বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১

প্রথম খণ্ড

রাজনৈতিক ইতিহাস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০০/ডিসেম্বর ১৯৯৩

শব্দগ্রন্থন : বীণাপাণি প্রেস, ১২/১এ বলাই সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পাদকের কথা

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) বিদ্বৎ সমাজে আদৃত হয়েছে। এর প্রথম সংস্করণ (শোভন ও সুলভ) নিঃশেষিত হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। গ্রন্থের ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আগে শুরু হওয়ায় এর বাংলা ভাষ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটেছে এবং এর ফলে বাজারে বেশ কিছুকাল বইটি অপ্রাপ্য ছিল। এজন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও সম্পাদকীয় পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বর্তমান সংস্করণটি আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যেসব দিক অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে বা মোটেই আলোচিত হয় নি সেগুলি বর্তমান সংস্করণে নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেসব লেখা পুনরাবৃত্তিমূলক বা কম প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে বেশ কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করে আরো সাবলীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যেসব লেখক, পর্যালোচক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব পণ্ডিতের লেখা প্রত্যাহার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আমরা সবাই ক্ষমাপ্রার্থী।

মোট ৫১ জন পণ্ডিতের ৬৪টি লেখা নিয়ে বর্তমান সংস্করণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন খণ্ডের এ সুবিশাল গ্রন্থ কতটুকু অবদান রেখেছে এর মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত গ্রন্থটি সুধি সমাজে সমাদৃত আছে বলে মনে হয়। এটা গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত সকলের সাফল্য বলতে হবে।

বর্তমান সংস্করণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল, প্রকাশনা কমিটি ও গ্রন্থের সম্পাদনা কমিটির কাছে। তবে এ সংস্করণ প্রকাশনায় যিনি সর্বাধিক সময় দিয়েছেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য নিজ উদ্যোগেই দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন প্রকাশনা কনসালটেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি আমার নিজের কাজকে বহুলাংশে সোজা করে দিয়েছেন। তার প্রতি আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার অপারেটর জুলফিকার আলী ভূট্টো ও দেলোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভূট্টো অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এশিয়াটিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল হাই ও কামরুল হাই বইটি যেন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য সব সময় তৎপর ছিলেন। গ্রন্থের সহ সম্পাদক অধ্যাপক সাজাহান মিয়া তার কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সম্পাদনা পর্ষদ

১

রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

সিরাজুল ইসলাম*

১৭০৪ সালে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।[১] এ ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে, এর ফলে বিগত শত বর্ষে মুগল রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল তার অবসান ঘটে। মুগল সেনাবাহিনী, সুবাদারি প্রতিষ্ঠানাদি, আমির-ওমরাহ, প্রশাসনিক শ্রেণী, বিপুল আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল তার অবলুপ্তি ঘটে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে।[২] পূর্ব বাংলা পরিণত হয় মুগল সাম্রাজ্যের এক অবহেলিত প্রান্তিক অঞ্চলে। অপর দিকে, ঢাকার ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন মহানগরী হিসেবে আবির্ভূত

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানী স্থানান্তরের কাজ হঠাৎ করে সংঘটিত হয় নি। বাংলার সুবাদার যুবরাজ আজিমুদ্দিনের (আজিম-উশ-শান নামে সমধিক পরিচিত) সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে মতৈক্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়ে দীউয়ান মুর্শিদকুলী খান (পূর্ব নাম কারতালাব খান) ১৭০২ সালে তাঁর দীউয়ানি দপ্তর মকসুদাবাদে (মুর্শিদকুলীর পরবর্তীকালে এর নাম হয় মুর্শিদাবাদ) সরিয়ে নেন। আজিম-উশ-শান ১৭০৩ সালে তাঁর দপ্তর জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে পাটনায় স্থানান্তরিত করার জন্য সম্রাটের নির্দেশ পান। ১৭০৪ সালে এই স্থানান্তরকরণ সম্পন্ন হয়। দেখুন, Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, (Dhaka 1964), 17

২. মুগল আমলের ঢাকা সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য কতিপয় উত্তম সহায়ক গ্রন্থ হচ্ছে : Sharif Uddin Ahmed, *Dacca—A Study in Urban History and Development*, (London 1986), Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka : Past Present Future*, (Dhaka 1991), A. H. Dani, *Dacca* (2nd ed. Dhaka 1962), S. M. Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, (Dhaka 1952); Charles D'Oyly, *Antiquities of Dacca*, (London 1824-30), Sayid Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca*, (Dhaka 1912).

হয় মুর্শিদাবাদ।[৩] অতএব, ১৭০৪ পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ তারিখ। স্বাধীন নবাবি যুগেরও গোড়াপত্তন হয় এই সনে, যখন দীউয়ান মুর্শিদকুলী খান সুবা বাংলার প্রকৃত স্বায়ত্তশাসকে পরিণত হন। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক কাল হিসেবে ১৭০৪ একটি যুক্তিসঙ্গত মাইলফলক। এই গ্রন্থের সমাপ্তি ১৯৭১ সালে, যখন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়পর্ব শুরু হয়।

নবাবি আমল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রধান প্রধান ধারা-প্রবণতাগুলো সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ বর্তমান গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঠারো শতককে সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায়—এর প্রথমার্ধে নবাবি শাসনের উত্থান ও বিকাশ এবং দ্বিতীয়ার্ধে নবাবি শাসনের পতন এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা। গোটা উনিশ শতক ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের উন্মেষপর্ব। বিশ শতকের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন, শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অবনতি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং পরিশেষে বাংলা ও ভারত বিভাগ।[৪] বিভাগোত্তর যুগের রাজনীতির লক্ষণীয় দিক হচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বদলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় এবং চূড়ান্ত পরাজয় ছিল আসলে মুসলিম জাতীয়তাবাদেরই পরাজয়। বাঙালি জাতীয় সত্তা সংরক্ষণের প্রতিজ্ঞা প্রথম প্রকাশ পায় ভাষা আন্দোলনে ও মুসলিম লীগের পরাজয়ে এবং সবশেষে ছয় দফা আন্দোলনে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে বাংলার অর্থনীতি আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ছিল বেশ সচ্ছল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে তখন বাংলাদেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সে উঠতি অর্থনীতি অধোগতি লাভ করে পলাশীর

---

৩. রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরিত হলেও ঢাকা গৌড় বা রাজমহলের রূপ পরিগ্রহ করে নি। বরং পূর্ব ভারতের প্রধান অভ্যন্তরীণ ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে ঢাকা তার ভূমিকা অব্যাহত রাখে। সকল বিদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানি ঢাকাতে তাদের ব্যবসাকেন্দ্র চালু রাখে এবং বিচারকাজ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য মুগল সরকার ঢাকায় যথাক্রমে একজন ফৌজদার ও একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত রাখে। নির্বাসিত ব্যক্তিগণসহ রাষ্ট্রীয় ভাতাপ্রাপ্ত মুগল অভিজাত শ্রেণীর বহু সদস্য সেসময়ে ঢাকায় বসবাস করতেন। সরকারি দপ্তর ও স্থাপনাসমূহ উঠে যাওয়ার দরুন ঢাকা যদিও বেশ কোনঠাসা হয়ে পড়ে, তথাপি বাংলার অন্যান্য রাজধানী শহরগুলো পূর্বে প্রায় অনুরূপ অবস্থার চাপে যেভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল, ঢাকা তাদের ভাগ্য বরণ করে নেয় নি। আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Sharif Uddin Ahmed (ed.) *Dhaka : Past Present Future*

৪. রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ও এর ফলাফল বিষয়ে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম হচ্ছে : David Page, *Prelude to Partition : The Indian Muslims and the Imperial System of Control*, (Delhi 1982); Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, (Dhaka 1987); and C. H. Philips and M. D. Wainwright (ed.), *The Partition of India, Policies and Perspectives 1935-1947*, (London 1970).

পর থেকে। পলাশীর পূর্বে বাংলাদেশ ছিল একটি বিরাট রপ্তানিকারক দেশ। এ দেশের রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদান করেছে বৃটেনসহ পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল নৌ-বাণিজ্যের দেশ। কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলার অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়। ইংরেজদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন নীতির ফলে অর্থনীতি এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে যে ১৭৬৮ সনের পর ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে, লোকশক্তির অভাবে কৃষিক্ষেত্র জঙ্গলে পরিণত হয়। ১৮২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিশ্ববাজার থেকে বিদায় নেয় এবং আমদানিকারক দেশ হিসেবে বৃটিশ সাম্রাজ্য-অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত হয়।

কোন দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যখন এমন ওলটপালট ঘটে, তখন এর প্রভাব থেকে সে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি মুক্ত থাকতে পারে না। নবাবি আমলে দেশে একটি নব্য অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সদস্য ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। নবাবি আমলের আমলাতন্ত্রে, ভূমি নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমান, বিশেষকরে স্থানীয় মুসলমানের অংশ ছিল নামেমাত্র। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে নতুন রাষ্ট্রকাঠামোতে নবাবি আভিজাত্যের অস্তিত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অতএব, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে নবাবি আভিজাত্যের পতন ঘটে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়ে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। গড়ে উঠে নতুন সমাজব্যবস্থা। কিন্তু কোন্ সে ব্যবস্থা? রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই যে ব্যাপক পরিবর্তন, এর সঠিক সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন দরকার, নচেৎ যেসব ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তন বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

দুই

স্পষ্টত, নবাবি যুগে বা প্রাক-নবাবি যুগে যদিও বাংলাদেশ ছিল, কিন্তু আধুনিক অর্থে কোন বাঙালি জাতি ছিল না। তখন আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্ববাদী, জাতীয়তাবাদী নয়। দেশের অধিনায়ক নিজেকে তখন বাংলা বা ভারতের রাজা বলে গণ্য না করে বরঞ্চ বিশ্ববাদশাহ্ বলে গণ্য করতেন। তাঁদের উপাধি ছিল জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলমগীর, শাহ আলম ইত্যাদি। এসব উপাধির আক্ষরিক অর্থ বিশ্বরাজা। প্রকৃত অর্থে বিশ্বরাজা না হলেও মুগল বাদশাহদের মনোভঙ্গি ছিল বিশ্বজনীন। বাদশাহকে আনুগত্য প্রদান করলে বিশ্বের যে-কেউ তাঁর রাজ্যে বসবাস করতে পারতো, এমনকি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও লাভ করতে পারতো। মাড়োয়ারি পুঁজিপতি ফতেহ্ চাঁদ জগৎ শেঠ বা বিশ্বব্যাংকার উপাধি লাভ করেন বাদশাহের কাছ থেকে, কারণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফতেহ্ চাঁদের সাহায্য ও মুগল সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য বাদশাহকে প্রীত করেছিল। তেমনিভাবে পলাশীবিজেতা রবার্ট ক্লাইভ বাদশাহের কাছ থেকে উপাধি পান 'সাবুদ জং' অর্থাৎ সমরে শক্ত।[৫] বিদেশী হিসেবে পলাশী পরিবর্তনে

৫. Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal 1756-1775*, (Cambridge 1963), xii

ক্লাইভের ভূমিকাকে দিল্লীর সম্রাট কোন রকম বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করেন নি। সমকালীন বাঙালি অভিজাত শ্রেণীও তা মনে করে নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মুগল রাজ্যে অবস্থান করতে পারতো, আনুগত্য সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও লাভ করতে পারতো এবং এ দেশে আগমন-নির্গমন ও অবস্থানের জন্য কোন সরকারি পূর্বানুমতির প্রয়োজন ছিল না। এর জন্য বাদশাহ ও নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছিল যথেষ্ট। কুঠি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে এ দেশে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার সবাইকে শর্ত সাপেক্ষে ভূমি দান করা হয়েছে। দেশে বিদেশীদের এহেন অবস্থানকে মুগল সরকার কখনো এর সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ বা হুমকি স্বরূপ গণ্য করে নি।[৬] বাংলার বড় বড় বাজার ও গঞ্জগুলোতে বিদেশীরা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। সমকালীন অন্য কোন এশীয় দেশে বিদেশীদের এমন অবাধ বিচরণের অনুমতি দেয়া হতো না। যেমন, চীনে বিদেশীরা শুধু ম্যাকাও দ্বীপে ব্যবসা করতে পারতো, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করতে পারতো না। মুগল সরকারের বিশ্বজনীন নীতি দেশের জনগণের মধ্যেও ছিল বিদ্যমান। দেশের মানুষ তাদের স্বরূপ প্রকাশ করেছে ধর্ম, বর্ণ, জাতগোষ্ঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বাঙালি বা ভারতীয় জাতি হিসেবে নয়। শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির কথা জনগণ চিন্তা করে নি। তাদের চিন্তা ছিল, শাসক যেই হউন, তাদের ধর্ম, বর্ণ ও জীবনযাত্রায় কোন আঘাত না আসলে সে-শাসককে তাদের মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই। মুগল নবাবদের বিরুদ্ধে এ দেশবাসীর কোন আপত্তি ছিল না, কেননা তাঁদের অধীনে দেশের ধর্ম, বর্ণ, আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে নিরাপদভাবে, কোন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ছাড়াই। অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ ও সমাজব্যবস্থার নিরাপত্তা দিলে যেকোন বিদেশী শাসককে মেনে নিতে দেশবাসীর কোন অসম্মতি ছিল না। এক কথায়, সার্বভৌমত্ব ও জাতিসত্তার ব্যাপারে মুগল সরকার যেমন ছিল বিশ্বজনীন, দেশের জনগণও ছিল তেমনি।

আমরা যখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক এ দেশে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি আলোচনা করি, তখন মুগল সরকারের উদারনীতি এবং সরকারের প্রতি জনগণের মনোভঙ্গিটি অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। পনেরো শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূত্রপাত থেকেই পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন নৌ-শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে। কিন্তু ঐ সব উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল নব আবিষ্কৃত জনবসতিশূন্য জায়গায়। কোন একটি সভ্য সমাজকে পরাভূত করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম উদাহরণ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা বিজয়। এটা হয়তো

---

৬. সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজরা যে দীউয়ানি ফরমান লাভ করেছিল (১৭ আগস্ট, ১৭৬৫), তাতে বলা হয়েছে, "এই আনন্দময় মুহূর্তে জারি করা হলো আমাদের রাজকীয় ফরমান, যা অপরিহার্য আনুগত্যের দাবিদার এবং এই ঘোষণা অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও কর্মতৎপরতার সুবিধার্থে...আমরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দীউয়ানি...তাদেরকে বিনামূল্যে উপহারস্বরূপ প্রদান করলাম।" Ramsay Muir, *The Making of British India 1756-1858*, (Pakistan reprint 1969), 84.

সম্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে মুগল সরকার ও দেশের জনগণের বিশ্বজনীন মনোভঙ্গির কারণে। চীন সরকার বিদেশীদের দেশের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া দূরে থাক, ম্যাকাও দ্বীপ ছাড়া অন্য কোথাও অনুপ্রবেশ করতে দিত না। কিন্তু মুগল সরকার এবং জনগণ যেকোন বিদেশীর দেশে অবস্থানে, এমনকি তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রদানেও কোন আপত্তি করে নি।

মুগল সরকারের 'মুক্তদ্বার' নীতি ছিল এমনই উদার যে, পর্তুগীজ ও ইংরেজদের সঙ্গে নিয়মিত যুদ্ধ করার পরও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদেরকে দেশে অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে দীর্ঘ চার বছরকাল (১৬৮৬-৯০) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নৌ-যুদ্ধ করার পরও ১৬৯০ সালে মুগল সরকার কোম্পানিকে কলকাতায় বাণিজ্যবসতি স্থাপন করতে সনদ প্রদান করে এবং ১৬৯৮ সালে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—এ তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব প্রদান করে। অধিকন্তু ১৬৯৮ সালে কোম্পানিকে কলকাতায় দুর্গ স্থাপনের অধিকার পর্যন্ত প্রদান করা হয়। মুগল রাজ্যের অভ্যন্তরে কলকাতায় গড়ে উঠে একটি সশস্ত্র ও স্বশাসিত বিদেশী বসতি। বিদেশীদের এহেন সুযোগ-সুবিধা প্রদান সমকালীন অন্য কোন প্রাচ্য দেশে ঘটে নি। প্রশ্ন উঠে, কেন বিদেশীদের এত সব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল ? যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে অবাধ বাণিজ্য এবং বিদেশী অভ্যাগতদের জন্য দেশকে উন্মুক্ত রাখা ছিল এ দেশের একটি রাজনৈতিক ঐতিহ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশীদের যোগদানের ফলে সরকার প্রভূত রাজস্ব লাভ করে। কিন্তু চীনের ম্যাকাও-এর মতো একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বিদেশীদের ব্যবসা করার অধিকার দিলে হয়তো সরকারি আয় কম হতো না। বিদেশী বণিকদের অবাধে দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদানের একটি বিশেষ কারণ হতে পারে এই যে, এর ফলে দেশের শাসক শ্রেণীর লোকেরা বিদেশীদের ব্যবসায় অংশী হয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারতো এবং পুঁজি বিনিয়োগ ছাড়াও বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে বিপুল অংকের পেশকাশ, নজরানা ও পুরস্কার গ্রহণ করতো। বিদেশী বণিকদের কাছে অতি উচ্চহারে সুদে টাকা লগ্নি করতেন স্থানীয় শাসকরা। এমনকি দেশের সুবাদার পর্যন্ত সুদে টাকা লগ্নি করতেন। সুবাদার শাহ শুজা, মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান বিদেশী কোম্পানিগুলিতে টাকা লগ্নি করেছেন এবং মোটা অংকের নজর ও পেশকাশের বিনিময়ে বিদেশীদের বসতি স্থাপনের অনুমতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন।[৭]

যুক্তি দেয়া যায় যে ১৭৬৫ সালে কোম্পানি যে রাজ্যের অধিকারী হয়, তা বস্তুত ১৬৯০ সনে স্থাপিত কলকাতা বসতিরই সম্প্রসারিত রূপ। এই ধরনের বিশ্লেষণ আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। তবে স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজদের মতো অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলোরও বসতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো কিন্তু রাজ্যে রূপান্তরিত হয় নি। বৃটিশ ছাড়া অন্যান্য বাণিজ্য কোম্পানিসমূহ বাংলায় বাণিজ্য ক্রমশ কমিয়ে বা স্থিতিশীল

৭. *History of Bengal*, Vol II, (Dhaka University 1948), 402; Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963), 3.

রেখে প্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড বিস্তার করে। অপরপক্ষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ বাংলায় বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে থাকে এবং এর সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে এ দেশের রাজনীতির প্রতি তাদের আগ্রহ। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে পলাশীর মাধ্যমে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্যের মূল কারণ ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, যে যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স বিশ্বে তাদের স্ব স্ব আধিপত্য কায়েমে মেতে উঠেছিল। তাঁদের মতে পলাশীর যুদ্ধ ছিল সপ্তবর্ষ যুদ্ধের একটি প্রাচ্য অঞ্চলীয় লড়াই। এ লড়াইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গে ফরাসীদের প্রভাব নস্যাৎ করা। পলাশী ঘটনার ফলে ইংরেজের এ উদ্দেশ্য চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছিল।

বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পটভূমি হিসেবে এসব ব্যাখ্যার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। আন্তঃসামুদ্রিক যোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় আঠারো শতকে। এর ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ একে অপরের উপর এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে এক দেশের ঘটনা আরেক দেশের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন. বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এর প্রভাব অচিরেই অনুভূত হতো লন্ডন, প্যারিস, আমস্টার্ডাম বা অন্য সব দেশে, যারা বাংলাদেশের পণ্য আমদানি করতো। এই প্রভাবের ধরন ছিল পণ্য সরবরাহে অপ্রতুলতা এবং অবশ্যম্ভাবী মূল্যবৃদ্ধি। দুর্ভিক্ষের ফলে উৎপাদনব্যবস্থা ব্যাহত হতো এবং এর প্রভাব থেকে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যরত কোন দেশই রেহাই পেতো না। এমনিভাবে ইউরোপেও কোন যুদ্ধবিগ্রহ বাধলে বা সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে কোন বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হলে এর প্রভাব অল্পকালের মধ্যেই বাংলার অর্থনীতিতে অনুভূত হতো। হাট-বাজার-গঞ্জে চাহিদা হ্রাস পেতো এবং এর ফলে বাজারমূল্যে নিম্নগামী প্রবণতা দেখা দিত। একদিকে লন্ডনে যেমন ঢাকা-মুর্শিদাবাদের মহাজনদের উচ্চ সুদের হার সম্পর্কে আলোচনা হতো, তেমনি এ দেশের ব্যবসায়ী মহলেও আলোচিত হতো বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাংলার রপ্তানিপণ্যের উপর উচ্চ শুল্কহার আরোপের কথা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এহেন পারস্পরিক সম্পর্ক যেখানে এত ঘনিষ্ঠ, সেখানে শুধু ইংরেজদের কলকাতা বসতিকে এককভাবে পলাশী ঘটনার জন্য দায়ী করা যায় না। আমাদের ধারণা, পলাশী যুদ্ধের কারণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মুর্শিদাবাদ দরবারের রাজনীতি। এই যুক্তির কিছু ব্যাখ্যা দরকার। আধা-স্বাধীন নবাবি শাসনের *একটি লক্ষণীয় দিক ছিল প্রশাসনিক কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।* সুবাদারি যুগে সুবা বাংলার প্রধান প্রধান পদগুলির কর্মকর্তা সরাসরি নিযুক্ত হতেন বাদশাহ কর্তৃক এবং বাদশাহের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হতো। তাছাড়া সুবা-সরকারের অন্যান্য পদ পূরণের জন্য ইরানী-তুরানী অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশক্রমে এ দেশে এসে প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের উপরি অংশ দখল করতো।[৮] এই ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে নবাবি আমলে। মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে দেশী হিন্দু অভিজাত

৮. আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Paramatma Saran, *The Provincial Government of the Mughals 1526-1658*, (Allahabad 1951).

শ্রেণীর ব্যক্তিকে নিয়ে উচ্চ আমলাতন্ত্র গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সূচিত হয়। নবাবি রাষ্ট্রকে শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য সরকার বিদেশীদের বদলে প্রশাসনে ব্যাপক হারে দেশী মুৎসুদ্দি নিয়োগনীতি গ্রহণ করে। নবাবের উপদেষ্টা পরিষদে শুজাউদ্দিন খানের (১৭২৮-৩৯) সময় থেকে দেশী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলে উচ্চ আমলা ও মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর লোক। ভূমি নিয়ন্ত্রণে জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নবাবি আমলে। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক শ্রেণীর ভূস্বামী রাজা-মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁরা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। এই পরিবর্তন ঘটেছে নবাবদের প্রত্যক্ষ সমর্থনেই।[৯]

মুর্শিদকুলী খান এবং তাঁর পরবর্তী নবাবদের অধীনে আরেকটি অতিশয় প্রভাবশালী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এরা হচ্ছে দেশের রপ্তানিবাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত বণিক শ্রেণী। দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্কিং থেকে এই বণিক শ্রেণী অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়।[১০] মুর্শিদকুলী খান এই নব্য ধনী বণিক শ্রেণীকে রাজ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি একটি বাণিজ্যিক অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলেন। এই বাণিজ্যিক অভিজাত শ্রেণী অধিকতর শক্তি লাভ করে নবাব সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী খানের আমলে।[১১] শিক্ষা ও সম্পদে বণিকরা ছিল সনাতন মুগল অভিজাত শ্রেণীর চেয়ে অধিক অগ্রসর এবং চরিত্রগতভাবে ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুরূপ। ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো সদ্য উত্থিত বঙ্গীয় ধনাঢ্য শ্রেণীও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অধিক ভূমিকা পালনের প্রয়াস পায়। ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে এই শ্রেণী প্রয়োজনে সনাতন অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে আঁতাত করে। এই আঁতাতের মাধ্যমেই তারা প্রথম সরফরাজ খানকে উৎখাত করে শুজাউদ্দিন খানকে মসনদে বসায় এবং পরে আলিবর্দী খানকেও অনুরূপভাবে ক্ষমতা অর্পণ করে। এমনিভাবে নব্য বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল রাজনির্মাতার ভূমিকা পালন করতে করতে তাদের ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের মতো হয়তো একদিন সামরিক আভিজাত্যের পতন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ সুগম করতে পারতো। কিন্তু এই সম্ভাবনা তিরোহিত হয় ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের ফলে। বাণিজ্যিক-প্রশাসনিক এলিট শ্রেণী কি পূর্বে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে ইংরেজকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ালে একদিন এদের হাতে তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে? এলিট শ্রেণী কি বুঝতে পেরেছিল যে কোম্পানি আসলে এ দেশে রাজ্য কায়েমের প্রস্তুতি নিচ্ছে? বলাবাহুল্য যে এমন আশঙ্কা চক্রান্তকারীদের কারো মধ্যেই জাগে নি। সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এসে ওরা এ দেশে রাজ্য স্থাপন করতে পারে এমন

৯. Shirin Akhtar, *The Role of Zamindars in Bengal 1707-1772*, (Dhaka 1982)

১০. K. M Mohsin, *A Bengal District in Transition Murshidabad 1765-1793*, (Dhaka 1973), chapters 5 and 7

১১. Orme Mss—India VI, 1500-1502, এতে নবাব আলিবর্দী খানের আমলের মন্ত্রী ও মুৎসুদ্দিদের তালিকা বিদ্যমান।

ভাবনা কারো মধ্যেই জাগে নি। এর কারণ ইউরোপীয় ও বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে এদের নিদারুণ অজ্ঞতা। তবে প্রশ্ন হলো, সুবা বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার রোধ করা কি আদৌ সম্ভব ছিল ?

প্রশ্নটি ঐতিহাসিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুবাদারি আমলে সুবা বাংলা নিয়ন্ত্রিত হতো দিল্লী থেকে। প্রশাসনে বাঙালির ভূমিকা ছিল গৌণ। সুবার সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছে মুগল সামরিক আভিজাত্যের সদস্যরা। প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে বাঙালিদের দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, নবাবি প্রশাসনে যখন বাঙালিদের অন্তর্ভুক্ত করার নীতি গ্রহণ করা হয়, তখন শুধু হিন্দু এলিট শ্রেণী থেকে রাষ্ট্রীয় মুৎসুদ্দি-আমলা নিয়োগ করা হয়, স্থানীয় মুসলমানদের আগের মতোই প্রশাসন থেকে দূরে রাখা হয়। যেমন, আলিবর্দী প্রশাসনের উচ্চ আমলা-মুৎসুদ্দিদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল হিন্দু এলিট শ্রেণীর লোক, কিন্তু স্থানীয় মুসলমান একজনও না। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলায়ও ছিল একই চিত্র। জমিদার শ্রেণীর মধ্যে প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। বণিক শ্রেণীর মধ্যেও প্রায় সবাই ছিল হিন্দু।[১২] দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে দেশী মুসলমানদের দূরে রাখা কি নবাবদের সচেতন নীতি ছিল? প্রশ্নটির উত্তর থেকে পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের কিছু ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসতে পারে। যদি মনে করা হয়, নবাবই সচেতনভাবে স্থানীয় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালন থেকে দূরে রেখেছেন, তাহলে পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকে এককভাবে দায়ী করা যাবে না। তখন ঐ বৈষম্যের শেকড় খুঁজতে হবে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে। হান্টারের বক্তব্য ঠিক নয় যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশের মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আসলে বঞ্চিত হয় হিন্দু এলিট শ্রেণী, যারা ছিল নবাবি শাসনের বড় সুবিধাভোগী শ্রেণী। তবে ঔপনিবেশিক যুগের নব্য অভিজাত শ্রেণী উচ্চবর্ণের হিন্দু হওয়ায় পুরানো হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর পতনের ঘটনাটি এতটা সাড়া জাগায় নি যতোটা মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর পতন চোখে পড়েছে।

তিন

লক্ষণীয় যে প্রাচ্যদেশে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ বাণিজ্য পরিচালনা করেছে সামুদ্রিক উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বাণিজ্যবসতি থেকে। সমুদ্র ছিল এদের সাধারণ মাধ্যম। স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে এরা কখনো মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেলায়। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম বাণিজ্যবসতির সীমানা অতিক্রম করে এ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। অথচ এ ধরনের রাজ্য স্থাপনের কোন পূর্বপরিকল্পনা বৃটিশ সরকার বা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কেউই করে নি। সমকালীন রাজনৈতিক ও

১২. M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, (Karachi 1967), Vol. 2, 168-174. এই গ্রন্থে বিভিন্ন পদ এবং পদাধিকারীর তালিকা স্থান পেয়েছে।

ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বৃটিশ সরকারের প্রাচ্যে কোন রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না, আর এহেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাণিজ্যিক দিক থেকে কোম্পানির জন্যও ছিল অলাভজনক। বস্তুত পলাশী যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির বাংলা-বাণিজ্য ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যদিও প্রাক-পলাশী যুগে কোম্পানির ব্যবসা পরিচালিত হয়েছে অত্যন্ত লাভজনকভাবে। তথাপি কেন কোম্পানি রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করলো ? পণ্ডিতগণ প্রায় সবাই একমত যে বাংলায় রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে আসলে কোম্পানির ভারত মহাসাগরীয় কর্মকর্তাবৃন্দ। নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রসারের জন্য ঐ কর্মকর্তারা এ দেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। রাতারাতি ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তারা এখানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রয়াস পায়। তাদের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। তারা সবাই অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল। বৃটেনে এই হঠাৎ ধনকুবেরদের বলা হতো 'নবব'। কিন্তু বাংলার ভাগ্যে কি ঘটলো ? 'নবব'দের অত্যাচার, শোষণ, লুটপাটের ফলে তিন দশকের মধ্যে বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়। জগৎ শেঠ পরিবার সহ সকল ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কিং পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে; রাজা-মহারাজা-জমিদার সমাজে ধস নেমে আসে, নবাবি যুগের সৈন্য, আমলা-মুৎসুদ্দিরা বেকারে পরিণত হয়। বেশি রাজস্ব আদায়ের লোভে দেশের জোত-জমি সব নিলামে বন্দোবস্ত করা হয়। রায়তের উপর নিলামদারেরা চালায় লাগামহীন অত্যাচার। সংস্কারের অভাবে রাস্তা, সেতু, হাট ও বাজার-গঞ্জগুলি এক করুণ রূপ ধারণ করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্র-শিক্ষানবিশশূন্য হয়ে পড়ে। ঘন ঘন আকাল-দুর্ভিক্ষের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের কৃষি ও শিল্পের উপর। যে বাংলা ছিল সমকালীন বিশ্বের একটি অন্যতম ধনী দেশ, সে দেশ কোম্পানির দুঃশাসনের ফলে তিন দশকের মধ্যেই দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়।

কোম্পানির এই লুটপাটের নায়ক ছিল এর কর্মকর্তারা। সমকালীন ধীর যোগাযোগব্যবস্থার কারণে এরা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং বৃটিশ সরকারকে অনবহিত রেখে এই নির্মম লুটপাটের বেসাতি চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া সমকালীন বৃটিশ জনমত ছিল ভারত সম্পর্কে অতিশয় উদাসীন। অমানবিক অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং সীমাহীন দুর্নীতি অবলম্বনের দায়ে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিচার হয়েছিল বৃটিশ পার্লামেন্টে। ঐ বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে এডমান্ড বার্কের বক্তৃতা, যুক্তি-তর্ক এতই মর্মস্পর্শী ছিল যে সেগুলি রীতিমতো উঁচু মানের সাহিত্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সে সাহিত্য সমকালীন বৃটিশ জনমতকে সামান্যই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। ভারত বিষয় সম্পর্কে বৃটিশরা ছিল নির্বিকার, নিরাসক্ত। ওদের ঔদাসীন্য ছিল এতই চরম যে ভারত বিষয়ে আলোচ্যসূচি থাকলে পার্লামেন্টে কোরাম বজায় রাখাই ছিল ভার। ভারত সম্পর্কে পার্লামেন্টে এহেন অনীহা, দুই দেশের মধ্যে বিরাট দূরত্ব এবং পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে নানা কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর অবস্থান প্রভৃতির ফলে কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তারা লাগামহীন লুণ্ঠনের সুযোগ লাভ করে এবং সে সুযোগ এরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয়, এদের পাশবিক অত্যাচার, শোষণ ও লুণ্ঠন সম্পর্কে কোম্পানি আমলের ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ সবাই ছিলেন নিশ্চুপ, যদিও এরা পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের 'অত্যাচার' আবিষ্কার করেছেন এবং বর্ণনা দিয়েছেন ফলাও করে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনে প্রথম দৃশ্যমান পদক্ষেপ ছিল কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ (১৭৬৫)। তবে দীউয়ানি লাভের পরেও কোম্পানি এ দেশে রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল। দীউয়ানি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের রাজস্ব থেকে কোম্পানির ভারত ও চীন-বাণিজ্যের পুঁজি সংগ্রহ করা এবং এ দেশে পণ্য ক্রয়ের জন্য ইউরোপ থেকে রৌপ্য আমদানি বন্ধ করা। মোট কথা, একটি রাজ্য পরিচালনার জন্য কোম্পানি প্রস্তুত ছিল না। তাছাড়া, একটি প্রাইভেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল বৃটিশ শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী। অধিকন্তু, মুগল সরকারের সনদপ্রাপ্ত হয়ে এ দেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ তাদের সমকক্ষ ইংরেজ কোম্পানিকে শাসক হিসেবে মানতে যাবে কেন? এসব বাস্তব অসুবিধা বিবেচনা করে কোম্পানি সরাসরি দীউয়ানি শাসন পরিচালনা না করে মুগল প্রশাসনের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দীউয়ানি গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ নয়। অতএব ১৭৬৫ সালে দীউয়ানি লাভ করে ক্লাইভ এবং তাঁর সহযোগী ভেরেলস্ট যে প্রশাসনব্যবস্থা অনুসরণ করেন, তা ছিল মূলত মুগল প্রশাসনকাঠামো অক্ষত রেখে কোম্পানি কর্তৃক উপর থেকে শুধু সংগৃহীত রাজস্ব বুঝে নেবার নীতি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ পর্বকে বলা যায় ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসন। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করে দেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব হস্তগত করা, কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটানো এবং এ দেশের রাজস্ব দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করা। ১৭৭৩ সালের *রেগুলেটিং এ্যাক্ট* ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে কোম্পানির কর্মকাণ্ডে চরম অব্যবস্থা, ব্যবসায়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষতি এবং ১৭৬৯-৭০-এর মহাদুর্ভিক্ষ। কোম্পানি কর্তৃক এ দেশে একটি রাজ্য স্থাপন এর লক্ষ্য ছিল না।[১৩] সক্রিয়ভাবে এহেন রাজ্য স্থাপনের চিন্তা প্রথম করেছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংস-এর পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয় *পীট্স ইন্ডিয়া আইনে* (১৭৮৪)। এই আইনের অধীনে একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জন্য কার্যকরী একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের জন্য গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড কর্নওয়ালিসকে নিয়োগ করা হয়।

১৩. Preamble to the Regulating Act, 1773 এর পূর্ণ শিরোনাম হচ্ছে : *An Act for establishing certain Regulations for the better Management of the Affairs of the East India Company as well in India as in Europe*

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় কর্নওয়ালিস প্রশাসন (১৭৮৬-৯৩) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হবে এবং কিভাবে তা শাসিত হবে এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং বাস্তব পন্থা উদ্ভাবন করে কর্নওয়ালিস সরকার। ১৭৯০ সালে তিনি ৪২টি রেগুলেশন জারি করেন। সমগ্র প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার নীতিমালা নির্ণীত হয় উক্ত ৪২টি রেগুলেশনে। বৃটিশ বিচারব্যবস্থার আদলে তিনি একটি নিরপেক্ষ আদালত স্থাপন করেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

রাজস্ব শাসন ছিল কর্নওয়ালিস ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। দক্ষ ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সম্ভাব্যতা। অতএব কর্নওয়ালিস সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন ভূমিব্যবস্থার উপর। ১৭৮৬ সাল থেকে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর অবশেষে ১৭৯৩ সনে কর্নওয়ালিস *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত* নামে তাঁর বিখ্যাত ভূমিনীতি ঘোষণা করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সফল করা এবং সমুন্নত রাখার জন্যই প্রণীত হয় বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এসে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোগত পূর্ণতা লাভ করলো। যদিও ১৭৯৩ সনের পরও এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় নি, তবুও এহেন পদক্ষেপ ছিল নেহাতই একটি কূটনৈতিক চাল। ১৭৯৩ সাল থেকে কোম্পানিই যে ছিল এ দেশের সর্বময় কর্তা এ সম্পর্কে কোন দেশী বা বিদেশীর মনে সংশয় ছিল না। কর্নওয়ালিস তাঁর জাতির জন্য যে মহা অবদান রেখেছেন এর স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ জাতির কাছ থেকে লাভ করেছিলেন বীরের সম্মান। কিন্তু আমাদের বাঙালি জাতির দিক থেকে তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন কিভাবে করা যায় ?

ঐতিহাসিকভাবে কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থাসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশ হিসেবে বাংলার ছিল নিজস্ব রীতিনীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, যা হাজার বছর ধরে বাঙালি সমাজকে একীভূত রেখেছে, দিয়েছে ঐক্য ও একটি পরিচয়। কিন্তু কর্নওয়ালিস এই সমাজকে ভিন্নভাবে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছেন এবং এর জন্য তিনি প্রণয়ন করেন নতুন নতুন আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠান, যেসবের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত*। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে বহু পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল এবং ইপ্সিত পরিবর্তন যেন অবশ্যই আসে সে লক্ষ্যে কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেন একটি দক্ষ শ্বেতাঙ্গ প্রশাসন। তিনি প্রশাসনের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে দেশীদের উৎখাত করে ইউরোপীয়দের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইউরোপীয় প্রশাসকদের জন্য ধার্য হয় অতি উচ্চ বেতন। এহেন ব্যবস্থা থেকে কি রাজনৈতিক ফল আশা করা যেতে পারে সহজেই অনুমেয়। একটি দেশ যদি অন্য একটি দেশের স্বার্থে শাসিত হয়, এর সকল সম্পদ যদি ঐ দেশে পাচার করা হয় এবং যদি এর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে এই বিজিত জাতির চূড়ান্ত পরিণতি কি হতে পারে ?

কোম্পানি আমলের শেষ অব্দি প্রশাসন ছিল মহা বর্ণবাদী। শ্বেতাঙ্গদের নিয়ন্ত্রণে ছিল গোটা প্রশাসন। বর্ণবাদী নীতি অনুসরণে সুবাদারি শাসকদের চেয়ে কোম্পানি শাসকরা ছিল অনেক বেশি কট্টর ও নির্মম। সুবাদারি আমলে দেশীয়দের জন্য উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদ খোলা না থাকলেও সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে তাদের দূরে রাখা হয় নি। কিন্তু কোম্পানি আমলে অতি নিম্নবর্গের কায়িক বা আধাকায়িক কাজ ছাড়া বাকি সব প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে। নবাবি আমলে বর্ণবাদী নীতি অনুসৃত হয় নি। মুগল এবং দেশীয়দের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল নবাবি প্রশাসন। ক্লাইভ, ভেরেলস্ট, এমনকি হেস্টিংসও নবাবি নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্লাইভ আর্থিক ও রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন কোম্পানিকে মুগল শাসনকাঠামোর অঙ্গ হিসেবে রেখে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে কোম্পানি কর্তৃক সম্রাটের অনুগত দীউয়ান হিসেবে অবস্থান নেবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।[১৪] ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসন (১৭৬৫-৭২) ক্লাইভের সৃষ্টি। স্থানীয় শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজদের উঠাবসা ও লেনদেন একদিনের নয়। পলাশীর শত বছর আগে থেকেই ইংরেজরা এ দেশে ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু করে। স্থানীয় বণিক ও আমলা শ্রেণীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বানিয়া ও মহাজন শ্রেণীর লোকেরা কোম্পানির ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করে। কোম্পানি ও দেশী বানিয়া-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকাল আদানপ্রদানের ফলে এদের মধ্যে পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইংরেজদের প্রতি পলাশীর চক্রান্তকারীরা আস্থাশীল ছিল বলেই তো এদের চক্রান্তে কোম্পানিকে জড়ানো হয়েছিল। ইতিপূর্বেও নবাব বদলের চক্রান্ত হয়েছে। শুজাউদ্দিন খান এবং আলিবর্দী খান চক্রান্তের মাধ্যমেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু তখন কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য চাওয়া হয় নি। কিন্তু পলাশী চক্রান্তে কোম্পানি জড়িত হয়েছে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার ব্যাপারে কোম্পানি ও দেশী কুচক্রীদের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বানিয়া-মুৎসুদ্দিরা পলাশী পরিবর্তন এনেছিল নিজেদেরকে ইংরেজের অধীন করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এদের অভিলাষ ছিল মুর্শিদাবাদ দরবারে নিজেদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সে লক্ষ্যেই তারা কোম্পানির সহযোগিতা কামনা করেছিল। এমনকি চক্রান্তকারীরা কোম্পানির সঙ্গে সমভিত্তিতে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতেও প্রস্তুত ছিল। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে মুগল শাসনতন্ত্রে বিদেশীদের ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত করা মুগল ঐতিহ্যের পরিপন্থী ছিল না। উচ্চাভিলাষী আমির, বানিয়া-মুৎসুদ্দি ও জমিদারেরা সম্মিলিতভাবে সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে মেতেছিলেন তাদের নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সুবাকে ইংরেজ রাজত্বের অধীনস্থ করার জন্য নয়। অপরদিকে কোম্পানি স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে মূলত অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিযোগীদেব বাংলা বাণিজ্য থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। প্রতিযোগীদের সরিয়ে ইংরেজের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন নবাবের অধীনে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে আনা ছিল রবার্ট ক্লাইভের লক্ষ্য। অতএব, যতোদিন ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নররূপে এ দেশে

১৪. Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal*, 105

ছিলেন, ততোদিন তিনি ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসন অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেন। কোম্পানি ও নাবালক নবাবের পক্ষে সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান ছিলেন রাজ্যপরিচালক। ১৭৭২ সাল পর্যন্ত রেজা খান কোম্পানি ও নবাবের প্রতিনিধিরূপে ক্লাইভের পরিকল্পনা অনুসারে রাজ্যশাসন পরিচালনা করেন।

কিন্তু রেজা খানের শাসন স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে ক্লাইভের প্রত্যাগমনের পর থেকে। ১৭৬৭ সনে প্রত্যেক জেলায় একজন করে ইউরোপীয় সুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে শুরু হয় দেশে সরাসরি কোম্পানিশাসন প্রবর্তনের প্রক্রিয়া। রেজা খানকে উৎখাত করার অজুহাত হিসেবে ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের কল্পিত কুফল নিয়ে কোম্পানি মহলে আলোচনা শুরু হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে রেজা খান প্রশাসনে অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ। অত্যাচার, অদক্ষতা ও দুর্নীতির দায়ে রেজা খানকে পদচ্যুত করার জন্য কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর কাছে সুপারিশ করা হয় এবং তদনুসারে ১৭৭২ সালে ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সরাসরি কোম্পানিশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

চার

মুগল রাজত্ব উৎখাত করে কোম্পানিরাজ্য প্রতিষ্ঠা একটি বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন বটে। কিন্তু এর প্রতি দেশের জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? কোম্পানিশাসনের প্রাথমিক যুগে বর্বরোচিত অত্যাচার, লুণ্ঠন ও শোষণ, ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের অবসান করে একটি শ্বেতাঙ্গ সরকার স্থাপন, পশ্চিমা মডেলের বিচার ও ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন, কৃষকের অধিকার বিলুপ্তি প্রভৃতি ঔপনিবেশিক কার্যকলাপ নিশ্চয়ই দেশের সনাতন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর চরম আঘাত হেনেছিল, ওলটপালট করে দিয়েছিল সকল প্রচলিত প্রতিষ্ঠানাদিকে। স্বাভাবিক কারণেই অনুধাবন করা যায় যে ভুক্তভোগী গোষ্ঠীসমূহ কোন না কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কি ছিল সে প্রতিক্রিয়া? এ প্রতিক্রিয়ার সমীক্ষা থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে কালান্তর যুগের রাজনীতির ধারা ও প্রকৃতি। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ ও কোম্পানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগের দলিলপত্রাদি বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে হবে যে দেশবাসীরা নতুন প্রভুর শাসনে পরম সুখে কালাতিপাত করছিল এবং তারা বৃটিশ শাসনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল।[১৫] আসলে কি তা ঠিক? এই সব তথাকথিত দলিলদস্তাবেজ কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

সমকালীন সরকারি দলিলপত্র থেকে আমরা জানি কিভাবে মীর জাফর ইং অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের জন্য গোপনে কূট

১৫. ১৮০১ সালে সকল জেলা জজ ও কালেক্টরের কাছে একটি প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়। তাতে জেলা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, 'নেটিভ'রা নতুন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য পোষণ করে কি-না। উত্তরে সকল কালেক্টর, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট একবাক্যে জানান যে বৃটিশ শাসনের অধীনে এসে জনগণ অত্যন্ত সুখী বোধ করছে। দেখুন, *Civil Judicial Proceedings*, 8 July 1802, No 76, (India Office Records, — IOR)

তৎপরতা শুরু করেছিলেন এবং কিভাবে এই অপরাধে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত নবাব মীর কাশিমও অনুরূপভাবে ইংরেজের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য জীবনের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং বক্সারের যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর দেশত্যাগ করে অযোধ্যার এক অজানা স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। মহারাজা নন্দকুমারকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হলো, কারণ তিনি দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য নবাবের হয়ে বিদেশী শক্তিসমূহের সমর্থন আদায়ের জন্য গোপনে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছিলেন। রেজা খান আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ১৭৬৫ সালের ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, কিন্তু সে প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। ১৭৬৫ সাল থেকে একের পর এক যাঁরা নবাব হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই কোম্পানির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন এবং কোম্পানিকে অনুগত দীউয়ান হিসেবে আচরণ করার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এমনকি নবাবেরা বৃটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত দূত পাঠিয়েছেন কোম্পানির বিশ্বাস ও চুক্তিভঙ্গের সমস্যা তুলে ধরার জন্য। কোম্পানি কর্তৃক ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জগৎ শেঠ পরিবার বহু প্রতিবাদ করেছেন। সনাতন সরকারব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এসব তৎপরতা কখনো তলিয়ে দেখা হয় নি। অথচ এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা ছাড়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। একথা মনে করা মোটেই ঠিক হবে না যে ইংরেজরা সম্পূর্ণ বিনা বাধায় এ দেশে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন করেছে।

কোম্পানি রাজ্য কায়েম করেছিল মূলত রাজস্ব সংগ্রহের জন্য, এ দেশের রাজস্ব থেকে কোম্পানির বাণিজ্যপুঁজির ব্যবস্থা করতে। স্বভাবত ঔপনিবেশিক সরকারের প্রথম যোগাযোগ ঘটে জমিদারদের সঙ্গেই। বলাবাহুল্য, পলাশীর পটপরিবর্তনের সময় প্রধান জমিদারগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং ঐ পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা অবশ্যই বিশেষ সুবিধা লাভের প্রত্যাশা করেছিলেন। জমিদারদের সে প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছিল ? দেখা যায় যে দীউয়ানি লাভের পর থেকে কোম্পানি ক্রমাগত জমিদারদের উপর রাজস্বদাবি বৃদ্ধি করে চলে। পঞ্চসনা বন্দোবস্তকালে (১৭৭২-১৭৭৭) জমিদারি নিলামে চড়ানো হয়। জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই সর্বোচ্চ নিলামদার কর্তৃক উৎখাত হয়। পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপারেশনে জমিদার শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। একটি নতুন নিলামদার ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব হয় পুরাতন অভিজাত জমিদার শ্রেণীর ধ্বংসস্তূপের উপর।[১৬] এই সব ওলটপালটে ভুক্তভোগী জমিদার সমাজের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ? কোম্পানির রাজস্ব দলিলপত্রে বিপুল পরিমাণ আরজিপত্র পাওয়া যায়, যেগুলি সাক্ষ্য দেয় যে জমিদারগণ কোম্পানিশাসনাধীনে ছিল ভীষণ অসন্তুষ্ট। ঐসব আরজিতে জমিদারগণ প্রায়শই ক্ষোভের সাথে অভিযোগ করে যে তারা মুগল শাসনামলে ছিল সুখী ও সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু বৃটিশের অধীনে তারা অতি অসহায় এবং ধ্বংসের মুখোমুখি। আরজি ও আবেদন-নিবেদনে সহানুভূতি না পেয়ে অনেক জমিদার বিদ্রোহ

---

১৬. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal A Study of its Operation 1790-1819*, (Dhaka 1978)

ঘোষণা করে এবং কোম্পানিশাসন উৎখাতের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়। অবশ্য এসব বিদ্রোহ ছিল নেহাতই আঞ্চলিক এবং অতিশয় অসংগঠিত, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখানে কয়েকটি বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যায়, যেমন, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৯০), রংপুর কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৮৭), বরিশালে বলাকী শাহের বিদ্রোহ (১৭৯২), ময়মনসিংহে পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৩-১৮৩৩), তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১) ইত্যাদি।[১৭]

গৃহত্যাগী ফকির-সন্ন্যাসী ও সাধারণ রায়ত শ্রেণী শ্রেণীগতভাবে ভিন্ন হলেও ধর্মীয় কারণে এদের মধ্যে ছিল নিবিড় সম্পর্ক। সম্পর্কের ভিত্তি ছিল রায়তের পক্ষে মুষ্টিভিক্ষা দান ও ফকির-সন্ন্যাসীদের পক্ষে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন। কোম্পানিশাসনে ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল বিক্ষুব্ধ, কারণ সরকার এদের মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ বেআইনী ঘোষণা করে। এদিকে প্রতি বছর খাজনার হার বৃদ্ধির ফলে রায়তশ্রেণীও ছিল অসন্তুষ্ট। অতএব বৃটিশবিরোধী তৎপরতায় ফকির-সন্ন্যাসী ও রায়তের মধ্যে সংহতি থাকা স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য যে ১৮৫৭ সালের সিপাহি অভ্যুত্থানে গ্রামের মানুষ অভিজাত শ্রেণীর ডাকে সাড়া দেয় নি। এর মাত্র দু'বছর পর কৃষকরা ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে সমাজের অভিজাত ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঐ সংগ্রামে সংহতি ঘোষণা করে নি।[১৮] এই সব ঘটনা সমাজের শ্রেণীগত মেরুকরণেরই ইঙ্গিত দেয়। ১৮৭০-এর দশকের এবং পরবর্তীকালের ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ছিল সামাজিক শাসক শ্রেণী ও উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিতে পরম অরাজকতার লক্ষণ, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের ভয়াবহ ইঙ্গিত। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, "এই সব আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের কার্যকলাপে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা খুবই বিরল। যারা বিত্তবান, যাদের হারাবার কিছু আছে তারা এই অরাজকতার ঝুঁকি নিতে পারে না। যারা সর্বহারা, যাদের কিছুই হারাবার নেই, যারা অবিরাম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে রত, শুধু তারাই লড়াই করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে এবং দেখাচ্ছেও বটে।"[১৯] ভীতিবিহ্বল ভূস্বামী ও এলিট শ্রেণী কৃষক অসন্তোষকে মহাবিপজ্জনক গণ্য করেছিল সন্দেহ নেই। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় : "সামনের দিনগুলোতে আমাদের দেশের জন্য সব চেয়ে বড় বিপদ হবে কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন উদরজ্বালার, আর কোন আন্দোলনই এই উদর-আন্দোলনের চেয়ে বেশি মারাত্মক হতে পারে না।"[২০] উচ্চমধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল এতই

---

১৭. দেখুন, এই খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে সিরাজুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধ, "অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিদ্রোহ"।

১৮. কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, R Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, (New Delhi 1983)

১৯. A M Zaidi (ed), *Congress Presidential Addresses*, Vol. I (New Delhi 1986), 263

২০. ঐ, ৩৫৪।

বিশাল এবং গরিব জনগোষ্ঠী ছিল এমনই নেতৃত্ববিহীন যে কৃষক অসন্তোষ কখনো এর স্থানীয় গণ্ডি অতিক্রম করে কোন জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে নি। কারণ, অভাব ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। দেশে ও সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান কিছুটা কমে আসে বিশ শতকের দ্বিতীয় সিকিতে, যখন সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের দাবিদাওয়ার প্রতি উচ্চ শ্রেণীর রাজনীতিকরা অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। নির্বাচনী রাজনীতিতে ক্ষমতার মই জনসমর্থন, বৃটিশ রাজের অনুকম্পা নয়। অতএব সে মই শক্তভাবে নির্মাণ করার জন; প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রজামুখী কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং একই সঙ্গে গড়ে তোলে দলের কৃষক-প্রজা ফ্রন্ট। কৃষক-প্রজার সমর্থন লাভের জন্য শুরু হয় আন্তঃদলীয় প্রতিযোগিতা, তোলা হয় গণমুখী শ্লোগান—যেমন, 'লাঙ্গল যার জমি তার', 'সবার জন্য ডাল-ভাত, শক্ত কর প্রজার হাত', 'বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা বিলোপ কর', ইত্যাদি।

কোম্পানিশাসনের প্রাথমিক যুগে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা রয়েছে। আমরা জানি যে নবাবি শাসনের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু বানিয়া, মুৎসুদ্দি, বড় জমিদার এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক আমলাগোষ্ঠী। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে একটি সুসংগঠিত আমলা শ্রেণী গঠন নবাবি শাসনের অন্যতম সৃষ্টি। প্রশাসনযন্ত্রে হিন্দু আমলার অন্তর্ভুক্তি এত দ্রুত ঘটছিল যে নবাব আলিবর্দী খানের শাসনামলে হিন্দু আমলা শ্রেণী প্রশাসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রশাসনে হিন্দুদের অন্তর্ভুক্তি ছিল নবাবদের রাষ্ট্রনীতির একটি প্রশংসনীয় দিক। এতে প্রশাসনের সঙ্গে হিন্দুরা একাত্ম হতে পেরেছিল এবং হিন্দু-মুগল একত্রিত হয়ে নবাবি রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু নতুন রাষ্ট্র গঠনের এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মুসলমানদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় আভিজাত্য থেকে স্থানীয় মুসলমানদের দূরে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত স্থানীয় মুসলমান সমাজ স্বভাবতই হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। এটা সত্য যে নবাবি রাষ্ট্রের সামরিক ও বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হতো মুসলমান কর্তৃক, কিন্তু ঐ মুসলমানগণ ছিলেন অস্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থানীয় মুসলমানের অনুপস্থিতির একটি সনাতন ব্যাখ্যা এই যে শিয়া মতাবলম্বী নবাবগণ সুন্নী বাঙালি মুসলমানদের অবহেলার চোখে দেখতেন। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, রাজনৈতিক কারণে যদি হিন্দুদের প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা হলে একই কারণে স্থানীয় মুসলমানদেরও প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতো।

প্রশাসনে স্থানীয় মুসলমানদের প্রায় অনুপস্থিতির একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যোগ্য প্রার্থীর অভাব। যদি তাই হয়, তবে আবার প্রশ্ন উঠে, যোগ্য লোকের অভাব কেন? শত শত বছরের মুসলিম শাসন কি তা হলে স্থানীয় মুসলমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কোন অবদান রাখে নি? স্থানীয় মুসলমানদের মনীষা উন্নয়নে পদক্ষেপ না নেয়া কি মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর কোন সচেতন নীতি ছিল? নবাবি শাসনের আগেই দেশের ভূমিনিয়ন্ত্রণ হিন্দুদের হাতে চলে যায়। এই অবস্থা আরো মজবুত হয় নবাবি যুগে। বিশেষকরে, রাজা-

মহারাজা উপাধিধারী বড় বড় হিন্দু জমিদার পরিবারগুলি ছিল নবাবদেরই সৃষ্টি। অনুরূপভাবে, নবাবি শাসনের অনেক আগে থেকেই মধ্য ও নিম্ন স্তরের সরকারি পদগুলি সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। নবাবি যুগে এসে তারা আরো সুবিধা লাভ করে এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রায় গোটা অংশই তারা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, হাট-বাজার সবই চলে আসে হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, মুসলমান আমলে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় ছিল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের চেয়ে অনেক পশ্চাৎপদ।

সংক্ষেপে এ কথাই বলতে হয় যে, নবাবি যুগে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় মুগল ও এলিট হিন্দুদের মধ্যে। সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন যখন শুধু শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত হয়, তখন এর ভুক্তভোগী ছিল মুগল ও হিন্দু এলিট শ্রেণী। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ছিল এক প্রভু থেকে অন্য প্রভুর অধীনে বসবাস। হারাবার মতো তাদের কিছুই ছিল না। হিন্দু অভিজাত আমলা শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়ে গুরুত্বহীন অবস্থায় নিপতিত হয়। অর্থনৈতিক অঙ্গনে মহা জগৎ শেঠ পরিবারসহ সকল ধনিক-বণিক নিঃস্ব হয়ে পড়ে। দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ইউরোপীয় এজেন্সি হাউজগুলি।[২১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বেশ আগেই জমিদার শ্রেণী আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই বন্দোবস্তের চাপে বহু জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। এদের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে বেশির ভাগই ইজারাদার ও নিলামদারের কাছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত সব মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পরও ভুক্তভোগীরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে মেনে নেয়। অবশ্য ভুক্তভোগী অভিজাতদের মধ্যে অনেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ ছিল নেহাতই মৃদু ও মুষ্টিমেয় লোকের। আরজি-আবেদন করে তারা নতুন রাষ্ট্রসৃষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে তারা বৃটিশ শাসনের প্রতি অনানুগত্য প্রকাশ করেন নি।

কিন্তু বৃটিশ শাসনের অন্যায়-অবিচারসমূহ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন সাধারণ কৃষক শ্রেণী। অধিকার আদায়ের জন্য রায়ত বা কৃষক শ্রেণী প্রয়োজনে সশস্ত্র আন্দোলনসহ সব রকম কলাকৌশল প্রয়োগ করে। পাবনা কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩), তুষখালী কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৫) ও ফরায়জী আন্দোলন ১৮৮০-এর দশক থেকে সরকারের উদার নীতি অবলম্বনের পটভূমি তৈরি করেছে। অথচ ঐ সব প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রাক্তন অভিজাত শাসক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল অতি গৌণ বা অনুপস্থিত। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই অভিজাত শাসক শ্রেণীকে পর্যুদস্ত করেছিল। কিন্তু আঞ্চলিক কৃষক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে সব সময়েই সমঝোতার পথ বেছে নিতে হয়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, গ্রামীণ কৃষক সমাজ ছিল একটি ভিন্ন জগত। এদের ছিল নিজস্ব রীতিনীতি, রেওয়াজ, বিশেষ অধিকার ও দায়দায়িত্ব। এগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করতো গ্রামীণ সমাজ।

২১. K M Mohsin, *Murshidabad*, 262

গ্রামীণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ আসলে তা প্রতিহত করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে নি। আক্রমণকারী জমিদার বা সরকার যেই হোক না কেন, অধিকার সংরক্ষণে কৃষকরা ছিল অকুতোভয়, অবিরাম সংগ্রামী। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৮৭) হতে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ ভাগের দেশব্যাপী ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। কিন্তু এই সব বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্র-রায়ত সম্পর্কের উপর ঐতিহাসিকগণ এ পর্যন্ত খুব কমই আলোকপাত করেছেন। অধুনা নিম্নবর্গের উপর গবেষণায় বিশেষ ভূমিকা রাখছেন এক শ্রেণীর পণ্ডিত, যাঁরা নিজেদেরকে 'সাবালটার্ন' বা নিম্নবর্গের পণ্ডিত বলে অভিহিত করেন। 'নিম্নবর্গের' পণ্ডিতগণ গবেষণাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন সন্দেহ নেই।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণী অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু পরম সুবিধা লাভ করেছিল নব্য বাবু শ্রেণী। পড়ন্ত অভিজাত শ্রেণী ছিল নতুন শাসন সম্পর্কে সমালোচনামুখর, কিন্তু নব্য আমলা শ্রেণী ছিল অত্যধিক অনুগত ও উদ্দীপ্ত। কালান্তর যুগের ওলটপালটের মধ্যে পুরাতন শাসক শ্রেণী তলিয়ে গেলেও নব্য বাবুরা লাভ করেছিল অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা। অতএব বৃটিশের প্রতি এদের অনুরাগ ছিল অসীম। কিন্তু এই অত্যুৎসাহী শ্রেণীর ব্যাপ্তি ছিল কলকাতাভিত্তিক কতিপয় বানিয়া পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে ১৭৯৩ সনে কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর নতুন নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, যেমন উকিল, মোক্তার, মুনসেফ, কালেক্টরেট আমলা, শহুরে বাড়িওয়ালা ও সরবরাহকারী, নতুন জমিদার, ইজারাদার, মধ্যস্বত্বভোগী ইত্যাদি। ১৮৩০-এর দশকে ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে দেশী লোকদের নিয়োগনীতি গ্রহণের ফলে একটি প্রশাসনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশ লাভ করছিল। এদিকে সরকারি বৃত্তের বাইরেও কতিপয় সেক্টরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছিল, যেমন, নৌ-পরিবহন, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য, অর্থকরী ফসলের বাজার ইত্যাদি। সদ্য উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত সমালোচনামুখর। এদের দৃষ্টিতে বৃটিশ শাসন ছিল এ দেশবাসীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বৃটিশভক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরা এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থান থেকে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থানের লোক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্বে ইংরেজদের সান্নিধ্যে এসেছে বানিয়া শ্রেণী এবং এরাই আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন করে। নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় বণিক শ্রেণীর অবস্থান দুর্বল হয়ে যাওয়ায় অনেকে ব্যবসা থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে ভূমিতে বিনিয়োগ করে। ভূমি নিয়ন্ত্রণে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ এনে দেয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। 'সূর্যাস্ত আইন'-এর আওতায় বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় এবং এর অধিকাংশই ক্রয় করে প্রাক্তন জমিদারি আমলা ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম পুরুষ ঐ নিলামদার ভূস্বামীগণ। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সৃষ্টি হয় জেলা ও প্রদেশভিত্তিক অফিস-আদালত, উকিল-মোক্তার, জেলাভিত্তিক শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মফস্বল শহর ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

নগরভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিমা কায়দায় নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। সনাতন নিয়মে ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সংগঠন পরিহার করে নব্য মধ্যবিত্তরা শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক সভা-সমিতি ও সংগঠন গড়ে তুলতে তৎপর হয়। এসব সজ্ঞের একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল বৃটিশ জাতি ও বৃটিশ শাসনের প্রশংসা করা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। পত্র-পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতির মাধ্যমে এরা পাশ্চাত্য চিন্তা, জীবনধারা অনুকরণ দ্বারা দেশের স্থবির অবস্থার মধ্যে গতি সঞ্চারের চেষ্টা করে।[২২] পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধীকল্প (ideas) দ্বারা অনেকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে তারা প্রায় অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়গান করতে থাকে। তথাকথিত 'নব্য বাংলা' (Young Bengal) নামে এক যুবগোষ্ঠী প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি এমন বৈরী হয়ে উঠে যে এদের চোখে যা-কিছু প্রাচ্য সবই জড় এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য ঠেকতো। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পক্ষে এদের অন্ধ অনুকরণকে অনেকে ভুল করে বাংলার জাগরণ বা রেনেসাঁ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আসলে নব্য বাংলাদের এই আচরণ ছিল রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রয়াস, রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি নয়। প্রত্যাখ্যাত জমিদার ও ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণী, ওহাবী, ফরায়জী এবং অন্যান্য প্রতিরোধকারীরা কখনো বৃটিশ শাসনকে স্বীকৃতি দেয় নি। তাদের দৃষ্টিতে ফিরিঙ্গি শাসন ছিল অবৈধ এবং এই অবৈধ শাসন উৎখাতের জন্য তারা ছিল তৎপর, যদিও অত্যন্ত অসংগঠিতভাবে। তাদের প্রতিরোধ তৎপরতাকে রাজনৈতিক অসচেতনতা বা পশ্চাৎপদতা বলে আখ্যায়িত করা নিতান্তই একপেশে সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে ইংরেজ এবং তা অন্ধভাবে গ্রহণ করেছে ইংরেজপন্থী পাশ্চাত্য শিক্ষিত পেশাদার শ্রেণী। ফিরিঙ্গি প্রতিরোধকারী সনাতন জাতীয়তাবাদীদের বড় জোর অবাস্তব পরিকল্পনাকারী বলা যেতে পারে, কিছুতেই তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ বা অসচেতন বলা যায় না। এরা চেয়েছিলেন ফিরিঙ্গিরাজ উৎখাত করে পূর্বতন সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং এই অসম্ভব উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তারা সব রকম ত্যাগস্বীকার করেছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। ফিরিঙ্গি সরকারকে উৎখাত করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছিল সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অতি বিলাসী চিন্তা। কিন্তু তবুও তাদের বৃটিশবিরোধী তৎপবতা ছিল অব্যাহত। অপরপক্ষে, বৃটিশপন্থী বাবু শ্রেণী এবং নব্য ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী বৃটিশ শাসনের দীর্ঘায়ু কামনা করে, যদিও বৃটিশ শাসকরা ছিল বর্ণবাদী শোষক ও উৎপীড়ক এবং যদিও বর্ণবাদী বৃটিশ শাসনাধীনে দেশী সভ্যতা-সংস্কৃতি পদদলিত হয়। বৃটিশ সিভিলিয়ান ঐতিহাসিকগণ বৃটিশের অনুগত বাবুদের প্রশংসা করেছেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রেণী হিসেবে। অর্থাৎ আনুগত্য ছিল 'সচেতনতা'র লক্ষণ। আর প্রতিরোধকারী সনাতন জাতীয়তাবাদীরা আখ্যায়িত হন রাজনৈতিকভাবে 'অসচেতন' ও 'পশ্চাৎপদ' শ্রেণী হিসেবে। স্বাধীনতাকামীদের কার্যকলাপের এ ধরনের ব্যাখ্যা অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত নয়। মার্কিনীরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতিরোধ করেছে বলে প্রতিরোধকারীদের রাজনৈতিকভাবে

২২. Rajat Sanyal, *Voluntary Associations and the Urban Public Life in Bengal (1815-1876)*, (Calcutta 1980), 232-34.

অজ্ঞ বা পশ্চাৎপদ বলা হয় না, তবে একই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী বাঙালিদের রাজনৈতিকভাবে অজ্ঞ বলা হয় কেন ? স্পেনীয়রা আরবি শিখতে চায় নি, কারণ তারা তাদের দেশের মাটিতে আরব শাসন মেনে নেয় নি। এটা কি স্পেনীয়দের রাজনৈতিক অজ্ঞতা না সচেতনতা ? একই প্রশ্ন উঠে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয়দের প্রতিরোধ আন্দোলনের বেলায়। দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি-স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রচনা করা রাজনৈতিক অজ্ঞতার পরিচয় হতে পারে না। তবে এটা যখন পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৃটিশ শাসন উৎখাত একেবারেই অসম্ভব, তখন প্রতিরোধকারীরা ক্রমশ বৃটিশ শাসনকে স্বীকার করে নেয় এবং বাস্তবতার তাগিদে বৃটিশ ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। তবে বৃটিশবিরোধী মনোভাব অনেকের মনে এমন শক্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল যে তারা ইংরেজি শিক্ষাকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে এবং মনে করে যে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ধর্মের পরিপন্থী।

পাঁচ

উনিশ শতকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এর একটি হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংগঠনিক পরিপক্বতা অর্জন এবং অপরটি হচ্ছে মুসলিম আত্মসচেতনতা ও তৎপ্রসূত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভঙ্গি। পূর্বে শুধু বহিরাগত অভিজাত মুসলমানরা নিজেদেরকে পূর্বতন শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সনাক্ত করতো এবং এ দেশীয় সাধারণ মুসলমান রাজনীতি এবং আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে ছিল উদাসীন ও অনাসক্ত। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদের মধ্যে এই মর্মে এক ধরনের জাতিগত চেতনার উন্মেষ হয় যে এ দেশের সকল মুসলমানই হচ্ছে এককালের শাসক শ্রেণী এবং বর্তমানে অবনত এবং তাদের মতে এই অবনতির জন্য সমভাবে দায়ী এক দিকে হিন্দু জমিদার ও বাবু শ্রেণী, অপর দিকে বৃটিশ রাজ। একটি কল্পিত ধারণা নিয়ে মুসলমানরা গর্ববোধ করতে থাকে যে এরা যখন ছিল শাসক, হিন্দুরা তখন ছিল তাদের অধস্তন প্রজা। এহেন মনোভাবের কারণে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংহতির বদলে সৃষ্টি হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাঙালি মুসলমানদের মনে প্রতীতি জন্মে যে তারা পূর্বতন শাসক শ্রেণীর জাত এবং এই ধারণা তাদের মধ্যে এমন আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে যে মুসলমানদের অতীত গৌরবময় ভূমিকা সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে পুনরায় তারা শাসক জাতিতে পরিণত হতে পারে।

বাঙালি মুসলমানরা যে পুরানো শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত এহেন দাবি প্রাক-বৃটিশ যুগে উঠে নি, উঠলে মুগল অভিজাত শ্রেণী যে সে দাবি ধৃষ্টতা বলে উড়িয়ে দিত এতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা মুগলরা কখনো বাঙালি মুসলমানদের অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদা দেয় নি। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে নবাবি আমলে শাসক শ্রেণীর অধীনে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ অবহেলিত হয়েছে এবং কিভাবে দেশীয় উচ্চবর্ণের

হিন্দুদের সঙ্গে আঁতাত করে মুগলরা আপামর জনগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় মুসলমানরা ছিল অবহেলিত, কারণ পেশাগতভাবে এরা ছিল কৃষক, তাঁতী, কারিগর, ধোপা, মাঝি ইত্যাদি। আভিজাত্যভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোতে এই নিম্নবর্গের পেশাজীবীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। পদানত প্রজা হিসেবে এরা শাসক অভিজাত শ্রেণীর প্রতি প্রদান করেছে প্রবৃত্তিজাত আনুগত্য। এমনিতরো আনুগত্য প্রদর্শন করেছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবনত শ্রেণীও। প্রতিবেশী হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এরা শান্তিপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখেছে। ধর্ম ভিন্ন হলেও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, রেওয়াজ, খাবার, বেশভূষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল অলক্ষণীয়। অতএব উচ্চ মহলের ন্যায় রাষ্ট্রের নিম্নপর্যায়েও ছিল পরম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তবে উচ্চ মহলে এই সম্প্রীতির কারণ ছিল রাজনৈতিক, আর নিম্নস্তরে ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। নিম্নবর্গের মানুষ গঠন করে একটি ভিন্ন জগৎ। উৎপাদন এবং রাজস্ব প্রদান ছিল এদের কাজ। এদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উপর জীবিকা নির্বাহ করেছে অভিজাত শাসক শ্রেণী। সুতরাং শ্রেণীগত আধিপত্য বজায় রাখার তাগিদে উৎপাদক শ্রেণীকে এমনভাবে বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যেন এরা অভিজাত শাসক শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থাকে।

তা হলে, বাঙালি মুসলমানরা নিজেদেরকে পূর্বতন 'শাসক শ্রেণীর' বংশধর গণ্য করলো কেন এবং কিভাবে ? এ মনোভাবের বিকাশের উৎস ছিল মূলত দুটি। এদের একটি বৃটিশ শাসনের অভিঘাত। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থার পূর্ব পর্যন্ত, এমনকি এর কিছুকাল পরও রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। তা ছাড়া রাষ্ট্রের অন্যান্য উচ্চ পদগুলিরও অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করতো মুসলিম আমলারা। এমনকি মধ্য ও নিম্নস্তরের রাষ্ট্রীয় পদসমূহে মুসলমানদের হিস্যা ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু এরা প্রায় সবাই ছিল অভ্যাগত অভিজাত মুসলমান, এদের মধ্যে স্থানীয় বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ছিল বিরল। কর্নওয়ালিসের সার্বিক শ্বেতাঙ্গ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর উক্ত চাকুরিজীবী অভ্যাগত মুসলমানদের পতন ঘটে। চাকুরিজীবী ছাড়াও বহু অভিজাত মুসলমান পরিবার ছিল, যারা দীর্ঘকাল এ দেশে বসবাস করে এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে। সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি ছিল এদের ভরণপোষণের মূল উৎস। কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকে ব্যাপক হারে লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করে ঐ জমির উপর কর আরোপ করা হয়। ফলে লাখেরাজদারদের স্বার্থ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে শ্বেতাঙ্গ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্তকরণ অভিযানের ফলে পরিসংখ্যানগতভাবে অভিজাত মুসলমান শ্রেণীর চেয়ে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। তবুও মুসলমানদের ক্ষতি বেশি চোখে পড়ে এজন্য যে এক শ্রেণীর হিন্দু ভূমিনিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পেশা থেকে চ্যুত হলেও আরেক শ্রেণীর হিন্দু এসে সে শূন্যতা পূরণ করেছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। এরা শুধু হারিয়েছে, এদের মধ্য থেকে অন্য কোন শ্রেণী এ শূন্যতা পূরণ করে নি। অতএব বৃটিশ শাসনাধীনে সাম্প্রদায়িকভাবে অধঃপতনের প্রশ্নটি

শুধু মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য। অধঃপতিত হয়ে অভিজাত মুসলমানরা সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে একাত্ম হবার তাগিদ বোধ করলো। অতএব উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণ শুরু হলে অভিজাত ও অনভিজাত সকল মুসলমান নিজেদের একটি বঞ্চিত জাতি হিসেবে গণ্য করে এবং এই ঐক্যবোধকে জোরদার করার জন্য মিথ তৈরি করা হয় এই মর্মে যে বাংলার মুসলমানরা একদা ছিল 'শাসক জাতি' এবং তাদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে হলে চাই ঐক্যের ভিত্তিতে জাগরণ।

বাংলার মুসলমানদের নিজেদেরকে প্রাক্তন শাসক শ্রেণীর সদস্য হিসেবে গণ্য করার আরেকটি উৎস হচ্ছে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রবর্তনের বিশেষ ধারা এবং সরকারি নীতির ফলে স্থানীয় মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিতে মূল ইসলামের অনুশাসন পালিত হতো খুব কম। বাঙালি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপাদান ছিল খুব লক্ষণীয়। এক কথায়, আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে এরা ছিল আধা হিন্দু, আধা মুসলমান। কিন্তু এদের জীবনধারা থেকে হিন্দু উপাদান উচ্ছেদ করে খাঁটি মুসলমানী উপাদান অনুপ্রবিষ্ট করার জন্য মুগল সরকার চেষ্টা করে নি। এ দেশের মুসলমানদেরকে হিন্দু সংস্কৃতিভুক্ত রাখার মধ্যে একটি রাজনৈতিক চিন্তা ছিল ক্রিয়াশীল। তা এই যে মৌল ইসলাম প্রবর্তিত হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৌলবাদভিত্তিক ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে এবং ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা বজায় রাখতে না পারলে এই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডে নবাবদের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করা সম্ভব নয়। অতএব বঙ্গীয় ইসলামকে রাজনৈতিক কারণে মিশ্রিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন নবাবি শাসকরা। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে মূল ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কোন সক্রিয় নীতি গ্রহণ করা হয় নি। ফলে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ছিল বহুলাংশে হিন্দু আচার-প্রথা দ্বারা প্রভাবিত। এদিকে হিন্দুদের উপরও মুসলিম সুফি-সাধকদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নি। ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল আঠারো শতকের রাজনীতির বড় বৈশিষ্ট্য। তবে অভ্যাগত ইরানী-তুরানী মুসলমানরা কখনো স্থানীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয় নি এবং নিজেদের ধর্মীয় রীতিনীতিও স্থানীয় মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে নি। এক কথায়, ইরানী-তুরানী মুসলমান, স্থানীয় মুসলমান এবং হিন্দু সমাজের সকলেই একে অপরকে প্রভাবিত না করে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণ করে। অভিজাত মুসলমানরা যদি কখনো মনে করতো যে ইসলাম বিপন্ন, তা হলে তারা ইসলাম রক্ষার জন্য সরকারের শরণাপন্ন হতো, কিন্তু কখনো স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মীয় দ্বন্দ্বে জড়াতো না।[২৩] তবে এমন পরিস্থিতি নবাবি আমলে খুবই কম লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম রক্ষার নামে অভ্যাগত ও স্থানীয় মুসলমানরা মৈত্রী গঠন করেছে উনিশ শতকের শেষার্ধে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয় এবং এই শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল স্থানীয় মুসলমান। পাট অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে গ্রামে একটি ধনী কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। মধ্যস্বত্বাধিকারী ও ধনী কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ

২৩. P. Hardy, *The Muslims of British India*, (Cambridge 1972), 58.

হয়ে উঠে। অভিজাত মুসলমানদের জাতীয় রাজনীতিকে শক্তিশালী ও অর্থপূর্ণ করার জন্য গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। অতএব উনিশ শতকে মুসলিম সংস্কার আন্দোলনে নেতাগণ আভিজাত্যের বদলে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলিম নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিবর্তন ঐতিহাসিকভাবে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে একদিকে যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়, অপরদিকে স্থানীয় পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ইসলাম ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের আচার-অনুষ্ঠান থেকে হিন্দু প্রভাব দূর করা। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সংশ্লেষণ রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য শুভ হলেও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের পথে ছিল একটি বড় অন্তরায়। বঙ্গীয় ইসলাম চর্চায় হিন্দু উপাদানকে মুসলিম সংস্কারবাদীগণ বেদাত বা অনৈসলামিক ঘোষণা করে ঐগুলি মুসলমানদের জীবনযাত্রা থেকে দূর করার আহ্বান জানান। অপর দিকে হিন্দু সমাজেও অনুরূপ সংস্কারবাদী আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দু সংস্কারবাদীগণ বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং হিন্দু ধর্মচর্চা থেকে পরবর্তীকালে সৃষ্ট আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস দূর করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। সংস্কার আন্দোলনের ফলে উভয় ধর্মের মধ্যে যে সংশ্লেষণী প্রতীকসমূহ ছিল সেগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। হিন্দু সমাজে মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠান আর মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানি আচার-অনুষ্ঠান পালনের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বিদূরিত হলো এবং এর সঙ্গে ভেঙ্গে গেল উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত মিলন-সেতু।

যদিও উনিশ শতকের শেষ নাগাদ সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের সকল উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা তখনো এতটা অনুভূত হয় নি। তখনো হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে লক্ষণীয়ভাবে কোন অবনতি ঘটে নি। মুসলিম জাগরণের অন্যতম নেতা স্যার সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেন :

> সে যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে কোন তিক্ততা ছিল না। সম্পূর্ণ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তারা এক সঙ্গে বসবাস করেছে, এক সঙ্গে কাজ করেছে। নামাজের সময় মসজিদের পাশ দিয়ে হিন্দু মিছিল গেলে মুসল্লীরা তেড়ে আসে নি। অপর পক্ষে বকরা ঈদে কোরবানিকে কেন্দ্র করেও হিন্দুরা কোন তুলকালাম কাণ্ড করে নি। এক কথায়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে কেন্দ্র করে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নি। যদি কোন বিরোধ দেখা দিত তা হতো নিতান্তই জাগতিক বা প্রতিবেশীজাত ব্যাপার নিয়ে। যেমন মুসলিম প্রতিবেশীর হাঁস-মুরগী হিন্দু প্রতিবেশীর আঙ্গিনায় গিয়ে কিছু নষ্ট করলো, হলো কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডা, এমনিতরো বিরোধ। কিন্তু ওসব প্রতিবেশোদ্ভূত সমস্যা কখনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকর হানাহানির রূপ নেয় নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন নিয়ে। ঐ ইস্যু সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানদের সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কে চিড় ধরে নি। পৃথক নির্বাচন ইস্যু থেকেই বিরোধ শুরু। এক পক্ষের আধিপত্য, অপর পক্ষের তলিয়ে পড়ার ভয় পৃথক নির্বাচন অব্দি ছিল না।[২৪]

২৪. Syed Razi Wasti, *Memoirs and Other Writings of Syed Ameer Ali*, (Delhi 1985, reprint), 18

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর থেকে পণ্ডিতগণ একটি সমস্যার উপর বিস্তর আলোকপাত করেছেন। সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। কিভাবে হিন্দু-মুসলমান সুসম্পর্ক পরিহার করে সাম্প্রদায়িকতার জালে জড়িয়ে গেল, কিভাবে মুসলিম সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে উঠলো এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু যতোই এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হচ্ছে ততোই একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে। সেটি হচ্ছে আন্তঃসম্প্রদায়ভিত্তিক সরকারি চাকুরি বিষয়ক পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যমূলক বিশ্লেষণ। দেখানো হয়েছে যে, যদিও বাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধায় তাদের উপস্থিতি ছিল অতি নগণ্য। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার সিংহভাগ ভোগ করেছে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। এই বৈষম্যে মুসলমানরা আরো বিচলিত হয়ে উঠলো যখন দেখা গেল যে, সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও তারা যোগ্যতার অভাবে সে সুযোগ গ্রহণ করতে অপারগ। এমনও দেখা গেছে, মুসলমানদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সরকারি পদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও প্রার্থী পাওয়া যায় নি, কারণ কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত মাত্র গুটিকয়েক মুসলমানকে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে আবার বেশিরভাগই ছিলেন অবাঙালি।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতাগণ চাকুরিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্য প্রদর্শন করতে সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যান দিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে তারা নীরব। দায়িত্বশীল পদের জন্য যোগ্য মুসলিম প্রার্থী হিন্দু প্রার্থীর তুলনায় ছিল নগণ্য। হিন্দু গ্র্যাজুয়েটদের অভিযোগ ছিল এই যে, তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের চেয়ে অল্প যোগ্যতা নিয়ে মুসলমানরা সরকারি চাকুরি পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অধিকতর যোগ্যতা নিয়ে হিন্দুরা পিষ্ট হচ্ছে বেকারত্বের জাঁতাকলে। যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমানদের স্বল্পতার একটি নজির পাওয়া যায় নবাব সলিমুল্লাহর জমিদারির আমলাদের তালিকা থেকে। সলিমুল্লাহ ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদের বড় প্রবক্তা। কিন্তু তাঁরই জমিদারির আমলাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্য ছিল আরো করুণ। ১৯০৭ সালে তাঁর জমিদারির দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন আমলার মোট সংখ্যা ছিল ৩৭১ এবং এদের মধ্যে মাত্র পঁয়তাল্লিশ জন আমলা ছিল মুসলমান।[২৫] দেখা যায় যে যোগ্য মুসলমান প্রার্থীর অভাবে এমনকি কলকাতা মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা (১৯১৭) পর্যন্ত হিন্দু কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এর অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইউরোপীয়।[২৬] ১৯০৫ সালে মোট ৩০২১ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে মাত্র ১৮৮ জন ছিল মুসলমান। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্য অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রভাব ফেলে নিয়োগক্ষেত্রে। তবে বৃটিশের বদান্যতায় শিক্ষার নিরিখে মুসলমানদের যা প্রাপ্য ছিল, বাস্তবে এর চেয়ে অনেক বেশি তারা লাভ করে। অতএব এটা

২৫. Sirajul Islam (ed), *Fazlul Huq Speaks in Council 1913-1916*, (Dhaka 1976), 9

২৬. Bengal Legislative Council Proceedings, 7 August 1917, Vol. XLIX, 516 reply to question asked by A K Fazlul Huq.

সন্দেহাতীত যে চাকুরিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের মূল কারণ শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য প্রমাণের জন্য চাকুরিতে নিয়োজিত লোকের সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যান পরিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

শিক্ষা ও নিয়োগে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্যের কারণ যাই হোক না কেন, এটা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে এই বৈষম্য শুধু বৃটিশ আমলেই বিদ্যমান ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, নবাবি আমলেও হিন্দু জাতি ছিল শিক্ষাদীক্ষায় স্থানীয় মুসলমানদের চেয়ে অনেক অগ্রসর এবং তখনো রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় স্থানীয় মুসলমানদের হিস্যা ছিল অতিশয় নগণ্য। মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল কৃষি, মজুরি, মাছ ধরা, তাঁত বোনা ও অন্যান্য শ্রমক্ষেত্রে। যা হোক, অভিজাত মুসলিম রাজনৈতিক জনগণকে তাদের ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা না দিয়ে 'শাসক জাতি' ভাবমূর্তিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য এ মর্মে তাদের সামনে একটি বিকৃত তত্ত্ব তুলে ধরা হয় যে তারা ছিল একদা শাসক শ্রেণীর সদস্য এবং তাদের বর্তমান অবনতির জন্য দায়ী হিন্দু আধিপত্য। বৃটিশ সরকার কর্তৃক এই তত্ত্বকে ফলাও করে প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং সে সুযোগে ঔপনিবেশিক শাসনকে আপদমুক্ত রাখা। ঐতিহাসিকদের উচিত 'শাসক শ্রেণী'র তত্ত্বকে খুঁটিয়ে দেখা এবং চাকুরি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা। কারণ চাকুরি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান জনমনে দারুণ রেখাপাত করেছিল এবং ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

চাকুরিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান আকাশ-পাতাল বৈষম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বিরাট বিরাট পরিসংখ্যান-সারণি তৈরি করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ সব সারণি সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঐ সব সারণিতে সম্প্রদায়ভিত্তিক চাকুরির পরিসংখ্যান মেলে, কিন্তু বেকারত্বের পরিসংখ্যান মেলে না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের সমস্যা ছিল অনেক বেশি প্রকট। কারণ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল অনেক বেশি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি শিক্ষার হার সমান থাকতো, আর চাকুরিবাজার যদি হিন্দুদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকতো, তাহলে বৈষম্যমূলক নীতির তত্ত্ব দাঁড় করানো যেতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারি চাকুরি পেতে পারে এমন শিক্ষিতের মধ্যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল হিন্দু। অতএব স্বাভাবিকভাবেই চাকুরিবাজারেও ছিল তাদের আনুপাতিক প্রাধান্য। বৈষম্য আলোচনায় শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলক হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় যদি সমহারে শিক্ষিত হয়, শুধু তখনই সম্প্রদায়ভিত্তিক চাকুরি-সারণি অর্থবহ হতে পারে, নচেৎ নয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিশ শতকের প্রথম সিকি পর্যন্ত মুসলমান শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় এবং তদনুপাতে চাকুরিপ্রাপ্ত মুসলমানের সংখ্যাও ছিল সীমিত। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে শিক্ষিত মুসলমানরা শিক্ষিত হিন্দুর চেয়ে আনুপাতিক হারে বেশি সরকারি চাকুরি লাভ করেছে। সে দিক থেকে বলা যায় যে মুসলমানরা ছিল কিছুটা

সুবিধাভোগী। অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে অগ্রসর হতে অধিকতর আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে সীমিত হারে হলেও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ অবশ্যই শিক্ষিত হিন্দুরা সহজে মেনে নিতে পারে নি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতিতে এই অগ্রাধিকার সমস্যাটি বেশ অবদান রেখেছে। বৃটিশরা মুসলমানদের চাকুরি দিতে চাচ্ছে আর শিক্ষিত হিন্দুরা তা মেনে নিচ্ছে না—এটা মুসলমানদের কাছে ছিল ভীষণ পীড়াদায়ক। মুসলমানদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয় যে হিন্দুরা মুসলমানদের উন্নয়ন চায় না। আসলে সমস্যাটি মুসলমান-হিন্দুর নয়, সমস্যাটি প্রতিযোগিতার। সমভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হয়ে কেউ সুবিধা লাভ করলে বঞ্চিতেরা স্বাভাবিক কারণেই অসন্তোষ ব্যক্ত করে। অগ্রাধিকারটি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বেলায় প্রযোজ্য হলেও একই প্রতিক্রিয়া হতো, যা হয়েছে বিভাগোত্তর ভারতে।

ছয়

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বিতর্ক আছে। অনেক অত্যুৎসাহী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন যে পাকিস্তানের শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। তাঁদের মতে, পাকিস্তানের উৎপত্তি সন্ধান করতে প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক যুগে গমন না করলেও অন্তত সিন্ধু সভ্যতা অব্দি পেছনে যেতে হবে। তবে নমনীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, পাকিস্তানের উৎস হচ্ছে আট শতকে 'সিন্ধুতে' আরবদের উপস্থিতি। সিন্ধুবিজয়ের মাধ্যমে আরবরা এ দেশে এসে ইসলাম প্রবর্তন না করলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতো না—এই তাঁদের যুক্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শেকড়ের গভীরতা সম্বন্ধে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করলেও একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ছিল অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ রাজ যতোই ভুল-ভ্রান্তি বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিক না কেন, পাকিস্তানের উদ্ভব ছিল অপ্রতিরোধ্য।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবিতা তত্ত্বের উল্টোপিঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অভিমত হচ্ছে এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি বড় ধস এবং এই ধস ঠেকানো যেতো যদি রাজনীতিকগণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন। সব ঐতিহাসিক ঘটনারই বিভিন্ন দিক থাকে এবং নানা বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে। কিন্তু ঘটনা একবার ঘটে গেলে তা আর পাল্টানো যায় না। অতীতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু তা পরিবর্তন করা যায় না। অতীতের ঘটনা সর্বাংশে সত্য। অতএব এটা না করে ওটা করলে এই ঘটনা ঘটতো না—এ ধরনের মনোভঙ্গি ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নেতিবাচক।

হারুন-অর-রশিদ ১৯০৬ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম অভিজাত ও উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতির ধারা ও ক্রমবিকাশ অতিশয় দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে মুসলিম নেতৃত্ব বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে আচরণ করেছে এবং কিভাবে তারা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো দেখিয়েছেন কিভাবে বঙ্গীয় মুসলিম নেতৃত্ব অবাঙালি নেতৃত্বাধীনে চলে যায়। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম রাজনীতি বিশ্লেষণ করে এর দুর্বলতাসমূহ উন্মোচন করেছেন এবং ব্যর্থতার বর্ণনা দিয়েছেন।[২৭] হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নে একের পর এক সুযোগ পণ্ড হয়ে যায়। লখনৌ চুক্তি (১৯১৬), খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-২২) এবং বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)—সবই ছিল সম্পর্ক উন্নয়নের সুবর্ণ সুযোগ। রশিদ মনে করেন, এই ব্যর্থতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আরো তিক্ত করে তোলে এবং এরই শেষ পরিণতি ১৯৩৭ সালের প্রজা-লীগ কোয়ালিশন, যার ঐতিহাসিক ফল ছিল সুদূরপ্রসারী।[২৮] এ. কে. ফজলুল হককে লীগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পাবলে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পরিস্থিতির হয়তো উদ্ভব হতো না। বজলুর রহমান খান ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম নেতৃত্বের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেন যে, তখন পর্যন্ত এরা ছিল রাজনৈতিকভাবে ভীষণ অসংগঠিত ও লক্ষ্যহীন। কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এরা দল তৈরি করতো। নির্বাচনের পর পরই ঐসব দল বিলুপ্ত হয়ে যেতো। খানের মতে, ঐসব দল গঠিত হতো শুধুই ক্ষমতা লাভের জন্য। যেভাবেই হোক ক্ষমতায় যাওয়া ছিল তখনকার রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৯] খান দেখিয়েছেন যে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নেতারা শুধুই নিজের ও নিজ পরিবারের স্বার্থকে সমুন্নত রেখেছেন, জাতীয় স্বার্থকে নয়। সাইমন কমিশনও মুসলমান নেতৃত্ব সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করে।

বিভিন্ন সভা-সমিতি-সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় সচেতনতা পুষ্টি লাভ করছিল উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই। এই সকল সংগঠন ছিল বেশিরভাগই পেশাভিত্তিক এবং যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বে নবউত্থিত পেশাজীবীরা ছিল প্রায় সবাই হিন্দু, সেহেতু ঐসব সংগঠনও ছিল মূলত হিন্দুদের দ্বারা গঠিত। এ কথা ঠিক যে এই সব সংগঠনই ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) শেকড়। অজস্র সভা-সমিতি-সংগঠনের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *জমিদারি এসোসিয়েশন* (১৮৩৭), *বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি* (১৮৪৩), *সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ন্যাশনাল ফিলিং* (১৮৬৬), *হিন্দু মেলা* (১৮৭৫) এবং *ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন* (১৮৭৬)। হিন্দু সংগঠনের বিপরীতে মুসলমানরাও প্রতিষ্ঠা করেছে অনুরূপ সমিতি, যথা, *মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি অব ক্যালকাটা (১৮৬৩), ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন* (১৮৭৭) ও স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য আঞ্জুমান। কিন্তু এসব সংগঠনের সম্মিলিত ধারা কংগ্রেসের মতো কোন কার্যকর রাজনৈতিক দল তৈরি করতে পারে নি। বলা যেতে পারে যে, এই সব

২৭. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 1-30

২৮. ঐ, ৫১-৫৯।

২৯. Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal 1927-1936*, (Dhaka 1987), 24

জাতীয় ও স্থানীয় মুসলিম সংগঠনেরই চূড়ান্ত ফল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ (১৯০৬)। কিন্তু বস্তুত এসব সংগঠন ছিল কোন না কোন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান। আদর্শ ও নির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাবে এগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবস্থান অতিক্রম করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে পারে নি। ফলে মুসলিম সংগঠনগুলি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু নিয়ন্ত্রিত সংগঠনগুলির ন্যায় জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। সাংগঠনিকভাবে হিন্দু ও মুসলিম সংস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য এই যে, হিন্দু সংগঠনগুলির নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর মুসলিম সংগঠনের পুরোভাগে ছিল অভিজাত শ্রেণী। দল হিসেবে মুসলিম লীগ কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল হলেও প্রথম থেকেই এর মধ্যে দেখা দেয় চরম কোন্দল ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। ফলে কংগ্রেসের মতো লীগও রাজনীতিতে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে নি। বাংলায় মুসলিম লীগ শক্তি অর্জন করতে থাকে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন থেকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দলীয় রাজনীতিতে যে আনাড়িপনা লক্ষ্য করা যায়, কৃষক প্রজা পার্টির ব্যাপারেও তাই লক্ষ্য করি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগমন ঘটেছিল এই দলে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে যে আংশিক সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিল তা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ. কে. ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টির একাংশ নিয়ে যোগদান করেন মুসলিম লীগে এবং অপর অংশ নেতৃত্ব-সঙ্কটে পড়ে ক্রমশ নামমাত্র দলে পরিণত হয়।

সাংগঠনিকভাবে মুসলিম লীগ ১৯৩৭-এর পূর্ব পর্যন্ত কখনো কোন শক্তি অর্জন করতে পারে নি, আর কৃষক প্রজা পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোও ছিল অতিশয় দুর্বল এবং ব্যক্তিনির্ভর, যেজন্য ব্যক্তির বিদায়ে দলও বিলুপ্ত হয়ে গেল। প্রশ্ন জাগে, বঙ্গীয় মুসলিম নেতৃত্বের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ কি? এ প্রশ্নের ত্বরিৎ উত্তর হচ্ছে, পেশাদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষুদ্রত্ব। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতির সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর। মুসলিম নেতৃত্বে অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য প্রবল থাকায় ব্যক্তিত্ব ও পরিবারকে অতিক্রম করে দলের সাংগঠনিক ভিত মজবুত করা যায় নি, যেমনটি সম্ভব হয়েছিল কংগ্রেসের বেলায়। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তন ক্ষুদ্র থাকায় সনাতন আশরাফ-আতরাফ বিভক্তি থেকে রাজনীতি মুক্ত হতে পারে নি। সংখ্যালঘিষ্ঠ আশরাফ শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ আতরাফ শ্রেণীর স্বার্থের কথা প্রচার পর্যন্তই সীমিত রাখে, কার্যত আশরাফ শ্রেণী কখনো গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর ছিল না। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার মানে সাধারণ নেতৃত্বের কাছে অবধারিত ক্ষমতা হস্তান্তর এবং জনগণকে ক্ষমতার উৎস করা। এর কোনটাই অভিজাত নেতৃত্বের কাছে অভিপ্রেত ছিল না। অভিজাত শ্রেণীর কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় তাদের যে সুবিধাজনক অবস্থান তা তিরোহিত হবে যদি ক্ষমতার উৎসস্থল বৃটিশ রাজ থেকে জনগণের কাছে স্থানান্তরিত হয়। বৃটিশ রাজের ব্যবস্থায় তারা সরকারের নমিনেশনে আইনসভা ও অন্যান্য সংস্থায় ক্ষমতা লাভ করেন। অতএব তাদের স্বার্থ নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক নমিনেশনব্যবস্থায়, নির্বাচনব্যবস্থায় নয়, আন্দোলনের রাজনীতিতেও নয়। সুযোগ-সুবিধা লাভের সন্ধানে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্যের রাজনীতি উনিশ

শতকের অনুগত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনীতির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ফলে ঐ ভদ্রলোক রাজনীতি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে বিশ শতকে। কিন্তু মুসলিম রাজনীতির বেলায় তেমনটি ঘটে নি। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তন ছিল অনেকটা অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল।

মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলনের রাজনীতির সূত্রপাত হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এবং এর ক্ষেত্র মূলত পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানরা অনুভব করে যে বঙ্গবিভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা কলকাতার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত হলে নানাভাবে তাদের কল্যাণ সাধিত হবে। এই অনুভূতি আরো ঘনীভূত হয় বিভাগোত্তর স্বদেশী আন্দোলনের বাড়াবাড়ির ফলে। বঙ্গবিভাগের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা। আন্দোলনের রাজনীতিতে এটাই ছিল তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের এই আন্দোলন ছিল কংগ্রেস তথা হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তবে এ থেকে এরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা অভিজাত রাজনীতির আনুগত্যের ধারাকে বেশ দুর্বল করে দেয়। অধিকার আদায়ের জন্য মুসলমানরা হিন্দু, সরকার, এমনকি বৃটিশের অনুগত মুসলিম অভিজাতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। কৃষক প্রজা পার্টির দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন ঐ কৌশল প্রয়োগেই সম্ভব হয়েছিল। হিন্দু ভদ্রলোক এবং মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্যের রাজনীতিতে যে ক্রমশই উগ্রপন্থীদের আক্রমণের উপক্রম হচ্ছে তা অনুধাবন করেই তারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের শ্লোগান তোলে। লখনৌ চুক্তি (১৯১৬), অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট প্রভৃতি ছিল ঐক্যপন্থীদের আপ্রাণ প্রয়াস। কিন্তু এগুলি ছিল নেহাতই ক্ষমতা ভাগাভাগির রাজনীতি—রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি। এই সব চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্বার্থকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে করা হয় নি, যেজন্য এই সব চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।[৩০]

বঙ্গীয় রাজনীতির নেতৃত্বে লক্ষণীয় পরিবর্তন শুরু হয় ১৯২০-এর দশক থেকে। ১৯৩০-এর দশকে সব দলেই নেতৃত্বের গঠনে গুণগত পরিবর্তন আসে। সব দলেই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এখন কোন একক ব্যক্তিত্বের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তা এখন বৃহত্তর গ্রুপের উপর ন্যস্ত। আরেকটি গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে সংগঠনের জেলা ইউনিট নেতাদের প্রভাব বৃদ্ধি। পূর্বে জেলাভিত্তিক নেতাগণ অপেক্ষায় থাকতেন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের জন্য, কিন্তু এখন জেলা-প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তারা তাদের অভিমত বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করেন।[৩১] জেলাভিত্তিক নেতাদের দুই গ্রুপে ভাগ করা যায়। একটি গ্রুপ প্রতিনিধিত্ব করে ভূস্বামী শ্রেণী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের স্বার্থের, আর অন্যটি প্রতিনিধিত্ব করে সাধারণ কৃষক, প্রজা, কারিগর ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থের।

৩০. Enayetur Rahim, *Provincial Autonomy in Bengal*, (Rajshahi 1981), 34

৩১. ঐ, ৫৩।

ভূস্বামী ও অন্যান্য পেশাদার শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল হিন্দু, আর কৃষক-প্রজার অধিকাংশ ছিল মুসলমান। অতএব বিপরীতমুখী স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে উক্ত দুই গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। সাম্প্রদায়িকভাবে অভিন্ন হলেও এই দ্বন্দ্ব এড়ানো হয়তো সম্ভব ছিল না। আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন গ্রুপের নেতাগণ তাদের নিজস্ব স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন অন্ধভাবে। ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছেন ভূস্বামীদের প্রতিনিধিগণ, আর কৃষক-প্রজার কথা বলছেন তাদের প্রতিনিধিগণ। দুই গ্রুপের নেতৃবর্গ মূলত দুই সম্প্রদায়ের বিধায় শ্রেণীস্বার্থজনিত দ্বন্দ্ব আরো তীব্রতর হয়ে উঠে এবং ক্রমশ তা উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। এই সাম্প্রদায়িকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন আইন প্রণয়নকালে। যেমন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯২৮) এবং প্রাইমারি এডুকেশন বিল ১৯৩০—এ দুটি বিল কাউন্সিলে আলোচনা এবং এর উপর ভোটাভুটির সময় দেখা যায়, দলবল নির্বিশেষে সকল মুসলমান সদস্যগণ বিল দুটির পক্ষে রায় দেন এবং এর বিপক্ষে ভোট দেন হিন্দু সদস্যগণ। ১৯৩২ সালের কমিউনাল এওয়ার্ড সকল মুসলিম সদস্যের সমর্থন লাভ করে আর এর চরম বিরোধিতা করে হিন্দু সদস্যগণ। এমনিভাবে ১৯৩৫ সালের ঋণসালিশী বোর্ড বিলের পক্ষে ভোট দেন মুসলিম সদস্যগণ এবং বিপক্ষে ভোট দেন হিন্দু সদস্যগণ। ভোট প্রদানে এই প্রবণতার ব্যতিক্রম থাকলেও এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, নেতৃবর্গের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয় অতি নগ্নভাবে। সব সমস্যাকে নেতাগণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত অনেক বঙ্গীয় মুসলমান কংগ্রেস রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেও ১৯৩৭ সাল নাগাদ মুসলমানদের কংগ্রেসভুক্ত থাকা প্রায় বিরল হয়ে উঠে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সিটের সংখ্যা ছিল ১১৯। যেকোন দলের মুসলমান সদস্য সংরক্ষিত সিটের জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারতো। কিন্তু দেখা যায়, ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষিত সিটে প্রতিযোগিতা করার জন্য মাত্র একজন মুসলমান প্রার্থী কংগ্রেসের টিকেট প্রার্থনা করেন। এ সময়ে সাম্প্রদায়িকতার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন দলের প্রথম সারির নেতাদের চেয়ে দ্বিতীয় সারির নেতারা অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক, অনেক বেশি উগ্র। জাতীয় নেতাগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উচ্চারণ করলেও আঞ্চলিক নেতারা ছিলেন আপোসহীনভাবে সাম্প্রদায়িক। দলীয় নীতি নির্ধারণে জেলাভিত্তিক নেতাদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায় সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪০ সালের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যুগ পেরিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গার যুগে প্রবেশ করে বাংলার রাজনীতি।[৩২] ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রসৃষ্ট রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত থাকলে '৪০-এর দশককে হয়তো বলা যেতো গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বিকাশের যুগ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঘটেনি। ঘটেছে অন্তঃ ও আন্তঃদলীয় সংঘাত, সংঘর্ষ, ক্ষমতার লড়াই, দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, দাঙ্গা এবং পরিশেষে দেশবিভাগ।

৩২. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 43

১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগকে হিন্দু নেতৃত্ব 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' বলে ঘোষণা করেছিল এবং লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে সে অবাঞ্ছিত বিভাগ রদ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ঐ হিন্দু নেতৃত্বই আবার ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগ দাবি করলো এবং সে দাবি মোতাবেক বাংলা ভাগ হলো। বঙ্গীয় রাজনীতির এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিগূঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাঙালির মধ্যে বাংলাকে ভাগাভাগি করা কি রোধ করা যেতো না? হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা এই বাংলাকে দুই টুকরো করে দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত না করে একে একটি অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা কি সম্ভব ছিল না? দেশবিভাগের বিকল্প হিসেবে একটি ফেডারেল বা কনফেডারেল ভারত রাষ্ট্র গঠন করা কি সম্ভব ছিল না? এই সব সৌখিন প্রশ্ন করা হয় আসলে ১৯৪০-এর দশকের ঘটনাপ্রবাহকে সামনে রেখে। সময়ের দিক দিয়ে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একই প্রশ্ন তোলা যায় ১৯৩০-এর দশকের রাজনীতি নিয়ে। ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রের শুধু প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত অংশ কার্যকর করা হয়। কংগ্রেসের বিরোধিতার দরুন ফেডারেল অংশ অকার্যকর থাকে। মুসলিম লীগ ফেডারেল অংশকে সমর্থন দিয়েছিল। উক্ত শাসনতন্ত্রের ফেডারেল কাঠামো কার্যকর করে দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হলে ১৯৪০ সালে হয়তো লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজন পড়তো না।

ফেডারেল সরকার গঠনে ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেস সর্বাংশে দায়ী। কংগ্রেসের ভুল থেকেই জন্ম নিল ১৯৪০-এর পাকিস্তান প্রস্তাব। কংগ্রেসের অবিমৃষ্যকারিতার পুনরাবৃত্তি হলো ১৯৪৬ সনের কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা পরিত্যাগের মাধ্যমে। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা জিন্নাহর পাকিস্তান পরিকল্পনার সাফল্যের কারণ হলো। মুসলিম লীগের ন্যায় কংগ্রেসও যদি উক্ত পরিকল্পনা মেনে নিত, তাহলে আদৌ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হতো কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। কংগ্রেসের ভুলের মাশুলই পাকিস্তান। কংগ্রেসের ভুলকে ব্যঙ্গ করে জিন্নাহ বলেন, "পাকিস্তান আমি এনেছি একজন ব্যক্তিগত সচিব ও একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে।" এই উক্তি উদ্ধত তবে সঙ্গত। তাঁর Direct Action নীতির ফলে যে রক্ত ঝরেছে তা টাইপরাইটারের কালির সঙ্গে তুলনীয় নয়। জিন্নাহর দম্ভোক্তি নেপোলীয়নের সেই আত্মপ্রসাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি প্যারিসের রাস্তায় ফ্রান্সের রাজমুকুট ধূলিধুসরিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এবং তরবারীর আগা দিয়ে কুড়িয়ে নেন। জিন্নাহর পাকিস্তান এমন কুড়িয়ে পাওয়া কিছু নয়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি ভুল পদক্ষেপের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন জিন্নাহ। জিন্নাহর প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার কাছে কংগ্রেসের ঔদ্ধত্য হার মেনেছিল।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মর্মান্তিক সংঘাতের পরিণতি হিসেবে বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের বড়লাট তাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। বাংলার জনগণ তাদের জন্মভূমির এই বিভাজন চায় নি, এ ধরনের বিভাজনের জন্য তারা প্রস্তুতও ছিল না। এই বিভাজনকে তাদের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক

কথায়, পাকিস্তানকেও জোর করেই তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কেননা, বাঙালি মুসলমানরা মূল লাহোর প্রস্তাবের ধারণার ভিত্তিতে পাকিস্তান চেয়েছিল। কিন্তু জিন্নাহর মস্তিষ্কপ্রসূত একক ট্রানকেটেড পাকিস্তান তারা চায়নি, যা জিন্নাহ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।

কাজেই বাঙালিদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় এবং লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র এক পাকিস্তানে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার ব্যাপারে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের প্রত্যাশিত পাকিস্তান ছিল এমন একটি রাষ্ট্র, যার অন্তর্ভুক্ত অংশগুলো থাকবে পরস্পর স্বাধীন এবং এদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা থাকবে অটুট। বিভাগপূর্ব বাংলার শিল্পোন্নত এলাকা হাতছাড়া হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণ ও তাদের নেতৃত্বের ব্যাপক হতাশা সত্ত্বেও তারা পাকিস্তানের কল্যাণে আন্তরিকভাবে নিবেদিত হয়েছিল। দুস্তর প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার অভিজ্ঞতা বাংলার মানুষের রয়েছে, ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। একইভাবে ' ট্রানকেটেড একক পাকিস্তানের' প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সেই প্রয়াস পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে একই প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পাকিস্তানের দুই অংশের অংশীদারিত্বের ব্যাপারটি প্রথম থেকেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংগঠনকাঠামো ও-প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণ করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক নীতিমালাকে খাটো করা হয় এবং শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন পর্যায়ে পারস্পরিক মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ না করে সরকারি আদেশ জারি করে দেশ শাসন করতে থাকেন। ফলে তাঁদের নির্দেশাবলীর অধিকাংশেই দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এজন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। পাকিস্তানের সূচনায় সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাষা আন্দোলন ছিল এ ধরনের প্রতিরোধের একটি নজির। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উত্তর ভারতের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত, সুবিবেচনাপ্রসূত বা বাস্তবসম্মত ছিল ? উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে তার ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে অবিরত বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তার ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন নাগরিকদের মনে গভীর হতাশা ও অসন্তোষের জন্ম দেয়। শেষ পর্যন্ত আন্তঃপ্রদেশ বৈষম্য দূরীকরণের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমর্থন লাভের প্রয়াস বিফলে যাবে বলে স্থিরনিশ্চিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান কনসেপ্ট-এর সামগ্রিক বাস্তবায়নযোগ্যতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। পাকিস্তানের স্বপ্ন যদি আদৌ থেকেও থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ও সামরিক কায়েমি স্বার্থের কুক্ষিগত হয়েছিল। এত দ্রুত ও অযৌক্তিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও

পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে যে, এ বিষয়ে লন্ডন টাইমস-এর ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সত্য প্রমাণিত হয়। লন্ডন টাইমস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হবে, তার পরের দিনই তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন অর্থ ও সমরাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন দান করতে এগিয়ে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে শুরু হয় সামরিক শাসন (১৯৫৮)।

আইয়ুব আমলের অবাস্তব কল্পনাময়, পরিবর্তনশীল ও এক ব্যক্তির আদেশনির্ভর একটি দশক পাকিস্তানের সমাজ ও অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। এ আমল দ্রুত পুঁজিসঞ্চয়, উচ্চ সামাজিক সচলতা ও পার্থক্যকরণ, রাজনৈতিক অবদমন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রদেশমুখী মেরুকরণ দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। যে পাকিস্তান মুসলিম লীগ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং যা ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল, তা পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া অন্য যেসব রাজনৈতিক দল তখনো তাদের ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছিল, তারাও অন্য প্রদেশে অর্থবহ কর্মতৎপরতা বন্ধ রেখে অবিমিশ্র প্রাদেশিক প্লাটফর্মে পরিণত হয়। এভাবে নিজ প্রদেশের বিষয়ে জনমত গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দল ছিল, কিন্ত সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের স্বার্থে কথা বলার জন্য কেউ ছিল না, সাংগঠনিকভাবে কথা বলার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় নেতাও ছিল না। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শুধু মার্কিন সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রই অবশিষ্ট ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র পাকিস্তানী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার আশায় শেষ উপায় হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই যুদ্ধ (১৯৬৫) থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া গেল না। বরং এর পরিবর্তে এই ক্ষতিকর যুদ্ধ রাষ্ট্রকে সমস্যার গোলকধাঁধায় নিমজ্জিত করে, যা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করেন 'শক্তমানব' আইয়ুব খান। এই যুদ্ধ এযাবৎ অজ্ঞাত সেই সত্যটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে যে, পাকিস্তানের তথাকথিত অপরাজেয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত প্রান্তিক ও নাজুক অবস্থানে ছিল। এই সত্য উদঘাটন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিশেষভাবে মর্মাহত করে, কারণ তাদের প্রদত্ত কর থেকেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাবদ খরচের বৃহত্তর অংশ আসতো।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো জনগোষ্ঠীই প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় বাস করতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তান ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক অবদমনের কারণে অত্যন্ত অসুখী ছিল এবং এর সাথে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো যুক্ত হয় প্রতিরক্ষাহীনতার বিষয়টি। এর ফলে গণআন্দোলন শুরু হয় এবং সকল শ্রেণীর জনগণ তথা রাজনীতিক, পেশাজীবী, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকগণ সমভাবে এতে অংশগ্রহণ করে।

উদ্ভূত সংকট উত্তরণের জন্য এবং রাষ্ট্রকে অংশীদারিত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তথা পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্ব একটি ফর্মুলা নিয়ে এগিয়ে আসে। এটি ছিল ছয় দফা সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন ফর্মুলা। এই ফর্মুলার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান একে যথাযথভাবেই বাঙালিদের মুক্তিসনদ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্ব স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে তথা সুবিচার, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে নবায়িত অংশীদারিত্বের উপর পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণাকে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত মুজিবের স্বায়ত্তশাসন তত্ত্বকে পূর্ব পাকিস্তানের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার পদক্ষেপ বলে গণ্য করলো। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের দাবি খারিজ করা এবং এ দাবি নিয়ে আন্দোলনকারী নেতাদের কারারুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হয়রানিমূলক বিচারের ব্যবস্থা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে তারা মনে করলো। সারা বিশ্ব জুড়ে ভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা সম্ভবত একঘেয়ে শান্তির পরিবেশের চেয়ে দমনমূলক পরিবেশে অধিকতর ভালো কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেন। যুগমানব হিসেবে আবির্ভূত শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিচরিত্রে একজন ফজলুল হকের মানসিক ক্ষিপ্রতা ও রসবোধ, একজন ভাসানীর বর্ণাঢ্যতা ও রোমাঞ্চ এবং একজন সোহরাওয়ার্দীর জ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা না থাকতে পারে, কিন্তু এমন কিছু গুণ তাঁর মধ্যে ছিল যা তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছিল। বাংলার জনগণ তাঁকে অত্যন্ত স্বদেশভক্ত ও সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন একজন নেতা বলে গ্রহণ করে। কারণ তাঁর মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছিল এমন একজন বিরল ধরনের নেতাকে, যিনি ছিলেন সাহসী, বিচক্ষণ, আত্মপ্রত্যয়ী, আপোসহীন, অনমনীয়, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী, দরদি ও অবিচল। আইয়ুব এবং আইয়ুবপরবর্তী আমলের দমনমূলক রাজনীতিতে জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর কণ্ঠস্বর তথা আওয়ামী লীগের কণ্ঠস্বর অচিরেই সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি কেবল আওয়ামী লীগ নয়, সমগ্র জাতির অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত হন। এক স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভিষেক অনুষ্ঠানে মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়। এটি ছিল নেতার প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন চাইলেন এবং জনগণ নির্দ্বিধায় এ সমর্থন প্রদান করে। নির্বাচনে মাত্র দুটি আসন ছাড়া সব ক'টি আসনে তাঁর মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি ছিল। যখন কেন্দ্র ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে নানা টালবাহানা শুরু করে, তখন শেখ মুজিব এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্য ৭ মার্চ ১৯৭১ রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত জনসভায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানের সংকল্প গ্রহণ করেন। এই ভাষণে সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রের নানা কৌশল ও ছলনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এবং পাকিস্তানে শাসনক্ষমতার অংশীদার হয়ে থাকা আর সম্ভব নয় বলে তাঁর স্থিরপ্রতীতির কথা জানিয়ে

তিনি জাতির উদ্দেশে বজ্রগম্ভীর আহ্বান জানান প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক গৃহ থেকে পাকিস্তানী শাসকচক্রকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং হাতের কাছে যে অস্ত্র আছে তা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তিনি এই বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" এতে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে, শেখ মুজিবের ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না ? তাঁর ঘোষণার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন অস্পষ্টতা নেই। মূলত এই ভাষণে ছিল গুরুতর এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা, যেমনটি ছিল বোস্টন টি-পার্টির ভাষণ, যা আমেরিকান বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল; কিংবা টেনিসকোর্ট শপথ অনুষ্ঠানের ভাষণ, যা থেকে ঘোষিত হয়েছিল ফরাসীবিপ্লবের অগ্নিশপথ।

এখানে বিদগ্ধ পাঠক কিছু প্রশ্ন তুলতে পারেন, যার জবাব এখনো আমাদের জানা নেই। পাকিস্তানের কনসেপ্ট প্রত্যাখ্যান করে এবং সার্বিক প্রতিরোধ অন্দোলনের ডাক দিয়ে (এজন্য জাতি যতো অপ্রস্তুতই থাকুক) শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এটা কি ইতিমধ্যে তাঁর ঘোষিত স্বাধীনতা সরকার কর্তৃক মেনে নেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল নাকি তা আসন্ন আলোচনা বৈঠকে সফলভাবে তাঁর ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব উত্থাপনে নিজেকে সক্ষম করার জন্য তাঁর রাজনৈতিক শক্তি আরো বৃদ্ধি করার কৌশল ছিল ? যদি স্বাধীনতার লক্ষ্যে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়ে থাকে, তা হলে এটা কি পরবর্তী আলোচনার বিষয় ছিল ? আর যদি তা না হয়ে থাকে, তা হলে কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে ৭ মার্চের ঘোষণা ছিল একটি কাব্যিক উক্তি মাত্র ?

তবে তাঁর ঘোষণা কাব্যিক উক্তি হোক বা না হোক, জনগণ বিশ্বাস করেছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যা বলেছিলেন এবং 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে রাজপথে যে আন্দোলন রচনা করেছিলেন এবং আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করা যায় না এমন যে বিষয়টি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলার নেতৃত্বকে বাধ্য করেছিলেন, তা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নেতা জনমত সৃষ্টি করেন এবং জনমত সৃষ্টি করে ইতিহাস। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে জনমত তৈরি হয়েছিল তাকে বুলেট দিয়ে স্তব্ধ করা যেতো না, এমনকি স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর দৈহিক অনুপস্থিতি দ্বারাও তাকে স্তব্ধ করা যেতো না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের শেষ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কঠোর আঘাতের জবাবে বাংলার সামরিক ও বেসামরিক জনগণ পরের দিন ২৬ মার্চ স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে প্রকৃত স্বাধীনতাযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন একজন সামরিক নেতা, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মেজর জিয়াউর রহমান।

২

সুবা বাংলা : সরকার ও রাজনীতি

আবদুল করিম*

সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলার একাংশ বিজয়ের পর সুবা বাংলা মুগল সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থায় একটি প্রশাসনিক একক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং আঠারো শতকের শেষ নাগাদ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এই সময়কালে সুবা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং কেন্দ্রের সাথে এর সম্পর্কের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের অধীনে একটি প্রশাসনিক একক হিসেবে এই সুবার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে এর ভৌগোলিক সীমানা পরিবর্তনের বিবরণ প্রদান করা প্রয়োজন, কারণ আঞ্চলিক পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং সুবার সাথে কেন্দ্রের সম্পর্কের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

আবুল ফজল সুবা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ দেন[১] :

> গড়হি[২] থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সুবা বাংলার দৈর্ঘ্য চার শ' ক্রোশ[৩] ; উত্তরে পর্বতমালা থেকে সরকার মান্দারণের[৪] দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত প্রস্থ দুই শ' ক্রোশ। উড়িষ্যা সুবা বাংলার সঙ্গে যুক্ত হলে দৈর্ঘ্য আরো তেতাল্লিশ ক্রোশ এবং প্রস্থ আরো তেইশ ক্রোশ বৃদ্ধি পায়। সুবা বাংলার পূর্ব

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খণ্ড; এইচ. এ জেরেট কর্তৃক অনূদিত এবং স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত; ৩য় সংস্করণ, কলকাতা *এশিয়াটিক* সোসাইটি ১৯৭৮ (পরে *আইন* ২য় রূপে উল্লেখিত), ১২৯-১৩২। এখানে হুবহু অনুবাদ না করে সারাংশ দেয়া হয়েছে।

২. গড়হি অর্থাৎ তেলিয়া গড়হি বা তেলিয়াগড়। এটি বিহার ও বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। এর উত্তরে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে রাজমহল পর্বতমালা। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে পশ্চিম দিক থেকে বাংলায় প্রবেশের মুখে এখানে একটি দুর্গ ছিল এবং এটি একটি অত্যন্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে এবং এর ভিতর দিয়ে পূর্বভারতীয় রেলপথ চলে গেছে।

৩. সাধারণভাবে এক ক্রোশ সমান দুই মাইল বা তার কিছু বেশি।

৪. মান্দারণ হুগলী জেলায় অবস্থিত। সুলতানি আমলে প্রায় সময় মান্দারণ বাংলা ও উড়িষ্যার সীমানা নির্ধারণ করতো।

সীমান্তে সমুদ্র, উত্তর ও দক্ষিণে পর্বতমালা এবং পশ্চিমে সুবা বিহার। পূর্ব দিকে অবস্থিত ভাটি এলাকা এই প্রদেশের (বাংলার) অন্তর্ভুক্ত। ভাটির পাশেই ত্রিপুরা পার্বত্য জাতির বাস, এই দেশের রাজারা মাণিক[৫] উপাধি গ্রহণ করেন। সুবা বাংলার উত্তরে কোচ দেশ; কামরূপ ও কামতা[৬] কোচ রাজার অধীন; এই রাজ্যের সীমান্তেই আসাম অবস্থিত। এর পাশেই নিম্ন তিব্বত এবং এর বামে খতা (চীন) দেশ।[৭] সুবা বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান এবং এই দেশেই চট্টগ্রাম বন্দর[৮] অবস্থিত।

আবুল ফজলের বক্তব্যে সামান্য তথ্যগত ভুল আছে। তিনি বলেন যে, সুবা বাংলার পূর্বে সমুদ্র, কিন্তু তা সত্য নয়। বাংলার পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত। সুবা বাংলার পূর্বে যে ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত ছিল তা আবুল ফজলের জানা ছিল, কারণ তিনি বলেন যে, বাংলার পূর্ব অংশে ভাটি এবং ভাটির পাশেই ছিল ত্রিপুরা। কিন্তু তবুও সীমানা দেয়ার সময় তিনি ভুল করে বাংলার পূর্ব সীমান্তে সমুদ্রের কথা বলেছেন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে যে আরাকানের অবস্থিতি এবং চট্টগ্রাম বন্দর যে আরাকানের অধীনে ছিল তাও আবুল ফজল জানতেন। কিন্তু বাংলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দেয়ার সময় তিনি চট্টগ্রাম থেকে গড়হি পর্যন্ত সুবা বাংলার সীমান্ত দিয়েছেন। সুবা বাংলার দক্ষিণ দিকে সারা সীমান্ত জুড়ে সমুদ্র, কিন্তু আবুল ফজল বলেছেন পর্বতমালা। তিনি হয়তো সুন্দরবনকে পর্বতমালা বলেছেন। তাঁর সময়ে সুন্দরবন বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল সন্দেহ নেই (কিন্তু সুন্দরবন পর্বতমালা নয়), এবং সুন্দরবনের পরেই যে সমুদ্র তা বোধহয় আবুল ফজলের জানা ছিল না। আবুল ফজল যখন *আইন-ই-আকবরী* লেখা শেষ করেন (১৫৯৩ খৃঃ)[৯], তার এক যুগ আগে সুবাব্যবস্থা চালু হয় এবং মুগল শাসনকাঠামোয় বাংলাকে সুবার মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু সেই সুবা বাংলায় মুগল কর্তৃত্ব ছিল খুবই দুর্বল এবং সেই দুর্বল

৫. ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস *রাজমালায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় একজন সুলতান (আমরা মনে করি সুলতান শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ) ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধি দান করেন। এই উপাধিধারী প্রথম রাজার নাম রত্ন-ফা বা রত্নমাণিক্য। (শ্রীরাজমালা, ১ম খণ্ড, কালিপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত, ৬০-৭১। আরো দেখুন, আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৭, ১৬৯।

৬. পশ্চিমে করতোয়া নদী থেকে পূর্বে বনাস (মনসা) নদী পর্যন্ত ভূভাগকে কামতা এবং বনাস নদীর পূর্ব তীর থেকে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর পর্যন্ত ভূভাগকে কামরূপ বলা হতো। কোচ রাজ্যকে *বাহরিস্তান-ই-গায়বী*-তে কামতার সঙ্গে অভিন্ন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মির্জা নাথন, *বাহরিস্তান-ই-গায়বী*, এম. আই. বোরাহ কর্তৃক অনূদিত এবং আসাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত (পরে *বাহরিস্তান* রূপে উল্লেখিত), ১৯৩৬; ১ম খণ্ড, ২৪৯-২৫২; ২য় খণ্ড, ৮০৬-৮০৭, টীকা নং ১৫, ১৬।

৭. এশিয়াবাসীর কাছে চীনদেশ প্রায় এক হাজার বছর ধরে খিতাই বা খতা নামে পরিচিত ছিল, ইউরোপীয়রা তা অনুসরণ করে ক্যাথে (Cathay) লিখে। *The book of Su Maro Polo*, ed. by Henry Yule, 2nd edition, Introduction, II, *Encyclopaedia of Islam*, Vol II, 737, (under Kara Khitai)

৮. আকবরের সময় চট্টগ্রাম বন্দর আরাকানের অধীনে ছিল, কিন্তু তবুও আবুল ফজল চট্টগ্রামকে সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন।

৯. আবুল ফজল চার খণ্ডে আকবরের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা করেন এবং তার পরিশিষ্টরূপে এক খণ্ডে আকবরের শাসনব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানাদির বিবরণ লেখার সিদ্ধান্ত নেন।। আকবরের রাজত্বের ৪২তম বর্ষে *আকবরনামা'র* খসড়া আকবরের সম্মুখে পেশ করার আগে চারবার সংশোধন করা হয়। *আইন-ই-আকবরী* ১৫৯৩ সালে শেষ হয়, পরে বেরার বিজিত হলে আরো কিছু সংযুক্ত কবা হয়। *আইন-ই-আকবরী*, ১ম খণ্ড, হেনরি ব্লখম্যান কর্তৃক অনূদিত, (কলকাতা ১৮৭৩), Lin. C H Philips (ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, (Oxford 1961), 144-45

কর্তৃত্বাধীন সুবা বাংলার আয়তনও ছিল অনেক কম। তাই আবুল ফজল প্রদত্ত সুবা বাংলার ভৌগোলিক বিবরণ সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণযোগ্য হলেও মুগল সুবা বাংলার আয়তনের প্রথম সীমা এবং পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ আলোচনাসাপেক্ষ।

১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই তারিখে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী মুগলদের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।[১০] এরই সঙ্গে বাংলার আফগান স্বাধীন সালতানাতেরও অবসান হয় এবং বাংলাদেশ, অন্তত কাগজে-কলমে, মুগল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। রাজধানী তাঁড়া[১১] মুগলদের হস্তগত হয় এবং সেখানে মুগল সেনাপতি খান জাহান অবস্থান নেন। কিন্তু রাজধানী অধিকৃত হলেও সারা বাংলা মুগল আধিপত্য স্বীকার করে নি; বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান সেনানায়কেরা ও বাংলার ভুঁইয়ারা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দাউদ কররানীর দুইজন মন্ত্রী কতলু লোহানী এবং শ্রীহরি বিশ্বাসঘাতকতা করে দাউদ খানের চূড়ান্ত পরাজয়ের আগেই মুগল সেনাপতি খান জাহানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং রাজমহলের যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করে দাউদের পতনে সাহায্য করে। পুরস্কারস্বরূপ কতলু লোহানী উড়িষ্যায় এবং শ্রীহরি যশোরে কয়েকটি পরগনা লাভ করে নির্বিঘ্নে শাসন করার সুযোগ পায়।[১২] এই দুইজন স্বপক্ষত্যাগী মুগল বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পরে কতলু লোহানী উড়িষ্যায় মুগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মাঝে মাঝে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও জীবনের শেষ পর্যন্ত মুগলদের শান্তিতে উড়িষ্যা দখলে রাখার সুযোগ দেয় নি। শ্রীহরি আজীবন মুগলদের প্রতি অনুগত থাকে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য প্রথমে মুগলদের অনুগত থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান চিশতী প্রতাপাদিত্যকে অন্যান্য বিদ্রোহ দমনে তাঁকে সাহায্য করতে আদেশ দিলে প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহ করেন। প্রতাপাদিত্য এখন বুঝতে পারেন যে, মুগল শক্তি স্থায়ীভাবে বাংলা গ্রাস করবে। কিন্তু যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে আবার মুগল বশ্যতা স্বীকার করে নেন। উড়িষ্যা ও যশোর বাদ দিলে দাউদ কররানীর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলে বাংলার ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখিত হতো, কিন্তু বিদ্রোহীরা বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই মুগলদের বিরুদ্ধাচরণ করে। সম্রাট আকবর একের পর এক সেনাপতি পাঠান, কিন্তু অনেক যুদ্ধ করেও তিনি সারা বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন।

১০. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৭, ৩৮৩-৮৪।

১১. এটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের তান্ডা (Tanda)। সোলায়মান কররানী ১৫৬৪ সালে গৌড় থেকে রাজধানী তাঁড়ায় স্থানান্তর করেন। তাঁড়া গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পাড়ে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন তাঁড়া নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

১২. কতলু লোহানীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা নিয়ামতুল্লাহর '*তারিখ-ই-খানজাহানি ওয়া মখজন-ই-আফগানা'য়*' এবং শ্রীহরির বিশ্বাসঘাতকতার কথা রামরাম বসুর '*প্রতাপাদিত্য চরিত্র*' গ্রন্থে পাওয়া যায়। নিয়ামতুল্লাহ বলেন, "Katlu Lohani, Daud's Commander-in-Chief, forming a reasonable connection with Khan Jahan, promised to take such a posture on the day of battle as to render Daud's defeat unavoidable, on condition that some porganas should be settled on him." (Dorn, *History of the Afghans*, Vol 1, 183)

বাংলার স্বাধীনচেতা ভুঁইয়া এবং পরাজিত আফগান সেনাপতি ছাড়া বাংলার মুগল সৈন্যদের বিদ্রোহও আকবরের সময় বাংলা বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৫৭৯ সালে বাংলা ও বিহারস্থ মুগল সেনানায়কেরা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঘোড়ার দাগ দেয়ার নিয়মের (branding regulations) কড়াকড়ি আরোপ, জাগির ভূমি-রাজস্বের হিসাব নিরীক্ষণে কড়াকড়ি, যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা (field allowance) হ্রাসকরণ ইত্যাদি কয়েকটি কারণে মুগল সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ধর্মের ব্যাপারে আকবরের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন। বিদ্রোহী মুগল সৈনিকেরা একজন সুবাদারকে (মুজাফফর খান তুরবতী) হত্যা করে, আকবরের ভাই কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা হাকিমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা করে। বিদ্রোহীরা মির্জা হাকিমের পক্ষে বাংলায় একটি বিদ্রোহী সরকার গঠন করে, মির্জা হাকিমের নামে খোতবা পাঠ করে, বিদ্রোহী নেতাদের উচ্চ পদ ও উচ্চ মনসব দান করে এবং জাগির ও খিলাত ইত্যাদি খুশিমতো প্রদান করে।[১৩] নিজ সৈন্যদের বিদ্রোহ দমনে আকবরের বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। কিন্তু মাসুম খান কাবুলী প্রমুখ কয়েকজন বিদ্রোহী সেনাপতি আত্মসমর্পণ না করে বাংলার ভুঁইয়া এবং আফগানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে। বাংলার ভুঁইয়াদের মধ্যে ভাটির বারো ভুঁইয়া, বিশেষকরে বারো ভুঁইয়ার নেতা ঈশা খান মসনদ-ই-আলা, শ্রীপুর-বিক্রমপুরের কেদার রায়, আফগানদের মধ্যে খাজা উসমান আফগান এবং মুগল বিদ্রোহী সেনাপতিদের মধ্যে বাবা খান কাকশাল ও মাসুম খান কাবুলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে শাহবাজ খান ও মানসিংহের মতো দক্ষ সেনাপতিদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলায় মুগল আধিপত্য বিস্তারের আশা পূর্ণ হওয়ার আগেই আকবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আকবরের আমলে যে এলাকায় মুগল আধিপত্য স্থাপিত হয় তার সীমানা মোটামুটি এভাবে নির্ধারণ করা যায় : উত্তরে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতগাঁও ও বর্ধমান, পূর্বে করতোয়া নদী এবং বগুড়া জেলার শেরপুর মুর্চার বরাবর একটি সমান্তরাল এলাকা এবং পশ্চিমে রাজমহল। সুতরাং এই ছিল আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* লেখা সমাপ্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত মুগল সুবা বাংলার সীমানা।[১৪]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ১৬০৮ সালে ইসলাম খান চিশতী বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি ঐ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে রাজধানী রাজমহলে[১৫] এসে

---

১৩. আবুল ফজল, *আকবরনামা*, ৩য় খণ্ড, হেনরি বেভেরিজ কর্তৃক অনূদিত, ৪৪৯-৪৫০ (পরে *আকবরনামা* ৩য় রূপে উল্লেখিত)।

১৪. স্যার যদুনাথ সরকার বলেন : "The effective control of the Mughal emperor was, however, confined to very narrow limits, and did not stretch far beyond the capital city and the few fortified posts set up by the imperial faujdars throughout the country." J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal* Vol. II, (Dhaka 1948), 235 পরে *HB* II রূপে উল্লেখিত।

১৫. রাজা মানসিংহ ১৫৯৫ সালে বাংলাব রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তবিত করেন। বাজমহলেব পূর্ব নাম ছিল আকমহল বা আগমহল। রাজমহল জেলা গঙ্গা নদীর তীরে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত; রাজমহল শহর গৌড়ের বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত; রাজা মানসিংহ এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নাম দেন আকবরনগর।

পৌঁছেন এবং বাংলা জয় করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলায় মুগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বাংলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়ে বিদ্রোহীদের সর্বাত্মক আক্রমণ করতে হবে এবং বিদ্রোহীদের স্বস্তি দেয়া যাবে না যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বা সময় নিয়ে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ না পায়। রাজধানী রাজমহল বাংলার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে, এই পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান নিয়ে সুদূর ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করা বা যুদ্ধে ঈপ্সিত ফল লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি রাজমহল থেকে রাজধানী সরিয়ে বাংলার মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঢাকাকে নতুন রাজধানীর জন্য নির্বাচন করেন। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয় এবং সম্রাটের নামানুসারে তিনি এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। দ্বিতীয়ত, ইসলাম খান চিশতী বুঝতে পারেন যে, নদীমাতৃক বাংলায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হলে শক্তিশালী নৌবহর প্রয়োজন। আকবরের সময়েও নৌবহর ছিল এবং সেই সময়েও নৌবাহিনী ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধ করে। কিন্তু আকবরের নৌবাহিনীর প্রধান ভাটির যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। সম্রাটের প্রতি শাহ্ বরদীর আনুগত্যও সব সময় সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না।[১৬] ইতিমধ্যে শাহ বরদী মৃত্যুবরণ করেন। এই জন্য ইসলাম খান চিশতী নৌয়ারা বা নৌবাহিনী শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করেন। তৃতীয়ত, ইসলাম খান চিশতী পরাজিত ভুঁইয়াদের দ্বিতীয় বার বিদ্রোহ করার সুযোগ দেন নি। এই বিষয়ে পূর্ববর্তী মুগল সেনাপতিদের নীতির সঙ্গে তাঁর নীতির কোন মিল ছিল না। পূর্ববর্তী সেনাপতিরা পরাজিত ভুঁইয়ারা বশ্যতা স্বীকার করলেই তাদেরকে নিজ নিজ এলাকার শাসনভার ফিরিয়ে দিতেন; এই সুযোগে তাঁরা নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করার এবং অবস্থা অনুকূল দেখলেই বিদ্রোহ করার জন্য তৈরি হতেন। তাঁরা বার বার বিদ্রোহ করতেন এবং বার বার তাঁদের মোকাবেলা করতে হতো। এতে লোক ও সম্পদ তো ক্ষয় হতোই, মুগল অগ্রগতিও ব্যাহত হতো। কিন্তু ইসলাম খান চিশতী বশ্যতা স্বীকারকারীদের নিজ এলাকায় ফেরত না পাঠিয়ে সুবাদারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে রেখে দিতেন এবং অন্য বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ফলে বাঙালিরাই বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেতো না। এভাবে বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত লোপ পায়।[১৭]

ইসলাম খান চিশতী রাজমহলে পৌঁছেই বাংলার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সম্রাটের কাছে নিম্নরূপ প্রতিবেদন পাঠান :

> এই প্রদেশের শাসন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের যত্নবান হওয়া উচিত এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। দীউয়ানের পদটি একজন অত্যন্ত সৎ লোককে দেয়া হোক। ইহতিমাম খান, যিনি একজন দক্ষ অফিসার, তাঁকে অথবা তাঁর মতো একইরূপ দক্ষ অফিসারকে

---

১৬. *আকবরনামা*, ৩য়, ৩৭৬।

১৭. J N Sarkar (ed.), *History of Bengal*, 234.

> নৌবাহিনীর কর্তা এবং গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হোক। পূর্ববর্তী সময়ের দুর্নীতিপরায়ণ ও বিশ্বাসঘাতক অফিসাররা, যারা এই প্রদেশে চাকুরির জন্য অনুপযুক্ত, তাদের প্রত্যাহার করা হোক।[১৮]

জাহাঙ্গীর অনতিবিলম্বে এই সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং ইহতিমাম খানকে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ইহতিমাম খানকে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন পূর্ববর্তী সুবাদার মানসিংহের অধীনস্থ সকল সৈন্য ও কামান, জাহাঙ্গীর কুলী বেগ নির্মিত কামান, রোহতাস দুর্গে অবস্থিত কামান এবং গোলাবারুদ ইত্যাদি হস্তগত করে বাংলার দিকে রওনা হন। ফলে বাংলার নৌয়ারা বা নৌবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়।

ইসলাম খান চিশতীর তিনটি পরিকল্পনাই অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার মাত্র চার বছরের মধ্যে নৌবাহিনীর সাহায্যে ভাটি সহ মেঘনা নদী পর্যন্ত সকল ভূভাগ মুগল অধিকারে আসে। বাংলার ভুঁইয়ারা সকলেই একের পর এক মুগল বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এমনকি,বারো ভুঁইয়ার নেতা ঈশা খানের ছেলে মুসা খানও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।[১৯] মুগল বিদ্রোহীদের সকলেই বশ্যতা স্বীকার করে[২০], এমনকি দুর্ধর্ষ আফগান খাজা উসমানও যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীরের আমলেই সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহ জঙ্গ ফেনী নদী পর্যন্ত মুগল সীমানা বিস্তৃত করেন। তিনি ত্রিপুরাও জয় করেন, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে ত্রিপুরা আবার হাতছাড়া হয়ে যায়।[২১] কিন্তু তখনো আবুল ফজল বর্ণিত এলাকা 'তেলিয়াগড় থেকে চট্টগ্রাম' সুবা বাংলার অধীনস্থ হয় নি। চট্টগ্রাম বিজিত হয় ১৬৬৬ সালে আওরঙ্গজেবের সময়ে অর্থাৎ দাউদ কররানীর পতনের (১৫৭৬ খৃঃ) ঠিক নব্বই বছর পরে।

ভৌগোলিক নিরিখে বৃটিশ বাংলার সঙ্গে সুবা বাংলার সম্পূর্ণ মিল ছিল না। জাহাঙ্গীরের সময় থেকে বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কোচ, কামতা, কামরূপ ও আসামে মুগলরা বারবার অভিযান চালায়, বহু যুদ্ধ হয়, মাঝে মাঝে কিছু অংশ বিজিত হয় আবার হাতছাড়া হয়ে যায়। এভাবে অনেক দিন চলে। শেষ পর্যন্ত কোচ, কামতা, কামরূপ ও আসামের হাজো পর্যন্ত বিজিত হয়। শেষদিকে এই সীমা মোটামুটি স্থিতিশীল হয়। শাহজাহানের একখানা শিলালিপি হাজো থেকে আবিষ্কৃত হয়।[২২] ঐ লিপি থেকে বোঝা

১৮. *Baharistan*, Vol I, 3-4

১৯. ইতিপূর্বে ১৫৯৯ সালে ঈশা খান মৃত্যুবরণ করেন।

২০. আফগান বিদ্রোহীদের নেতা মাসুম খান কাবুলীও ইতিপূর্বে ১৫৯৯ সালে পরলোকগমন করেন। মাসুম খানের পুত্র মির্জা মুমিন মুসা খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইসলাম খান চিশতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাঁরা কেউ টিকতে পারেন নি।

২১. আবদুল করিম, 'জাহাঙ্গীরের আমলে মুসলমানদের ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯১, ১১-৩৯।

২২. Shams-ud din Ahmad *Inscriptions of Bengal*, Vol IV (Rajshahi 1960), 280-84

যায় যে, মুগল আমলের শেষ পর্যন্ত 'আমলা আসাম' নামে জাগির পূর্বসীমান্তের প্রতিরক্ষাব্যয়ের জন্য নির্ধারিত ছিল।[২৩] শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের সময় ঢাকার নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান আবার ত্রিপুরা জয় করেন।[২৪] ফলে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত এলাকা মুগল সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ত্রিপুরার বিজিত অংশকে রৌশনাবাদ নাম দেয়া হয়। মুগল আমলে বিহারের ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়ার কিছু অংশ সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৫] মেদিনীপুরের ঘাটাল-এর উত্তর অংশ বাংলা এবং দক্ষিণ অংশ উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৬] কিন্তু আঠারো শতকে মুর্শিদকুলী খান মেদিনীপুরকে বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করেন।[২৭] অতএব, মুগল সুবা বাংলার সীমানা আমরা এভাবে নির্ধারিত করতে পারি :

> উত্তরে পর্বতমালা, উত্তর-পূর্বে আসামের হাজো, পূর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণে সমুদ্র, দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান,দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বিহার।

আবুল ফজলের আর একটি বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, উড়িষ্যা সুবা বাংলার সঙ্গে যুক্ত হলে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া পলাশী যুদ্ধের সময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল—এর তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আকবরের সময় উড়িষ্যা প্রশাসনিকভাবে বাংলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, কারণ বাংলা ও উড়িষ্যা একই সঙ্গে বিজিত হয় এবং একই সেনাপতি উভয় অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হন। উড়িষ্যার আফগান বিদ্রোহীরা তাড়া খেয়ে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে বাংলার সীমানায় প্রবেশ করতো। সুতরাং সামরিক প্রয়োজনেই বাংলা ও উড়িষ্যা বিজয়ের কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে হতো। কিন্তু বিজয় সম্পূর্ণ হলে মুগল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোয় উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে উড়িষ্যা বাংলার সুবাদারের অধীনে থাকতো। জাহাঙ্গীরের সময়ে সর্বপ্রথম উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র সুবার মর্যাদা দেয়া হয় এবং হাশিম খান প্রথম সুবাদার নিযুক্ত হন ১৬০৭ সালে। ১৬২০ সাল পর্যন্ত উড়িষ্যার স্বতন্ত্র মর্যাদা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ১৬২১ সালে বাংলার সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ একই সঙ্গে উড়িষ্যার দায়িত্ব লাভ করেন; তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।[২৮] ১৬৪২ সালের মার্চ মাসে

২৩. *Fifth Report, Appendix* 4, 189-91

২৪. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, আবদুস সালামের ইংরেজি অনুবাদ, ২৯৯। ১৭২৮ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৭৩৪ সাল পর্যন্ত ২য় মুর্শিদকুলী খান ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁর সেনাপতি মীর হাবিব ত্রিপুরা জয় করেন। Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, (Dhaka 1964), 21.

২৫. *HB II*. 235

২৬. ঐ, ২০১।

২৭. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963), (পরে *MQK* রূপে উল্লেখিত), 76

২৮. জাহাঙ্গীর, *তুজক-ই-জাহাঙ্গীরী*, রোজার্স ও বেভেরিজ-এর ইংরেজি অনুবাদ (পরে *তুজক* রূপে উল্লেখিত), ২০২।

বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ্ শুজাকে একই সঙ্গে উড়িষ্যার সুবাদারি দেয়া হয়।[২৯] ১৭১৪ সালে মুর্শিদকুলী খান উড়িষ্যার সুবাদার বা নাজিম নিযুক্ত হন। এর আগেই তিনি বাংলার দীউয়ান এবং অনুপস্থিত সুবাদার মীর জুমলার নায়েব বা প্রতিনিধিরূপে বাংলার সুবাদারের দায়িত্বে ছিলেন। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খান নিজে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।[৩০] সুতরাং ১৭১৭ সালে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারির দায়িত্ব একই লোকের হাতে ন্যস্ত হয়। মুর্শিদকুলী খান তাঁর জামাতা শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর ১৭২৭ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করেন এবং বাংলা ও উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের সুবাদারি লাভ করেন।[৩১] তিনি প্রথমে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তকী এবং পরে জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের মাধ্যমে উড়িষ্যা শাসন করেন।[৩২] সম্রাট মুহাম্মদ শাহ ১৭৩৩ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই প্রথম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনক্ষমতা একই ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পণ করা হয়।[৩৩] শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান শাসনের সুব্যবস্থার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে চারটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন, যেমন (১) পশ্চিম ও মধ্য বাংলা এবং উত্তর বাংলার কিছু অংশ; (২) ঢাকা বিভাগ, দক্ষিণ বাংলা এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম সহ পূর্ব বাংলা এবং উত্তর বাংলার বাকি অংশ; (৩) বিহার বিভাগ এবং (৪) উড়িষ্যা বিভাগ। একটি উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে সুবাদার নিজে প্রথম বিভাগ শাসন করতেন; অন্য তিনটি বিভাগে তিনি নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, কিন্তু সকলের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব বহাল রাখেন। বিহারে আলিবর্দী খানকে, ঢাকায় প্রথমে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে এবং পরে সরফরাজ খানকে এবং উড়িষ্যায় প্রথমে মুহাম্মদ তকীকে এবং পরে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।[৩৪] ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করে মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করেন। তিনিও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের মতো নিজে মুর্শিদাবাদে অবস্থান নিয়ে ঢাকা, বিহার ও উড়িষ্যায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দেশ শাসন করেন।[৩৫]

সুবা বাংলার ভৌগোলিক বিবর্তন আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আকবরের সময় বাংলা ও উড়িষ্যার অধিকৃত এলাকার আয়তন ছিল অতি সীমিত। সে কারণে বাংলা ও উড়িষ্যা দু'টি সুবা হলেও একই সুবাদারের অধীনে থাকে। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা আকবরের সময় বিধিবদ্ধ এবং সমন্বিত হলেও মুগল সুবা বাংলা পূর্ণতা লাভ করে জাহাঙ্গীরের সময়ে। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সময়ে সুবা বাংলার উপর

২৯. *HB II*, 332, note.

৩০. *MQK*, 48.

৩১. *HB II*, 422-23.

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ, ৪২৫।

৩৪. নায়েব বা প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় নওয়াব নামে পরিচিত হন, নওয়াব নায়েব শব্দেব বহুবচন।

৩৫. *HB II*, 442

সম্রাটের দৃঢ় কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার প্রশ্নে কয়েকটি ভ্রাতৃযুদ্ধের অভিঘাতে মুগল কেন্দ্রীয় শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে; সৈন্যবাহিনীসহ অনেক সেনাপতি নিহত হয়; রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে শাসনক্ষমতা দুর্বল ও অনভিজ্ঞ লোকদের হাতে পড়ে। এই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অফিসারগণ নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার কাজে অধিক সময় ব্যয় করতেন। এই সময় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সুবা বাংলার শাসনব্যবস্থায় কিছু প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, বাংলার সুবাদারেরা প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকতেন এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন চালাতেন। আওরঙ্গজেবের শেষ বয়সে শাহজাদা আজিমউদ্দিনের (আজিম-উশ-শান) সময় থেকে এই প্রবণতা শুরু হয় এবং ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের সুবাদার নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে শাহজাদারা দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। বাংলার শাসনের প্রতি তাঁদের বিশেষ নজর থাকতো না। একমাত্র ধন-সম্পদ লাভের আশায় তাঁরা বাংলায় সুবাদারি আঁকড়ে থাকতেন। কারণ আসন্ন উত্তরাধিকারের যুদ্ধে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, একাধিক সুবার শাসনভার একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হতো। একার পক্ষে একাধিক সুবার শাসনকাজ চালানো সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা একটি কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করে বিভিন্ন সুবায় নায়েব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। নায়েবরা নিজ নিজ এলাকায় নওয়াব নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরাও অর্থলিপ্সু হয়ে পড়েন। এঁদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব তো ছিলই না, বরং সুবাদার বা নাজিমের পক্ষেও এত অর্থলিপ্সু লোকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হতো না। তাছাড়া নাজিমের পুত্র বা নিকট-আত্মীয়রা নায়েব বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পেতো। ফলে অপত্যস্নেহে অন্ধ নাজিম নায়েবদের কার্যকলাপে বিশেষ তদারকি করতেন না। তৃতীয়ত, সুবা প্রবর্তনের মূলনীতি ছিল নিজামত এবং দীউয়ানি শাসন পৃথকীকরণ। নাজিম ও দীউয়ান নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে স্বাধীন ছিলেন, উভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং উভয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী থাকতেন। এই পৃথকীকরণ নীতি আকবর থেকে আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়,একই ব্যক্তি নাজিম ও দীউয়ান উভয় পদে নিযুক্তি পেতে থাকেন। একই ব্যক্তি নিজামত ও দীউয়ানির দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় শাসনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষমতা হয় এক ব্যক্তির কুক্ষিগত এবং স্বাভাবিক কারণেই ক্ষমতার অপব্যবহার হতে থাকে। চতুর্থত, মুগল সম্রাটেরা অর্থের লোভে সুবাদার বা নাজিম নিযুক্ত করা শুরু করেন। প্রত্যেক নাজিম সম্রাট ও উজিরদের দরবারে নিজ নিজ উকিল বা প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন এবং তাঁদের মারফত নজরানা-উপঢৌকন পাঠিয়ে সম্রাট ও উজিরদের অনুগ্রহ লাভ করতেন। কোন নাজিম মারা গেলে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের উকিলরা কেন্দ্রীয় রাজধানীতে তৎপর হয়ে উঠতো এবং যাঁর উকিল সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হতো তিনিই নাজিম পদে নিযুক্তি লাভ করতেন। ১৭২৭ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান এবং ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান প্রথমে যুদ্ধ করে মসনদ দখল করেন। তাঁরা সম্রাটের নিযুক্তি লাভ করেন ক্ষমতা দখল করার পর। সম্রাট নিযুক্তি দিয়ে শুধু জবরদখলকারীর ক্ষমতা আইনসম্মত করে দেন। ১৭২৭ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান এবং তৎপুত্র সরফরাজ

খানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে বা ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান সুবাদার সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করলেও সম্রাট বা কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন। এই নিষ্ক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উত্তর ভারতে মুগল অধিকার ও কর্তৃত্ব সন্তোষজনকভাবে স্থিতিশীল হলে আকবর শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করেন। তিনি রাজত্বের ২৪তম বর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ সালে সারা সাম্রাজ্যকে ১২টি সুবায় বিভক্ত করেন এবং সুবার সুশাসনের জন্য বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করেন। *আকবরনামায়* এই কর্মকর্তাদের বিবরণ এভাবে উল্লেখিত হয়েছে—১ জন সিপাহসালার, ১ জন দীউয়ান, ১ জন বখশী, ১ জন মীর আদল, ১ জন সদর, ১ জন কোতওয়াল, ১ জন মীর বাহর এবং ১ জন ওয়াকিয়ানবিশ।[৩৬] *আকবরনামায়* সুবার শাসনকাঠামো দেয়া হলেও সুবাগুলির নাম দেয়া হয় নি। নাম ও সংখ্যা বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে *আইন-ই-আকবরীতে*।[৩৭] সুবাগুলির নাম এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহমেদাবাদ, বিহার, বাংলা, দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান এবং মালওয়া। পরে বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগর অধিকৃত হলে সুবার সংখ্যা দাঁড়ায় পনেরোটি। উড়িষ্যা ও কাশ্মীরকে সুবার মর্যাদা দেয়া হলে সুবার সংখ্যা হয় সতেরোটি। *আইন-ই-আকবরী*তে প্রত্যেক সুবার শাসনকাঠামো, কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রশাসনিক বিভাগসমূহের নাম, রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ (assessment) ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথম সুবাব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় উড়িষ্যা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আবুল ফজল বলেন :

> This (Orissa) was formerly a separate state…His Majesty apportioned it into five Sarkars viz., Jalesar, Bhadrak, Katak (Cuttack), Kaling Dandpat and Raja Mahandrah. These five are now included in the province of Bengal.[৩৮]

সুবাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা একটি সুবায় পরিণত হয়। পি. সারন সুবাগুলিকে প্রধান এবং অপ্রধান (major & minor) রূপে ভাগ করেছেন। তিনি বলেন :

> These provinces varied greatly in status according to their extent and resources, or military and strategic importance. In view of their importance and status, they

৩৬. *আকবরনামা*, ৩য়, ৪১২-১৩। "One of the occurrences was the division of the wide tract of India into twelve portions... He distributed the territories according to suitable limits and laid out the garden of creation by appropriate methods. And he made it over to liberal and righteous guardians... In this way did he make fitting division of the wide and fertile land of India and in every province he appointed a Viceroy Sipah-salar, a Diwan, a Bakhshi, a Mir Adal, a Sadr, a Kotwal, a Mir Bahr (Admiral) and a Recorder (waqianavis)."

৩৭. *আইন*, ২য়, ১২৯। "His majesty apportioned the Empire into twelve divisions, to each of which he gave the name of Subah and distinguished them by the appellation of the tract of country or its capital city. These were Allahabad, Agra, Oudh, Ajmer, Ahmadabad, Behar, Bengal, Delhi, Kabul, Lahore, Multan, Malwah, and when Berar, Khandesh and Ahmadnagar were conquered their number was fixed at fifteen."

৩৮. *আইন*, ২য়, ১৩৮।

> may be classified into 1. major provinces and 2. minor provinces. Perhaps there were no definite rules for such classification. Nevertheless, the imperial government adopted, in regard to each individual province, administrative measures, such as the appointment of governors and other high officials in keeping with the status of that province. The charge of the major provinces was given to princes and nobles of the highest rank. Of the fifteen Subahs of Akbar's Empire the twelve original ones came under the category of major provinces, although among them too there were senior and junior grades.[৩৯]

আয়তন, সীমান্তরক্ষা সহ অন্যান্য সামরিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব বিবেচনায় সুবাগুলির মধ্যে মর্যাদার তারতম্য থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এই তারতম্য মাত্রাগত, প্রকারগত নয় (difference of degree, not of kind)। প্রশাসনিক কাঠামোতে, রাজস্ব নির্ধারণ বা আদায়ে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে সুবাগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য বা তারতম্য ছিল না। একই আইন-কানুন দ্বারা প্রত্যেক সুবা পরিচালিত হতো। সঙ্গত কারণেই আয়তনে বড় এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সুবাগুলিতে যুবরাজসহ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার (মনসবের) অধিকারী সেনানায়কদের সুবাদার নিয়োগ করা হতো। এই কারণে সুবাগুলিকে মেজর বা মাইনর সুবায় বিভক্ত করা যায় না। সুবা বাংলাকে মেজর বা 'প্রধান' সুবা রূপে প্রমাণ করার জন্য পি. সারন দু'টি যুক্তি উত্থাপন করেছেন : (১) তিনি বলেন যে, ১৬১১ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সুপারিশক্রমে রাজা টোডরমল্লের পুত্র রাজা কল্যাণকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। (২) তিনি বলেন যে, ১৬১৮ সালে (প্রকৃতপক্ষে ১৬২১ সাল) বাংলার সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন।[৪০] ১ নং তথ্য সঠিক, *তুজক-ই-জাহাঙ্গীরীতেই* তা পাওয়া যায়। কিন্তু ১৬১১ সালে এক বিশেষ কারণে সম্রাট বাংলার সুবাদারের সুপারিশ গ্রহণ করেন। বাংলা বিজয়ের সকল সুযোগ-সুবিধা সুবাদারের অনুকূল করার উদ্দেশ্যে সম্রাট বাংলার সুবাদারের সুপারিশক্রমে বাংলার সকল কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। যেহেতু বাংলা বিজয়ের সঙ্গে উড়িষ্যা বিজয়ও সম্পৃক্ত ছিল, সেহেতু ১৬১১ সালে বাংলার সুবাদারের সুপারিশে উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত এবং বোধগম্য। কিন্তু পি. সারনের ২ নং তথ্যটি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। মির্জা নাথনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, সম্রাট উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্তিতে বাংলার সুবাদারের সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। মির্জা নাথন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন :

> সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ তিন লক্ষ টাকা পেশকাশ বা সালামির বিনিময়ে এবং তাঁর বেগমের সুপারিশে জালহির খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু আহমদ বেগ খান

---

৩৯. P. Saran, *The Provincial Government of the Mughals*, 2nd edition, (Bombay 1973), (পরে P. Saran রূপে উল্লেখিত), ৬৪-৬৫।

৪০. ঐ, ৬৭, টীকা নং ৫৪।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কাছে এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানান, ফলে নূরজাহানের হস্তক্ষেপে[৪১] সম্রাট আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগ করার জন্য সুবাদার ইবরাহিম খানকে নির্দেশ দেন।[৪২]

যাহোক, সুবা বাংলার শাসনকে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। বাংলার সুবাদারি পদ খালি হলে বিহারের সুবাদারকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করার প্রথা আকবরের সময় থেকে, এমনকি সুলতানি আমলেও প্রচলিত ছিল। ইসলাম খান চিশতীও প্রথমে বিহারের সুবাদার ছিলেন এবং বিহার থেকেই তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয়। বিহারের সুবাদারিকে বাংলার সুবাদারি লাভের প্রথম পদক্ষেপ (stepping stone) রূপে গণ্য করা হতো। বাংলার সুবাদারি লাভ করাকে পদোন্নতি মনে করা হতো এবং বাংলার সুবাদারি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনসবও বৃদ্ধি পেতো। দ্বিতীয়ত, মুগল সরকারি দলিল-দস্তাবেজে কয়েকটি একত্রীকৃত সুবাকে সুবার বদলে 'আয়ালত' বলা হতো। দক্ষিণ ভারতের সুবাগুলি যখন আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ করা হয়, তখন এই সুবাগুলিকে একসঙ্গে 'আয়ালত' বলা হতো।[৪৩] 'আয়ালত' শব্দটি 'আউয়াল' বা 'প্রথম' থেকে উদ্ভূত। সুতরাং মুগল রেকর্ডে 'আয়ালত' শব্দ দ্বারা বোধ হয় প্রথম সারির শাসিত সুবা বুঝানো হতো। আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরীতে* বাংলাকে বরাবরই সুবা বলেছেন, কিন্তু '*আকবরনামায়* মাঝে মাঝে বাংলার জন্য 'আয়ালত' শব্দ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৪] তৃতীয়ত, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পাদ থেকে বাংলার বাৎসরিক রাজস্ব মোটামুটি এক কোটি টাকা সম্রাটের জন্য বেশ স্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সম্রাটের কাছে সুবা বাংলার গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

প্রথম মুগল বিজয়ের সময় বাংলার রাজধানী ছিল তাঁড়ায়। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় (সুলতানি আমলের লখনৌতি) আগেই পরিত্যক্ত হয়। মুগল সেনাপতি মুনিম খান খানান তবুও কিছুদিন গৌড়ে অবস্থান নেন। কিন্তু ঐ এলাকা মহামারীতে আক্রান্ত হয়। এতে অনেক সৈন্যক্ষয় হয় এবং মুনিম খান নিজেও মৃত্যুবরণ করেন।[৪৫] খান জাহান এবং তাঁর সেনাপতিরা তাঁড়ায় অবস্থান নেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৫৯৫ সালে রাজা মানসিংহ তাঁড়া থেকে রাজধানী রাজমহলে সরিয়ে নেন। আবুল ফজল বলেন যে, মানসিংহ বাংলায় এসে রাজধানী স্থাপনের জন্য এমন একটি স্থানের কথা চিন্তা করেন যা নৌ-আক্রমণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত এবং তিনি

---

৪১. *বাহরিস্তান*, ২য় খণ্ড, ৬৩৪।

৪২. আহমদ বেগ খান ছিলেন নূরজাহান এবং ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ উভয়েরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

৪৩. I. H. Qureshi, *The Administration of the Mughal Empire*, (Patna 1979), 228, note 7

৪৪. আবুল ফজল, *আকবরনামা*, ৩য় খণ্ড, মূল ফার্সি, ২৬৬। বেভেরিজ অনুবাদ করেছেন government (*আকবরনামা*, ৩য়, ৩৬৮), সুতরাং অনুবাদ থেকে মূল শব্দটি বোঝা যাবে না।

৪৫. মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মুনিম খান তাঁড়ায় ফিরে আসেন, কিন্তু মাত্র দশ দিন পরে ১৫৭৫ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। *আকবরনামা*, ৩য়, ২২৬।

আকমহল (রাজমহল)-কে নির্বাচিত করেন। শীঘ্রই এখানে একটি সুন্দর শহর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানসিংহ এর নাম দেন 'আকবরনগর'।[৪৬] কিন্তু রাজমহল নৌ-আক্রমণ থেকে মোটেই নিরাপদ ছিল না,কারণ রাজমহলও নদীর তীরে অবস্থিত। তবে আবুল ফজলের ভাষায় রাজমহল 'কিছুটা নিরাপদ' ছিল, কারণ ভাটি থেকে রাজমহলের দূরত্ব অনেক। রাজধানী সরাবার আসল কারণ বোধহয় এই যে, মানসিংহ হয় বাংলায় বিদ্রোহীদের মাঝে অবস্থান করতে সাহস করেন নি, না হয় বাংলার আবহাওয়া তিনি পছন্দ করেন নি।[৪৭] কিন্তু ইসলাম খান চিশতী আবার সামরিক কারণে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। ঢাকা প্রায় একশত বছর ধরে রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে প্রথমে শাহ শুজা এবং পরে শাহজাদা আজিমউদ্দিন যথাক্রমে রাজমহলে ও পাটনায় অবস্থান নেন। শাহ শুজা ঢাকায় 'বড় কাটরা' নামে খ্যাত একখানি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন, কিন্তু তিনি রাজমহলে চলে গেলে এই প্রাসাদ[৪৮] কাটরারূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। সম্রাটের অনুমতি নিয়েই শুজা রাজমহলে যান[৪৯]। কিন্তু তিনি রাজমহলেও সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর রাজমহলে বসবাসের স্মৃতি সুখকর ছিল না।[৫০] তিনি পাটনার কিছু অংশ তাঁকে দেয়ার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ জানান, কিন্তু তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা হয় নি। শাহজাদা আজিমউদ্দিন (আজিম-উশ-শান) ১৭০৩ সালে ঢাকা ত্যাগ করে পাটনায় অবস্থান নেন। দু'জনেই রাজনৈতিক কারণে ঢাকা ত্যাগ করেন। শাহ শুজা পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি লালায়িত ছিলেন, সুতরাং রাজধানীর কাছাকাছি থাকাই তিনি শ্রেয় মনে করেন। আজিমউদ্দিন দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। মুর্শিদকুলী খান (তখন তাঁর উপাধি ছিল কারতালাব খান) সম্রাটের খুবই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দীউয়ানি পরিচালনা করেন। অন্যদিকে আজিমউদ্দিনের দৃষ্টি ছিল অর্থ-সম্পদের দিকে। তিনি জানতেন যে, তাঁর পিতামহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের যুদ্ধ অনিবার্য এবং এই যুদ্ধে তাঁর পিতার[৫১]

৪৬. *আকবরনামা*, ৩য়, ১০৪২-৪৩।

৪৭. মানসিংহের আগে বাংলায় ৩ জন সুবাদার (মুনিম খান, খান জাহান এবং উজির খান) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন এবং ১ জন (মুজাফফর খান তুরবতী) নিহত হন। একজন সুবাদার ভয়ে (খান আজম) বাংলায় আসেন নি; মানসিংহও বাংলায় তাঁর দুই পুত্রকে হারান, একজন দুর্জন সিংহ বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন এবং অন্যজন হিম্মত সিংহ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান. তাছাড়া বহিরাগত অনেকেই বাংলার আবহাওয়া পছন্দ করতো না, এমন অনেক প্রমাণ আছে।

৪৮. বহিরাগত অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের (travelling merchants) থাকার স্থানকে কাটরা বলা হতো।

৪৯. *HB* II, ৩২৪ সম্রাটের চিঠি দ্রষ্টব্য। স্যার যদুনাথ সরকার সম্রাটের চিঠির অনুবাদ করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু চিঠির উৎস তিনি উল্লেখ করেন নি; এই চিঠিতে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, এতে বোঝা যায়, মুগল সম্রাট বা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্থানের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকতেন; দ্বিতীয়ত, সম্রাট সুবাগুলির সুশাসনের দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

৫০. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, 334

যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হবে। এই জন্য তিনি অর্থলোভী হয়ে পড়েন এবং যেভাবে পারেন টাকা আদায় করতে থাকেন, এমনকি 'সওদা-ই-খাস' নামে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করেন। ফলে মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে, কারণ মুর্শিদকুলী খান তাঁর সকল অপকর্ম সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করেন। সম্রাট সুবাদার আজিমউদ্দিনকে পাটনায় অবস্থান নিতে আদেশ দেন এবং মুর্শিদকুলী খানকে মকসুদাবাদে দীউয়ানি স্থানান্তরের অনুমতি দেন। ফলে ১৭০৩ সালে দীউয়ানি অফিসসমূহ মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। মুর্শিদকুলী খানের নামানুসারে মকসুদাবাদের নাম হয় মুর্শিদাবাদ। পরে মুর্শিদকুলী খান নিজে সুবাদার নিযুক্ত হলে তিনি আর ঢাকা ফিরে যান নি, মুর্শিদাবাদই অবশেষে প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হয়।

সুবা বাংলার চারটি রাজধানীর প্রত্যেকটিই নদীর তীরে অবস্থিত—রাজমহল গঙ্গার তীরে, তাঁড়া ও মুর্শিদাবাদ গঙ্গার ভাগীরথী শাখার তীরে এবং ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। নৌ-পথে যাতায়াতের সুবিধা এই স্থানগুলিতে রাজধানী স্থাপনের প্রধান কারণ। নৌকাই ছিল মধ্যযুগে বাংলায় যোগাযোগের প্রধান উপায়। নৌয়ারা বা নৌবাহিনীর যৌক্তিকতা আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ ছিল বাণিজ্যিক সুবিধা। মধ্যযুগে প্রধানত নৌকার সাহায্যে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন করা হতো। তাই একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছাড়া যেমন শহর গড়ে উঠে না, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শুল্ক আদায়ের জন্য রাজধানী নদীর তীরে অবস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। ইসলাম খান চিশতীর সময় ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সামরিক গুরুত্ব আগেই আলোচনা করা হয়েছে। মুর্শিদকুলী খানের সময় অর্থাৎ আঠারো শতকের প্রথম থেকে ঢাকার তুলনায় মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রথমত, এই সময় উড়িষ্যার দীউয়ানি ও সুবাদারি মুর্শিদকুলী খানের দায়িত্বে অর্পিত হয়। ফলে ঢাকার অবস্থান বাংলা ও উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশের এক প্রান্তে পড়ে যায়। মুর্শিদাবাদ ছিল দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে। মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শাসন করা সহজতর হয়ে উঠে। দ্বিতীয়ত, সতেরো শতকের শেষে এবং আঠারো শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির বাণিজ্যকুঠি ভাগীরথী নদীর তীরে হুগলী বন্দরের সন্নিকটে স্থাপিত হয়। দেশের বহির্বাণিজ্য অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং দেশে ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের বণিকদের আমদানিকৃত অভাবিতপূর্ব সম্পদ কাঁচা সোনা ও রূপার আকারে প্রবেশ করতে থাকে। অর্থনৈতিক কারণে (এবং প্রতিরক্ষার কারণেও) এই কোম্পানিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ হুগলী বন্দর এবং ইউরোপীয় কুঠিগুলির কাছাকাছি অবস্থিত। ঢাকার তুলনায় মুর্শিদাবাদ থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ ছিল। সুতরাং প্রশাসনিক প্রয়োজনেই রাজধানী স্থানান্তরিত হলো। বিশেষত মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর মুর্শিদকুলী খানের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

---

৫১. তাঁর পিতা শাহজাদা মুয়াজ্জম, পরে সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের যুদ্ধে আজিমউদ্দিনের পিতা জয়লাভ করেন, কিন্তু তাঁর পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তিনি (আজিমউদ্দিন) তাঁর বড় ভাই জাহান্দরের কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

সুবা এবং সুবার প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আকবর তাঁর রাজত্বের ২৪তম বছরে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যকে সুবায় বিভক্ত করেন এবং ঐ সময়েই বাংলা একটি সুবায় পরিণত হয়। সুবাগুলির জন্য এক রকম প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। তবে সুবা বাংলার জন্য কোন পৃথক কাঠামো ছিল না। প্রত্যেক সুবায় একজন সিপাহসালার (বা সুবাদার বা নাজিম), একজন দীউয়ান, একজন বকশী, একজন সদর, একজন কাজি, একজন কোতওয়াল, একজন মীর বাহর এবং একজন ওয়াকিয়ানবিশ-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। *আইন-ই-আকবরীতে* পৃথক পৃথক আইনে এদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৫২] তাছাড়া কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করে কর্মকর্তাদের কাছে পাঠাতো, এগুলিকে বলা হতো দস্তুর-উল-আমল (administrative manual) বা প্রশাসনিক আইন-কানুন। *আইন-ই-আকবরীতে* প্রদত্ত আইনসমূহ পাঠে দেখা যায় যে, দেশের সুশাসন, কৃষির উন্নতি, কৃষকদের উৎসাহ দান, নতুন নতুন ভূমি কৃষিযোগ্য করা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতি মুগল সম্রাটের সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রাদেশিক শাসনের শীর্ষে ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। তাঁকে আকবরের সময়ে 'সিপাহসালার', সতেরো শতকে 'সুবাদার' (বা সংক্ষেপে সুবা) এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে 'নাজিম' বলা হতো। মুগল শাসনের শেষ পর্যন্ত নাজিম শব্দটিই চালু থাকে, যদিও সুবাদার শব্দটি কোন সময় একেবারে বাদ যায় নি। এই পদবিগুলি তাৎপর্যবহ। 'সিপাহসালার' মানে সেনাপতি। মুগল শাসনের প্রথমদিকে রাজ্য জয় করা এবং সম্রাটের অধীনে রাখাই ছিল সিপাহসালারের প্রাথমিক দায়িত্ব। সেই সময়ে সেনাপতিত্বই ছিল তাঁর প্রধান ভূমিকা। তিনি রাজ্য শাসন করতেন, কিন্তু এই ভূমিকা ছিল গৌণ, রাজ্য থাকলে তো রাজ্য শাসন। এই কথাটি বিশেষকরে বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুবাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর পদবিরও পরিবর্তন হয় এবং তা সুবাদার-এ পরিণত হয়। সুবাদার অর্থ সুবার রক্ষক বা শাসক। কিন্তু 'নাজিম' পদবিই প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রকৃত পরিচয় বহন করে। 'নাজিম' শব্দের অর্থ কার্যনির্বাহক, অর্থাৎ 'নাজিম' ছিলেন নির্বাহী কর্মকর্তা; সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি প্রদেশ বা সুবার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। 'নাজিম' শব্দের মধ্যে শাসন এবং সুষ্ঠু শাসনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সুবাদারেরা সম্রাটের 'নায়েব' বা প্রতিনিধিরূপে সুবা শাসন করতেন। বাংলায় তাঁরা নওয়াব (নায়েব শব্দের বহুবচন) নামে পরিচিত ছিলেন। ইউরোপীয়রা শেষ পর্যন্তও তাঁকে সুবাদার (সংক্ষেপে সুবা) এবং নেবব (নওয়াব) রূপে অভিহিত করতো। এতে মনে হয়, মুগল সরকারি দলিলপত্রে 'নাজিম' পদবি প্রবর্তিত হওয়ার পরও জনগণের কাছে তাঁরা সুবাদার বা নওয়াব নামেই পরিচিত ছিলেন। সম্রাটের পক্ষে সুবাদার প্রদেশ বা সুবা শাসন করতেন এবং সুবার সাধারণ শাসন, প্রতিরক্ষা এবং ফৌজদারি বিচারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রদেশের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভারও সুবাদারের হাতে ন্যস্ত ছিল।

৫২. *আইন*, ২য়, ৩৭-৫২

সুবাদার নিযুক্তির পর সম্রাট নিজে সুবাদারকে তাঁর পদের বিশিষ্ট চিহ্ন বা তক্‌মা (insignia of office) পরিয়ে দিতেন এবং উপযুক্ত সম্মান ও উপহারাদি সহকারে কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুবাদারকে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ সম্বলিত লিপি (instrument of instructions) দিয়ে দিতেন। *আইন-ই-আকবরী* এবং বিভিন্ন ফরমানে প্রাপ্ত তথ্যে এসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই উপদেশাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) এতে সুবাদারের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা, অধিকার ও সীমাবদ্ধতা লিপিবদ্ধ থাকতো।

(২) এতে সুবাদারের কার্যপ্রণালী, তাঁর ব্যক্তিগত ও সরকারি ক্ষমতার ব্যবহার, চালচলন এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে বিশেষ উপদেশ থাকতো।

(৩) এতে সুবাদারের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সুবাদারের প্রতি অনুগত থাকার এবং সুবাদারের কাজে সহযোগিতা করার আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ লিপিবদ্ধ থাকতো।

এই উপদেশাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপ[৫৩] :

প্রথমে শাসন ব্যাপারে সম্রাটের নীতি ও আদর্শ ব্যক্ত করে সেই নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে নবনিযুক্ত সুবাদারের যোগ্যতা ও গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়। এর পরেই সুবাদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, সেনাবাহিনী ও জনগণ সুবাদারের আদেশ ও নির্দেশের অধীন এবং তাদের সকলের কল্যাণও সুবাদারের ন্যায়বিচারের উপর নির্ভরশীল; তাই কোন কারণেই, কোন অবস্থাতেই সুবাদার জনগণের উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারবেন না। সুবাদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল ব্যাপক এবং এগুলি ছিল জনগণের উন্নতি, অগ্রগতি এবং অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কাজের তদারকির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে ন্যায়বিচার ও বিচারকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উপর এবং জনগণকে হয়রানি না করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বিচার করার সময় শুধু সাক্ষী ও শপথের উপর নির্ভর না করে সরেজমিনে তদন্ত করার উপদেশ দেয়া হয়। আরও বলা হয় যে, শাস্তি দেয়ার সময় সুবাদারের উদার ও ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। বলা হয় যে, কোথায় সামান্য তিরস্কার শাস্তির চেয়ে বেশি কার্যকর হবে তা সুবাদারকে পরখ করতে হবে। অন্যান্য সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হলেই শুধু অপরাধীকে আঘাত করা, শৃঙ্খলিত করা বা হাতকড়া দেয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে সুবাদার কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন না; তিনি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার উপযুক্ত মনে করলে ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ সম্রাটের কাছে পাঠাতে হবে এবং সম্রাটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তিনি বাধ্য থাকবেন। কিন্তু সুবাদার সাম্রাজ্যের স্বার্থের তাগিদে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলে এবং মৃত্যুদণ্ড দিতে দেরি হলে সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তখনই কেবল মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সম্রাটকে তা অবহিত করতে হবে।

---

৫৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, P. Saran, *Provincial Government*, 178-79

সুবাদার কোন সময়, কোন অবস্থাতেই সম্রাটের অনুকরণে আচার-আচরণ করতে পারবেন না, যেমন সম্রাটের অনুকরণে দরবারে বসা, ঝারোকা দর্শন দেয়া, উচ্চ আসনে বসা, সৈন্যদের সালাম গ্রহণ করা, অন্ধ করা বা বিকলাঙ্গ করার মতো শাস্তি দেয়া, হাতি খেলা উপভোগ করা, অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কুর্নিশ বা সিজদা দিতে বাধ্য করা এবং বাইরে গেলে বাদ্য বাজানো সুবাদারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

সুবার শাসনে সুবাদারের নীচেই ছিল দীউয়ানের স্থান। ইতিহাসে দীউয়ান শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থ ও প্রয়োগে দীউয়ান-এর মতো আর কোন শব্দের এত পরিবর্তন দেখা যায় না। আব্বাসী খেলাফতে দীউয়ান দ্বারা একটি প্রশাসনিক বিভাগ বা বর্তমান মন্ত্রণালয়কে বুঝাতো। দিল্লীর সুলতানি আমলেও দীউয়ান শব্দটি এই একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। মুগল আমলে দীউয়ান প্রশাসনিক বিভাগ বা মন্ত্রণালয়কে না বুঝিয়ে রাজস্ব বিভাগের উজির বা মন্ত্রীকেই শুধু বুঝাতো। অনুরূপভাবে কেন্দ্রে যেমন দীউয়ান ছিলেন, তেমনি প্রদেশ বা সুবায়ও রাজস্ব বিভাগীয় কর্তাকে দীউয়ান বলা হতো। পরে অবস্থা এমন হয় যে, সম্পত্তি বা জাগির ইত্যাদির রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মকর্তাকে দীউয়ান বলা হতে থাকে। এমন কি কালক্রমে জমিদারগণও দীউয়ান নিযুক্ত করতে থাকেন।

সুবায় সুবাদারের নীচে দীউয়ানের স্থান হলেও দীউয়ান সুবাদারের অধীনস্থ ছিলেন না। সুবাদারের মতো দীউয়ানও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী থাকতেন। দীউয়ান ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব ও অর্থ বিভাগের কর্তা; কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকদের উন্নতি বিধানের দায়িত্বও ছিল দীউয়ানের। যেহেতু রাজস্বব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেহেতু দীউয়ান গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত সকল স্তরের শাসন বিভাগের (administrative unit) সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর অধীনে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল। বিভিন্ন প্রকারের ভূমিরেকর্ড দীউয়ানের অফিসে সংরক্ষিত হতো। দীউয়ানি বিচারের দায়িত্বও ছিল দীউয়ানের উপর ন্যস্ত। সঙ্গত কারণেই সদরের কাজের উপর দীউয়ানের কিছু তদারকির অধিকার ছিল। পরে দেখা যাবে যে, প্রাদেশিক সদরের সুপারিশক্রমে আলেম, সুফি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভূমি দান করা হতো। সুতরাং ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলি দীউয়ানের গোচরে আনা হতো। সাধারণ প্রশাসন এবং রাজস্ব ও অর্থ প্রশাসন পৃথকীকরণ মুগল শাসনব্যবস্থার এক উজ্জ্বল দিক।

সুবাদারের মতো দীউয়ানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও উপদেশাবলী (instrument of instructions) দেয়া হতো। এতে দেখা যায় যে, দীউয়ান কৃষি উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন, কোষাগারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং যথাযথ অনুমোদন ছাড়া কোষাগার থেকে কোন অর্থ কেউ নিতে পারবে না। সম্রাটের অনুমোদন ছাড়া কোন

অতিরিক্ত কর, সেচ, আবওয়াব ইত্যাদি আরোপ করা নিষিদ্ধ করা হয়, দীউয়ানকে এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখার আদেশ দেয়া হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ এবং আমিলদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখাও দীউয়ানের কর্তব্য ছিল। কোন আমিল কর্তব্যে অবহেলা করলে বা দুর্নীতিপরায়ণ হলে তাকে অপসারণের সুপারিশ করার দায়িত্ব ছিল দীউয়ানের। আমিলের অবহেলায় কোন এলাকায় রাজস্ব অনাদায়ী থাকলে সহজ কিস্তিতে শতকরা পাঁচ ভাগ হারে তা আদায় করার জন্য দীউয়ানকে নির্দেশ দেয়া হতো। তকবী (কৃষিঋণ) যথাযথভাবে আদায় করাও দীউয়ানের কর্তব্য। তাছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে দীউয়ানকে উপদেশ দেয়া হতো। যেসকল রেকর্ডপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ দীউয়ানের দপ্তরে সংরক্ষণ করা হতো এবং যেসকল দলিল-দস্তাবেজ প্রাদেশিক দীউয়ানকে কেন্দ্রীয় দীউয়ানের কাছে পাঠাতে হতো, তার ফিরিস্তি দেখেই দীউয়ানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[৫৪] দীউয়ানের দপ্তরে নিম্নরূপ দলিল সংরক্ষণ করা হতো :

(১) প্রশাসনিক বিভাগসমূহ (নিজামত) সম্পর্কে কাগজপত্র, খালসা বিভাগীয় রাজস্বের দলিলপত্র, খতিয়ান ইত্যাদি, রাজস্ব নির্ধারণ, রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব আদায়ের খরচপত্রের হিসাব-নিকাশ সম্বলিত রোজনামচা ও আওয়ারিযা।[৫৫]

(২) জাগির মহালের রেকর্ড এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার বেতন-ভাতার হিসাব-নিকাশ। এই রেকর্ডে প্রত্যেক পরগনা বা মহালের রাজস্ব, সাইর[৫৬] ইত্যাদির হিসাবপত্রও থাকতো।

(৩) প্রত্যেক পরগনায় কূয়ার হিসাব।

(৪) ইনাম[৫৭], গ্রাম-মাতব্বর, কানুনগো, মুকদ্দমের কমিশনের হিসাবপত্র (নিরিখনামা-ই-আজনাস)। সাইর মহালের রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের হিসাবপত্র এবং এগুলির রোজনামচা।

৫৪. ঐ, ১৭৮-৭৯। এটি পাঠে জানা যায় মুগল শাসনব্যবস্থা কত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব রেকর্ড বা দলিলপত্র আমাদের হস্তগত না হওয়ায় এ বিষয়ে আধুনিক গবেষকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

৫৫. রোজনামচা—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব; আওয়ারিযত—বিবরণসহ দেনাপাওনার হিসাবপত্র, স্থিতিপত্র বা ব্যালেন্সশীট।

৫৬. সাইর: রাজস্ব দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—মাল ও সাইর। ভূমিরাজস্বকে মাল বলা হতো, কিন্তু ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্য সব প্রাপ্যকে এক সঙ্গে সাইর বলা হতো। সাইর-এর মধ্যে ছিল—বহির্বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপণ্যের উপর শুল্ক, টাঁকশালের আয়, ব্যাঙ্কার বা সুদী ব্যবসায়ীদের উপর আরোপিত কর, কর্মকর্তা, জমিদার এবং অন্যদের দেয় পেশকাশ, নজরানা, সালামি ইত্যাদি।

৫৭. ইনাম শব্দের অর্থ পুরস্কার, ভূমি দান করলে বলা হতো *মদদ-ই-মাআশ* বা জীবিকাভাতা; মুগল আমলে ভূমি দানের জন্য সয়ূরগাল শব্দ ব্যবহৃত হতো, তবে *মদদ-ই-মাআশ* শব্দও পাওয়া যায়। সাধারণত আলেম, সুফি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের *ইনাম* বা *মদদ-ই-মাআশ* দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো।

প্রাদেশিক দীউয়ানের দফতর থেকে কেন্দ্রীয় দীউয়ানের দপ্তরে নিম্নরূপ তওয়ামির বা ফাইলগুলি পাঠানো হতো :

(১) বর আসদ— এগুলি আমিলরা তৈরি করতো এবং এতে থাকতো সকল খরচপত্রের পরে সরকারের নীট আয়ের হিসাব।

(২) বরখাস্তকৃত ও নতুনভাবে নিযুক্ত আমিলদের তালিকা।

(৩) জামানত সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।

(৪) আওয়ারিযা (স্থিতিপত্র বা ব্যালেন্সশীট) এবং মুতাসিবা বা আমিল, জমিদার এবং মনসবদারদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থের হিসাব।

(৫) বার্ষিক আদায়ী এবং অনাদায়ী রাজস্বের হিসাব।

(৬) পরগনা থেকে আমিল ও অন্যদের বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন বিষয়ে পেশকৃত দরখাস্তসমূহ।

(৭) আমিল বা অন্যান্যদের পরওয়ানা বা অন্যান্য দলিলপত্রের নকল।

(৮) দানকৃত সম্পত্তির ফরমান, প্রধান সদরের চিঠিপত্র, দানকৃত সম্পত্তির তালিকা ও বিবরণ, ফরমান লাভকারী লোকদের মৃত্যু হলে তাদের সম্পত্তির হিসাব।

(৯) কোষাগারের রোজনামচা বা দৈনিক আদান-প্রদানের হিসাব।

(১০) মনসবদারদের তালিকা, মনসবদার ও আজাদী সৈন্যদের বার্ষিক, মাসিক এবং দৈনিক বেতন ও তাদের আদান-প্রদানের হিসাব-নিকাশ।

(১১) টাঁকশালের হিসাব-নিকাশ।

(১২) প্রাদেশিক দীউয়ান এবং মহাফেজখানার হিসাব-নিকাশ।

প্রাদেশিক বকশী কেন্দ্রীয় বকশী বা মীর বকশী (বা বকশী-উল-মুল্ক) দ্বারা নিযুক্ত হতেন। বকশীর কাজ ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৈন্যবাহিনী তদারক করা। মনসবদাররা তাঁদের মনসবের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন কিনা তা দেখার দায়িত্বও ছিল বকশীর। মনসবদারদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়া ও সৈন্য রাখতে হতো। সুতরাং ঘোড়ার দাগ দেওয়ার দায়িত্বও বকশীর উপর অর্পিত ছিল। কোন জাগিরদার মৃত্যুবরণ করলে বকশী তাঁর জাগিরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতেন। বকশীর অনুমতি ছাড়া কোন মনসবদার তাঁর কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারতেন না। এক কথায় সৈন্য বিভাগের তদারকিই ছিল বকশীর প্রধান কাজ।

সদরের দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি তদারক করা এবং আলেম, সুফি ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পুরস্কার ও জীবিকা-ভাতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সদরের কাছে সুপারিশ করা। অত্যন্ত জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ লোকদের এই পদে নিয়োগ করা হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত ও সম্পদপ্রাপ্ত লোকদের তালিকা তাঁর কাছে থাকতো। দানকৃত সম্পদের ব্যাপারে তিনি দীউয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

কাজি বিচারের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন। কোন কোন সময় একই ব্যক্তি কাজি ও সদর উভয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কাজি নিযুক্তি লাভের পরে তাঁর পূর্ববর্তী কাজির কাছ থেকে দলিলপত্র গ্রহণ করতেন। এই দলিলগুলি থাকতো সম্পত্তি, এতিম, বিয়ে-শাদি ও উত্তরাধিকার বিষয়ক। নতুন কাজি দায়িত্ব নেয়ার পরই কয়েদিদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আদিষ্ট হতেন এবং কয়েদিদের পুনর্বিচার করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। কাজি সাধারণত মসজিদে বা তাঁর নিজের বাসস্থানে বিচারকাজ সমাধা করতেন। তাই বিচার হতো খোলামেলা। কাজি নিজের নিকট-আত্মীয় ছাড়া কারো কাছ থেকে কোনরূপ উপহার বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারতেন না। কাজিকে ফরিয়াদি ও আসামি উভয় পক্ষের প্রতি সমান ব্যবহার করতে হতো। এমনকি তিনি কারও প্রতি উদারতা দেখাতে পারতেন না। সাক্ষীদেরও কাজি সাহায্য করতে পারতেন না। বিচারালয়ে যাওয়ার সময়েও তাঁর পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হতো। প্রদেশ বা সুবায় যেমন কাজি নিযুক্ত হতেন, সরকার ও পরগনায়ও তেমনি কাজি নিযুক্ত হতেন এবং সুবার কাজির মতো সরকার ও পরগনার কাজিরও একই ধরনের দায়িত্ব ছিল। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কাজির কর্মক্ষেত্র ছিল ধর্মীয় এবং সিভিল বা বেসামরিক বিচারাদিতে সীমাবদ্ধ, ফৌজদারি ও দীউয়ানি বিচার যথাক্রমে সুবাদার ও দীউয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল।

নিম্নলিখিত কাজগুলিও কাজির দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল[৫৮] :

(১) মামলা-মোকদ্দমার বিচার ও মীমাংসা করা;

(২) মামলার রায় বাস্তবায়ন করা;

(৩) পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক, যারা স্বীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, তাদের সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত করা (Court of Wards);

(৪) ওয়াক্ফ সম্পত্তি নির্বাহ করা এবং তত্ত্বাবধান করা;

(৫) উইল সম্পাদন করা এবং কাজে পরিণত করা;

(৬) বিধবাবিবাহের দায়িত্ব নেয়া;

(৭) শরীয়ত-আইন অনুসারে শাস্তি বাস্তবায়ন করা;

(৮) রাস্তা ও ইমারতের তত্ত্বাবধান করা যাতে কেউ অননুমোদিত বাড়িঘর তৈরি করে এগুলির ক্ষতি সাধন করতে না পারে (কোতওয়ালের দায়িত্বের মধ্যেও তা পাওয়া যায়);

(৯) বিচারালয়ের নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের কাজ তদারক করা, যাদের কাজি নিজে নিযুক্ত ও বরখাস্ত করতে পারতেন;

(১০) যেখানে জাকাত ও ছদকা আদায়ের জন্য কোন পৃথক কর্মকর্তা থাকতো না, সেখানে কাজিকে ঐ দায়িত্বভার নিতে হতো।

৫৮. P Saran, *Provincial Government*, 321

তথ্যের অভাবে বিচার বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা দুষ্কর। তাছাড়া ধর্মীয় ও বিচার বিভাগের জন্য চারজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নাম পাওয়া যায়, যেমন কাজি, সদর, মীর আদল এবং মুফতি। *আইন-ই-আকবরীতে* কাজি ও মীর আদল সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায় যে, কাজি ও মীর আদল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রায় একই রকম—একজন আরেক জনের সম্পূরক বা পরিপূরক। মীর আদল যে বিচার বিভাগেই নিযুক্ত হতেন তা *আইন-ই-আকবরীতেই* জানা যায়। এতে বলা হয়েছে : "If capacity and vigour are not to be found united, he should appoint two persons, one to investigate whom they call as Qazi, the other the Mir Adl to carry out his finding."[৫৯] সুতরাং মীর আদলকে কাজির সহায়ক কর্মকর্তা বলে মনে হয়। সদরের সঙ্গে বিচার বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। সদরের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, এর সঙ্গে কাজির দায়িত্ব ও কর্তব্যের কোন মিল নেই। মুফতি ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। যদুনাথ সরকার বলেন :

> The qazi was the chief judge in criminal suits, and tried them according to Muslim Law... assisted by a mufti, who consulted the old Arabic books on jurisprudence and stated the abstract law bearing the case, the qazi pronounced the sentence[৬০]

কিন্তু মুফতিকে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কোন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বলে মনে হয় না। কাজি প্রয়োজন মনে করলে কোন বিশেষজ্ঞের (যাদের মুফতি বলা হয়ে থাকে) সাহায্য নিতে পারতেন। পি. সারন বলেন :

> He (Mufti) was a sort of unofficial legal referee recognised by public opinion ..Any one who was, by common agreement, ranked among the learned, recognised to be an authority on religious law, was called a mufti. His assistance was sought in all cases coming within the pale of religion on which the law was not clear to the judges of the court, and the mufti's duty was only to state the law applicable to the case under reference.[৬১]

অতএব কাজি, মুফতি ও আদল বিচার বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কাজি তদন্তকাজে, মুফতি আইন ব্যাখ্যায় এবং মীর আদল বিচারের রায় প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, বিচার বিভাগে কাজির নাম যেমন সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তেমন মীর আদল বা মুফতির নাম সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ দেখা যায় মাত্র।

৫৯. *আইন*, ২য়, ৪৩।

৬০. J N Sarkar, *Mughal Administration*, 2nd edition, (Calcutta 1963), 26

৬১. P Saran, *Provincial Government*, 325-326

কোতওয়াল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল শহরে। *আইন-ই-আকবরীতে* কোতওয়াল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি পৃথক আইন লিপিবদ্ধ আছে।[৬২] এতে বলা হয় যে, এমন লোক কোতওয়াল নিযুক্ত হবেন যে দক্ষ, অভিজ্ঞ, ধৈর্যশীল এবং উদার। শান্তি রক্ষাই কোতওয়ালের প্রধান দায়িত্ব। কোতওয়ালের অন্যান্য কাজও শান্তি রক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই জন্য কোতওয়ালকে শহরে পাহারা দেয়ার, বিশেষ করে রাত্রে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হতো। কোতওয়ালকে বর্তমান কালের পুলিশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁকে শহরের সকল গৃহের তালিকা এবং রাস্তা-ঘাটের খবরাখবর রাখতে হতো। এছাড়াও চুরি-ডাকাতি বন্ধ করা, শহরের পরিবেশদূষণ বন্ধ করা, সামাজিক দুর্নীতি বন্ধ করা এবং সতীদাহ নিবারণ করা কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। উত্তরাধিকারীবিহীন সম্পত্তির যত্ন নেয়া এবং সুষ্ঠুভাবে তা বিলি করা, কবরস্থান, শ্মশান ও কসাইখানা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা এবং এগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। শহরে নতুন আগমনকারী এবং শহর থেকে বহির্গমনকারীদের তালিকা রাখাও কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। বাজার নিয়ন্ত্রণও কোতওয়ালের দায়িত্ব ছিল। বাজারের লোকেরা ওজন ঠিক রাখে কিনা, মূল্য স্থিতিশীল রাখে কিনা, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মূল্য ঠিক রাখে কিনা ইত্যাদি দেখার দায়িত্বও ছিল কোতওয়ালের। এমনকি, বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের দায়িত্বও ছিল কোতওয়ালের। এসব কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য কোতওয়ালের অধীনে প্রয়োজন মতো কর্মচারী থাকতো। শহরের বাইরে মাঝে মাঝে থানা প্রতিষ্ঠা করা হতো। থানার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল গ্রামে শান্তি রক্ষা করা।[৬৩]

মীর বাহর ছিলেন নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ। মীর বাহর প্রধানত সামরিক কারণে নিযুক্ত হতেন। তাঁর কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। বাংলায় ভৌগোলিক কারণে নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল এবং মুগলরা শেষ অবধি নৌয়ারা প্রতিষ্ঠান বহাল রাখে।

ওয়াকিয়ানবিশ শব্দের অর্থ সংবাদ বা ঘটনার লেখক। দিল্লীর সম্রাটগণ প্রদেশের বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবরাখবর নেয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সুলতানি আমলেও এরকম সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। তবে সুলতানি আমলে সংবাদ সংগ্রাহকদের বলা হতো বরীদ। মুগল আমলে তাদের ওয়াকিয়ানবিশ এবং পরে সওয়ানিহনবিশ, খুপিয়ানবিশ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হতো। এই পদ সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশ বা সুবার বিভিন্ন কর্মকর্তার কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা, যাতে কোন কর্মকর্তা বেআইনী কাজে লিপ্ত হলে বা কর্তব্য পালন করার সময় সীমা লঙ্ঘন করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

৬২. *আইন*, ২য়, ৪৩-৪৫।

৬৩. P Saran, *Provincial Government*, 335

ওয়াকিয়ানবিশ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অবস্থান নিয়ে ঐ দফতরসমূহের কাজ এবং দপ্তরের কর্তাগণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বকশীর কাছে পাঠাতেন এবং বকশী এই সব সংবাদ গ্রন্থিত করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতেন। কিন্তু পরে গোপন সংবাদ সংগ্রাহক নিযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সওয়ানিহনবিশ (বা খুপিয়ানবিশ, খুপিয়া শব্দের অর্থ গোপন) নামে সংবাদ সংগ্রাহক পদের সৃষ্টি করা হয়। তারা গোপনে বিভিন্ন দপ্তরের সংবাদ সংগ্রহ করতো, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে কেন্দ্রে পাঠাতো। কিন্তু কালক্রমে প্রকৃত কর্মপদ্ধতিতে দেখা যায় যে, এই গোপন সংবাদ সংগ্রাহকরাও তাদের সংবাদ গোপন রাখতে পারতো না। তখন হরকারো নামে আর একটি গোপন তথ্যসংগ্রাহকের পদ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ওয়াকিয়ানবিশ, সওয়ানিহনবিশ (বা সওয়ানিহনিগার বা খুপিয়ানবিশ) এবং হরকারো এই তিন প্রকার সংবাদসংগ্রাহকের পদ সৃষ্টি করা হয়। এর একটি সুফলও ছিল—তিনটি পৃথক পৃথক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছতো এবং কেন্দ্রীয় সরকার তিনটিই পরখ করে প্রকৃত তথ্য বের করার সুযোগ পেতো। সংবাদসংগ্রাহকদের স্বাধীনভাবে তথ্য সরবরাহ করার সুযোগ থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বানোয়াট বা মিথ্যা সংবাদ সরবরাহে তারা বাধাস্বরূপ কাজ করতো। মুগল আমলের শেষদিকে এই সমস্ত সংবাদসংগ্রাহকের পরিচিতি দাঁড়িয়ে যায় আখবারনবিশ বা সংবাদলেখক হিসেবে।

মুগল বাংলার শাসনকাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলার শাসনের প্রতি সম্রাট বরাবর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। সুলতানি আমল থেকে বাংলা একটি বিদ্রোহী প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (প্রথমে মুকতা, পরে ওয়ালী এবং আরো পরে হাকিম নামে অভিহিত) সুযোগ পেলেই দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। জিয়াউদ্দিন বরানী বাংলায় বারবার বিদ্রোহের তিনটি কারণ নির্দেশ করেন : (১) দিল্লী থেকে বাংলার দূরত্ব, (২) বাংলার বিস্তীর্ণ আয়তন এবং (৩) যাতায়াত, যোগাযোগ এবং সংবাদ আদান-প্রদানের অসুবিধা। এই কারণে বরানী বাংলাকে বলগাকপুর বা বিদ্রোহী অঞ্চল নামে অভিহিত করেন।[৬৪] আবুল ফজলও বাংলাকে বলগাকখানা বলে অভিহিত করেন।[৬৫] প্রাক-মুগল যুগে দিল্লীর কোন কোন সুলতান এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ লখনৌতি রাজ্যকে (তখন বাংলা নামের প্রচলন হয় নি, বাংলা লখনৌতি রাজ্য নামে পরিচিত ছিল) দুই ভাগে ভাগ করে দুই জন শাসনকর্তা (মুকতা) নিযুক্ত করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সুশাসনের জন্য বাংলাকে তিন ভাগে ভাগ করেন—লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।[৬৬] সুলতান মুহাম্মদ

৬৪. জিয়াউদ্দিন বরানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, মূল ফার্সি, (কলকাতা ১৮৬২), ৮২।

৬৫. *আকবরনামা*, ৩য়, ২৫৬।

৬৬. জিয়াউদ্দিন বরানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, ৪৫৪।

বিন তুঘলকও এই ব্যবস্থা বহাল রাখেন। কিন্তু তবুও তাঁর সময়েই (অবশ্য সাম্রাজ্যের সকল দিকে বিশৃঙ্খলার কারণে) বাংলা স্বাধীন হয়ে যায়। শের শাহ আরো এক ধাপ অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে খিজির খানকে বাংলার শাসনকর্তা (হাকিম) নিযুক্ত করেন। কিন্তু খিজির খান শের শাহ কর্তৃক পরাজিত সৈয়দ বংশীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের মেয়েকে বিয়ে করেন, চৌকীতে (উচ্চ মঞ্চ) বসা শুরু করেন এবং বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ চালাতে আরম্ভ করেন। শের শাহ এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাংলায় এসে খিজির খানকে পদচ্যুত করেন এবং বাংলার শাসনকাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করেন। তিনি সারা বাংলাকে কয়েকটি জাগিরে বিভক্ত করে অনেক জাগিরদার নিযুক্ত করেন। তিনি কাজি ফজিলত নামের এক জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সকল জাগিরদারের উপরে আমিন নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমিনের কোন শাসনক্ষমতা ছিল না। জাগিরদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আমিন তা মীমাংসা করতেন।[৬৭] সুতরাং শের শাহের বাংলা শাসনে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হয়। যদিও শের শাহ এর পরে বাংলায় আর কোন সময় আসেন নি, তবু তাঁর জীবিতাবস্থায় বাংলায় আর কোন বিদ্রোহও হয় নি। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ পুনরায় বাংলাকে একক শাসনে আনয়ন করে তাঁর স্বগোত্রীয় এবং নিকট-আত্মীয় মুহাম্মদ শাহ সূরকে বাংলার শাসনকর্তা (হাকিম) নিযুক্ত করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মুহাম্মদ শাহ সূরের অধীনে বাংলা আবার স্বাধীন হয়ে যায়।[৬৮]

মুগল সম্রাটরাও বাংলার বিকেন্দ্রীকরণ করেন নি, বরং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলাকেও একটি একক সুবার মর্যাদা দেন। কিন্তু মুগল সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকার সুবাদারদের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এবং সম্রাটের নিকট জনকে বিশ্বস্ত সুবাদার নিযুক্ত করে পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান করেন। মুগলদের এই সমাধান বেশ ফলপ্রসূ হয়। অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন (মনসবদার) সেনাপতিকেই বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হতো। বাংলায় নিযুক্ত সুবাদারদের অনেকেই সম্রাটের নিকট-আত্মীয় বা অন্যভাবে সম্রাটের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনজন যুবরাজ (শাহ শুজা, শাহজাদা আজম খান এবং শাহজাদা আজিমউদ্দিন) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। আকবরের সময় সুবাদার (তখন সিপাহসালার) খান আজম মির্জা আজিজ কোকা আকবরের দুধভাই ছিলেন। আকবর প্রায়ই বলতেন যে, খান আজম ও তাঁর মধ্যে দুধের নদী প্রবাহিত।[৬৯] রাজা মানসিংহ বৈবাহিক সূত্রে আকবরের আত্মীয় ছিলেন। আকবর তাঁকে ফরজন্দ (ছেলে) উপাধি দেন। জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার প্রথম সুবাদার কুতুবউদ্দিন খান কোকা ছিলেন শয়েখ সলীম চিশতীর দৌহিত্র এবং জাহাঙ্গীরের খেলার সাথী। ইসলাম খান চিশতী ছিলেন শয়েখ সলীম চিশতীর পৌত্র, জাহাঙ্গীরের সমবয়সী এবং জাহাঙ্গীর তাঁকে ফরজন্দ

---

৬৭. M A. Rahim, *The History of the Afghans in India*, (Karachi 1961), 164; *HB* II, 177

৬৮. Rahim, ঐ, 165; *HB* II, 179

৬৯. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ১ম খণ্ড, হেনরি ব্লখম্যান কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, ৩৪৩-৪৪।

(ছেলে) ডাকতেন। জাহাঙ্গীরের সময় শয়েখ সলীম চিশতীর পরিবার সম্রাটের পরিবারের সঙ্গে বিশেষভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল।[৭০] ইসলাম খান চিশতী ও কাশিম খান চিশতীর সুবাদারি আমলে শয়েখ সলীম চিশতীর আত্মীয়রা সুবা বাংলার বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন, ফলে তাদের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। আবার কাশিম খান চিশতীকে অযোগ্যতার অপরাধে অপসারণ করা হলে বাংলার শাসনে চিশতীদের প্রভাব লোপ পায়। কাশিম খানের স্থলে নূরজাহানের ভাই ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। এই সময় আবার বাংলার শাসন ব্যাপারে নূরজাহানের পরিবার ও আত্মীয়দের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথমদিকে কয়েকজন ইরানী মনসবদার বাংলার সুবাদারি লাভ করেন। মনে হয়, শাহজাহানের শ্বশুর এবং প্রধান উজির আসফ খানের প্রভাবেই তাঁরা নিযুক্তি লাভ করেন। অবশ্য তাঁরা নিজেরাও সুবাদার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। এর পরেই আসেন যুবরাজ শাহ শুজা। তিনি আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত হওয়া পর্যন্ত একটানা বিশ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজেবের আমলের প্রথম সুবাদার মীর জুমলা সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। অল্পদিন পর তাঁর মৃত্যু হলে আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খানকে সুবাদার নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠান। শায়েস্তা খান কয়েক জন পুত্র নিয়ে বাংলায় আসেন এবং পুত্রদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন।[৭১] দুই কিস্তিতে শায়েস্তা খান চব্বিশ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। মাঝে তাঁর অনুপস্থিতিকালে সুবাদার হয়ে আসেন যুবরাজ মুহাম্মদ আজম। তিনি এক বছরের কিছু বেশি সময় বাংলায় ছিলেন। শাহজাদা আজিমউদ্দিন (আজিম-উশ-শান) বাংলার সুবাদার ছিলেন প্রায় পনেরো বছর। সুতরাং দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ থেকে শাহ আলম বাহাদুর শাহের মৃত্যু পর্যন্ত (১৬০৫-১৭১২ খৃঃ) একশত সাত বছরের মধ্যে যুবরাজেরা সুবাদার ছিলেন প্রায় ছত্রিশ বছর, সম্রাটের মাতুল সুবাদার ছিলেন প্রায় চব্বিশ বছর, সম্রাটের শ্যালক (ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গ) সুবাদার ছিলেন প্রায় সাত বছর। শয়েখ সলীম চিশতীর পৌত্র ও দৌহিত্র সুবাদার ছিলেন প্রায় দশ বছর একুনে মোট সাতাত্তর বছর; বাকি ২৯/৩০ বছর যাঁরা সুবাদার ছিলেন তাঁদেরও কেউ কেউ কোন না কোনভাবে সম্রাটের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। মুগল সম্রাটদের এই নীতি যে অত্যন্ত শুভ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সারা মুগল আমলে কোন সুবাদার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। সুবাদার ইবরাহিম খানের সময় (১৬৮৯-১৬৯৮ খৃঃ) শোভা সিংহ ও রহিম খান আফগানের বিদ্রোহ এবং মুর্শিদকুলী খানের সময় সীতারাম জমিদারের বিদ্রোহ ছিল মুগল সম্রাটদের জন্য অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাদের বিদ্রোহ দৃঢ়ভাবে দমন করা হয়।[৭২]

---

৭০. জনশ্রুতি আছে যে, শয়েখ সলীম চিশতীর দোয়ায় যুবরাজ সেলিম (জাহাঙ্গীব)-এর জন্ম হয়। তাই দুই পরিবারের বন্ধুত্ব অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।

৭১. এই বিদ্রোহ এবং পরিণতির জন্য দেখুন, *MQK*, ১-২; ৪৯-৫৩।

৭২. ঐ, ২১৪-১৫।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, মুগল সম্রাটরা যুবরাজ এবং নিকট-আত্মীয়দের মাধ্যমে সুবা বাংলা শাসন করলেও যুবরাজ বা নিকট-আত্মীয়দের কার্যকলাপের প্রতি তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, আত্মীয়তা তাঁদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। সুবাদারদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতেন। জাহাঙ্গীরের সময় সুবাদার ইসলাম খান চিশতী সারা বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম ছাড়া) মুগল অধিকারে আনার পর এতই দাম্ভিক হয়ে পড়েন যে, তিনি সম্রাটের অনুকরণে সম্রাটের বিশেষ অনুষ্ঠানাদি (prerogatives) নিজে করতে থাকেন। তিনি সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন, ঝরোকার মতো উচ্চ আসন তৈরি করেন এবং অধস্তন কর্মকর্তাদের নীচ থেকে তাঁর প্রতি সালাম জানাতে এবং কুর্নিশ করতে আদেশ দেন। যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁর আদেশ অমান্য করেন তাঁদের তিনি বন্দি করার আদেশ দেন।[৭৩] জাহাঙ্গীর খবর পেয়ে ইসলাম খানের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর ইসলাম খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। সম্রাট অন্য একটি কারণে ইসলাম খানের মনসব কমিয়ে দেন।[৭৪] তিনি ইসলাম খানের স্থলে সুজাত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইসলাম খানের সৌভাগ্যবশত সুজাত খান দুর্ঘটনায় মারা গেলে তিনি এই অপমান থেকে রক্ষা পান। সম্রাট একখানি ফরমান পাঠিয়ে ইসলাম খানকে রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে নিবৃত্ত করেন।[৭৫] অবশ্য অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খানের ভাই এবং পরবর্তী সুবাদার কাশিম খান চিশতীকে প্রথমে মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করার অভিযোগে তিরস্কার করেন।[৭৬] পরে অধস্তন কর্মকর্তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে তিনি তিরস্কৃত হন।[৭৭] সবশেষে জাহাঙ্গীর কাশিম খানকে অযোগ্যতার অপরাধে পদচ্যুত করেন।[৭৮] এক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধুত্ব বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সম্রাটকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে নি। শাহজাদা শুজা পিতার কাছে বারবার আবদার করেও পাটনার কিছু অংশ তাঁর সুবাদারিভুক্ত করতে পারেন নি। আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খানকেও রেহাই দেন নি। শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ছিল।[৭৯] তাই সম্রাট তাঁকে প্রত্যাহার করে নেন। গোলাম হোসেন সলীমের মতে, শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং সম্রাট শায়েস্তা খানকে পুনরায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে

---

৭৩. *এই ফরমানের পাঠ মির্জা নাথনের* *বাহরিস্তানে* পাওয়া যায় (*বাহরিস্তান*, ১ম খণ্ড, ২১৩-১৪)।

৭৪. *বাহরিস্তান*, ১ম খণ্ড, ৩৭৪-৭৫।

৭৫. ঐ, ৩৭৬।

৭৬. ঐ, ৪১৯।

৭৭. সাকী মুস্তাদ খান, *মাসির-ই-আলমগীরী,* স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত, ১৭০,২৩৪।

৭৮. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন,* আকবরউদ্দিন কর্তৃক *বাংলার ইতিহাস* নামে বাংলায় অনূদিত, (ঢাকা ১৯৭৮),১৭৬।

৭৯. *HB* II, 394

পাঠান।[৮০] শোভা সিংহ ও রহিম খান আফগানের বিদ্রোহের সময় নিষ্ক্রিয় থাকার অপরাধে সুবাদার ইবরাহিম খানকে পদচ্যুত করা হয়।[৮১] আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র সুবাদার আজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আজিমউদ্দিন ঢাকায় এসে 'সওদা-ই-খাস' নাম দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। আওরঙ্গজেব এ সংবাদ পেয়ে আজিমউদ্দিনকে তিরস্কার করেন এবং তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করে পাটনায় অবস্থান নেয়ার আদেশ দেন। সুতরাং আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মুগল সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকার সুবা বাংলার শাসনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং কঠোরভাবে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতেন।

মুগল আমলে প্রত্যেক সুবাকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগনা বা মহালে বিভক্ত করা হয়। *আইন-ই-আকবরী*তে সুবা বাংলাকে উনিশটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে বেশ কতগুলি পরগনা বা মহালে বিভক্ত করার কথা উল্লেখ আছে। পরগনা বা মহালই ছিল শাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট বা এলাকা। অবশ্য গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল। পঞ্চায়েত ছিল জনগণের দ্বারা গঠিত এবং জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু পঞ্চায়েত রাজস্ব আদায়ে এবং রাজস্বের ব্যাপারে ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তা দিলেও এবং মুগল শাসনে পঞ্চায়েত স্বীকৃত হলেও পঞ্চায়েত মুগল শাসনকাঠামোর অংশ ছিল না। সুবা বাংলার প্রশাসনিক সরকারের নাম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রধান শহরের নাম অনুসারে সরকারের নামকরণ করা হয় এবং সরকারের সীমানা নির্ধারণেও ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমারেখার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। সরকারের শাসনকাঠামোও সুবার অনুকরণেই তৈরি হয়েছিল, যেমন—সাধারণ ও সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন ফৌজদার; রাজস্ব ও অর্থবিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন আমলগুজার; কাজি ও কোতওয়াল পদবির কর্মকর্তাও সরকারে ছিলেন। সরকার নামটি পূর্ব থেকে, বিশেষ করে আফগান সুলতানদের আমল থেকে চালু ছিল। কিন্তু ফৌজদার ও আমলগুজার পদবি মুগলদের সৃষ্টি। শের শাহের আমলে সরকারের শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন 'সিকদার-ই-সিকদারান' (প্রধান সিকদার) এবং রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' (প্রধান মুন্সিফ)। *আইন-ই-আকবরীতে* ফৌজদার ও আমলগুজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পৃথক পৃথক আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।[৮২] ফৌজদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল (১) সাধারণ শাসন, (২) রাজস্ব এবং (৩) শান্তিরক্ষা বা পুলিশী ও সামরিক দায়িত্ব এবং আমলগুজারের কাজ ছিল দীউয়ানের অনুকরণে রাজস্ব আদায় করা। ফৌজদারের রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল শুধু অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ে আমলগুজারকে সহায়তা করা। কিন্তু ফৌজদারের প্রধান দায়িত্ব ছিল সরকারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জমিদার-

৮০. *আইন*, ২য়, ৪১-৪২; ৪৬-৫০।

৮১. *বাহরিস্তান*, ১ম খণ্ড, ৪; P Saran, 181, টীকা নং ৮৫।

৮২. উপরে ৮০ এবং ৮১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

জাগিরদারদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। পরগনাই ছিল মুগল শাসনের সর্বনিম্ন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। যেহেতু রাজস্ব বা অর্থ যেকোন সরকারের (গভর্নমেন্ট অর্থে) ধারক ও রক্ষক এবং রাজস্ব ও অর্থপ্রাপ্তির উৎসও ছিল পরগনা বা মহাল, সেহেতু পরগনা শাসনের গুরুত্বও ছিল সমধিক। শের শাহের সময়ে সিকদার, আমিন ও কানুনগো ছিলেন পরগনার প্রধান কর্মকর্তা। অবশ্য তাঁরা খাজনাদার (কোষাধ্যক্ষ), পাটওয়ারি এবং আরো অনেক কর্মচারীর সাহায্য লাভ করতেন। মুগল আমলেও এই পদবিগুলি বহাল ছিল। সিকদারের প্রধান দায়িত্ব ছিল পরগনার সাধারণ শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং আমিনকে রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করা। আমিনের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষি ও কৃষকদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ভূমি পরিমাপ করা, জরিপ করা, রাজস্ব নির্ধারণ করা এবং আদায় করা সবগুলিই প্রাথমিকভাবে আমিনের দায়িত্ব ছিল। আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক সরকার ও পরগনায়, বিশেষত শহরে কাজি ও কোতওয়ালও নিযুক্ত হতেন। এই সব ইউনিটে ওয়াকিয়ানবিশও (বা সওয়ানিহ্নবিশ বা খুপিয়ানবিশ) নিযুক্ত থাকতেন। সিকদারের কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে পরগনায় প্রয়োজনমতো থানাও স্থাপিত হয়। সুতরাং মুগল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোকে আড়াআড়িভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. সাধারণ ও সামরিক শাসন—সুবাদার, বকশী, ফৌজদার ও সিকদার; ২. রাজস্ব প্রশাসন—দীউয়ান, আমলগুজার ও আমিন। অন্যদের দায়িত্ব ছিল তাদের দায়িত্বের পরিপূরক। মীর বাহর, কোতওয়াল, সদর, কাজি, ওয়াকিয়ানবিশ স্ব স্ব নির্ধারিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, সুবাদাব ও দীউয়ান উভয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে স্বাধীন ছিলেন, কেউ কারো অধীনে ছিলেন না। ফলে সুবাদারি ও দীউয়ানি বিভাগের কর্মকর্তারাও স্ব স্ব দায়িত্বে স্বাধীন ছিলেন। মুগল শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার ভাগাভাগি বা সুবাদারি ও দীউয়ানি কর্মকর্তাদের স্বাধীনতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—(১) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং (২) সুবাদার কর্তৃক ক্ষমতা কুক্ষিগত করা বা অর্থ আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ। এই ব্যবস্থার কুফলও যে ছিল না তা নয়। এই নিয়ে কোন কোন সময় সুবাদার ও দীউয়ানের মধ্যে মনোমালিন্যও ঘটতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বা সম্রাট যতদিন কঠোর ছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে শাসন পরিচালনা করতেন, ততদিন সুবাদার ও দীউয়ানের মধ্যে মনোমালিন্য প্রকট রূপ ধারণ করতে পারে নি বা প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে নি। এরকম মনোমালিন্যের সংবাদ সম্রাটের গোচরীভূত হলে সম্রাট যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করে কোন একজনকে বা উভয়কে শাস্তি দিতেন, এমনকি অপরাধীকে পদচ্যুত করতেন। সুবা বাংলায় এ ধরনের কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খান চিশতীর সুপারিশে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত দীউয়ান উজির খানকে প্রত্যাহার করা হয়।[৮৩] শায়েস্তা খানের সুবাদারি আমলে দীউয়ান সম্রাটের কাছে সংবাদ দেন যে, সুবাদার (শায়েস্তা খান) তাঁর কার্যকালে মোট এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর পাওনার

---

৮৩. *HB* II, 402-405

অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। শায়েস্তা খান দ্বিতীয় কিস্তিতে সুবাদার থাকাকালে দীউয়ান সম্রাটকে জানান যে, সুবাদার বায়ান্নো লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ করেছেন। শায়েস্তা খানকে এজন্য জবাবদিহি করতে হয়।[৮৪] দীউয়ান কারতালাব খানের (পরে মুর্শিদকুলী খান) রিপোর্টের ভিত্তিতেই আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র ও সুবাদার আজিমউদ্দিনকে বাংলা ছেড়ে পাটনায় অবস্থান নিতে আদেশ দেন।[৮৫] অধিকাংশ সময় সুবাদার ও দীউয়ানের সম্পর্ক ভাল ছিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। তবে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুগল কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে এবং দীর্ঘকাল সুবাদারের কর্মস্থলে অনুপস্থিতির ফলে দীউয়ানের ক্ষমতা বেড়ে যায়। পরে এমন হয় যে, একই ব্যক্তিকে সুবাদার ও দীউয়ান উভয় পদে নিযুক্ত করা হয়। ফলে সুবাদারি ও দীউয়ানি শাসন পৃথকীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

সুবা বাংলাকে উপরোক্ত সরকার ও পরগনায় বিভক্তির বিবরণ, সরকার ও পরগনার নাম এবং প্রত্যেক পরগনায় নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ *আইন-ই-আকবরী*তে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। একে বলা হয় 'টোডর মল্লের বন্দোবস্ত' এবং তা তৈরি করা হয় ১৫৮২ সালে। কিন্তু তখনো সারা বাংলা মুগল অধিকারে যায় নি। বাংলার বিস্তীর্ণ ও অধিকাংশ এলাকা মুগল কর্তৃত্বের বাইরে ছিল। টোডর মল্লের বন্দোবস্তে উল্লেখিত সরকার চাটগাঁও মুগল অধিকারে আসে বন্দোবস্তের চুরাশি বছর পর। সুতরাং প্রশ্ন উঠে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তি কি ছিল? আকবরের রাজস্ব নির্ধারণের নীতি ছিল (১) ভূমির মাপ ও আয়তন নির্ধারণ, (২) উর্বরাশক্তির প্রকারভেদে কর্ষিত ভূমির মূল্যায়ন এবং (৩) উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ। স্বভাবতই এই ব্যবস্থার জন্য কৃষিভূমির আয়তন

৮৪. *MQK*, 74 মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রজাদের অত্যাচারের কথা নিম্নরূপে উল্লেখ করেন :

"উজীর হৈল রায়জাদা বেপারি-ক্ষত্রিয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হৈল বৈরি
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরখেল হৈল কাল খিল ভূমে লিখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধুতি
জোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় তঙ্কা প্রতি।

এই কাব্য রচিত হয় ১৫৮৪ সালে আকবরের রাজত্বকালে। কিন্তু রাজস্বকর্মকর্তাদের অত্যাচার আকবরের সময়ের আগেই হয়। কারণ, রাজস্বকর্মকর্তাদের অত্যাচারে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান এবং অনেক দিন পরে তাঁর কাব্য রচনা করেন। সুকুমার সেন মনে করেন যে, মুকুন্দরাম ১৫৪৪ খৃস্টাব্দের কিছুকাল পরে দেশত্যাগ করেন। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৫ম সংস্করণ (বর্ধমান সাহিত্য সভা ১৯৭০), ৫৩১, ৫৩৮।

৮৫. খালিসা অর্থ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন এলাকা।

এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ধারণই ছিল প্রাথমিক শর্ত। বাংলার অধিকাংশ এলাকা অনধিকৃত থাকায় টোডর মল্লের পক্ষে এর কোনটিই করা সম্ভবপর ছিল না।[৮৬] সুতরাং বাংলায় টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তি ছিল প্রকৃত আয়তন বা উৎপাদন নির্ধারণ নয়, অন্য কিছু। অর্থাৎ দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, টোডর মল্ল পূর্বতন সরকারের দলিল বা রেকর্ডের ভিত্তিতেই বাংলায় ভূমি-বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, উপরোক্ত সরকার এবং পরগনা বিভাগগুলিও পূর্বতন সরকারের দলিলের ভিত্তিতেই করা হয়। আগে বলা হয়েছে যে, দাউদ খান কররানীর মন্ত্রী শ্রীহরি মুগল সেনাপতি খান জাহান এবং টোডর মল্লের কাছে গোপন দলিলপত্র হস্তান্তর করেন। শ্রীহরি ছিলেন মন্ত্রী, তাঁর দুই পিতৃব্যপুত্রের একজন বসন্ত রায় ছিলেন দাউদ কররানীর সময় খালিসা বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ (খাজানাদার), আর একজন শিবানন্দ ছিলেন কানুনগো দপ্তরের প্রধান কর্মচারী। সুতরাং টোডর মল্ল বাংলার রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র শ্রীহরি ও তাঁর পিতৃব্যপুত্রদের কাছ থেকে পান এবং এই দলিলপত্রই যে টোডর মল্লের ভূমি-বন্দোবস্তের ভিত্তি ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মুগল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোর মধ্যে একটা মিল ও ঐক্য রক্ষার চেষ্টা থাকলেও অন্তত রাজস্ব প্রশাসনে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলায় একটি নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কাঠামোগতভাবে সকল সুবার মধ্যে মিল থাকলেও প্রকৃতিগতভাবে বাংলার ভূমিব্যবস্থায় যথেষ্ট অমিল ধরা পড়ে।

৮৬. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, (কলকাতা ১৩২৯ সন), ৮৩।

৩

পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা

সুশীল চৌধুরী*

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলার স্বল্প সময়ের রাজত্বকাল (১০ এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন ১৭৫৭) তরুণ নবাবের শুধু পতনই ঘটায় নি, এতে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর ঘটনাই ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। কেবল বাংলায় ক্ষমতাসীন হবার পরেই ইংরেজরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা সম্প্রসারণের সুযোগ পায়। তখনকার প্রায়-সমসাময়িক একজন ফার্সী ঐতিহাসিক যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, পলাশীর পরেই বাংলার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।[১]

বহুদিন ধরে ঐতিহাসিক মহলে সিরাজউদ্দৌলা, পলাশী ও ইংরেজদের বাংলা বিজয় সম্বন্ধে কতগুলো বক্তব্য স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে চলে আসছে। এ বক্তব্যগুলো হলো—সিরাজ এতই দুর্বিনীত, দুশ্চরিত্র এবং নিষ্ঠুর ছিলেন যে তাতে রাজ্যের অমাত্যবর্গ শুধু নয়, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতো; ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে যে বিবাদ ও সংঘর্ষের পরিণতি হিসেবে সিরাজ বাংলার মসনদ পর্যন্ত হারালেন, তার জন্য প্রধানত দায়ী সিরাজউদ্দৌলাই; মীর জাফরই পলাশী চক্রান্তের নায়ক এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই পতন হয়েছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবির। আবার অধুনা অনেকের ধারণা,

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Karam Ali, "Muzaffarnamah", tr. Jadunath Sarkar in *Bengal Nawabs*, (Calcutta 1952), 78

ইংরেজদের বাংলা বিজয় একটি 'আকস্মিক' ঘটনা, এর পেছনে ইংরেজদের কোন 'পূর্ব-পরিকল্পনা' ছিল না। পলাশী যুদ্ধের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হচ্ছে, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়ে প্রভাবশালী শাসকগোষ্ঠীকে তাঁর প্রতি বিরূপ করে তোলার ফলে বাংলায় যে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট দেখা দেয়, তার শেষ পরিণতিই পলাশী যুদ্ধ। ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টায় সম্ভবত কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাক-পলাশী বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত একটি চিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে খুবই সচেষ্ট। এঁদের বক্তব্য—পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ প্রধানত দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসকের নিপীড়নে নির্যাতিত সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান নবাবের অধীনতা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কোন ত্রাণকর্তার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে পড়েছিল এবং ইংরেজদের জানিয়েছিল সাদর অভ্যর্থনা।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো কতটা সঠিক এবং তথ্য ও যুক্তিনির্ভর, তার সূক্ষ্ম এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন মহাফেজখানায় যেসব নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেসবের পাশাপাশি আগের জানা তথ্য ও সমসাময়িক ফার্সী ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের পুনর্বিচার করে সমগ্র বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব। বর্তমান আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাবে, উপরের অধিকাংশ বক্তব্যই সঠিক নয়; বরং নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়ে বক্তব্যগুলোকে খণ্ডন করা যায়।

বিচার্য বিষয়

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলো পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। প্রথমত, ঐতিহাসিকরা (এবং সমসাময়িক লেখকরাও বটে) একমত যে, নবাব হবার আগে তরুণ সিরাজউদ্দৌলা এতই নির্মম, নিষ্ঠুর এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন যে, সবাই আলিবর্দী খানের পরে সিরাজের নবাব হওয়ার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সিরাজের এই 'কদর্য' চরিত্র শুধু সাধারণ মানুষকে নয়, অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রায় সবাইকে সিরাজের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। কাশিমবাজারের তদানীন্তন ফরাসী কুঠির প্রধান জঁা ল (Jean Law) লিখেছেন, "নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যুর আগে সিরাজ শুধু শ্লথচরিত্র ছিল না, অমানবিক নিষ্ঠুরতারও অনেক পরিচয় দিয়েছে।"[২]

দ্বিতীয়ত, অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাবের যে বিবাদ ও সংঘর্ষ হয়েছিল, তার জন্য সিরাজউদ্দৌলাই প্রধানত দায়ী। এ সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস. সি. হিল (S.C. Hill) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[৩] "নবাবের ক্ষমতাগ্রহণের উদ্দেশ্য বা কারণ" এবং "নবাবের প্রদর্শিত অজুহাতের" পার্থক্য চিহ্নিত

২. Law's Memoir, in S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, (London 1905) 62
৩. ঐ।

করেছেন। হিলের মতে, এই সংঘর্ষের কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো সিরাজউদ্দৌলার 'দম্ভ' (vanity) এবং 'অর্থলিপ্সা' (avarice)। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযোগ ছিল : ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গকে সংস্কার করে দুর্ভেদ্য করে তুলতে চেয়েছে, দস্তক বা রপ্তানিশুল্ক না দিয়ে বাণিজ্য করার যে বিশেষ সুবিধা ইংরেজ কোম্পানিকে দেয়া হয়েছিল তার যথেচ্ছ অপব্যবহার করেছে এবং নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছে। হিল এসব অভিযোগকে ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য নবাবের 'মিথ্যা ছলনা' বলে উড়িয়ে দেন।[৪]

তৃতীয়ত, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, পলাশীতে মীর জাফরই আসল বিশ্বাসঘাতক। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে বাংলার মসনদ অধিকার করার মতলবে মীর জাফর ইংরেজদের সঙ্গে পলাশী-চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলায় মীর জাফর নামটাই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। এখনো এই নাম বিশ্বাসঘাতকের সমার্থক শব্দ।

আবার অতি সাম্প্রতিক লেখাতেও বলা হচ্ছে যে, ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের কোন পরিকল্পনাই ছিল না, তারা নবাবকে হটানোর কথা নিজে থেকে ভাবেই নি। ইংরেজদের কার্যকলাপের পেছনে নাকি "রাজনৈতিক অভিসন্ধির চেয়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল মূল প্রেরণা"। লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক ঐতিহাসিক খুব সম্প্রতি লিখেছেন যে, প্রথমদিকে ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল 'নিতান্তই সীমিত'; কিন্তু তারা যখন উপলব্ধি করলো যে, বাংলায় একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বর্তমান, তখন তাদের লক্ষ্য আস্তে আস্তে প্রসারিত হলো।[৫]

সবশেষে এবং একদিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাক-পলাশী বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত চিত্র। কোন কোন ঐতিহাসিকের বক্তব্য, পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ হিন্দু এবং মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। মুসলমান নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুক্তি চাইছিল মুসলমান শাসন থেকে এবং তাই তারা ইংরেজদের স্বাগত জানাতে ছিল প্রস্তুত। এ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা এস. সি. হিল। ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার যে সংঘর্ষ বাধে, হিলের মতে তার অন্যতম কারণ মুসলমান শাসনের প্রতি হিন্দুদের অসন্তোষ।[৬] স্যার যদুনাথ সরকার সোজাসুজি এ ধরনের কথা না বললেও হিন্দুদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, মূলত হিন্দুরাই মুসলমান শাসনের পরিবর্তন চাইছিল। সাম্প্রতিককালে ব্রিজেন গুপ্ত বাংলার দ্বিধাবিভক্ত

৪. ঐ, Vol. I, iii.

৫. Peter Marshall, *Bengal—The British Bridgehead : The New Cambridge History of India*, (Cambridge 1987), 77, 91, আরো দেখুন, C. A. Bayly, *Indian Society and the Making of the British Empire*, (Cambridge 1987), 50; Rajat Kanta Ray, "Colonial Penetration and the Initial Resistance: The Mughal Ruling Class, the English East India Company and the Struggle for Bengal, 1756-1800", *Indian Historical Review*, Vol. XII, nos 1-2, July 1985—January 1986, 7, 8, 11, 12

৬. S. C. Hill, *Bengal*, Vol. I, XXIII, iii

৭. Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company*, 1756-57, (Leiden 1962), 48

এই সমাজের কথা বলতে গিয়ে প্রায় হুবহু হিলের বক্তব্যকে তুলে ধরছেন। তিনি লিখছেন যে, "ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল, বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ফাটল ধরেছে এবং জনসাধারণ শাসকশ্রেণীর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছে। তাই তারা নবাবের কর্মচারীদের প্রতি উদ্ধত মনোভাব গ্রহণ করেছিল।"[৭]

সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র

ইতিহাসের প্রচলিত ধারণায় শুধু নয়, মননশীল লেখকদের ভাষ্যেও সিরাজউদ্দৌলা দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর ও লম্পট হিসেবে চিহ্নিত। সন্দেহ নেই, সমসাময়িক বিদেশী পর্যটকের বিবরণ ও ফার্সী ইতিহাসে সিরাজের এরকম চরিত্রই চিত্রিত। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের সংঘর্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে বা পলাশী-চক্রান্তের স্বরূপ উদঘাটনে নবাব হওয়ার আগে সিরাজ-চরিত্রের এই 'অন্ধকার' দিক খুঁটিয়ে দেখার খুব একটা প্রয়োজন নেই। যদি তর্কের খাতিরে এটা প্রয়োজনীয় ধরেও নেয়া হয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, বাংলার সব নবাবই একই চরিত্রদোষে দুষ্ট। দুশ্চরিত্র আর নিষ্ঠুর কেউ কম ছিলেন না। তাহলে শুধু সিরাজউদ্দৌলাকেই কেন 'বদ চরিত্রের' জন্য দোষী করার প্রচেষ্টা ? মুর্শিদকুলী খান থেকে আলিবর্দী পর্যন্ত বাংলার সব নবাবই নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শুজাউদ্দিন ও সরফরাজ দু'জনেই দুশ্চরিত্র ছিলেন।[৮] সেক্ষেত্রে সিরাজউদ্দৌলার প্রতিই কেন এ বিশেষ অপবাদ ? এগুলোকে পলাশী-চক্রান্ত ও ইংরেজদের বাংলা বিজয়ের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রচার বলে সন্দেহ করা কি খুবই অমূলক ?

আমাদের এ বক্তব্য সিরাজ-চরিত্রের সাফাইচেষ্টা নয়। নবাব হবার আগে দুশ্চরিত্রের অপবাদ সিরাজকে দেয়া যায় না বা নবাব হিসেবে সিরাজ খুবই মহান ছিলেন এটা মোটেই আমাদের বক্তব্য নয়। যুক্তি অন্যত্র। আমাদের প্রশ্ন—নবাব হবার পরেও কি সিরাজ আগের সেই চরিত্রের লোক ছিলেন ? তাঁর মধ্যে কি কোন পরিবর্তন এসেছিল বা তাঁর কি চৈতন্যোদয় হয়েছিল ? নবাব হবার পরেও কি তিনি আগের মতো উদ্ধত, শ্লথচরিত্র, নিষ্ঠুর আর নির্মম ছিলেন ? ইতিহাসে এর সোজাসুজি সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু নেই। তবু এখানে ওখানে ছোটখাটো কিছু তথ্য, কিছু ইঙ্গিত থেকে একটা ধারণা আমরা করতে পারি। নবাব হিসেবে (যদিও স্বল্প সময়ের জন্য) সিরাজউদ্দৌলার আচরণ ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেও আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। এখানে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে। সিরাজ-চরিত্রের যে 'কদর্য' দিকটার দিকে সবাই অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন, তা কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা নবাব হবার আগের চরিত্র। নবাব হবার পরে সিরাজ-চরিত্রের এ 'অন্ধকার' দিকটার সোজাসুজি কোন তথ্য বা প্রমাণ কিন্তু

---

৮. ঐ, 30.

৯. Peter Marshall, *Bengal*, 75, 78, Rajat Kanta Ray, 'Colonial Penetration', 7, 14.

অপ্রতুল। এর কারণ সম্ভবত নবাব হবার পরে সিরাজউদ্দৌলার স্বভাব এবং আচরণে পরিবর্তন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অতি সাম্প্রতিক লেখাতেও সিরাজকে 'জেদি, একরোখা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁর 'মেজাজি, রাগী স্বভাবের' উপর জোর দেয়া হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক ঐতিহাসিক আবার সিরাজউদ্দৌলার 'নিষ্ঠুরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মাদ স্বভাবের' গল্পকে 'পরাজিতের মরণোত্তর পুরস্কার' বলে অভিহিত করেও সত্য ঘটনা কি তা এড়িয়ে বলেছেন, "সত্য যাই হোক না কেন, সিরাজউদ্দৌলা মোটেই আলিবর্দীর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না।"[৯] নবাব হবার পরে সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছিল তা আমরা জানতে পারি ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী স্ক্র্যাফটনের লেখা থেকেই। স্ক্র্যাফটন লিখেছেন, আলিবর্দীর মৃত্যুশয্যায় সিরাজ মদ্য স্পর্শ করবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।[১০]

এমন পরিবর্তন যে অসম্ভব নয় (যদিও নাটকীয় হতে পারে) এবং তার যে সম্ভাবনাও ছিল সেটা আমাদের জানাচ্ছেন সেই মঁসিয়ে জঁা ল, যিনি প্রধানত সিরাজ-চরিত্রের কদর্য রূপটি তুলে ধরেছেন। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সিরাজের এই যে চরিত্র তা নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর আগের। তাঁর বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : "সাধারণ লোক ভাবতো, সিরাজ নবাব হয়ে অনেক বেশি মানবিকতার পরিচয় দেবে।"[১১] তিনি নিজেও আশা করেছিলেন যে, হয়তো "সিরাজ একদিন (নবাব হবার পরে ?) সজ্জনে পরিণত হতে পারেন।" তাঁর এরকম বিশ্বাসের কারণও ছিল—তিনি মন্তব্য করেন, "তরুণ নবাব নওয়াজিস মুহম্মদ খান[১২] সিরাজের চেয়ে বেশি বই কম দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না, কিন্তু পরে সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেন।"[১৩]

এবার নবাব হবার পরে সিরাজের আচরণ বিশ্লেষণ করা যাক। মঁসিয়ে ল'র লেখা থেকে স্পষ্ট যে, সিরাজউদ্দৌলা ফরাসীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিলেন।[১৪] ফরাসীদের প্রতি কোন রকম নিষ্ঠুরতা বা উগ্রতা তিনি দেখান নি। তাঁর দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী (এবং মসনদের দাবিদার) ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গের প্রতি সিরাজ কেমন আচরণ করেছিলেন ? নবাব হওয়ার আগে তাঁর যে চরিত্র আমরা দেখেছি, তার সঙ্গে মিলে যায় এমন হঠকারিতা বা অবিবেচনাপ্রসূত কিছু কি তিনি করেছিলেন ? আমাদের উত্তর কিন্তু একদম 'না'। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর পয়লা নম্বর শত্রু ঘসেটি বেগমকে (যিনি সিরাজকে

১০. Luke Scrafton, *Reflections on the Government & ca of Indostan*, (London 1760), 54

১১. Law's Memoir, S C. Hill, *Bengal*, Vol. III, 162

১২. ঘসেটি বেগমের স্বামী, সিরাজউদ্দৌলার খালু এবং ঢাকার নবাব।

১৩. Law's Memoir, S. C Hill, *Bengal*, Vol. III, 162

১৪. ঐ, 163.

১৫. Yusuf Ali Khan, *Tarikh-i-Bangala-i-Mahabatjangi*, tr., Abdus Subhan, (Calcutta 1982), 118

নবাব হিসেবে একেবারে চান নি এবং সিরাজ যাতে নবাব হতে না পারেন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-চক্রান্ত করেছিলেন) যেভাবে 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তির সঙ্গে' বাগ মানিয়েছিলেন তা *তারিখ-ই-বাংগালা-ই-মহব্বতজঙ্গী*-এর লেখক ইউসুফ আলি খানও তারিফ না করে পারেন নি।[১৫] শওকত জঙ্গ অবশ্য অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিরাজকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। সিরাজ তাঁকে পরাভূত করে মসনদে নিজেকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গেও কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করেছেন, পরে একদিকে অস্ত্রধারণ ও অন্যদিকে কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যার একটা মিটমাট করতে চেয়েছেন।

কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান উইলিয়ম ওয়াটস সিরাজউদ্দৌলা "ক্ষমতা এবং ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যে কিঞ্চিৎ বেসামাল" বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা হয়তো সত্যের অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু পনেরো মাসের স্বল্প রাজত্বকালে সিরাজ কোন পাগলামি, অর্বাচীনতা বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় যে দেন নি ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ থেকে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হিসেবে, দেশের শাসক হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছেন। এ দেশে ব্যবসা করতে এসে নবাবের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার মতো কোন ঔদ্ধত্য সিরাজ সহ্য করতে চান নি। উইলিয়ম ওয়াটসের মতে, সিরাজউদ্দৌলা বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর কাছে প্রত্যাশা করেছেন যে, তারা নবাবের আদেশ বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু তাই বলে সিরাজ সর্বক্ষণ 'যুদ্ধংদেহি' মনোভাব দেখিয়েছেন, এমন কথা ঠিক নয়। যে তরুণ 'উগ্র বদমেজাজ' এবং 'নির্মম নিষ্ঠুরতার' জন্য কুখ্যাত, তিনি কিন্তু নবাব হওয়ার পর কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অবরোধ ও আত্মসমর্পণের পরে পরাজিত ইংরেজদের প্রতি 'উদার মানবিকতাপূর্ণ' ব্যবহার করেছেন, এ তথ্য কাশিমবাজার কুঠির এক ইংরেজ কর্মচারীরই।[১৬] কাশিমবাজারের পতনের পর ওয়াটস আর কোলেটকে শুধু সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করতে হলো—তাও বন্দি হিসেবে নয়। খুব সম্ভবত সিরাজ এভাবে কলকাতার গভর্নর ড্রেকের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে ড্রেক নবাবের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসেন। কাশিমবাজারে ইংরেজদের বিষয়-সম্পত্তির উপর সিরাজ হাত পর্যন্ত দেন নি, শুধু ওখানকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। সিরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে উইলিয়ম ওয়াটসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "নিজস্ব স্বভাবের দিক থেকে সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত নিরীহ ও ভীতু প্রকৃতির লোক ছিলেন।"[১৭] স্ত্রী লুৎফুন্নেসার প্রতি সিরাজের গভীর ভালবাসা ও মদ্যপান না করার প্রতিশ্রুতি রক্ষার মধ্যে কিন্তু বদচরিত্রের লক্ষণ কিছু পাওয়া যায় না।

১৬. Brijen K Gupta, *Sirajauddaulah* 57.

১৭. Watts to his father, 13 August 1757, S C Hill, *Bengal*, Vol II, 467

সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ

ইদানীং ঐতিহাসিকরা বাংলার নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলার চেষ্টা করছেন যে, আঠারো শতকের প্রায় প্রথম থেকে বাংলার নবাবের সঙ্গে সামরিক অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও জমিদারদের যে নতুন জোটবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল এবং যা আলিবর্দী পর্যন্ত বাংলার নবাবি শাসনের মূল ভিত্তি ছিল, সিরাজউদ্দৌলার সময় তা ভেঙ্গে পড়ে এবং তার ফলে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'সঙ্কট' ঘনীভূত হয়।[১৮] আর এ সুযোগে ইংরেজরা বাংলায় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এটা ঠিকই, ১৭৫৬-৫৭ সালে বাংলায় যে 'সঙ্কট' দেখা দেয় তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে বাংলার নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা ভাল করে বুঝতে হবে। এ সম্পর্ক আবার অনেকটা নির্ভর করতো একদিকে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার সমৃদ্ধির উপর। কিন্তু যে সমস্ত বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের উৎপত্তি, সেগুলো ভাল করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যাতে এ সংঘর্ষের প্রকৃত কারণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

আমরা আগেই বলেছি, ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার বিরোধ ও সংঘর্ষের কারণ হিসেবে হিল সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছেন নবাবের 'দম্ভ' এবং 'অর্থলিপ্সা'কে। নবাব হওয়ার আগে সিরাজ-চরিত্রে আত্মম্ভরিতা ছিল, সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করছি না। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার আচরণ বা ব্যবহারে এমন কোন তথ্য দেখানো অসম্ভব যাতে প্রমাণ করা যায় যে, সিরাজের দাম্ভিকতাই ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের অন্যতম কারণ। আর ইংরেজ কর্মচারীদের লেখা থেকেই সহজে দেখানো যায় যে, সিরাজের অর্থলিপ্সা যদি থেকেও থাকে, তা কিন্তু কোনভাবেই এ সংঘর্ষের জন্য দায়ী নয়। অন্যদিকে আমাদের কাছে এমন অনেক তথ্য-প্রমাণ আছে যা থেকে দেখানো যায়, যদি কোন একটি কারণকে এ সংঘর্ষের জন্য দায়ী করা যায়, তা হলো কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ড্রেকের কঠিন ও অনমনীয় মনোভাব। হিল কিন্তু এ সংঘর্ষে ড্রেকের ভূমিকা সম্বন্ধে নীরব।

অধুনা ঐতিহাসিকদের মধ্যে যদিও পিটার মার্শাল বলছেন যে, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের সঙ্গে "মিটমাট করার জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে নি", তবু তিনি এবং ক্রিস বেইলি এখনো হিলের অনুকরণে এ সংঘর্ষের জন্য সিরাজউদ্দৌলাকেই বেশি করে দায়ী করছেন।[১৯]

১৮. Peter Marshall, *Bengal*, 56, 63, Rajat Kanta Ray, 'Colonial Penetration', 6.

১৯. কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে এখানে মার্শাল East Indian Fortunes (Oxford 1976) সম্পর্কে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। তিনি লিখেছেন: "The avalanche was set in mot on by Siraj-ud-daula's attack on Calcutta in 1756" (259). But Chris Bayly still holds that the dispute "escalated when the Nawab Siraj-ud-Daula attempted to expel all the English from Bengal and its riches." Bayly, *Indian Society*, 46.

ক. সিরাজউদ্দৌলার 'দাম্ভিকতা'

সিরাজউদ্দৌলা হয়তো দাম্ভিক ছিলেন—এত অল্প বয়সে যিনি নবাব হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে আমাদের মূল প্রশ্ন—নবাব হওয়ার পর ইংরেজদের প্রতি সিরাজ কি কোন দাম্ভিকতা দেখিয়েছিলেন ? নবাব সিরাজউদ্দৌলার দম্ভ বা ঔদ্ধত্য ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য কতটা দায়ী তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং তার জন্য কিছুটা ইতিহাস পরিক্রমণ দরকার। নবাব হওয়ার আগে থেকেই সিরাজ ইংরেজদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন বলে যে অভিমত আছে, তার সত্যতা বিচারসাপেক্ষ। তা যদি সত্য হতো, তাহলে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা ১৭৫২ সালের সেপ্টেম্বরে সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসার পর লিখতো না যে, তারা যুবরাজের কাছে ওলন্দাজ বা ফরাসীদের চাইতেও বেশি আদর-অভ্যর্থনা পেয়েছে।[২০] কিন্তু তারপর সিরাজ ক্রমে ক্রমে সন্দেহ করতে শুরু করলেন, ইংরেজরা তাঁর মসনদ লাভের বিরোধিতা করতে পারে। নবাব হওয়ার পর তাঁর সন্দেহ আরো বেড়ে গেল যে, ইংরেজরা সক্রিয়ভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাহায্য করছে। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, এ সন্দেহ খুব অমূলক নয়। মঁসিয়ে জাঁ ল'র লেখা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইংরেজরা সিরাজের বিরোধী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছিল এবং আশা করছিল যে, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হতে পারবে না। সেজন্য তারা কোন কার্যোপলক্ষে নবাবের দরবারে যেতো না।[২১] তিনি আরো জানাচ্ছেন, ইংরেজরা ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার দ্বারা সিরাজউদ্দৌলাকে তাদের প্রতি আরো বিরূপ করে তুলেছিল।[২২] সমসাময়িক আরেকজন ফরাসী পর্যবেক্ষকও এ অভিমত সমর্থন করেছেন।[২৩] এমন কি হলওয়েলও বিশ্বাস করেছিলেন যে, সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের দলের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই বেশি।[২৪] *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন*-এর রচয়িতা ও শওকত জঙ্গের উপদেষ্টা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনও নিশ্চিত ছিলেন যে, সিরাজের বিরুদ্ধে সিংহাসন দাবির লড়াইয়ে শওকত জঙ্গ ইংরেজদের সাহায্য পাবেন।[২৫]

এসব প্ররোচনা সত্ত্বেও সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলেন ? তিনি যদি দাম্ভিক হতেন এবং তাঁর দাম্ভিকতাই যদি সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হতো (যেটা হিল জোর দিয়ে বলেছেন), তাহলে তাঁর প্রধান দুই শত্রুকে পরাভূত করার পরই তিনি ইংরেজদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎপর হতেন। কিন্তু সিরাজ তা করেন নি।

২০. Bengal Public Consultations (henceforth B. P. C), Range 1, Vol. 25, f 251, 18 September 1752
২১. Law's Memoir, S. C. Hill, *Bengal*, Vol. III, 162.
২২. ঐ, 163-64.
২৩. ঐ, 219.
২৪. Holwell to the Court of Directors, 10 August 1757, *Ibid.*, 349.
২৫. Ghulam Husain Khan, *Sier-ul-Mutaqherin*, tr. Nata Manus (Raymond Mustafa), Vol II, (Calcutta 1902), 198-99 (henceforth *Sier*).

সিংহাসনে আরোহণ করার ক'দিন পরে সিরাজ কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানিকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাসকে তাঁর হাতে প্রত্যর্পণের জন্য। কৃষ্ণদাস রাজবল্লভের আনুমানিক ৫৩ লক্ষ টাকার ধন-সম্পদ নিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘসেটি বেগমের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর রাজবল্লভ ছিলেন ঢাকার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত। ঘসেটি বেগমের প্রয়াত স্বামী ঢাকার নবাব নওয়াজিস মুহম্মদের সময় রাজস্ব বিভাগে রাজবল্লভ ছিলেন সহকারী। আলিবর্দীর মৃত্যুর আগেই রাজবল্লভের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়। ভয় পেয়ে রাজবল্লভ তাঁর ধন-সম্পদসহ পুত্র কৃষ্ণদাসকে সপরিবারে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর মাস খানেকেরও আগে (১৩ মার্চ ১৭৫৬ সালে) কৃষ্ণদাস কলকাতা পৌঁছে গেলেন।[২৬]

প্রথম চিঠি পাঠাবার কয়েক সপ্তাহ পরে সিরাজ কলকাতায় আরেকটা চিঠি পাঠিয়ে জানালেন—ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লাকে সুসংহত ও দুর্ভেদ্য করে তোলার জন্য যেন নতুন করে কিছু করা না হয় এবং ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়মে যে প্রাচীর ও অপসারণীয় সেতু সম্প্রতি বানিয়েছে তা যেন ভেঙ্গে ফেলা হয়। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক সিরাজের প্রথম চিঠিকে শুধু উপেক্ষাই করলেন না, দ্বিতীয় চিঠির বাহক, মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজা রামের ভাই নারায়ণ সিংহকে গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। অথচ তৎকালীন কলকাতার সবচেয়ে ধনী ও সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী উমিচাঁদই নারায়ণ সিংহকে পরিচয়পত্র দিয়ে ড্রেকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সিরাজের দ্বিতীয় চিঠির উত্তরে ড্রেক বেশ কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ যদি ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ করে, তাহলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা নবাবের সাধ্যে কুলোবে কি-না।[২৭] এ চিঠি পেয়ে সিরাজউদ্দৌলার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো যে, ইউরোপীয়রা, বিশেষকরে ইংরেজরা দক্ষিণ ভারতে মাত্র কয়েক বছর আগে যেভাবে নিজেদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, বাংলায় তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে। নারায়ণ সিংহকে বিতাড়নের খবর পেয়ে উইলিয়ম ওয়াটস শঙ্কিত হয়ে লিখছেন :

> যে মুহূর্তে আমি (নারায়ণ সিংহের) ব্যাপারটি জানতে পারলাম, তখনই আমি নবাবের উচ্চ পদাধিকারী এ কর্মচারীকে এভাবে অপমান করার ফল কি হতে পারে তা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, কারণ তরুণ নবাবকে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে কিঞ্চিৎ বেসামাল মনে হয় এবং সে আশা করতো তার আদেশ লোকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে।[২৮]

২৬. পত্রটি ১৭৫৬ সালের ১৫ এপ্রিল কলকাতায় পৌছে। ড্রেকের বিবরণ দেখুন, Hill, *Bengal*, Vol. I, 125. ঢাকায় অবস্থানকালে রাজবল্লভ দুই কোটিরও অধিক টাকা সঞ্চয় করেছিলেন বলে হিসাব পাওয়া যায়, দেখুন, Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. V, 125; Drake to Fort William Council, January 17-25, 1757, Hill, *Bengal*, Vol. III, 136; Holwell to Court of Directors, 10 August 1757, *Ibid.*, Vol. III, 248.

২৭. Drake's Narrative, Hill, *Bengal*, Vol. I, 125; Holwell to the Court of Directors, 30 November 1756, Hill, *Bengal*, Vol. II, 8.

২৮. Watts to Court of Directors, 30 June 1757, Hill, *Bengal*, Vol. III, 332.

এর পরের ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিরাজ এতসব সত্ত্বেও দম্ভসূচক বা হঠকারিতার কোন কাজ করেন নি। প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ *মুজাফফরনামার* লেখক করম আলির তথ্য অনুযায়ী মীর জাফর, রায়দুর্লভ, খোজা ওয়াজেদ প্রমুখের নেতৃত্বে একদল নবাবকে পরামর্শ দিলেন ইংরেজদের প্রতি দৃঢ় কূটনীতির সঙ্গে প্রয়োজনে অস্ত্রধারণের নীতি অবলম্বন করতে।[২৯] সেই পরামর্শ অনুযায়ী সিরাজউদ্দৌলা প্রখ্যাত আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজেদকে ইংরেজদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার দৌত্যে নিযুক্ত করলেন। ওয়াজেদের দৌত্য কিন্তু নিষ্ফল হলো। ইংরেজ গভর্নর ড্রেক খোজা ওয়াজেদকেও অপমান করে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করলেন। উইলিয়ম ওয়াটসের লেখা থেকে জানা যায়, খোজা ওয়াজেদ চারবার কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে দেখা করে নবাবের সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে এই বলে শাসিয়েছিল যে, এরকম প্রস্তাব নিয়ে তিনি যেন আর কলকাতায় আসার চেষ্টা না করেন।[৩০]

খোজা ওয়াজেদ যখন নিষ্ফল দৌত্যে ব্যস্ত, সিরাজউদ্দৌলা তখন দুর্লভরাম ও হাকিম বেগকে আদেশ দিলেন কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ করতে। শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য তিনি নিজে পূর্ণিয়া রওনা হলেন। রাজমহলে পৌঁছে ইংরেজদের উদ্ধত আচরণের খবর পেয়েই সিরাজ ত্বরিতগতিতে কাশিমবাজার অভিমুখে যাত্রা করলেন। বিনা যুদ্ধে কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির পতন হলো। কুঠির প্রধান উইলিয়ম ওয়াটস সিরাজের নির্দেশে এক শর্তাধীন চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন[৩১] এবং ওয়াটস ও কোলেট নবাবের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন।[৩২] সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কিছুই বাজেয়াপ্ত করেন নি। কোন লুটতরাজ বা হত্যাকাণ্ড হয় নি, কোন নিষ্ঠুরতাও না। সুতরাং ইংরেজদের সঙ্গে আচরণে এ পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোন দাম্ভিকতা বা ঔদ্ধত্যের পরিচয় আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুতপক্ষে সংঘর্ষ চলাকালীন সময়েও এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

২৯. Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 63-64, quoted in Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 52.

৩০. Watts and Collet to Fort St. George Council, 16 July 1756, Hill, *Bengal*, Vol. I, 58.

৩১. চুক্তির শর্তাবলী দ্র., Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 55.

৩২. উইলিয়ম টুক-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ওয়াটস নবাবের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ এ বর্ণনা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন (দ্র. রজত রায়, 'Colonial Penetration', 9-10)। এ বিবরণের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। অন্য কোন ইউরোপীয় বা ফার্সী ঐতিহাসিকের বিবরণে এমন রসালো গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় না। টুক যে অতিরঞ্জিত বিবরণ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর আরেকটি বিবরণে। এতে তিনি বাংলায় ইংরেজদের ক্ষতির পরিমাণ ২২,৫০০.০০ টাকা বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সরকারি হিসাব মোতাবেক প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭,৬৪৪.০০ টাকা। (Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 80).

খ. সিরাজউদ্দৌলার 'অর্থলিপ্সা'

সিরাজউদ্দৌলার অর্থলিপ্সাকে এস. সি. হিল ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে যতোই দেখাতে চান না কেন, সমসাময়িক কোন নথিপত্রে কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, সিরাজ অর্থলোলুপ হলে কাশিমবাজার কুঠির পতনের পর ইংরেজদের সব ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে পারতেন। কিন্তু সিরাজ তা করেন নি। ইংরেজদের কাছ থেকে কোন অর্থও তিনি দাবি করেন নি। ওয়াটস যে শর্তাবলীতে সই করেছিলেন তাতেও কোন অর্থের উল্লেখ ছিল না—ছিল শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযোগগুলোর কথা। সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে বাংলার সব নবাবই বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায় করতেন। সিরাজউদ্দৌলা তাও করেন নি। সিরাজের অর্থলিপ্সা যে কোন অবস্থাতেই এ সংঘর্ষের জন্য দায়ী নয় এবং সিরাজ যে সত্যিই একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছিলেন, তা কোম্পানির কর্মচারী ওয়াটস ও কোলেটের লেখা থেকেই সুস্পষ্ট : "নবাব যে একটা আপোস-মীমাংসা চেয়েছিলেন তার প্রমাণ এই যে, তিনি যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ছাড়া কাশিমবাজারে কোম্পানির অন্য কোন জিনিসে হাত পর্যন্ত দেন নি।"[৩৩] অবশ্য এটা ঠিক যে, কলকাতা আসার পথে ওয়াটস ও কোলেটের কাছে নবাবের দীউয়ান ও সেনাপতি দুর্লভরাম অর্থের কথা বলেন। কলকাতা দখল করার পর মুর্শিদাবাদ ফেরার পথে সিরাজউদ্দৌলা ওলন্দাজদের কাছ থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা ও ফরাসীদের কাছ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নজরানা গ্রহণ করেন। কলকাতার ইংরেজ কোষাগারে সিরাজ মাত্র চল্লিশ হাজার টাকার মতো পান। এখানে স্মর্তব্য, বাংলার সব নবাবই কোন যুদ্ধ জয়ের পর বা এ রকম উপলক্ষে বিদেশী বণিক ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রথাগত নজরানা আদায় করেছেন—নজরানার পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশি হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ফলে ইংরেজ কোম্পানির যে ক্ষতি হয় (আনুমানিক সাড়ে ষোল লক্ষ টাকা) তা মূলত সংঘর্ষের সময় অগ্নিকাণ্ডের জন্যই।[৩৪] লুটতরাজও অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে'র মতে, তার জন্য দায়ী রাজা মানিক চাঁদ, পরে সিরাজ তাঁকে এজন্য কারাদণ্ড দেন। কলকাতা লুণ্ঠনের জন্য মানিকচাঁদ দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান।[৩৫] সিরাজের বিরুদ্ধে অর্থলিপ্সার অভিযোগ যে কত অসার এবং তা যে সংঘর্ষের জন্য একেবারেই দায়ী নয়, তা সম্প্রতি জানা গেছে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত এক অজ্ঞাতনামা ইংরেজ লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে। উক্ত লেখক স্পষ্ট বলছেন : "বাংলার সুবাদার যা চেয়েছিলেন

৩৩. Watts and Collet to Fulta Council, 8 July 1756, Hill, *Bengal*, Vol. I, 61.

৩৪. ১.৬৫ মিলিয়ন বলে প্রাক্কলিত, দ্রষ্টব্য, Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah*, 81.

৩৫. Robert Orme, *History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan*, Vol II, (London 1803), 147.

তা মোটেই অর্থ নয়—অর্থের ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই গৌণ, তিনি আসলে চেয়েছিলেন ইউরোপীয়রা নিজেদের সুসংহত করার জন্য দুর্গগুলিকে যেভাবে দুর্ভেদ্য করে তুলছিল তার সম্পূর্ণ অবসান।"[৩৬] এমনকি, যে হলওয়েল সিরাজের প্রতি মোটেই সদয় ছিলেন না, তার ব্যাপারও প্রমাণ করে যে সিরাজ মোটেই অর্থলিপ্সু ছিলেন না। কলকাতার পতনের পর যখন হলওয়েলকে বন্দি হিসেবে নবাবের সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি নবাবকে জানালেন যে, যুদ্ধের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত অনেক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নবাবকে ভাল পরিমাণ টাকা দিয়েই তাঁর মুক্তি কিনতে পারেন। সিরাজ উত্তর দিয়েছিলেন : "হলওয়েলের টাকা থাকলেও তা তাঁর কাছেই থাক; ওঁর অনেক যন্ত্রণাভোগ হয়েছে; ওঁকে মুক্তি দেয়া হোক।"[৩৭] এ ঘটনা থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট যে, সিরাজের অর্থলিপ্সা তেমন কিছু ছিল না এবং অন্তত কিছুটা মানবিকতাও তাঁর মধ্যে ছিল।

সিরাজউদ্দৌলার অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত, নাকি শুধু মিথ্যা ওজর?

আমাদের কাছে যেসব তথ্য-প্রমাণ আছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করার পর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার যেসব অভিযোগ সেগুলো খুবই ন্যায়সঙ্গত এবং সেগুলোকে কোনমতেই নবাবের 'মিথ্যা ওজর' বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার অভিযোগ—(১) ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার সংস্কার এবং সেটাকে দুর্ভেদ্য ও সুসংহত করার প্রচেষ্টা, (২) দস্তকের (বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতিপত্র) যথেচ্ছ অপব্যবহার, এবং (৩) নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয়দান। খোজা ওয়াজেদকে ইংরেজদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার দৌত্যে নিয়োগ করার পর তাঁকে লেখা একটা চিঠিতে সিরাজ তাঁর অভিযোগগুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরেন।[৩৮] এ অভিযোগগুলোকে কেন্দ্র করেই যেহেতু ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার সংঘর্ষ বাধে, সেজন্য এগুলো আদৌ ভিত্তিহীন কিনা সেটা খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে। তখনকার সরকারি নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, সব ইউরোপীয় কোম্পানিই এ সময় তাদের কেল্লাগুলোকে সুসংহত ও দুর্ভেদ্য করে তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। সতেরো শতকের শেষদিকে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় বাংলার নবাব ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহকে তাদের কেল্লাগুলো শক্তিশালী করে তোলার যে ঢালাও অনুমতি দেন, তার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ কোম্পানি তাদের কেল্লাগুলো দুর্ভেদ্য করে তুলছিল।[৩৯] আবার মারাঠা আক্রমণের সময় ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়মে গেরিনের উদ্যানের দিকটাতে দুর্ভেদ্য

৩৬. Mss. Eur. D. 283, f. 283, India Office Library, London. এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Sirajauddaulah, English Company and Plassey — A Reappraisal", *Indian Historical Review*, Vol. XIII, nos. 1-2, July 1986-January 1987, f. n. 34.

৩৭. Holwell's Narrative, Hill, *Bengal*, Vol. III, 152.

৩৮. Siraj to Wazid, 1 June 1756, *Ibid.*, Vol. I, 4.

৩৯. S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720*, (Calcutta 1975), 39-40.

প্রাচীর ও অপসারণীয় সেতু তৈরি করে এবং ফোর্ট উইলিয়মের চারদিকে পরিখা খনন করে নেয়। এর পরেও লন্ডন থেকে কোম্পানির পরিচালকরা নির্দেশ পাঠায় "নবাবের অনুমতি নিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে" ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে।[৪০] বাংলায় নবাবের কর্তৃত্বকে ইংরেজরা এ সময় কি রকম তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা করতে শুরু করে ড্রেককে লেখা উইলিয়ম ওয়াটসের চিঠিই তার প্রমাণ। ওয়াটস লিখেছেন, "নবাব আলিবর্দীর হয়তো নজরেই পড়বে না যে আমরা কলকাতাকে দুর্ভেদ্য করে তুলছি। সুতরাং নবাবের অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজন নেই, তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা উচিত।"[৪১] ড্রেক ও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের অনুমতির তোয়াক্কা না করে কলকাতাকে আরো দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী করে তুলতে কাজ শুরু করে দিল।

অধুনা কয়েকজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য, ইংরেজরা ফরাসীদের আক্রমণের ভয়েই কলকাতার দুর্গ সুসংহত করছিল। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে লেখা ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের চিঠি এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে। কাউন্সিল লন্ডনে লিখে যে, দুর্গ শক্তিশালী করা হচ্ছে 'দেশীয় শত্রুর' বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য।[৪২] এসব তথ্য থেকে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইংরেজরা বাংলার নবাবের অনুমতি না নিয়েই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দুর্ভেদ্য করে তুলছিল। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের কর্মকাণ্ড দেখে এবং বাংলার মসনদের জন্য প্রতিযোগিতার কথা মনে রেখে সিরাজউদ্দৌলা স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের এ প্রচেষ্টায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এ বিষয়ে পূর্বোল্লেখিত আমাদের ঐ পাণ্ডুলিপির অজ্ঞাতনামা লেখকের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

> নতুন সুবাদার তাঁর রাজ্যে ইউরোপীয়দের স্বাধীন ক্ষমতা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাদের ক্ষমতা হ্রাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এদের মধ্যে ইংরেজরা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে তারাই তাঁর ন্যায়সঙ্গত নীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়ে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, ইংরেজরা যদি জাফর খানের (মুর্শিদকুলী খান) সময় তারা যেভাবে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতো সে অবস্থায় ফিরে না যায়, তা হলে তিনি তাদের ক্ষমতাই শুধু হ্রাস করবেন না, তাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করবেন। এটা স্পষ্ট যে, সিরাজউদ্দৌলার প্রধান ও আসল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার দুর্গ ও যুদ্ধসরঞ্জাম ধ্বংস করা।[৪৩]

দস্তকের অপব্যবহার সম্বন্ধে সিরাজউদ্দৌলার অভিযোগও ভিত্তিহীন নয়। ইংরেজ কোম্পানির নথিপত্রে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, কোম্পানির কর্মচারীরা দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার করছিল। এই দস্তক বা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতিপত্রের সাহায্যে কোম্পানির কর্মচারীরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকি দিত না,

৪০. Court of Directors to Fort William Council, Despatch Book (henceforth D. B.), Vol. III, 16 January 1752, India Office Library, London.

৪১. Watts to Drake and Fort William Council, B. P. C., Vol. 28, 15 August 1755.

৪২. C. R. Wilson, *Old Fort William in Bengal*, Vol. II, (London 1906), 31; See Bayly, *Indian Society*, 50.

৪৩. Mss. Eur. D. 283, *Fort William*, f. 26.

এমনকি অর্থের বিনিময়ে এ দস্তক দিয়ে এশীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যও শুল্কমুক্ত করে দিত, যার ফলে রাজ্যের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হতো। কারণ এর ফলে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব থেকে রাজ্য বঞ্চিত হতো। কোম্পানির কর্মচারীরা অবশ্য দাবি করতো যে, ১৭১৭ সালে মুগল সম্রাট ফররুখশিয়র যে ফরমান বা আদেশপত্র ইংরেজ কোম্পানিকে দিয়েছিলেন [৪৪], তাতে শুধু কোম্পানির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নয়, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকেও রপ্তানিশুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল। এ দাবি কিন্তু একেবারেই ভিত্তিহীন ও অসঙ্গত। যে উদ্দেশ্য ও পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ফরমান দেয়া হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৭১৭ সালের ফরমান কিন্তু শুধু কোম্পানির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকেই শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকেও তা বহিঃশুল্ক থেকে রেহাই দিয়েছিল একথা বলা কোনক্রমেই সঠিক নয়।[৪৫]

ফলে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে এ নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলার নবাবের প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ লেগে থাকতো। কখনো কখনো এ বিবাদের সুযোগ নিয়ে নবাবের আদেশে কোম্পানির বেচা-কেনা একদম বন্ধ করে দেয়া হতো। বিরোধ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতো, তখন কোম্পানি নবাব এবং তাঁর অমাত্যদের মোটা নজরানা দিয়ে তা মীমাংসা করে নিত। আমাদের অজ্ঞাতনামা লেখক এ সম্বন্ধে বলছেন : "কোম্পানির দস্তকের অপব্যবহার নবাবের হাতে ন্যায্য হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল যাতে নবাব ইচ্ছে করলে কোম্পানির বেচা-কেনা বন্ধ করে দিতে পারতেন।" তিনি আরো বলছেন : "দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে নবাব কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করার সুযোগ পেয়েছিলেন—এভাবে টাকা আদায় করাটা নবাবের বেশি বাড়াবাড়ি বলা যায় না।"[৪৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দস্তকের অন্যায় অপব্যবহারের কথা সিরাজউদ্দৌলা প্রথম তোলেন নি। সম্ভবত সিরাজ এ অবৈধ ও বেআইনী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং তাই হয়তো কোম্পানির কর্মচারীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে,তাদের রাতারাতি বড়লোক হওয়ার সবচেয়ে সহজ ও লোভনীয় উপায়টি এবার বন্ধ হয়ে যাবে।

দস্তকের অপব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা দেখে আমাদের অজ্ঞাত-নামা লেখক মন্তব্য করছেন, "কি লজ্জাকর বেশ্যাবৃত্তিই না চলছে দস্তক নিয়ে।"[৪৭] তিনি জানাচ্ছেন, দরবারের গুপ্তচররা "দস্তক নিয়ে এ বেশ্যাবৃত্তির" খবর রোজ দরবারে পৌঁছে দিত।[৪৮] এখানে মনে রাখা দরকার, সিরাজউদ্দৌলা কিন্তু একেবারে মৌলিক প্রশ্ন যেটা, সেটা তখন তোলেন নি। কোম্পানির কর্মচারীরা যে দস্তকের ভাওতা দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার শুল্ক ফাঁকি দিত সেটা জেনেও সিরাজউদ্দৌলা সে অবৈধ অধিকারকে

৪৪. ফরমানের বিধানসমূহ দ্র., S. Bhattacharyya , *The East India Company and the Economy of Bengal,* (London 1954), 28-29.

৪৫. S. Chaudhuri, *Trade,* 42.

৪৬. Mss. Eur. D. 283, ff. 15, 25.

৪৭. ঐ, f. 15.

৪৮. ঐ, f. 25.

চ্যালেঞ্জ করেন নি। সিরাজ শুধু কোম্পানির কর্মচারীরা যে মোটা টাকার বিনিময়ে দস্তকের মাধ্যমে এশীয় ব্যবসায়ীদের শুল্ক ফাঁকি দেয়ার ব্যবস্থা করে দিত তাতেই আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং এভাবে রাজ্যের যে রাজস্বহানি হচ্ছিল তা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের পাণ্ডুলিপির অজ্ঞাতনামা লেখক জানাচ্ছেন[৪৯] :

> সিরাজউদ্দৌলা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর কাছে যেসমস্ত রসিদ আছে তা থেকে তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, ইংরেজরা ফররুখশিয়রের ফরমান পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এশীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যকে কোম্পানির দস্তকের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত করে বাংলার নবাবকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য দেড় কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করেছে।

সুতরাং এসব তথ্য থেকে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দস্তকের অপব্যবহার সম্বন্ধে সিরাজউদ্দৌলার যে অভিযোগ তা খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং যথার্থ, কোনক্রমেই তা নবাবের 'মিথ্যা ওজর' নয়।

নবাবের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নবাবের অপরাধী প্রজাকে কলকাতায় আশ্রয়দানের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা কৃষ্ণদাসের ঘটনা। নবাব আলিবর্দীও এরকম অবৈধ আশ্রয় দানের জন্য ইংরেজ কোম্পানির কাছে কয়েক বারই জোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।[৫০] তথ্য-প্রমাণ থেকে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয়দানের পেছনে ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এবং সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজ ন্যায়সঙ্গতভাবেই কৃষ্ণদাসকে নবাবের হাতে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছিলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান উইলিয়ম ওয়াটসই গভর্নর ড্রেকের কাছে কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় আশ্রয়দানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ওয়াটসের ধারণা ছিল, ঘসেটি বেগমের দল, যার অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য ছিল কৃষ্ণদাসের-পিতা রাজবল্লভ, তারা মসনদ দখলের লড়াইয়ে নিশ্চিত সাফল্য লাভ করবে। কিন্তু আলিবর্দীর মৃত্যুর ঠিক আগে ওয়াটস বুঝতে পারলেন যে, সিরাজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তিনি গভর্নর ড্রেক ও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে জানিয়ে দিলেন যে, এ অবস্থায় কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় রাখা মোটেই সমীচীন হবে না। ড্রেক কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেন নি যদিও কাউন্সিলের দুই সদস্য হলওয়েল ও ম্যানিংহামও একই অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে, এ অবস্থায় কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় রাখা বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না, কারণ তা হলে নতুন নবাবের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ বাধতে পারে।[৫১] অবশ্য হলওয়েল ক'দিন পরেই মত পাল্টেছিলেন, কেননা তখন বাজারে গুজব উঠে যে, ঘসেটি বেগমের দল সিংহাসন দখল করতে পারে। তাই হলওয়েল বলছেন : "কৃষ্ণদাসকে এ সময় কলকাতা থেকে বের করে দেয়া কোম্পানির স্বার্থের দিক থেকে ক্ষতিকর হতে পারে।"[৫২] যাহোক এটা সুস্পষ্ট যে, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়ে ইংরেজরা শুধু নবাবের কর্তৃত্বকেই অমান্য এবং অবজ্ঞা করে নি, নবাবের শত্রুদের সঙ্গে চক্রান্তেও জড়িত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং নবাবের অপরাধী প্রজাকে অন্যায়ভাবে আশ্রয়দানের যে অভিযোগ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা করেছিলেন, তা খুবই ন্যায়সঙ্গত।

৪৯. ঐ।
৫০. Brijen K. Gupta, *Sirajauddaulah.*, 38-39.
৫১. Holwell to Court of Directors, 30 November 1756, Hill, *Bengal*, Vol. II, 5
৫২. ঐ।

সিরাজউদ্দৌলার অভিপ্রায়—গভর্নর ড্রেকের মনোভাব

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগ—বাংলা থেকে তিনি ইংরেজদের তাড়াতে চেয়েছিলেন। এস. সি. হিল হয়তো এটাকেই নবাবের 'নির্বুদ্ধিতার' চূড়ান্ত ভেবেছেন। ঐতিহাসিকমহলে এ ধারণা এতদিন ধরে এতই স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত হয় যে, ক্যামব্রিজের অধ্যাপক ক্রিস বেইলি তাঁর অতি সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বলছেন, "সিরাজউদ্দৌলা বাংলা থেকে সব ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন।"[৫৩] কিন্তু আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তা থেকে এ অভিযোগ ভ্রান্ত প্রমাণ করা যায়। খোজা ওয়াজেদকে লেখা চিঠিতে (২৮ মে ১৭৫৬) সিরাজউদ্দৌলা তাঁর অভিপ্রায় খুব পরিষ্কার করে জানিয়েছেন :

> ইংরেজরা আমার রাজ্যে থাকতে চাইলে তাদের দুর্গগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে, পরিখা ভরাট করে দিতে হবে এবং নবাব জাফর খানের (মুর্শিদকুলী খান) আমলে যে শর্তে তারা বাণিজ্য করেছে সেই শর্তেই তাদের এখন ব্যবসা করতে হবে। তা না হলে আমার রাজ্য থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে। তারা যেন মনে রাখে, আমিই এ রাজ্যের নবাব।...ইংরেজরা যাতে পূর্বোক্ত শর্তগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমি বদ্ধপরিকর।[৫৪]

এর কিছুকাল পর ওয়াজেদকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে (১জুন ১৭৫৬) সিরাজ আরো বলছেন : "ইংরেজরা যদি তাদের উপরোক্ত আচরণগুলো সংশোধন করবে বলে কথা দেয়, তাহলে আমি তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবো এবং তাদেরকে আমার রাজ্যে থাকতে দেবো।"[৫৫] এ চিঠিগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, সিরাজউদ্দৌলা আসলে চেয়েছিলেন ইংরেজরা যেন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মকে ১৭১৭ সালের ফরমানের শর্তগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং ফরমানে বাণিজ্যের যেসব সুবিধা দেয়া আছে সেসবের যেন যথেচ্ছ অপব্যবহার না করে। সিরাজ যে ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে চান নি সেটা ফোর্ট সেন্ট জর্জের (মাদ্রাজ) গভর্নর পিগটকে লেখা তাঁর চিঠিতে সুস্পষ্ট : "সুবা বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা বা এখান থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেয়া মোটেই আমার অভিপ্রায় নয়।"[৫৬] আমাদের অজ্ঞাতনামা লেখকও বলছেন : "ইংরেজরা যদি জাফর খানের আমলে যে শর্তে বাণিজ্য করতে সে শর্তেই আবার ব্যবসা করতে রাজি না হয়, তাহলে সিরাজউদ্দৌলা বাংলায় তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে এবং বাংলা থেকে তাদের বহিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।"[৫৭]

নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের যে সংঘর্ষ ও নবাবের কলকাতা দখলের আগের যে ঘটনাপ্রবাহ, তা বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, গভর্নর ড্রেকের কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব শেষ পর্যন্ত এ সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের লেখা থেকেই আমাদের বক্তব্যের প্রচুর সমর্থন পাওয়া যাবে। কাশিমবাজার থেকে কলকাতা অভিযানের পথে ওয়াটস দুর্লভরামের সঙ্গে মিটমাটের আলোচনার বিবরণ

৫৩. C. A Bayly, *Indian Society*, 46
৫৪. Siraj to Wazid, 28 May 1756, Hill, *Bengal*, Vol 1, 3
৫৫. ঐ, 4
৫৬. Siraj to Pigot, 30 June 1756, *Ibid.*, 196.
৫৭. Mss., Eur D. 283, f. 26

দিয়ে ড্রেককে এক গোপন পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু ওয়াটস জানাচ্ছেন যে, "ড্রেক তাতে কোন সাড়াই দেন নি। বরং নবাবের সঙ্গে মীমাংসায় যেতে ড্রেক একেবারেই নারাজ।"[৫৮] খুব সম্ভবত ড্রেক ভেবেছিলেন, নবাবের অভিযোগগুলো ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়নের এবং তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করার মিথ্যা অজুহাত। তাই ড্রেক চেয়েছিলেন সামরিক শক্তি প্রদর্শন ক'রে নবাবকে কাবু করতে। ওয়াটস, কোলেট ও বেটসন আবার ৩১ মে ড্রেক ও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে লিখিত পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানালেন 'নবাবকে' আপোসের সুরে একটি চিঠি লিখতে। ড্রেক সেটাও অগ্রাহ্য করলেন। এদিকে কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী উমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজেদের কলকাতা প্রতিনিধি শ্রীবাবুর আপোসচেষ্টা ড্রেকের আগ্রহের অভাবে ব্যর্থ হলো। কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ এবং ইংরেজদের শর্তাধীন আত্মসমর্পণে ড্রেক খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীবাবুকে ড্রেক নাকি বলেছিলেন, সিরাজ যতো তাড়াতাড়ি কলকাতা আক্রমণ করবেন ততোই মঙ্গল, তা হলে ড্রেক তাঁর পছন্দসই নবাব সিংহাসনে বসাতে পারবেন।[৫৯]

শ্রীবাবু দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টায় ১০ জুন ড্রেককে দিয়ে সিরাজউদ্দৌলার কাছে একটা *চিঠি লেখাতে সক্ষম হলেন, কিন্তু সে চিঠিতে যদি সমঝোতার কোন সুর থেকেও থাকে* তা ড্রেকই বানচাল করলেন ঐ একই দিনে থানা ও সুখসাগরে নবাবের দুটো ছাউনি আক্রমণ করার আদেশ দিয়ে।[৬০] নবাবের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় ড্রেক যে দৃঢ়সঙ্কল্প, তা ওয়াটস ও কোলেটের চিঠির (১২ জুন, তারা তখনও নবাবের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কলকাতার পথে) যে উত্তর ড্রেক দিচ্ছেন তা থেকে সুস্পষ্ট : "কাশিমবাজারে কোম্পানির যে অবমাননা হয়েছে, তার পরে ইংরেজরা নবাবের সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসতে একেবারেই নারাজ।"[৬১] আপোস-মীমাংসার শেষ চেষ্টা করেছিলেন ফরাসী কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী ও তখন নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক মার্কি দ্যা সা জাঁক (১৩ জুন)। ড্রেক এ প্রস্তাবের উত্তর দিয়েছিলেন, জাঁক যেন নবাবকে ছেড়ে ইংরেজদের পক্ষে চলে আসেন। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে না যে, ড্রেকের মারমুখো ও অনমনীয় মনোভাব ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের ১৬ জুনের সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী রিচার্ড বেচারের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> এ কথা কি কখনো কল্পনা করা যায় যে কোন রাজার (দোষী) প্রজাকে একদল বিদেশী বণিক আশ্রয় দেবে?...কিংবা তাঁর দূতকে অপমান করলে রাজা সেই অপমান নির্বিবাদে মেনে নেবেন?...দূতকে (অপমান করে) তাড়িয়ে দেয়াটা সারা পৃথিবীতেই রাজার অবমাননা বলে গণ্য হবে...।[৬২]

৫৮. Watts & Collet to Court of Directors, 16 July 1756, Hill, *Bengal,* Vol I, 103.
৫৯. Watts & Collet to Court of Directors, 17 July 1756, ঐ, 116-17.
৬০. ঐ।
৬১. ঐ, 104
৬২. Bengal Letters Received, Vol. 23, f. 460, India Office Library, London, Richard Becher to Roger Drake, 22 March 1757.

পলাশী-চক্রান্ত

ক. *মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা*

পলাশী-চক্রান্তের নায়ক মীর জাফরই এবং তিনিই আসল বিশ্বাসঘাতক—এ ধারণা বহুল প্রচলিত। বাংলায় মীর জাফর নামটাই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হয়ে গেছে—ওটা বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক শব্দ। এ ধরনের বিকৃত মনোভাব সমাজে প্রচলিত হয়েছে এই ধারণা থেকেই যে, পলাশী-চক্রান্ত এবং পলাশী যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পরাজয়ের জন্য দায়ী শুধু 'বিশ্বাসঘাতক' মীর জাফরই। সুতরাং শুধু মীর জাফরই 'বিশ্বাসঘাতক' বলে যে ধারণা প্রচলিত তা কতটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য, তার তথ্যভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন।

এখানে বলে নেয়া দরকার, মীর জাফর পলাশী-চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন এবং পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এটা খুবই সত্য—এটাকে অস্বীকার করার কোন চেষ্টা এখানে করা হচ্ছে না। যে মূল প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজছি তা হলো, মীর জাফরই কি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন বা পলাশী-চক্রান্তের আসল নায়ক ছিলেন ? বস্তুত আমাদের কাছে এমন তথ্য-প্রমাণ আছে যা থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, পলাশী-চক্রান্তের মূল নায়ক জগৎশেঠরা, মীর জাফর নয়। ইংরেজরা প্রথমে সিরাজের স্থলে নবাব হিসেবে ইয়ার লতিফ খানকে[৬৩] বসানোর চেষ্টা করেছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা জগৎশেঠদের মনোনীত প্রার্থী মীর জাফরের[৬৪] দিকে ঝুঁকলো, কারণ তারা জানতো, জগৎশেঠদের সাহায্য ছাড়া বাংলায় কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। মঁসিয়ে জাঁ ল পরিষ্কার বলছেন : "আমি ভাল করেই জানি, বাংলায় এ ঘটনার পেছনে মূল প্রেরণা জগৎশেঠদের। ইংরেজরা যা করেছে তাদের সমর্থন ছাড়া তা করতে তারা কখনো ভরসা পেতো না।"[৬৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতার দায় শুধু মীর জাফরের নয়—জগৎশেঠদের দায় মীর জাফরের চাইতে বেশি বই কম নয়।

আসলে ইতিহাস পরিক্রমায় একটু পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সব ক'টা রাজনৈতিক পালাবদলে জগৎশেঠরাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এ সময়কার রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের চাবিকাঠি ছিল জগৎশেঠদের হাতেই। মঁসিয়ে ল লিখছেন, "অনেক দিন ধরে বাংলায় যেসব রাজনৈতিক বিপ্লব হয়েছে সেগুলোর প্রধান হোতা ছিল তারাই (জগৎশেঠরা)।" রবার্ট ওরমে এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে,

৬৩. ওরমে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, "Seths had long been connected with Mir Jafar who although despised the wretched character of Surajah Dowla, dreaded the excesses of it" Robert Orme, *History*, Vol. II, Sec. I, 148.

৬৪. S. C. Hill, *Bengal*, Vol. III, 185.

৬৫. S. C. Hill, *Three Frenchmen in Bengal*, (London 1903), 77.

জগৎশেঠরাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য বের করার কাজে ইয়ার লতিফ খানকে নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৬] রবার্ট ক্লাইভের লেখা চিঠিপত্র দেখার পর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, পলাশী-চক্রান্তের পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল জগৎশেঠরাই। ১৭৫৭ সালের ৩০ এপ্রিল ক্লাইভ লিখেছেন : "কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এ চক্রান্তের নেপথ্যে থাকলেও আসল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জগৎশেঠ নিজেই।" ঐ বছরের জুন মাসে ক্লাইভ জগৎশেঠ সম্বন্ধে আবার জানালেন :

> ...যেহেতু তিনি তিনটি সুবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনসম্পত্তির মালিক এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি, এবং যেহেতু মুগল দরবারেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই বাংলার নবাবের সঙ্গে ব্যাপারগুলো নিষ্পত্তির জন্য তাঁকেই যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।[৬৭]

তবে এখানে বলা প্রয়োজন, মঁসিয়ে জাঁ ল মন্তব্য করেছেন যে, "মোহনলাল যদি সুস্থ থাকতেন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতারহিত না হতেন, তাহলে জগৎশেঠদের চক্রান্ত এত সহজে সফল হতো না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মোহনলাল কিছুদিন ধরে এবং বিশেষকরে চরম বিপদের এই মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।" করম আলিও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, মোহনলালকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।[৬৮]

খ. *পলাশী-চক্রান্তে ইংরেজদের ভূমিকা*

ইদানীং ঐতিহাসিকদের মধ্যে পলাশী-চক্রান্তে ইংরেজদের ভূমিকা সম্পর্কে আশ্চর্য রকমের ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। এঁদের বক্তব্য—পলাশী সম্বন্ধে ইংরেজদের কোন 'পূর্বপরিকল্পনা' ছিল না। এ চক্রান্তের উদ্ভব বা বিকাশে ইংরেজদের কোন ভূমিকাই নেই; মুর্শিদাবাদ "দরবারের অন্তর্দ্বন্দ্বই ইংরেজদের অনিবার্যভাবে বাংলার রাজনীতিতে টেনে এনেছিল।"[৬৯] কিন্তু পলাশী-প্রাক্কালীন ঘটনাবলী এবং আমাদের কাছে যেসব তথ্য-প্রমাণ আছে সেগুলোর সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে স্পষ্টত দেখা যাবে, ইংরেজরাই পলাশীর মূল ষড়যন্ত্রকারী। সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে অন্য কাউকে মসনদে বসাবার ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছিল। শুধু তাই নয়,পলাশী যুদ্ধের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রধান প্রধান দেশীয় চক্রান্তকারী যাতে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকে, সেজন্য ইংরেজরা বরাবর চেষ্টা করেছে।[৭০] এসব ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে অধিকাংশই খোলাখুলিভাবে কোন পক্ষ

৬৬. Robert Orme, *History*, Vol II, Sec I, 148

৬৭. Clive to Pigot, 30 April 1757, Hill, *Bengal*, Vol II, 457, 468, Clive to Select Committee, 30 June 1757, quoted in Bayly, *Indian Society*, 50.

৬৮. Law's Memoir, S. C Hill, *Bengal*, Vol III, 190, Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 70

৬৯. Peter Marshall, *Bengal*, 91; Bayly, *Indian Society*, 50; Rajat Ray,' Colonial Penetration', 7, 11, 12

৭০. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, Law's opinion of Durlabh Ram, Law's Memoir, Hill, *Bengal*, Vol. III, 191

নিতে চায় নি, তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে দল শেষ পর্যন্ত জিতবে সেই দলে ভিড়ে যাওয়া। আমাদের এ বক্তব্যকে এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের দোষ স্খালনের প্রচেষ্টা হিসেবে ধরে নেয়া ভুল হবে। মুর্শিদাবাদ দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি অংশ তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিরূপ হয়ে একটা চক্রান্ত করেছিল, এ কথা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা যে বক্তব্যে জোর দিচ্ছি তা হলো, ইংরেজদের নেতৃত্বেই পলাশী-চক্রান্ত পূর্ণ অবয়ব পেয়েছিল এবং খুব সম্ভবত ইংরেজদের কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া এ চক্রান্ত পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে নবাবের পতন ঘটাতে পারতো না। মঁসিয়ে জাঁ ল পরিষ্কার জানাচ্ছেন ইংরেজরা কিভাবে নবাবের প্রতি বিরূপতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং বুদ্ধিমানের মতো ঠিক জায়গায় টাকা ছড়িয়ে দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাত করেছিল।[৭১]

বস্তুতপক্ষে ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে অভিযানকারী সৈন্যদলকে বাংলায় পাঠাবার সময় যে নির্দেশ দিয়েছিল (১৩ অক্টোবর ১৭৫৬) তার মধ্যেই পলাশী-চক্রান্তের বীজ নিহিত ছিল। এই নির্দেশের মধ্যেই অভিযানের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শুধু "কলকাতা পুনরুদ্ধার" এবং "যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায়" অভিযানকারী দলের উদ্দেশ্য হবে না, "বাংলার নবাবের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ বা নবাব হওয়ার মতো উচ্চাভিলাষী কোন শক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে যেন তারা গোপন আঁতাত করার চেষ্টা করে"।[৭২] শেষদিকের অংশটুকুর তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। মাদ্রাজ থেকে রওনা হওয়ার আগেই ক্লাইভ লিখেছেন, সিরাজউদ্দৌলা 'দুর্বল শাসক' এবং "তাঁর দরবারের বেশিরভাগ লোকই তাঁর প্রতি বিরূপ"।[৭৩] দরবারের মধ্যে এই যে অসন্তোষ তা নিয়েই, ক্লাইভের ভাষায়, ইংরেজরা "রাজনীতির দাবা খেলায় বাজিমাৎ" করেছিল[৭৪] এবং এভাবেই তারা ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে শেষ পর্যন্ত পলাশীতে নবাবের পতন ঘটিয়েছিল। ক্লাইভ যখন তাঁর পিতাকে লিখছেন, "বাংলায় এ অভিযান সফল হলে আমি বিরাট কিছু করতে পারবো", তখন নিশ্চয়ই ক্লাইভ একেবারে কল্পলোকে বাস করছিলেন না। ক্লাইভ এবং ওরমে দু'জনেই স্কটের বাংলা বিজয়ের বিশদ পরিকল্পনার কথা জানতেন—এসংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিটি মাদ্রাজেই ছিল। ১৭৪৯-৫০ সালের শীতকালে ক্লাইভ যখন কলকাতায় এসেছিলেন, বাংলার অগাধ ঐশ্বর্য তখন ক্লাইভের মনে যথেষ্ট দাগ কেটেছিল। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসার এক সহযোগী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাংলায় যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে ক্লাইভ রাতারাতি মহা বড়লোক হয়ে যাবেন।[৭৫] এই পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাজের উপকূল অঞ্চলের পরিস্থিতির জন্য বাংলা থেকে তাঁকে সেখানে সরিয়ে নেয়া হতে পারে বলে ক্লাইভের যে উদ্বেগ তা সহজেই বোধগম্য হয়।[৭৬]

---

৭১. ঐ, 185

৭২. *Records of Fort St. George, Diary & Consultation Books*, Military Dept 1756, Madras, 1913, 330, Orme Mss., Vol. 170, f. 99, India Office Library, London, Hill, *Bengal*, Vol I, 239-40

৭৩. Orme Mss, O V, Vol. 6, f 1500, India Office Library, London

৭৪. Clive to his father, 5 October 1756, Hill, *Bengal*, Vol I, 227

৭৫. Pour's Collection, Box 20, John Brown to Clive, 27 February 1752, quoted in Mark Bence - Jones, *Clive of India*, (London 1974), 93

৭৬. Hill, *Bengal*, Vol. I, 228

নবাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা অসন্তোষ ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত পরিমণ্ডল তৈরি করতে পারে হয়তো, কিন্তু ষড়যন্ত্র দানা বাঁধার পক্ষে শুধু সেটাই পর্যাপ্ত নয়। সেজন্য দরবারের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী সম্বন্ধে ইংরেজদের সঠিক ধারণা লাভের প্রয়োজন ছিল। অংশত সেটা নির্ণয় করার জন্যই ইংরেজরা হুগলী আক্রমণ করে (৯ জানুয়ারি, ১৭৫৭)। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের চিঠি (৩১ জানুয়ারি, ১৭৫৭) থেকে তা সুস্পষ্ট :

> নবাবের সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করা এবং বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোকজনকে আমাদের দলে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য হুগলী শহর দখল ও ধ্বংস করা এতটা জরুরি হয়ে পড়েছিল...এতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।[৭৭]

এমনকি ১৭৫৭ সালের মার্চ মাসেও ইংরেজরা যখন চন্দননগরের অবরোধ নিয়ে ব্যস্ত, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি কাশিমবাজারে উইলিয়ম ওয়াটসকে নির্দেশ দিচ্ছে "জগৎশেঠরা ইংরেজদের পক্ষ যাতে সমর্থন করে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে"।[৭৮]

কোন কোন ঐতিহাসিকের বক্তব্য[৭৯], বাংলার মসনদ দখলের জন্য বরঞ্চ এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীরাই ইংরেজদের সাহায্য চেয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের লেখা খুঁটিয়ে পড়লে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইংরেজরাই নিজেদের 'পরিকল্পিত বিপ্লব' ঘটাবার জন্য বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। ক্লাইভের বিশ্বাসভাজন জন ওয়ালস্‌কে কাশিমবাজার থেকে স্ক্র্যাফটন ৯ এপ্রিল লিখেছেন :

> ঈশ্বরের দোহাই, একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের এগোতে হবে।...ঘটনাস্রোত যদি অন্যদিকে মোড় নেয় (বিরোধের দিকে?) সেটা ভেবে এখন থেকে আমাদের ব্যবস্থা নেয়া দরকার; মিঃ ওয়াটসকে এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত ও সামান্য উৎসাহ দিলেই সে একটি দল তৈরি করতে লেগে যাবে, যেটা বিপদের সময় কাজে লাগবে। কোম্পানির অনুগত একজন নবাবকে (বাংলার মসনদে) বসাতে পারলে ব্যাপারটা কোম্পানির পক্ষে কি গৌরবজনকই না হবে![৮০]

স্ক্র্যাফটন ১৮ এপ্রিল আবার ওয়ালস্‌কে লিখেছেন, ইয়ার লতিফ খানকে নতুন নবাব হিসেবে বসাবার প্রস্তাব দিয়ে[৮১] ওয়াটসকে লেখা ২৬ এপ্রিলের চিঠিতে ক্লাইভ এ পরিকল্পনা সমর্থন করেছেন। এদিকে ২৩ এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়মের সিলেক্ট কমিটিতে সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে নবাব করার নীতি সরকারিভাবে গৃহীত হলো।[৮২] আবার ঐ একই দিনে ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে অনুরোধ করলেন স্ক্র্যাফটন যাতে মুর্শিদাবাদে থাকতে পারেন তার অনুমতি দিতে। কারণ ক্লাইভ ওখানে "স্ক্র্যাফটনের উপর

৭৭. Bengal Council to the Secret Committee, 31 January 1757, Bengal Letters Record ,Vol. 23, f. 205.
৭৮. Select Committee to William Watts, 14 March 1757, Orme Mss., India V, f, !275; Orme Mss., O V. 170, f. 397, India Office Library, London
৭৯. উদাহরণ স্বরূপ দ্র. Ghulam Husain Khan (*Sier*); Robert Orme, *History*, and recently Rajat Ray, 'Colonial Penetration'.
৮০. Scrafton to Walsh, 9 April 1757, Hill, *Bengal*, Vol. III, 343.
৮১. Scrafton to Walsh, 18 April 1757, *Ibid.*, Vol. II, 342-43
৮২. ঐ, 368

কিছু জরুরি কাজের ভার দিতে চান।"[৮৩] এ কাজটা যে "দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাজিয়ে দেখা" সেটা আন্দাজ করে সিলেক্ট কমিটি ক্লাইভের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। কমিটি ২৮ এপ্রিল প্রস্তাব দিল : "কর্নেল ক্লাইভ যেন নবাবের প্রতি দরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোভাব এবং এ নবাবকে সরিয়ে অন্য কাউকে মসনদে বসানোর পরিকল্পনায় তাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করে।"[৮৪] সুতরাং ওয়াটস ও স্ক্র্যাফটন ইংরেজদের 'পরিকল্পনায়' দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন লাভের কাজে উঠে পড়ে লেগে যান।

রবার্ট ওরমের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, "মীর জাফর নবাবের প্রতি বিরূপ হয়েছেন বলে খবর পেয়ে" ক্লাইভ ওয়াটসকে মীর জাফরের সঙ্গে "বন্ধুত্ব স্থাপন করতে" নির্দেশ দেন।[৮৫] ওরমে আরো জানান, দরবারের ক্ষোভ ও অসন্তোষ পরিমাপ করতে ওয়াটস ও স্ক্র্যাফটনই উমিচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এর পরই উমিচাঁদ নবাবের পদস্থ অমাত্যদের নিকট নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন।"[৮৬] ফলে ২৩ এপ্রিল ইয়ার লতিফ খান ওয়াটসের সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওয়াটস তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে উমিচাঁদকে নবাবের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে পাঠান। ইয়ার লতিফ উমিচাঁদের কাছে তাঁর নবাব হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন এবং জানান যে, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠরা তাঁকে সমর্থন করবেন। ওয়াটস এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন এবং ক্লাইভকে এ কথা জানালেন। ক্লাইভও সত্বর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু যুদ্ধ, নিরন্তর পরিবর্তন এবং সুযোগসন্ধানীদের স্বার্থসিদ্ধির এই যুগে মসনদের আরেকজন প্রার্থী রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। ওরমে যদিও বলছেন, মীর জাফর কলকাতার আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা পেট্রুজের মাধ্যমে তাঁর প্রস্তাব ইংরেজদের কাছে পাঠান, ওয়াটস নিজে তাঁর পিতাকে পরে লিখেন যে, তিনি "নিজেই মীর জাফরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন"; মীর জাফর "খুব আগ্রহভরে আমার প্রস্তাবে সায় দেন এবং আমাদের সহায়তায় নবাব হওয়ার বিনিময়ে যেকোন যুক্তিসঙ্গত শর্তাবলীতে স্বাক্ষর করতে রাজি হন।"[৮৭] খুব সম্ভবত ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল, শুধু ইয়ার লতিফের নামে তারা তাদের 'কঠিন কার্যোদ্ধার' করতে পারবে না। তাই তারা তাকে ছেড়ে মীর জাফরের দিকে ঝুঁকলো, কারণ মীর জাফর শুধু সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সেনাপতিই নন, তাঁর পক্ষে জগৎশেঠদেরও সমর্থন আছে। কলকাতায় সিলেক্ট কমিটিও মীর জাফরকে নতুন নবাব করার সিদ্ধান্ত নিল এবং ওয়াটসকে মীর জাফরের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেয়া হলো।

৮৩. Select Committee Consultations, 23 April 1757, Orme Mss., India V, f. 1212, Orme Mss., O. V. 170, f. 222, India Office Library, London.

৮৪. Orme Mss., India V, f. 1214.

৮৫. Robert Orme, *History*, Vol. II, Sec. I, 148.

৮৬. ঐ।

৮৭. ঐ, 149; Watts to his father, 13 August 1757, Hill, *Bengal*, Vol. II, 467.

কিন্তু পলাশী-চক্রান্তের তখনো অঙ্কুরাবস্থা। মীর জাফর এ ষড়যন্ত্রে তখন পর্যন্ত পুরোপুরি সামিল হন নি। তাই ক্লাইভ ২ মে ওয়াটসকে লিখেন মীর জাফরকে যেন আশ্বস্ত করা হয় যে, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, ইংরেজরা নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে এবং ক্লাইভ নিজে তাঁর একজন সৈন্যও জীবিত থাকতে মীর জাফরকে পরিত্যাগ করবেন না।[৮৮] এদিকে সিলেক্ট কমিটিও অস্থির হয়ে পড়ে এবং ১৭ মে স্ক্র্যাফটনকে নির্দেশ দেয় মীর জাফরের সঙ্গে একটা গোপন বৈঠক করে "আমাদের পরিকল্পনাকে কিভাবে রূপায়িত করা যায় তার একটা ছক তৈরি করতে, আমাদের দাবিগুলো যে এমন কিছু বেশি নয় তা তাঁকে ভাল করে বোঝাতে...এবং আমাদের কথার যে কোন নড়চড় হবে না এবং তাকে যে আমরা নবাব করতে বদ্ধপরিকর সে সম্বন্ধে তাকে নিশ্চিত করতে।"[৮৯] কিন্তু কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়াতে ওয়াটস প্রায় ক্ষেপে যান। মীর জাফর ৩০ মে থেকে মুর্শিদাবাদে ছিলেন, তা সত্ত্বেও ওয়াটস মীর জাফরের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন নি। অত্যন্ত বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ওয়াটস ৩ জুন লিখছেন, "এসব অস্থিরচিত্ত, মিথ্যাচারী, মেরুদণ্ডহীন বদলোকের উপর নির্ভর না করে ইংরেজরা নিজেরাই সবকিছু করতে পারতো।"[৯০] ব্যাপারটা নিয়ে লোকেরা প্রকাশ্যে বলাবলি করছে দেখে ক্লাইভও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং বর্ষা আরম্ভ হওয়ার আগেই ক্লাইভ অভিযানটি শেষ করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে ওয়াটস ৫ জুন মীর জাফরকে দিয়ে লাল ও সাদা কাগজে দু'টি চুক্তি সই করাতে সক্ষম হন: লাল কাগজের চুক্তিটি, যাতে নবাবের কোষাগারের পাঁচ শতাংশ উমিচাঁদের প্রাপ্য বলে বলা আছে, তা নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। এতে ওয়াটসনের সই ক্লাইভের জ্ঞাতসারেই জাল করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। নবাব পদে উমিচাঁদের মনোনীত প্রার্থী ইয়ার লতিফকে বাদ দেয়ার ফলে উমিচাঁদ নবাবের সম্পদের যে ভাগ চেয়েছিলেন, সেটাকে ফাঁকি দেয়ার জন্যই ক্লাইভের এই চাতুরী। অবশ্য রাজবল্লভ সাদা কাগজের চুক্তি সম্বন্ধেও আপত্তি জানালেন এই বলে যে, চুক্তির চাহিদা মেটাবার মতো টাকা নবাবের কোষাগারে নেই। তাঁকে নবাবের সম্পদের পাঁচ শতাংশ দেবার প্রতিশ্রুতিতে তাঁর আপত্তি আর রইলো না।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেও কিন্তু সিলেক্ট কমিটি তাদের 'বিপ্লবের' পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। ১১ জুন কমিটি আলোচনা করলো "তখনই কি সোজা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অভিযান করা সমুচিত হবে, না কি মীর জাফরের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে।" কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করলো যে, "মীর জাফরকে মসনদে বসাবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না।" কারণ আর দেরি করলেই সিরাজউদ্দৌলা

৮৮. Clive to Watts, 2 May 1757, Hill, *Bengal*, Vol. II, 373.

৮৯. Orme Mss., India V. f. 1228; Orme Mss , O. V. 170, f. 265

৯০. Hill, *Bengal*, Vol. II, 397.

ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি জেনে ফেলতে পারেন। তখন মীর জাফরকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দেয়া হবে এবং ফলে "আমাদের পুরো পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে"। ইংরেজদের তখন "দেশের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একাই লড়াই করতে হবে।"[৯১] কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্লাইভ ১০ জুন পলাশী অভিমুখে যাত্রা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে গোলাম হোসেন ও জ্যাঁ ল'র যে বক্তব্য অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক সহজে ও নির্বিবাদে গ্রহণ করেছেন সেটা, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ দরবারের সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নবাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁকে সরাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল—তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি দুর্লভরাম পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে কোন পক্ষে যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন না। তাদের অনেকেই ওঁৎ পেতে বসে ছিল যে দল শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে সে দলে ভিড়ে যাওয়ার জন্য।[৯২] তা ছাড়া আমরা যেসব তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করেছি তা থেকে এটাও পরিষ্কার যে, অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের চেয়ে ইংরেজরাই তাদের 'নিজেদের বিপ্লবের পরিকল্পনাকে' কার্যকর করার জন্য বেশি তৎপর হয়ে পড়েছিল এবং পলাশী-চক্রান্ত মোটেই এ দেশীয়দের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়।

রাজ্যজয়, আধা-সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যক্তিগত ব্যবসা

১৭৫০-এর দশকের শুরুতে বাংলায় বাণিজ্যে নিয়োজিত ইউরোপীয় বণিকেরা সম্পদশালী বাংলাদেশকে জয় করার বিষয় প্রকাশ্যে আলোচনা করতো। ফরাসী কোম্পানির বুসি বা ইংরেজ কোম্পানির ওরমে কিংবা ভাড়াটে ইংরেজ সৈন্য কর্নেল মিল সবাই নিশ্চিত ছিলেন যে , 'বাংলা বিজয় আসন্ন' এবং এই দেশে 'প্রভুত্ব করা' অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।[৯৩] এটা মোটেই 'দিবাস্বপ্ন' ছিল না। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী স্কটের দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, ইউরোপীয়দের অনেকেই এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো। বস্তুত কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার স্কট আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে বাংলা বিজয়ের এক বিশদ পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিলেন। তাতে এ 'গৌরবময় ঘটনায়' কোম্পানি কি পরিমাণ লাভবান হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। স্কট জোর দিয়ে বলেছিলেন, "বাংলা জয় করতে পারলে ইংরেজ জাতির প্রভূত লাভ হবে" এবং এ রাজ্যজয়ের ফলে "শুধু যে আমাদের সুনাম ও খ্যাতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে তা নয়, আমাদের বিপুল জাতীয় ঋণ শোধেরও ব্যবস্থা হবে।"[৯৪]

৯১. Select Committee Consultations, 11 June 1757, Orme Mss., India V. II. 1232-33, *Bengal*. Orme Mss., O. V. 170, ff. 256-57

৯২. Law's Memoir, Hill, *Bengal*, Vol. III, 198

৯৩. বিস্তারিত দ্র. মৎলিখিত নিবন্ধ, "Sirajauddaulah"

৯৪. Orme Mss., O. V. 12, ff. 1487-91, India Office Library, London

ক্লাইভ স্কটের বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনার খসড়া মাদ্রাজে অবশ্যই দেখেছিলেন এবং বাংলা অভিযানের পূর্বে লন্ডনে নিশ্চয়ই অর্থহীনভাবে একথা লেখেন নি যে, "আমি খুবই আশা করছি যে কলকাতা অধিকার করেই এই বিজয় অভিযান শেষ হবে না, এতে এই অঞ্চলে কোম্পানির বিষয়-সম্পত্তি ও জমিজমার আগের চেয়ে আরো সুবিধাজনক এবং স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হবো।"[৯৫]

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কলকাতা পুনরুদ্ধার ও আলিনগরের চুক্তির (৯ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭) পর ক্লাইভ তাঁর পিতাকেই শুধু তাঁর 'ভারতের গভর্নর জেনারেল' হওয়ার গোপন উচ্চাভিলাষের কথা জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপনীয়তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে বলেছিলেন।[৯৬]

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই রাজ্যবিজয় সম্বন্ধে বাংলায় কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে একটি স্পষ্ট মতলব ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। আসলে আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের শেষদিকে ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এ কারণে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থেই বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। অবশ্য এই সময় কোম্পানির বাণিজ্য ব্যক্তিগত ব্যবসার মতোই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পড়েছিল। তবে তুলনামূলকভাবে, ফরাসীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার অভাবনীয় উন্নতি হওয়ায় ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবার্ট ওরমের ১৭৫১ সালের বক্তব্যে দেখা যায়, কলকাতার ব্যক্তিগত ব্যবসায় শুল্কের পরিমাণ (consulage) ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। কলকাতার এক বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ফেনউইক ১৭৫২ সালে লিখেন, "ফরাসীরা এখন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের শীর্ষে পৌঁছেছে।" ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্রে বাংলার বন্দরে ভিড়েছে এমন বিদেশী জাহাজের যে তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে এই উক্তিগুলোর পরিসংখ্যানগত সাক্ষ্য মেলে।[৯৭] ১৭৫৪ সালে যেসব ইংরেজ জাহাজ কলকাতা বন্দরে ভিড়েছিল তাদের মোট সংখ্যা ২০; সেগুলোর মধ্যে ১২টা ছিল কোম্পানির নিজস্ব জাহাজ আর মাত্র ৮টা ছিল যারা ব্যক্তিগত ব্যবসা করতো তাদের। সেক্ষেত্রে এ বছরেই বাংলায় ফরাসী জাহাজ এসেছে ২৭টি। সেগুলোর মধ্যে ২২টিই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত, আর ৫টি মাত্র ফরাসী কোম্পানির নিজস্ব জাহাজ ছিল। আবার ১৭৫১ সালে বাংলায় আগত ইংরেজ জাহাজের মোট ভারবহনক্ষমতা ছিল ৭৪২০ টন, তার মধ্যে ৫০২০ টন ছিল ব্যক্তিগত ব্যবসায় যারা লিপ্ত তাদের। আর ১৭৫৪ সালে ফরাসী জাহাজের মোট ভারবহনক্ষমতা ছিল ১০,৪৫০

৯৫. Clive to Secret Committee, London, 11 October 1756, quoted in Michael Edward, *The Battle of Plassey*, (London 1963), 77.

৯৬. Clive to his father, 23 February 1757, Hill, *Bengal*, Vol. II, 243.

৯৭. Robert Orme to Mr. Robbins, 10 May 1751, Orme Mss., O. V. 12, f 83, Capt. Fenwick's letter, 1752, Orme Mss., India, VI, f 111vo, India Office Library, London

টন, এর মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিযুক্ত জাহাজের মোট বহনক্ষমতা ছিল ৭৪৫০ টন এবং পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে ফরাসীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের যে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল তার ফলে ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হয়।[৯৮] সুতরাং কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তিগত বাণিজ্যস্বার্থকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ফরাসীদের বিতাড়ন এবং রাজ্যজয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন ছিল। তাতে শুধু যে আন্তঃএশীয় এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থরক্ষারই উন্নতি ঘটবে তা নয়, উৎপাদনক্ষেত্রে সরবরাহ, হাট-বাজার, ব্যবসায়ী, বস্ত্রশিল্পী ও অন্যান্য কারিগরদের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণও নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ তথ্য শুধু যে পূর্বোক্ত সমীক্ষায়ই ধরা পড়েছে তা নয়, তৎকালীন কোম্পানির কর্মচারীদের বিবৃতি ও কাজকর্মের মধ্য দিয়েও তা প্রকাশ পেয়েছে। স্কটের বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা, ফ্রাঙ্কল্যান্ড ও ম্যানিংহামের ক্লাইভকে লেখা চিঠি (১ সেপ্টেম্বর ১৭৫৩), যাতে ইংরেজ বাণিজ্যের, বিশেষকরে ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্রমাবনতির কথা করুণভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোম্পানির বেচা-কেনায় দাদনি থেকে গোমস্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তন[৯৯], নবাবের প্রতি ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ও গভর্নর ড্রেকের অনমনীয় এবং মারমুখো মনোভাব—এ সবই ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায় নির্দেশক। সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ মীর জাফরের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলী কি হবে তা আলোচনার সময় রিচার্ড বেচার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা চুক্তির শর্তাবলীতে রাখতে হবে, কারণ তাঁর মতে "তারাই পুরো ব্যাপারটা (নবাবকে হটিয়ে অন্য কাউকে বসাবার পরিকল্পনা) চালু করেছিল।" এ থেকে ইংরেজদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।[১০০]

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বা বৃটিশ গভর্নমেন্ট বাংলা বিজয়ের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয় নি, তথাপি তারা এর বিরোধিতাও করে নি। সমকালীন ধীরগতির যোগাযোগব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কোম্পানির কর্মচারীরা রাজ্যজয়ের মতো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে এবং পরিচালকমণ্ডলী তা মেনে নেন। এইসব কর্মচারীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ইউরোপে ফিরে গিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাকি জীবন অতিবাহিত করা। সে লক্ষ্য অর্জনের পথে সঙ্কট বা বিপদ দেখা দিলে তারা তখন কোম্পানির স্থানীয়

৯৮. ওলন্দাজদের বাণিজ্য জাহাজের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য। ১৭৫১ সালের হিসাবের জন্য দেখুন, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (henceforth V. O. C.), earlier Koloniaal Archief (henceforth K. A.), V. O. C. 2754 (K. A. 2646), f. 227; for 1754, See V. O. C. 2829 (K. A. 2721), ff. 294-94vo, 296vo-297, Algemeen Rijksarchief, The Hague.

৯৯. দ্রষ্টব্য, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Merchants, Companies and Rulers — Bengal in the 18th Century", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. XXXI, February 1988, 82-89 for changeover from *dadni* to *gomasta* system.

১০০. Richard Becher's evidence, 1st Report, Select Committee, 1772, *Report*, iii, 145, quoted in Peter Marshall, *East Indian Fortunes*, 164.

ক্ষমতা বা শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করতো। বাংলায় ১৭৫৬-৫৭ সালে আসলে অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল।

ইউরোপীয় বাণিজ্য, সোনা-রূপার আমদানি ও পলাশী যুদ্ধ

সাম্প্রতিককালে পলাশী যুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর অভ্যুত্থানের আলোকেই এর ব্যাখ্যা করা উচিত। ঐতিহাসিক এস. সি. হিল বহু আগেই এই ইঙ্গিত করেছিলেন। অধুনা ব্রিজেন গুপ্ত এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারত-ইউরোপীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের ফলে বাংলার "হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।"[১০১] এই বিশেষ শ্রেণীই বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। অতি সম্প্রতি পিটার মার্শাল এবং সি. এ. বেইলী বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁদের মোটামুটি বক্তব্য—এ সময় ইউরোপের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ হওয়ায় এবং এ বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়ায় বাংলার ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলা থেকে ইউরোপে রপ্তানির (প্রধানত নানা রকমের কাপড়, রেশম বা সিল্ক ও সোরা) পরিমাণ হঠাৎ অনেক বেড়ে যায়। আবার ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইংরেজ কোম্পানিই ঐ শতকের তৃতীয় দশক থেকে অন্যদের পেছনে ফেলে বাংলায় সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করতে শুরু করে। বিদেশী কোম্পানিগুলো বাংলা থেকে জিনিসপত্র কেনার জন্য সোনা-রূপা আমদানি করতো। কারণ, তাদের দেশের জিনিসের তেমন চাহিদা বাংলায় ছিল না। আবার বাংলায় সোনার চাহিদা বিশেষ ছিল না বলে রূপার আমদানি হতো সবচেয়ে বেশি। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর, বিশেষকরে ইংরেজদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে হিন্দু (এবং জৈন) ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বেশ লাভবান হতে থাকে এবং তার ফলে তাদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাঁদের মতে, বাংলায় ইউরোপীয়রাই বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি সোনা-রূপা আমদানি করতো এবং এই বাণিজ্যের ফলেই বাংলার ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইউরোপীয়দের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১০২] এমনকি বেইলী এ কথা বলেছেন যে, বাংলায় "ব্যবসায়ী ও জমিদারদের স্বার্থ ইউরোপীয়দের ভাগ্যের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল" যে, কলকাতা থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর ব্যাপারটা তারা "সহ্য করতে পারছিল না" এবং সেজন্যই পলাশীর ঘটনাটি ঘটলো।[১০৩]

১০১. Brijen K. Gupta, *Sirajauddaula,* 32.

১০২. Peter Marshall, *Bengal,* 65,67; Bayly, *Indian Society,* 49.

১০৩. Bayly, ঐ, 50.

এ ধরনের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও এগুলোর ঐতিহাসিক যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। উপরোক্ত বক্তব্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হচ্ছে, যার সত্যতা নিয়ে আধুনিকতম গবেষণা গভীর সন্দেহ ব্যক্ত করছে। প্রথমত, পলাশীর প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ইউরোপের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কে. এন. চৌধুরী (১৯৭৮) এবং ওম প্রকাশ (১৯৮৫) প্রমুখের গবেষণাগ্রন্থ থেকে এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।[১০৪] এসব ঐতিহাসিকের বক্তব্যে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে সম্প্রতি শিরীন মুসভি একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত ঘটনা আসলে অন্যরকমও হতে পারে। ইউরোপীয়রাই একমাত্র সোনা-রূপা এনে বাংলায় ব্যবসা করছে এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এ মূল্যবান বস্তু আমদানি করছে এমন নাও হতে পারে।[১০৫] ইউরোপের বিভিন্ন মহাফেজখানায় সম্প্রতি যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে একটা চিত্র পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আঠারো শতকের মধ্যভাগেও অর্থাৎ প্রাক-পলাশী বাংলায় এশীয় ব্যবসায়ীদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয় বাণিজ্যের চেয়ে আরো অনেক বেশি ছিল। বাংলা থেকে প্রধান দু'টি রপ্তানিসামগ্রীর (বস্ত্র ও রেশম) ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের চেয়ে এশীয় বণিকদের যে অধিকতর ভূমিকা ছিল এটা পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করা যায়। ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে বস্ত্র রপ্তানির যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, এশীয়দের (আর্মেনীয়দের অন্তর্ভুক্ত করে) অংশ ছিল দুই-তৃতীয়াংশ, সে তুলনায় ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিয়েও ইউরোপীয় বণিকদের অংশ ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।[১০৬] ওলন্দাজ সূত্র থেকেও বস্ত্র রপ্তানিতে এশীয় ব্যবসায়ীদের প্রধান ভূমিকার কথা জানা যায়। হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৭৪২ সালে ওলন্দাজ ছাড়া এশীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা ৭৬ লক্ষ টাকা লগ্নি করেছে বস্ত্র ব্যবসায়ে। এর মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (ওলন্দাজদের বাদ দিলে অন্যান্য ইউরোপীয়দের মধ্যে এদের বস্ত্র ব্যবসাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ছিল) ২৫ থেকে ৩০ লক্ষের বেশি হতে পারে না।[১০৭] রেশম রপ্তানির ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরো সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। ১৭৪৯ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে এশীয় বণিকরা প্রতি বছর গড়ে ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশম রপ্তানি করেছে বাংলা থেকে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ১৭৫১ সালে ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশম। এটা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মোট রেশম রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশি তো বটেই, এমনকি এ সময় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মোট রপ্তানির (বস্ত্র, রেশম, সোরা

১০৪. K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company*, (Cambridge 1978); Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, 1630-1720, (Princeton 1985).

১০৫. Shireen Moosvi, "The Silver Influx, Money Supply, Prices and Revenue Extraction in Mughal India", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. XXX, 1987, 92-94

১০৬. Taylor's Report, Home Misc. Series, 456F, ff. 93-95, India Office Library, London.

১০৭. V. O. C. 2849 (K. A. 2741), 27 October 1755, ff. 188vo-189. The "Memorie" of Director Taillefert.

সব জিনিস মিলিয়ে) মূল্যের কাছাকাছি।[১০৮] সুতরাং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বাণিজ্যই বাংলায় অর্থ সমাগমের প্রধান উৎস—এ বক্তব্য মেনে নেয়া কঠিন। তেমনি কঠিন ইউরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে পলাশী যুদ্ধের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা মেনে নেয়া।

দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে তাতেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বক্তব্যটি হলো, প্রাক-পলাশী বাংলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের মুনাফার মোটা অংশই আসতো ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর, বিশেষকরে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে। ইউরোপীয় বাণিজ্যকে যদি ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কিং শ্রেণী ও জমিদারদের আয়বৃদ্ধির (এবং সেজন্য তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির) প্রধান উৎস বলে প্রমাণ করা যায়, তবেই শুধু বলা যেতে পারে যে, ইউরোপীয়দের ভাগ্যের সঙ্গে বাংলার উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমরা একটু আগেই দেখিয়েছি, প্রাক-পলাশী যুগেও বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ইউরোপীয় বাণিজ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ এবং মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এ ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কিং শ্রেণী বাংলায় ইউরোপীয় বা ইংরেজদের অবলম্বন করেই প্রতিপত্তিশালী হয়েছে—এ কথা বলা যায় না। এই শ্রেণীর সম্পদ পুঞ্জীভবনের (এবং তা থেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠার) প্রধান উৎসগুলি বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। পলাশী-চক্রান্তের এ দেশীয় তিন প্রধান হোতা তিন বণিকরাজ—জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং খোজা ওয়াজেদের মোটা মুনাফার উৎস ইউরোপীয় বা ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে কিনা সেটা দেখলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে।[১০৯] ১৭৫৭ সালে লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) মুর্শিদাবাদ থেকে জগৎশেঠদের বার্ষিক আয়ের যে হিসাব পাঠিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায়, তাদের বাৎসরিক মোট আয় ৫০ লক্ষের মধ্যে টাঁকশাল (যেটা জগৎশেঠদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল) থেকে আয়, বাট্টা এবং বাণিজ্যিক ঋণের সুদ থেকে মোট আয় খুব বেশি করে ধরলেও ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার বেশি ছিল না।[১১০] এবং আমরা একটু আগে যা বলেছি তার পর বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, টাঁকশাল বা বাট্টা থেকে যা আয়, তার সবটাই ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে সোনা-রূপা আমদানির জন্যই শুধু সম্ভব হয়। তেমনি উমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজেদের সঙ্গে ইউরোপীয় বা ইংরেজদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের আয়ের মূল উৎস ছিল সোরা, লবণ প্রভৃতির একচেটিয়া ব্যবসা। উমিচাঁদ আফিম ও শস্যের একচেটিয়া কারবারেরও চেষ্টা করেছিলেন। খোজা ওয়াজেদের নিজস্ব বেশ কয়েকটি জাহাজ ছিল, যেগুলো হুগলী বন্দর থেকে সুরাট, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য

১০৮. B. P. C , Range 1, Vol. 44, Annex to Consult. 19 June 1769.

১০৯. এদের ব্যবসায়িক তৎপরতা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Merchants, Companies and Rulers", 90-103.

১১০. Luke Scrafton to Col. Clive, 17 Dec. 1757, Orme Mss., India, XVIII, f 5043, Eur G. 23 Box 37, India Office Library, London. জগৎ শেঠের বার্ষিক আয়ের বিস্তারিত হিসাব দ্র., মৎলিখিত নিবন্ধ, "Merchants, Companies and Rulers", 96

করতো।[১১১] এসব তথ্য জানার পরে কিন্তু বাংলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কিং শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রাক-পলাশী বাংলার দ্বিধাবিভক্ত সমাজ

আগেই বলা হয়েছে, প্রাক-পলাশী বাংলার দ্বিধাবিভক্ত সমাজের তত্ত্ব দেন এস. সি. হিল। তাঁর বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য হিল সমসাময়িক দু'জন ইউরোপীয়—জাঁ ল এবং স্কট-এর মতামত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১১২] সন্দেহ নেই, এ উদ্ধৃতিগুলোতে আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিল বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। হিলকে অনুসরণ করে ব্রিজেন গুপ্ত প্রাক-পলাশী বাংলার দ্বিধাবিভক্ত রূপ তুলে ধরায় যত্নবান। তাঁরা দু'জনেই বলছেন, পলাশী যুদ্ধের আগে বাংলার সমাজ হিন্দু-মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, মুসলমান শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমান নবাবের শাসনাবসান কামনা করছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলার এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে সমাজের কোন দ্বিধাবিভক্ত চেহারা (যার ফলে ইংরেজদের বাংলা বিজয় সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত হয়) চোখে পড়ে কিনা তা দেখার আগে সমাজের এই দ্বিধাবিভক্ত চিত্র আঁকার পেছনে ইউরোপীয়দের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে কিনা তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। বস্তুতপক্ষে আঠারো শতকের মধ্যভাগে অনেক ইউরোপীয়ই বাংলা বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল এবং এ জয় অনায়াসলভ্য বলে মনে করতো। তাদের লেখা থেকেই তাদের এ মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায়।[১১৩]

সুতরাং বাংলা বিজয় যখন ইউরোপীয়দের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন সে অবাধ বিজয়ের যাথার্থ্য প্রমাণে যদি তারা বাংলার দ্বিধাবিভক্ত সমাজের চেহারা খুঁজে বের করতে চায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে মসিয়েঁ ল বা স্কটের মন্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হয় এবং সে কারণেই ওগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা দখলের পর মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে কলকাতা অভিযানে পাঠানোর সময় যে নির্দেশ দেয়া হয়, তা থেকে স্পষ্ট যে বাংলা ইংরেজদের সাম্রাজ্যলোলুপতার শিকার হবে। এ নির্দেশে বলা হয়েছিল নবাবের দরবারে বিরোধী গোষ্ঠী বা নবাব হবার জন্য উদগ্রীব এমন কারো সঙ্গে যেন সংযোগ স্থাপন করা হয়। এভাবেই ষড়যন্ত্রের বীজ ছড়িয়ে পড়লো। শাসকশ্রেণীর এক ক্ষমতালোভী দল ও ইংরেজদের মিলিত ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন সিরাজউদ্দৌলা—সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি সমাজের জন্য এটা ঘটে নি। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার

---

১১১. বিস্তারিত দেখুন, ঐ, 101.

১১২. S. C. Hill, *Three Frenchmen in Bengal*, 120; S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol I, XXIII, In.

১১৩. দ্রষ্টব্য, মৎলিখিত প্রবন্ধ, *"Sirajauddaullah, English Company and Plassey Conspiracy"*.

ইতিহাসে বিশেষ ধরনের একটি ধারা লক্ষণীয়। একজন নবাবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্কজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। নতুন নবাবের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হবার ভয়ে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। নবাবের মৃত্যুর পর এই পরিচিত ধারাই দেখা যাচ্ছে ১৭২৭, ১৭৩৯-৪০ এবং ১৭৫৬-৫৭ সালে। ১৭২৭ বা ১৭৩৯-৪০ সালের পটপরিবর্তনে যেমন দ্বিধাবিভক্ত সমাজের প্রশ্নই আসে না, ১৭৫৬-৫৭ সালের ঘটনায়ও সে প্রশ্নের অবতারণা অবান্তর।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, আলিবর্দী বা সিরাজউদ্দৌলার সময় অধিকাংশ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদার হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক মহলে প্রাক-পলাশী সমাজের দ্বিধাবিভক্ত রূপ অবাধ স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও হল্যান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় ঠিক প্রাক-পলাশী বাংলার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের দু'টি তালিকা পাওয়া যায়। রবার্ট ওরমের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, আলিবর্দীর সময় (১৭৫৪ সালে) দীউয়ান, 'তন্-দীউয়ান', 'সাব-দীউয়ান', বকশী প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলঙ্কৃত করেছে,একমাত্র মুসলমান বকশী হলেন মীর জাফর। আবার ১৯ জন বড় জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু।[১১৪] বাংলায় ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান ইয়ান কারসেবুমের (Ian Kerseboom) তালিকাতেও (১৭৫৫ সাল) নায়েব দীউয়ান রায় রায়ান উমিদ রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুদের একচ্ছত্র প্রাধান্য লক্ষ্য করি।[১১৫] ১৭৫৪-৫৫ সালের এই যে চিত্র, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় তার কোন পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুসলমান রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতেও অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্রে হিন্দুপ্রাধান্য এত বেশি ছিল যে তা দেখে রবার্ট ওরমে মন্তব্য করেন :

> তাঁর [আলিবর্দীর] রাজত্বকালে হিন্দুদের প্রাধান্যই ছিল সবচেয়ে বেশি। শাসনযন্ত্রের প্রতিটি বিভাগেই এটা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা এত যত্নের সঙ্গে সব কাজকর্ম দেখতো যে তাদের অজান্তে বা তাদের হাত ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই হতো না।[১১৬]

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় এই হিন্দুপ্রাধান্য সর্বক্ষেত্রে আরো বেড়ে যায়। তরুণ নবাবের সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসভাজন ছিলেন দু'জন হিন্দু—মোহনলাল ও মীর মদন।[১১৭] সুতরাং এসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-পলাশী বাঙালি সমাজ হিন্দু ও মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

বাংলার সমাজ যদি সত্যিই দ্বিধাবিভক্ত হতো, তা হলে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ও ফার্সি ইতিহাসে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যেতো। কিন্তু সে রকম কোন ইঙ্গিত

১১৪. Orme Mss , India, VI, ff. 1500-1502.
১১৫. V. O. C 2849 (K. A. 2791), ff 125-126
১১৬. Robert Orme, *History*, Vol. II, Sec. I, 127-128.
১১৭. Yusuf Ali Khan, *Tarikh-i-Bangala-i-Mahabatjangi*, 130-132

আমরা তৎকালীন সাহিত্য বা ইতিহাসে পাই না। সমাজের উঁচুতলায় কিছুটা টানাপড়েন নিশ্চয় থাকতে পারে, জমিদার বা শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলতেই পারে। কিন্তু সেগুলো হিন্দু-মুসলমান বিভেদমূলক চেতনা থেকে উদ্ভূত নয়—তাদের মূল শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংঘাত। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান, বিশেষকরে এই দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ বহুদিন ধরে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্যে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের যে চেষ্টা অনেক দিন ধরে চলছিল, আঠারো শতকেও তা বজায় ছিল। শুধু তাই নয়, আঠারো শতকের মাঝামাঝি এই দুই ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ সময় মুসলমানরা হিন্দু মন্দিরে পূজা দিচ্ছে আর হিন্দুরা মুসলমানদের দরগাতে সিন্নি দিচ্ছে—এটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।[১১৮] দুই ধর্ম আর সংস্কৃতির সমন্বয়প্রচেষ্টা থেকেই সত্যপীরের মতো নতুন 'দেবতা'র জন্ম, যে 'দেবতা' দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই পূজ্য।[১১৯] ভারতচন্দ্রের 'সত্যপীর' কবিতা এ মিলনপ্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১২০] এডওয়ার্ড সি. ডিমক (Edward C. Dimmock Jr.) একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, মধ্যযুগের (পনেরো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্য পড়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কোন রকম 'গভীর বিদ্বেষের' পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।[১২১] দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা ও বোঝাপড়ার চমৎকার নিদর্শন আঠারো শতকের মধ্যভাগের কবি ফৈজুল্লার 'সত্যপীর' কবিতা, যেখানে "যে রাম, সেই রহিম" এমন অভিব্যক্তি সোচ্চার।[১২২] সুতরাং বাংলা সাহিত্য থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত রূপের কোন পরিচয় মেলে না।

শাসকশ্রেণীর চক্রিদলের কাছে সিরাজউদ্দৌলা সর্বনাশের প্রতীক ?

সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পর প্রথম থেকেই এটা স্পষ্ট যে, সামরিক অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও জমিদারদের নিবিড় জোটবদ্ধতা বাংলার নবাবের পূর্ণ ক্ষমতার উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, সিরাজ তা মেনে নিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় অবশ্য দেখানো হয়েছে যে, এই জোটবদ্ধতার কোন সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না, এটা ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, যার ফলে এটা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি।[১২৩] সে যাই হোক, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়েই

১১৮. D C Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta 1911), 793

১১৯. ঐ, 396-97

১২০. ভারতচন্দ্র, "সত্যপীরের কথা", *ভারতচন্দ্র রচনাবলী*, (কলকাতা ১৯৬৩)।

১২১. Edward C Dimock, Jr, "Hinduism and Islam in Medieval Bengal", in Rachel Van M. Baumer (ed), *Aspects of Bengali History and Society*, (New Delhi 1976), 2.

১২২. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, (ঢাকা ১৯৭৭), ৪২৩।

১২৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মৎলিখিত নিবন্ধ, "Sirajauddaullah, English Company and Plassey Conspiracy"

সামরিক ও বেসামরিক উভয় শাসনব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাতে শুরু করেন।[১২৪] মোহনলাল, মীরমদন ও খাজা আবদুল হাদি খানের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ এই নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। এঁদের বিরুদ্ধে 'অপদার্থ চালিয়াত' এবং সিরাজের 'অযোগ্য দোসর' বলে যে অভিযোগ করা হয় তার খুব একটা ভিত্তি নেই। মোহনলাল যে সুদক্ষ শাসক ও যোদ্ধা এবং সিরাজের ঘনিষ্ঠ শুভার্থী ছিলেন, তার প্রমাণ পূর্ণিয়া অভিযান ও পূর্ণিয়ার শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে মোহনলালের অবদান এবং পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সিরাজের পক্ষে তার অসমসাহসিক যুদ্ধ।[১২৫] মঁসিয়ে জঁা ল অবশ্য মোহনলালকে "সবচেয়ে বড় বদমাশ" বলে অভিহিত করেছেন (সম্ভবত সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণে বাধা না দেয়ায় এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ল'কে চলে যেতে বাধ্য করায় রাগে ও হতাশায় তিনি এই মন্তব্য করেছেন, কারণ এসবের জন্য মোহনলালই দায়ী বলে তিনি ভেবেছিলেন)। তবে একই সঙ্গে মোহনলালকে তিনি "জগৎশেঠদের চরম শত্রু" এবং "জগৎশেঠদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো একমাত্র ব্যক্তি" বলে স্বীকার করেছেন।[১২৬] বীর যোদ্ধা হিসেবে মীরমদনের দক্ষতা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না এবং মঁসিয়ে ল একমাত্র তাঁর উপরই অনেকটা নির্ভর করেছিলেন। খাজা আবদুল হাদি আগেই (আলিবর্দীর রাজত্বের শেষদিকে) নবাবের সৈন্যবাহিনীতে যে 'বিরাট জালিয়াতি ও প্রবঞ্চনা' চলছিল তা প্রকাশ করেন (এ দুর্নীতির মাধ্যমে 'মুৎসুদ্দি ও জমাদারদের' সঙ্গে মীর জাফর এবং খাদিম হুসেন খানও 'প্রচুর পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ' করেন) এবং তা বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের কর্মদক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।[১২৭]

আসলে সিরাজউদ্দৌলার মতো বেপরোয়া তরুণ নবাব হওয়ায় শাসকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ চক্রিদল, যাদের মধ্যে ব্যবসায়ী, জমিদার, রাজকর্মচারী সব শ্রেণীর লোকই ছিল, তারা সবাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। আগের নবাবদের আমলে এই বিশেষ শ্রেণীই সম্পদ পুঞ্জীভবনে লিপ্ত ছিল। এখন তাদের উৎকণ্ঠা জাগে যে, সিরাজউদ্দৌলা হয়তো তাদের সম্পদ পুঞ্জীভবনের পথগুলো বন্ধ করে দেবেন। জগৎশেঠরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তাদের নিজস্ব কারণে। এর সঙ্গে একটি প্রচলিত গল্পের কোন সম্পর্কই নেই। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তাঁদের সুবিধামত এ গল্প ব্যবহার করেছেন। গল্পটি হচ্ছে : *জগৎশেঠ নবাবের আদেশে ব্যবসায়ী ও জমিদারদের*

১২৪. Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 61; Ghulam Husain Salim, *Riaz-us-Salatin*, tr. Abdus Salam, Delhi (reprint) 1975, 364, Peter Marshall, *Bengal*, 75, M. Mazibor Rahman, "Nizamat in Bengal", M Phil Thesis, J. N. U. 1988

১২৫. *Sier*, II, 186-88, 216, 218; Karam Ali, *Muzaffarnamah*, 65, 70, *Riaz*, 364, Rajat Ray 'Colonial Penetration', 7

১২৬. Law's Memoir, Hill, *Bengal*, Vol III, 190

১২৭. J N Sarkar, *Bengal Nawabs*, 127

কাছ থেকে তিন কোটি টাকা তুলে দিতে অস্বীকার করলে সিরাজউদ্দৌলা নাকি প্রকাশ্য সভায় তাঁর গালে চড় মারেন। এই গল্পের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। জগৎশেঠরা সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে নবাব করতে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়ে। তাই তারা এ গল্প প্রচার করে। কিন্তু এটা নেহাতই কল্পকথা—এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।[১২৮] জগৎশেঠরা বিপুল পরিমাণ বিষয়-সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল পূর্বতন নবাবদের প্রদত্ত টাকশাল ব্যবহার, বাট্টা ধার্য করা ও খাজনা আদায়ের একচেটিয়া অধিকার থেকে। নবাব আলিবর্দীর অনুগ্রহে উমিচাঁদ সোরা, শস্য ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা করেছিলেন। আর্মেনীয় ব্যবসায়ী খোজা ওয়াজেদের সোরা ও লবণের একচেটিয়া কারবারও ছিল দরবারের আনুকূল্যে। সুতরাং ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী, বিশেষকরে বড় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো পাছে সিরাজউদ্দৌলা তাদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করার পথগুলো বন্ধ করে দেন, একচেটিয়া ব্যবসার আনুকূল্য তুলে নেন। মীর জাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রভৃতি অভিজাত অমাত্যবর্গ এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া তাদেরও আশঙ্কা ছিল, সিরাজউদ্দৌলার মতো দুঃসাহসী তরুণ এমন কিছু করতে পারেন যাতে তাদের অনুকূলে ক্ষমতার যে ভারসাম্য তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে তাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ইয়ার লতিফ জগৎশেঠদের কাছ থেকে মাসোহারা পেতেন এবং মীর জাফর জগৎশেঠদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে রবার্ট ওরমে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে অভিজাত সামন্তদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই অভিজাত অমাত্যদের মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা নবাবের দরবারে তাদের প্রভাব বিস্তার করতো। সুতরাং এই ব্যবসায়ী ও সামন্ত শ্রেণী উভয়েই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো যে তাদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করার পথে সিরাজউদ্দৌলা মূর্তিমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেন। কারণ তরুণ বয়সের সিরাজ হিতাহিত বিবেচনা না করে সংহারমূর্তি ধারণ করতে পারেন এমন একটা উদ্বেগ তাদের মধ্যে জেগেছিল।

সৈন্যাধ্যক্ষের পদ থেকে মীর জাফরের অপসারণ, রাজা মানিকচাঁদের কারাদণ্ড এবং সর্বোপরি আলিবর্দীর একান্ত বিশ্বস্ত ও প্রভূত ক্ষমতাশালী হুকুম বেগকে দেশ থেকে বিতাড়নের মধ্যে শাসকশ্রেণীর চক্রিদল বিপদসঙ্কেত পেয়ে যায়। এসব ঘটনা এবং নতুন এক অভিজাত সামন্ত গোষ্ঠীর (মোহনলাল, মীরমদন ও রাজা আবদুল হাদি যাদের প্রতিনিধি) সঙ্গে তরুণ নবাবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রত্যক্ষ করে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন

১২৮. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, চড় মারার গল্পটি প্রচার করেছিলেন মি. ফোর্থ, সম্ভবত ওলন্দাজ ডিরেক্টর মি. বিজডাম তাঁকে এ কথা জানিয়েছিলেন। আমি ওলন্দাজদের রেকর্ডপত্রে বিজডামের লেখায় এ তথ্য পাই নি। ফার্সী বা ইউরোপীয় উৎসেও এর কোন উল্লেখ নেই। এ ঘটনা সত্য হলে অন্য কোন সমসাময়িক পর্যবেক্ষক তা উল্লেখ করতেন। ফোর্থের গল্প দেখুন, *Bengal Secret and Military Consultations, Select Committee Consultations, Proceedings*, Range A, Vol 1, 5 September 1756, ff 73-74, India Office Library, London

গোষ্ঠী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। বস্তুতপক্ষে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে আলিবর্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিশেষ বনিবনা ছিল না। তাই তাঁরা সিরাজ নবাব হওয়ার পর নতুন পরিস্থিতিতে, বিশেষকরে ক্ষমতাবিন্যাসে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। সিরাজ যে এঁদের উপর আঘাত হানতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না তার প্রমাণ আলিবর্দীর খুব ঘনিষ্ঠ হুকুম বেগকে দেশ থেকে বিতাড়ন। হুকুম বেগ আলিবর্দীর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলেন এবং কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন জোর করে ও অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের জন্য। তা ছাড়া কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসাতেও হুকুম বেগ লিপ্ত ছিলেন। ইয়ান কারসেবুমের তথ্য অনুযায়ী হুকুম বেগ ছিলেন মুর্শিদাবাদের 'ক্ষমতাশালী পাচোত্রা দারোগা'।[১২৯] এহেন শক্তিশালী হুকুম বেগকে দেশ থেকে বিতাড়ন দরবারের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। তাছাড়া মীর জাফরের অপসারণ ও মানিকচাঁদের কারাদণ্ডে নতুন নবাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এঁদের মনে সন্দেহের কোন অবকাশ রইলো না। তাঁদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো যখন মোহনলাল, মীরমদন, খাজা আবদুল হাদি খান প্রমুখ অভিজাত শ্রেণীর নতুন এক গোষ্ঠীকে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর শাসনযন্ত্রের নানা বিভাগে প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। এঁদের সঙ্গে আগের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর তফাত—এঁরা এখনো সম্পদ পুঞ্জীভবনে লিপ্ত নয়। স্বাভাবিকভাবেই রাজা দুর্লভরাম পছন্দ করতে পারেন নি যে তাঁর কাজকর্মের তদারকি করবেন মোহনলাল; মীর জাফর সহ্য করতে পারেন নি যে খাজা আবদুল হাদি খান তাঁর জায়গা নেবেন। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, খোজা ওয়াজেদ প্রমুখ বণিকরাজরা ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করার সহজ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সিরাজউদ্দৌলাকে হটানো প্রয়োজন যাতে ক্ষমতার যে ভারসাম্য তখন ছিল তা নষ্ট হয়ে না যায়, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সম্পদ পুঞ্জীভবনের সহজ পথ রুদ্ধ না হয় এবং নতুন কোন গোষ্ঠী এসে যেন শাসকশ্রেণীর চক্রিদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।

এই সব সত্ত্বেও ইংরেজদের সক্রিয় সংযোগ ছাড়া হয়তো পলাশী বিপর্যয় সম্ভব হতো না। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ায় ইংরেজদের স্বার্থও বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করায় ইংরেজ কোম্পানি ততোটা না হলেও কোম্পানির কর্মচারীরা ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়লো, পাছে নতুন নবাব তাদের দুই 'কল্পতরু—নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও দস্তকের যথেষ্ট অপব্যবহার' সমূলে বিনাশ করে বসেন। আমরা আগেই দেখেছি, সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়েই ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী কর্তৃক দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অর্থের বিনিময়ে এই দস্তকের মাধ্যমে তারা এশীয় ব্যবসায়ীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল

---

১২৯. ওলন্দাজ ডিরেক্টর ইয়ান কারসেবুম হাকিম বেগের নিম্নরূপ পরিচয় প্রদান করেছেন : "Daroga van de Pansjoutra of tholplaatsen" and "een grote favoriet van den Nawab", V. O. C. 2849 (K. A. 2741), ff 125vo-127vo.

এবং এতে রাজ্যের প্রভূত রাজস্বহানি হচ্ছিল। যদিও এই দস্তক বিক্রি করে কোম্পানির কর্মচারীরা মোটা মুনাফা লুটতো, তথাপি তাদের ত্রাসের আসল কারণ হচ্ছে সিরাজ তাদের বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ বন্ধ করে দেবেন—এই আশঙ্কা। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এ ব্যক্তিগত ব্যবসাই ছিল রাতারাতি বড়লোক হওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ এবং এটা যতো অন্যায়ই হোক না কেন, তারা এটা ছাড়তে মোটেই রাজি ছিল না। গভর্নর ড্রেক থেকে শুরু করে সব ইংরেজ কর্মচারীই এই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল এবং কেউই এর মতো লাভজনক ব্যবসা ছাড়তে চায় নি। সুতরাং ইংরেজরাও চাইছিল সিরাজউদ্দৌলাকে হটাতে। তাই শাসকশ্রেণীর চক্রিদলের সঙ্গে হাত মেলাতে ইংরেজরা এগিয়ে এল।

পলাশী যুদ্ধ

সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ক্লাইভ ১৩ জুন কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং ১৯ জুন কাটোয়া পৌঁছলেন। কর্নেল কুট তার আগের দিনই কাটোয়া দখল করে নিয়েছিলেন। ক্লাইভ কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য কিভাবে কাজে অগ্রসর হবেন মীর জাফরের কাছ থেকে তার কোন নির্দেশ তখনো না পেয়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ১৯ জুন তাই ক্লাইভ কলকাতার সিলেক্ট কমিটিকে লিখছেন, "আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে যে এগুবো তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"[১৩০] আসলে মীর জাফর 'নিরপেক্ষ থাকা' ছাড়া অন্য কোন প্রতিশ্রুতিই কিন্তু ইংরেজদের দেন নি। ক্লাইভ ২১ জুন সমরবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভা ডাকলেন ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঠিক করতে। স্থির হলো, তক্ষুণি 'কার্যকরী আর কিছু' করা হবে না। ২২ জুন অপরাহ্নে ক্লাইভ মীর জাফরের কাছ থেকে 'বহু প্রতীক্ষিত' চিঠি পেলেন এবং সে চিঠিতে মীর জাফর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ দেখালেন। চিঠি পেয়েই ক্লাইভ পলাশী অভিমুখে রওনা হলেন এবং মধ্যরাত্রির পরে সেখানে পৌঁছে গেলেন। নবাবের সৈন্যবাহিনী তার আগেই পলাশীতে তাঁবু ফেলেছিল।

২৩ জুন প্রত্যুষে নবাবের সৈন্যরা তাঁবু ছেড়ে মাঠে সুসজ্জিতভাবে ছড়িয়ে পড়লো। এদের সাজসজ্জা, আড়ম্বর এবং চারদিকে উত্তোলিত পতাকা দেখে স্ক্র্যাফটন একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যবাহিনী "ভীষণ জাঁকজমকপূর্ণ ও ভয় পাইয়ে দেবার মতো"।[১৩১] পলাশীতে নবাবের যে শিকারগৃহ ছিল তার ছাদ থেকে ক্লাইভ এই দৃশ্য দেখে একটু হতোদ্যম হয়তো হয়েছিলেন। সকাল ৮টা নাগাদ 'তথাকথিত যুদ্ধ' শুরু হলো। নবাবের সৈন্যবাহিনী যেভাবে এগোচ্ছিল তা দেখে

১৩০. Quoted in Mark Bence Jones, *Clive of India*, 135.

১৩১. Luke Scrafton, *Reflections on Government*, 85.

ক্লাইভ ইংরেজদের 'নিশ্চিত জয়' সম্বন্ধে ভরসা পেলেন না এবং 'দিনের বেলা যথাসম্ভব আক্রমণ প্রতিরোধ করে' রাতে কলকাতা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেন। এটা ঠিক, পলাশীর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সিরাজউদ্দৌলার অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ কিছু ছিল না; তাঁর পক্ষে বেশ কয়েকজন দক্ষ ও অনুগত সেনাপতি এমন অবস্থায়ও যুদ্ধ করতে ছিলেন প্রস্তুত। মীরমদন, মোহনলাল এবং আরো ক'জন সেনাপতির নেতৃত্বে নবাবের সৈন্যবাহিনী বেশ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল এবং সাঁ ফ্রের অধীনে নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী শত্রুর উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল। আধঘণ্টার মতো উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণের পর দেখা গেল, ইংরেজদের মধ্যে ১০ জন ইউরোপীয় ও ২০ জন সেপাই নিহত বা আহত হয়েছে। নবাবের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় ইংরেজ বাহিনীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল এবং সেই কারণে উক্ত হতাহতের সংখ্যা ইংরেজদের পক্ষে 'মারাত্মক আঘাত' রূপে দেখা দিল। তখন ক্লাইভ শত্রুর গোলাবর্ষণ থেকে নিস্তার লাভের জন্য তাঁর সৈন্যদের আম্রকুঞ্জে আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দিলেন। ঠিক এ ধরনের প্রতিরোধ ক্লাইভ আশা করেন নি। এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের এক প্রতিনিধি নাকি ক্লাইভকে আশ্বাস দিয়েছিল, নবাবের সব সৈন্য ও সেনাপতি নবাবের প্রতি একান্তভাবেই বিরূপ এবং কেউই নবাবের হয়ে যুদ্ধ করবে না। ক্লাইভ যুদ্ধক্ষেত্রে সেই প্রতিনিধিকে নাকি বলেছিলেন, "এখন দেখছি ঠিক তার উল্টোটাই ঘটছে।"[১৩২] জন উড নামে পলাশীতে যুদ্ধ করেছে এমন এক ইংরেজ সৈন্য লিখেছে : "সারা সকাল ধরে ইংরেজদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল" এবং "রাত্রে কিছু করা ছাড়া অন্য কিছু তারা ভাবতেই পারছিল না।"[১৩৩]

চার ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পরও জয়-পরাজয়ের কোন নিষ্পত্তি হয় নি ঠিকই, কিন্তু ইংরেজদের অবস্থা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। অন্যদিকে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি মোটেই সুপ্রসন্ন ছিলেন না এমন একজন ফরাসী সমসাময়িক ঐতিহাসিকও বলছেন, "জয় ও বরমাল্য নবাবের হাতে প্রায় এসে যাচ্ছিল"। নবাবের সৈন্যবাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ মীর জাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায় দুর্লভের অধীনে দর্শকের মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখলেও মীরমদন ও মোহনলাল ধীরে অথচ সদর্পে আম্রকুঞ্জের দিকে এগোচ্ছিলেন।[১৩৪] সময় তখন বিকেল প্রায় তিনটা। আর তখনই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটলো। নবাবের 'শক্তির প্রধান উৎস', ডান হাত বলতে যা বোঝায়, সেই মীরমদন অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হলেন। নবাবের তাঁবুতে আনার পরই তাঁর মৃত্যু হলো। এ ঘটনায় পলাশী যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। স্ক্র্যাফটন পলাশীর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং লিখেছেন : "আমাদেব সাফল্যের একটি বড় কারণ হচ্ছে,ভাগ্যক্রমে মীরমদন নিহত

১৩২. *Sier*, Vol. II, 231, Mark Bence Jones, *Clive of India*, 140, Michael Edwardes, *The Battle of Plassey*, 144

১৩৩. Holden Furber & Kristof Glamann, "Plassey A New Account from the Danish Archives", *Journal of Asian Studies*, Vol XIX, No 2, February 1960, 178.

১৩৪. Ghulam Husain Salim *Riaz-us-Salatin*, 375; *Sier*, Vol II, 231

হলেন।"[১৩৫] দিশেহারা হয়ে সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফরকে ডেকে পাঠালেন এবং নিজের মাথার মুকুট মীর জাফরের সামনে রেখে তাঁর 'জীবন ও সম্মান' রক্ষা করার আকুতি জানালেন। মীর জাফর নবাবকে পরামর্শ দিলেন ঐদিনের মতো যুদ্ধ স্থগিত রাখতে. আশ্বাস দিলেন, পরের দিন মীর জাফর নিজে যুদ্ধ শুরু করবেন। এই খবরটি সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্লাইভকে পাচার করে দেন। উদ্ভ্রান্ত নবাব রায়দুর্লভকে ডেকে পাঠালেন, রায়দুর্লভও একই পরামর্শ দিলেন। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এবং এই জটিল পরিস্থিতি আপাতত সামলানোর উদ্দেশ্যে সিরাজউদ্দৌলা মোহনলাল, খাজা আবদুল হাদি, মীর মুহম্মদ কাজিম, রাজা মানিকচাঁদ প্রমুখ সেনাপতিকে পশ্চাদপসরণ করে তাঁবুতে ফিরে আসতে আদেশ দিলেন। মীরমদনের মৃত্যুর পর মোহনলাল নবাবের সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং নবাবের সৈন্যদের ফিরে আসতে বাধা দিলেন। সেনাপতিরা কিন্তু নবাবের আদেশ প্রথমে অগ্রাহ্য করেন এই কারণে যে, ঐ সময় নিজেদের জায়গা ছেড়ে তাঁবুর দিকে ফিরতে গেলেই শত্রুপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তখন পরিস্থিতি কিছুতেই সামলানো যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাবের বারংবার অনুনয়ে তাঁরা নবাবের আদেশ মেনে নিলেন। তাঁরা তাঁবুর দিকে ফেরা মাত্রই ইংরেজরা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো. নবাবের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিকেল ৫ টার মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ শেষ। সিরাজের পরাজয় ও পরে মৃত্যুর ফলে বাংলায় ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠাব শক্ত ভিত্তি স্থাপিত হলো।

১৩৫. Luke Scrafton *Reflections on Government* 100

৪

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা : ১৭৫৭-১৭৯৩

সিরাজুল ইসলাম*

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুগল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল সুবা বাংলায় বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয় সতেরো শতকের শেষ দশকে। ধাপে ধাপে প্রসারিত হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য। ১৬৯৮ সালে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি মৌজার উপর কোম্পানির জমিদারি স্বত্ব লাভ ছিল এই আধিপত্যের প্রথম দৃশ্যমান ধাপ। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পদক্ষেপ কোম্পানিকে এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্রমশ সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলে। যেমন, ১৬৯৮ সালে কলকাতায় দুর্গ স্থাপন, পরবর্তীকালে কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উপর কোম্পানির বেনামী জমিদারি স্বত্ব প্রসার, আঠারো শতকের প্রথম থেকে এ দেশে বিপুল হারে কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধি, ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে মহা সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ফরমান লাভ, ক্রমশ কোম্পানির ব্যবসায়ে দেশীয় পুঁজির অংশগ্রহণ, ব্যাপক হারে কোম্পানি-কর্মচারীদের অবৈধভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, ব্যবসায়িক স্বার্থে ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে দেশী গোমস্তাদের আঁতাত এবং পরিশেষে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার জন্য কোম্পানি ও দেশী বানিয়া-মুৎসুদ্দিদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র। ১৬৯৮-১৭৫৬ সময়কালে কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অধিকতর বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের নিরাপত্তা বিধান করা।

কিন্তু সরাসরি রাজ্য স্থাপন করার নীতি গ্রহণ করা হয় পলাশী যুদ্ধের পর এবং সে নীতিও একদিনে গৃহীত হয় নি। বস্তুত এ দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং ধাপে ধাপে। ১৬৯৮-১৭৫৬ সময়কাল ছিল যথার্থ অর্থে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মানসিক প্রস্তুতিকাল। পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কোম্পানিকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য, কিন্তু তখনো সে রাজনৈতিক অভিলাষ সীমাবদ্ধ ছিল এ দেশে বাণিজ্যরত কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে। ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বার্থে কর্মচারীরা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর (Court of Directors) নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজ্য স্থাপনের পথে এগিয়ে যায়। সমকালীন যোগাযোগব্যবস্থার কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায় এবং পরিস্থিতির চাপে পরিশেষে পরিচালকমণ্ডলী ঐসব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে বাধ্য হয়। মনে রাখা উচিত যে, শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনই ছিল পরিচালকমণ্ডলীর লক্ষ্য। কিন্তু এ দেশে কর্মরত কোম্পানির কর্মচারীদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। মুগল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোম্পানির দ্বন্দ্বের মূল কারণ দস্তকের অপব্যবহার, অর্থাৎ সরকার যেসব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা কোম্পানিকে প্রদান করেছিল, কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বলে দাবি করলো। কিন্তু সরকার তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণেই কর্মচারীরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ব্যবসা প্রসারের প্রয়াস পায়। ১৭৫৬ সালের ষড়যন্ত্র, পলাশীর যুদ্ধ, চব্বিশ পরগনার জমিদারি লাভ (১৭৫৭), বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলার স্বত্ব লাভ (১৭৬০), মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ (১৭৬৪) এবং ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল পরিচালকমণ্ডলীর অগোচরে। পরিচালকমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৭৬৭ সাল থেকে, যখন রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা হয় কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নররূপে এবং এই প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে ১৭৯৩ সালে, যখন নবাবি ক্ষমতা ও নবাবি শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে শ্বেতাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার এই ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

মীর জাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ১৭৫৭-৬০

পলাশী বিপর্যয়ের ফলে দেশে মুগল সার্বভৌমত্বের অবসান হয়েছে বা এমনকি কোনক্রমে তা ক্ষুণ্ন হয়েছে এমন কোন আশঙ্কা সমকালীন রাজনৈতিক মহলে জাগে নি। এদের দৃষ্টিতে পলাশী ঘটনা ছিল একটি আকস্মিক ক্ষমতাবদল মাত্র, যেমনভাবে ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়েছিল নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭২৭) এবং নবাব শুজাউদ্দিন খানের মৃত্যুর (১৭৩৯) পর। এমনকি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ভাবে নি যে পলাশী যুদ্ধ জয়ের ফলে মুগল সার্বভৌমত্ব ব্যাহত হয়েছে। মনে রাখা উচিত যে, মুগল রাজনৈতিক কাঠামোতে বিদেশীদের উপস্থিতি অবিধেয় কিছু ছিল না। উল্লেখ্য যে, মুগল সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে গোলন্দাজ শাখায় ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ফরাসীরা নিযুক্ত হয়েছে এক শতাব্দী আগে থেকেই। যেমন, মারাঠা হামলা থেকে সুবা বাংলাকে

রক্ষা করার জন্য আলিবর্দী খান ইউরোপীয়দের সামরিক সাহায্য কামনা করেছিলেন।[১] সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৭৪৪ সালে আলিবর্দী খান "ত্রিশ-চল্লিশ জন বৃটিশ সামরিক অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন"।[২] কলকাতা অভিযানে (১৭৪৪) এবং পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা অনেক ইউরোপীয় গোলন্দাজ যোদ্ধা ও প্রকৌশলী নিযুক্ত করেছিলেন।[৩]

মুগল রাজনৈতিক দর্শনে অগ্রাধিকার পেয়েছে সামরিক আভিজাত্য। আনুগত্য প্রদর্শন করলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যেকোন সমরনায়ক মুগল সামরিক অভিজাত শ্রেণীর সদস্যপদ লাভ করতে পারতেন। কিন্তু অন্য কোন পেশার লোক সহজে এ সুবিধা লাভ করতে পারতেন না। মুগল আভিজাত্যের দৃষ্টিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ছিল বণিক, অতএব নিম্নশ্রেণীর। মুগল সরকার কখনো এদের সমকক্ষ গণ্য করে নি। কারণ এদের মাপকাঠিতে বীর বড়, বণিক ছোট; বীরের সঙ্গে বণিককে সমপর্যায়ে দেখা যায় না। কিন্তু বৃটিশ রয়েল অফিসার হিসেবে কর্নেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন ছিলেন সামরিক নেতা। অতএব সমকক্ষ হিসেবে তাঁদেরকে মুগল আভিজাত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁদের কোন বাধা ছিল না। হুগলী দখলকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাই ক্লাইভকে লিখেছিলেন, "আমি অবগত আছি যে আপনি একজন যোদ্ধা, সমরবীর; সুতরাং আপনার সঙ্গে সমপর্যায়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আমার কোনই আপত্তি নেই"।[৪] নবাব মীর জাফরের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ কর্নেল ক্লাইভ, কর্নেল কুট ও এডমিরাল ওয়াটসনকে সম্মানসূচক সামরিক উপাধিতে ভূষিত করেন। যেমন, ক্লাইভকে উপাধি দেয়া হয় সাবুদ জং (সমরে শক্ত), মুইনুদ্দৌলা (রাষ্ট্রের সেরা); ওয়াটসনকে দেয়া হয় দিলীর জং (সমরে সাহসী) এবং কুটকে দেয়া হয় সাইফ জং (যুদ্ধের তলোয়ার) উপাধি, ইত্যাদি। অধিকন্তু, বাদশাহ ক্লাইভকে ছয় হাজারী জাট ও পাঁচ হাজারী ঘোড়ার মনসবদার পদে অধিষ্ঠিত করেন। ক্লাইভের পর ফোর্ট উইলিয়মের সকল গভর্নর ও কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মুগল উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৫] এসবের পেছনে তাত্ত্বিক যুক্তি এই যে, মুগল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিদেশীদের অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই যদি এরা অভিজাত হয়ে থাকে এবং মুগল সরকারের প্রতি অনুগত থাকে। আর উপাধি তো আনুগত্যেরই পুরস্কার।

১. *Bengal Public Consultations*, 29 July 1742, (India Office Records, London); A.M. Khan, *The Transition in Bengal, 1756-1775*, (Cambridge 1969), 2-3.

২. A.M. Khan, *Transition*, 3.

৩. S.C. Hill, *Bengal 1756-57*, (London 1905), Vol. 1, Appendix 66.

৪. Sirajuddaula to Clive, I February 1757, *Home Miscellaneous Series*, Vol. 193,23, Cited in A.M, Khan, *Transition*, 4.

৫. মুগল সরকার কর্তৃক বৃটিশ নাগরিকদেরকে প্রদত্ত খেতাবাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, A. M. Khan, *Transition*, XII-III, 5-6. ১৭৬০ সালের পর থেকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্রচুর পরিমাণে এবং নির্বিচারে এসব খেতাব প্রদান করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওসব উপাধি প্রদান ছিল সুবা বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য সসম্মানে মেনে নেবার ছল মাত্র। যদিও কোম্পানির বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল একজন মিত্র নবাবের অধীনে ১৭১৭ সালের ফরমান মোতাবেক শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য করা[৬], তথাপি পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের বৃহদংশ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য তৎপর হয়ে উঠে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৭৫৭-১৭৬৫ সময়কালের ঘটনাপ্রবাহ এই হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ ফল।

বাংলার ইতিহাসে ইতিপূর্বে অনেকেই কণ্টকাকীর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে মীর জাফর আলী খান বোধ হয় অতুলনীয়। অদূরদর্শী মীর জাফর আলী নগরচুক্তি (১৭৫৬) করার সময় হয়তো ভেবেছিলেন যে, কোম্পানির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হলে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তিনি স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী নবাব হিসেবে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হবেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অবাস্তব। সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর তিনি নিজ বলে সগৌরবে সিংহাসনে বসতে পারেন নি। পলাশী যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর ক্লাইভ তাঁকে গদিতে বসান (২৯ জুন ১৭৫৭)। সপ্তাহব্যাপী রাজনৈতিক শূন্যতায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক লুটপাট হয়। প্রত্যক্ষদর্শী লুক স্ক্র্যাফটনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, "নবাবের হারেমের মহিলারা বিপুল পরিমাণ সোনা, হীরা-মুক্তা ও নগদ অর্থ নিয়ে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নেয়; সিপাহিরা কোষাগার ভেঙ্গে যাকিছু পায় লুট করে নিয়ে যায়।"[৭] কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির (১৫ জুলাই ১৭৫৭) শর্ত মোতাবেক সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের কারণে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ মীর জাফর আলী খান কোম্পানিকে ২২৭ লক্ষ সিক্কা টাকা পরিশোধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন।[৮] এ

৬. পলাশী ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়ার যাথার্থ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সিলেক্ট কমিটি লিখে, "...এবং একটি বিপ্লব এতো স্বাভাবিকভাবে আশা করা যাচ্ছিল যে আমাদের সাহায্য ছাড়াই (সম্ভবত সাফল্যজনকভাবে) এই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে এর ফলাফল খুব সামান্যই আমরা ভোগ করতে পারতাম। অথচ এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত মৈত্রীসংঘের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ ও আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে একে সহায়তা প্রদান দ্বারা আমরা আমাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবো, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে আমাদের কর্মচারীদের লাভবান করতে পারবো, সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ করতে পারবো, অধিকৃত হওয়ার দরুণ আমাদের কলোনিবাসীরা (কলকাতা) যে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা পূরণের দ্বারা তাদের সন্তোষ উৎপাদন করতে পারবো, দেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এবং এর মাধ্যমে আমাদের ব্যবসায়ে নজিরবিহীন বৃহত্তর সুবিধাজনক পরিস্থিতির দ্বার উন্মোচন করতে পারবো এবং সবশেষে ফরাসীদের আশা-ভরসা ধূলিসাৎ করে তাদেরকে এই অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবো।"
দেখুন, ফোর্ট উইলিয়মের সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সিক্রেট কমিটির কাছে লিখিত পত্র। লন্ডন, ১৪ জুলাই, ১৭৫৭. উদ্ধৃত, Ramsay Muir, *The Making of British India,1756-1858.* (Oxford 1916). Pakistan reprint, 49-50.

৭. Luke Scrafton, A *History of Bengal before and after Plassey (1739-1758),* (London 1763). Indian edition, Calcutta, 1975, 87-88.

৮. ঐ।

ছাড়াও কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকর্তাকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করার জন্য তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোম্পানি ও এর কর্মকাণ্ডের দায়-দেনা শোধ করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন ছিল এর ক্ষুদ্রাংশও মীর জাফর আলীর কোষাগারে ছিল না।

কঠিন আর্থিক সমস্যা ছাড়াও মীর জাফর আলী জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। বিহারের নায়েব সুবা রামনারায়ণ রায় ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার অনুগত। তিনি মীর জাফরের সিংহাসন লাভের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। অনুরূপভাবে সিরাজের অনুগত জমিদারগণ, বিশেষকরে পূর্ণিয়া ও মেদিনীপুরের জমিদারবৃন্দ মীর জাফরকে নবাবরূপে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। মীর জাফরের দীউয়ান (অর্থমন্ত্রী) এবং পলাশী চক্রান্তের অন্যতম নায়ক রায়দুর্লভ প্রায় প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করে নবাববিরোধী চক্রের হাত শক্তিশালী করেন। ওদিকে বাংলা থেকে রাজকর না পেয়ে দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলম মুর্শিদাবাদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া যায়। বাদশাহ্কে সমর্থন দেন রামনারায়ণ রায়। অন্য দিকে নিয়মিত বেতন-ভাতাদি না পেয়ে সিপাহিরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাবাতাবাই মন্তব্য করেন যে, মীর জাফর বৈরী পরিস্থিতির এমন এক অসহায় শিকারে পরিণত হন যে, এর সুযোগ গ্রহণ করে সবাই যার যার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠে।[৯]

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গদি রক্ষার জন্য মীর জাফরের পক্ষে কোম্পানির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। এদিকে মিত্র হিসেবে তাঁকে গদিনশীন রাখা ছিল কোম্পানির স্বার্থ; তবে সম্পূর্ণ আপদমুক্ত হয়ে তিনি যেন শক্তিশালী শাসকে পরিণত না হন সেটাও ছিল কোম্পানির একটি রাজনৈতিক বিবেচনার বিষয়।[১০] অতএব, আমরা দেখতে পাই, রবার্ট ক্লাইভ একদিকে যেমন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করে মীর জাফরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করছেন, তেমনি অপরদিকে মীর উপর চাপ প্রয়োগ করছেন বিদ্রোহী নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত না করার জন্য হস্তক্ষেপে তিনি রামনারায়ণ রায়, রায়দুর্লভ প্রমুখ শত্রুদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন। তাঁরা নবাবের শত্রু বটে, কিন্তু কোম্পানির বন্ধু। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোম্পানির হস্তক্ষেপ তার সঙ্গে চুক্তির নগ্ন লঙ্ঘন। তবু মীর জাফর নিরুপায়। সুবার রাজনীতিতে নাক না গলানোর জন্য কোম্পানিকে তিনি বার বার অনুরোধ জানান, কিন্তু কোম্পানি এতে কর্ণপাত করে নি।

বৃটিশদের প্রতি নতজানু নীতি সত্ত্বেও অচিরেই নবাব মীর জাফর তাদের বিরাগভাজন হন। কোম্পানিকর্তৃপক্ষ আশা পোষণ করেছিল যে, মীর জাফর ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ

৯. Ghulam Husain Khan Tabatabai, *Seir-ul-Mutakherin* by Haji Mustafa (first published 1789) Calcutta reprint 1902, Part II, 6.

১০. Luke Scrafton, *Observations on Vansittart's Narrative*, (London 1767), 2.

শোধ করবেন এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা দিয়ে বাংলায় কোম্পানির পুঁজি যোগানো ছাড়াও দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খরচ যোগানো, বাংলায় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন এবং দূরপ্রাচ্যে বাণিজ্যের পুঁজি বিনিয়োগ সবই সম্ভব হবে।[১১] ইংরেজদের সে প্রত্যাশা মীর জাফর পূরণ করতে পারেন নি। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে সরকারের রাজস্ব-আয় এমন হ্রাস পায় যে, মীর জাফরের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেয়া দূরে থাক, সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতাদি দেয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মীর জাফর যেহেতু ক্ষতিপূরণ দিতে অপারগ, সেহেতু কোম্পানি মনে করে, ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারের উচিত কোম্পানিকে কতিপয় জেলা স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেয়া। গভর্নর ভান্সিটার্টের ভাষায় :

> বাংলার আয় থেকে ফোর্ট সেন্ট জর্জ অর্থাৎ মাদ্রাজের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো দূরে থাক, অর্থের অভাবে খোদ বাংলায়ই আমাদের 'ইনভেস্টমেন্ট' প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই নাজুক হয়ে পড়েছে যে, ফোর্ট উইলিয়মের অত্যাবশ্যক খরচ মেটানো এবং সৈন্যদের বেতন দেয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। এহেন অবস্থা রোধ করতে হলে অনতিবিলম্বে অধিক পরিমাণ এবং অধিকতর নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটা একমাত্র সম্ভব যদি নবাব স্থায়ীভাবে রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দেন।[১২]

প্রাক-পলাশী যুগে যখন কোম্পানির কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না এবং যখন কোম্পানি বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা করতো, তখন কোম্পানি বিপুল মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পলাশীর পর সুযোগ-সুবিধা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি ক্রমাগত লোকসানের ফলে প্রায় দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়। এর কারণ কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি ও অব্যবসায়ী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে মেতে উঠে এবং ঐ ব্যক্তিগত ব্যবসার নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর মতো অব্যবসায়ী খাতে খরচ বাড়িয়ে চলে। স্বভাবতই কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ছিল সমালোচনামুখর। কিন্তু কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ এদের পক্ষে এমনভাবে জনমত সৃষ্টি করে যে, ডিরেক্টরদের পক্ষে তা নীরবে অনুমোদন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। কোম্পানির অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে রাজ্যের কিছু ভূমি দখল করার পরিকল্পনা আসলে দুর্নীতিবাজ ও উচ্চাভিলাষী ফোর্ট উইলিয়ম কর্মকর্তাদের ধাপে ধাপে রাজ্য স্থাপনের বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ। পূর্বে তারা কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, সিরাজউদ্দৌলার বদলে একজন মিত্র

১১. P.J. Marshall, *The New Cambridge History of India*, II· 2; *Bengal:The British Bridgehead*, (Cambridge 1987), 84-85.

১২. *Fort William—India House Correspondence*, Vol III, 1760-63. ed. R.R. Sethi, (Delhi 1968), 290

১৩. Henry Vansittart, *A Narrative of the Transactions in Bengal from 1760 to 1764*, (London 1766) Vol.1, 64-65.

নবাবকে ক্ষমতাসীন করতে পারলে বাংলায় কোম্পানি-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। এবার এরা পরিচালকমণ্ডলীর কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, নবাবের রাজ্যের কিয়দংশ দখল করলে কোম্পানির আর কোন আর্থিক অসুবিধা থাকবে না।

ভূমি দখল নবাবের সঙ্গে কোম্পানির সকল চুক্তি এবং মিত্রতার পরিপন্থী। ভূমি দখলের মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ বণিকের অবস্থান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে তৎপর হয়। কোম্পানির এহেন রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল মুগল সার্বভৌমত্বের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। মীর জাফর সে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার জন্য তাঁর সাধ্যমত প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে আরো সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী করার সঙ্কল্প নেন এবং একই সময়ে ইংরেজদের আধিপত্যে ঈর্ষান্বিত ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১৩]

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের কাছে তাঁর অভিসন্ধি গোপন থাকে নি। মুর্শিদাবাদের ঐ ষড়যন্ত্রমূলক পরিবেশে কিছুই গোপন থাকার কথা নয়। কাউন্সিল মনে করে যে, ইংরেজদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে মীর জাফরকে অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন।[১৪] তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, চুক্তি মোতাবেক ১৭৫৭ থেকে তিন বছরের মধ্যে কোম্পানির সকল দেনা শোধ করার শর্ত তিনি লঙ্ঘন করেছেন। গভর্নর ভান্সিটার্ট দাবি জানান যে, মীর জাফর যেহেতু কোম্পানিকে প্রদেয় দেনা শোধ করতে অপারগ, সেহেতু ২৪ পরগনা ছাড়া আরো তিনটি জেলা (বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম) দেনা পরিশোধ বাবদ কোম্পানিকে হস্তান্তর করা হোক। ভান্সিটার্ট হুমকি দেন যে, প্রস্তাবিত জেলাগুলি হস্তান্তর না করলে নবাবের প্রতি কোম্পানির সমর্থন প্রত্যাহার করা হবে।[১৫] নবাব মীর জাফর তিনটি জেলা হস্তান্তর করার প্রস্তাবকে তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত কোম্পানির মৈত্রীচুক্তির নগ্ন লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের এক পর্যায়ে কোম্পানি মীর জাফরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমের সঙ্গে আঁতাত করে আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করে (২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৬০)। চুক্তি অনুসারে সিংহাসনের বদলে মীর কাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটি বিস্তীর্ণ জেলা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে রাজি হন। কোম্পানি তিনটি জেলার বিনিময়ে নবাবের কাছে সকল পাওনা পরিশোধিত হয়েছে বলে ঘোষণা করে।[১৬]

নবাব মীর কাশিম (১৭৬০-১৭৬৩)

সার্বভৌমত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা

২০ অক্টোবর ১৭৬০ মীর কাশিম নবাব বলে ঘোষিত হন। ইংরেজদের সাহায্যে মীর জাফর যেমন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করেন, তেমনি মীর কাশিমও ইংরেজদের

১৪. বিস্তারিত দ্র., Atul Chandra Roy , *The Career of Mir Jafar Khan 1757-1765*, (Calcutta 1953).

১৫. A. M. Khan, *Transition*, 32-33

১৬. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, (ঢাকা ১৯৮৪), অধ্যায়-২।

হাত ধরে নবাব হন। পার্থক্য এই যে, সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ করে পরাস্ত হন, আর মীর জাফর সিংহাসন ত্যাগ করেন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়া নিষ্ফল প্রচেষ্টা হবে—এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তিনি নীরবে গদি ছেড়ে দেন। ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশিমের আঁতাত অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। ক্ষমতালাভের জন্য ষড়যন্ত্র ও ঝুঁকিপূর্ণ আঁতাত মুগল সামরিক আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের একটি বৈশিষ্ট্য।[১৭] মীর কাশিমের উত্থান এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে ঝুঁকির দিক থেকে পূর্বেকার সকল আঁতাতকে ছাড়িয়ে যায় কোম্পানির সঙ্গে মীর কাশিমের চুক্তি। এর ফলে তাঁর নিজের জীবনই শুধু বিনষ্ট হয় নি, এ দেশে মুগল রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়। তবে কেন তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ? কোম্পানির শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন কয়েকটি অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়ে। যেমন, তিনি মনে করেন যে, কলকাতায় বৃটিশ বসতিকে কেন্দ্র করে হুগলী-ভাগীরথী অববাহিকায় কোম্পানি ১৬৯০ সাল থেকে বিগত পঞ্চাশ বছরে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে তা এতই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী যে, এই প্রভাববলয়ের ভিতর কোন শাসকের পক্ষেই সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় তিনি মনে করেন যে, অন্তত কিছুকাল গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে কোম্পানির তৎপরতা রাজনৈতিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে গঙ্গার উজানে এদের প্রভাববিস্তার রোধ করে সেখানে নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে পরে ধীরে ধীরে নিম্নাঞ্চলে কোম্পানিকে নবাবের কর্তৃত্বাধীনে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

মীর কাশিমের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে সুদূর মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে ইংরেজদের প্রভাববলয়কে অকার্যকর করে দেয়া, নতুন রাজধানীতে কোন ইংরেজ বা ইংরেজ প্রতিনিধিকে বসবাসের অনুমতি না দেয়া, ইংরেজদের সঙ্গে ভবিষ্যতে মোকাবেলার জন্য সরকারের অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং সেনাবাহিনীকে আধুনিক করা। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে আরো ছিল প্রশাসন থেকে সকল নবাববিরোধী ও বৃটিশপন্থী কর্মচারীদের বরখাস্ত করে একটি দক্ষ ও অনুগত আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এক কথায়, কৌশলগতভাবে একটি সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিয়ে একটি পেশাদার সেনাবাহিনী ও দক্ষ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে সমৃদ্ধ করে অচিরেই ইংরেজদের কবল থেকে সুবা পুনরুদ্ধার—এই ছিল মীর কাশিমের স্বপ্ন।

মীর কাশিম তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথমেই রাজধানী সরিয়ে নেন মুঙ্গেরে। মুঙ্গেরে গমনের জন্য তিনি নির্দেশ দেন শুধু সেসব আমলা, আমির ও অমাত্যদের, যাঁরা

১৭. মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর (১৭২৭) পর থেকে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। তাঁর মনোনীত সরফরাজ খান উৎখাত হন শুজাউদ্দিন খান (১৭২৮-৩৯) কর্তৃক, শুজাউদ্দিনের মনোনীত সরফরাজ খান পুনরায় আলিবর্দী খান (১৭৪০-৫৬) কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। আলিবর্দীর মনোনীত উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফর কর্তৃক সৃষ্ট সেই একই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। ১৭৬০ সালে এই মীর জাফরই আবার ক্ষমতাচ্যুত হন মীর কাশিমের দ্বারা।

ছিলেন তাঁর প্রতি অনুগত এবং ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন। মুঙ্গেরে যেন কোন বৃটিশ বা বৃটিশ প্রতিনিধি অবস্থান না নিতে পারে সেজন্য তিনি কোম্পানির প্রতিনিধিকে (Resident) মুর্শিদাবাদে থাকতে নির্দেশ দেন। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তিনি দরবারের সকল অপ্রয়োজনীয় কর্মচারী ছাঁটাই করেন ও যেসব উচ্চ আমলা-মুৎসুদ্দির আনুগত্য সন্দেহাতীত নয় তাদের বরখাস্ত করেন। তিনি সরকারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ ভুয়া লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করেন এবং নতুন জরিপের মাধ্যমে বর্ধিত হারে জমিদারদের রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। নতুন অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে নবাব মীর কাশিম সকল দেনা শোধ করতে এবং সেনাবাহিনীর সকল বকেয়া বেতন-ভাতাদি শোধ করতে সক্ষম হন। আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে তিনি একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য অবৃটিশ ইউরোপীয় সেনাপ্রশিক্ষক নিয়োগ করেন।[১৮]

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করা, আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নবাব মীর কাশিমের অসাধারণ যোগ্যতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় মেলে। কিন্তু সাফল্যের জন্য যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি নয়। ইতিহাসের যেসব রাষ্ট্রনায়ক যোগ্যতা ও আকর্ষণীয় নেতৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে পরাভূত হয়েছেন, মীর কাশিম তাঁদের অন্যতম। প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আমূল সংস্কার আনয়নের নীতি গ্রহণ করেন। মীর কাশিমের সংস্কারনীতির অন্যতম দিক ছিল কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের দেশী গোমস্তাদের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা। বাদশাহি ফরমান অনুযায়ী কোম্পানি-কর্মচারীদের নয়, শুধু কোম্পানিরই বিনা শুল্কে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদানের অধিকার ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে বাণিজ্য শুরু করে। এমনকি কোম্পানির গোমস্তারাও অবাধে এই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। এর ফলে দেশী ব্যবসায়ীরা এদের কাছে মার খায় এবং স্বাভাবিক কারণেই শুল্ক বাবদ সরকারের আয় প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এদের অত্যাচার মীর জাফর নীরবে সহ্য করেন, কারণ তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্তা ছিল কোম্পানির কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু সে দায়বদ্ধতা থেকে মীর কাশিম ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রশাসন ছিল তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, যা মীর জাফরের ছিল না। অতএব কোম্পানির কর্মচারী এবং দেশী গোমস্তাদের বেআইনী ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। চুক্তি ও দেশের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য মীর কাশিম কোম্পানিকে আহ্বান জানান এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজে কোম্পানির সঙ্গে সকল চুক্তি আক্ষরিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত, তবে স্বাভাবিকভাবেই অনুরূপ নীতি তিনি কোম্পানির কাছেও প্রত্যাশা করেন।

১৮. Vansittart, *Narrative*, Vol. III, 381.

কিন্তু সমস্যার মূল কারণ ছিল কোম্পানি-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা। সুবার আইন অনুসারে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে লিপ্ত দেশী-বিদেশী সবাইকে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক দিতে হতো। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা দাবি তোলে যে, কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে তাদেরও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার নবাবের নেই। এক কথায়, নবাব মীর কাশিম কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার উপর আইনানুগ শুল্ক আরোপ করতে বদ্ধপরিকর। অপরদিকে, কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকার আদায়ের দাবিতে অটল। এর অনিবার্য ফল কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে যুদ্ধ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে এ দেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষ কোম্পানির পরিচালকদের ছিল না। এই অভিলাষ একান্তই ব্যবসায়ে লিপ্ত কোম্পানি-কর্মচারীদের। বলাবাহুল্য, এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। নবাবের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করে আইনানুগভাবে বাণিজ্য করার পক্ষে যাঁরা মত পোষণ করেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন অতি নগণ্য। গভর্নর ভান্সিটার্ট ছিলেন এঁদের মধ্যে একজন। তবে কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণই প্রতিনিধিত্ব করতেন কোম্পানি-কর্মচারীদের স্বার্থের। নবাবের সঙ্গে বিবাদের কারণ ব্যাখ্যায় তিনি মন্তব্য করেন :

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি নবাবের (মীর কাশিম) অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি এবং তাঁর সরকারকে নানাভাবে হয়রানি না করি, তাহলে তিনিও আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না। --- এমন কোন দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে না যে, নবাব আমাদের বৈধ ব্যবসায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের কর্মচারী ও গোমস্তারা আইন লঙ্ঘন করছেন। এদের অন্যায় ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চুক্তিবহির্ভূত অযৌক্তিক দাবিদাওয়াই নবাবকে বিবাদে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। [১৯]

কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের বেআইনী ব্যবসা ও সরকারকে তোয়াক্কা না করার প্রবণতার বিষয় উল্লেখ করে মীর কাশিম বারবার কোম্পানি-কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হয় নি। অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত কর্মচারীরা দলে ভারী। অতএব এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উপায় ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের ছিল না।[২০] ফলে নবাবের শুল্ক-আমলাদের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব প্রায়শই সশস্ত্র সংঘাতের রূপ নেয়। এদিকে শুল্ক প্রদান করে দেশী বণিকরা কোম্পানির বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুলাতে না পেরে ব্যবসা থেকে বিদায় নিচ্ছে। দেশ ও সরকারের অর্থনীতির উপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অবশেষে মীর কাশিম পরোয়ানা জারি করে সকলের জন্য শুল্কপ্রথা রহিত করেন।

১৯. Ramsay Muir, *British India,* 74-75, Document no, 22

২০. ঐ, 73.

২১. ঐ, 73.

২২. Letter of Major Carnact, 26 February 1773, cited in John Malcolm, *The Life of Lord Clive*, Vol II (London 1830), 282-83.

কিন্তু নবাবের এই পরোয়ানাকে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের জঙ্গি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোম্পানির প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করে এবং এই পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য মীর কাশিমের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি নবাবকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হুঁশিয়ারি দেয়া হয় যে, "তিনি দিল্লীর বাদশাহের অনুমতি ব্যতিরেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।"[২১] বিদেশীরা বিনা শুল্কে দেশে বাণিজ্য করবে আর একই বাণিজ্যে দেশী বণিকরা শুল্ক দিতে বাধ্য হবে, তাও আবার বিদেশীদের চাপের মুখে—এহেন পরিস্থিতি কোন সার্বভৌম শাসক মেনে নিতে পারেন না। তাই নবাবের অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করলে এর প্রতিফল সম্পর্কে মীর কাশিম কোম্পানিকে হুঁশিয়ার করে দেন। রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তর, নতুন রাজধানীতে কোন ইংরেজ প্রতিনিধিকে বসবাস করতে না দেয়া, মুঙ্গের দুর্গে ইংরেজ পলাতকদের আশ্রয়দান, উন্নয়নমূলক সংস্কার নীতি, বৃটিশবিরোধী শক্তিসমূহের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন এবং শুল্ক বিলোপ করে প্রতিযোগিতায় দেশী বণিকদেরকে বৃটিশদের সমপর্যায়ে আনা প্রভৃতি পদক্ষেপকে কোম্পানি প্রত্যক্ষ বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপ বলে গণ্য করে। কলকাতা কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "মীর কাশিমকে আর অগ্রসর হতে দেয়া যায় না; তাঁর কার্যকলাপ ও স্বাধীনতা কোম্পানির জন্য বিপজ্জনক।"[২২]

১৭৬০ থেকে ১৭৬২ সাল পর্যন্ত ছোটখাটো অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের জের হিসেবে মীর কাশিম অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে কোম্পানির পাটনা কুঠি আক্রমণ করে তাঁর পরম শত্রু কুঠিয়াল এ্যালিসকে হত্যা করেন।[২৩] এই ঘটনা থেকেই শুরু হয় কোম্পানির সঙ্গে মীর কাশিমের যুদ্ধ (জুলাই ১৭৬৩)। নবাব মীর কাশিম হয়তো ভেবেছিলেন যে, তাঁর নবগঠিত ও অধিকতর সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী নগণ্য সংখ্যক ইংরেজ বাহিনীকে সাফল্যজনকভাবে মোকাবেলা করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে তাঁর বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করলো। মীর কাশিমও মুঙ্গের ছেড়ে আশ্রয় নেন অযোধ্যায়। ইংরেজদের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করে পূর্ণ মুগল সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিল্লীর বাদশাহ, অযোধ্যার নবাব এবং মীর কাশিম যৌথভাবে এক অভিযান চালালেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে। বক্সারের প্রান্তরে এ সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় কোম্পানির বাহিনীর কাছে (২৩ অক্টোবর ১৭৬৪)। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হলো যে, সংখ্যায় অল্প হলেও শ্রেষ্ঠ রণকৌশল ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্রের অধিকারী ইংরেজকে সেকেলে সমরকায়দায় হারানো সম্ভব ছিল না।

ইঙ্গ-মুগল যৌথশাসন, ১৭৬৫-১৭৭২

বক্সারের যুদ্ধে সম্মিলিত মুগল বাহিনী পরাজিত হলেও তা ইংরেজ মহলে দারুণ সংশয়ের সৃষ্টি করে। আগে এরা মুগল সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ভান করে

২৩. Malcolm, *Clive*, Vol.II, 340.

প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে নি, কিন্তু বক্সার যুদ্ধের পর এই ছলের আশ্রয় নেয়া আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরপর কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের কাছে বিকল্প ছিল দুটি : হয় বৃটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা, নয় যুদ্ধাবস্থা ও নৈরাজ্য পরিহার করার জন্য মুগল সরকারকে মেনে নেয়া। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল এমন যে, এই দুই বিকল্প পন্থার কোনটাই তারা পুরোপুরি গ্রহণ করতে ছিল অপারগ। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল পরিচালকমণ্ডলীর বিঘোষিত নীতির পরিপন্থী। তা ছাড়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় বণিকশক্তি ও দেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সামরিক সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী, যা বাণিজ্যিক দিক থেকে ছিল মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অনুরূপ মারাত্মক অবস্থা ছিল দেশকে সরকারহীনতায় ঠেলে দেয়া। সেক্ষেত্রে কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড অবশ্যই ব্যাহত হতো।

এমতাবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলো। সেটি হচ্ছে তাত্ত্বিকভাবে মুগল সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা। এরই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এলাহাবাদ দীউয়ানি চুক্তি (১২ আগস্ট ১৭৬৫)। এই চুক্তির নায়ক রবার্ট ক্লাইভ দিল্লীতে গমন করে প্রচুর নজরানা ও পেশকাশ দিয়ে এবং ভবিষ্যতে বিপুল রাজস্ব আয়ের লোভ দেখিয়ে বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুসারে বাদশাহ ফরমান জারি করেন :

> পরম পরাক্রমশালী যোদ্ধা এবং সরকারের অনুগত ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আলতামগা বা চিরস্থায়ী দান হিসেবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি মঞ্জুর করা হলো। শর্ত এই যে, বাদশাহি রাজস্ব হিসেবে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা পরিশোধে কোম্পানি জামিন থাকবে। সুবার রাজস্বতহবিল থেকে নবাবের নিজামত খরচ বাবদ যা প্রয়োজন তা নবাবকে প্রদান করে সংগৃহীত রাজস্বের বাদবাকি কোম্পানি এর সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইচ্ছামাফিক ব্যয় করতে পারবে।[২৪]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুগল সরকারের অধীনে দেশী-বিদেশী সবাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব লাভ করতে পারতো। শর্ত ছিল শুধু সামরিক আভিজাত্য ও আনুগত্য। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি "প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা ও সরকার-অনুগত", অতএব মুগল সরকারকাঠামোতে তাদেরকে মেনে নিতে কোন আইনগত বাধা নেই। কোম্পানি লাভ করলো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দীউয়ানি শাসনের দায়িত্ব। মুগল শাসনতন্ত্র মতে দীউয়ান পদটি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক নয়। অতএব, এলাহাবাদ চুক্তি অনুসারে কোম্পানি মুগল সরকারের অধীনে দীউয়ান মাত্র, কোন রাজনৈতিক শক্তি নয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ সবই ছিল ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি রবার্ট ক্লাইভের সুচতুর কূটকৌশল। আসলে দীউয়ানির মোড়কে তিনি সংগোপনে লুকিয়েছেন সুবা বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য।[২৫]

২৪. East India Company's Treaty with Mir Zafar, 10 July 1763, cited in W.K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the "Fifth Report"*, (Calcutta 1917), 20.

২৫. Ramsay Muir, *British India*, 84-85.

এলাহাবাদ চুক্তির অংশরূপে মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উল্লেখ্য যে, মীর কাশিম কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মীর জাফরকে পুনরায় মুর্শিদাবাদের মসনদে বসানো হয়। এলাহাবাদ চুক্তির অংশ হিসেবে মীর জাফরের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (সেপ্টেম্বর ৩০ ১৭৬৫)। এই চুক্তি অনুসারে দীউয়ান হিসেবে কোম্পানি সুবা বাংলার রাজস্ব থেকে নবাবকে বার্ষিক ৫৩,৮৬,১৩১ সিক্কা টাকা প্রদান করবে।[২৬] সংক্ষেপে, কোম্পানি সুবা বাংলা থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করবে সে রাজস্বের হিস্যা হিসেবে সম্রাট পাবেন বার্ষিক ২৬ লক্ষ সিক্কা টাকা, নবাব তাঁর নিজামত শাসন পরিচালনা বাবদ পাবেন ৫৩,৮৬,১৩১ সিক্কা টাকা আর বাদবাকি ভোগ করবে কোম্পানি।

এলাহাবাদ এবং মুর্শিদাবাদ চুক্তির শর্তগুলি আক্ষরিকভাবে দেখলে মনে হবে, সুবা বাংলার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব বোধহয় সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মুর্শিদকুলী খানকে দীউয়ান হিসেবে নিযুক্তির (১৭০৪) পর এবারই বাদশাহ দিল্লী দরবার থেকে সরাসরি দীউয়ান নিযুক্ত করতে সক্ষম হন। যদিও সুবাদার ও দীউয়ান সরাসরি নিযুক্ত হতেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের পর বাদশাহ কখনো আর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন নি। এক্ষণে তিনি 'অনুগত' কোম্পানিকে সুবা বাংলার দীউয়ান নিযুক্ত করতে সক্ষম হন। সুবাদার ও দীউয়ান সরাসরি নিযুক্ত করা এবং নিয়মিত প্রদেশ থেকে রাজস্ব লাভের ওয়াদা লাভ করার মাধ্যমে বাদশাহ মনে করলেন, সুবা বাংলার উপর দিল্লীর বাদশাহের পূর্বকর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো আর তিনি কোম্পানিকে গণ্য করলেন তাঁর মনোনীত মুৎসুদ্দি বলে।[২৭] সমকালীন বিশ্বের বৃহত্তম নৌ-শক্তি বৃটেনের বৃহত্তম একচেটিয়া চার্টার প্রতিষ্ঠান ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে তার ছিল অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্ব। সেই মহা একচেটিয়া বাণিজ্যিক কোম্পানিকে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম প্রাদেশিক দীউয়ান নিযুক্ত করে একে 'অনুগত' বাদশাহী মুৎসুদ্দি গণ্য করলেন—এর মধ্যেই পরিচয় মেলে শাহ আলমের অদূরদর্শিতা, অবিমৃষ্যকারিতা ও ইংরেজের কার্যকলাপ ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর সীমাহীন অজ্ঞতার। বাস্তব সত্য এই যে, কোম্পানি দীউয়ানি চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি না নিয়ে কায়েম করলো নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য, যা বাস্তবে সার্বভৌমত্বের সামিল। কোম্পানি এখন দেশের শাসনকর্তা না হলেও দেশ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বটে। মুগলদের মতো ইংরেজরাও এখন শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে সমভিত্তিতে মুগলদের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করার নীতি কোম্পানি বেশিদিন অনুসরণ করে নি। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্তই ছিল এর সময়কাল। এ সময়ে নবাব ও ইংরেজ উভয়ের প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন করেন সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান।

২৬. *ঐ*, 45
২৭. A M Khan *Transition*, 2-5

দীউয়ানি লাভ করলেও নানা কারণে ক্লাইভ সরাসরি দীউয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব শাসন পরিচালনা করতে ছিলেন অনিচ্ছুক। প্রথমত দীউয়ানি লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়ভাবে কোম্পানির জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা। এ দেশের রপ্তানিপণ্য ক্রয় করার জন্য কোম্পানিকে ইউরোপ থেকে রূপা আমদানি করতে হতো, কারণ বাংলাদেশ তখন আমদানির চেয়ে রপ্তানি করতো বেশি। এ দেশে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার ছিল না বিধায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ইউরোপীয়রা রজত আমদানি করতো। কিন্তু বেনেবাদ (mercantilism) যুগে রজত রপ্তানি ছিল সম্পদ পাচারের সামিল। অতএব দেশ থেকে মূল্যবান ধাতব আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে পুঁজি সংগ্রহ করা ছিল দীউয়ানি লাভের অন্যতম লক্ষ্য। দেশ শাসনের অভিলাষ ছিল এখানে নিতান্তই গৌণ। অতএব দীউয়ানি শাসন পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হলো সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে। তিনি নিযুক্ত হলেন নায়েব দীউয়ান। তাছাড়া তিনি নাবালক নবাব নাজমউদ্দৌলার অভিভাবকও নিযুক্ত হলেন। অর্থাৎ রেজা খান হলেন একাধারে নায়েব নাজিম ও নায়েব দীউয়ান। নবাবের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নায়েব নাজিম বা নিজামত শাসনকর্তা, এবং কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি দীউয়ানি শাসনকর্তা।

রেজা খানের প্রতি ছিল কোম্পানির অকুণ্ঠ সমর্থন। পূর্ণ মর্যাদায় রেজা খান যেন দীউয়ানি ও নিজামত শাসন পরিচালনা করতে পারেন সেজন্য ক্লাইভ বাদশাহের কাছ থেকে তাঁর জন্য একাধিক রাজকীয় উপাধি আদায় করেন, যেমন বাহাদুর (সাহসী), মুজাফফর জং (সমরবিজয়ী), মুঈন-উদ-দৌলা (রাজ্যের সেরা), মুবারিজ-উল-মুলক (রাজ্যের প্রথম), ইত্যাদি। ক্লাইভের সমর্থনে রেজা খান এমন দক্ষতা ও দাপটের সাথে দীউয়ানি শাসন পরিচালনা করেন যে, দেশবাসীর দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক।

কোম্পানির মনোনীত এজেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান কখনো কোম্পানির অন্ধ তাবেদার হিসেবে কাজ করেন নি। রাষ্ট্রকাঠামোতে তাঁর অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। কোম্পানিকে তিনি দেখেছেন বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ দীউয়ান হিসেবে। নায়েব নাজিম হিসেবে তাঁর অধিকার তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। মুগল শাসনব্যবস্থায় নবাবের পরেই দীউয়ানের স্থান। অতএব, নায়েব নাজিম হিসেবে তিনি কোম্পানির চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদার অধিকারী; অপরদিকে নায়েব দীউয়ান হিসেবে তিনি কোম্পানিরও প্রতিনিধি। উভয় ভূমিকায় তিনি এমন সুনিপুণ ও সুদক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন যেন মুগল ব্যবস্থা সমুন্নত থাকে।

রাষ্ট্রচিন্তায় রেজা খান পলাশীপূর্ব যুগের মুগল শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ সরকারব্যবস্থা বলে গণ্য করেন এবং সরকার পরিচালনায় যথাসম্ভব ঐ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। রবার্ট ক্লাইভেরও কৌশল ছিল পূর্বব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আবার সচল করা এবং মুনাফার সাথে ব্যবসা করা। সুতরাং মুগল শাসনব্যবস্থা

পলাশীপূর্ব যুগের দক্ষতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় রেজা খান ক্লাইভের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। রেজা খানের কাছে ক্লাইভের প্রত্যাশা ছিল শুধু এই যে, তিনি যেন কোম্পানির জন্য দীউয়ানিকে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেন। এই প্রত্যাশা পূরণে রেজা খানও ছিলেন আস্থাশীল, কারণ তিনি মনে করেন যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসলে এবং আগের মতো দক্ষতার সাথে সরকার পরিচালনা করতে পারলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে সম্পদের প্রবৃদ্ধি হলে বর্ধিত হারে রাজস্ব সংগ্রহ করাও সম্ভব হবে।[২৮]

ক্লাইভের সমর্থন ও সহযোগিতায় রেজা খান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেন। একাধারে নায়েব নাজিম এবং নায়েব দীউয়ান হিসেবে তিনি একজন শক্তিধর শাসকে পরিণত হন। রাজ্যের সকল নিয়োগ, বদলি ও বরখাস্তের ক্ষমতা তিনি লাভ করেন। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও সংগ্রহের ব্যাপারে রেজা খানের ক্ষমতা প্রাক-পলাশী যুগের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে তাঁর ক্ষমতার উৎস হচ্ছে কোম্পানি। কোম্পানি তাঁর উপর দীউয়ানি শাসনের সকল দায়িত্ব অর্পণ করে মুর্শিদাবাদ দরবারে নামেমাত্র একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। কার্যত কোম্পানির প্রতিনিধি রেজা খান নিজেই। তেমনিভাবে তিনি নবাবেরও প্রতিনিধি। উভয় ভূমিকায় তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে এই প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা বেশিদিন টেকে নি।

রেজা খান প্রশাসনের প্রথম পুণ্যাহ[২৯] অনুষ্ঠিত হয় ১৭৬৬ সালের এপ্রিল মাসে। দীউয়ান হিসেবে ক্লাইভ নিজে দরবারে উপস্থিত থাকলেও পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন নায়েব নাজিম রেজা খান। মুগল শাসনকাঠামোতে নাজিম ও দীউয়ানের পদমর্যাদা সমান হলেও নাজিমই সুবার প্রথম ব্যক্তি। এহেন এ্যাংলো-মুগল শাসনব্যবস্থায় রেজা খানের আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত। ১৭৬৬ সালের ৮ মে নবাব নাজমউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। নতুন নবাব সাইফউদ্দৌলাও ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক। নিজামত খরচ কম—এই যুক্তি দিয়ে তাঁর নিজামত ভাতা হ্রাস করা হয়। বাদশাহের অনুমতি ব্যতিরেকে দীউয়ান কর্তৃক নাজিমের ভাতা হ্রাস করা ছিল দীউয়ানি চুক্তির পরিপন্থী। ১৭৭০ সালে সাইফউদ্দৌলা মারা যান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক মুবারকউদ্দৌলা। তাঁর সময়েও আরেক দফা নিজামতভাতা হ্রাস করা হয়। দীউয়ানি চুক্তি মোতাবেক নিজামতভাতা বার্ষিক ২৬ লক্ষ থেকে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকায় কমিয়ে আনা

২৮. ঐ, 106-07.

২৯. বাংলা ফসলি পঞ্জিকা অনুযায়ী পুণ্যাহ ছিল বাংলার নতুন বছরের খাজনা আদায় উৎসব । বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখের প্রথম দিনে সারা বছরের জন্য নতুন খাজনা বন্দোবস্ত আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হতো এবং একই সময় দীউয়ান কর্তৃক বিগত বছরের খাজনার লক্ষ্যমাত্রা, খাজনা আদায় ও উদ্বৃত্ত সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো। সকল জমিদারি কাছারিতেই পহেলা বৈশাখ অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো।

হয়।[৩০] ফলে নবাব সিপাহি ও প্রাসাদ-আমলা আনুপাতিক হারে ছাঁটাই করতে বাধ্য হন। অসন্তোষ নিবারণের জন্য ছাঁটাইকৃত সেনাদের অধিকাংশকেই কোম্পানির সেনাবাহিনীতে পুনর্নিয়োগ করা হয়।[৩১] নিয়মিত এবং অধিক বেতন লাভের আকর্ষণে নবাবি সেনারা নির্দ্বিধায় কোম্পানির বাহিনীতে যোগদান করে। ফলে অনেকটা অলক্ষ্যে ও অননুভবনীয়ভাবে নবাবি সেনাবাহিনী বৃটিশ সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানি কর্তৃক সিপাহি ব্যাটালিয়ন গঠনে কোন জাতিভেদ নীতি অনুসৃত হয়েছে বলে কোন অভিযোগ উঠে নি, কারণ মুগলদের মতো প্রাথমিকভাবে কোম্পানিরও নীতি ছিল সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য রক্ষা করা। প্রতিটি নতুন ব্রিগেড গঠিত হয় যথাসম্ভব সমান সংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু সিপাহি নিয়ে।[৩২]

ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনব্যবস্থা ক্লাইভের সৃষ্টি। এটা ছিল কোন রাজনৈতিক ঝুঁকি না নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের সম্পদ মুগল অভিজাত ও কোম্পানির মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেবার একটি চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থা। দেশের সার্বভৌম কর্তা হিসেবে সুবাদারকে মেনে নেন ক্লাইভ।[৩৩] তাঁর সৃষ্ট ব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্বের মালিক এবং সে মালিকানা মুগল সার্বভৌমত্বের অন্তর্গত একটি স্থায়ী ব্যবস্থা।[৩৪] এই ব্যবস্থাধীনে রেজা খানের আধিপত্য ক্লাইভ তথা কোম্পানি কর্তৃক স্বীকৃত। ক্লাইভের সহযোগিতায় রেজা খান আপ্রাণ চেষ্টা করেন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে। স্বল্পকালের জন্য হলেও এই প্রচেষ্টায় রেজা খান কল্পনাতীত সাফল্য অর্জন করেন।

তবে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটিয়ে রাজস্ব-আয় বৃদ্ধি করে রেজা খান যে সাফল্য অর্জন করেন এর মূল কারণ ছিল তাঁর প্রতি ক্লাইভ ও তাঁর পরবর্তী গভর্নর হ্যারী ভেরেল্স্ট-এর সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন। ইঙ্গ-মুগল যৌথ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আধিপত্য থাকলেও ক্লাইভ ও ভেরেল্স্ট এমন নিখুঁতভাবে মুখোশ পরেছিলেন যে, এঁরা যে দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক প্রভু তা কখনো কার্যত প্রকাশ পায় নি। স্থানীয় প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে মুগল ব্যবস্থাধীনে রেখে এমন একটি ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করা হয় যেন দেশ আসলে আগের নবাবি যুগের মতোই স্বাধীন। ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের এই মুখোশ উন্মোচিত হতে থাকে ১৭৬৭ সালে ক্লাইভের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পর থেকে।

কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে প্রথম রেজা খানের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ শুরু হয়। মীর কাশিমের মতো রেজা খানও কোম্পানির কর্মচারী ও

৩০. আরো তথ্যের জন্য দেখুন, K.M. Mohsin, *A Bengal District in Transition Murshidabad* 1765-1793, (Dacca 1973), Chapter VI.

৩১. A. M. Khan, *Transition*, 122.

৩২. ঐ, 122-23.

৩৩. ঐ, 132-33.

৩৪. Clive's minute, 'Bengal Secret and Military Consultations', 16 January 1767, উদ্ধৃত, A. M. Khan, *Transition*, 137.

অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এহেন ব্যবসার ক্ষতিকর ও নির্যাতনমূলক দিকসমূহ তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম সিলেক্ট কমিটির কাছে অভিযোগ আকারে তুলে ধরেন। এর সমাধান হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত সকল ইউরোপীয়কে প্রত্যাহার করার জন্য তিনি কমিটিকে উপদেশ দেন।[৩৫] তিনি আরো হুঁশিয়ারি দেন যে, উক্ত সমস্যা সমাধান করা না হলে অচিরেই বন্দোবস্ত মোতাবেক সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে। কোম্পানির ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধির মুখে রাজস্বঘাটতি হলে যে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তা অনুধাবন করে সিলেক্ট কমিটি মফস্বলে ইউরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কতিপয় নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৩৬]

নিজেদের স্বার্থে বিঘ্ন ঘটায় অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত ইউরোপীয়রা রেজা খানের বিরুদ্ধে কোম্পানিমহলে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। এরা পাল্টা অভিযোগ তোলে যে, দেশের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য দায়ী রেজা খান নিজে এবং তাঁর "অদক্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ" আমলাবৃন্দ। খানবিরোধী মহল অচিরেই সিলেক্ট কমিটিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। ১৭৬৯ সালের ১৬ আগস্ট প্রতি জেলায় একজন ইউরোপীয় সুপারভাইজার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৭] জেলা সুপারভাইজারের দায়িত্ব রেজা খানের আমলাদের উপর খবরদারি করা, আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটিকে অবহিত করা। বৃটিশ আধিপত্যকে কলকাতা-মুর্শিদাবাদ থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তারের এটাই প্রথম পদক্ষেপ। গভর্নর হ্যারী ভেরেল্‌স্ট অবশ্য খানকে আশ্বাস দেন যে, সুপারভাইজার নিয়োগের উদ্দেশ্য তাঁর ক্ষমতা খর্ব করা নয়, স্থানীয় আমলাদের উপর সামান্য নজর রাখা।[৩৮] কিন্তু এই পদক্ষেপ যে দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা এ ব্যাপারে রেজা খান ছিলেন নিশ্চিত। তাই তিনি বহুবার সিলেক্ট কমিটিকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি মুগল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দীউয়ান মাত্র এবং নবাবের আমলাতন্ত্রের উপর খবরদারি করা কোম্পানির এখতিয়ারবহির্ভূত। কিন্তু রেজা খান এবং গোটা মুগল প্রশাসন এখন এমন অবস্থায় নিপতিত যে, কোম্পানিকে আইনের দোহাই দেয়া ছাড়া সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে অন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার সম্পূর্ণ অপারগ।

জেলা সুপারভাইজারগণ মূলত নিযুক্ত হয়েছিল রেজা খান প্রশাসনের ছিদ্রানুসন্ধানের জন্য এবং তাঁর প্রশাসনকে উৎখাত করার একটি যৌক্তিক অজুহাত বের করার জন্য। অতএব, প্রত্যাশিতভাবেই সুপারভাইজারেরা প্রশাসনের অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে থাকে। ওসব প্রতিবেদনে মত প্রকাশ করা হয় যে, নবাবের সাথে কোম্পানির ক্ষমতা ভাগাভাগির ফলে দেশে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে;

৩৫. 'Bengal Secret Consultations', 19 February 1766, উদ্ধৃত, A. M Khan. *Transition*, 137.
৩৬. Reza Khan's memorandum, *Bengal Public Consultations*, 24 March 1769.
৩৭. *Bengal Secret Consultations*, 16 August 1769
৩৮. Harry Verelst to Reza Khan, 8 September 1769, *Calender of Persian Correspondence*, Vol No. 1580

প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এমনকি ১৭৬৯-৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের জন্য রেজা খান প্রশাসনকে সরাসরি দায়ী করা হয়। প্রত্যুত্তরে রেজা খান অভিযোগ করেন যে, কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রসারের জন্য কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, তারা নিজেদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে গণ্য করছে এবং মফস্বলে কায়েম করছে ত্রাসের রাজত্ব; তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের ফলেই দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এবং এরই ফলশ্রুতি ১৭৬৯-৭০-এর মহাদুর্ভিক্ষ। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি তাঁকে অপসারণ করে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্ব শুরু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দুর্ভিক্ষের জন্য রেজা খানকে দায়ী করে কমিটির তরফ থেকে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হয় এবং ইঙ্গ-মুগল যৌথ শাসনের 'কুফল' সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। পরিচালকমণ্ডলী যথাবিহিত নির্দেশ দেয় যৌথ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দীউয়ানি শাসন সরাসরি পরিচালনা করতে। ১৭৭২ সালের ২৭ এপ্রিল রেজা খানকে বরখাস্ত করে 'দুর্নীতির' দায়ে বন্দি করা হয়। নায়েব দীউয়ানের পদ বিলুপ্ত করে দীউয়ানি দপ্তর কলকাতায় স্থানান্তর করা হয় এবং দীউয়ানি শাসন সরাসরি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৩৯]

সার্বভৌমত্ব বিতর্ক

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সরাসরি দীউয়ানি শাসন গ্রহণ, মফস্বলে ইউরোপীয় কর্মকর্তা নিয়োগ, কলকাতায় খালসা বা রাজস্ব দপ্তর স্থানান্তর এবং কলকাতাকে কেন্দ্রবিন্দু করে নানা ধরনের প্রশাসনিক সংস্কার সাধন, প্রশাসনে নাজিমের ভূমিকা নামমাত্র করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠে দেশের সার্বভৌমত্বের অবস্থান সম্পর্কে। বাংলার সার্বভৌম কর্তা কে? নবাব, না কোম্পানি? এই প্রশ্ন মুগল শাসকশ্রেণীর মধ্যে জাগে নি। এই বিতর্ক উঠে কোম্পানি সরকারের ভিতর থেকেই। বিতর্কে যোগদান করেন ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, কাউন্সিল-সদস্যগণ এবং সুপ্রিমকোর্ট। চার সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলের একজন সদস্য (রিচার্ড বারওয়েল) ছাড়া বাকি সকলে (জন ক্লেভারিং, জর্জ মনসন, ফিলিপ ফ্রান্সিস) অভিমত প্রকাশ করেন যে, অতীতের সকল চুক্তি মোতাবেক এবং দেশের আইন মোতাবেক মুর্শিদাবাদের নবাবই দেশের সার্বভৌম কর্তা এবং কলকাতার কাউন্সিল শুধু রাজস্ব সংগ্রহের অধিকর্তা। তাঁরা যুক্তি প্রদান করেন যে, নবাব অন্যান্য সার্বভৌম দেশের দূত গ্রহণ করেন এবং ঐ সব দেশে তাঁর নিজের দূত প্রেরণ করেন; নবাবের নামে দেশের মুদ্রা খচিত হয়; ফৌজদারি বিচার নবাবের হাতে এবং মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে নবাবের অনুমোদন নিতে হয়; দেশে অবস্থানরত অন্যান্য সকল বিদেশী কোম্পানি ও নাগরিক নবাবকেই সার্বভৌম কর্তা বলে স্বীকার করে এবং কোম্পানিকে গণ্য করে মুগল সরকারের চুক্তিবদ্ধ মুৎসুদ্দি হিসেবে।[৪০] এসব যুক্তির

৩৯. Letter from the Court of Directors, 28 August 1771, Fort William India House Correspondence Vol. 6, 122-23

৪০. এই বিতর্কটি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হয়েছে ডব্লিউ. কে. ফার্মিঞ্জার রচিত *Historical Introduction* গ্রন্থের ১২-১৩ পৃষ্ঠায়।

প্রত্যুত্তরে হেস্টিংস বলেন যে, নবাবের সার্বভৌমত্বের অনুকূলে যুক্তিসমূহ তত্ত্বনির্ভর, বাস্তবভিত্তিক নয়। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে—এই নবাবের নির্মাতা হলো কোম্পানি। শুধু নবাব নির্মাণেই নয়, নবাবের মন্ত্রী নিয়োগেও কোম্পানির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। হেস্টিংস বলেন যে, ১৭৭২ সাল থেকে মুর্শিদাবাদের মসনদ এমনি একটি নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যে, দেশ শাসন সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তই এখন নবাবের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়া হয় না। "এখন নবাব একজন শাসনক্ষমতাচ্যুত সাজসর্বস্ব শিখণ্ডী মাত্র।"[৪১] এর প্রমাণ মেলে হেস্টিংস-এর নিজের শাসন থেকেই। ১৭৭২-৭৩ সালে হেস্টিংস প্রশাসনের ইউরোপীয়করণ করে একটি ব্যাপক শাসনকাঠামো নির্মাণ করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কখনো নবাবের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন নি। বস্তুত নবাব নিজেও হেস্টিংস-এর কার্যকলাপের আইনগত বৈধতার প্রশ্ন তোলেন নি। নবাব বরঞ্চ নিজেকে কোম্পানির পেনশনগ্রহিতা হিসেবেই গণ্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর অধীনে ভারতে কোম্পানির বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন গভর্নর জেনারেল এবং তাঁকে সভাপতি করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হয়। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর নির্ভরশীল করা হয়। ঘটনাক্রমে প্রথম কাউন্সিলের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনই ছিলেন হেস্টিংস-এর বিরোধী। অতএব রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ নীতিকে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য মুগল সরকারের সঙ্গে চুক্তির বিরোধী আখ্যায়িত করে তা বর্জন করে আগের মতো যৌথ ব্যবস্থায় ফিরে যাবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে হেস্টিংস-এর অভিমত কাউন্সিলে বাতিল হয়ে যায়। কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নেন এবং হেস্টিংস-এর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ইঙ্গ-মুগল যৌথ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের নির্দেশ দেন (৩ মার্চ ১৭৭৫)। একই সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলী ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন রেজা খানকে মুক্তি দিয়ে পুনর্বার তাঁকে নায়েব নাজিম এবং নায়েব দীউয়ান নিযুক্ত করার জন্য।[৪২] নতুন পরিকল্পনা মোতাবেক রেজা খানকে পুনর্বার নায়েব সুবা ও নায়েব দীউয়ান নিযুক্ত করা হয়। ফৌজদারি আদালত কলকাতা থেকে পুনরায় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। আবার মুর্শিদাবাদকে সুবার রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

কিন্তু সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান নায়েব সুবা ও নায়েব দীউয়ান পুনর্নিযুক্ত (১৭৭৫) হলেও তিনি আর আগের মতো স্বাধীনচেতা শাসকের পরিচয় দেন নি, মুগল সরকারের শাসনতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে আর তিনি সোচ্চার হন নি। তিনি নীরবে বাস্তবতাকে মেনে নিলেন। আইনগতভাবে না হলেও বাস্তবে যে ইংরেজরা দেশের সার্বভৌম কর্তায় পরিণত হয়েছে এ সত্য তিনি স্বীকার করে নিলেন। বিশেষ করে রাজস্ব শাসন ব্যাপারে যৌথ ক্ষমতা পুনঃপ্রবর্তনকে তিনি একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব পদক্ষেপ বলে মনে করেন। ১৭৭৫-১৭৭৮ সময়কালে ফিলিপ ফ্রান্সিসের নেতৃত্বে হেস্টিংসবিরোধী দল

৪১. ঐ, 24.

৪২. A M Khan, *Transition*, 347.

সংখ্যাগরিষ্ঠতাবলে মুগল সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার পক্ষে রায় দিলেও রেজা খান বৃটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য মেনে নিলেন এবং ফৌজদারি ক্ষমতা ছাড়া দীউয়ানি ক্ষমতা তিনি প্রায়[৪৩] সম্পূর্ণ কোম্পানির ইচ্ছামাফিক প্রয়োগ করেন। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সিসের দলের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং এর সঙ্গে বিলুপ্ত হয় সকল নবাবি ক্ষমতা। হেস্টিংস পূর্ণ দাপটে সকল দীউয়ানি ও নিজামত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন। একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করেন তিনি। হেস্টিংস-এর নির্মিত রাজনৈতিক অবকাঠামো বৃটিশ পার্লামেন্টের স্বীকৃতি লাভ করে পিটস্ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর (১৭৮৪) মাধ্যমে। এর চূড়ান্ত রূপ দেন লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩)। লর্ড কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় (১৭৯৩) নবাবের ফৌজদারি ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে তাঁকে কোম্পানির পেনশনভোগীতে পরিণত করা হয়।

প্রশাসন শ্বেতাঙ্গীকরণ

১৭৬৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানি অংশগ্রহণ করে শুধু দীউয়ানি প্রশাসনে এবং তাও সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মুর্শিদাবাদ দরবারে। কোম্পানির মাত্র একজন প্রতিনিধি (Resident) দরবারে যোগদান করতেন। আমরা দেখেছি যে, কোম্পানির পক্ষে নায়েব দীউয়ান রেজা খান পরিচালনা করেছেন সমগ্র দীউয়ানি প্রশাসন, প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও দেশী। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রশাসনে প্রথম শ্বেতাঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটে ১৭৬৯ সালে, যখন প্রতি জেলায় একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। এদের প্রধান দায়িত্ব হয় নিজ নিজ অঞ্চল সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা, যেমন, (১) পরগনার ইতিহাস-ঐতিহ্য, (২) কৃষি উৎপাদন, (৩) জমির খাজনা ও অন্যান্য আবওয়াব বা কর, (৪) ও বিভিন্ন শিল্পোৎপাদন। বোঝা কঠিন নয় যে, দেশের প্রশাসন পরিচালনায় প্রথমেই সরাসরি লিপ্ত না হয়ে কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল সর্বাগ্রে দেশের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

প্রশাসন শ্বেতাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৭৭০ সালে। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে দুটি রাজস্ব পরিষদ (Revenue Council) স্থাপন করা হয়। এর ফলে রেজা খান ও অন্যান্য আঞ্চলিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপর কোম্পানির খবরদারি বৃদ্ধি পায় বটে, তবে প্রশাসন দেশী কর্মকর্তাদের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রশাসন থেকে দেশী কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ করে ইউরোপীয় কর্মকর্তা নিয়োগের আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয় ১৭৭১ সালের আগস্ট মাসে, যখন পরিচালকমণ্ডলী নির্দেশ দেন দীউয়ানি শাসন সরাসরি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালনা করার জন্য।[৪৪] ১৭৭২-৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রেজা খান সহ দেশী মুৎসুদ্দিদের বরখাস্ত করে প্রশাসনকে ইউরোপীয়করণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক

---

৪৩. Philip Francis to Lord Clive, 21 May 1775, Francis MSS, (India Office Records), EURE, 13,241.
৪৪. J. H. Harington, *An Analysis of the Laws and Regulations enacted by the Governor General in Council at Fort William in Bengal*, Vol. 2, (London 1821), 13.

কাঠামো নির্মাণ করেন। তিনি প্রতি জেলায় একজন ইউরোপীয় কালেক্টর ও সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। সদরে খালসা দপ্তর বিলুপ্ত করার ফলে সকল দেশী মুৎসুদ্দি অবসরপ্রাপ্ত হন। খালসা দপ্তর (রাজস্ব বিভাগ) পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হয় একটি সর্বশ্বেত বোর্ড অব রেভিনিউ। এই মহাশক্তিমান বোর্ডে দেশী উপাদান বলতে থাকে শুধু কতিপয় নিম্নবেতনভোগী মুনশী-মুহরার। তবে হেস্টিংস-এর পরিকল্পনায় জেলা পর্যায়ে দেশীদের যোগদানের সুযোগ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয় নি। প্রতি জেলায় ইউরোপীয় কালেক্টরের পাশাপাশি একজন সমমর্যাদার দেশী দীউয়ানের পদ সৃষ্টি করা হয়। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহে এদের একে অপরের প্রতিবিধায়ক ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করা ছিল এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হেস্টিংস-এর এই নীতি ১৭৭৫ সালে বাতিল হয়ে যায়। তবে প্রশাসনিকভাবে শুধু মফস্বল থেকে ইউরোপীয় প্রশাসক প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকে। ১৭৮০ সাল থেকে পুনরায় মফস্বলে ইউরোপীয় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ পদ শ্বেতাঙ্গদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন লর্ড কর্নওয়ালিস। মফস্বলে জেলা দীউয়ানদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নেই যে, এরা অদক্ষ এবং এদের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব সংগ্রহ অনিয়মিত বা কম হচ্ছে। বরঞ্চ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর রাজস্ব বৃদ্ধি সত্ত্বেও মফস্বল দীউয়ানগণ বর্ধিত রাজস্ব আদায় করতে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেছে এবং নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের মন জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রশাসন থেকে সেসব অনুগত ও দক্ষ দেশী আমলাদের বহিষ্কার করা ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। কর্নওয়ালিসের নীতি ছিল এক দিকে রাজস্বসংগ্রহ নিশ্চিত করা, অন্যদিকে শ্বেতাঙ্গ শাসন সুদৃঢ় করা।[৪৫] এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৭৮৬ সালে কর্নওয়ালিস মফস্বলে সকল দেশী কর্মকর্তা বরখাস্ত করে ইউরোপীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। ইউরোপীয় জেলা কালেক্টরকে দেয়া হয় সর্বময় ক্ষমতা। জেলা কালেক্টর হলেন একাধারে জেলার রাজস্ব, বিচার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ। একই হাতে শাসন, বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা অর্পণ সমকালীন বৃটেনে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু এখানে তা সম্ভব করা হলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য মানুষের অধিকার সংরক্ষণ নয়, এর লক্ষ্য স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থার মাধ্যমে অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন সুদৃঢ় করা। যেমন কর্নওয়ালিস তাঁর আমলাবর্গকে উপদেশ দেন, "সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমাদের থাকার মূল লক্ষ্য দুটি—একটি আমাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা, অপরটি এ দেশকে কোম্পানি ও বৃটিশ জাতির জন্য যতোটুকু সম্ভব সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পরিণত করা।"[৪৬] রাজনৈতিক নিরাপত্তার একটি হাতিয়ার হিসেবে কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ে একটি শক্তিশালী অনুগত অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলা। ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহে জমিদারদের রাজ-আনুগত্য কর্নওয়ালিসের নীতির

৪৫. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, P J Marshall, "Indian Officials under the East India Company" *Bengal Past and Present*, Vol L XXXIV, 1965.

৪৬. Lord Cornwallis's Minute, II February 1793, Second Report from the Select Committee, 1810, Appendix 9 (A), 107

দূরদর্শিতা প্রমাণ করলো। কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থাধীনে একজন জেলা জজ সর্বসাকুল্যে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতন পান, আর জেলা কালেক্টর পান চার হাজার টাকা। দেশী মুনশি-মুহরারদের সর্বোচ্চ মাসিক বেতন দেয়া হয় মাত্র ১৫০ টাকা।[৪৭] সে সময় অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে বৃটিশ মুদ্রা স্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রা সিক্কা টাকার বিনিময়হার ছিল ১ঃ২। অর্থাৎ স্টার্লিং-এর হারে একজন বৃটিশ জেলা কালেক্টরের বেতন ছিল দুই হাজার পাউন্ড, যা ছিল খোদ বৃটেনের সর্বোচ্চ সচিবের বেতনের চেয়েও দ্বিগুণ।[৪৮] জেলা কালেক্টর এবং জজদের সবার বয়স ছিল বিশের কোঠায় এবং বৃটেনের মানে এদের শিক্ষা ছিল খুবই সীমিত। চাকুরির জ্যেষ্ঠতা বৃদ্ধির সাথে এদের বেতন ও সুযোগ বাড়তো আরো বহু গুণ। অর্থাৎ বাংলায় একজন বৃটিশ কর্মকর্তা কয়েক বছর চাকুরিরত থাকতে পারলে সে প্রভূত সম্পদের মালিক হতে পারতো। উল্লেখ্য, বৃটিশ কর্মকর্তাদের আয় শুধু বেতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বেতন ছাড়াও এদের আরো আয়ের উৎস ছিল, যেমন প্রাইভেট ব্যবসা, ঘুষ, নজরানা, পুরস্কার ইত্যাদি। বিপুল সম্পদের অধিকারী এসব আমলা ছিল সবার ঈর্ষার পাত্র। ব্যঙ্গ করে এদের বলা হতো 'নেবাব'।

আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদিও পলাশী যুদ্ধের পরপরই রাজ্য স্থাপনে সক্ষম ছিল, তথাপি নানা বাস্তব বিবেচনা ও কূটকৌশলগত কারণে এরা নিজেদের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকে। বরঞ্চ একই লক্ষ্যে এরা এগিয়ে চলে ধাপে ধাপে। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মীর জাফর ও মীর কাশিমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সামরিক দুর্বলতার জন্য। কোম্পানির সেনাবাহিনী সংখ্যায় অল্প হলেও এরা ছিল সুশৃঙ্খল পেশাদার বাহিনী এবং অধিক শক্তিশালী মারণাস্ত্রের অধিকারী। রণকৌশলেও ছিল এরা শ্রেষ্ঠ। ১৭৬৫-১৭৭২ সময়ের ইঙ্গ-মুগল যৌথশাসন ছিল একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা, যার ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। হেস্টিংস-এর নীতি এই অবশ্যম্ভাবিতাকে ত্বরান্বিত করলো। হেস্টিংস বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূল স্থাপন করলেন এবং সে ভিত্তির উপরিকাঠামো নির্মাণ করলেন কর্নওয়ালিস। হেস্টিংস প্রতিষ্ঠা করলেন বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র আর সে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন কর্নওয়ালিস।[৪৯]

৪৭. Statement of salaries of Chittagong Collectorate Officials for 1787-88, *Chittagong District Records*, Vol 436, (National Archives of Bangladesh, Dhaka) 15

৪৮. Governor General to Board of Revenue, 18 July 1787, Extract in *Chittagong District Records*, Vol 436, 18 (বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, ঢাকা)। ১৭৯৩ সালে রাজস্ব আদায়েব উপর কমিশন প্রাপ্তির প্রথা বিলুপ্ত কবা হয় এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কালেক্টরদেব ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের মাসিক বেতন বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়।

৪৯. কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal* (Dacca 1978), W K Firminger, Fifth Report, 1812, (Calcutta 1917), A Aspinal, *Cornwallis in Bengal* (Manchester 1931); J. H Harington, *An Analysis of the Laws and Regulations* (Calcutta 1821), Ranajit Guha, *A Rule of Property for Bengal*, (Paris 1961)

৫

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিদ্রোহ

সিরাজুল ইসলাম*

মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পত্তন এবং মধ্য বিংশতিতম শতাব্দী পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব বাংলায় সুদীর্ঘ বিদেশী শাসনের ইতিহাসে আরেকটি অধ্যায় যুক্ত করে, যা ছিল যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। এই পর্বে বাংলার জনগোষ্ঠীর কোন জাতীয় পরিচিতি ছিল না এবং আধুনিক জাতীয়তাবাদের অনুরূপ চেতনাও তাদের মধ্যে গড়ে উঠে নি। তারা তাদের সর্বোচ্চ শাসকের জাতিত্ব ও ধর্মের উপর অতি কম গুরুত্ব আরোপ করতো। তখন একজন বিজেতাকে শান্তিপূর্ণভাবে অথবা বিদ্রোহের মাধ্যমে হটিয়ে আরেক জন দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতেন; কিন্তু ক্ষমতার এ পরিবর্তন নিম্নবর্তী জনগণের নিকট ছিল কেবল অবগতির বিষয়, যারা তাদের ঊর্ধ্বতন এলিট শাসক সম্পর্কে কদাচিৎ কোনো আগ্রহ বা উদ্বেগ প্রকাশ করতো। নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য তাদের ছিল তাদেরই গড়ে তোলা জীবনবিধান। এ জীবনবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের নিজস্ব রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস, আচরণ, বিশ্বাস ও দর্শন, এবং যতোদিন তাদের সামাজিক জীবনের এই অপরিহার্য উপাদানগুলোকে অব্যাহতভাবে ক্রিয়াশীল রাখা হতো, ততোদিন তারা কোনো অসন্তোষ বা বিরাগ প্রকাশ না করে কর প্রদানে প্রস্তুত থাকতো। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা এ বিশ্বাস অর্জন করেছিল যে নতুন শাসক যিনিই হোন এবং তাঁর জাতিত্ব ও ধর্ম যাই হোক না কেন, তাদেরকে স্থানীয় জীবনবিধান অনুসরণ করে জীবন যাপন করতে দেয়া হবে। তারা ইতিপূর্বে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার আলোকে বলা যায়, পূর্ববর্তী কোনো বিজেতা এযাবৎ তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানের পরিমণ্ডলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন নি। সামাজিক জীবনবিধানে কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা বস্তুত মননশীল কোনো সমাজসংস্কারক দ্বারা এবং স্বাভাবিক সমাজ পরিবর্তনের ধারায়

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাধিত হয়েছিল এবং কদাচিৎ কোনো শাসক রাজার আদেশের মাধ্যমে এ পরিবর্তন এসেছে। শাসকরা কর সংগ্রহ করেই তুষ্ট থাকতেন এবং তাদের অব্যাহত জীবনপদ্ধতি নিয়ে দেশ শাসন করতেন। তবুও জনসাধারণের প্রয়োজন একজন রাজাকে এবং তাঁকেই তারা কর দিত, কারণ তিনি ছিলেন তাদের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষক।

কিন্তু বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করার (laissez faire) সম্পর্কটি বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের সময় ভেঙে পড়ে। পূর্বের শাসকগণ অভিজাতদের মাধ্যমে রাজ্য শাসন করতেন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য থেকে মুনাফা সংগ্রহ নয়, বরং তাদের মর্যাদা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিক সরকারের জন্য প্রাধান্য বিস্তারই চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না। কোম্পানি এবং কোন না কোনভাবে বৃটিশ রাজও প্রধানত মুনাফা ও বাণিজ্যিক অগ্রগতির জন্য বেশি তৎপর ছিল এবং প্রাধান্য বিস্তারকে ঈপ্সিত মুনাফা অর্জনের উপায় হিসেবে নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল, বাংলা রাষ্ট্রকে অবশ্যই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত লভ্যাংশ যোগাতে হবে এবং রাজার (Crown) সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট অধীনতামূলক কর দিতে হবে, এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে অবশ্যই মুনাফাভিত্তিক হতে হবে। বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম বার রাষ্ট্র গঠনে ও রাষ্ট্রচিন্তায় মুনাফার লক্ষ্য সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়।

বণিক সরকার শুরু থেকেই রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের পরিবর্তনে সচেষ্ট ছিল, কারণ প্রচুর অর্থ পুরনো শাসনব্যবস্থা থেকে উৎসারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল, যা অর্থনীতিকেন্দ্রিক না হয়ে বরঞ্চ অভিজাততান্ত্রিক সম্মানের লক্ষ্যে পরিচালিত হতো। অতএব নতুন শাসকের চাহিদা পূরনের জন্য ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রের চারিত্রিক পরিবর্তন জরুরি ছিল। এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন ছিল প্রশাসন ও প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দকে পুনর্বিন্যাস করা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং রাজস্বের প্রধানতম উৎস ভূমিকে আরো অধিকভাবে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধান প্রধান ক্ষেত্র, যেমন ভূমিব্যবস্থা, প্রশাসন, শিক্ষা, আইন ও বিচার, পরিবহন, এমনকি বিবাহ ও নৈতিকতার পর্যায়ে সংস্কারকাজ শুরু করা হয়। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এসকল সংস্কার প্রচলিত ব্যবস্থার স্বার্থকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং বিভিন্ন স্বার্থের জন্ম দিয়েছিল, যা ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীসমূহ নীরবে মেনে নেয় নি এবং প্রয়োজনবোধে এর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

কোম্পানি শাসনের শুরু থেকেই নতুন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ লক্ষ্য করা যায় এবং বৃটিশ রাজের পতন পর্যন্ত ঐ প্রবণতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ এবং তাদের সংগঠনের ক্রিয়াপদ্ধতি এবং নেতৃত্ব কখনো একই স্বার্থে এবং একইভাবে পরিচালিত ও সংগঠিত হয় নি। প্রেক্ষাপট পরিবর্তন

এবং নতুন স্বার্থ ও শক্তির উত্থানের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক শাসক প্রদত্ত চাপ সকল সময়েই এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর উপর গিয়ে পড়েছে এবং দৃশ্যপটে পরিবর্তন এনেছে। দাবি এবং অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে এর প্রতিক্রিয়া কখনো সমরূপ ছিলনা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অবস্থা ও অনুষঙ্গের শিকার হয়ে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে। এদের প্রতিক্রিয়া ছিল কোন কোন সময় নিষ্ক্রিয় এবং প্রায়শই তীব্র। সার্বিক প্রেক্ষাপটে এসব প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস রচনা করা এবং অর্থবহ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তাই ঘটনাবলীকে সুনিপুণভাবে সাজিয়ে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কাহিনীকে (যা পক্ষান্তরে বহুমুখী ও জটিল) অবশ্যই ধারণাক্রম, বিন্যস্ত ধারণা ও ভূমিকার বিপরীতে বর্ণনা করতে হবে এবং সময় ও আদর্শের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতেই আমরা এবার অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ বা সম্মুখ প্রতিরোধের ঘটনাবলী সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করবো।

লুপ্ত সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা

ইতিহাসে একটা সাধারণ ব্যাপার এই যে পরাজিত শক্তির কিছু অংশ সর্বদাই থেকে যায় এবং তাদের সুবিধাজনক স্থান থেকে নতুন শাসকের বিরুদ্ধে নানা গোলযোগ সৃষ্টি করে। আমরা জানি যে বিজয়ী মুগলদের বাংলার উপর সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে এবং পূর্বতন পাঠানদের ও স্থানীয় শাসকদের বিতাড়িত করতে প্রায় এক শতাব্দী লেগেছিল। কিন্তু সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি দক্ষ হওয়ার কারণে উক্ত কার্য সম্পন্ন করতে বৃটিশদের অনেক কম সময় লেগেছিল। পলাশীর যুদ্ধ অবশ্যই বৃটিশদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা একেবারে চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিল না। মুগলদের অবশিষ্টাংশকে পরাভূত করতে এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তাদেরকে বশে আনতে বৃটিশদের অনেক দুঃসাহসী যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সিরাজউদ্দৌলার সবচেয়ে অদম্য জেনারেল এবং পাটনার ডেপুটি গভর্নর রাজা রাম নারায়ণ রায় কখনো মীর জাফরকে নবাব হিসেবে স্বীকার করেন নি এবং তাঁকে পরাভূত করতে আসা কোম্পানির সৈন্যসহ নবাবের বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রথম জেলা চব্বিশ পরগনার জমিদারগণ বৃটিশদের সাথে সমঝোতায় যেতে অস্বীকার করেন, কারণ তাদের কাছ থেকে বৃটিশরা নতুন হারে যে রাজস্ব দাবি করেছিল তার পরিমাণ পূর্বতন হারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দু'জন নৃপতি জমিদার—বর্ধমান ও বিষ্ণুপুরের মহারাজা বৃটিশের দুষ্কর্মের সহযোগী নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন। বৃটিশ সৈন্যদের সহায়তায় তাঁদেরকে বশে আনা হয়। বৃটিশের করায়ত্ত মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারগণও বিদ্রোহীদের ন্যায় আচরণ করছিলেন এবং তাদের সদাচরণ নিশ্চিত করার জন্য সেখানে কোম্পানির সৈন্য মোতায়েন করা হয়। তাদের অভিযোগ ছিল

এই যে কোম্পানি সরকার তাদের ভূমির উপর অধিক কর নির্ধারণ করেছে এবং তাদের এস্টেট ইজারা দিয়ে প্রজাদের ওপর তাদের ঐতিহ্যিক নিয়ন্ত্রণ খর্ব করেছে।

অল্পকালের মধ্যেই কোম্পানি সম্পর্কে মীর জাফরের মোহমুক্তি ঘটে, কারণ কোম্পানির নিকট তাঁর দেনা শেষ হচ্ছিলনা যদিও তিনি প্রতি বছর কোম্পানিকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং পরিশোধ করে যাচ্ছিলেন। কোম্পানি তাঁকে শত্রুদের সাথে স্বাধীনভাবে আলোচনায় বসার অনুমতি দেয় নি। কোম্পানির চাপে নবাবের সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেয়া হয় এবং এসব সৈন্যকে কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। মীব জাফর বৃটিশবিরোধী আঁতাত গঠনের জন্য অন্যান্য ভারতীয় রাজা ও নৃপতিদের সাথে যোগাযোগ করেন। এক্ষেত্রে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিলেন মহারাজা নন্দকুমার, যাঁকে পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেস্টিংস বিচারের মাধ্যমে হত্যা করেন। কোম্পানির নিকট থেকে গৃহীত ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধের ব্যবস্থা হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক দাবিকৃত তিনটি বৃহৎ জেলা মীর জাফর কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন। সেই অপরাধে তাঁর স্থলে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসানো হয়, যিনি বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এ তিনটি বড় জেলা হস্তান্তরের বিনিময়ে সিংহাসন লাভ করেন। শীঘ্রই মীর কাশিম অনুধাবন করেন যে দেশ ইতিমধ্যেই কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। অতএব তিনি নিজেকে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে চাইলেন। একজন স্বাধীন শাসক হওয়ার উদ্দেশ্যে মীর কাশিম ধনীদের উপর কর ধার্য করে রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে চান এবং সিপাহিদেরকে অধিক বেতন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। শেষে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন, যা ষড়যন্ত্রকারী ও বৃটিশদের থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। এভাবে শক্তিসঞ্চয় করে তিনি বৃটিশদের দেশ থেকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফ্রন্টে তাদের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তিনি অযোধ্যার নবাবসহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ থেকে সামরিক সাহায্য লাভের চেষ্টাও করেন। ১৭৬৪ সালে বক্সারে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়, কিন্তু যৌথ বাহিনী পরাজিত হয়। মীর কাশিম দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং উত্তর ভারতের কোন এক জঙ্গলে প্রাণত্যাগ করেন।

অরাজন্য (non-princely) রাজনৈতিক প্রতিরোধ

বক্সারে মীর কাশিমের পরাজয়ে সামরিক উপায়ে মুগল সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য নৃপত্য প্রতিরোধের অবসান ঘটে। তবে অন্যান্য অরাজন্য উপাদান, যারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পূর্বতন শাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তারা তখনও নতুন শাসকের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল। নবাবি প্রতিরোধের ব্যর্থতার পর রাজনৈতিক এলিটের প্রতিরোধমুখী চেতনার উদাহরণ হিসেবে সিলেটের মির্জা আগা মোহাম্মদ রেজা বেগ এবং ঢাকার নবাব শামসুদ্দৌলার প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। সিলেটের মির্জা

আগা মোহাম্মদ রেজা বেগ একজন স্বনির্বাসিত মুগল ছিলেন, যিনি ১৭৯৯ সালে 'ফিরিঙ্গি হুকুমত' থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সকলকে বৃটিশবিরোধী জেহাদে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি সিলেটের অদূরে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত কাছারে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি বড় বড় জমিদার ও অন্যান্য এলিটের নিকট পরওয়ানা পাঠান এবং তাদেরকে একসাথে ফিরিঙ্গি রাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[১] তাঁর বিচারের বিবরণীতে (final proceedings) দেখা যায়, ফতেহ মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে দেশের প্রধান জমিদারদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রধান দূত (emissary) নিয়োগ করা হয়। রেজা বেগ ক্ষমতায় গেলে তাদেরকে বৃটিশদের চাইতে অধিক সুযোগ-সুবিধা দানের অঙ্গীকার করা হয়। সিলেট জেলার বানিয়াচং-এর জমিদারকে বেগ লিখেছিলেন :

> সময় এসেছে আপনার ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটাতে, কারণ ফিরিঙ্গিদের দিন এখন শেষ প্রান্তে এবং আল্লাহ ও রসুলের শাসন সমাগত। অতএব আপনি অবশ্যই নাস্তিক ফিরিঙ্গিদের হত্যা করবেন এবং আমি আপনাকে এ যাবৎ আপনার অধিগত ভূমির চেয়ে আরো অধিক পরিমাণ ভূমি দান করবো। যদি আপনি আমার হুকুম বাস্তবায়ন করতে চান,' তবে যেখানেই ফিরিঙ্গিদের পাবেন বন্দি ও হত্যা করবেন এবং সিলেটে আমাকে সহায়তার জন্য ৫০০ জন অস্ত্রধারী পাঠাবেন ...
>
> তারিখ : শুক্রবার, ৩০ শে আষাঢ়, ১২০৮ বাংলা[২]

একইভাবে সিলেটের তুরাফ পরগনার জমিদারকে বেগ লিখেছিলেন :

> আপনার জানা দরকার যে ফিরিঙ্গিদের শাসনকাল ৪০ বছর ছিল, কিন্তু সে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর বান্দাদের বিজয়...সমাগত। আপনি যদি ভাগ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন...আমার প্রতি আসক্ত থাকেন, তবে ফিরিঙ্গিদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং অবিশ্বাসীদের হত্যা করুন ও তাদেরকে নরকে নিক্ষেপ করুন...এবং যে পরিমাণ ভূমি আপনি হারাবেন আমি আপনাকে তা মঞ্জুর করব অথবা আপনি বেশি চাইলে আমি তা দেব...
>
> তারিখ ৩০ শে আষাঢ়, ১২০৮ বাংলা[৩]

বেগ যে জমিদারদের নিকট থেকে কিছু সমর্থন লাভ করেন তার প্রমাণ হলো, ফিরিঙ্গিদের বহিষ্কারের জন্য তাঁর আহ্বানের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি কামান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রসজ্জিত এক বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ১৭৯৯ সালের ১৪ জুলাই রেজা বেগ পাঁচ হাজার অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যসহ কোম্পানির ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং

১. Criminal and Judicial Proceedings, 23 April 1801, No. 24 (British Library, India Office Records, অন্য কোন অর্থে উল্লেখ করা না হলে 'ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস্' বলতে সকল লেখ্যপ্রমাণ বোঝাবে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে রেজা বেগের নিজের ভাষা ফার্সি হলেও সকলের বোঝার সুবিধার্থে তার 'পরওয়ানা' শব্দটি বাংলায় লেখা হলো।

২. মির্জা মোহাম্মদ রেজা বেগের বিচারের কার্যবিবরণী দ্র., Criminal and Judicial Proceedings, 23 April 1801 No. 2.

৩. ঐ।

কোম্পানিবাহিনীকে পরাস্ত করে বিন্দাসাইল সীমান্ত পরগনা দখল করে নেন। কিন্তু তা তিনি বেশিদিন অধিকারে রাখতে পারেন নি। তাঁর শক্তি ও ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করে সরকার তাঁকে পরাভূত করতে নিয়মিত সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে। কোম্পানির সৈন্যদল কর্তৃক সহজেই পরাজিত হয়ে বেগ গেরিলাযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে নিজেকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ত্বরিৎ আক্রমণের (hit-and-run) পর দ্রুত নিক্রমণকালে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর প্রধান সর্দার বা সেনাপতিসহ বন্দি হন। এ বন্দি যোদ্ধাকে বিচারের জন্য কলকাতায় প্রেরণ করা হয়। কলকাতা আদালতে (court of circuit) বিচারকালে রেজা বেগের বিপক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁকে ১৭৯৯-এর ৪ ধারা মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।[৪] তাঁর সাথে বন্দি অন্যান্য সহযোগীদের বিচার হয় ঢাকায় এক পৃথক আদালতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাহাদুর শাহ, খাকি শাহ, নাজির মুহাম্মদ এবং রহিম খান, যাদের সকলকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।[৫]

আরো দুঃসাহসিক, সুশৃঙ্খল এবং ব্যাপকধর্মী ছিল নবাব শামসুদ্দৌলার প্রতিরোধপরিকল্পনা। তিনি ঢাকার নায়েব নাজিম নবাব নুসরাত জং-এর ভ্রাতা ছিলেন। তিনি অন্যান্য বেশির ভাগ বিদ্রোহীর মতো অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান, যাঁর ইংরেজি সহ অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে উইলিয়াম হিকি বলেন, "ভারতে আমার দেখা দেশীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে গুণবান ব্যক্তি; প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং ইংরেজি ভাষায় বিস্ময়কর দক্ষতার অধিকারী। যখন আমি তাঁকে প্রথম দেখি, তাঁকে আমার চল্লিশ বছর বয়স্ক মনে হয়েছিল। আমি বিশেষভাবে তাঁর সাবলীল ও সুরুচিপূর্ণ সম্বোধনে অভিভূত হই। তাঁর সাথে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনার পর আমি তাঁর ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হই।"[৬] হিকির (Hickey) ন্যায় বিশপ হেবারও (Bishop Heber) শামসুদ্দৌলার জ্ঞান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন, যাঁর সাথে তাঁর ১৮২২ সালে ঢাকায় সাক্ষাৎ হয়। সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে শামসুদ্দৌলার জ্ঞান দেখে হেবার বিস্মিত হয়েছিলেন। বিশপ শেকসপীয়ারের সাহিত্যিক গুণের মূল্যায়নে তাঁর দক্ষতা দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন। শামসুদ্দৌলা বিশপের সাথে অনর্গল ইংরেজিতে আলাপ করেন এবং কথা প্রসঙ্গে ইতিহাসের কয়েকটি ইংরেজি পুস্তকের উদ্ধৃতি দানকালে স্প্যানিশ যুদ্ধের ঘটনাবলী ও তাতে স্যার এডওয়ার্ড প্যাগেট-এর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে।"[৭]

৪. ঐ।

৫. ঐ, No. 26: রেজা বেগের বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, "Muslim Armed Resistance to Early British Rule in Bengal", *Revolt Studies*, vol. 1, No. 1, June, 1985.

৬. Alfred Spencer (ed.), *Memoirs of William Hickey*, vol. v. (1790-1809), 5th edition (1950), 252.

৭. Reginald Heber, *Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India, 1824-1825* (London, 1873 edition), vol. 1, 94.

কিন্তু বিদ্যা বা মার্জিত আচরণ শামসুদ্দৌলাকে সম্মানের সাথে বাঁচার জন্য কোন সুবিধা দেয় নি। তিনি ছিলেন বেকার। যেহেতু তিনি স্থানীয় অধিবাসী (native) ছিলেন, তাই তাঁর জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হয়। কর্নওয়ালিস বিধি (Cornwallis Code) মোতাবেক কোনো স্থানীয়কে রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা যেতোনা। ঢাকায় কোনো কর্মসংস্থান করতে না পেরে হতাশ হয়ে শামসুদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যান, কিন্তু ঢাকার মতো সেখানেও তাঁর জীবন ছিল একঘেঁয়ে ও সম্মানহানিকর। বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে শামসুদ্দৌলা দেশে বৃটিশ শাসনের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ না করে তিনি সাধারণ বিপ্লবের মাধ্যমে বৃটিশদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর হন। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলা ও বিহারের সকল অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে গোপন আন্দোলন শুরু করেন।[৮] মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় তাঁর কর্মব্যস্ততা এবং আন্দোলন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিতে পরিণত করে। ১৭৯৪ সালে তাঁকে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে ঢাকায় যেতে বলা হয় এবং তিনি ঢাকায় চলে যান। কিন্তু তাঁর আসল পরিকল্পনা তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন নি। তিনি দেশের অভ্যন্তরে কোডলিপির (code correspondence) মাধ্যমে সকল অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ভারতের অন্যান্য মুসলিম নৃপতির সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁদের নিকট দূত প্রেরণ করা হয়। ১৭৯৮ সালের মধ্যে এক সাধারণ গণঅভ্যুত্থানের জন্য তাঁর প্রস্তুতি পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তখন শামসুদ্দৌলা তাঁর ধারণাবহির্ভূত এক বহিঃস্থ ঘটনার শিকার হন। অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজির আলী তখন বেনারসে বাস করছিলেন। ১৭৯৯ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি বৃটিশ রেসিডেন্ট চেরি ও তাঁর ইউরোপীয় গার্ডদের হত্যা করে বেনারস থেকে পালিয়ে যান। পালাবার পর তাঁর বাড়ি থেকে এক বান্ডিল কাগজপত্র পাওয়া যায়। ঐ বান্ডিলে ৬২টি চিঠি ছিল, যেগুলো শামসুদ্দৌলাসহ বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহী নেতাদের লিখিত ছিল।[৯] তাঁর চিঠিগুলো পরীক্ষা করে জানা যায় যে সুবিধাজনক সময়ে জাতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। বেনারসে কি ঘটেছে তা তিনি জানতে পারার আগেই এক ঝটিকা বাহিনী (storm troop) ঢাকায় আসে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে। নিরাপত্তার কারণে এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় তাঁকে বিচারের জন্য ঢাকা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

বিচারকালে ওয়াজিরকে লেখা তাঁর সকল চিঠি খোলা হয়। চিঠিতে প্রকাশ পায় যে নবাব শামসুদ্দৌলা আফগানিস্তানের জামান শাহ ও মাস্কাটের শেখের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সময় বাইরে থেকে

---

৮. Bengal Secret and Separate Consultations, 1 April 1799, No. 30.

৯ ঐ, 18 February 1799, No. 3

কোম্পানির এলাকা আক্রমণের জন্য তিনি তাদের নিকট আবেদন জানান।[১০] তিনি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন আদায় করেন এবং তাদেরকে ঢাকার হেমায়েত শাহের নেতৃত্বে সংগঠিত করেন।[১১] মির্জা তাপিস নামে পারস্যের এক অভিযাত্রী কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার বৈরী ব্যবসায়ীদেরকে অনুপ্রাণিত করে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[১২] বিরভূমের রাজা, যিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি বাংলা এবং বিহারের অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারদের সমর্থন আদায়ে নিয়োজিত থাকেন। শেখ আলী খান নামে একজনকে আফগানিস্তানের জামান শাহের নিকট পাঠানো হয় সম্ভাব্য স্বাধীনতাযুদ্ধের নীলনক্শা সম্পর্কে তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলার জন্য। হাকিম খান, গর খান, দাউদ খান এবং মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী লালা ইন্দরমুন্ডের প্রতিনিধির (agency) মাধ্যমে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজির আলী এবং মারাঠা প্রধান সিন্ধিয়ার সাথে দু'টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির সিদ্ধান্ত ছিল, বাংলা এবং বিহারে বিদ্রোহের সময় তারাও বিদ্রোহী তৎপরতা আরম্ভ করবেন এবং জামান শাহের আক্রমণরত বাহিনীকে সহায়তা দেবেন।[১৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেনারসের ঘটনা এসব দুঃসাধ্য গোপনীয় প্রস্তুতিকে নস্যাৎ করে দেয়। বাংলায় বৃটিশ সরকারকে ধ্বংস করার চেষ্টা এবং অভ্যন্তরীণভাবে একতাবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলা ও বিহারের জমিদারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং পত্রাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক যোগাযোগের অভিযোগে শামসুদ্দৌলা এবং তাঁর সহযোগীদের বিচার হয়।[১৪]

শামসুদ্দৌলার পরিকল্পনা শুধুমাত্র অলস স্বাপ্নিকের অলীক কল্পনা ছিলনা। তাঁর পরিকল্পনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ যেভাবে নীরবে এবং নতমস্তকে বৃটিশ শাসন মেনে নেবে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়েছিল সেভাবে বৃটিশ শাসনকে তারা মেনে নেয় নি। তখন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল গণঅভ্যুত্থানের, কিন্তু অভাব ছিল নেতৃত্ব ও সংগঠনের, বিপ্লব সংঘটনের জন্য যা ছিল সবচেয়ে জরুরি। শামসুদ্দৌলা ব্যক্তিগত নেতৃত্ব এবং এক ধরনের অনিয়মিত সংগঠন নিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ ও সফল নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু বেনারসের দুর্ঘটনা তাঁর স্বপ্ন নস্যাৎ করে দেয়। যদি তিনি চূড়ান্ত অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হতেন, তবে তা কোম্পানি শাসনে কি ফল বয়ে আনতো তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু তাঁর গোপন তৎপরতা ইঙ্গিত দেয় যে বাংলা ও বিহারের জনগণের মানসিক অবস্থা ছিল বিপ্লবমুখী। শামসুদ্দৌলা এ সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

---

১০. ঐ, নং ৫২ : আরো দেখুন, 'Documents on Shamsuddoulah's Intrigues Against the English', *Bengal Past and Present*, vol., 53, Jan.-June 1937

১১. Bengal Criminal and Judicial Consultations, 23 April 1801, Nos , 16, 25.

১২. ঐ।

১৩. Bengal Secret and Separate Consultations, 1 April 1799, No, 3.

১৪. Bengal Criminal Judicial Consultations, 9 July 1801, No 2.

জমিদার বিদ্রোহ

প্রাক-বৃটিশ সময়কালে পরগনার নিয়ন্ত্রণ তথা স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ জমিদারদের হাতে ন্যস্ত ছিল, যারা মধ্যগ (middle man) হিসেবে সরকারের নিকট গ্রামীণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব এবং গ্রামীণ সমাজের নিকট সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। জমিদার ছিলেন বংশগতভাবে রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী কর্তাব্যক্তি, যার উপর বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব, যেমন প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, যোগাযোগ ইত্যাদির দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এমনকি তাঁর সামরিক দায়িত্বও ছিল। জরুরি অবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁকে সরকারকে সৈন্য, ঘোড়া এবং পশু সরবরাহ করতে হতো। সৈন্যবাহিনী চলাচলকালে সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় স্থানীয় সরবরাহ সহ অন্যান্য সহায়ক যোগানও তাঁকে দিতে হতো।

মুগল সরকারের নিকট জমিদারি প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিক সরকারের স্বার্থের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। যেহেতু জমিদারি প্রতিষ্ঠান ঔপনিবেশিক মুনাফার অভিপ্রায়কে সমর্থন করতো না, তাই কোম্পানি সরকারের সচেতন নীতি ছিল এই প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্নভাবে দুর্বল করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাত্ত্বিকভাবে না হলেও কার্যত তা থেকে অব্যাহতি লাভ করা। এভাবে ১৭৫৭ সালে পলাশীর উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত ২৪-পরগনার বড় বড় জমিদারি এবং ১৭৬০ সালে অধিকৃত তিনটি জেলাভুক্ত জমিদারি বিলোপ করা হয়। দীউয়ানি গ্রহণের পর জমিদারগণ ক্রমবর্ধমান রাজস্বচাহিদার চাপের মধ্যে পড়েন। ১৭৭২ সালে তাদেরকে পেনশনভোগীতে পরিণত করা হয় এবং তাদের এস্টেট পাঁচ বছরের জন্য সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীর নিকট ইজারা দেয়া হয়। জমিদারগণ পরিস্থিতির কারণে দরিদ্র ও হতোদ্যম হয়ে পড়েন এবং তারা সমাজের স্বাভাবিক নেতৃত্বে আর বহাল থাকলেন না। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের একজন সম্মানিত সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান যখন তিনি মন্তব্য করেন যে "বৃটিশ শাসনে জমিদারগণ ক্রমান্বয়ে আলস্য, নির্বুদ্ধিতা, চরম দারিদ্র্য ও অবমাননায় নিমজ্জিত হয়েছে।" তিনি আরো বলেন যে "সার্বিকভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে তাঁরা জনগণের কাছে সকল সম্মান ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন।"[১৫] ১৭৭৭ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত জমিদারদেরকে বাৎসরিক ভিত্তিতে তাদের দখল ফিরিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তাঁরা ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবির শিকার হয়েছিলেন। এ সময়ে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে বাদ দেয়া হয় এবং তারা শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহকারী এজেন্ট হিসেবে গণ্য হন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন করা হয় এবং সরকারের নিকট যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে তাঁদের ভূ-সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কাজেই এটা সম্ভব ছিলনা যে বাংলার এসব স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি, যাঁরা বংশপরম্পরায় ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁরা এ জাতীয় উদ্বেগজনক

১৫. Philip Francis to H. Strachey, 23 November 1775, quoted in Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal. A Study of its Operation 1790-1819* (Dhaka 1979), 8-9.

এবং অস্থিতিশীল পদক্ষেপ সময়মতো মেনে চলবেন। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত জমিদার সচরাচর ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনো কখনো যৌথভাবে কোম্পানির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সিলেটের আগা মোহাম্মদ রেজা এবং ঢাকার নবাব শামসুদ্দৌলার প্রতিরোধের উদাহরণ ইঙ্গিত দেয় বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে জমিদারগণ সাধারণভাবে কতখানি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এখানে আমরা যুক্তিসহ আরো কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরবো, যেখানে যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারগণ বাধ্য হয়েই বৃটিশ শাসন মেনে নেন এবং যখন নতুন সরকার কর্তৃক তাঁদের স্বার্থ ও প্রভাবের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে তখনই তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন।

বারুই (Barui) উপকূলীয় অঞ্চলের জমিদার বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। উক্ত এলাকায় স্থানীয় জমিদারদের প্রধান স্বার্থ ছিল লবণ উৎপাদন। কোম্পানি সরকার রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সরকারের একচেটিয়া অধিকারে নিয়ে আসে এবং ব্যক্তিগতভাবে লবণ উৎপাদনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। সরকার স্বয়ং লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে এগিয়ে আসবে এটি ঐতিহ্যবাহী লবণ উৎপাদনকারীদের চিন্তাবহির্ভূত ছিল। তাদের স্মৃতিতে এবং লোকাচারে রাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরনের পদক্ষেপের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। জমিদারগণ ঘৃণাভরে লবণবিধির (regulation) বিরোধিতা করেন এবং কোম্পানির লবণচাষীদেরকে খেলারী বা লবণক্ষেত থেকে হটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ দ্বন্দ্বের পর অবশেষে সরকার উপকূলীয় লবণ উৎপাদনকারী জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁদের সাথে মীমাংসায় আসতে বাধ্য হয়।[১৬]

গোড়ার দিকে প্রথম ও প্রধান প্রতিরোধ আসে বিরভূমের নৃপতিতুল্য জমিদার রাজা আসাদুজ্জামানের কাছ থেকে। নবাবের শাসনে রাজাকে পার্বত্য সীমান্ত রক্ষার কাজে ও রাজকীয় যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সামরিক বাহিনী রাখার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল।[১৭] কোম্পানি মীর কাশিমকে রাজার সৈন্যবাহিনী বাতিল করার এবং তাঁর রাজস্ব বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেয়। তবে মীর কাশিম তা করতে অস্বীকৃতি জানান। কোম্পানি নিজেই তখন

১৬. বারুই মন্তব্য করেন, "বাংলার উপকূল অঞ্চলের জমিদারগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণ একচেটিয়াকরণের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী, সংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ বিদ্রোহ গড়ে তোলেন। কোম্পানির এই একচেটিয়াকরণের ফলে জমিদারগণ মুগল আমল থেকে লবণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারান এবং লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা থেকে বাদ পড়েন। ফলে জমিদারদের লবণ উৎপাদন সৃষ্ট বহু যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা হুমকির সম্মুখীন হয়। জমিদারগণ ও তাঁদের স্থানীয় মিত্ররা প্রণালীবদ্ধভাবে উক্ত একচেটিয়াত্ব খর্ব করতে প্রয়াসী হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি বিভিন্নভাবে পুষিয়ে নিতে ব্রতী হয়। এভাবে এক পক্ষে কোম্পানি ও তার মিত্র এবং অপর পক্ষে জমিদারগণ ও তাদের মিত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।" দেখুন, বলাই চন্দ্র বারুই, "Resistance of the Bengal-Zemindars to East India Company's Salt Monopoly (1765-1836)", *Calcutta Historical Journal*, vol 11, 1992, 136-37

১৭. Nandalal Chatterjee, *Mir Qasim: Nawab of Bengal, 1760-63* (Calcutta 1935), 53.

রাজনৈতিক কারণে সৈন্যবাহিনী বাতিলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর হেনরী ভ্যানসিটার্ট (Henry Vansittart) রাজাকে তাঁর সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে বলেন, অন্যথায় কোম্পানির সামরিক আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার হুমকি দেন। আসাদুজ্জামান এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং কোম্পানির প্রভুত্বকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করেন। ভ্যানসিটার্ট তাঁকে পরাভূত করতে কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং অবশেষে রাজা পরাজিত ও বন্দি হন। বিরভূমের রাজা কখনোই যথাযথভাবে বৃটিশ শাসন মেনে নেন নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে তাঁর সমগ্র জমিদারি সাত বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাজা আসাদুজ্জামানের পুত্র জামান খান কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে এক কৃষক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং এ অপরাধে নিজস্ব প্রাসাদে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়, যেখানে তিনি ১৮০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮]

পূর্ববাংলার ফৌজদার ও নূরুল্লাপুরের জমিদার মোহাম্মদ আলী ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন যখন তারা দাবি করে যে তাদের অধিকৃত চট্টগ্রাম জেলা পশ্চিমে মেঘনা নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অধিকৃত চট্টগ্রাম জেলার বাইরে তারা নবাবের প্রজা এবং নবাবের এলাকায় তাদের প্রজা হিসেবেই আচরণ করতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে ফৌজদারের বাহিনী কর্তৃক নিগৃহীত হতে হবে।[১৯] মোহাম্মদ আলী এবং কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দীউয়ানি অধিকারের পর মোহাম্মদ আলীকে ফৌজদারের রাষ্ট্রীয় পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। নূরুল্লাপুর পরগনার জমিদার হিসেবে তাঁকে অতিরিক্ত রাজস্ব চাহিদার আওতাভুক্ত করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ধ্বংস করা। ১৭৬৯ সালে কোম্পানির এক ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী যখন তাঁর জমিদারিস্থ বাজারের দ্রব্যাদি একচেটিয়া দখলভুক্ত করতে আসে, তখন তাকে তিনি হত্যা করেন। কোম্পানি চট্টগ্রাম থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তাঁর নিজস্ব জমিদারি, সম্মান ও সুবিধা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে।[২০]

জমিদারদের প্রথম দিককার প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও সংগঠিত ছিল সন্দ্বীপের ভূ-মালিকদের (land holder) অভ্যুত্থান। ১৭৬০ সালে কোম্পানির অধিকারে নিয়ে আসার সময় সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল। ১৭৬০ সাল থেকে এই দ্বীপটি অনেকবার জরিপ (measure) করা হয় এবং প্রতিবার ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। জমিদার ও তালুকদারগণ এ ধরনের অভূতপূর্ব কঠোরতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। ১৭৬৪ সালে আরেকটি জরিপের জন্য আমিনদের পুনরায় প্রেরণ করা হয়। হাতিয়া, বামনি এবং সন্দ্বীপ—এ তিনটি দ্বীপের উত্তেজিত জমিদার ও তালুকদারগণ সন্দ্বীপের

---

১৮. Proceedings of the Board of Revenue, 15 December 1801

১৯. *Bangladesh District Records*, Chittagong, vol. 1 . 1760-1787, (Dhaka 1981), 99.

২০. Sirajul Islam,"Muslim Armed Resistance", 12-13

জমিদার আবু তুরাবের নেতৃত্বে সংগঠিত হন এবং ঘন ঘন জরিপের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে এবং কোম্পানিকে খাজনা না দিতে তাঁদের সংকল্প ব্যক্ত করেন। উক্ত তিনটি দ্বীপে জরিপের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকালে ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিল উল্লেখ করে যে "এ তিন দ্বীপের সকল জমিদার ও তালুকদার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কাছারি থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করে, বহু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীকে হত্যা করে এবং রাজস্ব প্রদান পুরোপুরি বন্ধ রাখে।" প্রাদেশিক কাউন্সিল আরো মন্তব্য করে যে "বিভিন্ন সময়ে সন্দ্বীপে দুটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে, একটি মেজর গ্রান্টের তত্ত্বাবধানে এবং অন্যটি ক্যাপ্টেন নলিকিন্সের পরিচালনায়। এ দুটি অভিযানই তৎকালীন জমিদার আবু তুরাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং তিনি নিজ বাড়িতে প্রকাশ্যে নিহত হন।"[২১]

১৭৭২-১৭৭৭ সময়ের চাষব্যবস্থার অধীনে অনেক জমিদার নিলাম ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন এবং নির্ধারিত শতকরা দশভাগ মালিকানা-ভাতার ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করেন। এসব ক্ষুব্ধ জমিদার ও তালুকদার গণঅভ্যুত্থানে প্রেরণা দান সহ স্থানীয় সংকট সৃষ্টি করে উক্ত চাষব্যবস্থাকে অকার্যকর করার চেষ্টা করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুমিল্লা জেলার হোমনাবাদের জমিদার আলী গাজী এবং মোজাফফর গাজীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিরিঙ্গি সরকারকে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেন।[২২] কুমিল্লার রেসিডেন্ট আর. লিক (R. Leeke) তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে চার বছর যাবৎ তাঁরা রাজস্ব প্রদান বন্ধ রাখেন এবং সরকারি কর সংগ্রহকারীদের কর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এলাকায় প্রবেশ সফলতার সাথে রুখে দেন।[২৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জন্য ব্যাপক সুবিধা বয়ে আনে, কারণ ততদিনে জমির মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ১৭৯৩ সালের খাজনার সমানই থেকে যায়। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থার প্রাথমিক বছরগুলোতে এটি জমিদারদের উপর কঠিন বোঝায় পরিণত হয়েছিল। তাঁরা কদাচিৎ সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে পারতেন এবং ফলশ্রুতিতে তাঁদের জমিদারি হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত কঠোর রাজস্ববিক্রয় আইনের আওতাভুক্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দশ বছরের মধ্যে বর্ধমানের রাজার জমিদারি ব্যতীত বাংলার বড় বড় সকল জমিদারি সূর্যাস্ত আইনের কার্যকারিতায় বিক্রয় হয় এবং হাজার হাজার জমিদারি এস্টেট নিলামে উঠে। হিসাব করা হয়েছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে সরকারি রাজস্বের মাপকাঠিতে বাংলার ভূ-সম্পত্তির অর্ধেকেরও বেশি রাজস্ববকেয়ার কারণে নিলামে বিক্রয় হয়ে যায়।[২৪] যেসমস্ত পরিবার

২১. *Proceedings of the Committee of Circuit of Dacca,* (printed), (3 Oct. -28 Nov. 1772), 115.

২২. Sirajul Islam, 'Muslim Resistance', 14-15.

২৩. ঐ।

২৪. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে ভূমি হস্তান্তরের সংখ্যাগত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন , Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of its Operation 1790-1819,* (Dhaka 1979), chapters iv-v

ভূমি হারায়, তারা বংশপরম্পরায় সমাজের গতানুগতিক নেতৃত্বে ছিল এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে ভূস্বামী হিসেবে তাদের পতন নিঃসন্দেহে এক বিরাট বিপর্যয় ছিল, যার জন্য তারা শুধুমাত্র ফিরিঙ্গিদের দায়ী করতো। ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে তারা সরকারের কাছে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করে এবং এমনকি তাদের অনেকেই মরিয়া হয়ে স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করে।[২৫]

অনেক পুরানো জমিদার যদিও আঞ্চলিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন, তথাপি তাঁরা তাঁদের লাখেরাজ বা খাজনা মওকুফ অধিকারের বদৌলতে কোনোভাবে তাঁদের সামাজিক সম্মান বজায় রাখতে পেরেছিলেন। অতীতে যথাযথ সরকারি অনুমোদন নিয়ে জমিদারগণ ধর্ম, সাহিত্য, বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে নিবেদিত ব্যক্তিদেরকে লাখেরাজ-স্বত্ব মঞ্জুর করতে পারতেন। একে মাদাদ-ই-মাআশ বা জীবিকানির্বাহমূলক ভূমি অনুদান বলা হতো। এসব অনুদানের মধ্যে ছিল ইমামদের জন্য আইমা (aima), সুফীদের জন্য পিরুত্তর (piruttar), ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের জন্য ব্রহ্মোত্তর (brahmuttar), প্রতীমাপূজার জন্য দেবোত্তর (debuttar), চারণ কবিদের জন্য ভাতুত্তর (bhatuttar) ইত্যাদি। এ ছাড়া বৃত্তি, মহাত্রাণ, মিল্লাকী, ওয়াকী ইত্যাদি অন্যান্য অনুদানও ছিল। এসব অনুদান সকল ধরনের শিক্ষক ও সাহিত্যিক ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্য নির্ধারিত ছিল। তত্ত্বগতভাবে এসব তামাদিযোগ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে এতে বংশগত দখলস্বত্ব ছিল। মুগল সরকারের উদার নীতির সুযোগ গ্রহণ করে অনেক জমিদার শুধু সত্যিকারের যোগ্য ব্যক্তিদেরই লাখেরাজ অনুদান মঞ্জুর করেন নি, তবে মানবিক কারণ দেখিয়ে বিপুল সরকারি রাজস্ব জব্দ করে মিথ্যা বা জ়াল নামে নিজেদের জন্য তা বরাদ্দ করেছিলেন।[২৬] প্রধানত দু'টি সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা খালসা (khalsa) বা রাজস্বভূমি সরাতে চেয়েছিলেন। প্রথমটি অতিরিক্ত আয় এবং দ্বিতীয়টি নিরাপত্তা। কোনো কারণে কিছু সময়ের জন্য জমিদারি হাতছাড়া হয়ে গেলে লাখেরাজ অনুদান তাঁদের অধিকারে থেকে যেতো। তাঁদের দূরদৃষ্টি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়ে যথাযথ প্রমাণিত হয়, যখন অনেক পুরনো জমিদার পরিবার তাদের ভূমি হারান, কিন্তু তখনও লাখেরাজ ভূমি বেনামীতে রাখার কারণে পুরোপুরি ধ্বংসের হাত থেকে তাঁরা বেঁচে যান।

কোম্পানি সরকার সুবিদিত ছিল যে সরকারি রাজস্বের বেশির ভাগ অংশ মাদাদ-ই-মাআশ নামে ফন্দিবাজ জমিদাররা বাগিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নি, কারণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তখন পর্যন্ত শিথিলভাবে গঠিত হচ্ছিল এবং জমিদারদের মতো ক্ষমতাবান কায়েমী স্বার্থকে উচ্ছেদ করার অবস্থানে ছিলনা। তবে ১৮২০ ও '৩০-এর দশকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ ছিলনা। অধিকন্তু ভীষণ আর্থিক সংকটে নিপতিত সরকার রাজস্বের নতুন

২৫. ঐ, Chapters ii-iii.

২৬. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society: Landlords, Planters and Colonial Rule 1830-1860* (Calcutta 1975), 29-30.

উৎস থেকে অধিক আয়ের পথ খুঁজতে থাকে। অকেজো লাখেরাজ ভূমিকে পুনরায় ভাড়ার আওতায় আনা সরকারের নিকট খুব আকর্ষণীয় এবং মজবুত মনে হয়েছিল। রাজস্ববোর্ডের প্রেসিডেন্ট জন শোর (John Shore) কর্তৃক তৈরি ১৭৮৯ সালের হিসাব মতে অকেজো লাখেরাজ-এর কারণে সরকার বাৎসরিক ৩৫ লক্ষ সিক্কা রুপী থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা সরকারের বাৎসরিক মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ।[২৭] ভূমি অনিরীক্ষিত থাকায় রাজস্বক্ষতির পরিমাণও কম ছিলনা এবং সেসকল ভূমি মুক্ত করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়। সরকার দাবি করে যে মুক্ত ভূমির মালিক রাষ্ট্র এবং সকল পুনঃদাবিকৃত ভূমির জন্য পৃথক বন্দোবস্ত অবশ্যই থাকতে হবে। জমিদারগণ পুনঃদাবিকৃত সকল ভূমি তাঁদের জমিদারি এস্টেটের অংশ হিসেবে দাবি করেন, যা নতুনভাবে করযোগ্য হবে না।

সরকার ১৮২০-এর দশক থেকে বাজেয়াপ্ত আইন (resumption proceedings) ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করে এবং ১৮২৮ সাল থেকে আরো আক্রমণাত্মকভাবে তা প্রয়োগ করে। জমিদার ও তালুকদারদেরকে তাদের লাখেরাজ বা তাইদাদ (taidad) কাগজপত্র পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ পদক্ষেপ জমিদারদের বেসামাল করে দিয়েছিল, কারণ তারা কদাচিৎ তাদের কাগজপত্র সঠিক ও আসল বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হতেন, যেখানে সরকার নিজেই উক্ত কাগজপত্র সঠিক হিসেবে মেনে নিতে আগ্রহী ছিলনা। বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা এ সকল পুরনো পরিবারের জন্য হুমকি হিসেবে আসে, যারা সূর্যাস্ত আইনে ইতিমধ্যেই তাদের এস্টেট হারায় এবং লাখেরাজ ব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত টিকে ছিল।

বাজেয়াপ্ত আইন নতুন করে জমিদারদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালে তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দু'টি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। সরকারি কর্মকর্তারা অকুস্থলে জরিপের জন্য আসা মাত্র স্থানীয় প্রতিরোধ সংগঠিত করা হয়। আমিন ও রাজস্ব সংগ্রহকারী এজেন্টদের তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে লাঠিয়ালবাহিনী ব্যবহার করা হয়। ফলশ্রুতিতে গ্রামাঞ্চলে পুলিশ ও জমিদারের লাঠিয়ালদের সংঘর্ষ স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।[২৮] চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো ১৭৬০-এর দশকে জরিপের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ গড়ে তোলা হয় এবং চট্টগ্রাম জমিদার বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। ১৮৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার জে. জে. হারভের নিকট পাঠানো পত্রে জেলা প্রশাসক জমিদারদের আনুগত্যহীনতা ও অসন্তুষ্টির উল্লেখ করেন, যারা তাদের এলাকায় সরকারি এজেন্সীর প্রবেশের বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। পালিত (Palit) মন্তব্য করেন, "অবস্থার এমন অবনতি ঘটে যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত সামরিক বাহিনী তলবের প্রয়োজন হয়।"[২৯] ঢোল বাজিয়ে জনগণকে সতর্ক করা হয় যাতে তারা

২৭. *Fifth Report*, Appendix 1, John Shore's Minute, 18 June, 1789, 181

২৮. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society*, 46.

২৯. ঐ।

জরিপকারীদের (measuring people) সাথে সহযোগিতা না করে এবং এলাকা থেকে তাদের বহিষ্কার করে। উভয় পক্ষে বহুজনের মৃত্যু হয়। কলকাতার এক পত্রিকা *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়াতে* চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ঘটনার বিবরণ নিম্নোক্তভাবে পরিবেশিত হয় :

> "বাজেয়াপ্ত আইন বাস্তবায়নে প্রথম রক্তপাত হয়েছে এবং আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে এটাই শেষ ঘটনা।"[৩০] কিন্তু তা শেষ ছিল না, বরং ছিল প্রথম। সিলেট এবং ত্রিপুরাতে লাখেরাজদারগণ জমি জরিপ ও অনুদানের কাগজপত্র পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত (১৮৪১) আমিন ও ডেপুটি কালেক্টরদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন। সশস্ত্র সিপাহিসহ জরিপকর্মকর্তাদের বিদ্রূপ, ইট-পাটকেল ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হতো এবং প্রায়শ এগুলো সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিত, যাতে উভয় পক্ষের লোক প্রাণ হারাতো।[৩১] অন্যান্য জেলাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে। প্রতিরোধ ফ্রন্টগুলো বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল সীমান্তজেলাসমূহে, যেমন চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে, যেখানে লাখেরাজ ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান ছিল।[৩২]

বাজেয়াপ্তকরণবিরোধী আন্দোলনের (anti-resumption movement) একটি রাজনৈতিক দিক ছিল। মফস্বল এলাকায় ব্যক্তিগত প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো ছিল বিশেষভাবে স্থানীয় ও নির্দেশনাবিহীন, অকারণ সন্ত্রাসমুখী এবং এর ফলে অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিমালিকদের দাবিদাওয়া সাংগঠনিকভাবে পূরণের বিষয়টি ছিল সময়ের দাবি এবং এ প্রয়োজনেই ১৮৩৭ সালে কলকাতা জমিদারি সঙ্ঘ (Zamindari Association of Calcutta) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল এ ধরনের প্রথম সঙ্ঘ, ১৮৩৮ সালে যার পরিবর্তিত নাম হয় ভূম্যধিকারী সমিতি (Landholder's Society)। এ সমিতি বাজেয়াপ্তকরণ ইস্যুকে মফস্বল এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের কঠোরতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত করে এবং বাজেয়াপ্তকরণ নীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় ও বিরুদ্ধবাদী এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখে এবং পার্লামেন্টে আবেদন জানিয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। ১৮৩৯ সালে ২০,০০০ ক্ষতিগ্রস্তের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয়। আবেদনকারীগণ যুক্তি উপস্থাপন করে যে বাজেয়াপ্তকরণ কর্মপন্থা আইনসিদ্ধ নয় এবং গ্রামাঞ্চলগুলো অকেজো লাখেরাজ অনুদান উৎঘাটনের জন্য নিয়োজিত অল্পবয়স্ক ও অশিক্ষিত ডেপুটি কালেক্টরদের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে। আরো অভিযোগ করা হয় যে ডেপুটি কালেক্টরগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের অপপ্রয়োগ করছিল এবং দেশের অসহায় গোষ্ঠীকে ঠকিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় প্রতিরোধ ও সমিতির আবেদন কর্তৃপক্ষকে ১৮৪০-এর দশকে বাজেয়াপ্তকরণের সমগ্র প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে।[৩৩]

৩০. *The Friend of India,* 12 January, 1837.

৩১. Report by Bidwell, special deputy collector for Tipperah and Sylhet, to the Chittagong Commissioner, 1 June 1841, Nos. 6 & 7, *Comilla District Records* (Bangladesh National Archives).

৩২. বহির্ভাগস্থ পরগনাসমূহে মাদাদ-ই-মাআশ সুবিধা বরাদ্দ মুগল সরকারের এক সাধারণ কর্মকাণ্ড ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল অর্থ প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করা এবং স্বল্প খরচে সীমান্ত রক্ষা করা।

৩৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Palit, *Tensions,* 49-51.

ধর্মীয় গোষ্ঠীর (order) প্রতিরোধ

প্রাক-বৃটিশ বাংলার রাষ্ট্রশাসনকার্যে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বৃটিশপূর্ব সব সরকার জনগণের সকল ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে। তখন সরকার শুধুমাত্র বহু ধর্মের উপস্থিতিকেই সহ্য করে নি, উপরন্তু উদারতার সাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান করে। বিদেশী শাসকদের জন্য এটি ছিল ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহকে তুষ্ট রাখার রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু পশ্চিমা, খ্রিস্টান ও মুনাফাকেন্দ্রিক কোম্পানি সরকার স্থানীয় ধর্মকে সম্মান প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। এই সরকার স্থানীয় ধর্মকে শুধুই কুসংস্কার হিসেবে দেখতো এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের কোনো রকম বাধ্যবাধকতা তাদের নেই বলে ভাবতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ফকির, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য ভিক্ষুদেরকে মুষ্টি (musthi) নামে গ্রামীণ গৃহস্থদের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণের অনুমতি দেয়া হতো না।[৩৪] ধর্ম ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মাদাদ-ই-মাআশ অনুদান প্রদানের রীতি রহিত করে দেয়া হয়। একইভাবে ধর্মীয় স্থান (shrine), মন্দির ও মসজিদের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদানও বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি ফকির ও সন্ন্যাসীগণকে সদলবলে ত্রিশূল, শিকল ইত্যাদি সহকারে গ্রামাঞ্চলে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দেয়া হতো না। ভ্রমণরত ভিক্ষুদেরকে প্রায়শই চুরি ও ছিনতাইয়ের দায়ে অভিযুক্ত করা হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্পষ্টত ক্ষুব্ধ হয় এবং নতুন সরকারের অনুসৃত নীতির কারণে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা কোম্পানি সরকারকে তাদের বৈধ শাসক হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং শুরু থেকেই প্রতিরোধ সংগঠিত করতে থাকে।

সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক সংগঠিত বিদ্রোহ গড়ে তুলেন ফকির মজনু শাহ। তিনি ফকিরদের মাদারীয়া অংশের বুরহানা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ফকিরদের সদর খানকাহ্ ছিল বিহারের কানপুর জেলার মাখনপুরে। উত্তর বঙ্গের জেলাগুলোতে ছিল মজনু শাহের নিজস্ব মুরীদদের এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এঁরা দেশের সকল স্থানে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মজনু শাহের নিকট থেকে নির্দেশ লাভ করতেন। যদিও ফকির প্রতিরোধ ১৭৬০ সালে শুরু হয়, তবে ১৭৭০-এর দশকের শুরুতে তা সাংগঠনিক দৃঢ়তা লাভ করে এবং ১৭৮০-এর দশকের শেষাবধি সক্রিয় থাকে। এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে যখন এর নেতা কোম্পানি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষকালে সম্ভবত ১৭৮৭ সালে নিহত হন।

---

৩৪. রন্ধনকালে গৃহিনীরা রান্নার পাত্র থেকে ভিখারিদের জন্য একমুঠো চাল তুলে রাখতো। ঐ ভিক্ষার চাল সংগ্রহের জন্য ভিখারিরা প্রতিটি বাড়িতে বিভিন্ন সময় পর পর যেতো। গৃহিনীকুল ও কৃষকগণ জমির উর্বরতাবৃদ্ধি, রোগমুক্তি ও মৃত্যু পরিহারের সহায়ক মনে করে উক্ত মুষ্টির চালকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতো।

১৭৮৪ সালে ফকিরগণ মজনু শাহের ভ্রাতা মুসা শাহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ, জাফরশাহী ও শেরপুর পরগনা দখল করে নেন।[৩৫] তাদেরকে এই পরগনাগুলো থেকে বহিষ্কারের জন্য কালেক্টরগণ ঢাকা থেকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ফকিরগণ শীঘ্রই গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে পশ্চাদপসরণ করেন এবং উক্ত পরগনা থেকে সৈন্যবাহিনী চলে যাওয়া মাত্র তারা ফিরে আসেন এবং তাদের বৈধ শাসক হিসেবে বৃটিশদের স্বীকার না করার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করেন। ১৭৮৪ সালে মজনু শাহ স্বয়ং বাংলার প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর সম্পর্কে কলকাতা সরকার ঢাকার চীফের নিকট লেখে, "আমরা গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েছি যে মজনু শাহ সৈন্যবাহিনীসহ সিলবারিস জেলায় প্রবেশ করেছে এবং আশা করছি যে আপনার জেলাকে তার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশে ছড়িয়ে থাকা সিপাহিদের একত্র করে এবং যুদ্ধের জন্য মোতায়েন করে আপনি যতদুর সম্ভব তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন... ।"[৩৬] ফকিরদের উৎখাতের জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে কদাচিৎ চিহ্নিত করা গেছে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ফকিরগণ সর্বদাই সরকারি বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। ফকিরবাহিনীর হয়রানিকৌশল এমন গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছায় যে কোম্পানির বাহিনী মোতায়েন থাকাকালে বাইরে থেকে গ্রামাঞ্চলকে কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত মনে হতো, কিন্তু এ বাহিনী প্রত্যাহৃত হলে কার্যত তা ফকিরদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতো। এ অবস্থার সাথে কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করার জন্য কলকাতা সরকার এর গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগকে আরো সক্রিয় করার এবং সরাসরি গভর্নর জেনারেলকে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় :

> কাউন্সিলসহ গভর্নর জেনারেলের অভিমত এই যে মজনু শ [মজনু শাহ] এবং তার অনুগতদের আক্রমণ ও ক্ষতি থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এ যাবৎ গৃহীত পদক্ষেপের চেয়ে আরো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অতএব তার এবং তার প্রধান সহযোগীদের সম্ভাব্য গ্রেফতার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাকে অনুসরণ, তার আস্তানা ও গতিবিধি চিহ্নিতকরণ এবং কিভাবে তিনি জীবন যাপন করেন তা জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ... এ বিষয়ে গভর্নর জেনারেল ও পরিষদের অবগতির জন্য আপনি শুধুমাত্র আমার সাথে যোগাযোগ করুন।[৩৭]

১৭৮৮ সালের শুরু থেকে ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কিত যথেষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। ধারণা করা হয় যে মজনু শাহ ১৭৮৭ অথবা ১৭৮৮ সালের কোনো এক সময় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বুরহানা ফকির প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে স্তিমিত

৩৫. ফকির প্রতিরোধ আন্দোলনের উপর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal* (Calcutta 1930), Mymensingh Collector to Dacca Chief, 5 February 1784; এটি সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *Bangladesh District Records : Dacca District* (1784-1787), vol,. 1 (Dhaka 1981)-এর অন্তর্ভুক্ত, 61.

৩৬. Government to Chief of Dhaka, October 18, 1784, ঐ, 100.

৩৭. Secretary of the Council to Mathew Day, Collector of Dhaka, 7 December 1787, ঐ, 423-24.

হয়ে আসে। শেষ প্রতিরোধটি ঘটে ১৭৯৯ সালে যখন শাহ্ বাহারপুর নামে এক ব্যক্তি বৃটিশদের থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে হিন্দুস্থানের 'রাজা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৮]

ফকিরদের স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৮০ এবং '৯০-এর দশকে সম্ভবত এক রীতি (fashion) হয়ে দাঁড়ায়। কুমিল্লা জেলার কালু ফকির, যাঁকে বিভিন্ন পরিচয়ে, যেমন হুল্লি ফকির, হাল্লা ফকির এবং আল্লাহ্ ফকির নামে ডাকা হতো, সেই ব্যক্তি কৃষক, জোতদার, তালুকদার ও জমিদারদেরকে তাঁর অধীনে সংগঠিত করেন এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর অনুগত প্রজা হিসেবে থাকার বিনিময়ে কাছ থেকে খাজনা দাবি করেন।[৩৯] ১৭৯২ সালে বরিশালের বলাকী শাহ রায়তদের' স্বার্থ তুলে ধরেন এবং জীয়ন নামে এক পরামর্শদাতাকে 'সুলতান' হিসেবে নিয়োগ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঢাকা জেলা কালেক্টরের (বরিশাল তখন ঢাকা জেলার অংশ ছিল) প্রতিবেদন অনুযায়ী "বলাকী শাহ নামে এক ব্যক্তি এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং কতিপয় পরগনায় জমিদারদের আটক করে...এবং রাজস্ব আদায় ক'রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন।"[৪০] এক সরকারি গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে তাঁর বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ঐ ফকির তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য কয়েক হাজার সশস্ত্র লোক সংগ্রহ করেন এবং সালিমাবাদ, নাজিরপুর ও চন্দ্রদ্বীপ পরগনার সকল জমিদারকে বৃটিশদের পরিত্যাগ করতে এবং তাঁকে প্রধান বা চীফ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেন। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে "ঐ ফকির ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করেন যে ফিরিঙ্গিদের শাসন শেষ হয়েছে ও তারা পালিয়ে গেছে এবং যদি কেউ ভবিষ্যতে ফিরিঙ্গিদের খাজনা দেয়, তবে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।"[৪১] বলাকী শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল পরগনায় বৃটিশ শাসনের শুরুতে বৃদ্ধিকৃত সকল কর বিলুপ্ত করা হয়। রাজস্বের হার হ্রাস করে বলাকী শাহ ঘোষণা করেন যে প্রতি কানি (প্রায় এক একর) জমির জন্য দুই রূপী খাজনা নেয়া হবে; কেউ তার অধিক নিয়ে থাকলে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাকে জরিমানা করা হবে।"[৪২]

দুঃসাহসী বলাকী শাহকে দমন করার জন্য ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত এক শক্তিশালী সিপাহিবাহিনী প্রেরিত হয়। বলাকী শাহের মাটির দুর্গে (mud fort) আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে বন্দি করা হয়। ঢাকার নিজামত আদালত তাঁকে বিদ্রোহ ও রক্তপাতের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং সাত বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে।[৪৩]

৩৮. Bengal Criminal and Judicial Consultations, 23 April 1801, No. 25.

৩৯. Collector of Tipperah to Chief of Dhaka, April 24, 1787 ; in Sirajul Islam (ed.), *Dacca*, 304-10

৪০. Bengal Revenue Consultations, 10 February 1792, No 6

৪১. ঐ।

৪২. ঐ।

৪৩. Bengal Revenue Consultations (Judicial), 10 May 1792.

আমরা বৃটিশ শাসন বিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠীর আরো অনেক প্রতিরোধের উদাহরণ দিতে পারি। এসব স্থানীয় প্রতিরোধ ইঙ্গিত দেয় যে জনগণ, বিশেষ করে ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ, যারা সাধারণ রায়ত হিসেবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা নতুন সরকারকে সামগ্রিকভাবে মেনে নেয় নি। তাই রায়তদের সমর্থনে তারা তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করে। স্থানীয় পর্যায়ে তাদের স্বাধীনতা জনগণের সত্যিকার জাতীয়তাবাদী চেতনার ইঙ্গিত দেয় না, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। নতুন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গঠনপ্রক্রিয়ায় শাসকের বিধি-বিধান তাঁর কর্মচারীগণ আসার পূর্বেই পল্লী অঞ্চলে পৌঁছে যেতো। প্রতিরোধকারী জনগণ নতুন শাসকদের সম্পর্কে শুনে থাকলেও তাদেরকে কদাচিৎ চোখে দেখেছিল। এজন্য সহজেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এক কথায়, গ্রামাঞ্চলের মানুষ নতুন শাসকদের অধীনে সুখী ছিল না, তাই নতুন অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে যিনি এগিয়ে আসতেন তাঁকেই তারা সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকতো।

ধর্মীয় স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে শেষ হয়ে যায়, যখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন পূর্ণতায় পৌঁছে এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণী হিসেবে ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে বাস্তবতার নিরিখে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে এবং নতুন শাসকগোষ্ঠীর সাথে সমঝোতায় আসে, যদিও ময়মনসিংহের শেরপুরের ন্যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখনো ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে নি, যেখানে পুরনো কায়দায় ধর্মীয় প্রতিরোধ লক্ষ্য করা গেছে। শেরপুর ও সুসাং পরগনায় টিপু শাহ ও তাঁর উপজাতীয় অনুসারীগণ নতুন শাসকের ভূমিনীতি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং প্রথমে ১৮২৪ ও পরে ১৮৩৩ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। টিপু ও তাঁর অনেক অনুসারীকে বন্দি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪৪] তিতুমীর, শরিয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার সাথেও নতুন শাসক ও তার স্থানীয় প্রতিনিধি জমিদারদের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তাঁদের বিদ্রোহের এক নতুন মাত্রা ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকের সাথে তাঁদের দ্বন্দ্ব ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের কারণে ঘটে, প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থের সংঘাতের কারণে নয়। এভাবে সংস্কারবাদী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জমিদারগণ ও সরকার আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় হস্তক্ষেপ করে এবং ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪৪. টিপুর বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ দ্র., Willem Van Schendel, "Pagalpanthi Rebellion of Mymensingh (Bangla)"; এটি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুন্তাসির মামুন সম্পাদিত *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা, ১৯৮৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪।

এথনিক প্রতিরোধ

সমাজের প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট উপজাতি হিসেবে পরিচিত বাংলার এথনিক সংখ্যালঘু জনগণ প্রধানত পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণের সীমান্তে উপ-পার্বত্য (sub-montane) অঞ্চলে বাস করতো। সীমান্তের প্রান্তিক সমাজ হিসেবে এথনিক গোষ্ঠীগুলো বাঙালিদের থেকে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতো। এমনকি তারা নিজেরাই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতো। প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব এলাকা এবং জীবনপ্রণালী ছিল। স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে প্রতিটি উপজাতি স্ববিবর্তিত ব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপন করতো এবং তারা কদাচিৎ বহিঃস্থ প্রভাব ও হস্তক্ষেপের প্রভাবাধীন ছিল। প্রাক-বৃটিশ সকল শাসক এসব উপজাতির এলাকাকে মধ্যবর্তী অঞ্চল (buffer states) হিসেবে গণ্য করতো এবং কদাচিৎ তাদের এলাকায় হস্তক্ষেপ করতো। কিন্তু কোম্পানি সরকার এ সকল সীমান্ত-অঞ্চলকে রাজস্বের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। উপ-পার্বত্য এলাকাসমূহকে কোম্পানিরাষ্ট্রের আওতাধীনে আনা হয় এবং উপজাতির জনগণকে নগদ অর্থ বা দ্রব্যে রাজস্ব পরিশোধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়। এ ধরনের বিনিময়ের মাধ্যম উপজাতিদের নিকট অজ্ঞাত বিষয় ছিল।

উপজাতীয় সমাজগুলোর নিকট রাষ্ট্রের আইনের বশ্যতা স্বীকার এক অজানা অভিজ্ঞতা ছিল এবং স্পষ্টত তারা এ জাতীয় বশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ও উপজাতির বিদ্রোহের মধ্যে একটা ধনাত্মক সম্পর্ক ছিল। এ বক্তব্যের সপক্ষে অনেক উদাহরণের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রতিনিধিত্বশীল উপজাতিবিদ্রোহের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

খাসি বিদ্রোহ (The Khasis Resistance)

স্থানীয় জনগণকে, বিশেষকরে খাসি জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালে রবার্ট লিন্ডসেকে সিলেটে রেসিডেন্ট (Resident) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এ অঞ্চল সম্পর্কে মানসিক জরিপ চালিয়ে পাহাড়ী সমাজে ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। খাসি পাহাড়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে জাহাজ নির্মাণসামগ্রী, কাঠ, লোহা, সিল্ক, মোটা বা অসূক্ষ্ম মসলিন, হাতির দাঁত, মধু, আঠা, কমলা, লেবু ইত্যাদি পাওয়া যেতো। কিন্তু খাসি জনগণের অর্থনীতি কোম্পানির সাথে ব্যবসা করার অনুকূল ছিলনা। অধিকন্তু লিন্ডসে মন্তব্য করেন, "গ্রামের প্রত্যেক চীফ (chief) নিজেকে রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং নিজস্ব এলাকায় তাঁর স্বাধীন সরকার রয়েছে।" গ্রামে চীফের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে লিন্ডসে আরো উল্লেখ করেন, "তারা নিজস্ব ধারণায় পুরোপুরি স্বাধীন। আমি রাজা ও প্রধান ব্যক্তিদের সাথে প্রায়শ পূর্বে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু একেবারে সমভাবে তা সম্ভব হয় নি, কিছু ক্ষেত্রে তারা সাক্ষাৎ দানে অস্বীকার করে। তারা আমাকে কোনো উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা দেয় নি এবং নিজেদের

পরিণাম সম্পর্কে তারা ছিল নাছোড়বান্দা (tenacious)।"[৪৫] লিন্ডসের মতে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাহাড়ী সমাজে অনুপ্রবেশ করা তাদের স্বাধীন মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে সম্ভব ছিলনা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র খাসি জনগোষ্ঠীকে কোম্পানি সরকারের আওতাধীনে আনার জন্য সীমিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তা পাহাড়ী জনগণের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের কারণ হয়।

খাসিরা পশ্চিমে পান্দুয়া থেকে পূর্বে লাউর পরগনা পর্যন্ত সমতলের জমিদারদের সাথে আঁতাত করে এবং কোম্পানির রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াকে নাজেহাল করে।[৪৬] খাসি জনগোষ্ঠীর সংহতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে সরকার সফলতার সাথে চীফদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি করে। ১৭৮৩ থেকে ১৭৯০ সাল পর্যন্ত খাসি জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকৃত সমতল ভূমি থেকে বের করে পাহাড়ের দিকে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে তাড়িয়ে পাহাড়ে উদ্বাস্তু করার পর আপোস-মীমাংসার দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং বলা হয় যে "তারা শান্তিপূর্ণ আচরণ সাপেক্ষে কোম্পানির এলাকায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে খোলাখুলি আদান-প্রদান করতে পারবে; তাদেরকে সশস্ত্রভাবে চলার অনুমতি প্রদান করা হবেনা; এবং যদি তারা কোম্পানির চৌহদ্দিতে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করে অথবা তাদের এলাকায় আক্রমণ চালায়, তবে ব্যক্তিগত শত্রু ও অনধিকারপ্রবেশকারী হিসেবে তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশসহ তাদের অঞ্চলে তৎক্ষণাৎ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা যাবে।"[৪৭] খাসি প্রতিরোধ আন্দোলনের নায়ক ছিলেন গঙ্গা শাহ, যাঁকে বৃটিশ বাহিনী বন্দি করে। কোম্পানিকে অবজ্ঞা করার দায়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

চাকমা প্রতিরোধ

খাসি ভূমির ন্যায় পার্বত্য অঞ্চলেও ব্যবসা ও রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোম্পানি রাষ্ট্রকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠী চাকমাদের অনুরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন করে। চাকমারা মুগলদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, কারণ মুগল শাসনে সূতার বিনিময়ে রাজস্ব প্রদান ব্যতিরেকে তাদের কাছ থেকে আর কোন কিছু দাবি না করে তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে নিজস্ব জীবন যাপনের অনুমতি দেয়া হতো। ১৭৩৩ সালে চাকমা চীফ শেরমস্ত খান পার্বত্য এবং চাষাবাদযোগ্য চাকলা রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলের জমিদারিসনদ লাভ করেন এবং জমিদার হিসেবে চাকমা চীফ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসেন। ঔপনিবেশিক সরকার স্বায়ত্তশাসনের পুরনো নীতি বাতিল করে

---

৪৫. Lindsay's 'Report on Khasis', 14 December 1787. cited in Nisith Ranjan Ray (ed.), *Challenge : A Saga of India's Struggle for Freedom* (New Delhi 1984, 133.

৪৬. Collector of Sylhet, Willes, to Governor General Cornwallis, 18 November 1789, cited in ঐ, 135.

৪৭. খাসি জনগোষ্ঠী ও কোম্পানির দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সিলেটের জেলা কালেক্টর এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেল ও রেভিনিউ বোর্ডের মধ্যে অনেক চিঠির আদানপ্রদান হয়। দেখুন, ঐ, 134 139, 12.

চাকমাদেরকে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। তাদেরকে নগদ রাজস্ব প্রদান করতে বলা হয়। রাঙ্গুনিয়া জমিদারিতে খাজনার হার বৃদ্ধি করা হয়। যখন চাকমা রাজা জুয়ান বক্স বর্ধিত খাজনা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন রাঙ্গুনিয়া এস্টেটকে কলকাতার এক বানিয়ার নিকট ইজারা দেয়া হয়। রাজার খাজনামুক্ত ভূমিসমূহ পুনর্দখল (resumed) করা হয়। এসব পদক্ষেপ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে এত বেশি ক্ষুব্ধ করে যে ১৭৭৬ সালে তারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং রাজার দীউয়ান রানু খানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।[৪৮]

সাংগঠনিকভাবে রানু খান গেরিলাকৌশল অবলম্বন করেন। তাদের যুদ্ধকৌশল ছিল আঘাত করে সরে পড়া (hit-and-run)। রানু খান ছিলেন সামরিক সর্বাধিনায়ক। তাঁর অধীনে বেশ ক'জন সেনাপতি (commander) ছিলেন। আবার তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল পালোয়ান নামে সৈনিকরা, যাদের অধিকাংশ কুকী গোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করা হয়। দাপ্তরিক বিবরণী ইঙ্গিত দেয় যে জুয়ান বক্স এবং রানু সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে বৃটিশ শাসনমুক্ত করেন এবং তদুপরি তাঁদের অধিকৃত এলাকা সমগ্র রাঙ্গুনিয়া ও সমতলসংলগ্ন অন্যান্য এলাকাতেও সম্প্রসারিত করেন। পূর্বতন জমিদারি রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলের উপর তাদের আক্রমণের মূল চাপ কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৭৭৭ থেকে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে তিনটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু বিদ্রোহীদের পরাভূত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রতিরোধী চাকমাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযানের বর্ণনা দিয়ে চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখে :

> "... যেহেতু এই লোককে (রানু খান) সর্বদা মর্যাদাহীন এবং বিবেচনার অযোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়েছে, আমি আশা করেছিলাম যে তাকে আটক করে অবিলম্বে তার অশুভ উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হবো, কিন্তু আমার কর্মসূচি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। লোকটি নিজস্ব বাসভূমি থেকে পালিয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে প্রেরিত ৫০ জন সিপাহি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, তারা শত্রুকে অনুসরণ করে এবং দুই বা তিনটি পাহাড় ও গ্রাম দখল করে এবং জ্বালিয়ে দেয়, যেখানে তারা অগ্রবর্তী ছিল; এটি তাকে বশে আনতে পর্যাপ্ত ছিলনা; সে আরো অধিক সংখ্যক লোক জড়ো করে, তারা তেমন সশস্ত্র না থাকলেও অভিযানকালে কিছু সিপাহিকে হয়রানি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপতি (Commanding Officer) ক্যাপ্টেন এলারকার গতকাল অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণ যথাযথ বিবেচনা করেন, যার ফলে নিয়োজিত সিপাহির সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ১১৫ জন, যাদেরকে বাধাদান করে বিপুল সংখ্যক কুকী উপজাতির লোক। এদেরকে ডেকে এনেছে রুনু কন (Runoo Cawn)। এরা বাস করে পাহাড়ের অনেক অভ্যন্তরে। এরা অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না এবং এদের দেহ থাকে অনাবৃত।"[৪৯]

৪৮. চাকমা প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, "Tribal Resistance in Chittagong Hill Tracts (1776-87)"; Nishith Ranjan Ray et. al (ed.), *Challenge* 122-128.

৪৯. Chittagong Council to Warren Hastings, 25 September 1775, in Sirajul Islam (ed.), *Chittagong District Records*, vol. I (Dhaka 1978), 239.

সিলেটে যখন চাকমাদের প্রতিরোধ চলছিল, তখন এ প্রতিরোধ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে প্রথমে সমতলের পরগনা থেকে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে তাড়িয়ে এ এলাকাকে তাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার এবং তারপর দীর্ঘস্থায়ী মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনার পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু যখন চাকমা নেতা কোম্পানির সাথে সমঝোতায় আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন আরো কঠোর ও অমানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সব ধরনের দ্রব্য, যেমন শুকনো মাছ, লবণ, মৃন্ময় দ্রব্য, লৌহ দ্রব্য, মুদি দ্রব্য, মশলা ইত্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়, যেগুলোর উপর পাহাড়ী জনগণ পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। এ অবরোধ খুব বেশি সফল হয় নি, কারণ বিদ্রোহী বাহিনী অন্যান্য স্থান থেকে বিকল্প সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। আবার যখন সিলেটে বিদ্রোহ বিস্তারলাভ করে, তখন চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় এবং এদের এক জনের পক্ষ নিয়ে অন্য জনকে পরাভূত করতে সচেষ্ট হয়। গুপ্তচরের মাধ্যমে চাকমা চীফ জুয়ান বক্সের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে রানু খান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং শীঘ্রই তিনি রাজাকে বহিষ্কারের উচ্চ অভিলাষ নিয়ে আঘাত হানবেন। এ কৌশলে কাজ হয়। রানু খানের অগোচরে জুয়ান বক্স সরকারের সাথে গোপন আলোচনা শুরু করেন, যার ফলে গভর্নর জেনারেল জুয়ান বক্সকে কলকাতায় গিয়ে রাজনৈতিকভাবে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান।[৫০]

১৭৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জুয়ান বক্স কলকাতায় যান এবং সরকারের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয়, কোম্পানি সরকার তাঁকে বৈধ চীফ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে এবং তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর এলাকা শাসন করবেন। আরো ঐকমত্য হয় যে জুয়ান বক্স রাঙ্গুনিয়া পরগনায় তাঁর জমিদারিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন এবং অন্যান্য জমিদারের মতো কোম্পানি রাষ্ট্রের একজন জমিদার হিসেবে দেশের সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত হবেন।[৫১] রানু খান, যিনি এ যাবৎ প্রতিরোধ আন্দোলনের চূড়ান্ত সামরিক নেতা ছিলেন কিন্তু রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন, তিনি নির্জন স্থানে গমন করেন এবং তাঁর সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় নি।

সাঁওতাল প্রতিরোধ

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় উপজাতীয় জনগণের মধ্যে যারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যমান সমস্যার প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারা হচ্ছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। ১৮৫৫ সালে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ সংগঠিত করে, যে শাসন তাদের সংস্কৃতি ও নিজস্ব জীবনপ্রণালীর প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রতিরোধের বেশ কিছু কারণ নরহরি কবিরাজ যথার্থভাবে চিহ্নিত

৫০. Proceedings of the Committee of Revenue, 28 March 1785, *Chittagong District Records*, vol. 509 (National Archives of Bangladesh)

৫১. Board of Revenue Proceedings, 29 March 1787.

করেছেন। কারণগুলো হলো—"মহাজনের নিপীড়ন, জমিদারের অত্যাচার, সরকারের বর্ধিত খাজনা আরোপ, ইউরোপীয় রেলওয়ের ঠিকাদার কর্তৃক বলপ্রয়োগে শ্রমিক খাটানো, মাঁঝি (manjhi) ও পরগনাইত (parganait)-এর অধিকার হ্রাসকরণ ইত্যাদি।"[৫২]

সাঁওতাল সমাজকাঠামোতে শাসক এলিটশ্রেণী ছিল মাঁঝি (manjhi) নামে বংশগত শ্রেণী, যার পরে ছিল পরগনাইত বা পরগনাপ্রধানগণ। তাদের আধিপত্য আধুনিক রেলব্যবস্থা, শ্রমব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়। উক্ত শাসক শ্রেণী অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নবর্ণভুক্ত উপজাতিকে (ডোম, বাউরি, লোহার, গোয়াল ইত্যাদি) সাথে নিয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বিরভূম জেলা ও ভাগলপুর সংলগ্ন পরগনাগুলোর উপর দরিদ্র মানুষের শাসন (poor man's raj) প্রতিষ্ঠা করে।[৫৩] বিদ্রোহীরা বৃটিশদের শান্তি প্রস্তাব তখনই মেনে নেয়, যখন ঐতিহ্যবাহী স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা সহ তাদের সকল দাবি সরকার পূরণ করে।

কৃষক প্রতিরোধ

মুগলদের ছিল একটি প্রধানত কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্য এবং তার অধীনে ছিল প্রধান উৎপাদকগোষ্ঠী হিসেবে রায়তগণ, যারা রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতো। যদিও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষি-উদ্বৃত্তের প্রায় সবটুকুই করের আকারে আদায় করা হতো, তথাপি রায়তদেরকে নিপীড়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটন থেকে নিস্তার লাভের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগের অনুমতি দেয়া হয়। মুনাফাশিকারি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দুঃসময়ে খাজনা মওকুফ এবং টাকভী ঋণের মতো কোন সুবিধা প্রদান ছাড়াই সকল কৃষকের উদ্বৃত্ত আদায়ে বদ্ধপরিকর ছিল। সরকারের ভূমিনীতি প্রজাদেরকে সরকারি প্রতিনিধি তথা ভূস্বামীদের শোষণের শিকারে পরিণত করে। যে ঐতিহ্যবাহী গ্রামপঞ্চায়েত প্রথাগতভাবে গ্রামে আইন-শৃঙ্খলা তদারক করতো, তার জন্য সরকারি সহায়তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বিচ্ছিন্ন (alienated) গ্রামসমাজ তখন অসহায়ভাবে রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধি, যেমন জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, বানিয়া, ব্যবসায়ী, একচেটিয়া কারবারি, আমলা প্রভৃতির শোষণের শিকার হয়। কৃষক সমাজ বিভিন্ন সময়ে এদের বিরুদ্ধে এবং এদের মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

কৃষক বিদ্রোহকে এর অন্তর্নিহিত কারণগুলোর প্রকৃতি অনুসারে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কারণগুলো হচ্ছে : (১) কৃষকদের খাজনা ও অধিকার সংক্রান্ত নীতি বা

৫২. Narahari Kaviraj, "Peasant and Adhivasi Uprisings"; Nishith Ranjan Ray et. al. (ed.), *Challenge*, 116.

৫৩. সাঁওতাল বিদ্রোহের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে নরহরি কবিরাজ রচিত গ্রন্থ, *The Santhal Rebellion, Problems of National Liberation*, Vol IV, No. 1

প্রথা লঙ্ঘন; (২) প্রচলিত খাজনার হার অগ্রাহ্য করে যুক্তিহীনভাবে খাজনার হার বৃদ্ধিকরণ; এবং (৩) কৃষিশ্রম শোষণ। উপরোক্ত তিন পর্যায়ের বিদ্রোহ থেকে আমরা উদাহরণ হিসেবে মাত্র একটি (typical) কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ করবো।

রংপুর কৃষক বিদ্রোহ

১৭৭২-১৭৭৭ সালের পঞ্চবর্ষব্যাপী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত এবং সে সময় থেকে বাৎসরিক বন্দোবস্তের অধীনে ভূমি সর্বোচ্চ নিলামে ইজারা দেয়ার পদ্ধতি কৃষকদের স্বার্থে এক বিধ্বংসী আঘাত ছিল। প্রথাগতভাবে রায়তগণ পরগনা নিরিখ অনুসারে ভূমিকর প্রদান করতো এবং তা বংশগত জমিদারদের দ্বারা সংগ্রহ করা হতো, যাদের সরকারি অনুমোদন ব্যতিরেকে পরগনা নিরিখ পরিবর্তনের অধিকার ছিলনা। স্পষ্টত রাজস্ব প্রদানকারী কৃষকদের (revenue farmers) প্রধান লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা। চুক্তি অনুসারে সরকারি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ও নির্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত মুনাফার জন্য এসব কৃষক বাধ্য হয়ে পরগনা নিরিখ অগ্রাহ্য করে, রাজস্বহার বৃদ্ধি করে এবং অবৈধভাবে আবওয়াব (abwab) বা কর সংগ্রহ করে। এতে অতিরিক্ত করভারে ভারাক্রান্ত রায়তেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। অনেক স্থানে তারা নিষ্ক্রিয় এবং কোন কোন সময় সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়।

রংপুর বিদ্রোহ

যাহোক, ১৭৮৩ সালে রংপুরে রায়ত-অসন্তোষের সবচেয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে কম্পিত করে তোলে। এটা ছিল কলকাতার এক রাজস্ব ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দেবী সিংহ রাজস্বহার বৃদ্ধি করেন এবং পরিবর্তিত হারে প্রজাদের খাজনা দিতে বাধ্য করেন। অধিকন্তু, তিনি কৃষকদেরকে দেরিনউইলা (Derinwilla) নামে নতুন কর (abwab) দিতে নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা বিলম্বে করপ্রদানকারীদের উপর আরোপ করা হয়। আরেকটি নতুন আবওয়াব, যা প্রজাদের দিতে হতো, তা হলো হুন্দিয়ান (Hundian) বা অর্থ বিনিময় ও প্রেরণ সংক্রান্ত কর। দেবী সিংহের গোমস্তারা নিজেদের ভোগের জন্য প্রজাদেরকে আবওয়াব পরিশোধে বাধ্য করে।

দেবী সিংহ ক্ষুদে স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহকারী এক ইজারাদার ছিলেন। উক্ত ভূমালিকগণ দেবী সিংহ ও কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। সাধারণ প্রজাদেরকে বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে নিষেধ করা হয় এবং ফলে উৎসাহী প্রজারা দেবী সিংহকে কোন রাজস্ব প্রদান করে নি এবং সেই সাথে তাঁকে রংপুর ও দিনাজপুরে অবাঞ্ছিত (undesirable) ব্যক্তি ঘোষণা করে।[৫৪]

৫৪. রংপুর প্রজা বিদ্রোহের উপর বিস্তারিত দেখুন, Narahari Kaviraj, *A Peasant Uprising in Bengal, 1783* (New Delhi 1972).

১৭৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে বামনডাঙ্গা ও তেপাহ পরগনায় বিদ্রোহ শুরু হয় এবং তা শীঘ্রই অন্যান্য পরগনায় ছড়িয়ে পড়ে। সব স্থানেই প্রজারা 'ইজারাদার দেবী সিংহের মুণ্ডু চাই' স্লোগান দেয়। এ যাবৎ দেবী সিংহের গোমস্তাদের দ্বারা আটককৃত সকল খেলাপী প্রজাকে মুক্ত করা হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় ইজারাদারের অনেক প্রতিনিধি নিহত হয়। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন প্রথমে ধীরাজনারায়ণ নামে এক ক্ষুদে ভূস্বামী এবং পরবর্তীতে নূরুল-আল-দীন, যিনি নিজেকে দেশের 'নবাব' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দয়াশীল নামে আরেকজন ক্ষুদে ভূস্বামী (petty landholder) তাঁর দীউয়ান বা ডেপুটি ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে সরকারি বাহিনীর সাথে সামরিক সংঘর্ষে নিহত হন। সৈন্যরা অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করে দেয়। আতঙ্কিত ও ভীত প্রজারা পরে আত্মসমর্পণ করে এবং সরকারি শর্তাবলী মেনে নেয়। শর্তের একটি বিষয় ছিল, সকল খাজনা বর্ধিতকরণ বাতিলযোগ্য হবে ও সংগৃহীত খাজনা ফেরত দেয়া হবে এবং আগামীতে কৃষকদের স্বার্থ বিবেচনা না করে খাজনার হার বৃদ্ধি করা হবে না। বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে জড়িত প্রজাদেরকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

নীল বিক্ষোভ (Indigo Disturbances)

কোম্পানিশাসনে অনেক অর্থকরী ফসল প্রবর্তন করা হয়, যেগুলোর একটি হলো নীল—এক জাতীয় রঙীন গাছ। রাজস্ব পরিশোধের জন্য কৃষকদের নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং নীল চাষ তাদেরকে এই নগদ অর্থ লাভের উত্তম সুযোগ এনে দেয়। এই শস্য প্রাচীনকাল থেকে ঘরোয়াভাবে (domistically) উৎপাদিত হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপীয়দের দ্বারা তা বাজারজাত করা হতো এবং ১৮২০-এর দশক থেকে ব্যাপক আকারে এর চাষ সম্প্রসারিত করা হয়। ১৮২৯ সাল নাগাদ যখন ইউরোপীয় আবাদকারীগণ (planters) প্রথম বারের মতো গ্রামাঞ্চলে জমিদারি ব্যবস্থার অধিকারী হয় এবং কর্তৃত্ব অর্জন করে, তখন নীলচাষীরা এ আবাদে খুশী হয়, কারণ নীল খামারে সহনীয় শ্রমের বিনিময়ে তারা নগদ অর্থ লাভ করে। কিন্তু এ সম্পর্কটি বেনটিঙ্ক-এর শাসনামলে পরিবর্তিত হয়। মজুরিশ্রমিক দ্বারা নীল উৎপাদনের কৌশল নীলের রায়তী আবাদ অধিকভাবে চালু করে। নীলকরগণ (Indigo planters) এস্টেটসমূহের মালিক ছিলেন এবং তারা প্রজাদেরকে ক্রমবর্ধমান হারে অসুবিধাজনক শর্তে নীল চাষে বাধ্য করতেন। যতদিন পর্যন্ত নীল যথেষ্ট মুনাফা অর্জনকারী খাত ছিল, নীলচাষীরাও উচ্চ মজুরিহারের ভাগ পেত। কিন্তু ১৮৪০ এবং '৫০-এর দশকে বিশ্বে নীলের বাজারে ভয়ানক মন্দা দেখা দেয় এবং ফলশ্রুতিতে নীলরায়তদের মুনাফাও কমে যায়। ১৮৫০-এর দশকের শেষ দিকে প্রজাদের জন্য নীলচাষ লোকসানের খাতে পরিণত হয়। হিসাব করা হয়েছিল যে এক বিঘায় নীল চাষ করতে প্রজারা ২ থেকে ৩ রূপী খরচ করতো এবং উৎপাদিত শস্যের জন্য নীলকরদের কাছ থেকে প্রায় সমান অথবা কম অর্থ লাভ করতো। প্রজারা ঐ শস্য উৎপাদনে আইনত বাধ্য ছিল, কারণ নীলকরদের কাছ থেকে তারা যে অগ্রিম নিত তা

কদাচিৎ তারা পরিশোধ করতে পারতো। হিসাববইতে তাদের বকেয়া পুঞ্জীভূত হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে শস্য উৎপাদনে অনাগ্রহী রায়তদেরকে আদালতে অভিযুক্ত করার হুমকি দেয়া হতো, যা ছিল সম্পূর্ণরূপে নীলকরদেরই প্রভাবাধীন। নীল ক্রমান্বয়ে দমন ও ভীতি প্রদর্শনের প্রতীকে পরিণত হয়। ১৮৫৯ সালে বাংলায় প্রায় ৫০০ নীলকর ১৪৩ টি নীলক্ষেতের মালিক ছিল এবং এগুলোর অধিকাংশই নদীয়া ও যশোর জেলায় অবস্থিত ছিল। এবং এ দুই জেলা থেকেই সবচেয়ে হিংস্র বিদ্রোহ শুরু হয়। এর নেতৃত্ব দেন প্রধানত জমিদার এবং মধ্যগ (intermediate) ভূমালিক ও ধনী কৃষকগণ, যারা ক্ষমতাকাঠামোতে নীলকরদের প্রতিপক্ষ ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার আওরঙ্গাবাদ কুঠি থেকে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শীঘ্রই তা সকল নীল জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের জন্য প্রস্তুতকৃত এক বিশেষ প্রতিবেদনে বিদ্রোহের সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে :

> নীলচাষের বিরুদ্ধে নিয়মিত এক লীগ (league) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এতে শপথ গ্রহণ করে। ঢোল বাজিয়ে এক গ্রামের রায়তদেরকে অন্য গ্রামের রায়তদের সহায়তা দানের আহ্বান জানানো হয়। বলা হয় যে যদি তারা নীলকরদের ভৃত্য প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং তাদেরকে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হয়, তবে তারা বিরোধিতা করবে; সংকেত প্রেরিত হয় ও চাঁদা তোলা হয়; ঢোলের আহ্বানে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে আসে এবং সশস্ত্র অবস্থায় বড় দলভুক্ত হয়ে হুমকিগ্রস্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হয়; প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেদের পদ্ধতিতে সবকিছু করে, পুলিশরা ভীত হয় এবং রায়তদের দ্বারা পরাভূত হয়।[৫৫]

১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নীল বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। ঐ সময় অনেক নীলকর তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয় এবং তাদের এস্টেট বিক্রি করে দেয়। কিন্তু বাংলায় নীল পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় নি। অনেক নীলকর খাজনা হ্রাস করে এবং ভদ্র আচরণ করে প্রজাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে। কিন্তু নীলের বাজার দ্রুত হ্রাস পায়। বিশ্ববাজারে নীলের চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে নীলকরগণ বাংলায় একের পর এক তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে থাকায় কৃষকগণ স্বস্তি বোধ করে।[৫৬]

পাবনা কৃষক বিদ্রোহ

নীল বিদ্রোহের পর দুই দশক ধরে অব্যাহত শান্তি বিরাজ করে। কৃষক সমাজ তাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সুখে বাস করছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ১৮৭০ এবং '৮০-এর দশকে প্রজাগণ পুনরায় প্রতিরোধমুখী হয়ে উঠে। ১৮৬০-এর দশকে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি

---

৫৫. Judicial Proceedings, 432-435, June 1860 (B-Proceedings).

৫৬. নীল বিদ্রোহের উপর উত্তম উৎসগুলোর কয়েকটি : Blair B. King, *The Blue Mutiny*, (Philadelphia 1966); Chittabarata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society* (Calcutta 1975); *Report of the Indigo Commission* (Calcutta 1860).

এবং ভূমির উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপের ফলে ভূমালিকরা (landowners) খাজনার হার বৃদ্ধিতে তৎপর হয়। কিন্তু রায়তগণ পরগনা নিরিখ অনুযায়ী খাজনা প্রদানে তাদের রীতিসিদ্ধ অধিকারের উপর জোর দেয়। ১৮৭০ থেকে দুই দশকের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে কৃষক বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায় সুন্দরবনের তুষখালিতে (১৮৭২-৭৫), নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ায় (১৮৭৪), উপ-পার্বত্য ময়মনসিংহে (১৮৭৪-৮২), ঢাকার মুন্সিগঞ্জে (১৮৮০-৮১) এবং মেহেদীগঞ্জে (১৮৮০-৮১)।

সবচেয়ে প্রচণ্ড কিন্তু ব্যাপকভাবে অহিংস ও সুসংগঠিত ছিল ১৮৭৩ সালের পাবনা কৃষক বিদ্রোহ। পাবনার জমিদারগণ, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে নিলামক্রেতা হিসেবে ভূমি নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন অনাবাসিক (non-resident)। সময়ে সময়ে খাজনা বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভূমালিকরা সকল ধরনের আবওয়াব (abwab) সংগ্রহ করতেন। যখন অহরহ খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ আবওয়াব সংগ্রহ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদনে কাজ হলোনা, তখন ক্ষুব্ধ প্রজারা ১৮৭৩ সালে খোলাখুলিভাবে অমান্য আন্দোলন শুরু করে। অমান্য আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রথমে সিরাজগঞ্জে শুরু হয়। শীঘ্রই তা অন্যান্য পরগনা ও জেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

রায়তরা নিজেদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্বের অধীনে বিভিন্ন জোট ও লীগে সংগঠিত করে।[৫৭] আইনসম্মত যুদ্ধ করা ও সার্বক্ষণিক লাঠিয়াল বাহিনী পরিচালনার জন্য সংগঠকগণ সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা নিজেদের দাবির ব্যাপারে জনগণকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা চালায়। এক গ্রামে সফল হলে তারা অন্য গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণের ফলে সমগ্র জেলা কৃষক লীগসমূহের সমর্থকে পরিণত হয়। প্রথম দিকে নেতৃত্ব প্রদান করেন দৌলতপুরের এক ক্ষুদে ভূস্বামী—ঈশ্বর চন্দ্র রায়। শীঘ্রই জগতুলার খুদি মোল্লা নামে এক মুসলমান জোতদার জোটগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি কৃষকদের মধ্যে 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে পরিচিত হন। পরবর্তীতে আরেকজন কৃষকনেতা খ্যাতি লাভ করেন। তিনি হলেন ষোলঘরের চন্দ্রনাথ মজুমদার। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে অনাবাসিক জমিদারদের সাথে সাধারণ কৃষক সমর্থিত স্থানীয় ক্ষুদে ভূমালিকদের বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। খাজনা প্রদান বন্ধ রাখা হয় যতক্ষণ না বৃহৎ অনাবাসিক জমিদারগণ কৃষকদের এ দাবি মেনে নেন যে ভূমির উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং বিনা কারণে ভূমালিকদের খাজনা বৃদ্ধির কোনো অধিকার নেই। এ ধারণা কৃষকদের মধ্যে সাধারণভাবে বিরাজ করছিল এবং এ ধারণা পোষণে তারা কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় নি, বরং রীতিসিদ্ধ অধিকারের ব্যাপারে তাদের সচেতনতাই এর মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। গ্রামাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যকার

৫৭. কে. কে. সেনগুপ্ত তাঁর পুস্তক ও প্রবন্ধে কৃষকদের সাংগঠনিক কাঠামো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। দেখুন, তাঁর রচিত গ্রন্থ *Pabna Disturbances and the Politics of Rent* 1873-1885 (New Delhi 1974); আরো দেখুন, "Agrarian League of Pabna", *Economic and Social History Review*, 7:2 (1970), 253-69.

সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ১৮৮৫ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংবিধানে ঈষৎ পরিবর্তন করে ১৮৮৫ সালে এক নতুন প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়। এভাবে ১৮৮৫ সালের বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন কেবল অনেকের কল্পিত কোনো উদারপন্থী তত্ত্ব নয়, বরং তার চেয়ে অধিক পরিমাণে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতি ছিল।

সমাপনী মন্তব্য

বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আমাদের উপরোক্ত জরিপে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে পূর্বতন অন্যান্য শাসনের মতো বৃটিশ শাসনও প্রজাসাধারণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে নি, বরং আমরা লক্ষ্য করি যে নতুন শাসককে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের প্রত্যাখ্যান নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। নতুন শাসকগোষ্ঠী ভিনদেশী ছিল বলেই জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে নি, তারা কখনো তাদের শাসকদের জাতি বা বংশ (race) নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় নি, বরঞ্চ তাদের প্রতিবাদের কারণ ছিল এই যে নতুন শাসক এ দেশ শাসনকালে চিরাচরিত রীতিকে উপেক্ষা করে তাদের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নি। এ শাসক ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, ভূমি নিয়ন্ত্রণ, আইন ও বিচারকে নগ্নভাবে উপেক্ষা করেছে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকল স্তর ও পরিস্থিতির জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে এবং জনগণের এ উদ্বেগ নিষ্ক্রিয় বিরোধিতা থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রতিক্রিয়া পূর্বতন শাসকগোষ্ঠী, নৃপতি-জমিদার, সাধারণ ভূমালিক, ধর্মীয় গোষ্ঠী, উপজাতীয় জনগণ এবং সর্বোপরি কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সমভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ভান করে যে প্রজাসাধারণ তাদের শুভ (benign) শাসনে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত সরকারি প্রতিবেদনে সরকারের এ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উপরে বর্ণিত প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিদ্রোহকে বৃটিশ জনমতের সম্মুখে সংগঠিত ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের কর্মকাণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয় যে তাদেরকে অবরোধ করে লুণ্ঠন থেকে বিরত রাখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে জেমস মিল (James Mill) সহ সমসাময়িক সকল বৃটিশ লেখক আশ্চর্যজনকভাবে স্থানীয় অস্থিরতা ও প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই পূর্বতন মুসলিম শাসনকে সর্বনাশা ও বৃটিশ শাসনকে কল্যাণকর হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে উল্লিখিত প্রতিরোধ আন্দোলন ও বিদ্রোহগুলো সকল সময়ে একই ধরনের গঠনপ্রকৃতি ও অংশগ্রহণকারী নিয়ে সংঘটিত হয় নি। ভারতে বৃটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ক্রান্তিকালে ক্ষমতাচ্যুত শাসকগোষ্ঠী দ্বারা বিদ্রোহ হয়েছে। বাংলাদেশেও কোম্পানি বাহাদুর স্থানীয় এলিটদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত

ছিলনা। কাজেই নবাব থেকে শুরু করে নৃপতি-জমিদার পর্যন্ত হতাশাগ্রস্ত এলিট গোষ্ঠী তাদেরকে হটানোর বৃটিশ পদক্ষেপ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। মীর কাশিম শৌর্যপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি ছাড়া বাকি সকল এলিট সহজেই পরাভূত হন এবং তাঁদের সবাইকে অবসরভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। প্রধান জমিদারদের ভাগ্যেও তদ্রূপ ঘটে। তাঁরা নিজস্ব প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতা হারান, কিন্তু অধিক রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে কিছু সময়ের জন্য তাদের জমিদারি টিকিয়ে রাখেন।

১৭৬০-এর দশকের শেষে শাসক অভিজাত শ্রেণী ও নৃপতি-জমিদারদের প্রতিরোধের সমাপ্তি ঘটে। অতঃপর সাধারণ জমিদারদের প্রতিরোধ শুরু হয়। পঞ্চবার্ষিক (১৭৭২) ও দশবার্ষিক (১৭৯০) বন্দোবস্তের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির ফলে তাদের স্বার্থ ও মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। ১৭৭২ সালে দীউয়ানি ক্ষমতা রেজা খানের হাত থেকে নতুন শাসকের হাতে চলে যাওয়ার পর কৃষক সমাজ ও ধর্মীয় গোষ্ঠী নতুন শাসকের উৎপীড়ন (pinch) প্রত্যক্ষ করতে শুরু করে এবং উক্ত সময় থেকে কৃষক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিরোধ আরম্ভ হয়। ঐ একই সময়কালে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে নতুন শাসকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদিও তাদেরকে স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদান করা হয়, তথাপি তাদের অনেক ঐতিহ্যগত অধিকার খর্ব করা হয়। সর্বশেষ প্রতিরোধ ঘটে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক শতাব্দী পর। ১৮৭০-এর দশকে কৃষক বিদ্রোহ সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় এবং এই বিদ্রোহ ছিল পরগনা নিরিখ বাতিল করে প্রচলিত খাজনাহার বৃদ্ধির জমিদারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। প্রজারা তখন নিজেদের অধিকার ও দাবি আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে থাকে এবং তাদের বিপক্ষে সরকার জমিদারদের পক্ষ নিতে আর আগ্রহী ছিল না। এভাবে ভূস্বামী-কৃষক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং পরোক্ষভাবে বৃটিশরাজ ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়।

৬

বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*

জন আর. ম্যাকলেন**

১৯০০ সালের পূর্বে বাংলায় প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্প্রদায়িক মানসিকতা তুলনামূলকভাবে জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রদায়িক মন্তব্য, সংঘর্ষ কিংবা হিংস্রতার স্বল্পতার বিচারেই এ কথা বলা যায়। এর এক বা দুই দশক আগে থেকেই পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে যদিও সাম্প্রদায়িকতার নেপথ্যে প্রশাসনিক নীতির প্রভাব ছিল, তা সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপকভাবে এর জন্ম হয়েছিল ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়গুলির সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ফলেই। ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক, গোহত্যা, ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব, পরামর্শসভা ও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব, শিক্ষা এবং সরকারি পদে নিয়োগের প্রশ্নে বাংলার তুলনায় অন্য প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা ছিল বেশি।

আধুনিককালে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গভঙ্গের উপর প্রায়ই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন, শুরু থেকেই তার বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শ এবং ১৯০৭ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সবই ছিল বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক স্রোতোধারার সৃষ্টি। আজ পিছনে তাকিয়ে বঙ্গভঙ্গকে আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে একটি প্রধান বিভাজক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যা ১৯৪৭ সালের বাংলা তথা ভারতবিভাগ অপরিহার্য করে তুলেছিল।

* এই প্রবন্ধ ইতিপূর্বে আরো বৃহৎ আকারে Alexander Lipski সম্পাদিত *Bengal East and West* (East Lansing 1970) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

** অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল, চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই লীগই মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯০৭ সালে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণের অব্যবহিত পরে কংগ্রেস তার কর্মসূচির সপক্ষে জনগণের সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় অহিংস পন্থায় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় বাধাদানের প্রচারণা শুরু করেছিল। পরবর্তী চার দশকের বিভিন্ন সময়েই কংগ্রেস এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছিল তা ছিল মোটামুটিভাবে ১৯০৫ সালের সীমানাবিভক্তিরেখা বরাবর। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি সাম্প্রদায়িক সীমানা।

'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটিকে এ অধ্যায়ে একটি জনগোষ্ঠীর নিজ স্বার্থকে তাদের ধর্মীয় দলগুলির স্বার্থের সাথে অভিন্ন বলে মনে করার প্রবণতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রবণতায় একটি জনগোষ্ঠী অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার-আচরণ ও মূল্যবোধকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও অস্বাভাবিক বলে মনে করে। এই প্রবণতায় ধর্ম রাজনৈতিক আনুগত্য নির্ধারণ করে এবং অতঃপর এই প্রবণতা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, যে অনুক্রমিক ঘটনাবলী ১৯০৭ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যকে সংবিধিগত স্বীকৃতি প্রদানের দাবির জন্ম দিয়েছিল, সে ঘটনাবলীতে বৃটিশ ভূমিকা ছিল মুখ্য। মূল বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা এবং পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন মোকাবেলা—এই উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে, সরকার তখন জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক অংশগুলির মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ১৯০৫-০৯ কালপর্বে বহু ক্ষেত্রেই সরকারি নীতির মূল সুর নিরপেক্ষ ছিল না। বরং সরকারি কর্মকর্তাগণ বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক আগুনকে আরো উস্কে দিয়েছিলেন। এমনকি এই যুক্তিও প্রদর্শন করা হয় যে, সরকারি নীতি সহিংসতার সূচনা করেছিল। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এমন আরেকটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেখানে সরকারি নীতির মতো কেবল একটি উপাদানকে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের কারণ হিসেবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

বঙ্গভঙ্গের আগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর সুস্পষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তার একটি কারণ হয়তো এই যে, এই সম্পর্ক সে সময় এত সংঘাতপূর্ণ ছিল না যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অথবা প্রশাসকগণ তা বিশ্লেষণে যত্নবান হবেন।[১] তথ্য এবং মন্তব্যের এই অনুপস্থিতিই সেই সময়ের সাম্প্রদায়িক চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। প্রায়ই ধারণা করা হয় যে, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা ছিল হিন্দু জমিদার এবং তাদের মুসলমান প্রজাদের মধ্যে ভূ-সংক্রান্ত উত্তেজনার ফসল। কিন্তু এই মতের সমর্থনে প্রত্যক্ষ

---

১. দেখুন, Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims, 1871-1906 A Quest for Identity* (Delhi, 1981). Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal, 1884-1912* (Dhaka 1974)

প্রমাণ খুবই কম। বঙ্গভঙ্গের পর যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার বিশ্লেষণ থেকেই এই ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ভূ-সম্পর্কের চেয়ে বঙ্গভঙ্গের দ্বারা উজ্জীবিত এলিট গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাই বরং নতুন সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল। কিংবা অন্তত সময়ের ক্রমানুসারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এলিট গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা বঙ্গভঙ্গ কালপর্বের ভূ-সংক্রান্ত উত্তেজনার পূর্বসূচনা হিসেবে কাজ করেছিল এবং পরোক্ষভাবে এই উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গপূর্ব মুসলমান সমাজ তেমন সংহত ছিল না। এ সমাজে যেমন বিচ্ছিন্নতা ছিল তেমনি ছিল শ্রেণীবৈষম্য। অবশ্য হিন্দু সমাজের সাথে এর সামাজিক সাদৃশ্য থাকলেও এই বৈষম্য বা বিচ্ছিন্নতা হিন্দু সমাজের মতো তত প্রকট ছিল না। জেলা গেজেটিয়ারের লেখকদের বর্ণনায় দেখা যায়, আশরাফ বা উচ্চবংশীয় মুসলমানগণ শারীরিক শ্রমকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো এবং তারা স্থানীয় মুসলমানদের আজলাফ বা 'নিম্ন জীবনযাত্রার জনগোষ্ঠী' বলে মনে করতো।[২] ১৯০৫ সালের আগে বাংলার গ্রাম এবং মফস্বল শহরগুলিতে যে শিক্ষিত মুসলমান এলিট গোষ্ঠীগুলির বাস ছিল, তাদের সাথে মুসলমান কৃষক, শ্রমিক কিংবা অন্যান্য নিম্নবর্গভুক্ত লোকদের তুলনায় হিন্দু এলিটদেরই মিল ছিল অনেক বেশি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী বঙ্গভঙ্গপূর্ব সময়ে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ শহরে তাঁর ছেলেবেলার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সম্ভবত অন্যান্য শহরগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। তাঁর বর্ণনা এবং সাধারণভাবে বঙ্গভঙ্গ কালপর্বের উল্লেখে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়ভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গপূর্ব কিশোরগঞ্জের স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন, সে সময়ে—

> পূর্ব বাংলায় (সাম্প্রদায়িক) বিদ্বেষের স্থান ছিল না মুসলমানদের সংখ্যার কারণে। তদুপরি এরাও ছিল বাংলাভাষী। দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ছিল একই সূত্রে গ্রথিত। আমাদের গলিতে বেশ কয়েকজন মুসলমান উকিল ছিলেন। তাঁদের আমরা আমার পিতার অন্যান্য সহকর্মীদের মতোই শ্রদ্ধা করতাম। তাঁদের কিংবা তাঁদের ভাইয়ের ছেলেদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল প্রতিবেশী অন্য হিন্দু ছেলেদের মতোই। বিশেষকরে দু'জন ছেলে আখতার ও করিম আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। স্কুলে আমাদের সহপাঠীদের একটা বড় অংশ ছিল মুসলমান। পুরো স্কুলে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা অন্তত হিন্দু ছাত্রসংখ্যার সমান ছিল। আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে কাজ করতাম, কথা বলতাম ও খেলতাম।[৩]

এই পরিস্থিতির কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত, চৌধুরী নিজেই উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদের সাথে তাঁদের প্রাত্যহিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও হিন্দু ভদ্রলোকগণ সমসাময়িক ইসলামী সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উচ্চবংশীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং আন্তরিক যোগাযোগের জন্য পরস্পরের প্রতি যে ঔৎসুক্য বা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন ছিল তা কোন পক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয়ত

২. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge 1957), 73

৩. Nirad C Chaudhuri, *Autobiography of an Unknown Indian* (London 1951), 238

ধরে নেয়া যায়, ব্যক্তিপর্যায়ে এমন অনেক হিন্দু ও মুসলমান ছিল, যাদের দীক্ষা বা অবস্থান ছিল চৌধুরীর তুলনায় অধিক ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক এবং যারা একে অপরকে যবন, ম্লেচ্ছ, গোহত্যাকারী, মাংসভুক, কাফের, মূর্তিউপাসক ইত্যাদি নামে অভিহিত করতো। এই সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ সঙ্কটের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যার চেয়েও বড় ভূমিকা পালনে সক্ষম ছিল। তৃতীয়ত, ভূমি, পেশা, বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা এবং গ্রামবাংলার সম্পদের প্রধান অংশের উপর হিন্দু এলিটদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নীরদ চৌধুরী নিজে ছিলেন একজন সফল আইনজ্ঞের সন্তান এবং সেই স্বল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের একজন সদস্য, যারা এই সুযোগ-সুবিধার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতো। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু আইনজ্ঞদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি পেশায় যোগদানের সামর্থ্য অর্জন করেছেন এমন মুসলমান আইনজ্ঞদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলিকে অনেক বেশি সহজ এবং সহনীয় দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব ছিল। যদি কিশোরগঞ্জ সে সময়ে পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরগুলির অনুরূপ হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রভর্তি হয়তো হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সমান সমান ছিল। কিন্তু প্রাথমিক স্কুল পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পেতো। কারণ পূর্ব বাংলায় তখন একজন সফল কলেজছাত্র অথবা একজন শিক্ষক, কেরানি, প্রশাসক, আইনজ্ঞ, ব্যবসায়ী কিংবা একজন খাজনা সংগ্রহকারীর পক্ষে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি।

নীরদ চৌধুরী যখন বলেন যে, তাঁর নিজ শহরের মুসলমানদের প্রতি তিনি কোন বিদ্বেষ পোষণ করতেন না, তখন তাঁর বক্তব্যেই সে সময়ে মুসলমানদের প্রতি সাধারণ অপছন্দের দিকটি স্বীকৃতি পেয়ে যায়। তিনি বলেন, "আমরা মুসলমানদের প্রতি আগে থেকেই সাধারণভাবে বিদ্বেষ পোষণ করতাম আমাদের উপর তাদের এককালের আধিপত্যের কারণে।" তাঁর মতে, মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে যেসব হিন্দু বিদ্রোহ করেছিল, তাদের শৌর্য-বীর্য নিয়ে লেখা বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী ও রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এবং পাশাপাশি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ ইতিহাসের পর্যালোচনা এই বিদ্বেষকে আরো তীব্র করেছিল। "এমনকি আমরা যখন পড়তে পারতাম না, তখনই আমাদের বলা হতো যে, মুসলমানরা এক সময় আমাদের শাসন ও নির্যাতন করেছে: তারা এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে ভারতে তাদের ধর্ম প্রচার করেছে; মুসলমান শাসকগণ আমাদের মেয়েদের অপহরণ করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের পবিত্র স্থানগুলি কলুষিত করেছে।" কিন্তু এ সত্ত্বেও ১৯০৫ সালের আগে নীরদ চৌধুরী তাঁদের "ঐতিহাসিক চেতনায় বিদ্যমান এই কাল্পনিক লেবেল লাগানো"[৪] মুসলমানদের সাথে তাঁর নিজ এলাকার মুসলমানদের এক করে দেখেন নি। ১৯০৫ সালের পূর্বে তিনি এবং কিশোরগঞ্জের হিন্দু ভদ্রলোকগণ মুসলমান উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সহমর্মিতার সাথেই বসবাস করেছেন।

৪. ঐ, 235, 239.

বঙ্গভঙ্গ হিন্দু এবং মুসলমান এলিট গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে দু'টি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। শিক্ষিত মুসলমানরা এই বিভক্তিকে স্বাগত জানায়। কারণ এই পদক্ষেপ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অনেক সুবিধার পথ সুগম করেছিল। অন্যদিকে শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকে যথার্থই আশঙ্কা করেছিলেন যে, এ বিভক্তির কারণে তাঁদের সুযোগ-সুবিধার ক্রমসংকোচন ঘটবে। ফলে হিন্দু ও মুসলমান এলিট গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বে কোন বিষয়ে এমন মতবিরোধের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি। এটি ইতিপূর্বের দুর্বল বা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে আরো উস্কে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত বাঙালি হিন্দুদের গৃহীত নতুন ধারার উগ্র ও সহিংস রাজনীতি মুসলমানদের ভীত এবং উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা শঙ্কার সাথে লক্ষ্য করেছিল, হাজার হাজার 'স্বদেশী' ছাত্র সরকারের উপর অভূতপূর্ব চাপ প্রয়োগ করছে এবং বিদেশী পণ্যের বিক্রি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিতে সফল হচ্ছে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানরা বিরোধী অসংখ্য ছাত্রের সফল বিক্ষোভ-সহিংসতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল, যা তাদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত; কারণ উচ্চশ্রেণীতে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল হিন্দুদের তুলনায় নিতান্তই কম। মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখনও প্রশাসনিক পর্যায়েই আবদ্ধ ছিলেন। এই পর্যায় থেকে 'বিক্ষুব্ধ' রাজনীতির স্তরে নিজেদের উত্তরণের জন্য মানসিক দিক থেকে অথবা অন্য কোনভাবে তারা তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। 'প্রশাসনিক' রাজনীতিকে ঐতিহ্যগতভাবেই সরকারি নীতি পরিবর্তনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেই ধারার রাজনীতিতে পুরাতন ঐতিহ্যগত এলিট গোষ্ঠীর সদস্যরা সরকারের প্রতি ব্যক্তিভিত্তিক, সতর্ক এবং সনির্বন্ধ আবেদন-নিবেদনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গকে এলিট পরিবারগুলি থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল, ফলে এলিটবহির্ভূত অন্যান্য সাধারণ জনগোষ্ঠীগুলি তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ও তাদের স্বার্থে তদবির করার জন্য এই এলিট পরিবারগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এভাবেই সরকারের সাথে যোগাযোগের একটি অগণভিত্তিক মাধ্যম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে 'বিক্ষুব্ধ' রাজনীতির ধারায় সর্বসাধারণের (এক্ষেত্রে ছাত্র) বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকারের বিরোধিতা করা হয় এবং দাবির সপক্ষে জনসমর্থন প্রকাশের মাধ্যমে দাবি আদায়ের চেষ্টা করা হয়।[৫]

বঙ্গভঙ্গের আগের বছরগুলিতে বাঙালি মুসলমানরা আরো অধিক সংখ্যায় তাদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তারা শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার অনুকূলে আলীগড় স্কুলের নীতিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। একটি সম্প্রসারিত ও ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একদিকে সম্পদ ও শিক্ষাই ভোটের অধিকার হিসেবে গণ্য হচ্ছিল, অন্যদিকে উচ্চ পর্যায়ের

৫. Lucien W. Pye in *Politics, Personality and Nation Building. Burma's Search for Identity* (New Haven 1962), 103

অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিই যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের পশ্চাৎপদতা সম্বন্ধে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের তুলনায় বেশি সচেতন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুবিক্ষোভ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি নতুন উপলব্ধির জন্ম দিয়েছিল, যার ফলে তারা অবাঙালি মুসলমানদের সাথে তাদের সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিল। বিশেষত ১৯০৬ সালে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল বাংলা ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলারের পদত্যাগ মুসলমানদের স্বীয় রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার বিপদ সম্বন্ধে সচকিত করে তোলে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সফলতা প্রতিটি প্রদেশের মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার মুসলমানরাও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯০৬ সালের আগে মুসলমানদের কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না, যার ফলে পরিস্থিতির চাপে মুসলমান নেতৃত্ব তাঁদের আবেদন হারিয়ে ফেলেছিলেন। সৈয়দ আহমদের যুক্তি ছিল, রাজনীতিতে প্রবেশ করা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। তাঁর বক্তব্য একারণে গ্রহণযোগ্য ছিল যে, তখন সিপাহি বিদ্রোহ ও ওহাবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বৃটিশদের মনে জাগ্রত ছিল এবং তারা মুসলমানদেরকেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি বলে মনে করতো। দ্বিতীয়ত, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ ও অযোধ্যার সহানুভূতিশীল সরকারে সৈয়দ আহমদ এবং আলীগড় নেতৃবৃন্দের সরাসরি প্রবেশাধিকার ছিল। যাই হোক, উনিশ শতকের শেষদিকের ঘটনাবলী মুসলমানদের স্যার সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার নীতি পুনর্মূল্যায়নে বাধ্য করেছিল। ১৮৯৮ সালে স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর আলীগড় আন্দোলন বিভক্তির সম্মুখীন হয়। স্যার সৈয়দ আহমদের যখন মৃত্যু হয়, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ এবং অযোধ্যার প্রশাসক ছিলেন স্যার এ্যান্টনী ম্যাক্‌ডনেল। ইতিমধ্যে সবার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, ম্যাক্‌ডনেল পূর্ববর্তী লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের মতো মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবেন না। সরকারি পর্যায়ে মুসলমানদের বিশেষ অবস্থানের যে অবসান ঘটেছিল তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯০০ সালে। হিন্দুদের দাবি মেনে নিয়ে ম্যাক্‌ডনেল উর্দুর পাশাপাশি হিন্দিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। লখনৌর মুসলমানরা এর প্রতিক্রিয়ায় উর্দু সংরক্ষণ সংস্থা গড়ে তোলেন। আলীগড়ের মুসলমানরাও অনুরূপ একটি সংস্থার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু তার আগেই ম্যাক্‌ডনেল আলীগড় কলেজ ট্রাস্টের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এই আন্দোলন অব্যাহত থাকলে কলেজে সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে ম্যাক্‌ডনেল উক্ত সভায় হুমকি প্রদান করেছিলেন।

সম্ভবত সরকারি চাপের মুখেই এ সময় কোন সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নি। অবশ্য স্যার সৈয়দের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের অবসান এবং হিন্দু রাজনীতিবিদদের প্রতি প্রদত্ত বৃটিশ সরকারের ক্রমবর্ধমান সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল। আলীগড় কলেজ দলের পক্ষে ভারতীয় নীতি নির্ধারণ আর সম্ভব ছিল না এবং অন্যরা এমন নীতি অনুসরণ করবে বলে আশা করাও যুক্তিযুক্ত ছিল না। উপরন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে মুসলমানদের নতুন আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাকে রূপদানের দাবিতে আলীগড়ের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আলীগড় নেতৃত্ব পুরোপুরি সমার্থক ছিল না। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ফুলারের পদত্যাগ এবং আইনপরিষদসমূহ আরো নির্বাচনমূলক করা হবে বলে প্রদত্ত ঘোষণা ছিল মুসলমানদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবেলার জন্য এদের একটি সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল।

বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের আন্দোলনের ফল ছিল না। এমনকি বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পর্যায়েও মুসলমানরা তা দাবি করে নি এবং এ সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব গ্রহণের পরেও তারা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিল অত্যন্ত ধীরে। সরকারই প্রথম মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গনীতি সমর্থনের আহ্বান জানায়। সেই উদ্দেশ্যে একটি পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের জন্য এই পদক্ষেপ কি কি সুবিধা বয়ে আনবে তা উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯০৪ সালের প্রথমদিকে লর্ড কার্জন এই লক্ষ্যে মুসলমানদের সমর্থন লাভের আশায় চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ সফর করে তাদের প্রতি বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের জন্য সরাসরি আবেদন জানিয়েছিলেন। ঢাকায় তিনি যেসব মন্তব্য ও বক্তৃতা প্রদান করেন, তাতে তিনি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক গৌরবে উদ্দীপ্ত হতে আহ্বান জানান। তখন শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ঢাকা এখন "তার পূর্বের ছায়া" মাত্র। তিনি বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, "যা এসব জেলার জনগণকে তাদের সংখ্যাধিক্য ও উচ্চতর সংস্কৃতির বদৌলতে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট জেলাসমূহে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করবে এবং পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে এমন ঐক্য গড়ে তুলবে, যা তারা প্রাচীন মুসলমান ভাইসরয় ও রাজাদের আমলের পর আর কখনো অর্জন করতে পারে নি।"[৬] কার্জন এবং তাঁর পরিষদ কার্জনের এই বক্তৃতাসফরের নীতি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা জানতেন যে, মুসলমানদের অনেকেই ঢাকাকে এমন একটি প্রদেশের রাজধানী হিসেবে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে, যেখানে মুসলমানপ্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলমানদের অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য এই আবেদন জানানোর মাধ্যমে বৃটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির কোন আশা পোষণ করেছিল কি-না তা কেবল অনুমানের ব্যাপার।

---

৬. *Speeches by Lord Curzon of Kedleston*, Vol. III (Calcutta 1906), Address at Dhaka, 18 February 1904, 302-03.

সুতরাং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলমানদের সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য সমর্থন লাভের জন্য সরকার উদগ্রীব ছিল। পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সচেতনতা ইতিমধ্যে গড়ে উঠলেও সাংগঠনিকভাবে উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত এর বহিঃপ্রকাশ ছিল সামান্য। নিজেদের পশ্চাৎপদ এবং অবনত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা মুসলমানদের মধ্যে আক্ষেপ সৃষ্টি করেছিল এবং তারা সময়ে সময়ে এ ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদনও করেছিল। কিন্তু তারা কখনো সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ অথবা নিজেদের সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে সক্ষম হয় নি। রাজনৈতিক এবং পৌর কার্যক্রমেও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য। এমনকি বঙ্গভঙ্গের পরেও *মুসলেম ক্রনিকল* এবং *মিহির ও সুধাকর* নামে যে দু'টি সংবাদপত্র সম্ভবত শিক্ষিত মুসলমানদের ব্যাপক শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, সে দু'টি সংবাদপত্রই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো, ঢাকা থেকে নয়। বাংলার প্রধান মুসলমান কলেজ 'কলিকাতা মাদ্রাসা' ছিল তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এর পাঠ্যসূচি ছিল অনাধুনিক। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা খুব কম সংখ্যক স্নাতকই প্রশাসনিক ও পেশাদারি ক্ষেত্রসমূহে হিন্দু ভদ্রলোকদের সাথে প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করেছিল, কিংবা মুসলিম সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলায় সরকারি কর্মচারী ও মুসলমান জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং মুসলমানদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আলীগড় কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান না থাকায় পূর্ব বাংলা ও আসামের নতুন প্রাদেশিক সরকার আস্থা স্থাপন করেছিল নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উপর, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উপাধি, সম্পদ এবং পারিবারিক মর্যাদার কারণে ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের অধীন কাশ্মীরের গভর্নর খাজা আবদুল হাকিমের বংশধর। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের দিল্লী দখলের সময় খাজা হাকিম বাংলায় পালিয়ে এসেছিলেন। বাংলায় প্রাথমিক বছরগুলিতে নবাব সলিমুল্লাহর পূর্বপুরুষেরা চামড়া এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। তবে ক্রমান্বয়ে তাঁরা ভূমিতে তাঁদের বিনিয়োগ স্থানান্তরিত করেন। পরে বৃটিশ সরকার তাঁদের নবাব উপাধি প্রদান করে।[৭]

নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০১ সালে তাঁর পিতা নবাব আহসানউল্লাহর মৃত্যুর পর এস্টেটে গদিনসীন হন। যদিও স্যার হার্বার্ট রিজলে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সলিমুল্লাহর ভূমিকাকেই প্রধান বলে উল্লেখ করেছিলেন[৮], তবু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের জন্য সলিমুল্লাহর ইচ্ছা বা মেধা কমই ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া যেটুকু রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করতে

৭. B.C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca* (Allahabad 1912), 181.

৮. Risley's Note, December 6, 1904, Government of Bengal Proceedings, February 1905, No. 155-67.

পারতেন, পরিবারপ্রধান হিসেবে তাঁর ব্যর্থতার কারণে তাও নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। নবাব আহসানউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি তাঁর আট সন্তান এবং বিধবা স্ত্রীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। একজন ইংরেজ ম্যানেজার ১৯০৪ সাল পর্যন্ত পুরো পরিবারের পক্ষে এই জমিদারি পরিচালনা করেন। এরপর নবাব সলিমুল্লাহ্ নিজেই এস্টেট পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ম্যানেজার হিসেবে তাঁর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন এবং এই পারিবারিক বিবাদ অচিরেই জটিল রূপ ধারণ করে। বাংলার সরকার তখন ঢাকায় নতুন প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা নিচ্ছিল। এই মাসগুলিতে সরকার নবাব পরিবারের ঐক্য রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করে। জমিদারির অংশীদারগণ আরেক জন ইংরেজ ম্যানেজার নিয়োগে রাজি হন। ১৯০৫ সালের মে মাসে কর্নেল জে. হোডিং যখন জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন এর তোষাখানা ছিল শূন্য এবং জমিদারির ঋণের বোঝা ছিল প্রায় ৩,০০,০০০ টাকা। ভূমিরাজস্ব এবং সেস্ হিসাব করে সরকার এই জমিদারির বাৎসরিক সম্পদ নির্ধারণ করে ১১,৫৯,৬৪১ টাকা। তবে নবাব সলিমুল্লাহর ব্যক্তিগত ঋণ ছিল জমিদারির ঋণের তুলনায় আরো অনেক বেশি। যদিও জমিদারিতে নবাব সলিমুল্লাহর অংশ ছিল মোট ষোল ভাগের তিন ভাগেরও কম, তাঁর বিপুল ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬,২৫,০০০ টাকা।[৯] ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে সরকারের কাছে প্রেরিত একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, নেতৃস্থানীয় হিন্দু রাজনীতিকগণ নবাবের ঋণদাতাদের উৎসাহিত করছিল "তাদের ঋণ ফেরত চেয়ে নবাবের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য"।[১০] পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে তাদের প্রধান সমর্থকের এই দেউলিয়া অবস্থা এবং তাঁর জমিদারি হারানোর সম্ভাবনা মেনে নেয়া কষ্টকর ছিল। সুতরাং সরকার সম্পূর্ণ অর্থ বার্ষিক শতকরা তিন এবং সাড়ে তিন টাকা হারে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' (Court of Wards)-এর মাধ্যমে নবাবকে ঋণ হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা করে।[১১] লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার মত প্রকাশ করেন যে, এই ঋণ প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতির অর্থ হবে, তাঁর ভাষায়, "এই সরকারের মর্যাদার প্রতি এবং মুসলমানদের উপর আমার ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রতি এক বিরাট আঘাত।"[১২]

আর্থিক দিক দিয়ে নবাবকে মহাজনদের কবল থেকে উদ্ধার, ১৯০৮ সালে নবাবকে 'নাইট' উপাধি প্রদান এবং ভাইসরয়ের আইনপরিষদে তাঁর অন্তর্ভুক্তি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য বৃটিশ সরকারের এক গোপন প্রয়াস বলে গণ্য হয়।

৯. Col. J. Hodding, *Report on the Dacca Nawab's Family Estate*, (Dhaka 1909), 1-2

১০. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 66, Paper No 66, West Bengal State Committee for the Compilation of the History of the Freedom Movement in India

১১. Hodding, *Report*, 10 নবাবের কুমিল্লা সফর এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার অনতিকাল পূর্বে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত সংবাদ বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১২. M N. Das, *India Under Morley and Minto · Politics Behind Revolution, Repression and Reforms* (London 1964), 179.

সরকারের কিছু সমালোচকের কাছে নবাব সলিমুল্লাহকে সরকারের পুতুল বলে মনে হয়েছিল। মুসলমান নেতৃবৃন্দের একটি অংশ এবং নবাবের নিজ আত্মীয়দেরই কয়েক জন এই ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে নবাবের নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি নবাবের আত্মীয় খাজা মোহাম্মদ আরজু ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বঙ্গভঙ্গবিরোধী এক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।[১৩] টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদার আবদুল হালিম গজনভী ১৯০৫ সালে কলকাতায় ইংরেজি বই আমদানিকারক মুসলমান ব্যবসায়ীদেরকে বই বিক্রি করতে বারণ করেছিলেন।[১৪] তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নবাব সলিমুল্লাহর ভাই নবাব আতিকুল্লাহর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান এবং ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রস্তাব উত্থাপন।[১৫] বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে নবাব সলিমুল্লাহর আত্মীয়দের অংশগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গবিরোধী নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। নবাবের আত্মীয়গণ এক্ষেত্রে স্পষ্টতই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিতর্কের চেয়ে তাদের পারিবারিক বিবাদ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এমন ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, নবাব সলিমুল্লাহর ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং প্রভাবের ফলেই মুসলমানরা ব্যাপকভাবে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিল। এর প্রতি প্রকাশ্য মুসলিম সমর্থন যদিও গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে, তা সত্ত্বেও ১৯০৭ সালের গোড়াতেই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বড় অংশের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম জনমতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বঙ্গভঙ্গ রদের বিপক্ষে। অবশ্য মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা এবং সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক পিছিয়ে ছিল। সমস্যাটি এত সর্বজনবিদিত যে এর বিস্তারিত বিবরণ সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন। তবে কিছু উদাহরণ এই অসমতাকে তুলে ধরতে পারে এবং ব্যাখ্যা করতে পারে কেন মুসলমানরা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই নতুন প্রদেশকে এবং সেই সাথে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ দানের নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিল। ১৯০১ সালে বাংলায় ইংরেজি ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রতি ১০,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ২২ জন। সেই তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১১৪ জন।[১৬] সরকারি 'উচ্চপদের' মাত্র ৪১টি ছিল মুসলমানদের দখলে। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের অর্ধেকের কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের দখলে ছিল প্রায় ১,২৩৫ টি পদ।[১৭] বঙ্গভঙ্গ কার্যকর

১৩. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 55

১৪. "He specially worked upon the English-made Boot importers in Chandni Chowk who are a large community of Eastern Bengal men of Mymensingh" *Report* by F L Halliday to Chief Secretary, Govt of Bengal, 21 September, 1905, Government of Bengal Proceedings

১৫. Pakistan Historical Society, *A History of the Freedom Movement*, Vol. III, 1831-1905, Part I (Karachi 1961), 17

১৬. General Report of the Census of India, 1901, 175

১৭. ঐ, 217.

হওয়ার পর সরকার জানতে পারে যে, পূর্ব বাংলার বিভাগ, জেলা এবং মহকুমা দপ্তরগুলিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পদসমূহে মুসলমানদের নিয়োগের হার ছয় ভাগের এক ভাগেরও কম। সরকারি দপ্তরগুলিতে হিন্দুরা এক ধরনের বেতনহীন শিক্ষানবিশি পদ্ধতির মাধ্যমে সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করেছিল।[১৮] পূর্ব বাংলার পুলিশ দপ্তরে মুসলমানদের অবস্থান ছিল আরো করুণ। পূর্ব বাংলায় পুলিশের 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেঞ্জ'-এ মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৯ ভাগ। অথচ ৫৪ টি পুলিশ ইন্সপেক্টর পদের মধ্যে মাত্র ৪টি পদে নিয়োজিত ছিলেন মুসলমান। ৪৮৪ টি সাব-ইন্সপেক্টর পদের মধ্যে মুসলমানদের দখলে ছিল মাত্র ৬০ টি। ৪৫০ জন হেড কনস্টেবলের মধ্যে ৪৫ জন এবং ৪,৫৯৪ জন কনস্টেবলের মধ্যে ১,০২৭ জন ছিলেন মুসলমান।[১৯] যে সমাজে মামলার বিচারে পারিবারিক, বর্ণীয় বা গোত্রীয় সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো, সেখানে পুলিশ প্রশাসনে দুর্বল প্রতিনিধিত্বকারী সম্প্রদায় ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অসুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। সাধারণভাবে পুলিশ বিভাগকেই প্রশাসনের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

আইন ব্যবসায়েও হিন্দুদের আধিপত্যের বিস্তার ঘটেছিল একেবারে গ্রামের দালাল থেকে শুরু করে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার পর্যন্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু আধিপত্য বজায় ছিল গ্রামের স্কুলের শিক্ষক হতে সরকারি সচিবালয় পর্যন্ত। ভূমিব্যবস্থায় ও গ্রামের কাছারিতে, যেখানে হিন্দু গোমস্তারা মুসলমান প্রজাদের খাজনা সংগ্রহ করতো, সেখান থেকে শুরু করে জমিদারের রাজবাড়িতে অবস্থিত প্রধান কাছারি এবং জেলা ভূমিরেকর্ড দপ্তর পর্যন্ত ছিল হিন্দু আধিপত্য। অবশ্য এই বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, হিন্দুরা তাদের এই ব্যাপক ক্ষমতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনিবার্যভাবে প্রয়োগ করতো কিংবা আইনগত বিরোধের সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গ্রহণ করা হতো। বিস্তারিত অনুসন্ধান বরং এই আশঙ্কাকে যথেষ্ট প্রশমিত করতে পারে। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে যে, হিন্দু ভদ্রলোক ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা, কেরানি কিংবা বিচার ও অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন হিন্দু ভদ্রলোক অনেক বেশি সুবিধাজনক পারিবারিক বা গোত্রীয় সাহায্য লাভ করতেন। ১৯০৫ সালের পরে এটাই ছিলো মুসলমানদের (এবং বৃটিশদের) একটি সাধারণ অভিযোগ। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রধানত হিন্দু এলিট এবং মুসলমান ভদ্রলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; হিন্দু কৃষক শ্রেণীর সন্তানরা মুসলমান কৃষকদের সন্তানের তুলনায় দ্রুতহারে শিক্ষা কিংবা সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতো—এমন ধারণার সপক্ষে তেমন যুক্তি নেই। পাশাপাশি এমন বিশ্বাস করারও কারণ

১৮. P.C. Lyon, Chief Secretary, East Bengal and Assam to Commissioner of Divisions, 25 May, 1906, Appointment Department, *Judicial Proceedings* No.16, Vol. 7215.

১৯. Chief Secretary, East Bengal and Assam to Inspector-General of Police, 12 December 1905, October Confidential, *Judicial Proceedings*, No. 6, Vol 7218.

ছিল না যে, গড়পড়তা একজন হিন্দু ভদ্রলোক মুসলমান কৃষকদের চেয়ে নমশূদ্রদের সাথে নিজেকে অনেক বেশি একাত্ম বলে মনে করতেন। বাস্তবিকপক্ষে নমশূদ্র নেতৃবৃন্দও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধীনতা এবং শিক্ষাগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[২০] প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের প্রভাবে যার বিকাশ ঘটেছিল, তা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু এবং মুসলমান অভিজাতদের সাম্প্রদায়িক সচেতনতা।

বঙ্গভঙ্গের পরে সরকার শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফুলার পুলিশের চাকরিতে মুসলমানদের নিয়োগের ক্ষেত্রে "জোর এবং ক্রমাগত উদ্যোগ" গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, প্রচলিত বৈষম্য "মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অন্যায় ··· (কারণ) এই ব্যবস্থা অবশ্যই ··· রায়তদের বিরাট অংশকে" তাদের হিন্দু জমিদারদের হুমকির মুখে পুলিশী দায়িত্ব থেকে 'বঞ্চিত' করছিল।[২১] তাঁর এই বক্তব্যে ফুলার সম্ভবত তাঁর নিরপেক্ষ এবং আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 'সুবিচার' সেই সময়ের একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হতে পারে এবং সরকারের নিরবচ্ছিন্ন ও নিঃস্বার্থ লক্ষ্য হতে পারে। তবে বঙ্গভঙ্গের পরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুবিচার ছিল মিশ্র উদ্দেশ্য এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য একটি দ্বিধারী তলোয়ার।

বাঙালি মুসলমানদের আরো অধিক হারে শিক্ষা এবং সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের বিশেষ প্রচেষ্টা এর আগেও গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু এত দৃঢ়তার সাথে নয়। অন্যদিকে ১৯০৫ সালের পরে নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি আরো সুদূরপ্রসারী এবং প্রকাশ্য সরকারি সমর্থন প্রদান হিন্দুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। হিন্দুদের আশঙ্কা ছিল, বঙ্গভঙ্গ প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্তেরই অংশ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের নিয়োগের সরকারি প্রচেষ্টা আরো জোরদার হচ্ছিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফুলার নতুন প্রশাসনিক পদগুলির জন্য যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বের করার জন্য স্থানীয় মুসলমান সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করতে সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরা যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী সংগ্রহে ব্যর্থ হলে তিনি মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণের এবং এই কোটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শূন্য পদগুলি মুসলমানদের দ্বারা পূরণের জন্য সুপারিশ করেন। তবে তাঁর মতে, ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান প্রার্থীর অভাবে এই কোটার সংখ্যা মোট পদের 'সর্বাধিক' তিন ভাগের এক ভাগের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।[২২] কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল, এই সুপারিশ কার্যকরী হলে তারা শত শত

---

২০. Rajat Kanta Ray, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927* (Delhi 1984), 78-81.

২১. ঐ।

২২. P.C Lyon, Chief Secretary, East Bengal and Assam to Divisional Commissioner, 25 May 1906, *Judicial Proceedings*, No.15, Vol. 7215.

আকাঙ্ক্ষিত চাকরি হারাবে এবং বেকারত্বের অভিশাপে ভুগবে। ফুলার জনসমক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁর প্রথম এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে তাঁর দ্বিতীয় রানী হিসেবে অভিহিত করে অনাবশ্যকভাবে হিন্দুদের উত্তেজিত করে তোলেন এবং মুসলমানদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেন। তাঁর এই বক্তব্য সে সময়ে বিভিন্ন অর্থে প্রচারিত হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি এর সাধারণ অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমি বলেছিলাম যে, আমি এমন একজন স্বামীর মতো যিনি দুটি স্ত্রী গ্রহণ করেন—একজন হিন্দু এবং অন্যজন মুসলমান। তারা দু'জনেই তরুণী এবং আকর্ষণীয়া। কিন্তু একজনের কর্কশ ব্যবহার তাঁকে অন্যজনের বাহুপার্শ্বে যেতে বাধ্য করেছিল।"[২৩] এভাবেই কৃষকের বোধগম্য ভাষায় সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বরিশালে ধর্মঘটী হিন্দু কেরানিদের স্থলে ৬৩ জন মুসলমান কেরানি নিয়োগ এবং বিক্ষুব্ধ এলাকায় শান্তি রক্ষার্থে ব্যবহৃত পুলিশবাহিনীর বেতন প্রদানের দায় থেকে মুসলমানদের অব্যাহতি প্রদান হিন্দুদের এ ধারণাকে আরো জোরদার করেছিল যে, নতুন প্রশাসন বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের প্রতিদান হিসেবে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং এর বিরোধিতা করার জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী মাসগুলিতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আরো অধিক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার যে প্রবণতা বাঙালিদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটি প্রধান কারণ ছিল সরকারের পক্ষপাতমূলক নিয়োগনীতি।

১৯০৬ সালের প্রথমদিকে মুসলমানদের মধ্যে যে নতুন আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে তা বঙ্গভঙ্গবিরোধীদের কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গবিরোধীরা এমন একটি পদক্ষেপকে বাতিল করতে চেয়েছিল, যা শিক্ষিত মুসলমানরা প্রায় সকলেই সমর্থন করেছিল। মুসলমানরা যেখানে ছিল বৃটিশ নীতির সমর্থক, সেখানে বোধগম্য কারণেই তাদের উপর বৃটিশ পণ্য বর্জনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা এতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করে। ১৯০৬ সালের প্রথমদিকে মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলায়, বিশেষত ময়মনসিংহে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বাষ্প ঘনীভূত হয়ে উঠে। ময়মনসিংহ জেলায় নিম্নবর্গের মুসলমানরা হিন্দু ভূস্বামীদের হেনস্থা করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তারা প্রথানুযায়ী প্রচলিত সেবা প্রদানে এবং হিন্দু ভূস্বামীদের জমি চাষ করতে অস্বীকার করছিল। হিন্দুদের এভাবে হেনস্থা এবং বর্জন করার প্রচেষ্টার জন্য বহিরাগত বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী মৌলবি কিংবা মৌলবি নামধারী ব্যক্তিদের প্রচারণাকেই দায়ী করা হয়। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত *চারুমিহির* পত্রিকা উল্লেখ করে, মৌলবিরা মুসলমান চাষীদেরকে হিন্দুদের বর্গা জমি চাষ করতে নিষেধ করছিল। উপরন্তু মৌলবিরা হিন্দু মহাজনদের তাদের ঋণের কাগজপত্র প্রদানের জন্যও ভীতি প্রদর্শন করছিল। মহাজনদের ভয় দেখানো হয়েছিল, অচিরেই বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটবে এবং ইতিমধ্যে ফুলার ও ঢাকার নবাবের মধ্যে একটি হিন্দুবিরোধী জোট গঠিত হয়েছে।[২৪] বেশ

২৩. Bampfylde Fuller, *Some Personal Experiences* (London 1930),140-41.

২৪. *Charu Mihir*, 22 May 1906, BNNR , No 22, para 2.

কিছু সংবাদপত্র মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ফুলার এবং নবাবকেই দায়ী করেছিল।[২৫] একটি সংবাদপত্র মুসলমানদের নতুন 'বিদ্রোহী' মনোভাবের জন্য তাদের প্রতি সরকারের 'তাৎক্ষণিক পৃষ্ঠপোষকতাকে' দায়ী করে বলে যে, এই পৃষ্ঠপোষকতা ও উস্কানি মুসলমানদের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে। এই সংবাদপত্র আরো জানায়, নিম্নবর্গের মুসলমানরা বিশ্বাস করেছিল যে, হিন্দুদেরকে পীড়নের মাধ্যমে তারা আরো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হবে।[২৬]

১৯০৬ সালের গ্রীষ্ম ও বসন্তে সহিংস এবং প্রায়সহিংস কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ছিল ময়মনসিংহে সংঘটিত একটি শ্লীলতাহানির ঘটনা এবং ঢাকা জেলার দু'টি বাজারে প্রায় একশো 'বদমাশ' মুসলমানের আক্রমণ। প্রথমোক্ত ঘটনাটিতে আক্রমণকারীরা তাদের 'অত্যাচারের' লক্ষ্য হিসেবে বারবনিতাদের বেছে নিয়েছিল।[২৭] আরো গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয় খুলনার 'মাগুরঘোনা' নামক স্থানে কোরবানি ঈদ উৎসবে। মুসলমানরা এখানে হিন্দুদের আপত্তি সত্ত্বেও গরু জবাই করে। এর প্রতিশোধ হিসেবে হিন্দুদের একটি দল মৌলবিদের একজনকে অপদস্থ করে এবং মুসলমানদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা কোরানের উপর মূত্রত্যাগ করে। বাংলা সরকার এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত অতিরঞ্জিত' বলে উল্লেখ করেছিল। তা সত্ত্বেও এই ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বরিশালে প্রায় চারশো মুসলমানের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলমানরা মাগুরঘোনার ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদানে সরকার ব্যর্থ হলে তারা নিজেরাই হিন্দুদের শাস্তিপ্রদান করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ইসলামের জন্য মৃত্যুবরণে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করে। খোদ মাগুরঘোনায় দশ হাজার মুসলমানের একটি জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য বর্ধমানের কংগ্রেসনেতা আবুল কাসেম এক্ষেত্রে মুসলমানদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে সমর্থ হন। তিনি অন্যান্য হিন্দু রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এই সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য খুলনায় এসেছিলেন।[২৮] *দৈনিক হিতবাদী* পত্রিকার সংবাদদাতার বিবরণ অনুযায়ী, আরেকটি গোহত্যা সংক্রান্ত ঘটনায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ ছাড়া বিনা সহিংসতায় নিষ্পত্তি ঘটে। ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার সংগ্রামকালী গ্রামের এক বাবু কোরবানির ঈদে গরু জবাই করতে মুসলমানদের বাধা প্রদান করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। স্থানীয় মুসলমানরা এ ব্যাপারে ঢাকার নবাবের কাছে আবেদন করলে নবাব ঢোলশোহরতের মাধ্যমে গরু জবাই করার আদেশ দেন। পরে প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান গরু জবাই করার উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লেখিত বাবুর বাসার কাছে জমায়েত হয়। কিন্তু হঠাৎ একটি বিশাল আকারের সাপ গাছ থেকে ভূমিতে পতিত হলে জনতার

২৫. BNNR, Part II, No. 20, para 611-16.

২৬. *Charu Mihir*, 15 May 1906, BNNR, No. 21, para 37 and 38

২৭. ঐ, ১৭ জুলাই ১৯০৬, BNNR, No 30, para 4

২৮. R.W. Carlyle, Chief Secretary, Govt. of Bengal to Secretary, Govt of India, Home Department, 7 April 1906, Prog No. 179, IHP

মধ্যে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত গরু জবাই কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায়।[২৯] *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে নান্দাইল থানার আরেকটি গ্রাম গাঙ্গাইলে সংঘটিত আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়। এখানে মৌলবি বা ছদ্ম-মৌলবিরা প্রচার করে, "হিন্দুদের অধীনে কোন সেবা গ্রহণ করা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ"। এর ফলে মুসলমানরা এখানে হিন্দুদের জন্য কাজ করতে অস্বীকার করলে কিছু হিন্দু একটি কোরান গ্রন্থকে অবমাননা করে। অন্যদিকে মন্দির হতে একটি শিবলিঙ্গ সরিয়ে এর পরিবর্তে সেখানে একটি গরুর মস্তক রেখে দেওয়া হয়।[৩০]

ঢাকার নবাব ১৯০৬ সালে ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিলে মুসলমানদের অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। মুসলমান গাড়োয়ানরা এতে সাড়া দিয়ে 'চৌকি' হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাদের গাড়ি ধার দিতে অস্বীকার করে। ফলে এই মিছিল দেখার জন্য সমবেত 'দশ সহস্র' লোক হতাশ হয়ে ফিরে যায়। নবাব দাবি করেছিলেন, ফুলারের পদত্যাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আশঙ্কায় তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত তিনি নিম্নবর্গের মুসলমানদের উপর হিন্দুরা কি পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল তা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।[৩১]

১৯০৬ সালের প্রথম আট মাসে সংঘটিত এসব ঘটনায় সহিংসতার মাত্রা ছিল অল্প। বস্তুত ১৯০৬ সালে যা সবচেয়ে অস্বাভাবিক ছিল তা হলো মুসলমানদের উত্তেজিত করে তুলতে মৌলবিদের ব্যাপক প্রচারণা, হিন্দুদের প্রতি প্রচলিত ও প্রথাগত সেবা প্রদানে মুসলমানদের একটি অংশের অস্বীকৃতি এবং ফুলারের প্রশাসন মুসলমানদের উত্তেজিত করেছে এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করেছে—এমন বিশ্বাস। মুসলমানরা হিন্দুদের বর্জন করার যে হুমকি দিয়েছিল তা মানসিকভাবে হিন্দুদের মধ্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন হিন্দু ভদ্রলোক যেমন ঐতিহ্যগতভাবে উঁচু মর্যাদার সম্মান লাভ করতেন, তেমনি পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের কাছ থেকে খাজনা, ভাড়া অথবা পেশাগত পারিশ্রমিক আদায়েও সক্ষম ছিলেন এবং যথারীতি সেসব আদায় করতেন। কিন্তু মুসলমানদের বর্জনের সম্ভাবনা তাঁকে অকস্মাৎ এক প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান জনসমুদ্রে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং একঘরে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার সম্মুখীন করেছিল। সান্দিকোনা (সম্ভবত ময়মনসিংহ জেলায়) গ্রামের এক চিঠিতে মুসলমানদের দ্বারা কোন কার্যকর বর্জন কি ধরনের বাস্তব পরিণতির জন্ম দিতে পারে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই গ্রামের জনগণের মাত্র আট ভাগের এক ভাগ ছিল হিন্দু। মুসলমানরাই এখানে কৃষিকাজ করতো, কারণ পত্রলেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, "নিজের হাতে চাষ করা কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছেই নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুর কাছেও সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ ছিল।" ফলে স্থানীয় মুসলমানরা যখন হিন্দুদের বর্জন করছিল, তখন প্রচুর জমি অনাবাদি থেকে গেল। "কিছুসংখ্যক কায়স্থ প্রাথমিকভাবে

২৯. *Daily Hitavadi*, 25 March 1906, BNNR, No. 13, para 9.

৩০. *Sanjivani*, 15 March 1906, BNNR, No. 12, para 9.

৩১. *Amrita Bazar Patrika*, 18 August 1906, BNNR, Part II, No. 34, para 1215 and *Dacca Prakash*, 19 August 1906, BNNR, No. 13, para 60.

নিজের হাতে চাষের কাজ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ বৈবাহিক সম্ভাবনা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় তারা পরবর্তীকালে কৃষিকাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল।" পত্রলেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, নিজেরা জমি চাষ না করলে স্থানীয় হিন্দুদের সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩২]

তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় না যে, বাস্তবিকই অনেক হিন্দুকে বর্জন করা হয়েছিল। বরং হিন্দু ভদ্রলোকগণ স্থানীয়ভাবে তাদের মুসলমান প্রজা, কর্মচারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর তাদের অবশিষ্ট ক্ষমতা নিয়েও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং পুলিশ ও সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে নিজেদের যোগাযোগের কারণে ব্যাপক সুবিধা ভোগ করছিল। তা সত্ত্বেও বর্জন ছিল একটি বাস্তব সমস্যা। উপরন্তু ভদ্রলোকদের উপর বদমাশদের আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল। অল্প কয়েকটি গ্রামে যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, তার বিবরণ হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করেছিল। মৌলবিদের প্রচারণা কিংবা মুসলমানদের সীমিত বর্জন যে প্রত্যক্ষ ফল সৃষ্টি করতো, তার তুলনায় এই ভীতি তাদের মধ্যে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। পূর্ব বাংলায় ১৯০৬ সালে ক্রমবর্ধিত হারে আরো অধিক সংখ্যক পত্রে এবং বিবরণে এই আতঙ্ক প্রকাশ পায়।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বসবাসকারী হিন্দুদের যে বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল, তার সুর কলকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলির হিন্দুদের বক্তব্য থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। ১৯০৫ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানের সম্ভাবনা যাদের মধ্যে উচ্চাশার জন্ম দিয়েছিল, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তারা হতাশ এবং বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। *চারু মিহির* পত্রিকা ১৯০৬ সালের আগস্টে এক সম্পাদকীয়তে সাম্প্রদায়িক গোলযোগপূর্ণ এলাকার হিন্দু অধিবাসীদের কয়েক জনের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিল। পত্রিকার বক্তব্য ছিল, "ভারত হতে বৃটিশ শাসনের আদৌ অবসান হলেও মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে একত্রিত হবে কিনা সন্দেহ। তারা সম্ভবত চেষ্টা করবে ভারতকে মুসলমান বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করতে অথবা সার্বভৌম মুসলমান শাসকদের সৈন্যের সাহায্যে ভারতে পুনরায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করতে।" লেখক নিজেও এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন, কারণ ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যার পরিণামে সংখ্যার দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের শেষকথা এই যে, যদিও হিন্দুরা "বৃটিশ শাসনের অধীনে প্রভূত বঞ্চনার শিকার" হয়েছে, তা সত্ত্বেও হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য এই শাসনের প্রয়োজন রয়েছে।[৩৩] সুতরাং মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতে বৃটিশদের উপস্থিতি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী ধারণাকে সম্ভবত আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৩২. *Charu Mihir*, 20 February 1906, BNNR, No. 9, para 53

৩৩, *Charu Mihir*, 14 August 1906, BNNR, No. 34, para 57

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনতির এই প্রেক্ষাপটে একদিকে ভারত সরকারের নীতিতে এবং আরেকদিকে বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে অবাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই উভয় ঘটনারই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের সিদ্ধান্ত এবং ফুলারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে একটি নতুন সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করেছিল। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে দু'টি স্কুলছাত্রকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হলে ভারত সরকার ফুলারকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বলে। ফুলার এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালের ১৫ জুলাই পদত্যাগের প্রস্তাব দিলে মোর্লি ও মিন্টো উভয়েই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।[৩৪] এছাড়াও অন্য একটি বিষয়ে তাঁরা উভয়েই একমত হন। সরকারবিরোধিতার আংশিক অবসান এবং নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁরা আইনপরিষদসমূহ সম্প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ২০ জুলাই 'হাউজ অব কমন্স'-এ মোর্লি ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের কথা বিবেচনা করছে। মোর্লির ঘোষণা জনগণের মধ্যে এই ধারণার উদ্রেক করেছিল যে, সম্ভবত আইনপরিষদসমূহের সম্প্রসারণ করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে নির্বাচনী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এই দাবিটিই কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল এবং তার বিরোধিতা করছিল আলীগড়পন্থী মুসলমানরা। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে সরকার ফুলারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করে। এই ঘোষণা আরো জোরালো ইঙ্গিত প্রদান করে যে, বৃটিশ সরকার কংগ্রেস দলের বিক্ষোভের কাছে নতিস্বীকার করেছে। কিন্তু বাংলা এবং ভারতের মুসলমান নেতারা এ ব্যাপারে মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *ছোলতান* মত প্রকাশ করে যে, ফুলারের "ক্ষেত্রে হিন্দু বিক্ষোভকারীরা যথেষ্ট শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে।" *ছোলতান*-এর আশঙ্কা ছিল, এর পর মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না এবং "সকল বিষয়ই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, যেখানে মুসলমানদের কোন সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে না।"[৩৫] কলকাতার *মিহির* ও *সুধাকর* পত্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে অন্যায় তোষণের অভিযোগ তোলে এবং মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য ফুলারের "অসংখ্য পদক্ষেপের" প্রশংসা করে। পূর্ব বাংলার বাইরেও অনেক স্থানে ফুলারের পদত্যাগ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। গভর্নর জেনারেলের অফিসে শত শত নিন্দাসূচক টেলিগ্রাম আসে এবং ভারতের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরেই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬]

ফুলারের পদত্যাগের তাৎপর্য বাংলার দুই বিশিষ্ট নেতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর কাছে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী

৩৪, Syed Razi Wasti, *Lord Minto and the Indian Nationalist Movement, 1905-1910* (London 1964), 49 এ বইতে ওয়াস্তি যে পরিস্থিতির কারণে ফুলারকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

৩৫, *Soltan*, 10 August 1906, BNNR, No. 33, para 41.

৩৬, Wasti, *Lord Minto*, 60-61

এক পর্যায়ে মুহসিন-উল-মুল্‌ক-এর কাছে আক্ষেপ করেছিলেন যে, যদি বাংলার মুসলমানরা সরকারকে অনুসরণ না করে হিন্দুদের মতো বিক্ষোভ প্রদর্শন করতো, তাহলে তাদের এত দুর্দশা হতো না; "আমাদের এখন হিন্দুদের মতো একই পথে অগ্রসর হতে হবে।"[৩৭] নবাবের পত্রিকা *মিহির* ও *সুধাকর* মুসলমানদের উদ্দেশে লেখা এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, ন্যায়পরায়ণ ফুলারকে পদত্যাগ করতে হয়েছে বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য। পত্রিকাটি আহ্বান জানায় যে, বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে একদা যদি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে, তাহলে ভারতের কোটি কোটি মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ হলে এখনো সে স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব।[৩৮]

ফুলারের পদত্যাগ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দিয়েছিল।[৩৯]

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান নেতৃবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিল এ উদ্দেশ্যে যে, যখন আইনপরিষদসমূহের সংস্কার সাধন করা হবে, তখন মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুবিবেচনা লাভ করবে। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পুরাতন আলীগড় মাধ্যমকেই ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। আলীগড় কলেজের সচিব মুহসিন-উল-মুল্‌ক কলেজ-অধ্যক্ষ ডব্লিউ. এ. জে. আর্চবোল্ড-এর মাধ্যমে লর্ড মিন্টোর কাছে আসন্ন সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি মুসলমান প্রতিনিধিদল গ্রহণের আবেদন জানান।[৪০] মিন্টো এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর সম্মতি প্রদান করেন।[৪১] ১ অক্টোবর সিমলায় আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ জন মুসলমানের এক প্রতিনিধিদলকে তিনি সাক্ষাৎদান করেন। অবশ্য এই প্রতিনিধিদল প্রস্তুতিতে বাঙালি মুসলমানদের ভূমিকা ছিল সামান্য। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন প্রতিনিধিদলে পূর্ব বাংলার একমাত্র সদস্য। উত্তর প্রদেশ থেকে ছিলেন ১১ জন, পাঞ্জাব থেকে ৮ জন এবং কলকাতা থেকে ৫ জন।[৪২] ভাইসরয়ের উদ্দেশ্যে পঠিত অভিভাষণ রচনা করেছিলেন মুহসিন-উল-মুল্‌ক ও সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামী। বিলগ্রামী সুদীর্ঘকাল যাবৎ আলীগড়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যদিও কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদ সরকারের সাথে সংযুক্ত। অভিভাষণে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, মুসলমানদের স্বার্থ ভারতের অন্যান্য জাতিব স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র। অভিভাষণের এই যুক্তি এবং এক্ষেত্রে লর্ড মিন্টোর জবাব বৃটিশ-মুসলমান

৩৭, Syed Nawab Ali Chaudhury to Mohsin-ul-Mulk, August 1906; M.N. Das, *India*, 168.

৩৮. *Mihir-O-Sudhakar*, 31 August 1906, BNNR, No. 36, para 49.

৩৯. উদাহরণ স্বরূপ, Syed Nawab Ali Chaudhury to Mohsin-ul-Mulk, August 1906; *Moslem Chronicle*, 15 September 1906, BNNR, Part II, No. 41, para 1502.

৪০. Text of letter, dated 4 August 1906, is quoted by Wasti, *Lord Minto*, 61-63

৪১. Das, *India*, 166.

৪২. List of signatories is Appendix II to Wasti, *Lord Minto*, 222-23.

অংশীদারিত্ব আসন্ন বছরগুলিতে কি কি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তার ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করেছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতির যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য সিমলা প্রতিনিধিদল যথাক্রমে সংখ্যা, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ভারতীয় সমাজের বহুজাতিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে তিনটি যুক্তি প্রদর্শন করেছিল। প্রথমত প্রতিনিধিদলের যুক্তি ছিল, ১৯০১ সালের জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ, সেখানে জরিপে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত অনেকেই ছিল অহিন্দু। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রচলিত হিসেবের চেয়ে অনেক বড়।[৪৩] দ্বিতীয়ত প্রতিনিধিদল দাবি করে যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যাশক্তির গণ্ডি পেরিয়ে তাদের রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুসলমানদের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছিল সম্ভবত সরকারকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি তিনজন সদস্যের একজন ছিল মুসলমান। প্রতিনিধিদল এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমানরা এক শতাব্দীর 'সামান্য কিছু' পূর্বেই ভারতের অধিকাংশ এলাকা শাসন করতো এবং পূর্বের সেই মর্যাদার স্মৃতি "স্বাভাবিকভাবেই তাদের মন থেকে মুছে যায় নি"। তৃতীয়ত প্রতিনিধিদলের যুক্তি ছিল, যেহেতু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে একেবারেই নতুন, সেহেতু এক্ষেত্রে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যাতে "আমাদের জাতীয় স্বার্থ একটি সহানুভূতিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া না হয়।" তা ছাড়াও অভিভাষণে আরেকটি বাস্তব এবং তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়। প্রতিনিধিদলের বক্তব্য ছিল, "বর্তমানে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে কোন মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে (নির্বাচিত হয়ে) ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব, যদি না তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়গুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি সহানুভূতিশীল হন।" সুতরাং মুসলমানদের দ্বারাই মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া উচিত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাও যথেষ্ট হওয়া উচিত (অর্থাৎ জনসংখ্যাভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন) যাতে তারা "কখনই অক্ষম সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত না হয়।"[৪৪]

লর্ড মিন্টো তাঁর পূর্বে প্রস্তুতকৃত জবাবে প্রতিনিধিদলের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির প্রতি সাধারণ সহানুভূতি এবং মতৈক্য প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি পৃথক নির্বাচনের পক্ষে তাঁর পরোক্ষ সমর্থন প্রদান করেন। অবশ্য এর অধিক কিছু প্রার্থনা করার সুযোগও প্রতিনিধিদলের ছিল না।

৪৩. বহু নিম্নবর্ণ ও বর্ণচ্যুতকে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে না দেখানোর পক্ষে যেসব যুক্তি ছিল তা মুসলিম লীগ সভাপতি সৈয়দ আমির আলি ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে লর্ড মোর্লির কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। U. N. Mukherji, *Hinduism and the Coming Census: Christianity and Hinduism* (Calcutta 1911), 2.

৪৪. C. H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan, 1858 to 1947 : Select Document* (London 1962), 190-193.

সিমলায় অবস্থানকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ একটি সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তবে এই ক্ষেত্রে সিমলা প্রতিনিধিদল গঠনের তুলনায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় বাঙালিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিকপক্ষে ফুলারের পদত্যাগে বাঙালি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াই হয়তো আরো বেশি সতর্ক আলীগড় নেতৃবৃন্দকে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় সম্মতি প্রদানে বাধ্য করেছিল। ১৯০৬ সালের ১৮ আগস্ট আর্চবোল্ডের কাছে লেখা এক পত্রে মুহসিন-উল-মুল্ক বলেন, "আমি লক্ষ্য করেছি, মুসলমানদের অনুভূতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং আমি হরহামেশাই এমন চিঠি পাচ্ছি যেগুলিতে জোরালো ভাষায় বলা হচ্ছে, হিন্দুরা তাদের বিক্ষোভের রাজনীতির কারণে সফলতা অর্জন করেছে এবং মুসলমানরা নিশ্চুপ থাকার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" মুহসিন-উল-মুল্ক মনে করতেন, মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে লাভের চেয়ে সম্ভবত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এই প্রশ্নে "কারো পক্ষেই তাদের নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা একটি নিদারুণ আঘাত পেয়েছে।"[৪৫] আগা খান দাবি করেছিলেন যে, তিনিই পরবর্তীকালে সিমলা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অবশ্য সৈয়দ রাজী ওয়াস্তীর মতে ঢাকার নবাবই এক্ষেত্রে "প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন" এবং "সর্বভারতীয় মুসলিম মৈত্রীসঙ্ঘ" গঠনের প্রস্তাবসম্বলিত একটি চিঠি মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।[৪৬] ঢাকার নবাবেরই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বাৎসরিক 'মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন' আয়োজনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল। তিনি ইতিমধ্যে একটি নতুন আঞ্চলিক দল 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন'-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বাংলায় মুসলমান স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে এই দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[৪৭]

১৯০৬ সালে ঢাকায় বাৎসরিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৈঠক চলছিল। ঢাকায় শিক্ষা সম্মেলনের পরে প্রতিনিধিদল সিমলা প্রতিনিধিদলের বেশ কিছু সদস্যসহ ২০ ডিসেম্বর একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন। এখানেই তারা "ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে" 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।[৪৮] কিন্তু ১৯০৬-০৭ সালের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত লীগ তাৎক্ষণিকভাবে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অনেকের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, সেই তুলনায় লীগের প্রতিষ্ঠা খুব কমই সাড়া জাগিয়েছিল।

---

৪৫. Das, *India*, 167-68.

৪৬. Wasti, *Lord Minto*, 77.

৪৭. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 52.

৪৮. মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঢাকা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখুন, Wasti, *Lord Minto*, 79.

প্রকৃতপক্ষে লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেস মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে বলে কংগ্রেসের দাবির সরাসরি বিরোধিতা করে। বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশ লীগকে এর প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালনের জন্য স্বাগত জানিয়েছিল। বিশেষত রাজনীতিমনস্ক মুসলমানদের মধ্যে লীগের এই প্রতিরোধমূলক নীতির পক্ষে সমর্থন ছিল প্রবল। ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে মোট ১,৬৬৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে বাংলা থেকে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪ জন। অথচ ইতিপূর্বে ১৯০১ ও ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট অধিবেশন দুটিতে যোগদানকারী বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৪ এবং ৪২ জন।[৪৯]

১৯০৬ সালের শেষ মাসগুলিতে বাঙালি মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের অভিযান শুরু করে। এই অভিযানের সাথে তাদের আগেকার প্রচেষ্টার কোন তুলনা ছিল না। ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবসে যে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির সাথে পূর্ববর্তী বছরের সভারও ব্যাপক পার্থক্য ছিল। কারণ এই বছরে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মুসলমানদের বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি সূত্র অনুযায়ী বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন প্রকাশের লক্ষ্যে কলকাতার সার্কাস স্কোয়ারে প্রায় ২০,০০০ মুসলমান সমবেত হয়েছিল।[৫০] হস্তান্তরিত জেলাসমূহে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অনুষ্ঠিত সভাগুলিতেও আগের তুলনায় আরো অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়, যদিও প্রতিবাদ সভাগুলিতে উপস্থিতির পরিমাণ ছিল আরো বেশি।[৫১]

১৯০৬ সালের শরৎকালে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক এবং বিরোধীদের মধ্যে উত্তেজনা ঘনীভূত হয়ে উঠে। যেসব স্থানে বিরোধীরা শক্তিশালী ছিল, সেখানেও মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তাদের সমর্থন প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ্যভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল। ঢাকায় মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই নবাব সৈয়দ আমির হোসেন খান এবং সিরাজুল ইসলাম কলকাতায় 'মোহামেডান ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন' গঠন করেন। মুসলমানদের উপর স্বদেশী বিক্ষোভকারীদের অত্যাচারের সংবাদ সংগ্রহ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।[৫২] উভয় নেতাই পরে ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের অস্থায়ী কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তবে 'লাল ইশতেহার' নামে প্রচারিত একটি উত্তেজক পুস্তিকা মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ মনোভাব ব্যক্ত করে। ঢাকা সম্মেলনের সময়েই মুসলমানদের মধ্যে এই পুস্তিকা বিতরণ শুরু হয়েছিল।

---

৪৯. Wasti, *Lord Minto*, Appendix 1, 221

৫০. R. W. Carlyle, Chief Secretary, Govt. of Bengal, Pol Dept., to Govt. of India, Home Dept., 26 October 1906, Prog. No. 147, IHP., Pol.

৫১. P. C. Lyon, Chief Secretary, East Bengal and Assam to Govt. of India, Home Dept., 5 November 1906, December 1906, Prog. No. 148 IHP., Pol.

৫২. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 69.

এতে জঙ্গি ভাষায় মুসলমানদের শোষণের জন্য হিন্দুদের অভিযুক্ত করা হয় এবং সার্বিকভাবে হিন্দুদের বর্জন করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই ইশতেহারের সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিম্নোদ্ধৃত অংশে স্পষ্ট হয়ে উঠে :

> হে মুসলমানরা, উঠ, জাগো ! তোমরা হিন্দুদের সাথে একই স্কুলে পড়ো না। হিন্দুর দোকান হতে কিছু ক্রয় করো না। হিন্দুদের দ্বারা তৈরি কোন পণ্য স্পর্শ করো না। কোন হিন্দুকে কোন কাজে নিয়োগ করো না। হিন্দুর অধীনে তোমরা কোন নিম্নপদ গ্রহণ করো না। তোমরা অজ্ঞ, কিন্তু যদি জ্ঞান অর্জন করো, তবে তোমরা অবিলম্বে সকল হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাতে পারবে। তোমরাই হলে এই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। কৃষকদের মধ্যেও তোমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কৃষিই হচ্ছে সম্পদের উৎস। একজন হিন্দুর নিজের কোন সম্পদ নেই এবং সে কেবল তোমাদের সম্পদ হরণ করেই নিজে সম্পদশালী হয়েছে। তোমরা যদি যথোপযুক্তভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ, তবে হিন্দুরা সকলেই অভুক্ত থাকবে এবং অচিরেই মুসলমান হয়ে যাবে।[৫৩]

মুসলিম নেতৃবৃন্দের কয়েক জন ঢাকা সম্মেলনে এবং ১৯০৭ সালের মার্চে বরিশালে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে 'লাল ইশতেহার' পুস্তিকার প্রচার ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এদের মনোভঙ্গি উপেক্ষা করে কলকাতার *মিহির* ও *সুধাকর* পত্রিকার প্রকাশক এটি বিতরণ করেন।[৫৪] তারা এর একটি সংক্ষিপ্তসারও প্রকাশ করেন।[৫৫] এই পুস্তিকার প্রতি *মিহির* ও *সুধাকর* পত্রিকার সমর্থন নিঃসন্দেহে অন্য যাঁরা এর গুরুত্ব হ্রাস করার এবং এটিকে যুক্তিহীন মৌলবাদীদের কাজ বলে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের প্রচেষ্টাকে ম্লান করে দেয়। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার মালিক ছিলেন পূর্ব বাংলার সুপরিচিত নেতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। তিনি স্থানীয় ঢাকা মুসলিম এসোসিয়েশনের সুপারিশে সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক আইন পরিষদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যদিও একজন সরকারি কর্মকর্তা দাবি করেছিলেন যে, ময়মনসিংহে ১৯০৭ সালের ভয়ঙ্কর দাঙ্গার আগে এই পুস্তিকা বিতরণ করা হয় নি[৫৬], তথাপি এর বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই পুস্তিকার লেখক ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অধিবাসী।

১৯০৭ সালের দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলিম লীগের আগমনের ফলে, যেখানে কংগ্রেস এবং স্বদেশী আন্দোলন ইতিমধ্যে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহর মুসলিম লীগ এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী

৫৩. This and other extracts are quoted in R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. II (Calcutta 1963), 118-19. ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত।

৫৪. ঐ, 119-20.

৫৫. *Mihir-O-Sudhakar*, 31 May 1907, BNNR, No. 23, Para 66

৫৬. R. Nathan, Officiating Commissioner, Dacca Division to Chief Secretary, East Bengal and Assam, July 1907, December 1907, Prog. No 57-63, IHP., Pub., Pol

বিক্ষোভকারীদের শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কুমিল্লায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১০,৫০০ এবং হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৮,৫০০ জন। হিন্দুদের অনেকেই ছিলেন ভদ্রলোক হিন্দু। স্থানীয় কংগ্রেসপন্থী সংগঠন 'ত্রিপুরা পিপলস এসোসিয়েশন' এবং তার পাঁচটি শাখা বঙ্গভঙ্গ বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। এছাড়াও এই সংগঠন গ্রামগুলিতে "জনগণকে পুলিশের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য" বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সমিতি গড়ে তুলেছিল। ১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ছাড়াই 'ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। 'ত্রিপুরা পিপলস এসোসিয়েশন' এবং বিপিন চন্দ্র পাল এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এর সংগঠকগণ কলকাতার ব্যারিস্টার আবদুর রসুলকে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। স্থানীয় মুসলমানদের অনেকেই অবশ্য এই পদক্ষেপকে স্পষ্টত একটি অন্যায্য দাবি বলে গণ্য করেছিলেন। ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে একটি সরকারি বিবরণে উল্লেখ করা হয় যে, জেলার মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গবিরোধীদের "অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছিল" এবং বিভিন্ন সভার আয়োজন করছিল।[৫৭]

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় প্রথম উল্লেখযোগ্য সহিংসতার ঘটনা ঘটে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং জেলা সম্মেলন প্রতিরোধ করার জন্য বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানরা কুমিল্লায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন সমাপ্তির দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহ এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা থেকে এই উদ্দেশ্যে কুমিল্লায় আগমন করেন। এই জেলায় নবাব সলিমুল্লাহর জমিদারি ছিল। প্রায় ছয় শত মুসলমানের[৫৮] একটি দল রেল স্টেশনে ঢাকার নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মিছিল সহযোগে তাঁকে প্রধান বাজারে নিয়ে যায়। মিছিলে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক ছিল। আচকান এবং পায়জামা পরিহিত এই স্বেচ্ছাসেবকরা 'মারহাবা' এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি প্রদান করছিল। পথিমধ্যে হিন্দুদের একজন কর্মী নবাবকে লক্ষ্য করে একটি ঢিল নিক্ষেপ করে। আরেকজন কর্মী নবাবের অতিক্রমণের সময় তাঁকে একটি ঝাড়ু প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ করা হয়। এর ফলে সামান্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মিছিলের ক্ষুব্ধ সদস্যরা জোরপূর্বক যোগীরাম পাল নামক জনৈক ব্যক্তির কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করে এবং দোকানের লোকজনদের ভীতি প্রদর্শন করে। সেই সন্ধ্যায় মুসলমানদের একটি দল ঢিল নিক্ষেপ ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাজারে ফিরে আসে। তারা আরো কিছু দোকান ভাঙচুর করে, লুটপাট করে এবং সেখানকার লোকদের মারধোর করে।

৫৭. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 64.

৫৮. *The Statesman*. 6 March 1907.

কুমিল্লার হিন্দুরা বাজারে মুসলমানদের আক্রমণে ভীত হয়ে পড়ে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারীদের প্রতি কার্যকর কিংবা সহানুভূতিশীল সাড়া প্রদানে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যর্থতাও তাদের শঙ্কিত করে তোলে। মার্চের ৫ ও ৬ তারিখে স্কুল ও কলেজের হিন্দু ছাত্রদের অধিকাংশ এবং উকিলবর্গ সম্ভাব্য আক্রমণ হতে তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ক্লাশ ও আদালতে যোগদান থেকে বিরত থাকে। ৫ তারিখের প্রধান ঘটনা ছিল নবাবের ব্যক্তিগত সচিবকে এক দল হিন্দুর লাঠি দ্বারা প্রহার। তবে চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয় পরবর্তী সন্ধ্যায়। একদল মুসলমান মিছিল সহযোগে শহর প্রদক্ষিণ এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি প্রদান করতে থাকে। এক পর্যায়ে লাঠি বহনকারী একদল হিন্দুর সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। অতঃপর পুলিশ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর পর মিছিল পুনরায় আরম্ভ হয় এবং এই পর্যায়ে একজন মুসলমান রুটিবিক্রেতা গুলিবিদ্ধ হয় এবং তার মৃত্যু ঘটে। এই ব্যক্তি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল অথবা দর্শক হিসেবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার জের হিসেবে কয়েকজন জঙ্গি হিন্দু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। এদের মধ্যে একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৫৯]

গুলিবর্ষণের ঘটনার পর হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ কুমিল্লায় অধিকতর গোলযোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে সহযোগিতা শুরু করেন। অবশ্য রক্তক্ষয়ের দিক থেকে একটি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ছাড়া কুমিল্লার গোলযোগ তেমন গুরুতর ছিল না। অন্যদিকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত হিন্দু আসামীদের মুসলমানদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট অভিযুক্তদের আপীলের রায়ে এই শাস্তি মওকুফ করে দেয়। সম্ভবত গুলিবর্ষণের ঘটনা কোন পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল না।

কুমিল্লার গোলযোগ একটি ধারা অনুসরণ করেছিল, যার জের ধরে অন্যান্য স্থানেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই দাঙ্গা দ্রুত নিম্নবর্গের লোকদের মধ্যে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কিংবা তার বিরোধিতা কোন বিতর্কিত বিষয় ছিল না। মুসলমান সহিংসতা ছিল হিন্দু সহিংসতারই জবাব, কিন্তু এসব সহিংসতার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসকদের ব্যবস্থা গ্রহণের গতিও ছিল মন্থর এবং এতে এমন ধারণার সৃষ্টি হয় যে প্রশাসন চায়, মুসলমানরা হিন্দু বিক্ষোভকারীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করুক।[৬০] পূর্ব বাংলা সরকারও সহিংসতার ঘটনার একটি একপেশে বিবরণ প্রকাশ করে এবং তার

৫৯. *Report* of E. C. Ryland, Superintendent of Railway Police, 9 March 1907, Unnumbered, 15 May 1907, Prog. (with Nos. 159-71), IHP., Pub.

৬০. H. Luson's letter of 15 March 1907. ১৯০৭ সালের ১২ মার্চের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় উদ্ধৃত ঘটনার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের সমালোচনা করা হয়।

বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের ধারণাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই বিবরণে সরকার মুসলমানদের দায়িত্বকে লঘু করে অভিযোগের দায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর চাপানোর চেষ্টা করে। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী একমাত্র লুটতরাজের ঘটনা সংঘটিত হয় দু'জন বারবনিতার গৃহে, যদিও মুসলমানরা নবাবের আগমনের দিন সন্ধ্যায় বাজারের দোকানসমূহে লুটতরাজ করেছিল এবং পরে এজন্য তাদের আদালতে অভিযুক্তও করা হয়েছিল।[৬১]

ঢাকার নবাব হত্যাকাণ্ডে নিহত ব্যক্তির শেষকৃত্য পর্যন্ত কুমিল্লায় উপস্থিত ছিলেন। পরে একটি বিশেষ ট্রেনে সিপাহি প্রহরায় তিনি চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা ত্যাগ করেন। *মিহির* ও *সুধাকর* পত্রিকা পরে একটি বিবরণ প্রকাশ করে সম্ভবত এই বিশেষ প্রহরার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। পত্রিকা উল্লেখ করে, নবাবের কুমিল্লা আগমনের সময় কুমিল্লার নিকটবর্তী স্থানে কিছু হিন্দু তাঁর ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করে। তা ছাড়াও নবাবের কুমিল্লা ত্যাগের পর কিছু হিন্দু তরুণ ঢাকার এক মন্দিরে কুমিল্লার গোলযোগে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে নবাবকে হত্যার শপথ গ্রহণ করে বলেও উল্লেখ করা হয়।[৬২] এই শপথ পূর্ণ না হওয়ায় ঢাকায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর গৃহে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।[৬৩] উপরন্তু স্থানীয় হিন্দুদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এমনকি নোয়াখালী ও বরিশাল থেকে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের কুমিল্লায় আগমন ঘটে।[৬৪] বস্তুত এই সমস্ত ঘটনা আরো অধিক গোলযোগের সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছিল।

১৯০৭ সালে কুমিল্লায় আর কোন দাঙ্গা সংঘটিত হয় নি। অবশ্য লীগ এবং 'স্বদেশী' দলগুলি ত্রিপুরা জেলায় তাদের সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখেছিল। মার্চ মাসের শেষদিকে ত্রিপুরার রাজার অধীন কিছু গ্রামে নতুন করে দাঙ্গার সূচনা হয়। কুমিল্লার সাতাশ মাইল উত্তরে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত 'মোগরা' নামে একটি বড় হাটের সন্নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সরকারি মতে, এখানে স্কুলছাত্ররা মুসলমানদের উত্তেজিত করে তোলে। তারা মুসলমানদের বিলাতি পণ্য বিক্রয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।[৬৫] তবে মূল দাঙ্গায় মুসলমানরা ছিল আক্রমণকারী। নিকটবর্তী একটি নদীর বিলগুলি থেকে আগত 'বদমাশরাও' এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য মুসলমান দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কুমিল্লার তুলনায় এখানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হয়েছিল।[৬৬]

৬১. *The Statesman*, 12 March 1907.

৬২. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 71

৬৩. East (Dacca), 28 March 1907, EBANNR, No 1, para 11.

৬৪. Note by H Risley, 11 March 1907, May 1907. Prog. Nos. 159-71 IHP., Pub

৬৫. Extracts from ten judgements by the Session Judge and Magistrates of Tippera, Enclosure to H. Le Mesurier, Officiating Chief Secretary, East Bengal and Assam to Secretary, Govt of India, Home Dept., 29 June 1907, July 1907, Prog. No. 192, IHP., Pol.

৬৬. H. Luson's letter of 10 April 1907

কুমিল্লার দাঙ্গা ছাড়াও ১৯০৭ সালে আর যেসব দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির প্রতিটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। তবে এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় যেসব ব্যাপক অনুক্রমিক দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল, সেগুলির জের হিসেবে অন্যান্য স্থানেও দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। ময়মনসিংহের দাঙ্গাগুলি কেবল অধিকতর সহিংসই ছিল না, বরং এই দাঙ্গা দেখে বোঝা যায় কিভাবে স্থানীয় এবং বাইরের রাজনৈতিক প্রভাব, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সামাজিক বিভক্তি এবং প্রশাসনিক ভূমিকা একত্রে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে। ময়মনসিংহে ১৯০৬ সালের প্রথমার্ধে হিন্দুদের পক্ষে কাজ না করার জন্য কিছু মুসলমানের সিদ্ধান্ত এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনতির বিষয় ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জামালপুরে গোলযোগের সূত্রপাত হয় অনেক আগে, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরে (বঙ্গভঙ্গ দিবসে)। সেদিন জামালপুরের দোকানদারদেরকে দোকানমালিক গৌরীপুর, রামগোপালপুর এবং নাটোরের জমিদারের কাছারিতে ডেকে নেওয়া হয়। তাদের বৃটিশ পণ্য বিক্রি বন্ধ করতে অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করতে বলা হয়। মুসলমান ব্যবসায়ীরা এই অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। সেজন্য তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বাধা প্রদান করা হয়। জামালপুরের একটি 'ঋণদপ্তর' শীর্ষস্থানীয় মুসলমান ব্যবসায়ীকে এলাকা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। পরবর্তী দেড় বছরে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটে। স্বেচ্ছাসেবকরা একজন মুসলমান দোকানদারের বিলাতি লবণ নষ্ট করে দেয়। আরেকজন মুসলমান লিভারপুল থেকে প্রেরিত লবণবোঝাই দু'টি মাড়োয়ারি শকট বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করলে স্থানীয় উকিলগণ তাকে বর্জন করে। একবার বিলাতি কাপড় পরিহিত স্কুলছাত্রদের হয়রানি করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গ বর্জনকারীদের একটি দল তাদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে অথবা জামালপুরে সংঘটিত একই ধরনের অন্যান্য ঘটনাগুলির ক্ষেত্রেও কোন মামলা দায়ের করা হয় নি স্থানীয় চাপের কারণে অথবা এই মামলাগুলি গ্রহণে তিন জন মুসলমান মোক্তারের অস্বীকৃতির কারণে। এদের মধ্যে একজন মোক্তার ছিলেন 'স্বদেশী'পন্থী এবং অন্য দু'জন তাদের হিন্দু সহকর্মীদের নাখোশ করতে রাজি ছিলেন না।[৬৭]

জামালপুর শহর ছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে এবং রেলপথে ময়মনসিংহ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। শহরের জনসংখ্যার অনুপাত ও অবস্থান ছিল কুমিল্লা কিংবা পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরগুলির মতোই। মোট ১৮,০০০ অধিবাসীর মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগেরও কিছু বেশি ছিল মুসলমান। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মুসলমানই সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। হিন্দুরা অবস্থান গ্রহণ করেছিল প্রধানত বাজারের ভিতরে অথবা সন্নিকটে। এখানে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য মহকুমা-সদরের মতো জামালপুরেও সর্বাপেক্ষা

৬৭. Note by L. O. Clarke, District Magistrate, Mymensingh, 17 June 1907. Enclosure No. 2 to R. Nathan, Officiating Commissioner, Dacca Division to Chief Secretary, East Bengal and Assam, July 1907, December 1907, Prog. No. 57-63, IHP, Pol

প্রভাবশালী হিন্দুদের মধ্যে স্থানীয় আদালতে কর্মরত বিশিষ্ট উকিলগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে অন্যান্য অধিকাংশ জেলার তুলনায় ময়মনসিংহে বৃহদায়তন জমিদারি ছিল বেশি। সুতরাং গৌরীপুর জমিদারির স্থানীয় পরিচালকগণ এবং নাটোর ও রামগোপালপুর জমিদারির স্থানীয় অংশের নায়েবগণও বৃহৎ হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন।[৬৮]

জামালপুর একটি বাৎসরিক মেলা এবং স্নান-উৎসবের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এখান থেকেই ১৯০৭ সালের দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল। জামালপুরের দাঙ্গার কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মুসলমানরা স্থানীয় স্নান-উৎসব এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও ইতিপূর্বে ছোটখাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল। 'স্বদেশী' স্বেচ্ছাসেবকদের বর্জন কার্যক্রমের প্রতি মুসলমানদের অসহিষ্ণুতা থেকেই এগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। ফলে এ ক্ষেত্রে হলুদ পাগড়ি* এবং স্বদেশী ব্যাজ পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকরা বর্জন আন্দোলনে সাহায্য এবং মেলার মহিলা স্নানার্থীদের রক্ষা করার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে জামালপুরে আগমন করে।

জামালপুরে ২১ এপ্রিল সংঘটিত প্রথম দাঙ্গায় ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরাই ছিল প্রধান। এর আগের দিন স্থানীয় মুসলমান সমিতি "তীর্থযাত্রীদের রক্ষার অজুহাতে" স্বেচ্ছাসেবকদের আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[৬৯] ২১ এপ্রিল সকালে জামালপুরে মুসলমান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আক্রমণের গুজবের প্রতিক্রিয়ায় কিছু হিন্দু মেলায় যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পুলিশ অবশ্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে বলে ঢোলশোহরত করে জনগণকে আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু তার পরে কি ঘটেছিল পরবর্তীকালে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল।

সরকারি বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, "জমিদারের কর্মচারী, উকিল, মোক্তার" এবং ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল লাঠি হাতে একটি হাতি নিয়ে মেলায় আগমন করে। তারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রদান করে, মুসলমান দোকানদারদের অপমান করে এবং খেলনা, মিষ্টি ও লবণ বিনষ্ট করে।[৭০] হিন্দুরা বলে যে, এই দলে মাত্র তিরিশ জন স্বেচ্ছাসেবক ছিল। তারা মুসলমানদের উত্তেজিত করার অভিযোগ অস্বীকার করে।[৭১] এই

* পুলিশ এবং মধ্যদেশীয় লাঠিয়াল কর্তৃক ব্যবহৃত পাগড়ি, শক্তির চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত।

৬৮. Nathan's letter of July 1907

৬৯. ঐ।

৭০. "Note on the occurrences at Jamalpur on 21 & 22 April" by R. Nathan, 23 April 1907, July 1907, Prog No. 6-16. IHP., Pol.

৭১. *The Statesman*, 5 May 1907.

মিছিল তীর্থযাত্রীদের রক্ষার জন্য হিন্দুদের শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল নাকি বর্জন সমর্থনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল তা কোন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় না। যাই হোক, মুসলমানদের একটি দল মেলা থেকে এই মিছিলকে আক্রমণ করে। সারা শহরব্যাপী আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের এক পর্যায়ে 'দুর্গাবাড়ি' (দুর্গামন্দির) নামক স্থানে তারা একটি মূর্তি ধ্বংস করে। মুসলমান জনতার নাগাল থেকে পালানোর সময় একজন হিন্দু চৌকিদার পানিতে ডুবে মারা যায় এবং অন্য ছয় জন আহত হয়। নিহত ও আহত হওয়ার এবং মন্দির অবমাননার ঘটনা সত্ত্বেও পরপর কয়েকদিন কোন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয় নি, বরং পুলিশ এগারো জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে গৌরীপুর জমিদারির দুই জন তত্ত্বাবধায়ক এবং ছয় জন উকিল ও মোক্তারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৭২] এবারও সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানদের সহিংসতাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলে হিন্দুরা মত প্রকাশ করে। 'সরকার বাহাদুর' মুসলমানদের পক্ষে বলে প্রচার করা হয়।[৭৩]

দুর্গাবাড়ি ঘটনার পর জামালপুরের হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে হিন্দুরা একটি স্থানীয় মসজিদ আক্রমণ করবে বলে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সামরিক পুলিশের আগমন এবং মন্দির অবমাননার জন্য অনেক বিলম্বে আট জন মুসলমান গ্রেপ্তার হওয়ায় হয়তো হিন্দুরা দমে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন আরেকটি দাঙ্গার আশঙ্কা তখনো ছিল। ময়মনসিংহ থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের হিন্দু ভাইদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে জামালপুর যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ২৭ এপ্রিলের পরবর্তী দাঙ্গার দিনে উত্তেজিত হিন্দুরা তাদের গৃহে অবস্থান করলেও মুসলমানদের বিভিন্ন দলকে শহরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।[৭৪] এক পর্যায়ে মুসলমানদের কয়েক জন জামালপুরের একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমানের বাড়ির সামনে পাঁচ জনের মতো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। তারা মুসলমানের ছদ্মবেশে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক বলে প্রমাণিত হয়। তারা সাথে রিভলবার বহন করছিল। মুসলমানরা তাদের ধরার চেষ্টা করলে স্বেচ্ছাসেবকদের একজন গুলি করে এবং তা একজন মুসলমানের উরুতে বিদ্ধ হয়। তখন উত্তেজিত মুসলমানদের আক্রমণের ফলে স্বেচ্ছাসেবকরা 'দয়াময়ী' মন্দিরে আত্মগোপন করে। এই মন্দিরটি রামগোপালপুর জমিদারির কাছারি এলাকায় অবস্থিত ছিল। মুসলমানরা মন্দিরের চারদিক ঘেরাও করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মন্দিরের দরজা খোলার নির্দেশ প্রদান করলে মন্দিরের ভিতর থেকে চারটি গুলির আওয়াজ করা হয়।

৭২. ১১ জনের মধ্যে ৬ জনকে ২১ এপ্রিল গ্রেফতার করা হয়।

৭৩. *The Statesman*, 28 April 1907 Also, *Report* by R Garlick, Additional District Magistrate, Mymensingh, 1 May 1907, July 1907, Prog. No. 6-16, IHP., Pol.

৭৪. *The Statesman*, 5 May 1907.

পরদিন এই মন্দির এবং রামগোপালপুর, গৌরীপুর এবং নাটোরের জমিদারির কাছারিসমূহে পুলিশ অস্ত্রের সন্ধানে খানাতল্লাশ করে। হিন্দু অভিযোগকারীদের মতে, পুলিশ লাঠিধারী একদল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে কাছারিগুলি তছনছ করে। প্রশাসন তাদের তেমন নিরাপত্তা প্রদান করবে না—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই দিনই হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ জামালপুর থেকে পালিয়ে যায়। *স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করে যে, প্রায় চারশত হিন্দু পরিবার মুসলমানদের সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ শহরে চলে এসেছিল।[৭৫]

এই ঘটনার পর জামালপুর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। জামালপুরের হিন্দু-মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত করার প্রচেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কিছু ভূমিকা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ময়মনসিংহে যাওয়ার পথে জামালপুরে যাত্রাবিরতি করেন। স্টেশনে এক বিরাট জনতা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। পরে ময়মনসিংহে তিনি একটি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে প্রায় ষাট জন মুসলমানও যোগদান করে, যারা হিন্দুদের সাথে পর্যায়ক্রমে 'বন্দে মাতরম্' এবং 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি প্রদান করে। কিন্তু ময়মনসিংহ ও জামালপুরের বাইরে ভদ্রলোক এবং পুলিশের তেমন প্রভাব ছিল না। ফলে দাঙ্গা দ্রুত প্রত্যন্ত হাট এবং গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই এলাকাগুলিতে ১৯০৭ সালের মে মাসে মুসলমানরা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। আইন-শৃঙ্খলা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই পর্যায়ে জামালপুর জেলায় চল্লিশটি 'গোলযোগ' সংঘটিত হয়েছিল। জেলার চব্বিশটি শহর এবং গ্রামে লুটতরাজ করা হয়েছিল।[৭৬] লুটতরাজের পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনাও সংঘটিত হয়। অন্যদিকে স্বীকৃত তথ্য অনুযায়ী হত্যা এবং ধর্ষণের সংখ্যা ছিল স্বল্প, আপাতদৃষ্টিতে এক ডজনেরও কম, যদিও স্পর্শকাতর সংবাদপত্রগুলির বিবরণ একটি ভিন্ন ধারণা দেবার চেষ্টা করে। লুটতরাজের ঘটনাগুলিতে বদমাশ শক্তি সক্রিয় ছিল। এদের মধ্যে "যমুনা নদী ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম থানাগুলির উগ্র ও মারমুখী মুসলমান জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[৭৭] অবশ্য সংঘটিত লুটতরাজের ঘটনাগুলির কোন নির্দিষ্ট ধারা নির্ণয় করা কষ্টকর। গ্রামগুলি ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং সেসব গ্রাম থেকে প্রাপ্ত বিবরণও ছিল অপর্যাপ্ত ও অস্পষ্ট। তবে তিনটি গ্রাম বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ এবং ফুলপুর ছিল আকারে বৃহৎ। এই তিনটি গ্রামের কোনটিতেই তেমন 'স্বদেশী' বিক্ষোভ দেখা যায় নি।

প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের এই দাঙ্গাগুলির ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ছিল এগুলির সংবাদ আংশিকভাবে পরিবেশন করা বা একেবারে গোপন করা। তবে সরকারি কর্মকর্তারা সরকারের নিরপেক্ষতার সুনাম গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বলে উপলব্ধি করেছিলেন।

---

৭৫. *The Statesman*, 3 May 1907

৭৬. Abstract of looting in the Mymensingh District, July 1907, Prog No. 6-16, HP., Pol.

৭৭. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 81.

তা ছাড়াও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সে কারণে শত শত লোককে গ্রেফতার করা হয় এবং অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। এর পরে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা তেমন উগ্রতা প্রদর্শন করে নি। পরবর্তী কয়েক বছরে যে সহিংসতা সংঘটিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের ফল।

আরো সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তুলনায় ১৯০৭ সালের দাঙ্গা মৃদু ছিল বলে মনে হতে পারে। পূর্ব বাংলার তেরোটি জেলার মধ্যে বলা যায় কেবল ময়মনসিংহে দাঙ্গার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু ১৯০৭ সালের ঘটনাকে অবশ্যই তার পূর্ববর্তী সময়ের আলোকে বিচার করতে হবে। পূর্ববর্তী দশকগুলিতে বাংলায় গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল বিরল। অধিকন্তু সাম্প্রতিককালে যেসব বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি ১৯০৭ সালের মতো সমাজের সমগ্র অংশকে প্রভাবিত করে নি। ১৯০৭ সালে বাংলার সমাজে সাম্প্রদায়িক ধারায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এই বিভক্তির একদিকে ছিল পশ্চিমা শিক্ষিত পেশাজীবী ও জমিদার শ্রেণী এবং অন্যদিকে ছিল ভূমিহীন মজুর ও বদমাশরা। দাঙ্গার ভৌগোলিক বিস্তার সীমিত হলেও ১৯০৭ সালের বসন্তে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে যাওয়ার এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে উন্মত্ত রূপ ধারণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা এবং রাজশাহী জেলায় চার মাসের মধ্যে বহু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে। রাজশাহী জেলার দুটি হাটে মুসলমানদের লুটতরাজের পরে চারশ' জনকে এবং পাবনায় কিছু গোলযোগের পর একশো জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাবনা জেলায় কতিপয় মুসলমান হিন্দুদের অধীনে কাজ না করার জন্য মুসলমানদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করে এবং এ লক্ষ্যে তারা একটি প্রচার অভিযান পরিচালনা করে।[৭৮] পাবনায় একটি প্রচারপত্রও বিলি করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। এই প্রচারপত্রে বলা হয়, "হিন্দু শালাদের জানানো যাচ্ছে যে, সাত দিনের মধ্যে তাদের বাড়ি লুট করা হবে।" প্রচারপত্রে প্রশ্ন করা হয়, "কিভাবে এই শালারা সংখ্যায় এত কম হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের সাথে বিবাদের সাহস পায়, যাদের উপর এমনকি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যও তারা নির্ভর করে।" মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই প্রচারপত্রে বলা হয়, "হিন্দুদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর, তাদের বাড়ি লুট কর, জোর করে তাদের বৌদের নিকা কর, তাদের মন্দির ভেঙ্গে দাও এবং তাদের মূর্তি ধ্বংস কর। .... তোমাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।"[৭৯]

১৯০৭ সালে বাংলার গ্রামগুলিতে যে আবেগ বিদ্যমান ছিল তা পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য কোন উপায় নেই। তবে কলকাতা, ঢাকা এবং দাঙ্গার কবল থেকে মুক্ত অন্যান্য শহর থেকে প্রকাশিত হিন্দু এবং মুসলমানদের পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ,

৭৮. ঐ, 84-5.

৭৯. *Hindu Ranjika* (Rajshahi), 29 May 1907, EBANNR, Part II, No 5, para 532.

সম্পাদকীয় এবং চিঠির ভাষা ছিল সাম্প্রদায়িক বিকারগ্রস্ত। জনগণ ১৯০৭ সালের দাঙ্গার চেয়েও বিশাল আকারের রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। অবশ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী কিছু মুসলমানের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিবেশী হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য তাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে হিন্দুরা বিশ্বাস করেছিল যে, সরকার এবং মুসলমানদের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র নিরাপত্তা তাদের নিজেদের প্রতিরোধশক্তি প্রদর্শন। বলাবাহুল্য, একবার শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর এবং ১৯০৭ সালের দাঙ্গা শেষ হওয়ার পর বঙ্গভঙ্গপূর্ব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মন্দির ও মসজিদের অবমাননা, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, সরকারি পক্ষপাতিত্বের সত্য অথবা মিথ্যা কাহিনী জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

মিহির ও সুধাকর পত্রিকা একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিল। তা এই যে, যশোর ও 'নলডাঙ্গা'র জমিদার তাঁদের মুসলমান প্রজাদের একটি স্বদেশী সভায় যোগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রজারা এই নির্দেশ পালনে অস্বীকার করলে জমিদারের আমলা প্রথমে তাদের খাজনা নিতে অস্বীকার করে এবং পরে দীউয়ানি আদালতে তাদের বিরুদ্ধে বাকি খাজনার জন্য মামলা দায়ের করে।[৮০] সিরাজগঞ্জে এক দল মুসলমান সরকারের কাছে ইংরেজি মাধ্যমে 'ইসলামী উচ্চ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করে। তাদের অভিযোগ ছিল, হিন্দু শিক্ষকরা মুসলমান ছাত্রদের বিক্ষোভে যোগদান করার জন্য চাপ প্রদান করছিল।[৮১] অন্যান্য এলাকাগুলিতে বিলাতি পণ্য বিক্রিরত মুসলমান দোকানদারদের হিন্দু মালিকদের বাজার থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়।[৮২] হিন্দু মহাজনরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী মুসলমানদের ঋণবন্ধকী তামাদি করতে শুরু করে। তারা মুসলমান পিয়নদের বরখাস্ত করে এবং যেসব প্রজার বকেয়া ছিল ও যারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৮৩] সামগ্রিকভাবে পরস্পরের প্রতি বিচিত্র ধরনের কাল্পনিক কিংবা অস্পষ্টভাবে অনুভূত বিদ্বেষ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠে। কুমিল্লা ও জামালপুরে দাঙ্গার পর প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকার পক্ষে নতুন সরকারি নীতি অথবা ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গরদ কোনটাই বাংলার সামাজিক কাঠামোতে সৃষ্ট এই ফাটলের পূর্ণ সংস্কার করতে পারে নি।

৮০. *Mihir-O-Sudhakar*, 20 July 1906, BNNR, No. 30, para 10.

৮১. Abdul Gaffor (sic) and others, Sirajganj, to Director of Public Instruction, East Bengal and Assam, 20 January 1906, June 1906, Prog. No 177, IHP., Pub.

৮২. *Soltan*, 4 January 1907, BNNR, No. 2, para 2.

৮৩. দেখুন, ৪৪টি স্বদেশী মামলার রায়, Appendix A of September 1910 Prog. No. 43, IHP., Pol., Vol.1, 843.

আধুনিক বাংলার ইতিহাসে ১৯০৭ সালের দাঙ্গা একটি ভেদরেখার সৃষ্টি করেছিল। যদিও বঙ্গভঙ্গের আগে কোন ঘটনা দাঙ্গার উস্কানি দেয় নি, বঙ্গভঙ্গের পরে সৃষ্ট নতুন ঘটনাবলী এবং তৎকালীন পরিস্থিতি একত্রে মিলে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল। এই দাঙ্গার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা একদিকে সরকারি নীতি এবং আরেকদিকে মোল্লাদের প্রচারণাকে দায়ী করেছিল। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তারা চেয়েছিলেন একদিকে ভূমিব্যবস্থা এবং অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ বর্জনকারীদের উত্তেজনাকে দাঙ্গার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে। এই চারটি কারণের তুলনামূলক গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে অবশ্যই সংঘটিত দাঙ্গাগুলির ধরন এবং তাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সীমিত উদাহরণ থেকে বলা যায় যে, এই সময় সাধারণভাবে দুই ধরনের দাঙ্গা সংঘটিত হয়— একটি প্রাথমিক পর্যায়ের এবং অন্যটি আনুষঙ্গিক পর্যায়ের। কুমিল্লা ও জামালপুরে সংঘটিত দাঙ্গাগুলি প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত, যেগুলি পরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও হাটগুলিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের দাঙ্গার সূচনা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে কুমিল্লা ও জামালপুর শহরে সৃষ্ট দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পল্লী অঞ্চলের দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল। সুতরাং পল্লী অঞ্চলের দাঙ্গা কোন স্ব-প্ররোচিত ঘটনা ছিলনা, বরং ধারাবাহিকভাবে একই প্রতিক্রিয়া থেকে এগুলির উদ্ভব হয়েছিল। সেসব অঞ্চলেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল, যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃহদংশ ছিল হিন্দু ভদ্রলোক এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন, যেখানে হিন্দুদের বর্জন এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী কার্যক্রম মুসলমান দোকানদারদের (জামালপুর) এবং অন্যান্য মধ্যবিত্ত মুসলমানদের (কুমিল্লা) অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। এই উভয় শহরে ইতিমধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ বহিরাগতদের আগমনের ফলে আরো তিক্ত হয়ে উঠেছিল। কুমিল্লায় এই বহিরাগতদের মধ্যে ছিল ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মার্চের প্রথমদিকে ঢাকার নবাবের প্রেরিত দল। জামালপুরে তীর্থযাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবকরা ছিল বহিরাগত। এই উভয় স্থানেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত দলগুলির মধ্যে প্রাথমিক সংঘর্ষের পরে মুসলমান 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' হিন্দু ভদ্রলোকদের আক্রমণ করেছিল। প্রতিটি স্থানে একজন হিন্দু পিস্তল দিয়ে একজন মুসলমানকে গুলি করে বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রতিটি স্থানে হিন্দু অধিবাসীদের একটি বড় অংশ শহর ত্যাগ করে চলে যায় এবং উভয় স্থানেই স্থানীয় হিন্দুদের রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের আগমন ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে, যেখানে শহরের দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে অধিকাংশ গ্রামগুলিতেই কোন ভদ্রলোকের বাস ছিল না এবং সেখানে কোন বর্জন আন্দোলনও সংগঠিত হয় নি। এই পর্যায়ের অধিকাংশ দাঙ্গায় 'বদমাশ' নামে চিহ্নিত ব্যক্তিরা জড়িত ছিল। কিন্তু 'বদমাশ' শব্দটি অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রেই এমন ব্যক্তিকেই বদমাশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার দাঙ্গা সংঘটনকারী হিসেবে দুর্নাম রয়েছে—সে একজন সাধারণ কৃষক অথবা ডাকাত যাই হোক না কেন। ফলে দাঙ্গার বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে না একজন 'ভদ্র চাষী' কতবার বদমাশদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

পল্লীর মুসলমানরা হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যদিও কত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা বলা মুশকিল। মোল্লা ও মৌলবিরা মুসলমানদের উত্তেজিত করে বলে অনেক বিবরণে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তদন্তের পর কম সংখ্যক মোল্লা ও মৌলবিকেই সনাক্ত করা যায়। দেখা যায় যে, যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তারা ছদ্মবেশী বহিরাগত বিক্ষোভকারী, যারা মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করার চেষ্টা করেছে। নদীয়ার একজন মুসলমানকে রাজশাহীর মুসলমানদের উত্তেজিত করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়।[৮৪] ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর. গারলিক প্রথমে রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তাঁর বিশ্বাস ফুলপুর দাঙ্গা ছিল "মুসলমান মৌলবাদীদের প্রচারণার ফল, যারা সকল হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলমানদের উত্তেজিত করে তুলছিল।"[৮৫] কিন্তু পরে আরো পুলিশ রিপোর্ট পাওয়ার পর তিনি লিখেন যে, তাঁর মনে হয় কোন মৌলবি বাস্তবিকপক্ষে ফুলপুর থানায় প্রবেশ করে নি। তাঁর মতে, মুসলমান বিক্ষোভকারীরা আদৌ বহিরাগত ছিল না এবং তারা "ইতিমধ্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল" যাতে স্থানীয় মুসলমানরা হিন্দুদের লুটতরাজ করার জন্য বদমাশদের সাথে যোগ দেয়।[৮৬] ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় প্রশাসক আর. নাথান সামগ্রিকভাবে জামালপুর জেলায় 'হিন্দুবিরোধী বিশৃঙ্খলার সূচনা' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, মৌলবিদের ভূমিকা সম্পর্কিত গুজবের 'কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল না। কিছু ব্যক্তি মৌলবি ও মোল্লার আবরণে হয়তো অপপ্রচার চালিয়েছিল। কিন্তু বদমাশদের লুটতরাজের তৃষ্ণা ছিল আরো মুখ্য কারণ।' তিনি অবশ্য তা সত্ত্বেও একজন মৌলবির নাম উল্লেখ করেন, যিনি দাঙ্গা শুরু হওয়ার অনতিপূর্বে বকশীগঞ্জের সন্নিকটে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। এই ব্যক্তি হিন্দুদের মূর্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাঁদা প্রদান না করার জন্য এবং তার পরিবর্তে সেই অর্থ নিজেদের সন্তানদের শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন।[৮৭] কাজেই সরকারি বিবরণসমূহ এবং সংবাদপত্রের অসংখ্য বর্ণনা বিবেচনায় এতে তেমন সন্দেহ নেই বলেই মনে হয় যে, মৌলবি ও ছদ্ম-মৌলবিরা হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি ধর্মের দোহাই দিয়ে আবেদন জানিয়েছিল এবং মুসলমান দাঙ্গাকারীরা তাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছিল।

সাধারণ সরকারি মত ছিল, মৌলবি ও ছদ্ম-মৌলবিরা সফল হয়েছিল আসলে হিন্দু জমিদার, আমলা এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে চাষীদের অসন্তোষের কারণে, শক্তিশালী ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক অনুভূতির তাগিদে নয়। অবশ্য প্রশাসনের প্রচেষ্টা ছিল এর বিরোধীদের

৮৪. "An Account of the Swadeshi Movement (1903-1907)", 85

৮৫. *Report* by R. Garlick, 18 May 1907

৮৬. *Note* by R. Garlick, 22 May 1907, ঐ।

৮৭. Nathan's letter of July 1907.

একটি দুর্বল নৈতিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাদের সেই সাধারণ আকাঙক্ষা পূরণে সাহায্য করেছিল। আর একেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা বলে মনে হতে পারে, তবে সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান ভারতীয় চিরায়ত সমাজব্যবস্থা এবং পূর্ববর্তী কৃষক বিদ্রোহের স্বল্প অভিজ্ঞতা এই দাঙ্গার শ্রেণীবিশ্লেষণের জন্য ছিল অনুপযোগী। যদি দাঙ্গাকারীরা তাদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে কোন পার্থক্য বিচার করতো এবং কেবল সেসব হিন্দুদেরই বেছে নিত, যাদের সাথে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল, তবে ভূমিব্যবস্থার সৃষ্ট অসন্তোষের তত্ত্ব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দাঙ্গাকারী এবং তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য ছিল বিচ্ছিন্ন বা অসম্পূর্ণ। বকশীগঞ্জে লুটতরাজকারীদের লক্ষ্য নির্বাচনে কিছু প্রভেদ ছিল। তারা প্রথমে হিন্দুদের মূর্তি ধ্বংস করে এই কারণে যে, মূর্তির জন্য মুসলমানরা তাদের হিন্দু ভূস্বামীদের 'ঈশ্বর বৃত্তি' নামে চাঁদা দিতে বাধ্য হতো। ঢাকার প্রশাসকের মতে, পরে তারা সবচেয়ে অত্যাচারী মহাজনদের আক্রমণ করে, লুটতরাজ করে এবং ঋণপত্রসমূহ ধ্বংস করে দেয়। এ প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্পর্শ করে নি।[৮৮] বকশীগঞ্জ সম্পর্কে কমিশনারের এই বিশ্লেষণ অবশ্যই তদন্তকারী কর্মকর্তার ধারণার আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ছিল, মুসলমান জোতদাররা হয়তো যাদের সাথে বিবাদ ছিল তাদের, যেমন 'সাহা' প্রজাদের দোকানে লুটতরাজ করার জন্য বদমাশদের প্ররোচিত করেছিল।[৮৯] দেওয়ানগঞ্জের দাঙ্গাকারীদের সম্বন্ধে ঢাকার কমিশনারের বক্তব্য ছিল, তারাও বকশীগঞ্জের মুসলমানদের মতো একই ধারা অনুসরণ করেছিল। কিন্তু এই বিশ্লেষণে তিনি সম্ভবত এল. ও. ক্লার্ক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যে বিবরণ দেন তা উপেক্ষা করেছিলেন। ক্লার্ক-এর মতে, দাঙ্গাকারীরা "বাঙালি মুসলমান এবং মাড়োয়ারি নির্বিশেষে লুটতরাজ করেছিল।"[৯০] জামালপুর মহকুমার মেলামগঞ্জে উচ্ছৃঙ্খল জনতা প্রথমে 'কালীবাড়ি' ধ্বংস করে এবং পরে প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে ব্যক্তিগত "প্রতিমাগৃহগুলি ধ্বংস করে দেয়।"[৯১] ফুলপুরে হিন্দু ও মুসলমান চাষীরা বদমাশদের সাথে যোগ দিয়ে হাট ও বাড়িগুলিতে লুটতরাজ করে। ক্লার্ক ভেবেছিলেন যে, দাঙ্গাকারীরা সম্ভবত যেসব দোকানের কাছে তারা ঋণী ছিল সেসব দোকান আক্রমণ করেছিল, যদিও তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না।[৯২] শেরপুরে স্থানীয় মুসলমানরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের বহিরাগত বদমাশদের আক্রমণ থেকে রক্ষা

৮৮. ঐ।

৮৯. L. O. Clarke, District Magistrate, Mymensingh to Commissioner, Dhaka Division, 5 May 1907, July Prog. No. 6-16, IHP., Pol

৯০. L. O. Clarke to Mr. Barniville, 7 May 1907, ঐ।

৯১. Nathan's letter of July 1907.

৯২. *Note* by L. O. Clarke, 18 May 1907, July 1907, Prog. No. 6-16, IHP., Pol

করার জন্য আশ্রয় দিয়েছিল।[৯৩] কুমিল্লার দাঙ্গাগুলি কৃষকদের অসন্তোষের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। জামালপুরের দাঙ্গাগুলি ভূমিসংক্রান্ত ছিল কিনা সে বিষয়েও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, যদিও জমিদারের কর্মচারী, মন্দির এবং কাছারিসমূহ আক্রান্ত হয়েছিল। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল জনতার আচরণের প্রমাণের ভিত্তিতে এই উপসংহার টানা সম্ভব নয় যে, ভূমিসংক্রান্ত অসন্তোষের ফলে দাঙ্গাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল।

দাঙ্গাকারীদের একটি সাধারণ দাবি এই যে, তারা আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের পক্ষে কাজ করেছিল। কখনো কখনো সরকার নিজেই হিন্দুদের উপর আক্রমণের জন্য মুসলমানদের আদেশ দিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়।[৯৪] কখনো এই আদেশ ঢাকার নবাবের কাছ থেকে এসেছিল বলে উল্লেখ করা হয়।[৯৫] অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার ও নবাব উভয়েই মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে প্রকাশিত হয়। যেমন বকশীগঞ্জে প্রাপ্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে লক্ষ্য করা যায় :

> **আল্লাহু আকবর।**
>
> মুসলমান ভাইদের এতদ্বারা বলা হচ্ছে যে, তারা সকলে জানে কি করে জামালপুরের মুসলমানরা আহূত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে নিযুক্ত হিন্দুদের দমন করেছে।
>
> হে মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা কি জান যে, সরকার এবং নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমর্থক ? সুতরাং, আমরা আর কার পরোয়া করবো ? লাঠি ধর, হিন্দুদের বিতাড়িত কর, খামা হিন্দুদের মাথা ভেঙ্গে দাও এবং ধুলায় মিশিয়ে দাও। যে এই বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়বে সে তার নিজ মাকে অপহরণ করেছে বলে সাব্যস্ত করা হবে।[৯৬]

এই বিশেষ বিজ্ঞপ্তিটি এবং এই ধরনের অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি ও গুজবের জন্য কে দায়ী ছিল ? কেউ কি হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ সংগঠন করেছিল ? অনেক হিন্দু সন্দেহ প্রকাশ করে, এ ব্যাপারে পূর্ব বাংলা এবং আসাম সরকারই দায়ী ছিল। এই সন্দেহকে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে করার পক্ষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এটা খুবই সম্ভব ছিল যে, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সহিংসতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এ কথা অবিশ্বাস করারও কোন বিশেষ কারণ নেই যে, বৃটিশ কিংবা মুসলমান অধস্তন সরকারি কর্মচারিরা সহিংসতা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। দাঙ্গা সৃষ্টির প্ররোচনার জন্য ঢাকার নবাবদের মতো স্থানীয় নেতৃবৃন্দকেও দায়ী করা যায়। এই নেতৃবৃন্দ হয়তো অনুভব করেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের যেটুকু সমর্থন অবশিষ্ট রয়েছে তার অবসান

৯৩. Nathan to Chief Secretary, East Bengal and Assam, ঐ।

৯৪. দ্রষ্টব্য, L. O. Clarke's letter of 7 May 1907.

৯৫. কুমিল্লা, ফুলপুর এবং বকশীগঞ্জে প্রাপ্ত।

৯৬. July 1907, Prog. No. 6-16, 38, IHP., Pol.

ঘটবে। তা ছাড়াও মুসলমানরা বৃটিশ সরকারের প্রতি এবং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যে সুস্পষ্ট সমর্থন প্রদান করেছিল, তা হয়তো বৃটিশ সরকারকে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে যথেষ্ট ঋণী করে তুলেছিল। ফলে মুসলমানদের স্বার্থের জন্য উৎকণ্ঠা প্রদর্শনে সরকার যেমন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তেমনি এর ফলে বঙ্গভঙ্গ রদের সম্ভাবনাও হয়তো কমে এসেছিল। ব্যক্তিগতভাবে নবাব সলিমুল্লাহ সম্বন্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের বিশ্বাস ছিল, নবাব মৌলবি কিংবা ছদ্ম-মৌলবিদের সংগঠিত করেন নি; এমনকি তিনি তাদের সমর্থনও করেন নি। নবাব কুমিল্লায় সরকারি নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন এবং দাঙ্গার বিস্তাররোধে সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। নবাবের নিজ জমিদারিও দাঙ্গামুক্ত ছিল। কাজেই দাঙ্গা সৃষ্টিতে নবাব সরাসরি দায়ী ছিলেন না—সরকারের এই বিশ্বাস সম্ভবত সঠিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বেসরকারি নেতার মর্যাদা লাভ করার পিছনে নবাব সলিমুল্লাহর নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভূমিকা ছিল কম।[৯৭] বরং এক্ষেত্রে তাঁর বংশানুক্রমিক খেতাব, তাঁর পুনরুত্থানের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং তাঁর উপর বঙ্গভঙ্গসৃষ্ট পরিস্থিতির প্রভাব অধিক ভূমিকা রেখেছিল। সরকার সহিংসতার পক্ষপাতী ছিল না এবং নবাবও সে বিষয়ে অবগত ছিলেন—এই ধারণার ভিত্তিতে এটা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয় যে, নবাব উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়েছিলেন।

আরেকজন সম্ভাব্য ব্যক্তি ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। কলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার ভূমিকা বিচার করে তাঁকে একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি হিন্দু এবং সরকার উভয়ের প্রতিই বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং সহিংসতা সৃষ্টিতে মুসলমানদের উৎসাহ প্রদানেও অগ্রগণ্য ছিলেন। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকাই আপত্তিকর 'লাল ইশতেহার' প্রচারে সাহায্য করেছিল। লীগনেতৃবৃন্দের অনেকে এই পুস্তিকার প্রচার ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯০৭ সালে সরকার এই পত্রিকাকে তার হিন্দুবিদ্বেষী চরিত্রের জন্য সতর্ক করে দেয়। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সে সময় সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং পত্রিকার সম্পাদককে বরখাস্ত করেছিলেন।[৯৮] কিন্তু ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা একটি গান প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে এই পত্রিকা যে তার সাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রেখেছে পুনরায় সেই ধারণা বদ্ধমূল হলো। এই গানের লেখক সম্ভবত বঙ্গভঙ্গবিরোধীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সদ্যসমাপ্ত 'শিবাজী' উৎসবের বিরুদ্ধে এবং মুসলমান দাঙ্গাকারীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তাঁর নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন :

> দস্যুদের শিরোমণি শিবাজীর বংশধরেরা আমাদের গৌরব কেড়ে নিয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল ও দুশ্চরিত্র মারাঠা সোনার দিল্লীর ধ্বংস সাধন করেছে। বর্তমানে আমরা যেকোন ক্ষেত্রে এবং সর্বত্র

৯৭. দ্রষ্টব্য, নবাবের সাথে *The Manchester Guardian* -এর সাংবাদিক Henry W. Nevison -এর সাক্ষাৎকারের বিবরণ, *The New Spirit in India* (London 1908). 189-205.

৯৮. শেখ আবদুর রহিম ছিলেন এর সম্পাদক।

> অপমানের সম্মুখীন। আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছি, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের সম্মান হারিয়েছি। নিজেদের আর কি করে আমরা মুসলমান বলবো ? আমরা সিংহের ঘরে কেবলমাত্র শৃগাল হয়ে জন্মেছি। আমাদের থেকে ধর্মে পৃথক, পিশাচ হতে নিকৃষ্ট কাফের আমাদের সমস্ত সম্পদ লুট করেছে এবং আমাদেরকে ভিক্ষুকেরও অধমে পরিণত করেছে। আমরা বিশ্বাসঘাতক দস্যুর অত্যাচার এবং শঠতাপূর্ণ উপায় বিস্মৃত হয়েছি এবং কেবল অশ্রুবিসর্জন করছি। হিন্দুদের অত্যাচার সকল বাংলা জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আমরা জানি না ভবিষ্যতে আর কত নিষ্পেষণ আমাদের উপর নেমে আসবে । মুসলমানরা আবার জেগে উঠ এবং ভয়শূন্য হয়ে হিন্দু শোষককে তুচ্ছ করে জগতকে পুনরায় (পূর্বের মতো) প্রকম্পিত করো।[৯৯]

কাজেই মনে হয়, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনকে সমর্থন করেছিলেন, যদিও নবাব এবং দাঙ্গাকারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সুতরাং কে জনগণের এই সহিংসতাকে পরিচালিত করেছিল বা আদৌ তেমন কেউ ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। জর্জ রুড ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের জনসমর্থিত গোলযোগগুলি সম্বন্ধে বলেছিলেন, "একেবারে উপরের সারির নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁদের অনুসারীদের খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরি যোগাযোগ ছিল।" নেতৃবৃন্দ প্রায়শই 'জনতার বাইরে' ছিল। তাঁরা তাঁদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে জনতাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন এবং জনতাকে তাদের উদ্দেশ্য নির্ধারণে সচেতন করে তুলেছিলেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁরা জনতার প্রতিটি পদক্ষেপকে পরিচালিত করেন নি। রুড ১৭৮০ সালে লন্ডনে সংঘটিত 'নো পোপারি' (রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সংঘটিত দাঙ্গা) দাঙ্গাসমূহের ক্ষেত্রে লর্ড জর্জ গর্ডন-এর 'দ্বিধাগ্রস্ত' কিংবা 'অনিচ্ছুক' নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। গর্ডনের বক্তব্য এবং তাঁর কার্যক্রম, বিশেষভাবে রোমান ক্যাথলিকদের উপর তাঁর তীব্র আক্রমণ নিঃসন্দেহে এই দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পূর্ণ সততার সাথে দাবি করতে পারতেন যে, তাঁর বক্তব্য এবং কার্যক্রমের ফলে যেসব ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা একেবারেই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।[১০০] এই ব্যাখ্যা নবাব সলিমুল্লাহ এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাঁরা হয়তো হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেন নি, কিন্তু তাঁরা উভয়েই ছিলেন রুডের ভাষায় জনতার 'বীর', "যাঁদের নামে জনতা দাঙ্গা কিংবা বিদ্রোহ করে, যাঁদের ডাকে তারা সাড়া দেয় ... এবং যাঁদের বক্তৃতা, কর্মসূচি কিংবা ধ্যান-ধারণা জনতার কার্যক্রমে আদর্শগত পটভূমি সৃষ্টি করে অথবা এর সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।"[১০১]

৯৯. *Mihir-O-Sudhakar*, 21 February 1908, BNNR, No. 9, para 133. ইংরেজি থেকে অনূদিত।

১০০. George Rude, *The Crowd in History A Study of Popular Disturbances in France and England, 1730-1848*, (N. Y. 1964), 248-49.

১০১. ঐ, 247.

মুসলমানদের সহিংসতার জন্য কে দায়ী ছিল তা নির্ধারণের প্রশ্নে এমনকি জনগণকে ছাড়িয়ে খোদ সরকারকেও দায়ী করা যেতে পারে। এটা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং এটি একটি বাস্তব ঘটনা বলেই মনে হয় যে, মুসলমানদের গোলযোগের প্রতি লর্ড মিন্টো প্রায়শই তাঁর যে গোপন সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন তা মুসলমান নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন, সরকার মুসলমানদের মাধ্যমে হিন্দু বিক্ষোভকারীদের প্রতিরোধে ইচ্ছুক। এই ধারণা মুসলমান 'বদমাশদের' কাছে হিন্দুদের লুটতরাজ করার আমন্ত্রণ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। ১৯০৭ সালে হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য যেসব মৌলবি এবং অন্যান্য ব্যক্তি মুসলমানদের প্ররোচিত করেছিল, তারা দাবি করেছিল যে, তারা সরকার ও ঢাকার নবাবের হয়ে কাজ করেছিল। যদিও সরকার এবং নবাব উভয়েই সহিংসতা সমর্থন করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন জোরালো প্রমাণ নেই, তথাপি সরাসরি সরকারি নীতির প্রভাবেই যে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছিল এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এ কথা অবশ্যই জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গের অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের যোগদানের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের বিকাশের যেকোন সম্ভাবনা বিনষ্ট করা। তবে 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতিকে যতো উদ্দেশ্যপূর্ণ ও কুটিল বলে মনে হোক না কেন, বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য তেমন ছিল না। উপরন্তু সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন অথবা নিরুৎসাহিত করার জন্যও এই পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। বরং সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই ছিল বৃটিশ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৃটিশ রাজের লক্ষ্য ছিল প্রভাবশালী ভারতীয়দের সমর্থন লাভ করা এবং তাদের বৈধ দাবিসমূহ পূরণ করা। বৈধতা অবশ্য একটি আপেক্ষিক ধারণা এবং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ধারণাও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিম সম্প্রদায় যখন বৃটিশ সরকারের আস্থা লাভ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী যখন শহরের শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করছিল, সেই পর্যায়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা তাদের প্রতি বিশেষ বিবেচনার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে অনুরোধ জানিয়েছিল, সরকার তার জবাবে মুসলমানদের আত্ম-উন্নয়নের উপদেশ প্রদান করেছিল। লর্ড কার্জন নিজেই এক সময় এ ধরনের জবাব প্রদান করেছিলেন। অবশ্য এই উপদেশের পরবর্তী পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের অনুকূলে শিক্ষা এবং সরকারি চাকুরিসমূহের ক্ষেত্রে প্রায়শই নীরব সরকারি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও এর ফলে সাধারণভাবে একটি দৃঢ়সঙ্কল্পের অনুপস্থিতির লক্ষণই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সম্পূর্ণরূপে হস্তক্ষেপ না করার সরকারি নীতি বাংলায় তখনই পরিত্যক্ত হয়েছিল, যখন কংগ্রেস মানসিকভাবে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় এবং যখন মুসলমানদের মধ্যে আরো অধিক মাত্রায় কংগ্রেসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার ভীতি দেখা দেয়। সুতরাং এই অর্থে বঙ্গভঙ্গ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করার

একটি প্রচেষ্টা। পাশাপাশি এর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস থেকে স্বতন্ত্র একটি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জাগিয়ে তোলা এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শক্তি গড়ে তোলা। অন্য অর্থে সাম্প্রদায়িক বিভক্তি কেবল বঙ্গভঙ্গের ফলই ছিল না, এটি ছিল বঙ্গভঙ্গের একটি সচেতন উদ্দেশ্য। লর্ড কার্জনের সাথে বঙ্গভঙ্গের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে স্যার হার্বার্ট রিজলে, তিনিও বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভক্তি সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে আমাদের শাসনের বিরোধী শক্তিশালী দলকে দুর্বল করে তোলা।" বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি হিন্দু কংগ্রেসীগণ থেকে মুসলমানদের পৃথক করতে চেয়েছিলেন। রিজলে 'কংগ্রেসী কুচক্রীদের' কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর ভাষায়, "যাঁদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা হলো নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের তাঁদের (কংগ্রেসীদের) প্রভাবে চলে আসার পরামর্শ প্রদান করা। প্রধানত ঢাকার নবাবের প্রভাবের কারণে তাঁরা এতদিন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। যদি ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয়, তবে বাংলার মুসলমানদের আকর্ষণ করার সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হয়ে উঠবে।"[১০২]

হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পরিচালিত করার জন্য সরকার কেবল বাংলাকে বিভক্তই করে নি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির পুরাতন দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছিল। পূর্ব বাংলা সফরের সময় "লর্ড কার্জন কি নীতি অনুসরণ করবেন" সে সম্বন্ধে ভাইসরয়ের পরিষদ আলোচনা করেন। কেবল এর পরেই লর্ড কার্জন "অতীতের মুসলিম সুবাদার এবং রাজাদের সময় থেকে" পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে একতার অভাব ছিল সে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সরকারি কর্মকর্তাগণ মুসলমানদের সাথে তাঁদের ব্যক্তিগত আলোচনায় তাদের (মুসলমানদের) অতীত শাসনের উদাহরণের সদ্ব্যবহার করেছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে ১৯০৭ সালের দাঙ্গার সময় সাধারণের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারি বক্তব্য এবং নীতি এই ধারণা প্রচারে সাহায্য করেছিল। যেমন, লর্ড মিন্টো এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথ উভয়ে ভূতপূর্ব নবাবি শাসন সংক্রান্ত প্রশ্নটির রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে যথেষ্ট স্পর্শকাতর ছিলেন। ১৯০৭ সালে লর্ড ক্লাইভের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার সময় তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করা হলে ডানলপ স্মিথ তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, বর্তমান 'অশান্ত এবং গোলযোগপূর্ণ' পরিস্থিতিতে মুসলমানরা যেখানে ব্যাপকভাবে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে, সেখানে "বাংলায় মুসলমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছিল যে ব্যক্তি তাঁর স্মৃতিরক্ষণ" হয়তো মুসলমান নেতৃবৃন্দকে অসন্তুষ্ট করে তুলবে।[১০৩] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবর্তে কেবলমাত্র মুসলমানদের আনুগত্য লাভের জন্য ডানলপ স্মিথের এই উদ্বেগ প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে সরকারি নীতির বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় বহন করে।

১০২ . Risley's Note of 6 December 1904, February 1905, Prog No. 155-67, IHP., Pub.

১০৩. Martin Gilbert, *Servant of India*, (London 1966), 88.

বঙ্গভঙ্গের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল তা বিশ্লেষণ পরবর্তীকালের বৃটিশ আচরণ ও নীতির ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গের ফল ছিল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের মন্তব্যসমূহের গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ঘটনা আকস্মিক কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত কোনটিই ছিল না। বরং সরকারি নীতির একটি উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। পূর্ব বাংলা এবং আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির অর্থ ছিল মুসলমানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি প্রদান করা। অন্যদিকে পৃথক নির্বাচন রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণকে একটি ধর্মীয় ভিত্তি প্রদান করেছিল। সুতরাং বৃটিশ সরকার মুসলমানদের একটি পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী এবং একটি ভৌগোলিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কংগ্রেসী আন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সরকারি কর্মকর্তারা এই সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে সিমলা প্রতিনিধিদলের সাথে লর্ড মিন্টোর সাক্ষাতের আগে স্যার থিওডোর মরিসন (১৯০৫ পর্যন্ত আলীগড় মোহামেডান কলেজের অধ্যক্ষ), স্যার ডেনজিল ইবেটসন (পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর) এবং লর্ড ল্যামিংটন (বোম্বের গভর্নর)-এর মতো ওয়াকিবহাল ব্যক্তিবর্গ মুসলমানরা অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে—এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে লর্ড মিন্টোকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।[১০৪] মিন্টোর ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথ মুসলিম সমর্থনের রাজনৈতিক মূল্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্বন্ধে মুহসিন-উল-মুল্‌ক-এর সতর্কবাণী পাওয়ার পর এবং লর্ড মিন্টোর সাথে সিমলা প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার পর ডানলপ স্মিথ তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন, "আমি যা চাচ্ছি তা হচ্ছে সমগ্র ভারত জুড়ে তরুণ মুসলমানদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল গঠনের প্রচেষ্টা রোধ করা। একবার যদি তারা এই খেলা শুরু করে, তারা আমাদের বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে।"[১০৫] কাজেই মুসলিম রাজনীতি এ সময় একটি সংযোগস্থলে এসে পৌঁছেছিল বলে মনে হয়, যখন একদিকে কিছু তরুণ মুসলমানের কংগ্রেসে যোগদান করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং অন্যদিকে অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ও আলীগড় নেতৃত্ব থেকে স্বতন্ত্র একটি বৃটিশবিরোধী ধারা অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, কংগ্রেস যা দাবি করেছিল তা থেকে স্বতন্ত্র কাঠামোর একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব মুসলমানদের প্রদান করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই ছিল বৃটিশ সরকারের স্বার্থ। পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশপক্ষীয় আলীগড় নেতৃবৃন্দকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। কারণ এর ফলে তারা তাদের অভিভাবকত্বে অকংগ্রেসী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে। বৃটিশদের এই উদ্দেশ্যের সাথে তাদের আচরণ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্ত মতামত এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত তথ্যের

১০৪. Das, *India*, 149 (Morison), 167 (Ibbetson), and 233 (Minto).
১০৫. Dunlop Smith's Diary, 10 September 1906. Martin Gilbert, *Servant of India*, 56

সঙ্গতি ছিল বলে মনে হয়। যেমন, মিন্টো একাধিক বার ফুলারের পদত্যাগ এবং সেই সাথে বঙ্গভঙ্গ বর্জন আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষোভকে একটি শুভ ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

লর্ড মিন্টো কুমিল্লার দাঙ্গার আগের মাসগুলিতে স্বয়ং বৃটিশ রাজা, মোর্লি, ভারত বিষয়ক সচিব ও সহকারী সচিব এবং পূর্ব বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে প্রেরিত বিভিন্ন পত্রে বারবার মুসলমানদের বিক্ষোভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।[১০৬] তিনি লিখেছিলেন, "ফুলারের অপসারণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষোভ যতদিন "নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যাবে, ততদিন এটি, আমার বিশ্বাস, আমাদের জন্য যথেষ্ট কার্যকরী হবে।"[১০৭] এমনকি, যখন এই বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়েছিল, তখন অল্পসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তাই এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বলে মনে হয়। মিন্টো বিশেষত প্রায় উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন যখন দাঙ্গা বন্ধের পক্ষে তাঁর কাছে সরকারি সহায়তার জন্য আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে গঠিত যৌথ হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিদলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১০৮] অবশ্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় সরকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে এই দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে এই দাঙ্গা ইতিমধ্যেই তার প্রভাব রেখে গিয়েছিল। দাঙ্গার সময় বঙ্গভঙ্গ বর্জনকারীদের বাধা দেওয়া হয়েছিল। ফলে কুমিল্লার ঘটনার পূর্বে তারা যেরকম সক্রিয় ছিল, পরবর্তীকালে তেমন সক্রিয়ভাবে তারা আর কখনো কাজ করতে পারে নি। সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ সরকারের সততা এবং নিরপেক্ষতার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছিল বলে সরকারি কর্মকর্তারা যদিও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, তথাপি এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, সামগ্রিকভাবে তাঁদের অনেকেই সংঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত অল্পসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তাই রিজলের মতো একান্ত সততার সাথে স্বীকার করেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিভক্তি ও তার বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা করা। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে রিজলে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, সেগুলোর একটি সম্বন্ধে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তাই সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। রিজলে বলেছিলেন, "বিভক্ত বাংলা কয়েকটি ভিন্ন ধারাকে টেনে আনবে। এটিই এই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সুফলগুলির একটি।"[১০৯] এটা বোধগম্য যে, এই উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূভাবে সংযত করা যেতো এবং তাকে মুছে ফেলার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা যুক্তিসিদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যেতো। যদিও দেশী মানুষের কল্যাণের ব্যাপারে বৃটিশ রাজের বিঘোষিত নীতি ছিল স্বার্থহীন জনকল্যাণ, তথাপি বঙ্গবিভাগ অবশ্যই ইঙ্গিত দেয় যে, এই পদক্ষেপ মোটেই স্বার্থহীন ছিল না।

১০৬. Das, *India*, 42,45, 151-52, 177 and Philips (ed), *Evolution of India and Pakistan*, 194

১০৭. Minto to Morley, 22 August 1906, quoted by Das, *India*, 42.

১০৮. Das, *India*, 155.

১০৯. H. H. Risley's *Note* of 7 February 1905, Prog. No. 155-67, IHP., Pub.

৭

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ

পিটার হিজ*

বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে চারটা কারণ বিদ্যমান ছিল : (১) গণপ্রতিষ্ঠানসমূহের "ন্যায়সঙ্গত" চাপ, (২) অহিংস প্রতিরোধ অভিযান, (৩) সহিংস প্রতিরোধ এবং (৪) বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পালাবদল। স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর লিখিত ইতিহাসগুলোর অধিকাংশ দ্বিতীয় ও প্রথম কারণের উপর জোর দিয়েছে, তৃতীয় কারণ সম্পর্কে অপর্যাপ্ত আলোচনা করেছে এবং চতুর্থ কারণকে প্রায় সর্বতোভাবে উপেক্ষা করেছে। সাধারণত ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠনের সময় থেকে এই আন্দোলনের সূচনা দেখানো হয়। পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে গৃহীত প্রস্তাবাবলী এর লক্ষ্যপথ নির্ধারণ করেছে। ১৯২০ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের নেতারূপে আবির্ভূত হন। তাই ইতিহাস রচনা পর্যায়ে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সত্যাগ্রহ অভিযান; এর আগের ও পরের সশস্ত্র বিপ্লবী অভিযানগুলো রয়ে গেছে আড়ালে। ১৯৩৯-এর পর বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর চাপ এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এই সময় থেকে শাসনতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বেশ কিছু ইতিবৃত্ত, বিশেষকরে ভারতে প্রকাশিত এ পর্যায়ের ইতিবৃত্ত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গি প্রতিরোধের বিবরণ দিয়েছে। এগুলোর কোন কোনটা আবার আঠারো ও উনিশ শতকের কৃষক অভ্যুত্থান বা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সঙ্গে বিশ শতকের সুসংগঠিত উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের অসমর্থিত যোগসূত্রও আবিষ্কার

প্রযত্নে : শ্রী অরবিন্দ আশ্রম আর্কাইভস এ্যান্ড রিসার্চ লাইব্রেরি, পন্ডিচেরি, ভারত।

করেছে। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বিবরণ প্রধানত আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির ভূমিকাকেই তুলে ধরে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিষয়টির প্রতি সাধারণ মনোভঙ্গি ছিল স্মৃতিচারণমূলক, যাকে স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদ মিনারেরই বাচনিক রূপ বলা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক গতিধারার প্রেক্ষিতে বিচার করলে বৃটিশবিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বীরোচিত কিন্তু নিষ্ফল কর্মকাণ্ড বলে মনে হয়, যা আতশবাজির প্রদর্শনীর মতো হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে গিয়েছিল।

বর্তমান নিবন্ধে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী সমিতিগুলোর উৎপত্তি, গঠনপ্রকৃতি ও কার্যাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে এদের বাইরের চেহারার একটু ভেতরে নজর দিতে চেষ্টা করেছি, যা সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে। এ পর্যায়ে আমি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছি এসব সমিতি গড়ে উঠার সময়কালের (১৯০২-১৯১০) প্রতি, এর সাথে পর্যালোচনাও করেছি মধ্য ১৯৩০-এর দশক ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী। বৃটিশ ভারতে সন্ত্রাসবাদ প্রধানত বাংলার ঘটনা। সুতরাং অবিভক্ত বাংলার কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এ পর্যায়ের ঘটনাবলীর প্রতিও নজর দেবো।

১৯০০ সালের পূর্বে সহিংস প্রতিরোধ

এই গ্রন্থের অন্যান্য অংশে আঠারো এবং উনিশ শতকের কৃষক অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।[১] বৃটিশ শাসনামলের শতাধিক কৃষক বিদ্রোহের খতিয়ান ঐতিহাসিকদের কাছে আছে। এগুলোর মধ্যে অধিক পরিচিত হলো উত্তর বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (আঠারো শতকের শেষ দিকে), বাকেরগঞ্জে বিদ্রোহ ও সিলেটে অভ্যুত্থান (দুটোই ১৭৯০-এর দশকে), শেরপুরে "পাগল বিদ্রোহ" (১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকে), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০ সালে) এবং সুসংগঠিত পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭০-এর দশকে)। এগুলো কমবেশি সহিংস বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এগুলোর কোনোটাকেই বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য রাজনৈতিকভাবে সচেতন প্রয়াস বলে গণ্য করা যায় না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিক্ষোভের কারণ ছিল স্থানীয়, সাধারণত খাজনা সংক্রান্ত। নীল বিদ্রোহ বিখ্যাত হয়েছে, কারণ কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মনকে তা নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল মূলত একটা শ্রমিক আন্দোলন, যা ক্ষেত্রবিশেষে সহিংস রূপ নিয়েছিল। কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলা যাবে না। সিলেট অভ্যুত্থানের নায়ক অবশ্য ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করতে চান। কিন্তু খাজনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছাড়া তাঁর আর যেসব উদ্দেশ্য ছিল সেগুলি সর্বতোভাবে ছিল ধর্মীয়। উনিশ শতকের ওহাবী ও ফরায়জী আন্দোলনের নেতারাও ছিলেন এ পর্যায়ভুক্ত।

---

১. দেখুন, এই খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে সিরাজুল ইসলামের প্রবন্ধ, "অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ"।

১৮৫৭-৫৮-এর মহাবিদ্রোহের সময় বাংলা মোটামুটিভাবে শান্ত ছিল। অবশ্য সিরাজুল ইসলাম এই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি এখানে বিরাজ করছিল এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে ছোটখাটো নিয়মভঙ্গ করার ঘটনা ঘটেছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা প্রেসিডেন্সির সর্বত্র বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষিত বাঙালি 'বাবুরা' কেবল নিজ প্রদেশেই নয়, বৃটিশ ভারতের সর্বত্র প্রাপ্তিসাধ্য অধস্তন পদগুলোর বিরাট অংশ গ্রাস করে। এবং মেকলের ঘোষণা অনুসারে এই বাঙালি বাবুরা ছিলেন সবচেয়ে কম জঙ্গি এবং নির্বীর্য। তাদের নির্বীর্যতা রমণীসুলভ দুর্বলতার পর্যায়ে পড়ে। ভারতের সকল "জনগোষ্ঠীর" মধ্যে বাঙালিরা সবচেয়ে কম "লড়াকু গুণসম্পন্ন"।

বাঙালিদের এই নতুনত্বহীন বাঁধাধরা জীবন যাপনের আরেকটা দিক ছিল। একই বাঙালি বাবুদের সম্পর্কে বৃটিশ পর্যবেক্ষকরা অভিযোগ করেন যে তারা বক্তৃতা দিতে এবং দল গঠন করতে পারদর্শী। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এর নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ছাত্র ও মধ্যবিত্তের অনানুষ্ঠানিক (informal) নির্বাচকমণ্ডলীর মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান। এই এ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের জন্ম দেয় (১৮৮৩, ১৮৮৫), যেটা পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে একীভূত হয়। দেশের রাজনৈতিক জীবন এভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে।

এই সকল সমিতির সভায় যেসব ছাত্র যোগদান করে, তাদের একাংশ নিজেরা কতকগুলো তথাকথিত গোপন সংগঠন গঠন করে, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল শারীরিক শক্তি অর্জন এবং "জাতীয়" অনুভূতির স্ফূরণ। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, এই সকল ক্লাব ১৮৭০-এর দশকে কলকাতায় পুরো ছাত্র সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ প্রায়ই একটা সমিতির কথা বলা হয়, যেটার সদস্য ছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু এই সমিতির রাজনীতি বা বিপ্লবের দিকে ঝোঁক ছিল না, এর ঝোঁক ছিল রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের দিকে। এ সমিতিগুলো পরবর্তীকালের বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর উৎস ছিল না, যদিও কখনো কখনো এরকম দাবি করা হয়। আসলে এসব সমিতি তরুণদের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে আগ্রহী করে তোলে এবং তাদের মধ্যে জাতীয় প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জীর রচনাবলী এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী এ প্রেরণাকে আরো প্রবল করে তোলে। এভাবে বৃটিশের অনুগত বাঙালিরাই বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিরোধ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা নিল।

জঙ্গি প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল মহারাষ্ট্র। ১৮৭০-এর দশকে বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে একটা দুর্বলভাবে সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল দেশকে হিন্দুধর্মের শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করা। এই অত্যুৎসাহী বিদ্রোহীর দ্বীপান্তর হয়ে যাবার পঁচিশ বছর পর চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় পুনার ফাদকে চিতপবন ব্রাহ্মণদের

মতো একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন, যেটার প্রকৃতি ছিল বাংলার গোপন সমিতিগুলোর অনুরূপ। কিন্তু এখানে যে শারীরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো এবং যে বৃটিশবিরোধী ভাবাবেগ সঞ্চার করা হতো, তাতে বিপ্লবের প্রেরণা তেমন ছিল না। ১৮৯৭ সালের মহামারীর সময় ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে নগরের প্লেগ কমিশনের চেয়ারম্যান ডাব্লু. সি. র‍্যান্ড তাঁর দৃঢ় অথচ অসংবেদনশীল নীতির কারণে "আমাদের ধর্মের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন"। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে তাঁরা র‍্যান্ডকে এবং সি. ই. আয়েরস্ট নামক আরেকজন ইংরেজকে গুলি করে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডকে বলা যায় আধা-রাজনৈতিক, যেটার জন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কংগ্রেস নেতা বি. জি. তিলকের লেখনী তাঁদের অন্তত আংশিক উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু মুখ্যত তাঁরা তাড়িত হয়েছিলেন ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও ধর্মীয় উন্মাদনা দ্বারা।

বাংলায় "আধুনিক" বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা

পণ্ডিতগণ প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দুই ধরনের সহিংস বিরোধিতা নির্দেশ করেছেন: সনাতন ও "আধুনিক" বিরোধিতা।[২] প্রথমটি হচ্ছে 'প্রাক-রাজনৈতিক', যার উদ্ভব সুনির্দিষ্ট অভাব-অভিযোগের দরুন কৃষক সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে। দ্বিতীয়টির সূত্রপাত করে শহরাঞ্চলের উচ্চ শ্রেণী একটি সচেতন রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলার কৃষক অভ্যুত্থান সনাতন হিংস্রতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চাপেকারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক আত্মসচেতনতা, কিন্তু একে আচ্ছন্ন করেছে ধর্মীয় চেতনা এবং সক্রিয় করেছে ব্যক্তিগত ক্ষোভ। আধুনিক ধরনের সংগঠিত সহিংসতার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল বাংলাতেই, শতাব্দীর সূচনাপর্বে।

এই সময় কলকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী এবং জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে সোচ্চার কেন্দ্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই "রাজনীতি" সংগঠিত জনমতের অধিক কিছু ছিল না, কারণ এমন কোনো দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না, যার মাধ্যমে ভারতীয়রা ক্ষমতার অংশীদার হতে পারতো। তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ, কংগ্রেসের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও আইনসভায় উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী ছিল দেশের রাজনৈতিক জীবনের সীমানাফলক। এই সীমিত ভূখণ্ডের মধ্যেই সুরেন্দ্র নাথ ও মতিলাল ঘোষের মতো ব্যক্তিরা বাংলার শিক্ষিত সমাজের উপর নিজ ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতে পেরেছিলেন। অনুরূপভাবে বোম্বাইতে ফিরোজশাহ মেহতা তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পুনাতে জনগণের অনুগত্য বিভক্ত হয়ে গেল; একদিকে ছিলেন সতর্ক জি. কে. গোয়েল, আরেক দিকে হঠকারী তিলক। আরো কয়েকটি শহরের কয়েকজন নেতার ভূমিকা বর্ণনা করলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে।

২. Richard C. Hula, "Political Violence and Terrorism in Bengal" in Michael Stohl, ed., *The Politics of Terrorism* (New York : Marcel Dekker, 1983), 419-45

ভারতীয় রাজনীতির সহজাত নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রথম যাঁরা আওয়াজ তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৯৩ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেই তিনি লিখলেন, কংগ্রেস এমনই সংগঠন, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না, একটিমাত্র সীমিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে ; তাই এটাকে সঙ্গতভাবে জাতীয় সংগঠন বলা যায় না।[৩] এই তরুণকে বলা হলো তার সমালোচনার সুর নরম করতে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এক দশক তিনি রাজনীতিভিত্তিক সাংবাদিকতা থেকে দূরে থাকলেন। ক্রমে অরবিন্দের বিশ্বাস জন্মালো যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রয়োজন একটি জঙ্গি বৈপ্লবিক আন্দোলন, আমেরিকান, ফরাসি ও আইরিশ আন্দোলনের মতো যেগুলো সম্বন্ধে তিনি ইংল্যান্ডে অধ্যয়ন করেছেন। ১৯০২ সালের দিকে যখন তিনি পশ্চিম ভারতে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে তিনি এই মতাবলম্বী কিছু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। সে সময় যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী নামক এক বাঙালি তরুণকে বরোদার মহারাজার সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ লাভে তিনি সাহায্য করেন। ১৯০২ সালের দিকে ব্যানার্জী কলকাতায় গিয়ে তরুণদের শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বৈপ্লবিক প্রচারণায় আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেন। এই শহরে কয়েকটা ক্লাব ও সমিতি তখনো সক্রিয় ছিল। এগুলোর মধ্যে যেটি সম্ভবত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল সেটি পরিচালনা করতেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী সরলা দেবী ঘোষাল। অনুশীলন সমিতি নামে আরেকটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সতীশচন্দ্র বসু ১৯০২ সালে। শীঘ্রই সতীশ প্রমথনাথ মিত্র নামে হাইকোর্টের একজন ব্যারিস্টারকে উদ্যোক্তারূপে পেলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজেই সমিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যতীন ব্যানার্জী সরলা দেবী ও পি. মিত্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁরা সতীশের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। ১৯০২ সালের মার্চে যতীন ও সতীশের দল দু'টি নতুন নামে একীভূত হয়ে গেল। এর নতুন নামটি সতীশ আগেই চয়ন করে রেখেছিলেন।

স্থাপিত হবার পর কয়েক বছর পর্যন্ত অনুশীলন সমিতি বা কলকাতার অন্যান্য দল দেশে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। রাজধানী ও মফস্বল অঞ্চলে কতিপয় যুবককে সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তারা অক্ষতিকর ধরনের কর্মকাণ্ডেই জড়িত হতো। ১৯০৩ সালে অরবিন্দ তাঁর ভ্রাতা বারীনকে পাঠালেন যতীনকে সহায়তা দান করতে। শীঘ্রই এই দুই যুবকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলো, বারীন গুজরাট ফিরে গেলেন। সেই সময় হয়তো আন্দোলনটার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো যদি কিছু রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত না হতো। ১৯০৫ সালে সরকার ঘোষণা করলো যে তা বঙ্গবঙ্গের বিতর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। জনগণের অভূতপূর্ব প্রতিরোধের মুখে স্বদেশী ও পণ্যবর্জন আন্দোলন জন্মলাভ করলো। প্রদেশের সর্বত্র বড় বড় প্রতিবাদসভা হতে লাগলো। পণ্যবর্জন কার্যকর করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের দলে দলে সংগঠিত করা হলো। ফলে

৩. Sri Aurobindo, *Bande Mataram · Early Political Writings and Speeches -1* (Pondicherry : Sri Aurodindo Ashram, 1972), 16.

স্বল্পকালের জন্য তা বেশ জোরদার হলো। কিন্তু মুসলমানরা এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। তারা এতে অংশগ্রহণের তাগিদ বোধ করেনি। হিন্দুদের মতো বঙ্গভঙ্গের নতুন বিধানের বিরোধিতা করার কোন কারণ মুসলমানদের ছিল না।

যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল, সেটা আরো আমূল পরিবর্তনমুখী ক্রিয়াপদ্ধতিকে উৎসাহিত করলো। বিপিন চন্দ্র পাল ও ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় দ্রুত বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠীর মুখপাত্ররূপে অকস্মাৎ খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। এই গোষ্ঠী মনে করতো, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও তাঁর কংগ্রেসী মিত্ররা যতটা প্রয়োজন ততটা আক্রমণশীল নয়। ১৯০৫ সালের শেষদিকে তাঁরা নিজদেরকে একটা নতুন দলরূপে পরিচিত করতে লাগলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা তাঁরা আখ্যায়িত হলেন চরমপন্থী বলে।

প্রথম থেকেই চরমপন্থী রাজনীতিবিদ ও বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর মধ্যে একটা মিথোজীবী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তরুণরা নেতাদের কাছ থেকে বস্তুগত সহায়তা ও নৈতিক অনুমোদন পেয়ে আসছিলেন। বিনিময়ে তাঁরা নেতার শক্তির ভিত্তি ও দক্ষিণ হস্ত হিসেবে কাজ করতেন। নেতার মান-মর্যাদা ও বাগ্মিতা সমিতিগুলোকে অনেকখানি এগিয়ে নিল। ১৯০৫ সালের নভেম্বরে বিপিন চন্দ্র ও পি. মিত্র ঢাকা সফর করলেন এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আহ্বান জানালেন দেশমাতৃকার জন্যে তাদের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে। যে আশি জন স্বেচ্ছাসেবী এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উয়ারির বাসিন্দা পুলিন বিহারী দাস। অনুশীলন সমিতির যেটা ব্যস্ততম কর্মক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠেছিল সেটারই প্রধান নিয়োগ করা হলো তাঁকে। তাঁর নেতৃত্বে এটা প্রদেশময় "দাবাগ্নির মতো" ছড়িয়ে পড়লো। এর পাঁচ শ'র অধিক শাখা খোলা হলো, যেগুলো পুলিনের সদর দপ্তরের সঙ্গে "ঘনিষ্ঠ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক সূত্র" দ্বারা যুক্ত হলো। ঢাকা অনুশীলন "শীঘ্রই তার মূল সংগঠনকে ছাড়িয়ে গেল" এবং অনেক ক্ষুদ্র দলকে টেনে নিল, বিশেষকরে পূর্ব বাংলায়।[৪] প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেই এটা স্বদেশী আন্দোলনে যে আগ্রহ অর্জন করেছিল তা হারিয়ে ফেলল এবং বাংলার প্রধান দু'টি বিপ্লবী সংগঠনের একটিতে পরিণত হলো।

অপর দলটি কোন এককেন্দ্রিক দল ছিল না, বরং তাকে একটা শিথিল ধরনের জোট বলা যায়। আলোচ্য বছরগুলিতে এটা একটা বেনামী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠে। এর আদি পর্ব একটা সংবাদপত্রের আদি পর্বের সাথে যুক্ত এবং এর নামকরণও হয় সেই সংবাদপত্রের নামানুসারে—'যুগান্তর'। ১৯০৬ সালের শুরুতে অরবিন্দ ঘোষ বরোদায় তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে আসেন। তাঁর ভ্রাতা বারীনও একই সময়ে কলকাতা পৌঁছান। অরবিন্দের প্রথম কাজ হলো নতুন বেংগল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠা

৪. *Memorandum on the History of terrorism in Bengal* (Calcutta : Bengal Government Press, 1933), 4; J. C. Nixon, *An Account of the Revolutionary Organizations in Bengal other than the Dacca Anushilan Samity* (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1917) [hereafter Nixon Report], 9; Charles Tegart, "Terrorism in India", Supplement to the Review of India, November 1932, 8.

করা। তাছাড়া তিনি বারীন ও অন্যান্যদের সাহায্য করলেন একটা খবরের কাগজ প্রকাশ করতে, যেটা খোলাখুলিভাবে একটা বৈপ্লবিক কর্মসূচি দেশের সামনে তুলে ধরবে। 'যুগান্তর'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো মার্চ মাসে। এ পত্রিকার পাঠকসংখ্যা প্রথমদিকে কম থাকলেও ক্রমশ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পত্রিকাটি জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তোলে। এটি জনগণকে দেশ স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানায়। এ পর্যায়ে বাঙালি তরুণদের বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে পত্রিকাটির এই আহ্বান : "ভারতকে মুক্ত করতে গিয়ে পাঁচ কোটি লোকের প্রাণবলিদান কি শান্তির ভয়ানক আশ্রয়ে এই নির্বীর্য মৃত্যুর চেয়ে শতগুণ শ্রেয় নয়...জীবনে যদি প্রকৃত মানুষ না হতে পার, মৃত্যুতে হও। তুমি কীভাবে জীবন ধারণ করবে সেটা বিদেশীরা এসে নির্ধারণ করে দিয়েছে, কিন্তু কীভাবে তুমি মরবে সেটা পুরোপুরি তোমার হাতে।"[৫]

একই সময়ে বারীনও চেষ্টা করছিলেন অনুশীলন সমিতির ভাঙা টুকরোগুলোকে নতুন করে জড়ো করতে। এক বা দু'ছর আগে যতীন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর সাথে তাঁর বিরোধের কারণে সমিতি ভেঙে গিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন জনগণের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি করেছিল এবং যুগান্তরের বিপ্লবী বাণী সেটাকে উসকে দিয়েছিল। ফলে তরুণদের দলে টেনে এনে বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত করা সহজ হলো। এভাবে এক ঝাঁক ছোট দল বৈপ্লবিক কর্মসূচি শুরু করে। পরে তারা সেই পত্রিকাটির নামে পরস্পর যুক্ত হয়ে যায়, যা ছিল তাদের প্রেরণার উৎস।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকাল। পত্রিকা সম্পাদনায় কাজ করতে করতে বারীন তখন ক্লান্ত। সে সময়ে সমিতির কলকাতাভিত্তিক এক পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে তিনি প্রস্তাব পেলেন একটা হত্যা প্রচষ্টায় অর্থ যোগানোর জন্য। এজন্য নির্বাচিত লক্ষ্যবস্তু বাম্পফিল্ড ফুলার, পূর্ববাংলা ও আসামের নবগঠিত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর। ফুলার সাহেব বাংলার হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কারণ তিনি স্বদেশী আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিলেন এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর ছিল স্বঘোষিত পক্ষপাত-নীতি। বারীন এবং মেদিনীপুর থেকে ভর্তি করা সদস্য হেমচন্দ্র দাস গৌহাটি থেকে বরিশাল ও সেখান থেকে রংপুর পর্যন্ত ফুলারের পিছু নিলেন। কিন্তু হত্যা-প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। শেষোক্ত স্থানে বারীন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি ডাকাতির পরিকল্পনা করেন, কিন্তু এলাকায় পুলিশ এসেছে শুনে সেটা বর্জন করেন। এ দু'টি পরিকল্পিত তৎপরতাই ছিল বাংলায় সম্ভবত এই প্রথম।[৬] এ দুটোর সূত্র ধরে বিঘোষিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পরবর্তীকালে কয়েক ডজন হত্যাকাণ্ড এবং কয়েক শ' ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়, যেগুলোর অনেকগুলো সফল হয়। অতএব বলা চলে, এসব পরিকল্পনা বাংলায় সক্রিয় সন্ত্রাসী

---

৫. "যুগান্তর", ১৭ জুন,১৯০৬। বাংলা পাঠ, উমা মুখার্জী ও হরিদাস মুখার্জী, *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান;* (কলিকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিঃ, ১৯৯৬), ১৬০।

৬. বাংলাতে কথোপকথনের সময় সন্ত্রাসবাদীরা যেকোনো প্রচেষ্টাকে (ডাকাতি, হত্যা) *কাজ* বা *কর্ম* বলতেন, যখন ইংরেজিতে কথা বলতেন তখন বলতেন "এ্যাকশন"।

আন্দোলনের সূচনা করে। আনাড়িপনা ও ব্যর্থতার জন্য বারীন ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন।

১৯০৭ সালে বারীন ও হেমচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় অধিকতর পেশাদারি দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করলেন। হেমচন্দ্র প্যারিসে যান, সেখানে থাকাকালে নৈরাজ্যবাদীদের সংস্পর্শে আসেন এবং বৈপ্লবিক রাজনীতি ও বোমা তৈরিতে পাঠ নেন। এই নৈরাজ্যবাদীদের কেউ কেউ রুশ ছিলেন।[৭] বারীন কলকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলায় তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন একটা বাগানবাড়িকে বৈপ্লবিক স্কুল ও অস্ত্রাগারে রূপান্তরিত করেন। এখান থেকেই প্রথম তিনি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু করেন। যেমন ১৯০৭ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে বহনকারী রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করার ব্যবস্থাগ্রহণ এবং ১৯০৮ সালের জানুয়ারি ও এপ্রিলে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট ও পরবর্তীকালে মুজাফফরপুরের জজ ডগলাস কিংসফোর্ডকে হত্যার কাজ সম্পন্ন করা। মুজাফফরপুরের এই এ্যাকশন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি সম্পাদন করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এটা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলোর অন্যতম। বারীন কর্তৃক পরিকল্পিত অন্য সকল এ্যাকশনের মতো এটাও ব্যর্থ হয়। কিংসফোর্ডের স্থলে দু'জন নিরপরাধ ইংরেজ মহিলা নিহত হলেন। এই "চরম নিষ্ঠুরতা" সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচিকে অন্য সমিতিগুলো কর্তৃক ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে পরিচালিত দু'টি সফল অভিযানের চেয়েও প্রকটভাবে জনগণের সামনে নিয়ে এলো। এ দু'টি অভিযানের একটি হচ্ছে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় একটা দল কর্তৃক চিংগ্রিপতায় (২৪ পরগনা) ডাকাতি এবং অরেকটি হচ্ছে ঢাকা অনুশীলনের সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. এ্যালেনের উপর গুলি বর্ষণ। সেক্রেটারি অব স্টেট জন মরলি মন্তব্য করলেন যে এ্যালেনকে গুলি করার সংবাদ পেয়ে তিনি বিস্মিত হন নি। ভাইসরয় লর্ড মিন্টোকে তিনি লিখলেন, "দীর্ঘদিন ধরে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সরকারের প্রতি ভারতবাসীর বৈরিতা ক্রমশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাড়তে থাকবে এবং হত্যাকাণ্ডের পর্যায়েও চলে যাবে।"[৮] এখন থেকে আধুনিক সশস্ত্র বিপ্লব বাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যপটের অংশ হয়ে দাঁড়ালো।

প্রভাব ও মতাদর্শ

মরলির মন্তব্য থেকে মনে হয়, তিনি বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবকে তীব্র রাজনৈতিক অসন্তোষের স্বাভাবিক পরিণতি বলে গণ্য করতেন। পক্ষান্তরে মিন্টো মনে করতেন, এটা নেহাত অনুকরণজনিত। মুজাফফরপুরের ঘটনার পর মরলিকে লেখা পত্রে তিনি বলেন যে

---

৭. এই সময় প্যারিসে নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে এবং সেখানে হেমচন্দ্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে দেখুন, P. Heehs, "Foreign Influences on Bengali Revolutionary Terrorism 1902-1908", *Modern Asian Studies* 28 (1994) : 533-56.

৮. Morley to Minto, 26 December 1907. *Minto Papers* (National Library of Scotland).

চক্রান্তকারীদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতে এযাবৎ অজ্ঞাত হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পন্থার বিস্তৃতি ঘটানো, যেটা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং অনুকরণপ্রিয় বাঙালি ছেলেমানুষের মতো বির্বিচারে গ্রহণ করেছে।[৯] ভাবটা এই যে বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবীদের কোনো প্রকৃত মতাদর্শ নেই। কংগ্রেসের সদস্যরা যেমন সংসদসদস্য হিসেবে খেলছে, তেমনি সশস্ত্র বিপ্লবীরা নৈরাজ্যবাদী হিসেবে খেলায় মেতেছে।

বাংলার সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদে যে বিদেশী প্রভাব ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অরবিন্দ আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রথমদিকের "গুপ্ত সমিতিগুলোর" সদস্যরা মাতসিনির (Mazzini) কাছ থেকে কিছুটা প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং কিছু বইপত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন, যেমন টমাস ফ্রস্টের *Secret Societies of the European Revolution*। দু'জন অভারতীয়ও কলকাতার সেই মহলকে প্রভাবিত করেছিলেন, যা থেকে ১৯০২ সালের দিকে বৈপ্লবিক সমিতিগুলোর উদ্ভব হয়। সমিতিভিত্তিক আন্দোলনের যখন সূচনালগ্ন, ঠিক সেই সময় জাপানী সমালোচক কাকুজো ওকাকুরা প্রমথনাথ মিত্র ও আরো কয়েকজনকে বৈপ্লবিক আদর্শ ও সর্ব এশীয় ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত করেন। এ পর্যায়ে আইরিশ মহিলা মার্গারেট নোবল-এর নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর থেকে 'সিসটার নিবেদিতা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। অরবিন্দ ঘোষ, সতীশ বসু এবং 'যুগান্তরের সহ-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজন তরুণের সাথে নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল। পিটার ক্রপটকিন, যিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না এবং বৈপ্লবিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর সাথেও নিবেদিতা পত্রযোগাযোগ রেখেছিলেন। নিবেদিতার নিজেরও কিছু বিপ্লবাত্মক ধ্যান-ধারণা ছিল বলে জানা যায়। উক্ত তরুণদের তিনি কিছু বাছাই করা বই পড়তে দিয়েছিলেন, যেগুলোর মধ্যে বিপ্লবের ইতিহাস সংক্রান্ত বইও ছিল এবং মাতৃভূমির প্রতি তাদের যে কর্তব্য আছে সেটা নিবেদিতা তাদের মনে করিয়ে দিতেন। মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, "বৈপ্লবিক দল" সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার পূর্বে তিনি এই সংগঠনের নেত্রী ছিলেন। এ ধরনের কিছু অস্পষ্ট প্রভাব ছাড়াও ১৯০৭ সালে প্যারিসে হেমচন্দ্র দাসের সাথে ইউরোপীয় বিপ্লবীদের যে যোগাযোগ ঘটেছিল এটা নিশ্চিত। হেমচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন যে যেসব বিপ্লবী ধারার রাজনীতির সংস্পর্শে তিনি এসেছেন সেগুলি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ও অনাগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল বিস্ফোরণ সংক্রান্ত রসায়ন। এই বিদ্যা তিনি ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন এবং যখন ভারতে ফিরে আসেন তখন সঙ্গে নিয়ে আসেন বিস্ফোরণের উপর হাল আমলের তথ্য সম্বলিত একটা হাতবই।

এই প্রযুক্তিগত ঋণকেই বলা চলে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের উপর সবচেয়ে বড় বিদেশী প্রভাব। বৃটিশ আমলারা ভারতীয় আন্দোলনকে অনুকরণশীল বলে অভিহিত করেছিলেন,

৯. Minto to Morley, 6 May 1908, *Morley Papers* (British Library, Oriental and India Office Collection).

কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অভাব-অভিযোগগুলো ন্যায়সঙ্গত। মিন্টো ১৯০৮ সালে লিখলেন : "স্বদেশে জনগণ মারাত্মক ভুল করবে যদি তারা মনে করে যে মুজাফফরপুরে যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তা অত্যাচারীর কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রামরত জনগণের তৎপরতার বহিঃপ্রকাশ।"[১০] এটা অবশ্যই মিন্টোর একটা বিরাট ভুল ছিল। বিপ্লবের যাঁরা হোতা ছিলেন, যেমন বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, তাঁদের মতাদর্শ যদিও অংশত ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠের ফলে জন্ম নিয়েছে, মূলত এটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ও দেশজ প্রতিক্রিয়া। তাঁদের মতাদর্শের তিনটা প্রধান লক্ষ্য ছিল : রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বরাজ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যা স্বদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনেরও লক্ষ্য ছিল এবং জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে কেবল প্রথম লক্ষ্যটার সরাসরি আবেদন ছিল। অনুশীলন সমিতির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় : কোনো জননন্দিত এবং বাহ্যিক স্বদেশী আন্দোলনের সাথে এই সমিতির কোনো প্রকাশ্য সম্পর্ক নেই, যেমন বিলাতি দ্রব্য, বস্ত্র, লবণ, চিনি ইত্যাদি বর্জন। এসব বিষয়ে কোনো বিবাদ বা বিরোধ অথবা মামলায় জড়িয়ে পড়া সমিতির নীতিবিরুদ্ধ।[১১] তেমনি বারীন ঘোষের দলও স্বদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনকে "বানিয়া রাজনীতি" বলে চিহ্নিত করলো। একটিমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এটা অর্জনের একমাত্র উপায় শক্তিপ্রয়োগ।

শক্তিপ্রয়োগের প্রশ্নে চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। বিপিন চন্দ্র পাল এর বিপক্ষে ছিলেন, অরবিন্দ ছিলেন পক্ষে। এটাই ছিল 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদকীয় পর্ষদ থেকে পালকে বহিষ্কার করার অন্যতম কারণ। যদিও অরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধতত্ত্ব (১৯০৭) স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশক ছিল, তিনি তাঁর এ অভিমত গোপন রাখেন নি যে একটি জাতি সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।[১২] কিন্তু যতীন ব্যানার্জী ও বারীন ঘোষকে যখন তিনি সমিতি সংগঠন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর চিন্তায় ছিল দুই বা তিন দশককাল ধরে গড়ে তোলা বড় মাপের জঙ্গি অভ্যুত্থানের কথা। অধৈর্য এবং অর্থ প্রদানকারীদের চাপ বারীন ও অন্যান্যদের সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। যদিও অরবিন্দ বাস্তবিক অর্থে হত্যা ও ডাকাতি সমর্থন করতেন না, তথাপি তাঁর ভ্রাতার তৎপরতা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন এবং অন্তত এতে মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন।[১৩] অহিংসা বনাম হিংস্রতার প্রশ্নটি বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল পর্বেই একটা জাগ্রত প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল।

১০. Minto to Morley, 27 May 1908. Morley Papers.

১১. Cited in P.K. Ghosh, "Ideology of a Revolutionary Secret Society : Anushilan Samity, 1902-1918". India Past and Present 1 (1984) : 94.

১২. Sri Aurobindo, *On Himself* (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1972), 41.

১৩. এ-সম্পর্কে আলোচনা ও সূত্রের জন্য দেখুন, P. Heehs, "Aurobindo Ghose and Revolutionary Terrorism", *South Asia*, 15 (1992), 47-67.

বিপ্লবীদের মতাদর্শে ধর্মের স্থান নির্ণয় একটা সমস্যা ছিল। অরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র, ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় এবং অন্যান্য তথাকথিত "হিন্দু"[১৪] প্রচারক তাঁদের লেখায় প্রায়ই ধর্মীয় চিত্রকল্প ব্যবহার করতেন এবং কখনোবা তাদের আন্দোলনকে "ধর্ম" হিসেবে চিহ্নিত করতেন। ফলে সমকালীন বৃটিশ পর্যবেক্ষকরা এবং পরবর্তীকালের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসবিদরা ধর্মের সাথে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলার দায়ে, এমনকি সাম্প্রদায়িকতার দায়ে তাঁদের অভিযুক্ত করেছেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ বঙ্গভঙ্গবিরোধী বিক্ষোভে রাজনৈতিক রূপ নেয়।[১৫] স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকরা ও মুসলিম রাজনৈতিক কর্মীরা পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস জন্ম নেয়। সাংবাদিক ও প্রচারপুস্তক রচয়িতারা আক্রমণাত্মক বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য স্থানে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। আত্মরক্ষার ডাক প্রতিশোধের হুংকারে পরিণত হয়।

এই অবনতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্র "দেশপ্রেমের ধর্ম" প্রচার করেন। কোনো কোনো সময় জনপ্রিয় ধর্মের ভাষা ব্যবহার করে তাঁরা আন্দোলনকে মেরুকরণের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন।[১৬] কিন্তু অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্র উভয়েই হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও গড়ে উঠতে থাকা ভারতীয় জাতির অংশ বলে গণ্য করতেন। উভয়েই জাতীয় আন্দোলনে আরো বেশি অংশগ্রহণের জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানান এবং দুই সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হন। অবশ্য উভয়েই মনে করেন, ১৯১০ সালে মরলি-মিন্টো সংস্কার দ্বারা প্রবর্তিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের বিধান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সর্বনাশ ডেকে আনবে। হলোও তাই।

বাংলায় বিপ্লবের প্রধান নায়কদের মতাদর্শে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনা কোনো স্থান পায়নি। তবে নিম্ন পর্যায়ে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সমিতির কিছু

১৪. এই বাক্যে উল্লেখিত তিন ব্যক্তির মধ্যে কেহই ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু ছিলেন না, যদিও এঁদের সকলেরই ধর্মীয় পরিচয় হিন্দু বা ব্রাহ্মণ।

১৫. বিশদ জানার জন্য দেখুন, এই খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে জন আর ম্যাকলেনের প্রবন্ধ, "বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক"।

১৬. এই সম্ভাবনাটা আমি মেনে নিলাম যদিও সমসাময়িক এমন কোনো দলিলপত্র মনে করতে পারছি না, যার দ্বারা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় যে জঙ্গিদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি মুসলিমদের বিরূপ করে তুলেছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক যখন তিক্ত হয়ে উঠল, তখন দুই পক্ষেরই বক্তব্য হয়ে গেল আরো উস্কানিমূলক। তথাকথিত *Red Pamphlet* ছিল হিন্দুবিরোধী ও স্বদেশীবিরোধী। 'যুগান্তর'-এর মতো পত্রিকা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাঁধাধরা বুলি বাদ দিয়ে চড়া সুর ধরলো। কিন্তু যতটা জানি, সরাসরি কোনো প্রকার উস্কানি দেয়নি। বলাই বাহুল্য, সংরক্ষিত নথিপত্রে তখনকার অংশগ্রহণকারীদের মনোভাবের সঠিক পরিচয় নাও থাকতে পারে। তাছাড়া, দেশমাতৃকাকে একটা হিন্দু দেবী কল্পনা করে তাকে রক্ষা করার ডাক যদি মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন নাও করে থাকে, অনুপ্রাণিত করে নি নিশ্চয়ই। আলোচনা ও উৎসের জন্য দেখুন, P. Heehs, *The Bomb in Bengal* (Delhi : Oxford University Press, 1993), 105-7.

সংখ্যক সদস্য বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানদের তাঁদের শত্রু বলে গণ্য করতে লাগলেন। সমিতির সদস্য এবং মুসলিম রাজনৈতিক কর্মীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ নেয়। খুব কম সংখ্যক মুসলমানই বৈপ্লবিক দলের সদস্য হয়েছিল। ঢাকা অনুশীলনের সদস্য হওয়ার পথ তাদের জন্য রুদ্ধ ছিল, যদিও নীতিগতভাবে সমিতির সদস্যদের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল "একটা জাতি হিসেবে মুসলমানদের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব প্রকাশ বা অন্যায় আচরণ না করার জন্য"।[১৭] দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা নিঃসন্দেহে আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এ বৈরিতার কারণে পূর্ব বাংলার সমিতিগুলো মুসলমান কৃষকদের সমর্থন পেল না। এতে সরকারেরই লাভ হলো। কিন্তু বৃটিশরা কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাড়িয়ে দিলেও তারা যে এ বিভেদ সৃষ্টি করেনি এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর গঠনকাঠামো

দু'টি বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন ও যুগান্তরের গঠনকাঠামো ছিল ভিন্ন। যুগান্তর ছিল বিভিন্ন নেতার পরিচালিত কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত একটা শিথিল জোট, যারা মাঝে মাঝে একযোগে কাজ করতেন। অনুশীলন ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত, এর পদসোপান (hierarchy) ছিল উল্লম্ব ধরনের এবং এতে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা। দুটো প্রতিষ্ঠানই ছিল কাঠামোগত দিক দিয়ে সম্ভবত সর্বোত্তম ধরনের, যার সাথে যেকোন নির্দিষ্ট সমিতির কাঠামোর কমবেশি মিল রয়েছে।

বারীন ঘোষ কর্তৃক ১৯০৭ সালে মানিকতলায় প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিকে যুগান্তর ধাঁচের সংগঠনের আদি রূপ বলা যায়।[১৮] তাত্ত্বিকভাবে দেখলে এটার একটা জটিল পদসোপান (hierarchy) ছিল, যেটা ফ্রস্টের *Secret Society*-এর মতো গ্রন্থে বর্ণিত রুশ ধাঁচের। প্রকৃত সাংগঠনিক দলিলে দেখা যায় দু'জন সক্রিয় নেতা বারীন ও উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মধ্যে এবং সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মৌলিক বিভেদ। অরবিন্দ সহ উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের কেবল সক্রিয় নেতাদের পরিচিত বলে ধরে নেয়া হয়। প্রত্যেক সদস্যের জন্য তিনটা কার্যবৃত্ত নির্ধারিত ছিল : (১) অর্থ সংগ্রহ, (২) সশস্ত্র বিপ্লবের বাস্তব কার্যক্রম এবং (৩) প্রচারণা। বাস্তব ক্ষেত্রে মৌলিক বিভেদ ছিল "সামরিক" কাজ (দ্বিতীয় কার্যবৃত্ত সম্পর্কিত) এবং "অসামরিক" কাজের মধ্যে।

মানিকতলা ও অন্যান্য দলের সদস্যরা প্রায়ই দাবি করতেন যে ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতিগুলোর বিরাট জালের সাথে তারা যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ

১৭. "Rules of Membership of the Anushilan Samiti'. circa 1913, and a Circular of the Anushilan Samiti, circa 1907, cited in P.K. Ghosh, "Ideology of a Revolutionary Secret Society", 95.

১৮. পরবর্তী বিবরণের ভিত্তি, P. Heehs, " The Maniktala Secret Society: An Early Bengali Terrorist Group, *Indian Economic and Social History Review* 29 (1992), 349-70.

মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সীমিত ছিল, যাঁদের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল পশ্চিম ভারতে। বাংলার অভ্যন্তরে মানিকতলা সমিতির সাথে অন্যান্য দলের যোগাযোগ ছিল, যেমন অনুশীলন এবং আত্মোন্নতি সমিতি। কিন্তু এ সম্পর্ক যতটা ছিল সহযোগিতামূলক, তার চেয়ে বেশি ছিল প্রতিযোগিতামূলক। মানিকতলা সমিতির প্রাথমিক সদস্যরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে যুগান্তর নেটওয়ার্ক তার স্থান দখল করে এবং এই নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়।

লিওনার্ড গর্ডনের মতে[১৯], ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে যুগান্তর নেটওয়ার্কের প্রতিটি উপদল ছিল স্বতন্ত্র ইউনিট এবং একজন নেতা ও তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এ ইউনিট গঠিত হতো। এ নেতা দাদা নামে পরিচিত ছিলেন। এ নাম থেকেই স্পষ্ট যে দাদা ছিলেন বিপ্লবী পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। তিনি ছিলেন একজন গুরু, যিনি শিষ্যদের শেখাতেন বিভিন্ন দক্ষতা ও কৌশল আর পাঠ দিতেন বৈপ্লবিক আদর্শে। গর্ডন মনে করেন, গ্রামবাংলায় যে সামাজিক কাঠামো আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল তা থেকেই দাদা-ব্যবস্থার উদ্ভব। তিনি মনে করেন, তাদের কর্মকাণ্ডের আওতায় রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি বাংলার গ্রামাঞ্চলে জমিদার-প্ররোচিত সহিংসতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। লোক সংগ্রহ, অর্থ ও সম্পদ অর্জন প্রভৃতি কাজে দাদারা যেমন পরস্পর সহযোগিতা করতেন, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতেন।

অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে একটু বিশদ বর্ণনা দেয়া সম্ভব, কারণ ঢাকায় এর কেন্দ্রীয় সংগঠনের বিধিমালা লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং সরকারি প্রতিবেদনে এর পূর্ণ বিবরণ বা সারাংশ প্রকাশিত হয়েছিল।[২০] কিন্তু মনে হয়, এর কোন নিয়মসিদ্ধ গঠনপ্রক্রিয়া সকল শাখার উপর চাপিয়ে দেয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। একটা হিসাব অনুসারে এক পর্যায়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির ৫০০ শাখায় ২০,০০০ সদস্য ছিল। অধিকাংশ শাখা বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহ, বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও শাখা খোলা হয়। ফেরারিদের জন্য আসামে গোপন আশ্রয়কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল আর ত্রিপুরায় ছিল দুটো খামার।

সম্ভবত পুলিন বিহারী দাসের লেখা একটা অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তিতে (আনু. ১৯০৮) বলা হয় যে এখনকার মতো সুব্যবস্থা করার জন্য সমগ্র বাংলাকে বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করা এবং কয়েকটি ছোট ছোট সমিতির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রধানত বৃটিশ প্রশাসনিক বিভাগ অনুসরণে বিন্যাসটা করা হয়েছিল সমিতির

১৯. Leonard A. Gordon. "Portrait of a Bengal Revolutionary". *Journal of Asian Studies* 27 (1968), 197-216.

২০. নিম্নের তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য, P. K. Ghosh, "Organizational Structure of a Revolutioanary Secret Society: Anushilan Samiti, 1901-1918", Bengal Past and Present 97 (1978): 139-48. ঘোষ পুলিশের জব্দকৃত সমিতির কাগজপত্র, সরকারি রিপোর্টসমূহ এবং সদস্যদের স্মৃতিকথাসমূহ কাজে লাগিয়েছেন।

সমগ্র কাজ অনুপুঙ্খভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনের জন্য সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে নিয়োগের প্রয়োজনে।[২১] পাঁচ বা দশ সদস্যের কয়েকটা দল একেকজন দলপতির নেতৃত্বে একেকজন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় সমিতিগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হতো। এগুলো ঢাকার কেন্দ্রীয় সংগঠন দ্বারা নিযুক্ত এবং এর নিকট দায়ী জেলা কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করতো। কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধিনায়ক ছিলেন পুলীন দাস এবং তিনি কারারুদ্ধ হলে যাঁরা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরা চারটি কার্যভিত্তিক দলে বিভক্ত ছিল। এ কার্যগুলো হলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, অস্ত্র সংরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ বিভাগের কর্মকাণ্ড। বার্তা আদান-প্রদান করা হতো বিশেষ বাহক মারফত এবং এ বার্তা লিখিত হতো গুপ্ত সংকেতলিপিতে। এই কর্মপ্রক্রিয়া এবং অন্য কার্যাবলীর বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যিক উৎসে এবং তা অংশত তরুণদের রোমান্টিক নাটকে অভিনয়ের চাহিদা পূরণ করতো।

সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর বিন্যাস

আলোচ্য সময়ে এবং পরেও বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলো প্রায় পুরোপুরি গঠিত হয়েছিল শহরাঞ্চলের অভিজাত হিন্দু তরুণদের দ্বারা। প্রথম দিকে এতে কোনো সক্রিয় মহিলা সদস্য ছিলেন না, বরং এতে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং কতকগুলো সমিতি সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছিল নারীসঙ্গ ত্যাগ করতে। ১৯২৪ সালের পর কয়েকটা দল মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেয় এবং কয়েকটা মহিলা দলও গঠিত হয়। হাতে-গোনা কয়েকজন মহিলা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশ নেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বীণা দাস। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবকে কেবল পুরুষদের কাজ বলেই মনে করা হতো।

সমিতিতে হিন্দুদের প্রাধান্যের কারণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমার বক্তব্য রেখেছি। কিন্তু এই প্রাধান্য চূড়ান্ত ছিল না। জাতীয়তাবাদী মৌলবি লিয়াকত হোসেনের প্রতি সমিতিগুলো অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল (গোঁড়া মুসলমানরা অবশ্য তাঁকে দলত্যাগী মনে করতেন)। ভবিষ্যতের কংগ্রেস নেতা আবুল কালাম আজাদ "দু'টি বা তিনটি উপলক্ষে" অরবিন্দ ঘোষের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং বৈপ্লবিক রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং দলগুলোর একটাতে যোগদান করেছিলেন।[২২] তা হলেও সাধারণ নিয়মের খুব বেশি ব্যতিক্রম সম্ভবত হয়নি। "হিন্দু" সশস্ত্র বিপ্লবীদের এক বড় অংশ ধার্মিক ছিলেন না, বিশেষকরে ১৯২০-এর পরে যখন অনেক বাঙালি তরুণ হিন্দু ধর্মচিন্তা বাদ দিয়ে মার্ক্সবাদী বিশ্বচিন্তার অনুসারী হন।

২১. উদ্ধৃত, S. A. T. Rowlatt and others, *Report of the Committee Appointed to Investigate Revolutionary Conspiracies in India* (London. 1918) [অতঃপর Rowlatt Report], ch. 5, para 88.

২২. Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom* (Delhi: Orient Longman. 1984). 4.

সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলোর অধিকাংশ সদস্য এসেছিলেন বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণী থেকে। তাঁদের বৃহদংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ বর্ণের। আলিপুর বোমা মামলায় (১৯০৯) যে ৩৬ জন সম্বন্ধে রায় দেয়া হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দু'জন ছাড়া সবাই ছিলেন উক্ত তিন বর্ণভুক্ত। বাংলায় ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে বৈপ্লবিক অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত অথবা অপরাধ সংঘটনের সময় নিহত ১৮৬ জনের মধ্যে শতকরা ৮৯ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ এবং শতকরা ৯ জন ছিলেন নিম্নবর্ণের। তিরিশের দশক জুড়ে একই ধারা অব্যাহত ছিল।[২৩] সর্বত্রই শহরাঞ্চলীয় বিপ্লবী দলগুলোতে উচ্চ শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যায়।[২৪] বাঙালি বিপ্লবী দলগুলোতে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর প্রাধান্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। বৃটিশরা এ আন্দোলনকে চিহ্নিত করলো 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর একটা চক্রান্ত হিসেবে। তারা মনে করেছে, এই শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়াই এর কারণ। আধুনিক কালের কোন কোন ইতিহাসবিদ দেখাতে চেয়েছেন, আন্দোলনটা অংশত ছিল 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর সেরাংশের (Elite) আপামর জনগণের উপর প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা। কিন্তু বোঝা যায় না শিক্ষা এবং চাকরির জগৎ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কারাগার এবং মৃত্যুর মখোমুখি হয়ে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাঁদের কোন উদ্দেশ্যটা সাধন করলেন। এই ধারণা আর নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না যে "শ্রেণী" বলে অভিহিত একটা নির্বস্তুক সত্তার বস্তুগত স্বার্থ থাকতে পারে।

উপরে তৃতীয় পর্বে উদ্ধৃত অংশে দেখানো হয়েছে, অরবিন্দ ১৮৯৩ সালেই আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। চরমপন্থীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ভিত্তি সম্প্রসারিত করেছিলেন ঠিক, কিন্তু অভিজাতের প্রতি পক্ষপাত বদলাননি। অনুশীলন ও অন্যান্য সশস্ত্র বিপ্লবী দল চেষ্টা করেছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলভুক্ত করতে। খুব একটা সাফল্য তারা লাভ করেনি।[২৫] তাদের প্রতি কৃষকদের সমর্থন যেমন ছিল না, তেমনি মুসলমানদেরও সমর্থন ছিল না, যার ফলে আন্দোলনটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

সকল যুগের, সকল দেশের বিপ্লবীদের মতো বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলোর অধিকাংশ সদস্য ছিল বয়সে তরুণ, অনেকে নেহাত ছেলেমানুষ। আলিপুর মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ৩৬ জনের গড় বয়স ছিল ২২। এই বয়সের নমুনাকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : এক শ্রেণীতে ছিলেন ৬ জন নেতা, যাঁদের গড় বয়স ৩২ এবং অন্য শ্রেণীতে ছিলেন ৩০ জন সর্বস্তরের সদস্য, যাঁদের বয়সের গড় ২০। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল তরুণরা। আলিপুর অথবা হ্যারিসন রোড মামলায় (১৯০৭-৮) যে ২১ জন আসামি

২৩. P. Heehs, *Bomb in Bengal*, 269.

২৪. Walter Laqueur, *The Age of Terrorism* (Boston: Little, Brown, 1987), 82-3.

২৫. *Terrorism in Bengal*, vol. 2 (Calcutta: Government of West Bengal, 1995), 741.

দণ্ডিত হয়েছিল এবং রাওলাট রিপোর্টে ১৯০৭-১৭ সালের যে ১৮৬ জন "বিপ্লবী অপরাধীর" তালিকা দেয়া হয়েছিল, সারণি-১-এ ৮টা স্তম্ভে বিভক্ত করে তাদের বয়স দেখানো হলো :

সারণি ১ : বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের বয়স, ১৯০৭-৮ এবং ১৯০৭-১৭

	১০-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪৫	৪৫+	নথিভুক্ত নয়
আলিপুর নমুনা	০	৯	৭	৪	০	১	০	-
রাওলাট নমুনা	২	৪৮	৭৬	২৯	১০	৯	১	১১

সূত্র : আলিপুর নমুনা : Government of Bengal pol. conf. file no. 24 of 1910. রাওলাট নমুনা : Rowlatt report , Annexure (2).। উভয় নমুনাতেই দণ্ড প্রদানের বা মৃত্যুর সময়ের বয়স ধরা হয়েছে, গ্রেপ্তারের সময়ের বয়স নয়। পিটার হিজের *Bomb in Bengal,* 270 থেকে গৃহীত।

সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর কার্যক্রম

সশস্ত্র বিপ্লবী সমিতিগুলোর কার্যক্রমকে দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম এবং (২) প্রকৃত সশস্ত্র তৎপরতা। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল দলভুক্তকরণ, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, বাইরের ছদ্ম কার্যক্রম, অস্ত্র সংগ্রহ এবং অর্থ সংগ্রহ। সম্ভাব্য সদস্যদের অধিকাংশকে স্কুল বা কলেজ থেকে দলভুক্ত করা হতো। দলভুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। দাদারাও সুযোগ পেলেই "ছেলে ধরার" কাজে লেগে যেতেন। মানিকতলা দলে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের অনেকে ছিল ছাত্র। 'যুগান্তর' পড়ে তারা যুগান্তর অফিসে চলে আসতো। স্বদেশী যুগের বাঙালিদের উপর এই পত্রিকার প্রভাব ছিল প্রবল। 'যুগান্তর'-এর অনেকগুলো নিবন্ধের একটা সংকলন বেরিয়েছিল 'মুক্তি কোন পথে ?' শিরোনামে। এটা হুহু করে বিক্রি হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এটা বাজেয়াপ্ত করলো। এই দলের আরেকটি দুঃসাহসিক প্রকাশনা ছিল 'বর্তমান রণনীতি'। এটা ছিল প্রধান দলের *Modern Weapons and Modern War* -এর ভাবানুবাদ। এর শেষ অধ্যায়ে বাঙালি লেখক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, "কীভাবে একটা দুর্বল নিরস্ত্র জাতি একটা অস্ত্রসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে পারে ?" লেখকই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন যে জনগণ যদি প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে কৃতসংকল্প হয়, তা হলে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যখন অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তখন দেশীয় সৈন্যরা দলত্যাগ করবে, পাহাড়ী উপজাতীয়রা জেগে উঠবে এবং তরুণরা নিজের মতো করে যুদ্ধে নামবে। এ সবের মিলিত ক্রিয়ায় এবং বিদেশী চাপের

মুখে শত্রু দুর্বল হয়ে পড়বে।[২৬] এ ধরনের প্রচারণার প্রভাবে মানিকতলা দল তাদের সময় ও সম্পদের বৃহদংশ ব্যয় করতে লাগলো প্রকাশনায় ও এসব প্রকাশনা বিলির কাজে। মনে হয়, ঢাকার অনুশীলন তার প্রচারণা ও দীক্ষিতকরণ কার্যের জন্য কলকাতার বইপত্রের উপর নির্ভর করতো।

এই দুই সংগঠনের সদস্য হতে গিয়ে দীক্ষা ও গোপনীতা সম্পর্কে বিস্তৃত শপথ নিতে হতো। এটা ছিল ধর্মীয় আচারের মতো। নব্য সদস্যের প্রধান কাজ ছিল শরীরচর্চা—ব্যায়াম, লাঠিখেলা, সাইকেল চালানো, ইত্যাদি। এইসকল কার্য সমিতিকে বাহ্য রূপ দিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা শিক্ষা দিয়েছিল। অনুশীলনের দলগুলো নৌকা চালনার বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দিত। এটা কাজে লাগতো যখন ছেলেরা নদীতীরের জেলাগুলিতে ডাকাতি করতে যেতো। ধর্মীয় ও বিপ্লবী বইপত্র পাঠেও শিক্ষানবিশরা অনেক সময় ব্যয় করতো। মানিকতলা সমিতি তার বাগানবাড়ির সদর দপ্তরে একটা পূর্ণাঙ্গ স্কুল খুললো। এর পাঠ্যসূচি ছিল অদ্ভুত ধরনের। পনেরো বছর বয়স্ক কৃষ্ণজীবন সান্যালের জবানিতে,"বাগানে উপেন বাবু আমাদের উপনিষদ ও রাজনীতিতে পাঠ দিতেন আর বারীন্দ্র বাবু পড়াতেন গীতা ও রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস এবং উল্লাস বাবু দুই দিন বিস্ফোরক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।"[২৭]

নীতিগতভাবে নব্য দলভুক্তদের সংগঠনের "সামরিক দিকে" জড়িত করা হতো না যতদিন না তারা নিজেদের খাঁটি বিপ্লবীরূপে প্রমাণ করতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দীর্ঘদিন সামরিক তৎপরতা তাদের অজানা থাকতো না। বারীন এবং মানিকতলার অন্যান্য নেতা নিরাপত্তার ব্যাপারে শিথিলতা দেখিয়েছিলেন এবং পুলিশের চররা সহজেই সংগঠনের ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল। সুশৃঙ্খল অনুশীলন সমিতির নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল মজবুত এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি এড়াবার জন্য তাদের বাছাইয়ের প্রক্রিয়া তারা কঠোর করেছিল। অভ্যন্তরীণ দলিলপত্রের বরাত দিয়ে পি. কে. ঘোষ বলেছেন যে অনুশীলনের সদস্যদের "নিষ্কলুষ নৈতিক চরিত্রের" অধিকারী হতে হতো। এ কথার বিপক্ষে বৃটিশ সূত্রের রিপোর্টও খতিয়ে দেখতে হয়। এতে বলা হয় যে অনুশীলনের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য ছোটদের সমকামিতার দিকে টেনে আনতেন।[২৮] যুগান্তরের নেতারা নৈতিক চরিত্রের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এসব নেতার মধ্যে মুখার্জী সব ধরনের ক্ষুদ্রতা, উচ্চাভিলাষ ও ভয় থেকে মুক্ত থেকে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

---

২৬. James Ker, *Political Trouble in India 1907-1917* [(Calcutta, 1917), reprint Calcutta, 1973], 50.

২৭. Court testimony cited in Government of India, Home (Political) Department, series A. May 1908, 112-50, 39.

২৮. P. K. Ghosh, "Organizational Structure", 141, Armstrong Report (1917)) reprinted in *Terrorism in Bengal*, vol. 2, 393-5.

শিক্ষা ছাড়াও সমিতিগুলোর আরেকটি বাহ্যত প্রতীয়মান প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সমাজসেবা। অশ্বিনীকুমার দত্তের দল "গরিবদের ছোট ভাই" গ্রামাঞ্চলে সেবার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে। এসব উপদলের সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তারা সংগঠন ও কাজের একটা আদর্শ খাড়া করেছিল যেটাকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কাজে লাগিয়েছে। মূল অনুশীলন সমিতির বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল সমাজসেবা, এবং তাদের এই লক্ষ্য পুরোপুরি মিথ্যাও ছিল না। সমিতির সদস্যরা অকৃপণভাবে সমাজসেবা করেছেন, যেমন দামোদরের প্লাবনের সময় এবং রাজনৈতিক সমাবেশ ও মেলার মতো গণঅনুষ্ঠান পরিচালনায় তারা সহায়তা করেছেন। তরুণ বাঙালিরা সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ সম্পাদন করছে দেখে বৃটিশ পর্যবেক্ষকরা অবাক হয়েছেন, কিন্তু এটাও তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে স্বেচ্ছাসেবকরা যে উর্দি ও ব্যাজ পরতো এবং যে লাঠি বহন করতো, সেগুলো তাদের কাজকর্মে সৈনিকসুলভ ভাব ফুটিয়ে তুলতো। সময় এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের কার্যক্রম সশস্ত্র বিপ্লব-কর্মকাণ্ডের একটা ছদ্মরূপ ও প্রশিক্ষণবিশেষ হয়ে দাঁড়ালো।

১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনে অধিকাংশ নেটিভের জন্য বন্দুক, তলোয়ার বা অন্য কোনো অস্ত্র রাখা বেআইনী ঘোষিত হলো। এই বেআইনী অস্ত্র সশস্ত্র বিপ্লবীদের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে এবং সশস্ত্র অভিযানে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। আগ্নেয়াস্ত্র দু'ভাবে অর্জিত হতো : বৈধ প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং চুরি। ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণাধীন চন্দননগরে অস্ত্র আইন প্রযোজ্য হতো না। এটাই সমগ্র ভারতে না হলেও বাংলায় বন্দুক ও পিস্তল আমদানির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। কিছু ব্যক্তিকে অস্ত্র আইনের কড়াকড়ি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছিল, যেমন জমিদার, রাজপরিবারের সদস্য এবং অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা। এদের নিজস্ব ব্যবহারের অস্ত্রও ছিল। আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত অস্ত্র দখলের ঘটনা হচ্ছে ১৯১৪ সালে কলকাতার একটা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০টা মৌসের অটোমেটিক পিস্তল এবং ৪৬,০০০ গোলাবারুদ চুরি। এটা প্রায় এক ডজন দলকে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সর্বাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ সম্ভব করে।

মানিকতলা সমিতি ভারতে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের কাজে বোমা ব্যবহার প্রবর্তন করে। প্রথমে উল্লাসকর দত্তের মতো স্বশিক্ষিত রসায়নবিদরা পরীক্ষাকার্য চালান। এর পরে হেমচন্দ্র দাস ও অন্যরা আরো উন্নত ও পেশাগত মানসম্পন্ন বিস্ফোরক তৈরি করলেন। ইউরোপ থেকে হেমচন্দ্র বিস্ফোরক তৈরি সংক্রান্ত যেসব বইপত্র এনেছিলেন, সেগুলো ব্যাপকভাবে বিলিবণ্টন করা হয়। এক পর্যায়ে অনেকগুলো জেলা স্কুলের ছাত্রদের কাছে বেনামীতে এসব বইয়ের কপি পাঠানো হয়। ১৯০৮ সালে বিস্ফোরক আইন পাশ হলেও সশস্ত্র বিপ্লবীরা রসায়নের পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করে উন্নত মানের বোমা তৈরি থেকে নিবৃত্ত হন নি।

জার্মান নৈরাজ্যবাদী জোহান মোস্ট-এর কথায়, "অস্ত্রের চাবিকাঠি লুকিয়ে ছিল অর্থবলের মধ্যে, যা ছিল ডিনামাইটের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।[২৯] আগ্নেয়াস্ত্র ও রাসায়নিক

২৯. উদ্ধৃত, Laqueur, *Age of Terrorism*, 57-8.

মালমশলা খরিদ করতে, প্রচারপত্র ছাপাতে ও বিলি করতে অর্থের প্রয়োজন ছিল। কয়েক ডজন কিশোরকে একটা বাড়িতে রেখে খাওয়ানোর খরচ আরো বেশি হতে পারতো। ১৯০৮ সালের একটা দলিল প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের তিনটা উপায়ের উল্লেখ করেছে। এগুলো হচ্ছে—(১) লাভজনক ব্যবসা, (২) ধনীদের কাছ থেকে চাঁদা, (৩) "সশস্ত্র বিভাগের সহায়তায় ধনীদের উপর করারোপ" অর্থাৎ সশস্ত্র ডাকাতি।[৩০] তৃতীয় পন্থাটাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী অভিযানের অধিকাংশ ছিল ডাকাতি, অবশ্যই যার লক্ষ্য ছিল ধনী ভারতীয়রা। বলাবাহুল্য, আক্রান্ত ধনীরা বিপ্লবী ডাকাতদের ডাকাত ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না এবং "করের" কথা শুনে কিংবা বিশেষ একটি পত্রের মতো কাগজপত্র দেখে বিভ্রান্ত হতেন না। পত্রটা পাওয়া গিয়েছিল কলকাতায় একটা ডাকাতির পর। এতে লেখা হয়েছিল : "আমাদের কলকাতা অর্থ বিভাগের ছয়জন অবৈতনিক কর্মকর্তা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আপনার কাছ থেকে টাকা ৯,৮৯১-১-৫ ঋণ নিয়েছেন এবং উপরোক্ত দপ্তরে আপনার হিসাবে জমা দিয়েছেন। যিনি এ ঘটনার শিকার তিনি নিঃসন্দেহে সুদ সহ অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, যা ছিল তাকে প্রদত্ত সেই হুমকির চেয়ে কম গুরুতর, যাতে বলা হয়েছিল যে যদি তিনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তা হলে অর্থবিভাগ "আপনার পরিবারের কাউকে আপনাদের অঢেল সম্পত্তি ভোগ করতে দেবে না"।[৩১]

সরকার দাবি করে যে আন্দোলনটা শুরু হওয়ায় তা জন্ম দিয়েছে "একটা ভদ্রলোক নামধারী ইতর অপরাধী শ্রেণী এবং একটা অরাজক পরিস্থিতি, যেখানে বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান থাকলেও এর একটা বড় উপাদান ছিল সাধারণ অপরাধ"। বারীন ঘোষ ও হেমচন্দ্র দাসের বিবৃতিতেও এর কিছুটা সমর্থন মেলে। এই সূত্রে লিওনার্ড গর্ডন মন্তব্য করেন যে ১৯১০ সালের পরে বাঙালি বিপ্লবীরা যেসব সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে "প্রায়শ সেগুলো ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যের সাথে কেবল অস্পষ্টভাবে সম্পর্কিত থাকতো।[৩২]

হত্যাপ্রচেষ্টার অবশ্য রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। লক্ষণীয় যে বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবীরা পরিকল্পনা মতো বৃটিশ কর্মকর্তাদের হত্যা করতে খুব কমই সফল হয়েছিলেন, যদিও যেসব বাঙালি শত্রুদের সহযোগী বলে চিহ্নিত হয়েছিল অথবা সমিতির প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের হত্যা করতে তারা কমই বিফল হয়েছিল। বাঙালি সংবাদপত্র উভয় ধরনের হত্যার নিন্দা করতো, কিন্তু ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখের জন্য জনগণের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা সব ক্ষেত্রেই ইংরেজ বা স্পষ্ট দৃশ্যমান বিশ্বাসঘাতককে হত্যার নিন্দা করে নি।

---

৩০. "General Principles of Secret Society", Oriental and India Office Library MSS Eur D 709. "Nangla Dacoity Case Exhibits", Ex 3g. 2.

৩১. *Rowlatt Report*, para 77.

৩২. Nixon Report, 7 ; হেমচন্দ্র কানুনগো (হেমচন্দ্র দাস), *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা* (কলকাতা : কমলা বুক ডিপো, ১৯২৮), ১৬৪; Barindra Kumar Ghose, *Wounded Humanity* (Calcutta : Privately published, n. d), 50; Gordon, "Portait", 205.

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিশেষভাবে যে সময়কাল আমরা পর্যালোচনা করছি সেই সময়কালে সশস্ত্র বিপ্লবীরা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। সারণি-২-এ বাংলায় প্রথম গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার অধিকাংশ নেতার কারাবরণ পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত অভিযানগুলির ফলাফল দেখানো হলো :

সারণি ২ : মানিকতলা গুপ্ত সমিতির পরিচালিত অভিযান

সাল	মাস	স্থান	লক্ষ্যবস্তু	প্রকৃতি	ফল
১৯০৬	?	পূর্ববাংলা	ফুলার	হত্যা	অকার্যকর
১৯০৬	আগস্ট	রংপুর	এক বিধবা	ডাকাতি	অকার্যকর
১৯০৬	আগস্ট	বাঁকুরা	এক মোহন্ত	ডাকাতি	অকার্যকর
১৯০৭	অক্টোবর	দার্জিলিং	ফ্রেজার	হত্যা	অকার্যকর
১৯০৭	নভেম্বর	মানকুণ্ডু	ফ্রেজার	ট্রেন লাইনচ্যুত করা	ব্যর্থ
১৯০৭	নভেম্বর	মানকুণ্ডু	ফ্রেজার	ট্রেন লাইনচ্যুত করা	অকার্যকর
১৯০৭	ডিসেম্বর	নারায়ণগঞ্জ	ফ্রেজার	ট্রেন লাইনচ্যুত করা	ব্যর্থ
১৯০৮	জানুয়ারি	কলকাতা	কিংসফোর্ড	হত্যা	ব্যর্থ
১৯০৮	এপ্রিল	চন্দননগর	টারডিভেল	হত্যা	ব্যর্থ
১৯০৮	এপ্রিল	মুজাফফরপুর	কিংসফোর্ড	হত্যা	ভুল ব্যক্তি নিহত

সূত্র : Government of Bengal pol. conf. file 266 of 1908; B. K. Bose, ed. The Alipore Bomb Trial (Calcutta : Butterworth, 1922), 16, Nixon Report, Table A; Government of India, Home (Political) Department, series A, September 1910, 33-40: 18-21, 42; GOI HPD series D. August 1911, 9 : 13, Reproduced from P. Heehs, *Bomb in Bengal,* 252

পরবর্তী বছরগুলোতে অভিযানের পৌনঃপুনিকতা ও সাফল্যের হার দুটিই বৃদ্ধি পেল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯১৫ সালে ৪৯টা "বৈপ্লবিক নৃশংসতার" প্রয়াস চালানো হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ৩৯টা ডাকাতি আর ১০টা হত্যা। চব্বিশটা ডাকাতি সফল হয়েছিল (এই অর্থে যে ডাকাতরা কিছু লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে পালাতে পেরেছিল)। হত্যাপ্রচেষ্টার সবগুলোর লক্ষ্যবস্তু ছিল বাঙালিরা (সরকারি চাকুরে, পুলিশ, ইত্যাদি) এবং দুটো ব্যতীত সবগুলো সফল হয়েছিল।[৩৩]

৩৩. Table in J. C. Nixon, *Notes on Outrages Compiled in 1917,* vol, 6 reproduced in *Terrorism in Bengal,* vol, 6 (Calcutta : Government of Bengal, 1995), 341-6.

১৯১০ সালের পর বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সমিতিগুলোর উন্মেষপর্বে (১৯০২-১০) তাদের কার্যক্রম ও গঠনপ্রকৃতির দিকে আমি বেশি মনোযোগ দিয়েছি, কারণ এই সময়ের দলিলপত্রের সাথে আমি বেশি পরিচিত, যেটা আমাকে এগুলো একটু গভীরভাবে বিচার করতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করবো এবং এগুলোর গঠনপ্রকৃতি বিশ্লেষণে যাব না। এ কথা অবশ্য বলা যায় যে সমিতিগুলোর উন্মেষকালের যে মৌলিক রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে, তা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের চার দশকব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের যুগে টিকেছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রথম তাৎক্ষণিক ফলস্বরূপ সরকারি দমননীতির একটা পর্ব চললো। এই পর্বে সমিতিগুলো বেআইনী ঘোষিত হলো এবং অনেক বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ বা দীপান্তরিত করা হলো। যাঁরা অব্যাহতি পেলেন তাঁরাও কিছুদিন গুটিসুটি মেরে থাকলেন। এই বছরগুলোতে যুগান্তর সংগঠনটি একটা আকার নিতে শুরু করলো। তখন পর্যন্ত বেআইনী অনুশীলন সমিতি নতুন দল হিসেবে শক্তি অর্জনের চেষ্টা করছিল। বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করেও সহিংস বিপ্লবকে বিফল করে দেয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে পারলো না। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে যখন নতুন রাজধানী দিল্লীতে মহাসমারোহে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীরা সুপরিকল্পিত বোমা হামলায় তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টায় অল্পের জন্য সফল হতে পারেন নি।

ইউরোপে যখন যুদ্ধ বেধে গেল, বিপ্লবী দলগুলো চেষ্টা করলো সুযোগটা কাজে লাগাতে। তখন যদিও ক্ষুদ্রাকারে সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যক্রম চলছিল, অধিকতর উচ্চাভিলাষী নেতারা একটা ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইলেন, যেটা এক দশক পূর্বে অরবিন্দ কল্পনা করেছিলেন। রাসবিহারী বসু (যিনি ভাইসরয়কে হত্যার প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন) মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু গণেশ পিংলে এবং কয়েকজন জঙ্গি শিখ সহযোগে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কয়েক স্থানে একসাথে সেনাবিদ্রোহ সংঘটনের পরিকল্পনা করেন। তাঁদের দুর্ভাগ্য, পরিকল্পনাটা ফাঁস হয়ে যায় এবং তখন মাত্র একটি বিদ্রোহ হয়েছিল যেটা শীঘ্রই দমন করা হয়। বিপ্লবীদের অন্যান্য দল জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ ও অস্ত্রসাহায্য চায়। তারা অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিল, কিন্তু চোরাপথে দেশে অস্ত্র আনার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাটি বিফল হয়ে যায়। নিউ ইয়র্কে একজন জার্মান এজেন্ট দ্বারা ক্রয় করা জাহাজভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ভারতের পথে প্রেরণ করার পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটক করা হয়। যুগান্তর নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এই মাল খালাসের জন্য উড়িষ্যায় অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু তিনি বৃটিশদের ফাঁদে পড়লেন এবং যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে।

যুদ্ধকালীন সশস্ত্র ও জঙ্গি তৎপরতা চলতে থাকার কারণে ভারতে প্রতিরক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনে "বৈপ্লবিক অপরাধ" দমন করবার জন্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়। যুদ্ধের পর এসব ক্ষমতা রাওলাট আইনের বলে প্রলম্বিত করা হয়, যে কারণে এম. কে. গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন।

অহিংস অসহযোগ নীতি যখন গণপর্যায়ে পরীক্ষিত হচ্ছিল, তখন দেশের অপর প্রধান নেতা ঢাকার সি. আর. দাসের অনুরোধে যুগান্তর সশস্ত্র কার্যক্রম বন্ধ রাখতে রাজি হলো। অনুশীলন এতে সম্মতি দেয়নি, কিন্তু তা ১৯২০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে বড় আকারের কোনো সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে নি।[৩৪] ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হয়। এরপর যুগান্তর আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় এর সহযোগী উপদল গঠিত হয়। চট্টগ্রামের উপদলটি ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের চট্টগ্রাম অফিসে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত করেছিল। এই উপদলের নেতা সূর্য সেন এবং আরো দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কিন্তু মুক্তি পেয়ে যান। পরের মাসে গোপীমোহন সাহা গ্রেপ্তার হন। তিনি একজন ইউরোপীয়কে ভুলক্রমে কলকাতা পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট মনে করে হত্যা করেন। বাঙালি সংবাদপত্র গোপীমোহনের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসও তাঁকে শহীদ ঘোষণা করে, যেটা গান্ধীকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এই সময় যুগান্তর কলকাতা কর্পোরেশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তখন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সি. আর. দাস ও সুভাষ চন্দ্র বসু। দৃশ্যত সুভাষ বসু "সক্রিয় বিপ্লবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা রাখতেন"। এই সময় থেকে বাংলার স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্যে তখনকার সশস্ত্র বিপ্লবী ও প্রাক্তন সশস্ত্র বিপ্লবীরা একটা প্রভাবশালী পক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।[৩৫]

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের কার্যক্রম ও প্রভাবের কারণে ১৯২৪ সালে বাংলা ফৌজদারি আইন সংশোধন অধ্যাদেশ পাশ হয়। পরের বছর এটা আইনের রূপ লাভ করে। এই আইনে পুলিশকে অসাধারণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে প্রায় দুইশ সন্দেহভাজন লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, যাঁদের অন্যতম ছিলেন সুভাষ বসু। এর পর বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রমে ভাটা পড়লো, কিন্তু অনুশীলনের সাথে যুক্ত

৩৪. দেখুন, *Terrorism in Bengal,* vol. 6, 645-8. যে কয়টা ঘটনা ঘটেছিল সেগুলোকে সেই ধরনের মামলা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল যেগুলোতে "বিপ্লববাদীরা সম্পৃক্ত ছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল ব্যক্তিগত লাভ।

৩৫. David M. Laushey, *Bengal Terrorism and the Marxist Left* (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1975), 21-27; quotation on Bose : Leonard Gordon, *Brothers Against the Raj* (New Delhi : Viking, 1990), 115.

একটা উপদল যুক্তপ্রদেশে কিছুটা প্রাধান্য বিস্তার করলো। ১৯২৩ সালে শচিন্দ্রনাথ সান্যাল এবং যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জী হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। শীঘ্রই কলকাতা থেকে লাহোর পর্যন্ত এর শাখা স্থাপিত হয়। উত্তর প্রদেশে পরপর কয়েকটা সফল ডাকাতির পর কাকোরিতে একটা দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতি সংঘটিত হয়। এর ফলে দুটি বিচার অনুষ্ঠিত হয় যা সংগঠনকে পঙ্গু করে দেয়। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বিপ্লবী ভাবধারা সঞ্চারিত করেছিল। কয়েক বছর পর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন নামে এর পুনর্জন্ম হয়।[৩৬]

১৯২৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃটেনের কাছ থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে। অরবিন্দ, তিলক ও অন্যান্য চরমপন্থী রাজনীতিক কুড়ি বছর আগে যে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন সেটা এখন স্বীকৃতি পেল। এর আংশিক কারণ ছিল জঙ্গি দলগুলোর চাপ। বাংলা তখন কিছুটা শান্ত ছিল। তাই সরকার ১৯২৫ সালের আইনের অধীনে আটককৃত অধিকাংশ বন্দিকে ছেড়ে দিল। এই সময় যুগান্তর ও অনুশীলনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যেটা সফল হয় নি। তখন তরুণ উগ্রপন্থীদের অনেকে নতুন পথ বেছে নিলেন। তরুণ ও প্রবীণ অনেকেই কংগ্রেসের কার্যক্রমে অংশ নিলেন, যেমন ১৯২৮ সালের সাইমনবিরোধী বিক্ষোভ। কংগ্রেসনেতা লালা লজপত রায় আহত হলেন যখন পুলিশ অক্টোবরে লাহোরে একটা বিক্ষোভ মিছিল ভেঙে দেয়। এই আঘাতেই তিনি মারা যান। ভগত সিং ও হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য নেতা ডিসেম্বরে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন। ভগত সিং বিধান সভায় বোমা নিক্ষেপ করেন। তিনি এবং হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকানের অন্যান্য সদস্য গ্রেপ্তার হন এবং এঁদের তিনজন কারাগারে অনশন করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। বাঙালি বোমা প্রস্তুতকারক যতীন্দ্রনাথ দাস আমৃত্যু অনশন করেন। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা কর্পোরেশন একটা শোকপ্রস্তাব পাশ করে। ভগত সিংহের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে।

ত্রিশের দশকের শুরুতে জাতীয় আন্দোলন যখন তীব্রতর হয়, তখন কয়েকজন প্রাক্তন সশস্ত্র বিপ্লবী কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা হয়ে উঠেন, যেমন যুগান্তর নেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। তখন অনেক বাঙালি কংগ্রেসী সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেস প্রথম বারের মতো "স্বাধীনতা দিবস" উদ্‌যাপন করে। পরবর্তী মাসগুলোতে স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মার্চ মাসে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন এবং তাঁর 'সল্ট মার্চ' পরিচালনা করেন। এপ্রিলে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে আক্রমণ চালান।

৩৬. Leushey, *Bengal Terrorism*, 24, 27-37.

যে চার বছর সময় আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল, সে সময়টা ছিল বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়কাল। কেবল ১৯৩০ সালেই এগার জন বৃটিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়, বিশেষকরে ডিসেম্বরের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণে। এই দশকের প্রথমার্ধে মেদিনীপুরে একের পর এক ক্ষমতাসীন তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করা হয় এবং আরো কয়েক ডজন সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু এটা ছিল নিভে যাবার আগে আগুনের হঠাৎ দফ করে জ্বলে উঠা। বলা যায়, ১৯৩৪ সালে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের অবসান ঘটে।[৩৭]

বিশ ও ত্রিশের দশকে বহু বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবী কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলে যোগদান করেন। এম. এন. রায় নামে সমধিক পরিচিত প্রাক্তন যুগান্তর নেতা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর একজন প্রভাবশালী সদস্য হয়ে যান এবং ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। যুগান্তর, অনুশীলন ও অন্যান্য দলের বহু নেতাকে কমিউনিস্ট পার্টি বরণ করে নেয়, বিশেষকরে ১৯৩০-এর দশকের ব্যাপক ধরপাকড়ের সময়। এই দশকের শেষ দিকে সবগুলো বামপন্থী দল প্রদেশের তরুণদের দলভুক্ত করার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। এই সময় দলের অধিকাংশ সদস্য নিছক ত্রাস সৃষ্টির বিরোধী ছিল, তাঁদের লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রাম।

অনেক সশস্ত্র বিপ্লবী, যাঁরা বামপন্থী দলগুলোতে যোগ দেন নি, তাঁরা কংগ্রেসের সদস্য হলেন। ১৯৩৮ সালে যুগান্তরকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়, তখন অনেক প্রাক্তন সদস্য সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের অধীনে একযোগে কাজ করতে থাকেন। সুরেন্দ্র মোহন পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ ঘোষ ও কংগ্রেসী রাজনীতিকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। কংগ্রেসে যে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্ট পদে সুভাষ বসুর নির্বাচনে ও ১৯৩৯ সালে তাঁর পুনর্নির্বাচনে। দ্বিতীয় বারের নির্বাচনে তিনি গান্ধীর প্রার্থীকে পরাজিত করেন এবং এজন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এপ্রিলে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য, গান্ধীর পক্ষকে পরাজিত করার জন্য একটা সুসংহত ও সুশৃঙ্খল বাম পক্ষ গড়ে তোলা। সুভাষকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু তিনি পালিয়ে ইউরোপ চলে যান, মুসোলিনি ও হিটলারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সামরিক অভিযান ব্যর্থ হয়, কিন্তু এই ক্রান্তিকালে দিল্লীতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অফিসারদের বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সমগ্র দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। পরে এসব অফিসারকে বেকসুর খালাস দিয়ে আদালত কার্যত স্বীকার করে নেয় যে, অস্থায়ী সরকারের অধীন একটা

৩৭. Laushey, *Bengal Terrorism*, 58-86, 121.

সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ দেশদ্রোহিতা নয়। কয়েক মাস পর বোম্বাইতে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করে যে সশস্ত্র বাহিনীর বিশ্বস্ততার উপর আর নির্ভর করা যাবে না। পরের দিনই সরকার ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করার কথা ঘোষণা করে।

স্বাধীনতা আন্দোলন যতদিন চলেছিল, ততদিন সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত থাকায় সরকার বৈধ আন্দোলনের নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়। গান্ধী এ ব্যাপারে সব সময় সচেতন ছিলেন। অহিংসার এই দূত ১৯৩১ সালের গোলটেবিল বৈঠকে ঘোষণা করলেন, তিনি "সশস্ত্র বিপ্লবীদের পক্ষে কোনো ওকালতি" করতে যাচ্ছেন না, কিন্তু এটুকু যোগ করতে ছাড়েন নি যে, সরকার যদি তাঁর সাথে কাজ করতে অসম্মত হয়, তাহলে তাকে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলা করতে হবে। "সন্ত্রাসকে বিদায় দেবার একমাত্র পথ হচ্ছে কংগ্রেসের সাথে কাজ করা।"[৩৮] মহাত্মাকে পছন্দ না করলেও সরকার তাঁর পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তখন সাম্রাজ্যবাদী বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার একটা উত্তম পথই তিনি দেখিয়েছিলেন, যা অবলম্বন করা হলে প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তিগুলোর সাথে প্রলম্বিত যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হতো।

উপসংহার

স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এ আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে বিপ্লবীদের মৌলিক অবদান। তাঁরা দেখিয়ে গেছেন, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া যেতে পারে। ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য সেন ও যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মোৎসর্গ ১৯০৮ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী কালের প্রজন্মের মানসলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীরা যে কার্য সম্পাদন করেছেন তাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে সফল বলা কঠিন। ডাকাতির মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যায় নি। যেসব বৃটিশ বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, তাদের অধিকাংশ বুলেট ও বোমার আক্রমণ এড়াতে পেরেছিল। বাঙালি সশস্ত্র বিপ্লবীরা অন্য বাঙালিকে হত্যা করতে বেশি সফল হয়েছিলেন, কিন্তু এসব হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য অভিযানের অধিকাংশের সাথে জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। অপরাধী পক্ষ যখন প্রবল হয়ে উঠলো, তখন অধিক সংখ্যক দল অকারণে সহিংসতা ঘটাতে লাগলো। যেসব অভিযান যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যেমন শাসকশক্তির সহযোগী বা গুপ্তচরদের হত্যা, সেসব অভিযান কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় নৃশংসতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অনুশীলন সমিতি আক্রান্তদের শিরচ্ছেদ করতো বা তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করতো। এই আন্দোলনের সংকীর্ণ ভিত্তি তার কার্যকারিতাকে করেছিল

৩৮. M. K. Gandhi, "Speech at the Plenary Session of the Round Table Conference", 1 December 1931, Collected Works of Mahatma Gandhi, 48· 358, 365.

সীমাবদ্ধ এবং বাংলায় সামাজিক বিভাজনকে তা আরো তিক্ত করে থাকতে পারে। খুব কম সংখ্যক মুসলমান বা নিম্নবর্ণের লোক এ সমিতির সদস্য হয়েছে। এমনকি সমিতিগুলোর প্রতি তাদের পরোক্ষ সমর্থনও ছিল খুবই কম। এটা এবং সমিতির অভ্যন্তরীণ দলাদলি সরকারকে সাহায্য করেছিল এর শাসনের প্রতি সশস্ত্র বিপ্লবের সত্যিকারের হুমকি হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব করে তুলতে।

ভারতে দীর্ঘকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় সহিংস বিরোধিতা সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে পশ্চিম বাংলার নক্সালবাড়িতে ঘটলো এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। চল্লিশের দশকের শেষদিক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত এই অঙ্গরাজ্যের বাম দলগুলো প্রাক্তন সশস্ত্র বিপ্লবীদের দ্বারা স্ফীত হয়ে অনেক সহিংস ধর্মঘট ও বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। ১৯৭৭ সালে বাম দলগুলোর উত্থান সম্পর্কে (তার পরে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছিল) পাশ্চাত্যের একজন সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন, "এতে সন্দেহ নেই যে পশ্চিম বাংলায় প্রায় সকল রাজনৈতিক দল সহিংসতাকে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক কৌশল মনে করে।[৩৯] এমনকি যে সহিংস প্রতিরোধ বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করলো, সেটাও বলা যায় অংশত ১৯৪৭পূর্ব যুক্ত বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত।

৩৯. Hula, "Political Violence", 440.

৮

রাজনীতির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি : ১৯০৬-১৯৪৭

জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড*

এই গ্রন্থের ষষ্ট অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উপর বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) প্রভাব আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, বঙ্গবিভাগ বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। বাংলার রাজনীতি এখন আর উনিশ শতকের রাজনীতির ধারায় প্রবাহিত নয়। বঙ্গভঙ্গ-উদ্ভূত রাজনৈতিক ইস্যুগুলি মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে। এই চেতনায় মুসলমান নেতৃত্ব গোটা রাজনৈতিক সম্পর্ককে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়নে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী শক্তি হচ্ছে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী, বৃটিশ রাজ নয়। বৃটিশ কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে অবনত মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ইংরেজদেরকে তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে এবং ফিরিঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেছে প্রায় এক শত বছরব্যাপী। কিন্তু বিশ শতকের গোড়া থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমান নেতৃত্ব বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন হিন্দু ভদ্রলোক, বৃটিশ রাজ নয়। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র থেকে মুসলমান নেতৃত্ব এই মন্ত্র লাভ করে যে, এদের সকল দুর্দশা ও পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী হিন্দু আধিপত্যবাদ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়। বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে গেল 'ওরা' এবং 'আমরা'য়। 'ওরা-আমরা' রাজনীতির ফসল ১৯৪৭ সালের বাংলাবিভক্তি।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাংলাবিভাগ এবং ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনেকের কাছেই আকস্মিক ও চমকপ্রদ মনে হতে পারে। এর জন্য দায়ী বিশ শতকের বঙ্গীয় রাজনীতির উপর বিশ্লেষণমূলক অপ্রতুল

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।

গবেষণা। মুসলিম রাজনীতি তো বটেই, বঙ্গভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপরও গবেষণা হয়েছে খুবই কম। বিগত দুই দশকে অবশ্য বেশ কয়েকটি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুফিয়া আহমেদের *Community in Bengal* (১৯২৪), শিলা সেনের *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947*, বজলুর রহমান খানের *Politics in Bengal, 1927-1936* (১৯৮৭), হারুন-অর-রশিদের *Foreshadowing of Bangladesh* (১৯৮৭) এবং রফিউদ্দিন আহমেদের *Bengal Muslims, 1871-1906* (১৯৮৮)।

বঙ্গীয় রাজনীতির উপর গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোধহয় এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। এখানে এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।[১] যেমন অবিভক্ত বাংলায় কি কি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ? সময়ের ব্যবধানে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতি ও কার্যকলাপে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এসব পরিবর্তনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি কি ?

প্রতিষ্ঠানগত বিশ্লেষণের একটি বিরাট সুবিধা হলো, এ ধরনের বিশ্লেষণে আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি এবং নেতৃত্বের প্রকৃতি সম্পর্কেও ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু বলার সুযোগ পাই। আত্মজীবনীমূলক সংকলনগুলি এবং এ সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ও নির্বাহী কমিটির তালিকা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অবশ্যই রাজনীতিবিদদের জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান। এগুলির সব ক'টির উপরই ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং তাদের বাস্তব অবদান সম্পর্কিত পরীক্ষা হচ্ছে রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পর্কে সবচেয়ে সুফলদায়ক তদন্ত।

কালানুক্রম

এই আলোচনার জন্য একটি কালানুক্রমিক কাঠামো তৈরি এবং বিগত অর্ধশতাব্দীর বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে চিন্তার উদ্রেক করার জন্য আমি প্রথমে কালানুক্রমিকভাবে বাংলার রাজনীতিকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করবো। আমি মনে করি, এ অঞ্চলের ইতিহাসে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালকে মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করার জন্য একটি সাধারণ মতৈক্য পাওয়া যাবে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই পর্যায়ে ১৯০৫ সালকেও যোগ করতে চাইবেন। কিন্তু এই অনুচ্ছেদের শিরোনামের দিক থেকে আমি এ তারিখটি বাদ দিয়ে ১৯০৬ সালকেই গ্রহণ করেছি। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষণার পরপরই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই আন্দোলন উনিশ শতকের শেষদিককার কংগ্রেসী আন্দোলনের মতো এক ধরনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করে। ১৯০৬ সালেই দেখা যায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম—কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবী ব্রিগেড পরিচালনা, অর্থনৈতিক বর্জন, স্বাদেশিকতার জঙ্গি প্রচারাভিযান এবং সন্ত্রাসবাদী

১. এই নিবন্ধটি Rachel Van M. Baumer সম্পাদিত এবং ১৯৭৫ সালে হাওয়াই থেকে প্রথম প্রকাশিত *Aspects of Bengal History and Society* গ্রন্থ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনর্লিখিত হয়েছে।

সমিতি কর্তৃক প্রথম প্রকাশ্য বিক্ষোভ। এই বছরেই প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলিই হলো বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

আমি সাধারণভাবে গৃহীত একটি মাইলফলক অর্থাৎ ১৯১২ সালের প্রাদেশিক পুনরেকত্রীকরণকে পুনরায় পাশ কাটিয়ে (অবশ্য কম নিশ্চয়তার সাথে) ১৯১৮ সালকে পরবর্তী পর্বের প্রারম্ভ হিসেবে নির্বাচন করেছি। মধ্যপন্থীরা ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং উদীয়মান রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাসকে সামনে রেখে নতুন নেতৃত্ব কংগ্রেসকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালায়। এই প্রয়াসের মধ্যে ছিল জেলা শহর পর্যন্ত দলীয় সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠনের প্রসার এবং এর মধ্যেই ছিল কংগ্রেসী দল ও রাজনীতির একটি ব্যাপক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। পুনর্বার নবোদ্যমে গড়ে উঠে এই দলটি এমনকি সন্ত্রাসবাদীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে বিপ্লবাত্মক সহিংস কর্মকাণ্ড কিছুকাল শান্ত থাকে। মুসলমান রাজনীতিবিদরাও ১৯১৮ সালে ব্যাপক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যায় পড়ে। এই সময়ে নানা কারণে কলকাতায় তাদের ধর্মীয় সহকর্মীদের হতাশার কারণে শুরু হয় মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই রকম বিস্ফোরণে নতুন সাম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহ, বিশেষকরে খেলাফত কমিটিগুলির প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয় এবং শিল্পশ্রমিকদের মাঝে উক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক তৎপরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে।

আট বছর পরে কলকাতায় এর চেয়েও মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং এই দাঙ্গায় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের আরেকটি মোড় সূচিত হয়। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুর পর কংগ্রেস ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে এবং যে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতা তিনি কঠিন শ্রম ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা তাঁর উত্তরসূরিরা অগ্রাহ্য করে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। এ থেকে জন্ম নেয় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ। সকল নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার প্রয়াসে সাম্প্রদায়িক প্রার্থীদের পিছনে মুসলিম ভোটারদের সংগঠিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত এই প্রয়াস টিকিয়ে রাখা হয় এবং তা বেশ সাফল্য অর্জন করে।

১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর শুরু হয় পরবর্তী পর্ব। ১৯৩৫ সালে আরো ৪০ লক্ষ কৃষককে ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন মতবাদী অনেক রাজনীতিবিদ প্রজাবর্গের পক্ষে কথা বলার দাবি নিয়ে সোচ্চার হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সাম্প্রতিককালে বৃটিশ কারাগার থেকে ক্রমান্বয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত মার্কসীয় মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ। হকের প্রধানমন্ত্রিত্ব ছয় বছরকাল টিকে থাকে এবং তাঁর পর্যায়ক্রমিক মন্ত্রিত্বকালে কয়েকটি গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজসংস্কার আইন প্রণীত হয়।

১৯৪৩ সালে ফজলুল হকের পতন ঘটে। এ প্রসঙ্গে এম. এ. জিন্নাহ দাবি করেন যে, তাঁর পরাজয় ছিল মুসলিম লীগের আদর্শের জয় এবং এই প্রতিষ্ঠান ছিল তখন পাকিস্তান অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্বে লীগ বাংলায় ক্ষমতাসীন থাকে। পাকিস্তানের মধ্যে এই প্রদেশটির পূর্ণ কিংবা আংশিক অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা ছিল এই সময়ের একটি প্রধান রাজনৈতিক বিষয়।

উনিশ শতকের ঐতিহ্য

উপরোক্ত পাঁচটি পর্বের প্রতিটির জন্য আমাদেরকে রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এটা করতে গিয়ে আমাদের উচিত 'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান' শব্দটির সম্ভাব্য সুস্পষ্ট গঠন উপস্থাপন করা। যেসব প্রতিষ্ঠান নামেমাত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রকৃতির, সেগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং আমরা যদি সেগুলিকে হিসেবের মধ্যে না আনি, তবে আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখবো। অতএব, এখানে আমি এক প্রান্তে সরকারি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং অপরপ্রান্তে পরিবারের রাজনৈতিক ভূমিকাকে আলোচনার মধ্যে রাখছি না। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলির প্রায় সব ক'টিকেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

বিশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকদের বিরক্তি সত্ত্বেও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। প্রশাসকরা এ রকম অবস্থাকে প্রদেশের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি বলে মনে করে। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি বৃটিশদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্থাপিত হয়, কিন্তু এগুলি ক্রমশ বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এই শতাব্দীর প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো বঙ্গীয় আইনসভাকে কঠোর বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ক্ষুদ্র উপদেশক সভা হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেখা যায়। কিন্তু কলকাতা পৌর কর্পোরেশন এবং অন্যান্য পৌরসভা ও স্থানীয় বোর্ডগুলির ক্ষেত্রে বৃটিশের পক্ষ থেকে এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি ততোটা জোরালো ছিল না। এই সকল স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচিত হওয়া বা নিযুক্তি লাভ ছিল এক চরম মর্যাদার ব্যাপার এবং তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে সক্রিয় দু'টি পেশাগত শ্রেণী এই মর্যাদা লাভের জন্য ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। এরা হচ্ছে ভূস্বামী ও আইনজীবী শ্রেণী। এই কারণে অধিকাংশ জেলা শহরগুলিতে ভূস্বামী ও আইনজীবী সমিতির অস্তিত্ব এবং রাজধানীতে এদের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। মাসে মাসে হলেও এই ভূস্বামী ও আইনজীবীদের কাজের সমন্বয় সাধন করতো কলকাতা থেকে জমিদারদের ক্ষেত্রে অভিজাত ও প্রভাবশালী বৃটিশ ভারতীয় সমিতি এবং আইনজীবীদের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বার লাইব্রেরি ক্লাব।

কলকাতায় ব্যাঙ্কমালিক ও ব্যবসায়ী এবং চা-বাগান (প্লানটেশন), কয়লাখনি ও কলকারখানার মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ছিল বণিক সমিতি। এই বণিক সমিতি-সমূহ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, পৃথক পৃথক বৃটিশ, মাড়োয়ারি, মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু

সংগঠনগুলির সহযোগিতায় গঠিত হয়। মফস্বল এলাকায় প্রায় সব বিখ্যাত ব্যাঙ্কমালিক ও ব্যবসায়ীর (মাড়োয়ারি, মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু) জমি ছিল। সুতরাং আমরা ভূস্বামী সমিতিগুলিকে স্থানীয়ভাবে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখতে পাই।

আইনজীবী ও জমিদারগণ জেলা ও অন্যান্য সমিতিগুলির নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং এখানে কলেজের অধ্যাপক, স্কুলশিক্ষক, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকেও দেখা যেতো। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু সংগঠন জেলাসদর শহরে সক্রিয় ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সংগঠনের কেন্দ্র ছিল কলকাতায়। সেখানে বিশিষ্ট পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীরা তাঁদের জীবনের উন্নতি বিধান করার জন্য যেতেন এবং সেখানে তাঁদের নিজ জেলার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট থাকতেন।

আমরা উনিশ শতকের প্রারম্ভে কংগ্রেস নামক সংগঠনের অস্তিত্ব দেখতে পাই না। প্রতিষ্ঠালাভের পর দীর্ঘকাল কংগ্রেস ছিল একটি নামসর্বস্ব সংগঠন। সমিতিগুলির অনেক সদস্যই নিজেদেরকে কংগ্রেসী বলে পরিচয় দিত; ভারতীয় সমিতির অধিকাংশ সদস্যই এই পরিচয় দিত। কিন্তু কংগ্রেসের সকল কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকে ভারতীয় সমিতির নির্বাহী সভা ও নিয়ন্ত্রণকারী জেলার জেলা সভার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ও প্রাদেশিক সম্মেলনের মধ্যেই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্ব কাগজে-কলমে থাকলেও বস্তুত তা ছিল ভারতীয় সমিতির একটি উপ-কমিটিবিশেষ।

আধুনিক ভারতের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখায় অন্যতম প্রধান প্রচলিত বিকৃতি হলো রাজনীতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সমীকরণ এবং যে বিষয়টি নিয়ে পুনরাবৃত্তি করার কারণ রয়েছে তা হলো এই যে, বিশ শতকের প্রথমদিকে বহু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল এবং তাতে জাতীয়তাবাদ ছিল অপ্রাসঙ্গিক ও কেবল প্রান্তিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের রাজনীতির একটি স্পষ্ট ক্ষেত্র ছিল বাংলার শিক্ষা-রাজনীতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট থেকে শুরু করে মহকুমা শহরের স্কুল শিক্ষাবোর্ড পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে অতি বিশিষ্ট স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছাশিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত ছিলেন। এঁরা স্থানীয়ভাবে ছিলেন অতিশয় প্রভাবশালী এবং শিক্ষা-রাজনীতি ছিল এঁদের কর্মকাণ্ডের একটি বড় ক্ষেত্র।

শিক্ষা-রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানরাও ছিল খুব সক্রিয়। তাদের মাদ্রাসা ও মক্তব বিষয়ক কাজকর্ম ছাড়াও ১৯০০ সালের দিকে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিকারমূলক সহায়তায় প্রভাব খাটাতে প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ে সভাসমিতি (কেন্দ্রীয় জাতীয় মোহামেডান এসোসিয়েশন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ) গঠনপূর্বক সাধারণ শিক্ষা-রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করছিল। হিন্দু পরিচালিত জেলা ও গণসমিতিসমূহের অনুরূপ সংস্থা জেলা ইসলামিয়া আঞ্জুমানগুলি শিক্ষা-রাজনীতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

এ বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমাদেরকে কলেজ ছাত্রসমিতিগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এই সমিতিগুলি নিজেরাই ছিল প্রাণবন্ত রাজনৈতিক বিতর্কের মঞ্চ এবং জাতীয়তাবাদী কর্মী তৈরির কেন্দ্র। রাজনীতির সাথে সরাসরি কম জড়িত কিন্তু শিক্ষিতদের মিলিত হবার এবং আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল অনেক শহরে বিদ্যমান ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, পাঠাগার এবং সাহিত্য পরিষদ, সারস্বত সভা ও সংস্কৃতি সভার মতো সাংস্কৃতিক সমিতিগুলি। এইসব প্রতিষ্ঠানের বাংলা শিরোনাম দেখে বোঝা যায় যে, এগুলি ছিল নির্দিষ্ট লোকালয়ের হিন্দু সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হিন্দু সমিতি। উল্লেখ্য যে, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল একেবারে নিষ্প্রভ, কারণ কলকাতার বাইরে তাদের ছিল এ রকম কেবল গুটি কয়েক সমিতি এবং সেগুলির অধিকাংশের পৃষ্ঠপোষকতা করতো উর্দুভাষী মুসলমান সম্প্রদায়, বাংলাভাষী মুসলমান সম্প্রদায় নয়।

এমতাবস্থায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন যে, সমভাবে সমগ্র প্রদেশব্যাপী এই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি সাধিত হয় নি। অবশ্য কলকাতা ছিল ব্যতিক্রম। কিন্তু দেশের অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাত্রায় ছিল লক্ষণীয় পারস্পরিক পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ, মেদিনীপুর ও হুগলীতে নিকটবর্তী বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের চাইতে বেশি রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতা দেখা যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী জেলাগুলির চেয়ে ঐ জেলাদ্বয়ে ছিল অনেক বেশি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই বৈষম্যময় অবস্থার কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি এই যে, বাংলার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং বিবিধ মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক সীমিত।

প্রথম পর্ব, ১৯০৬-১৯১৮

লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ বাংলার রাজনীতিতে অসাধারণ গতি সঞ্চার করে এবং হঠাৎ সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই এর প্রমাণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতা ঠিকই প্রাণবন্ত সাংবাদিকতার জন্য বিখ্যাত ছিল, তবে আমাদের এই সাংবাদিকতার আয়তন কিংবা এর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কেবল ১৯০৬ সাল থেকেই সংবাদপত্র পাঠের মাত্রা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকীর অফিসগুলি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আর এসব পত্র-পত্রিকায় নিয়োজিত হয় বিপুল সংখ্যক পেশাগত সাংবাদিক। স্বল্পকালস্থায়ী পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকা তখন দৈনিক পত্রিকা চালিয়ে নেবার সামর্থ্য অর্জন করে এবং অন্যান্য মফস্বল শহর অবিরাম সাপ্তাহিক সাময়িকী প্রকাশ করতে থাকে। এই সকল সাময়িকী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রেসের আনুষঙ্গিক পত্র-পত্রিকা এবং এদের প্রকাশকরা যখন তাদের প্রধানত সরকারি বিজ্ঞাপনের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিপূরণের জন্য স্থানীয় কংগ্রেসীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতো, তখনই শখ করে জাতীয়তাবাদী

রাজনীতির চর্চা করতো। এটি ছিল অন্যতম উপায়, যার মাধ্যমে বৃটিশরা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। মুসলমান রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরূপ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল না।

১৯০৬ সালে এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলায় রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বৃটিশদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। 'গরিবন্ডির লাল কোর্তাদের' দ্বারা উৎসাহিত হয়ে জঙ্গি যুব কংগ্রেসীরা যেসব দোকান আমদানিকৃত কাপড় বিক্রি করতো সেসব দোকান বর্জনে অগ্রণী ভূমিকা নিত। এই শতাব্দীর প্রথম থেকে পরীক্ষামূলক স্বেচ্ছাসাহায্য সমিতিসমূহের দ্বারা উৎপাদিত দেশীয় পণ্য এরা ফেরি করে বিক্রি করতো এবং এ উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাব্রিগেড সংগঠিত করে। এই আর্থিক স্বনির্ভরতার আদর্শকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শরূপে গড়ে তোলা হয়। আর্থিক স্বনির্ভরতার আদর্শের মধ্যে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতা থেকে মুক্ত রেখে জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাক্রম প্রযুক্তি ও শরীরচর্চা শিক্ষার উপর জোর দিয়ে হিন্দুস্থানের গৌরবময় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই সময়ে খেলাধুলার ক্লাব ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শরীরচর্চা শিক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাপূর্ণ সংগ্রামের প্রস্তুতির মধ্যকার কর্মকাণ্ড কোন গোপন ব্যাপার ছিল না।

এই পর্যায়ে অধিকতর গোপনীয়তা বজায় রেখে চলছিল বিপ্লবী সমিতিগুলি। এই সমিতি প্রতিশোধপরায়ণ মা কালীর প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে রাজনৈতিক আত্মবিসর্জনের উত্তেজক মতবাদ প্রচার করে কলেজ ছাত্রদের সমিতির সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করে। বিপ্লবী সমিতির ব্যাপক ব্রতীকরণ,আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সদস্যদেরকে আনুগত্য, গোপনীয়তা ও চিরকৌমার্য গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হতো এবং অতি বিশ্বস্তদের ক্ষেত্রে বৃটিশ কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতির জন্য বোমা ও রিভলবার নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। কলকাতা এবং হুগলী নদী বরাবর উত্তর দিকের শহর এলাকা, ঢাকা ও বরিশাল ছিল এই সমিতির প্রাথমিক কেন্দ্র। কিন্তু বৃটিশরা তাদের সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা কমিটির শক্তিবৃদ্ধি করায় এবং স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার ও নির্বাসনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের প্রত্যাঘাত করায় সন্ত্রাসকারীরা আত্মগোপন করে এবং তাদের গোপন আস্তানা থেকে দেশে বিপ্লবী সহিংসতার আদর্শ প্রচার করতে থাকে। এই বিপ্লবী সহিংসতাই বাংলার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠে।

কম দৃশ্যমান অথচ সক্রিয় ছিল যাত্রা (লোকনাটক) ও লোকসঙ্গীত দলগুলি। এই দলগুলি শহরের কেন্দ্র থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বাণী প্রচার করতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন ও মুকুন্দ দাসের মতো সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিমান পুরুষেরা এইসব দলের অভিনেতাদেরকে গান ও নাটক লিখে সরবরাহ করতেন।

এ সময় কলকাতা থেকে মফস্বল এলাকায় নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে পড়তেও দেখা যায়। উনিশ শতকের অধিকাংশ সময় রাজধানীতে এবং একটি বা দুটি বৃহৎ শহরে ব্রাহ্ম সমাজের মতো সংস্কারবাদী দল ও তাদের সনাতন বিরোধী প্রতিপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু গ্রামবাংলায় ধর্মীয় সংগঠন তাদের ঐতিহ্যগত পারিবারিক বা বংশীয় রূপ বজায় রাখে। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ, আশ্রম, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, লাইব্রেরি ও চিকিৎসালয় দ্রুত সারা বাংলায় ও বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় এবং এই মিশন রাজনীতির নয়া আদর্শ সরবরাহ করে এবং এই প্রসঙ্গে রাজনীতির নতুন পরিসর সৃষ্টি হয়।

যে সমাজসেবার আদর্শ মিশনকে কাজের উৎসাহ যোগাতো, তা একদল ক্ষুদ্র সমিতির কাজে উৎসাহ যোগায় এবং এই ক্ষুদ্র সমিতির অধিকাংশই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে রয়েছে বাংলার নিদারুণ সম্পর্ক সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝড় ও মহামারির পুনঃসংঘটনশীল ধ্বংসযজ্ঞের সময় এই সকল সংগঠন তহবিল গঠন করতো, ত্রাণ সরবরাহের যোগান দিত এবং দুর্যোগ-উপদ্রুত মানুষের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা নিত। জরুরি ত্রাণকাজ পরিচালনাকালে কঠোর পরিশ্রম ও কার্যকর সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সুনাম অর্জন করা হতো।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই উদ্যম ও প্রয়াস বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রতিকূল ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিকূল ক্রিয়াটি পরবর্তী দশকে যে পর্যায়ক্রমিক সঙ্কটে মুসলমানরা বিজড়িত থাকে সেই পর্যায়ক্রমিক সঙ্কটের মাঝে বজায় থাকতে দেখা যায়। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা সম্মেলনের পর নিখিল ভারত ও বাংলা প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এটিই ছিল মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন।

দ্বিতীয় পর্ব, ১৯১৮-১৯২৬

১৯১৭ ও ১৯১৮ সালের শীতকালে *ভারতীয় সমিতির* নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসকে উদ্ধার করে এর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর সহচর চরমপন্থীরা কলকাতায় নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে তাঁরা একশ'র বেশি গ্রামীণ প্রতিনিধি আনতে সক্ষম হন। প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভ করে চরমপন্থীরা বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষমতা দখল করেন এবং জেলা সমিতিগুলিকে প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব দেবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কমিটি পুনর্গঠিত করা হয়।

এটি ছিল বাংলায় কংগ্রেস কমিটির অবকাঠামো তৈরির প্রথম সজ্ঘবদ্ধ প্রয়াস এবং ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে উচ্চমাত্রা লাভ করতে দেখা যায়। সেই সময়ের মধ্যে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির

অফিস কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন দাসের সার্বক্ষণিক কর্মীবাহিনী কলকাতার চারটি এলাকার কাজ পরিচালনা করতো। রাজধানী শহর কলকাতাকে চারটি এলাকায় ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি জেলায় সক্রিয় কংগ্রেস কমিটিসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। কংগ্রেস সংবাদ সার্ভিসকে পার্টির প্রচারণার কাজে নিয়োগ করা হয় এবং আগের চেয়ে আরো নিয়মানুগ গতিতে অসংখ্য কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র প্রদেশব্যাপী স্বরাজ তহবিল শক্তিশালী করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক বিক্ষোভে বহুসংখ্যক মহিলাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় এবং নতুন মহিলা সমিতি শহরগুলিতে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। যেসব জাতীয় স্কুল ও কলেজ বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের বছরগুলিতে বন্ধ হয়ে যায়, সেগুলিকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনে উৎসাহ দেয়ার জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং কোন কোন স্থানে কংগ্রেস সালিশী বোর্ডগুলিকে আদালত থেকে প্রত্যাহারকৃত মামলার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। যদিও সমান্তরাল এই প্রয়াস অল্প কয়েক মাসের বেশি টিকিয়ে রাখা যায় নি, তথাপি এই প্রয়াসে এমন একটি সংগ্রামী প্রক্রিয়ার জন্ম হয়, যা স্বাধীনতা পর্যন্ত বা স্বাধীনতার পরেও প্রতিটি আইন অমান্য আন্দোলনে বারবার সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়। শহরগুলির বাইরেও কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তারের জন্য গান্ধীবাদীরা গ্রামীণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। এই আশ্রমগুলিতে ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও দায়িত্বের ভিত্তিতে ধৈর্যের সাথে গ্রাম পুনর্গঠন ও কুটিরশিল্পের বিভিন্ন দিকে শিক্ষাপ্রদান করা হতো। এসব কাজে মুসলমান ও হিন্দুরা জড়িত ছিল, অর্থাৎ ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এই সময়কালটি বাংলায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে মুসলমানদের উচ্চমাত্রায় অংশগ্রহণের পরিচয় বহন করছিল।

অধিকন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খেলাফত রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করে। দেশের প্রতি শহরে স্থাপন করা হয় খেলাফত কমিটি। খেলাফত কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় প্রধান দফতর ছিল কলকাতায় এবং প্রতিটি জেলা শহরে এদের শাখা বিস্তারলাভ করে। এই কমিটিগুলি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সাথে সমান্তরালভাবে গড়ে উঠে। খেলাফতীগণ জেলা ইসলামিয়া আঞ্জুমানগুলির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণেও তৎপরতা দেখায় এবং বহু মোল্লার সমর্থন পেয়ে তারা তাদের স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি নির্ভরযোগ্য যোগাযোগকাঠামো গড়ে তোলে।

খেলাফতীরাই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে কংগ্রেস কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে অনুসৃত প্রয়াসের অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে পরিবহনশ্রমিক, খনিশ্রমিক, কারখানাশ্রমিক এবং চা-বাগানের কুলিদের মধ্যেকার বিক্ষোভ অনেক বেপরোয়া ধর্মঘটের জন্ম দেয়, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনটি ছিল দুর্বল এবং সংগঠনটির

যেকোন ধর্মঘট করার মতো মজবুত তহবিলের অভাব ছিল। ফলে ধর্মঘটে জড়িত শ্রমিকগণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে একটি জোরালো শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য সংগঠনটির আরো বিশ বছর সময় লাগে।

এইসব প্রয়াস সুস্পষ্টরূপে আন্দোলনকে অধিকতর গণমুখী করার উদ্দেশ্যে সংগ্রহকাজে পরিচালিত হয়। নগরবাসী নিম্নমধ্যবিত্ত এবং ধনী কৃষিজীবীদের মধ্য থেকে ১৯২১ সালে প্রায় দশ লক্ষ নতুন লোকের ভোটাধিকার লাভে উৎসাহিত হয়ে আরো নতুন সংগঠন অন্যান্য পেশাদারি কর্মপ্রয়াসে তৎপর হয়। শিক্ষক, মোক্তার, অঘোষিত সরকারি কর্মকর্তা ও জোতদারদের নিয়ে সমিতি গঠনে প্রখ্যাত এবং উচ্চাকাঙক্ষী রাজনীতিবিদদের ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। নির্বাচনের ঝুঁকি গ্রহণ করা তখন যথোপযুক্ত হয়ে উঠে। কতিপয় সরকারি বিভাগের উপর প্রাদেশিক বিধান পরিষদকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়, সরকার কর্তৃক মনোনীতদের কাছ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে মধ্য দশকে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় এবং সম্প্রসারণপদ্ধতির আওতাভুক্ত স্থানীয় বোর্ডগুলি জেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয়। ১৯২১ সালে অসহযোগীরা তাদের সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেও বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এসব প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয়ার মধ্যে যে ঝুঁকির সম্ভাবনা ছিল সে সম্পর্কে বেশ সতর্ক ছিল এবং ১৯১৫ ও ১৯২৫ সালের মধ্যকার বছরগুলিতে তারা যে অন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ব্যাপারে সক্রিয় ছিল তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। সেটি হলো ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠা। বাংলার কোন কোন বর্ণগত সভার অভ্যুদয় অনেক আগেই ঘটেছিল, কিন্তু এই সময় মধ্য ও নিম্নবর্ণের বহু সংগঠনের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এই নতুন সমিতিগুলি পুরনো ও চিরাচরিত বর্ণগত পঞ্চায়েতের সাথে তুলনীয় নয়। জেলা শহর কিংবা কলকাতায় অবস্থানরত গুটিকয়েক শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের দ্বারা গঠিত হয়েছে এইসব নতুন সমিতি। মুদ্রিত পরিপত্রের মাধ্যমে এবং যেসব জেলা শহরে অধিকাংশ বর্ণহিন্দু সদস্যরা আরাম-আয়েশে থাকতেন, সেসব জেলা শহরে আহুত সভায় তাঁরা প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতেন।

অনুরূপভাবে, এইসব উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল যে উচ্চ মর্যাদার বিষয়টির সাথে বর্ণভেদ 'সন্দেহাতীতভাবে' জড়িত সেই উচ্চ মর্যাদার (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা নিরেট শূদ্র যেটিই হোক না কেন) উপযোগী করে বর্ণগত আচার-অনুষ্ঠানের উন্নতি বিধান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হলো সঠিক বর্ণগত মর্যাদা এবং এই বর্ণগত মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোন বর্ণগত নামকে দশ বছর অন্তর আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত করা। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণগত উপদল বিলোপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষকরে যেখানে লক্ষণীয়ভাবে পেশাগত পার্থক্য বিরাজ করে, সেখানে পরিপূর্ণ প্রয়াসকে সমর্থন করা হয়েছে। যদি বর্ণসমূহের

লোকেরা তাদের যেসব সাথী নির্বাচনে প্রার্থী হয় তাদেরকে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করে থাকে, তাহলে স্থানীয় বোর্ড এবং আইন পরিষদের উপর অর্পিত নতুন ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণসমূহের প্রতি প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সংস্কারগুলি কার্যকর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারের প্রচার অভিযানের প্রতি সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে সমিতির চাঁদার যোগান দিতে এবং অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে সাহায্য প্রদানে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তুলতে বর্ণসমূহকে উৎসাহিত করা হয়। এসব আবেদনে যখন অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতই সমিতিগুলি বর্ণসংক্রান্ত সাময়িকী প্রকাশ করতে শুরু করে, যদিও মাত্র কয়েকটি সাময়িকী অধিক সময় টিকে থাকে।

তৃতীয় পর্ব, ১৯২৬-১৯৩৭

কোন কোন হিন্দু বর্ণ সমিতির প্রকাশিত সাহিত্যে উচ্চবর্ণের লোকদের বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতার বিষয়ে সমালোচনা ছিল একটি বৈশিষ্ট্য। এতে ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা গঠনের পথ সুগম হয়। এই হিন্দু মহাসভা গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ব্রাহ্মণগণ এবং তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্য প্রতিরোধ করা। ১৯২৬ সাল থেকে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভাকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

কংগ্রেস কর্তৃক চিত্তরঞ্জন দাসের হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বাতিলকরণ ও এর পরবর্তী সময়ে ১৯২৬ সালের মধ্যভাগে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অনেক বাঙালি মুসলমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যেসব মুসলমান নেতা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সাথে সব ধরনের মৈত্রীর অবসানে মদদ যোগাচ্ছেন তাদেরকে অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং কোন কোন জেলায় বৃটিশ কর্মকর্তাদের সহায়তায় অধিকতর দক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় মুসলিম সমিতিগুলির একটি সাফল্যজনক একত্রীকরণ ঘটে। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বহু স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়লাভের ফলে এই সাফল্যজনক একত্রীকরণ সংঘটিত হয়। এই একত্রীকরণের ফলে পরবর্তী বছরে স্থানীয় বোর্ডগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাতে ব্যাপকহারে মুসলিম প্রার্থীর বিজয় সূচিত হয়। ১৯৩০ সালে প্রথমদিকে মুসলমানরা আরো বেশি আসন দখল করে এবং হিন্দু নিয়ন্ত্রিত কলেজ ও স্কুলবোর্ডগুলিতে তাদের প্রবেশলাভ করতে দেখা যায়। গ্রামীণ এলাকায় ভূম্যধিকারী উচ্চশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকগোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে কৃষক সমিতিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দেশের কৃষকগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার জন্য সক্রিয় ছিল, সেই কৃষক সমিতিগুলি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাংলার অর্থনীতিতে ধ্বস নামার সুযোগে ব্যাপকহারে কৃষকদের সমর্থন অর্জনে সমর্থ হয়। এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক ১৯৩৫ সালের কৃষক প্রজা পার্টি গঠনের ফলে আইন পরিষদে এই সমিতিগুলির নেতৃত্বদানের ও এদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ

করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাইমন কমিশন নিয়োগে যে শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক শুরু হয়, সেই শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক চলাকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি উপদলে নিম্নবর্ণসভাকে একত্রিত করার জন্য একই সময়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর (তফসিলী সম্প্রদায়, পরবর্তী সময়ে তারা এই নামে অভিহিত হয়) সমিতিসমূহ গঠন করা হয়। রাজনীতির এই উদ্দেশ্য অনুসরণ করে বাংলার একটি বৃহৎ কিন্তু সাধারণভাবে অবহেলিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং উপজাতীয়গণও গ্রামীণ পরিষদের মধ্যে আন্ত-উপজাতিক সংযোগ নির্মাণ করার প্রয়াস চালাচ্ছিল। এ ব্যাপারে তারা কেবল সীমিত সাফল্য অর্জন করে, তবে সাঁওতালরা সম্ভবত এ বিষয়ে ছিল সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী।

বাংলায় নানা চরমপন্থী সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের ভিতব দিয়ে চলছিল এই দুর্যোগময় বছরগুলি। সমসাময়িক ইউরোপের ফ্যাসিবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এ সময়ে কিছু কিছু বাঙালি যুব আন্দোলনকারীদের কাছে আদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী সমিতিগুলি বাংলার গ্রাম ও শহরের ব্যাপক এলাকায় জালের মতো তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং তাদের জবরদস্তিমূলক কৌশলসমূহ এখন তাদের মুসলমান ও হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে থাকে। ১৯৩০-১৯৩৪ সালের মধ্যকার আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে সন্ত্রাসবাদীরা বৃটিশ পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। মেদিনীপুর জেলায় তারা উপর্যুপরি কয়েকজন বৃটিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করায় সাময়িকভাবে সেখানে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং কিছুকালের জন্য কংগ্রেস একটি সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। গোহত্যা এবং মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানোর ব্যাপারে পরস্পরকে বাধাদান করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলি পারস্পরিকভাবে তাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষের অন্যায়-অপরাধের প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যস্ত থাকে। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি আরো মারাত্মক করে তোলার জন্য কলকাতার গুণ্ডাদল ছিল এবং এই গুণ্ডাদলকে আন্তঃদলীয় বিবাদে ভাড়াটে সাহায্যকারীরূপে উভয় ধর্মের উগ্রপন্থী রাজনীতিবিদরা ব্যবহার করেন।

এই সময়ে হাজার হাজার বাঙালি জাতীয়তাবাদের আরেক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেটি হলো বৃটিশ কারাগার বা নিরোধ ক্যাম্পে অবরুদ্ধ জীবন যাপনকারীদের প্রতিষ্ঠান। এইগুলিকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনায় কোনরূপ কৌতুকপ্রবণতা ছিল না। তবুও বলতে হয়, বিভিন্ন বয়স, অভিজ্ঞতা, আদর্শগত বিশ্বাস এবং মূল অঞ্চলের বহু বন্দিকে একত্রে দলবদ্ধ করে বৃটিশ জাতি অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক মঞ্চ, দলীয় কর্মসূচি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সৃষ্টির পথ সুগম হয়। জাতীয়তাবাদীরা কারাগার থেকে স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ ছাড়াও প্রচুর বাস্তব জ্ঞান নিয়ে এইসব রাজনৈতিক 'কলেজ' থেকে বের হয়ে আসে।

শেষ পর্ব, ১৯৩৭-১৯৪৭

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দশকটি বাংলার জন্য এত উত্তেজনাময় ও বেদনাদায়ক ছিল যে, যদিও ক্রুটিহীনভাবে এর সমগ্র প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলে মনে হয়, তথাপি এ পর্যায়ের যে মূল্যায়ন আমরা পাই, তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বা ভ্রমাত্মক নয়। এই সময় কতিপয় নতুন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। যে সমবায় আন্দোলন এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই আন্দোলনে ১৯৩০-এর শেষের দশকে কৃষক সমিতির উৎসাহ সৃষ্টি এবং পল্লীঋণ হ্রাসকরণ এবং কৃষিঋণের নতুন উৎস সৃষ্টির নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত একটি প্রাদেশিক সরকারের প্রতিশ্রুতি নতুন শক্তি সঞ্চার করে। এটিই ছিল প্রথম নির্বাচিত সরকার, যা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং প্রদেশসমূহে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করে। এই প্রশাসনের পক্ষে আইন পরিষদীয় সমর্থন জুগিয়ে আসছিল কৃষক প্রজা পার্টি ও তফসিলী সম্প্রদায়ের দলগুলি। এই তফসিলী সম্প্রদায়ের দলগুলি পরবর্তী সময়ে বাঙালি রাজনীতির নতুন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মৌলিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন পরিষদ মার্কসবাদী গোষ্ঠীর সমর্থন বর্জন করে এবং এতে বৃটিশ কারাগারগুলির মধ্যে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। যুব সন্ত্রাসবাদীদের অনেকেই তাদের অন্তরীণাবস্থায় সাম্যবাদী ভাবধারা গ্রহণ করে এবং ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে তাদের মুক্তি প্রদান করা হলে রাজনৈতিক জটিলতার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। উপদলীয় কোন্দলের জন্য সব সময়ই বাংলার মুসলিম রাজনীতির দুর্নাম ছিল। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর প্রাদেশিক কংগ্রেস তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৯ সালে গান্ধীর নির্দেশে প্রভাবশালী বসু গ্রুপ বহিষ্কৃত হওয়ায় এবং অতঃপর এদের দ্বারা ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলায় সমন্বিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সকল সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। রাজনৈতিক অবকাঠামো তথা পৌরসভা, ছাত্রসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, জেলা কংগ্রেস কমিটি ও কৃষক সমিতিগুলির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ ক্ষমতালাভের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। অবাঙালিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতিসমূহ কলকাতায় দাবিদাওয়ার শোরগোল আরো বাড়িয়ে দেয় এবং সমগ্র ভারতব্যাপী আঞ্চলিক ভাবধারাকে তীব্রতর করে।

শেষ পর্যায়ে, স্বাধীনতার ঠিক পূর্বেকার বছরগুলিতে আমরা কতিপয় অতি লক্ষণীয় ভিন্নধর্মী কর্মকাণ্ড দেখতে পাই। এর একটি হলো, এ সময়ে প্রতিবেশী পূজা কমিটিগুলি বড় বড় হিন্দু উৎসব তথা দুর্গা ও সরস্বতী পূজাকে পারিবারিক অনুষ্ঠানের গণ্ডি থেকে সমবেতভাবে সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে ব্যাপকভাবে স্থানান্তরণের কাজে লিপ্ত থাকে। নিজস্ব তহবিল গঠনের বেশ কয়েক বছরের মধ্যে তাদের লোকালয় সম্পর্কিত ব্যাপক জ্ঞানলাভ এবং পার্শ্ববর্তী আয়োজনকারীদের সাথে উদ্ভূত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব পূজা

কমিটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক অঙ্গ-সংগঠনের রূপ লাভ করে। ইত্যবসরে মার্কসবাদীদের অনেকেই বর্তমানের যে ঐক্যবিনাশকারী অবস্থা বৃটিশদের এখান থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথে অপসৃত হবে বলে ধারণা করেছিল, সেই ঐক্যবিনাশকারী অবস্থা থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতে পারে সেসব লক্ষ্য করে বাংলার প্রোলেতারীয় শ্রেণী তথা শিল্প ও বাগান শ্রমিক, ভূমিহীন, উপজাতি এবং বাংলার কৃষককুলের মধ্যে সমাজবিপ্লবের প্ররোচনা সৃষ্টিতে কাজে লেগে গেল। কোন কোন স্থানে জমির খাজনা ও কর প্রতিরোধের সপক্ষে আন্দোলনে সমর্থন দিতে তারা প্রথম বঙ্গবিভাগকালের পূর্বের লোকসঙ্গীত ও যাত্রানুষ্ঠান আয়োজনের কৌশল অবলম্বন করে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মগোপন এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের জন্য অক্ষশক্তির সাথে মৈত্রী গঠনের ফলে বাংলায় কল্পিত স্বতঃস্ফূর্ত সহিংসতায় ভাটা পড়ে। বৃহৎ ধর্ম দু'টির সাম্প্রদায়িক চরমপন্থীদের দ্বারা গঠিত সতর্ক প্রহরীদলভুক্ত স্থানিক বাহিনী ছিল কম কল্পনাবিলাসী ও তাৎক্ষণিকভাবে বেশ সহিংস। এইসব বেসরকারি বাহিনী ১৯৪০-এর দশকের প্রথমদিকে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় এবং অবশেষে ১৯৪৬ সালের খণ্ডযুদ্ধে এই অবস্থার অবসান ঘটে। এতে যে রক্তপাত ঘটে তাতে বাংলাবিভক্তি নিশ্চিত হয়ে যায়।

রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি

বিশ শতকের বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান যদি পরিপূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কেও আমরা সম্ভবত সীমিত জ্ঞানের পর্যায়েই রয়েছি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা এর সমর্থকদের পরিবর্তনশীল অঞ্চল, মর্যাদা, শ্রেণী এবং পর্যায়ভিত্তিক গঠন ও বিকাশের ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য কেবল প্রয়োজনীয় গবেষণা শুরু করা ছাড়া এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা অর্জন করতে পারি নি।

এখানে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে তাতে উক্ত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে জানার সূত্র পাওয়া যায়, তবে এই পরিবর্তনগুলির পরিমাণ এদের জানার সূত্রের চাইতে বেশি নয়। অধিকন্তু এদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা বা পাঠ করার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে ভূম্যধিকারী সমিতিগুলির প্রাধান্য সৃষ্টি এবং ১৯২০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়কাল হতে গুরুত্বের দিক দিয়ে এগুলোর দ্রুত অবনতিতে আমরা সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, পুরনো জমিদারশ্রেণী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যাই হোক, আমরা ভুল করবো যদি এই উদাহরণ থেকে এমনটি নিশ্চিত করে মেনে নিই যে, সকল প্রাতিষ্ঠানিক অবনতিতে নতুন সামাজিক স্তরের দিকে ক্ষমতার একটি পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১৮ সালের পর ভারতীয় সমিতির কোন গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে এই

সমিতিকে অতিক্রমকারী বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব আসে অনুরূপ ভদ্রলোক পদমর্যাদাসম্পন্ন দল থেকে এবং এই দল উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বাংলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে চলে।

অন্যত্র আমি যে অর্থে 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্যাখ্যা করেছি তা এই যে এরা সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী ও বিবেকবুদ্ধির বিচারে উৎকৃষ্ট একটি শ্রেণী। এই শ্রেণী আর্থিক দিক থেকে ভূমিরাজস্ব ও পেশামূলক এবং কেরানি ধরনের চাকুরির উপর নির্ভরশীল থাকে, উচ্চবর্ণীয় মর্যাদাসম্বলিত প্রতিষেধ ও শিক্ষাগত প্রাধান্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের দূরত্ব বজায় রাখে। এরা নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে গর্ববোধ করে এবং একটি বেশ জটিল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে নিজেদের সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষা করে, যে কাঠামোর মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে যে তারা সামাজিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সুবিধাবলী পরিবর্তন ও বৃদ্ধির জন্য লক্ষণীয়ভাবে প্রস্তুত।[২]

এই মন্তব্য করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই ভদ্রলোক শ্রেণীটি এমনকি স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী ও নকশালপন্থীদের মতো মৌলবাদী দলগুলির নেতৃত্ব প্রদানপূর্বক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করার দৃশ্যটি সম্ভবত অলীক হতে পারে, তবে এই ভদ্রলোক শ্রেণীটি গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তির সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে প্রকাশ না করে বরং গোপন করে আসছে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রথম বঙ্গবিভাগকালীন বিক্ষোভের সময় এবং ১৯২০-এর দশকে যখন কংগ্রেস নেতাদের অভ্যন্তরীণ কলহ ও আদর্শগত অবনতির ফলে যুব বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমাজবাদী দল গঠনের পথ রচিত হয়, তখন সাময়িকভাবে যে পুরুষানুক্রমিক বিবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেয় সেই পুরুষানুক্রমিক বিবাদের প্রতিফলের পরিমাণ নির্ণয় করার বাস্তবিকপক্ষে আর কোন সার্থকতা থাকে না। অনুরূপভাবে ভদ্রলোক সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত উত্তেজনার বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় এবং এই শ্রেণীগত উত্তেজনাটি কোন কোন কঠিন পরিস্থিতিতে, যেমন ১৯২০ সালের আইন অমান্য বিতর্ককালীন সময়ে যখন রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য সরকারকে বাধ্য করার প্রয়াস নেয়া হয় তখন দেখতে পাওয়া যায়।

এই প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণে ১৯১৮ সাল থেকে জেলা শহরগুলিতে জাতীয়তাবাদী সংগঠন পুনর্গঠন করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে এবং ১৯২০-এর দশকে মুসলিম

২. Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-Century Bengal, (Berkeley 1968), 12-13

সংগঠনের মধ্যেও অনুরূপ সমান্তরাল পুনর্গঠনের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে যে ফল পাওয়া যায় তা হলো বাংলার গ্রামীণ এলাকায় নতুন ধনসম্পদের বৃদ্ধি। ধনসম্পদের এই নতুন বৃদ্ধির বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই বাংলার যে ভূ-সংস্থান সব সময় যাতায়াতব্যবস্থাকে সমস্যাসঙ্কুল করে রেখেছে, সেই ভূ-সংস্থানকে এবং যে পরিবর্তনশীল নদীপ্রবাহ, বিশ্বাসঘাতী আবহাওয়া এবং মারাত্মক আঞ্চলিক রোগসমূহ একত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং কৃষি-উৎপাদনের অবিরল হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়, তাকে বিবেচনায় আনতে হবে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ এই যে, বাংলা এবং এর পশ্চাৎভূমির যে এলাকাগুলি (অর্থাৎ সুন্দরবন, ব্রহ্মপুত্র নদীর চর, টেরাই এবং ছোট নাগপুর প্রান্তের শালবন) বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকেও অব্যবহৃত ছিল এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগ, যেমন পরিবহন, কৃষি ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তির জন্য উপযোগী ছিল, সেই এলাকাগুলির উন্নতি বিধান করার জন্য প্রয়াস নেয়া হয়। এইসব নতুন ভূমি উদ্ধার করার ফলে কে উপকৃত হয়েছে সেসম্পর্কে এবং পূর্ব বাংলার পাট-ব্যবসা, উত্তর বাংলার চা-শিল্প এবং পশ্চিম বাংলার খনি থেকে কৃষিজমির জন্য পুনঃনিয়োজিত মূলধনের সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে এখনো কোন গবেষণা হয় নি। যাই হোক, এ সময় জেলা শহরগুলিতে বসবাসকারী এবং শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে চতুর্দিকস্থ গ্রামাঞ্চলের কোন কোন এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী জালের মতো বিস্তৃত এক শ্রেণীর ভূঁইফোড় লোকের অভ্যুদয় আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এই শ্রেণীটিই জেলা ও স্থানীয় বোর্ডগুলির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সুযোগ গ্রহণের সবচেয়ে অনুকূল স্থানে অবস্থান করে এবং এই শ্রেণীটিই অতি দ্রুত বর্ণগত সমিতিগুলির সাংগঠনিক সমর্থন অর্জন করে এবং ইসলামিয়া আঞ্জুমানগুলিকে সুসংহত করে। এরাই ছিল জোতদার সমিতিগুলির সক্রিয় শক্তি এবং এদের বিনিয়োজিত অর্থে অন্যান্য অর্থনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে জেলা সমবায় ব্যাংক পরিচালনার উদ্যোগও টিকে থাকে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলায় এককালে শহরের বাইরে এবং বড় জমিদারদের রাজবাড়ি ছাড়িয়ে দূরে যেসব লোকের আনাগোনা ছিল, তারা হলো বাংলার অবিচ্ছিন্ন বিপুল কৃষক জনগোষ্ঠী। সাধারণ গরিব গ্রামীণ জনগণের মধ্যে অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক 'মোটা বিড়াল'-এর অস্তিত্ব দেখা যেতো। সবচেয়ে স্বল্প ছিল সেই ভূমিহীন উদ্বাস্তু উপজাতি এবং অন্যান্য ভূমিহীন শ্রমিকশ্রেণী, স্বাধীনতার আগে যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৯৪০-এর দশকে যখন মার্কসবাদীরা তেভাগা ও অনুরূপ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভোগদখলবর্জিত রায়ত এবং ফসলের নগণ্য অংশীদারদের নেতৃত্ব দেয়, তখন পর্যন্ত তাদের নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে হয়। ভোগদখলদার রায়তরাই ছিল কৃষক সমিতিগুলির প্রধান উদ্যোক্তা এবং কতিপয় মধ্যস্বত্বাধিকারী (জোতদার, তালুকদার ও পত্তনিদার) সহ তারাই ছিল কৃষি সমবায়ের প্রধান অবলম্বন। এইভাবে গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠানসমূহ বলতে প্রথম দৃষ্টিতেই যা মনে হয়, যদি তা গভীরভাবে পরীক্ষা করা হয়,

তবে প্রমাণিত হবে যে, মধ্যপন্থী ধনীরাই আসলে শক্তির নতুন উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, বাংলার শিল্পপ্রোলেতারীয়দের রাজনৈতিক অভিযান গত তিন দশকে গ্রামীণ ভূমিহীন শ্রমিকদের রাজনৈতিক অভিযানের আগেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলি ছিল সম্ভাবনাময়। যুদ্ধপরবর্তী দাবিদাওয়া কৃত্রিমভাবে হলেও বাংলায় শিল্প ও খনি উন্নয়নের প্রয়াসকে উৎসাহিত করে। কিন্তু ১৯২০ সালের প্রথমদিকে ছিল ব্যবসার মারাত্মক পতনাবস্থা। এ অবস্থাকে আরো শোচনীয় করে তোলে ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারিসহ ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালের পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এতে খাদ্যসামগ্রী ও সূতাজাত দ্রব্যাদির তীব্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই মূল্যস্ফীতির সঙ্গে বেতন বা মজুরি বৃদ্ধি পায় নি এবং শিল্পশ্রমিকদের কাজের অবস্থা এবং চাকুরির শর্ত ছিল খুবই শোচনীয়।

আমরা দেখেছি যে, খেলাফতী ও কংগ্রেসীরা এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে পুনরায় জোরদার করার একটি সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে এবং এই পর্যায়ে তাদের প্রাথমিক সাফল্য অসহযোগ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। যাই হোক, পরবর্তী সময়ে রাজনীতিবিদরা আরো সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হয়। এই রাজনীতিবিদরা ছিল বাঙালি এবং অধিকাংশ শিল্পশ্রমিক ছিল বিহার ও যুক্ত প্রদেশের। বাঙালি নেতৃত্বকে মেনে নিতে এসব শ্রমিকের বরাবর অনিচ্ছা এবং যে এলাকায় কাজ করে তারা জীবননির্বাহ করে সেই এলাকা নিয়ে আত্মপরিচয় দিতে এদের অস্বীকৃতি বিংশ শতাব্দীর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় মারাত্মক অস্থিরতার উৎপত্তি ঘটায়। বিহারীদের দ্বারা পরিচালিত সাময়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা আমাদের যে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিত তা হলো, এখানে সব রাজনীতিই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নি।*

এই লেখার বৃহদংশ নেয়া হয়েছে Rachel Van M. Baumer কর্তৃক সম্পাদিত *Aspects of Bangladeshi History and Society* (1975) গ্রন্থে প্রকাশিত লেখকের 'Social and Institutional Bases of Politics in Bengal' শীর্ষক রচনা থেকে। অনুমতি প্রদানের জন্য লেখক উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

৯

বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা ১৯৩৭-১৯৪৭

হারুন-অর-রশিদ*

১৮৬১ সাল থেকে ধাপে ধাপে বঙ্গীয় আইনসভা গড়ে উঠলেও ১৯১৯ সালের দ্বৈতশাসনের (dyarchy) পূর্ব পর্যন্ত আইনপ্রণয়ন ও শাসনকাজ পরিচালনা সম্পূর্ণ বৃটিশ শাসকদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। দ্বৈতশাসনের আওতায় কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের আইনপ্রণয়নক্ষমতা প্রদান এবং কতিপয় বিষয়ের (transferred subjects) দায়িত্ব স্থানীয় মন্ত্রীদের উপর অর্পণ করা হলেও তার পরিসর ছিল খুবই সীমিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ভোটাধিকার ও আইনসভার সদস্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি[১] এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হলে এদেশীয়দের কাছে প্রাদেশিক পর্যায়ে সরকার গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘকাল পর ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকর্তৃত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের হাত থেকে তাদের হাতে চলে যায় এবং বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে, যার পরিণামে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। আলোচ্য সময়কালে বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হয় : ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩), নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫) ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)। এই প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে এসব মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলী এবং

---

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ১৯১৯ সালে যেখানে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ লোক ভোটার ছিল, ১৯৩৫ সালে তা শতকরা ১৪ ভাগে উন্নীত হয়। আইনসভার সদস্যসংখ্যাও ১৩৯ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০ জনে দাঁড়ায়।

এবং বঙ্গীয় রাজনীতিতে, বিশেষকরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

১৯৩২ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award) অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থ-গ্রুপের মধ্যে বণ্টনকৃত বঙ্গীয় আইনসভার আসনে 'পৃথক নির্বাচন' পদ্ধতিতে (separate electorate) অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন একক রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম না হওয়ায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। ২৫০ আসনবিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভায় এককভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সর্বাধিক আসন (১২১টি) সংরক্ষিত থাকায় এ সরকারের নেতৃত্ব যে তাদের হাতে আসবে তাও সুনিশ্চিত ছিল। এদিকে মুসলিম আসনে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি, জিন্নাহর মুসলিম লীগ এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক আসন লাভ করলেও[২] পটুয়াখালী নির্বাচনী এলাকা থেকে (অপর একটি আসন বাদে) সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফজলুল হক মুসলিম লীগ নেতা ও ঢাকা নবাব পরিবারের অন্যতম সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে নির্বাচিত হলে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও প্রজা আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় এটাও মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফজলুল হককেই সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে, সেজন্য মুসলমান জনমতের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে তা সফল হতে পারে নি।[৩] ফজলুল হকের এ উদ্যোগে শঙ্কিত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কালবিলম্ব না করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁদের সম্মতি ও সক্রিয় সহযোগিতা দানের কথা ব্যক্ত করলে ফজলুল হক ও তাঁর দল এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নিঃসন্দেহে এটি জিন্নাহর একটি কৌশলগত চাল ছিল, যা বাংলার রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

---

২. কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬, মুসলিম লীগ ৩৯, স্বতন্ত্র ৪৩।

৩. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কংগ্রেসের প্রত্যাশা পূরণ না হলে কংগ্রেস নির্বাচনের পর প্রথমে দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়। যাহোক, ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে তারা প্রথমত যেসব প্রদেশে পার্টির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেসব প্রদেশে, অতঃপর যেখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেখানে সরকার গঠনের এবং সর্বশেষে, যেখানেই সরকার গঠনের কোন সুযোগ আছে সেখানে তার সদ্ব্যবহার করার অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। Humayun Kabir, *Muslim Politics 1906-1947 and Other Essays*, (Calcutta 1969), 26. কংগ্রেসের সঙ্গে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখুন, Formation of New Government Under Fazlul Huq (1941-43), Part I, L/P & J/8/651, 166-167, in India Office Library and Records (hereafter IOR), আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, (ঢাকা ১৯৭৫), ১৩৬-১৪১।

'প্রজা-লীগ' ঐকমত্য সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি সহজ কাজ ছিল না। আইনসভার নির্বাচনের পরপর কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি (যাঁদের অধিকাংশই জমিদার শ্রেণীভুক্ত) আঞ্চলিকতা বা অন্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা তুলে নিজেদের পক্ষে অন্যান্য সদস্যের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। মন্ত্রিসভায় আসন লাভ করা ছিল এঁদের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে মাসুদ আলী খান পন্নী[৪] (টাঙ্গাইল), নবাব কে. জি. এম. ফারুকী[৫] (কুমিল্লা) এবং নবাব মোশাররফ হোসেন[৬] (জলপাইগুড়ি) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ তিন জনের মধ্যে নবাব মোশাররফ হোসেন আরো এক ধাপ এগিয়ে 'প্রশাসনে উত্তর বাংলার ন্যায্য অধিকার' সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে 'এ্যাসেমব্লি নর্থ বেঙ্গল গ্রুপ' গঠন করে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।[৭] একটি আধা-সামন্তবাদী সমাজে অনুন্নত দলীয় ব্যবস্থার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

যাহোক, প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিয়ে ফজলুল হকের পক্ষে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হলেন ফজলুল হক (মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়), স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন (স্বরাষ্ট্র), নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (কৃষি ও শিল্প), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বাণিজ্য ও শ্রম), সৈয়দ নওশের আলী (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), নবাব মোশাররফ হোসেন (বিচার ও আইন), নলিনী রঞ্জন সরকার (অর্থ), স্যার বি. পি. সিংহ রায় (রাজস্ব), প্রসন্নদেব রাইকত (শুল্ক ও বন), মুকুন্দ বিহারী মল্লিক (সমবায়, ঋণ ও পল্লীদারিদ্র্য) এবং মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী (যোগাযোগ ও পূর্ত)।

১১ সদস্যবিশিষ্ট এ মন্ত্রিসভায় ৬ জন ছিলেন মুসলমান এবং ৫ জন ছিলেন হিন্দু (৩ জন বর্ণহিন্দু ও ২ জন তফসিলী হিন্দু)। কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগদান না করায় হিন্দু সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়, বিশেষকরে ব্যাপক হিন্দু মধ্যবিত্তের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। অন্যদিকে ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন জমিদার[৮], ১ জন

৪. করটিয়ার প্রখ্যাত জমিদার, যিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তিনি ময়মনসিংহ জেলার সদস্যদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠনের চেষ্টা করেন। Star of India, 2 March 1937, 5.

৫. নবাব ফারুকী (১৮৯১-১৯৭১) কুমিল্লার একজন প্রভাবশালী জমিদার, যিনি ১৯২১ সাল থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং ১৯২৯-১৯৩৬ সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম দল' নামে তিনি আইনসভার মধ্যে একটি ভিন্ন গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ নেন। *আজাদ,* ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, ৭।

৬. নবাব মোশাররফ হোসেন (১৮৭১-১৯৬৬) জলপাইগুড়ি জেলার একজন জমিদার ও চা- বাগানের মালিক ছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং ১৯২৭ সালে স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

৭. *Star of India*, 27 February 1937, 9; *The Amrita Bazar Patrika,* 27 February 1937, 5

৮. নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, নবাব মোশাররফ হোসেন, স্যার বি. পি. সিংহ রায়, শ্রীশ চন্দ্র নন্দী ও প্রসন্ন দেব রাইকত।

পুঁজিপতি[৯] এবং ৪ জন আইনজীবী-রাজনীতিবিদ ছিলেন।[১০] নির্বাচনী এলাকা বিচারে ৩ জন বিশেষ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ২ জন জমিদার এ্যাসোসিয়েশন[১১] এবং ১ জন চেম্বার অব কমার্সের[১২] প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বাকি ৮ জনের মধ্যে ৪ জন শহর এলাকা থেকে নির্বাচিত ছিলেন।

ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগের সঙ্গে শুধু কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাই গঠন করেন নি, বরং যাঁর বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে তিনি ও তাঁর দল তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন, তাঁর সাথে 'প্রজা-লীগ কোয়ালিশনের' একটি যুক্ত সংসদীয় কর্মসূচিও প্রণয়ন করেন, যাতে তাঁর দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো থেকে কতিপয় ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়।[১৩] 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান নির্বাচনী ওয়াদা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মন্ত্রিসভায় জমিদারসদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেন। এজন্য অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, আত্মসংরক্ষণের তাগিদ এবং গদির আকর্ষণ বিচিত্র ধরনের বিপরীতধর্মী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছে, যা ফজলুল হককে সাধারণ মানুষের জন্য 'ডাল-ভাতের' নিশ্চয়তা বিধানের নির্বাচনী ইস্যু শিকায় তুলে রাখতে প্ররোচিত করে।[১৪] তৎকালীন পরিস্থিতির বাস্তবতায় এ ধরনের মন্তব্য হকের প্রতি খানিকটা অবিচার করার শামিল। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আসলে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তহীনতা ও অদূরদর্শিতা তাঁকে তাঁর এক সময়কার ঘোরতর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের শিবিরে ঠেলে দেয়। নিঃসন্দেহে মন্ত্রিসভায় পল্লী অঞ্চলের জনগণের, বিশেষকরে কৃষক প্রজার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই অপ্রতুল। তৎকালীন অবস্থায় মুসলিম লীগ ও অকংগ্রেসী হিন্দু সদস্যদের নিয়ে গঠিত কোয়ালিশনে প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদার-সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এই অবস্থায় যদি কোন মন্ত্রিসভাই গঠন করতে হতো, তাহলে ফজলুল হকের পক্ষে ঠিক এমন একটি মন্ত্রিসভা গঠনই সম্ভব ছিল।[১৫] কথা উঠতে পারে, তিনি আদৌ এ ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত না হলেও পারতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ লক্ষণীয়। বিরোধী অবস্থানে থেকে

---

৯. নলিনীরঞ্জন সরকার।

১০. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নওশের আলী ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক।

১১. স্যার বি. পি. সিংহ রায় ও শ্রীশ চন্দ্র নন্দী যথাক্রমে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১২. তিনি হলেন নলিনীরঞ্জন সরকার, যিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি ছিলেন।

১৩. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, (Dhaka 1987), 90.

১৪. Z.H. Zaidi (ed.), *Jinnah-Ispahani Correspondence*, 1936 1948, (Karachi 1976), 26

১৫. Partha Chatterjee "Bengal Politics and the Muslim Masses, 1920-1947", *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, XX.1, (1982), 37.

আদর্শচর্চার লোক তিনি ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ক্ষমতালাভ এবং ক্ষমতায় আরোহণ করে নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুকূলে। একে কেউ বলবেন 'সুবিধাবাদ', কেউ বলবেন 'বাস্তববাদিতা'। তবে, অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফজলুল হক বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংস্কারবাদী নেতা মাত্র।

মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে প্রথমে অসন্তোষ এবং কিছুদিন পর প্রকাশ্য বিভক্তি দেখা দেয়। মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগ যেখানে ৩টি আসন লাভ করে (সোহরাওয়ার্দী এবং ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা হাবিবুল্লাহ ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন), সেখানে কৃষক প্রজা পার্টি থেকে মাত্র ২ জন সদস্য (ফজলুল হক ও নওশের আলী) অন্তর্ভুক্ত হন। মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বক্ষণে চূড়ান্ত তালিকা থেকে ফজলুল হক তাঁর পার্টির সেক্রেটারি শামসুদ্দিন আহমদকে বাদ দিয়ে তদস্থলে নবাব মোশাররফ হোসেনকে অন্তর্ভুক্ত করে শপথ নিলে পার্টির অপেক্ষাকৃত তরুণ, সংগ্রামী অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। যদিও গভর্নর এবং বঙ্গীয় আইনসভার ২৫ সদস্যবিশিষ্ট 'ইউরোপীয় গ্রুপের' আপত্তির কারণেই শামসুদ্দিনের নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়[১৬], তথাপি পার্টির তরুণ অংশ হকের সদিচ্ছা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিল না। তাদের ধারণা ছিল ভিন্ন রকম। তারা মনে করতো, জমিদারি স্বার্থের কাছে ফজলুল হক নতি স্বীকার করেছেন।[১৭] শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধাচরণ করে কংগ্রেসের সহযোগীর ভূমিকা নেয় এবং প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে হকের সমালোচনা করে। ফজলুল হক এর ফলে ১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর পার্টির এ্যাসেমব্লি শাখার ১৭ জন 'অননুগত সদস্যের' বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এঁদের বহিষ্কার করেন।[১৮] এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে বহিষ্কার-পাল্টা বহিষ্কার সংঘটিত হয়, যা কৃষক প্রজা পার্টির এ্যাসেমব্লি শাখা ও মূল সংগঠন দুটোকেই আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে।

এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে, শুধু মন্ত্রিত্বের প্রশ্নে কৃষক প্রজা পার্টি বিভক্ত হয়। উভয় অংশের মধ্যে মৌলিক নীতিগত পার্থক্যও ছিল। শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশ যেখানে পার্টির মূল আদর্শ ও কর্মসূচি উর্ধ্বে তুলে ধরার পক্ষপাতী, সেখানে ফজলুল হকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নমনীয় ও আপোসমুখী। যাহোক, কংগ্রেসের কঠোর বিরোধিতা এবং নিজ দলের বিভক্তি হকের জন্য এক বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি করলে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি সরাসরি মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

১৬. Anderson to Linlithgow, 7 April 1937, *Bengal Governors Reports to Viceroy*, R/3/2/2, 3 in IOR

১৭. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ১৪২-১৪৭; Humayun Kabir, "Among The Bengal Peasants", *The Hindustan Times* (Magazine Section), 20 May 1945, 4.

১৮. *Star of India*, 1 September 1937, 1,8.

'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' এবং সাধারণ মানুষের জন্য 'ডাল-ভাতের' প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও ফজলুল হকের পক্ষে এর কোনটিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। প্রথমটির ব্যাপারে ১৯৩৮ সালে একটি কমিশন গঠিত হয় মাত্র, যা 'ফ্লাউড কমিশন'[১৯] নামে পরিচিত। আসলে ফজলুল হককে বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। তথাপি, কৃষক ও বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে হক মন্ত্রিসভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয় সেগুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯৩৮), কৃষিখাতক আইন (১৯৩৮), মহাজনী আইন (১৯৪০) এবং বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগ বিধি বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বণ্টন বিধি (১৯৩৯) অন্যতম।[২০] প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে জমিদারদের দেয় জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি, জমিদারদের জমিক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (pre-emption), সার্টিফিকেটপ্রথার মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ আদায় বা 'আবওয়াব' প্রভৃতি বাতিল করা হয়। কুড়ি বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মাত্র চার বছরের খাজনা পরিশোধ করে চাষীরা সিকস্তি জমি পুনরুদ্ধারের সুযোগ লাভ করে। বকেয়া খাজনার উপর ধার্যকৃত সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% স্থির করা হয়। এই আইনে জমিদারদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ও পর্যায়ের স্বত্বাধিকারীদের উপর খাজনাবৃদ্ধি দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। কৃষিখাতক আইনের আওতায় সমগ্র প্রদেশে বহুসংখ্যক 'ঋণসালিশী বোর্ড' গঠন করা হয়। বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশ করে সরকার সকল মহাজনের জন্য ট্রেড লাইসেন্স থাকা আবশ্যকীয় করে। এ ছাড়া, সুদের হারও স্থির করে দেয়া হয়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব আইন কৃষকদের এক বৃহৎ অংশকে "ভয়াবহ ঋণের বোঝা এবং মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও মহাজনদের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ আদায়" থেকে রেহাই দেয়।[২১] দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলার সরকারি চাকুরি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া দখলে। হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক চাকুরিতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে প্রণীত সম্প্রদায়ভিত্তিক বণ্টনবিধির অধীনে ৫০% পদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং এ নিয়োগনীতির যথার্থ প্রয়োগ তদারকির জন্য একজন বিশেষ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অধিকন্তু, মুসলমানদের প্রতি মন্ত্রিসভার সাধারণ পক্ষপাতিত্ব তো ছিলই।

মন্ত্রিসভার যাকিছু সাফল্য বা কৃতিত্ব ছিল, তা সংগঠনগতভাবে মুসলিম লীগ পুরোপুরি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। অন্য সবকিছু বাদ দিলেও একজন মুসলমানের (ফজলুল হক) নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন ছিল সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এক

১৯. এই কমিশন জমিদারদের ক্ষতিপূরণদানসহ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সুপারিশ করলেও দেশবিভাগের পূর্বে কোন মন্ত্রিসভার পক্ষেই তা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। একমাত্র ১৯৫০ সালে 'পূর্ব বাংলা প্রজাস্বত্ব অধিগ্রহণ আইন' পাশ করে সেটি কার্যকরী করা হয়।

২০. Shila Sen, *Muslim Politics In Bengal, 1937-1947*, (New Delhi 1976), 101-115; Muhammad Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal*, 1757-1947, (Dhaka 1978), 253-257

২১. Shila Sen, *Muslim Politics*,103

বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য। হক মন্ত্রিসভার প্রতি নিজ সম্প্রদায়ের বিপুল সমর্থনের পেছনে এই অনুভূতিও ক্রিয়াশীল ছিল। মন্ত্রিসভার সমর্থনে মুসলিম লীগ সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে, দ্বিধাবিভক্ত কৃষক প্রজা পার্টিতে শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী অংশ কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর চেষ্টা করলে মুসলমানদের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে এক তীব্র সাধারণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, যা কৃষক প্রজা পার্টির এই অংশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে খুবই প্রতিকূল ছিল। ফজলুল হক স্বয়ং তাঁর এক সময়কার রাজনৈতিক সহকারীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। পার্টিতে শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশকে তিনি 'কৃষক প্রজা পার্টির মুখোশে কংগ্রেস সমিতি' নামে আখ্যায়িত করে ঘোষণা দেন যে, এর সাথে তাঁর 'আসল' কৃষক প্রজা পার্টির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।[২২] স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় হক ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগারদের তরফ থেকে একই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল।

নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন গঠন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে লীগে যোগদান করার পর ফজলুল হক এই মর্মে একটি তত্ত্ব দেয়ার চেষ্টা করেন যে, বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থেই মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে হবে, কৃষক প্রজা পার্টিকেও সমর্থন করতে হবে। উল্লেখ্য, তিনি একই সাথে কৃষক প্রজা পার্টির নিজ অংশ এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ধরনের রাজনৈতিক দ্বৈতবাদ বিশেষকরে একটি আধুনিক ও গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের পক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হক নিজেও পরে স্বীকার করেন যে, এর ফলে তাঁর দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।[২৩] উপরন্তু ক্ষমতাসীন থেকেও তিনি নিজ সংগঠনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর কোন প্রয়াসই গ্রহণ করেন নি। সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের বিস্তৃতির স্বার্থে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতির সর্বোচ্চ সুযোগ গ্রহণ করেন। ফলে মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের হক সমর্থক কৃষ প্রজা পার্টির নেতা-কর্মীরা ক্রমান্বয়ে লীগে যোগদান করতে থাকে। শামসুদ্দিন ও আবদুল্লাহেল বাকীর নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির অপর অংশ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও কার্যত কংগ্রেসঘেঁষা একটি গ্রুপ হিসেবে আইনসভায় এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আইনসভার ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের তীব্র বিরোধিতার মোকাবেলা করতে গিয়ে[২৪] ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক অবস্থান অবলম্বন

২২. বঙ্গীয় সংসদে ফজলুল হকের বক্তৃতা, *Star of India*, 21 February 1939, 5

২৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফজলুল হকের উদ্বোধনী ভাষণ, ঐ, ১০ এপ্রিল ১৯৩৯, ৭।

২৪. উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যের বিরুদ্ধে একটি করে মোট দশটি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করে সারা প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

করেন। ১৯৩৭-১৯৪০ সময়কালে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন এবং লীগের জনসভা-কনফারেন্সে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি কংগ্রেসশাসিত ৭টি হিন্দুপ্রধান প্রদেশে মুসলমানদের উপর কথিত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় তাঁর সরকার কর্তৃক 'প্রতিশোধ' গ্রহণের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। নিজ নামে 'Muslim Sufferings Under Congress Rule' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মনোবল জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আসলে কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সাফল্য লাভ করায় ও ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে এককভাবে সরকার গঠন করায় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু আধিপত্যের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ বাংলায় ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন ব্যতীত ভারতের অন্য কোথাও সরকার গঠন করতে সমর্থ হয় নি। এ অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অধিকতর সংহতি গড়ে উঠে এবং মুসলিম লীগের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব' (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও অভিহিত) গৃহীত হলে মুসলিম লীগ একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক কর্মসূচি লাভ করে। পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং এর অগ্রগতি হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য।

এমনি অবস্থায় জিন্নাহর হাত ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকলে তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা শুরু করেন এবং এ নিয়ে শীঘ্রই ফজলুল হকের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং পরবর্তীকালে দু'জনের মধ্যে রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটে।

মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ফজলুল হকের কখনো সুসম্পর্ক ছিল না। সচরাচর নেতৃত্বের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও এক্ষেত্রে অবস্থা ছিল ভিন্নতর। ফজলুল হক সর্বভারতীয় পর্যায়ে নেতা হতে চান নি বা তিনি এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। তাঁর রাজনীতি মুখ্যত ছিল বাংলাকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাঁর মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে বাঙালি মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসলেও লীগের অবাঙালি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তাদের স্বার্থ ও ন্যায্য দাবিদাওয়া কখনো সুবিবেচনা লাভ করে নি। অবাঙালি নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর সম্পর্কের স্থায়িত্বের ব্যাপারে তিনি সবসময় সন্দিহান ছিলেন। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পরবর্তীকালে তাঁর নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সহযোগিতা প্রদান ও জিন্নাহর সম্মতি এবং কিছুদিন পরে হকের লীগে যোগদান উভয়ই ছিল পারস্পরিক সুবিধা লাভের একটি আঁতাত। বাংলায় মুসলিম লীগের বিস্তৃতি এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে এর মর্যাদা ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় জিন্নাহর জন্য যেমন ফজলুল হকের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল, তেমনি কংগ্রেসের বিরোধিতা মোকাবেলা করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হকেরও প্রয়োজন ছিল জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের সক্রিয় সমর্থন-সহযোগিতার। তাই বলে লীগে যোগদানের পর হক তাঁর কৃষক প্রজা পার্টিকে বিলুপ্ত

করেন নি, বরং নামসর্বস্ব হলেও এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি টিকিয়ে রেখেছিলেন। সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের উপর জিন্নাহর দলীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রচেষ্টা ফজলুল হকের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না, বরং একে তিনি তাঁদের 'অভ্যন্তরীণ' ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করতেন।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যুদ্ধের জন্য বেসামরিক সাহায্য-সহযোগিতা আদায় ও রাজনৈতিক সমর্থন লাভ সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জিন্নাহ ও মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে লীগের কতিপয় দাবির প্রতি বৃটিশ সরকারের সুবিবেচনা সাপেক্ষে সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমর্থন ও সহযোগিতা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে, মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ থেকে ফজলুল হক ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সেকান্দার হায়াত খান ছিলেন শর্তহীন সমর্থন দানের পক্ষে। তাঁরা মনে করতেন, নিঃশর্তভাবে যুদ্ধে সহযোগিতা দান অধিক পরিমাণে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে হক বঙ্গীয় আইনসভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে তা আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও হাসান ইস্পাহানীর নেতৃত্বে লীগ সংসদীয় দলের একটি অংশের ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। 'লীগ হাইকমান্ডের যেকোন সিদ্ধান্ত তিনি মেনে চলবেন' ফজলুল হক কর্তৃক এমন ঘোষণা দেয়ার পর প্রস্তাবটি আইনসভায় পাশ করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। যাহোক, ১৯৪০ সালের জুন মাসে জিন্নাহ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টায় লীগসদস্যদের কোন রকম সহযোগিতা দানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, যা বিশেষকরে বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী বলে ফজলুল হকের দৃঢ় ধারণা ছিল।[২৫] তিনি মনে করতেন, জিন্নাহ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলেই 'সিভিল গার্ডস' সহ যুদ্ধকালীন অন্যান্য সংস্থার চাকুরি হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। এমনকি জিন্নাহর অনুগত নাজিমুদ্দিনও এই বিধিনিষেধ আরোপ করাটা যথার্থ হয়েছে বলে মনে করতে পারেন নি। ফজলুল হক এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চলতে থাকেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কিছু করে ফেলারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যগণ এর বিরোধী ছিলেন। বিশেষকরে নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রবণতা তাঁকে খুবই ক্ষুব্ধ করে।

১৯৪১ সালের আদমশুমারি চলাকালে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের অঘোষিত প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা এমন চরমে পৌঁছে যে, খুলনা ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। হিন্দু মহাসভা ও বর্ণহিন্দুরা

২৫. Raghib Ahsan to Jinnah, 14 July 1940, *Quaid-i-Azam Papers*, F 204, 81-82, in National Archives of Pakistan, (hereafter NAP), Islamabad

নিজ সম্প্রদায়ের সপক্ষে প্রকৃত হারের চেয়ে বর্ধিত হারে জনসংখ্যা দেখানোর জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় পর্যায়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য জিন্নাহকে অনুরোধ করেও ফজলুল হক তাঁর কাছ থেকে আশানুরূপ কোন সাড়া পান নি। পক্ষান্তরে, খুলনা ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সারা প্রদেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সত্ত্বেও জিন্নাহ একই সময়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কর্মসূচি অনুযায়ী 'পাকিস্তান দিবস' উদযাপনের নির্দেশ দেন।[২৬] উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে ফজলুল হক বাংলায় 'পাকিস্তান দিবস' উদযাপন স্থগিত রাখার জন্য ইতিপূর্বে লীগ কমিটির বিভিন্ন শাখার প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন। এ সিদ্ধান্তের প্রতি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীরও সম্মতি ছিল।

প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলার ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে লীগ হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপজনিত অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ফজলুল হক কিছুদিন আগে থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছার কথা ভাবছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে জিন্নাহর সম্মতি পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করে তিনি এরকম একটি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু এতে জিন্নাহর সম্মতি পাওয়া যায় নি।[২৭]

ডিফেন্স কাউন্সিল ঘটনাকে কেন্দ্র করে হক-জিন্নাহ সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই ভাইসরয় 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল' (জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল) নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের পরিষদ গঠনের ঘোষণা দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাথে জনসাধারণকে সংশ্লিষ্ট করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করা। এতে জিন্নাহর পূর্বানুমতি ছাড়াই অন্যান্যের মধ্যে মুসলিম লীগ দলীয় তিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী সেকান্দার হায়াত খান (পাঞ্জাব), ফজলুল হক (বাংলা) ও সাদুল্লাহ (আসাম)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত হলে জিন্নাহ তাঁদেরকে কালবিলম্ব না করে এই কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন। অন্যথায় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। যদিও সেকান্দার হায়াত খান ও সাদুল্লাহ জিন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী পদত্যাগ করেন, কিন্তু ফজলুল হক তাঁর অবস্থানে অটল

২৬. Jinnah to Raghib Ahsan, 23 March 1941, *Quaid-i-Azam Papers*, F 204, 129, *আজাদ*, ২৫ মার্চ ১৯৪১, ৫।

২৭. Herbert to Linlithgow, 23 November 1940, *Governor's Fortnightly Reports* (hereafter GFR), L/P & J/5/147.

থাকার জন্য প্রথমে নিজ মন্ত্রিসভার সহকর্মী, ভাইসরয় ও গভর্নরের সহযোগিতা-সমর্থন লাভের জন্য সচেষ্ট হন।[২৮] কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনিও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই সাথে তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল থেকেও পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ৮ সেপ্টেম্বর লীগ সেক্রেটারি লিয়াকত আলী খানকে লেখা এক পত্রে ফজলুল হক লীগ সভাপতি জিন্নাহ কর্তৃক ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার এবং মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের প্রকৃত অবস্থা ও স্বার্থকে উপেক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। জিন্নাহকে একজন 'রাজনৈতিক একনায়ক' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, "আমাদের প্রদেশের বাইরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে বাংলা খুব একটা গুরুত্ব পায় না, অথচ ভারতের সমগ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছি আমরা... ।"[২৯] বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে লীগ হাইকমান্ডের অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি ঘোষণা করেন, "আমি বাংলার ৩৩ মিলিয়ন মুসলমানের উপর বাইরের কোন কর্তৃত্ব কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না।"[৩০]

হকের পত্র কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শুধু কলকাতার অবাঙালি মুসলমানরাই নয়, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সমগ্র নগরীতে হকবিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি জিন্নাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং হকের প্রতি কার্যত অনাস্থা জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা তাঁর বিরুদ্ধে হক সমর্থকদের বঙ্গীয় আইনসভায় একাধারে ৬টি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনে প্ররোচিত করে। জিন্নাহর জন্য এ ছিল এক বিশেষ মুহূর্ত, কেননা এ পর্যায়ে বাংলার দুইজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা হক ও সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন এবং দেশবিভাগের আগে তাঁরা আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি।

এদিকে ফজলুল হক জিন্নাহর বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি নেতৃস্থানীয় কারো সমর্থন-সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হন। সেকান্দার হায়াত খান শুরুতেই মাঠ থেকে সরে দাঁড়ান। ভাইসরয় এবং বাংলার গভর্নর দু'জনেই জিন্নাহর দৌরাত্ম্য খর্ব হোক এটা চেয়েছেন, তবে মুসলিম লীগের কোন রকম বিভক্তি তাঁদের কাম্য

২৮. Herbert to Linlithgow, 8 September 1941 , GFR, L/P&J/5/148; Linlithgow to Herbert,13 October 1941, *Formation of New Government Under Fazlul Huq, 1941-43,* L/P & J/8/651, Pt. 2 ,314-15.

২৯. Fazlul Huq to Liaquat Ali Khan, 8 September 1941 সম্পূর্ণ পত্রটি দ্রষ্টব্য, Zaidi (ed), *Jinnah-Ispahani Correspondence,* Appendix 11, 641-51.

৩০. ঐ।

ছিল না। তাই ফজলুল হককে উৎসাহ দানে তাঁরা বিরত থাকেন পাছে তিনি লীগকে ভেঙে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সবচেয়ে অবাঞ্ছিত অংশ বসু-গ্রুপকে সরকারে নিয়ে আসেন।[৩১] অধিকন্তু, সরকারি ইন্ধনে লীগের বিভক্তি ঘটলে তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জিন্নাহর হাতকেই শক্তিশালী করতে পারে এ আশঙ্কাও ছিল। ঐ সময় বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার বিভক্তি ঘটলে বৃটিশদের অনুগত স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের পক্ষে এমনকি ইউরোপীয় গ্রুপের সমর্থন নিয়েও সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট খুবই সন্দিহান ছিলেন। অতএব, তিনি একজন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর আপোসফর্মুলা অনুযায়ী[৩২] বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এক বৈঠকে ফজলুল হকের উপর আস্থা ব্যক্ত করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যদিকে ফজলুল হক লিয়াকত আলী খানকে লেখা আরেক পত্রে এই মর্মে মত ব্যক্ত করেন যে, তাঁর আগের চিঠির বক্তব্য দিয়ে তিনি কাউকে কটাক্ষ বা আহত করতে চান নি।[৩৩]

বস্তুত উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। গভর্নর হার্বার্টের আপোসফর্মুলায় তাঁদের সম্মতিজ্ঞাপন ছিল কৌশলগত চাল মাত্র। ফজলুল হক ইতিমধ্যে একটি বিকল্প কোয়ালিশন সরকার গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইনসভার বিভিন্ন গ্রুপের সাথে গোপন আলাপ-আলোচনায় অবতীর্ণ হন। ১ ডিসেম্বর ১৯৪১ হক মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণ 'তাঁকে নিজ অবস্থান সুদৃঢ়করণে আর কোন সুযোগ না দেয়ার' জন্য একযোগে পদত্যাগ করেন। তাছাড়া এরপর 'তাঁদেরকেই সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানো হবে' এমন ধারণাও তাঁরা লাভ করেছিলেন।[৩৪] দুদিন পর ফজলুল হক বিভিন্ন গ্রুপ, যেমন—ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তফসিলী হিন্দু, কৃষক প্রজা পার্টি (শামসুদ্দিন) ও নিজ অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৩৫] এরপর জিন্নাহ 'মারাত্মক অসদাচরণ ও প্রতারণার' দায়ে মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ফজলুল হককে বহিষ্কার করেন।

৩১. Herbert to Linlithgow, 8 October 1940, *GFR*, L/P&J/5/ 147, Herbert to Linlithgow, 13 July 1940, *ibid*; Herbert to Linlithgow, 10 July 1940, ঐ, Linlithgow to Herbert 12 October 1941, *Formation of New Government*

৩২. বিস্তারিত দ্র., Herbert to Linlithgow of 21 October 1941, *GFR*, L/P&J/5 148

৩৩. সম্পূর্ণ পত্র দ্র., Government of India, File 17/4/ 41, Poll (1). *Indian Annual Register 1941*, 11, 220

৩৪. Khwaja Nazimuddin to Jinnah, 14 December 1941, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 392, 76-78.

৩৫. ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর জে. সি. গুপ্তের কলকাতাস্থ বাসভবনে বিভিন্ন গ্রুপের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফজলুল হক এর নেতা এবং শরৎচন্দ্র বসু এর উপনেতা নির্বাচিত হন। আবুল মনসুর আহমদ, *রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ২২৫; Herbert to Linlithgow, 5 December 1941, *GFR*, L/P&J/ 5/148.

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা দুই পর্যায়ে গঠিত হয়—প্রথম পর্যায়ে তা আংশিকভাবে গঠিত হয় ১১ ডিসেম্বর, দ্বিতীয় পর্যায়ে আংশিকভাবে গঠিত হয় ১৮ ডিসেম্বর। ১ ডিসেম্বর ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটলেও খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং নব ঘোষিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির ডেপুটি লিডার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর গ্রেফতার এই দুই কারণে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন বিলম্বিত হয়।[৩৬] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার প্রতি নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে এর সর্বাত্মক বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতৃত্বের প্রশ্নে কোন্দলের ফলে ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ তাঁর অনুগামী ৮ জন আইনসভা-সদস্য সহ হকের দলে যোগ দেন। এর পর নাজিমুদ্দিনের জন্য আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকলো না। এমতাবস্থায় গভর্নর হার্বার্ট মুসলিম লীগ সহ সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি যুদ্ধকালীন 'কোয়ালিশন সরকার' গঠনের প্রয়াস পান, কিন্তু জিন্নাহর অসম্মতির কারণে[৩৭] তাঁকে তা পরিত্যাগ করতে হয়। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকায় যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হয়, তবু মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের দিনই ভারত প্রতিরক্ষা আইনে শরৎ বসুকে গ্রেফতার করা হয়। শুরুতেই এ ছিল হকের জন্য একটি প্রচণ্ড ধাক্কা। উল্লেখ্য যে, নতুন মন্ত্রিসভায় শরৎ বসুর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভের কথা ছিল।

হকের নতুন মন্ত্রিসভা পাঁচমিশালী দল নিয়ে গঠিত হয়। অবশ্য বঙ্গীয় কংগ্রেস এতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। ফজলুল হক ছাড়া মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য হলেন নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ (মুসলিম লীগ পক্ষ ত্যাগকারী), খান বাহাদুর আবদুল করিম (স্বতন্ত্র), খান বাহাদুর হাশেম আলী খান (হকের কৃষক প্রজা পার্টি), শামসুদ্দিন আহমদ (কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশের নেতা), শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা), সন্তোষকুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস), প্রমথনাথ ব্যানার্জী (ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (তফসিলী হিন্দু)। মন্ত্রিসভার এ গঠন দেখে গভর্নর জেনারেল লিনলিথগোর মন্তব্য ছিল : "এটি খুবই লক্ষণীয় বিষয় হবে যদি এ মন্ত্রিসভা নয় বা বারো মাস একত্রে থাকতে পারে।"[৩৮]

৩৬. Herbert to Linlithgow,20 December 1941, *GFR*, L/P&J/5/148; Governor of Bengal to Viceroy, *Telegram*, 9 December 1941, in Formation of New Government, 298.

৩৭. Governor of Bengal to Viceroy, *Telegram*, 9 December 1941, ঐ।

৩৮. Linlithgow to Amery, 22 December 1941, *Formation of New Government*, 280.

এ ধরনের একটি মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ফজলুল হক বঙ্গীয় রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন, আর তা হচ্ছে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান। স্পষ্টত এর দ্বারা তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর এতদিনকার অবস্থান থেকে সরে আসেন। নিঃসন্দেহে এ উদ্যোগ ছিল অতি বিলম্বিত। ইতিমধ্যে 'কায়েদে আজম'-এর উত্থান ঘটেছে; নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করেছে; 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' মুসলিম লীগের মূল আদর্শে পরিণত হয়েছে; বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে; হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটেছে; মুসলমান জনসাধারণের মনে সর্বভারতীয় মুসলমান সংহতির ধারণা ভিত্তিমূল লাভ করেছে এবং বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার বিভিন্ন কার্যকলাপ দ্বারা উপকৃত হয়ে মুসলিম লীগের সাথে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নকে সম্পর্কিত করে ফেলেছে।

লীগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফজলুল হককে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করতে হয়। এ সময়ে তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। শামসুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন অপর অংশের অবস্থাও দাঁড়ায় প্রায় অনুরূপ। আইনসভার বাইরে নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিরও ছিল না কোন অস্তিত্ব এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারভুক্ত বিভিন্ন গ্রুপকে একত্র রাখা।

মন্ত্রিসভায় অখণ্ড হিন্দুস্থানে বিশ্বাসী হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তর্ভুক্তি ছিল ফজলুল হকের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ১৯৩২ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (যার দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায় আইনসভায় পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আসন লাভ করে)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। হকের প্রথম মন্ত্রিসভার আমলে চাকুরিক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোটা নির্ধারণ, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল[৩৯] ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিল[৪০] -এর চরম বিরোধিতা এবং ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন সময়ে তাঁর ভূমিকা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তিনি একজন কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হন। এমনকি, মাত্র কয়েক মাস আগে স্বয়ং

৩৯. এই বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের অফিসারদের নিয়োগদান। বিলটি ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় পাশ হয়।

৪০. এই বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবল থেকে সমগ্র বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার মুক্ত করে একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপর তা ন্যস্ত করা এবং প্রস্তাবিত বোর্ডে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকার আইনগত বিধান করা। বর্ণহিন্দুদের বিরোধিতার কারণে বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে নি।

ফজলুল হক তাঁর সমালোচনায় মুখর ছিলেন। অতএব, মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তর্ভুক্তি হকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে মুসলিম লীগ নেতাদের চমৎকার সুযোগ প্রদান করে।

বাংলার মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাঁচ বছরকাল ক্ষমতা ভোগ করার পর গদিচ্যুত হওয়াটা মুসলিম লীগের জন্য খুবই উৎকণ্ঠার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আইনসভার ৪০ জনের মতো সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে লীগের প্রতি অনুগত থাকে। যেহেতু ফজলুল হক আইনসভার অভ্যন্তরে অধিকাংশের সমর্থন লাভে সক্ষম হন, সেহেতু লীগ নেতৃবৃন্দের সামনে একটি বিকল্প পথই খোলা ছিল আর তা হচ্ছে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে হাজির হওয়া।

তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে, ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে হকই হচ্ছেন মূল বাধা। তাই তাঁদের রণনীতি ছিল হককে নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। যেহেতু তাঁর রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার মূল অবলম্বন ছিল ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা, সেহেতু লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁর সমর্থনের সেই ঘাঁটিতেই আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়।

সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী টিম সমগ্র প্রদেশব্যাপী গণসংযোগে বের হয় এবং নতুন হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হওয়ার ৭ মাসের মধ্যে ৫০০ থেকে ৮০০ জনসভায় তাঁরা বক্তব্য রাখেন। এসব জনসভায় ফজলুল হক এবং তাঁর সহযোগীদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয় যে, "এসব মুসলমান কুইসলিং মুসলিম বাংলাকে মহাসভার হাতে তুলে দিয়েছে, যেভাবে মীর জাফর বাংলাকে ক্লাইভের হাতে তুলে দিয়েছিল।"[৪১] ফজলুল হককে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলা হয় যে, তিনি বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে ভারতীয় মুসলমানদের সংহতি বিনষ্ট করেছেন। যদিও ফজলুল হকের নতুন মন্ত্রিসভায় হিন্দু মহাসভা থেকে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তথাপি মুসলিম লীগ মহল কর্তৃক একে 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ফজলুল হককে হেয় প্রতিপন্ন করা। মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করে মুসলিম লীগের মুখপত্র *স্টার অব ইন্ডিয়া* এক সম্পাদকীয়তে লিখে :

> বাংলায় মহাসভা শাসনের কুফল ফলা শুরু হয়েছে। মুসলমানদের নিজেদের হাতে এর প্রতিকার নিহিত। সর্বত্র তাদের অবশ্যই মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং বর্তমান মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হওয়া যাবে না বলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।[৪২]

৪১. Raghib Ahsan to Jinnah, 27 March 1942, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 204, 203-4

৪২. *Star of India*, 26 January 1942, 2.

এভাবে মুসলিম লীগ সমর্থক *দৈনিক আজাদ, স্টার অব ইন্ডিয়া, দি মর্নিং নিউজ* ইত্যাদি পত্রিকা হকবিরোধী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। এর সাথে যুক্ত হয় সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উদ্দীপ্ত বাংলার মুসলমান ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়। হকের বিরোধিতায় জিন্নাহও তাঁর সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে এসে দাঁড়ান। ১৯৪২ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা উপলক্ষে পূর্ব বাংলার সিরাজগঞ্জ শহরে তাঁর আগমন কার্যত হকবিরোধী আন্দোলনকে আরো চাঙ্গা করে তোলে। সর্বভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি বলেন :

> বাঙালি মুসলমানদের উচিত লীগের নীতি ও কর্মসূচি অন্ধভাবে অনুসরণ করা…ভারতের অন্য সব এলাকার মুসলমানদের থেকে বাঙালি মুসলমানরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না এবং লাহোর প্রস্তাবে যে পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত হলে তা দ্বারা বাংলা ও পাঞ্জাবই অধিকতর লাভবান হবে।[৪৩]

সোহরাওয়ার্দীর অত্যন্ত দক্ষ সাংগঠনিক নেতৃত্বাধীনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ তার কর্মতৎপরতা বহুমাত্রায় বৃদ্ধি করে। লীগের সদস্য সংগ্রহের জন্য এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বহুল প্রচারের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মফস্বল শহরে লীগ, পাকিস্তান ও ছাত্রদের নামে বহুসংখ্যক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা বিভিন্ন জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

মুসলিম লীগের প্রচার-প্রচারণায় শঙ্কিত হয়ে ফজলুল হকও তাঁর কতিপয় সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকা সফরে বের হন এবং তাঁর নতুন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি জনসমর্থন লাভের নিষ্ফল প্রয়াস পান। মুসলমান ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়, যাদেরকে তিনি এতদিন সযত্নে প্রতিপালন করেছেন, তারা তাঁর বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শন করে এবং 'গাদ্দার মুর্দাবাদ' (বিশ্বাসঘাতক নিপাত যাক) ধ্বনি তোলে। ফজলুল হক যে অতি দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার চার মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে নাটোরে অনুষ্ঠিত প্রথম উপনির্বাচনের ফলাফলে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়ী প্রার্থীর ১০৮৪৩ ভোটের বিপরীতে তাঁর মনোনীত প্রার্থী মাত্র ৮৪০ ভোট পেয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

এ সত্ত্বেও ফজলুল হক তাঁর নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগুতে থাকেন। ১৯৪২ সালের জুন মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের একত্রে বসবাস

---

৪৩. ঐ, 13 February 1942, 8.

করতে হবে, ডুবতে হবে, সাঁতরাতে হবে এবং প্রয়োজনে মাতৃভূমির মঙ্গলে একই সঙ্গে জীবনদান করতে হবে।"[৪৪] পাটনা (বিহার) থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *দি সার্চলাইট* এই মর্মে সংবাদ পরিবেশন করে যে, বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক 'বঙ্গস্থান আন্দোলন' শুরু করার কথা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন।[৪৫] রিপোর্টে এও উল্লেখ করা হয় যে, বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এ পরিকল্পনা সর্বাত্মকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রস্তাবিত 'বঙ্গস্থান রাষ্ট্রে' পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা—এ দুটো স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটের বিধান থাকবে, যার প্রথমটিতে মুসলমান এবং দ্বিতীয়টিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।

যাহোক, ফজলুল হকের আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রতি মুসলমানদের জনসমর্থন পুনরুদ্ধার। এ লক্ষ্যে তিনি 'প্রগতিশীল মুসলিম লীগ' নামে লীগের একটি বিকল্প সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার মূল আদর্শ হবে 'সর্বক্ষেত্রে ইসলাম, তবে একই সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ'।[৪৬] ১৯৪২ সালের ২১ জুন তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে পত্র লিখে জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ তুলে ধরে প্রস্তাবিত প্রগতিশীল মুসলিম লীগ গঠনে তাঁকে সহযোগিতা দানের অনুরোধ জানান। চিঠিতে তিনি বলেন, "রাজনৈতিকভাবে আমাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য জিন্নাহর সমর্থকরা বাংলায় মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে খুবই তৎপর। আমি মনে করি, যে মুসলিম লীগ সংগঠনে আমি নেই সে ধরনের কোন সংগঠন দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের আদৌ কোন স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে না।"[৪৭] এ ছিল তাঁর অরণ্যে রোদন মাত্র। বাঙালি মুসলমানরা ইতিমধ্যে লীগের সর্বভারতীয় মুসলমান সংহতির আদর্শে দীক্ষিত হয়। সুতরাং প্রস্তাবিত প্রগতিশীল মুসলিম লীগ গঠনের ব্যাপারে হক আর অগ্রসর হন নি। এটি একটি 'কাগুজে পরিকল্পনা'ই থেকে যায়। মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে আর একটি মুসলিম লীগ গঠনের না ছিল অনুকূল পরিস্থিতি, না ছিলেন তিনি একজন দক্ষ সংগঠক।

বস্তুত ফজলুল হক একটি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হন। যদিও তাঁর মন্ত্রিসভার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, তবু এটি তাঁর সহকর্মীদের অনেকের, বিশেষকরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হৃদয়গত উপলব্ধির ব্যাপার ছিল না। মুখার্জী অধিকতর উৎসাহী ছিলেন 'হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়'।[৪৮] পাকিস্তান সম্বন্ধে মুসলিম লীগের প্রচার-

৪৪. Shyamoli Ghosh, "Fazlul Huq and Muslim Politics in Pre Partition Bengal," *International Studies*, July-December, 13 : 3(1974), 457.

৪৫. Quoted in *Star of India* ,11 June 1942. *Jinnah- Ispahani Correspondence*, 1.

৪৬. Zaidi (ed.), Appendix V111: *Fazlul Huq's Move*, 668.

৪৭. ঐ, 670.

৪৮. Herbert to Linlithgow, 21 April 1942, *GFR*, L/P & J/5/149.

প্রচারণা ও ক্রীপস্ পরিকল্পনায় (১৯৪২) পাকিস্তানের প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতির বিরুদ্ধে ১০ মে হিন্দু মহাসভা সভা-সমাবেশের মাধ্যমে 'পাকিস্তানবিরোধী দিবস' পালন করে। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা 'মুসলমানদের দারুণভাবে আহত করে এবং লীগ মহল কর্তৃক এর দায়-দায়িত্ব ফজলুল হকের উপর বর্তানো হয়'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিমান হামলা থেকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বেসামরিক লোকজনদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়, যা সংক্ষেপে এ. আর. পি. নামে অভিহিত ছিল। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সময় প্রণীত চাকুরিতে নিয়োগে 'সাম্প্রদায়িক বণ্টনবিধি'র আওতায় মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ পদ নির্দিষ্ট করা হলেও নতুন মন্ত্রিসভার আমলে শতকরা ৫ ভাগ মুসলমানও এ. আর. পির নিয়োগ লাভ করে নি।[৪৯] চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই দুরবস্থা হকবিরোধী প্রচারণায় মুসলিম লীগের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ছিল।

বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে ফজলুল হক সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাঁর হিন্দু সহকর্মীদের মনমানসিকতায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। মফস্বল এলাকা সফরে এসে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, নতুন উদ্যোগের প্রতি স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতিক্রিয়া খুবই বিরূপ। তিনি এক পর্যায়ে জিন্নাহর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে আগ্রহী হন। কিন্তু যত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই নিপতিত হোন না কেন, তিনি কিছুতেই বাংলার উপর সকল কর্তৃত্ব জিন্নাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে 'আত্মসমর্পণ' করার পক্ষপাতী ছিলেন না।[৫০]

হকবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বাংলার গভর্নর জন হার্বার্ট এবং মুখ্য সচিব থেকে মহকুমা অফিসার পর্যন্ত সর্বস্তরের আমলাদের আনুকূল্য লাভ করেন।[৫১] সচিবালয় থেকে ছাড় দেয়ার সাথে সাথেই সরকারি গোপন সার্কুলার ও নির্দেশাবলী সোহরাওয়ার্দীর হাতে পৌঁছে যেতো।[৫২] ফজলুল হকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও হার্বার্ট মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগদান থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে, মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি 'জাতীয় সরকার' গঠনের জন্য তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। ১১টি দপ্তর থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৮ জন (পরবর্তীকালে ৭ জন) মন্ত্রী ও ১ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়ে হককে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। এক পর্যায়ে তিনি হার্বার্টের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের অভিযোগ তোলেন, যা ভিত্তিহীন ছিল না। ভাইসরয় লিনলিথগোকে লেখা এক পত্রে তিনি

৪৯ Fazlul Huq to Herbert, 2 August 1942, *Formation of New Government*, Part 1, 15-21; *Star of India*, 23 July 1942, 5.

৫০. Fazlul Huq to Jinnah, 5 February 1943, in *Star of India*, 17 February 1943, 1,2, Huq's reply to Jinnah, ঐ, 18 February 1943, 3.

৫১. বিস্তারিত দ্র., Shila Sen, *Muslim Politics*, 151-65.

৫২. Kamruddin Ahmad, *A Social History of Bengal*, (Dacca 1970), 56

বলেন, "... আমার গভর্নর এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন যা আমাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করছে এবং আমার পক্ষে বিধিসম্মতভাবে শাসনকাজ পরিচালনা অসম্ভব করে তুলেছে।"[৫৩] এমনকি লিনলিথগোর মনেও এ স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হার্বার্ট খানিকটা মাত্রা অতিক্রম করেছেন এবং ফজলুল হকের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন নি, যদিও ফজলুল হক যেভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তা লিনলিথগোর কাছেও সন্তোষজনক ছিল না।[৫৪]

স্পষ্টত হার্বার্ট ও মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠে। বঙ্গীয় আইনসভার অভ্যন্তরে ইউরোপীয় গ্রুপ সরকারকে সমর্থনের চিরাচরিত নীতি পরিহার করে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলায়। অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ হার্বার্ট ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করেন, যা ছিল তাঁকে বরখাস্ত করার শামিল।[৫৫] ঘটনাপ্রবাহের যেকোন পর্যবেক্ষকের কাছে গভর্নরের এ পদক্ষেপ আকস্মিক মনে হবে না। কেননা, হকের এ মন্ত্রিসভার শুরু থেকেই তিনি প্রায়শ ৯৩ ধারা আরোপ বা এক ধরনের 'শো-ডাউন' কিংবা বরখাস্তের কথা বলে আসছিলেন। গভর্নর জেনারেলের কাছে হকের বিরুদ্ধে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হার্বার্ট উল্লেখ করেন যে, সে সময়ে হক মন্ত্রিসভা বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

এ কথা ঠিক যে, ফজলুল হক ক্রমবর্ধমান মাত্রায় নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার আমলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীদের কাছে সরকারমনোনীত প্রার্থীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ও জামানত হারায়। আইনসভার ভিতরে সরকারি দল প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সদস্যরা পক্ষ পরিবর্তন করে লীগে যোগদান শুরু করে। অবশেষে ফজলুল হককে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়, কেননা তখন পর্যন্ত তাঁর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন বহাল ছিল।

বাংলাকে ঘিরে ফজলুল হকের যে রাজনৈতিক স্বপ্ন ছিল তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির ফলে সে স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে বলে তিনি মনে করেন। আসলে বহু আগেই কৃষক প্রজা পার্টির

৫৩. Fazlul Huq to Linlithgow, Note (n.d.), October 1942

৫৪. Linlithgow to Amery. 10 October 1942, *Formation of New Government*, Part 2, 219, Viceroy to Secretary of State for India, *Telegram*, 8 October 1942, ঐ, 243.

৫৫. *Star of India*, 29 March 1943, 1; A K Fazlul Huq, *Bengal To-day*, (Calcutta 1944); Fazlul Huq to Secretary of State for India, *Telegram*, 10 April 1943, *Formation of New Government*, Part 1, 153-55 Linlithgow wrote to Herbert. ".. I would not like you to think that I am at all happy at the way that this matter has been handled . I am gravely disturbed, even now, at the possibility that we may have trouble in the House of Commons over his resignation... the situation stands. .as follows: that Huq was confronted by you with a draft of a letter or resignation, not, it is true, on Government House paper, but nonetheless a draft of a letter of resignation ... "Linlithgow to Herbert, 2 April 1943, ঐ, 135-36. Herbert replied: "... what I write now is by way of explanation ...If Huq managed to scrape through the session he would never have resigned · I must admit that I urged him pretty firmly (to resign) though "compulsion" is a quite unfair description... " Herbert to Linlithgow, 7 April 1943, *GFR*, L/P & J/ 5/150

দ্বিধাবিভক্তি ও আনুষ্ঠানিকভাবে ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদান করার সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠে। যে সময় লীগের অগ্রযাত্রা হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য, সে সময়ে এ দলে টিকে থাকতে না পারায় এই পরিণতি ঘটাই স্বাভাবিক। অস্বীকার করা যাবে না যে, ১৯৩৭-১৯৪৩ কালপর্বে তাঁকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একজন বড় মাপের নেতার বহু গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু তাঁর বড় দুর্বলতা এই যে, তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন না। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভ্রান্তি হলো, কৃষক প্রজা পার্টিকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে না তুলে তিনি নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করেছেন এবং কলকাতায় বসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন ও ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়াসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা মাত্র ৪৭৪ দিন ক্ষমতায় থাকে. এ সময়ে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে কাটাতে হয়েছে মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতার মুখে। ফলে, তাঁর মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি। অন্যদিকে মুসলিম লীগ পুরোদমে সক্রিয় হয়ে দলের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫)

ফজলুল হকের পদত্যাগের সময় গভর্নর কর্তৃক একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের ধারণা দেয়া হলেও কিছুদিনের মধ্যে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয় এবং ২৪ এপ্রিল তিনি ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর সদস্যরা হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন (মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বেসামরিক সরবরাহ), তমিজুদ্দিন খান (শিক্ষা), খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন (কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন), নবাব মোশাররফ হোসেন (বিচার ও ব্যবস্থাপনা), খাজা শাহাবুদ্দিন (বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প), খান বাহাদুর জালালউদ্দিন আহম্মদ (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন), তুলসীচরণ গোস্বামী (অর্থ), বরদা প্রসন্ন পাইন (পূর্ত ও যানবাহন), তারকনাথ মুখার্জী (রাজস্ব ও রিলিফ), প্রেমহরি বর্মা (বন ও আবগারি), পুলিনবিহারী মল্লিক (প্রচার) ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (সমবায়,ঋণ ও পল্লীদারিদ্র্য)।

মন্ত্রিসভায় ৬ জন হিন্দু সদস্য (৩ জন বর্ণহিন্দু ও ৩ জন তফসিলী হিন্দু) অন্তর্ভুক্ত হন সত্যি, কিন্তু এর দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ঘটে নি। কেননা, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোন অংশই মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নি। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফজলুল হকের ক্ষমতাচ্যুতির প্রাক্কালে মুসলমান সদস্যগণ পক্ষত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে যোগ দিতে থাকে। হক মন্ত্রিসভার পতন ও নাজিমুদ্দিনকে

সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর সাথে সাথে এরা অধিক সংখ্যায় লীগে যোগদান করে। ফলে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সদস্যসংখ্যা রাতারাতি ৪০ থেকে ৭৯ জনে উন্নীত হয়। নাজিমুদ্দিনের পেছনে ছিল ইউরোপীয় গ্রুপের পূর্ণ সমর্থন। এ ছাড়া তিনি তফসিলী হিন্দুদের একটি অংশ, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও অন্য আরো কিছু সদস্যের সমর্থন লাভে সক্ষম হন, গভর্নর হার্বার্টের সমর্থন-সহযোগিতা তো ছিলই। ফজলুল হককে যেখানে মাত্র ৮ জন (পরবর্তীকালে ৭ জন) মন্ত্রী এবং ১ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়, সেখানে নাজিমুদ্দিনকে শুরুতেই ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন এবং ১৭ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগ করতে অনুমতি দেয়া হয়।

মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব নিয়ে আঘোষিত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একক সংগঠক এবং হকবিরোধী আন্দোলনের মূল নায়ক হওয়া সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী স্থান লাভ করেন নাজিমুদ্দিনের দু'জন ডেপুটির মধ্যে একজন হিসেবে।[৫৬] সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিন্নাহ তাঁকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৪৩ সালে লীগ হাইকমান্ড এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করে যে, মন্ত্রী বা পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিদের কেউ একই সাথে লীগের সাংগঠনিক কোন পদে আসীন থাকতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্ত সোহরাওয়ার্দীকে খুবই বেকায়দায় ফেলে, কেননা তিনি মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ কথা হয়তো বলা যেতে পারে যে, লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দলীয় ও পার্লামেন্টারি নেতৃত্বের পৃথকীকরণের জন্য এ নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এটা মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করা।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীপদে বহাল থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও দলের সেক্রেটারির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদটি যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। লীগের পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব ছিল খাজাদের করায়ত্ত। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এককভাবে ঢাকা নবাব পরিবারের ১০ জন সদস্য[৫৭] বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় তাঁরই সহোদর খাজা শাহাবুদ্দিনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধু পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব কেন, সংগঠনের উপরও তাঁদের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। তাঁদেরই সমর্থক ও তৎকালীন একমাত্র বাংলা দৈনিক *আজাদ*-এর মালিক মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কলকাতায় বসবাসরত ও জিন্নাহর একান্ত

৫৬. অন্যজন ছিলেন খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন।

৫৭. এঁরা হচ্ছেন : নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, নবাবজাদা খাজা নসরুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, ফরহাত শাহাবুদ্দিন (শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী), খাজা নূরউদ্দিন, সৈয়দ আবদুল হাফিজ, সৈয়দ আবদুস সেলিম, সৈয়দ আবদুস শহীদ ও খাজা ইসমাইল।

বিশ্বস্ত অবাঙালি ইস্পাহানী পরিবারের হাতে ন্যস্ত ছিল লীগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণভার। বাংলার অন্যতম বৃহৎ জমিদারির মালিক হওয়ার সুবাদে সমগ্র প্রদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল তাঁদের সমর্থক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁদের প্রতি ছিল লীগ হাইকমান্ডের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা। তাই সোহরাওয়ার্দীর জন্য একমাত্র পথ খোলা ছিল সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তাঁর স্থলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদে তাঁর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) যাতে নির্বাচিত হন তা নিশ্চিত করেন।

বর্ধমানের (পশ্চিম বাংলা) খ্যাতিমান কংগ্রেসী মুসলিম নেতা আবুল কাসেমের পুত্র আবুল হাশিম যেমন ছিলেন সুবক্তা তেমনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। রাজনৈতিক বিশ্বাসে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ও প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। সোহরাওয়ার্দীর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে তিনি শুরুতেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে একটি ব্যাপক গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। লীগের সকল জেলা ও মহকুমা শাখার জন্য পার্টি-অফিসের ব্যবস্থা করতে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। লীগ তহবিলকে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। প্রত্যেক শাখাকে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বলা হয়। পূর্ব বাংলায় লীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৪৪ সালে ঢাকায় একটি স্থায়ী পার্টি-অফিস স্থাপন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মডেলে দলের জন্য বেশ কিছু সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োগ করা হয়। তাঁরই সুপারিশক্রমে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিল সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা খাজাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। এসবের মধ্যে রয়েছে (ক) লোকসংখ্যা নির্বিশেষে প্রত্যেক জেলার জন্য লীগ কাউন্সিলে ২৩ জন সদস্যের কোটা নির্ধারণ এবং (খ) ওয়ার্কিং কমিটিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ১০ জন থেকে কমিয়ে ৪ জন করা।

আবুল হাশিম কর্তৃক সূচিত লীগের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া এবং এর গণভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ খাজানেতৃত্বকে শঙ্কিত করে তোলে। যে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ ছিল আহসান মঞ্জিলের নবাব পরিবারের করায়ত্ত, ১৯৪৪ সালে তার নিয়ন্ত্রণ অন্যদের হাতে চলে যায়। আবুল হাশিম লীগ পার্লামেন্টারি গ্রুপের উপর দলের প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলে তাঁর সঙ্গে খাজা-গ্রুপের স্পষ্ট বিরোধ দেখা দেয়। পার্লামেন্টারি নেতৃত্ব দলকে উপেক্ষা করে সমগ্র প্রদেশ জুড়ে তাঁদের অনুগত রাজনৈতিক দোসরদের মাধ্যমে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখছে বলে হাশিম অভিযোগ তোলেন। আইনসভার অভ্যন্তরে দলত্যাগী সদস্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটসহ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ নেয়া হলে পার্লামেন্টারি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বাধা আসে। তাঁরা গদি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দলত্যাগী

সদস্যদের নানা সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে পুনরায় দলে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৫৮] হাশিম আরো অভিযোগ করেন যে, প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের জন্য রশিদবই ছাপাতে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার কাছ থেকে এক রিম কাগজ পর্যন্ত বরাদ্দ পাওয়া যায় নি।

সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের তৎপরতা মোকাবেলায় এক সময় খাজা-গ্রুপ কর্তৃক পূর্ব বাংলা-পশ্চিম বাংলা ইস্যু তোলা হয় এবং হাশিমের কর্মী-সংগঠকদের 'কমিউনিস্ট' বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রচারণা চালানো হয়।[৫৯] উল্লেখ্য, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম উভয়েরই জন্মস্থান হলো পশ্চিম বাংলা। অন্যদিকে নাজিমুদ্দিন ও খাজা-গ্রুপের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন পূর্ব বাংলার বাসিন্দা। অন্য একটি বাস্তব ব্যাপার ছিল এই যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিমের প্রগতিশীল নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা তরুণ সম্প্রদায়কে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৬০] তবে অধিকাংশেরই এ ধরনের কোন সংশ্রব ছিল না। আসলে, সোহরাওয়ার্দী-হাশিম এবং খাজা-গ্রুপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা একই গোষ্ঠীর মধ্যে নিছক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল না, এ ছিল উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সামন্ত শাসক শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অন্য কথায় জনসাধারণ ও প্রাসাদের দ্বন্দ্ব।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে সবচেয়ে বড় যে সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় তা হচ্ছে বাংলার দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এক পর্যায়ে জাপানীরা বার্মা দখল করে চট্টগ্রামের উপকূলে এসে হাজির হলে বাংলার পতন অত্যাসন্ন বলে মনে করা হয়। শত্রুপক্ষকে সর্বাত্মক অসুবিধার মধ্যে ফেলার বৃটিশ নীতি অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চল থেকে খাদ্য মজুত অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়; নৌ-যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করে দেয়ার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে দেশীয় নৌকা ধ্বংস করা হয় এবং বহু স্টীমার ও রেলগাড়ি বাংলার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে খাদ্যসামগ্রীর চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। উপরন্তু যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মূলে ছিল এসব কারণ। এ দুর্ভিক্ষের সময় বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে কলকাতা শহরে লঙ্গরখানা খুলে এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই পদক্ষেপ কলকাতা শহরে বহু জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলেও সারা বাংলায় ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে।

৫৮. *Review of Muslim League Organisation in Bengal*, submitted by the Secretary (Abul Hashim) of the Bengal Provincial Muslim League to the Secretary of the All-India Muslim League (Strictly Confidential), 30 July 1944, *Shamsul Hasan Collection: Bengal*, Vol. 1, File 23(micro-film) in NAP.

৫৯. Shahid Ahmed to Liaquat Ali Khan, 17 May 1945, File *BPML*, Vol. 42, in Archives of Freedom Movement, Karachi

৬০. যেমন, মোহাম্মদ তোয়াহা (নোয়াখালী), সরদার ফজলুল করিম (বরিশাল), শামসুদ্দিন (ঢাকা), আবদুল হক (যশোর)।

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা ভিন্ন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা তার দু'বছরের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি শিক্ষাবোর্ড গঠনের প্রস্তাবসহ যে 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সময় উত্থাপন করা হয়েছিল, তা আবার নতুন করে উত্থাপন করা হয়। কিন্তু আগের মতো হিন্দু সদস্যদের বিরোধিতার কারণে সেটি পাশ করা সম্ভব হয় নি।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নানা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। নাজিমুদ্দিন তাঁর সহোদর খাজা শাহাবুদ্দিনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করায় মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[৬১] মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ ছিল দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির। ব্যক্তিগতভাবে খাজা নাজিমুদ্দিন দুর্নীতিমুক্ত হলেও মন্ত্রিসভার অনেকের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠে। এও বলা হয় যে, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলায় যখন অগণিত লোক মৃত্যুবরণ করছিল, তখন মন্ত্রীরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও সমর্থকদের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করছিলেন। তাঁদেরই যোগসাজশে অনেকে প্রচুর অবৈধ টাকার মালিক হয়। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় খাজা শাহাবুদ্দিনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান শালিমার এন্ড কোং। ইস্পাহানী কোম্পানি লাভ করে খাদ্য সংগ্রহের সোল এজেন্সি। এমনকি, মন্ত্রীদের স্ত্রীরা পর্যন্ত রাতারাতি সরকারি ঠিকাদার বনে যান।[৬২] এসব কারণে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা এর নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে, এই মন্ত্রিসভার আমলে সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ছাড়াও বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি হিন্দু সদস্যদের আরো বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মন্ত্রিসভার প্রতি হিন্দু সদস্যদের যে সমর্থন ছিল তাও প্রত্যাহৃত হতে থাকে। এমনি এক অবস্থায় ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাজেটবরাদ্দের উপর এক ভোটাভুটিতে ২০ জন সরকারসমর্থক সদস্য বিরোধী শিবিরে যোগ দিলে ১০৬-৯৭ ভোটে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অবশ্য বিরোধীরা দলত্যাগীদের উৎকোচ দিয়ে বিরোধী দলভুক্ত করেছে বলে নাজিমুদ্দিনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।[৬৩]

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতনের পর এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাসহ ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসনাধীনে এটি ছিল সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনে ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভায় প্রাদেশিক

৬১. Raghib Ahsan to Jinnah, 11 July 1944, *Quaid-i-Azam Papers*, F.1103 (micro-film) , 344-47 in NAP.

৬২. Shahid Ahmed to Liaquat Ali Khan, 17 May 1945; *Confidential Report* (hereafter *CR*), lst half, April 1945, *GFR*, L/P & J/ 5/152.

৬৩. *Casey's Personal Diary*, Photo Eur. 48/3 , 33-38 in *IOR*. *Star of India*, 29 March 1945 , 2; also *CR* ,2nd half, March 1945, *GFR*, L/P&J/ 5/152, 182-83

মুসলিম লীগ ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ সাফল্যের মূল নায়ক ছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম। নির্বাচনের পরপরই সোহরাওয়ার্দী সর্বসম্মতিক্রমে লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে দলের প্রার্থী মনোনয়ন সংস্থা লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের নির্বাচনে নাজিমুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর কাছে হেরে গিয়ে পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালে সোহরাওয়ার্দীর পার্লামেন্টারি নেতৃত্বলাভ নিশ্চিত হয়ে যায়।[৬৪] ২ এপ্রিল বাংলার নতুন গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলের প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন কোন সমস্যা ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নেন। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় ১৯৩৭ সাল থেকে প্রদেশের শাসনকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার সময় সে সুযোগ তারা পেয়েছিল বটে, কিন্তু এ মন্ত্রিসভা ১৬ মাসের বেশি স্থায়ী হয় নি এবং এ কারণে বাংলার বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এ অবস্থা এক সময় বাংলার সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে ভেবে[৬৫] তাঁরা একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন যাতে করে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের সামগ্রিক কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করতে পারে।[৬৬] লীগের মধ্যে খাজা-গ্রুপ এ উদ্যোগ সমর্থন করে নি।[৬৭]

কোয়ালিশনের বিষয়টি নিয়ে বঙ্গীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ছাড়াও সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সম্মতিলাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, সোহরাওয়ার্দীর এ উদ্যোগ সফল হতে পারে নি। মন্ত্রিসভায় উভয় দলের আসনসংখ্যা নির্ধারণ, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বণ্টন ইত্যাদি প্রশ্নে আলোচনা ভেঙে যায় বলে প্রতীয়মান হলেও[৬৮] এর মূলে ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাব।[৬৯] এঁদের কেউ চান নি সর্বভারতীয় পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পূর্বে

৬৪. বিস্তারিত দ্র., Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 194-207.

৬৫. Abul Hashim, *In Retrospection*, (Dhaka 1974), 108

৬৬. Suhrawardy to Kiran Shankar Roy, 11 April 1946, *Star of India*, 23 April 1946, 3.

৬৭. Sir F. Burrows to Lord Wavell, 25 April 1946, *GFR*, L/P & J/5/153, 162-64; আরো দ্রষ্টব্য, *মিল্লাত*, ২৩ এপ্রিল ১৯৬৪, ৩।

৬৮. Burrows to Lord Wavell, 25 April 1946; also Kiran Shankar Roy's statement in *Star of India*, 22 April 1946, 3-4

৬৯. Governor of Bengal to Viceroy, *Inward Telegram*, 13 April 1946; *Franchise: Elections In Bengal 1946* (main file), L/P&J/8/475 in *IOR*; Suhrawardy's statement in *Star of India*, 23 April 1946, 4.

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে বাংলার উভয় সম্প্রদায় কোন ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হোক।

অবশেষে ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী ৭ জন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এবং ১ জন তফসিলী হিন্দু সদস্য নিয়ে মোট ৮ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হলেন সোহরাওয়ার্দী (মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), আহমদ হোসাইন (কৃষি), খান বাহাদুর আবদুল গোফরান (বেসামরিক সরবরাহ), খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী (অর্থ, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), খান বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসাইন (শিক্ষা ও রাজস্ব), খান বাহাদুর এ. এফ. এম. আবদুর রহমান (সমবায় ও সেচ), শামসুদ্দিন আহমদ (বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প) এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বিচার, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ)।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় চার জন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং চার জন খান বাহাদুর খেতাবধারী অন্তর্ভুক্ত হলেও মূলত এই মন্ত্রিসভা মধ্যবিত্ত স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৩৭ সালের পর প্রথমবারের মতো বাংলায় এই একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, যাতে ঢাকার নবাব পরিবারের কেউ অন্তর্ভুক্ত হন নি। এমনকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সমর্থকদের কেউই এ মন্ত্রিসভায় স্থান পান নি। মন্ত্রিসভার সবাই ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী। এখানেই শেষ নয়, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচনে মুসলিম লীগের কর্পোরেশন শাখা জিন্নাহর একান্ত বিশ্বস্ত ও অন্ধ অনুসারী হাসান ইস্পাহানীকে মনোনয়ন দান করলে নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে সোহরাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপে এই মনোনয়ন পরিবর্তন করে সেখানে তাঁরই সমর্থক মোহাম্মদ ওসমানকে মনোনয়ন দেয়া হয় এবং তিনি নির্বাচিত হন।

খাজাসমর্থকদের মালিকানাধীন তিনটি প্রভাবশালী দৈনিক *আজাদ, স্টার অব ইন্ডিয়া* এবং *দি মর্নিং নিউজ* শুরু থেকেই মন্ত্রিসভার প্রতি শীতল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং কখনো কখনো প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। মন্ত্রিসভার সমর্থনে জনমত গঠনে একমাত্র আবুল হাশিমের সাপ্তাহিক *মিল্লাত* কিছুতেই প্রয়োজনোপযোগী ছিল না। মন্ত্রিসভা গঠনকালে সোহরাওয়ার্দী এই প্রত্যাশায় কিছু আসন খালি রেখে দেন যে, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু এ রকম কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় নি। অতএব তিনি খাজা-গ্রুপের প্রতি নমনীয় হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যদিকে নাজিমুদ্দিন যখন দেখলেন যে, কিছুতেই জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ প্রদান করছেন না, তখন তিনি সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁর সমর্থকদের ব্যবধান আর যেন বেড়ে না যায় সে ব্যাপারে প্রভাব খাটাতে থাকেন। ফলে ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে সোহরাওয়ার্দী তাঁর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করলে এতে অন্যান্যের মধ্যে খাজা-গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য ও প্রাক্তন চীফ হুইপ ফজলুর রহমান অন্তর্ভুক্ত হন। এছাড়া খাজা গ্রুপের অপর এক সদস্য নূরুল আমিনকে স্পীকার নির্বাচিত

করা হয়। ১৩ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির মধ্যে অন্তত ৫ জনকে এই গ্রুপ থেকে নেয়া হয়।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা এর ১৫ মাসের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য কোন আইনগত বিধান রচনা করতে পারে নি। ভাগচাষী যেন তার ফসলের অর্ধেকের স্থলে দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে এবং জমিতে তার দখলস্বত্ব যেন প্রতিষ্ঠা পায় সে দাবিতে এই সময় বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন চলছিল, যা 'তেভাগা আন্দোলন' নামে সুপরিচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বঙ্গীয় আইনসভায় 'বেঙ্গল বর্গাদার (প্রভিশনাল) কন্ট্রোল বিল' নামে একটি বিল উত্থাপন করা হলে লীগের জোতদার সদস্যদের বিরোধিতার কারণে এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।[৭০] বাংলার কৃষক-অসন্তোষের মূলে ছিল জমিদারি প্রথা। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার আমলে গঠিত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করার বিষয়টি ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আইনসভায় তোলা হলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আইনে পরিণত হতে পারে নি।

আসলে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কার্যকাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই ঘটনাবহুল। ভারত থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, দেশবিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই অধ্যায়ের রাজনীতি আবর্তিত হয়। বাংলায় ভয়াবহ 'কলকাতা দাঙ্গা' (আগস্ট ১৯৪৬), 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ' এবং 'বঙ্গবিভাগ' হচ্ছে এই সময়কালের প্রধান ঘটনা।

কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙালির জীবনে একটি কালো অধ্যায়। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী এ দাঙ্গায় ৪ হাজার লোক নিহত এবং ১০ হাজার লোক আহত হয়[৭১], যদিও বেসরকারি হিসাব মতে এ সংখ্যা বহুগুণ বেশি। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা এ দাঙ্গারোধে ব্যর্থ হয় এবং বিশেষকরে হিন্দুদের মধ্যে অনেকে 'স্বয়ং সোহরাওয়ার্দীর' ভূমিকাকে এজন্য দায়ী করে থাকেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৬ আগস্ট সারা ভারতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনকে কেন্দ্র করে এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ঐ দিন সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা কর্তৃক বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং দাঙ্গা চলাকালে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে সোহরাওয়ার্দীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্নের উদ্রেক করে। তিনি পরবর্তীকালে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য তুলে ধরেন। যাই হোক, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত না হওয়ায়[৭২] সোহরাওয়ার্দীর সত্যিকার

৭০. Burrows to Mountbatten, 11 April 1947, *GFR*, L/P&J/5/154, 55-57.

৭১. *Secret Report*, 2nd half, August 1946, *GFR*, L/P&J/5/153, 90-91.

৭২. ভারতের চীফ জাস্টিস স্যার প্যাট্রিক স্পীনস্‌কে চেয়ারম্যান করে যদিও একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতবিভক্তি অত্যাসন্ন হয়ে পড়ায় অতঃপর তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ভূমিকা হয়তো কোনদিন জানতে পারা যাবে না। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বৃটিশ কেবিনেট মিশন কূটনীতিই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্রধানত দায়ী।[৭৩]

দেশবিভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়কে সঙ্গে নিয়ে 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ * রাজনৈতিকভাবে তাঁর জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই উদ্যোগ জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিপন্থী ছিল এবং এর প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের খাজা-গ্রুপের কোন সমর্থন ছিল না। তাঁরা ছিলেন জিন্নাহর 'এক পাকিস্তানের' সমর্থক। সোহরাওয়ার্দীর এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বাংলার বিভক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন দেশবিভাগ পরিকল্পনার নীতিমালা অনুযায়ী বাংলার হিন্দুপ্রধান এলাকার (পশ্চিম বাংলা) সদস্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে ৫৮-২১ ভোটে প্রদেশবিভাগের পক্ষে রায় দেন, যা ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

এরপর পাকিস্তানভুক্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে খাজাদের হাতে চলে যাবে সেটাই সহজে অনুমেয় ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই লীগ হাইকমান্ড পূর্ব বাংলার আইনসভার জন্য পার্লামেন্টারি নেতা নির্বাচন করতে দলীয় সদস্যদের নির্দেশ দেয়। ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিন ৭৫-৩৯ ভোটে সোহরাওয়ার্দীকে হারিয়ে তাঁর পরিবর্তে সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩৭-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলায় যে চারটি মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ছিল সেগুলোর মধ্যে একমাত্র ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা কতিপয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন রচনা করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য মন্ত্রিসভা একদিকে যেমন স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন থাকে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে এবং উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে তাদের প্রায় পুরো সময়ই ব্যয় করতে হয়। বাংলার এই পর্বের রাজনীতির প্রধান দিক হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ। বাংলায় হিন্দুদের দীর্ঘ সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সাল থেকে কার্যত সরকারের বাইরে থাকায় তাদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা প্রতিনিধিত্বের প্রেক্ষিতে মুসলিম মন্ত্রিসভার রূপ লাভ করে। বঙ্গীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য প্রধান অবলম্বন ছিল তাদের জনসংখ্যা। বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের কল্যাণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেই হিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতো। মূলত মন্ত্রিসভাগুলোর সাম্প্রদায়িক চরিত্র, দুই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব—এ সবকিছু ছাড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক ধারায়

৭৩. বিস্তারিত দ্র., Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, 255-261

* এ সম্বন্ধে লেখকের অপর প্রবন্ধ 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ'-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বভারতীয় পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি, যদিও শেষ মুহূর্তে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃত্বের একটি অংশ যৌথভাবে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা সফল হলে হয়তো এর একটি ইতিবাচক প্রভাব বাংলার রাজনীতির উপর পড়তো। আসলে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি বাংলার জন্য একটি বিকল্প ধারার সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিল। তা ছিল আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা। তবে বাঙালি জনগণের সামনে কোন রাষ্ট্রিক ধারণা তুলে ধরতে না পারাটা ছিল এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ফজলুল হকের পক্ষে ফ্লাউড কমিশন গঠন ব্যতীত এ লক্ষ্যে আর কিছু করা সম্ভব হয় নি। যেহেতু প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেহেতু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দও এর অংশীদার ছিলেন। লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর ফজলুল হক বিরোধীদের মোকাবেলা করতে গিয়ে লীগের সাম্প্রদায়িক অবস্থান অনুসরণ করেন। ফলে দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থকে সামনে রেখে তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর কোন যৌক্তিকতাই থাকলো না। মুসলিম লীগের রাষ্ট্রিক ধারণা 'পাকিস্তান' অবশেষে সবকিছু অতিক্রম করে গেল।

১০

বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ

সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম*

একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার মাধ্যমে সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনের একটি অন্যতম ইতিবাচক অবদান। প্রাক-বৃটিশ যুগের সরকার পরিচালিত হতো নবাবের ইচ্ছামাফিক। তবে নবাবের ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হওয়ার অবকাশ ছিল কম, কেননা নবাবের ইচ্ছা হুকুমত অতিক্রম করতে পারতো না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত ছিল হুকুমত, যাকে আমরা সনাতন শাসনতন্ত্র বলে অভিহিত করতে পারি। এই হুকুমত-শাসনতন্ত্রের ভিত্তি যেহেতু ছিল কুরআন-সুন্নাহ, কিয়াস এবং ধর্মশাস্ত্র, সেহেতু এর বিধান ভঙ্গ করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। এজন্য উপর মহলে সরকার স্বৈরতন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অধিকারের রক্ষাকবচ ছিল এই হুকুমত। এই হুকুমত-শাসনতন্ত্রের স্থলে বৃটিশ ব্যবস্থা কায়েম করতে সময় লেগেছিল এক শতকেরও বেশি। এই পরিবর্তনের জন্য নির্মাণ করা হয় প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবিক অবকাঠামো—যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, পাশ্চাত্য বিচারব্যবস্থা, পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সভা-সমিতি গঠন ইত্যাদি।

১৭৭২ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর আওতাধীনে প্রবর্তিত চার সদস্যবিশিষ্ট 'গভর্নর জেনারেল এ্যান্ড কাউন্সিল'কে ধরা যেতে পারে পরবর্তীকালের আইনসভার প্রাথমিক রূপ। আলোচনা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে কাউন্সিল পাশ করতো রেগুলেশন।[১]

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ১৮৩৩ সালে বৃটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের আইনকে 'রেগুলেশন' বলা হতো।

কাউন্সিলে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ১৭৮৪ সালের পীটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে এর নামকরণ করা হয় 'গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল'। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করার জন্য ১৮৩৩ সালে কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত আইন-সদস্য নিয়োগের বিধান করা হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং পাশ্চাত্য ধাঁচে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে ১৮৫০ সাল নাগাদ একটি অধিকারসচেতন তবে বৃটিশ-অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বৃটিশ-ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। এই সংগঠনটিই সর্বপ্রথম দেশ শাসনে দেশবাসীর অংশীদারিত্ব দাবি করে। ১৮৫৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার নবায়নের প্রাক্কালে এই সমিতি ৪,৯০০ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দাবিনামা বৃটিশ পার্লামেন্টের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে। ঐ দাবিনামার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলায় একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন।[২] কিন্তু এই দাবির বিপক্ষে কোম্পানি মহল এমন তদবির চালায় যে পার্লামেন্ট মনে করে, প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হতে আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।[৩]

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ উক্ত আইনসভা স্থাপনের প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্বরান্বিত করে। বৃটিশ সরকার অত্যন্ত সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করে যে, বাংলায় বিদ্রোহ হয়েছে নামেমাত্র এবং এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বাংলার জমিদার, শিক্ষিত সমাজ এবং পত্র-পত্রিকাগুলি ছিল সোচ্চার। এর ফলে বাঙালিদের প্রতি বৃটিশ সরকারের আস্থা সৃষ্টি হয় এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি এদের সমর্থন যেন অব্যাহত থাকে সেজন্য প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। পার্লামেন্টেও এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। পার্লামেন্টের জনৈক সদস্যের ভাষায়, "বাংলার শিক্ষিত সমাজ সিপাহি বিদ্রোহের সময় সরকারকে বিদ্রোহ দমনে যে মূল্যবান সমর্থন দিয়েছে সেটা বিবেচনা করে স্থানীয় পরিষদে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।"[৪] ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে ১৪৩৩ জন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকলিপি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়। স্মারকলিপির শিরোনাম ছিল 'Petition from inhabitants and Tax Payers of Calcutta and Bengal Proper'।[৫] এরই জের হিসেবে সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সরকারকে নির্দেশ দেন বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপনের জন্য।[৬] এর ফলে ১৮৬১ সালের ১ আগস্ট ভারতীয় কাউন্সিল আইন ঘোষিত হয়।

২. Biman Bihari Majumdar, *Indian Political Associations and Reforms of Legislature,* (Calcutta 1965), 40; P. N. Sinha Roy, (ed.), *Chronicle of the British Indian Association,* (Calcutta 1965), 9-19.

৩. William Taylor, *Indian Reform-Suggestion For the Consideration of the British Parliament,* (London 1871), 5.

৪. Hansard, *Parliamentary Debates*, Vol. 161, Col. 474.

৫. ঐ, Vol. 162, Col. 1157.

৬. *Parliamentary Papers*, Vol. 43 (1861), No. 307.

বঙ্গীয় আইনসভার বিকাশ

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হলেও ঐ আইনসভাকে খুব সীমিত আকারে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ঐ সংস্কার আইনে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি বা যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালি সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রকৃত ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের হাতেই থেকে যায়। তাই ঐ সংস্কার আইন ঘোষণার দুই সপ্তাহ পরেই স্যার চার্লস উড লিখেন, "কলকাতার ইংরেজরা যাদেরকে ঘৃণা করে তাদের প্রতিনিধিত্ব তারা করতে পারে বলে আমার মনে হয় না"।[৭] বলা বাহুল্য, অত্যন্ত করুণ অবস্থায় যাত্রা শুরু করলেও ধীরে ধীরে বঙ্গীয় আইনসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই প্রবন্ধে, আলোচনার সুবিধার্থে, বঙ্গীয় আইনসভার বিকাশকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রাথমিক পর্যায়, মধ্যবর্তী পর্যায় ও চূড়ান্ত পর্যায়।

প্রাথমিক পর্যায় (১৮৬২-১৯১১)

১৮৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনসভায় লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রান্ট পদাধিকারবলে সভাপতি এবং বারো জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। বারো জন সদস্যের মধ্যে চারজন সরকারি ও চারজন বেসরকারি বিদেশী এবং চারজন বাঙালি ছিলেন। বাঙালিরা হলেন মৌলবি আবদুল লতিফ, রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা রামপ্রসাদ রায়, বর্ধমানের জমিদার রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। রাজ-অনুগত ব্যক্তি হিসেবে বাঙালি সদস্যবৃন্দ সরকারের ধামাধরার ভূমিকা পালন করেন এবং আইন প্রণয়নে এঁরা সবসময়ই সরকারকে সমর্থন জানান।[৮] ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮৫৯ সালের আইনের দশম ধারার সংশোধনী প্রস্তাব বিল আকারে পেশ করা হয়। ঐ বিলের শিরোনাম ছিল "Fines on Villages for Outrages and Trespasses Committed"। মৌলবি আবদুল লতিফ ছাড়া সকলেই ঐ বিলে সম্মতি দেন। মৌলবি লতিফ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন :

> এভাবে সকলকে জরিমানা করার অর্থই হলো, পুলিশ অলস এবং অদক্ষ। এটা জমিদারদের দুর্নীতি করার সুযোগ দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। উক্ত বিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে চরম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কোন জমিদার যদি তার অনুরক্ত তিন-চারজন লোককে দিয়ে ঘোষণা করায় যে কোন বিশেষ গ্রামের বাসিন্দারা জমিদারের ফসল নষ্ট করেছে এবং কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি সেই গ্রামে ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করতে পারেন। ঐ গ্রামের বাসিন্দারা কখনো সেই পরিমাণ টাকা দিতে পারবে না। ম্যাজিস্ট্রেট তখন ইচ্ছা করলে উক্ত গ্রাম সেই জমিদারের কাছে বিক্রি করে দিতে পারেন। এর প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সকল গ্রাম শেষ পর্যন্ত জমিদারদের কবলে চলে যাবে।[৯]

৭. India Office Library, *Wood Papers*, Vol 8, 220-24.
৮. *Proceedings of Bengal Legislative Council*, Vol.I, (29 March 1862), 33, 101-102.
৯. ঐ, ৯৮-৯৯।

কিন্তু গণবিরোধী এই সংশোধনীতে অন্য কেউ এমন বক্তব্য রাখে নি। এটাই স্বাভাবিক। সংশোধনীটি আনা হয় জমিদারদের স্বার্থে। আইনসভায় লতিফ ছাড়া বাকি তিনজনই ছিলেন জমিদার।

বঙ্গীয় আইনসভায় সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী বিল পাশ হওয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলায় বেশ কিছু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বিভিন্ন স্বদেশী পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। উনিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে 'স্বদেশীদের সভা' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অন্যতম সদস্য নবগোপাল মিত্র '*জাতীয় পত্রিকা*' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৬৮ সালে যশোর থেকে শিশির কুমার ঘোষ '*অমৃতবাজার পত্রিকা*' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। ঐ একই সময় পাবনাতে 'কর বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়। এর তীব্রতা লক্ষ্য করে পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহীর কমিশনারকে লিখেন যে, "পাবনা ও বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন লিফলেট ছাড়া হয়েছে, যেগুলোতে ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের আহ্বান জানানো হয়েছে।"[১০] শেষ পর্যন্ত ঐ সকল আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে Dramatic Performances Act এবং ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act ঘোষণা করে সকল প্রকার সরকারবিরোধী বক্তব্য, আন্দোলন ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে। ঐ দুটি আইনের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায়, যথা ঢাকা, বরিশাল, বগুড়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠে। ১৮৭৮ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতায় এক প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গীয় আইনসভার কোন সদস্য ঐসব আন্দোলনের প্রতি কোনরকম সমর্থন জানান নি।[১১] ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে বঙ্গীয় আইনসভায় বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন, যেমন সৈয়দ আমির আলি, কৃষ্ণদাস পাল, রামশঙ্কর সেন, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, পিয়ারী মোহন মুখার্জী এবং রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর। ঐ সকল সদস্যের মধ্যে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় নি। কারণ, প্রথমত, তাঁরা সকলেই ছিলেন সরকারের পছন্দসই মনোনীত সদস্য; দ্বিতীয়ত, তাঁরা সকলেই ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা এবং বিত্তশালী; তৃতীয়ত, তাঁরা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন এবং আরো সুযোগ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অপরপক্ষে যাঁরা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মফস্বলের বাসিন্দা। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীব বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং আনন্দ মোহন বসু উভয়ের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহে। আইনসভার সদস্যবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করায় মফস্বলের নতুন নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' থেকে বেরিয়ে এসে 'ইন্ডিয়ান

১০. "Circulation of Seditious Papers in Bogra", *Judicial Proceedings*, No. 47 (June 1864).

১১. *সোমপ্রকাশ*, ১২ কার্তিক, ১২৬৯ (অক্টোবর ১৮৬২); প্রদত্ত ভট্টাচার্য, "বিদ্যাসাগর, বাংলার কৃষক এবং মার্কসবাদ", *পরিচয়* (কলকাতা), পূজা সংখ্যা, ১৯৭২, ২৯৯; Monju Chatterjee, "Pabna Peasant Uprising 1873", *Indian Left Review*, (New Delhi), 11· 3 (1973).

এসোসিয়েশন' গঠন করেন।[১২] এই সংগঠন বেশ কয়েকটি জনসভার আয়োজন করে। ১৮৮৩ সালে আনন্দ মোহন বসুর সভাপতিত্বে এই সংস্থার প্রথম অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও, যেমন বোম্বে ও মাদ্রাজে, এ সময় সরকারবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা দেশের অন্যান্য স্থানের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই প্রস্তাব গ্রহণ করে, "কংগ্রেস মনে করে যে, এমন ধরনের সংস্কার হওয়া উচিত যাতে স্থানীয় আইনসভায় বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় নির্বাচিত সদস্য থাকতে পারে।"[১৩] সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কলকাতায় তাঁর এক ভাষণে ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় আইনসভার একটি খসড়াও প্রণয়ন করেন এবং বলেন যে, উক্ত আইনসভায় নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সরকার এ দাবি উপেক্ষা করতে পারে নি। ভারতের ভাইসরয় স্বরাষ্ট্র সচিব এ্যান্টনি ম্যাকডনেলকে বাংলার সম্ভাব্য আইনসভার একটি রূপরেখা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। অবশেষে ঐ রূপরেখার ভিত্তিতেই পাশ হয় ১৮৯২ সালের সংস্কার আইন।

১৮৯২ সালের সংস্কার আইনে বঙ্গীয় আইনসভায় তেরো জন সদস্যের পরিবর্তে একুশ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। এর মধ্যে দশ জন মনোনীত সদস্য। যে সকল সংস্থা মনোনয়ন দানের অধিকার পেলো, তারা হলো কলকাতা কর্পোরেশন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, জেলাবোর্ডসমূহ এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মধ্যে যেসব মিউনিসিপ্যালিটির আয় ছিল পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে, তাদের ভোটে এক জন এবং যেসব মিউনিসিপ্যালিটির আয় এক লক্ষ টাকার উপরে ছিল, তাদের ভোটে পাঁচ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। সকল জেলাবোর্ড সমান ভোটে একজন সদস্য সুপারিশ করতে পারতো। অন্যান্য তিনটি সংস্থার প্রত্যেকে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত একজন করে সদস্য সুপারিশ করতে পারতো। ১৮৯৩ সালে নবগঠিত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৌলবি সিরাজুল ইসলাম, মৌলবি আবদুল জাব্বার, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, লাল মোহন ঘোষ, আনন্দ মোহন বসু, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গণেশচন্দ্র এবং নাটোরের জগদীন্দ্রনাথ রায়। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে সমালোচনামুখর ছিলেন না। তবে কোন বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বা সৈনিক কোন বাঙালির প্রতি দুর্ব্যবহার করলে অনেকেই বঙ্গীয় আইনসভায় এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১৪] সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আনন্দ মোহন বসু এ ব্যাপারে খুব সোচ্চার

১২. S. N. Banerjee, *A Nation in the Making*, (Calcutta 1925), 85-86.
১৩. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism*, (Cambridge 1968), 174.
১৪. বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৯৬ সালে মেমারীতে ভ্রমণে যান, যাওয়ার সময় পথে একটি গরুর গাড়ি সামনে পড়ে। ফলে তাঁকে রাস্তায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ছড়ি দিয়ে ঐ গাড়োয়ানকে বেত্রাঘাত করে রক্তপাত ঘটান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গীয় আইনসভায় ঐ ঘটনা তুলে ধরেন এবং গভর্নরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন।

ছিলেন। তাই যদিও বঙ্গীয় আইনসভায় তখনো বৃটিশ সরকারের নীতিসমূহের সমালোচনা করা শুরু হয় নি, তথাপি আমলাদের কার্যকলাপের সমালোচনা বৃটিশ সরকারের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

১৮৯২ সালের আইনে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ঐ আইনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোন বিধান করা হয় নি। তাই ভারতীয় কংগ্রেস ঐ সংস্থাকে নির্বাচিত সংস্থায় পরিণত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৮৯৫ সালে পুনা কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এ তথ্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, যুক্তরাজ্যের ৪ কোটি অধিবাসীর জন্য পার্লামেন্টে ৬৭০ জন সদস্য রয়েছে আর বাংলায় সাত কোটি লোকের জন্য রয়েছে দশ জন সদস্য।[১৫] তিনি দাবি করেন যে, অর্থসংক্রান্ত বিলের সমালোচনা করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা তুলে নিতে হবে। এর কিছুদিন পর ১৮৯৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত লখনৌ অধিবেশনে দাবি জানান যে, বঙ্গীয় আইনসভায় প্রত্যেক জেলা থেকে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে। বাংলার মতো ভারতের অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দও প্রত্যেক রাজ্যে প্রতিনিধিত্বশীল আইনসভার দাবি উত্থাপন করেন। মহারাষ্ট্রে দাবি উত্থাপন করেন বাল গঙ্গাধর তিলক আর পাঞ্জাবে লালা রাজপত রায়। ১৯০৪ সালে কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে পুনরায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাকে বর্ধিত করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া, ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে বৃটিশ অফিসার ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরার জন্য বাংলায় প্রায় দুই হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৬] ঠিক ঐ সময়ে কয়েকটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, বৃটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা উল্লেখ করে ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করেন। বাংলার হিন্দুদের মধ্যে এটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাজ্যে লিবারেল দল ক্ষমতায় আসে এবং জন মোর্লি ভারতের নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট নিযুক্ত হন। তৃতীয়ত, ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে একটি নতুন দল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পরিশেষে, বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার মুসলিম নেতা সৈয়দ আমির আলি লর্ড মোর্লির কাছে ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানান। লর্ড মোর্লি অবশ্য ইতিমধ্যেই ভারতে এক নতুন সংস্কার আইন ঘোষণা করতে মনস্থির করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সরকারকে এ ব্যাপারে একটি সুপারিশমালা পেশ করার নির্দেশ দেন। লর্ড মিন্টোর সুপারিশমালায় বঙ্গীয় আইনসভার কাঠামোতে মোট সাঁইত্রিশ জন সদস্য রাখার সুপারিশ করা হয়। তাঁদের মধ্যে বাইশ জন মনোনীত এবং চৌদ্দ জন নির্বাচিত সদস্য হবেন বলে উল্লেখ করা হয় (সারণি ১)।

কিন্তু এই সুপারিশমালায় মুসলমানদের জন্য কোন পৃথক সদস্যসংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয় নি। ফলে এই সুপারিশমালা সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় বৃটিশ সরকার বঙ্গীয় আইনসভাকে নিম্নরূপে গঠনের সুপারিশ করে (সারণি ২) :

১৫. A. C. Banerjee, *Indian Constitutional Document*, Vol. 1, (Calcutta 1945).

১৬. ঐ।

সারণি ১ : ১৯০৮ সালে লর্ড মিন্টো কর্তৃক সুপারিশকৃত বঙ্গীয় আইনসভার কাঠামো

মনোনীত সদস্য	নির্বাচিত সদস্য	সর্বমোট সদস্য
২২ জন ১৮ জন সরকারি অফিসার ৩ জন স্বার্থগোষ্ঠী ও তফসিলী প্রতিনিধি	১৪ জন ১ জন কলকাতা কর্পোরেশন ৭ জন মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডসমূহ ২ জন ভূস্বামীশ্রেণী ১ জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১ জন চেম্বার অব কমার্স ১ জন কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি ১ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি	৩৭ জন ৩৬ জন মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য+ লেফটেন্যান্ট গভর্নর

উৎস : Government of India, *Papers Relating to The Constitutional Reform in India,* Vol, II, (1908), 557.

সারণি ২ : ১৯০৮ সালে ভারতীয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত বঙ্গীয় আইনসভার কাঠামো

মনোনীত সদস্য	নির্বাচিত সদস্য	সর্বমোট সদস্য
২৬ জন ২৩ জন সরকারি অফিসার ৩ জন বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী ও তফসিলী প্রতিনিধি	১৯ জন ১ জন কলকাতা কর্পোরেশন ৪ জন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ ৪ জন জেলাবোর্ডসমূহ ৪ জন ভূস্বামীশ্রেণী ১ জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১ জন চেম্বার অব কমার্স ১ জন কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি ১ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি ২ জন মুসলিম সদস্য	৪৬ জন ৪৬ জন মনোনীত ও নির্বাচিত+লেফটেন্যান্ট গভর্নর

উৎস : সারণি ১-এর উৎস দ্র.।

উপরোক্ত সুপারিশমালার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড মোর্লি ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার একটি রূপরেখা পেশ করেন। এই রূপরেখায় আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং অর্থসংক্রান্ত বিলের উপর নিষেধাজ্ঞা রহিত করার সুপারিশ করা হয়। সকল প্রস্তাব বিবেচনা করে ১৯০৯ সালের ২৫ মে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয়।[১৭] এই সংস্কার আইনের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় বৃটিশ সরকার ১৯০৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গীয় আইনসভার নতুন কাঠামো ঘোষণা করে। উক্ত কাঠামোতে ১৭ জন সরকারি অফিসার ও ৩১ জন বেসরকারি সদস্যের বিধান করা হয়। বলাবাহুল্য, যদিও সুপারিশকৃত বঙ্গীয় আইনসভায় বেসরকারি সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ করা হয়, তথাপি কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী ছিলেন তাঁরা নতুন সংস্কার আইনকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এ আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোন বিধান করা হয় নি।[১৮] অন্যদিকে, মধ্যপন্থীরা যতোক্ষণ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রহিত করা না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত আইনসভায় অংশগ্রহণে অসম্মতি জানান। এমন অবস্থায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হয় এবং বাংলার দায়িত্ব গভর্নরের পরিষদকে দেয়া হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশ ঘোষণা করা হয় এবং ঐ দুটি রাজ্যে পৃথক আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।[১৯]

মধ্যবর্তী পর্যায় (১৯১২-১৯৩৪)

১৯১৩ সালের ১৮ জানুয়ারি নবগঠিত বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর কারমাইকেল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "আইনসভার সদস্য হিসেবে জনগণের মঙ্গল সাধন করবো—এটাই হবে আমাদের সকলের লক্ষ্য।"[২০] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনের এক বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। বৃটিশ সরকার সেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অনেক চরমপন্থী ধারণা করেছিল যে, এই সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটতে পারে। বৃটিশ সরকার সত্যিকারভাবেই ঐ সময়ে বেকায়দায় ছিল। ফলে সব ধরনের বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইনে হাজার হাজার তরুণ বিপ্লবীকে আটক করে। ঐ সময় মধ্যপন্থীরাও এক সঙ্কটে পতিত হয়। কারণ একদিকে তারা বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করছিল, অন্যদিকে বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি জানাচ্ছিল। চরমপন্থীদের সমর্থক চট্টগ্রাম বিভাগের অখিলচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয় আইনসভায় সরকারের সমালোচনা করে

১৭. ঐ, ২য় খণ্ড,২৪৫-২৪৬।
১৮. ঐ।
১৯. C.H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan . Selected Documents,* (London 1965), 169
২০. *Proceedings of the Bengal Legislative Council,* January 18, 1913, 3.

বলেন, "আমরা এখানে সকল নির্যাতনকে সমর্থন দেবার জন্যই বসি।"[২১] কিন্তু কর্তৃপক্ষ এসবে কর্ণপাত করে নি এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করে নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনকল্পে ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯১৬ সালে লখনৌতে একটি যৌথ সম্মেলনে মিলিত হয় এবং একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তিতে দাবি করা হয়, প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভায় চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত এবং এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত সদস্য থাকতে হবে; বড় প্রদেশগুলোর আইনসভায় কমপক্ষে একশো পঁচিশটি আসন এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রদেশের আইনসভায় পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরটি আসন থাকবে; আইনসভার সদস্যবৃন্দ জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত সংখ্যক আসন থাকবে; বাংলার আইনসভায় শতকরা ৪০টি মুসলিম আসন সংরক্ষিত থাকবে; ঐ আইনসভার অর্থসংক্রান্ত বিষয়সহ সকল বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকতে হবে। এভাবে একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলন, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের চাপ ঔপনিবেশিক সরকারকে বিব্রত করে তুললো। এমতাবস্থায় ১৯১৭ সালের ৩০ জুলাই ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট এক তারবার্তায় ভারতের জন্য কোন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। ভারতের ভাইসরয় চেমসফোর্ড এবং সেক্রেটারি অব স্টেট মন্টেগুর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয় এবং ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব রাজার অনুমতি পায় এবং তা আইনে পরিণত হয়।

১৯১৯ সালের আইনে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা (Dyarchy) চালু করা হয় এবং ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে 'রক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত'—এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। রক্ষিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব ঐ সকল মন্ত্রীকে দেয়া হয়, যাঁরা প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে দায়ী থাকবেন। আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলো, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ঐ সকল মন্ত্রীর হাতে দেয়া হয়, যাঁরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকবেন। বঙ্গীয় আইনসভায় জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১১৪ জন করা হয়। আইনসভার ক্ষমতাও বর্ধিত করা হয়, তবে কর নির্ধারণ ও সরকারি ঋণ প্রভৃতি বিষয়ে গভর্নরের পূর্বসম্মতি প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নরকে যেকোন বিলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাই উক্ত আইনে সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিধান করা হয় নি। বিভিন্ন দাবিদাওয়া পূরণ হওয়া সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের আইন বাস্তবায়ন করা কঠিন হলো, কারণ ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়।[২২] ১৯২০ সালে নির্বাচন ঠিকই অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাতে প্রায় শতকরা ৮০ জন ভোটার ভোটদানে বিরত থাকে।[২৩] নির্বাচনের পর বাংলার তদানীন্তন

২১. ঐ, মার্চ ২৪, ১৯১৭।

২২. Philips, *Evolution of India and Pakistan*

২৩. ঐ।

গভর্নর রোনাল্ডসে তাঁর নির্বাহী পরিষদের ৪ জন সদস্য এবং রক্ষিত বিষয়ের জন্য ৩ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। হস্তান্তরিত বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক (পুলিশ) বিষয় ও অর্থমন্ত্রণালয় দেয়া হয় যথাক্রমে হুইলার এবং কেরিকে, ভূমি মন্ত্রণালয় দেয়া হয় বি. সি. মাহতাবকে, বিচার মন্ত্রণালয় দেয়া হয় স্যার আবদুর রহিমকে, স্থানীয় শাসন ও জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেয়া হয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে, শিক্ষামন্ত্রণালয় দেয়া হয় প্রভাষচন্দ্র মিত্রকে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় দেয়া হয় সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরীকে।[২৪]

বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন শুরু হলে অন্যতম সদস্য কিশোরী মোহন মজুমদার নির্বাহী পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪ জন থেকে কমিয়ে ২ জন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ. কে. ফজলুল হক ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মন্ত্রীরা ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রস্তাবটির পক্ষে ৭৪ ভোট পড়ে। কয়েক দিন পর ১৯২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, "আগামী বছর থেকে দার্জিলিংয়ে সরকার স্থানান্তরের বাৎসরিক যে প্রক্রিয়া চলে তা বন্ধ করতে হবে।"[২৫] এ প্রস্তাবটির পক্ষেও তেপান্নটি ভোট পড়ে। এ ধরনের ছোটখাটো প্রস্তাব ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯২১ সালের মে মাসে আসামের চা-বাগানের বেশ কয়েক জন শ্রমিক পলায়ন করে এবং কুমিল্লার চাঁদপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু চা-বাগানের মালিকবৃন্দ চাঁদপুরে সেসব শ্রমিকের উপর নির্যাতন চালায়। চট্টগ্রাম বার সমিতির নেতা জে. এন. সেনগুপ্ত এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। বঙ্গীয় আইনসভায়ও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হলে স্যার হেনরি হুইলার বিষয়টি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেন।[২৬] কিন্তু কেবল চাঁদপুর নয়, ১৯২২ সালে পুলিশ ও জেলা কর্তৃপক্ষ ফরিদপুরের জেলে রাজবন্দিদের উপর অত্যাচার চালালে এ. কে. ফজলুল হক বঙ্গীয় আইনসভায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[২৭] চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র চিররঞ্জন দাসের সঙ্গে জেলে অন্তরীণ সময়ে যে দুর্ব্যবহার করা হয়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার সমালোচনা করেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার এসব সমালোচনায় কর্ণপাত না করে বাংলার অন্যান্য স্থানে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায়। পুলিশ রংপুরের নীলফামারীতে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থনকারী বহু স্বেচ্ছাসেবীকে নির্যাতন করে। বঙ্গীয় আইনসভায় ঐসব ঘটনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এমনকি হুইলার নিজে আইনসভায় স্বীকার করেন যে, "সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে, কারণ রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, বাকেরগঞ্জ, বীরভূম ও চট্টগ্রামের জনগণ চৌকিদারি কর দিচ্ছে না।"[২৮] ঠিক ঐ সময়ে ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর ওয়েল্‌সের রাজকুমার বোম্বেতে অবতরণ করেন এবং সেদিন সমগ্র কলকাতায় হরতাল পালিত হয়। ফলে সরকার ১৯ নভেম্বর

২৪. *Proceedings of the Bengal Legislative Council,* Vol. 1 (1921), 1-2.
২৫. ঐ, ফেব্রুয়ারি ৮ (১৯২১), ১০৫।
২৬. ঐ, জুলাই ৮ (১৯২১), ১৬৫।
২৭. ঐ, জানুয়ারি ১৯ (১৯২২)।
২৮. ঐ, ফেব্রুয়ারি ২০ (১৯২২)।

সকল জনসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তাতে আন্দোলন স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাস এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কংগ্রেস বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, তবে সকল দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আইনসভাকে অচল করে রাখা হবে।[২৯] মতিলাল নেহেরু ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলেও অনেকেই ঐ প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। প্রস্তাবটির পক্ষে জোর সমর্থন না পাওয়ায় চিত্তরঞ্জন দাস দলত্যাগের ঘোষণা দিলেন এবং 'স্বরাজ পার্টি' গঠনের হুমকি দিলেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন পাওয়া না গেলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেলেন। চিত্তরঞ্জন দাস অনেক মুসলমান নেতাকেও প্রভাবিত করলেন এবং আইনসভায় মুসলমানদের জন্য পৃথক সংখ্যক আসনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরই ফলে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (Bengal Pact) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় যে, যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি হিন্দু আসন এবং ৪০টি মুসলিম আসন থাকবে; আর যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি মুসলিম আসন ও ৪০টি হিন্দু আসন থাকবে। এমনকি ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্ট দলের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পায়।[৩০] ১৯২৩ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে সকল রাজবন্দির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : ১৯২৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
স্বরাজ পার্টি	৪২
কংগ্রেস	২৯
স্বতন্ত্র	২৫
ইউরোপীয়	১৮
মোট	১১৪

উৎস : *The Statesman*, (Calcutta), December 1, 1923.

১৯২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গীয় আইনসভার প্রথম অধিবেশনেই সকল রাজবন্দির মুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু (সুভাষ বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বরাজ পার্টির সকল সদস্য এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ঐ প্রস্তাব সমর্থন

২৯ C R.Das, "Statement on Civil Disobedience Enquiry Committee", *Indian Annual Register*, Vol I (1923).

৩০. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা ১৯৭০), ৫৫।

করেন। বঙ্গীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টি এর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে গভর্নর কর্তৃক তাঁর পরিষদে তিন জন ভারতীয় মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। লর্ড লিটন ইতিমধ্যেই এ. কে. ফজলুল হক, এ. কে. গজনবী ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মন্ত্রীদের বেতন, শিক্ষা-ইন্সপেক্টর ও মেডিকেল বিভাগ সংক্রান্ত সরকারি বিলের বিরুদ্ধে স্বরাজ পার্টির সদস্যবৃন্দ ভোটদান করেন।[৩১] লর্ড লিটন ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষা বিভাগ ও মেডিক্যাল বিভাগ বন্ধের হুমকি দেন। কিন্তু স্বরাজ নেতা ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নতুন মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে তিনি মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের ২৬ আগস্ট সরকার মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত বিলটি আবার আইনসভায় পেশ করে। বিলটি ৬৮-৬৬ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। ফলে লর্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন।[৩২]

১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে আবার বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন বসে। গভর্নর Bengal Ordinance-এ সংশোধন এনে Criminal Law Amendment Bill পাশ করার উদ্যোগ নিলে বঙ্গীয় আইনসভায় চিত্তরঞ্জন দাস ঐ বিলের ঘোর বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেন। ফজলুল হকও এই বিলের বিপক্ষে মতামত প্রদান করেন। দুদিন পর ভোটাভুটি হলে বিলের বিপক্ষে ৬৯টি ভোট এবং পক্ষে ৬৩টি ভোট পড়ে।[৩৩] লর্ড লিটন অসন্তুষ্ট হয়ে আবার আইনসভার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন। ঐ বছরই ১৬ জুন চিত্তরঞ্জন দাস দার্জিলিং-এ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২৫ সালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে কৃষক আন্দোলন চলছিল। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় কৃষক আন্দোলনের দাবির সমর্থনে একটি Tenancy Amendment Bill-এর প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু জমিদার সদস্যবৃন্দ এবং এমনকি স্বরাজ পার্টির অনেকে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে অল্পকাল পরেই ১৯২৬ সালে যখন পুনরায় বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন স্বরাজ পার্টি পরাজিত হয়। গভর্নর আবদুল করিম গজনবী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ঐ মন্ত্রিপরিষদ 'গাজা-চক্র' মন্ত্রিপরিষদ নামে পরিচিত ছিল।[৩৪] কৃষকদের দাবি পূরণ না হওয়ায় তখনো তাদের আন্দোলন চলছিল। ১৯২৭ সালে বরিশালের ফুলকাঠিতে কৃষকদের একটি মিছিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্ল্যান্ডির আদেশে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে সকলেই গাজা-চক্র মন্ত্রিপরিষদের পদত্যাগ দাবি করে। ঐ বছর ২৫ আগস্ট ডঃ বি. সি. রায় ঐ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ঐ অনাস্থা প্রস্তাব গজনবীর বিরুদ্ধে

৩১. *Proceedings of the Bengal Legislative Council,* August 26, (1924).

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ, জানুয়ারি ২৫ (১৯২৫)।

৩৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* ৫৬।

৬৬-৬২ ভোটে এবং চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৬৮-৫৭ ভোটে পাশ হয়। এরপর অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়।[৩৫] ২৬ আগস্ট গজনবী ও চক্রবর্তী পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। কয়েক দিনের মধ্যে গভর্নর মোশারফ হোসেন ও পি. সি. মিত্রকে নিয়ে মান্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রিপরিষদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।

ভারতের সাংবিধানিক সমস্যা নিরসনকল্পে ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতে একটি কমিশন প্রেরণ করে। কিন্তু স্বরাজ পার্টির সমর্থকগণ ঐ কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। বৃটিশ সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টিভুক্ত সকল বিরোধী সদস্যকে প্রভাবিত করে এবং সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। স্বরাজ পার্টি নেতা ডঃ বি. সি. রায় এমন প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯২৮ সালের ৩১ জুলাই সাইমন কমিশনকে লক্ষ্য করে বঙ্গীয় আইনসভায় স্যার আবদুর রহিম সাত দফা সম্বলিত একটি প্রস্তাব রাখেন। এগুলো হলো— (১) বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনে ভারতকে স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ন মর্যাদা দিতে হবে; (২) স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে হবে; (৩) দ্বৈতশাসনব্যবস্থার অবসান করে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার চালু করতে হবে; (৪) সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার দিতে হবে; (৫) আইনসভায় যথেষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে; (৬) সরকারি অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে; এবং (৭) অতি শীঘ্র সকল দাবি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৩৬] আবদুর রহিমের প্রস্তাবকে যশোরের কৃষকনেতা নওশের আলী এবং কুমিল্লার কৃষকনেতা আসিমুদ্দিন আহম্মেদ স্বাগত জানান। ঐ প্রস্তাব বঙ্গীয় আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

১৯২৮ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গীয় আইনসভায় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী পি. সি. মিত্র জমিদারদেরকে আরো ক্ষমতা দিয়ে Bengal Tenancy (Amendment) Bill উত্থাপন করেন। অধিকাংশ জমিদার সদস্যের ঐ বিলে সমর্থন থাকলেও অনেকেই, যেমন ফজলুল হক, নওশের আলী, আসিমুদ্দিন আহম্মেদ, আশরাফ আলী খান চৌধুরী এবং শামসুর রহমান ঐ বিলের তীব্র সমালোচনা করেন। আইনসভার অন্যতম সদস্য যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ঐ বিলের একটি সংশোধনী এনে 'প্রকৃত মালিকের' সংজ্ঞা দেন।[৩৭] মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য ঐ সংশোধনী প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। বিলটি শেষ পর্যন্ত ৭৩-৪৬ ভোটে পাশ হয়। একই দিনে আজিজুল হক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, সকল

৩৫. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, August 25, (1927), 261, *Indian Quarterly Register* Vol. II (July-December 1972), 380.

৩৬. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, July 31 (1928), 45.

৩৭. ঐ, আগস্ট ১৩ (১৯২৮), ১২১।

বর্গাদারকে আইনগত অধিকার দিতে হবে।[৩৮] ১৪ আগস্ট কংগ্রেসসদস্য অমরেন্দ্রনাথ ঐ বিলের ৫ নং ধারায় 'চাকর এবং শ্রমিক'-এর মধ্যে 'বর্গাদার' এবং 'ভাগীদার' সংযুক্ত করার সংশোধনী প্রস্তাব আনেন, কিন্তু প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে আসিমুদ্দিন আহম্মেদ 'সালামি' প্রথার বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন যে, কোন সালামি গ্রহণ করা চলবে না। কিন্তু মাত্র ২২ জন ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। পঁচাত্তর জন ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।[৩৯] এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কংগ্রেসের কয়েকজন মুসলিম সদস্য, যেমন মওলানা আকরম খাঁ, সৈয়দ নওশের আলী, এ. কে. ফজলুল হক, তমিজুদ্দিন খান, শামসুদ্দিন আহমেদ এবং আরো অনেকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন।[৪০]

বঙ্গীয় আইনসভার অবস্থা যখন এমন চরম সঙ্কটাপন্ন, তখন সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ঠিক ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতে 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এর ডাক দেন। ঐ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার বাঙালিকে কারাবরণ করতে হয়। এদিকে ১৯৩০ সালের জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী ঐ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। ঐ বছরের আগস্ট মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় সাইমন কমিশনের রিপোর্ট আলোচিত হয় এবং জে. এন. সেনগুপ্ত, আবদুস সামাদ, এস. এন. বসু প্রমুখ ঐ রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। ঐসব সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় Bengal Criminal Law Amendment Bill পাশ করাতে উদ্যোগী হয়। ফলে সমগ্র বাংলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।[৪১] অবস্থা চরমে পৌঁছলে ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বসে একটি সমঝোতায় উপনীত হন (গান্ধী-আরউইন চুক্তি)। গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন আর আরউইন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়া হবে।[৪২] ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রায় দশ হাজার বাঙালিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেককে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসন দেয়া হয়। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার ভারতে অধিকতর দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি নতুন সংস্কার আইন ঘোষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৩৮. ঐ, আগস্ট ১৪ (১৯২৮), ১৬৩।

৩৯. ঐ, সেপ্টেম্বর ৪ (১৯২৮), ৯২৭।

৪০. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ৬১।

৪১. Gautam Chattopadhyay, *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle,* (New Delhi : Indian Council of Historical Research, 1984), 123.

৪২. B. P. Sitaramayya, *History of the Indian National Congress,* (New Delhi 1969), 436.

চূড়ান্ত পর্যায় (১৯৩৫-৪৭)

১৯৩৫ সালে এক নতুন ভারতীয় আইন ঘোষণা করা হয়। ঐ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—(১) ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে এবং (২) প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে। ঐ আইনে আরো বলা হয় যে, ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী হবে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি নতুন দল 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠিত হয়। নির্বাচনী প্রচারণায় কৃষক প্রজা পার্টি ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঐ সকল কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলায় পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল রাজবন্দির মুক্তি।[৪৩] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রধানত ৩টি দল—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে। উক্ত নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় (সারণি ৪)।

সারণি ৪ ঃ ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

দল	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
কংগ্রেস	৬০
মুসলিম লীগ	৪০
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৫
স্বতন্ত্র মুসলমান	৪১
স্বতন্ত্র হিন্দু	১৪
স্বতন্ত্র তফসিলী সম্প্রদায়	২৩
ইউরোপীয়	২৫
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
মোট	২৪২

উৎস : *Indian Annual Register*, Vol 1, 1937, 59-60.

নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম লীগে ও কয়েকজন কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। ফলে মুসলিম লীগের আসনসংখ্যা দাঁড়ায়

৪৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* , ১১১।

৬০টি এবং কৃষক প্রজা পার্টির আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮টি। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। লীগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিত্ব পেলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ এবং নবাব মোশারফ হোসেন। কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে মন্ত্রিত্ব পেলেন এ. কে. ফজলুল হক এবং সৈয়দ নওশের আলী। স্বতন্ত্র হিন্দুদের মধ্য থেকে নলিনীরঞ্জন সরকার, শিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি. পি. সিংহ রায় এবং তফসিলীদের মধ্য থেকে প্রসন্ন দেব রাইকাত ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক মন্ত্রিত্ব পেলেন। এ. কে. ফজলুল হক হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৩৭ সালের ৯ আগস্ট যুক্তফ্রন্ট সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির মুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৯৩৭ সালের শেষ নাগাদ অধিকাংশ রাজবন্দি মুক্তি পায়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক জমিদারি প্রথার উচ্ছেদকল্পে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Bengal Tenancy (Amendment) Act Bill উত্থাপন করেন। বিলটি বিপুল ভোটে পাশ হয়। কিন্তু গভর্নর জমিদারদের মানসিকতা লক্ষ্য করে বিলটি স্বাক্ষর করতে কিছুটা সময় নেন। ফলে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়, কিন্তু ১৩০-১১১ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়।[৪৪] ১৯৩৮ সালেই গভর্নর উক্ত বিলে স্বাক্ষর প্রদান করেন। হক মন্ত্রিসভা কয়েকটি কৃতিত্ব অর্জন করে। প্রথমত, ভূমিরাজস্ব কমিশন গঠন করে সারা বাংলায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। দ্বিতীয়ত, Money Lenders Act বলবৎ করে অর্থঋণ প্রদানকারীদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

উপরোক্ত কৃতিত্ব সত্ত্বেও হক মন্ত্রিসভা শান্তিপূর্ণভাবে শাসন পরিচালনা করতে পারে নি। ১৯৩৯ সালে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দেয়। যুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ সরকার সকল প্রদেশের মন্ত্রিসভা ও আইনসভার সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। ফজলুল হক ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী না হলেও ১৯৩৯ সালে War Resolution প্রস্তাব বঙ্গীয় আইনসভায় ১৪২-৮২ ভোটে পাশ হয়ে যায়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, বঙ্গীয় সরকার ভারতীয় সরকারকে যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে।[৪৫] যুদ্ধের অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করলে বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হয়, কারণ ভারতে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন অবস্থায় ১৯৪২ সালে বৃটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠায়।

ক্রিপস্ ভারতীয়দের কাছে একটি যুদ্ধোত্তর প্রস্তাব রাখেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ চলাকালীন প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সরকারি সকল বিষয়ে ভারতীয়দের যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে আর যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেয়া হবে।

---

৪৪. ঐ, ১৭২।

৪৫. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, December 18 (1939).

কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক ক্রিপস্ প্রস্তাব সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি যুদ্ধবোমা বিস্ফোরিত হয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির অবিলম্বে মুক্তি দাবি করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করলো না। এদিকে ১৯৪৩ সালে সারা বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এই দুর্ভিক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। কোনরকম সাহায্যসামগ্রী পাঠানো হলো না।[৪৬] মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় আইনসভায় বৃটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, যেসব স্থানে পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছে সেসব স্থানে তদন্ত হওয়া উচিত। গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ফজলুল হকের বক্তৃতায় খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁকে গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠালেন। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গভর্নর ফজলুল হককে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন।[৪৭] ফলে স্পীকার সৈয়দ নওশের আলী আইনসভার সভা স্থগিত ঘোষণা করেন। ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল গভর্নর খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রভাবিত করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এতে সঙ্কট নিরসন করা সম্ভব হলো না। খাদ্যসঙ্কট চরম আকার ধারণ করলো। নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল নিজে ২০ ডিসেম্বর ঢাকায় আসেন এবং স্বচক্ষে বাংলার দুর্ভিক্ষ দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে তারবার্তা পাঠালেন। এর এক মাস আগেই তিনি ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট এমেরীর কাছে এক তারবার্তায় বাংলায় গভর্নরের শাসন জারির সুপারিশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "বাংলার রাজনীতি খুব তিক্ত মনে হচ্ছে। সম্ভবত ক্যাসিকে ৯৩ ধারা জারি করতে হবে।"[৪৮] সত্যি সত্যিই বাংলার গভর্নর ক্যাসি ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ ৯৩ ধারা অনুযায়ী বঙ্গীয় আইনসভা বাতিল ঘোষণা করেন এবং সারা বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করেন।

১৯৪৫ সালেই একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, অন্যদিকে ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন কনজার্ভেটিভ দলের পতন ঘটে। ইংল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী এটলীর নেতৃত্বে লেবার দল ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকার ভারতের সঙ্কট নিরসনে একটি মন্ত্রিমিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালে পুনরায় বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস ও সি. পি. আই. (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি) অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে, কংগ্রেস ৮৬ টি আসন লাভ করে (সারণি ৫)।

৪৬. জি. গোস্বামী, *বাঙ্গালীর হাদীঘাট তমলুক,* (মেদিনীপুর ১৯৭৩)।

৪৭. *Proceedings of the Bengal Legislative Council,* March 27 (1943).

৪৮. Casey, *Personal Experience, 1939-46,* (London 1962), 216-17.

সারণি ৫ : ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

দল	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
মুসলিম লীগ	১১৪
কংগ্রেস	৮৬
কৃষক প্রজা পার্টি	৩
স্বতন্ত্র তফসিলী	২
স্বতন্ত্র মুসলিম	৩
স্বতন্ত্র হিন্দু	৪
ভারতীয় খৃস্টান	২
ইউরোপীয়	২৩
সি. পি. আই.	৩
মোট	২৪০

উৎস : *The Statesman* (Calcutta), April 2, 1946.

১৯৪৬ সালের ২৩ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিমিশন ভারতে উপস্থিত হয়েছিল। ঐ বছর ১৬ মে মন্ত্রিমিশন ভারতকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। কিন্তু ঐ পরিকল্পনাও সকল ভারতীয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি।[৪৯] কংগ্রেস তখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিল। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল। ঐ সময় বৃটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় নিয়োগ করে। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা শেষবারের জন্য অধিবেশনে বসে এবং ১২৬-৯০ ভোটে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় আইনসভারও যবনিকাপাত ঘটে।

বঙ্গীয় আইনসভার কার্যপ্রণালী

বিশ্বের অন্য যেকোন আইনসভার মতো বঙ্গীয় আইনসভার প্রধান কাজ ছিল আইন প্রণয়ন করা। প্রথম থেকেই এ লক্ষ্যে বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে

৪৯. Stanley Wolpert, *A New History of India*, (New York 1982).

প্রাথমিক বিধিমালায় সংশোধন আনা হয়। ১৮৮৯ সালে বিধিমালায় সংশোধনী আনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৮৯০ সালের ১৮ জানুয়ারি এ কমিটি রিপোর্ট দাখিল করে। সর্বসম্মতি না থাকলেও ঐ রিপোর্ট বঙ্গীয় আইনসভায় অনুমোদিত হয়। ঐ বিধিমালা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী নির্দেশিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় আইনসভার বিধি অনুযায়ী ১৯২০ সাল পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নর (পরে গভর্নর) বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ও অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ্যাডভোকেট জেনারেল বা নির্বাহী পরিষদের একজন উচ্চপদস্থ সদস্য সভাপতিত্ব করতেন। ১৯২০ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পর ঐ নীতিমালাতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর পর থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজন পৃথক সভাপতি বা স্পীকারের বিধান করা হয়। অবশ্য বিধি অনুযায়ী গভর্নর যখনই প্রয়োজন মনে করতেন তখনই অধিবেশন আহ্বান করতে পারতেন। তবে বছরে অন্তত একটি অধিবেশন অবশ্যই বসতে হতো। প্রথমদিকে সাধারণত শনিবার ১১টায় অধিবেশন বসতো; তবে ১৯১২ সালে বিধান করা হয় যে, এক দিনের জন্য হলে বুধবার, দুই দিনের জন্য হলে মঙ্গলবার এবং দীর্ঘদিনের জন্য হলে সোমবার বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন বসবে।[৫০] বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন প্রথমদিকে খুব ঘন ঘন বসতো, তবে ক্রমান্বয়ে তা কমে আসে। যেমন, প্রথম বছর বঙ্গীয় আইনসভার ১৯টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, অথচ ১৯৪৭ সালে বসে একটি বা দুটি অধিবেশন ।

আইনসভার অনুমতিক্রমে বিল উত্থাপন করা হতো। যে সদস্য বিল উত্থাপন করতেন তাঁকে প্রথমে বিলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে হতো। কোন সদস্য একটি বিলে একবারই বক্তব্য পেশ করতে পারতেন। কেবল কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব আনলে বিতর্কের সময় জবাব দেবার সুযোগ পেতেন। প্রথমদিকে আইনসভায় নিজ মতামত প্রকাশ করতে সদস্যের জন্য কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল না। পরে প্রত্যেক সদস্যের জন্য সময়সীমা পনেরো মিনিট ধার্য কবা হয়। সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেই ঘণ্টা বেজে উঠতো। অবশ্য সরকারি অফিসারের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না। বিলের উত্থাপক সদস্যকে আধঘণ্টা সময় দেয়া হতো। প্রথমে বেসরকারি সদস্য বক্তব্য পেশ করতেন, পরে সরকারি সদস্য বক্তব্য রাখতেন। সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য পেশ করতে হতো।[৫১]

৫০. ঐ সকল বিধিমালা ১৮৬২ সালের ২৫ জানুয়ারি গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া-ইন- কাউন্সিলের অনুমোদন পায়। Notification No. 1932, dated 25-12-1912 (Published in the *Calcutta Gazette*, December 25,1912, part-V), 145.

৫১. S. N Banerjee, *A Nation in the Making*, (Calcutta 1925), 130.

প্রত্যেকটি বিল বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতো। আইনে পরিণত হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি বিলকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হতো। যেকোন বিল উত্থাপনের পর বিলের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য নীচের যেকোন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করতেন—(১) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো উচিত, (২) পরবর্তী কোনদিন বিলটি আলোচিত হওয়া উচিত, (৩) সকল সদস্যের মতামত যাচাইয়ের জন্য বিলটি সবার মধ্যে বিতরণ করা উচিত। সাধারণত সকল বিলই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হতো। সিলেক্ট কমিটি প্রধানত সমান সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। বিল উত্থাপক সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করতে পারতেন। সাধারণত এ্যাডভোকেট জেনারেল সব কমিটিতেই থাকতেন। বিলের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য সিলেক্ট কমিটিতে সভাপতিত্ব করতেন।

বঙ্গীয় আইনসভায় আরও কয়েকটি কমিটি ছিল, যেগুলো বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত বিলের দায়িত্ব পালন করতো। যেমন, রাজস্ব কমিটি। প্রতি বছর ৫ জানুয়ারি রাজস্ব কমিটি গঠন করা হতো। ঐ কমিটি বারো জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। তাঁদের মধ্যে ছয় জনকে গভর্নর মনোনীত করতেন এবং অবশিষ্ট ছয় জন সদস্য বঙ্গীয় আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। প্রত্যেক সদস্যের ছয়টি ভোট ছিল। প্রত্যেক সদস্য পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে বা যেকোন এক জনকে ছয়টি ভোট দিতে পারতেন। রাজস্ব কমিটির প্রধান কাজ ছিল প্রদেশের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব তৈরি করা। কমিটিকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হতো, কিন্তু খসড়া রিপোর্ট ১৮ জানুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হতো। ফলে মাত্র দশ দিন পর্যবেক্ষণ করার সময় পাওয়া যেতো। রাজস্ব বিল উত্থাপক সদস্য পদাধিকারবলে রাজস্ব কমিটির সভাপতি থাকতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাজস্ব বিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। কিন্তু সমান সমান ভোট প্রদত্ত হলে সভাপতি নিষ্পত্তি ভোট দিতে পারতেন। রাজস্ব কমিটি ছিল একটি ক্ষণস্থায়ী কমিটি।

বৃটিশ পার্লামেন্টের মডেল অনুসরণ করে বঙ্গীয় আইনসভায় আরেকটি কমিটি 'Committee of the Whole House'-এর বিধান করা হয়। আইনসভার সকল সদস্যই এই কমিটির সদস্য ছিলেন। আইনসভার বিধিমালার মতো নয়, বরং অনানুষ্ঠানিকভাবে সকল সদস্য বসে আইনগত ব্যাপারে আলোচনা করতেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল পাশের ক্ষেত্রে ঐ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'স্ট্যান্ডিং কমিটি' নামেও বঙ্গীয় আইনসভার একটি কমিটি ছিল। যদি আইনসভা সংক্রান্ত কোন বিধি-নিষেধ পরিবর্তনের প্রস্তাব থাকতো, তবে তা ঐ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ঐ কমিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল আইনসভায় উন্নতমানের বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

সকল কমিটি পর্যায়, বিশেষত সিলেক্ট কমিটি অতিক্রম করার পর আইনসভায় কমিটির রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতো। যেকোন বিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ হতো। প্রয়োজন হলে ভোট গ্রহণ করা হতো। বিল আইনসভায় পাশ হলে গভর্নরের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হতো। গভর্নর বিলে ইচ্ছানুযায়ী সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারতেন। গভর্নরের সম্মতি পেলে বিলটি আইনে পরিণত হতো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের ষাটের দশকে শাসক ও শাসিত উভয়ের প্রয়োজনেই বঙ্গীয় আইনসভার যাত্রা শুরু। প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর প্রতিষ্ঠানটি মূলত উচ্চশ্রেণী ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থই পূরণ করেছিল। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা আর জমিদারদের লক্ষ্য ছিল সমাজে তাদের কর্তৃত্ব আরো সুদৃঢ় করা। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষায় নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। আইনসভার লক্ষ্য সাধারণ জনগণ ছিল না। সাধারণ জনগণও এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত ছিল না। এমনকি, সদস্যদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিল উত্থাপিত হলে জোর বাধা সৃষ্টি করা হতো। তাই একবার স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল বঙ্গীয় আইনসভায় বলেন, "এই আইনসভায় এমন কোন ভদ্রলোক নেই যাকে সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধি বলে বিবেচনা করা যায়।" কিন্তু কালক্রমে সাধারণ নির্বাচন চালু হওয়ার পর বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এসকল সদস্য আংশিকভাবে হলেও জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন। আইনসভাকে পূর্ণ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করে না নিলেও এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রতিষ্ঠানের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা গুণ ও মর্যাদার দিক থেকে অনেক উন্নতমানের ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার চেয়েও বঙ্গীয় আইনসভা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আইনসভা প্রবর্তিত হয়। বঙ্গীয় আইনসভাই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা করে। আইনসভায় তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর এবং অন্যান্য সংসদীয় ব্যবস্থার প্রথাসমূহ ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক শুরুতেই সম্ভবত বঙ্গীয় আইনসভার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি। এই শাসকগোষ্ঠী প্রাকৃতিক বিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। বঙ্গীয় আইনসভায় অনুসৃত বিধিব্যবস্থাগুলো এখনো অনুসরণ করা হয়। ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বঙ্গীয় আইনসভার অবদান অনস্বীকার্য, কারণ এই প্রতিষ্ঠান কেবল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল তাই নয়, বরং বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যেসমস্ত বিধিমালা অনুসরণ করা হয় সেগুলোরও অগ্রদূত ছিল বঙ্গীয় আইনসভা।

পরিশিষ্ট

বঙ্গীয় আইনসভার শেষ নির্বাচনে (১৯৪৬) নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা

ডঃ আবদুল আহাদ (সাতক্ষীরা)
মওলানা মোঃ আবদুল আজিজ (পূর্ব নারায়ণগঞ্জ)
আবদুল আজিজ মুন্সী (পূর্ব মাদারীপুর)
মির্জা আবদুল হাফিজ (পশ্চিম টাঙ্গাইল)
মওলানা আবদুল হাই (দক্ষিণ নোয়াখালী)
আবদুল হাকিম মিঞা (পশ্চিম নোয়াখালী)
মোঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী (মুন্সীগঞ্জ)
মোঃ আবদুল হাকিম মোল্লা (পশ্চিম নদীয়া)
আবদুল হামিদ (দক্ষিণ রাজশাহী)
এ.এম. আবদুল হামিদ (পশ্চিম পাবনা)
আবদুল হান্নান (মেহেরপুর)
আবদুল করিম (উত্তর জামালপুর)
মৌলবি আবদুল খালেক (দক্ষিণ ঢাকা)
ফকির আবদুল মান্নান (উত্তর ঢাকা)
আবদুল মোমিন (ত্রিপুরা কেন্দ্র)
মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী (পূর্ব দিনাজপুর)
এ. এফ. এম. আবদুর রহমান (উত্তর-পূর্ব ২৪ পরগনা)
আবদুর রহমান খান (নুরু মিয়া) (উত্তর পটুয়াখালী)
আবদুর রশিদ মাহমুদ (দক্ষিণ সিরাজগঞ্জ)
মওলানা আবদুর রশিদ খন্দকার (সিরাজগঞ্জ)
সৈয়দ আবদুর রউফ (পূর্ব যশোর)
আবদুস সবুর খান (খুলনা)
মোঃ আবদুস সালাম (মতলববাজার)
মৌলবি আবিদুর রেজা চৌধুরী (পশ্চিম চাঁদপুর)
আবুল হাশিম (বর্ধমান)
আবুল কালাম শামসুদ্দিন (পশ্চিম ময়মনসিংহ)
কাজী আবুল মাসুদ (নাটোর)
আবুল কাশেম (হুগলী)

সিতাংশু কান্ত আচার্য (ঢাকা, জমিদার)
অমূল্যচন্দ্র অধিকারী (পূর্ব ময়মনসিংহ)
মীর আলী আহম্মদ (জামালপুর-মুক্তাগাছা)
আহম্মেদ আলী মৃধা (গোয়ালন্দ)
আহম্মেদ হাশেম (গাইবান্ধা দক্ষিণ)
আহম্মেদ কবির চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ)
মৌলবি আকবর আলী (নেত্রকোণা উত্তর)
আলী আহম্মেদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ)
আলী আহম্মেদ খান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া দক্ষিণ)
বেগম আনোয়ারা খাতুন (ঢাকা, মুসলিম)
আরিফ চৌধুরী (ধনুমিয়া) (বাকেরগঞ্জ উত্তর)
আসান আলী মোক্তার (নেত্রকোণা দক্ষিণ)
আওলাদ হোসেন খান (মানিকগঞ্জ পূর্ব)
সৈয়দ আজিজুর রহমান (ভোলা দক্ষিণ)
মোঃ বদিউজ্জামান (বগুড়া পূর্ব)
বাফাতুদ্দিন তালুকদার (জামালপুর পশ্চিম)
প্রমথনাথ ব্যানার্জী (মেদিনীপুর দক্ষিণ-পশ্চিম)
গোবিন্দলাল ব্যানার্জী (খুলনা)
শিবনাথ ব্যানার্জী (হাওড়া, কারখানা প্রতিনিধি)
সুশীলকুমার ব্যানার্জী (হাওড়া)
ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী (কলকাতা, কারখানা প্রতিনিধি)
হরেণ চন্দ্র বর্মণ (বগুড়া—পাবনা)
মোহিনী মোহন বর্মণ (জলপাইগুড়ি—শিলিগুড়ি)
দ্বারকানাথ বারুরী (ফরিদপুর)
হেমন্ত কুমার বসু (কলকাতা উত্তর)
জ্যোতি বসু (রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিনিধি)
চারুচন্দ্র ভান্ডারী (২৪ পরগনা উত্তর-পশ্চিম)
গণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (ঢাকা পূর্ব)
সুনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ঢাকা পশ্চিম)
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (মুর্শিদাবাদ)
বীর বীর্য (মালদহ)

ডাঃ ভোলানাথ বিশ্বাস (যশোর)
গয়ানাথ বিশ্বাস (ময়মনসিংহ পশ্চিম)
সতীশচন্দ্র বসু (কলকাতা দক্ষিণ)
রতন লাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিং সদর)
বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ পশ্চিম)
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)
হরিপদ চ্যাটার্জী (নদীয়া)
মিহির লাল চট্টোপাধ্যায় (বীরভূম)
আনন্দ প্রসাদ চৌধুরী (ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল)
ই. ই. করস্টোর ফাইন (ভারতীয় চা-সমিতি)
বীণা দাস (কলকাতা, কেন্দ্রীয়)
ব্রজমাধব দাস (রংপুর)
যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস (ত্রিপুরা)
রাধানাথ দাস (হুগলী উত্তর-পূর্ব)
যুগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি)
সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত (বগুড়া—পাবনা)
কানাইলাল দেব (বর্ধমান— কেন্দ্রীয়)
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ত্রিপুরা)
কানাইলাল দে (বাঁকুড়া—পশ্চিম)
মনোরঞ্জন ধর (উত্তর বাংলা মিউনিসিপ্যাল)
হরেন্দ্রনাথ দলুই (ঝাড়গ্রাম-ঘাটাল)
ডি. আই. ডাফ (ভারতীয় পাটকল সমিতি)
সুকুমার দত্ত (হুগলী দক্ষিণ-পশ্চিম)
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (ব্যারাকপুর, কারখানা প্রতিনিধি)
মৌলবি ইব্রাহিম খাঁ (টাঙ্গাইল উত্তর)
ইমাদুদ্দিন আহম্মদ (রংপুর দক্ষিণ)
ইস্কান্দার আলী খান (মাদারীপুর পশ্চিম)
এ. জে. এমেরী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ইউরোপীয়)
ফরিদ আহম্মদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম উত্তর-পূর্ব)
এ. কে. ফজলুল হক (বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ)
ফজলুল করিম (রামগঞ্জ, রায়পুর)

ফজলুল কাদির (চট্টগ্রাম উত্তর)
ফজলুর রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
ফজলুর রহমান (জামালপুর পূর্ব)
ফজলুর রহমান (নোয়াখালী উত্তর)
এফ. ডব্লিউ. ফিক্স (কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি)
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (২৪ পরগনা, মিউনিসিপ্যাল)
অরবিন্দ গায়েন (হাওড়া)
এ. কে. ঘোষ (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
বিমল কুমার ঘোষ (বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স)
শূন্য (কলকাতা পূর্ব)
হরেণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী (নোয়াখালী)
ডি. গোমেজ (কলকাতা-প্রেসিডেন্সি বিভাগ)
আর. এ. গোমেজ (ঢাকা বিভাগ)
প্রতাপচন্দ্র রায় (ফরিদপুর)
জে. সি. গুপ্ত (কলকাতা দক্ষিণ)
মনোরঞ্জন গুপ্ত (বাকেরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব)
ডেম্বার সিং গুরুং (দার্জিলিং)
সৈয়দ হাবিবুল হক (কিশোরগঞ্জ উত্তর)
হাফিজুদ্দিন চৌধুরী (ঠাকুরগাঁও)
কুবেরচন্দ্র হালদার (মুর্শিদাবাদ)
হামিদুদ্দিন আহম্মেদ (কিশোরগঞ্জ পূর্ব)
হাসান আলি (দিনাজপুর, পশ্চিম)
হাতেম আলী খান সাহেব (পিরোজপুর দক্ষিণ)
আর. হেউড (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
হুসনে আরা বেগম (কলকাতা, মুসলিম)
ই. এ. হাচিসন (কলকাতা উপশহর)
ইলিয়াস আলী মোল্লা (২৪ পরগনা কেন্দ্র)
এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী (মুসলিম চেম্বার অব কমার্স)
ঈশ্বর দাস জালাল (কলকাতা পশ্চিম)
জসিমুদ্দিন আহম্মেদ (২৪ পরগনা দক্ষিণ)
জনাব আলি মিঞা (চাঁদপুর পূর্ব)

কবির আহম্মেদ চৌধুরী (কক্সবাজার)
সাহেবজাদা সৈয়দ কাজেম আলী মির্জা (মুর্শিদাবাদ)
খয়রাত হোসেন (নীলফামারী)
দেবীপ্রসাদ খয়তান (ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স)
মোঃ খোদাবক্স (বহরমপুর)
খুররম খান পন্নী (টাঙ্গাইল দক্ষিণ)
নিশীথ নাথ কুণ্ডু (দিনাজপুর)
প্রভাষচন্দ্র লাহিড়ী (রাজশাহী)
এইচ. এ. লুক (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
লুৎফর রহমান (যশোর সদর)
লুৎফর রহমান দেওয়ান (পাবনা পূর্ব)
জি. এম. ম্যাকিনলে (ভারতীয় পাটকল সমিতি)
মাদার বক্স (রাজশাহী কেন্দ্র)
মফিজুদ্দিন আহম্মেদ (ত্রিপুরা দক্ষিণ)
সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল (পিরোজপুর উত্তর)
মোহাম্মদ ওয়াইস (রংপুর উত্তর)
মোহাম্মদ সাইদ মিঞা (মালদহ উত্তর)
চারুচন্দ্র মাহান্তী (মেদিনীপুর কেন্দ্র)
স্যার উদয় চাঁদ মাহাতাব (বর্ধমান, জমিদার প্রতিনিধি)
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (বর্ধমান বিভাগ, উত্তর)
নিশাপতি মাঝি (বীরভূম)
মুজিবর রহমান (নোয়াখালী কেন্দ্র)
ভূপতি মজুমদার (হুগলী-হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি)
ঈশ্বরচন্দ্র মাল (মেদিনীপুর দক্ষিণ-পূর্ব)
ডাঃ এ. এম. মালিক (পানি সরবরাহ শ্রমিক সমিতি)
আশুতোষ মল্লিক (বাঁকুড়া পশ্চিম)
আনন্দ প্রসাদ মণ্ডল (বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম)
বাঁকুবিহারী মণ্ডল (বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম)
শূন্য (বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ-পশ্চিম)
কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (মেদিনীপুর কেন্দ্র)
মনিরুদ্দিন আকন্দ (রাজশাহী উত্তর)

মর্তুজা রেজা চৌধুরী (জঙ্গিপুর)
মসিউদ্দিন আহমেদ (রাজামিয়া) (মানিকগঞ্জ)
আবু তৈয়ব মাজহারুল হক (ঢাকা কেন্দ্র)
জে. এইচ. মেথহোল্ড (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
মোবারক আলী আহম্মদ (বগুড়া উত্তর)
মোহাম্মদ শরীফ খান (হুগলী-হাওড়া)
মোহাম্মদ আলী (বগুড়া পশ্চিম)
শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
জে. ই. মরিস (রাজশাহী বিভাগ)
ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন (বাগেরহাট)
মুদাসসির হোসেন (বীরভূম)
মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (ফেনী)
মোহাম্মদ ইদ্রিস (হাওড়া)
মোহাম্মদ ইসহাক (বগুড়া দক্ষিণ)
মোহাম্মদ ইসরাইল (কিশোরগঞ্জ দক্ষিণ)
মওলানা হাজি মোহাম্মদ কাসেম (বাকেরগঞ্জ পশ্চিম)
মোহাম্মদ কামরুদ্দিন (ব্যারাকপুর)
মোহাম্মদ রফিক (কলকাতা উত্তর)
মোহাম্মদ রুকুনদ্দিন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
সৈয়দ মোহাম্মদ সিদ্দিক (বাঁকুড়া)
ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জী (হুগলী উত্তর-পূর্ব)
মুকুন্দবিহারী মল্লিক (খুলনা)
বসন্তলাল মুরাকা (কলকাতা কেন্দ্র)
নবাব খানবাহাদুর মোশারফ হোসেন (জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং)
মোজাফফর রহমান চৌধুরী (বালুর ঘাট)
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী (প্রেসিডেন্সি, জমিদার প্রতিনিধি)
মোহাম্মদ নাজমুল হক (মালদহ দক্ষিণ)
কে. নসরুল্লাহ (ঢাকা মিউনিসিপ্যাল)
অর্ধেন্দুশেখর নস্কর (২৪ পরগনা উত্তর-পশ্চিম)
হেমচন্দ্র নস্কর (২৪ পরগনা দক্ষিণ-পূর্ব)
নবাব আলী (ত্রিপুরা পশ্চিম)

নওয়াজেস আহম্মেদ (নদীয়া পূর্ব)
নাজির হোসেন খন্দকার (কুড়িগ্রাম দক্ষিণ)
কে. নুরুদ্দিন (কলকাতা দক্ষিণ)
নুরুজ্জামান (ভোলা উত্তর)
নুরুল আমিন (ময়মনসিংহ পূর্ব)
ওসমান আলি (নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ)
মোহাম্মদ ওসমান গনি (সিরাজগঞ্জ উত্তর)
পনিরুদ্দিন আহম্মেদ (কুড়িগ্রাম উত্তর)
যাদবেন্দ্র পাঞ্জা (বর্ধমান কেন্দ্র)
পি. আই. জি. ডব্লিউ. প্যারিস (কলকাতা ও উপশহর-ইউরোপীয়)
এল. আর. পেস্টনী (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
আর.আই. প্ল্যাটেল (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
আনন্দীলাল পোদ্দার (মাড়োয়ারী সমিতি)
শূন্য (বর্ধমান বিভাগ, ইউরোপীয়)
পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক (নদীয়া)
রজনীকান্ত প্রামাণিক (মেদিনীপুর পূর্ব)
শূন্য (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি)
কমল কৃষ্ণ রায় (বাঁকুড়া পূর্ব)
নগেন্দ্র নারায়ণ রায় (রংপুর)
রজনীকান্ত রায় বর্মণ (রংপুর)
ই. এম. রিকেটস (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
ধনঞ্জন রায় (ঢাকা পূর্ব)
হরেন্দ্রনাথ রায় (দিনাজপুর)
কিরণ শঙ্কর রায় (পূর্ব বাংলা —মিউনিসিপ্যাল)
রামহরি রায় (দিনাজপুর)
এস. এ. সালাম (নারায়ণগঞ্জ উত্তর)
বিজয়কৃষ্ণ সরকার (খুলনা)
প্রফুল্লরঞ্জন সরকার (ময়মনসিংহ পূর্ব)
আশালতা সেন (ঢাকা, সাধারণ)
দেবেন্দ্রনাথ সেন (কলিয়ারী কয়লা খনি)
যতীন্দ্রনাথ সেন (বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ-পূর্ব)

নেলি সেনগুপ্তা (চট্টগ্রাম)
সৈয়দ সিরাজুল হক (ত্রিপুরা দক্ষিণ)
সিরাজুদ্দিন আহম্মদ (মেদিনীপুর)
সিরাজুদ্দিন আহম্মেদ (গাইবান্ধা উত্তর)
সিরাজুল ইসলাম (বনগাঁ)
শামসুদ্দিন আহম্মেদ (কুষ্টিয়া)
শামসুদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী (বাদশা মিঞা) (ফরিদপুর পূর্ব)
শামসুদ্দিন আহম্মেদ খন্দকার (গোপালগঞ্জ)
মোহাম্মদ শামসুদ্দিন সিকদার (পটুয়াখালী দক্ষিণ)
মওলানা শামসুল হুদা (ময়মনসিংহ দক্ষিণ)
শরফুদ্দিন আহম্মদ (ময়মনসিংহ উত্তর)
নরেন্দ্র সিং সিনহা (রাজশাহী, জমিদার প্রতিনিধি)
অরুণচন্দ্র সিনহা (চট্টগ্রাম, জমিদার প্রতিনিধি)
বিমলচন্দ্র সিনহা (২৪ পরগনা দক্ষিণ-পূর্ব)
ডি.জি. স্মিথবার্ণ (দার্জিলিং)
এ. এফ. স্টার্ক (কলকাতা এবং উপশহর)
এন. স্টোকম (কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি)
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (২৪ পরগনা—মিউনিসিপ্যাল)
তোফাজ্জল আলি (ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব)
এ. ডব্লিউ. ও. বি. ই. টেলর (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (ফরিদপুর)
এন. কে. টড (ঢাকা বিভাগ, ইউরোপীয়)
তোফাজ্জল হোসেন (ঝিনাইদহ)
সি. পি. জি. ওয়েড় (চট্টগ্রাম বিভাগ, ইউরোপীয়)
জে. আর. ওয়াকার (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
আর. বি. হোয়াইটহেড (ভারতীয় খনি সমিতি)
এইচ. এফ. হুইটহোম (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)
জি. উইলকিনসন (হুগলী-হাওড়া)
জি. সি. ডি. উইল্কস (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান)
ডব্লিউ. সি. সি. আই. ই. ওয়ার্ডসওয়ার্থ (কলকাতা এবং উপশহর, ইউরোপীয়)
ইউসুফ হোসেন চৌধুরী (ফরিদপুর পশ্চিম)
এ. এম. এ. জামান (হুগলী-শ্রীরামপুর, রেজিস্টার্ড কারখানা প্রতিনিধি)

১১

আমলাতন্ত্র ও লোক প্রশাসন ১৭৬৫-১৯৪৭

সিরাজুল ইসলাম*

বাংলায় (পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে) বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা আপাতবিরোধী সত্য এই যে কখনো সচেতনভাবে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে একই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে তা কার্যকর করা হয়নি, বৃটিশদের দেশীয় কর্তৃপক্ষও (কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বত্বাধিকারীগণ) অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে একে সমর্থন করেনি। অন্যান্য রাজ্য যেভাবে কোনো চূড়ান্ত যুদ্ধ বা চুক্তির পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেভাবে বাংলায় কোম্পানির রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য শুরু এবং বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের পর এক শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ মুগল সরকার থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রাপ্ত ফরমান, পরোয়ানা ও সনদ এবং এ সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি এবং মাঝে মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের মাধ্যমে।

এ পর্যায়ে প্রথম দিকে বিজিত অঞ্চলগুলির, যেমন হস্তান্তরিত (ceded) এলাকা ও দীউয়ানি এলাকাগুলির শাসনকার্য পরিচালনায় সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভ একটা শাসনপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যেটাকে প্রায়ই দ্বৈত শাসন বলে অভিহিত করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে কোম্পানি দেশে পূর্ব থেকে বিদ্যমান শাসক শ্রেণীর সঙ্গে বরং অধস্তন অংশীদার (দীউয়ান) হিসেবে ক্ষমতার অংশীদার হয়।[১] ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭০-১৭৮৫) কোম্পানিকে প্রথমে সমান অংশীদার এবং পরে অত্যন্ত প্রভাবশালী অংশীদারে পরিণত করে কোম্পানির অবস্থানকে উন্নীত করেন। লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) আরো এক ধাপ এগিয়ে যান।

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদ জানার জন্য দেখুন, Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal, 1756-1775: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan* (Cambridge 1969), Chapters 6-8.

তিনি সাবেক সরকারগুলোর ইঙ্গ-বাংলা অংশীদারিত্বের জগাখিচুরি ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল করলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে দেশীয়দের (natives) পুরোপুরি বাদ দিলেন, প্রশাসনকে করলেন সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্বাধীন বিষয়, যদিও স্পষ্টত সমকালীন রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর মনোলোকে মুগল সাম্রাজ্যের সর্বময়তার ভাবমূর্তি তখনো অটুট ছিল। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রথমদিকে দেশীয় আইন, আচার ও প্রথা প্রশাসন ও বিচারকার্যের দিকনির্দেশিকা হিসেবে অনুসৃত হতো। কিন্তু কর্নওয়ালিসের পদ্ধতিতে তৎকালীন আইন ও আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর মধ্যে বিপুল পরিবর্তন আনা হয় এবং এগুলোকে আকস্মিকভাবে বৃটিশ বিধি-বিধানের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়। ফলে একটা যৌগিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলো, যাকে আমরা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলি। কর্নওয়ালিসের গৃহীত ব্যবস্থাবলী কার্যকর করার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আরো সংস্কার সাধন করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সংস্কারের গতিতে হঠাৎ ছেদ পড়ে।[২] কারণ হচ্ছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। বৃটিশরা এই অভ্যুত্থান থেকে এই শিক্ষা লাভ করলো যে ভবিষ্যতে এই ধরনের বা এর চেয়েও মারাত্মক পরিণতি এড়াতে হলে যতো অসম্পূর্ণভাবেই হোক, রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয়দের সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ১৮৬০-এর দশক থেকে ভারতীয়দের ক্ষমতার অংশীদার করার ব্যাপারে বিপরীতমুখী সংস্কার শুরু হয়। সংস্কারের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০-এর দশকে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকের মধ্যে আমলাতন্ত্রে আধিপত্য এবং শাসনক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে ঔপনিবেশিক সরকারের আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনযন্ত্র কদাচিৎ সমপরিমাণে দেশীয় ও বৃটিশদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ছিল উভয়েরই সংমিশ্রণ এবং উভয়ের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ছিল বিভিন্ন রকম। উদাহরণত, প্রথমদিকে দেশীয়দের অংশীদারিত্ব ছিল সর্বাধিক এবং ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দশকগুলিতেও দেশীয়দের এ প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। মধ্যবর্তী সময়কালে অর্থাৎ কর্নওয়ালিস যুগ থেকে কার্জন যুগ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রে শ্বেতাঙ্গদের পূর্ণ আধিপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে সংখ্যাগত দিক থেকে যদিও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ইউরোপীয়দের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে চলে এল, এর রূপ ও প্রকৃতি সগৌরবে অপরিবর্তিত থেকে গেল। অংশীদারিত্বের প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তিতে গড়ে উঠা প্রশাসনব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছিল, কিন্তু অংশীদারিত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐকমত্য ছিল ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের সপক্ষে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে সব সময়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে, বৃটিশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনো নয়। এ কারণে ১৯৪৭ সালে

২. কোম্পানির সংস্কারের রাজনীতি সম্বন্ধে জানতে হলে দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, "Britons in India: How Heavy was the 'White Man's Burden'?" , *Bangladesh Historical Studies*, 1996.

বৃটিশরা বিদায় নিলেও ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্র শাসনের জন্য বৃটিশ আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের এই পর্যবেক্ষণের উপর এখন আমরা আরো বিশদ আলোচনা করতে পারি।

আদি প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো

দীউয়ানিপূর্ব প্রকরণ

এ কথা সত্য যে পলাশীর অব্যবহিত পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেয়নি। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভের (১৭৬৫) আগে পর্যন্ত কোম্পানি দেশের ক্ষমতাকাঠামোতে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে জাহির করেনি। তবে মুগল সাম্রাজ্যের কাঠামোর ভিতরে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শাসন করে কোম্পানি মূল্যবান প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিল। পলাশী ষড়যন্ত্রের (৩ জুন ১৭৫৭) পুরস্কারস্বরূপ মীর জাফর নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি পুরস্কার হিসেবে ২৪-পরগনার দখল পেল। নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে একটা নতুন চুক্তির অংশ হিসেবে তিনটা সুবিস্তীর্ণ চাকলা বা প্রদেশ (বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম) ১৭৬০ সালে কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কোম্পানির এই নবলব্ধ এলাকাগুলো কিভাবে শাসিত হচ্ছিল? কোম্পানি ইচ্ছা করলে কলকাতায় প্রবর্তিত তাদের শাসনব্যবস্থা এসব এলাকায় সম্প্রসারিত করতে পারতো। কলকাতার সার্বভৌম মালিক হিসেবে কলকাতাকে তারা প্রধানত বৃটিশ আইন মোতাবেক শাসন করতো।[৩] কিন্তু এসব এলাকায় তারা বৃটিশ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন থেকে বিরত থাকলো, কারণ প্রাচ্যের একটা সমাজকে খাঁটি বৃটিশ আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে শাসন করতে যাওয়া রাজনৈতিক দিক থেকে বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে না বলে তারা মনে করতো। নবলব্ধ জেলাগুলো শাসনের জন্য বৃটিশ অফিসারদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। রাজস্ব নিষ্পত্তি ও আদায়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা এবং এমনকি বিদ্যমান আমলা[৪] বা পরগনা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দ পুরোপুরি বহাল ছিল। অবশ্য জমিদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্মমভাবে খর্ব করা হয়েছিল।[৫] সর্বতোভাবে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা গঠিত তিন সদস্যের একটি প্রাদেশিক পরিষদ প্রত্যেক হস্তান্তরিত জেলায় গঠন করা হয়েছিল।[৬] এই পরিষদগুলোকে দায়ী করা হলো এক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে,

৩. কোম্পানির বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় প্রজারা মেয়রের আদালতের এখতিয়ারাধীন ছিল এবং এই আদালত খাঁটি বৃটিশ আইন মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন করতো। দেশীয় প্রজারা ছিল জমিদারি কাছারির এখতিয়ারাধীন। এই কাছারির নিয়মকানুন ছিল দেশীয় ও ইউরোপীয় আইনব্যবস্থার জগাখিচুরিবিশেষ।

৪. 'আমলা' আরবি 'আমিল'-এর বহুবচন, অর্থ প্রশাসক।

৫. বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য, W. K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal portion of the Fifth Report*, (Calcutta reprint 1962), chapter on 'The Ceded Lands'.

৬. 'জেলা' ছিল 'প্রেসিডেন্সি'র মতো একটা ব্যবসায়িক শব্দ। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসারত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই শব্দ ব্যবহার করতো। বিশেষ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ কুঠি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতো এবং এ অঞ্চলের নাম দেয়া হয় জেলা। তারা মুগলদের ব্যবহৃত শব্দ 'চাকলা'র অর্থ করেছিল একাধারে প্রদেশ এবং জেলা। হেস্টিংসের শাসনামলে অনেকগুলো পরগনা মিলিয়ে গঠিত হয় জেলা, এই অর্থে জেলা শব্দটা সরকারি পর্যায়ে ব্যবহৃত হতো।

যার নামকরণ করা হয় কমিটি অব নিউ ল্যান্ডস। এই কমিটি গঠিত হয় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর এবং পরিষদের ছয় সদস্যের সমন্বয়ে। বস্তুত গভর্নর ও তাঁর পরিষদকে কমিটি অব নিউ ল্যান্ডস নামে অভিহিত করা হলো যখন তাঁরা এই জেলাগুলোর কার্য সম্পাদন করছিল। কমিটির সভাপতি ছিলেন গভর্নর।[৭] এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্র থেকেই ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইঙ্গ-মুগল অংশীদারিত্ব ১৭৬৫-১৭৯৩

রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ করেন। এযাবৎ মুগল প্রাদেশিক সরকার দুই ধরনের আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসিত হতো। একটা ছিল নিজামত বা সামরিক আমলাতন্ত্র, যেটা নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় দিকগুলি পরিচালনা করতো; অপরটা ছিল দীউয়ানি বা বেসামরিক আমলাতন্ত্র, যেটা রাষ্ট্রের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করতো। নিজামতের প্রধান ছিলেন সুবাদার, দীউয়ানির প্রধান ছিলেন দীউয়ান। এই দুই ধরনের আমলাতন্ত্র আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরস্পর স্বাধীন ছিল। মুগল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাধীনে নাজিম ও দীউয়ান সমান পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, সম্রাটের কাছেই দায়ী থাকতেন। নবাবি আমলে যখন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেল, তখন দুটি পদে অধিষ্ঠিত হলেন একই ব্যক্তি অর্থাৎ নবাব, যিনি কেন্দ্রের অধীনতা থেকে কার্যত মুক্ত হয়ে গেলেন। রবার্ট ক্লাইভ সম্রাটের সাথে দেখা করে তাঁকে উৎসাহিত করলেন সম্রাটরূপে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তাঁর দীউয়ান নিযুক্ত করতে, যার বিনিময়ে কোম্পানি সম্রাট ও নবাবকে ধার্যকৃত বার্ষিক কর প্রদান করবে। সম্রাট ক্লাইভের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ান নিযুক্ত করা হয়।

এরপর রবার্ট ক্লাইভ এবং ফোর্ট উইলিয়মে কর্মরত তাঁর পরিষদের সামনে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কিভাবে তাঁরা দীউয়ানি পরিচালনা করবেন ? তাঁরা কি বিদ্যমান ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র অপরিবর্তিত রাখবেন, নাকি এগুলোর স্থলে তাঁদের পছন্দমতো নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন ? এ সম্পর্কে ক্লাইভের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থা অটুট রাখার পক্ষে। তিনি যুক্তি দেখান যে হস্তান্তরিত এলাকাগুলোতে এযাবৎ প্রচলিত প্রত্যক্ষ প্রশাসন অত্যন্ত অদক্ষ এবং হয়রানিমূলক। প্রত্যেকটা হস্তান্তরিত এলাকায় অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ লেগেই থাকতো। সরেজমিনে কোম্পানির প্রশাসকরা দেখেছিলেন যে বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত ও অসন্তুষ্ট শাসক শ্রেণী উপর্যুপরি ঘটমান প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের পেছনে সক্রিয়

৭. Governor Henry Vansittart to Harry Verelst, Chief of the Council at Chittagong, 21 January 1761, Sirajul Islam (ed.), *Bangladesh District Records : Chittagong*, vol. 1 (1760-1787), (Dhaka 1978) doc, no. 2.1. 118.

রয়েছে এবং এতে তাদের প্রজাকুল ও দোসরদের সমর্থনের অভাব নেই।[৮] কাজেই দীউয়ানি প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনার চেষ্টা পরিহার করে বিপদ ডেকে না আনা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে বলে ধারণা করা হয়। তাই ক্লাইভ মনে করলেন, বিজিত জনগণকে শান্ত রাখার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো প্রথাগত আমলাতন্ত্র ও ভূস্বামী এলিট শ্রেণীকে না ঘাঁটিয়ে কোম্পানির কর্মকাণ্ড দরবার পর্যায়ে দেশীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'জমা' বা রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত। ক্লাইভের মতে, দেশ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা বাংলায় কোম্পানির বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও একটি সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা।[৯] স্বদেশে কর্তৃপক্ষ ক্লাইভের অভিমত গ্রহণ করলেন। ফলে ক্লাইভ একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুললেন, যা দেশীয় ব্যক্তিবর্গকে সকল তদারকি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে।

ক্লাইভের ব্যবস্থাধীনে নিজামত বা সামরিক বাহিনী ও পুলিশের উপর নিয়ন্ত্রণ নবাবের হাতে ন্যস্ত হলো। রাজস্ব ও আনুষঙ্গিক বেসামরিক প্রশাসন, যেটা সম্রাটের দীউয়ান হিসেবে কোম্পানির দায়িত্বের আওতাভুক্ত, সেটাও কোম্পানি কিছুটা পরোক্ষভাবে পরিচালনা করতে লাগলো মুৎসুদ্দি বা স্থানীয় নায়েব-নাজিমদেরকে স্বাধীনভাবে দীউয়ানি প্রশাসন চালিয়ে যেতে দেয়ার মাধ্যমে। বাংলায় দীউয়ানি প্রশাসন পরিচালনার জন্য ডেপুটি দীউয়ান নিযুক্ত করা হলো সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে। তিনি ছিলেন পারস্য থেকে আগত এক ভাগ্যান্বেষী, যিনি পলাশী-উত্তর যুগে রাজস্ব প্রশাসনের কাজে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে কলকাতার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ থেকে দীউয়ানি কার্য পরিচালনা করতে বলা হলো। এর উদ্দেশ্য ছিল মুগল অভিজাতবর্গকে এই ধারণা দেয়া যে কোম্পানি তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং কনিষ্ঠ অংশীদার মাত্র।

ক্লাইভের পদ্ধতি এই অর্থে অত্যন্ত সফল ছিল যে দেশীয় রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণী বা মুৎসুদ্দিদের কেউই এই পদ্ধতি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে নি। কিন্তু এই পদ্ধতি সফল হলেও কোম্পানির কর্মচারীদের রাজনৈতিক অভিলাষের প্রেক্ষিতে এ পদ্ধতি যে দীর্ঘদিন টিকবে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যেত। ১৭৬৯ সালে ক্লাইভের ব্যবস্থা ধসে পড়লো যখন জেলা পর্যায়ে ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হলো। সরাসরি দেশ

৮. দ্রষ্টব্য, Firminger, *Historical Introduction;* A. M. Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong 1761-1785* (Chittagong 1971), প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : 'Direct Administration'.

৯. ক্লাইভ সচেতন ছিলেন যে বৃটিশ রাজ ইতিপূর্বে তাঁর দেশজয়ের পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়েছে এবং ১৪ জানুয়ারি ১৭৫৮-এর সরকারি সনদপত্রবলে পার্লামেন্টের পূর্বানুমতি না নিয়ে বিদেশী শক্তির কাছ থেকে জমি ক্রয় করার অধিকার থেকেও কোম্পানিকে বঞ্চিত করেছে। তাছাড়া, বাংলার মতো একটি প্রাচীন রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য পর্যাপ্ত জনশক্তি ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কোনোটাই কোম্পানির ছিল না। তদুপরি, কোম্পানির কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই অর্থলোভীর মতো আচরণ করছিল; তাদের হাতে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা থাকলে তারা আরো বেপরোয়া লুণ্ঠন শুরু করতো। বাংলার প্রশাসন সম্পর্কে ক্লাইভের রাজনৈতিক ধারণার উপর একটা অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা দেখুন, Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal 1756-1775: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan* (Cambridge 1969), chapter 6.

শাসন না করে জেলা তত্ত্বাবধায়কদের নির্দেশ দেয়া হলো স্থানীয় আচার-প্রথা, অর্থনৈতিক সম্পদ, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, দেশীয় নিয়ন্ত্রণপ্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে।[১০] কার্যত এটাই ছিল উত্থানশীল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

১৭৭০ সালের মধ্যে বাংলায় কোম্পানির কর্মচারীরা অনুভব করলো যে তারা এখন সরাসরি রাজ্য শাসনের জন্য নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে অধিকতর পরিমাণে সক্ষম। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৭৪) দীউয়ানি শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং ইউরোপীয় কর্মচারীদের অভ্যন্তরে পাঠালেন রাজস্ব প্রশাসনে মুৎসুদ্দিদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করবার জন্য। ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেলরূপে (১৭৭৪-৮৫) আমলাতন্ত্রকে আরো জোরদার করলেন। তিনিই দেশীয় মুৎসুদ্দিদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব জোরালোভাবে খর্ব করে তাদের স্থলে জেলা কালেক্টরদের নিয়োগের মাধ্যমে এই আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৮৬ সালে কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন ১৭৮৪ সালের আইনানুসারে। তাঁর উপর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে এবং মুৎসুদ্দিদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির সকল ভনিতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিল, ১৭৯৩ সালে কোম্পানির সনদপত্র নবায়ন করলো। একই বছর সপরিষদ গভর্নর জেনারেল চার্লস কর্নওয়ালিস এই নতুন রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক খুঁটিনাটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিলেন।

আধুনিক আমলাতন্ত্রের পত্তন, ১৭৯৩

নতুন রাষ্ট্র শাসন করার জন্য কোম্পানির তিন ধরনের বেসামরিক কর্মকর্তা ছিল— চুক্তিবদ্ধ (covenanted), অচুক্তিবদ্ধ (uncovenanted) এবং দেশীয় আমলা। যেসকল কর্মকর্তাকে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সরাসরি নিয়োগ করতো তাদের বলা হতো চুক্তিবদ্ধ (covenanted) কর্মকর্তা, কারণ প্রাচ্যে কোম্পানির বিষয়াবলী সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার সূত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও দায়দায়িত্ব উল্লেখ করে তারা কোম্পানির সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতো। তারা কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক নিযুক্ত হতো এবং কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট দায়ী থাকতো। চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্টদের সংক্ষেপে সিভিলিয়ান বলা হতো। যেসকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কলকাতা সরকার নিয়োগ দিত, তাদের বলা হতো অচুক্তিবদ্ধ (uncovenanted) সিভিল সার্ভেন্ট। চুক্তিবদ্ধ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মতো তারা স্বদেশের সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতো না এবং তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার নিশ্চিয়তা বিধান করে কোনো চুক্তিও সম্পাদিত হতো না। আরেক শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিল মুৎসুদ্দি বা দেশী আমলা। বস্তুত তারা মুগল আমলাতন্ত্রেরই ছিটেফোঁটা অংশ। ১৭৮৬ সালে উচ্চ বেতনভুক দেশী আমলাদের বাদ

১০. Abdul Majed Khan, *Transition*, 200-1.

দেয়া হয়।[১১] তখন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ আমলারা তুলনামূলকভাবে স্বল্প বেতন পেত। এর পেছনে যুক্তি ছিল এই যে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার সুবিধা দেয়া হয়েছিল, এবং তাদের দাপ্তরিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে কোম্পানির জাহাজে পণ্য পরিবহনের জন্য বিনা মূল্যে তাদের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হতো।

কোম্পানির শাসনামলে আমলাতন্ত্র

কর্নওয়ালিসের প্রশাসন আঞ্চলিক প্রশাসনকে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে পৃথক করে দেয় এবং প্রশাসনিক চাকুরিকে পুরোপুরি একটা পেশায় পরিণত করে, যার সাথে ব্যবসার কোন সম্পর্ক থাকলো না। সিভিলিয়ানদের প্রকাশ্যে বা বেনামীতে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হওয়া বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং বিধি লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা অনুমোদিত ছিল, ক্ষতিপূরণ বাবদ সিভিলিয়ানরা মোটা অঙ্কের অর্থ পেতেন।[১২] এই নিয়মও প্রবর্তিত হয় যে রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্টরা পূরণ করবেন অথবা সকল সিভিলিয়ান এসব পদে নিয়োজিত হবেন, যাঁরা কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের সামনে এই মর্মে শপথ নেবেন যে তাঁরা সর্বদাই নির্ধারিত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হবেন, বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সিভিলিয়ানরূপে কর্তব্য পালনের সময় কখনোই কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো প্রলোভনের বশবর্তী হবেন না।[১৩]

একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্ট হতে হলে তার ক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে যে দেশীয় কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের অন্য কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকতে পারবেন না, কারণ কারো পক্ষে লন্ডনে গিয়ে প্রথমে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের একজন সদস্যের কাছ থেকে মনোনয়ন লাভ করা এবং তার পরে ভারতে কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে রাইটারের পদের জন্য অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া

১১. Extract from the Proceedings of the Hon'ble Governnor General and Council, 7 April 1786, in Sirajul Islam (ed.), *Bangladesh District Records: Dacca District*, vol. 1 (1784-1787), (Dacca University 1981), 190-91.

১২. জেলা কালেক্টর ও জজের বেতন ছিল ২৫০০ সিক্কা টাকা থেকে ৩০০ সিক্কা টাকা। স্টার্লিং-এর মূল্যমান অনুসারে এই অঙ্ক সেই সময় বৃটেনে অধিকতর শিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন সমপর্যায়ের অফিসারদের যে বেতন দেয়া হতো, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু দেশী আমলাদের বেতনক্রম হ্রাস করা হলো। কিছু আমলাকে, যেমন মুনসেফদের নামমাত্র বেতন দেয়া হতো সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে ফি আদায়ের মাধ্যমে। এর সপক্ষে কর্নওয়ালিসের যুক্তি এই যে বেশি বেতন দেশীয় আমলাদের নৈতিক উন্নতি সাধনে উৎসাহী করবে না, যাদের নৈতিকতা প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও সামাজিক ধারা অনুসারে কমবেশি স্থির হয়ে আছে। স্থানীয়দের প্রশাসন থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁর যুক্তিও ছিল এটাই।

১৩. সিভিল সার্ভিসের নিয়ম ও বিধিমালা ১৭৯৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট-এর ৫৬, ৫৭, ৬০ ধারায় বিধৃত হয়েছে।

কার্যত অসম্ভব।[১৪] কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের জন্য শিক্ষানবিশ মনোনয়ন কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের একক অধিকার ছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় এটা প্রত্যাশিত ছিল না যে কোনো ডিরেক্টর একজন ভারতীয়কে লন্ডনে শিক্ষানবিশির জন্য মনোনয়ন দেবেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নবগঠিত আমলাতন্ত্র থেকে দেশীয়দের সর্বাংশে বাদ দেয়া রাজনৈতিক দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। আমরা শীঘ্রই দেখতে পাবো যে এটা পরবর্তী যুগে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ধারা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সুতরাং ১৭৯৩ সালে বিন্যস্ত আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো প্রশাসন থেকে বাণিজ্যের পৃথকীকরণ, এবং এজন্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক নিযুক্ত একটা স্থায়ী শিক্ষানবিশবাহিনী গঠন, সিভিলিয়ানদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেতন নির্ধারণ এবং প্রশাসন থেকে দেশীয়দের অব্যাহতি দান। এটা অবশ্যই ছিল একটা চরম ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে দ্রুত রাজনৈতিক ও অন্যান্য পরিবর্তনের কারণে কর্নওয়ালিসের আমলাতন্ত্র সংশোধন ও পুনর্গঠন করতে হয়।

প্রশাসনের সাথে জড়িত অধিকাংশ আমলা অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের নিয়োগ প্রদান করতো কলকাতা সরকার। কোনো কোভেন্যান্ট বা চুক্তির আওতায় তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা ছিল না এবং যেকোন সময় যেকোন কারণে তাদের বরখাস্ত করা যেতো। তাদের বেতন অবশ্যই স্বল্প ছিল, কিন্তু বেতন যতই কম হোক, সকল নিয়োগ ও বেতনের ব্যাপারে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুমোদন নিতে হতো। উদাহরণত, যদি একজন শুল্ক কালেক্টরের গুদামের জন্য প্রহরীর প্রয়োজন হতো, এজন্য তাঁকে সম্ভাব্য ব্যয় ও লাভের পূর্ণ বিবরণসহ যুক্তি প্রদর্শন করে প্রস্তাব পেশ করতে হতো, যা জেলা কালেক্টর, রাজস্ব বোর্ড এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের বিবেচনার জন্য পাঠানো হতো এবং এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একই পথ ধরে উপর থেকে নীচে প্রস্তাব উত্থাপনকারী কর্মকর্তার নিকট ফিরে আসতো। এতে বোঝা যায় যে আর্থিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া এতই কেন্দ্রীভূত ছিল যে কেবল কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের যথাযথ মঞ্জুরি নিয়েই বড় বা ছোট যেকোন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হতো। তৎকালে যেহেতু যোগাযোগ সময়সাপেক্ষ ছিল, যেকোনো ব্যয়সাপেক্ষ কাজ সম্পাদন করতে দীর্ঘ সময় লাগতো এবং জনগণের যেকোনো কাজের সাথে খরচ জড়িত ছিল। তাই এ ধরনের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অকুস্থলে জনগণের উদ্যম এবং উন্নয়নপ্রয়াসকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এভাবে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা ও অচলাবস্থা ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়লো।

১৪. কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত হবার পর একজন প্রার্থী কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করতো একজন রাইটার হিসেবে। ভারতে চুক্তিবদ্ধ কোনো পদে নিয়োগদানের পূর্বে প্রার্থীকে রাইটার হিসেবে বহাল করা হতো। একজন পরিচালকের সুপারিশে প্রার্থী নির্বাচন করা হতো। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের প্রত্যেক সদস্য নির্দিষ্ট সংখ্যক রাইটারের মনোনয়ন দিতে পারতেন।

নতুন পদ সৃষ্টির পথে শত বাধা সত্ত্বেও এবং কর্নওয়ালিস কর্তৃক ভারতীয়দের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে দূরে রাখবার নীতি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ওয়েলেসলি প্রশাসন দেশীয়দের জন্য অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে কতকগুলো পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছিল। এর তাৎক্ষণিক কারণ হলো ভারতে বৃটিশ রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার এবং তার ফলে শ্বেতাঙ্গ জনশক্তির স্বল্পতা, এবং গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি। জেলা জজকে সহায়তা করতে দেশীয়দের জন্য সদর আমিন নামে একটা বিচার বিভাগীয় পদ সৃষ্টি করা হয়। অর্থনীতি ও জনশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা বিবেচনায় বেনটিঙ্ক প্রশাসন অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে দেশীয়দের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেনটিঙ্ক প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন নামে আরেকটি বিচার বিভাগীয় পদ সৃষ্টি করেন। প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিনের দাপ্তরিক মর্যাদা ছিল অতিরিক্ত জেলা জজের পরেই। জেলা কালেক্টরকে সহায়তা করার জন্য তিনি দেশীয়দের জন্য ডিপুটি কালেক্টর নামে একটা পদ সৃষ্টি করলেন। দেশীয়দের জন্য সৃষ্ট প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ কর্নওয়ালিসের সিভিল সার্ভিসে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করলো। ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট বলবৎ হওয়ায় কর্নওয়ালিসের সৃষ্ট জাতিভিত্তিক বাধা অপসারিত হলো এবং অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস দেশীয়দের মধ্যে কিছুটা মর্যাদা লাভ করলো। ১৮৪০ সালের দিকে অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে, বিশেষভাবে বিচারবিভাগের চাকুরিতে দেশীয়দের সংখ্যা তেমন কম ছিল না, কিন্তু তখনো তারা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বশীল পদ এবং উচ্চ বেতনের পদে নিয়োগ লাভ করতো না, যেগুলো শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এসব পদ লাভ করতে অভিলাষী ভারতীয়দের পরবর্তী সুযোগ গ্রহণ করতে হতো এবং তা হচ্ছে যোগ্যতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি।[১৫]

চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস : পৃষ্ঠপোষকতা থেকে প্রতিযোগিতা

আধুনিক আমলাতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকল স্তরে প্রতিযোগিতা। এই পদ্ধতি কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বলতে গেলে অনুপস্থিত ছিল। রাইটারদের বাছাই করা হতো কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এবং নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্যদের ব্যক্তিগত মনোনয়নের মাধ্যমে। প্রতি বছর কোর্টের চেয়ারম্যান দু'জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে পারতেন এবং নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান দু'জন এবং পরিচালক বোর্ডের প্রত্যেক পরিচালক একজন করে মনোনয়ন দিতে পারতেন। রাইটার কাজের বিনিময়ে নগদ উপহার প্রদান করতেন, এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যোগ্যতার বদলে অর্থই হয়ে গেল মনোনয়নের মাপকাঠি। কর্নওয়ালিস এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে পার্লামেন্টকে প্রণোদিত করতে সফল হয়েছিলেন। মুক্ত বাণিজ্যের সপক্ষে আন্দোলনকারীরা এ আইন প্রণয়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিলেন। ১৭৯৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট-এর বিধান

১৫. ১৮৫৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে সাত হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষরিত একটা আরজি পেশ করা হয়েছিল, যেটাতে প্রশাসনে ভারতীয়দের জন্য ন্যায্য অংশ দাবি করা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, *Parliamentary Papers*, House of Commons, vol. 27 (1852-53).

মোতাবেক কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের সদস্যদের এই মর্মে শপথ নিতে হতো যে রাইটারশিপের জন্য মনোনীতদের কাছ থেকে তাঁরা কোনো নগদ অর্থ বা উপহার নেবেন না। শিক্ষানবিশদের কাছ থেকে উপহার নেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ডিরেক্টরগণ তাঁদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের স্বার্থ হাসিলের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন।

ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে এগিয়েছে পেশাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস গঠনের প্রক্রিয়া। ভূখণ্ডের দিক দিয়ে এবং বস্তুগতভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া ১৮৫৮ সালে কোম্পানিশাসনের অবসান পর্যন্ত অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এগিয়েছে। রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র গঠনপ্রক্রিয়াও অব্যাহত ছিল। যখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ছিল কেবল বৃহত্তর বাংলার মধ্যে সীমিত, তখন কর্নওয়ালিস যে ধরনের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ১৮২০-এর দশকে যখন এ আমলাতন্ত্র সর্বভারতীয় আকার নিল এবং আরো পরিমার্জিত হয়ে উঠল তখন সঙ্গতিহীন হযে পড়লো। তা ছাড়া ১৮১৩ সালে কোম্পানি তার একচেটিয়া ব্যবসা হারালো এবং বৃটিশ ভারতকে মুক্ত বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হলো। ১৮২০-এর দশক থেকে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপনের পালা শুরু হলো। তাই নতুন সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কর্নওয়ালিসসৃষ্ট আমলাতন্ত্র সংশোধন ও সময়োপযোগী করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৮৩৩ সালে সেই সুযোগ এল যখন কোম্পানির সনদপত্র নবায়নের জন্য পার্লামেন্টে পেশ করা হলো।

সনদপত্র কোম্পানিকে পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার প্রদান করেছিল। কিন্তু পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে এই বিশেষ সুবিধাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর মোকাবিলা করার জন্য কোম্পানিও পার্লামেন্টে তার সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করছিল। এভাবে পার্লামেন্টেও কোম্পানির একটা সমর্থক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হলো, যেটা কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারের পক্ষে লড়তো। যাহোক, যারা কোম্পানির অধিকার, এমনকি তার অস্তিত্বও বিলোপ করতে চেয়েছিল, তারা ১৮৩৩ সালে নবায়িত চার্টার এ্যাক্টে এই মর্মে একটি বিধি সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হলো যে এখন থেকে প্রত্যেক ডিরেক্টর চারজন করে প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবেন, যাঁদের মধ্যে একজনকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা হবে। বাছাই করবে হেইলবারী কলেজের একটা বাছাই বোর্ড। অধিকার বিলোপের সমর্থকবৃন্দ চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসকে প্রতিযোগিতামূলক করার পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল ১৮৩৮ সালে আর একটি বিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে, যা বোর্ড অব কন্ট্রোলকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম করলো যে হেইলবারি কলেজের বাছাই বোর্ড যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থীদের প্যানেল পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে এবং কোন পৃষ্ঠপোষকের প্যানেল সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বাতিল করে ফেরত দিয়ে নতুন মনোনয়ন চাইতে পারবে। এ ধরনের বিধি পৃষ্ঠপোষকের উপর

চাপ প্রয়োগ করলো পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার প্রয়োগের সময় একটু সতর্ক হতে। একই বিধির আওতায় রাইটারদের বয়স-সীমা ষোল থেকে একুশের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো।

১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট কর্নওয়ালিসসৃষ্ট ব্যবস্থায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করে। এর একটা ধারায় উল্লেখ করা হয় যে এখন থেকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কারণে কেউ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।[১৬] এটা বাস্তবিকই ছিল একটা সাধু সিদ্ধান্ত, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কেবল সকল জাতির লোক নিয়োগ করা নয়, পার্লামেন্টে হট্টগোলকারী লিবারেলদের শান্ত রাখা। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে অনড় থাকলো এবং কলকাতা সরকারকে পরামর্শ দিল বিশ্বস্ততার সাথে উক্ত দফাকে অগ্রাহ্য করে পৃষ্ঠপোষণের নিয়মকে সমর্থন দিতে।[১৭] উৎকোচ দিয়ে এবং সুবিধা দিয়ে কোম্পানি লিবারেল শক্তিগুলোর সাথে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এ বোঝাপড়ার ধরনটা ছিল এই যে পার্লামেন্টের ভেতরে লিবারেলরা যা খুশি বলবে এবং কার্যক্ষেত্রে কোম্পানি যা খুশি করবে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের অবসানের বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে কোনো ভারতীয়কে মনোনয়ন দেয়া হয়নি।

কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার দিন শেষ হয়ে আসছিল। বৃটিশ ভারত তখন এমন একটি বিশাল ও সম্পদশালী দেশ ছিল যে অন্য স্বার্থগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে শুধু একটা ব্যবসায়ী কোম্পানির পৃষ্ঠপোষণব্যবস্থার মাধ্যমে এ দেশ শাসন করা সম্ভব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধী স্বার্থগোষ্ঠীগুলো কোম্পানির কার্যাবলীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল এবং এদের সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যার ফলে উৎকোচ আর পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা বণ্টন করে তাদের আর হাত করা যাচ্ছিল না।[১৮] ১৮৫০-এর দশকের মধ্যে বিরোধী শক্তিগুলো এতই সোচ্চার ও দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো যে পৃষ্ঠপোষণ ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়লো। ১৮৫৩ সালে নবায়নকৃত চার্টার এ্যাক্টের অধীনে পার্লামেন্ট কর্তৃক পৃষ্ঠপোষণ ব্যবস্থা বিলোপ করা হলো এবং চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার নিয়ম প্রবর্তিত হলো। পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব বাস্তাবায়নের পথ ও পন্থা নির্দেশ করবার জন্য টি বি মেকলের নেতৃত্বে একটা পাঁচ সদস্যের সংস্কার কমিটি গঠিত হয়।[১৯] মেকলে কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠানের জন্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অধীনে সিভিল সার্ভিস কমিশনার্স নামে

১৬. Article 87, Charter Act of 1833, দেখুন, A., C. Banerjee (ed.), *Indian Constitutional Documents* (Calcutta 1977-78), vol. 1, 259.

১৭. Anuradha Chanda, *Public Administration and Public Opinion in Bengal*, 1854-1885 (Calcutta 1986), 30.

১৮. Ralph Braibanti (ed.), *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition* (Duke University 1966), 104-7.

১৯. দেখুন, Macaulay Report on Civil Service and discussions on it, *Parliamentary Papers* (HC), No. 34 of 1855.

একটা স্থায়ী বাছাই কমিটি গঠিত হয়। আঠারো থেকে তেইশ বছর বয়স-সীমার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল নাগরিক প্রতি বছর অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেবার যোগ্য বিবেচিত হয়। মেকলে কমিটি চেয়েছিল, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যাঁরা যোগ দেবেন, তাঁরা বাণিজ্যে উদ্যোগী ব্যক্তি না হয়ে বরং কৃতবিদ্য ব্যক্তি হবেন। কাজেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতেও ইতিহাস ও সাহিত্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এই পাঠ্যসূচি প্রণীত হয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে।[২০] বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানের উপর জোর দেয়া হয়েছিল এই চিন্তা থেকে যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত কৃতবিদ্য প্রশাসকরাই সাম্রাজ্যকে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও সহমর্মিতা দ্বারা পরিচালনা করতে পারবেন। এই প্রতিযোগিতাভিত্তিক প্রবেশনের (recruitment) আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রদেশওয়ারি নিযুক্তি। রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বের কারণে প্রার্থীরা বাংলাকে বেশি পছন্দ করতো, নববিজিত সীমান্তপ্রদেশগুলো ছিল তাদের পছন্দের তালিকায় সর্বনিম্নে। তাই প্রভাবশালী মহল থেকে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ আসতো প্রার্থীদের পছন্দের জেলাগুলোতে নিযুক্তি দেবার জন্য। এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে সবচেয়ে মেধাসম্পন্নদের নিযুক্তি নিশ্চিত করতে এই বিধান রাখা হয় যে প্রার্থীদের নিযুক্তি প্রদান করা হবে সম্পূর্ণরূপে মেধার ভিত্তিতে এবং যখন মেধার ভিত্তিতে কোন প্রার্থীকে বিশেষ একটি প্রদেশে নিযুক্তি প্রদান করা হবে, তাকে চাকুরিজীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই চাকুরি করতে হবে। যেসকল প্রার্থী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেত, তাদের নিযুক্তি দেয়া হতো বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্নদের নিযুক্তি দেয়া হতো এই বিবেচনায় যে তাদের কেবল সবচেয়ে জনসংখ্যাপীড়িত ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ কেবল শাসনই করতে হবে না, শেষ পর্যন্ত মেধার ভিত্তিতে কলকাতায় বৃটিশ ভারতের সর্বোচ্চ সরকারও পরিচালনা করতে হবে।

২০. বিষয় ও বরাদ্দ নম্বর ছিল নিম্নরূপ :

ইংরেজি রচনা	৫০০
ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস	১০০০
গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৭৫০
রোমান ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৭৫০
ফরাসি ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৩৭৫
জার্মান ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৩৭৫
ইতালীয় ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৩৭৫
গণিত	১২৫০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	৫০০
নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন	৫০০
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য	৫০০
আরবি ভাষা ও সাহিত্য	৫০০
সর্বমোট	৭৩৭৫

বৃটিশ শাসনামলে সিভিল সার্ভিস (১৮৫৮-১৯৪৭)

কর্নওয়ালিস যদিও তাঁর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'কে একটা অপরিবর্তনীয় আইনে পরিণত করেছিলেন, তথাপি ১৭৯০-৯৩ সালে তাঁর গড়ে তোলা সিভিল সার্ভিস ও লোক প্রশাসনের নীতি ও গঠনপ্রক্রিয়ায় কালক্রমে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সম্প্রসাারিত ও সুসংহত এবং পুরোপুরি মেট্রোপলিটান ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার সাথে সাথে এর আমলাতন্ত্রের ধরনেও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর পর দেশের জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখা রাজনৈতিকভাবে সম্ভব ছিল না, যারা বৃটিশ শাসনকে মেনে নিয়েছিল এবং নতুন সরকারের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং একটা যুগোপযোগী সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। বৃটেনে রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং ভারতে সামাজিক বিবর্তন এ ধরনের প্রভূত্ব কায়েম করার পথে অন্তরায় ছিল। অপর দিকে ঔপনিবেশিক প্রভুরা, যারা নিজেদের বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর জাতি এবং সভ্যতার ধারক ও বাহক মনে করতো, তাদের কাছে এটাও রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য ছিল না যে তাদেরকে দেশের জনগণের সাথে সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ দেশ শাসন করতে হবে, যদিও তাদের নিজেদের বিচারে তাদের অনেকেই মেধাগত দক্ষতা এবং নৈতিক চরিত্রের মাপকাঠিতে সমপর্যায়ের ইউরোপীয়দের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না।

সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সারা ভারতব্যাপী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রসারণ ঘটে আর তার ফলে আমলাতন্ত্রের আকার বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতি ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান মাত্রায় আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের আওতাভুক্ত করে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রেরণা ও সাহস যোগায়।

এটা সত্য যে সিভিল সার্ভিসের নিয়োগনীতিতে মেকলে কমিটি পৃষ্ঠপোষণের স্থলে প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু পরীক্ষার পাঠ্যসূচি থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের সম্পৃক্ত করাই এর লক্ষ্য। ভারতীয় প্রার্থীর তো প্রশ্নই উঠে না, ঐ দুই সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত না হলে বৃটিশ স্নাতকদের পক্ষেও প্রতিযোগিতা করা দুঃসাধ্য ছিল। ১৮৫৫ সাল থেকে প্রতিযোগিতাভিত্তিক নিয়োগনীতি অনুসৃত হচ্ছিল। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮৪ জন ভারতীয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল; পক্ষান্তরে এই সময়কালে কৃতকার্য বৃটিশ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬৪৪, যাদের অধিকাংশ অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিল। আইলিংটন (Islington) কমিশন যথার্থই মন্তব্য

করেছিল যে বৃটিশ ও ভারতীয় প্রার্থীদের সংখ্যায় এই বিরাট ফারাকের কারণ এটা নয় যে ভারতীয়রা মেধায় খাটো ছিল; এর কারণ এই যে এই ব্যবস্থায় ভারতীয়দের লন্ডনে এসে প্রতিযোগিতা করতে হতো এবং পরীক্ষা দিতে হতো এমন একটা পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে, যেটা অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ছাত্রদের অনুকূলে প্রণয়ন করা হতো।[২১]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বৃটিশ লিবারেলদের সঙ্গে একযোগে দাবি জানিয়ে আসছিল যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো একই সময়ে লন্ডনে ও ভারতে অনুষ্ঠিত করা হোক যাতে ভারতীয় প্রার্থীরা সমতার ভিত্তিতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে। কিন্তু ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি প্রকৃত অর্থে প্রতিযোগিতামূলক হোক এমন কোনো অভিপ্রায় বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের ছিল না ; তাই একযোগে বৃটেন ও ভারতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে তারা সায় দিতে পারেনি। এই পর্যায়ে ভারতীয়দের চাপ এবং বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের চাপের মুখে ১৮৮৬ সালে পাঞ্জাবের গভর্নর চার্লস এচিসনের (Aitchison) নেতৃত্বে একটি ১৫ সদস্যের সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। এচিসন কমিশন একটা সমাধান পেশ করলো, যেটা ইঙ্গ-ভারতীয় এবং ভারতীয় উভয় ধরনের স্বার্থের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করা হলো। সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সাবোর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত স্ট্যাটিউটরি সিভিল সার্ভিস বিলোপ করে অধিক বেতনসম্পন্ন নতুন দুটি ক্যাডার গঠন করা হয়।[২২] উভয় ক্যাডারই ছিল প্রাদেশিক পর্যায়ে। একটা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস, অপরটা সাবোর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস। এ দু'টি চাকুরিতে নিয়োগের পদ্ধতি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না; তা ছিল সরাসরি মনোনয়ন, বিভাগীয় পরীক্ষা এবং কর্মচারীদের সম্পর্কে গোপন মূল্যায়ন। প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের নামকরণ হয় একেকটি প্রদেশের নামানুসারে, যেমন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিস, ইত্যাদি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাবিদগণ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস নামে ভারতীয়দের জন্য আরেকটি প্রতিযোগিতামূলক বিকল্প আমলাতন্ত্র গঠন করে আইসিএস-এর সমান্তরাল একটা স্তর সৃষ্টির ঘোর বিরোধী ছিল। নতুন ব্যবস্থায় চাকুরিপ্রার্থীকে প্রথমে সাবোর্ডিনেট

---

২১. বৃটিশ ও ভারতীয় প্রার্থীদের তুলনামূলক বিচারের জন্য দ্রষ্টব্য, Report of the Royal (Islington) Commission on *Public Services in India,* 1913-16, Appendix Vol,. IX; B. B. Misra, *The Bureaucracy in India, An Historical Analysis of Development upto 1947* (New Delhi 1977), 101-102.

২২. ১৮৬১ সালের সিভিল সার্ভিস আইনের অধীন সাবেক অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের সংস্কার করে এর নতুন নাম দেয়া হয় সাবোর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস। সর্বনিম্নে সার্ভেয়ার থেকে সর্বোচ্চ ডেপুটি কালেক্টর পর্যন্ত এই সার্ভিসের আওতাভুক্ত ছিল। ১৮৭৯ সালে ভারতীয়দের একটা উচ্চতর সিভিল সার্ভিস গঠিত হয় যার নাম স্ট্যাচুটরি সিভিল সার্ভিস। এই সার্ভিসের লক্ষ্য ছিল কিছুসংখ্যক শিক্ষিত খ্যাতিমান ভারতীয়কে মনোনয়নের মাধ্যমে আইসিএস-দের জন্য সংরক্ষিত পদগুলোতে নিয়োগ করা। এই চাকুরি জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না, কারণ ইতিপূর্বে যারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত এবং সমাজে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন কেবল তাঁরাই এ পদের জন্য বিবেচিত হতেন।

সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হতে হতো স্বাভাবিক বিভাগীয় নিয়োগপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তারপর চাকুরিজীবীরা মনোনয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রাদেশিক সার্ভিসে পদোন্নতি লাভ করতে পারতো। মনোনয়ন পেতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই বিশ্বস্ত ও অনুগত এবং শাসকদের সন্তুষ্টিবিধানে সক্ষম হতে হতো। সার্ভিসের লোকদের এ ধরনের মানসপ্রবণতা নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সহিংসতা প্রশমনের জন্য সহায়ক ছিল। অতএব প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ছিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মোটামুটি একচেটিয়া আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার একটা কৌশল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন অত্যুৎসাহী প্রবক্তা ভাইসরয় লর্ড কার্জন মনে করতেন, আইসিএস পরীক্ষা একযোগে লন্ডন ও ভারতে অনুষ্ঠিত হলে ভারতীয়রা সিভিল সার্ভিসে বিপুল সংখ্যায় ঠাঁই করে নেবে। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে ভারতীয় প্রার্থীরা মেধার দিক থেকে যোগ্য হতে পারে, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে তারা অধঃপতিত ও কাপুরুষ। অতএব বিপুল সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসে তারা প্রবেশ করলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নৈতিক মানের অবনতি ঘটবে।[২৩] তাই পরিকল্পিতভাবেই দুই স্তরবিশিষ্ট প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস গঠন করা হয়েছে যাতে একদিকে বিক্ষোভরত মধ্যবিত্তকে শান্ত রাখা যায়, আরেকদিকে ভারতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান বর্জন করে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রাখা যায়।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম পন্থা অবলম্বন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এতই বদলে দিল যে নতুন পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুরনো কাঠামো আর বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তাই অন্তত বাইরে ঔপনিবেশিক শাসন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সিভিল সার্ভিস ও প্রশাসন সহ রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বস্তরে দেশের জনগণের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার নামে পরিচিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এই অবস্থার মোকাবিলার উপায়স্বরূপ ছিল। এই আইনের কাঠামোর মধ্যে সিভিল সার্ভিস ও প্রশাসনের নতুন সৌধ নির্মিত হয়। সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য পুনর্গঠিত ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়, অনগ্রসর সম্প্রদায়, বর্ণ, এমনকি অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর জন্য পদ সংরক্ষণ এবং যোগ্যতা নির্ধারণের ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধা নির্ধারণের চেয়ে ন্যায়বিচার ও রাজনীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো। চাকুরির ভারতীয়করণের নয়া নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্লামেন্ট কর্তৃক ১৯২৪ সালে গঠিত লী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় চাকুরিগুলো তদারক করার জন্য ১৯২৬ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়।[২৪] তখন থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রতি বছর

২৩. Lord Corzon to Lord Hamilton, 23 April 1900, in C. H. Philips (ed.), *The Evolution of India and Pakistan 1858 to 1947*: Selected Documents (Oxford 1962), 564.

২৪. পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। সদস্যরা সরাসরি সপরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেট কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁদের কাছেই সদস্যরা দায়ী থাকেন।

ভারতে দুই-পঞ্চমাংশ, লন্ডনে দুই-পঞ্চমাংশ এবং প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো থেকে এক-পঞ্চমাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে বাছাই করার বিধান করা হয়। সার্ভিসগুলোর ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য উচ্চতর সার্ভিসগুলোকে তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন সর্বভারতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। সর্বভারতীয় সার্ভিসের সদস্যদের ভারতের যেকোন স্থানে নিযুক্ত বা বদলি করা যেতো এবং তাদের নিযুক্তি ও বদলি সপরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিয়ন্ত্রণে ছিল। চাকুরির শ্রেণীগুলো হলো ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস, ইন্ডিয়ান সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স এবং ফরেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস। কেন্দ্রীয় সার্ভিসের আওতাভুক্ত ছিল দেশীয় রাজ্য, পররাষ্ট্র বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক, হিসাব নিরীক্ষণ ও হিসাব রক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ। বাকি সব দপ্তর প্রাদেশিক সার্ভিসের আওতায় ন্যস্ত হয়। এটাই ছিল মূলত ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসনভিত্তিক সংবিধানের আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক রূপায়ণ। ঔপনিবেশিক রাজনীতির অনুশাসন অনুসারে ১৯২০-এর দশক থেকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হতো। এ পর্যন্ত ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় পর্যায়ের পাবলিক সার্ভিস ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতাধীন ছিল, যা ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে সার্ভিসগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৫-এর সংবিধান কার্যকর হয় এবং ১৯৩৫ সাল থেকেই ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনরূপে পুনর্গঠিত হয়, যাকে এখন থেকে কেবল কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলোর তদারকি করতে হতো। প্রদেশে পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হলো প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোর তদারকির জন্য।

পাবলিক সার্ভিসের ভারতীয়করণ

স্বদেশী আন্দোলনকারীরা সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণ দাবি করলেও বৃটিশ সরকার বিষয়টার প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়নি। ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাশ হলে প্রথমবারের মতো পাবলিক সার্ভিসগুলোর ভারতীয়করণের জন্য কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়। এর আগে বৃটিশ ভারতের কোনো প্রদেশেই সিভিল সাভিসে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব ১৬%-এর অধিক ছিল না, আর কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে এই হার ছিল শূন্যের কাছাকাছি। ১৯২২ সাল থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হতো এবং লী কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করাতে ভারতীয়করণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

১৯২২ সালের লী কমিশন রিপোর্ট এবং এর তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নকে সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিযাত্রার প্রকৃত সূচনা বলা যেতে পারে। এই রিপোর্ট যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তা ১৯২৫ সাল থেকে এমন গতি লাভ করলো যে ১৯৩৫ সালের মধ্যে উচ্চতর সার্ভিসগুলোতে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব শতকরা পঞ্চাশে

গিয়ে পৌঁছালো, এবং অচিরেই ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা বৃটিশদের ছাড়িয়ে গেল।[২৫] ভারত যেদিন বিভক্ত হলো সেদিন পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও সকল প্রশাসনিক ক্যাডারে ভারতীয়দের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল।

ক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্র : জেলা প্রশাসন

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ও কার্যক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র মহানগরীর কেন্দ্র থেকে দূর দূরান্তে অবস্থানকারী জনগণকে দক্ষভাবে এবং লাভজনকভাবে শাসন করার লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা দেখার জন্য আমরা যথাযথভাবে জেলা প্রশাসনের রীতিপদ্ধতির দিকে চোখ ফেরাতে পারি। এ জেলা ছিল সেই ইউনিট, যাকে আমরা সত্যিকার অর্থে ক্ষুদ্রাকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে পারি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ায় জেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জেলা থেকেই রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়া শুরু করেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ছিল একটি স্বশাসিত উপনিবেশ এবং এটি ছিল তিনটি মৌজা নিয়ে গঠিত একটি জেলা। মৌজাগুলো হচ্ছে কলকাতা, সুটানুটি ও গোবিন্দপুর। কোম্পানি ১৬৯৮ সালে প্রাপ্ত সনদবলে এ তিনটি মৌজা লাভ করে। ১৭৫৭ সালে একটি নতুন জেলা ২৪ পরগনাকে এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করা হয়। এ জেলাটি ছিল পলাশীর ঘটনা সংঘটনের জন্য নতুন নবাবের উপহার। এ ছাড়া ১৭৬০ সালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে আরো তিনটি বিস্তৃত জেলা যুক্ত করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর। কোম্পানি এই সংযুক্ত জেলাগুলোর প্রশাসন থেকেই জেলা প্রশাসনের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিল। ক্লাইভ-১৭৬৫ সালে দীউয়ানি চুক্তির পর যে শাসনপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন, সেটা মূলত ছিল জেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত, কারণ এখানে আমরা স্পষ্ট কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচয় পাই না।[২৬] তা ছাড়া ১৭৭২ থেকে

২৫. ১৯৪২ সালে আইসিএস সহ উচ্চতর সার্ভিসগুলোকে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের প্রদেশওয়ারি অনুপাত :

প্রদেশ	ভারত	ইউরোপ	মোট
মাদ্রাজ	১০৬	৮১	১৮৭
বোম্বাই	৮৪	৬৬	১৫০
বাংলা	১১১	৯৬	২০৭
উত্তর প্রদেশ	১০৯	১০৫	২১৪
পাঞ্জাব	৭৮	১০৩	১৮১
বিহার-উড়িষ্যা	৬৭	৬৩	১৩০
মধ্য প্রদেশ	৪৬	৪৬	৯২
আসাম	১৬	২৫	৪১
মোট	৬১৭	৫৮৫	১২০২

২৬. সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানের উপর নায়েব দীউয়ানরূপে কোম্পানির পক্ষ থেকে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু রেজা খান নাবালক নবাবের প্রতিভূ হিসেবে দেশের অধিকর্তাও ছিলেন। বাস্তব অবস্থা এই যে তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করে তার দীউয়ানি অংশ কোম্পানিকে প্রদান করতেন। ক্লাইভের ব্যবস্থা প্রথমে এভাবেই চলেছিল।

১৭৯৩ সাল পর্যন্ত রাজস্ব প্রশাসনের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসনকে নিখুঁত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।

অতএব এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না যে কর্নওয়ালিসের বিধান (১৭৯৩) জেলাগুলোকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু করে সেগুলোর উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। জেলা প্রশাসনের এই দিকনির্দেশক ভূমিকা ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান পর্যন্ত অটুট ছিল। ই. এন. বেকার (Baker) নামে একজন সিভিলিয়ান, যিনি অর্থসচিব ও প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর ভাষায় "এটি সরকারের চোখ ও কানের মতো" সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করেছে।[২৭] কিন্তু মাঝে মাঝে জেলা প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রতিবারই পরিবর্তন এসেছে জেলা আমলাতন্ত্রের নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে। ঔপনিবেশিক আমলের সমস্তটা জুড়ে জেলা পর্যায়ে নির্বাহী বিভাগ ও বিচাব বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অস্থিতিশীল ছিল। সব সময়েই অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে। যেমন ধরা যাক ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সালের সময়কার অবস্থার কথা। নবগঠিত রাষ্ট্র তখনো পরিপূর্ণ রূপ পায়নি এবং স্থানীয় অভিজাতদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করাই সেই সময়কার মুখ্য নীতি ছিল। জেলা কালেক্টরের (তখন সুপারভাইজার বলা হতো) কর্মকাণ্ডকে প্রকৃত দেশপরিচালনার আওতাভুক্ত করা হয়। প্রকৃত ক্ষমতা তখন ছিল দেশীয় দীউয়ান ও মুৎসুদ্দিদের হাতে। কিন্তু ১৭৮০'র দশকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ততোদিনে বাইরের বা ভেতরের যেকোন হুমকি মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ও শক্তি অর্জন করেছে। জেলা কালেক্টরকে পরিপূর্ণ প্রশাসনিক ও বিচারক্ষমতা দেয়া হলো এবং বলা হলো তাঁর জেলাকে তিনি যেন তেমন স্বৈরাচারী পন্থায় শাসন করেন, যেমনভাবে শাসন করতেন তাঁর সমকক্ষ মুগল ফৌজদার, অন্য একটি সরকারের প্রধান। কিন্তু এ দুই শাসকের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য ছিল। ফৌজদারের ছিল নিজের মানবতাবোধ ও বিবেক অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি জেলা কালেক্টরের সেই স্বাধীনতা ছিল না। সুনির্দিষ্ট আইনের অধীনে কাজ করাই কালেক্টরের দায়িত্ব ছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন না নিয়ে সুনির্দিষ্ট আইনের ব্যত্যয় ঘটাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এভাবে মনস্বী ব্যক্তিদের স্বৈরাচারের স্থান নিল জড়বোধসঞ্জাত নীতি ও বিধিমালার স্বৈরাচার। কিন্তু তথাকথিত নীতিমালার শাসন আইনের সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রেখেছে বলে কোনক্রমেই মনে করা যায় না। কারণ দৃশ্যত এ নীতিমালা প্রণীত ও কার্যকর করা

২৭. *Judicial Proceedings of the Government of Bengal*, July 1901, No. 21, (National Archives of Bangladesh). নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের যৌক্তিকতার উপর বিতর্ক কার্যবিবরণীর মধ্যে বিধৃত। সংখ্যাগুরুর অভিমত ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সর্বোচ্চ দায়িত্ব অব্যাহত রাখার পক্ষে।

হয়েছিল ঔপনিবেশিক সমাজের উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেবার জন্য, সমভিত্তিতে এর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়।

কেবল কোম্পানির থলি ভরবার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের এরূপ কঠোর ও নির্মম পদ্ধতি অবলম্বন বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। এ কারণে পার্লামেন্ট ভারতে কোম্পানির ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করে এবং লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিসকে গভর্নর জেনারেলরূপে (১৭৮৬-১৭৯৩) প্রেরণ করে। তাঁর উপর অর্পিত হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসারে নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবার দায়িত্ব। কর্নওয়ালিস পূর্ব ভারতে বৃটিশের অধিকৃত অঞ্চলগুলো শাসনের জন্য একটা বিধিমালা প্রবর্তন করেন। 'কর্নওয়ালিস বিধিমালা' নামে পরিচিত তাঁর বিধিমালা এক ধরনের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যাতে শাসক ও শাসিত একই আইন ও আদালতের আওতাভুক্ত হয়। এই ব্যবস্থা প্রাচ্যের সমাজে এযাবৎকাল অজানা ছিল। তা ছাড়া বিচার বিভাগের কার্যাবলীকে নির্বাহী বিভাগ থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করা হয়। আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের জন্য সামাজিক মর্যাদাক্রমে বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নির্বাহী বিভাগের উপরে স্থান দেয়া হয়। জজকে বেতন ও মর্যাদা উভয় দিক থেকেই জেলা প্রশাসনে প্রথম স্থান দেয়া হয় এবং কালেক্টরকে দ্বিতীয় স্থান দেয়া হয়। জজের উপর বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার পাশাপাশি পুলিশের ক্ষমতাও অর্পণ করা হয় এবং তাঁকে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও প্রদান করা হয়।[২৮] কর্নওয়ালিস গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে যদি রাষ্ট্র জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে, তাহলে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আপনাআপনিই অর্জিত হবে। এ কারণেই নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়।

যদিও মনে করা হয়েছিল যে কর্নওয়ালিসের জেলা প্রশাসন পরিকল্পনা চিরস্থায়ী না হলেও দীর্ঘস্থায়ী হবে, কিন্তু অচিরেই এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসে গেল এবং এর প্রবক্তার উচ্চ কণ্ঠের নীতিবাক্য ভেস্তে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে জেলার মধ্যে জজকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান মহানগরীয় সমাজের স্বার্থ পরিপূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হলো, এর ভৌগোলিক সম্প্রসারণ ঘটলো সারা ভারত জুড়ে। ফলে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি এমন বদলে গেল যে বিচার বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কর্নওয়ালিসের

২৮. ১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে কর্নওয়ালিস বিধির অধীনে জেলা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও একতিয়ারে যে পরিবর্তন ঘটে তার বিবরণ দেখুন, J. H. Herringbone (compiler), *An Elementary Analysis of the Laws and Regulations enacted by the Governor-General in Council at Fort William in Bengal for the Civil Government of the British Territories under that Presidency*, 3 Vols., (Calcutta 1805-1817); J. E. Colebrooke (compiler), Supplement to the Digest of the Regulations and Laws enacted by the Governor General in Council for the Civil Government of the Territories under the Presidency of Bengal, (Calcutta 1807).

ধারণা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযোগী এবং অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল প্রমাণিত হলো। এতএব জেলা প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৮২০-এর দশকে সরকার কর্তৃক লাখেরাজ জমির উপর কর পুনরারোপিত হওয়ায় অসন্তোষ ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করলে এবং এমনকি গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহিংসতার ঘটনা ঘটলে সরকার জজের ম্যাজিস্ট্রেটক্ষমতা প্রত্যাহারপূর্বক একে জেলার নির্বাহী কর্মকর্তা কালেক্টরের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীতা অনুভব করলো। এভাবে ১৮৩১ সালে কালেক্টরের পদের সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ যুক্ত করা হলো। এই নতুন ব্যবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার এবং তাঁর বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজ আদালতে গ্রেফতারকৃত পুরুষ বা মহিলার বিচার করার ক্ষমতা লাভ করলেন।[২৯] এভাবে সন্দেহকারী নিজেই হয়ে যান বিচারক এবং নথিপত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এর ফলে সাধারণত সন্দেহভাজন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়ে যায়। অধীন জনগোষ্ঠীর উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে হলে এমন সংক্ষিপ্ত বিচারের তীব্র প্রয়োজন ছিল।

ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবদী বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক অপরাধ রুখতে হলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হয়। সে কারণে মহাবিদ্রোহের পর জেলার বিষয়গুলোতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সর্বময় ক্ষমতা লাভ করলেন। জজের আগের ভাবমূর্তি বিদ্যমান থাকলো না। ১৮৬১ সাল থেকে জেলার নির্বাহী ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার জন্য জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট নামে একটা নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট হলেন আরেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের অধীন। ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করতেন কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মোট কথা, মহাবিদ্রোহের পর জেলা নির্বাহীর পদটিকে ততোটাই স্বৈরাচারী করা হলো যতোটা তা ছিল কর্নওয়ালিসের বিধিমালা কার্যকর করার পূর্বে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ অবধি আইনের শাসনের নামে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার কথা ভাবা হয়নি।[৩০]

২৯. ইংল্যান্ডে লিবারেলদের চাপের মুখে ১৮৩৭ সালে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ দুটি পৃথক করা হয়। কিন্তু মহাবিদ্রোহ ঔপনিবেশিক সরকারকে বাধ্য করলো ন্যায়বিচারের তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে জেলাপ্রশাসকের ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করতে। ১৮৫৯ সালে তাই দুটো পদ আবার যুক্ত হয়ে গেল এবং ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। কিন্তু পদটির নামকরণ করা হলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর।

৩০. ১৮৮০ সালে বিচার বিভাগের মানোন্নয়নের জন্য সরকার পৃথক বিচার বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সিভিলিয়ানরা জেলা পর্যায়ে নয় বছর চাকুরি করার পর প্রশাসনের নির্বাহী ও বিচারবিভাগ যে-কোনো একটিকে বেছে নিতে পারতো। দেখুন, *Judicial Proceedings*, July 1881, (Bangladesh National Archives); Sarmila Benerjee, *Studies in Administrative History of Bengal* (1880-1898), New Delhi 1978), 106-107.

১৭৯৩ সালে জেলার আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল অতিশয় ক্ষুদ্র এবং জটিলতামুক্ত। মাত্র একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন জেলা জজ গুটিকয়েক অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে সমগ্র জেলা প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তখন জেলাগুলোও ছিল আয়তনে বিশাল, সমগ্র বাংলায় জেলার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭টি।[৩১] জেলাগুলোর বিশালত্ব থেকেই বোঝা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলোতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও তার শাসিত জনগণের মধ্যে সম্পর্কের ব্যবধান কত বেশি ছিল। গ্রামাঞ্চল তখন জমিদারদের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র তখন রাজস্ব আদায় করেই তুষ্ট থাকতো। লাভ ও লভ্যাংশনির্ভর একটা ব্যবসায়ী কোম্পানির জন্য এটা অস্বাভাবিক বা বিচিত্র কিছু নয়।

কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী কিছুটা রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করলো এবং একটা পূর্ণাঙ্গ আধুনিক রাষ্ট্ররূপে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করলো। সুবিস্তীর্ণ জেলাগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে ছোট ছোট জেলা সৃষ্টি করা হলো সুশাসনের স্বার্থে এবং সেগুলোর প্রত্যেকটিকে ভেঙে ভেঙে কতকগুলো মহাকুমা গঠন করা হলো। মহকুমার শাসনভার ছিল একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ন্যস্ত, যিনি একাধারে ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী প্রধান। ১৯১৩ সালে বাংলায় জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। বাংলা জেলা প্রশাসন কমিটি (১৯১৩-১৪) আরো বিভাজনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কারণ সেসময় স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চলছিল। প্রতিটি জেলায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটা বিশদ প্রতিষ্ঠান ছিল। কী আশ্চর্য পরিবর্তন ! বাংলায় একটা সুবিশাল জেলা শাসন করবার জন্য ১৭৯৩ সালে ছিলেন কেবল দু'জন সিভিলিয়ান—একজন কালেক্টর এবং একজন জজ, যাঁদের শাসনকার্যের জন্য পর্যাপ্ত মনে করা হয়েছিল। অথচ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন সাম্রাজ্যবাদের সূর্য মধ্য গগনে, তখন গড়পড়তা পূর্ববর্তী জেলার চেয়ে আয়তনে অর্ধেক একটি জেলার শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছিল অর্ধ ডজনেরও কম সিভিলিয়ান দ্বারা। নির্বাহী শাখায় আমরা দেখতে পাই একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর, একজন পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, দু'জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। বিচার বিভাগে যেসকল পদ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত ছিল, সেগুলো ছিল সিভিল ও সেশন জজ, অতিরিক্ত জজ, সহকারী জজ, যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেট (বিচার বিভাগীয়) এবং সহকারী ম্যাজিস্টেট ও কালেক্টর (নির্বাহী) পদ এবং সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণ (বিচার বিভাগীয়) ছিলেন শিক্ষানবিশ, যাঁরা অন্যান্য সিভিলিয়ান থেকে প্রশিক্ষণ নিত।

৩১. জেলাগুলো হচ্ছে বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট। শেষোক্ত জেলাটি ১৮৭৪ সালে অনিয়ন্ত্রিত আসাম প্রদেশের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

জেলা পর্যায়ে আমলাতন্ত্রের এমন শাখা বিস্তারের কারণ পার্কিনসনের সূত্র নয়, যে সূত্র অনুসারে আমলাতন্ত্রের প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রসারণ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রসারণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বময় বিস্তারের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতকে মনে করা হতো বৃটিশ রাজের মুকুটের উজ্জ্বলতম মণি। বাস্তাবিকই জেলা ও তার অন্তর্গত মহকুমাগুলোতে সিভিলিয়ানরা ছিল ঐ মণির 'ইস্পাত কাঠামো'। জেলা ও এর অন্তর্ভুক্ত মহকুমাগুলোকে ক্ষুদ্রাকার সাম্রাজ্য বলে গণ্য করা হতো। এইরূপ দুষ্টিভঙ্গি ১৯৩০ সালেও হ্রাস পায়নি যখন এলিটবাদী আমলাতন্ত্র বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয় শরিকদের হাতে চলে যাচ্ছিল। যদিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অনেক ঊর্ধ্বতন পদ প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তথাপি সাবডিভিশনাল অফিসার, জেলা জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে কখনোই প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের নিয়োগ করা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে আমলাতান্ত্রিক সিঁড়ির এই বুনিয়াদি ধাপগুলোতে আইসিএস-এর সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত ছিল।[৩২]

একটি মূল্যায়ন

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো মতেই মুগল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চেয়ে কম স্বৈরাচারী ছিল না। কিন্তু একটা তফাত ছিল : মুগল স্বৈরাচার ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং অভিজাততান্ত্রিক, কিন্তু বৃটিশ স্বৈরাচার ছিল প্রাতিষ্ঠানিক এবং নির্দেশিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক। বৃটিশ স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনা করতো একদল পেশাদার আমলা, যারা নিয়ন্ত্রিত হতো আইন ও উচ্চতর আমলাদের দ্বারা এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা কাজ করতো না, যেমনটি আমরা দেখেছি মুগল স্বৈরতন্ত্রের আমলে। যদিও মুগলরা নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় বহিরাগত ছিল, ভারতে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এবং স্থানীয় প্রথাগত ঐতিহ্য এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় এলিটদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য শাসন করতো। অন্য দিকে বৃটিশরা সাগরের পরপার থেকে তাদের নিয়োজিত কনসাল ও সিভিল সার্ভেন্টদের মাধ্যমে একটি কলোনী হিসেবে তাদের দখলকৃত রাজ্য শাসন করতো। তৎকালীন পরিবহনব্যবস্থার নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সরাসরি সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা তখন

৩২. ভারতে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারত থেকে বৃটিশ শাসন প্রত্যাহার ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার। তবুও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স মনে করতেন যে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে লন্ডনে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ বন্ধ রাখার কারণে ভারতে বৃটিশ শক্তির ভিত এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে এর ফলে ভারত থেকে বৃটিশ শাসন প্রত্যাহার ত্বরান্বিত হয়েছে, Cripps's speech in the House of Commons, 5 March 1947, *Indian Constitutional Documents*, vol. iv, 278-80, edited by A. C. Banerjee.

সম্ভব ছিল না। আমরা খোশখেয়ালের বশে তাকে ঔপনিবেশিক মডেল বলে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু এর সাথে এ কথাও উল্লেখ করতে হবে যে অন্যান্য সমসাময়িক শক্তি নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চল শাসনের জন্য যে আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিল, তার সাথে বৃটিশদের গড়ে তোলা আমলাতন্ত্রের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এটি নিজেই ছিল একটি বিশেষ ধরনের আমলাতন্ত্র।

তাত্ত্বিকভাবে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্র পরিজ্ঞাত বিধি ও প্রভিধানমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সিভিলিয়ানদের আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে হতো, এবং তাদেরকে কোম্পানির (এবং পরে বৃটিশ রাজ্যের) কর্মচারি হিসেবে বিশ্বস্ততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হতো এবং সর্বাবস্থায় যেকোন প্রলোভন ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকতে হতো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সিভিলিয়ানরা বোধগম্যভাবে নিজেদেরকে জনগণের প্রভুতে পরিণত করেছিল এবং তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন বিলাসিতা ও স্বজাতিপ্রীতির মোহে আচ্ছন্ন থাকতো না। লোভ তাদেরকে বিপুল পরিমাণে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, এবং আইন তাদেরকে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য সহায়ক ছিল না।

ম্যাক্স ওয়েবার ও অন্যদের দ্বারা নির্ধারিত আধুনিক আমলাতন্ত্রের উপাদান কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিদ্যমান ছিল না, যা দ্বারা ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র শাসিত হয়েছে। আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে প্রতিযোগিতা, যা কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। এক্ষেত্রে সিভিলিয়ানদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই না করে পৃষ্ঠপোষণের মাধ্যমে বাছাই করা হতো। পৃষ্ঠপোষণ ব্যতীত কেউ বৃটিশ ভারতের আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করতে পারতো না। সিভিলিয়ানরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতো। এর ফলে সিভিলিয়ানদের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব হতো এবং একে খুব বেশি মূল্যও তখন দেয়া হতো না। অথচ এ নিরপেক্ষতা ছিল আমলাতন্ত্রের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদিও ১৮৫৫ সালে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতার মতো একটি উপাদান যুক্ত করা হয়েছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেবল কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কারণ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যেন তা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হয়, এবং প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছিল প্রায় একচেটিয়াভাবে উক্ত দুটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের করায়ত্ত। যদিও পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস একচেটিয়াভাবে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষণক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের করায়ত্ত ছিল, এখন তা দু'টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের একচেটিয়া অধিকারে চলে গেল। অন্য যে কারণে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, তা হচ্ছে কেবল লন্ডনে পরীক্ষা অনুষ্ঠান। লন্ডন থেকে সুদূর ভারতে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা ভারতীয় প্রার্থীদের

জন্য ভারত থেকে লন্ডনের পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া কার্যত অসম্ভব করে তুলেছিল।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আধুনিক আমলাতন্ত্র হিসেবে অর্থাৎ প্রতিযোগিতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও অঙ্গীকার, সংগঠন, সংহতি, নিরপেক্ষতা এবং এর সদস্যদের মর্যাদার ধারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশলাভের পথে কিছু অন্তরায়ও বিদ্যমান ছিল। চুক্তিবদ্ধ ও চুক্তিবহির্ভূত সিভিল সার্ভিসে ছিল দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। এদের একটি ছিল সুবিধাভোগী, অন্যটি সুবিধাভোগী নয়; একটি ইউরোপীয়, অন্যটি প্রধানত ভারতীয়। চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেন্টদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হতো না এবং তারা ছিল অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী, কারণ রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সেবা আদৌ অসম না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অন্যদের সমান মর্যাদা ও বেতন প্রদান করা হতো না। এ্যাচিশন কমিশন তাদের চাকুরির মর্যাদাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিল, কিন্তু তাদের চাকুরিগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয়নি। শিক্ষানবিশি ছাড়া তাদের প্রশিক্ষণ দানের জরুরি ব্যবস্থা তখনও গড়ে তোলা হয়নি। স্ট্যাটিউট্রি সিভিল সার্ভিস (১৮৭৯) লাভের ভিত্তি প্রতিযোগিতা ছিল না, এমনকি শিক্ষাগত যোগ্যতাও ছিল না। এক্ষেত্রে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণই ছিল নিয়োগ লাভের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। 'তালিকাভুক্ত' পদগুলোতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয়, বিভাগীয় সুপারিশের মাধ্যমে এসেছিল, এবং কেবল তারাই সুপারিশ লাভ করেছিল, যারা নিজেদের বৃটিশ রাজের জন্য হিতকর বলে প্রমাণ করতে পেরেছিল। ১৯১৯ সালের পরে বহু আইসিএস সদস্যকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ দান করা হয়। বেতন ও সুবিধার দিক দিয়ে উভয় সার্ভিসের মধ্যে পার্থক্য ছিল, যদিও তারা একই স্থানে একই অফিসে কর্মরত ছিল এবং একই ধরনের কার্য সম্পাদন করছিল। ১৯২২ সাল থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়। কিন্তু এ পরীক্ষা পরিচালনা করতো একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ (ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন)। লন্ডন কেন্দ্রে এ পরীক্ষা পূর্বের মতো পরিচালনা করতো বৃটিশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনার্স। ১৯২৫ সাল থেকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টের অধীনে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়।

এভাবে ১৯৪০ সালের মধ্যে আমরা বেশ কিছু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত আমলাতন্ত্র পেয়েছি। এসব কর্তৃপক্ষ হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনার্স, ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন। বিভিন্ন বিবেচনার ভিত্তিতে বিভাগীয় সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োজিত একটি আমলাতন্ত্রও আমরা পেয়েছি। এসব বিবেচনার মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব, বর্ণভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন মান ও বিবেচনার ভিত্তিতে নিয়োজিত এবং একই

ধারায় বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত সিভিল সার্ভেন্টগণ একই স্থানে, একই অফিসে এবং প্রায়শ একই বেতন-স্কেলে চাকুরি করেছে। কখনো এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল না যে বিভিন্ন স্বার্থ, বেতন-স্কেল ও মর্যাদার সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব চাকুরিজীবীর মধ্যে ত্যাগের মনোভাব, সাংগঠনিক সংহতি এবং পেশাগত অঙ্গীকার ও নিরপেক্ষতা বিদ্যমান থাকতে পারে না। এমনকি বৃটেনের সিভিল সার্ভিস কমিশনার্স কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সিভিলিয়নরাও নিজেদের কোনো ত্যাগের মনোভাবের অধিকারী বলে দাবি করতে পারতো না; কেননা ভারতে কর্মরত থাকাকালে তারা আচার-আচরণে স্কটিশ স্বার্থ বা আইরিশ স্বার্থ বা ওয়েলসের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যেমন ভারতীয় সিভিলিয়ানরা নিজেদের বর্ণ, সম্প্রদায় ও এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছে। জাতিসত্তা, জাতিত্ব, ধর্ম, শিক্ষা, আঞ্চলিকতা, বিভিন্ন নিযুক্তি ও প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন বেতন ও পদমর্যাদা ইত্যাদি সব কিছু মিলে বৃটিশ ভারতের আমলাতন্ত্রকে প্রভূত পরিমাণে একটা পাঁচমিশালী সংগঠনে পরিণত করেছে। এ ধরনের একটা সংগঠন কোন ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে, কিন্তু কখনো তা শৃঙ্খলা, অখণ্ডতা, দক্ষতা এবং সর্বোপরি একটা আধুনিক রাষ্ট্রের যৌক্তিক আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা অর্জন করতে পারে না। বৃটিশ ভারতেব আমলাতন্ত্রকে যথার্থই সর্বাংশে একটা বিশেষ ধরনের শাসকগোষ্ঠী বলা যায়, যেটা বিশেষভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল সুদূর ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে এবং বহুদুরে অবস্থিত মহানগরীর প্রভুদের সেবা করার জন্য।

কিন্তু এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে বৃটিশ আমলাতন্ত্র অন্তত একটা ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তা হচ্ছে প্রশাসনিক সিঁড়ির সকল ধাপে সব ধরনের লেনদেনের অনুপুঙ্খ ও পরিপূর্ণ দলিল সংরক্ষণ। সকল সিভিলিয়ান ও তাদের অধস্তনদের সূচিত ও গৃহীত সকল কার্যব্যবস্থার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হতো এবং এগুলোর অনুলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হতো। এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে নথিপত্রের অগ্রগমন লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে শেষ হতো। সেখানে নথিপত্রগুলো শ্রেণীবিভাগ করা হতো, ক্রমবিন্যাস করা হতো এবং এগুলো বিষয় ও বিভাগ অনুসারে ভবিষ্যৎ তথ্যসূত্রের প্রয়োজনে সংরক্ষিত হতো।[৩৩] ইন্ডিয়া অফিস ভারত সরকারের কার্যবিবরণী পাঠ করতো এবং সেখানেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা ভারতে পাঠানো হতো। ক্রমে নথিপত্রের স্তূপ জমে যেতো। এভাবে ইন্ডিয়া অফিসে যেসব নথিপত্র জমা হতো, সেগুলো কলকাতা সরকারের নিকট প্রেরিত হতো এবং সেগুলোর অনুলিপি প্রশাসনের সর্বনিম্ন ধাপ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রেরিত হতো। আবার এসব নথিপত্রের শ্রেণীবিভাগ ও ক্রমবিন্যাস করে এগুলো নতুন কর্মকর্তার দিকনির্দেশনার জন্য সংরক্ষণ করা হতো।

৩৩. বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য, M. Moir A *General Guide to the India Office Records.* (The British Library 1988).

আধুনিক আমলাতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও অনমনীয়তা এবং এজন্য বৃটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে। স্থানীয় অফিস থেকে লন্ডন ইন্ডিয়া অফিসে নথিপত্রের এই অবিরাম পথপরিক্রমায় উদ্যম ও নতুন প্রবর্তনা নিঃশেষ হয়ে যেতো। এ পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর লেগে যেতো এবং অনুমোদন যখন পাওয়া যেতো তখন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিত এতোটা বদলে যেতো যে সিদ্ধান্তটাই অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তো। কিন্তু গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত দলিলপত্র আমলাতন্ত্রের রীতিবদ্ধতার নিদর্শন হিসেবে থেকে যেতো। আমলাতন্ত্রে সব সময়েই বাহ্যিক নিয়মরীতির জয় হয়েছে এবং এর অন্তর্নিহিত মর্মবাণী হয়েছে উপেক্ষিত। এই প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত সিভিলিয়ান ও অফিসারগণ দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে এমন কেরানিমনোবৃত্তিসম্পন্ন ও যান্ত্রিক হয়ে পড়লো যে তারা কাজের চেয়ে কাগজকেই বেশি গুরুত্ব দিতে লাগলো। লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের অত্যন্ত গতিশীল ঔপনিবেশিক শাসক। তিনি একদিন আমাদের কাছে আমলাতন্ত্রের নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে এক গল্প বলেছিলেন। একদিন তিনি তাঁর সচিবকে ডেকে একটা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা শুরু করার ব্যাপারে তাঁর নিকট মন্তব্য পেশ করতে বললেন। সচিব তাঁর মন্তব্যের খসড়া লিখে মন্তব্যটা তাঁর অধস্তনের নিকট পাঠালেন এবং সেই অধস্তন অফিসের পদসোপানে তাঁর পরবর্তী অধস্তন কর্মকর্তার নিকট তা পাঠালেন এবং এভাবে নথিটা ধাপে ধাপে নিচে নামতে লাগলো। অতঃপর সবগুলি মন্তব্য আর মার্জিননোট সম্বলিত নথিটা সর্বনিম্ন ধাপ থেকে আবার সব ডেস্ক হয়ে উপরে উঠতে লাগলো। কার্জন লিখলেন—

> "...প্রথম কেরানি নথির মন্তব্যের ভাষা পরিবর্তন করে তার উপর নিজের ভাষায় মন্তব্য লিখলেন ৪১ পৃষ্ঠার অধিক মুদ্রিত পৃষ্ঠা জুড়ে। ...এর পর দ্বিতীয় কেরানির পালা। তিনি প্রথম কেরানির মন্তব্যের উপর যোগ করলেন আরো ২১ পৃষ্ঠা। এর পর আমরা এলাম সহকারী সচিব, ডেপুটি সচিব এবং সচিবদের মহলে। এই ভদ্রমহোদয়গণ সবাই একই রকম দীর্ঘ অর্থহীন বক্তব্য রাখলেন সংশ্লিষ্ট নথিতে। অবশেষে আমরা এলাম পদসোপানের শেষ ধাপে এবং দেখলাম, ভাইসরয় ও সামরিক সদস্য নিজ নিজ পদমর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়ে সমপরিমাণ দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে নিজেদের অতিরিক্ত জ্ঞান জাহির করেছেন। এর পর নথিটি ঘুরে এল এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে এবং কাউন্সিলের এক সদস্যের হাত থেকে অন্য সদস্যের হাতে। এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বক্তব্য ছিল নথিতে এবং এর ফল দাঁড়ালো এক ধরনের সাহিত্যিক পাগলামি বা পণ্ডশ্রম।"

এটা হচ্ছে বিগত দেড় শতাব্দী যাবৎ বেড়ে উঠা আমলাতান্ত্রিক মনমেজাজের একটা যথাযথ বিবরণ। আনুষ্ঠানিকতা সব সময়েই মর্মবাণী বা মূল আদর্শকে আড়াল করে মুখ্য হয়েছে, দ্বিধা-সংকোচ উদ্যোগ গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, জড়তা স্থবির করে দিয়েছে গতিশীলতাকে। সিদ্ধান্তগ্রহণ বিলম্বিত করা বা স্থগিত রাখা যেকোনো সংগঠিত আমলাতন্ত্রের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বৃটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য

অধিকতর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। বৃটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র প্রত্যেক উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ইন্ডিয়া অফিসের আমলাতন্ত্রের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল, সেই উদ্যোগ বা কার্যক্রম যতই গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন হোক। ছোট বা বড় প্রত্যেকটা পদক্ষেপের উপর ইন্ডিয়া অফিস সিদ্ধান্ত দেবে, সেজন্য ক্ষমতার দুই প্রান্তের মাঝখানে বিদ্যমান সাগর ও মহাসাগরকে কোনো প্রতিবন্ধক মনে করা হতো না। নিম্ন পর্যায়ে জেলা পর্যন্ত এই প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণের আগে সবাই এ সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাইত। প্রত্যেককে মন্তব্য প্রদান করে ঊর্ধ্বতনের দিকে নথি পাঠাতে হতো। এটি হয়ে দাঁড়ায় এক অন্তহীন প্রক্রিয়া, যার শেষ কোথায় জানা নেই। কোন প্রস্তাব সংক্রান্ত নথি সংশ্লিষ্ট সকলের মন্তব্য সম্বলিত হয়ে এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সকল সঞ্চিত কাগজপত্রসহ যখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া অফিসে না পৌছাতো, তখন পর্যন্ত তার যাত্রার সমাপ্তি হতো না; এবং এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাগ্রহণ সেদিন পর্যন্ত শুরু হতো না, যেদিন প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে নথি গভর্নর জেনারেলের পরিষদ, সংশ্লিষ্ট সকল সেক্রেটারি ও বিভাগ এবং অন্যান্য কর্তাদের মাধ্যমে মূল অফিসে অর্থাৎ প্রস্তাব উত্থাপনকারী অফিসে ফিরে না আসতো। ফলে ধীকল্প (ideas) ও উদ্যোগ গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রিতা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বেন্টিং থেকে কার্জন পর্যন্ত কোনো উদ্যমী ও শক্তিমান ঔপনিবেশিক শাসক ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কাজের ধারা সম্বন্ধে চরম হতাশা ব্যক্ত করে লর্ড কার্জন সেক্রেটারি অব স্টেট-লর্ড হ্যামিল্টনকে ব্যক্তিগতভাবে লিখেছিলেন :

> ভারতীয় শাসন সম্পর্কে সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা লাভের পর আমি স্বেচ্ছায় এ কথা বলছি যে আমাদের প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য যদি স্থানীয় সরকারগুলোর উদ্যোগ ও কার্যক্রমের উপর নির্ভর করতে হয়, তা হলে এর অগ্রগতি কখনো হবে না। আমি আমার কার্যকালের এমন একটি প্রস্তাবের কথাও স্মরণ করতে পারিনা, যা প্রশাসনের কোন শাখার উন্নয়নের জন্য কোন স্থানীয় সরকার কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল, ... এবং সেক্ষেত্রে আমি গুটি কতক প্রশাসনিক উন্নয়নের প্রস্তাবের কথা স্মরণ করতে পারি, যাতে তাদের নিজেদের কর্মকর্তাদের বেতনবৃদ্ধির অনুরোধ ছাড়া অন্য কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমি ভারতে আসার পর ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়, আমি বলতে পারি যে এদের একটিও কোন স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে শুরু হয় নি এবং বলতে পারি যে যদি আপনি তাদের কাছ থেকে কোন উদ্যোগ বা কার্যক্রমের জন্য অপেক্ষা করেন তা হলে অগ্রগতির চাকা থেমে যাবে এবং এক শতাব্দীর মধ্যে শাসনযন্ত্রের কোন সংস্কার বা পরিবর্তন সাধিত হবে না। আমি বহুবার আপনার নিকট উল্লেখ করেছি যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে না আছে সৃজনশীলতা, না আছে ধ্যান-ধারণা বা কল্পনাশক্তি, তারা বর্তমানকেই সর্বোত্তম মনে করে এবং কোন পরিবর্তন বা উন্নয়ন বা সংস্কারের কথা শুনলে তাদের পিলে চমকে উঠে।[৩৪]

৩৪ Lord Curzon to Lord Hamilton, 4 June 1903 in C. H. Philips, *The Evolution of India and Pakista 1858-1947* (London 1962), 73

গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়রূপে ভারতে আসার পূর্বে ভারত সম্পর্কে কার্জনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তিনি আদৌ জানতেন না যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এমন একটি সুসংগঠিত শক্তি, যাকে সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে হবে। তিনি বহুলাংশে এই শক্তিকে ডিঙিয়ে যেতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ছিল তুঙ্গে, যখন ইন্ডিয়া অফিস গভর্নর জেনারেলকে পরাক্রান্ত মুগল হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু উন্নয়নকামী আরেকজন শাসক লর্ড রিপনকে আমলাতন্ত্র সহজেই নতজানু করে ছেড়েছিল। রিপনের সময়টা সংস্কারের অনুকূল ছিল না। তবু তিনি এজন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপের একজন সমকালীন পর্যবেক্ষক ডাব্লু ব্লান্ট (W. Blunt) রিপনের জন্য দুঃখ বোধ করেছেন, যিনি আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতার কারণে তাঁর সংস্কারপ্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, "তাঁর প্রস্তাবিত প্রত্যেকটা ব্যবস্থা সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে এবং সিভিল সার্ভিস এতই ক্ষমতাবান যে তারা স্বদেশের সরকারকে ভারতীয় সমুদয় নীতি একের পর এক বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছে।[৩৫]

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে যদিও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে মূলত দেশ পরিচালনার জন্য একটা দক্ষ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্ররূপে গড়ে তোলা হয়েছিল, ক্রমে তা একটা বিচ্ছিন্ন অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হলো, যাকে সকল বৃটিশ ও ভারতীয় ঈর্ষার চোখে দেখতো, যাদের বিবেচনায় আই সি এস-এর সদস্যগণ ছিল "স্বর্গে জন্ম নেয়া সন্তান", যারা সর্বদাই প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে আর পেয়েছে অবারিত সুযোগ-সুবিধা। যদি বৃটিশ শাসনের অধীনে ভারত অপরিবর্তিত থেকে থাকে, তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত আমলাতন্ত্রের বদৌলতে। শুরু থেকেই বৃটিশ ভারতকে একটা আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের স্বার্থ নিহিত ছিল স্থিতিশীলতায়, পরিবর্তনে নয়। সিভিলিয়ানদের কাছে পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো রাষ্ট্রক্ষমতা পর্যায়ক্রমে আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার নিকট হস্তান্তরিত হওয়া, যা তারা কিছুতে মেনে নিতে পারেনি। ১৯২০ সাল থেকে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তখন থেকেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিস দুর্বল হতে থাকে। তখন থেকে বৃটিশ প্রতিযোগীদের কাছে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকে। স্পষ্টতই এই ফাঁক পূরণ করতে লাগলো ভারতীয়রা। ১৯৪০-এর মধ্যে সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় সদস্যরা, যারা ১৯২০ সালের পূর্বে কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল, তারা বাংলায় এবং অন্য সকল প্রদেশে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। ১৯৪০ -এর দশকে আইসিএস-এ ইউরোপীয়দের নিয়ুক্তি কার্যত থেমে গেল। এরূপ পরিস্থিতিতে অনেক প্রবীণ ইউরোপীয় সদস্য চাকরির মেয়াদ শেষ হবার আগেই অবসর নেবার পথ বেছে নিলেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয়

৩৫. W S Blunt, *India Under Ripon, A Private Diary*, (London 1909), Vol II, 158, Sarmila Banerjee, *Studies in Administrative History of Bengal 1880-1898* (New Delhi 1978), 178

সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যাই অধিক হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটছিল যে অনেকে অভিযোগ করেন যে সিভিল সার্ভিসের মান অধিক পরিমাণে নেমে গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এই অভিযোগ ব্যক্তিগত ধারণাপ্রসূত ও মনস্তাত্ত্বিক। পূর্বেকার আইসিএসবর্গ ছিলেন ফর্ম পূরণ, দীর্ঘসূত্রিতা এবং বর্ণবাদী ঔদ্ধত্যের জন্য সুপরিচিত, উদ্ভাবনী ধ্যান-ধারণা ও উদ্যোগের জন্য নয়। জনগণকে তুষ্ট করার জন্য তাদের দক্ষতার কথা ফলাও করে প্রচার করা হতো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায় নি। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং জাতীয়তাবাদী জাগরণের মুখে যখন সিভিলিয়ানরা এই উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হলো না, তখন তারা কমবেশি একই ঔপনিবেশিক মডেল অনুসরণ করে বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তোলা নতুন শাসকগোষ্ঠী এবং নতুন আমলাতন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করে সসম্মানে সরে দাঁড়ালো। যদিও গোড়ার দিকে তারা কতিপয় জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য সাধন করেছিল, পরবর্তীকালে তারাও একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বিভাগোত্তর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বা সামরিক সরকারের বাহ্য রূপের আড়াল থেকে শাসন করে চললো।

১২

লোক প্রশাসন ১৯৪৭-৭১

সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ*

উত্তরাধিকার

আসলে আলোচ্য কালপর্বে বাংলাদেশ অঞ্চলের লোক প্রশাসন ব্যবস্থা অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বিক শাসন কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তবে এর সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল ভারতে বৃটিশ শাসনামলে এবং তৎপূর্ববর্তী বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই। এই অধ্যায়ে আমরা পাকিস্তান আমলের জাতীয় ও প্রাদেশিক এবং তদন্তর্ভূত আঞ্চলিক পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো, এর রাজনৈতিক ভিত্তি এবং শুরু থেকে শেষ অবধি এর বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ সহকারে তৎকালীন লোক প্রশাসনের সার্বিক সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যক্রম আলোচনা করবো। পাকিস্তান আমলের লোক প্রশাসন সম্পর্কিত যে বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে ঐ সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর নিরিখেই দেয়া হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, বর্তমান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পূর্বেকার সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কার্যসম্পাদনের ধরন অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা এখনো চলছে।[১] যা হোক, প্রারম্ভিক এই পরিচ্ছেদের বাকী অংশটুকুতে পাকিস্তান আমলের লোক প্রশাসন ভারতবর্ষে বৃটিশদের সৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার উত্তরাধিকারের দ্বারা কি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল তা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

* অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, Nasir Islam, "Colonial Legacy, Administrative Reforms and Politics Pakistan 1947-1987", *Public Administration and Development,* vol. 9, 1989, 271-285; Syed Giasuddin Ahmed and Mohammad Mohabbat Khan, "Bangladesh", in V. Subramaniam (ed), *Public Administration in the Third World,* (New York 1990), 17-41, Garth N Jones and Shafik Hashmi, "Pakistan Personnel Administration in an Obsolescing Imperial Tradition", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* vol. 41, no 1, June 1996, 85-132.

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই পাকিস্তানকে (১৯৪৭-৭১) এমন একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন, যার রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিনির্ধারণ-প্রক্রিয়াটিতে বরাবরই সিভিল-মিলিটারি এলিটদের প্রাধান্য বজায় ছিল। এইসব এলিটই একদিকে যেমন নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকেছে, অন্যদিকে তেমনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় নীতিপ্রণয়ন সম্পর্কিত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেও দেখা গেছে। এমনকি তারা তাদের স্ব-আরোপিত এই রাজনৈতিক ভূমিকাকে বৈধতা দেয়ার একটি কৌশল হিসেবে দেশটির রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতেও প্রয়াসী হয়েছিল। ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রশাসনিক সদর দপ্তরগুলোকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেখানে এলিট শ্রেণীর আমলারাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ছিল। তিন তিনটি পৃথক সাংবিধানিক আইনের (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান) আওতায় পাকিস্তানের জন্যে ফেডারেল পদ্ধতির একটি সরকারব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলেও বাস্তবে দেশটি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনেই পরিচালিত হয়ে এসেছে। এই অবস্থাটির জন্যে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে ধরে রাখার মন-মানসিকতার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের প্রথাগত শ্রেণীকাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাও আংশিকভাবে দায়ী।[২]

পাকিস্তানের প্রশাসনিক পরিমণ্ডল দেশটির মুসলিম ঐতিহ্যের কারণে সমৃদ্ধ ছিল। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধুবিজয়ের মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে মুসলিম প্রভাবের যাত্রা শুরু হয় এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ধীরে ধীরে এর বিস্তার ঘটতে থাকে। তবে, পরবর্তীকালে বিশেষকরে ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই প্রভাব আরো দ্রুত এবং গভীরতর হতে শুরু করে।[৩] বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সম্রাট আকবরসহ সেই সময়কার আরো কয়েকজন শাসকের সফল রাষ্ট্রপরিচালনার ফলশ্রুতিতে এমন কিছু প্রশাসনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছিল, যা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত হতে থাকে। পাকিস্তানসহ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশসমূহে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ভূমিস্বত্ব আইন, রাজস্ব আদায় ও স্থানীয় সরকারপদ্ধতিগুলোর দিকে তাকালেই মুগলদের সেই উদ্ভাবনী দক্ষতার বেশ কিছু চিহ্ন চোখে পড়বে। পাকিস্তানীরা তাদের এই মুসলিম ঐতিহ্যের জন্যে গর্বিতই ছিল।[৪]

২. Nasir Islam. "Pakistan", in V. Subramaniam (ed.), *Public Administration in the Third World* (New York 1990),68.

৩. Alan Glendhill, *Pakistan: The Development of its Laws and Constitution* (Connecticut 1980), 3-11

৪. দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed, " A Typological Study of the State Functionaries under the Mughals", *Asian Profile*, vol. 20, no 4, August 1982, 327-346

অষ্টাদশ শতকে উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই মুগলদের হাত থেকে বৃটিশ শাসনাধীনে চলে আসে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলতে চেয়েছেন যে, বৃটিশরা ভারতে কাঠামো এবং উপাদানের দিক থেকে এমন একটি লোক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, যা বিশাল একটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে ছিল খুবই উপযোগী। বৃটিশ আমলারা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং যথাযথভাবে রাজস্ব আদায় করতে পারলেই নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হয়েছে বলে মনে করতো। ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে প্রণীত এই প্রশাসন পদ্ধতি পুরাপুরিই অক্ষুণ্ন ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মপরবর্তী চব্বিশ বছর সময়ে দেশটির এলিট শাসকরা বৃটিশদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থায় খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।[৫]

স্বাধীন পাকিস্তানে কি কেন্দ্রে কি প্রদেশে প্রশাসনিক কাঠামোর মৌলিক ধরনটি প্রাক-ভারত বিভাজন সময়কার মতোই ছিল। 'সেক্রেটারিয়েট' এবং 'এটাচ্‌ড্' বা 'অপারেটিং' ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যেকার পূর্বেকার বিভাজন ব্যবস্থাও বজায় ছিল। নীতিনির্ধারণী কার্যাবলীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য আগের মতোই সেক্রেটারিয়েটের হাতে থেকে গেল তাত্ত্বিক কারণে। অন্যদিকে অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের হাতে ন্যস্ত রইল নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ভার। ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রশাসন কাঠামোতে এ ধরনের সুস্পষ্ট বিভাজন ব্যবস্থা চালু রাখার তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যটি ছিল কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত রাখার পক্ষে একটি যুক্তি দাঁড় করানো। ঠিক একই যুক্তির দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো এলিট সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান বা সিএসপি অফিসারদের যতজনই পাওয়া গেছে যতটা সম্ভব ততজন দিয়েই পূরণ করা হয়েছিল।[৬]

মাঠ পর্যায়ে আইন কার্যকরীকরণ ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রমের ধরন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আগের মতোই থেকে গেল। মাঠভিত্তিক প্রশাসনের সবচেয়ে ছোট এলাকাটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে 'থানা' এবং পশ্চিম পাকিস্তানে 'তহসিল'। এগুলো আবার ছিল কয়েকটি মহকুমার অন্তর্গত এবং এই মহকুমাগুলো দায়বদ্ধ ছিল জেলার কাছে। এই জেলাই ছিল মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। আর জেলার কালেক্টর, ডেপুটি কমিশনার অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যে নামেই ডাকা হোক (পরবর্তীতে আমরা এই তিনটি পদের জন্যে একটি উপাধি অর্থাৎ "জেলা অফিসার" ব্যবহার করবো), তিনিই

৫. Guthrie S. Birkhead, "Introduction", in Guthrie S. Birkhead (ed.), *Administrative Reforms in Pakistan*, (New York 1966), 9.

৬. ঐ, 11.

ছিলেন পুরো বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী কর্মকর্তা। স্বাধীনতা পরবর্তী ২৪ বছর সময়ে তার কর্মপরিধির মধ্যে সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা ছাড়াও উন্নয়ন সম্পর্কিত বেশ কিছু নতুন দায়-দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭]

কয়েকটি জেলা নিয়ে আবার একটি বিভাগ তৈরি হয়েছিল এবং বিভাগের প্রধান হতেন একজন কমিশনার, যিনি সাধারণত একজন অভিজ্ঞ সিএসপি কর্মকর্তা। ভারতে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার বেশ কয়েক দশক পরেই কমিশনারের পদ এবং তার দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এই কর্মকর্তা জেলা অফিসারের মতো মাঠ পর্যায়ে সাধারণ মানুষদের দৃষ্টি খুব একটা আকর্ষণ করতে পারেন নি, যদিও আমলাতান্ত্রিক পদক্রমে জেলা অফিসারের পদটি বেশ নীচের দিকেই ছিল। কার্যত কমিশনারের এই পদটি ছিল মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ এবং এই পদটি সাধারণত কার্যক্ষেত্রে জেলা অফিসার অথবা সেক্রেটারিয়েটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালনকারী অফিসারদেরকেই দেওয়া হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা সিএসপি অফিসার ছিলেন। কমিশনার এবং জেলা অফিসার এই দু'টি পদের বৈশিষ্ট্যাবলীতে মুগল আমলে বা তারও পূর্বে মাঠ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার আদল লক্ষ্য করা যায়। তবুও, প্রায় দুই শত বছরব্যাপী বৃটিশ শাসনামলেই এই পদ দু'টির আসল চরিত্র নির্ণীত হয়েছিল।[৮]

ঔপনিবেশিক আমলে মূলত এই জেলা অফিসারই ছিলেন মাঠ পর্যায়ে জনগণের নিকটতম সরকারি কর্মকর্তা। ভারতবিভাগের পরেও তিনি তার আগেকার অর্থাৎ বৃটিশ আমলের ক্ষমতার প্রায় সবটাই ধরে রেখেছিলেন, যদিও তাঁর বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। তবে বিশ শতকের শুরুর দিকে যখন জনস্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি নতুন নতুন ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রম চালু হয়, তখন থেকেই এই সকল কর্মকাণ্ডের তদারকির ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। এগুলো ছাড়াও "জাতিগঠনমূলক" আরো কিছু কার্যবিভাগ মাঠ পর্যায়ে জেলাকে কেন্দ্র করেই তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করে। জেলা পর্যায়ে ঐ সব অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের আলাদাভাবে নিজস্ব কার্যক্রম চালু ছিল। তথাপি কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা অফিসারের নিকটই দায়বদ্ধ থাকতেন। জেলা অফিসার এই সব বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতেন। জেলা বা শীর্ষ নির্বাহী কর্মকর্তাভেদে এই সম্পর্ক বা দায়-দায়িত্বের তারতম্য ঘটলেও জেলা অফিসার সব সময়েই মাঠ পর্যায় এবং প্রাদেশিক সদর দপ্তরের মধ্যেকার সেতুবন্ধন হিসেবেই কাজ

৭. Najmul Abedin, *Local Government and Politics in Modern Societes: Bangladesh and Pakistan* (Dhaka 1973), 114-130.

৮. Birkhead, "Introduction", 12; S. G. Ahmed, (1982), 335-340.

করতেন। আর তিনি যদি একজন সিএসপি অফিসার হতেন, সেক্ষেত্রে তার মর্যাদাটি হতো আরো উপরে।[৯]

বৃটিশদের রেখে যাওয়া সম্ভবত সবচেয়ে দুরপনেয় যে চিহ্নটি পাকিস্তানী প্রশাসকদের মধ্যে কার্যকরভাবে উপস্থিত ছিল, তা হচ্ছে বিশেষ করে প্রশাসনের একেবারে উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত সিএসপি অফিসারদের ক্ষেত্রে তাদের মন-মানসিকতা। স্বভাবের দিক থেকে এরা হয়ে উঠেছিল অহঙ্কারী, জটিল মনোভাবাপন্ন এবং উন্নাসিক। একজন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক এই সিএসপিদেরই পূর্বসূরি আইসিএস অফিসারদেরকে প্লেটোর "আদর্শ রাষ্ট্রের" গার্জিয়ান ক্লাস-এর সাথে তুলনা করেছেন।[১০] বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে এই আইসিএস অফিসাররা পুরো উপমহাদেশকে যেভাবে কব্জা করে রেখেছিলেন, তাতে তাদেরকে কখনো কখনো বিশাল সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের "স্টিল ফ্রেম" হিসেবেও অভিহিত করা হতো। সিএসপিদের ক্ষেত্রেও এই অভিধাটি মাঝেমধ্যে ব্যবহার করা হতো যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামো পাকিস্তানের এই ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলয়ের আওতাধীন ছিল। এই "গার্জিয়ানশীপ"-এর সমপর্যায়েই ছিল এলিট সিএসপি, পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান (পিএসপি) এবং অনেকাংশে অন্যান্য সুপিরিয়র সার্ভিসভুক্ত কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা। সাধারণ মানুষদের থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন তারা। তবে এ কথা বলা মোটেই ঠিক হবে না যে, এইসব এলিট প্রশাসকের সকলের মধ্যেই জনস্বার্থে কাজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে দায়িত্বশীলতার অভাব ছিল। বিভাগপূর্ব কালের মতোই পাকিস্তান আমলেও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণেরা সিএসপি বা অন্যান্য এলিট সার্ভিসে যোগ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল।[১১]

প্রারম্ভিক পর্যায় ও বিকাশপর্ব

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ও পরবর্তীকালের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃটিশরা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই গণপরিষদের প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট ফেডারেল পাকিস্তানের নবগঠিত রাজধানী করাচিতে।[১২] পরের দিনই অর্থাৎ ১১ আগস্ট গণপরিষদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে এর সভাপতি নির্বাচিত করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট জিন্নাহ বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়ে পরিষদসভায় উপস্থিত হন এবং এ সময়েই আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট লাহোর

৯. Birkhead, "Introduction", 12-13.

১০. দেখুন, Philip Woodruff, *The Men Who Ruled India: The Guardians*, vol. 2 (London 1963), 12.

১১. Birkhead, "Introduction", 12

১২. Keith Callard, *Pakistan: A Political Study* (London 1957), 77-85

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আবদুর রশিদের নিকট জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং একই দিনে জিন্নাহ নিজে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে সাতজন মন্ত্রীকে (লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী) শপথবাক্য পাঠ করান।[১৩] ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্ট সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে সাতজন ক্যাবিনেটমন্ত্রীর মধ্যে আটটি মন্ত্রণালয় পর্যায়ের দপ্তর বণ্টন করা হয়। নতুন রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকাণ্ডের দ্রুত প্রসারমানতার প্রেক্ষিতে পরবর্তী মাসগুলোতে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এভাবেই ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহর মৃত্যুর সময়ে আটজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনে পূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় মোট বারোতে।[১৪] (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট করাচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিনেই যুগপৎভাবে পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের (পূর্ব বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা সীমান্ত প্রদেশ) নবনিযুক্ত গভর্নরগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একইসাথে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীকেও শপথ গ্রহণ করান। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটিরই গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনজন প্রবীণ বৃটিশ আইসিএস অফিসার। এঁরা হলেন স্যার ফ্রেড্রিক বার্নি (পূর্ব বাংলা), স্যার ফ্রান্সিস মুডী (পাঞ্জাব) এবং স্যার জর্জ কানিংহাম (সীমান্ত প্রদেশ)। এই ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রমী ব্যক্তিটি ছিলেন সিন্ধুর গভর্নর গোলাম হুসেইন হিদায়েতুল্লাহ। গভর্নর হিসেবে নিযুক্তির আগে তিনি একই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৫]

রিপোর্টারদের ভাষ্যে জানা যায় যে, বস্তুত ১৯৪৭ সালের ১৯ আগস্ট থেকেই করাচিতে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ অফিস তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করে। তবে পাকিস্তানকে তার চলার পথের একেবারে প্রারম্ভিক রেখা থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল। অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের প্রশাসনের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া খণ্ডিতাংশগুলো একত্রিত করে কাজ চালানোর মতো একটি রাষ্ট্রযন্ত্র দাঁড় করাতে হয়েছিল। রেলওয়ে, ডাক ও টেলিফোন এবং টাঁকশালসহ বিভাগপূর্ব সরকারের বিভিন্ন প্রকার স্থায়ী সম্পদের যথাযথ হিস্যা রাষ্ট্রীয় সীমানা অনুযায়ী পাকিস্তান পেয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন চালানোর মতো দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞ দেশটির ভাগে পড়েছিল খুবই কম। কারণ বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক সার্ভিসসমূহে যোগদানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানরা বরাবরই পিছিয়ে ছিল। ভারতে সিভিল সার্ভিসসমূহের চাকরিতে আগে থেকেই বৃটিশ এবং হিন্দু প্রাধান্য বজায় ছিল। ১৯৪৭ সালে ১০০০ আইসিএস এবং

১৩. দেখুন, *The Indian and Pakistan Year Book 1948* (Bombay 1948), 163.

১৪. দেখুন, Khalid Bin Sayeed, " The Central Government of Pakistan 1947-51", (unpublished Ph D thesis, Department of Economics and Political Science, McGill University, 1956), 53-54.

১৫. দেখুন, Callard, 344-345.

ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের (আইপিএস) কর্মকর্তাদের মধ্যে ১০০ জনেরও কম ছিলেন মুসলমান। এঁদের অনেকেই আবার চাকরির ক্ষেত্রে ছিলেন নিম্নপদস্থ ও অনভিজ্ঞ। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবে প্রায় ১০০ জন বৃটিশ আইসিএস অফিসার কর্মরত ছিলেন। কিন্তু দেশবিভাগের পরে তিন সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেল, এঁদের মাত্র ছয়জন সেখানে কর্মরত রয়েছেন। ফলে প্রারম্ভিক পর্বে দেখা গেল যে, পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের পদগুলি হয় শূন্য থেকেছে নয়তো অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।[১৬]

১৯৪৭ সালের পূর্বে করাচি ছিল পাঁচ লাখেরও কম লোকসংখ্যার মোটামুটিভাবে শান্ত ও পরিচ্ছন্ন একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু বিভাগোত্তর এক থেকে দুই বছরের মধ্যেই এর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণে গিয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে শহরটির চতুর্দিকে একরকম শ্বাসরুদ্ধকর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিল। পয়ঃব্যবস্থাদি ভেঙে পড়লো এবং গজিয়ে উঠতে লাগলো অসংখ্য অস্থায়ী শরণার্থীপল্লী। এরকম একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই সরকার পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং জরুরি ভিত্তিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামোকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হয়েছিল।[১৭]

পাকিস্তানের জন্যে আবশ্যিক একটি লোক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়লো প্রধানত ঊর্ধ্বতন কয়েকজন মুসলিম সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তার উপর, বিশেষ করে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর উপর, যিনি ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড একাউন্টস্ সার্ভিসের একজন সদস্য ছিলেন এবং পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। দেশবিভাগের পরে কয়েক মাস তিনি পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ের গঠনপ্রক্রিয়া তাঁর হাতেই সম্পন্ন হয় এবং এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়। তিনি ক্যাবিনেট সচিব, সংস্থাপন সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা লাভের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এমন একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারাটা সত্যিই ছিল একটি প্রশংসনীয় কাজ। কারণ ঐ সময়ে প্রয়োজনীয় অনেক রেকর্ডপত্রও পাওয়া যাচ্ছিল না। পাওয়া গিয়েছিল কেবল যৎসামান্য ভৌত পরিসম্পদ এবং ভারত থেকে বদলি হয়ে আসা স্বল্প সংখ্যক অভিজ্ঞ নির্বাহী কর্মকর্তা।[১৮]

১৬. Henry Frank Goodnow, *The Civil Service of Pakistan* (London 1964), 28-30.

১৭. ঐ, 28.

১৮. Mumtaz Ahmad, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan* (Karachi 1974), 2.

সারণি ১
পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভা
(আগস্ট ১৯৪৭—সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)

মন্ত্রী ও তাঁদের দপ্তর	সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন
১. লিয়াকত আলী খান : প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী; ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে দায়িত্বগ্রহণ করেন।	বিভাগপূর্ব সময়েই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন; অন্তর্বর্তীকালীন (১৯৪৬-৪৭) সরকারের অর্থ বিষয়ক সদস্য।
২. স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান : পররাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ সম্পর্ক; দায়িত্বগ্রহণ করেন ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৭।	ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সাবেক সদস্য; ফেডারেল আদালতের (১৯৪১-৪৭) সাবেক বিচারক।
৩. গোলাম মোহাম্মদ : অর্থ; অর্থনৈতিক বিষয়; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৮।	ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড একাউন্টস্ সার্ভিসের সাবেক সদস্য; হায়দরাবাদ রাজ্যের সাবেক অর্থমন্ত্রী; টাটার (ইন্ডিয়া) সাবেক পরিচালক।
৪. সরদার আবদুর রব নিশ্‌তার : যোগাযোগ; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭।	বিভাগপূর্ব কালের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন; অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যোগাযোগ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য।
৫. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল: আইন ও শ্রম; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭।	বিভাগপূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভার সাবেক সমবায় মন্ত্রী; অন্তর্বর্তী সরকারের আইন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য।
৬. ফজলুর রহমান: শিক্ষা ও শিল্প; বাণিজ্য ও পূর্ত; দায়িত্বগ্রহণ করেন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭	বিভাগপূর্ব বাংলার সাবেক মন্ত্রী (১৯৪৬)।
৭. পীরজাদা আবদুস সাত্তার: খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য; দায়িত্বগ্রহণ করেন ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৭।	সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রিসভার সাবেক মন্ত্রী (১৯৪১-১৯৪২, ১৯৪৬-১৯৪৭)।
৮. খাজা সাহাবুদ্দিন: স্বরাষ্ট্র; তথ্য ও প্রচার; শরণার্থী পুনর্বাসন; দায়িত্বগ্রহণ করেন ৮ মে, ১৯৪৮।	বিভাগপূর্ব বাংলার গভর্নরের নির্বাহী পরিষদের সাবেক সদস্য (১৯৩৬); বাংলার মন্ত্রিসভার সাবেক মন্ত্রী (১৯৪৩-৪৫)।

সূত্র: Khalid Bin Sayeed, "*The Central Government of Pakistan 1947-1951*" (unpublished Ph.D Thesis, Department of Economics & Political Science, McGill University, 1956), 56-57.

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অভিযোজিত ধারাসমূহের আওতায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় গঠিত পাকিস্তানের সরকারপদ্ধতি ছিল সংসদীয় (এর নেতৃত্বে ছিলেন

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান)।[১৯] কিন্তু গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ তাঁর বৃটিশ পূর্বসূরিদের মতোই অধিকাংশ সরকারি ক্ষমতা নিজের সিদ্ধান্তেই প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন। তিনি নিজেই মন্ত্রিসভার সদস্য, প্রাদেশিক গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রীদের মনোনীত করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও তিনি সভাপতিত্ব করতেন। গভর্নর জেনারেলের সচিবালয় (ব্যক্তিগত) ছাড়াও নবগঠিত একটি মন্ত্রণালয় (স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কিত) তিনি সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন। এমন উদাহরণও আছে যে, জিন্নাহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলিতে বৃটিশ আইসিএসসহ অন্যান্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন এবং বিশেষত প্রাদেশিক বৃটিশ গভর্নরদের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এভাবে তিনি নিজেই পাকিস্তান লোক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্যায়েই এর ধরন ও গড়ন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যার প্রভাব পরবর্তী চব্বিশ বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। বিশেষ করে মন্ত্রীবর্গসহ নির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধিদের অবজ্ঞা করার প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল তাঁর প্রশাসনে।[২০]

যাই হোক, প্রারম্ভেই ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু এবং ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ড নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্যে চরম বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। এর ফলে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং উপদলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। আর তখন সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় সুদূরপরাহত। কারণ, খোদ সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদে শুরু হয়ে যাওয়া বিরোধ আর বিভাজনের কোন্দলে পরিষদ সাত বছরেরও অধিক সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছার চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারে নি। অবশেষে ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত পরিষদটি বাতিল করে দেন। এবং এভাবেই দেশ একটি মারাত্মক আইনগত সঙ্কটে পড়ে, যা থেকে পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট তাকে উদ্ধার করে।[২১] এরপর ইস্কান্দার মির্জা গোলাম মোহাম্মদের স্থলাভিষিক্ত হন। শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার আমলেই ১৯৫৬ সালে দেশের জন্য একটি সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধান কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি ফেডারেল পদ্ধতির কাঠামো স্থির করে। এই কাঠামোর আওতায় কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয় স্থানেই সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়।[২২]

১৯. দেখুন, G. W. Chowdhury, *Constitutional Development in Pakistan,* (London 1969), 6-34.

২০. Nasir Islam, "Colonial Legacy" , 273.

২১. Goodnow, 30.

২২. দেখুন, G. W. Chowdhury, *The Constitutional Development,* , 102-132.

সংবিধান গৃহীত হওয়ার বিষয়টিও কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে খুব একটা সাহায্য করতে পারলো না। পূর্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘাত লেগেই থাকলো, এমনকি তা আরো ব্যাপক হয়ে উঠলো। এইসব ঘটনাপ্রবাহ এবং আরো কিছু বিষয় প্রেসিডেন্ট মির্জাকে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করে দেশে একটি সামরিক শাসন জারির সুযোগ করে দিল। সামরিক সরকার সামরিক আইনের আওতায় নির্দেশ জারি করে মন্ত্রিসভা ও নির্বাচিত পরিষদসমূহ বাতিল ঘোষণা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। দুই সপ্তাহ পরেই জেনারেল আইয়ুব নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিলেন।[২৩]

১৯৬২ সালে দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়নের ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমেই কেবল দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আরোপিত প্রায় চুয়াল্লিশ মাস ধরে চলতে থাকা নিষেধাজ্ঞাটির অবসান ঘটলো। নতুন সংবিধানের আওতায় পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। এই পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্টকে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়। প্রাদেশিক গভর্নর ও তাঁর মন্ত্রিসভা নিয়োগের ভার ন্যস্ত হয় কেন্দ্রের হাতে। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচিত আশি হাজার সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর পরোক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও আইনসভা গঠনের বিধান রাখা হয়। তবে বৃটিশ পদ্ধতির সংসদীয় রাজনীতি চর্চার উপযোগী একটি পরিমণ্ডলে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনপ্রণালী কায়েমের ধারণাটি ছিল অস্পষ্ট। যাই হোক, জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল একটি আমলানির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যবস্থা এই নতুন সংবিধানটিতে সন্নিবেশিত ছিল। এরই মাধ্যমে, প্রধানত ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ এবং সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিল।[২৪] পল্লী অঞ্চলের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোকে "সমর্থন দানের রাজনীতির" প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে নতুন শাসকেরা ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের মোড়কে নতুন এক ধরনের অংশীদারিত্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করলো।[২৫]

তবে, নতুন এসব প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নের এই ধারা বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ক্রমাগত উচ্চারিত হতে থাকা দাবিগুলোকে শেষ পর্যন্ত আর সামাল দিতে পারলো না। এটা সত্যি যে, আইয়ুব খানের শাসনামলে (১৯৫৮-৬৯)

২৩. Mumtaz, 3-4.

২৪. ঐ, 4.

২৫. দেখুন, Rahman Soban, *Basic Democracies Works Programme and Rural Development in East Pakistan*, (Dacca 1968), 240-261.

ব্যাপক শিল্পায়ন, দ্রুত নগরায়ণ এবং শিক্ষার প্রসার জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করেছিল। তথাপি ক্ষমতাসীন এই নতুন রাজনৈতিক শক্তির সাথে সাধারণ মানুষেব সম্পর্কের বিষয়টি অস্পষ্ট এবং অনির্ধারিত ও অনির্ণীতই থেকে গেল। কারণ, আমলাতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি শাসকদের জন্যে একটি গণভিত্তি নির্মাণের সেতুবন্ধ হিসেবে প্রয়োজনীয় কোন মেলবন্ধন সাধারণ মানুষের সাথে গড়ে তুলতে পারেনি। এর ফলে নতুন শহুরে এলিটদের মধ্যে ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিচ্ছিন্নতাবোধ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের ক্ষেত্রে সম্ভবত তৎপর্যপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করেছিল।[২৬]

সংক্ষেপে ঘটনা হলো, টানা পাঁচ মাস ধরে পাকিস্তানের উভয় অংশে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং এক অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। বিশেষকরে দেশের পূর্ব-অংশের গ্রামগুলোতে চলতে থাকা বিক্ষোভ ক্রমেই একটি সর্বাত্মক বিদ্রোহের আকার ধারণ করছিল। এ পরিস্থিতিতে অবস্থা বেগতিক দেখে এবং যে-কোন সময় পুরো প্রশাসনব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে এই আশংকায় জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। কালবিলম্ব না করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ৩১ মার্চ তারিখে যথারীতি তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।[২৭] প্রথম দিকে প্রধানত বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে লোকদেখানো একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হলেও ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন (১৯৬৯-৭১) কিন্তু প্রকৃত অর্থেই এর কৌলীন্য বজায় রেখেছিল। একান্তভাবে সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল প্রাদেশিক গভর্নরের পদগুলোসহ দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো পদেই উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের বসিয়ে দেয়া হয়। তবে, ইয়াহিয়ার তিন বছরের মতো স্থায়ী এই প্রশাসনকে প্রধানত জাতীয় এবং রাজনৈতিক প্রশ্নে জন্ম নেয়া দাবিগুলো সামাল দিতেই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইয়াহিয়া খান ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন এবং একইসাথে বেআইনীভাবে যারা বিদেশের ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত পরিচালনা এবং শাস্তি বিধানের হুকুম জারি করেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের খুশী করার জন্যে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর নির্দেশ দেন এবং সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের কোটা দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করেন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান

২৬. Mumtaz, 5.

২৭. দেখুন, Talukder Moniruzzaman, "Crises in Political Development and the Collapse of the Ayub Regime in Pakistan", *The Journal of Developing Areas*, vol. 5, no 2, January 1971, 221-238

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের "এক ইউনিট" ব্যবস্থা বাতিল করে পশ্চিম পাকিস্তানকে বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু—পূর্বেকার এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। এটি কেবলমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সকল অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদেরই দাবি ছিল।[২৮]

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অধীনে দেশব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দু'টি সুনির্দিষ্ট কারণে তা ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত, পাকিস্তানের জন্মের পর এই প্রথম পাকিস্তানীরা দেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্যে ভোট দেয়। দ্বিতীয়ত, খুবই পরিচ্ছন্ন এবং অবাধ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন) প্রদান করলেও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পরের রক্তক্ষয়ী সংঘাত, গণহত্যা এবং উত্তাল ঘটনাপ্রবাহ পাকিস্তানকে বিভক্ত করে ফেলে এবং পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে।[২৯]

কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো

পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের (১৯৪৭-৭১) প্রশাসনিক কাঠামোর বাহ্যিক রূপটি ছিল প্রধানত বিভাগপূর্ব বৃটিশ সাংগঠনিক কাঠামোরই মতো। এটি ছিল দুই স্তরবিশিষ্ট-নীতি প্রণয়নের জন্যে একটি সচিবালয় এবং প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে সচিবালয়ের সাথে সংযুক্ত বিভাগসমূহ অথবা অধীনস্থ অফিসসমূহ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং ডিভিশন বা বিভাগগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল সচিবালয়। বিভাগই ছিল সচিবালয়ের মূল ইউনিট। এক একটি বিভাগ গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একক একটি রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত নীতি-প্রণয়ন ব্যবস্থাপনাকে সংগঠিত করার জন্য। আবার কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল একাধিক বিভাগ।[৩০] প্রতিটি বিভাগ বা বিভাগসমষ্টির নেতৃত্ব থাকতেন একজন মন্ত্রী। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অন্তত এ কথা বলা যায় যে, প্রধানত রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলো তিনিই দেখতেন। আর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিসমূহ প্রণয়ন এবং সেগুলোর সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্যে নিয়োজিত থাকতেন "সরকারেব সচিব" পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

২৮. দেখুন, Damodar P Singhal, *Pakistan,* (London 1972), 186-201.

২৯. দেখুন, A. M. A. Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation,* (Dhaka 1978)

৩০. দেখুন, Government of Pakistan (Cabinet Division), *Rules of Business 1962* (corrected up to January 1965), (Karachi 1965), 1

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি হতেন "ঊর্ধ্বতন" একজন পেশাদার আমলা বা সিভিল সার্ভেন্ট। তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে পদসোপানভিত্তিক অধঃক্রম অনুসারে নিয়োজিত থাকতেন যথাক্রমে অতিরিক্ত সচিব (বড় মন্ত্রণালয়সমূহে), যুগ্মসচিব, উপসচিব এবং সেক্শন অফিসারের মতো কর্মকর্তাগণ। এই কর্মকর্তাগণই আবার তাদের অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী এবং উচ্চমান ও নিম্নমান করণিকের মতো কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করতেন। এইসব কর্মচারী অধিকাংশ সময়েই অফিসের নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তারা নোটসহ ফাইল ছাড়তো, নোটের খসড়া তৈরি করতো এবং পূর্বেকার রেকর্ড ও উদাহরণসমূহ খুঁজে বের করে তা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে সারসংক্ষেপ তৈরি করতো। তারা সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত ধারাগুলো চিহ্নিত করে নিজেদের মন্তব্য প্রদান করতো, যেগুলো তাদের তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কাজে লাগতো।[৩১] এটা বোঝাই যাচ্ছিল যে, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সরকারি কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁদের অধঃস্তন কর্মচারিদের সাহায্য-সহযোগিতার উপর বেশ খানিকটাই নির্ভরশীল থাকতেন। তবে দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত কোন কোন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এ জাতীয় সহযোগিতা অনেক সময়ই বিলম্বিত হতো। পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই অবস্থাটিকেই লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

দেশে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নেয়া সমস্যাসমূহ সমাধানের ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা ও সামর্থ্য এবং কোন্ ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত তার উপর নির্ভর করেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংখ্যা নির্ধারিত হতো। পাকিস্তানে প্রথম মন্ত্রিসভা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট শপথ গ্রহণ করে। এই মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র সাত এবং এদের অধীনে ছিল পনেরোটি বিভাগ সম্বলিত আটটি মন্ত্রণালয়। এ ছাড়াও ছিল আলাদা দু'টি সচিবালয়—একটি গভর্নর জেনারেলের (ব্যক্তিগত) এবং অন্যটি মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত। প্রথমটি গঠিত হয়েছিল বিভাগপূর্ব কালের তিনটি পৃথক গভর্নর জেনারেল সচিবালয়কে একীভূত করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি গঠন করা হয়েছিল স্বল্পায়ু মধ্যবর্তী সরকারের (১৯৪৬-৪৭) আমলে গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের কার্যবিবরণী ও অন্যান্য বিভাগের অভিন্ন কাগজপত্র ও তথ্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠিত অফিসটির আদল ও পদবি অনুসরণ করে।[৩২]

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশটি ছিল মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত সচিবালয়। এর কাজ ছিল মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, মন্ত্রণালয়গুলোতে জনশক্তি সরবরাহ

৩১. Goodnow, 130.

৩২. দেখুন, Choudhuri Muhammad Ali, *The Emergence of Pakistan* (New York 1967), 83-103, Syed Giasuddin Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh* (Dhaka 1968), 64-65.

এবং সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়-বিভাগসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও এই সচিবালয়ের অধীনেই ছিল।[৩৩] স্বাধীনতার পরপরই মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়টি দু'টি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি মন্ত্রিপরিষদ শাখা (পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ) এবং অন্যটি সংস্থাপন শাখা (পরে সংস্থাপন বিভাগ)। এই দু'টি শাখাই মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল পদবির সর্বোচ্চ কর্মকর্তার একক প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধীনে ন্যস্ত ছিল এবং পুরো সবিচালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীতে সংস্থাপন শাখাটি একজন পূর্ণ সচিবের অধীনে সংস্থাপন বিভাগে উন্নীত হয়। এটিই ফেডারেল কর্মী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সংস্থাপন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন ও পদ্ধতি নামক ইউনিটটিই সরকারের গঠনকাঠামো ও কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা এবং এগুলোকে আরো উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।[৩৪]

১৯৬২ সালের সংবিধানের আওতায় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়টি সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সচিবালয়কেও দু'টি শাখায় বিভক্ত করা হয়। এর একটিতে থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং অন্যটিতে থাকে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের অধীনে মোট সাতটি বিভাগ ছিল। যথা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুখ্যসচিবের বিভাগ, অর্থনীতিসংক্রান্ত বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত বিভাগ। এছাড়া মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনে ছিল অতিরিক্ত আরো বাইশটি বিভাগ। এগুলো ছাড়াও প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রণালয়সমূহের অধীনস্থ বিভাগগুলোর সাথে সংযুক্ত অসংখ্য ডিপার্টমেন্ট এবং অফিসও ছিল।[৩৫]

আকার, গুরুত্ব ও ক্ষমতার বিচারে সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে পার্থক্যও ছিল অনেক। যেমন, এমন কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট ছিল যেগুলোর প্রধান হতেন পূর্ণ সচিব মর্যাদার কর্মকর্তাগণ। বাদবাকী ডিপার্টমেন্টগুলোর দায়িত্বে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তারাই থাকতেন। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টগুলোর প্রধানদের পদবি হতো সাধারণত মহাপরিচালক বা প্রধান প্রশাসক। কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীনতা ছিল প্রচুর এবং আর্থিক ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। আর অধীনস্থ

৩৩. Goodnow, 131.

৩৪. পাকিস্তানের সংস্থাপন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো এবং এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, S. G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 63-95.

৩৫. Ralph Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan" in Ralph Braibanti *(ed.)*, *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition* (Durham 1966), 338-339.

অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রণে থেকে ঐসব মন্ত্রণালয় বা ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের কাজেই মূলত নিয়োজিত থাকতো। অধীনস্থ অফিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ, বেতন বৃদ্ধি, বদলি, পদোন্নতি এবং আর্থিক বরাদ্দ প্রদান জাতীয় কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। অধীনস্থ অফিসসমূহের প্রধান হিসেবে সাধারণত সরকারের সচিবের চেয়ে কম পদমর্যাদার কর্মকর্তাদেরই নিয়োগ দেয়া হতো।[৩৬] বলা যায়, অনেকটা ঔপনিবেশিক নীতির ধারাবাহিকতা হিসেবেই কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারে পাকিস্তানের প্রশাসনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো সাধারণজ্ঞ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার অর্থাৎ সিএসপি অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। এই সিএসপিরা পূর্বেকার আইসিএসদেরই ধারাবাহিক উত্তরসূরি। সিএসপি সার্ভিসের গঠনরীতি এবং ১৯৫৪ (১৯৬৬ সালে সংশোধিত) সালের ক্যাডার রুল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপসচিবদের দুই-তৃতীয়াংশ পদ সিএসপি অফিসারদের দ্বারা পূরণ করার কথা।[৩৭] নির্ধারিত এই কোটার সুবাদে সিএসপি অফিসাররা খুব সহজেই কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তার পদ দখল করে নিলেন। একটি সূত্র থেকে ১৯৬৫ সালে এই পদ বন্টনের আরো কিছু চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, ঐ সময়ে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ঊনত্রিশটি (মন্ত্রণালয়ভুক্ত ২২টি বিভাগ এবং প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের আওতাধীন ৭টি বিভাগ) ইউনিটের মধ্যে বাইশটিরই (৭৬%) প্রধান ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তাগণ।[৩৮] আর নিয়োগদানের ক্ষেত্রে এভাবেই সিএসপি ক্যাডার রুল (১৯৫৪) দ্বারা নির্ধারিত দুই-তৃতীয়াংশের কোটাটিও অতিক্রম করে যাওয়া হয়। পূর্ববর্তী বছরগুলোর চিত্রও কমবেশী এরকমই ছিল।

কর্মবাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (line organization) হিসেবে বিবেচিত সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট এবং অধীনস্থ অফিসসমূহের পদগুলো সাধারণত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পূরণ করা হতো। এইসব সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টের কারিগরী বিশেষজ্ঞরা সচিবালয়ের নীতি প্রণয়নকারীদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ এবং তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করতেন। তবে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে নীতিপ্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হতো এবং কেবলমাত্র গৃহীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নেই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। সচিবালয় এবং সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট ও অফিসসমূহের মধ্যেকার এই পার্থক্যটি ঔপনিবেশিক আমল থেকে সংগৃহীত একটি যুগ-অনুপযোগী রীতি ছিল বলেই ধরে নেয়া হয়। পাকিস্তানের প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কিত অনেক লোক প্রশাসন বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শকই

৩৬. দেখুন, Government of Pakistan (Ministry of Information and Broadcasting), *Twenty Years of Pakistan 1947-1967* (Karachi 1967), 97-98

৩৭. দেখুন, Government of Pakistan (Establishment Division), *Establishment Manual*, vol., 1 (Karachi 1968), 193-196.

৩৮. Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 301.

এই পার্থক্যের রীতিটিকে অচল বলে মত দিয়েছিলেন। আমেরিকান পরামর্শক বার্নার্ড গ্লডিয়েক্স (১৯৫৫) শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক পদগুলো সকল প্রতিযোগীর জন্যে উন্মুক্ত রাখার কথা বলেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সরকারের একজন সচিবকে সাধারণ এবং পেশাগত উভয়বিদ দক্ষতারই অধিকারী হতে হবে। বিচারপতি কর্নেলিয়াসের নেতৃত্বে গঠিত বেতন ও কর্ম কমিশন (১৯৫৯-৬২) এই মর্মে অভিমত দিয়েছিল যে, নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন এ দু'টি কাজকে আলাদা করে রাখা ঠিক হবে না। বস্তুত কর্নেলিয়াস কমিশন মাঠ পর্যায়ের ডিপার্টমেন্টগুলোর সাথে সচিবালয়ের একটা সমন্বয় সাধনেরই পরামর্শ দিয়েছিল। কমিশন সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিল, সচিবের পদটি হবে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত বিষয়াবলীর প্রধানের। একজন নীতিবিশেষজ্ঞ হিসেবে মন্ত্রীকে তিনি পরামর্শ দেবেন। অন্যদিকে নীতি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিপার্টমেন্টগুলোকে অবশ্যই নীতি প্রণয়নের কাজেও সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তারা সরাসরি মন্ত্রীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে।[৩৯]

পাবলিক কর্পোরেশন

পাকিস্তানে সাধারণভাবে পাবলিক কর্পোরেশন বা এন্টারপ্রাইজ নামে পরিচিত বেশ কিছু সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এগুলোর মাধ্যমে পুঁজিনির্ভর এবং শ্রমঘন কিছু বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। এছাড়া, যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বিধাগ্রস্ত, যেমন গৃহনির্মাণ, সেখানে বিনিয়োগ করা, অথবা সরকারের যেসব ক্ষেত্রে (যেমন, পানি ও বিদ্যুৎ) আশানুরূপ সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না সেসব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি বিধান করার মতো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ছাড়াও আরো কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল, যেগুলোঁর কোন কোনটি পুরোপুরি আবার কোন কোনটি আংশিকভাবে সরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো এবং তাতে সরকারি প্রতিনিধিত্ব থাকতো। এগুলো লোকবল ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। তবে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি পরামর্শ মেনে চলতো।

যাই হোক, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তান খুব সামান্য কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্যই ছিল করাচি এবং লাহোরে নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান রেলওয়ের কর্মকাণ্ড প্রথম কয়েক বছর অনেকটা কর্পোরেশনের মতোই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাদেশিক সরকারগুলোর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ এদের স্বায়ত্তশাসনকে খুবই সীমিত করে ফেলে। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কর্পোরেশন হিসেবে ১৯৪৮ সালে 'দি স্টেট

৩৯. Nasir Islam, "Pakistan', 76-77.

ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছরে প্রতিষ্ঠিত হয় শরণার্থী পুনর্বাসন ফাইনান্স কর্পোরেশন। আর ১৯৪৯ সালে বিনিয়োজিত পুঁজির এক-চতুর্থাংশ সরকারি মালিকানায় সরকারি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠালাভ করে 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' নামের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এর পর নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে 'পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' (পিআইডিসি) গড়ে তোলার পরই এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি গতিসঞ্চার ঘটে। এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় তেরোটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে প্রতিষ্ঠিত হয় পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে একটি অভ্যন্তরীণ জলপরিবহন কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৬২ সালে দুই প্রাদেশিক অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং 'পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' বা পিআইডিসি উভয় অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে'পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' বা 'ইপিআইডিসি' এবং 'পশ্চিম পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন' বা 'ডব্লিউপিআইডিসি'তে পরিণত হয়। এভাবেই ১৯৬৯ সালে আইয়ুব শাসনের শেষ দিকে এসে প্রায় চার ডজন বা তারও বেশি সরকারি কর্পোরেশন জন্মলাভ করেছিল। এদের প্রায় সবগুলোই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এগুলোর মধ্যে বারোটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো। অন্য বারোটি ছিল কেবল পূর্ব পাকিস্তানে এবং ছয়টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ ছাড়াও ছিল আরো বারোটি প্রতিষ্ঠান, যারা স্থানীয় ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো।[৪০]

স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তান "সহযোগিতাভিত্তিক" একটি শিল্প উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ১৯৫০ সালে 'পিআইডিসি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে প্রধানত ভারী প্রকৌশল, রসায়ন, সার এবং পূর্ব পাকিস্তানের পাটখাতে সরকারের সাথে যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহী করে তোলার জন্যে। সহযোগিতাভিত্তিক এই সরকারি নীতিটির পেছনের উদ্দেশ্যটি বাস্তব এবং সঠিক ছিল বলেই মনে হয়। বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাগণ সরকারের এই জড়িত হওয়ার উদ্যোগটিকে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের মনোভাব হিসেবে বিবেচনা করে নি। উপরন্তু সরকারের সহযোগিতাভিত্তিক এই শিল্পনীতির কারণেই সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানায় বেশ কিছু সফল শিল্পোদ্যোগ পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই 'পিআইডিসি'র প্রতিষ্ঠা শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটি গতিসঞ্চার করেছিল। ১৯৫৯ সাল নাগাদ 'পিআইডিসি'র সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দেশের গোটা শিল্পসম্পদের ১৬ শতাংশ। আর এতে কর্মরত জনশক্তির পরিমাণ ছিল সারা দেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট জনবলের ২০ শতাংশ।

৪০. Guthrie S. Birkhead, "Government by Corporations", in Birkhead (ed.), *Administrative Problems in Pakistan,* 119-120. পাকিস্তানে কর্পোরেশনসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Reza H. Syed (ed.) *Role and Performance of Public Enterprises in the Economic Growth of Pakistan,* (Karachi 1977), 23-35.

১৯৫০-এর দশকের শেষ নাগাদ 'পিআইডিসি' দেশের বহুসংখ্যক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ একটি কর্পোরেশন হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৫০-এর দশকের শেষে এবং ১৯৬০-এর দশকে 'পিআইডিসি' বেশ কয়েকটি সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান (public enterprises) স্থাপন করতে পেরেছিল এবং পরবর্তীতে সেগুলো ধাপে ধাপে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়েছিল।[৪১]

যাই হোক, বাজারসূচকের আলোকে বিচার করলে দুই অঞ্চলে বিভক্ত 'পিআইডিসি' এবং অন্যান্য সরকারি কর্পোরেশনের সাফল্য কিন্তু খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। তাদের উৎপাদন ও লাভের মাত্রা বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অনেক নিচের দিকেই ছিল। এই অবস্থার জন্যে সমালোচকরা পাকিস্তান আমলে প্রথাগতভাবে সরকারি কর্পোরেশনগুলিতে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা চাপিয়ে দেয়াকেই দায়ী করে থাকেন। নিজেদের যুক্তির পক্ষে উদাহরণ হিসেবে তাঁরা দেখিয়ে থাকেন যে, 'ইপিআইডিসি' এবং 'ডব্লিউপিআইডিসি' উভয়টি প্রায় বরাবরই সাধারণজ্ঞ (generalist) সিভিল সার্ভেন্ট এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আইয়ুব আমলে (১৯৫৮-৬৯) প্রথম সারির মোট ৮৫ জন সিভিল সার্ভেন্ট সরকারি কর্পোরেশনগুলির শীর্ষপদসমূহ দখল করেছিলেন। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিচালককেই নিয়োগ করা হয়েছিল পাকিস্তানের উচ্চবিত্ত শিল্প পরিবারগুলো থেকে। প্রধান নির্বাহী এবং অর্থপরিচালক পদে নিয়োগ পেতেন অবশ্যই শীর্ষস্থানীয় সিভিল সার্ভেন্টগণ।[৪২] ফল দাঁড়ায় এই যে, কর্পোরেশনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাব জন্যে সংশ্লিষ্ট আইনবলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা যে কর্তৃত্বটুকু পেতেন তা বরং তারা কর্পোরেশনগুলোর দৈনান্দিন প্রশাসনিক ও নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কাজগুলোতে হস্তক্ষেপ করার জন্যে ব্যবহার করতেন। সাধারণ আমলাতান্ত্রিক একটি ডিপার্টমেন্ট চালানোর জন্যে প্রণীত কার্যপ্রণালী এবং কাঠামো, যা একটি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে কোন অবস্থাতেই উপযোগী নয়, হরহামেশাই তা চাপিয়ে দেয়া হতো সরকারি কর্পোরেশনগুলির উপর। পাকিস্তানের অধিকাংশ সরকারি কর্পোরেশনগুলোতে এসব প্রথাবন্দি কর্মকাণ্ডের ফল দাঁড়িয়েছিল 'লাল ফিতার' দৌরাত্ম্যের প্রসার এবং লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক নিম্নহারের উৎপাদন।[৪৩]

সিভিল সার্ভিস

পাকিস্তানে 'সিএসপিই' একমাত্র সিভিল সার্ভিস ছিল না বা এমনও নয় যে, গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো প্রশাসনিক পদে এই সার্ভিসেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সবগুলো সুপিরিয়র সার্ভিসকে নিয়ে একত্রে যে "কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসেস" গঠিত হয়েছিল এটি ছিল

৪১. Nasir Islam, "Pakistan", in V. Subramaniam (ed.), *Public Administration in the Third World,* 79.

৪২. দেখুন, S.J. Burki, "Twenty Years of the Civil Service of Pakistan: A Reevaluation", *Asian Survey,* vol,. 9, April 1969, 254; A.K.M. Ahsan, "Top Level Management and Personnel Problems of Public Enterprises', in M. A. K. Beg and others (eds.), *Problems of Public Enterprises* (Lahore 1967), 150-169.

৪৩. Nasir Islam, "Pakistan", 79

তারই অন্যতম। মর্যাদার বিচারে শীর্ষে অবস্থিত সিএসপি এবং সর্বনিম্নে অবস্থানকারী কেন্দ্রীয় সচিবালয় সার্ভিস বা সিএসএস—এ জাতীয় সর্বমোট সতেরোটি সার্ভিস ছিল[৪৪] (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)। এই সার্ভিসগুলোকে কেন 'সুপিরিয়র' সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা হতো একটি সরকারি পুস্তিকায় তা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

> "সার্ভিসগুলোকে সুপিরিয়র হিসেবে গণ্য করা হয় এই কারণে যে, মর্যাদার দিক থেকে এগুলোর চেয়ে নিম্নতর আরো অনেক সার্ভিস রয়েছে। সুপিরিয়র সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সিভিল সার্ভেন্টের অধীনে আরো শতশত লোক কর্মরত রয়েছে, যাদের কেউই সুপিরিয়র সার্ভিসের সদস্য নয়। এই বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি সুপিরিয়র সার্ভিসের কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত"।[৪৫]

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সুপিরিয়র সার্ভিসগুলোর মধ্যে সিএসপিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একই পুস্তিকায় এই সার্ভিস সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলা হয়েছে, "পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পাকিস্তানে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসেরই উত্তরসূরি। এটি ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিভিল সার্ভিস।"[৪৬]

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সাংগঠনিক কাঠামোটি ছিল অনমনীয় এবং জটিল। বিশেষকরে উপরের দিকের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোটি কাজের ধরন বা ক্যাডারের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। এখানে আন্তঃক্যাডার মেধা প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ ছিল খুবই কম। আসলে এটি ছিল ভারতে বৃটিশ শাসন পরিচালনার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে একটি প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার লাগাতার কৌশলেরই ফসল।[৪৭] উপরের স্তরের আমলাতন্ত্রে কাজের ধরনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত ক্যাডার ব্যবস্থা ছাড়াও পদের শ্রেণীগত (১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণী) এবং স্থানগত (নিখিল পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক) বিভাজন রীতিও চালু ছিল। এই ব্যবস্থাকে অনেকেই একদিকে প্রশাসনের মধ্যে একটি সার্ভিসকৌলীন্য ও আন্ত-সার্ভিস বিরোধের জন্মদান এবং অন্যদিকে প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করে তোলার জন্যে দায়ী করে থাকেন।[৪৮] পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান তিন ধরনের ১ম শ্রেণীর চাকরির মধ্যে সর্বপ্রথমেই ছিল সেইসব পদ, যেগুলো আইনের ভিত্তিতে গঠিত একটি সার্ভিস বা ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। দ্বিতীয়ত, এমন কিছু চাকরি ছিল, যেগুলো নিয়মিত কোন সার্ভিস বা ক্যাডারের অন্তর্গত নয়। এগুলো ছিল

---

৪৪. পাকিস্তানে সার্ভিসের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের ছাব্বিশটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের নামও তালিকাভুক্ত পাওয়া গেছে—দেখুন, *Report of the Administrative Reorganization Committee - 1961* (Karachi 1961) (reprinted in public edition by Efficiency O & M Wing, Establishment Division, President's Secretariat, 1963), 348. আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 258-59.

৪৫. The Government of Pakistan (Establishment Division), *Careers in the Pakistan Central Superior Services* (Karachi 1954), 2.

৪৬. ঐ, 3.

৪৭. Ralph Braibanti, *Research on the Bureaucracy of Pakistan*, (Durham 1966), 101-112

৪৮. দেখুন, S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 48-49.

বিশেষ কিছু পেশাদার গোষ্ঠী, যেমন—অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, উপ/সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা, পরিকল্পনা কমিশনের উপ/সহকারী উপদেষ্টার পদ। তৃতীয়ত, আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়সমূহ, যথা— অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্যে ১৩০টি পদের একটি ইকনোমিক পুল ব্যবস্থাও চালু ছিল।[৪৯]

সারণি ২

সতেরোটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের তালিকা

১. সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান
২. পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস
৩. পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান
৪. পাকিস্তান অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিস
৫. পাকিস্তান মিলিটারি একাউন্টস সার্ভিস
৬. পাকিস্তান টেক্সেসন সার্ভিস
৭. পাকিস্তান রেলওয়ে একাউন্টস্ সার্ভিস
৮. পাকিস্তান কাস্টম্‌স এন্ড এক্সাইজ সার্ভিস
৯. সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১০. টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১১. পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১২. পাকিস্তান পোস্টাল সার্ভিস
১৩. পাকিস্তান মিলিটারি ল্যান্ডস এন্ড ক্যান্টনমেন্টস্ সার্ভিস
১৪. সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিস
১৫. ট্রেড সার্ভিস অব পাকিস্তান
১৬. জিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্তান
১৭. সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস

সূত্র : Government of Pakistan, *Report of the Working Group on the Reorganization of the Public Service Structure in Pakistan* (Chairman, D.K. Power), (Karachi 1969), 138.

৪৯. Cf. *Memorandum Submitted to the Services Reorganization Committee* (1969) by the CSP Association (reprinted in *Administrative Science Review*, NIPA, Dacca, vol. 4, no. 1, March 1970, 169-243), 208-211.

প্রথম ধরনের পদগুলোর জন্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সতেরোটি সার্ভিস বা ক্যাডার ব্যবস্থা চালু ছিল, যা ২নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এই সতেরোটির মধ্যেকার বিভাজন তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই সতেরোটি ক্যাডারে লোক নিয়োগ করা হতো। প্রতিটি ক্যাডারব্যবস্থাই ছিল আলাদা।[৫০] এগুলোর সাথেই যুক্ত করা হয়েছিল ছোট আকারের আরো একটি ক্যাডার। জেনারেল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিজার্ভ বা General Administrative Reserve (জিএআর) নামের এই ক্যাডারটিতে বিভাগ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে আইসিএস অফিসারদের স্বল্পতাজনিত সমস্যা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সার্ভিস বা ডিপার্টমেন্ট থেকে সংগৃহীত কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।[৫১] এই সবের বাইরে উল্লেখ করার মতো খুব সামান্য কিছু ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ছিল, যারা পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে ছিল বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সরবরাহ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা; কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও পেশাদার কর্মকর্তা; পরিকল্পনা কমিশন, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং অন্যত্র নিয়োজিত অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ; পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও আবহাওয়া ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা।[৫২]

১৯৫০ সালে 'ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স পুল' নামে একটি পৃথক সার্ভিস গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৯ সালে 'ইকনোমিক পুল' নামে এটিকে পুনর্গঠিত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশ কিছু পদ সৃষ্টি না করা পর্যন্ত এর কার্যক্রম স্থগিতই ছিল।[৫৩] ইকনোমিক পুল তৈরি করার এই ধারণাটি এসেছিল বিভাগপূর্ব বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগের প্রচলিত একটি নীতিকে অনুসরণ করে। এই নীতিটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্যাডারের অনমনীয় স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যবোধকে কিছুটা সংযত করার উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন সার্ভিসে কর্মরত মেধাবী অর্থনীতিবিদদেরকে অভিন্ন একটি ক্যাডারে নিয়ে আসা। অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাসহ মাঝারি পর্যায়ের সীমিত সংখ্যক কিছু কর্মকর্তাকেই ইকনোমিক পুলের জন্যে নির্বাচন করা হতো। এই পুলে যথাক্রমে ৬০ শতাংশ পদে

৫০. পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গঠন এবং এর কর্মকাণ্ডের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে, Syed Giasuddin Ahmed, *Bangladesh Public Service Commission*, (Dhaka 1990), 48-86; S. G. Ahmed, 'Public Service Commission in Pakistan", *Pakistan Administration*, vol. 31, no. 2, 1985, 87-98.

৫১. Cf. *The CSP Association Memorandum of 1969*, 208-211.

৫২. Government of Pakistan, *Report of the Working Group on the Reorganization of the Public Service Structure in Pakistan*, (Karachi 1969), 138.

৫৩. Cf. M.A. Rahman, ed., *Administrative Reforms in Pakistan* (Lahore 1969), 10-11.

সিএসপি এবং ৪০ শতাংশ পদে একাউন্টস ও টেক্সেশন ক্যাডারের কর্মকর্তারা নিয়োগ পেতে পারতো।[৫৪]

সতেরোটি ক্যাডার, ক্যাডারবহির্ভূত ১ম শ্রেণীর পেশাদারদের পদ এবং ইকনোমিক পুল ছাড়া পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বাদবাকী সার্ভিসগুলোর গঠন জটিলই ছিল। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের শ্রেণীকরণ রীতিপদ্ধতিটি বিভাগপূর্ব অবস্থার প্রায় অনুরূপই থেকে গিয়েছিল। পরিবর্তনের মধ্যে ছিল কেবল বিভিন্ন কয়েকটি ক্যাডারের নামের একটু হেরফের এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কয়েকটি সার্ভিস বা ক্যাডারের সংযোজন। সার্ভিসগুলোকে সর্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে শ্রেণীকরণ করা হয় স্থানভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে। যেমন, নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, কেন্দ্রীয় সার্ভিস এবং প্রাদেশিক সার্ভিস। সিএসপি এবং পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান (পিএসপি) ছিল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, যেহেতু এই সার্ভিস দু'টির কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারেই চাকরি করতো। আর এটা হয়েছিল এই কারণে যে, এই দু'টি সার্ভিসের মাঠ পর্যায়ের পদগুলো প্রধানত প্রাদেশিক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। নিখিল পাকিস্তান সার্ভিসকাঠামোর আওতায়ই পিএসপি দু'টি প্রাদেশিক ক্যাডারে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) বিভক্ত ছিল। অন্যদিকে সিএসপি ছিল পুরোপুরি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ক্যাডার। অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিস, মিলিটারি একাউন্টস সার্ভিস, টেক্সেশন সার্ভিস, রেলওয়ে একাউন্টস সার্ভিস, কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ সার্ভিস এবং সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের মতো কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলো নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস (সিএসপি এবং পিএসপি) দু'টি থেকে আলাদা ছিল। কারণ, প্রথম ধরনের সার্ভিসগুলোর সদস্যরা একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে কাজ করতো। নিয়োগ পাওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট কোন সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট বা অধীনস্থ অফিসে কাজ করতে শুরু করতো। এই ডিপার্টমেন্ট বা অফিসগুলো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো।[৫৫]

নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলো ছাড়াও প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারেরই নিজস্ব কিছু সার্ভিস ছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিজেই এসব সার্ভিসের জনবল সংগ্রহ, এদের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকতো। তবে চাকরির বিভিন্ন শর্তাদি বা সুযোগ-সুবিধার বিচারে প্রাদেশিক এই সার্ভিসগুলো নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় উভয় প্রকারের সার্ভিস থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। সিএসপি সার্ভিসেরই একটু ছোট আকারের অনুকৃতি প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের (অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস) সদস্যরা ব্যতীত অন্য অধিকাংশ প্রাদেশিক সার্ভিসের সদস্যরাই তাদের চাকরিজীবনের পুরোটা সময় প্রদেশের সংশ্লিষ্ট সার্ভিসেই কর্মরত থাকতো।[৫৬]

৫৪. বৃটিশ ভারতে অর্থনৈতিক পুলের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, 51 (fn. 19)

৫৫. S. G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 52-54.

৫৬. Cf. *The CSP Association Memorandum of 1969*, 208-209.

দায়িত্বের ধরন ও প্রকৃতি বিচারে পাকিস্তানে সার্ভিস ও ক্যাডারের ক্ষেত্রে বড় দাগের আরেকটি শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছিল। যেমন, (১) সাধারণজ্ঞ প্রশাসনিক সার্ভিস (সিএসপি); (২) পেশাদারী সার্ভিস (অর্থাৎ অডিট এন্ড একাউন্টস, ইনকাম ট্যাক্স, কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ); এবং (৩) বিশেষজ্ঞ সার্ভিস (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, টেলিগ্রাফ এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে)। সিএসপি অফিসারদেরকে সাধারণজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে বিবেচনা করা হতো এই কারণে যে, তারা এক ধরনের কাজ থেকে অন্য ধরনের কাজে, এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে এবং কেন্দ্র থেকে প্রদেশ বা প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে বদলি হতে পারতো। তারা কেবল ভূমিরাজস্ব বা আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত প্রশাসনই নয়, রাষ্ট্রের শিল্প, অর্থনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ক প্রশাসনেরও দায়িত্ব পালন করতো। তাছাড়া রাষ্ট্রের অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের সাথেও জড়িত ছিল তারা। কেউ কেউ আবার বিচার বিভাগেও কাজ করতো। সুতরাং সিএসপি ছিল পাকিস্তানে প্রকৃত অর্থেই সাধারণজ্ঞ সর্বক্ষেত্রে ধন্বন্তরি একটি সার্ভিস।[৫৭]

পেশাদারি সার্ভিসের সদস্যরা নিজ নিজ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত পেশাগত দায়িত্ব পালন করতো এবং চাকরিজীবনের সবটা সময় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টেই কাটিয়ে দিত। তবে বিশেষজ্ঞ সার্ভিসটি সাধারণজ্ঞ এবং পেশাদারি এই উভয় সার্ভিস থেকেই আলাদা ছিল। কারণ বিশেষজ্ঞ সার্ভিসের সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হতো তাদের বিশেষ পেশাগত ডিগ্রী এবং প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে। অন্যদিকে সাধারণজ্ঞ এবং পেশাদারি সার্ভিসের সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হতো প্রায় প্রতি বছর কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক অভিন্ন একটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে।[৫৮] সাধারণজ্ঞ, পেশাদাবি এবং বিশেষজ্ঞ জাতীয় বিভাজনটিকে সার্ভিসের উল্লম্ব শ্রেণীকরণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভাজন হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কারণ সার্ভিসগুলো তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী উল্লম্ব রেখা দ্বারা একে অপর থেকে বিভক্ত।[৫৯]

এ ছাড়াও পাকিস্তানে সার্ভিসগুলো আবার অনুভূমিকভাবে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা—১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী । প্রতিটি শ্রেণীর পদের গুরুত্ব, বেতনস্কেল এবং দায়িত্বের তারতম্যের উপর ভিত্তি করেই এই বিভাজনটিকে অনুভূমিক শ্রেণীবিভাজন বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ১ম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণীর অধিকাংশ কর্মকর্তাই ছিল গেজেটেড অফিসার (কারণ তাদের নিয়োগ, দায়িত্ব গ্রহণ এবং চাকরিজীবনের অন্যান্য তথ্যাদি সরকারি গেজেটবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হতো) এবং সার্ভিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি

৫৭. M. A. Chaudhuri, *The Civil Service of Pakistan.* (Dacca 1969), 60.

৫৮. *The CSP Association Memorandum of 1969,* 208-209; M.A. Chaudhuri, *The Civil Service of Pakistan.* 59-64.

৫৯. M. A. Chaudhuri, ঐ, 60.

কর্মকাণ্ড সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা উচ্চতর ক্ষমতা এবং দায়িত্ব লাভ করতো। ৩য় শ্রেণীর সিভিল সার্ভেন্টরা ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থেকে দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করতো। আর ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা নিয়োজিত থাকতো শারীরিক বা অন্যান্য ছোটখাট কাজকর্মে।[৬০]

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের শ্রেণীকরণপদ্ধতির বিরুদ্ধে অধিকাংশ সময়েই যে অভিযোগটি আনা হয় তা হলো, এই শ্রেণীকরণ পদ্ধতিটি সিএসপিদেরকে আলাদা একটি কৌলীন্যের মর্যাদা প্রদান করেছিল। তিনটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কৌলীন্যের বিষয়টি কার্যকর করা হতে। প্রথমত, এই সার্ভিসে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পদ্ধতির এমন একটি কঠিন নীতি বরাবরই চালু রাখা হয়েছিল, যা কেবল সমাজের বিশেষ ভাগ্যবান একটি অংশের প্রতিযোগীদেরকেই এই মর্যাদাপূর্ণ ক্যাডারটিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিত। দ্বিতীয়ত, চাকরিতে পদোন্নতি এবং পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে যাতে করে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় সেজন্যে বিপুল সংখ্যক অনুমোদিত পদের বিপরীতে সব সময়েই তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক সিএসপি অফিসার নিয়োগ করা হতো। এবং তৃতীয়ত, সচিবালয়ের অধিকাংশ নীতিনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং একই সাথে নীতি বাস্তবায়নকারী ডিপার্টমেন্টগুলোর প্রশাসনিক পদসমূহ সিএসপিদের জন্যে সংরক্ষিত থাকতো।[৬১] আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সিএসপি ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের প্রকৃত সংখ্যার চাইতে তাদের জন্যে সংরক্ষিত পদের সংখ্যা সব সময়ই বেশি ছিল। এর ফলে অতি সহজেই সিএসপি কর্মকর্তারা মাঠ ও সদর অফিস, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাবলিক কর্পোরেশন ও বিচার বিভাগের মধ্যে অহরহ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মরত থাকার সুযোগ পেত। এ জাতীয় স্থানান্তরের মানেই ছিল দ্রুত পদোন্নতি। শীর্ষপদগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উচ্চতর বেতনস্কেলের বিধানটিও কিন্তু সিএসপিদের জন্যে বিশেষ একটি মর্যাদা হিসেবে কাজ করতো। পেশাদারি এবং বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের ক্ষেত্রে সচলতা এবং পরিক্রমণের এ জাতীয় সুযোগ খুবই কম ছিল বলে প্রায়ই তারা পদোন্নতিতে সিএসপিদের চাইতে অনেক পিছিয়ে থাকতো। এই অবস্থাটি পেশাদারি ও বিশেষজ্ঞ সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে একটি ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণার জন্ম দিত।[৬২]

পুরো পাকিস্তান সময়ে (১৯৪৭-৭১) সর্বমোট কতজন লোক সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিল তার কোন সঠিক হিসাব অথবা জনশক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত কোন জরিপের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এমনকি কোনোক্রমে সংগৃহীত সূত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহও খুব বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় নি। এক্ষেত্রে জ্ঞাত তথ্যাদি ও অনুমিত

৬০. ঐ, 61; *The CSP Association Memorandum of 1969,* 210.

৬১. Cf. The Civil Service of Pakistan (Compostion & Cadre) Rules, 1954, in Government of Pakistan (Establishment Division), *Establishment Manual,* vol. 1 (Karachi 1968), 185-196.

৬২. দেখুন, Nasir Islam, "Pakistan", 82.

হিসাবের সাথে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত উপাত্তসমূহ মিলিয়ে নিয়েই মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। ১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পরিচালিত এক সরকারি গণনায় দেখা গেছে যে, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৩৭৬,৫২১ জন লোক সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিল।[৬৩] শিক্ষকবৃন্দ এবং রেলওয়েতে কর্মরত জনবলও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে, ডাক ও তারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিজীবী বিধায় তাদেরকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি চাকরিজীবীদের উপর পরিচালিত এক সরকারি গণনায় দেখা যায় যে, ঐ সময়ে সর্বমোট ১৮৫,৭৯৪ জন লোক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত ছিল। এদের মধ্যে ৫,৭৩৬ জন গেজেটেড অফিসার, ১০০,২৩৩ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ৭৯,৮২৫ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।[৬৪] ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এক কর্মচারী গণনায় দেখা যায়, ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই তারিখে প্রায় ১৩২,৯৯০ জন লোক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে নিয়োজিত ছিল।[৬৫] বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত নিয়ে রাল্‌ফ ব্রাইবান্টি দেখিয়েছিলেন, ১৯৬৩ সাল বা এর কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে প্রায় দশ লক্ষ (৯৯৫,৩২৩) লোক নিযুক্ত ছিল।[৬৬] আরেকটি সূত্রের হিসাব মতে, ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সরকারি চাকরিতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল বারো লক্ষ। এদের মধ্যে ৫৫৫ জন ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তা।[৬৭]

প্রাদেশিক প্রশাসন

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে পশ্চিম পাকিস্তানকে একক একটি প্রাদেশিক প্রশাসনের আওতায় আনার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোটি বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে জটিলভাবে বিন্যস্ত ছিল। পূর্ব অংশে পূর্ববঙ্গকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল গভর্নরশাসিত একক একটি প্রদেশ। আর পশ্চিম অংশে ছিল তিনজন গর্ভনরশাসিত তিনটি প্রদেশ, যথা (পশ্চিম) পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এন.ডব্লিউ.এফ.পি)। সেই সাথে ছিল (বৃটিশ) বালুচিস্তান, দি বালুচিস্তান স্টেটস (খালাত, লাসবেলা, মাকরান এবং খারানকে নিয়ে একত্রে গঠিত হয়েছিল বালুচিস্তান স্টেট্‌স ইউনিয়ন), দি এন.ডব্লিউ.এফ.পি. স্টেটস্ (দার, আম্ব, সোয়াত এবং চিত্রল), সীমান্ত উপজাতীয় অঞ্চল,

৬৩. Ralph Braibanti,, *Research on the Bureaucracy of Pakistan,* (Durham 1966), 131-132.

৬৪. দেখুন, Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *Census of Civil Employees 1965,* Vo. 1, (Dacca 1966), 1-9.

৬৫. Cf. *CSP Association Memorandum of 1969,* 210.

৬৬. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, R. Braibanti, "Concluding Observations", in R. Braibanti and others (eds.), *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition,* (Durham 1966), 648-649.

৬৭. Mumtaz Ahmad, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan,* (Karachi 1974), 63.

করাচির ফেডারেল রাজধানী এলাকা এবং খায়েরপুর ও বহওয়ালপুরের প্রিন্সলি স্টেটস্। ১৯৫৬ সালের আগ পর্যন্ত গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলি ১৯৩৫ সালের অভিযোজিত ভারত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের আওতায় পরিচালিত হতো। এবং এসব প্রদেশের শাসনপদ্ধতি মোটামুটিভাবে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের মতোই ছিল। প্রিন্সলি স্টেটগুলির অবস্থা ছিল একেবারে প্রায় একনায়কতান্ত্রিক শাসন থেকে গভর্নরের শাসনপদ্ধতির কাছাকাছি পর্যায়ের। অন্যদিকে বালুচিস্তান, করাচি এবং উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ শাসিত হতো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টদের মাধ্যমে। গভর্নর শাসিত তিনটি প্রদেশ, প্রিন্সলি স্টেটগুলো এবং উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ একক একটি প্রদেশের আওতায় এসে পশ্চিম পাকিস্তান (লাহোরে এর নতুন রাজধানী স্থাপিত হল) নাম ধারণ করলো। তখন থেকে পূর্ববঙ্গও হলো পূর্ব পাকিস্তান (আগের মতোই এর রাজধানী থেকে গেল ঢাকা)।[৬৮] ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোকে সরকারি নির্দেশ জারি, বিচার প্রশাসন (সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত), ভূমি, কৃষি, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, পানি, স্বাস্থ্য, সড়ক ও রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প এবং জনসেবা সংক্রান্ত আইন পাশের ক্ষমতা দিয়েছিল। গঠনকাঠামোর দিক থেকে অনেকটা ফেডারেল সরকারের মতোই প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারেরও ছিল একজন গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদ, এক কক্ষবিশিষ্ট একটি আইন পরিষদ, হাইকোর্ট, সচিবালয়, সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং পাবলিক কর্পোরেশন, সিভিল সার্ভিস এবং একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন। তবে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রশাসনকাঠামোর পার্থক্য নির্ণয়সূচক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট। ভৌগোলিক আয়তনের ভিত্তিতে এদের উচ্চ বা নিম্ন ক্রমটি নির্ধারিত ছিল। যেমন—বিভাগ, জেলা, মহকুমা এবং থানা/তহসিল।[৬৯]

প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন প্রদেশের নামমাত্র প্রধান। তিনি সাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বা বরখাস্ত হতেন। প্রাদেশিক পরিষদের যে সদস্য পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা অর্জন করতে পারবেন বলে মনে হতো তাঁকেই প্রদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিযুক্ত করার জন্যে ১৯৫৬ সালের সংবিধান গভর্নরকে নির্দেশ দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে গভর্নর একটি মন্ত্রীপরিষদও নিয়োগ করতেন (তিনি যেকোন মন্ত্রীকে আবার অপসারণও করতে পারতেন)।[৭০]

পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানটি নতুন অনেক কিছুই ধারণ করেছিল, আবার পুরনোও ছিল অনেক কিছু। সরকারের প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম আগের

৬৮. দেখুন, Callard, *Pakistan,* 155-156.

৬৯. দেখুন, Goodnow, 45-46.

৭০. ঐ, 48.

মতোই চলছিল। সামরিক ও বেসামরিক চাকরিগুলোকে সাংবিধানিকভাবে অনেক বেশি সুরক্ষিত করা হলো। তবে সরকারের কাঠামোটিকে ফেডারেল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হলেও ১৯৬২ সালের সংবিধানে বর্ণিত প্রাদেশিক সরকারগুলো অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়লো। প্রত্যেক প্রদেশেরই একটি করে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ থাকলেও প্রাদেশিক গভর্নর একান্তভাবেই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং অপসারিত হতেন। তা ছাড়া গভর্নরকে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্য নিয়োগের আগে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিতে হতো এবং এই মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কোন পদ ছিল না, যা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ছিল। এমন কি মন্ত্রিসভার সদস্যদের আইনপরিষদের সদস্যও হতে হতো না এবং আইনপরিষদের নিকট তাঁরা দায়বদ্ধও থাকতেন না। প্রাদেশিক বিভিন্ন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের একমাত্র কাজ ছিল গভর্নরকে তাঁর শাসন পরিচালনায় সহযোগিতা করা।[৭১]

১৯৬২ সালের সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে মোট ঊনপঞ্চাশটি বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করেছিল। এসকল বিষয়ের তালিকায় ছিল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, আন্তঃপ্রদেশ এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্য, বীমা, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং পর্যটন। বাদবাকি ক্ষমতাগুলো অনেকটা প্রদেশের জন্যেই সংরক্ষিত ছিল এবং এগুলো প্রাদেশিক আইনপ্রণেতাদের দ্বারা প্রণীত আইনের নিকট দায়বদ্ধ থাকতো।[৭২] এক্ষেত্রে অবশ্য সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদের ২ ধারার মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যতিক্রমের বিধান রাখা হয়েছিল। এই বিধান জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে হলে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, পরিকল্পনা ও সহযোগিতা অথবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমতা আনয়নের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে। ১৩১ (২) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মধ্যে প্রদেশগুলোতে 'স্বায়ত্তশাসন' চর্চার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। এই কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দেওয়া হয়েছিল প্রয়োজন সাপেক্ষে আইন বা বিধানাবলী প্রণয়নের জন্যে। এ কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টকেও দেয়া হয়েছিল পরোক্ষভাবে। কেননা প্রেসিডেন্ট ১৩১ (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আইনগত কোন পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে নির্বাহী অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনসভার মতই প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জারি করতে পারতেন।[৭৩]

আমরা এবার প্রাদেশিক প্রশাসনের বিষয়ে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো। আলোচনায় প্রধানত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবতার আলোকে লোক প্রশাসন বিষয়ের

৭১. Cf. articles 80-84 in *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan* (as modified up to 10 April 1968).

৭২. ঐ, Cf. articles 131.

৭৩. দেখুন, Braibanti, "Higher Bureaucracy of Pakistan", 217-218.

উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হবে। তবে আন্তঃপ্রাদেশিক পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলোর কথাও যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

প্রাদেশিক সচিবালয় : পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ১৯৬২ সালের রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী প্রাদেশিক সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি ডিপার্টমেন্ট ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রশাসনিক ইউনিট। এটির দায়িত্ব ছিল একটি স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে যাবতীয় সরকারি কর্মকাণ্ড নির্বাহ করা। অন্যদিকে ডাইরেকটোরেট/অধীনস্থ অফিসসমূহ 'অপারেটিং এজেন্সি' হিসেবে প্রাদেশিক সচিবালয়ের কোন না কোন ডিপার্টমেন্টের সাথে যুক্ত থাকতো। জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের আমলে সচিবালয়ের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টই এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত থাকতো। তাঁকে সহযোগিতা করার জন্যে থাকতো একদল স্থায়ী সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী; যথা— সচিব, অতিরিক্ত সচিব (কেবলমাত্র বড় ডিপার্টমেন্টগুলির ক্ষেত্রে), যুগ্ম সচিব, উপ সচিব, সেকশন অফিসার এবং করণিক পর্যায়ের বেশ কিছু কর্মচারী। একটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের প্রধান হতেন একজন সচিব। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও এই সচিব সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের জন্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন, এগুলোর সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজ পদাধিকারবলে মন্ত্রীকে সহযোগিতা প্রদান করতেন। সচিব তাঁর নিজ ডিপার্টমেন্টসহ সংযুক্ত অপারেটিং এজেন্সিগুলির মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করতেন। উদ্দেশ্য, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক বরাদ্দসমূহ প্রচলিত আর্থিক নিয়মনীতি অনুযায়ী ব্যয় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।[৭৪]

প্রাদেশিক সচিবালয় ও প্রাদেশিক ডাইরেকটোরেট বা "অপারেটিং" এজেন্সিগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক অনেকটা কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও কেন্দ্রীয় অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের মধ্যেকার সম্পর্কের অনুরূপই ছিল। প্রাদেশিক পর্যায়ের 'অপারেটিং' বা 'সংযুক্ত' বা 'ফাংশনাল' এজেন্সিগুলি (এগুলিকে এসব বিশেষ নামেই অভিহিত করা হতো) সচিবালয়ে অবস্থিত এদের নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টগুলির সাধারণ তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষা, কৃষি এবং পুলিশ ডাইরেকটোরেটসমূহ সাধারণত সচিবালয়ে অবস্থিত তাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টসমূহ, যথা—শিক্ষা, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক ডিপার্টমেন্টের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানেই নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো। বিভিন্ন ডাইরেকটোরেট বা অধীনস্থ অফিসসমূহের প্রধানদের পদবি কিন্তু এক রকম ছিল না। শিক্ষা ডাইরেকটোরেটের প্রধানকে বলা হতো ডাইরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা ডিপিআই, সড়ক পরিবহন ডাইরেকটোরেটের প্রধান ছিলেন 'চীফ ইঞ্জিনিয়ার' এবং প্রাদেশিক পুলিশের প্রধানের পদবি ছিল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বা আইজিপি।[৭৫]

৭৪. দেখুন, Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *The East Pakistan Government Rules of Business*, 1962 (revised up to June 1971), 3-4.

৭৫. Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies: Bangladesh and Pakistan* (Dhaka 1973), 102-103.

বাহ্যত প্রাদেশিক সচিবালয় কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ছোট একটি অনুকৃতি হলেও উভয় সচিবালয়ের মধ্যে বড় ধরনের কিছু পার্থক্যও ছিল। প্রাদেশিক সচিবালয়ে 'চীফ সেক্রেটারি' হিসেবে পরিচিত একজন 'চীফ' অফিসার ছিলেন। একজন সিনিয়র সিএসপি অফিসার এই পদে নিয়োগ পেতেন। সরাসরি কোন মন্ত্রীর নিকট তিনি দায়বদ্ধ থাকতেন না, দায়বদ্ধ থাকতেন কেবল মুখ্যমন্ত্রী/গভর্নর এবং পুরো মন্ত্রীপরিষদের নিকট।[৭৬] আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তিনি ছিলেন আসলে প্রাদেশিক প্রশাসনের অরাজনৈতিক প্রধান। সাধারণ প্রশাসন এবং সচিবালয়ের পুরো কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকের আয়োজন করতেন এবং মন্ত্রীপরিষদের পক্ষ থেকে নির্দেশসমূহ জারি করতেন। সিভিল সার্ভিসের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণও তিনি নিজের হাতেই রাখতেন। তাঁর কর্তৃত্বের প্রধান একটি দিক ছিল প্রদেশের সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা কর্মকর্তার উপর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান পরিচালনার ক্ষমতা। গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্টের কর্মকাণ্ডও তাঁরই সঠিক তত্ত্বধানে পরিচালিত হতো। এই ডিপার্টমেন্টটির দায়িত্ব ছিল প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।[৭৭]

কিন্তু কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে চীফ সেক্রেটারির কোন পদ ছিল না। অবশ্য বিভাগোত্তরকালে (১৯৪৭-৫১) এবং সামরিক শাসন জারির অব্যবহিত পরে (১৯৫৮) কিছু কালের জন্যে সেক্রেটারি জেনারেল নামে সিনিয়র একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের প্রধান এবং মন্ত্রীপরিষদের সচিব। বাদবাকি অন্য সব সময়েই মন্ত্রীপরিষদ সচিব কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত সকল সচিবের চীফ-অব-স্টাফের দায়িত্ব পালন করতেন।[৭৮]

১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারিতে নেয়া হিসাব মতে পূর্ব পাকিস্তানে বারোটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্ট ছিল। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ছিল ষোলো। তবে প্রতিটি প্রদেশে মোট যে পাঁচটি করে স্বতন্ত্র অফিসের সমন্বয়ে গভর্নরের সচিবালয়টি গড়ে উঠেছিল সেগুলোকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। এগুলো ছিল মুখ্য সচিবের অফিস, গভর্নরের সচিবের অফিস, পরিকল্পনা সচিবের অফিস এবং চাকরি সংক্রান্ত ও সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত ডিপার্টমেন্ট। এই অফিসগুলোর প্রতিটির প্রধান ছিলেন সচিব পর্যায়ের সিনিয়র সিএসপি অফিসার। পূর্ব পাকিস্তানে বারোটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পাঁচটিরই প্রধান ছিলেন সিএসপি অফিসারগণ। তাঁরা প্রাদেশিক মুখ্য সচিব এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের সাধারণ তত্ত্বাবধানে থেকে নিজেদের কার্যনির্বাহ করতেন। তবে প্রাদেশিক

৭৬. ১৯৫৮ সালের পূর্ববর্তীকালে ' নর (১৯৪৭-৭১) প্রদেশসমূহে মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন প্রধান নির্বাহী শাসক, কিন্তু ১৯৫৮ সালের ' । প্রকৃতপক্ষে গভর্নরই ছিলেন প্রধান নির্বাহী শাসক।

৭৭. Goodnow, 123.

৭৮. Braidanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 301.

সচিবালয় ডিপার্টমেন্টসমূহের দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে সিএসপি অফিসারদের প্রাধান্য পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানেই বেশি পরিলক্ষিত হতো। ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারির হিসাব মতে, পশ্চিম পাকিস্তানে ষোলোটি সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের মধ্যে বারোটির প্রধান ছিলেন সিএসপি অফিসার।[৭৯] যাই হোক, ১৯৭০ সালের শেষ দিকে এসে পূর্ব পাকিস্তানে সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সতেরোতে। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ চৌদ্দটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তাগণ। অবশ্য গভর্নরের সচিবের অফিস এবং মুখ্য সচিবের অফিসকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। এই অফিস দুটোর প্রধানও ছিলেন দু'জন সিএসপি অফিসার। এছাড়াও সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপসচিব পদে সিএসপি ক্যাডারের বহু অফিসার কর্মরত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব বোর্ডের (প্রাদেশিক পর্যায়ে কর সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ) পাঁচজন সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া বাদ বাকি সবাই এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন সিএসপি অফিসার। প্রদেশের চারটি বিভাগের মধ্যে তিনটিরই কমিশনার এবং উনিশটি জেলার মধ্যে বারোটির জেলা অফিসার (ডেপুটি কমিশনার) পদে সিএসপি ক্যাডারের অফিসারগণই কর্মরত ছিলেন। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের রেজিস্ট্রারের পদটিতে নিয়োজিত ছিলেন একজন সিএসপি অফিসার।[৮০]

প্রাদেশিক সরকারেও সিএসপি অফিসারের এ জাতীয় প্রাধান্য বজায় থাকার মূলে ছিল ১৯৫৪ সাল থেকে চাকরিতে সিএসপিদের জন্য কোটাপদ্ধতি এবং ক্যাডার-নীতির প্রচলন। এই নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক সচিবালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিব এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা অফিসার ও রাজস্ববোর্ডের সদস্যের মতো পদগুলির মোট দুই-তৃতীয়াংশই সিএসপি অফিসারদের দ্বারা পূরণ করতে হবে। একই নীতির অন্য একটি ধারাবলে সিএসপি ক্যাডারের ৩০ শতাংশ পদ আবার প্রাদেশিক সাধারণজ্ঞ সিভিল সার্ভেন্টদের (অর্থাৎ ইপিসিএস অফিসার) মধ্য থেকে পূরণ করার কথা ছিল। তবে এই পদ্ধতিতে পূরণকৃত সিএসপি ক্যাডারের পদগুলো ছিল একেবারেই অস্থায়ী ও স্বল্পমেয়াদী এবং এগুলো 'তালিকাভুক্ত পদ' হিসেবে চিহ্নিত থাকতো।[৮১]

বিভাগ : প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রতিটি প্রদেশই কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত থাকতো এবং প্রতিটি বিভাগ আবার গঠিত হতো কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল

৭৯. Braibanti, পূর্বোক্ত, 225

৮০. Cf. Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *The East Pakistan Civil List 1967-68*, Part I No. II, (Dacca 1971), 1-31.

৮১. "তালিকাভুক্ত" হিসেবে চিহ্নিত কিছু পদের বিধান চালু হয়েছিল ভারত বিভাগের আগে থেকেই। সেই বিধান অনুযায়ী সাধারণভাবে আইসিএস অফিসারদের জন্যে নির্ধারিত জেলাপ্রধান বা জেলা ও সেসন জজ-এর মত পদগুলির কোন কোনটিতে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে বাছাই করা দু'একজন কর্মকর্তাকেও নিয়োগ দেয়া হতো। Cf. *Report of the Indian Statutory Commission, Cmp. 3568, 1930*, vol. I, 265

চারটি বিভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তেরোটি।[৮২] প্রতিটি বিভাগের প্রধান ছিলেন 'বিভাগীয় কমিশনার' পদবিধারী একজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা। তাঁর সরকারি দায়দায়িত্ব অনেকটা প্রায় বৃটিশ ভারতীয় সময়ের দায়দায়িত্বের মতোই ছিল। অর্থাৎ তাঁর বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজের ব্যাপারে তাঁর নিজের কোন দায়-দায়িত্বই ছিল না। তিনি কেবল তাঁর বিভাগীয় জেলা অফিসারদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও তাদের কাজকর্মের সাধারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। এ ছাড়া বিভাগীয় সদর দফতরে অবস্থিত বিভিন্ন ডাইরেকটোরেটের অফিসসমূহে কর্মরত অফিসারদের কর্মকাণ্ডের সাধারণ তদারকির কাজও তিনি করতেন।[৮৩] তবে জেলা অফিসারদের তদারকি করার মতো অতি সাধারণ একটি দায়িত্বই কেবল বিভাগীয় কমিশনারদের উপর কেন যে অর্পিত হয়েছিল তার যুক্তিসঙ্গত কারণটি ছিল সম্ভবত এই যে, বিভাগের আয়তন বড় ছিল বিধায় কার্যকর একটি একক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বিভাগকে গণ্য করার বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচিত হয় নি।[৮৪]

এটিও ঠিক যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনাররা যে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন তা সর্বত্র সমান মাত্রার ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনাররা যে তদারকির দায়িত্ব পালন করতেন তার ক্ষেত্র ছিল অনেক বেশি বিস্তৃত এবং দায়িত্বপূর্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনারদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই ভিন্ন মাত্রাটি সংযুক্ত হবার আংশিক কারণ নিহিত রয়েছে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে। তা হলো, বৃটিশ ভারতে বেশ কিছু ননরেগুলেটেড এরিয়া বা অনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বা প্রদেশ ছিল। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ঐসব অঞ্চলে আলাদা একটি বিশেষ ধরনের প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছিল। পরবর্তীকালের তিনটি নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান) পশ্চিম পাকিস্তানের ঐসব অনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বা প্রদেশেরই উত্তরসূরি।

আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশসমূহের বিভাগীয় কমিশনারদেরকে তাঁদের অধীনস্থ জেলা অফিসারদের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্মের উপর খুবই তীক্ষ্ণ নজর ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হতো। কারণ এসব অফিসার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমনিতেই প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতেন। প্রতিটি জেলা অফিসার তাঁর নিজস্ব সীমায় সব ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। বিচার বিভাগীয় কাজ সহ আরো বহু ধরনের দায়িত্ব তিনি একাই পালন করতেন। দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রিত প্রদেশের কোন জেলার ন্যায় অন্তত জেলা

৮২. বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট বিভাগ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, 122-126 (fn. 4).

৮৩. দেখুন, Abedin, ঐ।

৮৪. দেখুন, *Report of the Bengal Administration Enquiry Committee, 1944-45* (Chairman, Sir A. Rowlands), (Alipore 19450, para 114 (1).

জজের মতো ন্যূনতম একজন প্রতিদ্বন্দ্বীও তাঁর ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই চিন্তা করা হয়েছিল যে, অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশের বিভাগীয় কমিশনারদের নজরদারিটি যদি কর্তৃত্বপূর্ণ হয় তবে তা অবাধ স্বাধীনতা ভোগকারী জেলা অফিসারদের রাশ টেনে ধরার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। এর ঠিক বিপরীত চিত্রটিই পাওয়া যায় নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ বৃটিশ বাংলায়। এখানকার জেলা অফিসারদের স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের তেমন কোন সুযোগই ছিল না। তাদেরকে বেঁধে দেয়া সাধারণত অপরিবর্তনশীল কিছু নিয়ম-কানুনের মধ্যে কাজ করতে হতো। আর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলাসমূহের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের উপর নজরদারিমূলক একটি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলেও তা ছিল নামমাত্র। রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধ বা অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনারগণ পূর্ব পাকিস্তানের বিভাগীয় কমিশনারদের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতেন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগীয় কমিশনারগণ উত্তরাধিকারসূত্রেই অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশসমূহের প্রশাসনব্যবস্থাটি পেয়েছিলেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল নিয়ন্ত্রিত বৃটিশ বাংলা প্রদেশের প্রশাসনব্যবস্থাটি।[৮৫]

কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো, যেমন বিভাগীয় কমিশনারদের পোস্টিং, পদোন্নতি, বদলি বা ছুটির বিষয়, সাধারণত প্রদেশের মুখ্য সচিবের সার্বিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনের অধীনে চাকরি এবং সাধারণ প্রশাসন ডিপার্টমেন্ট (প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় কর্মী ব্যবস্থাপনা এজেন্সি) নিয়ন্ত্রণ করতো। তবে যেসব বিভাগীয় কমিশনার সিএসপি ক্যাডারের কর্মকর্তা ছিলেন তাদের বিষয়গুলোর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাপন বিভাগের হাতেই থাকতো। বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারের পদমর্যাদা হচ্ছে প্রাদেশিক সরকারের একজন সচিব অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের একজন যুগ্মসচিবের সমান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে যে মোট ষোলোটি বিভাগীয় কমিশনারের পদ ছিল তাদের সবগুলোই সংরক্ষিত ছিল সিএসপি অফিসারদের জন্যে।[৮৬] যাই হোক, ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারির এক হিসাবমতে সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের চারটির মধ্যে দু'টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বারোটির মধ্যে দশটি বিভাগীয় কমিশনারের পদে সিএসপি অফিসাররা কর্মরত ছিলেন।[৮৭] বিভাগীয় কমিশনারের বাদবাকি পদগুলোতে কর্মরত ছিলেন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের 'তালিকাভুক্ত পদ'-এর কর্মকর্তারা।

জেলা : প্রশাসনিক প্রয়োজনে পূর্ব পাকিস্তানকে মোট ১৯টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে মোট ৫৫টি (এর মধ্যে উপজাতীয় অঞ্চলের ৬টি রাজনৈতিক এজেন্সিও অন্তর্ভুক্ত ছিল)

৮৫. Cf. Najmul Abedin, 31, 125.

৮৬. Cf. The Civil Service of Pakistan (Composition & Cadre) Rules, 1954.

৮৭. দেখুন, Braibanti, " The Higher Bureaucracy of Pakistan", 302.

জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৫৫,১২৬ বর্গমাইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৩১০,৪০৩ বর্গমাইল। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি ১০ লক্ষ এবং বসতির হার ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৯২২ জন। অন্যদিকে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩০ লক্ষের মতো এবং বসতির হার ছিল প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৮৩ জন।[৮৮] সাধারণভাবে একটি জেলার আয়তন ছিল ৪০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল দশ থেকে বিশ লক্ষের মধ্যে।

জেলা অফিসার ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন 'কর্ম বাস্তবায়ন' (functional) ডিপার্টমেন্টের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা একটি জেলাসদরে অবস্থান করতেন। এদের মধ্যে সাধারণত ছিলেন একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, একজন জেলা শিক্ষা অফিসার, একজন জেলা স্কুল পরিদর্শক, একজন জেলা স্বাস্থ্য অফিসার, একজন সিভিল সার্জন এবং একজন নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক) সহ আরো অনেকে। এইসব কর্মকর্তা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত হতেন এবং নিয়োগদাতা ডিপার্টমেন্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকতেন। তবে সাধারণত তারা দ্বৈত তদারকির নিয়ন্ত্রণে কাজ করতেন। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদেরকে জেলা অফিসারের সাধারণ তত্ত্বাবধানে তাদের নিজ নিজ কাজকর্ম পরিচালনা করতে হতো। বস্তুত জেলা অফিসার ছিলেন ছোটখাট একজন গভর্নর এবং তিনিই জেলা পর্যায়ে প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। তাকে ঘিরেই জেলার পুরো প্রশাসন আবর্তিত হতো। তাকে সময় সময় জেলা প্রশাসনের 'পিভট', 'কিংপিন', 'কীস্টোন', 'আর্কস্টোন', 'মেরুদণ্ড' এবং 'স্নায়ুকেন্দ্র' বলে অভিহিত করা হতো। বস্তুত একটি জেলায় প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্যে তিনিই ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল ব্যক্তি।[৮৯]

একজন জেলা অফিসারের প্রাথমিক কাজ ছিল ভূমিরাজস্ব আদায় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাবলে ফৌজদারি মামলায় সর্বাধিক দুই বছর পর্যন্ত সাজা প্রদান করতে পারতেন। তাকে পর্যায়ক্রমেই জেলার দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করতে হতো এবং তিনিই ছিলেন সরকারের উচ্চ পর্যায় ও জেলার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রধান মাধ্যম। পাঁচশালা পরিকল্পনাসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন-উত্তর মৌলিক গণতন্ত্রের কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়নে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার বিষয়টি ছিল বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[৯০]

৮৮. Abedin, 107-112 (fn. 1).

৮৯. দেখুন, A. M. A. Muhith, *The Deputy Commissioner in East Pakistan*, (Dacca 1968), 11-34.

৯০. Goodnow, 124-127.

জেলা অফিসারের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্যে প্রাদেশিক সদর দফতরে স্বতন্ত্র বা আলাদা ধরনের কোন অফিস ছিল না। কার্যত তিনিই ছিলেন জেলা পর্যায়ে সবগুলো সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের সরাসরি প্রতিনিধি। প্রাদেশিক সরকারের সকল সচিবই নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা পাঠানোর জন্যে তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তাঁরা তার কাছ থেকে বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদনও মাঝে মাঝে চেয়ে পাঠাতেন। এমনিতে সবগুলো সচিবালয় ডিপার্টমেন্টের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকলেও প্রধানত চাকরি ও সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার, অর্থ ও পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্টের সাথেই জেলা অফিসারের কাজের সম্পর্ক ছিল বেশি। তার চাকরির কর্মীব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদির অধিকাংশই নিয়ন্ত্রিত হতো মুখ্য সচিবের সার্বিক নিয়ন্ত্রণাধীন চাকরি ও সাধারণ প্রশাসন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক।[৯১] এক হিসাব মতে, ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের উনিশটি জেলার মধ্যে এগারোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পঞ্চান্নটি জেলার মধ্যে সাতাশটির জেলা অফিসারই ছিলেন সিএসপি ক্যাডারের অফিসার।[৯২]

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি (উনিশটি জেলার অন্যতম) প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকাসমূহের সমন্বয়ে ১৮৬০ সালেই স্বতন্ত্র একটি সত্তা নিয়ে জন্মলাভ করেছিল। অঞ্চলটিতে প্রধানত বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করতো। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এবং এর পরবর্তী সংশোধনী ও বর্ধিত ধারাগুলো অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় তিনটি 'সার্কেলে' বিভক্ত একটি 'বহির্ভূত' অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। অতঃপর প্রতিটি সার্কেলকে আবার একজন আঞ্চলিক উপজাতীয় 'চিফ' (স্থানীয়ভাবে এঁরা রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন)-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সার্কেল-'চিফ' এবং তাঁর অধীনস্থ হেডম্যানরাই সার্কেলের পুরো প্রশাসনের দায়িত্বে ছিল। তাদের প্রাথমিক কাজ ছিল রাজস্ব আদায় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ছোটখাট বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করা। তবে এসব 'চিফ'/হেডম্যানের মূল এবং একক নিয়ন্ত্রক ছিলেন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি)। তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের হয়ে এই অঞ্চলের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। যেমন, তিনি ছিলেন একাধারে জেলা মেজিস্ট্রেট, জেলা জজ, জেলা রেজিস্ট্রার ইত্যাদি। যাই হোক, ১৯৬৪ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আর 'বহির্ভূত অঞ্চল' হিসেবে থাকলো না। ফলে এর প্রশাসনিক ধরনটিও অন্য সব সাধারণ জেলার মতোই হয়ে গেল। তথাপি প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডিসির পদটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই রয়ে গেল; আগের মতোই তিনি জেলার 'কিংপিন' হিসেবেই বিবেচিত হতে

৯১. Najmul Abedin, 121.

৯২. দেখুন, Braibanti, "*The Higher Bureaucracy of Pakistan*", 302.

থাকলেন। তবে প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে তাকে এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হতে বলা হলো; তাকে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রয়োজনীয় মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং একই সাথে উপজাতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও নির্দেশ দেয়া হলো।[৯৩]

মহকুমা : পূর্ব পাকিস্তানের উনিশটি জেলার প্রতিটি (কেবল টাঙ্গাইল ও পটুয়াখালী জেলা বাদে) জেলাকে 'মহকুমা' নামে দুই বা ততোধিক প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে এই প্রদেশে সর্বমোট ৫৫টি মহকুমা ছিল। প্রতিটি মহকুমারই জনসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লাখের মতো এবং আয়তন ছিল ৫০০ থেকে ১০০০ বর্গমাইলের মধ্যে। একজন তরুণ সিএসপি অফিসার অথবা তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞ একজন ইপিসিএস অফিসার এই প্রশাসনিক ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। তাকে বলা হতো মহকুমা অফিসার। প্রতিটি জেলায় একটি করে মহকুমাকে আবার সদর মহকুমা বলা হতো। জেলার সদর দফতর এই মহকুমাতেই অবস্থিত থাকতো।[৯৪]

বস্তুত আলাদাভাবে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৃটিশ বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এটি প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল জেলা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনকে জনগণের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া, যাতে করে প্রধানত তাদের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাসমূহ সহজে উপলব্ধি এবং সমাধান করা যায়। বলা যায়, মহকুমা প্রশাসনটি ছিল আসলে জেলা প্রশাসনেরই বর্ধিত অংশ। দেখা যেতো, যেকোন জেলারই জেলা অফিসারের অফিস এবং ঐ জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমা অফিসারের অফিস একই শহরে অবস্থিত ছিল। ফলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারের উপস্থিতির কারণে ঐ শহরেই কর্মরত সদর মহকুমা অফিসারের অস্তিত্ব বা প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব একটা টের পাওয়া যেতো না।[৯৫]

সে যাই হোক, সদর এলাকার বাইরের অন্যান্য মহকুমার মহকুমা অফিসার কিন্তু যেকোন বিবেচনায়ই নিজ মহকুমায় কার্যত জেলা অফিসারের মতোই ছিলেন। সেখানে তিনি একজন জেলা অফিসারের মতোই মর্যাদা আর শ্রদ্ধা পেতেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায় থেকে শুরু করে সামাজিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা পর্যন্ত তার কার্যপরিধি বিস্তৃত ছিল। প্রাদেশিক সরকারের অধিকাংশ 'অপারেটিং' ডিপার্টমেন্টেরই মহকুমা সদরে নিজ নিজ প্রতিনিধি ছিল। তাদেরকে এক প্রকার দ্বৈত তদারকির অধীনেই কাজ করতে হতো। প্রথমত, জেলা পর্যায়ে তাদের নিজস্ব

৯৩. আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Muhammad Ishaq (ed.) *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts,* (Dacca 1971), 251-281

৯৪. Najmul Abedin, 127.

৯৫. দেখুন, A. M. A. Muhith, 16-17.

অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধতন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ছিলেন, যারা নিয়মমাফিক তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অন্যদিকে আবার মহকুমা সদরে অবস্থানরত মহকুমা অফিসারও তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর একটি সাধারণ নজরদারি চালাতেন। উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামগ্রিক একটি সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা।[৯৬]

তরুণ সিএসপি অফিসারদের মধ্য থেকে একজন সহকারী কমিশনার অথবা পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের কোন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকেই মহকুমা অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হতো। তাকে সহযোগিতা করার জন্য থাকতেন আরো কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদেরকে 'দ্বিতীয়' অথবা 'তৃতীয়' শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গণ্য করা হতো। আর মহকুমা অফিসারকে সাধারণত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের মর্যাদা প্রদান করা হতো।[৯৭] সিএসপি ক্যাডারের সদস্যদের ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনারের পদটিই ছিল সর্বনিম্নের। এবং চাকরিতে যোগদানের পর প্রথম দু'তিন বছর একজন সিএসপি অফিসার সাধারণত জেলা অফিসারের সহকারী হিসেবে কর্মরত থাকতেন। এই সময় তিনি তুলনামূলকভাবে সহজ মামলাগুলোতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতেন এবং সেই সাথে রাজস্ব সংক্রান্ত কম জটিল বিষয়গুলোরও দেখাশুনা করতেন। এভাবে এক সময় যখন দেখা যেতো যে তিনি প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, তখনই তাকে জেলা অফিসারের তত্ত্বাবধান থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি মহকুমার দায়িত্বে বসিয়ে দেয়া হতো।[৯৮] সিএসপি ক্যাডার রুল অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে সহকারী কমিশনারের ৩২টি পদ তরুণ সিএসপি অফিসারদের জন্যে নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে জেলার নিম্নতর ধাপে আলাদা একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহকুমা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় নি। তবে এর গুরুত্ব দেশবিভাগের পর থেকেই ক্রমান্বয়ে ঐ অংশে অনুভূত হতে থাকে। ১৯৬০ সালে যখন প্রাদেশিক প্রশাসন কমিশন (পিএসি) স্থাপন করা হয় তখন সারা পশ্চিম পাকিস্তানে মহকুমার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪টি। আর ১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৮৬তে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনেক তহসিল (পশ্চিম পাকিস্তানে প্রশাসনের সর্বনিম্ন ধাপ) মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি এতটা দৃঢ় গতিতে সম্পন্ন হয়েছিল সম্ভবত পিএসির কিছু সুপারিশের কারণে। পিএসি তার সুপারিশে বলেছিল যে, 'জেলা পর্যায়ে একটি দক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে হলে নীচের দিকের প্রশাসন ব্যবস্থাকেও অনেক বেশি মজবুত করতে হবে এবং

৯৬. Najmul Abedin, 119-120.

৯৭. Najmul Abedin, 126-129.

৯৮. Goodnow, 175.

এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে বর্তমানে যেসব এলাকায় মহকুমা ব্যবস্থা চালু নেই সেসব এলাকায় তা স্থাপন ও শক্তিশালী করাই হবে সঠিক ও উপযুক্ত পদক্ষেপ'।[৯৯] পিএসি সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব করে যে, বড় বড় তহসিলগুলোকে শীঘ্রই মহকুমায় রূপান্তরিত করতে হবে। আর ছোট আকারের তহসিলগুলোকে পরবর্তী দশ বছর মেয়াদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মহকুমা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।[১০০]

তবে, যে বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানে মহকুমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা হচ্ছে ১৯৫৯ সাল থেকে চালু হওয়া মৌলিক গণতন্ত্র কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়। আর প্রাথমিকভাবে এসব কর্মকাণ্ডের সরাসরি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রয়োজন থেকেই বড় বড় জেলাগুলোকে একাধিক মহকুমায় ভাগ করে ফেলা হয়। তবে জেলাসদরের আওতায় অতিরিক্ত হিসেবে প্রতি জেলায় একটি করে সদর মহকুমা স্থাপনের ধারণাটি পশ্চিম পাকিস্তানে কখনো বাস্তবায়িত হয় নি।[১০১]

পশ্চিম পাকিস্তানে (সিন্ধু ব্যতীত) মহকুমা প্রধানকে বলা হতো মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু সিন্ধুতে তার পদবি ছিল মহকুমা অফিসার। সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মরত তরুণ সিএসপি অফিসার অথবা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারাই যথারীতি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করতেন। সিএসপি ক্যাডার রুল অনুযায়ী সহকারী কমিশনার/মহকুমা অফিসারের সর্বোচ্চ ৬৭টি পদ তরুণ সিএসপি অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত থাকতো।[১০২]

থানা/তহসিল : পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিটি মহকুমা কয়েকটি থানায় বিভক্ত ছিল। 'থানার' আক্ষরিক অর্থ হলো 'পুলিশ স্টেশন'। তবে প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে সারা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বমোট ৪১১টি থানা অবস্থিত ছিল। মূলত পল্লী এলাকায় একটি পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই থানাগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিটি থানাসদরেই পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টরের অধীনে কয়েকজন জুনিয়র অফিসার সহ মোটামুটি আকারের একটি পুলিশ বাহিনী নিয়োজিত থাকতো। কর্মরত এই পুলিশ বাহিনীর সদস্যসংখ্যা কত হবে তা নির্ভর করতো সংশ্লিষ্ট থানার আয়তন এবং এর সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর।[১০৩]

---

৯৯. দেখুন, *Report of the Provincial Administration Commission*, (Lahore 1960), p 189

১০০. ঐ

১০১. পশ্চিম পাকিস্তানের মহকুমা ব্যবস্থার কাঠামোর কার্যাবলী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Ahmad Maqsood Hameedee, "Sub-divisional Administration in West Pakistan", in Inayatullah (ed), *District Administration in West Pakistan* (Peshawar 1964), 101-107

১০২. Cf. The Civil Service of Pakistan (Composition & Cadre) Rules, 1954.

১০৩. Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, 129.

১৯১৩ সালে 'সার্কেল' নামে বৃটিশ বাংলায় নতুন আকারের একটি প্রশাসন-কাঠামোর প্রবর্তন ঘটে। বস্তুত স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠা এই সার্কেল থেকেই মহকুমার নিম্নতর সাধারণ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে থানার উদ্ভব হয়। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, একটি সার্কেলের অধীনে একই মহকুমার দুই বা ততোধিক থানা অবস্থিত থাকতো এবং এই থানাগুলোর সীমার মধ্যে ছিল আবার কমবেশি পঁচিশটি করে ইউনিয়ন। প্রতিটি ইউনিয়নের আয়তন ছিল দশ থেকে পনেরো বর্গমাইল বা প্রায় দশটি গ্রামের সমান। লোকসংখ্যা দশ হাজারের মতো।[১০৪] দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বেঙ্গল জুনিয়র সিভিল সার্ভিসের জুনিয়র কোন অফিসারকে সার্কেলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হতো। তার পদবি ছিল 'সার্কেল অফিসার'। তার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল সার্কেলের অধীনস্থ ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের (গ্রামভিত্তিক সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা) কর্মকাণ্ড তদারক করা। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এগুলো সংগঠিত ও বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদেরকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের বুদ্ধি-পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতেন। একজন সার্কেল অফিসার তার সার্কেলের সীমার মধ্যে বলা যায় সব ধরনের দায়িত্বই পালন করতেন যাতে করে মনে হতো, তিনি ঐ সার্কেলে তার উপরস্থ মহকুমা অফিসারের একেবারে প্রত্যক্ষ একজন প্রতিনিধি। এছাড়াও পরিস্থিতির চাহিদা এবং উপরস্থ মহকুমা অফিসার, জেলা অফিসার এবং বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশমতো তাকে আরো অনেক কাজ (প্রধানত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান এবং তথ্যাদি সরবরাহ) করতে হতো।[১০৫]

১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার উপলব্ধি করলো যে, ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র কার্যক্রমের আওতায় পল্লী অঞ্চলের জন্যে নেয়া ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে প্রচলিত 'সার্কেল' প্রশাসনটিকে আরো জোরদার করা দরকার। তদনুযায়ী সরকার ১৯৬১ সালে সার্কেলের আয়তন কমিয়ে এনে একটি থানার সীমায় একে পুনর্বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রায় একই সময়ে প্রধানত বিভিন্ন সহযোগী সার্ভিসের মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের নিয়ে নতুন এক ব্যাচ অফিসার তৈরি করা হয়। তাদের এক এক জনকে পুনর্গঠিত প্রতিটি থানার উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়ে সার্কেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (নির্বাহী)[১০৬] নামে নবগঠিত একটি সার্ভিসের সদস্যপদ

১০৪. দেখুন, S D Khan, *Note on Reorganization of Local Bodies in the Province*, (Dacca 1959), 13, Hugh Tinker, *Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma* (London 1954), 118

১০৫. Md Anisuzzaman, *The Circle Officer: A Study of His Role*, (Dacca 1963), 3-4.

১০৬. Cf. Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *The East Pakistan Establishment Manual*, (Dacca 1968), 39-42.

প্রদান করা হয়। সরকার অপারেটিং ডিপার্টমেন্টগুলির প্রশাসনিক স্তর থানা পর্যন্ত বিস্তৃত করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে থানা পর্যায়ে কর্মরত ঐ সকল ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা স্থানীয় প্রয়োজনের নিরিখে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার সুযোগ পায়। থানা পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি অফিসের কর্মকাণ্ডের পরিধি সংশ্লিষ্ট থানার আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এভাবেই দেখা গেল যে, নতুন করে পুনর্গঠিত থানাগুলোর সবই ১৯৬১ সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে থানা পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন অপারেটিং ডিপার্টমেন্টের অফিসসমূহের সমন্বয়ে বৃহদাকার একটি প্রশাসনিক কমপ্লেক্সে পরিণত হয়ে গেছে। এসব ফাংশনাল অফিস ও তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সার্কেল অফিসারের আইনগত কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও তাকে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের বিষয়েই ওয়াকেবহাল থাকতে বলা হয়েছিল। তিনি এই অফিসের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলোর মধ্যে প্রধানত উৎসাহ বা তাগাদা প্রদান করতেন, বৈঠকে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতেন। তাকে কার্যত মহকুমা অফিসের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। ফলে দেখা যেত যে, নিজস্ব পরিসরে তিনি প্রায়শঃই যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব বিস্তার এবং সমীহ আদায় করতেন।[১০৭] তবে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) সব সময়েই যে কেবল উন্নয়ন-কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তা নয়, জেলা অফিসার এবং মহকুমা অফিসারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারেও তাকে আরো অনেক কাজ সম্পাদন করতে হতো। সুতরাং এটি খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তার সময় শ্রমের অধিকাংশটাই ব্যয় হয়ে যেত জেলা ও মহকুমা অফিসারদের কাছ থেকে যে-কোন সময় তলব করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং তথ্য সরবরাহের কাজে। এছাড়া তাকে তার নিজের উপর ন্যস্ত আনুষ্ঠানিক দায়-দায়িত্বাদি সম্পর্কিত এবং সার্কেল অফিসার হিসেবে পুরো থানা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার একটি প্রতিবেদন প্রতি মাসেই মহকুমা অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হতো। এমনকি জেলা এবং মহকুমা অফিসারদের মতো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ের কোনো রকম দায়-দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) উপর ন্যস্ত না থাকা সত্ত্বেও তাকে থানার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং রাজস্ব সংগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিতভাবে জেলা ও মহকুমা অফিসারদেরকে অবহিত করতে হতো।[১০৮]

পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে (সিন্ধু ছাড়া) তহসিলই ছিল জেলার অধীনস্থ মহকুমা স্বরূপ। আবার কোথাও কোথাও এই তহসিল ছিল মহকুমারই একটি অঙ্গবিশেষ। যেমন সিন্ধুতে প্রতিটি জেলাই কয়েকটি করে মহকুমায় বিভক্ত ছিল। সেখানে তালুকগুলি (তহসিলেরই পরিপূরক রূপ) ছিল আবার মহকুমারই অংশ স্বরূপ। প্রথমত, রাজস্ব প্রশাসনের ইউনিট হিসেবেই তহসিল ও তালুকগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই স্তরের

১০৭. Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, 129-131.

১০৮. ঐ।

প্রশাসনব্যবস্থাটি পুরোপুরিই তখন মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিক থেকে যখন অধিকাংশ অপারেটিং ডিপার্টমেন্টই তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো একেবারে তৃণমূলে নিয়ে যেতে শুরু করলো, তখন থেকেই ক্রমান্বয়ে তহসিল এবং তালুকগুলো আন্তঃডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এসব কেন্দ্রে কর্মরত সকল অফিসারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন প্রধান রাজস্ব অফিসার। তহসিলের ক্ষেত্রে তার পদবি ছিল তহসিলদার এবং তালুক হলে বলা হতো মুখতিয়ারকার। পূর্ব পাকিস্তানের সার্কেল অফিসারদের মতোই এসব তহসিলদার বা মুখতিয়ারকারেরও তাদের নিজ নিজ তহসিল বা তালুকে অবস্থানরত অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক কোন নজরদারির ক্ষমতা ছিল না। তথাপি জেলা অফিসারের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট/অফিসার ছিল তাদের) প্রতিনিধি এবং সেই অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীনতম সরকারি পদের কর্মকর্তা হিসেবে একজন তহসিলদার বা মুখতিয়ারকার তার অন্যান্য সহকর্মী এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী এবং সমীহ আদায়কারী কর্মকর্তা ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সার্কেল অফিসারের মতো তাকেও জেলা অফিসারের (অথবা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট/অফিসারের) নিকট পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হতো। তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের ক্ষেত্রে সার্কেল অফিসারের ভূমিকা থেকে তহসিলদারের (মুখতিয়ারকারের) ভূমিকা আলাদা ছিল। যেমন তহসিলদার দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও কাজ করতেন। অথচ সার্কেল অফিসারের বিচারকার্য সংক্রান্ত কোন ভূমিকাই ছিল না। এ ছাড়া তহসিলদার বা মুখতিয়ারকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি কোন ভূমিকাই ছিল না। কারণ এসব কর্মকাণ্ড তদারক করার জন্যে উন্নয়ন অফিসার নামে আলাদাভাবে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সার্কেল অফিসারই ছিলেন ঐ স্তরের মুখ্য সরকারি কর্মকর্তা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিম্নতম ঐ একই স্তরে নিযুক্ত রাজস্ব অফিসার অর্থাৎ তহসিলদার বা মুখতিয়ারকার ছিলেন সরকারের সর্ববিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা।[১০৯]

পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ অঞ্চলসমূহ : আগের পরিচ্ছেদগুলিতে যে পদ্ধতির প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কিছু দুর্গম পাহাড়ি এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অঞ্চলের জন্যে প্রযোজ্য ছিল না। অঞ্চলগুলো ছিল আম্ব, চিত্রল, দার এবং সোয়াত রাজ্য; খাইবার, কুররাম, মালাকান্দ, মোহমান্দ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের রাজনৈতিক এজেন্সি এবং বানু, দেরা

১০৯. আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Najmul Abedin, 133-134; Inayatullah, *Basic Democracies, District Administration and Development* (Peshawar 1964), 205-222.

ইসমাইল খান, হাজারা, কোহাট, মার্দান ও পেশোয়ার জেলা সংলগ্ন উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ। এসব অঞ্চলের আলাদা ধরনের ভূ-প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রচলিত মানের একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করার অনুকূল ছিল না বলেই মনে করা হয়েছিল। এগুলোর কোন কোনটি স্থানীয় গোষ্ঠীপতিদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। কোন কোনটি আবার শাসিত হতো বিভিন্ন ধরনের উপাধিধারী একনায়কদের দ্বারা। তবে এদের সবাই কমবেশি পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগত ছিল।

এসব অঞ্চলের সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত এক একটি এলাকার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন একজন সিএসপি অফিসার অথবা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের (পিসিএস) কোন কর্মকর্তা। তবে অঞ্চলভেদে তাদের মর্যাদা এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বেশ তারতম্যও থাকতো। এসব এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সাধারণত প্রাদেশিক গভর্নরের একজন প্রতিনিধি হিসেবেই নিয়োজিত থাকতেন এবং প্রাদেশিক সরকার ও ঐ বিশেষ এলাকার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করাই ছিল তার প্রাথমিক দায়িত্ব। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান দু'টির উভয়টিতেই এই মর্মে একটি বিধান চালু ছিল যে, প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক জারিকৃত অথবা প্রাদেশিক কিংবা জাতীয় আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনই ঐসব বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না যদি না পূর্বাহ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়ে থাকে।[১১০] ১৯০১ সালের সীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন নামে বিশেষ কিছু আইন পার্বত্য অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে চালু ছিল। এসব আইনের মধ্যেই পার্বত্য অঞ্চলগুলোর প্রশাসন ব্যবস্থাটি কেমন ধরনের হবে তার একটি বিস্তারিত রূপরেখা দেয়া ছিল। ঐসব বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনায় রেখেই অঞ্চলগুলোকে প্রধানত প্রশাসনিক প্রয়োজনে 'রাজনৈতিক এজেন্সি' নামে আলাদা কতকগুলো ইউনিটে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রতিটি রাজনৈতিক এজেন্সির দায়িত্বে থাকতেন জেলা অফিসারের সমমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। তার পদবি ছিল রাজনৈতিক এজেন্ট। তাকে সহযোগিতা করার জন্যে ছিলেন একজন সহকারী রাজনৈতিক এজেন্ট, একজন সহকারী রাজনৈতিক অফিসার এবং অধস্তন কিছু কর্মচারী। প্রতিটি এজেন্সিতেই প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় উভয় সরকারেরই কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি ছিল। আর এদের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন এবং তদারকির দায়িত্ব পালন করতেন স্বয়ং রাজনৈতিক এজেন্ট। রাজনৈতিক এজেন্সি এবং অন্যান্য সাধারণ এলাকায় কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যেই আন্তঃবদলির বিধান চালু ছিল।[১১১]

তবে আম্ব, দার, সোয়াত এবং চিত্রলের প্রিন্সলি স্টেটসমূহে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অন্যান্য উপজাতীয় অঞ্চলের ব্যবস্থার চাইতে বেশ আলাদা ধরনের ছিল। এসব স্টেটের

১১০. Goodnow, 126-127

১১১. Abedin, 141.

অভ্যন্তরীণ প্রশাসন কার্যত প্রচলিত জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার আওতার বাইরেই ছিল। এবং এসব প্রশাসনের পুরোটাই ছিল ক্ষমতাসীন সামন্ত প্রধানদের হাতে। সামন্ত শাসকরাই (এদের পদবি ছিল ওয়ালি, নওয়াব, মিম, খান এবং নিজাম) ছিল সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। তথাপি রাজনৈতিক এজেন্টদের মাধ্যমে এসব সামন্ত শাসক এবং পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের মধ্যে একটি সংযোগ রক্ষিত ছিল। এসব সংযোগ রক্ষার কাজে সংশ্লিষ্ট স্টেটের পার্শ্ববর্তী এলাকার কোন আবাসিক বাড়ি বেছে নেয়া হতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চিত্রল, সোয়াত এবং দার স্টেটের সামন্ত শাসকদের সাথে মালাকান্দ এজেন্সির রাজনৈতিক এজেন্টের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করা হতো।[১১২]

যাই হোক, ১৯৭০ সাল কিংবা তারই কাছাকাছি সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রিন্সলি স্টেটগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয় এবং এদের সামন্ত শাসকদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। এই সময়েই মালাকান্দ এজেন্সিকে রূপান্তরিত করা হয় একটি বিভাগে এবং চিত্রল, সোয়াত ও দারকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া পূর্বে যেসব এলাকা এই এজেন্সির আওতায় ছিল সেগুলোকেও নতুন এই বিভাগের অধীনস্থ করা হয়। অন্যদিকে আম্ব স্টেটটিকে করা হয় পেশোয়ার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।[১১৩]

প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস : ফেডারেল পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশেরই নিজস্ব কিছু সিভিল সার্ভিস ছিল। প্রাদেশিক পর্যায়েই প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং অন্যান্য কিছু কর্মীব্যবস্থাপনা এজেন্সির মাধ্যমে লোক নিয়োগ করে প্রাদেশিক সরকারগুলো নিজেরাই পুরোপুরিভাবে এসব সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোর অধিকাংশই ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে উচ্চতর দায়িত্বের জন্যে চুক্তিভিত্তিক চাকরির কিছু পদ তৈরি করা হয়। এসব পদে লোক বাছাই এবং নিয়োগ দেয়া হতো সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে। পাশাপাশি এসব উচ্চতর পদের নীচেও আবার আরেকটি ধাপ তৈরি করা হয়। তবে এই ধাপের সকল চাকরির বিভিন্ন পদে বিনা চুক্তিতে নিয়োগের জন্যে ভারতেই লোক বাছাইয়ের ব্যবস্থা করা হতো। চুক্তিহীন এসব চাকরি ছিল অস্থায়ী এবং স্বল্পমেয়াদী। পরবর্তীকালে চেয়ারম্যান হিসেবে চার্লস ইউ এচিসন-এর নেতৃত্বাধীন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (১৮৮৬-৮৭) সুপারিশ অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ এবং চুক্তিহীন এসব সার্ভিসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়। এগুলো ছিল (১) দি ইম্পেরিয়াল সার্ভিস যা পূর্বেকার চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসগুলোর স্থলাভিসিক্ত হয়, (২) চুক্তিহীন সার্ভিসের উপরের স্তরের চাকরিগুলোকে নিয়ে গঠিত প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ এবং (৩) চুক্তিহীন সার্ভিসের নিচের স্তরের চাকরিগুলোর স্থলে প্রবর্তিত অধস্তন সার্ভিসসমূহ। তিন স্তরবিশিষ্ট নতুন এই

১১২. ঐ।

১১৩. ঐ, 139-141.

সার্ভিসকাঠামোটি আবার দি রয়াল কমিশন অব পাবলিক সার্ভিস (১৯১২-১৫) কর্তৃক পুনঃঅনুমোদিত হয়, যার চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড ইস্‌লিংটন। যাই হোক, ইস্‌লিংটন কমিশন এই সার্ভিসকাঠামোর পুনর্বিন্যাসগত কিছু সংযোজনীরও প্রস্তাব দেয়। কমিশন মনে করে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিসরে কার্যকর সার্ভিসগুলো নামকরণের দিক থেকে বাস্তবসম্মত রীতিতে আলাদা হওয়া উচিত। এরই ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় পরিসরে বিদ্যমান উচ্চতর স্তরের সার্ভিসগুলো রাজকীয় বা নিখিল ভারত সার্ভিস হিসেবে গণ্য ছিল। একই স্তরের যে সার্ভিসগুলো কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় পরিসরে প্রযোজ্য ছিল সেগুলোর নাম দেয়া হলো কেন্দ্রীয় সার্ভিস ১ম শ্রেণী, আর মধ্যম বা প্রাদেশিক পর্যায়ের দায়িত্বের যে সার্ভিসগুলো কেন্দ্রীয় পরিসরে কার্যকর ছিল সেগুলোকে অভিহিত করা হল কেন্দ্রীয় সার্ভিস ২য় শ্রেণী হিসেবে। অন্যদিকে প্রাদেশিক সার্ভিসের যে সার্ভিসগুলোর কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র প্রাদেশিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেগুলোকে আলাদা করা হয় সংশ্লিষ্ট প্রদেশের নাম আলাদা আলাদাভাবে সেগুলোর সাথে জুড়ে দেয়ার মাধ্যমে। উপরন্তু প্রতিটি সার্ভিসের নামের সাথে তাদের কাজের ধরনও লিপিবদ্ধ থাকতো। ক্রমবিকাশের ধারায় এভাবে জন্ম নিয়েছিল বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, বোম্বে পুলিশ সার্ভিস, মাদ্রাজ কৃষি সার্ভিস ও বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস সহ এ ধরনের আরো বহু সার্ভিস। কার্যত এগুলো ছিল বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান মধ্যম অথবা প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহেরই প্রতিরূপ। অধস্তন সার্ভিসগুলো অবশ্য পূর্বের মতোই বহাল ছিল।[১১৪] বস্তুত উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কমিশন এবং লর্ড লীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত দি রয়াল কমিশন অন দি সুপিরিয়র সার্ভিসেস ইন ইন্ডিয়া (১৯২৪) কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহই পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম নেয়া বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ সার্ভিসকাঠামোর উন্নয়নে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এচিসন কমিশন যে প্রাদেশিক সার্ভিসের সুপারিশ করেছিল তা থেকেই পরবর্তীকালে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস তথা ইপিসিএস অথবা পিসিএস ও অন্যান্য বিশেষায়িত প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ পাকিস্তান সহ অন্যত্রও আবির্ভূত হয়। স্বাধীনতার সময় পাকিস্তান যে প্রাদেশিক সার্ভিসকাঠামোটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল পরবর্তী চব্বিশ বছরে তা প্রায় অক্ষুণ্নই থেকে গিয়েছে। পরিবর্তন বলতে সামান্য যেটুকু হয়েছিল তা ছিল কেবল বিভিন্ন সার্ভিসের নামকরণের ক্ষেত্রে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন কিছু সার্ভিস বা ক্যাডারও এর সাথে যুক্ত হয়েছিল।[১১৫]

১৯৫৫ সালে একক একটি পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাকিস্তান ছিল আলাদা চারটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র। এই কারণে সেই সময়কার প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোও চারটি প্রাদেশিক ইউনিটের (পূর্ব বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং

১১৪. বৃটিশ ভারতে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের ক্রমোন্নয়নের বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, B. B Misra, *The Bureaucracy in India*, (Delhi 1977), 91-299, Charles H. Kennedy, *Bureaucracy in Pakistan* (Karachi 1987), 17-53; Pakistan, *Report of the Pay and Services Commission 1959-1962* (Chairman, A.R. Cornelius) (Karachi 1969), 44-45.

১১৫. Cf. Charles H. Kennedy, 21-22.

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) অন্তর্গত করেই আলাদা আলাদাভাবে গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের জুন মাসে একক পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিটটি ভেঙ্গে দেয়ার আগ পর্যন্ত প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—এই দু'টি সুনির্দিষ্ট প্রাদেশিক ইউনিটেই বিন্যস্ত ছিল। সার্ভিসগুলোর সাথে প্রদেশের নাম জুড়ে দিয়ে এক প্রদেশের সার্ভিস থেকে আরেক প্রদেশের সার্ভিসকে আলাদা করা হয়। অবশ্য এর সাথে প্রতিটি সার্ভিসের কাজের ধরনও উল্লেখ করা থাকতো। যেমন, পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিস ইত্যাদি। যাই হোক, পশ্চিম পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে 'পশ্চিম পাকিস্তান' কথাটি সাধারণত ব্যবহার করা হতো না। এটিকে অভিহিত করা হয় কেবল প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস বা পিসিএস নামে।[১১৬]

পূর্ব পাকিস্তানে নিয়মিত ভিত্তিতেই মোট চব্বিশটি সার্ভিস (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য) প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে এরূপ সার্ভিসের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল চৌদ্দটি।[১১৭] প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের কাঠামো প্রায় কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহের কাঠামোর মতোই ছিল। কিন্তু চাকরির শর্তাবলীর দিক থেকে প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সার্ভিসের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার।

যাই হোক, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সার্ভিসগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সুস্পষ্টভাবেই ভিন্ন ভিন্ন ছিল। প্রথমত প্রাদেশিক এই সার্ভিসগুলো অনেকটা কেন্দ্রীয় সার্ভিসের মতোই প্রধান তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। যেমন, সাধারণজ্ঞ প্রশাসনিক সার্ভিস (অর্থাৎ ইপিসিএস এবং পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় সার্ভিস), বিশেষজ্ঞ সার্ভিস (অর্থাৎ স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রকৌশল সার্ভিস) এবং নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর সার্ভিস, অর্থাৎ যেগুলোর জন্যে চাকরিতে পূর্ববর্তী কারিগরি যোগ্যতার প্রয়োজন হতো না (অর্থাৎ পুলিশ ও এক্সাইজ সার্ভিস)। দ্বিতীয়ত, এই সার্ভিসগুলোর শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুসৃত সেই চারটি শ্রেণীর ধরনই বজায় রাখা হয়েছিল। যথা, ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণী। কোন কোন সার্ভিসে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে উত্তরণের সীমিত কিছু সুযোগ ছিল। তবে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে এমনকি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি দানের বাস্তব কোন সুযোগই ছিল না। তৃতীয়ত, প্রাদেশিক সার্ভিসের অনেকগুলোই আবার ১ম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী বা উর্ধ্বতন বা নিম্নতন অথবা উচ্চতর ও নিম্নতর—এভাবে বিভক্ত ছিল। চতুর্থত, প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের বেতনস্কেল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একই রকম সার্ভিসের বেতনস্কেলের

১১৬. Cf Muneer Ahmad, *The Civil Servant in Pakistan* (Karachi 1964), 204.

১১৭. দেখুন, Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", 244.

তুলনায় কম হতো। এ ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে অনেকগুলো বেতনস্কেল বহাল থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক একটি বেতনকাঠামো দাঁড় করানোর সমস্যাও ছিল। পঞ্চমত প্রাদেশিক পুলিশ সার্ভিসের কোন কর্মকর্তা পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে, যা ছিল একটি নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, উচ্চতর কোন পদে পদোন্নতি পেলে স্বাভাবিব নিয়মেই তিনি পিএসপির সদস্য হয়ে যেতেন। কিন্তু যেসব ইপিসিএস অফিসার তালিকাভুক্ত পদের জন্য নির্বাচিত হয়ে সিএসপি ক্যাডারভুক্ত পদে নিযুক্তি পেতেন, তাদেরকে কখনোই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ দেয়া হতো না।[১১৮]

সারণি ৩

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ

১. পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, ১ম শ্রেণী
২. পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, ২য় শ্রেণী
৩. পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (বিচার)
৪. পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস
৫. পূর্ব পাকিস্তান জুনিয়র পুলিশ সার্ভিস
৬. পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস
৭. পূর্ব পাকিস্তান জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিস
৮. রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স
৯. রেলওয়ে কমার্শিয়াল, ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড ট্রাফিক সার্ভিস
১০. পূর্ব পাকিস্তান এক্সাইজ সার্ভিস
১১. পূর্ব পাকিস্তান হেলথ সার্ভিস (আপার)
১২. পূর্ব পাকিস্তান হেলথ সার্ভিস (লোয়ার)
১৩. পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১৪. পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
১৫. পূর্ব পাকিস্তান এগ্রিকালচার সার্ভিস
১৬. পূর্ব পাকিস্তান হায়ার লাইভস্টক সার্ভিস

১১৮. পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সার্ভিস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, S G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, 159-164, Government of Bangladesh (Cabinet Division), *Report of the Pay and Services Commission*, Part 1 - *The Services*, vol. 1 (Dhaka 1977), 169-173; Civil Service Association (ex-CSPs), *Future Services Structure of Bangladesh* (Dhaka 1972.)

১৭. পূর্ব পাকিস্তান লাইভস্টক সার্ভিস
১৮. পূর্ব পাকিস্তান হায়ার ফিশারিজ সার্ভিস
১৯. পূর্ব পাকিস্তান ফিশারিজ সার্ভিস
২০. পূর্ব পাকিস্তান সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস
২১. পূর্ব পাকিস্তান জুনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস
২২. পূর্ব পাকিস্তান ফুড এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস
২৩. পূর্ব পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস
২৪. পূর্ব পাকিস্তান ট্যাক্সেশন সার্ভিস

সূত্র : Government of Bangladesh, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission,* Part 1- *The Services*, vol. 1, (Dhaka 1977), p.37.

প্রতিটি প্রদেশেই মোটামুটি সিএসপি সার্ভিসের মতোই প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ক্যাডারকে সাধারণত সিভিল সার্ভিস (ক্যাডার) হিসেবে মনে করা হতো। সংক্ষেপে এর নাম ছিল পিসিএস। পূর্ব পাকিস্তানে এই পিসিএসকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে চিনতে পারার জন্য বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস। সিএসপির মতো এটিও ছিল একটি সর্বক্ষেত্রে ধন্বন্তরি সার্ভিস যদিও সারা পাকিস্তান জুড়ে এর ব্যাপ্তি ছিল না। তবে, কখনো কখনো অল্প সংখ্যক বাছাই করা ইপিসিএস অফিসার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পেতেন। ইপিসিএস অফিসারদেরকে নিয়োগ করাই হতো মূলত প্রাদেশিক প্রশাসনের জন্যে। তরুণ ইপিসিএস অফিসারদের দিয়ে প্রধানত মাঠ প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের পদগুলো পূরণ করা হতো। সিএসপিদের মতোই তারাও মাঠ পর্যায়ের পদ থেকে সচিবালয়ের পদে অথবা সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায়ের পদে বদলি হতো। এই বদলি প্রদেশের ফাংশনাল এবং স্বায়ত্তশাসিত উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। তবে তাদের বদলি সিএসপি অফিসারদের মতো এত ঘন ঘন হতো না। সাধারণ প্রশাসনের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চ পদেই কেবল ইপিসিএস অফিসারদের নিয়োগ দেয়া হতো। সিএসপিদের মতো এত দ্রুত তারা উচ্চতর পদসমূহে পদোন্নতি পেতেন না।[১১৯]

১৯৬৬ সালে যেসব ইপিসিএস অফিসার মহকুমা ও জেলা অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে ৩৫ থেকে ৫০ এবং ৪৫ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালেই যেসব সিএসপি অফিসার পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখিত দু'টি পদে চাকরিরত ছিলেন, তাদের অধিকাংশের বয়সই ছিল যথাক্রমে ২৫ থেকে ২৮ এবং ৩২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ইপিসিএসদের মধ্য থেকে মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শনকারী সীমিত

১১৯. দেখুন, Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, 187-188.

সংখ্যক কিছু অফিসারই কেবল মহকুমা ও জেলা অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেতেন। তাদের থেকে বাছাই করা খুব অল্প সংখ্যক অফিসারই কেবল প্রাদেশিক সচিবালয়ের যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব পদে পদোন্নতি পেতেন।[১২০]

ইপিসিএস অফিসারদের মধ্যে বরাবরই এই অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল যে, ধারাবাহিকভাবে ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ সিএসপি অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত রেখে দিয়ে তাদেরকে তাদের চাকরিজীবনের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের বক্তব্য ছিল, তারা যে ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত সেই ক্যাডার কোন অবস্থায়ই সিএসপিদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। কারণ যে পদ্ধতিতে তাদের বাছাই করা হতো সেই পদ্ধতিটি কোন অংশেই সিএসপিদের বাছাইপদ্ধতির চেয়ে কম প্রতিযোগিতামূলক ছিল না এবং কর্মক্ষেত্রেও তাদেরকে সিএসপিদের অনুরূপ দায়িত্বই পালন করতে হতো। বাস্তব অবস্থাটি ছিল এই যে, মাঠ পর্যায় এবং সচিবালয় উভয় ক্ষেত্রেই ইপিসিএস অফিসারদের কাজের অভিজ্ঞতা ছিল দীর্ঘ এবং কাজের পরিধি ছিল বিস্তৃততর। কারণ তাদের ক্ষেত্রে এক পদ থেকে আরেক পদে বদলি বা পদোন্নতির ঘটনা খুব ধীরে এবং কমই ঘটতো। উপরন্তু ইপিসিএস অফিসারদের সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে চলছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৫০ সালে যখন ইপিসিএস অফিসারদের জন্যে 'তালিকাভুক্ত' পদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, তখন ইপিসিএস ক্যাডারে অফিসারের সংখ্যা ছিল ২৮০ জন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে এই ইপিসিএস অফিসারের সংখ্যা বেড়ে যখন ৭৪০-এ দাঁড়িয়েছিল, তখনো তাদের জন্যে নির্ধারিত 'তালিকাভুক্ত' পদের সংখ্যা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। এর অবধারিত ফল দাঁড়ালো এই যে, বহু যোগ্য ও দক্ষ ইপিসিএস অফিসারেরই পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসতে লাগলো। বিশেষত প্রাদেশিক সচিবালয়ে সিএসপি মুখ্য সচিবের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন চাকরি ও সাধারণ প্রশাসন ডিপার্টমেন্টে ইপিসিএস অফিসারদের চাকরি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা তাদের মনে বড় ধরনের একটি ক্ষতই তৈরি করেছিল।[১২১]

সিএসপি ও ইপিসিএসদের মধ্যেকার বিরোধ ছিল প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রে আন্তঃক্যাডার সম্পর্কের মাত্র একটি রূপ। বিরোধের আরেকটি দিক ছিল একদিকে সিএসপি ও ইপিসিএস (পশ্চিম পাকিস্তানে পিসিএস) অফিসার এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর ও বিশেষজ্ঞ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যেকার ঈর্ষা এবং বৈরিতার সম্পর্ক। এমনিতে সিএসপি এবং ইপিসিএসরা নিজেদের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত থাকলেও যখনই বৃত্তিভুক্ত ও বিশেষজ্ঞরা সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর দিকে হাত বাড়াতো, তখনই

১২০. ঐ., 144.

১২১. Cf. Ali Ahmed, *Role of Higher Civil Servants in Pakistan*, (Dacca 1968), 346-357

তারা বিরোধ বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে এক ঐক্য গড়ে তুলতো। সাধারণজ্ঞ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অধীনস্থ পদগুলোতে চাকরি করার ব্যাপারে এবং বৃটিশদের রেখে যাওয়া পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাটি, যা চৌকস কর্মকর্তাদের শীর্ষ পদগুলোতে বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল, তার ব্যাপারেই নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর ও বিশেষজ্ঞদের বরাবরই অসন্তোষ ছিল।[১২২]

উপসংহার

বস্তুত লোক প্রশাসন ব্যবস্থাটি ছিল দেশী-বিদেশী ও স্থানীয় উচ্চবর্গের শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন মূল্যবোধসঞ্জাত মানব তৈরির কৃত্রিম একটি সাংস্কৃতিক আবহ। পাকিস্তানের অভিজাত শাসকগোষ্ঠী এসব মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয় না। পাকিস্তান লোক প্রশাসনের গতিপ্রকৃতির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালেই এই বক্তব্যের সত্যতা স্পষ্টতর হবে।

প্রথমত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকার কাঠামোটি বরাবরই এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে আটকে ছিল যার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক একনায়কসুলভ প্রাধান্য।[১২৩] কেউ হয়তো যুক্তি দেখাবেন যে, পাকিস্তান নামের দেশটি এরূপ একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুঙ্গে পৌঁছেছিল আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-১৯৬৯)।[১২৪] তথাপি সত্যের খাতিরেই বলতে হয়, এর সবটা দায়দায়িত্ব এককভাবে কেবল আইয়ুব খানের উপর চাপানো ঠিক হবে না। বরং আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের বীজ রোপিত হয়েছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আমলেই। এঁরা দুজনেই অতি মাত্রায় আমলানির্ভর ছিলেন। এর কারণ ছিল সম্ভবত এই যে, জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী দু'জনেরই প্রশাসনিক কাজের বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে উভয়কেই আমলাদের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল। এই আমলাদের কয়েক জন ছিলেন আবার পাকিস্তানে প্রবাসী বৃটিশ আইসিএস অফিসার। অবশ্য এমনও শোনা গেছে যে, জিন্নাহর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মধ্যেও কিছুটা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করতো। যেমন ১৯৩৫ সালে অভিযোজিত ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রথম সরকার-প্রধান হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রী না হয়ে গভর্নর জেনারেলের পদটি বেছে নিয়েছিলেন। অথচ উল্লিখিত আইনটিতে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্যে একটি সংসদীয় সরকার-পদ্ধতির বিধানই

১২২. দেখুন, Talukder Maniruzzaman, "Administrative Reforms and Politics within the Bureauecracy in Bangladesh", *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, vol. xvii, no. 1, 1979, 49. Similar inter-cadre conflicts in West Pakistan are reported in Muneer Ahmed, *The Civil Servant in Pakistan*, 183-255; C.J. Hayes, *Report on the Public Service Commissions of British Commonwealth Countries* (London 1955), 168-169.

১২৩. Nasir Islam, "Pakistan", in Subramaniam (ed.), *Public Administration in the Third World* (New York), 96.

১২৪. Nasir Islam, "Colonial Legacy, Administrative Reform and Politics: Pakistan 1947-1987", 275.

সংযোজিত ছিল। জিন্নাহর অধীনে চারটি প্রদেশের মধ্যে তিনটির গভর্নরই ছিলেন আইসিএস অফিসার। তিনি সচিব পর্যায়ে তাঁর নিজস্ব পছন্দের কিছু কর্মকর্তাসহ এসব গভর্নরের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এবং এভাবেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান তাঁর সময় থেকেই গুরুত্ব হারাতে শুরু করেছিল।[১২৫]

ব্যাপারটি কখনো এমন ছিল না যে, ফেডারেল পাকিস্তান সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রীরই একই রকম প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল অথবা তাদের উত্তরসূরি মন্ত্রী এবং আইন প্রণেতারা পরবর্তী বছরগুলিতে (১৯৪৭-১৯৫৮) নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভাল কিছু প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। বরং জিন্নাহর মৃত্যু এবং লিয়াকত আলীর হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগে ভাঙ্গন দেখা দিতে শুরু করলো এবং দলটিতে গোষ্ঠীরাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সেই সাথে যখন তখন প্রদেশগুলোতে গভর্নরের এবং কেন্দ্রে গভর্নর জেনারেল কিংবা প্রেসিডেন্টের শাসন জারির ঘটনায় এই অবস্থাটি আরো সঙ্গীন আকার ধারণ করেছিল। এই ধরনের শাসনকালীন সময়গুলোতে সাধারণ প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাতিল থাকতো এবং দেশ কার্যত শাসিত হতো আমলাদের দ্বারা। ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হওয়া আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এই অবস্থাটিকে কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল এবং সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আমলাদের দিয়েছিল বাড়তি কিছু স্বাধীনতা।[১২৬]

পর পর পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের একক নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের অধীনে গড়ে উঠা প্রধান দু'টি নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস (সিএসপি ও পিএসপি) পাকিস্তানের লোক প্রশাসনটিকে অতিমাত্রায় একটি এক-কেন্দ্রিক চরিত্র প্রদান করেছিল, যা অন্য কোন ফেডারেল পদ্ধতির সরকারে দেখা যায় না। সম্ভবত অস্বাভাবিক কিছু বৈচিত্র্যের এমন একটি দেশে বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতাকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য এবং দ্রুততার সাথে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে চেইন অব কমান্ড প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে এই পদ্ধতিটির প্রাসঙ্গিকতা তখন ছিল। একই কারণে মনে হয়েছে, পাকিস্তানের সংবিধান একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চেয়েছিল এবং তা করতে যেয়েই নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহ ও আনুষঙ্গিক কিছু বিধি-বিধান চালু করেছিল। বিশেষত আইয়ুব আমলে ঘোষিত ১৯৬২ সালের সংবিধান পাকিস্তানকে একটি প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতির শাসন-ব্যবস্থায় নিয়ে যায়, যেখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

---

১২৫. ঐ, 273.

১২৬. M. Anisuzzaman, "Bureaucratic Reforms in Pakistan" (unpublished Ph D Thesis, Syracuse University, 1975), 91-92.

হতো। এছাড়া প্রাদেশিক গভর্নর এবং প্রদেশ-মন্ত্রিসভার সদস্যরাও নিয়োজিত হতেন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এবং আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর পরোক্ষ ভোটে দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হতো।[১২৭]

এভাবেই পাকিস্তানের প্রশাসন ব্যবস্থাটি অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত চরিত্র অর্জন করলো। কিন্তু ক্ষমতা প্রায় সবটাই ফেডারেল সরকারের কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় প্রাদেশিক পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব দেখা দিল। বস্তুত এই অবস্থাটি বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমান্বয়েই খুব বেশি বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে লাগলো এবং এ থেকেই ১৯৭১ সালে দেশটি বিখণ্ডিত হয়ে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো জন্ম নিয়েছিল।

তৃতীয়ত, পাকিস্তান লোক প্রশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই ব্যবস্থাটির মধ্যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বিভিন্নভাবে ধরে রাখার প্রবণতা। সচিবালয় ব্যবস্থা, মন্ত্রণালয় এবং সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজমান নীতি-প্রশাসনের দ্বি-বিভাজন বৃটিশ আইসিএস অফিসারদের উত্তরসূরি সাধারণজ্ঞ ক্যাডারের সিএসপি অফিসারদের আধিপত্য, জেলা প্রশাসন যেখানে একজন কালেক্টর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি কমিশনার কার্যত ছোটখাট একজন গভর্নরের মতোই প্রশাসন পরিচালনা করতেন এবং ভূমি রাজস্ব প্রশাসন এসবই ছিল ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের এক একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১২৮]

বিশেষভাবে সিএসপি পদের জন্যে যে বেতন-ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ধার্য করা হয়েছিল তা ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং এগুলো বৃটিশ আমলকে অনুসরণ করেই করা হয়েছিল। উপরন্তু বৃটিশ আমলের তুলনায় আরো বেশি সামাজিক মর্যাদাও এরা ভোগ করতেন। একজন পাকিস্তানী সমালোচক বলেছেন, বৃটিশ আমলের মতো শাসক সম্প্রদায়ের একটি সুবিধাভোগী জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হওয়া ছাড়াও ধনিকশ্রেণীভুক্ত হওয়া এবং ঐশ্বর্যময় ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করার প্রতিই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসটির আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের সাথে তাদের এই ধরনের জীবনযাপন ছিল একেবারেই সঙ্গতিহীন।[১২৯]

স্বাধীনতার পরে অবশ্য প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্যে বেশ কিছু কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এসব কমিশন ও কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল।

১২৭. দেখুন, Mumtaz Ahmad, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan*, 4.

১২৮. দেখুন, Nasir Islam, "Pakistan', 97.

১২৯. Mustaq Ahmad, *Government and Politics in Pakistan* (Karachi 1970), 84.

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, এসব সংস্কার বা পরিবর্তন হয় অসম্পূর্ণ না হয় অসময়োপযোগী ছিল। বিশেষত পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যাধিক্য এবং এগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত করার লক্ষ্যে এগুলোর পৃথকীকরণ পদ্ধতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের পরিবর্তন আনার সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এগুলোর কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণের অনুকূল একটি কার্যোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের বিষয়টিকে গুরুত্বই দেয়া হয় নি। উপরন্তু নব প্রতিষ্ঠিত এসব পাবলিক প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেই শীর্ষস্থানীয় পদসমূহে অভিজাত আমলাদেরই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন আবার সিএসপি অফিসার। তা ছাড়া সচিবালয়গুলোতে অবস্থিত নিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়সমূহ অধীনস্থ এসব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও অন্যান্য সরকারি ডিপার্টমেন্টের মতোই হস্তক্ষেপ করা অব্যাহত রেখেছিল।[১৩০]

পাকিস্তান প্রশাসনের চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি ছিল, এক কথায় বলতে গেলে, মুগল ধাঁচের কিছু কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনরুত্থান। আর এটি ঘটার কারণ সম্ভবত ছিল এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তিটিই ছিল ইসলামী আদর্শের স্পৃহা এবং উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভাবাবেগের প্রভাবের প্রতিফলন। বক্তব্যটি স্পষ্টতর করার জন্যে এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। পাকিস্তান লোক প্রশাসনের কোন কোন সমালোচক পাকিস্তানে বেশ কিছু অনড় অবস্থান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে মুগলদের সৃষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থাটির দিকেই নজর দিতে চেয়েছেন বেশি। এর বোধগম্য কারণটি ছিল এই যে, মুগল ধাঁচে রাষ্ট্র পরিচালনার সাদৃশ্যসূচক বেশ কিছু রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ঘটনা সে সময়ে পাকিস্তানে দেখা গিয়েছিল। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, পাকিস্তানের অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখ রাষ্ট্রীয় নীতি এবং এর সামরিক-বেসামরিক আমলাপ্রধান শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসটি মুগল রাষ্ট্রীয় এবং মনসবদারির অনেক বৈশিষ্ট্যকেই আত্মস্থ করেছিল।[১৩১]

বাস্তবিকপক্ষেই, অতি মাত্রায় কেন্দ্রীকরণের মুগল প্রবণতা এবং মুগল মনসবদারি যা বেসামরিকের তুলনায় অনেক বেশি সামরিক ছিল। বৃটিশ শাসনামলে এসে তা বেশ

১৩০. Nasir Islam, "Pakistan" 79.

১৩১. ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছর সময়ে অবিভক্ত পাকিস্তানে দুই দফা সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা থেকেই এ জাতীয় একটি চরিত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে একবার এবং ১৯৬৯ সালে আরেকবার বেসামরিক প্রশাসনকে বাতিল করা হয়েছিল। এমনকি যে স্বল্প সময়গুলোতে বেসামরিক শাসন বহাল ছিল তখনও পর্যন্ত বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে সামরিক বাহিনী বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবেই ক্ষমতা ভাগাভাগি করেছে; Cf. Aron S Klieman, "Confined to Barracks: Emergencies and the Military in Developing Societies" in *Comparative Politics*, Vol. 12. No. 2, January 1980, 154-158; Ferrel Heady, *Public Administration: A Comparative Perspectives*, (New York 1979), 314-320; Robert La Port, Jr., *Power and Privilege: Influence and Decision-Making in Pakistan* (Berkeley 1975).

কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। আর এটি সম্ভব হয়েছিল এই সময়ে রাষ্ট্রীয় শাসনকর্তৃত্বটি একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপ ধারণ করেছিল বলে। বিশেষত ভারতে বৃটিশ শাসন ক্রমাগতভাবেই একটি বেসামরিক রাষ্ট্রীয় রূপ লাভ করতে থাকে, যেখানে সামরিক এবং বেসামরিক কর্মতৎপরতার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান ছিল। পাশাপাশি বেসামরিক ব্যবস্থাটিও আবার ধীরে ধীরে আইন প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগীয় পর্যায়ে দু'টি স্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত হয়ে যায়। অন্য কথায়, ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তন এখানে ধীরগতিতে এবং ধারাবাহিকভাবে আইনের শাসন এবং একটি বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থার জন্ম দেয়, যা মোটামুটিভাবে একটি যৌক্তিক ও বৈধ ভিত্তির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল।[১৩২]

সবশেষে বলা যায়, ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার শত শত বছর আগে থেকেই যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি এখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তার ধরনটি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও বহাল থেকেছে। ব্যবস্থাটির কেন্দ্রীয়করণ প্রবণতা, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, পদমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ, কর্মকর্তাদের মধ্যে উঁচু-নিচু প্রভেদ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহেও স্বায়ত্তশাসনের অভাবের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো এখনো টিকে আছে।

১৩২. দেখুন, B.B. Misra, *The Bureaucracy in India*, (Delhi 1977), 387-8

১৩

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

হারুন-অর-রশিদ*

ভারতবর্ষ কখনো একজাতিক রাষ্ট্র ছিল না। পৃথিবীর মানচিত্রে বহুজাতি অধ্যুষিত ভারত একটি উপমহাদেশ। যদি স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেতো, তাহলে এসব জাতির পক্ষে এখানে একাধিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ভাষা, রক্ত-সম্বন্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য[১] বিবেচনায় ভারতের অন্য এলাকার চেয়ে বাংলায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। কিন্তু ইউরোপ স্বাধীনভাবে জাতি গঠনের যে সুযোগ পায়, ভারত তা পায় নি। তুর্কী, আফগান, মুগল, বৃটিশ প্রভৃতি বহিরাগত বিজাতীয় শক্তির দীর্ঘ (৭১২ খৃ. থেকে) শাসন, বিশেষকরে দুশ' বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এখানে এক অস্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়, যা জাতি-প্রশ্নটির স্বাভাবিক সমাধানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে একে ভিন্নপথে পরিচালিত করে। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতি-প্রশ্নটি উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি হলেও বস্তুত একই অবস্থার কারণে তা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে জাতি-সমস্যার স্বাভাবিক সমাধানের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির শিকার হয় এবং অমীমাংসিত থেকে যায়।

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ সম্পর্কে দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'বাঙালি জাতি'; মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশ* (ঢাকা ১৯৭৪), ৫৯-১০৭; Kamruddin Ahmad, *A Social History of Bengal*, (Dhaka 1970), I-XXIX; Denis Wright, *Bangladesh : Origins and Indian Ocean Relations, 1971-1975* (Dhaka 1988) 12-16; ইবনে আজাদ, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ"; আসহাবুর রহমান (সম্পাদিত), *বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকা ১৯৮৭), ৫০-৫২; আবদুল হক, *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা ১৯৮৪), ১৩৬-১৩৭।

এমনি এক ঐতিহাসিক ধারায় দেশবিভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২৭ এপ্রিল (১৯৪৭) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে "স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাংলা " প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।[২] এই উদ্যোগের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা কিরণ শংকর রায় প্রমুখ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এ প্রচেষ্টা সফল হলে ১৯৪৭ সালেই ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি অখণ্ড বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতো। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও একে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উত্থিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমন, এ ধারণার উৎপত্তি হলো কিভাবে ? এটা কি বাংলাকে বিভক্ত করার যে আন্দোলন গড়ে উঠে তা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে একটি নিছক কৌশলগত চাল ছিল, নাকি এর একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শগত লক্ষ্য ছিল ? এই উদ্যোগের পেছনে কি জিন্নাহর সম্মতি ছিল ? এই সময়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডের অবস্থান কি ছিল ? কলকাতা, দিল্লী ও লন্ডনস্থ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল ? কেন এ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ? এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের নিরিখেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপনিবেশসমূহে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠলে ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান প্রায় অবধারিত হয়ে পড়ে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি ঘোষণার (১৯৪৭) পর এটি এক রকম নিশ্চিত হয়ে যায়। এটলী তাঁর ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বৃটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত থেকে হাত গুটাতে চায় এবং এর মধ্যে বৃহৎ দুটো দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় বিবেচিত হবে। এ ঘোষণায় ভারতবিভক্তি ও এক ধরনের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ফুটে উঠে। এমতাবস্থায় কালবিলম্ব না করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে কট্টর হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা' বাংলাকে বিভক্ত করে কলকাতাসহ হিন্দুপ্রধান অংশ নিয়ে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠন এবং এই নতুন প্রদেশকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তকরণের আন্দোলন শুরু করে। এটলীর ফেব্রুয়ারি ঘোষণার তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে অখণ্ড ভারত ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এতদিনকার প্রবক্তা কংগ্রেস পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করার সুপারিশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৩] বাংলাবিভক্তি

২. *The Statesman*, 28 April 1947, 1

৩. Enclosure to 511, Nicholas Mansergh and Penderal Moon (eds.), *The Transfer of Power*, Volume X (London 1981), 897-901, 308-309; *Secret Report* (অতঃপর *SR*) *on the Political Situation of Bengal* (Home Dept.)', 1st half, March 1947; *Governor's Fortnightly Report* (অতঃপর *GFR*), L/P & J/5/154, 64, India Office Library, London; আরো দেখুন, *Star of India*, 11 March 1947, 2 (editorial).

আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতাস্থ বাঙালি-অবাঙালি শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে।[৪] এ ছাড়া প্রভাবশালী হিন্দু দৈনিক পত্রিকাসমূহ যেমন—*অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা* ও *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড* বাংলাবিভক্তির সমর্থনে হিন্দু জনমত গঠনে ব্যাপক প্রচারাভিযানে অবতীর্ণ হয়।

এমনি এক রাজনৈতিক পটভূমিতে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। বাংলাবিভক্তির দাবির পশ্চাতে সক্রিয় হিন্দু মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। এ দাবির অযৌক্তিকতা, 'বাংলাবিভক্তির পরিণতি', বাংলার ঐক্যবদ্ধ থাকার অপরিহার্যতা, স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সোহরাওয়ার্দী এক দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বাংলাবিভক্তির দাবিকে অদূরদর্শী এবং 'পরাজিতের মানসিকতা' বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন যে, ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার হিন্দুরা তাদের সংখ্যা, সম্পদ, শিক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির তুলনায় বঙ্গীয় মন্ত্রিসভায় আসন লাভ করতে না পারায় তা থেকে সৃষ্ট হতাশাই উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী। বাংলার হিন্দুদের ঐ অবস্থার মূল কারণ হিসেবে প্রধানত সর্বভারতভিত্তিক হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কথা তিনি উল্লেখ করেন, যেখানে সব ধরনের সমস্যা সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'প্রত্যেকটি প্রদেশ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলে পুরোপুরি ভিন্ন এক অবস্থার উদ্ভব হবে' এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে এমন একটি সরকারব্যবস্থা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবো, যা সকলের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে।' ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে 'ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গার' অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলার নোয়াখালী জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 'নোয়াখালী দাঙ্গা'কে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দুদের সম্ভাব্য অবস্থার একটি নজির হিসেবে কোন কোন মহল তুলে ধরার চেষ্টা করলে সোহরাওয়ার্দী তা খণ্ডন করে হিন্দু সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নোয়াখালী ছাড়া বাংলায় আরো বহু জেলা রয়েছে, যেখানে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায় বহুকাল ধরে শান্তি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করে আসছে। 'বাংলাবিভক্তি হিন্দুদের জন্যও আত্মহত্যার শামিল হবে'—এ অভিমত ব্যক্ত করে তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, 'অর্থনৈতিক ঐক্য, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং একটি কার্যকর শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা' বিবেচনায় বাংলা সর্বদাই অবিভাজ্য। তিনি বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে কিভাবে এক শ্রেণীর অবাঙালি কর্তৃক বাংলা শোষিত হচ্ছে সে কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলাকে সমৃদ্ধিশালী হতে হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে ... বাংলাকে অবশ্যই তার ধন-সম্পদ এবং নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে হবে।' বাংলা

৪. *The Statesman*, 1 May 1947, 5; আরো দেখুন, অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি*, (কলিকাতা ১৯৭৫), ১৩২-১৩৫।

ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হলে এর ভবিষ্যৎ চিত্র কেমন হতে পারে তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন :

> এটা বস্তুত একটি মহান দেশে পরিণত হবে, ভারত উপমহাদেশে যা হবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এখানে জনগণ উন্নত জীবন ধারণের সুবিধা নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করে কালক্রমে এ দেশ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করতে সমর্থ হবে।

সোহরাওয়ার্দী এই মর্মে আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলে এক সময়ে বাংলার সঙ্গে তৎসংলগ্ন ও বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মানভূম, সিংভূম ও পূর্ণিয়া জেলা এবং আসাম প্রদেশের সুরমা এলাকার সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান হলে আসামের বাকি অংশ বাংলার সঙ্গে একীভূত হয়ে একক রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৫] এটাই ছিল সোহরাওয়ার্দীর 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্রের ধারণা।

স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর দিল্লী ঘোষণার দু'দিনের মধ্যে ২৯ এপ্রিল আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে এ পরিকল্পনার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরে বাংলাবিভক্তির আন্দোলনে মদদ দানের জন্য বিদেশী পুঁজি এবং ভারতীয় দোসরদের দায়ী করেন। তিনি হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা (হিন্দুরা) বাংলার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন এক-সম্প্রদায়ের পক্ষে অপরকে পদানত করে রাখা সম্ভব নয়। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃতি কেমন হবে সে সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট মতামত দানে বিরত থাকলেও হাশিম হিন্দুদের উদ্দেশ্যে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রশাসনে তাদেরকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) অনুযায়ী ৫০ : ৫০ আসন প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার যুব সম্প্রদায়ের প্রতি এক আবেগপূর্ণ আবেদনে তিনি মন্তব্য করেন যে, 'উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনের পন্থা হচ্ছে গভীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন করা, একে বিভক্ত করা নয়।'[৬]

৫. ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত সোহরাওয়ার্দীর বিস্তারিত বক্তব্য দেখুন। এ বক্তব্যের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক জিন্নাহর কাছে পেশকৃত এবং ন্যাশনাল আর্কাইভস অব পাকিস্তান (ইসলামাবাদ)-এর *Quaid-i-Azam Papers,* F.458, 64-73 -এ সংরক্ষিত বক্তব্যের একটি কপি থেকে এর সার-সংক্ষেপ আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

৬. আবুল হাশিমের ২৯ এপ্রিল (১৯৪৭) প্রদত্ত বিবৃতিতে বিস্তারিত দেখুন। এর অন্যান্য উৎস হচ্ছে, *Star of India,* 30 April 1947, 2,5; *মিল্লাত* (সাপ্তাহিক), ২ মে ১৯৪৭, ১-২; Abul Hashim, *In Retrospection (* Dhaka 1974), 139-143.

তিন

স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিবেচনা কাজ করেছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিত ও পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।[৭] তাঁদের অধিকাংশ মনে করেন যে, এটা ছিল বাংলাবিভক্তিকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দীর একটি বিকল্প প্রস্তাব।[৮] নিঃসন্দেহে, সোহরাওয়ার্দী ও হাশিমের এটি আশু লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তাঁদের এই উদ্যোগ শুধুমাত্র বাংলাবিভক্তি রোধকল্পে একটি নিছক বিকল্প প্রস্তাব ছিল না। এর মূলে রয়েছে এক সযত্নলালিত ইতিবাচক আদর্শ ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, যা অতীত ঘটনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে এবং এই পর্যায়ে এর মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ থেকে বাংলার একটা স্বতন্ত্র সত্তা সুদীর্ঘকাল থেকেই লক্ষণীয়। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে বাংলা ছিল সর্বভারতীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক স্বাধীন ভূখণ্ড। বাস্তবিকই অভ্যন্তরীণভাবে এই ভূখণ্ডটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল।[৯] ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে তুর্কীরা বাংলা (লক্ষণাবতী) জয় করে নেয় এবং এভাবে বাংলায় তুর্কী মুসলমানদের আগমন ঘটে। তবে পরবর্তীকালে বাংলার সুলতানি আমলের শাসকরা দিল্লীর তুর্কী সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে শাসনের পরিবর্তে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। এসব শাসক একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন আর তা হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে মোটামুটি একই শাসনাধীনে নিয়ে আসা, যা একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রায় দুশ' বছর (১৩৪২-১৫৩৮) টিকে থাকে। এ সময় বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্য, প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে, যা পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদ রচনা করে।[১০] কালক্রমে তা বাংলায় একটি অখণ্ড জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করতে পারতো। কিন্তু মুগল (১৫৭৬) এবং বৃটিশদের (১৭৫৭) 'সমরশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।'[১১] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, তুর্কী, মুগল, বৃটিশ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির শাসনাধীনে এলেও দিল্লীভিত্তিক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বাংলার

৭. দেখুন, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh,* (Dhaka 1987), 280 n.

৮. দেখুন, V.P. Menon, *The Transfer of Power in India*, (New Delhi 1979), 355, Muhammad Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal, 1757-1947* (Dhaka 1978), 331-332.

৯. যেমন, সমতট-হরিকেল বা পূর্ববঙ্গ, গৌড় বা উত্তরবঙ্গ, এবং রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ।

১০. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার,* (ঢাকা ১৯৭৪), ২৬৭-২৬৯; M.R.Tarafdar, *Husain Shahi Bengal: A Socio-Political Study* (Dhaka 1965), *Passim.*

১১. আসহাবুর রহমান, '*দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিপ্রশ্ন* : বাংলাদেশ', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *সুন্দরম্*, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৯৪, ৬।

শাসক-নৃপতিদের বিভিন্ন সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দেখা যায় এবং এসব বৈদেশিক শক্তির মধ্যে একমাত্র বৃটিশরাই বাংলাকে দিল্লীভিত্তিক সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও, ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের প্রাক্কালে বাংলাকে বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। যদিও বৃটিশ শাসনের শেষদিকে জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের দ্রুত বিস্তৃতি দেশবিভাগকে অনিবার্য করে তোলে, তবু বাঙালি মুসলমান নেতৃত্বের একাংশের কাছে পাকিস্তান পরিকল্পনার ভিন্ন অর্থ ছিল এবং তা এই যে, পাকিস্তান পরিকল্পনার আওতায় বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেশ কয়েকদিন ধরে জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক ছিল আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। সে সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপ কি হবে তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে একাধিক পরিকল্পনা বিচার-বিবেচনার পর 'স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান' রাষ্ট্রের এক বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা জিন্নাহর কাছে পাঠায়।[১২] পাকিস্তান পরিকল্পনার রাষ্ট্রীয় রূপ সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে এটাই ছিল সর্বপ্রথম উদ্যোগ। 'স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান' রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে বঙ্গীয় লীগ নেতৃবৃন্দ দুটি ভিন্নমত পোষণ করেন। 'খাজা-গ্রুপ' নামে পরিচিত ঢাকার নবাব পরিবারের নেতৃত্বাধীন ও ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীটি পুরো আসাম, হিন্দুপ্রধান বর্ধমান বিভাগ (বর্তমান পশ্চিম বাংলা) বাদে বাংলার বাকি অংশ এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ নিয়ে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল। অন্যদিকে 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ' নামে পরিচিত ক্রমবিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী অংশ চেয়েছিল পুরো আসাম, অবিভক্ত বাংলা এবং বাংলার সংলগ্ন বিহারের কতিপয় জেলা এর অন্তর্ভুক্ত করতে।

বস্তুত এ সময় থেকে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এক ধরনের 'বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ধারণা পোষণ করতে থাকেন। প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণে দু'গ্রুপের মতপার্থক্যের মূলে যে বিবেচনা ক্রিয়াশীল ছিল তা হচ্ছে, প্রথম পক্ষ চেয়েছিল মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সুনিশ্চিত করতে; অন্যদিকে, অপর পক্ষ চেয়েছিল পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রতি বাংলার হিন্দুদের বিরোধিতা অতিক্রম করা ছাড়াও এর মাধ্যমে স্বাধীন

১২. Raghib Ahsan, *Hussain Shaheed Suhrawardy and the Inner History of the United Bengal Scheme*, (Karachi 1951), 4-7; Casey to Lord Wavell, 30 October 1944, *GFR*, L/P & J/5/151, 64; *Casey's Personal Diary*, Photo Eur. 48/1, 339-40, India Office Library, London. আরো দ্রষ্টব্য, Raghib Ahsan's *Confederacy of East Pakistan and Adibasistan*, enclosed in Raghib Ahsan to Jinnah, 14 August 1944, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 204, 324-29; Raghib Ahsan to Jinnah, 2 September 1944, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 5, 1-55; Maulana Akram Khan's *The Construction of the State of Eastern Pakistan*, enclosed in Akram Khan to Jinnah, 24 August 1944, *Quaid-i Azam Papers*, F.337, 4-22.

পূর্ব পাকিস্তানকে আর্থিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়ে একটি কার্যকর শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে।[১৩] উল্লিখিত জিন্নাহ-গান্ধী বৈঠকের সময় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (যা ১৯৪২ সালে এক শ্রেণীর মুসলিম সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন) কেবল প্রস্তাবিত 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক, যেমন এর সীমানা, সরকারের ধরন, অর্থনৈতিক সম্পদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাত, প্রতিরক্ষা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করে 'ইস্টার্ন পাকিস্তান : এর জনসংখ্যা, সীমানা ও অর্থনীতি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করে।[১৪] ১৯৪৫ সালের প্রথমদিকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম 'স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের' মৌলিক নীতিসমূহ চিহ্নিত করে লীগের একটি খসড়া মেনিফেস্টো প্রণয়ন করেন, যাতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি সাংবিধানিক পরিষদ (Constituent Assembly) গঠনের কথা বলা হয়।[১৫] মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪৬ সালের জুন মাসে বৃটিশ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করার অল্প কিছুদিন পরে *এসোসিয়েটেড প্রেসের* সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে বঙ্গাসাম (অর্থাৎ বাংলা ও আসাম, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের এটি একটি নাম) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। কলকাতার দাঙ্গায় (১৯৪৬) মুসলমানদের সপক্ষে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আনীত উস্কানিমূলক ভূমিকা পালনের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে বঙ্গীয় আইনসভায় সোহরাওয়ার্দী পুনরুক্তি করেন যে, 'বাংলা একদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করবে।'[১৬] ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে *হিন্দু* নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> লোকজন আমাকে বাংলার সমস্যা ভারতের অন্য সব এলাকা থেকে ভিন্ন করে দেখার কথা বলে ... এর মাধ্যমে আসলে তারা এক অর্থে পাকিস্তান আদর্শকে মেনে নিচ্ছে, কেননা স্বীকার করা হচ্ছে যে অঞ্চলসমূহের নিজস্ব পৃথক সমস্যাবলী রয়েছে, যা তাদেরই সমাধান করতে হবে। আমিও বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে যে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা কায়েম হবে, সেখানে বাংলার জনগণ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে... ।[১৭]

এ বিষয়টি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এটলীর ফেব্রুয়ারি ঘোষণা এবং তৎপরবর্তী হিন্দু মহাসভার বাংলাবিভক্তির আন্দোলনেরও আগে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে আবুল

১৩. Casey to Lord Wavell, 30 October 1944; *Casey's Personal* Diary, Photo Eur 48/1, Raghib Ahsan, *Hussain Shaheed Suhrawardy*, 6-7 ; Casey to Lord Wavell, 11 September 1944, *GFR*, L/P & J/5/151, 117-120; আরো দেখুন, *Casey's Personal Diary*, Photo Eur 48/2, 58.

১৪. দেখুন, *GFR*, L/P & J/5/151, 72-86.

১৫. খসড়া মেনিফেস্টোটি দেখুন, *Star of India*, 23 March 1945, 3

১৬. *The Amrita Bazar Patrika*, 21 September 1946 (cutting), *GFR*,/L/P & J/5/153, 82

১৭. Quoted in *Star of India*, 17 September 1946, 3; আরো দ্রষ্টব্য, *মিল্লাত*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, ৭।

হাশিম বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শরৎ বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর কতিপয় কর্তাব্যক্তির সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হন।[১৮] এভাবে স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায় যে, ব্যর্থ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা, 'ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গা' (আগস্ট ১৯৪৬) ও এটলীর ভারত সম্পর্কিত ঐতিহাসিক নীতি নির্ধারণী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে প্রদেশসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং পৃথক পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠনের জন্য হিন্দুদের দাবির বহু আগেই সোহরাওয়ার্দী ও হাশিম ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা কখনো 'ইস্টার্ন পাকিস্তান', কখনো 'বঙ্গাসাম', কখনো 'বৃহত্তর বাংলা' অথবা 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা' নামে আখ্যায়িত হয়েছিল।

এ কথা সকলেই অবগত যে, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর 'পাকিস্তান' লীগের মূলমন্ত্র ও একমাত্র কর্মসূচিতে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালের আগে মুসলিম লীগ হাইকমান্ড কর্তৃক পাকিস্তান পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা (তাঁদের ভাষায়, পাকিস্তান হবে ভারতের দু'টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র) প্রণীত না হওয়ার কারণে ১৯৪০ সাল থেকেই বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে ভারতের দু'টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দু'টি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে দেখে আসছিলেন।[১৯]

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্বটির পশ্চাতে প্রধানত তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, আবুল হাশিমের মতো কেউ কেউ এবং পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রবক্তারা বিশ্বাস করতেন, বাঙালি মুসলমানরা শুধু হিন্দুদের থেকে ভিন্ন নয়, বরং অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের থেকেও ভিন্ন, অতএব তারা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী। দ্বিতীয়ত কারো কারো (যেমন খাজা-গ্রুপ) মনে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি ভীতি[২০] বা অন্ধ আনুগত্য প্রবল ছিল। তৃতীয়ত লাহোর প্রস্তাবের 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' কথাটি সোহরাওয়ার্দীর মতো অনেকের মনে বাংলায় পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগ্রত করেছিল।

বস্তুত লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের গোটা সময়ব্যাপী বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন জাতিসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। বিশিষ্ট বাঙালি নেতা ও লাহোর প্রস্তাবের প্রস্তাবক ফজলুল হকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের মূলে ছিল পারস্পরিক স্বার্থ ও

১৮. *Star of India*, 29 January 1947, ৩; *মিল্লাত*; ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৭, ২; *মিল্লাত*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৭, ১২; Abul Hashim, *In Retrospection*, 134-135.

১৯. দেখুন, *আজাদ*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, ৪, সম্পাদকীয়: "পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ"; ঐ, ২৪মে ১৯৪০, সম্পাদকীয়।

২০. *Casey's Personal Diary*, Photo Eur. 48/3, 252; Casey to Lord Wavell, 11 September 1944, *GFR*, L/P & J/5/151, 117-120.

আনুগত্যের সংঘাত, যেহেতু তিনি দৃঢ়ভাবে অনুভব করতেন যে, অবাঙালি মুসলমান নেতারা বাংলার মুসলমানদের বিশেষ সমস্যার প্রতি কখনো প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করতেন না। বহু বিষয় ও ঘটনা হক, হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের মনে এ ধারণারই সৃষ্টি করে যে, জিন্নাহর 'প্রস্তাবিত' পাকিস্তান বাংলার জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না, অর্থাৎ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, একটি মাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বাঙালি মুসলমানদের উপর চলবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আধিপত্য। এসব বাঙালি নেতৃত্বের কাছে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের অর্থ ছিল ভিন্নতর। তাঁদের বিবেচনায় এটা অখণ্ড পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি পর্যায়ের কোন বিশ্বাসবোধ ছিল না, বরং এটা ছিল ভারতের মুসলমানদের সাধারণ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ হিন্দু বা 'সংক্ষেপে' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটি কৌশলগত দিক। পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা থেকে তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। যাহোক, ফজলুল হকের বিপরীতে হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী উপযুক্ত সময় ও সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার আগে এ সম্পর্কিত তাঁদের স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে ঐ সময় পর্যন্ত লীগের আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখাকেই শ্রেয় মনে করেন। কেননা এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করলে এ পর্যায়ে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে তা খোদ পাকিস্তান পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত হানতে পারে বলে তাঁরা একে আত্মঘাতী বিবেচনা করতেন।

অতএব, স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' বা এক ধরনের 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের ধারণা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহাল যেকোন ব্যক্তির কাছে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক গৃহীত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পেছনে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য কি ছিল তা 'অস্পষ্ট' থাকার কথা নয়।[২১] তা ছিল সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতার লক্ষ্য সামনে রেখে দাবিকৃত পাকিস্তান ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কার্যত দিল্লী থেকে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার জন্য আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দানকালে সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন : "আমি বাংলাকে বরাবর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভেবে আসছি, ভারতের কোন ইউনিয়নের অংশ হিসেবে নয়।"[২২]

চার

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের প্রতি বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা ঐ সময়কার *Transfer of Power Papers* এবং *Mountbatten Papers*

---

২১. বঙ্গীয় রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর অন্যতম উৎসাহী লেখক-গবেষক Leonard A. Gordon-এর কাছে সোহরাওয়ার্দীর মনোভাব 'অস্পষ্ট' রয়ে যায়। দেখুন, Gordon, "Divided Bengal : Problems of Nationalism and Identity in the 1947 Partition", *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 2 : XVI (1978), 155.

২২. সোহরাওয়ার্দীর ২৭ এপ্রিল দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য, দ্রষ্টব্য।

হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় নি। সাধারণ ধারণা হচ্ছে, বৃটিশরা এর বিরোধী ছিল এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্নতর। অধিকন্তু, এখন জানা যায় যে, বাংলার গভর্নর, সর্বভারতীয় পর্যায়ে গভর্নর জেনারেল এবং লন্ডনস্থ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন ছিল না।

বাংলার গভর্নর স্যার এফ. বারোজ তাঁর মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড স্বাধীন বাংলা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করলেও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন, যেহেতু তাঁকে বিষয়টি 'সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ' থেকে বিচার করতে হয় এবং তাই প্রথমদিকে এটি তাঁর কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হয় নি। বারোজ মনে করতেন, 'বাংলাকে বিভক্ত না করে স্বাধীনতা প্রদানই হচ্ছে বাংলার অত্যন্ত জটিল সমস্যাবলী যুক্তিসঙ্গতভাবে সমাধানের উপায়। এসব সমস্যার অন্যতম হচ্ছে বাংলার উভয় অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যার উপর কলকাতা মহানগরীর ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল। বাংলাকে বিভক্ত করা হলে খাদ্যঘাটতিপূর্ণ এবং বৃহৎ শিল্প-কারখানাহীন পূর্ব বাংলার পক্ষে বিভাগের পর টিকে থাকা সম্ভব নয়'[২৩], এবং যেহেতু উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে কলকাতা মহানগরীর উপর, তাই কলকাতাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাউন্টব্যাটেনের অভিমত এই যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যদি ভারতকে বিভক্ত করতে হয়, তাহলে একই যুক্তি বাংলা ও পাঞ্জাবসহ অন্য প্রদেশসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তিনি আরো মনে করেন, বাংলাকে যদি স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দেয়া হয়, তবে তা হবে ভারতকে 'খণ্ডবিখণ্ডকরণে' সাহায্য করার শামিল এবং কংগ্রেসের মৌলিক নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধে যাওয়া। এমন অবস্থায়, কংগ্রেস পাকিস্তানকে মেনে নিতে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে তার অখণ্ড ভারত আদর্শ থেকে সরে এসে যে ত্যাগ স্বীকার করলো এর মূল্য থাকলো কোথায়। এছাড়া, মাউন্টব্যাটেনের ধারণা ছিল, জিন্নাহ বাংলার স্বাধীনতার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন।[২৪] যাহোক, বারোজের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে মাউন্টব্যাটেন বাংলাকে অবিভক্ত রেখে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত হন বটে, তবে তা কোন অবস্থাতেই তাঁর সর্বভারতীয় অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করে নয়। অন্যদিকে, ভারতসচিব লিস্টওয়েলও (Listowel) বাংলাকে অবিভক্ত অবস্থায় স্বাধীনতালাভের সুযোগ দানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর যুক্তি হলো, (ক) আসামের সিলেট অঞ্চলসহ বা এটা বাদ দিয়ে হলেও বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য যথেষ্ট বৃহৎ; (খ) অবিভক্ত বা বিভক্ত যাই থাকুক না কেন, রাজনৈতিকভাবে (পশ্চিম) পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও কার্যত

২৩. Minutes of Viceroy's 9th Miscellaneous Meeting, 1 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 389-390; Burrows', *Partition of Bengal Scheme and Explanatory Note*, 390-394.

২৪. Minutes of Governor's Conference (Second Day), 16 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 269-279; আরো দেখুন, *Viceroy's Personal Report*, No.2, 9 April 1947, File L/P & J/10/79, 508-510; *Viceroy's Personal Report*, N0.3, 17 April 1947. *The Transfer of Power*, X, 296-303.

বাংলার অবস্থা হবে একটি পৃথক রাষ্ট্রের মতো এবং (গ) বাংলা বিভক্ত হলে বিশেষকরে পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হবে বিরূপ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া।[২৫] সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, বৃটিশ সরকারের অনুসৃত 'অফিসিয়াল' নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ডমিনিয়ন মর্যাদায় অবিভক্ত বাংলাকে স্বাধীনতা প্রদানে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্মত থাকা; তবে শর্ত হচ্ছে, অবশ্যই এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের অনুমোদন থাকতে হবে।[২৬]

সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উত্থাপিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের প্রতি জিন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল এ সম্বন্ধে দেশের বিদ্বজ্জন, রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং নেতৃবর্গের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও সম্প্রতি এ প্রস্তাব সম্পর্কে জিন্নাহর প্রকৃত অবস্থানটি জানা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ পায় এভাবে : ১৯৪৭ সালের ২৬ এপ্রিল এক সাক্ষাৎকারে সোহরাওয়ার্দী ভাইসরয়কে জানান যে, 'পর্যাপ্ত সময় পেলে তিনি বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।... তিনি এ মর্মে জিন্নাহর সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হবেন যে, যদি বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখা হয় তাহলে এর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা নেই।' তিনি আরো বলেন, 'বাংলার কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে থাকার সর্বপ্রকার ইচ্ছা রয়েছে।'[২৭] একই দিন জিন্নাহ ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে ভাইসরয় তাঁকে সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের বাইরে রেখে এর অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্পর্কে তাঁর মতামত সরাসরি জানতে চান। 'কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই' জিন্নাহ জবাব দেন :

> আমার আনন্দিত হওয়ার কথা। কলকাতা ছাড়া বাংলার মূল্য কোথায় ? তারা বরং অবিভক্ত ও স্বাধীন থাক, আমি নিশ্চিত যে তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।[২৮]

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার প্রতি জিন্নাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, "অবশ্যই, যেমনি আমিও আপনাকে ইঙ্গিত দিয়েছি যে পাকিস্তান কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চাইবে।"[২৯] জিন্নাহ এবং লিয়াকত

২৫. Memorandum by Secretary of state on Draft Statement of Policy, 17 May, *The Transfer of Power*, X, 876-880.

২৬. Mountbatten to Burrows, 23 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 971; Minutes of India Committee Meeting, 28 May 1947, *The Transfer of Power*, 1013-1023; আরো দেখুন, *Addendum* received on 2 June to Viceroy 's *Telegram* No. 1223-5, 31 May, L/P & J/10/79.

২৭. *The Transfer of Power*, X, 448-49.

২৮. Record of Interview between Mountbatten and Jinnah, 26 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 451-454; আরো দেখুন, Mountbatten to Burrows, 28 April 1947, *The Transfer of Power*, 471-472; Minutes of Viceroy's 9th Miscellaneous Meeting.

২৯. Record of Interview between Mountbatten and Jinnah, 29 April 1947.

আলী খান পরে বিভিন্ন সময়ে বাংলার অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে একই অভিমত ভাইসরয় এবং তাঁর স্টাফদের কাছে ব্যক্ত করেন।[৩০]

আসলে জিন্নাহর লক্ষ্য ছিল একটি মাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং এটা ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত দিল্লী মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশনে পরিষ্কার হয়ে যায়, যেখানে লাহোর প্রস্তাবের বহুবচনসূচক 'স্টেটস' কথাটিকে 'মুদ্রণ বিভ্রাট' হিসেবে বর্ণনা করে তিনি তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্রীয় ভাবনা-চিন্তার সপক্ষে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। তাহলে কি কারণে জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনার প্রতি অনুমোদন দান করেছিলেন? অবশ্যই সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ থেকে তাঁর উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। কেননা, বাইরের হস্তক্ষেপমুক্ত একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ছাড়াও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ছিল মহানগরী কলকাতার ভাগ্য, যে কলকাতা হচ্ছে তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রস্থল এবং যেখানে তিনি কাটিয়েছেন জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। অধিকন্তু ভাইসরয় জিন্নাহর সম্মুখে যে খণ্ডিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার জেতব্য অবস্থানের (vulnerability) কথা চিন্তা করে জিন্নাহ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। এই পাকিস্তানে পশ্চিমে সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের যোগদানের সম্ভাবনা ছিল নিশ্চিত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যোগদান তখনো অনিশ্চিত এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছিল কলকাতা বাদে বাংলার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশ। আর জিন্নাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আসামের সিলেট অঞ্চলও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো।[৩১] নিঃসন্দেহে, এক্ষেত্রে জিন্নাহর ইচ্ছা ছিল সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে বাংলার অখণ্ড সত্তা বজায় রাখাকেঁ তিনি তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করে থাকতে পারেন। যদি বাংলায় খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরম খাঁ ও নূরুল আমিনদের মতো খাঁটি পাকিস্তানপন্থীরা বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থও হন, তাতেও কোন ক্ষতি নেই, যতোদিন সমগ্র বাংলা হিন্দুস্থানের বাইরে থাকছে। জিন্নাহর ধারণা হলো, 'পাকিস্তানের একটি শক্তিশালী মিত্র'[৩২] হিসেবে বাংলা অবস্থান করবে। ইন্ডিয়া কমিটির কাছে পেশকৃত মাউন্টব্যাটেনের রিপোর্টেও এ মতের সমর্থন মেলে। এতে বলা হয়: "মিঃ জিন্নাহ মনে করেন যে, মুসলমানপ্রধান স্বাধীন বাংলা এক ধরনের আনুষঙ্গিক পাকিস্তানে পরিণত হবে।"[৩৩]

৩০. দেখুন, Mieville to Mountbatten, 29 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 479: Mountbatten to Burrows, 2 May 1947, *The Transfer of Power*, 554-555; আরো দেখুন, *Viceroy's Personal Report*, No. 5, 1 May 1947, *The Transfer of Power*, 533-547, Record of Interview between Mountbatten and Chundrigar, 2 May 1947, *The Transfer of Power*, 561-562, Minutes of India Committee Meeting, 5 May, *The Transfer of Power*, 625-628.

৩১. *Viceroy's Personal Report*, No.3; আরো দেখুন, *Viceroy's Personal Report*, No. 2.

৩২. R. J. Moore, *Escape From Empire*, Oxford University Press (London 1983), 340.

৩৩. Minutes of India Committee Meeting, 19 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 896-901

জিন্নাহ এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অনুকূল মনোভাব সত্ত্বেও সময়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, যেহেতু ভাইসরয় তাঁকে জানান যে, বাংলাকে অবিভক্ত ও স্বাধীন রাখার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তিনি 'বড়জোড়' দু'মাস সময় পেতে পারেন।[৩৪] আসলে, বাংলার স্বাধীন মর্যাদা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না এবং এঁদের মধ্যে সমর্থক ও বিরোধী উভয়ই ছিল। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে দুটি ভিন্ন মত সৃষ্টি হয়। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কংগ্রেসের এক অংশ যখন এ প্রস্তাবকে 'প্রাদেশিকতা'[৩৫] হিসেবে দেখার পক্ষপাতী, তখন অপর অংশ, যারা বাংলার যেকোন বিষয়ের প্রতি অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে সদা সচেতন, তারা মনে করেছিল বাংলার স্বাধীনতা অর্জনই এর অখণ্ডতা বজায় রাখার একমাত্র উপায় হতে পারে। অন্যদিকে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপে'র কাছে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার মধ্যে সে অর্থে নতুন কিছু ছিল না, যেহেতু এটা ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে প্রণীত 'পাকিস্তান ধারণার' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু 'খাজা-গ্রুপ' দৃঢ়ভাবে চেয়েছিল, বাংলা অবিভক্ত বা বিভক্ত যাই হোক, অখণ্ড পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হোক। যদিও 'খাজা-গ্রুপ'কে কিছুকাল পর্যন্ত স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' ধারণাটি লালন করতে দেখা যায়, তথাপি এদের কাছে এটা কোন গভীর বিশ্বাসের ব্যাপার ছিল না। জিন্নাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় রূপরেখা তুলে না ধরা পর্যন্ত এরা এ ধারণাটি পোষণ করতে থাকে এবং ১৯৪৬ সালে দিল্লী মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশনে জিন্নাহ 'এক পাকিস্তান তত্ত্ব' নিয়ে আবির্ভূত হলে 'খাজা-গ্রুপ' তাঁর অনুগত অনুসারী দলভুক্ত হয়।[৩৬] অখণ্ড বাংলার আন্দোলন চলাকালে যদিও জিন্নাহ উল্লিখিত কারণে বাংলাকে স্বাধীন মর্যাদা দানে সম্মত ছিলেন, তথাপি এ মনোভঙ্গি ব্যক্ত করে তিনি প্রকাশ্য কোন উক্তি করেন নি। বরং সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম যে সময় বাংলার অন্য সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছার শর্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনায় নিয়োজিত ছিলেন, সে সময় জিন্নাহর কাছ থেকে তাঁর অনুগত 'খাজা-গ্রুপ' এমন ধারণা লাভ করেছিল যে, 'হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য লীগ হাইকমান্ড থেকে কাউকে ক্ষমতা দেয়া হয় নি।'[৩৭] এভাবে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে জিন্নাহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের উভয় গ্রুপকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত

৩৪. Record of interview between Mountbatten and Suhrawardy, 26 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 448-449; আরো দ্রষ্টব্য, Lord Ismay to Mountbatten, 26 April 1947, *The Transfer of Power* X, 450.

৩৫. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের ২ মে'র (১৯৪৭) বিবৃতি দ্রষ্টব্য, অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, ১০৪-১০৫, ১৩২-১৩৫।

৩৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh;* আরো দ্রষ্টব্য, মওলানা আকরম খানের ৪ মে'র বিবৃতি, *Star of India*, 5 May 1947, 2.

৩৭. Serajuddin Hussain, *Look into the Mirror* (Dhaka 1974), 35.

সতর্কতা অবলম্বন করেন। যাহোক, এ পর্যায়ে 'খাজা-গ্রুপ' বা অখণ্ড পাকিস্তানপন্থীরা এ ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, (পশ্চিম) পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধনহীন অবস্থায় বাংলার মুসলমানরা 'ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্থানের শক্তি মোকাবেলা করতে'[৩৮] সমর্থ হবে না এবং কালক্রমে বাংলা 'ভারতের একটি অংশে'[৩৯] পরিণত হবে বলে তারা আশঙ্কা করে। এ ছাড়া পাকিস্তানের অভ্যুদয় যখন অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হচ্ছিল, তখন থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কলকাতা বনাম ঢাকা প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক নতুন উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৪০] অভিযোগ করা হয় যে, 'খাজা-গ্রুপে'র দৃঢ়চেতা অংশ, যাঁরা পূর্ব বাংলা থেকে আগত এবং যাঁরা বেশ কিছুদিন ধরে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা পুনর্বিন্যাসের পক্ষে একটানা প্রচার চালিয়ে আসছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে দমন করার লক্ষ্যে ব্যক্তিপর্যায়ে বাংলাবিভক্তির সপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন, বঙ্গীয় আইনসভার স্পীকার নূরুল আমিনের (পূর্ব বাংলা) নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং সে মন্ত্রিসভায় এঁরা নিশ্চিত আসন লাভে সক্ষম হবেন।[৪১]

পাঁচ

সে যাহোক, বহু আলাপ-আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎ বসুর কলকাতাস্থ বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার সমর্থক উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে পৌঁছে একটি চুক্তি প্রণয়ন করতে সক্ষম হন,[৪২] যা ছিল নিম্নরূপ :

এক. বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে তা সে নিজে নির্ধারণ করবে।

দুই. এ স্বাধীন বাংলার শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। হিন্দু ও তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে অথবা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন বণ্টন করা হবে। নির্বাচন হবে একটি এলাকা থেকে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনমূলক (multiple) এবং ভোট হবে বণ্টনধর্মী (distributive), সর্বোচ্চ

৩৮. আকরম খানের৪ মে'র বিবৃতি, পূর্বোক্ত।
৩৯. শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে প্রবন্ধকারের ১৯৮২ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার। আজিজুর রহমান ১৯৪৫-৪৭ সময়কালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক ছিলেন।
৪০. দেখুন, Raghib Ahsan, *Hussain Shaheed Suhrawardy*, 17.
৪১. Memorandum of the Calcutta District Muslim League and others to Jinnah, 31 May 1947, *Quaid-i-Azam Papers*, F. 10, 24-33 .
৪২. Abul Hashim, *In Retrospection,* 153-54; Sarat Chandra Bose, *I Warned My Countrymen,* (Calcutta 1968); 186-87; অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, ৩৮-৪১; আরো দ্রষ্টব্য, Text of Suhrawardy's Memorandum to Kiran Shankar Roy in Burrows to Listowell and Mountbatten, 19 May 1947, *The Transfer of Power,* X, 905-906, Burrows to Listowell and Mountbatten, 21 May, 926-927.

আসনসংখ্যাভিত্তিক (cumulative) নয়। কোন প্রার্থী যদি নির্বাচনে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের ২৫% পান, তাহলে তিনি নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন। যদি কোন প্রার্থী এ শর্ত পূরণে ব্যর্থ হন, তাহলে যিনি নিজ সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ ভোট লাভ করবেন তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

তিন. বৃটিশ সরকার এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করবে যে, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং বাংলা বিভক্ত হবে না; বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ বাদে সমসংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু (তফসিলী হিন্দুসহ) সদস্য নিয়ে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। এ মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু।

চার. নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু (তফসিলী সম্প্রদায়সহ) এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামরিক বাহিনী ও পুলিশসহ সকল চাকুরিতে সমান অংশ থাকবে। এসব চাকুরিতে কেবল বাঙালিদেরই নিয়োগ করা হবে।

পাঁচ. ইউরোপীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যগণ বাদে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান ও অমুসলমান সদস্যগণ মিলে ১৬ জন মুসলমান এবং ১৪ জন হিন্দু সদস্য অর্থাৎ মোট ৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান পরিষদ নির্বাচিত করবে।

যদিও বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতার স্বাক্ষরিত চুক্তির উল্লিখিত শর্তাবলী বাংলার রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে একটি যুক্তিসম্মত ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল, তথাপি এর প্রতি কংগ্রেস হাইকমান্ডের, বিশেষকরে নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া আদৌ সহায়ক ছিল না। অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনাকে 'একটি ফাঁদ' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্যাটেল বাংলার কতিপয় প্রখ্যাত হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাকে এ ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য সতর্ক করে দেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'বাংলার অমুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বাংলাকে অবশ্যই বিভক্ত করতে হবে।'[৪৩] নেহেরু আরো সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেন :

> বিরাজমান অবস্থায় বাংলার স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ যা দাঁড়াবে তা হচ্ছে এখানে মুসলিম লীগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এর অর্থ হবে কার্যত সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যদিও এর প্রবক্তারা তা বলছে না।[৪৪]

লীগ বা অনুরূপ কোন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় বাংলার স্বাধীনতার বিরোধিতা করাটা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানরা

৪৩. Sardar Patel to Binoy Kumar Roy, 23 May1947, Durga Das (ed.), *Sardar Patel's Correspondence* 1945-50, Vol. IV, (Ahmedabad 1972), 43; আরো দেখুন, Patel to K C. Neogy MLA, 13 May, ঐ, 39-40, Patel to Surendranath Sen, 1 June, ঐ, 52; Patel to Shyama Prasad Mookherjee, 17 May, ঐ, 41.

৪৪. *News Chronicle*-এর প্রতিনিধি Norman Clift-এর সঙ্গে নেহেরুর ২৭ মে'র (১৯৪৭) সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য, *The Transfer of Power*, X, 1039-1041.

প্রায় সমান। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারসহ যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা, যা বাস্তবায়িত হবে বলে বাঙালি নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে (যা সোহরাওয়ার্দী-বসু রায় ফর্মূলা নামেও পরিচিত) অঙ্গীকার করা হয়েছে, তাতে কোন একটি সম্প্রদায়ের কোন দলের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অধিকন্তু একবার স্বাধীন হলে বাংলার পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে মোটেও ছিল না একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

বস্তুত কংগ্রেস হাইকমান্ড বাংলার বিভক্তির প্রশ্নে অটল ছিলেন এবং তাঁরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় নি। অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার প্রতি তাঁদের সর্বাত্মক বিরোধিতার এটাই আসল কারণ। এটা সত্য যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একটি অংশ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। তবে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাবিভক্তির উদ্যোগ সর্বপ্রথম এঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকেই আসে।

স্পষ্টত কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে আশু বিবেচ্য বিষয় ছিল সম্পদসমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলা, বিশেষকরে কলকাতা শহর। আসামের গুরুত্ব সম্পর্কেও তাঁরা একইভাবে সচেতন ছিলেন বলে মনে করার কারণ রয়েছে। আসামে ছিল পেট্রোল ও অন্যান্য প্রচুর খনিজ সম্পদ। কৌশলগত দিক দিয়েও আসাম ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠিত হলে তা আসামকে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করতো; এর সঙ্গে রেলপথে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা থাকতো না; বাংলার মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য আসামের পক্ষে, মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ[৪৫] অনুযায়ী, 'ট্র্যানজিট অধিকার' লাভের জন্য বাংলার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে হতো। তবে এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা ছিল না যে, প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নের সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। সাধারণত সীমান্তবর্তী দেশের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক দেখা দেয়। তাই বৈরী ভাবাপন্ন বাংলা দ্বারা আসাম ঘিরে থাকার সম্ভাবনাও ছিল।[৪৬]

আসলে কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিশ্বাস ছিল, বাংলার বিভক্তি 'দীর্ঘস্থায়ী' হবে না[৪৭], কেননা কি অর্থনৈতিক কি ভূরাজনৈতিক কোন দিক বিবেচনায় এককভাবে পূর্ব বাংলার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। মাউন্টব্যাটেন এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন : "নেহেরু ... মনে করেন যে বর্তমানে ভাগ করা হলেও কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলা হিন্দুস্থানের মধ্যে চলে আসবে।"[৪৮]

৪৫. Minutes of Governor's Conference (Second Day).
৪৬. আসামের গভর্নর স্যার এন্ড্রু ক্লোও এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। দ্রষ্টব্য, ঐ।
৪৭. Norman Cliff-এর সঙ্গে নেহেরুর ২৭ মে'র সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত; আরো দেখুন, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর বক্তৃতা, *Star of India*, 24 May 1947, 1
৪৮. *Viceroy's Personal Report*, No. 7, File L/P & J/10/79, 222-226; আরো দেখুন, *SR*. Ist half, June 1947, *GFR*, L/P & J/5/154, 20-21.

যাহোক, ১৯৪৭ সালের ২৭ মে এক সংবাদ প্রতিনিধির কাছে ব্যক্ত নেহেরুর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার এ নাটক দ্রুত যবনিকাপাতের দিকে এগিয়ে যায়। তাঁর মন্তব্য ছিল : 'ইউনিয়নের (অর্থাৎ হিন্দুস্থানের) অভ্যন্তরে বাংলা অবস্থিত থাকবে একমাত্র এ শর্তে আমরা বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সম্মত রয়েছি।'[৪৯] যদিও ২ জুন অনুষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে উভয় হাইকমান্ড কর্তৃক বৃটিশদের দেশবিভাগ পরিকল্পনা কার্যত গৃহীত হয়, তথাপি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরা বাংলার দু'অংশে হিন্দু ও মুসলমান এ দু'সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম অংশের সদস্যরা ২০ জুন এক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন এবং ৩৭ ভোটের ব্যবধানে বাংলাকে ভাগ করার সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫০] যেহেতু দেশবিভাগ পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোন একটি অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা দেশবিভাগের সপক্ষে রায়দান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট ছিল, অতএব এ ভোটাভুটির মাধ্যমে বাংলাবিভক্তি নিশ্চিত হয়ে যায়।

ছয়

অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বাংলার শাসনকাজে ১৯৩৭-১৯৪৭ এই এক দশক যাবৎ কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনের সুযোগ না পেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এক ধরনের সম্পৃক্তিহীনতা জন্ম নেয়। একই সময়ের মধ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্দেশ্যে বহুবার প্রয়াস চালান, কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের বিরোধিতার কারণে সে উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বাংলার জনসংখ্যার বিস্তৃতি এমনি ছিল যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলাকে বিভক্ত করা এতে অতি সহজ হয়ে উঠে। কলকাতাসহ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলার অর্ধাংশ পেলে বাংলাবিভক্তিতে পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের ক্ষতি ছিল না। তারা বুঝেছিল যে, এর ফলে মুসলমানদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি না করে তারা নিজেরা একক শাসনক্ষমতা লাভ করবে। এটা তাদেরকে বাংলাবিভক্তির আন্দোলন জোরদার করতে আরো উৎসাহিত করে থাকতে পারে। অধিকন্তু, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে সংঘটিত 'ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গা'র পর থেকে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ স্বার্থান্বেষী হিন্দু মালিকানাধীন

৪৯. Norman Cliff-এর সঙ্গে নেহেরুর ২৭শে মে'র সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত; আরো দেখুন, *অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার* সঙ্গে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কৃপালনীর সাক্ষাৎকার, Minutes of India Committee Meeting, 28 May, *The Transfer of Power*, X, 1038-1039.

৫০. প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮ ভোট ও বিপক্ষে ২১ ভোট পড়ে। যাঁরা বিপক্ষে ভোট দেন তাঁরা বাংলার ঐ অংশ থেকে আগত মুসলিম লীগ দলভুক্ত ছিলেন।

পত্রিকাগুলোর জন্য সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে একটি 'অপূর্ব সুযোগ' এনে দেয়, যা দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 'ভয়ানক সন্দেহের প্রাচীর'[৫১] গড়ে তুলতে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে।

সময়ের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বাংলার গভর্নর বারোজসহ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা উদ্যোগের প্রবক্তারা বহুবার তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এটা আর একটি অন্তরায়। অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রশ্নে বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইতিপূর্বে উল্লেখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর 'হিন্দুদের মধ্যে তাদের পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে এবং বাংলাবিভক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে' দেখা যায়।[৫২] তবে সাধারণ অভিমত হচ্ছে : '... প্রস্তাবটি খুবই বিলম্বে এসেছে...কমপক্ষে এক বছর পূর্বে এটা উত্থাপন করা উচিত ছিল।'[৫৩] প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে এবং ঘোষিত সময়সীমার পূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে ভারতীয় ইউনিয়নের ডমিনিয়ন মর্যাদায় কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা, যাকে মাউন্টব্যাটেন 'আমাদের (বৃটিশদের) দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে একটি সুবর্ণ সুযোগ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তা বৃটিশ সরকারকে 'সম্ভাব্য সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ... একটি ঘোষণাদানের দিকে' অগ্রসর হতে তাগিদ দেয়।[৫৪] এভাবে পূর্বঘোষিত ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পরিবর্তে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত পরিত্যাগ করে। এটা ছিল অখণ্ড স্বাধীন বাংলা উদ্যোগের জন্য বিপর্যয়কর, কেননা এতে সফলকাম হতে হলে প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত সময়ের। এ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ডমিনিয়ন মর্যাদায় বাংলার তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও তারা অখণ্ড বাংলার বেদিমূলে তাদের সর্বভারতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিল না।

যদিও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দুদের একটি বড় অংশকে সংগঠিত করা হয়েছিল, তবুও এর ব্যর্থতার জন্য এটাই মুখ্য কারণ ছিল না। অখণ্ড স্বাধীন বাংলার ভাগ্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয় এবং এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ডের ভেটো বড় কারণ। নিঃসন্দেহে, সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতেন[৫৫] যদি এমনটি হতো যে, জিন্নাহর অনমনীয় মনোভাবের কারণে বাংলার

৫১. *Star of India*, 12 May 1947, 2.

৫২. *SR*, 1st half, May, 1947, *GFR*, L/P & J/5/154, 27-28

৫৩. Burrows to Mountbatten, 28 May, *The Transfer of Power*, X, 1025-1027

৫৪. Mountbatten to Lord Ismay, 11 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 774.

৫৫. দ্রষ্টব্য, Burrows to Mountbatten, 28 May, আরো দেখুন, Minutes of Viceroy's 9th Miscellaneous Meeting; Record of Interview between Mountbatten and Tyson, 15 April 1947, *The Transfer of Power*, X, 263-264; Suhrawardy to Liaquat Ali Khan, 21 May 1947, *Quaid-i-Azam Papers*, F, 458, 75-79

ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সমঝোতাটি অকার্যকর হয়ে পড়ছে। যাহোক, যেখানে পরিকল্পনাটির প্রতি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জিন্নাহর সম্মতি ছিল, সেখানে কংগ্রেস হাইকমান্ড, বিশেষকরে নেহেরু ও প্যাটেল আগাগোড়া এর ঘোর বিরোধিতা করতে থাকেন; সোহরাওয়ার্দী যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নেহেরু ও প্যাটেল যদি অনড় থাকেন, তাহলে কিরণ শংকর রায়ের পক্ষে তাঁদের মত পরিবর্তন করানো কিংবা নিজস্ব স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ কোনটাই সম্ভব ছিল না। এমনকি মহাত্মা গান্ধীকেও কংগ্রেস হাইকমান্ডের এ দু'নেতাকে বুঝিয়ে নরম করানোর মতো আর তেমন ক্ষমতাবান মনে হয় নি এবং অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রয়াসে শরৎ বসু ও অন্যদের সমর্থন দানের জন্য তাঁকে এক ধরনের 'ভর্ৎসনাও' করা হয়।[৫৬]

সাত

আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কেবল বাংলাবিভক্তি ঠেকানোর উদ্দেশ্যে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি, এটা ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের' দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রভাবনার ফল এবং সেকারণে তা তাঁদের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটাও অসত্য যে, বৃটিশরা এ উদ্যোগের বিরোধী কিংবা এর প্রতি নিরুৎসাহী ছিল। হিন্দুস্থান ও (পশ্চিম) পাকিস্তানের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলাকে ডমিনিয়ন মর্যাদায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানে তারা একেবারে অনিচ্ছুক ছিল না। এ কথাও বলা যাবে না যে, জিন্নাহর অনুমোদনের অভাবে সোহরাওয়ার্দীর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা একটা পর্যায় পর্যন্ত এর প্রতি তাঁর সম্মতি ছিল। এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার মূলে ছিল কংগ্রেস কর্তৃক 'ভেটো' প্রয়োগ।

স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' বা এক ধরনের 'বৃহত্তর বাংলার' ধারণা লালন করে 'সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাত দিয়েছিল, কেননা এর সঙ্গে বাংলা অবিভক্ত থাকা না থাকার মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রশ্ন এবং বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দু ও বাংলার বাইরের মুসলমানদের সম্বন্ধ কেমন হবে তা জড়িত ছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এঁরা রাষ্ট্রগঠন সংক্রান্ত তাঁদের এই স্বতন্ত্র ধারণা জনসম্মুখে তুলে না ধরে একে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেন। ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি, যা পাকিস্তান আন্দোলনের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য

৫৬. ১৯৪৭ সালের ৮ জুন দিল্লীতে গান্ধীর প্রার্থনাশেষে প্রদত্ত বক্তব্য দ্রষ্টব্য, অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, ৯০-৯১; আরো দেখুন, Gandhi to Sarat Bose, 8 June 1947, in Abul Hashim's *In Retrospection*, 1581 স্মর্তব্য। গান্ধীজী প্রদেশসমূহের বিভক্তির বিরোধী ছিলেন এবং অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার প্রতি তাঁর এক ধরনের আশীর্বাদ ছিল। দ্রষ্টব্য, *Viceroy's Personal Report*, No 7, *SR*, 2nd half, March 1947, *GFR*, L/P & J/5/154, 58-60; Burrows to Lord Wavell, 19 March 1947, *GFR*, পূর্বোক্ত, 62-63; Burrows to Mountbatten, 28 May 1947, *The Transfer of Power*, X, 1025-1027

শর্ত ছিল, সেটি বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কাতেই তাঁরা এমন পন্থা অবলম্বন করেন— তাঁদের ধারণাটি গুপ্ত রাখার এটি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হতে পারে না। তখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ছিলেন জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় বাঙালি নেতা। বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে তাঁদের আগ্রহ ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূরদর্শিতা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার নানা কারণ থাকতে পারে, তবে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল থাকায় তাঁরা এই পর্যায়ে বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন নি। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বাঙালি নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সম্পর্ককে তাঁদের পরিকল্পিত 'একীভূত পাকিস্তান রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগিয়েছে।

বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান যদি ঐক্যবদ্ধভাবে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বভারতীয় পর্যায়ে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ভূমিকা রাখতে পারতো, তাহলে এ উদ্যোগ সফল হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। এজন্য প্রয়োজন ছিল ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একই বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী ধারণা বর্তমান থাকা। কিন্তু তা অনুপস্থিত ছিল। বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দু'সম্প্রদায়ের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ বিবেচনায় একই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল।

যাহোক, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনপ্রচেষ্টার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আধুনিককালে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পথ ধরে উদ্ভাসিত স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' এবং 'বৃহত্তর বাংলা' পরিকল্পনা (১৯৪৪) ও অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা উদ্যোগের (১৯৪৭) সঙ্গে ১৯৭১-এর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রয়েছে, আর তা হচ্ছে, এতদঞ্চলে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন পর্যায়ে এর আদর্শিক ভিত্তি (যেমন ১৯৪০-এর দ্বিজাতিতত্ত্ব, ১৯৪৭-এর বিমূর্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ১৯৭১-এর অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আদর্শ) এবং ভৌগোলিক সীমারেখা (যেমন লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ভৌগোলিক সীমারেখা পুনর্নির্ধারণ, ১৯৪৭-এর অবিভক্ত বাংলা বা বৃহত্তর বাংলা এবং ১৯৭১-এর খণ্ডিত বাংলা) ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্নতা বা কখনো কখনো বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলেও উল্লিখিত যোগসূত্রের কোন ব্যত্যয় ঘটে নি, যে কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেও সোহরাওয়ার্দী ও অন্যদের পক্ষে ১৯৪৭ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিকল্পিত রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তির সময়োপযোগী ও যথাযথ পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এক অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অবস্থা থেকে ক্রমশ তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৪

স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব বাংলা

আহমেদ কামাল*

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে পকিস্তানের জন্ম হয় এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলা প্রদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। এই দ্বিখণ্ডিত প্রদেশটির পূর্বাংশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত হয়। বলা হয়ে থাকে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মুসলমানেরা আজানের ধ্বনি দিয়ে এই নতুন জাতি ও রাষ্ট্রের জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিল।[১] চল্লিশের দশকের একজন তরুণ মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন যে, ঢাকা শহরের সকল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসীরা সারা দিনরাত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য তোরণ নির্মাণ এবং সাজসজ্জা প্রভৃতির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল।[২] সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহ আলোকসজ্জিত করা হয়েছিল এবং জ্বালানো হয়েছিল আতশবাজি।[৩] জনগণের আনন্দোল্লাসে মুখরিত ছিল পথঘাট এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রাকে, কেউ বা হাতিতে চড়ে আনন্দমিছিলে যোগ । *স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, এ দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ছিল হিন্দু-মুসলমানদের একটি সম্মিলিত মিছিল, যা ভিক্টোরিয়া পার্কে এসে জমায়েত হয়েছিল এবং সেখানে প্রধান প্রধান দলের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিয়েছিলেন।[৪]

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আসহাব উদ্দীন আহমদ, *আসহাব উদ্দীন রচনা সংগ্রহ*, ৩য় খণ্ড (চট্টগ্রাম ১৯৮২), ৫৫।

২. তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী, সংকলিত, বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে কতিপয় দলিল*, (ঢাকা ১৯৮৪)।

৩. ঐ।

৪. *The Statesman*, 15 August 1947, Calcutta

যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে, বিশেষকরে এর পটভূমি ও অর্জন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তথাপি কোনো গ্রন্থে জন্মলগ্নে এবং জন্মের অব্যবহিত পরে এই রাষ্ট্রের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ প্রদান করা হয় নি। বর্তমান গ্রন্থের এই অধ্যায়ে এমন কিছু বিষয় উত্থাপন করা হবে, যেগুলোতে জন্মলাভের পরে এই রাষ্ট্রের যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে এবং এ নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল প্রধানত তার মধ্যেই আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কেবলমাত্র ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরিশাল শহরে বিজয় তোরণ নির্মাণের সাথে সাথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।[৫] সিলেটে দিবসটি উদযাপিত হয় জনসমাবেশের মধ্যদিয়ে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে সাইরেন বেজে উঠার সাথে সাথে এই জেলাটি আর ভারতের আসাম প্রদেশের অংশ রইল না। মুসলমানরা দলে দলে বেরিয়ে এসে মিছিল সহকারে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।[৬] একজন প্রখ্যাত জেলা পর্যায়ের কংগ্রেস নেতা প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন, উত্তর বাংলার শহর রাজশাহীতে সমবেত বিরাট জনতার প্রত্যেকের মুখমণ্ডল স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ লালিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।"[৭] এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীও বৃটিশ রাজের অধীনতা থেকে রাজনৈতিক মুক্তি লাভের দরুন নবপ্রেরণা ও আনন্দে মেতে উঠেছিল। একজন সক্রিয় কমিউনিষ্ট কর্মী এবং লেখকের মতে, অন্যদের মতো কমিউনিস্টরাও স্বাধীনতা লাভের আনন্দে অভিভূত হয়েছিল।[৮] ১৫ আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী এবং ভাটপুর অঞ্চলে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সভা, সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেন এবং এসবের মধ্যদিয়ে তারা নতুন রাষ্ট্রের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করেন।[৯]

স্বাধীনতা দিবসে সৌহার্দ্য ও মিলনের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য স্থানে।[১০] তাজউদ্দীনের দিনলিপির আকর্ষণীয় বর্ণনায় উঠে এসেছে স্বাধীনতা ও মুক্তির সীমাহীন আনন্দ ও উদ্দীপনায় মুখরিত সেদিনকার উৎসবমুখর প্রাদেশিক শহর-গ্রামের ছবি।[১১] স্পষ্টতই বিজয়োৎসবের দর্শকদের কাছে এই

৫. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *আলতাফ মাহমুদ* (ঢাকা ১৯৮২), ৭।
৬. *The Statesman*, 15 August 1947. Calcutta.
৭. Provash Chandra Lahiry, *India Partitioned and Minorities in Pakistan* (Calcutta 1964). 1.
৮. সত্যেন সেন, *বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম*, (ঢাকা ১৯৬৪), ৫৭।
৯. প্রমথ গুপ্ত, *মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী*, কলকাতা ১৯৮২, ৮৮।
১০. *ডায়েরী*, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সম্পর্কে মন্তব্য, *দলিল*।
১১. L F Rushbrook Williams, *The State of Pakistan* (London 1962), 35; Adrienne Cooper, *Sharecropping and Sharecroppers' Struggle in Bengal 1930-50*, Ph.D Thesis, London University, 1984.

'আনন্দোন্মাদনা' ছিল একমাত্রিক ও শর্তহীন। অবশ্য এই আনন্দোৎসবের হিড়িক দেখে ভাববার কোন কারণ নেই যে, স্বাধীনতা অর্জনের আনন্দোন্মাদনায় সকল মানুষ এক অভিন্ন অনুভূতির অংশীদার ছিল। 'আনন্দোন্মাদনা' শব্দটি পাকিস্তানের ধারণাকে ঘিরে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রত্যাশাকে প্রকাশ করে এবং আড়ালও করে।

পাকিস্তানের জন্মের দিনটি পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি সঠিক সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হয় নি। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের একটি রূপরেখা নির্ধারণে নিযুক্ত মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মীরা যখন এই সদ্যোজাত রাষ্ট্রের সংবিধানের নতুন নীতিমালা প্রণয়নে নিয়োজিত ছিলেন, তখনও তারা এই রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হন, যদিও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ছিল।[১২] স্বাধীনতার লগ্নে জিন্নাহ জাতির উদ্দেশ্যে বলেন :

> আমরা এই মৌলিক নীতি থেকে শুরু করছি যে আমরা সকলেই একই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমান নাগরিক… একে আমাদের সামনে আমাদের আদর্শ হিসেবে রাখা প্রয়োজন এবং আপনারা দেখবেন যে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলিমরা আর মুসলিম থাকবে না, তবে ধর্মীয় অর্থে নয়, কারণ ধর্ম হলো প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস, তবে রাজনৈতিক অর্থে সকলেই রাষ্ট্রের নাগরিক।

সেই একই ভাষণে জিন্নাহ পাকিস্তানের আইন প্রণয়নকারী গণপরিষদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।[১৩] ঢাকায় প্রখ্যাত মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা মওলানা ভাসানীও বিধান সভার অধিবেশনে একই ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন :

> আজ দেশ একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ এবং তা জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া উচিত।[১৪]

এ ধরনের স্থানীয় নেতাদের জন্য 'পাকিস্তান'-এর প্রকৃত অর্থ ছিল ঔপনিবেশিক আমলের অভিজ্ঞতালব্ধ অংশীদারিত্ববর্জিত, অগণতান্ত্রিক, অপ্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে বিপরীত রাজনীতির অবতারণা।[১৫]

"আজকের রাত বারোটা হলো বৃটিশ শাসনের অবসানমুহূর্ত এবং ভারতের নিজস্ব স্বাধীন সরকারের সূচনালগ্ন"—১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তাজউদ্দীন তাঁর দিনলিপিতে রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরীর পাতার শীর্ষে বড় অক্ষরে 'স্বাধীনতা' শব্দটি লিখেছেন, যা তাঁর অনুভূতিরই

---

১২. Mustaq Ahmed, *Politics without Social Change* (Karachi 1971), 3.

১৩. M A Jinnah, "Presidential Address to Constituent Assembly of Pakistan" on 11, August, 1947. দেখুন, Jamiluddin Ahmed (ed.), *Speeches and Writings of Mr. M A Jinnah*, Vol 2 (Lahore 1964), 402.

১৪. *East Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol 1, No 3, 7, from now on EBLA, *Progs*

১৫. Clive Y Thomas, *The Rise of the Authoritarian State in Peripheral Societies*, (New York, London 1984), 97.

ঘনীভূত অভিব্যক্তির সূচক।[১৬] রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে উদযাপন করতে গিয়ে এক কবি পাকিস্তানকে 'এক অনন্ত ঈদের দেশ' হিসেবে কল্পনা করেছেন।[১৭] বহু জাতীয়তাবাদীর কাছে স্বাধীনতা ছিল "ভারতীয় মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠতম সময়"।[১৮] একজন জাতীয়তাবাদী নেতা একে 'পাকিস্তান বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] তাদের বহুজনের কাছেই এটা ছিল নিদেনপক্ষে 'বর্বর শাসনের অবসান', যে শাসন সব ধরনের মানবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল এবং উদ্যমী মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে বিপর্যস্ত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী রচনা এবং বক্তৃতাসমূহ স্বাধীনতার দিনটিকে ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পর থেকে সংঘটিত সব আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি বলে গণ্য করেছে। আবার অন্য কেউ কেউ একে ১৮৫৭-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থান থেকে সূচিত কালক্রমে স্থাপন করেন। 'পাকিস্তান—প্রতিশ্রুতির দেশ, আশার দেশ, সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত দেশ' এমনিতরো অভিব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হতো জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের পাতায়।[২০]

আর এসব আশার কথা মুসলিম লীগের চারপাশে সমবেত হাজার হাজার মানুষকে শ্রেণী ও নৃতাত্ত্বিক বৈষম্যবর্জিত একটি মুসলিম 'জাতি' রূপে প্রতীয়মান করেছিল। দরিদ্র মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রায়শ ছিল অভিজাত মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন। এ ছাড়াও জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ কখনো পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন নি বলে একটা ভাবাদর্শগত শূন্যতা রয়েই গেল, অথচ মুসলিম লীগ সম্পর্কে নানাবিধ পরস্পরবিরোধী মূল্যায়ন বিদ্যমান ছিল।[২১]

'ইতিহাসের এক নতুন যুগ' এবং প্রভাতের উপমা প্রায়শ ব্যবহৃত হতো একটি নবসূচনার ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য।[২২] অ্যান্ডারসন সঠিকভাবেই প্রভাত, আলো ও

---

১৬. *ডায়েরী, দলিল*।

১৭. তালিম হোসেন, "পাক ওয়াতন", উদ্ধৃত, সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা ১৯৮৩), ১৭২।

১৮. Kalim Siddique, *Conflict, Crisis and War in Pakistan* (London 1972), 54.

১৯. Abul Mansur Ahmad, *End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution* (Dacca 1975), 165-8

২০. Begum Saistha Ikramullah, *From Purdah to Parliament* (London 1963), 158; A B M Habibullah, "Plassey to Pakistan", *Statesman*, Independence Day Supplement, 15 August 1947, Calcutta; আরও দেখুন, সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, মাসিক মোহাম্মদী নং ৭, ৯, ১০, ১১, ২০ বর্ষ, ৫৭৭, ৭৯৬, ৮৮১, ৫৮৯, ৯১৯ কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৫৪।

২১. বিস্তারিত দ্র. Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal* (New Delhi 1976); Sirajuddin Hussain, *Look into the Mirror* (Dacca 1974); Kamruddin Ahmad, *Social History*; আবুল মনসুর আহমদ , আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা।

২২. দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ এফ. ই. জুখভ পাকিস্তান কনসেপ্টের অনেক রকম অর্থ লক্ষ্য করেছেন; দেখুন, D Overstreet and Windmiller, *Communism in India*, (Barkeley 1959), 254.

সূর্যকে পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন, যা সেই মুহূর্তে যথার্থ ব্যঞ্জনা লাভ করে যখন জাতীয়তাবাদীদের জীবন "পৃথিবীর অগ্রযাত্রার সাথে যুক্ত হয়।"[২৩] সেটি এমন এক সময়, যখন গণমানুষের আশার বহুমুখী বিস্তার ঘটে। জাতীয়তাবাদীরা এই জটিল প্রপঞ্চের প্রায়শ সরলীকরণ করেছেন।

দুই

পাকিস্তানের অভিনবত্ব ছিল এর এলাকাগত অবস্থান, যা এযাবৎকালের জানা সব রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান ""জাতিত্বের প্রায় সকল মানদণ্ডকেই অস্বীকার করেছিল"।[২৪] এই নতুন রাষ্ট্রের দুই অংশ হাজার মাইলের ভারত দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ক্ষুদ্রতম পূর্বাঞ্চল (মাত্র ৫৪,০৯১ বর্গমাইল এলাকাসম্পন্ন) ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছয় গুণেরও বেশি।

যদিও এটা ছিল একটা 'দ্রুত উদ্ভাবিত' সর্বভারতীয় সমাধান[২৫], কতিপয় জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে এটা ছিল রাষ্ট্র নির্মাণের নব্য পরীক্ষানিরীক্ষা।[২৬] অন্য বহু জনের কাছেই এটা ছিল একটা অন্যায্য বিভাজন[২৭], ক্ষেত্রবিশেষে 'অস্বাভাবিক' বিভাজন। হয়তো অনেকেই এটাকে একটা উদ্ভট রাষ্ট্র ভেবেছিলেন।[২৮] এ ধরনের চিন্তাধারার পেছনে অসংখ্য কারণ ছিল। যেভাবে বৃটিশ ভারত এবং বিশেষত বঙ্গ প্রদেশ বিভক্ত হয়েছিল, তা ছিল অনেকের কাছেই অগ্রহণযোগ্য। কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান নেতা চেষ্টা করেছিলেন আর একটি তৃতীয় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে। এই পরিকল্পনাই পরে প্রস্তাবিত হয়েছিল বৃহৎ বঙ্গ নামে।[২৯] কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয়েছিল দলীয় বিরোধিতা দ্বারা এবং প্রতিযোগী ভারতীয় ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদীদের অনীহার কারণে।[৩০] বাংলাকে বিভক্ত করা হলো এবং কলকাতা ছাড়া পূর্ববঙ্গকে মনে হয়েছিল এক বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এক বৃহৎ দরিদ্র বস্তি।[৩১] এই বিভাজন সংঘটিত হলো বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাতের মধ্য

২৩. সাঈদ-উর-রহমান, *রাজনীতি ও কবিতা*।

২৪. Benedict O'Gorman Anderson, "A Time of Darkness and a Time of Light, Transposition in Early Indonesian Nationalist Thought" in Anthony Reid and David Marr (eds) *Perceptions of the Past in South-Asia* (Singapore 1979), 247.

২৫. Barbara Metcalf, "The Case of Pakistan," in Peter Herkel and Ninian Smart (eds.) *Religion and Nationalism in the Modern World* (New York,1983), 107

২৬. Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman* (Cambridge 1985), 293.

২৭. Kamruddin Ahmad, *The Social History of East Pakistan* (Dacca n.d.) , 89

২৮. Chaudhry Mohammad Ali, *The Emergence of Pakistan* (New York and London 1967), 203-221, Abul Mansur Ahmad, *Amar Dekha*, 257

২৯. Kamruddin Ahmad, *Social History*, 96.

৩০. Paul R. Greenough made this observation in his *Prosperity and Misery in Modem Bengal . The Famine of 1943-1944* (New York 1982), 8.

৩১. *Eastern Pakistan through Six Months of Independence*, East Bengal Government Press, from now on GOEB, 1948, 5, 29.

দিয়ে।[৩২] বিভাজন নাটকের একজন মূল নায়ক এ বিভাজনকে বর্ণনা করেছিলেন "ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক অপারেশন" হিসেবে।[৩৩] পাকিস্তানের জন্মলগ্ন অব্দি তার ভাবমূর্তি ছিল অস্বচ্ছ এবং অনিশ্চিত, সেই সাথে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের অভিমুখী।[৩৪]

ধর্মীয়, জাতিগত, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবেচনা এই নতুন রাষ্ট্রের নিয়ামক ছিল না, যার বিশেষ রাজনৈতিক ভূসংস্থান নির্ধারিত হয়েছিল বিদায়ী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং প্রতিযোগী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির স্বেচ্ছাচারী কার্যাবলী দ্বারা। জাইরিং যথার্থই মন্তব্য করেন যে, "জনগণের মধ্যকার ঐতিহ্যগত গতিশীলতাকে মন্থর ও সীমাবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সীমানাসমূহ টানা হয়েছে ।"[৩৫] কিছু মুসলিম লীগ নেতা অভিযোগ করেন যে, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রদেশকে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নদীপথসমূহকে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করা হয়েছে এবং একমাত্র কর্ণফুলী ছাড়া সকল বাঁধের এলাকাই পশ্চিম বাংলায় পড়েছে।[৩৬] বাউন্ডারি কমিশনের রোয়েদাদ সম্পর্কে বহু মুসলিম লীগ সদস্যের অভিমত এই যে, তা শিল্পায়নের বিকাশকে অনিশ্চিত করেছে।[৩৭] এ ছাড়া প্রদেশের এ ধরনের বিভাজন আসামের পার্বত্য ত্রিপুরা স্টেট এবং কাছাড় থেকে সিলেটের বহু থানায় চিরাচরিত নিয়মে চাল ও ধান সরবরাহ কঠিন করে তোলে।[৩৮] সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চলের কানাইঘাট, জয়ন্তিয়াপুর ও গোয়াইনঘাট থানাসহ জয়ন্তিয়া পরগনার জনগণ সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। আসামের সাথে তাদের স্বাভাবিক বাণিজ্যপথগুলি চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবার ফলে তাদের জীবনে দুঃখকষ্ট ও অভাব নেমে আসে।[৩৯]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট কলমের এক আঁচড়ের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশটির অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে যখন নানা সমস্যা "বিস্ময়কর গতিতে ভিড় করতে থাকে" এই ভূখণ্ডে, যেখানকার জনসংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ, যাদের মধ্যে ২৯,৪৮১,০০৯ জন মুসলমান, ১১,৭৩৬,০২৯ জন হিন্দু, ৫৬,৮৮২ জন খৃষ্টান এবং ১,১৭৯ জন শিখ। ঐ সময়ে মাইলপ্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৭৭৫ জন, যা ছিল বিশ্বে সর্বোচ্চ ঘনবসতি। কেবলমাত্র ৫০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং অসংখ্য আঁকাবাঁকা নদ-নদী ও খাল এই ভূখণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ তৈরি করেছিল।[৪০]

৩২. দ্রষ্টব্য, Metcalf, "Pakistan", 170.

৩৩. Mount Batten's Address to the Indian Constituent Assembly at New Delhi, 15 August 1947, taken from Ayesha Jalal, *Spokesman*, 293.

৩৪. Khalid B. Sayeed, *Pakistan : The Formative Phase* (Karachi 1960), 102.

৩৫. Lawrence Ziring, "The Failure of Democracy in Pakistan : East Pakistan and the Central Government 1947-1958", unpublished Ph.D. thesis, Columbia University, 1962, 10.

৩৬. EBLA, progs, Vol. 1, No. 3, 39.

৩৭. ঐ, Vol. 3, 143.

৩৮. Fishery Bundle, B-progs, Sept. 1953, Nos. 461-472.

৩৯. *The Dacca Gazzette*, 22 Nov., 1951, Parti, Dacca, 1225.

৪০. *East Pakistan Forges Ahead, Homes Political Bundle.*

পূর্ব বাংলা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল ভারতের ৪০০ সুতাকলের মধ্যে মাত্র ১০টি, ১০৬টি পাটকলের একটিও না, লোহা ও ইস্পাত কারখানা, কাগজ কল, রাসায়নিক শিল্প, কয়লা খনি কিংবা পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প একটিও না। কেবল ছিল ৪৯টি অস্থায়ী (ঋতুভিত্তিক) পাটের গাঁইট বাঁধার কারখানা (সমগ্র দেশের এতদসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ২০ শতাংশ মাত্র), ৫৮টি ক্ষুদ্র চাউলকল, ৩টি চিনির কল ও ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী।[৪১]

এতদ্‌সত্ত্বেও সমসাময়িক সরকারি বিবরণীতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব সম্পর্কে একটি আশাবাদী চিত্র তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতার পরপরই প্রকাশিত একটি সরকারি দলিলে উল্লেখ করা হয় যে "এসব উপেক্ষিত অঞ্চলের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা সংক্রান্ত আশা, যা নিয়ে নতুন রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করে, তা কোন মূল্যহীন বিশ্বাস নয়" এবং ঐ দলিলে চা, তামাক, চামড়া, কাগজ ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, এতে জনগণের আস্থা ও মনোবল অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, দশকের পর দশক ধরে পাট উৎপাদনকারী এই প্রদেশটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল "কলকাতার সমৃদ্ধির পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে"।[৪২]

পূর্ব বাংলায় কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও ঘাটতি ছিল, যেমন ভোজ্যতেল, চিনি এবং বস্ত্র। এখানকার ৪টি চিনির কলে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২৫,০০০ টন, যা প্রয়োজনের অর্ধেক।[৪৩] পূর্ব বাংলার ভাগে পড়ে অবিভক্ত বাংলার মোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাত্র ১২ শতাংশ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০০।[৪৪]

স্বাধীনতার সময়কালকে সরকারি প্রতিবেদনসমূহে সাধারণত "সমস্যা জর্জরিত" অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যেই বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় যখন চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ও পাঁচ লক্ষের অধিক জনগোষ্ঠী প্রবল বন্যায় আক্রান্ত হয়।[৪৫] শত শত ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়, অসংখ্য গবাদি পশু ভেসে যায় বন্যার পানিতে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শস্যসম্পদ।ফলে নতুন দেশে সৃষ্টি হয় খাদ্য সংকটের সমস্যা। বন্যার পানি নেমে না যেতেই 'নজিরবিহীন এক ঘূর্ণিঝড়' পূর্ববঙ্গের সর্বদক্ষিণের অঞ্চল কক্সবাজারের উপর দিয়ে বয়ে যায়, যাতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বার্ষিক পলিজ বৃদ্ধি ছাড়াও নদীসমূহে অব্যাহত ক্ষয়প্রক্রিয়ার কারণে পূর্ব বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।[৪৬]

৪১. Nafis Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan* (London 1958).
৪২. *Eastern Pakistan*, 30-32.
৪৩. East Bengal Province, Home Police, B-progs, June, 1951, No. 102.
৪৪. ঐ, ৬।
৪৫. দ্রষ্টব্য, *Eastern Pakistan*, East Pakistan Forges Ahead, GOEB.
৪৬. Abdur Razzaq, *Bangladesh : State of the Nation* (Dhaka 1981), 7.

তবে দেশের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠে খাদ্যসংকট। ৭.৮ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদনকারী এবং ৮ মিলিয়ন টন ধানের চাহিদাসম্পন্ন এই অঞ্চল দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন হলো, অথচ তখনো জনগণের স্মৃতি থেকে ১৯৪৩-এর ভয়াল দুর্ভিক্ষের ছবি মুছে যায়নি। বিভাজনের পর পূর্ববঙ্গ বরাদ্দ হিসেবে পায় মাত্র ১৮,০০০ টন ধান। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কোন মজুদ ময়দার অস্তিত্বই ছিল না এই প্রদেশে। এমনকি এই তারিখের চার মাস আগে থেকেই ঢাকায় কোন রুটির সংস্থান করা সম্ভব ছিলনা।[৪৭] তদানীন্তন ধানের মজুদ আর মাত্র দুই সপ্তাহ শহরের চাহিদা পূরনে সক্ষম ছিল, এবং তাও শহরের রেশনিং সিস্টেমের অধীন ছিল। প্রদেশের মোট ৩৯,০০০ টন খাদ্যের চাহিদায় ঘাটতি ছিল ৯,০০০ টন। যেহেতু সম্পূর্ণ পরিবহনব্যবস্থাই হিন্দু কর্মীরা দেশান্তরী হওয়ার ফলে অচল হয়ে পড়েছিল, তাই ঘাটতি এলাকাগুলি খাদ্য বিতরণকারী সংস্থার আয়ত্তের বাইরেই চলে যায়। অথচ একটি বাস্তব সত্য এই যে, সেই সময় খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয়ই প্রাদেশিক সরকারকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সচল রেখেছিল।[৪৮]

অবশ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, একটি দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার ও পশ্চিম বাংলার প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার খোলা চিঠিতে তা এভাবেই বিবৃত হয়েছে :

> 'খাদ্যের মূল্য মণপ্রতি ৩০ টাকা বেড়ে গেছে। রেশনিং চাল রয়েছে কেবলমাত্র ৬ লাখ লোকের জন্য। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানরা পাইকারি হারে অভুক্ত রয়েছে। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছে। পূর্ববঙ্গের বিশাল অঞ্চল সত্যিকার অর্থেই ভয়াল দুর্ভিক্ষের কবলে।[৪৯]

তিন

Greenough সমগ্র স্বাধীনতাপূর্ব সময়কে 'অনিয়ম' ও 'দুর্দশার কাল' বলে অভিহিত করেছেন।[৫০] প্রকৃত প্রস্তাবে খাদ্যঘাটতি, বন্যা এবং সরকার পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের কাছে স্বাধীনতা নতুন সূচনা না হয়ে নতুন সংকট হয়ে দাঁড়ালো।

যখন ঔপনিবেশিক শক্তি দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন জনগণের পরিবর্তে অনেকাংশে নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণই সরকারের শাসনভার গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ভারাক্রান্ত ও দুর্বহ হয়ে উঠেছিল অসংখ্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যার দ্বারা। এক সরকারি প্রতিবেদনের ভাষ্য

৪৭. *Estern Pakistan*, 3.

৪৮. Abdus Salam, "My Faith as an Editor". *Pakistan Day Supplement, Pakistan Observer*, 15 August 1966, as quoted in D N Banerjee, *East Pakistan, A Case Study in Muslim Politics* (Delhi, 1969), 46.

৪৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৫, ৯।

৫০. Greenough, *Prosperity*, 254.

অনুযায়ী, বিভাগীয় জটিলতা ও অস্পষ্টতার কারণে '১৫ আগস্ট' প্রাদেশিক রাজস্ব দপ্তরের তহবিল একদম শূন্য হয়ে পড়ায় একজন বিশেষ গুপ্তচরকে করাচীতে পাঠানো হয়েছিল ত্রাণসাহায্য চাওয়ার জন্য।'[৫১] কর্মকর্তার অভাব নিয়েও সমস্যা ছিল। কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রের সূচনা ছিল এই রকম :

> 'আগস্ট ১৪, ১৯৪৭। কলকাতার কাছাকাছি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে একটি ডাকোটা বিমান অনিচ্ছুকভাবে রওয়ানা দিল ঢাকার উদ্দেশে... বিমানটি ভূমি স্পর্শ করার পর দুই ডজন কর্মকর্তা তা থেকে নেমে এলেন। এঁরা ছিলেন পাকিস্তানে চলে আসতে ইচ্ছুক কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা, যাঁরা পূর্ব বাংলার কিছু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।...এ রকম একটি ঢাকাগামী ডাকোটা ফ্লাইটই যথেষ্ট ছিল ঐ পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী কর্মকর্তাদের অভাব পূরণের জন্য।'[৫২]

এমনকি কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গে সরকারি প্রশাসন প্রায় অস্তিত্বহীন এবং ভয়ানকভাবে অদক্ষ হয়ে পড়লো।[৫৩] ৯ মার্চ, ১৯৪৮-এর "Statesman" পত্রিকা এক সমালোচনায় লিখেছিল, "খুব স্বল্পসংখ্যক রাষ্ট্রই শূন্য তহবিল নিয়ে কাজ শুরু করে, যেমন পূর্ববঙ্গ কাজ শুরু করেছে, এর সাথে যোগ হয়েছে একটি ভেঙ্গে পড়া প্রশাসনযন্ত্র।"[৫৪] প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়ায় অসহায়ত্ব প্রতিভাত হয়েছে, কেননা তাদেরকে হঠাৎ নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকারের পদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এর চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন ছিল না :

> 'ঢাকা একটি ছোট্ট বিভাগীয় শহর...হঠাৎ করেই সেখানে কেবল প্রাদেশিক সরকার নয়, এর বিশাল কর্মচারীবাহিনী, আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম এবং এমনকি কতিপয় কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগের জন্য স্থান সংকুলানের প্রয়োজন হলো ... নতুন সরকার নিজের দেশেই ছিল পলায়নপর... সরকারি নির্দেশ কখনো ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় লিখিত হতো, তথ্যবিনিময় হতো ছেঁড়া সিগারেটের প্যাকেটে, টাইপরাইটার মাঝে মাঝে মিলতো, টেলিফোন ছিল এক দুর্লভ সামগ্রী...প্রশাসনের সুবিধাদায়ক যন্ত্র না হয়ে তা পরিণত হয়েছিল বিলাসসামগ্রীতে ...কর্মকর্তারা নিজেরাই প্রায়শ নিজেদের বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করতেন। আসবাবপত্র বলতে বস্তুত কিছুই ছিল না।[৫৫]

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জি ও সি) স্মরণ করেন, "স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই সেখানে কেবল দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক বাহিনী ছিল। এদের একটিতে ছিল তিনটি কোম্পানি, যাদের সৈনিক হওয়ার মত যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব ছিল। সদর দপ্তরে কোন টেবিল, চেয়ার, সাজসরঞ্জামাদি, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র কোন কিছুই ছিল না। কর্মকর্তারা চালাঘরে বাস করতো, মুষলধারে

---

৫১. *Eastern Pakistan*, 1.

৫২. *East Pakistan Forges Ahead*, Home Political Bundle, 1.

৫৩. Taya Zinkin, *Reporting India* (London, 1962), 40.

৫৪. *The Statesmen*, 9 March 1948, Calcutta.

৫৫. *East Pakistan Forges Ahead*, 3-4, Emphasis mine.

বৃষ্টি হলে তাতে ক্রমাগত পানি পড়তো, কখনো ত্রিপলঢাকা ছাদ উড়ে যেত।[৫৬] ১৯৪৭-এর আগস্টে ঢাকায় চাকুরিরত একজন সামরিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী : "১৯৪৭ সালের আগস্টে মনে হচ্ছিল, প্রদেশটি অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার কবলে পড়েছে।" তিনি আরো মন্তব্য করেন : "সেই অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ সাফল্যের জন্য যা পাওয়া গিয়েছিল, তাও ছিল তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল, এক কথায় একেবারেই অপর্যাপ্ত"।[৫৭]

পুলিশবাহিনী তাদের নিজেদের মূল্যায়নে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল। আইনের প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলা রক্ষা উভয় দায়িত্বই বৃটিশ আমলের মত তখনো পুলিশ বাহিনী পালন করতো। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ প্রশাসনের প্রতিবেদনে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল স্বাধীনতার প্রথম বছর সম্পর্কে বলেন, "এটি নজিরবিহীন প্রবল চাপ ও সংকটের বছর।" মজার ব্যাপার এই যে প্রারম্ভিক অনিশ্চয়তার এই সময়ে সরকারি প্রতিবেদনসমূহ সদয়ভাবে নতুন দেশকে অভিহিত করেছে 'শিশুরাষ্ট্র' বলে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য অবধারিতভাবে এক অনিশ্চয়তার জন্ম দিল, এবং এই পরিস্থিতিতে কখনো কখনো জনগণের উদ্যম ছিল অত্যন্ত প্রবল। কর্মকর্তাদের বিবেচনায় রাষ্ট্র ছিল সরকারি কার্যাবলীর সমষ্টিমাত্র। পক্ষান্তরে সরকার সম্পর্কে জনগণের ধ্যানধারণা ও প্রত্যাশা প্রায়শ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধাঁধায় ফেলে দিত। একদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং কাম্য ছিল জনগণের আনুগত্য, নতুন রাষ্ট্রের কাছে যাদের প্রত্যাশা মাঝে মাঝে ছিল একেবারে অবাস্তব। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল; কেননা রাষ্ট্রে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ছিল অগণতান্ত্রিক, দমনপন্থী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেরই অবদান।

চার

স্বাধীনতাপূর্ব দিনগুলিতে মুসলিম লীগ তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছিল এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক জাতীয় পরিচয় নির্মাণের উদ্দেশ্যে। ১৯৪০-এর ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতো মুসলিগ লীগ। কিন্তু তারা ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর সমালোচনা যেমন করেনি, তেমনি সম্ভাব্য রাষ্ট্রের চারিত্র্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্যও রাখে নি। মূলত এ রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল নেতিবাচকভাবে।[৫৮] পাকিস্তানবাদ হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশবাদবিরোধিতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধিতার নামান্তর।[৫৯] যে ইতিবাচক বক্তব্য লীগের ছিল তাকে বৃহৎ পরিসরে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কখনো উপমহাদেশের

৫৬. Muhammad Ayub Khan, *Friends not Masters : A Political Autobiography* (London, 1967), 22-23.

৫৭. Colonel Mohammad Ahmad, *My Chief* (Lahore 1960), 6-7.

৫৮. Humayun Kabir, *Muslim Politics, 1906-47 and Other Essays* (Calcutta 1969), 94

৫৯. দ্রষ্টব্য, Habibullah Bahar's speech in EBLA, progs, Vol. 1, No. 4, 26.

মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং সময় ও বৌদ্ধিক সম্পদের অভাবের দোহাই দিয়ে একে যুক্তিগ্রাহ্য করা হয়েছে।[৬০] তার ফলে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সব ধরনের আলোচনাকে এড়িয়ে গেছেন।

লীগের কিছু সদস্যের একমাত্র ভয় ছিল এই যে স্বাধীন অখণ্ড ভারতে হিন্দুরা প্রাধান্য বিস্তার করবে। অন্যরা আশা করেছিল যে অতীত ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শক্তির গৌরবের পুনর্জন্ম হবে। কিন্তু কোন পক্ষেরই পরিষ্কার ধারণা ছিল না কিভাবে রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে সংগঠিত করতে হবে।[৬১] আসলে তাদের চিন্তাভাবনা ছিল মূলত এলিটবাদী। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর লোকের স্বার্থকে সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হিসেবে দেখানো। এ ছিল তাদের আভিজাত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবে তারা ইসলামী ঐক্যের ধারণাটিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের গৌরবময় অতীতের কল্পলোকে স্থাপন করলেন।[৬২] বহু মুসলিম লীগ কর্মীর বক্তৃতা ও লেখায় এই উদ্দেশ্য সচেতনভাবে ক্রমাগত প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতার ঠিক ঊষালগ্নে পূর্ব পাকিস্তানের এক জেলায় জনৈক মুসলিম লীগ কর্মীর উচ্ছ্বাস ছিল, "মুসলিম ভারত তার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে যাচ্ছে।"[৬৩] অতীত কালের ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে লীগ চেষ্টা করতে লাগলো মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক প্রবণতাকে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত করতে।

একটি পৃথক রাষ্ট্র যখন প্রকৃত অর্থেই জন্ম নিল, তখন তা অনেকটা বৃটিশপ্রদত্ত উপহার হয়ে দাঁড়ালো। স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত *স্টেটস্‌ম্যান* পত্রিকায় একে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে জাতির অর্জনের পরিবর্তে বৃটিশের অমূল্য উপহার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার এই সম্মতিভিত্তিক পরিবর্তন পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম বয়ে নিয়ে এলো। বৃটিশ ভারতে যে পদ্ধতিতে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হতো সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে ১৫ আগস্টে জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল উপাধি ধারণ করলেন। তিনি গণপরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন এবং একই সাথে মুসলিম লীগের সভাপতির পদেও বহাল থাকলেন। যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগের একজন নেতা লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করলেন।

বাংলার বেশ কিছু স্বনামধন্য মুসলিম লীগ নেতা দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের পরিণামে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে উৎখাত হয়ে যান। অবিভক্ত বাংলার

---

৬০. Talukder Maniruzzaman, "National Integration and Political Development in Pakistan", *Asian Survey*, December 1967, Vol. 7, No. 12.

৬১. Keith Callard, "The Political Stability of Pakistan", *Pacific Affairs*, Vol. xxix, No. 1, 1956, 8

৬২. Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslim, 1871-1906* (Delhi 1981), xxii

৬৩. Speech by Manjurul Huq, Chairman, Reception Committee of Sub-divisional Muslim League Conference held on 4 May 1947, Umar (ed.), Delhi, 19

প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের সংসদীয় দল থেকে নেতৃত্বচ্যুত হয়ে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন ইতিমধ্যে অবনতিশীল বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য। যখন দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরকে স্বাধীনতাপরবর্তী বিজয়োৎসবের আনন্দ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তখন তিনি এক দরিদ্র মুসলমানের জীর্ণগৃহে অনশনরত গান্ধীজীর অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করছিলেন। ফজলুল হক, যিনি যুগ যুগ ধরে বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন, তিনি জিন্নাহর কূটকৌশলের দরুন বাংলার মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে কলকাতায় নিজের বাসভবনে পরাজয়ের মর্মবেদনা নিয়ে কালাতিপাত করছিলেন। মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম, যিনি মৃতপ্রায় এই সংগঠনটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা ও প্রাদেশিক কর্মসূচির ঘোষণাপত্র দিয়ে এর উদ্যমী তরুণ ছাত্র-সদস্যদের উজ্জীবিত করেছিলেন, তিনিও দেশবিভাগের সময়কার গোলযোগ ও বিভ্রান্তির শিকার হন। তিনি তখন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর সমস্ত কর্মোদ্যোগ নিয়োগ করেন। অবশ্য এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তিনি অবশেষে বর্ধমানে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আসামের মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানী, যিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে এসে বসবাসকারী মুসলমান কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আসামের জেলা সিলেটকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তিনিও দেখতে পেলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে নতুন মুসলিম লীগের দলীয় বিন্যাসে তাঁর কোন স্থান নেই এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আসাম সরকারের কারাগারে বন্দি হলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুর আহমদ বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর কলকাতায় থেকে যান। আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক প্রমুখ ঢাকাভিত্তিক বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা তখন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নতুন কেন্দ্র ঢাকার নবাববাড়ী 'আহসান মঞ্জিল' থেকে তাঁদের দূরত্ব পরিমাপ করে চলেছেন।[৬৪] তাঁদের প্রত্যেকেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিরোধী দলীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মওলানা আকরাম খাঁ যথাক্রমে প্রাদেশিক সরকার ও মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। মূলত মুসলিম লীগ তিনটি কেন্দ্রের কাছে বাঁধা পড়ে। এগুলো হচ্ছে নেতৃত্বের জন্য আহসান মঞ্জিল, প্রচারের জন্য দৈনিক আজাদ, অর্থের জন্য ইস্পাহানির বাণিজ্যিক সংস্থা।[৬৫] সংক্ষেপে এই ছিল তদানীন্তন মুসলিম লীগের

৬৪. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ২য় খণ্ড, ১৯৭৫, ৯০। ব্যানার্জী বঙ্গবিভাগের দরুণ বাঙালি মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের হতভম্ব দশার বিবরণ দিয়েছেন অতিরঞ্জিতভাবে। সম্ভবত তাদের কিছু অংশের বেলায় একথা আংশিকভাবে সত্য ছিল। দেখুন, D N Banerjee, *East Pakistan* (Delhi 1969), 45.

৬৫. ঐ, 21.

স্বরূপ। ভারতের মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বৃটিশ রাজ এই সংগঠনের কাছেই তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

পাঁচ

মার্ক্সীয় ধারার লেখাও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন করতো এবং মুসলিম লীগের স্বজাতির প্রতিনিধিত্ব করার দাবিকেও স্বীকার করতো।[৬৬] কিন্তু পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই কমিউনিস্টদের মোহমুক্তি ঘটে। জাতীয়তাবাদীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে এবং পরিণামে তাদের যাত্রাপথ ভিন্ন হয়ে যায়। তারা কেবল পৃথক পথ বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে পরস্পরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এ পর্যায়ে কমিউনিস্টদের উচ্চকিত শ্লোগানে বলা হয়, 'এ স্বাধীনতা মিথ্যা'। পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় প্রাথমিক মুহূর্তগুলির তিক্ততার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

এমনকি বেশ কয় বছর পর কেউ কেউ স্বাধীনতার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে একে তুলনা করেছে "সাদা হাতীর কালো মাহুত" অথবা "নতুন বোতলে পুরনো মদ"-এর সঙ্গে।[৬৭] স্বাধীনতার মোহভঙ্গ আমূল সংস্কারকামীদের কাছে এত গভীরপ্রসারী হয়েছিল যে, তারা একে অন্ধ যুগের আবির্ভাবের সাথে তুলনা করেছেন।[৬৮] প্রায় দুই যুগ পরে ১৯৭১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খুলনা শাখার প্রাক্তন সদস্য ধনঞ্জয় দাস ১৯৪৭ সালের আগস্টে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশ নিয়েছিলেন বলে খেদ প্রকাশ করেছেন।[৬৯] সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বরিশালের এক মুসলমান কমিউনিস্টের আত্মজীবনীতে বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভে তার অনুভূতির কথা কিছুই লেখা হয় নি।[৭০] বহু সংস্কারবাদীর কাছেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ আর কিছুই নয়, শাসনকাঠামোর বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন এবং বৃটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমন্বিত যোগসাজশের ফলশ্রুতি মাত্র। যেমন একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট বিদ্রূপের সাথে লিখেছেন : "কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, বৃটিশ পুলিশের স্থলে ক্যাম্প স্থাপন করেছে পাকিস্তানী পুলিশ।"[৭১]

৬৬. P C Joshi, "They Must Meet Again". Bombay, Sept. 1944, 7, as cited by Shri Prakash in "CPI and the Pakistan Movement", in Bipin Chandra (ed.) *The Indian Left* (Delhi 1983)

৬৭. আবদুস শহীদ, *আত্মকথা,* ১ম খণ্ড (ঢাকা ১৯৮৪), ১৪৬। আরও দেখুন, আবদুল মতিন, *মওলানা হামিদ খান ভাসানী প্রসঙ্গে* সংকলিত শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম* (ঢাকা ১৯৭৮), ১৪৭।

৬৮. সরদার ফজলুল করিম, *নানা কথার পরের কথা,* ঢাকা, ৫।

৬৯. ধনঞ্জয় দাস, আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাংলাদেশ, (কলকাতা ১৯৭১), ১৩।

৭০. আবদুস শহীদ, *আত্মকথা,* ১ম খণ্ড (ঢাকা ১৯৮৪), ১৪৮।

৭১. নুকুল মল্লিক, *আমার জীবন ও ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন* (ঢাকা ১৯৮০), ৩৪।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপর এক সক্রিয় কর্মী পাকিস্তানের প্রতি বাঙালি মুসলমানের সমর্থনকে সনাক্ত করেছেন এইভাবে : "পাকিস্তান দাবির প্রতি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জোরালো ও সক্রিয় সমর্থন রয়েছে।" সেই সাথে তিনি যুক্ত করেছেন : "যদিও এ দাবি ভুল ছিল কিংবা এতে সচেতনতার অভাব ছিল, তথাপি পূর্ব বাংলার খেটে খাওয়া মুসলমান জনগোষ্ঠী পাকিস্তানকে তাদের নিজস্ব ভূমি হিসেবেই গ্রহণ করেছে।"[৭২] পাকিস্তান সম্পর্কে কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রবণতা হচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গণসচেতনতাকে 'ভ্রান্ত হলেও সত্য' বলে মেনে নেয়া।

পূর্ব বাংলার সমাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সংগঠিত ছিল। তাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যাশাও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। প্রথমেই ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি লাহিড়ীর প্রতিক্রিয়া দিয়ে শুরু করা যাক :

> বলা যায়, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট অনেকটা ফাঁদে পড়েই মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের সাথে সম্মিলিতভাবে (পাকিস্তানী) পতাকা উত্তোলনে বাধ্য হলেন। মনে হয়, এই সংস্থাকে কেবল অপমানিত করার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল, যে সংস্থার অবিচল দাবি ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা... এতে বাঙালি বিপ্লবীদের পক্ষে আনন্দিত হওয়া ছিল কঠিন ব্যাপার।[৭৩]

পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে এক আকস্মিক পরাজয়, হতাশা ও বিশ্বাসভঙ্গের অনুভূতি পূর্ববঙ্গের উচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দু গোষ্ঠীর মনকে ভারাক্রান্ত করলো। একজন হিন্দু নেতা তাঁর মোহভঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : হিন্দুরা কখনো পাকিস্তান চায়নি। পাকিস্তানকে তাদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।[৭৪] ঢাকার একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট কর্মী জ্ঞান চক্রবর্তী উল্লেখ করেন যে, হিন্দুদের কাছে গোড়া থেকেই পাকিস্তান অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই বিপুল সংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, এই সম্প্রদায়ের প্রায় সকল সরকারি কর্মচারীই সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে।[৭৫] কিছু স্থানে হিন্দু পেশাজীবীদের প্রতিক্রিয়া এত বেশি তিক্ত ছিল যে, দেশত্যাগের পূর্বে তাঁরা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর পর্যন্ত করেছিল। অজয় ভট্টাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী, সিলেট হাসপাতালের হিন্দু কর্মচারীরা হাসপাতালের সম্পদ ভাঙচুরের পর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়।[৭৬] খবর পাওয়া যায় যে মুন্সিগঞ্জ সাব-জেলের

---

৭২. অমল সেন, *নড়াইলের তেভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা* (ঢাকা ১৯৮০), ৩৪।

৭৩. Lahiry, *India Partitioned*, 2-3.

৭৪. Letter from S. Bhattacharya, President Hindu Sevak Sangha, Sylhet, on 7 October, 1947, Home Political Bundle, Dhaka.

৭৫. জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জিলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ* (ঢাকা ১৯৭২), ১৩১, আরও দেখুন, সত্যেন সেন, *মনোরমা মাসামা* (ঢাকা ১৯৭০), ১২৭।

৭৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা) ১৪৭।

হিন্দু কেরানী ও বন্দিরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বরাদ্দ 'বাড়তি রেশন'-এর কোটা বর্জন করে।[৭৭] সমাজের 'নেতৃস্থানীয় শ্রেণী'[৭৮] উচ্চতর বর্ণের হিন্দুরা রাতারাতি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালো এবং বঙ্গবিভাগ তথা ১৯৪৭ সালের ভয়ানক দিনগুলোর মর্মান্তিক অনুভূতিসঞ্জাত হতাশা, তিক্ততা ও মোহভঙ্গ এক লক্ষণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করলো, সে ইতিহাস যদিও এই নিবন্ধের আওতার বাইরে।[৭৯]

লাহিড়ীর অভিমানসূচক অভিব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যর্থতাবোধ, যা পূর্ব বাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংখ্যক হিন্দুর মনে জাগ্রত হয়েছিল। এমনকি হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের নির্যাতিত শ্রেণী সাংবিধানিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে তাদের ভাগ্যকে বাংলার মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।[৮০]

তবু পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ধারার সাম্যবাদী রাজনীতিতে যুক্ত বহু হিন্দু এখানেই থেকে যাওয়ার এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে অবদান রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এঁদের অন্যতম ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী লিখেছেন :

> আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি দেশত্যাগ করবো না, আমি পাকিস্তানেই থেকে যাব। পাকিস্তানের জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে এখানেই আমি থেকে যাব। এই দেশ পূর্ব বাংলা আমার দেশ ... কেন আমি এই দেশ ত্যাগ করবো ?[৮১]

তাঁর মতো মনোভাবসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিউনিস্টও এদেশে থেকে যান পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারসমূহে দীর্ঘ বছরগুলোর দুর্ভোগপূর্ণ বন্দিত্ব বরণ করে নেয়ার জন্য।

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহেও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত গারোরা মনে করে যে নতুন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। অতএব, একমাস শেষ না হতেই ময়মনসিংহের পার্শ্ববর্তী এলাকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর একটি স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর

৭৭. Jail Bundle, B-progs, February, 1956, Nos 1-18.

৭৮. ঢাকায় হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৯% এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ঢাকার ধন-সম্পদের ৮৫%-এর মালিক। দেখুন, Jayanta Kumar Ray, *Democracy and Nationalism on Trial*, 35; EBLA progs, vol. 1, no. 4, 15; Sugata Bose, *Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics 1920-47* (London, 1986) 230.

৭৯. হিন্দু রাজনীতির এই দিক সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, Muhammad Golam Kabir, *Minority Politics in Bangladesh* (Delhi 1980).

৮০. ঐ, Jogen Mondol's letter of Resignation, Appendix v.

৮১. শ্রী ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), *জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ময়মনসিংহ ১৯৬৮), ৩৬১।

কাছে পেশ করা হয়।[৮২] এই স্মারকলিপি উত্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালের ২৪ আগস্ট উত্তর ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের রাংরাপাড়ায় আয়োজিত উপজাতীয়দের সমাবেশে। সেখানে উপস্থিত প্রায় ৪০০০ লোক তাদের বসতি অঞ্চলের একত্রীকরণ দাবি করে। এর মধ্যে ছিল ময়মনসিংহের অধীন ৫টি থানা এবং ঐ এলাকা সন্নিহিত ভারতের আসাম প্রদেশ।[৮৩] বৃটিশ রাজ কর্তৃক গৃহীত জাতিভিত্তিক নতুন রাষ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার দাবি জানানোর সুযোগ করে দিল। বৃটিশরাজের এই দেশবিভক্তি গারো সম্প্রদায়ের উপজাতীয় নেতা ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করলো উপজাতি সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করে এই দাবি জানাতে। সমতলের গারোরা যে কারণে অস্থিরতার শিকার হয় তা এই যে স্বেচ্ছাচারী রেডক্লিফ রোয়েদাদ মোতাবেক জোরপূর্বক দেশবিভাগের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে পাহাড়ী গারোরা ভারতীয় ভূখণ্ডের আওতাভুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে দেশবিভাগের দ্বারা গারোদের দু'টি অংশের ঐতিহাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, অথচ এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোন আলোচনাই করা হয়নি। স্বাধীনতার সময়ে উপজাতীয়দের আশা ও ভীতি যে বিতর্কিত বিষয়গুলির জন্ম দিয়েছিল, তা আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।

ছয়

স্বাধীনতার বড় বড় বুলির প্রকৃত অর্থ ভিন্নতর হয়ে যায় যখন আমরা স্বাধীনতাদিবসে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করি। তাজউদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেন : "যখন রাত নেমে এলো এবং আনন্দোৎসব শেষ হলো, তখনো ঢাকার রাজপথে বহুলোক রয়ে গেল, যাদের অধিকাংশই বিজয়োৎসবে অংশ নেয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গ্রামগুলি থেকে ঢাকায় এসেছিল।"[৮৪] রাজশাহী থেকে লাহিড়ী লিখেছেন : "দিনের আলো বাড়ার সাথে সাথে শত শত, হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ শহরে প্রবেশ করতে লাগলো।"[৮৫] সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান মিলে প্রায় ১ লক্ষ লোক ঢাকায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য উপস্থিত হয়। তাজউদ্দীন ১৫ আগস্ট লক্ষ্য করেন, অধিকাংশ লোকই জেলার বাইরের গ্রামবাসী। তারা এসেছিল সুদূর কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ থেকে 'পাকিস্তান'-এর বাস্তব

৮২. Home Political Bundle, B-progs, October, 1950, No. 516.

৮৩. গারো সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, Pierre Bassaignet, "Tribes of the Northern Border of East Pakistan" in Bassaignet (ed.) *Social Research in East Pakistan* (Dacca 1960), 150-52; আরো দেখুন, গৌতম ভদ্র, *'পাগলাই ধূম': ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ, শারদীয় অনুষ্টুপ* (কলিকাতা ১৯৮৬)।

৮৪. *ডায়েরী, দলিল*।

৮৫. Lahiry, *India Partitioned,* 1.

রূপায়ণ দেখার জন্য। তাদের অবস্থান গ্রামে, যেখানে ভৌগোলিক গতিশীলতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।[৮৬] শুধুমাত্র মুক্তির অনুভূতিই তাদের টেনে এনেছিল ঢাকায়, নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই রাতে ঢাকার পথে 'আগত জনগণ' সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নিয়েছে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ছাড়াই। সারাদেশেই তাদের সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ মৈত্রী ছিল অন্তত বাহ্যিকভাবে সুস্পষ্ট।

ঢাকায় তাজউদ্দীন ও লাহিড়ী উভয়েই বিচলিত হয়েছিলেন জনগণের অত্যধিক উচ্ছ্বাসের প্রকৃতি লক্ষ্য করে। তাজউদ্দীন নেতাদের বক্তৃতা শুনার জন্য আগত জনগণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। "তারা এসেছিল নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনতে এবং কোথাও আসন গ্রহণ না করে তারা ভিড় করছিল।"[৮৭] লাহিড়ী জানান যে এদের কেউ ট্রেনে টিকিট করার প্রয়োজন বোধ করেনি।[৮৮] তাজউদ্দীন আরো লক্ষ্য করেন যে যারা ঢাকায় এসেছিল 'তাদেরকে ট্রেনের ভাড়া দিতে হয়নি।' এসব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

এছাড়া আরো বহু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৪৭-এর ১১ সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জ সাব-জেল থেকে ৮৩ জন বন্দি পালিয়ে যায়। এরা সকলেই স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিলাভ করবে বলে আশা করেছিল।[৮৯] স্বাধীনতা অর্জনকে আরো কতিপয় বন্দি মুক্তিলাভের এবং পরবর্তীতে আত্মউন্নয়নের সুযোগ বলে মনে করেছিল। ১৯৪৭-এর ১৪ সেপ্টেম্বর আজাদ পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় :

> ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রায় সব বন্দিই এই মুহূর্তে অনশন ধর্মঘট পালন করছে। এই বন্দিরা স্বাধীনতা উপলক্ষে মুক্তি প্রার্থনা করেছিল। তারা কায়েদ-ই-আজম এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে মুক্তির জন্য আবেদন জানায় যাতে তাদের নিজেদের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ তারা পায়।[৯০]

স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল বৃটিশ শাসন সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির উপলক্ষ হিসাবে। জেলা পর্যায়ের একজন মুসলিম লীগ কর্মী আতাউর রহমান খানকে একজন প্রবীণ গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখন যখন পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে, এরপরও কি দেশে পুলিশ, কোর্ট-কাছারি, সৈন্য-সেন্ট্রি, জেল এবং লকআপের অস্তিত্ব থাকবে ?" খান উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন নয় ? এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করবেন কিভাবে ?" হতভম্ব সেই বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, "তাহলে কোন ধরনের পাকিস্তান আমরা পেলাম ? দয়া করে এর নামটি পাল্টে ফেলুন। আপনারা এর নাম দেবেন পাকিস্তান অথচ অনাচার আর দুর্নীতিকেও প্রশ্রয় দেবেন!"[৯১]

৮৬. ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে কেবল ৯৯ জন শহরের বাসিন্দা ছিল। দেখুন, Nafis Ahmad, *Statesman*, 15 August 1947, Supplement, Calcutta.
৮৭. *ডায়েরী, দলিল*।
৮৮. Lahiry, *India Partitioned*, 1.
৮৯. Jail Bundle, B-progs, February 1956, Nos. 1-18.
৯০. *আজাদ*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, কলকাতা।
৯১. আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর* (ঢাকা ১৯৪৭), ৪৫।

উক্ত বৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে, বিশেষকরে পুলিশ এবং আদালতকে স্বাধীনতার মূল্যবোধের অন্তরায় বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার পেছনে বহু যৌক্তিক কারণও ছিল। পালিত লিখেছেন, "নালিশ, সওয়াল-জবাব ও সাক্ষ্য প্রদানের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিই বস্তুত" ছিল গরিবের জন্য বর্জনীয়, এর কারণ খরচ, বিলম্ব, হয়রানি ও লিখিত দরখাস্ত পেশ করার আনুষ্ঠানিকতা।[৯২] ময়মনসিংহের উপজাতীয় কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেন যে কৃষকরা প্রায়শ আদালতের মামলার মাধ্যমে তাদের জমি হারাতো।[৯৩] কিন্তু সমস্যা শুধু উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মুসলমান কৃষকরাও জমি সংক্রান্ত মামলায় প্রচুর অর্থ খোয়ায়।[৯৪] এই শতকের প্রথম দশকে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পানান্দীকর লক্ষ্য করেন যে, কৃষিকাজে লাভের একটি বড় অংশ "মামলা-মোকদ্দমায় নষ্ট হয়।"[৯৫] স্বাধীনতার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাঈমুদ্দিন আহমেদ ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করেন যে, ঔপনিবেশিক আদালতের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষকরা রাস্তার ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।[৯৬] এমনকি ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন এই মর্মে মন্তব্য করে যে, আদালতে মামলা-মোকদ্দমার কারণে অনেক ভাগচাষী তাদের জমি হারিয়েছে।[৯৭] আইন-আদালতের উপর অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণের খুব কমই আস্থা ছিল। ৩০-এর দশকের প্রথম দিকের মালদহের উপজাতি বিদ্রোহের নেতা জিতু সাঁওতাল মন্তব্য করেছিলেন, "ইংরেজ রাজ" ছিল "নিপীড়নকারী", কারণ "সরকারি আদালতে বিচার পাওয়া যায় না।"[৯৮]

বিচার বিভাগের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান পুলিশ বিভাগ ছিল সমভাবে ভীতিপ্রদ। ইসলাম লিখেছেন, "জনগণ (ঢাকা জেলার বদরপুরের) ছিল পুলিশের ভয়ে ভয়ংকরভাবে ভীত।" স্বাধীনতার আগে লাল পাগড়ী দেখে (ইংরেজ আমলে পুলিশ লাল পাগড়ী পরতো) জনগণ নিকটবর্তী ধানক্ষেত কিংবা ঝোপের আড়ালে পালাতো।[৯৯] পূর্ববঙ্গ পুলিশ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, "স্বাধীনতার পূর্ববর্তী প্রায় অর্ধশতকে কখনোই পুলিশ জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে নি।[১০০] পুলিশ হচ্ছে ন্যূনতম বেতনভোগী চরম

৯২. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society* (Calcutta 1975), 81.

৯৩. Jnanbrata Bhattacharyya, "An Examination of Leadership Entry in Bengal Peasant Revolts, 1937-1947", *Journal of Asian Studies*, August, 1978, Vol xxxvii, No. 4, 626.

৯৪. উমর, *দলিল*, ৭৭।

৯৫. S G Panandikar, *The Wealth and Welfare of the Bengal Delta* (Calcutta 1926), 150.

৯৬. শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাইমুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগা জনসাধারণ* (ঢাকা ১৯৪৮),২।

৯৭. R K Mukherjee, *Dynamics of a Rural Society* (Berlin 1957), 30.

৯৮. Tanika Sarkar, "Jitu Santal's Movement in Malda, 1924-1932: A Study in Tribal Protest' in Ranajit Guha (ed.) *Subaltarn Studies*, Vol. iv (Delhi 1985), 159.

৯৯. A K M Aminul Islam, *Bangladesh Village Conflict and Cohesion* (Cambridge, Massachusetts 1974), 104.

১০০. Report of the East Bengal Police Committee, 1953, East Bengal Government Press, Dhaka, 1954, 5.

দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিষ্ঠুর, সকলের অপ্রিয় হিসেবে পরিচিত এবং ইংরেজ আমলের দমন-পীড়নের মূর্তিমান প্রতীক হিসাবে স্মরিত।[১০১] পূর্বোল্লেখিত কৃষকের রাজনৈতিক প্রত্যাশা ছিল এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি।

সাধারণ মুসলমান কৃষকের আদর্শিক ভাবনায় পাকিস্তান স্থান পেয়েছে একটি নতুন নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি হিসেবে, যেখানে পারস্পরিক অধিকারের এবং বিচারের নৈতিকতা সামাজিক জীবনের উপর কর্তৃত্ব করবে। সামাজিক উচ্চ শ্রেণী এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সদস্যদের দ্বারা যুগ যুগ ধরে অবদমিত হওয়ার ফলে তারা 'পাকিস্তান' নামটিকে একটি পবিত্র অনুভূতির মধ্যে স্থাপন করেছিল। একজন জনপ্রিয় কবি তাঁর কবিতায় পাকিস্তানের মাটিতে মিথ্যাচার ও অনাচার পরিত্যাগ করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান।"[১০২]

ঐতিহ্যগতভাবে মুসলমান কৃষকগণ যে সুপরিচিত দমন-পীড়নের শিকার হতো, তা ছিল শ্রেণীগত এবং জাতিগত বা ধর্মীয় উভয়ই। মহাজন এবং জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ১৯৪৭ সালে বাংলায় ২২৩৭টি বড় জমিদারির মধ্যে ৩৫৮টি ছিল মুসলমান জমিদারি।[১০৩] মহাজনদের অধিকাংশই জাতিতে ছিলেন বণিক ও তেলি, যারা খাতক মুসলমান জনগোষ্ঠীর নিপীড়নকারী বলে গণ্য হতেন। এরা ছিলেন ঋণ গ্রহণকারী মোট কৃষকগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশ।[১০৪] সুদের হার ছিল কম-বেশি ১২ থেকে ২৮০ শতাংশ, কখনো কখনো তারও বেশি।[১০৫] এই শতকের প্রথম দিকে কৃষকগোষ্ঠীর ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল নিম্নে পানান্দীকর প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি হিসাব করেছেন যে, ৩৯১৮৯৪ পরিবারের মধ্যে ১৮৫,৮৬৯টি পরিবার ঋণী ছিল এবং মোট ঋণের পরিমাণ $৪\frac{১}{৩}$ লক্ষ টাকা। অনুমান করা হয়, ফরিদপুর জেলায় মোট ঋণ ছিল ২৩০ লক্ষ টাকা, যা মাথাপিছু ১১ টাকা কিংবা মোটামুটিভাবে সমগ্র পরিবারের বার্ষিক আয়ের এক-পঞ্চমাংশ।[১০৬] ১৯৩৭ সালে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯ কোটি টাকা; সালিশী বোর্ডের নিকট মামলা দায়ের করা হয় ৪ লক্ষ।[১০৭] এর বাইরে ছিল জমিদার ও তার লোকদের 'আবওয়াবের' মাধ্যমে জোরপূর্বক অর্থসম্পদ আহরণ। প্রদত্ত খাজনার বাইরে

১০১. Tanika Sarkar, "National Movement and Popular Protest in Bengal, 1928-1934", Unpublished Ph.D. Thesis, Delhi University, 1980, 8.
১০২. কাজী আবুল হোসেন, *জিন্নাহনামা* (ঢাকা ১৯৬১) (পরিবর্ধিত সংস্করণ), ৯০।
১০৩. D N Wilber, Pakistan : Its People, Its Society, Its Culture (New Haven 1964), 219.
১০৪. কে. এম শমসের আলী, *প্রশাসনিক সংস্কারে সরকারী কর্মচারির ভূমিকা;* নিলুফার বেগম সম্পাদিত, *স্মৃতিচারণ প্রবীণ প্রশাসকের অভিজ্ঞতা,* (ঢাকা ১৯৮৪), ৭৯।
১০৫. দেখুন, Hashmi, Thesis, 40.
১০৬. দেখুন, Panandikar, *The Wealth and Welfare,* 181
১০৭. EBLA, progs. Vol. 1, No. 3, 34.

কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় খরচ এবং জমিদারের নিযুক্ত প্রতিনিধিদের খরচ উঠাতে যে অর্থ আদায় করা হতো সেটাই আবওয়াব। তা ছাড়াও বিশেষ আবওয়াব, যেমন খালবান্দি (বাঁধ খরচ), দাখিলা খরচ (খাজনা আদায় খরচ), পোল খরচ (সেতু তৈরি), ডাক খরচ, ভান্ডারী খরচ (হাট-বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, সাদিয়ানা (জমিদারবাড়ির বিবাহ খরচ) এবং সর্বশেষ বেগার খরচ (মজুরিবিহীন শ্রম) আদায় করা হতো। ব্যক্তিগতভাবে পালকি ব্যবহারের অনুমতিলাভের জন্য ১০ থেকে ২৫ টাকা এবং ছাতা ব্যবহার, হাতিতে চড়া কিংবা পুকুর খনন করতে ২০ থেকে ৪০ টাকা খাজনা প্রদান করতে হতো।[১০৮] কোন কোন জেলায়, যেমন বরিশালে, আবওয়াব ছিল মূল খাজনার এক-চতুর্থাংশ কিংবা তারো বেশি।[১০৯]

মুসলমান কৃষকদের সর্বপ্রকার সামন্তবাদী বৈষম্যমূলক নিপীড়ন সহ্য করতে হতো। অবৈধভাবে উচ্ছেদ, আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড এবং জমিদারের লোকজন কর্তৃক ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা এসবেরই শিকার হতো তারা, যখন তারা খাজনা দিতে দেরি করতো অথবা জমিদারের আদেশ-নির্দেশ পালনে অস্বীকার করতো কিংবা বিদ্রোহ করতো। ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, বদরপুরে আইন অমান্যের জন্য সাধারণ কৃষককে বেত কিংবা জুতো দিয়ে পিটানো হতো, পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থাসম্পন্ন কৃষককে কেবল জরিমানা করা হতো।[১১০] নড়াইল মহকুমার জগপুর গ্রামের মুসলমান কৃষকগণ হিন্দু জমিদার দ্বারা কী ধরনের বৈষম্যমূলক কঠোর সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতো সে বিষয়ে সিদ্দিকী বর্ণনা করেছেন :

> "সমগ্র গ্রামের জমির মালিক সাতজন জ্বাতিদারের (জোতদার) মধ্যে একজন মাত্র ছিলেন মুসলমান (এবং সেও একজন ক্ষুদ্র জ্বাতিদার)... অধিকাংশ মুসলমান ছিল হিন্দু মালিকদের জমির ভাগচাষী এবং দিনমজুর। এর সাথে হিন্দুত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যা (মুসলমানরা নীচ শ্রেণীর হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত) মুসলমান এবং দিনমজুর এই উভয় শ্রেণীকে আরও হীন করেছিল এবং গাঁয়ের মুসলমান প্রজাদের বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যমূলক নিপীড়নের শিকারে পরিণত করেছিল; তাদের 'ছোটলোক' (নীচ শ্রেণীর মানুষ) বলে প্রকাশ্যে সম্বোধন করা হতো; ... যদি কোন মুসলমান কোন ব্রাহ্মণের বাড়ি অতিক্রম করতো, তাহলে ঐ অপবিত্র স্থানটি পানি ও গোবর ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হতো।

সিদ্দিকী আরো উল্লেখ করেছেন যে, একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী ১৯৪০ সালের একটি ঘটনা এখনো মনে রেখেছেন, যে ঘটনায় একজন মুসলমান বালক হিন্দু জ্বাতিদারের আম বাগানে প্রবেশ করার কারণে জ্বাতিদার কর্তৃক প্রহৃত হয়।[১১১] বস্তুত সব শ্রেণীর কৃষকরাই মাটিতে মাদুর অথবা বেঞ্চের উপর বসতো, এমনকি অনেক জমিদার তার কাছারির

১০৮. Panandikar, *The Wealth and Welfare*, 102.

১০৯. Hashmi, Thesis, 31.

১১০. Aminul Islam, *Bangladesh Village*, 99.

১১১. Kamal Siddiqui, *The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh* (Dhaka 1983), 257

(জমিদারি অফিস) পাশ দিয়ে জুতো পরে যাতায়াত করতে কিংবা জমিদারির মধ্যে ঘোড়া বা হাতিতে চড়তে অনুমতি দিতেন না। কোন কোন জমিদার আবার জমিদারির প্রজাদের কুয়া, পুকুর কিংবা পাকা বাড়ি তৈরির অনুমতি দিতেন না। হিন্দু জমিদার প্রায়শ মুসলমান প্রজাকে গরু জবাই করতে দিতেন না।[১১২] প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা আবুল মনসুর আহমদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা সচ্ছল অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁরাও ছোটবেলায় হিন্দু জমিদার ও বর্ণ হিন্দুদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমন কিছু তিক্ত সামাজিক বৈষম্যের কথা তাঁরা তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে মুসলমান প্রজাদের উপর সামাজিক নিপীড়নের মাত্রাটি কেবল অনুভব করা যায়।[১১৩] ইসলাম এবং সিদ্দিকী উভয়েই উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, এইসব ঘটনাই গ্রামীণ পূর্ববঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির পথ সুগম করেছিল।

অতীতের স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে বলে বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'পাকিস্তান'-এর ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এই বিশ্বাসের প্রবক্তারা বেশ্যালয়, মদ ও জুয়ার অবলুপ্তি সাধনের আহ্বান জানাতেন এবং এজন্য ইসলামী বিধান কার্যকর করতে চাইতেন।[১১৪] মুসলিম লীগের সভা ও মিছিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে "কৃষককে ভূমিদান" এবং "ঋণের অবসান" প্রভৃতির প্রতিশ্রুতিভিত্তিক শ্লোগান।[১১৫] যখন কলকাতার এক শ্রমিক জিন্নাহকে বলেন, "তাঁরা (হিন্দু নেতারা) বলে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে ধনীদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য নয়", তখন জিন্নাহ বলেন, "যদি বৃটিশরা চলে যায় এবং ঐ এলাকা (বাংলা) পাকিস্তানে পরিণত না হয়, তাহলে হিন্দুরা কোন দিনই জমিদারের জোয়াল থেকে মুসলমানদের মুক্তির জন্য কোন আইন সৃষ্টি করতে দেবে না।"[১১৬]

চট্টগ্রামের এক জনসমাবেশে নাজিমুদ্দিন শপথ করে বলেন, "যদি পাকিস্তান অর্জিত হয়, তখন আপনার সন্তান মুন্সেফ হবে, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ও দারোগা হবে।"[১১৭] আইয়ুব খান, যিনি স্বাধীনতার পরপরই ঢাকায় কর্মরত ছিলেন, স্মৃতিচারণ করেন, "তারা (জনগণ) ভেবেছিল [স্বাধীনতা পেলে] তাদের জীবনে আর কোন সমস্যা থাকবে না।"[১১৮] তাই এটি মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্মের পরপরই তাঁতী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে তাদের নতুন সামাজিক স্বীকৃতি ও সামাজিক অবস্থানের উত্তরণ দাবি

১১২. Hashmi, Thesis, 53.

১১৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা,* ১৪; চৌধুরী কুদরাত-ই-গণি, *উন্নয়ন ও আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি*; সংকলিত, নিলুফার বেগম (সম্পা.) *স্মৃতিচারণ* (ঢাকা ১৯৮৪); কামরুদ্দীন আহমদ, *আত্মবিকাশ,* ১ম খণ্ড, ৭০।

১১৪. EBLA, progs, Vol. 1, No. 3, 155, আরো দেখুন, উমর, *দলিল,* ৩৫।

১১৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা,* ২৮৪।

১১৬. Sirajuddin Hossain, *Mirror,* 1.

১১৭. সাঈদ-উর-রহমান *রাজনীতি ও কবিতা,* ১০।

১১৮. Ayub Khan, *Friends,* 79.

করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আলোকে তারা এই দাবিকে যুক্তিযুক্ত ও বৈধ মনে করেছে।[১১৯]

গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তান অর্জিত হয়। এ আন্দোলন হচ্ছে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন বা বর্গাচাষীদের সংগ্রাম এবং খাজনা প্রদানের জন্য টংক ও নানকার প্রথার বিলোপ আন্দোলন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বের দশকে পূর্ব বাংলার প্রায় সমগ্র পূর্বাঞ্চল এবং আসামের অংশবিশেষ, প্রধানত সিলেট জেলা বিভিন্ন প্রকৃতি ও মাত্রার কৃষক আন্দোলনের আওতায় ছিল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই এসব আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এসব আন্দোলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাগচাষীদের আন্দোলন, যা তেভাগার লড়াই নামে বহুল পরিচিত। উৎপাদিত ফসলের উপর জমির মালিকের অংশ অর্ধেকের বদলে এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার দাবিকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন। বস্তুত সুনির্দিষ্টভাবে আন্দোলনকারী কৃষকদের এই দাবির কারণে আন্দোলনের নামও হয়েছে তেভাগার লড়াই। বামপন্থী ঐতিহাসিকদের মতে, বিভাগপূর্ব বাংলার উনিশটি জেলায় ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলনে ষাট লক্ষ কৃষক অংশ গ্রহণ করে।[১২০] কোন কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী কৃষকদের উপরোক্ত সংখ্যার সঠিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[১২১] আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের সংখ্যা সংক্রান্ত এই বিতর্ক কোনভাবেই বর্গাচাষীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের গুরুত্বকে খাটো করে না, যে আন্দোলন পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রদেশের কৃষক ফ্রন্ট প্রাদেশিক কৃষকসভা কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং এর সাহায্য লাভ করে। একজন খ্যাতনামা কৃষকসভাকর্মী এই আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই আন্দোলনকে "এমন একটি বিরাট ঘটনা" বলে অভিহিত করেছেন, যা গ্রামবাংলাকে আন্দোলিত করেছিল।[১২২]

এই আন্দোলন জমিদারি উচ্ছেদ কিংবা ব্যাপক প্রচলিত বর্গাচাষ প্রথা ধ্বংস করার লক্ষ্য স্থির করেনি, যা ১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে সমগ্র বাংলার কৃষিজমির এক-পঞ্চমাংশ এবং কৃষিভিত্তিক পরিবারের ৩৫ শতাংশের জন্য বর্গাচাষকে একটি প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থায় পরিণত করে। বর্গা নামে সমধিক খ্যাত বর্গাচাষ এবং উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতির চাষ হয়েছিল, বিনয় চৌধুরীর বর্ণনানুসারে, "অকৃষিকরণ প্রক্রিয়ায়" মাধ্যমে। এর ফলে রায়তী জমি কমে যাচ্ছিল এবং অকৃষক শ্রেণী এইসব রায়তদের হস্তচ্যুত জমি হস্তগত করছিল। এভাবে রায়ত কমছিল, বর্গাদার বাড়ছিল। কৃষকদের ঋণগ্রহণ এবং তার

১১৯. Home Pol. Bundle Memo No. 60; এটা পার্থ চ্যাটার্জীর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সহায়তা করবে। প্রশ্নটি ছিল, জমিদারি আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তাদের পাকিস্তান দাবি কি আরো সুনির্দিষ্ট ছিল না ? দেখুন, Partha Chatterjee, *Bengal, 1920-1947*, vol. 1, *The Land Question* (Calcutta 1984), 171.

১২০. আবদুল্লাহ রসুল, *কৃষকসভার ইতিহাস*(কলিকাতা ১৯৬৯) ১৫৪।

১২১. Hashmi, Thesis, 308; Also Jnanbrata Bhattacharyya, "Leadership Entry".

১২২. ভবানী সেন, *বাঙ্গালী তেভাগা আন্দোলন, তেভাগা স্মারক* (কলিকাতা ১৯৭৩), ৫।

ফলে মহাজন কর্তৃক জমি জবরদখল অকৃষিকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[১২৩] বর্গাচাষ বিষয়ে কোন রকম স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও অকৃষিকরণের এই পদ্ধতিগুলি বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন কৃষিমজুরকে এই আন্দোলনে টেনে আনে।

হাশমীর মতে, জোতদার ও মহাজনসহ ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের মোকাবিলায় পরিচালিত এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও প্রকৃত কৃষকের মধ্যকার সকল মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে।[১২৪] এই আন্দোলনের প্রভাব গ্রামীণ জীবনে গণতন্ত্র চর্চার যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তাও কতিপয় বামপন্থী নেতার দৃষ্টি এড়ায় নি, যদিও ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[১২৫] ভবানী সেনের মূল্যায়নে তেভাগা আন্দোলন সফল হয়েছিল; কারণ ৪০ শতাংশ ভাগচাষী ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ লাভে এবং বাকি ৬০ শতাংশ কৃষকের আবওয়াব বা ঋণের সুদ মওকুফ করাতে সমর্থ হয়। যারা তেভাগা লাভে সমর্থ হয় নি, তারাও সরকারের উপর অধিকতর চাপ প্রয়োগে ভূমিকা পালন করে, যার ফলে সরকার ন্যূনতম বর্গাচাষীদের দাবিদাওয়া অন্তর্ভুক্ত করে একটি সংসদীয় বিলের সুচনার কথা ঘোষণা করে।[১২৬] এটুকু অর্জন করতে প্রকৃতপক্ষে অনেক মূল্য দিতে হয়। প্রায় ৫০০০ কৃষক বন্দি এবং ৫০ জন কৃষক শহীদ হয়।[১২৭] পক্ষান্তরে একজন ভূস্বামীরও মৃত্যুদণ্ড হয়নি কিংবা কৃষক কর্তৃক তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়নি। কৃষকদের দ্বারা এই ধরনের দমন-পীড়ন কৃষক বিদ্রোহের সময় প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়।[১২৮]

তেভাগা আন্দোলনের চেয়ে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন টংক আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যে, প্রধানত ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলের হাজংদের মধ্যে। হাজার হাজার হাজং উপজাতীয় কৃষকের সমর্থিত এই আন্দোলন ৫০ মাইল দীর্ঘ এবং ১০ মাইল বিস্তৃত একটি বিশাল এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনকারী কৃষকদের অধিকাংশ হাজং হলেও তাদের সাথে কোচ, হাদি, ডালু এবং বনাই উপজাতীয় কৃষকরাও জড়িয়ে পড়ে।[১২৯] ভট্টাচার্য এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান টংকদারের জড়িত থাকার কথা অগ্রাহ্য করেছেন। তবে এই আন্দোলনের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা মনিসিংহ তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৩৭ সালে এই আন্দোলনের শুরুতে মুসলমান কৃষকদের অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করেছেন।

১২৩. Jnanbrata Bhattacharyya, "Leadership Entry", 625.
১২৪. Hashmi, Thesis, 316.
১২৫. অমল সেন, *নড়াইল তেভাগা,* ১০৯; রানী দাসগুপ্ত, *তেভাগার লড়াইয়ে কৃষক মেয়েদের ভূমিকা, তেভাগা স্মারক*।
১২৬. ভবানী সেন, *স্মারক,* ১৫।
১২৭. ঐ,১৪-৫।
১২৮. দেখুন, Ranajit Guha, *Elementary Aspect of Peasant Insurgency in Colonial India* (Delhi,1983), Chapter on *Negation.*
১২৯. Janabrata Bhattacharyya, "Leadership Entry", 612.

টংক পদ্ধতি এক ধরনের বর্গাচাষ প্রথা, যা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন ধানকরারি, ফুরর কিংবা চুক্তিবর্গা,[১৩০] যেখানে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ খাজনা হিসেবে প্রদান করতে হতো। বলা হয়, এই প্রথার উৎস বর্গা প্রথার চেয়ে অধিকতর আধুনিক এবং একজন ঐতিহাসিক এই প্রথার সূচনাকাল শতাব্দীর শুরুতে নির্ধারণ করেছেন।[১৩১] উৎপত্তিগতভাবেই এই আন্দোলন ছিল উত্তরপূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

যে লক্ষ্য নিয়ে টংক আন্দোলন পরিচালিত হয় তা হচ্ছে খাজনা প্রদানের মাধ্যম টংক-এর পরিবর্তে নগদ টাকায় রূপান্তর, যার পরিমাণ ছিল অনেক কম; এতে বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ দেয়া হলেও তা ছিল নগদ টাকায় খাজনা প্রদানকারী সাধারণ কৃষকদের দেয় অংশের চেয়েও ৫০০ ভাগ বেশি।[১৩২] ১৯৪৭ সালে প্রতি একর টংক জমির খাজনা ছিল ৪০-৭০ টাকা; পক্ষান্তরে ঐ একই পরিমাণ জমির সাধারণ খাজনা ছিল মাত্র ৬ টাকা। প্রতি একরে টংক খাজনা ছিল ৩ মণ ৩৩ সের ধান, যা অ-টংক জমির খাজনার চেয়ে ৮ গুণ বেশি।[১৩৩] স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের বিধানসভার একজন বামপন্থী সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী এই আন্দোলনকে "গরিব কৃষকদের উন্নতির জন্য বৈধ" বলে বর্ণনা করেছেন। টংক প্রথা বাতিলের সংগ্রামে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ২ জন মুসলমান কৃষকসহ অসংখ্য হাজং এবং ডালু উপজাতীয় কৃষক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।[১৩৪]

অন্যদিকে নানকার বিদ্রোহের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বর্গাচাষীর কায়িক শ্রম প্রদান প্রথার বিলোপ সাধন। এই প্রথায় এক একর জমির একজন বর্গাচাষীকে জমির মালিকের বাড়িতে মাসে পাঁচ থেকে সাত দিন বেগার খাটতে হতো; জমির মালিক ডাকা মাত্রই কৃষক তার স্বীয় প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নির্বিশেষে কাজ করতে বাধ্য হতো। নানকার জমির উপর বর্গাচাষীর কোন অধিকার ছিল না।[১৩৫] নানকার কৃষকের প্রাত্যহিক নির্দেশিত কাজ এত বেশি ছিল যে সেই কাজ করতে তার পুরো পরিবারকে শ্রম দিতে হতো, অন্যদিকে তার নিজস্ব যে ছোট্ট এক টুকরো জমি থাকতো, যা দিয়ে তার পুরো পরিবারের বাৎসরিক ভরণপোষণ চলতো, তার খুব কমই পরিচর্যা সে করতে পারতো, ফলে তার উৎপাদন কমতো।

১৩০. মনি সিং, *জীবন সংগ্রাম*, ৪৬।

১৩১. Binay Bhushan Choudhury, "The Process of Depeasantisantion in Bengal and Bihar, 1885-1947," *India Historical Review*, ii,i, 1975, 105-165, 146-52.

১৩২. Sunil Sen, *Agrarian Struggle in Bengal*, 1946-47 (New Delhi 1972), 78.

১৩৩. উমর, *ভাষা আন্দোলন*, ২য় খণ্ড, ৬০-১।

১৩৪. উমর, ভাষা আন্দোলন, ২য় খণ্ড, ৬০-১।

১৩৫. *Cross Roads*, 1 Sept. 1950, As cited in Yu V Gankovosky and L R Gordon, Polonsky, *A History of Pakistan* (Lahore, n.d.), 141.

জমিদারের কাজ না করলে শারীরিক নির্যাতন ছিল প্রাত্যহিক বিষয় এবং সময় নষ্ট করা হলে নষ্ট সময় পুষিয়ে নিতে আরো অনেক বেশি কাজ দেওয়া হতো। জমিদার কিংবা জমিদারবাড়ির পুরুষ সদস্যদের দ্বারা প্রায়শ নানকারদের স্ত্রী এবং যুবতী মেয়েরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতো এবং এই অবস্থা নিরসনে ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে প্রতিরোধ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এই ধরনের প্রতিরোধের জন্য চরম মূল্য দিতে হতো—বাস্তুচ্যুত হওয়া থেকে জমিদারের 'গুণ্ডারাহিনী' কর্তৃক হত্যা পর্যন্ত। ১৯৪৬ সাল ও ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে এই বর্বর প্রথা সিলেট জেলার অধিকাংশ গ্রাস করে। ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই জেলার জনসাধারণের ১০ শতাংশ এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করে।[১৩৬]

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে কৃষক বিপ্লবের 'ভূমি ও খাজনা' প্রশ্নটি পর্যায়ক্রমে প্রশমিত করে পরে একেবারেই খারিজ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি এবং বঙ্গবিভাজন কমিউনিস্ট কর্মীদের মতানুসারে কৃষকদের জমিদার ও রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধিতা থেকে সরে আসার মূল কারণ ছিল। সক্রিয় কৃষক কর্মীরা এবং কৃষকসভার সদস্যগণ বিশ্বাস করতো, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অপ্রয়োজনীয়। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাদের দাবি মেনে নেবে। এমনকি ভাগচাষীদের আন্দোলনের উপর সাম্প্রতিক লেখালেখিতেও তার সাক্ষ্য মেলে। কুপার বিশ্বাস করেন, এ ধরনের প্রত্যাশা তেভাগা আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।[১৩৭]

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব খোলাখুলিভাবে জনসমক্ষে কথা দিয়েছিল যে, তারা জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটাবে এবং অন্যান্য কৃষি বিষয়ক সংস্কার সাধন করবে। কতিপয় প্রধান আঞ্চলিক নেতা কৃষকদের প্রত্যাশার পরিমাণকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন পাঠান ছিলেন ময়মনসিংহের একজন অন্যতম লীগ নেতা। শোনা যায়, মুসলমান ভাগচাষীরা, যারা কৃষকসভার সাংগঠনিক নেতৃত্বে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, তেভাগার পিছনে তাদের সময় ও শ্রম অপচয় করা উচিত নয়; যেহেতু পাকিস্তানের অভ্যুদয় আর বেশি দূরে নয়, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের পুরোটাই অর্থাৎ চৌভাগই পাবে। মনি সিংহের ভাষ্য অনুযায়ী, এ কথায় যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়। কৃষকরা জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত শস্য ফিরিয়ে দিল।[১৩৮] বস্তুত মুসলিম লীগ ভাগচাষীদের দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা গ্রামীণ জীবনে প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১৩৬. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ,* ২য় খণ্ড, (ঢাকা), ২৩৪।

১৩৭. Adrienne Cooper, Thesis, 375.

১৩৮. মনি সিং, *সংগ্রাম,* ৯৭।

১৯৪৭-এর ২২ জানুয়ারি "দি বেঙ্গল বর্গাদার বিল", যা অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র প্রদেশে তেভাগা পদ্ধতি উপস্থাপন করতো, কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই বিল খুব ফলপ্রসূভাবে বিক্ষোভ প্রশমিত করে। যদিও প্রতিক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, মোদ্দা কথা এই যে, আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি আন্দোলনের প্রচণ্ডতাকে থিতিয়ে দেয়।[১৩৯] ভাগচাষীদের বিল কৃষি ব্যবস্থায় এক ধরনের প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে এবং একই সাথে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে আশা ও ভীতির জন্ম দিয়েছে। এই বিলটি মুসলমান কৃষকদের নিকট মুসলিম লীগের ভাবমূর্তিকে অনেক উঁচু করে তোলে, যদিও বিলটি পাশ করানোর জন্য কার্যকর কিছুই করা হয়নি। এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, খাজা নাজিমুদ্দিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক পর্যায়ের মুসলিম লীগ নেতা ব্যক্তিগত পর্যায়ে জমিদারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছিলেন।[১৪০] একটি জাতীয় সরকারের সম্ভাবনা সিলেট জেলায় নানকারদের চলমান সক্রিয় আন্দোলনে ছেদ ঘটায়। অজয় ভট্টাচার্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরাও স্বীকার করেন যে, সিলেটের সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা এবং ধারণা ছিল, নানকার সংকট আপোসের মাধ্যমেই সমাধান করা হবে যদি জনগণ পাকিস্তানের প্রতি তাদের সমর্থন অটুট রাখে।[১৪১]

এই একই সম্ভাবনা হিন্দু নানকারদের মধ্যেও হতাশার সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি আরো বেশি জটিল হয়ে উঠে যখন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা পাকিস্তানের জন্মের পরই তড়িঘড়ি করে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এদের কাছ থেকে অল্প হলেও যে সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল, তা তখন আর থাকলো না।[১৪২] একজন কৃষকসভাকর্মী হাজী মোহাম্মদ দানেশ বলেন যে, হিন্দুরা ভেবেছিল, মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানে তারা অসহায় হয়ে পড়বে।[১৪৩] হিন্দু ও মুসলমান নানকারদের মধ্যে একটি পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে পাকিস্তান অথবা ভারতের অংশ হওয়ার প্রশ্নে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়, যা সহজে পরিণত হতে পারতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। এরই সাথে যুক্ত হলো করিমগঞ্জ থানার বিভাজন, যা ছিল আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল এবং এর ফলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সৃষ্টি হলো অনিশ্চয়তা।[১৪৪]

আট

যখন পাকিস্তানের জন্ম হয়, পূর্ব বাংলা তখন দুর্ভিক্ষের কবলে। তারপরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, মুসলমান কৃষকরা তাদের হিন্দু ভাইদের মতো সেই সময়ে

১৩৯. Cooper, Thesis, 376.
১৪০. কামরুদ্দীন আহমদ, *আত্মবিকাশ* ১ম খণ্ড, (ঢাকা ১৯৭৫), ১১৬-৭।
১৪১. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার,* ২য় খণ্ড, ১৬৭।
১৪২. ঐ, ২৫১।
১৪৩. Cooper, Thesis, 380.
১৪৪. অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার,* ২য় খণ্ড, ২৪৩।

দেশত্যাগ করেনি। *স্বাধীনতা* পত্রিকার একটি রিপোর্টে বলা হয় : "পাকিস্তান অর্জিত হযেছে। মুসলমানরা প্রত্যাশা করে, দ্রব্যমূল্য নেমে আসবে। তারা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ নিয়ে ততোটা চিন্তিত নয়। তারা দেশত্যাগ করেও চলে যাবে না।[১৪৫] একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী আবদুস শহীদ স্মরণ করেন কিভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে বহু লোক আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করেছে।[১৪৬] রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে চট্টগ্রামের পল্লীগায়ক রমেশ শীল গেয়েছেন :

> ১৯৪৩ সালে সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে,
> অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক দিয়েছে জীবন।
> এইবার মোদের স্বাধীন রাষ্ট্র, দুর্ভিক্ষের অন্নকষ্ট
> ঘুচাইয়ে শান্তিরাজ্য কর ভাই স্থাপন।[১৪৭]

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর থেকেই মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বাসভূমির ছবি এঁকেছেন। তাঁরা আশা করেন, এমন হবে সে দেশ যেখানে দরিদ্র কৃষকের দুবেলা দুমুঠো খাদ্য পাবার স্বপ্ন সত্যি হবে।[১৪৮] মহা দুর্ভিক্ষের পর 'বিপর্যয়পরবর্তী কল্পরাজ্যের' প্রেক্ষিতে জনগণের কাছে দুমুঠো 'ভাত' পাওয়াই হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণতার প্রতীক। Greenough-এর মন্তব্য অনুসারে, বহু কৃষকের জন্য অন্নের সংস্থানই হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা।[১৪৯] লীগ কর্মীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এইসব বাস্তব দুর্দশাকেই তাদের রাজনৈতিক প্রচারণার বিষয় করে তুলেন। সাধারণ মুসলমান কৃষকদের আশাবাদ এবং পাকিস্তানকেন্দ্রিক প্রত্যাশা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রতিফলন। তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সবদিক দিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদ হতে পারতো নিতান্তই একটি উচ্চবর্গীয় চিন্তাভাবনা। কেননা মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদ ছিল বহু বিপরীত পরিস্থিতির একটি, যা দরিদ্রকে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছিল।[১৫০]

ইসলাম ধর্ম স্বয়ং এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত সাম্যবাদী জাতীয়তাবাদ[১৫১] একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো, বিশেষত যখন নিপীড়ক শক্তিকে উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছিল। ইসলাম দৈনন্দিন রাজনীতিতে সেই সময় এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ দাবিসমূহও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ দ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত হতো। '৫০-এর দশকের সদ্য গঠিত বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ ইসলামের

১৪৫. উদ্ধৃত, উমর, *ভাষা আন্দোলন*, ২য় খণ্ড, ৫।
১৪৬. আবদুস শহিদ, *আত্মকথা*, ১৩৭।
১৪৭. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, *কবিয়াল রমেশ শীল*, (ঢাকা ১৯৬৩), ৪৯।
১৪৮. Humaira Momen, *Muslim Politics*, 57; Shila Sen, *Muslim Politics*, 80-83, উমর, *দলিল*, ৭৭-৭৯।
১৪৯. Greenough, *Prosperity*, 228.
১৫০. ঐ, Chapter 4.
১৫১. গেলনার ইসলামকে প্রচ্ছন্ন সাম্যবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। দেখুন, Ernst Gellner, *Nations and Nationalism* (England 1993), 17.

সংগঠন ও বাণী থেকে এর বহু ধারণা ও উদাহরণ গ্রহণ করেছিল। এই জাতীয়তাবাদের প্রথম দিককার লেখায় নতুন রাষ্ট্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের প্রসঙ্গ ও উদাহরণ টেনে আনা হয় এবং তাঁর মতোই একটি আদর্শ সমাজ অর্জন ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে কেউ কেউ লিখেছেন "কখন আমরা হযরত ওমরের মতো একজন আদর্শ শাসক পাবো ? কখন আবার সেই চার খলিফার যুগের পুনরাবির্ভাব ঘটবে ?"[১৫২]

মুসলিম লীগের এই প্রচারণা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিল, কারণ তা মুসলমান কৃষকদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আনুগত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।[১৫৩] লীগ তার প্রচার কার্যক্রম চালাতো সামাজিক আনুষ্ঠানিক সমাবেশগুলির মধ্যে, যেমন জুম্মার নামাজ, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ ও ঈদের জামাত প্রভৃতিতে। এভাবেই সামাজিক জীবনকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করে মুসলিম লীগ ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আনুগত্যকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করলো, যা কখনো সাম্প্রদায়িক আন্দোলন এবং কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্যোতক প্রতীকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১৫৪]

সংক্ষেপে এই হলো বাংলার মুসলমান জনগণের নিজেদের পৃথক বাসভূমি অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে তাদের বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও শ্রমলব্ধ অবদানের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুসলিম লীগ সম্পর্কে মোহমুক্তি সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য মনে রাখা প্রয়োজন জনগণের সে সময়কার নানামুখী আশা ও প্রত্যাশার কথা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে লীগকে ক্ষমতাসীন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

১৫২. শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাইমুদ্দিন আহমেদ, *দুর্ভাগা জনসাধারণ*, ৭।

১৫৩. দেখুন, Rafiuddin Ahmed, *Bengal Muslims,* কামরুদ্দীন আহমদ, *আত্মবিকাশ* ২য় খণ্ড, ৪৯।

১৫৪. দেখুন, Partha Chatterjee, "Agrarian Relations and Communalism in Bengal, 1926-35"; Ranajit Guha (ed.) *Subaltern Studies;* Vol. 1, Delhi, 1982; আরো দেখুন, যুক্তপ্রদেশের রাজনীতিতে এই প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ, Gyan Pandey, "Rallying Round the Cow", ঐ, Vol. 2, Delhi, 1983, also Hashmi, Thesis, 44.

১৫

ভাষা আন্দোলন

বদরুদ্দীন উমর*

বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিল, সেসবের মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক, তীব্র ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের পৃথক অস্তিত্বের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থিত হতে দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি প্রবন্ধে বলেন, "যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।"[১]

শুধু সাংস্কৃতিক মহলই নয়, রাজনৈতিক মহলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ভাষা বিষয়ক কিছু উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনা ছিল। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম প্রাদেশিক কাউন্সিলের সামনে পেশ করার জন্য যে খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি

* প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'আমাদের ভাষা সমস্যা', *দৈনিক আজাদ*, ১২ শ্রাবণ ১৩৫৪

গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছিল।[২] ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ভারতবিভাগ সম্পর্কিত রোয়েদাদ ঘোষণার পর মুসলিম লীগের অল্পসংখ্যক বামপন্থী কর্মীর উদ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠিত হয়।[৩] কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীর দ্বারা এটি গঠিত হয়। এই গ্রুপ 'আশু দাবি কর্মসূচি আদর্শ' নামে যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে তাতে বলা হয় : "মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে।[৪] বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশে যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"[৫] বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এ কথার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তখন পর্যন্ত মুসলিম লীগ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। কাজেই গণআজাদী লীগের সদস্যদের হয়তো ধারণা ছিল যে, পাকিস্তানের দুই অংশে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম হবে এবং তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্রীয় একক হিসেবে গণ্য করা যাবে।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান যুব কর্মী সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবে বলা হয় :

> পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।[৬]

১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও আইন-আদালতের ভাষা করার পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালায়। ঐ বছরই ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-

২. Abul Hashim, *Draft Manifesto of the Bengal Provincial Muslim League*, (প্রকাশক, শামসুদ্দিন আহমেদ, ১৫০, মোগলটুলি-ঢাকা), ৬।
৩. *আশুদাবি কর্মসূচি আদর্শ*, প্রকাশক, কামরুদ্দীন আহমদ, কনভেনার, গণআজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, জুমরাইল লেন, ঢাকা, জুলাই ১৯৪৭।
৪. ঐ, ২২।
৫. ঐ, ২৩।
৬. শামসুল হক, ভূমিকা : 'আমরা গড়িব স্বাধীন সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান', পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনের পক্ষে শামসুল হক কর্তৃক, ১৫০ মোগলটুলি, ঢাকা হতে প্রকাশিত এবং বলিয়াদি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা হতে এ. এইচ. সৈয়দ দ্বারা মুদ্রিত।

না উর্দু ?' নামে তাঁরা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই পুস্তিকায় তাঁরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা, অফিসের ভাষা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করার কথা বলেন। পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলা হয়, "লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।"[৭] উল্লিখিত প্রস্তাবটি তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। এছাড়া পুস্তিকাটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং তৎকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদের ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধও ছাপা হয়।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অর্থাৎ বিভাগপূর্ব আমলের অখণ্ড বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা করা হবে না। এ বিষয়ে কমিটির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁকে সংবাদপত্রে একটি ঘোষণা প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৮] মুসলিম লীগের এই বৈঠক প্রধানমন্ত্রী* খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে'** অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় বহু সংখ্যক ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলাকে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁদেরকে আশ্বাস দেন যে, তাঁদের দাবি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে।[৯]

ইতিপূর্বে করাচীতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে অংশগ্রহণের পর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার এবং আবদুল হামিদ ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদেরকে বলেন যে, উপরোক্ত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই বিবৃতি ৬ ডিসেম্বরের *মর্নিং নিউজে* প্রকাশিত হওয়ার আগের

* তখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রধানকেও প্রধানমন্ত্রী বলা হতো।

** বর্তমান বাংলা একাডেমী ভবন।

৭. *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা- না উর্দু ?* প্রকাশক, অধ্যাপক এম. এ. কাসেম, তমদ্দুন মজলিস, রমনা, ঢাকা। প্রিন্টার এ. এইচ. সৈয়দ, বলিয়াদি প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ১৩৭ নং বংশাল রোড, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

৮. *Morning News*, December 7, 1947; *দৈনিক আজাদ*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

৯. *Morning News* , December 7,1947.

দিন অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর এ. পি. আই. পরিবেশিত ও *মর্নিং নিউজে* প্রকাশিত অপর একটি খবরে বলা হয় যে, শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। সেই সিদ্ধান্তের ভার পাকিস্তান গণপরিষদের উপর অর্পিত হয়েছে।

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৬ ডিসেম্বর দুপুর ২টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, সেটি ছিল রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসমাবেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এই বিরাট সমাবেশে যোগদান করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম। এই সমাবেশে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, এ. কে. এম. আহসান ও এস. আহমদ। সমাবেশটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

১. বাংলাকে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক।

২. রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলাভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

৩. পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার উর্দু ভাষার দাবিকে সমর্থন করার জন্য সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করছে।

৪. সভা 'মর্নিং নিউজ'-এর বাঙালিবিরোধী প্রচার-প্রচারণার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।"[১০]

এই ছাত্রসভাটি শেষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্ররা মিছিল সহকারে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সেক্রেটারিয়েট ভবনে উপস্থিত হয়। সেক্রেটারিয়েট থেকে তারা মন্ত্রী নূরুল আমিন এবং হামিদুল হক চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। এরপর মিছিলটি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রী মোহাম্মদ আফজাল এবং নূরুল আমিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থন

---

১০. ঐ।

করার প্রতিশ্রুতি দিলেও[১১] নাজিমুদ্দিন সে ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অসম্মত হন। সে সময় তিনি অসুস্থ থাকার অজুহাতে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অক্ষমতা জানান এবং সেই সঙ্গে তাঁদের কাছে পাঠানো একটি লিখিত নোটে বলেন যে, মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি পার্টির মতামত না জানা পর্যন্ত তিনি ভাষার প্রশ্নে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করতে পারবেন না।[১২] শিক্ষা সম্মেলন সম্পর্কে ঢাকা বিমান বন্দরে হবিবুল্লাহ বাহারের সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রতিবাদ করে ১১ ডিসেম্বর তিনি সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন যে, তাঁর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে এবং তিনি সে সময় বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত সম্মেলনে নেওয়া হয় নি।[১৩]

শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য স্থানে যে সময় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে, সে সময় সিলেটের কিছু সংখ্যক নাগরিক উর্দুর সমর্থনে খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিটিতে বলা হয় :

> একদল লোক নিজেদেরকে বিরাট সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিরুদ্ধে দারুণ প্রচারণা শুরু করেছে। পূর্ব বাংলার লোকেরা একটি জাতি, এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উর্দুকে জাতীয়তাবিরোধী ও বিদেশী ভাষা হিসেবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে চারিদিকে তোলপাড় আরম্ভ করেছে। জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার ভাব দেখিয়ে তারা নিজেরাই বাংলার মতো এমন এক ভাষার দাবি তুলেছে যে ভাষার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভের মতো যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী উর্দু ভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা যে শুধু ধ্বংসাত্মক তাই নয়, তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয় এবং সর্বোপরি সর্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।[১৪]

স্মারকলিপিতে তাঁরা আরও বলেন :

> পবিত্র কোরআন এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত উর্দু ভাষাকে অবহেলা করে আমরা যদি প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত বাংলা ভাষার দিকে যাই, তাহলে আমরা আমাদের জাতীয় সত্তাকেই অস্বীকার করবো। পৃথক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত ভারতের মুসলমানদের পৃথক জাতিত্বের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তান ধারণার জন্ম। ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় ভাষা এবং ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে সমৃদ্ধ উর্দুই পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা।[১৫]

১১. ঐ।
১২. ঐ, December 10, 1947
১৩. ঐ, December 13, 1947.
১৪. ঐ, December 19, 1947.
১৫. ঐ।

এই স্মারকলিপিতে দাবি করা হয় যে, যাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে ওকালতি করছেন তাঁদের মতের সঙ্গে জনসাধারণের মতের কোন মিল নেই। আসলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা যারা বলছেন তাঁরাই জনমতের প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে তাঁরা সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন, শর্ষিনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কনফারেন্স, সিলেটের সাপ্তাহিক পত্রিকা *যুগভেরী*, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রমুখের উর্দু সমর্থনের কথা বলেন। তাঁদের মতে, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র থাকবে না এবং তার ফলে পাকিস্তানী জাতীয়তা ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৬]

বাংলা ভাষাবিরোধীদের এই স্মারকলিপিতে সিলেটের জনগণের মতামতের প্রতিনিধিত্বকারী কোন প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা অথবা ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন সে বক্তব্য ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মহলের একটি প্রতিনিধিত্বশীল বক্তব্য।

১৯৪৭ সালেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানি অর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট এবং মুদ্রায় শুধুমাত্র ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার এবং এগুলিতে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করার ফলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ ও বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজনেই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিস এবং মুসলিম ছাত্রলীগের অল্প কয়েকজন কর্মীর উপস্থিতিতে এই সংগ্রাম পরিষদটি গঠিত হয় এবং তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।[১৭] এই সংগ্রাম পরিষদ প্রথমদিকে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান, লেখালেখি, আলোচনাসভা অনুষ্ঠান, সরকারি ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং কিছু কিছু সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত এই প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও

১৬. ঐ।

১৭. আবুল কাসেম, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* ঢাকা ১৯৬৭, ১৬।

গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উত্থাপন করেন।[১৮] ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির উপর গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন :

> এখানে এ প্রশ্নটি তোলাই ভুল হয়েছে। এটি আমাদের জন্য এক জীবনমরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।[১৯]

প্রস্তাবটিকে অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ বলে অভিহিত করে তিনি আরো বলেন :

> প্রথমে এই প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য নির্দোষ বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয়, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।[২০]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকে রাষ্টভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"[২১] এছাড়া গণপরিষদের সহ-সভাপতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি তমিজুদ্দিন খানও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন।[২২]

গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে লিয়াকত আলী খান, নাজিমুদ্দিন, তমিজুদ্দিন খান প্রভৃতি মুসলিম লীগ নেতা যেসব বক্তব্য প্রদান করেন তার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় অনেক বিবৃতি ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু শুধু পত্র-পত্রিকার বিরোধিতাই নয়, ছাত্রধর্মঘট, মিটিং-মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জনের পর মিছিল করে বাংলা ভাষার সমর্থনে নানা শ্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এরপর মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হলে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আবুল কাসেম সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ ও ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা।[২৩]

১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.২.১৯৪৮; *Amrita Bazar Patrika*, 27.2.1948

১৯. *Amrita Bazar Patrika* (Town edition), 27 2 1948

২০. *নওবেলাল*, ৪.৩. ১৯৪৮।

২১. ঐ।

২২. ঐ, সম্পাদকীয়।

২৩. *নওবেলাল*, ৪.৩.১৯৪৮ এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা* (শেষ শহর সংস্করণ), ২৭.২.১৯৪৮।

গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলা ভাষাবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহ্বান করা হয়।[২৪] এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন তাঁদের মধ্যে কামরুদ্দীন আহমদ, রনেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, শামসুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, তোফাজ্জল আলী, আলী আহমেদ, মহিউদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শহীদুল্লাহ্ কায়সার, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান, শওকত আলী, আবদুল আউয়াল, ওয়াহেদ চৌধুরী, নূরুল আলম, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[২৫] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কামরুদ্দীন আহমদ।[২৬]

ভাষা আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে এই সর্বদলীয় পরিষদে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ইত্যাদি ছাত্রাবাস থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি সদস্য মনোনীত হন এবং এর আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।[২৭]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এভাবে গঠিত হওয়ার পর এই সভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তান গণপরিষদে সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।[২৮]

১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সেই ধর্মঘট সফল করার জন্য কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অন্যদিকে সেই ধর্মঘট বানচাল করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ ও সরকার পক্ষ থেকে নানা ধরনের তৎপরতা শুরু করা হয়। ১১ মার্চের

২৪. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*, (প্রথম খণ্ড), *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী*, ২.৩.১৯৪৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

২৫. ঐ।

২৬. ঐ।

২৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড (৩য় সংস্করণ), ৬৮।

২৮. *সাপ্তাহিক নওবেলাল* (সিলেট থেকে প্রকাশিত), ৪.৩.১৯৪৮।

ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত কর্মসূচি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১০ মার্চ রাত্রে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি সভা বসে। ১১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা না হলেও প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা দরকার সে বিষয়ে এই সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া পরদিন ধর্মঘটের সময় বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।[২৯]

১১ মার্চ সকাল থেকে ইডেন বিল্ডিং-এর প্রথম ও দ্বিতীয় গেট, রমনা পোস্ট অফিস, পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, জেলা আদালত, হাইকোর্ট, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ইত্যাদি স্থানে বিশেষ পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১১ মার্চ খুব ভোর থেকেই ছাত্ররা পিকেটিং-এর জন্য পূর্বনির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ শুরু হতো ভোর পাঁচটা থেকে। সেজন্য ছাত্ররা সেখানে ভোর পাঁচটার আগেই উপস্থিত হয়। অফিসের লোকজন যেসব এলাকায় তখন বসবাস করতো সেসব এলাকায়, যেমন নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাকে ছাত্ররা অফিস শুরু হওয়ার বেশ আগেই উপস্থিত হয়।[৩০] রমনা ডাকঘরের সামনে ছাত্ররা পিকেটিং করার সময় তাদের কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৩১] হাইকোর্টের গেটের সামনে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে উকিলদেরকে সেদিনের জন্য আদালত বর্জনের অনুরোধ ও চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে উকিলদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে ছাত্রদের বাদানুবাদ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ফজলুল হক *অমৃতবাজার পত্রিকার* এক প্রতিনিধিকে বলেন :

> বেলা ১০-৩০ মিনিটের সময় আমি হাইকোর্টের সামনে উপস্থিত হই, কিন্তু ছাত্ররা সেখানে পিকেটিং করতে থাকার ফলে ভিতরে ঢুকতে অসমর্থ হই। ছাত্রদেরকে আমি বলি যে আমার প্রায় আটটি কেস কোর্টে আছে এবং আমার অনুপস্থিতিতে আমার মক্কেলরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুতেই রাজি করাতে সক্ষম না হয়ে অবশেষে আমি বাড়ির দিকে রওয়ানা হই।[৩২]

ফজলুল হকের সঙ্গে ছাত্রদের এই কথাবার্তা চলাকালে পূর্ব বাংলার তৎকালীন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং আইয়ুব খান হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সদ্য স্থাপিত বিভাগীয় সামরিক হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার সময় ফজলুল হক ও ছাত্রদের বাদানুবাদ লক্ষ্য করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর *প্রভু নয় বন্ধু* নামক পুস্তকে এই ঘটনার নিম্নলিখিত বর্ণনা দেন :

> আমার মনে আছে, একদিন একটি পরিদর্শনের কাজ শেষ করে আমি হাইকোর্টে ফেরত যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, ফজলুল হক আদালতের কাজে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাত্রদেরকে

---

২৯. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৭২-৭৩।

৩০. ঐ, ৭২।

৩১. ঐ, ৭৪।

৩২. *Amrita Bazar Patrika*, 12.3.1948.

> মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলছিলেন। আমি গাড়ির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিজন্য ঐ সব করা হচ্ছিল। ফজলুল হক আমাকে দেখেছিলেন এবং দেখার পর আমাকে তাঁর রীতিমতো ভীতিপ্রদ মনে হওয়ায় তিনি শান্তভাবে ছাত্রদেরকে সে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩৩]

আইয়ুব খানের এই বর্ণনার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রাপ্ত অন্য কোন তথ্যেরই কোন সঙ্গতি নেই এবং এটি পরবর্তীকালে প্রদত্ত একটি মিথ্যা ও বাহাদুরিপূর্ণ বক্তব্য ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

হাইকোর্টের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদের উপর পুলিশ এক পর্যায়ে লাঠিচার্জ করলে উকিলরা তার প্রতিবাদে আদালত বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩৪] ছাত্ররা শুধু হাইকোর্টের সামনেই নয়, হাইকোর্টের কাছাকাছি অবস্থিত সেক্রেটারিয়েটের সামনেও পিকেটিং করতে থাকে। পিকেটিং চলাকালে সেখানেও ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। এ সম্পর্কে *অমৃতবাজার পত্রিকার* প্রতিনিধির সাথে পূর্বোল্লেখিত সাক্ষাৎকারের সময় ফজলুল হক বলেন :

> হাইকোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে সেক্রেটারিয়েটের কাছে আমি একদল ছাত্রকে দেখি। আমি তাদেরকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি এবং তাদেরকে বাড়ি ফেরত যেতে অনুরোধ করি। এই সময় হঠাৎ একদল পুলিশ ধাওয়া করায় তারা দৌড়ে এসে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে হাজির হয়। আমি দেখলাম, একদল পুলিশ আমার চতুর্দিকে যে ছাত্ররা জড়ো হয়েছিল তাদেরকে মারপিট করতে শুরু করলো। লাঠির একটি বাড়ি আমারও হাঁটুর উপর পড়ায় আমি খুব যন্ত্রণা অনুভব করি। এরপর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আমি ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করিয়ে নিই। তবে আমার আঘাত তেমন গুরুতর ছিলো না।[৩৫]

১১ মার্চ সকালে সেক্রেটারিয়েটে পিকেটিং-এর জন্য ছাত্ররা তোপখানা এবং আবদুল গনি রোডস্থ উভয় গেটের সামনেই উপস্থিত হয়েছিল। আবদুল গনি রোডে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ প্রমুখ। তোপখানা রোডে উপস্থিত ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, বরকত প্রমুখ। পিকেটিং চলাকালে পুলিশের সঙ্গে শামসুল হক, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, বরকত প্রমুখের অনেক তর্কবিতর্ক হয়। পুলিশকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার জন্য সেক্রেটারিয়েটের উভয় গেট থেকে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখকে গ্রেফতার করে ওয়াইজঘাটের কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকেলের দিকে তাঁদের সকলকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।[৩৬]

৩৩. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, 30.

৩৪. *Amrita Bazar Patrika*, 12.3.1948.

৩৫. ঐ।

৩৬. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৭৭

১১ মার্চের ধর্মঘটের সময় ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ এবং অন্যান্য নির্যাতনের প্রতিবাদে বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ। এই সভায় বক্তারা সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং একটি প্রস্তাবে ছাত্রদের উপর সেদিনকার পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এছাড়া তাঁরা অন্য একটি প্রস্তাবে পাকিস্তান গণপরিষদের যেসকল পূর্ব বঙ্গীয় সদস্য বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষা করতে অক্ষম হন তাঁদের পদত্যাগও দাবি করেন।[৩৭]

সেদিনের ধর্মঘটে ছাত্রদের সাথে সেক্রেটারিয়েট ও রেলের কিছু সংখ্যক কর্মচারীও যোগদান করেন এবং এর ফলে ঢাকাতে কিছু সময়ের জন্য হলেও আংশিক রেল ধর্মঘট হয়। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ধর্মঘটের জন্য পিকেটিং করার সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদের এক সংঘর্ষ ঘটে এবং কয়েকজন ছাত্র সেখান থেকে গ্রেফতার হয়।[৩৮]

১১ মার্চ শুধু ঢাকাতেই নয়, ঢাকার বাইরেও অনেক জায়গায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র ঐদিন ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। প্রায় সকল স্থানেই মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালিত হলেও যশোরে ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জেলাকর্তৃপক্ষ পুলিশের মাধ্যমে হামলা চালায়। এই হামলার প্রতিবাদে সেদিন যশোরে দারুণ সরকারবিরোধী উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে এবং বিকেলের দিকেও এই ঘটনার প্রতিবাদে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়।[৩৯]

১২ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতির মাধ্যমে পূর্বদিনের ধর্মঘটের সময় ছাত্রদের উপর সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। এই বিবৃতিতে তিনি ১১ মার্চের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে নিহত, আহত ও পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের যে হিসাব দেন, সে হিসাব মতে আহত ২০০, গুরুতরভাবে আহত ১৮, গ্রেফতার ৯০০ (এদের মধ্যে অনেককে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়) এবং জেলে বন্দী ৬৯।[৪০]

এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান পরিবেশিত একটি সংবাদে বলা হয় যে, ১২ মার্চ সকালের দিকে জগন্নাথ কলেজে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সে সভা চলাকালে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে প্রায় একশ' লোক বাইরে থেকে এসে সভার লোকজনের উপর ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এই হামলার ফলে কেউ কেউ আহত হন।[৪১]

৩৭. *Amrita Bazar Patrika*, 12.3.1948
৩৮. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৭৯।
৩৯. ঐ, ৭৯-৮০।
৪০. *Amrita Bazar Patrika*, 13.3.1948.
৪১. ঐ।

জগন্নাথ কলেজের এই ঘটনা ছাড়াও ঢাকাতে বিক্ষিপ্তভাবে ঐদিন আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে। দুই ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট সন্দেহে লোহার রড দ্বারা আঘাত করা হয়। সেদিন সেক্রেটারিয়েটের সামনের সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দেয় এবং সেক্রেটারিয়েটের সামনে দিয়ে জনসাধারণের যাতায়াত বন্ধ থাকে।[৪২] এসব সত্ত্বেও ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মিছিল বের করে পুলিশী জুলুম ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৪৩]

১৩ মার্চ সরকার কলকাতা থেকে প্রকাশিত *অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *দৈনিক স্বাধীনতা* পূর্ব বাংলায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সেই আদেশ অনুযায়ী ঐদিন তেজগাঁও বিমান বন্দরে এই পত্রিকাগুলি এসে পৌঁছলে সেগুলি পুলিশ হস্তগত করে বাজেয়াপ্ত করে।[৪৪]

১১ মার্চে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৩ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে এবং সংগ্রাম পরিষদ ঐ ধর্মঘট ১৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কারণ ঐ দিনটি ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ।[৪৫]

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের দিন বিকেলে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের একটি সভা প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে শুরু হয়। এই সভা চলাকালে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র সেখানে উপস্থিত হয় এবং রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তিদান ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়।[৪৬] মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের ঐ সভায় ১১ মার্চের ঘটনাবলীর বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়।[৪৭]

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এবং নাজিমুদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি খাজা নসরুল্লাহ ১৫ মার্চ তারিখ সকালের দিকে সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা কামরুদ্দীন আহমদের বাসায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে জানান যে, নাজিমুদ্দিন

৪২. ঐ।
৪৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৮১।
৪৪. *Amrita Bazar Patrika*, 14.3.1948.
৪৫. ঐ, 14.3.1948 ; *নওবেলাল*, ১৯.৩.১৯৪৮।
৪৬. *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী*, ১৪.৩.১৯৪৮; উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল*, (প্রথম খণ্ড); *Amrita Bazar Patrika*, 16.3.1948.
৪৭. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ৮২।

ঐদিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে চান। এরপর সকাল সাড়ে দশটার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে সংগ্রাম পরিষদের এক জরুরি বৈঠক বসে। এই বৈঠকে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে তাঁরা একমত হন এবং সেই সাক্ষাতের সময় আলোচনার ধারা সম্পর্কেও নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যে চুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা হওয়ার কথা, তার একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ। ফজলুল হক হলের এই বৈঠকে সেই খসড়াটিও আলোচিত এবং অনুমোদিত হয়।[৪৮]

নির্ধারিত সময়ে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল কাসেম, নঈমুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ বর্ধমান হাউসে উপস্থিত হন। বৈঠকের আগে নাজিমুদ্দিন প্রস্তাব করেন যে, প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ সে আলোচনাকালে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা তাতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় আজিজ আহমদকে বাদ দিয়েই আলোচনা শুরু হয়।[৪৯]

নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের এই আলোচনাবৈঠকে তুমুল বিতর্ক এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সংগ্রাম পরিষদ যে চুক্তিটি অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে, তার কয়েকটি ধারা মেনে নিতে সম্মত হলেও অন্যগুলি সম্পর্কে নাজিমুদ্দিন তাঁর দৃঢ় অসম্মতি জানান। তিনি সংগ্রাম পরিষদকে বলেন যে, বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করে পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারে, প্রাদেশিক সরকারের এ ব্যাপারে কোন কিছু করার আইনগত এখতিয়ার নেই। *ইত্তেহাদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, স্বাধীনতা* ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে নাজিমুদ্দিন বলেন যে, পত্রিকাগুলি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করার কারণে সেগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় নি, নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে পত্রিকাগুলির পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণার জন্য।[৫০]

৪৮. ঐ, ৮৩-৮৪।

৪৯. ঐ, ৮৪।

৫০. ঐ।

সংগ্রাম পরিষদের দ্বারা পেশকৃত চুক্তিটির মধ্যে একটি দাবি ছিল, ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য কোন সরকারি কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান করা চলবে না। এ সম্পর্কে নাজিমুদ্দিন বলেন যে, সরকারি কর্মচারী সক্রিয়ভাবে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করলে যদি তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের কাজকর্ম শৃংখলার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারিভাবে ভাষা আন্দোলনকে রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এবং নাজিমুদ্দিন ১৪ মার্চ রাতে এক বেতারভাষণে নিজেও এ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। সংগ্রাম পরিষদ এ ব্যাপারে দাবি জানায় যে, ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সরকারি প্রচার সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোট জারি করে ভুল স্বীকার করতে হবে এবং আন্দোলন যে রাষ্ট্রশত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয় নি সেকথাও একই সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে। এর জবাবে নাজিমুদ্দিন বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের কাছে ভুল স্বীকার এবং দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দীর্ঘ সময় স্থায়ী এই বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়, কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা তাঁদের দাবিতে অনমনীয় থাকায় নাজিমুদ্দিন শেষ পর্যন্ত তাঁদের সবকটি দাবিই মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে ৮ দফা চুক্তিটির শেষ দফাটি কিছু রদবদল করে নাজিমুদ্দিন স্বহস্তে সেটি নতুনভাবে লিখে দেন।[৫১]

সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের ৮ দফা চুক্তির বিবরণ নিম্নরূপ :

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাঙলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্যে যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুলকলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

---

৫১. ঐ, ৮৫।

৫. আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাংলার যেসকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[৫২]

চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম প্রমুখ জেলখানায় উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনে আটক বন্দীদেরকে চুক্তিপত্রটি দেখান। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী প্রমুখ চুক্তির শর্তাবলী দেখার পর সেটি অনুমোদন করেন। এরপর সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ বর্ধমান হাউসে ফিরে আসেন। সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দীন আহমদ চুক্তিপত্রটিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন।[৫৩]

১৫ মার্চ দুপুর ১টায় একটি সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ছাত্ররা মিছিল সহকারে পরিষদভবনের সামনে উপস্থিত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। তখনও পর্যন্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার খবর সাধারণভাবে প্রচার করা হয় নি। কাজেই ছাত্র-জনতার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা লক্ষ্য করে আবুল কাসেম তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টায় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু চুক্তির কথা শোনামাত্র ছাত্ররা আরো উত্তেজিত হয়ে গালাগালি বর্ষণ করতে থাকে। চুক্তিপত্রটি তাদের পড়ে শোনানো হলেও তাতে কর্ণপাত না করে তারা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে চুক্তি সম্পর্কে সরাসরি শোনার জন্য দাবি জানাতে থাকে এবং বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে।[৫৪]

তখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছিল এবং বাইরে ছাত্র-জনতার সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পরিষদের অভ্যন্তরেও দারুণ গণ্ডগোল এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী দলীয় সদস্যগণও চুক্তি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিতে থাকেন। এসবের ফলে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে পরিষদের সামনে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু রিপোর্ট পেশ করার পর পরিষদে আবার হট্টগোল শুরু হলে তিনি ৮ দফা চুক্তিটি সম্পূর্ণ পাঠ করে তাদেরকে শোনান।[৫৫]

৫২. *East Bengal Assembly Proceedings*, Vol. 1, *The Amrita Bazar Patrika*, 16 3.1948

৫৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* প্রথম খণ্ড, ৮৬।

৫৪. ঐ।

৫৫. ঐ, ৮৬-৮৭।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের চুক্তি সম্পাদন এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদের সবগুলি দাবি মেনে নেওয়ার আসল কারণ ছিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর। এই সফরের সময় জনগণ কর্তৃক, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মতো কোন পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না ঘটে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই নাজিমুদ্দিন ও তাঁর সরকার যথেষ্ট নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা আশা করেছিলেন যে, জিন্নাহ উর্দুর সপক্ষে প্রকাশ্যে মতামত প্রদান করলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পরিস্থিতি তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে।

১৯ মার্চ বিকেলে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তেজগাঁ বিমানবন্দরে পৌঁছলে হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত হয় এবং অসংখ্য লোক বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত পথের দুই পাশে তাঁর দর্শনলাভের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।[৫৬]

২১ মার্চ ঢাকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিন বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় প্রায় এক ঘন্টাকাল বক্তৃতার মধ্যে ভাষার প্রশ্ন এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন :

> একথা আমি পূর্বেই বলেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও একটি সদ্য প্রকাশিত বিবৃতিতে যথার্থভাবেই একথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সরকার এদেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতক অথবা তাদের এজেন্টদের যেকোন চেষ্টাকে কঠিনভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আমি খুশি হয়েছি। বাংলা এই প্রদেশের সরকারি ভাষা হবে কিনা সেটা এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে যথাসময়ে এই প্রদেশের অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে।[৫৭]

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে একথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা, এই প্রদেশের অধিবাসীরাই চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা কি হবে। কিন্তু একথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্যদেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, এ প্রসঙ্গ পরে আসবে।[৫৮]

৫৬. ঐ, ১০৫।

৫৭. *Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah's Speeches as Governor General*, Pakistan Publication, Karachi, 89

৫৮. ঐ।

২৪ মার্চ সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন্নাহর সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন সভার আয়োজন করে। এই সমাবর্তন সভাতেও জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করেন। এ সময় উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক 'না, না' বলে চীৎকার করে জিন্নাহর বক্তৃতায় বাধার সৃষ্টি করেন। কিন্তু এরপরও জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রদানে বিরত না হয়ে আবার সেই একই বক্তব্য প্রদান করেন।[৫৯]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদলকে জিন্নাহ ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় সাক্ষাৎদান করেন। এই সাক্ষাতের সময় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, অলি আহাদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আলোচনার প্রথমেই জিন্নাহ তাঁদেরকে বলেন যে, নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছে সেটাকে তিনি স্বীকার করেন না, কারণ নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে জোরপূর্বক সেই চুক্তিতে সই আদায় করা হয়েছে। তিনি এ সময় দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদেরকে জানান যে, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই সাক্ষাৎকারের সময় উভয় পক্ষে অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হলে জিন্নাহ আর আলোচনা করতে অসম্মত হওয়ায় সাক্ষাৎকারটি নির্ধারিত সময়ের আগেই আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়।[৬০] সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহর কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।[৬১]

জিন্নাহর পূর্ব বাংলা সফরের পর ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন বসে তাতে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি লঙ্ঘন করে নিম্নলিখিত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব পেশ করেন :

(ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং

(খ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।[৬২]

৫৯. উমর *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১০৯-১১১।

৬০. ঐ, ১১১-১১৩।

৬১. *দৈনিক যুগান্তর*, ২.৪.১৯৪৮।

৬২. *East Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol. 1, No. 4, Thursday the 6th April 1948, 57

নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাব পেশ করার পর পরিষদে তুমুল বিরোধিতা ও হট্টগোল শুরু হলে জিন্নাহর মতামতের কথা উল্লেখ করে নাজিমুদ্দিন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন।[৬৩]

আন্দোলনের মুখে চুক্তি সম্পাদন এবং আন্দোলনের পর পরিস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে সেই চুক্তিভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ছাত্র আন্দোলন কিছুদিন স্তিমিত থাকলেও পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। মুসলিম লীগ সরকার কোন সমস্যারই সমাধানের চেষ্টা না করে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সঙ্কটজনক করে তোলে এবং স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চারদিকে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই বিক্ষোভের মুখে রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার, বহিষ্কারাদেশ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, জনগণের উপর নতুন নতুন কর নির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন মুসলিম লীগ সরকারের সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। এই সময় মুসলিম লীগের মধ্যেও দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ভাঙনের নানা লক্ষণ। এই ভাঙনের পরিণতিতে কোন বিরোধী দল যাতে গঠিত হতে না পারে সেজন্য মুসলিম লীগ সংগঠন ও সরকারি মহলে মুসলিম লীগের বামপন্থী গ্রুপ নামে পরিচিত পূর্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের কর্মীদের বিরুদ্ধে এমন সব পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে যাতে তাঁরা মুসলিম লীগের মধ্যে কোনক্রমেই আর অবস্থান করতে না পারেন এবং কোন পাল্টা রাজনৈতিক দলও যাতে গঠন করতে সক্ষম না হন।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা নিজেদের আর্থিক ও অন্যান্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ৮ এপ্রিল থেকে ১৮ দিন স্থায়ী এক ধর্মঘট করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নিজেদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার পর কর্তৃপক্ষ সেগুলি বিবেচনা করতে অসম্মত হওয়ায় ৩৬ জন মেডিক্যাল ছাত্র ১৮ এপ্রিল থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করে।[৬৪] অনশনকারী ছাত্ররা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহারের বাসভবনের সামনে এবং সার্জেন জেনারেল ও মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভ করার পর ২৭ এপ্রিল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি স্বীকার করে নিলে ঐ দিনই মেডিক্যাল ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে।[৬৫] নতুন

৬৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* ১৫৩-১৫৮।
৬৪. ঐ, ১৬১।
৬৫. *নওবেলাল,* ২২.৪.১৯৪৮; *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী,* ২৭.৪.১৯৪৮, উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল,* প্রথম খণ্ড।

বিক্রয়কর ধার্যের ফলে ঢাকা ও পূর্ব বাংলার অনেক জায়গায় জনসাধারণ ও দোকানদারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই কর ধার্যের বিরুদ্ধে ২৬ এপ্রিল ঢাকাতে পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। বিকেলের দিকে আরমানিটোলা ময়দানে কর প্রত্যাহারের দাবিতে এক বিরাট জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়।[৬৬]

ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং পূর্ব বাংলা থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ৩ জুন ঢাকা উপস্থিত হলে তাঁকে জননিরাপত্তা আইনের দশ ধারাবলে অন্তরীণ করা হয় এবং জানানো হয় যে, তিনি তাঁর সফরসূচি বাতিল করে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। প্রাদেশিক সরকারের কাছে সোহরাওয়ার্দী সেই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয় এবং তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।[৬৭] এভাবে সোহরাওয়ার্দীকে যখন পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয়,তখন তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের একজন সদস্য ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থা এবং শিক্ষকসমস্যা আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা করে।[৬৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৭ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষকগণই ছিলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ঐ একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় তীব্র শিক্ষকসঙ্কট দেখা দেয়। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের নিকট যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় তা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসমস্যার পরিচয় পাওয়া যায়। স্মারকলিপিটির দাবিসমূহ ছিল এই রকম :

১. বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে, প্রারম্ভিক বেতন বর্তমানের ১৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫০ টাকা করিতে হইবে।
২. অধ্যাপকগণের প্রচলিত বাধ্যতামূলক অবসরলাভের বয়স বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ইহা ষাট বৎসর করিতে হইবে।
৩. নিয়োগ ও পদোন্নতির সময় পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি বা সাম্প্রদায়িকতা চলিবে না।
৪. অবিলম্বে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া বর্তমানের শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।
৫. অধ্যাপকবৃন্দের অভাব-অভিযোগ অবিলম্বে পূরণ করিতে হইবে।
৬. যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে রাখিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।[৬৯]

৬৬. *নওবেলাল,* ২৬.৪.১৯৪৮।
৬৭. *দৈনিক আজাদ* , ১০.৬.১৯৪৮।
৬৮. ঐ, ১.৭.১৯৪৮।
৬৯. ঐ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্র এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই যে আন্দোলন চলছিল তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম বেতনের কর্মচারীরা, যাঁরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাও এক মাসের নোটিশে ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করে। এই ধর্মঘটে ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে, যা ইতিপূর্বে অথবা পরে কোন সময়ই আর দেখা যায় নি। এই আন্দোলনের সময় কিছু সংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং কিছু ছাত্রকে জরিমানা ও গ্রেফতার করা হয়। এসবের ফলে এই কর্মচারী ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট ও ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।[৭০]

১৯৪৮ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পুলিশ ধর্মঘট। দেড় মাস বেতন না পাওয়ার ফলে বিরাট সংখ্যক পুলিশ কনস্টেবল ১৪ জুলাই ধর্মঘট করে এবং ঢাকা শহরের পথে পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সরকার সামরিক বাহিনী তলব করে এবং তারা লালবাগস্থ পুলিশ লাইনে পুলিশদেরকে ঘেরাও করে।[৭১] এসময়ে সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলিবিনিময় হয় এবং তার ফলে ২ জন পুলিশ নিহত ও ১ জন আহত হয়।[৭২]

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটি রূপ ছিল বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা। এ চেষ্টা ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল এবং এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান। নানা বক্তৃতা, বিবৃতি, সভা-সমিতির মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ক্রমাগত একথা প্রচার করতে থাকেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং দুই অংশের জনগণের মধ্যে অর্থপূর্ণ ঐক্য গড়ে তোলা ও সুদৃঢ় করার জন্য পাকিস্তানের সকল ভাষার অক্ষর এক রকম হওয়া উচিত। হরফ পরিবর্তনের এই চক্রান্ত ভালভাবে দানা বাঁধে ১৯৪৯ সালে। এরপর ১৯৫০ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। একটি সরকারি সূত্র থেকে বলা হয় যে, প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ২৫ থেকে ৩৫ জন ছাত্র ঐভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে এবং ছয় মাসকাল তারা ঐ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষালাভে নিযুক্ত থাকবে।[৭৩]

১৯৪৯ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে সেই টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে এই খাতে ব্যয়

৭০. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১৯৩-৯৪।

৭১. *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরী*, ১৪.৭.১৯৪৮; উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ কতিপয় দলিল*, প্রথম খণ্ড।

৭২. *দৈনিক আজাদ*, ১৫.৭.১৯৪৮।

৭৩. ঐ, ২৪.৫.১৯৫০।

বরাদ্দ করা হয় ৬৭ হাজার ৭৬৪ টাকা[৭৪], যা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে খরচ হয় আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের কর্মসূচিতে। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য অস্থায়ীভাবে গৃহীত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় খরচে আরবি হরফে বাংলা বই ছাপানো হয় এবং সেই সমস্ত বই বিনামূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৫] এছাড়া আরবি হরফে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হবে এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়।[৭৬]

আরবি হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা ভাষাসংস্কার কমিটির সদস্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫০ সালের ৪ অক্টোবর একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[৭৭] এর আগেই সেপ্টেম্বর মাসে মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে গঠিত পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি তার এক রিপোর্টে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলন অন্তত কুড়ি বছর স্থগিত রাখার জন্য সুস্পষ্টভাবে সুপারিশ করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বিবৃতিতে এই সুপারিশের প্রতিও সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলা হরফ পরিবর্তন সম্পর্কিত পাকিস্তান সরকারের চক্রান্ত আরো কিছুদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শুধু বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের মধ্যেই এই ধরনের চক্রান্ত সীমাবদ্ধ থাকে নি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আরবি করার জন্য কোন কোন মহল থেকে প্রস্তাব করা হয়।[৭৮] কিন্তু তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানেও এই প্রস্তাবের পক্ষে বিশেষ কোন সাড়া না পাওয়ায় তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু এই দাবি ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের প্রশ্নের সাথে জড়িত থাকায় তা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের দাবিকে কতগুলি মহলে জোরদার করে।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অপর একটি রূপ ছিল বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে অনেক ধরনের অবাস্তব পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে 'পূর্ব বাংলায় প্রচলিত বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ, সহজীকরণ ও সংস্কারের প্রশ্ন পরীক্ষার' জন্য ৯ মার্চ ১৯৪৯ তারিখে পূর্ব বাংলা সরকার 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করে।[৭৯] মওলানা আকরাম খাঁ এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হবিবুল্লাহ বাহার, ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, সৈয়দ আবুল হাসনাত মুহম্মদ ইসমাইল, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, শইখ শরফউদ্দিন, গোলাম

৭৪. ঐ।
৭৫. ঐ।
৭৬. ঐ।
৭৭. ঐ, ৪.১০.১৯৫০।
৭৮. ঐ, ২৩.১.১৯৫০; ২৯.৪.১৯৫০; ১০.২.১৯৫১।
৭৯. *Report of the East Bengal Language Committee,* 1946, Officer on Special Duty (Home Der East Pakistan Govt. Press, Dacca, 2.

মুস্তফা প্রমুখ।[৮০] ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫০ তারিখে এই কমিটি এর মূল রিপোর্টটিকে চূড়ান্ত আকার দেন এবং কমিটির সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারির কাছে সেটি পাঠিয়ে দেন।[৮১]

ভাষা কমিটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরবি হরফ প্রচলনের পক্ষে একটা সুপারিশ আদায় করা। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ কারণেই সরকার উক্ত রিপোর্টটি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম হওয়ার পর ভাষা কমিটির এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। আইয়ুবের সময় বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের প্রশ্ন ছিল একেবারেই অসম্ভব। কাজেই রিপোর্টটি ধামাচাপা দিয়ে রাখার কারণ তখন আর ছিলনা। কিন্তু সেই রিপোর্টটির মধ্যে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশ থাকায় সেগুলি কার্যকর করার প্রতি আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ছিল অধিকতর আগ্রহী। এই আগ্রহের কারণেই তৎকালীন সরকার রিপোর্টটি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে, বিশেষকরে কৃষক-শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সামগ্রিকভাবে নানা ধরনের যে নির্যাতন চালানো হয়, সেসবের পুঞ্জীভূত প্রক্রিয়া জনগণের রাজনৈতিক জীবনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকেই পূর্ব বাংলায় বিপুল খাদ্যাভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য আগস্ট মাসেই পূর্ব বাংলায় সরকারি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের জন্য কর্ডন প্রথা চালু করা হয়। পূর্ব বাংলা সরকার আশা করেছিল যে, ১৭টি জেলার মধ্যে ৮টি উদ্বৃত্ত জেলার ধান-চাল সংগ্রহ করে তারা ঘাটতি এলাকাগুলোতে নিয়ে যাবে; এর ফলে ঘাটতি এলাকার ঘাটতি যেমন পূরণ হবে তেমনি সাধারণভাবে চালের মূল্য হ্রাস পাবে। কিন্তু কর্ডন প্রথা চালু করা সত্ত্বেও বস্তুতপক্ষে দেখা গেল যে, ধান-চাল উদ্বৃত্ত এলাকায় সংগ্রহ করে ঘাটতি এলাকায় তাড়াতাড়ি চালান দেবার মতো কোন ব্যবস্থা সরকারের নেই। এর জন্য প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং যানবাহন ও পথঘাটের দুরবস্থাই মূলত দায়ী। এছাড়া সরকারি আমলাদের দুর্নীতি এবং চোরাকারবারি ব্যবসায়ীদের তৎপরতার দরুন চোরাচালান, বেআইনীভাবে ধান-চাল গুদামজাত করে রাখা এবং ব্যাপক চোরাকারবারের

৮০. ঐ, 2-3.

৮১. ঐ, 115.

ফলে খাদ্যসঙ্কট দূর না হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮-৪৯ সালে এবং পরে ১৯৫১ সালে তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। খুলনা, ফরিদপুর, সিলেট এবং উত্তর বাংলার জেলাগুলিতে গ্রামাঞ্চলের জনগণ ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। অন্য জেলাগুলিতেও পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি ঘটে। শহরের গরিবদের অবস্থাও নিদারুণ সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। কোন কোন এলাকায় কৃষকরা এই পরিস্থিতিতে সংঘবদ্ধভাবে সরকারি খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনে জনগণকে ব্যাপকভাবে ও দেশব্যাপী সংগঠিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় সশস্ত্র আন্দোলনে নামার ফলে তার এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষক সমিতির উপর সরকারি নির্যাতন ও নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞার জন্য ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ের মতো তারা প্রকাশ্যে রিলিফের কাজে এগিয়ে আসতে পারে নি। তৎকালীন পরিস্থিতিতে গোপনীয়তা অবলম্বন করে অন্য কোনভাবেও রিলিফের কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে দু'একটি নতুন বিরোধী সংগঠন সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলির পক্ষেও এ ব্যাপারে বেশি কিছু করা সম্ভব হয় নি, যদিও কিছু রিলিফকাজ তারা বিক্ষিপ্তভাবে করেছিল এবং কোন কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভও সংগঠিত হয়েছিল।[৮২]

১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় একটানা তীব্র খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষাবস্থা জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সেটা ভাষা আন্দোলনের সময় সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সরকারবিরোধী বিক্ষোভ বিস্তৃত হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকসংগ্রাম সংগঠিত হয়। যশোর-খুলনার কোন কোন এলাকাতে তুলনামূলকভাবে ছোট আকারে হলেও কৃষক আন্দোলন ঘটতে দেখা যায়। ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী জেলায় কৃষক আন্দোলন সশস্ত্র আকারও ধারণ করে। ময়মনসিংহে হাজং সম্প্রদায় টংক প্রথা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে। সিলেটে নানকাররা নানকার প্রথা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে। রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলে সাঁওতাল কৃষকরা স্থানীয় ভূমিমালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এসব সংগ্রামের ফলে পূর্ব বাংলার সরকার ১৯৫০ সালে টংক ও নানকার প্রথা উচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়।[৮৩]

কিন্তু শুধু কৃষকরাই নয়, শ্রমিকরাও ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব বাংলাব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, স্বল্প মজুরি ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটানা আন্দোলন করে। চা-বাগানশ্রমিক, রেলশ্রমিক ও কর্মচারী, সুতাকল, সিমেন্ট, পোর্ট ও ডকশ্রমিকরা মাঝে মাঝে ধর্মঘট করে এবং খণ্ড খণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। সে সময়ে শিল্পের তেমন কোন বিকাশ না ঘটায়

৮২. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১-১২৬।
৮৩. ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ১৮৪-৩১৪।

শ্রমিকদের সংখ্যা বৃটিশ আমলের তুলনায় বেশি ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিক-অসন্তোষ ও শ্রমিক-ধর্মঘট সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে কিছুটা সহায়তা করে।[৮৪]

১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে ৪ থেকে ৬ মার্চ প্রতীক ধর্মঘট করেন। কিন্তু সরকার তাঁদের দাবিদাওয়া অগ্রাহ্য করায় শিক্ষকগণ ঐ বছরই ১ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। এই ধর্মঘটের সমর্থনে শুধু শিক্ষকগণই নয়, জনসাধারণও স্থানে স্থানে সভা ও সমাবেশ করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সরকার শিক্ষকদের দাবিদাওয়া মেনে নিতে অস্বীকার করায় দুই মাসকাল স্থায়ী হওয়ার পর ২ জুন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। শিক্ষকদের এই ধর্মঘট দাবিদাওয়া আদায়ে ব্যর্থ হলেও সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ হয়।[৮৫]

১৯৪৮ সাল থেকেই সরকার সংবাদপত্রের উপর হামলা শুরু করে। এই হামলার কবলে প্রধানত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি পড়লেও বিরোধী মতাবলম্বী দৈনিক পত্রিকাগুলিও তা থেকে রেহাই পায় নি। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ, জরিমানা, তলব, সম্পাদক ও সাংবাদিক গ্রেফতার ইত্যাদি দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় সে সময় সংবাদপত্রের উপর হামলা একটি নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়। এই হামলার বিরুদ্ধে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মালিকগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং জনসাধারণও তাঁদেরকে অনেক সাহায্য করে।[৮৬]

ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী ইত্যাদি জেলায় কৃষক আন্দোলন প্রধানত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় এবং সেখানে তাদের উপর সরকার সব ধরনের নির্যাতন চালায়, কৃষকদের গুলি করে হত্যা পর্যন্ত করে।[৮৭] ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের উপর গুলি চালিয়ে সরকার সাত জনকে হত্যা করে। অনেকেই আহত হন। এছাড়া ১৯৪৯ সালে ঢাকা, রাজশাহী ইত্যাদি জেলার কেন্দ্রীয় কারাগারসহ অন্যান্য জেলে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের উপর সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে শতশত রাজবন্দী কয়েকবার অনশন ধর্মঘট করেন। অনশন ধর্মঘটের সময়েও তাঁদের উপর নির্যাতন চালানো হয়।[৮৮]

ছাত্রদের উপরেও সরকারি নির্যাতন ১৯৪৭ থেকে নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য এলাকায় শতশত ছাত্রকে গ্রেফতার করা

৮৪. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১-৬৬।
৮৫. ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ১০৫-১২৮।
৮৬. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫৪-৩৬৫।
৮৭. ঐ, ১৯২-৩১৪।
৮৮. ঐ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ৩১৪-৩২৮, ৩৩২-৩৩৭।

হয় এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নিজ নিজ এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' ১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূর্ব বাংলাব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে ছাত্র ফেডারেশনও সমর্থন প্রদান করে। ৮ জানুয়ারি ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহর ও বিভিন্ন অঞ্চলে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়।[৮৯]

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে 'জননিরাপত্তা আইন'-এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য একটি অধ্যাদেশ পেশ করা হয়। এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হলেও ৫ নভেম্বর সেটি গৃহীত হয় এবং এর মেয়াদ ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।[৯০]

এই সময় সরকারের নির্যাতন যে কেবল কমিউনিস্ট ও ছাত্রদের উপরই জারি ছিল তাই নয়, প্রগতিশীল জনগণের সমগ্র অংশ, এমনকি মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে সরকারবিরোধী অংশও এই নির্যাতনের কবল থেকে রেহাই পায় নি। প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলা সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব থেকে আমলাতন্ত্রের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, আমলাতন্ত্রের এই প্রভাব সমগ্র প্রশাসন ও সরকারি নীতির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। এজন্য মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী এবং জেলা, মহকুমা অথবা তারও নিম্নপর্যায়ের নেতাদের কোন সমালোচনাই তৎকালীন পূর্ব বাংলার সরকারের নীতি অথবা কার্যাবলীর মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর ফলে মুসলিম লীগের মধ্যেই সরকারবিরোধিতা ক্রমশ ব্যাপক আকার পরিগ্রহ করছিল এবং তার পরিণতিতে এই ধরনের বিরোধী মতাবলম্বীরা মুসলিম লীগ থেকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল।[৯১]

মুসলিম লীগ কর্মীদের ক্ষেত্রে যা ঘটছিল, সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রেও ঘটছিল ঠিক তাই। সামান্য বিরোধিতা কোন জায়গায় দেখা দিলেই তাকে কমিউনিস্ট তৎপরতা বলে গণ্য করে সেই বিরোধিতাকে নির্যাতনেব মাধ্যমে স্তব্ধ ও বিলুপ্ত করতে সরকারের কোন ক্লান্তি ছিল না। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খুব ব্যাপক আকারে না হলেও বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল। অসংগঠিত বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ ধীরে ধীরে সংগঠিত ও দৃঢ় প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করছিল।

৮৯. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬৬-৩৭৯।

৯০. ঐ, ৩৭৪-৩৭৭।

৯১. ঐ, ৩৭৮-৩৭৯।

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারক কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে কমিটি যেসব সুপারিশ করে তাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীভূত করার এবং পূর্ব বাংলা সরকারের হাতে যেটুকু ক্ষমতা তখনও ছিল সেটুকু কেড়ে নেয়ার চেষ্টা ছিল। সুপারিশগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরই পূর্ব বাংলায় তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভে শুধু বিরোধী দলীয় ব্যক্তি ও পত্র-পত্রিকাই অংশগ্রহণ করে নি, মুসলিম লীগ সমর্থক ব্যক্তি ও পত্রিকাগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'গণতান্ত্রিক ফেডারেশন' নামে একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এই সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকায় একটি জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কতকগুলি পাল্টা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশও পেশ করা হয়। এর পর গণতান্ত্রিক ফেডারেশন-এর পক্ষ থেকে ১২ নভেম্বর মূলনীতি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাব্যাপী বিক্ষোভের জন্য জনসাধারণ ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটিও ঐ একই দিনে ছাত্র-ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। এর ফলে ঢাকা ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও জনসাধারণ ব্যাপকভাবে মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এভাবে পূর্ব বাংলার সর্বত্র কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে জনগণ সংগঠিত হতে শুরু করায় পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়ে এবং ১৯৫০ সালের ২১ নভেম্বর রিপোর্টটি সম্পর্কে পরিষদীয় আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৯২]

১৯৫০ সালের এই শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এদিক দিয়ে এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর মুসলিম লীগ শাসনের শোষণ-নির্যাতন শুরু হয় এবং ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯৫০ সালের এই আন্দোলনের পূর্বে সেই শোষণ ও নির্যাতনকে মূলত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হিসেবে না দেখার ফলে জনগণের বিক্ষোভ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রকাশ পায়। আমলাদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই যথেষ্ট বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও তাদের মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে না দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করেই জনগণ ক্ষান্ত থাকতো। শুধু তাই নয়, সেসময়ে প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের

৯২. ঐ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩৮০-৪১৬।

বিরুদ্ধে নির্যাতন, দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিকারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হতো। কারণ তখন জনগণ সাধারণভাবে মনে করতো যে, প্রাদেশিক সরকারই মুসলিম লীগ ও আমলাতন্ত্রের সাহায্যে জনগণের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বুঝি এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।[৯৩]

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। কারণ এই সুপারিশগুলি যে পূর্ব বাংলার উপর শোষণ-নির্যাতন কায়েম করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে তা জনগণ অচিরেই জানতে পারে। মূলনীতি কমিটি যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তদারকিতেই এই সমস্ত সুপারিশ প্রদান করেছিল, সেজন্য এর সমস্ত দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় সরকারের সে বিষয়ে জনগণের মনে কোন সন্দেহ রইলো না।[৯৪]

এই চেতনার ফলেই প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে বিবেচনা করে জনগণ তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালনা করে। কিন্তু এর পর থেকে শুধু শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামই নয়, সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে জনগণ মূল শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিজেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংগঠিত করতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার কোন কার্যকারিতা পরবর্তী কয়েক বছর আর থাকে নি। প্রতি বছরের মতো ১৯৫১ সালেও ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। খালেক নেওয়াজ খানের সভাপতিত্বে এই সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে বক্তাদের আলোচনার পর তা পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঐ সভাতেই আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এভাবে কমিটি গঠিত হওয়ার কয়েক দিন পর তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'পতাকা দিবস' উদযাপন করা হয় এবং গণপরিষদের সদস্যদের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটি যে খসড়া তৈরি করে, সেটি ২৫ মার্চ তারিখে হাবিবুর রহমান শেলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে বিবেচিত ও গৃহীত হয়। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্মারকলিপিটি মুদ্রণের পর

৯৩. ঐ।
৯৪. ঐ।

তার কপি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের কাছে এবং পাকিস্তানের সব পত্রিকাতে পাঠানো হয়।[৯৫]

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তারপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে ঢাকায় আসেন এবং ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় প্রাদেশিকতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য প্রদানের পর তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলার ভাষা কি হবে সেটা পূর্ব বাংলার জনগণই নির্ধারণ করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।[৯৬]

খাজা নাজিমুদ্দিনের এই বক্তৃতার পরই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দেওয়ালে পোস্টার লাগায় এবং ৩০ জানুয়ারি প্রতীক ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ৩০ জানুয়ারি যে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তাঁরা ১৯৪৮ সালে সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দিনের স্বাক্ষরিত চুক্তি রক্ষার দাবি জানায়। সভায় বক্তারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে নতুনভাবে সংগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাশেষে ছাত্ররা মিছিল করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।[৯৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এই সভা অনুষ্ঠানের পরদিনই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কাজী গোলাম মাহবুব ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদসহ অপরাপর রাজনৈতিক এবং ছাত্র সংগঠনও যোগদান করে। এ সভায় একটি প্রস্তাবে পল্টন ময়দানের বক্তৃতায় খাজা নাজিমুদ্দিনের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং অবিলম্বে তাঁর সেই বক্তব্য প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়। অপর একটি প্রস্তাবে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের সরকারি চক্রান্তের বিরোধিতা করে সে চক্রান্ত বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে ধর্মঘট আহ্বান করে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বার লাইব্রেরির এই সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে থাকেন মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, আতাউর

৯৫. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, ১২৯-১৩৯।
৯৬. *The Morning News*, 28.1.1952; *নওবেলাল*, ৩১.১.১৯৫২।
৯৭. *The Pakistan Observer*, 30.1.1952; *The Morning News*, 31.1.1952.

রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান।[৯৮]

৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং ধর্মঘটের পর ছাত্ররা মিছিল সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এরপর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সেখানে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব এবং অন্য কয়েকজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতায় নাজিমুদ্দিনের পল্টন বক্তৃতার তীব্র বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। সভার একটি প্রস্তাবে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'কে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হবার কথা ইতিপূর্বে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্বদ্যিালয়ের এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারা পূর্ব বাংলায় এক সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা সমাপ্ত হওয়ার পর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শ্লোগান দিতে দিতে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বাসভবন হয়ে, হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নবাবপুর, পাটুয়াটুলী, আর্মানিটোলা, নাজিমুদ্দিন রোড অতিক্রম করে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।[৯৯] ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভায় মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিমসহ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অনেক সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং ভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।[১০০] ৪ ফেব্রুয়ারি শুধু ঢাকাতেই নয়, পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।[১০১]

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস ৯৪, নবাবপুর রোডে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠক বসে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। বৈঠক চলতে থাকার সময়েই মাইকযোগে সরকারি ঘোষণা প্রচার করা হতে থাকে যে, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০ ফেব্রুয়ারি থেকেই ৩০ দিনের জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। রেডিওর মাধ্যমেও ঐ একই ঘোষণা প্রচার করা হয়। এভাবে ১৪৪ ধারা জারির ফলে সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। সংগ্রাম কমিটির ঐদিনের বৈঠকে ১৪৪ ধারার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

৯৮. *The Morning News* ,1.2.1952; *দৈনিক আজাদ,* ১.২.১৯৫২।

৯৯. *নওবেলাল*, ১৪.২.১৯৫২; গাজীউল হক, *একুশের সংকলন* ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ২৩৫; *The Morning News*, 5.2.1952.

১০০. *একুশের ইতিহাস,* হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২২৩।

১০১. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ১০.২.১৯৫২।

করা হবে কি হবে না এই নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ সদস্যই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুস সামাদ প্রমুখ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে এঁদের মূল যুক্তি ছিল এই যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, ফলে সাধারণ নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। সরকার ১৯৪৭ সালের পর থেকে সাধারণ নির্বাচন দেয় নি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন যদি আরো পিছিয়ে যায় বা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে, তা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হবে। এছাড়া সারা দেশে কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কোন সাংগঠনিক কাঠামো প্রদেশব্যাপী গড়ে না উঠায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অসম্ভাব্যতার দিকটিও তাঁরা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। অন্যদিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যুক্তি প্রদান করতে গিয়ে অলি আহাদ ও আবদুল মতিন বলেন যে, ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করলে ভাষা আন্দোলনের কোন অগ্রগতি তো হবেই না, উপরন্তু তা ধ্বংস হবে।[১০২]

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে এই বিতর্ক চলাকালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এরও একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভা চলাকালে তাঁদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে অলি আহাদ ও আবদুল মতিন বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশি; কাজেই তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সর্বদলীয় পরিষদকেও সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[১০৩] অধিক রাত্রি পর্যন্ত এই বিতর্ক চলার পর অবশেষে তা ভোটে দেওয়া হয়। অলি আহাদ ও আবদুল মতিনসহ মাত্র চারজন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। কাজেই অধিকাংশ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না সেটা পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। এই কথার পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়, তা হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলে ধরে নেওয়া হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ২১

১০২. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ২৫৪-২৬১

১০৩. ঐ।

ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভায় সর্বদলীয় পরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব ছাত্রদেরকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিষয় অবহিত করবেন এবং সেই সাথে সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করবেন।[১০৪] পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিন, সকল ভাষার সমমর্যাদা ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা করুন' শীর্ষক একটি সাইক্লোস্টাইল করা ইশতেহার প্রচার করে।[১০৫]

২১ ফেব্রুয়ারি বেশ সকাল থেকেই ছাত্ররা ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং-এর উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। নবাবপুর এলাকায় পিকেটিং শুরু করার পর আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ ইত্যাদি যারা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিল এবং এই পিকেটিং-এরও পক্ষে ছিল না, তাদের সঙ্গে এজন্য পিকেটিংরত ছাত্রদের নবাবপুরে একটা সংঘর্ষকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা বিস্তারলাভ করার আগেই ছাত্রসহ সকলে পিকেটিং বন্ধ রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ফিরে যায়। সকাল ৯টা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা শহর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে সমবেত হতে থাকে এবং তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এসময় অসংখ্য পুলিশকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, বিশেষকরে তৎকালীন কলাভবনের সামনে মোতায়েন করা হয়। পুলিশের এ সমাবেশ দেখে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১০৬]

সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা প্রায় ভর্তি হয়ে যায় এবং তারপর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা শুরু হয়। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা বোঝাতে চেষ্টা করলে ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দেয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর।[১০৭]

সভা শুরু হবার পর শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুব ছাড়াও মোহাম্মদ তোয়াহা ও খালেক নেওয়াজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে আবদুল

১০৪. ঐ।

১০৫. উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ কতিপয় দলিল*, প্রথম খণ্ড, ৩১৩।

১০৬. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, ২৬৫।

১০৭. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, ১৫২-১৫৩; গাজীউল হক, *একুশের সংকলন*, বাংলা একাডেমী, ১৪৬।

মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে, আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গেলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতেই হবে। অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে থাকলেও তিনি সভায় এ বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখেন নি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে চান, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও চান যাতে এমন বাক-বিতণ্ডা শুরু না হয় যাতে করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের এবং আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্ট হয়।[১০৮]

সভা ঘণ্টাখানেক চলার পর অবশেষে গাজীউল হক সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সভার পক্ষ থেকে ঘোষণা প্রদান করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এভাবে ঘোষিত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে '১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এই সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে স্থির হয় যে, দশ জন করে এক এক ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রীরা বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে, অন্যথায় সকলে একসঙ্গে বের হতে চাইলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দলটি গেট থেকে রাস্তায় বের হয়।[১০৯]

ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গকালেও ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে কিছু ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি হতে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে সমবেত ছাত্রদের দিকে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গেটের বাইরে গেলে পুলিশ অনেককেই গ্রেফতার করে গাড়িতে করে ঢাকার বাইরে কিছুদূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। একটি খুব মোটা রশি দিয়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধ রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু বেলা ১২টা থেকে ছাত্ররা সেই রশির বাধা পার হয়ে দলে দলে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে যেতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলটি তখন ছিল তৎকালীন ব্যবস্থাপকসভা ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হলের) একেবারে কাছাকাছি। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চারদিকে মোতায়েন করা পুলিশের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছিল এবং উভয় দিকে উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এলাকাতেও ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি চলছিল। এক পর্যায়ে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে এবং লাঠিচার্জ করার উদ্দেশ্যে হোস্টেলের ভিতরে প্রবেশ করে। ছাত্ররাও তখন পুলিশের দিকে বেশি করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে।[১১০]

---

১০৮. অলি আহাদ, ঐ, ১৫৪; গাজীউল হক, ঐ, ১৪৭।

১০৯. গাজীউল হক, ঐ, ১৪৭; মুহম্মদ সুলতান, *একুশের সংকলন ১৯৮০,* বাংলা একাডেমী, ৮২; হাবিবুর রহমান, *একুশের সংকলন ১৯৮০,* ৫৯।

১১০. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* তৃতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, ২৭৮-২৮৩।

এভাবে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে বেলা প্রায় ৩ টার দিকে পরিস্থিতির বেশ অবনতি ঘটে। এই সময় পুলিশের ডি. আই. জি., জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টসহ অনেক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ও সরকারি আমলা ঘটনাস্থলে ছিলেন। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে এই ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরাও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং ছাত্ররা পিছু হটতে অস্বীকার করে ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকলে তাঁদের উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়। এ সময় পুলিশ পক্ষ থেকে ছাত্রদেরকে দু'একবার সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন না হওয়ায় পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ করে। এই আওয়াজ শোনার পর ছাত্ররা পিছু হটে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের শেডগুলির (এই শেডগুলির মেঝে এবং দুই ফুট পর্যন্ত দেওয়াল পাকা, দেওয়ালের বাকি অংশ বেড়া এবং ছাদ টিনের ছিল) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। শেডের দেওয়াল বেড়ার তৈরি হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রই মেঝের উপর শুয়ে পড়ে। এই সময় চীৎকার করে কেউ কেউ বলে যে, পুলিশ ফাঁকা আওয়াজ করছে। ছাত্ররা এই কথা শোনার পর দলে দলে শেডগুলি থেকে বের হয়ে হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের একটা অংশ গেটের দিকে এগিয়ে যায়। এই সময়েই পুলিশ আরেক দফা গুলিবর্ষণ করে। এবার তারা ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করেই অনেক রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং সেই গুলিতেই বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র হতাহত হয়।[১১১]

গেটের সামনেই একজন ছাত্র মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়ে ছিটকে মগজ বেরিয়ে যায় ও পাশে খড়কুটোর উপর পড়ে। পরে খড়কুটোসহ মগজ আবার খুলির মধ্যে ঢুকিয়ে তাঁকে পার্শ্ববর্তী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আবুল বরকত নামে আরেকজন ছাত্র ১২ নং শেড থেকে বের হয়ে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থায় উরুতে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ পড়ে যান এবং তাঁর ক্ষতস্থান থেকে ভয়ানক রক্তক্ষরণ হতে থাকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালে আবুল বরকতের মৃত্যু ঘটে। কম-বেশি আহত হন প্রায় ষাট জন ছাত্র। এদের অধিকাংশকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও একজন সেদিনই সন্ধ্যা-রাত্রিতে মারা যান। এই নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন।[১১২]

২১ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের কাছাকাছি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য সভার সদস্যরা পরিষদভবনে যখন উপস্থিত ছিলেন সেই সময়েই ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলির আওয়াজ সেখান থেকেও শোনা যায়। গুলির কিছুক্ষণ পর ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যেদিকে পরিষদভবন অবস্থিত ছিল সেদিকে

১১১. ঐ, ২৮৪-২৯২
১১২. ঐ, ২৮৫-২৯৫

সমবেত হয়ে পরিষদসদস্যদেরকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য চীৎকার করে আহ্বান জানাতে থাকে। এ সময় পরিষদের অভ্যন্তরেও দারুণ হট্টগোল শুরু হয়। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ স্পীকারকে বলেন পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখতে যাতে করে তাঁরা সকলে বাইরে যেতে পারেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমিনকে বলেন যে, তাঁর উচিত তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল হাসপাতাল পরিদর্শন করা এবং তারপর পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদে বিবৃতি দেওয়া। নূরুল আমিন এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ সেদিনের মতো অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি করেন। কিন্তু নূরুল আমিন বিরোধী পক্ষের দাবি অগ্রাহ্য করে নিজের বিবৃতি দিতে শুরু করলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন এবং আলী আহমদ খান পরিষদভবন পরিত্যাগ করে বাইরে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হন।[১১৩]

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের একটি কামরায় মাইক বসিয়ে ছাত্ররা আগে থেকেই বক্তৃতা করছিল এবং গুলিবর্ষণের পর তাদের সেই বক্তৃতায় স্বাভাবিকভাবেই সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছিল। আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পরিষদভবন থেকে প্রথম বের হয়ে আসার পর তাঁকে হোস্টেলের ভিতরে মাইকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তিনি মাইকে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।[১১৪]

ঐ দিন সন্ধ্যার দিকেই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের মাইক থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাতটায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদ ছাত্রদের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। রাতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের একটি কামরায় তোয়াহা, অলি আহাদ, এমাদুল্লাহ, আবদুল মতিন, গোলাম মাওলা প্রমুখ বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সেমুহূর্তে অকার্যকর হয়ে যাওয়ার কারণে সংগ্রাম পরিষদকে নতুনভাবে সংগঠিত করা দরকার। এ কারণে সেই বৈঠকেই মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য গোলাম মাওলাকে অস্থায়ী সম্পাদক করে একটি নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পরদিনের গায়েবি জানাজা ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁরা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১১৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের যে আহ্বান জানানো হয় তার সমর্থনে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বহু দোকানপাট বন্ধ থাকে এবং যানবাহন চলাচলও হয় কম। কিন্তু ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকার সমস্ত দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

১১৩. ঐ, ৩০০-৩০৬।
১১৪. ঐ, ৩০৭।
১১৫. ঐ, ৩০৭-৩০৮।

২১ ফেব্রুয়ারি যে তিন জন ছাত্র নিহত হয়েছিলেন তাঁদের লাশ আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত না দিয়ে ঐ রাতেই পুলিশের তত্ত্বাবধানে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। এজন্য ২২ তারিখ সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একুশের শহীদদের গায়েবি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই জানাজায় ছাত্ররা উপস্থিত থাকলেও সারা শহর থেকে হাজার হাজার লোক তাতে অংশগ্রহণ করেছিল।[১১৬]

গায়েবি জানাজা এবং সংক্ষিপ্ত জনসভার পর উপস্থিত ছাত্রসহ হাজার হাজার লোক মিছিল করে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মিছিলটি শান্তিপূর্ণ থাকলেও হাইকোর্টের গেটের সামনের পথ অতিক্রম করার সময় মিছিলটির মাঝামাঝি জায়গায় পুলিশ লাঠিচার্জ করার ফলে প্রথমে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, কিন্তু পরে মিছিলটি দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ নাজিমুদ্দিন রোড ধরে চকবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী অতিক্রম করে পগোজ স্কুলের সামনে পৌঁছলে সেখানে পুলিশ আবার মিছিলটির উপর লাঠিচার্জ করে এবং একে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। হাইকোর্টের সামনের দিকে মিছিলের যে অংশ ছিল সেটি তৎকালীন রমনা রেস্ট হাউসের সামনে দিয়ে নবাবপুর রোড ধরে অগ্রসর হয়। এ সময় রাস্তায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গাড়ি ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন সকাল দশটার পর আর দেখা যায় নি।[১১৭]

রথখোলার মোড়ে সরকারসমর্থক পত্রিকা *দৈনিক সংবাদ* অফিস পাহারা দেওয়ার জন্য এক ট্রাক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মিছিলটি যখন বংশাল রোডের মোড়ে সংবাদ অফিসের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং বাধা সত্ত্বেও মিছিলটি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ট্রাকের উপর থেকেই পুলিশ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলে অনেকে হতাহত হয়। বংশালের মোড় ছাড়াও নবাবপুর রোডের আরও কয়েকটি স্থানে পুলিশ মিছিলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্থানে এভাবে গুলিবর্ষণের ফলে আট বছর বয়স্ক একটি বালকসহ পাঁচজন নিহত হয় এবং আহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশেরও অধিক।[১১৮]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* প্রথম থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা এবং উগ্র প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। তার উপর একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনার অনেক বিকৃত বিবরণ ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে মন্তব্য ২২ তারিখে প্রকাশ করায় জনসাধারণ পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সে সময় *মর্নিং নিউজ-এর* প্রেস এবং অফিস ছিল ভিক্টোরিয়া পার্কের (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের) নিকটবর্তী একটি গলিতে। সেই গলির দুই দিক থেকে বহু লোক

১১৬. ঐ, ৩২৩-৩২৪ ।

১১৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, ১৬২-১৬৪; *একুশে ফেব্রুয়ারি* (হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত), ২২৮; মুহম্মদ সুলতান, *একুশের সংকলন* ১৯৮০, ৮৭।

১১৮. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৩০০-৩৩২; *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২।

উক্ত প্রেস ও অফিসে আক্রমণ করে। তারা পত্রিকাটির অফিস তছনছ করে এবং প্রেস ও আসবাবপত্রে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর ফলে *মর্নিং নিউজ*-এর প্রেস ও অফিস সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে নাজিমুদ্দিন রোড বরাবর মিছিলটি সদরঘাট এলাকায় পৌঁছানোর পূর্বে।[১১৯]

২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবি জানাজার পর থেকে ঢাকা শহরের পরিস্থিতির উপর অবশ্য কারও কোন সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ থাকে নি। শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও জনতা দলবদ্ধভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিল এবং পুলিশের সাথে তাদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও সেদিন এই ধরনের একটি সংঘর্ষ ঘটে এবং জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি এসব সংঘর্ষের ফলে ঢাকায় ঠিক কত জন হতাহত হয়েছিল তার কোন সঠিক হিসাব দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না।[১২০]

২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিক ও রেলকর্মচারীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। এর ফলে রেলের চাকা সেদিন বন্ধ থাকে। নারায়ণগঞ্জেও রেলশ্রমিক ও কর্মচারীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ২১ তারিখের গুলি ও ছাত্রহত্যার খবর ঢাকার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পর গ্রাম থেকে কৃষকরা দলে দলে ঢাকা শহরে এসে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১২১]

২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার একটি অধিবেশন বসে। তাতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাকিস্তান সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব সরকারিভাবে পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন।[১২২]

২২ ফেব্রুয়ারির মতো ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখেও ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দোকানপাট, অফিস ও যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ থাকে। নারায়ণগঞ্জে একটি জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার সর্বত্র ছাত্র, শ্রমিক, কর্মচারীসহ জনগণের ব্যাপক অংশ ধর্মঘটে যোগদান করে।[১২৩] গ্রামাঞ্চলেও ঢাকার গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভমিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জের কাছে

১১৯. ঐ, ৩২৮-৩৩০; *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২।

১২০. ঐ, ৩৩২-৩৩৩; *দৈনিক আজাদ*, ২৩.২.১৯৫২।

১২১. ঐ, ৩৩৪-৩৩৭।

১২২. ঐ, ৩৪১-৩৫৫; *East Pakistan Legislative Assembly Proceedings*, 22.2.1952.

১২৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৩৬৩-৩৬৪, ৩৮২-২৮৩

একটি গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা টেস্ট রিলিফের কাজ বর্জন করে ঐ সময় ছাত্রহত্যার বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করে।[১২৪]

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল। কিন্তু ২২ তারিখ থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলেও আরেকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই ছিলেন ইসলামপন্থী। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল কেন্দ্রে যুবলীগের কর্মী ও কমিউনিস্টদেরই প্রাধান্য ছিল। এ কারণে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ও সলিমুল্লাহ হলে অবস্থিত দুই কেন্দ্রের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারির পর আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেটুকু সংগঠিত তৎপরতা ছিল সেটা এই দুই কেন্দ্র থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতো। এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা সাধারণভাবে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল কেন্দ্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালনে সমর্থ হওয়ার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কোন কার্যকারিতা এ পর্যায়ে আর ছিল না।[১২৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে সেখানে আলোচনা হলেও এসব আলোচনা থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঐ কমিটির কোন বিশেষ কার্যকারিতাও সে পর্যায়ে আর ছিল না।[১২৬]

২৩ তারিখ রাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি একটি শহীদ স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ।[১২৭] এই শহীদ মিনারটি ঠিক সেই স্থানটিতেই নির্মিত হয়েছিল, যেখানে মাথায় গুলি লেগে ছাত্রকর্মী সালাহউদ্দিন প্রথম শহীদ হন। ২৬ মার্চ পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে অভিযান চালিয়ে শহীদ মিনারটিকে ধ্বংস করে।[১২৮]

প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন আন্দোলনের সময় তাঁর প্রথম রেডিও বক্তৃতা প্রদান করেন ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই বক্তৃতায় নূরুল আমিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বিদেশী এজেন্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে আখ্যায়িত করেন।[১২৯] নূরুল আমিন তাঁর পরবর্তী রেডিও বক্তৃতা প্রদান করেন ৩ মার্চ। ঐ বক্তৃতাটির খসড়া হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আজফার তখন ছিলেন হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি।[১৩০] এই বক্তৃতাতে

১২৪. ঐ. ৩৫৬, ৩৮২-৩৮৩।

১২৫. ঐ, ৩৭০।

১২৬. ঐ, ৩৬৯।

১২৭. ঐ, ৩৭১।

১২৮. ঐ, ৪০৭।

১২৯. *দৈনিক আজাদ* , ২৪.২.১৯৫২।

১৩০. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪৩৪-৪৩৫

নূরুল আমিন বিদেশী এজেন্টদের সঙ্গে কমিউনিস্টদেরও যুক্ত করে তাঁদেরকে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণাদানকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠক বলে বর্ণনা করেন।[১৩১]

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে সংসদীয় দলের সদস্যগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন এবং সেই মর্মে একটি প্রস্তাবও তাঁদের দ্বারা গৃহীত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেও অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই বৈঠক পর পর তিন দিন অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৩২]

২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক বাজেট পেশ করেছিলেন। সেই বাজেট অধিবেশন কয়েক দিন চলার কথা ছিল, কিন্তু ২৪ তারিখেই প্রাদেশিক গভর্নর একটি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে বাজেট অধিবেশন স্থগিত করেন।[১৩৩]

২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিবাদ ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৪] সেই শোকসভায় তাঁরা গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তিবিধান করা ইত্যাদি দাবি জানিয়ে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকা ও শহরে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকাতেও ২৫ তারিখে যানবাহন, দোকানপাট, অফিস-আদালত সমস্ত বন্ধ থাকে। ঐ দিন ভোরেই আবুল হাশিম, খয়রাত হোসেন, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়।[১৩৫] ২৬ ফেব্রুয়ারি খুব ভোরের দিকে পুলিশ ডক্টর পি. সি. চক্রবর্তী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরী— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিন জন অধ্যাপককে গ্রেফতার করে। ঐ দিন আরও যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয় তাঁরা হলেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহ এবং সতীন সেন এম.এল.এ।[১৩৬]

২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একটি জরুরি বৈঠক ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং

১৩১. *দৈনিক আজাদ,* ৫.৩.১৯৫২।

১৩২. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* ৩৭২-৩৮১।

১৩৩. *দৈনিক আজাদ,* ২৫.২.১৯৫২।

১৩৪. *উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,* তৃতীয় খণ্ড, ৩৯৭-৩৯৮

১৩৫. ঐ, ৪০১-৪০৩; *The Statesman*, 26 2.1952, *দৈনিক আজাদ,* ২৬.২.১৯৫২।

১৩৬. *The Statesman*, 27 2.1952; *দৈনিক আজাদ,* ২৭.২.১৯৫২।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রাবাসগুলোতে অবস্থানকারী ৯০০ ছাত্র-ছাত্রীকে অবিলম্বে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৩৭]

নারায়ণগঞ্জ ছিল ভাষা আন্দোলনের একটি শক্তিশালী এলাকা। এজন্য সরকার নারায়ণগঞ্জের জনগণের উপর নানাভাবে হামলা করে। এই হামলার একটি বড় দৃষ্টান্ত ছিল ২৯ ফেব্রুয়ারির মিছিলের উপর পুলিশের আক্রমণ ও অসংখ্য লোককে গ্রেফতার। সেদিন নারায়ণগঞ্জে যে মিছিল বের হয় তাতে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম। পুলিশ মমতাজ বেগমকে ঐ দিন গ্রেফতার করে। ঐ দিনই তারা নারায়ণগঞ্জ থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ওসমান আলীকেও গ্রেফতার করে।[১৩৮] ১ মার্চ তারিখে নারায়ণগঞ্জে আরেকটি ঘটনা ঘটে। কোন এক গুপ্তঘাতকের গুলিতে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর সরকার তৎক্ষণাৎ পুলিশটির পরিবারের জন্য দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের দায়ী করে।[১৩৯]

ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে পূর্ব বাংলাব্যাপী ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের পর পূর্ব বাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বত্র ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে পুলিশী জুলুম ও সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে একটানা বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। সকল বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী ও নেতাগণ এসব বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এজন্য আন্দোলনে একটু ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।[১৪০]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ৫ মার্চ সারা পূর্ব বাংলায় 'শহীদ দিবস' উদযাপনের এবং সেই সঙ্গে ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। এই ধর্মঘট ঢাকায় ব্যর্থ হলেও পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়। এরপর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠক ডাকা হয় ৭ মার্চ তারিখে। ৮২ নং শান্তিনগরে ডাক্তার মুত্তালিব নামে এক ব্যক্তির বাসায় এই বৈঠকের স্থান নির্ধারিত হয়। সন্ধ্যার সময় এই বৈঠকটি চলাকালে পুলিশ বাসাটি ঘেরাও করে এবং সেখান থেকে সংগ্রাম পরিষদের প্রায় সকল উপস্থিত সদস্যকে গ্রেফতার করে। সেদিন যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁরা হলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, অলি আহাদ, মির্জা গোলাম হাফিজ, মুজিবুল হক, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী এবং বাসায় উপস্থিত হাসান পারভেজ নামে এক ব্যক্তি। কাজী গোলাম মাহবুব বাসার মধ্যে এক স্থানে আত্মগোপন করে থাকার ফলে গ্রেফতার থেকে

১৩৭. *The Statesman*, 28 2.1952

১৩৮. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪১৭-৪১৮

১৩৯. ঐ, ৪১৯-৪২০।

১৪০. ঐ, ৪২১-৪২৩।

রক্ষা পান। সংগ্রাম পরিষদের যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।[১৪১]

এভাবে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের গ্রেফতারের পর ঐ পরিষদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। পরে ১৪ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক এবং কামরুদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ আবদুর রহিমকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পুনর্গঠিত করা হয়।[১৪২]

২৭ এপ্রিল, ১৯৫২ তারিখে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকার বার লাইব্রেরিতে একটি কনভেনশন আহ্বান করে। এই কনভেনশনে সারা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা ও প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন। ইতিপূর্বে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ফরিদপুর জেল থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনটিতে মোট ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৪৩]

১৯৫২ সালের ১৩ মার্চ একটি সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনে বলা হয়, পূর্ব বাংলা সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঢাকা হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তদন্তের বিষয় হবে : (১) পুলিশের গুলিবর্ষণ প্রয়োজন ছিল কিনা; এবং (২) সেই পরিস্থিতিতে সেইভাবে পুলিশের বলপ্রয়োগ সঙ্গত ছিল, না শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল। তদন্ত যে গোপনে অনুষ্ঠিত হবে সে কথাও এই গেজেট নোটিফিকেশনে উল্লেখ করা হয়।[১৪৪] ১৭ মার্চ পূর্ব বাংলার গভর্নর ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি টি. এইচ. এলিসকে ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনা তদন্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[১৪৫]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এলিস কমিশন এই যুক্তিতে বর্জন করা হয় যে, কমিশনটিতে কোন বেসরকারি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এবং তদন্তের বিষয় যেভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে তার ফলে কোন প্রকৃত তদন্ত এই কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা এই তদন্ত প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানেরও দাবি জানান।[১৪৬]

১৪১. ঐ, ৪৪১-৪৫৫।

১৪২. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ১৭.৩.১৯৫২; *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২.৩.১৯৫২।

১৪৩. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪৭৩-৪৮১; *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ৫.৫.১৯৫২ ও ৮.৫.১৯৫২; *The Statesman*, 30.4 1952.

১৪৪. *Dacca Gazette Notification*, dated 13 March, 1952, Notification No. 943, Pl. (Quoted from *Ellis Commission Report*, Para 2.)

১৪৫. ঐ, Para 3

১৪৬. *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২৭.৩.১৯৫২।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিশন সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত জানানো হলেও পূর্ব বাংলা সরকার তদন্তের ব্যাপারে তাদের পূর্বসিদ্ধান্তই বহাল রাখে। এজন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে কমিশনকে পত্র প্রদান করেন। ৩১ মার্চ ছিল তদন্তের ব্যাপারে লিখিত সাক্ষ্য পাঠাবার শেষ দিন। কাজেই তারপর বিচারপতি এলিস আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর তদন্তকাজ আরম্ভ করে তা শেষ করেন ১৯৫২ সালের ৩ মে।[১৪৭]

বিচারপতি এলিস তাঁর পুরো তদন্তকাজ সম্পন্ন করার পর যে হাস্যকর তথ্যের সন্ধান পান তা হলো, পুলিশ কনস্টেবলরা মাথায় লোহার হেলমেটের পরিবর্তে কাপড়ের টুপি পরিহিত ছিল এবং এই গুরুত্বহীন তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি যে 'ঐতিহাসিক' বক্তব্য তাঁর রায় প্রসঙ্গে প্রদান করেন তা হলো, একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশরা যদি ইস্পাতের হেলমেট মাথায় পরে থাকতো, তা হলে তিনি যে তদন্তকাজ পরিচালনা করলেন তার কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখা দিত না।[১৪৮]

বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যে, এই 'প্রখর ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন' সরকারের ধামাধরা ইংরেজ বিচারপতি কমিশনের একমাত্র সদস্য হিসেবে যে রায় প্রদান করেন তা হলো, (ক) ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণের প্রয়োজন ছিল; (খ) সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুলিশ কর্তৃক বলপ্রয়োগ সঙ্গত ছিল।[১৪৯]

১৪৭. উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ৪৮২-৪৮৫

১৪৮. *Ellis Commission Report*, Para-50

১৪৯. ঐ, Para-51

১৬

স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে

কামাল উদ্দিন আহমেদ*

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল মুখ্যত ঘোরতর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এলিটগোষ্ঠীর সঙ্গে উঠতি বাঙালি কাউন্টার-এলিটের মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিবৃত্ত। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এলিটগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে কার্যত জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাঙালিদের একাত্মতাবোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে 'উৎপাদনব্যর্থতা'র (ঈস্টন ১৯৬৫) কারণে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যে ব্যর্থতার সূত্রপাত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের এলিট এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এলিটের বিরোধ (সাঈদ ১৯৭২) থেকে।

বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্তানের সিদ্ধান্তগ্রহণপ্রক্রিয়ায় বাঙালিদের অংশগ্রহণ করতে না দেয়া, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পশ্চিম পাকিস্তানী এলিটদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং দমনমূলক ব্যবস্থাবলী পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতির উদ্ভব ঘটায়। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের এলিটেরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে প্রবল গণআন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হয়। পণ্ডিতগণ ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে 'র‍্যাডিক্যাল রাজনীতি এবং আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি'র জন্য দায়ী কতিপয় কারণ চিহ্নিত করেছেন। কারণগুলি হচ্ছে—

> (১) ভৌগোলিক অব্যবস্থা (anomaly); (২) পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আধিপত্য; (৩) প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতা বন্টনের ব্যাপারে সাংবিধানিক সংকট; (৪) অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনা; (৫) সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রে অকিঞ্চিৎকর বাঙালি প্রতিনিধিত্ব; (৬) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ঘন ঘন হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক অবদমন, ইত্যাদি।

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যদিও ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন প্রত্যাশিত ছিল, তথাপি ১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত তা স্থগিত থাকে। নানা অজুহাতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত করাটা আসলে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতারই পরিচয় বহন করে। এই দল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কংগ্রেসের মতো ১৯৪০-এর দশকের মুসলিম লীগ ছিল জাতীয়তাবাদী, বাম ও দক্ষিণপন্থী ইত্যাদি বহুমুখী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটি মিশ্র প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান ছিল তাদের সাধারণ লক্ষ্য। আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং দেশবিভাগ থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে এ দলে যোগদান করেছিল, তাদেরকে আর ধরে রাখা এ দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে মুসলিম লীগের বিভক্তি ও তা থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটতে দেখতে পাই। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এসব দলের জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। এই অধ্যায়ে এই নির্বাচনের পটভূমি, বিভিন্ন দলের নির্বাচনী কর্মসূচি, রাজনৈতিক তৎপরতা এবং এদের নির্বাচনোত্তর আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নির্বাচনের পটভূমি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছরেই (১৯৪৭-৫৪) জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষকরে পাকিস্তান মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক উপদলসমূহের মধ্যে ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়। পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর কাছে প্রায় অপরিচিত 'উর্দু'কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য লীগ নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন উদ্যোগ এই বিরোধকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের অসম বণ্টন ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। বস্তুত বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন পাকিস্তানের পূর্বাংশে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং এ অঞ্চলে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে উৎসাহিত করে, যা পরিণতিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রূপান্তরিত হয়। পার্ক ও হুইলারের মতে :

> ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা বুঝতে পারে যে, তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানীদের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়েছে; পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 'উপনিবেশ' হিসেবে ব্যবহার করছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাকে পরিহার করে উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ গৃহীত হলে এই মনোভাব আরো পুঞ্জীভূত হয়।

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি এই অসন্তোষের পাশাপাশি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি এবং অদক্ষতা পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তোলে।[১]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকেই পাকিস্তান গণপরিষদে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ অভিযোগ করেন যে, পূর্ব বাংলার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং একে পশ্চিম পাকিস্তানের 'উপনিবেশ' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[২] যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ বাস করতো পূর্ব বাংলায়, তবু রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে অসম বণ্টনের প্রকৃত অবস্থা পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের নগণ্য অবস্থানের দৃষ্টান্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৮৯৪ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছিলেন বাঙালি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে "সচিবালয়ে বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন না বললেই চলে এবং ঐ সময়ে কোন বিভাগেই সচিব পর্যায়ে কোন বাঙালি ছিলেন না।"[৩] সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য পাঞ্জাবী নিয়ন্ত্রণাধীন শাসক এলিট শ্রেণীর গৃহীত বিভিন্ন নীতির ফলে আরো ব্যাপক রূপ ধারণ করে।

১৯৪৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তাঁর নিজের জেলা ময়মনসিংহের একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের ফলে শূন্য আসনগুলির উপনির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন। এটি যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তৃণমূল পর্যায়ে মুসলিম লীগের জনসমর্থন নেই, তখন তিনি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের শেষদিকে প্রাদেশিক আইনসভার ৩৪টি আসন ছিল শূন্য। এমন পরিস্থিতিতে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্তব্য করেন, "এমনকি প্রাদেশিক আইনসভার কার্যকালও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্দেশে বাড়ানো হয়, অথচ কেন্দ্রীয় আইনসভা নিজেই স্বাধীনতার পূর্বে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল।"[৪]

১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরপরই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম যুগ্মসম্পাদক এবং পরবর্তীকালে এর সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের মুসলিম লীগের উপর আর কোন আস্থা নেই এবং তারা পূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম লীগকে উচ্ছেদ করতে ঐক্যবদ্ধ।[৫]

১. Richard L. Park and Richard S. Wheeler, "East Bengal Under Governor's Rule," *Far Eastern Survey*, 23 (1954), 129.
২. *Constituent Assembly of Pakistan Debates*, Vol. 2, No. 1 (February 24, 1948), 7
৩. Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change*, (New York 1980), 40
৪. G. W. Choudhury, *Democracy in Pakistan*, (Dacca 1963), 56-57.
৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট*, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, অক্টোবর ১৯৫৫, ২১।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশন দুটি কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সমমনাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দ্বিতীয়ত, এই অধিবেশনেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ২১ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুমোদিত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। দল চারটি হলো— আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯ সালে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), কৃষক শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩ সালে বাংলার অপর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), মওলানা আতাহার আলীর নেজাম-এ-ইসলাম এবং হাজি দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনী মোর্চা গঠন ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে কৌশলগত পদক্ষেপ। ঐ সময়ে বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মওলানা ভাসানী সংশ্লিষ্ট দলগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা গঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।[৬]

১৯৫৪ সালের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রাদেশিক পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩০৯ স্থির করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী ২৩৭টি আসন মুসলমানদের জন্য, ৩১টি সাধারণ আসন নিম্নবর্ণবহির্ভূত সাধারণ হিন্দুদের জন্য, ২৬টি আসন তফসিলী হিন্দুদের জন্য, ১টি আসন পাকিস্তানী খ্রিস্টানদের জন্য এবং ২টি আসন বৌদ্ধদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। মুসলমান, সাধারণ হিন্দু এবং তফসিলী হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য যথাক্রমে ৯, ১ এবং ২টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।[৭] কিন্তু নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ কমিটি যথাসময়ে সরকারের কাছে এর চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে না পারায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।[৮]

৬. M. Rashiduzzaman, "The Awami League in the Political Development of Pakistan", *Asian Survey*, X:7 (1970), 576. অধিকন্তু, যুক্তফ্রন্ট গঠনে কমিউনিস্টদের প্রভাব অগ্রাহ্য করা যাবে না। কমিউনিস্টরা, বিশেষকরে ময়মনসিংহ জেলার কমিউনিস্ট সদস্যরা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ঢুকে পড়েন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলগুলোর একটি নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের প্রস্তাব পাস করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৭. Election Commission of Bangladesh, *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly 1954*, (May 1977), 2.

৮. এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ সালের জুলাই-এ নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এলাকা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয় :
এইচ. এস. এম. ইসাহাক, সি. এস. পি. (চেয়ারম্যান), এনায়েতুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ) এবং এমদাদ আলী (বিশেষ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)। রিপোর্ট প্রণয়নের সমস্ত ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে।

প্রধান নির্বাচনী ইস্যু এবং প্রচারকৌশল

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত এর ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। ২১ দফা কর্মসূচিকে 'ভার্নাকুলার এলিট'[৯] অর্থাৎ বাঙালি এলিট শ্রেণীর কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের'[১০] চেয়ে সমাজের বিভিন্ন বৃহত্তর সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভোটারসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ এই কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়াও ২১ দফা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা রেখে অন্যান্য বিষয় পূর্বাঞ্চলের হাতে ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এই কর্মসূচির মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, রাজবন্দীদের মুক্তি, নূরুল আমিনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসকে 'বাংলা একাডেমী'তে রূপান্তরিতকরণ, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশের গুলিতে যে স্থানে ছাত্ররা শহীদ হন সেখানে 'শহীদ মিনার' নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই. এল. ও.) বিধান অনুযায়ী শিল্পশ্রমিকদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি, পাটশিল্প জাতীয়করণ ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তাবিধান এবং সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল (পরিশিষ্ট দ্র.)।

এটি স্পষ্ট যে, যদিও ২১ দফা মূলত বাঙালি এলিট গোষ্ঠীরই কর্মসূচি ছিল, তবু এতে শ্রমিক ও কৃষকদের দাবিদাওয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়-;- ফলে এই কর্মসূচি—

> খুব সহজেই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এই কর্মসূচি পূর্ব বাংলায় যারা মুসলিম লীগ শাসনের অবসান কামনা করছিলেন তাদের জন্য ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। সরকারপন্থী লোকজন কর্তৃক ২১ দফাকে একটি অবাস্তব কর্মসূচি হিসেবে প্রচার করা সত্ত্বেও জনগণ একে পূর্ব বাংলার 'মুক্তিসনদ' হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে।[১১]

তবুও এ কথা বলা দরকার যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে বৈপ্লবিক কোন কিছু ছিল না। কোন কোন দফায় অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে ভাবাবেগ ছিল বেশি।[১২] তা সত্ত্বেও ২১ দফায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

৯. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration,* (Dacca 1977), 47.

১০. S. F. Levin, "The Peoples Party" in A. M. Yakov (ed.), *Pakistan: History and Economy,* (Moscow 1959), 86. 21 দফা সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট।

১১. M. Rashiduzzaman, "The Awami League," 576.

১২. Abu Jafar Shamsuddin, *Sociology of Bengal Politics,* (Dacca 1973), 33.

যুক্তফ্রন্টের সুদক্ষ নির্বাচনী প্রচারণা নির্বাচকমণ্ডলীকে এ ধারণা দিতে সমর্থ হয় যে, মুসলিম লীগ 'গণবিরোধী', 'দুর্নীতিপরায়ণ' এবং এর শাসন পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া, যুক্তফ্রন্ট যে একটি শক্তিশালী নির্বাচনী জোট তা মুসলিম লীগ তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনে নি। এমনকি তারা জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন নির্বাচনী কর্মসূচি উপস্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়। ভোটারদের কাছে মুসলিম লীগের একমাত্র বক্তব্য ছিল, তারা একটি 'ইসলামিক শাসনতন্ত্র' প্রণয়ন করবে। লীগের মূল শ্লোগান ছিল দুটি—এক, 'ইসলাম বিপন্ন', দুই, 'পাকিস্তান বিপন্ন'। কাজেই মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ব বাংলার জনগণের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। ফলে মুসলিম লীগ ভোটারদের কাছে কোন প্রশংসনীয় বিকল্প তুলে ধরতে সক্ষম হয় নি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বিমান, বিশেষ ট্রেন ও স্টিমার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। এছাড়া মুসলিম লীগ এর প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চাওয়ার জন্য এক শ্রেণীর ভাড়াটে মওলানাকে নিয়োজিত করে। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের চেয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন গুণগতভাবে ভিন্ন ছিল। কেননা '৫৪ সালে অনেক নতুন ইস্যু নির্বাচনে প্রাধান্য পায়। বোধগম্য কারণেই পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান ইত্যাদি ছিল ভোটারদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লেখ করা দরকার যে, নির্বাচনব্যবস্থার রূপ কি হবে তা নির্বাচনে কোন ইস্যুতে পরিণত হয় নি। কারণ যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যেই এই প্রশ্নে মতপার্থক্য ছিল। ফ্রন্টের প্রধান দুটি দল কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আওয়ামী লীগের 'নির্বাচনব্যবস্থা' সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা ছিল না।[১৩] অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রশ্নটিও নির্বাচনী প্রচারণার সময় পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। যাহোক, যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সামরিক সাহায্য গ্রহণের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তিকে 'দাসত্বের চুক্তি'[১৪] বলে সমালোচনা করেন।

নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলি লীগকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। যেমন, *পাকিস্তান রিভিউ* পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে লীগকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয় :

১৩. মুসলিম লীগও পৃথক নির্বাচনকে এই নির্বাচনের কোন ইস্যুতে পরিণত করে নি

১৪. *Keesings Contemporary Archives*, April, 10-17, 1954, 13514

> বিরোধীরা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সাধারণ দাবিতে এমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে যাতে মনে করার কারণ রয়েছে যে, তারা কোন সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতেই এভাবে একত্রিত হয়েছে এবং যেকোন প্রকারে ক্ষমতালাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।[১৫]

অন্যান্য যেসব পত্রিকা নির্বাচনে মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেগুলি হলো *ডন* (করাচি), *মর্নিং নিউজ* (ঢাকা) এবং *দৈনিক আজাদ* (ঢাকা)। এসব পত্রিকায়ও পূর্ব বাংলার জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার অর্থ হলো পাকিস্তানের শত্রুদের সহায়তা করা। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সচেতন পূর্ব বাংলার জনগণকে এভাবে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয় নি। পূর্ব বাংলার জনগণ চেয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট যথেষ্ট শক্তি নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করুক। কেননা তারা মনে করেছিল, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলে তাদের দাবিসমূহ পূরণ করা সম্ভব হবে।

মুসলিম লীগ ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অন্যদিকে, যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অধিকন্তু, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব মুসলিম লীগের তুলনায় শক্তিশালী ছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীর মতো অভিজ্ঞ ও সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন নূরুল আমিন, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সবুর খানের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গ। তাছাড়া, মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, মিস ফাতেমা জিন্নাহ, আবদুল কাইউম খান এবং সরদার ইব্রাহিম খান প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতাদের উপরও নির্ভরশীল ছিল। এঁরাও নির্বাচনী প্রচারকাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পত্র-পত্রিকায় যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটনা করা হয় এবং বলা হয় যে, "যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য প্রচুর ভারতীয় অর্থ পূর্ব বাংলায় ছড়ানো হয়েছে", যার অর্থ হলো, ভারত আশা করছে যে, যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে সে লাভবান হবে। ২১ দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধেও একই ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। উল্লিখিত পত্র-পত্রিকায় এমন অভিযোগও করা হয় যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা ব্যবস্থার অবসান, পাকিস্তান-ভারত বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, পাকিস্তানী মুদ্রার অবমূল্যায়ন—এসব বিষয়ে যুক্তফ্রন্টের বক্তব্য উত্থাপন বিস্ময়করভাবে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্যই করা হয়। একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে :

> যুক্তফ্রন্টের নেতাদের কৌশল ছিল মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, বিশেষকরে ভাষাপ্রশ্নের উপর অধিকতর জোর দেয়া। এটা ছিল জনগণের কাছে স্পর্শকাতর বিষয় এবং এর

১৫: *The Pakistan Review,* 11: 3 (1954), 8.

মাধ্যমে জনসমর্থন অর্জন করা সহজতর ছিল। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল পাটের নিম্নমূল্য। পাটের এই নিম্নমূল্য পূর্ব বাংলার পাটচাষীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করে।[১৬]

অন্যান্য কতিপয় ইস্যুকেও যুক্তফ্রন্ট সামনে নিয়ে আসে, যেগুলি পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। যেমন, যুক্তফ্রন্টের নেতারা ঐ সময়ের 'লবণ সঙ্কটের' উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। লবণের মতো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এত বেড়ে যায় যে, ঢাকায় তখন এক সের লবণ অসৎ ব্যবসায়ীরা ১৬ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি করতো, অথচ স্বাভাবিক সময়ে প্রতি সের লবণের দাম ছিল দুই থেকে তিন আনা মাত্র। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতারা এই সঙ্কট সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিদানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

মুসলিম লীগ নেতাদের জন্য আরেকটি বিব্রতকর দিক ছিল ভাষার প্রশ্নে তাদের অসংবেদী মনোভাব। যেমন, ১৯৫৪ সালের ৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলে উপস্থিত ক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা দাবি করতে থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় বক্তৃতা দিতে হবে। বিক্ষোভের মুখে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে সক্ষম হন নি। জনসভায় সমস্বরে ধ্বনিত হয় : "মুসলিম লীগ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক।" পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং জনসভা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যদিও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী নির্বাচনের সময় ব্যাপকভাবে পূর্ব বাংলা সফর করেন, তবুও তিনি ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তারে সফল হন নি।

যুক্তফ্রন্টের জন্য এর বিভিন্ন শরিক দলের কর্মীরা ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রচারাভিযান ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য শহর থেকে সুদূর লোকালয়ে গিয়েও কাজ করতে থাকে। এমনকি ছাত্ররা ঘরে ঘরে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি প্রচার করার চেষ্টা করে। পূর্ব বাংলার খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতারা, যেমন মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতা জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে বহু জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবির পক্ষে বাঙালি জনমত সৃষ্টি করেন।[১৭] বাস্তবিকপক্ষে স্বায়ত্তশাসন ও ভাষার প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের প্রচারণা ভোটারদের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা আসলেই অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যাপক ছিল। প্রসঙ্গত

১৬. M. Rashiduzzaman, "The Awami League," 577.

১৭. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, (Dacca 1975), 33.

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ, ভাসানী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি দলকে (পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) সংগঠিত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন এবং সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক রাজনীতির চেয়ে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতেই অধিক আগ্রহী ছিলেন।

নির্বাচনের রায় : বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনসহ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার ৫ জন প্রভাবশালী সদস্যও পরাজয় বরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রিধারী তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে পরাজিত হন। খালেক নেওয়াজ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে ৭ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ আবদুস সেলিমের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলিম লীগের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতা, যেমন মোনায়েম খান, টি. আলী, খান এ. সবুর, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল প্রমুখ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত যে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, সে মুসলিম লীগের জন্য এই নির্বাচনের ফলাফল ছিল একটি চরম আঘাত। এমনকি "ইসলামের দোহাই এবং পৃথক নির্বাচনের ওয়াদাও মুসলিম লীগকে '৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি থেকে রক্ষা করতে পারে নি।"[১৮] সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে অবাধে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করেও মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার গণরায়কে পরিবর্তন করতে পারে নি। যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল বিজয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমি স্বার্থবাদীদের মোহমুক্তিই শুধু ঘটায় নি, তাদের ভীত-সন্ত্রস্তও করে তোলে।[১৯] নির্বাচনী ফলাফলে ২১ দফা কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পূর্ব বাংলার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের আশার সঞ্চার হয়।

সারণি ১-এ দেখা যায় যে, ৩০৪টি আসনের জন্য ১২৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২২৮টি আসনে ৯৮৬ জন প্রার্থী, ৩০টি সাধারণ আসনে ১০১ জন প্রার্থী এবং তফসিলী হিন্দুদের ৩৬টি আসনে ১৫১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অমুসলিম আসনগুলিতে মুখ্যত পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং সিডিউল্ড্ কাস্ট ফেডারেশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

১৮. M. Mahfuzul Huq, *Electoral Problems in Pakistan*, (Dacca 1966), 80.

১৯. A. K. Choudhury, *The Independence of East Bengal*, (Dhaka 1984), 14.

সারণি ১ : পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর সারসংক্ষেপ

নির্বাচনী এলাকা	মোট আসন	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আসন সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা	মোট ভোটারের সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী এলাকার মোট ভোটার	প্রদত্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। মুসলমান	২২৮	-	৯৮৬	১,৫১,৫৯,৮২৫	১,৫১,৫৯,৮২৫	৫৬,৯৯,৪২৭	৩৭.৬০
২। সাধারণ	৩০	২	১০১	২০,৯৫,৩৫৫	২০,৯৫,৩৫৫	৭,৭৬,৭২৬	৩৯.১৯
৩। তফসিলী হিন্দু	৩৬	-	১৫১	২৩,০৩,৫৭৮	২৩,০৩,৫৭৮	৭,৬৬,২৪৫	৩৩.২০
৪। মহিলা							
(ক) মুসলমান	৯	-	৩২	১,৬১,৯৬৬	১,৬১,৯৬৬	৬০,৭৫২	৩৭.৩১
(খ) সাধারণ	১	১	-	২৫,৭২৬	-	-	প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন
(গ) তফসিলী হিন্দু	২	১	৩	১৪,৭৮৫	৫,০১৪	১,৭৭৯	৩৫.৪৮
৫। পাকিস্তানী খ্রিস্টান	১	১	-	৪৩,৯১১	-	-	প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন
৬। বৌদ্ধ	২	-	১২	১,৩৬,৪১৭	১,৩৬,৪১৭	৩৯,২৮৭	২৮.৮০
মোট	৩০৯	৫	১,২৮৫	১,৯৯,৪১,৫৬৩	১,৯৭,৪৮,৫৬৮	৭৩,৪৪,২১৬	৩৭.১৯

উৎস : পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর উপর প্রণীত রিপোর্ট থেকে সারণিকৃত।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এই নির্বাচনে মুসলমান মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই আসনগুলির সব ক'টিতেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। '৫৪ সালের নির্বাচনে সন্ত্রাস, প্রতারণা, কারচুপি প্রভৃতি অনুসৃত হয়েছে বলে কোন মহল থেকে অভিযোগ উঠে নি। বাকেরগঞ্জ জেলায় ভোটারতালিকায় কিছু অনিয়ম ধরা পড়লে অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[২০] অমোচনীয় কালির ব্যবহার এবং 'পূর্ব বাংলা নির্বাচনী অপরাধ অধ্যাদেশ' জারি প্রার্থী ও ভোটারদেরকে নির্বাচনে অবৈধ উপায় ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে।[২১] মাত্র পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়। পাঁচটি আবেদনের একটিকে গভর্নর 'ভারত (প্রাদেশিক নির্বাচন, দুর্নীতি ও নির্বাচন আবেদন) আদেশ, ১৯৩৬'[২২] -এর তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ অনুচ্ছেদবলে তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন।

মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে শতকরা ৩৭.৬০ ভাগ ভোটার ভোটদান করেন। সমসাময়িক রেকর্ডের তুলনায় এ হার কম হলেও পুরনো যোগাযোগব্যবস্থা এবং মুসলমান মহিলা ভোটারদের রক্ষণশীলতার কথা বিবেচনা করলে এ হার কোন মতেই কম ছিল না।

কৌশলগত কারণে কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; এভাবে কমিউনিস্টরা ১৫টি আসনে জয়লাভ করেন। কমিউনিস্টদের মধ্য থেকে নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন হাজি মোহাম্মদ দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ আবদুল মতিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, সরদার ফজলুল করিম এবং মোহাম্মদ তোয়াহা। অন্যান্য যেসব কমিউনিস্ট প্রার্থী সাধারণ আসন (হিন্দু) থেকে নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন বিজয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন কান্তি রায়, পূর্ণেন্দু দস্তিদার এবং সুধাংশু বিমল দত্ত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলমান মহিলা আসন থেকে সেলিনা বানু নামে একজন মহিলা কমিউনিস্ট প্রার্থী রাজশাহী-পাবনা আসন থেকে নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে জাতীয় এলিট গোষ্ঠীর আধিপত্য নিঃশেষিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি তখনো ভূস্বামী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলায় জমিদারদের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী, যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের

২০. *Report of the Election to the East Bengal Legislative Assembly*, 1954, 18.

২১. ঐ।

২২. ঐ, ২০। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি এবং দুজন অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।

প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[২৩] নির্বাচিতদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিলেন নতুন, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং এঁদের অনেকেরই পূর্ব-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত ২২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩০ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়কে বিভিন্ন লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নির্বাচন কমিশনার এম. আজফার সংবিধান কমিশনের সামনে এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোর প্রধান কারণ ছিল, এ সরকার পূর্ব বাংলার প্রধান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করে নি[২৪] এবং তারা এক অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে মনে করে যে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ধারণাই ভোটারদের মুসলিম লীগকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল নির্মমভাবে প্রমাণ করে মুসলিম লীগ তখন পূর্ব বাংলার জনগণ থেকে কি পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়ের "তিন মূল স্থপতি ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁরা জনগণকে বিপুলভাবে জাগিয়ে তোলেন।"[২৫] ভোটারদের উপর ছিল তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব। কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর *A Social History of Bengal* গ্রন্থে মুসলিম লীগের এই বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন[২৬]:

এক. নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমর্থন ছিল না। স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অনেকে মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও এরা ছিলেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ।

দুই. জনগণ পাঞ্জাবীদের নিয়ন্ত্রণাধীন আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'ব্যালট বাক্সের' মাধ্যমে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

তিন. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের' দাবি পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়।

চার. উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মুসলিম লীগ ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুসলিম লীগের এই মনোভাব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে।

২৩. G W. Choudhury, *Democracy in Pakistan*, 58.
২৪. *Report of the Constitution Commission, Pakistan*, 1961, 67.
২৫. Syed Qamrul Ahsan, *Politics and Personalities in Pakistan*, (Dacca 1967), 94.
২৬. Kamruddin Ahmed, *A Social History of Bengal*, (Dacca 1970), 113-114.

পাঁচ. '৫২ সালে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। অসাংবিধানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ স্থগিত করার জন্যও বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ছয়. লবণ, কেরোসিন তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহিণীরাও সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। এটাও মুসলিম লীগের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।

মুসলিম লীগের মুখপত্র *দৈনিক আজাদের* মতে, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না পারা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি একগুঁয়ে বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি, সাধারণ জনগণ থেকে নেতৃবৃন্দের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের পরাজয়ের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২৭] মুসলিম লীগের পরাজয়ের আরো কারণ হলো, এ দল তখন যথাযথভাবে সংগঠিত ছিল না এবং ঐ সময় দলের কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। ফলে এই পরাজয় দলের মধ্যে সংস্কার ও এর পুনরুজ্জীবনের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করায়। যেসব বড় বড় শিল্পপতি মুসলিম লীগকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন তাঁরাও বেশ বিব্রত হয়ে পড়েন।

কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ এবং যুক্তফ্রন্টে বিভক্তি

১৯৫৪ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান ফজলুল হককে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য হলেন আশরাফউদ্দিন চৌধুরী (বেসরকারি সরবরাহ ও যোগাযোগ), আবু হোসেন সরকার (বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার) এবং সৈয়দ আজিজুল হক (শিক্ষা, শ্রম ও শিল্প)। এখানে উল্লেখ্য যে, আবু হোসেন সরকার অবিভক্ত বাংলার আইনসভার একজন সদস্য ছিলেন। এ.কে. ফজলুল হকের ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন তখন নেজাম-এ-ইসলাম পার্টিভুক্ত। হক মন্ত্রিসভার এমন কাঠামো 'যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ শরিক দলের মধ্যে মারাত্মক অসন্তোষ সৃষ্টি করে'।[২৮] বিশেষকরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন নি এবং এর পরিণতি হয় অশুভ।

নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং শরিক দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিগত মতভিন্নতার কারণে যুক্তফ্রন্টে খুব শীঘ্রই বিভক্তি দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের

২৭. *দৈনিক আজাদ*, ২২ মার্চ ১৯৫৪, সম্পাদকীয়।

২৮. Abu Jafar Shamsuddin, *Sociology of Bengal Politics*, 42.

বিভক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন লেখক বলেন, "যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচনী মোর্চা, নির্বাচন এবং মুসলিম লীগবিরোধিতাকে কেন্দ্র করে এই মোর্চা গড়ে উঠে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতাদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং অতি দ্রুত যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে পড়ে।"[২৯]

১৯৫৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা সফরকালে ফজলুল হক রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য রাখেন বলে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে আয়ান স্টিফেন্স বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কলকাতা সফরে গিয়ে অসতর্কভাবে এমন সব বক্তব্য রাখেন, যা পাকিস্তানের প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়।"[৩০] ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তিনি দেশে ফিরে "কেন্দ্রের সাথে পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দেবেন"—এই মর্মে তিনি কলকাতায় বক্তব্য রেখেছেন।[৩১] মুসলিম লীগ নেতাদের মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি তাঁর এ বক্তব্যকে 'সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত' বলে গণ্য করে। *পাকিস্তান রিভিউ*-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "কোন বিদেশী সরকারের সাথে উচ্চ পর্যায়ের নীতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর কাজ নয়, ঢাকায় তাঁর আসন যতো সুদৃঢ় হোক না কেন কিংবা তিনি যতো জনপ্রিয় নেতাই হোন না কেন।"[৩২]

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফজলুল হক আওয়ামী লীগ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর মন্ত্রিসভাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। যুক্তফ্রন্ট গণপরিষদ বিলোপ এবং অচিরেই কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী গণপরিষদে বলেন :

> গণপরিষদ বিলুপ্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না, কেননা এর সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের জন্যই ম্যানডেট দেয়া হয়েছে…তাছাড়া এমন কোন সাংবিধানিক বিধানও নেই যার অধীনে গণপরিষদ বিলুপ্ত করা যেতে পারে।… প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাদেশিক সরকার কি ধরনের হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের রূপ কি হবে সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনভাবেই মতামত দেয়ার জন্য ভোটদাতাদের আহ্বান করা হয় নি।[৩৩]

ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালি ও বিহারীদের মধ্যে সংঘাতময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ফলে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস্ এবং চট্টগ্রামের

২৯. Najma Choudhury, *The Legislative Process in Bangladesh Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58,* (Dacca 1980), 22.
৩০. Ian Stephens, *Pakistan: Old Country New Nation,* (London 1963), 293.
৩১. *Round Table,* September 1954, 401-2.
৩২. *Pakistan Review,* 11:6 (1954), 9.
৩৩. *Keesings Contemporary Archives,* 13514.

চন্দ্রঘোনা পেপার মিল্‌স্ (চট্টগ্রাম)-এর অবাঙালি শ্রমিক ও বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এতে বহু শ্রমিক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করে। হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে একজন 'স্বঘোষিত রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করেন। কেন্দ্রের শাসন জারি করার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কে.বি. সাঈদ-এর মতে :

> পূর্ব বাংলায় পাঞ্জাবের মতোই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ঘটে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ নেতারা ধর্মীয় বিভেদ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদেরকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়, আর পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট নেতারা, যাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে, যদিও শুধু পাঞ্জাবে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং পূর্ব বাংলায় প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার উপর বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[৩৪]

বস্তুত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা অংশত কেন্দ্রের হস্তক্ষেপজনিত কারণে এবং আংশিকভাবে তাঁদের নিজেদের দুর্বলতার কারণে পূর্ব বাংলায় একটি গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার সুযোগ হাতছাড়া করেন। কেন্দ্রের শাসন জারির পর সশস্ত্র পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় এ. কে. ফজলুল হক নিজ বাড়িতে অন্তরীণ হন। হক মন্ত্রিসভা বাতিলের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থান থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রায় ১৬শ' নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়।[৩৫] আটককৃতদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রাদেশিক পরিষদের আরো ৩০ জন সদস্য। আওয়ামী লীগের মুখপত্র *দৈনিক ইত্তেফাকের* উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।[৩৬]

পূর্ব বাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে বেশ ঘন ঘন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও প্রধানত অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের কারণে যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি।"[৩৭] পূর্ব বাংলায় এবং কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫৪-৫৮

---

৩৪. Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan*, 41.

৩৫. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশবছর*, (ঢাকা ১৯৮১), ৬১।

৩৬. ঐ।

৩৭. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics*, 33.

কালপর্বে পূর্ব বাংলায় তিনটি এবং কেন্দ্রে পাঁচটি সরকার গঠিত হয়। অধিকন্তু ঐ সময়ে দুই বছরের জন্য পূর্ব বাংলায় সরাসরি গভর্নরের শাসন জারি হয়।[৩৮]

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমত, এই নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচন। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে এবং তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। তৃতীয়ত, এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি ব্যাপক জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। চতুর্থত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এটি প্রথমে বিপুল আশার সঞ্চার করে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের বহুলাংশে মোহমুক্তি ঘটায়। শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, এই নির্বাচন পূর্ব বাংলায় আভিজাত্যিক মুসলিম লীগ শাসনের অবসান ঘটায়। বস্তুত এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ এমনভাবে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় যে, পুনরায় জনসমর্থন লাভ করা মুসলিম লীগের পক্ষে আর কখনো সম্ভব হয় নি।

অসাংবিধানিকভাবে হক মন্ত্রিসভা বাতিল এবং পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে আঞ্চলিক অসন্তোষ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত হতে থাকে। যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং উপদলীয় কোন্দলের কারণে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। তবুও '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

এক দশকেরও অধিক কাল পরে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচিতে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটে। বিশেষত ২১ দফা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ১৯ নং দফাটি আংশিক পরিবর্তন করে ৬ দফা কর্মসূচিতে গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের ৬ দফায় জোর দিয়ে বলা হয় যে মাত্র দুটি বিষয়—দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং অন্য সকল বিষয়, যেমন মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর ও রাজস্ব সংগ্রহ থাকবে প্রদেশগুলোর এখতিয়ারে। ৬ দফা কর্মসূচি অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এর মধ্যে তিনটি দফা অর্থাৎ ৩, ৪ ও ৫ নং দফা স্থায়ীভাবে বৈষম্য দূর করার জন্য আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক বিষয় প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী

৩৮. Rounaq Jahan, *Pakistan*, 48

মেনিফেস্টো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একইভাবে ৬ দফা কর্মসূচির মূল দাবিও ছিল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। ২১ দফা কর্মসূচির মতো ৬ দফা কর্মসূচিও বাঙালি জনগণের প্রাণের দাবি হয়ে দাঁড়ায়, তা এখানকার উদ্যোক্তা শ্রেণীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে এবং পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে ৬ দফার উপর গণভোট বলে ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি ৬ দফা দাবি থেকে একচুল পরিমাণও সরে দাঁড়ান নি, কেননা ৬ দফার প্রশ্নে কোন আপোসরফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। অন্য দিকে জেনারেল আইয়ুব খান, জুলফিকার আলী ভূট্টো, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতৃবর্গ ৬ দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জেনারেল আইয়ুব ৬ দফা উত্থাপনকারী নেতৃবর্গকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে এরা বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলার স্বপ্ন দেখছে। আইয়ুব এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, ৬ দফা একটি নিতান্ত 'অনিষ্টকর অভিসন্ধি' এবং এটি দেশের ধ্বংস ডেকে আনবে। পাকিস্তানের এলিট শাসকরা ৬ দফাকে কেবল তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়, দেশের সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্বের প্রতি হুমকি বলে মনে করেছিল, যার উপর তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি নির্ভর করতো।[৩৯]

আইয়ুব সরকার সবচেয়ে বড়ো ভুল করলো যখন এ সরকার শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলো এবং তাঁকে ও সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীর কতিপয় কর্মকর্তাকে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করলো।[৪০] এই মিথ্যা মামলার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। এটি পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তীব্রতর করে এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তাকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে আইয়ুব সরকার গুরুতর গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হয় এবং ব্যাপক গণআন্দোলন সারা দেশকে আলোড়িত করে।

পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয় ছাত্র সমাজ। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) একজোট হয়ে গঠন করে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এবং তারা সবাই আওয়ামী লীগের ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেন এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শেখ মুজিব ও অন্য সকল অভিযুক্তকে বিনাশর্তে মুক্তিদান করেন।

৩৯. M. Anisur Rahman, "East Pakistan: The Roots of Estrangment", *South Asian Review*, vol. 3, April 1970, 238-39.

৪০. দেখুন, *Pakistan Observer*, January 7 and 19, 1968.

অতঃপর আইয়ুব ১৯৬৯ সালের মার্চে উভয় প্রদেশের নেতৃবৃন্দের একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে শেখ মুজিব পুনরায় ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। গোলটেবিল বৈঠক রাজনৈতিক সংকট সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব ২৫ মার্চ ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেন। ইয়াহিয়া ক্ষমতাগ্রহণ করেই প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন।[৪১] তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই লক্ষ্যে তিনি একটি আইনগত কাঠামো অধ্যাদেশ জারি করেন। এদিকে মওলানা ভাসানীও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি জানান। মুজিব নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ তিনি নির্বাচনকে ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে গণভোট বলে গণ্য করেন।[৪২] শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর বেতার ও টেলিভিশনে তাঁর নির্বাচনী প্রচার পর্যায়ের ভাষণে ৬ দফার উপরই জোর দেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগের ৬ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত হয়। এই নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই বিস্ময়কর বিজয় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিক, সামরিক জেনারেল এবং রাজনৈতিক পরিদর্শকদের হতবাক করে দেয়। এমনকি শেখ মুজিব নিজেও এমন বিপুল বিজয় আশা করেন নি। স্পষ্টতই এই বিজয়ের ফলে আওয়ামী লীগের ভেতরে ও বাইরে ৬ দফা বাস্তবায়নের জন্য প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানীও শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করার আহ্বান জানান। ভুট্টো জোর দিয়ে বলেন যে তাঁর দলের নিকট "দুই বিষয়ভিত্তিক কেন্দ্র" ও "মুদ্রা" গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে আওয়ামী লীগ ৬ দফা সম্পর্কে আপোস করার সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা না দিলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় অধিবেশনে যোগদান করবে না।[৪৩] ভুট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের সঙ্গে আপোসমীমাংসা করতে অস্বীকৃতি জানান। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গের এই বিরোধ ও মতানৈক্য জেনারেল ইয়াহিয়াকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করার অজুহাত যোগালো। এভাবে বাংলাদেশের পক্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে ৬ দফার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণের শেষ আশাটুকু নস্যাৎ হয়ে গেল। যে ৬ দফা আন্দোলন মূলত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা এখন বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ

৪১. দেখুন, Dawn, March 27, 1969.
৪২. দেখুন, *Pakistan Observer,* October 26, 1970.
৪৩. Dawn, February 16, 1971.

করলো। তবু জেনারেল ইয়াহিয়া, মুজিব, ভূট্টো এবং অন্যান্য নেতাদের মধ্যে নিষ্ফল সংলাপ ও আলোচনা ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৬ দফা দাবি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে সংকট আরো ঘনীভূত করেছিল, যেমন পরিচিতি সনাক্তকরণ, অংশগ্রহণ ও বন্টনের সংকট, যা সমাধান করা সম্ভব হয় নি। এই সংকটের মধ্যে পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ শক্তিপ্রয়োগ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি সংকটাপন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যেখানে জনগণ রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার রাজনীতি নিয়ে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ, সেখানে দমনমূলক ব্যবস্থা বিপরীত ফল উৎপাদী ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যে দেশ প্রায় পঁচিশ বছর ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব বজায় রাখার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে

পরিশিষ্ট

২১ দফা কর্মসূচি*

নীতি

কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির প্রতিকূল কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারির তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র-উপকূলে কুটিরশিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার

* *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* : প্রথম খণ্ড, (ঢাকা ১৯৮২), ৩৭৩-৭৪

আমলের লবণ কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের আশু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সব ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত করে সব বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে এবং অল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও সুবিধাজনক ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত করা হবে।

১২. শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমিয়ে ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের মধ্যে একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারি ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করে বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত

ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

১৬. বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাঁরা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে একে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশন মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

১৭

স্থানীয় সরকার

ডালেম চন্দ্র বর্মন*

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের স্থানীয় শাসনের ছিল তিনটি স্তর : গ্রাম পঞ্চায়েত, জমিদারি কাছারি এবং পরগনা তহসিল। গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল মুগল স্থানীয় সরকারের মূলভিত্তি। পরগনা তহসিল প্রতিনিধিত্ব করতো সরকারি স্বার্থের। গ্রামবাসী ও সরকারের মিলনস্থল ছিল জমিদারি কাছারি। জমিদার ছিল একাধারে গ্রাম পঞ্চায়েত ও সরকারের প্রতিনিধি। এ ধরনের স্থানীয় সরকার ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী। অতএব, কর্নওয়ালিস পরিকল্পনায় (১৭৯৩) মুগল স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করে ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে এমন কতিপয় পদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন মুনসেফ, থানাদার ও জেলা কালেক্টর। যতোদিন রাজস্ব সংগ্রহই ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য, ততোদিন ঐ কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থাই অনুসৃত হয়েছে প্রায় অন্ধভাবে। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের পর বৃটিশদের ভারতনীতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। ১৮৬১ সন থেকে পর্যায়ক্রমে ভারতীয়দের প্রশাসনে অংশীদার করার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই উদারনীতির সবচেয়ে বেশি প্রতিফলন ঘটে রিপন প্রশাসনে। রিপন প্রশাসনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আধুনিক স্থানীয় প্রশাসনব্যবস্থার বিকাশ সাধন।

পল্লীর স্থানীয় সরকার

ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিশেষকরে পল্লী এলাকায় রাজস্ব আদায় এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। এই উভয় কাজই ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট জমিদারদের হাতে অর্পণ করা হয়। কিন্তু আর্থিক কারণে

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জমিদারগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থার ফলে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন পাস করা হয়। এ আইনের বিধানমতে জেলাকে বিভিন্ন 'ইউনিয়নে' ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের আয়তন হয় প্রায় ১০ থেকে ১২ বর্গমাইল, যার আওতায় থাকতো কতকগুলি গ্রাম। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের জন্য গঠিত হতো একটি কমিটি, যার সদস্যসংখ্যা হতো ৫ এবং এটি পঞ্চায়েত বলে পরিচিত হতো। এসব পঞ্চায়েত নিজ নিজ এলাকাধীন গ্রামসমূহে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকতো এবং এ কাজে চৌকিদার বা গ্রাম-পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করতো। চৌকিদারদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য এসব পঞ্চায়েতকে কর আদায়ের ক্ষমতাদান করা হয়।

পঞ্চায়েত কোন নির্বাচিত সংস্থা ছিল না। পঞ্চায়েতের সদস্যদেরকে মনোনয়ন দান করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি তাদের সদস্যপদ বাতিলও করতে পারতেন, এমনকি কোন কারণ না দর্শিয়েও। পঞ্চায়েতের সদস্যপদ গ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক প্রকৃতির এবং সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে জরিমানা আরোপসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা হতে পারতো। পঞ্চায়েতের মনোনয়নমূলক চরিত্র, পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক সদস্যপদ গ্রহণ, সদস্যপদ বাতিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের খামখেয়ালিপনা, কর্তৃত্বহীন দায়িত্ব এবং কোন রকম সেবার ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র কর আদায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পরে এই ব্যবস্থার আরো সংস্কার সাধন করা হয়।

বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮৫

এ আইনটি ১৮৮৫ সালের ৬ এপ্রিল বঙ্গীয় আইন পরিষদ কর্তৃক পাস হয় এবং ঐ বছরেই ১১ জুলাই তা গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে।[১] এ আইনটি ছিল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের সুপারিশের ফল। রিপনের শাসনামলের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্কার'।[২] তিনি ছিলেন একজন উদার চিন্তার মানুষ এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্থানীয় সরকারকে যদি প্রাণবন্ত হতে হয়, তবে তা স্থানীয় পরিবেশ হতে গড়ে উঠতে হবে; আর যদি তা কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলতেই হয়, তাহলে কমপক্ষে তার পরিকল্পনা স্থানীয় প্রশাসকদের দ্বারা বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করাতে হবে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা তৈরি অবস্থায় চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না।[৩] সে সময়ে বৃটেনে উপযোগবাদী দর্শনের জোয়ার বইছিল এবং সেখানে উদারনৈতিক সরকার গঠন এই আইন প্রণয়নে সাহায্য করেছে।

১. *Report on the Administration of Bengal,* 1885-86, (Calcutta 1887), 80.

২. Hugh Tinker, *The Foundations of Local Self-government in India, Pakistan and Burma,* (London 1924), 43.

৩. ঐ।

এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলার জনসাধারণকে তাদের স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণভাবে উৎসাহিত করা এবং দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।[৪] এ আইন বাংলায় ত্রি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় শাসন প্রবর্তন করে। প্রতি জেলায় জেলাবোর্ড, প্রতি মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইনের অধীনে গঠিত পঞ্চায়েতের সদস্যদের মতো নতুনভাবে প্রবর্তিত ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগণ মনোনীত ছিলেন না। তাঁরা ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। সদস্যসংখ্যা কোনভাবেই ৫ জনের কম বা ৯ জনের বেশি হতো না। ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা ও পাটনা এই ষোলটি জেলার লোকাল বোর্ডসমূহ দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতো। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। তবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যেকোন জেলাকেই আগে বর্ণিত ষোলটি জেলার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন।[৫] উভয় ক্ষেত্রেই লোকাল বোর্ডের সদস্যসংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো, যদিও সংখ্যা কোনমতেই ৬-এর কম হতে পারতো না। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট গভর্নর কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে জেলাবোর্ড গঠিত হতো। লোকাল বোর্ড সম্বলিত জেলায় জেলাবোর্ডের সদস্যসংখ্যার অর্ধেক লোকাল বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হতো এবং অন্য অর্ধেক অংশ সদস্য মনোনীত হতেন সরকার কর্তৃক।

রাস্তা ও যোগাযোগ, হাসপাতাল ও ঔষধালয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, টিকাদান, দুর্ভিক্ষসাহায্য, আদমশুমারি গ্রহণ, বসবাসের জন্য বাংলো রক্ষণাবেক্ষণ, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন, জনস্বার্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে এই সব বোর্ড ও কমিটিকে এ আইনের অধীনে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হয়। নিজ নিজ এলাকায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি অনুদান বিতরণের ব্যাপারেও তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ট্রামপথ, রেলপথ এবং পানি সরবরাহের কারখানা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরকারের পক্ষে সরকারি ভবন নির্মাণ অথবা গ্রহণের ব্যাপারেও এসব কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৬]

জেলাবোর্ড স্থানীয় সরকারের প্রধান কর্তৃপক্ষে পরিণত হয় এবং লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহ তার অধীনে কাজ করে। লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটিসমূহ

৪. *Report on the Administration of Bengal*, 80.

৫. ঐ।

৬. ঐ।

অত্যন্ত সীমিত পরিমাণ কাজ করতে পারতো। কারণ অর্থের জন্য তাদেরকে জেলাবোর্ডের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো।[৭] তা ছাড়া জেলাবোর্ডসমূহেরও টাকার বড় অভাব ছিল, যে কারণে খুব কম অর্থই নিম্নতম বোর্ড ও কমিটিসমূহকে তারা দিতে পারতো। বেঙ্গল জেলা প্রশাসন কমিটির রিপোর্টে (১৯১২-১৩) মন্তব্য করা হয়, "জেলাবোর্ডকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একটি ইউনিটে পরিণত করে এর মঞ্জুরির উপর অন্যান্য নিম্নবর্তী অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকে নির্ভরশীল করা একটি ভুল ছিল।"[৮] অবশ্য ১৯০৮ সালের বেঙ্গল এ্যাক্ট (পঞ্চম আইন, ১৯০৮)-এর দ্বারা ১৮৮৫ সালের এ্যাক্টের বিভিন্ন ধারার বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমন ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বিভিন্ন ভবন ও নদী, অরণ্য ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকাশ্য উপদ্রব প্রতিহতকরণের জন্য অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এসবের ব্যয় বহন করার প্রয়োজনে কর আরোপের ক্ষমতাও তাদেরকে দেয়া হয়।[৯] তা সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠান জীবনীশক্তি পায় নি। ইউনিয়ন কমিটি এবং ১৮৭০ সালের চৌকিদার পঞ্চায়েত আইনের দ্বারা সৃষ্ট চৌকিদারি পঞ্চায়েতসমূহের গ্রামপ্রশাসন সংক্রান্ত কাজকর্ম মোটেই সন্তোষজনক ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কাজ একই রকম হয়ে যেতো।[১০] তাই গ্রাম-কর্তৃপক্ষের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, যাতে ইউনিয়ন কমিটি চৌকিদার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পাদন করবে এবং একটি গ্রাম বিচারব্যবস্থাও গঠন করবে। আরো প্রস্তাব করা হয় যে, লোকাল বোর্ডের স্থলে সার্কেল বোর্ড গঠন করা হোক, যার পরিধি হবে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং যা গ্রাম-কর্তৃপক্ষের কাজকর্ম তদারক করবে, যেখানে সমগ্র ব্যবস্থাটিই সার্কেল অফিসার নিয়ন্ত্রণ করবেন।[১১]

১৯০৭ সালে সি. ই. এইচ. হবহাউসকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব ছিল ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক পরীক্ষা করা এবং মতামত দেয়া যে, বিকেন্দ্রীকরণ বা অন্য কোন উপায়ে সরকারি ব্যবস্থাকে সহজতর ও উন্নতর করতে হবে।[১২] এই কমিশনের নাম ছিল বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন এবং ১৯০৯ সালে এই কমিশন তার প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। কমিশনের তদন্তে তথ্য উদঘাটিত হয় যে, রিপন যেমনটি আশা করেছিলেন স্থানীয় সংস্থাসমূহ সেভাবে গড়ে উঠে নি। প্রতিবেদনের মতে, প্রতিটি দিক থেকেই পল্লীবোর্ডসমূহকে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডির মধ্যে

৭. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22,* (Calcutta 1923), 80-81.
৮. *The Bengal District Administration Committee Report,* 1912-13, (Calcutta 1914), 85.
৯. *Report on the Administration of Bengal, 1921- 22,* 81.
১০. ঐ।
১১. ঐ।
১২. Tinker, *Foundations of Local Self-government,* 64.

কাজ করতে হয়েছে। অতএব এটি মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ১৯০৮ সাল নাগাদও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারে নি। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদি কর্তৃক প্রতিনিধিত্বশীল 'সরকার পরিচালনায় প্রশিক্ষণ'-এর সঙ্গে গ্রামীণ জীবন তখনও সামিল হতে পারে নি। "গ্রামের জনসাধারণের মতামত সমন্বিত অভিযোগের আকারে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় যে, যদিও জেলাবোর্ড কর্তৃক আরোপিত কর তারা পরিশোধ করেছে, তথাপি তারা কখনো এর কোন উপকার পায় নি।"[১৩] কমিশনের সুপারিশে জোর দেয়া হয়, প্রশাসনের সাথে গ্রামের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করবে এমন যেকোন স্থায়ী কাঠামোর ভিত্তি অবশ্যই হবে গ্রাম।[১৪] তাই নতুন ধরনের গ্রামসরকারের মাধ্যম হিসেবে পঞ্চায়েত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা হয়, যার কাজ হবে ছোটখাটো আদালতি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তিকরণ, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণ, অল্প-বিস্তর পূর্ত কর্মসূচি গ্রহণ এবং গ্রাম্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা। আরো সুপারিশ করা হয় যে, পঞ্চায়েতের উপর তদারকি করবেন জেলাকর্মকর্তাগণ, জেলাবোর্ড নয় এবং তাদেরকে কোনমতেই ছোট ছোট কর্মকর্তার স্বৈরাচারের শিকারে পরিণত করা যাবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে সুপারিশসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় নি এবং ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানাদির ক্রমোন্নতির মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করে।[১৫]

১৯১৯ সালে বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ্ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট পাস হয় (পঞ্চম বি. সি. আর. ১৯১৯)। মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিফর্মস্-এর সুপারিশ ছিল এই এ্যাক্টটির ভিত্তি। এই রিফর্মস্ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করে[১৬] এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহে জনগণের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে যতোদূর সম্ভব এসব সংস্থার স্বাধীনতা ... বোর্ডসমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার এবং পল্লীবোর্ডসমূহ যাতে করদাতাদের প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে পরিগণিত হতে পারে সেজন্য ভোটদানের অধিকার এবং যোগ্যতা যতোদূর সম্ভব নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব করে।[১৭] জেলা পর্যায়ে জেলাবোর্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যবস্থা রেখে এই আইন একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই আইন মোতাবেক মহকুমা পর্যায়ের লোকাল বোর্ড বাতিল হয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের সংস্থার নাম ইউনিয়ন কমিটির পরিবর্তে ইউনিয়ন বোর্ড রাখা হয়।

১৩. ঐ, ৮৪।
১৪. ঐ, ৮৫।
১৫. ঐ, ১০৫।

১৬. Atiur Rahman, "Rural Power Structure : A Study of the Union Parishad Leaders in Bangladesh", *The Journal of Social Studies,* 4 : 94.

১৭. Mohammad Shah, *The Emergence of a Muslim 'Middle Class' in Bengal : Attitudes and Rhetoric of Communalism, 1880-1940,* unpublished Ph. D. dissertation, (London University 1990), 221.

প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এবং প্রায় ৮,০০০ লোক নিয়ে গঠিত হয় একটি ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতেন এবং বোর্ডসমূহকে তাদের সদস্যদের মধ্য হতে তাদের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার অধিকার দেয়া হয়। এসব বোর্ডকে প্রশাসনিক, মিউনিসিপ্যাল ও বিচারসংক্রান্ত কাজের অধিকার এবং এসব কাজের সমর্থনে তহবিল গঠনের জন্য মৌলিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

এই এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী সহজ প্রকৃতির ফৌজদারি ও আদালতি মামলার মীমাংসার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন আদালত গঠন করা যেতো।[১৮] গ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং ছোটখাটো মামলা নিষ্পত্তি ছাড়াও রাস্তাঘাট এবং সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নলকূপ বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা এবং আরো কিছু জনসেবা, যেমন বিভিন্ন সময়ে, বিশেষকরে দুঃসময়ে সরকার অনুমোদিত খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণের দায়িত্বও এর উপর বর্তায়। টিংকারের মতে, "সীমিত আকারে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের কাজকর্ম দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের আগেই এর অধীনে প্রবর্তিত রাজনৈতিক কর্মসূচির একটি পূর্বাভাস দিয়েছিল, কেননা এসব কাজের মধ্যে সংরক্ষিত (পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা) এবং হস্তান্তরিত উভয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল"।[১৯]

ন্যূনতম ৯ জন সদস্য নিয়ে জেলাবোর্ড গঠিত হতো, যদিও জেলার আকার ও জনসংখ্যা অনুসারে সাধারণত ১৮-৩৪ জন সদস্য নিয়েই জেলাবোর্ড গঠিত হতো। জেলাবোর্ডের উপর অর্পিত প্রধান দায়িত্বগুলো ছিল রাস্তাঘাট এবং যাতায়াতের অন্যান্য ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত, বিশেষকরে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, টিকাদান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থা সংরক্ষণ, বিশ্রামাগার স্থাপন ও সংরক্ষণ, খোঁয়াড় এবং পারাপারের ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ। দুর্ভিক্ষ ও সঙ্কট মুহূর্তে মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের কাজেও এর তহবিল ব্যবহৃত হতে পারতো।[২০]

জমির উপর ধার্য খাজনা থেকেই প্রধানত জেলাবোর্ডের আয় আসতো। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এ খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের অর্ধেক জনসেবাকর হিসেবে সরকারের বরাবর জমা দিতে হতো, কিন্তু ১৯১৩ সালে এ অর্থও জেলাবোর্ডকেই দেয়া হয়। জেলাবোর্ডের আয়ের অংশবিশেষ শিক্ষা ও চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আয় এবং খোঁয়াড় ও পারাপারের আয় হতেও আসতো। তবে সরকার ছিল আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা শিক্ষা, যাতায়াতব্যবস্থার উন্নয়ন, পশুচিকিৎসা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে তহবিল অনুমোদন

১৮. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22*, 81.

১৯. Tinker, *Foundations of Local Self-government*, 199-200.

২০. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22*, 82.

করতো।[২১] ইউনিয়ন বোর্ডের আয় ছিল মূলত নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত খোঁয়াড়ের আয়, জেলাবোর্ডের অনুদান এবং ইউনিয়নের অধিবাসীদের উপর ধার্যকৃত কর।

মৌলিক গণতন্ত্র

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্থানীয় শাসন প্রবর্তন করা হয় ১৯৫৯ সালে। বৃটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সময়ের মধ্যে উপমহাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়।

বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ্ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯-এর ব্যবস্থাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৯৫৬ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর অধীনে প্রবর্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল এই আইনপ্রণেতাদের ঘোষণামতে, "জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ" সাধন করা।[২২] ঘোষণা অনুযায়ী চার স্তরবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক কাঠামো চালু করা হয়, যেখানে ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে গঠন করা হয় যথাক্রমে থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল।[২৩]

ইউনিয়ন কাউন্সিল

প্রথমদিকে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় রকমের সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। কিন্তু ১৯৬২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের এক সংশোধনী দ্বারা মনোনয়ন প্রথা বাতিল করা হয়। নির্বাচিত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনগণের দ্বারা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে পরোক্ষভাবে সভাপতি/চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। এক অর্থে বলা যায় যে, ইউনিয়ন কাউন্সিল যেন পূর্ববর্তী ইউনিয়ন বোর্ডেরই অবিকল প্রতিরূপ, তবে দুটোর মধ্যে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন, কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন সরাসরি জনগণের ভোটে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ, যাঁরা আবার মৌলিক গণতন্ত্রী বা বেসিক ডেমোক্রেট (বিডি) বলে পরিচিত

২১. ঐ।

২২. Shah Nazrul Islam Chowdhury and M. A. Jabbar, "Development Orientation of Local Government in Bangladesh: The case of Union Parishad," *The Bangladesh Journal of Agricultural Economics*, 2: 1 (1979), 304.

২৩. There was a provision of the Provincial Advisory Council at the time of the promulgation of the Order in 1959 but it was abolished after the institution of Provincial Assembly under the 1962 Constitution of Pakistan.

ছিলেন, তাঁরা দেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবেও কাজ করতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের তেমন কোন বিশেষ অধিকার ছিল না। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ এভাবে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং অধিকতর ক্ষমতা উপভোগ করতেন। ১৯৬২-৬৩ সালে প্রবর্তিত পল্লী পূর্ত কর্মসূচি নামক একটি কর্মসূচি তাঁদের আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং পল্লীর জনগণকে তাদের নিজস্ব স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়নধর্মী কাজে গঠনমূলক ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যেই পল্লী-পূর্ত কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। এ কর্মসূচি ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের উপর স্থানীয় 'পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এই উভয় দায়িত্ব' অর্পণ করে। কর্মসূচির ম্যানুয়েলের নির্দেশানুযায়ী ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিয়নের জনসাধারণের সাথে পরামর্শক্রমে তৈরি হওয়ার কথা, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব একজন ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রজেক্ট কমিটির উপর অর্পিত ছিল।

থানা কাউন্সিল

থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানবৃন্দ, টাউন কমিটির চেয়ারম্যানবৃন্দ (যদি থাকে) এবং কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সরকারি সদস্য সমবায়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হতো। সরকারমনোনীত সদস্যসংখ্যা অবশ্য কোনক্রমেই 'প্রতিনিধি-সদস্য' নামে পরিচিত বেসরকারি সদস্যসংখ্যার বেশি হতো না।[২৪] কোন মহকুমার অধীনে থানা কাউন্সিলসমূহের চেয়ারম্যান হতেন উক্ত মহকুমার প্রধান কর্মকর্তা এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) হতেন ভাইস-চেয়ারম্যান। মহকুমা কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা উভয়েই পদাধিকারবলে থানা কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন। থানা কাউন্সিল প্রধানত সমন্বয়কারী ও পর্যবেক্ষণকারীর ভূমিকা পালন করতো। থানা কাউন্সিলের অধীনে সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির কাজকর্ম সমন্বয়ের কাজ ছিল এই থানা কাউন্সিলের। এলাকাধীন সকল ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং টাউন কমিটির উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় ও বাস্তবায়ন তদারক করার দায়িত্ব পালন করতো থানা কাউন্সিল। জেলা কাউন্সিলের নির্দেশমতো থানা কাউন্সিল কাজ করতো এবং স্বীয় কাজকর্মের জন্য থানা কাউন্সিল জেলা কাউন্সিলের কাছে দায়ী থাকতো।

জেলা কাউন্সিল

জেলা কাউন্সিল ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ এবং তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সরকারি ও নির্বাচিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতো। এই কাউন্সিলের নির্বাচিত

---

২৪. Muzaffer Ahmed Chaudhury, *Rural Government in East Pakistan,* (Dhaka 1969), 139.

সদস্যসংখ্যা কোনমতেই সরকারি সদস্যসংখ্যার কম হতে পারতো না। কোন নির্দিষ্ট জেলার অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট জেলা কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। সেখানে তাঁরা ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।[২৫] জেলা কমিশনার পদাধিকারবলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তবে কাউন্সিল তার প্রথম সভাতেই নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতো। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তিনি কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন ও সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতেন।

জেলা কাউন্সিলের তিন ধরনের কাজ ছিল— (১) বাধ্যতামূলক কাজ; (২) ইচ্ছামূলক কাজ এবং (৩) সমন্বয়মূলক কাজ। বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে এই কাউন্সিল জেলার মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণমূলক কাজ করতো। এজন্য এই কাউন্সিলকে জনগণের চলাচলের রাস্তা, সেতু, রাস্তার নিচে আচ্ছাদিত পয়ঃনালী নির্মাণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো এবং তা সংরক্ষণ, গণবাগান. গণখেলার মাঠ, গণস্থানের ব্যবস্থা করা ও সংরক্ষণ, পারাপারের ফেরির সংস্থান ও সংরক্ষণ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করতে হতো। গণস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য এই কাউন্সিল পশু-ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়সহ মানুষের জন্য ঔষধালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, ক্ষতিকর কাজকর্ম প্রতিহত ও হ্রাসকরণ, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিহতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং খাদ্যদ্রব্যকে ভেজাল থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতো। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে জেলা কাউন্সিল গণপাঠাগার সংরক্ষণ, খেলাধুলার আয়োজন এবং অন্যান্য উৎসবের ব্যবস্থা করতো। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুহূর্তে একে ত্রাণকার্যসহ কৃষি, শিল্প ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতে হতো। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এই কাউন্সিলের একটি বাধ্যতামূলক কাজ ছিল।

জেলা কাউন্সিলের ইচ্ছামূলক কাজের তালিকা ছিল অত্যন্ত বড় এবং তহবিলের অর্থবল অনুযায়ী যেকোন অথবা সকল কাজই এই কাউন্সিল করতে পারতো। এসব কাজকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, আর্থিক কল্যাণ, গণস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এই কাউন্সিল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ও সংরক্ষণ, বৃত্তিদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান ও ভর্তুকি প্রদান, শিক্ষামূলক সমিতি গড়ে তোলা ও

২৫. শুরুতে জেলা কাউন্সিলে ি সদস্য ছিল না। নির্বাচিত সদস্যের ব্যবস্থা হয় ১৯৬২ সালের সংশোধনী আইনের অধীনে

তাদেরকে সহায়তা দান, শিক্ষাসংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা, শিক্ষাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বয়স্কশিক্ষার উন্নয়ন সাধন, বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ ও খাদ্য সরবরাহ করা, পুস্তক প্রকাশ ও ছাপাখানার ব্যবস্থা করা, এতিম ও অভাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিমূল্যে পুস্তক দান, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রির জন্য বই-পুস্তক ও কাগজপত্রসহ অন্যান্য দ্রব্যের দোকান পরিচালনা ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারতো। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এই কাউন্সিল যে কাজ করতো তার মধ্যে ছিল তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, সাধারণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন, গণস্থানে ও গণপ্রতিষ্ঠানে রেডিওর ব্যবস্থা, যাদুঘর, প্রদর্শনী ও চারুশিক্ষা প্রদর্শনশালা, সর্বসাধারণের মিলনস্থান এবং গণমিলনায়তন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, গণশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পল্লী পুনর্গঠন, স্বাস্থ্যবিধি, গণউন্নয়ন, কৃষি, শিল্প, গো-প্রজনন এবং জনকল্যাণমূলক অন্যান্য বিষয়ে তথ্যপ্রচার ইত্যাদি। জেলা কাউন্সিলের সমাজকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে থাকতো কল্যাণগৃহ, আশ্রয়কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবাসদন এবং নিগৃহীতদের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংরক্ষণ, নিঃস্বদের মৃতদেহ সমাহিত ও দাহকরণ, ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া, ক্ষতিকর ঔষধ ও মাদকদ্রব্য সেবন, শিশুঅপরাধসহ অন্যান্য সামাজিক অপরাধ প্রতিহত করা; জনগণের মাঝে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর বিকাশসাধন এবং সংকীর্ণতা, বর্ণবাদ, উপজাতিবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং প্রাদেশিকতাবাদকে নিরুৎসাহিতকরণ, স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা সংগঠন প্রতিষ্ঠা, গরিবদের আইনগত পরামর্শদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সমাজকল্যাণে সহায়তাকারী অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। জনগণের আর্থিক উন্নয়ন সাধনের জন্যও জেলা কাউন্সিল বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতো। যেমন আদর্শ কৃষিখামার সংগঠন ও সংরক্ষণ, কৃষির উন্নয়নপদ্ধতি জনগণের মধ্যে প্রচার ও বিস্তার, কৃষির উন্নত যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকদের ব্যবহারের জন্য ধার দেয়া এবং পতিত জমি চাষের অধীনে আনার ব্যবস্থা করা, কৃষিশিক্ষা বিস্তার এবং বাজারব্যবস্থাসহ কৃষি উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ। গণস্বাস্থ্যের উন্নয়নে এই কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো গণস্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাকার্যক্রম ও ম্যালেরিয়ানিরোধ প্রশিক্ষণপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন ও সংরক্ষণ, চিকিৎসাসাহায্য দান সংক্রান্ত সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান ও এর উন্নতিবিধান, পশুপাখির রোগ নিবারণ কর্মসূচি গ্রহণ, পশুপাখির মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জেলার অন্তর্গত স্থানীয় কাউন্সিলসমূহ, মিউনিসিপ্যাল সংস্থাসমূহ এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের সকল কাজের সমন্বয়সাধন জেলা কাউন্সিলের একটি দায়িত্ব ছিল। জেলা কাউন্সিল জেলার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করে তা বিভাগীয় কাউন্সিল বা অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতো, জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কাজ

পর্যালোচনা করতো এবং সকল বিভাগের সমস্যা বিবেচনা করে সমস্যা সমাধান, অবস্থার উন্নয়ন বা সাধারণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতো।[২৬]

বিভাগীয় কাউন্সিল

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের অধীনে বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল স্থানীয় সরকারের তৃতীয় স্তর। সরকারমনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো এ কাউন্সিল। তবে অধ্যাদেশ জারির অব্যবহিত পরে বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল সম্পূর্ণরূপে মনোনীত, যার অর্ধেক ছিল সরকারমনোনীত সদস্য এবং বাকি অর্ধেক ছিল মনোনীত বেসরকারি সদস্য—সরকারি সদস্যদের সংখ্যা কোনক্রমেই বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারতো না।

বেসরকারি নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের বিধান ১৯৬২ সালের সংবিধান চালু হবার সাথে সাথে প্রবর্তিত হয়। নির্বাচিত সদস্যগণ ছিলেন দু'ধরনের। এক গ্রুপ জেলা কাউন্সিলসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং অন্য গ্রুপ মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ক্যান্টনমেন্টবোর্ডসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতেন। নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা মনোনীত সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে কম হতো না। বিভিন্ন সংস্থা, যেমন জেলা কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যাল কমিটি এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহে আসনসংখ্যা নির্ধারিত হতো জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে মিউনিসিপ্যাল এলাকার জন্য কমপক্ষে একটি আসন বরাদ্দ করা হতো।

বিভাগীয় কাউন্সিলের অফিসিয়াল সদস্য ছিলেন জেলা কাউন্সিলসমূহের চেয়ারম্যানগণ এবং সরকারনির্ধারিত অফিস-কর্মকর্তাগণ। এই কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যগণ বিভাগস্থ জেলা কাউন্সিলের মিউনিসিপ্যাল কমিটি এবং ক্যান্টনমেন্টবোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকারবলে এই কাউন্সিলের সদস্য থাকতেন এবং এর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। তিনি বিভাগের সকল সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং বিভাগের নিত্যদিনকার প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্যও দায়ী থাকতেন। বিভাগীয় কাউন্সিলের কাজ ছিল মূলত সমন্বয়মূলক। বিভাগের সীমানাভুক্ত স্থানীয় সংস্থাসমূহ, মিউনিসিপ্যাল সংস্থা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন ছিল এই কাউন্সিলের দায়িত্ব। এই কাউন্সিল বিভাগের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও তা সরকারের কাছে প্রেরণ করতে পারতো, বিভাগীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে পারতো এবং বিভাগীয় প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করতে পারতো। তাছাড়া এই কাউন্সিল মৌলিক

২৬. Article 34, *Basic Democracies Order,* 1959.

গণতন্ত্র অধ্যাদেশ অনুযায়ী জেলা কাউন্সিলসমূহের জন্য নির্ধারিত কাজের ভার কোন বিশেষ জেলা কাউন্সিল বা সকল জেলা কাউন্সিলের পক্ষে সরকার নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বিভাগীয় কাউন্সিলের উপর অর্পণ করতে পারতো।[২৭]

পৌর সরকার

বাংলা প্রদেশে প্রবর্তিত প্রথম মিউনিসিপ্যাল আইন ছিল ১৮৪২ সালের দি বেঙ্গল পিপলস্ এ্যাক্ট (১০ নং আইন, ১৮৪২)। এই আইনটি ছিল একটি আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ। তবে এর আগেও অনেক আইন পাস হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে বাংলায় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮১৩ সালে শহর চৌকিদারের জন্য প্রথম স্থানীয় কর প্রবর্তনের মাধ্যমে। ঐ বছরের ১৩ নং রেগুলেশন ঢাকা শহরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চৌকিদার নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম একটি বিশেষ কর আরোপের বিধান প্রবর্তন করে। ১৮১৪ সালের ৩ নং রেগুলেশন অন্যান্য শহরের জন্যও অনুরূপ বিধান নির্দিষ্ট করে এবং ১৮১৬ সালের ২২ নং রেগুলেশন আরো অধিক সংখ্যক শহরের জন্য চৌকিদারের ব্যবস্থা দ্বারা প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে। এ রেগুলেশনটি তাই ১৮১৩ সালের ১৩ নং রেগুলেশন ও ১৮১৪ সালের ৩ নং রেগুলেশনকে আরও শক্তিশালী করে। পরবর্তীকালে ১৮৩৭ সালের ১৫ নং আইনের মাধ্যমে এসব রেগুলেশনকে মার্জিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট শহরসমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও মেরামতের জন্য আরোপিত করের একটি অংশ ব্যয়ের আইন করা হয়। যেমন একজন করদাতার সর্বোচ্চ করের পরিমাণ মাসিক ২.০০ টাকা ধার্য করা হয়। স্থানীয় উন্নয়নের জন্য এটাই ছিল সর্বপ্রথম কর।[২৮]

১৮৪২ সালের আইন মিউনিসিপ্যাল সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ এনে দেয়। তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। কেননা এই এ্যাক্টের অধীনে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনে উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল শহরের বাড়ির মালিকদের উপর, তাও আবার যদি দুই-তৃতীয়াংশ মালিক চাইতেন তবেই। ফলে খোদ বাংলাতেই এ্যাক্টটি অব্যবহৃত থেকে যায়। এ বিশেষ সমস্যাটি নিরসনের জন্য মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৮৫০ পাস করা হয়, যা ১৮৪২ সালের আইনের পরিমার্জন করে এবং এতে বলা হয় যে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের উদ্যোগ সরকারি প্রশাসনযন্ত্রই গ্রহণ করবে। এই আইনটিও বাংলার জন্য তেমন সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে নি যদিও অন্যান্য প্রদেশ আইনটির সদ্ব্যবহার করেছে। এই আইনের অধীনে মিউনিসিপ্যাল কমিটিসমূহ ময়লা ইত্যাদি নিষ্কাশনপূর্বক শহর পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তা মেরামত ও তাতে আলোর ব্যবস্থা করা, উপবিধি প্রণয়ন এবং তা প্রয়োজনবোধে জরিমানা আরোপের মাধ্যমে পরিচালিত

---

২৭. Chaudhury, *Rural Government*, 165

২৮. S. D. Khan, "Place of Municipality in the Socio-Economic Structure of Pakistan", in M. A. Hussain (ed.), *Problems of Municipal Administration*, (Dhaka 1968), 55.

করার দায়িত্ব পালন করতে পারতো। পরোক্ষ কর ধার্যকরণ করারোপক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯]

টাউন পুলিশ এ্যাক্ট নামে আরেকটি আইন পাস হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। এ্যাক্টটির উদ্দেশ্য ছিল ১৮১৬ সালের ২২ নং রেগুলেশনের পরিবর্তন সাধন করা এবং বাসিন্দাদের মতামত ব্যতিরেকেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তাদের উপর স্থানীয় কর আরোপ করার অধিকার প্রদান। সংশ্লিষ্ট শহরের জন্য পঞ্চায়েত নিয়োগের ক্ষমতাও এই এ্যাক্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করে। পঞ্চায়েত হোল্ডিং-এর মূল্যায়ন করতে পারতো এবং তার মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ হারে কর ধার্য করতে পারতো। বাংলার বেশ কয়েকটি শহরে এই আইন প্রবর্তিত হয়। তবে বাংলায় মিউনিসিপ্যাল সংগঠন গড়ে তুলতে আরো কয়েক বছর সময় লাগে এবং একমাত্র জেলা মিউনিসিপ্যাল উন্নয়ন আইন, ১৮৬৪ পাস হবার পরই ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলীতে এসব সংগঠন গড়ে উঠে। এই আইন মিউনিসিপ্যাল কমিটি নিয়োগের মাধ্যমে যেকোন শহর বা উঠতি শহুরে এলাকার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করে। বাসিন্দাদের দ্বারা আবেদনের আনুষ্ঠানিকতা বিলোপ করা হয়। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যেখানে বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট শহর বা শহরসমূহের কমপক্ষে ৭ জন বাসিন্দা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে কমিশনার হিসেবে কাজ করতেন। সম্পত্তিকর ছিল আয়ের প্রধান উৎস, যা একটি বাড়ির জন্য মাসে সর্বাধিক ৭.০০ টাকা হতে পারতো। অবশ্য, প্রয়োজনে জীবজন্তু, শকট ইত্যাদির উপর মিউনিসিপ্যালিটি কর আরোপ করতে পারতো। এই করের প্রথম অংশ শহরের পুলিশদের রক্ষণাবেক্ষণকাজে ব্যয় হতো এবং অবশিষ্ট অংশ রাস্তাঘাট, শহর পরিষ্কারপরিচ্ছন্নকরণ, ক্ষতিকর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, টিকাদান ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যেতো।[৩০] ১৮৬৪ সালের আইনটি ছিল মূলত বড় বড় শহরের জন্য এবং তাই বিশেষকরে ছোট শহরে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ সালে দি ডিস্ট্রিক্ট টাউন এ্যাক্ট (৬ নং আইন) নামে একটি আইন বেঙ্গল কাউন্সিলে পাস হয়। এই আইন একদিকে যেমন ১৮৬৪ সালের আইনের তুলনায় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গড়ে তোলার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহরে ১৮৫৬ সালের টাউন পুলিশ এ্যাক্টের প্রয়োগ রহিত করে তার পরিবর্তে এসব শহরে টাউন কমিটি গঠন করার ক্ষমতা প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট শহরের কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হতো এবং এর কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য হতেন সরকারি কর্মকর্তা, যাঁদেরকে সাধারণত ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত করতেন। ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত না করলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যগণ তাঁদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন।

২৯. Tinker, *Foundations of Local Self-government*, 29-33

৩০. Khan, "Place of Municipality ", 56.

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৬৮ সালের আইনের অধীনে গঠিত টাউন কমিটিসমূহ নির্বাহী সংস্থা ছিল না। তাদের দায়িত্ব ছিল পরামর্শদানের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করা এবং এভাবে এসব কমিটির উপর সরকারি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত বেশি।[৩১]

তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মেয়োর আর্থিক প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল হিসেবে ১৮৭১ সালে বেঙ্গল রোড সেস্ আইন পাস হয়। এই আইন পরিবহনব্যবস্থা নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ শতকরা ৩ ভাগ রোড সেস্ আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে, যা জেলা অথবা তার নিচের পর্যায়সমূহে নিয়মিত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের বাইরে উপরোক্ত রোড সেস্ আরোপ ও সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। বাংলার স্থানীয় সংস্থাসমূহের জন্য পূর্বে প্রবর্তিত সকল আইনকে সংহত ও সুসম্বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর বেঙ্গল কাউন্সিলে একটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিলে বিভিন্ন শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির কর আরোপের একটি কঠোর এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে করব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাবও ছিল।[৩২] কিন্তু তৎকালীন ভাইসরয় নর্থব্রুক সেই প্রস্তাবের উপর এই বলে ভেটো প্রদান করেন যে, প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল কর বৃদ্ধি ঐ সময়ে দৃশ্যত যুক্তিযুক্ত ছিল না—যদিও পরবর্তীকালে মিউনিসিপ্যাল আইনের কিছু কিছু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্য একটি বিলে তাঁর সম্মতি প্রদানে তাঁকে রাজি করানো গিয়েছিল। প্রস্তাবটি ১৮৭৩ সালের দি মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট (৬ নং আইন, ১৮৭০) নামে পরিচিত হয় এবং প্রথমবারের মতো বিশেষকরে ১৮৬৪ সালের দি ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইম্প্রুভমেন্ট এ্যাক্টের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় শহরে কর প্রদানকারীদের দ্বারা কমিশনার নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করে। এসব মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একজন নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান রাখার বিধানও এই আইনে ছিল।[৩৩] ১৮৭৪ সালে কিছু বর্ধিষ্ণু মিউনিসিপ্যাল কাজ, যেমন জবাইখানা সংরক্ষণ, ভাড়াটে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ, জীবজন্তুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ, জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কতিপয় বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭৬ সালে প্রবর্তিত মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের মাধ্যমে তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত সকল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আরেকটি প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। এই আইনে চারটি আইনের অধীনে গঠিত মিউনিসিপ্যাল সংস্থাসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ১৮৬৪ সালের আইনে গঠিত মিউনিসিপ্যাল সংস্থাসমূহকে প্রথম শ্রেণীর এবং ১৮৬৮ সালের আইনের

৩১. Rokeya Rahman Kabeer, *Administrative Policy of the Government of Bengal*, 1870-90, (Dhaka 1965), 7.

৩২. Syed Giasuddin Ahmed, *Emergent Leadership Pattern in the Pourasavas of Bangladesh : A study of the Administrative Proceedings of Candidates who contested for the Elective Offices in Municipalities in the Election 1973* (Monograph), Dhaka University 1974, 14

৩৩. Khan, "Place of Municipality", 57; also see Ahmed, *Emergent Leadership*, 15.

অধীন মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আর ১৮৫৬ সালের ২০ নং আইনের অধীন এবং ১৮৫০ সালের আইনের অধীন শহরসমূহকে যথাক্রমে ইউনিয়ন ও স্টেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব সংস্থার কাজ, দায়িত্ব, এমনকি গঠনপ্রকৃতি অপরিবর্তিতই থেকে যায়, যেখানে কতিপয় শহর ও নগর ব্যতীত সবক্ষেত্রে কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। অবশ্য কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ করদাতা লিখিতভাবে ইচ্ছা ব্যক্ত করলে যেকোন সংখ্যক অথবা সকল কমিশনারকে নির্বাচিত করার বিধানও ঐ আইনে ছিল।[৩৪] স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পদাধিকারবলে মিউনিসিপ্যাল সংস্থার সদস্যপদে বহাল থাকেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। তবে কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য থেকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে পারতেন। পরবর্তী বছরসমূহে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মপরিসর প্রসারিত করা হয় এবং প্রথম শ্রেণীর সকল মিউনিসিপ্যালিটিই ব্যক্তিগত শৌচাগার পরিষ্কারকরণ এবং সেস্-পুলের কর্তৃত্বের দায়িত্ব লাভ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ সালের আইনের অধীনে করারোপের কর্তৃত্বও লাভ করে। ১৮৮০ সালে টিকাদান বাধ্যতামূলক করার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ আরো সম্প্রসারিত হয়।[৩৫]

পূর্বে প্রবর্তিত মিউনিসিপ্যাল আইনসমূহকে সমৃদ্ধ করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৪ সালে আরেকটি আইন পাস হয় ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়, যিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্কার ও নবায়নকে তাঁর আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে দাবি করেন। আইনটি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৮৮৪ (১৮৮০ সালের আইন) নামে খ্যাত এবং এই আইন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যকার পার্থক্য নিরসন করতে প্রণীত হয়। তাছাড়া ইউনিয়ন ও স্টেশনসমূহ মিউনিসিপ্যালিটির সাদৃশ্য হারায়, যার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৮৮৫ প্রয়োজনীয় বিধান প্রবর্তন করে। সরকারের আদেশে নির্দিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া সকল মিউনিসিপ্যালিটিতেই নির্বাচনের বিধান করা হয় এবং উন্নত মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের অধিকারপ্রাপ্ত হন। এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য সরকারি অনুমোদনের বিধানটিও রহিত করা হয়। নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন ও নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীনতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারেন তারও ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়।[৩৬] করারোপ ও অতিরিক্ত করারোপের জন্য সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ মিউনিসিলিটিসমূহের জন্য

৩৪. ঐ।

৩৫. ঐ।

৩৬. Kabeer *Administrative Policy* 39

আবশ্যকীয় করা হয়। এসব সংস্থা যেসব অভিকর (rate) এবং কর আরোপ করতে পারতো তা ছিল নিম্নরূপ :

ক. মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে বাড়িমালিকদের উপর কর;

খ. বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর এবং তার অতিরিক্ত নিম্নরূপ কর :

১. গাড়ি, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর কর ;

২. গাড়ি নিবন্ধনের উপর ফি ;

৩. ফেরি, পুল ও পাকা রাস্তার উপর কর ;

৪. পানিকর (একটি সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত) ;

৫. আলোকিতকরণ বাবদ কর (বার্ষিক মূল্যের সর্বোচ্চ শতকরা ৩ ভাগ) ;

৬. শৌচাগার পরিষ্কারকরণের জন্য কর।[৩৭]

পরবর্তীকালে বাংলার মিউনিসিপ্যাল সংস্থার কার্য সম্প্রসারিত ও সুসমৃদ্ধ করে আরো অনেক আইন পাস হয়। ১৮৯৪ সালের ৪ নং আইন স্যানিটারি বোর্ড গঠন, পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার বিধান প্রবর্তন করে। ১৮৯৬ সালের ২নং আইনে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে তাদের তহবিলের কিয়দংশ কতিপয় জনকল্যাণমূলক কাজে, যেমন মুক্তস্থানের ব্যবস্থা, পাঠাগার, মাতৃসদন ও জীবজন্তুর জন্য যত্নকেন্দ্র স্থাপনের কাজে ব্যয় করতে ক্ষমতা দেয়া হয়। বিকেন্দ্রীকরণের উপর রাজকীয় কমিশন (১৯০৭-১৯০৯) মিউনিসিপ্যালিটির অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অধিকতর গণতান্ত্রিক বিধান প্রবর্তনের সুপারিশ করে। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের কারণেই সেসব সুপারিশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে সরকার ঘোষণা করেন যে, সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতে 'দায়িত্বশীল সরকার' প্রতিষ্ঠা করবেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে, যাতে প্রদেশসমূহে গ্রামীণ ও শহুরে উভয় স্থানীয় শাসনের বিষয়টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে পরবর্তীকালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে স্থানীয় সংস্থাসমূহের ক্রমবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়—একবার ১৯২০ দশকের শেষদিকে আবার ১৯৩০-এর দশকে। জাতীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসব সংস্থাকে ব্যবহার করা হয় এবং বিশেষকরে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে জাতীয়তাবাদীগণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁদের রাজনৈতিক প্লাটফরমে রূপান্তরিত করেন। অবশ্য নির্বাচকমণ্ডলী ধীরে ধীরে বর্ধিত হারে স্থানীয় নির্বাচনের প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে বিশেষত রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে শহরাঞ্চলে। তবে একই কমিশনারদের বার বার নির্বাচিত করার

৩৭. S. D Khan, " Evolution of Municipality in Bangladesh," S. Hussain (ed.), *Urban Affairs*, (Dhaka 1972), XVI-XVII, also see Ahmed, *Emergent Leadership*, 18.

প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং পেশায় উকিলগণই ছিলেন সর্বাধিক।[৩৮]

রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে বঙ্গীয় আইন কাউন্সিল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট, ১৯৩২ নামে একটি আইন পাস করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ১৮৮৪ সালের আইন ও তৎপরবর্তী সংশোধন-সংযোজনসমূহকে একটি 'কোড অব ল'তে সন্নিবেশিত করা এবং পূর্ববর্তী আইনসমূহের অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ বাতিল করা। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে তাদের সীমানাভিত্তিক ক্ষমতাকে আরো বর্ধিত করাও এই আইনের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য নতুন মিউনিসিপ্যালিটি গঠন, বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সীমানা ও কমিশনারের সংখ্যা নির্ধারণ এবং নির্বাচনপদ্ধতি ১৮৮৪ সালের অনুরূপই থেকে যায়। ব্যতিক্রম যা সাধন করা হয় তা ছিল ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে চার-পঞ্চমাংশ এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত সদস্যের বিধান। ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারতো। নির্বাচন ছিল যৌথ প্রকৃতির। তবে নির্বাচিত আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের বিধান ছিল। ভোটদানের প্রক্রিয়াটি ছিল গোপনীয়। তবে নির্বাচনী কোন প্রতীকের প্রবর্তন করা হয় নি। কমিশনারগণ নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন।[৩৯] অভিকর ও কর আরোপ এবং তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা পরবর্তীকালে আরো বর্ধিত ও নির্দিষ্ট করা হয়। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেও আইন প্রণীত হয়।[৪০] এভাবে স্থানীয় সরকারের বিকাশে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের উপাদানের পাশাপাশি সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণের উপাদানও পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত রাজনৈতিক সংস্কারও স্থানীয় সংস্থাসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তির পূর্বে রাজনৈতিক উত্থান-পতন বাংলায় মিউনিসিপ্যাল সংস্থার বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

এভাবে ১৯৪৭ সালের ভারতবিভাগের মাধ্যমে এই উপমহাদেশে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ভারতবিভক্তি এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এর ফলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়। আসাম মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯২৩ দ্বারা পরিচালিত সিলেট জেলার ৫টি মিউনিসিপ্যালিটিসহ পূর্ব বাংলা ৫০টি

৩৮. Tinker, *Foundations of Local Self-government*, 156-161, আরো দ্রষ্টব্য, Ahmed, *Emergent Leadership*, 20

৩৯. Khan, "Evolution of Municipality", XVIII-XIX.

৪০. Ahmed, *Emergent Leadership*, 21.

মিউনিসিপ্যালিটি লাভ করে। সিলেট জেলার ৫টি মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত ৪৫টি মিউনিসিপ্যালিটি ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধানমতে পরিচালিত হতো। ১৯৩২ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বারা পরিচালনার বিধান সম্বলিত ৭টি নতুন মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯৫৭ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫২-তে (সিলেট জেলার ৫টি বাদে) উন্নীত হয়। এই অবস্থান বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য বলবৎ থাকে। অবশ্য ১৯৫৭ সালে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। দি ইস্ট পাকিস্তান আইন দ্বারা (পূর্ব পাকিস্তান আইন কাউন্সিল কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাসকৃত) ১৯৩২ সালের ২২ নং বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা হয় : যেমন—(১) মনোনয়ন প্রথা এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার ব্যবস্থা রহিত করা হবে; (২) এসব স্থানীয় সংস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে; (৩) নির্বাচন সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটাধিকার অর্জনের বয়স হবে ১৪ বছর। তাছাড়া মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীন কতিপয় অপরাধের বিচার করার জন্য একজন বা একাধিক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন বেতনভুক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারকে প্রথমবারের মতো ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৪১] ১৯৩২ সালের আইনের এসব পরিবর্তন তাই মিউনিসিপ্যালিটির ধরন ও কাজে অধিকতর স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু অর্থবহ কোন কিছু সংঘটিত হবার পূর্বেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সমগ্র দেশ সামরিক শাসনের গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। সামরিক শাসন দেশে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রহিত করে এবং সকল স্থানীয় সংস্থাকে সরকারমনোনীত কর্মকর্তাদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে।[৪২] সামরিক শাসনকালে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ এবং ১৯৬০ সালে মিউনিসিপ্যাল-প্রশাসন অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

এ পদক্ষেপসমূহ পৌর ও গ্রামীণ সকল স্থানীয় সংস্থার বিধানসমূহ পরিবর্তন করে। নতুন ব্যবস্থাধীনে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ইউনিয়ন কমিটি ও টাউন কমিটি গঠন করা হয়। টাউন কমিটি ১৯২৩ সালের আসাম মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে সংগঠিত সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল টাউন কমিটির মডেল অনুসারে গঠন করা হয়। আসাম আইনের অধীনে একটি টাউন কমিটি ৪ জন নির্বাচিত এবং ২ জন মনোনীত মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এই আইনের অধীনে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য কোন পৃথক আসনের ব্যবস্থা ছিল না, তবে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সরকার মিউনিসিপ্যাল আসনসমূহকে প্রয়োজনমতো ভাগ করতে পারতো। ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ১৫,০০০ অথবা তার চেয়ে কম জনসংখ্যা (১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) বিশিষ্ট শহরসমূহের পূর্বমর্যাদা বহাল রাখা হয় এবং ১৯৬০ সালের

৪১. East Pakistan (Amendment) Act XXII of 1957 , also see Khan, "Evolution of Municipality", XVIII-XIX

৪২. Ahmed, *Emergent Leadership*, 26.

মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন অধ্যাদেশ অনুযায়ী একটি মিউনিসিপ্যাল কমিটি সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটির ইউনিয়ন কমিটিসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ (নির্বাচিত) এবং সমান সংখ্যক মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। মনোনীত সদস্যদের আংশিক থাকতেন অফিসিয়াল সদস্য (মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যানসহ, যিনি একজন সরকারমনোনীত সদস্য) এবং আংশিক থাকতেন নন-অফিসিয়াল সদস্য (৭০%)। মনোনীত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত হতেন। চেয়ারম্যান সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। কিন্তু ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হতে মিউনিসিপ্যাল কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। চেয়ারম্যান 'সার্বক্ষণিক' বা 'খণ্ডকালীন' উভয়ই হতে পারতেন। 'খণ্ডকালীন' হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি হতেন স্থানীয় কর্মকর্তা অর্থাৎ মহকুমা শহরের বেলায় মহকুমা হাকিম এবং জেলা শহরের বেলায় অতিরিক্ত জেলা কমিশনার। শ্রেণীকরণ সত্ত্বেও টাউন কমিটিসমূহকে মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে বিবেচনা করা যেতো। কারণ তাদের আর্থিক বিষয়াদি এবং কাজকর্ম ১৯৬০ সালের আইনের মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ীই পরিচালিত হতো।

১৯৬৪ সালে ইলেকটোরাল আইন পাস করা হয়, যা ইউনিয়ন ও টাউন কমিটির সদস্যদের উপর কতিপয় নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করে। গ্রামাঞ্চলে সংগঠিত সদস্যগণ সমেত তাঁরা দেশের প্রধান নির্বাহী অফিসার, প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনে নির্বাচক হিসেবে কাজ করতেন। ইলেকটোরাল কলেজ আইনের বিধান অনুযায়ী তাঁদেরকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং ১৯৬৫ সালে পুনর্গঠনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এ বিধানের ফলে একদিকে সাধারণ ভোটারগণ যেমন উচ্চতর স্তরে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার হতে বঞ্চিত হন, অন্যদিকে তেমনি ভোটারদের মোট সংখ্যা কমে যাওয়ায় ক্ষমতাশীন দলের পক্ষে তাঁদেরকে প্রভাবিত করাও সহজ হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থা সরকার ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের মধ্যে বিধিবহির্ভূত একটি সম্পর্ক স্থাপনেরও সুযোগ সৃষ্টি করে, যার ফলস্বরূপ জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি দুরত্ব গড়ে উঠে। জনগণ তাঁদের প্রতিনিধিদের উপর সকল প্রকার আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সমগ্র ব্যবস্থাটি ধিকৃত হয়ে পড়ে।

১৮

পাকিস্তান : রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী (১৯৪৭-১৯৭১)

এনায়েতুর রহিম*

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পুর্যন্ত অধিকাংশ সময় জুড়ে পাকিস্তান ছিল সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সামরিক আইন জারি অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনী আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এমনকি ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক আইন জারির পূর্বেও বেসামরিক প্রশাসনে সহায়তা দানের জন্য সামরিক বাহিনীকে কয়েক বার ডাকা হয়েছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী সামরিক আইনও জারি করা হয়েছিল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সকল রাষ্ট্রপ্রধান এবং সামরিক বাহিনীর প্রধানকেও সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরানো হয়েছিল। সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়ই পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক এবং সিভিল-মিলিটারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপড়েন ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত পাকিস্তানের ভাঙনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীই অনুঘটক এবং মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ভারতবিভাগের সময় বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জনবল, সরঞ্জাম এবং সুযোগ-সুবিধার হিস্যা নিয়েই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক সংগঠনের সূচনা ঘটে।

* Professor of History, Georgetown University, Washington D.C.

সামরিক সংগঠন

পাকিস্তানের সামরিক সংগঠন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবরণ এত সীমিত যে জনৈক গবেষক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে সামরিক বাহিনীর সকল দিক সম্পর্কে প্রচুর গবেষণাকর্ম আশা করা গেলেও বাস্তবে "এমনকি সবচেয়ে মৌলিক বিষয়েও তথ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত…কোন পরিসংখ্যান নেই, কেবল আছে ঝাপসা সাধারণ উক্তি…কেউই জানে না পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কিভাবে কাজ করতো"।[১] কিছু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও সামরিক সংস্কৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা বা সংখ্যাগত উপাত্তের অভাব রয়েছে।[২] এছাড়া প্রচারণাধর্মী প্রকাশনায়ও সামরিক সংগঠন সংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই বললেই চলে। তবুও এ বিষয়ে প্রণীত কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে এর উপর সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।[৩]

ভারতবিভাগের ফলে সামরিক বাহিনীর জনবল, সরঞ্জাম এবং সরবরাহসমূহ ভাগাভাগি হয়ে যায়। ভারতীয় অঞ্চল থেকে আসা মুসলিম সৈনিকদেরকে দুটি রাষ্ট্রের যে-কোনো একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ প্রদান ছাড়াও সকল মুসলিম ইউনিটকে তাদের রেকর্ড ও পদবিসহ পাকিস্তানে বরাদ্দ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, যা সংখ্যায় ছিল প্রায় দেড় লাখ অফিসার ও সৈনিক। ভারত যেহেতু ধর্ম নির্বিশেষে সকল সৈনিককে গ্রহণ করেছিল, তাই কিছু মুসলমান সৈনিক ভারতেই থেকে যায়। ভারতবিভাগের ফলে নৌ ও বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রেও একই প্রকার বিভাজন হয়, যাতে জনবল, সরবরাহ এবং সরঞ্জামের বড় অংশই ভারতে রয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্ম হয়, তা "অবশ্যই ছিল বৃটিশ ধাঁচের"—সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ।[৪] যদিও স্বাধীনতার লগ্নে নাড়ির বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, পাকিস্তান বাহিনী তার ঔপনিবেশিক অতীতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবেই সংযুক্ত ছিল। এটা না ছিল তরুণ তুর্কীদের মতো বিপ্লবী বাহিনী, না ছিল চীনের

১. Clive Dewey, "The Rural Roots of Pakistan Militarism." in D. A., Low (ed). *The Political Inheritance of Pakistan,* (New York: St. Martin's Press, 1991) 255-283. Deweyর মতে সেনাবাহিনী যত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে ততই তার সমালোচনার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।'

২. একটি লক্ষণীয় ব্যাতিক্রম Fazal Muqueem Khan, *The Story of the Pakistan Army,* (Karachi 1990).

৩. এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল Hassan Askari Rizvi, *The Military and Politics in Pakistan,* (Lahore 1986. First published in 1974); Stephen P. Cohen, *The Pakistan Army,* (Berkeley: University of California Press) and Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan's Political Economy of Defence,* (New York 1990).

৪. William Frank Gutteridge, *Military Institutions and Power in New States,* (New York 1965), 148.

সৈন্যবাহিনীর মতো জাতীয় মুক্তিফৌজ।[৫] যদিও বৃটিশ সেনাবাহিনীর উত্তরসূরি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সংগঠিত বাহিনী হিসেবে বৃটিশ ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল, রাজনীতিতে বেসামরিক কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার বৃটিশ সামরিক পেশাদারিত্বের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এক্ষেত্রে গৃহীত হয় নি। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর দায়িত্বের পরিধিতে মূলত অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত ছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা ও রণকৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার দৃশ্যমানতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাকর্মকর্তারা রাষ্ট্রের বেসামরিক কর্মপরিমণ্ডলে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এতে করে যে সামরিক বাহিনীর পেশাদারি চরিত্র খর্ব হয়েছিল সেটা তারা অস্বীকার করে। বস্তুত যে কয়েকটি যুদ্ধে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল তার কোনোটিতেই তারা চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করতে পারে নি।

বেসামরিক কর্তৃত্বের প্রতি প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে বেসামরিক কর্তৃত্বের প্রতি প্রথম চ্যালেঞ্জ আসে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন জনৈক শীর্ষ সেনাকর্মকর্তা জিন্নাহকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে কিছু বৃটিশ অফিসারকে রেখে "জাতীয় মেধা ও প্রতিভাকে" কাজে লাগাতে হবে।[৬] জিন্নাহ্ তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনীতে মেধা ও প্রতিভা সন্ধানের ধারণার বিরোধিতা করেন। জিন্নাহ দৃঢ়ভাবে জবাব দেন যে সামরিক বাহিনী হলো "জনগণের সেবক এবং জাতীয় নীতি প্রণয়নের কাজ সেনাবাহিনীর নয়; বেসামরিক ব্যক্তিরাই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব হলো তাদেরকে প্রদত্ত কাজ সমাধা করা"। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সকল আদেশ ও নির্দেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক নির্বাহীর কাছ থেকেই আসা উচিত।[৭]

জিন্নাহর মন্তব্যগুলো অবশ্যই সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মনঃপূত হয় নি। এমনকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার জীবদ্দশাতেও সামরিক বাহিনী সুস্পষ্টভাবে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদনের পথ বেছে নেয়। এরূপ কার্যের জন্য সব সময় যে কারণ দেখানো হতো তা ছিল জাতির নিরাপত্তা। দেশরক্ষা এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার কারণ দেখিয়ে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করতো, যদিও একই সময়ে তারা দাবি করতো যে "এটি একটি পেশাদার সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সাধারণ অফিসার রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না"।[৮] জনজীবনের কিছু দিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খবরদারির যে ঐতিহ্য বৃটিশ

৫. Morris Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations: An Essay in Comparative Analysis*, (Chicago 1964), 10.

৬. M. Asghar Khan, *Pakistan at the Crossroads*, (Lahore 1969), 9-10.

৭. ঐ।

৮. Cohen, *Pakistan Army*, 285-308.

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকাল থেকেই (১৭৮৬-১৭৯৩) সামরিক বাহিনীর প্রধান গভর্নর জেনারেলের পরিষদের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল শাসিত সেই রাষ্ট্রটি ছিল একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, যেটা পরিচালিত হতো বহিঃশক্তির স্বার্থে। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জিন্নাহ ছিলেন এ ধারণার ঘোর বিরোধী।

যদিও পাকিস্তান একটি বেশ বড় বাহিনীর উত্তরাধিকারী হয়েছিল, যাঁদের অনেকেই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন কেবল একজন মেজর জেনারেল, দুই জন ব্রিগেডিয়ার এবং ছয় জন কর্নেল। বিমানবাহিনীতে পাকিস্তানের অংশে ছিল ৬৫ জন পাইলট, ২০০ গ্রাউন্ড অফিসার এবং ১,০০০ বৈমানিক। বৃটিশ নৌ-বাহিনীর যে অংশকে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাতে ছিল ক্ষুদ্র একদল অফিসার এবং কয়েকশ' তালিকাভুক্ত নাবিক। অধিকাংশ বৈমানিক ও নাবিকই ছিল অদক্ষ।

স্বাধীনতালগ্নে সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্রকারখানা এবং অন্যান্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানকে বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তান দাবি করেছিল যে বরাদ্দকৃত সম্পদের একটি বড় অংশই তাকে প্রদান করা হয় নি।[৯] অফিসার পর্যায়ে পাকিস্তানে যে প্রাথমিক স্বল্পতা ছিল, তা বৃটিশ সরকার কর্তৃক ৫০০ বৃটিশ অফিসার অস্থায়ীভাবে পাকিস্তানে প্রেরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে মেটানো হয়। এসব অফিসারের অধিকাংশকেই ১৯৫১ সালের শেষ নাগাদ প্রত্যাহার করা হয় যখন পাকিস্তানী অফিসারদের দ্বারা তাদের শূন্যস্থান পূরণ করা হয়। নতুনদের কেউ কেউ ছিল কাকুলে নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীর স্নাতক, আর অন্যরা ছিল জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার পদমর্যাদা থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। কিছু জ্যেষ্ঠ পদ পূরণ করা হয় ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর পরই জনৈক বৃটিশ ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে কাকুলে একটি সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] একই সময়ে কমান্ড ও কন্ট্রোলের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ দানের জন্য কোয়েটায় স্থাপিত হয় একটি স্টাফ কলেজ।[১১]

পাকিস্তানের দুর্বল সামরিক অবকাঠামো শীঘ্রই তার নিজস্ব সম্পদ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সামরিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা মজবুত করা হয়। এর ফলে সামরিক সক্ষমতার যে বিকাশ ঘটে তার সাথে

৯. যেহেতু ৭৮টি সমরাস্ত্র কারখানার সব কটিই ভারতীয় এলাকায় স্থাপিত ছিল, তাই পাকিস্তানে সমরাস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠায় ভারত আর্থিক সহায়তা দানে সম্মত ছিল।

১০. একাডেমী ১৯৪৮ সালে তার প্রথম কোর্স চালু করে।

১১. স্টাফ কলেজটি আদিতে ১৯০৫ সালে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল।

তাল মিলিয়ে সৈন্যসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকবল ছিল ২,৬০,০০০।[১২] ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ ছাড়িয়ে যায় এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ৫ লক্ষের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ঔপনিবেশিক অতীতের সূত্র ধরে বিভিন্ন কারণে নতুন সংগঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সংখ্যায় শীর্ষে ছিল পাঞ্জাবীরা। এরপর ছিল পাঠান এবং স্বল্পসংখ্যক বেলুচি।[১৩] স্বাধীনতার পর বৃটিশ রাজ প্রবর্তিত অসম এবং স্বেচ্ছাচারী নিয়োগনীতি বাতিল না করে পাকিস্তান পাঞ্জাবীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ সেনাবাহিনীতে শ্রেণীভিত্তিক ইউনিট গঠনের ঔপনিবেশিক প্রথাই বহাল রাখে।[১৪] এমনকি পাঞ্জাবের অভ্যন্তরেও কয়েকটি বিশেষ জেলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশাওয়ার ও কোহাট জেলা থেকেই মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হতো।[১৫] এসব জেলা থেকে নিয়োগ করা হতো সেনাবাহিনীর প্রায় ৯৫ শতাংশ আর বাকি ৫ শতাংশ নিয়োগ করা হতো অন্য অঞ্চল থেকে।[১৬] অন্যভাবে দেখতে গেলে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৫ শতাংশই এমন এলাকা থেকে নিয়োগ করা হতো, মোট জনসংখ্যায় যাদের হিস্যা ছিল ৯ শতাংশ।[১৭]

যেহেতু বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুরূপ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লোকবল নিয়োজিত হতো মূলত উপরে উল্লেখিত চার-পাঁচটি পাঞ্জাবী জেলা থেকে, এর ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবীকরণ ঘটেছিল। পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সুগভীর ও স্থায়ী যে শেকড় প্রোথিত ছিল পাঞ্জাবের হাজার হাজার গ্রামে, সম্ভবত সেটিই ছিল পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর আধিপত্যের মূল চাবিকাঠি।[১৮] উত্তর পাঞ্জাবের যে অঞ্চল থেকে মূলত

১২. M. Asghar Khan, *Pakistan at the Crossroads*, (Lahore 1969), Introduction.

১৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবহিনীর ২০ লাখ সদস্যের মধ্যে ৭ লাখই এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকাগুলো থেকে।

১৪. সেনাবাহিনীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে ভারত স্বাধীনতার পরপরই বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সমন্বিত ইউনিট গঠনের জন্য জাতভিত্তিক সকল ইউনিট বিলুপ্ত করা হয়।

১৫. পাঞ্জাবী জেলাগুলোর মধ্যে সেনাবাহিনীতে ক্যাম্পবেলপুর-এর হিস্যা ছিল সর্বোচ্চ।

১৬. Khalid B. Sayeed, "The Role of the Military in Pakistan." in *Armed Forces and Society: Sociological Essays*, Jacques Van Doorn (ed.), (The Hague 1986), 274-297. সাইয়িদ এখানে সেনা রিক্রুটদেরকে স্বপ্রণোদিত মার্সিনারি হিসেবে অভিহিত করেছেন, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য অনুসরণ করছিল।

১৭. Cohen, *Pakistan Army*, 285.

১৮. Dewey, "Rural Roots", 261. পাকিস্তান রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক ভিত্তি স্থাপনে এই চমৎকার বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

সেনা নিয়োগ করা হতো, সেখানকার জীবনমানে ছিল স্থবিরতা। কেবল সিয-সুৎলেয সেচ অঞ্চলে যারা জমির অনুদান পেয়েছিল, সেসকল ভাগ্যবান সৈনিক ছাড়া অন্যরা খাল অঞ্চলের সমৃদ্ধি থেকে ছিল বঞ্চিত। সেনা নিয়োগের এসকল বিশাল এলাকার যোদ্ধাশ্রেণী বেসামরিক সরকারি সূত্রের চেয়ে সামরিক সূত্র থেকেই অধিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। বিভিন্ন ধাপ ও স্তর অতিক্রমকারী হাজার হাজার সৈনিকের বাহিনীই ছিল বৃহত্তম নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

রাওয়ালপিন্ডির মতো জেলায় সমগ্র অর্থনীতিই আবর্তিত হতো সেনানিবাসকে ঘিরে। বংশপরম্পরায় যোদ্ধাশ্রেণী যে আকর্ষণীয় বেতন, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাদি পেতো, তাতে সেনাবাহিনীর সাথে তাদের একটি দৃঢ় যোগসূত্র এবং যোদ্ধা পরিবারগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধন স্থাপিত হতো। নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ পরিবার যোদ্ধা সরবরাহ করতো এবং যে রেজিমেন্টে তারা চাকুরি করতো তার সাথে নিজের ইজ্জত বা সম্মানকে এক করে দেখতো। গ্রামে একটি পরিবারের অবস্থান নির্ভর করতো সেনাচাকুরিতে তার অতীত রেকর্ডের ওপর। যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়েই যোদ্ধাশ্রেণী এরকম ব্যাপক সুবিধা পেতো সামরিক শাসনের বদৌলতে। কাজেই তারা বেসামরিক শাসনের চেয়ে সামরিক শাসনকেই সাধারণত বেশি পছন্দ করতো।

সেনা সংগ্রহের এলাকা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি মিথোজীবী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যা ছিল জেনারেলদের ক্ষমতা গ্রহণের একটি শক্ত ভিত্তি।[১৯] ফলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে ইতিপূর্বে পাঞ্জাবীদের যে সংখ্যাধিক্য ছিল তা আরো সম্প্রসারিত হয়। কালক্রমে একটি পাঞ্জাবী সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাধান্য পায়। যখন কোনো অভ্যুত্থান সংঘটিত হতো তখনই তাকে স্বাগত জানানো হতো, এবং অভ্যুত্থানপরবর্তী জান্তাকে পর্যাপ্ত সমর্থন প্রদান করা হতো। প্রত্যেক সৈনিক পাঞ্জাবী অহমিকার বশবর্তী হয়ে মনে করতো যে সে দশজন ভারতীয় সৈন্যের চেয়েও উত্তম এবং পাকিস্তান তার চিরশত্রু ভারতের বিরুদ্ধে যে-কোন যুদ্ধে জয়ী হবে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশই নিয়োজিত হতো পল্লী অঞ্চল থেকে এবং এমন পরিবার থেকে, যাদের সামরিক পটভূমি ছিল। রেজিমেন্টাল প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তাদেরকে যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও বশ্যতা, শৃঙ্খলা, আনুগত্য এবং আত্মসম্মানবোধে দীক্ষিত করা হতো। যেহেতু নবীন সেনাদের শিক্ষা-দীক্ষা অল্পই থাকতো, তাই তাদেরকে সাক্ষরতাদান করতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো। পাঠক্রমে আরো অন্তর্ভুক্ত থাকতো ইসলামিয়াত এবং ধর্মীয় শিক্ষা। একজন সৈনিক যে শপথ গ্রহণ করতো তাতে

১৯. Dewey, "Rural Roots," 261. Dewey'র মতে যোদ্ধা নিয়োগের এলাকাগুলোতে সফলভাবে ভোট প্রার্থনার কারণেই ভুট্টোর সাফল্য এসেছিল। এসকল অঞ্চলে যোদ্ধাশ্রেণীই ছিল সংখ্যাগুরু এবং ভারতবিভক্তির পূর্বে তারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো।

রাষ্ট্রের সেবা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতো আল্লাহর সেবা এবং ইসলামের উচ্চতর গৌরবের প্রতি অঙ্গীকার।[২০] পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনৈক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছিলেন, "সামরিক বাহিনীর চমৎকার নৈপুণ্যের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে জেহাদের চেতনা।"[২১] এ ধরনের প্রণোদনার ফলে সামরিক বাহিনীতে হিন্দু জনসংখ্যা থেকে নিয়োগ আপনাআপনিই বাদ পড়ে গিয়েছিল; এ বাহিনী একদিকে যেমন ছিল অন্যতম বৃহত্তম জনশক্তি নিয়োগকারী সংগঠন, তেমনি ছিল রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

নেতৃত্ব

পাকিস্তানের বিশাল সামরিক সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন একদল বাছাই করা অফিসার, যাদেরকে বৃটিশ ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।[২২] অফিসারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আসতো পাঞ্জাবের পল্লী অঞ্চল থেকে, যেখানে জনসাধারণ ছিল রাজনৈতিক দিক দিয়ে অসচেতন, যে কারণে তাদেরকে নিরাপদ গণ্য করা হতো।[২৩]

স্বাধীনতার লগ্নে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সমগ্র অফিসারশ্রেণীকেই স্যানধার্স্ট, উলউইচ অথবা দেরাদুনে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। ফলে বৃটিশ সামরিক ব্যবস্থার শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও কারিগরি দক্ষতা এবং বৃটেনের সামরিক সংস্কৃতির আদর্শেই তারা দীক্ষিত হতো।[২৪] অন্তত প্রারম্ভিক বছরগুলোতে পাকিস্তানী অফিসারদের অ্যাংলোকরণ ঘটতো এবং বৃটিশ ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা অফিসারস্ মেস ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতো এবং বৃটিশ শিষ্টাচার অনুসরণ করতো। একাডেমীতে অন্তত আড়াই বছরের কঠোর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল পেশার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একজন অফিসারকে প্রস্তুত করে তোলা। কিন্তু পরিচারক দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ক্ষমতার গর্বে গর্বিত থেকে তারা আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সামরিক উপর মহল হয়ে পড়ে একটি সুবিধাভোগী ছদ্ম সামন্ত শ্রেণী, যারা গলফ এবং পোলো খেলতে ভালোবাসতো। অবশ্য এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে অধিকাংশ অফিসারই এসেছিল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে।

২০. Sayeed, " Role of the Military", 283. সাইয়িদের মতে জওয়ানদের ধর্মীয় চেতনা ছিল এত প্রখর যে কিছু কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ধর্মের ব্যাপারে তাদের ঢিলেমি ঢেকে রাখতে হতো।

২১. Mohammad Musa, *My Version: Indo-Pakistan War, 1965*, (Lahore 1983), 111.

২২. বলা হয়ে থাকে যে তাদের প্রশিক্ষণে এত সাদৃশ্য ছিল যে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে উভয় সেনাবাহিনীই একই প্রকার কৌশলগত অগ্রাভিযান অনুসরণ করেছিল। See Sayeed, "Role of the Military", 281.

২৩. Sayeed, Role of the Military", 278.

২৪. পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কিছু অফিসারকে মেধাবী না হলেও দক্ষ বলা হতো, যদিও তারা আমুদে ছিল এবং পোলো খেলতে ভালোবাসতো। Sayeed, Role of the Military", 279.

সেনাকর্মকর্তাদের পদমর্যাদা, বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উচ্চতর ধাপেরই অনুরূপ। সেনাকর্মকর্তারা বেসামরিক কর্মকর্তাদের তুলনায় উন্নততর জীবনযাপন করতো। এমনকি তালিকাভুক্ত জওয়ানরাও বেসামরিক কর্মীদেব চেয়ে ভালো অবস্থায় ছিল। চাকুরির ধরন আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা হতো বেশ কড়া। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীর ৮০টি ক্যাডেট পদের জন্য প্রার্থী ছিল ৩০০০ জন।[২৫] সামরিক শাসন জারির পর প্রাতিযোগিতা হয়ে উঠলো আরো তীব্র, কারণ সামরিক পেশা তখন আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

অফিসার পর্যায়ের অধিকাংশ সদস্যই নিযুক্ত হতো পাঞ্জাবী সামরিক পরিবার থেকে, যাদের অতীতে সামরিক বাহিনীতে চাকুরির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তাই পাকিস্তানের সামরিক সংস্কৃতিতে পাঞ্জাবের সূক্ষ্ম সামাজিক দ্যোতনা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছিল এবং এটা আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না।[২৬] পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবী নেতৃত্ব থাকায় একে পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবী স্বার্থের সাথে এক করে দেখা হতো। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই পাঞ্জাবীকরণের প্রতিফলন ঘটেছিল অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন খাতে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে এমন একটি দেশে এটা তাই স্বাভাবিক ছিল যে পাঞ্জাব থেকে আসা সামরিক নেতৃত্ব তাদের নিজস্ব এলাকার উন্নয়নে তৎপর হবে, যা কার্যত সামরিক স্বার্থ রক্ষায় তাদের একমাত্র পরিমণ্ডল হয়ে পড়ে। এই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনের কারণে কেন্দ্রীয় চাকুরি ও ব্যয়বরাদ্দ এবং অর্থনৈতিক, শিল্প ও আর্থিক উন্নয়নের এক অসম বড় অংশ পাঞ্জাব লাভ করতো।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, যাকে ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠীও বলা যেতো, তিনটি উপাদানে বিভক্ত ছিল। মেধা ও বন্দুকের সমন্বয়ে গঠিত সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মোর্চা ছাড়াও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই সংযোগের ফলে তিনটি উপাদানের মধ্যে গড়ে উঠেছিল পরস্পর নির্ভরশীল ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সম্পর্ক। এ কথা সর্বজনবিদিত যে পারিবারিক সংযোগ ছাড়াও এরা সংযুক্ত ছিল বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা।[২৭] একবার এই ত্রিভুজ মোর্চার আবির্ভাব ঘটার পর নিশ্চিতভাবেই সামরিক বাহিনী তার প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রাজনীতিসহ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সিভিল সার্ভিসকে ক্ষমতার একটি জোটে টেনে আনার ক্ষেত্রে সামরিক নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর পদগুলোতে বেসামরিক কর্মকর্তাদের একক আধিপত্য ভেঙে ফেলা। ১৯৬০ সালে সেনাকর্মকর্তাদের জন্য পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু সেনাকর্মকর্তারা এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি, কারণ তারা দেখেছিল যে তাদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ছিল

২৫. Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations: An Essay in Comparative Analysis*. (Chicago 1964), 298.

২৬. Coben, *Pakistan Army*, 42-44.

২৭. Sayeed, "Breakdown of Pakistan Political System." (Unpublished Paper, 1982).

তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বস্তুত, বিশেষকরে ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর চাকুরির ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঞ্জাবী যুবকের প্রথম পছন্দ ছিল সেনাবাহিনী।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি

সামরিক বাহিনী থেকে বাঙালিদের বাইরে রাখার সুদীর্ঘ কালের বৃটিশ নীতির কারণে কেবল যুদ্ধকালে নিয়োজিত সীমিত সংখ্যক বাঙালি ছাড়া সামরিক বাহিনীতে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অযোদ্ধা জনগোষ্ঠীর জন্য নিয়োগবিধি শিথিল করা হয়েছিল এ যুক্তিতে যে যোদ্ধাশ্রেণী থেকে প্রয়োজন মোতাবেক সৈনিক পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ৭,১১৭ জন বাঙালিকে নিয়োগ করা হয়েছিল, যুদ্ধের পর তাদেরকে পুনরায় অব্যাহতিপ্রদান করা হয়।[২৮] উনিশশ' বিশের দশকে বাঙালিদের মধ্য থেকে নিয়োগ কোন কোন বছরে শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছিল।[২৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন নিয়োগবিধি আবারও শিথিল করা হয়, তখনও বাংলা থেকে নিয়োগের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। তখন সমগ্র ভারত থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ২০,৪৭,৮৩০ জনের মধ্যে বাংলা থেকে এসেছিল ১,৭১,২৫২ জন[৩০], যাদের মধ্যে ষাট হাজারের কিছু বেশি বেঙ্গল পাইওনিয়ার কোর-এ (নির্মাণ ইউনিট) কাজ করার সুযোগ পায়।[৩১] নতুন রিক্রুটদের অধিকাংশকেই আবার যুদ্ধের পর অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান যে সেনাবাহিনী পায় তাতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি অল্প। স্বাধীনতার সময় সেনাবাহিনীতে একটিও বাঙালি মুসলিম ইউনিট ছিল না এবং সীমিত সংখ্যক বাঙালিদের[৩২] মধ্যে আর্টিলারি ও সিগনালে কেউই ছিল না। অধিকন্তু, পূর্ববঙ্গে স্থায়ীভাবে মোতায়েন কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না[৩৩] বিধায় এখানে ক্যান্টনমেন্ট, রিক্রুটমেন্ট কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ সুবিধা অথবা অন্যান্য সামরিক অবকাঠামোর কিছুই ছিল না। ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নবগঠিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্য দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন গঠন করে, যেটা সময়ের সাথে সাথে বেঙ্গল রেজিমেন্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই রেজিমেন্ট গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়

২৮. Hasan Askari Rizvi, *The Military and Politics in Pakistan.* (Lahore 1986 edition, first published 1974), 137.

২৯. Government of India, India in 1929-30, (Calcutta 1930), 61. ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বাঙালির সংখ্যা ছিল ৭,০০০। দেখুন, Report of the Statutary Commission, Vol I: Survey, (London 1936), 97.

৩০. Nandan Prasad, *Expansion of the Armed Forces and Defense Organization 1939-45,* (Delhi 1956), Appendix 16, 463.

৩১. Cohen, Pakistan Army, 43.

৩২. ভারতবিভাগের সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেনাবহিনীতে বাঙালিদের উপস্থিতি অমুসলিম বাঙালিরা ভারতে চলে যাওয়ায় কমে যায়।

৩৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী হুমকি ছাড়া বাংলায় কোন বাহ্যিক নিরাপত্তা হুমকি ছিল না।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে। প্রথম দুটি ব্যাটালিয়ন গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পরবর্তী পর্যায়ে গঠিত হয় আরো ৬টি ব্যাটালিয়ন। নবম ব্যাটালিয়নকে চট্টগ্রাম রেজিমেন্টাল সেন্টারে আত্মীকরণের সময়েই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে বেঙ্গল পাইওনিয়ার থেকেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকবল নেয়া হতো। এদের অধিকাংশই ছিল সেসকল মুসলমান যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্টে চাকুরি করেছে। নতুন রেজিমেন্টের অধিকাংশ অফিসার আসে পাঞ্জাব থেকে। পরবর্তী সময়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টে কেবলমাত্র বাঙালিরাই ছিল। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এটাই সম্ভবত ছিল একমাত্র একক শ্রেণীর ইউনিট।[৩৪] প্রথম দিকে হাইকোর্ট ভবনে স্থাপিত হওয়ার পর এর উন্নততর ডিভিশন সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ঢাকার সন্নিকটে কুর্মিটোলায়।

বৃটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাঙালিবিরোধী নিয়োগনীতির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ ছিল যৎসামান্য। পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন সামরিক অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়াসও নেয়া হয় নি। পাকিস্তানী সেনানেতৃত্ব বাঙালিদেরকে সামরিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতো না। তাদের ধারণা ছিল, একটি শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তান ব্যতীত ভারতীয় আগ্রাসন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সুরক্ষা সম্ভব নয়।[৩৫] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বল্প সংখ্যার কারণ নিরূপণ এবং প্রদেশ থেকে নিয়োগপ্রার্থী আকর্ষণের পন্থা নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটিও গঠন করেন। তবে কমিটির প্রতিবেদন কখনো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয় নি[৩৬], পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য কেবল কয়েকটা নামমাত্র পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নিয়োগকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রি-ক্যাডেট স্কুল স্থাপন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় স্কুলটি স্থাপিত হলেও এক বছর পর তালিকাভুক্তির স্বল্প হারের কারণে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩৭]

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান যেখানে সামরিক বাহিনীর মোট সদস্যসংখ্যার ১ শতাংশের জোগানদাতা ছিল[৩৮], পরবর্তীতে পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব অতি অল্পই থেকে যায়। (সারণী -১ দ্র.) ১৯৫৬ সালে মোট ৮৯৪ জন সেনা-অফিসারের মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। নৌ-বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ৫৯৩ জনের মধ্যে ৭ জন এবং বিমানবাহিনীতে ৬৪০ জন অফিসারের মধ্যে ৮০ জন। এমনকি ১৯৬৫ সালেও সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে

৩৪. Cohen, *Pakistan Army*, 43, and Rizvi: Military and Politics, 138.
৩৫. অধিকাংশ পাকিস্তানী জেনারেল আইয়ুবের কৌশল অনুসরণ করতো, যেখানে বলা ছিল যে সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আনলেও পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না যতক্ষণ না পশ্চিমা ঘাঁটিকে শক্ত করা হয়। Dawn, Jan. 18, 1955.
৩৬. Rizvi, *Military and Politics*, 138
৩৭. *Dawn*, Oct. 23, 1953.
৩৮. *Dawn*, June 25, 1967.

বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩,০০০।[৩৯] ১৯৬৪-৬৫ সালে সেনাবাহিনীর মোট ৮টি ডিভিশনে সৈন্যসংখ্যা ছিল ২,৩০,০০০; নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর আনুমানিক সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭,০০০ এবং ১৭,০০০-২৫,০০০।[৪০] নিচের সারণিতে ১৯৬৩ সালে সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতে দেখা যায় যে এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অনুমোদিত শতাংশ এখানে অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি।

সারণি ১ : সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

সার্ভিস	অনুমোদিত শতাংশ	প্রকৃত শতাংশ
সেনাবাহিনী		
অফিসার	৭.৮১	৫
জুনিয়র কমিশন্‌ড অফিসার	৭.৮	৭.৪
অন্যান্য পদবী	৭.৮	৭.৪
বিমানবাহিনী		
অফিসার		১৬
ওয়ারেন্ট অফিসার		১৭
অন্যান্য পদবী		৩০
নৌবাহিনী		
অফিসার		১০
ব্রাঞ্চ অফিসার		৫
চীফ পেটি অফিসার		১০.৪
পেটি অফিসার		১৭.৩
লিডিং সীমেন ও তার নীচে		২৮.৮

সূত্র : Rizvi, *Military and Politics* , pp. 38-39; Pakistan Assembly, *Debates*, Vol. 1, March 8, 1963, pp. 29-31.

এখানে লক্ষণীয় যে কোটাব্যবস্থা না থাকায় নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীতে বাঙালিদের অংশ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। বিমানবাহিনী ও নৌ-বাহিনীতে নিয়োগের

৩৯. *Dawn*, July 20, 1965. সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অংশগ্রহণের হার সংক্রান্ত হিসাবে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। সরকারও সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের উপস্থিতির অনুপাত সংক্রান্ত হিসাব প্রকাশে অনাগ্রহী ছিল।

৪০. Sayeed, "Role of the Military". 275.

ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা ভিত্তি হিসেবে কাজ করতো এবং যোদ্ধাশ্রেণীর বাধ্যবাধকতা তুলনামূলকভাবে শিথিল ছিল।

বাঙালিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে ব্যাখ্যা দিত তার মধ্যে দুটো বিষয় সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হতো। এগুলো ছিল শারীরিক চাহিদা পূরণে বাঙালিদের অসামর্থ্য এবং তাদের কাপুরুষতা। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধের পর অধিক সংখ্যক বাঙালি আকর্ষণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দৃশ্যমান প্রয়াসের অংশ হিসেবে উচ্চতার মাপকাঠি ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি থেকে হ্রাস করে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চিতে নামানো হয়। স্বল্পমেয়াদী কমিশনের ক্ষেত্রে উচ্চতা আরো হ্রাস করে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি করা হয়।[৪১] ১৯৬০-এর দশকেই অফিসার শ্রেণীতে বাঙালি নিয়োগের ব্যাপারে সরকারি আগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিকন্তু, নিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারকার্যও সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু এসকল পদক্ষেপ গ্রহণের সময় সরকার বাঙালিদের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা বা শতাংশের মতো মৌলিক বিষয়কে এড়িয়ে যাচ্ছিল। বাঙালিদের জন্য পূর্বনির্ধারিত কোটাব্যবস্থা তখনো শুধরানো হয়নি, যে ব্যবস্থায় তাদের সর্বোচ্চ হিস্যা ছিল ৮ শতাংশেরও কম এবং বাদবাকি পদগুলো ছিল মূলত পাঞ্জাবী ও পাঠানদের জন্য সংরক্ষিত। ফলে বাঙালিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয় নি।

১৯৬৫ সালে মোট ৬,০০০ সেনা-অফিসারের মধ্যে মাত্র ৩০০ ছিল বাঙালি এবং এদের মধ্যে মাত্র একজন মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন।[৪২] বাঙালি অফিসারদের পদোন্নতির হার সব সময়েই কম ছিল এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় অধিকাংশ বাঙালি কর্মকর্তাই ক্যাপ্টেন বা মেজরের উপরে উঠতে পারেন নি। বিমান ও নৌ-বাহিনীতে বাঙালি অফিসারদের শতকরা হারে কিছুটা উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু তারা স্পষ্টত ছিল সংখ্যালঘু। বিমান ও নৌ উভয় বাহিনীতেই বাঙালি অফিসারেরা নেতৃস্থানীয় পদগুলোর পরিবর্তে মূলত কারিগরি ও প্রশাসনিক শাখায় কর্মরত ছিল।

জানা যায় যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সকল রেজিমেন্টে পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য কোটা নির্ধারণের ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয় নি। বাঙালিদের অভাব-অভিযোগের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। এই মামলা শেষ হওয়ার পর ১৯৬৯ সালের শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের কোটা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়।[৪৩] আপাতদৃষ্টিতে বাঙালিদেরকে তুষ্ট করার জন্য সেনাসার্ভিসে বাঙালিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা সেনাবাহিনী স্বীকার করে। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈনিক নিয়োগ হ্রাসের

৪১. *Dawn*, November 16, 1965; *Pakistan Observer*, November, 5, 1965.

৪২. মেজর জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন ঢাকার নবাব পরিবার থেকে এসেছিলেন বিধায় তাঁকে সাধারণ বাঙালিদের সাথে এক করে দেখা যথাযথ নয়।

৪৩. See Rizvi, *Military and Politics*, 141.

ব্যাপারেও পরিকল্পনা নেয়া হয়, কিন্তু পাঞ্জাবীদের আপত্তির মুখে তা বাস্তবায়ন করা যায় নি। সম্প্রসারিত কোটাব্যবস্থায় যে স্বল্প সংখ্যক অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদেরকে অরাজনৈতিক ধাঁচের জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের মধ্য হতে নির্বাচন করা হয়, যার ফলে যোগ্য কলেজ-স্নাতকেরা বাদ পড়ে যায়। কঠোর নির্বাচন ও নিয়োগপদ্ধতির পরিবর্তে সাক্ষাৎকারপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।[৪৪]

একইভাবে ১৯৬৮-৬৯ সালে অন্য দুটো সার্ভিসেও বাঙালিদের শতকরা হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিমানবাহিনীর অফিসার ক্যাডারে কোন কোটা ছিল না, তবে বিমানসেনা ভর্তির নিয়োগকেন্দ্রসমূহের ৫০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। নৌ-বাহিনীর ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ শূন্য পদ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়; এর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে স্থানান্তরযোগ্য ছিল।[৪৫] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও বিমান ও নৌ-বাহিনীতে বাঙালিদের জন্য পদ বরাদ্দ ছিল, পদ পূরণের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ সকল সার্ভিসে বাঙালিদের অনুপাত নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় নি। অধিকন্তু, যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালি না পাওয়া গেলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক নিয়োগের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বাঙালিদের অনুকূলে শতাংশ বরাদ্দ কাগজপত্রে ভাল মনে হলেও তা অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাতে বাঙালিদের খুব একটা লাভ হয় নি। তবে এটা দুটো সার্ভিসে বাঙালিদের প্রমাণিত মানের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এ সকল সার্ভিসের সকল পদে প্রার্থিতার জন্য প্রয়োজন ছিল ভালো মানের শিক্ষা এবং কারিগরি দক্ষতা। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সময়ের সাথে সাথে যদিও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সামরিক বাহিনীর মোট সংখ্যার বিপরীতে তাদের শতকরা হার বৃদ্ধি পায় নি।

পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানে অপর্যাপ্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে বর্ধিত ক্ষোভের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ গণচীনের সহায়তায় ঢাকার অদূরে একটি সমরাস্ত্র কারখানা নির্মাণ ছাড়াও (যা ১৯৬৯ সালে আংশিক উৎপাদনে যায়) দুটি ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করে। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তান মেশিন টুল ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এসকল বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থা ছিল লোক-দেখানো। আসলে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকারীরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি টেকসই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না।[৪৬]

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঐক্যের সমগ্র সময় জুড়েই সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ জনসংখ্যা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য পরিমাণের

৪৪. ব্রিগেডিয়ার (অব) শাহাবুদ্দিন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎকার, ওয়াশিংটন ডি সি, এপ্রিল-মে, ১৯৯৭।

৪৫. Rizvi, *Military and Politics*, 141.

৪৬. ঐ, 41.

চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম ছিল। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কখনোই অফিসার শ্রেণী ও অন্যান্য স্তরে ইসলামী সমতার নীতি মোতাবেক পাঞ্জাবীদের কর্তৃত্ব রহিত করার জন্য কোনো ঐকান্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।[৪৭]

পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক আধিপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগত বহিঃপ্রকাশ ছিল সামরিক বাহিনীতে অব্যাহতভাবে বাঙালিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্ব। যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষে সামরিক বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করতে পেরেছিল, রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই পেশায় বাঙালিদের যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার না থাকায় এর ফলে কেন্দ্র এবং প্রদেশ উভয় স্তরে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাঙালিদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠকে বাইরে রেখে একটি গোষ্ঠী অথবা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কালক্রমে পাঞ্জাবীদের অব্যাহত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেবল প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান নয়, অধিকতর লাভজনকভাবে এ অঞ্চলের জনগণের ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে পশ্চিমাঞ্চলের বোধগম্য মেলবন্ধন সৃষ্টির জন্য সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত স্বল্প সংখ্যক বাঙালি সামরিক সদস্য প্রথম সুযোগেই পাঞ্জাবীদের নিপীড়নকৌশলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ বঞ্চিত বাঙালিদের হতাশার মাত্রা তখন বিস্ফোরন্মুখ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

সামরিক বাহিনীর প্রভাবশালী পাঞ্জাবীরা বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর (যাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবী) সাথে স্বাভাবিক আঁতাত একবার সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার পর তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ে সামরিক বাহিনীতে অর্থবহ অংশগ্রহণ থেকে বাঙালিদের ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করেছিল। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙালিদের স্বল্প নিয়োগের অনুপাত নিশ্চিত করার জন্য যে গুপ্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো, তার মধ্যে ছিল শ্রেণীসংমিশ্রণ বা জাতিগত সংমিশ্রণ রীতি, যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গঠনকাঠামোতে বাঙালিদের কোটা রাখা হয়েছিল ৮ শতাংশেরও কম।[৪৮] পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের উপর যেসব কাজ হয়েছে তার কোনোটাতেই এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টির উল্লেখ নেই। সামরিক বাহিনীর অন্যান্য শাখার মতো পাকিস্তান সেনাবাহিনীও একেকভাবে বাঙালিদের বাইরে রাখার নীতি অনুসরণ করতো, যার ফলে জনসংখ্যা অনুযায়ী বাঙালিরা প্রতিনিধিত্ব পেতো না। সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য একটি কোটা নির্ধারিত ছিল; কিন্তু

৪৭. Cohen, "Pakistan Army", 42.

৪৮. শ্রেণীগত বিন্যাসকে শ্রেণীবিন্যাসকৃত তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। দেখুন, Pakistan Army, *The Army Regulations*, (Rawalpindi 1960). section 1, Class Composition

সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত কোটা থাকার ফলে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত তাদের অবস্থান প্রান্তিকীকৃতই থেকে যায়।

বিশেষত পাকিস্তানের মতো একটি দেশে, যেখানে প্রচুর সংখ্যক বিভক্তিমূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও উপাদান ছিল, সেখানে সামরিক বাহিনীর উপর বেসামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বৃত্তিগত ও বস্তুগত পূর্বশর্ত ছিল এই যে সামরিক বাহিনী এ পর্যায়ে সমাজের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করবে, যে সমাজকে তা সামগ্রিকভাবে সেবা করেছে। বাঙালিদের অর্থবহ উপস্থিতির অবর্তমানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি জেলা থেকেই লোক নিয়োগ করা হতো এবং এর চরিত্র ছিল প্রাচীন রোমের proconsul বা praetorian-এর অনুরূপ। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের অপ্রতুল প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা, এমনকি মৌলিক গণতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট নব্য টাউটশ্রেণীও সর্বসম্মতভাব নালিশ জানাতো। মাঝে মাঝে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা ১৯৬২-৬৮ সময়কালে নিয়োগনীতি এবং প্রতিরক্ষাব্যয়ের ব্যাপারে ছাঁটাই প্রস্তাব আনতো। নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর করাচী থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর এবং কাকুল ও রিসালপুরের অনুরূপ সামরিক একাডেমী পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের ব্যাপারেও দাবি উত্থাপিত হতো। ১৯৬২ সালের সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা দপ্তরটি একজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তার জন্য বরাদ্দ ছিল। এটাকেও বাঙালিদেরকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের বাইরে রাখার একটি কৌশল হিসেবে সমালোচনা করা হয়। এরকমও শোনা যায় যে আলোচ্য ইস্যু এবং এ ধরনের অনেকগুলো বিষয়ে বাঙালিরা যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য দেখিয়েছিল তা ভাঙার উদ্দেশ্যেই আইয়ুব ১৯৬৩ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

কাশ্মীর বিরোধ, রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা এবং সিভিল সমাজ

স্বাধীনতার পর কাশ্মীর রাজ্য নিয়ে বিরোধ বাধার কিছু দিন পরেই সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপড়েন দৃশ্যমান হওয়ার নিদর্শন দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পর পর কয়েকটি ঘটনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়তায় পাঠান গোত্রের অনিয়মিত যোদ্ধারা বিনা উস্কানিতে রাজ্যে কয়েকটি হামলা চালায়। বিশৃঙ্খল ভাড়াটে যোদ্ধাদেরকে নিয়োজিত করার অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ হিতে বিপরীত হয়। এর ফলে ভারত সামরিক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। এরই ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ায় কাশ্মীরের মহারাজা ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর ভারতে যোগদানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরকম কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া ঠেকাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্বঘোষিত আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে উপত্যকায় আক্রমণ পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে রাজ্যের একটি অংশ তারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়, যার নাম দেয়া হয় তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর।

তবে প্রাথমিক জয়ের স্ফুলিঙ্গ পরবর্তী পর্যায়ে নাগালের বাইরে মনে হতে থাকে। কাশ্মীরের অবশিষ্ট অংশকে সামরিকভাবে একীভূতকরণের উৎসাহ দ্রুত হ্রাস পায় যখন ১৯৪৭ সালের নভেম্বর/ডিসেম্বর নাগাদ সংখ্যাধিক এবং শ্রেয়তর সমরাস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রত্যাঘাত করার পরিকল্পনা চালু করে। ১৯৪৮ সালের মে মাসের মধ্যে যুদ্ধপরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে ভারতের অনুকূলে চলে আসে এবং তারা কাশ্মীর পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যায়।

এরপর পাকিস্তান সরকার নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলে একদল যুদ্ধবাজ সামরিক অফিসার সামরিক তৎপরতায় ব্যর্থতার জন্য এবং যখন শত্রু রক্ষণাত্মক অবস্থানে ও একটি চূড়ান্ত বিজয় সন্নিকটে এমন মুহূর্তে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ায় খোলাখুলিভাবে সরকারের সমালোচনা করে। এই হাতে গোনা কিছু অফিসার কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার পক্ষে ছিল। সামরিক বাহিনীর এই যুদ্ধবাজ অংশই রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র ধারাবাহিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বেসামরিক সমাজকে করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছিল।

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী অবস্থান নেয়ার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ যুক্তি প্রদর্শন করেছিল যে ভারত রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানকে মেনে নিয়েছে কেবল পরবর্তীকালে তাকে সামরিকভাবে বিলোপ করার উদ্দেশ্যে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মতে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই দুরাত্মা ভারতের লক্ষ্য, যা পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষক হিসেবে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে নিশ্চিত করেছিল।

রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতাচ্যুত করার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার কথা ছিল ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে। একদল জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা কিছু বিশিষ্ট বেসামরিক ব্যক্তির সহায়তায় এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।[৪৯] তবে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের চমকপ্রদ কাহিনীটিকে একটি তাৎপর্যহীন ঘটনা হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছিল। এ বিষয়ে কোন কিছু প্রকাশিত না হওয়ায় ঘটনাটি রহস্যাবৃতই থেকে যায়। এ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অনেক কানাঘুষা হলেও জনসমক্ষে কোন বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয় নি। যতদূর জানা যায়, আদালতে মামলার বিবরণী শ্রেণীবিন্যাসকৃত হিসেবেই থেকে যায়।

৪৯. ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে এ পরিকল্পনা চালু হয়, যখন বিভিন্ন ধাপ ও পদের অফিসারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালের জনুয়ারি মাসে প্রশিক্ষণ উপলক্ষে পরিকল্পনার হোতা জেনারেল আকবর খানের যুক্তরাজ্যে গমনের ফলে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটলেও আগস্ট মাসে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর পরিকল্পনা পুনরায় চালু হয়।

আকস্মিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ অভ্যুত্থানপ্রচেষ্টাটি ছিল সামরিক-বেসামরিক বিরোধ এবং সামরিক বাহিনীর অফিসার শ্রেণীর অভ্যন্তরে দলাদলির একটি প্রতিফলন। যদিও সরকার এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকারীরা কাশ্মীর বিষয়ে ভারতকে মোকাবেলায় লিয়াকতের অদক্ষতার কারণেই মূলত অভ্যুত্থানের তাগিদ অনুভব করেছিল, বাস্তবে এর স্বরূপ ছিল আরো মারাত্মক। কেননা, অভ্যুত্থানের আদর্শগত এবং রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল বৈপ্লবিক এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র যে ধারণা ও আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনও বলা হয়েছিল যে অভ্যুত্থানপ্রয়াসের বিপ্লবী নেতারা "অন্যান্য সামরিক সংগঠনের গঠনপ্রকৃতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল; যুদ্ধের সময় তারা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সংস্পর্শেও এসেছিল"।[৫০] যদিও বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মৌলিক কাঠামো ও তার সমাজবিচ্ছিন্নতা পাকিস্তানে বজায় রাখা হয়েছিল এবং অধিকাংশ নতুন পাকিস্তানী অফিসার তাদের বৃটিশ পূর্বসূরিদেরকেই যোগ্য পেশাদারি আদর্শ হিসেবে দেখছিল, রাজনীতি ও আদর্শের ছোঁয়া ক্রমে তাদের মধ্যে স্থান করে নিচ্ছিল। মনে হয়, বিপদের প্রথম সংকেত পেয়েই এমনকি ষড়যন্ত্র পরিপক্ব রূপ নেয়ার পূর্বেই কর্তৃপক্ষ আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৫১ সালের ২১ মার্চ আইন পরিষদে এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতিতে লিয়াকত আলী খান জানান যে সরকার আবিষ্কার করেছে, সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ অফিসারদের একটি দল কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সহিংস পন্থায় সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছে।[৫১] লিয়াকত আলী জানান যে ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য ছিল সামরিক ছত্রছায়ায় কমিউনিস্ট পদ্ধতির একটি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা।[৫২] প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী ৭ মার্চ ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। এরপর রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আইন পাশ হওয়ার পর সিন্ধুর রাজধানী হায়দ্রাবাদে একটি বিশেষ

৫০. Coben, *Pakistan Army*, 161

৫১. অনেক বছর পর অভ্যুত্থানপ্রয়াসের নেতা জেনারেল আকবর সহিংসতা বা হত্যার পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। Rizvi, 4

৫২. Pakistan Constituent Assembly, (Legislature), Debates, Vol. I, March 21, 1951, P. 34. লিয়াকত আইনসভাকে আরো জানান যে, একটি বিশেষ দেশ থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের অর্থনৈতিক ও সংবিধান প্রণয়ন মিশন আমন্ত্রিত হওয়ার কথা ছিল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল সীমিত এবং অভ্যুত্থানকে তারা কোন অর্থবহ সমর্থন দিতে পারতো না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রকাশিত স্মৃতিকথায় আইয়ুব খান অভ্যুত্থানপ্রয়াসের নেতাদের কথিত কমিউনিস্ট যোগাযোগের কথা কিছুই বলেন নি, যদিও তাঁর সকল নথি এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেখার সুযোগ ছিল। একইভাবে বৃটিশ জেনারেল ফ্রান্সিস ইনগাল—যিনি অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকারীদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, তাঁর প্রকাশিত স্মৃতিকথায় কমিউনিস্ট যোগাযোগের কথা কিছুই উল্লেখ করেননি। বরং তিনি অনুশোচনা করেছিলেন যে, দেশের নবসৃষ্ট পেশাদার সেনাবাহিনী অত্যন্ত যোগ্য ও প্রতিশ্রুতিশীল কয়েকজন অফিসারকে চিরকালের জন্য হারাল। জিন্নাহ ইনগালকে পাকিস্তানের সামরিক একাডেমির প্রথম কমান্ডেন্ট নিয়োগ করেছিলেন।

বেসামরিক ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। প্রকৃত বিচারকার্য প্রায় ১৮ মাস স্থায়ী হয় এবং ১৯৫৩ সালের ৫ জানুয়ারিতে ঘোষিত রায়ে অভিযুক্তদেরকে ১ থেকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হয়, যখন গভর্নর জেনারেল দণ্ডাদেশের বাকি অংশ মওকুফ করে দেন।

যদিও রুদ্ধদ্বার বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, "এটা ছিল সবচেয়ে আলোচিত ও চমকসৃষ্টিকারী মামলা"।[৫৩] এর কারণ, ১৪ জন অভিযুক্তের মধ্যে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল আকবর খান সহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ জেনারেল। এসব জেনারেলের অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের জন্য উপাধি পেয়েছিলেন [৫৪] এবং কাশ্মীর যুদ্ধের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বীর ছিলেন। অপর এক অভিযুক্ত— পাকিস্তান টাইমস-এর সম্পাদক এবং বামঘেঁষা বিখ্যাত উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের গ্রেফতারে নাগরিকদের একাংশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অন্য এক অভিযুক্ত সাজ্জাদ সাহের ছিলেন একজন বামঘেঁষা লেখক।[৫৫]

প্রধানমন্ত্রী আইয়ুবকে ষড়যন্ত্রের বিষয় অবহিত করার পর আইয়ুব অবিলম্বে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান, নিশ্চিত হন এবং সামরিক আদালতে এর বিচার অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বেসামরিক ব্যক্তিরা জড়িত থাকায় তা খারিজ করা হয়। বেসামরিক আদালতে বিচারে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সেনা অফিসারকে জেরা করার সময় সোহরাওয়ার্দী স্পষ্টত আক্রমণাত্মক ছিলেন। কিন্তু আদালত তাঁকে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকে। আইয়ুব এতে বেশ ক্ষুব্ধ হন এবং ১৯৫৪ সালে মন্ত্রীপরিষদের এক সভায়[৫৬] সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর গুরুতর ক্ষতি করার অভিযোগ এনে বলেন যে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের বন্ধু নন।[৫৭] মন্তব্যটি যতই তেতো হোক না কেন, ১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর দায়িত্ব গ্রহণের পরও আইয়ুব প্রধান সেনাপতি হিসেবে বহাল থেকে যান। ততোদিনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক হয়ে পড়েছিল কেবল লোকদেখানো ব্যাপার। সামরিক বাহিনী তখন হয়ে পড়ে একটি প্রেইটোরীয় বাহিনী এবং কোন প্রধানমন্ত্রীরই সেখানে হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না।[৫৮] ১৯৫৮ সালে সফল অভ্যুত্থানের পূর্বে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র ছিল একমাত্র ঘটনা, যেখানে সামরিক বাহিনীর একটি অংশ রাজনীতিতে সরাসরি আগ্রহ দেখায়। এটা নিশ্চিতভাবেই

৫৩. Shaista Ikramullah, *Huseyn Shaheed Suhrawardy*, (Karachi 1991), 74.

৫৪. দেখুন, Rizvi, *Military and Politics*, 64

৫৫. দেখুন, Raymond A. Moorre, *Nation Building and the Pakistan Army, 1947-69*, (Lahore 1979), 68, বিরোধীদের সরিয়ে দেয়ার জন্য সামরিক আদালত হতে পারতো একটি পন্থা। কিন্তু মার্শাল থেকে নিবৃত করার মতো যথেষ্ট সেনাসমর্থন আকবরের ছিল।

৫৬. তথাকথিত মেধাবীদের মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী এবং আইয়ুব উভয়কেই নেয়া হয়েছিল।

৫৭. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, (London 1967), 37.

৫৮. পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে আইয়ুবের নির্দেশে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯৬৩২ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের একটি হোটেলে তাঁর মৃত্যুর পেছনে কোন অদৃশ্য হাত ছিল বলে বাংলাদেশের কেউ কেউ এখনো সন্দেহ পোষণ করেন।

সেনাবাহিনীর অফিসার শ্রেণীর মধ্যে একটা শিথিল ভাবের ইঙ্গিত দেয় এবং আইয়ুব প্রথম সুযোগেই সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা কঠোরতর করেন এবং যেসব অফিসারের আনুগত্য সন্দেহজনক ছিল তাদেরকে বহিষ্কার করেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্রের ঝামেলাপূর্ণ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সেনাবাহিনীর বেশ কিছুদিন সময় লেগে যায়। পরবর্তীতে সামরিক-বেসামরিক রাজনৈতিক সংযোগের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে সামরিক বাহিনীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, যে সমাজকে ঘিরেই ছিল তাদের সেবার পরিধি। এরপর সামরিক বাহিনীর জন্য এমন একটি নিয়োগবিধি প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিদেরকে অফিসার শ্রেণীতে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। রাওয়ালপিন্ডি ঘটনায় অপাতদৃষ্টিতে সামরিক বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি অনুগত থাকে, কিন্তু তাদের বিবেচ্য বিষয়ের পরিধি শীঘ্রই বেসামরিক অঙ্গনে বিস্তৃত হয়। এমনকি আইয়ুব খান, যিনি ষড়যন্ত্রকারীদের ধিক্কার দিয়েছিলেন, তিনিও পরবর্তীকালে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে আকবর খানের সুশৃঙ্খল সরকার গঠনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৫৯] ঘটনাটি নিশ্চিতভাবেই ছিল শাসনকার্য পরিচালনায় বেসামরিক কর্তৃপক্ষের দক্ষতার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর প্রশ্ন তোলার একটি সুযোগ। ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল একটি দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। সামরিক বাহিনীও সেসময় থেকে যখনই হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেছে, তখনই এই মহান লক্ষ্যের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

পাঞ্জাব গোলযোগ, ১৯৫৩

সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে সামরিক বাহিনী কর্তৃক বেসামরিক শাসনক্ষমতা দখলের সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ এসেছিল ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে, যখন আহমদীয়াবিরোধী ধর্মীয় রাজনৈতিক সংঘাত পাঞ্জাবে ব্যাপক সহিংসতার জন্ম দেয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার পর সামরিক বাহিনীকে ডাকা হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় সেনাবাহিনী পাঞ্জাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল এবং যে অকুণ্ঠ জনসমর্থন পেয়েছিল তার ফলে বেসামরিক বিষয়াদি ব্যবস্থাপনায় সামরিক বাহিনীর আত্মবিশ্বাস জন্মে। বিদেশী আক্রমণ থেকে বহিঃসীমান্ত সুরক্ষা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ ভাঙন রোধে যে সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, লাহোরের ঘটনাপ্রবাহ সে ব্যাপারে এক নতুন বোধোদয় সঞ্চার করে।

পাঞ্জাব গোলযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আহমদীয়া নামে পরিচিত ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিম গোষ্ঠীর প্রতি গোঁড়া সুন্নি মুসলমানদের একটি অংশের বৈরিতা।[৬০] পাঞ্জাবের পূর্ব

৫৯. Ayub Khan, *Friends Not Masters*, 38.

৬০. যদিও এটা একটি পৃথক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল, এটাকে বাহাই এবং এক ঘরনের গোঁড়া শিয়াদের অনুরূপ বলে বিবেচনা করা হতো।

ও মধ্যাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এই গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। অবস্থাপন্ন আহমদীয়া সম্প্রদায়ে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। স্যার জাফরুল্লাহ সেসময় ছিলেন পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আহমদীয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সালের দিকে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাদিয়ানের মির্জা গোলাম আহমদ (১৮৩৯-১৯০৮), যিনি নিজেকে একজন নবী এবং মাহদী হিসেবে দাবি করেন। এই দাবির ফলে গোষ্ঠীটিকে কট্টরপন্থীরা ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করেছিল। আহমদীয়াবিরোধী উত্তেজনার সূচনা করেছিল মজলিস-ই-আহরার নামের একটি সামাজিক প্রগতিশীল কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী। আলেমদের নেতৃত্বাধীন এই বৃটিশবিরোধী মুসলিম জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী আদিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তারা তাদের মুসলিম লীগ বিরোধী অবস্থান বজায় রাখে এবং ডোগ্‌রা মহারাজার শাসনে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার কাশ্মিরী মুসলমানদের সমর্থনে বিক্ষোভের আয়োজন করে। আদিতে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী হলেও নিজেদের পুনর্বাসনের প্রয়াসে আহরারেরা এই মর্মে দাবি জানায় যে আহমদীয়াদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে এবং সকল দায়িত্বশীল পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। বিক্ষোভকারীরা যুক্তি দেখায় যে এসকল পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার ইসলামের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পালন করতে পারবে। অতীতে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল এমন অনেক উলেমাগোষ্ঠী এতে যোগ দেয়ায় আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন দ্রুত বেগবান হয়।[৬১] এসকল ধর্মীয় নেতা ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে করাচীতে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম দলসমূহের একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এমনকি কিছু জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাও সম্মেলনে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তালিমায়াত-ই-ইসলামিয়ার সচিব এবং দুজন সদস্য।[৬২] আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন ধূমায়িত হয়েছিল ১৯৫২ সালের শেষ দিকে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি, প্রদেশে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অসন্তোষ, প্রশাসন পরিচালনায় মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতা এবং সাধারণভাবে একটি সরকারবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হওয়ার প্রেক্ষাপটে। আহমদীয়া আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। যদিও আহমদীয়াদের প্রতি বিদ্বেষ ১৯৫৩ সালের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, আহমদীয়াদেরকে কেন্দ্র করেই সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভাব-

৬১. মওদুদির নেতৃত্বাধীন জামায়াত-ই-ইসলামী পাঞ্জাবের বিক্ষোভকে সমর্থন
মাসালা (আহমদীয়া প্রশ্ন) নামক তাঁর প্রকাশিত বইয়ে বিক্ষোভের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। আহরারের উস্কানিমূলক তৎপরতার চেয়েও জামায়াতের সমর্থনকে সরকার আরও বিপজ্জনক ও অনিষ্টকর মনে করেছিল। Syed Vali R. Nasr, *Maududi and the Making of Islamic Revivalism,* (New York: 1996), 43

৬২. দেখুন, *Report of the Court of Inquiry to Inquire into the Punjab Disturbances of 1953* (Lahore 1954), 127. এ রিপোর্টকে সাধারণত *মুনির রিপোর্ট* হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অভিযোগের অনুভূতি ১৯৫৩ সালে দানা বেঁধে উঠেছিল। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের মূল ভিত্তি ছিল জমির মালিকশ্রেণী। যেহেতু তাদের রাজনৈতিক আচরণে ইসলামী আবেগের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, এটা প্রকাশের সুযোগও তারা সর্বদা খুঁজতো। ফলে আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন সহজেই তাদের সমর্থন পেয়েছিল। এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত এবং শহুরে সমাজবাদীও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

ইসলামের কখনোই একক স্তম্ভ ছিল না, তবে *পাকিস্তান আন্দোলন* সাময়িকভাবে হলেও গোষ্ঠীগত মতানৈক্যকে ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র অর্জিত হওয়ার পরই জাতিগত এবং আঞ্চলিক পার্থক্যের পাশাপাশি ধর্মীয় উপদলীয় কোন্দলও ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মৌলবাদীরা জনগণের উপর তাদের প্রভাব খাটানোর সুযোগ পেতো না। এতে করে আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভ এড়ানো যেতো অথবা অতি দ্রুত তা দমন করা যেতো। জিন্নাহ পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার অব্যবস্থাপনার জন্য এত ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তিনি তাদের অনেকের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যারা কয়েক দশক যাবৎ ষড়যন্ত্র ও হানাহানিতে রত ছিল এবং প্রায়শই বিরোধপূর্ণ মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে গবাদি পশু চুরিতে লিপ্ত হতো।[৬৩]

আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিষোদগার শুরু হয় ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচীতে, যখন এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। এরপর প্রাণহানিসহ কয়েকটি নোংরা ঘটনা ঘটে। যখন ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে একটি *ডাইরেক্ট এ্যাকশন* দিবসের ডাক দেওয়া হয়, তখন গোলযোগ এড়াতে শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে গোলযোগ অব্যাহতই থাকে; অধিকাংশ জেলাশহরেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। তবে পুলিশ মোটামুটিভাবে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে লাহোরে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং বেসামরিক সরকার তা নিয়ন্ত্রণের তেমন একটা চেষ্টাও করে নি। তখন দশ সহস্রেরও অধিক ক্ষিপ্ত জনতা নগরীর চারদিকে ঘুরে বেড়াতো এবং পুলিশকে আক্রমণসহ সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতো। মসজিদে আহমদীয়াদেরকে আক্রমণ করার জন্য ধর্মোপদেশ প্রচারিত হতো এবং সরকারের বিরুদ্ধে উগ্র বিক্ষোভমিছিলও অব্যাহত থাকতো। ৬ মার্চের মধ্যে দেয়ালঘেরা শহরের অংশবিশেষ জ্বালিয়ে দেয়া হয়, রেললাইন কেটে ফেলা হয়, বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে হামলা চালানো হয় এবং সরকারি দপ্তরগুলো

৬৩. দেখুন, Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan : the Nature and Direction for Change*, (New York 1980), 36. ১৯৪৭-৪৯ সময়কালে পাঞ্জাবের বৃটিশ গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস মুডির সাথে লেখকের ব্যক্তিগত যোগাযোগ।

অচল হয়ে পড়ে। বাস্তবে লাহোর নগরী হয়ে পড়ে নিশ্চল। কিন্তু নগরী যখন পুড়ছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে একটি বিবৃতি প্রদান করলেন, যার মাধ্যমে তিনি বিক্ষোভকারীদের এ দাবিই মেনে নিলেন যে আহমদীয়াদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা করা উচিত এবং জাফরুল্লাহ খানের মতো আহমদীয়া নেতাদের বরখাস্ত করা উচিত। অবশ্য একই দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সামরিক আইন জারি এবং আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। মেজর জেনারেল আজম খান, যিনি পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁকে নিযুক্ত করা হয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে। লাহোর নগরীকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত হয় একজন সামরিক আইন প্রশাসক। সৈন্য নামানোর সাথে সাথে সান্ধ্য আইন জারি, সড়ক অবরোধ ও চেক পয়েন্ট স্থাপন এবং সংবাদ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। সামরিক আদালত চালু হয়। বারো জনের মতো নিহত এবং কয়েকশত আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সফরের পর মার্চের শেষ দিকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিয়া মমতাজ খান দৌলতানা পদত্যাগ করেন। কিন্তু নাজিমউদ্দিন নিজেই এরপর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক বরখাস্ত হন। তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষমতার লড়াইয়ে পাঞ্জাবী দলাদলির শিকার হলেন।

১১ মার্চের মধ্যে নগরী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেনাবাহিনী আবার নগরীর নিয়ন্ত্রণ বেসামরিক প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। কিন্তু কেন্দ্র দ্বিমত পোষণ করলো। এছাড়া সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় বহাল রাখার জন্য গণদাবিও ছিল।[৬৪] কয়েকদিন পর ২৩ মার্চ তারিখে পুনরায় সামরিক শাসন শুরু হয়, যাকে বলা যায় "লাহোরে দ্বিতীয় পর্যায়ের সামরিক শাসন"।[৬৫] এ সময় প্রশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, চোরাচালানি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোধ, বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস এবং জনগণের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সামরিক প্রশাসন নগরীকে পরিষ্কার করে, সড়ক প্রশস্ত করে, পয়ঃপ্রণালী উন্নত করে, নতুন বিপণিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রচুর নাগরিক সুবিধা সংযোজন করে। এসকল ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়া হলো সামরিক বাহিনীর প্রতি জনসমর্থনের স্ফূরণ ঘটাতে। বাস্তবেও সেদিকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হলো।

সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ১৯৫৩ সালের ১৫ মে তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে এবং সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে

৬৪. Raymond A. Moore, *Nation Building and the Pakistan Army,* (Lahore: 1979), 73.

৬৫. Fazal Muqueem Khan, *The Story of the Pakistan Army,* (Karachi · 1963), 186.

ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সেনাবাহিনী বেসামরিক জনজীবনের সাথে তার এই স্বল্পকালীন মোকাবেলাতেই জনমনে প্রবলভাবে রেখাপাত করে এবং তার সাফল্যে নিজেই বিস্মিত হয়। সামরিক শাসন ছিল দক্ষ, সুশৃঙ্খল এবং প্রদত্ত সময়ের মধ্যেই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম। প্রথম সামরিক শাসনের এই সাফল্যের অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ ক্রমেই রাজনীতিকদের ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে, যারা অব্যাহতভাবে জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। জনগণ শীঘ্রই দেশোদ্ধারের জন্য আইয়ুবের মতো শক্ত মানবের নেতৃত্বাধীন সামরিক বাহিনীকে সমর্থন দিতে শুরু করলো। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করা হলো না সেটা হলো, সামরিক আইনের অধীনে সামরিক বাহিনীর নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে জবাবদিহিতা থাকে নি। সামরিক বাহিনী শাস্তির ভয় ব্যতিরেকে এবং বেসামরিক রীতি বা বিচারপ্রক্রিয়া দ্বারা সীমাবদ্ধ না থেকে তার কার্যাবলী সম্পাদন করতে গিয়ে একক হুকুম ও নিয়ন্ত্রণকাঠামোর মাধ্যমে যুদ্ধের অনুরূপ পরিস্থিতিতে দ্রুত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, কিন্তু যে-কোন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনব্যবস্থায় তার দীর্ঘকাল জড়িত থাকা নিশ্চিতভাবেই হিতে বিপরীত হতে বাধ্য। অধিকন্তু, লাহোরের অভিজ্ঞতা ছিল স্বল্প সময়ের জন্য, একটি ক্ষুদ্র এলাকার গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকেন্দ্রিক।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং মুসলিম লীগ দলীয় সরকার যে সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায়, এমনকি দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, লাহোরের ঘটনাবলী সে সত্যকে উন্মোচন করে দেয়। জাতীয় মঞ্চ থেকে জিন্নাহ এবং লিয়াকতের মতো দু'জন শ্রদ্ধাভাজন ও সক্ষম শক্তমানবের বিদায়ের পর মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জাতীয় জীবনে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন কায়েমের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তারা গোলযোগের সময় নিজেদেরকে উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীর শরণাপন্ন হতে থাকে, যার ফলে সামরিক হস্তক্ষেপের প্যান্ডোরার বাক্সটিই উন্মুক্ত হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করার জন্যই সামরিক বাহিনী লাহোরে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে তাদেরকে প্রত্যাহারের সময় তারা জাতীয় মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে সামরিক বাহনীকে নিয়ে আসার ফন্দি আঁটতে থাকে। সরকারি কর্তৃত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী নিজেদেরকে অত্যাবশ্যক মনে করতে থাকে এবং দূর্বল কর্তৃপক্ষকে প্রতিস্থাপন করা তাদের জন্য সুবিধাজনক কিনা সেটাও বিবেচনা করা শুরু করে। সামরিক বাহিনী নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেসামরিক শ্রেষ্ঠত্বের বৃটিশ ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, কিন্তু বেসামরিক নেতৃত্বই সে ঐতিহ্য বিনষ্ট করলো। অধিকন্তু পাঞ্জাব গোলযোগের একটি ফল ছিল এই যে, তা "সাংবিধানিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত" করেছিল[৬৬], যা সামরিক বাহিনীর জন্য সুবিধাজনক ছিল।

৬৬. Syed Vali R. Nasr, *Maududi and the Making of Islamic Revivalism,* (New York: 1996), 43.

১৯৬৮ সালের শেষে এবং ১৯৬৯ সালের শুরুতে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে শাসকগোষ্ঠী প্রধানত পাঞ্জাবী বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং উদ্যোক্তাশ্রেণীর সাথে সুদক্ষভাবে আঁতাত গড়ে তুলতে পারলেও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা মূলত শহর অঞ্চলে যে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল তা মোকাবেলা করতে তারা অক্ষম। ১৯৬৯ সালের মার্চে আইয়ুব কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক একটি নতুন ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে। প্রাথমিকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ইয়াহিয়া শীঘ্রই নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করলেন, সংবিধান বাতিল করলেন, মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানটিকে বর্জন করলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে একক ইউনিট করার পূর্বে যে চারটি প্রদেশ ছিল সেগুলো পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনায়ও বসলেন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শীঘ্রই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কথা ছিল, জাতীয় পরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করবে। পূর্ব পাকিস্তানকে তুষ্ট করার জন্যও ইয়াহিয়া কিছু অঙ্গীকার করলেন, যেগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা থাকলেও তা অস্পষ্টতার আবরণে ঢাকা ছিল।

মন্ত্রিসভায় সামরিক ব্যক্তিদের আধিক্য থাকলেও ইয়াহিয়া কিছু বেসামরিক সদস্যও নিয়েছিলেন, তবে সামরিক আইন প্রশাসকদের একটি কমিটি সরকারের সকল বেসামরিক কাঠামোর উপরে সক্রিয় ছিল। ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা ছিলেন জেনারেলদের একটি দল, যারা অন্ধের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠী বেসামরিক পোষাক পরে সরকারের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণকে আংশিকভাবে আড়াল করতে পেরেছিল, কিন্তু নতুন শাসনব্যবস্থায় সামরিক ব্যক্তিরা বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে খোলামেলাভাবে প্রতিস্থাপন করায় বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সাথে তাদের জোটবদ্ধতায় টানাপড়েন দেখা দেয়।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুনরায় অর্জিত হয়। এরপর ইয়াহিয়া সামরিক বাহিনী ও জেড. এ. ভূট্টোর সমর্থন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া থামিয়ে দেন। যে মুহূর্তে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত ছিল, সে মুহূর্তেই সামরিক বাহিনী তাদের প্রভাব হারানোর আশংকায় পুরো প্রক্রিয়াকেই নস্যাৎ করে দেয়। ভূট্টোর সহযোগিতা সামরিক বাহিনীর হাতকে আরো শক্তিশালী করলো। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দলটির পূর্ণ সমর্থন পেয়ে সামরিক বাহিনীর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও নিপীড়ন চালানো সহজতর হয়ে উঠলো।

উপসংহার

এ অধ্যায়ের সময়কাল বিবেচনায় রেখে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সম্পর্কে যে-কোন সমীক্ষাকে দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এর একটি পশ্চিম পাকিস্তানী প্রেক্ষিত ও অন্যটি পূর্ব পাকিস্তানী প্রেক্ষিত। এ দুয়ের মধ্যে সাধারণ ভিত্তি ছিল বিরল। আগেই বলা হয়েছে, বাঙালিরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে দেশপ্রেমের দৃষ্টিতে না দেখে সন্দেহের চোখে দেখতো। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশই যেখানে নিজেদেরকে সামরিক বাহিনীর সাথে এক করে দেখতো, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাধারণ মনোভাব ছিল বিপরীত। পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তাচাহিদা এবং প্রতিরক্ষা ধ্রুবক যে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল তার উপরও বিশেষ জোর দেয়া প্রয়োজন। কাশ্মীর ও ভারত পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতো, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এগুলো ছিল প্রান্তিক আগ্রহের বিষয়। এখানে আরো লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সামরিক শাসকদের ক্ষমতার সহযোগী বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উত্তরসূরি হিসেবে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করার অপরিহার্য মূল্যবোধ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঐ বৃটিশ ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে এবং ক্ষমতা দখলের পথে ধাবিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়ার বা একে সমর্থন প্রদানের কোন রেকর্ড না থাকায় সামরিক বাহিনী ভারতীয় আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলিম কাশ্মীরকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নতুন করে তুলে ধরার বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। কাশ্মীর রাজ্যটিকে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে দখল করে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করেই সে লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস চালানো হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মৌন সম্মতি নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাশ্মীরে এই হঠকারী অভিযান সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে। এর ফলে আর্থ-সামাজিক খাতসমূহের উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হ্রাস করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের এক বিরাট অংশ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করতে তারা সক্ষম হয়।

শ্রেয়তর অস্ত্রে সজ্জিত এবং একটি শক্তিশালী অর্থনীতির সহায়তাপুষ্ট ভারতের বৃহৎ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনী কাশ্মীরের ব্যাপারে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইসলামকে রক্ষা ও এর পক্ষে প্রচারণা ছাড়াও বহির্বিশ্বে ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আগ্রহ তুলে ধরে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা প্রেক্ষাপটকে দক্ষতার সাথে বহির্মুখী করা হয়েছিল। এতে দু'ধরনের ফল পাওয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন আসে, যাদের

ভারতভীতিকে গোঁড়া ধর্মীয় নেতৃত্বের সহায়তায় সামরিক বাহিনী অব্যাহতভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছিল।[৬৭] ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীলদের বিপরীতে ধর্মীয় গোষ্ঠী রাষ্ট্রকে গোঁড়া ইসলামী কায়দায় গড়ে তুলতে মনে-প্রাণে আগ্রহী ছিল। পাকিস্তানী বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর চেয়ে নৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী বলে একটি ভ্রান্ত ধারণা পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পোষণ করতো। তবে বাঙালিরা যেমন কাশ্মীর মুক্ত করার জন্য *ডন কুইকসোটতুল্য* তাড়নার সাথে একাত্ম ছিল না, তেমনি ইসলামের আবেগময় রাজনৈতিক আবেদনের ব্যাপারেও তারা খুব একটা উৎসাহী ছিল না।

শীতল যুদ্ধবলয়ে পাকিস্তানের অবস্থানের সূত্র ধরে বহির্মুখিতার আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে একটি শক্ত ঘাঁটি বলে বিবেচনা করে পশ্চিমা মিত্ররা পাকিস্তানের সাথে একের পর এক প্রতিরক্ষাচুক্তি স্বাক্ষর করে। এর ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানকে যে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করা হয়, তাতে করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে প্রচুর সম্পদ ও জনবল চলে আসে। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে সামরিক বাহিনীকে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। ফলে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় উপাদানই বেসামরিক কর্তৃপক্ষের তুলনায় সামরিক বাহিনীকে সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে আসে। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে এবং আসন্ন বিপরীত ভূমিকায় সামরিক নেতৃত্বের তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানকে প্রদত্ত মার্কিন সামরিক সাহায্য সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। এটা নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানের সামরিক অস্ত্রবল সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করেছিল। কিন্তু এর ফলে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাঙালিরা যে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতার অধিকারী নয় এ উপলব্ধি তীব্রতর হয়েছিল, কারণ বিদেশী সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে উদ্ভুত অধিকাংশ সম্পদই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হতো। এ সম্পদ ছিল সামরিক বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশাল বাজেটবরাদ্দের অতিরিক্ত, যা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানেই বিনিয়োজিত হতো।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। জনগণ থেকে সামগ্রিকভাবে পৃথক থাকার ফলে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনী কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে পারে নি। যোদ্ধাশ্রেণীর অনুকূলে বৃটিশ নিয়োগনীতি অব্যাহত রাখার ফলে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জনকারী বাঙালিদের কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল না।

৬৭. ভারতের মোকাবেলা করতে গিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মধ্যযুগীয় ইসলামী অনুশাসন *জিহাদের* ধারণার শরণাপন্ন হতো—যা ছিল অনন্তকাল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতবাদ। এতে প্রতিটি যুদ্ধ বিরতি বা সন্ধিকে শান্তির পরিবর্তে সাময়িক বিরতি মনে করা হতো।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো কারণ চিহ্নিত করা যায় না। তবে সম্ভবত প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যর্থতা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, উভয় প্রদেশে কেবল সেই মুসলিম লীগেরই অনুসারী ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে সে দলটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানকে একসাথে জুড়ে রাখার মতো কোন বিকল্প রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে নি। ১৯৫৪ সাল থেকে আঞ্চলিকতা ব্যাপ্তি পেতে থাকে এবং মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী সংগঠন সামরিক যন্ত্রের দ্বারা এ প্রক্রিয়া আরো তীব্রতর হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্যে পেশাজীবী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা ছাড়াও শীতল যুদ্ধ এবং কাশ্মীরের মতো বাহ্যিক উপাদানসমূহ অবস্থার অবনতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। সেনাবাহিনী তখন রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে প্রবৃত্ত হয়। এ প্রক্রিয়ায় বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে তারা আত্মকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্র এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যিক স্বার্থগুলোকে সাথে নিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে।

১৯

রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নৃগোষ্ঠী

আমেনা মোহসীন*

রাজনৈতিক ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক পরিচিতি বিনির্মাণ হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য ফলশ্রুতি বা অনুসিদ্ধান্ত। এটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অথবা রাষ্ট্র ব্যতিরেকে ঘটতে পারে। উপরোক্ত প্রথম উপাদানটি সহজে বোধগম্য, তবে দ্বিতীয়টির জন্য আবশ্যক আধুনিক রাষ্ট্রের সক্রিয়তা ও রাজনীতি অনুধাবন। যা হোক, এ প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর আধিপত্যকে প্রাধান্য দেয়। কোন একটি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতি নির্মাণের অর্থ হলো এই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে অন্যগুলো থেকে পৃথক করে দেখা। জাতীয়তাবাদী ধারণার[১] উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক রাষ্ট্র প্রভাবশালী বা সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতমূলক অবস্থান গ্রহণ করে এবং এর পরিণতি হচ্ছে দুর্বল গোষ্ঠীর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য। এ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক এমন কিছু মূলনীতি বা উন্নয়নমডেল তৈরি করা, যা দুর্বল সম্প্রদায়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে এক সময়ে দুর্বল গোষ্ঠীগুলো নিজেদের জন্য নতুন রাজনৈতিক পরিচিতি নির্মাণ ও দাবি করতে গিয়ে

* অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, আমেনা মোহসীন এবং ইমতিয়াজ আহমেদ, "Limits of the Nationalist Discourse: The Age of sub-State Nationalism", *Theoretical Perspecives, Vol 3, 1998*..

সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর বাকভঙ্গি ও রাজনীতি অবলম্বন করে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে যাই। এ প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের এথনিক গোষ্ঠীগুলোর প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাদের বর্তমান সংকটময় অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা।

এ প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রভাবশালী এবং অধস্তন পর্যায়ের রাজনীতির প্রেক্ষিতে এথনিক এবং জাতি বিষয়ক ধারণাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অংশে এসব এথনিক গোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যমূলক নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসমূহ এবং গারোদের[২] বিষয়ে আলোচনা করেছি। শেষাংশে আমরা এ সকল এথনিক গোষ্ঠীর পরিচিতি বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার সমস্যা পরীক্ষা করেছি এবং সংকট উত্তরণের উপায় নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছি।

(১)এথনিক বনাম জাতি : জাতিগত পরিচিতি কোন প্রদত্ত বা পূর্বনির্ধারিত বিষয় নয় বরং মানব সমাজ সৃষ্ট, যা এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিতবহ। যাহোক, এই আপাত স্বাভাবিক এবং সামাজিক ক্রিয়ার একটি নেতিবাচক রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে, যার উদ্ভব জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান থেকে যা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বৌদ্ধিক প্রভাবজনিত সমপ্রকৃতির জনসংখ্যার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু অধিকাংশ মানব সমাজ বহুবিধ প্রকৃতির, সেহেতু লক্ষ্য করা যায় যে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রভাবশালী গোষ্ঠী অনেকটা অন্যায্যভাবে বা ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে নিজেকে পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে তুলে ধরে এবং অন্য জনগোষ্ঠীগুলোকে 'এথনিক', 'উপজাতি', 'আদিবাসী' ইত্যাদি নামে অধস্তন পর্যায়ভুক্ত করে। যাহোক, 'জাতি' এবং 'এথনিক'শব্দদুটোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দুই শ্রেণীর মধ্যে খুব কম পার্থক্যই বিদ্যমান। আরো প্রতিভাত হবে যে এসব ধারণা প্রাকৃতিকভাবে প্রদত্ত নয়, বরঞ্চ মানবসৃষ্ট।

'nation' শব্দের উদ্ভব ল্যাটিন 'nasci' শব্দ থেকে, যার অর্থ জন্ম নেয়া।[৩] সাধারণভাবে এর দ্বারা বোঝানো হয় এমন এক মানবগোষ্ঠী, যাদের জন্মগত সাদৃশ্য রয়েছে এবং এ গোষ্ঠী একটি পরিবার থেকে বৃহৎ হলেও একটি ক্ল্যান (clan) বা গোত্র থেকে ক্ষুদ্রতর।[৪] শুরুতে এটি হীন অর্থে ব্যবহৃত হতো। রোমে একে বিদেশী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ

২. সাধারণভাবে অন্যান্য এথনিক গোষ্ঠীসমূহ প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে, কিন্তু এ দুটি গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ নীতিমালার ফলশ্রুতিতে তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৩. *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, 8.

৪. Elie Kedourie, *Nationalism* (New York 1961). 13.

করা হতো, যারা একটা ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে আগত ছিল, তবে ভিনদেশী হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা রোমান নাগরিকদের নীচে ছিল।[৫] একইভাবে 'এথনিক' শব্দটিও শুরুতে হীন অর্থবোধক ছিল। এটি গ্রীক শব্দ 'ethnikos' থেকে উদ্ভূত, যা কয়েকটি পরিচয় নির্দেশ করতো, যেমন—(ক) খ্রিস্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন জাতিসমূহ অর্থাৎ হীদেন এবং প্যাগানগণ; (খ) একই রীতি এবং বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গোত্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীসমূহ; এবং (গ) আদিম সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠীসমূহ।[৬] এভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উপরোক্ত দু'টি শব্দই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সমরূপতা ও অধস্তন অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গিত করতো। কিন্তু অধিক গুরুত্বের সাথে এটি অন্য গোষ্ঠীর 'বৈসাদৃশ্য' তুলে ধরতো। 'জাতি' শব্দটির অর্থের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিবর্তন এসেছে এবং এ পর্যায়ে এর হীন অর্থেরও অবলুপ্তি ঘটেছে।[৭] এর বর্তমান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ফরাসী বিপ্লব থেকে উৎসারিত হয়েছে। বিপ্লবীদের জন্য 'জাতি' ছিল বাস্তব এক রাজনৈতিক শ্রেণীবিশেষ। এবি সাইয়েস (Abbe Siey'es) যেমন বলেন,

> জাতি হচ্ছে এক সম্মিলিত গোষ্ঠী, যারা একই সাধারণ আইনের আওতায় বসবাস করে এবং একই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করে।[৮]

এখানে জাতিকে রাষ্ট্রের এলাকাগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে চিন্তা করা হয়েছে। এ অভিমতটি অবশ্য জার্মান এবং ইতালীয়দের দ্বারা স্বীকৃত নয়, তারা একে চ্যালেঞ্জ করেছে। হার্ডার (Herder), ফিশটে (Fichte) এবং ম্যাৎসিনী (Mazzini) জাতিকে একটি রাজনৈতিক শ্রেণী বলে গণ্য করেন নি; তাঁদের মতে, জাতি হচ্ছে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত একটি শ্রেণী। জাতি সংক্রান্ত এ সাংস্কৃতিক অভিমত অনুযায়ী জাতি আসলে সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত সমরূপতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শুধুমাত্র এ পর্যায়ের শ্রেণীকরণের মাধ্যমেই এর সংজ্ঞা প্রদান করা যায়।

এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে জাতিসত্তার আদিম ব্যাখ্যাতাগোষ্ঠী (Primordialist) সংস্কৃতির উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এঁরা ধরে নেন যে জাতিসত্তার পরিচিতি আসলে প্রদত্ত ব্যাপার, তা পছন্দের কোন ব্যাপার নয় এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় অযৌক্তিক উপাদান জড়িত। হ্যারল্ড আর. আইজ্যাক (Harold R. Isaacs)-এর মতে :

> এই পরিচিতি আসলে একজন মানুষের জন্মগত অথবা জন্মের মাধ্যমে অর্জিত। কাজেই এটা জনগণের অর্জিত অন্যান্য বহুবিধ ও গৌণ পরিচিতি থেকে পৃথক।[৯]

৫. Liah Greenfeld. *Nationalism Five Roads to Modernity* (Cambridge 1992), 4
৬. Websters *Third New International Dictionary of the English Language*, 78
৭. Greenfeld. *Nationalism*. 4-6
৮. Kedourie. *Nationalism*, 15
৯. Harold R. Isaacs 'Basic Group Identity: The Idols of the Tribe' in Nathan Glazer & Daniel P. Moynitham (eds) *Ethnicity Theory and Experience* (Harvard 1975) 30

পণ্ডিতগণ 'জাতি'কে বিষয়কেন্দ্রিক (subjective) অর্থেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন আরনেস্ট রেনান (Ernest Renan) বলেন :

> জাতি বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, অতীতে যাদের একইরূপ অস্তিত্ব ছিল; অবশ্য বর্তমানে একটি বাস্তব তথ্য দ্বারা তার চুম্বক পরিচয় তুলে ধরা হয়, তা হচ্ছে সম্মতি তথা একই রকম জীবনযাপন অব্যাহত রাখার সুস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা। একটি জাতির অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তাঁর প্রাত্যহিক গণভোট।[১০]

হ্যান্স কোহনও (Hans Kohn) মনে করেন, একটি জাতির সবচাইতে অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে চলমান ও সক্রিয় ইচ্ছা।[১১]

জাতিসত্তা(ethnicity)-কেও বিষয়ভিত্তিক (subjectivist) দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বক্তব্য হলো, এথনিক পরিচিতি সাংস্কৃতিক প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, এরা নিজস্ব তথা গোষ্ঠী সম্পর্কিত পরিচয়বৈশিষ্ট্যের অনুভূতি এবং অন্যদের দ্বারা তার স্বীকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।[১২]

এই শাব্দার্থিক বিশ্লেষণ উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যকার সাদৃশ্য এবং তাদের কৃত্রিমতার প্রকাশ ঘটায়। তথাপি 'আধুনিক' ধারণার ভিত্তিতে এ দুই শ্রেণীর পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। লেখকগণ একমত প্রকাশ করেন যে 'জাতি'র মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই হচ্ছে এর 'আধুনিকতা'।[১৩] গেলনার (gellner)[১৪] জোর দিয়ে বলেন যে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের জন্য জাতি বা জাতীয়তাবাদের কোন প্রয়োজন নেই; আধুনিক সমাজগুলোর ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক শিল্প স্থাপনের জন্য একই ধরনের এবং শিক্ষিত নাগরিকের প্রয়োজন হয়। এসব শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ সেসব বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব ঘটায়, যাঁরা একই সংস্কৃতিভিত্তিক জাতি প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। অন্য কথায়, জাতির ধারণা কেবল আধুনিক প্রেক্ষাপটে অর্থবহ হয়।

বেনেডিক্ট এন্ডারসনও (Benedict Anderson)[১৫] আধুনিক বাস্তবতায় জাতির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে, মানুষের ভাষাগত ভিন্নতার উপর পুঁজিবাদ এবং

১০. E. Renan. 'What is a Nation' in Homi K Bhabna ed. *Nation and Narration.* (London 1990). 19.

১১. Hans Kohn. *The Idea of Nationalism* (New York 1951). 15.

১২. Urmila Phandis, *Ethnicity and Nation-Building in South Asia* (New Delhi 1990). 14

১৩. E. J. Hobsbawm *Nations and Nationalism since 1780: Programme. Myth Reality* (Cambridge 1990). 14.

১৪. E. Gellner *Nations and Nationalism* (London 1983).

১৫. Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Orgin and Spread of Nationalism* (London 1991).

প্রকাশনা প্রযুক্তির সমন্বয় নতুন ধরনের এক সম্প্রদায় বা 'জাতি'র ধারণার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। যাহোক, দ্বিবিভাজনের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা এ. ডি. স্মিথ (A.D. Smith)-এর লেখায় পাওয়া যায়[১৬], যেখানে তিনি এথনিক-এর স্থলে এথনি (ethnie) শব্দ ব্যবহার করেন এবং এই এথনিকে 'জাতির' পূর্বগামী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে জাতি হচ্ছে এক আধুনিক বিনির্মাণ, যা কেবল আধুনিক সমাজপরিবেশে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ জাতি গঠনের জন্য আবশ্যক নির্দিষ্ট কিছু প্রাক-আধুনিক জাতিগত (ethnic) উপাদান এবং তা ক্রমে ক্রমে পুরনো এথনিক ইমেজের উপরই গড়ে উঠে। স্মিথ (Smith) মনে করেন :

> একটি জাতি হচ্ছে একটি মানবগোষ্ঠীর নাম, যার রয়েছে পুরুষানুক্রমে প্রবহমান বংশগত ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক স্মৃতিমালা ও গণসংস্কৃতি এবং যার রয়েছে পৃথক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত একটি ভূখণ্ড, সাধারণ অর্থনীতি, আইনগত অধিকার ও কর্তব্যসমূহ।[১৭]

অপর দিকে এথনি (ethnie)-এর কোন নির্দিষ্ট এলাকা, সাধারণ অর্থনীতি বা বৈধ অধিকার ও কর্তব্য বলে কিছু নেই।

অতএব এই বৌদ্ধিক পর্যালোচনা মানবসমাজগুলিকে (বর্তমানে জাতি-রাষ্ট্রে সংগঠিত) বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছে, যার ভেতর প্রভাবশালী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে সর্বোচ্চ ধাপ অর্থাৎ 'জাতির' পর্যায়ভুক্ত করে বাকিদের নিম্ন ধাপে অবনমিত করে রাখা হয়েছে, যাকে ফানডিস (Phandis) ইতর, বিশেষায়িত এবং বৃত্তাবদ্ধ জনগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৮]

এখানে উল্লেখ্য যে মানবসমাজগুলিকে 'জাতি' এবং 'এথনিক' হিসেবে শ্রেণী-বিভক্তকরণ এবং চিহ্নিতকরণ সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাঠামোগত বিভক্তি এবং অনৈক্য সৃষ্টি করে। আশংকাজনকভাবে এটি আধিপত্য এবং সন্ত্রাসের সংস্কৃতিকে নির্মাণ এবং লালন করে। এ সন্ত্রাস[১৯] প্রাথমিকভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের

১৬. দেখুন, A.D. Smiths 'The Myth of the Modern Nationi and the Myths of Nations' *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 1. No. 1 1988. The Ethnic Origins of Nations. (London 1986)

১৭. Urmila Phandis, 'Ethnic Tensions in South Asia Complications for Regional Cooperation' Paper presented at the Workshop on *Regional Cooperation & Development* Organised by the Centre for Policy Research New Delhi, India. 8-13 April, 1985 6

১৮. ঐ, 1986, 22.

১৯. এ ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, ইমতিয়াজ আহমেদ, 'Communal conflict in Modern Sri Lanka : Search for a Resolution', *International Journal of Peace Studies* vol. 1, No. 2, 1996

মূলধারার উন্নয়নপ্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। এখানে নিম্ন পর্যায়ভুক্তদের প্রতিবাদকে হয় অবজ্ঞা করা হয়, না হয় জাতি ও রাষ্ট্রের নামে দমন করা হয়।[২০] নিম্নে প্রদত্ত ব্যাখ্যায় এ বিষয়টির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে :

(২) সংখ্যালঘু এথনিক জনগোষ্ঠীসমূহ : সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠী সম্পর্কে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে লিখিত উৎসের স্বল্পতা রয়েছে, সে সঙ্গে এদের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে আদি উৎস হচ্ছে ব্রিটিশ প্রশাসকদের রেখে যাওয়া বিস্তারিত বিবরণসমূহ।[২১] এসব বিবরণ যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদান করে, তবুও তাদেরকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। পৃথকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এটি তৎকালীন সমাজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটায়, যা একটি ভিন্নতর ও প্রয়োগবিদ্যার আওতাবহির্ভূত ঐতিহ্যকে 'সভ্য' হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাকে 'অসভ্য', 'আদিম', 'যাযাবর' এবং 'বন্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইতিবাচক দিক দিয়ে অবশ্য এটি এসব গোষ্ঠীর স্বাধীন অস্তিত্বকে তুলে ধরেছে, যারা কারো কাছে মাথা নত করে নি, তবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় ঠাঁই নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ[২২], বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহ[২৩], মনিপুরি[২৪] ও গারোদের[২৫] বিদ্রোহ সবই এসব সম্প্রদায়ের সামরিক নৈপুণ্য, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

পরবর্তীকালে বাঙালি লেখকদের লেখাতেও একই পক্ষপাতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে।[২৬] এখানে মনে রাখা জরুরি যে আলোচ্য গোষ্ঠীগুলোকে এভাবে চিত্রিতকরণ তাদের ক্ষতির কারণ হয়েছে। এতে একটি গোষ্ঠীকে শুধু কালিমালিপ্ত করা

২০. আলোচ্য প্রসঙ্গে জাতি এবং রাষ্ট্রকে সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২১. দেখুন, T H. Lewin *Wild Races of South Eastern India* (London 1870), Alexander Mackenzie *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North-East Frontier of Bengal* (Calcutta 1884) G. A. Grierson *Linguistic Survey of India*. Vol. 1 Part. 1 (Calcutta 1927), R. H. S. Hutchinson, An Account of the Chittagong Hill Tracts, (Calcutta 1906). W.W. Hunter. *A Statistical Account of Bengal. Vol 6 Chittagong Hil Tracts. Chittagong. Noakhali, Tipperah, Hill Tipperah* (London 1876) E T. Dalton. *Tribal History of Eastern India* (Calcutta 1872). Major A Playfair *The Garos* (London 1909).

২২. Sirajul Islam ed... *Bangladesh District Records Chattagong*. Vol. 1. 1760-1787. (Dhaka 1978-83-84)

২৩. Ranajit Guha. *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in colonial India* (Delhi 1983).

২৪. A.K. Sheram. *Bangladesher Manipuri Teocc SangskritirTribence Sangame* (Dhaka 1996).

২৫. সুভাষ জেংচাম, বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায় (ঢাকা ১৯৯৪); Willem van Sehendel, 'Madmeni of Mymensingh: Peasant Resistance and the Colonial Process in Eastern India 1824 to 1833; The Indian Economic and Social History Feview. Vol.. 22. No. (Delhi 1945)

২৬. Abdus Sattar. *In the Sylvon Shadows* (Dhaka B1983)

হয় নি, তদুপরি আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে তা তার উন্নয়ন নীতিমালাকে সংখ্যাগুরুর চাহিদা মোতাবেক যুক্তিগ্রাহ্য করতে সহায়তা করেছে এবং তা করতে গিয়ে একটি সম্প্রদায়কে 'যাযাবর' বা 'অলস' হিসেবে চিত্রিত করেছে (তৃতীয় অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

বাংলাদেশে এথনিক গোষ্ঠীর সংখ্যা

বাংলাদেশে এথনিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে।[২৭] ১৯৯১ সালের বাংলাদেশ আদমশুমারি প্রতিবেদন[২৮] এথনিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৯ বলে উল্লেখ করেছে।

এ প্রসঙ্গে খালেক[২৯] যথার্থভাবে উল্লেখ করেন যে আদমশুমারি (census) প্রতিবেদনের দুটি স্থানে একই গোষ্ঠীকে দুটি পৃথক এথনিক গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেমন তালিকায় টিপরা এবং ত্রিপুরা এ দুটি গোষ্ঠীকে পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা একই গোষ্ঠীভুক্ত। অনুরূপভাবে এক গোষ্ঠীভুক্ত বংশী এবং রাজবংশীকেও উক্ত প্রতিবেদনে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। অতএব বলা যায় যে বাংলাদেশে অন্তত পক্ষে ২৭টি বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রয়েছে।

জনসংখ্যা এবং স্থানগত (spatial) বণ্টন

১৯৯১ সালের আদমশুমারি (census) অনুসারে বাংলাদেশে এথনিক জনসংখ্যা ১.২ মিলিয়ন, যা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার ১.১৩% ভাগ। দাপ্তরিক পরিসংখ্যান এবং বেসরকারি অনুমানের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ম্যালনী (Manoney)[৩০] উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন (মার্চ, ১৯৮১) অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগের পাঁচটি জেলার এথনিক জনসংখ্যা হচ্ছে ৬২,০০০। কিন্তু খ্রিস্টান মিশনের বেসরকারি শুমারিগুলোতে লক্ষ্য করা যায় যে প্রকৃত সংখ্যা দাপ্তরিক বুলেটিনে প্রদত্ত সংখ্যার দ্বিগুণ হতে পারে। এ সকল জনগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যাও আসলে অন্যান্য প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে ভিন্ন রকম। এদের মতে, এখানে এক সরকারি হীন প্রচেষ্টা

২৭. এ বিতর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য মাহমুদ এস. কুরাইশী সম্পাদিত *Tribal Cultures in Bangladesh* (রাজশাহী, ১৯৮৪)-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ দেখুন।

২৮. *Bangladesh Census Report* 1991. Vol. I Analytical Report (Dhaka Bangladesh Bereau of Statistics Govt. of the People's Republic Of Bangladesh (194). 195-198.

২৯. Kibriaul Khaleque. 'Ethnic Communities of Bangladesh'. In Philip Gain ed *Bagnladesh Land Forest and Forest People* (Dhaka 1995). 7.

৩০. C T. Maloney, "Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali Culture", In M. S. Qureshi ed. Tribal Cultures, 8.

কাজ করেছে যাতে তাদেরকে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে দেখিয়ে বাঙালিদের প্রভাবশালী অবস্থানকে আরো অধিক সুসংহত করা যায়।[৩১]

বাংলাদেশে এথনিক সংখ্যালঘুদেরকে ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে সমতলের গোষ্ঠী এবং পাহাড়ী গোষ্ঠী এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সমতলের এথনিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো দেশের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর এবং উত্তর-পূর্বের সীমান্তে বাস করে। যেমন উত্তর সীমান্ত এলাকায় কোচ, মুন্ডা, ওরাঁও, পাহাড়িয়া, রাজবংশী এবং সাঁওতালরা ঐতিহ্যগতভাবে বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী এবং রংপুর জেলার নির্দিষ্ট অংশে বসবাস করে আসছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বৃহত্তর সিলেট জেলা হচ্ছে খাসি, মনিপুরী, পাথর এবং টিপরা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যিক এলাকা। গারো, কোচ এবং হাজং জনগোষ্ঠী উত্তর সীমান্তের ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চলের টাঙ্গাইল জেলায় বাস করে। অধিকন্তু বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নভাবে বরিশাল, কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, পটুয়াখালী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় দেখতে পাওয়া যায়।[৩২]

পাহাড়ী গোষ্ঠীর এথনিক সংখ্যালঘুরা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বাস করে, যা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পরিচিত। এসব অধিবাসী আবার দুটি পৃথক বাস্তব্য (ecological) অঞ্চলে বসবাসরত—একটি গিরিচূড়া (ridge-top) এবং অন্যটি উপত্যকা। চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী উপত্যকায় বাস করে আর খুমী, ম্র, ম্রং, লুসাই, বনজোগী, কুকী, তনচংগ্যা, চাক এবং রিয়াং জনগোষ্ঠী পাহাড়ের চূড়ায় বাস করে। এ প্রেক্ষিতে বৃটিশ প্রশাসক টি. এইচ. লেউইন[৩৩] (T. H. Lewin) এদেরকে খিউনথা (Khyountha) এবং তুংথা (Toungtha) এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। বর্মী ভাষায় এ দুই শব্দের অর্থ হলো যথাক্রমে 'নদীর সন্তান' ও 'পাহাড়ের সন্তান'।

এথনিক পটভূমি

এখানে আমরা আদমশুমারি (census) প্রতিবেদনের তালিকায় উল্লেখিত গোষ্ঠীসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করবো।

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের এথনিক গোষ্ঠীসমূহ

চাকমা : ১৮৬৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময় চাকমাদের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০-এর মতো। সংখ্যার দিক দিয়ে এরাই ছিল প্রভাবশালী

৩১. ভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীর সদস্যবর্গ লেখকের নিকট এই মন্তব্য করেন।

৩২. T.H. Lewin. *The Hill Tracts of Cittagong and the Dwellers Therein. with cmparative* Vocabularies of the Hill Dialects (Calcutta 1869), 28.

৩৩. Kibria., *'Ethnic Communities', 1995. 13.*

এথনিক গোষ্ঠী। এরা গ্রামে বাস করতো। এদের ছিল বংশানুক্রমিক প্রধান (chief)। প্রতিটি গ্রামের নেতৃত্বে থাকতেন একজন 'দেওয়ান' অথবা 'তালুকদার'। এই পদও ছিল বংশানুক্রমিক।[৩৪] চাকমারা মঙ্গোলয়েড (mongoloid) গোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু এদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর। এ ভাষা বাংলা ভাষার অপভ্রংশ, যা বিকৃত বর্মী হরফে লেখা হয়ে থাকে।[৩৫] চাকমাদেরকে আরাকানের Task অথবা Tsek উপজাতির প্রশাখা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৬] এরা বৌদ্ধ এবং ১৫০টি গোজা বা পিতৃতান্ত্রিক বংশে বিভক্ত। চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক এবং এখন পর্যন্ত পাহাড়ী জনগণের মধ্যে প্রভাবশালী গোষ্ঠী।

মার্মা : ১৮৬৯ সালে মার্মাদের দুই জন গোত্রপ্রধান (clan chief) ছিলেন—একজন বান্দরবনের বোমাং এবং অন্যজন রামগড়ের মং রাজা। কর্ণফুলীর দক্ষিণের মার্মা গ্রামগুলোর প্রধান ছিলেন বোমাং রাজা। অন্যদিকে উত্তরের গ্রামগুলো মং রাজার অধীনে ছিল। প্রতিটি গ্রামের হেডম্যান (Headman)-কে বলা হতো রোয়াজা, যাকে নিয়োগদান করতেন প্রধান (chief)। কোন কোন সময় তিনি গ্রামবাসীদের দ্বারাও নির্বাচিত হতেন, তবে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রধানের অনুমোদনের উপর নির্ভর করতো। আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ পদটি পিতার কাছ থেকে পুত্রের উপর বর্তাতো।[৩৭] মার্মারা আরাকান থেকে এসেছিল। তারা আরাকানী ভাষায় কথা বলে এবং ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ। মার্মা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক।

ত্রিপুরা : ১৮৬৯ সালে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১৫০০। এদের নিজস্ব কোন প্রধান (chief) ছিল না। এরা মার্মা এবং চাকমা প্রধানদের আওতাধীন গ্রাম্য সম্প্রদায়ে বসবাস করতো। প্রতিটি গ্রাম নিজস্ব হেডম্যান (Headman) বা গ্রামপ্রধান নির্বাচিত করতো। ত্রিপুরাগণ বিশ্বাস করে যে পূর্বে তারা মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণে বাস করতো এবং কিলে (Kilay) এবং মাংলে (Manglay) নামক দুই ভ্রাতার নেতৃত্বাধীন ছিল, যারা ত্রিপুরার রাজা উদয়গিরির পক্ষে কারবারী হিসেবে ঐতিহ্যিক নেতা ছিলেন।[৩৮] পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাগণ নিজেদেরকে মানিক্য (Manikya) রাজার বংশধর হিসেবে বিবেচনা করে। এরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। এদের ভাষা বেডো (Bodo) গোষ্ঠীভুক্ত।[৩৯] এরা পিতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী।

৩৪. Lewin. *Hill Tracts* 67-68.

৩৫. G.A. Grierson *Linguistic Survey of India: Bengal* [Lower Provinces] (Calcutta 1898). 29

৩৬. Herbert Risley. *Tribes and Castes of Bengal. Ethnographic Glossary.* Vol 1. (Calcutta 1891). 168.

৩৭. Lewin ঐ, 1986, 36-37.

৩৮. R.H S. Hutchinson. *Eastern Bengal and Assam district Gazetteers.* CHT (Allahabad, 1909) 36

৩৯. Grierson. *Linguistic Survey.* 1927. 64

তনচংগ্যা : এরা চাকমাদের একটি প্রধান শাখা এবং চাকমা প্রধান ধরম বকশ্ খানের সময়কালে ১৮১৯ সালের দিকে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে আগমন করে। লেউইন[৪০] (Lewin)-এর মতে, সে সময় তারা আরাকানের ফাহ্প্রু (Phahproo) নামক প্রধানের নিকট তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু ধরম বকশ্ খান তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তাদের অনেকেই আরাকানে ফিরে যায়। ১৮৬৯ সালে তাদের জনসংখ্যা ছিল ২৫০০। তনচংগ্যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলী এবং এদের আচার-অনুষ্ঠান অনেকটা চাকমাদের মতো। এদের ভাষা কুকী-চীন গোষ্ঠীভুক্ত।[৪১]

খামী : ১৮৬৯ সালে খামীদের সংখ্যা ছিল ২০০০। এরা মার্মা বোমাং প্রধানের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতো এবং গ্রামপ্রধানের (village headman) মাধ্যমে তাঁকে বাৎসরিক কর প্রদান করতো।[৪২] এরা সপ্তদশ শতাব্দীতে আকিয়াব এবং আরাকানের পাহাড়ী এলাকা থেকে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রবেশ করে। এরা বৌদ্ধ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, কিন্তু এদের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার সর্বপ্রাণবাদভিত্তিক (animistic)। এরা স্ত্রী-প্রদানকারী (wife-giving) এবং স্ত্রী-গ্রহণকারী (wife-taking) এ দুই গোত্রে (clan) বিভক্ত। পরিবারের জ্যেষ্ঠতম পুত্র সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এদের মৌখিক ভাষা কুকী অংশের দক্ষিণ শাখাভুক্ত।[৪৩]

ম্র : ১৮৬৯ সালে ম্রদের সংখ্যা ছিল ১৫০০। এদের নিজস্ব কোন প্রধান ছিল না এবং এরা বান্দরবনের বোমাং প্রধানের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করতো। এদের প্রতিটি গ্রামের একজন প্রধান ছিলেন, যিনি বোমাং চীফের জন্য প্রত্যেক পরিবারপ্রধানের নিকট থেকে কর সংগ্রহ করতেন। গ্রামপ্রধানের পদটি ছিল বংশগত্।[৪৪] লেউইন (Lewin)[৪৫] এবং হান্টার (Hunter)[৪৬] বলেন যে আরাকানের খামী উপজাতি কর্তৃক পরাজিত হয়ে এরা চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে গোত্র (clan)-ব্যবস্থা বিদ্যমান। এরা সর্বপ্রাণবাদী (animist)। এদের কথ্য ভাষা তিব্বতী ভাষাপরিবারভুক্ত[৪৭] শ্যাকার (shafer)[৪৮], যাকে এরা এদের নিজস্ব এক প্রকারের (category) ভাষা হিসেবে বিবেচনা করে।

৪০. Lewin. *Hill Tracts.* 1986., 66
৪১. Maloney, "*Tribes of Bangladesh*". 11.
৪২. ewin. *Hill Tracts.* 1986. 87-88.
৪৩. Robert Shafer. '*Classification of the Sino Tibetan Languages*'. Word No. 19. 1955. 105.
৪৪. Lewin. *Hill Tracts.* 1986 86-88
৪৫. ঐ, 29
৪৬. Hunter. *Statistical Account.* 56.
৪৭. Lucien Bernot. 'Ethnic Groups of CHT' in Pierre Bessaignet ed. *Social Research in East Pakistan* (Dhaka 1964). 159
৪৮. Shafer. *Sino-Tibetan Languages.* 107.

লুসাই : এরা ১৫০ বছর পূর্বে ভারতের লুসাই পাহাড় অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় আগমন করে। ১৮৯২ সালে লুসাই পাহাড়গুলো বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগে এরা ভীষণ রকম হিংস্র গোষ্ঠী ছিল এবং পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এরা মুণ্ডু শিকার (head-hunting)-কে শৌর্যের প্রতীক বলে মনে করতো। এরা পাহাড়ের চূড়াকে বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এদের গ্রামের প্রবেশপথ সুদৃঢ়ভাবে প্রহরাধীন থাকতো। গ্রামপ্রধানদের বলা হতো 'লাল' (Lal) এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে 'লাল' গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দিতেন, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে 'লাল'-এর সাথে গ্রামবাসীদের কোন পার্থক্য থাকতো না।[৪৯]

লুসাইরা সর্বপ্রাণবাদী (animist)। এরা বিভিন্ন সেপ্ট (Sept)-এ বিভক্ত এবং এদের সমাজ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পিতার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। 'লুসাই' বা 'দোলনে' (Dolne) নামে এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে।[৫০] বৃটিশ শাসনামলে এদের মধ্যে মিশনারিগণ কর্মরত ছিল। ফলে এদের অধিকাংশই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এদের ভাষাও ল্যাটিন অক্ষরে লেখা যায়। ১৮৯২ সালে বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর এরা এদের জঙ্গি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

খিয়াং : লেউইন (Lewin)[৫১]-এর বর্ণনায় জানা যায় যে ১৮৬৯ সালে খিয়াংরা সংখ্যায় অল্প ছিল। এদের সামাজিক সংগঠন ম্র ও খুমীদের সংগঠনের ন্যায় ছিল। এরা বার্মার চীফদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। এরা নিজেদেরকে হিউ (Hyou) বলে সম্বোধন করে। এরা বিশ্বাস করে যে ২০০ বছর পূর্বে যুদ্ধের সময় তাদের চীফ বার্মা থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কোন সেপ্ট (sept) নেই। এরা বৌদ্ধ, কিন্তু এরা গৃহদেবতা নাদা গা (Nada ga) এবং জলদেবতা বগলীর (Bogley) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এদের ভাষা কুকী-চীন গোত্রীয়।[৫২]

পাংখো : পাংখোরা বিশ্বাস করে যে তারা বার্মার শান (shan) জাতির বংশধর।[৫৩] 'পাংখো' শব্দের অর্থ 'শিমুল ফুল' এবং 'খোয়া' (khoa) শব্দের অর্থ গ্রাম। এরা পাংখো এবং ভ্যানজাং (Vanzang) নামক দুটি সেপ্টে (sept) বিভক্ত। অতীতে এরা হিংস্র ছিল এবং পর্বতচূড়ায় ঘর নির্মাণ করতো। এদের গ্রামগুলো ভারী অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ও প্রহরাধীন ছিল। যাহোক বৃটিশ কর্তৃক এগুলো অধিকৃত হওয়ার পর এরা এদের সামরিক নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলে।

৪৯. Lewin. *Hill Tracts.* 1986 99-101.
৫০. Shafer. *Sino-Tibbetan Languages.* 107
৫১. Lewin. *Hill Tracts.* 94
৫২. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি (রাঙ্গামাটি ১৯৯৩), ৭৮।
৫৩. Grierson. Linguistic Survey. 1927. 144

পাংখোরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তবে বৃটিশ আমলে মিশনারিদের কর্মকাণ্ডের ফলে এদের অধিকাংশই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। লুসাই ভাষার সাথে এদের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এ ভাষা কুকী-চীন গোত্রীয়।[৫৪]

সাক : সাকদের চাকমা উপ-গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৫৫] এদের ভাষার সাথে কাদু (Kadu) ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। এ ভাষা মায়ানমারের মিতখিইনা (Myitkhyina) জেলায় ব্যবহৃত হয় এবং ভারতের মনিপুর জেলার অন্তর্গত আন্দ্রো (Andro) ও সেংমাই (Sengmei) ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাক জনগোষ্ঠী আন্দো (Ando) এবং এনগারেক (Ngarek) নামে দুটি সেপ্টে (sept) বিভক্ত। এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

ম্রং : ম্রং শব্দটি ত্রিপুরা থেকে এসেছে এবং শুধুমাত্র ত্রিপুরাদের একটি সেপ্টে এটি প্রযোজ্য যার অর্থ গোত্র (clan)। ম্রংদের মধ্যে গোত্র ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এদের অধিকাংশ নামের অর্থ ত্রিপুরা ভাষায়। এসব কারণে এরা ত্রিপুরাদের অংশ হিসেবে বিবেচিত।[৫৬]

বম (Bawm) : বমরা ১৮৩৮-৩৯-এর দিকে তাদের নেতা লিয়ানকুং-এর নেতৃত্বে আরাকান থেকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আগমন করে। এরা বান্দরবন জেলায় বসতি স্থাপন করে। এদের ভাষা কুকী-চীন গোত্রীয়[৫৭] এবং এরা প্রধানত খ্রিস্টান।

(খ) সমতলের এথনিক গোষ্ঠীসমূহ

গারো : গারোদের আদি নিবাস উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যের পাহাড়ী এলাকায়, যা তখন মেঘালয় নামে পরিচিত ছিল।[৫৮] এরা অবশ্য মনে করে যে এদের পূর্বপুরুষগণ তিব্বতের তরুয়া (Torua) প্রদেশে বসবাস করতো।[৫৯] গারো পাহাড় থেকে এদের নামকরণ করা হয়েছে। এরা নিজেদেরকে আচিক (পাহাড়ী মানুষ) অথবা মান্ডে (মানুষ) হিসেবে আখ্যায়িত করতে পছন্দ করে।[৬০] এদের ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয়।[৬১]

৫৪. সুগত চাকমা, ঐ, ৭৮।

৫৫. Lewin. *Hill Tracts*. 65.

৫৬. Maloney. '*Tribes of Bangladesh*' 14

৫৭. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, ৮৭-৯২।

৫৮. Zahidul Islam. *Social Organization among the Garos in Bangladesh: An Overview* Social Science Review. *The Dhaka University Studies* Part-D. vol. IX No. 2 Dec. 1992. 106.

৫৯. Playfair. *The Garos*. 9

৬০. ঐ, 7.

৬১. Grierson. *Linguistic Survey of India*. vol. III.. quoted in Kibriaul Khaleque. 'Adoption of Wet Cultivation and Changes in Property Relations Among the Bangladesh Garo'. *The Journal of Social Studies* (JSS). No. 20. 1983. 20.

গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম সংসারেক (Songsarek) নামে পরিচিত। এ ধর্মমতে তারা অতিপ্রাকৃতিক বস্তুসমূহের (Mite) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তবে বর্তমানে শতকরা ৯০ ভাগ গারো খ্রিস্টান ধর্মাবলী।[৬২] গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।

সাঁওতাল : হান্টার (Hunter)[৬৩] এবং রিজলে (Risley)[৬৪] বলেন যে সাঁওতালরা অস্ট্রেলিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে দেশান্তরী হয়ে এ অঞ্চলে এসেছে। শুরুতে তারা বাংলাদেশে এসেছিল জমি পরিষ্কার, রেলপথ নির্মাণ এবং অন্যান্য শ্রমের কাজ করতে। সাঁওতালরা সর্বপ্রাণবাদী (animist), তবে কিছুসংখ্যক সাঁওতাল বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, যাকে কোল (Kol)-এর প্রশাখা বলা যায়। গ্রিয়ারসন (Grierson) অবশ্য বিশ্বাস করেন যে এটি মুন্দারির (Mundari) এক উপ-গোষ্ঠী।[৬৫]

খাসি : এরা নিজেদের নাম খাসিয়া পার্বত্য অঞ্চল থেকে গ্রহণ করেছে। আদি খাসিগণ আসামের নির্জন খাসিয়া-জৈন্তা পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতো। এরা ৫০০ বছর পূর্বে সিলেটে আগমন করে।[৬৬] এইচ. রবার্টস (Rev. H. Roberts) মনে করেন যে প্রথমে খাসিরা বার্মা থেকে এসেছিল। অন্য মতে তারা উত্তর থেকে সিলেটে অভিপ্রয়াণ করে।[৬৭] এদের ধর্মকে সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলা হয়। এদের নিজস্ব গোত্র ব্যবস্থা রয়েছে। একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ সম্ভব নয়। খাসি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। সর্বকনিষ্ঠ কন্যাসন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, যা অস্ট্রো এশিয়াটিক (Austroasiatic) গোষ্ঠীভুক্ত।[৬৮]

মনিপুরী : বাংলাদেশে মনিপুরীরা ভারতের মনিপুর রাজ্য থেকে এসেছিল। বার্মা এবং মনিপুরের সাত বছর (১৮১৯-২৬) ব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মনিপুরী রাজাসহ তারা পালিয়ে যেতে এবং আসাম, কাছার ও সিলেটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[৬৯] ড্যাল্টন (Dalton)[৭০] বলেন যে মনিপুরীদের সাথে নাগা ও কুকীদের সম্পর্ক রয়েছে। শেকসপীয়ার (Shakespear)[৭১] মনে করেন যে তারা আসামের কুকী গোষ্ঠীভুক্ত। মনিপুরীরা অবশ্য

৬২. Kibriaul Khaleque. ঐ, 88.

৬৩. W.W. Hunter. *The Annals of Rural Bengal* (London 1868). 181.

৬৪. H.H. Risley. *People of India* (Calcutta 1887). 46.

৬৫. H.H. Risley. *People of India* (Calcutta 1887) 46.

৬৬. A. Sattar. *In The Sylvan Shadows*. 130

৬৭. P.R T. Gurdon. *The Khasis* (Delhi, 1975) 10.

৬৮. Maloney. '*Tribes of Bangladesh*' 17

৬৯. এ. কে. শিরাম, বাংলাদেশের মনিপুরী, ২১-২২।

৭০. Dalton. *Tribal History*. 48.

৭১. Col. J. Shakespear. *The Lusei-Kuki Clans* (London 1912). 150.

তাদেরকে মহাভারতের অর্জুনের বংশধর হিসেবে বিবেচনা করে।[৭২] এদের ভাষার নাম মেইথেই (Meithei) এবং আসামী অক্ষরের ন্যায় অক্ষরে তা লেখা হয়। এরা হিন্দুদের বৈষ্ণব (Vaisnavite) শাখাভুক্ত।

পাহাড়িয়া : এদের আদি বাসস্থান হচ্ছে বিহারের পূর্বাংশের জেলার সাঁওতাল পরগনা। জনসংখ্যার চাপে এরা বাংলা এবং বিহারের সমতলে চলে আসে। এরা মূলত রাজশাহী জেলায় কেন্দ্রীভূত রয়েছে। এদের মধ্যে কোন গোত্রব্যবস্থা নেই এবং এরা 'সুরিয়া' ও 'মল' এ দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কুমার বা কুমারভাগ মলের একটি শাখা। এ বিভক্তি পাহাড়িয়াদের মতে ভাষা ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে হয়েছে। এরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক। এদের প্রায় অর্ধেক খ্রিস্টান এবং বাকীরা হিন্দুধর্ম মিশ্রিত নিজস্ব ধর্ম অনুসরণ করে।[৭৩]

রাখাইন : রাখাইনরা পটুয়াখালী জেলা, কক্সবাজার এবং রামুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। প্রায় ২০০ বছর আগে এরা আরাকান থেকে বাংলাদেশে আসে। মায়ানমারে আরাকানীদের রাখাইন বলা হয়। একইভাবে বাংলাদেশেও এরা রাখাইন নামে অভিহিত হতে ইচ্ছুক। এরা জাতি (race) হিসেবে মঙ্গোলয়েড গোত্রীয় এবং বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। এদের নিজস্ব রাখাইন ভাষা রয়েছে, যা আরাকানের রাখাইন ভাষার অনুরূপ। ভাষাটি ভট-ব্রাহ্মো (Bhot-Brahmo) শ্রেণীভুক্ত।[৭৪]

রাজবংশী : রাজবংশীরা কোচ (Koch) জনগোষ্ঠী থেকে এসেছে এবং পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে কিছু মুসলমানও রয়েছে। এরা নিজেদেরকে ছোট নাগপুরের রাজার জ্ঞাতি হিসেবে দাবি করে। এজন্য এদের বিশেষণ হলো রাজবংশী।[৭৫] ম্যালনি (Maloney)[৭৬] বলেন যে এদের ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয় যদিও এরা এদের আদি ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। রাজবংশীদের ভাষাকে এখন বাংলার অপভ্রংশ বলা যায়।

কোচ (Koch) : ড্যাল্টন (Dalton)[৭৭] কোচদের ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করেছেন। ভারতের কুচবিহারে কোচদের নিজস্ব রাজ্য ছিল। তাদের আদি ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয় যদিও তাদের অনেকেই আসামী, হিন্দি অথবা বাংলায় কথা বলে। আদিতে তারা মাতৃতান্ত্রিক ছিল।

৭২. Dalton *Trbibal History*. 48.

৭৩. দেখুন, Father Stephen G Gomes. *The Paharias* (Dhaka 1988).

৭৪. মোস্তফা মজিদ, পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি , (ঢাকা ১৯৯২)।

৭৫. Dalton. *Tribal History*. 135-136.

৭৬. Maloney. *Trbibes of Bangladesh* 16

৭৭. Dalton. *Tribal History*. 89.

ওরাঁও : এদের বিশ্বাস, এরা দক্ষিণ বিহারের রাঁচী থেকে বাংলাদেশে এসেছে। এরা কুরুখ (Kurukh) ভাষায় কথা বলে এবং এদের কিছু অংশ সাদরি (Sadri) ভাষায় কথা বলে। ওরাঁওরা সর্বপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাসী যদিও কিছু ওরাঁও খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এরা হাথ সাঙ্গিয়া (Hath Sangia), আপার সাঙ্গিয়া (Uper Sangia) এবং কাত্রিয় (Katrio) এ তিন গোষ্ঠীতে বিভক্ত।[৭৮]

হাজং : ড্যাল্টন (Dalton)[৭৯]-এর মতে, হাজংদের আদি নিবাস আসামে এবং তারা আসামের গোয়ালপাড়ার কাচারি জাতির বংশধর। কোন কোন সময় এদেরকে সমতলের কাচারি (Plain's Kachari) বলা হয়। এদের অধিকাংশ হিন্দু এবং এদের ভাষা বোডো (Bodo) গোত্রীয়। এরা বায়াবচারিস (Byab charis) এবং প্যারামারথিস (Paramartis) এ দুই গোত্রে বিভক্ত। দ্বিতীয়টিকে উঁচু জাতের বলে বিবেচনা করা হয়।

মাহাত (Mahat) : ম্যালনি (Maloney)[৮০] মনে করেন যে এরা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী গোষ্ঠী। এরা পশ্চিম বঙ্গের বৃহৎ বর্ণগুচ্ছের অন্তর্গত। বাংলাদেশে এরা দিনাজপুরে বসতি স্থাপন করেছে এবং এরা সাদরি (Shadri) ভাষায় কথা বলে।

মুন্ডা : ড্যাল্টন (Dalton)[৮১] উল্লেখ করেন যে মুন্ডা বা মুন্ডারিরা এক সময় মগধনিবাসী ছিল এবং গৌতম বুদ্ধের জন্মের সময় পর্যন্ত সেখানে বাস করতো। পরে এরা ছোট নাগপুরে বসতি স্থাপন করে। মুন্ডাদের বিশ্বাস, সে সময় তাদের কোন রাজা ছিল না। প্রতিটি গ্রামে মুন্ডা নামে নিজস্ব চীপ ছিল, যার অর্থ সংস্কৃত ভাষায় হেড বা প্রধান। প্রায়শ একটি গ্রাম মাত্র একটি পরিবার নিয়ে গঠিত হতো এবং এভাবে পুরো সম্প্রদায় মুন্ডা নামে পরিচিত হয়। এরা বৃটিশ শাসনামলে দক্ষিণ বিহার থেকে সমতল বাংলায় আগমন করে। এরা মুন্ডা ভাষায় কথা বলে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে প্রথম বারের মতো বুমা, হরিজন এবং উরুয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব গোষ্ঠী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

পেশা এবং অর্থনীতি

বাংলাদেশে এথনিক গোষ্ঠীসমূহের বেশির ভাগই কৃষিবিদ। উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলোর এথনিক গোষ্ঠী জলা ধান (wet-rice) চাষে অভ্যস্ত। সিলেটে খাসিরা ঐতিহ্যগতভাবে

৭৮. Budla Orao. '*Oraons Among the Bangladesh Aboriginals*' in Mahmud. S. Qureshi ed. *Tribal Cultures. 131.*
৭৯. Dalton. *Tribal History.* 87.
৮০. Maloney. '*Trbibes of Bangladesh*' 22
৮১. Dalton. *Tribal History.* 163.

সীমান্তের ওপারের সাথে ব্যবসায়ে জড়িত। এটি তাদের প্রধান পেশা এবং কৃষি গৌণ বিষয়। মনিপুরীরা ঐতিহ্যগতভাবে কারিগর, যেমন ছুতোর (carpenter) এবং অলঙ্কার প্রস্তুতকারী (jeweler)। গারোরা জুম চাষ করতো, কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা জলা ধান (wet-rice) চাষে নিয়োজিত হয়। তারা আনারসের চাষও করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম ছিল চাষের প্রধান উপায়। তবে জুম চাষে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় এবং জমি ও বনাঞ্চল সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের ফলে জুম চাষ দুরূহ হয়ে পড়ে। উপত্যকার জনগোষ্ঠী জলা ধান (wet-rice) চাষ করতো। এখনো পাহাড়ের শীর্ষে জুম চাষ করা হয়। অতীতে বেশির ভাগ এথনিক গোষ্ঠী জীবনধারণভিত্তিক অর্থনীতির (subsistence economy) অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু 'রাষ্ট্রের' অনধিকারপ্রবেশের ফলে তারা বাজার অর্থনীতির (market economy) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক পর্যায়ভুক্ত করেছে। নীচে এই প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হলো।

(৩) রাষ্ট্র এবং এথনিক গোষ্ঠীসমূহের প্রান্তিকীকরণ

আধুনিক রাষ্ট্র পশ্চিমা টেকনোক্রেটিক ধাঁচের 'উন্নয়ন' (developmet) এবং 'প্রগতি'র (progress) ধারণা গ্রহণ করেছে, যা চাকচিক্যমুখী। এভাবে রাষ্ট্র স্থানীয় জনগণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। ফলে এথনিক সম্প্রদায়গুলোর অবস্থার প্রান্তিকীকরণ ঘটেছে এবং 'উন্নয়নের' নামে তাদের সম্পদ শোষণ করা হয়েছে। এখানে আমরা 'ভূমি', 'বনাঞ্চল' এবং 'জল'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি বিশেষ বাস্তবতার নিরিখে এই বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ আলোচনা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং গারোদের বিষয়ে সীমিত রাখা হবে।

(ক) ভূমি : ভূমিকে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি বলে গণ্য করতো। তাদের বিশ্বাস, গ্রাম সম্প্রদায়, জ্ঞাতিত্ব (kinship)-গোষ্ঠী এবং কিছু ক্ষেত্রে আত্মারা (spirit) ছিল ভূমির চূড়ান্ত মালিক; ব্যক্তি মালিকগণ শুধুমাত্র ভূমি ভোগ করার অধিকারী।[৮২] যাহোক, বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ১৮৬৮ সালে সকল পাহাড়ী ভূমির উপর মালিকানা (ownership) প্রতিষ্ঠা করে। এথনিক চীফগণ নিজেদেরকে ভূমির স্বত্বাধিকারী হিসেবে দাবি জানিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণে বাধা দান করে। তাদের যুক্তি ছিল, তারাই বংশগতভাবে খাজনা সংগ্রহকারী এবং এমন কিছু সুবিধাভোগী, যা তাদের এ ভূমির মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু চীফদের এ অধিকার সরকার কখনো স্বীকার করে নি।

৮২. Wolfgang Mey. *Genocide in the CHT. Bangladesh.* IWGIA Document No 51. (Compenhagen 1984). 76.

এক্ষেত্রে যে যুক্তি দেখানো হয় তা হলো, ভূমিতে পাহাড়ী চীফদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এলাকাভিত্তিক ছিল না, বরং গোত্র এবং উপজাতিভিত্তিক ছিল। কাজেই চীফদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল জনগণের উপর, ভূমির উপর নয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর সরকারের অসীম এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বর্তায়।[৮৩] এ ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্নে সরকার স্ববিরোধী অবস্থানও গ্রহণ করে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল চীফদের এখতিয়ারকে গোত্রভিত্তির পরিবর্তে এলাকাভিত্তিতে বর্ণনা করেছে। কারণ এ ব্যবস্থা কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়ক। উপরোক্ত পদক্ষেপের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করে : (ক) জুমের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান এবং (খ) ভূমিমালিকানার বিদেশী ধারণা প্রয়োগ।

(ক) জুম-এর উপর আক্রমণ :

বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনধারায় তাদের উৎপাদনপদ্ধতির উপর প্রথম প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালায়। এখানে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে জুম পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষির বৈশিষ্ট্য হলেও এটি একটি মান্ধাতার আমলের কৃষিপদ্ধতি। বৃটিশদের বিবেচনায় এতে জমি দীর্ঘকাল অনাবাদী পড়ে থাকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় হয়। বৃটিশরা জুম চাষের পরিবর্তে লাঙ্গল চাষ প্রবর্তনের চেষ্টা চালায়, কারণ লাঙ্গল চাষ জমি অনাবাদী বা পরিত্যক্ত রাখে না। ফলে তা অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভজনক এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর। কিন্তু পাহাড়ী জনগণের জন্য জুম পদ্ধতি ছিল এমন এক জীবনব্যবস্থা, যার সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জড়িত এবং সেটি অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যায়। সমগ্র জুম চাষ এবং এতে ফসল তোলার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্প্রদায়ভিত্তিক মালিকানা, বিনিময় এবং ভাগাভাগির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আছে। জুম চাষ পর পর দুই বছর করা যায় এবং তারপর জমিকে দশ থেকে পনেরো বছর পরিত্যক্ত বা অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখতে হয়। এ পদ্ধতি পাহাড়ী জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চর্চা করে আসছে এবং এটা তাদের প্রতিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বৃটিশরা অবশ্য এ পদ্ধতিকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল (পরিচ্ছেদ-৫, অধ্যায়-১৮, ধারা-২) স্পষ্ট করে কৃষকদের এক সার্কেল থেকে অন্যত্র বসবাসের উদ্দেশ্যে গমন নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ১৮৬০ সালের পর পূর্বের মতো ব্যক্তিগত অনাবাদী (fallow) ভূমির পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক কর দাবি করা হয়। এর

৮৩. Raja Devasish Roy. '*Land Rights of the Indigenous Peoples of the CHT Land*. vol 1 No 1 (Dhaka 1994). 13.

উদ্দেশ্য ছিল চাষীদেরকে নির্দিষ্ট এক এক খণ্ড জমির সাথে সম্পৃক্ত করে রাখা। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে জুমিয়াদেরকে লাঙ্গল চাষে উৎসাহিত করার এক সামগ্রিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ১৮৭২ সালের মধ্যে সমগ্র সমতলের ভূমি লাঙ্গল চাষের জন্য ইজারা দেয়া হয়, যার পরিমাণ ছিল ১৭০২ হেক্টর এবং এজন্য প্রদত্ত নগদ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২৭৪ পাউন্ড।[৮৪]

এভাবে লাঙ্গল চাষ প্রবর্তনের মাধ্যমে বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। এটি তাদের রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করতেও সহায়ক হয়। কারণ জুম ব্যবস্থায় চাষীরা নিজেদের চীফের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং তাঁর নিকট হেডম্যানের মাধ্যমে তাদের জুমকর প্রদান করতো। এই ব্যবস্থা সরকারকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য স্থানীয় কর্মচারীদের (indigenous functionaries) উপর নির্ভরশীল করেছিল। কিন্তু লাঙ্গল চাষের প্রবর্তন স্থানীয় কর্মচারীদের উপর রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। স্থানীয় চীফগণ (chiefs) নিজেদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার কারণে এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করে, কেননা নতুন ব্যবস্থাধীনে চাষীরা সরাসরি সরকারকে কর দিতে থাকবে।[৮৫] তাই চীফদের শান্ত করতে এবং তাদের আনুগত্য লাভের আশায় বৃটিশরা তাদেরকে সরকারি কর সংগ্রহকারী হিসেবে ঘোষণা দেয়। এ ব্যবস্থা অতঃপর পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়ালে স্বীকৃত হয় (পরিচ্ছেদ-৫, অধ্যায়-১৮, ধারা-২)। চীফদেরকে নিজেদের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গ্রামের হেডম্যান নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। এ পদক্ষেপ স্থানীয় রীতির বিরোধী ছিল, কেননা হেডম্যানগণ সাধারণত গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এ নতুন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এবং নিদারুণ বিরক্ত হয়ে 'গ্রাম উঠিয়ে দিয়ে নতুন গ্রাম গঠনে প্রয়াসী হয়'।[৮৬] এমন প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে বৃটিশরা চীফদের সহায়তা দানের জন্য এগিয়ে আসে, কারণ এ ক্ষেত্রে উভয়ের স্বার্থ সমান্তরাল ছিল।

কাজেই লাঙ্গল চাষের প্রবর্তন পাহাড়ী জনগণের জন্য সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। এটি প্রথমবারের মতো পাহাড়ীদেরকে নিজস্ব এলিটের শোষণ ও নির্যাতনের মুখোমুখি করে। লাঙ্গল চাষ বিভিন্ন পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থ-সামাজিক পৃথকীকরণ ঘটায়। উপত্যকায় জমির প্রকৃতির কারণে সহজেই লাঙ্গল চাষ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়। লাঙ্গল চাষের জন্য প্রয়োজন হয় বাজারের। ফলে এ সকল এলাকায় স্থায়ী বাজার এবং

৮৪. Aditya K. Dewan. *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh* Unpublished Ph.D. thesis. (McGill 1990). 152.

৮৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজস্ব প্রশাসনের পত্রাদি ১৮৮৬-১৮৮৭ (কোলকাতা ১৮৮৭) থেকে নির্বাচিত ৯৯।

৮৬. ঐ, 2.

শহর বা পৌর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে পাহাড়ী জনগণের মধ্যে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর (রাজনৈতিক ও বস্তুগতভাবে) আবির্ভাব ঘটে।

উপত্যকায় বসবাসরত জনগণের মধ্যে যারা লাঙ্গল চাষের জন্য ইজারার ভিত্তিতে ভূমি গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে এই ভূমির উপর মালিকানার অধিকার দেয়া হতো। তারা কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ধনিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। অপর দিকে যারা তা করেনি তারা ভূমিহীন এবং দিনমজুরে পরিণত হয়। পরিবারভিত্তিক ভূমিবরাদ্দ হওয়ার ফলে সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্পত্তির ধারণাও ভেঙে যায়। ১৯০০ সালের ম্যানুয়্যালের পরিচ্ছেদ-৪-এর ১৩ ধারা অনুসারে পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শুধুমাত্র বাবা, মা, কন্যা এবং পুত্ররা।

লাঙ্গল চাষের প্রবর্তন বাঙালিদের জন্য পাহাড়গুলো উন্মুক্ত করে। পাহাড়ী এলাকায় সমতলের জনগণের প্রবেশে যে বাধানিষেধ ম্যানুয়্যালে বর্ণিত ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করার জন্য তা ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। জুম অর্থনীতিতে সহায়ক হিসেবে কর্জগ্রহণ ও পণ্যবিনিময় প্রচলিত ছিল বলে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বাণিজ্যিক বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রটি সমতল থেকে আগত বাঙালিদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অধিকন্তু পাহাড়ী জনগোষ্ঠী লাঙ্গল চাষের জন্য বাঙালিদের ভাড়া করে। কাজেই জুমের স্থলে লাঙ্গল চাষ পদ্ধতি পাহাড়ীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করে এবং তাদেরকে বাঙালিদের উপর নির্ভরশীল করে। পাহাড়ীদের উপর এ প্রযুক্তি চাপানোর ফলে তাদের জীবনের সংহতি বিনষ্ট হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড়ীদের মূল্যবোধকে কোন বিবেচনায় আনা হয় নি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন অর্থাৎ জুম থেকে লাঙ্গল চাষের প্রযুক্তি প্রবর্তন এবং তৎসহ বাঙালি নিয়ন্ত্রিত বাজার-অর্থনীতি প্রবর্তন ভবিষ্যতে পাহাড়ীদের অধস্তন অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে।

এই পরিণতি ছাড়াও নয়া চাষপদ্ধতির ফলে পাহাড়ীদের উপর নেমে আসে যাযাবরত্বের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক (নিম্নের বিশ্লেষণে বর্ণিত) পাহাড়ীদের ভূমিবিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে।

(খ) ভূমিমালিকানার বিদেশী ধারণা : বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিতে দুই ধরনের ভোগদখলের অধিকার প্রবর্তন করে : (১) ব্যক্তিগত অধিকার (Private rights) এবং (২) উপস্বত্বাধিকার (Usufruct)।

(১) ব্যক্তিগত অধিকার (Private Rights) : ১৮৬৮ সাল থেকে যারা লাঙ্গল চাষ গ্রহণ করে তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ করা যেতো। ব্যক্তিগত মালিকানার এ নতুন ধারণা

পাহাড়গুলিকে পণ্যে পরিণত করে, যা অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতো এবং অলঙ্ঘনীয় পূতঃপবিত্র বস্তু (sacrosanct) হিসেবে বিবেচিত হতো না।

(২) উপস্বত্বাধিকার (Usufruct) : এর অর্থ হলো সেই ভূমি ব্যবহারের অধিকার, যার উপর রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকার রয়েছে। এটি জুম ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অধিকার প্রথা এবং রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাষ্ট্র কর্তৃক পাহাড়ী অঞ্চলকে বাণিজ্যিক শোষণের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে পাহাড়ী জনগণ তাদের ভূমি হারায়। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল পাহাড়ে বহিরাগত কর্তৃক ভূমি দখল করার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে (বিধি-৩৪), তথাপি তা পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল না। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ভূমি দখল (acquire) করা যেতো : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণ [বিধি ৩৪ (খ)], শিল্পের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ [বিধি ৩৪ (গ)]; আবাসিক উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ [৩৪ (ঘ)] এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ [৩৪ (ঙ)]। এভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের লাভের জন্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ভূমি বাণিজ্যিক শোষণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন এভাবে পাহাড়ীদের কাছ থেকে ভূমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে তা রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত করে, যে রাষ্ট্রে তাদের কোন অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব ছিল না। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল এর ৩৪ ও ৩৬ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পাহাড়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চেয়েছে। জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমতি ছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে অস্থায়ী বাসিন্দাদের নিকট ভূমি বিক্রয় এবং তাদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। এ অবস্থা পাকিস্তান আমলেও অপরিবর্তিত ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সর্বদাই দুষ্প্রাপ্য ছিল, যদিও প্রচলিত বিশ্বাস ছিল এর বিপরীত। এক বন সংক্রান্ত (forestal) প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা মাত্র ৩.২ ভাগ অর্থাৎ ১০৪,৩০৪,৬৪ একর জমি ছিল সব ধরনের কৃষিকাজের উপযুক্ত [ক শ্রেণীর জমি], শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ অর্থাৎ ৫০৫,২২৫,৬০ একর জমি ছিল ফলচাষ ও বনায়নের জন্য উপযুক্ত [খ শ্রেণীর জমি] এবং শতকরা ৭৭ ভাগ অর্থাৎ ২,৫০৯,৮৩০,৪০ একর জমি ছিল শুধুমাত্র বনায়নের উপযোগী [গ শ্রেণীর জমি]।[৮৭]

এমনকি, ১৯১৮ সালে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ২০০,০০০ ছিল, তখনও এখানে জীবন ধারণে সহায়ক জমি রক্ষার জন্য এবং এখানকার অর্থনীতিকে সংরক্ষণ

৮৭. Raja Devasish Roy. 'The Erosion of Legal and Constitutional Safeguards of the Hill Peoples of the CHT in Bangladesh: An Historical Account, Paper Presented at a seminar on the CHT Problem in Bangladesh. organised by the Manoghar Shishu Sadan. Rangamati. April 20-22, 1992, 10.

করার তাগিদে সমতল থেকে এ অঞ্চলে বসবাসের জন্য জনগণের গমন নিয়ন্ত্রণ করার ও সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়্যাল-এর ৩৪ এবং ৩৬ ধারা অনুসারে পাহাড়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমতি ব্যতীত অস্থানীয়দের এ অঞ্চলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি পঞ্চাশের দশকেও দেখা যায় যে পাহাড়ী জনসংখ্যার জন্য চাষযোগ্য ভূমি ছিল অপর্যাপ্ত, যার পরিমাণ ১৯৬১ সালে ছিল ৩৮৫,০৭৯ একর। ভূমির এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র পার্বত্য অঞ্চলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে 'উন্নয়নমূলক' কর্মকাণ্ড শুরু করে (এটি শেষ হয় ১৯৬০ সালে)। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সৃষ্ট জলাধার ১০০,০০০ মানুষকে উচ্ছেদ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৪,০০০ একরের বেশি প্রধান আবাদী জমিকে প্লাবিত করে। এর বিনিময়ে সরকার শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশ হারানো জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানে সক্ষম ছিল। অদ্যাবধি উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর অধিকাংশকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসিত করা হয় নি প্রধানত জমির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে। ফলে তারা জঙ্গলের দিকে সরে গেছে এবং ভঙ্গুর (fragile) জমিতে জুম চাষ করছে।

সমতলের এথনিক সম্প্রদায়গুলোর ভূমিসমস্যা পাহাড়ীদের সমস্যার তুলনায় ভিন্ন ধরনের। এর কারণ হচ্ছে এদের কৃষিকর্মের পার্থক্য, বাঙালিদের মধ্যে কিংবা নিকটবর্তী অঞ্চলে তাদের কেন্দ্রীভূত অবস্থান, বহিঃস্থ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রধানত গারোদের সমাজের মতো তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

সমতলের এথনিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এদের ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের ছোট নাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (Chota Nagpur Tenancy Act of 1908) প্রণীত হয়। এ আইন জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত উপজাতিদের ভূমি অ-উপজাতীয়দের নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে। এ বিধান অবশ্য প্রায়শ লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের এথনিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই সংকটের মূহূর্তে তাদের ভূমি বিক্রয় করেছে। এরা অভিযোগ করেছে যে ভূমি নিবন্ধন কার্যালয় থেকে ভুয়া নিবন্ধনকৃত কাগজপত্র বের করা বাঙালিদের জন্য বেশ সহজসাধ্য ব্যাপার, যেগুলো প্রায়ই ছিল প্রাক-তারিখযুক্ত। তারা আরো অভিযোগ করে যে ভূমি রাজস্ব কার্যালয় প্রায়ই তাদের কাছ থেকে ভূমিকর গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংখ্যালঘুদেরকে তাদের নিজ ভূমি থেকে উৎখাত করা। আবার যখন তাদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়, তখন হীন উদ্দেশ্যে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে ভূমি হস্তগত করার অপচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।[৮৮]

৮৮. Philip Gain & Shishir Moral. 'Land Right Land Use and Ethnic Minorities of Bangladesh', *Land* vol 2. No 2 (Dhaka) 1995). 53.

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মতো গারো সম্প্রদায়ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নীম্নের বর্ণনা থেকে এটি অধিক বোধগম্য হবে।

গারো জনগোষ্ঠী মূলত কৃষিজীবী। এরা কৃষিকাজে জুম পদ্ধতি প্রয়োগ করে। গারো পাহাড়ের মাটির প্রকৃতি পুরোপুরি লাঙ্গল চাষের উপযোগী নয়।[৮৯] গারো পাহাড়ের যেসব স্থানে জুম চাষ করা হতো, সেখানে সমগ্র গ্রামবাসী সম্প্রদায়ভিত্তিক আবাদ করতো। নীতিগতভাবে আকিং (Aking) নামে পরিচিত গ্রামের সাধারণ জমির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থাকতো মাহারী বংশের দু'টি গোষ্ঠীর হাতে, যারা গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। সাম্প্রদায়িক ভূমির মালিকানা ন্যস্ত হতো পরিবারের নারী-সদস্যের হাতে এবং এ ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত হতো পুরুষ-সদস্যের হাতে। প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য এ অধিকার বর্তাতো এ দুই বংশধারায় উত্তরাধিকারীর উপর।[৯০]

আকিং ভূমি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং এসব খণ্ড গ্রামের সকল গৃহস্থের জন্য গৃহের আকার অনুযায়ী বরাদ্দ করা হতো। কোন গৃহস্থকে একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের স্থায়ী মালিকানা প্রদান করা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রতি বছর পালাক্রমে ভূমির বরাদ্দ দেয়া হতো।[৯১]

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অবশ্য এদের চাষাবাদ পদ্ধতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নি। কিন্তু গারো গ্রামগুলোর উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব সংগ্রহ সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে সীমিত পুলিশ, সিভিল ও ফৌজদারি ক্ষমতাসম্পন্ন লস্কর কার্যালয় প্রবর্তন করা হয়।[৯২] কাজেই লক্ষ্য করা যায় যে বৃটিশরা গারোদের ভূমিব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটায় নি।

বাংলাদেশে উত্তর ময়মনসিংহ এবং মধুপুর গড় জঙ্গলে যেসকল গারো বসতি স্থাপন করে, তারা জুমসহ ভেজা ধান (wet-rice) চাষ করতো। এটি সম্ভব হয় একদিকে পরিবেশগত (ecological) চাপ এবং অন্যদিকে জনসংখ্যার চাপের কারণে। ভেজা ধান চাষের (wet-cultivation) কারণে ভূমির স্থায়ী মালিকানার সৃষ্টি হয়। যে গৃহস্থ প্রথম চাষ আরম্ভ করে, এটি তার উপর বর্তায়। কিছু সংখ্যক ভূমিকে ভেজা জমিতে (wet-field) রূপান্তরিত করায় গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় নি, কারণ যেসমস্ত ভূমি জুম চাষের অনুপোযোগী ছিল শুধুমাত্র সেগুলোরই রূপান্তর করা হয়। তথাপি, গারো

৮৯. Playfair *The Garos*. 35

৯০. Kibriul Khaluque. 'Change in Social Organization and its Implications for land and Tree Tenure Change The Case of the Garo Community of Madhupur Garh Forest' Unpublished Paper. n d., 3-4

৯১. Kibriaul Khaleque. ঐ, 94

৯২. বিস্তরিত জানার জন্য দেখুন, Milton S Sangma. *History and Culture of the Garos* (New Delhi 1981).

সমাজ ক্রমান্বয়ে ভূমির সম্প্রদায়ভিত্তিক মালিকানার ধারণা থেকে সরে আসে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা গ্রহণ করে। এটি পরবর্তীকালে এদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় যখন জমির নিবন্ধীকরণ পরিবারের পুরুষ-সদস্যের নামে করা হয়।

(খ) বনাঞ্চলের বাণিজ্যিকীকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা ৮২ ভাগ এলাকা নিয়ে বনাঞ্চল গঠিত।[৯৩] পাহাড়ী জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে বনসম্পদ গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করে আসছে। এ সমস্ত বনে জুম চাষও করা হয়ে থাকে। তবে তা এলোমেলোভাবে করা হয় নি। বরঞ্চ সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুমতি এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল ছিল। কারণ বনাঞ্চল সমগ্র সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে গণ্য হতো। জুম চাষের ক্ষেত্রে অনাবাদী কাল (fallow period) কঠোরভাবে অনুসরণ এ ব্যাপারে একটি প্রধান দৃষ্টান্ত।

সামাজিক বনায়নের ধারণা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক বনাঞ্চলের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বাৎসরিকভাবে বনসম্পদের উপর টোল (toll) আদায় করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা হতো এবং এসব বনজ সম্পদ নদীপথে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে আসা হতো।[৯৪] বনজ দ্রব্যের উপর চাঁদা সংগ্রহের জন্য ১৮৬২ সালে প্রধান প্রধান নদীতে টোল-কেন্দ্র (toll station) বসানো হয়। প্রথম দিকে সরকারি কর্মকর্তাগণ টোল সংগ্রহ করতেন, তবে ১৮৬৪ সালে চীফদের এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যা হোক, ১৮৭১ সালে বন বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল টোল-অফিসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।[৯৫]

১৮৬৫ সালে ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়। এ আইন বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য স্থানীয় জনগণের পাহাড়ে প্রবেশ এবং এর সম্পদ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এখানে মনে রাখা দরকার যে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এসব সম্পদ খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতো, কারণ তা এদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আসলে স্বয়ং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই ধ্বংসপ্রক্রিয়া শুরু করেছিল। কোন কোন সময় নিজেদের রাজনৈতিক বিজয় উৎযাপনের জন্য বৃটিশরা বনাঞ্চল উজার করে। রাজকীয় নৌ-বাহিনীর জাহাজ নির্মাণের জন্য ভারতীয় জঙ্গলের কাঠ প্রয়োজন হতো। রাজস্ব সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক ভূমিনীতি বন উজাড়ের জন্য দায়ী ছিল। রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিকাজের জন্য বনাঞ্চল পরিষ্কার করা হতো। ১৮৫৩ সালের দিকে রেলপথ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে বন উজাড় প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়।

৯৩. Hunter *The Annals of Rural Bengal* 1876. 29.

৯৪. Lewin *The Hill Tracts of Chittagong*. 869 27.

৯৫. J.M. Cowan. *Working Plan for the Forests of CHT Division* (Calcutta 1923). 14-16

১৮৭৮ সালে আরেকটি আইনের বলে রাষ্ট্র সকল বনভূমির উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে বনসম্পদের উপর তাদের সম্প্রদায়ভিত্তিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। মজার ব্যাপার এই যে এ আইন প্রণয়নের পূর্বে রাষ্ট্র বনাঞ্চলকে সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হিসেবে স্বীকার করেছিল।[৯৬]

১৮৬৯ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে একজন সহকারী বন কনজারভেটর নিয়োগ করা হয় এবং ১৮৭০ থেকে বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু তদারকি ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৭১ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সবটুকু অর্থাৎ ৬৮৮২ বর্গমাইলের মধ্যে ৫৬৭০ বর্গমাইল এলাকাকে সরকারি সংরক্ষিত বন (government reserve forest) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৯৭] স্থানীয় জনগণকে বনজ দ্রব্য শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। ১৮৭৫ সালে সংরক্ষিত বনভূমি (RF) এবং জেলা বনভূমি (DF) (বর্তমানে অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি) এই দুই ধরনের বনাঞ্চল গঠনের মাধ্যমে আরো অধিক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। সংরক্ষিত বনভূমিকে পুরোপুরিভাবে বনবিভাগের ব্যবস্থাপনায় আনা হয়। জুম চাষ এবং গার্হস্থ্য প্রয়োজনে বনজ দ্রব্য ব্যবহার সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। জেলা বনভূমিকে জেলা প্রশাসকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কোন কোন সময়ে জেলা প্রশাসকের আরোপকৃত বিধি-নিষেধের প্রেক্ষিতে এ বনভূমিতে জুম চাষ এবং গৃহস্থালীর কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হতো।[৯৮]

রাষ্ট্র থেকে ইউরোপীয় উদ্যোক্তাদেরকে (entrepreneur) উৎকৃষ্ট মানের ভূমি প্রদান করা হতো। ১৮৬০-এর দশকে চা, কফি ও কমলার আবাদ হয় এবং ১৮৭০-এর দশকে সেগুন চাষ করা হয়।[৯৯] ১৯৪০ সালে ৩,০০০ হাজার একর ভূমি সেগুন চাষের আওতাভুক্ত হয়।[১০০] ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাৎসরিকভাবে পাহাড়ী এলাকা থেকে বার্ষিক ৫০,০০০ কিউবিক ফুট কাঠ সংগ্রহ করা হয়।[১০১] সরকারি সংরক্ষিত বনভূমিতে কাঠ ও সেগুন চাষ করে বাৎসরিক গড় উদ্বৃত্ত ৭০,০০০ টাকা হিসাব করা হয়।[১০২]

৯৬. Ramachandra Guha *The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya* (Delhi 1991), 56-57.

৯৭. Cowan, *Working Plan for the Forests of CHT*, 14

৯৮. Selections from the Correspondence on the Revenue Administraiton of the CHT, 1862-1927 (Calcutta 1929), 202-204

৯৯. W.V Schendel, 'The Invention of the 'Jummas': State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh', *Modern Asian Studies* vol 26 Part. 1 (Cambridge 1992), 112.

১০০. Nafis Ahmad *A New Economic Geography of Bangladesh* (Delhi 1976) 110.

১০১. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong*, 1869, 8.

১০২. Cowan, *Working Plan for the Forests of CHT*, 36

বনভূমি থেকে পাহাড়ী জনগণকে উচ্ছেদের মাধ্যমে এদের প্রান্তিকীকৃত করা হয়। জুমের জন্য নির্ধারিত এলাকাকে এক-তৃতীয়াংশে সীমিত করা হয়। এর ফলে জুমিয়াদের প্রান্তিকীকরণ হয়, কারণ রাষ্ট্র জুমচাষীদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন পদক্ষেপ নেয়নি বা তাদের জন্য কোন রকম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নি। পরিবেশের উপর উপরোক্ত নীতির বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; ভূমি দুর্লভ হওয়ার কারণে জমি পতিত রাখার সময়কাল (following cyde) ১৫-২০ বছর থেকে ৮-১০ বছরে হ্রাস করা হয় যার ফলে মাটির ক্ষতি সাধন প্রক্রিয়া (degradation) ঘটতে থাকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো। ১৯৫৩ সালে এশিয়ার বৃহত্তম কর্ণফুলী কাগজকল প্রতিষ্ঠা তথাকথিত 'উন্নয়ন'-এর আরেক দৃষ্টান্ত, যার ফলে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী নিজস্ব ভূমি ও সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উক্ত কাগজকল নির্মাণের ফলে ঐ এলাকার অসংখ্য মার্মা (সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি) াড়া হয়ে যায়। বর্তমানে এই কাগজকলের নিকটে স্থানীয়দের কোন বসতি নেই এবং কাছাকাছি বসবাসরত জনগণের শতকরা ১০০ ভাগই বাঙালি। অধিকন্তু ঐ কল কাঁচামাল হিসেবে পাহাড় থেকে সংগৃহীত বাঁশ এবং নরম কাঠ ব্যবহার করে এবং এতে পাহাড়ী জনগণ কোনভাবেই উপকৃত হয় নি। অপরদিকে ঐ কাগজকল বাঙালিদের জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যারা এতে প্রধান পদগুলো দখল করেছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের শতকরা মাত্র এক ভাগকে কাগজকলে নিয়োগ দান করা হয়েছে, তাও আবার নিম্নতর পদে।

১৯৬৭ সালে ফরেস্টাল ফরেস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যশনাল লিমিটেড (অতঃপর করেস্টাল বলা হবে)-এর সুপারিশক্রমে সরকার সংরক্ষিত বনাঞ্চল [Protected Forest (PF)] নামে এক বনভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়, যা বৃটিশ কর্তৃক ইতিমধ্যে সৃষ্ট দুটি বনভূমির অতিরিক্ত। এ বনভূমিতে জুম চাষ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর পরিবর্তে সরকার ২১,০০০ একরের নরম কাঠ সার্কেল (soft wood working circle) ও ১৪,০০০ একরের ফলবৃক্ষ (fruit wood working circle) সার্কেল গঠনের প্রস্তাব করে।[১০৩] এ পদক্ষেপ উক্ত এলাকার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী বাঙালি ব্যবসায়ীদের উপকারে আসে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং বাঙালিদেরকে অধিক হারে পাহাড়ী অঞ্চলের গভীরে অনুপ্রবেশের সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে (PF) ধান উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর ফল দাঁড়ায় এই যে অল্পকাল পরেই খাদ্যসামগ্রীর অভাবকে অনশনজনিত মৃত্যুর প্রথম কারণ বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।[১০৪]

১০৩. ADB Report CHT Development Project (Dacca 1978). 53-55

১০৪. Anti-Slavery Society. The CHT. Militarization Oppression and the Tribes Series 2 (London 1984) 33

এটা ছিল স্বনির্ভর এক জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গারো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি পাহাড়ীদের থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। ব্রিটিশ আমলে মধুপুর গড়ের সকল বনভূমি নাটোরের জমিদারের ভূসম্পত্তির (estate) অংশ ছিল। সেখানে গারোদেরকে বসবাস ও চাষবাদের অনুমতি দেয়া হয়। তবে শর্ত থাকে যে তারা জঙ্গলের যত্ন নেবে এবং জমিদারকে বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করবে।[১০৫]

মধুপুর গড় এলাকায় অবশ্য জুমের জমি ব্যক্তিগত গৃহস্থালির অধীনে ছিল। সম্প্রদায়ভিত্তিক মালিকানা এ এলাকায় বিদ্যমান ছিল না। এখানে গারোদের দু'ধরনের ভূমিস্বত্ব লাভের অনুমতি দেয়া হয়। প্রথমটি পাট্টা (Patta) হিসেবে পরিচিত ছিল, যার মাধ্যমে ভূমির অধিকারীকে কর প্রদান সাপেক্ষে জমি চাষসহ নিজ উত্তরাধিকারীর নিকট ভূমি হস্তান্তরের অনুমতি দেয়া হতো। তবে তার জমি বিক্রি করার কোন অধিকার ছিল না। জমিদারগণ কোনরকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমি দখল করতে পারতেন।

জলা ধান চাষ (wet-rice cultivation) তীব্রতর করার পাশাপাশি পত্তন (Pattan) নামে অধিকতর স্থায়ী ধরনের এক ভূমিস্বত্ব চালু করা হয়। কয়েক বছর জলা ধান চাষের পর নিয়মিত কর প্রদান সাপেক্ষে একজন চাষীকে এই মালিকানা প্রদান করা হতো। পত্তন-এর অধীনে মালিকরা জমি বিক্রি করতে পারতো এবং জমিদারগণ জমির দখল নিলে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারতো। পত্তন জুম চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নি।[১০৬] এ ধরনের ভোগস্বত্বভিত্তিক ভূমিব্যবস্থার বিকাশের নির্দিষ্ট সময়কালও জানা যায় নি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। মধুপুর গড়ের বৃক্ষশোভিত উঁচুভূমি সরকার কর্তৃক বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।[১০৭] জলমগ্ন নিম্নভূমি বন বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ১৯৫৫ সালে মধুপুর গড়কে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে মধুপুর জঙ্গল জাতীয় বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়।[১০৮]

উল্লেখ্য যে গারোদের জন্য বৃক্ষকর্তন নিষিদ্ধ ছিল। জুম চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি এবং জুমভূমির নিকটস্থ জলাভূমিকে সরকারের নিজস্ব খাস জমিভুক্ত করা হয়। গারোরা শুধুমাত্র খাস জমি বলে ঘোষিত হয় নি এমন জলাভূমিতে চাষাবাদ করতে পারতো। প্রথমে চাষের জন্য গারোদেরকে জলাভূমিতে অস্থায়ী পাট্টা নামে অস্থায়ী উপস্বত্বাধিকার

১০৫. Kibriaul Khaleque. *Change in Social Organization*. 99.

১০৬. Gain & Moral. 'Land Right'. 56.

১০৭. *Dacca Gazette*. Nov. 8. 1951.

১০৮. *Dacca Gazette* Sept. 29. 1955

(usufruct) দেয়া হতো। এভাবে জমি ব্যবহারকারীকে জমি চাষ ও নিজ উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরের অনুমতি দেয়া হলেও জমি বিক্রির অনুমতি দেয়া হয় নি। এ সকল ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ কর্তনের একমাত্র অধিকার সরকার সংরক্ষিত রাখতো। সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি পুনর্দখলেরও অধিকার সংরক্ষণ করতো। চাষীদের বাৎসরিক কর দিতে হতো সরকারকে। বেশ কয়েক বছর চাষাবাদের পর চাষীদেরকে জমির পূর্ণ মালিকানা দেয়া হতো, যাকে স্থায়ী পাট্টা বলা হতো। কাজেই সরকার কিছু জলাভূমিতে গারোদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু জুমভূমির উপর তাদের কোন অধিকার স্বীকার করে নি।[১০৯]

১৯৫৫ সালে মধুপুর জঙ্গলে জুম চাষ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয় এবং গারোদেরকে জলা ধান চাষে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই জলা ধান চাষের উপযোগী বেশীর ভাগ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ফলে গারোদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস তীব্র হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে গারোদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস আগে থেকেই বিরাজমান ছিল। গৃহস্থরা অধিক সংখ্যক শ্রমশক্তির সহায়তায় অথবা যারা সুষ্ঠুভাবে জমি চাষে দক্ষ ছিল তারাই অন্যদের তুলনায় ধনী হতে থাকে। কিন্তু জুমব্যবস্থায় ভূমিহীনতা অজানা ছিল। শুধুমাত্র জুমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে সাথে গারোদের মধ্যে ভূমিহীনতার সৃষ্টি হয়। ভূমির মালিকানা সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৬২ সালে সরকার হাজার হাজার বাঙালিকে মধুপুর জঙ্গলে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। ফলে গারোদের ভূমির ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হয়। আবার গারোরা যেসব ভূমিতে শতাব্দীব্যাপী বসবাস করছিল, ১৯৬৪ সালে সরকার তার অধিকাংশ কেড়ে নেয়। ১৯৬৮ সাল থেকে সরকার বিভিন্ন সময়ে বনভূমিতে অবৈধ বাসিন্দা হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদেরকে উচ্ছেদের নোটিশ প্রদান করে।[১১০]

(গ) পানিসম্পদ : পূর্ব বাংলায় শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পানিসম্পদ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে কর্ণফুলী নদীর উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এজন্য মার্কিন আর্থিক ও প্রযুক্তিক সহায়তায় ১৯৫৭-৬২ সালের মধ্যে কাপ্তাই নামক স্থানে নির্মিত বাঁধের উত্তর ও পূর্ব পাশে এক বিশাল হ্রদ বা জলাধার তৈরি করা হয়। এ প্রকল্প থেকে সরকার নিম্নোক্ত সুবিধা প্রাপ্তির প্রস্তাব করেছিল :

১০৯. Kibriaul Khaleque. *Change in Social Organization*. 1983 101.

১১০. Gain & Moral. 'Land Rights', 57.

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব গ্রিডের জন্য ১,২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।
(খ) কর্ণফুলী নদীর ভাটিতে (downstream) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম (inaccessible) অঞ্চলে নৌচলাচল সুবিধা সৃষ্টি।
(ঘ) জলাধারে মৎস্যচাষের মাধ্যমে দেশের চরম প্রোটিন ঘাটতিসম্পন্ন এলাকায় অতিরিক্ত প্রোটিন সরবরাহ।
(ঙ) এলাকার দুর্গম অঞ্চল থেকে ব্যাপক পরিমাণে কাঠ সংগ্রহ সহজতর করা।[১১১]

উপরোক্ত বাঁধ নির্মাণ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। বাঁধ নির্মাণের আগে উক্ত প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে কোন গবেষণা করা হয় নি। বাঁধটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র জমির শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ৫৪,০০০ একর আবাদযোগ্য জমিসহ ৪০০ বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত করে। প্রায় ৯০ মাইল সরকারি রাস্তা এবং সংরক্ষিত বনের দশ বর্গমাইল এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যায়। এর ফলে ভূমিমালিকানাসম্পন্ন প্রায় ১০,০০০ চাকমা চাষিপরিবার এবং প্রায় ৮,০০০ চাকমা জুমিয়া পরিবারের প্রায় ১০০,০০০-এর অধিক চাকমা জনগণকে ভূমিহীন বা বাস্তুহীনে পরিণত হয়। এ বাঁধ প্রায় ৮,০০০ বাঙালি এবং ১,০০০ মার্মা বসতি স্থাপনকারীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।[১১২] সরকার তড়িঘড়ি তাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে এ পরিকল্পনার কথা আগে ভাবা হয় নি এবং তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িতও হয় নি। কাসালং-এর সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অংশবিশেষ অসংরক্ষিত ছিল এবং সরকার সেখানে ৫,৬৩৩টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করে। এদের প্রত্যেকে ৩ একর করে নিম্নমানের জমি লাভ করে, যা ছিল গড়ে এদের পুরনো ভূ-সম্পত্তির অর্ধেক। পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সরকার বাঙালিদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। কাসালং অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ভূমিতে ৫৭০টি বাঙালি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়।[১১৩]

এরপরও ৪,৫০০টি পাহাড়ী পরিবার অবশিষ্ট থেকে যায়, যাদেরকে সমপর্যায়ের ভূমি বরাদ্দ করা হয় নি। তাদেরকে নিম্নমানের জমিতে মিশ্র চাষের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়, কারণ পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এ ধরনের চাষাবাদে অভ্যস্ত ছিল না। সরকারও পচনশীল উৎপাদিত দ্রব্য গুদামজাত করতে বা বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে সরকার ১৮,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের ১১,৭৬১টিকে পুনর্বাসনের জন্য নিম্নমানের মাত্র ২০,০০০ একর সমতল আবাদযোগ্য ভূমি

১১১. Nazmul Islam. 'The Karnafuli Project. Its Implications on the Tribal Population'. *Public Administration.* vol. 3. No. 2. (Dacca 1978). 3.

১১২. M.Q.Zaman. 'Crisis in CHT. Ethnicity and Integration'. EPW. (Bombay 1982).

১১৩. D.E. Sopher. 'The Swidden Wet Rice Transition in the Chittagong Hills', *Annals of the Association ofAmerican Geographers.* Vol. 54. 1964. 350-351.

বরাদ্দ করতে সক্ষম হয়। এর অর্থ হলো নতুন বসতিতে নেহাত ৩৪,০০০ একর ভূমি হাতছাড়া হওয়া[১১৪] অধিকন্তু কাসালং এলাকার জমির শতকরা ৭০ ভাগ বর্ষার সময় জলমগ্ন হয়ে যায় বিধায় ঐ সময়ে চাষাবাদ অসম্ভব ছিল। যেহেতু ভূমিতে জুমিয়াদের কোন স্বত্ব ছিল না, সেহেতু পাহাড়ী জনগণের যাযাবর বৃত্তির কারণে পুনর্বাসন কর্মসূচিতে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি। এটি আসলে সত্যের অপলাপ ছিল, তাই সিরাজউদ্দিন উল্লেখ করেন :

> জুমিয়াদের চাষাবাদ অবশ্যই যাযাবরভিত্তিক ছিল, কিন্তু ব্যাপক ধারণার বিপরীতে তাদের পৈত্রিক গ্রামগুলি ছিল স্থায়ী। জুমের জন্য উপযুক্ত ভূমির সন্ধানে তারা দূর দুরান্তে চলে যেতো ... জুমভূমিতে তারা কুঁড়েঘর নির্মাণ করতো এবং শস্য দেখাশুনার জন্য পুরো মৌসুম সেখানে অবস্থান করতো। কিন্তু মৌসুম অতিক্রান্ত হলেই তারা নিজস্ব গ্রামে ফিরে যেতো।[১১৫]

কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক শরণার্থীতে রূপান্তরিত করে। উদ্বাস্তু জনগণের প্রায় ৪০,০০০ ভারতে পাড়ি জমায়। এ অভিপ্রয়াণ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নয়নের রাজনীতির প্রতি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর এক নিরব প্রতিবাদ।

সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য একটি রাজস্ব ক্ষতিপূরণ কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ঐ কার্যালয়টি পুরোপুরিভাবে বাঙালি কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করে, কিন্তু মাত্র ২.৬ মিলিয়ন ডলার বিতরণ করা হয়।[১১৬]

জনগণকে বাস্তুহারা করা ছাড়াও চাষিদেরকে ইতিমধ্যে দুর্লভ জমিতে জুমচাষ গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ফলশ্রুতিতে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। জুম থেকে উৎপাদন কমে যায় এবং চাষীদের মধ্যে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। যাহোক কাপ্তাই প্রকল্প পূর্ব বাংলার সমগ্র বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্র শতকরা ০.৫ ভাগ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের চাহিদার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। যেখানে কাপ্তাই বাঁধ অবস্থিত সেখানে পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ জোনে (zone) প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের ভাণ্ডারসহ প্রধান বিকল্প শক্তির মজুদ ছিল।[১১৭] এই বাঁধ

১১৪. N. Islam, "*The Karnafuli Project*', 31-32

১১৫. A.M. Serajuddin. 'The Chakma Tribe of the CHT in the Eighteenth Century' *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.* No. 1 1984. 92

১১৬. S. Kamaluddin, ' A Tangled Web of Insurgency', *Far Eastern Economic Review,* May 23, 980. 34.

১১৭. Srijagdish, "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও বাংলাদেশের ভূমিকা", জুম্ম সংবাদ বুলেটিন নং ৫ (জে এস এস প্রকাশনী ১৯৯১)।

নির্মাণের ফলে উৎপাদন হ্রাস এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ-দুর্গতির প্রেক্ষিতে পাহাড়ী জনগণ কাপ্তাই বাঁধকে একটি মৃত্যুফাঁদ বলে মনে করে।[১১৮] এ সমস্ত ধারণা ও মন্তব্যে রাষ্ট্রের উন্নয়ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সংশয়াকুল মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটে।

কাপ্তাই হ্রদ সংশ্লিষ্ট এলাকাটিকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করেছে। এটি রাষ্ট্রের জাতীয় রাজস্ব আয়ে অবদান রাখলেও পাহাড়ীদেরকে হাস্যকৌতুক ও বিনোদনের বস্তুতে পরিণত করেছে, যা সচেতন পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। পাহাড়ী জনগণ আরো অভিযোগ করে যে সরকার তাদেরকে বিনা খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহের অঙ্গীকার করেছিল, কিন্তু স্থানীয় জনগণ শতকরা মাত্র একভাগ বিদ্যুৎ পায় আর তাও বিনা খরচে নয়। বাঁধ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানও একচেটিয়াভাবে বাঙালিদের করায়ত্ত হয়।

উপসংহার : এথনিক জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণ এবং বিচ্ছিন্নকরণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বাঙালি/বাংলাদেশী মডেলের জাতীয়তাবাদের অভিধার আড়ালে আরো ঘনীভূত ও তীব্র হয়েছে। এর গূঢ় অর্থ হলো ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলোর উপরে প্রধান এথনিক গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সংখ্যালঘু এথনিক গোষ্ঠীগুলো আধিপত্য প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে নিজেদের পরিচিতি নির্মাণের রাজনীতি অবলম্বন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রায় দুই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসেবে এবং পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে একটি জুম্ম জাতি হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বিদ্রোহী আন্দোলন চলছে।[১১৯] সমতলের এথনিক গোষ্ঠীগুলো বাঙালিদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আদিবাসী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীগুলোও পাহাড়ের আদি বসতকারী হিসেবে নিজেদেরকে জাতি বলে বিবেচনা করে। একই সময়ে তারা দাবি করে যে তারা জাতির সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং প্রয়োজনবোধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে জাতীয়তা অর্জন করতে পারে। এই আত্মপরিচয়ের সন্ধান এসব গোষ্ঠীর সামনে শুধু সংকটই নয় বরং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকরভাবে রাষ্ট্র থেকে এদের বিচ্ছিন্নতাকে

১১৮. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Amena Mohsin. *Politics of Nationalism: The Case of the CHT. Bangladesh*. Unpublished Ph. D. thesis. (Cambridge University 1995).

১১৯. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে (জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬) লেখকের কাছে বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীর সদস্যবর্গ এই সুপারিশ করেন।

তুলে ধরে। কাজেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? এ পরিপ্রেক্ষিতে বিম্নোক্ত সমাধান প্রস্তাব করা যেতে পারে :

(ক) ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গনতন্ত্রায়ণ;
(খ) সমাজ এবং সংস্কৃতির গণতন্ত্রায়ণ; এবং
(গ) সমাজ এবং সংস্কৃতির বিকেন্দ্রীকরণ।

উপরোক্ত জটিল পরিস্থিতির বিচারে এর চেয়ে কম কিছু করার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস হতে বাধ্য।

সংযুক্তি (Appendix)

এথনিক গোষ্ঠী	জনসংখ্যা
বম	১৩৪৭১
বংশী	২১১২
বুনা	৭৪২১
চাকমা	২৫২৮৫৮
সাক	২১২৭
গারো	৬৪২৮০
হাজং	১১৫৪০
হরিজন	১১৩২
খুমি	১২৪১
খাসি	১২২৮০
খিয়াং	২৩৪৩
কোচ	১৬৫৬৭
লুসাই	৬৬২
মাহাত	৩৫৩৪
মনিপুরী	২৪৮৮২
মার্মা	১৫৭৩০১

ম্র	১২৬
ম্রং	২২১৭৮
মুন্ডা	২১৩২
ওরাঁও	৮২১৬
পাহাড়িয়া	১৮৫৩
পাংখো	৩২২৭
রাজবংশী	৫৪৪৪
রাখাইন	১৬৯৩২
সাঁওতাল	২০২১৬২
তনচংগ্যা	২১৬৩৯
টিপরা	১২৪২
ত্রিপুরা	৭৯৭৭২
উরুয়া	৫৫৬১
অন্যান্য	২৬১৭৪৩

২০

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব

এনায়েতুর রহিম*

দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানের অবসান-সূচনা

১৯৪৭ সালে সৃষ্ট দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানের অবসানের সূচনা হয়েছিল কখন থেকে ? অবশ্যই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের দিন থেকে নয়। দেশবিভাগকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বরণ করে নিয়েছিল অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এ গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে কামাল দেখিয়েছেন কিভাবে পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর নাগরিক পাকিস্তানকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তা হলে পরবর্তীতে পাকিস্তান পরিত্যক্ত হলো কিভাবে ? দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানের অবসানপর্ব কখন থেকে শুরু হলো ? ভাষা আন্দোলন থেকে ? আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম থেকে ? পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন থেকে ? যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, সকল ঘটনা ছিল মুসলিম লীগের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ এবং তা কোনোভাবেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল না। পাকিস্তান গণপরিষদে (১৯৫৬-৫৮) শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ অথবা আওয়ামী লীগ বা অন্য কোনো দলের কোনো সদস্যের ভাষণ এ ইঙ্গিত দেয় না যে তাঁদের কারো মনে পাকিস্তান সত্তার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা ছিল। সত্যিকার অর্থে, ১৯৭১ সালের মার্চের পূর্বে পাকিস্তান সত্তাকে কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীই চ্যালেঞ্জ করে নি, যদিও অনেক নেতা বা বুদ্ধিজীবীর মতে পাকিস্তানের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের কোনো যুগান্তকারী ঘটনাই অকস্মাৎ বা কোনো বিশেষ তারিখে শুরু হয় না। এর বীজ অঙ্কুরিত হয় সহজে দৃশ্যযোগ্য নয় এমন এক সময়ে। সম্ভবত পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই

---

* Professor of History, Georgetown University, Washington D.C.

এর মধ্যে এর ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল। এই অনুমানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের বিবরণ শুরু করবো সেই সময়কাল থেকে যখন পাকিস্তানকে ঘিরে উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকাল থেকে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং তারপর

কয়েক দফা নির্বাচন পেছানোর পর অবশেষে ১৯৫৪ সালে তা অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে ১৯৪৭ সাল থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সার্বিক পরাজয় ঘটে। অথচ অর্ধশতাব্দী পূর্বে এই পূর্ববঙ্গেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার এই পূর্ববঙ্গেই দলটি প্রত্যাখ্যাত হলো। এই নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর দলটি দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অবশেষে প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বাঙালি নির্বাচকমণ্ডলী মুসলিম লীগের ক্ষমতার দুর্গে প্রথম আঘাত হানে। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট গণরায়। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বিশেষত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের অস্পষ্ট ধারণাটি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে গণবিতর্ক এবং সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে জনগণ প্রদেশের অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে।

ক্ষমতাসীন দল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিকে খাটো করে দেখেছিল। ভাষা বিতর্ক ছাড়াও সংসদে প্রতিনিধিত্ব এবং ভোটাধিকার নিয়ে সাংবিধানিক অচলাবস্থা, কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগাভাগি, রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণে ইসলামের ভূমিকা এবং অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব এবং সম্পদ বণ্টনে অসমতা।[১]

প্রদেশে কর্মরত ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যপুষ্ট আমলাদের অধিকাংশই ছিল অবাঙালি। এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এমন যে, প্রায়শ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের অগোচরেই এরা নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতো। এ ধরনের ঔদ্ধত্যের কারণে সিনিয়র আমলা ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী। এর একটি উদাহরণ ছিল মুসলিম লীগ দলীয় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে মুখ্য সচিব আজিজ আহমেদের বিরোধ, যিনি মন্ত্রীর অজ্ঞাতেই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বদলি করতেন।[২] ১৯৪৯ সালের দি পাবলিক এ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসার্স (ডিসকোয়ালিফিকেশন) এ্যাক্ট (PRODA)-এর অধীনে দুর্নীতির দায়ে সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিচার করা যেতো এবং দণ্ডিত হলে তারা নির্বাচনে

১. বিস্তারিত জানার জন্য এ সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডে রেহমান সোবহান রচিত অধ্যায় দেখুন।

২. দেখুন, Khalid Bin Sayeed, *Political System of Pakistan*, (Boston: Houghton Mifflin), 1961, 64.

কোনো পদের জন্য প্রার্থী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এই আইন নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ১৯৫৪ সালে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে বাঙালিদের উল্লেখযোগ্য প্রান্তিকীকরণ ঘটে।

জনগণ থেকে সর্বোচ্চ সমর্থন আদায় এবং ঐক্যের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের প্রাক-নির্বাচনী কৌশল অবলম্বন করে মুসলিম লীগের বিরোধীরা একটি শক্তিশালী জোট গঠন করে, যা সদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ে যে যুক্তফ্রন্ট[৩] মোর্চা গঠিত হয় তার একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং আরেকটি যৌথ ও অবিচল লক্ষ্য ছিল প্রদেশে মুসলিম লীগের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো। স্বায়ত্তশাসনের আপোসহীন প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত আওয়ামী লীগ ছাড়া জোটে অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নিজাম-ই-ইসলামী এবং কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার বামপন্থী গোষ্ঠী। জোটের নেতৃত্বে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী এবং ফজলুল হকের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা এবং তরুণ ও উদ্যমী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল জোটের সাংগঠনিক কাঠামো নির্মাণের কঠিন দায়িত্ব।

পূর্ব বাংলার রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিধারার ছায়াস্বরূপ জোটের ২১ দফা কর্মসূচির মূল উপাদান ছিল ফেডারেল কাঠামোর অধীনে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করার বাঙালি অবস্থান। যদিও এতে কিছু বিপরীতমুখী লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী সমগ্র বিরোধী নেতৃত্বই নিঃশর্তভাবে ২১ দফা কর্মসূচি মেনে নেয়।

শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার আওয়ামী লীগ মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। দ্বিতীয় স্থান দখল করে কৃষক শ্রমিক পার্টি। মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ১০টি আসন।[৪] নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' ব্যবহার করে যুক্তফ্রন্ট যে চমকপ্রদ বিজয় অর্জন করে, তা ছিল অসাধারণ এবং প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বৈপ্লবিক মাত্রার, কারণ এ বিজয় একটি গণসমর্থনপুষ্ট সরকার গঠনের ভিত্তি গড়ে তোলে। তবে, এর মাধ্যমে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অচিরেই সংবিধান এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে করাচীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতায় আরোহণের ছয় সপ্তাহের মধ্যে দেশদ্রোহিতা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ফজলুল হককে সরিয়ে দেয়া হয়।[৫] তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগও আনা হয়। একটি নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে গভর্নরের

৩. ফজলুল হককে সংসদীয় নেতা নির্বাচন করে ১৯৫৩ সালের মে মাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।

৪. ৩০৯ সদস্য বিশিষ্ট সংসদে (পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত) দলীয় সদস্য ছিলেন নিম্নরূপ : আওয়ামী লীগ—১৪০, কৃষক শ্রমিক—৩৪, নিজাম-ই-ইসলামী—১২, গণতন্ত্রী দল—১০, যুবলীগ—১৫, কমিউনিস্ট পার্টি—৪, মুসলিম লীগ—১০। অমুসলিম সদস্যদের মধ্যে ৬৮ জন যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেন।

৫. *Pakistan Observer*, May 31, 1954.

শাসন জারির মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তফ্রন্টে ভাঙন সৃষ্টি করা। ফ্রন্টের ভেতরে গোষ্ঠী ও স্বার্থের সংঘাত চরম আকারে বিরাজমান ছিল, যার সাথে যুক্ত ছিল ক্ষমতা ও অন্যান্য সুবিধালাভের প্রতিশ্রুতি।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পূর্ববর্তী কয়েকটি বছর প্রাদেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে কোন্দল তাদের স্বায়ত্তশাসনের প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করে। এই সময়কালে ছলচাতুরীর রাজনীতি দলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন। হতবাক হওয়ার মতো বিষয় এই যে এর পর একই গভর্নর জেনারেল যখন ঢাকায় আসেন, তখন ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মাল্যভূষিত করার জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো রীতিমতো প্রতিযোগিতা করেছিল।[৬]

এমন তথ্যও আছে যে গভর্নরের শাসন জারির নেপথ্যে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হাত ছিল, যারা ভয় করেছিল যে ফ্রন্টের কিছু বামঘেঁষা সদস্য ১৯ মে তারিখে স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সামরিক মৈত্রীচুক্তির বিরোধী। রাজনীতিকদের ব্যাপারে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের রাজনীতিকদের ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর কোন ধৈর্য ছিল না। এসব রাজনীতিক পাকিস্তানের কিছু ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলছিল। অধিকন্তু, হক মন্ত্রিসভার পতনে পাকিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন কূটনীতিকদেরও হয়তো হাত ছিল। শোনা যায় যে, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের ১৬২ জন সদস্য যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সামরিক চুক্তির প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানকে মস্কোর বিরুদ্ধে মার্কিন স্বার্থের একটি মজবুত ঘাঁটি হিসেবে দেখছিল, তখন পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে বামঘেঁষা দলগুলোর শাসন নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অস্বস্তিকর ছিল।

এমন বিশ্বাসও কারো কারোর মধ্যে ছিল যে ১৯৫৪ সালের ১৭ মে তারিখে প্রদেশের গভর্নর হিসেবে চৌধুরী খলিকুজ্জামানের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে প্রেরণের লক্ষ্য ছিল চুক্তিবিরোধী শক্তিকে নির্মূল করা। মির্জা খুব দ্রুততার সাথে একজন মন্ত্রীসহ যুক্তফ্রন্টের প্রায় এক হাজার নেতা ও সমর্থককে গ্রেফতার করেন, যাদের অনেকেই ছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফজলুল হককে আটক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

দু'টি শিল্প চন্দ্রঘোনা কাগজের কল ও আদমজী পাটকলে দাঙ্গার ফলে যে প্রাণহানি ঘটে এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, তাও এখানে বিবেচনায় আনা যায়। মার্কিন অর্থায়নে স্থাপিত কাগজের কলটির ব্যবস্থাপনা ছিল প্রধানত অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আদমজীর মালিকানা

৬. G. W. Chowdhury *Constitutional Development of Pakistan*, (London 1959), 143.

ও ব্যবস্থাপনা ছিল জনৈক অবাঙালি পুঁজিপতির হাতে। বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা অনেকদিন ধরেই বিদ্যমান ছিল। উভয় কারখানাতেই ব্যবস্থাপনা ছিল বাঙালি শ্রমিকদের দৃষ্টিতে কট্টর বাঙালিবিরোধী, কাজেই বহিরাগতদের শোষণের প্রতীক। উভয় বিরোধই পর পর ঘটে ১৯৫৪ সালের ২৩ ও ২৫ মে তারিখে, প্রথমটি নির্বাচনের সময় আর দ্বিতীয়টি মন্ত্রিসভা গঠনের প্রক্রিয়া চলাকালে। অনেকে সন্দেহ করেছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীই বাঙালি শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা ও ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য এই সংঘাত দু'টি ঘটানোর জন্য ইন্ধন যুগিয়েছিল।[৭] উভয় কারখানাতেই বাঙালি শ্রমিকরা যুক্তফ্রন্টের কট্টর সমর্থক ছিল এবং নির্বাচনে একজোট হয়ে ফ্রন্টের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এলিটগোষ্ঠীর জন্য প্রদেশে তাদের অবাধ নিয়ন্ত্রণের প্রতি একটি সত্যিকারের হুমকি।

ধূর্ত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ফ্রন্টের ঐক্যে, বিশেষত আওয়ামী লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির ঐক্যে ফাটল ধরাতে ফজলুল হককে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী হওয়ার আমন্ত্রণ জানান, যাঁকে কিছুদিন পূর্বেই বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয়া হয়েছিল। আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের সংকেত দেয়া হয়েছিল, যদিও প্রাদেশিক সংসদে কৃষক শ্রমিক পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করলে মন্ত্রিত্ব লাভ করা যাবে এই আশায় ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধারাবাহিকভাবে উচ্চাভিলাষী সদস্যগণ কর্তৃক দলত্যাগের ঘটনা ঘটে, যার ফলে আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের সময় মোহাম্মদ আলী সোহরাওয়ার্দীকে আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণে রাজি করাতে সক্ষম হন। এর ফলে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ আরো দুরবস্থায় পতিত হয়। মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের একজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেন। করাচীর গভর্নর হিসেবে ফজলুল হক ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ঢাকা ফিরে আসেন এবং তাড়াহুড়ো করে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে শপথ গ্রহণ করান। কাজেই আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট, যা প্রদেশে মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটায়, তা অবলুপ্ত হয়ে যায়, যদিও তার একটি খোলস আরো কিছুদিন নামেমাত্র টিকে ছিল।

সংবিধান প্রণয়নের রাজনীতি

পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া ভারতের অনুরূপ না হয়ে ধীরগতিসম্পন্ন, বিবাদ-বিসংবাদে পূর্ণ এবং ক্লান্তিকর হয়ে উঠে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ভেঙে দেন। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য ছিল যেসব বিল রাষ্ট্রপ্রধানের সংসদ ও মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার বিশেষ সুবিধা খর্ব করে সেসব বিল বলবৎ

৭. ঐ।

করতে না দেয়া। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের ফেডারেল আদালত এই মর্মে নির্দেশ জারি করে যে একটি নতুন গণপরিষদ অবশ্যই গঠন করতে হবে। পরিষদটি অবশ্য গঠিত হবে উভয় প্রদেশের সমতা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নেয়ার ভিত্তিতে। গণপরিষদের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের জুন মাসে। সমতার নীতি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান পায় ৪০টি আসন, যাদের অধিকাংশই ছিল যুক্তফ্রন্টের। জুলাই মাসে মারীতে অনুষ্ঠিত নব নির্বাচিত পরিষদের প্রথম সভায় সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুল হকের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের সাথে এই মর্মে একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে : পশ্চিম পাকিস্তান একটি এককে পরিণত হবে; প্রতিটি প্রদেশেই পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বিদ্যমান থাকবে; সকল ক্ষেত্রেই দু'টি প্রদেশের মধ্যে সমতা বিদ্যমান থাকবে। যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে। বাংলা ও উর্দু উভয়ই হবে রাষ্ট্রভাষা।[৮] পরিষদে উভয় প্রদেশের জন্য সমান সংখ্যক আসনের ব্যাপারে ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দীর বিরোধিতা করেন, যেহেতু জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় পূর্ব বাংলার অধিক আসন লাভের অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব যথারীতি পালন করে, যা ১৯৫৫ সালের ২৬ মার্চ পাশ ও কার্যকর হয়। সেই তারিখ থেকে পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। বাস্তবে এটি ছিল দু'টি বিপরীতমুখী শক্তি—স্বায়ত্তশাসনকামী পূর্ববঙ্গ এবং কেন্দ্রমুখী পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি দায়সারা সমঝোতা। সংবিধান বাংলাকে দুটি রাষ্ট্রভাষার একটি হিসেবে স্বীকৃতি দান করে এবং পূর্ববঙ্গকে কিছুটা হলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। এটি পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেয়। যদিও প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাশী সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে এই দলিলে স্বাক্ষর করেন, দলের বামপন্থী সদস্যসহ মোট ২২ জন সদস্য দলিলে স্বাক্ষর করা থেকে কেবল বিরতই থাকেন নি, সংবিধানের ইসলামী নামকরণ এবং স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে ছাড় দেয়ার প্রতিবাদে পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন। পূর্ববঙ্গের ২২ জন সদস্যের[৯] সাহসী ভূমিকা প্রগতিশীলদের সম্মান বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। এর একটি পরিণতি ছিল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি দ্রুত সমর্থন হ্রাস এবং ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মে এর পতন। এ সময় থেকে একটি অসাম্প্রদায়িক সংবিধান প্রণয়ন এবং যুক্ত নির্বাচন ইস্যুই সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের মুখ্য নীতি হয়।

যদিও আওয়ামী লীগের একটি কট্টর অংশ সংবিধানের বিরোধিতা করে, নতুন সংবিধানের অধীনেই আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গ এবং কেন্দ্র উভয় স্থানে ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন আর আওয়ামী লীগের

৮. Talukdar Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: Bangladesh Books International, 1980, 78.

৯. আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে ওয়াক আউট হয় তাতে সমর্থন জোগায় গণতন্ত্রী দল।

আতাউর রহমান খান পূর্ববঙ্গে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ঘটনার এই বিবর্তনে মনে হয়েছিল যে পাকিস্তানের ক্ষমতাকাঠামোতে পূর্ববঙ্গ কিছুটা স্থান করে নিয়েছে।

আওয়ামী লীগে বিভক্তি এবং অতঃপর

কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির কারণে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর নীতিগুলোর বিরুদ্ধে। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানী তাঁর অভিযোগগুলো উত্থাপন করেন এবং বলেন যে পূর্ববঙ্গের অভাব-অভিযোগসমূহ পূরণ করা না হলে ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসতে পারে যখন পাকিস্তানকে বিদায় জানানো হবে। কোনো রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে পাকিস্তানের ধারণার বিরুদ্ধে এরকম উক্তি ছিল এই প্রথম।[১০] ভাসানীর এই হুশিয়ারির পর ৩ এপ্রিল বঙ্গীয় সংসদে সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব পাশ হয়, যাতে পররাষ্ট্র বিষয়াদি ও মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়।[১১] ১৯৫৭ সালের ১৩ জুন অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানীর এই আপোসহীন মনোভাব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যখন সোহরাওয়ার্দী তাঁর পশ্চিমঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষাচুক্তির পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। দুই নেতা ও তাঁদের সমর্থকদের বিরোধের এই পর্যায়ে ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন, যাকে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু দলছুট বামপন্থী রাজনীতিবিদও সমর্থন করেন।

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল এক ইউনিট ইস্যুটি। ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের একক সত্তাকে ভেঙে ফেলার পক্ষে ছিলেন, সেখানে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তিনি আরো চেয়েছিলেন বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার, যেটা পাঞ্জাবের ভূস্বামীদের সুযোগ-সুবিধা অনেকাংশে হ্রাস করতো। সামরিক বাহিনীর সাথেও সোহরাওয়ার্দীর সখ্যতার অভাব ছিল। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি সফলতার সাথে লিয়াকত আলী খানকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত জেনারেলদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী কিছুটা নরম অবস্থান নিলেও বাঙালিদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ পশ্চিমা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সন্দেহ তীব্রতর করে, যারা ইতিমধ্যে প্রশাসনযন্ত্রের উপর তাদের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

১০. *Pakistan Observer*, Feb. 8, 1957.

১১. দেখুন, East Pakistan Assembly Proceedings, Vol. XVI, No. 6, 1957.

সংসদীয় পদ্ধতির রীতিনীতি নগ্নভাবে লঙ্ঘন করে গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সোহরাওয়ার্দীকে আস্থাভোটের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ না দিয়েই ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পদত্যাগ করতে বলেন। ফলে, তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই সোহরাওয়ার্দীকে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ মোতাবেক ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়। তাঁর ১৩ মাসের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়েই স্বায়ত্তশাসন, সমতা এবং সংবিধানের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে উভয় প্রদেশ সমঝোতার মনোভাব দেখায়। সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার জন্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপ্রক্রিয়াও শুরু করেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতাধর মহল নির্বাচন ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে মনে করেছিল হুমকিস্বরূপ। ক্ষমতা থেকে সোহরাওয়ার্দীকে অপসারণ পূর্ববঙ্গের অনেক রাজনীতিকের জন্যই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বাধা স্বরূপ ছিল না। তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে পূর্ববঙ্গে জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে পাকিস্তানের কাঠামোতেও তাঁরা তাদের ন্যায্য স্থান লাভ করতে পারবেন। তখন কেবল আওয়ামী লীগই পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু ডানপন্থী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর সমর্থন আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয় নি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও পশ্চিমের বাম দলগুলোর সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।[১২] কিন্তু এ জাতীয় যাবতীয় প্রয়াসই ১৯৫৮ সালের সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে বিফল হয়ে যায়।

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি

পূর্ববঙ্গের কথা বলতে গেলে, এ প্রদেশ দুটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এ দুটির একটি ছিল এখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ভাঙন ও নেতৃত্বের সংঘাত এবং অন্যটি ছিল প্রদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া খর্ব করার জন্য প্রদেশের ব্যাপারে ঘন ঘন কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এমনকি যখন নির্বাচিত আইনসভা বিদ্যমান ছিল, তখনও প্রায় দুই বছরের জন্য প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি করা হয়েছিল এবং মন্ত্রিসভা কয়েকবার রদবদল করা হয়েছিল।

জন্মের পর থেকেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৩৬ জন সদস্য নিয়ে ৩০৯ সদস্যের সংসদে ছিল একটি ভারসাম্যবিধায়ক শক্তি। এ দলটি স্বায়ত্তশাসন অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলনে সমর্থন আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির নিকট ধরনা দিত। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিল পশ্চিমা শক্তিগুলোর সাথে সকল মৈত্রীচুক্তি বাতিল, কালবিলম্ব না করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল।[১৩] গভর্নরের পদ হারানোর পর সংসদীয় জোট গঠনের আশায় ফজলুল হক ভাসানীর প্রস্তাব সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের কাছেও ভাসানী অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করেন। ক্ষমতার রাজনীতির পটপরিবর্তনে ১৯৫৮ সালের ১৮ জুন আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা পরাজিত হয়

১২. Rounaq Jahan, *Pakistan's Failure in Regional Integration,* (New York 1972), 49.

১৩. *Pakistan Observer,* May 5, 1958.

এবং এরপর যে কৃষক শ্রমিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সেটাও ২৩ জুন আওয়ামী লীগ-ন্যাপ জোটের কাছে পরাজিত হয়। তবে ২৪ জুন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান না জানিয়ে ইস্কান্দার মির্জা সংবিধানের ৯২-ক ধারা মোতাবেক গভর্নরকে প্রাদেশিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক নাটকে আরেকটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটে ৮ সপ্তাহ পর ২৪ আগস্ট তারিখে, যখন আতাউর রহমান খান ক্ষমতায় পুনর্বহাল হন। ন্যাপ বা কৃষক শ্রমিক ছাড়াই তখন মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এই নতুন মন্ত্রিসভা পর পর কয়েকটি জঙ্গি আন্দোলনের সম্মুখীন হয়, যার কয়েকটি আওয়ামী মন্ত্রিসভাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য ভাসানীই পরিচালনা করেছিলেন। এই টালমাটাল অবস্থায় কৃষক শ্রমিকও ন্যাপের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। করাচীর ক্ষমতাসীনেরা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য ভাসানীর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী ছিল না।

এই জটিল পরিস্থিতিতে একটি নতুন উপাদান সংযোজিত হয় যখন করাচী সফরকালে কৃষক শ্রমিকঘেঁষা স্পীকার আবদুল হামিদ ইস্কান্দার মির্জার সাথে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সমঝোতায় উপনীত হন। স্পীকার ফেরত আসার পর ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থাভোট অনুষ্ঠিত হলে তিনি সরে দাঁড়ান এবং আওয়ামী লীগঘেঁষা শাহেদ আলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সবচেয়ে লজ্জাকর ঘটনা ঘটে পরের দিন যখন আইনসভায় সভাপতিত্ব করার সময় স্পীকার কৃষক শ্রমিকের কয়েকজন সদস্য দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে আহত হন। মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। পূর্ববঙ্গের সংসদীয় ইতিহাসে এ দিনটি ছিল সবচেয়ে কলংকিত একটি দিন এবং শাহেদ আলীর করুণ মৃত্যুর কারণে সমগ্র প্রদেশে শোকের ঢেউ বয়ে যায়।

সামরিক আইন, ১৯৫৮

শাহেদ আলী হত্যার ঘটনাটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের ইতি টেনে দেয়। ইস্কান্দার মির্জা, যিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যক্রমে অস্বস্তিবোধ করছিলেন, তিনি অবিলম্বে আওয়ামী লীগ সরকারকে বরখাস্ত করে সংসদ বিলুপ্ত করলেন। দুই সপ্তাহ পর ৭ অক্টোবর তারিখে মির্জা একটি আদেশ জারি করলেন, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো অবলুপ্ত হলো। ২ বছর পুরনো সংবিধান বাতিল হলো এবং দেশ সামরিক শাসনের আওতায় এলো। পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নিঃসন্দেহে সংবিধানবহির্ভূত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মির্জাকে অজুহাত যুগিয়েছিল। কিন্তু এর পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী প্রভাবিত আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে বাধ্যতামূলকভাবে অপসারণ। ভাসানী এতে বেশ কড়া প্রতিক্রিয়া

ব্যক্ত করেছিলেন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৪] কিন্তু তখন একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন সম্ভব হয় নি; দলাদলি তখন পূর্ববঙ্গের গণমুখী রাজনীতির গতিময়তাকে খর্ব করেছে এবং পুনরায় দলবদ্ধ হতে এবং নতুন কৌশল গড়ে তুলতে বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোর আরো সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আইয়ুব আমল

মাত্র কয়েক দিন পর ২৭ অক্টোবর তারিখে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর জেনারেল আইয়ুব খান মির্জাকে লন্ডনে নির্বাসনে পাঠান এবং সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদ এবং সংসদীয় প্রক্রিয়াকে ঘৃণা করতে অভ্যস্ত আইয়ুব সিভিল সার্ভেন্ট, সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তাঁর সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করেন। তবে বেসামরিক আবরণের নীচে সামরিক বাহিনীই তাঁর শাসনের লৌহকাঠামো গঠন করে। অদক্ষতা এবং দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য তিনি কিছু লোকদেখানো পদক্ষেপ নেন। আইয়ুব নিজেকে একজন সংস্কারক হিসেবে তুলে ধরেন এবং তাঁর ক্ষমতাগ্রহণকে চোরাকারবারি, কালোবাজারি ও দুর্নীতির অসহনীয় অবস্থা দূর করতে একটি বিপ্লব বলে অভিহিত করেন।[১৫] তাঁর ক্ষমতাগ্রহণের যুক্তি হিসেবে তিনি জাতির জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অজুহাত দেখান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, আইনগত ও সাংবিধানিক সংস্কার এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য তিনি কিছু নির্বাচিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। অবশ্য এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণের লক্ষ্য ছিল তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করা এবং বিরোধীদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা।

রাজনীতিবিদদের কোনঠাসা করে রাখতে আইয়ুব কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে জারিকৃত 'দি পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার' (পোডো)-এর মাধ্যমে দুর্নীতির কারণে সাজাপ্রাপ্তদের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদে প্রবেশের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে জারিকৃত 'দি ইলেকটিভ বডিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অধ্যাদেশ' (এবডো) অনুযায়ী অসদাচরণের জন্য বিশেষ আদালতে প্রাক্তন রাজনীতিবিদদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো ইলেকটিভ বডির প্রার্থী হবেন না বলে সম্মত হলেই কেবল তিনি বিচার এড়াতে পারতেন। এভাবে প্রায় ৭০০০ ব্যক্তিকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে অপসারণ করা হয়।[১৬] ১৯৬২ সালে রাজনৈতিক বন্দিদের নামে হেবিয়াস কর্পাস রীট মামলা দায়ের করা হয় এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৪. *Morning News*, Sept. 29, 1958.
১৫. Charles Peter O'Donnell, *Bangladesh: Biography of a Muslim Nation*, (Boulder, Colorado, 1984), 55.
১৬. Richard T Nyrop (ed.), *Pakistan: A Country Study*, (U.S. Government Press, 1984), 44.

একই সময়ে দৃশ্যমান সরকারবিরোধী সংগঠিত কার্যকলাপ বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে প্রেস এন্ড পাবলিকেশান্স অধ্যাদেশ সংশোধন করা হয়, যাতে কি কি অবস্থায় সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা বন্ধ অথবা বাজেয়াপ্ত করা যাবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়। বর্ণিত শর্তগুলো ছিল বেশ বিস্তৃত, যাতে সেসব প্রকাশনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যেগুলোতে সরকার বা সামরিক বাহিনীর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন কিছু সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়, তেমনি অন্য যেসব সংবাদপত্র সামরিক আইনের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকে সেগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ইউনিয়নকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং মসজিদগুলোকে রাজনৈতিক আলোচনার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার না করার জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

একদিকে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার এবং অন্যদিকে আইয়ুব বাস্তবেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহী এ ধারণা দেয়ার দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে আইয়ুব স্বায়ত্তশাসনের অনুকূল কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগ বৃদ্ধি, ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন, পূর্ববঙ্গে অধিকতর বিনিয়োগ, নিয়মিতভাবে পরিকল্পনা কমিশনের সভা অনুষ্ঠান এবং কিছু বাঙালিকে দৃশ্যমান জাতীয় পদে অধিষ্ঠিত করা। স্পষ্টতই এসকল লোকদেখানো পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল বিরোধীদের মনে আস্থার মনোভাব সৃষ্টি করা যাতে শাসকগোষ্ঠীকে প্রদেশগুলোর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনে হয়। বাস্তবে সরকারের কাঠামো ছিল অত্যধিক কেন্দ্রীভূত, এবং অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও রাজনীতিসচেতন বাঙালিরা বিভিন্ন কারণে নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করতে লাগলো। আইয়ুবের উন্নয়নের দশকে দুটি প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় বেড়ে গেল এবং পূর্ববঙ্গ তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর সবচেয়ে বড় আঘাতের সম্মুখীন হলো।

মৌলিক গণতন্ত্র

সামরিক আইন জারির পর থেকে আইয়ুবকে অধ্যাদেশ, আদেশ এবং সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করতে হয়, যেটা শাসকগোষ্ঠীর দখলদারি চরিত্রের প্রতিই ইঙ্গিত করে। সুতরাং সরকারকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আইয়ুব শঠতাপূর্ণভাবে স্থানীয় স্বশাসন এবং পল্লী উন্নয়নের একটি কদর্য কাঠামো সৃষ্টি করেন। ১৯৫৯ সালের 'দি বেসিক ডেমোক্রেসিস অর্ডার' মোতাবেক পাঁচ স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো নির্মাণ করা হয়। এর নিম্নতম স্তর ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল ১০ জন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত, যারা উচ্চতর ধাপের প্রতিষ্ঠান থানা, জেলা এবং বিভাগীয় কাউন্সিল গঠনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬০ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই আইয়ুবকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে বলা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান মোতাবেক প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোকে আবারও নির্বাচকমণ্ডলীতে রূপান্তরিত করা হয়।

এক সময়ে নির্দেশিত বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বলে অভিহিত মৌলিক গণতন্ত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সরকারকে বৈধতা দান, যা ছিল বেসামরিকীকরণের একটি পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বিকল্প। শাসকগোষ্ঠী আশা করেছিল যে এ ব্যবস্থায় বিশেষত পল্লী অঞ্চলের জনগণকে সংগঠিত করা যাবে এবং স্থানীয় ব্যাপারে, বিশেষত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের মধ্যে অংশগ্রহণের অনুভূতি সৃষ্টি করা যাবে। শাসকগোষ্ঠী আরো আশা করেছিল যে এ ব্যবস্থায় রাজনীতির স্থানীয়করণ ঘটবে এবং জাতীয় রাজনীতির ব্যাপারে জনগণের উৎসাহ হ্রাস পাওয়ার ফলে রাজনৈতিক ভাঙন দেখা দেবে ও জাতীয় নেতৃত্বের অবসান ঘটবে। অধিকন্তু, দলীয় রাজনীতি ও তার শহুরে ভিত্তিকে অচল করে দেয়াও এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল।

ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষি ও জনপদ উন্নয়ন, পল্লীপুলিশের মাধ্যমে আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষা, সালিশী আদালতে ছোট-খাটো মামলার নিস্পত্তি করার জন্য কিছু মাত্রায় বিচারক্ষমতা এবং স্থানীয় প্রকল্পের জন্য স্থানীয় কর আরোপের ক্ষমতা। তবে, কাউন্সিলের কর্তৃত্বকে ভয়ানকভাবে স্থায়ী সিভিল সার্ভেন্টদের প্রভাববলয়ের অধীন করা হয়, যারা প্রায়শ কাউন্সিল-কর্তৃপক্ষকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিত না এবং তাদের বশ্যতা দাবি করতো।

১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ উভয়টি সৃষ্টির পর এগুলো সংবিধানেরই সমালোচনার মূল মঞ্চ হয়ে উঠলো, যে সংবিধানবলে এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু পরিষদগুলোর বাইরে আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে থাকলো। ১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহের দু'টাকার ডানপন্থী উকিল মোনেম খানকে পেশাজীবী গভর্নর গোলাম ফারুকের স্থলাভিষিক্ত করার ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। মোনেম খানের সুদীর্ঘকালের স্বৈরাচারী শাসনকালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাস দাবির প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। জনপ্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধেও তাঁর ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবোধ আরো বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিবিদদের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার জন্য পশ্চিমা দাতা দেশগুলোর চাপের কারণে আইয়ুবের পরবর্তী পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করা, যা তাঁর প্রতিপক্ষদের এবং দাতাদেশগুলোকে তুষ্ট করবে।

১৯৬২ সালের সংবিধান

লাগামহীন ক্ষমতার মঞ্চে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব একটি সংবিধান জারি করেন, যা একই বছর ৮ জুন কার্যকর করা হয়। এ সংবিধান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যদিও আইয়ুব সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন, চূড়ান্ত দলিলে কমিশনের সুপারিশসমূহ স্থান পায় নি। প্রকৃতপক্ষে

এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর নিজের অবদান বলে আইয়ুব দাবি করেছিলেন। এই সংবিধান সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির কোনোটিই ছিল না এবং এতে কোনো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বিধানও স্থান পায় নি।

স্বৈরতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানযুক্ত এ সংবিধান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত পশ্চাদ্মুখী প্রমাণিত হয়। নিয়ন্ত্রণহীন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আইয়ুব তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা সংরক্ষণে সদা তৎপর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এর ফলেই তাঁকে অসম্মানজনকভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়।

এই সংবিধান কার্যকরভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোটাধিকার হরণ করে। এর দ্বারা ১০ কোটি জনসংখ্যার দেশের জন্য সৃষ্টি করা হয় একটি ১৫৬ সদস্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির জাতীয় পরিষদ, যা উভয় প্রদেশের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত ছিল। এই ঃ চ্যাতর আহনসভাঢ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতো না, উপরে বর্ণিত ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর নির্বাচনী সভা কর্তৃক তা নির্বাচিত হতো। যেহেতু মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুবেরই সৃষ্টি ছিল, তাই এ নব্য শ্রেণীটি স্বভাবতই তাঁর প্রতি অনুগত ছিল।

১৯৬২ সালের সংবিধান প্রধান নির্বাহীকে প্রচুর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রদান করে। সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দ্বৈত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি আইনসভা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা, রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠানের জন্য আবেদনের অধিকার, বাজেটের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকার বাতিলসহ বিশেষ জরুরি ক্ষমতার অধিকারী হন। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিশংসনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ছিল কঠোর আইনি বিধান। এর মধ্যে ছিল যে "অভিশংসন প্রস্তাবের পক্ষে যদি জাতীয় পরিষদের অর্ধেকেরও কম সদস্য ভোট দেয়, তবে যারা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে তারা অবিলম্বে সদস্যপদ হারাবে।" রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনস্বার্থ এবং নৈতিকতা সংরক্ষণের অজুহাতে সংবিধান মৌলিক অধিকার খর্ব সংবিধানের একটি প্রশংসনীয় দিক ছিল, রাষ্ট্র "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান"-এর পরিবর্তে "রিপাবলিক অব পাকিস্তান" নাম নিয়ে একটি প্রজাতন্ত্র হবে। এর মুখবন্ধে ইসলাম সম্বন্ধে উল্লেখ এত অস্পষ্ট ছিল যে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ১৯৬২ সালের সংবিধানকে "ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সামান্য দূরবর্তী" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সংবিধান পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে একক ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। যেমন আশা করা গিয়েছিল ১৯৬২ সালের সংবিধান বাঙালিদেরকে তেমন কোন ছাড় দেয় নি এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। ফলে পূর্ববঙ্গে তা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আইয়ুব ১৯৬১ সালে কয়েকটি আইন এবং অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করেন। এজন্যে ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ সংবিধানবিরোধী সমালোচনায় নেতৃত্ব দেয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ কারারুদ্ধ থাকার কারণে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ এবং পূর্ব

পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন হরতাল এবং বিক্ষোভের আয়োজন করে। সংবিধানের কপি প্রায় প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে পোড়ানো হয়। যখন সংবিধানের একজন প্রণেতা মনজুর কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরে আসেন, তখন জঙ্গি ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হওয়ার উপক্রম হলে তিনি পালিয়ে যান।

নতুন সংবিধানের অধীনে পাকিস্তানে ১৯৬২ সালের এপ্রিলের শেষে জাতীয় পরিষদ এবং ১৯৬২ সালের ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়েও ১৯৫৮ সালে জারিকৃত সামরিক আইন বহাল ছিল, তবে ১৯৬২ সালের ৮ জুন তা প্রত্যাহার করা হয়। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল এবং এবডোবলে অযোগ্য ঘোষিত রাজনীতিবিদদের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। যদিও নির্বাচনকালে কিছু ব্যক্তি ও স্থানীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠী এবং দলের উদ্ভব ঘটে, সমালোচনা এবং জনমত গঠনের মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক সংবিধানের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন সাধারণভাবে বর্জন করা হয় নি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রথম সারির প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে কেবল দ্বিতীয় সারির রাজনীতিবিদরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এর পরিণতি পরবর্তী পর্যায়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে, কারণ শাসকগোষ্ঠী আইনসভাকে প্রতিনিধিত্বশীল বলে দাবি করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁদের শিক্ষার মান ছিল উচ্চতর। তাঁরা ধীরে ধীরে বিরোধী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হন। প্রথম দিকে জাতীয় বিষয়াবলীর ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ দেখানোর পর পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী সদস্যরা আঞ্চলিক সমস্যাবলী এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁদের কাছে তখন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার পেতে থাকে। ১৯৫০-এর দশকে বাঙালিদের বঞ্চনা ও শোষণের অভিযোগ থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকে দেখা দেয় একটি "তিক্ত পূর্ব-পশ্চিম বিরোধ"। জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ এই উভয় পরিষদের নির্বাচনেই প্রধানত রক্ষণশীল এবং মুসলিম লীগপন্থী গোষ্ঠীগুলো প্রাধান্য বিস্তার করে। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ১৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮ জন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। যদিও ১৯৬২ সালের ১৪ জুলাই পাশকৃত "দি পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যাক্ট" এবং ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি এর সংশোধনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তথাপি এ আইনগুলোতে কিছু অযোগ্যতার ধারা থাকার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৯৬৪ সালের শুরুর দিকেও তাদের পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করতে পারে নি। আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানে শেখ মুজিব ছিলেন মুখ্য শক্তি।

শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরাও সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেন। ছাত্রবিক্ষোভ

এবং হরতাল হয়ে পড়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আইয়ুব ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে ১৯৬২ সালে এমনকি গভর্নর আজম খানকেও বরখাস্ত করেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুবের পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময় ছাত্র এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রবল সংঘাত দেখা দেয়।[১৭] ছাত্ররা একই সাথে ১৯৬২ সালের জাতীয় শিক্ষা রিপোর্টের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায়, যা স্নাতক কোর্সের সময় এক বছর বৃদ্ধি করে। এখানে লক্ষণীয় যে ছাত্র-অস্থিরতা আংশিকভাবে কলেজ-স্নাতকদের ব্যাপক বেকারত্বের সাথে সম্পর্কিত হলেও মৌলিক গণতন্ত্র এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার নতুন কারণ তৈরি করে।

ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখার পর ১৯৬২ সালের ১৯ আগস্ট সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তিদান করা হয়। তাঁর মুক্তির পর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা দেন। তিনি একে দল না বলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন বলে অভিহিত করেন।[১৮] সোহরাওয়ার্দীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আইয়ূব ১৯৬৩ সালের ৬ জানুয়ারি দুটি অধ্যাদেশ জারি করেন, যাতে দু'বছরের জেল ও জরিমানা বা উভয়ের বিধান রেখে এবডোবলে অযোগ্য ঘোষিত সকল রাজনীতিবিদকে যেকোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে বারণ করা হয়। এ কড়াকড়ি আরোপের প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দী স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যান। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি বৈরুতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে আসে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে, যিনি স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের জন্য ইতিমধ্যেই সুপরিচিত হয়েছিলেন। এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানায় ঘন ঘন স্থানান্তরিত এই নেতা বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ান।[১৯] একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বা তাত্ত্বিক না হয়েও মুজিব ছিলেন একজন শক্তিশালী বক্তা, যিনি জনগণের আবেগকে আন্দোলিত করতে পারতেন। তাঁর সাংগঠনিক গুণাবলী ছিল অসাধারণ।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বর্ধিত গণ অসন্তোষ এবং অব্যাহত ছাত্রবিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে আইয়ুব ১৯৬৪ সালের মার্চে নির্বাচনী সংস্কার বিল প্রবর্তন করেন, যাতে নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের পরোক্ষভাবে নির্বাচনের বিধান যুক্ত করা হয়। জেনারেল আইয়ুব সর্বদাই

১৭. *Pakistan Observer*, Dec. 17, 22, 23, 1962.। রাজশাহী কলেজের একজন শিক্ষক হিসেবে লেখক ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জেরার সম্মুখীন হওয়ার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে এমনকি থানায়ও যেতে হয়েছিল।

১৮. Mohammad H. R. Talukdar, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, (Dhaka 1987), 69

১৯. *Pakistan Observer*, Jan, 29, 1969.

রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদেরকে অবজ্ঞা করতেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালের মে মাসে তাঁর নিজের নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম লীগকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করেন এবং এর এক অংশের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের এই অংশটি কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে পরিচিত হয়।

আরেকটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা দেখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও নিজাম-ই-ইসলামীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের দাবিতে একটি এডহক সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে সম্মিলিত বিরোধী দল নামে একটি নতুন জোট উক্ত এডহক কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয়, যাতে জামায়াতে ইসলামীও যোগ দেয়। এই জোটের নয় দফা কর্মসূচিতে বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং "কোমল ভাষায় ব্যক্ত"[২০] প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিরোধী দলগুলো যখন একটি অভিন্ন মঞ্চ গড়ে তুলতে তৎপর ছিল, তখন ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার চারপাশের পাটকলগুলোতে বাঙালি এবং উর্দুভাষী শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধেছিল। এর আগে জানুয়ারিতে ঢাকায় অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়, যার ফলে প্রাণহানি ঘটে, কলকাতায় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং পরবর্তী মাসগুলোতে উভয়দিকেই বড়মাপের অভিবাসন ঘটে। এসব ঘটনা এবং ১৯৬৩ সালের শুরুতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সংঘাত শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যেই ঘটানো হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুবের আত্মবিশ্বাস প্রথমবারের মতো ঝাঁকুনি খায়। নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ পেয়েছিলেন মোট ভোটের ৩৭ শতাংশ। বিরোধী দলগুলো সুসংগঠিত না হলেও ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছিল আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রথম চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনে আইয়ুব ৬৩.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি সম্পদের ব্যবহার এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর জেলা প্রশাসনের প্রভাব সত্ত্বেও নির্বাচনে বিরোধীদের আবেদন প্রতিফলিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের ২৬ শতাংশ বিরোধী ভোটের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে ৪৭ শতাংশ বিরোধী ভোট এখানে ধূমায়িত অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। নির্বাচন প্রথম বারের মতো বিরোধীদেরকে শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা এবং তাদের কর্মসূচী প্রচারের সুযোগ করে দেয়।

পরবর্তীকালে আইয়ুব সরকারে যখন ভাঙন দেখা দেয়, তখনই নির্বাচনের প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যায়। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইয়ুব কায়েম করেন এবং যে সীমিত

---

২০. ঐ, ৪০.

নির্বাচন তিনি অনুষ্ঠান করেন, তা বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকদেরকে তুষ্ট করতে পারে নি, যেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রাজনীতিকরা ছিল দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি একটি আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং জাতীয় পদ্ধতির পরিবর্তন তার লক্ষ্য ছিল না। একটি ক্রান্তিকাল এসে গেল এবং বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ পেল। আইয়ুবদশকের অবসানের শুরুটা দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ কেবল এ প্রক্রিয়াটিকেই ত্বরান্বিত করলো।

পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫

জন্মের পর থেকেই পাকিস্তান ভারতের সাথে একটি প্রলম্বিত সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, যা ১৯৬৫ সালে অঘোষিত হলেও একটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে রূপ নেয়। পাক-ভারত বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কাশ্মীরে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ। কাশ্মীরে পাকিস্তানের জড়িত হওয়ার পেছনে ছিল ভারতের কবল থেকে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানদের উদ্ধার করার আবেগজাত তাড়না এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি। দু'দেশের মধ্যে শত্রুতা চলতেই থাকে। পাকিস্তান কাশ্মীরের একটি বড় অংশ দখল করে তার নামকরণ করে আজাদ কাশ্মীর এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে তা পরোক্ষ স্বীকৃতি পায়।

১৯৬৫ সালের শুরুতে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতিরেখা বরাবর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে রান অফ কাচ-এর নিকট পরপর কিছু সংঘর্ষ ঘটে। রান অফ কাচ-এর অবিভাজিত এলাকায় ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে একটি বড় ধরনের সংঘর্ষের পর বৃটিশদের উদ্যোগে জুনের শেষে আরেকটি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয় এবং বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সালিশের উপর অর্পণ করা হয়। যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও জাতিসজ্ঘ পর্যবেক্ষকেরা পাকিস্তানের দিক থেকে অনুপ্রবেশের তৎপরতা চলেছে বলে রিপোর্ট প্রদান করে। বেশ কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষের পর ভারত সাঁড়াশি আক্রমণের মাধ্যমে দ্রুত লাহোর এবং শিয়ালকোটের প্রান্তসীমা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। অবশ্য উভয় দেশেরই ছিল সীমিত লক্ষ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো সীমিত সম্পদ। ১৯৬৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসজ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতায় আরেকটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাতে শত্রুতার অবসান ও পারস্পরিক সেনা প্রত্যাহারের বিধান রাখা হয়। বিজয় এবং নতুন এলাকা করায়ত্ত করার দাবি সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ ছিল আইয়ুব খান ও তাঁর সরকারের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর। যদিও পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতার দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের মৈত্রীসম্পর্ক ছিল, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে তার নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য একতরফাভাবে

পাকিস্তানে তার সামরিক সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে বিশ্বাসভঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছিল বিশেষত এ কারণে যে দেশটি ছিল পাকিস্তানের অন্যতম সমরাস্ত্র সরবরাহকারী। যে আইয়ুব-শাস্ত্রী চুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়েছিল, তাকে অনেকের কাছে পাকিস্তানের জন্য অবমাননাকর মনে হয়েছিল। পাকিস্তানের তেজস্বী ও উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো যদিও তাসখন্দ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, তিনি এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন এবং একজন সোচ্চার বিরোধী দলীয় নেতায় পরিণত হন। ভারতীয় প্রভুত্ব থেকে কাশ্মীরের মুসলমানদের মুক্ত করার ন্যায়সঙ্গত অবস্থান পরিত্যাগ করার জন্য তিনি জনসমক্ষে আইয়ুবের সমালোচনা করেন। এ যুদ্ধ থেকে পাকিস্তান কিছুই অর্জন করতে পারে নি। তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হয়েছিল তা হলো, অজেয় হিসেবে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এছাড়া এ সময়ে বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানের শহরাঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটা শুরু হয়।

ছয় দফা

পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষত সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে আইয়ুববিরোধী অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাসখন্দকে মনে হয়েছিল একটি "করুণ ও অযৌক্তিক আত্মসমর্পণ"[২১] যদিও আইয়ুব তাসখন্দ থেকে উদ্ভূত ক্ষোভের ঝড় সামলাতে পেরেছিলেন, এমনকি তাঁর সমর্থনের মূল এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানেও ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দু থেকে তাঁর পতন শুরু হয়। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভিন্নমত ও বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ শুরু হলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারে প্রত্যাবর্তনের দাবিও পরোক্ষভাবে বেগবান হয়।

আইয়ুব সরকারের বিপর্যয়ের এ মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রকর্মীদের সহায়তায় আইয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ও সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দেয়ার একটি সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে আহূত সর্বদলীয় সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের জন্য মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল তাসখন্দ চুক্তি ও তার পরিণতি। যে ৭০০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেয় তাঁদের মধ্যে মাত্র ২১ জন এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে।[২২] শেখ মুজিব, যিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তাসখন্দ চুক্তির ব্যাপারে অতি কম আগ্রহ দেখান, বরং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ছয় দফা দাবি উপস্থাপনের জন্য তিনি সম্মেলনকে ব্যবহার করেন। মুজিবের প্রস্তাব লাহোরে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান তুলে ধরার জন্য এটা নিঃসন্দেহে ছিল একটা সুযোগ। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা শেখ মুজিবের সাথে দরকষাকষি করতে চান নি, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ের জন্য এমন একটি দাবিনামা পেশ করতে মুজিবের সাহস,

২১. Herbert Feldman, *From Crisis to Crisis: Pakistan 1962-1969*, (Karachi: Oxford 1972), 158.
২২. Richard T. Nyrop (ed.), *Pakistan: A Country Study*, (Washington 1984), 52.

সততা এবং ধৈর্য দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বোধোদয়ও ঘটেছিল যে, পূর্বাঞ্চলে সবকিছু ঠিক নেই। ছয় দফা কর্মসূচির প্রধান দিকগুলো ছিল : একটি ফেডারেল সংসদীয় সরকার গঠিত হবে, যা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যা অনুযায়ী সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে, ফেডারেল সরকার দায়ী থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের জন্য; প্রতিটি প্রদেশের জন্য বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা থাকবে; ফেডারেল সরকারকে অর্থায়নের নিশ্চয়তাসহ প্রদেশগুলোকে কর ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হবে; প্রতিটি প্রদেশের থাকবে পৃথক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব; প্রতিটি প্রদেশ একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করবে।

শাসকগোষ্ঠীর ভয় ছিল যে যদি ছয় দফা বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে তা পাকিস্তানের ভাঙনের সূচনা করবে। মনে হয় ছয় দফা দাবি এমন একটি উপযুক্ত মুহূর্তে প্রণয়ন করা হয়েছিল, "যখন বাঙালিরা তাদের পুনরুজ্জীবিত জাতীয় গৌরব প্রকাশের জন্য এবং একটি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় পর্যাপ্ত স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি বাস্তব কাঠামো খুঁজছিল।[২৩] ছয় দফা ফর্মুলা কেবল বাঙালিদের অভিযোগেরই ফিরিস্তি ছিল না, এটি ছিল তাদের নিজেদের বিষয়াবলী নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার সংকল্পেরই বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু বা শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দাবির পেছনে অবস্থান নেয়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় নি। ভারত থেকে কোনো সামরিক হুমকির অবর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিকাশকে গণতান্ত্রিক বেসামরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক বলে মনে করতো না।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। "কেন্দ্রের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ যুদ্ধকে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।" এ যুদ্ধ প্রদেশের অধিবাসীদেরকে ভৌগোলিক হুমকির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। পূর্ববঙ্গের দূরবর্তিতা এবং যোগাযোগ ও সরবরাহব্যবস্থায় চরম অচলাবস্থা প্রদেশে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। যুদ্ধশেষে একটি সম্ভাব্য অভিন্ন হুমকির মুখে দুই অঞ্চলের স্বল্পকালীন আবেগতাড়িত সংযোগ তিরোহিত হওয়ার পর বাঙালিদের বোধোদয় হয় যে তাদেরকে এমন একটি জনগোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে ভারতীয় আগ্রাসনের পথে জোর করে টেনে আনা হয়েছিল, যাদের সাথে তাদের কোনো দৈহিক বা মানসিক বন্ধন ছিল না। যদিও পূর্ববঙ্গের জন্য ভারত কোনো হুমকি ছিল না, তথাপি প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত ঢাকার একটি স্বল্প সমরাস্ত্র সজ্জিত সেনা ডিভিশিন প্রদেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করতে বড় একটা সক্ষম ছিল না। এই বাস্তব অবস্থাটি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে একটি বাস্তবভিত্তিক যৌক্তিকতা যুগিয়েছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালি সৈন্যদের দক্ষতা ও সাহসিকতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে গর্বের সঞ্চার করেছিল। বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের ক্ষমতাবলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের অধিকার দাবি করে আসছিল। অধিকন্তু,

২৩. Jahan, *Pakistan's Failure*, 167.

যুদ্ধসম্পর্কিত অর্থনৈতিক মন্দা প্রদেশটির অবস্থার আরো অবনতি ঘটায়, বিশেষত যখন মার্কিন সহায়তার অবর্তমানে পাকিস্তান অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় হ্রাস করে। যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ এবং পশ্চিম বঙ্গ থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান ও প্রকাশনা আমদানি নিষিদ্ধকরণকে বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সামনে নিয়ে আসে।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে লাহোর থেকে ফেরার পর শেখ মুজিব ছয় দফার উপর দেশব্যাপী রেফারেন্ডাম দাবি করেন। তিনি "যাঁরা ক্ষমতাসীন এবং যাঁরা পূর্বে ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদেরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে" প্রচারণার মাত্রা বৃদ্ধি করেন। এ আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়; এমনকি "হেঁয়ালিতুল্য" ভাসানীও স্বায়ত্তশাসনের দাবিদারদের দলে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু "ক্ষমতাসীনদের গণ্ডগোল" এড়িয়ে চলেন। ফরিদ আহমদ এবং নূরুল আমীনের মতো ব্যক্তিদের জন্য ফর্মুলাটি ছিল অতি বৈপ্লবিক; কাজেই তাঁরা একে সমর্থন করেন নি।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা বিরোধী দলগুলোর জন্য হয়ে পড়লো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মন্ত্র এবং মুজিবের বাগ্মিতা এবং জনমত গঠনে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটলো। ছাত্র-বুদ্ধিজীবীগণ ছাড়াও শহরের বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে যোগদান করে, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে আন্দোলন জঙ্গি রূপ নেয়। থানা, ব্যাংক, সরকারি দপ্তর ও সরকারপন্থী সংবাদপত্রগুলো জনরোষের শিকার হয়। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে মুজিবের অবিশ্বাস্য সাফল্যে পাকিস্তান সরকার ভীত হয়ে পড়ে। ১৯৬৬ সালের মে মাসে অন্যান্য বিশিষ্ট জননেতাদের সাথে মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল তা তখনো বলবৎ ছিল। নাগরিক অধিকার খর্ব করার জন্য সরকার একে বারংবার ব্যবহার করে। রাজনৈতিক বন্দিদেরকে কোন বিচার বা অভিযোগ ছাড়াই কারাভ্যন্তরে রাখা হয়। মার্চ মাসে যখন আইয়ুব এ প্রদেশ সফর করেন, তখন তিনি সংলাপের কোন উদ্যোগ না নিয়েই ধারাবাহিক বক্তৃতা ও বিবৃতিতে মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সার্বভৌম বাংলা স্কীমের উস্কানিদাতা বলে আক্রমণ করেন এবং এর পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুমকি দেন। এমনকি আইয়ুব এমন হুমকিও দেন যে তিনি স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের বিরুদ্ধে "অস্ত্রের ভাষা" ব্যবহার করবেন এবং "চরম সন্ত্রাসী পন্থা" অবলম্বন করবেন। প্রাদেশিক গভর্নর মোনেম খানও ছয় দফাকে কঠোরতম ভাষায় সমালোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো মুজিবকে একটি উন্মুক্ত বিতর্কে তাঁর মোকাবেলা করার আহ্বান জানান বাস্তবে যেটা নিয়ে তিনি অগ্রসর হন নি।

একই সাথে পাকিস্তান সরকার আরেকটি প্রচারণায় নামে, যাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হিন্দুত্ব থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে খাটো করার চেষ্টা করা হয়। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ছয় দফা পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের

মাঝে কোনো আতংকের সৃষ্টি করে নি এবং সেখানকার সংবাদমাধ্যমগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলের ঘটনাবলীকে অগ্রাহ্য করেছে। শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছয় দফা আন্দোলনের সমর্থনে আওয়ামী লীগ প্রদেশব্যাপী একটি ধর্মঘটের আয়োজন করে। এমনকি *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *দি লন্ডন অবজারভার* এবং *দি লন্ডন টাইমস*-এর বিদেশী সাংবাদদাতারাও তাদের এপ্রিল ও মে, ১৯৬৬-এর প্রতিবেদনসমূহে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের শক্তিমত্তার কথা তুলে ধরেন। তাদের বিশ্লেষণে তারা এ কথার উপর জোর দেন যে এই আন্দোলন ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি অথবা এ যুদ্ধ থেকে সর্বাধিক প্রণোদনা লাভ করেছে, যখন পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত হয়ে যায় এবং ভারতের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আন্দোলনের প্রচার-প্রচারণা রোধ করার উদ্দেশ্যে গভর্নর *ইত্তেফাক*, *আজাদ* এবং *ঢাকা টাইমস*-এর মতো জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলোর উপর কড়াকড়ি আরোপ করেন। বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে এমন যেকোন সংবাদ প্রকাশ করা তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অতিরিক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল অনেক সংবাদপত্রের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানও বন্ধ করে দেয়া হয়।

অনেক দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও আন্দোলনের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে না পেরে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী শেষ অস্ত্র হিসেবে ১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবকে গ্রেফতার করে। এরপর তাঁকে একবার মুক্তিদান করে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এভাবেই এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানায় তাঁর দু'বছরের দুঃসাহসিক যাত্রা শুরু হয়, যা ১৯৬৮ সালে শেষ হয়, যখন তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যান। মুজিবের সাথে তাঁর দলের শীর্ষ নেতারাও গ্রেফতার হন। নানা দমন-নিপীড়ন সত্ত্বেও প্রচণ্ড গতিতে আন্দোলন চলতে থাকে, অবশেষে ১৯৬৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা কর্মসূচির প্রথম বার্ষিকীতে এ আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে।

আট দফা কর্মসূচি

১৯৬৪-৬৫ সালে আইয়ুবের বিরুদ্ধে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ 'সম্মিলিত বিরোধী দল'-এর পথ ধরে আরেকটি বিরোধী দলীয় জোট গঠন করা হয় ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন নামক নতুন এ জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল আওয়ামী লীগ, নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি, জামাত-ই-ইসলামী , পাকিস্তান পরিষদ মুসলিম লীগ এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। এ আন্দোলন ১৯৬৭ সালের মে মাসে একটি আট দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং

বয়স্কদের ভোটাধিকার। কিন্তু মূলত পাকিস্তানের সমর্থকদের কথা বিবেচনায় রেখে ছয় দফা কর্মসূচির কিছু দাবি বেশ কিছু পরিমাণে নমনীয় করা হয়। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ঢাকায় আন্দোলনের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আদি ছয় দফা থেকে বেশ কিছু ছাড় দেয়ার ফলে আট দফা কর্মসূচি প্রদেশে তেমন কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। এতে আওয়ামী লীগে ভাঙন দেখা দেয়। যারা ছয় দফার প্রশ্নে আপোস করতে আগ্রহী ছিলেন, দৃঢ়চেতা শেখ মুজিব ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী তাজুদ্দীন আহমদ তাঁদের থেকে দূরে সরে দাঁড়ান।

মুজিব কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায়ই পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন উভয় প্রদেশ থেকে সমর্থন নিয়ে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন চরম বাম ও চরম ডানপন্থীসহ বিভিন্ন মতের দৃঢ়চেতা নেতৃবর্গ, যাঁদের অভিন্ন লক্ষ্য ছিল আইয়ুবকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ।[২৪] কমিটি সফলভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। ফলে আইয়ুবের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ প্রকাশ পায় এবং তিনি জনগণের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আইয়ুব ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খানকে ইসলামাবাদে আমন্ত্রণ জানান। কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে এ রকম কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পাঁচ দফা পূর্বশর্ত আরোপ করে। এ পূর্বশর্তগুলোর মধ্যে ছিল সকল রাজবন্দির মুক্তি, সভা ও মিছিল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক তৎপরতার উপর কড়াকড়ি প্রত্যাহার, ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ইত্যাদি পুলিশী নির্যাতনের অবসান, যেসকল বিধি, অধ্যাদেশ ও আদেশ স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার এবং ব্যক্তিবিশেষদের কর্মকাণ্ডে বিধি-নিষেধ আরোপের সুযোগ করে দিয়েছিল সেগুলো প্রত্যাহার।

১১ দফা আন্দোলন

যে সময়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের অধিকাংশ কারাগারে আটক ছিলেন এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনে ভাটার লক্ষণ দেখা যায়, তখন ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং তারা চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সকল মত ও আদর্শের অনুসারী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। এ কমিটি ছয় দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি এগার দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দফাগুলোর মধ্যে ছিল শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য পর্যাপ্ত মজুরি, কৃষকদের জন্য প্রযোজ্য ভূমিকর হ্রাস, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি।[২৫] এই ছাত্রআন্দোলন রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কেবল

২৪. কমিটির বিস্তারিত কর্মসুচি দেখুন, *Pakistan Times*, Jan. 9 1969.

২৫. Pakistan Observer, Jan 6, 1969.

বাহ্যিক সমর্থন পেলেও শিল্পশ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তসহ সমাজের সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিল। এমনকি চরম নির্যাতন ও হয়রানির মুখেও ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। ছাত্রদের চাপে মৌলিক গণতন্ত্রীদের অধিকাংশ পদত্যাগ করেন, সরকারি কার্যক্রমে অচলাবস্থা দেখা দেয় এবং রেল ও অন্যান্য পরিবহনের চাকা থেমে যায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

জনগণের সমর্থনপুষ্ট দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের মুখে শেখ মুজিবকে কারাগারে রেখে বিরোধীদের সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না বুঝতে পেরে আইয়ুব ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুজিবসহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদেরকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে দায়েরকৃত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও প্রত্যাহার করা হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় ৬ জন বাঙালি বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কারাবন্দি শেখ মুজিবকে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রকাশ্য আদালতে সরকারপক্ষ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ভারতের সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রে জড়িত থেকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনলেও সরকার সে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। জনসমক্ষে বিচার অনুষ্ঠিত হলে মুজিবের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে এবং তাঁকে অন্তত দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রদান করা হবে বলে আইয়ুব আশা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হলো না। এর পরিবর্তে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিমান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আইয়ুবই বানোয়াট অভিযোগের মাধ্যমে মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। সকলেই বিশ্বাস করেছিল যে মুজিব ষড়যন্ত্র করেছেন বলে কোনো প্রমাণ থাকলে সরকার পক্ষ তার ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে অবশ্যই তা উপস্থাপন করবে। আগরতলা ছিল আইয়ুবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়তির প্রতিশোধ। সম্ভবত আগরতলার উপর অনুসন্ধানমূলক তদন্তই কেবল শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবে।

গোলটেবিল সম্মেলন

আইয়ুবের আমন্ত্রণ পেয়ে শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদান করেন। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির সদস্যরাও এ সম্মেলনে যোগদান করেন। যদিও আইয়ুব সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে যেতে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত ছিলেন, মুজিবের পক্ষে তখন আর পশ্চাদপসরণ করার উপায় ছিল না এবং ছয় দফা কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া ছাড়া কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব ছিল না। সম্মেলনে বিরোধী দলকে ভয় দেখিয়ে রাজি করানোর এবং বোকা বানানোর প্রয়াসে আইয়ুব ব্যর্থ হন।

সম্মেলনে দৃশ্যত অনুপস্থিত ভূট্টো এবং ভাসানী মুজিবকে পাশ কাটিয়ে একটি পুরোদস্তুর চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন, যাতে বলা হয় যে তাঁরা একত্রে পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, বিদেশী হস্তক্ষেপ বর্জন এবং সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য কাজ করবেন। কিন্তু এ কৌশল বিপরীত ফল উৎপাদী বলে প্রমাণিত হয় এবং এতে কেবল স্বায়ত্তশাসনের দাবিই জোরদার হয়। যখন গোলটেবিল সম্মেলন চলছিল ঠিক তখনই আদমজী পাটকল এবং পাকিস্তান টোব্যাকো কোম্পানির মতো পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক শ্রমিকধর্মঘট সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়ায় বিহারী ও বাঙালির পুরনো শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন গণবিক্ষোভ হানাহানির রূপ নেয়, যখন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। অনেকের ধারণা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রদেশের রেকর্ডে কালিমা লেপনের জন্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ধর্মঘটের আয়োজন করা হয়েছিল। আইয়ুব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানকে অপসারণ করে ডঃ এম. এন. হুদাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।

আইয়ুবের পতন এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারি

প্রদেশের সর্বত্র প্রতিবাদ ও হরতালসহ চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করার প্রেক্ষাপটে শিল্পোৎপাদন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত ঘটে, আমলাতন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং খবর পাওয়া যায় যে এমনকি সামরিক বাহিনী নড়বড়ে সরকারকে সহায়তা করতে অসম্মতি জানায়। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব তাঁর দায়িত্ব পরিত্যাগ করে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে "দেশের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদান করেন"।[২৬] সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের পর সামরিক আইন জারি করা হয় এবং সৈন্যরা যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক বাহিনী দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, তবে কেবল রাষ্ট্রের বিভাজনে নেতৃত্ব করার জন্য। ক্ষমতা ত্যাগের মাধ্যমে আইয়ুব আরেকটি স্বৈরাচারী সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেন, যাকে বাঙালিরা তাদের কোনঠাসা করে রাখার আরেকটি কূটচাল হিসেবে দেখে বিশেষত তাদের বিজয় যখন ছিল হাতের মুঠোয়। আইয়ুব কর্তৃক জোরগলায় প্রচারিত 'উন্নয়নের দশক' প্রকৃতপক্ষে জাতির মূল রাষ্ট্রকাঠামোকেই ধ্বংস করে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, প্রদেশের জনগণের সংবেদনশীলতা ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে যা ছিল অবধারিত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আইয়ুব ও তাঁর দোসরদের এবং তাদের স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পক্ষান্তরে, প্রদেশের রাজনৈতিক গতিময়তার মধ্যে সক্রিয় মুজিব জনগণের চোখে তাদের অধিকারের রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন।

২৬. *Pakistan Observer,* March 26, 1969.

ইয়াহিয়া সরকার

আইয়ুবের পতনের পর সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রধানত দায়ী ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করা হয় এবং নতুনভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাপ্রধান হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালনকালে ১৯৬৯ সালের ৩১ মার্চ নিজেকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া তাঁর প্রশাসনকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন এবং ক্ষমতাগ্রহণের পর পরই অনতিবিলম্বে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন, যা একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে। তিনি রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার দূরদৃষ্টির অভাব ছিল এবং ইতিমধ্যেই আটকে পড়া একটি তরীর কাণ্ডারী হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। চরিত্রহীন এবং গুটিকয়েক উপদেষ্টার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ইয়াহিয়া তাঁর প্রশাসনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করেন নি এবং কোনো জাতীয় কর্মসূচিও হাতে নেন নি। তাঁর পূর্বসূরির মতো তিনিও বেসামরিক জনগণকে ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং সকল কর্তৃত্ব এমন একটি সামরিক গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত করেন, যারা সমগ্র সরকারি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতো।[২৭] ক্ষমতাসীন সরকারের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন লাভের লক্ষ্যে এবং ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে ইয়াহিয়া ১৯৬৯ সালের আগস্টে একটি সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেন, যাতে কিছু বাছাই করা বেসামরিক ব্যক্তিও ছিলেন। তবে কিছু বেসামরিক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত এই মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব ছিল একেবারে বাহ্যিক। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল আবদুল হামিদ, নূর খান, এস. এম. আহসান এবং জি. এম. পীরজাদার মতো সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে। এই সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় বাঙালি সদস্যরা ছিলেন এ. মালিক, আহসানুল হক, হাফিজুদ্দিন, শামসুল হক এবং জি. ডব্লু. চৌধুরী। এঁদের কেউই বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বাঙালি আমলা শফিউল আজমও বাঙালিদের স্বার্থের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলেন না বলে জানা যায়।

ইয়াহিয়া দু'টি বিতর্কিত ও বিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের যে একক সত্তা কার্যকর ছিল, তা ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি কলমের এক খোঁচায় বিলোপ করে দেন। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের আদি চারটি প্রদেশের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এভাবে ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে বিধৃত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমতার নীতিটি কার্যকরভাবে পরিবর্তিত হয়। তিনি একই সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের আদেশ জারি করেন।[২৮] এ সিদ্ধান্তের ফলে প্রথম বারের মতো জাতীয় পরিষদে

২৭. দেখুন, Fazl-i-Muqueem Khan, *Pakistan's Crisis in Leadership*, (Karachi: National Book Foundation, 1973), 19.

২৮. ১৯৬১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি আসন বরাদ্দ করা হয়, যে পরিষদ গণপরিষদ হিসেবে কাজ করবে।[২৯]

আইনগত কাঠামো আদেশ

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া একতরফাভাবে একটি আইনগত কাঠামো আদেশ[৩০] জারি করেন, যাতে নির্বাচনের পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য জাতীয় পরিষদের জন্য নির্বাচনী বিধি এবং সংবিধানে সংযোজনার্থে কিছু বিধানের রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ আদেশ প্রদেশ ও অঞ্চলসমূহের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশনের ধারণা দেয় এবং "নিশ্চয়তা দেয় যে ফেডারেশনের ঐক্য কোনোভাবেই বিনষ্ট হবে না।" এ আদেশ জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফেডারেল ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রের নীতিমালাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। আদেশের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিগত ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রদেশসমূহ এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য হ্রাস করার অঙ্গীকার। এ আদেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপ্তি নির্দেশ করা না হলেও একথা বলা হয় যে প্রদেশগুলোর সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে, যা ছিল একটি অস্পষ্ট শব্দ এবং এ আদেশে ছয় দফা অথবা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ দাবির উল্লেখ ছিল না। আদেশের অন্য কয়েকটি ধারা ছিল পশ্চাদ্মুখী পদক্ষেপ এবং এগুলো পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোনো সমর্থন পায় নি। যেমন, এ পর্যায়ের একটি ধারায় বলা হয়, সাংবিধানিক বিলটি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে; জাতীয় পরিষদ নয়, বরং প্রেসিডেন্ট আদেশটি পরিবর্তন করতে পারবেন এবং আদেশের ব্যাখ্যাও প্রেসিডেন্ট প্রদান করবেন। আদেশটিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোনো সুযোগ রাখা হয় নি। এতে বলা হয় যে পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র; যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তা সংরক্ষণ করা হবে, এবং রাষ্ট্রের প্রধান হবেন একজন মুসলিম। শেখ মুজিব কৌশলে আদেশটি এড়িয়ে যান, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ছয় দফার উপর একটি গণরায়ে রূপান্তরিত হবে।[৩১] ফলে আইনগত কাঠামো আদেশের মাধ্যমে

২৯. মহিলাদের জন্য ১৩টি আসন সংরক্ষিত ছিল, যেগুলো প্রদেশগুলোর নির্বাচিত সদস্য দ্বারা পূরণযোগ্য। সংরক্ষিত আসনের ৭টি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল।

৩০. আদেশটির পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, *White Paper on the Crisis of East Pakistan*, (Islamabad.Government of Pakistan, August 1971), Appendix B: Legal Farmework Order.

৩১. *Pakistan Observer*, Oct. 26, 1970 এবং Sen, p. 252. আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবিকে তার ম্যানিফেস্টোতে আরো বিস্তারিত ও ধারালোভাবে পুনঃউপস্থাপন করে এবং ইয়াহিয়ার নিরপেক্ষ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৭০-এর এপ্রিলে প্রকাশিত হয়। দেখুন, A.H.M Kamruzzaman, *The Manifesto of the Awami League*, Dhaka: Clory Printers, 1970, and *Morning News*, June 8, 1970.

অনেক কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও বাঙালিরা বর্তমান ব্যবস্থায় থেকেই কাজ করতে আগ্রহী ছিল। অধিকন্তু, তাড়াহুড়ো করে প্রণীত এই দলিলে সাংবিধানিক বিলের উপর ভোটাভুটির পদ্ধতির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অস্পষ্টতা থাকায় সাংবিধানিক বিলটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হবে নাকি সকল ফেডারেল এককের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে চলে যায়।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল নির্বাচনপূর্ব প্রচারণা শুরু হয়। ঠিক তখনই ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের ৮,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরের দ্বীপসমূহে আঘাত হানে। স্মরণকালের এই সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ৩,৫০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়।[৩২] এছাড়া এতে যোগাযোগ অবকাঠামো এবং সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই সময়ে ইয়াহিয়া সংক্ষিপ্ত সফরের উদ্দেশ্যে ১৫ নভেম্বর ঢাকায় আগমন করেন, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় ত্রাণ ও পুনঃনির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন নি। তাঁর এ অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তা বাঙালি জনগণকে হতবাক করে এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। ঢাকার সংবাদমাধ্যমগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চরম অবহেলা, অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য এবং আন্তর্জাতিক ত্রাণসংস্থার তৎপরতাকে বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ আনে। শেখ মুজিব আক্ষেপ করে বলেন যে "পশ্চিম পাকিস্তানে গমের বাম্পার ফলন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নিকট খাদ্যশস্যের প্রথম চালান আসে বিদেশ থেকে" এবং "বস্ত্রব্যবসায়ীরা আমাদের পরিধানের জন্য এক গজ কাপড়ও দেয় নি।"[৩৩] মুজিব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের এক বিশাল সেনাবাহিনী আছে, কিন্তু আমাদের মৃতদেহগুলো কবর দেয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বৃটিশ নাবিকদের উপর।" তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের ঐক্যের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন : "সকল গ্রাম, গৃহ ও বস্তিতে এখন সকলের মনে এ অনুভূতি প্রবল হয়েছে যে আমরাই নিজেদেরকে শাসন করবো। সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরাই গ্রহণ করবো। আমরা আর আমলা, পুঁজিপতি ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তবাদী গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী শাসন মেনে নেব না।"[৩৪] ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তীকালে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আবেগের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৭০-এর সংবিধান

ঘূর্ণিঝড়ের পর চার সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে বাঙালিদের অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে

৩২. *The Washington Post, Chicago Tribune, New York Times* এবং অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের উপর ব্যাপক কভারেজ দেয়া হয়।

৩৩. *Bangladesh: A Country Study*, 29

৩৪. ঐ।

প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন; তবে পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন জেলায় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়।[৩৫] এই প্রথম বারের মতো জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন। ভোট প্রদানের হার ছিল বেশ উচ্চ এবং নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদে বরাদ্দকৃত ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতেই জয়লাভ করে।[৩৬] একইভাবে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৮৮টি লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বাকি ১০টি আসনের জন্য নির্বাচন তখনও হয় নি। ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি লাভ করে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়, যাদের অধিকাংশ ছিলেন পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে নির্বাচিত। বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। কোনো দল উভয় প্রদেশ থেকে অর্থবহ সমর্থন লাভে সক্ষম না হওয়ায়[৩৭] পাকিস্তানের ঐক্য খুবই শিথিল হয়ে পড়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। বস্তুত ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচন তার পতনের সূচনা করে। আওয়ামী লীগের বিস্ময়কর নির্বাচনী বিজয় জাতীয় পরিষদে তার নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করে। একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের কারণে সংসদীয় পদ্ধতিতে মুজিবের সরকারপ্রধান হওয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু মুজিবের কাছে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের চেয়েও বড় বিষয় ছিল জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রণীতব্য সংবিধানে ছয় দফা ফর্মুলা অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাধরদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ছয় দফার মৌলিক প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা একটি ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি, যেখানে একটি রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারতো। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শেখ মুজিবের কাছে আওয়ামী লীগের ছয় দফা ছিল নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাই পিছু হটার কোন সুযোগ ছিল না।[৩৮] ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত

৩৫. ইতিপূর্বে ৫ অক্টোবর , ১৯৭০ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু আগস্টে ভয়াবহ বন্যার কারণে এই তারিখে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়।

৩৬. জাতীয় পরিষদের যে দুটি আসনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয় তার একটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নূরুল আমিন জয়লাভ করে; আরেকটিতে জয়লাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় প্রধান রাজা ত্রিদিব রায়। রায়ের আসনে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এই উভয় ব্যক্তিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল।

৩৭. আওয়ামী লীগের ১৯ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ছয় দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচির যোগফল।

ছয় দফা কর্মসূচিকে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়েছিল এবং ভূট্টো তাঁর নির্বাচনী প্রচারণার সময় একে কখনো চ্যালেঞ্জ করেন নি।

আইনগত কাঠামো আদেশ অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ১২০ দিন সময়কালের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের কথা ছিল। যদিও মুজিব যথাসময়ের পূর্বে অধিবেশন অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন, যেখানে ইতিপূর্বে অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নির্বাচনী ফলাফল জানার পরেই ভূট্টো জনসমক্ষে ঘোষণা দেন যে তাঁকে কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগ না দিলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান করবে না। সংসদে ভূট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও প্রতীয়মান হচ্ছিল যে তুরুপের তাস ছিল তাঁরই হাতে। সংসদ বর্জনের হুমকি দিয়ে ভূট্টো একে অকার্যকর করতে পারতেন। এক্ষেত্রে ভূট্টোর ছিল কৌশলগত সুবিধা। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল সংসদের বাইরে, ভেতরে নয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের শক্তি কার্যকর হতো।

নির্বাচনপরবর্তী ঘটনাবলী

আওয়ামী লীগের যুগান্তকারী নির্বাচনী বিজয় মুজিবকে বাঙালিদের অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত করে। আর আওয়ামী লীগের সর্বাত্মক বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবিচল অভিব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়। বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের পুনরুজ্জীবিত ও সংকল্পদৃঢ় প্রেরণা এবং বাঙালি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি সারা বাংলাদেশকে উদ্দীপ্ত করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে "কেউই আমাদেরকে ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নে বাধা দিতে পারবে না।" তিনি এখানে নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার জন্য শপথনামা পাঠ করান।[৩৯] এ ব্যাপারে যেকোন সন্দেহ দূর করার জন্য মুজিব তাঁর ভাষণে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে ছয় দফা আমাদের পবিত্রতম ধ্রুব লক্ষ্য এবং আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসন কার্যক্রমে কোনো দ্ব্যর্থকতা নেই, এবং অতীতের মতো পর্দার অন্তরালে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পশ্চিম পাকিস্তানী স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না অথবা দলত্যাগ করবে না। পরের দিন, ৪ জানুয়ারি শাসকগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করে মুজিব পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে বাঙালিরা নির্বাচনে

৩৮. পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ছিল : পাঞ্জাব ০.০৭, সিন্ধু ০.০৭, বেলুচিস্তান ১.০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ০.০২। পিপল্স পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রার্থী দেয় নি।

৩৯. দেখুন, *ইত্তেফাক*, জুন ৪, ১৯৭১; আরো দেখুন, *Bangladesh Documents*, (New Delhi Government of India, Ministry of External Affairs, 1973), 137-8

দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং ছয় দফা পরিবর্তনের কোনো কর্তৃত্ব জাতীয় পরিষদের থাকবে না।[৪০] স্বায়ত্তশাসন ইস্যুতে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত অবশ্য দেন নি। আওয়ামী লীগের একদল সংবিধানবিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যেই ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে একটি কার্যকর সংবিধান প্রণয়নের কাজে একাগ্রচিত্তে নিয়োজিত হন।

মুজিব যখন সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ভাসানী তাঁর জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের আশায় এবং সম্ভবত ভূট্টোর সাথে সাংবিধানিক বিতর্কে জড়িত মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন যে আওয়ামী লীগের বিজয়কে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জনগণের রায় হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং আওয়ামী লীগ এ লক্ষ্য থেকে সরে গেলে তিনি আন্দোলনের হুমকি দেন।[৪১] তবে তোহা-হকের নেতৃত্বে বামদল স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবিকে একটি ভিন্নমুখী পদক্ষেপ হিসেবে দেখে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে একটি ইস্যু বলে গণ্য করে নি।[৪২] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জনসমর্থনের কাছে পরাজিত হওয়ার আশংকায় ভাসানী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান নি। নির্বাচনের পরে তাঁর প্রভাব প্রান্তিক পর্যায়ে নেমে আসে। অবশ্য মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আরেকটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ওয়ালী খানের সাথে হাত মিলিয়েছিল, তবে তারা আওয়ামী লীগকে নিঃশর্ত সমর্থন জোগায়।

নির্বাচনের পরে পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে রাজনৈতিক ত্রিভুজের তিন প্রধান নায়ক ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভূট্টো তিনটি স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই ত্রিভুজের ভঙ্গুর স্থানগুলোতে টান পড়লে তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোকেই ধ্বংস করে দেবে। নির্বাচনের পরে প্রথম যে কাজটি করা উচিত ছিল তা হলো সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা। কিন্তু আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভীত হয়ে শাসকগোষ্ঠী ভূট্টোর সহায়তায় মুজিবকে সংসদের বাইরে একটি দীর্ঘস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক আপোস-আলোচনায় নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র করে। এরপর যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সুনির্দিষ্ট কোনো আলোচ্যসূচি ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রের দুই অংশের ঐক্য সংরক্ষণ করার মতো কোন অভিন্ন অবস্থান তাদের ছিল না।

আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচনপূর্ববর্তী নীল নকশা বানচাল করে দিয়েছিল। তারা আশা করেছিল যে আওয়ামী লীগ বড় জোর সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, যার ফলে তা পশ্চিম পাকিস্তানী দলগুলোর সাথে জোট গঠনে বাধ্য হবে। ইয়াহিয়ার

৪০. *Pakistan Observer*, Jan. 5, 1971

৪১. *Far Eastern Economic Review*, Jan, 19, 1971.

৪২. Hasan Zaheer, *The Separation East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, (Karachi 1994), 131, এবং *Far Eastern Economic Review*, Jan. 16, 1971. পরে ভাসানীর অনুসারী মোহাম্মদ তোয়াহা এবং আবদুল হক পদত্যাগ করে একটি বামপন্থী দল গঠন করে। এখানে উল্লেখ্য যে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া ১৯৭১-এর শুরুতে এ দলের সমর্থন ছিল তাৎপর্যহীন।

গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক "বরাবরই বলছিল যে কোনো একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না।[৪৩] অধিকন্তু ইসলামপছন্দ জোট হিসেবে আখ্যায়িত কিছু ডানপন্থী ধর্মভিত্তিক দল ও স্বার্থ শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের অঢেল আর্থিক সহায়তা পায়। তারা দাবি করেছিল যে তাদের যথেষ্ট জনসমর্থন আছে এবং মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে তারা সক্ষম। বিশেষত জামায়াতে ইসলাম স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচিকে ইসলামের বিরোধী বলে চিহ্নিত করে এর বিরোধিতা করেছিল।[৪৪]

সংসদীয় জোটভিত্তিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে শাসকগোষ্ঠী আশা করেছিল যে আওয়ামী লীগ তার স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচি শিথিল করতে বাধ্য হবে এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। জানা যায় যে সেনাবাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগের মনোভাব লক্ষ্য করে সকল জেনারেল ইতিমধ্যেই শংকিত হয়ে পড়েছিল এবং তারা নির্বাচনের ফলকে একটি "বিপর্যয়' বলে গণ্য করেছিল।[৪৫] এমনকি কয়েকজন সিনিয়র অফিসার এ আশংকাও প্রকাশ করেছিলেন যে বাঙালি অফিসার কর্নেল এম. এ. জি ওসমানী, যাঁকে পদোন্নতি প্রদান না করে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তিনি আওয়ামী লীগ সরকারে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তাঁর অপমানের শোধ নেবেন।[৪৬]

ঢাকার মঞ্চে ইয়াহিয়া

ইয়াহিয়া কিছুকালের জন্য নিষ্ক্রিয় ছিলেন, যে সময়ে তিনি নির্বাচনপরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন। এরপর মুজিবের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ঢাকায় আগমন করেন। ইয়াহিয়া ও তাঁর জেনারেলরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেন যে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় মুজিবই তখন দেশের রাজনীতিতে মুখ্য ব্যক্তি। মুজিব ইতিপূর্বে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। স্পষ্টতই মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদেরকে জানাতে চেয়েছিলেন যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

শীর্ষ পর্যায়ে মুজিব ও ইয়াহিয়ার তিনদিন ব্যাপী আলোচনা এবং তিন প্রধান নেতার মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনার বিষয় সম্পর্কে বেশি কিছু প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এ পর্যায়ের আলোচনায় যেসকল বিশিষ্ট বাঙালি নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের

৪৩. Zaheer, *East Pakistan*, 130
৪৪. দেখুন, Maudud Ahmed, *Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy*, Dhaka University Press, 1976, 93.
৪৫. Zaheer, *East Pakistan*, 130.
৪৬. ঐ।

মধ্যে ডঃ কামাল হোসেন ছাড়া আর কেউ এখন বেঁচে নেই। ডঃ কামাল হোসেন পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, কামাল হোসেনও সেসব রুদ্ধ আলোচনার কোনো বিবরণ প্রকাশ করেন নি। আওয়ামী লীগের কয়েকটি বিবরণে আলোচনার সমস্যা সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ আছে, কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ আজো প্রকাশিত হয় নি।[৪৭]

জানা যায় যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্বে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের ক্ষমতাবান ডেপুটি চেয়ারম্যান এম. এম. আহমেদ এক অত্যন্ত গোপনীয় পত্রে সুপারিশ করেছিলেন যে নির্বাচনের পরিবর্তে এখন দু'অংশের বন্ধুত্বপূর্ণ বিচ্ছেদের সময় এসেছে; অন্যথায় সমগ্র দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।[৪৮] অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে পিপল্‌স পার্টি কর্তৃক জারিকৃত কিছু পুস্তিকায় স্বীকার করা হয়েছিল যে "পাকিস্তানে একটি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে" এবং "পূর্ব পাকিস্তান তার দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান ছাড়া কোন পথ দেখছে না" এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ কেউ মনে করেন যে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে প্রভূত উন্নতিলাভ করেছে বিধায় এখন তা পূর্ব পাকিস্তানকে পরিহার করে টিকে থাকতে সক্ষম।[৪৯] অন্যদিকে পিপল্‌স পার্টি উপলব্ধি করে যে আওয়ামী লীগ কর্তৃক উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকাঠামোর পুরোদস্তুর পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন। পিপল্‌স পার্টির এ উপলব্ধির বিপরীতে মুসলিম লীগের বাদ বাকি অংশসহ ইসলামপছন্দ দলগুলোর সমর্থন নিয়ে সামরিক বাহিনী একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিল। সেনাবাহিনীর এই অভিমতের ভিত্তি ছিল সেই সাধারণ ধারণা যে উপমহাদেশের সকল মুসলমান একটি পৃথক জাতি এবং তাদের জন্য প্রয়োজন একটি একক রাজনৈতিক ব্যবস্থা।[৫০] সামরিক বাহিনী

৪৭. এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের কাজে লাগার মতো প্রকাশনার মধ্যে আছে : *Bangladesh Contemporary Events and Documents*, 1971, and Tajuddin Ahmed, *Bangaldesh A Statement issued on April 17, 1971*. আলোচনার ধারাবাহিক বিবরণ আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত *Why Bangladesh* পুস্তিকায়, ১৯৭১ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত কালানুক্রমিক বিবরণ আছে Federal Intervention in Pakistan Background Report 1 এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পাকিস্তানের সংকটের উপর একটি শ্বেতপত্রে। অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ছিল ভাসা ভাসা ও অনেক ক্ষেত্রে অনুমাননির্ভর। পাকিস্তন পিপল্‌স পার্টির প্রকাশনা *Great Tragedy*-তে ভুট্টোর নিজস্ব বিবরণ ছিল মূলত আলোচনা ভেঙে যাওয়ার জন্য তার নিজের সাফাই।

৪৮. Zaheer, *East Pakistan*, 129.

৪৯. J. A. Rahim, *Outline of a Federall Constitution for Pakistan*, (Karachi: Pakistan People's Party, Dec. 2969), 36-38.

৫০. দেখুন, David Dunbar (ছদ্মনাম), "Pakistan: the Failure of a Political Negotiations", *Asian Survey*, May 1972, 444-461.

একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে দীর্ঘকাল মুরব্বিয়ানা করেছে এবং তাদের ধারণা ছিল যে দেশের পূর্বাঞ্চলের উপর পশ্চিমাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলে তাদের অধিগত ক্ষমতা, সম্মান এবং বিপুল সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পাবে।

যে ভাসা ভাসা তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যে মুজিব ও ইয়াহিয়ার প্রথম সাক্ষাৎটি ছিল "তিক্ততাপূর্ণ"।[৫১] মুজিব পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান করা উচিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে তাঁকে সরকার গঠন করতে দেয়া উচিত। কিন্তু তিনি একই সাথে পশ্চিমের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে বলেন যে তিনি একজন গণতন্ত্রী এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে অবজ্ঞা করতে পারেন না।[৫২] ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে ছয় দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই, কিন্তু মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সমর্থন লাভ করতে হবে, এবং একথা তিনি বারবার বলেছিলেন।[৫৩] ইয়াহিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে মুজিব সেই সমর্থন লাভ করতে পারবেন না। লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভূট্টো ছয় দফার প্রশ্নে নতিস্বীকার করেন নি, বারংবার এর বিরোধিতা করেছেন আপোসহীনভাবে; তাঁর মতে ছয় দফা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের সমতুল্য।

সাত ঘন্টারও অধিক কাল স্থায়ী ইয়াহিয়া-মুজিব শীর্ষ বৈঠক ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। যদিও ধারণা করা হয়েছিল যে প্রধান বিষয়গুলোতে ইয়াহিয়া-মুজিব সমঝোতা হয়েছে, বাস্তবে তা ছিল ফাঁকা বুলি মাত্র। রাজনৈতিক সংকটের একমাত্র সমাধান ছিল অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা; কিন্তু ইয়াহিয়া কালক্ষেপণ করলেন এবং কোন প্রকারে গোঁজামিল দিয়ে চললেন। এই কালক্ষেপণ মুজিবের বিরুদ্ধে ভূট্টো এবং জেনারেলদের একজোট হতে সহায়তা করলো।

ইয়াহিয়া মুজিবকে ধোকা দেওয়ার জন্য করাচীতে ফিরে এসে সাংবাদিকদের জানালেন, "শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন।"[৫৪] অথচ, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন করে ইয়াহিয়া দেশদ্রোহিতার জন্য মুজিবের নিন্দা করলেন .... তিনি বললেন, মুজিব এ দেশের সংহতি ও অখণ্ডতার মূলে আঘাত করেছেন।[৫৫]

ভূট্টোর পালা

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া একদল জেনারেলসহ ১৭ ফেব্রুয়ারি লারকানাতে ভূট্টোর বাড়ী গমন করেন পরিস্থিতিতে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার

৫১. Zaheer, *East Pakistan*, 132. জহিরের চমৎকার সমীক্ষায় ইয়াহিয়ার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শী উপদেষ্টার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত আছে।

৫২. ঐ।.

৫৩. ঐ।.

৫৪. *Dawn*, Jan 15, 1971.

৫৫. *Dawn*, Mar. 26, 1971

ব্যয়বহুল আতিথ্য উপভোগ করে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যই অশোভন ও অবিবেচনাসুলভ কাজ। এরই বিপরীতে রাষ্ট্রপতির ঢাকায় অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় প্রটোকল কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। লারকানায় অনুষ্ঠিত বৈঠক ছিল "ভূট্টো এবং জেনারেলদের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনাবৈঠক....বৈঠকে তাঁরা বাঙালিদের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।"[৫৬] আওয়ামী লীগের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিছু জেনারেল তাঁদের কর্তৃত্ব বলবৎ রাখার জন্য ভূট্টোকে একজন বন্ধু হিসেবে গণ্য করেন।[৫৭] লারকানার এ বৈঠক মুজিবের বিরুদ্ধে ভূট্টোকে পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং জেনারেলদের সমর্থন পেয়ে ছয় দফার প্রতি ভূট্টোর দৃষ্টিভঙ্গি আরো কঠোর হয়ে দাঁড়ায়। ইয়াহিয়া ভূট্টোর এই অনিচ্ছাকৃত প্রতিশ্রুতি নিয়ে লারকানা থেকে ফিরে আসেন যে মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হবে, তবে ছয় দফার ব্যাপারে কোন আপোস করা হবে না। জানা যায়, লারকানায় ভূট্টো ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে নিজেকে রেখে দুই প্রদেশের একটি গ্র্যান্ড কোয়ালিশন-এর প্রস্তাব করেছিলেন। উদ্ধত, আপোসহীন এবং প্রায়শ প্রতিবাদী ভূট্টো তখন অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছিলেন না। ঢাকা এবং লারকানার মধ্যে ত্রিভুজের কেবল দুটি পক্ষ মিলিত হয়েছিল। ইয়াহিয়ার পরামর্শে ভূট্টো মুজিবের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করার জন্য এক বৃহৎ দলীয় প্রতিনিধিদল নিয়ে ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় আগমন করেন। উপরেই উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও ভূট্টো-মুজিব আলোচনার কোনো প্রামাণিক বিবরণ নেই, গুজব রটেছিল যে ভূট্টো মুজিবের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব দেন, কিন্তু মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করে আবার বলেন যে ছয় দফা নিয়ে দরকষাকষি করা চলবে না। নূরুল আমীন এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের ন্যায় অন্য বাঙালি নেতার মতো না হয়ে মুজিব ছিলেন অন্য ধাঁচে গড়া; তাঁকে হয়তো ভাঙা যেতো, কিন্তু নীতির প্রশ্নে মচকানো যেতো না।

২৯ জানুয়ারি ভূট্টো যখন ঢাকা ত্যাগ করেন, তখন সংবাদমাধ্যমে কোনো অগ্রগতির খবর প্রকাশিত হয় নি। ঢাকায় অবস্থানকালে ভূট্টো ছয় দফাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করাকে এড়িয়ে চলেন, কিন্তু করাচীতে আসার পর ইঙ্গিত দেন যে ছয় দফা মেনে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।[৫৮] ১১ ফেব্রুয়ারি যখন ইয়াহিয়া ভূট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন ভূট্টো ইয়াহিয়াকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান না করার পরামর্শ দেন, কারণ তাঁর দলের সাথে পরামর্শ করতে তাঁর আরও সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে মুজিবের বেঁধে দেয়া সুনির্দিষ্ট তারিখ ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি।[৫৯]

৫৬. Zaheer, *East Pakistan*, 137

৫৭. আপাতঃদৃষ্টিতে পর্দার অন্তরালে এই জেনারেলরাই ভূট্টোর শরণাপন্ন হয়েছিল। Zaheer, *East Pakistan*, 137

৫৮. দেখুন, *Dawn*, Jan. 30, 1971.

৫৯. Bhutto, *The Great Tragedy*, 24-25

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পরিষদ প্রতিষ্ঠার জন্য, তবু ভূট্টো পরিষদের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছিলেন।

অধিবেশন আহ্বানে অত্যধিক বিলম্ব দেখে[৬০] ইয়াহিয়া-ভূট্টো ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বাঙালিদের মনে যে সন্দেহ দেখা দেয় তা দূর করার জন্য ইয়াহিয়া ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। আওয়ামী লীগ এ তারিখ ঘোষণাকে স্বাগত জানায় এবং সংবিধানের তৎপ্রণীত ভাষ্য চূড়ান্তকরণের কাজে হাত দেয়। আইনগত কাঠামো আদেশে পিপল্স পার্টি অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য কোন দলের সহযোগিতা নিয়ে অথবা না নিয়ে সংবিধান প্রণয়নে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আসন্ন অধিবেশনের কথা বিবেচনায় রেখে আওয়ামী লীগ নিজেকে সংগঠিত করা শুরু করে। এ পর্যায়ে মুজিব ছিলেন সংসদীয় দলের নেতা এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন উপনেতা। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে দলের নেতা নির্বাচিত হন মনসুর আলী।

পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ ক্ষুদ্র দল ও উপদল পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু ভূট্টো ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে অবজ্ঞাভরে ঘোষণা করেন যে তাঁর দল ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করবে না, যেটা হবে একটি "চাপিয়ে দেওয়া" সংবিধান প্রণয়নের জন্য "একটি কসাইখানার মতো"।[৬১] ভূট্টো ছয় দফা প্রত্যাখ্যানের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন, ফেডারেশনের এককগুলোর ঐকমত্য দাবি করেন এবং দুটি প্রদেশের জন্য পৃথকভাবে সংবিধান প্রণয়নের জন্য পৃথক অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন।[৬২] ভূট্টো অন্তত নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।[৬৩]

ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাতের পর ভূট্টো ঘোষণা করেন যে তিনি দেশের অর্ধেকের প্রতিনিধিত্ব করেন, সুতরাং অন্য অর্ধেকের প্রতিনিধি মুজিবের সাথে তারও সংবিধান প্রণয়নে সমান ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।[৬৪] আওয়ামী লীগের কাছে ভূট্টোর এ প্রস্তাবকে মনে হয়েছিল

৬০. ৩০ জানুয়ারি কাশ্মীর থেকে ভারতগামী একটি বিমান ছিনতাই, বিমানটিকে লাহোর নিয়ে যাওয়া এবং ভূট্টো ও শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ছিনতাইকারীদেরকে বীরোচিত সম্বর্ধনা প্রদান পূর্ব পাকিস্তানের দৃষ্টিতে পরিষদের সভা পিছিয়ে দেয়ার কৌশল হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল।

৬১. *Morning News*, Feb. 16 and Feb. 18, 1971.

৬২. *Dawn*, Feb 16, 1971.

৬৩. দেখুন, DAvid Dunbar, "Pakistan: the Failure of Political Negotiations", *Asian Survey*, Vol XI, No 5, may 1972, 444-461.

৬৪. Dunbar, ঐ, 451. ভূট্টোর নিকটজন এবং ১৯৭১ সালে করাচীতে অবস্থানরত এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর সাংবাদিক আর্নল্ড জাইটলিন লেখককে জানান (ওয়াশিংটন ডি সি, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯৭) যে ফেব্রুয়ারির শেষে পেশাওয়ারে তিনি যখন ভূট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন ভূট্টো বলেন যে তিনি একটি শিথিল জাতীয় ফেডারেশনের অধীনে দেশের জন্য পৃথক প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব করবেন।

ভেটোক্ষমতা প্রয়োগের মতো। ২৪ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে মুজিব ব্যাখ্যা করেন যে ভূট্টো যেভাবে দাবি করছেন ছয় দফা সেরকম বিভক্তিমূলক কর্মসূচি নয়, এবং ছয় দফার কাঠামোর মধ্যেই একটি টেকসই ফেডারেশন গঠন করা সম্ভব। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানে এ আশংকার সৃষ্টি হয় যে ইয়াহিয়াজান্তার পরামর্শদাতার অবস্থানে আর কোন বাঙালি বোধ হয় থাকলো না। তবে ইয়াহিয়া তাঁর পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দেখান যে এটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরেকটি পদক্ষেপ।

পরিষদ বর্জনের জন্য ভূট্টোর সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র দলগুলোর সমর্থন পায় নি। শুধু ব্যতিক্রম ছিল মুসলিম লীগের কাইয়ুম গ্রুপ। কিন্তু পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘনিয়ে এলে কাইয়ুম গ্রুপ এবং ভূট্টোর নিজ দলের মধ্যে দলত্যাগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এক ভীতিপ্রদর্শনমূলক প্রচারাভিযানে ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে ভূট্টো খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত কেবল আইন অমান্য বা হরতালেরই হুমকি দেন নি, অধিকন্তু যাঁরা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের খতম করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেন।[৬৫] জানা যায় যে ইয়াহিয়ার অনুগত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি জেনারেল ওমর পিপল্স পার্টির সদস্য নয় জাতীয় পরিষদের এমন সব সদস্যকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের জন্য তাঁর প্রভুর নামে নির্দেশ দেন।[৬৬] ফলে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি ইয়াহিয়া-ভূট্টো আঁতাত পরিষ্কারভাবে গড়ে উঠে।

পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

ভূট্টোর সাথে ঘনিষ্ঠ ও অভিন্ন স্বার্থজড়িত জেনারেল হামিদ, মিঠা, পীরজাদা, ওমর, টিক্কা এবং গুল হাসানের নেতৃত্বে একদল জেনারেলের পরামর্শ মোতাবেক ইয়াহিয়া ১ মার্চ তারিখে সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।[৬৭] এই পূর্বপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ইয়াহিয়া বাহ্যত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীরই একটি ষড়যন্ত্রের প্রতি সমর্থন জানালেন, যার উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাগ্রহণের সুযোগ প্রদান না করা এবং তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছয় দফা দাবি বাতিল করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা। এই ঘোষণা প্রদানের সময় ইয়াহিয়া ভূট্টোর সংসদ বর্জনের ব্যাপারে আপোসহীন মনোভাবের কথা উল্লেখ করলেও কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন; তবে ইয়াহিয়া সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে একটা যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।[৬৮]

৬৫. *Morning News*, March 1, 1971.
৬৬. Talukdar, *Bangladesh Revolution*, 89.
৬৭. পিরজাদার মত ছিল এই যে অধিবেশন পেছানো না হলে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা ঘোষণা করতো, Zaheer, *East Pakistan*, 141-42.
৬৮. দেখুন, *Dawn*, March 2, 1971.

ইয়াহিয়া কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা মুজিবকে একেবারে হতবাক করে দেয়। রেডিওর ঘোষণা যখন ঢাকায় পৌঁছে, মুজিব তখন খসড়া সংবিধান চূড়ান্তকরণে ব্যস্ত। মুজিব ছিলেন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, তবু পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ব্যাপারটি তাঁকে আগে জানানো হয় নি। এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের সংবাদ পাওয়া মাত্রই প্রদেশে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন কিছু কট্টরপন্থী মহল এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণারও দাবি জানায়। সমগ্র প্রদেশে তখন এ জনমত গড়ে উঠে যে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালিদের অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না। যখন বাঙালিদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, তখন শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ভীতিপ্রদর্শনও বৃদ্ধি পায়; বেসামরিক ছদ্মাবরণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা হয়।[৬৯] ইয়াহিয়া কঠোর ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং অতিরিক্ত দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর কড়াকড়ি আরোপ এবং সান্ধ্যআইন জারি, যা কদাচিৎই পালিত হয়েছিল। ইয়াহিয়া তাঁর হুমকি কার্যকর করতে গিয়ে অমায়িক ও জনপ্রিয় এ্যাডমিরাল আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পদ থেকে প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর পরিবর্তে জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর নিয়োগ করেন, যিনি ইতিমধ্যেই বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কঠোর হস্তে দমনের মাধ্যমে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসক হিসেবে দুর্নাম কুড়িয়েছিলেন। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকেও প্রত্যাহার করা হয়, যিনি সংকট উত্তরণের জন্য কঠোর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাধানের সুপারিশ করেছিলেন বলে শোনা যায়। এ কথা উপলব্ধি করতে বেশি চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন ছিল না যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ইস্যুটির নিষ্পত্তি করার জন্য সামরিক সমাধানেরই পাঁয়তারা করা হচ্ছিল।

নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগ

সামরিক বাহিনী থেকে চরম উস্কানি এবং বাঙালি চরমপন্থীদের, বিশেষত ছাত্রদের প্রচণ্ড চাপের মুখে মুজিব একটি সতর্ক পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে তার পরিবর্তে ২ মার্চ তারিখে প্রতিবাদ-হরতালের ডাক দিলেন। পরের দিন তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর কর্মসূচি তিনি ৭ মার্চ উপস্থাপন করবেন। একই সাথে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গান্ধীর অনুকরণে প্রদেশব্যাপী অহিংস আইন অমান্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, যা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকলো। আওয়ামী লীগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনামা অনুসরণ করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার কার্যত অচল হয়ে পড়লো; সামরিক আইনের বিধানাবলীকে অগ্রাহ্য করা হলো, কর প্রদান বন্ধ হলো, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লো, পরিবহনসেবা মারাত্মকভাবে

৬৯. মার্চের আন্দোলন চলাকালে সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধি চলতেই থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানে একাধিক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।

ব্যাহত হলো এবং সকল আন্তঃপ্রদেশ লেনদেন বন্ধ হলো। বিপুল জনসমর্থন এবং সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ হয়ে পড়লো আইনসঙ্গত এবং প্রকৃত কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামাবাদের নিয়ন্ত্রণবলয় ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকলো। সরকারের বেসামরিক প্রশাসনে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব এমন নিরঙ্কুশ হয়ে পড়লো যে ঢাকা হাই কোর্টের সকল বিচারক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে জেনারেল টিক্কা খানকে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং এ উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে নিয়ে আসতে হলো। যখন অসহযোগ আন্দোলন শক্ত ভিত লাভ করলো, তখন শাসকগোষ্ঠী ভীতিপ্রদর্শন, সন্ত্রাস এবং কঠোর নিপীড়নমূলক পন্থা প্রয়োগ করলো, যার ফলে অনেক রক্ত ঝরলো। ২ ও ৩ মার্চের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফলে অন্তত এক সহস্র মানুষ প্রাণ হারালো। গণঅভ্যুত্থানের প্রবল প্রতিরোধের মুখে[৭০] সামরিক বাহিনীকে ৫ মার্চ ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার কৌশলগত নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু তাদের নির্বিচার নির্যাতন-লুণ্ঠন অব্যাহত থাকলো। ফলে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি হলো বিপুল পরিমাণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অরক্ষিত বেসামরিক জনগণকে আক্রমণ করছিল।

১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণের সময়কালে অধিকাংশ বিদেশী সংবাদদাতাই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির সংবাদ পাঠায় নি। তখন বাংলাদেশ সচিবালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল ধানমন্ডিতে অবস্থিত মুজিবের বাসভবন থেকে। সচিবালয় মার্চের ৪, ৭, ৯ ও ১১ তারিখে বেশ কিছু নীতিগত নির্দেশমালা জারি করে। মার্চে ক্ষমতার যে শূন্যতা বিরাজ করছিল তার প্রেক্ষিতে এ নির্দেশনামাগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবাহে স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করেছিল। পূর্ববর্তী নির্দেশগুলোকে ছাড়িয়ে ১৪ মার্চ যে সামগ্রিক নির্দেশনামা জারি করা হয় তা সরকারি প্রশাসনিক ম্যানুয়েলের মর্যাদা লাভ করে।[৭১]

প্রদেশে আওয়ামী লীগ কর্তৃক মোটামুটি ভালো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সত্ত্বেও কিছু অসামাজিক গোষ্ঠী সাধারণ গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করে। এ সময়ে ব্যক্তিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এবং জেলভাঙার ঘটনাও ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অবাঙালি স্থাপনাগুলোতে জনতার আক্রমণের রূপ নেয়, যাতে সম্পদের ক্ষতি এবং নির্দোষ মানুষের প্রাণহানিও ঘটে। পাকিস্তানী সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের একতরফা যুক্তি ছিল বাঙালিদের ক্রোধ থেকে অবাঙালিদের রক্ষা করা। তবে এটা পরিষ্কার যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের যুক্তি দাঁড় করানোর প্রয়াসে

৭০. সড়ক ব্যারিকেড, রেল লাইন অপসারণ এবং সরবরাহ প্রদানে বাঙালিদের অস্বীকৃতির ফলে সৈন্য চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল।

৭১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, White Paper, Appendix D, Awami League Directives, March 1971.

এ ধরনের অনেক সংঘর্ষের কথা জোরেসোরে প্রচার করেছিল।[৭২] বিহারীবিরোধী অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মুজিব বার বার শান্তির আহ্বান জানান এবং এমনকি সামরিক সন্ত্রাসী অভিযানের মুখেও স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচির অহিংস প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মার্চ আন্দোলনের শুরুর দিনগুলোতে বাঙালি কর্মচারীরা রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রকে 'ঢাকা বেতারকেন্দ্র' নামকরণ করে। এ বেতারকেন্দ্র আওয়ামী লীগের সংবাদ-বুলেটিন এবং অসাধারণ আবেগসঞ্চারী গান 'আমার সোনার বাংলা' প্রচার করা শুরু করে, যা জনগণের মনে দেশাত্মবোধ ও লড়াকু অনুভূতি জাগ্রত করে। প্রায় একই সময়ে জনগণের আবেগ যখন এক নতুন উচ্চতায় উপনীত, ঠিক তখনই বাংলাদেশের লাল ও সবুজ পতাকা পাকিস্তানী পতাকার স্থান দখল করে এবং 'জয় বাংলা' শ্লোগান এক ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করে। এ সময়ে শেখ মুজিবকে ভক্তিভরে সম্বোধন করা হয় 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে। এই দ্রুত সংঘটিত ঘটনাবলীর মাঝে আ. স. ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ ও অন্যদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' অসাধারণ অবদান রাখে। সমগ্র মার্চব্যাপী আন্দোলনে ছাত্র, শিক্ষক এবং নগরকেন্দ্রিক প্রোলেতারিয়েৎরাই সম্মুখভাগে ছিল এবং শত্রুর মোকাবেলা করেছিল। সামগ্রিকভাবে এক বৈপ্লবিক চেতনা ও উদ্দীপনা তখন বাঙালিদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মার্চ মাসে রাজনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষত সঙ্গীত, নাটক ও সাহিত্যকর্মের স্ফুরণ ঘটে।

ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে যখন রক্ত ঝরছিল, তখন ইয়াহিয়া ৩ মার্চ একটি ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণপত্র জারি করেন, যাতে তিনি ১২টি সংসদীয় দলের নেতৃবৃন্দকে ১০ মার্চ ঢাকায় তাঁর সাথে বৈঠকে বসার আহ্বান জানান। মুজিব একে একটি 'নিষ্ঠুর কৌতুক' বলে আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিবেকের তাগিদে এমন একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিতে পারেন না যখন "রাজপথে শহীদের রক্ত তখনো শুকায়নি। কিছু মৃতদেহ তখনো সমাহিত না হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল এবং শত শত আহত লোক হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছিল।"[৭৩]

অব্যাহতভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে মুজিব বলেন যে সৎ বিশ্বাসে বৈঠকে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মুজিব আরো বলেন যে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল আলোচনা হওয়া উচিত পরিষদে, ব্যক্তিগত বৈঠকে নয়।

মুজিবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এবং সামরিক প্রস্তুতির জন্য আরো সময় নেয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে ইয়াহিয়া ৬ মার্চ ঘোষণা দেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৫ মার্চে

৭২. ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অবাঙালি [illegible] সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লাখ, যাদের অনেকেই বাংলাদেশে বসবাস অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ [illegible] হওয়ার পর বিহারীবিরোধী কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে নি।

৭৩. Maudud Ahmed, *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy*, (Dhaka 1976), 226.

আহ্বান করা হয়েছে। এটা ছিল মুজিবের পূর্বনির্ধারিত ৭ মার্চের জনসভার আগের দিন, যেদিন সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের নেতার ঐতিহাসিক নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। অতীতের মতোই ইয়াহিয়া কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন পুনরায় আহ্বানকে "পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্পূর্ণ ও নিরঙ্কুশভাবে নিশ্চিত করার জন্য তাঁর দৃঢ় সংকল্পমিশ্রিত হুমকি বলে মনে করা হয়। তিনি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, ঐক্য এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রতিও আহ্বান জানান।[৭৪]

এসব হুমকি এবং ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও মুজিব তাঁর পূর্বের অঙ্গীকার মোতাবেক ৭ মার্চ জনগণের সামনে আওয়ামী লীগের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। সেদিন মৃদুমন্দ বায়ুময় প্রশান্ত বিকেলে মুজিব এক অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষণ দিলেন, যেটা পরবর্তীকালের ইতিহাসের একটি মাইলফলক হয়ে থাকলো এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিল। ইয়াহিয়া কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের আরেকটি নতুন তারিখ ঘোষণার জবাবে মুজিব সাহসিকতার সাথে চারটি পূর্বশর্ত তুলে ধরলেন, যেগুলো মেনে নেয়া হলে তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করবেন বলে জানিয়ে দিলেন। শর্তগুলো হচ্ছে : সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে; সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে; সামরিক বাহিনীর গুলিতে প্রাণহানির ঘটনার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ঐতিহাসিক ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সেদিনের বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ তিনি এই আবেগমথিত ঘোষণা দিয়ে শেষ করেন : "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তাঁর উদাত্ত আহ্বানে তিনি জনগণকে তাদের কাছে যাকিছু আছে তা দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বেশ কিছু প্রশাসনিক নির্দেশনামাও জারি করলেন, যেগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবে। যেসকল কট্টরপন্থী পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ঘোষণা আশা করেছিল, মুজিব তাদের হতাশ করলেন; আসলে সেই মুহূর্তে তিনি সাংবিধানিক পন্থার বাইরে যেতে চাচ্ছিলেন না। মুজিব দেখালেন যে তিনিই বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং আন্দোলনের গতিপথও তিনিই নির্ধারণ করছেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব তিনি শাসকগোষ্ঠীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

অসহযোগ আন্দোলনের বিস্ময়কর সাফল্য এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পশ্চাদপসরণ[৭৫] প্রাদেশিক প্রশাসন আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেয়। এতে শাসকগোষ্ঠী একটি রহস্যজনক আপোসনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হলো। কিন্তু একই সময়ে পরবর্তী সামরিক পুনর্মূল্যায়ন চলছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পুনরায় সংগঠিত হওয়া ও সৈন্য

৭৪. Government of Pakistan, *White Paper on the Crisis of Pakistan*, 1971, 11.

৭৫. সেনাবাহিনী যখন বেসামরিক জনগণের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছিল এবং হতাহতদের নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা কেবল বিশাল বহর নিয়ে বেরোতে পারতো। তাছাড়া সেনাসদস্যদের এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গের প্রদেশত্যাগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সামরিক বিমান এবং বাণিজ্যিক পরিবহনের শুন্য ফিরতি ফ্লাইটগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল সামরিক সদস্য ও সরবরাহ আনার জন্য।

মোতায়েন করা, মজুদমাল সরবরাহ করা, যুদ্ধ করার শক্তি বৃদ্ধি করা এবং শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী স্থানীয় দালাল সংগ্রহ করা।

ইয়াহিয়া আবার ঢাকায়

মুজিবকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে রাজি করানোর জন্য এবং নাগরিক আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘটানোর জন্য ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ আবার ঢাকায় আগমন করেন। প্রায় একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু দলগুলোর নেতারাও ঢাকায় আসেন, যাঁরা আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা দাবি করছিলেন।[৭৬] ঢাকায় ইয়াহিয়ার সাথে যোগ দেন প্রধান বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস এবং এম. এম. আহমেদ সহ একদল উপদেষ্টা। মুজিবও একদল আলোচক নিয়োগ করেন, যাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহ্মদ এবং নজরুল ইসলাম। এ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে টিক্কা খান সেনাবাহিনী ও পুলিশের বাড়াবাড়ির ব্যাপারে অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশন গঠন এবং এর কার্যপরিধির ব্যাপারে মুজিবের সাথে কোনো পরামর্শ করা হয় নি। তিনি তাই কমিশনের কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকার করে ১৮ মার্চ এক বিবৃতি প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, "সামরিক আইনের আদেশের মাধ্যমে এটি গঠন করা এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট এর প্রতিবেদন দাখিল করার বিধান আপত্তিকর।"[৭৭]

ইয়াহিয়া ঢাকায় আসার পথে করাচীতে ভূট্টোর সাথে দেখা করেন এবং তখন ভূট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর কাছে স্ব স্ব প্রদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করেন। ১৫ মার্চ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নীতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে ভূট্টো এই মর্মে বিবৃতি দেন যে দুই অংশের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে "সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রযোজ্য নয়।"[৭৮] ভূট্টো বস্তুত দেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'টি সরকার গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার চেয়েও ক্ষমতা ভাগাভাগিতে বেশি আগ্রহী ভূট্টো ইতিপূর্বে দুই প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদীয় দলগুলো পাকিস্তানের বিভাজনের জন্য ভূট্টোর ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।[৭৯] আওয়ামী লীগের মতো

৭৬. Jahan, *Pakistan*, 193. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একটি অংশের নেতা এবং আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য মিত্র ওয়ালী খানও পাঠানদের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করছিল। একইভাবে বেলুচিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও তাদের প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন দাবি করছিল এবং মুজিবের সাথে শলাপরামর্শের জন্য ঢাকায় এসেছিল।

৭৭. *White Paper*, 16.

৭৮. Choudhury, *Last Days*, 163.

৭৯. Zaheer, *East Pakistan*, 149.

তারাও সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে ভূট্টোর বক্তব্য রাখার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে, যেহেতু তাঁর দলের কেবল পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

মুজিব ও ইয়াহিয়া যখন রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনা করছিলেন, তখন টিক্কা খানের বাহিনী তাদের সন্ত্রাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগের নির্দেশনামাকে অগ্রাহ্য করে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ সরকারি কর্মচারীদেরকে কাজে ফিরে আসার আদেশ দেয়। যদিও এ আদেশ মান্য করার চেয়ে লঙ্ঘনের ঘটনাই বেশি ঘটেছিল, তবু এটা ছিল জনগণের জন্য উস্কানিমূলক। জানা যায় যে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশ্যে চাল বহনকারী কয়েকটি জাহাজকে করাচীর দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতে বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ পায়।[৮০] কয়েকদিন যাবৎ চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানকারী পাকিস্তানী জাহাজ এম. ভি. সোয়াত থেকে সরবরাহদ্রব্য খালাস করতে ২০ মার্চ ডকশ্রমিকরা অস্বীকার করে। এর ফলে সামরিক বাহিনীর সাথে জনসাধারণের যে সংঘর্ষ হয়, তাতে প্রচুর বেসামরিক লোক হতাহত হয়। এর পূর্বে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে সামরিক যান চলাচল বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যারিকেড স্থাপনকারী গ্রামবাসীদের উপর সেনাবাহিনী গুলি বর্ষণ করলে প্রচুর রক্ত ঝরে। মুজিব যখন জেনারেল পীরজাদার কাছে এ সামরিক হামলার ব্যাপারে অভিযোগ করেন, তিনি তখন কেবল অভিযোগের বিষয় টুকে রাখেন। আস্থাসৃষ্টির মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার একটি ন্যূনতম শর্ত ছিল যুদ্ধবিরতির আদেশ প্রদান। সামরিক অস্ত্রসম্ভার আঘাত হানার জন্য যখন বেরিয়ে আসা শুরু হলো, তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্যের বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে এলো।

খসড়া ঘোষণা

১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় মুজিব ৭ মার্চ উপস্থাপিত তাঁর চার দফা দাবির ব্যাপারে ইয়াহিয়ার অবস্থান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট জবাব চাইলেন। ইয়াহিয়া পরিষ্কার ইঙ্গিত দিলেন যে তাঁর কোন আপত্তি নেই এবং ঐ চারটি দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান রচনা করা যেতে পারে।[৮১] সুদীর্ঘ আলোচনার পর মুজিব আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দেন। এ আলোচনায় মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু নেতাদের সমর্থন করেন। এই লক্ষ্যে ২০ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া সাময়িকভাবে একটি খসড়া ঘোষণা দানের ব্যাপারে সম্মতি জানান, যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল : রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা বেসামরিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর; প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর; অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সবকারের নিয়ন্তা

৮০. Dunbar, 'Pakistan', . 456.

৮১. তাজউদ্দীনের বিবৃতি। এর পূর্বে ইয়াহিয়া ৭ মার্চের দাবিগুলোর ব্যাপারে কোন অবস্থান নেয়া থেকে বিরত থাকেন।

হিসেবে ইয়াহিয়া বহাল থাকা; সংবিধান চূড়ান্তকরণের জন্য পরিষদের যৌথ অধিবেশনের পূর্বে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পরিষদ-সদস্যদের পৃথক প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠান; ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে ক্ষমতা প্রদান, তবে তারা প্রেসিডেন্টের সম্মতি সাপেক্ষে এবং পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি মোতাবেক স্বাধীনভাবে নিজস্ব স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। স্থির হয় যে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা হিসেবে প্রকাশিত হবে।[৮২] কয়েকবার পরিবর্তনের পর খসড়ায় সম্মতি জানালেও ইয়াহিয়া মুজিবকে বলেন যে খসড়ার প্রতি অবশ্যই ভূট্টোর সম্মতি থাকতে হবে এবং তিনি আরো সন্তুষ্ট হবেন যদি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারাও এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছয় দফার মূল উপাদানগুলো অক্ষুণ্ন রেখে সাংবিধানিক ফর্মুলা হিসেবে মুজিব-ইয়াহিয়া সমঝোতার গুজব[৮৩] ভূট্টোকে আতংকিত করে তোলে। যদিও তিনি ইতিপূর্বে ঢাকায় আসার জন্য ইয়াহিয়ার একটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এখন তিনি তাড়াহুড়ো করে ২১ মার্চ ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর ঢাকায় আগমনের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর এক দীর্ঘ বৈঠকের পর তিন প্রধান পক্ষ পরের দিন (২২ মার্চ) বৈঠকে মিলিত হয়, যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।[৮৪] ভূট্টো খসড়ার অধিকাংশ বিধানেরই তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব, যা আওয়ামী লীগের মৌলিক অবস্থান হিসেবে নয়, বরং ভূট্টোকে আমল দেয়ার জন্য প্রথমেই ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেছিলেন। অধিকন্তু, সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে ক্ষমতার শূন্যতা সৃষ্টি হবে এ ধরনের আইনগত আপত্তিও তিনি তোলেন। ভূট্টো খসড়ার ফর্মুলাকে "কনফেডারেশন গঠনের এমন এক প্রচ্ছন্ন চার্টার বলে আখ্যায়িত করেন যাতে সাংবিধানিক বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ লুকিয়ে আছে।"[৮৫] তবে খসড়াটি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে ভূট্টো নতুন কোনো আপোসপ্রস্তাব বা নতুন ধ্যানধারণা উপস্থাপন করেন নি। এই ফর্মুলা ভূট্টো কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সেসকল হামসাচ্চা জেনারেল স্বস্তিবোধ করেন, যাঁরা মনে করেছিলেন যে ইয়াহিয়া খুব বেশি দূর এগিয়ে গেছেন এবং কেবল অস্ত্রের ভাষাই পাকিস্তানের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে।

ইয়াহিয়া খসড়ায় ভূট্টোর সম্মতি নিতে কোনো প্রচেষ্টা চালান নি, কারণ তিনি জানতেন যে সামরিক বাহিনী প্রভূত পরিমাণে খসড়াটির বিরোধিতা করেছে এবং শক্তিশালী জেনারেলদের সমর্থনপুষ্ট হয়েই ভূট্টো খসড়াটি প্রত্যাখ্যানের সাহস পেয়েছিলেন।[৮৬]

---

৮২. ইয়াহিয়া, ভূট্টো এবং তাজউদ্দীনের বিবরণ মোটামুটি একই রকম। দেখুন, *White Paper*, Appendix E; Bhutto, *Great Tragedy*, 40, and Tajuddin Ahmed, *Statement*.

৮৩. সম্পূর্ণ খসড়ায় এমনকি নতুন প্রদেশ হিসেবে 'বাংলাদেশ'-এর নাম উল্লেখ করা হয়।

৮৪. এই শেষবার মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা করেন।

৮৫. Bhutto, *Great Tragedy*, 11.

৮৬. Choudhury, *Last Days*, 106.

জনগণের উপর মুজিবের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং ছয় দফার ব্যাপারে তাঁর আপোসহীন সাহসী অবস্থানের কারণে ইয়াহিয়া, ভূট্টো এবং জেনারেলরা মুজিবকে সমীহ করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন।[৮৭] তবে স্পষ্টত মুজিবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের এসকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা তাঁকে জাতীয় নেতার অবস্থানে মেনে নিতে সম্মত ছিলেন না। ভূট্টো একবার বক্তব্য রাখেন যে মুজিব তাঁকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলেছিলেন যে সামরিক বাহিনীকে বিশ্বাস করা যায় না, অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হলো খসড়ার প্রতি ভূট্টোর সম্মতি জানানো, এবং এমনকি দুটি প্রদেশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবও তিনি রাখেন।[৮৮] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মুজিব বাস্তবিকই যদি এ প্রস্তাব রাখতেন, তা হলে ভূট্টো অবশ্যই তা মেনে নিতেন। যদিও এ ব্যক্তিগত আলাপচারিতার অন্য কোনো সাক্ষী ছিল না, এ কথা বলা যায় যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে হলেও মুজিব ছয় দফা বাস্তবায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। উক্ত খসড়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর এ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নির্ধারণে শাসকগোষ্ঠীর অনড় অবস্থানের কারণে হতাশ হয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। দিনটির জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচি ছিল জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার আরেকটি বলিষ্ঠ নিদর্শন। এ দিনের জনসমাবেশ ও গণবিক্ষোভ এবং ভাষাগত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে আয়োজিত কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠান বাঙালি চেতনাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। ৩১ বছর পূর্বে এই দিনেই একজন বাঙালি নেতা কর্তৃক উপস্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাব লাহোরে গৃহীত হয়েছিল। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এই তারিখেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের দাবির মুখে নতশির হলো পাকিস্তান। এক বিশাল ও উত্তাল জনসমাবেশে মুজিবের উপস্থিতিতে সেদিন ছাত্ররা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিল এবং পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেয় নি। কিন্তু জনগণের প্রতিবাদ এবং বিরাজমান অস্থিরতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরল বিশ্বাসে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার সংশোধনী বিবেচনার জন্য আলোচনা চালিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সদস্যরা যখন ২৪ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন তখনো আলোচনা ভেঙে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। ২৫ মার্চ ভূট্টোর সংবাদসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে বিবদমান দলগুলো নীতিগত সমঝোতায় উপনীত হয়েছিল।[৮৯] ২৪ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টারা যখন ইয়াহিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেন, পীরজাদা তখন উক্ত খসড়া

৮৭. পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া ও ভূট্টো বলেছিলেন যে মুজিব তাঁদেরকে জানিয়েছিলেন যে ছয় দফা ছিল আলোচনার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য বিষয়; কিন্তু তাঁরা এর কোন প্রমাণ দেখান নি। ১৯৬৬ সাল থেকেই ছয় দফা ছিল আওয়ামী লীগের মূল স্তম্ভ এবং এ থেকে যেকোন তাৎপর্যপূর্ণ বিচ্যুতি হতো আত্মহত্যার সামিল।

৮৮ .Choudhury, *Last Days*, 108.

৮৯. *Dawn*, March 26

চূড়ান্তকরণের জন্য পরের দিন সকালে একটি সম্ভাব্য চূড়ান্ত বৈঠকের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছিলেন।[৯০]

পরিস্থিতির আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি এবং আশু আপোসরফার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া অকস্মাৎ ২৫ মার্চ অপরাহ্ণে ইসলামাবাদ ফিরে যান এবং সেদিন সন্ধ্যায়ই টিক্কা খানের জরুরি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই সময়ে আওয়ামী লীগের প্রতি কোনো চরমপত্র বা শেষ প্রস্তাব দেয়া হয় নি এবং কোনো সান্ধ্য আইনের আদেশও জারি করা হয় নি যখন পাক সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অরক্ষিত জনগণকে আক্রমণ করে ইতিহাসের জঘন্যতম এবং নিন্দনীয় হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা সম্পাদন করে।

ইয়াহিয়া ২৬ মার্চ প্রদত্ত ভাষণে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করার পরিকল্পনা করার জন্য আওয়ামী লীগকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর সরকার কখনোই উক্ত পরিকল্পিত বিদ্রোহের কোনো প্রমাণ প্রদর্শন কবতে পারে নি। স্পষ্টত এটা ছিল সামরিক অভিযানের পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য একটি ছলমাত্র। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়; আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং সংবাদমাধ্যমের উপর কড়া সেন্সরসীপ আরোপ করা হয়। ভূট্টো প্রায় সকল পর্যায়েই গঠনমূলক ভূমিকা রাখা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু তিনি সামরিক অভিযানকে এই বলে স্বাগত জানান যে, " খোদাকে ধন্যবাদ, পাকিস্তান রক্ষা পেল"।[৯১] এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ভূট্টোর সম্মতি ছাড়া সেনাবাহিনী সামরিক সমাধান বেছে নিত না। কারারুদ্ধ হওয়ার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিব বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং জনগণকে চূড়ান্ত ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান। এরপর এক বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।[৯২]

৯০. Zaheer, *East Pakistan*, 157.
৯১. *Dawn, March*, 27, 1971.
৯২. মুক্তিযুদ্ধের বিবরণের জন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলো দেখুন।

২১

মুক্তিযুদ্ধ : সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধ

কে. এম. মোহসীন*
মেজর রফিকুল ইসলাম**

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে আক্রমণ করার ফলে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসে নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা কবলিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি দুর্জয় আক্রোশে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[১]

সর্বস্তরের জনগণ বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং বাংলাদেশের নগরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে অমিততেজে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধযুদ্ধ আরম্ভ করে। ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক, কৃষক ও লক্ষ লক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে। তারা যার যা আছে তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত বাঙালি সৈন্য, ইপিআর সৈন্য, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে একতাবদ্ধ হয়। মুষ্টিমেয় পাকিস্তানপন্থী দালাল ব্যতীত সমগ্র বাঙালি জাতি পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।[২]

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** নিবন্ধকার ও গবেষক। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে পিএইচ. ডি। সামরিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১. The Editorial, *The Times*, London, 3 April 1971.
২. *The Saturday Review*, USA, 22 May, 1971.

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কেবলমাত্র বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকারই হন নি, তাঁরা পেয়েছেন অসম ব্যবহার ও নিদারুণ অবহেলা। বাঙালির সমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানী শাসকদের চোখে তাঁরা নিম্নশ্রেণী হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি ক্রমশ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবহেলিত, বঞ্চনাক্লিষ্ট জনগণের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। জনগণ সম্পদের সমান অধিকার, সুষম উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার দাবি করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত বাঙালি সৈন্যরাও নিদারুণ অবহেলার শিকার হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। বাঙালি অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি পাকিস্তানীদের কোন আস্থা ছিল না। মেধা থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পদ দেয়া হয় নি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় নি।[৩]

সেনাবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী অফি রেরা বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের তিহাসে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার যে স্ফূরণ ঘটে, বাঙালি সামরি ও তা সমভাবে উদ্দীপ্ত করে। ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ছয় দফা আদায়ের সংগ্রাম এবং ঊনসত্তরের মহান গণআন্দোলন সর্বস্তরের জনগণ ও বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদেরকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। বিশেষত সত্তরের নির্বাচনী রায় বানচাল করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত সামরিক শাসক ও পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানী গণহত্যা থেকে রক্ষা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ঐতিহাসিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমি পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দীর্ঘ ন'মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে জনগণ এবং সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর বাঙালি সৈন্যরা অসীম বীরত্ব ও সুমহান দেশপ্রেমের অঙ্গীকারে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যে দুর্জয় আক্রোশে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ করেছিল, এ অধ্যায়ে শুধু সেই অগ্নিপ্রভ সময়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

দখলদার পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর তুলনামূলক চিত্র

বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৬০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ ভূখণ্ডের তিন দিক ভারতীয় এলাকা দ্বারা

৩. Major General K. M. Shafiullah, PSC, Bir Uttam, *Bangladesh at War* (Dhaka 1989), 7

বাংলাদেশ ও বার্মার মধ্যে সামান্য আন্তর্জাতিক সীমানা আছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পার্বত্য চট্টগ্রাম গহীন অরণ্য ও পর্বতমালায় পরিপূর্ণ থাকায় কোন পরিকল্পিত সামরিক অভিযান সম্ভব ছিল না। পশ্চিম দিকে বিশাল সমতল পলিভূমি। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদী এই সমতল এলাকাকে চারটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এতদ্ব্যতীত কয়েক শত ছোট-বড় নদী-নালা মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবাহিত। এ ছাড়াও রয়েছে অনেক জলাভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাল বনভূমি সুন্দরবন এবং উত্তরে টাঙ্গাইলের মধুপুর জঙ্গল অবস্থিত।

সারাদেশে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ষাকাল। প্রতিবছরই বন্যায় বিশাল এলাকা প্লাবিত হয় এবং দেশের যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাহত হয়। তখন জলযান ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও কিছু সময় অভিযানকারী দলের জন্য নরম মাটি অনুপযুক্ত থাকে। পরে অবশ্য সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ পুনরায় সচল হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের উল্লিখিত ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চতুর্দশ ডিভিশন সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সজ্জিত ছিল। ঢাকায় এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকসহ ৫৭ ব্রিগেড অবস্থিত ছিল এবং যশোরে ছিল ১০৭ ব্রিগেড। বেসামরিক প্রশাসন অধিগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব এই দুই ব্রিগেডকে প্রদান করা হয়। পরে উভয় ব্রিগেডকেই বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৫৭ ব্রিগেডের ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে ঢাকা সেনানিবাসে রিজার্ভ হিসেবে মোতায়েন করা হয় এবং ঢাকা সেনানিবাসের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৪৩ হাল্কা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টকে ঢাকা বিমান বন্দরে মোতায়েন করা হয়। ২২ বেলুচ রেজিমেন্টকে পূর্ব থেকেই পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দপ্তরে মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ব্যাটালিয়নকে পিলখানায় অবস্থানরত প্রায় ২৫০০ বাঙালি ইপিআর সৈন্যকে নিরস্ত্র করার আদেশ দেওয়া হয়। এদেরকে অয়ারলেস এক্সচেঞ্জ দখল করার আদেশও দেওয়া হয়। ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে প্রায় ১০০০ বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করার আদেশ দেওয়া হয়। ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পুরাতন ঢাকার নওয়াবপুর এলাকায় মোতায়েন করা হয় এবং শেরে বাংলা নগরে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় ফিল্ড রেজিমেন্টকে পার্শ্ববর্তী মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় বসবাসরত বিহারীদের রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করা হয়। এ ছাড়া ১৮ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি, ২২ বেলুচের এক কোম্পানি ও ৩২ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বিশেষ করে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং

এক প্লাটুন কমান্ডোকে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হয়। এম-২৪-এর এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ২৬ মার্চ রাতে ঢাকার নগরবাসীদের সন্ত্রস্ত করতে রাজপথ প্রকম্পিত করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়।[৪]

যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত ১০৭ ব্রিগেডের পাকিস্তানী সেনাদল খুলনা এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু যে পাকিস্তানী সেনাদল ঝিনাইদহ, ঈশ্বরদী ও বেনাপোল অভিমুখে যাত্রা করে, তারা যশোর থেকে ছয় মাইল অতিক্রম করার আগেই মারমুখী জনতার তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই ব্রিগেডের কুষ্টিয়া শহরে অবস্থানরত ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ২৫ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা বেনাপোল-যশোর বিমানবন্দর এলাকায় আটকে পড়ে। বিমানবন্দরটি বিমান অবতরণের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এভাবে এই ব্রিগেডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর জন্য ঢাকা সদর দপ্তরকে অনুরোধ করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ঢাকা থেকে যশোর আসে এবং এই ব্রিগেডের সঙ্গে যোগ দেয়।

রংপুর-সৈয়দপুর এলাকায় ২৩ ব্রিগেড অবস্থিত ছিল। রাজশাহী উপশহরে অবস্থিত ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট জনগণের স্বতস্ফূর্ত আক্রমণের মুখে পড়ে। ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য পাবনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের এক কোম্পানি সৈন্য দিনাজপুরে যায়। ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টকে বগুড়া দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত ২৯ ক্যাভালরি, ইনজিনিয়র ব্যাটালিয়নের দুই কোম্পানি সৈন্য (এক কোম্পানি ১০ ইনজিনিয়র ব্যাটালিয়নের, অপর কোম্পানিটি ৬ ইনজিনিয়র ব্যাটালিয়নের), সিগন্যাল কোম্পানি এবং ফিল্ড এমবুলেন্স এই ব্রিগেডের অধীনস্থ ছিল এবং রংপুরে অবস্থান করছিল।

২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স অবস্থিত ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। ইনজিনিয়র সেনাদল এবং ১২০ মিলিমিটার মর্টার সজ্জিত ৮৮ মর্টার ব্যাটারি ২৬ মার্চ রাত ১টার সময় চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা সেনানিবাসে পৌঁছে। ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি এবং ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন কুমিল্লাস্থ ৫৩ ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সিলেটে ব্রিগেড সদর দপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। ২০ বেলুচ রেজিমেন্ট, ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি এবং নেভাল বেইস চট্টগ্রামে অবস্থিত ছিল। ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন অবশ্য কুমিল্লা থেকে পরে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়।[৫]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানের খারিয়ান সেনানিবাস থেকে ৯ ডিভিশন ঢাকায় আসে। মেজর জেনারেল শওকত রেজা এই ডিভিশনের জিওসি নিযুক্ত হন। মে

৪. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, (Oxford 1977), 72-3
৫. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 83

মাসের শেষ সপ্তাহে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা এই ডিভিশনের দায়িত্বে দেওয়া হয়। ১৪ ডিভিশনের আওতাধীন ২৭ ব্রিগেডকে ময়মনসিংহে পাঠানো হয় এবং ৩১৩ ব্রিগেডকে সিলেট প্রেরণ করা হয়। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট পূর্ব থেকেই সিলেটে অবস্থান করছিল। ৫৩ ব্রিগেড কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয় এবং তদস্থলে ১১৭ ব্রিগেডকে কুমিল্লায় পাঠানো হয়।

১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা অধিকার করে এবং এই ব্রিগেডের ৩৩ বেলুচকে চাঁদপুর পুনর্দখল করার জন্য পাঠানো হয়। অপর একটি সেনাদলকে আখাউড়া দখলের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সেনাদলটি আখাউড়ায় তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এপ্রিল মাসে কোয়েটা সেনানিবাস থেকে ১৬ ডিভিশনকে ঢাকায় আনা হয় এবং সম্পূর্ণ উত্তর বাংলা এই ডিভিশনের আওতাধীন করা হয়। ময়মনসিংহ, ঢাকা ও যশোর এলাকা ১৪ ডিভিশনের যুদ্ধএলাকা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।[৬]

৫৭ ব্রিগেড ঢাকায় অপারেশনের পর যমুনা অতিক্রম করে যশোরস্থ নবম ডিভিশনের সঙ্গে যোগ দেয়। ২৭ ব্রিগেডকে ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রার পূর্বে কুমিল্লা-সিলেট রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ভৈরব বাজারে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিশাল মেঘনা নদী অতিক্রমের জন্য পাকিস্তানী সৈন্যদের নদী অতিক্রম অপারেশন করতে হয়। ট্যাংক, হেলিকপ্টার, বিমান ও গানবোট ৭২ ঘন্টাব্যাপী এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

৫৭ ব্রিগেডকে রাজশাহীতে বিধ্বস্ত ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে রক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। সড়ক ও নদীপথে পাক সেনাদল ৮ এপ্রিল ঢাকা থেকে অগ্রসর হয় এবং ১৪ এপ্রিল রাজশাহী পৌঁছে। পূর্বে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ২৭ ব্রিগেড ময়মনসিংহ অভিমুখে অগ্রসর হয়।

লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি ১১ এপ্রিল, ১৯৭১ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। টিক্কা খানকে এই কমান্ডের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাঁকে গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিয়াজি ইপিআর-এর স্থলে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস (ইপিসিএএফ) গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।[৭] এই বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ব্যক্তিবর্গ এবং বাঙালি রাজাকারদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। মেজর জেনারেল জামসেদকে এই নতুন বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত

৬. পূর্বোক্ত, ৪৪.

৭. পাকিস্তানপন্থী এবং ধর্মান্ধ লোকদের সমন্বয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের সহযোগিতা এবং বেসামরিক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাজাকারবাহিনী গড়ে তোলা হয়। অনুরূপভাবে আলবদর ও আল সামস বাহিনী গঠন করা হয়। এসব পাকিস্তানী দালাল বাংলাদেশের অভ্যুদয় রোধ করার জন্য মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

করা হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও স্বাধীনতার সমর্থক ব্যক্তিদের ধ্বংস, নির্যাতন ও হয়রানি করার দায়িত্ব এই বাহিনীর উপর অর্পণ করা হয়। এই বাহিনীতে প্রায় ৪০,০০০ অশিক্ষিত, অল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ধর্মান্ধ ব্যক্তি যোগ দেয়, যাদের কোন আদর্শ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশন ঢাকা, ময়মনসিংহ ও যশোরে, ৯ ডিভিশন মেঘনার পূর্বে চট্টগ্রাম ও সিলেটে এবং ১৬ ডিভিশন উত্তর বাংলায় মোতায়েন করা হয়। এ ছাড়া দেশের সর্বত্র ছিল নবগঠিত ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস। সারাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যরা ও তাদের সহযোগী দোসররা নিরপরাধ ও নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ শুরু করে, যা সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে সুপরিকল্পিত গণহত্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়।

আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সৈন্যদের তুলনায় সাড়ে সাত কোটি বিদ্রোহী বাঙালি জনগণ ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত কয়েক হাজার বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, আধাসামরিক আনসার বাহিনীতে চাকুরিরত বাঙালি এবং অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈন্যরা ব্যতীত অবশিষ্ট জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষিত ছিল না।

তথাপি বাঙালি জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জনগণ অমিততেজে ও দুর্জয় আক্রোশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং দখলদার পাকবাহিনীকে ধ্বংস করে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তারা অসীম সাহস আর দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়। সর্বস্তরের জনগণ, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী বাঙালি ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে জনগণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করে এবং প্রচণ্ড প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিরস্ত্র জনগণ বাঁশের লাঠি, সড়কি ইত্যাদি দিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অসীম সাহস, সুগভীর দেশপ্রেম ও দৃঢ়চিত্তই ছিল জনগণের একমাত্র সম্বল।

১৯৪৮ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জন্মলাভ করে। এই রেজিমেন্টের জন্মলগ্ন থেকেই তা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিমাতাসুলভ আচরণ পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেখানে পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্টের ৪০টি ব্যাটালিয়ন ছিল এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও আজাদ কাশ্মীর-এর ৩০টি ব্যাটালিয়ন ছিল, সেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়নের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টি। সপ্তম ও অষ্টম ব্যাটালিয়ন গঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে। কিন্তু এ দু'টি ব্যাটালিয়ন আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল না। সৈনিকদের প্রশিক্ষণও উন্নতমানের ছিল না। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই আটটি ব্যাটালিয়নের মধ্যে তিনটি ব্যাটালিয়ন অবস্থান করছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পঞ্চম ব্যাটালিয়ন অবস্থিত ছিল শিয়ালকোটে এবং এর অধিনায়ক

ছিলেন লেঃ কর্নেল এম. এ. রউফ। মুক্তিযুদ্ধকালে এই ব্যাটালিয়নকে ওয়াগা সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য লাহোর ফ্রন্টে আনা হয়। যুদ্ধের সময় এই ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানি সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। লেঃ কর্নেল ফিরোজ সালাউদ্দিন ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি তাঁকে ঢাকায় বদলি করা হলে লেঃ কর্নেল মাশুরুল হক এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। সপ্তম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল এইচ. এম. এরশাদ। এই ব্যাটালিয়নটি করাচীর মালির সেনানিবাসে অবস্থিত ছিল। বাকী ব্যাটালিয়নগুলো পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল এবং এই ব্যাটালিয়নগুলো বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত ছিল এবং এই ব্যাটালিয়নটির অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল রেজাউল জলিল। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ঢাকা থেকে ২৫ মাইল দূরে জয়দেবপুরে অবস্থান করছিল। এই ব্যাটালিয়নটির অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল মাসুদুল হোসেন খান। ২৪ মার্চ, ১৯৭১ তাঁকে কমান্ড থেকে অপসারণ করে অপর একজন বাঙালি অফিসার লেঃ কর্নেল রকিবকে পদস্থ করা হয়। তৃতীয় ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল ফজল করিম এবং এই ব্যাটালিয়নটি সৈয়দপুরে অবস্থিত ছিল। চতুর্থ ব্যাটালিয়ন অবস্থিত ছিল কুমিল্লায় এবং এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত, একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার। অষ্টম ব্যাটালিয়ন অবস্থিত ছিল ষোল শহর, চট্টগ্রামে। একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন। এই ব্যাটালিয়নটি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হচ্ছিল এবং এর দুই কোম্পানি সৈন্য ইতিমধ্যে খারিয়ান সেনানিবাসে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অবশিষ্ট সৈন্যদের পরবর্তী জাহাজে পশ্চিম পাকিস্তানের পথে যাত্রা শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল।

এতদ্ব্যতীত নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত একজন বাঙালি অফিসার লেঃ কর্নেল মুশতাককে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নবম ব্যাটালিয়ন সংগঠিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অপর একজন বাঙালি অফিসার লেঃ কর্নেল মুইদউদ্দিনকে ঢাকা সেনানিবাসে দশম ইস্ট বেঙ্গল গঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই ব্যাটালিয়নটি জাতীয় সার্ভিস স্কীমের আওতায় কলেজের ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

এ ছাড়াও পদাতিক বাহিনীর বাইরে অন্যান্য সার্ভিস ইউনিটে শতকরা পাঁচ ভাগ বাঙালি সৈন্য ছিল। সব মিলিয়ে ইস্টার্ণ কমান্ডের অধীনে প্রায় ছয় সহস্রাধিক বাঙালি সৈন্য চাকুরিরত ছিল। সেনাবাহিনী ছাড়াও তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স (ইপিআর)-এ কর্মরত বাঙালি সৈনিকরা মুক্তিবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইপিআর-এর প্রায় পনেরো হাজার বাঙালি সৈনিক সমগ্র দেশে, বিশেষত সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন ছিল। সীমান্ত এলাকায়

অবস্থানের ফলে তাদের পক্ষে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া সহজ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় বিশ হাজার পুলিশ, কয়েক হাজার অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আনসার ও মুজাহিদ মুক্তিবাহিনীর শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে সকল স্তরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থনের ফলে সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। কিন্তু সম্ভবত যুদ্ধপরিকল্পনা ও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার অভাবে কোন সমন্বিত প্রয়াশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

প্রাথমিক প্রতিরোধ

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট বাঙালি জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। জনগণ যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সমঝোতাবৈঠক চলাকালে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভরত জনগণ যুদ্ধ করার মানসিকতা প্রদর্শন করছিল। অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যরা পল্টন ময়দানে কেবল মার্চপাস্ট করেই ক্ষান্ত হলো না, তাঁরা উদ্দীপ্ত তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আরম্ভ করলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা অস্ত্রপ্রশিক্ষণ ও শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করতে শুরু করলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল সমগ্র জাতি যেন স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদানের আহ্বানের জন্য অত্যন্ত সচেতনভাবে অপেক্ষা করছিল।

পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রবোঝাই জাহাজ এম.ভি. সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছে। চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ডের শ্রমিকরা অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে পূর্ণ হরতাল করার ফলে জাহাজটির বন্দরে নোঙ্গর করতে এক সপ্তাহ বিলম্ব ঘটে। পি.এন.এস. জাহাঙ্গীর ও অন্যান্য জাহাজগুলোও গভীর সমুদ্রে অপেক্ষা করছিল। এসব অস্ত্রসম্ভার বহনকারি জাহাজের সমাবেশে পাকিস্তানীদের হীন উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ই.বি.আর.সি)-এর কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ব্রিগেডিয়ার এম.এইচ. আনসারীকে পদস্থ করা হয়, যিনি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ খালাশ করার জন্য বেপরোয়াভাবে শক্তি প্রয়োগ করেন। বহু বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। ই.বি.আর.সি'র রিক্রুট সৈন্যদেরকে জাহাজ খালাশ করতে অস্বীকার করার কারণে হত্যা করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চট্টগ্রামে অবস্থিত বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার হীন উদ্দেশ্যে একদল পাকিস্তানী সৈন্যসহ ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব জয়দেবপুরে আসেন। বেলা ১টা ত্রিশ মিনিটে ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুর পৌঁছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লেঃ কর্নেল জাহেদ, মেজর জাফর (ব্রিগেড মেজর), তিনজন ক্যাপ্টেন ও

সত্তর জন সৈন্য। পাকিস্তানী সৈন্যরা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করার জন্য জয়দেবপুর আগমন করেছে এই খবর চারিদিকে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি সৈন্যদের সচেতনতা ও প্রস্তুতি দেখে তাদের নিরস্ত্র করতে গেলে সংঘর্ষ হতে পারে এই ভয়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাব বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। কিন্তু উত্তেজিত জনতা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে রেলওয়ে ক্রসিং-এর উপর শক্ত বেরিকেড তৈরি করে। দিনটি ছিল শুক্রবার। সাপ্তাহিক বাজারের দিন হওয়ায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে।

জনতা বেরিকেডের উভয় পাশে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বেরিকেড সরাতে অস্বীকার করে। এই বেরিকেড সৃষ্টির ফলে ব্রিগেডিয়ার আরবাব ও তাঁর সেনাদল জয়দেবপুর খেকে ঢাকা যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাঙালি মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী যখন উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেসময় ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাঁর সেনাদলসহ হাজির হন। ব্রিগেডিয়ার আরবাব ও পাকিস্তানী সৈন্যদের দেখে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো যখন দুইজন বাঙালি সৈন্য গাড়ির ড্রাইভার ও হেলপারসহ সেখানে এসে বর্ণনা করলো কীভাবে তারা জনতা কর্তৃক প্রহৃত হয়েছে এবং কোনভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তারা একটি ট্রাকে চড়ে টাংগাইল থেকে রেশন সংগ্রহের জন্য জয়দেবপুরে আসছিল। যখন ট্রাকটি রাজবাড়ির দিকে আসছিল তখন জনতা ট্রাকটি থামায় এবং পাঁচজন সৈন্যকে চাইনিজ রাইফেল ও সাব মেশিনগান সহ ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব মেজর মঈনকে গুলিবর্ষণ করে বেরিকেড সরিয়ে ফেলতে আদেশ দেন। সমবেত জনতাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যথারীতি ফ্ল্যাগ প্রদর্শন করে সকলকে সতর্ক করা হয়। মেজর মঈন গুলিবর্ষণের আদেশ দেন বটে কিন্তু বাংলায় পায়ের নীচে অথবা মাথার উপর দিয়ে গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। এ সময় বাঙালিরাও পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। ব্রিগেডিয়ার আরবাব এর ফলে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং চিৎকার করতে থাকেন, "একটা গুলির বদলে আমি একটি মৃতদেহ চাই। তুমি যদি পরিস্থিতি সামাল দিতে না পার তাহলে আমি আমার সৈন্য নিয়োগ করব।" গুলিবর্ষণের ফলে দুইজন নিহত ও একজন গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় পরিস্থিতি বিপজ্জনক মোড় নেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা বেরিকেডের পেছন দিক দিয়ে মসজিদের ছাদ থেকে চাইনিজ সাব-মেশিনগান দিয়ে গুলি বর্ষণ করে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের কয়েকজন সৈন্য আহত হয়। ব্রিগেডিয়ার আরবাব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এটাই ছিল জনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ।[৮]

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ১৫ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের আড়ালে কালক্ষেপণ করে সৈন্য সমাবেশ করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও

৮. Major General K M. Shafiullah, PSC Bir Uttam, *Bangladesh at War*, 21-22.

অস্ত্রসম্ভার এনে গণহত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং অনুমোদিত হয়। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চলাইট। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেন। মেজর জেনারেল খাদিম রাজা তাঁর অধীনস্থ ব্রিগেড ও ইউনিটসমূহের মধ্যে অস্ত্রসম্ভার-রসদ বিতরণ ও দায়িত্ব বণ্টন করেন। পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী ষোলটি অনুচ্ছেদ সম্বলিত অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনাটি ২০ মার্চ অপরাহ্নে ফ্লাগ স্টাফ হাউজে জেনারেল হামিদ ও টিক্কা খানকে পড়ে শোনানো হয়। পরে ইয়াহিয়া খান সামান্য সংশোধন করে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।[৯]

বাঙালি জাতিকে আক্রমণ করার সময় নির্ধারিত হয় ২৬ মার্চ রাত ১টা। অনুমান করা হয়েছিল যে ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিরাপদে করাচী অবতরণ করবেন। অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা অনুযায়ী দু'টি সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। মেজর জেনারেল ফরমানকে ঢাকা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ব্রিগেডিয়ার আরবাবের অধীনস্থ সাতান্ন ব্রিগেডকে এই অপারেশনের জন্য নিয়োগ করা হয়। অপরদিকে বাংলাদেশের অবশিষ্ট এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করার জন্য মেজর জেনারেল খাদিমকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অপারেশন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন লেঃ জেনারেল টিক্কা খান। দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় সামরিক আইন সদর দপ্তরে অবস্থান করে ২৬ মার্চ সারা রাত্রি টিক্কা খান অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা ও এর অগ্রগতি সমন্বয় করেন।[১০]

ঢাকা শহরের জঙ্গি ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীরা সেনানিবাসের বাইরে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকিস্তানী বাহিনীর অগ্রাভিযানে বাধা প্রদানের জন্য বড় বড় সড়কের উপর অসংখ্য বেরিকেড গড়ে তোলা হয়। আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সৈন্যরা অভিযান শুরু করার আদেশের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষারত ছিল। এ সময় ঢাকা সেনানিবাসস্থ পাকিস্তানী সৈন্যদের বিভিন্ন স্তরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বিক্ষুব্ধ বাঙালি কর্তৃক সেনানিবাস আক্রমণ অত্যাসন্ন। পাকিস্তানী সৈন্যরা এ ধরনের গুজবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় অধিনায়করা অপারেশন শুরু করার সময় (H- hour)* এগিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে। রাত এগারটা ত্রিশ মিনিটে অয়ারলেসসজ্জিত জীপগুলো এবং পাকিস্তানী সৈন্য বহনকারী ট্রাকসমূহ বেরিয়ে পড়ে।

পাকিস্তানী বাহিনীর প্রথম দলটি সেনানিবাস থেকে এক কিলোমিটার দূরে ফার্মগেটে প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয়। বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে এখানে রাস্তার উপর বিরাট রোডব্লক তৈরি

* H. hour-এর অর্থ আপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী আঘাত হানার সময়।

৯. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, 218-224

১০. পূর্বোক্ত, 71.

করা হয়েছিল। ভাঙা গাড়ি এবং স্টীম রোলার রাস্তার ওপরে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানীদের বেরিয়ে আসতে দেখে শত শত বাঙালি 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকে। এই প্রতিরোধ মাত্র পনের মিনিট স্থায়ী হয়। মেশিনগানের গুলিবর্ষণের প্রচণ্ড শব্দে জনতার 'জয় বাংলা' স্লোগান তলিয়ে যায়।

বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা সামনে যা-কিছু পায় সবই ধ্বংস করে এবং যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে। ফুটপাতে ঘুমন্ত আশ্রয়হীন দরিদ্র জনগণও রেহাই পায়নি। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হল আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে ছাত্রদের হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু খ্যাতিমান ও যশস্বী শিক্ষককে হত্যা করা হয়। ডঃ জি. সি. দেব, ডঃ মনিরুজ্জামান, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সবার প্রিয় মধুদা ও অসংখ্য কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। এটি ছিল ঠাণ্ডা মাথায় শিক্ষিত যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের জঘন্য হত্যাকাণ্ড। পুরানো ঢাকার হিন্দু এলাকা আক্রমণ করে তারা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে, বাড়িঘর ভস্মীভূত করে, সম্পদ লুটপাট করে এবং নারীধর্ষণ করে।[১১]

লেঃ কর্নেল জেড. এ. খান ও মেজর বেলাল পঞ্চাশ জন সৈন্যের একটি কমান্ডো গ্রুপ সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। রাত প্রায় ১টা ত্রিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সুপরিকল্পিত গণহত্যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রে রাশি রাশি মৃতদেহ ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর ছবিসহ মানব-ইতিহাসে বিরল এই গণহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে।*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যখন গ্রেফতার করা হয় ঢাকা শহর তখন জ্বলছে। তখন স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসের মাধ্যমে ইথারে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে রেকর্ডকৃত এই বাণীতে বলা হয়, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

> এটাই আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমাদের যার যা-কিছু আছে তাই নিয়ে যে যেখানে আছ দখলদার পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ কর। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর সমস্ত সৈন্য অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চলবে। জয় বাংলা।[১২]

১১. *Bangladesh Documents*, Foreign Ministry of India, Vol. 1, 402.

* সাইমন ড্রিং কর্তৃক প্রেরিত গণহত্যার প্রতিবেদন, ৩০ মার্চ '৭১, ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত হয়। টাইম্স ও ডেইলি টেলিগ্রাফেও ১৬ এপ্রিল এইচ শ্যানবার্গ কর্তক প্রেরিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সমগ্র বিশ্বের জনগণ এই নৃশংস গণহত্যার কথা জানতে পেরে শিউরে উঠে।

১২. পূর্বোক্ত ,২৮৬।

স্বাধীনতা ঘোষণার এই বাণী ২৬ মার্চ মধ্যরাতে বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ স্টেশন কর্তৃক গৃহীত হয়।

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান সর্বপ্রথম ২৬ মার্চ, ১৯৭১ অপরাহ্ন ২টা ৩০ মিনিটে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১৩] পরদিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তাঁর ঘোষণায় বলা হয় যে তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর প্রথম ঘোষণা সংশোধন করে নিম্নবর্ণিত ঘোষণা দেন :

> আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি, আমাদের মহান জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে আমরা ইতিমধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বৈধ সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠন করেছি, যা আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা সকল জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কাজ করে যাব। আমি সকল দেশের সরকারকে বাংলাদেশে বর্বরোচিত গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।[১৪]

ঢাকা পিলখানায় প্রায় ২৫০০ জন ইপিআর (বর্তমানে বিডিআর) সৈন্য অবস্থান করছিল। এদের মধ্যে ২৫০ জন নিরাপত্তা বিভাগ, ৪৫০ জন সদর দপ্তর উইং এবং ২০০ জন সদর দপ্তরে কর্মরত ছিল। ঢাকা সেক্টরে তিনটি উইং যথাক্রমে ১৩, ১৫ এবং ১৬ উইং অবস্থিত ছিল। প্রত্যেক উইং-এ ৪৫০ জন সৈন্য কর্মরত ছিল। চারজন বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন দেলওয়ার, ক্যাপ্টেন দানিয়াল ইসলাম, ক্যাপ্টেন লতিফ ও ক্যাপ্টেন আজাদ এখানে চাকুরিরত ছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ২২ বেলুচ রেজিমেন্টকে পিলখানায় মোতায়েন করা হয়।[১৫]

২৫ মার্চ ঢাকা সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিলখানা আক্রমণ করা হয়। মধ্যরাতে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। পিলখানায় অবস্থিত বাঙালি সৈন্যরা প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে। বাঙালি সৈন্য ও দখলদার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ

১৩. মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে,* ৯৮।

১৪. Shafiullah, *Bangladesh at War,* 40.

১৫. বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পিলখানাস্থ ইপিআর-এর অফিসার ও সৈন্যদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ইপিআর ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় তাঁদের বেসামরিক জনগণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে তাঁরা বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা পিলখানার একটি গাছের মাথায় উত্তোলন করেন। এই ছিল ইপিআর সৈন্যদের আবেগ ও সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ।

আরম্ভ হয় এবং বিরামহীনভাবে সারারাত্রি অব্যাহত থাকে। শত শত বাঙালি সৈন্য নিহত হয়। একজন পাকিস্তানী অফিসারসহ বহু পাকিস্তানী সৈন্যও নিহত হয়। ২৬ মার্চ অপরাহ্নে ট্যাংক বাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের সাহায্যার্থে পিলখানায় আসে। বাঙালি সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে এই প্রতিরোধযুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে অসম যুদ্ধে টিকতে না পেরে তারা বুড়িগঙ্গা অতিক্রম করে জিনজিরায় অবস্থান গ্রহণ করে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা তাৎক্ষণিকভাবে রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তরও আক্রমণ করে। প্রায় ১০০০ বাঙালি পুলিশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই বীরত্বমূলক প্রতিরোধযুদ্ধে মাত্র কয়েকজন বাঙালি পুলিশ ব্যতীত সবাই নিহত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধুঁয়া সমগ্র শহর গ্রাস করে।

২৫ মার্চ রাত্রি সাড়ে ১১টায় ২০ বেলুচ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি) সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করে। প্রায় ১০০০ রিক্রুট বাঙালি সৈনিককে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা আবাসিক এলাকা আক্রমণ করে, লুটপাট ও নারীধর্ষণ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ষোল শহরে অবস্থান করছিল। পাঞ্জাবী কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম বন্দরে যেতে নির্দেশ দেন। জিয়া বন্দর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু পথিমধ্যে দেওয়ানহাট স্কোয়ারে ভারি রোডব্লকের কারণে থেমে যেতে বাধ্য হন। কয়েকজন লোককে দিয়ে তিনি যখন রোডব্লক অপসারণ করতে ব্যস্ত, তখন সেখানে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ছুটে আসেন এবং ইবিআরসিতে নির্বিচারে বাঙালি হত্যার বিষয় জিয়াকে অবহিত করেন। বাঙালি নিধনযজ্ঞের কথা জানতে পেরে জিয়া ষোলশহরে ফিরে আসেন এবং তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে আহ্বান জানান। জানজুয়াকে বাসা থেকে ডেকে তোলা হয় এবং গ্রেফতার করা হয়। জিয়া ঐ রাতেই ব্যাটালিয়নসহ কালুরঘাটে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৬]

ইপিআর-এর চট্টগ্রাম সেক্টরের এডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রফিক ২৫ মার্চ রাতের প্রথম লগ্নে বিদ্রোহ করেন এবং অয়ারলেস কলোনী, রেলওয়ে হিল ও হালিশহরে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর সৈন্যদের নিরস্ত্র করেন। রাতের অন্ধকারে ক্যাপ্টেন রফিক প্রায় সারা চট্টগ্রাম শহর নিজ দখলে আনেন। তিনি কাপ্তাই ও রামগড়ে অয়ারলেসবার্তা পাঠান এবং বাঙালি ইপিআর সৈন্যদের চট্টগ্রামে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানান। কিন্তু কাপ্তাই ও রামগড় থেকে আগত ইপিআর সৈন্যদের জিয়া কালুরঘাটে থামিয়ে দেন এবং

১৬. জিয়া ২৬ মার্চ, ১৯৭২ প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় এই ঘটনা বর্ণনা করেন।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন। জিয়া যখন ষোল শহর ছেড়ে কালুরঘাটে চলে যান, তখন রফিক চট্টগ্রাম শহরে একা হয়ে পড়েন। ৩-৪ দিন চট্টগ্রাম শহর দখলে রাখার পর রফিক তাঁর বাহিনীসহ রামগড়ে যান এবং সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান।

কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত ৫৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফীর নেতৃত্বে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি সেনাদল ৮৮ মর্টার ব্যাটারির ১২০ মিঃ মিঃ মর্টার সহ চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তারা নিরাপদে এবং কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে বিকাল পাঁচটায় শুভপুর ব্রীজ অতিক্রম করে এবং কুমিরা এলাকায় প্রবেশ করে। এই সেনাদল ছোটখাট রোডব্লক অপসারণ করার জন্য এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। আকস্মিকভাবে তাদের উপরে মুক্তিবাহিনী ভারী মেশিনগান ও মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু করে। অপরাহ্ন ১টায় ইপিআর সৈন্যরা কুমিল্লায় পাকিস্তানী বাহিনীকে অ্যামবুশ করে। ক্যাপ্টেন এম.এস.এ. ভুঁইয়া প্রথম দিকে এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেন। লেঃ কর্নেল শাহপুর খান এবং ১৫২ জন পাকিস্তানী সৈন্য কুমিরা সংঘর্ষে নিহত হয়। পরবর্তী দুইদিন কুমিরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানী বাহিনী সম্পূর্ণভাবে হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনোবলহারা সৈন্যদের উৎসাহ প্রদানের জন্য মেজর জেনারেল মিঠ্‌ঠা খান হেলিকপ্টারে চড়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে আসেন। ১৪ ডিভিশনের জি.ও.সি. মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা হেলিকপ্টারে চড়ে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে কুমিরায় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তার হেলিকপ্টারে গুলি বর্ষিত হয়। হেলিকপ্টারটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নিরাপদে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে অবতরণ করে। অনতিবিলম্বে গোলন্দাজ বাহিনীকে আনয়ন করা হয়। ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ২৮ মার্চ নতুন করে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং শত্রুসৈন্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করে কুমিরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসে।[১৭]

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য নিয়ে আসা হয়। ৫৩ ব্রিগেডকে সদর দপ্তরসহ চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। ইতিমধ্যে দুইটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং দুই স্কোয়াড্রন ট্যাংক পি.এন.এস. জাহাঙ্গীর যোগে চট্টগ্রাম পৌঁছে। মুক্তিযোদ্ধারা হালিশহর ও কোর্টহিলের অবস্থান ২ এপ্রিল পরিত্যাগ করে।

চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে মুক্তিযোদ্ধারা কালুরঘাটে সমবেত হয়। ক্যাপ্টেন হারুণ এবং লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। পাকিস্তানী বাহিনী ২৯ মার্চ মুক্তিযোদ্ধাদের কালুরঘাট প্রতিরক্ষা অবস্থান আক্রমণ করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তা প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। জিয়াউর রহমান এই সময় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় এলাকা সাবরুমে যান। ৩১ মার্চ সকালে ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন কালুরঘাট আক্রমণ করে। যুদ্ধ কয়েকদিন ধরে বিরামহীনভাবে চলে। অবশেষে

১৭. মেজর জেনারেল এম. এস. এ. ভূঁইয়া, *মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস*, ২৮।

১১ এপ্রিল কালুরঘাটে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানী বাহিনী কালুরঘাট ব্রীজ এলাকা দখলের জন্য মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন এবং লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরী শত্রুর হাতে ধরা পড়েন। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পেছনে সরে আসে। মেজর মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে একটি দল রাঙ্গামাটি, ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলটি কাপ্তাই এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে তৃতীয় দলটি কক্সবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে তাঁরা সবাই ভারতীয় এলাকায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৮]

মেজর শোয়েবের নেতৃত্বে ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য ২৫ মার্চ রাতে কুষ্টিয়া পৌঁছে এবং প্রায় ৫০০ বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করে পাকিস্তানী সৈন্যরা কুষ্টিয়া জেলা স্কুল এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনে অবস্থান গ্রহণ করে। কয়েক হাজার ইপিআর সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক এবং ছাত্র সংঘবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানীদের অবস্থানে আক্রমণ করে। জনতার মুহূর্মুহু শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়। হাজার হাজার মানুষ বাঁশের লাঠি, দাও, সড়কি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রাকভর্তি খাবার বহু দূরবর্তী গ্রাম থেকে পাঠাতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা ৩০ মার্চ বিকাল সাড়ে চারটায় পাকিস্তানী বাহিনীর পাঁচটি অবস্থানের উপর যুগপৎ আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধুরীর নেতৃত্বে এ আক্রমণ পরিচালিত হয়। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এবং ডাক্তার আসহাবুল হক ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ যুদ্ধে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে এই বিজয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।[১৯]

ভীত সন্ত্রস্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা জনতার মহূর্মুহূ শ্লোগানের ফলে আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত শত্রুসৈন্যরা আরও সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধবার্তা পাঠাতে থাকে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশিত সাহায্য আসেনি। ১ এপ্রিল ৭৫ জন পাকিস্তানী সৈন্যসহ মেজর শোয়েব পলায়ন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা তাদের সবাইকে হত্যা করে।

দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে জয়দেবপুরে মোতায়েন করা হয়েছিল। আলফা কোম্পানি টাঙ্গাইলে এবং চার্লি কোম্পানি ময়মনসিংহে অবস্থান করছিল। ডেল্টা কোম্পানির এক প্লাটুন সৈন্য রাজেন্দ্রপুর অ্যামুনিশন ডিপোতে মোতায়েন ছিল। এক কোম্পানি পাকিস্তানী সৈন্য আগে থেকেই এখানে মোতায়েন করা হয়েছিল। ব্রেভো কোম্পানির এক প্লাটুন সৈন্য গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে অবস্থান করছিল। ব্যাটালিয়নের অবশিষ্টাংশ সদর দপ্তরসহ জয়দেবপুর রাজবাড়িতে অবস্থিত ছিল। ২৫ মার্চ টিক্কা খান নবনিযুক্ত কমান্ডিং

১৮. মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা ১৯৮১),১২৪।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৮;আরও দেখুন, *Hindustan Standard*, Calcutta, 4 April, 1971.

অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রকিবকে আরও এক কোম্পানি সৈন্য গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে মোতায়েন করতে নির্দেশ দেন। এর ফলে সবার মনে এই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন কোম্পানিকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে যাতে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা না যায়। টিক্কা খানের নির্দেশ অনুযায়ী এক কোম্পানি সৈন্য গাজীপুরে প্রেরণ করা হয়।[২০]

ঢাকার গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ২৭ মার্চ জয়দেবপুরে এসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত হামলার বর্ণনা দেন। এ ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর শফিউল্লাহ বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যাটালিয়নের বাকী অংশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ময়মনসিংহে ব্যাটালিয়নের বিচ্ছিন্ন দলসমূহকে একত্রিত করতে সচেষ্ট হন। ২৯ মার্চ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ময়মনসিংহে পৌঁছে। ময়মনসিংহে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের এক কোম্পানি সৈন্যকে পাকবাহিনী আক্রমণ করলে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়।

মেজর শফিউল্লাহ ইপিআর সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে অয়্যারলেস বার্তা প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি ঢাকা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ৩১ মার্চ তিনি মেজর খালেদ মোশাররফের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত বার্তা পান : "ঢাকা অভিযান করলে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা এবং সিলেটের কিছু অংশ মুক্ত করেছি। ঢাকা আক্রমণের পূর্বে আমাদের যৌথভাবে সম্পূর্ণ এলাকা মুক্ত করা সমীচীন হবে। আমি ইতিমধ্যে ভারতীয় বি.এস.এফ.-এর অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাঁরা আমাদেরকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। কারণ আমাকে বি.এস.এফ-এর ব্রিগেডিয়ার পান্ডের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি আমাদেরকে সহায়তা করার অঙ্গীকার করেছেন।"[২১] মেজর শফিউল্লাহ্ এ বার্তাটি পাওয়ার পর ঢাকা আক্রমণ স্থগিত করেন।

মেজর খালেদ কুমিল্লা সেনানিবাসে ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর ছিলেন। তাঁকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক হিসেবে বদলি করা হয় এবং তিনি ২৩ মার্চ তাঁর নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেন। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন একজন পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত। খালেদকে ২৪ মার্চ আলফা কোম্পানিসহ শমসেরনগরে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবিলা করার জন্য শমসেরনগর যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ব্যাটালিয়নের চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানি পূর্ব থেকেই বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করছিল। চার্লি কোম্পানির

২০. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 25-26.
২১. পূর্বোক্ত, 53.

অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি মেজর শাফায়াত জামিল এবং একজন পাকিস্তানী মেজর সাদেক নেওয়াজ ডেল্টা কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন।

সাধারণত ব্যাটেলিয়নের উপ-অধিনায়ককে কোম্পানির অধিনায়কত্ব দেওয়া হয় না। খালেদকে বলা হয় যে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি ও ইপিআর-এর এক কোম্পানি সৈন্য তাঁর সঙ্গে শীঘ্রই যোগ দেবে। পরবর্তীকালে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খালেদ ও তাঁর সঙ্গের বাঙালি সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি এলাকায় হত্যা করার জন্য চক্রান্তমূলকভাবে শমসেরনগর পাঠানো হয়।

২৭ মার্চ সকাল দশটায় খিজির হায়াত অফিসারদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। এ সময় মেজর শাফায়াত জামিল, ক্যাপ্টেন হারুন, ক্যাপ্টেন কবীর ও অন্যান্য বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং পাকিস্তানী অফিসার ও সৈন্যদের গ্রেফতার করে। খালেদ বেলা ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন এবং ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন।

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত ছিল। ২৫ মার্চ ব্যাটালিয়নটি যশোর সেনানিবাস থেকে ১৩ মাইল দূরে জগদীশপুর চৌগাছায় প্রশিক্ষণরত ছিল। বাঙালি কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল রেজাউল জলিল ১০৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এস. এ. আর. দুররানীর আদেশে ২৯ মার্চ রাত ১১টায় যশোর সেনানিবাসে ফিরে আসেন। পরদিন সকাল আটটায় ব্রিগেডিয়ার দুররানী ব্যাটালিয়নে আসেন এবং অস্ত্রাগারের চাবি নিজ হাতে নিয়ে ব্যাটালিয়নটিকে নিরস্ত্র করতে সচেষ্ট হয়। ব্রিগেডিয়ার দুররানী চলে যাওয়া মাত্র বাঙালি সৈন্যরা অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে নেয়। ২৫ বেলুচ, ২৭ বেলুচ ও ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তিন দিক থেকে এই ব্যাটালিয়নকে আক্রমণ করে। চতুর্থ দিক থেকে গোলন্দাজ, কামান ও মর্টারের গোলা বর্ষণ করা হয়। এই ব্যাটালিয়নের প্রায় সকল সৈন্যকে পাকিস্তানীরা হত্যা করে। লেঃ হাফিজ ও ১৫০ জন বাঙালি সৈন্য কোনভাবে প্রাণে বেঁচে যান এবং খিতিবদিয়ার পথ ধরে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসেন। দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট আনোয়ার (বাঙালি) এই যুদ্ধে নিহত হন।

সৈয়দপুর সেনানিবাসে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল অবস্থিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার লেঃ কর্নেল ফজল করিম এই ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। বাঙালি অফিসার মেজর নিজামউদ্দিনের নেতৃত্বে আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি ঘোড়াঘাটে মোতায়েন ছিল। এক প্লাটুন সৈন্য লেফটেন্যান্ট মোখলেসের নেতৃত্বে গাইবান্ধায় ভি.এইচ.এফ. স্টেশনে প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। অবাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন শাফায়াত হোসেন ডেল্টা কোম্পানিসহ পার্বতীপুরে অবস্থান করছিল। বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন আশরাফ-এর অধিনায়কত্বে চার্লি কোম্পানি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে সৈয়দপুর সেনানিবাসে অবস্থান করছিল। অপর একজন বাঙালি অফিসার লেফটেন্যান্ট আনোয়ার কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৬/২৭ মার্চ মধ্যরাতে ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল

আক্রমণ করে। সারারাত্রি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। আনোয়ার ডেল্টা কোম্পানি এবং সদর দপ্তর কোম্পানিসহ পার্বতীপুরে চলে যান। চার্লি কোম্পানি ব্যতীত সব সৈন্য ফুলবাড়ি এলাকায় সমবেত হয়। শত্রুর অগ্রাভিযান বিলম্বিত করার লক্ষ্যে আশরাফ রংপুর-বগুড়া মহাসড়কে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেন। মেজর নিজাম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। ফুলবাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি পাকিস্তানীদের সাথে যোগ দেয়ার প্রয়াস পান। বাঙালি সৈন্যরা এ কারণে তাঁকে হত্যা করে। প্রাথমিক প্রতিরোধযুদ্ধের পর ব্যাটালিয়নটি হিলি সীমান্তে পৌঁছে।

রাজশাহীতে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট অবস্থিত ছিল। লেঃ কর্নেল শাফকাত বেলুচ এই ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। মেজর আসলাম (পাকিস্তানী)-এর নেতৃত্বে এক কোম্পানি সৈন্য পাবনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। দু'দিন পর পাকিস্তানীরা মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে রাজশাহী পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। ২৮ মার্চ বিকেল ৩টায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আকস্মিকভাবে পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালিকে হত্যা করে। ঢাকায় নির্বিচারে গণহত্যার খবর দাবানলের মতো রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়ে। সারদা ক্যাডেট কলেজের এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রশীদ ২৬ মার্চ বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা পাবনায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে এবং নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ম্যানেজার ও শ্রমিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ ও ইপিআর সৈন্য পাবনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানী অফিসার সহ ৪০ জন পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

ক্যাপ্টেন রশিদ নবাবগঞ্জে অবস্থানরত ইপিআর-এর বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন গিয়াসের সঙ্গে এবং নওগাঁয় অবস্থিত মেজর নাজমুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী অবস্থান আক্রমণ করে এবং রাজশাহী শহর করায়ত্ত করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৭ ব্রিগেড ৮ এপ্রিল নগরবাড়ি হয়ে পাবনা ও রাজশাহী অভিমুখে অগ্রসর হয়। তারা গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। ক্যাপ্টেন গিয়াস ও ক্যাপ্টেন রশীদ তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যসহ ১৪ এপ্রিল ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশব্যাপী প্রতিরোধযুদ্ধ অব্যাহত থাকে।[২২]

মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন

মুক্তিবাহিনীর ইউনিটগুলো সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের নিরাপদ এলাকায় প্রবেশ করে। মুক্তিবাহিনীর পশ্চাদপসরণের মূল কারণ ছিল দু'টি। প্রথম, শত্রুবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল এবং দ্বিতীয়, শত্রুবাহিনী সুসংগঠিত ছিল এবং

২২. রাজশাহী যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দীন আহমেদ, বীর বিক্রম, পিএসসি -এর সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার।

আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও গোলন্দাজ, সাঁজোয়া ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকারী ছিল। এ সময় ভারতে অবস্থানকারী বিচ্ছিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত ও একক কমান্ডের অধীনে এনে সুসংগঠিত বাহিনীতে পরিণত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করার প্রথম উদ্যোগ হিসেবে ৪ এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর সিনিয়র অফিসারগণ তেলিয়াপাড়ায় সমবেত হন। ইতিপূর্বে মেজর শফিউল্লাহ তাঁর অধীনস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যদের নিয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে মেঘনার পূর্ব এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তেলিয়াপাড়া একটি ছোট পাহাড়ি চা-বাগান এলাকা এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ছোটখাট অপারেশন চালানোর উপযোগী নিরাপদ ভূখণ্ড।

তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় যেসব সিনিয়র অফিসার উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন কর্ণেল এম. এ. জি ওসমানী, লেঃ কর্নেল এম. এ. রব, লেঃ কর্নেল সালাহউদ্দীন মোহাম্মদ রেজা, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী ও অন্যান্য। এই সভায় কমান্ডারদের মধ্যে অপারেশনাল এলাকা ভাগ করে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার দায়িত্ব মেজর শফিউল্লাকে দেওয়া হয়। কুমিল্লা-নোয়াখালী এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর খালেদ মোশাররফকে। মেজর জিয়ার উপর অর্পিত হয় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দায়িত্ব এবং মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে কুষ্টিয়া-যশোর এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মেজর জিয়াউর রহমান এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ২ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় মেজর শফিউল্লাহ ও মেজর খালেদের সঙ্গে দেখা করে কিছু নিয়মিত সৈন্য তাঁর এলাকায় পাঠানোর অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী দুই কোম্পানি সৈন্য চট্টগ্রাম এলাকায় পাঠানো হয়।[২৩]

এই সভায় সর্বসম্মতভাবে কর্নেল এম. এ. জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কত্ব করার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন অপারেশন এলাকা বিভাজন এবং অধিনায়কদের উপর এগুলোর দায়িত্ব বণ্টনের ফলে মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠে। এর ছয়দিন পরে ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রদান করে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মন্ত্রিসভায় অন্য মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্ব নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা হয় : খন্দকার মোশতাক আহমেদকে আইন, সংসদীয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মনসুর আলীকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা

২৩. Shafiullah, *Bangladesh at War,* 71.

হয়। তাজউদ্দীন আহমদ ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম বেতারভাষণে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন। 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটিও তাঁর ঐ ভাষণে প্রথম উচ্চারিত হয়।[২৪]

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তাজউদ্দীন আহমদ ৪ জন আঞ্চলিক অধিনায়ক নিয়োগের বিষয় ঘোষণা করেন। এঁরা হলেন মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর ওসমান। পূর্বে উল্লেখিত এলাকাসমূহ এই অধিনায়কদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। পরদিন, ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী আরও ৩ জন আঞ্চলিক অধিনায়ক নিয়োগ করেন। মেজর নাজমুল হকের উপর দিনাজপুর-রাজশাহী-পাবনা এলাকা, মেজর জলিলের উপর বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকা এবং ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের উপর রংপুর এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এসব এলাকাকে পরবর্তীকালে সেক্টর হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১০ এপ্রিল থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং সেক্টরকে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। এসব সেক্টরকে অপারেশনের স্বার্থে নিম্নবর্ণিতভাবে বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়[২৫] :

এক নম্বর সেক্টর : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চিম অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। শুভপুর ব্রিজ ও ফেনী নদী পর্যন্ত এই সেক্টর বিস্তৃত ছিল।

(ক) সদর দপ্তর : সাবরুম

(খ) সেক্টর কমান্ড :

(১) মেজর জিয়াউর রহমান, ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত।

(২) ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম, জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

(গ) সাব-সেক্টর :

(১) ঋষিমুখ সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন সামসুল ইসলাম অধিনায়ক ছিলেন।

(২) শ্রীনগর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এবং ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান পর্যায়ক্রমে এই সাব-সেক্টরটির অধিনাযকত্ব করেন।

(৩) মনুঘাট সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান।

(৪) তবলছড়ি সাব-সেক্টর : সুবেদার আলী হোসেন এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন।

২৪. ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি,* কাগজ প্রকাশনী ১৯৯১, ৪৫।

২৫. Shafiullah, *Bangladesh at War,* 205-209.

(৫) ডিমাগিরি সাব-সেক্টর : একজন সুবেদার এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা

আবদুল মান্নান, এম.এন.এ.*

দুই নম্বর সেক্টর : সেক্টর ২ এর অন্তর্ভূক্ত ছিল নোয়াখালী, ফরিদপুরের অংশবিশেষ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা বাদ দিয়ে কুমিল্লা এবং ঢাকার কিছু অংশ। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল ফেনী নদী বাদে আখাউড়া পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : মেলাঘর

(খ) সেক্টর কমান্ড : মেজর খালেদ মোশাররফ অক্টোবর ১৯৭১-এর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত, খালেদের অনুপস্থিতিতে নিম্নবর্ণিত অফিসারবৃন্দ অক্টোবর ১৯৭১-এর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এই সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু দাপ্তরিকভাবে তাদেরকে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব প্রদান করা হয় নি। ক্যাপ্টেন সালেক চৌধুরী সেক্টর সদর দপ্তরের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পান। ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার খালেদের অনুপস্থিতিতে ঢাকা শহর এলাকায় গেরিলা অপারেশন পরিচালনা করেন।

(গ) সাব-সেক্টর :

(১) গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(২) মন্দভাগ সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন গাফফার।

(৩) শালদানদী সাব-সেক্টর : মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী ছিলেন এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক।

(৪) মতিনগর সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(৫) নির্ভয়পুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আকবর এবং লেফটেন্যান্ট মাহবুব পর্যায়ক্রমে এই সাব -সেক্টরের অধিনায়কত্ব করেন।

(৬) রাজনগর সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়কত্ব করেন পর্যায়ক্রমে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ এবং লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :

১। নুরুল হক এম.এন.এ*

২। প্রফেসর খোরশেদ আলম, এম.এন.এ.

---

* এম. এন. এ. অর্থ মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেম্ব্লি অর্থাৎ জাতীয় সংসদ সদস্য।

তিন নম্বর সেক্টর : সেক্টর নং ৩-এর অন্তর্ভূক্ত ছিল সিলেট জেলার অংশবিশেষ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল আখাউড়া থেকে চোরামনকাঠি পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : সিমনা

(খ) সেক্টর কমান্ড :

১। মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ পিএসসি —সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত।

২। ক্যাপ্টেন এ.এন.এম. নূরুজ্জামান*— অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত

(গ) সাব-সেক্টর :

(১) আশ্রমবাড়ি সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আজিজ এবং ক্যাপ্টেন এজাজ এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়ক ছিলেন।

(২) বাঘাইবাড়ি সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আজিজ এবং ক্যাপ্টেন এজাজ এই সাব-সেক্টরটিরও নেতৃত্ব দেন।

(৩) হাতকাটা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ছিলেন অধিনায়ক।

(৪) সিমনা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিন এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়কত্ব করেন।

(৫) পঞ্চবটী সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নাসিম ছিলেন সাব-সেক্টটির অধিনায়ক।

(৬) মনতলা এবং বিজয়নগর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন এম.এস. এ. ভূঁইয়া উভয় সাব-সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন।

(৭) কালাছড়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট মজুমদার ছিলেন এই সাব-সেক্টরটির কমান্ডার।

(৮) কলকলিয়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট মোরশেদ ছিলেন এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার।

(৯) বামুটিয়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট সাইয়িদ এর অধিনায়ক ছিলেন।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :

(১) প্রফেসর খোরশেদ আলম, এম.এন.এ.

(২) লুৎফুল হাই সাচ্চু, এম.পি.এ.**

* ১৯৭০ সালের পূর্বে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসব গ্রহণ করেন।

** এম. পি. এ অর্থ মেম্বার অব প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলি অর্থাৎ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য।

চার নম্বর সেক্টর : সেক্টর ৪ সিলেটের পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল চুরামনকাঠি থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : করিমগঞ্জ

(খ) সেক্টর কমান্ড : মেজর সি.আর দত্ত।

(গ) সাব-সেক্টর

১) জালালপুর সাব-সেক্টর : মাসুদুর রব শাদী, একজন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

২) বড়পুঞ্জী সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আবদুর রব অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) আমলাশিদ সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জহীর।

৪) কুকীতল সাব-সেক্টর : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের এবং ক্যাপ্টেন শরীফুল হক পর্যায়ক্রমে এর নেতৃত্ব দেন।

(৫) কৈলাশপুর সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট ওয়াকীউজ্জামান ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৬) কমলাপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন এনাম এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(গ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা : দেওয়ান ফরীদ গাজী, এম.এন.এ.

পাঁচ নম্বর সেক্টর : সিলেটের উত্তরাঞ্চল এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল করিমগঞ্জ-জাকীগঞ্জ থেকে টেকেরঘাট পর্যন্ত। এই সেক্টর আগস্ট ১৯৭১-এর শেষ থেকে কার্যকর হয়।

ক) সদর দপ্তর : ডাউকী

(খ) সেক্টর অধিনায়ক : মেজর মীর শওকত আলী

(গ) সাব-সেক্টর

(১) মুক্তাপুর সাব-সেক্টর : সুবেদার নাজির হোসেন ছিলেন সাব-সেক্টর অধিনায়ক।

(২) ডাউকী সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন সুবেদার মেজর বি.আর. চৌধুরী ।

(৩) শেলা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন হেলাল এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।

(৪) ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট তাহেরুদ্দীন আখঞ্জী ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৫) বালাট সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন, এনামুল হক চৌধুরী এবং সুবেদার আবদুল গণি পর্যায়ক্রমে এই সাব সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৬) বড়ছড়া সাব-সেক্টর : এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দীন।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :

(২) আবদুল হক, এম. এন. এ.

(৩) দেওয়ান ওবায়দুর রেজা চৌধুরী. এম. এন. এ.

ছয় নম্বর সেক্টর : ছয় নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত ছিল রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল রংপুরের ভুরুঙ্গামারী থেকে দিনাজপুরের হিলি পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : তেঁতুলিয়া।

(খ) সেক্টর কমান্ড : উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার।

(গ) সাব-সেক্টর :

(১) ভজনপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নজরুল, স্কোয়াড্রন লীডার সদরউদ্দীন এবং ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(২) পাটগ্রাম সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৩) সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নওয়াজিশউদ্দীন এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৪) মোঘলহাট সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ছিলেন এর অধিনায়ক।

(৫) চিলাহাটী সাব-সেক্টর : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :

(২) মতিউর রহমান, এম. এন. এ.

(৩) ফজলুল করিম, এম. পি. এ.

সাত নম্বর সেক্টর : এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনা জেলা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল পার্বত্য এলাকা বাদে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : তরঙ্গপুর।

(খ) সেক্টর কমান্ড :

(১) মেজর নাজমুল হক—জুলাই ১৯৭১ পর্যন্ত।

(২) মেজর কাজী নুরুজ্জামান*— আগস্ট ১৯৭১ থেকে শেষ পর্যন্ত।

(গ) সাব-সেক্টর :

১) মালন সাব-সেক্টর : একজন সুবেদার এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।

(২) তপন সাব-সেক্টর : মেজর নাজমুল হক প্রাথমিকভাবে এই সাব-সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন, পরে একজন সুবেদার অধিনায়ক হন।

(৩) মেহেদীপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন জাহাঙ্গীর অধিনায়ক ছিলেন ।

(৪) হামজাপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন ইদ্রীস এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৫) আঙ্গিনাবাদ সাব-সেক্টর : একজন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন অধিনায়ক।

(৬) শেখপাড়া সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন রশীদ ছিলেন কমান্ডার।

(৭) ঠোকরাবাড়ী সাব-সেক্টর : সুবেদার মোয়াজ্জেম ছিলেন অধিনায়ক।

(৮) লালগোলা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

(৯) ভোলাহাট সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট রফিকুল ইসলাম অধিনায়ক ছিলেন ।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :

(১) আজিজুর রহমান, এম.এন.এ.

(২) আবদুস সালাম।

আট নম্বর সেক্টর : আট নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, অংশত ফরিদপুর এবং খুলনা। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে কালীগঞ্জ পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : কল্যাণী।

(খ) সেক্টর কমান্ড :

(১) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী—আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত।

(২) মেজর এম.এ. মঞ্জুর—সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে শেষ পর্যন্ত।

(গ) সাব-সেক্টর :

(১) বয়রা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা ছিলেন অধিনায়ক।

(২) হাকিমপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন শফীউল্লাহ অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) ভোমরা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন সালাহ্ উদ্দীন ছিলেন অধিনায়ক

* ১৯৭১ সালের পূর্বে তিনি সেনাবহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(৪) লালবাজার সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধুরী এই সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(৫) বানপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান এর নেতৃত্ব দেন।

(৬) বেনাপোল সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৭) শিকারপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম অধিনায়ক ছিলেন।

নয় নম্বর সেক্টর : নয় নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত ছিল খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালী। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল কালীগঞ্জ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : টাকী।

(খ) সেক্টর কমাণ্ড : মেজর এম.এ. জলিল।

(গ) সাব-সেক্টর :

(১) টাকী সাব-সেক্টর : মেজর জলিল ছিলেন এই সেক্টরের অধিনায়ক ।

(২) হিঙ্গলগঞ্জ সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা এর অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) শমসেরনগর সাব-সেক্টর : ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহ্ এই সাব-সেক্টরটির অধিনায়ক ছিলেন।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা :

(২) এম.এ.গফুর, এম.এন.এ.

(৩) নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, এম.এন.এ.

দশ নম্বর সেক্টর : দশ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল থেকে টেকনাফ পর্যন্ত। এই সেক্টর কখনই অপারেটিভ ছিল না। পরে বিশেষ নৌ-কমান্ডো অপারেশন এলাকা নদীপথ দশ নম্বর সেক্টরের এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এগারো নম্বর সেক্টর : এগারো নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ এবং টাঙ্গাইল। সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল টেকেরঘাট থেকে রাউমারী পর্যন্ত। এই সেক্টর কার্যকর ছিল আগস্টের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

(ক) সদর দপ্তর : তুরা।

(খ) সেক্টর কমান্ড : মেজর আবু তাহের আগস্টের শেষ থেকে নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে যখন তাহের আহত হন, স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ এই সেক্টরের সিনিয়র অফিসার হিসেবে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরে ঢাকার পথে সৈন্যদলকে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু তিনি সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন নি।

(গ) সাব-সেক্টর :

(১) মানকারচর সাব-সেক্টর : স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(২) মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট মান্নান অধিনায়ক ছিলেন।

(৩) পুরাখাসিয়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট হাশেম এই সাব-সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।

(৪) ঢালু সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট তাহের এবং লেফটেন্যান্ট কামাল পর্যায়ক্রমে এই সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেন।

(৫) রংরা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ছিলেন অধিনায়ক।

(৬) শিববাড়ী, বাঘমারা এবং মহেশখোলা সাব-সেক্টর : একজন সুবেদার সাব-সেক্টরটির নেতৃত্ব দেন।

(ঘ) বেসামরিক প্রশাসন উপদেষ্টা : রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া, এম.এন.এ.।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নবগঠিত প্রবাসী সরকার শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথম জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেণ। এই স্থানের নামকরণ করা হয় মুজিব নগর। অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ইপিআর ও পুলিশের একটি সুসজ্জিত দল রাষ্ট্রপতি ও নতুন মন্ত্রীসভাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, ক্যাপ্টেন এ. আর. আজম চৌধুরী, সিভিল সার্ভেন্ট তৌফিক এলাহী চৌধুরী, পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন ও অন্যান্য স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন করে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অসংখ্য যুবশিবির গড়ে উঠে। এসব যুবশিবিরে প্রথাগত যুদ্ধ এবং গেরিলাযুদ্ধ উভয় প্রকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার রাজ্য সরকার অসংখ্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র এবং শরণার্থী শিবির সীমান্ত এলাকায় গড়ে তোলে। ইতিপূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২৭ মার্চ[২৬] ভারতীয় লোকসভায় বাঙালি জাতির সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। আতঙ্কগ্রস্ত বাঙালি জনগণ যেন সীমান্ত অতিক্রম করে এসব নিরাপদ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে সেজন্য ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বি.এস.এফ.) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দেয়। এসব শিবির থেকে বহু তরুণকে মুক্তিবাহিনীর অর্ন্তভূক্ত করা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। আত্মোৎসর্গ ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে

২৬. *Bangladesh Documents,* Volume 1, 672.

প্রস্তুত হাজার হাজার স্বাস্থ্যবান যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। এসব যুবককে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য শারীরিক ব্যায়ামসহ অস্ত্রশিক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলা হয়। উপরন্তু পাঁচটি রাজ্যে অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে এসব মুক্তিযোদ্ধাকে বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োগ করা হয়। ১২ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর কাজ শুরু করে। মে মাসে কলকাতায় ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।*

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি জাতির উপর অতর্কিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসামের ধুবড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি পৃথিবীর পরাশক্তিসহ সমস্ত সরকার প্রধানদের কাছে নির্যাতিত বাঙালি জাতির ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা প্রদানের জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। পরে তিনি নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির মনি সিং, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর এবং আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর গ্রুপ) ও কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং নবগঠিত সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দান করে। তাঁরা সীমান্ত এলাকায় বহু যুবশিবির গড়ে তোলেন। হাজার হাজার গেরিলা এসব যুবশিবিরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে।

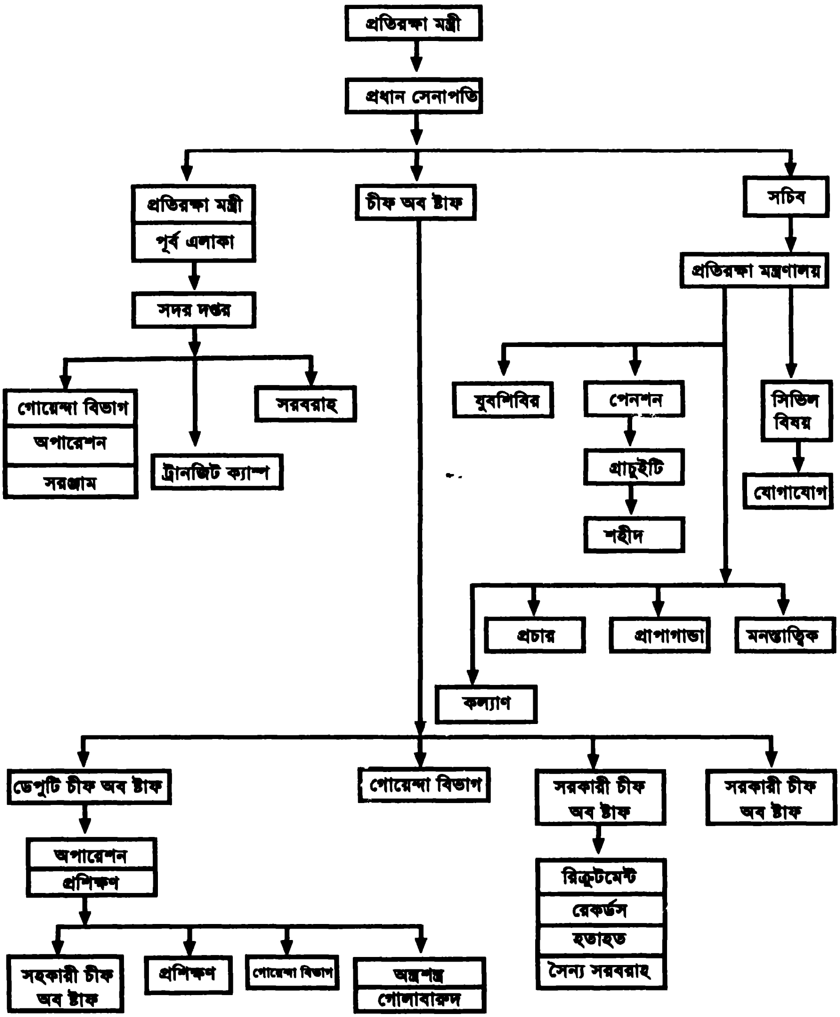
এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রয়াসে আরও অনেক বাহিনী গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে টাঙ্গাইলে কাদের বাহিনী. সিরাজগঞ্জে লতিফ মির্জা বাহিনী, ঝিনাইদহে আকবর হোসেন বাহিনী, ফরিদপুরে হেমায়েত বাহিনী, পিরোজপুরে রফিক বাহিনী, বরিশালে কুদ্দুস মোল্লা ও গফুর বাহিনী এবং ময়মনসিংহে আফসার বাহিনী ও আফতাব বাহিনী অন্যতম। এসব বাহিনী নিজস্ব শক্তি ও লোকবলের উপর ভিত্তি করে দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারে গড়ে উঠে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে অসংখ্য সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে। সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর বাহিনী সংগঠিত করেন।

১৯৭১ সালের ৯ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক মাইলফলক সৃষ্টি হয়। এদিন এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বাহিনীর প্রথম ব্যাচের অফিসারদের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিবাহিনীর ৬১ জন ক্যাডেটকে যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহস ও বীরত্ব

* মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-১-এ দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো



প্রদর্শনের নিরিখে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এসব অফিসার বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রবল গতি সঞ্চারিত করেন। ভূটান-ভারত সীমান্তে মূর্তি উপত্যকায় একটি প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন করা হয় এবং এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারগণ প্রায় চৌদ্দ সপ্তাহ কঠোর প্রশিক্ষণ দান করে। এ পর্যায়ে যুদ্ধকৌশল, হালকা ও ভারী অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং মর্টার ও বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ৬১ জন অফিসারকে বিভিন্ন সেক্টরে ও নবগঠিত ব্রিগেডসমূহের নিয়মিত ইউনিটে নিয়োগ করা হয়। প্রথাগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী এর সকল তরুণ অফিসার যুদ্ধে যোগদানের ফলে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য অনিবার্য হয়ে উঠে।

মুক্তিবাহিনী যখন প্রবল উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন মুজিব বাহিনী নামে অপর এক বাহিনী গড়ে উঠে।[২৭] ভারতীয় সেনাবাহিনীর গেরিলাযুদ্ধ বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় সরকারের কেবিনেট ভিভিশনের অধীনস্থ রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস উইং (র)-এর অনুমোদনক্রমে মুজিববাহিনী সংগঠিত করা হয়। মুজিববাহিনী রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত দেশপ্রেমিক ও শিক্ষিত বাঙালি তরুণ সমন্বয়ে গড়ে উঠে। দেরাদুনে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান এ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন।*

ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ছয়টি সেক্টর প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম বাংলার মূর্তি ক্যাম্পে আলফা সেক্টর, পশ্চিম বাংলার রাজগঞ্জে ব্রেভো সেক্টর, বিহারের চাকুলিয়ায় চার্লি সেক্টর, ত্রিপুরার দেউতামূরায় ডেলটা সেক্টর, আসামের মাসিমপুরে ইকো সেক্টর এবং মেঘালয়ের তুরায় ফক্সট্রট সেক্টর প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সেক্টরের অধিনায়কত্ব করেন যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার বি.সি. জোশী , বিগ্রেডিয়ার প্রেম সিং, ব্রিগেডিয়ার এন.এ. সালিক, বিগেডিয়ার সাবেক সিং, বিগ্রেডিয়ার এম. বি ওয়াদকে ও বিগেডিয়ার সান্ত সিং।[২৮]

নিয়মিত এবং অনিয়মিত উভয়ের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে। নিয়মিত সৈন্যদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনী এবং অনিয়মিত সৈন্যদের নিয়ে গণবাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর সৈন্যদের নিয়মিত বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরে বিভিন্ন সেক্টরে যোগদান করে।অনিয়মিত বাহিনীতে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৯]

২৭. Shafiullah, *Bangladesh at War*, 139-140.

* প্রধান সেনাপতির সম্মতি ব্যতিরেকেই মুজিব বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিব বাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

২৮. পূর্বোক্ত, 140.

২৯. দৈনিক বাংলা ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হেদায়েত হোসেন মোরশেদ কর্তৃক গৃহীত জেনারেল ওসমানীর সাক্ষাৎকার।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা অভিযান চালিয়ে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অনিয়মিত সৈন্যদের প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে নিয়মিত বাহিনীকে প্রথাগত পদ্ধতিতে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ করা হয়। ৭ জুলাই প্রথম বিগ্রেড জেড ফোর্স গঠিত হয়। মেজর জিয়াউর রহমানকে এই ব্রিগেডের অধিনায়ক নিয়োগ করা হয় এবং জিয়ার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় জেড ফোর্স। প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে এই ব্রিগেড গঠিত হয়। দ্বিতীয় নিয়মিত ব্রিগেড এস ফোর্স অক্টোবর মাসে গঠিত হয়। দ্বিতীয় এবং একাদশ ইস্ট বেঙ্গল এই ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত হয়। মেজর শফিউল্লাহ্ এই ব্রিগেডের অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং তাঁর নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় এস ফোর্স। অনুরূপভাবে নবম, দশম ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল সমন্বয়ে তৃতীয় নিয়মিত ব্রিগেড কে ফোর্স গড়ে উঠে। মেজর খালেদ মোশাররফকে এই ব্রিগেডের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। খালেদ মোশাররফের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় কে ফোর্স।

২৮ সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে এয়ার কমোডোর এ. কে খন্দকার-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ক্যাপ্টেন খালেক, সাত্তার, সাহাবুদ্দিন, মুকিত, আকরাম ও সরফুদ্দিন সহ প্রথম দিকে ৬৭ জন বিমানসেনা সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গড়ে উঠে। প্রথম পর্যায়ে মাত্র কয়েকটি ডেকোটা, অটার ও এ্যালুভেট হেলিকপ্টার সম্বল ছিল।

নৌবাহিনীর বাঙালি সৈন্যদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী গড়ে উঠে। ছোট আকারের প্রথম রণতরী দু'টি সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু নৌবহর ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয়।

এভাবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সেনাবাহিনীর ব্রিগেডসমূহ, বিভিন্ন সেক্টর ও গেরিলা সমন্বয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য এক বিশাল বাহিনী গড়ে উঠে।

সেক্টরসমূহের যুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত অসংখ্য প্রথাগত যুদ্ধ ও গেরিলা অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এ নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবু বিভিন্ন সেক্টরে অপারেশনের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করা হলো।*

এক নম্বর সেক্টর : ২৪ মে এক কোম্পানি মুক্তিবাহিনী চাঁদগাজিতে সুদৃঢ় পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, অষ্টম খণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কমান্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সেক্টরসমুহে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

করেন। তিন ঘন্টা ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী চাঁদগাজিতে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। ৬ জুন চাঁদগাজি পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে পুনরায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করে, কিন্তু দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। এই যুদ্ধে ৭৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। ১৭ জুন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পুনরায় ট্যাংক, মর্টার ও গোলন্দাজবাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ করেও চাঁদগাজি পুনর্দখল করতে ব্যর্থ হয়। এবারও ৪৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। ২৯ জুন পাকিস্তানী সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ করে। এ আক্রমণে পাঁচটি হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হয়। মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের পশ্চাতে দুই ব্যাটালিয়ন পাকিস্তানী সৈন্য হেলিকপ্টারযোগে অবতরণ করে। সারাদিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকার পরে মুক্তিবাহিনী চাঁদগাজি থেকে পিছনে সরে আসে। চাঁদগাজি পাকিস্তানীদের দখলে চলে যায়। এ যুদ্ধে ১৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

ক্যাপ্টেন মাহফুজ ও তাঁর অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধারা ১০ জুন হিয়াকু-রামগড় সড়কে পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। ৪ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। করলিয়াটিলায় ২৩ জুন মুক্তিবাাহিনী পুনরায় পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যসহ একজন অফিসার নিহত হয়। ১ জুলাই মুক্তিবাহিনী দেবীপুর বিওপি আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেন। ১২ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং ৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ক্যাপ্টেন মাহফুজ চিকনছড়ায় ৩ জুলাই পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করেন।

করইয়াবাজারে পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ১৯ জুলাই আক্রমণ করা হয়। ৩০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। হিয়াকুতে পাকিস্তানীদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা অবস্থান ২৭ জুলাই মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। ৪ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

২৯ আগস্ট অমালিকা বিওপিতে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ১২ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় এবং অন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হয়। এক কোম্পানি মুক্তিবাহিনী ১৫ অক্টোবর ছাগলনাইয়া বিওপি আক্রমণ করে। ৪০ জন পাকিস্তানী সৈন্য এখানে অবস্থান করছিল। এই আক্রমণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্ট গোলন্দাজ কামান থেকে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই যুদ্ধে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় এবং ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ৬ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী শালিয়াদিঘিতে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ৭ নভেম্বর এই অবস্থান আক্রমণ করে। তিন দিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ অব্যাহত থাকলেও মুক্তিবাহিনীকে টলানো সম্ভব হয় নি। মুক্তিবাহিনী অতঃপর বেলুনিয়াস্থ পাকিস্তানীদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী চম্পকনগর বিওপি ও বল্লমপুর আক্রমণ করে। ৫০ জন পাকিস্তানী সৈন্য এবং ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হয়।

দুই নম্বর সেক্টর : ১৯ জুলাই মন্দভাগে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন গাফফার মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেন। এই যুদ্ধে ৩১ বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল কাইয়ুম এবং ৫৩ আর্টিলারী রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বোখারীসহ কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। মে-জুন মাসে মুন্সিহাট, ছাগলনাইয়া ও বেলুনিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শালদা নদী স্টেশনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ দুই সপ্তাহ ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। বহু শত্রুসৈন্য নিধন করে মুক্তি বাহিনী ৮ অক্টোবর শালদা নদী দখল করে। ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কসবা যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে খালেদ মোশাররফ গুরুতরভাবে আহত হন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লাতুমুরা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ৩ জন অফিসার ও ৪০ জন সদস্য নিহত হয় এবং ৬০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। বেলুনিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৮ নভেম্বর। এতদ্ব্যতীত গেরিলাদের ক্রাক প্লাটুন ঢাকা শহরে বহু সংখ্যক অপারেশন পরিচালনা করে। নবম ইস্ট বেঙ্গলের এক কোম্পানী সৈন্য লেঃ আজিজের নেতৃত্বে শালদা নদীর নিকটবর্তী পাকিস্তানী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর এই অবস্থান মুক্তিবাহিনী করায়ত্ত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেঃ আজিজের বুকে এবং মাথায় গুলি লাগে এবং তিনি রণক্ষেত্রে নিহত হন। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁর মরদেহ নিয়ে যায়।

তিন নম্বর সেক্টর : লেঃ মোর্শেদ ও তাঁর সৈন্যরা ১৪ মে মাধবপুরে পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। অনুরূপভাবে সিলেট মহাসড়কে ক্যাপ্টেন মতিয়র রহমান নালুয়া চা-বাগানের সন্নিকটে ১৬ মে পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। রায়পুরা, মাধবপুর, কাপাশিয়া, মনোহরদী, কুলিয়ারচর, কটিয়াদী, তেলিয়াপাড়া, মুকুন্দপুর ও কলেংগা জঙ্গলে সংঘটিত অসংখ্য গেরিলা অভিযান ও সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে।

চার নম্বর সেক্টর : ২৪ মে সুতাকান্দি যুদ্ধ এবং ১৯ জুন লাঠিটিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্যাপ্টেন রব উভয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে অসংখ্য গেরিলা অভিযান চালানো হয়। ১০ আগস্ট শাহবাজপুর (লাতু) রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। বিয়ানীবাজার, বড়লেখা ও জাকিগঞ্জে মুক্তিবানিহীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অক্টোবর মাসে এই সেক্টরে প্রথম ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল উপস্থিত হয় এবং অসীম বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে। মুক্তিবাহিনী দক্ষিণগুল এলাকা দখল করে। ১০ নভেম্বর আটগ্রাম- জাকিগঞ্জে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন রব সালামটিলা আক্রমণ করেন এবং লেঃ জহির রাজটিলায় ১০ নভেম্বর প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে।

পাঁচ নম্বর সেক্টর : গহীন জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর চলাচল ব্যাহত হয়। বড়ছড়া, বালাট, ভোলাগঞ্জ, শেলা এবং ডাউকিতে জুলাই-আগস্ট মাসে অসংখ্য সংঘর্ষ হয়। রাধানগর, টেংরাটিলা ও ছাতক ব্যতীত সুরমা নদী পর্যন্ত দু'শ মাইল ব্যাপী বিশাল এলাকা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মুক্তিবাহিনী দখল করে। মুক্তিবাহিনী ৫০টি নৌযান দখল করে। অক্টোবর মাসে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল এই সেক্টরে যোগদান করে, ছোটখিল গোয়েনহাট এবং ছাতকে যুদ্ধ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দলকে ৩ নভেম্বর তাহেরপুরে এবং ১৬ নভেম্বর আজমিরিগঞ্জে এ্যামবুশ করা হয়। ২৭-২৮ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী টেংরাটিলায় পাকিস্তানী অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। বহু শত্রুসৈন্য নিহত হয়।

ছয় নম্বর সেক্টর : প্রধানপাড়া, ডাংগাপাড়া ও নুনিয়াপাড়ায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ করে। ভজনপুর সাব-সেক্টরের অন্তর্গত জগদ্দলহাট এলাকা ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয় এবং চাওই নদী পর্যন্ত তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশউদ্দিন এবং তাঁর সৈন্যরা ৮ আগস্ট ফুলবাড়ী, ১৩ আগস্ট ভূরুংগামারী এবং ১৫ আগস্ট আলীপুর পুলিশ স্টেশন আক্রমণ করে। ৪ সেপ্টেম্বর নাগেশ্বরীতে অনুরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভূরুংগামারী ও জয়মনিরহাটে ১৪ অক্টোবর ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। ১ জন পাকিস্তানী অফিসার ও ৭ জন সৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ধরা পড়ে এবং প্রায় ছয়শত বর্গমাইল এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। ১৯ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী বড়খাতা দখল করে নেয়। চিলমারী সাব-সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা ডিমলা ও মোগলহাট সাব-সেক্টরে লালমনিরহাট শহরের চার মাইল পূর্ব পর্যন্ত বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। ১৮ নভেম্বর জয়মনিরহাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিবাহিনীর তরুণ লেঃ আসফাকুস সামাদ এই যুদ্ধে নিহত হন।

সাত নম্বর সেক্টর : মুক্তিবাহিনী ১৮ জুন দিনাজপুর ঠনঠনিয়াপাড়ায় পাকিস্তানী অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। ৪-৫ জুলাই মেজর নাজমুল হকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী কাঞ্চন ব্রীজ আক্রমণ করে। নবাবগঞ্জ জেলার কলাবাড়ীতে ১ আগস্ট প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে ২৩ আগস্ট কানসট আক্রমণ করা হয়। ৩ আগস্ট তাহেরপুরে এবং ২৬ আগস্ট দুর্গাপুরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। ময়মনসিংহ কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্র শিবলীর নেতৃত্বে একদল গেরিলা শারদায় পাকিস্তানী অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। শিবলী এই সংঘর্ষে নিহত হন। মুক্তিবাহিনী ২২ আগস্ট চারঘাট থানায় মিরগঞ্জ বিওপি আক্রমণ করে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে ইসলামপুরে পাকিস্তানী অবস্থানে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ৮০ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে।

১৮ নভেম্বর লেঃ রফিক ও তাঁর সৈন্যরা আলমপুরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর আক্রমণ করে।

শাহপুর গড়ে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান পাকিস্তানীরা দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনী পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে ২২ নভেম্বর শাহপুর দখল করে নেয়। সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান এই আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, লেঃ রশিদ, লেঃ রফিক, লেঃ কাইয়ুম, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নজরুল, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ ও ডাঃ মিজানুর রহমান নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দান করেন। ১৩-১৪ নভেম্বর খানপুর বিওপি-তে সংঘঠিত যুদ্ধে ৩০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

আট নম্বর সেক্টর : মুক্তিবাহিনী ২৭ মে বয়রা আক্রমণ করে। চৌগাছা ও মাসিলার মধ্যবর্তী স্থানে ক্যাপ্টেন নুরুল হুদার নেতৃত্বে ১০ মে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ করে। ক্যাপ্টেন হুদা ও তাঁর সৈন্যরা ১৫ মে কাশিপুর বিওপি আক্রমণ করেন এবং ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা করেন এবং একটি হালকা মেশিনগান ও ৮টি চাইনিজ রাইফেল হস্তগত করেন।

৩ জুন মুজিবনগরে মুক্তিবাাহিনী ও পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ২০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং আরো ২০ জন গুরুতরভাবে আহত হন। ৫ আগস্ট বর্নি বিওপি আক্রমণ করা হয়। ১৭ জুলাই বাগুয়ান রতনপুর এলাকা আক্রমণ করা হয়। ১৭ আগষ্ট গয়েশপুরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়।

এ সময় সাতক্ষিরা জেলার কলারোয়ায় ভয়ংকর যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৫ অক্টোবর সংঘটিত বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। ২ জন পাকিস্তানী অফিসার ও ৭০ জন সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়। ক্যাপ্টেন হুদা ঝিকরগাছায় এ্যামবুশ করে ৩০ জন পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা করেন। ৩ নভেম্বর হিজলী বিওপি আক্রমণ করা হয়। লেঃ কমল সিদ্দিকী নড়াইল সাব ডিভিশন দখল করে যশোরের দিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন।

নয় নম্বর সেক্টর : সেক্টর কমান্ডার মেজর এম.এ. জলিল এই সেক্টরে গেরিলা যুদ্ধের বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১২-১৩ জুন বসন্তপুর বিওপি আক্রমণ করা হয়। অনুরূপভাবে খানজি বিওপি ও হিংগলগঞ্জ বিওপি আক্রমণ করা হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর গোাবিন্দপুর মুক্ত হয়। শ্যামনগরেও প্রচন্ড যুদ্ধ চলে। ২০ নভেম্বর কালিগঞ্জ যুদ্ধে চল্লিশ জন পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

দশ নম্বর সেক্টর : সমুদ্র ও নদীপথে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোরা বীরত্বের সঙ্গে অপারেশন চালায়। মুক্তিবাহিনী লিমপেট মাইন ব্যবহার করে এম.ভি. হরমুজ ও আল আব্বাস জাহাজ দু'টি ডুবিয়ে দেয়। উপর্যুপরি ধ্বংসাত্মক অভিযানের ফলে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর অকার্যকর হয়ে পড়ে। নৌ-কমান্ডোরা প্রধান সেনাপতির বিশেষ বাহিনীর অন্তর্গত আত্মঘাতী যোদ্ধা হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। একটি পাকিস্তানী সাবমেরিন পরিত্যাগ করে ৭ জন ফ্রগম্যান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। বাংলাদেশের নদীপথ ও উপকূলীয় অঞ্চলে সফল গেরিলা অভিযান মুক্তিযুদ্ধে প্রবল গতি সঞ্চার করে। এই সব অভিযানের ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা হতাশাগ্রস্ত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

এগার নম্বর সেক্টর : সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের এই সেক্টরে গেরিলা অভিযান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অসংখ্য সম্মুখযুদ্ধ ছাড়া ৪-৫ জুলাই নালিতাবাড়িতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

কোদালকাঠি, চিলমারি, হালুয়াঘাট ও কামালপুর যুদ্ধ স্মরণীয় হয়ে আছে। ১ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবরের মধ্যে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬ নভেম্বর ঢালু বিওপি. এবং ১২ নভেম্বর বন্দরকাটা আক্রমণ করা হয়।

উপরোক্ত সেক্টরসমূহের যুদ্ধ ছাড়াও জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স দখলদার বাহিনীর সঙ্গে অসংখ্য সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জেড ফোর্সের অধীনে কামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট ও নকসী বিওপি আক্রমণ বিখ্যাত হয়ে আছে।

শালদা নদী, কসবা ও বেলুনিয়া যুদ্ধে কে ফোর্সের আক্রমণ এবং ধর্মনগর, মুকুন্দপুর, আখাউড়া, রাধানগর কমপ্লেক্স ও মনতলা যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

রণকৌশল, যুদ্ধপরিকল্পনা ও সৈন্য সমাবেশ

পাকিস্তানী সমরনায়কদের ধারণা ছিল যে একটি বিশাল এলাকা দখল করে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ও শরণার্থীদের স্থানান্তর করাই ভারতের উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধরত বাঙালি কর্তৃক বড় ধরনের এলাকা দখল প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানীরা সৈন্যসমাবেশ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচলিত রণকৌশল ছিল যুদ্ধ করে কোন এলাকা দখল করে পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে সমরপদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ড-এর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী প্রথাগত যুদ্ধের এই পদ্ধতি মনে রেখে সৈন্য মোতায়েনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

জেনারেল নিয়াজীর কাছে চারটি পথ খোলা ছিল :

প্রথম : পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার তীরে শক্ত ব্যূহ রচনা করে ঢাকা বৃত্তকে রক্ষা করা। এতে দুটো অসুবিধা ছিল— এক : ঢাকার বাইরে যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বিশাল এলাকা বিনা যুদ্ধে শত্রুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। দুই : প্রতিরক্ষা এলাকা ছোট হলে ভারতীয়দের পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে বেশি সৈন্য মোতায়েনের সুযোগ দেয়া হবে।

দ্বিতীয় : সীমান্ত এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়ার পর যুদ্ধ করতে করতে ঢাকা বৃত্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করা। এতে অসুবিধা ছিল, শত্রুর

বিমানশক্তির আধিপত্য ও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার ফলে ঢাকা বৃত্তের দিকে পশ্চাদপসরণ সম্ভব নাও হতে পারে।

তৃতীয় : গতিশীল যুদ্ধ (mobile warfare) পরিচালনা করা। এটা ছিল সবচেয়ে উপযোগী, কিন্তু এতে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক তাড়িত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশী।

চতুর্থ : গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বড় বড় রাস্তাগুলোর উপর শক্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুর অগ্রগতিকে প্রতিহত করা (fortress concept of defence)। এই পরিল্পনায় দুটো বড় ধরনের সুবিধা ছিল। প্রথম ঃ সীমান্তের বিশাল এলাকা বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দিতে হচ্ছে না, আর দ্বিতীয় : পাকিস্তানীদের সীমিত সম্পদ দিয়ে অগ্রসরমান শত্রুবাহিনীকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল।

যেভাবেই হোক, ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত এলাকায় বাধা দিয়ে বিলম্ব ঘটানো ছিল নিয়াজীর পরিকল্পনা। সীমান্তে সব ক'টি পাকা রাস্তার উপরে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে অগ্রসরমান সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিহত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ১৪০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকায় শত্রুঘাঁটিগুলোতে প্রচুর গোলাবারুদ ও রসদপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করে নিয়াজী চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্মিলিত বাহিনীকে বিলম্বিত করতে চাইলেন।[৩০]

পাকিস্তানী জেনারেলরা যুদ্ধের গতি ও পরিণতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। ফলে ঢাকা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধা দিতে ব্যর্থ হয় পাকবাহিনী। বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পলায়নপর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানীদের সৈন্য সমাবেশের বিবরণ[৩১] :

যশোর এলাকা : নবম ডিভিশন মেজর জেনারেল আনসারীর নেতৃত্বে যশোর এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ১০৭ ব্রিগেড যশোর এবং ঝিনাইদহে অবস্থিত ছিল। এ ছাড়া ২টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও একটি রেকি ও সার্পোট ব্যাটালিয়ন ছিল।

উত্তর বাংলা : মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের নেতৃত্বে ১৬ ডিভিশনকে উত্তর বাংলা রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৬ ডিভিশনের সদর দপ্তর নাটোরে অবস্থিত ছিলো। ২৩ ব্রিগেড রংপুরে এবং ২০৫ ব্রিগেড বগুড়া এলাকায় মোতায়েন করা হয। এর ১টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ২টি মর্টার ব্যাটারি, ৯টি রেকি ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন এবং ১টি আর্মার্ড রেজিমেন্ট ছিল।

---

৩০. Siddiq Salık, *Witness to Surrender*, 124-125.

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -১২৬।

পূর্ব এলাকা : মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর নেতৃত্বে ১৪ ডিভিশনকে পূর্বাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে মেজর জেনারেল জামসেদের নেতৃত্বে ৩৬ ডিভিশন ঢাকায় ও মেজর জেনারেল রহিমের নেতৃত্বে ৩৯ ডিভিশন চাঁদপুরে গড়ে তোলা হয়। অবশ্য এই দু'টি ডিভিশন কোনক্রমেই পাকশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে নি। কারণ বিভিন্ন ইউনিট পুনর্বিন্যাস করেই এই ডিভিশন দু'টি গড়ে তোলা হয়। ১৭৭ ব্রিগেড কুমিল্লায়, ২৭ ব্রিগেড ময়মনসিংহে ও ৩১৩ ব্রিগেড সিলেটে মোতায়েন করা হয়। সিলেটে ১টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ২টি মর্টার ব্যাটারী ও মাত্র ৪টি ট্যাংক ছিল।

চট্টগ্রাম এলাকা : চট্টগ্রামে ৯৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিগ্রেড অবস্থিত ছিল, যাব অধিনায়ক ছিলেন বিগ্রেডিয়ার আতাউল্লা।*

অন্যদিকে সম্মিলিত বাহিনী এইসব প্রতিরক্ষা-অবস্থানগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। প্রথম লক্ষ্য ছিল খুব কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করার জন্য বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ পরিচালনা করা। দ্বিতীয়ত, সীমান্তে সবদিক দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে পাকসেনাদের ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা। তৃতীয়ত, ছড়িয়ে পড়া পাকবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা। চতুর্থত, পাকা রাস্তা বাদ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষাব্যূহকে এড়িয়ে যাওয়া। পঞ্চমত, মনস্তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যাতে তারা যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করে।[৩২]

ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার অধীনে ছিল তিনটি নিয়মিত কোর ও একটি কমিউনিকেশন জোন। এ ছাড়া প্রায় এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ১১টি সেক্টরে বীরবিক্রমে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।**

দ্বিতীয় কোর : কৃষ্ণনগরে ছিল দ্বিতীয় কোরের সদর দপ্তর। লেঃ জেনারেল টি. এন. রায়না ছিলেন কোর কমান্ডার। এতে ছিল নবম ও চতুর্থ পার্বত্য ডিভিশন। এছাড়া ছিল টি-৫৫ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে গঠিত একটি মাঝারি আর্মার্ড রেজিমেন্ট, পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংক সজ্জিত একটি হালকা ট্যাংক রেজিমেন্ট, ১৩০ মিলিমিটার (রাশিয়ান) একটি মাঝারি গোলন্দাজ ইউনিট ও একটি ব্রিজিং ইউনিট।

তেত্রিশ কোর : তেত্রিশ কোরের সদর দপ্তর ছিল শিলিগুঁড়িতে। লেঃ জেনারেল এম. এল. থাপান ছিলেন এই কোরের কমান্ডার। ষষ্ঠ পাবর্ত্য ডিভিশন ও ২টি ব্রিগেড নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এ ছাড়া পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে একটি হালকা আর্মার্ড রেজিমেন্ট, একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট (বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি) ও একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজিং ইউনিট ছিল।

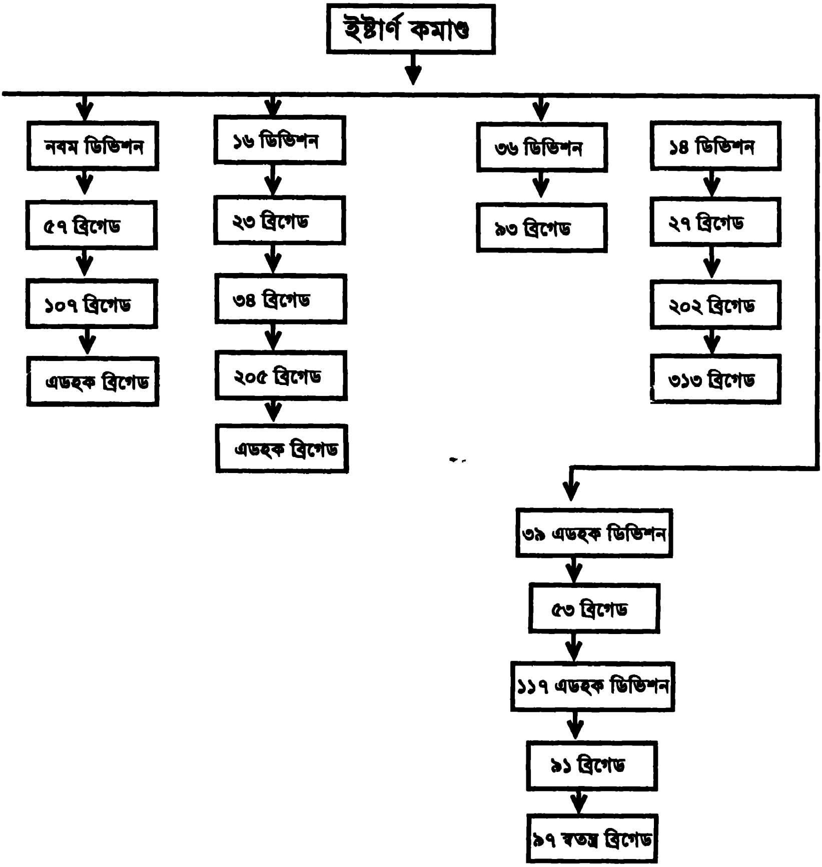
* পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ডের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২-এ দেওয়া হয়েছে।

৩২. Major General D. K. Palit, *The Lightning Campaign* (New Delhi 1972), 101.

** ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ডোর সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-৩-এ দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট -২

পাকিস্তান সেনসাবাহিনীর ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের সাংগঠনিক কাঠামো
(২১ নভেম্বর- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)



চতুর্থ কোর : চতুর্থ কোরের সদর দপ্তর ছিল আগরতলায়। লেঃ জেনারেল সাগত সিং এই কোরের কমান্ডার ছিলেন। অষ্টম, সাতান্ন ও তেইশ পার্বত্য ডিভিশন নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এ ছাড়া দুই স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ ট্যাংক ও একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট (বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি) ছিল।

১০১ কমিউনিকেশন জোন : ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সদর দপ্তর ছিল গৌহাটিতে। মেজর জেনারেল জি. এস. গিল ছিলেন এর কমান্ডার। যুদ্ধে জেনারেল গিল আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা কমান্ডার নিযুক্ত হন। একটি পদাতিক বিগ্রেডের সমান ছিল এর আকার ও শক্তি।[৩৩]

মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল '৩০৩ রাইফেল, সাব মেশিন গান, সীমিত সংখ্যক হালকা মেশিন গান ও পাকিস্তানীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মর্টার। তাদের কোন গোলন্দাজ বাহিনী কিংবা সুসংগঠিত বিমান বাহিনী ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে প্রথাগত যুদ্ধ করে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। সূচনাপর্বে মুক্তিযোদ্ধারা অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করে এবং তাঁদের মনোবল অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। অসীম বীরত্ব ও সাহস, অমিত তেজ ও সুমহান দেশপ্রেমই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যের কারণ। মানব-ইতিহাসে সমগ্র জনপদে এমন সুকঠিন প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে টিকে থাকা মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পরে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের মধ্যে মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠিত হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে।

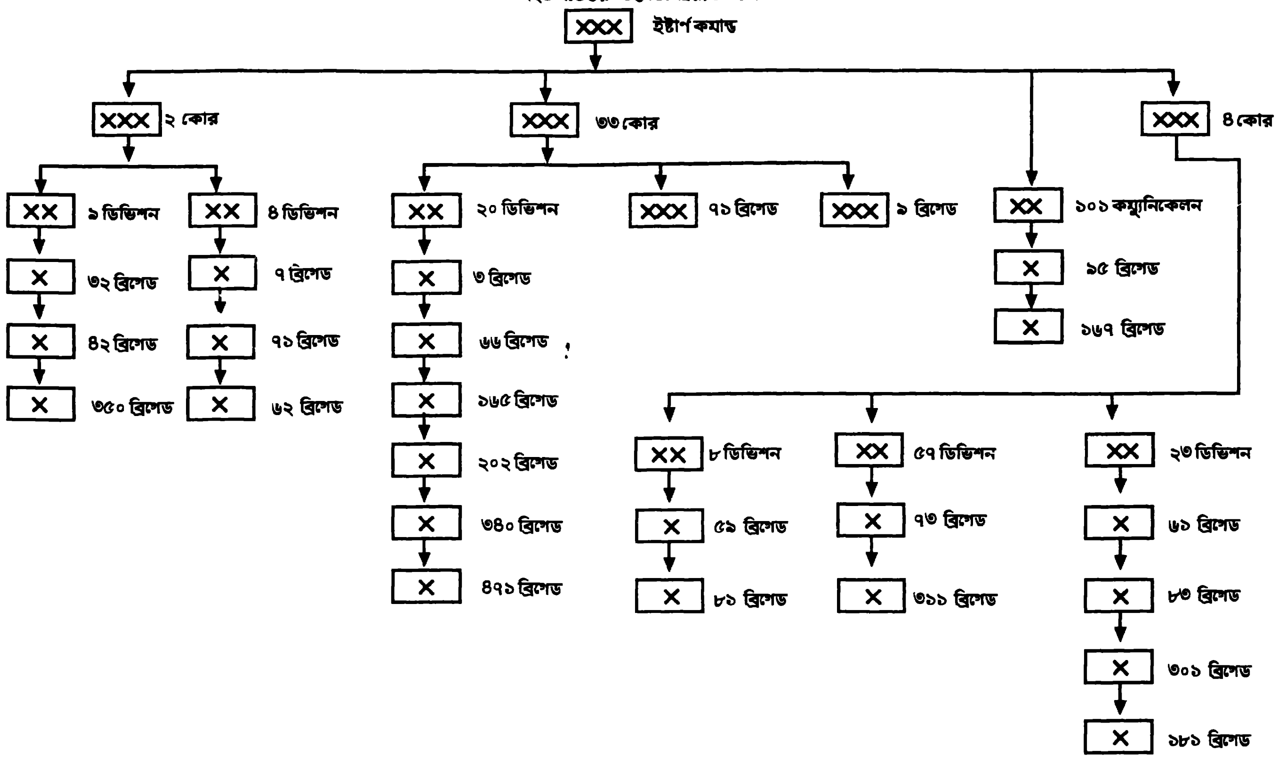
মুক্তিবাহিনীর হাই কমান্ড সম্যক উপলব্ধি করে যে শুধুমাত্র প্রথাগত যুদ্ধ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। মে মাসের শেষদিকে বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গেরিলাযুদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্যদের হতাশাগ্রস্ত করে তোলে এবং বিচ্ছিন্ন এলাকায় মোতায়েন হতে বাধ্য করে। পাকিস্তানী সৈন্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র গেরিলা অভিযানের ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সদর দপ্তর থেকে প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারকে নিজ সেক্টর এলাকায় গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অপারেশনের জন্য পাঠাতে নির্দেশ জারী করা হয়।[৩৪]

৩৩. ঐ, 103.
৩৪. দৈনিক বাংলা ০৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হেদায়েত হোসেন মোরশেদ কর্তৃক গৃহীত জেনারেল ওসমানীর সাক্ষাৎকার।

পরিশিষ্ঠ-৩

ভারতীয় সেনাবাহিনী ইষ্টার্ণ কমান্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

(২১ নভেম্বর -১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)



উল্লেখ্য যে কর্নেল (পরে জেনারেল) এম. এ. জি. ওসমানী প্রথাগত যুদ্ধে প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, শুধু গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করে বাংলাদেশ মুক্ত করতে অনেক সময় লাগবে। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ৬০-৭০ হাজার গেরিলা ছাড়াও ২৫০০০ নিয়মিত সৈন্য প্রথাগত যুদ্ধের জন্য গড়ে তোলা হবে। জুলাই-অক্টোবর মাসে এ কারণে 'জেড কোর্স', 'এস কোর্স' ও 'কে কোর্স' নামে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। আশা করা হয় যে নবগঠিত ব্রিগ্রেডসমূহ বিশাল এলাকা মুক্ত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব হয় নি। কারণ মুক্ত এলাকা ধরে রাখার মতো গোলন্দাজ বাহিনী বা বোমারু বিমান বাংলাদেশ বাহিনীর ছিল না।

কতিপয় অফিসার অবশ্য নিয়মিত ব্রিগ্রেড গঠনে দ্বিমত পোষণ করেন। সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে মেজর আবু তাহের চল্লিশটি গেরিলা ডিভিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন যে সকল সেক্টর কমান্ডারকে তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যসহ বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় স্থানান্তর করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অনেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সেই মোতাবেক গেরিলা যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরে একটি নির্দেশনামা জারী করা হয়।

মুক্তিবাহিনীর রণকৌশল কী হবে সে বিষয়ে সেপ্টেম্বর মাসেই বিস্তারিত যুদ্ধপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুসৈন্যদের সামনের দিক দিয়ে ব্যস্ত রাখা হয় এবং পশ্চাত দিক দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। অবশ্য মুক্তিবাহিনীর সেক্টরসমূহ ও ব্রিগেসমূহের অবস্থান পরিবর্তন করা হয় নি।

চূড়ান্ত অভিযান

নভেম্বরে মুক্তিবাহিনী সীমান্তসংলগ্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে। হতোদ্যম পাকিস্তানী সৈন্যরা সর্বত্রই পশ্চাদপসরণ করছিল। এই বিশাল মুক্ত এলাকা থেকে চূড়ান্ত অভিযান সহজতর হয়। উল্লেখ্য যে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী সমন্বয়ে যৌথ কমান্ড গঠনের বিষয়ে নভেম্বর মাস থেকে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন।* ৩ ডিসেম্বর বিকেলে যৌথ কমান্ড কার্যকর হয়, যখন পাকিস্তান বিমান বাহিনী আকস্মিকভাবে অমৃতসর, শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকায় অঘোষিত বোমাবর্ষণ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেসময় কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি অবিলম্বে

অগ্রাভিযানের পূর্ণ বিবরণ মেজর জেনারেল ডি. কে. পালিত রচিত *The Lightning Campaign* গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লীর পথে যাত্রা শুরু করেন এবং ভারতীয় বাহিনীকে সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করার আদেশ দেন। যৌথ বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অগ্রাভিযান শুরু করে।*

মুক্তিবাহিনী ৭ নভেম্বর ৮ নম্বর সেক্টরে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কালীগঞ্জ এলাকায় বিশাল ভূখন্ড মুক্ত করে। ৭ নম্বর সেক্টরে অনুরূপভাবে হিলি অভিমুখে মুক্তিবাহিনী অগ্রসর হয়। ৬ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ভূরুঙ্গামারি দখল করে। উত্তরে কামালপুর যুদ্ধ এবং পূর্বে বেলুনিয়া যুদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্যদের হতাশাগ্রস্ত করে। বহু পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। সিলেটে 'জেড ফোর্স' অধিকতর তৎপরতা দেখায়। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল ২০ নভেম্বর আটগ্রাম দখল করে সুরমা নদীর পূর্বতীরে কানাইরঘাট এলাকায় অবস্থান সুদৃঢ় করে। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল ছাতক দখল করে নেয়। একটি পাকিস্তানী ব্রিগেড ক্রমাগত ছয় দিন মুক্তিবাহিনীকে প্রতিহত করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহু হতাহতের পর অক্টোবরের শেষ দিকে পিছু হটে যায়। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার মেজর শাফায়াত জামিল ছোটখিল যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর মহসিন এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২ নভেম্বর গোয়েঘাট দখল করে সিলেটের পথে অগ্রযাত্রা আব্যাহত রাখেন।

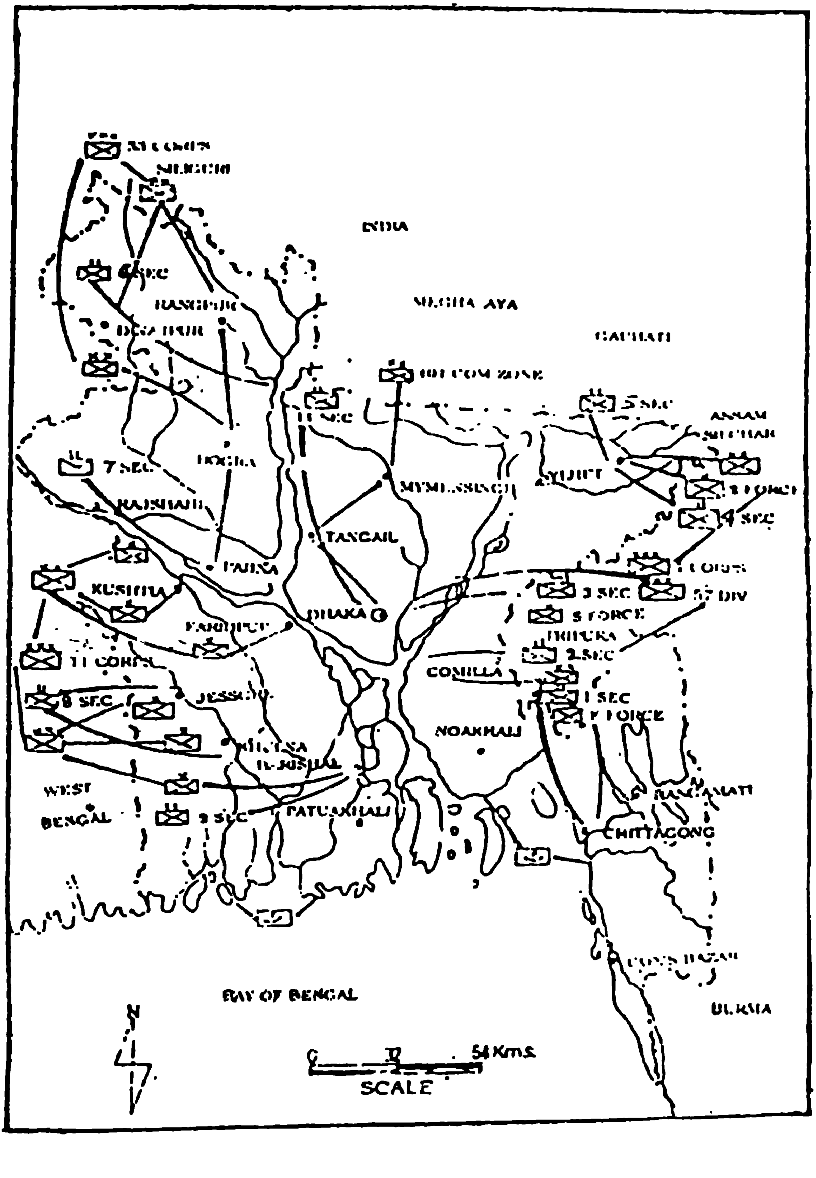
অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক মেজর আমিনুল হক নভেম্বরের মাঝামাঝি লাতু দখল করেন এবং ১ ডিসেম্বর কমলগঞ্জ মুক্ত করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর অভিযানের ফলে মৌলভীবাজারের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এক নম্বর সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রায় সবক'টি যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে। দুই নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ডিসেম্বরের ১ তারিখে ফেনী দখল করে। চতুর্থ ও দশম ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যরা রেজুমিয়া ব্রীজ অভিমুখে অগ্রসর হয়। ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে এক নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা এই ব্রীজে মিলিত হয় এবং ১ ডিসেম্বর যৌথভাবে ফেনী-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে অগ্রসর হয়। একটি দল মুহুরী নদীর পাড় দিয়ে ডান দিকে অগ্রসর হয় এবং অপর একটি দল মহাসড়ক ধরে বামদিকে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। ১ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা ছাগলনাইয়া থেকে পিছু হটে যায়।

চতুর্থ ও দশম ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যরা এবং ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে অগ্রসরমান সৈন্যরা ৯ ডিসেম্বর জোরারগঞ্জ পৌঁছে। এখানে মিত্রবাহিনীর ৩২ মাহার রেজিমেন্টের সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং পাকিস্তানী অবস্থানের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। গোলন্দাজ সহায়তায় পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে। জোরারগঞ্জ যুদ্ধে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটার সময় শুভপুর ব্রীজসহ সকল ব্রীজ ধ্বংস করে দেয়। মিত্রবাহিনীর ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে

* মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযান পরিশিষ্ট-৪-এ দেওয়া হয়েছে।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর অগ্রাভিযান

পরিশিষ্ট-৪



অগ্রসর হয়ে ১১ ডিসেম্বর সীতাকুন্ড এলাকায় চন্দ্রকান্ত মন্দিরে পৌঁছে যায়। যৌথবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর সকালে কুমিরা দখল করে এবং ঐ দিনই চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে। সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম সার্কিট হাউসে তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করেন এবং ক্যাপ্টেন মাহফুজ চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে তাঁর সৈন্যসহ অবস্থান গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম ক্লাবের বিপরীতে রেলওয়ে ভবনে ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেডের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। [৩৫]

দুই নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের দশম ইস্ট বেঙ্গল ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী দখল করে এবং চট্টগ্রাম অভিমুখে ধাবিত হয়। যৌথবাহিনী ১৩ ডিসেম্বর কুমিরার মাত্র ৪ মাইল পেছনে পৌঁছে যায়। নবম ইস্ট বেঙ্গল এবং চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল যথাক্রমে মেজর আইনউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। ১৪ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে দশম ইস্ট বেঙ্গল কুমিরা পৌঁছে এবং পাহাড়ী এলাকা দিয়ে হাটহাজারীর দিকে অগ্রসর হয়। ঐ দিনই তারা হাটহাজারী পৌঁছে এবং ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানী অবস্থান আক্রমণ করে। ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের মেজর হাদি তাঁর অধীনস্থ এক কোম্পানী সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে। তিন নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী ৩০ নভেম্বর আখাউড়া পাকিস্তানী অবস্থানের উপর প্রচন্ড আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ কয়েকদিন স্থায়ী হয়। মুক্তিবাহিনী আযমপুর রেলওয়ে স্টেশন ১ ডিসেম্বর ভোর ছটার সময় দখল করে নেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা ২ ডিসেম্বর পুনরায় আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী সাময়িকভাবে পেছনে সরে আসে এবং ২ ডিসেম্বর আবার আক্রমণ করে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন আখাউড়া যুদ্ধে যোগ দেয়। ৪ ডিসেম্বর বহুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। অবশিষ্ট পাকিস্তানী সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পলায়ন করে। লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান, নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান, সিপাহী রুহুল আমিন, সিপাহী শাহাবউদ্দিন ও সিপাহী মুস্তাফিজুর রহমান আখাউড়া যুদ্ধে নিহত হন। [৩৬]

আখাউড়া দখলের পর দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। প্রথম দলটি দক্ষিণ দিক থেকে ব্রাহ্মবাড়িয়া আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয় দলটি উত্তর দিক থেকে সিলেট সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবেশ করে। ৮ ডিসেম্বর এস কোর্স-এর ১১ ইস্ট বেঙ্গল শাহবাজপুর নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যে ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে আশুগঞ্জ-ভৈরব বাজারে অবস্থান গ্রহণ করে। ৯ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী এবং মিত্র বাহিনীর ৩১১ মাউন্টেন ডিভিশনের অধীনস্থ ব্যাটালিয়নসমূহ আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশনের সৈন্যরা আখাউড়ায় সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলেছিল। মিত্র বাহিনীর ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট, এস কোর্স ও তিন নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে ফেলে এবং আশুগঞ্জে প্রবেশ করে।

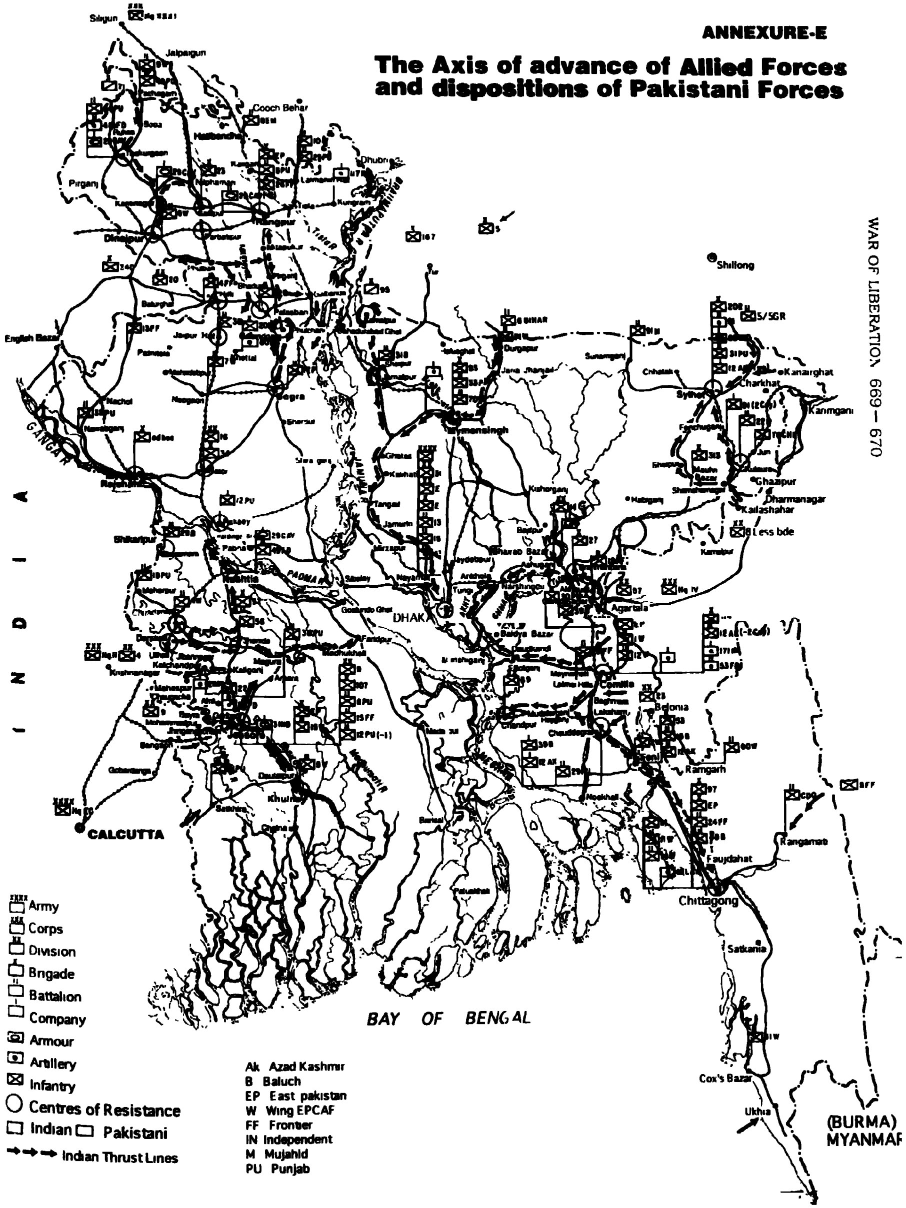
৩৫. Shafiullah, *Bangladesh at War,* 201-203.

৩৬. পূর্বোক্ত, 180.

পরিশিষ্ট ৫

ANNEXURE-E

The Axis of advance of Allied Forces and dispositions of Pakistani Forces



মিত্রবাহিনীর ১ স্কোয়াড্রন ট্যাংক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ১০-১১ ডিসেম্বর আশুগঞ্জ থেকে পশ্চাদপসরণ করে ভৈরবে অবস্থান গ্রহণ করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৯ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্যরা ১১ ডিসেম্বর হেলিকপ্টারযোগে মেঘনার অপর তীরে অবতরণ করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী অগ্রসরমান পাকিস্তানী সৈন্যদের গতিরোধ করে। অনন্যোপায় হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভৈরব ব্রীজ ধ্বংস করে। মিত্রবাহিনীর ৭৩ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনীর এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ভৈরববাজার ঘিরে ফেলে। অপরদিকে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ১০ বিহার ও ১৮ রাজপুত নরসিংদী অভিমুখে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ১২ ডিসেম্বর রায়পুরা ও ১৩ ডিসেম্বর নরসিংদী পৌঁছে। মিত্রবাহিনীর ৪ জাট রেজিমেন্ট এবং মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল নরসিংদী ডেমরা সড়ক ধরে বরপা পৌঁছে যায় এবং ভুলতা–মুরাপাড়া–রূপগঞ্জ হয়ে ঢাকার পথে অভিযান অব্যাহত রাখে। ১৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় এবং ১০ বিহার রেজিমেন্ট বালু নদী পর্যন্ত দখল করে। ১৬ ডিসেম্বর দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঢাকা-ডেমরা সড়কে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। কর্নেল খিলজির নেতৃত্বে পাকিস্তানী সৈন্যরা অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় মাতুয়াইলে যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং ও মুক্তিবাহিনীর লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ ১৬ ডিসেম্বর ৩টা ৩০ মিনিটে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে যান।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তিশালী অবস্থানগুলোকে পাশ কাটিয়ে তীব্র গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল ভারতীয় যুদ্ধপরিকল্পনার মূল বিষয়। কলিকাতায় অবস্থিত দ্বিতীয় কোরের দুই ডিভিশন সৈন্য পদ্মার পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা মুক্ত করার লক্ষ্যে ধাবিত হয়। লেঃ জেনারেল টি. রায়না দ্বিতীয় কোরের অধিনায়ক ছিলেন। একটি ব্রিগেড কুষ্টিয়ার দিকে, একটি ব্রিগেড মাগুরা-ফরিদপুরের দিকে এবং অপর একটি ব্রিগেড খুলনা-বরিশালের দিকে অগ্রসর হয়। অবশিষ্ট ব্রিগেডগুলো খুলনা-যশোর-ভেড়ামারা রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে শত্রুসৈন্যদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে।[৩৭]

মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত করেছিল। মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডসমূহ কোন বাধা ছাড়াই ঝিনাইদহ দখল করে শত্রুর যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে। ঝিনাইদহের পতনের পর পাকিস্তানী সৈন্যরা মাগুরায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং যশোরের পতনের পর তারা খুলনায় অবস্থান নেয় এবং দক্ষিণ দিক থেকে যৌথ বাহিনীর সম্পূর্ণ এলাকা দখল করে। যৌথ বাহিনী কর্তৃক মাগুরা আক্রান্ত হলে পাকিস্তানী সৈন্যরা মধুমতি নদীর তীরবর্তী কামারখালী এলাকায় অবস্থান নেয় এবং ফরিদপুরে পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে মিত্রবাহিনীর একটি ব্রিগেড ফরিদপুর দখল করেছিল। এমতাবস্থায় ১১ ডিসেম্বর নাগাদ পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর ছিলনা।

৩৭. Palit, *The Lightning Campaign*, 139.

লেঃ জেনারেল এম.এল. থাপানের নেতৃত্বে তেত্রিশ কোরের এক ডিভিশন সৈন্য হিলি আক্রমণ করে এবং রংপুর ও দিনাজপুরে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থানে মিত্রবাহিনীর দুইটি ব্রিগেড প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ৭ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী চাঁপাই নবাবগঞ্জে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। লেঃ রফিক ও লেঃ রশিদ তাদের বাহিনী সহ রহনপুর-আমনুরা-নবাবগঞ্জ অক্ষরেখা বরাবর অগ্রসর হয়।

অপর দিকে বীরশ্রেষ্ঠ কাপ্টেন জাহাঙ্গীর তাঁর বাহিনীসহ শিবগঞ্জ-নবাবগঞ্জ অভিযান অব্যাহত রাখেন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ১৩ ডিসেম্বর নবাবগঞ্জ বারঘোরিয়া নামক স্থানে শত্রুর পরিখায় গ্রেনেড নিক্ষেপকালে নিহত হন। নবাবগঞ্জ ১৪ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়। মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী রাজশাহী পৌছে যায়। পলায়নরত পাকিস্তানী সৈন্যরা নাটোরে যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে ১৪ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী দিনাজপুরে প্রবেশ করে। ১৬ ডিসেম্বর বগুড়া শত্রুমুক্ত হয়।

পাকিস্তানী ১৬ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহকে ৮ ডিসেম্বর লেঃ তারেকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পীরগঞ্জে এমবুশ করে। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং স্থানীয় বাসে চড়ে রংপুর পৌঁছেন।[৩৮]

এগারো নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা কামালপুর শত্রুমুক্ত করে এবং পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে বক্সীগঞ্জ ও মোরাপুর দখল করে। ৭ ডিসেম্বর দেওয়ানগঞ্জ এবং বাহাদুরাবাদ দখলের পর মুক্তিবাহিনী ট্রেনযোগে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হয়। ১১ ডিসেম্বর জামালপুর মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। অতঃপর মুক্তিবাহিনী ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার উপকণ্ঠে পৌছে যায়। ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল জি. এস. গিল এক ব্রিগ্রেড সৈন্যসহ ৯ ডিসেম্বর জামালপুর পৌঁছে যান।

যুদ্ধে মেজর জেনারেল গিল গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং অপর একটি ভারতীয় ব্রিগেড নিয়ে ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করেন। টাঙ্গাইলের বিশাল এলাকা কাদেব সিদ্দিকীর বাহিনী শত্রুমুক্ত করে। ১২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল শহরের কয়েক মাইল উত্তরে একটি ভারতীয় প্যারা ব্রিগেড বিমান হতে অবতরণ করে। টাঙ্গাইলের পতন হয়। প্যারা ব্রিগেড এবং কাদের বাহিনী ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হয়।

৩৮. Major General Lachhman Singh PVSM VrC, *Indian Sword Strikes in East Pakistan* (1979), 93; Shafiullah, *Bangladesh at War*, 188.

লেঃ জেনারেল সাগত সিং-এর নেতৃত্বে চতুর্থ কোরের তিনটি ডিভিশন সুরমার দক্ষিণে এবং মেঘনার পূর্বে অবস্থিত এলাকা দখলের জন্য ধাবিত হয়। চট্টগ্রামের দিকে পাকিস্তানী সৈন্যদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে মেঘনা নদী অতিক্রম করে ঢাকার পথে অগ্রসর হওয়া এদের উদ্দেশ্য ছিল। এক ডিভিশন সৈন্য শিলচর-করিমগঞ্জ অক্ষরেখা বরাবর সিলেট অভিমুখে, এক ডিভিশন সৈন্য আখাউড়া-আশুগঞ্জ অক্ষরেখা বরাবর ঢাকা অভিমুখে এবং এক ডিভিশন সৈন্য কুমিল্লা, লাকসাম ও ফেনী দখল করে চট্টগ্রামের দিকে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য অগ্রসর হয়।

২-৩ ডিসেম্বর রাতে চার নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা কানাইরঘাট দখল করে। যৌথ বাহিনী ১২ ডিসেম্বর হরিপুর আক্রমণ করে। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল, ৪ নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা ও মিত্র বাহিনী সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল মৌলভীবাজার হয়ে সিলেটের পথে অগ্রসর হয়। পাঁচ নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা এবং তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল গোয়েনঘাট ও ছাতক দখলের পর সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়। ১৫ ডিসেম্বর খাদিমনগরে পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর খাদিমনগরের পতন ঘটে।

১০১ কম্যুনিকেশন জোনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল নাগরা এবং ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ১৪ ডিসেম্বর টঙ্গী এবং ১৬ ডিসেম্বর সকালে সাভার পৌছে যায়। পাকিস্তানী ৩৬ ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল জামশেদ মিরপুর ব্রিজে মেজর জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানান। সকাল ১০-১০ মিনিটে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়ধ্বনির মধ্যে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। অপরাহ্ন একটায় ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণের দলিলসহ ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিনই বিকাল চারটায় লেঃ জেনারেল অরোরা ও তাঁর স্টাফ অফিসারগণ হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল অরোরার সঙ্গে আসেন। পরাজিত পাকিস্তানী অধিনায়ক লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী বিমানবন্দরে লেঃ জেনারেল অরোরাকে অভ্যর্থনা জানান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেস্‌কোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং লেঃ জেনারেল নিয়াজী তাঁদের অধীনস্থ্ বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৯]

৩৯. আত্মসমর্পণের মূলপাঠ সিদ্দিক সালিক প্রণীত *Witness to Surrender* গ্রন্থে পরিশিষ্ট ৩ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

উপসংহার

অবশেষে বন্দুকের শক্তি পরাজিত হয় এবং বীর জনতার বিজয় হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে এই বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, সাহস ও দেশপ্রেম দৃষ্টান্তমূলক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

এভাবে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধিকার অর্জনের দাবিতে পরিণত হয় এবং অবশেষে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পাকিস্তানী সৈন্যদের জঘন্যতম গণহত্যার জবাবে বাঙালি জাতি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বেসামরিক জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জনগণের অংশগ্রহণ এবং বাঙালি সৈন্যদের সামরিক দক্ষতা বাংলাদেশ স্বাধীন করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই বিজয় জনগণের সুদৃঢ় সংকল্প ও বাঙালি সৈন্যদের অংশগ্রহণের ফলে অর্জিত হয়। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বেসামরিক জনতা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রতিরোধযুদ্ধ সফলতা লাভ করে এবং জাতীয় ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করে।

২২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : বৃহৎ শক্তি প্রতিক্রিয়া

আবুল কালাম*

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে এ দেশের মুক্তযুদ্ধ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে ; বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গভীরতর আগ্রহের সঞ্চার হয়ে চলেছে।[১] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশ্বশক্তিবর্গের রাজনৈতিক মেরুকরণ ও মৈত্রীসম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া) ও গণচীনের মতো বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহের হস্তক্ষেপমূলক ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[২] রাজনৈতিকভাবে অধিকার বা কর্তৃত্ব আরোপ না করা হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গ মহা দায়িত্বের দাবিদার। এটা বৃহৎ শক্তি মাত্রেরই স্বঘোষিত বা অঘোষিত ভাবমূর্তি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বৃহৎ শক্তিবর্গ তা'দের নিজ নিজ ভাবমূর্তির

---

* অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ভারত, জাতিসংঘ, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ ও বিশ্বজনমতের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মতামত দ্রুত পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল* (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২)। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা সম্পর্কিত লেখকের বিশ্লেষণধর্মী পূর্বেকার লেখালেখির মধ্যে রয়েছে, "Bangladesh Independence Movement, South Asia and the Great Power Triangle. A Strategic Re-assessment" in Emajuddin Ahamed and Abul Kalam (eds.), *Bangladesh, South Asia and the World* (Dhaka, 1992)

২. দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্রষ্টব্য, Dilara Chowdhury, *Bangladesh and the South Asian International System* (Dhaka 1992); Richard Sisson and Leo E. Rose, *War and Secession : Pakistan, India and the Creation of Bangladesh* (New Delhi, 1990); A. M A. Muhith, *American Response to Bangladesh War of Independence* (Dhaka 1996); Rashid-ul Ahsan Chowdhury, "United States Foreign Policy in South Asia : 1971," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* vol. 35, No. 1 (June 1990).

সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ঘটনা মূল্যায়ন করে থাকে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত হয় ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে। বাংলাদেশের জন্য ১৯৭১ সন ছিল যুগসন্ধিক্ষণ, ঘটনাবহুল। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে এবং পরে ঘটেছে মার্চে পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতা। এসবের প্রত্যুত্তরে বাঙালিরা স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করে। এসব ঘটনা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ফলে বৃহৎ শক্তিবর্গ সাড়া না দিয়ে পারে নি। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময় থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণের তাগিদ অনুভব করে। পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিবর্গও এ বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, এসব শক্তির প্রতিক্রিয়া কি ধরনের ছিল? মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর্যায়ে মোটামুটি এসব বিষয় এ প্রবন্ধে পর্যালোচিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত্রে পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানে নৃশংস সামরিক অভিযান ('Operation Searchlight') পরিচালনা করে। এ ঘটনায় বিশ্বের তিনটি প্রধান শক্তি দৃশ্যত হতবাক হয় এবং এ ঘটনার পর থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রতিটি বিশ্বশক্তি বাংলাদেশ সংকটে জড়িয়ে পড়ে।[৩] তবে এমন বলা সমীচীন হবে না যে, বিশ্বের নীতিনির্ধারক শক্তিগুলোর বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কিত কোনরূপ পরিকল্পিত নীতি ছিল। বরং লক্ষণীয় যে এ সংকট চলাকালে ওয়াশিংটন, মস্কো ও বেইজিং-এর প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্তি, সংশয় ও দোদুল্যমানতার উপাদান পরিস্ফুট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘটনাপ্রবাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এ প্রক্রিয়ায় ওয়াশিংটন বারবার পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে প্রাণহানি, ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং তাদের দ্বারা জনজীবনের জন্য কষ্টদায়ক পন্থা অবলম্বনের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে "ন্যায্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের" উপর বিধি-নিষেধ আরোপের কারণেও মার্কিন উদ্বেগ ব্যক্ত হয়। স্বাভাবিক কারণে আগ্রাসনের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলনরত জনগণের জন্য আমেরিকায় যথেষ্ট সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয় এবং সেই প্রভাব বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন নীতিতেও প্রতিফলিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যঘাটতি পূরণে আন্তর্জাতিক ত্রাণসাহায্যে মার্কিন অবদান ও অনুদান এবং একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ও ভারতীয় শরণার্থীশিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর জন্য মার্কিন খাদ্যসাহায্যে মার্কিন জনগণের সহানুভূতি প্রকাশ পায়।[৪]

৩. শুধুমাত্র ১৯৭১-এর এপ্রিলের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত পর্যায়ে কয়েকটি 'Position Paper' এবং 'Report' তৈরী করা হয়। বিশেষত কিভাবে মার্কিন বাংলাদেশ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে সেই বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশমালা সংযোজিত হয়। দ্র : প্রাগুক্ত. পৃ : ৪৭-৬২।

৪. দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা চলে, "The Crisis in East Pakistan Statements by the Department of State Press Spokesman", March 26, 31, April 2, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 27, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল*। Vol. 13 পৃঃ ২০১-২১৫।

পক্ষান্তরে, মস্কো ও বেইজিং-এর প্রতিক্রিয়া ছিল কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, যদিও তা ছিল কম্যুনিস্ট কূটনীতির চিরাচরিত ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কার্যত, এ দু'টি সরকারের কোনটাই ভাষাগত উদ্বেগ ও আশংকার ঊর্ধ্বে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে কি ঘটছে বা না ঘটছে সেই ব্যাপারে কোনরূপ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণে অনীহার ভাব প্রদর্শন করে। দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষকরে ভারত থেকে প্রকাশিত প্রায় সকল লেখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকাকে প্রায়শই বিতর্কিতভাবে দেখাবার প্রয়াস মেলে; পক্ষান্তরে সোভিয়েত ভূমিকা ইতিবাচক দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়।

একথা সম্ভবত সত্য যে, বাংলাদেশের সংকটকালে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের নীতি নির্ধারণে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু কিছু কিছু লেখক ও বিশ্লেষক এসব শক্তির প্রতিপত্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখাতে প্রয়াসী হন, এমনকি তাদের ক্ষমতার ভুল ব্যাখ্যাও প্রদান করেন।[৫] আজো অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করে পাকিস্তানী নৃশংস সামরিক জান্তার প্রতি অব্যাহত সমর্থন প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন।[৬] তেমনি 'নীতিবিবর্জিত' ও পাকিস্তানপন্থী অবস্থান গ্রহণের দায়ে চীনও নিন্দাবাদের শিকার হচ্ছে।[৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের রাজনীতির দাবাখেলায় অনেক নাটকীয় পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও বিগত দশকগুলোতে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে আসছে। সেই নীতিগত অবস্থান বাংলাদেশের সংকটকালে বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত বহন করে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের অনেক দলিল ও প্রমাণপত্র এখন গবেষকদের সমীপে উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষক ও বিশ্লেষকমাত্রই এসব থেকে লাভবান হতে পারেন, পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন সামগ্রিক সমস্যার। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা মুক্তিযুদ্ধোত্তর অনেকটা ভাবাবেগ ও অনুভূতিপ্রসূত অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন, উপস্থাপন করতে পারেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

---

৫. দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে যে, একজন বিশ্লেষক "বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়কে দুটো পরাশক্তি ও কয়েকটি বৃহৎশক্তির মিশ্র প্রক্রিয়ার ফল" বলে অভিহিত করেন। এ মতে, বৃহৎ শক্তিগুলোর একটি ছিল "প্রতিবেশী চীন এবং অতি উচ্চাভিলাষী কতিপয় মাঝারি ধরনের শক্তি, যাদের মধ্যে প্রতিবেশী ভারত ছিল একটি।" Dr. M. A. Aziz, "Bangladesh Relations with India", *Endeavor*, Vol 8, Nos. 10 and 11 (February 1989).

৬. Dilara Chowdhury, *প্রাগুক্ত*, 75, 82.

৭. দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য, "China and the Emergence of Bangladesh: Role of Great Power Global Perceptions", *India Quarterly*, Vol. 39, No, 2 (April-June 1983).

কোন কোন লেখক এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করে আসছেন যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ ইচ্ছা করলে পূর্ব পাকিস্তানে সহিংসতা রোধ করতে পারতো, সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারতো দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান বিধানে। কিন্তু এ ধরনের দায়িত্ব সম্পাদন করার সাধ্য বা সদিচ্ছা কি তাদের ছিল ? সম্ভবত না। কেননা বৃহৎ শক্তিবর্গ একে অপরের বিরুদ্ধে বিশ্বরাজনীতির শক্তিদ্বন্দ্বে মেরুকরণপ্রক্রিয়ায় বিজড়িত ছিল । এ কারণে শান্তি কিংবা সহিংসতা কিছুই তাদের স্বাভাবিক অভিন্ন অভিলাষ বা অভিরুচিতে ধরা পড়ে না। পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি সংরক্ষিত হলে এক শক্তিজোটের জন্য তা স্বস্তির বিষয় হলেও পক্ষান্তরে বিরোধী জোটে পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অবকাশ থাকে। কোন কোন বিশ্লেষক প্রায়শ এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যে, পাকিস্তানের ভাঙন ও স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল আন্তর্জাতিক শক্তি-রাজনীতির ফসল। এ ধরনের বক্তব্যে বস্তুত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে, তুচ্ছ করে দেখা হয় পাকিস্তানী সরকারের নৃশংসতার প্রত্যুত্তরে বাঙালিদের আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাসকে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব ছিল শূন্যমান প্রকৃতির—'হয় হার, না হয় জিত' ভিত্তিক সেই শূন্যমানের খেলার প্রেক্ষাপটে একথা বলা সমীচীন নয় যে, বাংলাদেশ সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বৃহৎ শক্তিবর্গের নিছক সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পারস্পরিক সহযোগিতাই যথেষ্ট ছিল।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে নিরাপত্তা, রণনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে প্রবন্ধে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের পারস্পরিক নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিমাত্র; এতে প্রতিফলিত হয় তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের অন্বেষার প্রয়াস—বাঙালিদের ও পাকিস্তানীদের একত্রে নির্ভরশীল করে রাখা বা তাদের স্বাধীনতা আদায়ের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন প্রকার পরার্থী নীতিতে তারা কেউ অনুপ্রাণিত হয় নি। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দলিল-প্রমাণাদি ও গবেষণাকর্ম থেকে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড মার্চের গণহত্যা ও পরবর্তী স্বাধীনতা ঘোষণার পর্যায় থেকে কালক্রমে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করে, এতে ব্যাঘাত ঘটায় নি । বস্তুত, এ সময় থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের স্বপ্নের মাতৃভূমি 'সোনার বাংলায়' পাকিস্তানী হানাদারদের বেআইনী দখলদার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৭১ ছিল ক্রান্তিকাল। ১৯৬০-এর দশকব্যাপী এবং ১৯৭০ সন অবধি 'দক্ষিণ এশীয় কৌশলগত পরিবেশ সম্পর্কে মার্কিন ও সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়।

ফলে এ অঞ্চলে তাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তৎকালীন দু'টি পরাশক্তির ঐ সময়কার পরিবর্তনমুখী পররাষ্ট্রনীতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবে একই সময়ে চীনকেও এ অঞ্চলের প্রতি তার ভূমিকা ও নীতি পুনর্নির্ধারণে প্ররোচিত করে। মার্কিন কৌশলগত নীতির ক্ষেত্রে এ সময়ে কিছু কিছু উপাদান চোখে পড়ার মতো। বিশ্বপরিমণ্ডলে আমেরিকার নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল লক্ষণীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত নীতির ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এসব সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় ঐতিহ্যগত মার্কিন কৌশলগত নীতির ধারায় এমন একটি ভাব বিদ্যমান ছিল, যাতে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টির কোন কারণ ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্বের দু'টি অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর ঘটনাপ্রবাহ আলোচিত হয়েছে, যেসকল ঘটনা বা দুর্ঘটনায় পাকিস্তানী সরকার প্রবৃত্ত হয় ২৫ মার্চের নৃশংসতায়, বাধ্য করে বাংলাদেশের জনমানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে। উপর্যুক্ত ঘটনাবলীতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং কিভাবে তারা তাদের নিজ নিজ নীতি নির্ধারণ করে বর্তমান অধ্যায়ে এসব বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল বহুকাল থেকে। দ্বন্দ্ব নিরসনে দু'পক্ষের আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় ১৯৭১-এর মার্চ মাসে। সেই অচলাবস্থার পটভূমিতে ২৫ মার্চের রাত্রে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী অতর্কিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণের উপর এক নিষ্ঠুর সামরিক হামলা পরিচালনা করে। সেই হামলার অন্তরালে মূল কারণ ছিল ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নিকট পাকিস্তানের সামরিক সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৭০ সনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ঐতিহ্যগত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগেরই পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার কথা। কিন্তু সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক রায় অগ্রাহ্য করে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সামরিক সরকারের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মার্চের নৃশংসতার পরবর্তী নয় মাসকাল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সর্বত্র যে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে, তা গ্রন্থের পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগীদের নৃশংসতার শিকার হয়ে নিরাপত্তা অন্বেষণে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে। এতে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের

পাশাপাশি বেসামরিক জনগণও যোগ দেয়। দিকনির্দেশনা আসে নির্বাসিত সরকার থেকে। অভ্যন্তরীণভাবে পাকিস্তানে এভাবে সংগ্রাম শূন্যমানের রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রশ্নে বিবদমান দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে পান্তিপূর্ণ মীমাংসার ঊর্ধ্বে চলে যায়। ইসলামাবাদে অধিষ্ঠিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার বিষয় গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় নি। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গও বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে অনমনীয় হয়ে পড়ে। ফলে যুদ্ধ হয় অবধারিত।

বহিঃশক্তিবর্গ বাংলাদেশ প্রশ্নকে পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি বলে মনে করে। বহিঃশক্তিবর্গের মধ্যে অবশ্যই ভারতের প্রসঙ্গ প্রথমেই আসে। ভারত হচ্ছে প্রধান আঞ্চলিক শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বাঙালিরা ভারত থেকে আশানুরূপ সাহায্য-সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়, কেননা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন বা এ সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহে জড়িয়ে পড়ার বিষয়ে নয়াদিল্লীতে খুব একটা উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয় নি। পরবর্তীকালে সংকট যতই ঘনীভূত হয়, দানা বেঁধে উঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারত সরকারের আগ্রহ ততই বেড়ে চলে । শীঘ্রই নয়াদিল্লী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। সুনির্দিষ্টভাবে সম্ভবত এটাও বলা চলে যে, পাকিস্তানের ভাঙনে নয়াদিল্লীর উত্তরোত্তর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের এ ধরনের আগ্রহের কারণ দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রাজনৈতিকভাবে, পাকিস্তানের ভাঙন পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করবে; কেননা মুসলিমপ্রধান পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাঠামো ভেঙে দেয়ার অর্থ হবে, মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের ভিত্তিমূলে বহুল প্রচারিত জাতীয়তাবাদের কোনরূপ বাস্তবতা নেই। কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান ভেঙে যাবার ফলে চিরতরে নির্ধারিত হবে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক কর্তৃত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের হোতা কে হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় এভাবে দ্বিতীয় শূন্যমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—সেই হারজিতের খেলায় বিজড়িত হয় ভারত ও পাকিস্তান।

শীঘ্রই অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গও বাংলাদেশ সংকটে অবস্থান গ্রহণে প্ররোচিত হয়। মার্কিন ও চীনা সমর্থন লাভের জন্য পাকিস্তান বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ ও ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি লাভের জন্য সক্রিয় হয়। বিশ্বের জনমানুষ ও সরকারসমূহের সমর্থন লাভের জন্য উভয়ের পক্ষ থেকে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয় যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ আন্দোলনে সমর্থন প্রদানে কার্যত মানবতা ও মানবাধিকারের প্রতিই সমর্থন প্রদান করা হবে, যে মানবতাবোধ ও মানবাধিকারের প্রতি খোদ জাতিসংঘের সনদ নিশ্চয়তা প্রদান করে।

বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কে ১৯৭১ সনের একটি চমকপ্রদ ঘটনা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান এতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান ছিল উভয় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং উভয় দেশের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান তার সংকটকালে দু'টি বৃহৎ শক্তির সমর্থন প্রত্যাশা করে। অথচ দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রের একটিও পাকিস্তানকে প্রতীকধর্মী সমর্থনের ঊর্ধ্বে কার্যকর কোনরূপ সাহায্য প্রদান করে নি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দীর্ঘকাল থেকে পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্কে আবদ্ধ। সেই মৈত্রীসম্পর্কের ঐতিহ্যগত সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামাবাদে অবস্থিত পাকিস্তান সরকারকে কিছু কিছু সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে। সেই সরবরাহ ছিল নিছক প্রতীকধর্মী বা নামেমাত্র সামরিক সাহায্য। পক্ষান্তরে, ১৯৬৫ সন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে অনেকটা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মধ্যস্থতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে ভারতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গের আচরণে পরিলক্ষিত এ ধরনের বৈপরিত্য ও দ্বিমুখী নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির বা পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিভাবে দেয়া যায়? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বৃহৎ শক্তিবর্গের গৃহীত নীতি ও আচরণ সম্পর্কে আরো প্রশ্নের অবতারণা করা চলে। তাদের ঐতিহ্যগত নীতিগত দৃষ্টিকোণের প্রতি তারা কতখানি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল? বন্ধুত্ব বা মৈত্রীবন্ধনের প্রতি তাদের সার্বিক প্রতিশ্রুতি কি বিকশিত হয়, নাকি দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের কৌশলগত চিন্তাধারার ধারণাগত ব্যাখ্যা ও বাস্তব অভিব্যক্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী রূপ পরিলক্ষিত হয়?

গ্রন্থের বর্তমান অধ্যায়ে এসব বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এ প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তিনটি বৃহৎ শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের মৈত্রীযোগাযোগের ধারা ও নিরাপত্তা নীতি একটি বিশ্লেষণী রূপরেখার মাধ্যমে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। সমগ্র বিষয়াবলীকে রীতিবদ্ধভাবে গুছিয়ে বলার প্রয়োজনে প্রবন্ধকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে তিনটি প্রধান বিশ্বশক্তির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও আঞ্চলিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে (ক) পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও রণনীতির সমন্বয়ে একটি বিশ্লেষণী কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে ; কেননা এসব ধারণাগত দৃষ্টিকোণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তাদের পারস্পরিক আচরণকে প্রভাবিত করে। পরবর্তী ভাগগুলোতে (খ, গ, ঘ) তিনটি বৃহৎ শক্তি, যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আচরণ বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীতে তাদের নিজ নিজ ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিরচিত প্রত্যুত্তর পর্যালোচনা

করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ঐ সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে এই তিনটি শক্তিই মুখ্যত প্রভাব বিস্তার করে। এ অধ্যায়ের শেষ ভাগে (ঙ) লেখক তাঁর পরিকল্পিত বিশ্লেষণী ধারা, সিদ্ধান্ত ও তথ্যাদি সারাংশ হিসেবে উপস্থাপনে প্রয়াসী হন, এবং পরিশেষে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রত্যুত্তরের ধারা দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃআঞ্চলিক সম্পর্কে কি ধরনের প্রভাব রাখে তা পুনর্মূল্যায়ন করেন।

(ক) পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও রণনীতি : একটি বিশ্লেষণী রূপরেখা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ছিল জটিল। এতে বৃহৎ শক্তিবর্গের পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তানীতি ও কৌশলগত বাধ্যবাধকতার জটিল সংমিশ্রণ ঘটে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার কারণেই তারা মুখ্যত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহ কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'পররাষ্ট্রনীতি' ধারণা হিসেবে এমন কিছু সিদ্ধান্ত ও গৃহীত ব্যবস্থা বোঝায়, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে "বহুমুখী উপাদানের সমন্বয় ঘটায়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে রাষ্ট্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় দিকগুলো।"[৮] রণনীতি বিষয়ক অভিধানে 'নিরাপত্তা' ও 'রণনীতি' সমার্থমূলক ধারণা বলে বিবেচিত। একই বিষয় প্রসঙ্গে নিরাপত্তা প্রায়শ প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং রণনীতি দ্বারা বোঝায় পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। রণনীতি কলাকৌশল বা বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উভয়বিধ ক্ষেত্রে একটি জাতির ক্রান্তিকালীন বা যুদ্ধচলাকালীন নীতির প্রতি সর্বোচ্চ সমর্থন প্রদানকল্পে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক শক্তির সমন্বয় করে থাকে রণনীতি। রণনীতি এভাবে বিবেচিত হয় জাতীয় উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে; আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর ব্যবহার চলে জাতীয় স্বার্থের স্থায়িত্ব বিধান বা সম্প্রসারণকল্পে।

রণনৈতিক বিজ্ঞানে বিশ্লেষকবৃন্দ জাতি বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-সামরিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পর্যায় বুঝাবার উদ্দেশ্যে 'কৌশলগত' ধারণা ব্যবহার করে থাকেন। উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে নীতি, এরপর রণনীতি এবং নিম্নতম পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় রণকৌশল। রণনৈতিক বিশ্লেষণে 'নীতি' হচ্ছে পরশপাথর স্বরূপ—এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় রণনীতি এবং নীতিগত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে ব্যবহৃত পদ্ধতি বা উপায় রণনীতির মাধ্যমে রূপলাভ করে। রণনীতির নিম্নতর পর্যায়ে রণকৌশল রণনীতির প্রয়োগ হিসেবে চিহ্নিত হয়, যদিও রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে পার্থক্য প্রায়শ অস্পষ্ট বলে মনে হয়। কেননা এদের একটি

৮. K. W. Thompson and Roy C. Macridis, "The Comparative Study of Foreign Policy", in Roy C. Macridis (ed.), *Foreign Policyt in World Politics* (N. J. Englewood Cliffs., 1962), 11.

অপরটিকে শুধু প্রভাবিত করে না, উভয়ে সংমিশ্রিতও হয়ে থাকে।[৯] উপর্যুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতিভাত হবে যে, পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও রণনীতি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ও মিথস্ক্রিয়ায় সংযুক্ত। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে বেশ কিছু কৌশলগত বাধ্যবাধকতা থাকে, আর সেই বাধ্যবাধকতাই বাংলাদেশ সংকটকালে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বান্দ্বিক পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির আন্তঃক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

(খ) মার্কিন প্রতিক্রিয়া

রণনীতি বা নিরাপত্তা কোনরূপ সর্বজনীন হাতিয়ার বলে পরিগণিত নয়; এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র বা শক্তির বিভিন্ন ধরনের ধারণাগত অভিব্যক্তি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আচরণ ও নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বিরচিত এবং সেই জাতীয় স্বার্থের বোঝাপড়া হয়ে থাকে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন সরকারের সকল সিদ্ধান্ত ও গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সেরা শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। এ কারণে দক্ষিণ এশিয়া ও এশিয়ার অন্যত্র মার্কিন নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব পর্যায়ে মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দূরপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিকে পূর্ব অভিমুখী সম্প্রসারণ সুনিশ্চিতকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার এশীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। দুই মহাসাগরের প্রান্তে অবস্থিত বিশ্বে আমেরিকার কৌশলগত পরিচয় স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উল্লেখ্য, আটলান্টিক মহাসাগর ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে জলসংযোগ স্থাপন করে আছে, আর এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে জলজ বন্ধন রেখে চলেছে প্রশান্ত মহাসাগর। ফলে আমেরিকার পক্ষে বিশ্বের সকল বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এছাড়া কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দু'টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থিত। এ দু'টি অঞ্চল হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়া। বিশ্বরাজনীতির অনুকূল বিবর্তন ও নিজস্ব কৌশলগত গুরুত্ব ও প্রাধান্য বৃদ্ধির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহায্য-সমর্থন প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এশিয়ায় মার্কিন অবস্থান সেই অঙ্গীকারেরই অংশবিশেষ এবং এ মহাদেশে মার্কিন উপস্থিতি তার অগ্র-প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

---

৯. Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina 1954-1975* (Dhaka 1983), 292-293

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালীন মার্কিন নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী মার্কিন নীতি প্রণীত হয় একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত কম্যুনিস্ট জোটের প্রত্যক্ষ ভয়ভীতিজনিত হুমকির প্রেক্ষাপটে। মার্কিন দৃষ্টিতে, সেই সংগঠিত কম্যুনিস্ট জোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালীন নতুন বিশ্বশক্তি সাম্যের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে চলছে। এ জোট ছিল সশস্ত্র, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ছিল এ জোটের সক্রিয় কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা-প্রশাখা। সেই জোটের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মস্কো এবং বিশ্বের সর্বত্র কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর মাধ্যমে মস্কোর কেন্দ্রীয় নির্দেশাবলী পালিত হতো। স্পষ্টতই ১৯৫০-এর দশকব্যাপী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মস্কোর পরিচালনায় কম্যুনিস্টদের বিজয় সূচিত হয় এবং ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক হুমকি সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা প্রয়াসী হয় কিভাবে সেই হুমকির মোকাবেলা করা চলে, একে প্রতিহত করা যায় যাতে বিবর্তমান শক্তিসাম্য সংরক্ষিত হয়। এসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি কম্যুনিস্ট শক্তি সীমিতকরণনীতি প্রণয়ন করে এবং পর্যালোচনা ও প্রচারণাপূর্বক তা প্রয়োগ করে। কম্যুনিস্টবিরোধী সেই নীতির বিঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা সীমিত করা। কার্যত মার্কিন প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে আমেরিকার কৌশলগত স্বার্থের হানি ঘটাতে সোভিয়েত প্রয়াস সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয় কিংবা আমেরিকার স্বার্থের প্রতি সোভিয়েত হুমকি হ্রাস পায়। ১৯৫০-এর দশকেই 'নিবারক' ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করে। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্য বা গুপ্ত কম্যুনিস্ট সম্প্রসারণবাদ প্রক্রিয়া নিবারণে রাজনৈতিকবাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় 'মুক্ত বিশ্বের' আদর্শের লালন ও সংরক্ষণে। প্রথমদিকে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চরম ও কঠোর মনোভাবসম্পন্ন; যেকোন প্রকাশ্য কম্যুনিস্ট হুমকির মোকাবেলায় স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় "ভয়াবহ প্রত্যুত্তর" দেয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকা তার শ্রেষ্ঠতর কৌশলগত বিমান ও নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতিও গ্রহণ করে।

১৯৬০-এর দশকের দিকে অবশ্য পারমাণবিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নও শক্তিশালী পাল্টা-জবাব দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে আমেরিকা তার "ভয়াবহ প্রত্যুত্তরের" পরিবর্তে "নমনীয় প্রত্যুত্তর" নামে নতুন কৌশলগত নীতি ঘোষণা করে। নববিঘোষিত নীতির মধ্যে সীমিত অথচ দৃঢ় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়, রাখা হয় শক্তিশালী পারমাণবিক নিবারক ব্যবস্থাভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিধানও। তবু নববিঘোষিত নীতি ছিল নমনীয়, কেননা ওয়াশিংটন ভয়াবহ পাল্টা-ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রদান থেকে বিরত থাকে। কালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বিপর্যয় এবং এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে ১৯৬৮-৬৯'র দিকে কৌশলগত

পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বাস্তবানুগ নিবারক' ধারণা গৃহীত হয়। এতে জোর দেয়া হয় 'পর্যাপ্ততার' উপর। এতে বলা হয়, কোথাও অত্যাবশ্যকীয় মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানা হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সামরিক সরবরাহ দ্বারা সেই আঘাতকে প্রতিরোধ করা হবে, প্রতিহত করা হবে আমেরিকা ও তার মিত্রদের থেকে জোরপূর্বক কোনরূপ সুবিধা আদায় বা ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক কোন ধরনের স্বার্থোদ্ধারের অপপ্রয়াস।[১০] ১৯৭০-এর দশকের প্রথম অবধি এ ধরনের মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি আমেরিকার পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তানীতির নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যদিও এ সময়ের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্বপ্রতিযোগী পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক অধিকতর স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়। এমনকি অপর কম্যুনিস্ট শক্তি গণচীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক পূর্বের চেয়ে উন্নততর হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ কৌশলগত সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী হয়।[১১] অর্থাৎ আঞ্চলিক রাজনৈতিক কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন নীতি ছিল শক্তিসাম্য-নীতির অনুকূলে। সম্ভবত মার্কিন কৌশল ছিল, সময় ও সুযোগ বুঝে সেই শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে একটি কম্যুনিস্ট শক্তিকে আরেকটির বিরুদ্ধে চাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

মার্কিন নীতির আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়াতেও উপর্যুক্ত মার্কিন নীতির ধারা প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এটাও অবশ্য সত্য যে, মার্কিন রণনীতি বা বিশ্বব্যাপী আমেরিকার নিরাপত্তা অন্বেষায় দক্ষিণ এশিয়া ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার বিজড়িত হবার পেছনে ইন্ধন যোগায় দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্বার্থ সংরক্ষণের প্রবল অন্বেষা। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন উদ্যোগে সৃষ্ট কম্যুনিস্টবিরোধী সামরিক মৈত্রীজোটে পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল বিশ্বব্যাপী মার্কিন নিবারক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেকটা একই প্রক্রিয়ায় ১৯৬২ সনের চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে চীনবিরোধী মৈত্রীকাঠামোয় আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়।

পরবর্তীকালে কিন্তু "নমনীয় প্রত্যুত্তর" ভিত্তিক মার্কিন কৌশলগত নীতি গ্রহণের ফলে চীনের প্রতি ওয়াশিংটনের পক্ষে নমনীয় ভাব প্রদর্শন সম্ভব হয়। ফলে ১৯৭১-এর দিকে আমেরিকা চীনবিরোধী সীমিতকরণ নীতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণপ্রক্রিয়া শুরু করে। এতে পূর্বেকার সীমিতকরণ নীতি বর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বে রত দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রধান শক্তি এ সম্পর্কিত পরিবর্তিত মার্কিন নীতিকে ভিন্ন

১০. ঐ, 336-386.
১১. Henry Kissinger, *The White House Years* (Boston 1979), 261, 1474..

দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করে। পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে, দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৬২-উত্তরকালীন মার্কিন নীতির ক্ষেত্রে কৌশলমূলক পরিবর্তন ছিল পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন মৈত্রী-অঙ্গীকার ভাঙার শামিল। পক্ষান্তরে, ১৯৭১ সনে চীনের প্রতি মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে ভারত তার নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে।

এটা উল্লেখ করা সমীচীন যে, ঐতিহ্যগতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রতিযোগী শক্তিকেই কম্যুনিস্ট শক্তি সীমিতকরণ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে আগ্রহী ছিল, সচেষ্ট ছিল একটি মাঝামাঝি অবস্থান বজায় রাখতে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমরূপ ব্যবধান প্রদর্শন করতে, যাতে উভয় পক্ষের কেউ আমেরিকাকে অন্ততঃপক্ষে পক্ষাবলম্বী হিসেবে না দেখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আঞ্চলিক শক্তিদ্বয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে মার্কিন নেতৃবৃন্দ এটাকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিকল্প বলে বিবেচনা করেন। ১৯৫০-এর দশকের দিকে ভারত যেহেতু মার্কিন উদ্যোগে সৃষ্ট মৈত্রীজোটে যোগ দিতে অনীহা প্রদর্শন করে, সেহেতু ওয়াশিংটন একদিকে পাকিস্তানকে সামরিক সরবরাহ ও অন্যদিকে ভারতকে প্রচুর পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। নয়াদিল্লী এ ধরনের ভারসাম্যমূলক মার্কিন নীতিকে ভালো চোখে দেখেনি। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন আঞ্চলিক নীতিকে ভারত পাকিস্তানপন্থী বলে বিবেচনা করে, যে নীতির লক্ষ্য ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সমতা বজায় রা া। পক্ষান্তরে, ১৯৬২ সনের পর থেকে ভারতে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের ফলে পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ হয় এবং মনে করে যে আমেরিকা তার কৌশলমূলক স্বার্থ চরিতার্থতার প্রয়োজনে পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্কের জলাঞ্জলি ঘটায়।[১২]

মার্কিন দক্ষিণ এশীয় নীতি ও চীন-মার্কিন সম্পর্কের সংযোগ

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পর্যায়ে মার্কিন আচরণ বিশ্বের বৃহত্তর পরিমণ্ডল বা এশিয়ায় কৌশলগত ভারসাম্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত মার্কিন নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বিশেষকরে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক উঠা-নামা ও প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। প্রথমে ১৯৬২ সনে ভারতে মার্কিন সামরিক সাহায্যের বিষয় পুনর্বার উল্লেখ করতে হয়। কেননা ভারত সেই সামরিক সাহায্যকে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে অনেকটা তাচ্ছিল্যভরে, কিন্তু পাকিস্তান সেই সাহায্যের পরিমাণকে ব্যাপক পরিমাণ সোভিয়েত সামরিক সাহায্য কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করে একে দেখে আঞ্চলিক ভারসাম্যের প্রতি বিরাট হুমকি হিসেবে। সুতরাং বলা যায় যে, চীনকে সীমিত রাখা বা

১২. Sisson and Rose, "War and Secession," 254-255.

একঘরে করার মার্কিন নীতি কার্যত ভারতের চোখে ছিল অসন্তোষজনক এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের নিকট তা ছিল স্থিতিশীলতাবিরোধী।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বিশ্বের দু'টি পরাশক্তি তাদের পারস্পারিক উত্তেজনা প্রশমনের ফলে পরস্পরের কাছাকাছি আসে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ সময় থেকে আমেরিকা তার ভূমিকা হ্রাস করে, সায় দেয় এ অঞ্চলে সোভিয়েত কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের পরিবর্তিত মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়ায় পরাশক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে কিছুটা সমন্বয়মূলক উপাদান সংযোজন করে। দু'টি পরাশক্তিই ঐ পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের উদ্দেশ্যাবলীর সংজ্ঞায়নে প্রয়াসী হয় নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে, যদিও উভয় শক্তি পারস্পরিকভাবে সমর্থনমূলক চীনকে সীমিতকরণ বা একঘরে করে রাখার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে। অর্থাৎ চীনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য উভয় পরাশক্তি আগ্রহী হয়। এ সময়েই মস্কো পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং সার্বিকভাবে আমেরিকাও ভারতের ভূমিকার প্রতি ইতিবাচক সায় প্রদান করে। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'দেশেই সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখে। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সাহায্য পুনরায় চালু করা হয়, যদিও পরিমাণে তা হ্রাস পায়। কিন্তু সামরিক সাহায্য সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে ও শর্তাধীন হওয়া ছাড়া বাতিল বলে বিবেচিত হয়। এ সময়ে ইন্দোচীনে ব্যাপকভাবে আমেরিকার বিজড়িত হবার কারণ, এশিয়ার অন্যত্র তার পক্ষে বড় ধরনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার ফুরসত ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল জাপান, কোরিয়া ও তাইওয়ানের মতো দেশের ক্ষেত্রে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় বিজড়িত ছিল। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহে ভারত কিংবা পাকিস্তানকে প্রভাবিত করে বড় ধরনের ভূমিকা গ্রহণও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনুকূল ছিল না।[১৩]

বাংলাদেশ সংকট ও মার্কিন নীতিতে মোড় পরিবর্তন

বাংলাদেশ সংকট যখন দানা বেঁধে উঠে, তখন এ অঞ্চলের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণীয় নীতিগত অবস্থান ছিল না। এর প্রধান কারণ এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যত্র ওয়াশিংটনের কৌশলগত ব্যস্ততা। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের নৃশংস সামরিক অভিযানে অব্যবহিত মার্কিন প্রতিক্রিয়ায় ওয়াশিংটনের হতবাক ভাব ব্যক্ত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাও হয়নি এ সময়ে। অব্যবহিত পদক্ষেপের মধ্যে ছিল ২৫ মার্চের পূর্বে ইসলামাবাদকে দেয়া মার্কিন উপদেশের পুনরুল্লেখ। তা হলো পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সমাধানের পথ পরিহার করা।

১৩. ঐ, 255.

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য ৭ অক্টোবর ১৯৭০-এর মার্কিন-পাকিস্তান চুক্তি দ্বারা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ওয়াশিংটন সামরিক সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সেই বিঘোষিত ওয়াদা অনুযায়ী পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু মারণাস্ত্র সহ "মৌলিকভাবে অনাধুনিক" সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের সুযোগ লাভ করে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সম্মত উপকরণের মধ্যে ছিল ৩০০টি সশস্ত্র সৈন্যবাহী বাহন, ৭টি পুরনো বি-৫৭-এর পরিবর্তে নতুন বি-৫৭, ৬টি এফ-১০৪ বিমান, ৪টি নৌ-প্রহরী বিমান এবং কতিপয় "প্রাণহানিকর নয়" এমন সরঞ্জাম। এসবের সর্বমোট মূল্য ছিল আনুমানিক ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। [১৪]

উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুত সৈন্যবাহী বাহন বা বিমানসমূহ সরবরাহ করা হয় নি, কিন্তু ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের সামরিক সরঞ্জাম বাংলাদেশ সংকট শুরু হবার পূর্বেই ক্রয়ের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের বিষয়েও আলাপ-আলোচনা চলছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু হবার পর অন্যান্য সামরিক সরবরাহের উদ্দেশ্যে নতুন লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ওয়াশিংটনে গৃহীত হয়। ৬ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন লাইসেন্স প্রদানের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এটা অবশ্য বলে দেয়া হয় যে, পূর্বে এক বছরের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স মোতাবেক যেসব মালামাল ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলো ফেরত নেয়া সমীচীন হবে না। ২৩ এপ্রিল আরেকটি নির্দেশ দেয়া হয় যে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া পাকিস্তানে কিছু কিছু শ্রেণীর সরঞ্জাম পাঠানো যাবে না, কিন্তু পাকিস্তান সরকারের হাতে রয়েছে প্রাণহানিকর নয় এমন কিছু অস্ত্রশস্ত্রের খুচরাংশ পাঠানো যেতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজে তাঁর ২৫ জুন ১৯৭১-এর স্মারকলিপিতে পাকিস্তান সংক্রান্ত মার্কিন নীতি আপাতত অব্যাহত রাখার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন, কেননা এতে পাকিস্তান সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর মার্কিন প্রভাব অটুট রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু একই সঙ্গে ওয়াশিংটন প্রয়োজনবোধে বিকল্প নীতির পথও উন্মুক্ত রাখে এবং প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর অবধি পাকিস্তানের নিকট আমেরিকার সরবরাহকৃত সামরিক উপকরণের মূল্য পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিম্নে ছিল। উল্লেখ্য, ডিসেম্বরের দিকে পাকিস্তানে সামরিক সরবরাহের উপর পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান ছিল আমেরিকার ঐতিহ্যগত মিত্রদেশ এবং ১৯৭১-এর দিকে আঞ্চলিক পর্যায়ে মার্কিন রণনীতি ছিল সাম্যাবস্থা বিধানভিত্তিক। কিন্তু

১৪. ঐ, 256। পাকিস্তানকে প্রদত্ত মার্কিন সাহায্য ভারতীয় বিশ্লেষক ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু বাংলাদেশী বিশ্লেষকও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানকে প্রদত্ত মার্কিন সামরিক সাহায্য সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। এ বিশ্লেষণ প্রায়শই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যজ্ঞানশূন্য।

মিত্রদেশের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় অবজ্ঞা করে, এমনকি তার নিজস্ব সাম্যাবস্থার রণনীতিরও পরিপন্থী ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৭১-এর আর্থিক বছরে ওয়াশিংটন পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত আনুমানিক ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখে। শুধু তাই নয়, একমাত্র খাদ্যসাহায্য ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি সকল প্রকারের অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য কর্মসূচি স্থগিত করে। উল্লেখ্য, খাদ্যসাহায্য চালু রাখার অনুকূলে মুখ্য যুক্তি ছিল খাদ্যে ঘাটতি পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক দুর্ভিক্ষের বিপর্যয় এড়ানো।

মার্কিন প্রতিক্রিয়ার ইতিবাচক দিক

ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সংকটকালে মার্কিন নীতি বিচার্য। ১৯৭১ সনে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসাহায্য কর্মসূচির অধীন মার্কিন সাহায্য বরাদ্দ ছিল ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ৫৫ মিলিয়ন ডলার ছিল পি. এল. ৪৮০-এর অধীন, আর বাদবাকি ৩৫ মিলিয়ন ডলার ছিল নগদ সাহায্য। ১৯৭১ সনের ১ অক্টোবর নিক্সন অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন ডলার পৃথকভাবে বরাদ্দ আদায় করে। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশী শরণার্থীদের সাহায্য এবং পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণসাহায্য হিসেবে এ অর্থ ব্যবহৃত হয়। আরো উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ভারতে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য অব্যাহত থাকে। শুধুমাত্র ডিসেম্বর ১৯৭১-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবার পর উভয়বিধ সাহায্য স্থগিত করা হয়।

সার্বিকভাবে উপর্যুক্ত বিষয় ছিল মানবিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক সমর্থন সংক্রান্ত। এটা অজানা নয় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের নৃশংস সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে মার্কিন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর রণনৈতিক কাঠামোর কারণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তা হচ্ছে বিশ্বরাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষিতপ্রসূত। চীন-মার্কিন যোগাযোগের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ে কৌশলগত প্রতিযোগিতা এ সময়ে কিছুটা তীব্রতর হয়। এটা খোদ দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকভাবে প্রতিফলিত হয় এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার ঐতিহ্যগত মৈত্রীসম্পর্ক।[১৫] বিশ্বপ্রতিযোগী সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা মার্কিন দৃষ্টিতে এ সময়ে ছিল 'অগ্নিসজ্জিত মানসিক বিকারগ্রস্ত খেপাটে ব্যক্তির' মতো। সেই শত্রু আমেরিকার আন্তঃহিমালয় নিরাপত্তাকাঠামোর ব্যূহ ভেঙে পাকিস্তানের মতো একটি 'ঐতিহ্যগত মিত্রের প্রতি অশুভ ধরনের হুমকি দিয়ে চলেছে'। ওয়াশিংটন মনে করে যে, মস্কো পাকিস্তানকে হীনবল করতে এবং বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে নিরাপত্তাহীন করে তুলতে চেয়েছে। তাই একটি পরাশক্তি মিত্রদেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। এ সকল কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাজনৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে

---

১৫. Muhith, "American Response," 206.

প্রকাশ্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় নি।[১৬] কেননা তার অর্থ দাঁড়াতো, পাকিস্তানের ভাঙনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মিত্রদেশের সরকারিভাবে প্রকাশ্য ভূমিকা রাখা। বিকল্প পন্থা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সংযত আচরণের বিষয়ে বেসরকারি পর্যায়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

উল্লেখ্য, ১৯৭১-এর এপ্রিলে ওয়াশিংটন পাকিস্তান সরকারকে দু'দেশের মধ্যে ১৯৫৯ সনে স্বাক্ষরিত আঙ্কারা চুক্তির শর্তাদি স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐ চুক্তিতে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল। বিশেষকরে দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ক্ষেত্রে মার্কিন অস্ত্রসামগ্রী ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার শর্তের বিষয় আমেরিকার পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য পাকিস্তানের অতীত আচরণ থেকে জানতো যে, ইসলামাবাদ সম্ভবত এ সকল বিধিনিষেধ অমান্য করতে পারে, কেননা ইতিপূর্বে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও পাকিস্তান সরকার এসব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে অভ্যন্তরীণভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে।[১৭]

আঞ্চলিক পর্যায়ে মার্কিন উদ্দেশ্যাবলী

২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে প্রায় সারা বছরব্যাপী মার্কিন সরকারি নীতি ছিল এমন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব হচ্ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। মাকিন দৃষ্টিতে, এ ধরনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে কোন বহিঃশক্তির জড়িয়ে পড়া সমীচীন নয়। এ সময়ে পরিলক্ষিত মার্কিন কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি নীতিগত বিষয়। প্রথমত, বাংলাদেশ সংকটের একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে উৎসাহ প্রদান করা যাতে পাকিস্তানের কোনরূপ ঐক্যবদ্ধ কাঠামো ধরে রাখা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব না হলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশটিকে বিভক্ত করে দু'টি সার্বভৌম দেশ সৃষ্টি করা যায়। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন ধরনের ত্রাণসহায়তামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে যাতে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষের অবস্থা এড়ানো যায় বা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বা স্বদেশ থেকে অভিবাসী এবং ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত কোটি কোটি বাঙালিকে মানবিক সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে। জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা, মার্কিন সরকারি সংগঠন বা বেসরকারি সংস্থাসমূহও এতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।[১৮] পরিশেষে, বাংলাদেশ সংকটকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের একটি নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা পরিহার করাও ছিল মার্কিন উদ্দেশ্যাবলীর অংশবিশেষ, কেননা এ ধরনের যুদ্ধের সম্প্রসারণ ঘটলে বাইরের বৃহৎ শক্তিবর্গও জড়িত হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।[১৯]

১৬. Christopher Van Hollen, "The Tilt Policy Revisited: Nixon-Kissinger Geopolitics and South Asia", *Asian Survey* (April 1980), ঐ, 239-245.

১৭. Sisson and Rose, *প্রাগুক্ত*, "War and Secession", 258.

১৮. বিশদ দেখুন, Muhith, *প্রাগুক্ত*, "American Response," 202, 222-232..

১৯ Sisson and Rose, ঐ, 258.

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রীসম্পর্ক দীর্ঘকালের। তাই আমেরিকা দ্বিধান্বিত ছিল এ বিষয়ে কিভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় এ সময়ে পাকিস্তানকে একঘরে না করে তার উদ্দেশ্যাবলী অর্জন সম্ভব হয়। কোনরূপ প্রকাশ্য সমালোচনা কিংবা সরকারিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক নৃশংসতা ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার নিন্দা করা হলে শুধুমাত্র একটি দীর্ঘকালীন মিত্রদেশের সঙ্গে সম্ভবত অহিনকূল সম্পর্ক সৃষ্টি হতো, অথচ এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের নীতি পরিবর্তন আদৌ কোন প্রভাব ফেলতো কিনা সন্দেহ। এ সকল দিক বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন থেকে বিরত থাকে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের নিপীড়নমূলক নীতি প্রসঙ্গে মার্কিন নীতির অভিব্যক্তি ঘটে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্ত আশংকা-উদ্বেগে, পাকিস্তানের প্রতি সাহায্যের পরিমাণ সীমিতকরণে এবং একই সঙ্গে ইসলামাবাদের সঙ্গে সরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ বজায় রাখার প্রয়াসে। এ সময়ে ওয়াশিংটন ইসলামাবাদে পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সম্পর্ক পুরোপুরি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না যদি পূর্ব পাকিস্তানে গৃহীত পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে।

কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল কৌশলমূলক। ওয়াশিংটন মনে করে যে, ঐ ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই বাংলাদেশ সংকটে আমেরিকা সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সম্প্রীতিমূলক পর্যায়ে সম্পর্ক রেখে চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখতে পারে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের উপর এবং একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মানবিক প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূরণেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বের সেরা পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকা তার ভূমিকাকে আঞ্চলিক স্থিতি ও সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুখ্য বলে বিবেচনা করে, আর এ কারণেই প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের শামিল বলে মনে করে। কেননা, মার্কিন দৃষ্টিতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি মিত্রদেশের ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে এ ধরনের আচরণ বিবেচিত হতো দুর্ভাগ্যজনক দৃষ্টান্ত হিসেবে।

মার্কিন দৃষ্টিতে আরো গুরুতর বিবেচ্য বিষয় জড়িত ছিল। অনেকটা পাকিস্তানের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একদা গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং আমেরিকার জাতীয় সংহতি এতে বিপন্ন হয়। এছাড়া, ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সংকটকে ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে উঠার সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এসকল উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রতি সরাসরি মার্কিন বিরুদ্ধাচরণ বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারতো। প্রথমত, এ ধরনের মার্কিন আচরণ তার নিজস্ব কৌশলগত চিন্তাধারার পরিপন্থী হতো; এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার নিজস্ব একটি মিত্রদেশের সংহতির বিরুদ্ধে পরাশক্তিদ্বয়ের ঐক্যবদ্ধ চক্রান্তে লিপ্ত হবার দায়ে দোষারোপ করা হতো এবং মিত্রদেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী মার্কিন বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি

দাঁড়াতো। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানেব ভাঙন ও বাংলাদেশের মুক্তি অন্দোলনে মার্কিন সমর্থনের ফলে এ অঞ্চলে একই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগানো হতো, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অন্যত্রও একই ধরনের আন্দোলনে মার্কিন সমর্থনের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

যা হোক, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন সরকারি তৎপরতা, বেসকারি পর্যায়ে উপদেশ কিংবা মানবিক সাহায্য-সহানুভূতি পাকিস্তানের সরকারি নীতিতে কোনো প্রকার প্রভাব রাখতে সমর্থ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭১ সনে পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ বিরাট ধরনের এমন কিছু ছিল না যে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তার পছন্দসই কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা পরিবর্তনে চাপ সৃষ্টি করার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা ওয়াশিংটন প্রয়োগ করতে পারতো। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে, ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামাদি প্রেরণে মার্কিন ব্যর্থতার কারণে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধায়ক হিসেবে আমেরিকা তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। ১৯৭১-এর মধ্যে বাংলাদেশের মতো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন ইসলামাবাদে তার রাজনৈতিক নৈপুণ্য প্রয়োগের ক্ষমতা হারাতে বসে, কেননা পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে, বাংলাদেশ প্রশ্ন মূলত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে।

তবে এও সত্য যে, বাংলাদেশ বিষয়ে ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বকাল অবধি ওয়াশিংটন ইসলামাবাদকে সামরিক পন্থার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাধান অন্বেষণের বিষয়ে তাগিদ দিয়ে আসে। এ কাজ মার্কিন নেতৃত্ব করে অনেকটা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তরালে, অনানুষ্ঠানিকভাবে। সংকটের শেষের দিকে যুদ্ধদ্বন্দ্বরত উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওয়াশিংটন এমনকি মধ্যস্থের ভূমিকা পালনের আগ্রহও প্রকাশ করে, কিন্তু এ বিষয়ে নয়াদিল্লীর বিরূপ ভাব ও ইসলামাবাদের আগ্রহের অভাব দেখে মধ্যস্থতার উদ্যোগগ্রহণ থেকে আমেরিকা বিরত হয়। তবু বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহে ঘাটতি ছিল না। ওয়াশিংটন যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছে তা নয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক সমাধানের সেই কাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছে। স্পষ্টতই পাকিস্তান সরকার আমেরিকার প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে নি। কিন্তু ন্যূনপক্ষে মার্কিন হস্তক্ষেপমূলক ভূমিকার কারণে পাকিস্তানীদের নৃশংসতা থেকে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা পায়।[২০]

বাংলাদেশ সংকটকালে দক্ষিণ এশিয়ায় শেষ মার্কিন কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এড়ানো এবং সেই যুদ্ধের সম্ভাব্য সম্প্রসারণ এড়ানো।

২০. ঐ, 260.

সেই লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল ছিল আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপর। কিংবা যুক্তরাষ্ট্র সুযোগমতো পক্ষদ্বয়কে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে প্রয়াসী হয়; এমনকি ওয়াশিংটন তার শ্রেষ্ঠতর সামরিক ক্ষমতা প্রদর্শনমূলক ব্যবহারের মাধ্যমেও দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শক্তি ভারতকে সহিংস প্রক্রিয়ার পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের অনুকূলে ইসলামাবাদ থেকে সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হয়। এ ধরনের মার্কিন কৌশলগত চাল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অসমর্থ হয় বটে, কিন্তু সেই চাল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচে প্রয়োগ করা হলে এর চেয়ে অধিকতর সাফল্য আসতো কিনা সন্দেহ। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সংকটকালে এ বিষয়ে ভারত কিংবা পাকিস্তানকে প্রভাবিত করার মতো মার্কিন ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা ছিল—দু'পক্ষই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে শূন্যমান রণনীতির চালের মাধ্যমে নিজ নিজ অবস্থানকে অপরিহার্য সাফল্যের বিষয় বলে বিবেচনায় রাখে এবং সেই সাফল্য সুনিশ্চিত করতে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় শক্তি বদ্ধপরিকর ছিল। এ প্রসঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরী "ইউএস এন্টারপ্রাইজ"-এর বহু বিতর্কিত উপস্থিতির বিষয় অবতারণা করা যেতে পারে। সেই রণতরীর উপস্থিতি ছিল নিছক কৌশলমূলক, প্রতীকধর্মী: মার্কিন উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিস্তৃতি এড়ানো যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব ও সংকটের সৃষ্টি হয় তা যেন বাংলাদেশের সীমারেখার মধ্যে সীমিত থাকে।

পক্ষাবলম্বন নয়, স্থিতিবিধায়ক হিসেবে মার্কিন ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশ্বের সেরা পরাশক্তি এবং স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্বধর্মী। আঞ্চলিক পর্যায়ে আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। এ সকল কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূলে প্রকাশ্যভাবে পক্ষাবলম্বন ওয়াশিংটনের পক্ষে অনেকটা কঠিন ছিল, যদিও মার্কিন জনমত ছিল বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে। পাকিস্তানের সঙ্গে ঐতিহ্যিক মার্কিন মৈত্রীবন্ধন ও মার্কিন জনমতের সাম্প্রতিক ধারা বিবেচনায় রেখে ওয়াশিংটন মধ্যপথ বেছে নেয়, তা হলো স্থিতিবিধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। কার্যত, এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তান সরকারের সামরিক অভিযান থেকে নিজস্ব দূরত্ব বজায় রাখা, সহিংসতার ধারা সীমিত রাখা এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ ধরনের মার্কিন কৌশলগত অবস্থান বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের তৎকালীন ভাবাবেগতাড়িত প্রত্যাশা সম্পূরণের পক্ষে অবশ্যই যথার্থ ছিল না। কেননা পাকিস্তানের নৃশংসতার শিকার হয়ে স্পষ্টতই বাঙালিমাত্রই তখন ছিল অতিষ্ঠ। লক্ষ-কোটি বাঙালি তখন নিজ নিজ ঘরবাড়ি ও আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত। তাই তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠে প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন কৌশলগত আচরণ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার ঐতিহাসিক মৈত্রীবন্ধনের ধারা পুনর্মূল্যায়নের এক বেদনাদায়ক পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত। সম্ভবত পাকিস্তান তার চরম এক রাজনৈতিকভাবে সংকটময় মুহূর্তে মার্কিন আচরণকে দেখে একটি অতি "বন্ধুপ্রতিম মিত্রের" নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে। এতে পাকিস্তানী নেতৃত্বের রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে এবং বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে। ফলে সংগ্রামরত বাঙালিদের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন সহজতর হয়। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ও বাইরে স্বাধীনতা অভিলাষী বাঙালিরা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন মানবিক-অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে লাভবান হয়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাজনৈতিক-সামরিক বিষয়াদিতে আপেক্ষিকভাবে স্থিতিবিধায়ক মাঝামাঝি মার্কিন অবস্থান কার্যত পূর্ব পাকিস্তানে গৃহীত পাকিস্তানী সামরিক সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর বিপক্ষে চলে যায়, বিপন্ন হয় পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি।

চীনের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীনের দক্ষিণ এশীয় নীতির মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন চীনা নীতির কৌশলগত বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত করা। চীনের অভ্যুদয় থেকে চীনের কৌশলগত দৃষ্টিকোণে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য এতে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ধারাবাহিকতার উগাদানও ছিল। ১৯৪৯ সনের পহেলা অক্টোবর যখন নতুন চীনের অভিযাত্রা শুরু হয়, চীন তার শির উন্নত করতে সমর্থ হয়, বিঘোষিত হয় গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন "একমাত্র চীনা সরকার" হিসেবে, ঐতিহ্যবাহী চীনের অনুকরণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেইজিং উপস্থাপন করে এক নতুন নীতিগত ভাবমূর্তি।[২১] চীন চায় নিজকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে, চীনা জাতি বিশ্ব পরিমণ্ডলে স্বদেশকে একটি অতি শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয় যাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ একে সমীহ করে, করে অনুকরণ। চীন আর কখনো মাথা নীচু করবে না, কাউকে দেবে না চীনের দর্পচূর্ণ করতে। চীন চায় তার নিজ সীমারেখার বাইরে তার ভাবমূর্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটাতে। চীন চায়, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের মোকাবেলায় তৃতীয় বিশ্বে চীনের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।[২২] সমকালীন কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গনে আপেক্ষিকভাবে চীন হচ্ছে নবাগত। আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রে চীনের আত্মগত বিবেচনায় ছিল সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায়িত রূপ, যার অভিব্যক্তি ঘটে কার্ল মার্ক্স, লেনিন ও মাও জেদং-এর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও চিন্তাধারার রূপরেখার মাধ্যমে। এছাড়া চীনের বস্তুগত প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যাবলীও বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে ছিল প্রতিরক্ষা বা আত্মসংরক্ষণ বা

২১. "China Stands Up", *Asia Week* (2 June, 1989), 23.

২২. Abul Kalam, "China's Self-image in the Post-Cold War Era", *The Daily Star* (3 January 1997)

চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা সুদৃঢ়করণ, জাতীয় শক্তির উন্নয়ন এবং জাতীয় ঐক্যের বা দেশের পুনরেকত্রীকরণের কাজ সমাধা করা।[২৩]

চীনের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা ধারণা

উপর্যুক্ত উপাদানসমূহ চীনের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও কৌশলগত অভিব্যক্তিতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছে বটে, কিন্তু নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীন দু'দিক থেকে ব্যাপকতর সমস্যার সমুখীন হয়। চীনা দৃষ্টিতে, একদিক থেকে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা" আগ্রাসনপ্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত, অন্যদিক থেকে পরবর্তীকালে সোভিয়েত "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা' এশিয়া সহ বিশ্বের অন্যত্র "আধিপত্যবাদ" প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। ষাটের দশকে চীন-সোভিয়েত বিরোধ ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। ফলে এক সময়কার মিত্রদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। চীনের উত্তরাঞ্চলীয় সীমানাপ্রান্তে প্রায় দশ লক্ষের মতো সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন থাকে। এ ছাড়া ছিল শ্রেষ্ঠতর সোভিয়েত পারমাণবিক শক্তিসম্ভার। এসব কারণে প্রতিবেশী দেশসমূহ সহ পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন তার পররাষ্ট্র ও কৌশলগত নীতি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। বিশ্ব ও আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন মোড় চীনকে বাধ্য করে এমন এক নীতি গ্রহণে যাতে চীনের দক্ষিণ প্রান্তে চীনকে কৌশলগতভাবে বৃত্তায়নের উদ্দেশ্যে আরেকটি শক্তিজোট গঠিত না হয়। বিশেষ করে চীন চায় যে তার প্রতিবেশী অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন কোনো প্রকার স্থায়ী সামরিক উপস্থিতি স্থাপনের সুযোগ লাভ না করে।

এ সকল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ১৯৬০-এর দশকের শেষপাদে বেইজিং কৌশলগত চাল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত রাখে। ঐ সময়কালীন চীনা আধিপত্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক-সামরিকভাবে দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত কৌশলগত নীতি ছিল উভয় পরাশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের প্রারম্ভ থেকে এ ধরনের চীনা কৌশলগত নীতি বাস্তবে উত্তরোত্তর পরিচালিত হতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

চীনের কৌশলগত আচরণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের কৌশলগত আচরণ নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বেইজিং-এর উপর্যুক্ত রূপান্তরের পটভূমিতে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, বিশ্ব রাজনীতির পরিমণ্ডলে পরাশক্তিদ্বয়ের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয়

---

২৩. Abul Kalam, "China's Foreign Policy and Security Perceptions", *BIISS Journal* (1996), আরো দ্রষ্টব্য তৎরচিত *The Communist Triangle: Foreign Policy Interactions* (Dhaka 1987), especially ch, 3; Allen S. Whiting, "Foreign Policy of Communist China", in Roy C. Macridis (ed), *Foreign Policy in World Politics* (Englewood Cliffs, N J Prentice-Hall, Inc., 1967), 314-328

মুক্তিসংগ্রামে আদর্শগত সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে চীন এক ধরনের কৌশলগত উভয়সংকটমূলক সমস্যার সমুখীন হয়। স্পষ্টতই তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য প্রদান থেকে সম্ভাব্য সোভিয়েত হুমকির মোকাবেলা করা চীনের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অগ্রাধিকার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা চলে যে, বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি চীনা সমর্থন সর্বদাই ছিল নিছক তাত্ত্বিক পর্যায়ের, কেননা চীন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে স্বনির্ভরতার উপর জোর দিয়ে আসে প্রথম থেকে।

উপরন্তু, একদিকে চীন-মার্কিন দ্যঁতত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলনসমূহের সদিচ্ছা অর্জনে চীন-সোভিয়েত আদর্শগত প্রতিযোগিতাপ্রসূত উভয়-সংকটমূলক পরিস্থিতির মোকাবেলায় বেইজিং একটি বিপ্লবী দ্বৈত রণকৌশল অবলম্বন করে। কূটনৈতিক পর্যায়ে এটি এক সংমিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করে, যাকে শ্লোগানে রূপ দেয়া হয় "মৈত্রী ও সংগ্রাম" নামে। আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিবেচিত হয় নিষ্কণ্টক বলে, অথচ কৌশলগত পর্যায়ে বিকল্প চালের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতিও মেলে এতে। কূটনীতির কলাকৌশলের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয় সর্বপ্রকার ফন্দি-ফিকিরের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় বিধান করা এবং এমনভাবে চাল খেলা যাতে "সকল দ্বন্দ্ব, ফাঁক ও শত্রুপক্ষের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নেয়া যায় এবং এসবকে আজকের মুখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চলে"।[২৪] এসকল কলাকৌশলে চীনের বাস্তবমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, কেননা বাহ্যত চীন তার বিপ্লবী নীতির প্রতি কঠোর আনুগত্য বর্জন না করেও আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রচলিত ধারার সঙ্গে নমনীয় সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বেইজিং-এর তৎকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবর্তনশীল সম্পর্কের পটভূমিতে এধরনের কৌশলগত চালের কোনরূপ বিকল্প ছিল না।

বাংলাদেশ সংকটকালে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বেইজিং তার দ্বৈত বিপ্লবী রণকৌশল প্রয়োগ করে বলে মনে হয়। কেননা চীনা দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সময়ে সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠী ছিল "নব্য-জারদের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। চীনের প্রতি তৎকালীন সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চীনকে ঘিরে বৃত্তাঙ্কিত রণনীতিপ্রসূত— চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকার পরিচালিত একের পর এক রণনৈতিক কৌশলমূলক চাল স্বাভাবিকভাবেই সরাসরি সোভিয়েত হুমকি সম্পর্কে বেইজিংকে আশংকিত করে তোলে। চীনের বিরুদ্ধে পরাশক্তির দ্যঁতত সম্পর্ক জোরদার করার জন্য মস্কো বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়। চীন স্পষ্টতই অনুধাবন করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহকারে চীনবিরোধী শক্তিজোট গঠন করাই হচ্ছে সোভিয়েত লক্ষ্য। এছাড়া, মস্কো একটি "এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা" গড়ে তুলতেও প্রয়াসী হয়। চীনের দৃষ্টিতে, প্রকৃত অর্থে এটা ছিল চীনবিরোধী

২৪. Abul Kalam, *Superpower Rivalry in the Middle East* (Unpublished M A. Thesis, Carleton University, Ottawa, Canada, 1975).

মৈত্রীজোট। এর পেছনে পুরো ইন্ধন যোগায় এমন একটি শক্তি যে-শক্তি আসলে এশীয় নয়, অথচ এর উদ্দেশ্য ছিল এশীয় শক্তি চীনকে বৃত্তাঙ্কিত রণনীতির চাল দিয়ে ঘিরে রাখা।

চীনের দক্ষিণ এশীয় নীতির পরিবর্তনশীল ধারা

চীনের বিশ্বভিত্তিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত রূপরেখার প্রেক্ষাপটে এখন দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা রাজনৈতিক কৌশলগত আচরণ মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় কয়েকটি কৌশলগত বিকল্প নিয়ে চীন দ্বিধান্বিত ছিল, যদিও উনিশ শতকে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত বৃটিশ আগ্রাসী শক্তির শিকার হয় বলে চীন নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতকে ঘিরে চীনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্রে উভয়বলতা পরিলক্ষিত হয়, এমনকি সেই দক্ষিণ এশীয় বৃহৎ শক্তি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে চীনা পরিবর্তনশীল মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৯ সনে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর নয়াদিল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বেইজিং-এর তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। কেননা চীনের দৃষ্টিতে ভারতের নতুন 'বুর্জোয়া' সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের 'লেজুড়' ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু কালে কোরিয়া ও তিব্বতের মতো চীনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতের নির্জোট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে নয়াদিল্লীর প্রতি বেইজিং-এর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। শীঘ্রই দু'দেশেরই এশীয় বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপমূলক নীতি সীমিতকরণ বিষয়ে ঐকমত্যধর্মী প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত দুই প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তির মধ্যে সংলাপ চলে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে দু'দেশ স্বাক্ষর করে ১৯৫৪-এর তিব্বত চুক্তি। তিব্বত সহ অন্যান্য বিষয় ছাড়া এ চুক্তিতে প্রখ্যাত 'পঞ্চশীলা' নীতি গৃহীত হয়, যে-নীতিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কিত পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫০-এর দশকে দু'টি এশীয় বৃহৎ শক্তি চীন ও ভারতের মধ্যে একটি অলিখিত মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সময়ে ভারত নববিঘোষিত 'বান্দুং নীতি'র ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে এবং সেই আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি সহকারে ভারত এশিয়া · নব স্বাং দেশসমূহের মুখপাত্র হিসেবে টপস্থাপনে প্রয়াসী হয়। চীনও স্বয়ং আফ্রো-এশীয় অনেক অকম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে নয়াদিল্লীকে ব্যবহার করে। এমনকি ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে পঞ্চশীলা নীতিমালার ভিত্তিতে অনেক আফ্রো-এশীয় দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে। দু'দেশের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার আমেজ প্রদর্শনে দু'দেশ এ সময়ে 'হিন্দি-চীনী ভাইভাই' শ্লোগানও ব্যবহার করে। অবশ্য এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, নয়াদিল্লীকে অবজ্ঞা না করেও

বেইজিং সতর্কতার সঙ্গে পাকিস্তানের মতো অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। অতি শীঘ্রই 'হিন্দি-চীনী ভাইভাই' ভিত্তিক উষ্ণতায় শীতল ভাব পরিলক্ষিত হয়। সহসা দুই মিত্র দেশ দু'দেশের সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তৃত্বের বিষয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৫০-এর দশকের শেষ পাদে চীন-ভারত বিরোধ তিক্ত রূপ ধারণ করে। এই তিক্ততার প্রক্রিয়া চলে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতির পাশাপাশি এবং সেই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে সংঘটিত হয় ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সীমান্তে স্বল্পকালীন অথচ এক তীব্র যুদ্ধ। চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধ চলাকালে ও এর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় পরাশক্তি ভারতকে কূটনৈতিক সমর্থন ও সামরিক সরবরাহ প্রদান করে। এতে বেইজিং-এ নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, নয়াদিল্লী বান্দুং নীতিমালা পরিত্যাগ করে সম্প্রসারণবাদী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেছে এবং এই জাতীয় অভিলাষ সাধনে ভারত উভয় পরাশক্তির সমর্থন লাভে ব্যতিব্যস্ত হয়েছে।

সোভিয়েত দোসর হিসেবে ভারত সম্পর্কে চীনের ধারণা

১৯৬২ সনের চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। এ ঘটনার পূর্বাবধি ভারত সম্পর্কে চীনের ধারণা ছিল পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি জোটনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে এবং সেই ভাবমূর্তি থাকার কারণে সাধারণভাবে ভারতের প্রতি বেইজিং সমর্থনমূলক নীতি গ্রহণ করে আসছিল। কিন্তু ১৯৬২ সনের পর থেকে নয়াদিল্লীকে চীন দেখে পরাশক্তিদ্বয়ের দোসর হিসেবে, দেখে বিশেষত সোভিয়েত লেঁজুড় হিসেবে। চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের কৌশলগত উদ্দেশ্য ক্রমশ সোভিয়েত 'আধিপত্যবাদী' কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করার রূপ পরিগ্রহ করে। চীন-ভারত সম্পর্ক, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সার্বিক নীতি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। চীনকে ঘিরে সোভিয়েত বৃত্তাঙ্কিত রণনীতিতে ভারতের অবস্থান কোথায় থাকছে সেটাই ছিল বেইজিং-এর নিকট বিচার্য। চীনের দৃষ্টিতে, মস্কো-নয়াদিল্লী সম্পর্কের অন্তরালে ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের পারস্পরিক স্বার্থের সামঞ্জস্য। এ দু'দেশের জাতীয় স্বার্থের অন্বেষা ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন খাত থেকে উৎসারিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ পর্যায়ে দু'দেশের স্বার্থ এক অভিন্ন ধারায় সম্মিলিত হয়।

ব্রেজনেভ মতবাদ বিঘোষিত হয় ১৯৬৯ সনের জুনে। কিন্তু সেই মতবাদের অন্তরালে ছিল ১৯৬৯ সনের মার্চের চীন-সোভিয়েত সীমান্তসংঘর্ষ। দু'টি কম্যুনিস্ট দেশের সীমান্তসংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে ব্রেজনেভ মতবাদে উত্থাপিত হয় এশিয়ায় সোভিয়েতপন্থী যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রসঙ্গ

বিবেচিত হয় নি; বরং এতে জোর দেয়া হয় সোভিয়েত বন্ধনে আবদ্ধ প্রতিরক্ষাচুক্তির মতো বিষয়াদির উপর। মস্কোর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী: প্রাচ্যের এলাকাসমূহ থেকে বৃটিশ বাহিনী প্রত্যাহারের পর শক্তিশূন্যতা পূরণ করা, চীনকে বৃত্তায়িত করা এবং এশিয়াকে মস্কোর প্রাধান্যে আনা। এ বিষয়ে বেইজিং-এ অবশ্যই একটা আত্মতৃপ্তির ভাব পরিদৃষ্ট হয়। মস্কো তার "চীনবিরোধী সামরিক মৈত্রীর জীর্ণ পতাকা" নিয়ে বেশিদুর এগুতে পারে নি, সোভিয়েত শাসকশ্রেণী সমর্থ হয় নি এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে তার প্রভাব বিস্তার করতে। তবু চীন-সোভিয়েত বিরোধের ফলে দক্ষিণ এশিয়াতেও দু'টি কম্যুনিস্ট শক্তির প্রভাববলয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখা যায়। চীন স্পষ্টতই বুঝতে পারে যে, মস্কো ভারতকে হাত করতে প্রয়াসী এবং এ প্রয়াস অবশ্যই ছিল চীন-ভারত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[২৫]

চীনের দক্ষিণ এশীয় রণনীতির কার্যকর নীতিমালা

এ পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের রণনীতির মৌলিক কার্যকর নীতিমালা তুলে ধরা যেতে পারে। এসব প্রচ্ছন্ন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত ছিল : (১) ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের সম্পর্ক ব্যাহত করা, নয়াদিল্লীর সঙ্গে তাদের বিরোধে ইন্ধন যোগানো এবং এসব বিরোধের সমাধানে ভারতের শর্তাবলী প্রত্যাখ্যানে উৎসাহ প্রদান করা; (২) দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত কৌশলগত ফন্দি-ফিকির জটিল করে তোলা, ভারতকে সোভিয়েতদের দোসর হিসেবে দেখানো এবং (৩) পরিশেষে মস্কোপন্থী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের দায়ে ভারতের উপর অব্যাহত চাপ সৃষ্টি করে চলা, যেমন ভারতে বিপ্লবী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি চীনের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা এবং সময়-সুযোগ মতো মাঝে-মধ্যে বিরোধপূর্ণ চীন-ভারত সীমান্ত অঞ্চলে চাপ সৃষ্টি করা।[২৬]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৬০-এর দশকে চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুগপৎ সংকটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সংকটের কারণেই বেইজিং পাকিস্তানের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, এমনকি দু'দেশের সম্পর্ক জোরদার করতেও প্রয়াসী হয়। চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক গভীরতর হওয়ার পেছনে তিনটি উপাদান কাজ করে : (১) পাকিস্তান তার নিরাপত্তার বিকল্প দিকগুলো, বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার মৈত্রীসম্পর্কের বিষয় পুনর্মূল্যায়ন করতে বদ্ধপরিকর হয়। কেননা তখনো চীনের দৃষ্টিতে আমেরিকা ছিল তার এক নম্বর শত্রু। (২) পাকিস্তান তার কাঙ্ক্ষিত অভিলাষ অনুযায়ী একটি বিকল্প নিরাপত্তা সমর্থনের উৎস লাভ করে, যা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প। এক্ষেত্রে অবশ্যই পাকিস্তানের চাহিদা ছিল কোনরূপ সোভিয়েত চাপের

২৫. Shirin Tahir-Kheli, "Chinese Objectives in South Asia "Anti-Hegemony" vs "Collective Security", *Asian Survey*, Vol. XVIII, No. 10 (October 1978), 998-999, 1006

২৬. Sisson and Rose, *War and Secession*, 247-248

মুখে নতিস্বীকার না করা। চীনা সমর্থনের ফলে পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের জন্য মস্কোর প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়। (৩) পরিশেষে, এ সময়ে ভারতবিরোধী এক "চীনা-পাকিস্তানী যোগসাজশমূলক চক্রান্ত" নয়াদিল্লীর চোখে পরিদৃষ্ট হয়। ফলে কৌশলগতভাবে প্রতিবেশী দু'টি শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এককভাবে বা উভয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কোনরূপ রাজনৈতিক ও রণনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ দুষ্কর হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের প্রতি সকল প্রকার সামরিক সাহায্যকর্মসূচি বন্ধ করে দেয়, চীন তখন বহিঃসাহায্যবঞ্চিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সামরিক সরবরাহের প্রধান উৎসরূপে পরিগণিত হয়। এভাবে ১৯৬৫ সনের দিকে বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে চীনই শুধুমাত্র পাকিস্তানের বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য মিত্রদেশ বলে বিবেচিত হয়।

চীন স্বয়ং পাকিস্তানের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল, এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে সেই সম্পর্ক গভীরতর করতেও তৎপর হয়। ১৯৬০-এর দশকের সূচনা থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকাল অবধি চীন বহির্বিশ্বের সঙ্গে, বিশেষকরে মুসলিম দুনিয়ার দেশসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পাকিস্তানকে ব্যবহার করে কূটনৈতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এসব সত্ত্বেও আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটলে পাকিস্তানের সাহায্যে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার প্রদান থেকে নিঃশব্দে চীন বিরত থাকে।

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বছরগুলোর (১৯৬৬-৬৯) বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার কারণে চীনা পররাষ্ট্রনীতিতে স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৯ সনে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকট, বিশেষকরে দু'দেশের সীমান্তঅঞ্চলে ব্যাপক আকারের সংঘর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি চীনের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। ঐ সময়ে চীনের বহিঃসম্পর্কে মস্কো কেন্দ্রবিন্দু রূপে আবির্ভূত হয়।[২৭] ভারত চিহ্নিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় ধরনের সমর্থক হিসেবে। প্রকৃত অর্থে চীন ভারতকে চীনবিরোধী সোভিয়েত বৃত্তাঙ্কিত রণনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ বলে বিবেচনা করে। মস্কো চায় ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্বধর শক্তি বা কর্ণধার হিসেবে দাঁড় করাতে। পক্ষান্তরে, পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চীন দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার অনুকূলে ছিল যাতে ভারত এই অঞ্চলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ না করে।[২৮] এভাবে যে ভারতবিরোধিতা ১৯৬০-এর দশকের দিকে চীনের দক্ষিণ এশীয় রণনীতির কৌশলমূলক উপাদানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, কালক্রমে তা বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে শক্তিসাম্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

২৭. Tahir-Kheli,"Chinese Objectives," 996.

২৮. Bhabani Sengupta, *Fulcrum of Asia* (New York: Praeger, 1970), 36; Kamal Siddiqui, *The Political Economy of Indo-Bangladesh Relations* (Unpublished M. A. Thesis, The School of Oriental and African Studies, University of London, September 1975), 118.

চীনের পরিবর্তনবিরোধী দক্ষিণ এশীয় নীতি

দক্ষিণ এশিয়ায় সম্ভাব্য ভারত-সোভিয়েত কৌশলগত চালের বিপক্ষে চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে নিঃসন্দেহে পরিবর্তনবিরোধী প্রবণতা দেখা দেয়, যা ছিল আঞ্চলিক পর্যায়ে শক্তির ভারসাম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭১-এর মার্চে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট ঘটনাবলীর কারণে চীন এ অঞ্চলে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় কঠিন পরীক্ষার সমুখীন হয়। চীন সম্ভবত অনুধাবন করতে পারে যে, এসব ঘটনাবলীর ফলে চীনের লাভের কিছুই নেই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা ব্যাপক। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ব্যাপকতর নৃশংসতা বুর্জোয়াবাদী আওয়ামী লীগপন্থীদের পাশাপাশি চীনপন্থী বাম রাজনীতিকদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। ফলে বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড সমর্থন করা বেইজিং-এর পক্ষে কঠিন ছিল। সাধারণ তত্ত্বগত দিক থেকে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন হতো বাস্তবে "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের" প্রতি চীনের আদর্শগত একাত্মতার পরিপন্থী।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের সমস্যাকে চীনের নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চীনের বড় ধরনের একটি উদ্বেগের বিষয় বিজড়িত ছিল। চীন চায় নি যে পাকিস্তানের মতো একটি মিত্রদেশ দুর্বলতর হয়ে পড়ুক বা চীনের আচরণে পাকিস্তান খুব ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ুক অথবা উভয় দেশের অভিন্ন শত্রু ভারত সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংকট নিরসনে উৎসাহিত হোক। চীনের দৃষ্টিতে, ভারতের এ ধরনের হস্তক্ষেপ হতো ভারত ও চীন কর্তৃক স্বীকৃত পঞ্চশীলা নীতির পরিপন্থী, কেননা পঞ্চশীলা নীতির মর্মকথাই ছিল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান।

চীনের হস্তক্ষেপবিরোধী মনোভাব

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সংকটকালে চীন ছিল বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এ কারণে ১৯৭১-এর মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করার পর চীন সরকারিভাবে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি, কিন্তু চীনা সংবাদসংস্থা *New China News Agency* ৪ এপ্রিল এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করে যে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে *People's Daily* তার ১১ এপ্রিলের সম্পাদকীয় বক্তব্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রাখা থেকে বিরত থাকে। একই তারিখে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুয়েনলাই কর্তৃক পাকিস্তানের সামরিক সরকারপ্রধান ইয়াহিয়াকে লিখিত সরকারি পত্র ছিল "কূটচাল ও

ধাপ্পাবাজির কৌশলমূলক" প্রমাণপত্রবিশেষ। কেননা এতে সরাসরি পাকিস্তান সরকার বা বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের কোন সমালোচনা করা হয় নি, অথচ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের দায়ে ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে ঐ পত্রে একই ধরনের হস্তক্ষেপমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশের সরকারের উপর দোষারোপ করা হয়। চীনের সেই পত্রে আরো রাজনৈতিক চালের পরিচয় মেলে; কেননা চীন "পাকিস্তানী জনগণের" প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, অথচ পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রতি কোনরূপ সুস্পষ্ট সমর্থন প্রদান থেকে বিরত থাকে।[২৯] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক মুহূর্তগুলোতে এভাবে চীনের রণনৈতিক তত্ত্বীয় অভিব্যক্তিসমূহ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিফলিত হয়। চীনের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টতই সোভিয়েত ও ভারতবিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কর্মকাণ্ডে বেইজিং ইতিবাচক সায় প্রদান থেকে বেশ সতর্ক থাকে।

বিষয়টি প্রকারান্তরে এভাবেও বলা চলে : বাহ্যত বেইজিং-এর অবস্থান ছিল পাকিস্তানের প্রতি সমর্থনমূলক, কিন্তু অপ্রকাশ্যে চীন ইসলামাবাদকে জানিয়ে দেয় যে দক্ষিণ এশিয়ায় কোনরূপ সহিংস বিরোধে তার পক্ষে হস্তক্ষেপমূলক ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা সমীচীন যে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় সরকারই চীনের কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তদনুযায়ী উভয় দক্ষিণ এশীয় শক্তি নিজ নিজ রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর চীন নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের জন্য প্রতিশ্রুত তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সরবরাহ অব্যাহত রাখে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর জন্য প্রেরিত ব্যাপক চীনা সামরিক সরঞ্জাম জাহাজ থেকে খালাশ করার বিষয়েও বেইজিং আপত্তি তোলে নি। তবে উল্লেখ্য বিষয় এই যে, এসব সামরিক সরঞ্জাম ২৫ মার্চের পূর্বেই জাহাজবোঝাই করা হয়, যদিও চট্টগ্রাম নৌ-বন্দরে এসব সরঞ্জামাদি এপ্রিলের দিকে পৌঁছে। এভাবে চীন তার পূর্বে ওয়াদাকৃত সামরিক সরবরাহ পাকিস্তানকে প্রদান করে, কিন্তু ১৯৭১-এর বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালের নতুন সামরিক সাহায্য প্রদানের বিষয়ে অনীহার ভাব প্রদর্শন করে। পাকিস্তান চীন থেকে বিশেষকরে কিছু জঙ্গি বিমানের জন্য আবেদন করে। এসকল আবেদন বিবেচনার প্রক্রিয়ায় বেইজিং বেশ কালক্ষেপণ করে এবং পরবর্তীকালে কয়েক মাস সময় নিয়ে যখন পাকিস্তানকে ঐ সকল জঙ্গি বিমান পাঠায়, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে যায়।[৩০]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, প্রায় ১৯৭১ সন ব্যাপী পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে বেইজিং সতর্কতা সহকারে নীরবতা পালন করে, একমাত্র পরোক্ষভাবে প্রয়োজনবোধে সময়মতো প্রতিবেশী দেশসমূহে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চিরাচরিত ভাষায় নিন্দাবাদ

২৯. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 250.
৩০. ঐ, 251-252.

জ্ঞাপন করে। ১৯৭১ সনের শেষপাদে অবশ্য চীনের নিকট স্পষ্ট হয় যে, সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট ভারত পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগে বদ্ধপরিকর।

চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে বাস্তববাদী প্রবণতার লক্ষণ

বাংলাদেশ সংকটকালে চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে সুস্পষ্ট বাস্তববাদী চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তি ঘটে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর। এ সময় পাকিস্তান সরকার পুনর্বার চীনের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়। চীন তখন ছিল সম্পর্কের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি। উভয় শক্তি এ সময়ে পাকিস্তানকে কূটনৈতিক সমর্থন প্রদানে এগিয়ে আসে। চীনের দৃষ্টিতে, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির কারণে ভারতের জোটনিরপেক্ষতা শুধু ক্ষুণ্ন হয়নি, বরং এতে চীনের নিরাপত্তাগণ্ডীর চারপাশে বেড়াজাল সৃষ্টির সোভিয়েত পাঁয়তারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। তাই চীন মনে করে, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীজোটকে শুধুমাত্র আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সমীচীন হবে না, একে মূল্যায়ন করতে হবে চীনবিরোধী সোভিয়েত কৌশলগত চালের অংশবিশেষ হিসেবে। মস্কোর সেই চালের বিরুদ্ধে পাল্টা রাজনৈতিক চাল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই ছিল তখন চীনের জন্য শ্রেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে বাংলাদেশ সংকটকালে চীনের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিত সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। চীনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—চীনবিরোধী সোভিয়েত কূটচাল মোকাবেলা করা।

এসব থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনরূপ আদর্শগত ভিত ছিল না, এতে চীনের নিজ স্বার্থগত যুক্তিযুক্ততাই বাহন হিসেবে কাজ করে। ১৯৭১-এর নভেম্বরের ৭ তারিখ জুলফিকার আলী ভূট্টো একটি উচ্চ পর্যায়ের পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল সহকারে চীনের নিকট জরুরি সামরিক সরবরাহের দাবি নিয়ে বেইজিং সফরে যান। ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ক্ষেত্রে চীনা সমর্থনও কামনা করে। চীনের সেই সময়কার অবস্থান ছিল উভয়সংকটমূলক, বিপরীতধর্মী। জুয়েনলাই নাকি বোঝাতে চান যে, যুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু যুদ্ধ সংঘটিত হলে চীন পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে সাহায্য প্রদান করবে, সামরিক সাহায্যও প্রদান করা হবে প্রয়োজনমতো। কিন্তু তিনি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, যুদ্ধ সংঘটিত হলে পাকিস্তানের সপক্ষে চীন সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করবে না।[৩১]

৩১ বাংলাদেশ সংকটের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান মরিয়া হয়ে আরেকটি পাক-ভারত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। সম্ভবত এক্ষেত্রে তা নিজ সামরিক বাহিনীসমূহের নৈতিক বল বৃদ্ধির প্রয়াস চালায় যাতে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত হয়। এ সকল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পাকিস্তান স্বয়ং এমন একটা ভাব দেখায় যে পাকিস্তানে ভারত হামলা চালালে চীন হস্তক্ষেপ করবে। এটা ছিল নিছক চাল মাত্র, এর বাস্তাবিক কোন ভিত্তি ছিল না।

বস্তুত, ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশ সংকটকালীন ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময়ে চীনা আচরণের তুলনামূলক আলোচনা করা হলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। ১৯৭১ সনে চীনে কোন ধরনের রণসমাবেশ বা যুদ্ধের প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয় নি, যা থেকে ধারণা করা যেতো যে চীন ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৬৫ সনে চীন ঐ ধরনের প্রস্তুতির ভাব প্রদর্শন করে। সম্ভবত এমনও বলা চলে যে, ঐ সময়ে চীন কোনরূপ বিদেশী অভিযানে জড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থায় ছিল না। তিব্বত কিংবা পূর্ব বা পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় চীন তার সামরিক বাহিনী জোরদার করে নি বা অতিরিক্ত কোন সরঞ্জামাদির সরবরাহও প্রদান করা হয় নি। উপরন্তু, ১৯৭১-এর শেষের দিকে চীনের সামরিক প্রতিষ্ঠানাদি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সৃষ্ট অরাজকতার কারণে মারাত্মক বিপত্তির পর্যায়ে পৌঁছে। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে মাও'র উত্তরসূরি বলে পরিচিত এবং তাঁর রাজনৈতিক আশীর্বাদে আশ্রিত লিন বিয়াও বিদ্রোহের প্রয়াস চালান বলে জানা যায়। সেই বিদ্রোহী প্রয়াসে চীনা বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ যোগ দেয়। সেই ঘটনার কারণে কিছুকাল সময়ের জন্য চীনের বিমানবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি ভারতও এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তদনুযায়ী তার নিজস্ব কৌশলগত পথ বেছে নেয়।[৩২] নয়াদিল্লীর কৌশলগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ভারতীয় রণনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুঝতে সমর্থ হন যে, চীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করবে; এমনকি বাংলাদেশ সংকটকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেলে সেক্ষেত্রে চীনের মৌখিক নিন্দাবাদেও ঘাটতি পড়বে না, কিন্তু চীন স্বয়ং সেই সম্ভাব্য যুদ্ধে জড়াবে না।

পাকিস্তানের প্রতি চীনের প্রচারণামূলক সমর্থন ও মধ্যপন্থী নীতি

বাংলাদেশ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চীনের সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে যা ভাবা হয় বেইজিং ঠিক তাই করে— ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পর চীন জোর গলায় সোচ্চার হয়ে ভারতের নিন্দা জ্ঞাপন করে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বানচাল করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানে বিজড়িত হওয়া থেকে সতর্কতার সঙ্গে বিরত থাকে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, চীনের দক্ষিণ এশীয় কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এই অঞ্চলে ভারত-সোভিয়েত যৌথ প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল। চীন প্রকাশ্যে পাকিস্তানের নিন্দা জ্ঞাপন করে নি, কেননা চীন মনে করে যে তার ফল দাঁড়াতো "ভারত-সোভিয়েত হস্তক্ষেপমূলক পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন প্রদান এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের লাভ হতো নিতান্তই তুচ্ছ।"[৩৩] পাকিস্তানের প্রতি

৩২. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 251-252.

৩৩. উদ্ধৃত, Siddique, প্রাগুক্ত, 50

কূটনৈতিক ও প্রচারণামূলক চীনা সমর্থন এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে ইসলামাবাদে বেইজিং-এর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা সমীচীন যে, চীন সম্ভবত স্বাধীনতা সংগ্রামরত বাঙালিদের বিরুদ্ধাচরণ করে নি; বরং চীন নিঃসংকোচে বক্তব্য রাখে যে, "অন্যান্য যেকোন দেশের জনগণের মতো নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার ন্যায্য অধিকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণেরও রয়েছে।" চীনের প্রশ্ন ছিল ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং সে কারণেই চীন ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা করে। চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, "একটি বিদেশী সামরিক বাহিনী অভিযান চালিয়ে সৃষ্টি করবে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র—এটা সঠিক হতে পারে না এবং তদুপরি সেই রাষ্ট্রে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই সর্বদা ভারতের উদ্দেশ্য ছিল।" চীনা নেতৃত্ব সম্ভবত আরো চেয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক ও এর উপর তাদের প্রভাবের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য প্রণোদিত করতে। বস্তুত, পাকিস্তানকে তার কঠোরতর অবস্থান নমনীয় করার জন্য বেইজিং পরামর্শ দান করে, চাপ সৃষ্টি করে যাতে ইসলামাবাদ বুঝতে পারে কারা "পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতীয় কর্তৃত্বে ঠেলে দিতে চায়" এবং কারা জনগণের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে নিয়োজিত।[৩৪]

এ ক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ইসলামাবাদের সামরিক মতবাদ ছিল সুস্পষ্টরূপে শূন্যমানপ্রসূত, হারজিতভিত্তিক। এ কারণে বাংলাদেশের প্রতি ঐ সময়ে পাকিস্তানী সামরিক সরকারের নীতি কোন প্রকারে নমনীয় হবে এটা আশা করা ছিল নিরর্থক। অন্যদিকে, চীনের দৃষ্টিতে, ভারত-সোভিয়েত কৌশলগত চালের মুখে তার পক্ষে ভিন্ন পথ ধরাও কঠিন ছিল এবং একই সঙ্গে পাকিস্তান যে মিত্রদেশ তাও বিবেচনায় রাখতে হয়। এ সকল কারণে চীনের পক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়া সহজ ছিল না।

তাই চীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি কৌশলগত সমঝোতামূলক মধ্যপথ অবলম্বন করে। একদিকে বেইজিং নয়াদিল্লী-মস্কো কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে দূরত্ব বজায় রাখে, অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন মৌখিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে মোটামুটি সীমাবদ্ধ রাখা শ্রেয় মনে করে। চীনের কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক পর্যায়ে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা। ভারত-সোভিয়েত কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সেই ভারসাম্য ভেঙে পড়তে পারে এবং এ অঞ্চলে উভয় শক্তির প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে পারে এই ভয়ে চীন উভয় শক্তির কৌশলগত চালের বিরুদ্ধে জোর গলায় নিন্দাবাদ ব্যক্ত করে।

(ঘ) সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া

পরিশেষে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে আসা যাক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল তৎকালীন এক পরাক্রমশালী পরাশক্তি। স্বাভাবিক

---

৩৪. ঐ।

কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মস্কোর ভূমিকা গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে। এছাড়া, সোভিয়েত ভূমিকা সম্পর্কে একটি সাধারণ জনশ্রুতি ও প্রত্যয় রয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মস্কো ছিল একমাত্র বিশ্বশক্তি, যা অকৃত্রিম আন্তরিকতা সহকারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন প্রদান করে।[৩৫] প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে মস্কো স্বয়ং "যথার্থভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছে" বলে দাবি করে এবং মনে করে যে এ দায়িত্ব পালনে সোভিয়েত ইউনিয়ন "মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশের জনগণের প্রতি নৈতিক ও বস্তুগত উপাদান সহকারে সকল প্রকার সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।"[৩৬]

মস্কোর স্বীয় ভাবমূর্তি প্রদর্শন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে মস্কোর বক্তব্য থেকে এরূপ একটি ধারণা জন্মে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন প্রদান করতে গিয়ে একটি বিপ্লবী শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার "আন্তর্জাতিক দায়িত্ব" পালন করেছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের এক অত্যন্ত সংকটময় পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতের পক্ষাবলম্বন করে। এটাও পরম সত্য যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান সহ সম্পর্ক স্থাপনকারী দেশগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল অন্যতম। এসব বিষয়ের সত্যতা সত্ত্বেও একথা বলা অমূলক হবে না যে, বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন আসে সংকটের প্রায় শেষ পর্যায়ে, আর সেই সমর্থনের অন্তরালে ছিল সোভিয়েত আঞ্চলিক ও বিশ্ব-কৌশলগত স্বার্থ এবং ঐ সমর্থনের সঙ্গে কোনরূপ আদর্শ বা নৈতিক অবস্থান বিজড়িত ছিল না।

সম্ভবত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মস্কোর কৌশলগত আচরণের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকাল থেকে ১৯৭০-এর দশক অবধি সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তার বিবর্তন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ঐ সময়কার সোভিয়েত নিরাপত্তা চিন্তাধারা মস্কোর বিশ্বকৌশলগত আচরণ বির্ধারণ করে, প্রভাবিত করে দক্ষিণ এশিয়ায় বিজড়িত হবার পেছনে গৃহীত প্রতিটি সোভিয়েত পদক্ষেপ।

৩৫. সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নিষ্ঠার সাথে সমর্থন প্রদান করেছিল—এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটি ভারত ও সোভিয়েতপন্থী গোষ্ঠী উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে আসছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন কতিপয় রাজনৈতিক দল, যারা তাদের সুপরিচিত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী বিশেষ কিছু মুখোশে সংগঠনের মাধ্যমে দুটো আঞ্চলিক ও বিশ্বশক্তির সঙ্গে লেজুড়ে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে।

৩৬. *Kommunist*, No. 14, 1975, 8, quoted in A. A. Gromyko and B.N. Ponomarev (eds.) "Soviet Foreign Policy 1945-1980," Vol. II (Moscow 1980), 401.

সোভিয়েত কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী

মস্কোর কৌশলগত ধারণা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈশ্বিক উদ্দেশ্যাবলী ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলগ্ন থেকে মস্কো দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ সম্পর্কে ক্লজভিৎসের মতবাদে আস্থাবান। সোভিয়েত তত্ত্বে সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনরূপ সুস্পষ্ট বিভেদ তুলে ধরা হয় না। নীতিনির্দেশক পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবে মস্কো সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তারে সর্বদাই সচেষ্ট।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সোভিয়েত কৌশলগত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতিপয় উপাদান সম্পৃক্ত বলে মনে হবে। প্রথমত, বিশ্বরাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদবাকী বিশ্বের সঙ্গে তার ক্ষমতার দাপট বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, একটি বড় ধরনের যুদ্ধের ঝুঁকি দেখা দিতে পারে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উদ্দেশ্যমূলক কাজ থেকেও মস্কো নিজকে নিবৃত্ত রাখতে চায়। তৃতীয়ত, নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও চীনের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলায় মস্কো ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে একটি শক্তিশালী সামরিক-কৌশলগত অবস্থান বজায় রাখতে আগ্রহী হয়। চতুর্থত, তৃতীয় বিশ্বে আপন স্বার্থের সমর্থনে ও বিশ্বপ্রতিযোগী পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজ অবস্থান সুসংহত করার উদ্দেশ্যে মস্কো একটি দ্রুত সচল ও বহুমুখী ক্ষমতাসম্পন্ন নৌবাহিনী ও সামুদ্রিক যানবাহন গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। পঞ্চমত, রাজনৈতিকভাবে মস্কো নিজেকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী বলে উপস্থাপন করে এবং তার ক্ষমতাকে শান্তি, প্রগতি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সহায়ক বলেও উপস্থাপনের প্রয়াস পায়। পরিশেষে, মস্কো "পাল্টা-নিবারক" সুযোগেরও অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে, তার মানে শত্রুপক্ষের শ্রেষ্ঠতর নিবারক ব্যবস্থা অচল রাখতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু কোন কারণে যদি সোভিয়েত পাল্টা-নিবারক ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয় বা ভেঙে পড়ে, সেক্ষেত্রে "সাম্রাজ্যবাদীদের শুরু করা" যুদ্ধে বিজয়ের নিশ্চয়তাবিধান ছিল মস্কোর চূড়ান্ত লক্ষ্য।[৩৭]

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে দুটি উপাদান সোভিয়েত কৌশলগত নীতিকে প্রভাবিত করে, তার মধ্যে ছিল সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বৈত উদ্দেশ্য—জাতীয় সরকার হিসেবে খোদ সোভিয়েত স্বার্থ রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতা হিসেবে আপন অবস্থান সমুন্নত রাখা। তদুপরি একটি শ্রেষ্ঠ পারমাণবিক শক্তি হিসেবে যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিবেচনায় রাখা। একটি বিশাল পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দু'ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। প্রথমত, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় না দিয়ে কিভাবে মস্কো সোভিয়েত কৌশলগত নীতির প্রতিরক্ষা ও অগ্রগামিতামূলক চাহিদা সম্পূরণে তার

---

৩৭. Kalam, *Superpower Rivalry*, 71-76.

পারমাণবিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে, এবং দ্বিতীয়ত, কিভাবে আদর্শগত উদ্দেশ্যাবলীকে পররাষ্ট্রনীতি ও ভূ-কৌশলগত চাহিদার সঙ্গে সমন্বিত করতে হয়। অন্য কথায়, বিশ্বরাজনীতির পরিমণ্ডলে আদর্শগত প্রতিশ্রুতি ও ভূ-কৌশলগত উপাদান এ দু'টির মধ্যে মস্কোকে সমন্বয়বিধান করতে হয়, কেননা সোভিয়েত নিরাপত্তাব্যবস্থায় দু'টির উপরই সমান জোর দেয়া হতো।

সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তাধারার রূপান্তর

উপর্যুক্ত কারণে বিশ্বপর্যায়ে বিপ্লব ঘটানো সম্পর্কিত পূর্বেকার সোভিয়েত অঙ্গীকারে ভাটা পড়ে। বাস্তব কৌশলগত-রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়ায় এরূপ : স্টালিনের আমলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহকে তাত্ত্বিক পর্যায়ে যেভাবে বুর্জোয়া মতবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হতো তা পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মস্কো এমন একটি কৌশলগত ধারা চিহ্নিত করে, যাতে মোটামুটি সকল ধরনের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সমাজবাদের ছায়াতলে তাৎপর্যবহ বলে বিবেচনা করা হয়। স্পষ্টতই মস্কোর কৌশলগত নীতিতে এ ধরনের রূপান্তর ছিল উদ্দেশ্যমূলক। সোভিয়েত উদ্দেশ্য ছিল নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে যথাসম্ভব পশ্চিমা প্রভাব দূর করা এবং বিশ্বের যত এলাকায় সম্ভব মস্কোর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করা। এ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনেই মস্কো জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সাহায্য-সমর্থন প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কৌশলগত ঝুঁকির দিকটাই বাচ-বিচারে রাখে।

উল্লেখ্য, সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় থেকে পরবর্তীকালে পর পর কয়েকটি সরকারিভাবে প্রকাশ্য বক্তব্যে নতুন নীতিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে ১৯৫৫-এর প্রথম পাদে, পরে বান্দুং সম্মেলনের প্রাক্কালে এবং পরিশেষে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের প্রাক্কালে ক্রশ্চেভ-এর তথাকথিত "গোপন বক্তৃতায়" মস্কোর নতুন নীতি ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতর হয়। সেই নতুন নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় বিশ্বের জাতিসমূহকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে "শান্তির এলাকা' বলে একাত্ম করা হয়, কেননা পাশ্চাত্যবিরোধী ভাবধারা ও নীতির দিক থেকে তাদের মধ্যে অভিন্ন সাদৃশ্য ও একাত্মতাবোধ রয়েছে বলে ধরা হয়। ফলে অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি "সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে" বস্তুগত সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয়। এ অঞ্চলের পরাধীন ও স্বাধীনতাকামী জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যও গভীর আগ্রহ ও উদ্বেগ ব্যক্ত হয়। এর বিশেষ কারণও ছিল, কেননা অনেক ক্ষেত্রে এসব দেশ সোভিয়েত স্বার্থবলয়ের কাছাকাছি বলে বিবেচিত হয়। এরূপ "নতুন দৃষ্টি" সম্বলিত নীতি প্রণয়নে উদ্যোগ নেন ক্রশ্চেভ এবং এ থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিশ্বশক্তির রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। সেই প্রক্রিয়া চলতে থাকে ব্রেজনেভ-এর আমলে এবং ক্রমান্বয়ে তাতে গতি সঞ্চারিত হয়।

সোভিয়েত জাতীয় স্বার্থ ও দক্ষিণ এশীয় নীতি

লক্ষণীয় যে, এভাবে সোভিয়েত কৌশলগত ধারণা নমনীয় রূপ পরিগ্রহ করে : কেউ একে হয়তো দোদুল্যমান, এমনকি সুবিধাবাদী বলেও অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু মস্কো মনে করে যে তার নীতিগত রূপান্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশলগত উপাদানসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্রের হিসেব-নিকেশ করেই নীতিগত পরিবর্তনের সূচনা করা হয়।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে, মস্কো তার আদর্শগত দায়িত্ব সীমিত করতে চায়। ক্রেমলিন চায় এমন কিছু দেশ বা জাতির প্রতি সমর্থন যোগাতে যেখানে সোভিয়েত কৌশলগত স্বার্থ জরুরি বলে বিবেচিত, যার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে মস্কোর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, এবং একই সঙ্গে কম্যুনিস্ট শক্তি হিসেবে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির আদর্শগত ভাবধারাও পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হবে না। ১৯৬০-এর দশকের দিকে চীন-সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধ যতই প্রখর রূপ পরিগ্রহ করে, দু'টি কম্যুনিস্ট শক্তির মধ্যে প্রভাববলয় সৃষ্টির কৌশলগত প্রতিযোগিতা ততই বেড়ে চলে। এই প্রক্রিয়ায় কম্যুনিস্ট আদর্শ তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে বসে। সোভিয়েত জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মস্কো তখন দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে চীনা প্রভাব ক্ষুণ্ন করতে জোরসোর প্রয়াস চালায়, কেননা দক্ষিণ এশিয়া হচ্ছে চীনের সীমানাসংলগ্ন।

এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় তার কৌশলগত আগ্রহ প্রদর্শন করে। কেননা ঐ সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে সোভিয়েতবিরোধী বেষ্টনী সৃষ্টি করতে প্রয়াস পায়। সেই প্রয়াসের মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সংগঠিত মৈত্রীচুক্তিব্যবস্থায় পাকিস্তানকে টেনে আনা, ছিল ভারতকে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বশে আনা। দক্ষিণ এশিয়ায় সেই কম্যুনিস্টবিরোধী মার্কিন বেষ্টনীর বাঁধ ভাঙতে গিয়ে মস্কো প্রথমে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করার প্রয়াস পায়। পরের দশকে ১৯৬০-এর দিকে এশিয়া ও আফ্রিকার অকম্যুনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মস্কো ভারতকে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়। তাই মস্কোর দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েত কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষায় দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক বজায় রেখে চলা ছিল বিশেষভাবে জরুরি। ঐ সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেসামাল অবস্থা পরিহার করা জরুরি বলে বিবেচিত হয়। এরপর থেকে মস্কোর কৌশলগত বিবেচনায় ভারতকে প্রাধান্য দেওয়া বা সোজা কথায় "ভারত সমর্থন" সোভিয়েত দক্ষিণ এশীয় রণনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়। একই সঙ্গে সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মস্কো ভারতকে একটি অনুকরণীয় 'আদর্শ দেশ' হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পায়, সগর্বে বোঝাতে চায় যে সোভিয়েত সাহায্য-সমর্থনের আনুকূল্যেই

৩৮. ঐ, 75-76.

প্রযুক্তি ও শিল্পখাতে ভারত নৈপুণ্য লাভে সমর্থ হয়। অতএব, মস্কো ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ককে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও মস্কোর ছায়াতলে টেনে আনতে চায়।[৩৯]

মস্কোর "ভারত সমর্থন" রণনীতি

মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতপন্থী রণনীতি মোটামুটিভাবে অব্যাহত রাখে। শুধুমাত্র ১৯৬৫ সন থেকে ১৯৬৯ সন অবধি কিছুকালের জন্য মস্কোর "ভারত সমর্থন" রণনীতিতে খানিকটা পরিবর্তনের আভাস দেখা দেয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মস্কো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অধিকতর ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক। তবু সেই প্রয়াস ছিল অনেকটা কৌশলমূলক, বাস্তবে কৌশলগত দিক থেকে সোভিয়েত নীতিতে ভারতপ্রীতির ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে এই উপমহাদেশে ক্রেমলিনের অধিকতর ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণের পেছনে কিছু কারণ ছিল। ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকে চীন-সোভিয়েত বিরোধের গুপ্ত ধারা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। স্বাভাবিক কারণেই মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা প্রভাব রোধ করতে প্রয়াসী হয় এবং চীনের বিরুদ্ধে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি করে চীনের সঙ্গে কৌশলগত মোকবেলার বিষয়ে আগ্রহী হয়। কিন্তু চীন যেহেতু উত্তরোত্তর তার শক্তি বৃদ্ধি করে চলে, মস্কো বুঝতে পারে যে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত রণনীতিতে একমাত্র ভারতকে নিয়ে চীনবিরোধী বেষ্টনী গড়ে তোলা হলে তা কার্যকর নাও হতে পারে। কেননা পাকিস্তানও চীনের সীমান্তসংলগ্ন দেশ। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকেও চীনবিরোধী কৌশলগত বেষ্টনীর চালে জড়াতে সচেষ্ট হয়। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের ছিল অনানুষ্ঠানিক মৈত্রীসম্পর্ক। যদিও পাকিস্তান ঐ সময়ে সোভিয়েতপ্রদত্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বেশ আগ্রহ সহকারেই গ্রহণ করে, কিন্তু চীনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন খাটো করার সোভিয়েত প্রয়াস দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ক্রেমলিন এতে হতাশ হয়, তবে হাল সহজে ছাড়েনি।

এটা অবশ্য সত্য যে, ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি থেকে মস্কো প্রায় দু'বছর কালের জন্য ভারতপন্থী দক্ষিণ এশীয় রণনীতিতে ফিরে যায়। কিন্তু এর পাশাপাশি ক্রেমলিন পাকিস্তানকে সোভিয়েত কৌশলগত ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কৌশলমূলক প্রয়াস অব্যাহত রাখে। এ ধরনের কৌশলমূলক পন্থা অবলম্বনের কারণও বর্তমান ছিল। প্রথমত, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক অস্থিতিশীল ধারা সম্পর্কে ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ ওয়াকেবহাল ছিলেন, যে-ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার ঝুঁকিপূর্ণ, এমনকি ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ডে জড়াতে পারে। এসব ক্ষেত্রে, ১৯৬৫ সনের তাসখন্দ শান্তি সম্মেলনের মতো মস্কোর পক্ষে সুবিধা হাসিলের সুযোগ আসতে পারে। দ্বিতীয়ত,

৩৯. Shirin Tahir-Kheli, *Soviet Moves in Asia* (Lahore: Firoz Sons, 1976), 80-130.

বিকল্প হিসেবে মস্কো ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনও পর্যবেক্ষণ করে আসছিল। মস্কোর দৃষ্টিতে, ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে "প্রগতিবাদী" শক্তিসমূহের মৈত্রীজোট সম্পর্কের ধারা ভিন্ন প্রবাহে সংগঠিত হতে পারে যাতে মস্কোপন্থী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (ইন্দিরা) দলের সঙ্গে সোভিয়েত প্রভাববলয় সৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এ ধরনের সম্ভাবনা অবশ্যই সোভিয়েত স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হতে পারে, কিন্তু ঐ পর্যায়ে কৌশলগত কারণে মস্কো সকল বিকল্প পথ উন্মুক্ত রাখতে চায়।

অবশ্য মস্কোর দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সোভিয়েত প্রস্তাবিত "এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায়" ভারতীয় সমর্থন লাভ। সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ-এর স্বপ্ন ছিল দক্ষিণ এশিয়া সহ এমন একটা নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা যাতে "আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সার্বিকভাবে সোভিয়েত কৌশলগত কর্মকাণ্ড গতি বিস্তার করে।" বাস্তবে এ ধরনের সোভিয়েত কৌশলগত প্রয়াস ছিল মস্কোর চীনবিরোধী বেষ্টনী গড়ে তোলার হাতিয়ারবিশেষ মাত্র।[৪০]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্যে ভারত যেহেতু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের হোতা বলে দাবিদার, সেহেতু তার পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে মস্কোর উত্থাপিত ও সোভিয়েত যোগসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ এশীয় নিরাপত্তাব্যবস্থায় জড়িত হওয়া কঠিন ছিল, কিন্তু চীনকে বাইরে রেখে কোন এক প্রকার নিরাপত্তাব্যবস্থায় মস্কোর সঙ্গে একাত্ম হতেও নয়াদিল্লীর তেমন একটা অনীহা ছিল না। পক্ষান্তরে, চীন-সোভিয়েত বিরোধে পাকিস্তান মোটামুটি বেশ চীনপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে, এমনকি পাকিস্তান যে সোভিয়েতদের চীনবিরোধী নিরাপত্তা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ সেই ইঙ্গিতও প্রদান করে। তাই ১৯৭০-এর শেষের দিকে, বিশেষকরে বাংলাদেশ সংকটের প্রারম্ভের দিকে মস্কোর ভারতপন্থী রণনীতি পুনরায় আবির্ভূত হয়।[৪১]

মস্কোর চীনবিরোধী বেষ্টনী চাল

ইতিমধ্যে অবশ্য মস্কো পাকিস্তানে অধিকতর প্রভাবশালী ভূমিকা লাভের ব্যাপারে সহজে হাল ছাড়েনি। ক্রেমলিনে শেষাবধি এরূপ প্রত্যাশা বিরাজ করে যে, চীনবিরোধী বেষ্টনীতে পাকিস্তানের সমর্থনও পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে বার বার বিভিন্ন প্রকার কৌশল প্রয়োগে পাকিস্তানকে চীনের প্রভাববলয় থেকে বের করে আনতে ব্যর্থমনোরথ হয়ে শীঘ্রই মস্কো ভারতের পেছনে পুরো সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মস্কোর ভারতপন্থী রণনীতি যথার্থ ব্যাপকতা লাভ করে যখন ১৯৭১-এর মাঝামাঝি হেনরী কিসিঞ্জার

৪০. আরো বিশদ দ্রষ্টব্য, Gromyko and Ponomarev (eds), প্রাগুক্ত, 509-511.

৪১. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 237-238.

গোপনে বেইজিং সফর করেন। এটা অজানা ছিল না যে, সেই সফর আয়োজনে পাকিস্তান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যার ফলে চীনের পক্ষে দু'দশকের অধিক কালীন সময়ের রাজনৈতিক-কূটনৈতিকভাবে একঘরে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়। ক্রেমলিনের দৃষ্টিকোণ থেকে, চীনের সেই সাফল্য মস্কোর প্রণীত চীনবিরোধী বেষ্টনী নীতির প্রতি ছিল মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। কেননা, পরাশক্তিদ্বয়ের কৌশলগত চালের মোকাবেলায় চীন পাল্টা-চাল খেলার সুযোগ লাভ করে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও সম্ভাব্য পরাশক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থে হাত মেলাবার সুযোগও চীনের আয়ত্তে আসে। এ সকল কারণে পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে মস্কো তৎপর হয়, এগিয়ে আসে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কর্তৃত্ব স্থাপনে।

উপরন্তু, পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে তা নিশ্চিতভাবে হবে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ, হবে তা চীনবিরোধী। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় রাজনৈতিক চাল হিসেবে মস্কোর কাছে গুরুত্ববহ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া উপর্যুক্ত কৌশলগত পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে।

পাকিস্তানের সামরিক সরকারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে—তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণের উপর ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অতর্কিত ও নৃশংস আক্রমণ। বিশ্ব ও আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কের বিবর্তনের আলোকে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল বাংলাদেশের অনুকূল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। ঐ বছর ২ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পডগর্নী পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ করে এক পত্রে আবেদন করেন "যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত রক্তক্ষয়ী ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করা হয় এবং এর পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়।" একই পত্রে ইয়াহিয়াকে আরো অনুরোধ জানানো হয় যাতে " যে-উদ্দেশ্যে এই আবেদন জানানো হয় তা যেন সঠিকভাবে দেখা হয়"। অর্থাৎ মস্কো তার উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখ করে "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত ও সাধারণভাবে স্বীকৃত মানবতাবাদী নীতিমালা এবং বন্ধুপ্রতিম পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত অভিন্ন আশংকা বা উদ্বেগ।"[৪২]

ইয়াহিয়া খান সেই পত্রের উত্তর দেন ৬ এপ্রিল। তিনি জোরালো ভাষায় ক্রেমলিনের পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং বোঝাতে প্রয়াসী হন যে, শুধু সোভি

৪২. "The New York Times"(5 Arpil 1971), উদ্ধৃত, Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 240

নয়, কোন দেশই তাঁর দেশের মতো একটি স্বাধীন দেশকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী "জাতিবিরোধী ও দেশপ্রেমবিরোধী" গোষ্ঠীসমূহকে সুযোগ দিতে পারে না, প্রসন্নভাবে দেখতে পারে না এসব গোষ্ঠীর নাশকতামূলক কাজকে।" ইয়াহিয়া ক্রেমলিনকে স্মরণ করিয়ে দেন খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজের মানবাধিকারের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বিষয় এবং এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহিঃশক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ হবে জাতিসঙ্ঘ সনদের লঙ্ঘন। ইয়াহিয়ার এ ধরনের প্রত্যুত্তরের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত সংবাদমাধ্যমে পাকিস্তানের ঘটনাবলীর উপর গুরুত্ব কমিয়ে আনা হয়। মস্কো থেকে আসা পরবর্তী মতামত ছিল নমনীয় পর্যায়ের। পরবর্তীকালে কয়েক বার মস্কো প্রকাশ্যে উল্লেখ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলী পাকিস্তানের "অভ্যন্তরীণ বিষয়"। উপরন্তু, ১৯৭১ সনে সোভিয়েতরা প্রায় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের বিবৃতিতে এ দেশকে "পূর্ব বাংলা" না বলে "পূর্ব পাকিস্তান" বলে উল্লেখ করতো। কেননা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও সংবাদমাধ্যম কর্তৃক বাংলাদেশকে "পূর্ব বাংলা" বলে উল্লেখ করাটা মস্কোর কাছে তখনো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। স্পষ্টতই এই ভাষার চাল ও শব্দচয়ন ছিল কৌশলমূলক—মস্কো কর্তৃক "পূর্ব পাকিস্তান" কথাটি ব্যবহার ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় তার সার্বিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হলো চীনকে বেষ্টনীতে আবদ্ধ রাখা এবং সেই বেষ্টনীতে ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী বলে বিবেচনা করা হয়।

সোভিয়েত নিরাপত্তা বিবেচনার প্রাধান্য

সোভিয়েত কূটনৈতিক অবস্থান শুধুমাত্র ভাষার চাল বা শব্দচয়নে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা সম্ভবত অস্বীকার করার উপায় নেই যে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য ও সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে মস্কো একই ধরনের কৌশলগত বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই পাকিস্তান সোভিয়েত সামরিক সাহায্য লাভ করে আসছিল। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি কথিত সোভিয়েত সমর্থন বা সহানুভূতি সত্ত্বেও পাকিস্তানকে প্রদত্ত সামরিক সরবরাহ বন্ধের ক্ষেত্রে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সামরিক সাহায্য, বিশেষকরে পূর্বে প্রদত্ত সামরিক উপকরণের যন্ত্রাংশ এপ্রিল ১৯৭১-এর শেষাবধি, এমনকি তারপরেও লাভ করে, যদিও সংখ্যা বা পরিমাণের দিক থেকে তা ছিল কম। এসব সম্পর্কে সোভিয়েত ব্যাখ্যা ছিল এই যে, ঐসব সম্পর্কিত চুক্তি বা জাহাজে অস্ত্র বোঝাই ২৫ মার্চের পূর্বেই করা হয়েছিল। তার পরবর্তী সামরিক সরবরাহের জন্য আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতাকে দায়ী করা হয়, বলা হয় ঐসব ক্ষেত্রে ক্রেমলিন থেকে উৎসারিত কোনরূপ স্থির সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল না।

বাস্তবে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য সরবরাহের বিষয়ে সোভিয়েত অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা চীনের চাইতে তেমন একটা ভিন্ন ছিল না। বরং পাকিস্তানে অব্যাহত সামরিক সাহায্যের ধারা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার বা সম্প্রসারিত করার আগ্রহ সত্ত্বেও মস্কো সেই প্রক্রিয়ায়

পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে দূরে ঠেলে দিতে চায় নি। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে তাসখন্দ শীর্ষ বৈঠকের মতো পুনরায় মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করেন—এক্ষেত্রে অবশ্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব ছিল পাকিস্তানের দু'প্রদেশের মধ্যে। কিন্তু যখন বাংলাদেশ দ্বন্দ্বের শূন্যমান প্রকৃতি তারা অনুধাবন করতে পারে, তখন অতি দ্রুত মস্কো তার সেই ধরনের চিন্তাধারা গুটিয়ে ফেলে এবং তার চেয়েও বড় বিষয় হলো, কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষায় ক্রেমলিন অধিকতর সুযোগের সন্ধান লাভ করে।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি, আগস্ট ১৯৭১

১৯৭১ সনের ৯ আগস্ট তারিখে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া একটি "উপদেশক" ধারা (ধারা ৯) সন্নিবিষ্ট হয়, যাতে কৌশলগত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে একে অপরের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ করার বিধান রাখা হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই বাংলাদেশ বিষয়ে ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে মস্কো তার তথাকথিত ভারসাম্যমূলক অবস্থান পরিত্যাগ করে। এটা অজানা নয় যে, এ ধরনের একটি চুক্তিই ছিল ১৯৬৯ সন থেকে ভারত-সোভিয়েত কূটনৈতিক আলোচনার বিষয়। এ চুক্তিতেই স্পষ্টভাবে এক অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দিকদর্শনের ক্ষেত্রে বা নীতিগত সামঞ্জস্য বিধানে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের হোতা ভারতকে মস্কো কখনো ইতিপূর্বে এতোখানি ঘনিষ্ঠভাবে সোভিয়েত নীতিগত অবস্থানের কাছাকাছি লাভ করে নি। তাই ক্রেমলিন অতি দ্রুত সোভিয়েত মৈত্রীসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভারতীয় অভিলাষের সুযোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ক্রেমলিনের সিদ্ধান্ত ছিল, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অত্যাসন্ন, সেই যুদ্ধে মস্কো সম্ভাব্য চীনা হস্তক্ষেপ প্রতিহত করবে।[৪৩]

এসকল কৌশলগত চালের পরিপ্রেক্ষিত সত্ত্বেও মস্কো পাকিস্তানকে সুসম্পর্কের ছায়ায় ধরে রাখার বিষয়ে হাল ছেড়ে দেয় নি। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে মস্কো সফরে যান। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে এক "সময়োপযোগী ও কার্যকর" আলোচনায় সম্মিলিত হন। এমনকি ঐ পর্যায়েও সোভিয়েত সংবাদমাধ্যম ও ক্রেমলিনের নেতৃবর্গ বাংলাদেশ সমস্যাকে "পূর্ব পাকিস্তানের উদ্ভূত" সমস্যা বলে অভিহিত করে। শুধু তাই নয়, ৯ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ অবধিও "তাসখন্দের চেতনা" পুনরায় জাগরুক করার কথা উত্থাপিত হয়। এসব থেকে মনে হয় যে, মস্কো তখনো বাংলাদেশ সমস্যাকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকাঠামো ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে।[৪৪]

৪৩. ঐ, 240-241.
৪৪. Dilara Chowdhury, "Bangladesh," 37.

প্রশ্ন হতে পারে, মস্কোর এ ধরনের পাকিস্তানপ্রীতির কারণ কি ? পাকিস্তান তখন ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। সম্ভবত ক্রেমলিন পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এ ধরনের একটি রাষ্ট্র ভেঙে দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত দেখতে চায় নি। মুসলিম বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ মস্কো সম্পর্কে বিরূপ ধারণা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের (২৭-২৯ সেপ্টেম্বর) পর দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ক্রেমলিনের চিন্তাধারা স্পষ্টতই ভারতপন্থী রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে এর পর থেকে পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েত মনোভাব কঠোরতর হতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধী যখন মস্কো ত্যাগ করেন তার মধ্যেই সোভিয়েত নেতৃত্ব বুঝতে পারে যে, ভারত সুযোগমতো অতি সত্বর পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে অবশ্য ক্রেমলিনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার প্রেক্ষিতে মস্কোর কৌশলগত বিকল্প প্রতিক্রিয়া কি কি হতে পারে। মস্কোর সবচেয়ে বড় ভয় এই যে, ঘটনাবলী সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে; বাংলাদেশে একটি প্রলম্বিত যুদ্ধ দেখা দিলে সেক্ষেত্রে উদারপন্থী আওয়ামী লীগকে এক পাশে রেখে অধিকতর জঙ্গিবাদী চীনপন্থী গোষ্ঠী শক্তি অর্জন করতে পারে। সোভিয়েত সমর্থনের অভাবে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কে মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।[৪৫]

এ ধরনের বিভিন্ন কৌশলগত বিকল্প নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় মস্কো কয়েক সপ্তাহ নেয়, কিন্তু পরিশেষে অক্টোবর ১৯৭১-এর শেষের দিকে সোভিয়েত উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী এন. ফেরউবিনকে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির নয় নম্বর 'উপদেশক' ধারা মোতাবেক পরিকল্পিত পরামর্শের জন্য ভারতে পাঠানো হয়।

ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক সোভিয়েত একাত্মতা

সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবিলম্বে ব্যাপক পরিমাণ সামরিক সাহায্য ও সরবরাহ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। ভারতের অনুরোধে সাড়া দিয়ে মস্কো এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানে সম্মত হয়, কিন্তু সাহায্যসামগ্রীর মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে নি। তবে নভেম্বরের দিকে মস্কো তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে এবং ভারতে সোভিয়েত সাহায্যসামগ্রী প্রেরণ জোরদার করে। এর মধ্যে তিনটি জাহাজবোঝাই অস্ত্রশস্ত্র এবং জরুরি বিমানবহরে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের ফরমায়েশ অনুযায়ী সীমিত পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রেরণ করা হয়।

বস্তুত, ১৯৭১-এর নভেম্বরের দিকে সোভিয়েত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এ সময়ের দিকে ক্রেমলিন দক্ষিণ এশিয়ায় তার কৌশলগত রূপরেখা বাস্তবায়নে পুরোপুরিভাবে তৎপর হয়ে উঠে এবং ভারতের পেছনে পূর্ণ সমর্থন দানে এগিয়ে

৪৫. ঐ, 37-38

আসে। এ পর্যায়ে মস্কো তার কৌশলগত সিদ্ধান্তসমূহ এমনভাবে বাস্তবায়ন করে যে নয়াদিল্লী তাকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানায়।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা সমীচীন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর মস্কো সফরকালে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দের অবকাশ ছিল না, এক্ষেত্রে ক্রেমলিনের অবস্থান যাই হোক না কেন ; বরং ক্রেমলিনে ভারতীয় সূত্রের পক্ষ থেকে এরূপ আভাস দেয়া হয় যে, বাংলাদেশ সংকটের ঐ পর্যায়ে মস্কো সমর্থন প্রদানে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে কৌশলগত বিষয়ে নয়াদিল্লীর সিদ্ধান্তগ্রহণপ্রক্রিয়ায় এর দারুণ বিরূপ প্রভাব পড়বে। সোভিয়েত দৃষ্টিতে, ভারতের এ ধরনের বিরূপ অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত কৌশলগত স্বার্থের পরিপন্থী হবে, বিঘ্ন ঘটাবে এ অঞ্চলে মস্কোর রণনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের অন্বেষায়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ সংকটে ভারতের অবস্থানের অনুকূলে মস্কো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ না করলে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে "অপূরণীয় ক্ষতির" আশংকা দেখা দিতে পারে। তাই এ বিষয়ে ক্রেমলিন সকল দিক বিবেচনা করেই ভারতপন্থী অবস্থান চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে।[৪৬]

সোভিয়েত প্রতিক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন

উপর্যুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত আচরণ আঁকাবাঁকা গতিতে মোড় নেয়। তবে সেই আঁকাবাঁকা গতিতে তিনটি মোড় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় অনুপ্রবেশ করে মেরুকরণ সৃষ্টি করে অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করে মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় মেরুকরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে, বিশেষকরে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মস্কো মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; কিন্তু একেবারে শেষের দিকে বাংলাদেশ সংকটের চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি পরোক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে মস্কো আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এতে দৃশ্যত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে ভারতের পক্ষ অবলম্বন করে মস্কো একটি নৈতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে।

এ সম্পর্কে ক্রেমলিনের প্রকাশ্য বক্তব্য যাই হোক না কেন, দক্ষিণ এশিয়ায় মস্কোর কৌশলগত সম্পর্কের পুরোটা সময়ের কোন পর্যায়ে আদর্শগত সূত্রের কোনরূপ বন্ধন বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি পরিলক্ষিত হয় নি, যা দিয়ে ক্রেমলিনের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক আচরণকে বোঝা যাবে। মস্কোর কৌশলগত পরিকল্পনায় ছিল সোভিয়েত জাতীয় স্বার্থের

---

৪৬. Sisson and Rose, প্রাগুক্ত, 243-244.

অন্বেষা, ছিল তার বিশ্ব প্রতিযোগী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আপন প্রভাববলয় সৃষ্টি ও সুবিধামত অবস্থান লাভের প্রয়াস। বস্তুত, দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত কৌশলগত আচরণ ছিল সোভিয়েত রণনীতির পরিবর্তনশীল ধারার মতো সুযোগসন্ধানী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মনে হয়, মস্কো কৌশলমূলক চালে বাজিমাত করতে ব্যতিব্যস্ত ছিল, দু'দিকেই গুটির চাল খেলতে থাকে, প্রত্যাশায় থাকে যে তার বিশ্বপ্রতিযোগী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বন্দ্বরত দু'টি আঞ্চলিক রাষ্ট্রকেই হাতের মুটোয় রাখা যাবে। মস্কোর এই কৌশলগত চাল অব্যাহত থাকে সেই চূড়ান্ত মূহূর্ত অবধি, যখন মস্কো স্পষ্টত বুঝতে পারে যে বিজয় কোন পক্ষের অবধারিত এবং সেই সুযোগলগ্নে বিজয়ী পক্ষের পক্ষাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এর পর থেকেই মস্কো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তারই রাজনৈতিক-কূটনৈতিক বিজয় হয়েছে বলে দাবি করে আসছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লগ্নে কৌশলগতভাবে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীজোটের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও মস্কোর পক্ষ থেকে এরূপ দাবি করার কোন অবকাশ নেই যে, ক্রেমলিন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার অথবা মুক্তিবাহিনীকে একটি বন্দুক বা একটি টোটা বন্দুকের গুলি দিয়ে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের অনুকূলে সোভিয়েত রাজনৈতিক বা সামরিক সমর্থন প্রকৃত অর্থে আসে ভারতের চাহিদা বা প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে। কেননা ভারতই ছিল তাদের প্রধান আঞ্চলিক মক্কেল এবং স্পষ্টত সোভিয়েত দক্ষিণ এশীয় রণনীতির প্রধান হিতভোগী। জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনামঞ্চে ভারতের পক্ষাবলম্বন করেই মস্কো কূটনৈতিক বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। দু'দুবার অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তে মস্কো ভিটো প্রদান করে, কূটচাল দিয়ে দীর্ঘায়িত করে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা যাতে নয়াদিল্লী সদর্পে বাংলাদেশে তার সামরিক বিজয় দাবি করতে পারে। একমাত্র ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত বিষয়ে তার ভিটোর অধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকে। মস্কো-নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্য যাই হোক, উভয় শক্তির কৌশলগত হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়।

এদিকে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের দুর্যোগকালে সামরিক সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভের পর নয়াদিল্লী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সমর্থ হয়। ভারত তার চরম আঞ্চলিক শত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার নিজস্ব সামরিক-কৌশলগত অভিলাষ সম্পূর্ণ করতে সফল হয়। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান তার ঐতিহ্যিক মিত্রদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন থেকে প্রত্যাশিত উল্লেখযোগ্য সামরিক সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও অবশ্য মস্কো চীনকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি

বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শনের দায়ে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি। এমনকি চীনের বিরুদ্ধে এমনও অভিযোগ আনা হয় যে, চীন পাকিস্তানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এশিয়ায় তার বৃহৎ শক্তিসুলভ আধিপত্যবাদী নীতি বাস্তবায়নে তৎপর থাকে।[৪৭]

ঙ. উপসংহার

প্রবন্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশ্বের তিনটি বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দিকদর্শন লাভের প্রয়াসে প্রবন্ধে স্নায়ুযুদ্ধকাল থেকে ১৯৭১ সন অবধি দক্ষিণ এশিয়ায় তিনটি বিশ্বশক্তির কৌশলগত বিচরণের পটভূমি মূল্যায়ন করা হয়েছে যাতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে জানা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভিন্ন রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে বাংলাদেশীদের ভাবনা-চিন্তা আবেগমুক্ত নয়। পক্ষান্তরে, এ সম্পর্কিত বিষয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ রয়েছে। উভয় দৃষ্টিকোণ মনে রেখেই স্বতন্ত্রধর্মী ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বশক্তিবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে এমন একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন ছিল। এমনকি প্রায়শ এই দুই বৃহৎ শক্তিকে বাঙালিদের স্বার্থের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলেও বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে এ ধরনের তত্ত্ব নাকচ করা হয়েছে। প্রবন্ধকার যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া ছিল বৃহৎ শক্তিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাপসৃত, তাদের নীতি ও প্রত্যক্ষজ অনুভূতির পেছনে ইন্ধন যোগায় তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ। প্রবন্ধে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন ছিল বিভিন্ন ধরনের কূটচালে আবর্তিত; তবু সোভিয়েত সমর্থন যতই আপন স্বার্থে পরিচালিত হোক না কেন, তা মুক্তিযুদ্ধের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে আসে যার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়। ১৯৭১ সনে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কৌশলগত আচরণও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হয়, তবে তা হয় পরোক্ষভাবে।

উপর্যুক্ত যুক্তি উপস্থাপনকল্পে প্রবন্ধে একটি সংমিশ্রিত বিশ্লেষণী রূপরেখা ব্যবহৃত হয়েছে। এই রূপরেখায় সন্নিবিষ্ট হয় পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও কৌশলগত ধারণাবলী। এই কাঠামোতে তিন পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, রণনীতি ও রণকৌশল প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংকটকে কেন্দ্র করে এই তিন পর্যায়ের বিরোধের মধ্যে ছিল বিশ্ব ও এশীয় পর্যায়, দক্ষিণ এশীয়-আঞ্চলিক এবং

৪৭. Victor Mayevsky নামক জনৈক সোভিয়েত পর্যবেক্ষকের মন্তব্য, উদ্ধৃত, Dilara Chowdhury, প্রাগুক্ত, 39.

পরিশেষে দ্বিপাক্ষিকভাবে ভারত-পাকিস্তান পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শক্তিবর্গের মৌল বা সার্বিক নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে ; দ্বিতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক রণনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ভারত ও পাকিস্তানকে ঘিরে বাংলাদেশ সংকটের একেবারে চরম ক্রান্তিলগ্নে শক্তিবর্গের কৌশলমূলক চাল তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধে এভাবে তিনটি বিশ্বশক্তির প্রতিক্রিয়া ও ভৌগোলিক স্থানসংক্রান্ত বিষয়াবলী সময়কালের নিরিখে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনটি বিশ্বশক্তি তাদের নিজ নিজ কৌশলগত ও নিরাপত্তাস্বার্থের অন্বেষা এবং তাদের ভিন্নমুখী আদর্শগত ও হুমকিজাত চেতনার কারণে প্রধানত দক্ষিণ বাংলাদেশকে ঘিরে এশিয়ার দ্বন্দ্বে বিজড়িত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া কার্যত তাদের অবস্থানগত সুবিধা ও আঞ্চলিক প্রভাববলয় সৃষ্টির প্রয়াস থেকে উদ্ভূত হয়।

একথা সম্ভবত বলা সঠিক হবে না যে, বহির্বিশ্বের শক্তিবর্গ দক্ষিণ এশিয়াকে তাদের কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষায় মধ্যমণি বলে চিহ্নিত করে; অথবা এমনও মনে করা সমীচীন নয় যে, দক্ষিণ এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে তিক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে একথা বলা ভালো যে, বিশ্বশক্তিবর্গের পরিবর্তনশীল সার্বিক বিশ্বব্যাপী সম্পর্কের রূপরেখার বাইরে ঐ শক্তিসমূহের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব অতি সামান্যই। ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে ক্রমান্বয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য স্নায়ুযুদ্ধের প্রক্রিয়া তার তীব্রতা হারাতে থাকে এবং ত্রিকোণ পর্যায়ের বিশ্ব কৌশলগত দ্বন্দ্ব আদর্শিকতার লেবাস পরিহার করে অধিকতর জাতীয়তাবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। মৈত্রীবন্ধনের ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন আদর্শগত সীমারেখা ভেদ করে নতুন যোগসূত্রের দিকে মোড় নেয়, এমনকি নীতিগত ক্ষেত্রেও বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এভাবে ১৯৬০-এর দশকেই দ্যঁতত সম্পর্কের কারণে বেইজিং-এর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ও মস্কো পরস্পর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করে। একইভাবে, ১৯৭০-এর দশকের শুরুতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীন-মার্কিন নীতিগত ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; তারাও একই ধরনের দ্যঁতত সম্পর্ক গড়ে তোলে উভয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসে। বিশ্ব পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের চিহ্নিত অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে পরিবর্তনশীল মৈত্রীধারা ও নীতিগত একাত্মতাবোধ আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের রণনৈতিক-কৌশলগত আচরণে প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বিশ্বকৌশলগত নীতির দৃষ্টিকোণে বৈপরিত্যমূলক উপাদান ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তাবন্ধনের একই পাশে দু'শক্তিই অবস্থান নেয়, কেননা দু'টি শক্তিই এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে সমরূপ

মত পোষণ করে। ফলে তাদের আঞ্চলিক রণনীতিও প্রণীত হয় আঞ্চলিক স্থিতাবস্থার অনুকূলে। এ কারণে উভয় শক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী-সংযোগ রক্ষা করে চলে, যদিও এটা অবিদিত ছিল না যে আঞ্চলিক শক্তিদ্বন্দ্বে পাকিস্তান হারতে চলেছে।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ সংকটের শেষ লগ্নে প্রণীত মস্কোর দক্ষিণ এশীয় রণনীতি ছিল অপ্রতিসম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যদিও তা বাংলাদেশ সংগ্রামের অনুকূলে আসে। মস্কো তার ভারতপন্থী রণনীতির মাধ্যমে এমনভাবে ভারতের শক্তিবৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয় যাতে ভারত শক্তিদাপট সহকারে দক্ষিণ এশিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তার করে ক্রেমলিনের চীনবেষ্টনী নীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে। বস্তুত, ঐ সময়কার সোভিয়েত আঞ্চলিক রণনীতিতে একটা অন্তর্নিহিত স্থিতাবস্থাবিরোধী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার কাজে যা ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্য দু'টি বৃহৎ বিশ্বশক্তির ভূমিকা উপর্যুক্ত কৌশলগত নিরাপত্তাবাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে, যদিও সেই সোভিয়েত রণনীতি ছিল বাংলাদেশ আন্দোলনের অনুকূলে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতার পটভূমিতে। অতি শীঘ্রই সেই সংগ্রাম শূন্যমান রূপ পরিগ্রহ করে। এতে অভ্যন্তরীণভাবে এক পক্ষ ছিল ইসলামাবাদে অবস্থিত পাকিস্তানী সরকার ও দ্বিতীয় পক্ষ ছিল বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার। বাংলাদেশকে ঘিরে আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারত ও পাকিস্তান আরেক শূন্যমান সংগ্রামে রত হয়। স্পষ্টতই সেই সংগ্রাম দক্ষিণ এশিয়ার তৎকালে প্রচলিত শক্তির ভারসাম্যকে ভেঙে দেয়ার পর্যায়ে ঠেলে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয় শক্তিই দেখতে পায় যে, পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে গেলে বাদবাকি পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করে বিজয়ীর বেশে সামরিকভাবে শক্তিসম্পন্ন ভারতকে কৌশলগতভাবে মোকাবেলা করা কোনভাবে সম্ভব হতে পারে না। অন্যদিকে নব স্বাধীনতালব্ধ বাংলাদেশের পক্ষে নয়াদিল্লীর আধিপত্য-কর্তৃত্বাধীন সম্পর্কের রূপরেখার বাইরে আসা খুব কঠিন হবে। একই সঙ্গে খোদ ভারতও তার বিশ্বমিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে সামরিক নিরাপত্তা সমর্থন লাভের কারণে কৌশলগতভাবে দায়বদ্ধতার নাগপাশে বন্দি হয়ে থাকবে।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রভাব পড়তে পারে ভেবে স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে যার ফলে এ অঞ্চলের শক্তিসাম্য অধিকতর ক্ষুণ্ন হতে পারে। বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থতা সম্পর্কে দু'টি শক্তিই সজাগ ছিল, আর সে কারণেই উভয় শক্তি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের একেবারে ক্রান্তিলগ্নে তাদের নিজ নিজ কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের ঐতিহ্যিক মিত্রদেশ পাকিস্তানের অবস্থান থেকে কৌশলমূলক দূরত্ব বজায় রাখে। মুক্তিযুদ্ধরত বাঙালিদের পক্ষে, এমনকি বাংলাদেশকে সমর্থন প্রদানকারী মিত্রশক্তির পক্ষেও এটা ছিল বিরাট গুরুত্বের বিষয়। কেননা অতীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

চীনই ছিল পাকিস্তানের কৌশলগত রক্ষাকবচ। এটা সহজে অনুমেয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে শূন্যমানের রণনীতিতে নিজকে ব্যাপৃত করতে গিয়ে ইসলামাবাদ নিশ্চয়ই তার ঐতিহ্যগত পৃষ্ঠপোষকদের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য ও সমর্থন আশা করছিল। সেই প্রত্যাশিত রণনৈতিক রক্ষাকবচ বলে পরিচিত উভয় বৃহৎ শক্তি থেকে প্রকৃত সহায়তা লাভের ব্যাপারে ইসলামাবাদকে ব্যর্থমনোরথ হতে হয়। ফলে বাংলাদেশ আন্দোলনকে বানচাল করার সকল পাকিস্তানী পরিকল্পনা ও প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা সমীচীন যে, পাকিস্তানের সামরিক-কৌশলগত পরিকল্পনা ও প্রয়াস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দূরত্ব বজায় রাখার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামরত বাঙালি ও তাদের মিত্রশক্তির পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার রাজনৈতিক লক্ষ্যে উত্তরণ সহজতর হয়, সম্ভব হয় তাদের পক্ষে সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক সমর্থন আদায় করা বা প্রয়োজন অনুযায়ী সামরিক সরবরাহ লাভ করা। উপরন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দৃশ্যত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দু'টি শক্তির একটিও যুদ্ধদ্বন্দ্ব সম্প্রসারণে কারক বা সামরিক বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি; বরং উভয় শক্তি চায় ইসলামাবাদের কূটনৈতিক প্রভাব অব্যাহত রাখতে যার ফলে তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। এভাবে দু'টি শক্তিই বাংলাদেশকে ঘিরে একটি প্রলম্বিত সংগ্রামের পথ পরিহার করতে পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে। তা না হলে একটি অবাঞ্ছিত প্রলম্বিত যুদ্ধের প্রক্রিয়া এ অঞ্চলের সকল দেশের জনগণের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারতো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে আরেকটি বাস্তব সত্যও স্মরণযোগ্য। ঐতিহ্যিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছিল খাদ্যঘাটতি এলাকা। পাকিস্তান আমলে দীর্ঘকাল থেকে এ প্রদেশে মার্কিন খাদ্যসাহায্য অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেই মার্কিন মানবিক সাহায্য অধিকতর জোরদার করা হয়। সম্প্রসারিত মার্কিন মানবিক সাহায্যের মধ্যে ছিল পি. এল. ৪৮০-এর অধীন খাদ্যসাহায্য কর্মসূচি। এছাড়া ছিল ভারতকে প্রদত্ত অব্যাহত খাদ্য ও অর্থনৈতিক সাহায্য। এসব সাহায্যের ফলে শুধুমাত্র লক্ষ লক্ষ বাঙালি, যারা পাকিস্তানী বাহিনীর দুঃসহ নৃশংসতা এড়ানোর জন্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তারাই লাভবান হয় নি, দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত কোটি কোটি মানুষও ত্রাণসাহায্য লাভ করে—এদের মধ্যে এমনকি ধরা যায় সংঘবদ্ধ বাঙালি গেরিলা বাহিনীকেও, যারা পাকিস্তানীদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। একই সঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, অগণিত মার্কিন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহায্যসংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী পূর্ব পাকিস্তানে ও সীমান্তের ওপারে মানবিক ত্রাণসাহায্য প্রদানকল্পে আসে। এদের উপস্থিতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি "খোলা জানালা" সদৃশ হানাদার বাহিনীর নৃশংস রূপ বহির্বিশ্বের নিকট

উন্মোচিত করে, জাগিয়ে তোলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সতর্ক চেতনা। এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে বিশেষকরে পশ্চিমা জনমত প্রভাবিত ও সংগঠিত হয়।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা সঙ্গত যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-সোভিয়েত যৌথ প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভের অন্বেষার মুখেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কৌশলগত আচরণে এক উল্লেখযোগ্য অব্যাহত ধারা পরিলক্ষিত হয়। এ দু'টি শক্তিই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের মাধ্যমে কর্তৃত্ব স্থাপনের সোভিয়েত পরিকল্পনার বিরোধিতা করে; দু'টিই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্য রক্ষাকল্পে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং উভয় শক্তিই তাদের নিজ নিজ কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদিও পৃথকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি, তথাপি পরোক্ষভাবে হলেও সহায়তা প্রদান করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারত-সোভিয়েত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার পরিকল্পনায় আশঙ্কা প্রকাশ করে। তাই নব স্বাধীনতালব্ধ দেশটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পূর্বে একে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানে উভয় শক্তি দ্বিধাবোধ করে। বস্তুত, এই অঞ্চলে "রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি" সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হওয়া অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে নি।[৪৮] ওয়াশিংটন এ ধরনের ইঙ্গিত প্রদান করে যে, বাংলাদেশকে মার্কিন স্বীকৃতি প্রদান সেই দেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য পরোপুরি প্রত্যাহার করার পূর্বে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে ভারত-সোভিয়েত চক্রের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চীন অধিকতর জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করে।[৪৯] প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশে ভারতপন্থী সরকারের পতনের পূর্বাবধি ঢাকা ও বেইজিং-এর মধ্যে যথার্থ কোনরূপ সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত বাংলাদেশে স্থায়ী কোনরূপ কৌশলগত স্বার্থের বন্ধন গড়ে তোলে নি ; তবু ১৯৭২ সনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতির পর থেকে বাংলাদেশে দুর্যোগ ও অব্যাহত খাদ্যসংকট মার্কিন মানবিক উদ্বেগের কারণ বলে বিবেচিত। একটি গণতান্ত্রিক, স্বনির্ভর ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ, মার্কিন দৃষ্টিতে, দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক বিবর্তনে স্থিতিশীল উপাদান হিসেবে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। ১৯৭৫-এর পর থেকে চীনও একইভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং

৪৮. American Foreign Relations 1972 : A Documentary Record, Richard P. Stebbins and Elaine P. Adams (eds.) New York. Council of Foreign Relations, 1972, উদ্ধৃত, Ishtiaq Hossain, "Bangladesh-United States Relations: The First Decade" in Emajuddin Ahamed (ed.), *Foreign Policy of Bangladesh: a small state's imperative* (Dhaka 1984), 71.

৪৯. আরো বিশদ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম, "চীন, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা: চীনের দৃষ্টিকোণ", **ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা** (১৩৯৮ সাল), নং ১-৩, ৫-১৯।

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকভাবে শক্তির ভারসাম্য সংরক্ষণে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করে চলেছে।[৫০]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত আচরণ পরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ সংকট উত্তরণের পর মস্কো অন্যান্য বৃহৎ শক্তির মতো দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ চায়, কিন্তু সেই স্বাভাবিকীকরণ অবশ্য ক্রেমলিন চায় সোভিয়েত স্বার্থের অনুকূলে রাখতে। তখন সোভিয়েত উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে তার বিশ্বপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের কার্যকর ভূমিকা সীমিত রাখা। সেই ধরনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মস্কো ভারতের সঙ্গে গভীরতর বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক ও সর্বব্যাপী সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়। এ ধরনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মস্কো ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তিকে এশিয়ায় উভয় দেশের যৌথ কৌশলগত কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। এভাবে বাংলাদেশ সংকট উত্তরণের পরও মস্কো তার ভারতপন্থী রণনীতিতে অব্যাহতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য সুসংহত হয়। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীসম্পর্ককে এশীয় মহাদেশের "স্থিতিশীলতার একমাত্র উপাদান" বলেও প্রচার করতে ক্রেমলিনের নীতিনির্ধারকদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। কেননা, মস্কোর দৃষ্টিতে, দু'দেশের সম্পর্ক কোনরূপ অব্যবহিত কৌশলমূলক বিবেচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠে নি; বরং এর পেছনে দু'দেশের দীর্ঘমেয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় বিজড়িত রয়েছে।[৫১]

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে গড়ে উঠা সেই গভীরতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এটাও মনে রাখা সমীচীন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মস্কো উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ কোন সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকে; এক্ষেত্রে ক্রেমলিন শুধুমাত্র ভারতের প্রতি সমর্থনমূলক সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। মস্কো প্রকাশ্যে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরকে (সেপ্টেম্বর ১৯৭২) স্বাগত জানায়, কিন্তু নয়াদিল্লীর সঙ্গে পূর্বে স্বাক্ষরকৃত চুক্তির অনুরূপ কোন মৈত্রীচুক্তি কখনো ক্রেমলিন ঢাকার সঙ্গে স্বাক্ষর করার প্রস্তাব রাখে নি।

এভাবে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ভারতই প্রধান আঞ্চলিক দোসর হিসেবে সোভিয়েত কৌশলগত পরিকল্পনায় স্থায়ী আসন লাভ করে, আর বাংলাদেশকে দেখা হয় একটি রাজনৈতিক সম্পূরক বা ভারতের কর্তৃত্বাধীন একটি লেজুড়ে দেশ হিসেবে। ৯ আগস্ট ১৯৯১ তারিখে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি নবায়ন করা হয়। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতভিত্তিক সোভিয়েত কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির অব্যাহত ধারা প্রতিফলিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর অর্থাৎ ১৯৯১ সনের পর থেকে আন্তর্জাতিক সিস্টেমে

---

৫০. আরো ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Abul Kalam, "China's Forign Policy and Security Perceptions," *BIISS Journal*, Vol. 17, No. 2 (1996), 205-206.

৫১. "Relations between the USSR and the Countries of South and Southeast Asia", in Gromyko and Ponomarev (eds.), প্রাগুক্ত, 622.

মস্কোর পরাশক্তির পদমর্যাদা লোপ পায়। নয়াদিল্লীর নিকট তা ছিল শোচনীয় আঘাত স্বরূপ। কিন্তু উভয় দেশে পালাক্রমে সরকার পরিবর্তন সত্ত্বেও নয়াদিল্লী ও মস্কো দ্বিপাক্ষিক মৈত্রীচুক্তির উপর পুনর্বার আস্থা ব্যক্ত করে চলছে। সেই চুক্তির "উপদেশক" ধারা বিলোপ করা হলেও দু'পক্ষের কৌশলগত ভাববিনিময় ও ভারতের প্রতি অব্যাহত রুশ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ থেকে উভয়ের স্থায়ী মৈত্রীবন্ধনের ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।[৫২]

পরিশেষে তিনটি বিশ্বশক্তির দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক রণনীতি সংক্ষেপে পুনরায় পর্যালোচনা করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আঞ্চলিক রণনীতি ইতিহাসের ভিন্নতর সময় ও ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বটে, কিন্তু উভয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে একই লক্ষ্যে পরিচালিত; তা হলো আঞ্চলিক শক্তিসাম্য বজায় রাখা। সেই শক্তিসাম্য ব্যাহত হতে পারে এ ভয়ে উভয় শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রদানের বিষয়ে সংযত আচরণ করে, কিন্তু বর্তমানকালে উভয় শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও শক্তিশালী বাংলাদেশ সেই আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের কৌশলগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তা হবে এ অঞ্চলের জাতিসমূহের, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিসম আশা-অকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে এই ধরনের কৌশলগত দৃষ্টিকোণ এ অঞ্চলের সাধারণ জনমানুষের অন্তর স্পর্শ করে, অপেক্ষা রাখে সমর্থন লাভের। কেননা এর ফলে এ অঞ্চলের সকল দেশ তাদের নিজ নিজ সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্তার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে।

পক্ষান্তরে, মস্কোর আঞ্চলিক রণনীতি কিছুকালের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক দু'মেরুর দিকে দোলা দেয়, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে দু'শক্তির নীতিগত সাদৃশ্য ও মৈত্রীবন্ধন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে হলেও কালের ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তর্নিহিতভাবে দু'শক্তির মৈত্রীবন্ধন এক অপ্রতিসম রূপ পরিগ্রহ করে। নয়াদিল্লীর আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের প্রতি মস্কোর একাত্মতা এতে প্রকাশ পায় বলে তা ভারত ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্থায়ী স্বার্থের প্রতিকূল—এমনকি এ অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সার্বভৌম ও উন্নয়নমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষাবিরোধী। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর স্নায়ুযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের রূপান্তর, মস্কোর ঐতিহ্যগত আধিপত্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা এবং এসবের ফলে ভারতের আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্ভাব্য পরিবর্তন প্রভৃতি ভারতের ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূরণে সহায়ক হবে, কালে দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ বিবর্তন ঘটাবে—এরূপ প্রত্যাশা করা অমূলক নয়।

৫২. Abul Kalam, *Japan and South Asia: Subsystemic Linkages and Developing Relationships* (Dhaka 1996), পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট ১

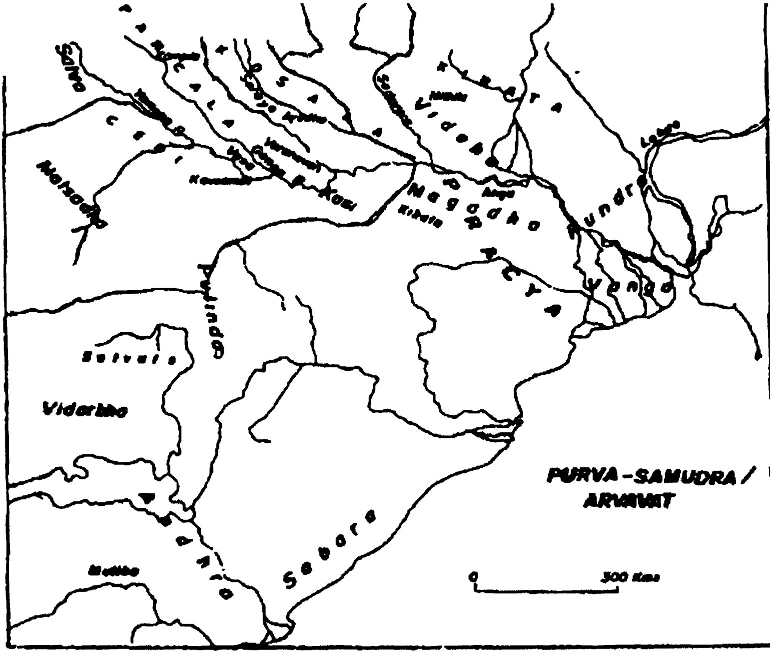
মানচিত্রে বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

কে. মউদুদ ইলাহী*

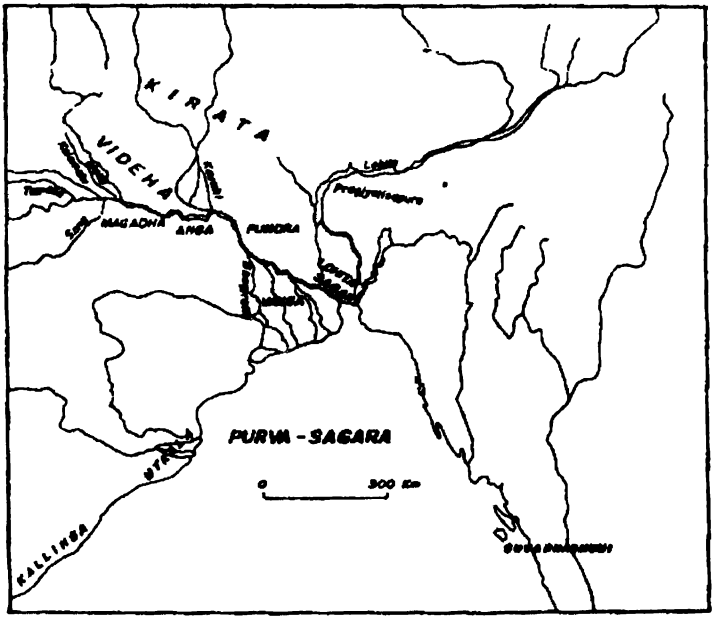
ভূগোলবিদ এবং ইতিহাসবেত্তা উভয়ের জন্য ঐতিহাসিক মানচিত্র একটি অঞ্চলের প্রাচীনত্বের ধারণা প্রদান করে থাকে। এই ধারণা কেবলমাত্র প্রাচীনকালের পরিসর, অবস্থান এবং দূরত্ব সম্পর্কীয় নয়, বরং একটি জাতি বা রাজ্যের আয়তনগত বিবর্তন, সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পরিবর্তন, রাজনৈতিক আধিপত্য অথবা এর অভাব কিভাবে একটি দেশের জন্য গুরুত্ববহ তার ধারণা প্রদান করে থাকে। এই প্রবন্ধে "বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ"-এর ভূ-ঐতিহাসিক বিবর্তনের পর্যায়সমূহ মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বভাবতই প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য কারণে বর্তমানে যে অঞ্চলকে বাংলাদেশ বলা হয় সেই ভূখণ্ডের এবং এর সন্নিহিত এলাকার সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিতকরণ করা সহজসাধ্য নয়। কাজেই মানচিত্রে নির্দিষ্ট সীমানাকে সামগ্রিক বা মোটামুটিভাবে এই এলাকার সীমানা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এরূপ পরিস্থিতির কারণগুলির মধ্যে প্রাচীনকালের মানচিত্রে খাত পরিবর্তনশীল নদীসহ, পাহাড়-পর্বত এবং উপকূলরেখা অঙ্কিত হয় নাই। তদুপরি, প্রাচীনকাল থেকে অনেক ভূরূপ এবং প্রাকৃতিক নিদর্শনের পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। কাজেই, এই প্রবন্ধে মানচিত্রায়নে প্রকৃত মাপনী (স্কেল) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশ ও সন্নিহিত অঞ্চলের সীমানা বিবর্তন পর্যায়সমূহ তুলনা করা যায়। তবে কিছু মূল/প্রাচীন মানচিত্রও ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তৎকালীন মানচিত্রায়ন অভিজ্ঞান এবং আলোচ্য অঞ্চল সম্পর্কে ধারণার মাত্রা অনুধাবন করা যায়।

* অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।



মানচিত্র-১ক



মানচিত্র- ১খ

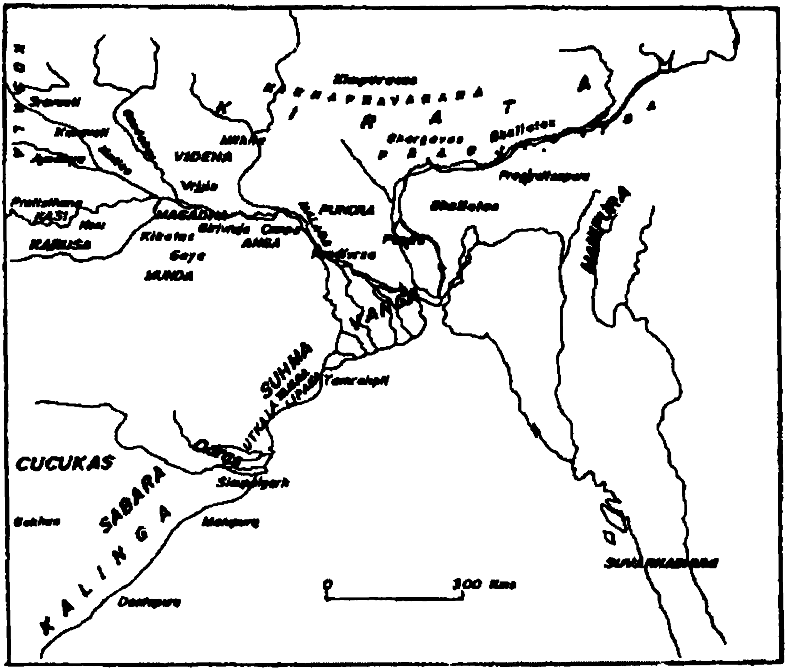
মানচিত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় কোন ঐতিহাসিক মানচিত্রায়নের বা ঐতিহাসিক কালিক পারম্পর্য সম্পর্কীয় মৌলিকত্ব এখানে দাবি করা হচ্ছে না। এগুলিতে কেবল বাঙ্গালা, বেঙ্গল এবং পরে বাংলাদেশের আয়তনগত বিস্তৃতি এবং/অথবা সীমানার বিবর্তনগত বিবরণ বিধৃত হয়েছে। একই সাথে অঞ্চলটির পরিসরগত ধারণা এবং দূরত্ব প্রকাশের জন্য আনুমানিক স্কেল (মাপনী) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাক-পাল আমলের মানচিত্রের পর পরবর্তীকালের মানচিত্রে উপকূলীয় ভূমিগঠনের প্রমাণ মেলে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে ব-দ্বীপ গঠনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই, এই সময়কার মানচিত্রের সাথে সাম্প্রতিককালের মানচিত্রের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রবৃদ্ধিসূচক মানচিত্রায়নে বিভিন্ন উৎস, যেমন, ভৌগোলিক মানচিত্রবিদ্যা এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য-উৎস প্রবন্ধের শেষে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং প্রবন্ধের মধ্যে বারবার নির্দেশ করা হয় নি।

মানচিত্র ১ (ক-গ) : ১০০ থেকে ৭০০ খৃঃ পূর্ব

প্রাচীন বৈদিক সূত্রে প্রথম বাংলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এই এলাকা 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল—এলাকাটিতে সম্পূর্ণ নিম্ন গাঙ্গেয় এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এলাকাটির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এবং এর অধিবাসীদের নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ছিল। সন্নিহিত রাজনৈতিক এবং/অথবা ভৌগোলিক এলাকাগুলি ছিল পুন্ড্র, প্রাচ্য, বিদেহ এবং কিরাতা। বঙ্গসহ এই এলাকাগুলির প্রাক-আর্য অবস্থান ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্যদের আগমনকালে (১৫০০-৮০০ খৃঃ পূর্ব) বঙ্গের বেশিরভাগ অংশ অরণ্যভূমি ছিল এবং বঙ্গসহ সন্নিহিত এলাকা আদিবাসী বা ভূমিজ অধিবাসী সমৃদ্ধ ছিল। সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত এলাকা নদীজ ভূমিরূপ এবং অরণ্যময় থাকার কারণে আর্য প্রভাবমুক্ত ছিল (মানচিত্র ১ক)। রামায়ণকালে (৮০০-৭০০ খৃঃ পূর্ব) বাঙ্গালার আয়তনগত বিস্তৃতিকে বৃটিশ উপনিবেশকালীন বাঙ্গালার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বঙ্গ এবং পুন্ড্র প্রখ্যাত জনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অঙ্গ সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল। লোহিতসাগর নামে একটি লোকালয়ের বিকাশ ঘটে গঙ্গা ও লোহিত (ব্রহ্মপুত্র) নদীর সঙ্গম এলাকায়। ঠিক এর দক্ষিণেই পূর্বসমুদ্র বা আর্ভাভত (বঙ্গোপসাগর)-এর অবস্থান ছিল (মানচিত্র ১খ)।

মহাভারতকালে (৬০০-৩০০ খৃঃ পূর্ব) বাঙ্গালা এবং সন্নিহিত এলাকার একটি অঞ্চলগত ধারণা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। অঙ্গ এবং পুন্ড্রের তুলনায় বঙ্গের আয়তনগত অবস্থান দৃঢ় ছিল (মানচিত্র ১গ)।

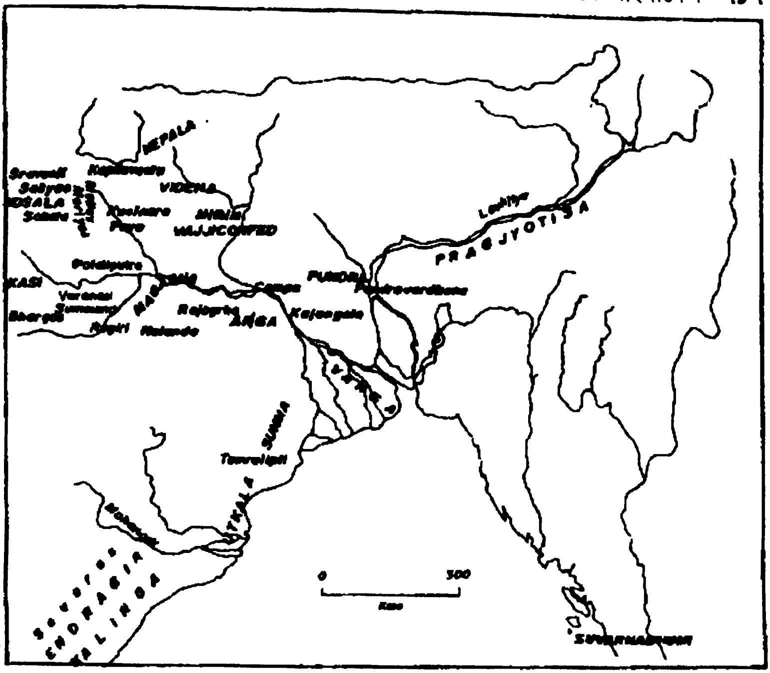


মানচিত্র- ১গ

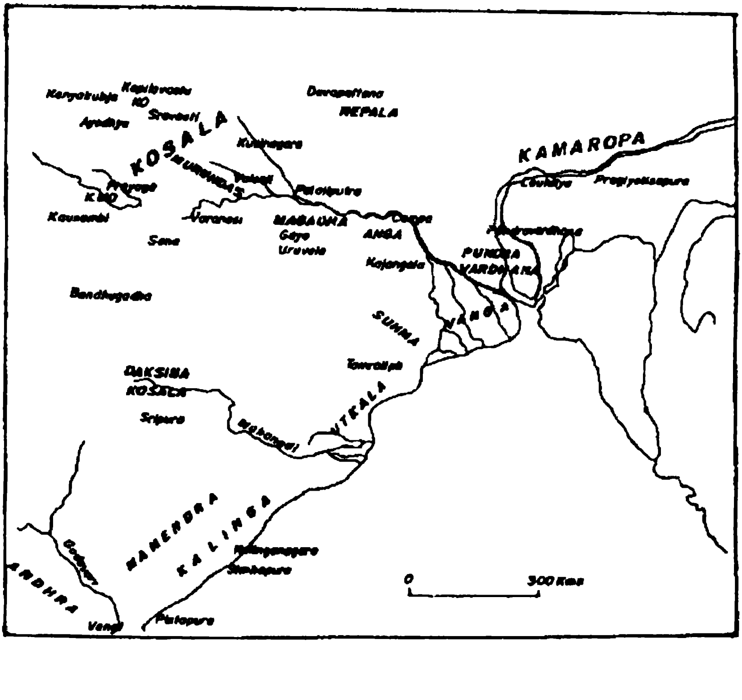
মানচিত্র ২ : মগধ যুগে বাঙ্গালা : ৫৬০-৩২৫ খৃঃ পূর্ব

বর্তমানকালের উত্তর-মধ্য ভারত বা তৎকালীন মধ্যদেশে অতীতে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটে। এই অঞ্চলের পূর্বে প্রাচ্য নামে একটি বৃহদায়তন এলাকার মধ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক অবস্থান, যেমন, অঙ্গ, পুন্ড্র, সুহ্ম এবং বিশেষ করে বঙ্গের বিকাশের সাথে সাথে উত্তর-পূর্বভাগে লোহিত নদী (ব্রহ্মপুত্র) বরাবর প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের উত্থান ঘটে। অঙ্গ ও পুন্ড্রের ব্যাপক অংশ এবং বঙ্গের কিছু অংশ মগধ রাজ্যভুক্ত হয় (৫৪৫ খৃঃ পূর্ব)।

পরবর্তীকালে মৌর্য শাসনামলে (৩২১-১৮১ খৃঃ পূর্ব) অঙ্গ, পুন্ড্র এবং প্রাগজ্যোতিষের তুলনায় বঙ্গ অধিকতর ভূ-রাজনৈতিক খ্যাতি লাভ করে। এর কারণ হিসেবে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নিম্ন গাঙ্গেয় নদীমালার নৌ-পথ ব্যবহার এবং নৌ-পথ সংলগ্ন বেশ কিছু জনপদ ও নগরের বিকাশ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়কালটি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বিখ্যাত ছিল, আর তৎকালে বৌদ্ধরা পরিকল্পিত সড়কপথ, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, শহর এবং বৌদ্ধ চর্চার জন্য পাঠকেন্দ্র (বা বিশ্ববিদ্যালয়) নির্মাণের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।



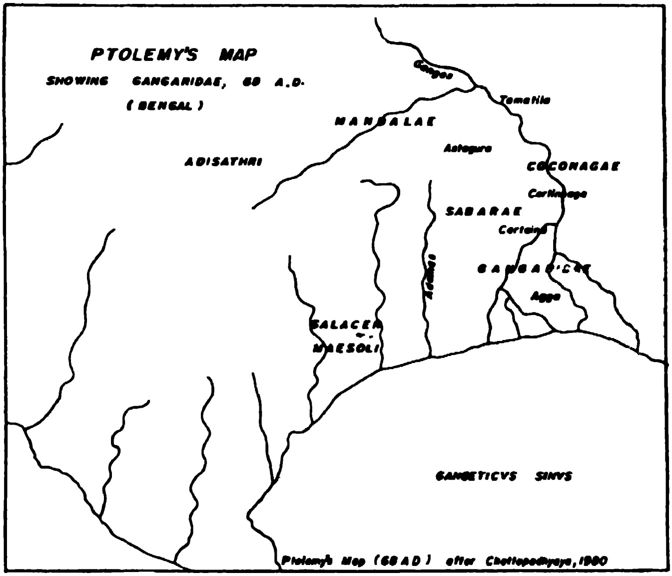
মানচিত্র - ২



মানচিত্র- ৩

মানচিত্র ৩ : কুষাণ যুগে বাঙ্গালা: ৩০০-১০০ খৃঃ পূর্ব

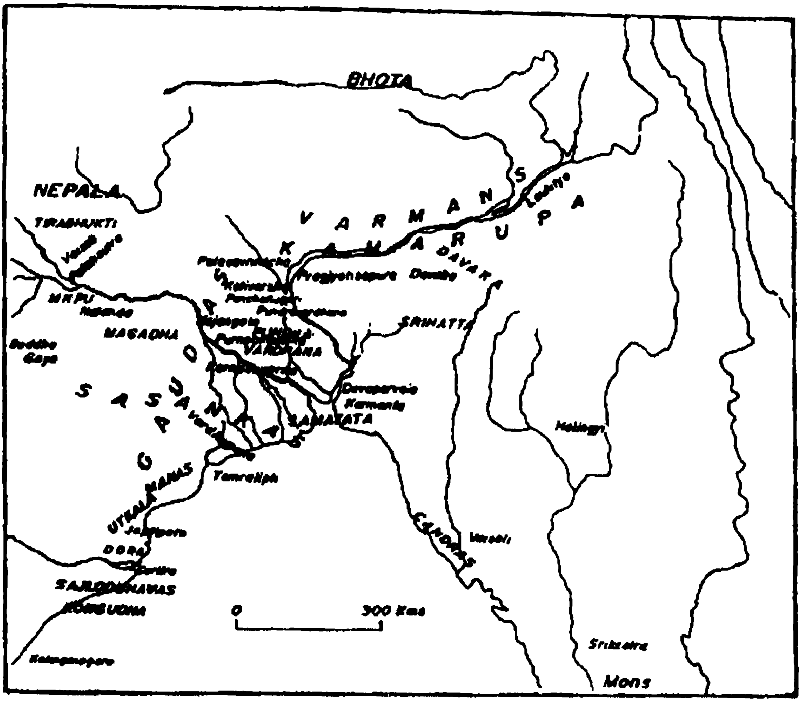
উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে মূলত যাযাবরবৃত্তিক কুষাণগণ খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় আগমন করে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। কালক্রমে এদের এই সভ্যতার সাথে পরিপূর্ণ সংস্কৃতায়ন ঘটে এবং এরা উত্তর ভারতে গঙ্গানদী বরাবর ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে এক রাজশক্তির উদ্ভব ঘটায়। তবে কুষাণগণ মগধ পর্যন্তই তাদের রাজ্যবিস্তৃতি সীমিত রাখে। ফলে, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম এবং পুন্ড্রদের স্বকীয় অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। তবে এদের মধ্যে পুন্ড্র অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থানের চূড়ান্ত পরিণতি এই সময় লক্ষণীয়। এই বিকাশমান রাজনৈতিক বিস্তৃতি পুন্ড্রবর্ধন নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু অপরদিকে প্রাগজ্যোতিষের অবনতি ঘটে।



মানচিত্র- ৪

মানচিত্র ৪ : টলেমীকৃত বাঙ্গালার মানচিত্র : ৬৮ খৃঃ

বঙ্গ বা বাঙ্গালার কালিক ইতিহাস শুরু হয খৃঃ পূঃ ৩২৪ থেকে, যখন আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করতে এসে সিন্ধুনদের তীরে এসে গঙ্গারিদে এবং প্রাস্য (প্রাচ্য) অঞ্চলের যোদ্ধাদের বীরগাথা সম্পর্কে অবগত হন এবং তাঁর অভিযান শেষ করেন। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলকে গঙ্গারিদে নামকরণ টলেমী'র মানচিত্রে (৬৮ খৃঃ) পাওয়া যায়। এর অধিবাসীরাও একই নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গারিদের আয়তনগত বিস্তৃতি ছিল নিম্ন গঙ্গার বঙ্গ এবং অঙ্গ অঞ্চলে, যদিও প্রকৃত ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দেশ করা এখন কঠিন।



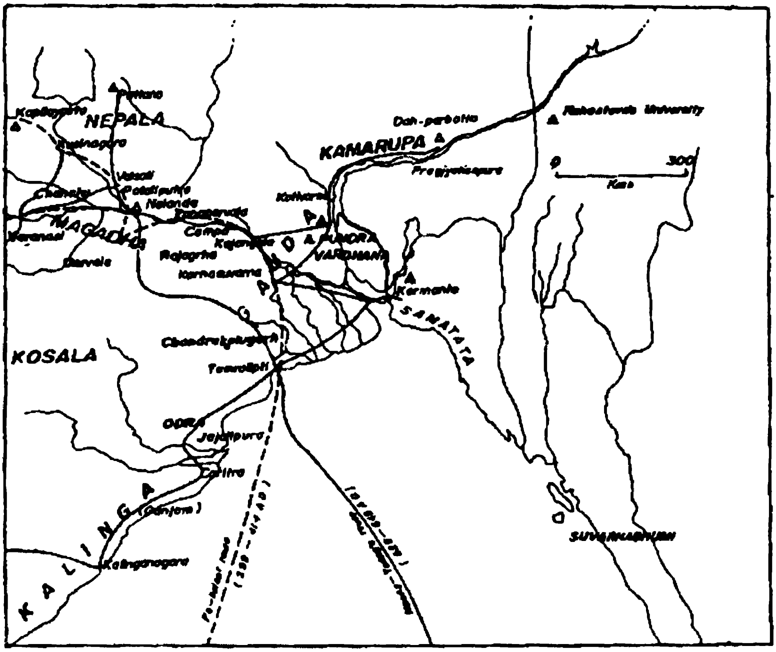
মানচিত্র- ৫

মানচিত্র ৫ : হর্ষ-শশাঙ্ক অন্তর্বর্তীকালে বাঙ্গালা : ৫০০-৭০০ খৃঃ

এই সময়কালে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিমে (বর্তমান উড়িষ্যা) শশাঙ্ক এবং উত্তর-পূর্বে (বর্তমান কামরূপ) বর্মনরা প্রভূত রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। কামরূপের শশাঙ্কের গৌড় আক্রমণের ঘটনায় সন্দিহান হয়ে ভাস্করবর্মন হর্ষবর্ধনের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর ফলে হর্ষবর্ধন পুন্ড্রবর্ধনে অনুপ্রবেশের সুযোগ পান। এই যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গালার রাজনৈতিক গুরুত্বও কমে যায় এবং সমতটের রাজশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমতটের বিস্তৃতি পূর্বে গঙ্গা-লোহিত সঙ্গমস্থল থেকে পশ্চিমে সমগ্র গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পর্যন্ত ঘটে। লক্ষণীয় যে, এ সময় কামরূপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক খ্যাতি পুন্ড্রবর্ধন, এমন কি মগধকেও অতিক্রম করে।

মানচিত্র ৬ : বিদেশী পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে বাঙ্গালা : ৩০০-৭০০ খৃঃ

হর্ষ-শশাঙ্ক অন্তর্বর্তীকালে বেশ কিছু চীনা পরিব্রাজকের ভারতে আগমন ঘটে। এঁদের কয়েকজন বাঙ্গালায় আগমন করেন। এঁদের লিখিত বিবরণ থেকে বাঙ্গালার অধিবাসীদের



মানচিত্র- ৬



মানচিত্র- ৭

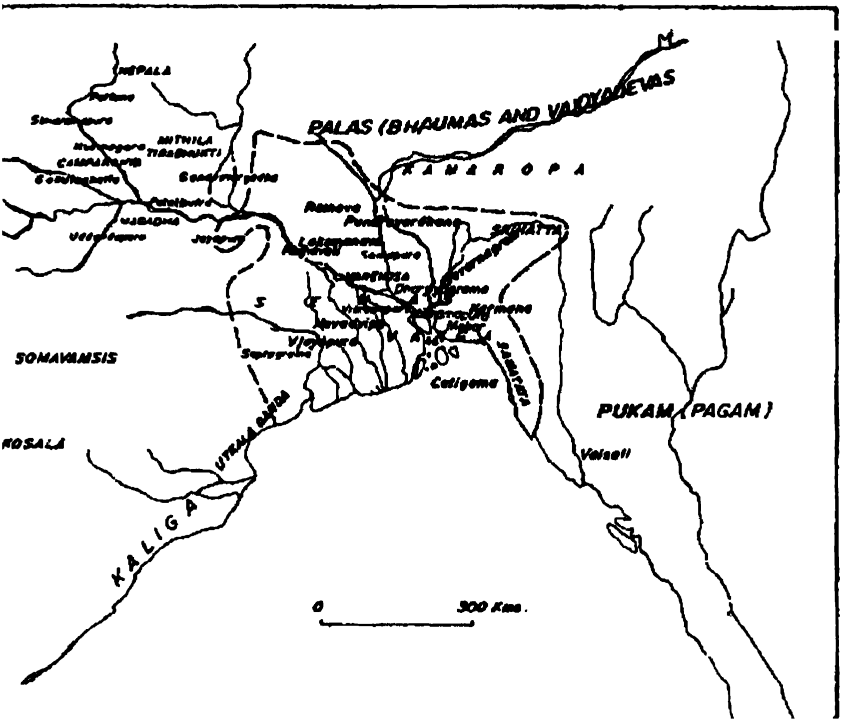
সংস্কৃতি, ধর্ম এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। এই সময়টি বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের ফলে সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ এবং উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষ সুপরিচিত ছিল। চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা হিয়েন (৩৯৯-৪১৫ খৃঃ) এবং হুয়েন সাং (৬২৯-৬৫০ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। উভয়েই মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সড়কপথে আগমন করেন এবং বাঙ্গালা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। গৌড়ের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তি নামক নৌ-বন্দর থেকে তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে পুন্ড্রবর্ধন এবং বঙ্গের বেশ কিছু অংশ গৌড়ের (মগধের পূর্বে) অন্তর্ভুক্ত হয়। সমতট আরও পূর্বে ত্রিপুরা থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চীনা পরিব্রাজকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বাঙ্গালা অঞ্চলে নদীতীরে বহু বর্ধিষ্ণু শহর ছিল। সমগ্র এলাকা জনঅধ্যুষিত ছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালার নৌ-বন্দরের বিকাশ থেকে অনুমান করা যায় যে এখানকার অধিবাসীগণ নৌ-পারদর্শী ছিল। ফা হিয়েন প্রধানত পশ্চিম গৌড় পরিভ্রমণ করেন এবং পাটলীপুত্র, নালন্দা, কাজঙ্গলা এবং তাম্রলিপ্তি দর্শন করেন। তিনি পাটলীপুত্র এবং নালন্দাকে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার প্রধান পাদপীঠ বলে উল্লেখ করেন, যাকে বর্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা যায়। কামরূপ, পুন্ড্র, কোটিবর্ষ এবং কামান্তা (কুমিল্লা ?) সম্পর্কে হুয়েন সাং অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

মানচিত্র ৭ : পাল যুগে বাঙ্গালা : ৭০০-৯২৫ খৃঃ

এই সময়কালে সমগ্র এশিয়া তথা বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে এই কালে পশ্চিম ভারতে আরব মুসলমানদের অভিযানের ফলে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটতে থাকে; কিন্তু বাঙ্গালায় ইসলাম ধর্মের প্রসার এরূপ অভিযানের ফলে ঘটে নি, বরং ধীর গতিতে ও অহিংস পরিবেশেই ঘটেছে।

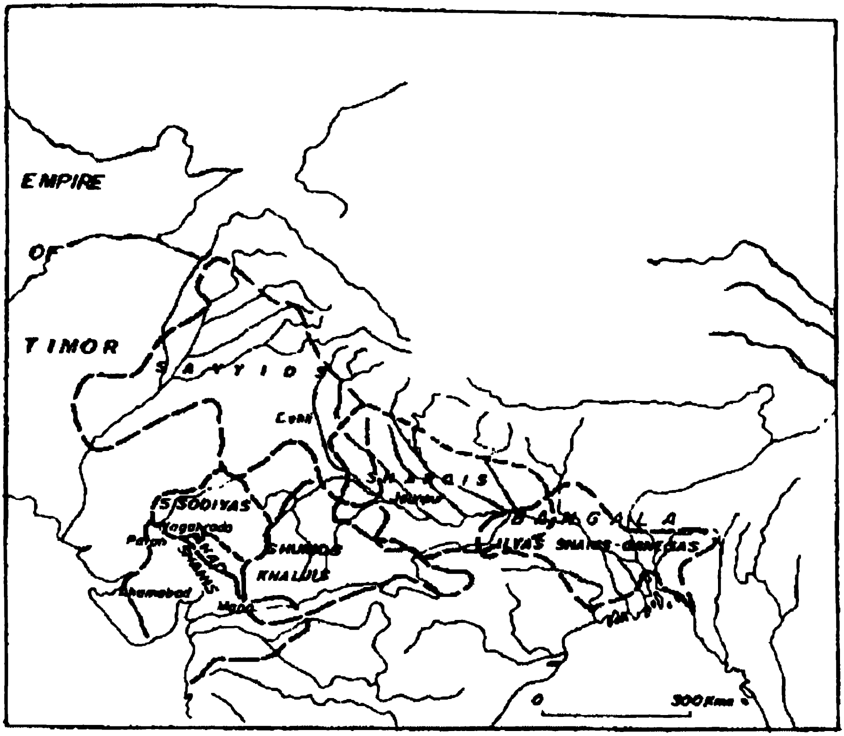
পূর্বে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, রাজনৈতিক বৈরিতা, স্থানীয় যুদ্ধাবস্থা এবং সামাজিক অস্থিরতা গুপ্ত আমলের শেষের দিকে বাঙ্গালায় সামগ্রিকভাবে এক অরাজকতার সৃষ্টি করে স্থানীয় বহু বিবদমান রাজ্যের সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, স্থানীয় নেতৃবর্গ এক পর্যায়ে ৭৫৬ খৃস্টাব্দে গোপাল নামীয় পাল বংশের এক ব্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মনোনীত করেন। এই সময় থেকে পাল রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। গোপাল তাঁর শাসনামলে ক্ষমতা সুসংহত করে সমগ্র বাঙ্গালায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্য উত্তরে হরিকেল এবং পুন্ড্রবর্ধন, পূর্বে কামান্তা, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উৎকল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। পালগণ, বিশেষকরে গোপাল বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বিক্রমশীলাসহ বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্য বিদ্যাপীঠ নির্মাণ করেন।



মানচিত্র- ৮

মানচিত্র ৮ : সেন যুগে বাঙ্গালা : ১০০০-১২০০ খৃঃ

বাংলায় পাল আমলে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও মহিপাল (৯৯৫-১০৪৩ খৃঃ) এবং রামপালের রাজত্বকালে (১০৮২-১১২৪ খৃঃ) চান্দেলা, কোল, চালুক্য এবং কালকুরিদের সাথে যুদ্ধ ও কোন্দল চলতে থাকে। পাল আমলের শেষদিকে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল ও অস্থিতিশীলতা বিরাট বাঙ্গালা রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের ধারক দাক্ষিণাত্যের বংশোদ্ভূত সেন রাজাগণ বাঙ্গালায় প্রভুত্ব বিস্তার করে। ফলে মগধ থেকে বঙ্গ, পুন্ড্র এবং সমতট সেনরাজ্যভুক্ত হয়। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীরা সেনদের অত্যাচারের শিকার হয় এবং এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সময় ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ আরব ও পার্সি বণিক সম্প্রদায়ের সাথে সমুদ্রপথে সমতট ও আরাকান অঞ্চলে আগমন করেন। এঁদের সংস্পর্শে বহু অত্যাচারিত বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেনদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পায়।



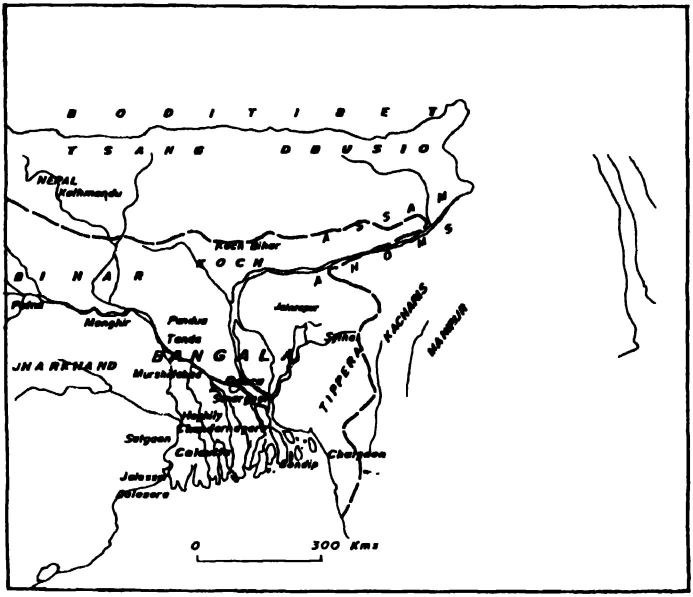
মানচিত্র- ৯

মানচিত্র ৯ : শাহী-গণেশ আমলে বাঙ্গালা : ১৩৪০-১৪৯০ খৃঃ

১২০৪ সালে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর হাতে সেনরা পরাভূত হয়। খিলজী অযোধ্যাশাসকের সম্ভবত একজন জায়গিরদার ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কিছু পেশাদার মুসলিম যোদ্ধার সাহায্যে বিহারের কিছু ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য দখল করেন। এরপর তিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন।

বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণের ফলে সেন রাজা লক্ষণ সেন গৌড় থেকে বঙ্গের বিক্রমপুরে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে ১২৪৫ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তী রাজাগণ প্রধানত বঙ্গেই অবস্থান করে বৈরী পরিবেশে কোন রকমে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত শাসনকাজ চালাতে থাকেন। তবে ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতায় ইসলাম ধর্ম ক্রমাগত সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে এবং পশ্চিম দিক হতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ বাঙ্গালার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এর ফলে মুসলিম শাসনামলের শুরুতেই এক নতুন বাঙ্গালার বিস্তৃতি রূপলাভ করে।

উত্তর ভারতে ঘুরী রাজবংশ ১২০৬ সালে দিল্লীতে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের বিকাশ ১৫২৬ সালে মুগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত চলতে থাকে। এইরূপ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বাঙ্গালা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৩৪২ সালে বাঙ্গালা ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই শাহী আমলে বাঙ্গালার স্বাধীন অবস্থা ১৩৫৭ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

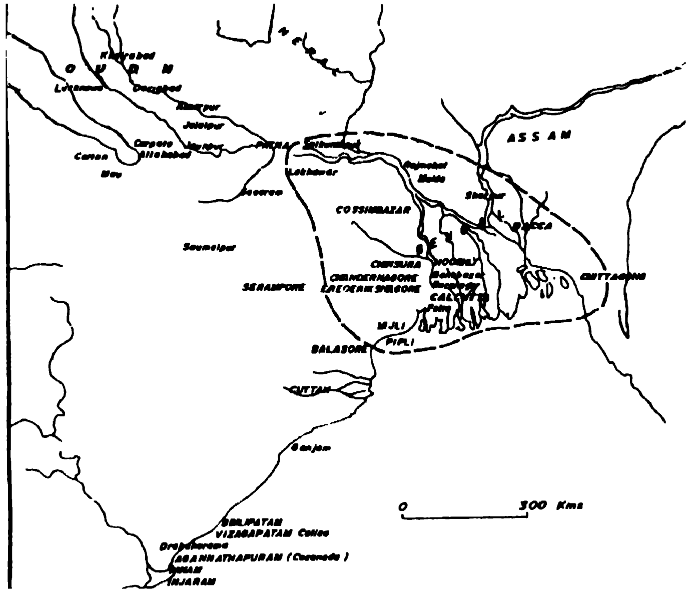


মানচিত্র- ১০

ফিরোজ শাহ তুঘলগ কর্তৃক বাঙ্গালায় অসফল অভিযানের পর তিনি এক সন্ধিচুক্তিবলে ১৩৫৯ সালে বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। ১৪১৫ সালে দিনাজপুরের শাসক রাজা গণেশ শিহাব উদ্দীনকে পরাভূত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন। তবে গণেশের বংশধরগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ১৪৩৫ সাল পর্যন্ত সেখানকার শাসনভার চালিয়ে যান। ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪৩৬ থেকে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙ্গালায় শাসনকাজ চালান। সেন শাসনের পরবর্তী সময় থেকে (১২০০ খৃঃ) শাহী আমল পর্যন্ত ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাঙ্গালার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা অক্ষুণ্ন ছিল। অর্থাৎ, এই সময় বাঙ্গালার বিস্তৃতি ছিল উত্তরে নেপাল সীমান্ত থেকে দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যা পর্যন্ত এবং আরও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত, এবং পশ্চিমে বিহার থেকে পূর্বে আসামের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত।

মানচিত্র ১০ : মুগল আমলে বাঙ্গালা : ১৫৭৬-১৭০৭ খৃঃ

মুগল আমলে প্রধান ভূ-রাজনৈতিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক ছিল বাবরের শাসনামলে ১৫২৬ সালে সাম্রাজ্যের আয়তনগত সম্প্রসারণ থেকে ১৮ শতকের শেষের দিকে আওরঙ্গজেবের শাসনামলে এই সম্প্রসারণের চূড়ান্ত পরিণতি। একই সাথে ১৮ শতকের শেষার্ধে রাজনৈতিক সংঘাত, স্থানীয় বিপ্লব ইত্যাদি দ্বারাও সাম্রাজ্যটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের রাজনৈতিক টানাপড়েন বাঙ্গালাকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি। কেননা, মুগল শাসনের বশ্যতা স্বীকার করলেও 'সুবা বাঙ্গালা' হিসেবে অঞ্চলটি মোটামুটি স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।



মানচিত্র- ১১

বাঙ্গালায় মুগলরা বরং বিলম্বেই আগমন করেছিল, আকবরের মৃত্যুর পর। বাঙ্গালা যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ১৬১২ সালে এবং পুনরায় ১৬৬১ সালে কুচবিহার এবং ১৬১২-৬৩ সালে অহম ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে সীমানা সুস্পষ্ট না থাকলেও বিহার-ঝাড়খন্ড বাঙ্গালার অধীনে ছিল। দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যা পর্যন্ত বাঙ্গালার সীমান্ত ছিল। এই সময়ে সমগ্র বাঙ্গালায় মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বেশ কিছু নগরের পত্তন ঘটে। এগুলোর মধ্যে পাটনা, মুঙ্গের, পাভুয়া, মুর্শিদাবাদ, সোনারগাঁও, সিলেট, চট্টগ্রাম (চাটিগাঁও) এবং সন্দ্বীপ উল্লেখযোগ্য।

মানচিত্র ১১ ও ১২ : ইউরোপীয় সংযোগকালে বাঙ্গালা : ১৬ - ১৭ শতক

১৬ শতকের শেষার্ধে মুগল রাজদরবারে বৃটিশ দূত প্রেরণের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৬০০ সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের মাধ্যমে তারা বাণিজ্যিক সুবিধাদি লাভ করে। ১৬১২ সালে তারা সুরাটে ফ্যাক্টরী কুঠি নির্মাণের অনুমতিলাভ করে। ১৬৫১ সালে বৃটিশরা বাঙ্গালায় হুগলী নদীতীরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। এ সমস্ত সুবিধাদির পরিবর্তে আওরঙ্গজেব শুল্ক লাভ করেন। কিন্তু মুগল ভারতে তথা বাঙ্গালায় বৃটিশ স্বার্থ কেবল বাণিজ্যকেন্দ্রিক ছিল না। প্রধানত হুগলী নদীতীরে বেশ কিছু দুর্গ নির্মাণের মাধ্যমে বাঙ্গালা বৃটিশ স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। কালক্রমে তারা তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সুসংহত করার উদ্দেশ্যে নদীপথের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। বৃটিশ ভূ-জরিপবিদ জেমস্ রেনেল (১৭৮৪) সর্বপ্রথম ভারতের মানচিত্রে বাঙ্গালাকে 'বেঙ্গল' বলে চিহ্নিত করেন (মানচিত্র ১২ক)। এই মানচিত্র অনুযায়ী বেঙ্গলের বিস্তৃতি পশ্চিমে অযোদ্ধ্যার সীমান্তবর্তী বেনারস এবং বিহার থেকে পূর্বে নিম্ন আসাম ও সিলেট এবং উত্তরে নেপাল ও ভুটান সীমান্ত থেকে দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যার নিকট মেদিনীপুর এবং বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছিল। বেঙ্গলের নদ-নদীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ পরিবহনপথ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

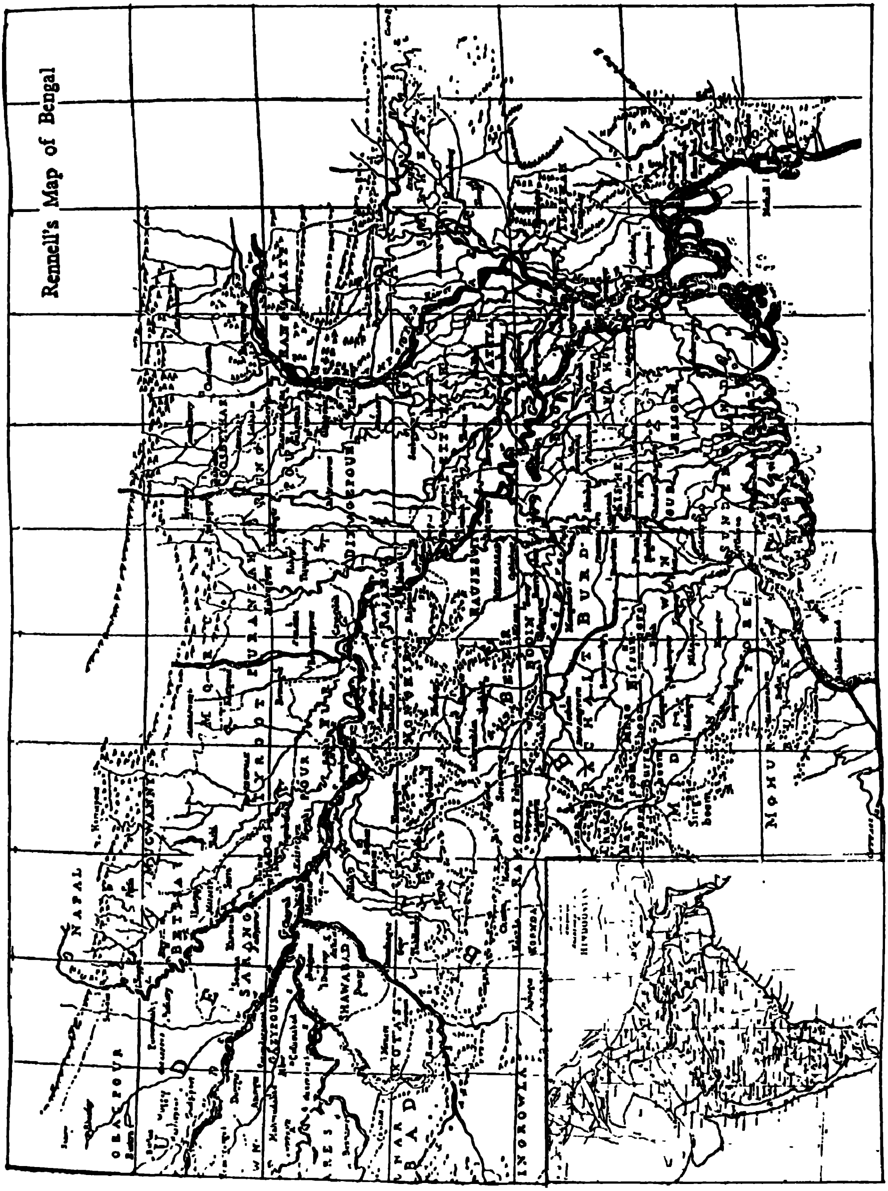
এর কিছু আগে ফরাসী পানিবিদ জে. এন. বেলিন (১৭৬৪) একটি বিরাট রাজ্য হিসেবে বাঙ্গালার মানচিত্রায়ন করেন (মানচিত্র ১২ খ)। রাজ্যটি বহু জনপদপূর্ণ ছিল।

উক্ত মানচিত্র দু'টি রীতিবদ্ধভাবে অঙ্কিত হয়েছিল বিধায় এখানে দেখানো হলো।

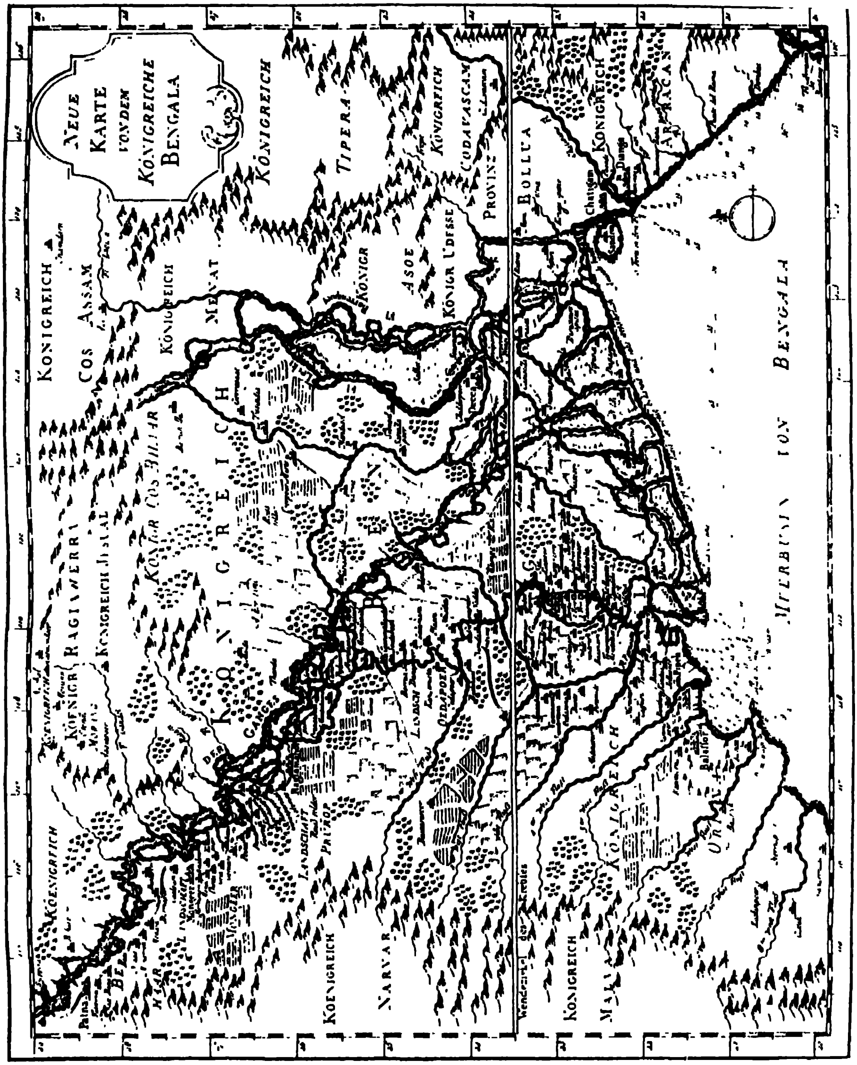
মানচিত্র ১৩ : মুগল সাম্রাজ্যের পতন এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থানকালে বাঙ্গালা : ১৭০৭-১৭৬৬

মুগল আমলে বাঙ্গালায় স্বায়ত্তশাসনের কারণে দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে এই প্রদেশের পৃথক একটি মর্যাদা ছিল। এই পরিস্থিতি বৃটিশদের কেন্দ্র ও প্রদেশ থেকে অধিকতর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। বৃটিশরাও ক্রমাগত স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়ে ষড়যন্ত্র ও কূটচাল দ্বারা অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ফলে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশদের কাছে বাঙ্গালার নবাবের পতন ঘটে। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকারান্তরে বাঙ্গালার শাসনক্ষমতা দখল করে। ১৭৬৫ সালে মুগলদের নিকট হতে সুবা বাঙ্গালার 'দীউয়ানি' ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে বৃটিশরা প্রদেশটির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এবং বিচার আচার পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে।

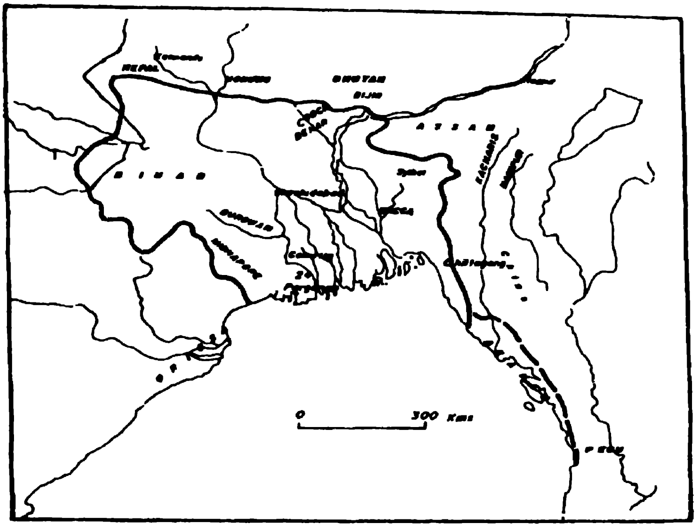
এই সময়ে বাঙ্গালায় সীমানার বিস্তৃতি মানচিত্র ১৩-তে দেখানো হয়েছে।



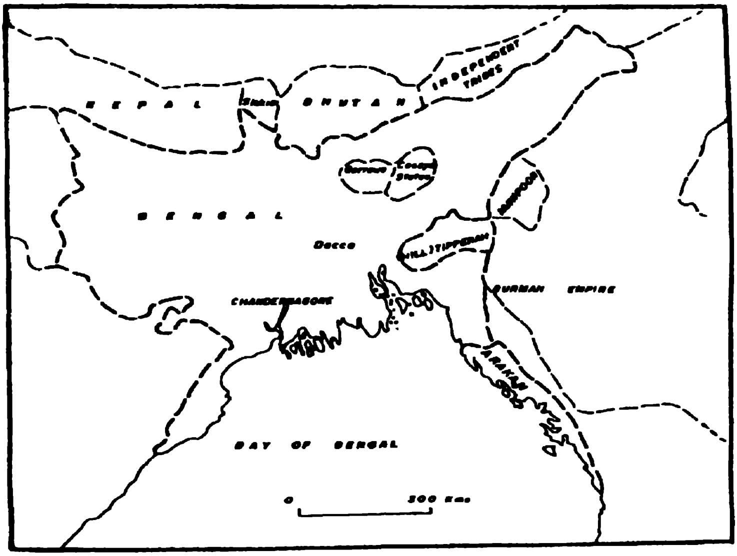
মানচিত্র- ১২ক


NEUE
KARTE
VON DEN
KÖNIGREICHE
BENGALA
KÖNIGREICH
COS ASSAM
KÖNIGREICH
TIPERA
KÖNIGREICH
CODAVASCAM
PROVINZ BOLLUA
KÖNIGREICH
ARRACAN
Chittigan
ASOE
KÖNIGR UDESSE
KÖNIGREICH
KÖNIGR COS BILIAR
KÖNIGREICH JESUAL
RAGIANNERRA
KÖNIGREICH
BENGALA
MEERBUSEN VON BENGALA
NARVAR
KOENIGREICH
KÖNIGREICH
ORIXA
LANDSCHAFT PATANES
KOENIGREICH
Patna

মানচিত্র- ১২খ



মানচিত্র- ১৩



মানচিত্র- ১৪

মানচিত্র ১৪ : ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালা

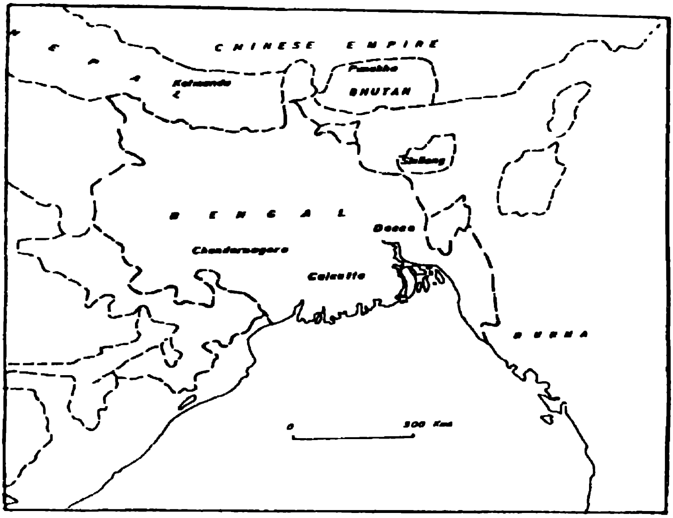
১৮৫৭ সালের মধ্যে বৃটিশরা ভারতে তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলয় পাকাপোক্ত করে তুলে। বাঙ্গালার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র সৃষ্টি হয়। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বাঙ্গালার বিস্তৃতিকে পাল আমলের বাঙ্গালার সাথে তুলনা করা চলে। 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' সমগ্র বিহার, উত্তর-পূর্ব উড়িষ্যার অংশবিশেষ, মূল বাঙ্গালা প্রদেশ, সমগ্র আসাম এবং আরাকানের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। পূর্বদিকে বেশকিছু উপজাতীয় এলাকা এই এলাকার বাইরে রাখা হয়।

মানচিত্র ১৫ এবং ১৬ : ১৮৫৭-১৯০৪ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালার আয়তনগত পরিবর্তন এবং ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ

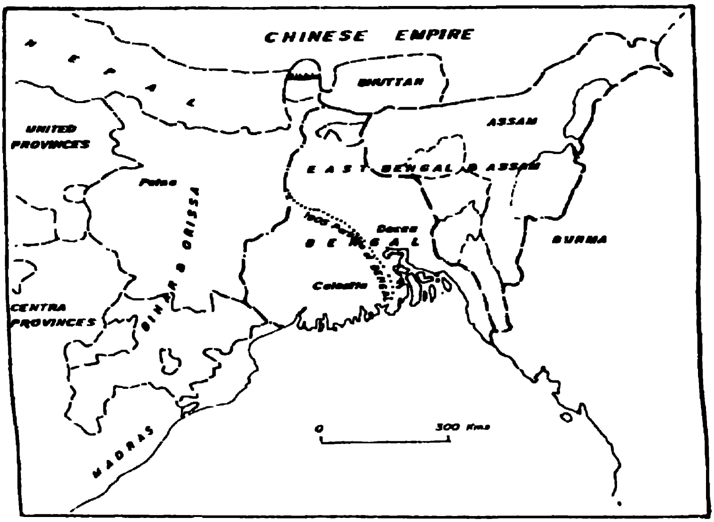
১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লব (সিপাহি বিপ্লব) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সমাপ্তি ঘটায় এবং এরপর বৃটিশরাজ শাসন শুরু হয়। ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আয়তনগত এবং সীমানাগত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের কারণ কিছুটা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ছিল। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল প্রশাসনিক সংস্কারের নামে ১৯০৫ সালে বাঙ্গালার বিভাক্তি। এই পুনর্গঠনের মধ্যে পরবর্তীকালে গঠিত 'পূর্ব বাংলা'র বীজ রোপিত হয়েছিল। 'পূর্ব বাংলা এবং আসাম' নামে গঠিত এই নতুন প্রদেশের বিস্তৃতিকে ইয়েট্স (ভারতীয় আদমশুমারি কমিশনার)-এর ১৯০১ সালে প্রণীত 'নদী উপত্যকা পরিকল্পনার সাথে তুলনা করা যায়। তখন এই প্রদেশের আয়তন ছিল ২৭৬,০০০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ছিল ৩১ মিলিয়ন (৫৯.৩% মুসলমান, ৩৯.০% হিন্দু এবং ১.৭% অন্যান্য)।

মানচিত্র ১৭ ও ১৮ : বৃটিশ শাসনের শেষলগ্নে বাংলা, ১৯১২-১৯৪৭ এবং পাকিস্তান আমলে বাংলা, ১৯৪৭-১৯৭১

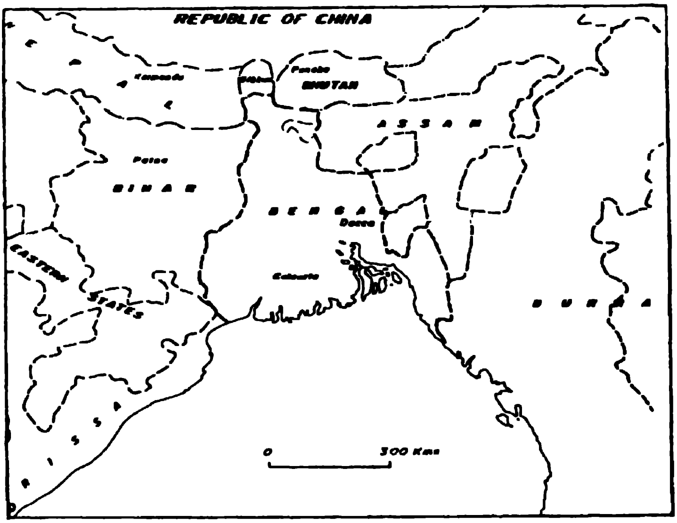
কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে বৃটিশরা ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন একীভূত বাংলা ১৯০৫পূর্ব আকার লাভ করে নি। খণ্ডিত বাংলা পুরোপুরি বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয় এবং আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। ফলে খণ্ডিত নতুন বাংলা সমভাষাসম্পন্ন কিন্তু ধর্মীয়ভাবে পৃথক দু'টি বাংলায় অর্থাৎ হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বাংলা এবং মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলায় বিভক্ত হয়ে যায়। হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বাংলা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা বিবেচনায় সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করে।



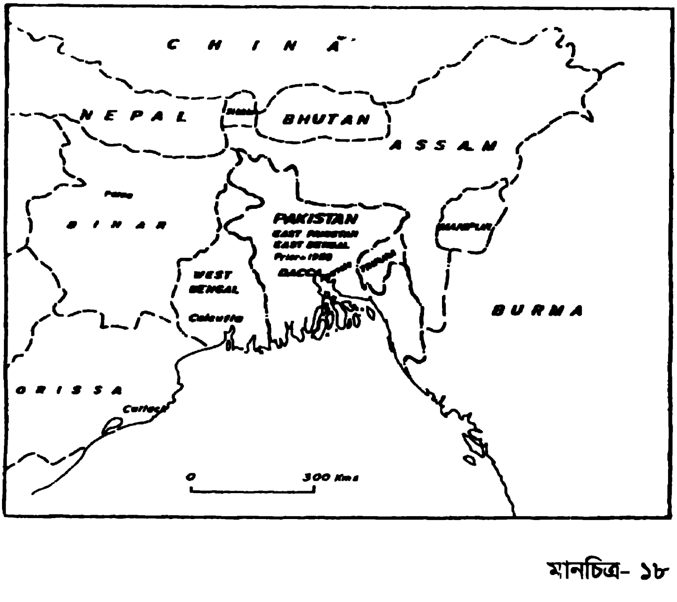
মানচিত্র- ১৫



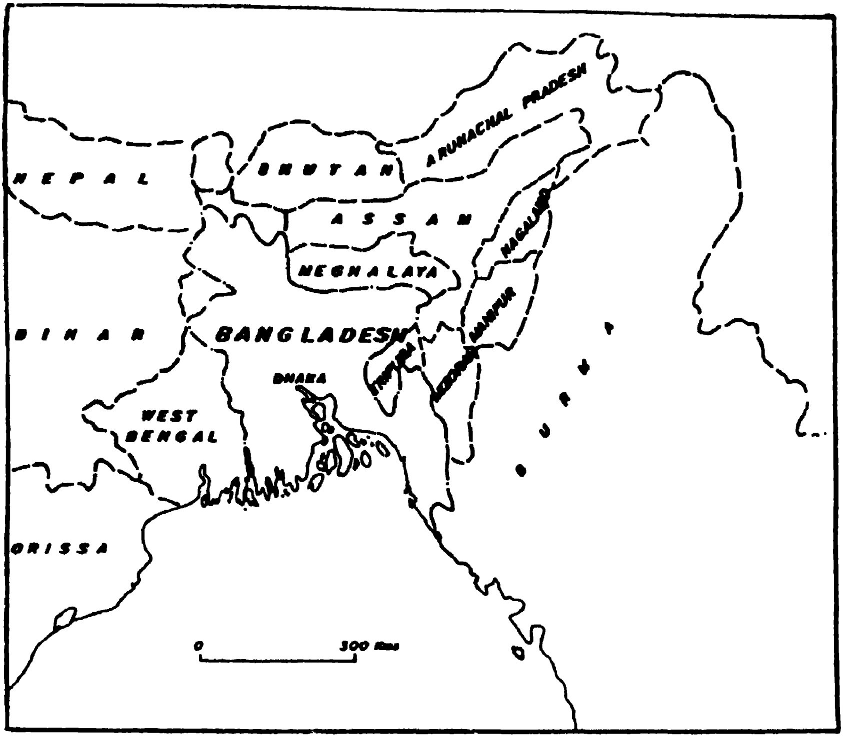
মানচিত্র- ১৬



মানচিত্র- ১৭



মানচিত্র- ১৮



মানচিত্র- ১৯

উপরোক্ত পরিস্থিতি পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, যা বাংলার ইতিহাসে প্রথম ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ধারার সূচনা করে। মুসলমানরা এ সময় 'পাকিস্তান' নামে পৃথক রাষ্ট্র অর্জনের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে, উপরোক্ত আন্দোলনে বাংলার ভৌগোলিক বিবেচনা সম্ভবত কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নি এবং র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে তড়িঘড়ি বাংলাকে বিভক্ত করার পর বাংলার নতুন রাজনৈতিক এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান। বৃহত্তর বাংলার ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষিনির্ভর ১৪৪ বর্গ কি. মি. আয়তন এবং ৪২ মিলিয়ন জনসংখ্যাবিশিষ্ট এলাকাকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্ভাবনাময় অঞ্চল, যেমন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তরের চা-বাগান এলাকা এবং হুগলী-কলকাতার শিল্পএলাকার একাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

'র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল : (ক) জটিল এবং অনিয়মতান্ত্রিক এলাকা ও রাজ্যসমূহের সীমানা সহজতর করা, (খ) প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠী অর্থাৎ হিন্দু ও ইসলাম

ধর্মাবলম্বীদের সুবিন্যস্ত করা, এবং (গ) রাজনৈতিক বিভাগ ও রাজ্যগুলির শাসকদের ধর্ম অনুযায়ী উপমহাদেশ ভাগ করা।

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাংলা নামটি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ১৯৫৬ সালে এর নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। অতঃপর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল।

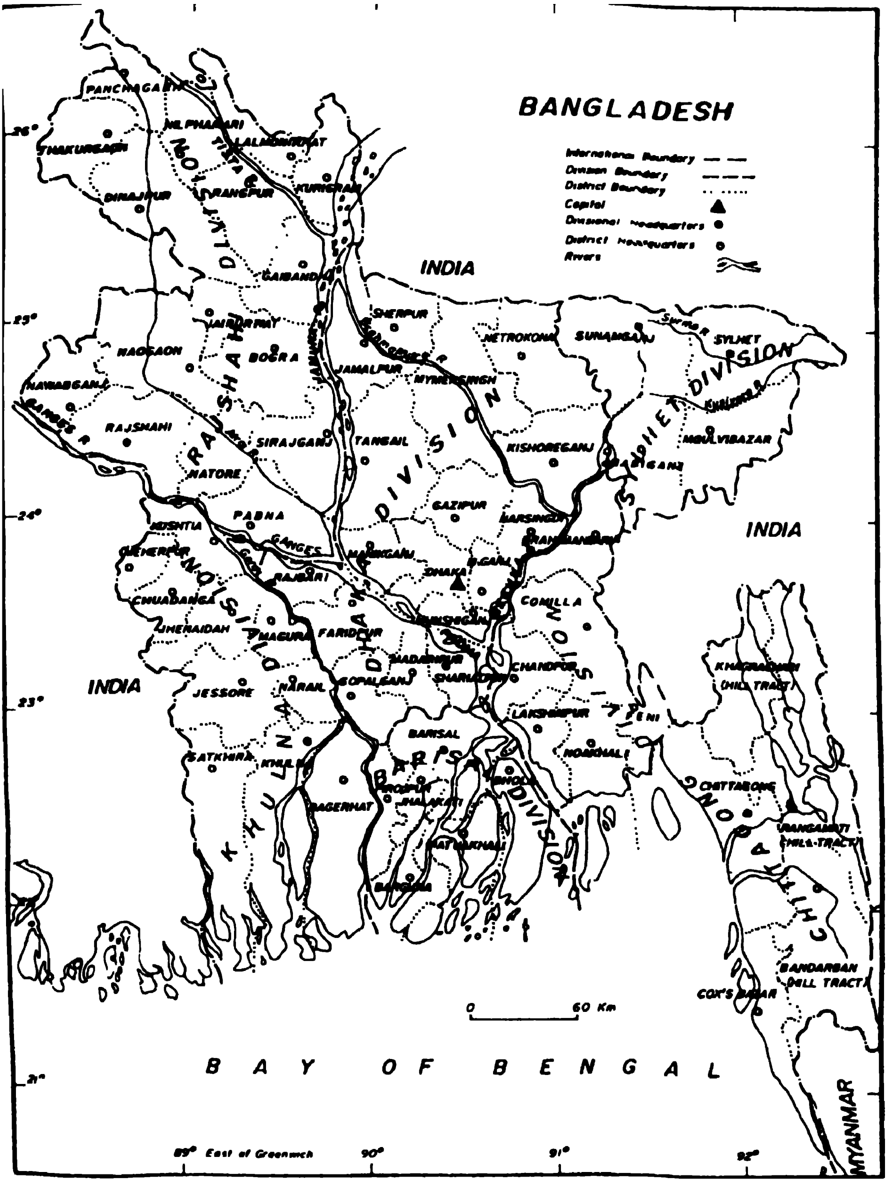
মানচিত্র ১৯ : বাংলাদেশ, ১৯৭১

ষাটের দশকের শেষের দিকে এবং সত্তরের দশকের প্রারম্ভে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ব্যাপক রূপ লাভ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলের ছয় দফা আন্দোলনের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও পাকিস্তানের সামরিক শাসক নির্বাচনের রায় অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে অর্পণ করতে গড়িমসি করতে থাকে। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান শুরু করে। ফলে পাকিস্তানের এই অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে এই যুদ্ধে বাঙালিদের বিজয়ের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উদ্ভব হয়।

উপসংহার

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত উপমহাদেশের পূর্বদিকের রাজ্যসমূহে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ভূগোলের পরিবর্তন লক্ষণীয়। এক সময় প্রায় সমগ্র এলাকায় মুসলিম আধিপত্য নিরঙ্কুশ ছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন সমগ্র অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার জন্য ঐক্য এবং অনৈক্য উভয়ই সৃষ্টি করে। এক সময়কার বাংলার রাজনৈতিক বিস্তৃতি বিহার থেকে বার্মা (মায়ানমার) পর্যন্ত ছিল। এরপর বাংলার আয়তনের সঙ্কোচন শুরু হয়। ১৯০৫ সালে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। দ্বিতীয়বার এই বিভাজন ঘটে ১৯৪৭ সালে। বর্তমান বাংলাদেশের বিস্তৃতি ও সীমারেখা এই ভূ-ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল মাত্র। সুবা বাংলার ৫১৬,০০০ বর্গ কি. মি. বিস্তৃতি, যা বিহার থেকে আসাম এবং নেপাল থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত জুড়ে ছিল, তার স্থানে বর্তমান বাংলাদেশ মাত্র ১৪৮,৩৯৩ বর্গ কি. মি. -এ পরিণতি লাভ করেছে। ১৯ শতকের প্রথম দিকে বৃটিশ বাংলার জনসংখ্যা ছিল ১৫ মিলিয়ন, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ তথা ক্ষুদ্রাকার বাংলায় জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২০ মিলিয়নে। এই বৈশিষ্ট্যের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে গবেষকদের জন্য নিরীক্ষার বিষয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগ এবং ৬৪টি জেলায় বিভক্ত (মানচিত্র ২০)।


BANGLADESH
International Boundary
Division Boundary
District Boundary
Capital
Divisional Headquarters
District Headquarters
Rivers
INDIA
INDIA
INDIA
PANCHAGARH
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
KURIGRAM
GAIBANDHA
NAOGAON
BOGRA
NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
PABNA
KUSHTIA
CHUADANGA
JESSORE
SATKHIRA
TANGAIL
JAMALPUR
SHERPUR
MYMENSINGH
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
KISHOREGANJ
MOULVIBAZAR
GAZIPUR
DHAKA
COMILLA
CHANDPUR
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
BARISAL
FARIDPUR
GOPALGANJ
BAGERHAT
PATUAKHALI
BARGUNA
CHITTAGONG
COX'S BAZAR
RANGAMATI
BANDARBAN
RAJSHAHI DIVISION
DHAKA DIVISION
SYLHET DIVISION
KHULNA DIVISION
BARISAL DIVISION
CHITTAGONG DIVISION
GANGES
0
60 Km
BAY OF BENGAL
MYANMAR
26°
25°
24°
23°
21°
89° East of Greenwich
90°
91°
92°

মানচিত্র- ২০

তথ্যসূত্র

চৌধুরী, সি. ই. ১৯৮৭, *বাংলাদেশে আদি বসতির উৎপত্তিস্থল*, দ্বাদশ বাংলাদেশ বিজ্ঞান সম্মেলন, ঢাকা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জলিল, শে. আ. ১৯৮২, *স্বদেশ আমার, স্বজন আমার*, জামালপুর।

বন্দোপাধ্যায়, রা. দা. ১৯৭১, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১ম খন্ড), কলিকাতা।

মজুমদার, র. চ. ১৯৭৪, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম খন্ড), কলিকাতা।

রহিম, মু. আ., চৌধুরী, আ. ম. মাহমুদ, এ. বি. এম এবং ইসলাম, সি (সম্পা.) ১৯৯৫। *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা।

রায়, নী. র. (১৩৮৬ ব), *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (১ম খন্ড), কলিকাতা।

সুর, অ. ১৯৭৭, *বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা।

হাসান, ফা. ১৯৮২, *পিতৃভূমি ও স্বরূপ অন্বেষণ* (১ম খন্ড), ঢাকা।

Chakladar, H. C. 1963, *Geography of Kalidasa,* Calcutta: Indian Studies.

Chottopadhyaya, S. 1980, *The Periplus of Erythrean Sea and Ptolemy of Ancient Geography of India,* Calcutta: Prajna.

Dey, N. 1979, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India,* New Delhi: Cosmo.

Law, B. C. 1941. *India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism.* London: Luzac.

Majumder, R. C. 1963, *The History of Bengal,* Dacca, Dacca University Press.

Morrison. B. M. 1970, *Political Centres and Culture Regions in Early Bengal,* Tucsan: University of Arizone Press.

Rennell. J. 1976, *Memoir of a Map of Hindoostan on the Mughal Empire,* Calcutta: Editions Indian. (reprinted from 1793 edition).

Sarker, D. C. 1971, *Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India,* Delhi.

Schwartzberg. J. E. 1978, *A Historical Atlas of South Asia,* Chicago: Chicago University Press.

Shafer, P. 1954, *Ethnography of Ancient India,* Wiesbaden: Ottohartassowitz.

Sultana. S. 1993, *Rural Settlements in Bangladesh*, Dhaka: Graphosman.

Tarafdar, M. R. 1965, *Husain Shahi Bengal: A Socio-Political Study*, Dacca : Asiatic Society of Pakistan.

VER Hermann Haack, *Cartographic Archives, Selected Maps on Bengal and South Asia,* Gotha, Germany. (Selected collections).

ঘটনাপঞ্জি

১৬৯০	জব চার্নক কর্তৃক সুতানুটি মৌজার চৌহদ্দিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক বসতি স্থাপনের বাদশাহী ফরমান লাভ। সরকারকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে কোম্পানির বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের নতুন অধিকার লাভ।
১৬৯৫-৯৬	চন্দ্রকোনার (মেদিনীপুর) জমিদার শোভা সিংহ ও উড়িষ্যার আফগান নেতা রহিম খানের বিদ্রোহ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে তাঁদের স্বাধীনতা ঘোষণা। বিদ্রোহ দমনে সুবাদার ইব্রাহিম খানের (১৬৯৫-৯৬) ব্যর্থতা।
১৬৯৮	বাংলার ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র মোহাম্মদ আজিম-আল-দীনকে (ওরফে আজিম-উশ-শান) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। নতুন সুবাদার মাত্র ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি মৌজার মালিকানাস্বত্ব প্রদান করেন।
১৬৯৮-৯৯	স্থানীয় বিদ্রোহের পটভূমিতে মুগল সরকার কর্তৃক ইউরোপীয় বাণিজ্যিক বসতিসমূহে প্রতিরক্ষা দুর্গ স্থাপনের অনুমতি দান। বৃটিশ বসতি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, ফরাসী বসতি চন্দননগরে অরলিন্স দুর্গ এবং ওলন্দাজ বসতি চুঁচুড়ায় গুস্তাবাস দুর্গ স্থাপন।
১৭০০	কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য মাদ্রাজ থেকে পৃথক হয়ে কোম্পানির নতুন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্থাপন। কারতালাব খান ওরফে মুর্শিদকুলী খানকে দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক বাংলার দীউয়ান নিয়োগ।

১৭০২ দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একত্রিত হয়ে একটি যৌথ কোম্পানি গঠন। পূর্ণ নাম UNITED COMPANY OF MERCHANTS OF ENGLAND TRADING TO THE EAST INDIES। সুবা বাংলায় অবস্থিত সকল ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি, যথা কলকাতা, কাশিমবাজার, বালাসোর, পাটনা, মালদহ এবং ঢাকা পুনর্গঠিত কোম্পানির অধীনে ন্যস্ত।

১৭০৪ সুবাদার আজিম-উশ-শান এবং দীউয়ান মুর্শিদকুলী খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব মারাত্মক রূপ ধারণ করলে মুর্শিদকুলী তাঁর দীউয়ানি দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। সম্রাটের নির্দেশে সুবাদার আজিম-উশ-শান ঢাকা ছেড়ে পাটনায় বসবাস শুরু করেন।

১৭০৭ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু। দিল্লীর মসনদ নিয়ে শাহজাদাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ।

১৭১২ বাদশাহ শাহ আলমের মৃত্যু। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত থেকে আমলা-মুৎসুদ্দি আমদানি বন্ধ করে বাংলা থেকে আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী সৃষ্টি করে দেশ শাসনের নীতি গ্রহণ।

১৭১৩ বাংলায় মনসবদারি প্রথা বিলুপ্ত করে চুক্তিবদ্ধ চাকলাদারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ ও আইন-শৃংখলা রক্ষা করার ব্যবস্থা প্রবর্তন। এরপর থেকে মনসব একটি আলঙ্কারিক উপাধি হিসেবেই পরিগণিত হয়। এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলায় অনেকগুলি বিশালায়তনের জমিদার পরিবার সৃষ্টি হয়। উদীয়মান অতিকায় জমিদারিগুলির মধ্যে ছিল রাজশাহী, বর্ধমান, দিনাজপুর, নদীয়া, চাচড়া, ইউসুফপুর, রুকুনপুর, মোমেনশাহী, রাজনগর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ইত্যাদি। কালক্রমে সবক'টি পরিবারকে রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সামন্ত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এদের মধ্যে একমাত্র বীরভূম পরিবার ছিল মুসলমান আর বাকি সব ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু।

১৭১৭ ইংরেজ কোম্পানিকে বাদশাহ ফররুখশিয়রের বিখ্যাত ফরমান প্রদান। উক্ত ফরমানবলে কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্য করার জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ইতিপূর্বে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার অতিরিক্ত আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। যেমন, কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর

মৌজার অতিরিক্ত আশেপাশে অবস্থিত আরো আটত্রিশটি মৌজার জমিদারি স্বত্ব বাৎসরিক আট হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানের শর্তে কোম্পানিকে প্রদান; কোম্পানির মালামাল চুরি হলে তা উদ্ধার করে কোম্পানিকে ফেরৎ দিতে সরকারের বাধ্যবাধকতা; কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ থেকে পালিয়ে যাওয়া দেনাদার ও অন্যান্য অপরাধীদের কোম্পানির কাছে সোপর্দের জন্য সুবা সরকারের বাধ্যবাধকতা; মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল থেকে কোম্পানির আমদানিকৃত ধাতব দিয়ে মুদ্রাকরণের অধিকারলাভ ইত্যাদি। মীর জাফর পর্যন্ত সব নবাবই নানা অজুহাতে এই সার্বভৌমত্ববিরোধী ফরমান কার্যকর করা থেকে বিরত থাকেন। কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে ক্রমশ খারাপ সম্পর্কের এক বড় কারণ ছিল এ ফরমান।

১৭১৮ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য মুর্শিদকুলী বাংলাকে ১৩টি চাকলা এবং চাকলাগুলিকে ১৬৬০টি গরগনায় বিভক্ত করেন। চাকলাগুলির নাম : বন্দর বালাসোর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী বা সাতগাঁও, ভূষণা, যশোর, আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কুড়িবাড়ি, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), সিলেট, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)।

১৭২৩ মুর্শিদকুলীর সুপারিশে ফতেহচান্দ সম্রাট মোহম্মদ শাহ থেকে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্বে ফতেহচান্দ সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে লাভ করেন শেঠ উপাধি (১৭১৫)। ফতেহচান্দের পিতা ফররুখশিয়রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন নগর শেঠ উপাধি।

১৭২৫-২৬ ব্যাপক মগ হামলা শুরু হয় ১৭২৫ সনের নভেম্বরে। চট্টগ্রাম ও ফেনী অঞ্চল পরপর দু'বার মগ লুটপাট ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। মগ আক্রমণের মুখে জুগদিয়া (নোয়াখালী, বর্তমানে সাগরবক্ষে) থেকে কোম্পানির কুঠির লোকেরা ঢাকায় এসে আশ্রয় নেয়।

১৭২৬ কলকাতা নগরীর রাজস্ব বকেয়া (৪০০০ রুপী) রাখার দায়ে কোম্পানির উকিলকে মুর্শিদাবাদে আটক রাখা হয়। এ ইস্যুতে কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং পরিশেষে ফতেহচান্দের মধ্যস্থতায় সঙ্কট নিরসন হয়।

১৭২৭	নবাব মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যু এবং তদীয় পৌত্র (কন্যা পক্ষের) সরফরাজ খানের মসনদে আরোহণ। কিন্তু অচিরেই পিতা শুজাউদ্দিন খান তাঁকে উৎখাত করে সিংহাসন দখল করেন।
১৭২৮	রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য নবাব শুজাউদ্দিন কর্তৃক একটি পরামর্শক পরিষদ গঠন।
১৭৩৩	বিহারকে বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর ফলে সর্বপ্রথম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে সমগ্র সুবাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন— (১) সদর বিভাগ (পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ); (২) জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা বিভাগ (পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ, সিলেট ও ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম; (৩) বিহার, এবং (৪) উড়িষ্যা। প্রথম বিভাগ সরাসরি উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা শাসিত এবং অন্যান্য প্রদেশের জন্য নিযুক্ত হয় নায়েব নাজিম।
১৭৩৯	নবাব সুজা খানের মৃত্যু এবং তদীয় পুত্র সরফরাজ খানের পুনরায় সিংহাসনলাভ।
১৭৪০	বিহারের শাসনকর্তা এবং সুজা খানের পরামর্শক পরিষদের অন্যতম সদস্য আলিবর্দী খান কর্তৃক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরফরাজকে উৎখাত করার পরিকল্পনা এবং গিরিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে সুবা বাংলার মসনদ দখল।
১৭৪২	ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বা বর্গী হামলা—প্রথম আক্রমণের শিকার বর্ধমান ও বীরভূম।
১৭৪৫	নবাব আলিবর্দী খানের আফগান সেনাদের বিদ্রোহ।
১৭৪৮	নবাবের আফগান সেনাদের পুনরায় বিদ্রোহ।
১৭৫৬	নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যু এবং সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণ। শওকত জং নিজে সিংহাসনের দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুর্শিদাবাদ দরবার অঘোষিতভাবে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি সিরাজের পক্ষে, আরেকটি তাঁর বিপক্ষে।
১৭৫৬	বিক্রমপুরের রাজনগর পরগনার জমিদার রাজা রাজবল্লভ হিন্দু পণ্ডিতদের সম্মেলন ডেকে হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রবাণী লাভ করেন।

১৭৫৬	নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা দখল (১৬ জুন)।
১৭৫৭	কোম্পানির সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার সন্ধি, ফেব্রুয়ারি ৯। শর্ত : মুগল সরকার কর্তৃক কোম্পানিকে প্রদত্ত পূর্বেকার সকল চুক্তি পুনর্বহাল; সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কোম্পানির কলকাতা, কাশিমবাজার ও ঢাকা কুঠিসমূহ কোম্পানিকে যথাবিহিত ফেরত প্রদান; কোম্পানির কুঠি ও সম্পত্তি দখল করার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণ। ১৯ মে কোম্পানির সঙ্গে মীর জাফর-জগৎশেঠের ষড়যন্ত্রচুক্তির শর্ত : ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধির অতিরিক্ত ২৪-পরগনা দান, আরো উদার হারে ক্ষতিপূরণ দান, কোম্পানির বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক নেতাদের আর্থিক পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার।
১৭৫৭	জুন ২৩ পলাশীর যুদ্ধ।
১৭৫৮	২৪-পরগনা কোম্পানিকে হস্তান্তর।
১৭৬০	কোম্পানিকে দেয় সমুদয় ঋণ পরিশোধ বাবদ চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান এই তিনটি জেলা কোম্পানিকে হস্তান্তর করার শর্তে মীর কাশিম নবাব হন।
১৭৬০-১৮০০	ফকির মজনু শাহ এবং তাঁর অনুসারীদের বৃটিশবিরোধী তৎপরতা। ফকির-সন্ন্যাসিদের প্রতিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল ১৭৭০ ও '৮০-এর দশকে। ১৭৮৭ সনে মজনু শাহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, চেরাগ শাহ, করম শাহ প্রমুখ। সর্বশেষ ফকির বিদ্রোহ ঘটে ১৭৯৯ সনে, যখন কোন এক শাহ বাহার 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করে নিজেকে ভারতের 'বাদশাহ' বলে দাবি করেন।
১৭৬২	কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বে-আইনি ও উৎপীড়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের কাছে নবাব মীর কাশিমের চরমপত্র।
১৭৬৩	স্বাধীনচেতা নীতি অনুসরণের জন্য অচিরেই কোম্পানির সঙ্গে মীর কাশিমের বিবাদ শুরু।
১৭৬৪	দিল্লীর বাদশা ও আযোধ্যার নবাবের সাহায্যে মীর কাশিম ইংরেজদের উৎখাত করার শেষ চেষ্টা চালান। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

১৭৬৪	সন্দ্বীপে জমিদার-তালুকদার বিদ্রোহ। জমিদার আবু তোরাব চৌধুরীর নেতৃত্বে কোম্পানির অত্যাচারমূলক রাজস্ব বন্দোবস্ত নীতির বিরুদ্ধে সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও বামদি দ্বীপের জমিদার ও তালুকদারগণ বিদ্রোহ করে।
১৭৬৫	রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে কোম্পানির জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভ। শর্ত এই যে, সুবার রাজস্ব থেকে কোম্পানি দিল্লীর বাদশাকে প্রদান করবে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা এবং নবাবকে দিবে ৫৩ লক্ষ টাকা।
১৭৬৫-৭২	সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েব দীউয়ান এবং নায়েব নাজিম (যেহেতু নবাব নজমুদ্দৌলা নাবালক) নিযুক্ত করে ইঙ্গ-মুগল যৌথশাসন প্রতিষ্ঠা।
১৭৬৯	মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন বৃটিশ 'রেসিডেন্ট' নিয়োগ ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রতি জেলায় একজন ইংরেজ জেলাসুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে শুরু হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া।
১৭৬৯-৭০	মহা দুর্ভিক্ষ, যার ফলে বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। কিন্তু ঐ দুর্ভিক্ষে বাংলার পূর্বাংশ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।
১৭৭০	রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে কোম্পানির কর্তৃত্ব আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মুর্শিদাবাদে কম্পট্রোলিং কাউন্সিল অব রেভিনিউ স্থাপন।
১৭৭১	নায়েব দীউয়ান রেজা খান পদচ্যুত। জেলা সুপারভাইজারদের নতুন পদবি জেলা কালেক্টার। জেলা কালেক্টারকে রাজস্ব বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংগ্রহে ক্ষমতা প্রদান।
১৭৭২	ওয়ারেন হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর নিযুক্ত। কোম্পানি কর্তৃক সরাসরি দীউয়ানি শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ।
১৭৭২-১৭৭৭	ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের চিরাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করে নিলামের মাধ্যমে ইজারাদারদের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদি ভূমি বন্দোবস্ত।
১৭৭৩	রেগুলেটিং এ্যাক্টের আওতায় ওয়ারেন হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত এবং রাষ্ট্র সাহায্য করার জন্য চার সদস্যের একটি কাউন্সিল গঠন।

১৭৭৩ রেভিনিউ বোর্ড গঠন। সুবাকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রতি প্রদেশের জন্য একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন।

১৭৭৮ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (১৭৫১-১৮৩৯) প্রকাশ করেন প্রথম বাংলা ব্যাকরণ—গ্রামার অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ।

১৭৭৬-৮৭ চাকমা রাজা জুয়ান বকশ ও রানু খানের নেতৃত্বে (প্রাক-বৃটিশ যুগে চাকমা ও অন্যান্য আদিবাসী অভিজাতেরা মুসলমানী নাম গ্রহণ করতো) পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়গণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং গেরিলা পদ্ধতিতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

১৭৭৯-১৮০২ হেনরি পিটস্ ফরস্টার প্রণীত প্রথম বাংলা-ইংরেজি অভিধান—ভুকাবুলারি প্রকাশ।

১৭৮০-৮৩ হোমনাবাদ (কুমিল্লা) জমিদারদের বিদ্রোহ। পঞ্চসনা বন্দোবস্তের অধীনে ইজারাদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায়তেরা আলি গাজী ও মুজাফফর গাজীর নেতৃত্বে হোমনাবাদ পরগনার কৃষকগণ কোম্পানি সরকারকে খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয় এবং 'নাসারা'দের দেশ থেকে উৎখাতের জন্য জেহাদ ঘোষণা করে।

১৭৮০ সিলেটে জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা। উদ্যোক্তা, রবার্ট লিন্ডসে।

১৭৮০ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উদ্যোগে কলকাতা মাদ্রাসা নামে একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত মুসলিম আইন বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করার জন্য মুফতি-মৌলবি তৈরি করা। মুফতি মজিদ-আল-দীন মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ।

১৭৮১ পরগনা দান্দ্রার (নোয়াখালী) জমিদার মোহাম্মদ আলি পার্শ্ববর্তী সকল জমিদারকে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। তাঁর রচিত প্রতিরোধ আন্দোলনে সাড়া দেন বলদাখাল, গঙ্গামণ্ডল, পিটকারা, কড়োয়া, বিদ্যারবাদ, আমনাবাদ, সরাইল এবং হোমনাবাদ পরগনার জমিদরগণ।

১৭৮১ প্রাদেশিক কাউন্সিল ব্যবস্থা বিলুপ্ত। নিলামি ভূমি-বন্দোবস্ত রদ করে বার্ষিক বন্দোবস্ত ভিত্তিতে পুনরায় জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৭৮৩	রংপুর কৃষক বিদ্রোহ। কোম্পানির রাজস্ব ইজারাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ রায়তেরা ইজারাদার রাজা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাজস্ব বিদ্রোহ পরে বৃটিশ খেদা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বিদ্রোহীরা তাদের নেতা নূরলদীনকে 'নবাব' বলে ঘোষণা করে।
১৭৮৩	পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ।
১৭৮৪	প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়ম জোনস-এর উদ্যোগে এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতির উপর গবেষণার জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১৭৮৩-৯০	সিলেটের খাসী উপজাতিদের সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ শুরু হয় যখন কালেক্টার লিন্ডসে তাদের সনাতন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। থেকে থেকে খাসীদের বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে ১৭৯০ সন পর্যন্ত, যখন তাদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা মেনে নিয়ে একটি অলিখিত চুক্তি করা হয়।
১৭৮৪	পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর অধীনে সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর একটি স্থায়ী রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
১৭৮৬	গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড কর্নওয়ালিসের যোগদান এবং একটি স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁর নির্দেশ।
১৭৮৭	হাতিয়া দ্বীপের জমিদার মোহাম্মদ আকবর চৌধুরীর নেতৃত্বে রায়তেরা বিদ্রোহ করে। কোম্পানির ঠিকাদারের জন্য লবণ তৈরি না করার জন্য মুলঙ্গী বা লবণ শ্রমিকদের আহ্বান জানানো হয় এবং সাধারণ রায়তেরা কোম্পানির কোন ইজারাদারকে খাজনা না দেবার জন্য ঘোষণা প্রদান করে ।
১৭৮৮-৮৯	একাধারে মহাপ্লাবন, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটায় এবং দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।
১৭৯০	বার্ষিক রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা রহিত করে জমিদারের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদি ভূমি বন্দোবস্ত করা হয় এবং একই সঙ্গে ঘোষণা দেয়া হয় যে, কোর্ট অব ডিরেক্টর্স চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করলে এই দশসনা বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

১৭৯১ হিন্দু আইন বিষয়ে দেশী পণ্ডিত তৈরি করার জন্য জোনাথান ডানকানের উদ্যোগে বেনারসে স্থাপিত হয় হিন্দু সংস্কৃত কলেজ।

১৭৯২ বাকেরগঞ্জের ফকির বলাকি শাহ ফিরিঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

১৭৯৩ দশসনা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী ঘোষণা করা হয়। এর প্রধান প্রবক্তা গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস। এ ব্যবস্থাধীনে জমিদারকে জমির একচ্ছত্র মালিক ঘোষণা করা হয়। জমিদার কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় ভূমিরাজস্বের হার চিরকালের জন্য ধার্য করে দেয়া হলেও প্রজার উপর জমিদারের খাজনার হার পরিবর্তনশীল থাকে।

১৭৯৩-১৮০০ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপারেশনে নবাবি যুগে উত্থিত প্রায় সব রাজা-মহারাজা-জমিদার পরিবারের পতন এবং এদের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বহু নতুন পরিবার, ইতিপূর্বে যারা ছিল ইউরোপীয়দের বানিয়া-মুৎসুদ্দি এবং জমিদারি আমলা।

১৭৯৯ 'হাফতম' (সপ্তম রেগুলেশন) আইনবলে ভূস্বামীরা খাজনা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে প্রজাদের দৈহিক নির্যাতন, এমনকি বাস্তুহারা করার অধিকার লাভ করে।

১৭৯৯ 'ফিরিঙ্গি হুকুমত'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন সিলেটের মির্জা আগা মোহাম্মদ রেজা বেগ। জেহাদি বাহিনী নিয়ে তিনি প্রথম কাছাড় দখল করে সেখানে সামরিক ঘাটি স্থাপন করেন। বহু কামান-বন্দুক সংগ্রহ করে ১৪ জুলাই তারিখে থানা বিন্দাশালে তিনি কোম্পানির সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক সম্মুখ সমরে লিপ্ত হন। যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি আহতাবস্থায় বন্দি হন। কলকাতায় তাঁর বিচার হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৮০০ নবাগত বৃটিশ সিভিলিয়ানদের এদেশের প্রশাসন, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

১৮০০ দেশের সকল বিক্ষুব্ধ জমিদার, তালুকদার এবং বিহার ও উত্তর ভারতের বৃটিশবিরোধী পরিবারদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি দেশব্যাপী বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা করেন ঢাকার নায়েব নাজিম নসরত জং-এর ভ্রাতা নবাব শামসউদ্দৌলা। কিন্তু পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে গেলে তিনি বন্দি হন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কয়েক বছর কারাবাসের পর মানবিক কারণে তাঁকে মুক্তি দিয়ে ঢাকায় নজরবন্দি করা হয়।

১৮১৩ মুগল আমলে শিক্ষাদান ছিল একটি সরকারি দায়িত্ব, কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে কোম্পানিসরকার বিরত থাকে। কোম্পানির চার্টার আইন নবায়নকালে বৃটিশ দার্শনিক ও রাজনীতিক উইলবারফোর্সের তদবিরে আইন করে কোম্পানিসরকারকে বাধ্য করা হয় জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বছরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিতে।

১৮১৩ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য-সুবিধা বিলোপ দ্বারা অবাধ বাণিজ্যের জন্য ভারতকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং ভারতের উপর বৃটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হয়।

১৮১৫ আত্মীয় সভা গঠনের মাধ্যমে রামমোহন রায়-এর সংস্কার আন্দোলন শুরু।

১৮১৭ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব ও কলকাতার আরো অনেক নেতৃস্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকের উদ্যোগে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ।

১৮১৭ ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি।

১৮১৭-১৮ কলকাতায় প্রথম কটন মিল স্থাপন।

১৮১৮ *বেঙ্গল গেজেটি* নামে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ। একই সনে প্রকাশিত হয় *সমাচার দর্পণ*, বাংলা মাসিক *দিগদর্শন*, সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পণ* এবং মাসিক *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া*।

১৮১৯ পত্তনি আইন জারি। এর ফলে ভূমিনিয়ন্ত্রণে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১৮২৩	শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্থাপন।
১৮২৩	কলকাতায় রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্রলোকদের দ্বারা গৌড়ীয় সমাজ স্থাপিত।
১৮২৩	কলকাতা খিদিরপুর ডকই 'ডায়না' নামক প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ নির্মাণ।
১৮২৪	বারাকপুর সিপাহি বিদ্রোহ।
১৮২৫	ঢাকা নগরের রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)-এর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এর পরিকল্পক ঢাকা জেলা কালেক্টার মি. ডোস।
১৮২৪-৩৩	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে বিশেষকরে বর্তমান জামালপুর-শেরপুর জেলায় দেওয়ানা বা পাগলপন্থী নামে পরিচিত ফকিরদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ। এর কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নব্য জমিদার ও ইজারাদারদের ক্রমাগত খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতা। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন টিপু শাহ।
১৮২৭-৩১	বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া মতবাদের প্রবর্তক সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সংস্কার আন্দোলন এক পর্যায়ে কৃষক বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
১৮২৮	রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৮২৮	ডিরোজিও কর্তৃক একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।
১৮২৮	লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।
১৮২৮	বাদশাহী যুগে প্রদত্ত লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার আইন প্রণয়ন।
১৮২৮	হিন্দুধর্মের সতী প্রথাকে মানবিক ও সামাজিক অপরাধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন।
১৮২৯	সরকারের নির্দেশে মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক এবং অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু।

১৮২৯	সর্বপ্রথম দেশীয় বিদগ্ধজনেরা কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি'র পূর্ণ সদস্যপদের জন্য আবেদন করার অধিকার লাভ করেন। এ বছর চারজন বাঙালি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভ করেন। তাঁরা হলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শীবচন্দ্র দাস, রাসময় দত্ত ও রামকমল সেন।
১৮৩০	কলকাতায় রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্রলোকগণ কর্তৃক ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা। সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব।
১৮৩০	বাষ্পীয় জাহাজের উন্নয়নে ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা।
১৮৩০	কোল উপজাতি বিদ্রোহ।
১৮৩৩	প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলায় একজন ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ।
১৮৩৩	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিলুপ্ত।
১৮৩৪	প্রিন্সিপাল সদর আমিন নামে দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ।
১৮৩৪	কলকাতা চেম্বার্স অব কমার্স প্রতিষ্ঠা, ১৮৫৩ সালে এর নামকরণ করা হয় বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স।
১৮৩৫	প্রাচ্যভাষায় প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাদানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান নীতি গ্রহণ।
১৮৩৫	কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে প্রাচ্য ঔষধশাস্ত্র শিক্ষাদান বিলুপ্ত করে পাশ্চাত্য ঔষধশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন।
১৮৩৬	কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৬	মোহসীন ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে হুগলী কলেজ স্থাপন।
১৮৩৭	জমিদারি এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। বাংলা তথা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত সমিতি। উদ্যোক্তা রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ মিত্র। ১৮৩৮ সনে এর নতুন নামকরণ হয় ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি। সম্পাদক, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর।

১৮৩৮	ইয়ং বেঙ্গলগণ কর্তৃক তাদের সংগঠন সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব নলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৯	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৯	আসাম কোম্পানির উদ্যোগে প্রথম চা-বাগান পত্তন।
১৮৪০	ফরায়জী আন্দোলনের নেতা হাজি শরীয়তউল্লাহর মৃত্যু।
১৮৪০	ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা।
১৮৪১	ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৪৩	বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। উদ্যোক্তা জর্জ টমসন (সভাপতি), প্যারীচাঁদ মিত্র (সম্পাদক)। উদ্দেশ্য, বৃটিশ শাসনের মঙ্গলকামনা, বৃটিশ ও দেশীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন।
১৮৪৩	দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশ।
১৮৪৪	সরকারি চাকুরির জন্য ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান অত্যাবশ্যক ঘোষণা।
১৮৪৫	কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৪৭-৪৮	বিশ্ববাজারে মন্দা। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় সঙ্কট, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কসহ অনেক অর্থপ্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষণা।
১৮৪৮	লর্ড ডালহৌসী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।
১৮৪৯	বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৫১	বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির জন্য ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃটিশ এবং কলকাতার ভদ্রলোকদের কাছে 'ন্যাশনাল' শব্দটি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় অচিরেই এর নামকরণ করা হয় বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।
১৮৫৩	কলকাতায় রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৫৩	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ শুরু।

১৮৫৪	সরকারের শিক্ষানীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন। পরিবর্তনের মধ্যে ছিল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি শিক্ষা পরিদপ্তর স্থাপন; কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা; নিম্ন পর্যায়ে দেশী ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্যসহ নানাভাবে উৎসাহিত করা; বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি মঞ্জুরি দেয়া; প্রতি জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি করে সরকারি স্কুল বা কলেজ বা উভয়ই স্থাপন করা।
১৮৫৪	বাংলার ডেপুটি গভর্নরের পদ বিলুপ্ত করে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ।
১৮৫৪	ন্যায্যমূল্যের স্ট্যাম্পে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন।
১৮৫৫	কলকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন।
১৮৫৫	কলকাতা থেকে হুগলী নদীর কয়েক মাইল উজানে রিশরা নামক স্থানে পাটকল স্থাপন। উদ্যোক্তা, বিশ্বম্ভর সেন ও জর্জ
১৮৫৫	হিন্দু কলেজের নতুন নামকরণ করা হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ।
১৮৫৫-৫৭	সাঁওতাল বিদ্রোহ। প্রাথমিকভাবে এ বিদ্রোহ ছিল মহাজন ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে। পরে তা বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহে রূপ নেয়।
১৮৫৬	দি মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (আঞ্জুমান-ই-ইসলামী) প্রতিষ্ঠা। এটি ছিল বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। সভাপতি ফজলুর রহমান, সম্পাদক মোহাম্মদ মাজহার। উদ্দেশ্য বৃটিশের প্রতি মুসলমানের আস্থা জ্ঞাপন, মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার।
১৮৫৭	সিপাহি বিদ্রোহ। বাংলায় কোম্পানিসরকার এবং সিপাহিদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রায় ঘটে নি বললেই চলে। তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে সিপাহিরা সরকারি প্রতিহিংসার ভয়ে দলবদ্ধভাবে ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেছিল। জমিদারসমাজ, পত্র-পত্রিকা ও ভদ্রলোক জনমত ছিল বিদ্রোহের বিপক্ষে।

১৮৫৮ কোম্পানি শাসন অবলুপ্ত করে বৃটিশ ভারত সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে ন্যস্ত।

১৮৫৮ বৃটেনের ভারত নীতি বিষয়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা— রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যক্ত, ধর্মনিরপেক্ষতা, সকল ধর্ম-বর্ণের ভারতীয়দের অধিকার সংরক্ষণ, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোন কারণে দলন ও দমননীতির বিরুদ্ধে অঙ্গীকার।

১৮৫৯ ভূমিতে কোন কোন শ্রেণীর প্রজার সীমিত স্বত্ব স্বীকার করে খাজনা আইন পাশ (Rent Act X, 1859)।

১৮৫৯-৬১ নীল বিদ্রোহ। নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীলচাষীদের ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন। এ বিদ্রোহের পক্ষে জমিদার-জোতদার সমাজের সহানুভূতি থাকলেও পত্র-পত্রিকা ও পেশাদার মধ্যবিত্ত শ্রেণী তেমন সমর্থন দেয় নি। বিদ্রোহের ফলে অচিরেই বাংলায় নীলচাষের অবসান ঘটে।

১৮৬০ ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের *নীল দর্পণ* নাটক বেনামে প্রকাশ। নাটকটির পুরো নাম *নীলদর্পনং নাম নাটকম।*

১৮৬০ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড প্রণীত।

১৮৬১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রকাশ।

১৮৬১ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট পাশ।

১৮৬১ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট-এর অধীনে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি প্রবর্তিত। মনোনীত বারো সদস্যবিশিষ্ট এই পরিষদে চার জন সদস্য ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, চার জন সরকারবহির্ভূত ইউরোপীয় এবং চার জন ভারতীয়। উক্ত চার জন হলেন মৌলবি আবদুল লতিফ, রাজারাম, প্রতাপচন্দ্র, ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। পদাধিকারবলে লেফটেন্যান্ট গভর্নর এসেম্বলির সভাপতি।

১৮৬১ সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ* প্রতিষ্ঠা। পত্রিকাটি প্রায় একশ' বছর টিকে থাকে। এটা ছিল পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা। এর প্রথম সম্পাদক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১৮৬২ কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৮৬২ ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে লাইন স্থাপন (কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া)।

১৮৬২ ফরায়জী আন্দোলনের নেতা দুদু মিঞার (হাজি শরীয়তউল্লাহর পুত্র) মৃত্যু।

১৮৬৩ মৌলবি আবদুল লতিফ কর্তৃক দি মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য, মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি। কলকাতা ১৬, তালতলা লেনে সোসাইটির মাসিক সভা হতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। বক্তৃতার ভাষা ছিল উর্দু, ফার্সি, আরবি ও ইংরেজি।

১৮৬৪ বাংলা গদ্যসাহিত্যে নতুন মোড় আনয়নকারী হুতোম পেঁচার নকশা প্রকাশ। লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৮৬৫ ইউরোপের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ স্থাপন।

১৮৬৫ ঢাকা জ্ঞান প্রদায়নী প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য, সাধারণের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা সৃষ্টি।

১৮৬৭ রাজনারায়ণ বসু এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মেলা।এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছর দেশীয় পণ্যের প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক মেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু জাতির বর্তমান অবস্থা ও অতীত গৌরব ও ভবিষৎ সম্ভাবনাকে তুলে ধরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনে প্রথম জনসমক্ষে একটি স্বরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তির সুযোগ পান এই হিন্দু মেলার এক অনুষ্ঠানে (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

১৮৬৮ শিশির কুমার ঘোষের সম্পাদনা ও মালিকানায় প্রকাশিত হয় *অমৃত বাজার পত্রিকা*। এর পূর্বসূরি *অমৃত প্রবাহিনী* পত্রিকাটি প্রথম তিনি প্রকাশ করেছিলেন স্বগ্রাম যশোহরের পুলুয়ামাগুরা থেকে।

১৮৬৯ চট্টগ্রাম কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০ বঙ্গচন্দ্র রায়-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু।

১৮৭১ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স* প্রকাশ। এ গ্রন্থের একটি উক্তি "A hundred and seventy years

ago it was almost impossible for a well-born Musalman in Bengal to become poor, at present it is almost impossible for him to continue rich." মুসলিম রাজনীতিতে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল।

১৮৭১ গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও অগ্রগতির জন্য সরকারি স্কুল-কলেজগুলিতে আরবি-ফার্সি-উর্দু প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং শিক্ষা বিভাগে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের নিয়োগে প্রাধান্য দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৮৭২ প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত। এতে দেখা যায়, বাংলার সর্বমোট লোকসংখ্যা ৩৪ মিলিয়ন। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ মিলিয়ন। প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৪২২। ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ৬৯২১২।

১৮৭২ ঢাকা পিপল্স এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *বঙ্গদর্শন* সাময়িকী প্রকাশ।

১৮৭২ দীনবন্ধু মিত্রের *নীল দর্পণ* নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার-এর উদ্বোধন।

১৮৭২ নবাব আবদুল গণি কর্তৃক আহসান মঞ্জিল নির্মাণ।

১৮৭৩ জমিদারদের লাগামহীন খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতার বিরুদ্ধে পাবনা জেলার জোতদার শ্রেণীর গ্রামপ্রধানদের নেতৃত্বে সাধারণ কৃষক বিদ্রোহ।

১৮৭৩ বেঙ্গল জুট কমিশন রিপোর্ট তথ্য দেয় যে, কৃষকরা আড়তদারদের কাছ থেকে নগদ আগাম নিয়ে পাটচাষ করে এ যুক্তি ঠিক নয়; বরঞ্চ চাষীরা তাদের নিজেদের উদ্যোগেই পাটচাষ করে থাকে। তবে বহু জায়গায় দাদনের প্রচলন আছে।

১৮৭৩ রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২-৭৫ বাকেরগঞ্জের খাসমহল তুষখালী এলাকার ইউরোপীয় ইজারাদার মোড়েলের খাজনাবৃদ্ধি নীতি চ্যালেঞ্জ করে

	কৃষকরা খাজনা প্রদান বন্ধ করে দেয়। নানা অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়েও খাজনা সংগ্রহে ব্যর্থ হলে সরকার মোড়েলের ইজারা বাতিল করতে বাধ্য হয়।
১৮৭৪	আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।
১৮৭৪	উনিশ শতকের বাংলার শ্রেষ্ঠতম আরবি ভাষাজ্ঞ আল্লামা উবায়দুল্লাহ-আল-উবায়দি কর্তৃক ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৫	বাঙালি জাতিত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের কলেজছাত্রদের নিয়ে দি স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠন।
১৮৭৬	ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে যাত্রা ও নাট্য কর্মকাণ্ডে নানা বিধিনিষেধ আরোপ।
১৮৭৬	দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গঠন। প্রধান উদ্যোক্তা আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।
১৮৭৭	মুসলমান সমাজে আধুনিক চিন্তাধারা প্রবর্তন ও ভারতের সকল জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আমির আলি কর্তৃক ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন। বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর অনেক শাখা স্থাপিত হবার পর ১৮৮৩ সনে সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্যে এর নামকরণ করা হয় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন।
১৮৭৭	দিল্লী দরবার। রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা।
১৮৭৮	ব্রাহ্ম সমাজে বিভক্তি। মূল ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠন।
১৮৭৮	ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট জারি করে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।
১৮৮০	লর্ড রিপন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।
১৮৮০	ফেমিন কমিশন। কৃষিভূমিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ।

১৮৮০-৯০	ঢাকা শহরের পূর্ব দিকে ওয়ারী, গেণ্ডারিয়া, তোপখানা প্রভৃতি আবাসিক এলাকা প্রতিষ্ঠা।
১৮৮২	বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* প্রকাশ। গ্রন্থের স্লোগান 'বন্দে মাতরম' পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখে।
১৮৮৩	ইলবার্ট বিল বিতর্ক। ভারতীয় জনমতের প্রতিবাদী ভূমিকার মুখে বিলটি সংশোধিত হয়।
১৮৮৩	যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্লড'স পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নস-এ স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বক্তৃতা।
১৮৮৩	ফেমিন কোড প্রণীত।
১৮৮৪	ইন্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৪	লর্ড ডাফরিন গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত।
১৮৮৪	ঢাকা জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৫	দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৫	বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভার্নমেন্ট এ্যাক্ট প্রণয়ন।
১৮৮৫	ভূমিতে সাধারণ প্রজা ও অন্যান্য ভূভিত্তিক শ্রেণীর অধিকার সংজ্ঞায়িত করে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন।
১৮৮৫-৯০	মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু* প্রকাশ।
১৮৮৭	বাঙালিদের মধ্যে ব্যবসায়ের উদ্যোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স প্রতিষ্ঠিত।
১৮৮৮	ডাফরিন রিপোর্ট প্রকাশিত। এ রিপোর্ট অনুসারে গ্রামীণ লোকসংখ্যার এক বড় অংশ ইতিমধ্যেই ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল এবং এদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উৎস ছিল কৃষিখামারে শ্রম বিক্রয়। ভূমিহীন সমস্যা সবচেয়ে প্রকট ছিল পূর্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে।
১৮৮৯	বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন।
১৮৮৯	সৈয়দ আমির আলি কর্তৃক প্রণীত মুসলমানদের মধ্যে সাড়া জাগানো *A Short History of the Saracens* প্রকাশিত।
১৮৮৭-৯০	পূর্ব বাংলায় আকাল ও দুর্ভিক্ষ।

১৮৯১	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।
১৮৯১	সিলেট এম. সি. কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৯১	সৈয়দ আমির আলির *The Spirit of Islam* প্রকাশিত।
১৮৯২	আসাম বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে উদ্বোধন।
১৮৯৩	পূর্ববঙ্গে, বিশেষকরে ঢাকা ডিভিশনে দুর্ভিক্ষ।
১৮৯৪	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মৃত্যু।
১৮৯৫	রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী খন্দকার ফজলে রাব্বী কর্তৃক ফার্সি ভাষায় রচিত *হকিকত-ই-মুসলমান-ই-বাঙ্গালা* (বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি) প্রকাশিত। এই গ্রন্থে তিনি তত্ত্ব দেন যে, "বাংলার মুসলমানদের বৃহৎ অংশের আদি পরিচয় হচ্ছে আরব, ইরানী, তুর্কী, পাঠান ও পাঞ্জাবী, অতএব বাংলার মুসলমানরা স্থানীয় নিম্নশ্রেণী-উদ্ভূত নয়"।
১৮৯৬-৯৭	বাংলাদেশসহ সারা ভারতে দুর্ভিক্ষ।
১৮৯৮	পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৯	বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম।
১৮৯৯	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৯	লর্ড কার্জন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।
১৯০২	কলকাতা অনুশীলন সমিতি গঠন। প্রতিষ্ঠাতা, সতীশ চন্দ্র বসু ও প্রমথ নাথ মিত্র।
১৯০২	লর্ড কার্জনের বিতর্কিত শিক্ষানীতি ঘোষণা।
১৯০৩	সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় মাসিক *নবনূর* প্রকাশিত। এর উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সুধীসমাজে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি।
১৯০৪	কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে বাংলায় সমবায় আন্দোলনের সূচনা।
১৯০৩-৮	স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী পণ্য বর্জন, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, অখণ্ড বাংলার জয়গান, 'জাতীয় শিক্ষা' প্রসার, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা প্রভৃতি অর্জন ছিল এই

আন্দোলনের লক্ষ্য। তবে এ আন্দোলনে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য।

১৯০৫ বঙ্গবিভাগ। এই ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠন। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকেই এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়, কিন্তু পরে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের মুসলমান নেতৃত্ব বঙ্গবিভাগের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে।

১৯০৫ কার্জন হল নির্মাণ। ১৯০৪ সনে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভাইসরয় লর্ড কার্জন নিজে।

১৯০৬ বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র *যুগান্তর* প্রকাশ।

১৯০৬ ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন। প্রতিষ্ঠাতা, পুলিন বিহারী দাস।

১৯০৬ অক্টোবর ১ সিমলা ডেপুটেশন। কার্যসূচিতে বঙ্গবিভাগ ইস্যুটি তুলতে অবাঙালি মুসলিম নেতারা অস্বীকার করায় বঙ্গীয় মুসলিম নেতাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে স্যার সলিমুল্লাহ ডেপুটেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।

১৯০৬ ডিসেম্বর ১০ মুসলমানদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে ভারতীয় নেতাদের কাছে নবাব সলিমুল্লাহর পত্র। তিনি প্রস্তাবিত দলের নাম দেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসি।

১৯০৬ ডিসেম্বর ২৬-৩০ ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সভা।

১৯০৬ ডিসেম্বর ৩০ এডুকেশনাল কনফারেন্সের সমাপনী সভায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খান কর্তৃক উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৬-৭ বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯০৮ নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠিত।

১৯০৫-১০ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকার রমনা এলাকায় বহু সুরম্য অট্টালিকা ও রাস্তাঘাট নির্মাণ।

১৯০৯	মোর্লি-মিন্টু সংস্কার। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি আরো সম্প্রসারিত। ৪৮ জন সদস্য, এদের মধ্যে ১৭ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং ৩১ জন বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত।
১৯১০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ *গীতাঞ্জলি* প্রকাশ।
১৯১১	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠন। সম্পাদক, মুহম্মদ
১৯১১	দিল্লী দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জের ঘোষণা—বঙ্গবিভাগ রদ, শুধু বাংলাভাষী অঞ্চল নিয়ে একটি মাত্র প্রদেশ গঠন, বাংলা থেকে বিহার পৃথক, আসামকে বাংলা প্রদেশ থেকে পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর।
১৯১২	নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকা ডেপুটেশন। পূর্ব বাংলার সমস্যা পেশ। ভাইসরয় আশ্বাস দেন যে, বাংলার গভর্নর বছরে অন্তত একবার ঢাকায় কিছুদিন অবস্থান করবেন, বেঙ্গল কাউন্সিলের বছরে অন্তত একটি অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং অচিরেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ।
১৯১৬	লখনৌ চুক্তি। কংগ্রেস প্রয়োজনীয় মেয়াদ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন মেনে নেয়। কিন্তু চুক্তিটি বাংলার মুসলমান নেতৃত্বের সমর্থন পায় নি, কারণ এই চুক্তির অধীনে তারা বঙ্গীয় কাউন্সিলে মাত্র ৪০ শতাংশ আসন পায়, যদিও জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫২.৬ শতাংশ।
১৯১৮	কলকাতায় *সওগাত* প্রকাশ।
১৯১৮	কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।
১৯১৯-২২	খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। বাংলায় প্রধান খেলাফতী নেতা ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুজিবুর রহমান খান ও মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী।

১৯১৯ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার। সীমিত সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৯১৯ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন (স্যাডলার কমিশন) রিপোর্ট প্রকাশ। রিপোর্টে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যাপারে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

১৯২০ ভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্রসমাজের জড়িত হবার আহ্বান।

১৯২১ অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আদলে আবাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যেজন্য প্রাথমিক স্তরে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আলঙ্কারিকভাবে বলা হতো 'অক্সফোর্ড অব দি ইস্ট'।

১৯২২ চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে কংগ্রেস-খেলাফত স্বরাজ্য দল গঠন।

১৯২৩ বেঙ্গল প্যাক্ট। প্রধান উদ্যোক্তা সি. আর. দাস, স্যার আবদুর রহিম, আবদুল করিম। উদ্দেশ্য, আপেক্ষিকভাবে পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা।

১৯২৩ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে একে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত।

১৯২৪ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের অধীনে মন্ত্রিসভা গঠন। মন্ত্রীরা হলেন এ. কে. ফজলুল হক, এ. কে. গজনভী ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। কিন্তু স্বরাজ্য দলের অনাস্থাভোটে ছ'মাস পরই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

১৯২৬ কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন।

১৯২৬ ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা। সংগঠনের সাধারণ পরিচিতি ছিল 'শিখা গোষ্ঠী' নামে।

১৯২৬ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯২৬ স্যার আবদুর রহিম কর্তৃক বেঙ্গল মুসলিম পার্টি গঠন।

১৯২৮ কলকাতায় সর্বপ্রথম ছাত্রসংগঠন অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠিত। এর গঠন-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন

	জওহরলাল নেহেরু এবং বিশেষ অতিথি বক্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু।
১৯২৯	সুভাষ বসুর সমর্থক ছাত্রগোষ্ঠী মূল অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন।
১৯২৮	কতিপয় অভিজাত মুসলিম নেতার প্রভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য উর্দু ভাষা বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে মাসিক *মোহাম্মদী* ও *শিখা* পত্রিকার চরম ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন।
১৯২৮	বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধন) পাশ। ভূমিতে প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্যরা দলগতভাবে না হয়ে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিন্দু সদস্যরা ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে মতপ্রকাশ করে।
১৯২৯	এ. কে. ফজলুল হক, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন ও স্যার আবদুর রহিমের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা।
১৯২৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল নির্মাণ।
১৯২৯	বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গ্রামোফোন কোম্পানি হিজ মাস্টারস ভয়েস-এ যোগদান। এখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি রচনা করেন নানা শ্রেণীর প্রায় তিন হাজার গান।
১৯৩০	বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্ট পাশ। এই আইন পাশের প্রক্রিয়ায় কাউন্সিল সদস্যগণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন।
১৯৩০	গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন।
১৯৩০	মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
১৯২৯-৩৫	অর্থনীতিতে মহামন্দা। পাট অর্থনীতির পতন। কৃষককুল ঋণগ্রস্ত।
১৯৩০-৩২	ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে লন্ডনে রাউন্ড টেবিল বৈঠক।
১৯৩২	সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। ধর্ম, বর্ণ ও পেশাভিত্তিক পৃথক সাধারণ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দু

শ্রেণীর তীব্র সমালোচনা। এই আইনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৯৩২ ঢাকায় অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠিত।

১৯৩৩ দি বেঙ্গল বোর্ড অব ইকনমিক ইনকুয়ারি তথ্য প্রকাশ করে যে, তখন বাংলার গ্রামীণ পরিবারগুলির ৭৭% মহাজন ও ভূস্বামীদের কাছে ঋণগ্রস্ত।

১৯৩৫ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (১৯৩২) ভিত্তিতে ভারত শাসন আইন। কংগ্রেস সর্বতোভাবে এই আইন প্রত্যাখ্যান করে এবং মুসলিম লীগ সমালোচনা করে এর ফেডারেল অংশ।

১৯৩৫ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটার্স এ্যাক্ট পাশ। গ্রামীণ সালিশের মাধ্যমে প্রজার ঋণের বোঝা হালকা করা ছিল এর উদ্দেশ্য। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার আমলে (১৯৩৭-৪১) আইনটির কার্যকারিতা জোরদার করা হয়।

১৯৩৬ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটার্স এ্যাক্ট-এর অধীনে জেলায় জেলায় ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন।

১৯৩৬ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির ময়মনসিংহ সম্মেলনে (১৯৩৫) নেতৃবর্গ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। পূর্ববঙ্গ অংশের নেতৃত্ব দেন এ. কে. ফজলুল হক। তাঁর নেতৃত্বাধীন প্রজা সমিতিকে এর ঢাকা সম্মেলনে (১৯৩৬) কৃষক প্রজা পার্টি নামে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করা হয়।

১৯৩৬ ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে প্রজা সমিতির এক অংশ ও কতিপয় মুসলিম জমিদার ও পেশাজীবী নিয়ে গঠিত হয় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি। কিন্তু জিন্নাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সব সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

১৯৩৬ বাংলা প্রদেশ থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন।

১৯৩৭ সর্বপ্রথম বর্ধিত ভোটাধিকারসহ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। দলগতভাবে কংগ্রেসের সংখ্যারিষ্ঠতা অর্জন। প্রাপ্ত আসনের

	দিক থেকে মুসলিম লীগ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কৃষক প্রজা পার্টি।
১৯৩৭	এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন। কোয়ালিশনে অংশী হয় কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দু ও মুসলিম স্বতন্ত্র সদস্য, তফসিলী সদস্য ও এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গ্রুপ। মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা এগারো।
১৯৩৮	বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধন)-বলে ভূমিতে প্রজার অধিকার আরো জোরদার করা হয়। জমিদারকে সেলামি প্রদান ছাড়াই প্রজা তার স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে।
১৯৩৮	জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক ফ্লাউড কমিশন গঠন।
১৯৪০	মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব। ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলি নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের দাবি।
১৯৪০	বেঙ্গল মানিলেন্ডার্স এ্যাক্ট। এই আইন প্রণয়ন দ্বারা গ্রামীন মহাজনি ঋণের সুদের সর্বোচ্চ হার বেঁধে দিয়ে মহাজন-খাতক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। ঋণ সালিশী বোর্ডের কার্যবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় এই আইনের অধীনে।
১৯৪১	বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগ করে জার্মানি গমন।
১৯৪১	ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন। তাঁর নেতৃত্বে নয় মন্ত্রীর (পাঁচ জন মুসলমান ও চার জন হিন্দু) দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন।
১৯৪১	মুসলিম লীগ থেকে ফজলুল হককে বহিষ্কার।
১৯৪২	কংগ্রেস ও লীগ উভয় দল কর্তৃক ক্রিপ্‌স মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।
১৯৪২	গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলন।
১৯৪৩	সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ না দিয়ে ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে লীগ মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৪৩-৪৪	মহাদুর্ভিক্ষ। প্রায় তিরিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি। দুর্ভিক্ষের চরম দিনগুলি ছিল আগস্ট ('৪৩) থেকে ফেব্রুয়ারি ('৪৪) পর্যন্ত।
১৯৪২	কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৩(?)	ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠন।
১৯৪৫	নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন।
১৯৪৫-৪৬	সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান।
১৯৪৬	বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের নির্বাচনী বিজয় এবং মন্ত্রিসভা গঠন।
১৯৪৬	এপ্রিল ৭-৯ দিল্লী মুসলিম লেজিসলেটর কনভেনশনে জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস' পরিবর্তন করে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' করা হয়।
১৯৪৬	জুন ৬ মুসলিম লীগ কর্তৃক কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক আংশিক প্রত্যাখান।
১৯৪৬	জুলাই ২৭ কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতার পটভূমিতে লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবি নিয়ে আন্দোলন ঘোষণা।
১৯৪৬	আগস্ট ১৬ মুসলিম লীগ কর্তৃক ডিরেক্ট এ্যাকশন ডে পালন, বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা। ১৬-১৮ আগস্ট, কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মহা হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়।
১৯৪৬	অক্টোবর ২৫ কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন।
১৯৪৭	ফেব্রুয়ারি ২০ যেকোন অবস্থায়, এমনকি প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সর্বশেষ ১৯৪৮ সনের জুনের মধ্যে ভারত ত্যাগ করার ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।
১৯৪৭	এপ্রিল ২০ নেহেরু কর্তৃক পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯৪৭	এপ্রিল ২৭ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা পেশ ।
১৯৪৭	এপ্রিল ২৮ কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে (দিল্লী) ভারত বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯৪৭	জুন ৪ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ১৫ আগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা।
১৯৪৭	জুন ১৩ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক পার্টিশন কমিটি গঠন।
১৯৪৭	জুন ২০ বাংলা ভাগের পক্ষে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯৪৭	জুলাই ঢাকায় মুসলিম লীগের কিছু সংখ্যক বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে গণ-আজাদী লীগ গঠন। আহ্বায়ক, কামরুদ্দীন আহমদ।
১৯৪৭	জুলাই ৬-৭ গণভোটের মাধ্যমে সিলেট জেলার পূর্ববঙ্গে যোগদান।
১৯৪৭	জুলাই ১৬-২৪ বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন-এর অধিবেশন।
১৯৪৭	জুলাই ১৮ বৃটিশ পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স এ্যাক্ট পাশ।
১৯৪৭	জুলাই ১৯ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক এই উপমহাদেশকে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।
১৯৪৭	আগস্ট ১৩ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণা।
১৯৪৭	আগস্ট ১৪ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি।
১৯৪৭	সেপ্টেম্বর ৬-৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুব লীগ নামে একটি অসাম্প্রদায়িক যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৭	সেপ্টেম্বর ১ তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন। সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম।
১৯৪৮	জানুয়ারি ৪ সরকারবিরোধী ও সোহরাওয়ার্দী সমর্থক ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ-এর প্রতিষ্ঠা। আহ্বায়ক, নাইমউদ্দীন আহমদ (রাজশাহী)।
১৯৪৮	ফেব্রুয়ারি ২৩ পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯৪৮ মার্চ ১১ পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান।

১৯৪৮ মার্চ ১৫ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি

১৯৪৮ মার্চ ২১ ঢাকার রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানের জনসভা ও ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে বক্তব্যদান। উভয়স্থানে জিন্নাহর এ ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

১৯৪৯ পূর্ববঙ্গ সহ সমকালীন বিশ্বের একাত্তরটি দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল প্রথম এবং ইন্দোনেশিয়া সর্বনিম্ন (একাত্তর)। জরিপভুক্ত কতিপয় দেশের আপেক্ষিক স্থান যথাক্রমে বৃটেন ৬, সোভিয়েট রাশিয়া ২৩, জাপান ৪৫, শ্রীলঙ্কা ৫৪, ভারত ৫৫, পাকিস্তান (সমগ্র) ৫৭, আফগানিস্তান ৫৮, পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) ৫৯, ফিলিপাইনস ৬০, দক্ষিণ কোরিয়া ৬৯।

১৯৪৯ জুন ২৩ আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক, শামসুল হক (টাঙ্গাইল) এবং যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ও এ. কে. রফিকুল হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)। ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম গ্রহণ।

১৯৫০ ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এ্যান্ড টেনান্সি এ্যাক্ট-এর অধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত।

১৯৫০ মূলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee) রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্থলে কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতাদানের সুপারিশ।

১৯৫০	ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে উর্দু ও বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামাসহ বিকল্প মূলনীতি প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯৫১	মার্চে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ-এর প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মাহমুদ আলী, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ।
১৯৫২	জানুয়ারি ২৬ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে পল্টন ময়দানের জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা—'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু'।
১৯৫২	জানুয়ারি ৩০ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন। আহবায়ক, কাজী গোলাম মাহবুব।
১৯৫২	ফেব্রুয়ারি ২১ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান। সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া গুলি বর্ষণ। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আবদুল জব্বার, রফিক উদ্দিন আহম্মদ ও আব্দুল বরকত।
১৯৫২	এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন-এর প্রতিষ্ঠা।
১৯৫৩	জানুয়ারি গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা। সভাপতি, হাজী মোহাম্মদ দানেশ।
১৯৫৩	ফজলুল হক কর্তৃক কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।
১৯৫৪	মার্চ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ২১-দফা কর্মসূচি নিয়ে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরাট বিজয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের মাত্র ৯টি আসন লাভ।
১৯৫৪	এপ্রিল এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন।
১৯৫৪	মে ৩০ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং ৯২-ক ধারা জারি। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত।

১৯৫৪	অক্টোবর ২৫ গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা।
১৯৫৪	পাকিস্তানের বাগদাদ প্যাক্ট (পরবর্তীতে সেন্টো)-এ যোগদান।
১৯৫৫	জুন ৯ আবু হোসেন মন্ত্রিসভা গঠন।
১৯৫৫	জুলাই ১০ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে ৫-দফা শর্তযুক্ত মারী চুক্তি সম্পাদিত।
১৯৫৫	পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একীভূত করে এক ইউনিট গঠন।
১৯৫৫	পাকিস্তানের সিয়াটো সামরিক জোটে যোগদান।
১৯৫৬	মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে আখ্যাত হয় এবং এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতি প্রর্বতন করা হয়। বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
১৯৫৬	আগস্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুক্তনির্বাচন (Joint Electorates) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে আওয়ামী লীগের আহ্বান।
১৯৫৬-৫৭	কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন। মন্ত্রিসভায় প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্য নেয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে এক বছরের অধিককাল মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম হয় নি।
১৯৫৬	সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান-এর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন।
১৯৫৬	অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে যুক্ত নির্বাচন আইন পাশ।
১৯৫৬	ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল-এর ছাত্রদের উদ্দেশে সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষকরে পশ্চিমা সামরিক জোটে যোগদানের সপক্ষে যুক্তি প্রদান।

১৯৫৭ ফেব্রুয়ারি ৬-১০ আওয়ামী লীগ-এর কাগমারী (টাঙ্গাইল) সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এই সম্মেলনে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক এবং প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। একই বছর ২৫ জুলাই এরা ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে।

১৯৫৮ অক্টোবর ৭ মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারি।

১৯৫৮ অক্টোবর ২৭ জেনারেল আইয়ুব খান-এর ক্ষমতা দখল। ইস্কান্দার মির্জা বিতাড়িত।

১৯৫৯ আগস্ট ৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) ঘোষণা। এর অধীনে সোহরাওয়ার্দীসহ ৭৮ জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অযোগ্য ঘোষিত হন।

১৯৫৯ অক্টোবর ২৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ ঘোষণা। এর অধীনে চার স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রবর্তন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত অন্যসব নির্বাচন (দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদসহ) পরোক্ষ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) কর্তৃক সম্পন্নের ব্যবস্থা।

১৯৬১ ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৬২ জানুয়ারি ৩১ পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার।

১৯৬২ এপ্রিল ২৭ এ. কে. ফজলুল হকের মৃত্যু।

১৯৬২ জুন পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত, যা আইয়ুব সংবিধান নামে আখ্যাত। এর দ্বারা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থাধীনে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনসহ সামরিক-বেসামরিক আমলা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং ক্ষমতা কাঠামোর সকল স্তরে বাঙালিদের অংশগ্রহণ উপেক্ষিত হয়।

১৯৬২ জুন ২৪ 'আইয়ুব সংবিধান' প্রত্যাখ্যান করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে ৯ নেতার বিবৃতি। এঁরা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া)।

১৯৬২ জুলাই ১৫ রাজনৈতিক দল গঠন ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলবিধি আইন পাশ।

১৯৬২ সেপ্টেম্বর ১৭ হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত। পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু, অনেককে গ্রেফতার।

১৯৬২ সেপ্টেম্বর ২৫ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে আইয়ুববিরোধী মোর্চা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন. ডি. এফ.) গঠিত।

১৯৬২ অক্টোবর ২৬ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে মোনায়েম খানের নিযুক্তি।

১৯৬৩ সেপ্টেম্বর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে সরকার যেকোন প্রকাশনা বন্ধ বা বাতিল ঘোষণার ক্ষমতা লাভ করে। এই আইন প্রয়োগ করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৯৬৩ ডিসেম্বর ৫ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু।

১৯৬৪ জানুয়ারি ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন।

১৯৬৪ মার্চ সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের দাবি।

১৯৬৪ আইয়ুব সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এন. এস. এফ.) প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৪ জুলাই ২১ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াত-ই-ইসলাম—এই পাঁচটি দল নিয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)

	গঠিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপের' মনোনয়নে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ।
১৯৬৪	খাজা নাজিমুদ্দিনের মৃত্যু।
১৯৬৫	জানুয়ারি ২ একটি নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে পরোক্ষ পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান। মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে আইয়ুব খান নির্বাচিত।
১৯৬৫	সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ সময়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ভার পশ্চিম পাকিস্তানের উপর'—এ 'তত্ত্বের' অসারত্ব প্রমাণিত হয়।
১৯৬৬	ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি পেশ।
১৯৬৬	জুন ৭ রাজবন্দিদের মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ আহূত হরতাল পালিত। ৬ দফা আন্দোলন শুরু।
১৯৬৬	সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত। এর প্রতিবাদে কুদরত-ই-খোদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীনসহ বেশ কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি দান।
১৯৬৬-৬৭	আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো ও পিকিং কেন্দ্রিক বিভক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও আন্দোলন প্রশ্নে মতপার্থক্য থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এসময়ে দ্বি-ধারায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশের নেতৃত্বে থাকেন মওলানা ভাসানী (পিকিংপন্থী) এবং অন্য অংশের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ (মস্কোপন্থী)।
১৯৬৭	মে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, কৃষক শ্রমিক পার্টি, এন. ডি. এফ. ও আওয়ামী লীগ-এর একটি অংশ নিয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি. ডি. এম.) গঠিত।
১৯৬৮	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এতে ৩৩ জন বাঙালি আমলা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ভারতের

সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমেদ ফজলুর রহমান সি. এস. পি., রুহুল কুদ্দুস সি. এস. পি. ও সার্জেন্ট জহরুল হক অন্যতম। এঁদের বিচার অনুষ্ঠান সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটায়।

১৯৬৮ জুন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দি : 'পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাবাইয়া রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র মামলা।'

১৯৬৮ ডিসেম্বর ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ-এর নেতৃত্বে ১১-দফা কর্মসূচিভিত্তিক আইয়ুব শাসন বিরোধী ছাত্র মোর্চা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৬৯ জানুয়ারি ৮ পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগ সহ ৮টি রাজনৈতিক দলের ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন।

১৯৬৯ জানুয়ারি ২০ পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ)-এর মৃত্যু।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ১৫ বন্দি অবস্থায় ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ১৮ ই. পি. আর-এর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা নিহত।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ২২ দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার। শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল অভিযুক্তদের মুক্তিলাভ।

১৯৬৯ ফেব্রুয়ারি ২৩ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তিলাভের পর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-এর পক্ষ থেকে রেসকোর্স

ময়দানে দেয়া গণসম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান।

১৯৬৯ মার্চ ২৫ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ।

১৯৬৯ নভেম্বর ২৮ গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণ।

১৯৭০ ফেব্রুয়ারি ২২ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) কর্তৃক পল্টনের জনসভা থেকে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা।

১৯৭০ মার্চ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' দুই নম্বর আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন-এর নেতৃত্বে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত।

১৯৭০ মার্চ ৩০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আইনগত কাঠামো আদেশ (এল. এফ. ও.) জারি।

১৯৭০ অক্টোবর ২৮ রেডিও ও টেলিভিশনে জনগণের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্বাচনী ভাষণ।

১৯৭০ নভেম্বর ১২ এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য বাঙালি জনমনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

১৯৭০ ডিসেম্বর ৭ ও ১৭ যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পর পর ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী আখ্যাদান।

১৯৭০ ডিসেম্বর ২০ পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসবে না বলে লাহোরে ভূট্টোর ঘোষণা।

১৯৭১ জানুয়ারি ৩ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথগ্রহণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ মার্চ ১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা। প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দেশব্যাপী ৩ মার্চ ধর্মঘট পালনের আহ্বান।

১৯৭১ মার্চ ২ ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কলাভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ডাকসু'র সহ-সভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।

১৯৭১ মার্চ ৩ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ।

১৯৭১ মার্চ ৩-২৫ শেখ মুজিবুর আহ্বানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অহিংস অসহযোগ

১৯৭১ মার্চ ৭ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

১৯৭১ মার্চ ৭ ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৭১ মার্চ ১৬-২৩ ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ।

১৯৭১ মার্চ ২৩ 'পাকিস্তান দিবসে' পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতসহ সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের আধিবেশন আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা।

১৯৭১	মার্চ ২৫ মধ্যরাতের কিছু আগে ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচার গুলি, হত্যা, অগ্নিসংযোগ। এসবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা।
১৯৭১	মার্চ ২৬; ২৫ মার্চের মধ্যরাতের কিছু পরে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। এটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র (তখন চট্টগ্রামে) থেকে ২৬ মার্চ প্রচারিত হয়।* ২৭ মার্চ মেজর জিয়া (জিয়াউর রহমান) কর্তৃক একই বেতারকেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা। ১০ এপ্রিল মুজিব নগরে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অধ্যাপক ইউসুফ আলী কর্তৃক স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ।

উৎস : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা ১৯৮২), পৃঃ ১

নির্ঘণ্ট

বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ - ১৯৭১

বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ - ১৯৭১

১ম খণ্ড   রাজনৈতিক ইতিহাস

২য় খণ্ড   অর্থনৈতিক ইতিহাস

৩য় খণ্ড   সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থনৈতিক ইতিহাস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০০/ডিসেম্বর ১৯৯৩

শব্দগ্রন্থন : বীণাপাণি প্রেস, ১২/১এ বলাই সিংহ্ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পাদকের কথা

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) বিদ্বৎ সমাজে আদৃত হয়েছে। এর প্রথম সংস্করণ (শোভন ও সুলভ) নিঃশেষিত হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। গ্রন্থের ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আগে শুরু হওয়ায় এর বাংলা ভাষ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটেছে এবং এর ফলে বাজারে বেশ কিছুকাল বইটি অপ্রাপ্য ছিল। এজন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও সম্পাদকীয় পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বর্তমান সংস্করণটি আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যেসব দিক অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে বা মোটেই আলোচিত হয় নি সেগুলি বর্তমান সংস্করণে নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেসব লেখা পুনরাবৃত্তিমূলক বা কম প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে বেশ কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করে আরো সাবলীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যেসব লেখক, পর্যালোচক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব পণ্ডিতের লেখা প্রত্যাহার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আমরা সবাই ক্ষমাপ্রার্থী।

মোট ৫১ জন পণ্ডিতের ৬৪টি লেখা নিয়ে বর্তমান সংস্করণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন খণ্ডের এ সুবিশাল গ্রন্থ কতটুকু অবদান রেখেছে এর মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত গ্রন্থটি সুধি সমাজে সমাদৃত আছে বলে মনে হয়। এটা গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত সকলের সাফল্য বলতে হবে।

বর্তমান সংস্করণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল, প্রকাশনা কমিটি ও গ্রন্থের সম্পাদনা কমিটির কাছে। তবে এ সংস্করণ প্রকাশনায় যিনি সর্বাধিক সময় দিয়েছেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য নিজ উদ্যোগেই দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন প্রকাশনা কনসালটেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি আমার নিজের কাজকে বহুলাংশে সোজা করে দিয়েছেন। তার প্রতি আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার অপারেটর জুলফিকার আলী ভূট্টো ও দেলোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভূট্টো অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এশিয়াটিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল হাই ও কামরুল হাই বইটি যেন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য সব সময় তৎপর ছিলেন। গ্রন্থের সহ সম্পাদক অধ্যাপক সাজাহান মিয়া তার কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতি
অধ্যাপক আবদুল করিম

সদস্য

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
অধ্যাপক কে. এম. মোহসীন
অধ্যাপক হারুন-উর- রশীদ
অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম
অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

সহ সম্পাদক
অধ্যাপক সাজাহান মিয়া

সূচিপত্র

১

অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

সিরাজুল ইসলাম*

বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক বোধ হয় তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। কেন ? রাজনৈতিকভাবে খুব অল্প সময়ই বাঙালিরা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পেরেছে। সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিরা কখনোই বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধবাদ, ইসলাম এবং সকল বিজয়ী শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতি বাঙালি সাংস্কৃতিক জীবনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। বাঙালির অভ্যাস, আচার-প্রথা, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানাদিতে বিদেশী এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু একটি মাত্র ক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালিরা ছিল চির স্বাধীন। বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের সময় এবং এর আগে সমগ্র বিশ্বে বাংলার পরিচিতি ছিল এবং সে পরিচিতির কারণ ছিল বাংলার শিল্পপণ্য। প্রাক-আধুনিক বিশ্ব বাংলার কোন রাজবংশের নাম বা এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদির কথা শোনে নি; শুনেছে, দেখেছে এবং সংগ্রহ করেছে বাংলার সূক্ষ্ম কারুপণ্য, বাংলার মসলিন। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনির লেখায়ও বাংলার শিল্পপণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার ইতিহাসে একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বহির্বিশ্বে বাংলার পরিচয় ঘটেছে পাল, সেন, তুর্কী, পাঠান প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠীর শাসকশ্রেণী বা সমরনায়কদের দ্বারা নয়। সাধারণ কারিগরদের উৎপাদিত পণ্যই ছিল বহির্বিশ্বে বাংলার দূত। শৈল্পিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বাংলার শিল্পপণ্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এদেশ রাজনৈতিকভাবে প্রায়শই বিদেশীদের করতলগত হলেও বিদেশী শাসনের প্রভাব কখনো গ্রাম পর্যায়ে এসে না

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পৌঁছানোর ফলে শিল্পপণ্যের কারিগররা ছিল বিদেশীদের প্রভাবমুক্ত। অতএব বাইরের প্রভাবমুক্ত পরিবেশে স্থানীয় কারিগরগণ বিভিন্ন শিল্পের, বিশেষকরে বয়নশিল্পের যে উৎকর্ষ সাধন করেছে তা স্থানীয় বাজারে তো বটেই, বিশ্ববাজারেও নন্দিত হয়। বিশ্ববাজারের সঙ্গে বাংলার যে সংযোগ তা কখনো কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিনষ্ট হয় নি।

সতেরো ও আঠারো শতকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক দেশসমূহের মাধ্যমে বাংলা বিশ্ববাজারের সঙ্গে একীভূত হলো—এ ধরনের মন্তব্য অবশ্যই ভিত্তিহীন। ইউরোপীয়রা এদেশে আসার আগে বাংলাদেশ বিশ্ববাজার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এমন যুক্তি দেয়া যায় না, কারণ বাংলার পণ্য ইউরোপে বাজারলাভ করেছে ইউরোপীয়রা এদেশে আগমনের বহু শত বছর আগে থেকেই। বস্তুত ইউরোপে বাংলার পণ্যের পরিচয় ছিল বলেই ইউরোপের বণিকেরা জলপথে এদেশে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কারণ তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংযোগকারী বাণিজ্যপথগুলি তুর্কী সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তুর্কী সরকার বাধ্যতামূলক বাণিজ্যকর আরোপ করলে ইউরাপীয়রা বিকল্প জলপথে প্রাচ্যের পণ্যলাভের চেষ্টা করে। সতেরো শতকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের ফলে অধিক পণ্য ইউরোপে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা স্থলপথে সম্ভব ছিল না। যোগাযোগ বিপ্লবের আরেক দিক হচ্ছে বিপুলহারে মূল্যবান ধাতব আমদানি। পণ্যের পরিবর্তে ধাতব লাভ বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যের এক নতুন দিক। স্থলপথে বাণিজ্যিক লেনদেন হতো স্থানীয় মুদ্রায় বা পণ্যের পরিবর্তে পণ্যে। রপ্তানিবাণিজ্য থেকে মূল্যবান ধাতব লাভ করায় বাংলার অর্থনীতির জন্য খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত।

নৌপথে বাংলা-ইউরোপ বাণিজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সামুদ্রিক বাণিজ্যপথগুলোতে জলদস্যুর উৎপাত থাকায় বাণিজ্যজাহাজগুলো নৌসেনার প্রহরায় যাতায়াত করতো। ঐ নৌসেনাই পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে রাজ্যজয়ের জন্য। স্থানীয় শাসক শ্রেণীর উপর ইংরেজরা তাদের চাপ প্রয়োগ করতে পেরেছিল ঐ নৌবাহিনীর বলেই। বিশ্ব যোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলেই বিশ্বের সনাতন বাণিজ্যশক্তিগুলির মধ্যে সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটে স্থানীয় রাজনীতিতে। এমনি একটি ঘটনা পলাশীর যুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ। স্থানীয় ও বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে এসব ঘটনার রয়েছে গভীর তাৎপর্য। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বাংলা সর্বপ্রথম পশ্চিমা বণিকদের মাধ্যমেই বিশ্ববাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো।[১]

১. এ মতবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ইমানুয়েল ওয়ালেস্টেইন (Immanual Wallerstein)। *The Modern World-System* (New York 1974, 1980, 1989) শিরোনামের গ্রন্থ সিরিজে তিনি অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন এলাকা আঠারো ও উনিশ শতকে পুঁজিবাদী বিশ্বঅর্থনীতির মাধ্যাকর্ষণে বিলীন হয়ে পুঁজিবাদী শিল্পায়িত দেশসমূহের বাজারে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তাঁর গবেষণার মূল্য অনেক। কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে তাঁর তত্ত্ব সবসময় পূর্ণভাবে খাটে না। বাংলার অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী বিশ্বঅর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর সিরিজের তৃতীয় অংশে (১৯৮৯)। পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, ১৩৯-৪০, ১৫৮-৫৯, ১৬৭-৮৭।

নৌপথে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ অবদান রাখে পর্তুগীজেরা। নৌ-বাণিজ্যে পর্তুগালের সঙ্গে বাংলার প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় ষোল শতকের শেষভাগে। কিন্তু অচিরেই পর্তুগীজেরা বাণিজ্যের চেয়ে জলপথে দস্যুবৃত্তিতে বেশি উৎসাহী হয়ে উঠে। বাংলায় ব্যাপক বাণিজ্য শুরু করে প্রথম ওলন্দাজেরা। সতেরো শতকে ওলন্দাজেরা বাংলা বাণিজ্যে প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে ওলন্দাজদের পরে শরিক হয় ফরাসী, ইংরেজ, ওস্টেন্ডার (বেলজিয়াম) ও অন্যান্য ইউরোপীয় নৌ-জাতি। মুগল সরকার এদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছে এদেশে বাণিজ্য করার জন্য। কারণ এর ফলে দেশের রপ্তানিবাণিজ্য অভূতপূর্ব প্রসারলাভ করে। আর যেহেতু বাংলাদেশ আমদানির চেয়ে রপ্তানি করতো অনেক বেশি, সেহেতু বাংলার পক্ষে বাণিজ্যউদ্বৃত্ত ছিল অনেক বেশি এবং সে উদ্বৃত্ত রপ্তানির ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশীরা আমদানি করতো বিপুল পরিমাণ সোনারূপা। নতুন বিশ্বে অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধে যে সোনারূপা আহরিত হয়েছে, এর একটি বড় অংশ ইউরোপ হয়ে বাংলায় এসে জমা হতো। প্রতি বছর শত শত জাহাজ নোঙ্গর করতো কলকাতা বন্দরে। সেসব জাহাজের ব্যবসায়ীগণ বিশ্ববাজারে বিপণনের জন্য ক্রয় করতো বাংলার রকমারি পণ্যসামগ্রী। আর রপ্তানির বিনিময়ে মুগল সরকার লাভ করতো বিপুল পরিমাণ সোনারূপা।

রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত সোনারূপা দিয়ে এ দেশের সরকার ও জনগণ কি করতো? বিপুল রপ্তানির বিপরীতে মূল্যবান ধাতব আমদানি দেশের সমকালীন অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে এর উপর বিশেষ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এখনো তেমন হয় নি। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, আমদানিকৃত ধাতব দিয়ে মুগল সরকার মুদ্রা খচিত করতে সক্ষম হয় যার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি পণ্য বদল অবস্থা থেকে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নীত হয়। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই মূল্যবান ধাতবের সবচেয়ে উৎপাদনশীল ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করার কারণ নেই। বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে অন্য যেকোন সস্তা ধাতব বা জৈব কিছু ব্যবহার করা যেতো, যেমন তামা, দস্তা, কড়ি, গাছের বাকল, কোন লতাপাতা বা অন্য কোন কিছু। কিন্তু রপ্তানির বিনিময়ে প্রাপ্ত মূল্যবান কোন ধাতব উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার না করে মুদ্রায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু যথার্থ হয়েছে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। রৌপ্যবিহীন মুদ্রায় বা অন্য ব্যবস্থায় এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। অতএব অর্থনীতিকে মুদ্রাভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে দেশের রপ্তানিবাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দেয়া হলো বলে মনে করা বোধ হয় একপেশে চিন্তা হবে। মুগলদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল একটি বিরাট সেনাবাহিনী পোষা এবং এর জন্য রৌপ্য ছিল একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক উপায়। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা সাধারণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে বা সাধারণ মানুষ এর ফলে উপকৃত হয়েছে মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ

নেই। এটি সত্য যে, উৎপাদক শ্রেণী গঞ্জে রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিক্রি করে হাতে কিছু নগদ রৌপ্যমুদ্রা পেয়েছে, কিন্তু ঐ মুদ্রা খাজনা আকারে আবার সরকার উঠিয়ে নিয়েছে। বিদেশ থেকে পাওয়া রৌপ্যের এক বড় অংশ রূপান্তরিত হয় অভিজাত শ্রেণীর গহনাপত্রে। দামি অলঙ্কার পরিধান আভিজাত্যের একটি প্রতীক। আভিজাত নারী-পুরুষ সবাই অঙ্গ সজ্জিত করতো নানা মূল্যবান ধাতবের গহনা দিয়ে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধাতবের এহেন ব্যবহার ছিল এক বিশাল অপচয়।

বাংলার অর্থনীতি সঙ্কটময় হয়ে উঠলো যখন দিল্লীর বাদশাহ বাংলার রাজস্ব মুদ্রায় সংগ্রহ করা শুরু করলেন। পূর্বে রাজকীয় রাজস্ব প্রেরিত হতো হুন্ডিতে। দিল্লীতে মুদ্রায় রাজস্ব পাঠানো শুরু হবার পর প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হতো। শত শত চটের থলেতে করে রৌপ্যমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণের পর দেশ এমন মুদ্রাসঙ্কটে পড়ে যেতো যে টাকার সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগতো ন্যূনপক্ষে ছয় মাস।[২] মুদ্রা অর্থনীতির সুযোগ গ্রহণ করে ইউরোপীয়রা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও যোগদান করে। তারা এক বাজার থেকে পণ্য কিনে অন্য গঞ্জে বিক্রি করতো এবং প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে রপ্তানিপণ্য কিনে দেশত্যাগ করতো। এহেন রপ্তানি ছিল দেশের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিকর, কেননা এই রপ্তানির বিপরীতে কোন আমদানি হয় নি। ১৭১৭ সালে বাদশাহী ফরমানলাভের পরই ইংরেজরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাপক হারে যোগদান করে। ঐ ফরমানবলে ইংরেজ কোম্পানি দেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এই ফরমানের অপব্যাখ্যা দিয়ে কোম্পানির কর্মচারিরাও তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বিনাশুল্কে করতে শুরু করে।[৩]

বাংলা-ইউরোপ বাণিজ্যের চরিত্র সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক ছিল না। এ বাণিজ্য অনেকাংশে ছিল বহুপাক্ষিক। স্থানীয় পণ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় মূল্যবান ধাতবের বিনিময় ছাড়াও ইউরোপীয়দের মাধ্যমে বাংলার পণ্যের সঙ্গে অনেক প্রাচ্যদেশের পণ্যের বিনিময় হতো। ঐ বিনিময় ছিল বাংলা-ইউরোপ বাণিজ্যিক লেনদেনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল একদিকে সরাসরি বাংলা-ইউরোপীয়, অপরদিকে বাংলা-প্রাচ্য-ইউরোপীয়। ওলন্দাজ বাণিজ্যের উপমা টেনে এই ত্রিমুখী বাণিজ্যধারার একটি চিত্র তুলে ধরেন ওম প্রকাশ। তিনি দেখিয়েছেন যে, জাপান থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত এ বাণিজ্য পরিচালিত হতো এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে। জাপান থেকে ইউরোপ পর্যন্ত সকল প্রধান

---

২. J. Steuart, *Principles of Money Applied to the Present State of the Coin in Bengal,* (London 1772), 63.

৩. সমসাময়িক শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এই ফরমান একটি কৌতূহলোদ্দীপক দলিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal,* 1704 to 1740, (London 1954), 25-39· Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and Hist Times,* (Dhaka 1963), 166-173

বন্দর ছিল এই বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক-এর অন্তর্গত। বহুপাক্ষিক ওলন্দাজ বাণিজ্যের উপমা টেনে ওম প্রকাশ মন্তব্য করেন : ভারতীয় তাঁতবস্ত্র কেনার জন্য ওলন্দাজেরা সঙ্গে নিয়ে আসতো রৌপ্য। ঐ রৌপ্যের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং ঘাটতি পূরণের জন্য রৌপ্য সংগ্রহ করা হতো দূরপ্রাচ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে। ওলন্দাজেরা চীনে ক্রয় করতো রেশম ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, যা তারা বিক্রয় করতো জাভায়। বিক্রয়লব্ধ জাভাই রৌপ্য এবং ইন্দোনেশীয় গোলমরিচের বিনিময়ে তারা তাইওয়ানে লাভ করতো স্বর্ণ। পাশ্চাত্য থেকে আনা রৌপ্য এবং দূরপ্রাচ্য বাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতির বিনিময়ে কেনা হতো ভারতীয় তাঁতবস্ত্র। ঐ তাঁতবস্ত্রের কিছু অংশ বিনিময় হতো ইন্দোনেশীয় গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলার সঙ্গে, আর বাকি অংশ রপ্তানি হতো বিভিন্ন এশীয় দেশে ও ইউরোপে। দূরপ্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত গোলমরিচ ও মসলাদির বেশিরভাগ রপ্তানি হতো ইউরোপে এবং বাকি অংশ বিপণন করা হতো ভারত, পারস্য, তাইওয়ান ও জাপানে। গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলা, চিনি ও ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের বিনিময়ে পারস্য ও চীন থেকে সংগৃহীত হতো কাঁচা রেশম এবং সে রেশম রপ্তানি হতো ইউরোপে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন যে, এই বহুজাতিক বাণিজ্য দেশে দেশে সৃষ্টি করে নতুন সম্পর্ক, যে সম্পর্ক তৈরি করে একটি বহুজাতিক ও বহুমুখী বাজার—এ বাজার ছিল একদিকে আন্তঃএশীয়, অপরদিকে এশীয় বনাম ইউরোপীয়।[৪]

বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ, বিশেষকরে স্বর্ণরৌপ্যের আমদানি কি পরিমাণ ছিল এর উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য-পরিসংখ্যানের অভাবে পণ্ডিতগণ উক্ত গবেষণার জন্য একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করেছেন কত দেশ থেকে কতগুলো এবং কত ওজনের জাহাজ এ দেশের বন্দরে নোঙ্গর করেছে এবং পণ্যসম্ভার নিয়ে বন্দর ত্যাগ করেছে এবং কোন্ শর্তে বিদেশীরা এখানে বাণিজ্য পরিচালনা করেছে।[৫] এসব গবেষণাকর্মে আমরা দেখতে পাই প্রতি বছর কত শত বৈদেশিক বাণিজ্যপোত এদেশের রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদান করেছে এবং কি কি পণ্য নিয়ে ওসব পোত বিশ্ববাজারে বিপণনের উদ্দেশ্যে বন্দর ত্যাগ করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পণ্ডিতই একটি প্রশ্নে কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। সেটি হচ্ছে, দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপর ব্যাপক রপ্তানিবাণিজ্যের কতটুকু প্রভাব পড়েছিল ? বিশ্ববাজারে বাংলার পণ্যের ব্যাপক চাহিদা এবং সে চাহিদা মোতাবেক বিপুল রপ্তানি কি দেশের উৎপাদনপ্রযুক্তি এবং উৎপাদনসংগঠনে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল

৪. Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720*, (Princeton 1985), 19.

৫. বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, এই খণ্ডের নবম অধ্যায়ে সুশীল চৌধুরী রচিত নিবন্ধ, *আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য* ; Om Prakash, *Dutch East India Company;* S. Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal, 1704-1740*, (London 1954); A. Karim, *Murshid Quli Khan;* K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760*, (Cambridge 1978).

ব্যাপক রপ্তানি কর্মকাণ্ডের ফলে কি এমন কোন শক্তিশালী উদ্যোক্তা শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের নেতৃত্ব দেশের অর্থনীতিতে যুগান্তর সৃষ্টি করতে পারতো ? পণ্ডিতগণ একমত যে, বিশ্ববাজারে বৃটিশ পণ্যের ক্রমপ্রসারের ফলে বৃটেনে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, বাংলার পণ্য অনুরূপ বিশ্ববাজার পেলেও এখানে কোন শিল্পবিপ্লব ঘটে নি কেন ?

রপ্তানিপণ্যের শীর্ষে ছিল তাঁতবস্ত্র। বাংলার তাঁতশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সমকালীন বিশ্বে দ্বিমতের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁতজাত শিল্পকর্মের রকমারিতা, সূক্ষ্মতা, শিল্পসৌকর্য সম্পর্কে কাহিনী ও উপকথা বাংলায় এবং বহির্বিশ্বে প্রচলিত ছিল। শুধু শিল্পসৌকর্য নয়, তাঁতশিল্পের সংগঠন ও অর্থসংস্থান সম্পর্কেও পণ্ডিতগণ একমত যে, তাঁতশিল্পের সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে অতি অনুকূল বিনিয়োগ ও ক্রেডিটব্যবস্থা, যা কিনা সমকালীন ইউরোপীয় ঋণ ও লগ্নিব্যবস্থার চেয়ে কোন অংশেই কম দক্ষ ছিল না। স্থানীয় ব্যবস্থাপনাদক্ষতার দরুনই বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করেছিল। ইউরোপীয় বণিকদের এশীয় বাণিজ্য সারা প্রাচ্যদেশব্যাপী হলেও এদের বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলাদেশ। আঠারো শতকে রপ্তানিবাণিজ্যে বাংলার ব্যাপক ভূমিকা উল্লেখ করে ওম প্রকাশ তথ্য প্রদান করেন :

> সতেরো শতকের শেষ সিকিতে ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের হামলা ইউরোপ-ভারত বাণিজ্যে এক নতুন পর্বের সূচনা করে। এই পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে বাংলা শুধু ভারতের মধ্যেই নয় সমগ্র এশিয়ায় ছিল সেরা। আঠারো শতকের প্রারম্ভে ওলন্দাজরা এশিয়া থেকে যে পণ্যসম্ভার হল্যান্ডে রপ্তানি করতো এর শতকরা চল্লিশ ভাগই সংগৃহীত হতো বাংলা থেকে। আর ওলন্দাজ কোম্পানি এশিয়া থেকে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতো, মূল্যের নিরিখে এর অর্ধেকেরও বেশি রপ্তানি হতো বাংলার বস্ত্র আকারে। বাংলায় সবচেয়ে বড় রপ্তানি-অংশীদার ছিল ইংরেজ কোম্পানি এবং এদের বেলায়ও একই চিত্র বিদ্যমান। এশীয় বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক পণ্য রপ্তানি হতো বাংলা থেকে।[৬]

পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এশিয়ার বাণিজ্যজগতে বাংলার স্থান ছিল সর্বোচ্চে। এ অবস্থায় এটা আশা করা অযৌক্তিক নয় যে, বাংলার এই শিল্পোন্নতির জন্য ক্রিয়াশীল ছিল উৎপাদন-সংগঠন, প্রযুক্তি, বিপণন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা এবং এই শিল্পোন্নতির ফলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি এসেছিল। রপ্তানির নিরিখে এও অনুমান করা অমূলক নয় যে, রপ্তানিপণ্যের উৎপাদক শ্রেণীর জীবনযাত্রা ছিল সচ্ছল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যধিক দুর্বল। সাধারণ মানুষের অবস্থাও ছিল তাই। তাদের গড় আয় ছিল অত্যধিক কম। কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম ছিল এত অল্প যে, উদ্বৃত্ত ফসল বাজারজাত করার কোন উৎসাহ কৃষকরা পেতো না।

৬. Om Prakash, *Dutch East India Company,* 8

১৭৩৯ সালে এক টাকায় আট মণ সাধারণ মানের চাল কেনা যেতো এবং সে সুবাদে নাকি ঢাকা শহরের পশ্চিম দ্বার খুলে দিয়েছিলেন নবাব শুজাউদ্দিন। কথিত আছে যে, সুবাদার শায়েস্তা খানের (১৬৭৯-৮৮) সময় একবার চালের মূল্য টাকায় আট মণে নেমে এসেছিল। তখন তিনি শহরের পশ্চিম তোরণ বন্ধ করে দম্ভভরে ঘোষণা দেন যে, ভবিষ্যতে তখনই ঐ তোরণ আবার খোলা যাবে যখন চালের মূল্য ঐ পর্যায়ে নেমে আসবে।[৭] ১৭৩৯ সালের মূল্যমাত্রা অবশ্য একটি চরম উপমা। সাধারণত মওসুমভেদে চালের মূল্য ছিল তখন টাকায় তিন থেকে চার মণ। এই মূল্যকাঠামোয় সাপ্তাহিক আয় যাদের গড়ে এক টাকা ছিল, তারা মোটামুটিভাবে পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে পারতো। কিন্তু কয়জন লোক সপ্তাহে গড়ে এক টাকা আয় করতে পারতো? এই প্রশ্নের সহজ জবাব নেই, কারণ তথ্যের অভাব। তবে সমকালীন টুকিটাকি তথ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মাসে গড়ে চার পাঁচ টাকা উপার্জনকারী সাধারণ লোকের জন্য অবশ্যই তা ছিল একটি বিরল ব্যাপার।

লক্ষণীয় যে, নিম্নমূল্য এবং নিম্নআয়ের ধারা অপরিবর্তিত ছিল দীর্ঘকাল। সাধারণ ভোগ্যপণ্যের মূল্য সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে যে মাত্রায় ছিল প্রায় একই মাত্রা বিরাজমান থাকে এর এক শত বছর পরেও। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চালের মূল্য। কৃষকঅর্থনীতি বিচারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হচ্ছে চালের মূল্য। যুগ যুগ ধরে চালের বাজারমূল্য ছিল স্থিতিশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে চালের মূল্য স্থানীয়ভাবে উঠানামা করলেও এটা ছিল নেহাতই সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদ বিবেচনায় চালের মূল্য ছিল মোটামুটি অপরিবর্তিত। তবে যে বছর খুব ভাল ধান উৎপন্ন হতো সে বছর চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যেতো। ভাল ফসলের সময় বিদেশী জাহাজ এসে উদ্বৃত্ত ফসল ক্রয় না করলে ধান-চালের দাম এমন পড়ে যেতো যে, কৃষকরা তাদের ফসল বিক্রি করতে না পেরে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তো। ভাল ফসল হলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং এটা ঘটতো বাজারঅর্থনীতির অসম্পূর্ণতার কারণে।

কৃষিপণ্যের মতো শিল্পপণ্যের মূল্যও ছিল দীর্ঘমেয়াদের জন্য স্থিতিশীল। যদিও সতেরো শতকে বিশ্ববাজারে বস্ত্রের চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে, কিন্তু বস্ত্রের বাজারমূল্য মোটেই বাড়ে নি, বরঞ্চ স্বল্পমেয়াদের জন্য অনেক সময় কমেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও কখনো এর মূল্য বৃদ্ধি পায় নি, কিন্তু কোন কারণে চাহিদা হ্রাস পেলে তুলনামূলকভাবে মূল্য হ্রাস পেতো আরো বেশি। বাজারের এই প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উৎপাদক শ্রেণী। নিম্নমূল্যের স্থিতিশীলতা দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার ফলে শিল্পপণ্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তিক পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি, সঞ্চারিত হয় নি উৎপাদকদের হাতে পুঁজি, সূচিত হয় নি উৎপাদকদের মধ্যে নব উদ্যোগ। অভিনবত্ব ও

৭. *Ghulam Husain Salim, Riyaz-us-Salatin.* ed. by Abdus Salam, (Calcutta 1904), 228.

উদ্যোগের অভাবে শিল্প ক্রমে ঐতিহ্যনির্ভর হয়ে উঠে। শিল্পের মালিক, কারিগর ও শ্রমিক সবাই আটকা পড়ে খোরাকি অর্থনীতির আবর্তে।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে এখানে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে, যদিও মূল্য বাড়ে নি। মূল্যবৃদ্ধিকে সফলভাবে রোধ করেছে দাদনি ব্যবস্থা। বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদানের প্রথম থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা দাদনি ব্যবস্থা অনুসরণ করেছে। এই ব্যবস্থাধীনে কোম্পানি এবং তাঁতীদের মধ্যে চুক্তি হতো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করার জন্য। মূল্যও নির্দিষ্ট হতো চুক্তির সময়। তবে সে মূল্য চাহিদা ও সরবরাহের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতো না, হতো চলতি নিরিখের উপর ভিত্তি করে। চুক্তির সময় তাঁতীদের দাদন বা আগাম দেয়া হতো। চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁতীদের উপর তাগিদকার বা তাগিদ্দার বসানো হতো। আবাসিক তাগিদ্দারদের ভয়ে তাঁতীরা থাকতো সন্ত্রস্ত। তাগিদ্দার নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য ছিল তারা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির সঙ্গে যেন চুক্তিবদ্ধ হতে না পারে তা লক্ষ্য রাখা। অতএব তাঁতীরা ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে সুবিধাজনক মূল্যলাভ থেকে ছিল বঞ্চিত। বাস্তবে তাঁতীরা ছিল এক ধরনের মুচলেকাবদ্ধ দাস। এই সব দাস-তাঁতীদের উৎপাদন ও বিপণনব্যবস্থা প্রাক-আধুনিক ইউরোপের কারিগরদের চুক্তিব্যবস্থার (Putting Out System) সঙ্গে তুলনীয়। তখন ইউরোপের কারিগরেরাও ছিল বিপণনবণিকদের কাছে বন্দি। কারিগরদের উৎপাদন নির্ভর করতো বণিকের আগামের উপর। শুধু অতি অল্প সংখ্যক তাঁতীর নিজস্ব পুঁজি ছিল বিনিয়োগের জন্য। অধিকাংশ তাঁতীর উৎপাদন ছিল আগামের উপর নির্ভরশীল। এবং আগাম নেবার মানে হচ্ছে পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগলাভের পরিবর্তে শুধু খেটে খাওয়া। বাজারে স্বাধীনভাবে পণ্য বিপণন করে প্রতিযোগিতাভিত্তিক মূল্যলাভ আগামগ্রহীতার ভাগ্যে জুটতো না। এর ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, দেশীয় পণ্যের বিপুল বিশ্বচাহিদা ও রপ্তানি সত্ত্বেও এর কোন লক্ষণীয় প্রভাব দেশের মূল্যকাঠামোর উপর পড়ে নি অর্থাৎ তা সাধারণ অর্থনীতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নিম্ন মূল্যকাঠামোয় আয়ও ছিল নিম্ন, ফলে জীবনের মানও ছিল নিম্ন। এই বিষাক্ত চক্রের ফলে কারিগরদের অর্থনৈতিক জীবনে কোনই পরিবর্তন আসে নি যদিও তাদের পণ্যের বিপুল চাহিদা ছিল এবং বিপণন ছিল বিশ্বব্যাপী। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আহৃত রৌপ্য ইউরোপে এনেছিল মূল্যবিপ্লব। অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বিপুল মুনাফা সৃষ্টি হয়, মুনাফা থেকে সৃষ্টি হয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি। মূল্যবিপ্লবের ফলে ইউরোপে Putting Out বা আগামভিত্তিক গৃহশিল্পের পতন ঘটে এবং উন্মেষ ঘটে আধুনিক পুঁজিবাদের। কিন্তু যদিও প্রতি বছর বাংলায় বিপুল পরিমাণ রৌপ্য আমদানি হয়েছে, কিন্তু বাজারমূল্যের উপর এর বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নি। মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁতী ও তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত বণিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায় নি, সঞ্চয় সৃষ্টি হয় নি। আগের মতোই তাঁতীরা তাদের উৎপাদনের জন্য নির্ভরশীল থাকে দাদনের উপর। শাসক এবং শাসিত উভয় শ্রেণীই গর্ববোধ করেছে নিম্ন বাজারমূল্যের জন্য, কিন্তু নিম্নমূল্যের অর্থনীতির তাৎপর্য তারা অনুধাবন করতে পারে নি। আভিজাত্যিক সমাজকাঠামোয় পেশাজীবীদের

লম্বিক উঠানামার সুযোগ প্রায় নেই। যারা সাধারণ তাঁতী তারা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিবাদী হয়ে উঠুক এটা সামরিক আভিজাত্যের কাম্য ছিল না। অতএব ল্যাটিন আমেরিকার রৌপ্য ইউরোপে যে মূল্যবিপ্লব ঘটিয়েছে, বাংলার রপ্তানির বিনিময়ে প্রাপ্ত রৌপ্য অনুরূপ মূল্যবিপ্লব ঘটাতে পারে নি। এখানে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে প্রচলিত প্রথা অনুসারে, অর্থনৈতিক নিয়মে নয়। ফলে বাজারমূল্য এবং মুদ্রা সঞ্চালন কোন সময়েই চাঙ্গা হয়ে উঠে নি। অর্থনৈতিকভাবে নিম্নমূল্য মানে নিম্নআয়, নিম্ন জীবনমান। তাঁতীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি হয় নি, কারণ তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য দিয়ে শুধু কোন রকম জীবন ধারণ করতে পেরেছে, সঞ্চয় করতে পারে নি, দাদন ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে উৎপাদনে উপনীত হয়ে দরকষাকষির মাধ্যমে সঞ্চিত হতে পারে এমন মুনাফা অর্জন করতে পারে নি।

বাংলার তাঁতশিল্পের উপর গবেষণা হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় এই যে, বাংলার অন্যান্য শিল্পের উপর অনুসন্ধান হয়েছে খুবই কম, বলা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ হয় নি। এদেশের চারু-কারু শিল্পের ছিল ব্যাপক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার। এসব শিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল মুর্শিদাবাদের পিত্তল, কৃষ্ণনগরের মৃন্ময়, ঢাকার কশিদা, শাখা, স্বর্ণ-রৌপ্যগহনা, সিলেটের শীতলপাটি ও আরো অনেক শিল্প। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারের চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠেছিল নৌ-শিল্প, কাঠশিল্প, ধাতব শিল্প এবং চিনি, লবণ ও বিভিন্ন ভেষজ শিল্প। স্থলপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো পাল্কী। অতএব পাল্কী নির্মাণও ছিল একটি বড় শিল্প। প্রত্যেক শিল্পের ছিল এর আঞ্চলিক বিশেষত্ব, এবং কোন না কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শিল্প-কারখানা। ঐ বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য হাট, বাজার, গঞ্জ। দূর দূরান্ত থেকে আগমন করতো ক্রেতারা ঐ সব বিপনীকেন্দ্র থেকে পণ্য সংগ্রহ করার জন্য। ঐ সব কেন্দ্রের মালিকদের বলা হতো মহাজন বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অর্থনৈতিকভাবে মহাজন শ্রেষ্ঠই ছিলেন বটে। মহাজনের আড়ং থেকে বিদেশী ক্রেতাদের পণ্য ক্রয় করতে হতো। মহাজনরা মুনাফা লুটতো তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে পারলে একদিকে যেমন ক্রেতাগণ অনেক কম মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করতে পারতো, অন্যদিকে খুচরা বিক্রেতারাও লাভ করতে পারতো সুবিধাজনক মূল্য। বিদেশীরা পছন্দ করতো না যে প্রতিযোগিতার বদলে বাজারমালিকগণ পণ্যের মূল্য তাদের খেয়ালখুশিমতো নির্ধারণ করুক। বাজারে মহাজনদের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পাবার জন্য ঢাকার কালেক্টর (১৭৮৫) একবার সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আঞ্চলিক বাজারগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে বাজারগুলোর উপর সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।[৮] শিল্পের আঞ্চলিক বিকাশ, আঞ্চলিক বাজার ও বাজারমালিক (মহাজন), দেশী-বিদেশী ক্রেতার সঙ্গে মহাজনের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের রয়েছে অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক দিক, যা

৮. M Day, Collector of Dhaka, to Board of Revenue, 1785, Sirajul Islam, (ed.), *Bangladesh District Records. Dacca District*, Vol. 1 (1784-1787), (Dhaka 1981), 136-37.

এখনো ঐতিহাসিকগণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন নি। আঞ্চলিক শিল্পোৎপাদন ও উৎপাদকদের সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন, বিপণন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁতশিল্পে লিপ্ত কারিগরদের মতো এসব আঞ্চলিক শিল্পের কারিগরদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল খুবই করুণ। এরাও তাদের উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য লাভ থেকে ছিল বঞ্চিত। বাজারমালিকদের শোষণের শিকার ছিল আঞ্চলিক চারু-কারু শিল্পকারিগরেরা। এরা যদি তাদের উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পেতো, মুনাফার মাধ্যমে এদের হাতে যদি সঞ্চয় সৃষ্টি হতে পারতো, তাহলে হয়তো এদের সঞ্চয় পুঁজিবাদে রূপ নিতে পারতো এবং পুঁজিবাদের অভিঘাতে উৎপাদনপদ্ধতি, প্রযুক্তি ও বিপণনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারতো।

শিল্পে নিয়োজিত কারিগর-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে কৃষককুলের অবস্থা ভাল ছিল না মোটেই। মুগল সরকার ছিল একটি বিশাল কৃষি-সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক। যদিও আঠারো শতকের শুরু থেকে আমদানি-রপ্তানিশুল্ক বাবদ সরকারের আয় অনেক বেড়ে যায়, তথাপি কৃষিই ছিল সরকারি আয়ের সর্বপ্রধান উৎস। রাজনৈতিক কারণে মুগল সরকারের নীতি ছিল রায়ত শ্রেণীকে আকাল-দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধা ও মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা। কৃষিঋণ প্রদান, লঙ্গরখানা স্থাপন, খাজনা মওকুফ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপৎকালীন সময়ে রায়ত শ্রেণীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু দুর্যোগ পেরিয়ে উৎপাদন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে সরকার কৃষকদের বাধ্য করতো বর্ধিত খাজনা প্রদানের মাধ্যমে সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করতে। স্বাভাবিক খাজনার হার ছিল এত বেশি যে, সরকারি খাজনা পরিশোধ করার পর কৃষকের হাতে খায়খোরাকি ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। খাজনা আকারে কৃষকের গোটা উদ্বৃত্ত সংগ্রহের জন্য মুগল সরকার গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল এর বিশাল রাজস্ব আমলাতন্ত্র।

যেকোন মানদণ্ডে মুগল আমলে কৃষকের উপর খাজনার হার ছিল খুবই বেশি। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পূর্বকালে খাজনার হার ছিল সমগ্র উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আর আওরঙ্গজেবের সময়ে উক্ত হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয় উৎপাদনের প্রায় অর্ধাংশ।[৯] মুর্শিদকুলী খানের সময়ে (১৭০৪-১৭২৭) খাজনার হার ফসলের অর্ধাংশ ধার্য করা হয়।[১০] এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আজকের বর্গাদারদের মতো সে যুগের রায়ত শ্রেণীকে তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে খাজনা হিসেবে। অতএব, এমন ভাবা অযৌক্তিক নয় যে, আজকের বর্গাদারদের অর্থনীতির মতো প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের কৃষকের অর্থনীতি ছিল একই রকম দুর্বল ও নড়বড়ে। কোন প্রাকৃতিক কারণে ফসলহানি হলে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব ছিল না। মুগল বাংলার অর্থনীতির যে রঙিন ছবি বিদেশী

৯. W. H. Moreland, *Agrarian System of Muslim India,* (Cambridge 1929).

১০. A. Karim, *Murshid Quli Khan,* 85.

পর্যটকরা এঁকেছেন, তা আসলে আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি ছিল না। বিদেশী পর্যটকেরা চিত্র এঁকেছেন মূলত অভিজাত, জমিদার ও বণিক শ্রেণীর অর্থনীতির। সাধারণ মানুষ বাস করতো পর্ণ কুটিরে, সরকারি রাজস্ব আমিল কেড়ে নিত তাদের সমস্ত কৃষি-উদ্বৃত্ত। খোরাকির উপরে তাদের হাতে কোন সঞ্চয় সৃষ্টির উপায় ছিল না। সাধারণ মানুষের চাহিদা ছিল নগণ্য, কারণ আয়ও ছিল নগণ্য। তাদের ক্রয়ক্ষমতা নিম্নপর্যায়ে থাকার দরুন পণ্যসামগ্রীর মূল্যও ছিল নিম্নপর্যায়ে। মন্দামূল্যের বাজারে উৎপাদক শ্রেণী কখনো কোন সুবিধা অর্জন করতে পারে নি। বিদেশী পরিব্রাজকগণ এদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন স্বদেশের পাঠকের জন্য। ইউরোপের পাঠকরা বিমোহিত হতো প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের কথা শুনে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা দিলে ভ্রমণবৃত্তান্তের রোমাঞ্চে তাল কাটার সম্ভাবনা ছিল বলে অভিজাত শ্রেণীর বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রা অঙ্কনই ছিল বিদেশী পর্যটকদের লক্ষ্য। ভট্টাচার্যের ভাষায় :

> প্রাক-বৃটিশ বাংলার অর্থনীতি চিত্রণে ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণের উপর এতটা নির্ভর করা উচিত হবে না। পর্যটকগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সোনালী চিত্র অঙ্কন করেছেন। এঁরা অভিভূত হয়েছিলেন গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলের মাটির উর্বরাশক্তি দেখে। বাংলার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁরা উচ্ছ্বাসে প্রায় আত্মহারা হয়েছেন। প্রাচ্য দরবারের সাজসজ্জা, রাজপুরুষ ও অমাত্যদের ঐশ্বর্য, হীরা, মুক্তা, জহরত দেখে পর্যটকেরা এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে তাঁদের প্রতীতি জন্মে যে, সারা দেশই বুঝি এমন ঐশ্বর্যপূর্ণ। কিন্তু আসলে যে তা ছিল না এমন উপলব্ধি তাঁদের কখনো হয় নি।[১১]

তবে আমির-ওমরাহ, জমিদার শ্রেণীর বাইরে আরেকটি শ্রেণী প্রভূত ধনার্জন করেছিল আঠারো শতকে। বিদেশী বণিকদের সহায়তাকারী দেশী দালাল-মুৎসুদ্দি শ্রেণী অভূতপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। বিদেশীরা এদেরকে বলতো বেনিয়া বা বানিয়া। বানিয়াদের সাহায্যেই বিদেশী কোম্পানিগুলো এখানে বাণিজ্য করতো। স্থানীয় ভাষায় কথোপকথন ছিল বিদেশীদের বিরাট সমস্যা। বানিয়ারা এদের সঙ্গে লেনদেন করতে করতে অনেক ইউরোপীয় শব্দ আয়ত্ত করে ফেলে। ইউরোপীয়রাও আয়ত্ত করে অনেক দেশী শব্দ। বানিয়ারা ঐসব শব্দ ব্যবহার করে এবং বিশেষ অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাব আদানপ্রদানে সফল হয়েছিল এবং ঐ সাফল্যই ছিল ধনার্জনের কারণ। ভাষার সমস্যা, ওজন ও মাপের সমস্যা, মুদ্রা ভাঙানোর সমস্যা প্রভৃতি কারণে বিদেশী বণিকেরা বানিয়াদের সাহায্য নিতে বাধ্য হতো। বানিয়াদের কাছ থেকে প্রয়োজনে ঋণও নিত বিদেশী বণিকগণ।

নিঃসন্দেহে বৈদেশিক বাণিজ্য সৃষ্টি করেছিল একটি শক্তিশালী বানিয়া অর্থনীতি। বানিয়া অর্থনীতি আভিজাত্যের বাইরে বিশেষ একটি শ্রেণীকে সমৃদ্ধ করেছিল। এরা হচ্ছে উচ্চবর্ণের হিন্দু বণিক-মুৎসুদ্দি শ্রেণী। বানিয়াদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের দলিলখানায়। বানিয়াদের কর্মকাণ্ডের উপর বেশ কিছু গবেষণাকর্মও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এসব গবেষণার কোনটাই বানিয়া অর্থনীতির উপর তেমন গুরুত্ব

১১. S. Bhattacharya, *East India Company*, 13.

আরোপ করে নি। বানিয়া পুঁজির পরিমাণ ও বিনিয়োগ সম্পর্কে এখনো আমরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোম্পানির দালাল হিসেবে বানিয়ারা রপ্তানিমূল্যের উপর শতকরা দেড় টাকা থেকে আড়াই টাকা পর্যন্ত কমিশন (সে যুগের ভাষায় সেলামি) দাবি করতো। এর ভিত্তিতে বানিয়াদের অর্থাগমের একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যেতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন সে যুগের রপ্তানির পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা। কিন্তু বানিয়াদের মধ্যস্থতায় কি পরিমাণ রপ্তানি সম্পাদিত হয়েছে এ সম্পর্কে আমাদের কোন সঠিক ধারণা নেই, এমনকি এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্যভাবে অনুমান করার মতো তথ্যও আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া কমিশনভোগী বানিয়ারা ছাড়াও সুদূর হাট-বাজারে পর্যায়ক্রমে নানা ধরনের দালাল নিযুক্ত হতো। ওরাও নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেতো। কিন্তু এই সব মধ্যবর্তী দালালের লেনদেন সম্পর্কে আমাদের কোন রকম তথ্য নেই। বানিয়া অর্থনীতির আলোচনা থেকে এই মধ্যবর্তী দালালদের বাদ দেয়া যায় না। কারণ রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফার একটি বড় অংশ লাভ করেছিল এই মধ্যবর্তী দালাল শ্রেণী। তবে মোদ্দাকথা এই যে, রপ্তানি বাণিজ্য দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপর কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারলেও দেশে একটি শহরভিত্তিক বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

সকল তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে, রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত বিপুল পুঁজি দেশের উৎপাদন সংগঠন ও প্রযুক্তি, বিতরণ ও বিপণন, উৎপাদক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা, পণ্যের মূল্যকাঠামো প্রভৃতিতে কোন ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। শহরভিত্তিক বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ইউরোপে পুঁজিবাদী পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, কিন্তু বাংলার বেলায় বানিয়া-মুৎসুদ্দি শ্রেণী তেমনটি ঘটাতে পারে নি। এর কারণ ? অনেকে যুক্তি দেন যে, বানিয়া পুঁজি বিকাশের স্বাভাবিক লক্ষ্যে পৌছার আগেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটায় সে পুঁজি বিকৃত পথ ধরে সামন্ত রূপ পরিগ্রহ করে। উৎপাদন ও শিল্পোদ্যোগ থেকে বানিয়াপুঁজি প্রত্যাহৃত হয়ে অনুপ্রবেশ করে ভূমিনিয়ন্ত্রণে। এই যুক্তি আপাত দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় ঠেকে বটে, তবে প্রশ্ন উঠে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে পুঁজিবাদী পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি কেন ? বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণী হিসেবে বানিয়াদের আবির্ভাব ঘটে সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে এবং আঠারো শতকের প্রথম দশক থেকে আশির দশক অব্দি বানিয়াপুঁজির মহা দাপট বজায় থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে পুঁজিবাদী পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় নি কেন ? ১৮১৩ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত করে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন করা হলে বানিয়াপুঁজি বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। অবাধ বাণিজ্যের কারণে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বিপুলভাবে বিস্তারলাভ করে। ফলে বৃদ্ধি পায় বানিয়াদের আয়। উপমাস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বানিয়া রামদুলাল দে'র কথা। শুধু সদ্যাগত মার্কিন বণিকদের দালালি করে রামদুলাল অচিরেই কোটিপতিতে পরিণত হন।[১২] অথচ মার্কিনীদের সঙ্গে বাণিজ্য

১২. Susan S Bean, 'Calcutta Banians for the American Trade', in Pratap Pal (ed.), *Changing Vision, Lookings, Images: Calcutta through 300 Years,* (Bombay 1990), 71-73.

শুরু করার আগে তিনি ছিলেন একজন ছা-পোষা সরকার (কেরানি) মাত্র। রামদুলাল দে এবং তাঁর শ্রেণীর লোকদের কোটি কোটি টাকা অর্জন দেশের পুঁজিবাদী উন্নয়নে কোন অবদান রাখে নি। বানিয়াদের বাণিজ্যিক যোগ্যতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিস্ময় এই যে, তাঁদের বাণিজ্যিক যোগ্যতা পুঁজিবাদী যোগ্যতায় রূপান্তরিত হয় নি। এই ব্যর্থতা ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই, নানা ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বানিয়ারা খরচ করছেন একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তাঁরা সামাজিক স্বীকৃতি লাভের প্রয়াস পাচ্ছেন অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ উড়িয়ে, সঞ্চয় ও পুঁজিবাদী বিনিয়োগের মাধ্যমে নয়।

২

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে ঘন ঘন, কিন্তু সেসব ঘটনা দেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে খুব কমই প্রভাবিত করেছে। নতুন শাসকরা পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে কোন হস্তক্ষেপ করে নি। কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা আবহমানকাল থেকে অপরিবর্তিত থাকার এটা একটি বড় কারণ বটে। বলা যায়, অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে গ্রামবাংলা চিরকালই ছিল স্ব-নিয়ন্ত্রিত। উপরের স্তরে রাজনৈতিক পরিবর্তন কখনো গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে নি। গ্রামীণ অর্থনীতি সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রভাব অনুভব করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। কোম্পানিশাসনের প্রভাবে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য সব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয় এবং সে পরিবর্তন ছিল নেতিবাচক। কোম্পানিশাসনের প্রাথমিক শোষণ ও লুণ্ঠননীতির ফলে দেশের গোটা অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পশ্চাতে রবার্ট ক্লাইভের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। ক্লাইভ চেয়েছিলেন মুগল সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে যোগদান করে কোম্পানির আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিশ্চিত করতে। লুটতরাজের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করা মোটেই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তিনি কোম্পানির কর্মকর্তাদের প্রশাসন থেকে দূরে রাখলেন। রেজা খানকে তিনি দিলেন মুগল প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনভাবে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব। এমনকি ক্লাইভ কোম্পানির কর্মচারিদের নির্দেশ দিলেন দেশের আইন মেনে চলতে এবং কোম্পানির ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে।[১৩] ক্লাইভ কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর থাকাকালীন কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিরা লুণ্ঠন-লুটতরাজ থেকে বিরত ছিল। শোষণ-লুটতরাজ শুরু হয় ক্লাইভের বৃটেনে প্রত্যাবর্তনের পর। কোম্পানির সকল শ্রেণীর কর্মচারি দেশের অভ্যন্তরে ছোটে সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে।[১৪]

১৩. For Reza Khan's rule see, Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal, 1756-1775: A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan,* (Cambridge 1969), chapters six and seven.

১৪. J Malcolm, *Robert Lord Clive,* Vol. 3, 88.

ব্যবসার নামে তারা চালায় পাশবিক অত্যাচার-উৎপীড়ন। ইংরেজ অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে ঐতিহাসিক টমসন বাংলাকে প্যাগোদা বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'ঝাঁকুনি দাও, লুফে নাও স্বর্ণ-রৌপ্যের ঝরা ফল'। ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় দেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার। প্রধানত এই ইস্যুর উপরই নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে কোম্পানির। কোম্পানির কর্মচারিদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য মানে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বণিকদের উৎখাত হওয়া। শুধু বিনাশুল্কে বাণিজ্য করেই কোম্পানির কর্মচারীরা ক্ষান্ত হয় নি, তারা অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় বণিকদের দ্বারা ঐসব পণ্যের বেসাতি বেআইনি ঘোষণা করেছে। এমন অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ উঠেছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। ক্ষমতামত্ত, অর্থগৃধ্নু ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইংরেজের অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্পর্কে কতিপয় সাহসী ভূম্যধিকারী কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের কাছে নিম্নরূপ অভিযোগ করেন (১৭৬৫) :

> ইংরেজ বণিক গোমস্তাগণ বাংলার সর্বত্র কুঠি স্থাপন করেছেন, ছড়িয়ে পড়েছেন গ্রামে-গঞ্জে। তাঁরা দেশের তাবৎ উৎপন্নদ্রব্যের কেনাবেচা করেন, যেমন বস্ত্র, চুনাপাথর, তৈলবীজ, তামাক, হলুদ, তৈল, চাল, শন, দড়ি, গম এবং সব রকম খাদ্যশস্য। এসব দ্রব্য কেনার জন্য সাহেবরা রায়তকে টাকা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং এভাবে তাঁরা নিম্নমূল্যে জিনিস ক্রয় করেন, কিন্তু বিক্রয়ের সময় বাজারের ক্রেতাদেরকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে বলপ্রয়োগ করেন। সরকারকে তাঁরা শুল্ক দেন না। যেকোন রকমের জঘন্য কাজ করতে তাঁদের মোটেই বাধে না। ফলে দেশ এখন এক শূন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছে।[১৫]

বাঙালির চোখে কোম্পানির কর্মচারীরা ছিল মনুষ্যরূপী পঙ্গপাল। এই পঙ্গপালদের আক্রমণে বাংলার হাট, বাজার, গঞ্জ ও সকল শিল্পোৎপাদনকেন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এক দশকের মধ্যেই। হাট-বাজারে গিয়ে এরা উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের বলপ্রয়োগে বাধ্য করতো তাদের কাছে বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কমমূল্যে পণ্য বিক্রি করতে।[১৬] একের পব এক পুতুল নবাব ও তাদের আমির-ওমরাহ ও জমিদারগণ চাপের মুখে বাধ্য হন তাঁদের সকল উদ্বৃত্ত নজরানা, পেশকাশ ও বকশিসরূপে ফিরিঙ্গিদের হাতে তুলে দিতে। এদের দুঃশাসন ও অত্যাচারের ফলে সকল আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হয়ে দেশ একটি জংলী সমাজে পরিণত হলো। কার্থেজ বিধ্বংসের পর বাংলাদেশই বোধ হয় এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতি ধ্বংসের দ্বিতীয় নজির।[১৭]

কোম্পানি-কর্মচারীদের লুটপাট নীতি শুধু বাংলার অর্থনীতিকেই বিনষ্ট করে নি, এর দুষ্ট অভিঘাতে একই সঙ্গে খোদ কোম্পানির অর্থনীতিও ধ্বংস হয়েছে। পলাশীর আগে

১৫. Cited in Edward Thompson and G T. Garratt, *Rise and Fulfillment of British Rule in India*, (Allahabad 1962), 102

১৬. ঐ.

১৭. Charles Caraccioli, *Life of Clive*, Vol 1, 106, cited in Thompson and Garratt, *Rise and Fulfillment*, 104

কোম্পানির বাংলাবাণিজ্য ছিল বিপুল লাভজনক, প্রতি বছর এর শেয়ারহোল্ডারগণ পেতেন অতি উচ্চহারে লভ্যাংশ। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানি বাণিজ্যে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে চলে। প্রতি বছর বাড়তে থাকে সে লোকসানের মাত্রা। বাণিজ্যিক ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য কৃষকের উপর খাজনা বৃদ্ধি করা হয় বার বার। কিন্তু সে বর্ধিত খাজনা পরিশোধ করার ক্ষমতা কৃষকের আছে কিনা সে বিষয় কোম্পানি কখনো ভেবে দেখে নি। ফল দাঁড়ায় এই যে, ১৭৬৮ সন থেকে শুরু হয় আকাল ও দুর্ভিক্ষ। ১৭৬৮ থেকে ১৭৮৯ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ কখনো আকাল ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্ত ছিল না। স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে আকাল বা দুর্ভিক্ষ লেগেই ছিল। ১৭৬৮ সন থেকে দুর্ভিক্ষজনিত অনাহার ও মৃত্যুর কারণে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ১৭৯২ সনে এক সরকারি হিসাবে অনুমান করা হয় যে, কৃষিকর্মীর অভাবে দেশের কৃষিযোগ্য ভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পতিত অবস্থায় পশু-পাখি অধ্যুষিত জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।[১৮] তা সত্ত্বেও বণিক সরকার প্রতি বছর নতুন বন্দোবস্ত করেছে রায়তের উপর খাজনা বৃদ্ধি করে। জমিদারগণ সরকারি রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হন, কেননা রায়ত শ্রেণী বর্ধিত হারে খাজনা দিতে সক্ষম হয় নি। সরকার সনাতন নিয়মে জমিদারের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত না করে অধিক রাজস্ব আদায়ের লোভে ভূমি বন্দোবস্ত করে নিলামের মাধ্যমে। নিলামে যারা সর্বোচ্চ হারে বন্দোবস্ত গ্রহণে সম্মত হয়েছে, তাদের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদে ভূমি ইজারার বন্দোবস্ত করা হয়।। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও রায়তের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব মেয়াদী ইজারাদার পরোক্ষ সরকারি অনুমোদন লাভ করে রায়ত শ্রেণীর সকল উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার জন্য।

রায়ত শ্রেণীর মতো তাঁত ও অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্পশ্রমিকরা কোম্পানি ও কোম্পানি-কর্মচারীদের লাগামহীন শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়। সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানিপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার শাস্তিমূলক আইন জারি করে। চুক্তি মোতাবেক সরবরাহ না করতে পারা চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। এই সব নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে তাঁতীরা বস্তুত মুচলেকা-মজুরে (bonded labour) পরিণত হয়। মুচলেকা-তাঁতীরা খোলা বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। যদিও উৎপাদনের সকল উপকরণের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল এবং খোলা বাজারে পণ্যমূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবু কোম্পানির তাঁতীরা চুক্তি মোতাবেক পূর্বেকার মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য হতো।[১৯]

১৭৯০-এর দশক থেকে ইউরোপে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের দরুন বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ফলে সামুদ্রিক

১৮. Governor General Lord Cornwallis's Minute, 18 September 1789, *Fifth Report,* 1812.
১৯. Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833,* (Calcutta 1978), 62.

যোগাযোগ ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে ইউরোপের যোগদান নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসে। তা ছাড়া বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করার জন্য বৃটেনে বাংলার রপ্তানিপণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলে ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রপ্তানিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে ইউরোপে ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বাংলার রপ্তানিপণ্যের বাজার ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হতে হতে আঠারো শতকের শেষে এসে আন্তর্জাতিক রপ্তানিবাণিজ্যে বাংলার অবস্থান তার পূর্বেকার সকল গৌরব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৮১৩ সালে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হলে বাংলার বস্ত্ররপ্তানি বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মূল্যে ও গুণে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের কাছে বাংলার রপ্তানিপণ্য মার খেতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, কিছুকাল আগেও যেখানে বাংলার তাঁতবস্ত্র বিশ্ববাজারে সমাদৃত ছিল, সেখানে ১৮২০-এর দশকে বাংলাদেশ ইউরোপ থেকে বস্ত্র আমদানি শুরু করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তনে তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত তাঁতী শ্রেণী ছাড়াও অসংখ্য বানিয়া, আড়তদার, পাইকার, বেপারি, যাচনদার, বয়াল, গোমস্তা, সরকার বেকারে পরিণত হলো।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, রপ্তানিবাণিজ্যে চূড়ান্ত পতনের পর ঐসব শিল্পোদ্যোক্তা, তাঁতী, কারিগর, বানিয়া ও অন্যান্য মধ্যস্থ দালালদের কি গতি হলো ? জীবিকা নির্বাহের জন্য এরা কোন পথ বেছে নিল ? বিশেষকরে রপ্তানিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত বিপুল বানিয়াপুঁজির কি হলো ? অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বানিয়াপুঁজি বাণিজ্য থেকে ভূমিনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিপুল সংখ্যক জমিদারি সরকারি রাজস্ব অনাদায়ের জন্য নিলামে বিক্রি হয়, এবং সে প্রক্রিয়ায় নবাগত জমিদারদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল রপ্তানিবাণিজ্যে লিপ্ত বানিয়া-মুৎসুদ্দি। দেব, মল্লিক, নন্দী, ঠাকুর, ঘোষাল ও আরো অনেক বিখ্যাত বানিয়া পরিবারগুলির ভূমিনিয়ন্ত্রণে আগমন উক্ত তত্ত্বের ভিত্তি। কিন্তু কারা কত পুঁজি বিনিয়োগ করেছে জমিদারি ক্রয়ে, এর সঠিক তথ্য রয়েছে নিলামের দলিলপত্রে। এই সব দলিলপত্র থেকে জানা যায় জমিদারি ক্রয়ে কত পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছে, কারাই বা ক্রেতা। সত্য যে নবাগত জমিদারদের মধ্যে বানিয়াদের সংখ্যা কম নয়, তবে যে পরিমাণ পুঁজি ভূমিক্রয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তা ছিল সমগ্র বানিয়াপুঁজির এক ক্ষুদ্রাংশ। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, বাকি বানিয়া পুঁজি উজাড় হয়েছে অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে, যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণ, মন্দির, ঘাট, পুকুর, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণে। বানিয়াপুঁজির একটি অংশ হয়তো মহাজনি ঋণদান, শস্য ব্যবসা, কোম্পানির কাগজ ক্রয় প্রভৃতি খাতেও বিনিয়োজিত হয়েছে।

৩

মার্কিন স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাজিত জেনারেল লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিস যখন কলকাতায় এসে বৃটিশ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (১৭৮৬) তখন বাংলার অর্থনীতি ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্নওয়ালিসকে নিয়োগ করে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য। সেটি হচ্ছে বাংলায় বৃটিশ লুণ্ঠন বন্ধ করা, অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করার

লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এমন একটি স্থায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার অধীনে অর্থনীতি আবার গতিশীল হবে, জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং কোম্পানি ও বৃটিশ জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সাধিত হবে।[২০]

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং এর আনুষঙ্গিক আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানাদি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অবশ্য লর্ড কর্নওয়ালিসের কোন মৌলিক অবদান নয়। ১৭৭৬ সালে কাউন্সিলসদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। এর পর থেকে কলকাতা ও লন্ডনে এ ব্যাপারে প্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকে এবং কর্নওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস্তাব একটি ভিন্ন গুরুত্ব লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে কর্নওয়ালিস ও তাঁর উপদেষ্টাদের চিন্তা-ভাবনা ছিল ফিলিপের চেয়ে অনেক ভিন্ন। এ বন্দোবস্তের সুফল সম্পর্কে কর্নওয়ালিস ছিলেন নিঃসন্দেহ। তিনি আশা পোষণ করেছিলেন যে, এই বন্দোবস্তের ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটবে।[২১] তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একটি বিশেষ ব্যবস্থার ফল একেক দেশে একেক রকম হতে পারে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষবাদীদের যুক্তির উত্তরে তিনি বলেন যে, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা যদি ইংল্যান্ডে কৃষিবিপ্লব আনয়ন করতে পারে, তবে অনুরূপ ভূমিমালিকানা বাংলায় সৃষ্টি করলে এখানেও অনুরূপ কৃষিবিপ্লব ঘটতে বাধ্য। কর্নওয়ালিসের উন্নয়নচিন্তায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান ছিল একটি বড় প্রত্যয়। তাঁর মতে মানুষ সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হয় তখনই, যখন সে তাঁর সৃষ্ট সম্পদ ভোগ করতে এবং সে সম্পদ নিয়ে নিরাপদভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কলকাতায় আগমন করে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা দেখে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তাঁকে বিশেষভাবে পীড়া দিয়েছে সরকার কর্তৃক জমিদারকে এবং জমিদার কর্তৃক রায়তকে শোষণ। রায়তের সকল উদ্বৃত্ত কেড়ে নেয় রাষ্ট্র। একে কর্নওয়ালিস স্রেফ রাষ্ট্রীয় লুটতরাজ বলে গণ্য করেন, এবং তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই লুটতরাজপ্রক্রিয়ার ফলেই বাংলা এবং কোম্পানির অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে।

ভূমিতে জমিদারি সম্পত্তি সৃষ্টি করার প্রেরণা কর্নওয়ালিস লাভ করেছিলেন সমকালীন বৃটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ফরাসী ফিজিউক্রেসীর চিন্তাধারা থেকে। বৃটেন ও ফ্রান্সে কৃষিঅর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল ভূস্বামীদের নেতৃত্বে। কিন্তু জমিদারদের নেতৃত্বে বাংলায় অনুরূপ পরিবর্তন আনয়ন করার চিন্তা অবাস্তব ছিল। কারণ, ইউরোপের

২০. কর্নওয়ালিসের পরিকল্পনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, C A. Aspinal, *Cornwallis in Bengal*, (Manchester 1931).

২১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal: A Study of its Operation 1790-1819*, (Dhaka 1978); R Guha, *A Rule of Property for Bengal. An Essay on the Idea of Permanent Settlement* (Paris 1963).

কৃষিবিপ্লবের পশ্চাতে শুধু ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রশ্ন ছাড়াও আরো অনেক কারণ ছিল ক্রিয়াশীল। প্রধান কারণগুলির মধ্যে ছিল নৌ-শক্তিবলে বিশ্বময় সমুদ্র উপকূলসমূহে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে বাজার সৃষ্টি, মূল্যবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, ঋণ ও লগ্নি সংস্থার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি উন্নয়নকামী স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। এ সবের কোনটাই বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বর্তমান ছিল না।

অতএব কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে নি, কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি বৈ কোন উন্নতি হয় নি। জমিদারদের উপর প্রত্যাশা স্থাপন করা হয়েছিল যে, এরা কৃষিউৎপাদন ও কৃষিসম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগী নেতৃত্ব দেবে, যেমনটি দিয়েছিল ইউরোপের ভূস্বামী শ্রেণী। কিন্তু বাস্তবে জমিদারগণ গরিব কৃষকের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে আদায়কৃত তাদের অর্জিত খাজনার উপর নির্ভরশীল একটি পরনির্ভর শ্রেণীতে পরিণত হয়। জমিদারগণ কেন উন্নয়নকামী হয় নি এ নিয়ে অনুসন্ধানের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে পুঁজিবাদী উন্নয়নে জমিদারদের অনীহার অর্থনৈতিক কারণ এই হতে পারে যে, পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের যতোগুলি সুযোগ ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে কম লাভজনক এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কৃষিখাত। অধিকতর লাভজনক এবং তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগপন্থা ছিল মহাজনি ব্যবসা, শস্য ব্যবসা, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি। মূল্যবিপ্লবের দরুন বৃটিশ ভূস্বামীরা কৃষিবিনিয়োগ থেকে যে হারে মুনাফা লাভ করতো, তা অন্য যেকোন বিনিয়োগক্ষেত্রের তুলনায় ছিল অধিক সুবিধাজনক। সমকালীন বাংলার কৃষি বিনিয়োগ থেকে অনুরূপ মুনাফা অর্জন ছিল অকল্পনীয়। মহাজনি, শস্য ব্যবসা প্রভৃতি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগক্ষেত্র। তবে বাংলার কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিনিয়োগের অভাব বিশ্লেষণ করতে শুধু লাভ-ক্ষতির পাল্লায় বিচার করলে চলবে না। জমিদারদের সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত হয় নি। বরঞ্চ সমকালীন অভিজাত শ্রেণীর মনোভঙ্গি ছিল সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী নয়। অতএব তাদের জীবনধারায় অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে সামাজিক উপাদানের প্রভাব ছিল বেশি গভীর। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি বিবেচনায় এসেছে অতি গুরুত্ব সহকারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যেসব বানিয়া ভূমিনিয়ন্ত্রণে এসেছে তারা অধিক মুনাফার জন্য ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ কথা বলা যায় না। তারা জমিদারি এস্টেট ক্রয় করেছে অধিক সম্মানের জন্য, সামাজিক স্বীকৃতির জন্য।

পুরনো এবং নতুন জমিদার সবাই অবগত ছিলেন, তারা জমির মালিক হলেও এই মালিকানা ছিল শর্তাধীন। জমিতে রায়তের অধিকার ছিল। সে অধিকারের উৎস ছিল প্রচলিত প্রথা ও রেওয়াজ। ইচ্ছে করলেই রায়তের প্রদেয় খাজনার হার বৃদ্ধি করা যেতোনা

আর ইচ্ছে করলেই কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না। খাজনার হার নির্ধারিত হতো পরগনা নিরিখ অনুসারে, চুক্তি অনুসারে নয়। পরগনা নিরিখ উপেক্ষা করে খাজনার হার বৃদ্ধি করলে প্রজাকুলের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করলে তদনুপাতে খাজনা বৃদ্ধি করা ছিল সুকঠিন কাজ। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে খাজনা মওকুফ করতে বাধ্য হতো জমিদার। ভাল ফসল ঘরে আসলে কৃষিপণ্যের মূল্য কমে যেতো এবং ভাল ফসলের সুবিধা থেকে কৃষক বঞ্চিত হতো। তা হলে জমিদার কোন্ অর্থনৈতিক যুক্তিতে জমির উন্নয়নে পুঁজি বিনিয়োগ করবে ?

তবে কৃষির উন্নয়নে না হোক, কৃষির সম্প্রসারণে অনেক জমিদার পরোক্ষ অবদান রেখেছেন। কৃষিযোগ্য পতিত জঙ্গলভূমি আবাদ করার জন্য অনেক জমিদার আবাদ তালুক সৃষ্টি করে নামেমাত্র খাজনায় মধ্যস্বত্বাধিকারীর কাছে তা বন্দোবস্ত দেন। বস্তুত নগদ সেলামি দিয়ে মধ্যস্বত্বাধিকারীরা তালুক কিনে নেন এবং বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করে ঐ সব পতিত জমি কৃষিযোগ্য করে তোলেন। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের পুঁজি বিনিয়োগ ও উদ্যোগের ফলে উনিশ শতকে কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান প্রধান আবাদ-এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের সমগ্র উপকূল অঞ্চল, নোয়াখালীর উপকূল অঞ্চল, মেঘনা ব-দ্বীপ এলাকা, সুন্দরবন এলাকা, বরেন্দ্র এলাকার অনেক অংশ এবং উত্তর-পূর্ব বাংলার হাওর অঞ্চল। আঠারো শতকের শেষ সিকিতে ঐসব অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, এবং মধ্যস্বত্বাধিকাবীদের আবাদ আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে এগুলি শ্যামল শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়।[২২] ১৭৭০-এর দশকে রেনেলকৃত জরিপে সুন্দরবন এলাকাকে দেখানো হয়েছে "জনশূন্য, তবে একদা জনপদবহুল"। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ঐ অঞ্চল আবার জনাকীর্ণ হয়ে উঠে। আবাদ আন্দোলনের ফলে সুন্দরবন এলাকা কেমন অর্থনৈতিক রূপ ধারণ করে এ সম্পর্কে একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয় :

> দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃক্ষবেষ্টিত গ্রাম আর গ্রাম। কিন্তু সুন্দরবন এলাকায় দেখা যায় একটি ভিন্নরূপ। তাকিয়ে দেখুন, এ যেন একটি মহা প্রান্তর, উভয়দিকে প্রসারিত মাইলের পর মাইল সোনালী ধানে ভরা সমতল মাঠ। দোলা খাওয়া ধান্যভূমির সমুদ্র মিশে গেছে ভাটির বনভূমির নীলিমায়। এই চিত্র শুধু ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, যেখানে বছরের পর বছর চলেছে আবাদ অপারেশন।[২৩]

২২. হাওর অঞ্চল আবাদ হয়েছে অনেক পরে। জনসংখ্যার চাপের মুখে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে এই অঞ্চল আবাদ হতে থাকে। আবাদি কৃষক আসে পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি বর্তমান বৃহত্তর জেলা থেকে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *Villages in the Haor-Basin of Bangladesh,* (Tokyo 1985), দ্বিতীয় অধ্যায়।

২৩. *Annual Report on the Internal Trade of Bengal, 1876-77,* (Calcutta 1877), 27.

উনিশ শতকের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বোধ হয় কৃষি সম্প্রসারণ। দেশের অর্থনীতির অন্য কোন খাতে এত বিস্তার দেখা যায় নি। জঙ্গলভূমি পরিষ্কার করে আবাদকাজ পরিচালনা অবশ্যই দেশের কৃষি-অর্থনীতির বড় দিক, যে বিষয়টি এখনো পণ্ডিতদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। উনিশ শতকের কৃষি-অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যে জমিদারদের ভূমিকা অতিশয় গৌণ। এটা ছিল মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণীর প্রায় একক কৃতিত্ব। আবাদ সংগঠনে জমিদারদের ভূমিকা ছিল আবাদকার তালুকদারদের কাছে জঙ্গলভূমি চিরস্থায়ী ইজারা দিয়ে দেয়া। আবাদকার তালুকদারগণ কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে ভূমিতে আরেক ডিগ্রি চিরস্থায়ী ইজারা স্বত্ব সৃষ্টি করেন। এমনিভাবে আবাদকাজ সম্পন্ন করে ভূমি কৃষিউপযোগী করা পর্যন্ত আবাদকার তালুকদার থেকে কৃষক পর্যন্ত কয়েক দফা মধ্যস্বত্ব স্তর সৃষ্টি হয়। মধ্যস্বত্বের স্তর গ্রাম পত্তনকারী প্রধান কৃষক পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে উপর থেকে নীচে পর্যায়ক্রমে মধ্যস্বত্বগুলি সৃষ্টি হয়েছে ভূমির আবাদকে মূল লক্ষ্য বিবেচনা করে। আবাদের পর ভূমি থেকে যে আয় হবে সেটার উপর লক্ষ্য রেখেই সবাই মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। আবাদের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পুঁজির এবং সে পুঁজির বৃহদংশ সরবরাহ করেছে আবাদকার তালুকদার এবং তাদের অধীনস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ। গ্রাম পত্তনকারী নেতাও ছিলেন একজন মধ্যস্বত্বাধিকারী, তবে তিনি তাঁর স্বত্বের জন্য প্রধানত বিনিয়োগ করেন শ্রম। সকল স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারীর লক্ষ্য ছিল কৃষকের উদ্বৃত্ত থেকে মুনাফা অর্জন। সুন্দরবন আবাদ অঞ্চলের খাজনার হার থেকে মধ্যস্বত্বের মুনাফার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ১৮৪০-এর দশকে সেখানে এক কানি (১ কানি=২.৬৫ একর) জমির খাজনার হার ছিল ছয় টাকা। জমিদার থেকে নিম্নতম স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারীর মধ্যে উক্ত খাজনা ভাগাভাগি হতো। এ ভাগাভাগিতে জমিদারের অংশ ছিল নামেমাত্র, কারণ সেলামি গ্রহণ করে তারা জমি চিরস্থায়ী ইজারা দিয়ে দেন আবাদকার তালুকদারের কাছে।

দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি অর্থনীতিতে মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল উনিশ শতকে। মধ্যস্বত্বাধিকারীর পুঁজি বিনিয়োগ ও সংগঠন ছাড়া উনিশ শতকের আবাদ আন্দোলন মোটেই গতিলাভ করতে সক্ষম হতো না। কিন্তু মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর বিনিয়োগ পুঁজিবাদের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন না করে মধ্যস্বত্বাধিকারীরা অচিরেই নির্দিষ্ট খাজনা ও সেলামির বিনিময়ে আরেক দফা মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে নিজেদেরকে অনর্জিত আয়ের উপর নির্ভরশীল পরজীবী শ্রেণীতে পরিণত করে। দ্বিতীয় স্তরের মধ্যস্বত্বাধিকারী সৃষ্টি করে তৃতীয় স্তর, তৃতীয় স্তর হতে সৃষ্টি হয় চতুর্থ স্তর। এমনিভাবে জমিদার থেকে আসল চাষী এ দুই শ্রেণীর মধ্যখানে সৃষ্টি হয় বহু স্বত্বস্তর। দক্ষিণ বঙ্গে এই সব স্বত্বস্তরকে বলা হতো সেকা। সেকার উপর সেকা সৃষ্টির মানে মধ্যস্বত্বাধিকারীসহ কৃষককুলের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, কারণ প্রত্যেকটি সেকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছুটা লাভের উপর। একই জমির উপর এতগুলো সেকার মানে একদিকে কৃষকের উপর জুলুম, অন্যদিকে মধ্যস্বত্বাধিকারীর দারিদ্র্য।

ইংল্যান্ডের ইজারাদারদের মতো বাংলার মধ্যস্বত্বাধিকারী নামে স্থায়ী ইজারাদারগণও ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিবাদী পরিবর্তন করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। কেন মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ পুঁজিবাদী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে নি এ নিয়ে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা যায়। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী পুঁজিবাদী নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে এরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে আবাদপ্রক্রিয়ার সময়। পতিত জমি আবাদ পর্ব শেষ হয়ে গেলে সাধারণ জমিদারদের মতো মধ্যস্বত্বাধিকারীরাও নিজেদের খাজনাজীবী শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে। ভূমি ব্যবহারে তাদের কোন ভূমিকা না থাকায় এবং কৃষিকাজের সঙ্গে কোন সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় মধ্যস্বত্বাধিকারী ভূস্বামীগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে যাত্রা করে, গ্রহণ করে কোন না কোন শহুরে পেশা। কৃষকদের থেকে সংগৃহীত খাজনা পাচার হয় শহরে। শহরে গ্রামীণ সম্পদ পাচার বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাংলার অর্থনীতির এক বড় বৈশিষ্ট্য। জমিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী, ইজারাদার ও অন্যান্য ভূস্বামী শ্রেণীর গ্রামত্যাগ পল্লীর সনাতন আর্থকাঠামোকে চরমভাবে আঘাত করেছে। পল্লীর কাছারি, সালিশ, গ্রাম-পঞ্চায়েত, মেলা, পুণ্যাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূলে আঘাত আসে। গৃহনির্মাণ, পুকুর-ঘাট-জলাশয় নির্মাণ, চারু-কারুশিল্প, যোগাযোগ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সমুদয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে পড়ে। ম্রিয়মান হয়ে যায় গ্রামের সনাতন কর্মচাঞ্চল্য।

ফসলবিন্যাসের দিক থেকে উনিশ শতকে যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সুতী ও রেশমবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হতো। এটা সম্ভব ছিল এজন্য যে, চট্টগ্রাম থেকে পূর্ণিয়া পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন মানের তুলা উৎপন্ন হতো। সর্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদিত হতো ঢাকায়। আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে তাঁতজাত পণ্য রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকায় তুলার চাহিদাও হ্রাস পেতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই আনুপাতিক হারে তুলার আবাদও কমতে থাকে। তুলার আবাদ নগণ্য পর্যায়ে নেমে আসে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে। কারণ তখন তুলাজাত পণ্যের রপ্তানিও নেমে আসে প্রায় শূন্যের কোঠায়। একই সময়ে বৃদ্ধি পায় নীলচাষ। এদেশে নীলচাষের প্রচলন ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। তবে এর আবাদ ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বিশ্বযোগাযোগের উন্নয়ন ও বিশ্ববাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের প্রথম থেকে নীলের আবাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীল আবাদ বৈপ্লবিক হারে বৃদ্ধি পায় লর্ড বেন্টিংক-এর শাসনামলে এবং এর পরবর্তী দুই দশকে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে উদ্বৃত্ত ফসল স্বদেশে প্রেরণের প্রয়োজনে তাদের রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নীল ছিল এই বাণিজ্যিক ফসলের অন্যতম। কিন্তু বিবিধ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কারণে নীল-অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৫০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার নীলের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে এবং স্বাভাবিক কারণেই এর সঙ্গে কমতে থাকে নীল আবাদ। চাষীদের জন্য নীলচাষ একটি অত্যাচারের

মাধ্যমে পরিণত হয়। নীল উৎপাদনে অনিচ্ছুক চাষীদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে অবশেষে ইউরোপীয় নীলকরেরা নীলচাষে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৮৬০-এর দশকে বাংলায় নীলচাষ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

অচিরেই নীলের স্থান দখল করে আরেকটি অর্থকরী ফসল, পাট। নীলের মতো পাটও এদেশে উৎপন্ন হতো সুপ্রাচীন কাল থেকেই। কিন্তু তখন এর ব্যাপ্তি ছিল গৃহস্থালী প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাটের তেমন কোন বাণিজ্যিক আকর্ষণ ছিল না। ইউরোপীয় বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাট উৎপাদন শুরু হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি পাটের আবাদ ছিল অতিশয় নগণ্য। ব্যাপক হারে পাটচাষ এবং পাট-আঁশের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় ১৮৭০-এর দশক থেকে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে পাট বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেয়। কৃষি-আয়ের উৎস হিসেবে পাটকে তখন তুলনা করা হয় স্বর্ণের সঙ্গে। কিন্তু এই স্বর্ণ-আঁশের স্বর্ণযুগ শেষ হয় ১৯২৬ সনে, যখন পাটের বাজারে মন্দা শুরু হয়। ১৯৩০ সনে পাট-অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। পাট ছিল বিশ্বমন্দার অন্যতম শিকার।

বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাস রচনায় তুলা, নীল, আফিম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব ফসলের সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলার কৃষককুল ও অন্যান্য মধ্যবেপারির ভাগ্য। জাতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সকল গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসলের উত্থান-পতনের একটি সমন্বিত ইতিহাস রচনা আমাদের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন প্রচেষ্টাকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি অর্থকরী ফসলের উপর কোন বিস্তারিত বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস রচিত হয় নি। অনেক সুযোগ্য অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এ মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এদেশে বাণিজ্যিক ফসলের প্রবর্তন করা হয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। নগদ অর্থে খাজনা সংগ্রহ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের উদ্বৃত্ত স্বদেশে প্রেরণের জন্য কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া রপ্তানির চেয়ে আমদানি অধিক হওয়ায় বাণিজ্যিক ঘাটতি পরিশোধ করার জন্যও নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাঁদের মতে, বাংলার কৃষককুল খাদ্যশস্যের পাশাপাশি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, বাধ্য হয়ে। এই তত্ত্বের সমর্থকগণ যুক্তি দেন যে, অর্থকরী ফসল চালু করা হয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে মোটেই নয়। তাঁরা আরো মনে করেন যে, বাণিজ্যিক ফসল প্রবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের আবাদ স্বাভাবিক কারণেই হ্রাস পায় এবং এর প্রভাবে দেশে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁদের মতে, বাংলার কৃষকরা বাজারমূল্য সম্পর্কে ছিল উদাসীন এবং বাজারমূল্য কৃষকের উৎপাদন-সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নি।

তবে এই তত্ত্বের সারবত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রথমত এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, নীল, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি অর্থকরী ফসল এদেশে নতুন প্রবর্তিত

হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও দেশী ও বিদেশী জাহাজের চালানে নীল ও পাটজাত পণ্য, বিশেষকরে চটের থলের উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন আঠারো শতকে তুলার আবাদ ছিল ব্যাপক এবং পাট ও নীল আবাদ ছিল নগণ্য। কিন্তু উনিশ শতকে তুলার আবাদ নেমে আসে এবং বেড়ে যায় নীল ও পাটের আবাদ। উনিশ শতকের শেষপাদে পাটের আবাদ তুঙ্গে উঠে, কিন্তু নীলচাষ নেমে আসে সর্বনিম্নে। এই সব পরিবর্তন ঘটেছে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজার অবস্থার পরিবর্তনের ফলে। চাষীরা বাজারমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে বিশেষ অর্থকরী ফসলের আবাদও কমিয়েছে বা বাড়িয়েছে। কোন ফসল যদি অন্য ফসলের তুলনায় কম লাভজনক মনে হতো, তখন কৃষকরা অবশ্যই এর আবাদ কমিয়ে দিত, এমনকি বন্ধ করে দিত, যেমন ঘটেছে তুলা ও নীলের ক্ষেত্রে। প্রথম প্রথম চাষীরা নীলচাষে আগ্রহী ছিল, কেননা তখন এর বাজারমূল্য ছিল সুবিধাজনক। কিন্তু ১৮৫০-এর দশকে নীলের মূল্য পড়ে গেলে কৃষকরা এর আবাদে অনাসক্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজ নীলকরগণ নীল আবাদ করতে কৃষকদের চাপ দিলে কৃষকরা এর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে।

এ মর্মে যথেষ্ট প্রমাণ নেই যে, বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে কৃষকরা বাধ্য হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক ফসলের দরুন খাদ্যশস্যের আবাদ কমে যায় এবং কৃষক শ্রেণী খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। সবক'টি অর্থকরী ফসল একই সময়ে সারাদেশে উৎপাদিত হতো না। যেমন নীল ও পাটের ব্যাপক আবাদ একই সময় ঘটে নি। তাছাড়া অর্থকরী ফসল ফলানো হয়েছে খাদ্যশস্যের বদলে নয়। ধান ও পাটের জমি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাট উৎপাদিত হতো নিম্নভূমিতে, যা ধান বা অন্য কোন খাদ্য-ফসল চাষের জন্য অনুপযোগী।[২৪] এ যুক্তিও প্রমাণিত নয় যে, চাষীরা পাটচাষ করেছে মহাজনদের চাপের মুখে। এ ব্যাপারে আকবর আলী খান যুক্তি দেন যে, চাষীরা আসলে পাটের মতো অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করেছে বাজার অর্থনীতির কারণে, মহাজনের প্রভাবে নয়।[২৫]

কিন্তু আকবর আলী খানের যুক্তিতে আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। চাষীরা যদি খানের মতানুসারে মূল্যমুখী (price-responsive) হয়ে থাকে এবং তারা যদি উৎপাদনক্ষেত্রে অন্ধ ঐতিহ্যের অনুসারী না হয়ে থাকে, তাহলে বাংলার সনাতন খোরাকি কৃষিতে (subsistence agriculture) পুঁজিবাদী পরিবর্তন সূচিত হয় নি কেন? এ ব্যাপারে জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামী শ্রেণীকে কোন পুঁজিবাদী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় নি। এদের ব্যর্থতার ফলে সরকার কৃষিকে অধিকতর গতিশীল করে তোলার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনের সংস্কার করে ভূমিতে কৃষকের সীমিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫)-এর উদ্দেশ্য ছিল উপরস্থ কৃষকদের উদ্বৃত্ত যেন জমিদারগণ হরণ

২৪. এ প্রসঙ্গে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Akbar Ali Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal 1890-1914: A Neo-Classical Analysis*, (Dhaka 1982), 45-72.

২৫. ঐ, 113

করতে না পারে। আশা করা হয়েছিল, উপরন্তু রায়তের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হলে সে সঞ্চয় পুঁজি গঠনে সহায়তা করবে এবং কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সৃষ্টি হবে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে খাজনা বৃদ্ধি করা খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় যে, তিন দশকের মধ্যে কৃষকের উপর জমিদারি খাজনার চাপ বিপুলভাবে কমে আসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কৃষকদের খাজনার হার মোট উৎপন্ন ফসলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ দাবি করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম সিকিতে সে খাজনার হার নেমে আসে উৎপন্ন ফসলের ষোল ভাগের এক ভাগ থেকে বিশ ভাগের এক ভাগে।[২৬]

তবে ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী পরিবর্তন আনার নীতিও দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। ১৮৫৯ সাল থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রজাদেরকে ভূমিতে স্বত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়াতেই প্রণীত হয় ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে এই আইনকে কৃষকের অধিকারের এক মহাসনদে পরিণত করা হয়। কিন্তু ভূমিতে প্রজার স্বত্ব সৃষ্টির যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তা মোটেই সফল হয় নি। কৃষকের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী পরিবর্তন ঘটে নি। বরঞ্চ, এর ফলে সমাজকাঠামোর অনেক নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষক শ্রেণী জমি হস্তান্তরের অধিকার প্রাপ্ত হলে গ্রামে কৃষক পর্যায়ে একটি ভূমিবাজার সৃষ্টি হয়। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অচিরেই ভূমি নিয়ন্ত্রণে বিরাট বৈষম্য প্রকাশ পায়। গ্রামের জমি কতিপয় শক্তিমান জোতদারের হাতে পুঞ্জীভূত হবার প্রবণতা দেখা দেয়। এ প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যায় যে, ১৯৩০-এর দশকে এসে রায়ত শ্রেণীর এক বিরাট অংশ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র কৃষকে পরিণত হয় আরেকটি বড় অংশ। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয় গ্রামের জমি, কিন্তু ঐ মুষ্টিমেয় বড় জোতদার পুঁজিবাদী মালিকে পরিণত হয় নি। পুজিবাদী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করে এই সব জোতদার সামন্ত মডেলে বর্গাদার বা আধিয়ার নামে ভাগচাষীর মাধ্যমে উৎপাদনব্যবস্থা চালিয়ে যায়। ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকগণ এখন জোতদারের বর্গাদার, পুঁজিবাদী নিয়মে বেতনভোগী মজুর নয়। বর্গাদার কৃষক অবশ্যই পুঁজিহীন। অতএব বর্গাদার কর্তৃক ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগের প্রশ্ন উঠে না। এর সামগ্রিক ফল দাঁড়ায় এই যে, জমিতে উৎপাদন বাড়ে নি। মালিক হিসেবে জোতদাররা ফসলের অর্ধেক অংশ হস্তগত করতো। মুনাফার দিক দিয়ে বিচার করলে জোতদারগণ জমি বর্গা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, কেননা অনুন্নত পুঁজিবাদী কৃষি-সম্পর্কে বর্গার চেয়ে অধিক মুনাফা

২৬. মনে রাখা দরকার যে, গোটা দেশের জন্য কোন একক খাজনার হার বলবৎ ছিল না, কোন জেলায়ও না। এমনকি একটি বিশেষ পরগনার মধ্যেও কোন একক খাজনার হার বিদ্যমান ছিল না। খাজনাকাঠামোর দিক থেকে প্রতিটি মৌজাই ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। খাজনার হার অনেকাংশে নির্ভর করেছে জমির উৎপাদনক্ষমতার উপর। তবে কৃষি-স্বত্বও ছিল খাজনাহারের একটি নিরূপক। আবাসিক স্থিতিশীল রায়তের খাজনার হার অস্থিতিশীল রায়তের খাজনার চেয়ে ছিল অপেক্ষাকৃত কম। রাজস্ব জরিপে দেখা গেছে, উনিশ শতকে এবং এর পরে যে পরিমাণে কৃষকের আয় বেড়েছে সে পরিমাণে খাজনার হার বৃদ্ধি পায় নি।

অর্জন সম্ভব ছিল না। ক্ষতিকর বর্গাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকার কোন আইন প্রণয়ন করে নি, করলেও তা হয়তো কার্যকর করা সম্ভব হতো না। কারণ শহরে শিল্পায়ন ব্যতিরেকে ভূমিহীন কৃষকদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব ছিল না। অতএব, জোতদারের শর্ত মেনে নিয়ে গ্রামে থেকে বর্গাদার হতে তারা বাধ্য হতো। জোতদারি শোষণের বিরুদ্ধে কোন জনমত সৃষ্টি করাও সম্ভব হয় নি, কারণ ১৯১৯ ও ১৯৩০ সালের ভারতীয় আইনের অধীনে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে। জোতদারদের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার জোতদারদের অনুকূলেই আইন প্রণয়ন করে।[২৭]

৪

মানুষের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা কতটুকু ভাল বা মন্দ তা যাচাইয়ের একটি নির্ভরশীল মানদণ্ড হচ্ছে মজুরিসূচক। আরেকটি সমগুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের বাজারমূল্য। মজুরি ও মূল্য—এ দু'টি উপাদান বিশ্লেষণ করলে একটি বিশেষ সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি নির্ভরযোগ্যভাবে জানা সম্ভব। কেননা মজুরি ও মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার একের প্রতি অন্যের প্রাপ্যকে চিত্রিত করে। এই বহুল উদ্ধৃত উক্তি নিরর্থক যে একদা জীবনযাত্রা ছিল এত সহজ যে টাকায় তখন আট মণ পর্যন্ত চাল ক্রয় করা যেতো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এর অর্থ শুধু এই যে, রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে চালের বিনিময়ে রৌপ্য ছিল অনেক তেজি। এর মানে এ নয় যে, গোটা অর্থনীতিই ছিল তেজি। রৌপ্যের উচ্চমূল্য ভোক্তাদের উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা বোঝায় না। অন্য কথায়, রৌপ্যের বাজারমূল্য রৌপ্যের সরবরাহ ও চাহিদাকে চিত্রিত করে, মালিকানা ও বিনিময়-অবস্থাকে চিত্রিত করে না। এক খণ্ড রৌপ্যের যেমন ক্রয়ক্ষমতা আছে, তেমনি আছে এক ইউনিট শ্রমেরও ক্রয়ক্ষমতা। এক ইউনিট শ্রমের বিনিময়ে কতটুকু ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা যায় এটাই নির্ণিতব্য বিষয়। শ্রম ও পণ্যের বিনিময়ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে এক ইউনিট শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য প্রাপ্য পণ্য কম, তাহলে শ্রমবিক্রেতার জীবন হবে দুর্বিষহ এবং পণ্যবিক্রেতা হবে ঐশ্বর্যশালী। এখানে পণ্য বলতে শ্রমের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য অন্য সব কিছুকে বোঝানো হচ্ছে। অসম বিনিময়ব্যবস্থায় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া গেলেও শ্রমিক ক্রয়ক্ষমতার অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগতে পারে বা দুর্ভিক্ষের শিকার হতে পারে। একই যুক্তি খাটে ঐ কৃষকের বেলায়, যে তার শ্রম ও পুঁজি দিয়ে চাল উৎপাদন করলো। সে টাকায় যদি আট মণ চাল বিক্রয় করে আর ঐ টাকায় যদি অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সাথে ন্যায্য বিনিময় না ঘটাতে পারে, তাহলে অভাব-অনটন তার অবশ্যম্ভাবী।

মূল্য ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য খুবই সীমিত, বিশেষকরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি অব্দি। অতএব, আঠারো ও উনিশ শতকের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল এ ব্যাপারে নির্ভরশীল বিবরণ দেয়া কঠিন। তবে যেহেতু প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে দেশ শাসিত হয়েছে একটি সামরিক আভিজাত্য কর্তৃক এবং রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ছিল সমাজের

২৭. George Blyn, *Agricultural Trends in India, 1891-1947,* (Philadelphia 1966), 165-184.

উচ্চশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে, সেহেতু অনুমান করা যায় যে, সম্পদ বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থায় উচ্চশ্রেণীই ভোগ করেছে সম্পদের সিংহভাগ, যদিও সংখ্যায় এরা ছিল নগণ্য। একজন ফৌজদার বা তার সমতুল্য কর্মকর্তার আয় ছিল রাজকীয়। শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠ আয় থেকে শাসক শ্রেণী ভোগ করেছে এমন এক জীবনযাত্রা, যা ছিল সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অনুরূপভাবে কোম্পানি আমল এবং এর পরেও উচ্চ আমলা শ্রেণীর আয় ছিল বিপুল। ১৭৯৩ সালে একজন জেলা কালেক্টরের মাসিক বেতন ছিল অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়া তিন হাজার টাকা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ছিল প্রায় সম অঙ্কের। ঐ সময় যেকোন মফস্বল শহরে টাকায় দুই মণ সরু চাল কেনা যেতো। সুতরাং চালের হিসেবে তখন একজন জেলা কালেক্টরের মাসিক বেতন ছিল ন্যূনতম ছয় হাজার মণ চাল। আর বর্তমানে একজন জেলা কমিশনারের মাসিক বেতন হচ্ছে চালের হিসেবে সর্বোচ্চ তেরো মণ চাল। অতএব নবাবি ও কোম্পানি আমলে শাসক শ্রেণীর জীবনযাত্রা যাচাই করা একটি নিরর্থক চেষ্টা। শাসক শ্রেণী দেশ শাসন করেছে তাদের নিজেদের স্বার্থে। স্বাভাবিকভাবে সম্পদ বিনিময় ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান ছিল অকল্পনীয়ভাবে অসম ও অন্যায্য। তবে সাধারণ মানুষের জীবনমান তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া অবশ্যই অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের একটি পরম কর্তব্য।

নবাবি যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে কোন স্থানীয় উপাদান এখনো উদঘাটিত হয় নি। অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের নথিপত্রে মজুরির হার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে বিদেশী কুঠিসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরির হার দেশের সাধারণ শ্রমিকের মজুরির হারকে প্রতিফলিত করে কিনা বলা কঠিন। ইংরেজদের কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি রেকর্ডস (১৭৩৯)-এ বিভিন্ন মজুর শ্রেণীর মাসিক মজুরি নিম্নোক্তভাবে বিধৃত হয়েছে[২৮]:

রাজমিস্ত্রি	৩-০০-০	টাকা
ছুতোর	২-১৫-০	"
কুলি	২-০০-০	"
মাঝি	৩-০০-০	"
ধোবা	১০-০০-০	"
নাপিত	৩-০০-০	"
মশালচি	২-০০-০	"

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাধারণ শ্রমিকদের আয় ছিল অনেক নিম্নপর্যায়ের।[২৯] তবে বাজারমূল্যও যেহেতু ছিল অতিশয় নিম্নপর্যায়ের, ফলে একজন দিনমজুর পাঁচ জনের একটি

---

২৮. Cited in Bhattacharya, *East India Company,* 205.

২৯. Abdul Karim, *Dacca: The Mughal Capital,* (Dhaka 1964), 105.

পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারতো। দুঃসহ অভাব-অনটন তার ছিল না। মোটা চাল তখন টাকায় প্রায় দুই থেকে তিন মণ পর্যন্ত পাওয়া যেতো। অতএব বিদ্যমান বাজারমূল্যে তখন একজন শ্রমিক তার মজুরি দিয়ে পাঁচ-ছয় মণ চাল কিনতে পারতো যা বর্তমানে সম্ভব নয়। নবাবি যুগে বয়নশ্রমিকদের অবস্থা অবশ্য ততোটা ভাল ছিল না। বয়নশ্রমিকের মায়না ছিল মাসিক দু'টাকার কম। ফলে তার অর্থনীতি ছিল খুবই দুর্বল। অভাব ছিল তার নিত্যসঙ্গী।[৩০] কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের অস্তিত্ব প্রায় নেই বলা যায়। কারণ চাষাবাদ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তখন জমির অভাব ছিল না। জমি ছিল সরকারি সম্পত্তি। কৃষক জমি ভোগ করতে পারতো, কিন্তু হস্তান্তর করতে পারতো না। ফলে কৃষকের পক্ষে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হবার সম্ভাবনা ছিল না। পারিবারিক শ্রমে পরিচালিত হতো কৃষিকর্ম। পারিবারিক শ্রমের বাইরে শ্রমের প্রয়োজন হলে প্রতিবেশীর শ্রম ধার করার প্রথা ছিল। শ্রমের সঙ্গে বিনিময় হতো শ্রমের। বিনিময়যোগ্য শ্রম ছাড়াও ছিল কৃষিদাস শ্রম। অভিজাত ও ধনী কৃষক শ্রেণীর লোকেরা দাসশ্রম ব্যবহার করতো। কৃষিদাসের ভাগ্যোন্নতির কোন অবকাশ ছিল না বটে, তবে পরিবারে তার অবস্থান ছিল নিরাপদ। তার ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল মালিকের এবং দাসের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের কোন ঐতিহ্য ছিল না। পরিবারের অন্যান্যদের মতো দাসও ছিল পরিবারের একজন সদস্য, তবে উত্তরাধিকারবিহীন।

আঠারো শতকের শেষ অব্দি কোম্পানিশাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নমজুরি এবং উচ্চমূল্য। ফলে মানুষ আকাল ও দুর্ভিক্ষের শিকার হতো। ১৭৬৭ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত বলা যায় আকাল-দুর্ভিক্ষের যুগ। এ সময়কালে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও অভাবের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বড় শিকার ছিল বয়নশ্রমিক শ্রেণী। এদের শ্রমের বিনিময়ে যা ক্রয় করা যেতো তা দিয়ে জীবন চলতো না। চালের মূল্য ছিল ক্রমোর্ধ্বমুখী, কিন্তু শ্রমের মূল্য স্থিতিশীল থাকায় শ্রমিকের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। ১৭৮৪ সনে ঢাকায় সাধারণ চালের মূল্য ছিল টাকায় এক মণ বা এরও কিছু কম। অর্থাৎ নবাবি যুগের তুলনায় এ মূল্য ছিল প্রায় দ্বিগুণ বেশি।[৩১] স্বল্পমেয়াদী উঠানামা ব্যতিরেকে চালের এই উচ্চমূল্যের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ১৮৪০ অব্দি। তবে, এর পর চালের মূল্য আরো দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। হান্টারের জেলা গেজেটিয়ার (*Statistical Account*) থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৮৪১ থেকে চাল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য ক্রমশ উঠতির দিকে ছিল। ১৮৭০-এর দশকে এসে দ্রব্যমূল্য নবাবি যুগের সূচকে প্রায় পনেরো গুণ বেড়ে যায়, কিন্তু একই সময়ে মজুরির হার বৃদ্ধি পায় মাত্র আধা গুণ।

৩০. ঐ, 105-106

৩১. Mathew Day, the Collector of Dhaka, to the Committee of Revenue, 9 January 1784, in Sirajul Islam, *Bangladesh District Records : Dacca District,* Vol. 1 (1784-1787), (Dhaka 1981), 58.

আমরা তাহলে ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত হতে পারি যে, "তখন সাধারণ মানুষের প্রচুর পরিমাণ খাবারের সামর্থ্য ছিল এবং তাদের অবস্থা আঠারো শতকে অবশ্যই উনিশ শতকের চেয়ে অনেক ভাল ছিল, বর্তমানের সঙ্গে তো এর কোন তুলনাই চলে না।"[৩২] নোয়াখালী জেলা কালেক্টর তাঁর জেলার মজুরি ও মূল্য (১৮৬৫-৬৬) নিরূপণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি সমীক্ষা করেন। তাঁর সমীক্ষা ভট্টাচার্যের দাবিকে সমর্থন করে। কালেক্টরের সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকৃত মজুরি কমেছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।[৩৩] শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা আরো কমেছে উনিশ শতকের শেষার্ধে। জেলা গেজেটিয়ারের তথ্যের উপর নির্ভর করে স্বেন্ডেল এবং ফরায়জী ১৯০১-১৮ সময়কালে গ্রামীণ শ্রমিকের দৈনিক মজুরি চালের নিরিখে নিম্নরূপ বিদ্যমান ছিল বলে মনে করেন[৩৪] :

পশ্চিম বঙ্গীয় জেলা		২.৫ সের
মধ্যবঙ্গীয়	"	২.৫ "
উত্তর বঙ্গীয়	"	৪.০ "
পূর্ব বঙ্গীয়	"	৬.০ "

মনে হয় যে, শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা সবচেয়ে হ্রাস পেয়েছে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গীয় জেলাসমূহে। পূর্ববঙ্গীয় জেলাসমূহে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে ভাল। বস্তুত পূর্ববঙ্গে শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা হতো দু'রকমভাবে—নগদ অর্থে এবং ফসলে। ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো শুধু ফসল তোলার সময়। ফসল তোলার শ্রমিককে মজুরি দেয়া হতো ফসলেই। উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে ঢাকা জেলার ফসল ভাগের নিরিখ ছিল সংগৃহীত ফসলের এক-পঞ্চমাংশ।[৩৫] ভাগ-ফসলে মজুরি দেবার রেওয়াজ ছিল শুধু খাদ্যশস্যের বেলায়। ভাগশ্রমিকগণকে মালিকের বাড়িতে মজুরির অংশ হিসেবে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। নগদ অর্থে মজুর নিয়োগ করা হতো পাট ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে।

৩২. Bhattacharya, *East India Company*, 206

৩৩. Report on the rates of prices and wages in the district of Noakhali in 1865-66, in H Noma and R L. Chakraborty (eds), *Select Records on Agriculture, Land Revenue, Economy and Society of Noakhali District, 1849-1878*, (Dhaka 1990), 60-61.

৩৪. Willem Van Schendel and Aminul Haque Faraizi, *Rural Labourers in Bengal 1880 to 1980*, (Rotterdam 1984), 83-84

৩৫. Sirajul Islam, *Rent and Raiyat: Society and Economy of Eastern Bengal 1859-1928*, (Dhaka 1989), 54

নগদি মজুরগণ মজুরির অংশ হিসেবে মালিকের বাড়িতে সকাল ও দুপুরের খাবার খেতো। ঢাকা জেলার কেওয়াটখালী (১৯১৭) মৌজার মজুরিকাঠামো সম্পর্কে সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার নিম্নরূপ উক্তি করেন :

> সাধারণত হালচাষের সময় শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। যাদের নিজেদের লাঙ্গল-গরু নেই বা অপর্যাপ্ত আছে তারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিনে নেয়। এক পাখি জমি (একরের এক-তৃতীয়াংশ) চাষ করতে মজুরির হার হচ্ছে আট আনা এবং দুবেলা মালিকের বাড়িতে খাবার। পাটশ্রমিকরা পায় দৈনিক আট আনা থেকে বারো আনা এবং দুবেলা মালিকের বাড়িতে খাবার। ধান কাটার মজুর অর্থাৎ দাওয়ালের পারিশ্রমিক হচ্ছে শুধু কর্তিত ধানের এক-পঞ্চমাংশ।[৩৬]

তিরিশের মহামন্দার পর কৃষিশ্রমিকের দরকষাকষিক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। প্রাক-মন্দা যুগের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, উঠতি মূল্য ও ঋণিতা। এসব কারণ এবং পরিশেষে মহাদুর্ভিক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধোত্তর ও বিভাগোত্তরকালে অর্থনীতি এমন মোড় নেয় যে, এর অধীনে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা গতিলাভ করে বিশ শতকের গোড়ার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। সুতরাং আমরা অতি আস্থার সাথেই মন্তব্য করতে পারি যে, পলাশীর পর থেকে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মজুরি বা ক্রয়ক্ষমতা নিম্নগতি লাভ করে এবং এই প্রবণতা আরো গুরুতর হয়ে উঠে মহামন্দার পর থেকে। যুদ্ধোত্তর ও বিভাগোত্তরকালেও মজুরের ক্রয়ক্ষমতার কোন উন্নতি ঘটে নি।

---

৩৬. ঐ, 54

২

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : নবাবি আমল

সুশীল চৌধুরী*

সতেরো শতকে সুবা বাংলাকে 'জান্নাত-আবাদ' বা 'স্বর্গরাজ্য' বলে অভিহিত করা হতো। দ্বিতীয় মুগল সম্রাট হুমায়ুন নাকি স্বয়ং এই আখ্যা দিয়েছিলেন।[১] আওরঙ্গজেবও বাংলাকে 'জাতির স্বর্গ' বলে উল্লেখ করতেন। সত্যিই কোন মুগল ফরমান, নিশান বা অন্যান্য সরকারি নথিপত্রে বাংলাকে 'ভারতের স্বর্গ' জাতীয় আখ্যা ছাড়া উল্লেখ করা হতো না। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির প্রধান জাঁ ল'র মতে সুবা বাংলার এই বর্ণনা যথার্থ।[২] আঠারো শতকের প্রথম ভাগে নবাবি আমলেও যে বাংলা সতেরো শতকের মতো সমান সম্পদশালী ও ক্রমউন্নতিশীল ছিল তার সাক্ষ্য মেলে তখনকার প্রায়-সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস *রিয়াজ-উস-সালাতিন* রচয়িতার লেখায়। তিনিও বাংলাকে 'জান্নাত-উল-বিলাদ' বা 'জাতির স্বর্গ' বলে বর্ণনা করেছেন।[৩] বাংলার অতুল ঐশ্বর্য ও সকল জিনিসপত্রের সুলভতার কথা কিংবদন্তিরূপে সমসাময়িক ইউরোপীয়দের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। ইংরেজ কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট প্রাক-বৃটিশ যুগের বাংলা সম্বন্ধে বলেন : "[তখন] এ রাজ্য ছিল সচ্ছল, ব্যয় বেশি নয়, স্বাধীন রাজ্য পরিচালনার ব্যয় ও দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এদেশের মানুষ কৃষি ও ব্যবসা-

---

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Abul Fazl, Ain-i-Akbari, Vol. 1, Text (ed.) Blochmann, 390, trans., Jarret, Vol II, 122-23; Al Badaoni. Muntakhab-ut-tawarikh, Text (ed.) Maulavi Ahmed Ali, Vol I, 349, trans. Ranking, Vol 1, 458.

২. S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol.3, (London 1905), 160.

৩. Ghulam Husain Salim, *Riyaz-us-Salatin*, Text (ed.) Maulavi Abdul Hak Abid, (Calcutta 1890), 4, trans., Maulavi Abdus Salam, (Calcutta 1904), 4.

বাণিজ্যের কাজে সুখী। তারা প্রাচুর্য ও শান্তিতে জীবন যাপন করতো।"[৪] হ্যারি ভেরেলস্ট নামে ইংরেজ কোম্পানির অন্য এক পদস্থ কর্মকর্তার মতে :

> নবাবি বাংলার সম্পদশ্রীর কারণ তার শিল্পজাত দ্রব্যের সুলভ মূল্য ও গুণগত উচ্চমান, যার জন্য সর্বত্র এসব জিনিসের প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। বড় বড় ইউরোপীয় জাতির রপ্তানি ছাড়াও বাংলার কাঁচা রেশম, বস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে স্থলপথে দেশের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে গুজরাট, লাহোর, এমনকি ইস্পাহান পর্যন্ত রপ্তানি হতো।[৫]

আসল কথা, অর্থনৈতিক জীবনে সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সব অবস্থা তখন বাংলায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। উর্বরা ভূমিসম্পদ কৃষিব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতির অনুকূল ছিল। ফলে বাংলার কৃষিজাত সম্পদ ছিল বিচিত্র ও অফুরন্ত। তাই বাড়তি কৃষিজাত পণ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে সরবরাহ করা সম্ভব হতো সহজেই। সতেরো শতকের প্রায় সব বিদেশী পর্যটকই এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আঠারো শতকেও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির এই ধারা অব্যাহত ছিল।[৬] ওলন্দাজ কোম্পানির মহাফেজখানায় বাংলার বন্দরগুলি থেকে এশীয় বণিকদের যেসব জাহাজ আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল সেগুলির তালিকা আছে। এই তালিকায় জাহাজগুলির গন্তব্যস্থল ও পণ্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, প্রাক-পলাশী বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ চাল, গম, চিনি, ঘি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি হতো।[৭] নবাবি আমলে বাংলায় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন, বিশেষকরে সুতীবস্ত্র ও রেশমের উৎপাদন চরম উন্নতিলাভ করেছিল। এই সময় এসব জিনিস দ্বারা ইউরোপ ও এশিয়ার বিপুল চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছিল এবং তার ফলে অপরিমেয় রূপা/নগদ টাকা এদেশে আমদানি হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার এই রকম উন্নতি সম্ভব হয়েছিল নবাবি শাসনে রাজনৈতিক সুস্থিরতার জন্য। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এধরনের রাজনৈতিক স্থিতি তখন ছিল প্রায় অকল্পনীয়। মুর্শিদকুলী খান প্রতিষ্ঠিত নবাবি শাসন পরবর্তীকালে শুজাউদ্দিন খান ও আলিবর্দী খানের মতো দক্ষ শাসকের পরিচালনায় প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সুবা বাংলায় রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রেখেছিল। মারাঠা ও মগ আক্রমণ সত্ত্বেও বাংলায় শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি মোটামুটি বজায় ছিল। রাজনৈতিক অশান্তি বা অস্থিরতা না থাকায় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উদ্যোগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং নবাবি আমলের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা যে পরবর্তী কোম্পানি শাসনামলের

৪. *Parliamentary Papers*, House of Commons, Vol. VIII, quoted in N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Völ II (Calcutta1968), 230

৫. Verelst to Court of Directors, 5 April 1769, Bengal Public Consultantions, (B.P.C.) Vol 44, f, 324, Para 6.

৬. সপ্তদশ শতকে পর্যটকদের কিছু মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য, S. Chaudhury, *Trade and Commercial Organization in Bengal*, 1650-1720, (Calcutta 1975), 4-5.

৭. ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্রে এশীয় বণিকদের জাহাজের তালিকা পাওয়া যাবে Vereenigde Oost-Indische Compagnie (এর পর থেকে V.O.C) নামক সিরিজে, আগে যার নাম ছিল Kolonial archief (K. A এর পর থেকে)। এগুলি আছে Algemeen Rijksarchief, The Hague-এ।

চেয়ে অনেক উন্নত ছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রিচার্ড বেচার নামে কোম্পানির এক কর্মকর্তা একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তিনি পলাশী যুদ্ধের আগে এবং পরেও অনেকদিন বাংলায় ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "একজন ইংরেজের পক্ষে বিশ্বাস করতে অবশ্যই কষ্ট হয় যে কোম্পানির দীউয়ানি ক্ষমতা অধিগ্রহণের পরে এদেশের লোকের (অর্থনৈতিক) অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না।"[৮]

স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা এবং দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থার জন্য নবাবি যুগে বাংলায় কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানিবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। সন্দেহ নেই, সতেরো শতকেও বাংলার সনাতন শিল্পজাত সামগ্রী এশিয়া তথা ইউরোপে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এশীয় ও ইউরোপীয় বাজারের প্রচণ্ড চাহিদা মেটাতে এসব শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন বহুলাংশে বেড়ে যায়। নবাবি আমলের ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির, বিশেষকরে ওলন্দাজ ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানির পরিমাণ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে। এশিয়া ও ইউরোপের বাজারের চাহিদা মেটাতে বাংলার প্রধান শিল্পজাত সামগ্রীর (বস্ত্র ও রেশম) উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। এখন জানা যায় যে, ইউরোপে রপ্তানি বাদ দিয়ে শুধু এশীয় বণিকরাই আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের শেষদিকে ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে বাংলা থেকে বছরে গড়ে ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম রপ্তানি করতো। নবাবি যুগের বাংলা সম্বন্ধে উইলিয়ম বোল্টস যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এই পরিমাণ রপ্তানির কথা শুনে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি লিখেন, "নানা ধর্ম ও জাতের বণিক—যেমন কাশ্মিরী, মুলতানী, পাঠান, শেখ, সন্ন্যাসী, পাগাইয়া, বেতিয়া এবং আরো অনেকে কাফেলা আকারে বা হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হয়ে অসংখ্য বলদের পিঠে চেপে বাংলা থেকে পণ্যদ্রব্য হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যেতো।"[৯] লিউক স্ক্র্যাফটনের বক্তব্যেও একই রকম চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : "অতি সম্প্রতিও এশিয়ার সব প্রান্ত থেকে, বিশেষত হিন্দুস্থানের অন্যান্য অংশ থেকে অসংখ্য বণিক, কখনও কখনও হাজারে হাজারে বণিকের দল শুধু নগদ টাকা এবং বিল (হুন্ডি) নিয়ে বাংলায় আসতো এই প্রদেশের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য কিনতে।"[১০]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, নবাবি আমলে বাংলার অন্তর্বাণিজ্য এবং ইউরোপীয়দের বাদ দিয়েও বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর অর্থ, নবাবদের শাসনে স্বেচ্ছাচার থাকলেও তা চরম উৎপীড়নমূলক হয়ে উঠে নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উৎপাদনশিল্পে

৮. Richard Becher's letter to Governor Verelst, 24 May, 1769, quoted in W K Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report*, reprint, (Calcutta 1962), 183.

৯. William Bolts, *Considerations on Indian Affairs*, (London 1772), 200.

১০. Luke Scrafton, *Reflections on the Government of Indostan*, (London 1760), 20.

নবাবরা উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার ফলে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যে অনুকূল ভারসাম্য (favourable balance of trade) বজায় ছিল এবং "এই গহ্বরে [বাংলায়] সোনা-রূপা অদৃশ্য হয়ে যায়, তা বেরিয়ে যাবার কোন রাস্তাই থাকে না"। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের ভাষায়, "আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমৃদ্ধিশীল অবস্থার কথা ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল।"[১১]

রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থা

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই নির্ভর করে যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থার উপর। সুতরাং নবাবি বাংলার অর্থনেতিক অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তখনকার রাস্তাঘাট ও পরিবহনব্যবস্থার বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। তৎকালীন বাংলার প্রায় সব বর্ণনাতেই পাওয়া যায় যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সুবা বাংলার সর্বত্রই ভাল রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগব্যবস্থা ছিল। তার ফলে জোরালো অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ভূগোলবিদ জেমস রেনেল তাঁর বিখ্যাত *Description of the Roads in Bengal and Bihar* (১৭৮৮) গ্রন্থে আঠারো শতকের বাংলার প্রধান প্রধান সড়কের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। বাংলার প্রধান শহরগুলি, যেমন মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা, পাটনা ও কলকাতার সঙ্গে পূর্বে নেপাল ও ভুটান, দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিংভূম, পালামৌ ও ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমে বেনারস ও গাজিপুর সড়কপথে সংযুক্ত ছিল। তা ছাড়া উত্তর-পশ্চিমে বিহারের বেতিয়া, উত্তর-পূর্বে সিলেট, জয়ন্তিয়া ও খাসপুর এবং দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম ও রাজঘাটের সঙ্গে সংযোগব্যবস্থা ছিল।[১২] এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শুধু প্রধান প্রধান শহরই নয়, বর্ধমান ও নাগোরের মতো ছোট জায়গাতেও দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা ছিল। বর্ধমান থেকে চন্দননগরের মধ্য দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত দু'টি রাস্তা ছিল। তা ছাড়া বর্ধমান থেকে আরো অনেক রাস্তা ধনেখালি, তমলুক, বজবজ, নদীয়া, জলঙ্গী, রাজমহল, রাধানগর, চন্দ্রকোনা, ফারুকাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন পণ্যউৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৩] অনুরূপভাবে কাশিমবাজারও ভাল রাস্তার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কাশিমবাজার থেকে ২৮১ মাইল দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক রাজমহল হয়ে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তা ছাড়া কাশিমবাজার থেকে বর্ধমান, জলঙ্গী, ঢাকা, রামপুর বোয়ালিয়া, মীনথোট, দিনাজপুর, বালিতুঙ্গী (জলঙ্গী নদীর উপর), বীরভূম, মালদা, রাঙ্গামাটি, গোয়ালপাড়া, কান্দি ও সুরুল (বীরভূম) পর্যন্ত নানা দিকে রাস্তা ছিল।[১৪] এ রকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায়।

১১. N. K Sinha, *Economic History of Bengal*, 230

১২. James Rennell, *Description of the Roads in Bengal and Bihar*, (London 1778), 10-69.

১৩. James Rennell, *Journals*, (Calcutta 1910), 97-108

১৪. ঐ।

আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার প্রধান প্রধান শহর ও উৎপাদনকেন্দ্রের সঙ্গে স্থলপথে উত্তর ভারতের সমতলভূমির প্রধান স্থানগুলির ভাল সংযোগ ছিল। একটি প্রধান সংযোগকারী ৫২২ মাইল দীর্ঘ সড়ক কলকাতা থেকে রাজমহল ও কাশিমবাজারের মধ্য দিয়ে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেখান থেকে এলাহাবাদ ও মথুরা হয়ে দিল্লী ও আগ্রা যাওয়া যেতো। বাংলা থেকে মুগল সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছে প্রেরিত ইংরেজ কোম্পানির 'সারমান দূত' এই রাস্তা ধরেই দিল্লী পৌঁছেছিল।[১৫] বাংলার রাস্তাঘাট শুধু যে একটি প্রধান কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে সুবার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রকে সংযুক্ত করেছিল তা নয়, প্রতিটি জেলার মধ্যেই অনেকগুলি রাস্তা ঐ জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেনেল বীরভূম জেলার মধ্যেই নানা রাস্তার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রধান সড়ক নাগোর থেকে দেওঘর, কুমিরাবাদ, মালুতি ও মরাগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নাগোর থেকে সিউড়ি পর্যন্ত তিনটি রাস্তা ছিল। এছাড়া নাগোর থেকে কৃষ্ণনগর, ইলামবাজার, উখরা, দীর্ঘমেয়াদীত (রানীগঞ্জ) এবং সুপুর পর্যন্ত সড়ক ছিল। নবাবি বাংলায় যোগাযোগব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দেশের অভ্যন্তরে সুদূরতম অংশের সঙ্গেও দূরবর্তী শহরের সড়কপথে সংযোগ। এই রাস্তাগুলি যে সর্বদা ব্যবহার করা হতো রেনেল তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন কলকাতা থেকে পাচওয়ারি (সাঁওতাল পরগনা) এবং পাকুড়ের মতো জায়গা পর্যন্ত রাস্তা ছিল। অবশ্য সব রাস্তাই ভাল ছিল না। বিশেষত বারাসত থেকে যশোরের রাস্তা খারাপ ছিল। রেনেল সে বিষয়ে লিখেন, "বারাসত ছাড়ার পর খুব কম রাস্তাই ভাল পেলাম।[১৬] রাস্তাগুলি অত্যন্ত সরু, এবড়োথেবড়ো এবং প্রায়ই ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে গেছে। ফলে হাল দেয়া হলে রাস্তার চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" তবু সমসাময়িক বর্ণনা থেকে সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় যে, নবাবি আমলে বাংলার যোগাযোগব্যবস্থার মান "যন্ত্রশিল্প উদ্ভাবনের আগের মানদণ্ড অনুযায়ী মোটামুটি বেশ ভালই ছিল।"[১৭]

পূর্ব ও উত্তর বাংলার অভ্যন্তরে, বিশেষকরে ঢাকার পূর্বদিকে অবস্থিত অঞ্চলে বহু নদীনালা থাকায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অত ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। তবে এ অঞ্চলের প্রধান স্থানগুলি চতুর্দিকের বড় বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেমন কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত দু'টি রাস্তা এবং আরো দু'টি রাস্তা বাখরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দু'টি রাস্তা ছিল এবং আরেকটি রাস্তা ছিল শ্রীহট্ট হয়ে ঢাকা পর্যন্ত। রেনেল লিখেছেন, পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ রাস্তাই কাঁচা রাস্তা হওয়ায় যুক্তিসঙ্গত কারণে বর্ষাকালে তাদের অবস্থা বেশ খারাপ হতো। স্থলপথে বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্তী মরিচা (ইংরেজ

১৫. K.K. Datta, *Studies in the History of Bengal Suba,* 1740-1770, Vol 1, Calcutta 1936). 391.

১৬. James Rennell, *Journal,* 86-87.

১৭ P J Marshal, *Bengal The British Bridgehead,* (Cambridge 1987), 13.

কোম্পানির নথিপত্রে 'মিরচা' নামে অভিহিত) ছিল যোগাযোগ ও মাল পরিবহনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মরিচা গঙ্গার সঙ্গে জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সংযোগকারী একটি খাড়ির উপর অবস্থিত ছিল। পাটনা থেকে কলকাতায় পণ্য সরবরাহের পথে এখানে বড় বড় নৌকা থেকে পণ্যদ্রব্য ছোট ছোট নৌকায় তোলা হতো। পাটনা ও ফুতুয়া থেকে রেশমবস্ত্র ও সোরাভর্তি নৌকা ভাগলপুর ও কলগং হয়ে মরিচা আসতো। সেখানে শুকনো ঋতুতে নৌকা বদলাতে হতো, কারণ নদীতে তখন খুব কম পানি থাকতো। নদীতে জলের গভীরতা বেশি থাকলে নৌকাগুলি নদীয়া হয়ে কলকাতা যেতো।[১৮] সোনারূপা ও মোটা কাপড় (বনাত) নিয়ে কলকাতা থেকে নৌকা এই পথেই পাটনা যেতো। বস্তুত বাংলা ও উত্তরাঞ্চলের মধ্যে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মরিচা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বাংলার নবাবদের যখনই কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতো বা কোন দাবি কোম্পানির উপর চাপানোর প্রয়োজন হতো, তখন নবাবরা সাধারণত যে উপায় অবলম্বন করতো তা হলো মরিচায় সৈন্য মোতায়েন করা, যাতে কোনদিকেই মাল যাতায়াত করতে না পারে।[১৯] কোম্পানিগুলি আরেকটি পথে মরিচা বাদ দিয়ে মাল পাঠানোর চেষ্টা করতো। সেটা হলো জলঙ্গীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু মরিচা বা জলঙ্গীর মধ্য দিয়ে দু'টি জলপথের কোনটিই কার্যকরী না হলে কিছু পরিমাণ মালপত্র 'জঙ্গলের মধ্য দিয়ে' নিয়ে যাওয়া হতো।

বরাবরের মতো নবাবি আমলেও বাংলায় যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছিল নদীপথ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের অসংখ্য শাখানদী ও খাল দিয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সহজে যাতায়াত করা যেতো। এ প্রসঙ্গে রেনেলের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশকে বিভিন্ন দিকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে যে তাতে সম্পূর্ণ ও সহজতম নৌযোগাযোগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবা যায়। এই প্রাকৃতিক খালগুলি এমন সমান ও সুন্দরভাবে ছড়ানো আছে যে ... আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে বীরভূম ও বর্ধমান সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়া দেশের আর সব অংশেই শুকনো ঋতুতেও কমপক্ষে ২৫ মাইলের মধ্যে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার এক-তৃতীয়াংশ দূরত্বের মধ্যে নৌচলাচলযোগ্য নদীপথ আছে।[২০]

তিনি আরো বলেন যে, বাংলার অভ্যন্তরীণ জলপথে প্রায় ৩০,০০০ মাঝি সর্বদা নিযুক্ত থাকতো। সারা বাংলার ১০ লক্ষ লোকের প্রয়োজনীয় লবণ ও বেশিরভাগ খাদ্যশস্য এই জলপথে সরবরাহ করা হতো। এই অভ্যন্তরীণ জলপথই বাংলার রপ্তানি ও আমদানি

১৮. B. P. C, Vol 14, f 313, 21 Nov 1739

১৯. S. Bhattacharyya, *The East India Company and the Economy of Bengal*, (London 1954), 47.

২০. James Rennell, *Memoirs of the Map of Hindustan*, (London 1793), 245, 335.

বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন ছিল। এ পথে ২ লক্ষ পাউন্ড (প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা) মূল্যের ব্যবসা-বাণিজ্য হতো।[২১]

বাংলার প্রায় সব অঞ্চলের, বিশেষকরে পূর্ব বাংলার মধ্য দিয়ে বহুসংখ্যক শাখানদী, নালা, খাড়ি প্রবাহিত হতো এবং তাতে সহজ যোগাযোগ সম্ভব হতো। এর ফলে বাংলার অভ্যন্তরে সুদূরতম গ্রামেও বণিক ও পর্যটকরা সহজে যাতায়াত করতে পারতো। রেনেল লিখেছেন, "বাংলা, বিশেষকরে বাংলার পূর্বাঞ্চল স্বভাবতই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র, কারণ নদীগুলি এমনভাবে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে যে জনগণ সব প্রধান স্থানেই জলপথে সহজে যাতায়াত করতে পারে।"[২২] ওলন্দাজ পর্যটক স্টাভোরিনাস আঠারো শতকের শেষদিকে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি বলেন :

> বড় এবং প্রশস্ত খাল দিয়ে দেশটি সর্বত্রই বিভক্ত ...এই জলপথেই দেশের সব মালপত্র খুব সহজে এক জায়গা থেকে অন্যত্র পরিবহন করা হয়। নদীর প্রধান শাখাগুলিও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত... তাদের দুই ধারে শহর ও গ্রাম, মনোরম শস্যক্ষেত ও প্রান্তর দেশের শোভা বৃদ্ধি করেছে।[২৩]

আঠারো শতকে কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাতায়াতের দু'টি নদীপথ ছিল। প্রথমটি জলঙ্গী এবং নদীয়ার মধ্য দিয়ে কোশী পর্যন্ত ও দ্বিতীয়টি ভাগীরথী ও সুতির মধ্য দিয়ে বিহারের মুঙ্গের ও পাটনা পর্যন্ত গিয়েছিল। শেষের পথটিই ব্যবহৃত হতো বেশি। কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদীপথ জলঙ্গীর মধ্য দিয়ে পদ্মা এবং তারপর পাবনা এবং ইছামতি হয়ে জাফরগঞ্জ ও ধলেশ্বরী হয়ে ঢাকা পৌঁছায়। সমগ্র পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল নদী-নালা ও তাদের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে এত সুন্দরভাবে সংযুক্ত ছিল যে পণ্যদ্রব্য পরিবহনের ব্যাপারে কোন অসুবিধাই হতো না। আলেকজান্ডার ডাও যথার্থই বলেছেন :

> জলপথে সহজ যোগাযোগব্যবস্থার ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের অনেক সুবিধা হয়েছে : প্রত্যেক গ্রামেই আছে খাল, প্রত্যেক পরগনাতে আছে নদী এবং সমস্ত দেশ জুড়ে রয়েছে গঙ্গা, যার বিভিন্ন মুখ বঙ্গোপসাগরে পড়ছে, ফলে সমুদ্রপথে পণ্যদ্রব্য রপ্তানির পথ হয়েছে প্রশস্ত।[২৪]

এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, সুবিধাজনক প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার যোগাযোগব্যবস্থা যে যথেষ্ট ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুতরাং নবাবি আমলে বাংলার গ্রামগুলি অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ম্ভর ছিল বলে যে

২১. ঐ।

২২. "An unpublished Letter of Major James Rennell, 31 August 1765", *Bengal Past and Present*, July-September 1933.

২৩. J. S. Stavorinus, *Voyage in the East Indies, trans* S. H. Wilcoke, Vol 1, (London 1798), 399.

২৪. Alexander Dow, *The History of Hindostan*, Vol III, 2nd reprint, (New Delhi 1985), lXII.

প্রচলিত ধারণা, তা সহজেই এখন খণ্ডন করা যায়। বস্তুত সুসংগঠিত যোগাযোগব্যবস্থার ফলে বাংলার সঙ্গে একদিকে যেমন বাইরের জগতের ক্রমাগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রধান উৎপাদনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে। ফলে নবাবি যুগে বাংলার গ্রামগুলি অর্থনৈতিকভাবে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করছিল বলে যে ধারণা রয়েছে তা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয় বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে আমলে বাংলার বহু তাঁতী ও অন্যান্য কারিগর বহু দূরদেশের বাজারের জন্যও পণ্য উৎপাদন করতো। বাংলার চাষীরাও তুলা, আখ, গুটিপোকা, তৈলবীজ প্রভৃতি নগদ মূল্যে বিক্রি করা যায় এমন দ্রব্য উৎপাদন করতো। এমনকি নগদ মূল্যে বিক্রিযোগ্য ধান, বিশেষকরে শীতকালের আমন ধানের চাষ করা হতো যাতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে চাল রপ্তানি করা যায়। এ যুগে বাংলার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থনীতিতে মুদ্রার বহুল প্রচলন, যার ফলে সাধারণত রাজস্বও নগদ অর্থে মেটানো হতো। অবশ্য খুচরা বেচাকেনা বা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কড়ির ব্যবহারই বেশি হতো। সমাজের সব শ্রেণীই বাজারে টাকা ধার করতে পারতো, তবে সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে ঋণের শর্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টাকা-পয়সা পাঠানোর উত্তম ব্যবস্থা ছিল। হুন্ডিরও ছিল বহুল প্রচলন। এই যুগে দেশীয় ব্যাঙ্কিং ও টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যবস্থা যথেষ্ট সুসংগঠিত ও উন্নত ছিল।[২৫]

সম্প্রতি জনৈক ঐতিহাসিক[২৬] প্রতিপাদন করেছেন যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলায় "বেশ কিছুটা উন্নত ও সুসংহত অথচ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনীতির" উদ্ভব হয়েছিল। কোন কোন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল খাদ্যশস্যের বাড়তি উৎপাদন। কোথাও আবার নগদ অর্থে বিক্রির যোগ্য ফসল, অন্য কোথাও বিশেষ ধরনের বস্ত্র ও রেশম উৎপাদন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। নানা রকম বাজারের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য বেচাকেনার সুবিধে হয়েছিল। তা ছাড়া বড় বড় পাইকারি বাজারগুলি বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গড়ে উঠেছিল। যেমন মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলায় নবাবি আমলে বাংলার সবচেয়ে বড় শস্যের বাজার ছিল। ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জে ছিল এই রকম আরেকটি বড় পাইকারি বাজার। তা ছাড়া গঞ্জ অর্থাৎ বড় আঞ্চলিক বাজার ছিল বাংলার সর্বত্র। ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো গ্রামের হাটে। হাট বসতো সাধারণত সপ্তাহে দু'দিন। নথিপত্রে দেখা যায়, ১৭৭০-এর দশকে মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামের তেরোটি দোকানের মধ্যে তিনটি ছিল কড়ি বেচাকেনার আর দু'টি টাকা-পয়সা বদলাবার বা ভাঙানোর দোকান।[২৭]

২৫. Marshall, *Bengal*, 13.

২৬. ঐ।

২৭. ঐ, 13.

এই অর্থনৈতিক সংহতির মূলে ছিল জল ও স্থলপথে যোগাযোগব্যবস্থা, যা যেকোন প্রাক-আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী যথেষ্ট সন্তোষজনক ছিল। মধ্য আঠারো শতকের বাংলার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে মূল্যস্তর মোটামুটি এক রকম ছিল। এ থেকে অর্থনৈতিক সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এ চিত্র শুধু বড় শহর ও নদীর কাছাকাছি অবস্থিত নৌপরিবহনকেন্দ্রগুলিতেই মেলে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা দূর গ্রামে শস্যের মূল্যে প্রচুর তারতম্য দেখা যেতো। সেসব জায়গায় অল্প দূরত্বের ব্যবধানেও মূল্যের যথেষ্ট পার্থক্য হতো। এই তারতম্য শুধু এক বছর থেকে অন্য বছরের নয়, একই বছর এক মাস থেকে অন্য মাসের মূল্যস্তরেও যথেষ্ট তারতম্য দেখা যেতো। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল উৎপাদনেও অর্থনৈতিক সংহতির প্রমাণ মেলে। এ ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বণিককুল ও তাদের বিভিন্ন উদ্যোগের কর্মজাল একটি প্রধান ভূমিকা নেয়। এই বণিকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ধনবান, তারা একাধারে ব্যাঙ্কার-মহাজন, জাহাজের মালিক ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী ছিল। তারা সাধারণত নিজেদের গোমস্তা বা কর্মচারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতো।

বাজার, মূল্যস্তর ও মজুরি

ক. *বাজার*

নবাবি বাংলায় বাজার ছিল অসংখ্য। প্রতিটি প্রধান শহর বা গ্রামের নিজস্ব বাজার ছিল। আবার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র নয় এমন যেসব জায়গা, সেখানেও বাজার বা এর কাছাকাছি হাট ছিল। শহরের বাজারে শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়, বিলাসদ্রব্যেরও দোকান ছিল। তখনকার সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদ বর্ধমান শহরের বাজারের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। *সিয়ার-উল-মুতাখেরিনের* লেখক বর্ধমান শহর সম্বন্ধে লিখেন যে, "বিপুল জনসংখ্যা ও খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের জন্য বাংলার শহরগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।" তিনি লিখেন :

> এছাড়া কবি [সুন্দর] রাজার বাজারে হাজার হাজার বিদেশী বণিককে দেখেন। শত শত দোকানদার, অগণিত মণিমুক্তা, বিভিন্ন রকমের সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র বাজারের চতুর্দিকে।...বহু মূল্যবান ও রুচিসম্মত বিলাতী (বিদেশী) দ্রব্য ক্রেতার অভাবে স্তূপাকারে পড়ে আছে। বাজারে সবকিছুই সস্তা এবং সুলভ।[২৮]

এই বর্ণনা বর্ধমান বাজারের বস্ত্র ও অলঙ্কার বিভাগের। সাধারণভাবে শহরের বাজারে সব রকম জিনিসপত্রের নানা দোকান থাকতো। বিজয়রামের *তীর্থমঙ্গলে* তৎকালীন শহরের

---

২৮. Ghulam Husain Khan, *Seir-ul-Mutakherin*, (hereafter *Seir*) Vol II, (Calcutta 1902), 377.

বাজারের বিশেষ ধরনের জিনিসপত্রের নানা দোকানের বর্ণনা পাওয়া যায়।[২৯] ভগবানগোলার বাজার সম্বন্ধে কবি বলেন :

> নৌকা শীঘ্র ঘাটে পৌঁছে গেলে সবাই হরি হরি বলে ধ্বনি তুললো। বাজার দেখে তারা খুব খুশি, পায়ে হেঁটে সারা শহর ঘুরে এলো। চার ক্রোশ (৮ মাইল) জুড়ে বাজারটি দেখতে সুন্দর। অসংখ্য শাঁখারী (শাঁখের কারিগর), কাঁসারী (কাঁসার কারিগর) এবং তাঁতীর মেলা সেখানে। মুদির দোকান সর্বত্র। সবাই বাজারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শস্যের গোলা রয়েছে অসংখ্য।[৩০]

হলওয়েলও লিখেছেন যে, ভগবানগোলা "হিন্দুস্থানে এবং সম্ভবত পরিচিত বিশ্বে শস্য, তেল ও ঘি'র শ্রেষ্ঠ বাজার।" এই প্রধান বাজারটিতে কি পরিমাণ ব্যবসা চলতো তা অনুমান করা যায় যখন আমরা জানতে পারি যে, এখানে শস্যই শুধু বিক্রি হতো বছরে তিন লক্ষ টাকার।[৩১] হলওয়েল নাটোরের রাণী ভবানীর জমিদারিতে বিভিন্ন বাজারের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো ভবানীগঞ্জ, শিবগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ এবং জামালগঞ্জ। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এগুলি প্রধানত শস্যের বাজার ছিল।[৩২] মধ্য আঠারো শতকের কলকাতায় প্রায় ১০/১১টা বাজার ছিল—শোভাবাজার, বাগবাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লস বাজার, বেগমবাজার, জননগর, মন্ডিবাজার, নয়াবাজার ইত্যাদি।[৩৩]

নবাব বা জমিদারের কর্মচারিরা বাংলার সর্বত্র বাজারের সব ব্যাপার দেখাশোনা করতো। জিনিসপত্রের গুণগত মান, দাম, ওজন, মাপ সব তাদের এখতিয়ারে ছিল। এই কর্মচারিরা শহর ও গ্রামাঞ্চলের বাজার ও হাটে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতো। কোতোয়ালের একটি প্রধান কাজ ছিল বাজার রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাতে কোন অন্যায় বা কারচুপি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কর্মচারিরা নিয়মিত ওজন, বাটখারা ইত্যাদি পরীক্ষা করতো, জিনিসপত্রের মান এবং দাম নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতো। কেউ আইনভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি বিধান করা হতো। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এর বহুল প্রমাণ মেলে। শমসের গাজীর পুঁথিতে বলা হয়েছে : "কেউ ওজনে ফাঁকি দিতে বা বেশি দামে বিক্রি করতে কিংবা ঠকাতে পারে না। আইনভঙ্গ করলে কাজি কঠোর শাস্তি দিতেন। ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল।"[৩৪]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, জমিদার বা অন্য রাজকর্মচারিগণ বাজারগুলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতো সেই এলাকায় নিযুক্ত তাঁদের কর্মচারির সাহায্যে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ

২৯. Ramprasad, *Vidyasundar*, 6.

৩০. ঐ, 39-40.

৩১. J. Z. Holwell, *Interesting Historical Events*, (London 1765), 194

৩২. ঐ, 193.

৩৩. B. P. C. Range I, Vol 25, f, 234, *Consultations*, 9 October 1752.

৩৪. *Samser Gajir Punthi, Typical Selections etc., pt.* II, 1853.

মানুষের বিশেষ সুবিধা হতো। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, শুধু শহরই নয়, গ্রামাঞ্চলের বাজারও জমিদার বা নবাবের কর্মচারিদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নইলে *শমসের গাজীর পুঁথিতে* গ্রামাঞ্চলের বাজার প্রসঙ্গে উল্লিখিত তথ্য এত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হতো না। কলকাতার ইংরেজ কোম্পানি বাজারদর, ওজন ও বাটখারা বিষয়ে কড়া নজর রাখতো। কেউ আইনভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি পেতো।[৩৫]

বাংলার নবাবরা, বিশেষকরে মুর্শিদকুলী খান বাজার ও বাজারদরের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর শাসনকাল সম্বন্ধে *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখক বলছেন :

> তিনি খাদ্যশস্যের দাম সস্তা রাখতে খুবই সচেষ্ট ছিলেন, ধনীদের খাদ্যশস্য মজুত করতে দিতেন না। প্রতি সপ্তাহেই খাদ্যশস্যের চলতি বাজারদরের বিবরণী তৈরি হতো এবং গরীব লোকরা সত্যিই কি দাম দিয়ে এসব জিনিসপত্র কিনছে তা তুলনা করে দেখা হতো। যদি দেখা যেতো যে এসব গরীব লোকের কাছ থেকে চলতি বাজারদরের চাইতে এক দামও [পয়সা] বেশি নেয়া হয়েছে, তাহলে তিনি সেই ব্যবসায়ী, মহলদার ও ওজনদারকে নানাভাবে শাস্তি দিতেন। তাদের গাধার পিঠে চাপিয়ে সারা শহরে ঘোরানো হতো।[৩৬]

প্রায় সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাসগুলিতে বলা হয়েছে, শুজাউদ্দিনের রাজত্বকাল "শান্তি ও সমৃদ্ধির" দ্বারা চিহ্নিত এবং তিনি "তাঁর রাজ্য থেকে নিপীড়ন ও স্বৈরাচার নির্মূল করেছিলেন"। আলিবর্দীর রাজত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থগুলির বক্তব্য এই যে, মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার পর তিনি "অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর প্রজাকুলের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং কখনো সেই নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি।"[৩৭] এসব বক্তব্য থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, শুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী উভয়েই তাঁদের রাজ্যের বাজার ও বাজারদর সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।[৩৮]

খ. *বাজারদর / মূল্যস্তর*

আমাদের বর্তমান জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাজারদরের গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। যদিও ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে বিশেষকরে খাদ্যদ্রব্যের কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল বলে মনে হয় এবং সেটা নেহাৎ সামান্যই, "১৭২০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত তেমন লক্ষণীয় এবং উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি" কারো চোখে পড়ে না। অধুনা বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য, যেমন বস্ত্র, কাঁচা রেশম এবং চাল ইত্যাদির মূল্য নিয়ে মূল্যস্তরের গতিবিধি পর্যালোচনা করা হয়েছে।[৩৯] যে পদ্ধতিতে এটা

৩৫. Letter of the Court of Dirctors to Bengal , II February 1756. quoted in Datta, *Bengal Suba*, 462

৩৬. *Riyaz-us-Salatin*, 280-81

৩৭. উদাহরণস্বরূপ, J. N Sarkar (ed), *History of Bengal,* Vol II, (Dhaka 1948) 424, 434, 449, *Seir* Vol I, 325, *Riyaz*, 290-91

৩৮. *Calender of Persian Correspondence*, Vol. II, 191, 197, quoted in K K. Datta, *Alivardi and His Times*, 2nd ed (Calcutta, 1963), 140.

৩৯. K N Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company,* (Cambridge, 1978), 99-104.

করা হয়েছে, মনে হয় তা হলো খাদ্যদ্রবের মোট যোগফল দিয়ে সব পণ্যদ্রব্যের জন্য দেয় মূল্যকে সহজ নিয়মে ভাগ করে পণ্যদ্রব্যের একক মূল্য নির্ধারণ। কিন্তু এতে প্রয়োজনীয় অনেক চলক (variables) হিসাব থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে, যার ফলে ফলাফল বিভ্রান্তিকর হতে পারে। যেমন, বস্ত্রের ক্ষেত্রে অন্তত শ'খানেক নামের বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র ছিল আর তাদের মান বা ধরন অনুযায়ী দামের মধ্যে অনেক তারতম্য হতো। আবার কাপড়ের দাম, সূক্ষ্মতা, মাপ ও কোন্ আড়ং-এ প্রস্তুত তার উপর নির্ভর করা হতো বলে একই ধরনের কাপড়ের দাম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারতো। কাঁচা রেশমের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে নানা প্রকারের রেশম ছিল। একই ধরনের রেশমের দাম আবার কোন্ ঋতুতে উৎপন্ন হয়েছে তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন হতো। সুতরাং বস্ত্র কিংবা রেশমের সঠিক দাম নির্ধারণ করতে হলে কোন্ ধরনের বস্ত্র কি পরিমাণ এবং কোন্ ধরনের রেশম কি পরিমাণ সেটা নিশ্চিতভাবে জানা এবং হিসাব করার সময় প্রভৃতি বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। চালের ক্ষেত্রেও তাই চালের উৎকর্ষের উপর দাম নির্ভর করতো, 'মোটা' চাল কতটা 'মোটা' এবং কোথায় কেনা হয়েছে, দামের তারতম্যের ক্ষেত্রে তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৪০]

বাংলায় পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর, বিশেষকরে ১৭৪০ থেকে মূল্যের হঠাৎ ঊর্ধ্বগতি (আমরা পরে দেখাবো যে মোটেই সেটা সঠিক চিত্র নয়) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে কয়েকটি জিনিসের উপর বড়ো বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৪১] সেগুলি হলো— (ক) ১৭২০ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে "ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বাংলা থেকে রপ্তানির পরিমাণ ও ফলে বাংলায় তাদের সোনারূপা আমদানির পরিমাণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি", (খ) বাংলায় মারাঠা আক্রমণ ও তার ফলে অর্থনৈতিক দুর্দশা, (গ) ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে বাংলার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (ঘ) বাংলার নবাবদের উচ্চহারে শুল্ক ধার্যের নীতি এবং (ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ। একথা অনস্বীকার্য যে, আঠারো শতকের প্রথমভাগে বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর রপ্তানিবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল এবং তার ফলে দেশে সোনা-রূপার আমদানিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সে কারণেই এই সময় বাংলায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিস্তারলাভ করে এবং বাজারে টাকা-পয়সার আমদানিও বাড়ে। তবে বাংলার সমগ্র অর্থনীতি (বা অর্থনৈতিক অবস্থা) ও মূল্যের গতিবিধির উপর এর প্রভাব এ আমলে কতটা, তা আরো নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি[৪২] যে, আঠারো শতকের মধ্যভাগেও বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। সেসময়েও বাংলা থেকে এশীয় বণিকদের রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয়দের চেয়েও অনেক বেশি ছিল। ফলে সোনা-রূপার আমদানি যে

৪০. এ রকম তারতম্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Table 4, Price of Rice, 1729.

৪১. উদাহরণস্বরূপ Datta, *Bengal Suba*, 463-69; Chaudhuri, *Trading World*, 99-108.

৪২. এই সিরিজের প্রথম খণ্ডে আমার লিখিত অধ্যায় 'পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা' দ্রষ্টব্য।

কেবলমাত্র ইউরোপীয়রাই করতো তা নয় এবং তারাই আমদানি সবচেয়ে বেশি করতো তাও নয়। মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেটা প্রধানত আঞ্চলিক ব্যাপার এবং তার প্রভাব নেহাৎ অল্প সময়ের জন্যই পড়েছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ঠিকই, কিন্তু তার ফলে পণ্যদ্রব্যের বাজারে সাধারণভাবে দামের বিশেষ তারতম্য ঘটে নি। বাংলার নবাব এবং জমিদারগণ এসময় আবওয়াব (বাড়তি কর) এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক বসিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তার ফলাফলকে অতিরঞ্জিত করা সমীচীন নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাজারদরকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সেখানেও এ ঘটনা নেহাৎই আঞ্চলিক ছিল এবং অল্প সময়ের জন্য ঘটেছিল।

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া যায় যে, বস্ত্র ও রেশম জাতীয় রপ্তানিদ্রব্যের মূল্য এসময় বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাহলে সাম্প্রতিক এক ঐতিহাসিকের মতে একথা বলা যায় যে, এই ধরনের আংশিক বৃদ্ধি (sectoral rise) শুধু উপযুক্ত পণ্যদ্রব্যের চাহিদার তুলনায় সেসব পণ্যের সরবরাহের ঘাটতিকেই প্রকাশ করে, উপরোক্ত সাধারণ অর্থনীতিতে বাজারদরের ঊর্ধ্বগতিকে অনিবার্যভাবে নির্দেশ করে না। বাজারদরের বৃদ্ধি প্রমাণ করার জন্য যেসব জীবনধারণের সামগ্রী (wage goods) ছিল তাদের দামের গতিবিধি লক্ষ্য করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এদের মধ্যে প্রধান হলো মূল খাদ্যদ্রব্য, যেমন চাল, গম ইত্যাদি।[৪৩] তবে বর্তমানে জ্ঞাত তথ্য থেকে এরকম কিছু নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, কারণ সঠিক তথ্যের অভাবে ভুল সিদ্ধান্তের খুবই আশঙ্কা আছে। প্রধান খাদ্যদ্রব্যেরও আবার নানা রকম মাত্রাভেদ আছে, বিশেষকরে চালের ক্ষেত্রে বহু মানের চাল লক্ষণীয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের দাম থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে সঠিক তথ্যের অভাবে মূল্যের গতিবিধি ভয়ানক এলোমেলো হবারই সম্ভাবনা। ১৬৫০ থেকে ১৭২০ সন পর্যন্ত বাংলায় চালের দামের এক সাম্প্রতিক নিরীক্ষা থেকে তা-ই দেখা গেছে।[৪৪] 'কোয়ানটিটি থিওরি অব মানি'কে ভিত্তি করে যে ব্যাখ্যা, তদনুযায়ী নগদ মূল্যে বিক্রীত রপ্তানিদ্রব্যের বৈদেশিক চাহিদার ফলে দেশেও খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে মূল্যস্তরে চাপ সৃষ্টি হয়। সে সম্বন্ধে সম্প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। একজন সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে অর্থ সঞ্চালনের গতিবৃদ্ধির সম্পূর্ণ চিত্র এখনো পাওয়া যায় নি, তবু একথা বলা যায় যে, ইউরোপীয় বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে মোট বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে নগদ টাকা-পয়সা লেনদেনের পরিমাণ যথেষ্ট অনুপাতে বেড়েছিল। তা ছাড়া, আমাদের আলোচ্য

৪৩. Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, (Princeton 1985), 250.
৪৪. ঐ, 251-53.

যুগের দীর্ঘ পরিসরে প্রাকৃতিক নিয়মে জনসংখ্যারও বৃদ্ধি হয়েছিল, যার ফলে উৎপাদন ও লেনদেনের পরিমাণও বাড়ছিল যাতে মাথাপিছু উৎপাদন ও প্রাপ্যের হার না কমে যায়। এসব কারণে সোনা-রূপার আমদানিতে অর্থাগমের গতি বৃদ্ধি পেলেও সাধারণভাবে বাজারদর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।[৪৫]

যাহোক, বাংলার সাধারণ মানুষ যে "উনিশ শতকের চেয়ে আঠারো শতকের প্রথমভাগে আরো অনেক বেশি খেতে পেতো এবং আরো অনেক বেশি ভাল অবস্থায় ছিল" সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৪৬] সাধারণ মানুষের কাছে চালের দাম ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভাতই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। মুর্শিদকুলীর শাসনামলে চালের দাম ছিল টাকায় ৫ থেকে ৬ মণ—এ তথ্য সর্বজনবিদিত। *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখক বলেন যে, চালের মতো অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দামও এতো সস্তা ছিল যে, তখন মাসে এক টাকা খরচ করে "লোকে রোজ পোলাও-কালিয়া খেতে পারতো"। এটা অবশ্যই অত্যুক্তি, তবু আলঙ্কারিক উক্তি বাদ দিয়েও তাঁর বক্তব্য "ভোগ্যপণ্য সস্তা ও সুলভ হওয়ায় গরীব লোকও শান্তি এবং আরামে দিন কাটাতো" খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[৪৭] বস্তুত প্রায় সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস ও ইউরোপীয় কোম্পানির নথিপত্রে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খান খাদ্যশস্যের দাম যথাসম্ভব সস্তা রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি খাদ্যশস্য মজুত করার উপর নিষেধাজ্ঞাই শুধু নয়, প্রয়োজন হলে খরা বা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করে দেয়ার আদেশও দিতেন।[৪৮]

নবাব শুজাউদ্দিন খানের আমলে খাদ্যদ্রব্যের সুলভ মূল্য গল্পকথায় পরিণত হয়েছিল। *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন* ও অন্যান্য ফার্সি ইতিহাসে শুজাউদ্দিনের রাজত্বকাল সুখ ও শান্তির কাল বলে চিহ্নিত হয়েছে। ১৭৮৯ সালে স্যার জন শোর এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, শুজাউদ্দিনের শাসনকাল ছিল "সতর্ক, দৃঢ় অথচ নরমপন্থী এবং সমগ্র নবাবি (মুর্শিদকুলী থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত) আমলের মধ্যে সম্ভবত আলিবর্দীর শাসনকালের শেষ কয়েক বছর ছাড়া যেকোন দিক থেকে শাসনব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের উন্নতি।"[৪৯] শুজার শাসনকালেই ঢাকা শহরের পশ্চিম দিকের তোরণ পুনরায় খোলা হয়েছিল—শায়েস্তা

৪৫. Chaudhuri, *Trading World*, 102, 108

৪৬. *Bhattacharyya, East India Company*, 206.

৪৭. *Riyaz*, 280-81.

৪৮. B. P. C Vol. 6, f. 297, *Consultations*, 12 June 1727; *Riyaz*, 208; Salimullah, *Tarikh-i-Bangla*, f 65 b, quoted in Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963), 73.

৪৯. Shore's Minutes, 18 June 1789 in W K. Firminger, *Fifth Report*, Vol II, 9.

খান বাংলা থেকে চলে যাবার পর এটি বন্ধ করা হয়েছিল এবং চালের দাম যতোদিন না টাকায় আট মণ হবে ততোদিন এটা খোলা বারণ ছিল। তার মানে শুজার সময় চালের দাম টাকায় আট মণে নেমে এসেছিল।[৫০] তিনিও অনটনের সময় খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৫১] গোলাম হোসেন ও করম আলি দুজনেই বলেছেন যে, আলিবর্দীর শাসনকালে সর্বাঙ্গীণ উদারতার পরিচয় মেলে এবং নবাব প্রজাদের কল্যাণ ও সুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।[৫২] আবওয়াব ধার্য করা সত্ত্বেও আলিবর্দীর শাসনকালের শেষভাগে বাংলার প্রজারা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। খাদ্যাভাবের সময় আলিবর্দীর সরকার বাখরগঞ্জ থেকে কলকাতায় চাল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে দ্বিধা করে নি। কলকাতায় বছরে প্রায় ৪০০,০০০ মণ চাল আমদানি হতো শহরের চাহিদাপূরণ ও পুনঃরপ্তানির জন্য। কলকাতার জমিদার হলওয়েল ও চালব্যবসায়ীদের পরামর্শে কলকাতার ইংরেজ কাউন্সিল এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।[৫৩] খাদ্যশস্যের যখনই কোন অভাব হয়েছে, তখন আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে রপ্তানিকৃত চালের উপর শুল্ক মওকুফ করে দিয়েছেন এবং মুর্শিদাবাদে খাদ্যসরবরাহকারী নৌকা থেকে চৌকিগুলিতে কোন শুল্ক নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।[৫৪]

আগেই বলা হয়েছে, মূল্যস্তরের গতিবিধি বিচার করতে হলে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের দাম, যেমন বাংলায় চালের দাম যাচাই করা প্রয়োজন। বস্ত্র বা রেশমের মতো প্রধান প্রধান রপ্তানিপণ্যের মূল্য দিয়ে তা বিচার করা সম্ভব নয়, কারণ এশীয় বণিক ও ইউরোপীয়দের কাছে এসব পণ্যের প্রচণ্ড চাহিদা থাকায় যখনই পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব হতো, তখন এসব পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণও যেহেতু এসব পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটিকে সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধির নির্ণায়ক মনে করেন এবং এটাকে বাংলায় "লক্ষণীয় ও উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি"র প্রমাণ হিসেবে দেখান[৫৫], সেজন্য আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এসব পণ্যের মূল্যের সাধারণভাবে ঊর্ধ্বগতি হয়েছিল কিনা এবং হলে কতটা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এখানে

৫০. J N Sarkar (ed) *History of Bengal*, 427.

৫১. B. P C Range I, Vol. 13, 20 July 1738, Vol. 13 f. 298.

৫২. J. C. Sinha, *Economic Annals of Bengal* , (London 1927), 19

৫৩. B. P C. Range I Vol 26, ff 152-54, 24 May 1753; ff 336-36 vol, 19 November 1753; vol. 27, f 181, 10 June 1754

৫৪. ঐ, Vol 26 ff 336 vo, 19 November 1753.

৫৫. Chaudhuri, *Trading World*, 102.

মনে রাখা দরকার, পূর্বতন ঐতিহাসিকগণও (যেমন কালী কিঙ্কর দত্ত, ব্রিজেন গুপ্ত)[৫৬] আলোচ্য সময়ে বস্ত্র ও রেশমের মূল্য "অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল" বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, ১৭৩৮ ও ১৭৫৪ সালের মধ্যে এসব পণ্যদ্রব্যের দাম অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল। অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থে পি. জে. মার্শালও পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে একই রকমের অভিমত প্রদান করেছেন।[৫৭]

বস্ত্র ও রেশমের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল বলে কালীকিঙ্কর দত্ত ও ব্রিজেন গুপ্তের যে অভিমত তার একমাত্র এবং অন্যতম ভিত্তি ১১ ডিসেম্বর, ১৭৫২ সালের 'বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস'-এ অন্তর্ভুক্ত একটি চিঠির অপ্রাসঙ্গিক অপব্যাখ্যা।[৫৮] উক্ত কনসালটেশনস-এ ঢাকা থেকে ৪ ডিসেম্বর, ১৭৫২ সালে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ আছে, যাতে ঢাকার কুঠিয়ালরা তাদের পাঠানো কাপড়ের নিকৃষ্ট মান সম্বন্ধে কলকাতা থেকে প্রেরিত অভিযোগের উত্তর দিচ্ছে। ঢাকার বক্তব্য, ১৭৩৮ সালের নমুনা দিয়ে ঢাকা থেকে পাঠানো ১৭৫২ সালের কাপড়ের গুণাগুণ বিচার করা মোটেই সমীচীন নয়। ঢাকার কুঠিয়ালরা তাদের পাঠানো কাপড়ের মান কেন নিকৃষ্ট হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে উক্ত চিঠিতে লিখেন,

> কাপাস তুলো গত দু'বছর ধরে ৯ টাকা বা ১০ টাকার নিচে পাওয়া যাচ্ছে না। চালের দামও খুব বেশি। অথচ ১৭৩৮ সালে কাপাসের দাম দুই টাকা আড়াই টাকার বেশি ছিল না। চালও ছিল খুব সস্তা—টাকায় ২ মণ ২০ সের থেকে ৩ মণ। তার উপরে সবাই জানে, সব রকম কাপড়ের দাম ১৭৩৮ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি বেড়ে গেছে। গত দু'বছর ধরে তারা (ঢাকার কুঠিয়ালরা) খুবই ঝামেলায় আছে, কারণ ওখানে (সদ্য প্রতিষ্ঠিত) ফরাসী কুঠির লোকেরা ক্রমাগত মহামান্য (ইংরেজ) কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। এরকম করে তারা মোটা, মিহি সবরকম কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তাদেরও (ঢাকার কুঠিয়ালদের) কাপড়ের দাম ঠিক করার সময় দালালদের প্রতি সদয় হতে বাধ্য হতে হয়েছে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঢাকার কুঠিয়ালরা তাদের পাঠানো কাপড়ের নিকৃষ্ট মান ও বেশি দামের সপক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছে। কোম্পানির কর্মচারীরা সর্বদা

৫৬. Datta, *Bengal Suba*, 464; Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulla and the East India Company*, (Leiden 1962), 33.

৫৭. P. J. Marshall, *East India Fortunes*, (Oxford 1976), 35; *Bengal 73*,

৫৮. *Bengal and Madras Papers*, Vol. II; P. 34, *Fort William Consultations*, 11 December 1752; B. P. C., Vol. 26, f. 214; *Consultations*, 11 December 1752; James Long, *Unpublished Records of the Government*, (ed.) M. P. Saha, (Calcutta 1973), 40, document no. 103.

সততার পরিচয় দিত না তা সর্বজনবিদিত। কাপড়ের মান যেহেতু ১৭৩৮ সালের নমুনা অনুযায়ী হওয়ার নির্দেশ ছিল, একমাত্র সেকারণেই ১৭৩৮ সালকে লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছে, আর কোন কারণে নয়। শুধু সেজন্যই ১৭৩৮ এবং ১৭৫২ সালের মধ্যে কাপড়ের দাম শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে গেছে বলে এত জোর দিচ্ছে ঢাকার কুঠিয়ালরা। তা ছাড়া উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি ভালভাবে পরীক্ষা করলে গত দু'বছর দরের উপর যে জোর দেয়া হয়েছে তা বোঝা যায়। অর্থাৎ তাদের পাঠানো কাপড়ের মানের অবনতি শুধু এ দু'বছরই ঘটেছে, ১৭৩৮ থেকে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত পুরো সময় ধরে ঘটে নি। এসময়ের মধ্যে কাপড়ের দাম প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে বলে উল্লেখ আছে সন্দেহ নেই এবং তা যদি সত্যি হয়, তাহলেও শুধু ঢাকা সম্বন্ধে এটা প্রযোজ্য। এই স্থানীয় মূল্যবৃদ্ধিকে সারা বাংলার সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির সপক্ষে তথ্য বলে মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। উপরন্তু এই তথ্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে, কারণ এ চিঠি দুর্নীতির অভিযোগ স্খালনের প্রচেষ্টায় আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়া আর কিছু নয়। যারা কোম্পানির এই সময়কার নথিপত্র মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তারা সবাই লক্ষ্য করেছেন যে, যখনই কোম্পানির জন্য কেনা পণ্যদ্রব্যের নিকৃষ্ট মান ও চড়াদাম নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, তখনই কর্মচারিরা একই সুরে চাল ও তুলোর অগ্নিমূল্য, এশীয় বণিক ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সাধারণভাবে সকল রপ্তানিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির উল্লেখ করে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছে। এ ধরনের 'তথ্য' বা 'অজুহাত' সম্বন্ধে সাবধানতা প্রয়োজন।

বরং তার চেয়ে বাস্তব তথ্য—সেই যুগের বাংলার বস্ত্র ও রেশমের বাজার থেকে সংগ্রহের মূল্য বিশ্লেষণ করলে তখনকার দিনে এসব পণ্যমূল্যের গতিবিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ যেহেতু ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে বাংলায় বাজারদরের ঊর্ধ্বগতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন (মারাঠা আক্রমণের সঙ্গে যার সমগামিতা লক্ষণীয়), সেহেতু আমরা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি যেসব বস্ত্র রপ্তানি করতো তার প্রধান কয়েকটির ১৭৩০-এর দশকের প্রথমদিকের এবং ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিকের দামের তুলনামূলক নিরীক্ষা করবো। এগুলি ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ মূল্য অর্থাৎ দু'পক্ষের মধ্যে অনেক দরকষাকষির পর ভারতীয় বণিকরা যে নির্ধারিত মূল্যে কোম্পানিকে এসব রপ্তানিপণ্য সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেটা। সুতরাং এই মূল্যতালিকা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। যদিও কোম্পানি কখনো কখনো কাপড় সরবরাহের পর পূর্বনির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য নিতে বণিকদের বাধ্য করেছে, সেটা প্রায় সব সময়ই করেছে নিকৃষ্টতর মানের দোহাই দিয়ে। সাধারণত চুক্তিবদ্ধ মূল্যের পরিবর্তন কখনো করা হতো না।

সারণি ১ : ১৭৩২ ও ১৭৪৪ সালে কতগুলি বিশেষ কাপড়ের দাম

বাণকদের সঙ্গে চুক্তবদ্ধ মূল্য ১৭৩২

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম	
৬০০	কোসা	৪০ কোঃ ভ ৩ কোঃ	১৫ টাকা	আনা
২০০	" মিহি	৪০ " ভ ৩ "	১৮ "	
৪৫০	"	৪০ " ভ ২ ৫/৮ "	১৩ "	
১৫০	"	৪০ " ভ " "	১৬ "	
৭,০০০	" "	৪০ " ভ ২ ১/৪ "	১১ "	
৫০০	" "	৪০ " ভ ২ ১/৪ "	১৪ "	
৪,০০০	"	৪০ " ভ ২ "	৯ "	১২
৬০০	"	৪০ " ভ ১ ৩/৪ "	৮ "	১০
৫০০	"	৪০ " ভ ১ ১/২ "	৭	৮
৮০০	খাসা নাদোনা	২৫ " ভ ২ ১/৪ "	৩ "	১৪
৪০০	মলমল	৪০ " ভ ৩ "	১৫ "	
১০০	মলমল মিহি	৪০ " ভ ৩ "	১৮ "	
৩০০	" "	৪০ " ভ ২ ৫/৮ "	১৩ "	
১০০	" "	৪০ " ভ ২ ৫/৮ "	১৬ "	
৩,৮০০	"	৪০ " ভ ২ ১/৪ "	১১ "	
৪০০	" মিহি	৪০ " ভ ২ ১/৪ "	১৪ "	
১,৬০০	"	৪০ " ভ ২ "	৯ "	১২
৫০০	"	৪০ " ভ ১ ৩/৪ "	৮ "	১০
—	—	— —		
৮০০	"	৪০ " ভ ১ ১/২ "	৭ "	

উপরের সারণি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে রপ্তানির জন্য চুক্তিবদ্ধ দু'টি প্রধান বস্ত্রপণ্যের দাম ১৭৩২ থেকে ১৭৪৪ সালের মধ্যে একেবারেই বাড়ে নি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এগুলি মিহি ও সুতীবস্ত্রের দাম, যেখানে দাম বাড়াটা স্বাভাবিক নয়। আসলে দাম বাড়ছে কিনা সেটা মোটা ও সস্তা কাপড়ের তুলনামূলক দামে ধরা পড়বে। সুতরাং দেখা যাক, কোম্পানির রপ্তানিতালিকায় সস্তা ও

মোটা কাপড়ের মধ্যে যেগুলো বহুলভাবে রপ্তানি হতো, সেগুলোর দামের কতটা তারতম্য এ বছরে হয়েছিল। সারণি ২-এ এরকম কাপড়ের জন্য কোম্পানির সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের চুক্তিবদ্ধ মূল্য দেয়া হলো।

বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য ১৭৪৪

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম	
১,৫০০	খাসা	৪০ কোঃ ভ ৩ কোঃ	১৫ টাকা	আনা
-	-	- -		
১,০০০	খাসা	৪০ " ভ ২ ৮/৫ "	১৩ "	
-	-	- -		
৫,০০০	"	৪০ " ভ ২ ১/৪ "	১৯ "	
-	-	- -		
৩০০০	"	৪০ " ভ ২ "	৯ টাকা	১২
৮০০	"	৪০ " ভ ১ ৩/৪ "	৮ "	১০
৭০০	"	৪০ " ভ ১ ১/২ "	৭ "	৮
২,০০০	খাসা নাদোনা	২৫ " ভ ২ ১/৪ "	৩ "	১৪
৬০০	মলমল	৪০ " ভ ৩ "	১৫ "	
১০০	" মিহি	৪০ " ভ ৩ "	১৮ "	
২০০	"	৪০ " ভ ২ ৫/৮ "	১৩ "	
-	-	- -		
৩০০০	"	৪০ " ভ ২ ১/৪ "	১৯ "	
১৫০	" মিহি	৪০ " ভ ২ ১/৪ "	১৪ "	
১,২০০	"	৪০ " ভ ২ "	৯ "	১২
১,০০০	"	৪০ " ভ ১ ৩/৪ "	৮ "	১০
২০০	" মিহি	৪০ " ভ ১ ৩/৪ "	১০ "	৮
১,০০০	"	৪ " ভ ১ ১/২ "	৭ "	

১৭৪৪ সালের জন্য, V O C. 2629 (K.A, 2521), ff.199-218, হুগলী থেকে বাটাভিয়া, ৪ জানুয়ারি, ১৭৪৪

কোঃ = কোভিদ বা Covid, পর্তুগীজ শব্দ, যার বাংলা অর্থ হাত অর্থাৎ ৪০ কোঃ × ৩ কোঃ হচ্ছে ৪০ হাত ×৩ হাত।

সারণি ২ : মোটা ধরনের কাপড়ের দাম, ১৭৩২ ও ১৭৪৪

বাণকদের সঙ্গে চুাক্তবদ্ধ মূল্য ১৭৩২

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম
৮০০	সানু	২৪ কোঃ ভ ২ কোঃ	৪ টাকা ৮ আনা
৬,০০০	খড়িদারি বা চোরাদারি	১৮ " ভ ২ ১/৪ "	৪ "
৫,০০০	ফোটা	২৪ " ভ ২ ১/৪ "	৫০ টাকা প্রতি কর্জ
২০,০০০	রুমাল (সুতী)	১৫ '" ভ ১ "	৫০ " " "
৪,০০০	দিশী	৪ " ভ ১ ১/২ "	১৩ " " "

বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য ১৭৪৪

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম
১,০০০	সানু	২৪ কোঃ ভ ২ কোঃ	৪ টাকা ৮ আনা
২,০০০	খড়িদারি/ চোরাদারি	১৮ " ভ ২ ১/৪ "	৪ "
৬,০০০	ফোটা	২৪ " ভ ২ ১/৪ "	৫৭ টাকা প্রতি কর্জ
৫০,০০০	রুমাল (সুতী)	১৫ " ভ ১ "	৫০ " " "
১,০০০	দিশী	৪ " ভ ১ "	১৩ " " "

[সূত্র ১ নং সারণি দেখুন। কর্জ (×) হচ্ছে এক কুড়ি অর্থাৎ কুড়িটি]

এই সারণি থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোটা ধরনের কাপড়ের ক্ষেত্রেও একমাত্র মোটা কাপড়ের দামে সামান্য বৃদ্ধির আভাস ছাড়া ১৭৩২ থেকে ১৭৪৪ সালের মধ্যে কাপড়ের দামে কোন তারতম্য হয় নি।

রেশমের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা একটু ভিন্ন চিত্র পাই। নীচের সারণিতে রপ্তানি- পণ্যের মধ্যে অন্যতম এই পণ্যের ১৭৩৩ থেকে ১৭৫৩ পর্যন্ত কয়েক বছরের মূল্যের গতিবিধি পাওয়া যাবে।

সারণি ৩-এ রেশমের মূল্যে যে প্রবণতা দেখা যায়, তা এ যুগে মূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি নির্দেশ করে না। ১৭৩৩ থেকে ১৭৪৫ সাল পর্যন্ত রেশমের দাম বেড়েছে যৎসামান্যই, সুতরাং ১৭৪০-এর দশকে প্রথম থেকে বাংলার মূল্যস্তর অস্বাভাবিকভাবে

সারণি ৩ : কাঁচা রেশমের দাম, ১৭৩৩-১৭৫৩

তারিখ		কোন্ রকমের রেশম	প্রতি সেরের দাম				সূত্র
মার্চ	১৭৩৩	নভেশ্বরবন্দ	৫	টাকা	১২	আনা	KFR, Vol. 5, Consult.7 March 1733
"	"	গুজরাট	৬	"	৬	"	" " " " "
"	"	কুমারখালী	৫	"	১২	"	" " " " "
জানুয়ারি	১৭৪৫	নভেশ্বরবন্দ	৫	"	১৪	"	KFR Vol.6, Consult. 19 Jan. 1745
"	"	গুজরাট	৬	"	৭	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৫	"	১১	"	" " " " "
এপ্রিল	১৭৪৭	নভেশ্বরবন্দ	৯	"	8	"	B.P.C Range, 1, Vol. 19, f. 209 vo., Consult. 22 April 1747
"	"	গুজরাট	৯	"	১৩	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৯	"	১	"	" " " " "
জানুয়ারি	১৭৪৮	নভেশ্বরবন্দ	৯	"	8	"	C & B. Abst. Vol 5, f 114, 10 Jan. 1748
"	"	গুজরাট	৯	"	১৩	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৯	"	১	"	" " " " "
জুন	১৭৪৮	নভেশ্বরবন্দ	৭	"	৮	"	K. F. R., Vol. 7, Consult. 2 June 1748
"	"	গুজরাট	৮	"	১	"	" " " " "
"	"	কুমারখালি	৭	"	৫	"	" " " " "
অক্টোবর	১৭৪৯	নভেশ্বরবন্দ	৭	"	-	"	B. P. C Range 1, Vol 22. ff. 350-50vo., Consult. 31 Oct. 1749

সারণি ৩ : আগের পৃষ্ঠার পর

তারিখ		কোন্ রকমের রেশম	প্রতি সেরের দাম				সূত্র
"	"	গুজরাট	৭	"	৯	"	" " " "
"	"	কুমারখালি	৬	"	১৩	"	" " " "
ফেব্রুয়ারি	১৭৫১	নভেশ্বরবন্দ	৮	"	॥	"	K. F. R., Vol. 10, Consult. 22 Feb. 1751
"	"	গুজরাট	৮	"	৯		" " " "
"	"	কুমারখালি	৭	"	১৩	"	" " " "
"	"	নভেশ্বরবন্দ	৭	"	১২	"	B. P. C., Range 1, Vol. 26, f. 114, Consult. 16 March 1752
"	"	গুজরাট	৮	"	৭	"	" " " "
"	"	কুমারখালি	—		—	—	— — —
এপ্রিল	১৭৫৩	নভেশ্বরবন্দ	৭	"	১২	"	B. P.C. Range 1, Vol. 26, f. 114, Consult. 18 April 1753
মার্চ	১৭৫২	নভেশ্বরবন্দ	৭	"	১৪	"	B. P. C. Range 1, Vol-25, f-86 vo.. Consult. 18 April 1753
"	"	গুজরাট	৮	"	৫	"	" " "

সূত্র : K. F. R. = Kasimbazar Factory Records; B P.C. = Bengal Public Consultations; C & B Abst. = Coast of Bay Abstracts. All in India Office Library, London].

বাড়তে থাকে বলে যে ধারণা এতদিন করা হয়েছে তা মোটেও ঠিক নয়। উপরের সারণিতে দেখা যায়, ১৭৪৭ থেকে ১৭৪৮ সালের মধ্যে রেশমের দাম হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। তবে এটা সাময়িক ব্যাপার, কারণ ১৭৪৮ সালের জুন মাস থেকে দাম আবার কমতে থাকে এবং ১৭৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামান্য বৃদ্ধি ছাড়া মোটামুটি একই ছিল। অর্থাৎ রেশমের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা যে অভিমত প্রদান করেছিলেন তা সঠিক নয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। রেশমের মূল্যের গতিবিধিতে যে কিছুটা এলোমেলো ভাব দেখা যায় তার প্রধান কারণ, রেশম একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের পণ্য, গুটিপোকার চাষ থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরে এর উৎপাদন নানা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন একটি স্তরে কিছু ঝামেলা হলেই উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে, তাতে দামেরও হেরফের হয়। এতসব সত্ত্বেও রেশমের মূল্যের গতিপ্রকৃতিতে কোন স্থায়ী ঊর্ধ্বগতির প্রবণতা দেখা যায় না।

আগেই বলা হয়েছে, মূল্যের গতিবিধি সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য বাংলায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন চালের মূল্য যাচাই করা, কারণ ভাত বাংলার প্রধান খাদ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো চালের নানা প্রকারভেদ নিয়ে, যার উপর নির্ভর করে দামেরও বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। সারণি ৪-এ একটি উদাহরণ দেয়া হলো, যা আমাদের বক্তব্য সমর্থন করছে।

সারণি ৪ : চালের দাম, ১৭২৯

কি ধরনের চাল	দাম	টাকা প্রতি	পরিমাণ	
সরু চাল :				
বাঁশফুল ঃ প্রথম শ্রেণী	"	" "	১ মণ	১০ সের
২য় শ্রেণী	"	" "	১ "	২৩ "
৩য় শ্রেণী	"	" "	১ "	৩৫ "
মোটা চাল :				
দেশনা	"	" "	৪ "	১৫ "
পূরবী	"	" "	৪ "	২৫ "
মুনসুরা	"	" "	৫ "	২৫ "
কুরকাসালী	"	" "	৭ "	২০ "

[সূত্র ঃ *Sixth Report*, Appendix 15]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চাল মোটা না সরু সেটা জানাই শুধু যথেষ্ট নয়, মোটা বা সরুর মধ্যেও আবার তারতম্য আছে। মোটা চালের দামই যখন টাকায় ৪ মণ ১৫ সের থেকে ৭ মণ ২০ সের পর্যন্ত হতে পারে (অর্থাৎ দামের তফাৎ ৭১%)[৫৯], তখন চালের প্রকৃত

৫৯. Chaudhuri, *Trading World*, 99; Marshall, *Bengal*, 73, 142, *Eas. India Fortunes*, 35.

মান কি সেটা নিশ্চিতভাবে না জেনে শুধু সরু বা মোটা চালের দাম থেকে সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিপন্ন করা একেবারে যুক্তিসঙ্গত নয়। তাতে বিরাট ভুলভ্রান্তির ঝুঁকি থেকে যায়। তবুও এধরনের তথ্য এবং অনেক সময় শুধু খণ্ড খণ্ড তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ উক্তি করেন যে, "১৭৩৮ সালে চালের দাম ছিল টাকায় ১০০ থেকে ১২০ সের আর ১৭৪০ সালের মাঝামাঝি টাকায় পাওয়া যেতো মাত্র ৩০ সের।" এটিকে তথ্য হিসেবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, বাংলায় "উৎপাদন কমেছে ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে"[৬০] কিংবা ১৭৪০ থেকে "বাংলার সুবিধাজনক আর্থিক অবস্থা অন্তর্হিত।"[৬১] পূর্বতন ঐতিহাসিকের উপর নির্ভর করে সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞগণও বলেন যে, ১৭৩৮ থেকে ১৭৫৪ সালের মধ্যে "কলকাতায় চালের দাম তিন-চার গুণ বেড়ে গিয়েছিল"।[৬২] এই বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থেও উক্ত বক্তব্যের পুনরুক্তি করা হয়েছে এভাবে—"স্থানীয় অভাব থেকে খাদ্যদ্রব্যের খুবই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।"[৬৩]

এখন দেখা যাক এই বক্তব্য কতটা তথ্যনির্ভর। ১৭৩৮ সালে চালের দাম কত ছিল তার জন্য কালীকিঙ্কর দত্ত এবং ব্রিজেন গুপ্ত[৬৪] উভয়েই নির্ভর করেছেন ঢাকা কুঠিয়ালদের ১৭৫২ সালে কলকাতা থেকে লেখা একটা চিঠির উপর। ঐ চিঠিতে নিম্নমানের কাপড় সরবরাহের অভিযোগের উত্তর দেয়া হয়েছে বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিটা যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লেখা হয়েছে তাই নয়, আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ১৭৫২ সালে ঢাকার কর্মচারিরা ১৭৩৮ সালে চালের দামের কথা লিখছে সম্ভবত অনেকটা কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করেই। তা ছাড়া নিজেদের দোষ ঢাকা দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় সত্যের উপর রং চড়ানোর সম্ভাবনাও বাদ দেয়া যায় না। আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, উক্ত চালের দামের উল্লেখ শুধু ঢাকার প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তথ্যটিও পূর্বে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ঢাকা ও কলকাতায় চালের দাম এক হবে এটা আশা করা ঠিক নয়। তা ছাড়া কোম্পানির নথিপত্রে বহুবার উল্লেখ আছে যে, কলকাতায় চালের দাম প্রায়ই বাখরগঞ্জ ও দৌলিয়া থেকে সরবরাহের উপর নির্ভর করতো। এ সরবরাহে ঘাটতি পড়লে বা তা বন্ধ হলে শহরে 'প্রচণ্ড অভাব-অনটন' দেখা দিত এবং শহরে ক্রমবর্ধমান 'শিথিল অবস্থার' সুযোগ নিয়ে কলকাতার চাল ব্যবসায়ীরা প্রায়ই কৃত্রিমভাবে চালের দাম বাড়িয়ে দিত।[৬৫] প্রকৃতপক্ষে সারণি ৫ থেকে দেখা যাবে, ১৭৩৮ সালে কলকাতায় চালের দাম ছিল মাদ্রাজী টাকায় ৩৮ সের। এই দামেই

৬০. Gupta, *Sirajuddaullah*, 33
৬১. Marshall, *East India Fortunes*, 35
৬২. ঐ।
৬৩. Marshall, *Bengal*, 73. আরো উল্লেখযোগ্য, মার্শাল বলছেন, "১৭৪০-এর দশকে জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ও অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় মূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল।" তিনি অবশ্য প্রধানত কে. এন. চৌধুরীর উপর নির্ভর করেই এ সিদ্ধান্ত টেনেছেন।
৬৪. Datta, *Bengal Suba*, 463-64, Gupta, *Sirajuddaullah*, 33.
৬৫. B. P. C., Vol . 26, ff 56 vo-57, 19 February 1753; ff. 152-154, 24 May 1753; ff. 336-36 vol, 19 November 1753; Vol. 27, f, 181. 10 June 1754, ff 244vo-245, 12 August 1754, ff 378-78 vol, 5, December 1754.

সারণি ৫ : বাংলায় চালের দাম, ১৭৩৮-১৭৫৪

তারিখ	স্থান	টাকা প্রতি	মণ	সের	চালের মান	সূত্র
১২ জুন ১৭৩৮	কলকাতা	প্রতি মাদ্রাজ টাকায়	০ মণ	৩০ সের	মোটা (সৈন্যদের জন্য)	B.P.C, Vol. 13, f 262 Vol.
২৬ মার্চ ১৭৩৯	"	" "	১ মণ	৩০ সের	'খুব ভাল'	" " "
৩১ মে ১৭৩৯	ঢাকা	" দশম "	৯ 'পসারী'(?)		সরু	D. F. R, Vol. 2, Consult. 31 May 1739
"	"	" " "	১১ 'পসারী'(?)		'সাধারণ'	" "
৭ জানুয়ারি ১৭৪৪	কলকাতা	" মাদ্রাজ "	০ মণ	৩০ সের	'মোটা ধরনের'	B.P.C. Vol. 16, f. 40 1 Vol.
"	"	" আর্কট "	১ মণ	– "	মোটা	" " "
২০ সেপ্টেম্বর ১৭৫১	"	প্রতি টাকায়	০ "	৩৫ "	'ভাল'	B.P.C. Vol. 24. f. 323
"	"	" "	১ মণ	১০ "	'সাধারণ'	" " "
২ জানুয়ারি ১৭৫২	কলকাতা(?)	" "	-	৩৫ "	'ভাল'	Beng. Gen. Letters., Vol. 22
"	"	" "	১ "	১০ "	'সাধারণ'	" " "
১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৩	"	" "	০ -	২৩ "	?	H.P., Vol. 3, f. 68, Consult. 11 Feb. 1753
১০ জুন ১৭৫৪	"	" "	০ -	৩২$\frac{১}{২}$ "	'সরু'	B.P.C., Vol. 27, ff. 224 vo. 225
" "	"	" "	০-	৩৫ "	'মাঝারি'	" " "
" "	"	" "	১ "	- "	'মোটা'	" " "
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৫৬	"	" "	০ -	৩৭ "	?	H.P., Vol. 5. f. 712. Consult. 6 Feb. 1756

সূত্র : D.F.R.- Dhaka Factory Records, B.P.C- *Bengal Public Consultations;* Beng-Gen. Letters—Bengal General Letters, all received from India Office Library; H.P.— Home Public Series, National Archives of India, New Dellhi

ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল সৈন্যবাহিনীর জন্য চাল কেনা স্থির করে (এটা মোটা চাল ঠিকই, কিন্তু কি ধরনের মোটা চাল সেটাই প্রশ্ন), যেখানে ১৭৪৪ সালে 'মোটা গোছের' চালের দাম ছিল কলকাতায় মাদ্রাজী টাকায় ৩০ সের। চালের দাম 'প্রচণ্ড' বেড়ে যাওয়ার জন্য চালের আমদানিকারকদের দায়ী করে কাউন্সিল কলকাতার জমিদারকে আদেশ দেয় তিনি যেন প্রতি আর্কট টাকায় ১ মণের কম কাউকে চাল বিক্রি করতে অনুমতি না দেন।[৬৬] নীচের সারণি থেকে আরো দেখা যাবে যে, ১৭৫৪ সালে ভাল সরু চাল টাকায় মাত্র ৩২.৫ সের করে বিক্রি হয়েছে, যেখানে মোটা চাল পাওয়া যেতো আর্কট টাকায় ১ মণ। সুতরাং ১৭৩৮ থেকে ১৭৫৪ সালের মধ্যে চালের দাম তিন-চার গুণ বেড়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের যে বক্তব্য তা মেনে নেয়া যায় না।

সারণি ৪ থেকে চালের দামের হ্রাস-বৃদ্ধির কোন স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠে না। তবে এই সারণি বিশ্লেষণ করতে গেলে একথা মনে রাখা দরকার যে, কতগুলি দাম অনটন ও দুর্ভিক্ষের সময়কার, স্বাভাবিক সময়কার নয়। যেমন ১৭৩৮ সালে চালের দাম। ১৭৩৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বাংলায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও বন্যা হয়, যার ফলে ১৭৩৮ সালে চালের দাম বেড়ে যায়।[৬৭] আবার মারাঠা আক্রমণের পর এবং ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় ১৭৫২ সালে দুর্ভিক্ষ হয়। ৬০ বছরের মধ্যে এমন খাদ্যাভাব কখনো হয় নি। ফলে চালের দাম ১৭৫৩ সালের প্রথমদিকে বেড়ে টাকায় ২৩ সের হয়েছিল। তবে মুর্শিদাবাদে চালের দাম আগের চেয়ে ৬ গুণ বেড়ে গেছে বলে ওরমের যে বক্তব্য[৬৮] তা অত্যুক্তি ভিন্ন কিছু নয়।[৬৯] ১৭৫৩ সালের প্রথম দিকে চালের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া যে নেহাৎই সাময়িক ব্যাপার সেটা ১৭৫৩ সালের শেষে এবং ১৭৫৪ সালে চালের দাম আবার স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

এই পর্যায়ে সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে ও সীমিত তথ্যের জন্য চালের দাম থেকে সাধারণ দামের গতিবিধি নির্ণয় করা যে খুবই কঠিন তা নিম্নের সারণি থেকে বোঝা যাবে।

সারণি ৪-এ প্রদত্ত চালের দামের সঙ্গে সারণি ৫-এ প্রদত্ত চালের দাম মেলানো কঠিন ব্যাপার। তবে এতে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যদিও চালের দামই সাধারণ

৬৬. B. P C. *Range* I, Vol 16, f 401 vol, 7 January 1744.

৬৭. Bhattacharyya, *East India Company*, 214-15, ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে লেখা এক চিঠিতে হুগলীর ফৌজদার পীর খান অভিযোগ করেছিলেন যে, কলকাতা থেকে কোম্পানি এবং ব্যবসায়ীদের চাল রপ্তানির ফলে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। B P. C Range 1, Vol. 13,f, 298, Annexure to Consultations, 20 July 1738.

৬৮. Robert Orme, *Historical Fragments of the Mogul Empire*, (London 1905), 405.

৬৯. মার্শাল কিন্তু খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি দেখাতে গিয়ে এই তথ্য এবং হলওয়েলের কলকাতার দুর্ভিক্ষের বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন, Holwell, *India Tracts*, 2nd edn. (London 1764), 165; দ্রষ্টব্য, Marshal, *Bengal*, 18, 73.

সারণি ৬ : ওলন্দাজ নথিপত্রে খাদ্যদ্রব্যের দাম, ১৭৩০-৩২

খাদ্যদ্রব্য	জানুয়ারি ১৭৩০	মার্চ ১৭৩১	মার্চ ১৭৩২
সরু চাল	প্রতি সিক্কা টাকায় ৩০ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ২০ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ২০ সের
মোটা চাল	" " " ১ মণ ৫ সের	" " " ৩৫ "	" " " ৩৫ "
গম	" " " ২০ "	" " " ৩০ "	" " " ৩০ "
সর্ষের তেল	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা
মাখন	" " " ৮ টাকা ৮ আনা	" " " ১০ টাকা	-
কড়ি	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ

সূত্র : K.A. 2045, ff. 8074-74 vo, K A 2087, f 430; K.A 2133. ff 963-64 চলতি টাকা, যেটাকে বলা হতো 'কারেন্ট রুপি'।

মূল্যবৃদ্ধির প্রধান সূচক, তবু আমাদের আলোচ্য সময়ে সঠিক পরিসংখ্যানমূলক তথ্যের অভাবে চালের দামের উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়। সুতরাং এ সময় বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল কি হয় নি এ বিষয়ে চালের দামের উপর নির্ভর করে সঠিক কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়।

বাংলায় সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ এমনকি অধুনাতম গ্রন্থেও মারাঠা আক্রমণের ফলাফল ও ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপর অযথা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৭০] ১৭৪০-এর দশক থেকে বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে বক্তব্যে যুৎসই তথ্য হিসেবে ইংরেজ কোম্পানির গুদামঘরের দুই কর্মচারি ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ও ম্যানিংহামের রিপোর্টকে ব্যবহার করা হয়েছে।[৭১] আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, এই রিপোর্ট স্ববিরোধী, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ইংরেজদের পণ্যসরবরাহ দাদনি থেকে গোমস্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য উদ্দেশ্যমূলক অত্যুক্তি ছাড়া কিছু নয়।[৭২] সুতরাং এ রিপোর্টকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন। উপরন্তু এই দুই ইংরেজ কর্মকর্তা লিখেছেন যে, "জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলির দাম 'গত দশ-বিশ বছরে' অত্যধিক বেড়ে গেছে।" এই উক্তি থেকে তাঁদের বক্তব্যের নমনীয় ভাবও লক্ষণীয়। যেহেতু তাঁরা ১৭৫৩ সালে লিখছেন, তাতে "গত দশ-বিশ বছরে" মূল্যবৃদ্ধি মানে ১৭৩৩ থেকে মূল্যবৃদ্ধি বোঝাতে পারে, আবার ১৭৪৪ থেকে মূল্যবৃদ্ধিও বোঝাতে পারে। এ একটা অদ্ভুত অবস্থা। অথচ আমাদের বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকেই শুধু "লক্ষণীয় এবং উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি" হয়েছে। অর্থাৎ ১৭৩০ এবং ১৭৪০-এর দশকে মূল্যস্তরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সুতরাং এই দুই ইংরেজের বক্তব্যের একাংশ ("গত বিশ বছর ধরে") অবান্তর হয়ে পড়ছে। মূল্যবৃদ্ধি যদি ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে হয়ে থাকে, তাহলে এই রিপোর্টের বক্তব্য আমাদের বিশেষজ্ঞদের মতের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি, ব্যাপারটি তা নয় অর্থাৎ ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিকে বাংলায় মোটেই লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নি। সুতরাং ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ও ম্যানিংহামের রিপোর্টকে মূল্যবৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসেবে মনে করার কোন কারণ নেই।

অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের মতো উক্ত দুই ইংরেজও তথাকথিত মূল্যবৃদ্ধির জন্য মারাঠা আক্রমণের ফলে সবকিছুর অভাব-অনটনকে দায়ী করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল। তবে এর ফলাফলকে প্রায়শই অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। মারাঠারা যে পথে

৭০. Datta, *Bengal Suba*, 465-68; Chaudhuri, *Trading World*, 99-108, P. J. Marshal, *Bengal*, 73, 142-43.

৭১. Frankland and Manningham's Report, B. P. C Range I, ff. 164-65, 7 June 1753. Both K. N. Chauduri and P.J. Marshall relied heavily on this report, Chaudhuri, *Trading World*, 99, 102; Marshall, *East India Fortunes*, 35

৭২. S Chaudhury, " Merchants, Companies and Rulers—Bengal in the Eighteenth Century", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Leiden, XXXI (1988), 82-89.

এগিয়েছে, সাধারণত ক্ষয়ক্ষতি তার দু'পাশেই হয়েছে। দেশের অন্যান্য জায়গায় কিন্তু তেমন কিছু হয় নি। রিচার্ড বেচার দেখিয়েছেন যে, বর্ষা শুরু হলে আক্রান্ত জায়গাগুলি থেকে মারাঠারাও ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ফলে ঐ এলাকাতেও জানুয়ারি পর্যন্ত কোন উপদ্রব ছিল না। মারাঠারা চলে যাওয়ার পর পরই সেখানকার অধিবাসীরা চাষবাস শুরু করে, ফসল তুলে পরের বছর আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই সেগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছে।[৭৩] মারাঠা আক্রমণ সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থা যে তেমন খারাপ হয় নি তার প্রমাণ, জমিদারগণ তাদের বার্ষিক খাজনা ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহের বাড়তি খরচ মেটানোর জন্য আলিবর্দীকে একবার এক কোটি টাকা ও আরেকবার ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছে।[৭৪] মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার বহু বণিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং নবাব ও জমিদারদের অতিরিক্ত অর্থচাহিদার জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছিল বলে যে বক্তব্য তা কিন্তু ঠিক নয়। তেমনি বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি ক্রমশ নিজস্ব গোমস্তার মাধ্যমে তাঁতী বা অন্যান্য কারিগরদের সঙ্গে সোজাসুজি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করছিল বলে যে অভিমত সেটাও মেনে নেয়া যায় না। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি[৭৫], ওলন্দাজ কোম্পানি ১৭৪৭ থেকে ১৭৪৯ সাল পর্যন্ত কয়েক বছর মাত্র পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ অঞ্চলে এই ধরনের চেষ্টা করেছিল এবং সেখানেও আবার ১৭৫০ থেকে দাদনি বণিকদের সঙ্গে চুক্তিতে ফিরে গিয়েছিল। আর ১৭৫৩ সালে ইংরেজ কোম্পানির দাদনি থেকে গোমস্তা পদ্ধতিতে বাণিজ্যরীতির পরিবর্তন বাংলার বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য ঘটে নি, ঘটেছিল অন্য কারণে। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে গিয়ে দাদনি ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছিল।

মারাঠা আক্রমণের ফলাফল যে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল তা প্রমাণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ আবার সমসাময়িক সাহিত্য ও ফার্সি ইতিহাসের উপর বড় বেশি নির্ভর করেছেন। এই তথ্যগুলি ভাল করে বিচার করলে বোঝা যায় যে এগুলি অতিরঞ্জিত। গঙ্গারাম লিখেছেন, "চাল, ডাল, তেল, ঘি, ময়দা, চিনি, লবণ সবকিছুই টাকায় এক সের দামে বিক্রি শুরু হয়েছে...। সমাজের নীচতলা থেকে উপরতলার সবাইকে, এমনকি নবাবকে পর্যন্ত কলাগাছের থোড় সেদ্ধ করে খেয়ে প্রাণধারণ করতে হয়েছে।"[৭৬] এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, চাল, ডাল, ঘি, তেল, লবণ সবকিছুরই দর এক টাকা। আরো অবিশ্বাস্য যে, নবাবকে পর্যন্ত কলাগাছের থোড়সেদ্ধ খেয়ে বাঁচতে হয়েছে। এ কথাকে কাব্যিক উচ্ছ্বাস বলে ধরে নিলেও একে ঐতিহাসিক তথ্য বলে মানা কঠিন। *রিয়াজ-উস-সালাতিন*-এর লেখকও ক্ষিধের জ্বালায় মানুষকে কলাগাছের থোড় খেয়ে বেঁচে থাকতে

৭৩. Richard Becher's Letter to Governor Verelst, 24 May 1769, quoted in W. K. Firminger, *Fifth Report*, 183-184
৭৪. ঐ।
৭৫. S Chaudhury, "Merchants, Companies and Rulers".
৭৬. Gangaram, *Maharastrupurana*, Lines 234-42.

হয়েছে বলে লিখেছেন। তবে সেটা মূলত বর্ধমান শহরের কথা, কারণ সেখানে ধানের গোলাগুলি মারাঠারা পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং অল্প কিছুদিন বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছিল।[৭৭] ভারতচন্দ্র বর্ধমানে মালিনীর বাজার করার বর্ণনা দিয়েছেন, তবে সে জিনিসপত্র যে দামে কিনেছে তা 'অত্যন্ত বেশি' মনে হলেও সঠিক তথ্যের অভাবে আগের দামের সঙ্গে তুলনা করে সত্যিই তাই কিনা জানার উপায় নেই।[৭৮] মারাঠা আক্রমণের ফলে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর, বিশেষকরে ইংরেজ কোম্পানির বাংলা থেকে মোট রপ্তানির পরিমাণে তেমন হেরফের হয় নি। তা থেকেও বোঝা যায়, এই উপদ্রবের ফলে বাংলার সাধারণ আর্থিক অবস্থার সাংঘাতিক ক্ষতি কিছু হয় নি।[৭৯]

সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক[৮০] বলেন, "পলাশী যুদ্ধের বছর দশেক আগে থেকে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যবৃদ্ধি ও তার ফলে বাংলায় রূপার আমদানিবৃদ্ধিতে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে।" এই বক্তব্য যদিও ১৭৪০-এর দশক থেকে মারাঠা আক্রমণের কিছুদিন পর বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছিল বলে যে প্রচলিত অভিমত তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তবুও তা সমর্থন করা যায় না। এই যুগে ইউরোপীয়দের মধ্যে বাংলার পণ্য রপ্তানিকারী প্রধান দু'টি কোম্পানি হলো ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি। ১৭২০-এর দশকের শেষদিক থেকে ওলন্দাজরা ইংরেজদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। আর ইংরেজ কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলা থেকে মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৭৩০-এর দশকের তুলনায় ১৭৪০-এর দশকে তেমন বিপুল কিছু বাড়ে নি। নীচের সারণি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে :

সারাণ ৭ : হংরেজ কোম্প্যানর পঞ্চবাষক রপ্তানর পারমাণ, ১৭২৭-৫৫

বছর	মোটমূল্য	বাৎসরিক গড়মূল্য
১৭২৭-৩১	২,২৮৯,৩২৩ পাউন্ড	৪৫৭,৮৬৫ পাউন্ড
১৭৩২-৩৬	২,০৪৬,১৫০ "	৪০৯, ২৩০ "
১৭৪১-৪৫	২,৪০১,৭৮৫ "	৪৮০,৩৫৭ "
১৭৪৬-৫০	২,১৭৩,৫২৪ "	৪৩৪,৭০৫ "
১৭৫১-৫৫	২,০৩৩,২৩৫ "	৪০৬,৬৪৮ "

সূত্র : কে. এন. চৌধুরীর *দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া* (পৃ. ৫০৯-৫১০) থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এই সারণি তৈরি করা হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে উপরোক্ত বছরগুলিতেই ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল।

৭৭. *Riyaz*, 340

৭৮. K. K. Datta, *Bengal Suba*, 466.

৭৯. 'ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮০. P. J. Marshall, *Bengal*, 163-64.

উপরোক্ত তথ্য থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ১৭৩০-এর দশকে বাংলা থেকে ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ চল্লিশের দশক ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধের রপ্তানির প্রায় কাছাকাছি ছিল। সুতরাং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ক্রমবর্ধমান পণ্যক্রয়ের ফলে বাংলায় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল—এ কথা বলা যায় না। তা ছাড়া বাংলা থেকে ইউরোপীয় রপ্তানি সত্যিই যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাতে যে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতোই একথা বলা যায় না। সম্প্রতি একজন ঐতিহাসিক[৮১] বলেছেন যে, রপ্তানিদ্রব্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধিতে এমন ক্ষেত্র তৈরি হবার সম্ভাবনা ছিল যাতে এসব রপ্তানিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সমুচিত ব্যবস্থা করা যেতো। একথা অবিসংবাদিতভাবে বলা যায় যে, মুগল ভারতে বাংলা ছিল সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলির অন্যতম। শুধু ভারতের অন্যান্য অংশে নয়, প্রতিবেশী কয়েকটি দেশেও বাংলা থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো। উক্ত ঐতিহাসিকের মতে, "খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হওয়ায় দরকার হলে পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে নগদ মূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য পরিবর্তিত ব্যবস্থা করতে খুব বেশি অসুবিধা হতো না।"[৮২]

১৭৫০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর রপ্তানিপণ্যের মধ্যে বিশেষ একটির লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়। সেটি হলো বেশ মোটা ধরনের সুতী কাপড়। নিচের সারণি থেকে বোঝা যাবে যে, ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সালের মধ্যে এই ধরনের কাপড়ের চুক্তিমূল্যে লক্ষণীয় রকমের বৃদ্ধি ঘটেছে।

১৭৪১ সালের তুলনায় ১৭৫১ সালে বেশ মোটা ধরনের কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধরনের কাপড় বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি তৈরি হতো এবং ঐসব অঞ্চলেই মারাঠা উপদ্রব সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল। তার ফলেই এসব মোটা কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানে একটি ব্যাপার মনে রাখা দরকার, ১৭৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই দাদনি বণিকরা এসব মোটা কাপড় সরবরাহের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। অথচ ভাল মিহি কাপড় সরবরাহের জন্য চুক্তি করতে তারা খুবই আগ্রহী ছিল। তাই কোম্পানিগুলোকে প্রায়ই অনিচ্ছুক বণিকদের উপর মোটা কাপড় সরবরাহের চুক্তি চাপিয়ে দিতে হতো। বণিকদের অনাগ্রহের কারণ, প্রধানত এসব কাপড়ে লাভের পরিমাণ বেশি থাকতো না, অথচ মারাঠা উপদ্রুত অঞ্চলে এগুলি তৈরি হতো বলে এগুলি সংগ্রহ করতে অনেক ঝামেলা হতো এবং অনেক সময় তাঁতীরা আগাম নিয়েও মারাঠাদের ভয়ে পালিয়ে যেতো বলে বণিকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো।

---

৮১. Om Prakash, *Dutch East India Company*, 238, 250-51.

৮২. ঐ, 238

সারণি ৮ : বেশ মোটা ধরনের কাপড়ের দাম, ১৭৪১ ও ১৭৫১

১৭৪১ সালে বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য					১৭৫১ সালে বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য				
কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ভ প্রস্থ	প্রতিটির দাম	মোট দাম	কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য ভ প্রস্থ	প্রতিটির দাম	মোট দাম
৬০,০০০	গিনি কাপড়	৭৫ কোঃ ভ ২$\frac{১}{৪}$ কোঃ	১২৯ টাঃ ৮ আঃ টাঃ	৩৬৪,৫০০	২০,০০০	গিনি কাপড়	৭৫ কোঃ ভ ২$\frac{১}{৪}$ কোঃ	১৭৫ টাঃ	টাঃ ১৭৫,০০০
-	-	-	-	-	২৫,০০০	গারা	৩৬ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৮৪ "	" ১০৫,০০০
৮০,০০০	গারা	৩০ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৪৮ " - " "	১৯৪,০০০	১২,০০০	"	৩০ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৭০ "	" ৪২,০০০
-	-	-	-	-	৫,০০০	" বুরাং	৩৬ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৫০ "	" ২৫,০০০
-	-	-	-	-	৬,০০০	"	২৪ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৭০ "	" ৪৬,৮০০
৫০,০০০	সালামপুরী	৩৭$\frac{১}{২}$ ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৬০ " ১২ " "	১৫১,৮৭৫	১০,০০০	সালামপুরী	৩৭$\frac{১}{২}$ " ভ ২$\frac{১}{৪}$ "	৮৭ " ৮আঃ	" ৪৩,৭৫০
১০,০০০	ডংগিরি	২৭ " ভ $\frac{১৩}{৪}$ "	৩১ " -	১৫,৫০০	১০,০০০	ডংগিরি	২৭ " ভ $\frac{১৩}{৪}$ "	৫০ " ॥	" ২৫,০০০

সূত্র : ১৭৪১ সালের জন্য ঃ V.O.C 2537 (K.A.2429), ff. 1427-1428, হুগলী থেকে বাটাভিয়া, ২৬ নভেম্বর ১৭৪১; ১৭৫১ সালের জন্য, V.O.C. 2783 (K.A. 2675), ff. 82-84, pt. I, হুগলী থেকে বাটাভিয়া, ২১ ডিসেম্বর ১৭৫১।

আবওয়াব ও অন্যান্য কর চাপানোর ব্যাপারটিকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই। মুর্শিদকুলী খান প্রথমে আবওয়াব প্রচলন করেন, পরে অবশ্য শুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী খানও তা অনুসরণ করেন। সন্দেহ নেই যে, এতে একটি বিপজ্জনক রীতি তৈরি হলো। এই কর দিতে হতো জমিদারদের, তবে তারা রায়তদের কাছ থেকে এটা আদায় করার অনুমতি পেয়েছিল। স্যার জন শোর মনে করেন, অতিরিক্ত এই কর আদায় করাতে কৃষকরা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। তাঁর মতে, বাণিজ্যের উন্নতি ও সোনা-রূপার আমদানি বৃদ্ধিতে "এ যুগে দেশের আর্থিক অবস্থা এই অতিরিক্ত করের বোঝা সহজেই বহন করতে পেরেছিল।"[৮৩] অবশ্য শোরের বক্তব্য নেহাৎই ব্যক্তিগত অভিমত, তার পিছনে পরিসংখ্যানমূলক কোন ভিত্তি নেই। তবে শুজাউদ্দিন বা আলিবর্দীর শাসনকালে ব্যাপকভাবে আবওয়াব আদায় করা সত্ত্বেও[৮৪] তেমন লক্ষণীয় মূল্যবৃদ্ধি না হওয়ায় এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আবওয়াব বা অন্যান্য কর চাপানোর প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু হয় নি। আমরা আগেই দেখেছি, শুজাউদ্দিনের শাসনকাল খাদ্যদ্রব্যের সুলভ মূল্যের জন্য কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং আলিবর্দীর শাসনের শেষদিক "অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির" কাল বলে চিহ্নিত হয়েছিল।[৮৫] বন্যা, দুর্ভিক্ষ, খরা জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মূল্যবৃদ্ধির ঘটনাও ছিল সাময়িক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এসবের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই।

গ. *মজুরি*

নবাবি আমলে বাংলায় জিনিসপত্রের দাম যেমন কম ছিল তেমনি মজুরির পরিমাণও ছিল কম। ১৭৩৬ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকার একটি চিঠিতে জানা যায়, "যেসব লোক তাঁতীদের কাজে সাহায্য করতো" তারা মজুরি বাবদ দিনে তাদের খোরাকি চাল ও এক পণ কড়ি" পেতো।[৮৬] টেইলরের মতে, আঠারো শতকের মধ্যভাগে ঢাকায় তাঁতীদের মজুরি ছিল মাসে ১ থেকে ১.৫ আর্কট টাকা এবং তাদের সহকারী পেতো ৮ আনা থেকে ১২ আনা।[৮৭] তিনি আরো জানান, যে প্রধান তাঁতী সুতা কেনে, যে তাঁতী কাপড় বোনে ও যে সহকারী তাঁতীকে কাপড় বোনার কাজে সাহায্য করে—এই তিনজন মলবুসখাসে একসঙ্গে ছ'মাস কাজ করে মোট ৪৭ টাকার মতো উপার্জন করতো।[৮৮] ঢাকায় সুতাকাটা কারিগরদের (spinners) মধ্যে (বেশির ভাগই মহিলা) যারা সবচেয়ে ভাল, তারা রোজ গড়ে তিন ঘণ্টা কাজ করে মাসে ১২ আনা থেকে ১৪ আনা রোজগার করতো।[৮৯] ১৭৫০-

৮৩. W. K Firminger, *Fifth Report*, Vol II, 120.
৮৪. বিস্তারিত, ঐ।
৮৫. J C Sinha, *Economic Annals of Bengal*, 19
৮৬. B P. C. Vol. II, ff. 288 vo-289, 28 August 1736
৮৭. Home Misc 456 F, f 205
৮৮. ঐ, f 145.
৮৯. ঐ, f. 129. টেইলর জানাচ্ছেন যে, একজন মহিলা মাসে এক সিকি সিক্কা ওজন পরিমাণ সুতা কাটতে পারতো এবং এ সুতার দাম ছিল প্রতি সিক্কা ওজন তিন থেকে সাড়ে তিন টাকা।

এর দশকে কলকাতায় সাধারণ শ্রমিকদের মজুরি সামান্য বেড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ১৭৫১ সালের মার্চ মাসে কুলিদের মজুরি বাড়িয়ে দিনে ২ পণ কড়ি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ বছরেই নভেম্বরে চালের দাম বাড়ার জন্য এই মজুরি বেড়ে হয় দিনে ২ পণ ১০ গণ্ডা। পরের বছর জানুয়ারিতে মজুরি বেড়ে দাঁড়ায় দিনে ২ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি।[৯০] কলকাতার মেয়রকোর্টের ১৭৫২ সালের নভেম্বর থেকে ১৭৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত খরচের হিসাবে দেখা যায়, পিওনের বেতন মাসে ২ টাকা ৪ আনা, দেশী সার্জেন্টের বেতন মাসে ২ টাকা ৪ আনা এবং ইউরোপীয় সার্জেন্টের বেতন মাসে ১০ টাকা। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল কলকাতায় ১৭৫৭ সালের আগে ও ১৭৫৭ সালে বিভিন্ন মজুরির হারের একটি তালিকা তৈরি করে। সেটি নিচে দেয়া হলো :

সারণি ৯ : কলকাতায় মজুরির হার, ১৭৫৭ সালের আগে ও ১৭৫৭ সালে

	১৭৫৭ সালের আগে					জানুয়ারি ১৭৫৭				
ইটমিস্ত্রি	৩	পণ	১০	গণ্ডা	কড়ি	৪	পণ	০	গণ্ডা	কড়ি
কুলি	২	"	১০	"	"	৪	"	০	"	"
ছোট ছেলে	১	"	১৫	"	"	২	"	৫	"	"
স্ত্রীলোক	১	"	১৫	"	"	২	"	-	"	"
ছুতোর	৩	"	-	"	"	৩	"	১০	"	"
ছুতোর (খুব ভাল)	৪	"	-	"	"	৪	"	১০	"	"
ছুতোরের সর্দার	৭	"	-	"	"	৮	"	-	"	"
রংমিস্ত্রি	৩	"	-	"	"	৪	"	-	"	"

সূত্র : B. P. C., Range 1, Vol. 29, f. 26, Annex to Consults, 13 January 1757.

সুতরাং নবাবি আমলে বাংলায় সাধারণ মানুষের আয় যে খুবই কম ছিল তা সুস্পষ্ট। কিন্তু এ অল্প আয়েও সে বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতো। টাকার ক্রয়ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে মাসে কয়েক আনা খরচ করে একজন লোক প্রচুর খেতে পারতো। কোম্পানির আমল, আঠারো শতকের শেষদিক ও উনিশ শতকের প্রথমদিকের তুলনায় একজন সাধারণ মানুষ নবাবি আমলের বাংলায় অনেক বেশি খেতে পেতো এবং তার আর্থিক অবস্থাও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে অনেক বেশি ভাল ছিল।

৯০. B. P. C., Vol. 24, f 38, 22 March 1751; f 374, 15 November, 1751; Coast & Bay Abstracts, Vol. 5, f. 325, para 63, 2 January 1753,

৩

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : কোম্পানি আমল

পিটার জে. মার্শাল*

নবাবি আমলে বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুশীল চৌধুরী যে উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন, কোম্পানি আমলে তা অতিশয় ম্লান দেখতে পাই। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এখানে ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর আনাগোনা হ্রাস পেয়েছে, বলা যায় প্রায় থেমে গেছে। ১৮১৩ সালের পর ভারত অবাধ বাণিজ্যজগতে প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু প্রায় অর্ধ শতকের বানিয়া সরকারের দুঃশাসন এবং বৃটিশ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশ্ববাজারে বাংলার বাণিজ্যিক অবস্থান পুরোপুরি পাল্টে যায়। বাংলার অর্থনীতিতে তখন যুগান্তর সাধিত হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিতে তখন রপ্তানিকারক থেকে আমদানিকারকে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়া চলছে। কোম্পানি-যুগ শেষ হবার বেশ আগেই এদেশ বৃটিশ শিল্পপণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, রপ্তানির মধ্যে থাকে শুধু কিছু কৃষি-কাঁচামাল। এহেন পরিবর্তনের জন্য কারা দায়ী বা কিভাবে এই কালান্তর ঘটলো এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা যায় এবং হয়েছেও। তবে বর্তমান অনুচ্ছেদে আমাদের আলোচনা শুধু সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১৭৬৫ সালে কোম্পানির 'দীউয়ানি' প্রাপ্তির সময়ে বাংলার বেশিরভাগ মানুষ বাস করতো গ্রামাঞ্চলে এবং তারা নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। কোন কোন এলাকা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ, কিন্তু সমসাময়িক পর্যটকগণ বেশ কিছু অনাবাদি ভূমিও লক্ষ্য করেছেন। বিভিন্ন রকমের ধান ছিল প্রধান শস্য। অবশ্য প্রায় সব কৃষকই তৈলবীজ, কলাই ইত্যাদি কিছু সবজি ফলানোর চেষ্টা করতো। অনাবাদি ভূমিতে বিচরণ করতো গবাদি পশু। এমনকি একজন ক্ষুদ্র কৃষকও তার উৎপাদিত পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করে সরকারের খাজনা পরিশোধ করতে পারতো। অপরদিকে আখ, তুলা অথবা তামাকের মতো অর্থকরী

রোডস প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কিংস কলেজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়।

ফসলেরও বেশ আবাদ হতো। গ্রামে বাস করতো কারিগর, যারা তৈরি করতো কাপড়, ধাতব পণ্য এবং মাটির পাত্র। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বাস করতো এমন কিছু কারিগর, যারা রপ্তানির জন্য বয়ন করতো উন্নতমানের সুতী ও রেশমি কাপড়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলার নগরগুলো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য বা প্রশাসনের কেন্দ্র তথা পীঠস্থান। এই নগরগুলো গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল ঘনিষ্ঠভাবে, এমনকি বিশেষ অর্থে বলতে গেলে উভয়ের অস্তিত্ব ছিল পরস্পর নির্ভরশীল। নগরে বাস করতো অধিক সংখ্যক কারিগর, যাদের পাশে অবস্থান ছিল ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারের। গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এদের প্রভাব ছিল বিস্তৃত। বাংলার কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভর করতো মহাজন ও ব্যবসায়ীর ঋণের উপর। এই ব্যবসায়ীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ রপ্তানিবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। এদের মাধ্যমে বাংলার পণ্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে চলে যেতো।

মধ্য আঠারো শতকে বাংলায় জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে গণদারিদ্র্যই ছিল এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সন্দেহ নেই যে, এমন ধারণার মূল কারণ ছিল সংস্কৃতিগত ব্যবধান। তবুও তথ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলা যায়, বাংলার অধিকাংশ মানুষের জন্য জীবনধারণের উপকরণ পর্যাপ্ত ছিল না। শস্যের ফলন ভাল না হলে তাদের অবস্থা হতো শোচনীয়। সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল প্রকট। জমির সঙ্গে সংযোগ ছিলনা এমন মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রচুর জমি অনাবাদি থাকলেও অনেক কৃষকের জমির পরিমাণ এমন ছিল যা দিয়ে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ হতো না। ফলে কৃষকেরা অপরের জমিতে শ্রমিক বা ভাগচাষী হিসেবে কাজ করতো, অথবা বিভিন্ন খণ্ডকালীন কাজ খুঁজতো। কৃষিশ্রমিকের চাহিদা থেকে অনুমান করা যায় যে, এমন জমিও ছিল যা একটি পরিবারের পক্ষে চাষ করা সম্ভব ছিল না। এমন জমির অধিকারী ছিল জমিদার বা বড় জোতদার। কৃষক ও কারিগরের শ্রমের উপর নির্ভর করতো ব্যবসায়ী সমাজ। সমাজের সচ্ছল মানুষদের অধিকাংশের আয়ের উৎস ছিল রাজস্ব। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এমনি সচ্ছল শ্রেণীর মানুষ ছিল জমিদার।

আঠারো শতকের বাংলার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মধ্য-উনিশ শতকের বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলার অর্থনীতি একশ' বছর পরেও প্রধানত কৃষিনির্ভর ছিল এবং মানুষ সনাতন পদ্ধতিতেই ধানের চাষ করতো। কিন্তু জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর জমি আবাদযোগ্য করে তোলা হয়। বিশেষকরে অর্থকরী ফসল উৎপাদনে আবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে অর্থকরী ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল নীল এবং বাংলার অর্থনীতিতে পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ফসল পাট। গ্রামাঞ্চলের কারিগররা তাদের সনাতন

পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতো। কিন্তু তারা বিভিন্ন আমদানিপণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। উন্নত মানের বস্ত্রবয়নকারী সম্প্রদায় বিদেশী ও স্বদেশী বাজার হারিয়ে দুর্দশায় পড়ে। অবশ্য তখনো নতুন প্রযুক্তি ও নতুন উৎপাদনপ্রক্রিয়ার প্রয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। বাংলার যাতায়াতব্যবস্থা তখনো প্রধানত নির্ভরশীল ছিল মানুষের শ্রম ও পাল দ্বারা চালিত নৌকার উপর। কলকাতা বিশাল নগরী হিসেবে গড়ে উঠেছিল; কিন্তু বাংলার অন্যান্য স্থানে নগরায়ণ-প্রক্রিয়া লক্ষণীয় ছিল না। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায় এবং বাংলার আদি বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয় বিদেশী, বিশেষকরে ইংরেজ বণিক।

আপামর জনগণের জীবনযাত্রার মান ১৭৬৫ সালে যা ছিল, তার তুলনায় এই সময়ে মৌলিক কোন পরিবর্তন সম্ভবত আসে নি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জনজীবনে ভাল বা মন্দ কোন পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে নি। বিশেষকরে বেকার তাঁতী ছিল একটি অশুভ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত। জমির উপর জনসংখ্যার যে চাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার ফলে কৃষকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ বাড়ে নি, বরং কমে গিয়েছিল বলা যায়। কৃষিপণ্যের বর্ধিত বাণিজ্যের কারণে লাভ হয়েছিল শুধুমাত্র কতিপয় অবস্থাপন্ন কৃষকের। কৃষিশ্রমিকের বর্ধিত চাহিদার ফলে কিছু সুবিধা ভোগ করেছিল দরিদ্র মানুষ। রাজস্বভিত্তিক আয় তখনো বিত্তবান সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তবে রাজস্বব্যবস্থায় প্রবর্তিত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের আয়ের তারতম্য হয়েছে, অবশ্য অন্যদিকে জনগণের উপর করের বোঝা বেড়েছে। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আয়েরও তারতম্য হয়েছে এবং লাভবান হয়েছে ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীবৃন্দ। নবাবি আমলে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে কিছু পেশাজীবীর জীবিকানির্বাহের সুযোগ ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে এমন সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়।

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই পর্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় প্রধানত ইংরেজ শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণের উপর। কিন্তু যাবতীয় পরিবর্তনের দায়ভার ইংরেজ বিজয়ের উপর চাপিয়ে দেয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে আবহাওয়ার তারতম্য বা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মতো মৌলিক কারণগুলোর প্রভাব উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু তবুও এটা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশ থেকে আগত বণিক সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে বাংলার অর্থনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কাজেই ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার অর্থনীতি মূল্যায়ন করতে গেলে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো এই প্রদেশে ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

আলোচ্য সময়ে বাংলায় শাসন পরিচালিত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড-বাংলা বাণিজ্যে এই কোম্পানির ছিল একচেটিয়া অধিকার।

১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানি এই বাণিজ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৮১৩ সাল থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলো শেকড় গেড়ে বসে বাংলার বাণিজ্য-অঙ্গনে। কিন্তু এর আগেও কোম্পানির পাশাপাশি এমনি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। এরা ছিল ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং কলকাতাভিত্তিক যৌথ কারবারি, যাদেরকে বলা হতো 'হাউজেস অব এজেন্সি'।

কাজেই বাংলায় ইংরেজদের অবস্থান ছিল শাসক ও ব্যবসায়ী হিসেবে। যেহেতু শাসকবর্গ ছিল একটি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের অংশ, সেহেতু ধারণা করা সঙ্গত হবে যে, বাণিজ্যের স্বার্থেই শাসন পরিচালিত হতো। বস্তুত, অতি সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েও যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, উল্টোটি ছিল সত্য। সর্বশেষ পন্থা হিসেবে সাধারণত শাসনের চেয়ে লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হতো। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এবং এর জন্য প্রয়োজন হতো একটি বিশাল সেনাবাহিনীর, যাদের বেতন আসতো ভূমিরাজস্ব থেকে। কোম্পানির স্বার্থে যারা নীতি নির্ধারণ করতো তাদের কাছে বাণিজ্যের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল প্রতিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়। সত্যি কথা বলতে কি, আর্থিক কারণে বাণিজ্য হতো। যেমন লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসার সূত্রে ভারত থেকে সরাসরি বা চীনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার হতো। রাজস্বস্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে বাংলার অর্থনীতিতে কোম্পানির প্রভাব ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ করে যে সম্পদ আহরণ করতো তার বেশ কিছু অংশ আবার বাংলার প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনে ব্যয়ের মাধ্যমে পুনর্বন্টিত হতো। উপরন্তু ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থে বাংলার অর্থনীতিকে প্রয়োজনীয়ভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়াস তো ছিলই। কিন্তু ঠিক এ কারণেই সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কোম্পানি তার একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হারিয়েছিল। সুদূরপ্রসারী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলার অর্থনীতিতে এমনি বাণিজ্যের ভূমিকা গতিশীল হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বাস্তবে এমনটি ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।'এজেন্সি হাউজ' এবং অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমন পুঁজি ও প্রযুক্তি ছিল না, যা দিয়ে তারা মৌল কিছু পরিবর্তনের সূচনা করতে পারতো। অবশ্য বাণিজ্যজাহাজের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা প্রধানত কৃষক-উৎপাদিত কিছু অর্থকরী ফসল নিয়েই ব্যবসা করতো। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় চা উৎপাদন শুরু না হওয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় সম্প্রদায় কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয় নি। ১৮৫০-এর দশকে ইংরেজ পুঁজি ও প্রযুক্তির অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ শুরু হয়।

ইংল্যান্ডপ্রভাবিত বিশ্বঅর্থনীতির পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সম্পৃক্ত হওয়ার গতি নিয়ে ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মন্তব্য করলেও এই প্রক্রিয়া যে চলছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি এর প্রমাণ। এ তথ্যাদি অবশ্য বিশেষ সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করতে হবে। বাংলাদেশের উপর একটি বইয়ের একজন পাঠককে স্মরণ রাখতে হবে যে, সরকারি আমদানি-রপ্তানি হিসেবে যেসব পণ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখিত হয়েছিল তা কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করা হয়েছিল এবং শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং অন্যান্য অঞ্চল থেকেও সেগুলো আহরিত হয়েছিল। এমনকি ১৭৬০-এর দশকেও কলকাতা বিহারের কাপড় ও আফিম রপ্তানি করেছিল। ১৭৯০-এর দশক থেকে কলকাতা পূর্ব ও মধ্য ভারতের পণ্যের রপ্তানিবন্দর হয়ে উঠে। কাজেই প্রকৃত অর্থে কলকাতা বন্দরের বাণিজ্যের বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়।

কিন্তু তবুও কলকাতা বন্দরের পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবাহ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ চিনি, শস্য এবং কাপড়ের প্রধান রপ্তানিকারক হয়ে উঠেছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ সেসময় থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্ধিত হারে রেশমি ও অন্যান্য পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে বৃটেনে তাদের আয় পাচার করছিল। ফলে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে রপ্তানিকৃত কোম্পানির মালামালের খরচ ১৭৬০-এর দশকে ৫০ লক্ষ থেকে ১৭৯০-এর দশকে এক কোটি টাকায় দাঁড়ায়।[১] এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি ইংরেজ প্রতিষ্ঠান চীনসহ এশিয়ার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ করেছিল। এ পর্যায়ে চা পরিবহন সংক্রান্ত ব্যবসার অর্থ যোগানো হতো বাংলাদেশের পণ্যরপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থ হতে। ফলে এ সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকার অনেক সমুদ্র পরিবহন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৭৯৭-৯৮ থেকে ১৮০১-২ পর্যন্ত সময়ে কোম্পানিবহির্ভূত রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ গড়ে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ছিল।[২] কাপড় রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানির তালিকায় পরিবর্তন ঘটলেও বাংলাদেশের শস্য, চিনি, নীল ও রেশমজাত কাঁচামাল এবং দূরান্তরের তুলা ও আফিম রপ্তানি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নিচের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় :

---

১. K. N. Chaudhuri, " Foreign Trade and Balance of Payments (1757-1947)". *Cambridge Economic History of India*, II, c 1757-1970, (ed.), D. Kumar (Cambridge 1983), 819; A. S. Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency* 1793-1833, 2nd edn., (Calcutta 1979), 4.

২. Chaudhuri, "Foreign Trade", *Cambrige Economic History*, II, 820.

কলকাতা থেকে রপ্তানি : পাঁচ বছরের গড় হিসাব[৩]

১৮০৮-৯	থেকে	১৮১২-১৩	টাকা	৩	কোটি	২০	লক্ষ
১৮১৩-১৪	"	১৮১৭-১৮	"	৪	"	৪৯	"
১৮১৮-১৯	"	১৮২২-২৩	"	৫	"	১০	"
১৮২৩-২৪	"	১৮২৭-২৮	"	৫	"	০৬	"
১৮২৮-২৯	"	১৮৩২-৩৩	"	৩	"	৫৯	"
১৮৩৩-৩৪	"	১৮৩৭-৩৮	"	৫	"	২৪	"
১৮৩৮-৩৯	"	১৮৪২-৪৩	"	৭	"	১৫	"
১৮৪৩-৪৪	"	১৮৪৭-৪৮	"	৮	"	৪৯	"
১৮৪৮-৪৯	"	১৮৫২-৫৩	"	১০	"	৪০	"
১৮৫৩-৫৪	"	১৮৫৬-৫৭	"	১০	"	৬৬	"

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, কলকাতা বন্দরের রপ্তানির পরিমাণ সমানভাবে বৃদ্ধি পায় নি। ১৮১৩ সালে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলুপ্ত হয়। এরপর থেকে ক্রমশ রপ্তানিবাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। তবে ১৮২০-এর দশকের শেষদিক এবং ১৮৩০-এর দশকের প্রথমদিকে ইউরোপে মন্দার কারণে ভারতীয় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছিল।

কলকাতায় আমদানি : পাঁচ বছরের গড় হিসাব[৪]

১৮১৩-১৪	থেকে	১৮১৭-১৮	টাকা	১	কোটি	৪৭	লক্ষ
১৮১৮-১৯	,,	১৮২২-২৩	,,	২	,,	৪৪	,,
১৮২৩-২৪	,,	১৮২৭-২৮	,,	২	,,	৫২	,,
১৮২৮-২৯	,,	১৮৩২-৩৩	,,	২	,,	৪৬	,,
১৮৩৩-৩৪	,,	১৮৩৭-৩৮	,,	২	,,	৫৬	,,
১৮৩৮-৩৯	,,	১৮৪২-৪৩	,,	৩	,,	৯৬	,,
১৮৪৩-৪৪	,,	১৮৪৭-৪৮	,,	৪	,,	৯১	,,
১৮৪৮-৪৯	,,	১৮৫২-৫৩	,,	৫	,,	৪৪	,,
১৮৫৩-৫৪	,,	১৮৫৬-৫৭	,,	৬	,,	৭১	,,

৩. India Office Records, *Bengal Commercial Reports*, 174, 24; *Parliamentary Papers*, 1852-3, XXVIII, 331; 1857-8, XLII, 144-5.৪.

৪. *Parliamentary Papers*, 1852-3, XXVIII, 331; 1857-8, XLII, 144-5.

আঠারো শতকের বেশিরভাগ সময়ে বাংলাদেশে পণ্য আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে কম ছিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮১২-এর মধ্যে এই পরিমাণ ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।[৫] ১৮১৩-এর পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ বেশ বাড়লেও ১৮৪০-এর দশকের আগে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপর যায় নি। নিচের সারণিতে দেখা যায় যে, কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের সমাপ্তির পর প্রধানত বৃটিশ পণ্যের আমদানি বেড়ে যায়, যা অবশ্য বেশিদিন বজায় থাকে নি। ১৮১৭ সাল থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির পর ১৮৪০-এর দশকের আগে আর কোন লক্ষণীয় পরিমাণ আমদানি বৃদ্ধি পায় নি। বাংলার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, ভারতে বৃটিশ বস্ত্রপণ্যের আমদানি ১৮১৪ সালে শতকরা ৬ থেকে ১৮১৮ সালে ২০, ১৮২৮ সালে ৫০ এবং ১৮৩৮ সালে ৬৩ ভাগে উন্নীত হয়।[৬] কোম্পানিশাসনের শুরুতে তো বটেই, এমনকি উনিশ শতকের শেষেও আদমশুমারিতে জনসংখ্যার হিসাব অনুমাননির্ভর হতে বাধ্য। তবে ইউরোপীয়দের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা হলো, কোম্পানিশাসনের শেষপ্রান্তে জনসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ১৭৭২ সালে জেমস রেনেল লিখেছিলেন :

> বাংলা প্রদেশে যথেষ্ট সংখ্যক বসতি ছিল না। যদিও দেশটি ইংল্যান্ডের চেয়ে তিনগুণ বড় ছিল, তবুও আমাদের মনে হয় , সেখানে ততো বেশি মানুষ ছিল না। বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর ভূখণ্ড সবটাই অনাবাদি পড়ে আছে চাষ করার মানুষের অভাবে।[৭]

১৮২৮ সালে প্রকাশিত একটি গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয় যে, "এক থেকে পাঁচশ' লোক অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা বহু। দেশের কোন কোন অংশে নদীর কূল ধরে মাইলের পর মাইল একটানা গ্রাম রয়েছে"।[৮] উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার গ্রামীণ অবস্থান এমন দাঁড়ায় যে, ইউরোপীয়দের নজরে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের সেরা গ্রামবসতি এলাকা। আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলা ও বিহারের লোকসংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ মিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়।[৯] উনিশ শতকের গোড়া থেকে লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় বলে মনে করার কারণ রয়েছে। ১৮৭২ সালের লোকগণনায় বিহার ছাড়া শুধু বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,৭৬৯,৭৩৫।[১০] এই বৃদ্ধির হার সব সময় সমান ছিল না। ১৭৬৯-৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, এর ফলে বাংলার লোকসংখ্যা দারুণভাবে কমে যায়। পূর্ব বাংলা অবশ্য

৫. Chaudhuri, "Foreign Trade".

৬. D. A. Farnie, *The English Cotton Industry and the World Marke.*, 1815-96 (Oxford 1979), 98, 116-17

৭. Letter to G. Burrington, 6 April 1772, India Office Records, *Home Miscellaneous,* 815

৮. W. Hamilton, *The East India Gazetteer,* (London 1828), I, 191.

৯. H. Beverley, *Report on the Census of Bengal of 1872,* (Calcutta 1872) , 81.

১০. ঐ, Appendix 1

দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি থেকে অনেকাংশে রক্ষা পায়।[১১] ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বাংলার পশ্চিমাংশে দুর্ভিক্ষ আসে খরার ফলে, আর পূর্বাংশে দুর্ভিক্ষ আসে বন্যার ফলে। বন্যার ফলে পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ১৭৮৩, ১৭৮৬ ও ১৭৮৭ সালে। ফলে দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পায়। তবে এই প্রবণতা ১৭৯০ থেকে দূরীভূত হয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি অব্দি বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটায় দেশ দুর্ভিক্ষ থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। এর প্রভাব পড়ে জনসংখ্যার উপর। মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার বেড়ে যাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১২]

গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি। জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পতিত জমির আবাদ শুরু হয়।[১৩] তবে গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, এর ফলে কৃষিভূমি বিভক্তির হার বেড়ে যায়। কৃষিভূমি খণ্ডবিখণ্ড হবার প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলার কৃষি অর্থনীতি আরো দুর্বল হয়ে পড়ে গঙ্গার প্রবাহ পূর্ব দিকে মোড় নেবার ফলে। কৃষিজমির উর্বরতা ক্রমশ হ্রাস পায়, কেননা গঙ্গা পূর্বমুখী গতি গ্রহণের ফলে বিপুল এলাকা বর্ষার পানিবহির্ভূত হয়। কিন্তু বহু নদীবিধৌত পূর্ব বাংলায় জলসেচের সমস্যা তেমন ছিল না। পূর্ববঙ্গ ছিল হালকাবসতি এলাকা। বিপুল এলাকা ছিল অনাবাদি। এসব অনাবাদি এলাকায় নতুন বসতি স্থাপিত হয়। একদিন যে অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও জনহীন তা শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। সুন্দরবন এলাকায় আবাদকর্মকাণ্ড ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যাপক আবাদকর্মকাণ্ডের ফলে উর্বর পূর্ব বাংলা কৃষিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, অপরদিকে গঙ্গার গতিধারা পরিবর্তনের ফলে একদা সমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে।

পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আবাদকাজ চললেও এর ফলে কৃষিপ্রযুক্তিতে কোন পরিবর্তন আসে নি। নতুন আবাদএলাকার কৃষিপদ্ধতি ছিল পুরাতন বসতির কৃষিপদ্ধতিরই সম্প্রসারণ। তখনো ধান ছিল সর্বপ্রধান শস্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে একটি মাত্র নতুন সংযোজন দেখা যায়—সেটি হচ্ছে গোল আলু। বিদেশের চাহিদায় সাড়া দিয়ে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ফসলের সম্প্রসারণ ঘটে। ইক্ষু এর অন্যতম। বিশ্বে চিনির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি পায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হচ্ছে কাঁচা রেশম। বৃটিশ কারখানাগুলির চাহিদা অনুসারে কোম্পানি বাংলাদেশে প্রচলিত রেশম চাষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত কোম্পানি এ দেশে রেশমচাষের

১১. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রজত দত্তের প্রকাশিতব্য লেখা দ্রষ্টব্য।

১২. I. Klein, " Malaria and Mortality in Bengal 1840-1921", *Indian Economic and Social History Review*, IX (1972), 132-60.

১৩. W. B. Bayley, "Statistical View of the Population of Burdwan", Asiatic Researches, XII (1816), 551.

প্রভূত প্রসার ঘটায়। রেশমগুটি উৎপাদন ও রেশমবাণিজ্যকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড পরবর্তীকালে হ্রাস পায় এবং এর প্রতিক্রিয়া পড়ে রেশম উৎপাদনকারী ও রেশম কারিগর-সওদাগরদের উপর। এদের এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে পড়ে। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্বের একটি অভিনব কৃষি হচ্ছে নীলচাষ। ১৭৯০-এর দশক থেকে বাণিজ্যিক হারে নীলচাষ ও নীল প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু হয় এবং তা তুঙ্গে উঠে ১৮৪০-এর দশকে। নীল উৎপাদন সর্বোচ্চ শিখরে উঠে ১৮৪৭ সালে। নীলকুঠি ও নীলকারখানার মালিক ছিল বেশিরভাগই ইউরোপীয়। দেশী জমিদার ছিল অনেক কুঠি-কারখানার মালিক। নীলচাষে লিপ্ত রায়তেরা কুঠি থেকে দাদন বা আগাম গ্রহণ করতো। একবার নীলঋণ গ্রহণ করলে কুঠির কবল থেকে রায়তের বেরিয়ে আসা ছিল কঠিন। নীলচাষীর অর্থনীতি ছিল খুবই নড়বড়ে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত নীল ছিল বৃটিশ টেক্সটাইল শিল্পের জন্য একটি মৌলিক কাঁচামাল। কিন্তু স্বদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায় পরিশোধের জন্য ভারত থেকে বৃটেনে অর্থ স্থানান্তরের উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজনে নীলের চাহিদাকে কৃত্রিমভাবে, হয়তো কিছুটা বিপজ্জনকভাবেও, বাড়িয়ে দেয়া হয়।[১৪] উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিশেষকরে পূর্ববঙ্গে পাটচাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৪০-এর দশকে কলকাতা বন্দর দিয়ে রপ্তানিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৫]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাংলার কৃষিকে কোন কোন দিক থেকে 'ধনতান্ত্রিক' বলে আখ্যায়িত করা যায়। বাজারের জন্য কৃষকদের শস্য উৎপাদন শস্য-ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ঋণের উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। ধনী প্রতিবেশীরাও তাদের ঋণ সরবরাহ করতো। আখ উৎপাদন নির্ভর করতো চিনিব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ঋণের উপর। মালবেরী চাষের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগাম প্রদান করতো। নীল কারখানা মালিকেরা নীল উৎপাদনের জন্য চাষীদের আগাম প্রদান করতো। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষির অন্যান্য সাধারণ ধনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনটাই ছিল না। ব্যতিক্রম দেখা যেতো শুধু ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে। ভূমির উপর পুঁজিপতিদের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ভূমি ছিল কৃষকদেরই হাতে। পুঁজিপতিরা শ্রমিকও নিয়োগ করতো না। এমনকি যারা অন্যের জমিতে শ্রম দিত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদেরও জমি ছিল। চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় ছাড়া নব্য প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা হতো না। ইউরোপীয়রা পদ্ধতিগত ত্রুটিবিচ্যুতির ব্যাপারে অভিযোগ করতো এবং প্রায়ই বড় বড় আবাদক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে তাদের ভাষায় 'যথার্থ

---

১৪. B. B. Kling, *Blue Mutiny: The Indigo Disturbance in Bengal 1859-62* (Philadelphia 1966); B. B Chowdhury, *The Growth of Commercial Agriculture in Bengal* (1757-1900), 1, (Calcutta 1964).

১৫. H C. Kerr, *Report on the Cultivation of Jute in Bengal*, (Calcutta 1873)

অর্থে' ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখতো। কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য অবস্থা আদৌ অনুকূল ছিল না। ভারতীয় অর্থবাজারের যেটুকু ইউরোপীয়দের আয়ত্তের মধ্যে ছিল, তা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং তারা কৃষিতে বিপুল মূলধন খাটিয়েছিল বলে এই বাজার ছিল তাদের জন্য পরিবর্তনশীল। এর স্থান গ্রহণ করার জন্য বৃটেন থেকে তখনো যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন সরবরাহ হচ্ছিল না। ইউরোপে ভারতে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা তখনো ব্যয়বহুল উদ্ভাবনের জন্য লাভজনক পর্যায়ে পৌঁছে নি। এছাড়াও ভারতে উৎপাদিত পণ্য আমেরিকায় উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় ইউরোপে কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতা-মূলক হওয়ার জন্য পরিবহনখরচ তখনো যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব হয় নি। সেজন্য বাংলাদেশে উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্য ছিল ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাতে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাস্তবসম্মতভাবে তারা সরাসরি ভূমি ও শ্রম নিয়ন্ত্রণে তাদের সম্পদ ব্যবহারে অগ্রাধিকার না দিয়ে ঋণদানে আগ্রহী ছিল। এর ফলে উৎপাদন সম্পর্কিত ঝুঁকি বর্তাতো উৎপাদকদের উপর। এজন্য দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সালের তুলনায় ১৮৫৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশের কৃষি ছিল অনেক বেশি বাণিজ্যভিত্তিক, কারণ এ সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ কৃষিপণ্যের বেচাকেনা হয়। কিন্তু উৎপাদনের সম্প্রসারণ অন্য তেমন কোন পরিবর্তনের সূচনা করে নি। এমনকি ১৭৬৫ সালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষিকে ভরণপোষণক্ষম বলে আখ্যায়িত করা যায় না এবং বাজারজাতকরণের জন্য বর্ধিত উৎপাদন অর্জন করা হয় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যতিরেকেই বা মূলধন, ভূমি এবং শ্রমের মধ্যে নতুন কোন সম্পর্ক সৃষ্টি না করেই।[১৬]

এরকম মনে করার কোন কারণ নেই যে, বাংলাদেশে কারুশিল্পেও কৃষি উৎপাদনের তুল্য ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে বরং এর উল্লেখযোগ্য সংকোচন হয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন হয়েছিল সামান্যই। রেশম পাকানোতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিছু নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের সূচনা করেছিল। বাঙালিদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সুতা পাকানোর কৌশল শেখানো হয়েছিল। এ পদ্ধতিতে নিজের বাড়িতে কাজ না করে তারা বড় বড় ইউনিটে কাজ করতো। নিজস্ব উদ্যোগে কেউ কেউ প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ-দ্রব্যের উত্তোলন ও ব্যবহার শুরু করেছিল। ১৯২০-এর দশকে কলকাতায় এবং তার আশেপাশের নদীতে চলাচলকারী নৌকা-জাহাজে এবং কলকারখানায় বাষ্পশক্তির ব্যবহার শুরু হয়। একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত হলো কলকাতার কাছে ফোর্ট গ্লস্টারের একটি বাষ্পশক্তিচালিত মিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদনে সাফল্য। ১৮৫৪ সালে বাষ্পশক্তিচালিত প্রথম পাটকলের উদ্বোধন করা হয়। ১৮৫০-এর দশকে রেলওয়ে নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপগুলি গৃহীত হয়।

১৬. দ্রষ্টব্য, R and R. Ray, ' The Dynamics on Continuity in Rural Bengal under the British Imperium, *Indian Economic and Social History Review*, X (1973), 93-128.

উনিশ শতকের শেষদিকে এই পরিকল্পনা খুব দর্শনীয়ভাবে বর্ধিত হয়। ১৮৫৪ সালে রানীগঞ্জের কয়লাখনির সঙ্গে কলকাতার সংযোগ সাধিত হয়।[১৭] এগুলোর সবকটিই ছিল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাশূন্য। তথাপি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসানের সময়ে শিল্পোন্নত বৃটেন থেকে বাংলাদেশের প্রযুক্তিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আমদানি হয় নি। জনসংখ্যার বৃহদংশের প্রয়োজন তখনো মেটাতো তাঁতী, কামার-কুমোর এবং অন্যান্য কারিগরেরা। তারা আগের মতোই একই যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজেদের গ্রামে বা শহরের কর্মশালায় কাজ করতো।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এসব কারিগরের বৃহদংশের অবস্থা কেমন ছিল তা সামান্যই জানা যায়। শেষ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আমদানি করা সস্তা পণ্য তাদের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, বহুল পরিমাণ আমদানি তখনো ছিল দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। সুতীবস্ত্র ইত্যাদি তৈরিতে যারা নিয়োজিত ছিল, তাদের অনেকেই অবশ্য ইতিমধ্যেই বিদেশী প্রতিযোগিতার পরিণামফল ভোগ করতে শুরু করেছিল। ভুক্তভোগীরা ছিল উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী এবং তাদের সহায়তাকারী যারা সুতা কাটতো তারা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা। ল্যাঙ্কাশায়ারের টেক্সটাইল শিল্পের সঙ্গেই ছিল প্রধান প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা দেখা দেয় ধীরে ধীরে। ল্যাঙ্কাশায়ারে এসব ঘটলেও বাংলাদেশের সুতায় তৈরি বস্ত্রসামগ্রীর বিশ্বজোড়া রপ্তানি ১৭৬৫ সাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৮১৫ সাল নাগাদ বৃটেনের বাজারের একটি বড় অংশ এসব পণ্যের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর পরই বন্ধ হয়ে যায় ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বাজারসমূহ। ভারতের গ্রামের ভোক্তারা অবশ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়চোপড় পরিধান অব্যাহত রাখে। কিন্তু ১৮২০-এর দশক থেকে ১৮৪০-এর দশকের বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান গতিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতা ও কাপড় ভারতের বাজার এককভাবে দখল করতে শুরু করে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু তাঁতীসম্প্রদায়ের জন্য রপ্তানিবাণিজ্যের অবলুপ্তি ছিল চূড়ান্ত। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঢাকার এধরনের তাঁতীরা। ইংরেজ পর্যবেক্ষকগণ এদের দুঃখ-দুর্দশার কথা নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য অঞ্চলে তাঁতীদের যেসব কারবার ছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ বৃটেন থেকে ক্রমাগত আমদানির ফলে ভারতের শহরে বাজার থেকে কেনাকাটার জন্য বড় ধরনের ফরমাশ বন্ধ হয়ে যায়।[১৮] লবণ উৎপাদনকারীদের জীবনও সঙ্কুচিত হতে শুরু করে, কারণ ১৮৫০-এর দশকে বৃটেন থেকে আমদানিকৃত লবণ বাংলাদেশের অর্ধেক বাজার দখল করে ফেলে।

১৭. B. B. Kling, *Partner in Empire Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*, (Berkeley 1976); R. S. Rungta, *The Rise of Business Corporations in India*, (Cambridge 1979), 59-64.

১৮. D. B. Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal*, (Calcutta 1979).

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন ধরনের কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না যা নগরায়ণে নতুন ধারার প্রবর্তন করতে পারে। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি নতুন নতুন গ্রাম সৃষ্টি করে চলছিল অথবা সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছিল পুরনো গ্রামগুলির। সেই আদিকাল থেকেই নগরগুলি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন এবং ধর্মের কেন্দ্র। এসময়ে উৎপাদনের নতুন কেন্দ্র হিসেবে এগুলি বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করে নি। একটি নগর সমৃদ্ধিশালী হয়েছে নাকি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে তা নির্ভর করেছে নদীর গতিপথের পরিবর্তন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উপর। একটি বড় জমিদারির পতন হলে রাজার প্রশাসনের কেন্দ্র ঘিরে যে শহর থাকতো তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যেতো। কোম্পানি কোথাও সেনানিবাস তৈরি করলে তার আশেপাশে বসতি গড়ে উঠতো। কোম্পানির শাসনের প্রথমদিকে যে দু'টি শহর এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে দু'টি হলো মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। তবে এই ক্ষতি হয় উনিশ শতকের অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। শহর দু'টির মধ্যে মুর্শিদাবাদ ছিল আঠারো শতকে নবাবদের রাজধানী। এতে অত্যন্ত লাভবান হয়েছে কলকাতা। বৃটিশদের বিজয়ের বহু পূর্বেই কলকাতা বাংলার প্রধান বন্দরে পরিণত হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য অংশে বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত হওয়ার পর কলকাতা হয়ে গেল এক বিশাল পশ্চাৎভূমির বহির্দ্বার। ১৭৭২ সালে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। কোম্পানিতে চাকুরিরত এবং চাকুরিবহির্ভূত ইউরোপীয়রা কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যবসায়ী, শহরের বাড়িতে বসবাসরত জমিদার এবং পেশাগত জনগণের একটি অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়ও কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি কলকাতা হয়ে উঠতে থাকে শুধু বাংলাদেশেরই নয়, ভারতের পূর্বাঞ্চলের সব অংশেরও ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের কেন্দ্রস্থল। ১৮৩৭ সালের হিসাব অনুযায়ী এই শহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আনুপাতিক হার ছিল শতকরা ৬৩ ও ৩৭। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় জনসংখ্যার বেশিরভাগই ছিল কত ক্ষণস্থায়ী।[১৯] সব পর্যবেক্ষকই বর্ণনা করেছেন কলকাতা কিভাবে শহরতলি আর গ্রামের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে পল্লীঅঞ্চলের সঙ্গে মিশে গেছে। এই পল্লীঅঞ্চল ছিল মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। দিনের বেলায় দূরবর্তী গ্রামগুলি থেকে প্রায় সব লোকজনই শহরে কাজ করতে আসতো। এ ধরনের ভ্রমণশীল জনসংখ্যার হিসাব রাখা ছিল বেশ কঠিন ব্যাপার। ধারণা করা হয়েছিল, ১৮২০-এর দশকে কলকাতার স্থায়ী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০,০০০। ১০০,০০০ লোকের একটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রতিদিন শহরে প্রবেশ করতো। ১৮৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা ৪০০,০০০-এর বেশি বলে ধরা হয়।[২০]

এতগুলি লোকের একত্র সমাবেশ বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কৃষির জন্য ছিল একটি ব্যাপক উদ্দীপকবিশেষ। কলকাতার খাদ্যের চাহিদা কেবল আশেপাশের জেলাগুলোতে ব্যাপক উৎপাদনের দ্বারাই মেটানো হতো না, গঙ্গার পথে দূরদূরান্ত থেকে বাণিজ্যের

১৯. A Mitra, "Calcutta City", *Census of India, 1951*, VI, pt, iii (Calcutta 1954), 11-12.

২০. A .K Ray, "A Short History of Calcutta", *Census of India*, 1901, VII (Calcutta 1902), 60.

মাধ্যমে এবং সর্বোপরি পূর্ববাংলা থেকেও মেটানো হতো। পূর্বের সম্প্রসারণশীল জনবসতিপূর্ণ এলাকাসমূহে যে অতিরিক্ত চাল উৎপাদিত হতো তার বেশিরভাগই জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হতো।

কলকাতা সন্দেহাতীতভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেকোন আকারের প্রতিটি স্থানীয় বাজারের নিজস্ব ব্যবসায়ী ছিল। মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল উনিশ শতকের অনেক আগে থেকেই। ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলি, বিশেষকরে বেনারস থেকে মহাজনেরা বাংলাদেশে বেশ ব্যবসা করেছে। তা সত্ত্বেও কলকাতার প্রাধান্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এমনকি ১৭৬৫ সালের আগেও ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং মহাজনেরা কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আঠারো শতকের শেষদিকে কলকাতায় বসবাসরত ব্যবসায়ীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হয়। বেশির ভাগ ব্যবসায়ী নিজেরাই ইউরোপীয়রা যেটাকে তাচ্ছিল্যভরে বাজার বলে উল্লেখ করতো সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করতো। অনেকেই আবার বৃটিশদের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বেসরকারি ব্যবসায়ী এবং পরবর্তীকালের এজেন্সি হাউজের সবাই ভারতীয়দের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করতো। শুরু থেকেই এক ধরনের অংশীদারিত্বের উদ্ভব হয়। এর কারণ হলো, ভারতীয়রা পৃথক পৃথকভাবে ইউরোপীয়দের ব্যবসার ব্যবস্থাপক বা 'বানিয়া' মুৎসুদ্দি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইউরোপীয় প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি খাত যখন এজেন্সি হাউজে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়, তখন মুৎসুদ্দি এবং অন্যান্য এজেন্ট এবং দালালেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। কিছু কিছু ভারতীয় আবার সাহস করে এসব ব্যবসায়ে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করে। ১৮৩০-এর দশকে ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঠাকুর হলেন একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। এই পরিবারের নীল, কয়লা এবং চায়ের ব্যবসা ছিল এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশীদারিত্ব ছিল।[২১]

যদিও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল একটি অপরিহার্য বাস্তবতা, তবুও বর্ণভিত্তিক সীমারেখাও প্রকট হয়ে উঠতে চাইতো। মৌল কৃষিতে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা, সর্বোপরি শস্যদানার বিশাল ব্যবসা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে। কোম্পানির লবণ বিতরণের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করা হতো। ইউরোপীয় এজেন্সি হাউজগুলি ছিল জাহাজের মালিক এবং তারা বৃটেন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ব্যবসা করতো। যেসব ভারতীয় এসব ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিত, দুর্বল হলে তারা অকৃতকার্য হতো, মার খেতো। ১৮২০-এর দশকের শেষের বছরগুলোতে এবং পুনরায় ১৮৪০-এর দশকে কলকাতার বেশ কয়েকটি এজেন্সি হাউজ ও ব্যাঙ্ক দর্শনীয়ভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়

২১. Kling, *Partner in Empire.*

এবং ভারতীয় লগ্নিকারীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে যারা নতুন প্রজন্মের ছিলেন, তারা অনেক ব্যাপক এবং নিবিড়ভাবে খোদ বৃটেনের ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। এগুলিতে অবশ্য ভারতীয়দের ভূমিকা ছিল নগণ্য।[২২]

ইউরোপীয় হোক কিংবা ভারতীয় হোক, ব্যবসায়ীরা এমন একটা মুদ্রা এবং জমাব্যবস্থার মধ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো, যা এসময়ে তুলনামূলকভাবে খুবই কম পরিবর্তিত হয়। বৃটিশরা উত্তরাধিকারসূত্রে এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা লাভ করে, যার ভিত্তি ছিল বিভিন্ন টাঁকশালে প্রস্তুত রৌপ্যটাকা। আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে চালু ছিল একটি বেশ জটিল বাটাব্যবস্থা, যাতে বিভিন্ন টাঁকশালে তৈরি টাকা বা বিভিন্ন বছরে তৈরি টাকা ব্যবহৃত হতো। এই জটিলতা এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে খরচ হতো তা ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হতো। বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে কোম্পানি ১৮৩৫ সালে টাকার একটি একক মানের প্রচলন করে। ভারতীয় মহাজনদের নামে প্রদেয় এবং হুন্ডি নামে অভিহিত বিল অব একচেঞ্জ, ইউরোপীয়দের নামে প্রদেয় বিলসমূহ এবং কোম্পানি কর্তৃক জারিকৃত কাগজের সার্টিফিকেটসমূহ বা বন্ডসমূহ রৌপ্যের ঘাটতি মেটায় এবং সম্পদের সরাসরি স্থানান্তর ছাড়াই বিরাট অঙ্কের টাকার স্থানান্তর সম্ভব করে তোলে। বিভিন্ন ধরনের কাগজে দলিলের ব্যবহারের ফলে বাটার মাধ্যমে জটিল ও ব্যয়বহুল বিনিময়ের সূত্রপাত হয়। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাঙ্কনোটের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে এবং ১৮০৯ সাল থেকে সরকারি মদদপুষ্ট ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল বাজারে নোট ছাড়তে শুরু করে। ইউরোপীয়দের মালিকানাধীন ব্যাঙ্কসমূহও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু এধরনের নোট বিতরণের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৮৩১ সালে এ কথা বলা হয় যে, "ব্যাঙ্কনোটের সাহায্যে বণিকেরা এবং কোম্পানি টাকা পাঠাবার সুবিধা লাভ করলেও দেশের অভ্যন্তরে কাগজের টাকা হিসেবে এব কোন অস্তিত্বই প্রায় ছিল না"। অন্যদিকে সরবরাহ কম হলেও 'দেশে চালু ধাতব মুদ্রা' 'দেশীয় ব্যবসায়ীরা' তখনো ব্যাপকহারে ব্যবহার করতো।[২৩]

প্রতিটি স্তরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল ঋণপ্রাপ্তির উপর। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ ধরনের ব্যবস্থাকে সঙ্কটজনক বলে বিবেচনা করা হতো এবং টাকা ধার করার ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশি। বৃটিশদের বিজয়ের বহু পূর্বেই বাজারে বিক্রি করার জন্য কৃষকেরা যা উৎপাদন করতো, তা বণিকদের কাছে বা অন্যান্যদের কাছে বন্ধক থাকতো। এরা চড়া সুদে কৃষকদের টাকা আগাম দিত। চাল দায়বদ্ধ রেখে যে টাকা ধার দেয়া হতো, তার সুদ হিসেবে শতকরা ২৪ টাকা ন্যূনতম বলে বিবেচিত হতো।

২২. ঐ, 243-5.

২৩. Evidence of Holt Mackenzie, *Parliamentary Papers*, 1831-2 X, pt. i, 50; on banking and currency in general, দেখুন A. K. Bagchi, *The Evolution of the State Bank of India, The Roots 1806-76*, (2 Vols. (Bombay 1987), Vol. I.

শতকরা ৫০ টাকা বা তদূর্ধ হারের সুদ ছিল স্বাভাবিক।[২৪] আখের জন্য আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল আরো চড়া। যারা মালবেরী উৎপন্ন করে বা তাঁতের কাপড় বুনে কোম্পানির জন্য কাজ করতো তারা বা ইউরোপীয় নীল কারখানায় যারা কাজ করতো তারা যে টাকা আগাম নিত তার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সুদ ধার্য করা হতো না। কিন্তু প্রায়ই বিশেষভাবে নীলচাষীদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করা হতো যে, শেষ পর্যন্ত পণ্যের মূল্য অত্যন্ত কম দেয়ার কারণে বিরাট অঙ্কের সুদ কেটে রাখা হয়েছে। বাংলার সব বণিকেরই ব্যয়ের হিসাবে সুদ ছিল প্রধান খাত। ১৭৭৩ সাল থেকে কোম্পানির আদালতে বলবৎ করা যেতো এরকম সুদের সর্বোচ্চ হার ছিল ১২ শতাংশ। কিন্তু কলকাতার ভারতীয় বণিকেরা এর চেয়ে অনেক বেশি হারে সুদ প্রদান করতো বলে জানা যায়।[২৫] ১৮২০-এর দশকে নীলচাষীরা এজেন্সি হাউজের কাছ থেকে নেয়া ধারের জন্য ৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিয়েছে বলে জানা যায়। এজেন্সি হাউজ আবার এ টাকা ধার করতো ইউরোপীয় বা ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। তহবিলের স্বল্পতার কারণে অর্থপ্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো এবং প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার বেড়ে যেতো ব্যাপকভাবে। ১৮২৬ সালে এজেন্সি হাউজগুলি অভিযোগ করে যে, বার্মা যুদ্ধের জন্য সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের ফলে তারা ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত হারে সুদ দিতে বাধ্য হচ্ছে।[২৬] বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রকৃত অর্থে মূলধনের ঘাটতি পড়েছিল কিনা বা বণিকদের স্বার্থের আলোকে অর্থবাজারে খুবই অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল কিনা তা পরিষ্কার নয়। উভয়ক্ষেত্রেই বৃটিশ ভাষ্যকারেরা বিশ্বাস করতেন যে, ঋণ সবররাহের মূল্য এবং অনিশ্চয়তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছিল একটি প্রধান বাধা। তারা বৃটেন থেকে মূলধন আসবে বলে আশা পোষণ করেছিল। কিন্তু প্রথমদিকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বৃটেন থেকে রেলওয়ে বাবদ মূলধনের প্রবাহ ছিল অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধারাবাহিকতার উপাদানসমূহ ছিল অত্যন্ত জোরালো, এবং শিল্পপুঁজিবাদের একক প্রতিভূ নয় এমন একটি উপাদান ছিল বৃটিশ শাসনামল থেকে উদ্ভূত পরিবর্তনের চাপসমূহ প্রতিহত করতে সমর্থ। ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালে বাংলাদেশের কৃষি কিছুটা বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছিল। বৃটিশদের অধীনে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং নীলের মতো নতুন ফসলসমূহের ব্যাপক চাষ হতে থাকে। বণিকদের কাছ থেকে উচ্চহারে নেয়া ধারের সাহায্যে ক্ষুদ্র চাষীদের চাষাবাদ সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন চিনি ও নীল ইউরোপে ঢোকার প্রবেশপথ পায় এবং রেশম সহযোগে এগুলি ভারত থেকে সরকারি এবং বেসরকারি ফান্ড স্থানান্তরের উপায় হিসেবে সুতীর তৈরি পণ্যের স্থান দখল করে। কিন্তু বাংলাদেশে উৎপন্ন

২৪. R Datta, "Merchants and Peasants A Study of the Structure of Local Trade in Grain in Eighteenth Century Bengal", *Indian Economic and Social History Review,* XXIII (1986), 393-4.

২৫ P J. Marshall, *East Indian Fortunes. The British in Bengal in the Eighteenth Century,* (Oxford 1976), 42.

২৬. Tripathi, *Trade and Finance*, 164

পণ্য তখন পর্যন্ত গুণের দিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয় নি, এত সস্তাও হয় নি যে তা বৃটেনের খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহের প্রধান উৎস হবে। কোম্পানির শাসনামলের শেষ পর্যায়ে বাংলায় শিল্পপণ্যের উৎপাদন হয়তো যথার্থই কমে গিয়ে থাকবে। কিন্তু কোম্পানির শাসনের মাধ্যমে বৃটিশদের পক্ষ থেকে যে প্রতিযোগিতা চালু হয় তা কোন প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে ছিল অত্যন্ত দুর্বল। নেপোলিয়নের আমলের যুদ্ধের পরই তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৮৪০-এর দশকেই বৃটেন থেকে রপ্তানিকৃত পণ্য প্রবলভাবে ভারতের বাজার দখল করতে শুরু করে। বাংলায় ইউরোপীয়দের ব্যবসা প্রথমত কোন স্থানই পেতো না যদি না সেখানে মুদ্রা এবং ঋণের একটি জটিল পদ্ধতি এবং নৌকাযোগে সমগ্র প্রদেশে যাতায়াতের একটি বেশ উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা না থাকতো। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার (অবকাঠামো) উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির সহায়ক ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিকের বছরগুলিতে আরো উন্নয়নের জন্য অধিকতর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল বলে মনে হচ্ছিল সে সম্পর্কে বৃটিশরা সচেতন ছিল। তারা অপর্যাপ্ত মুদ্রা, উচ্চ সুদের হার, সীমিত অর্থবাজার এবং অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। তখন উত্তরাধিকারসূত্রে তারা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার পেয়েছিল, তাদের নিজেদের সৃষ্ট কোন ব্যবস্থাকে সেটির স্থলাভিষিক্ত করার সামর্থ্য তাদের ছিল না।

যদিও প্রায় একশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার অর্থনীতিতে মৌল কোন পুনর্বিন্যাসের ধারার সূত্রপাত করতে পারে নি, তবুও প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে এ দেশের জনগণের একটি বিরাট অংশের জীবনমান তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। আর যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনেরই ফল। এসব পরিবর্তন মূল্যায়ন করার প্রাক্কালে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশের জনগণ শুধুমাত্র উৎপাদনকারী, ভোক্তা, শ্রমবিক্রেতা, মূল্য এবং দৈনিক মজুরির উঠানামার দ্বারাই প্রভাবিত ছিল তা নয়, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজস্বপ্রদানকারীও ছিল এবং তারা রাজস্ব আদায়ের পর্যায় দ্বারাও ছিল বেশ প্রভাবিত। বাংলার রাজস্বের ইতিহাস অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচিত হবে, কিন্তু সে ইতিহাসের কিছু প্রতিক্রিয়া এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোম্পানি আমলে বাংলার সম্পদ এবং দারিদ্র্যের বিষয়টি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণবন্ত বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। এসব বিতর্ক আজও চলছে। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের (যেমন জনসংখ্যার হিসাব বা উৎপাদনের পর্যায়) অভাবে এসব বিতর্কের চূড়ান্ত সমাধান সুদূরপরাহত। সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পরিমাণগতভাবে বিভাজন করার চেষ্টা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে শাসনযন্ত্র কায়েম করেছিল, তা এমন এক পর্যায়ে দেশের সম্পদ শোষণ করে যে, তা সমগ্র দেশের জনগণের জীবনের মানে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এর আগে যেসব সারণি দেয়া

হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বাংলার সমগ্র প্রদেশ নয়, শুধু কলকাতা এবং তার পশ্চাৎভূমি থেকেই প্রধানত ইউরোপে এবং চীনে পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানির পরিমাণ আমদানিকৃত পণ্য বা স্বর্ণ-রৌপ্যের আকারে প্রতিদানে বাংলাদেশ যা পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমদানির চেয়ে রপ্তানির এই আধিক্যের জন্য অর্থযোগান দেয়া হয়েছে বাংলা থেকে ট্যাক্স আদায় করে। ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে কখনো সরাসরিভাবে আদায়কৃত রাজস্ব দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালামাল ক্রয়ের মাধ্যমে, কখনো পরোক্ষভাবে ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় এবং মুনাফা দিয়ে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে। আর এই সঞ্চয় ও মুনাফার বেশিরভাগই পাওয়া যেতো বাংলার রাজস্ব থেকে। আঠারো শতকের শেষদিকে সমগ্র বৃটিশ ভারতের কিছু সময়ের রপ্তানিউদ্বৃত্ত হিসাব করা হয়েছে ১.৮ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা)।[২৭] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক একটা কাঠামোতে স্থির হয়, যা বৃটিশ শাসনের যবনিকা পর্যন্ত টিকে যায়। কোম্পানি বাংলাদেশের পণ্য মুনাফায় বিক্রি করতে পারুক বা না পারুক, তাকে এমন একটা রপ্তানিউদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করতে হতো, যা দেশীয় খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট হতো বলা যায়। অর্থাৎ এই উদ্বৃত্ত দিয়ে বৃটেনে প্রধানত কোম্পানির দেনা পরিশোধ করা হতো, বৃটেনের যে খরচ তা মেটানো হতো, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেয়া হতো অথবা অস্ত্র ক্রয় করা হতো বা ভাণ্ডারের অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা হতো। ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানি সমগ্র বৃটিশ ভারত থেকে বৃটেনে যে অর্থ পাঠিয়েছে তার বার্ষিক গড় হলো প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ড (আনুমানিক ৩.৫ কোটি টাকা)।[২৮] যে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বা মুনাফা সমগ্র ভারত থেকে বৃটেনে পাচার করা হয়েছে, তার হিসাব হলো ১৮২২ সালে ১ মিলিয়ন পাউন্ড (এক কোটি টাকা) এবং ১৮৫০-এর দশকের প্রথমদিকে ১.৫ মিলিয়ন অথবা ২ মিলিয়ন পাউন্ড (১.৫ বা ২ কোটি টাকা)।[২৯]

বাংলাদেশের রপ্তানিউদ্বৃত্ত পরিমাণগতভাবে নির্ণয় করা গেলেও তা এই প্রদেশের মোট উৎপাদনের কতটুকু অংশ তা এখনো হিসাব করা অসম্ভব বলেই প্রতীয়মান হয় এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ কখনো নির্ণয় করা যাবে না। আঠারো শতকের শেষদিকে সমগ্র বৃটিশ ভারতের হিসাবকৃত উদ্বৃত্ত রপ্তানির এবং বৃটিশদের দ্বারা বাংলায় বাৎসরিক উৎপাদনের সমসাময়িক অনুমানের আলোকে এই পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা অবশ্য করা হয়েছে। এধরনের হিসাবনিকাশের মূল্য যাই হোক, পণ্ডিতেরা বাংলার বার্ষিক উৎপাদনের ৯ শতাংশ

২৭. H. Furber, *John Company at Work* (Cambrige Mass, 1948), 309-10.

২৮. K. N Chaudhuri, *The Economic Development of India Under the East India Company 1813-58*, (Cambridge 1971), 36

২৯. ঐ, ৬২; evidence of J. C. Melvill, *Parliamentary Papers*, 1852-3, XXVIII.

বা ৪ শতাংশ পরিমাণ লোকসানের হিসাব দিয়েছেন।[৩০] বাংলাদেশের সম্পদ বাইরে স্থানান্তরের বিষয়টি হিসাবের মধ্যে ধরে এবং এই প্রদেশের উৎপাদনের যতোটুকু অংশই হোক না কেন, বৃটিশদের বিজয়ের ফলে যে রপ্তানিউদ্বৃত্ত হয়, তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতির সঞ্চার করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নিজেদের নৈপুণ্যের ফলে বাংলাদেশের বয়নশিল্পীরা বিশ্বজোড়া বাজার দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। বৃটিশদের বিজয়ের ফলে টেক্সটাইল শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, তবে শেষ পর্যন্ত এই শিল্প যে এই রপ্তানিবাজার হারাতো তা মনে হয় অনিবার্য ছিল। এই প্রদেশের নতুন শাসনকর্তারা যদি রাজস্ব থেকে ব্যয় করে একে উৎসাহিত না করতেন, তাহলে যে পরিমাণে বিকল্প রপ্তানির উন্নয়ন হয়েছিল সে পরিমাণে তা হতো কিনা সন্দেহ। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ হতে বিশ্ববাজারের চাহিদার অতিরিক্ত সিল্ক, নীল বা চিনি রপ্তানি করা হতো।

সম্পদ পাচারের বিষয়টি অবশ্য শুধু ইউরোপ এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা প্রেসিডেন্সির (যা বাংলার সীমানার বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল) রাজস্বের ৪০ শতাংশের বেশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেকোন এক বছরে সামরিক খাতে ব্যয় করতে পারতো।[৩১] সৈন্যদের বেতন এবং কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির জন্য ব্যয় পুনরায় স্থানীয় অর্থনীতিতে ফিরে যেতো। তবে এটা ঠিক যে, এ ধরনের ব্যয় থেকে বাংলা তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপকৃত হয় নি। বাংলা সেনাবাহিনীর প্রায় সব সৈন্যই অযোধ্যা এবং বিহার থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তাদের কর্মস্থল ছিল উত্তর ভারত। তাছাড়া তাদের সরঞ্জামাদির প্রায় সবই ছিল আমদানিকৃত। তদুপরি সামগ্রিকভাবে বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজস্ব ব্যয় করা হতো অন্যান্য প্রেসিডেন্সির, এমনকি সম্পূর্ণরূপে ভারতের বাইরের যুদ্ধের ব্যয়-সহায়তার জন্যও।

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার যাই হোক না কেন, স্পষ্টতই এটির উপর অনেক বোঝা চাপানো হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের একটি বিরাট অংশ ব্যবহার করা হতো রপ্তানিউদ্বৃত্ত বজায় রাখার জন্য এবং এমন একটি সেনাবাহিনীর খরচের জন্য, যা নিয়োজিত ছিল সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের দায়িত্বে এবং কখনো কখনো বিশালাকার বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বীয় সম্পদের এধরনের ব্যবহার থেকেও প্রদেশটি নিঃসন্দেহে কিছুটা লাভবান হয়েছিল। রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে এই প্রদেশে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল,

৩০ শতকরা ৯ ভাগ হারের জন্য, দেখুন, I. Habib, "Colonialisation of the Indian Economy", *Social Scientist*, III (pt vii) 28 ; for 4 percent, দেখুন, A. K. Bagchi, *The Political Economy of Underdevelopment*, (Cambrige 1982), 81

৩১. P. J. Marshall, *Bengal the British Bridgehead: Eastern India 1740-1828*, (Cambridge 1988), 135.

রপ্তানি বৃদ্ধি না হলে তা হতো না। বাংলা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়েছিল এবং প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে পেয়েছিল অভ্যন্তরীণ শান্তি। কিন্তু এই লাভগুলি হয়েছে সামগ্রিকভাবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের বিনিময়ে।

রাজস্বপদ্ধতিই ছিল প্রধান কৌশল, যার মাধ্যমে এই প্রদেশের সম্পদ আহরণ করা হয়। কোম্পানির আহরণের পরিমাণ অবশ্য নির্ধারণ করা যায়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সালের পরের বছরগুলিতে রাজস্বের সর্বমোট যে অঙ্ক দাবি করা হতো এবং মোট যে অঙ্ক বাস্তবিকই পাওয়া যেতো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। ১৭৮৯ সালে কোম্পানি বাধ্যতামূলকভাবে রাজস্বের অঙ্ক নির্ধারণ করে দেয় এবং ১৭৯৩ সালে তা-ই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করে। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরাজস্ব নির্ধারণ করা হয় ২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা।[৩২] বাংলাদেশের নবাবরা যা আদায় করতো তার তুলনায় এই কর নির্ধারণ কতগুণ বেশি হয়েছিল তা বিতর্কের বিষয়। অনেক ঐতিহাসিকই এই যুক্তি দেন যে, নবাবরা যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতো কোম্পানির আদায়ের পরিমাণ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। অন্যান্য হিসাবনিকাশ থেকে দেখা যায় যে, ১৭৫০-এর দশকের তুলনায় ১৭৮৯ সালে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কর বেশি নির্ধারণ করা হয়।[৩৩] ১৭৮৯ সালে এ ধরনের করবৃদ্ধির কষ্টকর প্রভাবের সম্ভবত কিছুটা উপশম হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রদেশটির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাষাবাদ বৃদ্ধির ফলে সরকারনির্ধারিত নির্দিষ্ট রাজস্বদাবির মোট বোঝার ভার বহুলাংশে হ্রাস পায়। কোম্পানি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে যে রাজস্ব নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, তা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোম্পানির তেমন কিছু করার ছিল না। তবে কোম্পানি মাঝে মাঝে নিষ্কর ভূমির অধিকার পুনরায় গ্রহণ করার চেষ্টা করতো, অর্থাৎ পূর্বে যে ভূমি রাজস্ব আরোপ থেকে রেহাই পেয়েছিল তা থেকে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করতো অথবা যেসব জমিতে নতুন বসতি স্থাপিত হয়েছিল সেসব জমির উপর করারোপ করার চেষ্টা করতো। এসব পদ্ধতিতে রাজস্বের মোট বৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না।

ভূমি থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো, কোম্পানির রাজস্ব অবশ্য শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কোম্পানি আমদানির উপর এবং ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর শুল্ক আরোপ করেছিল। সর্বোপরি কোম্পানি লবণ বিক্রি থেকে রাজস্ব পেতো এবং এর পরিমাণ ছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে মোট যা পেতো তার শতকরা ২০ বা ৩০ ভাগ। লবণরাজস্ব আসতো বাংলা এবং উড়িষ্যার উপকূলে বাষ্পীভবনের দ্বারা লবণ উৎপাদন এবং বিক্রয়ের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার

৩২. ঐ, 123
৩৩. ঐ, 141

থেকে। ১৯৪০-এর দশকে বৃটেন থেকে আমদানিকৃত লবণ বিক্রয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাতে ক্রমবর্ধমান হারে এই রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে উৎপাদিত লবণ সাধারণত উৎপাদনব্যয়ের প্রায় চার গুণ বেশি মূল্যে বিক্রি করা হতো এবং আমদানিকৃত লবণের উপর কর তার তুল্য করে ধরা হতো। ভোক্তাদের কাছে পৌঁছার আগে লবণের দামের সঙ্গে যুক্ত হতো বণিক এবং খুচরা বিক্রেতাদের মুনাফা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, লবণের উপর থেকে রাজস্ব আদায় করার ফলে ভোগের একটি মৌলবস্তুর মূল্য বহুগুণ বেড়ে যায়।

স্থূলভাবে বলতে গেলে, বাংলার উপর বৃটিশরা যে রাজস্বচাহিদা আরোপ করেছিল তা দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে। ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বর্ধিত রাজস্ব আদায় করা হয় (এর অর্থ এই নয় যে এই চাহিদা মুগল বা অন্যান্যদের শাসনামলে বৃদ্ধি পেতো না)। ১৮৮৯ সালের পর ভূমির উপর রাষ্ট্রের সরাসরি চাহিদা স্থিতিশীল হয়। কিন্তু ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পরোক্ষ কর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

রাজস্বচাহিদার বোঝা যারা রাজস্ব দিত তাদের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে কিভাবে সমন্বিত হতো তা একটি জটিল বিষয়। এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। রাষ্ট্র কর্তৃক মোট যে রাজস্ব ধার্য করা হতো এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র চাষী যা সত্যিই প্রদান করতো, তার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। ধরে নেয়া হয় যে, রাষ্ট্রের চাহিদার যেকোন বৃদ্ধি কৃষকদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে দালালেরা পৌঁছে দিত। এই বৃদ্ধিকে বলা হতো 'আবওয়াব' বা অতিরিক্ত কর। ব্যাপারটি যদি সাধারণত এমনই হয়ে থাকে, তবে এর বিপরীতটা মনে হয় কদাচিৎই ঘটতো। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী বছরগুলিতে রাষ্ট্রের চাহিদার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কমে গেলেও কৃষকদের উপর চাপের বোঝা কমে গিয়েছিল এমন মনে করার কোন ভিত্তি নেই; বরং বলা যায় যে, বোঝা বেড়েই গিয়েছিল। এ গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তত্ত্বগতভাবে হলেও বৃটিশদের ইচ্ছে ছিল রাজস্বদালাল এবং কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে দালালদের প্রদত্ত নিরাপত্তার কিছুটা কৃষকেরা পায়। এ ধরনের প্রচেষ্টা ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল এবং বাস্তবে কোম্পানি রাজস্বের দাবি মেটানোর জন্য জমিদারদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়। উনিশ শতকের শুরুতে বৃটিশ শাসকদের এই সর্বজনীন মত ছিল যে, চাষাবাদে নিয়োজিত জনগণের অবস্থা মোটের উপর অবনতির দিকে যাচ্ছে। বেশিরভাগ চাষীর পক্ষেই রাজস্ববৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। এই সুযোগে জমিদারেরা ভূমির উপর জনগণের ক্রমবর্ধমান চাপের সুবাদে ভূমিকর বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অবস্থা এত সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, ১৮৫৯ সালে বাংলার নতুন রাজপ্রশাসকেরা একটি আইন পাশ করে কয়েক শ্রেণীর চাষীকে রাজস্ববৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা করেন। আধুনিককালের গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দরিদ্রতর চাষীদের উপর ঋণের

বোঝা বেড়ে যাচ্ছিল, যেমন বেড়ে যাচ্ছিল তাদের ঋণিতা। এ সময়ে যেসমস্ত গ্রামবাসী মাত্র ভরণপোষণের স্তরে জীবিকানির্বাহ করতো তাদের সংখ্যা (এবং সম্ভবত তাদের হারও), সে কয়েক বিঘার মালিক রায়ত হোক অথবা অন্যের জন্য সার্বক্ষণিক শ্রমিকই হোক, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভূমির উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়।[৩৪] কোম্পানি আমলের শেষ পর্যায়ে চাষাবাদে নিয়োজিত জনগণের মধ্যে স্তরবিন্যাস কি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তা সুস্পষ্ট নয়। অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী চাষীদের বিভিন্ন দল জমিদারদের রাজস্ববৃদ্ধির চাপকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে এবং বেশিরভাগ চাষীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে একটি সুবিধাভোগী অবস্থান বজায় রাখতে সফল হয়েছিল। ১৮৫৯ সালের আইনের দ্বারা এরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়।[৩৫]

সম্ভবত ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানির বর্ধিত রাজস্বচাহিদার সময়ে দালালেরা এই বোঝার কিছুটা অন্তত কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। যে সময়ে স্থিতিশীল রাজস্বচাহিদা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছিল, সে সময়ে খাজনা এবং রাজস্বের মাধ্যমে যেসমস্ত সুযোগ-সুবিধা বিতরিত হয়েছিল, তা রাষ্ট্রের কাছেও পৌঁছে নি, কৃষককুলের কাছেও পৌঁছে নি, পৌঁছেছে বিপুলভাবে ক্রমবর্ধমান দালাল শ্রেণীর কাছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তাৎক্ষণিক কারণে বড় বড় জমিদারির প্রায় সবগুলিই আঠারো শতকের প্রথমদিকে ভেঙে পড়ে।[৩৬] যেগুলি উনিশ শতক পর্যন্ত টিকেছিল সেগুলি এবং মাঝারি আকারের জমিদারিগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এ সময়ে রায়তিস্বত্ব ভোগকারীদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। এদের সবারই আয়ের উৎস ছিল কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব।

রাজস্বসংগ্রহ ছিল বাংলাদেশের সম্পদ বিতরণের একটি কৌশল। মূল্য এবং মজুরির উঠানামা ছিল অন্য একটি কৌশল। এতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই যে, বিদেশী এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বর্ধিত পরিমাণ ছিল বাংলাদেশে বৃটিশ শাসনের একটি ফল। এই প্রদেশের জনগণের জীবনমানের ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা ছিল কিনা তা তেমন সুস্পষ্ট নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সমগ্র জনগণকে প্রথমত ভোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে নাকি উৎপাদক হিসেবে তা ছিল অনিশ্চিত। যে বিপুল সংখ্যক কৃষক তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত জমির অধিকারী ছিল না, তারা যে খাদ্যদ্রব্য বাজার থেকে ক্রয় করতো তার কম মূল্য ভোক্তা হিসেবে তাদের জন্য সহায়ক ছিল। অন্যদিকে, উৎপাদক হিসেবে তাদের কাছে উচ্চমূল্যের এক তাৎপর্য ছিল : তারা তাদের উৎপাদিত শস্যকণা বা

৩৪. R Ray, *Change in Bengal Agrarian Society*, (New Delhi 1979), 290.

৩৫. C. Palit, *Tensions in Bengal Political Society: Landlords, Planters and Colonial Rule*, (Calcutta 1975), 201.

৩৬. S. Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study in its Operation 1790-1819*, (Dacca 1979), 76-143.

অন্য শস্যের যে অংশ খাজনা পরিশোধ করার জন্য বিক্রয় করতে বাধ্য হতো, উচ্চমূল্যের ফলে তারা তা থেকে ভাল মুনাফা করতো। সব মিলিয়ে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, ১৭৬৫ সাল থেকে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে অনেক পণ্যেরই দাম খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। ১৭৬৯ এবং ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বেড়ে যায়। এরপর দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত কমে যায়। শেষ অবধি এমন একটা স্তরে এসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল হয়, যা উনিশ শতকে বহু বছর পর্যন্ত বজায় থাকে। এ সময়ে মূল্য আর তেমন উঠানামা করে নি। বিশেষকরে প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে মূল্য স্থিতিশীল ছিল। অবশ্য অঞ্চলভেদে মূল্যের বেশ উঠানামা ছিল।[৩৭] উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময়ে দ্রব্যের উচ্চমূল্য, বিশেষকরে খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য বজায় না থাকার ফলে চাষাবাদের সম্প্রসারণ নিরুৎসাহিত হয় নি। মূল্য স্থিতিশীল হওয়ার ফলে বর্ধিত রাজস্বচাহিদার ক্ষেত্রে চাষী বিপদের মুখে ছিল, কিন্তু সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পাওয়ায় অনেকেই নিঃস্ব হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে, রাজস্ব সংক্রান্ত দালালরা ছাড়া কৃষি সম্প্রসারণের ফলে আর যারা লাভবান হয়েছিল তারা হলো বণিকগোষ্ঠী। বণিকদের প্রদত্ত ধারের উপর কৃষকরা নির্ভরশীল ছিল। বণিকেরা বিপুলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যবসা পরিচালনা করতো। এমনকি মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হলেও কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা করে বিপুলসংখ্যক বণিক আরামপ্রদ জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিভিন্ন রচনায় এ বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে যে, এই শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে স্থানীয় ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিফল হয়। সাধারণত এ ধরনের বিফলতার যেসব কারণ দেখানো হয় তা হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বয়নশিল্প, রেশম এবং লবণের উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, ভারতীয়দের প্রতিযোগিতা সীমিত রাখার ক্ষেত্রে বেসরকারি বৃটিশ স্বার্থের নির্দয়তা, ১৮৩০-এর এবং ১৮৪০-এর দশকে ব্যাঙ্কসমূহ এবং এজেন্সি হাউজসমূহের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয়দের বিপুল লোকসান।[৩৮] যদিও ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কিছু অংশের, বিশেষকরে কলকাতার সম্পদের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তথাপি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বৃটিশ স্বার্থ বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরকমটি তারা ভারতের অন্য কোন অংশে, বিশেষকরে পশ্চিম উপকূলে করতে পারে নি।

বেশি ব্যবসা মানেই শ্রমের বর্ধিত চাহিদা। আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত বয়নশিল্পের সম্প্রসারিত উৎপাদনের সময়ে বয়নশিল্পীদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কৃষি- শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আর কলকাতায় এই পুরো সময়ে শ্রমের বেশ চাহিদা ছিল। যারা শ্রম বিক্রয়

৩৭. A. S. M. Akhtar Hussain, "A Quantitative Study of Price Movements in Bengal during the Eighteenth and Nineteenth Centuries", London, Ph. D. thesis (1977).

৩৮. উদাহরণস্বরূপ, N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal* 1793-1848, III, (Calcutta 1970), 105 27.

করতো তারা শ্রমের এই বর্ধিত চাহিদা থেকে যে পরিমাণে লাভবান হতে সমর্থ তা পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। কোম্পানি পণ্যমূল্য এবং বয়নশিল্পীদের, যারা রেশমের সুতা বুনতো তাদের এবং যারা লবণ সেদ্ধ করতো তাদের যে যে মূল্য বা মজুরি দিত তা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন গবেষণাকর্ম থেকে দেখা যায় যে, কোম্পানি অনেক ক্ষেত্রে মজুরি কৃত্রিমভাবে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত কমিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে।[৩৯] কলকাতায় অবশ্য মজুরি বেঁধে দেয়ার চেষ্টা তেমন সফল হয় নি[৪০] এবং বেশিরভাগ ভাষ্যকারই মনে করেন যে, কৃষিকাজের জন্য মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়। ঢাকায় মজুরির অঙ্ক থেকে দেখা যায় যে, ১৮০৩ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত কৃষি এবং সাধারণ শ্রমের পারিশ্রমিক দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪১] মজুরির আকর্ষণে ছোট- নাগপুরের পাহাড়ী এলাকা থেকে দলে দলে উপজাতীয় লোক বাংলায় কাজ করতে আসে।

১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসানে বহুক্ষেত্রে বাংলার অর্থনীতি ১৭৬৫ সালে যে রকম ছিল সে রকমই থাকে। কোম্পানি পরিবর্তন আনয়নে তেমন কোন আগ্রহ দেখায় নি। কোম্পানি বয়নশিল্পে এর প্রাচীন ব্যবসা যতোদিন সম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। কোম্পানির প্রধান চেষ্টা ছিল রাজস্বের উপর তার যে সামরিক শক্তি নির্ভরশীল ছিল তা রক্ষা করা। কোম্পানি রাজস্ব-আয় নিরাপদ করার স্বার্থে যে পর্যায়ে ভূমি থেকে কর সংগ্রহ করতো, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তা চিরকালের জন্য সীমিত করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। এর দ্বারা কোম্পানি শুধু নিজের সম্পদই সীমিত করে নি (এর ব্যয় কমানোর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ না করে), বরং জনগণের সঙ্গে এর সংযোগও বিপুলভাবে কমিয়ে দেয় এবং জনগণের অবস্থা পরিবর্তনে এর যে সামর্থ্য ছিল তাও করে দেয় অনেক সীমিত। এর ফলে জনগণকে ছেড়ে দেয়া হয় রাজস্বদালালদের দয়ার উপর। যাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ছিল তারা সে অধিকারের সুযোগ নিত, কোন ব্যবসাভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা বা কৃষি উন্নয়নের কোন কাজের দ্বারা মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা করতো না। আর কোম্পানির না ছিল এসব কাজ নিজে করার সামর্থ্য, না ছিল কোন আগ্রহ। অন্তত ১৮৫০ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বৃটিশ স্বার্থ বা ভারতীয় বণিকেরা কেউই অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করতে আগ্রহী বা সমর্থ ছিল না। তারা শুধু নীলচাষীদের ধার দিত এবং কৃষকদের দিত আগাম এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার ছিল অত্যন্ত উচ্চ। এর বেশি তারা আর কিছুই করতো না।

কোম্পানি, বেসরকারি ইংরেজ, জমিদার এবং ভারতীয় বণিকেরা সবাই ছিল এই পরিস্থিতির মুখোমুখি। বাংলার অর্থনীতি ইতিমধ্যে দক্ষতার এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত

৩৯. H. Hossain, *The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organisation of Textile Production in Bengal 1750-1813,* (Delhi 1988)

৪০. P J Marshall, "The Company and the Coolies : Labour in Eighteenth Century Calcutta", *The Urban Experience Calcutta. (ed.)* P Sinha, (Calcutta 1987), 23-38.

৪১. J. Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* (Calcutta 1840), 306-9.

হয়েছিল যে, প্রচলিত পদ্ধতিতেই রাজস্ব আদায় এবং কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা যেতো। অন্যদিকে এসব পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য কোন উৎসাহই দেয়া হতো না। বাংলায় যা উৎপন্ন হতো বিশ্বে তার চাহিদা তখনো ছিল সীমিত বা বড়জোর অনিশ্চিত। যারা পরিবর্তনের জন্য বেশি আগ্রহী ছিল, তারা ইচ্ছুক ছিল বাংলাদেশে বৃটেনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে। কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার অবসানের পর তারা দারিদ্র্যের দ্বারা ভীষণভাবে সঙ্কুচিত দাবির কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলো। ১৮৩০ সাল নাগাদ বৃটেনে উৎপাদিত তুলাজাত পণ্যাদি উল্লেখযোগ্য লাভে বিক্রি হতে থাকে, কিন্তু শুরুতেই এই সাফল্যের মূল্য হয় তীব্রতর দারিদ্র্য। তুলা প্রস্তুতকারকেরা এই দারিদ্র্যের জন্য বেশ দুঃখপ্রকাশ করেছিল।

কৃষকদের এবং বয়নশিল্পীদের উৎপাদনের সহনীয় বৃত্তের মধ্যে অবশ্যই প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল, অন্তত কৃষির ক্ষেত্রে তো বটেই। কিন্তু কোম্পানি যে পরিমাণে আদায়কৃত রাজস্ব রপ্তানিউদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে ব্যয় করতো তার দ্বারা এই প্রবৃদ্ধি সীমিত ছিল। এই রপ্তানিউদ্বৃত্ত দিয়ে বৃটেনে অর্থ স্থানান্তরিত হতো এবং বাংলাদেশের বাইরে সামরিক ব্যয় নির্বাহ হতো। এই প্রবৃদ্ধির যে লাভ ছিল তা অসমভাবে বিতরিত হয়েছে বলে মনে হয়। বৃটিশ সম্প্রদায়, রাজস্বদালাল, একশ্রেণীর বণিক এবং এক শ্রেণীর লোক, যারা টাকার কারবার করতো, তারাই এই লাভের সিংহভাগ করায়ত্ত করে। অধিকতর সম্পদশালী কৃষকরা সম্ভবত তাদের অবস্থান ঠিক রেখেছিল। এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, জনগণের একটা বিরাট অংশের কোন উন্নয়ন সাধিত হয় নি। ভূমির উপর চাপ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় খাজনার চাহিদাও। বয়নশিল্পে চাকুরির সুবিধা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। খাদ্যের কম দাম, শ্রমের উৎসাহজনক চাহিদা এবং দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত মৌসুমি বৃষ্টি দুর্যোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোম্পানি শাসনের অবসানে দুর্যোগ মোকাবেলার সামর্থ্য আঠারো শতকের সামর্থ্যের চেয়ে উন্নত হয় নি।

৪

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, ১৮৫৭-১৯৪৭

সুগত বসু*

নবাবি ও কোম্পানি যুগের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে মানুষের জীবনযাত্রার মান অবনতির দিকে মোড় নেয়। প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প, আফিম ও শর্করা। কোম্পানি শাসনের শেষ নাগাদ এই সব উপাদান গুরুত্ব হারায় এবং প্রাচীন অর্থব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভাব ঘটে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির, যাতে যুক্ত হয় নতুন উপাদান, যেমন নীল, পাট, চা ও আধুনিক শিল্প। কিন্তু সাধারণ অর্থনীতি তখনো ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। উনিশ শতকের গোড়া থেকে জনসংখ্যাবৃদ্ধি একদিকে যেমন কৃষিসম্প্রসারণে সহায়ক হয়, অপরদিকে তা জমির উপর চাপ সৃষ্টি করে। পতিত জমি আবাদের ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রাথমিক চাপ ছিল অর্থনীতির অনুকূলে। কিন্তু অনাবাদি জমি ক্রমশ কমে আসার পর অতিরিক্ত জনসংখ্যা সাধারণ অর্থনীতির নিরিখে এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে অর্থকরী ফসলেব প্রবর্তন। পাটের মাধ্যমে বাংলার কৃষি অর্থনীতি সরাসরি সম্পৃক্ত হয় বিশ্ববাজারের সঙ্গে। পাটচাষের সঙ্গে জড়িত ছিল ঋণ। কারণ পাটচাষ করতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হতো। এর প্রধান যোগানদার ছিল স্থানীয় জোতদার ও মহাজন। বিশ্ববাজারের প্রবণতার প্রভাব থেকে এ সময়ে মুক্ত ছিল না বাংলার সাধারণ অর্থনীতি। এ পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দ্বিতীয় শতকের বাংলার অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হবে এই অধ্যায়ে।

১৮৫০-এর দশক থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময়কাল বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বিনিময়ের অসম বাণিজ্যসম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত। এই সময়ে বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমে এবং পৃথিবীর অপরাপর দেশে কাঁচামাল বিক্রির দ্বারা রপ্তানিউদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন. যুক্তরাষ্ট্র।

একটি জটিল পরিশোধপদ্ধতির মাধ্যমে বৃটেনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।[১] ভারতের রপ্তানিতালিকায় কাঁচা তুলা, কাঁচা পাট, চা, কফি, গম, তৈলবীজ ও চামড়া ছিল উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে পাট ও চা ছিল বাংলার প্রাথমিক উৎপাদকদের বড়ো অবদান। প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও পরিশোধপদ্ধতি অর্থনৈতিক সঙ্কট, যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক আলোড়ন এবং ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যমান মন্দার ফলে ধ্বসে পড়ে। অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বাজার উঠানামার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক অর্থনীতি বৃটেন ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থে সক্রিয় হওয়ায় যারা জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যায়নের উপায় অবলম্বন করেছে তাদের নাজুক অবস্থাটি প্রকট হয়ে উঠে। এই সময়ে অর্থকরী ফসলের একত্রিত বিন্যাসপ্রণালী ও বাজারের সাধারণ ঝোঁককে জীবনধারণের জন্য প্রধান শস্য চাউলের উৎপাদন ও বিপণন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি। অর্থ আয়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কেবল চাউলের কিয়দংশ খাদ্যবহির্ভূত বাণিজ্যিক শস্যের সাথে বাজারে যোগান দেওয়া হয় নি, এর সাথে উদ্বৃত্ত জমি, আপেক্ষিক ব্যয় ও মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট ঋণকার্যক্রম এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, জীবিকা ও বাজার সংক্রান্ত বিষয়াদি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জনসাধারণ, উৎপাদন ও দারিদ্র্য

১৯২১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলার জনসংখ্যা ১৮৮১ সালে যে পর্যায়ে ছিল তার চাইতে ২৮.৬% বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ০.৭%, যা বিগত চল্লিশ বছরে সর্বভারতীয় বৃদ্ধির চেয়ে কিছু বেশি ছিল এবং এই সময়ে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ০.৫%। বাংলায় ১৮৯১ সালে মোট জনসংখ্যার ৯৪% ও ১৯২১ সালে ৯৩% ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যা। তা ২৭.৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.৭৭ থেকে ৪৪.৩৮ মিলিয়নে দাঁড়ায়।[২] যাহোক, এই মোট পরিমাণে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার অসঙ্গতি লক্ষণীয়। জনসংখ্যার এই ক্রমবৃদ্ধির জন্য পূর্ব বাংলাই প্রাথমিকভাবে দায়ী। মহামারি আকারে উপর্যুপরি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পশ্চিমাঞ্চলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯১৬ সালে সি. এ. বেন্টলি বলেন, পশ্চিম বাংলায় ১৮৬০ সাল থেকে সংক্রামক জ্বরের প্রকোপে পূর্ব বাংলার কোন কোন এলাকার মতো বর্ধমানেও স্বাস্থ্যকর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে ব্যাপক আকারে ম্যালেরিয়া বিস্তারলাভ করে।[৩] এই অদ্ভুত জ্বরটি 'বর্ধমান জ্বর' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রোগীরা যেমন দুর্বল হতো, এর চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও তেমনি ব্যর্থ হতেন। যাহোক,

১ S. B Saul, *Studies in British Overseas Trade* (London 1970), 55-63.

২. Government of India, *Census of India* 1921, Vol. V, *Bengal*, Pt. 2, Tables; R.H. Cassen, *India. Population, Economy and Society*, (London 1978), Chapter 1.

৩. C A. Bentley, *Report on Malaria in Bengal*, (Calcutta 1916), 30-38.

১৮৩৬ সালে প্রথম যশোরে এই জ্বরের আবির্ভাব ঘটে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই জ্বর পুরনো পাললিক ভূমির প্রতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৭-৪৮ ও ১৮৫৪-৫৬ সালে যশোর, ১৮৫৭-৬৪ ও ১৮৮০-৮১ সালে নদীয়া, ১৮৫৭-৬৪ ও ১৮৭৮ সালে হুগলী ও চব্বিশ পরগনা, ১৮৬৮-৭২ সালে বর্ধমান এবং ১৮৭০-৭২ সালে বীরভূম, মেদিনীপুর ও হাওড়ায় মারাত্মক মহামারিরূপে এই জ্বর দেখা দেয়। এমনকি, অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমদিকে মাঝে মাঝে মহামারি আকারে এই জ্বর ছড়িয়ে পড়ে। পরিণামে ১৮৯০-এর দশকে ভারতের অন্যান্য এলাকায় দুর্ভিক্ষে মৃত্যু অথবা ১৯১৮-১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যুজনিত ক্ষতির সাথে যদিও বাংলার ক্ষতি তুলনীয় নয়, তথাপি পশ্চিম বাংলায় পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ নিশ্চিতভাবে প্রদেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি কঠোরভাবে সংযত রাখে।

১৮৭০-এর দশকের প্রথমদিকে স্থানীয় কর্মকর্তারা বিশ্বাস করতেন যে, খাদ্য-শস্য উৎপাদনের উপর চাপ সৃষ্টিকারী জনসংখ্যার ম্যালথুসীয় হারে বৃদ্ধির ব্যাপারটি এখানে ঘটেছে, যদিও সাধারণ সাদৃশ্য ও কার্যকারণসূত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক চিহ্নিত করা তখন সম্ভব হয় নি।[৪] তবে এর সুস্পষ্ট ফল এই দাঁড়ায় যে, হ্রাসমান উর্বরতাবিশিষ্ট জমির উপর জনসংখ্যার চাপ নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে বর্ধমান জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭০০ জনের অধিক থেকে ৫৫০ জনে হ্রাস পায়। ১৮৫০-এর দশকের শেষ থেকে ১৮৭০-এর দশকের শেষ নাগাদ হুগলীর জনসংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে বলে অনুমান করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মেদিনীপুরের ম্যালেরিয়াকবলিত এলাকার জনসংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলী জেলার নির্বাচিত গ্রামগুলিতে স্থানীয় অনুসন্ধানে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এসব অঞ্চলে মহামারির বছরগুলিতে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ১৯২১ সাল থেকে ৫০ বছরের অধিক অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের অধিকাংশ জেলায় গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রায় স্থিব ছিল এবং এই সময়ে নদীয়া ও যশোরের জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ১০% কমে যায়।[৫]

যদি মানুষের হস্তক্ষেপজনিত দ্রুত পারিবেশিক অবনতির কারণে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে, তবে এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াগুলি কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৮৭৫ সালে ক্রমানুসারে দরিদ্র দিনমজুর, স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাষী ও কারিগরদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল সর্বোচ্চ। এক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৮৭৪ সালে বীরভূমে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে ম্যালেরিয়াজনিত

৪. Burdwan Magistrate to Burdwan Commissioner, 7 March 1874, Bengal Gen. (Statistics, Head No.1) Progs , Sep 1875, Collection 4-7/8, উদ্ধৃত Binay Chaudhuri, "Agricultural Production in Bengal Co-existence of Decline and Growth", *Bengal Past and Present* (1969) , 156.

৫. Chaudhuri, "Agricultural Production", 160 ; GOI *Census of India* 1921, Vol. V. *Bengal,* pt 1, 48-55.

মৃত্যুর হার ছিল এমন : দিনমজুর ও ভিক্ষুকের মধ্যে মৃত্যুর হার ৩৭%, কৃষিজীবী রায়তের মধ্যে ৩১%, কর্মকার, কুমোর, ধোপা, স্বর্ণকার প্রভৃতি কারিগরদের মধ্যে ১৯% এবং অশ্রমজীবী উচ্চশ্রেণী, যেমন জমিদার, বণিক, যাজক ও কৃষকের মধ্যে ১২%।[৬] ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের ফলে কৃষিশ্রমিকের অভাব ঘটে এবং এর পরিণতিতে কৃষিভূমি অনাবাদি থাকে। ক্রমশ জঙ্গলবৃদ্ধির প্রভাবে আগুরি, সদগোপ, মাহিস্যা, বাগদী প্রভৃতি উপজাতির কৃষি-অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ এলাকার ভূমির নিঃশেষিত অবস্থা এবং ম্যালেরিয়া সংক্রমণের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণে পশ্চিম বাংলায় কৃষিকাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যশোর জেলার মাগুরা ও ঝিনাইদহ মহকুমায় ১৮৭৬ সালের এক জরিপে মোট জমির ৭৫% কৃষির অধীনে নিয়ে আসা হয় বলে জানা যায়: ১৯২০ সালের মধ্যে এ অনুপাত ৪০%-এর নীচে নেমে আসে। শ্রমিকের অভাব ছাড়াও ম্যালেরিয়াপীড়িত কৃষিজীবী মানুষ তাদের শারীরিক সামর্থ্য ও শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং জমিতে কঠোর পরিশ্রম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।[৭] জনসংখ্যা এবং মানুষের দৈহিক শক্তি হ্রাস পাওয়ার কারণেই ১৮৬০ ও ১৯২০ সালের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ সম্ভবত হ্রাস পেয়েছিল। এই করুণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কেবল কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির দরুন। ধীর ও নিশ্চিতভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে উদ্যোগী কৃষকদের অর্থ ও তদারকি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের দৈহিক শ্রমের কল্যাণে এই এলাকায় চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও মেদিনীপুরে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে ১৮৬০-এর দশকে মেদিনীপুরের কনটাই ও তমলুক মহকুমায় সরকারের একচেটিয়া লবণ ব্যবসা তুলে নেয়ার ফলে এই অঞ্চলটি ম্যালেরিয়ার কারণে পালিয়ে আসা মাহিস্যা কৃষকদের নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হয়।

অপরদিকে পূর্ব বাংলায় উৎপাদনই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম এবং উৎপাদন না হওয়া বা কম হওয়া ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। ১৮৬০ সালের আগে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও কৃষির পুরনো ঝোঁক ষাট বছর ধরে বজায় ছিল এবং সেই ঝোঁক এই সময়কালের শেষেরদিকে কেবল ধীর গতিতে এবং ১৮৭৬ সালের বিরাট ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে চলতে থাকে। প্রায় জনবিরল ব-দ্বীপে যেহেতু জনসংখ্যা স্থির থাকে, সেহেতু জনঅধ্যুষিত ব-দ্বীপে এই জনসংখ্যা প্রায় ৬০% বৃদ্ধি পায়। সীমিত পরিমাণে এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলে এবং এক জেলার লোক অন্য জেলায় চলে যাওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে জন্মহার অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯২১ সালের মধ্যে ঢাকা, ত্রিপুরা,

৬. GOB to GOI, 15 Sep. 1875, and Birbhum Collector to Burdwan Commissioner, 8 Jan. 1874, Bengal Gen. (Statistics, Head No 1) Progs., Sep. 1875, Collection, 4-13 cited in Chaudhuri, "Agricultural Production", 163.

৭. M. A Momen, *Jessore Settlement Report*, 1920-24. (1925), 20.

নোয়াখালী ও ফরিদপুরে প্রতি বর্গমাইলে ১০০-এর বেশি জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখা যায় এবং বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, পাবনা ও বগুড়া এদের প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। উনিশ শতকের শেষদিকে এই অঞ্চলের অনেকাংশে পুরোপুরি ঘাটতি জনসংখ্যা আপেক্ষিক ঘাটতি জনসংখ্যায় পরিণত হয়। সক্রিয় ব-দ্বীপে মুসলমান ও নমশূদ্র কৃষকদের মধ্যে চাষবাসের কাজ ছিল মোটামুটিভাবে অতি ক্ষুদ্র আকারের এবং এটি সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির ছিল না। যে বাখরগঞ্জ জেলায় কৃষকরা কোন ভবিষ্যৎ গ্রামীণ সমাজের কথা না ভেবেই সার্বিকভাবে বসতিস্থাপন করেছিল[৮], সেই জেলায় ১৮০ বর্গমাইল নতুন পাললিক ভূমি জেগে উঠা সত্ত্বেও 'অনধ্যুষিত জনশূন্য এলাকা' ১৮৬০-এর দশকের প্রথমদিকে ৫২৬ বর্গমাইল থেকে ১৯৪৫ সালে ১৮৪ বর্গমাইলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আবাদকৃত এলাকায় চাষের জমির আয়তন ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[৯] ময়মনসিংহ জেলায় ১৮৭২ ও ১৯১০ সালের মধ্যে কৃষিজমির আয়তন ৩৫৬২ বর্গমাইল থেকে ৪২৯২ বর্গমাইলে বৃদ্ধি পায় এবং এই কৃষিজমির মধ্যে ঢাকা জেলার মধুপুর জঙ্গলের শক্ত মাটির ৪৭০ বর্গমাইল এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। চাষবাস ব্যাপকভাবে এবং পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃতিলাভ করে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে অধিকাংশ পূর্ববঙ্গীয় জেলায় প্রায় সকল চাষযোগ্য জমিতে চলতি প্রযুক্তির ভিত্তিতে কৃষিকাজ চলতে থাকে। নোয়াখালী জেলার চাষযোগ্য প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ও ফলের গাছের চাষ হতে থাকে। দ্রুত বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য কাজের সংস্থান করতে আরো বিপুল জমির প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে ঢাকার ভূমিপ্রশাসন অফিসার বিস্মিত হন।[১০]

জনসংখ্যার প্রবল চাপ দ্রুত অনুভূত হতো যদি না দু'টি কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পেতো : প্রথমত আংশিক উচ্চমূল্য ও প্রচণ্ড শ্রমভিত্তিক অর্থকরী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যাপক মাত্রায় শোষণ এবং দ্বিতীয়ত বসতিস্থাপনের জন্য বিশেষকরে নিকটবর্তী আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যাসমভূমির দিকে জনগণের অভিগমন। ১৯২০ সালের দিকে পূর্ব বাংলার নীট ফসলি জমির ৩৪ শতাংশ ছিল দ্বি-ফসলি জমি, পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ দ্বি-ফসলি জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ। অধিকন্তু সাধারণত দ্বিতীয় ফসলের মূল্য পূর্ব বাংলায় ছিল অনেক বেশি। যদিও ১৮৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই পাট অর্থকরী ফসল হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করে, তবে ১৯০৬-০৭ সালে পাটচাষের ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়। তখন থেকে পূর্ব বাংলার সাতটি বৃহৎ পাট উৎপাদনকারী জেলায়

৮. J E. Gastrell, *Geographical and Statistical Report on the Districts of Jessore, Fureedpore and Backergunje*, (Calcutta 1868), উদ্ধৃত Ralph Nicholas, 'Villages of the Bengal Delta" (Unpublished D Phil dissertation, Chicago 1962), 67

৯. J C Jack *Bakarganj Settlement Report*, 1900-08 (1915), 10-11, On expansion of cultivation in Faridpur, দেখুন, J C. Jack, *Faridpur Settlement Report, 1904*-14 (1916), 5

১০. *Mymensingh District Gazetteer* (1919), 48 , F. A Sachse, *Mymensingh Settlement Report, 1908-19* (1919), 29, W H Thompson, *Noakhali Settlement Report. 1915-19* (1919), উদ্ধৃত Ganguli, *Trends of Agriculture*, 239 , F D. Ascoli, *Dacca Settlement Report, 1910-17* (1917) , 50.

চাষযোগ্য ১০ থেকে ২২ শতাংশ জমি পাটচাষের আওতায় আনা হয়।[১১] উনিশ শতকের শেষ নাগাদ জনতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় বাণিজ্যায়ন প্রক্রিয়ার গতি ও চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে পশ্চিম বাংলায় পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে নি। এই শতকের প্রথম তিন দশকে পূর্ব বাংলার অতি জনাকীর্ণ জেলাগুলি থেকে আসামে পাটের জমির সন্ধানে প্রায় দশ লক্ষ কৃষকের অভিগমন ছিল একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা।[১২] এই অভিগমন ছিল জাভা থেকে সুমাত্রায় কিংবা উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে জনগণের অভিগমনের অনুরূপ। সাধারণত সেসব লোকের জন্য এটি ছিল একটি কষ্টকর পথপরিক্রমা, যারা পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার তীরে একখণ্ড ভূমির জন্য হন্যে হয়ে উঠতো।

উত্তর বাংলার সীমান্তগুলিতে উৎপাদনের যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে সেটি পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা থেকে এত স্পষ্টভাবে পৃথক যে, এই এলাকার মানুষের অন্যত্র গমনের চিত্র পৃথকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। পুরনো পাললিক ভূমি তথা পশ্চিম দিনাজপুরের পশ্চিম প্রান্তের জন্ম ও মৃত্যুহারের প্রকৃতির সাথে পশ্চিম ও মধ্য বাংলার জন্ম ও মৃত্যুহারের প্রকৃতির মোটামুটি সাদৃশ্য রয়েছে। তিস্তা ও যমুনা দ্বারা সৃষ্ট উত্তর বাংলার জনঅধ্যুষিত ব-দ্বীপের পূর্ব অংশে (উদাহরণস্বরূপ পূর্ব রংপুর) এবং পূর্ব বাংলার অনুরূপ এলাকাগুলিতে জনসংখ্যার সঞ্চরণপ্রবণতার ক্ষেত্রেও একই সত্য বিদ্যমান ছিল। যাই হোক, ১৮৬০ ও ১৯২০ সালের মধ্যে বিহার থেকে অধিকাংশ সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুন্ডা উপজাতীয় শ্রমিকদের অভিবাসন উত্তর বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের জনসংখ্যাকে স্ফীত করে তোলে। ১৮৫৫ সালের উপজাতিক বিদ্রোহ দমনের পর এই অভিবাসনপ্রক্রিয়া দ্রুততর হয়ে উনিশ শতকের একেবারে শেষে গিয়ে প্রবল গতিবেগ লাভ করে।[১৩] এই সকল এলাকার জঙ্গল পরিষ্কারে উপজাতীয় শ্রমিকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর চা-বাগানগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এবং এরা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতির ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে উল্লেখ করা হয় যে, এক দশকে জলপাইগুড়ির অভিবাসীর সংখ্যা ব্যাপকহারে অর্থাৎ ১৪৩৯২২ থেকে ১৮৮২২৩-এ বৃদ্ধি পায় এবং এই অভিবাসীদের প্রায় অর্ধাংশ ছিল ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার চা-বাগানের কুলি। ১৯১১ সালে জলপাইগুড়িতে অবস্থানরত ১২৬২১৪ জন অভিবাসীর জন্ম বিহারের রাঁচী জেলায় এবং ১৯২১ সালে শ্রমিকদের মধ্যে অসংখ্য ওরাওঁ এবং মুন্ডা ছিল বলে জানা যায়।[১৪]

১১. Ganguli, *Trends of Agriculture,* 244 , M Azizul Huque, *The Man behind the Plough* (Calcutta 1939), 59

১২. GOI, *Census of India 1921,* Vol V, *Bengal,* pt 1, 32 - 33; Md. Abdul Hamid, *Pater Kabita* (verses on Jute, Juriya, Assam 1930)

১৩. Chaudhuri, " Agricultural Production", 172-3

১৪. C. A Bentley and S R Christophers, *The Causes of Blackwater Fever in the Duars* (Simla 1908), 22-5; GOI, *Census of India* 1921, Vol V, Bengal, pt. 1, 389.

বাংলায় ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে মাথাপিছু উৎপাদনহ্রাসের পর্যায় বলে গণ্য করা হয়। পূর্ব বাংলায় বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার বিরামহীন অভিবাসন-প্রবণতায় দুই শতকের অধিক সময়কালব্যাপী জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯২০ সালের পর পশ্চিম বাংলায় মৃত্যুহারের নাটকীয় হ্রাসের ফলে এলাকাটি প্রদেশের বাকি অংশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাথে আরো সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় চলে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় গ্রামীণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির আন্তশুমারি হারে উক্ত প্রবণতার মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গ্রামীণ জনসংখ্যার আন্তশুমারি বার্ষিক বৃদ্ধির হার[১৫]

অঞ্চল	১৯২১-৩১	১৯৩১-৪১	১৯৪১-৫১
পশ্চিম বাংলা	০.৭২%	১.৪৭%	০.৭৯%
পূর্ব বাংলা	০.৫৪%	১.৫৭%	-০.০৭%

১৯২০-এর দশকের গোড়া থেকে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং ১৯৩০-এর দশকে এই বৃদ্ধির গতি তীব্র রূপ ধারণ করে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ব্যাপক হারে মৃত্যুর ফলে ১৯৪০-এর দশকে এই গতি হঠাৎ থেমে যায়। ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২.৭ থেকে ৩ মিলিয়ন অতিরিক্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল এই দুর্ভিক্ষ।[১৬] ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে যে মৃত্যুর সংখ্যা দেখা যায় তার চাইতে বরং ১৯৪১-৪২ সালের গড় মৃত্যুর সংখ্যাকে যদি স্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা বলে গ্রহণ করা হয়, তবে দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৩.৫ থেকে ৩.৮ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়।[১৭] দুর্ভিক্ষের প্রকোপে উচ্চহারে মৃত্যু অঞ্চল ও শ্রেণীভেদে এক রকম ছিল না। ভূমিহীন দরিদ্র শ্রেণীই ব্যাপক হারে এই আকালের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল।

এ পর্যায়ে উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিকৌশল উদ্ভাবনের জন্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উদ্যোগ সুস্পষ্টরূপে সফল হতে পারে নি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মোট কৃষিউৎপাদন বার্ষিক মাত্র ০.৩% বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন স্থির থাকে। এই সময়ে জনসংখ্যা বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ পশ্চিম বাংলার হৃদয় হিসেবে পরিচিত বর্ধমান বিভাগে প্রকৃতপক্ষে ১.০ শতাংশ নেতিবাচক উৎপাদনহার দেখা যায়। প্রেসিডেন্সি বিভাগে অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদনবৃদ্ধির হার ১.১ শতাংশ সম্ভবত খুলনার সুন্দরবন এলাকা ও

১৫. Boyce, *Agrarian Impasse*, 139-40

১৬. Sen, *Poverty and Famines*, 195-216

১৭. Paul Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal . the Famine of 1943-44*, (New York 1982), 299-315.

চব্বিশ পরগনায় অনাবাদি জমি আবাদের ফল। পূর্ব বাংলার ঢাকা বিভাগে বার্ষিক উৎপাদন ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ০.৭ শতাংশ হারে উৎপাদন হ্রাস পায়। উত্তর বাংলার জেলাসমূহ নিয়ে গঠিত রাজশাহী বিভাগের উৎপাদন বার্ষিক ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।[১৮] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মোটামুটি উৎপাদনশীল কৃষিএলাকাগুলিতেও মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পায়।

ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ এবং পণ্যউৎপাদন

১৮৫০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রবণতাকে কেবল পুঁজিবাদী বিশ্বঅর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই অর্থপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ১৮৫৪ সালে রেলপথে বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হওয়ায় ভারতে দ্রব্যমূল্য ও মজুরির বৃদ্ধিজনিত চাপ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব ভারতের কৃষিঅর্থনীতির একটি ক্ষুদ্র অংশ মজুরিশ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং এর ফলেই মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, যার প্রবল চাপ অধিকাংশ ক্ষুদ্র ভূমিচাষীদের উপর পড়ে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬) শুরু হওয়ার পর রাশিয়া থেকে ফ্লাক্স ও হেসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং নতুন করে বাংলার পাটের চাহিদা সৃষ্টি হয়। বাংলার পাটরপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য ১৮৩৯-৪০ সালে ১১১২১৮ মণ ও ১,৫২,৯২৪ টাকা থেকে ১৮৫৫-৫৬ সালে ১১৯৪৪৭০ মণ ও ৩২,৭৪,৭৬৮ টাকায় বৃদ্ধি পায়।[১৯] ইউরোপ ও চীনের বাজারে চাউলের চাহিদা সৃষ্টিতে এবং পাট ও তৈলবীজের জমি ধানের জমি হিসেবে ব্যবহারের ফলে ১৮৫৫ সালের প্রথমদিকে চাউলের মূল্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অনুভূত হয়। ১৮৫৫ ও ১৮৬০ সালের মধ্যে বাংলার জেলাগুলিতে চাউলের মূল্য স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায় (পরের পৃষ্ঠায় সারণি দ্রষ্টব্য)। যখন বিদেশী মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ এবং বিদেশের বাজারে চাহিদার ফলে ১৮৫৪ ও ১৮৫৭ সালের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটে, তখন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরুর পর মুদ্রাস্ফীতিপ্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হিসেবে দেশে বিচ্ছিন্নতা ও দুষ্প্রাপ্যতা জেঁকে বসে। পণ্যদ্রব্য ও খাদ্যশস্যের স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ অলাভজনক নীলজাতীয় শস্যের বাধ্যতামূলক চাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের পক্ষ থেকে আগের চাইতে প্রবলতর বাধা আসে। কৃষকেরা স্থানীয় ঋণদাতা জমিদারদের কাছ থেকে মূল কৌশলগত সমর্থন লাভ করে এবং ধানচাষের ক্ষেত্রে আরো বেশি লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। কৃষকদের কাছে অনেক দিন ধরে ইউরোপীয় নীলচাষীরা ঘৃণার পাত্র ছিল। তাই তৎকালীন গ্রাম্য লোকগীতিতে বলা হতো, ওরা (ইউরোপীয় নীলচাষীরা) সুঁইয়ের মতো প্রবেশ করে, কিন্তু লাঙ্গলের ফলা হয়ে বেরিয়ে যায়। ইউরোপীয় নীলচাষীরা বাংলায় আর পেরে উঠে নি। কিন্তু তারা অন্য

১৮. Islam, *Bengal Agriculture*, 50-6.

১৯. *The Hindoo Patriot*, 25 December 1857.

সময়ে পার্শ্ববর্তী বিহারে তৎপরতা চালাবার জন্য পুনরায় দলবদ্ধ হয়। বাজারের জন্য শোষণমূলক উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে অকেজো করে দেয়ার পদক্ষেপ কৃষক-শ্রমজীবীদের জীবিকার সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। বাজার এবং জীবিকার মধ্যেকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগে যে বিষয়টি নিশ্চিত হয় তা হলো, ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক অর্থনীতির নয়া কাঠামোতে ঋণদানকারী জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরকে উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে নতুন বাণিজ্যায়নের পর্যায়ে কৃষক-উদ্বৃত্ত সৃষ্টির প্রধান দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। পাট ছিল তখন একটি প্রধান পণ্য।

বাংলার জেলাগুলিতে প্রতি মণ ধানের মূল্য

জেলা	১৮৫৫	১৮৬০
যশোহর	১০ আনা	১ টাকা ৪ পয়সা
বর্ধমান	১০ আনা	১ টাকা ৭ আনা ৬ পয়সা
নদীয়া (শান্তিপুর)	১০ আনা	১ টাকা ৬ আনা
নদীয়া (কৃষ্ণনগর)	১০আনা ৬ পয়সা	১ টাকা ৪ আনা ৬ পয়সা
২৪পরগনা (বারাসাত)	১২ আনা	১ টাকা ১০ আনা
হুগলী	১ টাকা	২ টাকা ২ আনা

উৎস : *নীল কমিশন রিপোর্ট*, পরিশিষ্ট ৩।

এক সময়ে ইউরোপীয় বাজারে বিক্রীত আঁশ 'ভারতীয় পাট থেকে পাওয়া যেতো'। যদিও ১৮৩৮ সালে কফির বস্তা তৈরিতে পাট ব্যবহারের জন্য নেদারল্যান্ড সরকারের সিদ্ধান্তে এই পণ্যটিকে উচ্চমর্যাদা প্রদান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে পাট সম্পর্কে পূর্বেকার সংস্কার ও ধারণা অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। অতি নিম্নপর্যায় থেকে পাটরপ্তানির পরিমাণ ১৮৩৮-৪৩ ও ১৮৬৮-৭৩ সালের মধ্যে চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৬০-এর দশকে কাঁচা পাটের রপ্তানিমূল্য ৪.১ মিলিয়ন থেকে ২০.৫ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি অবশ্য ১৮৭২-৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা চলাকালে বিশ্ববাজারে প্রথমবারের মতো কাঁচা পাটের মূল্যের ব্যাপক পৌনঃপুনিক নিম্নমুখী উঠানামার পূর্বে সংঘটিত হয় এবং এই মন্দার সময়ে কাঁচা পাটের মূল্য কোন কোন জায়গায় প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনা হয়।[২০] ১৮৭৩-৭৪ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষাবস্থার কারণে প্রাথমিক উৎপাদকরা

২০. Hem Chandra Kar, *Report on the Cultivation of and Trade in Jute* (Calcutta 1877); Binay Bhushan Chaudhuri, "Growth of Commercial Agriculture in Bengal: 1859-1885', *Indian Economic and Social History Review* (hereafter IESHR), Vol VII, No. 2 (1970), 240-1, Chaudhuri, "Foreign Trade", Kumar (ed), *Cambridge Economic History*, Vol II, 851-2.

পাট থেকে ধান উৎপাদনে পুনরায় ফিরে আসতে প্রলুব্ধ হয়। উনিশ শতকের শেষপাদে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শস্যের ব্যবসা বিস্তৃতিলাভ করায় কাঁচা পাট উৎপাদনের উপযোগী জমি সৃষ্টি এবং পূর্ব ভারতে পাটকল প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। ১৮৭০-এর দশকে বাংলা থেকে দুর্ভিক্ষকবলিত বোম্বে ও মাদ্রাজের এলাকাগুলিতে শস্যরপ্তানি করার জন্য প্রয়োজনীয় পাটজাত থলির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটখাতকে ১৮৭৩-৭৪ সালের চরম অবনতির পর্যায় থেকে তুলে আনার ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা পাওয়া যায়।

পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত বাংলার পাট-অর্থনীতি স্বল্পকাল স্থায়ী মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষিজমি সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করে, যার ফলে অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। পাটচাষীদের উচ্চ আয় ও আশাবাদ ১৮৮২-৮৩ সালের শেষ পর্যায়ে ক্ষতি ও নিরাশায় পর্যবসিত হয় এবং এই সময়ে পাশ্চাত্যের বাজারে পাটের চাহিদা অপ্রত্যাশিতভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ১৮৮০-এর দশকের শেষের দিকে আরেকটি সম্প্রসারণপর্যায় চরম পরিণতি লাভ করে। জেলায় জেলায় চাষের জমি সম্প্রসারিত হয় এবং সেগুলিতে আগে থেকেই পাটচাষের ব্যবস্থা ছিল। তবে এই সময়ে পাটের চাষ নোয়াখালীর মতো নতুন জেলাগুলিতে বিস্তারলাভ করে এবং তখন পর্যন্ত এসব জেলায় পাটের চাষ অজানা ছিল। কিন্তু ১৮৯০-৯১ সালের সঙ্কটকালে পাটের মূল্য প্রায় অর্ধেক কমে গেলে বিভিন্ন জেলা, যেমন দিনাজপুর, ত্রিপুরা ও পূর্ণিয়ায় পাটের এক বিরাট অংশ মাঠে পঁচতে দেখা যায়।[২১] ১৯০৬ সালে বাংলার পাট সবচেয়ে প্রবল ও স্থায়ী ক্রয়বিক্রয়পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং এ অবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত চলে। ১৯০৭ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ৩.৮৮ মিলিয়ন একর পর্যন্ত পৌঁছে।[২২] এর পরে কৃষকরা যদিও আপেক্ষিক মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাট ও শরৎকালীন ধানচাষের মধ্যে স্বল্পকাল অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে, তথাপি পাটচাষের জমির দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির কোন ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় নি। যাই হোক, ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা না লাগা পর্যন্ত বাংলার পাটের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে একটি দীর্ঘমেয়াদি মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা চলতে থাকে।

সম্পূর্ণরূপে পৃথক সামাজিক কাঠামোর আওতায় একটি প্রধান বাণিজ্যিক শস্য হিসেবে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের ঢালুতে চা উৎপাদনের প্রসারকে পূর্ব বাংলার নদী-অববাহিকাগুলিতে পাটচাষের প্রসারের সাথে মোটামুটি একই পর্যায়ের বলে গণ্য করা যেতে পারে। ১৮৫০ সালে দার্জিলিং-এ প্রথম চা-বাগানের উদ্বোধন করা হয় এবং ১৮৭৪ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় পশ্চিম দুয়ার বলে পরিচিত পাহাড়ের ঢালু এলাকায় প্রথম চা-

২১. Chaudhuri, "Commercial Agriculture . 1859-85", IESHR , VII, 2(1970), 244.

২২. Rajat Ray, ""The Crisis of Bengal Agriculture— Dynamics of Immobility", IESHR, X, 3(1973) 261-2

বাগান তৈরি করা হয়। যদিও এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ দুয়ারসমূহে চা-বাগানের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৩৫টিতে উন্নীত হওয়ার পর ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে, তথাপি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চা-চাষের জমি ও শ্রমিকশক্তির আয়তন ক্রমাগত বাড়তে থাকে (পরের পৃষ্ঠার সারণি দেখুন)। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রটি ইউরোপীয় চাষীদের কাছে অনুকূল শর্তে অনুদান হিসেবে চা-চাষের জন্য ভূমি সহজলভ্য করে তোলার মাধ্যমে চা-চাষের প্রাথমিক বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে চা-এর রপ্তানিমূল্য ঘটনাক্রমে কাঁচা পাটের রপ্তানিমূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু জীবনধারণের জন্য কৃষিবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল উৎপাদকদের সংখ্যার নিরিখে পাটই এই এলাকায় জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রধান শস্য থেকে যায়।

জলপাইগুড়ির দুয়ারসমূহে চা-চাষের পরিমাণ[২৩]

সন	চা-বাগান	চাষের মোট জমি	স্থায়ী শ্রমিক	অস্থায়ী শ্রমিক	মোট শ্রমিক
১৯০১	২৩৫	৭৬৪০৩ একর	৪৭৩৬৫	২১২৫৪	৬৮৬১৯
১৯১১	১৯১	৯০৮৫৯	৫৬৬৯৩	১৮৬২২	৭৫৩১৫
১৯২১	১৩১	১১২৬৮৮	৮৬৬৯৩	১৮৭১	৮৮৫৬৪
১৯৩১	১৫১	১৩২০৭৪	১১২৫৯১	৪২৬২	১১৬৮৫৩

কৃষি এবং ক্ষুদ্র জোতের বাণিজ্যায়নপ্রক্রিয়ার সাথে কৃষকের জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার একটি নিকট-সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামের প্রচণ্ড দারিদ্র্য উপজাতীয় শ্রমিককে তাদের স্বাভাবিক আবাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং সর্দারদের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তোলে। এসব সর্দারি তাদেরকে চা-চাষের জন্য নিয়োগ করতো।[২৪] উচ্চ আয়ের জন্য এ ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধি ক্ষুদ্র জোতজমির মালিকদের কাছে চাল উৎপাদন করার চাইতে অধিক কাম্য হয়ে উঠে। একেই তারা উনিশ শতকের প্রথমদিকে জীবিকার নিশ্চয়তা লাভের জন্য উত্তম ঝুঁকি বলে মনে করে।[২৫] ১৯৩০ সালে পাটউৎপাদনকারী জেলাগুলির প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা এক একর জমি কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাণ জমির উপর জীবিকা নির্বাহ করতো এবং তাদের খাদ্যের অভাব পূরণ ও তাদের খাজনা আদায়ের উপায় হিসেবে পাটচাষের উপর নির্ভর করতো।[২৬] ১৯৩৭ সালে

২৩. A. Mitra, *Census of India*, 1951, Vol VI, part 1A (Calcutta 1953), 263, cited in Sharif Bhowmick, *Class Formation in the Plantation System*, (Delhi 1981), 53.

২৪. Bhowmick, *Class Formation*, 43-52.

২৫. Sugata Bose, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Cambridge 1986), 46-58.

২৬. *Report of the Land Revenue Administration in Bengal, 1930-31*, (Calcutta annual), 5.

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সংগৃহীত তথ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, পাটউৎপাদনকারী পরিবারগুলির ৮০ ভাগই ৩০ মণ তথা প্রায় ২ একর জমির পাটের চাইতে কম পাট উৎপাদন করে।[২৭]

যে কৌশল পাটকে গ্রাম থেকে কলকাতার নিকটবর্তী ডক ও কলগুলিতে নিয়ে আসে, তা রপ্তানি ও প্রস্তুতকারক পক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়ায় পরিকল্পিত ও পরিমার্জিত হয় এবং বিশ্ববাজার উঠানামার জরুরি অবস্থা অনুযায়ী সময় সময় পুনর্বিন্যস্ত হয়। উৎপাদন এবং ঋণবাজারের সংযোগের মাত্রা বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়। ১৮৫৫ সালে হুগলী নদীর তীরে প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদনপ্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯২০-এর দশকের শেষ ও ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিককার চিত্র থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদিত কাঁচা পাটের ৫০%-এরও বেশি পাটকলগুলিতে চলে যায়।[২৮] পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রাধান্য পশ্চিম ভারতীয় তুলা উৎপাদনের তুলনায় ব্যাপক ছিল। এটি বৃটিশ আমলাবর্গের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পেলেও পরোক্ষ সহযোগিতা পায়। তবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু প্রবেশাধিকার লাভের পথ উন্মুক্ত করে।[২৯] এছাড়া মফস্বল শহরে কতিপয় ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দালাল, বাঙালি ও মাড়ওয়ারিদের জোট প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের সাথে চূড়ান্ত ক্রেতাদের সংযোগ সাধন করে।

পাটবাজারের কাঠামো সম্পর্কিত অধিকাংশ সমীক্ষা থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কৃষিউৎপাদনকারীরা একতাবদ্ধভাবে নিজেদের স্বার্থ অর্জনের বেলায় অধিকতর সংগঠিত ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের তুলনায় অনেক অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। উৎপাদনবাজারের গ্রন্থিল অবস্থা থেকে উৎসারিত প্রতিকূলতাকে কৃষিঅর্থনীতিতে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনকাঠামো এবং প্রক্রিয়ার সাথে দৃঢ়সংলগ্ন প্রতিকূলতা থেকে পৃথক করে দেখানো অবশ্য প্রয়োজন। পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকে স্বল্পমূল্যে শস্য পাওয়ার জন্য আগাম প্রদানের নিয়মটি খুব প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। ১৮৭৩ সালের বাংলা পাট কমিশন পাটচাষী ও ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জানায় যে, সাধারণত আগামের জন্য চাহিদা ছিল না। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, অবস্থাটি ছিল ঐ রকমই, কেননা পাটচাষীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম, প্রাথমিক আনুষঙ্গিক খরচাদি ছিল অল্প এবং কৃষকেরা শ্রম, বীজ ও সার নিজেরাই সরবরাহ

২৭. Cited in Omkar Goswami, "The Peasant Economy of East and North Bengal in the 1930s", IESHR 21. 3 (1984), 357-8.

২৮. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30*, Vol. I, 104-5; *Report of the Bengal Jute Enquiry (Finlow) Committee 1934*, 157.

২৯. Amiya Bagchi, *Private Investment in India* (Cambridge 1969).

করতো।[৩০] অপ্রত্যাশিতভাবে যখন মূল্য হ্রাস পায়, তখন কৃষকরা অনেক সময় পাট না কেটে মাঠেই রেখে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পাটক্রেতারা সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকায় এবং চাহিদার পরিমাণ পূর্বাহ্নে জানতে না পারার কারণে তাদের কর্মকাণ্ডে নানা বাধার সম্মুখীন হতো। ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় পাটকল সমিতি যদিও স্বল্পকালীন কাজের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাথমিকভাবে কিছুটা সাফল্য অর্জন করে, তথাপি ১৮৯৫ ও ১৯০১ সালে তারা যে মূল্যনির্ধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯০৬ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে পাটের বিপণনপদ্ধতি ও শ্রেণীবিভাগে একটি গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদন-কারী ও রপ্তানিকারকগণ কৃষিউৎপাদন ও ব্যবসায়ে অর্থসংস্থানে গভীরভাবে জড়িত থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের চাইতে অনেক কম মূল্যে কাঁচামালের নিশ্চিত সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টা করতো। বৈদেশিক অর্থ এবং বাণিজ্যিক মূলধনের বার্ষিক অন্তর্প্রবাহ কেবল বাংলার বাণিজ্যিক কৃষিতেই একটি জটিল ব্যাপার হয়ে উঠে নি, সার্বিকভাবে শুধু বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে নয়, সামগ্রিক অর্থনীতিতে নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। গ্রামীণ এলাকায় যে সুদী মূলধনের প্রচলন ছিল, তা বিশ্বের বাণিজ্যবাজারে আস্থা অর্জন করে হালে পানি পেয়েছিল। কুসিদজীবীদের অনেকেই ছিল ঋণদাতা জমিদার। যদিও তারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনবাজারের সাথে জড়িত ছিল না এবং দাদন ও আগামপ্রদানকারী ব্যবসায়ীদের থেকে পৃথক ছিল, তথাপি বাজারগুলিকে ১৯০৬ এবং ১৯২৯ সালের মধ্যে রীতিবহির্ভূত উপায়ে হলেও কার্যকরভাবে সমন্বিত করা হয়। তখন পাউন্ড-টাকা বিনিময়হার ব্যবহার কিংবা ঋণগ্রহণ কার্যাবলীর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকারের মুদ্রা এবং ঋণবিষয়ক হস্তক্ষেপ রাষ্ট্র ও বাজারের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

যেসকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফড়িয়া কিংবা বেপারি নামে পরিচিত, তারা চাষীদের বাড়ি কিংবা গ্রাম থেকে পাট সংগ্রহ করতো এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে তারা মধ্যস্বত্বভোগী পর্যায়ের অন্যান্য কমিশনএজেন্টের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীটি আবার চূড়ান্ত ক্রেতা-কোম্পানিগুলির কাছ থেকে অর্থগ্রাহকরূপে অবস্থান করতো। জেলাসমূহে বেইলার ও আড়তদার কিংবা গুদামরক্ষকের দালালরাই সাধারণত ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে চিহ্নিত ছিল। ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত ১৯২৬ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, পাট ফসলের জন্য অর্থসংস্থানে বিরাট অঙ্কের মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং বেপারি, আড়তদার ও দালালরাই আংশিক মূলধন সরবরাহ করতো; কিন্তু মূলধনের বিরাট অংশ প্রদান করতো ক্রেতা-কোম্পানিগুলি, যারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করতো।[৩১] সুদের হার ২৪ ও ৭৫ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করতো এবং

৩০. Cited in Chaudhuri, " Commercial Agriculture : 1859-85", 228.

৩১. Collector of Tippera to Registrar of Cooperative Societies in *Report on the Marketing of Agricultural Produce in Bengal 1926,* (Calcutta 1928)

অনুরূপভাবে ঋণগ্রাহকরা বাজারদরের নীচে ১০% থেকে ২৫% পর্যন্ত কম মূল্যে পাট সরবরাহের ঝুঁকি গ্রহণ করতো। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যস্বত্বভোগীর কমিশন অন্তত ২০% হ্রাস পায় বলে অনুমান করা হয়, যা প্রাথমিক উৎপাদকরা অন্যভাবে বাগিয়ে নিতে পারতো। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, তথাপি ভারতীয়রা যেরকম অভিযোগ করে সেভাবে কৃষকরা প্রাথমিকভাবে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর হস্তক্ষেপের কারণে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয় নি, বরং বঞ্চিত হয়েছে প্রধানত পাটের ইউরোপীয় ক্রেতারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে।[৩২] ক্রেতাদের মধ্যে কিছু কিছু বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ক্রেতাদের আর্থিক ও সাংগঠনিক শক্তি এবং উৎপাদকদের ভূসম্পত্তি ইজারা বা পাট্টা নেয়ার অক্ষমতার দরুন বাংলার জেলাসমূহে কলকাতার গড়মূল্য এবং ফসল কাটার সময়কালীন মূল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯১০, ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে এই মূল্য যথাক্রমে ৩২%, ৩১% এবং ৩৩% বলে হিসাব করা হয়েছিল।[৩৩] উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির পদ্ধতি কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই রকম একটি অধিক কার্যকর উপায় হলো গ্রেড অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের আঁশ চিহ্নিত করা। ১৯৩০-এর দশকের মন্দায় একচেটিয়াভাবে সংগঠিত পাটশিল্প কেবল প্রাথমিক উৎপাদকদের বদৌলতে নয়, বরং মধ্যস্থদের বদৌলতে বাজারকাঠামোর উপর তার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করে। আর্থিক মূলধনের নিম্নগামী প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মধ্যস্থ শ্রেণী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পরিণামে প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের দৃষ্টিকোণ থেকে অতি অপ্রয়োজনীয় দাদনের ব্য'পারটির অবনতি ঘটে। এতে শিল্পের এমন এক বেদনাদায়ক অথচ যুক্তিগ্রাহ্য পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়, যা সার্বিক বিবেচনায় একটি লাগামহীন বাজারকাঠামোর সৃষ্টি করে। তামিলনাড়ুর গ্রাম-এলাকা সংক্রান্ত এক গবেষণার নিরিখে একথা বলা যায় যে, ব্যাপকভাবে পণ্য তুলে নেয়ার ক্ষতিকর পরিণাম বৃহত্তর পরিসরে সকল গ্রামে একই হয়েছিল এবং কেবল বাংলায় যে এমন ঘটেছিল তা নয়।[৩৪]

আর একটি বড় রপ্তানিদ্রব্য চায়ের ক্ষেত্রে শ্রমমজুরির ভিত্তিতে উদ্ভূত উৎপাদনসম্পর্ক এবং উৎপাদন ও ব্যবসায়ের মধ্যেকার সম্পর্ক গুণগতভাবে পৃথক ছিল। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রাধান্যের বিষয়টি কোন অবস্থাতেই একটি বিশদ বাজারকাঠামোর ঝঞ্ঝাটপূর্ণ অভ্যুদয়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে নি। বৃটিশ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানাধীন এবং এগুলির দ্বারা পরিচালিত চা-বাগানগুলি জাহাজে করে লন্ডনে পাঠানোর জন্য কলকাতা ও চট্টগ্রামে চা প্রেরণ করে এবং লন্ডনে নিলামে চা বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অন্য সব চা-বাগান

৩২. Ray, 'Crisis of Bengal Agriculture' 261-2 মধ্যস্বত্বভোগীদের কমিশন সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, Evidence of R. S. Finlow and K. Mclean, Director and Assistant Director of Agriculture, in Evidence, *Report of the Royal Commission on Agriculture*, Vol. 4, 13 and Appendix, Vol . 14. 70 .

৩৩. Bagchi, *Private Investment*, 287.

৩৪. দ্রষ্টব্য, C. J. Baker, *An Indian Rural Economy: the Tamilnad Countryside, 1880-1955* (Delhi 1984), Chapter 4

কলকাতাভিত্তিক চারটি ইউরোপীয় দালাল প্রতিষ্ঠানের একটিকে নিয়োগ করে এবং এই প্রতিষ্ঠান চা-বাগানগুলির পক্ষে নিলামকারী হিসেবে কাজ করে। খিদিরপুর ডকগুলির কাছে অবস্থিত গুদামে সীসার পাত দিয়ে তৈরি কাঠের চা-বাক্সগুলি রাখা হতো এবং এগুলি সপ্তাহে একবার এবং মাঝে মাঝে সপ্তাহে দু'বার বিক্রি করা হতো। তখন চা-বাগানমালিক ও চারটি ইউরোপীয় দালাল প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতাকারী কারোরই অস্তিত্ব ছিল না।[৩৫]

চাউল বাংলার কৃষকদের জীবনধারণের প্রধান শস্য হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট বাণিজ্যিক গুরুত্ব অর্জন করে। ১৯৩০-এর দশকে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, বার্ষিক উৎপাদনের পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ চাউল প্রদেশে বা প্রদেশের বাইরে আমদানি বা রপ্তানি করা হয়। তবে বার্মা থেকে চাউল আমদানি করার ফলে এ মূল্যের উপর একটি অনানুপাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[৩৬] ১৯৪১ সালে উৎপাদনের ৪৪ শতাংশ অন্তত গ্রাম পর্যায়ে পণ্যবিনিময়ের পরিসরে নিয়ে আসা যেতো।[৩৭] চাউল ব্যবসার অধিকাংশ ছিল আন্তঃজেলাভিত্তিক। বাহ্যত এর বাজারকাঠামো ছিল পাটের বাজারকাঠামোর সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও ইউরোপীয়রা এতে প্রাধান্যবিস্তার করতো না। বিশ-এর দশকে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীটি ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির এবং দাদনের ব্যবহার খুব একটা ব্যাপক ছিল না। দু'টি প্রধান অর্থকরী শস্য এবং খাদ্যশস্যের মূল্য ছিল অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত এবং বাংলার কৃষককুলের জীবিকার নিরাপত্তার উপর এ দু'টির সংযুক্ত বাজারের আপেক্ষিক প্রবণতার প্রভাব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার একজন লোককবি আবেদ আলী মিয়া হতাশার সুরে বলেছিলেন যে, কৃষকরা চাউল ত্যাগ করে লাভের আশায় পাটের ঝুঁকি নিয়েছিল, তাদের এমন একদিন আসবে যখন তাদের সেই পাটগাছের কাঠি খেতে হবে।[৩৮] তথাপি এটি ক্ষুদ্র ক্ষেতমালিকদের একটি অবিবেচনাপ্রসূত ঝুঁকি ছিল না, যার মাধ্যমে তাদের জীবিকার বার্ষিক চাহিদা পূরণ

৩৫. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30*, Vol. I, 104.
৩৬. Bose, *Agrarian Bengal*, Chapter 3
৩৭. *Report on The Marketing of Rice in India and Burma* (Delhi 1941)
৩৮. বুঝলি না তুই বুড়ার বেটা, আবেদের কথা নয়কো ঝুটা
খেতে হবে পাটের গোড়া ঠিক জানিস মোর ভাষা
মনে করেছো নিব টাকা
সে আশা তোর যাবে ফাঁকা
পঁচিশের পয়া হবে তোর, ঋণে পড়বি ঠাসা
নিবি বটে টাকা ঘরে
পেটের দায়ে যাবে ফুরে
হিসেব করে দেখিস খাতা, যতো খরচের পাশা।
আবেদ আলী মিয়া, দেশ শান্তি (গনতিপাড়া, রংপুর ১৯২৫)।

করতে তারা ছিল উৎকণ্ঠিত। ১৮৯০ ও ১৯১২ সালের মধ্যে দত্ত কমিটির মূল্যসংক্রান্ত বিস্তৃত অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিভিত্তিক আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল মন্থর। যেখানে জনগণের মাথাপিছু কৃষি-উৎপাদন বা আয় ছিল ১৮৯০-৯৪ সালের চেয়ে ১৯০৯-১৩ সালে ১৭ শতাংশের বেশি, সেখানে একজন কৃষকের স্বাভাবিক ক্রয়ের গড় খুচরা মূল্য ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যাহোক, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় যেসকল কৃষক শুধু পাটচাষ অবলম্বন করেছিল তারা লাভবান হয়েছিল এবং আগের চেয়ে অনেক সচ্ছল হয়ে উঠেছিল।[৩৯] সাধারণ গ্রাম্য লোকগীতিতেও ১৯৬০ সালে সূচিত সমৃদ্ধির বিবরণ পাওয়া যায়।[৪০] যাহোক, এর ভিত্তি শক্ত কাঠের খুঁটির মতো সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না, যার উপর পাটের দালালরা তাদের নতুন চারতলা বাসভবন নির্মাণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে হঠাৎ মূল্য হ্রাস পাওয়ার পর পরই এসব লোকগীতির সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে একদিকে ইউরোপীয় ব্যবসায়িক করপোরেশনগুলির সঙ্গে বৃটিশ সরকারের, অন্যদিকে দেশীয় বাণিজ্যিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে কৃষককুলের স্বার্থের প্রকাশ্য সংঘাত দেখা দেয়[৪১] এবং এতে প্রাথমিক উৎপাদকরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। চটের ব্যাগ ও কাপড়ের রপ্তানিমূল্য এবং ১৯১৬ ও ১৯২১ সালের মধ্যে গ্রাম থেকে কলকাতায় আনীত পাটের আমদানিমূল্যের মধ্যেকার প্রসারমান পার্থক্য থেকে দেখা যায় যে, কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতি-ষ্ঠানগুলি যুক্ত হয়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করে।[৪২] ঔপনিবেশিক সরকারের বিনিময়-হারনীতি ও সরকারি ব্যয়ের প্রসার কৃষিখাতের বিরুদ্ধে বাণিজ্যশর্তগুলিকে দৃঢ় রূপ দেয় এবং মুদ্রাস্ফীতির ইন্ধন যোগায়। ১৯১৯ সালের সংক্ষিপ্ত আর্থিক পুনরুদ্ধার এবং ১৯২০-২২ সালের আর্থিক অবনতির পর গ্রামীণ পূর্ববাংলার পাট অর্থনীতি আরেকটি ব্যাপক উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।

১৯২০-এর দশকে ক্রয়-বিক্রয়ে বাহ্যত আকস্মিক বৃদ্ধি দৃশ্যমান হলেও তা প্রকৃত বৃদ্ধি ছিল না। তখন পাট ও চাউলের মূল্য সঙ্গতিপূর্ণভাবে সকল দ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির পিছনে পড়ে থাকে।[৪৩] পাটচাষের পশ্চাতে যদিও স্থূল আয়ের বৃদ্ধিই ছিল প্রধান নীতি, তবে এই পর্যায়ে অর্থকরী ফসলের চাষে আয় কমে আসছিল। এক হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব এবং

৩৯. উদ্ধৃত, Chaudhuri, "Agrarian Relations : Eastern India", Kumar (ed.), *Cambridge Economic History*, Vol. 2, 147.

৪০. একটি কবিতায় বলা হয় :
নায়লা বেপারী, সাতখানা বাড়ী
জোয়ানশাইয়া ঠুনি দিয়া বাঁধছে চৌআরী।
দ্রষ্টব্য, *Bose, Agrarian Bengal*, 80

৪১. Ray, " Crisis of Bengal Agriculture", 264.

৪২. Saugata Mukherji, "Imperialism in Action through a Mercantilist Function", Barun De (ed.), *Essays in Honour of Professor Suso bhan Sarkar*, (Calcutta 1974), 741; 'Some Aspects of Commercialisation of Agriculture in Eastern India, 1891-1938' in Asok Sen et al., *Perspectives in Social Sciences 2: Three Studies in the Agrarian Structure in Bengal 1850-1947* (Calcutta 1982), 234-6.

৪৩. Bose, *Agrarian Bengal*, chapter 3.

উত্তর বাংলার জেলাগুলিতে পাট এবং আমন ধান থেকে প্রকৃত স্থূল আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯২০-এর দশকে ২ শতাংশের নীচে, যেটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের চৌদ্দ বছরে গড় প্রবৃদ্ধির হারের প্রায় অর্ধেক।[৪৪] যদি জনসংখ্যাবৃদ্ধির কথা ধরা হয়, তবে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির কাল হিসেবে ১৯২০-এর দশকের ছবিটি বাস্তবিকই অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠবে। তথাপি ১৯৩০-এর দশকের শূন্য-বিবর্ণ পরিবেশ পূর্ববর্তী দশককে পরিপূর্ণ আলোতে দৃশ্যমান করে তুলেছে।

বাংলার কৃষকদের জীবনে এই সময়ে বিশ্ববাজারের উঠানামা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল না। পর্যায়ক্রমিক সঙ্কটের অভিজ্ঞতাসহ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বাংলার কৃষকরা ১৯৩০-এর দশকের মন্দার আঘাত সামলাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে নি। এই মন্দাটি গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে ছিল একটি নজিরবিহীন ঘটনা। পাশ্চাত্যের শিল্পের জন্য কাঁচামালের ক্রমহ্রাসমান চাহিদা থেকে এই মহামন্দার উৎপত্তি, যা দ্রব্যসম্ভারের ভারে জর্জরিত কৃষিবিশ্বে আরো তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৯ সালের মন্দার মোকাবেলা করতে শিল্পায়িত পশ্চিমা দেশগুলো আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর শুল্ক আরোপ করায় স্থানীয় অর্থনীতিতে আরো মন্দাভাব দেখা দেয়। ১৯২৫-২৬ সালে বাংলার যে রপ্তানি ১৬৬০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়, তার মূল্য ১৯৩০-৩১ সালে ৮১১ মিলিয়ন টাকায় অবনমিত হয় এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে তা আরো কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৬১২ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৩০ ও ১৯৩৩ সালের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ সাময়িকভাবে প্রায় ১৫ শতাংশ হ্রাস পায়। কাঁচা পাটের মূল্য নিম্নাভিমুখী হয়, কিন্তু কোন রপ্তানিদ্রব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় নি। মহাজনি মূলধনের প্রবাহে সৃষ্ট নিশ্চলতা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ঋণসীমার মধ্যে এমন একটি লিকুইডিটি সমস্যার সৃষ্টি করে, যা রপ্তানিমূল্যের প্রায় সমপরিমাণে দেশীয় মূল্যকে কমিয়ে দেয়। ১৯৩২ ও ১৯৩৪ সালের মধ্যে পাট ও চাউলের মূল্য ১৯২০-এর দশকের শেষদিকের মূল্যের চাইতে ৬০ শতাংশেরও বেশি নিম্নমুখী করা হয় এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পাট ও চাউলের মূল্য আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।[৪৫] একটি হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় অর্থআয় ১৯২৬-২৯ সালের বার্ষিক গড় ৯৭৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৩০-৩৪ সালের ৪৮৬ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ৫০ শতাংশের বেশি কমে আসে এবং প্রকৃত আয় কমপক্ষে ২৫ শতাংশ হ্রাস পায়।[৪৬]

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে যখন কাঁচা পাটের মূল্য একেবারে নীচে নেমে আসে, তখন ফসল তোলাকালীন মূল্য এবং চট ও থলি জাতীয় উৎপন্নদ্রব্যের মূল্যের পার্থক্য সর্বোচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ও অর্থসংস্থানকারী কিংবা প্রাথমিক উৎপাদকদের মধ্যে কেউই পাটের মূল্যহ্রাসজনিত পরিস্থিতির প্রভাব থেকে রেহাই পায় নি।[৪৭] ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রধানত আর্থিক ক্ষেত্রে

৪৪. Goswami, " Peasant Economy", 340.
৪৫. Sugata Bose, *Agrarian Bengal*, 79-87.
৪৬. Goswami, " Peasant Economy", 344.
৪৭. Report of the Jute Enquiry (Finlow) Committee 1934, 146.

কতিপয় নীতিনির্ধারণমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে এই সঙ্কট তীব্র করে তুলতে ইন্ধন যোগায়। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে স্বর্ণমান থেকে স্টার্লিং সরিয়ে আনার এবং টাকাকে অবমূল্যায়িত পাউন্ড-এর সাথে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্তে ভারতীয় গ্রামসমূহে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ না করার প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামীণ বাংলার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে প্রথমবারের মতো মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করা হয়। এই অর্থ প্রদান করা হয় ভারতের কৃষিপণ্য রপ্তানি বাবদ উদ্বৃত্ত থেকে বিপুল খেসারত দিয়ে।[৪৮]

পাটের বাণিজ্যিকীকরণের পিছনে যে প্রাথমিক যুক্তি কাজ করেছে তা হলো এ থেকে পর্যাপ্ত অর্থাগমের ব্যবস্থা করা, যা দিয়ে খোরাকিপণ্য, বিশেষত চাউল ক্রয়ের সামর্থ্য অর্জন করা যায়। মন্দার সময়ে চাউলের মূল্যাবনতিতে অভাবজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার অনুষঙ্গী অর্থনৈতিক বিকলতা পাটবাজারের মাধ্যমে জীবিকার নিশ্চয়তা দানের কৌশলের সাথে জড়িত ঝুঁকিকে মারাত্মক করে তোলে। সরকারের যুদ্ধকালীন বিপুল ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি চক্রটিকে পুষ্ট করে এবং এক্ষেত্রে বিশেষকরে ১৯৪২ সালের শরৎ থেকে ফটকামূলক ক্রয় ও মজুদ খাদ্যের আতঙ্কজনক মূল্যবৃদ্ধির উৎসাহ সৃষ্টি করে। যদিও অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর প্রাদেশিক সরকার পাটচাষের জমি বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এগিয়ে আসে, তথাপি এই অর্থকরী ফসলের আপেক্ষিক মূল্য চাউল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ থাকে। ফলে পাটের উপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র জমির অধিকারী কৃষক ধানচাষের জন্য জমি বিনিময়ের ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৯৪৩ সালের মার্চে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সূচনায় প্রধান পাট আইন নিয়ন্ত্রক মূল পাট উৎপাদনকারী জেলাসমূহের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন : "বেশি পাট বলতে বোঝায় কম ধান এবং এই মুহূর্তে ধানের মূল্য পাটের মূল্যের চাইতে প্রায় দেড় গুণ বেশি"।[৪৯] সুতরাং গ্রাম্য কবিদের ভবিষ্যদ্বাণী নিদারুণ সত্যে পরিণত হয়। সর্বগ্রাসী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত অনেকগুলো নিষ্ফল ও পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থার একটি ছিল ১৯৪৩ সালে পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের প্রয়াস। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে মূল্যের সিলিং নির্ধারণের ফলে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকগণ পারস্পরিক সুবিধালাভের সুযোগ পায় এবং আমলাদের সহযোগিতায় এরাই ১৯৪৬ সালের ফসল কাটার সময়ে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে এর বিরোধিতা করে।[৫০]

স্বাধীন ভারত, পাকিস্তান ও ১৯৭১ সালের পরবর্তী বাংলাদেশে পাটবাজারের কাঠামো ও ঝোঁক সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক ধারা পরিত্যক্ত হয়। বঙ্গবিভাগ অবশ্য কাঁচামাল উৎপাদনকারী পশ্চাৎভূমি থেকে শিল্পকে পৃথক করার মাধ্যমে একটি বিচ্ছিন্ন বা অস্বস্তিকর

৪৮. Bose, *Agrarian Bengal*, 65-7, cf. Baker, *Indian Rural Economy*, chapter 2

৪৯. Note by Chief Controller, Jute Regulation, cited in Bose, *Agrarian Bengal*, 91.

৫০. *Milap*, 12 July ,1946.

অবস্থার জন্ম দেয়। ভারত সরকার ১৯৫৬ সাল থেকে কতিপয় নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত ব্যবস্থার অধীনে ব্যবস্থাপনা-দালালদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায় এবং অবশেষে ১৯৬৭ সালে একটি সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ১৯৭০ সাল থেকে যুগপ্রাচীন পদ্ধতির বিলোপসাধন করে। যাই হোক, আই. জে. এম. এ টিকেছিল যদিও তা এখন তার পূর্বতন আকারের ছায়ামাত্র। পাকিস্তান সরকার ১৯৫০-এর দশকে পাটসামগ্রী উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠায় পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের সাহায্য প্রদান করে এবং এতে পূর্ব বাংলার কৃষকদের প্রতি অবিচারের ঐতিহ্যবাহী ধারা বহাল থাকে।[৫১]

উপসংহার

বাংলার কৃষকগণ ১৮৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকের মধ্যে বিশ্বঅর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রশস্ত, পরস্পর সংযুক্ত সোপানের নীচের ধাপে স্থান পায়। যখন ভূমি ও শ্রমবাজারকে পশ্চাতে রেখে উৎপন্নদ্রব্যের বাণিজ্য ও মূলধনবাজার সম্প্রসারণে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়, তখনও এই গ্রামীণ উৎপাদকশ্রেণী তাদের স্বতন্ত্র সম্পর্ক ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী গিলাফে আচ্ছাদিত একটি প্রকৃত কৃষিজীবী সমাজই রয়ে যায়। অবশ্য নীল ও পাটের মতো পণ্য তাদের মনোজগৎকে রঙিন করে তুলেছিল, যেভাবে তাদের চারপাশের পরিবেশকেও তারা নতুন রূপে গড়ে তুলেছিল। অর্থকরী ফসল উৎপাদনে হাড়ভাঙা শ্রম বিনিয়োগ করেও কৃষকেরা জানতো না বিনিময়ে এ থেকে তারা বর্ধিত আয় তুলে আনতে সক্ষম হবে কিনা। অবশ্য তাদের এই উদ্যোগ ছিল সেসব ঔপনিবেশিক পুঁজিপতির আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণের চেয়ে কম কল্পনাবিলাস, যারা পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি থেকে প্রচুর আয় নিশ্চিত করার সুযোগ খুঁজছিল।

আবদুল সামাদ মিয়া তাই একটি লোককবিতায় বলেন :

পাট আসিয়া যখন দেশেতে পৌছিল
পশ্চিমা এসে তখন দখল করিল
এখন তাদের হাতে দেখ পয়সা হইল
বাঙ্গালীরে তারা দেখ কিছু না বুঝিল
না পাইত খাইতে যারা ছাতুয়ার গুঁড়া
বালামের ভাত খায় বুঝে দেখ তারা
না মিলে বাঙ্গালীর রেঙ্গুনের ভাত
বোবা হয়ে গেল দেখ বাঙ্গালীর জাত।[৫২]

---

৫১. দ্রষ্টব্য, Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule : the Origins of Pakistan's Political Economy of Defence,* chapters 3,4 and 5

৫২. আবদুস সামাদ মিয়া, *কৃষক বোকা,* আহারা, ময়মনসিংহ, ১৯২১, ৬-৮।

৫

সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : পাকিস্তান আমল

এম. এম. আকাশ*

নবাবি যুগ হতে বিভিন্ন পর্বে সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সূত্রপাত করে সুশীল চৌধুরী নবাবি আমলে বাংলার সাধারণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, তৎকালীন বিশ্বঅর্থনীতিতে বাংলাদেশ ছিল উন্নত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। চাল-ডাল-কাপড়সহ সকল ভোগ্যপণ্যের মূল্য ছিল খুবই কম। আকাল-দুর্ভিক্ষ ছিল বিরল। বাংলার কৃষি ও শিল্পপণ্যসম্ভার ব্যাপকহারে বিশ্ববাজারে রপ্তানি হতো। এদেশের লাভজনক রপ্তানিবাণিজ্যে যোগদান করেছে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, দিনেমার, আরমেনীয়, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, তামিল ও আরো অনেক দেশী-বিদেশী বণিক জাতি। কৃষি ও শিল্প ছিল সুসমন্বিত এবং সাধারণ মানুষ ছিল অনাহার-অর্ধাহার থেকে মুক্ত। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করেছেন পিটার মার্শাল এবং সুগত বসু। তাঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে সনাতন অর্থনীতি ঔপনিবেশিক শাসন ও আধুনিক পুঁজিবাদের অভিঘাতে ভেঙে পড়েছে এবং কিভাবে এর ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মিত হয়েছে এক বিকৃত ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থবিরতা, বৈষম্য, দারিদ্র্য, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতা। এই অর্থনীতিই ছিল পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার উত্তরাধিকার। পাকিস্তান পর্বের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচিত হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে আলোচনার ক্রমপরম্পরা হবে নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি : '৪৭-এর অর্জিত উত্তরাধিকার

২. '৫০-এর দশকের অন্তিম পর্ব ও '৬০-এর দশকের অর্থনৈতিক গতিপ্রবণতা

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূমিকা

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি : '৪৭-এর অর্জিত উত্তরাধিকার

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই রাষ্ট্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভৌগোলিক ব্যবধান। এর পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমাঞ্চল তথা পশ্চিম পাকিস্তান শুধু যে একই রাষ্ট্রের দুটি পৃথক প্রদেশ ছিল তাই নয়, এই দুই প্রদেশের মধ্যে ছিল সহস্র মাইলের ব্যবধান এবং এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছিল 'বৈরী' ভারত। ফলে দুই প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অর্থনৈতিক যোগাযোগ ভৌগোলিক কারণেই সম্ভব ছিল না। শুধু সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ব্যবধান নয়, মৌলিক সম্পদের বিন্যাস এবং মৌলিক অর্থনৈতিক ধ্রুবকগুলির নিরিখেও 'পূর্ব বাংলা' (এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্থলে পূর্ব বাংলা) তার জন্মলগ্ন থেকেই একটি 'পৃথক উৎপাদনকারী ও ভোগকারী' অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সমগ্র পাকিস্তানের আয়তন ছিল ৩৬৫ হাজার ৫২৯ বর্গমাইল এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র ৫৫ হাজার ১২৬ বর্গমাইল এলাকা অর্থাৎ পুরো পাকিস্তানের মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলা। অথচ পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৯ লক্ষ অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ।[১]

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে সামান্য এলাকায় মায়ানমার (বার্মা) ছাড়া পূর্ব বাংলার বাকি সবদিকে বিশাল সীমান্ত এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে ভারত। ভারত থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন বৃহৎ নদীর পলিমাটি দিয়েই পূর্ব বাংলার অধিকাংশ এলাকা গড়ে উঠেছে। এটি মূলত একটি সমতল নিম্নভূমি, যাকে মালার মতো অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, নালা-ডোবা, জলাভূমি বেষ্টিত বা অলঙ্কৃত করে রেখেছে। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা খুব বেশি নয়। সমুদ্র থেকে ১০০ মাইল ভিতরের এলাকাও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৩০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে (কিছু পাহাড়অঞ্চলের ব্যতিক্রম বাদ দিলে) সারা দেশটি ক্রমশ ঢালু হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। তবে এই ঢালের পরিমাণ খুবই মৃদু, মাইলপ্রতি মাত্র পাঁচ ইঞ্চিরও কম।[২] ভূতত্ত্ববিদদের মতে, পলিগঠিত এরকম সুবৃহৎ বদ্বীপ পৃথিবীতে খুব কমই আছে এবং এর গঠন অনেক দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। অর্থাৎ নতুন নতুন দ্বীপাঞ্চল গঠন অথবা পুরনো দ্বীপের সমুদ্রগর্ভে অবলুপ্তি এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার চলমানতায় পূর্ব বাংলার গঠন ও আয়তন পরিবর্তনশীল। এর আবহাওয়া চরম প্রকৃতির নয়। যদিও মৌসুমভেদে ব্যাপক উঠানামা রয়েছে এবং সর্বনিম্ন গড় উষ্ণতার মাত্রা ৪৯

---

১. ১৯৫১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুসারে।

২. রফিউজ্জামান (সম্পাদিত), *Pakistan Year Book 1970*, (Karachi, Dhaka 1970), 2.

ডিগ্রি ফারেনহাইট (জানুয়ারি মাসে) এবং সর্বোচ্চ উষ্ণতা হচ্ছে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট (এপ্রিল-মে মাসে)। সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতহার হচ্ছে ৪৭.৯ ইঞ্চি (রাজশাহী অঞ্চলে) এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতহার হচ্ছে ২২৫.৮ ইঞ্চি (সিলেট অঞ্চলে)। এছাড়া অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে।[৩] বাংলাদেশের এসব প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে, মূলত বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল নদীনির্ভর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। বস্তুত মৌসুমি জলবায়ুর খামখেয়ালির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল একটি দুর্বল কৃষিভিত্তিক পশ্চাৎপদ অর্থনীতি নিয়েই ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

পূর্ব বাংলার জন্মলগ্নে অর্থনীতির প্রাথমিক গতিপ্রবণতা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তথ্যের অপ্রতুলতা। বস্তুত পূর্ব বাংলার জন্মলাভের চার বছর পর ১৯৫১ সালে যে আদমশুমারি পরিচালিত হয় তা থেকেই প্রথমবারের মতো কিছু বৈজ্ঞানিক পন্থায় আহরিত তথ্য প্রণয়ন সম্ভব হয়। তবুও বিভিন্ন জায়গায় এর আগে বা অব্যবহিত পরে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মোটা দাগে আঁকা নিচের অর্থনৈতিক চালচিত্রটি তুলে ধরা হলো। এসব তথ্য চরম মাত্রা (absolute level) সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে না পারলেও গতিপ্রবণতা (dynamic trends) সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারে।

১নং সারণিতে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের জন্য মোট প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা এবং মোট প্রকৃত মাথাপিছু আয় এই তিনটি চলকের গতিপ্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে।[৪] এই সারণি থেকে প্রথমদিকে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলি বিবেচ্য :

১. প্রথমদিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এই বৃদ্ধির হার ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমান। শেষদিকে এমনকি তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে নিচে নেমে যায়।

২. ফলে আলোচ্য কালপর্বে গড় মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় স্থবির। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব বাংলার একজন নাগরিকের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ২৬৭ টাকা (১৯৫৯-৬০ সালের বাজারদামে) এবং ৬ বছর পর তা মাত্র চার টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭১ টাকা।

এই মন্থর বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য দ্বিগুণ বঞ্চনাকর মনে হয়েছিল, কারণ এর সঙ্গে একই সময়ে যুক্ত হয়েছিল পাকিস্তানেরই পশ্চিম অংশ তথা পশ্চিম পাকিস্তানের চোখধাঁধানো অগ্রগতির বিপরীত বাস্তবতা। ১৯৪৯-৫০

৩. প্রাগুক্ত, ১-৪ থেকে সংগৃহীত।

৪. এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর সরকারিভাবে সর্বপ্রথম একটি ছয় বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, যার কালপর্বও ছিল ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত।

সারণি ১ : পূর্ব বাংলায় মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতা, ১৯৪৯-৫০-১৯৫৪-৫৫

বিষয়	বছর					
	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১০৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫
মোট জাতীয় উৎপাদন (মিলিয়ন টাকা)	১১৫৬৯	১২২৯৫	১২৭৪৯	১৩১১৪	১৩৫১৫	১৩২৮৮
মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪২.২৫	৪৩.২৯	৪৪.৩৬	৪৫.৪৫	৪৬.৫৭	৪৭.৭২
মাথাপিছু জাতীয় আয়	২৬৭	২৭৫	২৭৭	২৭৯	২৮৪	২৭১
জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	-	৬	৩	২	৩	(-) ২
মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	-	৩.৭২	.৭২	১.৭	১.৭	(-)৫

টীকা : ১. এখানে মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৫৯-৬০ সালের স্থির বাজারদামে (At Constant Market Price, 1959-60) পরিমাপ করা হয়েছে।

২. উৎস : মহিউদ্দীন আলমগীর এবং লডউইজ্‌ক জে. জে. বি. বার্লেজ , *বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনকাম এ্যান্ড এক্সপেনডিচার : ১৯৪৯-৫০-১৯৬৯-৭০*, বি. আই. ডি. এস. ১৯৭৪, ঢাকা, ১৬২।

সালেই পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের পূর্বাংশের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫তে এই ব্যবধানের হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯.৪৬ শতাংশ।[৫] আর এই বৈষম্যমূলক প্রবৃদ্ধির পেছনে শুধু প্রাকবিভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতর অর্থনৈতিক বিকাশস্তরই দায়ী ছিল না, পরবর্তীকালে অনুসৃত নানারকম বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতিও এই ব্যবধান বা বৈষম্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্রিয় অবদান রেখেছিল। এই সময় সচেতনভাবে পূর্ব বাংলার স্বর্ণসূত্র পাটের বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্তকে

৫. আতিউর রহমান, "ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি : অঞ্চলভিত্তিক একটি সামগ্রিক চিত্র", *একুশের প্রবন্ধ*, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, ৯২। এই রচনায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ ও ৩৩০ টাকা (১৯৬৯-৭০ বাজারদামে) এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৯৮ এবং ৩৫৬ টাকা।

পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করা হয়েছিল। উন্নয়নখাতে বরাদ্দ, অবকাঠামো নির্মাণ, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স বিতরণ, প্রশাসনিক পদ বণ্টন, উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ইত্যাদি সকল খাতেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিমাতাসুলভ নীতি পরিগ্রহণ করে আসছিল। বস্তুত এরকম একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্য প্রথমদিকের নয়, বরং ষাটের দশকের ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের প্রাথমিক যুগের পরিসংখ্যান একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। এই প্রক্রিয়ারই একটি ঘনীভূত রাজনৈতিক পরিণতি হচ্ছে পাকিস্তানের জন্মের মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন[৬], যা সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিমূলে প্রথম কুঠারাঘাত হানে।

এই প্রসঙ্গে শুধু পশ্চিম পাকিস্তান নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নমাত্রা কোন্ স্তরে অবস্থিত ছিল সেটিও আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। সৌভাগ্যবশত আমাদের হাতে ১৯৪৯-৫০ সালের জন্য সারা বিশ্বের ৭০টি দেশের মাথাপিছু আয়ের একটি আন্তর্জাতিক তুলনামূলক তালিকা রয়েছে। তাতে দেখা যায়, পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল তখন ৫১ ডলার এবং ঐ ৭০টি দেশের মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ৫৭তম। পক্ষান্তরে 'পূর্ব পাকিস্তানের' মাথাপিছু আয় ছিল তখন ৪৬ ডলার এবং সেই হিসেবে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থান দাঁড়ায় ঐ ৭০টি দেশের মধ্যে ৫৯তম। পাঠকের সুবিধার্থে ৭০টি দেশের মধ্যে নির্বাচিত ১২টি দেশের তুলনামূলক মাথাপিছু আয়ের তথ্য ২ নং সারণিতে প্রদান করা হলো।

এই সারণি থেকে পূর্ব বাংলার নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থান (৫৯তম) সম্পর্কে যেমন কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তেমনি এটাও আমরা দেখতে পাই যে, অন্তত ১৯৪৯-৫০ সালে মাথাপিছু আয়ের নিরিখে পূর্ব বাংলার অবস্থান ছিল এমনকি ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার উপরে।

বৃটিশ ভারতে দশ বছর পর পর আদমশুমারি পরিচালনার যে রীতি ছিল সেই রীতি অনুসারে পূর্ব বাংলায় ১৯৩১, ১৯৪১ এবং ১৯৫১ সালে (পাকিস্তান সৃষ্টির পর) বিস্তৃত আদমশুমারি পরিচালিত হয়েছিল। এই আদমশুমারির তথ্যাবলী ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে। তদুপরি এই পরিপ্রেক্ষিতে নিকট অতীতের সঙ্গে একটি তুলনামূলক বিচারও করা যায়।

১৯৫১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুসারে পূর্ববঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৩২ হাজার। এর মধ্যে ৬৪টি মহকুমাশহরে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র

৬. এই বিষয়ে বিস্তৃত পরিসংখ্যান তথ্য ও যুক্তির জন্য দেখুন, আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, (ঢাকা ১৯৯০)।

সারণি ২ : ১২টি নির্বাচিত দেশের জনসংখ্যা,মাথাপিছু আয় এবং ক্রমিক অবস্থানের চিত্র ১৯৪৯

দেশের নাম	জনসংখ্যা (হাজারে)	মাথাপিছু আয় ১৯৪৯ (ডলারে)	মাথাপিছু আয়ের মানদণ্ডে ৭১টি দেশের মধ্যে ক্রমিক অবস্থান
১. আমেরিকা	১৪৯২১৫	১৪৫৩	১
২. বৃটেন	৫০৩৬৩	৭৭৩	৬
৩. সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৯৩০০০	৩০৮	২৩
৪. জাপান	৮২৬৩৩৬	১০০	৪৫
৫. শ্রীলংকা	৭২৯৭	৬৭	৫৪
৬. ভারত	৩৪৬০০	৫৭	৫৫
৭. আফগানিস্তান	১২০০০	৫০	৫৮
৮. পাকিস্তান (সমগ্র)	৭৩৮৫৫	৫১	৫৭
৯. পূর্ব পাকিস্তান	৪২২৫০	৪৬	৫৯
১০. ফিলিপাইন	১৯৩৫৬	৪৪	৬০
১১. দক্ষিণ কোরিয়া	২০১৮৯	৩৫	৬৯
১২. ইন্দোনেশিয়া	৭৯২৬০	২৫	৭১

টীকা : ১. ১৯৪৯-৫০ সালে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অফিসের অর্থনৈতিক শাখা কর্তৃক প্রকাশিত "ন্যাশনাল এ্যান্ড পার ক্যাপিটা ইনকাম অব সেভেন্টি কান্ট্রিজ, এক্সপ্রেসড ইন ইউ. এস. ডলার, নিউইয়র্ক, অক্টোবর ১৯৫০ : ১৪-১৬ নং থেকে সংকলিত।

২. পূর্ব বাংলার মাথাপিছু ডলার আয়ের হিসাব নির্ণয়ের জন্য তৎকালীন সরকারি বিনিময়হার (১ ডলার= ৩.৩০ টাকা) ব্যবহার করা হয়েছে এবং চলতি দামে ১৯৪৯ সালের মাথাপিছু আয় ২১৭ টাকা ধরা হয়েছে যেহেতু ১৯৫৯-৬০ সালের বাজারদামের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সালের বাজারদাম প্রায় ২০ শতাংশ কম ছিল।

৩. 'পূর্ব পাকিস্তান'কে তালিকাভুক্ত করায় তুলনীয় দেশের সংখ্যা ৭১-এ দাঁড়ায়।

উৎস : ডব্লিউ. এন. পীচ, এম. উজির এবং জি. ডব্লিউ. রাকার *বেসিক ডাটা অফ দ্য ইকনমি অব পাকিস্তান,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, (করাচী ১৯৫৯), ২৯-এ উদ্ধৃত ১৫ নং সারণি দ্রষ্টব্য।

১৮ লক্ষ ২০ হাজার। অর্থাৎ শহরের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৩ শতাংশ। সুতরাং সর্বপ্রথমে সহজেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হচ্ছে, তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ ছিল মূলত গ্রামীণ। এই গ্রামসর্বস্বতার পাশাপাশি লক্ষণীয় যে, জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সক্রিয়তার মাত্রাও ছিল খুব অল্প। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী

'সিভিলিয়ান লেবার ফোর্স' বা সক্রিয় জনশক্তির মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৬ হাজার (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ) জন। জনসংখ্যার অবশিষ্ট ৬৯ শতাংশকে 'পরনির্ভর' আখ্যা দেয়া হয়েছিল। বস্তুত এদের মধ্যে বৃদ্ধ, গৃহবধূ, শিশু (যাদের বয়স ১২ বছরের কম), বেকার ইত্যাদি সকল পরনির্ভর ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেইদিক থেকে হিসাব করলে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গে তখন প্রতি একজন অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় লোকের উপর ২.২২ জন নিষ্ক্রিয় লোকের বোঝা চেপে বসেছিল। একদিকে শ্রমের নিম্ন উৎপাদনশীলতা অপরদিকে অনুৎপাদনশীল পরনির্ভরতার চাপ। তদুপরি গ্রামাঞ্চলে যেখানে দারিদ্র্য বেশি সেখানে নির্ভরতার হার ছিল আরো বেশি।

১৯৫১ সালে সক্রিয় জনশক্তির পেশাগত বিন্যাস ছিল সর্বতোভাবে কৃষিমুখী। লক্ষণীয় যে, ১৯৩১-১৯৫১ সময়কালে এই কৃষিমুখিনতা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৩ নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া যায় :

ক. পূর্ববঙ্গে কৃষি পেশাভুক্ত ব্যক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯৩১-৫১ সময়কালে ৭৭.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

খ. ম্যানুফেকচারিং খাতে নিয়োজিত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.৬ শতাংশ থেকে আরো হ্রাস পেয়ে ৬.৬ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

গ. ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীটির গুরুত্ব ৬.১ শতাংশ থেকে প্রচণ্ড হারে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৩.৯ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

ঘ. সরকারি চাকুরি, পেশাদারি ও কারুশিল্পের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর গুরুত্ব ৩.৫ শতাংশ থেকে তীব্রভাবে হ্রাস পেয়ে ১.৫ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

পেশাকাঠামোর এই দীর্ঘমেয়াদী কৃষিকেন্দ্রিকতা বিভাগোত্তর মুহূর্তটিতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে যারা ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু, যাদের পেশা ছিল মূলত অকৃষিভিত্তিক।[৭] এই বর্ধিত কৃষিকেন্দ্রিকতার ফলে গ্রাম ও কৃষির উপর সক্রিয় জনশক্তির যে অতিরিক্ত ভর তথা চাপ পড়েছিল তার প্রতিফলন দেখা যায় তুলনামূলকভাবে গ্রামীণ মাথাপিছু আয়ের নিম্নমাত্রার মাঝে। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত গ্রামীণ মাথাপিছু আয় বেড়েছিল মাত্র দুই টাকা। আর এই সময় গ্রামীণ মাথাপিছু আয় শহরের মাথাপিছু আয়ের চুয়াল্লিশ শতাংশের

৭. ১৯৪৭ সালে এক দফা এবং ১৯৫০-এর দাঙ্গার সময় আরেক দফা পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপক হারে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ডঃ ওয়াকিল প্রদত্ত হিসাবানুযায়ী সেই সময় যারা পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কৃষক ছিলেন মাত্র ৪ শতাংশ। বাদবাকিদের মধ্যে প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য (৩৮ শতাংশ), চাকুরিজীবী (২৮ শতাংশ), ভূস্বামী বা জোতদার (১২ শতাংশ), ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল ইত্যাদি (১২ শতাংশ), দর্জি, কারিগর ও অন্যান্য পেশাজীবী (৭ শতাংশ) এবং কারখানার শ্রমিক (১.৫ শতাংশ)।

বেশি কখনোই হয় নি। (৪নং সারণি দ্র.)। সারণিতে প্রদত্ত তথ্যাবলী থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাজমান তীব্র আয়বৈষম্যের বিষয়টিও এই সময় সুপরিস্ফুট হয়ে উঠে। এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে শহরের মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলকভাবে দ্রুততর প্রবৃদ্ধি।

সারণি ৩ : সক্রিয় জনশক্তির পেশাগত বিন্যাসের আপেক্ষিক হার (১৯৩১-৫১)

অর্থনৈতিক গোষ্ঠী	পূর্ববঙ্গ	
	১৯৩১	১৯৫১
মোট সক্রিয় শ্রমিক (মিলিয়ন)	৭.৮	১২.৯
মোট সক্রিয (শতাংশ)	১০০	১০০
কৃষি	৭৭.৮	৮৪.১
খনি ও উত্তোলন	-	-
শিল্প	৭.৬	৬.৬
ব্যবসা-বাণিজ্য	৬.১	৩.৯
সরকারি প্রশাসন, পেশাদারি ও কারুশিল্প	২.৬	২.০
গৃহভৃত্য ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৫	১.৫
অন্যান্য	২.২	০.৮

টীকা : ক .১৯৩১ সালের মিলিয়নের অঙ্কটি মোট উপার্জনকারী এবং সক্রিয় পরনির্ভরদের সংখ্যা থেকে সেনাবাহিনী ও অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের বিভাগোত্তর পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করাব জন্য কিছুটা পরিবর্তন করে এটি পরিমাপ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের অঙ্কটি ১৯৫১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

খ. কৃষি বলতে এখানে চাষাবাদ, পশুপালন, বনভিত্তিক পেশা এবং মৎস্যশিকার ইত্যাদি সকল পেশাকে একত্রে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

গ. শিল্প বলতে ম্যানুফেকচারিং, গৃহনির্মাণ, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, পরিবহন, ডাক এবং টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

উৎস : "Census of Pakistan", 1951, Vol. 1, 107.

১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে শহরবাসীর প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৭ টাকা এবং শতাংশের হিসাবে ২.৮৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে, গ্রামবাসীর প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র দুই টাকা এবং শতাংশের হিসাবে মাত্র ০.৭৯ শতাংশ।

সারণি ৪ : গ্রাম ও শহরের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য ঃ ১৯৪৯-৫০-১৯৫৪-৫৫

[মাথাপিছু আয় (১৯৫৯-৬০-এর উৎপাদন উপকরণ ব্যয় অনুসারে)]

সন	গ্রাম	শহর	গ্রাম/শহরের শতাংশ হিসাবে
১৯৪৯-৫০	২৫৩	৫৯৬	৪২
১৯৫০-৫১	২৬০	৬০৯	৪৩
১৯৫১-৫২	২৬২	৬১৬	৪৩
১৯৫২-৫৩	২৬৩	৬১৩	৪৩
১৯৫৩-৫৪	২৬৯	৬১৪	৪৪
১৯৫৪-৫৫	২৫৫	৬১৩	৪২

উৎস : Mohiuddin Alamgir and Berlage, *Bangladesh*, 65-66.

প্রাথমিক লগ্নে এবং পরবর্তীকালেও বহুদিন পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। প্রথমদিকে কৃষির প্রধান দুটি সমস্যা ছিল—(১) জমির উপর বিপুল জনসংখ্যার চাপ এবং (২) নিম্ন উৎপাদনশীলতা। তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় মোট ৩৪.৯৩৬ মিলিয়ন একর জমি ছিল। এর মধ্যে ৫৭.৫২ শতাংশ অর্থাৎ ২০.০৯ মিলিয়ন একর জমি ১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যেই আবাদের অধীনে এসে গিয়েছিল। বাকি ১৪.৮৪ মিলিয়ন একর জমির মধ্যে আবাদযোগ্য কিন্তু তখনো আবাদের অধীনে আনা হয় নি এরকম জমির পরিমাণ ছিল ৬.২৭ মিলিয়ন একর অর্থাৎ মোট জমির প্রায় ১৮ শতাংশ। সুতরাং সামগ্রিকভাবে আবাদযোগ্য জমি ছিল মোট জমির ৭৫.৫২ শতাংশ, যার মধ্যে ৫৭.৫২ শতাংশ (দশ ভাগের আট ভাগ) ইতিমধ্যেই আবাদের অধীনে চলে এসেছিল।[৮] অর্থাৎ সেই সময় পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জনসংখ্যা ও কৃষিকর্মে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় লোকসংখ্যা যেহেতু ছিল যথাক্রমে ৪০.১১ মিলিয়ন এবং ১০.৮৪ মিলিয়ন, সেহেতু গ্রামীণ মাথাপিছু এবং কৃষি শ্রমজীবীর মাথাপিছু নীট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৫০ একর এবং ১.৮৫ একর। তবে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্বের (density of population) তারতম্য থাকায় জেলাভেদে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণেও প্রচুর তারতম্য ছিল। বিশেষত ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামে

আবাদযোগ্য জমি বলতে আমরা বুঝাচ্ছি নীট আবাদকৃত জমি (net area sown) + চলতি ফেলে রাখা জমি (current fellow) + আবাদযোগ্য খিল জমি (cultivable waste)। আর আবাদের অযোগ্য জমি বলতে বোঝানো হচ্ছে বনাঞ্চল + আবাদ-অযোগ্য খিল জমি (uncultivable waste) এবং অশ্রেণীভুক্ত জমি (area not classified)। এই সংজ্ঞানুসারে ১৯৪৯-৫০ সনে আবাদ-অযোগ্য জমির মোট পরিমাণ ছিল (২.৯২ + ৫.০১ + .৬৩) = ৮.৫৬ মিঃ একর বা মোট জমির ২৪.৪৫ শতাংশ। এসব হিসাবের উৎসের জন্য দেখুন, J. R. Andrus and Azizali F. Mohammad, The *Economy of Pakistan* (Karachi and Dhaka 1958), 37.

কৃষিশ্রমিকপ্রতি জমির পরিমাণ গড়ের চেয়ে নিচে ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তদানীন্তন কৃষিবিশেষজ্ঞদের মতে একটি কৃষিজীবী পরিবারের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল ৫ একর জমি (চট্টগ্রামে এই পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৭২ একর অর্থাৎ গড়ের তুলনায় অর্ধেকেরও কম)।[৯] সুতরাং গড়ে প্রতিটি পরিবারের হাতে মাত্র ২×১.৮৫= ৩.৭০ একর জমি ছিল, যা তখনকার উৎপাদনশীলতার নিরিখে মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না

সারণি ৫ : চাষীদের শ্রেণীবিভাগ (১৯৫১)

শ্রেণী	মোট সংখ্যা (মিঃ)	শতাংশ
১. মালিক চাষী	৩.৭৪৩	৩৫
২. মালিক ও বর্গাচাষী	৪.৩৩৪	৪১
৩. বর্গাচাষী	০.৬২১	৫.৮৩
৪. বর্গাচাষী ও ক্ষেতমজুব	০.৪১০	৩.৮৪
৫. ভূমিহীন ক্ষেতমজুর	১.৫১৩	১৪.২০
৬. ফসলবহির্ভূত কৃষিখাতে নিয়োজিত মজুর	০.০২৫	০.১৩
সর্বপ্রকার মোট কৃষিশ্রমিক	১০.৬৫	১০০

টীকা : ক. মালিক চাষী বলতে শুধু কৃষিখাতে সেসব শ্রমদাতাদের বোঝানো হয়েছে যারা সম্পূর্ণভাবে শুধু নিজেদের মালিকানাধীন জমি চাষ করছে।

খ. মালিক ও বর্গাচাষী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা অংশত নিজের জমি এবং অংশত ভাড়া করা অন্যের জমি (যা বর্গা বা অন্য যেকোন চুক্তির অধীনে হতে পারে) আবাদ করছে।

গ. বর্গাচাষী বলতে ভূমিমালিকানাহীন ভাড়াটে চাষীকে বোঝানো হচ্ছে।

ঘ. বর্গাচাষী ও ক্ষেতমজুর বলতে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যারা অংশত ভাড়া জমিতে শ্রম দেয় এবং অংশত বাইরে শ্রম বিক্রয় করে। এরাও ভূমিহীন।

ঙ. ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রধানত ক্ষেতমজুরির মাধ্যমেই জীবিকা অর্জন করে এবং তাদের অধীনে কোন আবাদি জমিই নেই।

চ. ফসলবহির্ভূত কৃষিখাতে নিয়োজিত মজুর বলতে যে দুটি বিশেষ গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে তারা হচ্ছে গোচারণ ও দুগ্ধ দোহনের কাজে নিয়োজিত রাখাল এবং গোয়ালা (herdsmen and dairymen)।

উৎস : J. R. Andrus and Azizali F. Mohammad,"The Economy of Pakistan," (Oxford 1958),79.

৯. এখানে গড়ে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছয় জন ধরা হয়েছে, যাদের মধ্যে দুজন বা এক-তৃতীয়াংশ পরিপূর্ণভাবে কৃষিকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। বিস্তৃত তথ্যের জন্য দেখুন, Nur Ahmed, *East Pakistan as it is now and some of its urgent needs*, (Chittagong 1956), 31-32.

(প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৭৫ শতাংশ)। কিন্তু এসব গড় হিসাব থেকে প্রকৃত চিত্র ধরা পড়বে না। বস্তুত জমির মালিকানাকাঠামো ছিল প্রচণ্ড রকমের বৈষম্যমূলক। ফলে জমির প্রকৃত ব্যবহারকারীর হাতে এমনকি ৫ একর জমি থাকলেও মধ্যস্বত্বভোগী মালিকদের খাজনা ইত্যাদি প্রদান করার পর প্রকৃত চাষীর হাতে যা থাকতো তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন ছিল। তাই বাস্তবে জমির স্বল্প প্রাপ্যতা সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল জমির বৈষম্যমূলক বন্টনের সমস্যা। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে কৃষিখাতে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ১০.৬৫ মিলিয়ন ব্যক্তির ভূমির উপর স্বত্বাধিকার সম্পর্কে একটি ধারণা প্রণয়ন করা সম্ভব। ৫ নং সারণিতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রদান করা হলো।

৫ নং সারণি থেকে দেখা যায়, ভূমির মালিকানা ছিল কৃষিতে নিয়োজিত শ্রম-শক্তির ৭৬ শতাংশের হাতে (অর্থাৎ এক এবং দুই নং শ্রেণী)। পক্ষান্তরে ভূমিহীনদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল প্রায় ২৪ শতাংশ। অবশ্য যদি আমরা নিখাদ বর্গাচাষীকে (pure tenant) ভূমিহীন হিসেবে না ধরে হিসাব করি, তাহলে ভূমিহীনের (অর্থাৎ ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী) আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় প্রায় ১৮ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, মালিক ও বর্গাচাষী মিলিয়ে যারা জমি চাষ করছিল তাদের সবার হাতে সমান জমি কখনই ছিল না। তবে ১৯৫১ সালের খামার আয়তন বিন্যাস বিষয়ক তথ্য আমাদের হাতে না থাকায় এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। তবে ১১ বছর আগে প্রণীত 'বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন রিপোর্ট (১৯৪০)' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্যার ম্যালকম ডারলিং পরে উল্লেখ করে গেছেন—"বাংলার খামারসমূহের প্রায় অর্ধেকই তাদের মালিকদের পরিবারের জীবিকানির্বাহের জন্য আয়তনের দিক থেকে যথেষ্ট নয় .... কৃষিভিত্তিক জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু আবাদকৃত জমির পরিমাণ এখন এক একরের সামান্য কিছু কম।"[১০] সুতরাং ১৯৪০ সালেই যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে ১৯৫১ সালে এসে এই অবস্থার যে আরো অবনতি হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৫০ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রশক্তি মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারি প্রথা বিলোপের যে অভিযান চালায় তা বিরাজমান অবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধনে সক্ষম হয় নি। একথা ঠিক যে, শহরে বসবাসকারী অতি বৃহৎ হিন্দু ভূস্বামী এবং তাদের সঙ্গে জড়িত তালুকদার, পত্তনিদার, দর পত্তনিদার ইত্যাদি বহু রকমের যেসমস্ত মধ্যস্বত্বভোগী তখনো ছিল, সংস্কারের মাধ্যমে তাদের অধিকারের বিলুপ্তি

১০. স্যার ম্যালকম ডারলিং-এর এই উদ্ধৃতি ১৯৪০ সালের অবস্থা নির্দেশ করছে। জমির চরম অভাব এবং জমি বন্টনে আপেক্ষিক বৈষম্য দুটি দিকই এই উদ্ধৃতিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পরবর্তীকালে অবস্থার অবনতি বই উন্নতি হয় নি। আবাদকৃত জমির প্রাপ্যতা মাথাপিছু আধা একরের নিচে নেমে গিয়েছিল (১৯৫১ সালে) এবং আপেক্ষিক বৈষম্যের খুব একটা হেরফের হয় নি। দেখুন, Sir Malcolm Darling, *Report on Labour Conditions In Agriculture In East Pakistan*, (Karachi 1955)

ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের স্থলে 'চাষী' নাম ধারণ করে গ্রামাঞ্চলে অচিরেই একটি মুসলিম জোতদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীর জমির উপর নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তা কিছুই এই আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয় নি। বাস্তবে আইনের সংজ্ঞার ফাঁক দিয়ে 'জোতদার' হয়ে গেলেন চাষী প্রজা (cultivating tenant) এবং বর্গাচাষী হয়ে গেলেন জোতদারের জমিতে নিয়োজিত নিছক কৃষিশ্রমিক।[১১] তদুপরি আইনে প্রথমে ১০০ বিঘা ভূমিমালিকানা সিলিং-এর পদক্ষেপ গৃহীত হলেও পরে চাপের মুখে সেখান থেকেও পিছিয়ে আসা হয় এবং সিলিং নীতিটি নিছক বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়।

তৎকালে পূর্ব বাংলায় কৃষির উৎপাদনশীলতা মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতো। প্রথম, জলসেচের ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, কৃষি-উপকরণ কেনার জন্য কৃষকের হাতে পর্যাপ্ত নগদ টাকা বা ঋণের ব্যবস্থা। বাস্তবে এই দুই দিক থেকেই সেই সময় কৃষি ছিল নিদারুণভাবে অবহেলিত। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব বাংলায় জলসেচের বিভিন্ন উৎসভেদে জমির বিভিন্ন পরিমাণের একটি হিসাব নিম্নোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হলো :

সারণি ৬ : পূর্ব বাংলায় সেচের অধীন জমির উৎসসমূহের বিন্যাস, ১৯৪৯-৫০

সেচের উৎস	জমির পরিমাণ (হাজার একরে)	সেচের অধীন মোট জমির পরিমাণ (শতাংশ)
১. সরকারি খাল	০৬	১.৪৮
২. বেসরকারি খাল	৪৭	১১.৬৩
৩. পুকুর	১৫	৩.৭১
৪. কূপ	১২	২.৯৭
৫. অন্যান্য উৎস	৩২৪	৮০.১৯
মোট	৪০৪	১০০

উৎস : J. R. Andrus, and others প্রাগুক্ত, 79.

সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব বাংলায় সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ ৪ হাজার একর। সেই হিসেবে বলা যায়, মোট আবাদি জমির (২০.০৯ মিঃ একর) মাত্র ১.৮২ শতাংশ ছিল সেচের আওতাধীন। যেহেতু চাষতীব্রতা ছিল তখন মাত্র ১.২৮ শতাংশ, সুতরাং চাষকৃত জমির পরিমাণ (cropped land) ছিল

১১. ১৯৫০ সালের সংস্কার আইনে 'চাষীব' সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল ইংরেজিতে 'tenure holder who cultivated with the help of bargadars' এবং এভাবে 'জোতদারিকে' অনুপস্থিত বৃহৎ জমিদারি থেকে পৃথক দেখিয়ে আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। এই ফাঁকির বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের জন্য দেখুন, J R. Andrus, *The Economy of Pakistan,* 120-122.

২৫.৭১ মিলিয়ন একর। আরেকটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, মোট চাষকৃত জমির মধ্যে ২৫.২৫ মিলিয়ন একরই ছিল সেচসুবিধাহীন। মাত্র ০.৪৫৮ মিলিয়ন একর ছিল সেচের সুবিধাসহ চাষের অধীনে অর্থাৎ চাষকৃত জমির মাত্র ১.৭৮ শতাংশ ছিল সেচের অধীন।[১২] সুতরাং আবাদযোগ্য জমি এবং চাষকৃত জমি উভয় বিচারেই জলসেচের মাত্রা ছিল খুবই নগণ্য। সেই সময় কৃষিতে পুঁজি সরবরাহেরও তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। সারা পূর্ব বাংলায় মাত্র ৩০,০০০টি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হতো। প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে এরা মোট ঋণচাহিদার মাত্র ১২ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম হতো। বাকি ৮৮ শতাংশ ঋণচাহিদা পূরণ হতো মহাজনদের দ্বারা।[১৩]

অপর্যাপ্ত ঋণ এবং জলসেচের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে স্বল্প উৎপাদনশীলতা। দুটি প্রধান ফসল ধান ও পাটের ফলন ও তাদের চাষের জন্য জমি ব্যবহারের তুলনামূলক মূল্যায়ন থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ৭ নং সারণিতে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। সারণিতে দেখা যায়, ১৯৪৭—১৯৫১-৫২ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য গড়ে ধানী জমির পরিমাণ ছিল ১৯.৬৫ মিলিয়ন একর অর্থাৎ মোট আবাদি জমির প্রায় ৮৬ শতাংশ। এই পরিমাণ জমিতে ধানের মোট ফলন ছিল গড়ে ৭.২৩৩ মিলিয়ন টন। অতএব একরপ্রতি ফলন ছিল মাত্র ০.৩৬ টন বা মাত্র ৯.৫ মণ। আরো উদ্বেগজনক ব্যাপার হচ্ছে, স্বল্পকালের ব্যবধানে ধানী জমি যে হারে বেড়েছিল ধানের মোট ফলন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নি। ১৯৪৭—৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সাল নাগাদ ধানী জমির পরিমাণ ৮.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মোট ফলন বৃদ্ধি পায় মাত্র ৪.৯৩ শতাংশ। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে একরপ্রতি ফলন হ্রাস। এই সময়ে একরপ্রতি ফলন ০.৩৬ টন থেকে কমে ০.৩৫ টনে পরিণত হয়। অবশ্য পাটের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এরকম হয় নি। যেহেতু এই সময় ধানী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কৃষি আরো একমুখী ও আত্মপোষণশীল (mono cropped subsistence oriented agriculture) আকৃতি ধারণ করেছিল, সেহেতু অনিবার্যভাবে পাটচাষের জমি ও মোট ফলন দুই-ই তখন হ্রাস পেয়েছিল। উল্লিখিত কালপর্বে পাটচাষের জমি হ্রাস পেয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ, পক্ষান্তরে মোট ফলন হ্রাস পেয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। ফলে একরপ্রতি ফলন ০.৫৫ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৬৭ টন হয়েছে। যাই হোক, সামগ্রিক বিচারে দেখা যায়, আমাদের কৃষিতে প্রধানতম ফসল ধানের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও জমির ব্যবহার বাড়লেও একরপ্রতি ফলন কমেছে আর দ্বিতীয় প্রধান ও নগদ অর্থ আদায়কারী ফসল পাটের ক্ষেত্রে একরপ্রতি ফলন বাড়লেও মোট উৎপাদন ও জমির ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য দেশের ফলনের হারের সঙ্গে পূর্ব বাংলার প্রধান ফসল ধানের ফলনের হার তুলনা করলে

---

১২. প্রাগুক্ত, ৭৯।

১৩. দেখুন, Nur Ahmed, *East Pakistan as it is.*

উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে (সারণি ৮ দ্রষ্টব্য)। দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৭-৪৮—১৯৫১-৫২ কালপর্বে গড়ে আমাদের ধান উৎপাদনশীলতার তুলনায় জাপানে উৎপাদনশীলতা ছিল ৪ গুণেরও বেশি, গ্রেট বৃটেন ও চীনে ছিল প্রায় ৩ গুণ বেশি, মিশরে প্রায় দ্বিগুণ বেশি, ভারতে ২৮ শতাংশ এবং আমেরিকায় ২৬ শতাংশ বেশি।

সারণি ৭ : ধান ও পাটের অধীনে জমি ও মোট উৎপাদন : ১৯৪৭-৫২ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত

	বছর							
	গড়		গড়		গড়		গড়	
ফসল	১৯৪৭ -১৯৫২		১৯৫২-৫৩		১৯৫৩-৫৪		১৯৫৪-৫৫	
	জমি (হাজার একর)	ফলন (হাজার টন)	জমি	ফলন	জমি	ফলন	জমি	ফলন
ধান	১৯৬৫৩	৭২৩৩	২০৭৭৮	৭৩৩৫	২২০১০	৮২৪৫	২১৩৩৬	৭৫৯০
পাট	১৭০৫	৯৪৪	১৯০৭	১২১৮	৯৬৫	৬৪৫	১২৪৩	৮৩৩

উৎস : J. R. Andrus, and others প্রাগুক্ত, 32, 57..

সারণি ৮ : ধানের একরপ্রতি ফলন (১৯৪৭-৫১/৫২) : আন্তর্জাতিক তুলনা

দেশের নাম	একর প্রতি ফলন (পাউন্ড/একর)	সূচক
পূর্ব বাংলা	৮১৫	১০০
যুক্তরাষ্ট্র	১০২৬	১২৬
ভারত	১০৪৪	১২৮
বৃটেন	২১৬৬	২৬৫
চীন	২২৪৬	২৭৫
মিশর	১৬২০	১৯৯
জাপান	৩৩৬১	৪১২

উৎস : J. R. Andrus, and others প্রাগুক্ত, 40.

কৃষির পরে শিল্পের দিকে যদি আমরা এখন মনোযোগ দেই তাহলে দেখবো, পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিল্প-উত্তরাধিকারটি ছিল খুবই দুর্বল। তুলনামূলক বিচারে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বতঃপ্রতীয়মান। ১৯৪৭-৪৮ সালে অবিভক্ত ভারতে যৌথ মূলধনভিত্তিক বড় ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল মোট পঁচিশ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট আদায়কৃত

মূলধনের (paid up capital) পরিমাণ ছিল ৫৮৫ কোটি টাকা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সমগ্র পাকিস্তানের ভাগে পড়ে মাত্র ২.৮ হাজার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ভারতের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। তবে এই শতকরা ১১ ভাগ প্রতিষ্ঠানের আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট মূলধনের শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ। আবার পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল আরো করুণ। পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১.৩ হাজার অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট প্রতিষ্ঠানের ৪৬ শতাংশ এবং আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা অর্থাৎ পাকিস্তানের মোট মূলধনের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ।[১৪] স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই সময় পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ পূর্ব বাংলায় বসবাস করতো।

বস্তুত ভারতবর্ষে যেটুকু শিল্পায়ন বৃটিশ আমলে হয়েছিল তা ঔপনিবেশিক বিশেষ স্বার্থের কারণে প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিল বন্দরনগরীর মধ্যে আর বাংলাদেশের বন্দরনগরী হিসেবে গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন কলকাতা নগরী। তাই 'পূর্ব বাংলা' বরাববই কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রান্তিক এলাকা হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় কোন পাটকল ছিল না। নারায়ণগঞ্জ ও আশেপাশে কিছু 'জুট বেলিং ও প্রেসিং'-এর কাজ হতো এবং প্রক্রিয়াকৃত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য পাট চলে যেতো কলকাতায়। পূর্ব বাংলা তাই ছিল প্রধানত কাঁচা পাট রপ্তানিকারক। অবশ্য পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতে যখন কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়, তখন এ অঞ্চলে পাটশিল্প গড়ে উঠার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সে সুযোগ প্রধানত ব্যবহার করেছিল অবাঙালি উদ্যোক্তা-মালিকগণ। শুধু পাটকল নয়, তখন পযন্ত পূর্ব বাংলায় কোন লৌহ কারখানা বা সিগারেট কারখানা ছিল না। সাকুল্যে কয়েকটি বৃহৎ কাপড়ের কল, দু'একটি চিনিকল, কয়েকটি চা-বাগান, একটি সিমেন্ট কারখানা, কিছু 'রাইস মিল', ময়দার কল—এই ছিল পূর্ব বাংলার মোট শিল্পসম্পদ।[১৫] কিন্তু এসবেরও মালিক ছিলেন মূলত হিন্দু উদ্যোক্তাবৃন্দ। দেশবিভাগের পর তাদের ব্যাপকহারে বহির্গমনের ফলে এসব ক্ষেত্রেও শূন্যতা ও নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

১৪. তথ্যের উৎস : আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* (ঢাকা ১৯৮৩), ৮৪।

১৫. প্রাগুক্ত, মূল উৎস হচ্ছে— C. N. Vakil, *Economic Consequences of Divided India,* (Bombay 1950), 78। এছাড়া আরেকটি গ্রন্থে ১৯৫১ সালে 'পূর্ব বাংলায়' অবস্থিত মোট শিল্প কারখানার (রেজিস্ট্রিকৃত) সংখ্যা মাত্র ৩২৭টি বলে উল্লেখ করা হয়। এসব কারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১১৬টি চা-কারখানা, ৮৩টি চালকল, ৬৪টি জুটপ্রেস, ১৫টি বস্ত্রকল এবং ১০টি চিনিকল। এসব রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় ১৯৫১ সালে শ্রমিকসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩৫০৪ জন অর্থাৎ মোট জনংখ্যার এক হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। দেখুন, Nur Ahmed, *East Pakistan as it is* (Chittagong 1956), 32-33.

১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় শিল্প-উৎপাদন একেবারে নগণ্য মাত্রা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। লক্ষণীয় যে, এই ছয় বছরে কৃষি-উৎপাদন ও জাতীয় উৎপাদন যথাক্রমে মাত্র ১১ শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পক্ষান্তরে শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষিখাতে গড়ে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ২.২ শতাংশ হারে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩ শতাংশ হারে এবং শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০ শতাংশ হারে। এর ফলে জাতীয় উৎপাদনকাঠামোতে কিছুটা অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে জাতীয় উৎপাদনে কৃষি ও শিল্পের অংশ ছিল যথাক্রমে ৬৫ এবং ৩ শতাংশ। ১৯৫৪-৫৫ সালে সামান্য হলেও তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৩ এবং ৪.২০ শতাংশ।[১৬]

এই সময় শিল্পখাতে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক উপখাত ছিল। একটি ছিল নেতৃত্বদানকারী, সদ্য গড়ে উঠা ও দ্রুত বর্ধমান আধুনিক বৃহদায়তন ম্যানুফেকচার, অপরটি ছিল চলে আসা অবিকশিত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাত। উন্নত কুটিরশিল্পও দ্বিতীয় উপখাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচ্য কালপর্বে যদিও সমগ্র শিল্প-উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০ শতাংশ, কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড় হারের দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ ২৩ শতাংশ।[১৭] পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড় হারের অর্ধেক অর্থাৎ ৫ শতাংশ। তবে মনে রাখা ভাল যে, এর পরেও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫৪-৫৫তে ছিল ৩৪.৫ কোটি টাকা (১৯৫৯-৬০), স্থির দামে যা ছিল বৃহদায়তন শিল্প-উৎপাদনের তুলনায় প্রায় ৭৩ শতাংশ বেশি। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাথমিক লগ্নে পূর্ব বাংলায় শিল্পখাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। নগণ্য ভিত্তি (base) থেকে এরকম দ্রুত বৃদ্ধি কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে এর পরেও শিল্পোৎপাদনে প্রথাগত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের আধিপত্য তখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণই থেকে গিয়েছিল।

এতক্ষণ আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন সামষ্টিক চলক (যেমন জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, গ্রাম-শহর আয়বৈষম্য, কৃষি-উৎপাদন, শিল্প-উৎপাদন ইত্যাদি) নিয়ে যে আলোচনা করেছি তাতে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত 'পূর্ব বাংলার' অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি নৈরাশ্যজনক স্থবির চিত্রই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সামষ্টিক চলকের গতিপ্রবণতা থেকে ব্যষ্টিক স্তরে জীবনযাত্রামানের গতিপ্রবণতা সম্পর্কে পরোক্ষ ধারণা পাওয়া গেলেও গভীরতর ধারণার জন্য তা খাত ও শ্রেণী অনুযায়ী আরো ভেঙে ভেঙে খতিয়ে দেখা দরকার। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এখানে শুধু এই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃত আয় ও জীবনযাত্রার মানের যে উঠানামা হয়েছিল সে বিষয়ে সামান্য কিছু তথ্য প্রদান করা হবে।

১৬. Mohiuddin Alamgir and others, *Bangladesh National Income and Expenditure*, (Dhaka 1974), 167

১৭. ঐ, 39.

প্রথমেই গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ২৪ শতাংশ ভূমিহীন মজুরদের প্রকৃত মজুরির উঠানামার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা যাক। ৯ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ সালকে ভিত্তিবছর ধরলে এই সময়কালে কৃষিমজুরদের প্রকৃত মজুরি মূলত হ্রাস পেয়েছে এবং হ্রাসের হার ছিল ২৩ শতাংশ (অর্থাৎ ১০০ থেকে ৭৭)। তবে চালের হিসাবে এই সময় মজুরি মোটামুটি স্থির ছিল। ১৯৫০ সালে একজন কৃষিমজুর ১.৬২ টাকা মজুরি পেতো এবং তা দিয়ে ৩.২৪ কে. জি. চাল ক্রয় করা যেতো। ১৯৫৫ সালে তার মজুরি ১.৩২ টাকায় নেমে আসে, তবে তা দিয়ে তখনও তার পক্ষে ৩.২২ কে. জি. চাল ক্রয় করা সম্ভব ছিল। আজকের তুলনায় এ মজুরির মাত্রা খারাপ নয়; কিন্তু যেটি লক্ষণীয় তা হচ্ছে এর নিম্নগামী প্রবণতা, যা পরবর্তীতেও অটুট ছিল। এই সঙ্গে আরো মনে রাখতে হবে যে, এই মজুরি হচ্ছে গড় মজুরি, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে যখন কাজের অভাব দেখা দিত তখন মজুরি এর চেয়ে অনেক নিচেও নেমে যেতো। স্যার ম্যালকম ডারলিং এই সময়কালে (১৯৫২-৫৩) আই. এল. ও'র পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন গ্রামে কৃষিশ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এসেছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিমজুরদের মজুরি এমনকি ০.৫০ টাকায়ও নেমে যায়। এমনকি তাঁর ভাষায় মজুর অনেক সময় শুধু পেটে-ভাতে কাজ করতে বাধ্য হতো।[১৮]

সারণি ৯ : পুরুষ কৃষি-শ্রমিকদের মজুরির গতিপ্রবণতা : ১৯৪৯-১৯৫৫

সন	দৈনিক মজুরি (টাকায়)	মোটা চালে রূপান্তরিত দৈনিক মজুরি (কে. জি.)	প্রকৃত মজুরি (১৯৭২-৭৪ সালের দামে) (সূচক)
১৯৪৯	১.৯২	-	১১.৯২ (১০০)
১৯৫০	১.৬২	৩.২৪	১০.১৭ (৮৫)
১৯৫১	১.৫৬	৩.০৬	৯.৫৫ (৮০)
১৯৫২	১.৫২	২.৭১	৯.৪২ (৭৯)
১৯৫৩	১.৩৮	২.৭১	৮.১৯ (৬৯)
১৯৫৫	১.৩২	৩.২২	৯.২১ (৭৭)

উৎস : Mahabub Hossain and A. R. Khan, The Strategy of Development in Bangladesh, (London 1989), 159.

আলোচ্য পর্বে সমগ্র গ্রামবাসীদের আয় ও ভোগের মানও যে খুব নিচু ছিল তা গ্রামবাসীর গড় মাথাপিছু আয়ের নিম্নমান (১৯৫৯-৬০ সালে মাসিক প্রায় ২২ টাকা)

১৮. Sir Malcolm Darling, *Report on Labour Condition*, (Karachi 1955).

থেকেই প্রতীয়মান হয়। যেহেতু ১৯৫৯-৬০ সালে চালের দাম ছিল প্রায় ৩০.১৯ টাকা মণ, সেহেতু চালের হিসাবে গড় মাসিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১.৩৯ মণ। এটা কৃষিমজুরের মাসিক আয়ের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে কম মনে হলেও এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একজন মজুরের আয়ের উপর নির্ভর করতো ৪-৫ জন লোক এবং প্রতিদিন মজুরের কর্মসংস্থানের সুযোগও ছিল না। পক্ষান্তরে উপরে বর্ণিত অঙ্কটি গ্রামীণ গড় মাথাপিছু আয় নির্দেশক। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রামীণ জনগণের আয় ও ভোগ সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে এক জরিপ চালানো হয়েছিল। সেই জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে গ্রামে দৈনিক মাত্র এক বেলা বা তার চেয়েও কম আহারের সুযোগ পায় এরকম পরিবারের সংখ্যা ছিল শতকরা পাঁচ ভাগ। আরো শতকরা ৪৫ ভাগ পরিবার ছিল, যারা দৈনিক এক বেলার বেশি কিন্তু সপ্তাহে ১০ বারের কম (অর্থাৎ দৈনিক দেড় বেলার কম) আহার করতো। এই দুই শ্রেণীর লোককে আমরা ঘাটতি দরিদ্র পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি এবং তদনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৬ সালে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের আপেক্ষিক হার ছিল ৫০ শতাংশ। ঔপনিবেশিক আমলে ১৯১৬ সালে বাংলাদেশে মেজর জে. সি, জ্যাক হুবহু একই পদ্ধতিতে অনুরূপ একটি জরিপ চালিয়েছিলেন। তাঁর তথ্যের সঙ্গে ১৯৫৬ সালের তথ্য মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ৪০ বছর পরেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় একই রকম রয়ে গেছে।[১৯]

কৃষিখাতের তুলনায় শিল্পখাতে যদিও শ্রমিকসংখ্যা খুবই নগণ্য, তবুও এই সময়কালে শিল্পখাতে যে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল (গড়ে ১০ শতাংশ বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে), তার ফলাফল শ্রমিকরা কতটুকু পেয়েছিল সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ১০ নং সারণিতে ১৯৫১-৫৩ কালপর্বে পূর্ব বাংলার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শিল্পসমূহে (perennial industries) শিল্পশ্রমিকদের বার্ষিক আয়ের উঠানামা দেখানো হয়েছে। এ থেকে দেখা যায়, টাকার অঙ্কে আয় প্রথম বছরে তথা ১৯৫১-৫২ সালে ১.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ঐ সময় শ্রমিকদের (নারায়ণগঞ্জে) জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক ৬.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতএব ধরে নেয়া যায় যে, প্রকৃত আয় প্রায় ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩-এর মধ্যে টাকার অঙ্কে আয় হ্রাস পেয়েছিল ৫.২ শতাংশ আর ঐ একই সময়ে শ্রমিকদের (নারায়ণগঞ্জে) জীবনযাত্রাব্যয়সূচক হ্রাসের হার ছিল মাত্র ১.৮০ শতাংশ। অর্থাৎ এর পরের বছরও প্রকৃত আয় প্রায় ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। সুতরাং অন্তত ১৯৫১-৫৩ কালপর্বে শ্রমিকদের গড় বার্ষিক প্রকৃত আয় বৃদ্ধি তো পায়ইনি, বরং ৩ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছিল। এ. আর. খান প্রদত্ত আরেকটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৪ সালকে ভিত্তিবছর (১০০) ধরলে শহুরে শিল্পশ্রমিকদের প্রকৃত গড় মজুরিসূচকটি ১৯৫৫ সালে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৮৮ অর্থাৎ প্রকৃত

১৯. Dr Abdullah Farouk et al., *Rural Credit and Unemployment In East Pakistan,* (Dhaka 1958), 43-45

মজুরি সেই বছর প্রায় ২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।[২০] সুতরাং সামগ্রিক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আলোচ্য কালপর্বে পূর্ব বাংলার শ্রমিকরা সাধারণভাবে বর্ধিত শিল্পোৎপাদনের কোন সুফল লাভ করে নি। বরং কৃষিমজুরদের মতোই তাদের প্রকৃত মজুরি বা আয় স্থবির বা নিম্নগামী ছিল।[২১]

সারণি ১০ : স্থায়ী শিল্পকারখানাসমূহের শ্রমিকদের গড় বার্ষিক আয় : ১৯৫১-৫৩

সন	সকল শিল্পের জন্য শ্রমিকদের আয় (টাকায়)	শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক
১৯৫১	৭৭১.৭০	১০৪
১৯৫২	৮৩৩.০০	১১১
১৯৫৩	৭৯৮.০০	১০৯

টীকা: ক. এখানে সকল শিল্প বলতে পূর্ব বাংলার পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনিয়াবিং শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাগজ ও মুদ্রণশিল্প , কাঠ, পাথর ও কাঁচশিল্প, চামড়াশিল্প ও অন্যান্য স্থায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা বোঝানো হয়েছে।

খ. শ্রমিক বলতে শুধু সেসমস্ত কর্মচারীকে বোঝানো হয়েছে যারা 'মজুরি অধ্যাদেশের' অধীনে মাসিক ২০০ টাকার কম মজুরি পেয়ে থাকেন।

গ. শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকটি নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের জন্য প্রণীত এবং ভিত্তিবছর হচ্ছে ১৯৪৮-৪৯=১০০।

উৎস : J. R. Andrus, et. al , The Economy of Pakistan, (London 1958), 418, 440.

পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যুর হার ইত্যাদি সূচকগুলিও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে 'সাক্ষরতার হার' ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ২১.১১ শতাংশ। তবে এর মধ্যে এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি শুধুমাত্র আরবি ভাষায় লিখিত কুরআন শরিফ পড়তে পারতেন (অর্থ না বুঝে)। যদি এদেরকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু তাদেরকেই 'সাক্ষর ব্যক্তি' বলি, যারা অন্তত মাতৃভাষায় পড়তে, লিখতে ও বুঝতে পারেন, তা হলে ১৯৫১ সালে

২০. A. R. Khan, *Bangladesh*, 19.

২১. আরেকটি প্রবন্ধে অর্থনীতিবিদ এ. আর. খান দেখিয়েছেন যে, পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালে সমগ্র শিল্পখাতে মোট সংযোজিত মূল্যের মাত্র ৪৬ শতাংশ শ্রমিকদের ভাগে জুটেছিল এবং এর পর থেকে তা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৬২-৬৩ সাল নাগাদ শ্রমিকদের হিস্যার পরিমাণ মাত্র ২৬ থেকে ২৮ শতাংশ দাঁড়ায়। বিশেষ শিল্প পাটের ক্ষেত্রেও ১৯৫৪ সালে সংযোজিত মূল্যে (value added) শ্রমিকদের হিস্যা ছিল মাত্র ৪৫ শতাংশ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে তা দাঁড়ায় ২৯ থেকে ৪১ শতাংশে। দেখুন, A. R. Khan,"What has been happening to Real Wages In Pakistan?" *P. D. R. Autumn*, No. 3, Karachi, 336.

প্রকৃত সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে মাত্র ৫৯ লক্ষ ৪৫ হাজার জন তথা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশ। লক্ষণীয় যে, এই একই সংজ্ঞানুযায়ী ১৯৪১ সালে এই অঞ্চলে সাক্ষর ব্যক্তির হার ছিল ১৩.৮৮ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত অর্থে ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত এই দশ বছরে এই অঞ্চলে সাক্ষরতার হারে কার্যত কোন অগ্রগতি হয় নি। ভবিষ্যতেও এক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। কারণ ১৯৫১ সালে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ১৭ শতাংশ স্কুলে যাওয়া-আসা করতো। ১২ বছরের নিচে শিশুর সংখ্যা ছিল ৮৮ লাখ। তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই কোন রকম বিদ্যালয়ের ছায়া মাড়াতো না।[২২]

স্বাস্থ্যখাতেও পরিস্থিতি ছিল রীতিমতো উদ্বেগজনক। সারা পূর্ব বাংলার প্রায় সারে চার কোটি লোকের জন্য ১৯৫১ সালে পাশ করা ডাক্তার ও সার্জেনের সংখ্যা ছিল সর্বমোট মাত্র ৬৪৬০ জন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৬৯৬৫ জনের জন্য একজন ডাক্তার। আর মোট স্বাস্থ্যকর্মচারী (ডাক্তারসহ) ছিল ২৭০২০ জন অর্থাৎ প্রতি ১৬৬৫ জনে একজন। প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১৬০ জন এক বছরে পা দেয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। পক্ষান্তরে সেই সময় বৃটেনে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে মাত্র ২০ থেকে ৩০ জন।[২৩]

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জীবনের মান (quality of life) উভয়দিক থেকেই পূর্ব বাংলার প্রাথমিক পর্বের অবস্থাটা আনন্দদায়ক ছিল না। অধিকাংশ অর্থনৈতিক চলকের (variables) গতিপ্রবণতা ছিল (শিল্প বাদে) স্থবির বা নিম্নগামী। আর যেখানে যেটুকু প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল তার মাত্রা ছিল জনগণের আশার তুলনায় অনেক নিচে, তার বণ্টনপ্রণালীও ছিল প্রচণ্ডভাবে বৈষম্যমূলক এবং শুধু শ্রেণীবৈষম্য নয়, আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রাও ছিল শুরু থেকেই ক্রমবর্ধমান।

২. '৫০-এর দশকের অন্তিম পর্ব ও '৬০-এর দশকের অর্থনৈতিক গতিপ্রবণতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত সাধারণ অর্থনৈতিক গতিধারার যে চিত্র তুলে ধরেছি তা কি পরবর্তীতে একই ধারায় অগ্রসর হয়েছিল? নিম্নে ১১ নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে এ বিষয়ে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে :

১১ নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৪-৫৫ সালের পরবর্তী পাঁচ বছর বা পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে পূর্ব বাংলার প্রকৃত মাথাপিছু আয় আগের মতো শুধু স্থবির থাকে নি, বরং ২৭১ টাকা থেকে ২৬২ টাকায় নেমে গেছে অর্থাৎ পাঁচ বছরে প্রায় ৩.৪৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। যদিও এই সময়ে মোট জাতীয় আয় প্রায় ৯ শতাংশ

২২. Nur Ahmed, *East Pakistan as it is* (Chittagong 1956), 27.
২৩. ঐ, 39.

বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় ১৩ শতাংশ সেজন্যই মাথাপিছু আয়ের এই অবনতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

সারণি ১১ : জাতীয় উৎপাদন, মোট জনসংখ্যা, মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি চলকের গতিপ্রবণতা : ১৯৫৪-৫৫-১৯৬৯-৭০

বিষয়	সন ১৯৫৪-৫৫	সন ১৯৫৯-৬০	সন ১৯৬৯-৭০
মোট জাতীয় উৎপাদন (মিলিয়ন টাকা)	১৩২৮৮	১৪৪৮৯	২১৯৪২
মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪৭.৭২	৫৩.৯০	৭২.৪০
মাথাপিছু উৎপাদন (টাকা)	২৭১	২৬২	২৯৭

টীকা : ক. এখানে মোট জাতীয় উৎপাদন ১৯৫৯-৬০ সালের স্থির দামে পরিমাপ করা হয়েছে।

উৎস : Mohiuddin Alamgir and Berlage,"Bangladesh", 162.

অবশ্য পরবর্তী দশ বছরে বা ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫১.৪৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে একই সময়ে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৩৪.৩২ শতাংশ। সুতরাং এই কালপর্বে অর্থাৎ ১০ বছরে মাথাপিছু আয়ের ঊর্ধ্বগতির হার ছিল প্রায় ১৩ শতাংশ। সেই হিসেবে বলা যায় যে, ষাটের দশকে এসে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে পূর্বেকার স্থবিরতা বা নিম্নগামিতার পরিবর্তে কিছুটা ঊর্ধ্বগামিতা ও সচলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। মহিউদ্দীন খান আলমগীর ও বার্লেজ বিভিন্ন কালপর্বের জন্য বার্ষিক প্রবৃদ্ধির গড় চক্রবৃদ্ধিহারও (average annual compound rate of growth) পরিমাপ করেছেন। তাঁদের প্রাক্কলিত হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ কালপর্বে তথা বিশ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহার ছিল ৩.৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে এই সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির গড় আনুমানিক হার ছিল শতকরা ২.৫ ভাগ। অতএব সমগ্র পাকিস্তান আমলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ০.৭০ অর্থাৎ এক শতাংশেরও কম।[২৪]

২৪. পাকিস্তান আমলের দুই দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথম দশকে দ্বিতীয় দশকের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল এটাই সাধারণভাবে মনে করা হয়। আমরা এখানে যে ২.৪ শতাংশ হারের কথা উল্লেখ করেছি সেটি এ বিষয়ে মাহবুব হোসেন ও এ. আর. খানের সর্বশেষ 'স্টাডি' থেকে নেয়া হয়েছে। দেখুন, Mahabub Hossain and A. R. Khan, *The Strategy of Development in Bangladesh*, (London 1987), 23.

এটা মোটেও কোন লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধির হার ছিল না। তবে মনে রাখতে হবে, বিশ বছরের এই গড় হার দুটি দশকের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রথম দশ বছর অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০—১৯৫৯-৬০ কালপর্বে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ছিল নিম্নাভিমুখী। মহিউদ্দীন আলমগীর প্রমুখের হিসাব অনুসারে এই সময়ে মোট জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধিহার ছিল মাত্র ২.৩ শতাংশ, যা জনসংখ্যাবৃদ্ধির গড় হারের চেয়ে সামান্য কম ছিল।[২৫] পক্ষান্তরে, ষাটের দশকে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩ শতাংশ, যা গড় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে ১.৩ শতাংশ বেশি। এসব তথ্য থেকেই ধারণা করা হয় যে, ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত বর্ধমান ছিল। কিন্তু ষাটের দশকের এই বর্ধিত প্রবৃদ্ধির হারও তদানীন্তন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অর্জিত হারের তুলনায় মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ১২ নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার বর্ধিত প্রবৃদ্ধির হারটি সমগ্র পাকিস্তানের হারের মাত্র অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি। পাকিস্তানের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার তুলনায় ছিল ০.১ শতাংশ কম। সুতরাং বলা যায়, এই সময় পাকিস্তানের গড় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৩.৯ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তা ছিল নিশ্চিতভাবেই আরো বেশি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের হারটি ছিল প্রায় ৫ গুণ বেশি বা ততোধিক। ১২ নং সারণিতে প্রদত্ত অন্যান্য দেশগুলির পরিসংখ্যানও দেখাচ্ছে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। যেখানে জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধির হার পিছিয়ে নেই (যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাজ্য), সেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার এত এগিয়ে আছে যে দুয়ে মিলে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি আবার পিছিয়ে গেছে। বস্তুত ষাটের দশকে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী ৩৭টি দেশ ছিল নিম্নআয়ের দেশ (low income countries)। তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্থান ছিল নিচের দিক থেকে তৃতীয়।[২৬] ষাটের দশকে সবগুলি নিম্নআয়ের দেশের গড় গুরুত্বসম্পন্ন প্রবৃদ্ধির হার (average weighted growth rate) ছিল ৩.৯ শতাংশ, যা পূর্ব বাংলার তুলনায় ছিল ০.৩ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলা তার সমগোত্রীয় নিম্নআয়ের দেশগুলির মধ্যেও নিম্নতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অধিকারী ছিল। এভাবে সামগ্রিকভাবে দেখলে ষাটের দশকে 'চাকচিক্যময় প্রবৃদ্ধির' বিষয়টি অপেক্ষাকৃত ম্লান এবং প্রকৃত রূপ নিয়ে আমাদের সামনে ধরা পড়ে এবং আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই কেন পঞ্চাশের দশকের তুলনায় ষাটের দশকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার জনগণ শেষাবধি ১৯৭১ সালে অসন্তুষ্ট, বিক্ষুব্ধ এবং এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামী হয়ে উঠেছিল।

---

২৫. এই তথ্য আমাদের আলোচনার সত্যতাকে (validity) পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বেও প্রলম্বিত করেছে।

২৬. পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৪৯-৫০ সালে আমাদের স্থান ছিল ৭০টি দেশের মধ্যে ৫৯ তম। অর্থাৎ নিচের দিক থেকে একাদশ।

সারণি ১২ : পূর্ব বাংলার প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে কতিপয় নির্বাচিত দেশের প্রবৃদ্ধির হারের তুলনা : ১৯৬০-৭০

দেশের নাম	মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার (১৯৬০-৭০)	জনসংখ্যাবৃদ্ধির শতকরা হার (১৯৬০-৭০)
পূর্ব বাংলা	৩ ৬	২.৯
সমগ্র পাকিস্তান	৬.৭	২.৮
শ্রীলংকা	৪.৬	২.৪
ভারত	৩.৬	২.৩
ন্দানেশিয়া	৩.৫	২.২
থাইল্যান্ড	৮.২	৩.১
ফিলিপাইন	৫.১	৩.০
দঃ কোরিয়া	৮.৫	২.৪
চীন (সমাজতান্ত্রিক)	৬.৬	১.৯
রাষ্ট্র	৪.৩	১.৩
যুক্তরাজ্য	২.৯	০.৫
জাপান	১০.৫	১.০

টীকা : এই তালিকায় প্রদত্ত হিসাব আমাদের আগের দেশীয় তালিকাসমূহের হিসাব থেকে সামান্য পৃথক। সম্ভবত আন্তর্জাতিক তুলনার জন্য যেসব 'এ্যাডজাস্টমেন্ট' করা হয়েছিল তাতেই এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

উৎস : "World Bank Deve!opment Report," 1979, 128, 158.

পূর্ব বাংলায় এই সময়ে ষাটের দশকে যে প্রবৃদ্ধিহার লক্ষ্য করা যায় তার পশ্চাতে নেতৃত্বদানকারী খাত ছিল ম্যানুফেকচারিং খাত। ফলে এই সময়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং সেই স্থানটুকু শিল্প ও সার্ভিস সেক্টর দ্রুত দখল করে নেয়। পঞ্চাশের দশকের শেষে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ ছিল ৬০.৩৪ শতাংশ। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালে সেই অংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৩.৩৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে, শিল্পখাতের অবদান ১৯৫৯-৬০ সালের ৫.৯৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯-৭০ সালে ৭.৭৭ শতাংশে পরিণত হয়। সার্ভিস ও অন্যান্য সেক্টরের অবদানও ৩৩.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৯০ শতাংশে পরিণত হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯৩১-৪৭ কালপর্বে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক কালপর্বে উৎপাদনকাঠামো যেমন কৃষিকেন্দ্রিক ও কৃষি অভিমুখে পরিবর্তনশীল ছিল, '৪৭-এর পর থেকে তা আর তেমনটি থাকে নি। সর্বভারতীয় শিল্পএলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে পূর্ব বাংলায় প্রথম

থেকেই এক বাধ্যতামূলক শিল্পায়নপ্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল এবং তা ষাটের দশকেও অব্যাহত থাকে, যা উৎপাদনকাঠামোতে শিল্পের অনুকূলে কিছু পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়। তবে লক্ষণীয় যে, শিল্পায়নের গতিবেগ সর্বদা সমান ছিল না। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত বিশ বছরে সমগ্র ম্যানুফেকচারিং খাতে উৎপাদনবৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহার ছিল ৮.৩ শতাংশ। এর মধ্যে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ১২.৯ শতাংশ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬.১ শতাংশ হারে। কিন্তু এই বিশ বছরের প্রথম ১০ বছরে সমগ্র ম্যানুফেকচারিং উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধিহার ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি তথা ৯.৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ষাটের দশকে এই হার ছিল ৭ শতাংশ। তবে ষাটের দশকে প্রবৃদ্ধির ভিত্তি (base) যেহেতু ১৯৪৯-৫০-এর তুলনায় অনেক বড় ছিল, সেহেতু ষাটের দশকে প্রবৃদ্ধির হার নিম্নতর হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনবৃদ্ধির চরম মাত্রা (absolute level) তাৎপর্যপূর্ণভাবে উচ্চতর ছিল। পঞ্চাশের দশকে বৃহদায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি (অর্থাৎ যথাক্রমে ১৯.৩ শতাংশ এবং মাত্র ৫ শতাংশ)। কিন্তু ষাটের দশকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় সামান্য বেশি (অর্থাৎ যথাক্রমে ৭.২ শতাংশ এবং ৬.৮ শতাংশ)।[২৭] ধীরগতিতে প্রবহমান এসব কাঠামোগত পরিবর্তন সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ কৃষি থেকেই উৎসারিত হচ্ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে অর্থাৎ সর্বশেষ বছরেও মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে ছিল ৫৫.৭ শতাংশ, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে ততোদিনে দ্রুততর শিল্পায়নের কারণে কৃষির অবদান ৪১.৬ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার তুলনামূলক শ্লথগতি এবং তুলনামূলকভাবে অথবা চরম মাত্রা (absolute level) বিচারে উভয় দিক থেকেই এই অঞ্চলে কৃষির প্রাধান্যের বিষয়টি 'খাতওয়ারী কর্মনিয়োজনের বিন্যাসের' বিবর্তন থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ১৩ নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৬-৬৭ সালেও পূর্ব বাংলায় মোট কর্মনিয়োজনের ৭৭.৮ শতাংশই কৃষিখাতে নিয়োজিত, যদিও সেই সময় মোট উৎপাদনের ৫৫.৭ (১৯৬৯-৭০) শতাংশ আসতো কৃষিখাত থেকে। পক্ষান্তরে, একই সময়ে পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম-৪১.৬ শতাংশ (১৯৬৯-৭০) এবং কর্মনিয়োজনে কৃষির অংশও ছিল অপেক্ষাকৃত কম—৫৩.৪ শতাংশ (১৯৬৬-৬৭)। ১৩ নং সারণিতে একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হচ্ছে, পঞ্চাশের দশকে কর্মনিয়োজনে কৃষির অংশ পূর্ব বাংলায় হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই সময়ে পূর্ব বাংলায় জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান, আমরা জানি, সামান্য হলেও হ্রাস পেয়েছিল। এ থেকে মনে হয়, পঞ্চাশের দশকে

২৭. প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের উৎসের জন্য দেখুন, Mohiuddin Alamgir and Berlage, প্রাগুক্ত, ৩৬

শিল্পোৎপাদন মূলত বৃদ্ধি পেয়েছিল অত্যন্ত পুঁজিঘন বৃহদায়তন কতিপয় শিল্পের মাধ্যমে এবং এদের দ্বারা কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাতের হার (absorptive rate) ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম। আমাদের প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যও অনুরূপ সাক্ষ্যই প্রদান করে। পঞ্চাশের দশকে বৃহদায়তন ম্যানুফেকচারিং-এর প্রবৃদ্ধির হার ছিল যেখানে ১৯ শতাংশ, সেখানে শ্রমঘন ক্ষুদ্রায়তন ম্যানুফেকচারিং-এর প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৫ শতাংশ।

বৃহদায়তন শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই গতিধারা পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে এবং সমগ্র ষাটের দশকে শহর এবং গ্রামের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে

সারণি ১৩ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে কর্মনিয়োজনের বিন্যাস

ক.	পূর্ব বাংলা	সন	সন	সন
		১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৬-৬৭
	কৃষি	৮৪.৭	৮৫.৩	৭৭.৮
	শিল্প	৬.৬	৬.০	৯.৬
	সেবা	৮.৭	৮.৭	১২.৬
খ.	পশ্চিম পাকিস্তান	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৬-৬৭
	কৃষি	৬৫.৩	৫৯.৩	৫৩.৪
	শিল্প	১১.৬	২৯.২	২৫.৪
	সেবা	২৩.১	১০.৫	২১.২

উৎস : Keith Griffin and A. R. Khan (eds.), *Growth and Inequality in Pakistan*, (London), 4.

ব্যবধান ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এসময় যেটুকু শিল্পায়ন পূর্ব বাংলায় হয়েছে তা শুধু যে পুঁজিঘন ছিল তাই নয়, এটি কেন্দ্রীভূত ছিল শহরাঞ্চলে। ফলে শিল্পায়ন ও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির সুফল শহরবাসীর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ১৪নং সারণির হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ বিশ বছরে গ্রাম ও শহরের মাথাপিছু আয়ের অনুপাত ২ঃ ১.৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ঃ ২.৭৩-এ পরিণত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, পঞ্চাশের দশকে এই বৈষম্য শুধু আপেক্ষিক অর্থে নয়, চরম অর্থেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে গ্রামীণ মাথাপিছু আয় ২৫৩ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪৪ টাকায় পরিণত হয়েছিল। পক্ষান্তরে ঐ একই সময়ে শহরের মাথাপিছু আয় ৫৯৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৫ টাকায় পরিণত হয়েছিল। ষাটের দশকে অবশ্য গ্রামীণ ও শহুরে মাথাপিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তবু আপেক্ষিক বৈষম্য এই সময়েও বৃদ্ধি

পেয়েছে, কারণ গ্রামীণ মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার শহুরে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম ছিল। প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িককালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম-শহর বৈষম্যের মাত্রা সংক্রান্ত চিত্রটি তুলনার সুবিধার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে এই বৈষম্য ছিল ১ : ১.৭৫, (১৯৬১-৬২), ইন্দোনেশিয়ায় ছিল ১ : ১.৩৬ (১৯৬৪-৬৫), শ্রীলংকায় ছিল ১ : ১.৮৮ (১৯৬৩) অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই দুয়ের কম। অথচ পূর্ব বাংলায় ন্যূনতম বৈষম্যমাত্রাটিই ছিল ১ : ২.৫৩ (১৯৪৯-৫০)।

পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্ব ও ষাটের দশকের শিল্পায়ন শুধু যে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান বৃদ্ধি করেছিল তাই নয়, তা সমগ্র পাকিস্তানে কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবারেরও জন্ম দিয়েছিল। এরা ছিল একই সঙ্গে ব্যাঙ্কপুঁজি, শিল্পপুঁজি ও বাণিজ্যপুঁজির প্রধান নিয়ন্ত্রক। গবেষক লরেন্স জে. হোয়াইটের গবেষণা থেকে জানা যায়, ১৯৬২ সাল নাগাদ সারা পাকিস্তানে ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের অধীনে মোট যতো সম্পদ ছিল তার ৭৩ শতাংশ ছিল মাত্র ৪৩টি পরিবারের করায়ত্ত। ম্যানুফেকচারিং খাতে ৭৭ শতাংশ সম্পদও ছিল এই ৪৩টি পরিবারের দখলে। এই ৪৩টি পরিবারের মধ্যে অবশ্য বাঙালি পরিবার ছিল মাত্র একটি—জনাব এ. কে. খানের পরিবার। এই ৪৩টি পরিবার পাকিস্তানের ব্যাঙ্ক ও ইন্স্যুরেন্সের সিংহভাগ সম্পত্তির মালিক ছিল। এক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইন্স্যুরেন্সসম্পদের প্রায় ৭৬ শতাংশের মালিক ছিল তারা। লরেন্স আরো উল্লেখ করেছেন যে, মাত্র ৭ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি সকল ব্যাঙ্কজামানতের ৬০ শতাংশের মালিক ছিলেন এবং প্রায় ৪৯ শতাংশ ব্যাঙ্কসম্পদ তাঁদের করায়ত্ত ছিল।[২৮] বস্তুত সর্বশেষ হিসাব অনুসারে ষাটের দশকের শেষে পূর্ব বাংলায় যেসব শিল্পপতি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাঙালিদের অধীনে শিল্পসম্পদের পরিমাণ ছিল মোট শিল্পসম্পদের মাত্র ১৮ শতাংশ। পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের দখলে ছিল ৪৭ শতাংশ এবং রাষ্ট্রের অধীনে ছিল বাকি ৩৫ শতাংশ। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ষাটের দশকে শিল্পায়-নের কোন সুবিধা সাধারণ মানুষ এবং বিশেষভাবে বাঙালিরা উপভোগ করতে সক্ষম হয় নি।[২৯]

পূর্ব বাংলায় ষাটের দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অসংখ্য দুর্বলতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এর বিদেশনির্ভর চরিত্র। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব বাংলায় বিনিয়োগের হার ছিল মাত্র ৬.৭ শতাংশ এবং পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়হারও ছিল মাত্র ৬.৪ শতাংশ। অর্থাৎ মোট বিনিয়োগের ৯৫.৭ শতাংশই আসতো দেশীয় সঞ্চয় থেকে। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর যেতে না যেতেই বিনিয়োগহার বৃদ্ধি পেয়ে ১১ শতাংশ হলেও সঞ্চয়হার ৬.৩ শতাংশেই আটকে থাকলো। তাই ১৯৬৪-৬৫ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, মোট বিনিয়োগে দেশী সঞ্চয়ের

২৮. এম. এম. আকাশ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা,* (ঢাকা ১৯৯০), ৭৭

২৯. Mahabub Hossain and A. R Khan, *The Tragedy*, (London 1989), 81.

পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৮ শতাংশ। বাকি ৪২ শতাংশ আসছে বিদেশী সাহায্য থেকে। অবশ্য ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

সারণি ১৪ : মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য : গ্রাম বনাম শহর

সন	মাথাপিছু আয়		গ্রাম/শহর অনুপাত
	গ্রাম	শহর	
১৯৪৯-৫০	২৫৩	৫৯৬	১ঃ ২.৫৩
১৯৫৯-৬০	২৪৪	৬২৫	১ঃ ২.৫৬
১৯৬৯-৭০	২৭৯	৭৬১	১ঃ ২.৭৩

টীকা : মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয়েছে ১৯৫৯-৬০ ফ্যাক্টর কস্টে।

উৎস : Mohiuddin Alamgir and Berlage, Bangladesh, 65-66.

সেই সময়ে মোট বিনিয়োগহার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩.৫ শতাংশ এবং তাতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অংশও বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ হয়। তবে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদরা তখন এই বলে অভিযোগ করছিলেন যে, 'বর্ধিত স্বনির্ভরতার' কারণ শুধু অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়হারের বৃদ্ধিই ছিল না, বরং মুখ্য কারণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বিদেশী সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আত্মসাৎ-করণ। আর সেজন্যই হয়তো পূর্ব বাংলাকে মাত্র ১৩.৫ শতাংশ বিনিয়োগহার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। যদি বিদেশী সাহায্যের ন্যায্য অংশ পূর্ব বাংলা লাভ করতো, তাহলে বর্ধিত বিনিয়োগ সম্ভব হতো এবং পূর্ব বাংলার স্বনির্ভরতার হার হ্রাস পেলেও প্রবৃদ্ধির হার নিশ্চিতভাবে আরো বৃদ্ধি পেতো। এই সময়ে পূর্ব বাংলাকে যে শুধু তার ন্যায্য বৈদেশিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাই নয়, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ যে ক্রমবর্ধমান ডেট-সার্ভিসিং-এর বোঝা সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর চেপে বসেছিল তার একটা বড় অংশ পূর্ব বাংলার রপ্তানিলব্ধ আয় দিয়েই মেটানো হয়েছে।[৩০]

শিল্পের তুলনায় কৃষিতে এবং গ্রামে আলোচ্য কালপর্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। আলমগীর ও বার্লেজ-এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০–১৯৬৯-৭০ এই দীর্ঘ বিশ বছরে কৃষির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.২ শতাংশ, যা জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। অর্থাৎ সমগ্র পাকিস্তান কালপর্বেই কৃষি-উৎপাদনের

৩০. ১৯৫৫-৬০ সালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি-আয়ের মাত্র ১.৮ শতাংশ 'ডেট-সার্ভিসিং' বাবদ দিতে হতো। ১৯৬০-৬৫ সালে তা গড়ে ৭.২ শতাংশে পরিণত হয়। ১৯৬৫-৭০ সালে তা হয় গড়ে ১৪ শতাংশ। দেখুন, Keith Griffin and A R. Khan (ed.), *Growth and Inequality in Pakistan*, (London 1972), 47

মাথাপিছু লভ্যতা পূর্ব বাংলায় ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। এই গড় অবনতির হার অবশ্য প্রথম ১০ বছরের জন্য (১৯৪৯-৫০-১৯৫৯-৬০) অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ ছিল। সেই সময় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ। পরবর্তী ষাটের দশকে অবশ্য বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৩ শতাংশ অর্থাৎ সেই দশকের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের ঠিক সমান সমান। অবশ্য পাশাপাশি এই ষাটের দশকেই পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের মতোই কৃষিতেও পূর্ব বাংলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর একটি নিবিড় সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ষাটের দশকে স্বদেশ রঞ্জন বোসের হিসাবানুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল পূর্ব বাংলার চেয়ে ১.৬ শতাংশ বেশি অর্থাৎ ৪.৬ শতাংশ এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও ছিল ৩ শতাংশের কম।[৩১]

এই সময় কুমিল্লা একাডেমিকে কেন্দ্র করে তথাকথিত 'উফশী' প্রযুক্তিভিত্তিক একটি নতুন গ্রাম উন্নয়ন মডেল পূর্ব বাংলায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলেও সেটি ব্যর্থ হয়। প্রধানত তিনটি কারণে এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রথমত, এর জন্য যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও যথাযথ পানি সরবরাহের প্রয়োজন ছিল সেগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষকের দ্বারে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়ত, যেহেতু গ্রামীণ সমাজে আর্থিক ক্ষমতার (financial ability) বিন্যাস ছিল প্রচণ্ড রকমের বৈষম্যমূলক, সেহেতু অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে বাজার থেকে উল্লিখিত উপকরণ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না।[৩২] তৃতীয়ত, বন্যানিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকরা, বিশেষত ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুদ্র চাষী কোন রকম ঝুঁকি নিতে আগ্রহী ছিল না। অথচ সবুজ বিপ্লবের প্রকৃতিই ছিল অধিকতর ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

৩১. দেখুন, S. R. Bose, "East-West Contrast in Pakistan's Agricultural Development", in Keith Griffin and A R. Khan (ed.), ঐ, 70.

৩২. গ্রামসমাজে বিরাজমান আর্থিক ক্ষমতার বৈষম্যের চিত্রটি ধরা পড়বে ১৯৬৩-৬৪ সালের গ্রামীণ আয় বন্টনের চিত্রে। সেই সময় গ্রামীণ পরিবারের সর্বনিম্ন ২০ শতাংশের হাতে ছিল মোট গ্রামীণ আয়ের মাত্র ৮.৫ শতাংশ। অথচ উপরের ২০ শতাংশ পরিবারের হাতে ছিল গ্রামীণ মোট আয়ের ৪২ শতাংশ। মাহবুব হোসেন ও এ. আর. খানের হিসাব অনুযায়ী সেই সময় গ্রামীণ আয়বৈষম্যের গিণি-সহগ (goini coefficient) ছিল ০.৩৩। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শহরে এই আয়বৈষম্য-সহগটি ছিল আরো বেশি (০.৪১)। দেখুন, এ. আর. খান ও মাহবুব হোসেন, *দ্য স্ট্র্যাটেজি*, (লন্ডন ১৯৮৯), ১৪৯। ১৯৬০ সালের আদমশুমারি ও ১৯৬৮ সালের মাস্টার সার্ভের তথ্য থেকে এসময় ভূমি ব্যবহারে বৈষম্যের বিষয়টিও প্রকটভাবে ধরা পড়ে। ১৯৬০ সালে বড় খামার (৭.৫ একরের উপব)-এর সংখ্যা ছিল মোট খামারের মাত্র ১১ শতাংশ। অথচ তাদের নিয়ন্ত্রণে জমির পরিমাণ ছিল ৩৮ শতাংশ। ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যাগুলি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮ শতাংশ এবং ৩১ শতাংশ। ১৯৬০ সালে ক্ষুদ্র খামার (২.৫ একরের নিচে)-এর সংখ্যা ছিল মোট খামারসংখ্যার ৫২ শতাংশ অথচ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬ শতাংশ। ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যাগুলি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৭ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ। অতএব দেখা যাচ্ছে, পুরো ষাটের দশকেই ভূমি ব্যবহারে বৈষম্য অটুট ছিল। দেখুন, A R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972) 39

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের যে প্রচার তখন করা হয়েছিল তা নিতান্তই কুমিল্লা ও আশেপাশের 'পকেটেই' সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬৬-৬৭—১৯৬৮-৬৯ এই তিন বছরের জন্য গড় চাষতীব্রতা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৩৪ অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে ১২৮-এর তুলনায় মাত্র ৪.৬৮ শতাংশ বেশি। এ. আর. খানের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৯২৭ হাজার একর অর্থাৎ মোট আবাদি জমির মাত্র ৪ শতাংশ।[৩৩] অর্থাৎ ২০ বছরে ১ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে উন্নয়ন ! আন্তর্জাতিকভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাশের দশকে যেমন অনেক পিছিয়ে ছিলাম, ষাটের দশকের শেষে সামান্য উন্নতি সত্ত্বেও মূলত আমরা তাই রয়ে গেলাম। ১৫ নং সারণিতে ষাটের দশকের প্রধান ফসল ধানের (১৯৬৬-৬৭—১৯৬৮-৬৯ কালপর্বে গড়ে আবাদি জমির ৭৮.১৮ শতাংশই ধানচাষের জন্য ব্যবহৃত হতো) একরপ্রতি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফলনের হারের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সারণি ১৫ : একরপ্রতি ধানের গড় উৎপাদনশীলতা (১৯৬৫-৬৭) : তুলনামূলক চিত্র

দেশ	একর প্রতি ফলনের সূচক
বাংলাদেশ	১০০
জাপান	৩১৯
চীন	১৫২
ভারত	৯৬
মিশর	২৯৮
আমেবিকা	১৯৭

উৎস : A. R. Khan, প্রাগুক্ত, 44.

৩৩. এ. আর. খান সেচায়িত জমির নিম্নোক্ত বিন্যাসটি তুলে ধরেছেন (১৯৬৯-৭০ সালের জন্য) ঃ

১.পানি ও শক্তি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সেচায়িত		৯০,০০০ একর
২. কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক সেচায়িত		৭৪২,০০০ "
	ক) পাম্পচালিত	৭২০,০০০ "
	খ) টিউবওয়েল	২২,০০০ "
৩. কুমিল্লা সমবায় ধরনের সমবায়ের অধীনে		৮,০০০ "
	সর্বমোট	= ১৫,৮২,০০০ একর

লক্ষণীয় যে, সরকার বৃহদায়তন বন্যানিয়ন্ত্রণভিত্তিক সেচপ্রকল্পের দিকে জোর না দিয়ে (মোট সেচায়িত জমির মাত্র ৯.৭ শতাংশ) জোর দিয়েছেন অপেক্ষাকৃত সহজ শীতকালীন পাম্প ও টিউবওয়েলভিত্তিক সেচের উপর (মোট সেচায়িত জমির প্রায় ৮০ শতাংশ)। এটা পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জরুরি দাবি বন্যানিয়ন্ত্রণকে অবহেলা করে পশ্চিম পাকিস্তানে তা কার্যকরী করার বিমাতাসুলভ নীতির অন্যতম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেখুন, A R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972), 49

ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় কৃষির বিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় সবশেষে যে কথা বলা দরকার তা হচ্ছে, প্রকৃত বিচারে এই সময়ে পূর্ব বাংলার কৃষিখাতকে শহরের শিল্পখাত তার প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নের (primitive accumulation) পীঠস্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে। বস্তুত এই সময়ে তুলনামূলকভাবে পূর্ব বাংলার কৃষিখাতকে শিল্পখাতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিনিময়হারের তুলনায় এক অত্যন্ত অসম বিনিময়হারে বিনিময় চালাতে বাধ্য করা হয়েছিল। কৃষির প্রতি এই বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও সত্য বটে, তবে সেখানে আন্তর্জাতিক বিনিময়হারের তুলনায় ঘাটতির পরিমাণ পূর্ব বাংলার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এ বিষয়ে চমৎকার তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে স্টেফেন লিউয়িস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিম্নের সারণিতে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব বাংলার কৃষি ১৯৫১-৬৪ কালপর্বে আন্তর্জাতিকভাবে যা পেতে পারতো, তার সর্বনিম্ন ২৮ শতাংশ (১৯৫৩-৫৬ কালপর্বে) এবং সর্বোচ্চ মাত্র ৫৯ শতাংশ (১৯৬১-৬৪ কালপর্বে) বাস্তবে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে, ঐ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বনিম্ন পাওনার হার ছিল ৪২ শতাংশ (১৯৫৩-৫৬ কালপর্বে) এবং সর্বোচ্চ পাওনার হার ছিল ৬৪ শতাংশ (১৯৬১-৬৪ কালপর্বে)। পুরো বিষয়টি আরো সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, ১৯৭০ সাল নাগাদ কাঁচা পাট রপ্তানি করে পূর্ব বাংলার কৃষক যদি এক ডলার আয় করতো, তবে তার জন্য দেশীয় টাকায় তাকে দেয়া হতো মাত্র ৪.৭৫ টাকা। আর যেকোন শিল্পপণ্য রপ্তানি করে শিল্পপতি যে ১ ডলার আয় করতেন সেজন্য তাঁকে দেশীয় টাকায় দেয়া হতো ৮ টাকা। এভাবে বাংলার পাটচাষী গোপন শোষণের তথা অসম বিনিময়হারের শিকার হয়েছিল।[৩৪]

পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে এবং ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার জনগণের জীবন-যাত্রার মানও খুব একটা উন্নত হতে পারে নি। যদিও ষাটের দশকে গড় মাথাপিছু আয় ২৬২ টাকা থেকে ২৯৭ টাকায় উন্নীত হয়েছিল এবং যদিও এই সময়ে শিল্পখাতে উৎপাদন বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি এসবের সুফল জনগণের দ্বারে পৌঁছায় নি। পূর্ব বাংলার জনগণ আঞ্চলিক এবং শ্রেণীগত উভয় প্রকার বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। বিশেষত কৃষিখাতে শোষণ এবং ভূমিহীনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছিল (১৭ নং সারণি দ্রঃ)। এর প্রতিফলন হিসেবে গ্রামে গড়ে উঠেছিল ক্রমবর্ধমান হারে সর্বাধিক বঞ্চিত বিশাল ক্ষেতমজুর গোষ্ঠী। সারা বছর তাদের কাজের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। উপরন্তু, উদ্বৃত্ত শ্রমের বাজারে তাদের মজুরির প্রকৃত হার ক্রমাগত হ্রাস পায়। শিল্পায়নের পুঁজিঘন প্রকৃতির ফলে সেখানে ব্যাপক আকারে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ ছিল না। মালিক কৃষকের উপর শিল্প ও শহর কর্তৃক নির্মম আদিম শোষণ চালানোর কারণে তাদের

৩৪. এই ধরনের শোষণকে অর্থনীতির পরিভাষায় "কৃষিখাতের উপর লুক্কায়িত করারোপ" (concealed taxation of agriculture) হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন ঐ. ৪৭।

সারণি ১৬ : কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বিদ্যমান দেশীয় বিনিময়হার (Terms of Trade) এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বিনিময়হারের অনুপাত :

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান

৩ বছরের গড়	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫১-৫৪	০.৩২	০.৪৫
১৯৫২-৫৫	০.২৮	০.৪৩
১৯৫৩-৫৬	০.২৮	০.৪২
১৯৫৪-৫৭	০.৩৮	০.৪৬
১৯৫৫-৫৮	০.৪৫	০.৫১
১৯৫৬-৫৯	০.৫১	০.৫৫
১৯৫৭-৬০	০.৫১	০.৫৬
১৯৫৮-৬১	০.৫৫	০.৫৯
১৯৫৯-৬২	০.৫৭	০.৬০
১৯৬০-৬৩	০.৫৯	০.৬৪
১৯৬১-৬৪	০.৫৯	০.৬৪

উৎস: Computed from Lewis, "Effects of Trade Policy on Domestic Relative prices : Pakistan 1951-64", *American Economic Review*, March 1968, Table 1.

পক্ষেও গ্রামে সবুজ বিপ্লবের প্রসার ঘটিয়ে উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও মজুরি প্রদানের দ্বারা এই শ্রেণীটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এরই সার্বিক প্রতিফলন দেখা যায় এদের মজুরিহারের ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী গতিতে (১৮ নং সারণি দ্রঃ)। শহরাঞ্চলের শিল্পশ্রমিকরা এদের চেয়ে সচ্ছল থাকলেও উৎপাদনে অবদান অনুযায়ী ফল লাভে তারাও সক্ষম হয় নি। শিল্পখাতে প্রকৃত উৎপাদন ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও তাদের প্রকৃত মজুরিসূচক এই সময়ে ১৯৫৪ সালের স্তরেই স্থির থাকে (১৮ নং সারণি দ্রঃ)। অবশ্য এই শ্রমিকশোষণের ব্যাপারটি শুধু পূর্ব বাংলা নয়, সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই সত্য ছিল। লিউয়িস দেখিয়েছেন, ১৯৫৪-৬৩ কালপর্বে সমগ্র পাকিস্তানের শিল্পশ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিসূচক ১০০ থেকে মাত্র ১০২-এ উন্নীত হয়েছিল। পক্ষান্তরে এই সময়ে গড়ে শ্রমিকপিছু সংযোজিত মূল্য বা ভ্যালুএ্যাডেড-এর প্রকৃত সূচক ১০০ থেকে ১১৬-তে উপনীত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদনশীলতা গড়ে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল গড়ে মাত্র ২ শতাংশ।[৩৫]

৩৫. এম. এম. আকাশ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন*, (ঢাকা ১৯৯০), ৭৭।

সারণি ১৭ : ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের সংখ্যা

সন	সংখ্যা (মিলিয়নে)	মোট কৃষিশ্রমে তাদের অংশ %	মোট গ্রামীণ পরিবারে তাদের অংশ %
১৯৫১	১.৫১	১৪.৩	-
১৯৬১	২.৪৭	১৭.৫	-
১৯৬৬	-	-	৬.৯৭
১৯৬৭-৮৬	৩.৪০	১৯.৮	৬.৯৭

উৎস : Mahabub Hossain and A. R. Khan,"Bangladesh", 168.

যদিও আলোচ্য কালপর্বে 'দারিদ্র্যের' পরিমাণ সম্পর্কে কালানুক্রমিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তথাপি নমুনা জরিপসমূহ থেকে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যেতে পারে। ১৯৬২-৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে সমগ্র পূর্ব বাংলায় একটি 'পুষ্টি জরিপ' (nutrition survey) চালানো হয়েছিল। উক্ত জরিপলব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, গ্রাম ও শহরে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ক্যালোরি সংগ্রহে অক্ষম এরকম বঞ্চিত দরিদ্রের সংখ্যা ছিল তখন যথাক্রমে ৪৬ ও ৭৭ শতাংশ। এই তথ্য কিছুটা পুরনো হলেও পরবর্তীকালে দারিদ্র্যের মাত্রা আরো বৃদ্ধিই পেয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। আর মনে রাখতে হবে, অনুকূল কৃষিমৌসুমে জরিপ চালানোর দরুন এই পরিমাণের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী পক্ষপাতিত্বও (bias) কিছুটা থাকবে। বিশেষত শহরে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর দারিদ্র্যহারের ব্যাপারটিও প্রশ্নসাপেক্ষ।[৩৬] যদি খাদ্য ও পুষ্টি ছেড়ে বস্ত্রের দিকে তাকাই, তা হলে দেখা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে পূর্ব বাংলায় মাথাপিছু বস্ত্রের প্রাপ্যতা ছিল সারা বছরের জন্য গ্রামে সাড়ে সাত গজ এবং শহরে সাড়ে বারো গজ। তবে অধিকাংশ লোকের বস্ত্রপ্রাপ্যতা নিশ্চয়ই এই গড়ের চেয়ে নিচেই ছিল এবং সেই হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, বছরের একটি বড় সময় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 'লেংটি' পরেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হতো।

গৃহসংস্থানেরও নিদারুণ অভাব ছিল পূর্ব বাংলায়। গ্রামীণ জনগণের অধিকাংশের পর্ণকুটিরকে গৃহ না বলাই সমীচীন। ১৯৬৮ সালের জরিপ থেকে এও জানা যায় যে, শহরে প্রতি ৫.৬ জন লোকের জন্য ১.৫টি কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি বরাদ্দ ছিল। ৭১ শতাংশ শহুরে পরিবার তখন অস্থায়ী কাঁচা বাড়িতে থাকতো এবং ৫৬ শতাংশ শহুরে পরিবারের জন্য বরাদ্দ ছিল শুধু ১ কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি! ৯৭ শতাংশ শহুরে পরিবারের জন্য তখন কোন বিদ্যুৎসুবিধা ছিল না এবং ৫৬ শতাংশের জন্য এমনকি বিশুদ্ধ পানির সুবিধাও ছিল না। ১৯৬৮ সালেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আগে অবস্থা আরো

৩৬. প্রাগুক্ত, 4.

সারণি ১৮ : গ্রামীণ ও শহুরে মজুরদের প্রকৃত মজুরি

সন	শহরের শিল্পখাতে মজুরি সূচক (সকল শিল্প)	পাটশিল্প	বস্ত্রশিল্প	সন	গ্রামীণ মজুরি সূচক
১৯৫৪	১০০	১০০	১০০	১৯৪৯	১০০
১৯৫৫	৮৮.৪	-	১০৩.২	১৯৫০	৯৪.৮
১৯৫৭	৯১.৪	-	৮৪.৯	১৯৫৫	৯২.৮
১৯৫৮	৯৩.৬	-	৮৮.৫	১৯৫৯	৮৮.৫
১৯৫৯/৬০	৯২.৮	-	৯৪.৬	১৯৬০	৮৮.০
১৯৬২/৬৩	৯৬.৪	-	১০১.৮	১৯৬১	১০০.৫
				১৯৬৫	৯৬.৯
১৯৬৭/৬৮	১০১.১	৯৪.৬	৮১.৭	১৯৬৬	৮২.৩

উৎস : A. R. Khan,"Bangladesh", 19.

কতো অনুন্নত ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এ সমুদয় তথ্য উদ্ধৃত করার পর অং এ. আর. খান মন্তব্য করেন :

> জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অনাহারে থাকে, প্রায় ৯০ শতাংশ কোন না কোন খাদ্যের অভাবে থাকে এবং বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জীর্ণবেশে ও নিরাশ্রয় অবস্থায় দিন কাটায়।[৩৭]

বস্তুত পূর্ব বাংলার অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন জনগণের জীবনের গড় আয়ুও স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এ সময় হ্রাস পেয়েছিল। পুরুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৯.২ বছর এবং মহিলাদের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৭ বছর। অথচ সেই সময়ে উন্নত পশ্চিমা দেশগুলিতে গড় আয়ু ছিল ৬৯ বছর। শিশুমৃত্যুর হার পূর্ব বাংলায় ছিল পুরুষ শিশুদের ক্ষেত্রে হাজারে ১৫৩ এবং মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে হাজারে ১২৮ জন। পক্ষান্তরে উন্নত দেশগুলিতে এই হার ছিল হাজারে মাত্র ২০ জন বা তার চেয়ে কম।[৩৮] সাক্ষরতার হার ১৯৬৮ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছিল মাত্র ২৫.৭ শতাংশ। বস্তুত সাক্ষরতার সংজ্ঞা আরো সঠিকভাবে প্রণয়ন করলে তা আরো কমে যাবে এবং ১৯৬১ সালের সাক্ষরতাহারের (১৮ শতাংশ) চেয়ে খুব বেশি হবে না।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে পূর্ব বাংলার স্থবির অর্থনীতি নিচের দিকেই ধাবিত হয়েছিল। তবে ষাটের দশকে তা ভারসাম্যহীনভাবে

৩৭. A. R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972), 27.
৩৮. প্রাগুক্ত, লক্ষণীয় যে ১৯৫১ সনে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৬০ জন, অর্থাৎ ১৭ বছরে এই মৃত্যুর হারে মাত্র ৭ জন হ্রাস পেয়েছে।

কিছুটা সামনে এগিয়েছিল। প্রবৃদ্ধির এই চরিত্রগত ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়েছিল শ্রেণীতে শ্রেণীতে, অঞ্চলে অঞ্চলে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে, যেমন কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে। এ ধরনের ভারসাম্যহীন প্রবৃদ্ধি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে কোন ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি। বিশেষত গ্রামীণ ও শহুরে মজুরদের এবং সাধারণভাবে গ্রামের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচ্য কালপর্বে উত্তরোত্তর অবনতির দিকেই ধাবিত হয়েছিল।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ আইন অনুসারে পাকিস্তান যেসব অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেসব অঞ্চলে অতীত থেকে বিরাজমান গণপরিষদের (Constituent Assembly) উপরই ঔপনিবেশিক শাসকরা নতুন রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পণ করে। সেই হিসেবে পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে উত্তরাধিকারসূত্রে যে 'ফেডারেল এসেমব্লিটি' পেয়েছিল তার মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৯, যার মধ্যে ৪৯ জন মুসলিম লীগ, ১৬ জন কংগ্রেস এবং বাকি ৪ জন অন্যান্য বিভিন্ন দলভুক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ সাল নাগাদ এর সদস্যসংখ্যা ৭৯তে উন্নীত হয়। এর মধ্যে ষাট জন মুসলিম লীগ দলভুক্ত, ১১ জন কংগ্রেস দলভুক্ত এবং ৩ জন অন্যান্য বিভিন্ন দলভুক্ত ছিলেন (বাকি ৫টি পদ শূন্য ছিল)। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা প্রথম থেকেই মুসলিম লীগের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধীনে ছিল। আরো যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, ৭৯টি সদস্যপদের মধ্যে ৪৪টিই ছিল পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্যের পদ এবং বাকি ৩৫টি আসনের মধ্যে ছিল ২২টি পাঞ্জাব, ৫টি সিন্ধু, ৪টি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ১টি করে বেলুচিস্তান, ভাওয়ালপুর এবং খয়েরপুরের আসন। এ থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানের 'ফেডারেল এসেমব্লিতে' প্রথমদিকে পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সাংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানলে খুবই ভুল হবে যে, তাঁরা সর্বদা পূর্ব বাংলার স্বার্থেই সংসদে সরব ছিলেন। বরঞ্চ মূল শাসকদল মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে তাঁরা প্রধানত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অবাঙালি 'কম্যান্ডের' নির্দেশেই নিজেদের পরিচালনা করতেন। এঁদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহী অংশ ছিল, কিন্তু তাঁরা শাসকদলে বা শাসকদল অনুসৃত মূল অর্থনৈতিক নীতিমালায় বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলেন না। শ্রেণীগত দিক থেকেও এঁদের চরিত্র ছিল প্রতিকূল। এ সম্পর্কে গবেষক মুশতাক আহমেদ লিখেছেন :

> পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত ও সামন্ত শ্রেণী জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রায় একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করেছে। উভয় প্রদেশে কৃষক শ্রেণীর বলতে গেলে কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। এবং শ্রমিক

শ্রেণী ও শিল্পখাত এখনও দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রে এমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, যেজন্য এরা রাজনৈতিক স্বীকৃতির দাবি করতে পারে।[৩৯]

এসব তথ্য থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নকারী রাজনৈতিক মূল কর্তৃত্বের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা ছিল শুরু থেকেই একটি বাস্তব ব্যাপার। আর পূর্ব বাংলার আসনসংখ্যা গণপরিষদে বেশি হলেও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যে রাষ্ট্রযন্ত্রটি তখন গড়ে উঠেছিল সেখানে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই একাধিপত্য। এছাড়া শাসকদলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ছিল মূল নেতৃত্বের অধিকারী। ১৯৫৫ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৯ জন সচিবের মধ্যে সব ক'জনই ছিলেন অবাঙালি, ৪১ জন যুগ্ম-সচিবের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন বাঙালি, ১৩৩ জন উপ-সচিবের মধ্যে মাত্র ১০ জন ছিলেন বাঙালি এবং ৫৪৮ জন অধস্তন সচিবের (Under Secretary) মধ্যে মাত্র ৩৮ জন ছিলেন বাঙালি।[৪০] এসব তথ্য থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসন উভয়েই পূর্ব বাংলায় শুরু থেকে যেসব অর্থনৈতিক নীতিমালা কার্যকরী করেছিল তাতে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত পক্ষপাতিত্বের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল।

তবে এখানে বলে রাখা ভাল যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র তথা আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী বেশিদিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাকিস্তানের শাসন পরিচালনা সহ্য করে নি। যে গণবিচ্ছিন্ন গণপরিষদের কথা উপরে উল্লেখ করলাম, এমনকি তাকেও বেশিদিন সক্রিয় থাকতে দেয়া হয় নি। পাকিস্তানের জন্মের পর ঐ গণপরিষদের প্রায় ৯ বছর লেগেছিল একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ গৃহীত ঐ সংবিধান টিকেছিল মাত্র আড়াই বছর এবং ১৯৫৮-এর অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানে কায়েম হয়েছিল সেনাশাসন। গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। এর পর দীর্ঘ প্রায় দশ বছর

---

৩৯. দেখুন, Mushtaq Ahmed, *Government and Politics in Pakistan*, (Karachi 1959), 97 এই গ্রন্থে পাকিস্তানের ৭৯ জন কেন্দ্রীয় গণপরিষদ সদস্যের যে অর্থনৈতিক পেশাগত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

১.	ভূস্বামী	২৭ জন
২.	ব্যবসায়ী	৯ জন
৩.	উকিল	৩১ জন
৪.	অন্যান্য পেশাজীবী	১২ জন
	মোট	৭৯ জন

৪০. Rounaq Jahan, *Pakistan . Failure in National Integration*, (Dhaka 1977), 26.

আইয়ুব খানই পাকিস্তানের শাসনকাজ পরিচালনা করেন। ১৯৬২ সালে তিনি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন, যার চরিত্র ছিল খুবই অগণতান্ত্রিক। ঐ সংবিধানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনপদ্ধতির বদলে পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে গণপরিষদ বা মন্ত্রীদের কাছে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছিল। প্রেসিডেন্টকে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের মন্ত্রী মনোনয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল এবং সর্বোপরি সংবিধানের প্রাথমিক খসড়ায় মৌলিক অধিকারসমূহের কোন স্বীকৃতি ছিল না। এমতাবস্থায় সমগ্র ষাটের দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল পরিচালক ছিলেন কার্যত কেন্দ্রীয় বেসামরিক আমলা এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবৃন্দ। আর ষাটের দশকে সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনে মূল কর্তৃত্বভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রণীত এক হিসাবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালিদের অংশ ছিল পরিকল্পনা বিভাগে ২৩.৭ শতাংশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিদপ্তরে ২৩.৪ শতাংশ, শিল্প বিভাগে ৩৬.৩ শতাংশ এবং কৃষি বিভাগে ১৪.২ শতাংশ[৪১] আর সামরিক বাহিনীতে ঐতিহ্যগতভাবেই বাঙালিরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ।[৪২]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবয়বের অতি সংক্ষিপ্ত এই রূপরেখা বর্ণনার পর আমরা এখন রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করবো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর প্রথম যে সমস্যা রাষ্ট্রকে আঘাত করে তা হচ্ছে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্যসংঘাতের সমস্যা। বিশেষত ১৯৪৯ সালে ভারত ও বৃটিশ সরকার যুগপৎ তাদের মুদ্রার মানের অবমূল্যায়ন ঘটায়। এর ফলে ভারতীয় দ্রব্যাদির দাম পাকিস্তানী টাকার হিসাবে হ্রাস পেলো এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে দ্রব্য আমদানি উৎসাহিত হলো। অন্যদিকে যেহেতু পাকিস্তানী দ্রব্যের দাম ভারতীয় মুদ্রায় বৃদ্ধি পেলো, সেজন্য এর ফলে পাকিস্তান থেকে ভারতে দ্রব্যরপ্তানি অনুৎসাহিত হলো। অথচ এই সময়ে পাকিস্তান সরকার চাইছিল ভারতে উচ্চদামে পাট ও তুলা রপ্তানি করতে, কারণ তখন পর্যন্ত সব কৃষিজাত কাঁচামালের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (processing industries) ভারতেই অবস্থিত ছিল। এছাড়া যাবতীয় ভোগ্য শিল্পপণ্যের জন্যও পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান তখন পর্যন্ত ভারতের উপরেই ছিল প্রবলভাবে নির্ভরশীল। বস্তুত ১৯৪৯ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তানের শতকরা আশি ভাগ বহির্বাণিজ্যই পরিচালিত হচ্ছিল ভারতের

৪১. দেখুন, S S. Baranov, *পূর্ব বাংলা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য : ১৯৪৭-১৯৭১,* (ঢাকা ১৯৮৬), ১৬৮।

৪২. তালুকার মনিরুজ্জামান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে 'মেজর' পদের উপরে মোট ৮৯৭ জন অফিসারের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ জন। জেনারেল, লেঃ জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার এবং কর্নেল পদে তখন কোন বাঙালি অফিসারই ছিলেন না। দেখুন, Talukder Moniruzzaman, *The Politics of Development,* (Dhaka 1971) 40

সঙ্গে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের মুদ্রা অবমূল্যায়ন নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান সরকার সরাসরি ভারতের সঙ্গে সকল বাণিজ্য সহসা বেআইনী ঘোষণা করলেন। এর ফলে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্য শূন্যে নেমে আসে এবং পরে তা শুরু হলেও ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কখনো তা ৭ শতাংশের মাত্রা অতিক্রম করে নি। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই বাণিজ্য পুনরায় স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের সঙ্গে সাধারণ বাণিজ্যছেদের কারণে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে তখন দুটি বিশেষ ধরনের প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি হয়েছিল : ১. ভারত থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলি অন্য জায়গা থেকে আমদানির ব্যবস্থা করা এবং ২. ভারতে পাঠানো কৃষি কাঁচামালগুলি যাতে দেশের অভ্যন্তরেই প্রক্রিয়াজাত করা যায় সেই লক্ষ্যে আধুনিক পাট ও বস্ত্র কারখানার প্রসার ঘটানো।

১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার তাই অবাধ আমদানিকে উৎসাহিত করার জন্য ও. জি. এল. (open general license policy) পদ্ধতি চালু করে। কিন্তু আমদানির জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর নগদ বৈদেশিক মুদ্রা। সৌভাগ্যের বিষয়, ১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটের থলের চাহিদা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সময় পাকিস্তান পাট রপ্তানি করে প্রয়োজনীয় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের অর্থনীতির ইতিহাসে ১৯৫০-৫১ সালটি তাই 'কোরীয় স্ফীতি' (Korean boom) নামে খ্যাত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। যুদ্ধ প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫২ সাল নাগাদ রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকে এবং আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থায় পাকিস্তান সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ মুদ্রাবিনিময়হার ইত্যাদি পদক্ষেপ নতুনভাবে গ্রহণ করে। বস্তুত কোরীয় স্ফীতির সময় যেসব রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলেন তারাই এখন দেখলেন যে, এসময় আমদানি না করে বরং আমদানিযোগ্য পণ্যগুলি দেশে প্রস্তুত করলে দেশের সংরক্ষিত বাজারে অতি উচ্চহারে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। ফলে ১৯৫০ সালের পর থেকে এদেশে ধীরে ধীরে বহু আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প গড়ে উঠে। বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোতেও তখন এ সময় অনুকূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। কিন্তু যদিও ১৯৫১-৫৭ কালপর্বে শিল্পোৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি কৃষি এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট উপখাতগুলির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই রয়ে গেল খুবই পিছিয়ে। আর যেহেতু তখনো কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান খাত, সেহেতু কৃষির এই স্থবিরতা সমগ্র অর্থনীতিরই স্থবিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যার ইতিহাস আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

তবে এই শিল্পনির্ভর ভারসাম্যহীন প্রাথমিক প্রবৃদ্ধির ফলে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়েছিল পূর্ব বাংলা। কারণ শিল্পখাতে যেটুকু প্রবৃদ্ধি হয়েছিল তার একটা বড় অংশ ছিল বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে এবং সেটি মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। পাটশিল্পের যেটুকু উন্নতি তখন হয় তার বেশিরভাগ সুফলও বাংলার পাটচাষী পায় নি, পেয়েছিল

পাটশিল্পের উদীয়মান মালিকরা, যারা আবার অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী।

এ ছাড়া বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাকে সচেতনভাবে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৪৩] যদিও প্রায় সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রাই উপার্জিত হয়েছিল পাট রপ্তানির মাধ্যমে, কিন্তু তা আমদানিকারকদের মধ্যে বণ্টনের সময় নিয়ম করা হয় যে, একমাত্র তাদেরকেই আমদানির সুযোগ দেয়া হবে, যারা অন্তত আড়াই বছর বা ততোধিক কালব্যাপী আমদানি করে আসছেন। আর শিল্প গড়ার জন্য সস্তায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের প্রধান দফতরটিও অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। এ ছাড়া কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির অধিকার শুরুতে শুধু তাঁদেরকেই দেয়া হয়েছিল, যাঁরা প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ছিলেন। এসব কারণে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে প্রাগ্রসর পশ্চিম পাকিস্তানীরাই সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে নিজেদের পুরনো অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেই আরো পাকাপোক্ত করে তুলেছিল। এটা ছিল 'তেলা মাথায় তেল ঢালা' নীতির এক সার্থক দৃষ্টান্ত।

এ সময় ১৯৫০ সালে মুসলিম লীগ সরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষিখাতে জমিদারি উচ্ছেদের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেটিও গণপরিষদের ভূস্বামী-জোতদার সদস্যদের চাপের মুখে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। প্রথমত মুসলিম লীগ সরকারের পূর্বপ্রতিশ্রুতি ছিল বিনা খেসারতে জমিদারি বাজেয়াপ্তের। কিন্তু আইন করার সময় 'খেসারত' (compensation) দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। আর এই ব্যবস্থার সুযোগে 'খেসারতের পরিমাণ' হিসাব করা নিয়ে দিনের পর দিন তালবাহানা চলতে থাকে এবং বড় ও হিন্দু মালিকদের গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সকলের ক্ষেত্রেই জমি অধিগ্রহণ দিনের পর দিন পিছিয়ে যেতে থাকে। ছোট ও মাঝারি জোতদাররা সরকারি 'খেসারত পরিমাণের' বিপরীতে নতুন পরিমাণ উল্লেখ করে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন এবং সেসব অসংখ্য অভিযোগের দ্রুত মীমাংসা করাটা প্রশাসনের পক্ষে তখন ছিল একেবারেই অসম্ভব।[৪৪] এভাবে পঞ্চাশের ভূমিসংস্কার ভূমিহীন মজুর ও বর্গাচাষীর কোন কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়। পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রদেশের জন্যই একথা সত্য।

৪৩. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ কালপর্বে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে জুটেছিল মাত্র ১৮.৮ কোটি টাকার সরকারি উন্নয়নখরচ, যা ছিল মোট খরচের মাত্র শতকরা ৩১ ভাগ। পূর্ব বাংলার ভাগ্যে এসময় জুটেছিল মোট আমদানির মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ, যদিও পাকিস্তানের রপ্তানিআয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসতো পূর্ব বাংলার রপ্তানি থেকে। সারা পাকিস্তানের রাস্তাঘাট তৈরির জন্য ১৯৪৯-৫০ সালে ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে পূর্ব বাংলা পেয়েছিল মাত্র ১৭ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ মাত্র ১৯ শতাংশ)। এছাড়া বাণিজ্য লাইসেন্স বন্টনের মাধ্যমে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারি-জুন নাগাদ মোট যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তার শতকরা ৯০ ভাগই পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা। দেখুন, আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *অর্থনৈতিক পটভূমি* (ঢাকা ১৯৮৬), ৯৯-১০০।

৪৪. একমাত্র পটুয়াখালী মহকুমাতেই এ ধরনের অভিযোগের সংখ্যা ছিল ২০০,০০০ টি। এগুলো মীমাংসার জন্য ছিল মাত্র ২৫ জন অফিসার ও ১৮টি কেন্দ্র। স্বভাবতই তাদের আন্তরিকতা থাকলেও ন্যূনতম কয়েকবছর সময় ছাড়া এসব অভিযোগের মীমাংসা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। দেখুন, ম্যালকম ডারলিং, প্রাগুক্ত, (করাচী ১৯৫৫)।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নীতিপ্রণেতাদের শুরু থেকেই 'প্রবৃদ্ধির জন্য প্রবৃদ্ধি' (growth for growth's sake) এবং 'ব্যক্তিগত খাতের' প্রতি ছিল এক দুর্নিবার পক্ষপাতিত্ব। ধারণা করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠীকে যদি বাড়তি সুবিধা দেয়া হয়, তাহলে তারাই অধিক সঞ্চয় ও অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উল্লম্ফন সংগঠিত করবেন। তাদেরকে পরিকল্পনাদলিলগুলিতে entrepreneur বা captain of industry হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী দলিলের মূল উন্নয়ননীতি এই অনুমিতির উপরে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই উদীয়মান পুঁজিপতিদের বর্ধিত হারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে :

১. নামমাত্র মূল্যে সরকারি খাতের কারখানা ব্যক্তিমালিকের কাছে হস্তান্তর;

২. উদার শিল্প ও বাণিজ্যঋণ নীতি;

৩. উদার করনীতি;

৪. সংরক্ষিত বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় মুদ্রার কৃত্রিম উচ্চতর বিনিময়হার ও নানাপ্রকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ;

৫. বিশেষত ষাটের দশকে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য বোনাস ভাউচার স্কীম প্রথা চালু করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার বহুমুখীকরণ;

৬. শ্রমঘন শিল্পখাত ও কৃষিখাতের প্রতি সচেতনভাবে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ;

৭. বৈদেশিক পুঁজি ও বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজিকে উদার আমন্ত্রণ।

এসব নীতির ফলে সমগ্র পাকিস্তানে কিভাবে সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল এবং ৪৩ পরিবারের উদ্ভব হয়েছিল তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বস্তুত পাকিস্তানে ষাটের দশকে যে শিল্পায়ন ঘটেছিল তার চরিত্রগত দুর্বলতা ইতিমধ্যেই বহু গবেষণায় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৫] এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথ্য প্রদান ও আলোচনার পর অর্থনীতিবিদ এ. আর. খান যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করে এ আলোচনার ইতি টানবো। এ. আর. খান বলেন, "সকল যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগই দেখায় যে, প্রাইভেট ক্যাপিটালিস্টরা অধিক সঞ্চয়ী (high savers) ছিলেন না এবং খুব সম্ভবত শুধু উৎপাদনোপকরণ সস্তায় আমদানি করার সুযোগের মাধ্যমে তাঁরা যে পরোক্ষ 'নীট সাবসিডি' পেয়েছিলেন তার পরিমাণই ছিল তাঁদের মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের চেয়ে বেশি। entrepreneurship সংক্রান্ত যুক্তিটিও ধোপে টেকে না, যেহেতু একজন বৃহৎ পুঁজিপতিকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য প্রদান করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য অনেক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তার জন্য তা ব্যাপক অনুৎসাহ সৃষ্টি করে এবং চূড়ান্ত বিচারে এমনকি তাদের

---

৪৫. দেখুন, Ian Little Skitvoski and Morris Scot, *Industry and Trade in Some Developing Countries A Comparative Study*, (London 1970).

উৎখাতসাধন করে। এসব নীতির ফলে আসলে দেশ যা পেয়েছিল তা হচ্ছে একটি অত্যন্ত অদক্ষ বৃহদায়তন ম্যানুফেকচারিং শিল্প। বিকৃত ও যথেচ্ছ দাম নির্ধারণের কারণে প্রাইভেট ক্যাপিটালিস্টদের জন্য তা যথেষ্ট লাভজনক হলেও সমাজের কাছে তার মূল্য ছিল নগণ্য অর্থাৎ অলাভজনক, যদিও সমস্ত মূল্যায়ন আপেক্ষিক সামাজিক দুষ্প্রাপ্যতা বা relative social scarcity অনুযায়ী করা হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটিরশিল্প ও কৃষির জন্য সৃষ্টি হয়েছিল অত্যন্ত শক্তিশালী অপ্রণোদনা (disincentive), যার পরিণতিতে এরা স্থবির হয়ে পড়েছিল এবং আয় বণ্টনে এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল।[৪৬]

সমগ্র পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে বিশেষ ধনিকগোষ্ঠীকে টার্গেট করে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করেছিলেন, ঐতিহাসিকভাবে তাদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন বলে এই নীতির আরেকটি মারাত্মক কুফল প্রতিফলিত হয়েছিল ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্যের মধ্যে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫০—১৯৫৪-৫৫ কালপর্বে পরিকল্পিত মোট উন্নয়নব্যয়বরাদ্দের শতকরা আশি ভাগই ব্যয় করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং মাত্র ২০ ভাগ ব্যয় করা হয়েছিল পূর্ব বাংলায়। পরবর্তী ১৯৫৫-৬০ কালপর্বে তথা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাকালে পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত অংশ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৬ ভাগ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩২ ভাগ। অখণ্ড পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিকল্পনা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৬৫-১৯৬৯-৭০) ব্যয়ের হার ছিল সর্বাধিক মাত্র ৩৬ শতাংশ। অথচ পূর্ব বাংলায় এই সমগ্র কালপর্বে সর্বদাই পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বসবাস করতো। শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রেই এই বৈষম্য সীমাবদ্ধ ছিল না, পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদপাচার অব্যাহত ছিল। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত দুই দশকে মোট সম্পদপাচারের হিসাব করেছেন পূর্ব বাংলার তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ এবং তাঁদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, এর মোট পরিমাণ ছিল ৩১১২ কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর পূর্ব বাংলার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১০ শতাংশ এসময় পশ্চিমে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। এসব বিবিধ কারণে ১৯৭০ সালের পর পরই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙে যায় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৪৭]

৪৬ A R Khan, প্রাগুক্ত, (London 1972), 151.

৪৭. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় 'পূর্ব পাকিস্তানের' প্যানেল অব ইকনমিস্টদের পৃথক রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন, এই গ্রন্থের ২১ অধ্যায়ে রেহমান সোবহান রচিত প্রবন্ধ *বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি*।

৬

সোনার বাংলা : কিংবদন্তি ও বাস্তব

আকবর আলি খান*

বিদেশী পর্যটকরা ও ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যে উচ্ছলিত অমরাবতী রূপে বর্ণনা করেছেন। সোনার বাংলার কিংবদন্তি সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তা বাস্তব।[১] কিন্তু বাংলার নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি সম্পর্কে যে ব্যাপক সরলীকৃত বক্তব্য রয়েছে তা বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। স্কট গর্ডন যথার্থই বলেছেন, " ... তত্ত্ববিহীন বর্ণনা অন্তঃসারশূন্য। যেসব বিজ্ঞানী এ ধরনের কাজ করেন তারা ভিন্ন ধরনের মোহে বিভ্রান্ত, তারা বিশ্বাস করেন যে তারা কোন তত্ত্ব ব্যবহার করছেন না, কেননা অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব তারা ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই সজাগ নন"।[২] তাই বাংলার আর্থিক বিবর্তন সম্পর্কে সনাতন ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত অনুমানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা অত্যাবশ্যক।

---

* সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১. বর্তমান খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুশীল চৌধুরী প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে,বাংলা কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে এবং এর ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এত উন্নত হয় যে বাংলাকে আলঙ্কারিক ভাষায় "স্বর্গরাজ্য", "ভারতের বেহেশত", "বিশ্বের জান্নাত" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। শুধু স্থানীয় ভদ্র লোকরাই এ ধরনের ধারণার জন্ম দেন নি, এতে সমকালীন বৈদেশিক পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের অবদান রয়েছে। এই স্বর্গরাজ্য তত্ত্ব আরো জোরদার হয় ঔপনিবেশিক সমাজে সনাতন অর্থনীতির অবক্ষয় এবং পরবর্তীকালে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে। এই পর্যায়ে আমরা প্রামাণ্য অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোকে এই স্বর্গরাজ্য তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করবো। তবে এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার তুলানামূলক সমৃদ্ধি সম্পর্কে সুশীল চৌধুরীর বক্তব্য অস্বীকার করা নয় (সম্পাদকের নোট)।

২. Scott Gordon. *The History and Philosophy of Social Science* (London and New York 1993), 10.

সোনার বাংলা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতবাদ অর্থনীতির প্রামাণ্য তত্ত্বের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তাত্ত্বিক মতভেদ সত্ত্বেও সকল ধরনের অর্থনীতিবিদই সোনালী যুগ তত্ত্বকে কিংবদন্তি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সোনার বাংলার ব্যাখ্যা অকাট্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সোনার বাংলা সম্পর্কে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যায় সোনার বাংলা তত্ত্বের চারটি অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। প্রথমত, ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন যে, বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা অব্যাহত সমৃদ্ধি উপভোগ করেছে। এর অর্থ হলো, বাংলায় কখনো দুর্ভিক্ষ ঘটে নি এবং সমসাময়িক সমাজে অর্থনৈতিক চক্রের ফলে যে ধরনের উঠানামা দেখা যেতো তা ছিল বাংলায় অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ শাসনের পূর্বে বাংলা ছিল 'প্রাচুর্য ও সস্তা দামের দেশ'[৩]। তৃতীয়ত, বাংলার আপামর জনগণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফল ভোগ করেছে। ফলে বাংলার জনগণের কাছে দারিদ্র্য ছিল অপরিচিত। চতুর্থত, সমসাময়িক সমাজের তুলনায় প্রাক-বৃটিশ বাংলা ছিল সমৃদ্ধতর।

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হলো 'সোনার বাংলা' তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ পরীক্ষা করা। এটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে প্রাক-বৃটিশ বাংলাতে কথিত অব্যাহত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সোনার বাংলায় সুলভ দ্রব্যমূল্যের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অংশে প্রাক-বৃটিশ বাংলাতে দারিদ্র্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ অংশে রয়েছে এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যসমূহের সারসংক্ষেপ এবং বাংলার অতীত ইতিহাসের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা।

নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে কিংবদন্তি

'সোনার বাংলা' তত্ত্বের প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন যে, বৃটিশ শাসনের পূর্বে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাজ করতো। এ তত্ত্বের দু'টি স্পষ্ট অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। প্রথমত, প্রাক-বৃটিশ আমলে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের কৃষিপ্রধান সমাজে মাঝে মাঝে অর্থনীতিতে যে ধরনের উঠানামা দেখা যেতো তা ছিল অনুপস্থিত।

প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজ সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা প্রামাণ্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের স্বীকৃত ধারণার সাথে মোটেও মেলে না। তাত্ত্বিক মতবিরোধ সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজ সম্পর্কে বিস্ময়কর মতের মিল রয়েছে। এ ধরনের সমাজ সম্পর্কে ধ্রুপদী, নব্য-ধ্রুপদী, কেইনসীয় (Keynesian) ও মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের ধারণায় কোন মতবিরোধ নেই। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মতে প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজ ছিল

৩. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I, (Karachi 1963), 404.

ম্যালথুসীয় (Malthusian) ফাঁদে বন্দী। এ ধরনের সমাজে বেশিরভাগ লোক কোন রকমে বেঁচে থাকতো। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল নিয়ন্ত্রক ছিল জনসংখ্যা। ম্যালথুসের পূর্বসূরি এডাম স্মিথ বিশ্বাস করতেন যে, "অন্যান্য পণ্যের মতো মানুষের উৎপাদন তার চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।"[৪] ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মতে, মজুরির হার বেড়ে গেলে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যেতো। রিকার্ডোর মজুরি সম্পর্কে অমোঘ নিয়মের (iron law) বক্তব্য হলো, দীর্ঘদিন ধরে মজুরির হার বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি থাকতে পারে না। মজুরি বাড়লে জনসংখ্যা বাড়বে; জনসংখ্যা বাড়লে মজুরি আবার কমে যাবে। কাজেই প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের অর্থনীতিতে উঠানামা ছিল, কিন্তু কোন দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। ম্যালথুসীয় বিশ্লেষণে প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতো দুর্ভিক্ষ। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে মজুরি বেড়ে গেলেই জনসংখ্যার অতিসরবরাহ দেখা যেতো। এর পরিণামে শুরু হতো মজুরি হ্রাস আর সবশেষে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষে জনসংখ্যা কমে গেলে আবার মজুরির হার বেড়ে যেতো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হতো জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও দুর্ভিক্ষের পরবর্তী চক্র।

যদিও নব্য-ধ্রুপদী ও কেইনসীয় অর্থনীতিবিদরা শিল্পপ্রধান সমাজে ধ্রুপদী মডেলের প্রয়োগ যথার্থ মনে করেন না, তবু প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের ক্ষেত্রে ধ্রুপদী বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাদের কোন আপত্তি নেই। তাই নব্য-ধ্রুপদী ধারার দু'জন ইতিহাসবেত্তা এ ধরনের সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন :

> যদি আমরা মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্থনৈতিক জীবন আধুনিক মানদণ্ডে বিচার করি, তা হলে দেখতে পাবো যে জীবন ছিল বিরামহীন দুর্দশা। . . . দুর্দশার যুগকে কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সেসব যুগকে গ্রাম্য সারল্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সেসব যুগ স্বর্ণযুগ ছিল না।[৫]

অনুরূপ মত কেইনস্‌ও ব্যক্ত করেছেন। কেইনস্ লিখেছেন :

> প্রাচীনতম সময় যখন থেকে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ধরুন খৃষ্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে থেকে আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোন বড় পরিবর্তন হয় নি। উঠানামা হয়েছে নিশ্চয়ই। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধও দেখা দিয়েছে। কখনো এসেছে সোনালী বিরতি। কিন্তু অগ্রগতিশীল কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি।[৬]

প্রাক-বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ধারণাও ছিল অনুরূপ। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, হিন্দুস্থানের সোনালী যুগে যারা বিশ্বাস করে তিনি তাদের দলে

৪. Quoted in Robert L. Heilbroner, *The Worldly Philosophers,* (New York 1986), 65

৫. Nathan Rosenberg and L.E. Birdzwell, Jr., *How the West Grew Rich,* (New York 1986), 1.

৬. J. M. Keynes, "Economic Possibilities of Our Grand Children", *Essays in Persuasion* ,(London 1931), 360

নন।[৭] তিনি প্রাক-বৃটিশ ভারতের জীবনকে "মর্যাদাহানিকর, স্থবির ও প্রগতিহীন" বলে চিহ্নিত করেছেন এবং গ্রাম্য সমাজকে "ক্ষুদ্র, আধা-বর্বর, আধা-সভ্য সমাজ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৮]

"কৃষকরা সর্বত্র একই ধরনের"।[৯] ম্যাক্সিম গোর্কীর এ স্মরণীয় উক্তি প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের রূঢ় বাস্তবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐতিহাসিকদের স্বাভাবিক অনুমান হওয়া উচিত যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় বিরামহীন দারিদ্র্য বিরাজ করতো। ঐতিহাসিকগণ পক্ষান্তরে বলেন যে, প্রাপ্ত ঐতিহাসিক আকরসমূহ হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক-বৃটিশ যুগে বাংলাতে আদৌ কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি। মধ্যযুগের বাংলা সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, "দেশে সব সময় প্রচুর খাদ্য থাকতো। এর ফলে উত্তর ভারতের অন্যত্র মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের খবর পাওয়া গেলেও সমগ্র মুসলমান শাসনামলের ঐতিহাসিক উপাদানসমূহে একটি দুর্ভিক্ষেরও উল্লেখ নেই।"[১০]

ঐতিহাসিক আকরসমূহ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় অন্তত তিনটি দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কৌতূহলের বিষয় এই যে, বাংলার প্রাচীনতম লিপিতে রয়েছে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ। মহাস্থানলিপি সম্ভবত খৃস্টের জন্মের তিন শত বছর আগে রচিত হয়েছিল। লিপিটিতে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে রাজার ভাণ্ডার হতে খাদ্যশস্য প্রদানের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লিপিতে পুণ্ড্রনগরের মহাজাতককে দুর্ভিক্ষের ত্রাণব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।[১১] আনুমানিক নবম শতকে রচিত *মঞ্জুশ্রী মূলকল্প* গ্রন্থে গৌড়ের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে 'মহা দুর্ভিক্ষের' উল্লেখ রয়েছে।[১২] নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষটি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বিরাজমান অরাজকতাকালে (৬৫০-৭৫০ খৃ.) দেখা দেয়।[১৩] আরেকজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল গুপ্ত শাসনের প্রথম পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে।[১৪] তৃতীয় দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রয়েছে *ফতিয়া ইবরিয়া* গ্রন্থে, যাতে ১৬৬১-১৬৬৩ সালের দুর্ভিক্ষ বর্ণিত হয়েছে।[১৫] প্রথমোক্ত দুর্ভিক্ষটি ঘটেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে। তৃতীয় দুর্ভিক্ষটি ছিল মনুষ্যসৃষ্ট।

৭. Karl Marx, "The Future Results of British Rule in India", in Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works*, Vol I, (Moscow 1962), 345.

৮. ঐ, 350.

৯. Quoted from Fernard Braudel, *The Wheels of Commerce Civilization and Capitalism of 15th-18th Century*, Vol. II, translated by Sian Reynolds, (New York 1982), 253

১০. Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol IB, (Riyadh 1985), 960.

১১. Radha Krishna Chaudhury, *Inscriptions of Ancient India*, (New Delhi 1983). 91.

১২. K P. Jayaswal, *An Imperial History of India in a Sanskrit Text*, (Lahore 1934), 32

১৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব (সংক্ষেপিত), (কলিকাতা ১৩৮২ বা. স.), ২৪১।

১৪. K P Jayaswal, *Imperial History*. 52

১৫. Quoted from Jadu Nath Sarkar (ed.), *The History of Bengal*, Vol II, (Patna 1973), 343-344

এ দুর্ভিক্ষে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাহীনতার জন্য খাদ্যদ্রব্য চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং গ্রাম্য চৌকিদার ও অভ্যন্তরীণ শুল্কের কর্মকর্তাদের অত্যাচার। দুর্ভিক্ষের ফলে দুর্দশা ছিল তীব্র। তালিশ লিখেছেন. "রুটির চেয়ে জীবনের দাম ছিল সস্তা আর রুটি পাওয়াই যাচ্ছিল না।"[১৬]

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, দু'হাজার বছরে মাত্র তিনটি দুর্ভিক্ষের উল্লেখ এ কথাই প্রমাণ করে যে, বাংলায় কদাচিৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক আকরসমূহে যতো দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের অনুমানের পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, বাংলার ইতিহাসের উপাদানসমূহ রচনা করেছেন বিদেশী সভাসদগণ ও বিদেশী পর্যটকগণ। সভাসদদের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের প্রভুদের গুণকীর্তন। যেহেতু পর্যটকরা সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের সাথে মেলামেশা করেছেন, সেহেতু এ দেশের সাধারণ লোকদের জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ভাসা-ভাসা ও অস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, রোজেনবার্গ ও বার্ডজেল যথার্থই উল্লেখ করেছেন,

> সাহিত্য, কবিতা, রোমান্স ও কিংবদন্তির কল্যাণে আমরা অনেক সময় অতীতে দুর্দশার প্রাধান্যের কথা ভুলে যাই। এসব উপাদানে যারা ভাল করে বেঁচেছিল তাদেরই স্মরণ করা হয়েছে আর নীরব দারিদ্র্যে যারা কালাতিপাত করেছে তাদের ভুলে যাওয়া হয়েছে।[১৭]

তৃতীয়ত ঐতিহাসিক উপাদানে উল্লেখ না থাকলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলায় বন্যা, খরা ও ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বারবার আঘাত হেনেছে। এসব দুর্বিপাকের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহে অধিকাংশ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকই উল্লেখিত হয় নি।

সাহিত্যিক উপাদানসমূহও বাংলায় মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হওয়ার অনুমান সমর্থন করে। তেরো শতকের প্রথমদিকে শ্রীধর দাস সংকলিত *সদুক্তিকর্ণাত* গ্রন্থে ক্ষুধার্ত সন্তানকে খাদ্যদানে অক্ষম মায়ের আর্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৮] ষোল শতকের কবি জয়ানন্দ তাঁর *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে একটি দুর্ভিক্ষের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :

> শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল
> ডাকা-চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল।
> উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া
> নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পালাইয়া।[১৯]

---

১৬. ঐ, 344.

১৭. Nathan Rosenberg and L.E. Birdzwell, Jr., *How the West Grew Rich*, I.

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস,* ১৯৭।

১৯. জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল,* সম্পাদনা বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা ১৯৭১), নদীয়া খণ্ড।

জয়ানন্দের পূর্বপুরুষরা এর ফলে সিলেট হতে নবদ্বীপে বসতি স্থানান্তর করেন। জয়ানন্দের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অনাবৃষ্টির ফলে মড়ক ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। ষোল শতকের অন্য এক কবি চন্দ্রাবতী তাঁর *মলুয়া* আখ্যানে আরেকটি দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন।[২০] এক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের কারণ হলো বন্যা। আখ্যানটিতে বন্যায় উদ্ভূত নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আশ্বিনের বন্যায় চাঁদ বিনোদের জমির ফসল ভেসে যায়। ধানের দাম বেড়ে টাকায় ছয় মণে দাঁড়ায়। ধান ক্রয়ের ক্ষমতা চাঁদবিনোদের নেই। প্রথমে তার হালের বলদ বিক্রি হয়, তারপর মহাজনের কাছে জমিজমা বন্ধক দেয়া হয়। সবশেষে খাদ্য ও অর্থের সন্ধানে চাঁদবিনোদ গ্রাম ছেড়ে চলে আসে। ষোড়শ শতকের আরেকজন কবি বৃন্দাবন দাস রচিত *চৈতন্যভাগবতে*ও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ রয়েছে।[২১]

উল্লিখিত সাক্ষ্যসমূহ প্রাক-বৃটিশ বাংলায় দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির অনুমান অগ্রাহ্য করে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলায় ঘনঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বাংলায় অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ও নিবিড়তা কম ছিল। এ অনুমানের পক্ষে দু'টি যুক্তি রয়েছে। প্রথমত বাংলায় প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মধ্যে বন্যা সবচেয়ে ঘনঘন হতো। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয় ছিল খরা। উপদ্রুত অঞ্চলে খরার ফলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যেতো; বন্যার ফলে ক্ষতি কম হতো। একই গ্রামের ভিতরে ও একই অঞ্চলে সব জমির উচ্চতা সমান ছিল না। এর ফলে সব জমিতে বন্যার ফলে সমান ক্ষতি হতো না। উচ্চতর জমিতে বন্যায় আদৌ কোন ক্ষতি হতো না, কখনো কখনো যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের জন্য বন্যাপরবর্তী ফলন ভাল হতো। পক্ষান্তরে নিচু জমিতে সকল ফসল তলিয়ে যেতো। এর ফলে সচ্ছল কৃষকরা, যারা সাধারণত উঁচু ও ভাল জমির মালিক, তারা বন্যায় ফসলের দাম বেড়ে গেলে লাভবান হতো। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা, যারা বন্যাপ্রবণ জমির মালিক, বন্যার ফলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়তো। বন্যা তাই সমাজে মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। সাহিত্যিক উপাদানসমূহেও উপরোক্ত প্রবণতাসমূহ লক্ষ্য করা যায়। জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গলে* দেখা যায় যে, খরার ফলে দুর্ভিক্ষ হলে নীলাম্বর চক্রবর্তীকে দেশান্তরে যেতে হয়। স্পষ্টতই খরার ফলে তার পূর্বতন বাসস্থান বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। চন্দ্রাবতীর *মলুয়াতে* দেখতে পাই যে, যদিও বন্যায় শস্যহানির দরুন চাঁদবিনোদের গ্রামে দুর্দশা বিরাজ করছে, তথাপি মহুয়ার গ্রাম বা চাঁদবিনোদের ভগ্নির গ্রামে খাদ্যাভাব নেই। বাংলায় বন্যার ফলে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে দরিদ্র লোকদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা যেত। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে খরার ফলে ব্যাপক দুর্দশা দেখা দিত।

২০. চন্দ্রাবতী, 'মলুয়া', *ময়মনসিংহ গীতিকা,* সম্পাদনা সুখময় মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা ১৯৭০), ৪৪-৬।

২১. Quoted in Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal : A Socio Political Study* (Dhaka 1965), 161-162

দ্বিতীয়ত দক্ষিণ এশিয়াতে দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকতো। বৃটিশ প্রশাসনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যেখানে পরিবহনব্যবস্থা উন্নত ছিল সেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ততো কম ছিল। কার্ল মার্কস যথার্থই বলেছেন :

> ভারতের মতো অন্য কোথাও পরিবহনের অভাবে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মধ্যে সামাজিক দুর্দশা দেখা যায় না। বৃটিশ হাউজ অব কমন্সের একটি কমিটির কাছে ১৮৪৮ সালে প্রমাণ করা হয় যে, যখন খান্দেশে ৮ বুশেল খাদ্যের দাম ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং, তখন পুনাতে এর দাম ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং। পুনার রাস্তায় লোক মরছিল, কিন্তু কাদার রাস্তাতে খান্দেশ থেকে খাদ্য নিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না।[২২]

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনব্যবস্থা ছিল। এর ফলে বাংলার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্য পাঠানো সহজ ছিল। তাই বাংলায় দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও নিবিড়তা কম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে সহজ যোগাযোগব্যবস্থা দুর্ভিক্ষ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট ছিল না। প্রাকৃতিক বাধা ছাড়াও মানুষের সৃষ্ট বাধা (যার উল্লেখ তালিশ করেছেন) খাদ্যশস্য চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া উপদ্রুত এলাকাতে খাদ্যশস্য পাঠানো যথেষ্ট নয়, খাদ্যশস্য কেনার জন্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতা থাকতে হবে। দৃশ্যতই ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত ছিল। এর ফলে এরা ছিলেন খাদ্যাভাবের প্রধান শিকার। কাজেই বাংলায় দুর্ভিক্ষের নিবিড়তা কম হলেও বাংলায় দুর্ভিক্ষ অজানা ছিল একথা বলা ঠিক হবে না। কয়েকজন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলায় স্থানীয় খাদ্যাভাব ঘটতো, দুর্ভিক্ষ নয়।[২৩] দুর্ভিক্ষ ও স্থানীয় খাদ্যাভাবের মধ্যে মাত্রার তফাৎ রয়েছে, কিন্তু এদের প্রকৃতি অভিন্ন। উপরন্তু প্রাক-বৃটিশ বাংলায় কোন জাতীয় বাজার ছিল না, সকল বাজারই ছিল খণ্ডিত ও স্থানীয়। এ ধরনের পরিবেশে স্থানীয় খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে অর্থবহ পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে বারবার ব্যাহত করেছে। কৃষিতে এ ধরনের অস্থায়ী উঠানামা ছাড়াও বাংলার অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী উঠানামা দেখা গেছে। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করেছে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অবস্থা, বাণিজ্যিক সড়কে রাজনৈতিক অবস্থা ও বৈদেশিক চাহিদা। বিভিন্ন সময়ে বাংলায় প্রাপ্ত মুদ্রা বিশ্লেষণ করলে বাংলার অর্থনৈতিক উঠানামার আভাস পাওয়া যায়। পাঁচ ও ছয় শতকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু সাত শতক হতে বারো শতক পর্যন্ত যখন পাল ও সেন রাজারা রাজত্ব করতেন তখন কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হয় নি। তেরো শতকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর আবার স্বর্ণমুদ্রা চালু হয়।

২২. Karl Marx, "The Future Results of British Rule in India", 354.

২৩. Mohar Ali, *Muslims of Bengal,* 925

উপরোক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, সাত শতক হতে বারো শতক এই পাঁচশত বছর ধরে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে স্থবিরতা বিরাজ করে।[২৪] এই স্থবিরতার কারণ দু'টি। প্রথমত, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় এবং এর ফলে বাংলার পণ্যের চাহিদা দ্রুত কমে যায়। দ্বিতীয়ত, ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য আরব বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এ বাণিজ্য থেকে ভারতীয় বণিকদের উচ্ছেদ করা হয়। এর ফলে বাণিজ্যে মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মন্দার সাক্ষ্য ও পঞ্চম থেকে বারো শতক পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রার অনুপস্থিতি বাংলায় অব্যাহত সমৃদ্ধির অনুমান মোটেও সমর্থন করে না। এমনকি, মুসলিম শাসনামলে যখন যথেষ্ট স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরায় চালু করা হয়, তখনো বাংলার অর্থনীতিতে অবশ্যই উঠানামা ছিল। নিশ্চয়ই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। কাজেই চৌদ্দ শতক হতে আঠারো শতক পর্যন্ত পাঁচ শত বছর ধরে একই ধরনের সমৃদ্ধি বিরাজ করছিল।[২৫] এ ধরনের দাবি মেনে নেয়া কঠিন। একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, হাবশী ক্রান্তিকালের (১৪৮৭-১৪৯৩) মতো রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে নি। সম্ভবত অর্থনৈতিক উঠানামা ও রাজনৈতিক উঠানামা একই সাথে ঘটেছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাংলায় অব্যাহত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাজ করে নি। প্রথমত, অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী উঠানামা ছিল। বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যেও উল্লেখযোগ্য উঠানামা দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যশস্যের মূল্যে স্বল্পস্থায়ী উঠানামা ছিল। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ও মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার জন্য খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে। দুর্ভিক্ষ এবং আকাল বারবার প্রাচুর্যের ধারাবাহিকতা রূঢ়ভাবে ছিন্ন করেছে।

সুলভ দ্রব্যমূল্যের অর্থনৈতিক তাৎপর্য

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অবিশ্বাস্যভাবে সুলভ ছিল।[২৬] চৌদ্দ শতকে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, "পৃথিবীর আর কোথাও এত সস্তা দাম দেখি নি"।[২৭] চীনা পরিব্রাজক ওয়াং তু ওয়ান, যিনি চৌদ্দ শতকে

---

২৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, ৯৩-৯৭।

২৫. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 925.

২৬. ঐ, 960.

২৭. Ibn Batuta, *Travels in Asia and Africa, 1325-1354*, translated by H.A.R Gibb. (New York 1969), 267

বাংলায় এসেছিলেন, তিনি লিখেছেন, বাংলায় দ্রব্যমূল্য মোটামুটি সস্তা ছিল।[২৮] ১৬২৮ থেকে ১৬৪১ সাল পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করেছিলেন সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক। তাঁর সাক্ষ্য অনুসারে বাংলায় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা।[২৯] সতেরো শতকের পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের বাংলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সস্তামূল্য লক্ষ্য করেছেন।[৩০] বাংলায় দ্রব্যমূল্যের সুলভতার কারণ হিসেবে কৃষি ও শিল্পে বাংলার অসাধারণ উৎপাদনশীলতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালের একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন:

> কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের কারণ হচ্ছে ভূমির উর্বরতা, শিল্পের বিকাশ এবং জনগণের শ্রম ও কারিগরি নৈপুণ্য। বাংলায় দ্রব্যাদি এত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো যে দেশের লোকের চাহিদা মেটানোর পরও সমৃদ্ধিশালী বহির্বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকতো। এ উদ্বৃত্তের বিনিময়ে বিদেশ হতে সোনা-রূপা এসে এ প্রদেশকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে।[৩১]

সস্তাদাম একটি আপেক্ষিক ধারণা। প্রথমত, একটি দেশের দ্রব্যমূল্য অন্য দেশের তুলনায় সস্তা হতে পারে। কিন্তু এ উপাত্তের ভিত্তিতে দু'টি দেশের জীবনযাত্রার মানের তুলনা সম্ভব নয়, কারণ জীবনযাত্রার মান শুধু দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভর করে না, আয়ের স্তর ও বণ্টনের উপরও নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, একটি দেশের লোকের আয়ের তুলনায় সে দেশের দ্রব্যমূল্য সস্তা হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলার ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে এ দু'টি স্বতন্ত্র ধারণাকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন :

> তবু একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম ছিল এবং তার ফলে স্বল্প আয়ে একজন লোক তার নিজের ও তার পরিবারের ভরণপোষণের সংস্থান করতে পারতো।[৩২]

এ ধরনের যুক্তির মূল ত্রুটি এই যে, দ্রব্যমূল্যের সুলভতা দেশের লোকের আয়ের তুলনায় নির্ণয় না করে বিদেশী দামের তুলনায় নির্ণয় করা হয়। স্পষ্টতই বস্ত্রের মূল্য সস্তা হলে তাঁতির মজুরি বেশি হতে পারে না, কৃষিপণ্যের মূল্য সস্তা হলে খামার-শ্রমিকের মজুরি কম হবে। তাই দ্রব্যমূল্যের সুলভতা জীবনযাত্রার উচ্চমানের জন্য প্রয়োজনীয় কিংবা যথেষ্ট নয়।

---

২৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল,* (কলিকাতা ১৯৮০), ৩১৮-৩১৯।

২৯. Mohar Ali, *Muslims of Bengal,* 962.

৩০. Francois Bernier, *Travels in the Moghal Empire, trans* Archibald Constable, (Lahore 1976), 438-439.

৩১. Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* 404.

৩২. Mohar Ali, *Muslims of Bengal,* 963.

ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহে দ্রব্যমূল্যের সুলভতার উল্লেখ বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত। এসব বৃত্তান্তে শুধু বাংলার দ্রব্যমূল্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু এগুলো বাংলার জনগণের আয় ও মজুরি সম্পর্কে নীরব। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে দ্রব্যমূল্যের সুলভতার তাৎপর্য সম্পর্কে অর্থবহ ইঙ্গিত রয়েছে। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার তুলনায় দিল্লীতে আয় ও দ্রব্যমূল্য বেশি ছিল। বাংলায় সবচেয়ে উত্তম ক্রীতদাসী এক দিনারে বিক্রি হতো, একটি দাস বালকের মূল্য ছিল দুই দিনার।[৩৩] দিল্লীতে ইবনে বতুতা একজন তুর্কীর কাছে একটি ক্রীতদাস একশ' দিনারে বিক্রয় করেন।[৩৪] এ সময়ে দিল্লীতে দাসী বালিকার দাম ছিল আট দিনার, উপপত্নীর দাম ছিল ১৫ টঙ্কা।[৩৫] ইবনে বতুতা বাংলার লোকদের আয় সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হতে দেখা যায় যে, দিল্লীর আমিরদের আয় ছিল অনেক বেশি। তিনি লিখেছেন যে, দিল্লীর উজির তাঁর প্রতিটি ক্রীতদাসকে পঁয়ষট্টি রৌপ্যদিনার (৬.৫ স্বর্ণদিনারের সমান) বখশিস দিয়েছিলেন। অথচ বাংলায় দুই দিনারে একজন ক্রীতদাস ক্রয় করা যেতো।[৩৬] বাংলায় দ্রব্যমূল্যের তুলনায় ইবনে বতুতার আয় ছিল প্রচুর। সুলতান বছরে ইবনে বতুতাকে সতেরো হাজার দিনার ভাতা দিতেন।[৩৭] ঋণ শোধ করার জন্য সুলতান তাঁকে পঞ্চান্ন হাজার দিনার দেন।[৩৮] প্রথমবার সালাম জানাতে গেলে দিল্লীর উজির তাঁকে দুই হাজার রৌপ্যমুদ্রা (দুশ' স্বর্ণমুদ্রার সমান) উপহার দেন।[৩৯] সুতরাং ইবনে বতুতা যে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য সস্তা বিবেচনা করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বাংলায় লোকের আয়ের তুলনায় দ্রব্যমূল্য সস্তা ছিল না এ ধরনের ইঙ্গিত ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তেই রয়েছে। প্রথমত ইবনে বতুতা লিখেছেন, বাংলায় করের হার খুব বেশি ছিল। পূর্ব বাংলা সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "এখানকার প্রজারা মুসলমান রাজার বিধর্মী প্রজা। এদের ফসলের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নিয়ে নেয়া হয়। তার উপরে তাদের কর দিতে হয়।"[৪০] যেহেতু আদায়কৃত কর জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হতো না, বরং দিল্লীকে নজরানা প্রদান এবং যুদ্ধের জন্য ব্যয় করা হতো, সেহেতু করের উচ্চহার জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস করে। এ ধরনের করব্যবস্থা চালু থাকলে

৩৩. Ibn Batuta, *Travels*, 267.

৩৪. ঐ, ১৯৬।

৩৫. Irfan Habib, "Non Agricultural Production and Urban Economy", *The Cambridge Economic History of India*, Vol. I, (ed),Tapan Ray Chaudhuri and Irfan Habib, (New York 1982). 92.

৩৬. Ibn Batuta, *Travels*, 210

৩৭. ঐ, 206-207.

৩৮. ঐ, 210

৩৯. ঐ।

৪০. ঐ, 271

দ্রব্যমূল্য কম হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, ইবনে বতুতা বলেছেন, "আমি তাদের বলতে শুনেছি যে এ দামও তাদের জন্য বেশি"।[৪১] এ উক্তি জনগণের সীমিত ক্রয়ক্ষয়তা সম্পর্কে অনুমান সমর্থন করে। বাংলায় জনগণের আয়ের তুলনায় দ্রব্যের মূল্য সস্তা ছিল না। তৃতীয়ত, দাসদের স্বল্পমূল্য প্রমাণ করে যে, বাংলায় মজুরির হার কম ছিল। একজন দাস সারা জীবনে যা আয় করতো তার উপর নির্ভর করে দাসের দাম। যদি মজুরির হার বেড়ে যেতো তবে দাসের দামও বাড়তো। বস্তুত দিল্লীতে ঘোড়ার দাম বাংলায় দাসের দামের চেয়ে বেশি ছিল। ঐতিহাসিক বারানী লিখেছেন যে, দিল্লীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘোড়ার দাম ছিল দশ থেকে বারো টঙ্কা।[৪২] ইবনে বতুতা লিখেছেন, মুলতানে ঘোড়ার জন্য সাত দিনার শুল্ক দিতে হতো।[৪৩] এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় দাসদের উৎপাদনশীলতা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

ইবনে বতুতা বাংলায় দ্রব্যমূল্য তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, বাংলার জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ইবনে বতুতা বাংলায় দ্রব্যমূল্য নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

> আমি আট দিবহামে আটটি তাজা মোরগ বিক্রয় হতে দেখেছি, এক দিরহামে পনেরোটি কচি কবুতর পাওয়া যেতো, দুই দিরহামে পাওয়া যেতো একটি মোটাসোটা ভেড়া। আমি আরো দেখেছি, ত্রিশ হাত লম্বা সর্বোত্তম মানের মিহি তুলার কাপড় দু'দিনারে বিক্রয় হয়েছে, সুন্দরী ক্রীতদাসী বিক্রয় হয়েছে এক দিনারে, যা মরক্কোর মুদ্রায় আড়াই দিনারের সমান।[৪৪]

ইবনে বতুতা বাংলাদেশে দ্রব্যাদির দাম সোনার দিনার এবং দিরহামে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে বাংলায় স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা বিনিময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল না, কড়ি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। তিনি নিজে তা জানতেন এবং কড়ি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন :

> এসব দ্বীপের (মালদ্বীপের) অধিবাসীরা কড়ির খোলস মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে। কড়ি হচ্ছে এক ধরনের প্রাণী যা সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়। এগুলি গর্তে রেখে দিলে বাইরের খোল থেকে যায় আর মাংস শুকিয়ে যায়। কেনাবেচার জন্য এক স্বর্ণদিনারের বদলে এক হাজার কড়ি দেয়া হয়। চালের বদলে কড়ি বাংলার এবং ইয়ামনের সাথে বিনিময় করা হয়। বাংলায় কড়ি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ইয়ামনের লোকেরা বালির বদলে (ভার হিসেবে) জাহাজে কড়ি ব্যবহার করে। নিগ্রোরা তাদের দেশে কড়ি ব্যবহার করে। মল্লি এবং গ্যগ্যতে আমি এক স্বর্ণদিনারের বদলে ১১৫০টি কড়ির বিনিময় দেখেছি।[৪৫]

৪১. উদ্ধৃতি দেখুন, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, IA, 130.

৪২. Irfan Habib, "Non Agricultural Production", 92.

৪৩. Ibn Batuta, *Travels*, 186.

৪৪. ঐ, 267.

৪৫. ঐ, 243.

ইবনে বতুতা মোরগ বা কবুতরের দাম কড়িতে উল্লেখ করেন নি। এতে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, ইবনে বতুতা যারা দিনারে আয় করে তাদের দৃষ্টিকোণ হতে দ্রব্যমূল্যের কথা চিন্তা করেছিলেন, যারা কড়িতে আয় করতেন তাদের দৃষ্টিকোণ হতে নয়।

ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক উপাদানসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বাংলায় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কড়ি ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। স্পষ্টতই যারা কড়িতে বেচাকেনা করতো তারা আয়ও কড়িতেই করতো, সোনা বা রূপার মুদ্রায় নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক কড়ির ব্যাপক ব্যবহার বিভ্রান্তিকর মনে করেন। প্রাক-মুসলিম বাংলাতে ব্যাপক কড়ির ব্যবহারের কারণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা। ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হয়। ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরও কড়ির ব্যবহার কেন চালু ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে, মধ্যযুগের বাংলায় সোনা ও রূপার পর্যাপ্ত সরবরাহ পুনরায় শুরু হলেও বাঙালিরা অন্ধ আনুগত্যের জন্য কড়ির ব্যবহার চালু রাখে।[৪৬] এটি একটি জটিল বিষয়ের অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একথা সত্য যে, মধ্যযুগের জাঁকালো বহির্বাণিজ্যের ফলে বাংলায় প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রূপা আমদানি করা হয়। কিন্তু এসব মূল্যবান ধাতু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা হতে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণের জন্য। আবুল ফজল লিখেছেন যে, বাংলার লোকেরা মোহর ও টঙ্কা খাজনা দেয়ার জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে আসতো।[৪৭] যেহেতু রাষ্ট্রের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ছিল সীমাহীন, সেহেতু অনেক সময় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা সম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো। এজন্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ড এবং ছোটখাটো বিনিময়ের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হতো না। একজন ঐতিহাসিক ঠিকই বলেছেন যে, বাংলায় স্বর্ণমুদ্রা ছিল সখের মুদ্রা[৪৮] এবং এ মুদ্রা বাদশাহ-আমিরদের নজরানা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। তাই বাংলার জাঁকালো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাইরে থেকে যে সোনা ও রূপা নিয়ে আসতো তা ব্যবহৃত হতো দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানোর জন্য।

বাংলা থেকে দিল্লীতে অর্থ পাচারের ফলে বাংলার লোক আরো দরিদ্র হতো। রাজস্ব প্রশাসন অধিকতর কার্যকর হলে বাংলা হতে অধিকতর সম্পদ চলে যেতো। কাজেই দিল্লীর প্রতিনিধিদের আদায়ের পরিমাণ বেড়ে গেলে বাংলার জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে স্বভাবতই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে সুলভ মূল্যের তাৎপর্য হচ্ছে জনগণের দুর্দশা, সমৃদ্ধি নয়।

৪৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ৩৫৫-৩৫৬।

৪৭. উদ্ধৃত, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 928.

৪৮. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dhaka 1963). 93.

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে শায়েস্তা খানের সুবাদারিকালের (১৬৬৪-১৬৮৮) সমৃদ্ধি সম্পর্কে কিংবদন্তি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। ক্যাপ্টেন চার্লস স্টুয়ার্ট শায়েস্তা খান সম্পর্কে নিম্নলিখিত কিংবদন্তি লিপিবদ্ধ করেছেন :

> বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শাসনামলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত সস্তা ছিল যে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো। এ ঘটনার স্মৃতি রক্ষা করার জন্য তিনি যখন ঢাকা ছেড়ে চলে যান তখন ঢাকার পশ্চিম তোরণ, যার মধ্য দিয়ে তিনি শহর ছেড়ে যান, তা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। তোরণটিতে একটি লিপি খোদাই করা হয়, যাতে লেখা হয় যে ভবিষ্যতে কোন সুবাদার যদি চালের দাম অনুরূপ পর্যায়ে কমাতে পারে তবেই এ তোরণ খোলা হবে। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে নবাব সরফরাজ খানের প্রশাসন পর্যন্ত এ তোরণ বন্ধ ছিল।[৪৯]

একজন সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক শায়েস্তা খানের সময় চালের দামের নাটকীয় হ্রাসের দু'টি কারণ চিহ্নিত করেছেন : (১) পর্তুগীজ-আরাকানী জলদস্যুদের হুগলীস্থ আখড়া ১৬৩২ সালে ভাঙ্গার পর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ফলে বাণিজ্যে তেজীভাব এবং (২) আরাকানীদের হাত থেকে ১৬৬৭ সালে চট্টগ্রাম দখল।[৫০]

এ ব্যাখ্যার তিনটি স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত, শায়েস্তা খান বাংলাদেশে ১৬৬৪ হতে ১৬৭৭ এবং ১৬৭৯ হতে ১৬৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছেন। ১৬৩২ সালে পর্তুগীজ-আরাকানীদের দমন করা হলে শায়েস্তা খানের শাসনামলে দ্রব্যমূল্যের উপর তার প্রভাব কেন পড়বে তা বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম জয়ের ফলে চালের মূল্য কমে যাবে যদি চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে চালের বড় রপ্তানিকারক হয়। এ অনুমানের সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সবশেষে উপরোক্ত ব্যাখ্যায় চালের চাহিদার কথা একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে। যখন চালের চাহিদা কমে যায় তখন চালের দামও কমে যাবে। চালের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে চালের দাম কমে যাওয়ার জন্য এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। শায়েস্তা খান একজন যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। বাদশাহকে খুশি করার জন্য ও নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তিনি জনগণের কাছ থেকে যতোটুকু সম্ভব অর্থ আদায় করতেন। সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শায়েস্তা খান গড়ে প্রতি বছর জনগণের কাছ থেকে রাজস্বের অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করতেন তার পরিমাণ ৮০ লক্ষ থেকে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টঙ্কা পর্যন্ত উঠানামা করতো।

শায়েস্তা খানের সময় সরকারিভাবে আদায়কৃত রাজস্বের কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব নেই। তবে শায়েস্তা খানের আগে ও পরে যে রাজস্ব আদায় হয়েছে তা থেকে শায়েস্তা খানের শাসনামলে রাজস্বের পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে। ১৬৫৮ ও ১৭০০ সালের রাজস্বের গড়ের ভিত্তিতে শায়েস্তা খানের শাসনামলে বাংলায় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ১২৫ লাখ টঙ্কা নির্ধারণ করা যেতে পারে (সারণি ২ দেখুন)। আবুল ফজল জানাচ্ছেন যে, মুগল

৪৯. উদ্ধৃত, Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, 386-87.

৫০. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 748.

আমলে ভূমির উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় হতো।[৫১] এ দু'টি তথ্যের ভিত্তিতে বাংলায় তৎকালীন কৃষিউৎপাদনের মূল্য ৩৭৫ লাখ টঙ্কা নির্ধারণ করা যেতে পারে। কৃষিখাতে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপন্ন হতো অনুমান করলে শায়েস্তা খানের আমলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) সম্ভবত ৪৬৮ লাখ টঙ্কার কাছাকাছি ছিল। মোট রাজস্ব ও শায়েস্তা খানের অতিরিক্ত আদায়ের মোট পরিমাণ ২০৫ লাখ টঙ্কা (১২৫ লাখ রাজস্ব+ ৮০ লাখ জোরজবরদস্তি করে আদায়) হতে ৩০০ লাখ টঙ্কা (১২৫ লাখ রাজস্ব + ১৭৫ লাখ জোরজবরদস্তি করে আদায়) হতে পারে। এ হিসাব থেকে মনে হয় যে, তাঁর শাসনামলে রাষ্ট্র মোট জাতীয় উৎপাদনের কমপক্ষে ৪৩.৮% আদায় করেছে এবং এই আদায়ের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬৪% পর্যন্ত হতে পারে।

সারণি ১ : শায়েস্তা খানের জোরজবরদস্তিমূলক আদায়

	সূত্র	প্রাক্কলন-১	সূত্র	প্রাক্কলন-২
১.	মাস্টার-এর হিসাবে শায়েস্তা খানের ধন-দৌলতের পরিমাণ	৩০০০ লাখ	১. আসামের ঐতিহ্যগত ইতিহাসে শায়েস্তা খানের ধন-দৌলতের পরিমাণ	১৭০০ লাখ
২.	১৬৮০ সালে বাদশাহকে প্রদত্ত ঋণ, যা মাফ করে দেয়া হয়	৭ লাখ	২.১৬০০ সালে বাদশাহকে প্রদও ঋণ, যা মাফ করে দেয়া হয়	৭ লাখ
৩.	পাঁচ লাখ টাকা করে চার বছর (১৬৮২-১৬৮৫) বাদশাহকে প্রদত্ত অতিরিক্ত রাজস্ব	২০ লাখ	৩.পাঁচ লাখ টাকা করে চার বছর (১৬৮২-১৬৮৫) বাদশাহকে প্রদত্ত অতিরিক্ত রাজস্ব	২০ লাখ
৪.	১৬৮২ সালে দিল্লীকে প্রদত্ত জিজিয়া	১লাখ	৪.১৬৮২ সালে দিল্লীকে প্রদত্ত জিজিয়া	১ লাখ
৫.	১৬৭৮ সালে বাদশাহকে প্রদত্ত নজরানা	৩৪ লাখ	৫.১৬৭৮ সালে বাদশাহকে প্রদত্ত নজরানা	৩৪ লাখ
	২২ বছরে মোট জবরদস্তিমূলক আদায়ের পরিমাণ	৩০৬২ লাখ	২২ বছরে মোট জবরদস্তি-মূলক আদায়ের পরিমাণ	১,৭৬২ লাখ
	গড়ে বার্ষিক আদায়ের পরিমাণ	১৭৫.৫ লাখ	গড়ে বার্ষিক আদায়ের পরিমাণ	৮০.০৯ লাখ

উৎস : Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II, (Patna : 1973), 373-374

৫১. উদ্ধৃত, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 748.

সারণি ২ : বাংলায় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ, ১৫৮২-১৭৫৬

সাল	মোট রাজস্ব (টাকাতে)
১৫৮২	৬৩,৪৪,২০০
১৬৫৮	১৩১,১৫,৯০৭
১৭০০	১১৭,২৮,৫৪১
১৭০৭	১২৬,৭৬,৬৪৭
১৭১২	১৩৪,২৬,৯৩৮
১৭১৬	১৩৯,৩৯,৪০১
১৭২৮	১৪২,৪৫,৫৬১
১৭৫৬	১৪২,৪৫,৫৬১

উৎস : ১. ১৫৮২ ও ১৬৫৮ সালের উপাত্তের জন্য, মোহাম্মদ মোহর আলী, *History of The Muslims of Bengal,* Vol. IB (Riyadh 1985), 748.

২. ১৭০০ হতে ১৭৫৬ সালের উপাত্তের জন্য, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাঙলা,* (কলিকাতা ১৯৮২), ৬৯।

তর্কের অবতারণা করে বলা যেতে পারে যে, উপরোক্ত হিসাবে বাংলার মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য কম ধরা হয়েছে, কারণ যোগাযোগব্যবস্থার অসুবিধার জন্য সম্ভবত সকল স্থান হতে নির্ধারিত হারে কর আদায় করা সম্ভব হয় নি। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ উপরোক্ত হিসাবে বেশি ছিল, তবু মোট জাতীয় উৎপাদনের কর ও জবরদস্তিমূলক আদায়ের হার সম্ভবত পূর্বোক্ত হিসাবের খুব কম হবে না, কারণ উপর্যুক্ত হিসাবে অধস্তন কর্মকর্তা এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা জোরজবরদস্তি করে যে অর্থ আদায় করতো তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। বাংলা সাহিত্যে অধস্তন কর্মচারীদের ব্যাপক অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে রাজস্ব ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ও বণিক এবং স্বর্ণকারদের জোরজবরদস্তিমূলক আদায়ের চমৎকার চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫২] বিভিন্ন বর্ণনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে কর ও জোরজবরদস্তিমূলক আদায়ের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশি। এ ধরনের পরিবেশে যেখানে রাষ্ট্র সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যেতো, সেখানে সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত হতে বাধ্য। কাজেই মধ্যযুগের বাংলায় অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য দ্রব্যমূল্য কম ছিল না, দ্রব্যমূল্য কম থাকার বড় কারণ ছিল জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অভাব।

৫২. উদ্ধৃত, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকা ১৯৬৫), ১১৮-১১৯।

প্রাক-বৃটিশ বাংলায় দারিদ্র্য

অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন দেশ সমৃদ্ধ হলেই দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর হয়ে যায় না। যদি সম্পদের সুষম বণ্টন না হয়, তবে ধনী দেশেও দারিদ্র্যের সুযোগ থাকে। বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকসমূহের বক্তব্য এই যে, বাংলা শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই সমৃদ্ধ ছিল না, সব দিক দিয়েই বাংলায় দারিদ্র্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ সম্পর্কিত গ্রন্থে বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রাক-বৃটিশ আমলে বাংলায় সাধারণ লোকের খাওয়া-পরার কোন সমস্যা ছিল না। যুক্তি দেখানো হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় জনসংখ্যা ছিল কম, কিন্তু প্রচুর পরিমাণ অনাবাদি উর্বর জমি ছিল। কাজেই সাধারণ লোকের খাদ্যাভাবের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই বক্তব্য আয়-বন্টনের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে। যদি আয়ের সুষম বণ্টন না হয়, তবে দেশে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের উৎপাদন সত্ত্বেও কিছু লোক দরিদ্র থেকে যাবে। বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের চিরাচরিত ব্যাখ্যার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ দু'ধরনের ঐতিহাসিক উপাত্ত রয়েছে। প্রথমত, প্রাক-বৃটিশ আমলের বাংলায় দাসপ্রথা চালু ছিল। সকল লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকলে দাসপ্রথা চালু থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের আকরসমূহে বারবার তাঁতিদের 'সর্বজনীন' এবং 'প্রচণ্ড' দারিদ্র্যের কথা বলা হয়েছে।[৫৩] প্রাক-বৃটিশ আমলে তাঁতিরা ছিল সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিক। এদের মজুরি কম হলে স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, বাংলায় অকৃষি শ্রমিকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল ছিল না।

বাংলায় দাসপ্রথা প্রাচীনকাল হতে চালু ছিল। বাৎসায়নের *কামসূত্রে* দাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। আইনজ্ঞ জীমূতবাহন (আনুমানিক খৃঃ ১২/১৩ শতক) দাসত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেছেন। জীমূতবাহনের *দায়ভাগ* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি উত্তরাধিকারসূত্রে একাধিক ব্যক্তি একজন ক্রীতদাসী লাভ করে, তবে মালিকদের সম্পত্তিতে ভাগ অনুসারে দাসীকে পর্যায়ক্রমে সকল মালিকের কাজ করতে হবে।[৫৪] বিদেশী পর্যটকরা দাসপ্রথার উল্লেখ করেছেন। চৌদ্দ শতকের চতুর্থ দশকে বাংলা ভ্রমণ করে ইবনে বতুতা লিখেছেন, "আমি 'শয্যাভূষণ' ক্রীতদাসীদের এক দিনার অর্থাৎ মরক্কোর আড়াই দিনারে বিক্রয় হতে দেখেছি। আমি ঐ দামে আশুরা নামে একজন ক্রীতদাসী ক্রয় করেছিলাম। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী। আমার একজন সহযাত্রী দুই দিনার দিয়ে লুলু নামে একজন দাস বালক ক্রয় করেছিল।"[৫৫] পর্তুগীজ ব্যবসায়ী বারবোসা ষোল শতকে বাংলায় দাস ব্যবসার নিম্নরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন :

৫৩. K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company*, (Cambridge 1978), 268-270.

৫৪. R.C. Majumdar (ed), *History of Bengal*, Vol. I, (Dhaka 1943), 618.

৫৫. উদ্ধৃত, Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 131.

> এই শহরের (বাঙ্গালায়) মুরিশ (মুসলমান) বণিকরা দেশের ভিতরে গিয়ে বহু পৌত্তলিক বালককে তাদের পিতামাতার অথবা যারা তাদের চুরি করে, তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে এবং তাদের নপুংসক বানায়। তাদের (ঐ বালকদের) মধ্যে কেউ কেউ এতে মারা যায়। যারা বেঁচে যায়, তাদের এরা খুব ভালোভাবে মানুষ করে এবং পণ্য হিসেবে ইরানীদের কাছে জনপ্রতি কুড়ি বা ত্রিশ ডুকাট দামে বিক্রি করে, তারা (ইরানীরা) তাদের স্ত্রীদের এবং ঘরবাড়ির রক্ষক হিসেবে এদের খুব মূল্যবান জ্ঞান করে।[৫৬]

আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে, সিলেট ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল অনেক খোজা সরবরাহ করতো।[৫৭] জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে বাংলার দাসপ্রথা সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে :

> হিন্দুস্থানে, বিশেষ করে বাংলার উপনিবেশ সিলেট প্রদেশে লোকদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে তারা তাদের ছেলেদের খোজা করে সুবাদারকে রাজস্বের বদলে খোজা দিত। ক্রমে এই প্রথা অন্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি বছর কিছু কিছু ছেলের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রজননক্ষমতা হারাচ্ছে। এই প্রথা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে আমি আদেশ জারি করলাম যে, এরপর আর কেউ এ প্রথা অনুসরণ করবে না এবং ছোট ছোট ছেলেদের খোজা করে বিক্রি করার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়।[৫৮]

কোন কোন ঐতিহাসিক বাংলায় দাসপ্রথার প্রচলন সম্পর্কে উপরোক্ত সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নন।[৫৯] তাঁরা বলেন, যদিও বাংলায় দাসপ্রথা চালু ছিল তবু বাংলার বাজারে যে- সব দাসদাসী বেচাকেনা হতো তাদের বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছিল, তারা বাঙালি নয়। তাঁরা বলেন যে, বাংলায় শ্রমিকের অভাব থাকায় বাইরে থেকে দাস আমদানি করা হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইলিয়াস শাহী শাসকরা আবিসিনীয় দাস আমদানি করেছিলেন। তাঁরা অবশ্য স্বীকার করেন যে, পর্তুগীজ জলদস্যুরা কখনো কখনো স্থানীয় লোকদের জোর করে দাসে পরিণত করেছে। একজন ঐতিহাসিক জোর দিয়ে বলেছেন, "বাংলাতে কোন স্থানীয় লোককে অন্য স্থানীয় লোকের কাছে দাস হিসেবে বিক্রয় করার নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[৬০] বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দাস বিক্রয়ের যেসব দলিল পাওয়া গেছে তা প্রত্যক্ষভাবে উপরোক্ত উক্তির পরিপন্থী।

মিত্র জানাচ্ছেন যে, চন্দননগরে ফরাসী শাসকদের মহাফেজখানায় দাস বিক্রয়ের কমপক্ষে একশ'টি দলিল রয়েছে।[৬১] দাস বিক্রয়ের দলিল পাওয়া গেছে সিলেটে[৬২],

---

৫৬. উদ্ধৃত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ৩৪৫-৩৪৬।

৫৭. উদ্ধৃত, Abdur Rahim, *History of Bengal*, 299

৫৮. Emperor Nur-Al-Din Muhammad Jahangir, *The Tuzuk-i Jahangiri*, translated by Alexander Rogers , (Delhi 1968), 150.

৫৯. Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 964.

৬০. ঐ।

৬১. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ*, (কলিকাতা ১৯৬২), ২৯২।

৬২. Siva Ratan Mitra, *Types of Early Bengali Prose*, (Calcutta 1922), 87.

হুগলী[৬৩] জেলায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যে।[৬৪] কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত একটি দলিল হতে দেখা যাচ্ছে যে, কায়স্থপাড়া গ্রামের জনৈক গোপীনাথ মজুমদার ১০৭৪ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ (অর্থাৎ ১৬৬৮ খৃস্টাব্দ) তারিখে নিজেকে ইসিদ্দর খানের কাছে বিক্রয় করে।[৬৫] বলা হয়েছে যে, আর্থিক দুরবস্থার জন্য গোপীনাথ নিজেকে বিক্রয় করেছে। শায়েস্তা খানের শাসনামলকে বাংলার স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অথচ গোপীনাথের আত্মবিক্রয় শায়েস্তা খানের শাসনামলের চতুর্থ বছরে ঘটেছে।

সারণি ৩-এ দশটি দাসবিক্রয় দলিলের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৬৪৯ হতে ১৭৫৪ সালে বাঙালিদের দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়েছে। দশটি মনুষ্যবিক্রয় দলিলের মধ্যে তিনটি মাতাপিতা কর্তৃক শিশুসন্তান বিক্রয়ের দলিল। ১৭১৯ সালে এগারো বছরের শিশুকন্যা এবং ১৭২১ সালে ছয় বছরের মেয়ে বিক্রয় করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় পিতামাতার দ্বারা কন্যাসন্তান বিক্রয় ছিল অতি মামুলি ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ *চৈতন্য চরিতামৃত*-এর নিম্নোক্ত শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে :

নাহা লুহা লবণ বেচিবে ব্রাহ্মণে
কন্যা বেচিবেক যে সর্ব শাস্ত্রে জানে।[৬৬]

আসামের ঐতিহাসিক আকর হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক-বৃটিশ আমলে স্বামীরা স্ত্রী বিক্রয় করতো।[৬৭] উনিশ শতকে বাংলায় অনুরূপভাবে স্ত্রী বিক্রয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে।[৬৮]

সারণি ৩-এ চারটি আত্মবিক্রয়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দলিলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, দুর্দশা, অনাহার ও ঋণের কারণে দলিলদাতারা নিজেদের বিক্রয় করেছে। এ ধরনের লেনদেনের জন্য লিখিত দলিল কেন সম্পাদন করা হতো তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যদি পরবর্তী পর্যায়ে দাসদের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে পলাতক দাসদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের দলিলের প্রয়োজন হতে পারে। ১৭৭০ সালের একটি দাস বিক্রয়ের দলিল উপরোক্ত অনুমান সমর্থন করে। দলিলটিতে শর্ত রয়েছে যে, যদি দাস পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে মালিক তাকে শাস্তি দিতে পারবেন।[৬৯] সারণি

৬৩. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস*, ২৮৩-২৯৬।
৬৪. আনিসুজ্জামান, *পুরোনো বাংলা গদ্য*, (ঢাকা ১৯৮৪), ১২৮।
৬৫. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস*, ২৮৬।
৬৬. জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, ২১৬।
৬৭. Amalendu Guha, "The Mediaeval Economy of Assam", *The Cambridge Economic History of India*, Vol. I, 503.
৬৮. সুধীরকুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস*, ২৮৬।
৬৯. Siva Ratan Mitra, *Bengali Prose*, 90.

৩-এ উল্লেখিত দাসরা অধিকাংশই হলো নিম্নবর্ণের শূদ্র। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমানদের বিক্রয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। গোপীনাথ মজুমদার, যে নিজেকে শায়েস্তা খানের শাসনামলে বিক্রয় করেছিল, সম্ভবত সে একজন কায়স্থ ছিল, কারণ অনেক কায়স্থ মধ্যযুগের বাংলায় মজুমদার উপাধি ধারণ করতো।[৭০] উপরন্তু ইবনে বতুতার কেনা ক্রীতদাসীর নাম ছিল আশুরা। নামটি মুসলমানের মনে হয়। যেহেতু শুধু পুরুষ দাসদের বাইরে থেকে আনা হতো, তাই আশুরা সম্ভবত স্থানীয় মুসলমান ছিল।

দশটি দাসবিক্রয় দলিলের মধ্যে চারটিতে অনাহার, ঋণ ও দুর্ভিক্ষকে মানুষ বিক্রয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি দলিলে কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য দু'টি দলিল নাবালক সন্তান বিক্রয়ের। সম্ভবত মনে করা হতো যে, পিতা-মাতার নাবালক সন্তান বিক্রয়ের অধিকার ছিল। এ কারণে হয়তো এসব দলিলে বিক্রয়ের কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৭৫৪ সালের একটি দাসবিক্রয় দলিলে 'মহা দুর্ভিক্ষের' উল্লেখ আছে। অন্যান্য ঐতিহাসিক দলিলে এ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবত দুর্ভিক্ষটি ছিল স্থানীয় এবং শহরে বসবাসরত ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে উপেক্ষা করেছেন।

উপরোক্ত দলিল থেকে বাংলায় দাসপ্রথা চালু থাকার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দাসত্বের বিস্তার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়ে গেছে। প্রথমত, দাসত্ব কি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল? দ্বিতীয়ত, এ দাসত্বের প্রকৃতি কি ছিল?

প্রাক-বৃটিশ আমলে বাংলার জনসংখ্যার কত শতাংশ লোক দাস ছিল তার কোন হিসাব পাওয়া যায় না, তবে প্রতিবেশী আসামে দাস, ভূমিদাস ও বন্ধকিদাসরা জনসংখ্যার ৫ শতাংশ হতে ৯ শতাংশ ছিল বলে অনুমান করা হয়।[৭১]

আসামে আনুপাতিক হারে বাংলার চেয়ে দাস বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। সিলেট জেলায় চাকরান ও নানকার ব্যবস্থা দাসব্যবস্থার স্মারক হিসেবে পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এতে মনে হয় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটে দাসব্যবস্থা অনেক বেশি শিকড় গজিয়েছিল। তবে বাংলার জনসংখ্যায় দাসের সংখ্যার হার নেহায়েত নগণ্য ছিল অনুমান করা ঠিক হবে না। সতেরো ও আঠারো শতক হতে দাস বিক্রয়ের যেসব দলিল এখনো রয়ে গেছে সেসব দেখলে মনে হয় না যে বাংলাদেশে নেহায়েত কালেভদ্রে দাস বিক্রয় হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্রে দেখা যায় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় অনেকগুলো দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার ছিল।[৭২]

৭০. Abdur Rahim, *History of Bengal*, 309.

৭১. *Amalendu Guha, "Mediaeval Eco*nomy," 503.

৭২. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা,* (কলিকাতা ১৯৮২), ২৭।

সারণি ৩ : মনুষ্য বিক্রয় দলিল বিশ্লেষণ, ১৬৪৯-১৭৫৪

বিক্রয়ের বছর	বিক্রেতার নাম	বিক্রিত দাসের নাম	বিক্রয়মূল্য	বিক্রয়ের কারণ
১৬৪৯	শ্রী দৈবাকি শূদ্র	আত্ম ও পুত্র	-	বলা হয় নি
১৬৭১	শ্রী রতি নন্দন	দাস	২.৫ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৬৯৫	শ্রী সনাতন দত্ত	আত্মবিক্রয়	৯ রুপিয়া	অনাহার ও ঋণ
১৬৯৬	শ্রী রাম ভদ্র চক্রবর্তী	আত্মবিক্রয়	৩.৫ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৭১৯	শ্রী বোদাইর স্ত্রী	১১ বছর বয়স্ক কন্যা	৩ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৭২১	শ্রী পার্বতী দাসী	কন্যা শ্রীমনি দাসী, বয়স-৬	৩ রুপিয়া	অনাহার
১৭২৮	শ্রী মুচিরাম চঙ্গ	আত্মবিক্রয়	১১ রুপিয়া	অনাহার
	শ্রীমতি তপী	-	-	-
	শ্রী পঞ্চা চঁঙ্গ	-	-	-
	শ্রী বারু চঙ্গ	-	-	-
	শ্রী রঞ্জিত চঙ্গ	-	-	-
	শ্রীমতি কালি চঙ্গ	-	-	-
১৭৩৫	শ্রী আত্মারাম বাগদী	শ্রীশ্যাম বাগদী ৮ বছর	৭ টঙ্কা	বলা হয় নি
১৭৩৭	শ্রী নন্দ রাম চন্দ্র	দাসের কন্যা	১ রুপিয়া	বলা হয় নি
১৭৫৪	শ্রী সদারাম শূদ্র	আত্মবিক্রয়	২১ রুপিয়া	দুর্ভিক্ষের
	শ্রী বামধন শূদ্র	-	-	ফলে
	শ্রীমতি মাধবী	-	-	অনাহার
	শ্রী বলিরাম শূদ্র	-	-	-
	শ্রীমতি রতনি	-	-	-

উৎস : (১) শিবরতন মিত্র, *Types of Early Bengali Prose*, (University of Calcutta 1922), 29-90.

(২) [illegible] প্রকাশন ১৯৬৪), ২৮৬-২৮৭।

(৩) তরিকুল আলম খান বাংলাদেশে দাস প্রথা; কতিপয় অপ্রকাশিত দলিল, Journal of Asiatic Society of Bangladesh Vol. III December 1985.

চিরাচরিত দাসত্বের তুলনায় বাংলায় দাসত্বের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। এইচ. এ. আর. গীব যথার্থই বলেছেন :

এ কথা মনে রাখতে হবে যে দাসরা ছিল প্রভুদের দেহরক্ষী অথবা ব্যক্তিগত ভৃত্য এবং দাসত্ব কোন অর্থেই মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। রোমান ভূস্বামীদের সাথে দাসদের যে সম্পর্ক ছিল অথবা আমেরিকায় খামারমালিকদের সাথে দাসদের যে সম্পর্ক ছিল তার চেয়ে মুসলমান মনিব ও ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি মনুষ্যত্বপূর্ণ। এর ফলে দাসত্ব ছিল অনেক কম কলঙ্কময়।[৭৩]

মুসলমান শাসিত বাংলায় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন দাসের পক্ষে অভিজাত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে কোন বাধা ছিল না। এর ফলে দাসরা সিংহাসনও দখল করতে পেরেছে। হান্টার বাংলার দাসদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (bonded labour) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৭৪] বেশিরভাগ দাসদের গার্হস্থ্য কাজে ব্যবহার করা হতো যদিও এদের মাঝে মাঝে কৃষিউৎপাদনেও কাজে লাগানো হতো। যেহেতু বড় খামারের পরিবেশে তারা কাজ করতো না, সেহেতু বাংলায় দাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করা হতো। ধ্রুপদী ধরনের অমানুষিক দাসত্ব বাংলায় ছিল অজানা। ক্রীতদাসীদেরকে বাড়িতে গৃহপরিচারিকা ও কখনো কখনো উপপত্নী হিসেবে সেবা করতে হয়েছে। ক্রীতদাসীদের যৌনদাসত্ব ছিল দাসত্বের একটি কালিমাময় দিক।

সারণি ৩-এ দেখা যাচ্ছে যে, দাসের দাম ছিল খুবই কম। এক্ষেত্রে দাসের মূল্য হলো একজন দাস সারাজীবন ধরে যে আয় করবে তার বর্তমান মূল্য। ইবনে বতুতার বিবরণ ও সারণি ৩ ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলায় দাসদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। এর অর্থ হলো, বাংলায় শ্রমিকের মজুরিও ছিল কম।

বাংলায় প্রকৃত মজুরি সম্পর্কে উপাত্ত অপ্রতুল। বাংলায় মজুরির হার সম্পর্কে তথ্যের অভাবে কোন কোন ঐতিহাসিক দিল্লীর মজুরিহারের ভিত্তিতে বাংলায় মজুরি অনুমান করার চেষ্টা করেছিলেন।[৭৫] প্রকৃত মজুরির হার হিসাব করার জন্য দিল্লীর মজুরিকে বাংলার দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, বাংলার তুলনায় দিল্লীতে আয় ও দ্রব্যমূল্য দু'টিই ছিল বেশি। ফলে দিল্লীর মজুরির হার ও বাংলার দ্রব্যমূল্য ব্যবহার করে এসব ঐতিহাসিক বাংলায় মজুরিহার দু'ভাবে বাড়িয়ে দেখিয়েছেন।

কিংবদন্তিখ্যাত মসলিনতাঁতিদের জীবন সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত করুণ। মসলিন ব্যবসায়ে তাঁতিরা লাভবান হতো না, লাভ করতো মূলত বিদেশী ব্যবসায়ীরা, তাদের দালালরা এবং সরকারি কর্মকর্তারা। আঠারো শতকের শেষদিকে জন টেইলর ঢাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, মসলিনের

৭৩. H. A. R. Gibb's "Introduction" in Ibn Batuta, *Travels*, 39.

৭৪. উদ্ধৃতি দেখুন, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা*, ২৭।

৭৫. Abdur Rahim, *History of Bengal*, 410-411 and Mohar Ali, *Muslims of Bengal*, 963.

দামের কমপক্ষে শতকরা বিশ ভাগ মুগল শাসকদের তত্ত্বাবধায়কদের কমিশন হিসেবে দিতে হতো।[৭৬] কারখানায় অবস্থানরত মুকিমরা মসলিন ব্যবসায়ীদের নিয়ত তত্ত্বাবধান করতো। কম দামে মসলিন তৈরি করার জন্য মুগল শাসকরা সবচেয়ে দক্ষ কারিগরদের বেঁচে থাকার মতো মজুরি দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করতেন। ফরাসী লেখক আবে রায়নাল বলেছেন যে, বাংলায় দক্ষ তাঁতি হওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ছিল, কারণ তাদের নগণ্য মজুরির বদলে কাজ করতে বাধ্য করা হতো।[৭৭] কাজেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, হিন্দু তাঁতিদের সবচেয়ে নিচু বর্ণে স্থান দেয়া হয়েছে। মুসলমান তাঁতিদের অবজ্ঞাভরে বলা হতো জোলা (যার অর্থ হচ্ছে বোকা)।

বাংলায় কাপড়ের মূল্য সম্পর্কে যেসব বিক্ষিপ্ত প্রমাণ রয়েছে, তা থেকে তাঁতিদের আয় সম্পর্কে কিছু অনুমান করা সম্ভব। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, সবচেয়ে ভালো কাপড়, যা প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা হতো, তা মাত্র দু'দিনারে বিক্রি হতো। বাংলায় বস্ত্রের উৎপাদনব্যয়ের কাঠামোর প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় যে, শ্রমের মজুরি কাপড়ের দামের শতকরা ১৭ হতে ৬০ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো (সারণি ৪ দেখুন)। তাঁতিরা মসলিনের সম্পূর্ণ দাম পেতো ও কোন কমিশন দিত না এবং শ্রমিকরা মসলিনের দাম শতকরা ৫০ ভাগ পেতো এ দু'টি অনুমান (দু'টি অনুমানে মজুরির হার বাড়িয়ে ধরা হয়েছে) প্রয়োগ করলে একখণ্ড মসলিন তৈরির মজুরি বড়জোর এক দিনার হবে। জন টেইলরের মতে, একখণ্ড সূক্ষ্ম মসলিন তৈরির জন্য একজন ওস্তাদ তাঁতি, একজন সহকারী ও একজন শিক্ষানবিসের এক বছর সময় লাগতো।[৭৮] শিক্ষানবিস কোন মজুরি পেতো না। সহকারী তাঁতি ওস্তাদ তাঁতির আয়ের ২৫ হতে ৫০ শতাংশ পেতো। ইবনে বতুতার সময় এক দিনারে ৮৭.৫ মণ চাল বিক্রয় হতো। ওস্তাদ তাঁতির বার্ষিক মজুরি খুব বেশি হলে ৫৭.৮ মণ হতে ৭০ মণ চাল হবে। সহকারী বছরে পেতো ১৭.৫ হতে ২৯.৭ মণ চাল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে ১৯৮৭-৮৮ সালে একজন দক্ষ বস্ত্রকারিগর ৪৫.৭ মণ চাল আয় করেছে।[৭৯]

চৌদ্দ শতকে বাংলার ওস্তাদ কারিগররা খুব বেশি হলে আজকের তাঁতিদের চেয়ে ২৬ থেকে ৫৩ শতাংশ বেশি আয় করতো। তবে খুব সম্ভবত চৌদ্দ শতকের ওস্তাদ কারিগরদের আয় আজকের দক্ষ তাঁতিদের মজুরির চেয়ে খুব বেশি হবে না।

৭৬. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন,* (ঢাকা ১৯৬৫), ১০৫।

৭৭. ঐ, ১০৬।

৭৮. ঐ, ১১০।

৭৯. চালের বাজারদাম চারটি শহরের দামের গড়ের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে এবং বস্ত্রশিল্পের দক্ষ কারিগরদের দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে মজুরি হিসাব করা হয়। দেখুন, *Statistical Pocket Book of Bangladesh*, 1989, (Dhaka 1989), 223-244.

সারণি ৪ : বাংলার বস্ত্রের খরচের কাঠামো

সন	প্রাক্কলনের উৎস	সুতার খরচ শতকরা হিসেবে	শ্রমের খরচ শতকরা হিসেবে
১৭৮৯ সালের পূর্বে	কে. এন. চৌধুরী	৬৩-৬৯	৩৭-৩০
১৭৮৯ সাল	কে. এন. চৌধুরী	৭০-৮৩	৩০-১৭
১৮০০ "	আবদুল করিম	৫০-৪০	৫০-৬০

উৎস : ১. প্রথম দু'লাইনের জন্য K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company,* (Cambridge, Cambridge University Press 1978), 267.

২. তৃতীয় লাইনের জন্য, আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন,* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৬৫), ১১০-১১১।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে যখন মসলিনের চড়া চাহিদা ছিল তখনো তাঁতিদের মজুরি ছিল খুবই কম। জন টেইলরের হিসেবে ১৭৬০ সালের দিকে একজন তাঁতি বছরে ১২ হতে ১৮ টাকা আয় করতো।[৮০] ১৭৫১-৫২ সালে টাকাপ্রতি চালের দাম ছিল ১.৪ হতে ১.৮ মণ।[৮১] চালের হিসাবে ঐ সময়ে একজন তাঁতি ১৩.৬ হতে ৩২.৪ মণ চাল বছরে উপার্জন করতো। এটি ইবনে বতুতার আমলে একজন তাঁতির সহকারীর আয়ের সমান। আরেকটি হিসাবে ১৭৬০ সালের দিকে সুতা কাটুনি ১৫ থেকে ৩০ টাকা (২১ হতে ৫৪ মণ চাল) বছরে আয় করতো।[৮২]

বাংলাদেশে মজুরির স্বল্পতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষও লক্ষ্য করেছেন। সতেরো শতক হতে মসলিনের দামের সাথে খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের খুবই নিবিড় ধনাত্মক সহগমন (correlation) লক্ষ্য করা গেছে। এর কারণ হিসেবে কোম্পানির কর্মচারীরা বলেছেন যে, তাঁতিরা কোনমতে বেঁচে আছে এবং খাদ্যের দাম বেড়ে গেলে মসলিনের দাম না বাড়িয়ে ওদের বেঁচে থাকা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে যখনি খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে তখনি মসলিনের দাম বাড়ে।[৮৩] ফরাসী ও বাঙালি শ্রমিকের মজুরিহারের সরাসরি তুলনা করে ১৭৩৫ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস লিখেছেন যে, ফরাসী শ্রমিকের মজুরির হার ভারতীয় শ্রমিকের মজুরির চেয়ে ছয়গুণ বেশি ছিল।[৮৪] অকৃষিমজুরদের মজুরিহারের স্বল্পতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বাংলার অর্থনীতিতে লক্ষ্য করা গেছে। ব্রুঁদেল মনে করেন যে,

৮০. দেখুন, আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন,* ১১১।

৮১. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা,* ৯০।

৮২. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন,* ১১২।

৮৩. K. N. Chaudhuri, *Trading World,* 112

৮৪. ঐ, 273.

"সতেরো ও আঠারো শতকে ভারতীয় পণ্যসমূহ ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ পণ্যের চেয়ে শুধু মান ও সৌন্দর্যের জন্যই নয়, মূল্যের জন্যও আকর্ষণীয় ছিল। আজকে একই কারণে হংকং ও কোরিয়ায় তৈরি বস্ত্র বিশ্বের বাজার ছেয়ে ফেলেছে।"[৮৫] শ্রমের নিম্নমজুরি থাকায় শ্রম বাঁচানোর জন্য কারিগরি পরিবর্তনের প্রয়োজন বাংলায় আদৌ অনুভূত হয় নি। পক্ষান্তরে বাংলার পণ্যের প্রতিযোগিতা বিলাতে কারিগরি পরিবর্তনের তাগিদ সৃষ্টি করে। কাজেই শিল্পবিপ্লব ছিল অংশত বাংলার সস্তা শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

উপসংহার

প্রাক-বৃটিশ আমলের বাংলা শাংগ্রিলার মতো স্বপ্নরাজ্য ছিল না। এ সমাজে সাধারণ প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের বেশিরভাগ লক্ষণই প্রকাশ পায়। এখানে জীবন ছিল দার্শনিক হবসের বর্ণিত নরকের মতো দরিদ্র, নোংরা, পাশবিক এবং হ্রস্ব। এ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ক্ষণভঙ্গুর এবং প্রকৃতির খেয়ালখুশিতে পরিচালিত। স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায় যে, এ সমাজে মাঝে মাঝে সাময়িক দুর্দশা দেখা গেছে। তথাকথিত সোনার বাংলায় তাই দুর্ভিক্ষ অজানা ছিল না। কিন্তু প্রাক-বৃটিশ বাংলায় দারিদ্র্য ক্ষণস্থায়ী ছিল না। এ সমাজে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্যের গহ্বর ছিল। দাসপ্রথার প্রচলন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সমাজে অনেক জনগোষ্ঠী ছিল অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থায়। তারা বার বার দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলার অর্থনীতির সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কেন সোনার বাংলার কিংবদন্তি এতদিন চালু রয়েছে? ঐতিহাসিকগণ বলবেন যে, সোনার বাংলা তাঁরা আবিষ্কার করেন নি। ইতিহাসের আকরসমূহে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ঐকমত্য রয়েছে। বাংলার প্রাচুর্য সম্বন্ধে কিংবদন্তি প্রচার করেছেন বিদেশী পর্যটকরা। এঁরা ছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ওয়াকিবহাল। চৌদ্দ শতকের ইবনে বতুতা হতে সতেরো শতকের ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের। মরক্কো, চীন, ইতালি, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের পর্যটকরা সকলে একই ধরনের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে বতুতার আমলে বাংলা 'উপহারে পূর্ণ নরক' (দোজখ-পুরে-নিয়ামত) বলে পরিচিত ছিল।[৮৬] নরক এজন্য যে, উত্তরের লোকেরা বাংলার আর্দ্র আবহাওয়াকে ঘৃণা করতো। বাংলা উপহারে পূর্ণ ছিল বাংলার অভূতপূর্ব প্রাচুর্যের জন্য। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের সতেরো শতকে বাংলায় দু'বার এসেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলা মিশরের চেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, অথচ মিশরকে প্রতিযুগে সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে উৎপাদনশীল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বার্নিয়ের

---

৮৫. Francis Braudel, *The Perspective of the World, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century*, Vol 3, translated by Sian Reynolds, (New York 1982), 521

৮৬. Ibn Batuta, *Travels*, 267

লিখেছেন, "বাংলার অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের সমৃদ্ধি এবং বাংলার ললনাদের সৌন্দর্য ও শান্ত স্বভাব পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে কিংবদন্তির জন্ম দেয় যে, "বাংলায় আগমনের জন্য শত শত তোরণ আছে, কিন্তু নির্গমনের জন্য একটি তোরণও নেই।"[৮৭] বাংলার সমৃদ্ধি সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন চৌদ্দ ও পনেরো শতকের চৈনিক পর্যটকরা এবং সতেরো শতকের ভেনিসীয় পর্যটকরা।

স্বাভাবিকভাবেই এতগুলো অকাট্য সাক্ষ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে না। তবু দু'টি কারণে এসব বিবরণের ব্যাখ্যা পুনর্মূল্যায়নের অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দু'ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে : অনাপেক্ষিক সমৃদ্ধি ও আপেক্ষিক সমৃদ্ধি। এক্ষেত্রে আপেক্ষিক সমৃদ্ধির তাৎপর্য এই যে, সমসাময়িক অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলা সমৃদ্ধতর ছিল। অনাপেক্ষিক সমৃদ্ধির অর্থ এই যে, এ সমাজে দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য অনুপস্থিত ছিল। কোন প্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই শুধু যুক্তির ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট যে, কোন প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজে অবাধ সমৃদ্ধি বিরাজ করতে পারে না। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ পাঠ করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা বাংলার আপেক্ষিক সমৃদ্ধির কথা বলেছেন, অনাপেক্ষিক সমৃদ্ধির কথা বলেন নি। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলা সমৃদ্ধ ছিল এ ধারণা সমর্থন করার কারণ রয়েছে। বাংলায় জলের প্রাচুর্য ছিল। এখানে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে খরা অনেক কম ধ্বংসাত্মক ছিল। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বৃটিশ শাসনামলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় দুর্ভিক্ষ কম হয়েছে।[৮৮] দ্বিতীয়ত, এ কথা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, ঐতিহাসিক আকরসমূহে দারিদ্র্যের সঠিক প্রতিফলন পাওয়া যাবে। রবার্ট চেম্বারস যথার্থই বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়েও গ্রামীণ দারিদ্র্যকে রীতিমত কম করে দেখানো হচ্ছে।[৮৯] "দরিদ্র পরিবারগুলো কেন্দ্র হতে দূরে থাকে, থাকে শহর থেকে দূরে, গ্রামের এক প্রান্তে অথবা বড় রাস্তা থেকে দূরে।"[৯০] চেম্বার্সের বক্তব্য তাই যথার্থ যে, পক্ষপাত দূর করার সচেতন প্রয়াস না থাকলে 'পল্লীউন্নয়ন পর্যটনে'র ফলে দারিদ্র্যের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।[৯১] পর্যটকরা শুকনো মওসুমে যখন মওসুমি দারিদ্র্য সবচেয়ে কম থাকে, তখন বড় বড় রাস্তা দিয়ে পৌরকেন্দ্রসমূহে চলাফেরা করেন। এর ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য কম করে দেখানো হয়। এটা আশা করা অযৌক্তিক যে, আজকের পেশাদার পল্লীউন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা যা করতে পারেন না তা মধ্য ও প্রাচীন যুগের পর্যটকরা করতে পারতেন।

৮৭. Francois Bernier, *Travels*, 439.

৮৮. উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৫০-১৯৫৭ সালে বাংলায় পাঁচটি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, কিন্তু বোম্বে প্রদেশে এ সময়ে দশটি দুর্ভিক্ষ হয়েছে। দেখুন, D. Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India*. Vol. II, (Cambridge 1983), 528-530.

৮৯. Robert Chambers, *Rural Poverty Unperceived: Problems and Remedies*, (Mimeo), World Bank Staff Working Paper No. 400, 1980, 2.

৯০. ঐ, 6

৯১. ঐ।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার অর্থনীতির দুর্বলতাসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় শুধু নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য বিরাজমান ছিল। এ সমাজে দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি পাশাপাশি দেখা যেতো। প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজে যারা সচরাচর প্রাপ্ত ফসলে ভালভাবে জীবন কাটাতে পারতো তারাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়তো।

ঐতিহাসিক এবং পর্যটকদের বিবরণের তুলনায় সাহিত্যে প্রাক-বৃটিশ বাংলার জীবন অনেক বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি পাশাপাশি বিরাজ করতো। *সদুক্তিকর্ণামৃত*-তে যেমন রয়েছে নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনা, তেমনি রয়েছে কৃষকের জীবনের অপরিমেয় আনন্দের কথা। *সদুক্তিকর্ণামৃতের* দু'টি পরস্পরবিরোধী শ্লোক নিম্নরূপ :

> "শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, তাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ, আত্মীয়-স্বজনেরা মন্দোদর, পুরাতন ভগ্ন জলপাত্রে এক ফোটা জল ধরে, গৃহিণীর পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র।"

> "বর্ষার প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে। ইক্ষুর সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে। অন্য কোন ভাবনা আর নাই। ঘরে গৃহিণী সারাদিন প্রসাধনরতা। বাহিরে আকাশ হইতে জল ঝরিতেছে প্রচুর। গ্রাম্য যুবক সুখে নিদ্রা যাইতেছে।"[৯২]

অনুরূপ পরস্পরবিরোধী চিত্র চন্দ্রাবতীর *মলুয়াতে* দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় চাঁদবিনোদের ঘরে খাদ্য ছিল না। মলুয়ার বাড়িতে এধরনের কোন অভাব দেখা যায় না, সেখানে চাঁদবিনোদের সম্মানে বড় ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।[৯৩]

এ কথা সত্য যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলার সমাজ আদৌ সমতাবাদী ছিল না। ধনবৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিবেশে দাসত্ব টিকে থেকেছে। প্রাক-বৃটিশ বাংলার দাসত্বকে মূলধারাবহির্ভূত প্রবণতা বলে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। দাসত্ব শুধু বাইরে থেকে আমদানিকৃত দাস বা জলদস্যুদের অভিযানের শিকারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সতেরো ও আঠারো শতকের দাসবিক্রয়ের দলিলসমূহ প্রমাণ করে যে, দাসপ্রথা সমাজের মূলধারায় প্রোথিত ছিল। এ কথা সত্য যে, বাংলায় দাসদের প্রধানত ঘরের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, ক্রীতদাসীরা পরিচারিকা ও উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল দাসত্ব, সেসব সমাজের তুলনায় বাংলায় দাসদের সঙ্গে অনেক বেশি মানবিক ব্যবহার করা হতো। তবু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় দাসত্বের অস্তিত্ব এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ সমাজে অনেক দরিদ্র লোক ছিল, যারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় অক্ষম ছিল।

৯২. উদ্ধৃত, নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙলার ইতিহাস*, ১৯৭।

৯৩. চন্দ্রাবতী, "মলুয়া" *ময়মনসিংহ গীতিকা*, ৪২-৪৬ এবং ৫৬-৫৭।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় যে, প্রাক-বৃটিশ বাংলায় মজুরির হার ছিল খুবই কম। তাঁতিদের দারিদ্র্য সম্পর্কে যেসব পরিমাণগত ও বর্ণনামূলক বিবরণ পাওয়া যায় সেসব এ অনুমানই সমর্থন করে। তবে নিম্নহারে মজুরি শুধু তাঁতিদের মধ্যেই চালু ছিল না। সম্ভবত এ ধরনের অর্থনীতি, যেখানে জীবনধারণের সর্বনিম্ন পর্যায়ের আয় ছিল, সেখানে সকল শ্রমিকেরই মজুরি ছিল কম। এর অর্থ হলো, বাংলার জাঁকালো বহির্বাণিজ্যের সুফল ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

দু'টি কারণে বাংলার বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে চিরাচরিত ব্যাখ্যা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রথমত দেখা যাচ্ছে যে, তাঁতিরা তাদের কাপড়ের পুরো দাম পেতো না। কাপড়ের দামের একটা বড় অংশ আদায় করতো মধ্যস্বত্বভোগীরা, সরকারের তত্ত্বাবধায়করা ও বিদেশী বণিকের দালালরা। মধ্যস্বত্বভোগীরা ও বিদেশী বণিকরাই প্রধানত বাংলার বহির্বাণিজ্যের মুনাফা লুটেছে। দ্বিতীয়ত তারা কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে সোনা-রূপা আমদানি করতো। বেশিরভাগ আমদানিকৃত সোনা-রূপা দিল্লীতে রাজস্ব হিসেবে পাঠানো হতো, অবশিষ্ট গোপনে মজুদ করা হতো। প্রাক-বৃটিশ বাংলার বহির্বাণিজ্য তাই প্রবৃদ্ধির যন্ত্র ছিল না, এ বাণিজ্যই ছিল সম্পদপাচারের মাধ্যম।

তথাকথিত সোনার বাংলায় দৈনন্দিন কাজে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করা হতো না। সাধারণ লোক বাড়িতে আয় করতো, ক্রয় করতো এবং বিক্রয় করতো। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায় খাজনা দেয়া হতো। কিংবদন্তির সুলভ মূল্য পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ থেকে হয় নি, হয়েছে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে প্রাক-বৃটিশ বাংলায় সুলভ মূল্য সমৃদ্ধির নয়, দুর্দশার নিদর্শন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সোনার বাংলা আপেক্ষিক অর্থে 'সোনালী' ছিল না। প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের সকল দুর্বলতাই প্রাক-বৃটিশ বাংলাতে উপস্থিত ছিল। প্রাক-বৃটিশ বাংলা সমসাময়িক অন্যান্য সমাজের তুলনায় সচ্ছল ছিল—এ অনুমান প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অবশ্য এ সম্পর্কে প্রাপ্ত সাক্ষ্য বর্ণনামূলক ও দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তাই প্রাক-বৃটিশ ভারত শিল্পবিপ্লবের পূর্বকালে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের তুলনায় সচ্ছল ছিল কিনা এ সম্পর্কে বিতর্ক চলছে।[৯৪] উপাত্তের অপ্রতুলতা ছাড়াও এ ধরনের তুলনায় প্রণালীগত জটিলতা রয়েছে।[৯৫] সোনার বাংলার আপেক্ষিক ভাষ্য সম্পর্কে তাই আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৯৪. উপরোক্ত বিষয়ে বিতর্ক সম্পর্কে দেখুন, Morris D. Morris,"Towards a Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History", *Journal of Economic History*, XXIII: 4 (1963), 607-618 এবং Tapan Ray Chaudhri, "A Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History", *Indian Economic and Social History Review*, V (1958), 77-100.

৯৫. প্রণালী সংক্রান্ত সমস্যাবলীর আলোচনার জন্য দেখুন, J. D. Gould, *Economic Growth in History*, (London 1972), 14-21.

৭

মুগল রাজস্বব্যবস্থা

আবদুল করিম*

মুগল রাজস্বনীতি প্রণীত হয়েছিল দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে—যতোটুকু সম্ভব বেশি রাজস্ব আদায় করা এবং একই সঙ্গে চাষীদের সুখে রাখা যেন তারা আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করতে পারে এবং বেশি পরিমাণে চাষাবাদে সক্ষম হয়। চাষীদের মঙ্গলের উপরেই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে—এই প্রত্যয় মুগল সম্রাটের স্বীকৃতি লাভ করে। মুগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর সর্বপ্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরাও এই নীতি অনুসরণ করেন। *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে আমলগুজার বা রাজস্বসংগ্রাহক কর্মকর্তা সম্পর্কে একটি পৃথক আইন লিপিবদ্ধ আছে। এতে আমলগুজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অন্যান্য নির্দেশের মধ্যে একস্থানে বলা হয়েছে :

> আমলগুজার হবেন চাষীদের বন্ধু ; সত্যবাদিতা এবং চাষীদের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের সাহায্য করার আগ্রহই হবে তাঁর কর্মপদ্ধতির আদর্শ। তিনি নিজেকে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করবেন এবং তিনি এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবেন (অফিস বা দপ্তর স্থাপন করবেন) যেখানে সকলে সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং কৃষককে কোন মধ্যস্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না হয়।[১]

সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থেও চাষীদের কল্যাণের কথা সর্বত্র পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের ফরমানেও এই একই নীতির বক্তব্য পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, তাদের চাষাবাদে সাহায্য করতে হবে এবং উৎসাহ

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খণ্ড, জেরেট এবং সরকার কর্তৃক অনূদিত ও সংশোধিত, দিল্লীর পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৮, অতঃপর '*আইন ২য়*' রূপে উল্লেখিত, ৪৬।

দিতে হবে।[২] আকবরের অনুসৃত মূলনীতির মধ্যে ছিল (ক) ভূমি জরিপ করা এবং জমির পরিমাণ নির্ধারণ, (খ) কর্ষিত এবং চারণভূমির পার্থক্য নিরূপণ এবং সেই হিসেবে নথিভুক্তকরণ, (গ) উর্বরতার ভিত্তিতে কর্ষিত ভূমির প্রকারভেদ নিরূপণ এবং সেই অনুপাতে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ এবং নির্ধারিত রাজস্ব নগদ টাকা বা শস্যে আদায়ের ব্যবস্থাগ্রহণ। এই নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিকে আবার খালিসা ও জাগিরে বিভক্ত করা হয়; খালিসা থাকতো সরকারের এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং জাগিরভূমি পদস্থ কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার বিনিময়ে তাঁদের অধীনে দেয়া হতো। মোটামুটিভাবে এই মূলনীতিগুলি আকবরের পরবর্তী শাসকদের সময়েও প্রচলিত ছিল; কিন্তু বাস্তবে এই নীতিগুলি সর্বত্র বা সকল সময়ে পালিত হতো কিনা বা পালিত হলেও সর্বক্ষেত্রে অনুরূপ ছিল কিনা বলা কঠিন।

সুবা বাংলায় মুগল রাজস্বব্যবস্থাও আকবরের সময়ে প্রবর্তিত হয়, কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। *আইন-ই-আকবরীতে* রাজস্বব্যবস্থার একটি কাঠামো পাওয়া যায়। আবুল ফজল এতে সুবা বাংলাকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগনা বা মহালে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক পরগনা বা মহালের রাজস্ব 'দাম'[৩] -এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজস্বকাঠামো টোডর মল্লের বন্দোবস্ত নামে ১৫৮২ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত হয়। আবল ফজল বলেন, সুবা বাংলায় ২৪টি সরকার ও ৭৮৭টি মহাল আছে। এই সুবার রাজস্বের পরিমাণ ৫৯,৮৪,৫৯,৩১৯ দাম (বা ১,৪৯,৬২,০০ টাকা)।[৪]

উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে উড়িষ্যাও অন্তর্ভুক্ত, কারণ ঐ সময়ে উড়িষ্যাও সুবা বাংলার অঙ্গীভূত ছিল। উড়িষ্যায় ছিল ৫টি সরকার এবং ৯৯টি মহাল এবং এর রাজস্ব ছিল ১২,৫৭,৩২,৬৩৮ দাম। অতএব উড়িষ্যা বাদ দিলে বাংলায় ছিল ১৯টি সরকার এবং ৬৮৮টি মহাল এবং রাজস্ব ছিল ১,১৮,১৮,১৬৭ টাকা। ১৫৮২ সালে টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সময় সারা বাংলায় মুগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি, শুধু পশ্চিম অঞ্চলের কিছু অংশে মুগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ টোডর মল্লের বন্দোবস্ত নামে কথিত এবং *আইন-ই-আকবরীতে* বিধৃত রাজস্বব্যবস্থা সারা সুবা বাংলার জন্যই প্রণীত হয়। তাই আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত একটি সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত সম্পাদিত দলিল। এটা আসলে প্রাক-মুগল যুগের দলিলপত্র অবলম্বনে রচিত এবং এতে

২. *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৯০৬, ২৩৩-২৫৬।

৩. 'দাম' এক ধরনের তাম্রমুদ্রা, ৪০ টির মূল্য এক টাকা হতো।

৪. *আইন, ২য়*, ১৪১।

প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয় না।[৫] *আইন-ই-আকবরীর* রাজস্বসারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, রাজস্ব ছিল দুই প্রকার—মাল এবং সায়ের।[৬] মাল অর্থ ভূমিরাজস্ব, কিন্তু সায়ের ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। সায়ের দ্বারা ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্য সব রকম করকে বোঝায়। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দোকানপাট বা কেনা-বেচার উপর আরোপিত কর, নদী, খাল, বিল, পুকুরের উপর বা মৎস্যসম্পদের উপর আরোপিত কর, লবণ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং হাতির উপর নির্ধারিত কর। *আইন-ই-আকবরীতে* কোন কোন মহালে জাকাতেরও উল্লেখ আছে। আরো গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, লবণকর শুধু সরকার ফতেহাবাদ এবং সরকার চট্টগ্রামেই আরোপিত, কিন্তু এই সরকারদ্বয়ের কোনটিই টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সময় মুগল অধিকারে ছিল না। অন্যান্য

৫. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, W. H Moreland, *Agrarian system of Modern India*, (Allahabad 1929), 196.

৬. ব্লখম্যান সম্পাদিত ও জেরেট কর্তৃক অনূদিত এবং যদুনাথ সরকারের সংশোধিত গ্রন্থে এই শব্দের উল্লেখ নেই। ইরফান হাবিব বলেন : "...ব্লখম্যানকৃত 'আইন'-এর প্রামাণ্য সংস্করণের একটি ভুল কারও নজরে পড়ে নি। এই ভুলের দরুন পরিসংখ্যানগত তথ্যের মারাত্মক ভুল উপস্থাপিত হয়েছে। সবচেয়ে ভাল পাণ্ডুলিপিগুলিতে 'বারোটি প্রদেশের বিবরণ'-এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান মূলে সারণির আকারে দেওয়া ছিল। ব্লখম্যানের সংস্করণে, সম্ভবত ছাপার সুবিধার জন্য, সেটি হুবহু সেইভাবে দেয়া হয় নি। ব্লখম্যান শুধু মূল সারণির স্তম্ভগুলিকেই বাদ দেন নি, বিনা ব্যাখ্যায় স্তম্ভশীর্ষকও বাদ দিয়েছেন। তাই তাঁর পাঠকদের জানার কোন উপায় নেই যে প্রতি পরগনার পাশে যেসব 'কওম' (গোষ্ঠী, জাত)-এর নাম দেয়া আছে সেগুলি আসলে জমিদার (পাণ্ডুলিপিতে কখনও কখনও 'বুমী') শীর্ষক একটি স্তম্ভের। কার্যত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বেরার ও খান্দেশ—এই পাঁচটি প্রান্তিক ছাড়া, সরাসরি প্রশাসনভুক্ত অঞ্চলের প্রত্যেক পরগনা সম্বন্ধেই এই স্তম্ভের নিচে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। শুধু এই পাঁচটি প্রদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশের করদপ্রধানশাসিত অঞ্চলে 'পরগনার' পাশে কিছু লেখা নেই। সাধারণত, গোটা 'সরকার'-এর ক্ষেত্রেই জমিদারদের বিভিন্ন 'কওম' নির্দিষ্ট করা আছে।" (ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা*, কলকাতা ১৯৮৫, ১৪৮)। টীকায় ইরফান হাবিব আরো বলেন : "মূল সারণিগুলিতে আটটি স্তম্ভ আছে, শীর্ষকগুলি এই : 'পরগনাত' (পরগনা), 'কিলা' (দুর্গ) 'নগদী' (নগদ টাকায় নির্দিষ্ট রাজস্ব), 'সুয়ুরগাল' (রাজস্ব ও নগদ অনুদান), 'জমিদার' (বুমী), 'সওয়ার' (ঘোড়সওয়ার বাহিনী) এবং 'পিয়াদা' (পদাতিক) ব্লখম্যানের সংস্করণে 'সুয়ুরগাল', 'সওয়ার' এবং 'পিয়াদা' ছাড়া বাকি সবই বাদ গেছে। সংক্ষেপে এগুলির শুধুমাত্র আদ্যক্ষর এবং প্রতি পরগনার নামের পাশে সেই পরগনার অঙ্কগুলি দেয়া আছে। মূল সারণিগুলির ক্ষেত্রে ব্লখম্যানের হাতে যে বিভ্রান্তির সূচনা, জ্যারেটের অনুবাদে তা আরো বেড়েছে (২য় খণ্ড, সম্পা. যদুনাথ সরকার, ১২৯)। তিনি আরও খামখেয়ালিভাবে স্তম্ভ ও শীর্ষকগুলির পুনর্বিন্যাস করেছেন। 'জমিদার' শীর্ষকটির জায়গায় তিনি বসিয়েছেন 'কাস্টস' (বর্ণ) এবং মূল সারণির স্তম্ভের ষষ্ঠ স্থান থেকে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন একেবারে শেষে; আর ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক স্তম্ভ দু;টির অঙ্কগুলিকে বসিয়েছেন 'রাজস্ব' স্তম্ভের ঠিক পরে।" ঐ, টীকা নং ৪।

উপকূলীয় সরকারে, যেমন খলিফতাবাদ এবং বাকলায়ও নিশ্চয়ই লবণ উৎপন্ন হতো, কিন্তু এই সরকারগুলির রাজস্ববিবরণে লবণের উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে জাকাতের উল্লেখ আছে শুধু সরকার তাজপুর, ঘোড়াঘাট এবং সোনারগাঁয়ে। কিন্তু মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে মুসলিম সমাজ সারা বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করে এবং জাকাতও সকল সরকারে নির্ধারিত হওয়ার কথা। ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার, দোকানপাট, নদী, খাল-বিলের কর অর্থাৎ সায়ের সকল সরকারে উল্লেখিত নেই। এতেও মনে করা যায় যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তে বেশ ফাঁক রয়েছে এবং আগেই বলা হয়েছে যে, এই বন্দোবস্ত বাস্তব অবস্থার নিরিখে নির্ণীত হয় নি, বরং প্রাপ্ত পুরাতন দলিলপত্রের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়।

কিন্তু টোডর মল্লের বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের এবং সম্রাটদের কাছে দিশারীরূপে গণ্য হয়, কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে এটিই ছিল একমাত্র দলিল। সারা বাংলা বিজিত হওয়ার পরেও এই বন্দোবস্ত পরবর্তী পদক্ষেপের ভিত্তিরূপে কাজ করে। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে আধুনিককালে আলোচনার জন্যও টোডর মল্লের বন্দোবস্ত মূল ভিত্তিরূপে গণ্য হয়। *আইন-ই-আকবরীতে* বন্দোবস্তের যে রূপরেখা পাওয়া যায়, তাতে বন্দোবস্তের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না।

প্রশ্ন উঠে, বন্দোবস্ত কি জমিদারদের সঙ্গে করা হয়, নাকি রায়তদের সঙ্গে করা হয়? *আইন-ই-আকবরীতে* প্রাপ্ত মহালগুলি এভাবে বিভক্ত ছিল—(ক) কতকগুলি মহাল শুধু স্থানের নাম বোঝায়, (খ) কতকগুলি মহাল ব্যক্তির নামে তালুক হিসেবে চিহ্নিত, (গ) কতকগুলি মহাল সায়ের নামে উল্লেখিত, (ঘ) কতকগুলি মহাল রায়তি নামে চিহ্নিত এবং (ঙ) কতকগুলি আবার জাকাতমহাল। কিন্তু *আইন-ই-আকবরীর* সরকার ইউনিটের সারণির শিরোনামে জমিদার (ভূমি বা ভৌমিক বা ভূঁইঞা) এবং তাঁদের গোত্রের নাম লিখিত আছে এবং আবুল ফজল বলেন যে, বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই কায়স্থ গোত্রভুক্ত।[৭] সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, যেসব মহালে তালুকদারি বা রায়তি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নেই, সেসব মহালে সায়ের ও জাকাত মহালগুলি বাদ দিয়ে বাকি মহালগুলি জমিদারদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত হয়। *আইন-ই-আকবরীর* জমিদাররা ছিলেন অনেকেই সামন্ত প্রভু; এই সামন্তরা প্রাক-মুসলিম এবং প্রাক-মুগল যুগ থেকে বংশপরম্পরায় জমিদারিস্বত্ব ভোগ করেছেন। তালুকদারেরাও ভূমির মালিকানা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবে তারা সামন্ত নৃপতি ছিলেন না। জমিদারি ও তালুকদারি মালিকানাস্বত্বের পার্থক্য পরে আলোচনা করা হবে। *আইন-ই-আকবরীতে* সরকার সোনারগাঁ এবং সরকার সিলেটে মাত্র তিনটি রায়তি মহাল দেখানো হয়েছে। এই রায়তি মহালগুলি অবশ্যই রায়তদেরকে প্রত্যক্ষভাবে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। টোডর মল্লের বন্দোবস্তে সোনারগাঁ এবং সিলেটে রায়তি

৭. *আইন, ২য়,* ১৪১

মহালের অবস্থিতি এও প্রমাণ করে যে, এই বন্দোবস্ত পুরাতন দলিলের সাহায্যে তৈরি হয়। কেননা এ দু'টি সরকার ১৫৮২ সালে মুগল অধিকারে আসে নি। সুতরাং *আইন-ই-আকবরীতে* প্রাপ্ত মহালগুলি, জমিদারি, তালুকদারি বা রায়তি যাই হোক না কেন, প্রাক-মুগল সরকারের অধীনে বর্তমান ছিল—এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

টোডর মল্লের বন্দোবস্তে প্রদত্ত রাজস্বের অঙ্ক কি রাজস্বের মূল্যমান (valuation) বোঝায়, না রাজস্বের দাবি (demand) বোঝায় এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। এই প্রশ্নে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। জেমস গ্রান্ট এই বন্দোবস্তাধীন রাজস্বের অঙ্ককে রাজস্বদাবি মনে করেন এবং সুবা বাংলার মুগল রাজস্বের আনুপূর্বিক ধারা নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করেন :

১. ১৫৮২ সালে টোডর মল্ল কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্বদাবি বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করেন এবং তাঁর দেয়া রাজস্বের অঙ্ক (revenue figures) গড়পড়তা উৎপন্নশস্যের এক-চতুর্থাংশ নির্ধারিত হয়। টোডর মল্ল রাজস্বদাবির মান নির্ধারণ করেন এবং সেই হিসাবে জমিদারেরা কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করেন। জমিদারেরা ছিলেন বার্ষিক হিসাবে মধ্যস্বত্বভোগী (annual contracting farmers), তাঁরা রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে কমিশন বা ভাতা পেতেন, তাঁদের এই কমিশন বা ভাতা কোন সময়েই রাজস্বদাবির এক-দশমাংশের বেশি হতো না।

২. ১৬৫৮ সালে শাহ শুজা টোডর মল্লের রাজস্বদাবি পুনর্নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই পুনর্নির্ধারণে টোডর মল্লের মূল ভিত্তি পরিবর্তন করা হয় নি, কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয় যার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, ইতিমধ্যে বিজিত কিছু এলাকার রাজস্বদাবি সংযোজন করা হয়, অথবা অন্য সুবার কিছু অংশ সুবা বাংলায় স্থানান্তর করা হয়।

৩. ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খান রাজস্বদাবি পুনর্নির্ধারণ করেন।

৪. মুর্শিদকুলী খানেব উত্তবসূরিগণ জমিদারদের উপর অতিরিক্ত কর আবওয়াব বা সেসের আকারে আরোপ করেন, কিন্তু মূল রাজস্বদাবি অপরিবর্তিত থাকে।[৮]

সুতরাং জেমস গ্রান্ট টোডর মল্লের বন্দোবস্ত বা *আইন-ই-আকবরীতে* প্রাপ্ত রাজস্ব-অঙ্ককে রাজস্বদাবিরূপে গণ্য করেন। কিন্তু আমরা উপরে বলেছি যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত প্রাক-মুগল যুগের দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত রাজস্বব্যবস্থা। সুতরাং তা রাজস্বদাবি না হয়ে রাজস্বমান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মোরল্যান্ডও মনে করেন যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বের অঙ্কগুলি আসলে রাজস্বমান (valuation), রাজস্বদাবি (demand) নয়। তিনি বলেন[৯] :

> আমার মতে গ্রান্টপ্রদত্ত প্রথমদিকের রাজস্ব-অঙ্কগুলির সম্ভাব্য পাঠ হবে রাজস্বমান; তিনি যে দলিলগুলি ব্যবহার করেন সেগুলিতে রাজস্বমান দেয়া ছিল, রাজস্বদাবি নয়।...বাংলা ও অন্যান্য

---

৮. মোরল্যান্ডের সারসংক্ষেপ মত, দেখুন, Moreland, *Agrarian System*, 195.

৯. ঐ, ১৯৬-৯৭।

প্রদেশের জন্য *আইন-ই-আকবরীতে* প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলি রাজস্বমান, রাজস্বদাবি নয়। দলিলগুলি প্রণয়নের সময় টোডর মল্ল রাজস্বমানই পান, রাজস্বদাবি পান নি। বাংলা তখন মাত্র বিজিত হচ্ছে, এই সময়ে টোডর মল্ল রাজস্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পান। সুতরাং এই সময়ে টোডর মল্ল বা তাঁর অধস্তন কর্মকর্তারা যা কিছু পুরনো দলিলপত্র পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে রাজস্বের পরিসংখ্যান বা অঙ্ক লিপিবদ্ধ করেন। এই দলিলগুলি খুব সম্ভব প্রাক-মুগল সরকারের ছিল। এমন সম্ভাবনা এই কারণে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে, যেসকল এলাকা আকবর কর্তৃক অধিকৃত হয় নি সেসকল এলাকা, বিশেষকরে পূর্ববঙ্গের এলাকাসমূহে টোডর মল্লের পক্ষে রাজস্ব নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রামের কথা উল্লেখ করা যায়। চট্টগ্রামের রাজস্ব নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিজিত হবে এই আশায় প্রাক-মুগল যুগের সরকারের নথিপত্রের সাহায্যে এই রাজস্বমান নির্ধারণ করা হয়। গ্রান্ট যেভাবে মনে করেন যে টোডর মল্ল বিস্তারিতভাবে রাজস্বনির্ধারণ করেছিলেন, সেইরূপ করা টোডর মল্লের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর ছিল না।[১০]

মির্জা নাথন রচিত *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* জাহাঙ্গীরের আমলের মুগল নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ইহতিমাম খানের জাগির সম্পর্কে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই তথ্যে রাজস্ব সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও এতে বোধ হয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বসূচক সংখ্যাগুলি রাজস্বদাবি নয়, বরং রাজস্বমান। ইহতিমাম খান নৌবাহিনী পরিচালনার জন্য তাঁর নাবিকদের বেতনের পরিবর্তে জাগির লাভ করেন। এই জাগির হলো পরগনা জাহানাবাদ, তনবুলক (তমলুক) ও উড়িষ্যা এবং বর্ধমান ও মেদিনীপুরের নিকটবর্তী আরো কয়েকটি পরগনা। এ ছাড়া সোনা বাজু, ভাতুরিয়া বাজু ও কলাবরী পরগনা এবং ভাটী ও ঘোড়াঘাটের আরো কয়েকটি স্থান তিনি জাগির হিসেবে পান। তাঁর জাগিরে মোট মহালের সংখ্যা ছিল ২২টি।[১১] এই মহালগুলির মধ্যে কয়েকটিতে মুগল কর্তৃত্ব ছিল তখনও খুব ক্ষীণ। ভাটীতে মুগল কর্তৃত্ব তখনও

১০. টোডর মল্লের দলিলগুলি প্রাক্-মুগল সরকারের। তিনি এইগুলি দাউদ কররানীর মন্ত্রী শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য) এবং তাঁর ভাই বসন্ত রায় ও শিবানন্দের কাছ থেকে লাভ করেন। বসন্ত রায় ছিলেন দাউদ কররানীর খালিসা বিভাগের কর্তা এবং শিবানন্দ ছিলেন কানুনগো বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। রাম রাম বসুর *প্রতাপাদিত্য চরিত*-এ এই বিষয়ে সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। বসুর বইখানি যোগাড় করতে অসমর্থ হওয়ায় আমরা এখানে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ইংরেজি অনুবাদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

From *Pratapaditya Charita* it would appear that when Daud entrenched himself at Rajmahal, Srihari and his brother concealed themselves as *Sanyasis* and remained in hiding somewhere in North Bengal. Todar Mal and Khan Jahan (called Omrao Sing by Basu) in the meantime encamped at Rajmahal. Thence they advanced on Gaur which was plundered but failed to yield a rich booty. Then they proclaimed that anyone giving any important state information would be rewarded and would be re-instated in the post he used to hold in the government of Daud. Srihari and his brother thereupon went to Rajmahal and sent a secret agent to Todar Mal and Khan Jahan and met them on assurance of safety The brothers surrenderd all state papers and necessary information on condition that their rights and possessions in the Kingdom of Jessore between the Brahmaputra on the east and the Bhagirathi on the west would not be disturbed. "Bengal Chief's Struggle for Independence" in *Bengal : Past and Present*, XXVI: part I (1928), 16.

১১. Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi* (hereafter referred to as *Baharistan)*, Government of Assam, 1936, Vol. I, 12-13.

স্থাপিত হয় নি। ইহতিমাম খানের লোকজন (পরগনার রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তাবৃন্দ) বিস্তর যুদ্ধের পর সোনা বাজু পরগনার কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই ঘটনা *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* লিপিবদ্ধ আছে।[১২] সুতরাং ইহতিমাম খানকে জাগির প্রদানের সময় এই মহালগুলি জরিপ করা সম্ভব হয় নি এবং এর রাজস্বদাবিও নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। অতএব বলা যেতে পারে যে, এই মহালগুলি টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তিতেই ইহতিমাম খানকে জাগির হিসেবে দেয়া হয়। মির্জা নাথন আরো বলেন :

> এক রাত্রে ইহতিমাম খানের নৌবহরের নাবিকেরা পালিয়ে যায়,কারণ তারা অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছিল। কেননা দীউয়ান ইতিকাদ খান তাদের পাওনা পরিশোধ করে নি এবং সুবাদার ইসলাম খানও দীউয়ানকে নাবিকদের পাওনা পরিশোধ করতে নির্দেশ দেন নি। সকালে দেখা যায় যে, যুদ্ধ ও পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত মোট ৩০০ নৌকার জন্য মাত্র ৭০০ নাবিক উপস্থিত ছিল।[১৩]

উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, যুদ্ধ ও পরিবহনের জন্য ইহতিমাম খানের মোট ৩০০টি নৌকা ছিল। কিন্তু বলা হয় যে, দীউয়ান নাবিকদের পাওনা পরিশোধ না করায় আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে নাবিকরা পালিয়ে যায়। এই উক্তিটির তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ নয়। ইহতিমাম খানকে তাঁর নৌবহর পরিচালনার জন্য ২২টি মহাল জাগির দেয়া হয়। *বাহরিস্তানে* বলা হয়েছে, এই জাগির তাঁর লোকদের (অর্থাৎ নাবিকদের) বেতনের পরিবর্তে দেয়া হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠে, দীউয়ান কেন তাদের পাওনা পরিশোধ করবেন ? পাওনা পরিশোধ করার দায়িত্ব ইহতিমাম খানেরই। এই একই বিষয়ে আলোচনার জের টেনে মির্জা নাথন বলেন যে, ইহতিমাম খান দীউয়ান এবং সুবাদারের কাছে তাঁর নাবিকদের জন্য রসদ দাবি করেন। রসদ দাবি করার বিষয়টিও বোধগম্য নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, নৌবাহিনী পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইহতিমাম খানের নিজের। যাই হোক, রসদ দাবি করায় সুবাদার ইসলাম খান ইহতিমাম খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তিনি বাজ বাহাদুর কলমককে ইউসুফ শাহী ওরফে শাহজাদপুর পরগনা জাগির দান করেন এবং বিনিময়ে বাজ বাহাদুর ৫০টি নৌকা পরিচালনার জন্য স্বীকৃত হন। অতঃপর সুবাদার ইসলাম খান ইহতিমাম খানকে বলেন :

> ইহতিমাম খান,আপনি সম্রাটের দরবার থেকে এসেছেন। আপনার দায়িত্ব নৌবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনী সঠিকভাবে পরিচালনা করা। সুতরাং সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে প্রাক্তন অসাধু কর্মকর্তারা যেখানে প্রতি নৌকা ৪০০ টাকায় পরিচালনা করতো, সেখানে আপনার উচিত ৩৫০ টাকায় প্রতি নৌকা পরিচালনা করা। কিন্তু বাজ বাহাদুর যেখানে প্রতি নৌকা ৪০০ টাকায় পরিচালনা করতে রাজি, সেখানে আপনি প্রতি নৌকার জন্য ১২০০ টাকা দাবি করছেন। এটা কি অযৌক্তিক নয় ?[১৪]

---

১২. ঐ, 16-17
১৩. ঐ, 29-30
১৪. ঐ, 34

সুতরাং ইহতিমাম খান প্রতি নৌকা ৪০০ টাকায় পরিচালনা করতে বাধ্য হন। মির্জা নাথন আরো বলেন :

> ৩০০ নৌকার জন্য ইহতিমাম খানের যেখানে (৪০০ টাকা হিসাবে) ১,২০,০০০ টাকা প্রয়োজন, সেখানে তাঁর ছিল (তাঁর জাগিরের আয় ছিল) ৮০,০০০ টাকা। সুতরাং বাকি ৪০,০০০ টাকা আয় বৃদ্ধির জন্য ইহতিমাম খান কাহাল ও আরো ৯টি মহাল জাগির লাভ করেন।[১৫]

মির্জা নাথনের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, মির্জা নাথন বলেছেন যে, দীউয়ান নাবিকদের পাওনা পরিশোধ না করায় নাবিকরা পালিয়ে যায় এবং ইহতিমাম খান নাবিকদের রসদ দাবি করেন। নাথনের বক্তব্যে বোঝা যায় যে, ইহতিমাম খানকে ইতিপূর্বে যে পরিমাণ জাগির দেয়া হয় সেই জাগির হতে প্রাপ্ত অর্থে তিনি নৌবাহিনী পরিচালনা করতে অসমর্থ হন। এর কারণ পরবর্তী বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইহতিমাম খান প্রতিটি নৌকার জন্য ১২০০ টাকা দাবি করেন, কিন্তু সুবাদার বা দীউয়ান এই দাবি অযৌক্তিক মনে করেন এবং প্রতি নৌকার জন্য আরো অনেক কম দিতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী কর্মকর্তারা ৪০০ টাকায় প্রতি নৌকা পরিচালনা করতেন। তৃতীয়ত, বাজ বাহাদুর ৪০০ টাকায় প্রতি নৌকা পরিচালনা করতে রাজি হন এবং ৫০টি নৌকার জন্য ইউসুফ শাহী পরগনা জাগির লাভ করেন। অবশেষে ইহতিমাম খানকে প্রতি নৌকা ৪০০ টাকা হিসাবে, ৩০০টি নৌকার জন্য আরো ১০টি মহাল জাগির দেয়া হয় অর্থাৎ আগের ২২টি সহ তিনি মোট ৩২টি মহাল লাভ করেন। ইহতিমাম খানকে প্রদত্ত সকল মহালের নাম পাওয়া যায় না। তাই এই মহালগুলির রাজস্বের পরিমাণ টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সঙ্গে তুলনা করে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে এটা সত্য যে, এই ৩২টি মহালের রাজস্ব সর্বমোট এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার বেশি ছিল না। বাজ বাহাদুর প্রতিটি নৌকা ৪০০ টাকা করে ৫০টি নৌকা পরিচালনার জন্য ইউসুফ শাহী পরগনা লাভ করেন। প্রতিটি নৌকা ৪০০ টাকা করে ৫০টি নৌকার ব্যয় আসে ২০,০০০ টাকা। কিন্তু টোডর মল্লের বন্দোবস্তে ইউসুফ শাহী পরগনার রাজস্ব দেখানো হয়েছে ১৬,৭০,৯০০ দাম বা প্রায় ৪১,৭৭৭ টাকা। সুতরাং ইউসুফ শাহী পরগনার রাজস্বদাবি হবে ২০,০০০ টাকা এবং টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ৪১,৭৭৭-৮-০ টাকা হবে রাজস্বমান। এটা আর একটি প্রমাণ যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত রাজস্বমান (valuation), রাজস্বদাবি (demand) নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, অন্য কোন তথ্য বা সমসাময়িক দলিলের অভাবে টোডর মল্লের বন্দোবস্তই পরবর্তী রাজস্বকর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলা বিজিত হওয়ার এবং মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে রাজস্ব

---

১৫. ঐ, 35.

বিভাগীয় কর্মকর্তারা স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টোডর মল্লের বন্দোবস্ত এবং এই বন্দোবস্তের রাজস্বমানের সমন্বয় সাধন করে। পরগনা ইউসুফ শাহীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর রাজস্বদাবি এইরূপ সমন্বয় সাধনের একটি উদাহরণ। এই পরগনার রাজস্বদাবি টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বমানের প্রায় অর্ধেকেরও কম। যদিও জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবা বাংলায় মুগল রাজস্বব্যবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে পুরোপুরি কার্যকর হয়, তথাপি এই সময়ের রাজস্ব নির্ধারণ (রাজস্বমান বা রাজস্বদাবি যাই হোক) সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, কারণ এই সময়ের কোন দলিল এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। জাহাঙ্গীরের কর্মকর্তারা টোডর মল্লের বন্দোবস্তের কতোটুকু উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছিল তাও জানার উপায় নেই। যতোটুকু জানা যায় তা এই যে, এই সময়ে ভূমি খালসা এবং জাগির এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ খালসা ভূমি সরকারের রাজস্বকর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল, সরকার প্রত্যক্ষভাবেই খালসা ভূমির রাজস্ব আদায় করতো। অপরদিকে, জাগির ভূমি পদস্থ কর্মকর্তাদের বেতনের বিনিময়ে বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের (যেমন নৌ-বাহিনী) ব্যয় বহনের জন্য কর্মকর্তাদের কাছে বরাদ্দ করা হতো। এই প্রদেশ বিজিত হওয়ার সময় যেসকল ভূঁইঞা, জমিদার বা সামন্ত মুগল বশ্যতা স্বীকার করে, তাদের ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা বহাল রাখা হয়। এইরূপ জমিদারদের ভূমি জরিপ না করে তাদের নিকট থেকে পেশকাশ (নজর) বা থোক রাজস্ব গ্রহণ করা হতো। কোন কোন সামন্ত কর্তৃক ভূমিরাজস্বের পরিবর্তে স্বীয় সৈন্যবাহিনী বা নাবিক এবং নৌকাসহ মুগলদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। খালিসা ও জাগির ভূমিতে হয়তো কোন কোন স্থানে জমির মাপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো। কিন্তু জমির মাপ নেয়া সম্ভব না হলে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। কিন্তু জমিদারদের অধীনস্থ ভূমি জরিপ করা হতো বলে মনে হয় না। কারণ যেভাবে জমিদারদের সামরিক কাজে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল, তাতে জমি মাপের প্রশ্ন উঠে না। মির্জা নাথনের *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* সামন্তদের মুগল বাহিনীর সঙ্গে সামরিক কাজে নিযুক্তির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূমিরাজস্ব ছাড়াও কতগুলি অতিরিক্ত কর আরোপিত হতো। এই করগুলিকে সাধারণভাবে সায়ের বলা হতো। এই করগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার, দোকানপাট ইত্যাদির উপর ধার্য হতো।[১৬] তাছাড়াও ছিল জাকাত। ইসলামী শরীয়তের বিধানমতে জাকাত আদায় করা হতো। যদিও টোডর মল্লের বন্দোবস্তের কয়েকটি মহালে জাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়, পরবর্তীকালের দলিলসমূহে জাকাত সম্পর্কে তথ্য বিরল। অবশ্য জাকাত ভূমিরাজস্বের আওতায় পড়ে না।

---

১৬. T. K. Ray Chaudhuri, *Bengal under Akbar and Jahangir*, 24 ff.

জেমস গ্রান্ট ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে শাহ্ শুজার এক বন্দোবস্তের বিবরণ দিয়েছেন।[১৭] এই বন্দোবস্ত সম্পর্কে তিনি নিম্নরূপ পরিসংখ্যান দেন :

আকবরের সময়ের রাজস্ব হিসাব বা ১৫৮২ সালের টোডর মল্লের বন্দোবস্ত-এর উপরে প্রবৃদ্ধি	টা. ৬৩,৪৪,২৬০ টা. ৯,৮৭,১৬২
নতুন এলাকা বিজয় বা রাজস্বের নতুন উৎস	টা. ১৪,৩৫,৫৯৩
	টা. ৮৭,৬৭,০১৫
জাগির ভূমির রাজস্ব	টা. ৪৩,৪৮,৮৯২
মোট	টা. ১,৩১,১৫,৯০৭

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে টোডর মল্লের বন্দোবস্তের উপরে ১৫.৫০% প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। এই প্রবৃদ্ধি হয় অন্তবর্তীকালীন ৭৬ বছরে। প্রবৃদ্ধির কারণ নতুন এলাকা বিজয় এবং নতুন চাষাবাদ। টোডর মল্লের বন্দোবস্তের মতো শাহ্ শুজার বন্দোবস্তেও ভূমিকে খালিসা এবং জাগিররূপে বিভক্ত করা হয়েছে। সায়ের কর আলাদাভাবে দেখানো হয় নি, তা খালিসা বা জাগিরের পরিসংখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সরকার মন্দারণের পশ্চিমে তিনটি জঙ্গলাকীর্ণ এবং দুর্গম সামন্ত রাজ্য ছিল—বিষ্ণুপুর, পাচেট এবং চন্দ্রকোণা। এগুলি ঝাড়খণ্ডের অংশবিশেষ। দুর্গম হওয়ায় এগুলিকে জরিপ না করে এদের সামন্ত জমিদারদের উপর থোক রাজস্ব বা পেশকাশ নির্ধারিত হয়। জাহাঙ্গীরের অধীনে আরো অনেকগুলি সামন্ত জমিদার ছিলেন, যেমন ভূষণার রাজা স্বত্রাজিত এবং ঈশা খানের পুত্র-পৌত্ররা। সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে এঁদের জমিদারি বহাল রাখা হয়। শাহ শুজার বন্দোবস্তে এঁদের সম্বন্ধে পৃথক কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এঁদের কয়েকজন যে শুজার বন্দোবস্তের সময়ে, এমনকি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও মুগল বাহিনীকে সামরিক সাহায্য প্রদান করতেন বা মুগলদের পক্ষ হয়ে অংশ নিতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময়ে ঈশা খানের প্রপৌত্র মুনওর খান স্বীয় নৌবহরসহ মুগলদের পক্ষে আরাকানী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মীর জুমলা এক জমিদার ও তাঁর শরিকদের জমা বা রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। এই রাজস্ব নগদ টাকায় দেয়া হতো না, নৌকা সরবরাহ করে দেয়া হতো। তাদের ২০টি নৌকা সরবরাহ করার কথা ছিল। মীর জুমলা তা বাড়িয়ে ২৯টি করেন।[১৮] সুতরাং দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীরের আমলের সামন্ত

১৭. James Grant, *Analysis of the Finances of Bengal in Fifth Report*, ed. by W. K Firminger, Appendix 4, (hereafter referred to as *Fifth-Report*), 182-186.

১৮. J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal* , Vol. II, (Dacca 1948), (hereafter referred to as *HB II*), 38 ; ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা ১৫৫৬-১৭০৭*, ১৮৮ এবং টীকা ৩৮।

জমিদারদের সকলের অস্তিত্ব শুজা বা আওরঙ্গজেবের সময়ে না থাকলেও সতেরো শতকের শেষ অবধি কোন কোন সামন্ত জমিদারের অস্তিত্ব ছিল। শাহ সুজার পরে সতেরো শতকে আর কোন বন্দোবস্তের তথ্য পাওয়া যায় না।

১৭২২ খৃস্টাব্দে একটি নতুন বন্দোবস্ত হয়। তা মুর্শিদকুলী খানের (বা জাফর খানের) বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই বন্দোবস্ত সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু জানা যায় না, যদিও সলিমুল্লাহর *তওয়ারীখ-ই-বঙ্গালা,* গোলাম হোসেন সলিমের *রিয়াজ-উস-সালাতীন* এবং জেমস গ্রান্টের *Analysis of the Finances of Bengal*-এ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সূত্রগুলির কোনটিই সমসাময়িক নয়। কিন্তু তবুও অধিকতর নির্ভরশীল তথ্যের অভাবে এই সূত্রগুলিকে আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। প্রথমোক্ত দু'টি সূত্রে ভূমি জরিপ এবং রাজস্ব সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিন্তু তাতে পরিসংখ্যান তেমন নেই। শুধু থোকভাবে দুই একটি অঙ্কের উল্লেখ আছে। জেমস গ্রান্ট রাজস্বের পরিসংখ্যান দিয়েছেন এবং বলেন যে, প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতেই এই পরিসংখ্যান তৈরি। কিন্তু গ্রান্ট যে দলিলের সাহায্যে পরিসংখ্যান তৈরির দাবি করেছেন, সেগুলির অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই গ্রান্টের পরিসংখ্যানও পুনঃনিরীক্ষণের অবকাশ নেই।

মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে সলিমুল্লাহর বক্তব্য নিম্নরূপ :

(ক) চাকলা মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা থেকে কেটে নিয়ে সুবা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। মুর্শিদকুলী খান জমিদারদের ডেকে নিয়ে বন্দী করে রাখেন। (বিশ্বস্ততা) পরীক্ষা করে এবং চুক্তিতে সই নিয়ে তিনি বিশ্বাসী এবং পারদর্শী বাঙালি আমিলদেরকে হাল এবং বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। এভাবে নিযুক্ত আমিলদের প্রত্যেক মহাল এবং প্রত্যেক চাকলায় নিয়োগ করা হয় এবং রাজস্ব সংগ্রহ এবং আদানপ্রদানে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। উপরোক্ত আমিলরা প্রত্যেক পরগনায় শিকদার, আমিন এবং করণিক পাঠান এবং তাদের সাহায্যে কৃষি এবং পতিত জমি জরিপ সম্পাদন করেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক খণ্ড জমিতে এবং প্রত্যেক রায়তের জমিতে এইরূপ জরিপ করা হয় এবং এভাবে সমগ্র সুবা বাংলার জরিপ সম্পন্ন করা হয়। তাঁরা দরিদ্র কৃষকদের বীজের জন্য তকবি বা কৃষিঋণও দেন। অনেক চেষ্টার পরে চাষাবাদকৃত জমি এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক মহালের রাজস্বও বৃদ্ধি পায়। বকেয়া এবং হাল রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে রাজস্বআয়ের একটি খসড়া দলিল তৈরি করা হয়। জমিদারদের অতিরিক্ত ব্যয় (অর্থাৎ জমিদার কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহ করার অতিরিক্ত ব্যয়) কমাবার ফলে ব্যয়সঙ্কোচন হয় এবং জমিদারদের জন্য জীবিকাভাতা বা নানকরের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যয়সঙ্কোচনের ফলে ভূমিরাজস্ব এবং সায়ের করের প্রবৃদ্ধি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্বের হিসাবে যোগ করা হয়।[১৯]

(খ) মুর্শিদকুলী খান নিজে দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে বালাম বই-এ প্রত্যেক দিন সই করতেন। তিনি প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত হারে রাজস্ব আদায় করতেন। সরকারি রাজস্বে

১৯. *তওয়ারীখ-ই-বঙ্গালা,* ইন্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি নং ২৯৯৫, (অতঃপর তঃবাঃ রূপে উল্লেখিত), ফলিও ৩১ এ।

ঘাটতি দেখা দিলে খেলাপি জমিদার, আমিল, কানুনগো এবং মুৎসুদ্দিদের দীউয়ানি দপ্তরে আটক থাকতে হতো। খেলাপিদের খাদ্য দেয়া হতো না, পানি পান করতে দেয়া হতো না এবং এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেও দেয়া হতো না। তাদের এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্দী করে রাখা হতো এবং কোন কোন সময় তাদের মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো, বেত্রাঘাত করা হতো। এইরূপ শাস্তি প্রদানের পরেও যারা সরকারি পাওনা পরিশোধ করতো না, তাদের স্ত্রীপুত্রসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হতো। মুর্শিদকুলী খান বাঙালি হিন্দু ছাড়া অন্য কাউকে ভূমি এবং সায়ের রাজস্বের দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন না, কারণ তাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করা সহজতর ছিল।[২০]

(গ) চৈত্র মাসে রাজস্বআদায় শেষ হতো এবং বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে মুর্শিদকুলী খান পুণ্যাহ[২১] উৎসব পালন করতেন। তারপরে ১,০৩,০০,০০০ (এক কোটি তিন লক্ষ) টাকা সরকারি রাজস্ব দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হতো। *আবওয়াব-ই-খাসনবিশীরূপে* কথিত সেস-এর টাকা ভিন্নভাবে পাঠানো হতো।[২২]

(ঘ) দর্পনারায়ণ কানুনগোর কর্মক্ষমতার প্রশংসা করে সলীমুল্লাহ বলেন যে, এই কানুনগো খালিসা রাজস্ব এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেন।[২৩]

(ঙ) ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং আসামের রাজাদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাঁরা মুর্শিদকুলী খানের নিকট থোক কর (tribute) পাঠাতেন, অর্থাৎ তাঁদের অধিকৃত ভূমি জরিপ না করে তাঁরা চুক্তিমতো নির্দিষ্ট অঙ্কের কর দিতেন।[২৪]

(চ) বীরভূম এবং বিষ্ণুপুর সম্পর্কে সলীমুল্লাহ বলেন যে, এই দু'টি জমিদারিও জরিপ করা হয় নি। কারণ বীরভূমের জমিদার আসাদউল্লাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ লোক এবং তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির জন্য দান করেন। বিষ্ণুপুর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং দুর্গম, তাই এই জমিদারিও জরিপ করা হয় নি।[২৫]

গোলাম হোসেন সলিম সলিমুল্লাহর ২৪ বছর পরে বই লিখে সলিমুল্লাহর উপরোক্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক বাংলা থেকে উড়িষ্যায় জাগির স্থানান্তর সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

খালিসা এবং সায়ের রাজস্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করে মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের দরবারে এক কোটি টাকা পাঠিয়ে দিতেন এবং খালিসা জাগির ভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ রাজস্বতালিকা তৈরি করেন। আগের দিনে সুবা বাংলার প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা (মনসবদাররা) এই

২০. ঐ, ফলিও ৩৬-৩৭।
২১. সালতামামী উৎসব।
২২. তঃ বাঃ ফলিও ৩৮ এ। আবওয়াব-ই- খাসনবিশী অর্থ দীউয়ানি দপ্তরের কেরানিদের জন্য একটি বিশেষ কমিশন বা ভাতা। মুর্শিদকুলী খান এই সেস্ প্রবর্তন করেন, এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু রাজস্ববৃদ্ধি।
২৩. ঐ, ফলিও ৪২ বি।
২৪. ঐ, ফলিও ৩৬ এ।
২৫. ঐ, ফলিও ৩১ বি।

প্রদেশে চাকুরি করতে অনীহা প্রকাশ করতেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, এই প্রদেশে যে মৃত্যু অনিবার্য শুধু তাই নয়, এখানে দৈত্য-দানবও বাস করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের দীউয়ান মনসবদারদের এই প্রদেশে চাকুরি করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাংলায় অনেক জাগির প্রদান করেন। এই নীতির ফলে সুবা বাংলায় খালিসা মহালের সংখ্যা কমে যায়। ফলে কম সংখ্যক খালিসা মহালের দ্বারা নগদী (নগদ বেতনে নিযুক্ত) এবং অন্যান্য নিয়মিত সৈন্যের বেতন দেয়া সম্ভব হতো না।[২৬] তাই অন্য প্রদেশের রাজস্ব দ্বারা এই অভাব পূরণ করা হতো। মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, বাংলার মনসবদারদের উড়িষ্যায় জাগির দেয়া হোক। সম্রাট এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। অতঃপর মুর্শিদকুলী খান বাংলার জাগিরগুলি সায়ের সহ খালিসায় স্থানান্তর করেন এবং পরিবর্তে এই জাগিরগুলি উড়িষ্যায় দেয়া হয়। শুধু বাংলার নিজামত এবং দীউয়ানি জাগিরগুলি এই পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হয়। উড়িষ্যার ভূমি ছিল নিম্নমানের এবং অপেক্ষাকৃত কম উর্বর। এই নীতির ফলে মুর্শিদকুলী খান জমিদার এবং জাগিরদারদের আয় সঙ্কোচন করে সম্রাটেব রাজস্বআয় অনেক বৃদ্ধি করেন।[২৭]

জেমস গ্রান্ট ১৭২২ সালের বন্দোবস্তের নিম্নরূপ পরিসংখ্যান দিয়েছেন[২৮] :

শাহ শুজার বন্দোবস্তে খালিসা রাজস্ব	টা. ৮৭,৬৭,০১৫
তার উপর প্রবৃদ্ধি	টা. ১১,৭২,২৭৯
	টা. ৯৯,৩৯,২৯৪
জাগির থেকে খালিসায় স্থানান্তর	টা. ১০,২১,৪১৫
	১,০৯,৬০,৭০৯
জাগির ভূমি	টা. ৩৩,২৭,৪৭৭
মোট	টা. ১,৪২,৮৮,১৮৬

জেমস গ্রান্টের বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, এই বন্দোবস্তে সুবা বাংলাকে ১৩টি চাকলায় এবং ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। চাকলাগুলি হচ্ছে—(১) বন্দর বালেশ্বর, (২) হিজলী, (৩) মুর্শিদাবাদ, (৪) বর্ধমান, (৫) হুগলী বা সাতগাঁও, (৬) ভূষণা, (৭) যশোহর, (৮) আকবরনগর (রাজমহল), (৯) ঘোড়াঘাট, (১০) কুরিবারি, (১১) জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), (১২) সিলেট এবং (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)।

জেমস গ্রান্ট ১৭২৮ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের আরো একটি বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করেন। তবে এটি ঠিক বন্দোবস্ত নয়, বরং ১৭২২ সালের বন্দোবস্তকে দীউয়ানি

২৬. গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন,* আবদুস সালামের ইংরেজি অনুবাদ, দিল্লী পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৫ (অতঃপর *রিয়াজ* রূপে উল্লেখিত), ২৪৮-৪৯।

২৭. নিয়মিত সৈন্যরা স্থায়ী এবং নগদী সৈন্যরা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত হতো।

২৮. *Fifth Report*, Appendix 4, 189-91.

অফিসে শুদ্ধিকরণ বা সুসমকরণ। এতে খালিসা মহালগুলিকে ২৫টি বড় জমিদারি এবং অনেকগুলি ছোট ছোট জমিদারিতে ভাগ করা হয়েছে। বড় জমিদারিকে ইহতিমাম এবং ছোট জমিদারিকে মজকুরি বলা হয়েছে। বোঝা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের চাকলাওয়ারি রাজস্ব হিসাবকে সহজতর করার জন্য দীউয়ানি দপ্তরে একে জমিদারওয়ারি রাজস্বে পরিণত করা হয়েছে। শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের এই সুষমকরণ পর্যায়ে জাগির মহালগুলিকে নিম্নরূপে ভাগ করা হয়েছে :

১. জাগির-ই-সরকার-ই-আলি বা সুবাদারের (নাজিমের) জাগির।

২. জাগির-ই-বন্দা-ই-আলি দরগাহ বা দীউয়ানের জাগির।

৩. জাগির-ই-আমির-উল-উমারা বখশি বা বখশির জাগির।

৪. ফৌজদারদের জাগির।

৫. মনসবদারদের জাগির।

৬. মদদ-ই-মাআশ বা জীবিকাভাতা। (আলিম, শিক্ষক, পণ্ডিত ব্যক্তি প্রমুখকে এইরূপ ভাতা দেয়া হতো। ভূসম্পত্তি দান করলে তা লাখেরাজ সম্পত্তি রূপে দেয়া হতো।)

৭. সালিয়ানা দারান (ছোট জমিদারি ভাতা)।

৮. আল-তমঘা (ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি)।

৯. রোজিনা দারান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সম্পত্তি)।

১০. নওয়ারা বা নৌবহরের জন্য নির্দিষ্ট জাগির।

১১. আমলা-ই-আসাম বা পূর্ব সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট জাগির।

১২. জমিদারদের জাগির অর্থাৎ চারটি সীমান্তবর্তী জমিদারদের জন্য মঞ্জুর করা জাগির—যেমন ত্রিপুরা।

১৩. খেদা বা হাতি ধরার প্রতিষ্ঠানের জন্য জাগির।

এখন সলিমুল্লাহ, গোলাম হোসেন সলিম এবং জেমস গ্রান্টের তথ্যগুলিকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা যাক। দেখা যায় যে, বিস্তারিত বিবরণে তাঁদের মধ্যে মিল না থাকলেও গরমিল খুব বেশি নেই। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিম মোটামুটি পূর্ণ সংখ্যায় রাজস্বের হিসাব দিয়েছেন, কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত কোন দলিল তাঁদের হস্তগত হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু গ্রান্ট রাজস্ব-অঙ্ক কোটি, লাখ, হাজার এবং শতক, এমনকি দশক ও একক হিসেবেও দিয়েছেন এবং বলেন যে, তাঁর প্রদত্ত রাজস্ব-অঙ্ক ফার্সি দলিলের ভিত্তিতে নির্ধারিত। সলিমুল্লাহ এক স্থানে বলেছেন যে, দর্পনারায়ণ কানুনগো খালিসা রাজস্ব বৃদ্ধি করে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেন। এটা অবশ্যই অত্যুক্তি বা লিপিকারের প্রমাদ, কারণ সলীমুল্লাহ নিজেই আবার বলেছেন যে, মুর্শিদকুলী খান প্রত্যেক বছর ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে পাঠাতেন। খালিসা রাজস্ব সম্পূর্ণটাই সম্রাটের প্রাপ্য এবং দিল্লীতে প্রেরিতব্য। প্রশাসনব্যয় সুবাদার,

দীউয়ান, বখশি ইত্যাদি কর্মকর্তাদের জাগিরের আয় দ্বারা মিটানো হতো। অতএব, বোঝা যায় যে, সলীমুল্লাহ দর্পনারায়ণ কানুনগো কর্তৃক রাজস্ব ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করার কথা বলে সম্পূর্ণ খালিসা এবং জাগির রাজস্বের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, শুধু খালিসা রাজস্ব নয়। সুতরাং সলিমুল্লাহপ্রদত্ত হিসাবে সম্পূর্ণ রাজস্বের পরিমাণ জেমস গ্রান্টপ্রদত্ত হিসাবের সম্পূর্ণ রাজস্বের প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। কারণ সলিমুল্লাহর মতে সম্পূর্ণ রাজস্ব ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং গ্রান্টের মতে তা প্রায় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। যদুনাথ সরকার সলিমুল্লাহর এক পাণ্ডুলিপিতে লক্ষ্য করেন যে, মুর্শিদকুলী খান বাংলার রাজস্ব ১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি ৫০ লক্ষে উন্নীত করেন।[২৯] এর অর্থ এই যে, সলিমুল্লাহ এবং জেমস গ্রান্টের রাজস্ব-অঙ্ক প্রায় মিলে যায়। গ্রান্টের মতে রাজস্ব ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪২,৮৮,১৮৫ টাকা হয়। গ্রান্টের প্রদত্ত খালিসা রাজস্বের অঙ্কও সলিমুল্লাহর খালিসা রাজস্বের অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। গ্রান্ট খালিসা রাজস্বের হিসাব দেন ১,০৯,৬০,৭০৯ টাকা এবং সলিমুল্লাহ বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান বছরে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা খালিসা রাজস্ব সম্রাটের কাছে পাঠাতেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, সলিমুল্লাহ গ্রান্টের চেয়ে কোন প্রকারে অধিকতর নির্ভরযোগ্য নন। সলিমুল্লাহ লিখেন ১৭৬৩ সালে, তখন মুগল শাসন প্রায় অবলুপ্ত। তাছাড়া সলিমুল্লাহ কোন রাজস্বদলিল সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু গ্রান্ট তা হস্তগত করেছিলেন বলে দাবি করেন। *দস্তুর-উল-আমল* এবং *চাহার গুলশান* নামক পাণ্ডুলিপিতেও গ্রান্টের প্রায় অনুরূপ রাজস্ব-অঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি *দস্তুর-উল-আমলে* রাজস্ব-অঙ্ক পাওয়া যায় ৫২,৪৬,৩৬,২৪০ দাম বা ১,৩১,১৫,৯০৬ টাকা।[৩০] এডওয়ার্ড টমাস তিনটি *দস্তুর-উল-আমল* পরীক্ষা করেছিলেন। দুইটিতে তিনি রাজস্ব-অঙ্ক পান ১,৩১,১৫,৯০৬ টাকা এবং তৃতীয়টিতে পান ১,৩১,১৫,৯০৩ টাকা।[৩১] ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে জন হ্যারিস আওরঙ্গজেবের সময়ের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। এ রাজস্বের পরিমাণ ১,৩১,১৫,৯০৬ টাকা।[৩২] *চাহার গুলশান*-এ ১৭২০ খৃষ্টাব্দ বা সমকালীন সময়ের রাজস্বের অঙ্ক পাওয়া যায় ১,৪০,৭২,৭২৫ টাকা।[৩৩] এই সকল সূত্রেই দেখা যায় যে, রাজস্ব-অঙ্কে প্রায় মিল আছে। প্রথমোক্ত অঙ্কগুলি আওরঙ্গজেবের সময়ের বা শাহ্ শুজার বন্দোবস্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত, কিন্তু *চাহার গুলশানের* অঙ্ক মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। নিম্নের সারণি থেকে এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে :

২৯. *HB* II, 412
৩০. ইন্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি নং ১৩৮৭, ফলিও ৭-এ।
৩১. Edward Thomas, *The Revenue Resources of the Mughal Empire in India*, 42-43.
৩২. John Harris, *Navigatinn atque Itinerantium Bibliotheca : Or A Complete Collection of Voyages and Travels*, Vol I, 651
৩৩. *Chahar Gulshan*, translated by Jadunath Sarkar in *India of Aurangzib*, XXXII, 133.

উৎস	আওরঙ্গজেবের সময়ের বা শাহ শুজার বন্দোবস্ত	মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত
(ক) জেমস গ্রান্ট	টা. ১,৩১,১৫, ৯০৭	টাঃ ১,৪২,৮৮, ১৮৫
(খ) *দস্তুর-উল-আমল*		
টমাসের 'এ' পাণ্ডুলিপি	টা. ১,৩১,১৫,৯০৬	-
(গ) *দস্তুর-উল আমল*		
টমাসের ' বি' পাণ্ডুলিপি	টা. ১,৩১,১৫,৯০৬	-
(ঘ) *দস্তুর-উল-আমল*		
টমাসের 'সি' পাণ্ডুলপি	টা. ১,৩১,১৫,৯০৩	-
(ঙ) *চাহার গুলশান* ১৭২০?	-	টা. ১,৪০,৭২,৭২৫
(চ) জন হ্যারিস	টা. ১,৩১,১৫,৯০৬	-

ইরফান হাবিব বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে বাংলার রাজস্বের একটি সারণি প্রকাশ করেছেন। সারণিটি নিচে দেয়া হলো[৩৪] :

উৎস	সন	রাজস্ব (টাকা)[৩৫]
আইন-ই-আকবরী[৩৬]	১৫৯৫-৯৬	১,০৫, ১৮, ১৪২ -৮-০[৩৭]
ম্যানরিক	১৬৩২	৯০,০০,০০০
বয়াজ-ই-খুশবুই	১৬২৮-৩৬	১,০০,৬৩,০০০
ফরহঙ্গ-ই-করদানী	১৬৩৩-৩৮	১,০৬,৭৯,৭৭৫
অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি নং ১৬,৮৬৩	১৬৪৬-৪৭	১,১১,৮৪,৭৫০
পাদশাহনামা, ২য়	"	১,২৫,০০,০০০
সাদিক খান	"	১, ২৫,০০,০০০
Or. 1840	১৬৩৮-৫৬	১,০৬,৭৯,৭৭৫
দস্তুর-উল-আমল-ই-ইলম-ই-নভিসন্দিগী		১,০৬,৭৯,৭৭৫(!)
Bodl. 0. 390	"	১,০৬,৭৯,৭৭৫
সুজন রায়	"	১,১৫,৭২,৫০০

৩৪. ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা,* (কলকাতা ১৯৮৫), ৪২৯।
৩৫. ইরফান হাবিবের 'দাম'-এ দেয়া রাজস্ব টাকায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।
৩৬. উৎসের সম্পূর্ণ বিবরণ ইরফান হাবিবের বইতে দেয়া আছে, তাই পুনরুল্লেখ করা হলো না।
৩৭. এই সংখ্যায় উড়িষ্যার রাজস্বও সংযুক্ত

উৎস	সন	রাজস্ব (টাকা)
মানুচি	”	১,০০,৫০ ,০০০
ফরহঙ্গ-ই-করদানী ও কার-আমোজী	”	১,০৬,৭৯,৭৭৫
সিয়াকনামা	”	১,১০,০০,০০০
দস্তুর-উল-আমল-ই আলমগিরী	আনু. ১৬৫৬	১,১৪,৮৬,৪৫০
মিরাৎ-উল-আলম	আনু. ১৬৬৭	১,৩০,৩৯,৪৭৭-১২-০
জওয়ারিত-ই-আলমগিরী	১৬৮৭ আনু. ১৬৯১	১,৩১,১৩,৪০৬
ফ্রেজার ১৬৮৭	আনু. ১৬৯৫	১,৩১,১৩,৪০৬
ইন্তেখাব-ই-দস্তুর-উল-আমল-ই-পাদশাহী	১৬৮৭?	১,৩১,১৩,৪০৬
জগজীবন দাস : মুন্তখব-উত-তওয়ারীখ	আনু. ১৭০৯	১,৩১,১৩,৪০৬
Add. ৬৫৮৬	১৭২০	১, ৪১,১৫,৩৬৯

এই সারণিতে প্রাপ্ত অঙ্কগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। তা গ্রান্ট এবং সলিমুল্লাহর রাজস্ব-অঙ্ককে সমর্থন করে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের পরের রাজস্ব-অঙ্কগুলি ১ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৩১ লক্ষের মধ্যেই আছে। গ্রান্টের মতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহ শুজার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হয়। অতএব ১৬৫৮ থেকে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত রাজস্বের হিসাব শাহ শুজার বন্দোবস্তের রাজস্ব-অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পরে রাজস্ব-অঙ্ক ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার উপরে। এই অঙ্কগুলি মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে এবং গ্রান্ট ও সলিমুল্লাহর রাজস্ব-অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। অতএব গ্রান্টের রাজস্বপরিসংখ্যান গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এই পরিসংখ্যানমতে মুগল রাজস্বের পরিমাণের হিসাব নিম্নরূপ :

বন্দোবস্ত	খালিসা	জাগির	মোট
টোডর মল্লের বন্দোবস্ত	টা ৬৩,৪৪, ২৬০	৪৩,৪৮,৮৯২	১,০৬,৯৩,১৫২
শুজার বন্দোবস্ত	টা. ৮৭, ৬৭,০১৫	৪৩, ৪৮, ৮৯২	১,৩১,১৫,৯০৭
মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্ত	টা. ১,০৯, ৬০,৭০৯	৩৩, ২৭, ৪৭৭	১,৪২,৮৮,১৮৬

উপরোক্ত সূত্রগুলিতে বিভিন্ন বছরে রাজস্ব-অঙ্কের যে তারতম্য দেখা যায়, তার কারণ বোধ হয় এই যে, উপরোক্ত সূত্রগুলিতে বিভিন্ন বছরে আদায় বা সংগ্রহের পরিমাণ দেয়া হয়েছে। যেমন মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে খালিসা রাজস্বের পরিমাণ দেখা যায় এক

কোটি নয় লক্ষ টাকারও উপরে। কিন্তু সলিমুল্লাহর সাক্ষ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুর্শিদকুলী খান প্রতি বছর এক কোটি তিন লক্ষ টাকা সম্রাটের কাছে পাঠান।

মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত সম্পর্কে জেমস গ্রান্টের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বেশ কিছু সংখ্যক জাগির খালিসায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে জাগির ভূমির রাজস্ব হ্রাস পায় এবং আনুপাতিক হারে খালিসা রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় উজির নিযাম-উল-মুলক এই সময়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনায় জাগির পুনর্বণ্টন করা হয় এবং কর্মকর্তাদের বেতন কমিয়ে সম্রাটের রাজস্বআয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। সম্রাট উজিরের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, কিন্তু এর কার্যকারিতা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন।[৩৮] মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক জাগির কমিয়ে খালিসা রাজস্ব বৃদ্ধি করার নীতি উজির নিযাম-উল-মুলকের এই পরিকল্পনার অংশবিশেষ কিনা বলা যায় না। ইংরেজ কোম্পানির কাউন্সিল কাশিমবাজার থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে বলেন : "তারা শুনতে পাচ্ছে যে উজির সম্রাটের দরবারস্থ সকল আমির-ওমরাহের বেতন কমিয়ে দিয়েছেন। জাফর খানের (মুর্শিদকুলী খানের) বেতন শত হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করা হয়েছে, দীউয়ানের বেতনও আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেয়া হয়েছে"।[৩৯] নিযাম-উল-মুলকের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু জেমস গ্রান্ট জাগির ভূমির রাজস্বের যে পরিমাণ উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায়, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে জাগির অনেক হ্রাস করা হয়েছে। সলিমুল্লাহ এর অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান নিজেই একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে বাংলায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জাগির বাংলার পরিবর্তে উড়িষ্যায় দেয়া হয়। উজির নিযাম-উল-মুলকের পরিকল্পনা বা মুর্শিদকুলী খানের নিজস্ব পরিকল্পনার যেকোন একটি নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হয় এবং ফলে বাংলায় জাগিরভূমি হ্রাস পাওয়ার একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মুর্শিদকুলী খান ভূমি জরিপ করেন এবং একটি নতুন বন্দোবস্ত করেন, যা ১৭২২ সালে সমাপ্ত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ রূপলাভ করে। একই বছর ইংরেজ কোম্পানির কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতে বলা হয়, জাফর খান অর্থের জন্য দেশকে ক্ষতবিক্ষত করছেন।[৪০] এও বলা যায় যে, জেমস গ্রান্ট রাজস্বের পরিসংখ্যান ও মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। অবশ্য মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের খুঁটিনাটি বিষয়ে আরো কিছু প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত কি রায়তওয়ারি ছিল নাকি জমিদারওয়ারি ছিল ? সলিমুল্লাহর মতে, মুর্শিদকুলী খানের জরিপ এমন বিস্তারিতভাবে

৩৮. Shatish Chandra, *Parties and Politics at the Mughal Court* 1707-1740, 174-75.

৩৯. India Office Records, *Bengal Public Consultations*, 16 April, 1722.

৪০. ঐ।

করা হয় যে, সরকার প্রত্যেক কৃষকের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়। এইরূপ বিস্তারিত তথ্য লাভ করার উদ্দেশ্যে জমিদারদের আটক রাখা হয় যাতে সরকারের বিশ্বস্ত রাজস্বকর্মকর্তারা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়া জরিপকাজ সমাধা করতে পারে। সলিমুল্লাহ আরো বলেন যে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক ভূমিখণ্ডে, প্রত্যেক রায়তের জমিতে এবং প্রত্যেক চাকলায় কৃষি এবং পতিত জমি জরিপ করা হয়। সুতরাং সলিমুল্লাহ ভূমির মাপসহ একটি বিস্তারিত জরিপের কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, বীরভূম এবং বিষ্ণুপুরে জরিপ করা হয় নি, কারণ বীরভূমের জমিদার আসাদউল্লাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ লোক, তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক দান করেন। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর জঙ্গলাকীর্ণ এবং দুর্গম হওয়ায় সেখানে জরিপ করা সম্ভব ছিল না। ত্রিপুরা, কুচবিহার এবং আসাম সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই রাজ্যগুলি নির্দিষ্ট হারে কর (tribute) দিত, সুতরাং এগুলির ভূমি জরিপ করার প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজ কোম্পানির অধীনস্থ কলকাতা শহর (সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা) জরিপ করার কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য কলকাতা শহরের অবস্থা ছিল ভিন্ন। ইংরেজদের অধিকার এবং শহরগুলির রাজস্ব ফররুখশিয়রের ১৭১৭ সালের ফরমান দ্বারা স্থিরীকৃত ছিল। গ্রান্টের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত ছিল জমিদারওয়ারি, রায়তওয়ারি নয়। গ্রান্টের বিবরণে এই বন্দোবস্ত ১৩টি চাকলায় বিভক্ত দেখা যায়। কিন্তু ১৭২৮ সালে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের সময় এর যে সুষমকরণ করা হয়, তাতে জমিদারওয়ারিভাবে রাজস্ব দেখানো হয়েছে। শুজাউদ্দিন যে কোন নতুন জরিপ বা বন্দোবস্ত করেন তার কোন প্রমাণ নেই, অন্ততপক্ষে কোন সূত্রে এরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায়, শুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তকেই গ্রহণ করেন। এতে জমিদারওয়ারি রাজস্ব উল্লেখিত হওয়ায় ধরে নেয়া যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তও জমিদারওয়ারি ছিল। চাকলাগুলি ছিল ভৌগোলিক বিভাগ। কোন জমিদারের জমিদারি এক বা একাধিক চাকলায় বিস্তৃত ছিল। বড় জমিদারিকে ইহতিমাম এবং ছোট জমিদারিকে মজকুরি বলা হয়েছে। এই জমিদারিগুলি জাগিরভূমি থেকে স্বতন্ত্র। সলিমুল্লাহও জমিদারের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্বস্ত এবং অনুগত জমিদারদের সরকারের পক্ষে তাঁদের নির্দিষ্ট জমিদারি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বহাল রাখা হয়। বোঝা যায় যে, জমিদার নতুন বন্দোবস্ত স্বীকার করে নিলে এবং নানকর বা জীবিকাভাতা গ্রহণ করতে রাজি হলে জমিদারি স্থিতিশীল রাখা হতো। এটা মুর্শিদকুলী খানের প্রশাসনব্যয় সঙ্কোচনের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে, জমিদারি বহাল রাখায় এটাও বোঝা যায় যে, জমিদারি সম্পূর্ণ বাতিল করা যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তা মুর্শিদকুলী খান বুঝেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, সলিমুল্লাহ এবং তাঁকে অনুসরণ করে গোলাম হোসেন সলিম প্রতি চাকলায়, প্রতি গ্রামে প্রত্যেক রায়তের জমি জরিপ করার কথা বলেছেন। এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। অবশ্য ইংরেজ কোম্পানির কাউন্সিলও বোধ হয় এই বক্তব্য সমর্থন করে

বলেছেন যে, মুর্শিদকুলী খান অর্থের জন্য দেশকে ক্ষতবিক্ষত করছেন। দেশে যে ব্যাপক জরিপকাজ চলছিল, তা নিশ্চয়ই ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায় নি। যদিও কাউন্সিলের এই বক্তব্য খুব পরিষ্কার নয়, কাউন্সিল বোধ হয় এই কথা বলে মুর্শিদকুলী খানের জরিপ এবং বন্দোবস্তের দিকে ঈঙ্গিত করেছেন।

আওরঙ্গজেবের সময়ে ভূমি জরিপের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ[৪১] :

মোট গ্রামের সংখ্যা	জরিপ করা গ্রাম	জরিপ না করা গ্রাম	জরিপ জমি (বিঘায়)
১,১২,৭৮৮	১,৫৩৮	১,১১,২৫০	৩,৩৪,৭৭৫

এতে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের সময়েও বাংলায় ভূমি জরিপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সুবা বাংলায় ভূমি জরিপের এটাই প্রথম প্রমাণ। মনে করা যেতে পারে যে, মুর্শিদকুলী খান এই প্রদেশের দীউয়ানরূপে যোগদানের পরে এই জরিপ শুরু করেন। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিমের বক্তব্য সত্য হলে বলতে হয় যে, মুর্শিদকুলী খান তাঁর জরিপকাজ চালিয়ে যান এবং ধীরে ধীরে অধিক থেকে অধিকতর গ্রাম জরিপের আওতায় আনেন, যদিও প্রকৃত জরিপ করে ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুর্শিদকুলী খান তাঁর বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় ভূমির উৎপাদনক্ষমতা নির্ধারণ করতে সমর্থ হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জমিদারদের আটক করে রাখেন যাতে তাঁর বিশ্বস্ত রাজস্বকর্মকর্তারা বিনা বাধায় ইপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন।

টোডর মল্লের বন্দোবস্তে জমিদার, তালুকদার এবং রায়তের উল্লেখ আছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, টোডর মল্লের বন্দোবস্ত পুরাতন রেকর্ডের ভিত্তিতে তৈরি, অর্থাৎ প্রাক-মুগল সরকারের ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থায় জমিদারি, তালুকদারি এবং রায়তি স্বত্বের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু জেমস গ্রান্ট মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তালুকদারি এবং রায়তি স্বত্বের উল্লেখ নেই। তাই বলে এই স্বত্বগুলি যে ছিল না তা বলা যায় না। তবে এগুলি জমিদারি স্বত্বের অধীনস্থ ছিল বলে মনে হয়। জমিদারেরা ছিলেন সামন্ত প্রভু। *বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে* প্রচুর প্রমাণ আছে, যাতে দেখা যায় যে পরাভূত সামন্ত প্রধান বা ভূস্বামীদেরকে তাদের ভূমির উপর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়া হয়, বিনিময়ে তাঁরা নির্দিষ্ট অঙ্কের রাজস্ব দিতেন বা রাজস্বের বিনিময়ে স্বীয় লোকলস্কর, নৌকা ইত্যাদি নিয়ে মুগল বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতেন। ইরফান হাবিব বলেন :

> বাংলার ব্যবস্থা ছিল সত্যিই অন্য রকম। মনে হয়, সেখানকার জমিদাররা দীর্ঘ, কিন্তু অনির্দিষ্ট সময় ধরে প্রশাসনের নির্দিষ্ট এক বাঁধা অঙ্কেই ভূমিরাজস্ব দিতেন। এই ব্যবস্থার নজির মেলে *আইন-ই-আকবরীতে*, সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার 'জমা' ছিল 'পুরোটাই নগদী'। এখন 'নগদ' মানে

৪১. ইরফান হাবিব, *মুগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা,* ৪, সারণি নং ১

> টাকাকড়ি, অতএব আলাদা করে ধরলে এর সরল অর্থ এই হতে পারে যে, বাংলার রাজস্ব আদায় হতো নগদ টাকায়।[৪২]

আবুল ফজল পরিষ্কার বলেছেন যে, বাংলার রাজস্ব নগদে সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু সেই প্রশ্ন পরে আলোচিত হবে। তালুকদার ছিলেন এক প্রকার ছোটখাটো জমিদার। ইরফান হাবিব দু'য়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন :

> মনে হয় ১৭ শতকের শেষভাগে ভূমিরাজস্বদাতা হিসেবে জমিদারকে বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছিল। 'তাল্লুকদার' মানে 'তাল্লুক'-এর অধিকারী। 'তাল্লুক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'সংযোগ', কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়িয়েছিল : যে জমি বা এলাকার উপর কোন ধরনের স্বত্ব দাবি করা হয়। ১৮ শতকে 'তাল্লুকদার'-এর সংজ্ঞায় দু'টি আলাদা বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথমটি অনুযায়ী তিনি ছিলেন নেহাৎই এক ধরনের ইজারাদার। আর দ্বিতীয়টি অনুসারে তিনি ছিলেন ক্ষুদে জমিদার। এ থেকে শুধু যে ১৮ শতকের ঐ সংজ্ঞায় 'তাল্লুকদার'-এর একজন ক্ষুদে জমিদার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাই নয়, 'ফথিয়া ইব্রিয়ার' একটি জায়গায়ও পরিষ্কার বোঝা যায়, আরাকান সিংহাসনের দাবিদাররা শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম অভিযানের সময় মুগলদের পক্ষে ছিল। বলা হয়েছে, তাদের আশা ছিল অন্তত "রাজা না হলে জমিদার, জমিদার না হলে তালুকদার হবে"। অবশ্য একথার উপরেই জোর দিতে হয় যে, তাল্লুকদার ছিল এক বিশেষ ধরনের জমিদার মাত্র; দু'টি শব্দের কোনটিকে ব্যবহার করা হলো বহু ক্ষেত্রেই তাতে কিছু এসে যেতো না।[৪৩]

এই প্রসঙ্গে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার উপর কোম্পানির স্বত্বের উল্লেখ করা যায়। এই তিনটি গ্রাম, যা কোম্পানির রেকর্ডপত্রে সর্বত্র শহররূপে উল্লেখিত, মূলত বসাকদের অধিকারে ছিল। হুগলী নদীর তীরে এই গ্রামগুলি ছিল পতিত, জলা এবং জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি। ১৬৯৮ খৃস্টাব্দে সুবাদার আজিম-উশ-শানের আমলে কোম্পানি বসাকদের কাছ থেকে এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করে। বিক্রিকবলায় বিক্রেতাদের অর্থাৎ বসাকদের জমিদার বলা হয়েছে এবং ইংরেজরা মনে করে যে, তারা জমিদারি স্বত্বই ক্রয় করেছে। কিন্তু বসাকরা সামন্তপ্রধান ছিল না, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা জমির স্বত্ব লাভ করে নি, উত্তরাধিকারসূত্রে স্বত্ব পেয়েছে এরূপ কোন প্রমাণও নেই। মোরল্যান্ড বলেন :

> এই বেচাকেনায় জমিদারের অর্থ দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : সাধারণভাবে একে ভূমির মালিক বলা যায় যাতে জমির উপর যেকোনরূপ অধিকার বোঝায়, কিন্তু এতে জমিদারি বা অন্য কোনরূপ স্বত্ব বোঝায় না এবং সম্ভবত এই অর্থেই তা ঐ এলাকায় তখন ব্যবহৃত হতো। অন্যপক্ষে এর দ্বারা যেকোন প্রকার স্বত্বও বোঝাতে পারে (স্বত্ব যাই হোক না কেন), এই স্বত্ব মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। এই দুইটির কোন অর্থই উত্তর ভারতে জমিদার শব্দের উপর আরোপিত অর্থের সঙ্গে মিলে না। উত্তর ভারতে চৌদ্দ থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত জমিদার দ্বারা প্রাক-মুসলিম যুগ থেকে স্বত্ববান হওয়ার কথা বোঝায়।[৪৪]

---

৪২. ঐ, ১৮৭।

৪৩. ঐ, ১৮৩-১৮৪।

৪৪. Moreland, *Agrarian System*, 191

যাই হোক, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার বসাকদের সামন্তপ্রধান বলা যায় না এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় দীউয়ানি দপ্তরও কোম্পানি যা ক্রয় করেছে তাকে জমিদারিস্বত্ব বলে নি। কোম্পানিকে দেয়া ফররুখশিয়রের ১৭১৭ সালের ফরমানে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার গ্রামগুলির উপর কোম্পানির স্বত্ব স্বীকৃত হয় এবং একই শর্তে পার্শ্ববর্তী আরো গ্রাম ক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু ফরমানে কোম্পানির স্বত্বকে জমিদারি বলা হয় নি, তালুকদারি বলা হয়েছে। অন্য কথায় এই গ্রামগুলি খরিদ করে কোম্পানি এগুলির তালুকদারে পরিণত হয়। কিন্তু কোম্পানি তাদের নথিপত্রে সর্বত্র এবং সর্বদা তাদের স্বত্বকে জমিদারিরূপে দাবি করেছে। এই গ্রামগুলির তত্ত্বাবধানে কাউন্সিলের যে সদস্য নিয়োজিত হন তাঁকে কোম্পানির রেকর্ডে জমিদার এবং তাঁর অধীনস্থ স্থানীয় কর্মচারীদের 'ব্ল্যাক জমিদার' বলা হয়।

মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্বের অঙ্ক কি রাজস্বমান না রাজস্বদাবি[৪৫] সেই প্রশ্নে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। জেমস গ্রান্ট মনে করেন যে, তা রাজস্বদাবি এবং রাজস্ব-অঙ্কের সম্পূর্ণ পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সংগৃহীত হতো। কিন্তু মোরল্যান্ড একে রাজস্বমান বলে মনে করেন এবং টোডর মল্লের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে তাঁর যুক্তি খাড়া করেন। টোডর মল্ল সারা বাংলার রাজস্ব নির্ধারণ করেন, যদিও তখন পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে মুগল অধিকার স্থাপিত হয় নি। শাহ শুজা এবং মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে 'জমা' শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং মোরল্যান্ড বলেন যে, 'জমা' শব্দ দ্বারা রাজস্বমান বোঝায়, রাজস্বদাবি নয়। মুর্শিদকুলী খান যে অঙ্কের রাজস্বের জন্য বন্দোবস্ত করেন এবং যে পরিমাণ অর্থ সম্রাটের কাছে পাঠাতেন, তার তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, উভয় অঙ্কের মধ্যে মিল নেই। জেমস গ্রান্ট কোষাগারের যে স্মারক প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, ফররুখশিয়রের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ থেকে মুহাম্মদ শাহের রাজত্বের নবম বর্ষ পর্যন্ত মোট ১৫ বছর ৯ মাস ৫ দিনে মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের কাছে ১৪,০৭,৩৮, ১৩৬-১-৮ খালিসা রাজস্ব পাঠান।[৪৬] এই স্মারক মতে মুর্শিদকুলী খান গড়পড়তা প্রতি বছর ৯৪ লক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠান। কিন্তু বন্দোবস্তের পরিসংখ্যানে খালিসা রাজস্বের পরিমাণ ১০৯ লক্ষ টাকারও বেশি। অতএব গড়পড়তা প্রতি বছর ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা যায়।[৪৭] সুতরাং বন্দোবস্তের রাজস্ব-অঙ্কের চেয়ে সংগৃহীত রাজস্ব

৪৫. এখানে valuation-এর জন্য রাজস্বমান এবং demand-এর জন্য রাজস্বদাবি ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দগুলি মোরল্যান্ডের ব্যাখ্যামতো ব্যবহৃত। দেখুন,মোরল্যান্ড, পরিশিষ্ট A, 209-215.

৪৬. *Fifth Report*, Appendix 4, 213.

৪৭. কোষাগারের স্মারক মতে মুর্শিদকুলী খান মোট ১৬,৫১,৩০,৩০৬-১০-০ পাঠান। এর মধ্যে বাংলার খালিসা রাজস্ব ছাড়াও উড়িষ্যা এবং ভাগলপুরের রাজস্ব, জাগিরদারদের নযর, আবওয়াব এবং মৃত কামাল উদ্দিন খানের অর্থসম্পদও ছিল। এফ. ডি. আসকলী (*Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report*, 47) এই সমুদয় অর্থ খালিসা বলে মনে করেন, কিন্তু জাগিরদারদের নযর এবং কামাল উদ্দিন খানের সম্পদ খালিসা রাজস্বে যুক্ত করা যায় না।

কম পড়ে। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিমের মতে, মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং খেলাপকারীদের অমানুষিক অত্যাচার করতেন। সুতরাং রাজস্বে ঘাটতির জন্য সংগ্রহে শিথিলতাকে দায়ী করা যায় না। গ্রান্ট এই ঘাটতির জন্য মুর্শিদকুলী খানকে দায়ী করেন এবং বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান তহবিল তসরুপ বা আত্মসাৎ করেছিলেন।[৪৮] কিন্তু কোষাগারের স্মারকপত্রে আরো দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ তাঁর মৃত্যুর পরে শুজাউদ্দিন খান দিল্লীতে পাঠান, এই অর্থ-সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬১ লক্ষ টাকা। অথচ মুর্শিদকুলী খান বছরে ১৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করলে ১৫ বছরে তাঁর সম্পদের পরিমাণ হতো প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকা। তাছাড়া মুর্শিদকুলী খান ১৭০৪ সাল থেকে প্রায় ২৩ বছর বাংলার রাজস্বসংগ্রহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই হিসাবে মুর্শিদকুলী খানের বার্ষিক সঞ্চয় আড়াই লক্ষ টাকার বেশি হয় না। সুতরাং মনে হয় না যে, মুর্শিদকুলী খান তহবিল তসরুপ করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের চরিত্র এবং সম্রাটের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্যের কথা বিচার করলেও বলা যায় না, মুর্শিদকুলী খান এইরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে পারতেন। যদিও উপরের আলোচনা মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত রাজস্বমান বা রাজস্বদাবি ছিল কিনা সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বিশেষ সহায়ক নয়, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বন্দোবস্তের রাজস্ব কোন সময়েই সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নি। তাই বন্দোবস্তকৃত রাজস্ব রাজস্বমান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্ধারণের হার কি ছিল তাও বলা শক্ত। শের শাহ এবং আকবরের সময়ে রাজস্বহার ছিল উৎপাদিত শস্যের বা উৎপাদনক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ[৪৯] এবং দাবি করা হয় যে, আওরঙ্গজেবের সময়ে এই হার বৃদ্ধি করে অর্ধেক করা হয়।[৫০] এই হিসেবে টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ ধরে নেয়া যায়। কিন্তু টোডর মল্লের বন্দোবস্তে রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ হলে অঙ্কের সোজা হিসাবে মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বহারকে অর্ধেক বলা যায় না। কারণ টোডর মল্লের ৭৬ বছর পরে শাহ শুজার রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ১৫.৫০% এবং শাহ শুজার ৬৪ বছর পরে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় আরো ১৩.৫০%। শাহ শুজার বন্দোবস্তে নতুন বিজিত ভূমির রাজস্বও ১৪ লক্ষ টাকার বেশি ছিল। মধ্যবর্তী প্রায় দেড়শো বছরে চাষাবাদও অনেক বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সময়ের রাজস্বহার আলোচনা করে প্রশ্নটির কিছু মীমাংসা করা যায়। মুর্শিদকুলী খান থেকে মীর কাশিম পর্যন্ত সকল সুবাদার আবওয়াব বা সেস বা অতিরিক্ত কর আরোপ করেন। এই সেস্‌গুলি ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত এবং ১৭২২ সালের বন্দোবস্তের পরে আরোপিত। স্যার জন শোর এবং জেমস গ্রান্ট সঠিক বলেছেন যে, সেস্-এর পরিমাণ সামান্য হলেও মুর্শিদকুলী খান একবার সেস্ আরোপ করার পরে

৪৮. *Fifth Report*, Appendix 4, 214

৪৯. Moreland, *Agrarian System*, 76, 91.

৫০. ঐ, 135.

পরবর্তী সুবাদারেরা এর সুযোগ গ্রহণ করেন এবং মীর কাশিমের সময়ে শুধু সেস্ খাতেই ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকা সংগৃহীত হয়, যা ছিল ভূমিরাজস্বের প্রায় সমপরিমাণ। সেস্ জমিদারের উপর আরোপিত হয় এবং জমিদারের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়, যদিও নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, শেষ পর্যন্ত সেস্-এর বোঝা কৃষকদেরই বহন করতে হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর ৩৬ বছরের মধ্যে ১৭৬৩ সালে সেস্ সহ সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে রাজস্বহার যদি উৎপাদনের অর্ধেক হয়, তাহলে ১৭৬৩ সালে কৃষকদের সম্পূর্ণ উৎপাদিত পণ্যই রাজস্ব মিটাতে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। অবশ্য ইতিমধ্যে চাষাবাদ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে পণ্যসামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজস্ববৃদ্ধি অভাবনীয় এবং অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। ইংরেজ কোম্পানির রেকর্ডের ভিত্তিতে এই বিষয়ে কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করা যায়। ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলা ২৪টি পরগনা কোম্পানির অধিকারে দিলে কোম্পানি এই পরগনাগুলি পরিচালনার পদক্ষেপ নেয়। কলকাতা কাউন্সিল তাদের এই অর্জিত সম্পত্তির আর্থিক মুনাফা সম্পর্কে এক চিঠি লিখে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে অবহিত করে। এই চিঠিতে বলা হয় যে, এই পরগনাগুলির ৮,১৬,৪৪৬ বিঘার মধ্যে জমিদারেরা শুধু ৪,৫৪,৮০৪ বিঘার রাজস্ব সংগ্রহ করে, বাকি ভূমি পতিত বা অকর্ষিত বা ওয়াকফ্ বা দেবোত্তর সম্পত্তি। এই পরগনাগুলির জন্য নবাবের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ২,১৫,০০০ টাকা বা তার কাছাকাছি।[৫১] পরে কানুনগোদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে কাউন্সিল জানতে পারে যে, সেস্ বাদ দিয়ে নবাবের কাছে দেয় রাজস্ব ২,২২,৯৫৮-১০-১১।[৫২] জমিদারদের সেস্ দিতে হতো, কিন্তু কোম্পানিকে সেস্ দিতে হতো না। স্পষ্টতই এই পরিমাণ রাজস্ব মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয় এবং একথা বলা ভুল হবে না যে, এই হিসাবে প্রতি বিঘা ভূমির রাজস্ব আট আনারও (এক টাকার অর্ধেক) কম হয়। কোম্পানির ২৪ পরগনার কর্তৃত্ব লাভের পরে অবশ্য রাজস্ব নিলামদাররা প্রস্তাব নিয়ে আসে যে, রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পেলে তারা কোম্পানিকে বিগত বছরের সম্পূর্ণ রাজস্ব এবং তদুপরি আরো ১ লক্ষ এক টাকা দেবে।[৫৩] কিন্তু কোম্পানি নিলামে ৭,৬৫,৭০০ টাকা রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা দিয়ে দেয়।[৫৪] এই নিলামের টাকাকে ভূমির প্রকৃত রাজস্বরূপে গণ্য করা যায় না, কেননা নিলাম ডাককারী কৃষকদের শোষণ করে এই অর্থ সংগ্রহ করে। ১৭৬৭ সালে নিলাম ডাককারীরা পরগনাগুলির রাজস্ব সংগ্রহের বিনিময়ে ১০,০০,০০১ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করে। কিন্তু কোম্পানি এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, কারণ কোম্পানির মতে পরগনাগুলির রাজস্বপ্রদানক্ষমতা আরো বেশি।[৫৫] এই সময়ে কাউন্সিলের

৫১. India Office Records: *Letters Received from Bengal*, Vol. IV, 101ff; *Fifth Report*, Vol I, XCVIII.

৫২. James Long, *Selections from Records of the Government of India*, Vol. I, No. 442.

৫৩. *Fifth Report*, Vol. I, C.

৫৪. James Long, *Selections*, No. 443.

৫৫. ঐ, No. 912.

প্রেসিডেন্ট (লর্ড ক্লাইভ) মন্তব্য করেন যে, নিলাম ডাককারীরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি বিঘায় ২-৮-০ থেকে ২-১২-০ আনা সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু তারা নিজেদের আবাদ জমির রাজস্ব দেয় আট আনা থেকে বারো আনা।[৫৬] সুতরাং আট আনা থেকে বারো আনাই বিঘাপ্রতি নবাবের নিকট দেয় রাজস্ব, দুই টাকা আট আনা থেকে দুই টাকা বারো আনা ছিল শোষণ। শোষণ করেই নিলাম ডাককারীরা তাদের নিলামের দাবি শোধ করতো। অনুরূপভাবে ১৭৬১ সালে চট্টগ্রামে প্রেরিত কোম্পানির কর্মকর্তারা জানায় যে, চট্টগ্রামে আবাদ ভূমির পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ কানি। তারা আরো জানায় যে, ১৭১৩ সালে চট্টগ্রামের ফৌজদার মীর হাদী ১,৭৫,৪৫৮ টাকা রাজস্ব আদায় করেন, কিন্তু তিনি নবাবের কাছে ৬৮,৪২২-১০-৭.৫০ প্রদান করেন।[৫৭] গ্রান্টপ্রদত্ত হিসাবমতে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে চাকলা চট্টগ্রামে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৭৬,৭৯৫ টাকা। মীর হাদী কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ এই অঙ্কের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতি কানি ভূমির রাজস্ব আট আনার চেয়েও কম। উল্লিখিত সংখ্যাগুলি ধারণা দেয় যে, ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তে প্রতি বিঘা বা প্রতি কানি ভূমির রাজস্ব আট আনা থেকে বারো আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৫৮] মুর্শিদকুলী খানের সময়ে টাকায় গড়পড়তা চার মণ চাল বিক্রি হতো[৫৯]। সুতরাং বিঘাপ্রতি বা কানিপ্রতি রাজস্ব দুই থেকে আড়াই মণ চালের বেশি নয় এবং তা এক-তৃতীয়াংশের বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

রাজস্ব সংগ্রহের নীতি সম্পর্কে সলিমুল্লাহর বিবরণে দেখা যায় যে, জমিদার ও আমিল (রাজস্ব সংগ্রহকারী সরকারি কর্মকর্তা) উভয়ের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো। রাজস্ব সংক্রান্ত আলোচনার সময় সলিমুল্লাহ জমিদার ও আমিলের কথা সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান জমিদার, আমিল ও অন্যান্য রাজস্বসংগ্রাহকের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হারে[৬০] রাজস্ব আদায় করতেন। এতে বোঝা যায় যে, জমিদার ও আমিল সকলেই জরিপের পরে স্থিরীকৃত রাজস্বনথি বা খতিয়ানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। সুবা বাংলায় কৃষকেরা বা রায়তেরা নগদ টাকায় রাজস্ব আদায় করতো, এখানে শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি চালু ছিল না। আবুল ফজল বলেন :

৫৬. *Fifth Report*, Vol. I, CVII.

৫৭. ঐ, CXX - CXXI

৫৮. ৩৫ ডেসিমেল-এ এক বিঘা। চট্টগ্রামের কানি মঘী কানি, প্রতি কানি ৪০ ডেসিমেল, নোয়াখালী-কুমিল্লায় শাহী কানি ব্যবহৃত হয়, প্রতি শাহী কানি ১৬০ ডেসিমেল। মঘী কানি এবং বিঘার মধ্যে তফাৎ খুব কম। সুতরাং আট আনা থেকে বারো আনা রাজস্ব বিঘা এবং কানি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৫৯. ত.বা. ফলিও ৬৫ বি; S. Bhattacharyya, *East India Company and the Economy of Bengal*, 205, 213 note, "Murshid Quli Khan's Regulations regarding price and supply of Rice", in *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, June 1984.

৬০. ত. বা. ফলিও ৩৬ বি।

জনগণ অনুগত, তারা তাদের রাজস্ব সময়মতো আদায় করে, প্রত্যেক বছরের রাজস্বদাবি আট মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করে, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তারা নিজেরাই মোহর বা টাকা নিয়ে আসে। সরকার ও রায়তদের মধ্যে শস্য ভাগাভাগি এই প্রদেশে চালু নেই। এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়, ভূমির মাপের উপর জোর দেয়া হয় না, এবং উৎপন্নশস্যের আনুমানিক অনুপাত ঠিক করে রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হয়। সম্রাট তাঁর ঔদার্যে এই প্রথা অনুমোদন করেন।[৬১]

সুবা বাংলা যখন বিজিত হচ্ছিল, তখন সামরিক চাকুরির বিনিময়ে সামন্তপ্রধানদের নিজ নিজ রাজ্য বহাল রাখা হয়। এইভাবে ইসলাম খান চিশতী ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ এবং অন্যদের নিজ নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দেন। বিনিময়ে এঁরা নিজ লোকলস্কর, নৌকাসহ মুগলদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঈশা খানের পৌত্র মাসুম খান এবং প্রপৌত্র মুনওয়ার খান নিজস্ব সৈন্য, নাবিক এবং নৌকা নিয়ে মুগল বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। এটা জমিদারদের নগদ রাজস্বের বিনিময়ে রাজস্ব প্রদানের মতো একরূপ নিয়ম। কিন্তু কৃষক বা রায়তদের ক্ষেত্রে নগদ টাকা রাজস্ব দেয়ার পদ্ধতি চালু ছিল। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে জমিদারদের সামরিক চাকুরির প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইতিপূর্বেই সারা বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ হয় এবং দেশে মোটামুটিভাবে স্থিতাবস্থা বিরাজ করছিল। হয়তো এই কারণে রাজস্বের পরিবর্তে সামরিক চাকুরির ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭২২ সালের বন্দোবস্তে এবং ১৭২৮ সালে এই বন্দোবস্তের সুষমকরণে জমিদার কর্তৃক সামরিক চাকুরির কোন উল্লেখ নেই, এর পরিবর্তে কতকগুলি সামরিক প্রতিষ্ঠানের (নওয়ারা, আমলা-ই-আসাম ইত্যাদি) উল্লেখ আছে, যার জন্য জাগির নির্দিষ্ট করা হয়।

এখন মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্তের প্রধান প্রধান দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। এই বন্দোবস্তের মূলকথা ছিল একটি সার্বিক রাজস্বতালিকা তৈরি করা, ভূমির উৎপাদনক্ষমতা এবং রায়তদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তালিকা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা। যতোদিন পর্যন্ত জমিদারেরা যথাযথভাবে রাজস্ব সরকারের কাছে আদায় করতো, ততোদিন তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি স্বত্ব বহাল রাখা হতো। পুণ্যাহ উৎসব[৬২] মুর্শিদকুলী খানের একটি নতুন সংস্কার বা সংযোজন। এটা ছিল সালতামামী উৎসব, যখন রাজস্বসংগ্রহ সম্পূর্ণ করা হতো এবং স্থিতিপত্র (balancesheet) তৈরি করা হতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা অন্য কোন কারণে ফসলহানি হলে রেয়াত দেয়ার প্রশ্ন ঐ দিনই বিবেচনা এবং চূড়ান্ত মীমাংসা করা হতো। এতেও বোঝা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের এবং তাঁর পূর্বের বন্দোবস্তে প্রদত্ত রাজস্বের অঙ্ক রাজস্বমান, রাজস্বদাবি নয় এবং জেমস গ্রান্ট প্রদত্ত রাজস্বের অঙ্ক পরীক্ষা করেও দেখা যায় যে,

৬১. *আইন, ২য়*, ১৩৪।

৬২. ত. বা. ফলিও ৩৮ এ। হান্টার (*Statistical Account of Bengal*, Vol IX, 133) মনে করেন যে, মুর্শিদকুলী খান পুণ্যাহ উৎসব প্রবর্তন করেন। যদুনাথ সরকার (*Mughal Administration*, 7, note) মনে করেন যে, পুণ্যাহ মূলত হিন্দু আমলের রাজস্ব বিভাগীয় উৎসব। এটা হিন্দু আমল থেকে মুসলমান আমলে এবং বৃটিশ আমল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা একটি প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য বলেই মনে হয়, কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের আগে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইংরেজ আমলে জমিদারেরা পুণ্যাহ উৎসব পালন করতো।

নির্ধারিত রাজস্ব কোন সময়েই সম্পূর্ণ সংগৃহীত হতো না। রাজস্বের হারও ছিল মধ্যম (moderate) বা অনতিরিক্ত, খুব সম্ভব উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়। কৃষকদের বীজ সংগ্রহের জন্য তকবি ঋণ দান, অনতিরিক্ত রাজস্বহার নির্ধারণ, ভূমির উৎপাদনক্ষমতা এবং রায়তদের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে রাজস্বহার নির্ধারণ, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা অবলম্বন এবং সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত প্রদান সবকিছুই এই ধারণা দেয় যে, মুর্শিদকুলী খানের রাজস্বসংস্কার নীতি দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। প্রথমত যতো বেশি সম্ভব রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয়ত রায়তদের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করা। মুগল আমলে মুর্শিদকুলী খানের পরে আর কোন বন্দোবস্ত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী সুবাদারেরা আবওয়াব বা সেস্ প্রবর্তন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন।

মুর্শিদকুলী খান জমিদারদের উপর আবওয়াব বা সেস্ প্রবর্তন শুরু করেন। তাঁর প্রবর্তিত সেস্‌কে আবওয়াব-ই-খাসনবিশি বলা হতো। শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান কয়েকটি সেস্ প্রবর্তন করেন, যেমন নযরানা মুকররি, যর মা-তাহুত, মা-তাহুত ফীলখানা এবং ফৌজদারি আবওয়াব। আলিবর্দী খানও কয়েকটি সেস্ প্রবর্তন করেন, যেমন চৌথ মারাঠা, আহুক, নযরানা মনসুরগঞ্জ, এবং মীর কাশিম কিফায়েৎ হস্তবুদ, সরফসিক্কা, কিফায়েৎ ফৌজদারান এবং তৌফের জাগিরদারান নামক সেস্ প্রবর্তন করেন। মুর্শিদকুলী খান থেকে মীর কাশিম পর্যন্ত সকলে যে সেস্ প্রবর্তন করেন তার মোট অঙ্কের পরিমাণ ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকা।[৬৩] আঠারো শতকের প্রথম থেকে সুবা বাংলায় আর্থিক উন্নতি সূচিত হয়। দেশের বহির্বাণিজ্য অভাবিতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশ থেকে বিদেশী বণিক ও বণিক্কোম্পানি মারফত অভাবিত পরিমাণ অর্থ দেশে প্রবেশ করে। ফলে কৃষিপণ্যসহ সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভবত চাষাবাদও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই আর্থিক প্রবৃদ্ধির সুফল কাজে লাগিয়ে নতুনভাবে ভূমি বন্দোবস্ত করা শুজাউদ্দিন থেকে মীর কাশিম পর্যন্ত কোন নবাবের পক্ষে সম্ভব হয় নি। হয়তো তাঁদের সেই প্রবৃত্তি বা সময় ছিল না। তাই তাঁরা নতুন বন্দোবস্ত না করে সেস্ প্রবর্তন করে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করেন। (স্মরণীয় যে, সেস্-এর এই অতিরিক্ত অর্থ সম্রাটের কাছে পাঠানো হতো না।) কিন্তু জমিদার বা রায়তের দেয় রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। মোরল্যান্ড বলেন : "যদিও মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর দাবিকৃত রাজস্বের কোন পরিবর্তন হয় নি, বাণিজ্যবৃদ্ধির সুফল তাদের একা ভোগ করতে দেয়া হয় নি। আবওয়াব প্রবর্তন করে রাজস্বদাবি বৃদ্ধি করা হয়, মাঝে মাঝেই নতুন আবওয়াব প্রবর্তন করা হয় এবং ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির সুফল নবাব-সরকারের কাজে লাগানো হয়।"[৬৪]

৬৩. *Fifth Report*, Vol II. 239. এই সেসগুলির ব্যাখ্যা জেমস গ্রান্ট দিয়েছেন সুতরাং পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

৬৪. Moreland. *Agrarian System*, 199-200

৮

মুগল আমলে ব্যাঙ্কিং

কে. এম. মহসীন*

মুগল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে তীর্থযাত্রী, পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধা হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। বাংলার ক্রমসম্প্রসারণশীল রপ্তানিবাণিজ্য ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে টাকা-পয়সা লেনদেনের চাহিদাবৃদ্ধি ব্যাঙ্কব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।[১] ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ব্যবসায়ীরা রাস্তাঘাটে ডাকাতি এবং ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি এড়িয়ে নিরাপদে ব্যাপকভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারতো। আঠারো শতকের এই সব ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও দেশের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে ব্যাঙ্কারদের ভূমিকা আলোচনা করাই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।[২]

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা, স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল ও কারিগরি দক্ষতা প্রাপ্তি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের ফলে বাংলায় বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদসহ বাংলার বিভিন্ন স্থান উপমহাদেশীয় এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্ক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় পরিবার, বিশেষকরে জগৎশেঠ পরিবারের প্রভাব। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা যাদুঘর বার্ষিক সম্মেলনে এম. এ. রহিম কর্তৃক পঠিত 'Banking in Muslim India' (প্রকাশিত), ১৯৭৩ সালে ভারতীয় ইতিহাস সম্মেলনে Gautam Bhadra পঠিত 'Some aspects of the social position and functions of Merchants at Murshidabad, (1765-93)' শীর্ষক প্রবন্ধ (অপ্রকাশিত) এবং K.M. Mohsin-এর *A Bengal District in Transition. Murshidabad 1765-1793* (Dhaka 1973) দ্রষ্টব্য।

২. বর্তমান প্রবন্ধের জন্য লেখকের *A Bengal District in Transition : Murshidabad 1765-1793* গ্রন্থ থেকে অবাধে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত এবং আব্বাসীয় যুগে আরবদের প্রবর্তিত ব্যাঙ্কব্যবস্থার সমন্বয়েই বাংলার ব্যাঙ্কব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাগদাদ থেকে তাদের ব্যাঙ্কব্যবস্থার ধারণা ও ঐতিহ্য এদেশে প্রচলন করে।[৩]

ব্যাপক ও সুসংগঠিতভাবে না হলেও প্রাচীন ভারতে ব্যাঙ্কব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা বর্তমান ছিল। সে সময়ের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা সাধারণত ঋণদাতা, পোদ্দার, মহাজন এবং দোকানদার হিসেবেই পরিচিত ছিল। গুপ্ত লিপিতে বর্ণিত আছে, গিল্ড অথবা ব্যবসায়ী সমিতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হতো।[৪]

মুসলিম আমলে স্থানীয় ব্যাঙ্কাররা শাসকদের আর্থিক অসুবিধার সময় টাকা ধার দিত। দেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু নগদ, কিছু বিলের মাধ্যমে এই সব ব্যাঙ্কার টাকা আদান-প্রদান করতো। এসব আদান-প্রদান পদ্ধতি সাধারণত হুন্ডি নামে পরিচিত ছিল। হুন্ডি দূরবর্তী স্থানের ব্যবসায়ীদের টাকা প্রদান এবং গ্রহীতা কর্তৃক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা স্থানান্তরে সহায়ক ছিল। এরকম নগদ লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কাররা গ্রাহকের কাছ থেকে বেশ উচ্চহারে কমিশন আদায় করতো।[৫]

এসব ব্যাঙ্কার সচরাচর নিজস্ব মূলধন খাটিয়েই ব্যবসা করতো। সেকালের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থায় জনগণ সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কারদের কাছে জমা রাখতে আগ্রহী হতো না, কারণ ব্যাঙ্কাররাই সাধারণত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার প্রধান শিকার হতো। ১৭৪২ সালে মারাঠা নেতা মীর হাবিব মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যাঙ্কার জগৎশেঠের বাসভবন থেকে তিন লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেন।[৬] বিশ বছর পর নবাব মীর কাশিম অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে শেঠদের প্রভাব লক্ষ্য করে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হন। তিনি শেঠ পরিবারের দু'জন প্রধান সদস্যকে মুঙ্গেরে আনেন এবং সেখানে তাদের প্রাণদণ্ড দেন।[৭]

---

৩. M. Rashid Akhtar Nadvi, 'Industry and Commerce Under the Abbasids' in *Journal of the Pakistan Historical Society*, I: iii (1953). 260-61.

৪. Quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 112.

৫. এম. এ. রহিম, পূর্বোক্ত, ৪। ইংরেজ কোম্পানির রেকর্ডপত্রে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের প্রদত্ত এ ধরনের হুন্ডি বা Bill of Exchange-এর উল্লেখ আছে। K.N. Chaudhury, *The East India Company*, (London 1965), 121-22.

৬. Ghulam Husain Tabatabai, *Siyar-ul-Mutakherin*.Tr. by Haji Mostafa Vol. II, (Calcutta 1926), 457-58

৭. ঐ, 455.

অর্থনীতিতে টাকার ব্যবহারেই বোঝা যায় এ সময়ে ব্যাঙ্কব্যবস্থা কোন পর্যায়ে ছিল। নগদ টাকায় ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য শুল্ক সংগ্রহের অর্থ হচ্ছে, গ্রামসমূহকেও মুদ্রাব্যবস্থার আওতাধীনে আনা হয়েছিল।[৮] 'সারাফ' নামে অভিহিত টাকা বিনিয়োগকারী প্রতিটি শহরের, এমনকি গ্রামের বাজারেও মুদ্রা বিনিময়ের কাজে নিয়োজিত থাকতো। টাকা বিনিময় ও সরবরাহের ক্ষেত্রে এসব সারাফ ছিল খুবই প্রভাবশালী।[৯] আঠারো শতকে বাংলার প্রায় সর্বত্র লেনদেনের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী শেঠ, সারাফ, মহাজন ও পোদ্দারদের হাতে টাকা আদান-প্রদান কেন্দ্রীভূত ছিল। শেঠ এবং সারাফরা ছিল ব্যাঙ্কের মালিক। টাকা বিনিময়কারী হিসেবেও তারা পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার মানিকচাঁদকে শেঠ উপাধি প্রদান করা হলে অন্যান্য অর্থ লেনদেনকারী সারাফদের থেকে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং জগৎশেঠ পরিবারের এ নেতৃত্ব বহুদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার উপর তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন জগৎশেঠের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্কাররা শহরের টাঁকশাল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন জানিয়েছিল।[১০] বস্তুত সে সময়ের জটিল মুদ্রাব্যবস্থার জন্য অর্থনৈতিক লেনদেনে সারাফদের বিশেষ ভূমিকা অনেকখানি দায়ী ছিল।

মুগল টাঁকশালে জনসাধারণ অল্পখরচে তাদের সোনা-রূপা মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারতো। মুদ্রার মান ঐ মুদ্রার ধাতুর পরিমাণ ও ওজনের উপর নির্ভর করতো। সুতরাং আদান-প্রদানের সময় কেবল মুদ্রা জাল কিনা যাচাই করা ছাড়াও এর ওজন ঠিক আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হতো।[১১]

মুদ্রা পরীক্ষা করা তাই সারাফদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল। মুদ্রার খাদ, ওজন এবং মুদ্রণের সময় নিরূপণ করার ব্যাপারে তারা ছিল দক্ষ। বস্তুত সারাফদের অভিজ্ঞতা ও কাজের উপর মুগল টাঁকশালের সাফল্য নির্ভর করতো, কেননা সারাফরাই মুদ্রার

৮. Irfan Habib, *Banking in Mughal India in Contributions to Indian Economic History*, edited by Tapan Ray Chaudhuri, (Calcutta 1960), Vol. 2.

৯. J.B. Tavernier, *Travels in India*, (edited by W. Crook), Vl. 1,4. See also Mohsin, *Murshidabad*, 114.

১০. *Bengal Public Consultations*, Range 3, Vol. 9. 25 December 1784 and 24 January 1785.

১১. "The longer time that a rupee of silver has been coined the less is it worth than those coined at the time or which have been coined a short time, because the old ones having often passed by hand, it wears them and they are in consequence lighter"—quoted in J.C. Sinha, *Economic Annals of Bengal*, 65.

বিশুদ্ধতার মান নির্ণয় করতো। তারা মুদ্রা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে অচল মুদ্রা বাজার থেকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করতো।[১২]

সারাফরা এই ব্যবসা থেকে প্রচুর লাভ করতো। যেহেতু টাকার আসল মূল্য সব সময়ই পরিবর্তিত হতো, সেহেতু সারাফদের পক্ষে ইচ্ছামত কমিশন/বাটা ধার্য করাও স্বাভাবিক ছিল। এ ব্যাপারে তাদের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না বা এ থেকে অর্থাগমও হতো না। ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৫ সালে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ধনী লোকেরা এটা মোটেও অনুভব করতো না যে, দক্ষ লোকেরা অতিরিক্ত বাটা আরোপে বাধা দিতে পারতো; কিন্তু জনসাধারণ, যাদের অধিকাংশই ছিল অনভিজ্ঞ তারা কোন প্রতিকার ছাড়াই আরোপিত কমিশন দিতে বাধ্য হতো এবং অনেক সময় সারাফরা তাদেরকে প্রতারিত করতেও দ্বিধা করতো না।[১৩]

যদিও যেকোন ব্যক্তির জন্য টাঁকশাল ব্যবহারে কোন বাধা ছিল না, তথাপি সারাফরাই টাঁকশালের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করতো। সারাফরা পুরনো ও খাদ- মেশানো মুদ্রা আবার নতুন করে তৈরি করার জন্য টাঁকশালে নিয়ে আসতো এবং একই উদ্দেশ্যে তারা নিজেরা পুরনো মুদ্রাও কিনতো।[১৪] সরকারের রাজস্বসংগ্রাহক, টাকা বিনিময় ও সরবরাহকারী হিসেবে প্রভাবশালী এবং সম্পদশালী ব্যাঙ্কারদের নিয়োগ করার রীতিও ছিল। জগৎশেঠ পরিবারের ইতিহাসে দেখা যায়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ব্যাঙ্কারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[১৫] দেশের বিভিন্ন স্থানে টাঁকশাল থাকায় এবং সেসব টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত বিভিন্ন মানের মুদ্রা বাজারে চালু থাকায় দেশীয় ব্যাঙ্কারদের ব্যবসা বেশ লাভজনক হয়ে উঠে। ব্যাঙ্কারদের কার্যাবলীর সঙ্গে তৎকালীন মুদ্রাব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় এই মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

---

১২. Irfan Habib, 'Banking', 3. ১৭৭৫ সালে বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সারাফদের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কোন বিকল্প মুদ্রাব্যবস্থা চালু না করা পর্যন্ত সারাফদের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখার সুপারিশ করেন। *Murshidabad Factory Record* Vol. XII, 4 October, 1776

১৩. *Home Miscellaneous Series* , Vol. 125, (Francis Minute, 13 March 1775), 429-62. আরো দেখুন, Harry Verelst, *View of the Rise, Progress and Present State of the English Government in Bengal*, (London 1772), 84-95.

১৪. Irfan Habib, "Banking", 4 (note 20).

১৫. H. Sinha, *Early European Banking in India*, (London 1927), 1. জগৎশেঠ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের জন্য দেখুন, J. H. little, 'House of Jagat Seth' In *Bengal Past and Present*, XX and XXII (1920-1924), W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, Vol. IX, 252-65; A.Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, (Dacca 1963), 97.

আঠারো শতকের প্রারম্ভে সুবা বাংলায় ঢাকা, পাটনা ও রাজমহলে তিনটি টাঁকশাল ছিল। ১৭০৫ সালে মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজমহল টাঁকশালের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।[১৬] মুর্শিদকুলী খানের সময় ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা তৈরি হতো। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে সন্ধির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় মুদ্রা তৈরি করার অধিকার লাভ করে। আঠারো শতকের শেষদিকে এদেশে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় হওয়ার পর থেকে কলকাতা টাঁকশাল পুরোপুরি কাজ করতে থাকে।

ব্যাপক লেনদেনের জন্য যে মুদ্রা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো, তা ছিল রৌপ্য- মুদ্রা, যা সিক্কা টাকা নামে পরিচিত ছিল। স্বর্ণমুদ্রা ছিল শখের মুদ্রা। এগুলো সম্রাট অথবা উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপহার অথবা কর প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। ছোটখাটো লেনদেনের জন্য বাংলার জনগণ কড়ি ব্যবহার করতো। মাঝে মাঝে এই কড়ি সরকারের রাজস্ব প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হতো। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৯১ সালের শেষদিকে সিলেট জেলার রাজস্ব কড়িতে প্রদান করা হয়।[১৭] পর্যটক এবং সমসাময়িক লেখকরা মফস্বলে কড়ির বহুল প্রচলনের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৭৭০ সালে ডাচ পর্যটক স্টাভোরিনাস দৈনন্দিন কাজকারবারে কড়ির ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন।[১৮] সাধারণ শ্রমিক তাদের পারিশ্রমিক কড়িতে গ্রহণ করতো। পোদ্দাররা শহরের একটি বড় হাটে সাধারণত এক অথবা একের বেশি কড়ির দোকান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে থাকতো।

---

১৬. Mohsin, *Murshidabad*, 118.

১৭. চারটি কড়িতে ১ গণ্ডা এবং আশি কড়িতে ১ পণ ধরা হতো এবং ৮০ পণ অথবা ৫০০০ কড়ি ১ টাকার সমান ছিল। (দ্রষ্টব্য, W. Harmilton, *Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan*, Vol. 1, 40-41. সিলেট জেলায় কড়িতে রাজস্ব প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করে ১৭৬৯ সালে নায়েব দীউয়ান রেজা খান বলেছেন : পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চল দরিদ্র ছিল এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন অনুযায়ী রূপা আমদানি করতে পারতো না। তাই জনসাধারণ বাধ্য হয়ে তাদের উৎপন্ন ফসল স্থানীয় বাজারে কড়ির বদলে বিক্রি করে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র কিনতো এবং বাধ্য হয়ে কড়ির মাধ্যমেই তাদের রাজস্ব প্রদান করতে হতো। Quoted from Fort William, *India House Correspondence*, Vol. V, 600.

১৮. J.S. Tavorinus, *Voyages to the East Indies*, (Translated by S. H. Wilcocke), Vol 1, 462. পোদ্দাররা বিভিন্ন হাট-বাজারে খোলা জায়গায় বিপুল পরিমাণ কড়ি নিয়ে বসে থাকতো। সকালে তারা রূপার বিনিময়ে কড়ি বিক্রি করতো এবং সন্ধ্যায় খুচরা ক্রেতা-বিক্রেতারা তাদের কাছ থেকে কড়ির বদলে রূপা গ্রহণ করতো। যখন হাট-বাজার বসতো তখন পোদ্দাররা একটি মুদ্রার সঙ্গে ৫৭৬০ টি কড়ি বিনিময় করতো আবার হাট-বাজার শেষে তারা একটি মুদ্রার বদলে ৫৯২০টি কড়ি গ্রহণ করতো। এভাবে পোদ্দাররা ১৬০টি কড়ি প্রত্যেক মুদ্রার বিনিময়ে লাভ করতো। দেখুন, Hamilton, *Hindostan*, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 119.

মুদ্রার মূল্য এর ধাতুর ওজনের উপর নির্ভর করতো এবং সরকার মুদ্রার প্রকৃত মূল্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতো, যার ফলে মুদ্রাপদ্ধতি জটিল হয়ে উঠে। 'সিক্কা' টাকা বাংলার হিসাবের টাকা ছিল না, হিসাবের টাকা ছিল 'চলতি' টাকা। এই টাকা ছিল কল্পিত মুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রায় সকল লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য চলতি টাকায় তা সমন্বয় করতে হতো। ১৭৭২ সালে সিক্কা টাকার সাথে চলতি টাকার সম্বন্ধ ছিল নিম্নরূপ : মুদ্রণের প্রথম বছর সিক্কা টাকা চলতি টাকার চেয়ে ১৬ ভাগ উৎকৃষ্ট ধরা হতো, অর্থাৎ ১০০ সিক্কা টাকা ১১৬ চলতি টাকার সমান। দ্বিতীয় বছরে সিক্কা টাকা চলতি টাকার চেয়ে ১৩ ভাগ উৎকৃষ্ট ছিল। অর্থাৎ ১০০ সিক্কা ছিল ১১৩ চলতি টাকার সমান। মুদ্রণের তৃতীয় বছরে সিক্কা 'সানওয়াত' টাকা হিসেবে গণ্য হতো, যার আসল মূল্য চলতি টাকার চেয়ে শতকরা ১১ ভাগ বেশি। মাদ্রাজ, সুরাট ইত্যাদি জায়গায় যেসব মুদ্রা মুদ্রিত হতো তা চলতি টাকার চেয়ে শতকরা দশ ভাগ উৎকৃষ্ট ধরা হতো যদিও ওজন এবং গুণগত মানে তা ছিল সানওয়াত টাকার চেয়ে উৎকৃষ্ট।[১৯]

চলতি টাকাকে প্রামাণ্য টাকায় পরিণত করার কারণ, এটা ছিল কল্পিত। এটিকে খাদমেশানো বা জাল করা যেতো না। প্রত্যেক বছর পুরনো টাকা নতুনভাবে মুদ্রিত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হতো না। ফলে বিপুল সংখ্যক পুরনো মুদ্রা বাজারে চালু থাকতো। বাটা অথবা ডিসকাউন্টের মাধ্যমে এইসব মুদ্রার সমন্বয় করা হতো এবং এভাবে মুদ্রার প্রকৃত মূল্য বজায় রাখা হতো।

কেবল একটি টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত সিক্কা টাকাই যদি সারা দেশব্যাপী চালু থাকতো, তাহলে মুদ্রাব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হতো। কিন্তু বিভিন্ন টাঁকশালের সরবরাহকৃত মুদ্রা এবং সুরাট ও মাদ্রাজে ইংরেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত মুদ্রাও ব্যাপকভাবে বাংলায় প্রচলিত ছিল।[২০] বিভিন্ন টাঁকশালের মুদ্রাগুলি ছিল বিভিন্ন মানের। বিভিন্ন ওজন ও নিখুঁত অবস্থার মুদ্রা এবং একটি নির্দিষ্ট ও অভিন্ন নামে পরিচিত মুদ্রার হ্রাস-বৃদ্ধিরও অভ্যন্তরীণ মূল্য ছিল। প্রাচীন রীতিতে প্রতিষ্ঠিত বহু টাঁকশাল ছিল, যেখানে মুদ্রার নিখুঁত

১৯. James Stewart, *The Principles of Money Applied to the Present State of the Coin of Bengal* (1772), 16; আরো দেখুন, Karim, *Murshid Quli Khan*, 94 and J.C. Sinha, *Economic Annals*, 112-113.

২০. ঢাকা শহরে ১৭৮৭ সালে সাত রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, "Social Life in Dhaka, 1763-1800", Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future* (Dhaka 1991), 80. আরো দেখুন, S. Islam (ed.) *Bangladesh District Records: Dacca District*, Vol. 1, 1784-87 418-419.

অবস্থা এবং ওজন সংক্রান্ত নিয়ম ছিল ভিন্নতর, যদিও তাদের নাম অভিন্ন ছিল।[২১] বিভিন্ন প্রদেশের টাকা বা মুদ্রা বিভিন্ন প্রকারের মূল্যে প্রচলিত ছিল। মুর্শিদাবাদ এবং পাটনার সিক্কা টাকার মানেরও পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন টাঁকশাল থেকে তৈরি এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা থাকার ফলেই মুদ্রাপদ্ধতির জটিলতা এবং জনসাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। এতে এক শ্রেণীর লোক অথবা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়, যারা মুদ্রাবিশেষজ্ঞ হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রায় অর্থগ্রহণ এবং এক প্রকারের মুদ্রার সাথে অন্য প্রকারের মুদ্রার বিনিময় করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

প্রকৃত চালু টাকা এবং চলতি টাকার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তাতে দু'টি মুদ্রার মাঝে ডিসকাউন্টের হার নিরূপণ করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র সারাফদের। যখন কিছু মুদ্রা কোন সারাফের কাছে আনা হয়, তখন সে পৃথক পৃথকভাবে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখে এবং ঐসব মুদ্রার নিখুঁত অবস্থা ও ওজন অনুসারে সেগুলিকে বিন্যস্ত করে, তারপর সিক্কা এবং সানওয়াতের উপর বিভিন্ন আইনগত বাটা ধার্য করে এবং এরপর চলতি টাকার সাহায্যে সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করে।[২২]

এই পদ্ধতিতে মুদ্রার মান নিশ্চিত করা হলেও জনগণের কাছে এটি অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল। জেমস স্টুয়ার্ট বলেন, "কোন ব্যক্তি সারাফের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব মুদ্রার মান বলতে পারতো না।" মুগল সুবাদার মুদ্রানিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন না! মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার উপর শেঠদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। মুর্শিদকুলী খান শেঠদের সরকারি টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৩] এর ফলে সরকার মুদ্রার উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারায়। শেঠদের সাথে সরকারের এই মৌন সহযোগিতা সম্পূর্ণ অবিবেচনাপ্রসূত ছিল। এর ফলে শেঠরা নিজেদের প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের এই কর্তৃত্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বিস্তারলাভ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুদ্রাপদ্ধতির উপর এইসব ব্যাঙ্কারের প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিল এবং বাংলায় তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্থায়ী এবং একই ধরনের মুদ্রা প্রচলনের একটি প্রয়াস চালায়। ১৭৬৫ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস আদেশ দেন যে, বাংলায়

২১. James Stewart, *The Principles of Money Applied to the Present Sate of the Coin of Bengal (1772)*, 17. ১৭৭৬ সালে টাকা ক্রয় এবং টাকার অংশ লাভের উপর সরাফদের আদায়কৃত বাটা অথবা ডিসকাউন্টের হার জানার জন্য দেখুন, *Murshidabad Factory Records*, Vol. 12, 4 October, 1776.

২২. James Stewart, *Coin of Bengal*, 24; See also Hunter, *Annals of Rural Bengal*, 300.

২৩. S. Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal*, 107.

প্রচলিত সকল প্রকারের মুদ্রা পুনর্বার তৈরি ও সিক্কা টাকার উপর বার্ষিক ডিসকাউন্ট বন্ধ করার মাধ্যমে সিক্কাকে মানসম্পন্ন করে তৈরি করতে হবে। কলকাতা টাঁকশালের অধ্যক্ষ আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, সারাফরা নতুন সিক্কা পরিমাপে ব্যর্থ হবেন এবং এভাবে বাজারে এসব মুদ্রার কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি হবে।[২৪] মুহম্মদ রেজা খান এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কারণ তিনি মনে করেন, দেশীয় ব্যাঙ্কাররা এতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি প্রস্তাব দেন যে, প্রদেশের চারটি টাঁকশালে একই ওজন ও মানের মুদ্রা তৈরি করা যেতে পারে।[২৫] কাউন্সিলের কিছু সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও কোর্ট অব ডিরেক্টরস ১৭৭১ সালে সানওয়াত টাকার উপর বাটা উচ্ছেদের জন্য পূর্ববর্তী আদেশ পুনরায় ঘোষণা করে।

ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালের অর্থাৎ ১৭৭১ সালের দ্বাদশ বছর থেকে কোম্পানির টাঁকশালে সিক্কা টাকা তৈরি করা হবে এবং এই সকল সিক্কা টাকা ১৬ শতাংশ বাটায় আদান-প্রদান করা হবে। প্রবিধানে আরো ঘোষণা করা হয় যে, নতুন সিক্কাগুলি একাদশ সালের সিক্কাকে মূল্যমান হ্রাসে বাধ্য করবে না। অর্থাৎ যে সিক্কাগুলি ১৭৭০ সালে তৈরি হয়েছিল সেগুলি টাঁকশাল থেকে আসার সময় প্রথমে তাদের যে মান ছিল তা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং সেহেতু পরবর্তী বছরগুলোতে যেসব সিক্কা প্রচলন করা হয়েছিল সেগুলি তাদের পূর্ণমান রক্ষা করবে, যার মাধ্যমে সিক্কা টাকার উপর তাদের সানওয়াত সময়কালের আগে প্রতিষ্ঠিত ক্রমমূল্যহ্রাসকরণের বিধান বিলোপ করা যায়।[২৬] এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য ছিল সিক্কা টাকাকে ধার্য করে দেওয়া এবং সিক্কা টাকার একটি অভিন্ন মান অর্জন করা। কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন টাঁকশাল থেকে প্রচলিত মুদ্রার নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত মান বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তাই ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ সালের শেষদিকে ঢাকা ও পাটনার টাঁকশালগুলো বন্ধ করে দেন। এর মধ্যে স্যার জেমস স্টুয়ার্টের প্রস্তাবনা তাঁর বইয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন প্রকারের টাকা প্রচলিত থাকায় এবং একই টাকা সকল দ্রব্যের জন্য যেকোন জেলায় ব্যবহার করা সম্ভব না হওয়ায় সিক্কা টাকা স্থায়ী করার ব্যবস্থা হিসেবে প্রচুর মুদ্রা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৭]

---

২৪. J. C. Sinha, *Economic Annals*, 117; আরো দেখুন, Mohsin, *Murshidabad*, 123-124.

২৫. *Murshidabad Factory Records* , Vol. 3, 330, (May, 1771).

২৬. *Bengal Public Consultation*, 26 August 1771.

২৭. বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থির করার আগে গভর্নর জেনারেল সিক্কা টাকার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা থেকে যে সুযোগ-সুবিধা আশা করা যেতে পারে সে ব্যাপারে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলোর মতামত চেয়ে পাঠান। প্রাদেশিক কাউন্সিল সিক্কা টাকা স্থায়ী করার ব্যবস্থা হিসেবে প্রচুর মুদ্রা তৈরি করার সিদ্ধান্তটি সরকার ও জনসাধারণের উপকারে আসবে চিন্তা করে সমর্থন জানান। দেখুন, J. C. Sinha, *Economic Annals*, 136 and Mohsin, *Murshidabad*, 124-125.

অতএব, হেস্টিংস সরকার ১৭৭৭ সালের মে মাসে একটি প্রাবিধানের দ্বারা ঘোষণা করে যে, কেবল কলকাতার টাঁকশালে প্রদেশে ব্যবহারের জন্য মুদ্রা তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হবে। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে যে সিক্কা টাকা তৈরি করা হবে সেগুলি ছাড়া প্রাদেশিক কাউন্সিল ও কালেক্টরগণ তাদের ট্রেজারি থেকে সকল টাকা কলকাতায় প্রেরণ করবেন। টাঁকশালে স্বর্ণ আনার জন্য লোকদেরকে উৎসাহপ্রদান করার উদ্দেশ্যে পুনর্মুদ্রণের জন্য আড়াই শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়।[২৮]

বাংলায় এধরনের মুদ্রা প্রবর্তনে এটি ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। সরকার মুদ্রা তৈরিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অত্যন্ত শঙ্কিত ছিল। অন্যদিকে টাঁকশালের খরচ হিসেবে মুদ্রিত মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অংশ টাঁকশালের অফিসারদের দেওয়া হতো এবং দূরের জেলাগুলি থেকে পুরনো মুদ্রা কলকাতায় আনার ব্যাপারে পরিবহনখরচ, পথের ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ও এতে জড়িত ছিল। ফলে প্রদেশে সিক্কা টাকার যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ দেখা যায় নি। পরে চালু অবস্থা থেকে পুরনো এবং খাদযুক্ত মুদ্রাগুলি তুলে নেওয়ার বিষয়টি একটি বিরাট সমস্যারূপে কর্নওয়ালিস সরকারের নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। পনেরো বছরের কিছু সময় পরে বিভিন্ন শহরের কালেক্টরগণ মুদ্রাব্যবস্থার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, প্রদেশের প্রায় প্রতিটি শহর এবং পরগনায় বিভিন্ন বছরের এবং মূল্যের ১১, ১২ অথবা ১৫ সানওয়াত টাকা মূল্যমানের প্রধানত পুরনো আমলের একটি আলাদা সিক্কা মুদ্রা চালু ছিল। ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত টাঁকশালে কিছু মুদ্রা তৈরি হতো এবং অন্যগুলি ব্যক্তিগতভাবে গোপনে তৈরি হতো।[২৯]

কর্নওয়ালিস সিক্কা টাকা থেকে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি দূরীকরণে পরবর্তী সময়ে জোর প্রয়াস চালান এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদের টাঁকশালগুলি পুনরায় চালু করার নির্দেশ দেন।[৩০] দেশের এ মুদ্রাসঙ্কটের সময় ব্যাঙ্কার ও সারাফরা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুদ্রাব্যবস্থার এই জটিলতার সুযোগে তারা প্রদেশের মুদ্রা সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়।

২৮. *Murshidabad Factory Records*, Vol. 6, 20 March 1772.

২৯. J. C. Sinha, *Economic Annals*, 142 and N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol. 1, 124-127.

৩০. ১৭৯২ সালের দিকে এসব টাঁকশাল পুনরায় চালু করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে অল্পকাল পরই একে একে এ টাঁকশালগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়—মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল ১৭৯৫ সালে, পাটনা টাঁকশাল ৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৬, ঢাকা টাঁকশাল ৩১ জানুয়ারি ১৭৯৭ বন্ধ করা হয়। E. Thurston, "Note on the History of the East India Company's Coinage from 1753-1835," in The *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, LXII: I (1893), 54, 59-60.

এই সময়ের মুদ্রাব্যবস্থার অদ্ভুত অবস্থার সাথে সারাফদের কাজও ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তবে সারাফদের এইসব কাজ পরবর্তীকালে আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠার পর আর লক্ষ্য করা যায় নি।

মুদ্রাবিনিময় অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যাঙ্কব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকায় মুদ্রা পরীক্ষা ও বিনিময় করা ছাড়াও দেশীয় ব্যাঙ্কাররা হুন্ডির মাধ্যমে টাকাপয়সা আদান-প্রদান করতো। সুতরাং সারাফদের দ্বিতীয় কাজ ছিল হুন্ডির ব্যবসা। হুন্ডি অথবা ব্যাঙ্কারদের ড্রাফট এবং বিনিময়পত্রের বহুল প্রচলন ছিল। হুন্ডিপদ্ধতি প্রচলনের ফলে দূরবর্তী স্থানে মুদ্রা বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তৎকালীন পরিবহন ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাবহন বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল ছিল। ইংরেজদের দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭২৮ সাল থেকে জগৎশেঠ ব্যাঙ্কপরিবার মুর্শিদাবাদ থেকে দিল্লীতে হুন্ডি অথবা বিনিময়পত্রের মাধ্যমে বাংলার রাজস্ব প্রেরণের ব্যবস্থা করে।[৩১]

ঢাকা থেকে দিল্লী পর্যন্ত উত্তর ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে জগৎশেঠ পরিবারের বহু শাখাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এই পরিবার বিভিন্ন শাখা থেকে টাকা তোলার জন্য বিনিময়পত্র প্রদান করতো। জগৎশেঠ পরিবার এর ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের সকল শাখা, দালাল এবং বার্তাবাহকদের মাধ্যমে বিস্তৃত একটি বিলিব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলে। সমগ্র উপমহাদেশে তাদের সমকক্ষ কোন ব্যাঙ্কার অথবা ধনী ব্যবসায়ী ছিল না। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলায় তাদের সমসাময়িক অন্যান্য ব্যাঙ্কার, তাদের প্রতিনিধি নতুবা তাঁদের পরিবারের কেউ ছিল।[৩২] ঢাকা এবং ত্রিপুরার রাজস্ব প্রেরণে বিলম্বের জন্য মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল ঢাকা কাউন্সিলকে জগৎশেঠ পরিবারের বিনিময়পত্রের মাধ্যমে রাজস্ব প্রেরণের নির্দেশ দেয়। ১৭৭১ ও ১৭৭২ সালে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের সুপারভাইজাররা জগৎশেঠ পরিবার থেকে বিনিময়পত্রের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব প্রেরণ করেছিল।[৩৩]

দেশী ব্যাঙ্কারদের দ্বারা প্রচলিত সবচেয়ে সাধারণ মুদ্রা বিনিময়পদ্ধতি ছিল হুন্ডি। হুন্ডিকে এভাবে বর্ণনা করা হয় যে এটি একটি লিখিত, সাধারণত শর্তহীন আবেদনপত্র, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাওয়ামাত্র এতে উল্লিখিত ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দিষ্ট

৩১. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 222. আঠারো শতকে হুন্ডি ব্যবসায়ের জন্য দ্রষ্টব্য, Irfan Habib, "Banking", 8-14; A. Rahim, 1-6; L.C. Jain, *Indigenous Banking in India*, (London 1924), 70-83; Mohsin, *Murshidabad*, 128-132.

৩২. *Siyar*, Vol. II, 457-58.

৩৩. *Proceedings of the Council of Revenue*, 1771-1772, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 129.

পরিমাণ টাকা নেওয়া যেতো। এটি ছিল কোন বণিককে প্রদানের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণপদ্ধতি এবং অন্য যেকোন স্থানে পুনঃপরিশোধযোগ্য। এটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা প্রেরণের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। হুন্ডির কাজ বা ভূমিকা বর্তমানকালে ডাক, মানিঅর্ডার, চেক ও ব্যাঙ্কড্রাফটে রূপান্তরিত হয়েছে। আঠারো শতকে হুন্ডি ব্যবসা খুব জনপ্রিয় ছিল। কেউ টাকা পাঠাতে চাইলে তিনি ব্যাঙ্কারের কাছে টাকা জমা রেখে পরিবর্তে অন্য স্থানের ব্যাঙ্কারের প্রতিনিধির ঠিকানাযুক্ত হুন্ডি গ্রহণ করতেন। বস্তুত এই হুন্ডি হচ্ছে জমাকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য যিনি হুন্ডি প্রদান করেন তাঁর দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি আদেশপত্র। যদিও এতে অন্য কোনভাবে নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা ছিল না, তবুও একে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হতো এবং যার নামে হুন্ডি কাটা হতো তাকে যথাসময়ে অর্থ পরিশোধ করা হতো।

আঠারো শতকে এইসব হুন্ডি বা বিনিময়পত্র থেকে ব্যাঙ্কাররা ডিসকাউন্ট বা কমিশন গ্রহণ করতো। টাভার্নিয়ার সুরাটে প্রচলিত বিভিন্ন বিনিময়পত্রের উপর ডিসকাউন্টের হারের একটি তালিকা দেন। তিনি বলেন, এইসব শহরে একজন ব্যবসায়ীর কিছু ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে স্থানীয় ব্যাঙ্কাররা তাদেরকে চড়া সুদে বিনিময়পত্র দিত। এ ছাড়া অনাদায়ের ঝুঁকিস্বরূপ অতিরিক্ত টাকাও আদায় করা হতো। তবে এ হার সময় এবং অবস্থার নিরিখে বিবেচনা করা হতো।[৩৪]

১৭৮৬ সালে মুর্শিদাবাদ কাস্টমস-এর কালেক্টর বলেন যে, বিনিময়পত্রের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় টাকা প্রেরণ করার জন্য দেশীয় ব্যাঙ্কাররা কোম্পানির কাছ থেকে অর্ধ শতাংশ হারে ডিসকাউন্ট দাবি করে।[৩৫] উনিশ শতকের প্রথমদিকে বুকানন লিখেন যে, জগৎশেঠ পরিবার এদেশের বিভিন্ন স্থানে বিনিময়পত্র সরবরাহ করতো এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কারের সরবরাহ কেবল কলকাতা, পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের বিনিময়হার নির্দিষ্ট ছিল এবং দূরত্ব অনুসারে এ হার নির্ধারিত হতো।[৩৬] ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে ব্যাঙ্কারদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠিত ইনস্যুরেন্সব্যবস্থা দেশে বিদ্যমান ছিল। এ. সি. লায়াল বলেন, আঠারো শতকে ভারতের সর্বত্র একটি উদ্যমী ব্যবসায়িক সম্প্রদায় বিনিময়ব্যবস্থা পরিচালনা করতো।

---

৩৪. *Bengal Revenue Council*, Range 49, Vol. 39, 13 April 1773, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 131-323.

৩৫. *Bengal Board of Revenue Proceedings*, Range 70, Vol. 16, 23 June 1786.

৩৬. Mohsin, *Murshidabad*, 132.

আধুনিককালের মতো জীবনবীমা পদ্ধতি মুগল আমলে বিদ্যমান ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সাধারণত মালামাল এবং জাহাজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য বীমা করা হতো। জানা যায় যে, পথের নিরাপত্তাহীনতার কারণে ব্যবসায়ীরা তাদের মালামাল, জিনিসপত্র ও অন্যান্য সম্পদ স্থানীয় ব্যাঙ্কে জমা দিত এবং এইসব ব্যাঙ্ক যথাসময়ে মালিকের কাছে মালামাল পৌঁছে দিত।[৩৭] ইংরেজদের আঠারো শতকের রেকর্ডপত্রে ইনস্যুরেন্সের বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে জল ও স্থলপথে মালামাল বহন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় সারাফরা নিজেদের অন্য কাজে নিয়োজিত করে।

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের পরবর্তী দায়িত্ব ছিল সরকারের সাথে বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে লেনদেন করা। এর প্রধান দিক ছিল রাজস্ব গ্রহণ ও প্রেরণ, রাজস্ব আদায় ও সরকারকে ঋণ প্রদান। জগৎশেঠ পরিবারের সমৃদ্ধির ইতিহাস এবং মুগল সম্রাট কর্তৃক ফতেহ চাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রদান থেকে বোঝা যায়, ব্যাঙ্কারদের সাথে শাসকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে সরকারি স্থানীয় কর্মকর্তা এবং জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজধানীতে পাঠানোর দায়িত্বও ব্যাঙ্কারদের হাতে অর্পণ করা হয়।[৩৮]

জগৎশেঠ পরিবার বাংলায় সরকারি রাজস্ব গ্রহণকারী এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতো। মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে জগৎশেঠ ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ রাজস্বের জামিনদার হিসেবে স্থান করে নেন। জমিদাররাও অনাদায়ী রাজস্ব পরিশোধের জন্য জগৎশেঠের শরণাপন্ন হতেন। জগৎশেঠের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান রাজস্ব গ্রহণ এবং সরকারি লেনদেন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা সিক্কামানে রূপান্তরিত করার জন্য পরীক্ষা, বিন্যস্তকরণ ও ওজন করার অধিকার ভোগ করতো। অর্থবছরের প্রথম দিন 'পুন্যাহ' অনুষ্ঠানে জগৎশেঠ জমিদার-কৃষকদের পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া খাজনার জন্য জামিনদার হওয়ার এবং তার পক্ষ থেকে সরকারকে সমস্ত পাওনা পরিশোধ করার অঙ্গীকারপত্র প্রদান করতেন। এজন্য জমিদারদের কাছ থেকে তিনি শতকরা দশ ভাগ কমিশন লাভ করতেন। এ পদ্ধতিতে সরকারের সুবিধা ছিল এই যে, অনাদায়ী খাজনার জন্য তাদের আর কোন মাথাব্যথা ছিল না। ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শহরের জমিদার ও কৃষকদের বিপুল অনাদায়ী খাজনা এমন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো। এতে জমিদাররাও তাদের সুবিধামতো রাজস্ব পরিশোধ করতে সক্ষম হতো।

যেকোন ধরনের রাজস্বসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে আর্থিক দিক দিয়ে বাংলার ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল এবং সরকারকে ঋণ প্রদান করার ব্যাপারে এগুলো বেশ নির্ভরশীল ছিল। এসব ঋণ ছিল উপায়-উপকরণের সংস্থান অথবা সামরিক অভিযান অথবা ঝুঁকির

---

৩৭. Irfan Habib, "Banking", 15-16.
৩৮. Mohsin, *Murshidabad*, 134.

ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি অর্থযোগান সম্পর্কিত। সরকারকে ঋণ প্রদান করার বদৌলতে এসব ব্যাঙ্ক বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতো এবং কোন কোন এলাকায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা অর্জন করতো। এই বিশেষ সুবিধার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জগৎশেঠ পরিবার তাদের ব্যবসার জন্য মাত্র ৫ শতাংশ শুল্ক প্রদান করতো এবং শুল্ক অফিসে তাদের মালামাল পরীক্ষা করা হতো না।[৩৯] ১৭৭৩ সালে সম্রাট শাহ্ আলম এই মর্মে মুহম্মদ রেজা খানকে চিঠি লিখেন যে, তিনি যেন জগৎশেঠকে দিল্লীতে পুনরায় ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালু করার জন্য প্রভাবিত করেন। সম্রাট প্রতিজ্ঞা করেন, এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।[৪০] সরকারের অর্থব্যবস্থার সাথে জড়িত নয় এমন ব্যাঙ্কপরিবার ও বণিকদেরকে সরকার সব সময় ঋণ প্রদানের অনুরোধ জানাতো। ১৭৮৯ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর বোর্ড অব রেভিনিউকে জানান যে, ১৭৮৮ সালের রাজস্ব প্রদানের জন্য তিনি মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন[৪১]:

গোপাল দাস	-	১৭,৪৮৪	টাকা
জগৎশেঠ	-	১০,০০০	"
কিশোরী মোহন	-	৪,৮৪৯	"
জগবন্ধু রায়	-	৩, ৯৯৬	"
বাহাদুর সিংহ	-	১, ৯৯৯	"
বিজয়রাম রায়	-	১,৮৯৬	"
কাশীনাথ	-	৯৯৮	"
মোট	-	৪১, ২২২	টাকা

ইংরেজ কোম্পানির রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, জগৎশেঠ পলাশী যুদ্ধের পর মীর জাফরকে তাঁর প্রতিশ্রুত অর্থ ইংরেজদের প্রদানের সুবিধার্থে এবং অন্যান্য ব্যয় বহনের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন।[৪২]

৩৯. *Board of Revenue Misc. Proceedings*, R. 98. Vol. 4, 21 April 1773.

৪০. ঐ, 12 February to 13 September 1773, quoted in Mohsin, *Murshidabad*, 135.

৪১. *Bengal Revenue Consultations*, R. 51, Vol. 37, 6 June 1789.

৪২. হিসাব অনুসারে জগৎশেঠ ১৭৬৬ সালে নবাবের কাছে ২১ লাখ টাকা দাবি করেন। এ ব্যাপারে কোম্পানি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উক্ত টাকার অর্ধেক অর্থাৎ দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দশ বছরের মধ্যে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে নবাবের ভাতা থেকে পরিশোধ করা হবে। কিন্তু নবাব ১৫ বছরেও তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হন। ১৭৯০ সালে জগৎশেঠ গভর্নর জেনারেলকে জানান যে, নবাব তার কাছে ঋণী। *Bengal Public Consultation*, R.3 Vol. 51, 29 March 1790.

সরকারি ঋণের সুদের পরিমাণের সঠিক হার বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বলা হয়, এই হার জমিদারদের সাথে ব্যাঙ্কারদের আরোপকৃত হারের চেয়ে কম ছিল। আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকে তারা জমিদারদের উপর বছরে দশ থেকে বারো শতাংশ সুদের হার ধার্য করেছে।[৪৩]

এইসব ব্যাঙ্ক পরিবার সরকারের সাথে তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করতো। বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ইউরোপীয় বণিকরা স্থানীয় বণিকদের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিত। ইংরেজ বণিকদের নথিপত্রে জগৎশেঠ পরিবারকে তাদের মূলধনের স্থানীয় উৎস হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।[৪৪]

প্রদেশব্যাপী তাদের ব্যবসা বিস্তৃত হওয়ায় এ সম্পর্কে কোন সঠিক বা বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। যাহোক, প্রকৃতপক্ষে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে সরকার, জমিদার ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সাথে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি গুটিকয়েক ব্যাঙ্কপরিবারের মধ্যে, বিশেষকরে জগৎশেঠ পরিবার এবং পরবর্তী সময়ে মনোহর দাস ও গোপাল দাস পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নিম্ন পর্যায়ে বহু ব্যাঙ্ক ছিল, যাদের ব্যবসা প্রদেশের সব এলাকায় বিস্তৃত ছিল।[৪৫] বুকাননের ভাষ্য অনুযায়ী উনিশ শতকের প্রারম্ভে 'কুঠিওয়ালা' বলে অভিহিত মুর্শিদাবাদের সাতজন ধনী ব্যাঙ্কার তাদের প্রতিনিধি এবং গ্রামীণ ঋণদাতাদের মাধ্যমে গ্রামের কারিগর ও সাধারণ লোকদের ঋণ প্রদান করতো। এই ব্যাঙ্কাররা সীমিতভাবে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতো। তবে তাদের প্রধান ব্যবসা ছিল টাকার লেনদেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন গ্রহীতার জন্য টাকার যোগানদানকারী দেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ শহরের ধনী ব্যাঙ্কার থেকে শুরু করে কারিগরদেরকে ক্ষুদ্র পরিমাণের অর্থ ঋণ প্রদানকারী গ্রামীণ ঋণদাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের ব্যবসার প্রকৃতি, বিস্তার এবং কি পরিমাণ মূলধন তারা নিয়োগ করতো সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও বেশিরভাগ মহাজন নিজ এলাকায় ব্যবসা করতো, তবু তাদের সমগ্র ব্যবসা থেকে মোটা অঙ্কের লাভ হতো। কাজের দিক থেকে ব্যাঙ্কাররা মহাজনদের থেকে আলাদা ছিল। মহাজনরা প্রধানত অর্থ ধার দেওয়ার ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের ফলে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের কাজ সীমিত হয়ে পড়ে, তবে মহাজনদের ব্যবসা অক্ষুণ্ন থাকে। এই ব্যবসার পদ্ধতি এবং মহাজনরা কি নিয়ম অনুসরণ করতো এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব আছে। সাধারণত এই ঋণ কোন

৪৩. Mohsin, *Murshidabad*, Vol. I. 137

৪৪. O. H Little, 19-33.

৪৫. ঢাকার প্রভাবশালী ব্যাঙ্কারদের নামের জন্য দেখুন, S. Islam, 'Social life', 5-6. অন্যান্য ব্যাঙ্কারদের তালিকার জন্য দেখুন, *Bengal Public Consultation*, 1 August 1778 and Gautam Bhadra, 'Merchants at Murshidabad', 12-14.

প্রমাণপত্র বা সাক্ষী ছাড়াই পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেওয়া হতো। জমি, সোনার অলঙ্কার এবং অন্যান্য সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হতো।

বুকাননের বর্ণনা থেকে উনিশ শতকের প্রারম্ভে এই সুদের হার সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বলেন যে, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় শহরে সুদের গড় হার ছিল বারো থেকে আঠারো শতাংশ, কিন্তু তারা মুনাফার উপর আরো সুদ ধার্য করতো।[৪৬]

অনেক সময় মহাজনেরা শস্যের মরসুম আসার আগে চাষীদেরকে অর্থঋণ প্রদান করতো। এই ঋণের পরিবর্তে চাষীর কাছ থেকে তারা শস্য গ্রহণ করতো এবং বাজারে অধিক মুনাফালাভের জন্য শস্য গুদামজাত করতো। বিভিন্ন জেলায় জগৎশেঠরা যে সুদ আদায় করতো তা প্রতি মাসে দুই থেকে চার শতাংশ পর্যন্ত উঠানামা করতো। তবে ব্যক্তিগত ঋণের জন্য মহাজনরা আরো অধিক হারে সুদ আদায় করতো।[৪৭]

ধনী ব্যাঙ্কাররা প্রধানত আর্থিক লেনদেনের কাজেই নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতো। তবে তাদের সকলেই মূলত ব্যবসা ও ব্যাঙ্কের কাজ এ দু'টি একত্রে পরিচালনা করতো। আঠারো শতকের শেষভাগে অধিকাংশ ব্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে এটি সত্য ছিল। তিন ধরনের দেশীয় ব্যাঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রধানত যাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্যাঙ্কসংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা, যারা মূলত শেঠ ও সারাফ বলে পরিচিত ছিল; দ্বিতীয়ত যারা ছিল প্রধানত ব্যবসায়ী বা বণিক এবং যারা ব্যাঙ্কের কাজে কিছু কিছু মূলধন নিয়োগ করতো; শেষত তারা ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসা দুটিই সমানভাবে পরিচালনা করতো, যাদের ব্যাঙ্কার অথবা ব্যবসায়ী হিসেবে সহজে চিহ্নিত করা দুরূহ ছিল।

আঠারো শতকে বাংলার নবাবদের সময়ে দেশীয় ব্যাঙ্কাররা মুদ্রা এবং সরকারি অর্থের উপর যে প্রভাব অর্জন করেছিল তা বৃটিশ প্রশাসনের প্রথমদিকেও অটুট ছিল। কিন্তু তারা তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি শেষপর্যন্ত বজায় রাখতে পারে নি। তবে ইংরেজদের দীউয়ানি লাভের পরও গ্রামাঞ্চলে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণ বিশ্বাস করতো, তাদের মাধ্যমে জমিদাররা সহজেই সরকারের খাজনা মেটাতো এবং টাকা স্থানান্তরের সুযোগ-সুবিধা যুগিয়ে, টাকা সরবরাহে উৎসাহিত করে তারা আর্থিক লেনদেনে সহায়তা করতো। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ ব্যাঙ্কপরিবারের আয়ের উৎস সীমিত হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলো ধ্বংসমুখী হয়ে পড়ে। যে জগৎশেঠ পরিবার দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো, ১৭৬৫ সালের পর সে পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।[৪৮]

---

৪৬. Buchanan, *Dinajpur*, 211.

৪৭. *Murshidabad Factory Records*, Vol. 5, 18 February 1772.

৪৮. Gautam Bhadra, 'Merchants at Murshidabad', 9-11.

জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মানিক চাঁদ আঠারো শতকের প্রথমদিকে পাটনা থেকে ঢাকায় এসে একটি ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। মুর্শিদকুলী খান ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করলে মানিক চাঁদও মুর্শিদাবাদে চলে যান। তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এবং নবাবের ব্যাঙ্কার ও উপদেষ্টার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭১২ সালে সম্রাট ফররুখশিয়র সিংহাসনে আরোহণ করার পর পরই মানিক চাঁদকে 'নগরশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৭১৪ সালে মানিক চাঁদের মৃত্যুর আগেই এ পরিবার প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর উত্তরাধিকারী ফতেহ চাঁদ ১৭২৩ সালে সম্রাট মাহমুদ শাহের কাছ থেকে 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভের পর তাদের পরিবারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক রেকর্ডপত্রে উল্লেখ আছে যে, ঋণগ্রহণ, সোনারূপা বেচাকেনা এবং অন্যান্য লেনদেনের মাধ্যমে জগৎশেঠ পরিবারের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই পরিবারের আয়ের উৎস ছিল অনেক। এরা সরকারি রাজস্বের তত্ত্বাবধায়ক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিল। জমিদারের প্রদত্ত অর্থ এবং সংগৃহীত রাজস্ব এই পরিবারের কাছে জমা থাকতো এবং বাংলার রাজস্ব তাদের মাধ্যমেই দিল্লীতে পাঠানো হতো। এসব লেনদেনে তারা শতকরা দশ ভাগ কমিশন পেতো এবং এই উৎসগুলি থেকে তারা বছরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করতো। দেশের টাঁকশালে তাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, কলকাতায় টাঁকশাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠলে জগৎশেঠ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের সপক্ষে জগৎশেঠ পরিবারের ভূমিকা সর্বজনবিদিত।

১৭৫৭ সালের পর থেকেই এ পরিবারের পতন শুরু হয়। মুগল সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে জগৎশেঠ বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। নবাব মীর কাশিম এই পরিবারের দু'জন প্রভাবশালী সদস্যকে হত্যা করলে এদের পতন আরো ত্বরান্বিত হয়। শেঠদের বিশ্বাস যে, খুশাল চাঁদ বিপুল পরিমাণ অর্থ মাটির নিচে পুঁতে রাখেন। মৃত্যুর আগে তিনি কাউকে এ গুপ্ত খবর বলে যেতে পারেন নি[৪৯], তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ কোম্পানির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে শেঠদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশী এবং দেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের আর ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হতো না এবং রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবেও তারা আর বহাল রইলো না।[৫০]

৪৯. Mohsin, *Murshidabad*, 143

৫০. H.R. Ghosal, *Economic Transition in the Bengal Presidency*, 284-285; Hamilton, *Hindostan*, Vol. 1, 40-41.

সম্ভবত কোম্পানির সাথে এই পরিবারের অতীত বাণিজ্যের প্রতিদানে কোম্পানি জগৎশেঠকে বেশ কিছুকাল নিজস্ব ব্যাঙ্কার হিসেবে নিয়োজিত রাখে। কিন্তু ১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে সরকারি কোষাগার কলকাতায় স্থানান্তরিত হলে কোম্পানির ব্যাঙ্কার হিসেবে তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসা ছোট ছোট সারাফদের হাতে চলে যায়। ১৭৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতার বাণিজ্যিক সার্কেলে নবাগত হিসেবে পরিচিত হাজারী মল ও দয়াল মল এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন। তখন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে এ পরিবারের অর্থ মুদ্রণের বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে তাঁরা এ সুবিধা কাজে লাগাতে পারে নি। ১৭৬১ সালে মীর কাশিম মুর্শিদাবাদে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সরকারের সাথে আর্থিক লেনদেনের জন্য মনোহর দাস ও দ্বারকা দাসের একটি ফার্ম ১৭৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যে লেনদেনের কাজ আগে জগৎশেঠ পরিবারের দ্বারা সম্পাদিত হতো।[৫১] সঙ্কীর্ণ পরিসীমায় ব্যাঙ্কের কাজ ব্যবসানিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হলেও এসব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সংগঠনজনিত সমস্যার কারণে একটি সমন্বিত ব্যাঙ্কব্যবস্থা পুনরায় গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি।

স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের এই সংগঠনজনিত সমস্যা এবং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ পায়। ফলে দেখা যায়, সরকারি ট্রেজারি ও পাশ্চাত্য ধাঁচে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হতে শুরু করে। এতে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি আরো অসুবিধায় পড়ে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন একটি সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং তৎপরতা শুরু করে, তখন এসব দেশীয় ব্যাঙ্ক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৭৭৩ সালের ১৩ এপ্রিল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিকল্পনার ফলে বাংলা ও বিহারে সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় বিলের মাধ্যমে রাজস্ব প্রেরণ করে বাংলার গ্রামাঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন অটুট রাখা। এই প্রক্রিয়ায় খাজনা প্রদানের মাধ্যমে যে অর্থ গ্রহণ করা হতো, তার পূর্ণমান বজায় রাখার ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই ব্যাঙ্কের অন্য উদ্দেশ্য ছিল এর বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে আড়ংসমূহে ব্যবসায়ীদের জন্য টাকা প্রেরণের সহজ ও সস্তা উপায় সৃষ্টি করে দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করা।[৫২]

---

৫১. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol 1. 143-145 (note 3).

৫২. J. C. Price, *Notes on the History of Midnapore*, Vol. 1, 201-206; *Bengal Revenue Consultation*, Range 49, Vol 39, 13 April, 1773

যাহোক, বিভিন্ন জেলায় শাখাসহ দুই দেশীয় ব্যাঙ্কারের ব্যবস্থাপনায় সকল প্রকার টাকা-পয়সা প্রেরণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি প্রিন্সিপ্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্কের পক্ষে কমিশন পথের দূরত্ব, ঝুঁকি ও পরিবহনব্যয় অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। সকল সাধারণ বণিক নির্ধারিত হারে আড়ংগুলিতে টাকা প্রেরণ করতো। কিছুকাল পরে বাংলার জেলাগুলিতে প্রতিমাসে দুই শতাংশ হারে এবং কলকাতায় প্রতিমাসে এক শতাংশ হারে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য কৃষকদের অর্থ আগাম দিতে প্রধান শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণ ব্যাঙ্কারদের জগৎশেঠপ্রদত্ত হারে মুর্শিদাবাদে মুদ্রা তৈরি করতে অনুমতি দেওয়া হয়।[৫৩]

এই পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করার পর ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে। প্রথম তিন চার মাসে লাভ হয়েছিল ৩০,০০০ টাকা। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেন যে, এই লাভের অর্ধাংশ পাবেন ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপকরা এবং বাকি অর্ধেক সরকারি এ্যাকাউন্টে জমা হবে।[৫৪]

অতএব, ডিরেক্টরবৃন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রবিধানগুলি অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। পরে বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে কাউন্সিলে আলোচিত হয়। ফ্রান্সিস এর ত্রুটিগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, এই ব্যাঙ্ক থেকে যেসব সুবিধা আশা করা হচ্ছে এটা তা মেটাতে পারবে না। যাহোক হেস্টিংস এই ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন, কিন্তু কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে ১৭৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই ব্যাঙ্ক বিলোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫৫]

জেনারেল ব্যাঙ্ক প্রায় এক বছর আট মাস কাজ করেছিল। এই সময়কালে জেনারেল ব্যাঙ্কের প্রায় দুই লাখ টাকা লাভ হয় এবং এই লাভের অর্ধাংশ সরকারি কোষাগারে জমা হয়। ১৭৭৩ সালের এই পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। তথাপি বাংলার ব্যাঙ্কব্যবস্থার ইতিহাসে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সরকারি রাজস্বের জিম্মাদার হয়ে বিভিন্ন স্থানে অর্থ প্রেরণের উপায় সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকারী এবং সিক্কা মুদ্রাকে প্রমাণ মুদ্রায় উন্নীত করার লক্ষ্যে ভারতে এ ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর ফলে স্থানীয় ব্যাঙ্কাররা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সরকারি সমর্থন ও সহযোগিতায় সৃষ্ট এই বৃহৎ

---

৫৩. *Bengal Revenue Consultations*, R. 49, Vol. 53, 24 December 1773.

৫৪. *Bengal Revenue Consultations*, R. 49, Vol. 39, 13 April 1773.

৫৫. *Bengal Revenue Consultations*, R. 49, Vol. 53, 15 February and 29 May, 1775.

ব্যাঙ্ক ছোট ব্যাঙ্ক পরিবারগুলিকে দুর্বল হতে সহায়তা করে। এই ব্যাঙ্কটি সারাফদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু বিভিন্ন ব্যাঙ্কারের মধ্যে কোন ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার সুবিধা গ্রহণ করার পরিবর্তে এটি দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়।[৫৬]

সাধারণ ব্যাঙ্কের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলো স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের অবস্থার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরে। মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল থেকে খবর পাওয়া যায় যে, জেলার ব্যাঙ্কগুলি হ্রাস পাচ্ছে এবং মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্কাররা সরকারি ব্যাঙ্কের নীতির বিরোধিতা করে। মনে হয়, স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের বিরোধিতা সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিলেন।[৫৭]

মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের টাকশাল বিলোপ এবং পরবর্তী সময়ে সোনারূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর অভাবের ফলে মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের ব্যাঙ্কারদের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ১৭৮১ সাল থেকে তাদের দুঃখ-দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। এ সময়ে মুর্শিদাবাদের সব প্রভাবশালী ব্যাঙ্কার জগৎশেঠের নেতৃত্বাধীনে মুর্শিদাবাদ শহরে টাঁকশাল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করে যাতে তারা তাদের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যেতে পারে এবং সার্বিকভাবে জনগণের উপকারে আসতে পারে। স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের আবেদন কলকাতা কাউন্সিলে প্রেরণ করা হয়।[৫৮] এসব ব্যাঙ্কারের অবস্থা এত করুণ ছিল যে, মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ইংরেজ রেসিডেন্ট ১৭৮৪ সালে কলকাতায় লিখে পাঠান যে, বাংলার নবাবও স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে টাকা ধার পাচ্ছেন না।[৫৯] ১৭৮৮ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টরকে শহরে সেনাবাহিনী, বিপুল পরিমাণ বকেয়া, ফৌজদারি আদালতের বেতন এবং কাশিমবাজার ও জঙ্গিপুরের কারখানার জন্য আগাম প্রদান করতে টাকা ধার নিতে বলা হয়। কিন্তু কালেক্টর তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ৪১,২২২ টাকার বেশি ধার সংগ্রহ করতে পারেন নি।[৬০]

---

৫৬. Mohsin, *Murshidabad*, 148, quoted from Francis Minute, 20 January 1775, 211.
৫৭. ঐ, 165.
৫৮. *Bengal Public Consultation*, R. 3, Vol. 9, 24 January 1785.
৫৯. ঐ।
৬০. *Board of Revenue Proceedings*, R. 71, Vol. 16, 2 November 1979.

৩৭

আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য

সুশীল চৌধুরী*

মধ্যযুগে বাংলার সম্পদের কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এখানকার উন্নত উৎপাদনশিল্প এবং উৎপন্নদ্রব্যের, বিশেষকরে কাঁচা রেশম, সুতীবস্ত্র ও খাদ্যশস্যের সুলভ মূল্য শুধু এশিয়ার বণিকদের নয়, দূর সমুদ্রপারের বিদেশী বণিকদেরও আকৃষ্ট করেছিল। তাই আমাদের আলোচ্য সময়কালে দেখি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, অস্টেন্ড, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানি সুবা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করেছিল। এসব বিদেশী কোম্পানির মধ্যে ওলন্দাজ ও ইংরেজরাই সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রধানত বাংলার সুলভ পণ্য—নানা রকম বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা ইউরোপে রপ্তানি করতো। বাংলা থেকে এসব রপ্তানিপণ্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানিগুলিকে ইউরোপ থেকে প্রধানত সোনা-রূপা আমদানি করতে হতো, কারণ তাদের দেশজ দ্রব্যের কোন চাহিদাই এখানে ছিল না। প্রথম থেকে শুরু করে আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে ওলন্দাজ কোম্পানির প্রাধান্য সন্দেহাতীত। তবে এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে ইংরেজ কোম্পানি ওলন্দাজদের পিছনে ফেলে রপ্তানিবাণিজ্যে অনেকটা এগিয়ে যায় এবং ক্রমশ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ফরাসীরা সতেরো শতকের শেষভাগে বাংলার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করলেও ১৭২০-এর দশকের শেষদিক থেকে তাদের বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং ১৭৩০-এর দশকে ডুপ্লের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ফরাসী বাণিজ্য

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়। কিন্তু পরে ক্রমশ তার অবনতি ঘটতে থাকে। একমাত্র ডুপ্লের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ফরাসী কোম্পানির বাণিজ্য ওলন্দাজ কিংবা ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে নি। বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যে অস্টেন্ড ও দিনেমার কোম্পানির ভূমিকা ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানির ভূমিকার তুলনায় অত্যন্ত সীমিত ছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের গোড়াপত্তন

রাজকীয় সনদের মাধ্যমে ১৬০০ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তন হলেও তাদের প্রথম বাণিজ্যতরী ক্যাপ্টেন হকিন্সের নেতৃত্বে সুরাটে এসে পৌছায় ১৬০৮ সালে। মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান পাওয়ার পর ১৬১৩ সালে সুরাটে প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরও প্রথম দিকে বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ নৌ-বাণিজ্যের কোন ইচ্ছা ইংরেজদের ছিল না।

এর কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত, কোম্পানির তখনো শৈশবাবস্থা—ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য খুব ক্ষুদ্র আকারে থাকায় অনেকগুলি কুঠি স্থাপনের প্রয়োজন তার ছিল না। দ্বিতীয়ত, বাংলার বন্দরে পর্তুগীজদের একচ্ছত্র আধিপত্য ইংরেজদের পক্ষে বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বাংলার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার অভিপ্রায় প্রথম প্রকাশ পায় কোম্পানিকে লেখা স্যার টমাস রোর চিঠিতে (২৪ নভেম্বর ১৬১৫)।[১] রো সাহেব বাংলার ধনসম্পদের কথা এবং উৎপন্নদ্রব্যের, বিশেষকরে বস্ত্র ও রেশমের প্রাচুর্য ও সুলভ মূল্যের কাহিনী শুনে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বাংলার সঙ্গে সরাসরি সমুদ্রবাণিজ্য শুরু করতে ভরসা পান নি। সুরাটের কুঠিয়ালের কাছে তিনি লিখেন, বাংলার সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্য শুরু করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথমদিকে সুরাট কাউন্সিল এ ব্যাপারে অনিচ্ছুক থাকলেও ক্রমশ উপলব্ধি করলো যে, ভারতে একমাত্র বাংলাই সবচেয়ে সস্তায় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বস্ত্র ও রেশম সরবরাহ করতে পারবে এবং এতে এসব পণ্যের জন্য ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তাই সুরাট থেকে ১৬২০ সালে আগ্রার ইংরেজ কুঠিতে নির্দেশ পাঠানো হয় যেন রবার্ট হিউজেস্‌কে পাটনায় কুঠি স্থাপন করার জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নানা কারণে এই অভিযান ব্যর্থ হয়।[২] বারো বছর পরে একই উদ্দেশ্যে পিটার মান্ডিকে পাঠানো হয়

১. British Museum, Addl. Mss. (এখন থেকে B. M. Addl. Mss), 6115. f. 63vo, British Museum, London; W. Foster (ed.), *The Embassy of Sir Thomas Roe to India*, (London 1926), 76.

২. বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, Sushil Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1650-1720* (Calcutta 1975), 14-16.

পাটনায়, সে যাত্রাও সফল হয় নি।[৩] ইতিমধ্যে কোম্পানি বাংলার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছিল মসুলিপত্তমে। ১৬৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার কারণে কোম্পানি বাংলায় স্থায়ী কুঠি স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। ১৬৩০ সালে করোমন্ডলে দুর্ভিক্ষের ফলে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। কোম্পানির কর্মচারীরা লক্ষ্য করে যে, বাংলা থেকে মসুলিপত্তমে চাল, ঘি, চিনি ইত্যাদি আমদানি করলে প্রচুর লাভে বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে করোমন্ডলে বহু তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরের মৃত্যু ঘটায় কাপড়ের দাম অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাই কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার সুলভ সুতীবস্ত্র ও রেশমের দিকে আকৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় লাভজনক ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যও তারা প্রলুব্ধ হয়। এদিকে ১৬৩২ সালে মুগল সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করায় ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্যপত্তনে উৎসাহিত হয়। এভাবে ১৬৩৩ সাল নাগাদ ইংরেজরা হরিহরপুর ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করে। তবে এরপর প্রায় এক দশক বাংলার সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এমনকি ১৬৪১ সালে ইংরেজ কোম্পানি বাংলা থেকে বাণিজ্য গুটিয়ে নেবার কথা ভেবেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থে কোম্পানির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে অনিচ্ছুক ছিল। ১৬৪৪ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যে বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬,০০০ টাকা। কিন্তু এই সময় কয়েকটি ঘটনার কারণে ইংরেজদের কাছে বাংলার বাণিজ্য অপরিহার্য হয়ে উঠে। মসুলিপত্তম ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং পুরো করোমন্ডল উপকূলে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ঐসব এলাকায় কোম্পানির বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় বাংলার পণ্যের, বিশেষকরে সুতীবস্ত্রের বাণিজ্য আরো অধিক হারে শুরু করা ছাড়া কোম্পানির গত্যন্তর ছিল না। অতএব ক্যাপ্টেন ব্রুকহেভেনের নেতৃত্বে কোম্পানির চারজন কর্মচারী লায়জেস নামক জাহাজে চড়ে হুগলী অভিমুখে রওনা হন। বালেশ্বর পৌঁছে ব্রুকহেভেন জেমস্ ব্রিজম্যান এবং আরো দুজন কর্মচারীকে প্রিন্সেস নামক স্লুপে হুগলীতে পাঠান। এভাবে ইংরেজরা ১৭৫১ সালের প্রথমদিকে হুগলীতে তাদের প্রথম স্থায়ী কুঠি পত্তন করে।[৪]

বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা ও স্থানীয় শাসকের সঙ্গে সম্পর্ক

বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকদের মত এই যে, ইংরেজরা বার্ষিক ৩,০০০ টাকা দিয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু কোম্পানির মহাফেজখানায় অধুনা কিছু নতুন নথিপত্র আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে

---

৩. ঐ, 18-20.

৪. প্রাগুক্ত, 20-26.

ইংরেজদের শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধার যে তত্ত্ব দাঁড় করানো হয় তা মেনে নেয়া যায় না। বস্তুত ১৭১৭ সালের আগে কোম্পানি কখনোই কোন বাদশাহী ফরমানের বলে বাংলায় এই রকম কোন সুবিধা আইনত ভোগ করে নি। এই রকম সুবিধাভোগ সম্পর্কে ইংরেজদের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—তার পিছনে কোন আইনগত বা বৈধ বাদশাহী সনদ ছিল না।

প্রথম থেকেই ইংরেজ কোম্পানি অন্যায়ভাবে শুধু অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি নয়, এমনকি স্থানীয় বণিকদের চেয়েও বেশি বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় ছিল যাতে অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। কোম্পানি দাবি করে যে, তারা এসব বৈষম্যমূলক সুবিধা পেয়েছে নানা ফরমান, নিশান ও পরোয়ানার মাধ্যমে এবং আমাদের আলোচ্য সময়কালে কোম্পানি সর্বদাই এসব বিশেষ সুবিধা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোম্পানির প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হয়েছে। এরা কোম্পানির এসব বিশেষ সুবিধাভোগের বৈধতা নিয়ে বার বার প্রশ্ন তুলেছে এবং এগুলো যথার্থ আদেশপ্রসূত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আমলাতান্ত্রিক শোষণ যখন মাত্রা ছাড়িয়েছে ,তখন ইংরেজরাও অস্ত্রের সাহায্যে তার মোকাবেলা করতে চেয়েছে। এভাবে এই বিরোধের এক পর্যায়ে ১৬৮৬ সালে মুগলদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়; যুদ্ধের পর যে মিটমাট হলো (১৬৯০ সালে) তাতে বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারপর ইংরেজ বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে যে বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করেছে সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মাত্রায় একই গল্পের পুনরাবৃত্তি করেন। এঁদের মতে, ইংরেজদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা আদায়ের মূলে আছে গ্যাব্রিয়েল বাউটন নামে এক ইংরেজ চিকিৎসকের মহানুভবতা। বাউটন ছিলেন বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ্ শুজার খুবই প্রিয়পাত্র। তাঁর চিকিৎসায় খুশি হয়ে শাহ শুজা তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি নাকি কোন ব্যক্তিগত পুরস্কার নিতে অস্বীকৃতি জানান. তার বদলে তিনি চাইলেন বাংলায় ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি। এই কাহিনীর নানারকম ভাষ্য আছে। এগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও এগুলি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে, বাউটন বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা শুধু নিজের জন্যই আদায় করেছিল, সাধারণভাবে ইংরেজদের বা ইংরেজ কোম্পানির জন্য নয়।[৫] কোম্পানির জন্য ১৬৫১ সালের আগস্টে প্রথম নিশান শাহ্ শুজার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন জেমস ব্রিজম্যান। এর বছর খানেক আগে

---

৫. প্রাগুক্ত, 28-30.

মুগল সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে ডেভিজ যে ফরমান পেয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই এই নিশান দেয়া হয়। ঐ ফরমানের[৬] মূল উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যা, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত যেসব পণ্য পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলিতে রপ্তানির জন্য পাঠানো হতো, সেগুলিকে রাহাদারি বা পথকর থেকে রেহাই দেয়া। দিল্লী থেকে প্রদত্ত ঐ ফরমানের যতো উদার ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, এটা কোনমতেই ইংরেজদের বাংলার রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রচলিত শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেয় নি। যাই হোক, ব্রিজম্যান ৩,০০০ টাকা উপঢৌকন দিয়ে শাহ্ শুজার কাছ থেকে নিশান লাভ করেছিলেন, যার ফলে ইংরেজরা বলতে শুরু করলো যে বাদশাহী ফরমান তাদের বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছে।[৭]

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় হিসেবে কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়। তাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং সেগুলি যেকোনভাবে রক্ষা করা যাতে স্থানীয় পণ্যের বাজারের উপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় থাকে। কিন্তু স্থানীয় শাসকবর্গ কোম্পানির বিশেষ সুবিধাভোগের পথে নানাভাবে বাধা দিয়েছে। তবে তারা বিদেশী বণিকদের 'কামধেনু'র মতো দোহন করেছে বলে যে মত প্রচলিত আছে তা পুরোপুরি মেনে নেয়া যায় না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, নবাবের কর্মচারীরা শাসনের নামে শোষণ করতো না। কোম্পানির বিশেষ সুবিধাভোগের প্রশ্নটির নানা জটিল দিক আছে। যতোদিন ইংরেজ বাণিজ্যের পরিমাণ সামান্য ছিল ততোদিন মুগল কর্মচারীরা শুল্করেহাই-এর ব্যাপারটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় নি। এ নিয়ে কখনো কোন অসুবিধা দেখা দিলে ইংরেজরা উপহার-উৎকোচ দিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নেয়, বিশেষকরে ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত জাহাজের সংখ্যাবৃদ্ধিতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে উঠে যখন এশীয় বণিকরা নিজেদের বাণিজ্যপণ্যকেও কোম্পানির দস্তকের মাধ্যমে অবৈধভাবে শুল্কমুক্ত করতে শুরু করে। তার উপর অনেক স্থানীয় মুগল কর্মচারী তখন বাংলায় অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, যার ফলে কোম্পানির সঙ্গে বিবাদের একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ালো বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এসব কর্মচারীর পিছনে

---

৬. B. M. Addl Mss , 24, 039, f. 5; W. Foster (ed.), *The English Factories in India*, (এখন থেকে *E.F. I.*), 1655-1660, (Oxford 1927), 414 15.

৭. B. M. Addl. Mss., 24,039, f.6; W Foster (ed.), *English Factories*, 111.

রাজনৈতিক মদদ থাকায় কোম্পানির সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্র আরো ব্যাপ্ত হলো। তবে কোম্পানির সঙ্গে বাংলার শাসকগোষ্ঠীর বিবাদ-বিসংবাদের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কোম্পানির বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারগুলির অস্পষ্টতা, যার সুযোগে উভয় পক্ষ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো।

এসব কারণে কোম্পানি মুগল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলায় বাণিজ্যের জন্য বাদশাহী ফরমান লাভ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৭১৭ সালে সারম্যান-এর দূতালির মাধ্যমে কোম্পানি বছরে তিন হাজার টাকা পেশকাস্ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুগল সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে বাংলায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার লাভ করলো। ১৭১৭ সালের এই ফরমান বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের 'ম্যাগ্না কার্টা' বলে যে অভিমত[৮] তা মেনে না নিলেও এটা অনস্বীকার্য যে, এই ফরমানের ফলে অন্তত কাগজপত্রে বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের পথে বহু বাধা দূর হলো। বৈধ ফরমান না থাকায় স্থানীয় শাসকরা এতদিন ইংরেজদের বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি তুলতো, তার সুযোগ আর রইলো না। ইংরেজদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাভ হলো, তারা এই প্রথম বাদশাহী ফরমানের বলে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার পেলো। এর আগে কোন বাদশাহী ফরমান তাদের এই অধিকার দেয় নি, যদিও তারা উপহার-উৎকোচ দিয়ে বিভিন্ন সুবাদারের কাছ থেকে নিশান ও পরোয়ানা জোগাড় করে তাদের বাণিজ্য শুল্কমুক্ত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ১৭১৭ সালের ফরমান ইংরেজদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে সেগুলি সুস্পষ্ট নয়, যেমন শুধু ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যই শুল্কমুক্ত না কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যও শুল্কমুক্ত এ প্রশ্নের জবাব ফরমান থেকে পাওয়া যায় না। তবে এই ফরমানের পটভূমিকা এবং যে উদ্দেশ্যে ফরমান চাওয়া হয়েছে ও দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, কোম্পানির বাণিজ্যকেই শুধু আমদানি-রপ্তানির জন্য শুল্ক থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে, অন্তর্বাণিজ্য বা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধা কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। ১৭১৭ সালের ফরমানে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা নিয়ে কোম্পানি এবং বাংলার নবাবদের মধ্যে যে বিবাদ-বিতর্কের সূচনা হয় তার জের চলেছে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) পর্যন্ত। কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা এই চল্লিশ বছর ধরে বরাবর দাবি করেছে যে, এই ফরমান শুধু কোম্পানির বাণিজ্য নয়, তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকেও শুল্ক থেকে রেহাই দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী,

---

৮. S. Bhattacharyya, *The East India Company and the Economy of Bengal, 1704-40*, (London 1954), 29.

শুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী কোনদিনই ইংরেজদের দাবি মেনে নেন নি। সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরো গুরুতর অথচ সত্য অভিযোগ তোলেন যে, কোম্পানির কর্মচারীরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য দস্তকের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত করে নি, তারা এশীয় বণিকদের কাছে দস্তক বিক্রি করেছে, যার ফলে এশীয় বণিকরাও নিজেদের বাণিজ্যপণ্যের জন্য শুল্ক না দিয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে, এতে বাংলার নবাব তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই কারণেই তাঁকে নবাবের পদ থেকে সত্বর অপসারণ করা হয় যাতে ইংরেজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চলতে পারে।[৯]

ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

বাংলায় বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা লক্ষ্য করে ওলন্দাজ বণিকরা এ অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথমদিকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত হল্যান্ড এবং কিছুটা ইন্দোনেশিয়ার জন্য কাপড়, হল্যান্ড ও পারস্যের জন্য চিনি এবং হল্যান্ডের জন্য সোরা রপ্তানি করা। তাছাড়া বাংলার সস্তা চাল ও ঘি বাটাভিয়ায় ওলন্দাজ কোম্পানির ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হতো এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ উপনিবেশগুলির উন্নয়নমূলক কাজ ও সুরক্ষার জন্য বাংলা থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হতো। বাংলায় কুঠি স্থাপনের আগে ওলন্দাজরা করোমন্ডল উপকূল থেকে বাংলার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতো। কিন্তু এতে দু'টি অসুবিধা হতো। প্রথমত, পণ্যদ্রব্যের মূল্য হতো বেশ-কিছুটা বেশি এবং দ্বিতীয়ত, সব সময় এসব পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াও যেতো না।

ওলন্দাজরা বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য প্রথম চেষ্টা করে ১৬১৫ সালে মসুলিপত্তম থেকে। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয় নি।[১০] ১৬৩০-এর দশকের প্রথম দিকে বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ রেশম সংগ্রহের আশায় এবং ১৬৩২ সালে হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়নের ফলে নতুন উৎসাহে ওলন্দাজরা বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করার জন্য সচেষ্ট হয়। তারা লক্ষ্য করে যে, বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারলে নতুন নতুন সুবিধালাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর জেনারেল ১৬৩৪ সালে লিখলেন যে, উত্তর ভারতের সঙ্গে এতদিন কোম্পানির যে বাণিজ্য সুরাট থেকে পরিচালিত হতো, তা বাংলা থেকে করা গেলে অনেক সহজ ও লাভজনক হবে, কারণ নদীপথে আগ্রা ও উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগব্যবস্থা ভাল। ওলন্দাজদের এমনও ধারণা

৯. প্রথম খণ্ডে Nawab Sirajuddaula and Battle of Palashi নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, 1630-1727, (Princeton 1985), 35-38.

হয়েছিল যে, গঙ্গার মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যাথের (চীন) সংযোগ আছে।

উড়িষ্যার হরিহরপুরে প্রথম ওলন্দাজ কুঠি স্থাপিত হয় এবং ১৬৩৪ সালে করোমন্ডলের কুঠিয়ালরা হরিহরপুরে একটি জাহাজ পাঠিয়ে হুগলী অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেয়। এই সময় নাগাদ ওলন্দাজরা বাংলার সুবাদার আজম খানের কাছ থেকে হুগলীতে কুঠি স্থাপন এবং বাংলার যেকোন জায়গায় বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে।[১১] ২৩ অক্টোবর সান্তভুরট নামক জাহাজ মসুলিপত্তম থেকে হুগলী পৌঁছায়। নতুন সুবাদার ইসলাম খান ওলন্দাজ কোম্পানিকে হুগলীতে কুঠি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেন। অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাট শাহজাহানের ১৬৩৫ সালের বিখ্যাত ফরমান এসে পৌঁছায়। এতে বাংলায় ওলন্দাজদের বাণিজ্য করার বাদশাহী অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু হুগলীর স্থানীয় কর্মচারীরা ওলন্দাজদের প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। ফলে ১৬৩৬ সালে হুগলীতে ওলন্দাজ কুঠির প্রধান জ্যাকব মাহুইজেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কুঠি লুণ্ঠিত হয়। এদিকে বাংলায় বাণিজ্যের জন্য ওলন্দাজ কোম্পানি সুরাটে ১৬৩৬ সালে দু'টি এবং ১৬৩৮ সালে একটি ফরমান পায়, যাতে কোম্পানিকে এই অঞ্চলে অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়। তবে ফরমানগুলিতে বাণিজ্যশুল্কের হার সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা ছিল না। জ্যাকব মাহুইজেন কিন্তু হুগলীতে ওলন্দাজ বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরই পরামর্শে ১৬৩৬ সালের ডিসেম্বরে ওলন্দাজরা হুগলী কুঠি পরিত্যাগ করে উড়িষ্যার পিপ্‌লিতে চলে যায়।[১২] ইতিমধ্যে ওলন্দাজ কোম্পানি পিপ্‌লিতে ভালই গোড়াপত্তন করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই কাছাকাছি বালেশ্বরে একটি ছোট কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হরিহরপুরের কুঠি ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়। পাটনাতেও একটি কুঠি স্থাপিত হয় ১৬৩৮ সালে। কিন্তু সে বছরই খরচ কমানোর জন্য ওটা বন্ধ করে দেয়া হয়। কোম্পানি আবার হুগলী কুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ১৬৪৫ থেকে ১৬৪৭ সালের মধ্যবর্তী কোন সময়ে।[১৩] পাটনা কুঠিও পুনরায় স্থাপিত হয় ১৬৪৫ সালের মধ্যে এবং নতুন একটি কুঠির পত্তন হয় কাশিমবাজারে।

বাংলায় বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অনুধাবন করে বাটাভিয়া কাউন্সিল ১৬৫৩ সালে জোহান ভেরপুরটেনকে এই অঞ্চলে কোম্পানির বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থাদি করার জন্য বিশেষ কমিশনার পদে নিযুক্ত করে। ভেরপুরটেন সুপারিশ করেন যে, বাংলার কুঠিগুলিকে

---

১১. প্রাগুক্ত, 37.

১২. ঐ, 38.

১৩. ঐ, 39.

এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হোক যাতে এগুলি পুলিকটের অধীন হয়ে আর না থাকে এবং হুগলী কুঠিকে বাংলা অঞ্চলের প্রধান কুঠিতে পরিণত করা হোক। বাটাভিয়া কাউন্সিল ১৬৫৫ সালে বাংলার কুঠিগুলিকে অন্য কোন অঞ্চলের ওলন্দাজ প্রতিষ্ঠানের অধীন নয় বলে ঘোষণা করলো এবং পিটার স্টারথেমিয়াসকে বাংলার কুঠিগুলির প্রথম ওলন্দাজ ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করলো। তাঁকে কাশিমবাজার বা হুগলীর কুঠির মধ্যে যেকোন একটিকে ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান কুঠি হিসেবে বেছে নিতে বলা হলো। ১৬৫৬ সালের প্রথমদিকে কাশিমবাজার কুঠিকে তখনকার মতো প্রধান কুঠি হিসেবে ঠিক করলেও পরে ওলন্দাজরা হুগলী কুঠিকেই কোম্পানির প্রধান কুঠি হিসেবে বেছে নেয় এবং পরবর্তী দেড়শ' বছরের মতো হুগলীই বাংলায় ওলন্দাজ কোম্পানির প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। চুঁচুড়া, বরানগর ও বাজার মির্জাপুর গ্রাম কোম্পানি বছরে ১৫৭৪ টাকা খাজনার বিনিময়ে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। পরে হুগলী থেকে চুঁচুড়ায় কুঠি সরিয়ে নিয়ে আসা হলেও নথিপত্রে বরাবর তাকে হুগলী কুঠি বলেই উল্লেখ করা হতো।[১৪]

বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা

ইংরেজ কোম্পানির মতো ওলন্দাজরা কোন বাদশাহী ফরমানের বলে কোন সময়েই শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা পায় নি। সতেরো শতকের শেষ দুই দশক এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধে তারা শতকরা ৩.৫০ ভাগ হারে বাণিজ্যশুল্ক দিত।[১৫] তবে শাহজাহান, আওরঙ্গজেব, শাহ্ আলম ও জাহান্দার শাহ্ প্রদত্ত নানা ফরমানের ভিত্তিতে ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্যের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্যদ্রব্য চলাচলের উপর কর থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পেয়েছিল।[১৬] ১৬৪২ সালের নভেম্বর মাসে শাহজাহানের ফরমান প্রথম কোম্পানিকে এই সুবিধা দেয়।[১৭] এই কর থেকে অব্যাহতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল, কারণ তাতে কোম্পানি এই অঞ্চলের সবচেয়ে সস্তা বাজারে জিনিস কিনে সবচেয়ে চড়া বাজারে বিক্রি করতে পারতো। মুগল রাষ্ট্র ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের এই সুবিধা দিয়েছিল যাতে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যশুল্ক থেকে রাজ্যের রাজস্বআয় বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে রাজ্যে সোনা-রূপার আমদানিও বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির কুঠির প্রধান কর্মচারী দস্তক নামক এক অনুমতিপত্র পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে পাঠাতো, যার বলে রাহাদারি বা পথকর থেকে অব্যাহতি

১৪. প্রাগুক্ত, 39-40.

১৫. ঐ, 42

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ঐ, 37, 38, 41, 42.

১৭. ঐ, 38.

পাওয়া যেতো। যেখান থেকে পণ্য পাঠানো হতো, সেখানকার রাজস্ববিভাগের কর্মচারী রওয়ানা বা ছাড়পত্র দিত, যার ফলে এসব পণ্যের উপর পথকর দিতে হতো না। কিন্তু স্থানীয় রাজকর্মচারীরা পথকর থেকে রেহাই দেয়ার ব্যাপারটি সুনজরে দেখতো না এবং প্রায়ই কোম্পানির এই সুবিধাভোগে বাধা দিত। তার কারণ হলো, কোম্পানি প্রায়ই এই সুযোগের অপব্যবহার করে এশীয় বণিকদের পণ্যও শুল্কমুক্ত করে দিত। তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায়ই এশীয় বণিকদের কাছে দস্তক বিক্রি করতো, যার ফলে এশীয় বণিকরা তাদের পণ্যেরও কোন শুল্ক দিত না। তাতে রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হতো। তার উপর কোম্পানি জিনিসপত্রের দাম কম দেখিয়ে সঠিক মূল্যের উপর যে শুল্ক হতো তা ফাঁকি নিত। ১৬৭১ সালের একটা হিসাবে দেখা গেছে যে, পূর্বের ১৬ বছরে ওলন্দাজ কোম্পানি মোট দেয় করের ১৪ শতাংশ কম দিয়েছে। আর কোম্পানি যে বছর খুব ভাল বাণিজ্য করেছে সে বছর এই শুল্কফাঁকির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত হতো।[১৮]

ফরাসী কোম্পানি ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণ

বাংলার বাণিজ্যজগতে ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে সতেরো শতকের শেষভাগে। তার মূলে রয়েছে সমসাময়িক ইউরোপে 'ভারতীয়' জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক ঝোঁক। বাংলার কাপড়ের সন্ধানেই প্রধানত ফরাসীরা এখানে আসে। ১৬৮১ থেকে ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক অনুসন্ধানে উৎসাহিত হয়ে পন্ডিচেরীর সুচতুর গভর্নর ফ্রাঁসোয়া মার্তে তাঁর জামাতা দ্যেলন্দেকে বাংলায় পাঠান স্থায়ী কুঠি স্থাপনের জন্য। এভাবে ১৬৯১ সালে ফরাসীরা চন্দননগরে নিজেদের কুঠি স্থাপন করে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে সক্ষম হয়।[১৯] ডুপ্লের নেতৃত্বে অল্পকাল ছাড়া ফরাসীরা বাংলার বাণিজ্যজগতে কখনোই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নি। বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার পর প্রথম তিন দশক তাদের পক্ষে সময় খুব কঠিন ছিল। মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও ফররুখশিয়রের কাছ থেকে প্রাপ্ত দু'টি বাদশাহী ফরমানের বলে তারা ওলন্দাজদের মতো বাণিজ্যিক সুবিধা এখানে পেয়েছিল।[২০] কিন্তু এক্ষেত্রেও স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী প্রায়ই এসব সুবিধাভোগে বাধার সৃষ্টি করেছে। ১৭৩০-এর দশকের প্রথমদিকে ডুপ্লে চন্দননগরে পৌঁছে দেখেন, এসব বাধার সম্মুখীন হয়ে ফরাসী বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। কিন্তু তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে

১৮. প্রাগুক্ত, 46.

১৯. Indrani Roy, "The French Company and the Merchants of Bengal, 1680-1730", *Indian Economic and Social History Review*. (এখন থেকে *IESHR*), VIII: 1 (1971), 41-42.

২০. Indrani Roy, "Some Aspects of French Presence in Bengal", *Calcutta Historical Journal*. (এখন থেকে *CHJ*), 1: 1 (1976) ,91,97.

একদিকে ফরাসী কোম্পানির বাণিজ্য এবং অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরবর্তী দশ বছরে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। চন্দননগরের গভর্নর হিসেবে ডুপ্লের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসীদের বাণিজ্যিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নয়। ১৭৩১ থেকে ১৭৪২ সালের মধ্যে তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের জন্য ৯০টি সমুদ্রঅভিযানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২১] তাঁর নেতৃত্বে ফরাসীরা বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। ফরাসী বাণিজ্যের, বিশেষকরে ফরাসীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের হঠাৎ বিপুল বিস্তারে ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে পড়লো।[২২] চন্দননগরের গভর্নর হিসেবে ডুপ্লের শাসনকাল সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তিকে মিথ্যে অহঙ্কার বলে মনে হয় না :

> আমি ইংরেজদের প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছি, কারণ (এই কয়েক বছরের মধ্যে) তারা দেখলো যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে গেছে এবং তাদের বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেছে। মাত্র ৯ বছরে আমি এই কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি।[২৩]

ডুপ্লের প্রস্থানের পর ফরাসী বাণিজ্যের ব্যাপক অবনতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৭৪০ সালের শেষ দিক থেকে ১৭৫০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফরাসীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বেশ কিছুটা পুনরুত্থান ঘটে।

অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির মধ্যে এই সময় বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল দিনেমার ও অসটেন্ড কোম্পানি। ১৭৭৬ সালে দিনেমাররা বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের কাছ থেকে হুগলী নদীর তীরে কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। তারা বাংলায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার জন্য ফরমান জোগাড় করার চেষ্টাও করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এদিকে কিছুদিন পর বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খানের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে তাদের হুগলী থেকে বিদায় নিতে হয়। এর বেশ কিছুদিন পরে ১৭৫৫ সালে নবাব আলিবর্দী খানের অনুমতি লাভ করে তারা শ্রীরামপুরে নিজেদের আবার প্রতিষ্ঠিত করে।[২৪] ফ্লেমিশ বণিকদের দ্বারা গঠিত অসটেন্ড কোম্পানির পিছনে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের মদদ ছিল। বাংলার নবাবের অনুমতি নিয়ে খুব সহজেই তারা বাঁকিবাজারে কুঠি স্থাপন করে।

---

২১. Dupleix's trade দেখুন, Indrani Roy, "Dupleix's Trade at Chandernagore", *Indian Historical Review*, এখন থেকে *IHR*), 2 (1974), 279-94.

২২. Sushil Chaudhuri, *Trade, Bullion and Conquest : Bengal in the Eighteenth Century*, Presidential Address, Medieval India Section, Golden Jubilee Session, Indian History Congress, December, 1989.

২৩. Virginia M Thompson, *Dupleix and his Letters*, 1742-54, (New York 1933), 723.

২৪. S. Bhattacharyya, *East India Company*, 78-79.

ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানির সমবেত বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা কিছুদিন ভালই ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আলেকজান্ডার হিউম নামের এক পলাতক ইংরেজ অভিযাত্রী বাংলায় অস্টেন্ড কোম্পানির কর্ণধার হন এবং তাঁর পরিচালনায় কোম্পানি কিছুদিন বেশ উন্নতিলাভ করে। কিন্তু ১৭৩০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে অস্টেন্ড কোম্পানি বাংলার বাণিজ্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় এবং অবশেষে ১৭৪৪ সালে সরকারি আদেশে বাঁকিবাজারের কুঠি ভেঙে ফেলা হলে বাংলায় তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে।[২৫]

রপ্তানিবাণিজ্যের কাঠামো ও সংগঠন

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির পণ্যসংগ্রহ (investment)[২৬] অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী চাহিদা ও সরবরাহের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল না। ভারতীয় অবস্থার বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানিগুলিকে নানা সমস্যার মধ্যে রপ্তানিপণ্য সংগ্রহ করতে হতো। তাদের কর্মচারীরা এখানকার বাজারের হালচাল সম্বন্ধে খুব বেশি ওয়াকেবহাল ছিল না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় ভাষাও বুঝতো না। এই অবস্থায় রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের জন্য তাদের নির্ভর করতে হতো একশ্রেণীর মধ্যস্থ বণিকদের উপর। এইসব বণিক আবার কোম্পানির প্রধান বণিকের তত্ত্বাবধানে কাজ করতো। সাধারণত এই প্রধান বণিককে কোম্পানির নথিপত্রে ব্রোকার বা দালাল আখ্যা দেয়া হতো। এভাবে কোম্পানিগুলি বেশিরভাগ কুঠিতেই স্থানীয় দালাল নিযুক্ত করতো এবং পণ্যসংগ্রহের জন্য সম্পূর্ণভাবে তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কোম্পানির প্রধান বণিক অন্যান্য মধ্যস্থ বণিকদের সঙ্গে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহের জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে সাহায্য করতো। বস্তুত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রধান বণিক অন্য মধ্যস্থ বণিকদের নাম কোম্পানির কাছে সুপারিশ করতো। তারাই কোম্পানির ইউরোপগামী জাহাজের জন্য পণ্যসংগ্রহ করতো। কোম্পানিকে এইসব বণিকের পণ্যসংগ্রহের চুক্তির পরিমাণ অনুযায়ী দাদন বা অগ্রিম টাকা দিতে হতো। এজন্য এইসব বণিককে দাদনি বণিক নামে অভিহিত করা হতো। দাদনি বণিকেরা আবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাদের গোমস্তাদের মাধ্যমে তাঁতী, কারিগর ও অন্যান্য প্রাথমিক উৎপাদকদের তাদের উৎপন্নদ্রব্যের জন্য অগ্রিম দিত। এই গোমস্তারা বিভিন্ন আড়ং বা উৎপাদনকেন্দ্রে ঠিকমতো পণ্য সরবরাহ ও চাহিদামতো গুণগত মান রক্ষা করা হচ্ছে কিনা তার তদারকিও করতো। তাঁতী ও অন্যান্য হস্তশিল্পী বা উৎপাদকরা অগ্রিম টাকার বিনিময়ে সময়মতো সঠিক মানের পণ্য সরবরাহ

---

২৫. ঐ, 79-95.

২৬. Investment বলতে এখানে কোম্পানির রপ্তানিপণ্য সংগ্রহ বোঝানো হয়েছে।

করতে না পারলে আর্থিক দায় দাদনি বণিকদেরই বহন করতে হতো। বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে অগ্রিম টাকার পরিমাণ শতকরা ৫০ থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[২৭] ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির এই ধরনের রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের রীতি 'দাদনি ব্যবস্থা' নামে পরিচিত ছিল। কলকাতার দুই বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায়ী পরিবার—শেঠ ও বসাকরা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বণিকের কাজ করেছে বরাবর; চন্দননগরে ফরাসীদের প্রধান বণিক ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আর চুঁচুড়াতে ওলন্দাজদের প্রধান বণিক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন হরিকৃষ্ণ রায়।[২৮]

মূলধনের দীর্ঘস্থায়ী অভাব

রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে প্রধান যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হলো প্রয়োজনীয় মূলধনের দীর্ঘস্থায়ী অভাব। এটা আরো তীব্র আকার ধারণ করার কারণ হলো, বাংলায় ইউরোপ থেকে আমদানি করা পণ্যের তেমন চাহিদা ছিল না। কোম্পানিগুলি যে পণ্য আমদানি করতো তার পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। তবু এই স্বল্পপরিমাণ পণ্যের বাজার ছিল সীমিত। একমাত্র যে জিনিসের নিয়মিত চাহিদা ছিল তা হলো সোনা-রূপা। কিন্তু যেহেতু এগুলির সরবরাহ হতো বিশেষ মরশুমে এবং সীমিত পরিমাণে, সেহেতু কোম্পানিগুলিকে বাংলায় পণ্যসংগ্রহের জন্য বাড়তি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হতো। তাছাড়া ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত সোনা-রূপা স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে কোম্পানিকে অদ্ভুত সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। আর এক সমস্যা ছিল ভাল মরশুমে পণ্যসংগ্রহের জন্য অর্থের জোগাড় করা। এই মরশুম সাধারণত শুরু হতো ইউরোপগামী জাহাজগুলি বাংলা ছেড়ে যাবার পর। ঠিক সময়ে পণ্যসরবরাহের চুক্তি করতে না পারলে এবং পণ্যসংগ্রহে দেরি হয়ে গেলে রপ্তানিপণ্যের দাম কখনো কখনো শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত চড়ে যেতো।[২৯] তাই ইউরোপগামী জাহাজ ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানিগুলিকে তাদের দাদনি বণিকদের সঙ্গে পরবর্তী বছরের পণ্য সরবরাহের চুক্তি করতে হতো। সাধারণত এরকম চুক্তি ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে করা হতো। ফলে আগের বছরের পণ্য সরবরাহের জন্য পাওনা টাকা পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গেই

---

২৭. Sushil Chaudhuri, "Merchants, Companies and Rulers, Bengal in the 18th Century", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* (এখন থেকে *JESHO*), XXXI : pt. 1 (1988), 75-85 ; Sushil Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 158-59; Om Prakash, *Dutch East India Company*, 102-107.

২৮ দ্রষ্টব্য, Sushil Chaudhuri, "European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System—A Study of Bengal in the Eighteenth Century", *Calcutta Historical Journal*, XI : 1-2 (1986-1987) (এখন থেকে *CHJ*), 120-33.

২৯. Despatch Book (এখন থেকে DB), Vol. 84, f. 411, 28 January 1659, India Office Library (এখন থেকে *IOL*), London.

আবার পরবর্তী বছরের পণ্য সংগ্রহের জন্য দাদনি বণিকদের আগাম দেয়ার জন্য কোম্পানির টাকার প্রয়োজন হতো। সব ইউরোপীয় কোম্পানিরই অবস্থা প্রায়শ খুব হতাশাব্যঞ্জক হয়ে পড়তো। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের একটি আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয় :

> গত বছরের [পণ্যসরবরাহের] খাতে [দাদনি] বণিকদের কাছে আমাদের দেয় অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে। আমাদের কাছে কোন টাকা নেই যাতে এই পাওনা মেটানো যায় বা এই বছরের চুক্তির জন্য আগাম দিতে পারি। নগদ টাকা বা সুদসহ (with interest) তমশুকের (bill) জন্য তারা চেঁচামেচি করছে—অনুযোগ করছে, তা না হলে বাধ্য হয়ে বাজার থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে নতুন চুক্তির পণ্য সংগ্রহের জন্য তাদের আড়ং-এ পাঠাতে হবে।[৩০]

স্থানীয় ঋণবাজার

সুতরাং স্থানীয় মহাজনদের বা শরাফদের (Saraf বা Shroff) কাছ থেকে টাকা ধার করা ছাড়া ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সামনে অর্থাভাব মেটানোর আর কোন পথ খোলা ছিল না। তবে তাদের সৌভাগ্যক্রমে বাংলার ঋণবাজার অত্যন্ত সুদক্ষ ও সুসংগঠিত ছিল। বস্তুতপক্ষে এসময় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপযোগী ঋণব্যবস্থা ও বিনিময়ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বিশেষকরে শরাফ বলে পরিচিত এক শ্রেণীর বণিকদের কাজকর্ম অর্থনৈতিক দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এসব থেকে এটা অবিসংবাদিত যে, ষোল শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় বাণিজ্যিক মূলধন ও ব্যবসায়িক সংগঠন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত ছিল। ফলে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বাংলার বাজার থেকে প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করে তাদের মূলধনের তীব্র অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছে। অবশ্য বিভিন্ন কোম্পানি বছরে কি পরিমাণ ঋণ করেছে তার কোন সুসংবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা বিবরণী থেকে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপীয়দের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩১]

১৭২০-২১ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ টাকা। আর ১৭৪৭-৪৮ সালে সুদের পরিমাণ ছাড়াই ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫.৫০ লক্ষ টাকা।[৩২] ওলন্দাজ কোম্পানিও স্থানীয় ঋণবাজার থেকে ধার নিয়েছে প্রয়োজনমতো। ১৭২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশিমবাজারের বণিক/মহাজনদের কাছে ওলন্দাজ কোম্পানির ঋণের

৩০. Bengal Public Consultations (এখন থেকে B.P.C.) Range 1, Vol 4, ff. 404vo-405, 29 May 1751, IOL.

৩১. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Sushil Chauduri, "European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System", *CHJ* ,135-47.

৩২. D.B., Vol. 101 ,f. 372, para 32, 21, December 1722; Coast and Bay Abstracts (এখন থেকে C&B Abstr.) Vol. 5, f. 117, para 261, 10 January 1748, IOL .

পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা।[৩৩] ১৭৫৪ সালের মার্চ মাসে বাংলায় ওলন্দাজ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ফ্লোরিন ৪২৪৬৯০২-১০-৮ বা টাকা ২৮,৩১,২৬৮।[৩৪] ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির উত্তমর্ণতালিকায় প্রধানতম ছিল জগৎশেঠ পরিবার। এর পরে প্রথমে কাশিমবাজার ও পরে কলকাতাবাসী কাট্‌মাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩৫] ফরাসী ও অস্‌টেন্ড কোম্পানিও স্থানীয় বাজার থেকে প্রায়ই ধার নিয়েছে। স্থানীয় শরাফ/মহাজন ও বণিকরা অস্‌টেন্ড কোম্পানিকে ঋণ দিয়েছে। ১৭৩০ সালে আলেকজান্ডার হিউম জানাচ্ছেন যে, অন্যান্য মহাজনদের মধ্যে জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের নিকটাত্মীয় নয়নসুখ বাবু কোম্পানিকে প্রচুর টাকা ধার দিয়েছেন।[৩৬] পণ্যসংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করতে ফরাসীরাও একইভাবে টাকার জন্য স্থানীয় বাজারের উপর নির্ভর করতো। তাদের কাছেও প্রধান উত্তমর্ণ হিসেবে জগৎশেঠ ছিলেন অপরিহার্য। ডুপ্লে ফতেহচাঁদকে 'ইহুদীদেরও অধম' এবং 'আমাদের কসাই' ইত্যাদি বলে অভিহিত করলেও তাঁকে প্রায়ই ফতেহচাঁদদের কাছ থেকে এক থেকে তিন লক্ষ টাকা ধার করতে হয়েছে।[৩৭] কাশিমবাজারের ধনী ও ক্ষমতাশালী বণিক/মহাজন পরিবার কাট্‌মাদের কাছ থেকেও তাঁকে ঋণ নিতে হয়েছে।[৩৮] তবে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কাছে এ যুগের সবচেয়ে প্রধান উত্তমর্ণ জগৎশেঠ পরিবার। ১৭৫৫ থেকে ১৭৫৭ সাল এই তিন বছরে জগৎশেঠদের কাছ থেকে ওলন্দাজ কোম্পানির ঋণের পরিমাণ ছিল ২৩,৮৫,৮০৩ টাকা।[৩৯] ১৭৫৭ সালের মার্চে চন্দননগরের পতনের সময় তাদের কাছ থেকে ফরাসী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টাকা।[৪০] কলকাতার বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ফেন্‌উইক ১৭৪৭-৪৮ সালে ফরাসী ঋণের পরিমাপ করেছে ১৭ লক্ষ টাকারও বেশি আর উইলিয়ম ওয়াটস্‌ ১৭৫৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাইভকে লিখেন যে, "শেঠদের কাছ থেকে ফরাসী ঋণের পরিমাণ ১৩ লক্ষ টাকার মতো।"[৪১]

৩৩. Vereenighde Oost Indische Compagnie (এখন থেকে V. O. C.), 2030, ff. 156, 58, Hughli to Batavia (এখন থেকে HB), 16 March 1725.

৩৪. V.O. C., 2829 (earlier Kolonial Archief, এখন থেকে K. A. 2721), ff. 126-27.

৩৫. Sushil Chaudhuri, "European Companies", *CHJ*, 136-42.

৩৬. Alexander Hume's "Memorie", Stadsarchief Antwerpen, 5769, Antwerp. কে. এন. চৌধুরীর কপি থেকে আমি এটা কপি করেছি।

৩৭. Indrani Roy, " Some Aspects of French Presence in Bengal", *CHJ*, 99.

৩৮. ঐ, 100-101.

৩৯. Computed and Compiled from V.O. C. 2874.

৪০. J. H. Little, *The House of Jagat Seth*, Introduction by N.K. Sinha, (Calcutta 1967), XI.

৪১. Orme Mss., *India* VI, f. 1525, IOL, Watts' Letter to Clive, 18 February 1757.

বাংলার মূলধনের বাজার ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির অর্থাভাবের নিয়ত সমস্যাকে বেশ কিছুটা সহজ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থানীয় মহাজন/ বণিকদের কাছ থেকে সব সময় ঋণ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। এক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা ছিল, ঋণ পাওয়া যেতো সাধারণত খুব অল্প সময়ের জন্য, দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রচলন প্রায় ছিল না, ঋণ পাওয়া যেতো সাধারণভাবে শুধু কয়েক মাসের জন্য। সুদের পরিমাণ মাসিক হারে নির্ধারিত হতো আর কোন ক্ষেত্রেই ঋণের মেয়াদ খুব বেশি হলে এক বছরের বেশি হতো না।[৪২] তার ফলে শরাফ ও বণিক/মহাজনরা, এমনকি প্রতাপশালী ব্যাঙ্ক এবং মহাজন জগৎশেঠ পরিবারও ইউরোপ থেকে সোনা-রূপা নিয়ে জাহাজ আসা মাত্রই তাদের টাকা দাবি করে বসতো। জগৎশেঠরা পর্যন্ত কোম্পানিকে শাসাতো যে, নির্ধারিত সময়ে তাদের ঋণ শোধ না করলে তারা বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে। ঋণ শোধ করতে ইউরোপীয়দের দেরি হলে তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হতো তার পরিচয় পাওয়া যায় ঢাকার ইংরেজ কুঠিয়ালদের ১৭৪৯ সালের নভেম্বরের চিঠি থেকে। চিঠিতে তারা জানাচ্ছে, জগৎশেঠ মাহতাব রায়ের গোমস্তা তার মনিবের পাওনা টাকা ফেরত দেয়ার জন্য "প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে, এমনকি এই বলে শাসাচ্ছে যে টাকা ফেরত না পেলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেয়া হবে।"[৪৩]

বাংলার ঋণবাজারে কখনো কখনো বিভিন্ন কারণে যথেষ্ট টাকার অভাব দেখা দিত বলে ইউরোপীয়দের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়তো। এরকম সাময়িক অভাবের একটি প্রধান কারণ হলো, শরাফ ও বণিক/মহাজনরা তাদের অর্থসম্পদ দেখাতে অনিচ্ছুক ও ভীত ছিল. পাছে নবাব বা তাঁর কর্মচারী জোর করে কিছু আদায় করে বসে। যদিও সাধারণভাবে আলোচ্য সময়কালের পুরোটাতেই এটা সত্য, তবু চল্লিশের দশক ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে মারাঠা আক্রমণের সময় এই অবস্থা চরমে উঠে। জগৎশেঠদের মতো বিখ্যাত ও প্রতাপশালী মহাজন পরিবারেও এই ভীতি সঞ্চারিত হয়। ১৭৪৬ সালে লেখা কাশিমবাজারের চিঠিতে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে :

> তাদের [কাশিমবাজারের] ধার পাবার আর কোন আশাই নেই, কারণ অর্থাভাব এত বেশি যে এমনকি ফতেহচাঁদের পরিবারও বহু কষ্টে (তাদের কাছ থেকে কেনা) সোনা-রূপার দাম দিতে

৪২. Sushil Chaudhuri," European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System", *CHJ*, 143-44.

৪৩. *Factory Records*, Dacca, Vol. 3, 9 November 1749; B. P.C., Range 1, Vol. 22, f. 420 vo. 15 November 1749, IOL.

> পেরেছে…অন্তত আমাদের মনে হয়, যদি তাদের (শেঠদের) টাকা থাকেও, নবাবের ভয়ে তারা সে টাকা বার করতে ভরসা পাচ্ছে না।[৪৪]

বাংলায় মূলধনের বাজারে অর্থাভাবের আরেকটি প্রধান কারণ, বাজারে টাকা পাওয়া না পাওয়া বহুল পরিমাণে নির্ভর করতো আগ্রায় টাকার বিনিময়হারের উপর। যদি সেখানে বিনিময়ের হার চড়া থাকতো, তাহলে বাংলায় টাকা পাওয়া দুর্লভ হতো, কারণ শরাফ ও বণিক/মহাজনরা তখন তাদের টাকা আগ্রায় পাঠিয়ে দিত এবং এভাবে টাকা খাটানো বাংলায় শতকরা ১২ টাকা হারে সুদে ধার দেয়ার চাইতেও অনেক বেশি লাভজনক ছিল। সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমদিকে বাংলায় আর্থিক বাজারের এই ছিল সাধারণ চিত্র। ১৭০০ সালে কাশিমবাজার কাউন্সিলের লেখা চিঠিতে অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ পায় :

> এখানে সুদে কোন টাকা আমরা ধার করতে পারছি না, কারণ দেশে নগদ টাকার খুবই অনটন। এখান থেকে দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে চলতি বিনিময়দর শতকরা ৬ এবং শ্রফরা (শরাফ বা স্রফ বা বণিক/মহাজন) হাতের নগদ টাকা সবটাই এই বিনিময়বাজারে খাটাচ্ছে।[৪৫]

১৭৪০ সাল পর্যন্ত বাংলায় সুদের হার ছিল চড়া। তাই ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির স্থানীয় বাজার থেকে টাকা ধার করার সমস্যাও ছিল। ইংরেজ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ লন্ডন থেকে বারংবার লিখে পাঠাচ্ছিল শতকরা ১২ টাকা সুদে যেন বাজার থেকে টাকা ধার করা না হয়—এই সুদের হার তারা অত্যধিক বেশি মনে করতো এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে 'বিষবৎ' ক্ষতিকর গণ্য করে কর্মচারীদের ধার নিতে নিরুৎসাহিত করতো। বিভিন্ন কুঠিতে পাঠানো চিঠিতে তারা ধার না করে কাজ চালাতে পরামর্শ দিত, কারণ এই ধারের সুদ শোধ করতে গিয়ে কোম্পানির লাভ অনেক কমে যেতো।[৪৬] জগৎশেঠরা এবং তাদের অনুকরণে অন্যান্য শরাফরা অবশ্য ১৭৪০ সাল থেকে সুদের হার কমিয়ে শতকরা ৯ টাকা করে দেয়। তা সত্ত্বেও কোম্পানিগুলির পক্ষে সব সময় বাজারে টাকা ধার করা সম্ভব হতো না।[৪৭] ফরাসী কোম্পানির কর্মচারীরা লিখছে : "এখানে বেশি লোক পাওয়া যাবে না, যারা টাকা ধার দেবে বা অনেক সুদ নিয়েও বেশি দিনের জন্য টাকা ধার দেবে।"[৪৮] এসব সত্ত্বেও কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, ইউরোপীয়

৪৪. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 7, 22 January 1746; B. P. C., Range 1, Vol. 18, f 265vo, 30 June 1746, IOL.

৪৫. *Factory Records*, Calcutta, Vol. 10, pt. II, f. 92, IOL.

৪৬. D. B., Vol 95, f. 519, 18 January 1705.

৪৭. Sushil Chaudhuri, " European Companies and Pre-modern South Asian Commercial System", *CHJ*, 146.

৪৮. Indrani Roy, " The French Company and the Merchants of Bengal", *IESHR*, 51.

কোম্পানিগুলির দীর্ঘস্থায়ী মূলধনের অভাব বাংলার স্থানীয় ঋণবাজার অনেকাংশেই মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

টাঁকশাল ও বাজারে সোনা-রূপা বিক্রি

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির পক্ষে তাদের পণ্যক্রয়ের জন্য নগদ টাকার সমস্যার অনেকখানিই লাঘব হতো যদি তারা ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত সোনা-রূপা টাঁকশালে পাঠিয়ে সোজা দেশীয় মুদ্রা তৈরির অবাধ অধিকার পেতো। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তারা বাংলায় টাঁকশাল নিয়মিত ব্যবহারের কোন অনুমতি বাংলার নবাবদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে নি। এ পথে তাদের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল জগৎশেঠ পরিবার। আঠারো শতকের ত্রিশের দশকের প্রথমদিক থেকে জগৎশেঠরা টাঁকশালে মুদ্রাকরণের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে শুরু করে। টাঁকশালে সোনা-রূপা পাঠিয়ে দেশীয় মুদ্রাকরণ যেহেতু একটি প্রধান সুবিধা এবং কোম্পানিগুলির বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক, তাই বিভিন্ন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ইউরোপ থেকে এদেশে তাদের কর্মচারীদের এই সুবিধা আদায় করার জন্য বার বার নির্দেশ দিয়েছে। লন্ডন থেকে ইংরেজ কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস এই মর্মে তাদের একটি চিঠিতে লিখে :

> আমরা আশা করি যে আমাদের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিল তাদের দক্ষতা ও উদ্যমের পবিচয় দিয়ে অন্যান্য কার্যকলাপের সঙ্গে মুদ্রাকরণের সুবিধাও আদায় করতে সক্ষম হবে। আমরা বহুবার একান্তভাবে আপনাদের তাগিদ দিয়েছি এ সুবিধা আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে। আপনাদের বহুবার জানিয়েছি টাঁকশালের সুবিধা না পাওয়াতে আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। বাজারে রূপা বিক্রি করে ও আমাদের মাদ্রাজ টাকায় বাট্টা দিয়ে এবং আরো কতোভাবে যে আমাদের লোকসান হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না।[৪৯]

কিন্তু ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অস্টেন্ড কোম্পানির প্রধান আলেকজান্ডার হিউম ১৭৩০ সালে লিখছেন যে, টাঁকশালে মুদ্রাকরণের বিশেষ চেষ্টা তিনি করেন নি পাছে "ফতেহচাঁদের মতো বন্ধু হারাতে হয়, কারণ টাঁকশালের কারবারের প্রায় সবটাই একচেটিয়া ফতেহচাঁদের হাতে।"[৫০] এমনকি ১৭৫৫ সালে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল উইলিয়ম ওয়াটস্ জানাচ্ছেন যে, কলকাতায় টাঁকশাল তৈরির প্রস্তাব নবাবের কাছে অগ্রাহ্য হবে, "কারণ জগৎশেঠরা তাতে একেবারেই রাজী হবে না। ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত সব সোনা-রূপার তারাই একমাত্র ক্রেতা—ফলে এই লাভজনক ব্যবসা তারা (জগৎশেঠরা) হাতছাড়া হতে দেবে না।"[৫১]

৪৯. D. B. Vol. 101. f. 162, para 56, 15 February 1722.
৫০. Hume's "Memorie".
৫১. C & B Abstr., Vol., 5 f 399, 12 February 1753; Bengal Letters Received, Vol. 22, ff. 384-85, 8 Februray 1753, IOL.

বাংলার খোলা বাজারে সোনা-রূপা বিক্রি করতে পারলেও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির অবস্থা অনেক ভাল হতো। কিন্তু টাঁকশালের কারবার জগৎশেঠদের প্রায় একচেটিয়া হওয়ায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে সোনা-রূপা জগৎশেঠদের কাছেই বিক্রি করতে হতো এবং জগৎশেঠরা যে দাম দেবে সে দামেই। বলাবাহুল্য, এই দাম খোলা বাজারের দামের চাইতে কম। ফলে কোম্পানিগুলির প্রচুর ক্ষতি হতো। রূপার দাম নিয়ে কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রায়ই জগৎশেঠদের দরকষাকষি হতো। কোম্পানিগুলি চেষ্টা করতো একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ নিয়ে যাতে জগৎশেঠরা সোনা-রূপার জন্য তাদের কাছে বাজারের চাইতে কম দাম গছাতে না পারে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়ই সফল হতো না। ১৭৪৩ সালে রূপার দাম নিয়ে এরকম দরকষাকষির সময় কলকাতা কাউন্সিল কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালদের লিখে, দাম নিয়ে ফতেহচাঁদের কাছে দরবার করেও "যদি ফল পাওয়া না যায়", তাহলে জগৎশেঠদের দামেই যেন রূপা তাদের কাছে বিক্রি করা হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা যেন "তাদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরকম করলে ভবিষ্যতে আমরা এদেশে সোনা-রূপা আমদানি করা বন্ধ করে দেব।"[৫২] শেঠরা অবশ্য ভাল করেই জানতো যে, বাংলায় রপ্তানিপণ্য সংগ্রহের জন্য কোম্পানির পক্ষে এদেশে সোনা-রূপা আমদানি না করে উপায় নেই। ফলে ইংরেজদের হুমকিতে তারা কর্ণপাতও করে নি। ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানিকেও একই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৭৪৩ সালের ১৮ নভেম্বরের কনসালটেশনস্ থেকে তা সুস্পষ্ট :

> আমাদের মতো ফরাসীরাও দারুণ দ্বিধায় পড়েছে। সোনা-রূপা তাদের কুঠিতে পড়ে আছে, কিন্তু তার দরদাম নিয়ে এখনও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হয় নি। ওলন্দাজদেরও অবস্থা একই রকম—একটা টাকাও এখনো তারা টাঁকশাল থেকে পায় নি, কারণ নবাবের সঙ্গে বিবাদের কোন নিষ্পত্তি এখনো হয় নি।[৫৩]

ফরাসীরা অভিযোগ করে যে, প্রচণ্ড প্রতাপশালী 'হিন্দু' ফতেহচাঁদের অর্থলিপ্সার জন্যই তাদের টাঁকশালে রূপা পাঠিয়ে মুদ্রা তৈরির সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে তারা তাদের আমদানিকৃত সব সোনা-রূপা জগৎশেঠদের কাছে বিক্রি করেছে শেঠদের স্থির করা দামে—এতে তাদের শতকরা ৪ ভাগ ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছে।[৫৪]

রপ্তানিপণ্য

বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ছিল বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা। ছোটখাটো রকমারিদ্রব্যও অবশ্য রপ্তানিতালিকায় ছিল। তার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ছিল

৫২. B. P. C., Range 1, Vol. 16, f. 333, 9 November 1743.
৫৩. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 6, Consultations, 18 November 1743.
৫৪. Indrani Roy, " Some Aspects of the French Presence in Bengal", *CHJ*, 97.

চিনি, চাল, গম, ঘি ও সরষের তেল। তাছাড়া মোম, বোরাক্স (borax), গালা, কড়ি ও চটের থলিও রপ্তানি হতো। প্রধান তিনটি রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে প্রথমদিকে সোরাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সতেরো শতকের সত্তরের দশক থেকে কাঁচা রেশম রপ্তানি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে এবং আশির দশকে রেশমরপ্তানি অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তেমনিভাবে সত্তরের দশক পর্যন্ত বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ ছিল নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু আশির দশক থেকে ইউরোপে বাংলার বস্ত্ররপ্তানি আশ্চর্য রকমে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, ঐসময় ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে বাংলার সস্তা কাপড় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং এর চাহিদাও খুব বেড়ে যায়। তারপর থেকে ইউরোপের বাজারে যেমন বাংলার কাপড়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে, তেমনি বাংলা থেকে কোম্পানিগুলির রপ্তানির পরিমাণও আনুপাতিকভাবে বেড়ে চলে। ফলে আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষ অবধি বাংলা থেকে ইউরোপীয় বিভিন্ন কোম্পানির রপ্তানিপণ্যতালিকায় বস্ত্রই সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের আনুপাতিক অংশ নিম্নোক্ত সারণি থেকে জানা যাবে :

সারণি ১ : বাংলা থেকে ইংরেজ-ওলন্দাজ রপ্তানিপণ্যের আনুপাতিক হার (শতকরা)

পণ্য	ইংরেজ		ওলন্দাজ	
	বছর ১৬৭৫-৭৬	বছর ১৭০১-১৭০২	বছর ১৬৭৫-৭৬	বছর ১৭০১-১৭০২
বস্ত্র	৭১	৭১	২১.৯৩	৫৪.১৯
কাঁচা রেশম	১২	২২	৩৯.৫৭	২৯.৪৪
সোরা	১১	১	১২.১১	৫.৭১
আফিম	x	x	৬.৬৪	৭.০৮
অন্যান্য	৬	৬	১৯.৭৫	৩.৫০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

[সূত্র : সুশীল চৌধুরী, *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন ইন বেঙ্গল*, ২৫৩-২৫৪; ওম প্রকাশ, *দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ্যান্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল*, ৭২]

যদিও ওলন্দাজ কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যের সঠিক পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্য এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই, তবু আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যের যে তথ্য আমরা পাই, তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোম্পানিগুলির রপ্তানিপণ্যের আনুপাতিক হার প্রায় একই রকমের ছিল—সর্বপ্রধান স্থান বস্ত্রের, তারপর যথাক্রমে কাঁচা রেশম ও সোরার স্থান।

সারণি ২ : বাংলা থেকে ইংরেজ রপ্তানিপণ্যের আনুপাতিক হার (শতকরা)

পণ্য	বছর ১৭১২-১৩	বছর ১৭১৪-১৫	বছর ১৭১৬-১৭	বছর ১৭১৯-২০
বস্ত্র	৮৩	৮৩	৭১	৯১
কাঁচা রেশম	৭	১১	২১	৫
সোরা	৪	৪	৪	৩
অন্যান্য	৬	২	৪	১
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র : সুশীল চৌধুরী : *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন ইন বেঙ্গল,* ২৫৪।

প্রথমদিকে বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের মোট মূল্য তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। যেমন, ১৬৫২ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির পণ্যসংগ্রহের মোট মূল্য ছিল ৭০০০ পাউন্ড বা ৫৬,০০০ টাকা। আর ঐ বছরে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ওলন্দাজ রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ৬,৮৫,২৮০ ফ্লোরিন বা ৪,৫৬,৮৫৩ টাকা।[৫৫] তবে, বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৭৩০-এর দশক পর্যন্ত এই বাণিজ্যে ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। অবশ্য এর মাঝে কিছুদিন নানা কারণে, যেমন ইউরোপ ও ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ এবং বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি ইংরেজ বাণিজ্যের হঠাৎ বিশেষ গতিবৃদ্ধি হয়—১৬৭৫-৭৬ এবং ১৬৭৬-৭৭ এই দু'বছরের রপ্তানিপণ্যের গড়পড়তা মূল্য দাঁড়ায় ৪,৪৩,৩৭৬ টাকা। অবশ্য ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ ইংরেজ রপ্তানিকে ম্লান করে দেয়—ঐ সময় ওলন্দাজদের রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ১৮,৫৫,৪৭৩ টাকা।[৫৬] সতেরো শতকের শেষ দশকে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ মোটামুটি এরকমই ছিল। এই শতকের শেষ দু'বছর ১৬৯৮-৯৯ ও ১৬৯৯-১৭০০ সালে ওলন্দাজ রপ্তানি গড়ে বছরে পনের লক্ষ টাকার মতো ছিল। সারণি ৪ ও ৫ থেকে আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলা থেকে ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানির মোট রপ্তানিমূল্যের তুলনামূলক হিসাব পাওয়া যাবে।

৫৫. Original Correspondence (এখন থেকে O. C.), 2246, Vol. 22, 14 January 1652, IOL, for English investment. For the Dutch exports, Om Prakash, *Dutch East India Company*, 70. The rate of Conversion £1 = Rs. 8/- and 1Re = 1.5 florin (Dutch).

৫৬. বৃটিশ পণ্যরপ্তানি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 253 and for Dutch exports, Om Prakash, *Dutch East India Company*, 70.

সারণি ৩ : ওলন্দাজ রপ্তানির ত্রিবাৎসরিক মোট মূল্য

সময়	মোট মূল্য (এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানি)	গড় (ফ্লো)	গড় (টাকা)	মোট মূল্য (ইউরোপ)	গড় (ফ্লো)	গড় (টাকা)
১৭০০/০১-১৭০২/৩	৯৮,৮২,১৩৫ ফ্লো	৩২,৯৪,০৪৫ ফ্লো	২১,৯৬,০৩০ টা:	৭৬,৩৯,৮৩৫ ফ্লো	২৫,৪৬,৬১২ ফ্লো	১৬,৯৭,৭৪১ টাঃ
১৭১০/১১-১৭১২/১৩	৯৪,১২,২৫৪ "	৩১,৩৭,৪১৮ "	২০,৯১,৬১২ "	৬৭,৪৬,৬৫২ "	২২,৪৮,৮৮৪	১৪,৯৯,২৫৬
১৭১৫/১৬-১৭১৭/১৮	১,১৫,৩৭,৬৪৬ "	৩৮,৪৫,৮৮২ "	২৫,৬৩,৯২১ "	৮৪,৫৩,৪১৮ "	২৮,১৭,৮০৬	১,৮৭,৫৩৭

[সূত্র : ওম প্রকাশের *দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি* নামের বইটি থেকে পৃ. ৭০, ৭৬, ৭৭ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে। ফ্লো= ফ্লোরিন, ১.৫ ফ্লোরিন= ১ টাকা]

সারণি ৪ : ইংরেজ রপ্তানির ত্রিবাৎসরিক মোট মূল্যের হিসাব

সময়	মোট মূল্য (পাঃ)	বার্ষিক গড় (পাঃ)	বার্ষিক গড় (টাকা)
১৭০০/১-১৭০২/০৩	৬,৯৮,৯৮৯ "	২,৩২,৯৯৬ "	১৮,৬৩,৯৭১ "
১৭১০/১১-১৭১২/১৩	৭,২১,৯২৬ "	২,৪০,৬৪২ "	১৯,২৫,১৩৬ "
১৭১৫/১৬- ১৭১৭/১৮	৬,৪৫,৪৩৬ "	২,১৫,১৪৫ "	১৭,২১,১৬৩ "

[সূত্র : সুশীল চৌধুরী, *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন*, ২৫০ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট মূল্যের হিসাব দেয়া হয়েছে।
১ পাঃ=৮ টাকা]

সারণি ৪ ও ৫ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এশিয়া ও ইউরোপ মিলিয়ে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকে ইংরেজ রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তবে এশীয় অঞ্চলে রপ্তানি বাদ দিয়ে শুধু ইউরোপে রপ্তানির পরিমাণ ধরলে ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানি এই সময়ে প্রায় সমমূল্যের ছিল, ইংরেজদের সামান্য একটু বেশি ছিল। কিন্তু ১৭২০-এর দশক থেকে ওলন্দাজরা ইংরেজদের রপ্তানি তুলনায় রপ্তানিবাণিজ্যে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজদের বাণিজ্য ১৭৩০-এর দশকে সবচেয়ে তুঙ্গে উঠে। ১৭৩০ সাল থেকে প্রতি বছরে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণের তথ্য আমাদের কাছে এখন না থাকলেও ১৭৩০-এর দশক থেকে প্রত্যেক দশকের প্রথম তিন বছরে ওলন্দাজ রপ্তানির মোট পরিমাণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির সব তথ্য অবশ্য আমাদের কাছে আছে।

যাই হোক, ১৭৩০ থেকে প্রত্যেক দশকের প্রথম তিন বছরে ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানির পরিমাণ থেকে আমরা মোটামুটি একটা তুলনামূলক চিত্র পেতে পারি।

উপরের সারণি থেকে বোঝা যায় যে, ত্রিশের দশক থেকে ইউরোপে ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ ইংরেজদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৭৩০-এর দশকেব প্রথমদিক থেকে ১৭৫০-এর দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত ওলন্দাজদের বার্ষিক গড়পড়তা রপ্তানিবাণিজ্যের মোট মূল্য ইংরেজ বাণিজ্যের অর্ধেকেরও কম ছিল। তবে এ সারণিতে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ওলন্দাজ রপ্তানির পরিমাণ ১৭৩০-এর প্রথমদিকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে অবনত হলেও ১৭৪০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে আবার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৭৫০-এর দশকের প্রথমেও সেটা বজায় থাকে। তবু তাদের রপ্তানিবাণিজ্যের পরিমাণ পুরো সময়েই ইংরেজদের রপ্তানির তুলনায় অনেক কম ছিল। বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির

সারণি ৫ : ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানির মোট রপ্তানিমূল্যের ত্রিবাৎসরিক হিসাব

সময়	ওলন্দাজ রপ্তানি (ইউরোপে) মোট মূল্য (ফ্লো)	গড় (ফ্লো)	গড় (টাকা)	ইংরেজ রপ্তানি মোট মূল্য (পাঃ)	গড় (পাঃ)	গড় (টাকা)
১৭৩০/৩১-১৭৩২/৩৩	৪৭,৪৯,৯২৬ ফ্লো	১৫,৮৩,৩০৯ ফ্লো	১০,৫৫,৫৩৯ টা:	১২,৮৭,৭৬৯ ফ্লো	৪,২৯,২৫৬ পাঃ	৩৪,৩৪,৪০৮ টাঃ
১৭৪০/৪১-১৭৪২/৪৩	৭৫,৪৬,১১৩ "	২৫,১৫,৩৭১ "	১৬,৭৬,৯১৪ "	১২,২৫,৫৬৫ "	৫,০৮,৫২২ "	৪০,৬৮,১৭৬ "
১৭৫০/৫১-১৭৫২/৫৩	৮০,৭০,৩৬৯ "	২৬,৯০,১২৩ "	১৭,৯৩,৪১৫ "	১২,৯৭,২৫৭ "	৪,৩২,৪১৯ "	৩৪,৫৯,৩৫২ "

[সূত্র : ডাচ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে V.O.C. records, Algemeen Rijkarschief, the Hague থেকে। ইংরেজ রপ্তানির জন্য কে. এন. চৌধুরী, "দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া" পৃ. ৫০৯-৫১০ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে মোট পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে।]

বার্ষিক গড়পড়তা মূল্যের দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা বিচার করলে ১৭৩০-এর দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত স্থির ঊর্ধ্বগতিই লক্ষ্য করা যায়। তারপর মধ্য ত্রিশের দশকে সামান্য একটু কমে গিয়ে আবার চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। তারপর থেকে পলাশীযুদ্ধ পর্যন্ত অবশ্য ইংরেজদের রপ্তানিবাণিজ্যে ক্রমাবনতিই লক্ষণীয়। এই ধারার গতি পরের সারণি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সারণি ৬ : ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট মূল্যের পরিমাণ, ১৭২৭-১৭৫৫

সময়	মোটমূল্য (পাঃ)	বার্ষিক গড় (পাঃ)	বার্ষিক গড় (টাকা)
১৭২৭-৩১	২২,৮৯,৩২৩ "	৪,৫৭,৮৬৫ "	৩৬,৬২,৯২০ "
১৭৩২-৩৬	২০,৪৬,১৫০ "	৪,০৯,২৩০ "	৩২,৭৩,৮৪০ "
১৭৪১-৪৫	২৪,০১,৭৮৫ "	৪,৮০,৩৫৭ "	৩৮,৪২,৮৫৬ "
১৭৪৬-৫০	২১,৭৩,৫২৪ "	৪,৩৪,৭০৫ "	৩৪,৭৭,৬৪০ "
১৭৫১-৫৫	২০,৩৩,২৩৫ "	৪,০৬,৬৪৮ "	৩২,৫৩,১৮৪ "

[সূত্র ঃ কে.এন. চৌধুরী রচিত, '*দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া*' গ্রন্থের পৃ. ৫০৯-১০ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট মূল্য হিসাব করা হয়েছে।]

ফরাসীদের বাণিজ্য তুঙ্গে উন্নীত হয় ১৭৩০-এর দশকে। এ সময় তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ টাকার মতো। অস্টেন্ড ও দিনেমার কোম্পানির রপ্তানি ইংরেজ ও ওলন্দাজদের তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না।

সোরা

সোরা যে শুধু অত্যন্ত লাভজনক পণ্য ছিল তা নয়, ইউরোপগামী জাহাজের তলদেশ বোঝাই করে সমুদ্রপথে জাহাজের ভারসাম্য (ballast) রক্ষার পক্ষেও তা খুব উপযোগী ছিল। বারুদ তৈরির একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ হিসেবেও পাশ্চাত্যে সোরার প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। ভারত উপমহাদেশে সোরা উৎপাদিত হতো প্রধানত গুজরাট, করোমন্ডল উপকূল ও বিহারে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমশ বিহারই ইউরোপীয় বাজারে প্রায় একমাত্র সোরা সরবরাহকারী হয়ে উঠলো। তা থেকে বোঝা যায়, সোরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বিহারের কতগুলি সুবিধা ছিল, যেমন অপেক্ষাকৃত কম দাম, গুণগত উৎকর্ষ এবং গঙ্গার নিকটবর্তী হওয়ায় দ্রুত অথচ সুলভে হুগলী বন্দরে রপ্তানিপণ্য পৌঁছে দেয়ার সুবিধা। সোরা প্রধানত চম্পারণ, বিহার, হাজিপুর, সরণ এবং তিরহুত

জেলায় উৎপাদিত হতো। লুজিয়া নামক সম্প্রদায়ের লোকেরাই সোরা উৎপাদন করতো। উৎপাদনের কাল ছিল নভেম্বর থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

১৬৮৮ সালের একটি ওলন্দাজ রিপোর্টে সোরা উৎপাদনের বিশদ তথ্য পাওয়া যায়, যেমন বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ, কোন্ কোন্ পরগনায় কি পরিমাণ সোরা উৎপন্ন হয়, এসব অঞ্চলের মালিক বা কর্মচারীদের পরিচয় ইত্যাদি।[৫৭] এই রিপোর্ট অনুযায়ী বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,২৬,২০০ মণ। শোধনের পর এই পরিমাণ (এই পরিশুদ্ধ সোরাকে বলা হতো *দোবারা-কাবেসা)* দাঁড়াতো ১,২৭,২৩৮ মণে। তা থেকে হুগলীতে যেতো ১২০০ মণ, ঢাকায় যেতো ৩০০০ মণ এবং পাটনার বারুদের কারখানার জন্য রাখা হতো ৭০০০ মণ। বাকি ১,০৫,২৩৮ মণ থাকতো রপ্তানির জন্য। মোট ২৮টি পরগনায় সোরা উৎপন্ন হতো। তাদের মধ্যে ১১টি পরগনায় অপরিশোধিত সোরার ২২ শতাংশ উৎপন্ন হতো। এ পরগনাগুলি ছিল বাদশার খালসা জমি। বাকি পরগনাগুলি ছিল জায়গির। এসব জায়গিরের মালিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওয়াজির আসাদ খান, নবাব শায়েস্তা খান ও উড়িষ্যার নবাব ইব্রাহিম খান।[৫৮]

সাধারণত তিন প্রকারের সোরা উৎপন্ন হতো—পরিশোধিত বা *দোবারা-কাবেসা* বা কাল্মি অর্থাৎ দুবার সিদ্ধ বা *দোবারা* এবং অপরিশোধিত বা কাঁচা।[৫৯] ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রধানত পরিশোধিত সোরা রপ্তানি করতো, না হলে তা বারুদ তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতো না। তাছাড়া কাঁচা বা অপরিশোধিত সোরা রপ্তানি করলে অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটেই সাশ্রয় হতো না, কারণ কাঁচা সোরা ভারী বলে এতে জাহাজভাড়ার খরচ যেতো বেড়ে। কিন্তু কাঁচা বা অপরিশোধিত সোরার উপর শুল্ক দিতে হতো একই হারে।[৬০] পরিশোধন সাধারণত সাবেকী ভারতীয় পদ্ধতি বাষ্পীকরণের মাধ্যমেই করা হতো এবং এতে মাটির পাত্র ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বিশাল বিশাল মাটির পাত্রে পরিশোধন করা সময়সাপেক্ষ ও সমস্যার ব্যাপার ছিল, কারণ প্রায়ই পরিশোধন চলাকালে পাত্রগুলি ভেঙে যেতো। তাই কোম্পানিগুলি এই কাজের জন্য বাইরে থেকে বড় তামার পাত্র আমদানি করতো, স্থানীয় বাজারে এগুলি পাওয়া যেতো না। পরিশোধনের খরচ অবশ্য খুব সামান্যই ছিল—মণপ্রতি ৩/৪ আনা।[৬১]

৫৭. V.O. C. 1451 (K.A. 1343), ff. 748 vo -749 vo.

৫৮. S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, Appendix G.

৫৯. *Factory Records*, Hughli, Vol. 10, f. 235.

৬০. D. B., Vol. 95, f. 232.

৬১. B. P. C., Range 1, Vol. 6, f. 488 vo.

সোরার ব্যবসায়ে সরবরাহের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল, বাণিজ্যের বিস্তারও সম্ভব ছিল। তবে বাধা ছিল একটাই। তা হলো স্থানীয় শাসক, উচ্চকর্মচারী ও তাদের পেটোয়া বণিকরা এই ব্যবসাকে একচেটিয়া করে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিল। অবশ্য এ চেষ্টা তেমন জোরদার বা সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। বাংলার মুগল সুবাদার মীর জুমলা, শায়েস্তা খান ও আজিম-উশ-শান এই ধরনের চেষ্টা করেছেন। তবে এতে সব সময় তাঁরা খুব একটা সফল হন নি।[৬২] আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ও পঞ্চাশের দশকে প্রথমে উমিচাঁদ ও পরে খোজা ওয়াজিদ একচেটিয়াভাবে সোরার ব্যবসা করেন। উমিচাঁদের ভাই দীপচাঁদ বিহারে সোরার প্রধান কেন্দ্র সরকার সিরঙ্গ-এর (সরণ) ফৌজদার ছিলেন।[৬৩] নবাব আলিবর্দীকে ২৫,০০০ টাকা দিয়ে ১৭৫৩ সালে ওয়াজিদ সোরার বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। বিহারে ওয়াজিদের দুই প্রতিনিধি মীর আফজল ও খোজা আসরফ (ওয়াজিদের ভাই) ওয়াজিদের হয়ে এ ব্যবসা চালাতেন।[৬৪] এই একচেটিয়া ব্যবসার ফলে অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির পণ্যসংগ্রহে খুব অসুবিধা হয় নি, তবে তাদের অনেক সময় দাম একটু বেশি দিতে হতো। সাধারণত আসমী (assomies) বা সোরার খুচরো ব্যবসায়ীদের সাহায্যে সোরা সংগ্রহ করতে হতো। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এদের আগাম টাকা দিয়ে সোরাসংগ্রহের জন্য চুক্তি করা হতো। মাঝে মাঝে সাধারণ ব্যবসায়ী বা দালালদের সোরা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করা হতো। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সোরার বাজারে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকতো, বিশেষকরে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে।

সতেরো শতকের আশি ও নব্বই-এর দশকে ওলন্দাজদের সোরারপ্তানির পরিমাণ নিঃসন্দেহে ইংরেজদের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এমনকি আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকেও যখন বাংলা থেকে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মোট রপ্তানির মূল্য প্রায় সমপর্যায়ের ছিল, তখন ওলন্দাজদের সোরার বাণিজ্য ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ঐ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকেই ইংরেজদের সোরারপ্তানি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে চতুর্থ দশকের প্রথমদিকে একমাত্র তাদের বাণিজ্য ওলন্দাজদের ১৭১০-এর দশকের বৃহত্তম পরিমাণকেও অতিক্রম করে যায়। পরবর্তী সারণি (সারণি ৭ ও ৮) থেকে তা প্রতীয়মান হবে।

৬২ S. Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 166.

৬৩. B. P. C., Range 1, Vol. 17, f. 769, 16 December 1744.

৬৪. The "Memorie" of A. Bisdom, Voo. C. 2850 (K. A. 2742), ff. 498-301vo., 10 January 1756; আরও দেখুন, *IHB*-তে আমার রচিত নিবন্ধ, "Armenians in Bengal Trade and Politics—A Study of Khwaja Wazid's Role in mid-18th Century Bengal".

সারণি ৭ : ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : সোরা (১৬৮১-১৭১৫)

ক. ওলন্দাজ রপ্তানি

সময়	মোট পরিমাণ (ওলন্দাজ পাঃ)	বার্ষিক গড় (ওলন্দাজ পাঃ)	বার্ষিক গড় (ইংরেজ পাঃ)
১৬৮১/৮২-১৬৮৬/৮৭ (১৬৮৪/৮৫ বাদে)	১.২০,২৮,২৬৯	২৪০৫,৬৫৪	২২,০৭,০২১
১৬৮৮/৮৯-১৬৯৪/৯৫	১,১৮,৫১,০৮৫	২৩.৭০.২১৭	২১.৭৪.৫১১
১৭০১/০২-১৭০৫/০৬	১,৩৪.২৭,১৫০	২৬,৮৫,৪৩০	২৪.৬৩.৬৯৭
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	১,৮২,৩৫,৮৭০	৩৬,৪৭,১৭৪	৩৩,৪৬,০৩১

খ. ইংরেজ রপ্তানি

সময়	মোট পরিমাণ (ইঃ পাঃ)	বার্ষিক গড় (ইঃ পাঃ)
১৬৮১/৮২-১৬৮৫/৮৬	৬২,৯৮,২০৮	১২,৫৯,৬৪১
১৬৯০/৯১-১৬৯৫/৯৬ (১৬৯১/৯২ বাদে)	২৬.৫২.৯৬৪	৫.৩০,৫৯২
১৭০১/০২-১৭০৬/০৭ (১৭০৩-০৪ বাদে)	৩৭.৮৫,৪৮৬	৭.৫৭.০৯৭
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	৪২,০২,৫১৪	৮,৪০,৫০২

সূত্র : ওম প্রকাশের *দি ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ্যান্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল,* পৃ. ২০৪-০৫ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে ওলন্দাজ রপ্তানি এবং সুশীল চৌধুরীর *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন*, পৃ. ১৭০-৭১ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে মোট পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ৮ : ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : সোরা ১৭৩০-৫০

সময়	মোট পরিমাণ (ইঃ পাঃ)	বার্ষিক গড়(ইঃ পাঃ)
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	১,০১,৬৫,৯০৪	২০,৩৩,১৮৪
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	৮৮,২২,০১৬	১৭,৬৪,৪০৩
১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	২০,৭,৬৭,৩৭৬	৪১,৫৩,৪৭৫
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫০	৯৬,৮৭,৬৬৪	১৯,৩৭,৫৩৩

সূত্র : কে. এন. চৌধুরীর *দ্য ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া,* ৫৩১-৩২ থেকে তথ্য নিয়ে হিসাব করা হয়েছে

কাঁচা রেশম

১৬৭০-এর দশক থেকে আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যন্ত বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যে একমাত্র সুতীবস্ত্রের পরেই অন্যতম পণ্য ছিল কাঁচা রেশম। যদিও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি, বিশেষত ইংরেজ ও ওলন্দাজরা প্রথমদিকে চীনদেশীয় ও পারস্যের রেশম সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল, ১৬৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলার রেশম তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলার রেশমের প্রধান আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, চীন ও পারস্যের রেশমের তুলনায় তার দাম অনেক কম এবং সেজন্য ইউরোপে তা বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করা যেতো। বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমনের আগেও বাংলা থেকে রেশমের আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহুল পরিমাণেই হতো। এই বাণিজ্যের সঙ্গে প্রধানত সংশ্লিষ্ট ছিল আগ্রা, গুজরাট ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত ব্যবসায়ীরা। কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ ও সংলগ্ন অঞ্চলই ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। সতেরো শতকের ষষ্ঠ দশকে টেভারনিয়ের লিখেন যে, কাশিমবাজারে বছরে বাইশ হাজার গাঁট বা বস্তা (bale) রেশম উৎপন্ন হতো, প্রত্যেক গাঁটের ওজন একশ' পাউন্ড করে।[৬৫]

রেশমচাষের ফসল [যাকে 'বন্দ' (band) বলা হতো] উৎপাদিত হতো বছরে তিনবার—নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও জুন-জুলাইতে। নভেম্বরের রেশমই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট, ফেব্রুয়ারি-মার্চের ফসল তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর জুন-জুলাই মাসের রেশম হতো মোটা ধরনের। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ইয়ান কারসেবুম (Ian Karseboom) ১৭৫৫ সালে লিখেন যে, বার্ষিক রেশম উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশই প্রথম দুই ধরনের রেশম।[৬৬] বাংলায় উৎপন্ন সব কাঁচা রেশমের সূক্ষ্মতা আবার নানা মাত্রার হতো। ১৬৬১ সালে কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির প্রধান জন কেন (John Kenn)-এর লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে, বাংলায় তিন ধরনের রেশম বোনা হতো—সূক্ষ্মতার দিক থেকে এদের বলা হতো 'মাথা' (head), 'পেট' (belly) ও 'পা' (foot) অর্থাৎ উৎকর্ষে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রেশম। ইংরেজ কোম্পানি প্রধানত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রেশম কিনতো যথাক্রমে ৫ : ৪ আনুপাতিক হারে। এই রেশমকে পাট্টা (putta) বা সরু/পাতলা গোছের বলা হতো। এশীয় ব্যবসায়ীরা আগ্রা ও অন্যান্য অঞ্চলের জন্য যেধরনের রেশম কিনতো, তাকে বলা হতো 'দোলেরিয়া' (dolleria)। এই জাতীয় রেশম

---

৬৫. Jean-Baptiste Tavernier, *Travels in India, 1640-67*, trans. V. Ball, Vol.2, (London 1889), 1, 2-3, দেখুন, টেভেরনিয়েরের তথ্য সম্পর্কে ওম প্রকাশের মন্তব্য, Om Prakash, *Dutch East India Company*, 57.

৬৬. V. O. C. 2849 (K. A. 2741), f. 110.

ছিল 'মাথা', 'পেট' ও 'পা' তিন শ্রেণীর রেশমের সংমিশ্রণ।[৬৭] ওলন্দাজ কোম্পানি এই তিন ধরনের রেশমকে যথাক্রমে 'কাবেসা' (cabessa), 'বারিগা' (bariga) ও 'পী' (pea) বলতো। পরে ওলন্দাজরা 'টানি' (tanny) নামে অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের রেশম রপ্তানি করতো। গুটিপোকার উৎকৃষ্টতম সূক্ষ্ম সুতায় জড়ানো কাটিম জাতীয় অংশ থেকে এই রেশম তৈরি হতো। হল্যান্ড থেকে ১৬৭৬ সালে পাঠানো পণ্যতালিকায় টানি রেশমের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই এই জাতীয় রেশমের চাহিদা অন্যান্য শ্রেণীর রেশমের চাহিদার চেয়ে অনেক বেড়ে যায় এবং তা বাংলার বিভিন্ন জাতের রেশমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠে।[৬৮]

প্রথমদিকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি নীতিগতভাবে বাংলার অতি সূক্ষ্ম রেশম রপ্তানি করতে একেবারেই আগ্রহী ছিল না। কারণ ঐ জাতীয় রেশম বেশি সূক্ষ্ম বলে ইউরোপীয় কারিগরদের পক্ষে তা ব্যবহারের অনুপযোগী বিবেচিত হতো। তাই এই রেশম বাজারে বিক্রি করতে হতো খুবই কম মুনাফায়।[৬৯] ইংরেজ কোম্পানি ধীরে ধীরে 'গুজরাট' রেশম নামে বাংলার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে দামি রেশম কিনতে শুরু করলো। ১৭৩৫ সাল নাগাদ 'গুজরাট' রেশম ইংল্যান্ডের ক্রেতাদের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো যে লন্ডন থেকে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস বাংলায় কর্মচারীদের কাছে নির্দেশ পাঠায় তারা যেন এই উৎকৃষ্টতম সূক্ষ্ম রেশম সংগ্রহ করতে চেষ্টার ত্রুটি না করে এবং তারা যেন এই পণ্যের ব্যক্তিগত ব্যবসা না করে।[৭০] কাশিমবাজার ছাড়া রংপুর অঞ্চলেও রেশম উৎপন্ন হতো। তাছাড়া নদীয়া জেলার কুমারখালি থেকেও অন্য এক ধরনের রেশম আসতো। প্রথমদিকে ইউরোপীয় চাহিদা শুধু কাশিমবাজার অঞ্চলে উৎপন্ন রেশমে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৩০-এর দশক থেকে ইংরেজ কোম্পানি রংপুর ও কুমারখালি অঞ্চলের রেশমও ইউরোপে রপ্তানি করার চেষ্টা শুরু করে। অবশ্য বণিকদের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তিতে বিভিন্ন জাতের রেশমের পরিমাণ বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন রকম হতো। পরবর্তী সারণি (সারণি ৯) পর্যবেক্ষণ করলে তা বোঝা যায়।

---

৬৭. B. M. Addl. Mss. 34, 123, f. 42 ; C. R. Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal*, Vol. 1, (London 1895), 376

৬৮. Kristof Glamann, *Dutch Asiatic Trade, 1620-1740*, (Copenhagen 1958).

৬৯. K. N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760* (Cambridge 1978), 352.

৭০. D B., Vol. 106, para 31, f. 411, 31 January 1735.

সারণি ৯ : বণিকদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির রেশম সরবরাহের চুক্তি

রেশম	১৭৩৩		১৭৪০	
নভেশ্বরবন্দ	২৪০০ মণ	প্রতি সের ৫টাকা ১২ আনা	১৩৫০ মণ প্রতি সের	তথ্য নেই
গুজরাট	৭৮০ "	" " ৬ " ৬ "	৪২০ " " " "	"
কুমারখালি	৬০০ "	" " ৫ " ২ "	১৮০০ " " " "	"
রংপুর	৮০০ "	" " ৪ " ৫ "	১৫০ " " " "	"
মোট	৪,৫৮০ মণ		৩,৭২০ মণ	

[সূত্র : *কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি রেকর্ডস,* ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।]

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি কাশিমবাজারের বড় বড় রেশমব্যবসায়ীদের সঙ্গে কিংবা ছোট ব্যবসায়ী, বিশেষকরে পাইকারদের সঙ্গে রেশম সরবরাহের চুক্তি করতো। এরা রেশমউৎপাদক চাষীদের আগাম টাকা দিয়ে পত্তনি (pattani) বা না-বোনা রেশমের ছোট ছোট গাঁট সংগ্রহ করতো। রেশমের বাজারে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় খোলা বাজারে তাৎক্ষণিক বেচাকেনার উপর ভরসা করা যেতো না। সেজন্য রেশমচাষের ফসল তোলার ঠিক আগেই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসরবরাহের চুক্তি করাটা পর্যাপ্ত পরিমাণ রেশমসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল। সাধারণভাবে ইংরেজ কোম্পানি যেসব ব্যবসায়ী আড়ং-এ পত্তনি কিনেছে তাদের সঙ্গেই রেশমসরবরাহের চুক্তি করতো। এসব ব্যবসায়ীর বাড়িতেই রেশম বোনার ব্যবস্থা করা হতো। ওলন্দাজ কোম্পানি কিন্তু প্রধানত পাইকারদের কাছ থেকে পত্তনি কিনে তাদের নিজস্ব কুঠিতে রেশম বোনার ব্যবস্থা করতো। অস্টেন্ড কোম্পানির প্রধান হিউমের মতে, এটাই হচ্ছে ভাল রেশম কেনার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, কারণ এতে কুঠিতে রেশমকাট্‌নিদের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা সম্ভব হতো।[৭১] ১৬৫৩ সালে ওলন্দাজরা কাশিমবাজারে রেশম তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বাভাবিক রকম টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়। কখনো কখনো কোম্পানির প্রায় সব কাঁচা রেশমই এখানে রিল (reel) করা হতো। আবার কখনো একেবারেই কিছু হতো না। কাজ যখন পুরোমাত্রায় চলতো, তখন এখানে বছরে ১৫০০ বেল বা গাঁট রেশম রিল করা হতো এবং এ কাজে ৩০০০ লোক নিযুক্ত থাকতো। আবার অন্যদিকে এমন চরম অবস্থারও সৃষ্টি হতো, যখন ১০০ জনেরও কম লোক কাজ করতো এবং শুধুমাত্র বণিকদের সঙ্গে চুক্তির জন্য খালি

---

৭১. Hume's "Memorie".

নমুনা এখানে প্রস্তুত হতো।[৭২] এর ফলে ওলন্দাজদেরও প্রায়ই কাঁচা রেশম সরবরাহের জন্য বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করতে হতো।

ইউরোপীয়রা বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে রেশম রপ্তানি করলেও বাংলার রেশমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। বাংলার রেশমবাজারে যে বিপুল সংখ্যক এশীয় বণিক বাণিজ্য করতো তারাই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। কাশিমবাজার ইংরেজ কাউন্সিলের কলকাতায় লেখা নানা চিঠিপত্রে এটা খুবই স্পষ্ট।[৭৩] ১৭৪৪ সালে কাশিমবাজারের কুঠিয়ালরা রেশমের বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের অক্ষমতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে লিখছে : "যদিও গত বছরের তুলনায় এবছর (রেশমের) দাম অনেক বেশি, তবু আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা (রেশমের) বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম— কিছুদিন হলো বাজারদর অত্যন্ত চড়া যাচ্ছে।"[৭৪] রেশমের বাণিজ্যে পণ্যসংগ্রহের ব্যাপারে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে বাংলায় বিভিন্ন এশীয় বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এদের মধ্যে গুজরাটিরাই ছিল সর্বপ্রধান এবং তাদের কার্যকলাপ বাংলার রেশমবাজারের 'সাধারণ নির্দেশক' (general indicator) ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৭৫] ১৭২৬ সালে কাশিমবাজার কাউন্সিল তাড়াহুড়ো করে রেশম-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করলো। কারণ তাদের ভয় ছিল, "গুজরাটিদের অস্বাভাবিক চাহিদার জন্য দাম আরো বেড়ে যাবে।"[৭৬] "গুজরাটি ছাড়াও বাংলার রেশমবাজারে তৎপর ছিল লাহোর, মুলতান, বেনারস, গোরখপুর, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী ('কালোয়ার') এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের বণিকগোষ্ঠী। শেষোক্ত বণিকরা আবার বেনারসের ব্যবসায়ীদের গোমস্তা হিসেবে রেশম কেনার কাজে নিযুক্ত ছিল। আর আর্মেনীয় বণিকরা তো ছিলই। রেশমসংগ্রহে আরেক দল বণিক সক্রিয় ছিল, নথিপত্রে যাদের 'বুর্দেলওয়ালী' (Burdelwali) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খুব সম্ভবত তারা উত্তর ভারতের কোন অঞ্চল থেকে আসতো।

এটা খুবই লক্ষণীয় যে, কখনো কখনো এই বণিকগোষ্ঠীর চাহিদা এমনকি গুজরাটিদের বাদ দিয়ে রেশমের বাজারে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো, যার ফলে কাঁচা রেশমের দাম বেড়ে যেতো। কাশিমবাজার কুঠির তরুণ কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস পদ্মার ওপারে 'পাওয়া' (powa) নামক রেশমের আড়ং থেকে জানায় যে, পত্তনির দাম সেখানে হঠাৎ বেড়ে গেছে "গুজরাটিদের কেনাকাটার জন্য নয়, সব রকম বিদেশী বণিকদের ওই আড়ং-এ কিনতে আসার কারণে।" হেস্টিংস লিখেছেন যে, এসব বণিক হলো 'কালোয়ার',

---

৭২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Om Prakash. *Dutch East India Company*, 113-17.
৭৩. উদাহরণস্বরূপ, C & B. Abstr., Vol. 3, para 38, 26 December 1733.
৭৪. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 6, 23 January 1744.
৭৫. K. N. Chaudhuri, *Trading World*, 354.
৭৬. B. P. C., Range 1, Vol. 6, f. 172, 21 February 1726.

গোরখপুরী আর জঙ্গিপুরী, "যারা ছয় সাত লক্ষেরও বেশি টাকা মূল্যের পত্তনি, বিশেষকরে সূক্ষ্ম জাতের রেশম চড়া দাম সত্ত্বেও রোজ কিনে নিচ্ছে।"[৭৭] এত চড়া দাম সত্ত্বেও কেন এসব বণিক এটা করছে বুদ্ধিমান হেস্টিংস তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> প্রথমোক্ত দুই দল (কালোয়ার ও গোরখপুরী) সুদূর দিল্লী ও বেনারস থেকে এসেছে। এত দূর থেকে এসেছে বলেই তারা চড়া দাম দিয়েও পণ্য কিনতে দ্বিধা করছে না। পরবর্তী (জঙ্গপুরী) দলেরও প্রায় একই অবস্থা। যদিও এখান থেকে জঙ্গিপুরের দূরত্ব মাত্র কয়েক দিনের, কিন্তু এদের বেশির ভাগই সুদূর বেনারসের ব্যবসায়ীদের গোমস্তা হিসেবে কাজ করছে। ফলে বেনারস থেকে যে পরিমাণ রেশমের ফরমাশ আসছে এরা তাই সংগ্রহ করতে উৎসুক, দাম যতো বেশি হোক না কেন।[৭৮]

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাতেই ওলন্দাজদের কাঁচা রেশম রপ্তানি ইংরেজদের তুলনায় বেশি ছিল। ওলন্দাজ বাণিজ্যের এই অগ্রগতি আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকেও বজায় ছিল। (সারণি ১০ দেখুন)

কিন্তু ক্রমশ ওলন্দাজ বাণিজ্য সাধারণভাবে কমতে থাকে, অন্যদিকে ইংরেজ বাণিজ্য ধীরে ধীরে বাড়তে আরম্ভ করে। ফলে ১৭২০-এর দশকের শেষভাগে ও ১৭৩০-এর দশকে ইংরেজদের রেশমরপ্তানি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ১৭৩০-এর দশকে ইংরেজদের কাঁচা রেশমের বাণিজ্য তুঙ্গে পৌঁছায়।

সারণি ১০ : ওলন্দাজ ও ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : কাঁচারেশম ১৭০০ -১৭২০

	ওলন্দাজ রপ্তানি		ইংরেজ রপ্তানি		
সময়	মোট পরিমাণ (ওল. পাঃ)	বাৎসরিক গড় (ওল. পাঃ)	বাৎসরিক গড় (ইঃ পাঃ)	মোট পরিমাণ (ইঃ পাঃ)	বাৎসরিক গড় (ইঃ পাঃ)
১৭০০/০১-১৭০৪/০৫	৭,৫৪,৬৪৮	১,৫০.৯৩০	১,৬৪,৫১৪	৪,৭৬,২৮৩	৯৫,২৫৬
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	৭,৫১,০৫৪	১,৫০,২১১	১,৬৩,৭৩০	২,৫৯,২৯২	৫১,৮৫৮
১৭১৫/১৬-১৭১৯/২০	৬,২৫,৬৫৩	২,০৮,৫৫১	৩,১২,৮২৭	৬,৩৫,২২৫	১,২৭,০৪৫

(ওলন্দাজ রপ্তানি ৩ বছরের জন্য-১৭১৫/১৬-১৭১৭/১৮)

সূত্র : ওম প্রকাশ, *ওলন্দাজ কোম্পানি*, পৃ. ২১৮ থেকে তথ্য নিয়ে ওলন্দাজ রপ্তানির হিসাব এবং এস. চৌধুরীর *ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন* গ্রন্থের পৃ. ২৫৪-৫৫ থেকে তথ্য নিয়ে ইংরেজ রপ্তানির হিসাব করা হয়েছে। এক ওলন্দাজ পাউন্ডকে (ওঃ পাঃ) ১.০৯ ইংরেজ পাউন্ড (ইঃ পাঃ) ধরে হিসাব করা হয়েছে।

৭৭. *Factory Records*, Kasimbazar, Vol. 12, Consultations, 27 January 1756.
৭৮. ঐ, K. N. Chaudhuri's contention that the "products bought by the Gujaratis did not directly compete with those shipped to Europe" is hardly tenable.

নিম্নের সারণিতে (সারণি ১১) ১৭৪০ সাল থেকে ইংরেজ কোম্পানির রেশমরপ্তানিবাণিজ্যে বার্ষিক গড়ের ক্রমাবনতির নির্দেশ পাওয়া যাবে :

সারণি ১১ : ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ : কাঁচা রেশম ১৭৩০-১৭৫৫

সময়	মোট পরিমাণ (গ্রেট পাঃ)	বার্ষিক গড় (গ্রেট পাঃ)	বার্ষিক গড় (স্মল পাঃ)	বার্ষিক গড় (মণ)
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	৭,০২,৯০৭	১,৪০,৫৮১	২,১০,৮৭২	২,৮১২
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	৭,১৪,০০৪	১,৪২,৮০০	২,১৪,২০১	২,৮৫৬
১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	৫,৯৬,০৫১	১,১৯,২১০	১,৭৮,৮১৫	২,৩৮৪
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫০	৩,০০,০০১	৬০,০০০	৯০,০০০	১,২০০
১৭৫০/৫১-১৭৫৪/৫৫	২,৮৬,৬২০	৫৭,৩২৪	৮৫,৯৮৬	১,১৪৬

সূত্র : কে. এন. চৌধুরীর *ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড*গ্রন্থের পৃ. ৫৩৪ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে হিসাব করা হয়েছে। ইংল্যান্ডে রেশমের ওজন হতো গ্রেট বা বড় পাউন্ডে, যা স্মল পাঃ বা সাধারণ ইংরেজ পাউন্ডের দেড় গুণ। বাংলায় রেশমের ওজন হতো মণ ও সেরে, এক মণের সমান ৭৫ পাঃ।

প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—এ ধারণা বহুলপ্রচলিত এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এ ধারণা যে অচল বিশেষকরে বাংলার রেশমরপ্তানির ব্যাপারটি বিচার করলে এতে সন্দেহ থাকে না। ১৭৪০ এবং ১৭৫০-এর দশকে এশীয় বণিকরা বাংলা থেকে যতো কাঁচা রেশম রপ্তানি করেছিল তার পরিমাণ সবগুলি ইউরোপীয় কোম্পানির মোট রেশমরপ্তানির পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। মুর্শিদাবাদ থেকে শুধুমাত্র এশীয় বণিকদের রেশমরপ্তানি ১৭৪৯-৫৩ সালে ছিল বছরে গড়ে ১৯,৮০৩ মণ, যার মূল্য ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ১৭৫৪-৫৮ সালে ছিল বছরে গড়ে ১৪,৯৩৭ মণ, যার মূল্য ছিল ৪২ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণিতে (সারণি ১২) এর একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় ১৭৩০ সালের তুঙ্গপর্যায়ে, যখন ইংরেজ কোম্পানির কাঁচা রেশম রপ্তানির উচ্চতম গড় ছিল মোটামুটি ২,৮৫৬ মণ এবং তা কখনোই ৩,০০০ মণ অতিক্রম করে নি (সারণি ১১) এবং ১৭৩০-এর দশক থেকে ১৭৫০-এর দশক পর্যন্ত ওলন্দাজ কোম্পানির রপ্তানির মোট মূল্য ইংরেজ বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ ছিল (যা সারণি ৫ থেকে স্পষ্ট)। একথা মনে রেখে বলা যায় যে, বাংলার কাঁচা রেশমের ওলন্দাজ রপ্তানি সবচেয়ে বেশি হলেও কখনোই ১,০০০ মণ অতিক্রম করে নি। এর সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয়দের মোট রপ্তানি যদি বড় জোর ১,০০০ মণ ধরেও হিসাব করা হয়, তাহলেও বাংলার রেশমের মোট ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ

বছরে ৫,০০০ মণের বেশি হতে পারে না। এটা এশীয় বণিকদের বার্ষিক রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ। কাঁচা রেশমের ইউরোপীয় রপ্তানির মোট মূল্য তাহলে এক সের রেশমের দাম ৭ টাকা হিসাবে (ইংরেজ নথিপত্রে এশীয় বাণিজ্যের এই দরই পাওয়া যায়) ১৪ লক্ষ টাকার মতো দাঁড়ায়। এই মূল্য আবার ১৭৫০ সালের গোড়ার দিকে এশীয় রপ্তানিবাণিজ্যের বার্ষিক গড় মূল্যের এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক-পলাশী যুগে ইউরোপীয়রাই বাংলায় সোনা-রূপার প্রধান আমদানিকারী ছিল[৭৯] বলে বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

সারণি ১২ : এশীয় বণিকদের রেশমরপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ
১৭৪৯-৫৮

সময়	মোট পরিমাণ (মণ)	বাৎসরিক গড় (মণ)	সর্বোচ্চ পরিমাণ (মণ)	মোট মূল্য (টাকা)	গড়মূল্য (টাকা)
১৭৪৯-৫৩	৯৯,০১৬	১৯,৮০৩	২৩,৭৩৯ (১৭৫১)	২,৭৭,২৪,৩৬৫	৫৫,৪৪,৮৭৩
১৭৫৪-৫৮	৭৪,৬৯২	১৪,৯৩৮	২১,৩৪৬ (১৭৫৭)	২,০৯,১৩,৩৪২	৪১,৮২,৬৬৯

[সূত্র : বি. পি. সি. রেঞ্জ ১, খণ্ড ৪৪, কনসালটেশন ১৯ জুন ১৭৬৯, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন।]

বস্ত্র

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যের সাধারণ কাঠামোয় পরিমাণ ও মূল্য উভয় দিক থেকে বস্ত্র ছিল প্রধানতম শিল্পজাত পণ্য। এশিয়ার বাকি সমস্ত অঞ্চল ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে মোট যে পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করতো, একা বাংলাই তার চেয়ে অনেক বেশি বস্ত্র এই কোম্পানিগুলিকে সরবরাহ করতো। ওলন্দাজ কোম্পানি যে কাপড় সংগ্রহ করতো, তার কিছুটা যেতো এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে, যেমন জাপান, পারস্য, সিংহল ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ। তবে সংগৃহীত পণ্যের সিংহভাগই ছিল ইউরোপের জন্য—কিছুটা হল্যান্ডের জন্য, বাকিটা পুনঃরপ্তানির জন্য রাখা হতো। অনুরূপভাবে ইংরেজ কোম্পানিও বস্ত্রসংগ্রহ করতো বেশিরভাগই ইংল্যান্ডের বাজারের জন্য পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে। ইউরোপে বাংলার বস্ত্রবাণিজ্যের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হলো ১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিকে ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের হঠাৎ অস্বাভাবিক চাহিদাবৃদ্ধি। এর মূলে ছিল ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের চাহিদার দ্রুত বিস্তৃতি ও সমাদরলাভ।

৭৯. P. J. Marshall, *Bengal : The British Bridgehead, New Cambridge History of India*, (Cambridge 1987), 65, 67; C. A. Bayly, *Indian Society and the Making of the British Empire, New Cambridge History of India*, (Cambridge 1987), 49-50.

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলার কাপড়ের চাহিদার কারণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম দাম ও গুণগত উৎকর্ষ। সুদক্ষ কারিগর ও তাঁতীদের সুনিপুণ শিল্পকর্ম বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য। সূক্ষ্ম বয়নশিল্প ও সুলভ মূল্যের জন্য বাংলার কাপড় এশীয় বণিকদের কাছে বহু শতাব্দী ধরেই সমাদর লাভ করেছে। সুতরাং ইউরোপীয়রা যে বাংলার বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করতো এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্রের অস্বাভাবিক চাহিদাবৃদ্ধিকে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের পণ্যভোগকারীদের রুচির এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিকে 'ভারতীয়ত্বের' (Indianness) প্রতি যে অস্বাভাবিক ঝোঁক শুরু হয়, সতেরো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত তা লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন 'ফ্যাশনের' গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় ১৬৯৫ সালে লেখা জে. ক্যারির এক ইস্তাহারে :

> কুড়ি বছর আগে ভাবাই যেতো না যে আমরা ক্যালিকো [সুতীবস্ত্র] কাপড়—যা আমাদের অভিজাতদের সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হতো (মসলিন বা অন্য যেকোন নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন)—দেখতে পাব, তখন এই কাপড় কদাচিৎ ব্যবহার করা হতো। শুধু মৃতের আচ্ছাদন হিসেবে কিংবা যারা ভাল দামি লিনেন কিনতে অক্ষম সেই সব গরীবরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ ক্যালিকো ব্যবহার করতো না। কিন্তু এখন খুব কম লোকই ক্যালিকোর পোশাক ছাড়া নিজেকে সুসজ্জিত মনে করে। পুরুষ, নারী সবাবই এক অবস্থা। পুরুষদের জন্য ক্যালিকো শার্ট, গলাবন্ধ, কবজিবন্ধ, রুমাল ইত্যাদি এবং মেয়েদের জন্য মাথার বন্ধনী, রাত্রিবাস, জামার হাতা, এপ্রন, গাউন, পেটিকোট ইত্যাদি এবং কি নয়। আর সবার জন্য ভারতীয় মোজা। এসব না হলে কারুরই চলে না।[৮০]

একই সুর শোনা যায় ১৬৯৬ সালে বোর্ড অব ট্রেডের সামনে পোলেক্সফেনের (Palexfen) বক্তৃতায়, যাতে ১৬৮১ সালে ইংল্যান্ডে ভারতীয় বস্ত্রের কদর ও জনপ্রিয়তা প্রতিধ্বনিত হয় :

> আগাছা যেমন দ্রুত বেড়ে উঠে, তেমনি ভারতের এই শিল্পজাত দ্রব্য [বস্ত্র] সর্বোচ্চ অভিজাত থেকে ঠাকুর, পরিচারিকা সবার কাছে এমন সমাদর লাভ করেছে যে ভারতীয় বস্ত্র ছাড়া আর কোন পরিধানকে তারা নিজেদের সাজসজ্জার যোগ্য বলে মনে করছে না।[৮১]

বাংলার বস্ত্রের এত বৈচিত্র্য ও বিবিধ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাদের শ্রেণীকরণ ও যথার্থ সনাক্তকরণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। তৎকালীন নথিপত্রে অন্তত পঁচাত্তরটি বিভিন্ন নামের কাপড়ের উল্লেখ আছে। শ্রেণীকরণ সহজ না হলেও ইউরোপীয়

---

৮০. J. Carry, *A Discourse Concerning the East India Trade*, (London 1696), 4.
৮১. *India Office Tracts*, Vol. 83, Tract No. 7, 50.

কোম্পানিগুলি যেসব বস্ত্র রপ্তানি করতো, সেগুলোকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—রেশমবস্ত্র, রেশম ও সুতীমিশ্র বস্ত্র এবং সাধারণ সুতীবস্ত্র (রং না করা ও রং করা)। ইংরেজদের কাছে বাংলার রেশমবস্ত্র 'টাফাটি' (taffatie) বা 'টাফেটা' নামে পরিচিত ছিল আর ওলন্দাজরা একে বলতো আর্মোসিনেন (armosijnen)। বাংলার রেশমবস্ত্র বা টাফেটার বেশিরভাগই প্রস্তুত হতো কাশিমবাজার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। এক ধরনের টাফেটার নাম ছিল রেস্‌টাস্‌ (restas)—দাঁড়িকাটা বা সোনালী 'পামবার্স' (pumbers)। ইউরোপীয়রা অন্য যেসব রেশমবস্ত্র রপ্তানি করতো, তাদের মধ্যে সারসেনেটস্‌ (sarcenetts), জামবার (jamwars) এবং রেশমী লুঙ্গি প্রধানত কাশিমবাজারেই প্রস্তুত হতো। রেশমী রুমাল, গলাবন্ধ এ্যাটলাস্‌ (atlasses) ইত্যাদি হুগলী ও বালেশ্বর অঞ্চলে তৈরি হতো। রুমাল ঢাকাতেও তৈরি হতো। সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে টাফেটা ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানিতালিকায় প্রধানতম পণ্যদ্রব্য হলেও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এর প্রাধান্য হ্রাস পায়। আমাদের আলোচ্য সময়কালের পুরোটাতেই দেখা যায় সুতী ও রেশমের মিশ্রবস্ত্র এবং সুতীবস্ত্রই একক বৃহত্তম রপ্তানিপণ্য ছিল। যেসব মিশ্রবস্ত্র কোম্পানি রপ্তানি করতো সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো আলাবানি (allabanee), কাটানি (cuttanee), খারাদারি (carriderie) বা চোরাদারি, চাকলা (chukla), চারকোণা (cherconna), কাস্‌তা (cushta), এলাচি (elatchi), কিংখাব (gingham), জামদানি (jumdenie), নীলা (nilla), পেনিয়াসকোস (peniascoes), সুসি (soosy), শিরসাকার (seersucker) এবং মন্ডিলা (mandilla)। এর মধ্যে কিংখাব ও নীলা সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানিতালিকায় প্রাধান্য লাভ করেছে। এ দু'টি প্রধানত প্রস্তুত হতো হুগলী ও বালাসোর সংলগ্ন অঞ্চলে।

তবে ইউরোপীয় কোম্পানির রপ্তানিতালিকায় সংখ্যার দিক থেকে সুতীবস্ত্রই অন্যান্য বস্ত্রের (রেশম বা মিশ্র) চেয়ে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। সুতীবস্ত্র প্রধানত মসলিন ও ক্যালিকো এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মসলিন খুব মিহি সুতো থেকে তৈরি হতো। এর বুনোট ছিল শিথিল। ঢাকা জেলায় সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন বোনা হতো। সোনারগাঁ, জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর ছিল মসলিন তৈরির ঐতিহ্যবাহী প্রধান কেন্দ্র। রোমান যুগ থেকে প্রসিদ্ধ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ জাতের মসলিন অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি রপ্তানি করতো না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, স্বল্পপরিমাণে তৈরি হতো বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তার সবটাই একচেটিয়াভাবে সংগ্রহ করতো ধনী অভিজাতদের কাছে বিক্রির জন্য, ইউরোপীয়রা তার নাগাল পেতো না। তাছাড়া ইউরোপের শীতল আবহাওয়াতে অতি সূক্ষ্ম মসলিন খুব উপযোগীও ছিল না। মসলিনের অন্যান্য উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছিল মালদহ জেলা

ও নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। হুগলী ও বালেশ্বরে তৈরি হতো সাধারণ মানের মসলিন। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি নানা ধরনের যেসব মসলিন রপ্তানি করতো, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো তাঞ্জেব (tanjeb), টেরিন্দাম (terrindam), খাসা (khasa or cossa), মলমল (mulmal), দুরিয়া (dorea), রেহাঙ্গ (rehang), আদাতি (adatie), আত্ছাবানি (atchabanie), চন্দরবানি (chanderbani), দোতানি (dotani), একতানি (ektani), গঙ্গালহরী (gangalahari), কামখানি (kamkhani), কোমরবন্ধ (kamarband), মিলমিল (milmil), মোহনবানি (mohanbani), রুদ্রবানি (rudrabani), নয়নসুখ (nainsook), শিরবন্দ (sirband) ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে খাসা ও মলমলের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরে দুরিয়া বা ডুরে। হাতের এবং সূচের কারুকার্য করা হতো মলমল, তাঞ্জেব বা খাসার মতো মিহি মসলিনের জমিতে। বিভিন্ন স্থানে বোনা মসলিনের গুণমান/সূক্ষ্মতা এবং দামের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য হতো। দাম ও সূক্ষ্মতা দিয়ে শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়, কারণ তাতে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৮২]

মসলিনের মতো সাধারণ সুতীবস্ত্র বা ক্যালিকোর ক্ষেত্রেও উৎকর্ষের মান ও নানা বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সূক্ষ্মতর সুতীবস্ত্রের উৎপাদনকেন্দ্র ছিল মালদহ ও ঢাকা জেলায়। অপেক্ষাকৃত মোটা ধরনের কাপড় তৈরি হতো বীরভূম, পাটনা, হুগলী ও বালেশ্বর এলাকায়। এ ধরনের কাপড়ের মধ্যে ইউরোপীয়রা রপ্তানি করতো প্রধানত হামাম (humhum), সলোগাজি (sologazi), সানু (sanu), রুমাল, ফোটা (fota), চিনটস (chints), গিনি কাপড়, গারা (garra), চেলা (chela), দিমিটি (dimiti), বাফ্তা (bafta), বেথিলা (bethila), ডানগেরি (dengeri), লাখোরি (lakhori), আমৃতি (amriti), দরিয়াবাদি (dariabadi), পট্‌কা (patka), সালামপুরী (salampuri) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে গারা, ফোটা, গিনিকাপড় ইত্যাদি ছিল সাধারণ মোটা কাপড়, তাতে কোন নক্সা থাকতো না। এগুলি কোরা , সাদা কিংবা উজ্জ্বল রঙে ছোপান হতো। অন্যান্য কাপড়ের মধ্যে সানু, হামাম ইত্যাদি ছিল সাদা বা কোরা, কিন্তু মিহি।

বাংলা থেকে বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ বিচার করলে সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওলন্দাজদের রপ্তানিবাণিজ্য ইংরেজদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকে ইংরেজ রপ্তানির পরিমাণ ওলন্দাজদের ছাড়িয়ে যায়। কি পরিমাণ বস্ত্র

---

৮২. দ্রষ্টব্য, S Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization*, 194-195, f. u. 141 for a fuller discussion.

রপ্তানি হয়েছে তা যদি কোন নির্দেশক হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকেই ইংরেজ রপ্তানি ওলন্দাজদের ছাড়িয়ে গেছে। এই দশকে যেখানে ওলন্দাজদের বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ হলো বছরে গড়ে ২,০৩,৮৫৩, সেখানে ইংরেজ রপ্তানির পরিমাণ ২,৭৮,৫৮৮। বাংলা থেকে ইংরেজদের বস্ত্ররপ্তানি ক্রমে বৃদ্ধি পায়, যা শীর্ষে পৌঁছায় ১৭৪০-এর দশকের প্রথমভাগে। নিম্নের সারণি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বাংলার বস্ত্রশিল্পে ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয়রাই বাংলায় সবচেয়ে বেশি সোনা-রূপা আমদানি করেছে— এই তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নেয়া হয় যে, ইউরোপীয়দের বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ

সারণি ১৩ : ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ ঃ বস্ত্র

১৭১০-১৭৫৫

সময়	মোট সংখ্যা (পাঃ)	মোট মূল্য	গড় সংখ্যা (পাঃ)	গড় মূল্য (টাকা)	গড় মূল্য
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	১২,৪৬,৯০৭	৯,১৪,৪৪৬	২,৪৯,৩৮১	১,৮২,৮৮৯	১৪,৬৩,১১২
১৭১৫/১৬-১৭১৯/২০	১৫,৩৮,৯৭২	৯,৭০,৭৫৯	৩,০৭,৭৯৪	১,৯৪,১৫২	১৫,৫৩,২১৬
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	৩০,২৮,১৩২	১৬,৫৬,৫৮৮	৬,০৫,৬২৬	৩,৩১,৩১৮	২৬,৫০,৫৪৪
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	২৮,২০,৭৮৩	১৫,৫২,৯৮১	৫,৬৪,১৫৭	৩,১০,৫৯৬	২৪,৮৪,৭৬৮
১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	৩০,৪২,৯৬৪	১৯,২৬,৩৩৫	৬,০৮,৫৯৩	৩,৮৫,২৬৭	৩০,৮২,১৩৬
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫০	২৩,৫৬,৪০৫	১৮,৯৭,৫০৫	৪,৭১,২৮১	৩,৭৯,৫০১	৩০,৩৬,০০৮
১৭৫০/৫১-১৭৫৪/৫৫	১৯,৫৪,০৭১	১৭,০৭,৭৩৫	৩,৯০,৮১৪	৩,৪১,৫৪৭	২৭,৩২,৩৭৬

সূত্র ঃ কে. এম. চৌধুরীর *ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড* গ্রন্থের পৃ: ৫৪৪-৪৫ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে হিসাব করা হয়েছে। ১৭৪০ ও ১৭৫০ সালের পরিসংখ্যান সন্দেহজনক মনে হয়। কারণ চৌধুরীর দেয়া ইংরেজ রপ্তানির মোট মূল্য (সারণি ৬) যদি ঠিক হয়, তাহলে তা ৩৮ লক্ষের বেশি কখনো হয় নি। এর মধ্যে কাঁচা রেশমের রপ্তানি (গড়ে ২,৮০০ মণ) ৮ লক্ষ টাকার মতো, সোরা ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকার মতো। তাহলে বস্ত্ররপ্তানির মোট মূল্যের পরিমাণ খুব বেশি হলে ২৫ লক্ষ টাকার মতো হবে।

এশীয় বণিকদের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্য নয়। প্রাক-পলাশী যুগেও বাংলা থেকে এশীয় ব্যবসায়ীদের বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ ইউরোপীয়দের চেয়ে বেশি ছিল। ১৭৪৭ সালে

ঢাকা থেকে মোট রপ্তানির এক হিসাবে দেখা যায়, আর্মেনীয়সহ এশীয়দের বাণিজ্য মোট রপ্তানির ২/৩ অংশ ছিল, যেখানে ব্যক্তিগত বাণিজ্যসহ ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১/৩ অংশ।[৮৩] ওলন্দাজ কোম্পানির নথিপত্রেও বস্ত্ররপ্তানিতে এশীয় বণিকদের প্রাধান্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, ১৭৪২ সালে ওলন্দাজদের বাদ দিয়ে বাংলায় বস্ত্রজাত পণ্যসংগ্রহের জন্য ৭৬ লক্ষ টাকা লগ্নি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের সমন্বিত অংশের মূল্য খুব বেশি হলেও ৩০ লক্ষের বেশি হতে পারে না।[৮৪] তার অর্থ, এশীয় বাণিজ্যের অংশ হবে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষের মতো।

ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব

বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের অতিশয়োক্তি করার প্রবণতা প্রতিহত করার সময় এসেছে। এপর্যন্ত যেসব তথ্য বিশ্লেষণ করেছি তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হলেও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না। তখনো এশীয় রপ্তানিবাণিজ্য ইউরোপীয় রপ্তানিবাণিজ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবু বাংলার অর্থনীতিতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব নিশ্চিতরূপে পড়েছে। ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে বাংলায় প্রভূত পরিমাণে সোনা-রূপা ও টাকার আমদানি হয়েছে, যদিও ইউরোপীয়রা সোনা-রূপার একমাত্র আমদানিকারক নয় এবং সবচেয়ে বড় তো নয়ই। বাংলার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কার্যকলাপ নিশ্চিতভাবে রপ্তানিদ্রব্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করেছে। বাংলার উৎপন্নদ্রব্যের জন্য ইউরোপীয় চাহিদা রপ্তানিবাণিজ্যের ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা। ইউরোপীয় বাজারে সরবরাহ করার জন্য বাংলার যেসব অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী (traditional) রপ্তানিবাণিজ্য ছিল সেখান থেকে তা সরে গেছে বলে যেহেতু কোন তথ্য পাওয়া যায় না, সেহেতু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই সময় রপ্তানিপণ্যের উৎপাদন অনেক বেড়েছিল। অন্যান্য বাজারে সরবরাহ বন্ধ না করে বা পুরনো ক্রেতাদের জন্য নির্ধারিত পণ্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সরবরাহ না করে বাংলা ইউরোপীয়দের রপ্তানিবাণিজ্যের চাহিদা মিটিয়েছে। রেশম ও বস্ত্রের বাজার থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। বাংলার পণ্যদ্রব্যের সনাতন ক্রেতারা—গুজরাটি, উত্তর

৮৩. Taylor's Report, *Home Misc. Series*, 456 f, ff. 94-95, IOL.

৮৪. "Memorie" of Dutch Director Taillefert, V. O. C. 2849 (K. A. 2741), 27 October 1755, ff. 188vo.-189.

ভারতীয় এবং অন্যান্য এশীয় বণিকরা ইউরোপীয়দের পাশাপাশি এবং তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার বাজারে রেশম ও বস্ত্র সংগ্রহের ব্যবসা চালিয়ে গেছে।

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানিপণ্যের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে, সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পণ্যউৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকার সম্প্রসারণ ছাড়া ইউরোপীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উৎপাদনব্যবস্থা বা পদ্ধতির কোন আমূল পরিবর্তন ছাড়াই পণ্যউৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। কাঁচা রেশমের ক্ষেত্রে সম্ভবত গুটিপোকার উৎপাদন বাড়ানো হয়েছিল তুঁতচাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে, একরপ্রতি গুটিপোকার উৎপাদন বাড়িয়ে নয়। কারণ গুটিপোকাচাষের পদ্ধতি বা প্রযুক্তিতে কোন পরিবর্তন করা হয় নি। এভাবে তুঁতচাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে হয় অনাবাদি জমিকে চাষের কাজে লাগিয়ে অথবা অন্য ফসলের জমি তুঁতচাষের অন্তর্ভুক্ত করে।

বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, অর্থনীতিতে যে শিথিলতা ছিল তাকে চাঙ্গা করে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল। কারণ বাংলার বস্ত্রশিল্পে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনপদ্ধতি বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না করেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছিল। এ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, সীমিত সময়ের জন্য হলেও বাংলার বস্ত্রশিল্পে সম্ভাব্য অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা ছিল অথবা বেশ কিছু নতুন সুদক্ষ কারিগর এই শিল্পে যোগদান করেছিল, যেটা উৎপাদনব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সম্প্রতি বলা হচ্ছে, নিতান্ত আনুমানিক এবং মোটাদাগের (crude) হিসাবের ভিত্তিতে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি আঠারো শতকের প্রথমদিকে প্রচুর পণ্য ক্রয় করে ১,০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[৮৫] দুর্ভাগ্যক্রমে যেসব ঐতিহাসিক ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ায় অত্যুৎসাহী, তাঁরা উক্ত লেখকের প্রদত্ত তথ্যাদি সতর্কভাবে যাচাই করে না দেখেই তাঁর বক্তব্য লুফে নিয়েছেন।[৮৬] উক্ত লেখক অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর হিসাব 'মোটা' (crude) এবং তাতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাও প্রচুর। কিন্তু লেখকের হিসাব একেবারেই সঠিক নয়, খুবই অতিরঞ্জিত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আপত্তি, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানিবস্ত্রের

৮৫. Om Prakash, "Bullion for Goods : International Trade and the Economy of early Eighteenth Century Bengal", *Indian Economic and Social History Review*, XII (1976), 173-75 Om Prakash, *Dutch East India Company*, 241-48.

৮৬. Marshall, *Bengal*, 66

মোট দৈর্ঘ্য হিসাব করার সময় আসল একক (basic unit) কোবিদকে (covid) ২৭´ ইঞ্চি বলে ধরা হয়েছে। কোবিদ আসলে ১৮´ ইঞ্চি। এর ফলে লেখকের হিসাব এক লাফে এক-তৃতীয়াংশ কমে যেতে বাধ্য। যার মানে দাঁড়ায়, নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা এক লক্ষের জায়গায় ৬৬ থেকে ৬৭ হাজার। অর্থাৎ ভ্রান্তির সীমারেখা দাঁড়াচ্ছে শতকরা ৩৩, যেটা কোন রকমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া মসলিন, মিহি সুতীবস্ত্র, সাধারণ সুতীবস্ত্র—কাপড়ের এই ধরনের শ্রেণীকরণ, যা এই হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, মোটেই নির্ভুল নয়। এতে হিসাবে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থায় এই 'মোটা হিসাব' যথেষ্ট অবাস্তব, এর উপর বিশেষ ভরসা করা যায় না।[৮৭]

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে উৎপাদন ও ব্যবসায়িক সংগঠনে বিরাট মাত্রায় না হলেও কিছু নতুন উপাদান যুক্ত হয়। কিন্তু তাদের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বলে এই নতুনত্বকে অভিনব পরিবর্তন বলা চলে না। কোম্পানিগুলির আগমনের আগে এশীয় ও পর্তুগীজ বণিকরা বাজার থেকে বা সোজাসুজি উৎপাদকদের কাছ থেকে যে সময় যে রকম পাওয়া যেতো সে রকম পণ্যদ্রব্যই কিনতো। কিন্তু ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি একদিকে ইউরোপে ভারতীয় জিনিসের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক মেটাবার জন্য ব্যবসা করতো বলে এবং অন্যদিকে প্রচুর মুনাফা অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখতো বলে প্রত্যেকটি জিনিস সরবরাহের ক্ষেত্রে নমুনা অনুযায়ী বিশেষকরে মাপ, রং, গুণগত উৎকর্ষ ইত্যাদির উপর খুব জোর দিত। ফলে সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলায় নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সরবরাহের ধারণার প্রথম প্রবর্তন ঘটলো। এর আগে এ অঞ্চলে নমুনা বা মান অনুযায়ী সরবরাহের জন্য চুক্তির প্রচলন ছিল না। তবে এ ব্যাপারটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়। কারণ একদিকে স্থানীয় কারিগরি উৎপাদনব্যবস্থার প্রকৃতি এমন ছিল যে খুব বাঁধাধরা কোন মাপকাঠি বা নমুনা অনুযায়ী কাজ করানো বেশ কঠিন ছিল। অন্যদিকে স্থানীয় বাজারে পণ্যসংগ্রহের জন্য ক্রেতাদের মধ্যে এমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল যে বণিক ও উৎপাদক কেউই কঠোর মান অনুযায়ী জিনিস সরবরাহে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। কারণ তাদের জিনিস ক্রয়ের জন্য বাজারে আগ্রহী ক্রেতার কোন অভাব ছিল না।

ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির চেষ্টায় ও উৎসাহে দাদনব্যবস্থা এ সময় আরো বিস্তৃত হয়। অবশ্য তাদের আগমনের অনেক আগে থেকেই এ ব্যবস্থা চালু ছিল। বাংলার বাণিজ্যে বিদেশী কোম্পানিগুলির আগমনের আগে এশীয় ও পর্তুগীজ বণিকরা আগাম দেবার সময়

---

৮৭. Om Prakash, *Dutch East India Company*, 241-48.

কখনো ফরমায়েশী পণ্যদ্রব্যের দাম বেঁধে দিত না। পণ্যদ্রব্য যখন নিয়ে আসা হতো, তখনই তার দাম ঠিক করা হতো। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি কিন্তু অগ্রিম দেয়ার আগেই নমুনা অনুযায়ী পণ্যের দাম ঠিক করে নিত। এই ব্যবস্থা বাংলার বাণিজ্যিক সংগঠনে সম্পূর্ণ নতুন। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি অনেক সময় কাপড় সাদা করা (bleach), রং করা (dyeing) ইত্যাদি নানারকম প্রক্রিয়ার জন্য এবং রেশমের সুতা বোনা বা গোটানোর জন্য কারখানা স্থাপন করেছিল। আবার তারা তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরদের দিনমজুর হিসেবে নিয়োগ করতো। তারা এমনকি ইউরোপ থেকেও সুতীবস্ত্র ও রেশমের দক্ষ কারিগর এনে স্থানীয় কারিগর ও বয়নশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জিনিসের গুণগত মান উন্নত করার চেষ্টা করতো, যাতে বস্ত্র ও রেশমের রং ও বুনটের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ ধরনের সংস্থা এ অঞ্চলের উৎপাদনব্যবস্থার পরিধি আরো সম্প্রসারিত করেছিল, যদিও এটা এ দেশে সম্পূর্ণ অভিনব ছিল না। নবাবি আমলে এখানে 'কারখানা' অনেক পুরনো ছিল এবং যদিও তাতে উৎপাদন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, বাজারে বিক্রির জন্য নয়, তথাপি বণিকরা ঐ কারখানার ধাঁচেই তাদের নিজস্ব সংস্থাগুলি গড়ে তুলেছিল।

১০

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষি অর্থনীতি

সিরাজুল ইসলাম*

সুপ্রাচীনকাল হতে বৃটিশ বিজয় অব্দি এ দেশে অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু এর ফলে সনাতন জীবনযাত্রার প্রবহমানতায় কখনো কোন বিঘ্ন ঘটে নি। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিপ্লব বা বৈদেশিক আক্রমণ ও বিজয় সাধারণ মানুষ অবলোকন করেছে অতিশয় উদাসীনভাবে। কারণ তারা জানতো শাসকশ্রেণীর ঐ পরিবর্তনের কোন প্রভাব তাদের জনপদে প্রতিফলিত হয় নি। ধর্মপ্রথা ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিমজ্জিত জনপদগুলি ছিল যেন এক একটি আলাদা বিশ্ব; পরিবর্তনবিহীন একই গ্রন্থিতে বাঁধা খণ্ড খণ্ড গ্রামীণ বিশ্ব। জনঅসন্তোষ এড়িয়ে নির্বিঘ্নে শাসন করার স্বার্থে সকল শাসক সাধারণ সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের পূর্বধারা অক্ষুণ্ন রেখেছে। যেমন, মুগল কৃষিব্যবস্থা আসলে পূর্ববর্তী তুর্কী-পাঠান ব্যবস্থারই অনুকরণ, আবার তুর্কী-পাঠান ব্যবস্থা সেন-পাল ব্যবস্থার অনুকরণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার খাতিরে শাসনপদ্ধতির ক্ষেত্রে একে অপরকে অনুসরণ করার এই ঐতিহ্য সম্পর্কে কোম্পানির শাসকশ্রেণী অবশ্য সচেতন ছিল, কিন্তু তবু তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো এমন একটি অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঝুঁকি গ্রহণ করে, যার প্রভাব এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

পূর্ববর্তী শাসকদের মতো কোম্পানি কেবল শাসন করার বা বংশীয় আধিপত্য কায়েমের উদ্দেশ্যে রাজ্যস্থাপন করে নি। কোম্পানি রাজ্যস্থাপন করেছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, অধিকতর মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। এই রাজ্যের অন্যতম স্থপতি হেস্টিংস-এর ভাষায়, "এদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব দেশে পাচার করা"ই ছিল এদেশে বৃটিশ আধিপত্য

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থাপনের অন্যতম লক্ষ্য।[১] অধিকতর হারে সম্পদ পাচার করতে প্রয়োজন ছিল অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি করা। কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি না করে রাজস্ব বৃদ্ধি করলে ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ এবং পরিশেষে কৃষিউৎপাদনের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। অতএব ঔপনিবেশিক শাসনকে যুক্তিযুক্ত এবং স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য প্রশাসকদের মধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয় কিভাবে সনাতন কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে কৃষিক্ষেত্রে বৃটেনের মতো রূপান্তর আনয়ন করা যায়। কৃষির প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করছে বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহ এবং বাড়তি আমদানি-রপ্তানি। আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে কোম্পানির আয়বৃদ্ধিও ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু কোম্পানি-প্রশাসকদের মধ্যে প্রতীতি জন্মে যে সনাতন ভূমিব্যবস্থার অধীনে কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর সম্ভব নয়।

কোম্পানি-প্রশাসকদের এই 'উন্নয়নচিন্তার' আরেকটি কারণ ছিল দেশের কৃষি ও শিল্পে ক্রমাগত মন্দা ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ। পলাশী থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত সময়কাল ছিল কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্মম শোষণ, লুটতরাজের যুগ। এদের লাগামহীন লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, খোদ কোম্পানিও এই প্রক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসায় প্রতি বছর কোম্পানি বিপুল পরিমাণ লোকসান দিতে থাকে। এদেশে রাজ্যস্থাপনের আগে এখানে কোম্পানির ব্যবসা ছিল লাভজনক, কিন্তু পলাশী পরিবর্তনের পর লাভের হার হ্রাস পেতে থাকে এবং দীউয়ানি (১৭৬৫) লাভের পর ব্যাপক লোকসান শুরু হয়।[২] কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এর কর্মচারীগণ নিজ নিজ ব্যবসা এবং লুটপাটে নিমগ্ন থাকে। ফলে দেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষি ও শিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৭৬৯ থেকে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং এসব দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের লোকসংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে কৃষি-আবাদে। ১৭৯০ সালের একটি সরকারি হিসাবে অনুমান করা হয় যে, কোম্পানির দুঃশাসন ও ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি চাষাবাদের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে বুনো পশুপাখির আবাসে পরিণত হয়।[৩]

কোম্পানি ও দেশের এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সওদাগর-সরকার চিন্তা শুরু করেন কিভাবে অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যায়, কিভাবে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। কোম্পানির চিন্তা-চক্রের (think-tank) সুখ্যাত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আলেকজান্ডার ডাও, হেনরি প্যাট্রোলো, রিচার্ড বারওয়েল, ওয়ারেন হেস্টিংস, ফিলিপ ফ্রান্সিস, জর্জ ডুকারেল, ফিলিপ ডাকার্স, বাউটন রাউস, টমাস

১. Warren Hastings, *Memoirs Relative to the State of India, 1786*, extracted in Ramsay Muir, *The Making of British India, 1756-1858*, (First published, London 1915, Pakistan reprint 1969), 162.

২. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations*, Vol III, (London 1819), 251

৩. Lord Cornwallis's Minute, 18 September 1784, *Fifth Report*, 1812.

ল, জেমস গ্রান্ট, হেনরি কোলব্রুক, চার্লস স্টুয়ার্ট এবং জন শোর। এঁরা সবাই দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন না কোন মতবাদ ও মতাদর্শ ব্যক্ত করেছেন। পরে লর্ড কর্নওয়ালিসও যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে। চিন্তা-চেতনা, ভাবধারায় এরা সবাই সমকালীন রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ফিজিওক্রেসির মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির স্বরূপ কি হবে এ নিয়ে যুক্তিতর্কে তাঁরা ইউরোপীয় মনীষীদের উদ্ধৃতি দেন বিস্তর। বাংলায় কি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় এ ব্যাপারে দুটি প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন সবাই একমত। একটি হচ্ছে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করা এবং আরেকটি হচ্ছে ভূমিনিয়ন্ত্রণে একটি ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি করা। উভয় প্রতিষ্ঠানই ইউরোপীয় এবং দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস নিজে ছিলেন একজন অভিজাত এবং উন্নয়নকামী ভূস্বামী। অতএব তিনি ছিলেন মুগল জমিদারশ্রেণীকে বৃটিশ মডেলে ভূস্বামী করার পক্ষপাতী। তিনি যুক্তি দেন যে, বাংলার জমিদারদের যদি জমির মালিক ঘোষণা করা হয় এবং সে মালিকানা যদি চিরস্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপিত হয় এবং জমিদারদের উপর সরকারি রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে ধার্য করে দেয়া হয়, তাহলে তারা নিরাপদ বোধ করবে এবং বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো ভূমিউন্নয়নে মনোযোগী হবে এবং জমিদার কর্তৃক ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃটেনের মতো এদেশেও একটি কৃষিবিপ্লব সংঘটিত হবে। কর্নওয়ালিস তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেন যে, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকারকে প্রদেয় চিরস্থায়ী রাজস্বে অনুপ্রাণিত হয়ে জমিদারেরা অধিক মুনাফার জন্য পতিত জমি আবাদ করবে। ফলে দেশের অভাব দূর হলে জনসংখ্যা বাড়বে, সার্বিক উৎপাদন কর্মকাণ্ড বাড়বে, আমদানি-রপ্তানি বাড়বে এবং এসব উপাদানের পৌনঃপুনিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, যার সুফল ভোগ করবে কোম্পানিসরকার ও দেশবাসী উভয়েই।[৪] কিন্তু কর্নওয়ালিসের এমন আশাব্যঞ্জক তত্ত্বের সারবত্তা সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করেন বোর্ড অব রেভিনিউ-এর প্রেসিডেন্ট জন শোর (গভর্নর জেনারেল, ১৭৯৩-৯৭)। জন শোর তত্ত্বের উপর নির্ভর না করে জোর দেন এদেশের সমাজঅর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার উপর। তাঁর যুক্তি ছিল যে, বৃটিশ তত্ত্ব বাংলার প্রেক্ষাপটে অনুপযোগী, কেননা বৃটিশ ও বঙ্গমুলুকের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা মোটেই তুলনীয় নয়। অতএব বৃটিশ তত্ত্ব বাংলায় প্রয়োগ করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে এদেশের ভূমিব্যবস্থা, জমিদার-রায়তের সম্পর্ক ও অধিকার, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, খাজনার হার প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫] কিন্তু কর্নওয়ালিস মনে করেন যে, তথ্য সংগ্রহের নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বিলম্বিত করা মানে অবশ্যম্ভাবী উন্নয়নকে ঠেকিয়ে রাখা। যাহোক, কোর্ট অব ডিরেক্টর্স শোরের যুক্তির প্রশংসা

৪. Cornwallis's Minute, 3 February 1790, *Fifth Report*, 1812.

৫. Shore's Minute, 21 December 1789, *Fifth Report*, 1812.

করলেও অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন কর্নওয়ালিসের পক্ষে। কালবিলম্ব না করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করার জন্য কোর্ট কলকাতা সরকারকে নির্দেশ দেন। তদনুসারে ১৭৯৩ সালের ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ঘোষণা করেন :

> দশসনা বন্দোবস্তের সময় জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূস্বামীগণ যে জমায় জমিতে বন্দোবস্ত নিয়েছেন সে বন্দোবস্ত দশ বছরের স্থলে চিরস্থায়ী ঘোষণা করা হলো। এখন থেকে চিরস্থায়ী জমায় তারা এবং তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীগণ বংশপরম্পরায় জমিতে একচ্ছত্র মালিকানা ভোগ করবেন।[৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে ভূসম্পত্তি

লর্ড কর্নওয়ালিস কলকাতা ত্যাগ করেন এই সন্তোষ নিয়ে যে, তিনি অবশেষে ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করতে পারলেন যা কিনা ইতিপূর্বে এদেশে ছিল অনুপস্থিত। তাঁর আরেক তৃপ্তি ছিল এই যে, তিনি জমিদারকে তাঁর সৃষ্ট সম্পত্তির মালিক করতে পারলেন। কর্নওয়ালিসের দৃষ্টিতে সামাজিকভাবে জমিদারেরা ছিল বৃটেনের ভূস্বামী শ্রেণীর কাছাকাছি এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই যে, বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো বাংলার জমিদারেরাও দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দেবেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিতে জমিদারকে একচ্ছত্র মালিক বলে ঘোষণা করা হলো। মালিক হিসেবে তিনি তাঁর ইচ্ছে মোতাবেক জমি ব্যবহার, হস্তান্তর, ইজারা ও দান করতে পারবেন। মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক জমিদারের বৈধ উত্তরাধিকারীরা তাঁর ভূসম্পত্তির অধিকারী হবে এবং এ ব্যাপারে সরকার কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। জমিদারি সম্পত্তিকে জোরদার করে উন্নয়নের হাতিয়ারে পরিণত করার লক্ষ্যে জমিদারের উপর সরকারি রাজস্ব চিরস্থায়ী করা হলো। এই ত্যাগস্বীকার করতে সরকার কুণ্ঠাবোধ করে নি এই আশায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে কৃষিবিপ্লব ঘটবে এবং কৃষির পরিবর্তনের ফলে আসবে শিল্পবিপ্লব এবং এসব পরিবর্তনের ফলে সার্বিক অর্থনীতির এমন উন্নতি ঘটবে যে, সরকার নানা পরোক্ষ কর আরোপের মাধ্যমে চিরস্থায়ী রাজস্বের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে।

কিন্তু আদর্শিকভাবে ভূমালিকানা যতো মুক্তভাবে কার্যকরী করা উচিত ছিল ততোটা মোটেই হয় নি। নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে মালিকানা কণ্টকাকীর্ণ হয়েছে, যার ফলে বৃটেনের ভূস্বামীদের মতো বাংলার ভূস্বামীরা মুক্তভাবে সম্পত্তির স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করতে পারেন নি। জমিদারেরা সব সময় আতঙ্কিত ছিলেন রাজস্ব বিক্রয় আইনের ভয়ে। রাজস্ব বিক্রয় আইনে ঘোষণা করা হয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন জমিদার খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অজুহাতে সরকারি রাজস্ব মওকুফের জন্য

৬. Section 4, Regulation 1, 1793

আবেদন করতে পারবেন না। "যদি কোন জমিদার ধার্য তারিখে সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে অনিবার্যভাবে তার ভূসম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে। কোনক্রমেই কারো জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় কবা হবে না।"[৭] এই আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়। নিলামি বিক্রয় আইন থেকে রক্ষা পাবার জন্য জমিদারেরা ছিলেন সদা ভীত-সন্ত্রস্ত। নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ তখনই সম্ভব যখন নিয়মিত ফসল উঠে। কিন্তু এদেশের ফসল সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল প্রাকৃতিক পরি-বেশের উপর। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল কৃষি অর্থনীতি প্রায়শই বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতো। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রব যেখানে কৃষি অর্থনীতিকে অনিবার্যভাবে অনিয়মিত করে রেখেছে, সেখানে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের কঠোর আইন ভূসম্পত্তির চালিকাশক্তিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। জমিদারি সম্পত্তির আরেকটি দুর্বল দিক ভূমিতে রায়তের অধিকার। বৃটেনে ভূস্বামীগণ প্রজাকে ইজারাশেষে বিদায় করে দেবার অধিকার ভোগ করতেন, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার স্বীকৃত।[৮] ফলে জমিদারকে তাঁর সম্পত্তি পরিচালনায় রায়তের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশে রায়তের অবস্থান ছিল একটি বড় বাধা। বৃটিশ ভূস্বামীরা তাদের ভূমিনিয়ন্ত্রণে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে ভূস্বামী পূর্বপ্রজার বদলে অন্য যেকোন প্রজার সঙ্গে চুক্তি করার অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু বাংলার জমিদার রায়তকে এমনিভাবে উৎখাত করতে পারতেন না। প্রথা আইনে ভূমিতে রায়তের ভোগদখলের অধিকার স্বীকৃত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই প্রথাভিত্তিক অধিকার বিলুপ্ত করে নি। বরঞ্চ সরকার একটি রেগুলেশনে ঘোষণা করে যে, ভবিষ্যতে রায়তের স্বার্থে প্রয়োজনে জমিদার-রায়ত সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করা হবে না।[৯] এর অর্থ এই যে, জমিদারি একটি নির্ভেজাল কণ্টকবিহীন সম্পদ নয়। এ সম্পদ নিয়ন্ত্রণে জমিদারের হাত নানাভাবে বাঁধা। অতএব, জমিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেন সৃষ্টি হয় নি তা অনুসন্ধানে এই বাধাসমূহ নজরে রাখা আবশ্যক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিক অভিঘাত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাগণ সবাই আশাবাদী ছিলেন যে, এই ব্যবস্থা কৃষি অর্থনীতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করবে। কর্নওয়ালিসের কথায় :

> এই ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে অদম্য শ্রম ও অর্থনৈতিক স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে এবং এর প্রভাবে বর্তমানে অনাবাদ অবস্থায় পড়ে থাকা বিপুল আয়তনের জমি আবাদ হবে। ভূস্বামীরা প্রভূত লাভবান হবেন এবং লাভের এক অংশ বাঁধ নির্মাণ, জলাধার ও অন্যান্য কৃষি উন্নয়ন খাতে ব্যয় করবেন এই কারণে যে, এর ফলে তাদের মুনাফা আরো বৃদ্ধি পাবে। কৃষকরা যেহেতু সকল কৃষিকর্মের মূল,

৭. Proclamation Article III, Section 4, Regulation 1,1793.

৮ Section 3, Regulation VII, 1793.

৯. Cornwallis's Proclamation Article VIII, Clause 1, 1793.

সেহেতু জমিদারেরা আপন স্বার্থেই তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য-সহায়তা করবেন।[১০]

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, জমিদারগণ বাস্তবে উন্নয়নকর্মে কোন ভূমিকা রাখেন নি এবং রায়তশ্রেণীর প্রতিও সহানুভূতিশীল থাকেন নি। এর জন্য হয়তো কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা অনেকাংশে দায়ী। তাঁর ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ভূমালিকানাকে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠান হিসেবে মালিকানাকে চিরস্থায়ী করা হয়, কিন্তু মালিককে নয়। মালিকের স্থায়িত্ব শর্তযুক্ত করা হয় নিয়মিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধের সঙ্গে। এই শর্ত মালিক শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে। যেকোন কারণে সরকারি রাজস্ব বাকি পড়লে নিলামের মাধ্যমে জমি হস্তান্তর ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই ত্রাস বিশেষকরে বিদ্যমান ছিল ঐসব জমিদারের মধ্যে, যাদের রাজস্বহার সম্পদাতিরিক্ত ধার্য করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব কোন জরিপের উপর ভিত্তি করে ধার্য করা সম্ভব হয় নি, যেজন্য সরকারি রাজস্ব সকল এস্টেটের উপর সম্পদের দিক থেকে সমভাবে ধার্য করা হয় নি।[১১] সম্পদাতিরিক্ত রাজস্বভারে ন্যুব্জ জমিদারগণ স্বাভাবিক কারণেই ছিলেন রাজস্ব বিক্রয় আইনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, নিলামে জমিবিক্রয় এমন একটি ভূমিবাজার সৃষ্টি করবে, যেখানে "অজ্ঞ, অযোগ্য ও দুর্বল মালিকের জমি বাজারে আসবে এবং এই বাজারের মাধ্যমে জমি যোগ্য পুঁজিবাদী মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হবে।"[১২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাদের স্বপ্ন কতটুকু সফল হয়েছিল ? বাংলার জমিদার-সমাজ কি বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো পুঁজিবাদী স্বভাব লাভ করতে পেরেছিল ? জমিতে বাজার সৃষ্টির ফলে কি ভূমিনিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদী বিনিয়োগকারীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ? এককথায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কি কৃষি অর্থনীতিতে ইপ্সিত রূপান্তর ঘটেছিল ? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আরেকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে যায়। তা হলো, সকল ইপ্সিত পরিবর্তনের উৎস হিসেবে ধরা হয় ভূসম্পত্তির মালিক জমিদারকে; আশা করা হয়, সম্পত্তির যাদুকাঠির স্পর্শে সকল জমিদার একটি উন্নয়নকামী পুঁজিবাদী শ্রেণীতে পরিণত হবে। কিন্তু খুঁজে দেখা দরকার আসলে জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

বৃটিশের রাজত্ব স্থাপনের আগে জমিদারসমাজ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি জড়িত। বিশেষকরে মুগল কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে জমিদারেরা আঠারো শতকের প্রথমার্ধে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। শিরীন আখতারের মতে, বড় বড় জমিদারেরা

১০. Governor General in Council to the Court of Directors, 12 April 1790, Para 3, *General Revenue Letter*, (India Office Records, London)

১১. Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of its Operation* 1790-1819, (Dacca 1979), 22-30

১২. Thomas Law, *A Sketch of some late arrangements and a view of the Rising Resources in Bengal*, (London, 1792), 179

তখন নবাবি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সুবাদারি পদ লাভের রাজনীতিতে প্রতিযোগীগণ জমিদারদের সমর্থন কামনা করে এবং সেই রাজনীতির ধারামতেই তারা ব্যাঙ্কার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যোগসাজশে সরকার পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। এমনি ছিল তাদের ক্ষমতা।[১৩] জমিদারদের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা যাই থাকুক না কেন, সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা এলাকার একমাত্র প্রভুতে পরিণত হয়। বড় বড় জমিদাররা প্রতিবেশী ক্ষুদ্র জমিদারদের এলাকা বলপ্রয়োগে নিজেদের দখলে এনে জমিদারির সীমানা আরো সম্প্রসারিত করে। রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি দিয়ে তাদের আধিপত্যবাদের স্বীকৃতি দেয় সরকার। এমনকি সরকার তাদেরকে সামাজিক বিচারক্ষমতা পর্যন্ত প্রদান করে।[১৪] মাঝারি ও ছোট জমিদারদেরও ছিল প্রজাকুলের উপর প্রভূত ক্ষমতা। এককথায়, তাত্ত্বিকভাবে জমির মালিক হোন আর নাই হোন, নবাবি আমলে জমিদার ছিলেন ভূমির স্থায়ী দখলকার এবং এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধি মোতাবেক জমিদারশ্রেণী সার্বিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা এখন শুধু ভূস্বামী, ভূমিনিয়ন্ত্রণের অধিকারী, জেলা কালেক্টরের অধীনে অতি সাধারণ নাগরিক। জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রদান করে এবং সরকারি রাজস্বহার চিরস্থায়ীভাবে ধার্য করে সরকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এতে জমিদারগণ কৃষিউন্নয়ন কর্মে উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু জমিদারগণ এই মালিকানাস্বত্ব পেয়ে নতুন কোন সুবিধা লাভ করেছে বলে মনে করে নি। বরঞ্চ বৃটিশ শাসনাধীনে তাদের চূড়ান্ত পতন হয়েছে বলে তারা ধরে নেয়। তারা মনে করে যে, রাজস্ব বিক্রয় আইনের অধীনে তারা অবশিষ্ট ক্ষমতাটুকুও যেকোন সময় হারাতে পারে। চিরস্থায়ী রাজস্বহারও তাঁদের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না, কারণ মুগল আমলে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে রাজস্বদাবিও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্পদ হ্রাস পেলে রাজস্বদাবিও অনুরূপভাবে হ্রাস পেয়েছে। মুগল আমলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজস্ব মওকুফ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজস্ব বাকি পড়লে জমিদারকে এজন্য দায়ী করে উৎখাত করা হতো না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে যেকোন কারণেই হোক, সরকারি রাজস্ব বাকি পড়লে তৎক্ষণাৎ জমি বিক্রি করে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। জমিদারদের বক্তব্য ছিল এই যে, নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ নির্ভর করে নিয়মিত ভাল ফসল উৎপাদনের উপর এবং সেটা নির্ভর করে প্রথমত নিয়মিত ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের উপর এবং দ্বিতীয়ত মহামারী, কীটপতঙ্গ, নদীসিকস্তি প্রভৃতি থেকে নিরাপদ থাকার উপর।[১৫] এরকম প্রাকৃতিক বিষয়গুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অথচ কঠোর নির্দেশ দেয়া হলো যে, রাজস্ব বাকি পড়লেই এর কারণ বিবেচনা না করে জমি নিলামে বিক্রি করে বকেয়া সংগ্রহ করা হবে।

১৩. Shirin Akhtar, *The Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772*, (Dhaka 1982), 179.

১৪. ঐ, দেখুন অধ্যায় 4-6.

১৫. Sirajul Islam, *Permanent Settlement*, 20-22

স্বাভাবিক কারণেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থাকে জমিদারেরা স্বাগত জানাতে পারে নি। তবুও তারা এই বন্দোবস্তে রাজি হতে বাধ্য হয়েছে, কারণ এছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। অনেক জমিদার অবশ্য প্রতিবাদ জানিয়ে বন্দোবস্ত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বিধি মোতাবেক রাজস্বের উপর শতকরা দশ ভাগ মালিকানা নিয়ে তারা সরকারকে জমি ইজারা দিয়ে দেন। এককথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে ভূমিউন্নয়নে প্রেরণা যোগাবে– কোম্পানি সরকারের এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর করার পরপরই ভূমিনিয়ন্ত্রণে এক বিরাট সঙ্কট সৃষ্টি হয়। রাজস্ব বকেয়ার কারণে হাজার হাজার জমিদারি প্রতি বছর নিলামে বিক্রি হতে থাকে। জমিবিক্রির হিড়িকে বড় বড় জমিদারিগুলি প্রথম দশ বছরের মধ্যেই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথম দশকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বড় বড় জমিদারিগুলির মধ্যে ছিল নাটোর রাজ, দিনাজপুর রাজ, নদীয়া রাজ, বীরভূম রাজ, বিষ্ণুপুর রাজ এবং আরো অনেক বড় বড় পরিবার।[১৬] এঁদের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পান একমাত্র বর্ধমান রাজ। মাঝারি ও ছোট জমিদারগণ এই সঙ্কটে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। তবে অচিরেই ভূমিনিয়ন্ত্রণে স্থিরতা আসে। ১৮০৩ সাল থেকে রাজস্ব বকেয়ার কারণে ভূমিবিক্রয় ক্রমশ কমে আসে। ১৮২০ সাল নাগাদ সরকারি রাজস্বের নিরিখে বাংলার প্রায় অর্ধেক জমিদারি ভূমি নিলামের মাধ্যমে হাতবদল হয়।[১৭]

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ব্যাপক ভূমিহস্তান্তর মানে সনাতন জমিদার-সমাজকাঠামোয় এক মহা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বড় বড় রাজা-মহারাজা এক দশকের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন এবং তাঁদের ধ্বংসস্তূপের উপর সৃষ্টি হলো অসংখ্য নতুন জমিদার, যারা পেশাগতভাবে আগে ছিলেন ব্যবসায়ী, সরকারি ও জমিদারি আমলা। তারা ভূমিনিয়ন্ত্রণে যোগদান করলেন আসলে সামাজিক স্বীকৃতির জন্য, পুঁজিবাদী পরিবর্তনের জন্য নয়। এমন কোন আলামত নেই যে, ভূমিনিয়ন্ত্রণে আগত নতুন জমিদারগণ পুরনোদের চেয়ে বেশি পুঁজিবাদী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। নতুন ও পুরনো উভয় শ্রেণীর ভূস্বামীরা ছিলেন ভূমিতে পুঁজিবিনিয়োগের ব্যাপারে অনাগ্রহী। এর অর্থনৈতিক কারণ হয়তো এই যে, মহাজনী, শস্য ব্যবসা, মজুতদারি, কোম্পানির কাগজ ক্রয় প্রভৃতি খাতে পুঁজিবিনিয়োগ যতোটা লাভজনক ও নিরাপদ ছিল, ভূমিউন্নয়ন খাতে তা ততোটা ছিল না। তারা জমিদারসমাজে অনুপ্রবেশ করেছেন সামাজিক স্বীকৃতির জন্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নয়। নতুন জমিদারগণ বরঞ্চ পুরনোদের চেয়ে আরো কঠোর ছিলেন এই অর্থে যে, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন এলাকায় অনুপস্থিত। তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা ছিল শহরে। আর তাঁদের এস্টেট পরিচালনা করতো নায়েব-গোমস্তারা। গ্রামের সম্পদ পাচার হয়েছে শহরে, বেড়েছে গ্রামীণ দারিদ্র্য।

---

১৬. ঐ, Chapter four

১৭. ঐ, 157.

এ কথা সত্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং দীর্ঘদিন দেশ দুর্ভিক্ষমুক্ত থেকেছে। কিন্তু এর জন্য অবশ্যই জমিদারদের দায়ী করা যায় না, এই কৃতিত্ব কৃষকশ্রেণীর। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক জেমস মিল-এর ভাষায়, "রায়তের হাতে পুঁজি সৃষ্টিতে জমিদারি ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছে এমন ধারণা আমি করতে পারি না, আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে, অধুনা যে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটছে এর জন্য দায়ী কৃষক, জমিদার নয়।"[১৮] জেমস মিল ছিলেন কোম্পানির ইন্ডিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা। বাংলা থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রের উপর ভিত্তি করে তিনি আরো সাক্ষ্য দেন, "জমিদারেরা কৃষির উন্নয়নে কোনরূপ অবদান রাখছেন এমন প্রমাণ নেই। বাংলার বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণ বলছেন যে, এই সম্প্রসারণ ঘটছে সম্পূর্ণ রায়তের প্রচেষ্টায়, জমিদারের বিনিয়োগের জন্য নয়।"[১৯] হেনরি নিউনহ্যাম দীর্ঘদিন বাংলায় অবস্থান করেছেন কোম্পানির বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে। তিনি সাক্ষ্য দেন যে, বাংলায় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে কৃষক-শ্রমিক কর্তৃক। জমিদারের ভূমিকা এখানে শুধু কৃষককে উচ্চহারে চক্রবৃদ্ধি সুদে সামান্য ঋণ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জঙ্গল পরিষ্কার করে জনপদ সৃষ্টি করা, পুকুর কাটা, জলাশয় নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেছে কৃষক-শ্রমিক।[২০]

কোম্পানি প্রশাসন আশাবাদী ছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো উন্নয়নকামী পুঁজিবাদী ভূস্বামীতে পরিণত করবে। কিন্তু বাস্তবে সে আশা অচিরেই তিরোহিত হলো। ১৮১৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস মন্তব্য করেন যে, "এই বন্দোবস্ত কর্নওয়ালিস করেছিলেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয় নি। এই বন্দোবস্ত অধিকন্তু বাংলার সকল কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে চরম অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখে ঠেলে দেয়।"[২১]

মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর আবির্ভাব

সদ্যসৃষ্ট ভূমিবাজারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভূস্বামীশ্রেণীর গঠনগত পরিবর্তন এবং ভূস্বামী শ্রেণীতে নতুন সদস্যের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা প্রথমেই অনুমিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতারা বরং তা কামনাই করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এর ফলে ভূমিনিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদী উদ্যোগে বিনিয়োগকারীর যোগদান সম্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে জমিদার ও রায়তশ্রেণীর মধ্যবর্তী একটি বহুস্তরবিশিষ্ট মধ্যস্বত্বশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটবে। মধ্যস্বত্ব

১৮. J. Mill's evidence, *British Parliamentary Papers*, (India Affairs), Vol. 5, Evidence 3348.04

১৯. ঐ, Evidence 3355.

২০. H. Newnham's evidence, 7 May 1832, *British Parliamentary Papers* (India), 1831-32, Vol XI, Evidence 2737.

২১. Hastings' Minute, *British Parliamentary Papers* (India), 1831-32, Vol. XI, Report IV-V.

প্রকৃতপক্ষে ছিল জমিদারদের সৃষ্ট আরেকটি সম্পত্তি। অন্যকথায় সম্পত্তির ভিতর সম্পত্তি। জমিদার কর্তৃক এহেন স্বত্ব সৃষ্টি ছিল আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার একটি দিক। এর প্রধান কারণ রাজস্ব বিক্রয় আইন (সূর্যাস্ত আইন)। মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে তারা তাদের ভূমিনিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে অনর্জিত আয়ের ব্যবস্থা করলো। যে শর্তে জমিদার সরকারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল, প্রায় একই শর্তে মধ্যস্বত্বাধিকারীরাও জমিদারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রধান শর্ত ছিল, ধার্য খাজনা নিয়মিত পরিশোধ করা হবে। তবে জমিদারি সম্পত্তি লাভ করতে যদিও জমিদারদের কোন মূল্য দিতে হয় নি, তবু মধ্যস্বত্ব লাভ করতে গিয়ে মধ্যস্বত্বাধিকারীকে মোটা অঙ্কের সেলামি দিতে হয়।

মধ্যস্বত্ব ছিল জমিদারি স্বত্বের মতোই হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারযোগ্য। তবে মধ্যস্বত্বের দায়-অধিকারের বৈশিষ্ট্য সকল অঞ্চলে সমান নয়। স্বত্বের উৎপত্তি ও সম্পর্কের দিক বিচার করলে মধ্যস্বত্বকে মোটামুটি দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—পত্তনিস্বত্ব ও পতিত-আবাদ স্বত্ব। পত্তনিস্বত্ব বাংলার বিদ্যমান কৃষিসম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। এর উদ্ভাবক ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। এই অভূতপূর্ব স্বত্ব তৈরি করে বর্ধমানরাজ রাজস্ব বিক্রয় আইনের প্রয়োগ থেকে রক্ষা পান। মহারাজা তাঁর বিশাল জমিদারি কয়েক হাজার তালুকে বিভক্ত করেন এবং মোটা অঙ্কের নগদ সেলামির বিনিময়ে প্রতিটি তালুক এক একজন তালুকদারের কাছে পত্তন দেন। পত্তনির শর্ত থাকে এই যে, পত্তনিতালুকদার জমিদারকে প্রদেয় খাজনা চিরকাল অপরিবর্তিত হারে প্রদান করবে, সে তালুক হস্তান্তর করতে পারবে, তার উত্তরাধিকারীরা জমি একই শর্তে বংশপরম্পরায় ভোগ করবে, কিন্তু নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে জমিদার উক্ত তালুক বিক্রয় করে বকেয়া খাজনা সংগ্রহ করতে পারবেন। বর্ধমানমহারাজা এই পত্তনিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর এই সাফল্য অন্য ভূস্বামীদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে।[২২]

কৃষি অর্থনীতিতে পত্তনিস্বত্বের কোন গঠনমূলক অবদান রাখার অবকাশ ছিল না। এটি ছিল সম্পূর্ণ একটি খাজনাসংগ্রহপদ্ধতি এবং ভূমিব্যবস্থাপনায় কোন অংশ না নিয়ে অনর্জিত আয় বৃদ্ধি করার একটি দায়িত্বহীন ব্যবস্থা। এর ফলে রায়তের খাজনার হার বেড়ে যায়। সম্পদ বৃদ্ধি না করে পত্তনিতালুকদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধিতে রায়তেরা উৎপীড়নের শিকার হয়। পত্তনিদারগণ আবার মুনাফার লোভে সৃষ্টি করে অধীনস্থ পত্তনিতালুক। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর পরিণতি ছিল মারাত্মক। এর ক্ষতিকর বিস্তার দেখে বর্ধমানমহারাজা নিজেই হতবাক হয়ে যান। অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি সরকারকে অবগত করেন :

২২. Sirajul Islam, "The Problem of Madhyasvatvas in Nineteenth Century Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 1 32 (1987), 14-15.

পত্তনিদারের কুকাণ্ড। অতিলোভের বশবর্তী হয়ে পত্তনিতালুকদারেরা নিজেরা জমির ব্যবস্থাপনা থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে অধিক মুনাফার লোভে পত্তনিমহলে দার-পত্তনি ইজারাদার সৃষ্টি করেছে। দার-পত্তনিদারেরাও ফের সৃষ্টি করেছে সে-পত্তনি অর্থাৎ তৃতীয় মাত্রার ইজারাদার। এমনিভাবে চার-পাঁচটি স্বত্বস্তর সৃষ্টি হয়েছে মূল পত্তনিদার ও রায়তের মধ্যে। সহজেই অনুমেয়, একই জমির আয়ের উপর যদি এতগুলি মুনাফাখোর পরগাছা বাঁচার ব্যবস্থা করে, তা হলে প্রকৃত রায়তের অবস্থা কি পরিণতি লাভ করতে পারে। মহল থেকে এখন রায়তেরা পালিয়ে যাচ্ছে, কৃষিজমি পরিণত হচ্ছে পতিত জঙ্গলে।[২৩]

পত্তনিস্বত্বের বিস্তার পরিমাপ করা কঠিন। তবে অনুমান করা যায় যে, পত্তনি- স্বত্ব বর্ধমান অঞ্চলের বাইরে খুব একটা প্রসারলাভ করে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ, এই পত্তনিস্বত্ব লাভজনকভাবে সৃষ্টি করার জন্য বিশাল আয়তনের জমিদারিগুলি ছিল বিশেষভাবে উপযোগী, কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগেই বড় বড় জমিদারিগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বর্ধমান অঞ্চলের বাইরে বরঞ্চ আরেক শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব বিকাশলাভ করে। সেটি হচ্ছে পতিত-আবাদ স্বত্ব এবং এর আদর্শ ক্ষেত্র ছিল পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চল।

কৃষিযোগ্য পতিত জমি আবাদপ্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড উনিশ শতকের প্রথম থেকে শুরু হয়। সরকারিভাবে অনুমান করা হয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি প্রাকৃতিক অবস্থায় বিরাজমান ছিল।[২৪] এই বিশাল পতিত এলাকার বৃহদংশ অবস্থিত ছিল পূর্ব বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে দেখা যায়, আবাদ আন্দোলনের ফলে সুন্দরবনের কেবল 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ছাড়া বাকি সব পতিত জমিতে বসতি স্থাপিত হয়েছে।[২৫]

পতিত-আবাদ শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব বিকাশের জন্য কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে জমিদারেরা নানা ধরনের প্রতিরক্ষাকৌশল অবলম্বন করে। একটি হচ্ছে পতিত ভূমি আবাদ করা। খাজনার হার না বাড়িয়ে আয় বাড়ানোর একটি সফল পন্থা ছিল পতিত-আবাদ। জমিদারেরা এতে আগ্রহী হয় আরেকটি কারণে। সরকার সকল বসতিহীন পতিত জঙ্গলভূমি খাসমহল অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এস্টেট বলে ঘোষণা করে।[২৬] অতএব জমিদারির পার্শ্ববর্তী বন এলাকা আবাদ করে জমিদারেরা এর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন জরিপের উপর ভিত্তি করে

২৩. Raja of Burdwan to Sadr Diwani Adalat, date not available, *Civil Judicial Proceedings*, 8 October 1819, No. 30, (India Office Records, London)

২৪. Lord Cornwallis's Minute, 18 September 1788, *Fifth Report*, 1812, Appen-dix 5

২৫. The courses of reclamation movement may be traced in Rennel's Survey Maps (1764-72), *Revenue Survey Maps* (1847-63) and Survey and Settlement Maps (1886-1944)

২৬. Governor General in Council to Board of Revenue, 5 July 1816, abstracted in *Board of Revenue Proceedings*, 15 June 1827, No 90, (India Office Records, London)

হয় নি এবং ১৮৫০-এর দশকে থাক্‌বস্ত জরিপের আগে গ্রাম ও জমিদারির কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা ছিল না। জমিদারেরা এর সুযোগ গ্রহণ করে আবাদকে মালিকানার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জমিদারশ্রেণী আবাদে আগ্রহী হয়েছে আরো দুটি প্রধান কারণে—একটি জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অপরটি কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি।

একই পরিবেশে সমকালীন বৃটেনেও আবাদ আন্দোলন হয়েছে। জনসংখ্যা ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে বৃটিশ ভূস্বামীরা আবাদের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করেন এবং সে বিনিয়োগ ছিল পুঁজিবাদী। কিন্তু বাংলার ভূস্বামীরা আবাদে পুঁজিবাদী পন্থা অবলম্বন না করে সামন্ত কায়দায় স্বত্ব সৃষ্টি করে অনর্জিত আয়ের ব্যবস্থা করেন। পতিত-আবাদের জন্য প্রয়োজন বিপুল শ্রমশক্তি। আবাদজমি থেকে মুনাফা অর্জন করার জন্য কমপক্ষে দশ বছর অপেক্ষা করতে হতো। জঙ্গল কাটা, নল-খাগড়া কাটা, বৃক্ষের গুড়ি তোলা, পানি নিষ্কাশন ও জলসেচের ব্যবস্থা করা, গ্রামবসতি স্থাপন করা প্রভৃতি খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ, লোকশক্তি ও সময়ের দরকার ছিল তা যোগাড় করার শক্তি অনেক জমিদারেরই ছিল না। অতএব, এরা অবলম্বন করে আবাদের সামন্তবাদী পথ অর্থাৎ জঙ্গলবাড়ি তালুকদারের মাধ্যমে আবাদ করা। জমিদার কর্তৃক জঙ্গলবাড়ি তালুকদারের মাধ্যমে আবাদ করার সমস্যাটি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষও লক্ষ্য করেন। পতিত-আবাদ মধ্যস্বত্বের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি সরকারি রিপোর্টে (১৮৩৯) মন্তব্য করা হয় :

> বৃটেনে জনসংখ্যা ও মূল্যবৃদ্ধিতে সাড়া দিয়ে ভূস্বামীরা ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন এবং সে সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছে পুঁজিবাদী ইজারাদার কর্তৃক। কিন্তু অনুরূপ জনসংখ্যা ও মূল্যবৃদ্ধির পরিবেশে এদেশে কৃষি সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছে সামন্ত চরিত্রের স্থায়ী মধ্যস্বত্ব কর্তৃক। তালুকদার এবং অধীনস্থ হাওলাদার—এই দুই প্রধান মধ্যস্বত্বাধিকারীর নেতৃত্বে পতিত-আবাদ সংঘটিত হচ্ছে।[২৭]

বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো বাংলার জমিদারেরাও বিরাট মুনাফা লাভ করতে পারতেন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে পারতেন, যদি তারা মধ্যস্বত্বের আশ্রয় না নিয়ে পুঁজিবাদী পন্থায় ইজারাদারের মাধ্যমে আবাদ সংগঠন করতে সক্ষম হতেন। আবাদ অঞ্চলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের বিশেষ সুযোগ ছিল এজন্য যে, এখানে কোন জনপদ ছিল না, রায়ত ছিল না। অতএব রায়ত উৎখাত করে পুঁজি ও শ্রমের ভিত্তিতে কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে তোলার কঠিন সমস্যা এখানে ছিল না। তবুও জমিদারেরা সরাসরি আবাদ না করে মধ্যস্বত্বাধিকারীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন কেন? এদের এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, রাজস্ব বিক্রয় আইন

২৭. Halliday's Note on undertenures, 30 July 1839, *Bengal Revenue Consultations*, 12 November 1839, No 49, (India Office Records, London).

থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিয়মিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধের প্রয়োজন ছিল। মধ্যস্বত্বাধিকারী কর্তৃক সেলামি ও নিয়মিত খাজনা প্রদানের ফলে জমিদারেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়। দ্বিতীয়ত, জমিদারের ছিল পুঁজির অভাব। আবাদকাজের জন্য যে বিপুল পুঁজির প্রয়োজন ছিল, যে সাংগঠনিক দক্ষতার প্রয়োজন ছিল এর কোনটাই জমিদারদের ছিল না। তৃতীয়ত, ঐতিহ্যগতভাবে চিরকালই পতিত-আবাদ সংগঠিত করেছে জঙ্গলবাড়ি তালুকদার। মুগল সরকার সবসময়ই পতিত-আবাদে আগ্রহী ছিল। জঙ্গলবাড়ি তালুকদার নামেমাত্র রাজস্বের ভিত্তিতে বা নিষ্কর ভিত্তিতে সরকার থেকে পাট্টা লাভ করতো। জঙ্গলবাড়ি তালুকদার এবং লাখেরাজদারেরা প্রকৃত আবাদ সংগঠনের জন্য সৃষ্টি করতো বিভিন্ন নামের মধ্যস্বত্বাধিকারী, যথা, হাওলাদার, গুনতিদার, জোতদার, ওদাদার ইত্যাদি। এদের নেতৃত্বে গ্রামপত্তন হতো এবং এরাই ছিল গ্রামের প্রকৃত ভূস্বামী।

মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে আবাদ করার ঐতিহ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারেরা পরিহার করতে পারে নি। পুঁজিপতির ভূমিকা পালন করার জন্য যে পুঁজি, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল তা জমিদারদের মধ্যে ছিল না। তবে উনিশ শতকের আবাদ আন্দোলন ছিল এতই ব্যাপক এবং অর্থনৈতিক ও কৃষিসম্পর্কের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে, এর সংগঠক মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়া প্রয়োজন। স্বত্ব ও সংগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যস্বত্বকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন, নোয়া-আবাদ, চর-আবাদ, বিল-আবাদ এবং সুন্দরবন-আবাদ।[২৮] নোয়া-আবাদ চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবাদ আন্দোলনের বিশেষ নাম। সরকার থেকে মেয়াদি পাট্টা নিয়ে ইজারাদারেরা জঙ্গল আবাদ করতো। নোয়া-আবাদ তালুকদার নামে পরিচিত এসব ইজারাদার প্রকৃত আবাদের জন্য আবাদকার পাট্টা প্রদান করে চৌধুরী নামে গৃহস্থকে, যারা জমি আবাদ করে সেখানে বসতি স্থাপন ও কৃষিকাজের ব্যবস্থা করে। মেঘনা ব-দ্বীপ এলাকার চরসমূহ আবাদ হয় একটি ভিন্ন পরিবেশে। চর জেগে উঠার পর প্রথম দখলকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সরকার থেকে বন্দোবস্ত লাভ করে মেয়াদি বা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে। চরকে কৃষি-উপযোগী করে তোলার জন্য ঐ বন্দোবস্তকারী ভূস্বামী মেয়াদি বা চিরস্থায়ী স্বত্বে পুঁজি বিনিয়োগকারী ইজারাদার নিয়োগ করে। তালুকদার নামে এসব ইজারাদার গ্রামপত্তন ও চাষাবাদ শুরু করার জন্য মেয়াদি বা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে হাওলাদার নামে আবাদকার নিযুক্ত করতো। একই শর্তে হাওলাদার নিযুক্ত করতো নিম-হাওলাদার। হাওলাদার ও নিম-হাওলাদারেরা হচ্ছে বসতিপত্তনকারী গ্রামপ্রধান। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে চাষী এনে তারা চাষাবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চর-আবাদ পদ্ধতির মতো দক্ষিণবঙ্গে বিস্তীর্ণ বিল এলাকায়ও আবাদ শুরু হয় কয়েক দফা মধ্যস্বত্বাধিকারীর পুঁজি বিনিয়োগের ফলে। মধ্যস্বত্ব কর্তৃক সুন্দরবন

২৮. The organisational structure of reclamation by madhyasvatva interests has been elaborated in Sirajul Islam's *Bengal Land Tenure : The origin and growth of intermediate interests in the 19th Century*, (Calcutta, 1988), 47-56.

আবাদের কাহিনী বেশ চমকপ্রদ। সুন্দরবন অতিশয় উর্বর এলাকা, কিন্তু এর আবাদ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুকিপুর্ণ। কমপক্ষে দশ থেকে বারো বছর সময় লাগলো আবাদ সম্পন্ন করে কৃষি-আবাদ শুরু করতে। বৃক্ষ কর্তন, নলখাগড়া ও আগাছা পরিষ্কার, নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, সমুদ্রের লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণ, দীর্ঘদিন কর্ষা বা চাষীদের খোরাকি ও গবাদিপশু বাবদ ঋণ প্রদান করা, হাট-বাজার স্থাপন করা প্রভৃতি কাজে বিপুল পুঁজি বিনিয়োজিত হয়। এই পুঁজির ব্যবস্থা করতে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন স্বত্ব-সেকা (intermediate tenure)। তালুকদার, ওসাত তালুকদার, নিম-ওসাত তালুকদার, হাওলাদার, নিম-হাওলাদার, ওসাত নিম-হাওলাদার প্রভৃতি নামে মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্তর বা সেকার সংখ্যা সাধারণত চার থেকে ছয় মাত্রা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দশ থেকে বিশ মাত্রা পর্যন্ত স্বত্বস্তর লক্ষ্য করা যায়।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। উনিশ শতকের শেষ দশকে এসে আমরা একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। প্রায় সারা দেশই তখন চাষাবাদে ভরে উঠেছে। এই মহা আবাদ আন্দোলনে জমিদারশ্রেণীর ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। এই আবাদ আন্দোলনে বড় অবদান রেখেছে মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী, মূল পুঁজিবিনিয়োগকারী আবাদকার তালুকদার এবং মাঠ পর্যায়ে মূল আবাদ সংগঠক হাওলা, নিম-হাওলা, ওসাত হাওলাদার প্রভৃতি আবাদকার। তারাই গ্রামপত্তন করে এবং তাদের পুঁজি ও শ্রমের ফলেই জঙ্গল পরিণত হয় উর্বর শস্যক্ষেত্রে। কর্ষা নামক চাষীরা ছিল এক ধরনের কৃষিশ্রমিক। জমিতে এদের কোন অধিকার ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে এদেরকে মজুর হিসেবে আনা হতো এবং তারাই ছিল আবাদ জমির প্রথম চাষী।

মধ্যস্বত্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবিনিয়োগ হলেও এটি আধুনিক পুঁজিবাদী সম্পর্কে রূপান্তরিত হতে পারে নি। পতিত-আবাদে পুঁজিবিনিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক দিক ছিল এমন যে, তা উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে শুধু আবাদের প্রাথমিক স্তরে। গ্রামপত্তন এবং কৃষিউৎপাদন শুরু হবার পর মধ্যস্বত্বাধিকারীর ভূমিকা শুধু খাজনা সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রকৃত কৃষকের সকল খাজনা সংগ্রহকারী স্তর তখন অনর্জিত আয়ভোগকাবী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় এবং কৃষক হয় তাদের শোষণের শিকার।

প্রজাস্বত্বের বিকাশ ও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মুগল আমলে জমিতে রায়তের ভোগদখলের অধিকার ছিল। রেওয়াজ ও দস্তুর ছিল এই অধিকারের ভিত্তি। জমিদার কখনো এই অধিকার থেকে রায়তকে বঞ্চিত করতে পারতো না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে রায়ত প্রজায় পরিণত হলো, কারণ জমির মালিক এখন জমিদার, সরকার নয়। জমিদার এখন ভূস্বামী এবং রায়ত তার চুক্তিবদ্ধ প্রজা। পাট্টায় লিপিবদ্ধ চুক্তির বরখেলাপ করলে জমিদার মালিক হিসেবে তাঁর প্রজাকে

উৎখাত করতে পারেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে ভূমিতে রায়তের কোন অধিকার না থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণায় রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য রায়তের সে অধিকার ঐ ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নি। ফলে রায়তের অধিকার সংক্রান্ত মামলায় আদালত সাধারণত জমিদারের পক্ষেই রায় দিয়েছে, যদিও আদালত কখনো কখনো ব্যাখ্যা দিয়েছে এই মর্মে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্বত্বেও ভূমিতে রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার রয়েছে এবং তা অস্পষ্ট। অনুরূপ দ্বন্দ্ব ছিল পত্তনি ও অন্যান্য স্বত্বের প্রশ্নেও। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে জমিদার কর্তৃক উপস্বত্ব সৃষ্টি ছিল বিধিবহির্ভূত। এসব কারণে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ক্রমশই অবনতির পথে যাচ্ছিল। অধিকার আদায়ের জন্য রায়তেরা বিদ্রোহ করেছে জমিদারের বিরুদ্ধে। বিশেষকরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে কৃষক-আন্দোলন ভীষণভাবে বেড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে কৃষকের অধিকার সংজ্ঞায়িত করে আইন পাশ করতে সরকার বাধ্য হয়। অধিকন্তু কৃষকের পক্ষে সরকারের চিন্তা-ভাবনার আরেকটি কারণ ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে জমিদারদের চরম ব্যর্থতা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম অর্ধ শতকের অভিজ্ঞতা সরকারি মহলে প্রতীতি জন্মায় যে, গোটা কৃষিব্যবস্থারই পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। এই চিন্তারই প্রথম ফসল ১৮৫৯ সালের দশম আইন।[২৯]

প্রাক-ঔপনিবেশিক রায়ত সমাজকে প্রধান দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, খোদকাশতা ও পাইকাশতা। খোদকাশতা রায়ত ছিল গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। খোদকাশতা রায়তের মধ্যে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল। এরা সরকারকে খাজনা দিত চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় হারে। জমিতে স্থায়ী অধিকারপ্রাপ্ত এইসব খোদকাশতা রায়তকে বলা হতো মুকারারি এবং মিরাসি রায়ত। পাইকাশতা রায়ত ছিল তারা, যারা কোন গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো না। এরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে অস্থায়ীভাবে চাষাবাদ করতো। এ শ্রেণীর রায়ত সৃষ্টি হবার একটি অর্থনৈতিক কারণ এই ছিল যে, এরা খোদকাশতা রায়তের চেয়ে অনেক কম হারে খাজনা দিত এবং যেখানে ভাল জমি কম খাজনায় পাওয়া যায় সেখানেই গমন করতো। আবাসিক রায়তের সামাজিক মর্যাদা ছিল বেশি, তবে এই মর্যাদার জন্য অধিক হারে খাজনা দিতে হতো। অতএব সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পাইকাশতা রায়তিতে যোগদান করতো অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য। সকল প্রকার রায়তের দায়- অধিকারের ভিত্তি ছিল পরগনার প্রচলিত প্রথা, রেওয়াজ, দস্তুর। প্রতিটি পরগনার জন্য ছিল নির্দিষ্ট খাজনার হার, যাকে বলা হতো পরগনা নিরিখ। জমিদার পরগনা নিরিখের অতিরিক্ত খাজনা দাবি করতে পারতো না বা দাবি করতো না। রায়তের এই সব প্রথাভিত্তিক অধিকার অস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত

২৯. Resolution of the Governor General in Council, 29 April 1859, *Bengal Government Proceedings* (Council).

হয় নি। কিন্তু জমিদার ভূসম্পত্তির মালিকানাবলে পরগনা নিরিখ পদদলিত করে রায়তের খাজনার হার বৃদ্ধি করেছে। জমিদারের এই ধরনের আচরণ কখনো রায়তশ্রেণী মেনে নেয় নি। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে জমিদার-রায়ত সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি ঘটে।

১৮৫৯ সালের রাজস্ব আইন-এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি অধিকার ক্ষুণ্ন না করে যতোটুকু সম্ভব রায়তের পূর্বঅধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তবে আগের মতো রায়তকে খোদকাশতা ও পাইকাশতা শ্রেণীতে বিভক্ত না করে রায়তের অধিকার সংজ্ঞায়িত করার জন্য এদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয় :

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে যারা অপরিবর্তিত হারে খাজনা দিয়ে আসছে, তাদের খাজনা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাবে না (ধারা ৩) এবং জমি থেকে তাদের উৎখাত করা যাবে না। এরা চিরস্থায়ী রায়ত।

২. যারা এক নাগাড়ে কমপক্ষে বারো বছর জমি ভোগদখল করে আসছে, তারা স্থিতিবান রায়ত (occupancy raiyat)। তাদের খাজনা বাড়ানো যাবে, তবে জমির সম্পদ বৃদ্ধি না পেলে বা মুদ্রাস্ফীতি না ঘটলে খাজনা বাড়ানো যাবে না। নিয়মিত খাজনা প্রদান করলে তাদেরকে উৎখাত করা যাবে না (ধারা ৬)।

৩. যারা বারো বছরের কম জমির ভোগদখলে আছে বা যারা খুবই অস্থায়ী, তারা অস্থিতিবান রায়ত (non-occupancy raiyat)। তারা জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজা (tenants-at-will)। তাদের খাজনা কারণ দর্শানো ছাড়াই বাড়ানো যাবে এবং নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে তাদের উৎখাত করা যাবে (ধারা ৮)।

দশম আইনে মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপূর্ব রায়ত সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বেকার মুকারারি ও মিরাসি রায়ত প্রথম শ্রেণী, খোদকাশতা রায়ত দ্বিতীয় শ্রেণী এবং পাইকাশতা রায়ত তৃতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। দশম আইনে প্রথম শ্রেণীর রায়তের প্রথাভিত্তিক অধিকার এখন আইনগত বৈধতা লাভ করলো। প্রথম শ্রেণীর রায়ত এখন প্রকৃত অর্থে প্রায় মালিক। জমিদারের মতো এদের প্রদেয় খাজনাও এখন চিরস্থায়ীভাবে ধার্য হয়ে গেল। কিন্তু অধিকারের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রায়তের কিছুটা অবনতি ঘটেছে, কেননা মুদ্রাস্ফীতি বা সম্পদবৃদ্ধির কারণ দর্শিয়ে খাজনা বাড়ানোর ক্ষমতা জমিদার লাভ করলো। বর্ধিত খাজনা প্রদানে ব্যর্থ হলে রায়তকে উৎখাত করার অধিকারও পেলো জমিদার। বলা বাহুল্য যে, একজন ভূস্বামীর পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি বা ভূমির মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে খাজনা বৃদ্ধি করা দুঃসাধ্য কিছু ছিল না। দশম আইনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ পূর্বেকার পাইকাশতা রায়ত। আগে বিপুল সংখ্যক রায়ত পাইকাশতা মর্যাদায় চাষাবাদ করতো অর্থনৈতিক কারণে। জমি যখন মানুষের তুলনায় অঢেল ছিল তখন দরকষাকষি করে রায়তেরা যেখানে কম খাজনায় ভাল জমি চাষ করতে পারতো সেখানেই গমন করতো। স্থিতিশীল বা খোদকাশতা রায়ত গ্রাম-গ্রামান্তরে গিয়ে চাষ করতো না বলে দরকষাকষির সুবিধা তার ছিল না। অতীতে এদের উপর খাজনার হার

ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে জমি ও মানুষের অনুপাত ছিল প্রায় সমান সমান । জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার হারও বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত খাজনার ভার বহন করে অস্থিতিবান রায়ত। অচিরেই দেখা যায় যে, স্থিতিবান রায়তের চেয়ে অস্থিতিবান রায়ত অধিক হারে খাজনা প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছে। তদুপরি স্থিতিবান রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করা কঠিন বলে অস্থিতিবান রায়ত যেন স্থিতিবান হতে না পারে সেজন্য ভোগদখলের বারো বছর অতিক্রম করার আগেই ভূস্বামী কর্তৃক তাকে উৎখাত করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

১৮৫৯ সালে খাজনা আইন পাশকালে সরকারি আলোচনায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, এই আইন রায়তের হাতে পুঁজিসঞ্চয়ে সহায়ক হবে, কেননা এই আইন রায়তের উদ্বৃত্তের প্রতি হাত বাড়ানো থেকে জমিদারকে বিরত রাখবে।[৩০] কিন্তু বাস্তবে এই আইন প্রণীত হয়েছে ক্রমবর্ধমান কৃষক-অসন্তোষ প্রশমিত করার জন্য। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মধ্যস্বত্ব বিকাশের ফলে গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অধিকাংশই প্রজাও বটে। প্রজা হিসেবে তারা জমিদারকে বাড়তি খাজনা দিতে প্রস্তুত নয়। খাজনা বাড়াবার জমিদারি প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও তাদের আছে। গ্রামীণ প্রধান হিসেবে তাদের প্রভাব অনেক। এই প্রভাবশালী গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব জমিদারশ্রেণীর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করে। এই উঠতি প্রভাবশালী মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃতি দেবার উপলব্ধি থেকেই খাজনা আইন ১৮৫৯ প্রণীত হয়। এই আইনে যাদের খাজনা অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করা হয়, তারা মূলত মধ্যস্বত্বাধিকারী রায়ত। এদেরকে সুবিধাভোগী শ্রেণীতে উন্নীত করা ছিল একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন, কারণ তাদের নেতৃত্বে জমিদারবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর টমসন-এর (১৮৮৩) কথায় :

> সরকার তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হলো যখন দেখা গেল যে, ভূস্বামীদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষককুল একটি গ্রামীণ বিদ্রোহের পরিবেশ সৃষ্টি করলো এবং বিদ্রোহের পথ থেকে তাদের বিরত রাখার জন্যই খাজনা আইন ১৮৫৯ সালে প্রণয়ন করা হলো যেন ভূস্বামীগণ যথেচ্ছভাবে খাজনার হার বৃদ্ধি করতে না পারে।[৩১]

কিন্তু এই আইন প্রকৃতপক্ষে জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধি করা এবং বলপূর্বক খাজনা আদায় করার প্রবণতা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই আইনের অধীনে সুবিধা পায় শুধু মিরাসি ও মুকারারি রায়ত নামে কথিত ধনী জোতদারশ্রেণী, যারা খাজনা আইনের বলে

৩০. *Proceedings of the Legislative Council of India*, January-December, 1859, Vol 5, (Calcutta 1859), 221-30.

৩১. Speech of Sir Rivers Thompson at the Legislative Council of India, 13 March 1883.

জমিতে প্রায় স্থায়ী মালিকানাস্বত্ব লাভ করে। এই সুবিধা প্রদান করেই সরকার তাদেরকে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করে ভূস্বামীশ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করলো। সরকারের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিল। জোতদারশ্রেণী বিদ্রোহের পথ পরিহার করে ভূস্বামীশ্রেণীর সাথে সমঝোতা ঘোষণা করে এবং নেতৃত্বহীন সাধারণ কৃষকশ্রেণী আগের মতোই ভূস্বামী শ্রেণীর শোষণ-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়।[৩২]

স্বাভাবিক কারণেই ভূস্বামী-রায়ত সম্পর্কের কোন উন্নতি হয় নি। জোতদারশ্রেণী নেতৃত্ব হারালেও অচিরেই রায়তশ্রেণীর মধ্যে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠে এবং পুনরায় দেশের কৃষিসম্পর্কে এমন অবনতি ঘটে যে, সরকার অবশেষে বাধ্য হয় কৃষকের অধিকারসংক্রান্ত একটি অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। ১৮৭৯ সালে একটি Rent Commission গঠন করা হয়। কৃষিসম্পর্কের সার্বিক অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রদান করে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয় ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এই আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদারি শোষণ বন্ধ করা এবং কৃষকের উদ্বৃত্ত যেন হাতছাড়া না হয়ে পুঁজিতে পরিণত হয় সে পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে (১৮৮৫) নিম্নবর্ণিত ধারাসমূহ সন্নিবেশ করা হয় :

১. যেসব রায়তের খাজনার হার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কখনো বাড়ানো হয় নি, তাদের খাজনা ভূস্বামীগণ ভবিষ্যতেও আর বৃদ্ধি করতে পারবেন না।

২. বারো বছর বা ততোধিক বছরের উর্ধ্বে ভোগদখলকার রায়তের খাজনার হার শুধু তখনই বাড়ানো যেতে পারে, যখন জমিদার আদালতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবে যে তার নিজস্ব উদ্যোগ ও বিনিয়োগের ফলেই জমির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এহেন পরিস্থিতিতে খাজনা বৃদ্ধি করলেও সে বৃদ্ধির হার অবশ্য সমগুণের পার্শ্ববর্তী জমির খাজনার হার অতিক্রম করতে পারবে না।

৩. স্বল্পমেয়াদি বা কুর্ফা রায়তের খাজনার হার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে বৃদ্ধি করা যাবে না।

৪. কুর্ফা রায়ত ব্যতিরেকে বাকি সব শ্রেণীর রায়ত প্রথা অনুসারে জমি হস্তান্তর করতে পারবে, তবে প্রতি হস্তান্তরের জন্য জমিদারকে নির্দিষ্ট হারে সেলামি প্রদান করতে হবে।

ভূমিতে রায়তের স্বত্বের প্রশ্ন বিচার করলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনকে অবশ্যই একটি বড় মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা যায়। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনের অভিজ্ঞতা এই আইনকে অনেকাংশে সাহায্য করেছে এবং বলা যায় যে, এই আইন ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে। তবে প্রজাস্বত্ব আইন পাশের পরও রায়তঅর্থনীতি জমিদারঅর্থনীতির নাগপাশে আবদ্ধ থাকে। যেমন, প্রজারা বৃক্ষ কর্তন করতে পারে না, যদিও রোপণ করতে পারে; জমিদারের অনুমতি ব্যতিরেকে জমি বন্ধক বা হস্তান্তর করতে পারে না; পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারে না; পুকুর, দিঘি খনন করতে পারে না।

৩২. Chittabrata Palit, *Tensions in Bengal Rural Society*, 1830-1860, (Calcutta 1975), 190.

এইসব সীমাবদ্ধতা কৃষিঅর্থনীতিকে আড়ষ্ট করে রেখেছে গণ্য করে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন অনুসারে জমিদারের অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই প্রজা জমিহস্তান্তরের অধিকার লাভ করে, কিন্তু জমিদারকে হস্তান্তরের জন্য সেলামি প্রদানের নিয়ম বলবৎ থাকে। এই সংশোধিত আইনে প্রজা জমিদারের সম্মতি ছাড়াই বৃক্ষ কর্তন, পাকা বাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন প্রভৃতির অধিকার লাভ করে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে আরেক দফা সংশোধনী আনা হয় ১৯৩৮ সালে, যখন জমিহস্তান্তরের জন্য জমিদারকে সেলামি প্রদানের নিয়ম বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলে প্রজা জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করলো। এইসব আইনের ফলে জমিদারি ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে এর কার্যকারিতা হারালো।

ভূমিতে প্রজার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সনাতন ভূমিনিয়ন্ত্রণকাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভূমিনিয়ন্ত্রণে জমিদারের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন হয় মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী সৃষ্টির ফলে। তেমনি প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে স্বত্বাধিকারী সমাজও পরিণত হয় একটি অনর্জিত আয়নির্ভর উপজীবী শ্রেণীতে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী উভয় শ্রেণীই খোলসসর্বস্ব সত্তায় পরিণত হয় ১৯৩৮ সালের সংশোধনীর পর। তবে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষকশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কৃষিঅর্থনীতির উপর এর প্রভাবের দিক দিয়ে সুদূরপ্রসারী।

আগে জমি হস্তান্তর অবৈধ ছিল বিধায় কৃষকশ্রেণীর মধ্যে ভূমিহীনতার সমস্যা কখনো প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। কৃষিউদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করা হতো কৃষি সম্প্রসারণে বা অন্যান্য ভূমিউন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে। কিন্তু ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার পর কৃষিউদ্বৃত্ত জমিক্রয়ে ব্যয়িত হতে থাকে। এর ফলে কৃষক একদিকে যেমন উৎপাদন খাতে কৃষিউদ্বৃত্ত বিনিয়োগ না করে অনুৎপাদনশীল ভূমিক্রয়ে বিনিয়োগ করতে থাকে, অন্যদিকে কৃষকশ্রেণীর দুর্বল অংশ ভূমিনিয়ন্ত্রণ থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন রায়তে পরিণত হতে থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এইসব ভূমিহীন কৃষক অস্তিত্ব রক্ষা করে বর্গাদার বা দিনমজুর হিসেবে।[৩৩] ভূমিহীনতার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে অর্থনৈতিক মন্দা ও দুর্ভিক্ষের সময়, যখন প্রান্তিক কৃষক জমি বিক্রয় করে বা বন্ধক দিয়ে অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস পায়। এর ফলে কৃষিভূমি নিয়ন্ত্রণে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইশহাক জরিপে (১৯৪৪-৪৫) দেখা যায় যে, মাত্র শতকরা ষোল ভাগ কৃষকপরিবার গড়ে পাঁচ একরের অধিক জমি নিয়ন্ত্রণ করে, আর বাকি সবাই ছিল প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার বা দিনমজুর।[৩৪] ধনী কৃষকেরা অবশ্যই পুঁজিবাদী

৩৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন , Benoy B. Chaudhury, "The Process of Depeasantization in Bengal and Behar, 1885-1947", *Indian Historical Review*, 2:1 (1975), 105-65; Partha Chatterjee *Bengal 1920-1947. The Land Question* (Calcutta 1984), section 12

৩৪. H S M. Ishaque, *Agricultural Statistics by Plot-to-Plot Enumeration* in *Bengal*, 1944-45, Part-I (Alipore 1946), 49-50, আরো দেখুন, Atiur Rahman, "Peasant Differentiation in Bangladesh, 1950 to 1980s", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 32 1 (1987), 70-72.

বিকাশে এগিয়ে আসে নি। পূর্বেকার জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর মতো সদ্য গজিয়ে উঠা ধনী কৃষকেরও পুঁজিবাদী বিনিয়োগে ছিল অনীহা। এর কারণ অনেক। তবে এখানে আমরা শুধু একটি সমস্যা আলোচনা করবো। সেটি হচ্ছে খাজনা।

'খাজনা' ও কৃষিঅর্থনীতিতে এর প্রভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাগণ মহাপরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন এবং খাজনা এই পরিবর্তনের একটি অনুঘটক হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। খাজনা কিভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে এ নিয়ে তাঁরা তত্ত্বালোচনাও করেন। তাঁদের মতে, সংগৃহীত খাজনায় উদ্বৃত্ত পুঁজি আকারে ভূমিউন্নয়নে বিনিয়োজিত হলে কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে খাজনার হার বৃদ্ধি করে জমিদার প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারবে। জমিতে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে খাজনা ছাড়াও আয়বৃদ্ধির অন্যান্য উৎস সৃষ্টি হতে থাকবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। বৃটিশ ভূস্বামীদের মতো এদেশের জমিদারেরা উন্নয়নমুখী পুঁজিবাদী ভূস্বামীতে পরিণত হতে পারে নি, যদিও খাজনার হার বৃদ্ধি করা হয়েছে কয়েক গুণ। এই ব্যর্থতার জন্য অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায় যে, জমিদার কর্তৃক সংগৃহীত খাজনার উদ্বৃত্ত জমির চেয়ে অন্য খাতে অধিক মুনাফা ও নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করার সুযোগ বিদ্যমান ছিল। ভূমিউন্নয়ন ছিল অতিশয় ব্যয়বহুল এবং বিনিয়োজিত টাকার লাভ ছিল খুবই অনিশ্চিত ও সময়সাপেক্ষ। অপরপক্ষে মহাজনি, শস্য মজুতদারি, কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি ব্যবসায় একদিকে যেমন লাভের হার ছিল অনেক গুণ বেশি, অন্যদিকে পুঁজির নিরাপত্তাও ছিল সমধিক। তাছাড়া কৃষকখামারকে ভেঙে পুঁজিবাদী খামারে রূপান্তরিত করা বা গোটা কৃষকখামারকেই পুঁজিবাদী খামারে রূপ দেয়া সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছিল একটি অবাস্তব ও অলীক চিন্তা। জমিদার কর্তৃক পুঁজিবিনিয়োগের বিকল্প সুযোগগুলির মধ্যে একটি অতি লাভজনক পন্থা ছিল সেলামির বিনিময়ে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করা এবং পুঞ্জীভূত সেলামির অর্থ ভূমিউন্নয়নে বিনিয়োগ না করে লাভজনক ব্যবসায় খাটানো। এভাবেই বর্ধমানের মহারাজা রাজস্ব বিক্রয় আইন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং কালে একজন মহাধনী ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন।

কৃষিঅর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে জমিদারদের ব্যর্থতা সরকারকে নতুনভাবে পুঁজিবাদী রূপান্তর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে বাধ্য করে। কিন্তু কিভাবে রূপান্তর আসবে? কৃষিঅর্থনীতির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, খাজনা আকারে জমিদার যদি কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করতে না পারে এবং এর ফলে কৃষকের হাতে যদি পুঁজি তৈরি হয়, তাহলে ঐ পুঁজি তারা কৃষি এবং গবাদি পশুর উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে। কৃষকের অনুকূলে এই চিন্তার মূলে ছিল আসলে দেশব্যাপী

জমিদারবিরোধী অসন্তোষ এবং সমকালীন বৃটিশ উদারনৈতিক মনোভাব। ১৮৫৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হবার ফলে রায়তশ্রেণী অধিকারের দিক দিয়ে ক্রমশ এমন শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, বিশ শতকের শুরু থেকে জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষকের উদ্বৃত্ত কৃষকের হাতেই থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এবার দেখা যেতে পারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে কি হারে খাজনা সংগৃহীত হয়েছে এবং কৃষিঅর্থনীতিতে এর কি প্রভাব পড়েছে। বিশেষকরে আমরা লক্ষ্য করবো প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার পর কৃষকের হাতে পুঁজি সৃষ্টি হয়েছিল কিনা, না হলে কেন সৃষ্টি হয় নি। প্রকৃত 'খাজনা'র সহজ সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। আসলে তা প্রজা কর্তৃক ভূস্বামীকে প্রদেয় নানা ধরনের জমা, যার বর্গীয় নাম খাজনা। এর রকম ছিল অনেক, যেমন নগদ খাজনা, শস্য খাজনা, স্থিরীকৃত খাজনা, অস্থিরীকৃত খাজনা, চাকরান বা সার্ভিস খাজনা, শ্রম খাজনা, রেওয়াজি খাজনা, বর্গা খাজনা, জিরাতি খাজনা, চুক্তি খাজনা, আবওয়াব বা চাঁদা খাজনা, তুহুরি খাজনা বা ঘুষ খাজনা, এমনকি লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর খাজনা। খাজনার ধরন থেকে ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। খাজনার বৈচিত্র্য ছাড়াও এর হারও ছিল বিভিন্ন। একই জেলা, একই পরগনা, এমনকি একই মৌজার ভিতরেও খাজনার হার মোটেও এক ছিল না। কারণ খাজনার হার নির্ভর করতো জমির গুণের উপর নয়, জমিদার-প্রজা সম্পর্কের উপর। মকারারি, মিরাসি, খোদকাশতা, পাইকাশতা প্রভৃতি রায়ত একই মানের জমির জন্য খাজনা দিত ভিন্ন হারে, কারণ জমিদারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল ভিন্ন ধরনের। ভূ-স্বত্বের ধরনের উপরও নির্ভর করেছে খাজনার হার, যেমন একই মানের জমির খাজনার হার এস্টেটভেদে ভিন্ন ছিল। সাধারণত সরকারি এস্টেটের গড় খাজনার হার জমিদারি এস্টেটের চেয়ে বেশি ছিল; আবার জমিদারি এস্টেটের মধ্যে ওয়ার্ড এস্টেটের খাজনার হার খাস এস্টেটের চেয়ে বেশি ছিল; আবাদ এস্টেটের খাজনার হার পুরনো জমিদারির চেয়ে বেশি ছিল; পুরনো জমিদারি এস্টেটের চেয়ে নতুন জমিদারির খাজনাহার বেশি ছিল। তাই দেখা যায় যে, উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলির বেশিরভাগই পরিচালিত হয়েছে নব্য জমিদারদের বিরুদ্ধে। অনুপস্থিত জমিদারদের এস্টেটের চেয়ে আবাসিক জমিদারদের এস্টেটের খাজনার হার ছিল বেশি। সুতরাং খাজনার হারে পরিবর্তন দেখানোর জন্য কোন বিশেষ জেলা বা পরগনা বা মৌজাকে বেছে নিলে একপেশে চিত্র বেরিয়ে আসতে বাধ্য। সে চিত্র থেকে খাজনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

যাহোক, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন মোতাবেক পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় জরিপ ও বন্দোবস্তের দলিলপত্র থেকে খাজনা বিষয়ে অনেক তথ্য মেলে।[৩৫] ইতিপূর্বে

৩৫. Such notes and observations of the Settlement Officers have been recorded in classified forms in Record Series called *Village Notes* and *Village Statistics* now reserved at the concerned district Collectorate Record Rooms

হান্টারের পরিচালনায় একটি জেলাওয়ারি তথ্যানুসন্ধান জরিপ হয়েছিল, যার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় *A Statistical Account of Bengal* (২০ খণ্ড)। সরকারপরিচালিত খাসমহলগুলির ব্যবস্থাপনা দলিলপত্র থেকেও খাজনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।[৩৬] অনুরূপ নির্ভরযোগ্য তথ্য ওয়ার্ড এস্টেটের দলিলপত্র থেকেও পাওয়া যায়। এইসব উৎস থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, অন্তত টাকার নিরিখে খাজনার হার খুব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয় না। জমিদারগণ খাজনার হার বৃদ্ধির চেয়ে নতুন আবাদের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন এমন প্রচুর তথ্য মেলে। সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্টসমূহে সার্ভে-অফিসারগণ প্রায় সকলেই মতপ্রকাশ করেছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দিকে প্রজার উপর খাজনার যে বোঝা ছিল, উনিশ শতকের শেষ সিকিতে এসে তা অনেকাংশে হালকা হয়ে আসে। কৃষিপণ্যের মূল্য এবং ভূমির উৎপাদন যতো বেড়েছে খাজনার হার ততো বাড়ে নি। অনুমান করা যায় যে, খাজনার হারের আপেক্ষিক স্থবিরতা এবং একই সময়ে মূল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এক শ্রেণীর কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা কালেক্টরেটের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৮২৮ সালে একই রকমের জমির বিঘাপ্রতি খাজনার হার ছিল ঢাকা জেলায় টা. ৩-২-০, বাখরগঞ্জ জেলায় টা. ২-১৩-১২, কুমিল্লা জেলায় টা. ২-৭-১৬, দিনাজপুর জেলায় টা. ১২-১৮, নোয়াখালী জেলায় টা. ২-১২-১৭ এবং যশোর জেলায় টা. ২-৯-৮।[৩৭] ১৯৪০ সালে এইসব জেলার গড় খাজনার হার উপরোক্ত হারের চেয়ে খুব বেশি নয়[৩৮], অথচ ইতিমধ্যে মূল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বেড়েছে অনেক গুণ। ১৮৭৩ সালে জে. সি. চার্লস ঢাকা জেলার খাজনার উপর একটি প্রতিবেদনে বলেন :

> সরেজমিনে তদন্তকালে আমি দেখে বিস্মিত হলাম যে, এই জেলার কৃষকেরা যা উৎপাদন করে তার সিংহভাগ নিজেরা ভোগ করে। অনেক সূক্ষ্মভাবে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি যে, স্থিতিবান কৃষকেরা তাদের গোটা উৎপাদনের মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগ খাজনা হিসেবে ভূস্বামীকে দিয়ে থাকে।[৩৯]

খাজনা সম্পর্কে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন জে. সি. জেক। বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন তিনি। সময়ের ব্যবধানে কিভাবে খাজনার বোঝা হালকা হয়ে বিশ শতকে প্রায় নামমাত্র হয়ে গেল, এ সম্পর্কে জেক বলেন :

৩৬. For quality of these records see Akinobu Kawai, *'Landlords'and Imperial Rule. Change in Bengal Agrarian Society, 1885-1940*, 2 Vols, (Tokyo 1986)

৩৭. Sirajul Islam, *Rent and Raiyat: Society and Economy of Eastern Bengal, 1859-1928*, (Dhaka 1989), 20

৩৮. Motaharul Huq, *Final Report on the Revisional Survey and Settlement Operations in the District of Bakarganj,1940-42*, (Dacca 1953), 57-59.

৩৯. Cited in Nariaki Nakazato, *Agrarian Structure* in the Dacca Division of Eastern Bengal 1870-1905, (Unpublished Ph D thesis at Calcutta University, 1985), 397-98.

টাকার মাপকাঠিতে বর্তমানে একজন কৃষক একরপ্রতি গড়পড়তা যে পরিমাণ ফসল ভূস্বামাকে দিয়ে থাকে, পঞ্চাশ বছর আগে এর তুলনায় দিত অনেক বেশি। পাট এবং অন্যান্য অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ফলে কৃষকের খাজনার ভাব অনেক কমে গেছে। মূল্যবৃদ্ধির বদৌলতে যে খাজনা ১৮৬০ সালে ছিল কৃষকের জন্য জুলুমপ্রায়, ১৯১৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে অতিশয় নগণ্য হয়ে গেলো। সংরক্ষিত হিসাবপত্র থেকে বোঝা যায়, এই জেলায় ১৮৬০ সালে গড়পড়তা একরপ্রতি খাজনার হার ছিল গোটা উৎপাদনের বাজারমূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ, ১৮৮০ সালে তা ছিল ১২ ভাগ এবং ১৯১৪ সালে মাত্র ৬ ভাগ।[৪০]

আর. সি. দত্ত প্রায় পঁচিশ বছরকাল রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন যে, রায়তের খাজনাবৃদ্ধির হার মূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। তিনি মন্তব্য করেন, "আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, জমিদার-গণ যে হারে খাজনা সংগ্রহ করে তা মোদ্দা ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ বা আরো কম।"[৪১] পার্বতী চরণ রায় তাঁর দীর্ঘ রাজস্বঅভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করেন যে, রায়তের খাজনাভার ক্রমেই কমছে। তিনি অনুমান করেন, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার খাজনার হার যথাক্রমে মোদ্দা ফসলের পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ মাত্র।[৪২]

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, খাজনাকাঠামো নিয়ে আলোচনায় কোন সুনিশ্চিত মন্তব্য করা ঝুঁকিপূর্ণ। তবে খাজনার বিস্তারিত চিত্র প্রদান পরিপূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, খাজনার হার বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির অনেক পশ্চাতে ছিল। ফলে খাজনার ভার ক্রমেই হালকা হয়ে আসে। পাটচাষ, দু-ফসল উৎপাদন এবং ব্যাপক পতিত-আবাদের ফলে কৃষকের যে আয় বৃদ্ধি পায়, এর অতি কম অংশের উপরই জমিদার হাত বাড়াতে পেরেছে। বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন এবং বর্ধিত খাজনা পরিশোধে রায়তের অনীহা ও প্রতিরোধের মনোভাব জমিদারকে বল্গাহীনভাবে খাজনাবৃদ্ধি করা থেকে বিরত রাখে। ফলে, যে খাজনা ছিল এককালে রায়তের জন্য বিরাট বোঝা, ১৯৪০-এর দশকে এসে তা নামমাত্রে পরিণত হয়। তা হলে প্রশ্ন জাগে, কৃষকের হাতের উদ্বৃত্ত আয় গেল কোথায়? এই জিজ্ঞাসার কারণ আমাদের সকলের এই অবগতি যে, কখনো কৃষিঅর্থনীতিতে স্থবিরতা লক্ষণীয়ভাবে কাটে নি। অতএব, কৃষকের উদ্বৃত্ত কোথায় বিলীন হলো—এ অনুসন্ধিৎসা অতি স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠে।

নাকাজাতো এ প্রসঙ্গ তুলে ব্যাখ্যা দেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হতে পারে যে, খাজনার হার প্রকৃত অর্থে হ্রাস পাওয়ার ফলে কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু

৪০. J. C. Jack, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District*, 1904 to 1914, (Calcutta 1916), para 74

৪১. Romesh C. Dutt, *Open Letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessment in India* (London 1900), 60-61

৪২. Parbati Charan Roy, *The Rent Question* (Calcutta 1876), 8-12

আসলে কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার ভিন্ন ফন্দি ভূস্বামীরা উদ্ভাবন করে নিয়েছিল।[৪৩] ১৮৬০ ও ৭০-এর দশকের ব্যাপক কৃষকঅসন্তোষ, প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫, ১৯২৮) প্রভৃতি থেকে ভূস্বামীরা উপলব্ধি করতে পারে যে, খাজনাবৃদ্ধির মাধ্যমে জমিদারি আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা রায়তেরা সহজে মেনে নেবে না। খাজনার ব্যাপারে রায়তেরা স্পর্শকাতর হলেও অন্যান্য আদায় সম্পর্কে এদের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। এর সুযোগ নিয়ে জমিদারেরা আবওয়াব, সেস, সেলামি প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পত্তনি ও অন্যান্য কায়েমি স্বত্ব সৃষ্টি করে সেলামির নামে ধনী কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ ছিল একটি অন্যতম কৌশল। ভূমিহস্তান্তরের জন্য সেলামি দিতে হতো। সুতরাং কৃষকের উদ্বৃত্ত আগে হরণ করা হতো খাজনার মাধ্যমে এবং বিশ শতকের শুরু থেকে হরণ করা হয় কায়েমি স্বত্ব ও ভূমিহস্তান্তর বাবদ সেলামির মাধ্যমে। জমির মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ নামজারি সেলামি হিসেবে গ্রহণ করা হতো এবং আনুপাতিক হারে অন্যান্য সেস আদায় করা হতো।

ভূমিহস্তান্তরের অধিকার প্রাপ্তির পূর্বে কৃষকের উদ্বৃত্ত ব্যয়িত হতো কৃষি- সম্প্রসারণে। এখন সে উদ্বৃত্ত ব্যয়িত হয় ভূমিক্রয়ের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে। ভূমিহস্তান্তরের অধিকার পাওয়ার ফলে কোন কারণে অভাবগ্রস্ত হলে কৃষক তার জমি বিক্রি করে অর্থাগমের ব্যবস্থা করে। ফলে ভূমিহস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক সমাজ-কাঠামোয় দেখা দেয় বৈষম্য। অনটন-দুর্ভিক্ষের সময় সে বৈষম্যপ্রক্রিয়া বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয়। যেমন ত্রিশের মহামন্দা ও তেতাল্লিশের মহাদুর্ভিক্ষের সময় ভূমি- হস্তান্তরের মাধ্যমে বৈষম্য এমন বৃদ্ধি পায় যে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ব্যাপকহারে ভূমিহীনে পরিণত হয় এবং তাদের জমি হস্তান্তরিত হয় গ্রামের মুষ্টিমেয় জোতদার-মহাজনের হাতে।[৪৪] এমনিভাবে নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো কৃষিকাঠামো ভেঙে গিয়ে গ্রামীণ সমাজ ধনী কৃষক ও ভূমিহীন বর্গাদার এই দুই মেরুতে পুনর্বিন্যস্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় জমিদারি বন্দোবস্ত এর পূর্বকল্পিত পুঁজিবাদী সম্ভাবনা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। যৌক্তিকভাবেই এই বন্দোবস্ত ১৯৫০ সালে বিলুপ্ত হয় এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই এই বিলুপ্তি গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি।

৪৩. Nakazato, *Agrarian Structure*, 399.

৪৪. Ratan Lal Chakraborty, *Rural Indebtedness in Bengal 1935-1947*, (Unpublished Ph.D. thesis at the University of Dhaka, 1988), 73.

১১

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

বিনয়ভূষণ চৌধুরী*

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগেও বাংলায় কৃষিপণ্যের বাজার ছিল। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ছিল সীমিত। প্রাক-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-অর্থনীতি এবং বিশ্ববাজারে বাংলার অবস্থান ব্যাপক আকারে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সহায়ক ছিল না। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির লেনদেন এবং নির্দেশনা বাংলায় একটি নতুন অবস্থার সূচনা করে, যার ফলে বিভিন্নভাবে ব্যাপক আকারে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই অধ্যায়ে আমরা বাণিজ্যিকীকরণের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনাসহ তার ফলাফলও বিশ্লেষণ করবো। কৃষিঅর্থনীতির উপর বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এখানে বাংলা বলতে পুরনো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বোঝাচ্ছে, যেখানে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন হয়েছিল।

কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের ক্রমবিকাশ নির্দিষ্ট কতগুলো পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে চা, রেশম, আফিম, নীল, আখ ও পাট উল্লেখযোগ্য। আমরা বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের উপর বিশেষভাবে নজর দেবো, যেখানকার দুটো বিশেষ অর্থকরী পণ্য ছিল পাট ও নীল।

তা ছাড়া এ সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। এ পর্যায়ে কতিপয় প্রশ্ন হলো— কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে কৃষকরা কিভাবে জড়িত হলো ? অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি তাদের স্বাধীনতা ছিল ? অথবা তা কি কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল ? যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন উঠে,

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থকরী ফসল আবাদের ক্ষেত্রে চাষীদের ভূমিকা, সামাজিক কাঠামো এবং কৃষক-অর্থনীতিতে এর কতখানি প্রভাব ছিল ?

কতগুলি কৃষিপণ্যের বাজারে চাহিদার সঙ্গে কৃষকদের প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নগুলি সঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিভাবে এই বাজারের উৎপত্তি ও উন্নয়ন হলো সেটাও অনুসন্ধানের বিষয়। অবশ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি বিশ্লেষণের পূর্বে ঔপনিবেশিক যুগে এর অবস্থা কি ছিল তা নির্ণয় করা দরকার।

সর্বপ্রথম আমরা চায়ের কথাই ধরি। শুরুতে সংক্ষেপে এর উৎপাদনের ইতিহাসটি তুলে ধরা যাক। চা উত্তরবঙ্গ ও আসামে উৎপন্ন হতো। আমাদের পর্যালোচনায় চা অন্যান্য পণ্যের চেয়ে ভিন্নধর্মী। বেতনভোগী শ্রমিক কর্তৃক এর চাষ হতো। ১৮২৪ সালে আসামে চা আবিষ্কারের পর এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব ১৮৩০-এর দশকে প্রথম অনুভূত হয়। এই শিল্পে প্রথম সরকারই পূর্ণ মাত্রায় বিনিয়োগ আরম্ভ করে এবং এর কারণ ছিল ইংল্যান্ড ও চীনের মধ্যে আফিম প্রশ্নে সংঘর্ষের সম্ভাবনা, যার ফলে জনপ্রিয় চীনা চায়ের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডে তখন চা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় ছিল। যাহোক, সরকার অচিরেই চা আবাদের উদ্যোগ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ১৮৪০ সালে চা সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নবপ্রতিষ্ঠিত আসাম টি কোম্পানির উপর ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে এই শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর করেছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ এই শিল্পটি ছিল একচেটিয়াভাবে ইউরোপীয়দের করায়ত্ত।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের সঙ্গে অন্যান্য দেশের চায়ের প্রতিযোগিতা ছিল এবং তন্মধ্যে চীনা চা অন্যতম। কিন্তু অচিরেই ভারতীয় চা বাজারে বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। ১৮৫০ সালের শেষদিকে চীনা চায়ের একচেটিয়া আধিপত্য ঘুচে যায়। ভারতীয় চায়ের রপ্তানি ১৮৪৭ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে বিশেষভাবে বেড়ে যায়। ১৮৫৮-৫৯ এবং ১৮৭৬-৭৭ সালে এটা আরো বাড়ে।[১] তখন থেকে প্রবৃদ্ধির হার মাঝে মাঝে উঠানামা করে, যার কারণ ছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রায় ৪৫ শতাংশ চাষবৃদ্ধি।

চা-বাজারের উত্থান সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয় নি, যদিও এর শুরুটা শুভই হয়েছিল। কারণ, এর জন্য মূলধন-ভূমি-শ্রম যোগানোর ক্ষেত্রে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন চা-চাষের জন্য অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চেয়ে অধিক মূলধনের প্রয়োজন ছিল, তখন ব্যক্তিগত মালিকানায় এর দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে এর যোগান ছিল কম। তাছাড়া ভারতীয় চায়ের বাজারের ভবিষ্যৎ এতখানি আশাপ্রদ ছিল না যে, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ততোটা আকর্ষিত হবে। যাহোক, ক্রমে মূলধন বিনিয়োগ-

১. Romesh Dutt, *Economic History of India in the Victorian Age, 1837-1901*, 5th edition, (London), 351

সমস্যার সমাধান হতে থাকে, কারণ এর সিংহভাগ সরকারের ইউরোপীয় কর্মকর্তাগণ যোগাতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকেও মূলধনের একটা বিশেষ অংশ আসতে থাকে।

চা-চাষে ভূমির প্রাপ্যতার কোন অসুবিধা ছিল না, কারণ প্রচুর পতিত জমি চাষের আওতায় আনা হয়। তবে সরকার যেখানে উচ্চ খাজনায় রায়তি স্বত্বের উপর জোর দিতে থাকে এবং বিশেষ সময়ের মধ্যে পতিত জমি উদ্ধারের উপর জোর দেয়, সেখানে চা-উৎপাদকগণ নামমাত্র মূল্যে ভূমির মালিকানা চাচ্ছিলেন। তাদের মতে, এর ফলে চায়ের বাজার আরো সম্প্রসারিত হবে এবং লন্ডনের বাজার থেকে এখানে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া অপর্যাপ্ত শ্রমশক্তির যোগান ছিল আরো একটি গুরুতর সমস্যা।

চা-চাষ ছিল শ্রমভিত্তিক এবং বহুকাল ধরে অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে চা উৎপাদিত হতো। ফলে চাষের জন্য পর্যাপ্ত শ্রম যোগান ছিল অনিশ্চিত। এমনকি আসামের গতানুগতিক কৃষির ক্ষেত্রেও শ্রমের স্বল্পতা ছিল লক্ষণীয়। স্থানীয় খাজনা আদায়কারীগণ বৃটিশ বিজয়ের পর (১৮২৬) যতোটুকু সম্ভব চাষ এবং সরকারের খাজনা-আয় বৃদ্ধির জন্য চা রোপণকারীদের দ্বারা স্থানীয় শ্রম বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করলেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর চা-উৎপাদকদের অসুবিধা আরো বৃদ্ধি পায়, কারণ এ সময়ে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ধান এবং অন্যান্য অর্থকরী শস্য, যেমন সরিষা, পাট ও তামাক চাষের উৎসাহ আরো বেড়ে যায়, যার ফলে পুরনো কৃষির ক্ষেত্রে শ্রমের ব্যতিক্রমধর্মী চাহিদার সৃষ্টি হয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশের বিস্তার এবং ইউরোপীয় মূলধনের ব্যাপক বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিবিস্তার এবং চা-চাষ বৃদ্ধির ফলে অসুবিধাগুলি আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষকদের মনোভাবের পিছনে একটা কারণ ছিল। ভাড়া করা শ্রম ইংরেজদের বিজয়ের পূর্বে প্রায় অজ্ঞাত ছিল, অথবা কাছাড়ী বা অহিন্দু অন্যান্য অনুন্নত উপজাতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল, যাদেরকে ভূমিদাস হিসেবে গণ্য করা হতো এবং যারা উন্নত শ্রেণীর মুক্তবৃত্তির অহিন্দুদের চাইতে ঘৃণ্য হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তাছাড়া যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বাইরে থেকে শ্রম আমদানিও সম্ভব ছিল না।

শ্রমসমস্যাব সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কতগুলো অসুবিধার জন্য চা-উৎপাদকেরাই দায়ী ছিল। ১৮৬৫-৬৬ সালের সঙ্কট এটা প্রমাণ করে। ১৮৫৯-৬০ সালে চায়ের প্রতি অতিআকর্ষণ এবং অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশার ফলে অপরিকল্পিতভাবে চা-চাষের বিস্তার ঘটে। এর ফলে এক্ষেত্রে ফটকাবাজি বিনিয়োগ শুরু হয় এবং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই শিল্পের একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন না করে অধিক মুনাফা লাভের জন্য শুধুমাত্র ক্রয়–বিক্রয় করা। অযোগ্য ব্যবস্থাপনায় এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের হিড়িকে যোগ্যতা যাচাই না করেই ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা

হতো। এই হিড়িকে নিম্নমানের চা-উৎপাদনের জন্য এর সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। ১৮৬৫-৬৬ সালে সর্বপ্রথম চায়ের বাজারদর হঠাৎ কমে যায়, ফলে লন্ডনে অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং বাণিজ্যের মন্দা দেখা দেয়।

এই সঙ্কটের জন্য ভারতীয় চা-শিল্পে অবশ্য বড় একটা অবনতি ঘটে নি। তবে ফটকাবাজারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দূরদর্শী চা-রোপণকারীগণ শেষ পর্যন্ত টিকে যায়, এমনকি প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ার কারণে শ্রম এবং ঋণবাজারের অপর্যাপ্ততার মধ্যেও তাদের অবস্থা আরো শক্তিশালী হয়। এই সঙ্কটের শেষে চা-শিল্পের উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

আমাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র চাষীরাই মূলত মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং প্রয়োজনীয় মূলধনের কিছু অংশ অন্যান্য শ্রেণীর কাছ থেকেও আসে। এর মধ্যে আফিমেব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। আফিম উৎপাদন ও বিক্রির সমুদয় নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারের হাতে। এর চাষাবাদ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল ছিল সরকারের উপর।[২]

বৃটিশ শাসনের পূর্বে এদেশে স্বল্পমাত্রায় আফিমচাষ ছিল। আগে যেখানে এর ব্যাপ্তি পাটনা ও তার নিকটবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে এ সংক্রান্ত বাণিজ্যসম্পর্ক বৃটেন, চীন ও ভারতের মধ্যে প্রসারলাভ করে। তখন মূল প্রশ্ন ছিল বৃটেন কর্তৃক চীনা চা ও রেশম (এবং মূলত চা) ক্রয়ের জন্য অর্থ যোগান। বৃটিশ পণ্যের চাহিদা চীনে কম ছিল এবং বৃটেনের ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে ক্রমাগত কম লাভের পরিপ্রেক্ষিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনা চা আমদানিতে মনোনিবেশ করে। চীনে রৌপ্য আমদানি দ্বারা এই সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান সর্বদা সম্ভবপর হয় নি । ১৭৭৯ ও ১৭৮৫-এর মধ্যে ইউরোপ থেকে রৌপ্য আমদানি হ্রাস পেলো, যখন আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলো এবং এর ফলে দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও বৃটেনে রূপার স্বাভাবিক যোগান কমে যায়।

ভারতীয় দু'টি পণ্য কাঁচা তুলা ও আফিম রপ্তানি এই অবস্থার ফলপ্রসূ সমাধান দেয়। চীন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তুলা উৎপন্ন করলেও সেদেশ আংশিকভাবে ভারতীয় তুলার উপর নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তার নিজস্ব ফসলহানি না ঘটলে ভারতের উপর নির্ভর করতে হতো না। তাছাড়া চীনে তখন আফিমের ব্যবহার বেড়ে যায়। দূরপ্রাচ্যের বাজারে বাংলার আফিমব্যবসার উন্নতি হওয়ার পশ্চাতে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা লন্ডনে প্রেরণ এবং আরেকটি কারণ আফিম বিক্রির মাধ্যমে কলকাতা নিলামবাজারে ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব আদায়।

২. Benay Chaudhuri, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal, 1757-1900,* (Calcutta 1964), Vol I, Chapter I

আফিমচাষের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সরকার এর চাষ বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট ছিল না এবং সবচেয়ে ভাল জমিতে এর চাষ হতো, যদিও সরকার এ থেকে বেশি রাজস্ব আদায় করতে চাইতো। কারণ যতোদিন পর্যন্ত বাংলার আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা অক্ষুণ্ন থাকবে, ততোদিন স্থিতিশীল রাজস্বপ্রাপ্তির ব্যাপারে সরকার নিশ্চিত ছিল। চীনে ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য এর দাম বেড়ে যায়, যার ফলে কলকাতা নিলামবাজারেও এর প্রভাব পড়ে।

অতিমাত্রায় মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সরকার সীমিত আফিমচাষের নীতি পরিহার করতে বাধ্য হয়। বাংলার আফিমের মূল্য চীনের বাজারে এত বেড়ে যায় যে, সেখানকার ভোক্তারা অন্য কোন সূত্রে তা পাওয়ার জন্য তৎপর হলো (১৭৯৮-৯৯ সাল থেকে ১৮১৬-১৮১৭ সালের মধ্যে এর বাজারমূল্য শতকরা ৩৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়)। শীঘ্রই এর বিকল্প আবির্ভূত হলো, যা বাংলার আফিমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। এটি 'মালওয়া আফিম' নামে পরিচিত, যা মালওয়া ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশে এবং রাজপুতনার দেশীয় রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হতো। সেসব স্থানে বিপুল পরিমাণে এর চাষের কারণ ছিল মারাঠা ও পিণ্ডারী ভীতির অবসান, আফিমের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং মুক্তভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা।

বাংলার আফিমের একচেটিয়া আধিপত্যজনিত ভীতিপ্রদ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এর চাষ বাড়ায় নি, বরং বিভিন্ন উপায়ে তা রোধ করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে একটি ছিল বাজার থেকে ক্রেতা হিসেবে বিশেষ পরিমাণে মালওয়া আফিম ক্রয় করা এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে সেখানকার শাসকদের সহায়তায় এর চাষ বন্ধ করা। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি, কারণ দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ বৃটিশ সরকারকে অনেক সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করলেও তাদের স্ব স্ব রাজ্যের অর্থনৈতিক কারণে সে প্রতিশ্রুতি থেকে তাঁরা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এরপর সরকার বাংলার আফিম আবাদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে যাতে বাংলার আফিম পূর্বদেশীয় বাজারে কিছুটা সহজলভ্য হয় এবং তার হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়। ১৮২৮-২৯ ও ১৮৩৮-৩৯ সালের মধ্যে আফিমচাষ শতকরা ১২২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১৮৩০-এর দশকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো আফিমব্যবসার প্রতি চীন সরকারের উত্তরোত্তর শত্রুভাবাপন্ন হওয়া। আফিমব্যবসার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা কলকাতার ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আফিমের বাজারে অনিশ্চয়তাসহ লন্ডনের মুদ্রার বাজারে মন্দা দেখা দেয়। ফলে কলকাতার নিলামবাজারে আফিমের দর অনেক গুণ কমে যায়, যার ফলে ১৮৩৭ সালে এক বাক্স আফিমের দাম ১৩২১ রুপী থেকে ৫৩৬ রুপীতে নেমে আসে। ১৮৪০ সালে আফিমযুদ্ধ আরম্ভ হলে এই সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়। ১৮৩৮-৩৯ ও ১৮৪১-৪২ সময়কালে আফিমচাষ শতকরা ২৫.৭ ভাগ হ্রাস পায়। যুদ্ধে বৃটিশ শক্তির

বিজয়ে আফিমের বাজারে লোকসান পরে পুষিয়ে নেয়া হয়। ফলে ১৮৪২-৪৩ ও ১৮৪৫-৪৬ সময়ের মধ্যে এর চাষ আবার ১৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

চীনের বাজারে বাংলার আফিমের চাহিদা স্থিতিশীল হওয়ার পর সরকার এর চাষ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো যাতে আফিম থেকে রাজস্বের পরিমাণ একই পর্যায়ে থাকে। সরকার কেবল 'সঙ্কীর্ণ' মনোভাবের বশবর্তী হয়ে রাজস্বের পরিমাণ রক্ষায় নিমগ্ন ছিল না, ঐ সময়ের বৃহত্তর অর্থনৈতিক কারণে কিছু স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা নেয়ার উদ্দেশ্যও কর্তৃপক্ষের ছিল। তবে আফিমের ব্যাপক চাষাবাদও সরকারকে বিব্রত করেছিল। বাজারের চাহিদার চেয়ে বেশি উৎপাদন আফিমের মূল্য কমিয়ে দেবে এবং তাতে রাজস্বও কমে যাবে এ ভয় সরকারের ছিল। আফিমের কম উৎপাদনের ফলে চীনে রপ্তানি হ্রাস ছিল একটি বড় ধরনের বিপদ, যার ফলে চীনে স্থানীয়ভাবে আফিমের ফলন শুরু হয় এবং বাংলার আফিমের একচেটিয়া স্থান বিনষ্ট হয়। সরকারের স্বাভাবিক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল আফিমচাষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আফিমের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া। ১৮৪৫-৪৬ ও ১৮৬০-এর মধ্যবর্তী সময়ে সরকার আফিমচাষীদের বিশেষ উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে চাষবৃদ্ধির ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিল। ঐ সময়ে বাজারে আফিমের স্বল্প চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলায় সমসাময়িক কিছু ঘটনা সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। তখন ইক্ষুচাষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সরকারের সংশয় ছিল যে, অধিক মূল্যের জন্য আফিমচাষ বৃদ্ধি পেলে জমি ইক্ষুচাষের পরিবর্তে আফিমচাষের জন্য ব্যবহৃত হবে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে সরকার তথ্য প্রকাশ করে যে, প্রচুর পরিমাণে আফিম বিক্রয়ের ফলে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ রুপী বাজারে হাতবদল হয়, যার ফলে ব্যবসা ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ১৮৪৮ সালে বাণিজ্যিক সঙ্কটের সময়ে চীনে আফিমের সীমিত চাহিদার কারণে সরকারের আফিমচাষ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটে।

তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, সরকারের এরকম সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও চাষীরা ১৮৪৫-৪৬ ও ১৮৫৩ সালে আফিমের চাষ শতকরা ৫২ ভাগ বাড়িয়ে দেয়। এর কারণ চিনি ব্যতীত রপ্তানিযোগ্য অন্যান্য পণ্যের বাজার তখন অতি মন্দা ছিল। এমনকি খাদ্যপণ্যের মূল্য কোন কোন স্থানে হ্রাস পায়, যদিও তুলনামূলকভাবে সন্নিহিত কিছু অঞ্চলের (যেমন উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ) তুলনায় বাংলা ও বিহারে এই হ্রাস তেমন লক্ষণীয় ছিল না।

সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) পরে যখন কৃষিমূল্যে ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে দ্রব্যমূল্য ও মজুরি হঠাৎ বেড়ে যায়, তখন কৃষকদের আফিমচাষের উৎসাহে ভাটা পড়ে। বিদেশী বাজারে চাহিদা এবং বিশাল ইউরোপীয় সৈন্যদলের উপস্থিতি তৈলবীজ, খাদ্যশস্য ও আলুচাষের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির ফলে আফিমচাষের ব্যয় বেড়ে যায়। ১৮৩০ সাল থেকে যেসব নতুন চাষী আফিমচাষের দিকে ঝুঁকে পড়ে,

তারা পুরনো আফিমচাষীদের (কোয়েরী) চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাগতদের মধ্যে রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও অন্যদের শ্রমিক ভাড়া করতে হতো, কারণ বর্ণগত বিধিনিষেধের জন্য তাদের মেয়েরা মাঠে কাজ করতে পারতো না।

এভাবে আফিমচাষ সর্বত্র কমে যায় এবং ১৮৫৩-৫৪ সাল ও ১৮৫৮-৫৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ আফিম আবাদ কমে যায়। দেশে আফিমচাষের এই হ্রাসপ্রাপ্তি এবং চীনে আফিমচাষ বৃদ্ধির ফলে সরকার চাষীদের মূল্য প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি করে। বস্তুত নিম্নমানের জমি, যা আফিমচাষের জন্য অনুপযোগী ছিল, তাও এর চাষের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত এর চাষ ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

শীঘ্রই এর একটি প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। আফিমচাষের ক্রমবর্ধনশীলতার ফলে বাজারে এর মজুদ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা দেখে সরকার ১৮৬৪ সালে চাষীর মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ কমিয়ে দেয়। এভাবে মূল্যনির্ধারণের মাধ্যমে চাষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৮৮৭-৮৮ সালে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। আফিমের এজেন্টদের কড়া নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেন কম লাভজনক স্থানগুলো ত্যাগ করে, অসন্তোষজনক উৎপাদকদের আর আগাম না দেয় এবং বড় শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিম্নমানের আবাদ বন্ধ করে দেয়। এভাবে অবাঞ্ছিত আফিমচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

আফিমচাষের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এর উপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে নীলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নীলচাষের উদ্যোগ ছিল একচেটিয়াভাবে ইউরোপীয়দের। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো কিভাবে ইউরোপীয় নীলকররা নীলচাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল, যা ক্ষুদ্রচাষীদের উৎপাদন থেকে পৃথক ছিল। অপরদিকে বিহারের জেলাসমূহে আফিমচাষের প্রচলন বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। স্বল্পকালের জন্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গে নীলচাষ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর অনুকূল প্রভাব পড়ে।

নীলচাষের প্রবৃদ্ধি ছিল উৎসাহজনক। এর কারণ হচ্ছে, নীল একটা নতুন ফসল ছিল এবং বাণিজ্যিকভাবে নীলচাষের জন্য ইউরোপীয়দের উদ্যোগ নেবার কোন ভিত্তি ছিল না। কতগুলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর চাষের উন্নতি ঘটে, যেমন আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধি এবং গতানুগতিক উৎস, যেমন পশ্চিম ভারত, উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এর সরবরাহ হ্রাস। রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ১৭৪০ সাল নাগাদ নীল প্রতিষ্ঠালাভ করে এর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী *ওয়াড*-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর যুদ্ধে জড়িত শক্তিগুলোর সৈন্যদের নীল পোশাক উৎপাদনের জন্য নীলের ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। আমেরিকার স্বাধীনতালাভের পর আমেরিকা থেকে এর সরবরাহ কমে যায়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীলউৎপাদকরা কফি ও তুলা উৎপাদন আরম্ভ করে এবং ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে ঐসব স্থানে নীলচাষ প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায়।

বাংলাদেশ ধীরে ধীরে নীল সরবরাহের উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বহির্বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাংলার বস্ত্রদ্রব্যের ব্যবসায় মন্দার ফলে নীল ব্যবসার মাধ্যমে আয়ের বিকল্প উৎস খুঁজে পেলো। বিভিন্নভাবে কোম্পানিসরকার ইউরোপীয় নীলকরদের সাহায্য করে। আর্থিক অনটনের সময়ে অর্থ ধার দেয়া ছাড়াও উত্তর ভারত থেকে মুক্ত আমদানি রোধ করে বাংলার নীলচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। এর ফলে প্রথমত উত্তর ভারতীয় নীল বাংলার নীল থেকে দামে সস্তা থাকায় বেশি বিক্রি হতো, দ্বিতীয়ত নিম্নমানের হলেও উত্তর ভারতীয় নীল বাংলা নীল নামে কলকাতা থেকে রপ্তানি হতো। বাংলার নীলকরদের আরো অনেক অসুবিধা ছিল। জটিল ভূমিব্যবস্থার জন্য তারা সঠিক জমি চাষের জন্য পেতো না এবং আইনত জমির মালিক হতে পারতো না। নীলের মতো একটা নতুন শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল মূলধনের, যা কখনো সৃষ্টি হয় নি, কারণ এ শিল্পে কৃতকার্য নীলকরেরা তাদের স্ব স্ব উপার্জন ও লাভ নিয়ে দেশে ফিরে যেতো এবং বোর্ড অব ট্রেডের মতে নিঃস্ব ও সম্বলহীন ব্যক্তিরা আবার তাদের স্থলাভিষিক্ত হতো।

পরবর্তীকালে বাংলার নীল ১৮১০ সালের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর মতে, বাংলার নীল ইউরোপের চাহিদা মেটাতো এবং তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকার সম্ভাবনা ছিল না। বাংলার নীলের প্রবৃদ্ধির কালে এর উৎপাদন ১৭৮৮-৮৯ সালে ৪৯৫২ ফ্যাক্টরি মণ থেকে ১৮২৯-৩০ সালে ১৩২৯৪৯ ফ্যাক্টরি মণে উন্নীত হয়।

নীলের প্রবৃদ্ধি বাধাহীনভাবে ঘটে নি। এর উত্থান-পতনও ছিল। এই প্রবৃদ্ধি সর্বপ্রথম ঘটে যখন বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাজারে দ্রব্যের সরবরাহ সম্পর্কে কাল্পনিক ধারণার প্রসার ঘটে। বাংলায় ১৭৮৮-৮৯ সালে ৪৯৫২ মণের স্থানে ১৭৯৫-৯৬ সালে ৬২৫০০ মণ নীল উৎপন্ন হয় এবং লন্ডনের বাজারে তা থেকে শতকরা ৬৭ ভাগ সরবরাহ যায়। ঐসব অবস্থায় নীলের চালান ছিল পর্যাপ্ত। ১৭৯৬-৯৭ সালে লন্ডনে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে নীলের দাম কমে যায়। ফলে বাংলায় নীলচাষ ১৭৯৭-৯৮ ও ১৭৯৮-৯৯ সালের মধ্যে ৫৬ শতাংশ হ্রাস পায়। কেবল ১৮০৪-০৫ সালে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ১৭৯৫-৯৬ সালের প্রায় সমপরিমাণ হয়। তারপর এর স্বল্পকালীন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮০২-০৩ ও ১৮০৮-০৯ সালের মধ্যে এর উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নেপোলিয়ন কর্তৃক মহাদেশীয় অবরোধ আরোপের ফলে এই প্রবৃদ্ধির ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৮০৪-০৯ সাল ছিল বাংলার আফিমব্যবসার সবচেয়ে প্রতিকূল সময়। ১৮০৮-০৯ ও ১৮০৯-১০ সালের মধ্যে নীলচাষ শতকরা ৫৪ ভাগ হ্রাস পায়। যাহোক, যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সেই সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য শুরু (১৮১৩) হলে নীলচাষের প্রসার ঘটে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৮১০-১৪ থেকে ১৮১৫-১৬ এই দুই বছরে নীল উৎপাদন প্রায় ৫৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

যাহোক, নীলচাষের নতুন উদ্যোগ ছিল দুর্বল। নতুন নীলকরেরা ছিল ভাগ্যান্বেষী। তারা কলকাতার এজেন্সিহাউজসমূহ থেকে প্রচুর অর্থ ঋণগ্রহণ করতো। তাদের অনেকেরই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং তারা তাদের ঋণদাতাদের সহানুভূতি হারায়। এই ধরনের উদ্যোগ সফল করার জন্য যে প্রযৌক্তিক ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক দক্ষতা থাকা দরকার তা তাদের ছিল না। ফলে নীল উৎপাদন কমে যায়। তবে অচিরেই নীলের বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠে। বিভিন্ন কারণে ১৮২০-এর দশকে নীলচাষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে নীল রপ্তানির মাধ্যমে লন্ডনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মুনাফা প্রেরণের সরকারি সিদ্ধান্ত। নীল আবাদ এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, নীলচাষ ও নীলকর-নীলচাষী সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮২৩ সালে একটি রেগুলেশন (ষষ্ঠ রেগুলেশন) প্রণীত হয়।[৩]

১৮২৬ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে দু'টি কারণে এই শিল্পের দারুণ অবনতি ঘটে। কারণ দু'টি হচ্ছে ১৮২৬ সাল থেকে ইংল্যান্ড ও বাংলায় অর্থনৈতিক মন্দা এবং ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে প্রধান এজেন্সিহাউজগুলোর অকৃতকার্যতা। অর্থনৈতিক মন্দা নীলবাজারকে অত্যধিক নিস্তেজ করে ফেলে এবং এজেন্সিহাউজগুলোর অবসান নীলকরদের বিনিয়োগের সুযোগ রুদ্ধ করে দেয়। অতএব ১৮২৬ থেকে ১৮৩১-৩২-এর মধ্যে নীলচাষ প্রায় ১৯.৫ শতাংশ হ্রাস পায়। নীলকরদের দুরবস্থার কারণে নীল আবাদ হ্রাসের পরিমাণ আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল। অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে এর রপ্তানির পরিমাণ ১৮২৮-২৯ ও ১৮৩৯-৪০ সালের মধ্যে কম ছিল।[৪]

দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দা শেষ হওয়ার পর নীলশিল্পে আবার ১৮৩৯-৪০ থেকে ১৮৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৫২-৫৩ থেকে ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত ছয় বছরে গড়ে এর বাৎসরিক উৎপাদন ১৮৩৯-৪০ থেকে ১৮৪৪-৪৫ পর্যন্ত ছয় বছরের তুলনায় শতকরা ২০.৫ ভাগ কম ছিল। নীলশিল্পের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এই হ্রাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। এজেন্সিহাউজগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিনিয়োগের জন্য অর্থ যোগান দেয়ার যে অসুবিধা দেখা দেয় তার সমাধান হয় ১৮২৯ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনবলে ইউরোপীয় নীলকরদের জমিতে স্বত্বাধিকার দেয়া হয় এবং এর ফলে নীলশিল্পের ভিত্তি আরো শক্ত হয়।

---

৩. Benay Chaudhuri, *Growth of Commercial Agriculture*, 149-52.

৪. K. N Chaudhuri, "India's Foreign Trade and the Cessation of the East India Company's Trading Activities, 1828-1840", *The Economic History Review*, No 2 (1966).

চাষীদের প্রতিরোধ নীলব্যবসা হ্রাসের কারণ ছিল না। কেবল ১৮৫৯-৬০ সালে ব্যাপক নীল বিদ্রোহ এবং এর পরও পুনঃ পুনঃ নীলকরদের সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ নীলচাষের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই শিল্পের ক্রমাবনতির কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমাগত নীলের চাহিদা হ্রাস। বিশেষকরে ১৮৪৫-৪৬ সালে ১৮৪১-৪২ সালের তুলনায় মূল্য শতকরা ২০.৪ ভাগ কমে যায়। লন্ডনের বাজারে ১৮২২ থেকে ১৮২৬ সালে মূল্যবৃদ্ধির সময়ে এর মূল্য মণপ্রতি ২২০ রুপী থেকে ২৮০ রুপীর মধ্যে উঠানামা করতো এবং ১৮৪১-৪২-এর মন্দার সময় তা ১৯৬ রুপীতে পড়ে গেল এবং ১৮৪৬-৪৭-এর পর কোন সময়েই এর মূল্য ১৬০ রুপীর উপরে উঠে নি। আসলে নীলশিল্পের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল ১৮৫৯-৬০ সালের কৃষক বিদ্রোহ। এই সঙ্কটে নীল রপ্তানিতে দ্রুত নিম্নগতির ফলে রপ্তানির পরিমাণ ১৮৫৫ সালের ১২৩৫৫২ মণ থেকে ৬৮৭১০ মণে নেমে আসে অর্থাৎ শতকরা ৪৪.৩ ভাগ উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৮৬৮-৭৪ সালে যশোরে এর চাষ অর্ধেক কমে যায়।[৫] রংপুরে পশ্চিমা শিল্পপতিরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যারা নীল ব্যবসায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিল।[৬] রাজশাহীর কুঠিসমূহের মধ্যে যেগুলোর পানি সরবরাহের পরিমাণ কম ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

নীলশিল্প থেকে ইউরোপীয় মূলধন প্রত্যাহার করার ফলে অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনারের মতে, শিল্পপতিরা চায়ের মতো পণ্য উৎপাদনে বেশি আগ্রহী হয়, কারণ এতে ঝুঁকি ছিল কম এবং নীলের চেয়ে লাভ ছিল বেশি। ১৮৭৬ সালে ঢাকার কমিশনারের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী চার বছর থেকে নীলচাষ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৭] ঢাকাতেও এর চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কেবল একটা কুঠি তখন সীমিতভাবে কাজ করছিল। ফরিদপুরে ১৮৬১ সালে নীলচাষের পরিমাণ প্রায় ৫০ ভাগ হ্রাস পায়।

বাংলায় দেশীয় উদ্যোক্তাদের নীলচাষে ক্রমবর্ধমানভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। রাজশাহীর কমিশনার বলেন যে, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী ছাড়া অন্যত্র সব ব্যবসা স্থানীয় লোকদের হাতে ছিল এবং তা খুব স্বল্প মূলধন দ্বারা পরিচালিত হতো।[৮] ১৮৭৩ সালে রংপুরের ডেপুটি কালেক্টর অনেক লোককে তিনশ' বা চারশ' রুপী পুঁজি নিয়ে নীল ব্যবসা করতে দেখেছেন। কয়েকজন প্রভাবশালী জমিদারও এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। বাংলার জমিদারদের এই উৎসাহ বেশিদিন টেকেনি। রাজশাহীতে অনেকের কোন লাভই হয় নি

৫. Benay Chaudhuri, 'Growth of Commercial Agriculture in Bengal and its Impact on the Peasant Economy", *The Indian Economic and Social History Review*, VII : 1 (1970), 46.

৬. ঐ।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. ঐ, ৪৭।

এবং নিরাশ হয়ে তারা তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দেন। নীল ব্যবসার মন্দার সময়ে স্বল্প বিনিয়োগকারী প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রংপুরের স্থানীয় কুঠিগুলিতে প্রস্তুতকৃত নীল ছিল নিম্নমানের এবং তা স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হতো।

অপরদিকে বিহারে নীলচাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৪০-এর দিকে আখচাষ থেকে তাদের আকর্ষণ নীলের দিকে চলে যায় এবং তাদের মূলধন আখচাষের পরিবর্তে নীলচাষের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। ১৮৫০-এর দশকে নীল আখের স্থান দখল করে নেয় এবং নীলচাষ ইউরোপীয়দের বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ১৮৫৯-৬০-এর বিদ্রোহের পর বাংলাদেশ থেকে মূলধন বিহারের নীলশিল্পে স্থানান্তর করা হয় এবং রাসায়নিক রং তখনো উক্ত শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি। ১৮৯০-এর পরে এর ফলাফল অনুভূত হয়। ১৮৮৮ সালে কলকাতার কাস্টমস কালেক্টর মন্তব্য করেন, "নীল সকল প্রকার রাসায়নিক রং থেকে উন্নত"। কিন্তু যখন রাসায়নিক রং-এর বিপণন শুরু হয় তখন বিহার এবং বাংলার নীল এর সঙ্গে কোন প্রকার প্রতিযোগিতায় আসতে পারে নি।

আফিম, নীল ও পাটের (এ সম্পর্কে পরে আলোচিত হবে) মতো বাংলার রেশম কখনই আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ স্থান অধিকার করে নি। ইউরোপে এর একটা ক্ষুদ্র অংশ রপ্তানি হতো। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রেশমের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং এর পরই তা হ্রাস পেতে থাকে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির মতো এর চাহিদা কমতে থাকলেও অভ্যন্তরীণ বাজারে এর চাহিদ অক্ষুণ্ন থাকে। রেশমগুটির মূল খাদ্য তুঁত গাছের পাতা। তাই সময়ে সময়ে তুঁতচাষের উৎপাদনে তারতম্যের ফলে রেশমের ফলনে তারতম্য ঘটে এবং এর প্রভাব পড়ে বাজারমূল্যে।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বাংলার রেশমের একটি আন্তর্জাতিক বাজার ছিল। বলা যায়, তুলাশিল্প ছাড়া রেশমই ছিল বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রপ্তানিপণ্য। পলাশীর পর রেশম উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির দীউয়ানি লাভের পর রপ্তানিবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। ১৭৬৮ সালে বাংলা সরকারের কাছে কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয় কোম্পানি যেন রেশম রপ্তানির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত রাজস্ব স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে কোম্পানি কাঁচা রেশমের ব্যবসার প্রসার ঘটায়। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স বুঝতে পেরেছিল যে বৃটেনে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কাঁচা রেশমেরও চাহিদা বাড়বে।

বাংলা সরকার রেশম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরে অল্প সময়ের জন্য বাংলা সরকার কর্তৃক তুঁতচাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু লোকসংখ্যাহ্রাসের কারণে হঠাৎ তুঁতচাষ কমে যায়। দুর্ভিক্ষের পরে চাষীদের পুনরায় দুর্ভিক্ষভীতি তুঁতচাষ বৃদ্ধিতে তাদের অনীহা সৃষ্টি করে। সরকার তুঁতচাষে সরাসরি কোন মূলধন বিনিয়োগ করে নি। সরকার কেবল স্বল্প হারে খাজনা নির্ধারণ করেছিল যেন চাষীরা পতিত জমি তুঁতচাষের জন্য আবাদ করে। তুঁতচাষ বেড়ে গেল ঠিকই, তবে তা সরকারের আশানুরূপ বাড়ে নি। এর কারণ, উৎপাদকরা

রেশমবাজারের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে এতটা আস্থাশীল হতে পারে নি। অতএব তুঁতচাষে বিনিয়োগ করতে তারা অনিচ্ছুক ছিল। তারা নির্বিচারে যেকোন স্থানেই তুঁতচাষ করতো না। এজন্য উপযুক্ত জমি সেগুলোই ছিল, যেগুলোর অবস্থান ছিল প্লাবনসীমার উপরে। বাজারের অনিশ্চয়তার জন্যই মূলত ১৭৭৯ থেকে ১৭৮৫-এর মধ্যে তুঁতচাষ হ্রাস পায়। কোম্পানি আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য রেশমশিল্পে বিনিয়োগ বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। এর মূল কারণ ছিল ১৭৮১ ও ১৭৮২ সালে ইউরোপীয় রেশমবাজারে মন্দাভাব এবং ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৫ সালের খাদ্যসঙ্কটের বছরগুলোতে বাংলায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি, যার ফলে পুরনো তুঁতচাষীরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কাঁচা রেশমের গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা চলতে থাকে, যার জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন ছিল। দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত রেশম ইংল্যান্ডে তৈরি কতগুলি বস্ত্রপণ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

রেশমের গুণগত মান উন্নয়ন কেবল সুতা গুটানো ও উন্নতভাবে পাকানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা তুঁতগাছের পাতা এবং গুটিপোকার গুণগত মানের উপরও নির্ভরশীল ছিল। অতএব সরকারের তৎপরতা কেবল তুঁতচাষীদের প্রয়োজনীয় অগ্রিম প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাছাড়া এটি উৎপাদনের কলাকৌশল তদারক করা হতো সেখানে, যেখানে শুধুই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হতো। চাষী ও অন্যরা পুরাদস্তুর তুঁতচাষে গুটিপোকার যত্ন নিত। গুটিপোকার যোগান দেয়ার ব্যবস্থা একটি মধ্যবর্তী দলের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুপযোগী প্রমাণিত হয় যখন অল্প সময়ের মধ্যে অনেক গুটিপোকা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হতো। ১৮১২ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থায় সরকারকে প্রতিযোগিতায় নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়তে হয় যার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায়। কীট বা তুঁতগাছ বাছাইয়ের উপর (রেশম পোকা যার পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে) কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যেজন্য রেশমের গুণগত মানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সরকারের প্রতি কোর্টের প্রস্তাব ছিল তারা যেন সরাসরি তুঁতচাষ এবং গুটিপোকা পালনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। রেশমের গুণগত মান উন্নত করার বিষয়ে সরকারের ভূমিকার মধ্যে চীনদেশ থেকে উন্নতমানের তুঁতচারা আনয়ন এবং রেশম গুটানোর উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন ছিল অন্যতম। শেষোক্ত বিষয়ে ইউরোপ থেকে আগত রেশমবিশেষজ্ঞরা মাঝে মধ্যে দেশীয় উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ দিত। ফলে বাংলার রেশমের গুণগত মান উন্নত হয়। নতুন নীতির ফলে তিন বছরের মধ্যে রেশম উৎপাদন শতকরা ৮০ ভাগ বেড়ে যায় এবং সেই ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলার রেশম ব্যবসায়ে যে ক্রমাগত স্থবিরতা দেখা দেয় তা ১৭৯২ থেকে ১৮১১ সাল পর্যন্ত রেশম রপ্তানির পরিমাণ থেকে বোঝা যায়।[৯]

---

৯. নিম্নে উল্লিখিত পাঁচ বছর মেয়াদি পর পর চারটি কালপর্বে রেশম রপ্তানির গড় বার্ষিক পরিমাণের গতি-প্রকৃতি থেকে এর মন্দার বিষয়টি স্বতঃপ্রতীয়মান—১৭৯২/৯৬ : ৪৮৩৬৮৭ পাউন্ড, ১৭৯৭/১৮০১ঃ ৩৭১০৭৭ পাউন্ড, ১৮০২/১৮০৭ঃ ৪৭৭১৯৫ পাউন্ড এবং ১৮০৮/১৮১১ঃ ৪৮১৩২০ পাউন্ড।

মহাসাগরীয় অবরোধ আরোপের ফলে ১৮১১ সাল থেকে রেশম ব্যবসার উন্নতি হয়, যখন ইতালি থেকে লন্ডনে রেশম আমদানি বন্ধ হয়ে যায় এবং বৃটিশ রেশম- ব্যবসা গভীর সঙ্কটে পড়ে। ফলে বাংলার রেশমের চাহিদা বেড়ে যায়। ১৮০৮- ১৮১২ সময়কালে বৃটিশ রেশমশিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটেন বাংলা সরকারের কাছে এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, শত্রুর খামখেয়ালি ও বিরুদ্ধ বাণিজ্যিক নীতির উপর নির্ভরশীল বৃটিশ উৎপাদকদের যেকোন অবস্থায় উদ্ধার করা উচিত। ১৮৩০-এর প্রথমদিকে বাণিজ্যিক মন্দার পূর্ব পর্যন্ত রেশমরপ্তানি বেশ উচ্চস্তরে ছিল। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ সালের মন্দার সময়ে রপ্তানি শতকরা ৩৩.৫ ভাগ হ্রাস পায়। ১৮৪০-এর দিকে এই নিম্নগতি রোধ হলেও বাংলার বাণিজ্যের স্থবিরতা অনেকদিন চলতে থাকে। ইতালি, ফ্রান্স, চীন ও জাপানের কাছে বাংলাদেশ তার রেশমের বাজার হারাতে থাকে।

উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে প্রতিপক্ষের গুটিপোকার চাষ ও লালন এবং রেশম গুটানোর পদ্ধতি অনেক উন্নত হওয়ায় বাংলার রেশম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাজয় বরণ করে। চীন ও জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরো তীব্র হয় সুয়েজ খাল নৌপথ হিসেবে খুলে যাবার পর, যখন ঐসব দেশ থেকে বর্ধিত হারে অধিকতর কম মূল্যে রেশম রপ্তানি আরম্ভ হয়।

ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাংলায় চায়ের ব্যবসার প্রসার ঘটে। ১৭৮৪ সালে বৃটিশ কম্যুটেশন এ্যাক্ট-এর বলে চীনের আমদানিকৃত চায়ের উপর ধার্যকৃত কর হ্রাস পায় এবং ফলে চায়ের ব্যবহার বাড়লে ইংল্যান্ড ও ইউরোপ মহাদেশে চিনির ব্যবহারও বেড়ে যায়। অপরদিকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশসমূহ, বিশেষকরে সেন্ট ডোমিনগো থেকে এর যোগান কমে যায়। দাসবিদ্রোহের (আগস্ট ১৭৯১) ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশেষকরে শ্রমিকসঙ্কটের আবর্তে সেখানকার চিনিব্যবসা খর্ব হয় এবং ইউরোপীয় বাজারে চিনির মূল্য বেড়ে যায়। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকের (১৫ মার্চ ১৭৯২) জেনারেল কোর্ট অব প্রোপ্রাইটার্স বাংলা সরকারকে অতি শীঘ্র এবং স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ পরিমাণ চিনি গ্রেট বৃটেনের ঘাটতি লাঘবের জন্য প্রেরণ করতে অনুরোধ করে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছুকাল নিম্নমুখী থাকার পর বাংলায় আখচাষ আবার চাঙ্গা হতে থাকে। চিনিব্যবসার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে দেয় অর্থ প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কোম্পানি ইক্ষুচাষে উৎসাহী হয়। কোম্পানির সরাসরি উদ্যোগের ধরন ছিল তিন প্রকার— জেলা অফিসারদের মাধ্যমে চাষীদের বাজার সম্পর্কে তথ্য প্রদান, জমিদাররা যাতে বেশি মুনাফা লাভের আশায় আখক্ষেত থেকে বেশি খাজনা আদায় না করে তা দেখার জন্য জেলা অফিসারদের আদেশ প্রদান এবং ইউরোপীয়দের উক্ত ব্যবসায় এই বলে উৎসাহ প্রদান যে, দেশীয় পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদন দ্বারা সম্প্রসারণশীল চিনির বাজারের চাহিদা

পূরণ করা যাবে না। তবে সরকার ইউরোপীয় উদ্যোগের উপর বেশি নির্ভরশীল হলেও তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং চিনিশিল্পের উন্নয়ন দেশীয় উদ্যোগেই হয়। বিদেশ থেকে ইক্ষুচারা এনে ইউরোপীয়রা সেগুলোকে এদেশীয় আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশ উইপোকার দ্বারা ধ্বংস হয়। যেসব উৎপাদক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনুসৃত ধারায় বিশেষকরে ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিল তাদের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে চিনির ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে ব্যবসাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়। ফ্রান্সের আমদানি- বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষকরে যুদ্ধরত নেদারল্যান্ড ঐ সময়ে ইউরোপে বাংলার চিনির সবচেয়ে বড় খরিদ্দার ছিল। ১৮০৪ সালে যেখানে এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৮৬১৯, সেখানে ১৮১১ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২৩৩৬ কিলোওয়াটে। কোম্পানি বাংলার চিনি ইউরোপের জন্য ক্রয় করা বন্ধ করে দেয়।

১৮১৩ সালে শান্তি স্থাপিত হওয়ার ফলে অন্যান্য পণ্যের মতো চিনিব্যবসার সম্ভাবনাও কিছুটা উজ্জ্বল হয়। নীলের জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধন চিনিশিল্পে স্থানান্তরিত হয়। কারণ চিনির বাজার নীলের থেকে বেশি স্থিতিশীল ছিল এবং তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উঠানামা থেকে বেশি নিরাপদ ছিল।

বাংলার চিনির বাণিজ্যে নানা অন্তরায় ছিল এবং নীলব্যবসার ন্যায় তা খুব দ্রুত উন্নত হয় নি। লন্ডনের বাজারে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনি বাংলার চিনির চেয়ে অনেক কম শুল্কে আমদানি করা হতো। ফলে প্রতিযোগিতায় বাংলার চিনিচাষীরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ১৮২৪ সালে বাংলার চিনির উপর শুল্ক শতকরা ১০০ ভাগ বেড়ে যায়। ১৮৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা (১৮২৯-৩০ ও ১৮৩৩-৩৪-এর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার চিনির ব্যবসা শতকরা ৫৫.৬ ভাগ হ্রাস পায়) শেষ হওয়ার পর ১৮৩৫-৩৬ সালে চিনি রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ঐ বছর বৃটেনে চিনির উপর শুল্কের একই হার ঘোষণা করাই এর মূল কারণ। ১৮৩৫-৩৬ থেকে ১৮৪৫-৪৬ সালের মধ্যে বাংলার চিনির রপ্তানি শতকরা ৮৩.৬ ভাগ বেড়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ টাকার পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮৪৮ সালে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, "নীলের চেয়ে চিনি অনেক মূল্যবান পণ্য, কারণ এই দেশে এর চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে নীল উৎপাদনের পরিমাণ থাকে সীমিত। আমরা নীল উৎপাদন করতে পারি বটে, কিন্তু সুবিধামতো বিক্রি করতে পারি না।"

১৮৪৬ সালে বিহারে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু উৎপাদকের উদ্যোগ যদি কৃতকার্য হতো, তবে বাংলার চিনিশিল্প হয়তো অনেকটা শক্তিশালী হতো। ১৮৩৩ সালে দাসপ্রথা রহিত হওয়ার ফলে উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৪৬ সালে বাণিজ্যিক বিপর্যয়ের

পর ভারতে তারা ভাগ্যপরিবর্তনের চেষ্টা করে এবং বিহারকে এ বিষয়ে ঘাঁটি হিসেবে বাছাই করে। এভাবে ১৮৪৬ সালে বিহারে চিনিশিল্পের বিকাশের জন্য অনেকে ঝুঁকে পড়ে এবং মরিশাসের একজন উৎপাদক তার সমুদয় মূলধন বিহারে বিনিয়োগ করে। অনেক মূলধন বড় বড় ইমারত, ব্যয়বহুল অথচ অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় হয়। তাছাড়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইক্ষুগাছকে এ দেশীয় আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অতএব চিনিশিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হতাশাগ্রস্ত উৎপাদকরা তাদের মূলধন চিনি থেকে সরিয়ে নিয়ে নীলে বিনিয়োগ করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলার চিনিব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর আন্তর্জাতিক বাজার হ্রাস। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বাংলার চিনি বিদায় নেয়। ইউরোপের সবচেয়ে উত্তম চিনিশিল্পের দ্রুত উন্নয়নই বাংলার চিনিশিল্পের সঙ্কোচনের প্রধান কারণ। ইউরোপের বিশাল চিনিশিল্পের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বীটচিনি বাজারজাত করার ফলে বাংলার চিনি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে নি।

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার চিনির বিশ্বব্যাপী চাহিদা থাকলো না।[১০] তাছাড়া উন্নতমানের চাষ এবং চিনি তৈরির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রস আহরণও এর অন্যতম কারণ ছিল। রপ্তানিক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্যে চিনি উৎপাদনকারী দেশের অবস্থান আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী হলো। অপরদিকে কলকাতা সরকার এদেশের শিল্পের উন্নয়নের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেয় নি। কেবল আমদানিকৃত শুল্করেয়াত লাভকারী চিনির উপর করারোপ করা হয়। যাহোক, মুক্তবাণিজ্যের ফলে বাংলার চিনির বাণিজ্যে যে ক্ষতি হয়েছিল এভাবে তার আংশিক পূরণ হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার চিনির চাহিদা কমলেও এখানে ইক্ষুচাষ কমে নি। বস্তুত এর পরিমাণ বেড়েছিল।[১১] এর কারণ ছিল খোদ ভারতেই অপরিশোধিত চিনির চাহিদা বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ চাহিদার স্থিতিশীলতা ছাড়াও ইক্ষুচাষের উন্নতির জন্য আরো কতগুলো অনুকূল অবস্থা কাজ করেছিল, যেমন বিহারে উন্নতমানের সেচব্যবস্থা, আখ মাড়াইয়ের উন্নততর ব্যবস্থা এবং নীলচাষ থেকে ইক্ষুচাষে মূলধন স্থানান্তর। ১৮৭৫ সালে শোন খাল নির্মাণের ফলে জলসেচব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। এর ফলে পাটনা বিভাগে ইক্ষুচাষের অনেক উন্নতি হয় এবং এবং চাষের জমির পরিমাণ ১৮৭৫ সালে ১৮০৪ একরের স্থলে ১৮৮০ সালে ২২০০০ একরে উন্নীত হয়।

ইক্ষু মাড়াইয়ের জন্য লৌহযন্ত্রের ক্রমাগত ব্যবহার কৃষিপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলা এবং বিহারে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শাহবাদ এস্টেটের অধিকারী টমসন ও মেইন

১০. A. K. Bagchi, *Private Investment in India, 1900-1939,* (1969), 360

১১. M. M. Islam, *Bengal Agriculture, 1920-1946,* (Cambridge 1978), 234.

'বেহিয়ামিল' নামে ক্ষুদ্র এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তা কল নামে পরিচিত পূর্বতন কারখানার স্থলাভিষিক্ত হয়। নতুন কারখানায় কাষ্ঠাধারের মধ্যে স্থাপিত বৃহদাকার যন্ত্র এক জোড়া বলদ দিয়ে ঘুরানো হতো। ইক্ষু ছোট ছোট করে কেটে কাষ্ঠাধারে রেখে যন্ত্রটি ঘুরিয়ে মাড়াই করা হতো। পুরনো কলের চেয়ে নতুন কল প্রায় তিনগুণ ইক্ষু মাড়াই করতে পারতো এবং তা একজন লোক দিয়েই করানো যেতো। যে রস পাওয়া যেতো তা ছিল অনেক পরিষ্কার এবং তা থেকে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ চিনি বেশি পাওয়া যেতো। প্রথম পর্যায়ে এই নতুন যন্ত্র কৃষকদের শ্রম সাশ্রয়ের উপায় হিসেবে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়। রাজশাহীর কমিশনারের মতে চিনি উৎপাদনের ব্যয় এর ফলে এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়।[১২]

পাট তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ফসল। অর্থকরী ফসল হিসেবে এর আবির্ভাব ১৮৫০-এর মাঝামাঝি দিকে। এর চাষে প্রবৃদ্ধির হার বেশি ছিল। অন্য কোন অর্থকরী ফসলের এরকম তুলনামূলক রেকর্ড নেই। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চেয়ে এর চাষ অধিক জমিতে হতো। উনিশ শতকের শেষে ইক্ষুচাষ ১৬০২০০ একর জমি দখল করেছিল। আফিমচাষ কদাচিৎ ৩.২০ লক্ষ একরের বেশি জমিতে হতো। রাসায়নিক রং নীল ব্যবসার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আগে ১৮৯০ সালের প্রথমদিকে ৬.৫ লক্ষ একর জমিতে নীলচাষ হতো। এমনকি শাহবাদ অঞ্চলেও ১৯১০ সালের দিকে নীলচাষের এলাকা শতকরা ৩ ভাগের বেশি ছিল না। যেখানে ইক্ষুচাষ সবচেয়ে বেশি হতো, সেখানে আফিমচাষ কদাচিৎ শতকরা ১ থেকে ৩ ভাগ ছিল। নীলের সবচেয়ে বেশি আবাদি এলাকা, যথা সরণ, মোজাফফরাবাদ, চম্পারণ এবং দ্বারভাঙ্গায় যথাক্রমে মোট আবাদি এলাকার শতকরা ৩.৪৫, ৫.৬২, ৬.৬৩ এবং ৩.০৮ এলাকায় নীলচাষ হতো। দশ বছরে চাষের বার্ষিক হার (১৮৯১-৯২ থেকে ১৯০০-১৯০১) ছিল ২০৩০৫৪৮ একর। ১৯০১-০২ সালে রংপুর, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকার সম্পূর্ণ আবাদি জমির যথাক্রমে ৩০%, ২৭%, ১৮% ও ১৩.৫% এলাকায় পাটচাষ হতো।[১৩]

বাংলার কৃষিপণ্যের মধ্যে পাটের বিশেষ অবস্থানের কারণ ছিল দেশে ও বহির্বিশ্বে অন্যান্য পণ্যের তুলনায় এর বেশি চাহিদা। কতগুলো অস্থায়ী কারণের জন্য পাটের চাহিদা অস্থিতিশীল ছিল। কৃষিতে শ্রম সরবরাহের বিশেষত্ব এর জন্য দায়ী ছিল।[১৪] কতটুকু জমি একজন চাষী পাটচাষের জন্য বরাদ্দ করবে তা নির্ভর করতো কাঁচা পাটের মূল্য এবং ধান ও পাটের তুলনামূলক মূল্যের উপর। বস্তুত ধানের চেয়ে পাটের জমির স্থিতিস্থাপকতা

১২. *Annual General Report on the Rajshahi Division by the Commissioner*, 27 June 1883, para 10.

১৩. নির্দিষ্ট জেলাসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য, *District Gazetteer* (Statistics), (Calcutta 1905), Table no VII .

১৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : Akbar Ali Khan, *Peasant Behaviour in Bengal : A Neo-Classical Analysis, 1872-1914,* (Dhaka 1983).

কয়েকগুণ বেশি ছিল। যখন কাঁচা পাটের দাম বাড়তো তখন চাষীরা বেশি জমি পাটচাষের অধীনে আনতে প্রলুব্ধ হতো। চাষীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের দরুন পাটের সরবরাহ অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হতো এবং ফলে পাটের বাজারমূল্য পড়ে যেতো। অপরদিকে পাটকলগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করে অল্প মূল্যে পাট কিনে তা গুদামজাত করতো। স্বাভাবিক কারণেই পরবর্তী উৎপাদনের মৌসুমে তাদের কাঁচা পাটের চাহিদা কম হতো বলে বাজারমূল্য কম হতো। এর প্রতিক্রিয়ায় পাটচাষের এলাকাও সঙ্কুচিত হতো। পাটের চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার তার দামও বাড়তো। ফলে চাষীরা পাটচাষে উৎসাহিত বোধ করতো এবং মৃত পাটক্ষেত্র পুনরুজ্জীবিত হতো। মোটের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পাটচাষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও প্রবৃদ্ধির হার ছিল কম।

১৮৫৫ সালে কলকাতায় প্রথম পাটকল স্থাপনের পর কারখানার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৩ সালে এর সংখ্যা ছিল ১২৫০টি তাঁতসহ ৫টি। ১৮৭৫ সালে ১৩টি নতুন মিল স্থাপিত হয় এবং তাঁতের সংখ্যা ৩৫০০-তে বৃদ্ধি পায়। এরপর ১৮৭৫ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি খুব শ্লথ হয় এবং উক্ত সময়ে কেবল একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এরপর আবার পাটের বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠে। পাট ব্যবসার প্রসারের ফলে কারখানাগুলোর কর্মকাণ্ড বেড়ে যায় এবং ১৮৮২-৮৪-এর মধ্যে আরো এক হাজার তাঁতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় উৎপাদনের জন্য পুনরায় এর প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে পড়ে। এই দুঃসময় কাটিয়ে ওঠার জন্য মিলমালিকদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে একটি জুট মিল এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপাদন কমানোর জন্য শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস করা হয়। পরবর্তী দশকে মাত্র একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৫০ সালের পর কাঁচা পাট রপ্তানিও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পাটের সঙ্গে শনের মিশ্রণের প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে বাংলার পাটের ব্যবহার কমে যায়। ১৮৩৮ সাল নাগাদ ওলন্দাজ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য কফিব্যাগ শনের পরিবর্তে পাট দিয়ে তৈরি শুরু হলো। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে (১৮৫৪-৫৫) রাশিয়া থেকে শনের যোগান বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প হিসেবে পাটের চাহিদা আবার বেড়ে যায়। পাট সম্পর্কে পূর্বেকার কুসংস্কার সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়। ডান্ডির কারখানাগুলো ছিল মূল আমদানিকারক। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬০-৬৪) পাটের অবস্থান আরো শক্তিশালী করে। পৃথিবীতে প্যাকিংসামগ্রীর মধ্যে চটের তৈরি কাপড় সবার উপরে স্থান পায়।[১৫] ১৮৩৮-৪৩ থেকে ১৮৬৪-৭৩-এর মধ্যে কাঁচা পাট রপ্তানি একচল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পায়।[১৬] ১৮৬৬-৬৮-এর বছরগুলো বাদে অন্য বছরে পাটের সাফল্য ছিল অপ্রতিহত। ১৮৭৩ সালে এর সাফল্য ব্যাহত হয়।

১৫. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1934,* Vol. I, (Calcutta 1934), 6.

১৬. Hem Chandra Kar, *Report on the Cultivation of and Trade in Jute,* (Calcutta 1877), para 267.

১৮৭৩ সালের পর কাঁচা পাটের রপ্তানিতে মন্দার কতগুলো কারণ ছিল। বাংলা সরকারের মতে স্থানীয় কারখানাগুলোতে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় কাঁচাপাট ব্যবহার ১৮৭২-৭৩ থেকে ১৮৭৬-৭৭ সালের মধ্যে রপ্তানিবাণিজ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল। এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য হলেও পাটচাষের স্থিতিশীলতাও এখানে লক্ষণীয়। ১৮৭৩ সাল থেকে অর্থনৈতিক মন্দায় কাঁচা পাটের মূল্যহ্রাস রপ্তানিবাণিজ্যে ঘাটতির কারণ ছিল। তাছাড়া ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ থেকে ১৮৭৭-৭৮ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বেতে দুর্ভিক্ষের সময় পর্যন্ত চালের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পাটচাষের চেয়ে ধানচাষের দিকে চাষীরা বেশি ঝুঁকে পড়ে।

আমরা পাটের চাহিদা দ্রুত হ্রাসের জন্য দু'টি উদাহরণ দিতে পারি। যথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং ১৯৩০-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা। যাহোক দু'ভাবে পাটচাষ সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের সময়ে হঠাৎ পাটের দর কমার ফলে পাটচাষের এলাকা কমে যায় এবং অন্য কতগুলো কারণেও চাষীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলার পাটের আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা আনয়ন করে। ফলে চাষীরা অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একনাগাড়ে অনেকদিন তেজী অবস্থা চলার পর তা হয়েছিল। তাছাড়া কাঁচা পাট ব্যবহারের ধরনটিও এখানে লক্ষণীয়। অর্ধেকের বেশি পাট রপ্তানি হতো ইউরোপ ও আমেরিকায়। ঐসব স্থানে পাটজাত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য ছিল। অপরদিকে কাঁচা পাটের উপর কোন কর আরোপিত ছিল না। বিশেষকরে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে মহাদেশীয় বাজার হাতছাড়া হওয়ার ফলে কাঁচা পাটের চাহিদা অনেকাংশে কমে যায়। শিপিং-এর অভাবে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ফলে কাঁচা পাটের দাম কমে যায়। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, পাটের মূল্য প্রায় ৪০% কমে গিয়েছিল। এর প্রভাবে পাটচাষের এলাকাও সঙ্কুচিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে সব পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। চার বছর পূর্ব থেকে পাটের ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাসের কারণ ছিল বিশ্ববাণিজ্যে বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানিতে পাটের অর্থনৈতিক মন্দা। পাটের অতিরিক্ত ফলনও পাটের মূল্য কমিয়ে দেয়।[১৭] পাটের মূল্যহ্রাসের ফলে পাটচাষের এলাকাও কমে যায়। তবে মূল্যহ্রাসের ফলে পাটের আবাদ কমলেও অতিরিক্ত ফলনের দরুন পাটের মোট সরবরাহ তেমন কমে নি। কিন্তু স্থানীয় কারখানাগুলিতে কাঁচা পাটের ব্যবহার হ্রাস পেলে সঙ্কট সৃষ্টি হয়।[১৮] অন্যান্য সময়ের মতো কারখানাগুলো পাটের মূল্যহ্রাসের সুযোগ নিয়ে কাঁচা পাট ক্রয় করে মজুদ বৃদ্ধি করে নি। কারণ পাট ব্যবসার মন্দার কারণে কারখানাগুলো পাট কিনে গুদামজাত করা সমীচীন মনে করে নি।

১৭. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1934*, 86.

১৮. ঐ; আরো দেখুন, *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1939*, (Calcutta 1939), Vol. 1.

কৃষকদের অন্যান্য কৃষিপণ্য চাষে অসুবিধার কারণে পাটচাষ ও তার মূল্যহ্রাস হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা পাটচাষ কমাতে পারে নি। অন্যান্য প্রায় সকল কৃষিপণ্যের মূল্য পাটের মূল্যের চেয়ে কম ছিল। আখের মতো কোন কোন কৃষিপণ্যের চাষ পাটচাষের জমির জন্য অনুপযুক্ত ছিল। তাছাড়া ঐসব পণ্যের বাজার সীমিত থাকায় পাটচাষের জমিতে তা চাষ করা সমীচীন ছিল না। পাটের মূল্য হ্রাসের জন্য পাট উৎপাদকরা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ধান উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নি, কারণ ধানের মূল্যের মন্দাভাব আরো লক্ষণীয় ছিল।

মহামন্দার পূর্ব থেকেই ধানের মূল্য নিম্নগামী ছিল। ত্রিশের মন্দা ঐ অবস্থাকে আরো তীব্রতর করেছিল। এর কারণ ছিল বাংলা ও ভারতীয় বাজারে বার্মার ধানের ক্রমাগত প্রতিযোগিতা।[১৯] ধীরে ধীরে বাংলার চাল ব্রহ্মদেশের চালের কাছেই শুধু নয়, থাইল্যান্ড ও ইন্দোচীনের মতো ধান উৎপন্নকারী দেশের চালের কাছে হার মানে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের আঞ্চলিক বাজার হারায়। ব্রহ্মদেশের ধান স্থানীয় বাজারে বাংলার ধানের স্থান দখল করে নেয়।

আমরা সংক্ষেপে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ধারা বর্ণনা করেছি। এখন এই প্রসঙ্গে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয়া প্রয়োজন। উক্ত ধারায় কৃষকরা কিভাবে জড়িয়ে পড়েছিল? কৃষকরা কি কেবল বাজারের অবস্থার সঙ্গে সাড়া দিত? অথবা তারা কি কেবল জীবনধারণের তাগিদেই সাড়া দিত এবং তা কি কেবল কৃষিজ সমাজকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ছিল? তাই যদি হয়, তবে কিভাবে বাণিজ্যিকীকরণের ধারা এই সমাজকাঠামো এবং কৃষক-অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল? আমরা এসব প্রধান প্রশ্নের উত্তর আধুনিক নতুন ব্যাখ্যার আলোকে দিতে চেষ্টা করবো।

লক্ষণীয় যে, প্রথমদিকে জাতীয়তাবাদী লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত বাণিজ্যিকীকরণের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। তিনি কেবল খাদ্যশস্যের বাণিজ্যসম্প্রসারণের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন। এই বাণিজ্যসম্প্রসারণ কৃষকদের উন্নতি এনেছিল বলে সরকারের যে ধারণা তা তিনি চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে উক্ত ব্যবসা ছিল 'কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক', যার উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শক্তিকে অর্থ যোগান দেয়া। দত্তের সূত্র ধরে পরে বি. এ. ভাটিয়া ভারতীয় বাণিজ্যঘাটতির জন্য কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে বৃটেন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের পরিবর্তে ভারত খাদ্যশস্য রপ্তানি করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা পরিশোধ করতে পারতো না। দত্ত ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ ধরনের জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যের কুফল লক্ষ্য করেন, যার প্রভাব জনগণের খাদ্যশস্য প্রাপ্তির উপর বেশি প্রভাব ফেলেছিল। যে বিষয়টি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল তা হলো স্থানীয় বাজারে

১৯. *The Bengal Paddy and Rice Enquiry Committee Report, 1939*, (Calcutta 1939), para 52.

খাদ্যশস্য সরবরাহে অস্থিতিশীলতা, মানুষের ভোগ্য নিম্নমানের শস্যের উচ্চমূল্য এবং ঘন ঘন খাদ্যঘাটতি ও সঙ্কট। তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল জনগণের খাদ্যের নিরাপত্তা বিধান নিয়ে। গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করার জন্য তিনি ঔপনিবেশিক শাসনকে দায়ী করেন। জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতগণ কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে, কৃষিক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক ধারার চেয়ে অন্যরকম এবং এর ফলে উদ্বৃত্ত শস্যের স্বাভাবিক বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। এমন ধারণা করা হয় যে, এই ধরনের বিনিময়ের ফলে কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতি বাড়ে এবং অনেক রকমের দ্রব্য আহরণের সুযোগ হয়। আবার এও মনে করা হয় যে, চাষীদের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ছিল অনিচ্ছাকৃত। তারা তাদের উদ্বৃত্ত শস্য বাজারজাত করতো না। তাৎক্ষণিক অর্থের প্রয়োজনেই তারা উৎপাদিত পণ্যের বিশেষ অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হতো।

জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতদের পরবর্তী লেখাসমূহে ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চেয়ে ধীরে ধীরে চাষীদের নগদ অর্থের প্রয়োজন এবং সেই সাথে গ্রামের প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, কৃষকদের অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়লো ঔপনিবেশিক শাসকের দাবি মেটানোর জন্য, যেমন খাজনা প্রদান। খাজনা প্রদানে অক্ষম হলে চাষীকে তার জমি থেকে উৎখাত করা হতো। ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলেও একই পরিণতি হতো। তাছাড়া ঋণদানকারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা শত্রুতা করলে ঋণের উৎসসমূহ বন্ধ হয়ে যেতো। ভূমিহীন এবং ঋণলাভে অসমর্থ হওয়া ছিল চাষীর জীবিকার উপর এক অপ্রতিরোধ্য হুমকি।

অমিত ভাদুড়ী[২০] বাজারে ক্রয়বিক্রয়ের ধারার সঙ্গে একজন চাষীর অর্থনৈতিক জীবনধারার সম্পর্কের কথা বলেছেন। ভাদুড়ী মনে করেন যে, চাষী বাজারে যেটা বিক্রি করতো সেটা তার উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্তাংশ ছিল। তাঁর ব্যাখ্যায় বাংলার কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বিশেষকরে ভূমিব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের কারণে। অর্থাৎ জমিদারেরা দীর্ঘ বা স্বল্প মেয়াদের জন্য তাদের জমির অংশবিশেষ কৃষকদের কাছে ইজারা দিতেন। ইজারাদারেরাও প্রায়শ এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি করতো। ভূমিবণ্টনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ও জটিলতা কৃষকের খাজনার বোঝা বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।[২১] কৃষিউৎপাদন ক্রমবর্ধমান খাজনার তুলনায় বাড়ানো যায় নি। ঋণের জন্য তাকে দুঃসময়ে পণ্য বিক্রি করতে হতো। তার মজুদকৃত খাদ্য হ্রাস পাওয়ার কারণে বছরের শুষ্ক মাসগুলোতে বাজার থেকে তাকে খাদ্য কিনতে হতো।

২০. A Bhaduri, " The evolution of land relations in Eastern India under British Rule," *Indian Economic and Social History Review*, January-March 1976.

২১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure*, (Calcutta 1988) । আরো দেখুন, Sirajul Islam, *Rent and Raiyat*, (Dhaka 1987).

চাষীরা তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য আংশিকভাবে খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলায় শহীদ আমিনের ইক্ষুচাষের উপর আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে যে, উত্তর প্রদেশে এর মূল কারণ ছিল চাষীর খাজনা প্রদানের সময় এবং শস্য আহরণের সময়ের অসঙ্গতি। এমনও হতো যে, খাজনার কিস্তি পরিশোধের জন্য কোন খাদ্যশস্য অবশিষ্ট থাকতো না। তখন চাষীর ইক্ষুফসল কাটার সময়। তাই ক্ষুদ্র চাষী একদিকে ফসল তোলার সময়ের স্বল্পতা এবং অতি সত্বর খাজনা দেয়ার প্রয়োজনীয়তার চাপে ইক্ষু থেকে অর্থলাভের ব্যবস্থা করতো। আমিন উপসংহারে বলেন, "অর্থ যোগান এবং ঋণ পরিশোধেই ইক্ষুচাষের গুরুত্ব ছিল। তা দিয়ে উদ্বৃত্ত কিছু করা যেতো না এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে এটাই ছিল গোরখপুরের ক্ষুদ্র চাষীঅর্থনীতির গোড়ার কথা। ইক্ষুচাষ ও গুড় উৎপাদন ক্ষুদ্র চাষীর অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল"।[২২] পূর্বভারতের সবচেয়ে বড় অর্থকরী ফসল পাটের প্রতি কৃষকের আকর্ষণ সম্পর্কে একইভাবে আলোচনা হয়েছে। অনেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পাটের প্রতি চাষীদের আকর্ষণের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এর মাধ্যমে অগ্রিম পাওয়ার সুবিধা। ফলে পাট কৃষকদের জীবিকানির্বাহের এক প্রান্তিক পর্যায়ে রাখতে অবদান রাখতো।[২৩]

জাতীয়তাবাদীদের ধারণা হয়, এ বিশেষ কৃষিকাঠামো বাণিজ্যিকীকরণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। গতানুগতিক যুক্তি অনুযায়ী গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে তা আরো শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। বিশেষকরে গ্রাম্য ঋণদাতাদের অবস্থা আরো শক্তিশালী হয়। প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে তারা সময়বিশেষে সাহায্যদাতা ছিল, কিন্তু এখন তারা গ্রাম্য অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ কৃষকরা তাদের ঋণ ছাড়া চলতে পারতো না।

সুনীল সেনের[২৪] মতে, অর্থকরী ফসল চাষের ফলে গতানুগতিক কৃষির্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হয়। জাতীয়তাবাদীগণ বাণিজ্যিকীকরণকে একটি অর্থনীতিতে নেতিবাচক ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তপন রায় চৌধুরী অর্থনীতিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন— গতানুগতিক এবং আধুনিক। তাঁর মতে, বর্তমান জীবিকাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা, প্রযুক্তি, সামাজিক সংগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চলতার কারণ।[২৫] অমিত ভাদুড়ীর বর্ণনায় দেখা

২২. Shahid Amin, *Sugarcane and Sugar in Gorakhpur An Enquiry into Peasant Production for Capitalist Enterprise in Colonial Period,* (Delhi 1984), 70-71, 88.

২৩. Partha Chatterjee, " Agrarian Structure in pre-partition Bengal" in Asok Sen et al. (eds.) *Three Studies in the Agrarian Structure in Bengal, 1850 1947,* (Delhi 1952), 115; আরো দেখুন, Daniel and Alice Thorner, *Land and Labour in India,* (Delhi 1965), 55.

২৪. Sunil Sen, *Agrarian Relations in India, 1793-1947,* (New Delhi 1979), 90, 97. সেনের যুক্তি বিশেষ করে আখচাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৫. Raychaudhuri, " A Reinterpretation of the Nineteenth Century Economic History" in M. D Morris et al. (eds.) *Indian Economy in the Nineteenth Century:* A Symposium, (Delhi 1969)

যায় যে, বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ঋণের আবশ্যকতার দরুন ঋণের পরিবর্তে ধান দেয়া হতো। সে অবস্থায় অর্থনৈতিক স্থবিরতা ছিল স্বাভাবিক। কারণ জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের দারিদ্র্য জিইয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শস্যের আপৎকালীন ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কৃষকের বিনিময়পদ্ধতির ফলে তার বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ছিল না। ফলে কৃষি এবং শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরতা জন্মে নি। উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে কৃষিপণ্যের বিনিময় সম্ভবপর হলে শিল্পপণ্যের দেশীয় বাজার প্রসারিত হতো এবং একটি সুষ্ঠু শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পেতো।[২৬]

সাম্প্রতিককালে যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে, কৃষকের সনাতন উৎপাদনব্যবস্থায় বর্তমান দক্ষতা ও উৎকর্ষ একে আরো উৎপাদনশীল করে গড়ার পথে ছিল বাধা স্বরূপ। ইউরোপীয় উদ্যোগের ফলে বাণিজ্যিকীকরণ সম্পর্কে যে চিন্তাধারা ভারতীয় গ্রামসমাজকে প্রভাবিত করেছে তাকে খণ্ডন করার জন্যই এই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ও নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রাচ্যদেশীয় সমাজ কতটুকু সাহায্যপুষ্ট তার উপরই গতানুগতিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নতুন গবেষণাপদ্ধতির প্রবক্তা সি. জে. বেকার উক্ত মতবাদ নাকচ করে মত প্রদান করেন যে, স্থানীয় সমাজ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়টির উপরও গুরুত্ব দেয়া উচিত।[২৭] এই মতবাদের অপর প্রবক্তা বেইলি আরেক পণ্ডিত বুয়েকের দ্বৈত অর্থনীতির ধীকল্প (idea) খণ্ডন করেন। তিনি ইউরোপীয় এবং দেশীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে লেনদেন করতে যেসব বাধার সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে উক্ত ধীকল্প খণ্ডন করেন। বুয়েকের মতে, অনুন্নত অর্থনীতির ব্যবসায়িক লেনদেন স্থবির হয়ে যায়, কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য কার্যক্রম অধনতান্ত্রিক সমাজের সনাতন মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অসম্পূর্ণভাবে সম্পর্কিত। মন্তব্য করতে গিয়ে বেইলি বলেন, কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়ী সমাজের কর্মক্ষমতা ও মূল্য সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা বহিরাগতদের মূল্য এবং মুদ্রা যোগান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা নস্যাৎ করে দেয়।[২৮]

আমরা বাংলায় বাণিজ্যিকীকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি কতগুলো যুক্তির আলোকে আলোচনা করবো। দত্তের কাছ থেকে আমরা খাদ্যশস্যের জবরদস্তিমূলক এবং 'কৃত্রিম' বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। তাতে দেখা যায়, প্রান্তিক চাষী এবং মাঝারি কৃষকরা

২৬. দ্রষ্টব্য পাদটীকা, ২০।

২৭. C J Baker, *An Indian Rural Economy The Tamil and Countryside*, (Delhi 1984), 520.

২৮. C. A Bayly, *Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion*, (Cambridge 1983), 464-65

তাদের জীবিকার মৌলিক চাহিদা মেটাতে শস্য বাজারজাত করতো। কিন্তু কৃষিকাঠামোর উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সম্পর্কে দত্ত কোন বিশ্লেষণ দেন নি।

কুর্ফা কৃষক সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের ধারণা আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে কৃষকদের চিন্তাধারা ও ব্যবহার বোঝার জন্য এবং সেটা অবশ্যই অর্থকরী ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত। ভারতীয় দৃষ্টিতে কুর্ফা কৃষক সম্পর্কে ধারণা গ্রহণযোগ্য। তবে অর্থকরী ফসল চাষের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক সেটা খুঁটিয়ে দেখার বিষয়।

মূল্য উঠানামার সঙ্গে সময় সময় অর্থকরী ফসল চাষের তারতম্য জানার জন্য ঐ দু'টি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। মূল্য নিম্নগামী হলে অর্থকরী ফসলের চাষ কমই বাড়তো। যাহোক, বাণিজ্যিকীকরণে একটা সামাজিক ধারাও কাজ করেছিল। সব চাষী কি বাজার বিষয়ে একইভাবে সাড়া দিত ? কেন কেউ কেউ সাড়া দিত আবার কেউ কেউ সাড়া দিত না ? সবাই কি তাদের চাষ একইভাবে বিন্যাস করতো ? একবার যখন চাষীরা কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো, তারা কি সব সময় তাই করতে থাকতো ?

অর্থকরী ফসলের চাষ ও পরিবর্তনশীল মূল্যের সম্পর্ককে চাষীদের বহুমুখী সম্পর্ক থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়, যা আবার গভীরভাবে জড়িত গ্রাম্য প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে।

বাণিজ্যিকীকরণে জবরদস্তির কথা কতগুলো প্রধান শস্য সম্পর্কে জরিপ করে যাচাই করা যেতে পারে, যেমন নীল, আফিম, ইক্ষু ও পাট। আমাদের সর্বপ্রথম যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে সেটা হলো অর্থকরী ফসল ফলানোর জন্য চাষীদের অগ্রিম প্রদান। চাষীরা কৃষির জন্য অগ্রিম চাচ্ছিল মূলধনের অভাবের জন্য, না অন্যান্য আর্থিক দায়দায়িত্ব মেটানোর জন্য ? এই অগ্রিমগ্রহণ সাধারণ ঋণগ্রহণের চেয়ে ভিন্ন রকমের ছিল। এই অগ্রিমগ্রহণে চাষীদের দরকষাকষির স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু সাধারণ ঋণের বেলায় এ রকমটি ছিল না। উল্লিখিত অর্থকরী ফসল চাষে অগ্রিমের কি ভূমিকা ছিল ? কৃষকদের জন্য এর গুরুত্ব কি ছিল ? অগ্রিম না নিলে কৃষকের পক্ষে কি সুবিধা ছিল ? তিন রকমের অগ্রিম গ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আফিম ও নীলের ক্ষেত্রে সেসব অগ্রিম সবাই গ্রহণ করতো। ইক্ষুচাষীদের ক্ষেত্রে অগ্রিম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হতো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাটচাষের বেলায় প্রথম পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে পাটচাষের প্রসারের ফলে আংশিকভাবে ঋণ গ্রহণ করা হতো।

নীলচাষে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগ্রিমের উপর নির্ভরশীল ছিল। চাষী অগ্রিম গ্রহণে উৎসাহী ছিল এবং উৎপাদকরা চাষীদের অগ্রিম দেয়ার বিষয়ে আগ্রহী ছিল। অবশ্য চাষীদের উৎসাহ কদাচিৎ নীলচাষে মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করতো। উৎপাদকদের মতে নীল ছিল একটি অলাভজনক ফসল। চাষীরা অগ্রিম গ্রহণ করতো অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদে। এক্ষেত্রে নীল কমিশনের পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য। চাষীরা আগাম গ্রহণ করে বছরের এমন

এক সময়ে, যখন তার খাজনা দিতে হতো অথবা বাৎসরিক দুর্গাপূজা উদযাপন করতে হতো। কেউ কেউ ঋণগ্রস্ত ছিল, আবার কেউ কেউ ছিল অতিব্যয়ী এবং সবাই সুদবিহীন অর্থ গ্রহণ পছন্দ করতো।[২৯] এই কারণেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষকরা নীলকরের নাগপাশে বন্দী হয়ে পড়েছিল। তারা যে অগ্রিম গ্রহণ করতো তার কিছু অংশ নীলচাষে ব্যয় হতো। নীলকরেরা স্বল্প মূল্য প্রদান করতো, যা দিয়ে কৃষিব্যয় সঙ্কুলান হতো না এবং চাষের জন্য পুঁজির অভাবের ফলে চাষী আরো গভীরভাবে নীলকরের কাছে বাধা পড়তো। এভাবে তারা নীলচাষের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তো, যদিও সেখানে দাদন পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। অপরদিকে নীলকর দাদনের মাধ্যমে চাষীর জমি ও শ্রমের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলো। দাদন গ্রহণকারী চাষীর জমি তাৎক্ষণিকভাবে কুঠির কর্মচারীদের দ্বারা সনাক্ত ও চিহ্নিত করা হতো।

সরকারের এক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ইক্ষুচাষ ব্যয়সাধ্য হলেও লাভজনক ছিল। বিত্তশালী কৃষকেরা এর চাষ করতো এবং ঋণপ্রদানকারীদের সাহায্য কদাচিৎ গ্রহণ করতো।[৩০] স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী এই তথ্য সঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমানে ইক্ষুচাষীরা ঋণদাতাদের আঙিনায় ইক্ষুমাড়াই করে রস ও গুড় তৈরি করতো এবং সেই গুড় উক্ত স্থানে বসে অথবা বাজারে বিক্রি করে ঋণ শোধ করতো।[৩১] রাজশাহীতে কোন কোন চাষী মহাজনদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতো এবং গুড় প্রদানের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতো এবং বাজারের প্রচলিত হার অনুযায়ী চাষীদের মণপ্রতি ছয় থেকে আট আনা সুদ দিতে হতো।[৩২] পাবনায় চাষীরা ঋণের অর্থে চাষ করতো অথবা মহাজনদের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে থাকতো। মহাজনরা অর্থ অগ্রিম প্রদান করতো এবং বিনিময়ে সুদ ও অপরিশোধিত চিনি বাজারদরের চেয়ে কমমূল্যে আদায় করতো।[৩৩] চিনির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে পরে সাধারণ বিত্তশালী কৃষকরাও ইক্ষুচাষে উৎসাহিত হয়। ঋণ গ্রহণে তাদের অনীহা ছিল না যদি তারা মনে করতো যে, ইক্ষুচাষ তাদের জন্য লাভজনক। এখন প্রশ্ন হলো, কেন অধিকাংশ ইক্ষুচাষী ঋণ ছাড়া চলতে পারতো না? শহীদ আমিন গোরখপুরের ক্ষেত্রে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে কি চাষীদের মানসিকতা একই ধরনের কাজ করতো বলে মনে হয়? অর্থাৎ শস্য পরিপক্ক হওয়ার সময়ে কি বিশেষভাবে খাজনা দেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল? খাজনা বা করের বোঝার ধরন বাংলায় ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। শীতকালীন ফলনের পর অর্থাৎ মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য-ডিসেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি

২৯. *Report of the Indigo Commission,* (1860), para 57.

৩০. *India Agriculture and Horticulture Proceedings,* May 1844, Government of Bengal to Government of India.

৩১. ঐ, Burdwan Commissioner to Government of Bengal, 9 May 1883, para 16.

৩২. ঐ, Commissioner of Rajshahi and Cooch Behar to Government of Bengal, 6 July 1885.

৩৩. ঐ।

খাজনার কিস্তি পরিশোধ করতে হতো। চাষীকে ঋণ প্রদানের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে এই ফসলের ফলনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল ছিল। অর্থ আদায়কারী এবং ঋণ পরিশোধকারী ফসল হিসেবে এখানে ইক্ষুর ভূমিকা উত্তর প্রদেশের চেয়ে অনেক সীমিত ছিল।

তবুও ইক্ষুচাষীরা ঋণের উপর নির্ভরশীল ছিল। আমিনের আলোচনায় খাজনা প্রদান তথা বাঁচার তাগিদে ঋণ বা আগাম নেয়ার উপর জোর দেয়া হয়েছে। ফলে ঋণ যে বিনিয়োগে ব্যবহৃত হতো সে দিকটা উপেক্ষিত হয়েছে। ইক্ষুচাষে ব্যয় এবং গুড় তৈরি এই ঋণ দ্বারা সম্পন্ন হতো এবং চাষীরা লাভের জন্যই ঋণ গ্রহণ করতো। তারা সম্ভবত কিছু লাভও করতো।

ইক্ষুচাষের খরচ ছিল অনেক। সেজন্যই ঋণের প্রয়োজন ছিল। শহীদ আমিন স্বীকার করেন যে, উত্তর প্রদেশের কৃষকদের ইক্ষুচাষের জন্য সবচেয়ে বেশি সময় ও শ্রম দিতে হতো। ফসল হিসেবে ইক্ষু দশ মাস জমি দখল করে রাখে এবং গুড় তৈরিতে কৃষকেরা আরো দশ থেকে বার সপ্তাহ অতিবাহিত করে। ইক্ষুমাড়াই করে রস আহরণ এবং গুড়তৈরি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। বেহিয়া মিলের মতো ইক্ষু মাড়াইয়ের লৌহকারখানাসমূহ, যেগুলো ধীরে ধীরে গতানুগতিক কাষ্ঠনির্মিত কলের পরিবর্তে স্থাপিত হচ্ছিল, সেগুলো ইক্ষুচাষীদের জন্য ছিল বেশি ব্যয়বহুল। কোন কোন সময় হিসেবী চাষীরা যৌথভাবে তা ক্রয় করতো। অনেক সময় তারা ঋণদাতা বা জমিদারদের কাছ থেকে তা ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করতো। বিরাটাকার জ্বাল দেয়ার কড়াই, যেটি ছিল অত্যন্ত দামী বস্তু, তা একটা বিশেষ সময়ের জন্য ভাড়া দেয়া হতো। সেই কড়াইয়ের জন্য চাষীরা ঋণ বা আগাম গ্রহণ করতো। ঋণের এই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করার অর্থ কৃষকদের এ সুবিধার বিষয়টি বিকৃত করা।

স্পষ্টত পাটচাষ আংশিকভাবে আগামের উপর নির্ভরশীল ছিল। পাটের মূল্য হঠাৎ হ্রাস পেলে এর উপর আরো বেশি নির্ভর করতে হতো। অগ্রিম অর্থের প্রাপ্যতা নির্ভর করতো মহাজনের ব্যবসায়ী স্বার্থের উপর। অপরদিকে পাটব্যবসায়ী অথবা পাইকারেরা নিজেদের মধ্যে কাঁচা পাট কেনার প্রতিযোগিতায় চাষীদেরকে আগাম দিত।

আগামের প্রশ্নটি উদঘাটন করে বেঙ্গল জুট কমিশন (১৮৭৩) মন্তব্য করে যে, "আগাম অর্থের কোন চাহিদা নেই এবং বেশ কিছু চাষী মহাজন বা ফড়িয়াদের কাছ থেকে আগাম না নিয়েই পাটচাষ চালিয়ে যাচ্ছিল।"[৩৪] মনে হয় এই মন্তব্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত যথার্থ ছিল। ১৯১৪ সালে ঢাকার সেটেলমেন্ট অফিসার গ্রামীণ ঋণব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেন, "আমি সন্দেহ করি এক হাজারে একজন কৃষক ঋণ বা আগামের জন্য আড়তদার, বেপারি বা পাট ব্যবসায়ীর উপর নির্ভরশীল ছিল কিনা। জেলায়

৩৪. Hem Chandra Kar (Report on Jute,) (পাদটীকা ১৫) Appendix, পাটচাষীদের বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Statements Nos 10, 11, 12, 14, 19, 22, 25, 28, 31-32, 38-49, etc.

এটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরে ঋণগ্রহণতত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে।"[৩৫] ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পাটচাষীদের জন্য দুঃসময় নিয়ে আসে, কারণ এর ফলে পাটের মূল্য হ্রাস পায়। তখন আগামের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৬ সালের পর নারায়ণগঞ্জ মহকুমা, পাবনা এবং রংপুরে দাদনব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠে। ময়মনসিংহে পাটের বাজারদরের চেয়ে কম হারে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবসা আরম্ভ হয়।[৩৬]

পাটচাষীদের আগামের উপর নির্ভরতা থাকলেও একে ভিত্তি করে পাটচাষ করা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। ১৯১৬ সালের এক সরকারি তদন্তে তা দেখা যায়। আগাম গ্রহণের শর্তে তারতম্য ছিল। ঢাকার কালেক্টর রিপোর্ট দেন, "এই জেলায় পাট বা অন্যান্য ফসলের জন্য আগাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মহাজনরা অবশ্য চাষীদের সুদে উচ্চহারে চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে অর্থঋণ দেয় এবং তা শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসে আদায় করে।"[৩৭] জামালপুর ও ময়মনসিংহের মহকুমা হাকিম একই বিবরণ প্রদান করেন, "এই মহকুমায় শস্যচাষের জন্য দাদন প্রথা নেই। মহাজন কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করে এবং লাভজনক বাজার না পাওয়া পর্যন্ত মজুদ রাখে। পাট ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল শস্যের বেলায় এটাই ছিল নিয়ম। পাট মাড়োয়ারী ও ইউরোপীয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলো কিনতো।"[৩৮] ময়মনসিংহ সদর মহকুমার অবস্থা অবশ্য অন্যরকম ছিল। পাটব্যবসায়ীদের দালালরা পাটচাষীদেরকে আগাম প্রদান করতো এ শর্তে যে, উৎপাদিত সমুদয় পাট বাজারদর অনুযায়ী তাদের কাছে বিক্রি করতে হবে, তবে কদাচিৎ পাটচাষীরা বাজারদর পেতো।[৩৯] রংপুর জেলার গাইবান্ধার মহকুমা হাকিমের প্রতিবেদনে জানা যায়, যে হাটে বেপারি বা ফড়িয়ারা ক্রয় করতে আসে সেখানে চাষীরা পাট বিক্রি করার জন্য নিয়ে যায়। কোন কোন সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি ক্রয় করার জন্য হাটে নিজস্ব ক্রেতা পাঠাতো, কিন্তু এটা সাধারণ নিয়ম নয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি দালালের মাধ্যমে বেপারিদের অর্থ আগাম দেয় এবং আগাম প্রদানে বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।[৪০] কুড়িগ্রামের মহকুমা হাকিম দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, আগাম নিলেই বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে চাষীরা তাদের পাট বিক্রি করবে এ মর্মে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে পাট উৎপাদনকারী কৃষক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মহাজনের কাছ থেকে ফাল্গুন

৩৫. উদ্ধৃত, Omkar Goswami, " Agriculture in Slump, the Peasant Economy of East and North Bengal in the 1930s", *Indian Economic and Social History Review*, July-September 1984, 338

৩৬. ঐ, 339-40

৩৭. *Marketing of Agricultural Produce in Bengal, 1926*, (Calcutta 1926), 38.

৩৮. ঐ, 41

৩৯ ঐ, 42

৪০. ঐ, 60-61

মাসে আগাম গ্রহণ করে এবং চুক্তি অনুযায়ী মহাজনকে কার্তিক মাসে প্রতি তিন রুপী অগ্রিমের জন্য এক রুপী লাভ হিসেবে প্রদান করে। তবে মহাজনের ইচ্ছানুযায়ী মূল উৎপাদনকারী তার পাট বিক্রি করতে বাধ্য ছিল না।[৪১]

পাটচাষে আগাম অর্থ গ্রহণের ভূমিকা সম্পর্কে জুট এনকোয়ারি কমিটিগুলো (১৯৩৪, ১৯৩৫) অনুসন্ধান চালিয়েছিল। প্রথম কমিটির প্রশ্নমালায় এই প্রশ্নগুলো স্থান পায়—চাষীরা তাদের শস্য ফলনের পূর্বেই তা বিক্রি করার জন্য কি কি শর্তে দায়বদ্ধ ? চাষীরা কার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে ? এ কথা বললে কি সত্য হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণদাতারাই শস্যক্রেতা ? দ্বিতীয় কমিটির প্রশ্নগুলো ছিল—শস্য সংগ্রহের পূর্বেই কৃষকরা তাদের শস্য বিক্রির বিষয়ে কতখানি এবং কাদের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল ? মূল্যের উপর এর প্রভাব কি ছিল ? এই কমিটিগুলোর প্রাপ্ত তথ্যে গ্রামীণ ঋণব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এর মধ্যে কতগুলো সাধারণ ধারা সনাক্ত করা যায়। ১৯৩০-এর দশকে যখন বাণিজ্যমন্দা চরমে ছিল, তখন পাটচাষীদের ঋণ সম্পর্কে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, যখন পাটচাষীরা অন্যান্য চাষীদের মতো ঋণ চাইছিল, তখন ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেলো এবং পেশাদার ঋণদাতারা ঋণ প্রদান কমিয়ে দিল। ফলে পাটচাষীরা পাটকল ও পাটব্যবসায়ীদের দালালদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কাঁচা পাটের ক্রমাগত চাহিদাবৃদ্ধি (যদিও পূর্বের চেয়ে কম) সত্ত্বেও ব্যবসার সাধারণ অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চিত বাজারের প্রেক্ষাপটে চাষীদের কাছে কোম্পানি আগাম ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করছিল। তারা সে সময়ের দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন, চাষীদের খাজনা ও ঋণ পরিশোধে অনিচ্ছা এবং দুঃস্থ চাষীদের পক্ষে স্থানীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও পক্ষাবলম্বন ইত্যাদি বিষয় কঠিনভাবে গ্রহণ করে। চাষীদের অসন্তোষের পশ্চাতে কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাসের পরও খাজনাবৃদ্ধি এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ করার অতিরিক্ত তাগিদ কাজ করছিল। সমসাময়িক রাজনীতিকদের উস্কানিতে 'খাজনা দেবো না, ঋণ শোধ করবো না' এই মানসিকতার উদ্ভব পাটকল ও ব্যবসায়ী-এজেন্টদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চাষীদের ঋণপরিশোধের বিষয়ে স্থানীয় সরকারের মনোভাবের ফলে ভীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।[৪২] ১৯৩৫ সালের 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটর্স এ্যাক্ট'-এর উদ্দেশ্য ছিল চাষীর ঋণের পরিমাণ হ্রাস ও ঋণপরিশোধ সহজতর করা। ডেট সেটলমেন্ট বোর্ড উক্ত আইনের অধীনে স্থাপিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা হ্রাস করা হয় যদিও ঋণ প্রদানকারীর স্বার্থ একেবারে জলাঞ্জলি দেয়া হয় নি।[৪৩] কাঁচা পাট

---

৪১. ঐ, 59

৪২. Binay Bhushan Chaudhuri, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar", *Indian Historical Review*, July 1975, Section 3 আরো দেখুন, Sugata Bose, *Agrarian Bengal Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Cambridge 1986), Chapter 4.

৪৩. Ratan Lal Chakraborty, *Rural Indebtedness in Bengal, 1935-1947*, (Unpublished Ph D Dissertation, University of Dhaka, 1978) Dr Chakraborty Concludes: " It is believed commonly that the operation of the debt Settlement Boards had rescued the Bengal peasantry from the clutches of the mahajans of various denominations But our investigations have revealed that mahajani interests were more enthusiastic about resorting to D S Boards than the peasantry" ঐ , 271

বাজারজাতকরণপ্রক্রিয়ার উপর প্রতিবেদনসমূহ থেকে এই ধারণা করা যায় যে, স্বাভাবিক সময়ে পাটচাষে আগামের ভূমিকা অস্বাভাবিক ছিল না। অধিকাংশ চাষীই তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি করতো। পাটের চাহিদাবৃদ্ধির সময়ে ফড়িয়ারা চাষীদের বাড়ি থেকে পাট ক্রয় করতো। পূর্বেকার ব্যাপক আকারে আগামব্যবস্থায় ঐ রকম খোলা বাজারে বিক্রি ছিল সীমিত। ১৯৪৪ সালের 'জুট এনকোয়ারি কমিটি' পাট বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বিবরণে এ বিষয়ে মন্তব্য করে যে, চাষী তার পাট মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিক্রি করে এবং তাদের মধ্যে ফড়িয়া, বেপারি, আড়তদার অথবা মহাজন ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা চাষীদের প্রতারণা করে থাকে। তারা চাষীদের বাড়ি থেকে অথবা স্থানীয় হাট থেকে পাট ক্রয় করে। প্রথমত, স্মরণ রাখা উচিত যে চাষীরা কোনক্রমেই অজ্ঞ নয় এবং দ্বিতীয়ত, ফড়িয়া ও বেপারিরা স্থানীয় লোক এবং কৃষকও বটে। অতএব, তারা যাদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করে তারা তাদের পরিচিত জন।[৪৪]

পাটের বাজারে মন্দার ফলে কিভাবে পাটচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো সেটা পাটচাষে আগামের প্রান্তিকতা প্রমাণ করে। প্রথমত আমরা ১৮৭২-৭৩ সালের মন্দার কথা উল্লেখ করতে পারি। পূর্বের দু'বছরে পাটের লাভজনক ফটকাবাজি ব্যবসা করে বেপারিরা কৃষকদের কাছ থেকে পাটক্রয়ের অতি আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৮৭২-৭৩ সালে পাটচাষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরে হুজুগে নিম্নমানের পাট উৎপন্ন করা এবং বাজারে সরবরাহ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবার ফলে পাটের বাজারে মন্দা নেমে আসে। স্থানীয় বিবরণসমূহে মন্দার তীব্রতা প্রকাশ পায়। ২৪ পরগনা ও হুগলীতে অবিক্রিত পাট মোট ফসলের এক-চতুর্থাংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ ছিল। পাট উৎপাদনের প্রধান দুই জেলা ঢাকা এবং ময়মনসিংহে সর্বত্র আগের মৌসুমে উৎপাদিত পাট মাঠে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। কলকাতার বাজারে মূল্যহ্রাসের দরুন চাষীদের মনে এমন ভীতির সঞ্চার হয় যে, পানিতে ভেজানো তাদের অনেক কাঁচা পাট পরিত্যক্ত অবস্থায় পঁচে যায়।[৪৫]

এর সঙ্গে তুলনীয় ১৮৮২-৮৩ সালের ঘটনা। ১৮৮০ সাল থেকে বাজারে পাটের অতিরিক্ত সরবরাহ ঘটে। ১৮৭৯ সালে স্বাভাবিকের তুলনায় সর্বত্র পাটচাষ কম ছিল। পাটচাষের উপর ট্যাক্স বসবে এই গুজবের ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে পাটচাষ হ্রাস করা হয় এবং দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ ঢোল পিটিয়ে পাটের পরিবর্তে ধান চাষের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন।[৪৬] ফলে পাটের স্বল্পতার দরুন অনেক তাঁত বন্ধ করে দেয়া হয়।[৪৭] রাজশাহীতে একটা বিশেষ ধরনের পাটের মূল্য ৮০% বৃদ্ধি পায়।

৪৪. *Report of the Bengal Jute Enquiry Committee, 1934*, 12-13
৪৫. H. C. Kar to Government of Bangal, 10 April 1873, Bengal Agriculture Progs, November 1873, file 1-85/89
৪৬. *Annual General Report*, Rajshahi Division, 1879-80, 29 June 1880, para 9.
৪৭. *Report on the Administration of the Customs Deptartment*, 1879/80, para 55.

এর ফলে কৃষকরা পাটচাষে আবার প্রলুব্ধ হয়। ১৮৮০ সালে ধানের মূল্য হ্রাসের জন্য চাষীরা পাটচাষের স্থির সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ঢাকা বিভাগের পাট প্রায় ২৫% বৃদ্ধি পায়।[৪৮] পাটের উচ্চমূল্য তখনো বিদ্যমান ছিল। সুতরাং স্বল্প সময়ের জন্য চাষীরা পূর্ণ মুনাফা লাভ করে।[৪৯]

১৮৮১ সালে পাটের আবাদ বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়াও ছিল অনুকূলে। ফলে সে বছর পাটের প্রচুর ফলন হয়। ঢাকা বিভাগে পূর্ববর্তী দশ বছরের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ফলন হয়।[৫০] বাজারে চাহিদা তখনো হ্রাস পায় নি। ১৮৮২ সালে পাটের আবাদ আরো বৃদ্ধি পায়। তখন ময়মনসিংহ জেলার বিস্তৃত এলাকা পাটচাষভুক্ত ছিল। অচিরেই এর কুফল পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় পাটকলসমূহে, ডান্ডিতে এবং অন্যত্র এইসব পাটের চাহিদা কমে যাওয়ায় এর মূল্য কমে যায়। ঢাকায় ২৯% এবং ফরিদপুরে ৬৬.৬% হারে মূল্য হ্রাস পায়।[৫১] পূর্ণিয়া জেলায় পাটের দাম এতো কমে যায় যে উৎপাদনখরচ তুলে আনাও কঠিন হয়ে পড়ে এবং চাষীরা পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়াতে অস্বীকৃতি জানায়।[৫২] ত্রিপুরায় অনেক চাষী নিম্নমূল্যের জন্য পাট কাটা থেকে বিরত থাকে।[৫৩]

দু'বছর পাটের উচ্চমূল্য বজায় থাকার পর ১৮৯০-৯১ সালে একই সঙ্কট দেখা দেয়, এবং ফলে পাটচাষ বৃদ্ধি পেলো। তখন দিনাজপুরের কালেক্টর লিখেন, "কৃষিযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশ জমি পাটচাষের আওতায়।" মোটকথা, আগে যেসব জেলায় পাটচাষ হতো না, সেখানেও তা আরম্ভ হয়। এতে অতিউৎপাদনের ফলে আবার সর্বত্র মূল্য হ্রাস পেতে থাকে এবং পূর্ণিয়াতে মূল্য ৪২.১% হ্রাস পায়। নোয়াখালীতে প্রত্যাশিত মূল্যের অর্ধেকের কিছু বেশি পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় মূল্য এত হ্রাস পায় যে সেটা হাস্যরসের বিষয়ে পরিণত হয়। দিনাজপুরে পাটবিক্রয়কেন্দ্রে ক্রেতা ছিল না, বিস্তৃত স্থানের পাট আকাটা অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকে।

পাটচাষে আগামের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। ঋণ ব্যতিরেকে পাটচাষীরা চাষ করতে পারতো না এটা ঠিক নয়। চাষীদের জীবনধারণের প্রয়োজন ছাড়াও পাটচাষের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল। সাধারণত এ চাষ ছিল শ্রমকেন্দ্রিক এবং ধানচাষের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল। পাটচাষীরা পাটব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আগাম না নিয়ে বিকল্প ঋণদাতাদের উপর নির্ভর করতে পারতো। পাট ছিল

৪৮. *Annual General Report*, Dacca Division 1880/81, 12 July 1881

৪৯. ঐ, para 40.

৫০. *Annual Report on the Internal Trade in Bengal*, 1881/ 82, para 50

৫১. *Annual Report on the Internal Trade in Bengal*, 1882/83, *para* 44

৫২. *Annual General Report*, Bhagalpur Division, 1882/83, 28 June 1883, para 29

৫৩. *Annual General Report*, Chittagong Division, 1882/83, 30 June 1883, para 38.

কৃষিঅর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিরল ক্ষেত্র বাদে পাটচাষ কোথাও কোথাও কৃষকদের মুখ্য কর্ম ছিল। পাটের বাজারের উঠানামা চাষীকে পাটচাষে দ্বিধাগ্রস্ত করতো। প্রয়োজনের সময়ে ধান ও অন্যান্য শস্যের চাষীও গ্রামীণ ঋণদাতা এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতো।

অন্যদিকে পাটব্যবসায়ী ও পাটউৎপাদকরা শুধু তাদের ইপ্সিত পাট পাওয়ার জন্যই চাষীদের অগ্রিম প্রদান করতো না, প্রচলিত বাজারদরে বিক্রির জন্য উৎপাদিত পাট বাজারে আনতে তাদের প্রলুব্ধ করতো। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫-০৬ সালে পাটের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষণীয়। পাটের বাজারে অনেক ক্রেতার আগমন এবং পাটের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে অনেক ক্ষেত্রে পাটব্যবসায়ী পাটচাষীকে আগাম দিয়ে উৎপাদিত ফসল বন্ধক দিতে প্রলুব্ধ করে। স্বাভাবিক বাজারে পাটব্যবসায়ীরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা চাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য আগাম না দেয়া পছন্দ করতো। অতএব কৃষকেরা আগাম ছাড়াই পাট উৎপাদন করতো। চাষী তার কতখানি জমির উপর পাট জন্মাতো এবং বিভিন্ন সময়ে তার কি পরিবর্তন হতো তা নির্ভর করতো কাঁচা পাটের মূল্য এবং পাট-ধানের মূল্যের আনুপাতিক ব্যবধানের উপর।

পাটের প্রতি চাষীর ঝোঁকের বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। আজিজুল হক পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কৃষকের জমির উপর চাপবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করেছেন। অনাবাদি নিম্নজমিতে পাটচাষ দ্বারা জমির দুষ্প্রাপ্যতা পুষিয়ে নেয়া হয়।[৫৪]

পাটচাষের ফলে শ্রমিকদের এবং বিশেষকরে কৃষকপরিবারের একটা বিশেষ অংশ যারা বেকার থাকতো, তারা আবাদের কাজ পায়। এতে পাটচাষের সম্প্রসারণ ঘটে। যাহোক, জনসংখ্যা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে পাটচাষের চরিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

কেবল কাঁচা পাটের মূল্য সর্বত্র পাটচাষের পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি ধারা নির্ধারণ করতে পারে না। আমরা নিকটবর্তী আসামে পাটচাষের প্রসারকে একটা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বাংলায এর চাষ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। কিন্তু তবুও আসামে পাটচাষ প্রসারলাভ করে। এই তুলনা প্রাসঙ্গিক এজন্য যে পাটচাষের প্রসারের জন্য স্থানীয় কৃষকরা দায়ী ছিল না, বরং পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ জেলা থেকে আগত আবাদি কৃষকদের জন্যই এটি সম্ভবপর হয়েছিল। আসাম উপত্যকায় বহিরাগতদের অভিবাসনের ফলে ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে শতকরা ৫৫.৬ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে বৃদ্ধি পায় পাটচাষ। এই প্রসঙ্গে আমরা তিনটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আলোচনা করতে চাই :

৫৪. A Haque, *The Man Behind the Plough,* (Calcutta 1939) ,124-25.

১. কুর্ফা চাষীদের আগাম গ্রহণের অর্থ কি ? অগ্রিম গ্রহণ কি নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছিল ?

২. আগাম গ্রহণের ফলে অর্থকরী ফসল উৎপন্নকারী চাষীদের কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ?

৩. চাষীদের স্বত্বহীনতা ও নির্ভরশীলতা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত বা স্থিতিশীল করার পথে কতটুকু বাধাস্বরূপ ছিল ? এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কারণ জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যিকীকরণের আদৌ কোন প্রমাণ নেই এবং সংশ্লিষ্ট চাষীদের এই ধরনের নির্ভরশীলতা বা জবরদস্তি মোকাবেলা করার ক্ষমতা ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বলা প্রয়োজন যে, আগাম গ্রহণই নির্ভরশীলতার একমাত্র কারণ ছিল না। এর সঙ্গে ফসলের উৎপাদনব্যবস্থা এবং প্রসারিত বাজারপদ্ধতিও সম্পর্কিত ছিল। আমরা দু'টি পণ্যের উল্লেখ এখানে করতে পারি—আফিম ও নীল। চাষীরা এখানে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল। ইউরোপীয় নীলচাষপদ্ধতি ক্ষুদ্র চাষীর উৎপাদন এবং শ্রমমজুরির ভিত্তিতে মালিকের সরাসরি চাষকে তথা জিরাতকে নিরুৎসাহিত করে। পরবর্তীতে আমরা দেখাবো যে, কৃষিঅর্থনীতিতে জিরাতপদ্ধতি একটা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। চাষীর ভূমি ও শ্রমের উপর মালিকের নিয়ন্ত্রণ ও সফলতা নির্ভরশীল ছিল। সাধারণভাবে মালিকরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কৃষকদেরকে নীলচাষে বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়। ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলায় ব্যাপকভাবে নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই ব্যর্থতার প্রমাণ। তখন পর্যন্ত রায়তি চাষে নীল উৎপাদনের মুখ্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল। মালিকরা বিভিন্ন কারণে রায়তি ব্যবস্থা পছন্দ করতো, কিন্তু চাষীরা সে ব্যবস্থায় মালিকের কাছে আবদ্ধ থাকতো বলে তারা এই ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতো। মালিকরা বিকল্প জিরাতব্যবস্থায় অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। রায়তি ব্যবস্থা তাদের জন্য ছিল অনেক লাভজনক। মালিকের লাভ মানে কৃষকের ক্ষতি। এই কারণে কৃষকরা বিভিন্নভাবে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে।

জিরাতি চাষে কুঠিয়ালের সুবিধা ছিল (ক) দখলিস্বত্বসহ পর্যাপ্ত জমি পাওয়ার, (খ) উক্ত জমি চাষের ব্যবস্থা করার এবং (গ) চাষ লাভজনক করার। জমিদারের কাছ থেকে পতিত জমি ইজারা অথবা খাসখামার ইজারা নিয়ে সরাসরি চাষ করা কুঠিয়ালদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি ছিল। অনেক ভূস্বামীর পতিত জমি ছিল, কিন্তু তা বেশি পাওয়া যেতো না। পতিত জমি আবাদের মাধ্যমে কৃষিপ্রযুক্তির তথা কৃষির উন্নতি হয় এবং লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পতিত জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। খাসখামার ইজারা দেয়ায় ভূস্বামীর অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, কারণ তারা সরাসরি চাষ করতো না, তাদের খাসখামার ক্ষুদ্র ছিল।

নীলকরদের ব্যক্তিগত কর্ষণে অক্ষমতা এবং অনিশ্চিত শ্রমসরবরাহের জন্য প্রাপ্ত জমি সরাসরি আবাদে অসুবিধা হতো। কুঠিয়াল ব্যয়হ্রাস করার জন্য হাল-বলদ ক্রয় এবং সারা

বছর পোষার পরিবর্তে কৃষকদের কাছ থেকে হাল ভাড়া করতে পছন্দ করতো। তারা অবশ্য ইচ্ছানুযায়ী চাইলেই হাল ভাড়া পেতো না, কারণ চাষীরা নীলচাষের জন্য তা দিতে অনিচ্ছুক ছিল পাছে তাদের নিজস্ব কৃষিকর্মের ক্ষতি হয়।

জিরাতি চাষে উৎপাদনের সকল খাতে নগদ অর্থ প্রদান করতে হতো। কিন্তু রায়তি চাষে কুঠিয়ালদের অনেক সাশ্রয় হতো, কারণ তাতে শ্রমের মূল্য দিতে হতো না, রায়ত নিজেই সব কিছু করতো। রায়ত জমি পরিষ্কার করতো, চাষ করতো এবং তার সন্তানগণ তাকে সাহায্য করতো। এভাবে কুঠিয়ালরা অল্প খরচে দাদন প্রথার মাধ্যমে রায়তি ব্যবস্থায় নীলচাষ করতো। এ ব্যবস্থায় অগ্রিম গ্রহণকারী চাষীরা তাদের সমুদয় উৎপাদিত শস্য মালিকের কাছে সমর্পণ করতো। এর মূল্য থেকে আগাম অর্থসহ মালিকপ্রদত্ত শস্যের মূল্য, নীলকুঠিতে উৎপাদিত ফসল পৌছানোর খরচ এবং নীলচুক্তির আনুষ্ঠানিক স্টাম্পের মূল্য কেটে রাখা হতো। এরপর অবশিষ্ট যা থাকতো তা অর্থনৈতিকভাবে চাষীর জন্য মোটেই লাভজনক ছিল না। যে মুহূর্তে বকেয়া জমে যেতো, নীলকরেরা চাষীকে দাদন দেয়া বন্ধ করে দিত এবং মূল্য থেকে বকেয়া কেটে নেয়া হতো। নীলকরেরা চাষীদের কাছ থেকে সাধারণ বকেয়া সংগ্রহে আগ্রহী ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য চাষীদের আবদ্ধ রাখা। এভাবে শ্রমশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে উৎপাদনের অন্যান্য হাতিয়ারসমূহের উপরও কুঠিয়ালের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫]

নীলচাষে দাদনব্যবস্থা থাকার ফলে কৃষকের অধীনতা পাকাপোক্ত হতো। কর্ষণব্যবস্থার উপর কুঠিয়ালের নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীলচাষের জন্য জমি নিজে পছন্দ করার অধিকার চাষীর ছিল না। নীলকরের পছন্দানুসারে সে চাষ করতে বাধ্য ছিল। অতএব তার কোন জমি বিশেষ কোন শস্য চাষের জন্য কর্ষিত হলেও, এমনকি তাতে ঐ শস্যের বীজবপন করা হলেও সেই জমিতে নীলকরের ইচ্ছানুযায়ী নীলচাষ করতে হতো। নীলকরের হস্তক্ষেপের এখানেই শেষ নয়, নীলচাষের জন্য উপর্যুপরি জমি চাষ করতে হতো, মাটিঢেলা পেষণ করতে হতো এবং আগাছাদি পরিষ্কার, জমি মসৃণ করা প্রভৃতি কাজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নীল রোপণ করতে হতো।[৫৬]

আফিমচাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল অন্য ধরনের। সরকারি নিয়ন্ত্রণের সফলতা গ্রামের শক্তিশালী মহলের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করতো। সরকারের একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য আগামব্যবস্থার রূপরেখা প্রণীত হতো। আগাম গ্রহণের সঙ্গে চাষী আফিম আবাদ করতে সরকারের অনুমতি লাভ করতো। সরকার ব্যতীত তারা অন্য কারো অনুমতি নিতে পারতো না। অতএব সরকার যতোখানি চাইতো ততোটুকুই তারা উৎপন্ন করতো এবং যা উৎপন্ন হতো তাই সরকারকে দিত। আগাম গ্রহণকারী আফিমচাষীরা

৫৫. Sugata Bose, *Agrarian Bengal*, 52, 54

৫৬. *Report of the Indigo Commission* (1860), para 59

দীর্ঘকালের জন্য উক্ত চাষে জড়িয়ে পড়ে নি। দৃঢ়ভাবে ঋণে আবদ্ধ কৃষকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আগত বছরের হিসাবের সঙ্গে ঋণের হিসাব যোগ করা হতো না। আফিমচাষ জরবদস্তিমূলক বা অপরিহার্য ছিল না। এই চাষ হ্রাসের জন্য এবং তাকে কম আকর্ষণীয় করার জন্য সরকার আফিমের মূল্য কমিয়ে দেয়। চাষীরা অপছন্দ করলে এ চাষ নাও করতে পারতো। যাহোক, সরকারের একচেটিয়া আফিমব্যবসা চাষীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক ছিল। আইনগত ব্যবস্থা ছাড়াও গ্রাম্য প্রভাবশালী মহল, যথা মহাজন, গ্রাম্য মাতব্বর ও জমিদারদের সহযোগিতার উপর এ বিষয়ে সরকারের কৃতকার্যতা নির্ভর করতো। খাতাদারের মাধ্যমে আফিম বিভাগের সঙ্গে কৃষকদের যোগাযোগ হতো। আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিভাগের অঙ্গীভূত না হলেও চাষীদের অগ্রিম প্রদানের দায়িত্ব খাতাদারের উপর ন্যস্ত ছিল।

অনেক ক্ষেত্রে খাতাদারদের সঙ্গে চাষীদের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হতো, যা নিরসনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতো না। খাতাদারদের আরোপিত সেস সম্পর্কে সরকার অবহিত থাকতো। এই কর এত পুরনো ছিল যে তা প্রদান লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি চাষীরা সেস আরোপের জন্য খাতাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগও করতো না। বিনা প্রতিবাদে ওরা সেস প্রদান করতো। খাতাদারদের সাহায্য ছাড়া সরকারের এ বিষয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না বলে সরকার এ বিষয়ে কোনরকম হস্তক্ষেপ করতো না। সেজন্য স্থানীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও সরকার খাতাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি, পাছে আফিমচাষ ভণ্ডুল হয়ে যায়।[৫৭]

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আগামগ্রহণ পাটচাষে আংশিক ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি যেখানে চাষীরা আগাম গ্রহণ করেছিল সেখানে তাদের অবস্থা নীল ও আফিম চাষীদের থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। আগামগ্রহণের ফলে ঋণদাতাদেরকে পূর্বনির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী পাটের একটি অংশ দিতে হতো এবং সে মূল্য ঋণদাতাদের অনুকূলে থাকতো। যাহোক, মূল্যের ঘন ঘন উঠানামার জন্য ঋণদাতারা পাটচাষীদের সঙ্গে মহাজন-খাতক সম্পর্ক গড়ে তোলে নি এবং নীলকর ও আফিম বিভাগ যেমন প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল ছিল, তারা তেমন ছিল না।

যাহোক, পাটচাষী আগামগ্রহীতা হোক আর নাই হোক, তারা যে আরেক ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর অধীন ছিল তা হলো পাটকলসমূহ। এটির উপর জোর দেয়া দরকার, কারণ বলপূর্বক বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে চাষীর ঋণগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কিত।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অপেক্ষাকৃত শক্তিমান, সংগঠিত এবং বুদ্ধিমান পাটব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা, অসংগঠিত এবং সীমিত বিত্তের চাষীরা,

৫৭. Parliamentary Papers 1896, IX1 (32), 22; Board of Revenue to Government of Bengal, 19 February 1895, para 14

যারা পাট উৎপন্ন হওয়ার পর পরই তা বাজারে না এনে পারতো না, তাদের পক্ষে প্রথমোক্তদের সঙ্গে দরকষাকষি করা কঠিন ছিল। ফসল কাটার পর পরই বাজারে কাঁচা পাটের স্তূপ জমে যেতো, যার ফলে পাটকলের দালালরা সুবিধাজনক মূল্যে পাট ক্রয় করতে পারতো। এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, পাটকলের এরকম ক্ষমতা থাকার ফলে বছর বছর পাটের মূল্য উঠানামা করতো এবং তা পাটচাষীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। বাজারের চাহিদার একটি আপেক্ষিকতা ছিল এবং যারা পাটের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের পক্ষে চাহিদার উপর প্রভাববিস্তার করার কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। কৃষকরা পাটব্যবসায়ী ও পাটক্রেতাদের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারপরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এরা বেশি উৎপাদন করতে চাইলেও পাটকলগুলো অবশ্যই বেশি ক্রয় করতো না। পাটকলের এই আধিপত্য বিশ শতকের প্রথম চার দশকে যতোটা পরিলক্ষিত হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ততোটা দেখা যায় নি।

চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি হওয়ার একটি বিশেষত্ব ছিল। ১৮৯৭-১৯৩৭ সময়ের মধ্যে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা পাটশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানিবাজারের প্রসারের ফলে পাটকলের সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটা ছিল ধীরগতিসম্পন্ন এবং এতে মূল্যের ঘনঘন উঠানামা হতো। পুরনো ও গতানুগতিক উৎপাদনপদ্ধতি নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা ব্যাহত করে, যার ফলে অনেক দেশে এর বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অপরদিকে গতানুগতিক পাটশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সংশয় দেখা দেয় পাছে তার চাহিদা আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে এই শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা এবং উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। কোন কোন সময়ে পাটশিল্পের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যোগসূত্র ছাড়াই উৎপাদন হ্রাস পায়। উৎপাদন ইচ্ছাকৃতভাবেই হ্রাস করা হয় যাতে বিধিনিষেধের দরুন বাজারে স্তূপীকৃত মালের একটা সুরাহা হয় এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পাটকলমালিকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে একাজ করতে পারতো। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তাদের গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে ছিল তাঁত ও টাকু বন্ধ করে দেয়া এবং কারখানার কাজের সময়ের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাজ না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রভাব পড়ে পাটকলগুলোর কাঁচা পাট ক্রয়ের নীতির উপর। পাটকলগুলো অনুকূল সময়ে স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশি পাট ক্রয় করে তা মজুদ করতো এবং পরবর্তী সময়ে তা ক্রেতা হিসেবে দরকষাকষির ক্ষেত্রে তাদেরকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে আসতো।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে পাটকলগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদন হ্রাস করানো ছাড়া অন্যভাবেও পাটের বাজারে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতো। ফলে কাঁচা পাটের মূল্য কমে যেতো। পাটকলগুলো বিক্রেতাদের কাছে পাটের সার্বিক চাহিদা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ গোপন রাখতো এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে পাটচাষীরা পাটকল ও অন্যান্য ক্রেতারা কত

পরিমাণ পাট ক্রয় করবে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতো না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে পাট সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ব্যয়বহুল ছিল। তাই এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠে। নীল ও আফিমের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন প্রতিরোধের হাতিয়ারসমূহ ক্ষুদ্র কৃষিখামারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নীলকর ও আফিম বিভাগের হাতে ব্যবসাব্যবস্থাপনার ভূমিকা ছাড়াও ক্ষুদ্র কৃষকের চাষের উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিল এবং সে নিয়ন্ত্রণ ছিল জমিতে ফসল তৈরি থেকে আরম্ভ করে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রসারিত। নীলকর ও আফিম বিভাগ কৃষিপ্রক্রিয়াসমূহ পরিদর্শন করতো বটে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণে তাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কৃষকের জমিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় কৃষিপ্রক্রিয়ার খুটিনাটি বিষয়গুলোর তদারকি করা ছিল ব্যয়বহুল। নিয়ন্ত্রণ যেখানে কম সেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

বৃহৎ জেলাসমূহের নীল উৎপাদনকারী কৃষকরা যখন নীলচাষবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের প্রতিরোধের ধরনও ব্যাপক আকার ধারণ করে। কৃষক আন্দোলনের মুখে নীলকরদের জবরদস্তিমূলক কর্তৃত্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। ১৮৪৭-৪৮ সাল থেকে কতিপয় কারণে পরিবর্তন আসে, যার ফলে সমগ্র নীলচাষী সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দু'ধরনের পরিবর্তন আসে, যেমন নীলচাষ ব্যবস্থায় নীলচাষীদের উপর নতুন ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে তারা ঐ ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অশান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় তারা তাদের শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায়। বাংলায় ১৮৫৯-৬০ সালে তাদের দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে নীলচাষ দ্রুত কমতে থাকে। ১৮৬৮ সালে বিহারের নীলকরেরা সর্বপ্রথম বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জিরাতি ব্যবস্থার ফলে তাদের অবস্থা আংশিকভাবে রক্ষা পায়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাসায়নিক রং আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক নীলের বাজার বিনষ্ট হয়। ১৯১৭-১৮ সালে ব্যাপক চাষীপ্রতিরোধের মুখে বিহারে অবস্থিত নীলকরদের শেষ ঘাটির পতন ঘটে। নীলকরদের মূলধনের বিরাট উৎস ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন (ডিসেম্বর ১৮৪৭-জানুয়ারি ১৮৪৮) বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকে নীলকরেরা ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঋণমওকুফ বন্ধ করে দেয়। ১৮৫৫-১৮৫৯ সালে সকল পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা কৃষকদের নীলের সঙ্গে তাদের পূর্বেকার আবশ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে। মজুরিবৃদ্ধি ও হালের গরু ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির ফলে নীলচাষের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। নীলকরেরা কৃষিউৎপাদনের বাড়তি মূল্যের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ায় নি। অপরদিকে নীলচাষের মতো অলাভজনক চাষ বাদ দিয়ে অর্থকরী ও লাভজনক পণ্য, যেমন তামাক ও আলু (যার চাহিদা কলকাতা ও এর সন্নিহিত এলাকায় বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতির জন্য বেড়ে গিয়েছিল) সহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঐসব পণ্যের চাষের প্রতি চাষীদের আকৃষ্ট করে।

নীলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল ঐক্য এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল নীলচাষ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং নীলকরদের বলপূর্বক নীলচাষ করানোর প্রচেষ্টা নস্যাৎ করা। এই আন্দোলন লেলিহান শিখার মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে

পড়ে। নীলকরেরা আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য শত চেষ্টা করেও সফলকাম হয় নি। স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা তাদের কাজে আসে নি এবং আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সামাজিকভাবে একঘরে করার জন্য তাদের উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থাদিও কার্যকর হয় নি। জমিদার কর্তৃক প্লান্টারদের দেয়া জমির লীজ বা দখলিস্বত্ব, যেটি এতদিন তাদের আধিপত্যের সামাজিক ভিত্তি ছিল তাও নষ্ট হয়। মোটকথা প্লান্টারদের বিরুদ্ধে কিছু শক্তিশালী জমিদার জমির দখলি-স্বত্ব দেয়ার ব্যাপারে শত্রুমনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন।

আফিম বিভাগের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এ ধরনের বিরুদ্ধশক্তির সম্মুখীন হয় নি। আমরা আফিম উৎপাদকদের এ ধরনের মুক্ত বাজারের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে দেখি না। আফিম বিভাগের নিয়ন্ত্রণের উপরই তারা নির্ভরশীল ছিল। ঐ নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো, বিভাগ থেকে আগাম গ্রহণকারী কৃষকরা তার উপর অনধিকারচর্চা করতে পারতো না। তবে তারা আফিম উৎপাদন করা না করার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। অপরদিকে নীলকরদের চেয়ে আফিম বিভাগ চাষীদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অর্থাৎ অন্যান্য শস্যের লাভের বিষয়ে উদাসীন ছিল এবং চাষীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আফিমের মূল্য প্রায়শ বাড়িয়ে দিত। অর্থাৎ মূল্যের বিষয়ে তারা অহেতুক কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নি। যখন কৃষকরা দেখলো যে, আফিমের চাষ অলাভজনক, তখন তারা অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চাষে মনোযোগ দিল এবং এতে তারা কখনো আফিম বিভাগ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় নি।

চাষীরা কোন কোন স্থানে অবৈধ উপায়ে আফিম চাষ ও বিক্রয় করতো। একচেটিয়া মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গোপনীয়ভাবে পাইকারদের কাছে আফিম বিক্রি করা ছিল একচেটিয়া ব্যবস্থাকে পাশ কাটানোর একটি পদ্ধতি। বস্তুত কৃষকদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা ছিল আফিমের জন্য দাদন নিয়ে এর চাষের আইনগত ভিত্তি ঠিক রাখা এবং তার বিশেষ বিশেষ অংশ তাদের উৎপাদিত পণ্যের অবৈধ ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য ব্যয় করা। ঐসব কাজের জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া সত্ত্বেও তাদের এ পন্থা থেকে নিবৃত করা যায় নি। উদ্ধত কৃষকেরা আফিমচাষের জন্য নির্ধারিত উত্তম জমিসমূহের পরিবর্তে নিম্নমানের জমি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তাছাড়া তারা তাদের আয় বাড়ানোর জন্য আফিমের পাশাপাশি অন্যান্য অখ্যাত শস্যও চাষ করতে থাকে। এ সবই কৃষকদের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন।

পাটের ক্ষেত্রে উক্ত দু'ধরনের প্রতিরোধমূলক তৎপরতা দেখা যায় নি। তার কারণ পাট সম্বন্ধে চাষীদের ভিন্ন ধারণা ছিল এবং পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থাদি ছিল। নীলচাষীরা নীলচাষব্যবস্থার বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল, কারণ তাদের কাছে ঐ ফসল চাষ করা ছাড়া কোন বিকল্প পথ ছিল না। কিন্তু আফিমচাষীরা বিভিন্ন কারণে আফিমচাষ করতো। তাদের এটি পছন্দনীয় না হলে তা চাষ না করার স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা

একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের জন্য যে মূল্য পেতো সেটাই আসল ব্যাপার ছিল। তাদের প্রাত্যহিক প্রতিরোধমূলক তৎপরতা আফিমচাষকে আরো লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করার একটা ফন্দি ছিল। প্রত্যক্ষ কৌশলগুলো প্রকাশ্য এবং সমষ্টিগত প্রতিরোধ থেকে পৃথক ছিল এবং সদাসচেতন আফিম বিভাগ থেকে সেসব সুকৌশলে গোপন রাখা হতো।

অপরদিকে কৃষকগণ পাট সম্পর্কে উৎসাহী ও তৎপর ছিল। যদি পাটের মূল্য কম বিবেচিত হতো, তবে বিকল্প হিসেবে তারা ধান বা অন্য শস্য চাষে মনোনিবেশ করতো। আফিম ও নীলচাষের বিশেষত্বগুলো এখানে অনুপস্থিত। এই দু'টি ফসলের চাষ নির্ভরশীল ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে আগামের উপর। আফিমের একচেটিয়া ব্যবসার জন্য আগামের প্রয়োজন ছিল। নীলকরদের সে ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ছিল না। তবে ১৮৩৫-এর পরে নীলকরদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব লোপ পায়। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, 'বেঙ্গল ইনডিগো কোম্পানি' নামে এক বৃহৎ সংস্থার আবির্ভাব ঘটে ঐ সময়ে এবং উক্ত সংস্থা বিশাল নীল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। উভয় প্রকার চাষের সাফল্য নির্ভর করতো শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর সহযোগিতার উপর।

পাটের বিষয়টি ছিল ভিন্ন ধরনের। পাটব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গৃহীত আগামের সীমিত ভূমিকা ছিল। স্থানীয় ঋণদানকারী এবং অন্যান্য উৎস থেকে কৃষকেরা ঋণ নিত। তবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঋণদান সংস্থাগুলোর আগাম আর ঋণের মধ্যে পার্থক্য ছিল। অন্যদিকে একাধিক পাটক্রয়সংস্থা ও পাটদ্রব্য উৎপাদনকারী থাকায় এক্ষেত্রে আফিম বিভাগ এবং নীলকরদের মতো কৃষকের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অত সহজ ছিল না। পাটক্রেতারা কোন কোন ক্ষেত্রে পাটকল অথবা কাঁচা পাট রপ্তানি সংস্থাগুলো থেকে আগাম নিয়ে পাটক্রয়ে বিনিয়োগ করতো। যাহোক, সংস্থাগুলো নিজেরাই অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে তথ্যবিনিময় না করে বিনিয়োগ করতো।

পাটকলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও দরকষাকষির ক্ষমতা থাকার ফলে কাঁচা পাটের চাহিদা ও মূল্যের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। তবে অনুকূল পারিপার্শ্বিকতার অভাবে স্বাভাবিক কৌশলের দ্বারা ইপ্সিত ফললাভ অনেক সময় ব্যাহত হয়। কাঁচা পাট ক্রয়ের জন্য পাটের পাইকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন তারা নির্বিচারে যে ধরনের পাট পেতো তাই কিনতো। পাটরপ্তানিসংস্থাগুলো সরকারকে ফড়িয়াদের অসৎ পন্থা গ্রহণ বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু সরকার তাতে রাজি হয় নি, কারণ তার যুক্তি ছিল, যে পর্যন্ত পাটের পাইকারেরা পাটের বাজারে একে অপরের চেয়ে বেশি দাম দেবে সে পর্যন্ত আইনের খুব একটা কার্যকারিতা থাকবে না।

এটা স্বীকার্য যে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কাঠামোগত পরিবর্তনসাধন সম্ভব হলে ক্ষুদ্র কৃষিঅর্থনীতি হয়তো অন্তর্হিত হতো এবং কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক সৃষ্টি হতো। সাধারণভাবে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে প্রভাবশালী গ্রাম্য গোষ্ঠীসমূহ তাদের ক্ষমতার ভিত্তি শক্তিশালী ও সংগঠিত করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্রাম্য ভূস্বামীগণ, যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার গতানুগতিক ধারা ছিল খাজনা ও আইনবহির্ভূত আবওয়াব আদায়ের মাধ্যমে কৃষকের কৃষিউদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা। এই আত্মসাতের ফলে উৎপাদকদের উন্নতি সীমিত হয়ে পড়ে।

আফিম বিভাগ আফিমউৎপাদনকারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতো এবং তাদের উপর আফিম বণ্টনের দায়িত্ব অর্পণ করতো। খাতাদারদের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পছন্দ খামখেয়ালির ঊর্ধ্বে ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামীণ ঋণদাতা। বাইরে থেকে ঋণের অর্থের যোগান তাদেরকে মক্কেলদের উপর গতানুগতিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। সুবিন্যস্ত শ্রেণীকাঠামোর অনুপস্থিতি, যেটা এরিক স্টোক্স বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মিশ্র ভূমিকা থেকে উল্লেখ করেছেন, তা কদাচিৎ প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক উৎপাদনের উৎসসমূহ অপরিবর্তিত রইলো।

অবশেষে এ কথা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষকসমাজ কৃষির যে বাণিজ্যিকীকরণ আনয়ন করে এবং এর ফলস্বরূপ যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা মূল্যায়নের সত্যিকারের মাপকাঠি হলো কাঠামোগত পরিবর্তন।

১২

দেশী শিল্পের অবস্থা

ইফতিখার-উল-*

আঠারো শতকের প্রথম পাদে বাংলা একটি সমৃদ্ধিশালী ও বর্ধিষ্ণু প্রদেশরূপে সুপরিচিত ছিল। এর বিপুল প্রাচুর্যের জন্যই সমসাময়িক সুধীজনেরা এই দেশটিকে 'রাজ্যসমূহের মধ্যে স্বর্গ', 'ভারতের স্বর্গ', 'স্বর্গরাজ্য' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।[১] এর সম্পদের আকর্ষণেই দূরদূরান্ত থেকে বিদেশী বণিকেরা বাংলার উপকূলে এসে ভিড় জমাতো। বিশেষকরে আসতো ইউরোপের বিভিন্ন জাতির বণিক। তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য বর্ণনায় এ অঞ্চলের গৌরবগাথা অঙ্কিত রয়েছে। এমনও বলা হয়েছে, এটি এমন একটি আকর্ষণীয় স্থান, 'যেখানে প্রবেশের জন্য রয়েছে হাজারো উন্মুক্ত দরজা, কিন্তু ফিরে যাওয়ার জন্য একটিও নয়'।[২]

এ জাতির সম্পদ সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এদেশের উর্বর মাটি, যেখানে ফলতো ধান, গম এবং অন্যান্য শস্য, যেমন আখ, তুলা, আফিম, নীল এবং বিভিন্ন রকমের তেল ও সবজি জাতীয় কৃষিপণ্য। অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে উৎপন্ন হতো প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা, মোম, লম্বা মরিচ, লবণ এবং শোরা। কিন্তু আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে বাংলা হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জাতের তুলা এবং সিল্কের তৈরি পণ্যের এক অসাধারণ ভাণ্ডার। এ পণ্য শুধু মহান মুগলদের সাম্রাজ্য হিন্দুস্থানেই ব্যবহৃত হতো না, এ পণ্য যেতো বৃটেনে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। এই পণ্যগুলো শুধু যে

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. দেখুন, এ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়।

২. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire,* (Oxford 1914), Vol. I, 190.

চমৎকার মসৃণতা এবং মিহি কারুকাজের জন্যই খ্যাত ছিল তাই নয়, তুলনামূলকভাবে দামেও ছিল সস্তা। এভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার শিল্প-অর্থনীতিকে পৃথিবীর অন্য যেকোন দেশের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

এই অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় শিল্পের অবস্থা কেমন ছিল তা পর্যালোচনা করা হবে। শেষ পর্যন্ত এই শিল্প কেন ধ্বংস হলো তার কারণগুলিও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে। এ প্রসঙ্গে শৈল্পিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার বা নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে যাতে বৃটিশ শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তা নিরূপণ করা যায়। তারা কি দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এগুলোর উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ? শিল্পের এই যে ধ্বংস তা কি প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হয়েছে নাকি তা করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে ? শিল্পের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসৃত হয়েছিল, তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে যেন স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পগুলোর উপর এধরনের নীতিমালার সার্বিক প্রভাব নিরূপণ করা যায়।

১.০ তাঁতশিল্প : সুতীবস্ত্র

বাংলার সব রকমের হস্তশিল্পের মধ্যে কার্পাসশিল্প ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ইতিহাস অন্ততপক্ষে দু'হাজার বছর প্রাচীন। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে সবচাইতে বিত্তশালী রোমান মহিলাদের কাছে ভারতীয় মসলিন ছিল গভীর অনুরাগের বস্তু। দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকের রোমান লেখক প্লীনি অভিযোগ করেন যে, এমন কোন বছর যায় না যখন ভারত এই সাম্রাজ্য থেকে পাঁচশত পঞ্চাশ মিলিয়ন 'সেস্টারসেজ' (Sesterces) শুষে নেয় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের হিসাব অনুযায়ী এ অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ১,৪০০,০০০ পাউণ্ড।[৩] কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* 'ভঙ্গ' বা পূর্ববঙ্গের মিহি কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃস্টীয় প্রথম শতকের নাম-না-জানা লেখকের *Peripuss of the Erythraean Sea* গ্রন্থে গাঙ্গিটিকি (Gangitiki) নামের যে মসলিনের উল্লেখ পাওয়া যায় তার উৎস সম্ভবত পূর্ববঙ্গে। নবম শতকে সোলায়মান নামের যে আরব পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আসেন তিনিও সম্ভবত পূর্ববঙ্গের মিহি মসলিনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "রাহমী রাজ্যে (যাকে পূর্ববঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে) যে সুতীবস্ত্র উৎপন্ন হয় তা এত মিহি এবং সূক্ষ্ম যে অনায়াসে একটি পুরাদস্তুর পরিধেয় সিগনেট রিং-এর মধ্যে তা প্রবিষ্ট করানো যায়।" মার্কো পোলোর সফরকালে (১২৯৪ থেকে ১২৯৫ সাল) ভারতে তুলা বয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল গুজরাট, ক্যাম্বে, তেলেঙ্গানা, মালাবার এবং বাংলা। তিন শতাব্দী পর

৩. S. N. Gupta, *British, The Magnificent Exploiters of India*, (New Delhi 1979), 7-9. The estimate obviously included silk fabrics which were so eagerly sought after by Roman ladies.

(১৫৮৩) ভারত ভ্রমণকারী র‍্যালফ্ ফিৎস (Ralph Fitch)-এর মতে, ঢাকা থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে তেরো মাইল দূরে অবস্থিত সোনারগাঁও ছিল "এমন একটি শহর যেখানে সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে মিহি কাপড় তৈরি করা হতো।" প্রায় একই সময়ে আবুল ফজলও লিখেন, "সরকার সোনারগাঁও-এ এমন এক জাতের মসলিন উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত মিহি এবং যার পরিমাণও বিপুল।"[৪] বার্নিয়ার ও ট্যাভার্নিয়ারের মতো পরবর্তীকালের ভ্রমণকারীগণও বাংলায় তৈরি সস্তা, হালকা, জমকালো এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলায় উৎপন্ন তুলাজাত দ্রব্যের সৌন্দর্য এবং মসৃণতার জন্য সহজেই তা ইউরোপের ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সতেরো শতকের শেষেরদিকে বাংলায় ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে, যা তখন 'ফ্যাক্টরি' নামে পরিচিত ছিল।

১.১ তাঁত সংগঠন

বাংলায় বৃটিশ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি সুদৃঢ় হবার আগে তুলাশিল্পের সংগঠন ছিল পুরোপুরি কুটিরভিত্তিক। তখন ক্ষুদ্র এবং স্বাধীন উৎপাদনকারীগণ নিজ পরিবারের সদস্যদের শ্রমে উৎপাদন চালিয়ে যেতো, অবশ্য মাঝে মাঝে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকও নিয়োগ করতো। গোড়াতে তেমন কোন শ্রমবিভাজন ছিল না এবং প্রধান উৎপাদনকারীকে লগ্নিকারী এবং ব্যবসায়ী উভয় ভূমিকাই পালন করতে হতো। অন্যদিকে, ঘরোয়া ব্যবস্থাপনায় প্রধান কারুশিল্পী মহাজনদের মূলধনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই মহাজনেরা প্রায়ই ঋণদান এবং কাপড়ের ব্যবসাকে সংযুক্ত করে নিত। মহাজনেরা মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে টাকা আদানপ্রদান করতো। মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের বলা হতো পাইকার। পাইকারদের অধস্তন এক ধরনের কর্মচারী ছিল, যাদের বলা হতো 'মুকিম'। এরা ঘুরে ঘুরে উৎপাদিত বস্তুর গুণ এবং মানের তদারকি করতো। ইউরোপীয়দের ভারতে আগমনের পর কুটিরভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা আরো প্রসারলাভ করে। সেসময় প্রায় সকল ভারতীয় কারুশিল্পীরই মূলধনের প্রচণ্ড অভাব ছিল। তাই যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনকারীদের অগ্রিম টাকা প্রদান না করে বিদেশী ব্যবসায়ীদের গত্যন্তর ছিল না।[৫]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁতীদের অগ্রিম প্রদান করতো। এ দু'টি পদ্ধতি ছিল চুক্তি এবং এজেন্সি ব্যবস্থা। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোম্পানি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতো। এই ব্যবসায়ীদের বলা হতো 'দাদনি' ব্যবসায়ী। এরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করতো। এরা আবার

৪. J C. Sinha, "The Dacca Muslin Industry", *The Modern Review*, April 1925, 400-01.

৫. It was not the same as the 'putting out' system of Europe under which the merchant advanced to weavers not liquid capital but the actual raw materials.

তাঁতীদের সঙ্গেও চুক্তি সম্পাদন করতো এবং তাদের অগ্রিম বা দাদন প্রদান করতো।[৬] চুক্তি সম্পাদনের সময় দাদনি ব্যবসায়ীরা কাপড়ের মোট মূল্যের অর্ধেক, এমনকি চার ভাগের তিন ভাগ টাকাও পেতো। তাই তারা আবার তাঁতীদের প্রয়োজনমাফিক দাদন দিতে পারতো। তাদের কাজের জন্য দালালদের মূল্যের শতকরা ৪.৫ থেকে ৮ ভাগ পর্যন্ত কমিশন দেয়া হতো। আর খরচপত্র মেটানোর জন্য দেয়া হতো অতিরিক্তি সাড়ে সাত ভাগ।[৭] দাদনি ব্যবসায়ীরা প্রায়ই নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে সরবরাহ করছে বলে অভিযোগ আসতো।[৮] এই প্রেক্ষিতে ১৭৫৩ সালে চুক্তিব্যবস্থা রহিত করা হয়। কিন্তু আসলে ইংরেজরা কখনো একটা জিনিসের ন্যায্যমূল্য দিত না। আবার বায়নাকৃত পণ্য নেবার বেলায়ও এরা ছিল মাত্রাতিরিক্ত খুঁতখুঁতে। এজন্য "১৭৪০ সালের পর থেকে দাদনি ব্যবসায়ীরা ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে ব্যবসা করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বরং ফরাসী ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক শর্ত তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ঠেকে। তখন অনেক ক্ষেত্রে তারা ইংরেজ কোম্পানির আরোপিত শর্ত মেনে নিতে অসম্মতি প্রকাশ করে।"[৯]

১৭৫৩ সালে যে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় তার নাম এজেন্সি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মকর্তারা কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁতীদের অগ্রিম প্রদান করতো। অন্যভাবে বলতে গেলে, কম দামে সবচেয়ে বেশি পণ্য সংগ্রহের স্বার্থে কোম্পানি দ্রব্য সরবরাহের আসল উৎসের কাছাকাছি যেতে চায়। তাঁতীদের সাথে চুক্তির শর্তগুলো যেন যথাযথভাবে পালিত হয় সেটা তদারক করার জন্য তারা ফ্যাক্টরির অধীনে প্রত্যেক 'আড়ং'-এ বেশ কিছু ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করে। এসব কর্মচারী 'গোমস্তা', 'সেরেস্তাদার', 'মুহুরি', 'মুকিম', 'তাগিদগির' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল; কখনো কখনো অন্যান্য কর্মচারীও নিয়োগ করা হতো। তাদেরকে অভিহিত করা হতো 'আমিন', 'নায়েব-গোমস্তা', 'নায়েব' এবং 'তহবিলদার', 'জমাদার', 'বরকন্দাজ' ও 'পিয়ন' নামে। গোমস্তা ছিল 'আড়ং'-এর প্রধান কর্মকর্তা। তার মাধ্যমেই অগ্রিম প্রদান এবং সংগ্রহের কাজ করা হতো। "গোমস্তাদের মাধ্যমেই প্রায় ফ্যাক্টরির সব কেনাকাটা পরিচালিত হতো। ... এসব কর্মচারী নিয়োগের শর্ত দ্বারাই কোম্পানির প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা হতো। তারাই ছিল কোম্পানির কর্তৃত্বের প্রতিভূ ... ।"[১০] দাদনি

৬. J. C. Sinha, *Economic Annals of Bengal,* (London 1927), 79.

৭. Anisuzzaman, *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records,* (London1981), 5

৮. J. C Sinha, *Economic Annals,* 80.

৯. D B. Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal,* 1757-1833, (Calcutta 1978), 46-47.

১০. Hameeda Hossain, "The Company's Controls Over Textile Production: Implications of its Regal Framework for Weavers, 1757-1800", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* XXVIII: 1. (June 1983), 115.

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে তাঁতীরা যে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তা এভাবে গোমস্তাদের সঙ্গে কোম্পানির একচেটিয়া সম্পর্কে পরিণত হয়।[১১]

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এককালের কর্মকর্তা উইলিয়ম বোল্টস তাঁর *Considerations on Indian Affairs* গ্রন্থে গোমস্তারা কিভাবে কোম্পানির পণ্য সংগ্রহ করতো তার এক প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থ থেকে গোমস্তাদের আচরণ সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি লিখেছেন :

> সে (গোমস্তা) তাদের (তাঁতীদের) দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং মূল্যে একটি নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য সরবরাহের শর্তে বন্ড সই করিয়ে নিত এবং তাদের প্রাপ্য টাকার একটা অংশ অগ্রিম প্রদান করতো। দরিদ্র হতভাগ্য তাঁতীদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির তারা পরোয়া করতো না। কোম্পানির ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার পর গোমস্তারা প্রায়শই তাঁতীদের দিয়ে যা খুশি তা সই করিয়ে নিত; এবং তাঁতীরা প্রস্তাবিত শর্তে আগাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তা তাদের কোমরে বেঁধে দেয়া হতো এবং বেত্রাঘাত করে তাদের বিদায় করা হতো। ...এসব তাঁতীদের অনেকের নামই গোমস্তারা সাধারণত কোম্পানির খাতায় রেজিষ্ট্রি করে রাখতো এবং তাদেরকে অন্য কারো অধীনে কাজ করতে দেয়া হতো না। বরং ক্রীতদাসের মতো তাদেরকে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর করা হতো। এরা পরবর্তী প্রত্যেক গোমস্তার অত্যাচার এবং নষ্টামির শিকার হতো। বস্ত্র তৈরি হবার পর তা সংগ্রহ করে গুদামঘরে রাখা হতো এবং সংশ্লিষ্ট তাঁতীর নাম লিখে তা চিহ্নিত করে রাখা হতো। পরে গোমস্তা সুবিধামতো 'খাতা'র আয়োজন করে প্রতিটি বস্ত্রখণ্ডের শ্রেণীবিভাগ করে মূল্য নির্ধারণ করতো। এ কাজে যাচনদার নামে কোম্পানির একজন কর্মচারী নিয়োজিত থাকতো। এ বিভাগে যে কি পরিমাণ হঠকারিতার আশ্রয় নেয়া হতো তা কল্পনাতীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভীষণভাবে ঠকতো গরিব তাঁতীরা। কারণ কোম্পানির গোমস্তারা এবং তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যাচনদারেরা পণ্যের যে দাম নির্ধারণ করতো তা সর্বত্রই খোলা বাজারের চেয়ে অন্ততপক্ষে শতকরা পনেরো ভাগ এবং কোথাও কোথাও শতকরা চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত কম ছিল। এজন্য ন্যায্যমূল্য প্রত্যাশী তাঁতীরা গোপনে অন্যের কাছে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় করার চেষ্টা করতো ... তাই কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতীদের পাহারা দেয়ার জন্য তাদের পিয়ন নিয়োজিত করতো এবং প্রায়শই বুননের শেষ পর্যায়ে তাঁত থেকে বস্ত্র কেটে নিত।[১২]

বোল্টের এই বর্ণনার মধ্যে কোন আতিশয্য নেই। সমসাময়িক দলিলপত্রে কোম্পানির ইউরোপীয় প্রভুদের যোগসাজশে স্থানীয়-কর্মচারীরা যে শঠতা ও দুর্নীতির আশ্রয় নিত তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।[১৩]

১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করার জন্য ১৭৭৩ সালের এপ্রিলে ইংরেজ কোম্পানি হুকুম জারি করে যে, প্রচলিত বাজারমূল্যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করতে হবে। এ মুক্ত বাজারনীতির কারণ এই যে, তখন

১১. ঐ।

১২. William Bolts, *Considerations on India Affairs*, (London 1772), 193.

১৩. J. C. Sinha, *Economic Annals*, 83-84.

উৎপাদন কমে গিয়েছিল অথচ বাজারে চাহিদা ছিল যথেষ্ট। দু'বছর পর কোম্পানি আবার চুক্তিব্যবস্থায় ফিরে আসে।[১৪] কিন্তু মূলধন সংগ্রহের এই চুক্তি দাদনি বণিকদের সঙ্গে না করে করা হতো ফ্যাক্টরির প্রধান ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশত, এই পরিবর্তনগুলি কোম্পানির জন্য লাভজনক হয় নি। মুক্ত বাজারব্যবস্থায় একদিকে যেমন মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে পণ্যের গুণগত মানেও দেখা দেয় অবনতি। যেসব তাঁতী কোম্পানির কাছে দায়বদ্ধ ছিল, তারা এক সময় ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানি এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীদের কাছে কোম্পানির স্থিরীকৃত মূল্যের চেয়ে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেশি দামে গোপনে পণ্য বিক্রয় করতে শুরু করে। নিজের মূলধন উদ্ধার করার জন্য কোম্পানি ১৭৭০ ও ১৭৮০ সালে এক জবরদস্তিমূলক আইন প্রবর্তন করে। এর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল পণ্যের গোপন বিক্রয় বন্ধ করা। চুক্তির শর্ত পালন না করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৯৩ সালের কর্নওয়ালিস কোডে এসমস্ত আইনের চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়, এবং এর দ্বারা বয়নশিল্পে কোম্পানির ব্যবসার শর্তাদিও নিরূপিত হয়। এসব অনুশাসন জারি করার ফলে তাঁতীদের কর্মোদ্যোগ খুবই বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্বাধীন উৎপাদক রূপান্তরিত হয় দিনমজুরে।[১৫]

এদিকে কোম্পানির এজেন্টদের অত্যাচার-উৎপীড়ন শিল্পের এতটা ক্ষতি করে যে, অনেক তাঁতী তাঁতের পেশা ছেড়ে কম ঝামেলার পেশার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এমনকি ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের আগেও তাঁতীদের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। এরপর সে ঘাটতি আরো বেড়ে যায়। "অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তাঁতীরা হয় অন্যত্র পালিয়ে বাঁচে নয় বন্দী হয়। পেশাত্যাগকারীদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য··· । এরা তাঁত বয়ন ছেড়ে দিনমজুরের পেশা গ্রহণ করে। কেউ কেউ মাছ ধরার বা অন্য কোন পেশা নেয়, আর কেউ কেউ পলাতক অবস্থায় মারা যায়।"[১৬]

কোম্পানি অবশ্য প্রদেশের তাঁতের পেশায় নিয়োজিত জনগণের প্রায় তিন ভাগের একভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো।[১৭] অল্প ক'জন ব্যতীত অন্যান্য বয়নশিল্পীরা মূলধন এবং পণ্য বাজারজাত করার ব্যাপারে স্থানীয় মহাজনদের উপর নির্ভরশীল ছিল। অবশেষে ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের (Charter Act) মাধ্যমে কোম্পানি তার বস্ত্রব্যবসা গুটিয়ে ফেলে (বাস্তবে ১৮২৫ সাল নাগাদ ফ্যাক্টরিগুলিতে কাপড় তৈরির ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়)। যেসব তাঁতী এরপরও এই পেশা চালিয়ে যায়, তারা স্থানীয় মহাজনদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে পড়ে। কারুশিল্পীদের চরম দারিদ্র্যের জন্যই এধরনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা দেয়। কাজ

১৪. In 1787, the agency system was reintroduced and commercial residents were appointed to the factories. This was done to stop the corrupt practices of contractors.

১৫. Hameeda Hossain, "Textile Production", 121.

১৬. Anisuzzaman, *Factory Correspondence*, 13.

১৭. Mitra, *Cotton Weavers*, 107.

চালিয়ে যাওয়ার মতো কাঁচামাল (যেমন সুতা) কেনার জন্য একজন কারুশিল্পীর যে শুধু সচল মূলধনের প্রয়োজন ছিল তা নয়, সংরক্ষিত মূলধনেরও প্রয়োজন ছিল। উৎপাদিত পণ্য বাজারের অভাবে প্রায়ই অবিক্রীত পড়ে থাকতো, বিশেষকরে যখন চাহিদা ছিল কম। অথচ এসময়েও তাঁতীকে কাজে লিপ্ত থাকার জন্য সুতা ক্রয় করতে হতো। একবার কোন হস্তচালিত তাঁতী মহাজনের কাছে ঋণী হয়ে পড়লে তার পক্ষে আর ঋণের দায় থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন ছিল। মহাজনেরাও তাঁতীদেরকে ঋণের ক্ষেত্রে বেশ উৎসাহ দিত। তাঁতী কিছু টাকার জন্য ঋণগ্রস্ত থাকলে যেসব মাসে খেলাপী হয়ে পড়তো সেসব মাসে তা মহাজনের গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতো। এসব চুক্তির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অংশীদার হিসেবে স্বাভাবিকভাবে মহাজনেরা তাদের নিজেদের অনুকূলে চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণ করতো। আর আসল কর্মী পেতো ভরণ-পোষণের জন্য কিছু অর্থ। কেনাবেচা থেকে যে ব্যবসায়িক লাভ হতো মহাজনেরা তার পুরোটাই নিজেরা গ্রহণ করতো। মহাজনেরা হস্তচালিত তাঁতীদেরকে সমবায়ভিত্তিতে পরিচালনার সব প্রচেষ্টায় প্রবল বাধা দেয়। এভাবে বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত এ শিল্প সাধারণভাবে মহাজনের খপ্পরেই থেকে যায়।

১.২ তাঁতজাত দ্রব্য

বাংলার হস্তচালিত তাঁতভিত্তিক সুতীবস্ত্র শিল্প ছিল সারা দেশে বিস্তৃত। রবার্ট ওরমে (Robert Orme) এসম্পর্কে বলেন :

> করমন্ডল উপকূলে বা বাংলায় 'সদর' রাস্তা বা কোন প্রধান শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এমন কোন গ্রাম পাওয়া কঠিন ছিল, যেখানে প্রত্যেক নারী, পুরুষ এবং বালক-বালিকা একখণ্ড কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত নেই… সমগ্র প্রদেশগুলোর বিরাট অংশ এই একটি উৎপাদনে নিয়োজিত… লিনেন (তুলা) থেকে উৎপাদনের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে পাওয়া যাবে হিন্দুস্থানের জনগণের অর্ধাংশের জীবনের আলেখ্য।[১৮]

ওরমের এই মন্তব্যে কোন অতিরঞ্জন নেই। ১৭৭৬ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, শুধু ঢাকা জেলাতেই বস্ত্রবয়নশিল্পে জড়িত ছিল ১,৪৬,৭৫১ জন লোক। এদের মধ্যে ২৫,২০০ জন ছিল তাঁতী, বাকি ৮০,০০০ জন সুতা কাটার লোক। ১৮২৫ সালে কোম্পানির প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার ফলে বেকার হয়ে যাওয়া তাঁতী, তুলা উৎপাদক, তন্তুবায়, ড্রেসার এবং নকশাকারের সংখ্যা বোর্ড অব ট্রেডের হিসাব মতে দাঁড়ায় ৫০০,০০০।[১৯] যেহেতু ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসলে প্রদেশের তাঁতীকুলের মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো, ১৮২৫ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের ১.৫ মিলিয়ন লোক

১৮. Robert Orme, *Historical Fragments of the Mogul Empire*, (London 1805), 409.

১৯. Mitra, *Cotton Weavers*, 169.

সুতীবস্ত্র উৎপাদনে সরাসরি নিয়োজিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই শিল্পের এত প্রসারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওরমে বলেছেন যে, শারীরিক শক্তি কম হওয়ার ফলে এখানকার অধিবাসীগণ তাঁতবোনা অধিক পছন্দ করতো। কাজটি বসে করা যেতো, তাই এতে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন সবচেয়ে কম হতো।[২০] কে. এন. চৌধুরী এর সম্ভাব্য অন্য কারণের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, এই শিল্পের প্রসারের সঙ্গে জনগণের বিশেষ কোন জেনেটিক (genetic) বৈশিষ্ট্যের যোগ ছিল না, বরং সমগ্র ভারতে বয়নশিল্প সংগঠিত হয়েছিল বর্ণভেদের উপর ভিত্তি করে।[২১]

বয়নশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত বস্ত্র এবং বৈদেশিক ও আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসার জন্য উৎপাদিত বস্ত্রের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত বস্ত্র ছিল মোটা এবং দামে সস্তা। কাপড়ের মান ও মূল্য জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরি করা হতো খুব যত্নের সঙ্গে, ব্যবসায়ীদের নমুনা অনুসারে। তবে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত বস্ত্রের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যেতো। মালদহ, হরিপল (রাজশাহী জেলায় অবস্থিত), শ্রীপুর (রাজশাহী জেলায় অবস্থিত), বলিকুশী, কাগমারী (ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি কোসা, এলাচি, হাম্মাম চৌতাহ, তুতালী, শশী, শিরসাকার, বাফতা, সেনো, মলমল এবং তানজিব উৎপাদনের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। বর্ধমান, খীরপয় (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত), রাধানগর (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত), দেয়ানগঞ্জ এবং বলীগিসাগর শহর থেকে ইংরেজ কোম্পানির জন্য সরবরাহ হতো দরিয়া, তরিন্দম, কাটানী, শশী, সুতীরুমাল, গুড়া, শিস্টেরসায়, সন্তান কুপি, চরিধারী চিলা, কুস্তা, দুসুতা প্রভৃতি নামের বস্ত্র। বীরভূমের এলামবাজার থেকে ইউরোপে সরবরাহ করা হতো বিপুল পরিমাণ গুড়া, নদীয়া জেলার শান্তিপুর এবং বুরন থেকে সরবরাহ করা হতো মলমল এবং কোসা। মেদিনীপুরের খ্যাতি ছিল মসলিন এবং রঙিন বস্ত্রসম্ভারের জন্য। রংপুরের আড়ংসমূহ, ঘোড়াঘাট (দিনাজপুরে অবস্থিত) এবং সন্তোষ বুদৌল (দিনাজপুরে অবস্থিত) থেকে ইংরেজ কোম্পানির জন্য সরবরাহ করা হতো সেনো মলমল এবং তানজিব।[২২] কিন্তু সাদাসিধে বস্ত্র উৎপাদন এবং জামদানী, নামক নকশামণ্ডিত মসলিন তৈরিতে ঢাকার অবস্থান ছিল নিঃসন্দেহে সবার উপরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য ঢাকা ফ্যাক্টরির আড়ং-এ আঠারো শতকের শেষ দশকে নিম্নলিখিত ধরনের মসলিন উৎপাদিত হতো :

---

২০. Orme, *Historical Fragments of the Mogul Empire*, (London 1805), 409.

২১. "The Structure of Indian Textile Industry in the Seventeenth and Eighteenth Centuries'", *The Indian Economic and Social History Review*, Vol xi, Nos. 2-3, June-September, 1974, 131.

২২. Mitra, *Cotton Weavers*, 151-52

চাঁদপুর	:	আদি, কোসা, লাক্কারিখ এবং নয়নসুখ।
ঢাকা	:	আক্রয়ান, আদি, বুটা, কোসিদা, চীকন, ডুরে, জামদানী, জরি ও সাদা বস্ত্র।
ধামরাই	:	বুটা, কোসিদা, তরিন্দম ও সাদা বস্ত্র।
জঙ্গলবাড়ী	:	আদি, বাফতা, বুটা, কোসা, শিরকার গুজী, কোরা, নয়নসুখ, সাদাসিধে বস্ত্র, সমুদ্রলহর সুতা, শিরহাদকোনা, শির আলী ও তানজিব।
নারায়ণপুর	:	আদি, মামুদী, মামুদিয়াতি, মুগাদিয়া, নয়নসুখ, শিরবন্দ , শিরবতী ও তানজিব।
সোনারগাঁও	:	আদি, আলাবলি, বুনীজি, কোসা, গুজী, মলমল, সাদাসিধে বস্ত্র, সমুদ্রলহর সুতা, শিরবন্দ ও শিরবতী।
শ্রীরামপুর	:	কোসা, দিমতি, হাম্মাম, ইজরি ও লং ক্লথ।
তিতবাধী	:	তানজিব।[২৩]

শুধুমাত্র ঢাকার আড়ংগুলি থেকেই ১৭৪৭ সালে কার্পাসের তৈরি যেসব পণ্য রপ্তানি হয়, তার বার্ষিক মূল্য ছিল সাড়ে আটাশ লক্ষ টাকা।[২৪] ১৭৮৭ সালে এই অঙ্ক বেড়ে হয় ৫০ লক্ষ টাকা।[২৫] কিন্তু জন টেইলরের মতে, ঢাকা কাস্টমস হাউজ বার্ষিক ৫০ বা ৬০ লক্ষ টাকার যে হিসাব দেখিয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্মীপুর, হুরীপুর এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি নিকটবর্তী অঞ্চলের পণ্যের মূল্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব পণ্যের রপ্তানির চালান অবশ্যই ঢাকা কাস্টমস হাউজ থেকেই নিতে হতো। তাঁর মতে, ১৭৯০ সালের দিকে ঢাকা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বার্ষিক যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হতো, তার মূল্য ছিল প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এর একটা সারণি দেয়া হলো[২৬]:

কোন কোন উৎপাদন-অঞ্চলে তাঁতীদের বৈশিষ্ট্য এবং বেশি সংখ্যায় অবস্থানের কারণ নির্ভর করতো অনেকগুলো অবস্থার উপর। এর মধ্যে অন্যতম কাঁচামালের সহজ প্রাপ্তি। এই বিষয়টিই আবার নির্ভরশীল ছিল বিশেষ জলবায়ু এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর। অন্য দু'টি কারণ হলো রাজদরবার ও ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং পরিবহনের সুবিধা (পরিবহনের সুবিধা বলতে বোঝানো হয়েছে বাজারের সুবিধা এবং পরিবহন খাতের স্বল্পব্যয়)।

২৩. Anisuzzaman, *Factory Correspondence*, 10.

২৪. দেখুন, John Taylor's Report in Abdul Karim, "An Account of the District of Dacca, Dated 1800", *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, VII· 2 (1962), 307-09.

২৫. Anisuzzaman, *Factory Correspondence*, 4.

২৬. John Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca" 331

আড়ং-এর নাম	উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (আর্কট টাকায়)
ঢাকা	৪,৫০,০০০
সোনারগাঁও	৩,৫০,০০০
নারায়ণপুর	২,০০,০০০
জঙ্গলবাড়ী-বাজিতপুর	৪,৫০,০০০
চাঁদপুর	৫০,০০০
শ্রীরামপুর	৫০,০০০
ধামরাই	২,৫০,০০০
তিতবাধী	১,৫০,০০০
	মোট ১৯,৫০,০০০
স্থানীয়দের ব্যবহারের জন্য নিম্নমানের বাদ দিয়ে	৪,৫০,০০০
হিসাবে সম্ভাব্য কম পড়ার বিষয়টি ধরে ঃ	২,০০,০০০
মোট টাকার অঙ্ক	২৬,০০,০০০

বস্ত্রবয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

বাংলায় তখন বস্ত্র তৈরির ভালো কাঁচামাল পাওয়া যেতো। এসব কাঁচামাল উৎপন্ন হতো বিশেষ উৎপাদনকেন্দ্রসমূহের বেশ কাছাকাছি এলাকায়। ঢাকায় ফোটি কার্পাস থেকে প্রায় সব ধরনের মিহি মসলিন উৎপাদিত হতো।[২৭] এছাড়া ঢাকায় আরও উৎপন্ন হতো বৈরাতি কার্পাস। এভাবে যে স্থানীয় তুলা উৎপন্ন হতো তা ছিল বিশ্বের যেকোন অঞ্চলের তুলা থেকে উৎকৃষ্টতর। এই তুলার আঁশ ছিল অন্য যেকোন ভারতীয় আঁশের চেয়ে মিহি। পাকানোর সময় এটাকে বহুবার ঘোরানো ও প্যাঁচানো যেতো। ঢাকার তুলার আর একটা বিশেষ গুণ ছিল এই যে, শুভ্র (bleach) করার পর এই তুলা থেকে উৎপন্ন সুতা ফুলে যেতো না।[২৮] ঢাকার কার্পাসের এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জন টেইলর বলেন যে, এটি উৎপাদিত হতো সমুদ্রের খুব কাছেই। সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় মেঘনার জলের সঙ্গে মিশতো, কারণ বছরের তিন মাস এই জলে দেশের এই অংশ প্লাবিত হতো। ভাটার সময়

২৭. J. C Sinha, "Dacca Muslin Industry", 402.

২৮. ঐ।

জল থেকে বালি, লবণের কণা ইত্যাদির তলানি পড়তো। এর ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি খুব বেড়ে যেতো। এই মাটির রং ছিল হালকা বাদামী। এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, কার্পাস গাছের পুষ্টিতে সমুদ্রের সতেজ বাতাসের শুভ প্রভাব পড়তো।[২৯] ঢাকা ছাড়া পাটনাতে পাঁচ রকম তুলা উৎপন্ন হতো। মালদহ, বর্ধমান এবং রাধানগরে উৎপন্ন হতো তিন রকম তুলা। হুরীপলে উৎপন্ন হতো দুই রকম তুলা। মেদিনীপুর, শান্তিপুর এবং চট্টগ্রামেও তুলা উৎপন্ন হতো।[৩০]

উৎপাদনের এই বিশেষ কেন্দ্রগুলি সারাদেশে ছড়ানো রাজদরবার ও উপরাজ-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে গড়ে উঠতে পারতো না। প্রতিটি দরবারই সাধারণত একদল তাঁতী পুষতো। বাংলার হিন্দু রাজন্যবর্গ এবং পরবর্তী সময়ে মুগল সম্রাট ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন অধিকতর মিহি এবং মূল্যবান বস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুগলদের রাজত্বকালে রাজপরিবারে ব্যবহারের জন্য বস্ত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত কারখানাকে বলা হতো মালবুস খাস কুঠি। ঢাকা, সোনারগাঁও ও জঙ্গলবাড়ীতে এগুলি অবস্থিত ছিল এবং এগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দারোগা। দারোগাদের তাৎক্ষণিক কর্তব্য ছিল সকল বস্ত্র উৎপাদনপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। ঢাকা থেকে মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠানো মালবুস খাসের বার্ষিক মূল্যই ছিল প্রায় এক লক্ষ আর্কট টাকা।[৩১] মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য এবং জগৎশেঠের জন্য পাঠানো বস্ত্রের আড়ংমূল্য ছিল যথাক্রমে তিন লক্ষ আর্কট টাকা এবং দেড় লক্ষ রুপী।[৩২] তাঁতীরা এসময় নিয়মিত বস্ত্রবুননে নিয়োজিত ছিল। ফলে তাদের দক্ষতা বেশ বেড়ে যায়। দারোগাদের এবং তাদের লোকদের অবিরাম খবরদারি, তাদের কাছে প্রত্যাশিত কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি হলে তার জন্য শাস্তির ভয় নিশ্চয়ই বস্ত্র উৎপাদনের সময়ে কোন প্রকার অযৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করতে তাঁতীদের কার্যকরভাবে নিবৃত্ত করেছিল।[৩৩] তাছাড়া সুতা কাটার সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে এসব বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা কাটায় নিয়োজিত করা হয়। সব সময় এরকম মিহি সুতা কাটার অভ্যাস, সুতা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট করে কাটার প্রচ্ছন্ন দায় এবং এ ধরনের কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতার মনোভাব সুতাকে গুণগত দিক থেকে যতোখানি সম্ভব উৎকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল।[৩৪] পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো এসব

২৯. John Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 313-14.

৩০. Mitra, *Cotton Weavers*, 156-57.

৩১. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 303-05.

৩২. ঐ, 307-09.

৩৩. ঐ, 321.

৩৪. ঐ, 319

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বুননকেন্দ্রের কোন কোনটিতে আবাসিক প্রতিনিধির অবস্থানের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া এরা ইউরোপীয় বাজারে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাওয়া বাংলার এই সুবিখ্যাত তৈরি বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আরো নতুন নতুন বুননকেন্দ্রেরও পত্তন করে।

উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে জলপথে, স্থলপথে বা উভয় পথেই যোগাযোগব্যবস্থা ছিল চমৎকার। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, কলকাতা ও পাটনার সঙ্গে নেপাল ও ভুটানের যোগাযোগ ছিল। ঢাকা এবং কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ ছিল দু'টি রাস্তার মাধ্যমে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধমানেরও যোগাযোগ ছিল। জেমস রেনেল আঠারো শতকের এই যোগাযোগব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বহু সড়কের একটি তালিকা প্রদান করেন। এ গ্রন্থের অন্যত্র এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।[৩৫] স্থলপথে ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌপথে উৎপাদনকেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত চমৎকার। জলপথে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং কলকাতা ও পাটনার মতো বড় শহরে সারা বছরই যাতায়াত করা যেতো। এ প্রসঙ্গে ডাও বলেন, "জলপথে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা অধিবাসীদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠার পথ সুগম করে . . . বিভিন্ন মুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়ে গঙ্গা নদী পণ্য ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি রপ্তানির সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে দেয়।"[৩৬]

১.৩ উৎপাদনের ব্যয়কাঠামো

বয়নশিল্পের উৎপাদনব্যয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মজুরি এবং কাঁচামালের মূল্য। মজুরির মধ্যে রয়েছে বুননের জন্য ব্যয়, আয়তন ঠিক করা এবং তাঁতের টানা সুতা তৈরির (টানা এবং দুমড়ানোসহ) জন্য ব্যয়, কাপড়ের প'ড়েন পাকানোর জন্য ব্যয় এবং চূড়ান্ত রূপদানের ব্যয়। মজুরি বাবদ ব্যয় অবশ্য নির্ভর করতো কি ধরনের বস্ত্র উৎপাদিত হতো তার উপর। সর্বোৎকৃষ্ট মালবুস খাসের মূল্য অনেক বেশি। প্রতিবছর সম্রাটের জন্য যে মালবুস খাস পাঠানো হতো অথবা বাংলার নবাবের জন্য 'সরকার-ই-আলী' নামে যেসব বস্ত্র উৎপাদন করা হতো, সেগুলোর জন্য পারিশ্রমিক ছিল খুবই বেশি। এক্ষেত্রে তাঁতীদেরকে অত্যন্ত মিহিসুতা দিয়ে কাজ করতে হতো। শ্রমের জন্য ব্যয় আরো নির্ভর করতো 'জামদানী' নামের ফুলখচিত মসলিনে যে ধরনের নকশা বোনা হবে তার জটিলতার উপর। টেইলর জানাচ্ছেন যে, আঠারো শতকের শেষদিকে সর্বোৎকৃষ্ট অর্ধখণ্ড 'মলমল খাসের' মূল্য ছিল আশি আর্কট টাকা। এর মধ্যে সুতার দাম ছিল ঊনচল্লিশ টাকা আর একচল্লিশ টাকা থাকতো মুনাফা হিসেবে তাঁতীর জন্য।[৩৭] মোটকথা মজুরিই ছিল

৩৫. দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩৬. Alexander Dow, *The History of Hindostan*, Vol. III, (New Delhi 1985, reprint), lxii

৩৭. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 318.

মোট উৎপাদনখরচের শতকরা ৫১.২৫ ভাগ। কিন্তু আঠারো শতকে ইউরোপে যে সমস্ত বোনা বস্ত্রপণ্য রপ্তানি করা হতো তা সর্বোৎকৃষ্ট মানের ছিল না। "১৭৯২ সাল পর্যন্ত কোম্পানি কখনো সম্পূর্ণ একখণ্ড কাপড়ের জন্য পঞ্চাশ আর্কট টাকার অধিক মূল্য প্রদান করে নি।"[৩৮] সর্বোৎকৃষ্ট নয় এমন ধরনের বস্ত্রের উৎপাদনখরচ কিছুটা কম ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৮৯ সালের ঠিক আগের বছরগুলিতে কোন কোন ধরনের মিহি বাফতা এবং কোসার উৎপাদনখরচ স্বাভাবিক সময়ে শতকরা ৩১ থেকে ৩৭ ভাগ পর্যন্ত উঠানামা করতো।[৩৯] ১৭৯৪ সালে একখণ্ড 'মলমল মামনী'র জন্য মজুরি ছিল শতকরা প্রায় ২৫.৮০ ভাগ, মামুধিয়াটির জন্য লাগতো ২৭.৫০ ভাগ, সাধারণ শিরবতীর জন্য লাগতো ২৫.৯৩ ভাগ, এবং ১২০০ সুতার মলমলের জন্য লাগতো ২৩.৫৩ ভাগ।[৪০] ১৮০৪ সালের কোন কোন বস্ত্রের উৎপাদনব্যয়ের যে হার পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, তুলার ক্রমবর্ধমান উচ্চমূল্যের ফলে তাঁতীদের লাভের পরিমাণ অনেক কমে যায় (সারণি ১.১)।

রপ্তানির জন্য সূক্ষ্মতর বস্ত্রাদি ছাড়াও সাধারণ মানুষের জন্য শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা এবং এ ধরনের রকমারি বস্ত্রাদি উৎপন্ন করা হতো। বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে বাংলায় এ ধরনের বস্ত্রপণ্য বোনার জন্য মজুরি পড়তো শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ।[৪১]

উৎপাদনখরচের ক্ষেত্রে অন্য গুরুত্বপূর্ণ চলক (variable) হলো সুতার মূল্য। এই মূল্য আবার নির্ভর করতো সুতার সূক্ষ্মতার উপর (এবং অন্য কোন উপাদান ব্যবহৃত হলে তার উপর)। রাজপরিবারের জন্য মসলিন তৈরি করা হতো সূক্ষ্মতম সুতা দিয়ে। এই সুতা কাটা হতো সম্ভবত ৫০০ কাউন্টের উপর।[৪২] টেইলরের মতে, সারা মাস ধরে পুরো সকাল মাকুতে কাজ করার পরও একজন সুতা কাটার লোক সর্বোচ্চ মাত্র আধা তোলা পরিমাণ সুতা কাটতে পারতো। তিনি আরো হিসাব করে দেখান যে, সূক্ষ্মতম ধরনের মসলিনের অর্ধখণ্ড (যার ওজন ৪.৫ আউন্স) বোনার জন্য (১০গজ×১গজ) একজন লোকের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতা কাটতে লাগতো প্রায় দু'বছর।[৪৩] বুনন খরচের মতোই এধরনের সুতার দাম স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকতো। কোম্পানির রপ্তানিযোগ্য পণ্যের অধিকাংশই ছিল মাঝারি ধরনের আর সুতার মূল্যই ছিল উৎপাদনখরচের বড় অংশ। সাধারণ বাফতা এবং মিতা মামুদির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। সূক্ষ্মবস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে সুতার আনুপাতিক মূল্য ছিল কিছুটা কম (সারণি ১.১)। অর্থাৎ প্রতি পাউন্ড তুলা ব্যবহার

৩৮. ঐ।

৩৯. K. N. Chaudhuri, "Indian Textile", 169.

৪০. Mitra, *Cotton Weavers*, 113-15.

৪১. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal, 1900-1939*, (New Delhi 1982), 221.

৪২. J. C. Sinha, "Dacca Muslin Industry", 403.

৪৩. ঐ, 404-05.

করে অতিসূক্ষ্ম কাউন্টের সুতা তৈরির জন্য একজন তাঁতী যে শ্রম দিত তা সাধারণ সুতা তৈরির শ্রমের চাইতে ছিল অনেক বেশি।[৪৪]

সারণি ১.১ : কয়েক শ্রেণীর সুতীবস্ত্রের ব্যয়কাঠামো

বস্ত্রের শ্রেণী	সুতার মোট মূল্য	২ থেকে ৬ পর্যন্ত শতকরা ভাগ	তাঁতীদের মজুরি	৪ থেকে ৬ পর্যন্ত শতকরা ভাগ	গোমস্তার হাতে তুলে দেয়ার সময়ে বস্ত্রের প্রকৃত মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬
	টা-আ-প		টা-আ-প		টা-আ-প
বাফতা চৌবিশা ২৫×২	২-২-০	৮০.৯৫	০-৮-০	১৯.০৫	২-১০-০
মীতামামুদি ২৫×২	২-১১-০	৮১.১৩	০-১০-০	১৮.৮৭	৩-৫-০
মূকাশাড়ি ২৫ × ১ ১/২	২-৮-০	৭৬.৯২	০-১২-০	২৩.০৮	৩-৪-০
মিহি বাফতা ২৫×২	৩-১-০	৭৭.৭৮	০-১৪-০	২২.২২	৩-১৫-০
কোসা ৪০ × ২	৩-১১-৮	৭৫.৮০	১-৩-০	২৪.২০	৪-১৪-৮
শুরা ৩৬×২ ১/২	৩-২-০	৭৫.৭৬	১-০-০	২৪.২৪	৪-২-০

উৎস : Proceedings of the Bengal Board of Trade (Commercial), Vol. 171, March 30, 1804, No. 25.

তাঁতীদের আয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশদের অধীনে তাঁতী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বোল্টের ভাষায়, আলিবর্দী খানের আমলে তাঁতীরা স্বাধীন ছিল। তারা তখন নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারতো এবং একবারেই একজন ব্যবসায়ীর কাছে ৮০০টি মসলিন বস্ত্রখণ্ড বিক্রি

৪৪. *Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18*, (Parliamentary Paper, XVII of 1919), 435.

করতে পারতো।[৪৫] নতুন রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলে শুধুমাত্র এ ধরনের সফল ও সৃজনশীল তাঁতী শ্রেণীরই ক্রমশ বিলুপ্তি ঘটে নি, সাধারণ তাঁতী এবং সুতা কাটার লোকদের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ খাদ্যশস্য ও শিল্পের কাঁচামালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। ১৭৬০ সালের দিকে যে কার্পাস বিক্রি হতো প্রতি সের চার থেকে পাঁচ পণ দরে, ১৮০০ সালে সে দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রতি সের নয় পণ। চল্লিশ বছরের মধ্যেই চালের দাম প্রতি আর্কট টাকায় আড়াই মণ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রতি আর্কট টাকায় দেড় মণ।[৪৬] উনিশ শতকের প্রথম দু'দশকে দ্রব্যমূল্য আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলার প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই চালের দাম প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কাঁচা তুলার দামও বেশ বৃদ্ধি পায়।[৪৭] জীবনযাত্রার ব্যয় এবং শিল্পের কাঁচামালের মূল্যের এই বৃদ্ধির ফলে তাঁতীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোম্পানি নিজের আয়-ব্যয় সম্পর্কে ছিল যথেষ্ট সচেতন। কোম্পানি তাদের চুক্তিবদ্ধ তাঁতীদের মজুরি এমনভাবে ধার্য করতো যেন তারা কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে। জামদানী বস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে দাম অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেয়া হয় (সারণি ১.২)। টেইলর লিখেন :

> জামদানী বস্ত্রের দাম যে অত্যন্ত কমে গেল তার কারণ এই নয় যে, সব তাঁতী কারুকার্যবিহীন বস্ত্র প্রস্তুত করে যে লাভ করতো তার তুলনায় জামদানী প্রস্তুতকারক তাঁতীরা সবসময় সামঞ্জস্যহীন মুনাফা অর্জন করতো। তার কারণ বরং এই যে, আগে জামদানীর স্বল্পসংখ্যক প্রস্তুতকারক যেমন দারুন মুনাফা অর্জন করতো তা একটা যুক্তিযুক্ত মানে কমিয়ে আনা হয়। এর আগে অবশ্য জামদানী প্রস্তুতকারক তাঁতীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে এই বস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আনুপাতিক হারে প্রতিযোগিতাও বেড়ে যায়।[৪৮]

ডি. বি. মিত্র বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, কোম্পানির কাজ করে প্রায়শই তাঁতীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো।[৪৯] "যথার্থভাবে ক্ষতিটা ছিল বস্ত্রের প্রকৃত মূল্য এবং কোম্পানির এজেন্টের কাছ থেকে তাঁতীরা যে মূল্য পেতো তার মধ্যকার তারতম্যের কারণে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁতীরা তাদের শ্রমের জন্য কোন মূল্য পেতো না এবং তারা যে কাঁচামাল ব্যবহার করেছে তার দাম পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হতো।"[৫০] এ থেকেও বোঝা যায় কেন তাঁতীরা ক্রমশ কোম্পানির কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা সুতা কাটতো তারাও খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের পারিশ্রমিক দীর্ঘকাল ধরে অপরিবর্তিত থেকে যায়। যেমন, যথাক্রমে ১৭৯২-৯৩ সাল থেকে ১৮২২-২৩ সাল পর্যন্ত মালদহ এবং

৪৫. James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Vol. II, (Calcutta 1840), 311.

৪৬. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 328.

৪৭. Mitra, *Cotton Weavers*, Table 5 & 6.

৪৮. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 323

৪৯. Mitra, *Cotton Weavers*, 109-15.

৫০. ঐ, 115.

সারণি ১.২ : ১৭৬০-৬৪ এবং ১৮০০ সালে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ঢাকা প্রস্তুত বস্ত্রের মূল্যের তুলনামূলক চিত্র

বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র	সুতার সংখ্যা	মাপ (হাতে)	১৭৬০-৬৪সালে প্রদত্ত মূল্য (আর্কট টাকা)	১৮০০ সালে প্রদত্ত মূল্য (সিক্কা টাকা)
ডুরী	১৫০০	৪০ ×২	১২	১৫
" মাঝারি	১৯০০	"	১৮	২০-১৫
" প্রশস্ত	"	৪০ ×২$\frac{১}{৮}$	২০-৪	২২-১০
" মিহি	২০০০	৪০ ×২	২৫	২৯
চারকোনা অতিমিহি	২১০০	"	৩০	২৮
" প্রশস্ত	"	৪০ × ২$\frac{১}{৮}$	৩৩-১২	৩৭-১১
" বগজি	"	৪০ × ২	৫০	৪৪
আক্রুয়ান	১৪০০	"	৩৬	৩৯-২
জামদানী	"	২০ × ২	৫০	৩৬-৪
শ্রীবতী সাধারণ	"	৪০ × ২	৫	৭-৮
শিরবন্দ মিহি	"	৪০×$\frac{১}{৮}$	৪	৪-১৫
মলমল	১২০০	৪০ ×২	৭-৪	১০-৪
" মিহি	১৩০০	"	৯	১২-৭
" লম্বা	"	"	১১	১৪-১৫
" অতিমিহি, লম্বা	১৪০০	"	৩০	৩৩-৮
" অতিমিহি	১৬০০	"	২০	২২-৫
" "	১৮০০	৪৫ × ২	৪৭	৫০-৪
মামুধিয়াটি	২৭০০	৪০ ×২	৩-৯	৫-৪
শিরবন্দ	৬০০	৪০ × ১$\frac{১}{৮}$	৩-৪	৩-১২
নয়নসুখ চাঁদপুর মিহি	"	৪০ × ২$\frac{১}{৮}$	১০	১২
" অতিমিহি	"	"	১৬	১৮
" কালো মিহি	"	"	১৪	১৫-৮
" অতিমিহি	"	"	২০	২১
হাম্মাম মিহি	"	২৪ × ৩	১৬	১৪
" অতিমিহি	"	"	২১	১৮-৮
দ্বিমত্তি সাধারণ	"	২৪ × ২	৬	৬-১০
" মিহি	"	"	১১-৮	১২-৮

উৎস : Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 324-26.

রাধানগরে তাদের মাসিক আয় ছিল প্রায় পৌনে তিন টাকা এবং তিন টাকা।[৫১] তাদের দিন আসলে ফুরিয়ে আসে। বৃটেন থেকে যন্ত্রের তৈরি সূক্ষ্ম অথচ স্বল্পমূল্যের সুতা আমদানির ফলে শ্রেণী হিসেবে তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাঁতীদের কেউ কেউ নতুন পেশা গ্রহণ করে, কেউ বা অনাহার-অপুষ্টিতে মারা যায়। এদিকে বৃটিশ মিলে তৈরি বস্ত্রে বাজার ছেয়ে যায়। ভারতীয় বস্ত্রের বাজার হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত। জি. এন. গুপ্ত দেখিয়েছেন যে, বিশ শতকের শুরুতেও যেসব তাঁতী নাছোড়বান্দার মতো নিজের পেশায় নিয়োজিত ছিল, তারা দৈনিক ২ থেকে ৩ আনা মাত্র আয় করতো। আর যারা নিজেদের মূলধন বিনিয়োগ করেছিল, তারা গড়ে মাসে ১৫ থেকে ২০ টাকা আয় করতো বলে জানিয়েছে।[৫২]

১.৪ সুতীবস্ত্র রপ্তানি

বাংলার প্রধান রপ্তানিপণ্য ছিল সুতীবস্ত্র। তা শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন ও ইউরোপসহ দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও ব্যাপকভাবে রপ্তানি হতো। ইবনে বতুতা, মা-হুয়ান, দুয়ার্তে বারবোসা, সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক, বার্নিয়ার এবং বাংলায় ভ্রমণ করেছেন এমন অন্যান্য ভ্রমণকারীদের রচনায় বিভিন্ন রকমের অত্যন্ত মিহি এবং সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র উৎপাদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় উৎপাদিত বস্ত্রের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে (১৬৪০-৪১) ম্যানরিক বলেন :

> এখানে সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান মসলিন বস্ত্র উৎপাদিত হয়। এগুলোর দৈর্ঘ্য ৫০ অথবা ৬০ গজ। প্রস্থ ৭ অথবা ৮ তালু। এগুলোর প্রান্তদেশ স্বর্ণ-রৌপ্য এবং রঙিন সিল্কের কারুকাজখচিত। এই মসলিন বস্ত্রগুলো এত সূক্ষ্ম যে, ব্যবসায়ীরা এগুলোকে দুই সাধারণ বিঘৎ লম্বা বাঁশের পাইপে করে বহন করতো এবং এভাবে তারা এগুলি খোরাসান, পারস্য, তুরস্ক এবং অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যেতো।[৫৩]

১৬৬৬ সালে বাংলায় আগমনকারী ফরাসী ব্যবসায়ী ভ্রমণকারী বার্নিয়ার জানান যে, এই বস্ত্র এখানে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হতো। তিনি লিখেন :

> আমি মাঝে মাঝে বিপুল পরিমাণ সুতীবস্ত্র দেখে অবাক হতাম। এগুলি ছিল বিভিন্ন রকমের মিহি এবং মোটা, সাদা ও রঙিন। এসব বস্ত্র শুধু হল্যান্ডের অধিবাসীরাই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষকরে জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি করতো। ইংরেজ, পর্তুগীজ এবং স্থানীয় বণিকেরা এসব পণ্যের প্রচুর ব্যবসা করতো। লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র মুগল সাম্রাজ্য, কাবুল এবং সাধারণত যেসব বিদেশী

৫১. ঐ, Table 7.

৫২. G. N. Gupta, *A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-08,* (Shillong 1908), 14.

৫৩. *Travels of Fray Sebastian Manrique 1629-1643,* Vol. I, (translated by C. Eckford Luard), (Oxford 1927), 57.

জাতির কাছে সুতীবস্ত্র পাঠানো হতো তা সরবরাহের জন্য প্রতি বছর বাংলা থেকে যে পরিমাণ সুতীবস্ত্র সংগ্রহ করা হতো তা কল্পনা করা সম্ভব নয়।[৫৪]

ইতিহাসে উল্লেখিত আছে যে, আঠারো শতকেও এশিয়া এবং ইউরোপের বণিকেরা বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। হিন্দু, আর্মেনিয়ান এবং মুসলিম বণিকেরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, তুরস্ক, আরব এবং পারস্যের সঙ্গে তেজী ব্যবসা করতো। ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের মতো ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং অসংখ্য ব্যক্তিগত ও মুক্ত ব্যবসায়ী ইউরোপে বিভিন্ন রকমের সুতীবস্ত্র রপ্তানিতে নিয়োজিত ছিল। ১৭৪৭ সালে ঢাকায় বস্ত্রব্যবসায়ের একটি বিবরণ থেকে বিভিন্ন জাতির যেসব বণিক এসময়ে ব্যবসা করতো তাদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। নীচে এর একটি তালিকা দেয়া হলো[৫৫] :

	(আর্কট টাকায়)
দিল্লীর সম্রাটের জন্য প্রেরিত বস্ত্রের মূল্য	১০০,০০০
মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য প্রেরিত বস্ত্রের মূল্য	৩০০,০০০
জগৎশেঠের বাণিজ্যের মূল্য	১৫০,০০০
তুরানী বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	১০০,০০০
পাঠান বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	১৫০,০০০
বসরা, মক্কা এবং জেদ্দার সঙ্গে আর্মেনীয় বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	৫০০,০০০
অংশত দেশের অভ্যন্তরে এবং অংশত বসরা, মক্কা ইত্যাদির সঙ্গে মুগল বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	৪০০,০০০
দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	২০০,০০০
ইউরোপের সঙ্গে বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	৩৫০,০০০
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্বতন্ত্র বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যের মূল্য	২০০,০০০
ইউরোপের সঙ্গে ফরাসী কোম্পানির বাণিজ্যের মূল্য	২৫০,০০০
ফরাসী প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের মূল্য	৫০,০০০
ইউরোপের সঙ্গে ওলন্দাজ কোম্পানির বাণিজ্যের মূল্য	১০০,০০০
মোট বস্ত্রব্যবসার পরিমাণ	২,৮৫০,০০০

৫৪. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire. A. D. 1656-1658,* (reprinted, Delhi 1968), 439.

৫৫. Taylor's Report in Abdul Karim, "Dacca", 308-09.

কিন্তু আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দীউয়ানি লাভ করে এবং বাংলা থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত রাজস্ব পণ্যের আকারে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (ইতিপূর্বে আমদানিকৃত স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বাট দ্বারা পণ্যক্রয়ের কাজ সমাধা করা হতো)।

সারণি ১.৩ : ১৭৭১-১৭৯২ সালে বাংলা থেকে আমদানিকৃত এবং যুক্তরাজ্যের কোম্পানি কর্তৃক বিক্রীত বস্ত্রপণ্যের সংখ্যা

সন	দ্রব্যাদির সংখ্যা	বিক্রয়মূল্য (পাঃ)	বিক্রয়মূল্য (সিক্কা টাকা)
১৭৭১	৬,০৪,৭৫৭	১০,৭৩,৮৪১	৮৫,৯০, ৭২৮
১৭৭২	৬,২৬,১৬০	১০,৩৫,৬৮৬	৮২,৮৫, ৪৮৮
১৭৭৩	৭,৬১,৪৮৯	১২,২৪,৪৬৭	৯৭,৯৫,৭৩৬
১৭৭৪	৬,১৬,২২৬	১১,০৫,২৩০	৮৮,৪১,৮৪০
১৭৭৫	৫,১৭,৭৬১	৯৬০,২৪৪	৭৬,৮১,৯৫২
১৭৭৬	৬,০৭,৮৭৮	১০,৯০,৭৪৪	৮৭,২৫,৯৫২
১৭৭৭	৬,৫৫,৩৩২	১১,১৪,৭৩৪	৮৯,১৭,৮৭২
১৭৭৮	৮,০৫,০১০	১১,৯৪,৬১৩	৯৫,৫৬,৯০৪
১৭৭৯	৩,৩৮,৪৬৫	৫,২৪,৬৩৬	৪১,৯৭,০৮৮
১৭৮০	৪,৭৪,৭০৩	৯,৮৪,৭৬৩	৭৮,৭৮,১০৪
১৭৮১	৩,০১,৬১৭	৫,৮২,১১৬	৪৬,৫৬,৯২৮
১৭৮২	৪,৪৬,৪৮৮	১০,৩৩,৫৫৭	৮২,৬৮,৪৫৬
১৭৮৩	৪,৩৭,৮০২	১০,৪৯,২২৪	৮৩,৯৩,৭২২
১৭৮৪	৫,১৬,০৮৮	৯,০৮,৩৭০	৭২,৬৬,৯৬০
১৭৮৫	৭,৬৮,২২৮	১৪,২৬,২৫২	১,১৪,১০,০১৬
১৭৮৬	৭,৬৪,১৭৩	১৪,৫৮,৪১৬	১,১৬,৬৭,৩২৮
১৭৮৭	৭৪৫,৪৪৯	১৩,১৭,৯৩৪	১,০৫,৪৩,৪৭২
১৭৮৮	৫,৯৪,৭২৮	৯,৭৮,৫০৭	৭৮,২৮,০৫৬
১৭৮৯	৬১৪,৮৩৯	৯,৪৩,০৯৬	৭৫,৪৪,৭৬৮
১৭৯০	৮,৬৬,২৮২	১৪,৮৫,০৮০	১,১৮,৮০,৬৪৫
১৭৯১	৭,০৯,৫৪০	১১,৩১,৭১৭	৯০,৫৩,৭৩৬
১৭৯২	৬,০৭,৩২৯	১১,৯৪,৮৭৫	৯৫,৫৯,০০০

William Milburn, *Oriental Commerce,* Vol. II, (London 1813), 234. ১সিক্কা টাকা = ২ শিলিং ৬ পেনস। এই হারে পাউন্ড-স্টারলিং-এর মূল্যের অনুপাতে সিক্কা টাকাতে বিক্রয় মূল্য হিসাব করা হয়েছে। মিলবার্ন অন্যত্র এই হার ব্যবহার করেছেন। বস্ত্রপণ্যের দ্বারা মিলবার্ন বুঝিয়েছেন প্রত্যেক রকমের ক্যালিকো এবং মসলিন।

রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের বস্ত্রপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানি তাঁতীদের উপর প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অসংখ্য কর্মচারী ও এজেন্টের দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হতো। "হিন্দুস্থানের উচ্চ অঞ্চলের বণিকেরা কার্যত বিতাড়িত হয়। যারা সমুদ্রপথে রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা নিরুৎসাহিত হয়। আর তাতে উৎপানকারীরা শুধু যে বাধাগ্রস্ত হয় তা নয়, সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা স্থানীয় এজেন্টদের দ্বারা প্রায়শই তারা নির্যাতিত হয়। এসব এজেন্ট তাদের নিয়োগকারীদের দ্বারা এবং যাদের উপর তারা খবরদারি করতো তাদের দ্বারাও লাভবান হতো।"[৫৬]

মিলবার্নের বিবরণে ১৭৭১-৯২ কালপর্বের বছরগুলিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ইংল্যান্ডে রপ্তানিকৃত বস্ত্রপণ্যের পরিমাণ জানা যায়। এই বিবরণে লন্ডনে এসব পণ্যের বিক্রয়মূল্যও জানা যায়। তিনি যেসব পরিসংখ্যান সরবরাহ করেছেন (সারণি ১.২ দ্রষ্টব্য) তা থেকে দেখা যায় যে, ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত এসব পণ্যের রপ্তানি বেশ স্থিতিশীল ছিল এবং এই সালেই ৮,০৫,০১০টি বস্ত্র বিক্রয় হয়। এরপর প্রায় ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য রপ্তানিবাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। এই স্বাধীনতাযুদ্ধে ফ্রান্স, স্পেন এবং হল্যান্ড ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইংল্যান্ডে যেসব পণ্য আমদানি করা হতো তা প্রধানত সেদেশে ভোগ করা হতো না। ১৭৮৮ সালে লর্ডস অব দি ট্রেজারির উদ্দেশে নিবেদিত একটি স্মারক থেকে জানা যায় যে, "ইংল্যান্ডে যেসব জিনিস আমদানি করা হয় তার বিশ ভাগের সতেরো ভাগ ছিল সবচেয়ে মোটা পণ্য এবং এগুলির নাম ছিল ক্যালিকো। যেসব পণ্য মসলিন নামে অভিহিত, তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ এবং ভারতে প্রস্তুত সব রকম রঙিন পণ্য রপ্তানির জন্য বিক্রয় করা হতো।[৫৭] পুনঃরপ্তানিকৃত পণ্যের সর্বশেষ ভোক্তা ছিল ইউরোপীয় দেশগুলি, আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

শান্তির সময় ফরাসীরাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে। কিন্তু ১৭৫৬ সালে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে বাংলায় ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য ফরাসী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৬৩ সালে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় শুরু হয়। ১৭৬৪ সাল থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে বাংলায় ফরাসী ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তারা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মূলধন দিয়ে ব্যবসা করতো। এসব কর্মচারী তাদের সম্পদ ইংল্যান্ডে পাঠাতে ছিল আগ্রহী। কিন্তু তারা চাইতো যে, তাদের প্রভুরা যেন কিছুতেই বিষয়টি জানতে না পারে।[৫৮] এক হিসাব মতে ১৭৬৫ সালের পর বাংলায় ফরাসী ব্যবসার বার্ষিক মূল্য ছিল ৫ থেকে ৬ লাখ 'লিভার্স' (Livres)।[৫৯] ১৭৮৩ সালের পর ফরাসীরা পুনরায় বাংলায় বাণিজ্য শুরু করে। ১৭৯১ সালে ল' উপরয়েন্টে (L' Orient) বাংলায় উৎপন্ন যে বস্ত্রপণ্য বিকিকিনি

৫৬. Letter from Cornwallis to the Court of Directors, dated November 1, 1788. Cited in J. C. Sinha, *Economic Annals*, 81.

৫৭. William Milburn, *Oriental Commerce*, Vol. II, (London 1813), 233.

৫৮. N K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. I, (Calcutta 1965), 36-37.

৫৯. S P. Sen, *The French in India* , (Calcutta 1958), 91-92.

হয় তার মূল্য হলো—বেঙ্গল ক্যালিকো পাঃ ১,৪৩, ৭৪৮, নিষিদ্ধ বাংলা-পণ্য পাঃ ১৩,০১৪ এবং বাংলায় উৎপন্ন মসলিন পাঃ ৩,১৮, ৩৪৩।[৬০]

বাংলার সঙ্গে ওলন্দাজদের বাণিজ্য চললেও তারা এদেশ থেকে বস্ত্রপণ্য রপ্তানিতে তেমন আগ্রহী ছিল না। ওলন্দাজরা বাংলা থেকে ১৭৫০ সালে রপ্তানি করে ৫৭,০০০ টি, ১৭৫৩ সালে ৭৯.০০০টি এবং ১৭৫৬ সালে ৫১,০০০টি বস্ত্রপণ্য। ১৭৫৮ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫,০০০টি। অবশ্য ১৭৬৪ সালে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭,০০০টি।[৬১] ওলন্দাজদের এই অনাগ্রহের প্রধান কারণ দেখাতে গিয়ে এন. কে. সিনহা বলেন যে, তারা "সুতা এবং রেশমের তৈরি বস্ত্রপণ্যের চেয়ে শোরা (saltpetre) এবং আফিম সংগ্রহে বেশি মনোযোগী ছিল।"[৬২] ১৭৮৫ থেকে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত সাত বছরে যে বস্ত্রপণ্য রপ্তানি করা হয়, তার গড় বিক্রয়মূল্য ছিল মাত্র পাঃ ১,০৯,৫৭০।[৬৩] কিন্তু এর সঙ্গে ওলন্দাজেরা ১৭৮৭ থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত অস্টেন্ড, হামবুর্গ, জেনোয়া এবং অন্যান্য দেশের পতাকাবাহী অসংখ্য জাহাজযোগে ভারত থেকে ইউরোপ মহাদেশে যা আমদানি করে তার মূল্যও অবশ্য যোগ করতে হবে। নেপোলিয়নের সময়ে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রপ্তানিবাণিজ্যের ধরনে কিছু পরিবর্তনের সূচনা হয়। তখন বাংলায় উৎপন্ন বস্ত্রপণ্যের ফরাসী বাজার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় (১৮০২-০৩ সাল ব্যতীত)। ফলে বাংলা রপ্তানির একটি মূল্যবান বাজার হারায়। এই ক্ষতিটুকু ছাড়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্য ১৭৯৭-৯৮ সালটি ছাড়া ১৮০২ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ১৭৯৭-৯৮ সালে কোম্পানির আমদানির বিক্রয়মূল্য আগের বছরের বিক্রয়মূল্যের অর্ধেকের চেয়েও কম ছিল।[৬৪] এই হ্রাসের কারণ ছিল ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা।[৬৫] বাজারের সঙ্গিন অবস্থা বিবেচনা করে কোম্পানি নিজেই ১৮০২-০৩ সাল থেকে আমদানি কমিয়ে দেয়। এ সময় বাংলার মসলিনের বিকল্প পণ্যে আন্তর্জাতিক বাজার ছেয়ে যায়। মসলিনের দাম তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যোগী ব্যবসায়ী কর্তৃক আমদানিও এই সময়ে অত্যন্ত কমে যায়। নেপোলিয়নের জারিকৃত বার্লিন এবং মিলান ডিক্রির ফলে রপ্তানিপরিস্থিতি আরো সঙ্গিন হয়ে পড়ে। ১৮০৩-০৪ সালের পাঃ ১০,৬০,৬১২-এর তুলনায় ১৮০৬-০৭ সালে বাংলা থেকে কোম্পানির আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় মাত্র পাঃ ২,০১,১০৭-এ।[৬৬] "নেপোলিয়নের বার্লিন এবং মিলান ডিক্রির ফলে বাংলার বস্ত্রপণ্যের জন্য ইউরোপ মহাদেশের বাজার ব্যাপকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে

---

৬০. Milburn, *Commerce*, 234.

৬১. N K Sinha, *The Economic History*, Vol. I, 57.

৬২. ঐ, 56.

৬৩. Milburn, *Commerce*, 234.

৬৪. ঐ, 235.

৬৫. Mitra, *Cotton Weavers*, 26

৬৬. Milburn, *Commerce*, 235.

১৮০৭-০৮ সালে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের পারস্পরিক বৈরিতার ফলে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে।"[৬৭] ১৮১৫ সালে এই বৈরিতার অবসান হলো বটে, কিন্তু তখন ইংল্যান্ডের তুলাজাত বয়নশিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। ১৮১৫ সাল থেকে ইংল্যান্ড নিজের উৎপাদিত বস্ত্রপণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে থাকে।

সারণি ১.৪ : ১৭৯৫-৯৬ থেকে ১৮৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে সমুদ্রপথে সুতী বস্ত্রাদির বেসরকারি রপ্তানিমূল্য (সিক্কা টাকায়)

সন	মূল্য	সন	মূল্য
১৭৯৫-৯৬	৫১,৫৩,৬০৭	১৮১৬-১৭	১,৬৫,৯৯, ৯৪৩
১৭৯৬-৯৭	৭৪,২৬,৭৫২	১৮১৭-১৮	১,৩২,৩৪,৭২৫
১৭৯৭-৯৮	৫৭,৪৮,৬১৭	১৮১৮-১৯	১,৩২,৮২,৭৮৯
১৭৯৮-৯৯	৫৭,৭৪,০৫৭	১৮১৯-২০	৯০,৩৫,১৫২
১৭৯৯-১৮০০	১,২০,০১,১৯৯	১৮২০-২১	৮৫,৩২,৬৫৬
১৮০০-০১	১,৪১,৬৭,১০৬	১৮২১-২২	৭৭,০১.৩১৯
১৮০১-০২	১,৬৫,৯১,৩০৯	১৮২২-২৩	৭৯,৯৯, ৫২১
১৮০২-০৩	১,৮৫,৯৪,৬৭৬	১৮২৩-২৪	৫৮,৭২,৭২৯
১৮০৩-০৪	১,৬১,৬৯,৪৭৮	১৮২৪-২৫	৪২,২৫,৭১৯
১৮০৪-০৫	১,১০,৮৫,৫০৯	১৮২৫ ২৬	৩৪,১৩,৪৫৪
১৮০৫-০৬	১,১৮,৪৯,৬৭০	১৮২৬-২৭	২৮,৫১,২১৩
১৮০৬-০৭	১,৩৩,৪০,৭৩৮	১৮২৭-২৮	২৭,৫৬, ১৬৮
১৮০৭-০৮	১,১৫,৮৮,৯৪৯	১৮২৮-২৯	২১,৩৬,০০৪
১৮০৮-০৯	৫৪,৭৯,১৪৭	১৮২৯-৩০	১৫,২৭,৬৯২
১৮০৯-১০	১,১১,৪১,৬৭৪	১৮৩০-৩১	১১,৯৩,৩৯১
১৮১০-১১	১,৩১,১৯,৫৩৫	১৮৩১-৩২	৯,৬৭ ,৭০১
১৮১১-১২	১,০৭,৫৬,৫১৯	১৮৩২-৩৩	৯,০১,৮৫১
১৮১২-১৩	৯৫,১২,৭৫৮	৮৩৩-৩৪	৭,৪৩,৮৫৩
১৮১৩-১৪	৫২,৮৬,৩৬২	১৮৩৪-৩৫	৮,৬৮,৪৪৩
১৮১৪-১৫	৮৪,৯৫,৫৯৯	১৮৩৫-৩৬	৮,২২,৭২১
১৮১৫-১৬	১,৩১,৫৬,৫৮৭	১৮৩৬-৩৭	৭,৬৯,৩৭৯
		১৮৩৭-৩৮	৭,৩০,০৪৬

উৎসসমূহ : India Office Records, P/174/13; *Bengal Commercial Reports,* 1795-1802 ; P /174/20, ঐ, 1808-09; P/174/25, ঐ, 1813-14; P/174/33, ঐ, 1821-28, P/174/41; ঐ, 1829-30; P/174/49, ঐ, 1837-38.

৬৭. H. R. Ghoshal, *Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833*, (Patna 1950), 40.

ইউরোপে প্রলম্বিত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যেসব দেশ বহুদিন ধরে বাংলার পণ্য আমদানি করতো, সেসব দেশে এ অঞ্চলের বস্ত্রপণ্য রপ্তানিতে ভাটা পড়ে। কিন্তু তখন আমেরিকা এবং ইউরোপের বেসরকারি ব্যবসায়ীরা মাঝারি মানের বস্ত্রপণ্য কিনতে শুরু করে।

সারণি ১.৫ : ১৮০২-০৩ এবং ১৮২১-২২ সালে বাংলার সুতী বস্ত্রপণ্যের গন্তব্যস্থল এবং রপ্তানমূল্য (সিক্কা টাকায়)

গন্তব্যস্থল	১৮০২-০৩	১৮২১-২২
লন্ডন	৬৪,৭০,২০২	৬,৪৬,৬৯০
লিসবন	২৪,৩৩,০৯২	৪,৪৭,৭১২
ক্যানডিজ	৩,৭৫,৭৮২	শূন্য
আমেরিকা	৪০,২১,৯৪২	৩,৪৯,১১৮
বাটাভিয়া	৮৭,০৫৯	শূন্য
ম্যানিলা	১,২৮,৪৮৬	৫,৩৯,৯৬৮
আরব ও পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ	৮,৭৭,৯১৬	১৮,৩০,৫৮০
সুমাত্রা উপকূল	৬৮,৬০০	১,৯৩,৮০৫
মালাবার উপকূল	১০,৪২,৬৪২	১,৬২,৮৮৮
করমন্ডল উপকূল	২,৪৪,৩১২	৫৯,৩৭০
পেনাং এবং ইস্টওয়ার্ড	১৪,৭৪,৫৫৯	৬,৫৮,২৬৩
চীন	৪,৭২,৫৪৪	১৮,১৩৫
পেগু	১,১৮,১৯২	২৭,৪৬৫
মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ	১৪,০০৪	শূন্য
মরিশাস	৫,১০,৬৩৪	৫,২৫,৮৪৫
মাল্টা এবং জিব্রালটার	শূন্য	৪,১৫,৫৩৮
ব্রাজিল	শূন্য	১,৩০,৮৮৩
দক্ষিণ আমেরিকা	শূন্য	৭,৫০,২৯৫
উত্তমাশা অন্তরীপ	শূন্য	৩,০৩,৭২৯
জাভা	শূন্য	৫,৬০,৮৫৫
নিউ সাউথ ওয়েলস	শূন্য	৭৩,৫০৫
অন্যান্য স্থানসমূহ	২,৫৪,৭০৯	শূন্য
মোট	১,৮৫,৯৪,৬৭৬	৭৭,০১,৩১৯

উৎস : India Office Records, P/174/14; *Bengal Commercial Reports*, 1802-03, ঐ, 1829-30, P/174/33, ঐ, 1821-22.

"আমেরিকা এবং ইউরোপে বাংলার বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলে সাময়িকভাবে ভারতীয় বয়নশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে।"[৬৮] ১৭৯৫-৯৬ সালে কলকাতা থেকে বস্ত্রপণ্যের বেসরকারি রপ্তানিমূল্য দাঁড়ায় সিক্কা টাকা ৫১,৫৩, ৬০৭। ১৮০২-০৩ সালে এ অঙ্ক নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হয় সিক্কা টাকা ১,৮৫,৪,৬৭৬ (সারণি ১.৩)। মার্কিনীরাই ৪০ লক্ষ সিক্কা টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করে এবং লিসবনের ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে প্রায় ২৫ লক্ষ সিক্কা টাকার পণ্য। (সারণি ১.৪ দ্রষ্টব্য)। ১৮১২ সালে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে আমেরিকার সাথে ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[৬৯] ইউরোপে শান্তি ফিরে আসার পর বাংলার বস্ত্রপণ্যের বেসরকারি ব্যবসা পুনরায় চাঙ্গা হয়। কিন্তু বিশ্ববাজারে মার্কিন ও বৃটিশ বয়নশিল্পের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের ফলে ১৮২০ সালের দিকে এতে পুনরায় দ্রুত ভাটা পড়ে। আরব দেশ, পারস্য উপসাগরীয় দেশ, ম্যানিলা, জাভা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বাংলার বস্ত্রপণ্যের চাহিদা দেখা দিলে স্বল্প সময়ের জন্য ইউরোপীয় ও মার্কিন বাজার হারানোর কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়। অবশ্য সে বাজারও অচিরেই হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৮৩১-৩২ সাল নাগাদ বাংলার বস্ত্রপণ্যের রপ্তানি ১০ লক্ষ সিক্কা টাকার নীচে নেমে আসে (সারণি ১.৩)।

১.৫ তাঁতশিল্পের অবনতি

বাংলায় তাঁতভিত্তিক তুলাজাত বয়নশিল্পের অবনতির অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রাথমিক বছরগুলিতে তাঁতীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার পরিলক্ষিত হয়। এ সময় কোম্পানি তার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসা শুরু করে। অবশ্য এরকম নিপীড়ন মুগল আমলেও চলতো। কিন্তু তখন যেসব তাঁতী রাজকারখানায় কাজ করতো শুধু তারাই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোম্পানি শাসনামলে জবরদস্তি এবং চাপপ্রয়োগ অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করে। আসলে এটা নতুন উৎপাদনব্যবস্থার একটি অংশ হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা আইনের কতগুলি ধারার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক রূপলাভ করে। শারীরিক নির্যাতন, জরিমানা, পণ্যের জন্য হয়রানি, সম্পত্তি দখল, মামলা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানি অর্থ আদায় করে। এর ফলে তাঁতীদের উদ্যোগ স্তিমিত হয়। তারা কোম্পানির কাজেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। "তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে ফেলার প্রচলিত অতিরঞ্জিত কাহিনীর কথা বাদ দিলেও একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, নির্যাতন এই শিল্পটির জন্য এত ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয় যে, অনেক তাঁতী তাদের পেশাই পরিত্যাগ করে।"[৭০] অন্যদিকে, কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে তাঁতীরা তাদের শ্রমের জন্য ন্যায্য

৬৮. A Tripathi, *Trade and Finance of Bengal Presidency, 1793-1833,* (Calcutta 1956), 117.
৬৯. ঐ, 79.
৭০. J. C Sinha, *Economic Annals,* 85

পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতো না। কোম্পানিপ্রদত্ত দাম শুধু যে কম ছিল তাই নয়, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বছরগুলিতেও এ দাম ছিল স্থির। কিন্তু এর চেয়ে জঘন্য ছিল কোম্পানির আবাসিক বাণিজ্যিক কর্মকর্তাদেরকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত ব্যবসার অধিকার। "নিজেদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এরা ১৭৯৩ সালের ৩১ নং রেগুলেশনের অপব্যবহার করে বস্ত্রপণ্যের তাঁতীদেরকে নিজেদের দেয়া দাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতো। বোর্ড অব ট্রেডের কার্যবিবরণীতে জোর করে আদায়, প্রতারণা এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে প্রচুর নালিশ রয়েছে। এজন্য স্থানীয় কর্মকর্তারা অধিকতর দায়ী হলেও ইউরোপীয়রা বরাবর এসব কাজে তাদেরকে ইন্ধন যোগায়।"[৭১]

আঠারো এবং উনিশ শতকের গোড়াতে ইংল্যান্ডে যে রাজস্বনীতি অনুসৃত হয়, বাংলায় তুলাজাত বয়নশিল্পের অবনতির জন্য তাও কম দায়ী নয়। ১৭০০ সালের এ্যাক্টের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে কয়েক জাতের 'ক্যালিকো' ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। মোটা মসলিন এবং মিহি ক্যালিকোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় এই এ্যাক্টের জন্য কয়েক ধরনের মসলিনও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৭২০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে আরেকটি এ্যাক্ট পাশ হয়, যা ইংল্যান্ডে ছাপা ক্যালিকো ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। "এই দু'টি এ্যাক্টের ফলে ইংল্যান্ডে বাংলার তুলাজাত বস্ত্রপণ্যের রপ্তানি বহুল পরিমাণে সীমিত হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের বাজারে ছাপা এবং রঙিন ক্যালিকো ও বিশেষ জাতের মসলিনের বাজারে প্রবেশ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। সাদা ক্যালিকোর আমদানিও হয়ে পড়ে সীমিত।"[৭২] যেসব পণ্য নিষিদ্ধ করা হয় নি (যেমন সাদা ক্যালিকো এবং কয়েক ধরনের মসলিন) সেগুলির উপরও শতকরা ১৫ ভাগ শুল্ক ধার্য করা হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এই কর আরো বৃদ্ধি করা হয়। শেষ পর্যন্ত দেশে ব্যবহারের জন্য সাদা ক্যালিকো আমদানির উপর কর ধার্য হয় শতকরা ৮৫ পাঃ ২ শিঃ ১ পেঃ এবং মসলিন ও ন্যানকিনের উপর শতকরা ৪৪ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেঃ, যা ১.৬ সারণিতে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

তুলাজাত পণ্যের উপর এভাবে উচ্চহারে করারোপ এ সময়ে বৃটিশ শিল্পের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। ১৮১৩ সালেও বৃটেনের বাজারে এগুলি বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যেতো এবং শুল্কারোপ সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে উৎপাদিত পণ্যের দামের চেয়ে এগুলির বাজারমূল্য ছিল শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কম।[৭৩] অবস্থা যদি এ রকম না হতো, যদি এরকম বিধিনিষেধমূলক কর এবং ডিক্রি না থাকতো, তাহলে শুরুতেই পেইজলি এবং ম্যানচেস্টারের কারখানাগুলি হয়তো বন্ধ হয়ে যেতো। ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হলে এর প্রতিশোধ নিতে পারতো। কিন্তু তখন আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কোন

৭১. A. Tripathi, *Trade*, 218

৭২. J. C Sinha, *Economic Annals*, 26-27

৭৩. Opinion of H. N Wilson cited by S. N. Gupta, *British*, 32

সুযোগ ছিল না। ভারত তখন অধিকতর ক্ষমতাধরের দয়ার উপর নির্ভরশীল। কোন রকম কর না দিয়েই বৃটেন তার তৈরি পণ্য এর উপনিবেশ ভারতে বিক্রি করেছে। এভাবে বিদেশী উৎপাদনকারীরা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খাটিয়ে একজন প্রতিযোগীকে বাজার থেকে উৎখাত করেছে।[৭৪] ১৮৪০ সালের দিকে ইংল্যান্ডে বাংলা থেকে আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের জন্য কর দিতে হতো শতকরা ১০ ভাগ। অথচ এর বিপরীতে ভারতে ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য কর দিতে হতো মাত্র শতকরা ৩.৫০ ভাগ। এটাও বিদেশী ব্যবসায় প্রশাসনের খরচ মেটাবার জন্য ধার্য করা হয়েছিল।

সারণি ১.৬ : ১৮০২-১৮১৪ সালে দেশে ব্যবহারের জন্য ইংল্যান্ডে আমদানিকৃত ভারতীয় বস্ত্রপণ্যের উপর আরোপিত করের হার

সন	সাদা ক্যালিকো			মসলিন এবং ন্যানকিন		
	পা	শি	পে	পা	শি	পে
১৮০২	২৭	১	১	৩০	১৫	৯
১৮০৩	৫৯	১	৩	৩০	১৮	৯
১৮০৪	৬৫	১২	৬	৩৪	৭	৪
১৮০৫	৬৬	১৮	৯	৩৫	১	৩
১৮০৬	৭১	৬	৩	৩৭	৭	১
১৮০৯	৭১	১৩	৪	৩৭	৬	৮
১৮১৩	৮৫	২	১	৪৪	৬	৮
১৮১৪	৬৭	১০	১	৩৭	১০	০

উৎস : Edward Baines, *The History of the Cotton Manufacturers in Great Britain,* (London 1835), 325.

কিন্তু বাংলার তুলাজাত পণ্যের উপর সবচেয়ে কঠোর আঘাত হানে আঠারো শতকের শেষার্ধের ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব। একটির পর একটি যান্ত্রিক উদ্ভাবন ইংল্যান্ডের তুলাজাত শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। এই যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের দীর্ঘ তালিকার শীর্ষে ছিল ১৭৬৭ সালের হারগ্রীভস স্পিনিং জেনি। এর পর পরই উদ্ভাবিত হয় আর্করাইটের জলীয় কাঠামো (১৭৬৮) ও ক্রম্পটনের 'মিউল' (১৭৭৫)। শেষোক্ত যন্ত্রটি দিয়ে এত মিহি সুতা কাটা যেতো যে খোদ ইংল্যান্ডেই মসলিন উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি হলো ১৭৮৪ সালে কার্টবাইট কর্তৃক উদ্ভাবিত শক্তিচালিত তাঁত এবং বেলের বেলুন দিয়ে ছাপা (Cylindrical Printing Process) পদ্ধতি এবং ১৭৮৫ সালে বার্থোলেটের (Berthollet's) ক্লোরিন দিয়ে শুভ্র করার যন্ত্র। ১৭৮৭ সাল নাগাদ বৃটেনে

৭৪. ঐ, 32-33.

তুলাজাত বয়নশিল্প এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, তা প্রায় ৫,০০,০০০ খণ্ড মসলিন উৎপাদনে সক্ষম হয়।[৭৫] এ প্রসঙ্গে কোর্ট অব ডিরেক্টরস মন্তব্য করে, "বৃটিশ উৎপাদনকারীদের মহাকৌশল এবং অধ্যবসায়ী শ্রমের ফলে সাধারণ এবং মাঝারি ধরনের মসলিন বস্ত্র শেষপর্যন্ত নৈপুণ্যের এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করা যায় যে, সুরাটের সর্বোৎকৃষ্ট তুলার যথেষ্ট সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে বিদেশী বাজারে ভারতের সাদা বস্ত্রপণ্যের চাহিদা বৃটিশ মসলিন দিয়ে মেটানো সম্ভব হবে।"[৭৬] ১৮০৩ ও ১৮১৩ সালে যথাক্রমে জনসন এবং হরকস্ কর্তৃক শক্তিচালিত তাঁতের উন্নতিসাধনের ফলে উৎপাদন আরো বেড়ে যায়। তুলাজাত শিল্পের ক্ষেত্রে এই উন্নতির ফলে ইংল্যান্ড পৃথিবীর একটি সেরা বয়নশিল্পের দেশে পরিণত হয়। একই সঙ্গে সুতা ও বস্ত্রপণ্যের উৎপাদনখরচও যথেষ্ট হ্রাস করা সম্ভব হয়। ১৮৩০ সাল নাগাদ ভারতে সুতা উৎপাদনের যে ব্যয় তার অর্ধেক দিয়েই ইংল্যান্ডে অনুরূপ সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হয়।[৭৭] ফলে বৃটেনে তৈরি বস্ত্রপণ্যের বাজারমূল্য এত কমে যায় যে, বাংলা থেকে বস্ত্রপণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।[৭৮] এমনিভাবে বাণিজ্যের চাকা ঘুরে গেল এবং ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় তুলনামূলকভাবে সস্তায় বিপুল পরিমাণ বস্ত্রপণ্যের আমদানি শুরু হয়ে গেল (সারণি ১.৭)। "ভারতীয় বস্ত্রপণ্য এখন স্থানীয় বাজার থেকে হলো বিতাড়িত এবং বৃটিশ বস্ত্রপণ্য দ্রুত সরবরাহের ফলে গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত এই বস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই সেই গ্রাম, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে সুতাকাটা ছিল একটি সহায়ক কর্মসংস্থান এবং প্রকৃতির খেয়ালের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ।"[৭৯]

অভ্যন্তরীণ শুল্কব্যবস্থা বাংলার তুলাজাত বয়নশিল্পের অবনতিকে ত্বরান্বিত করে। ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলায় আমদানিকৃত বিদেশী বস্ত্রশিল্পের জন্য দিতে হতো শতকরা ২.৫ ভাগ শুল্ক। কিন্তু বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের জন্য শুল্ক দিতে হতো আরও অনেক উচ্চহারে। যেমন, কাঁচা তুলার জন্য শুল্ক দিতে হতো শতকরা ৫ ভাগ, সুতা উৎপাদনের পর আরো দিতে হতো শতকরা ৭.৫ ভাগ। বস্ত্রপণ্যের উৎপাদনের পর দিতে হতো শতকরা ২.৫ ভাগ আর যদি সাদা কাপড় হিসেবে এটির জন্য 'রওয়ানাহ' দেবার পর এটিকে রঙ করা হতো, তাহলে শতকরা আরো ২.৫০ ভাগ কর দিতে হতো। এভাবে মোট করের পরিমাণ দাঁড়াতো শতকরা ১৭.৫ ভাগ।[৮০] "উৎপাদনশীলতাকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে এই বিধিনিষেধের যে প্রভাব তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে কেউ আর

৭৫. Milburn, *Commerce*, 232.

৭৬. উদ্ধৃত J. C Sinha, *Economic Annals*, 247.

৭৭. A. Tripathi, *Trade*, 197.

৭৮. ১৮১৭ সালে বৃটিশ ও ভারতীয় বস্ত্রপণ্যের তুলনামূলক বাজারমূল্য সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন ঐ, ২৪৭।

৭৯. ঐ, 204.

৮০. C. E. Trevelyan, *Report Upon the Inland Customs and Town Duties of the Bengal Presidency* (ed. by T. Banerjee), (Calcutta, reprint 1976), 99.

ভারতের উৎপাদনশিল্পের দুরবস্থা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করবে না। কাঁচা তুলা থেকে অবশ্যই সুতা তৈরি করতে হবে, সুতা থেকে অবশ্যই বস্ত্র তৈরি করতে হবে এবং একই স্থানে বস্ত্রকে অবশ্যই রঙ করতে হবে, অন্যথায় কোন 'চৌকি' বা শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি অতিক্রম করলে অতিরিক্ত কর দিতে হতো। এ হেন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানের লোকদের নৈপুণ্যের এবং তাদের স্বাভাবিক অবস্থানগত পরিবেশের প্রভাবের ফলে তাদের বিভিন্ন মাত্রার যে সামর্থ্য তা শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে কোনভাবে সহায়তা করতো না।[৮১] অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, এই শুল্কব্যবস্থা ইংল্যান্ডে উচ্চ শুল্কের হার অপেক্ষাও ভারতের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, কারণ এটা বৃটিশ তুলা উৎপাদনকারীদের স্থানীয় বাজার দখলের পথ সুগম করে এবং ঢাকার মতো উৎপাদনকেন্দ্রগুলির অবক্ষয়কে অবশ্যম্ভাবীভাবে ত্বরান্বিত করে। ১৮৪০ সালে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে চালর্স ট্রেভেলিয়ন এক করুণ বর্ণনা দেন। বিশপ হেবারের ইন্ডিয়ান জার্নালেও এর মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়।[৮২] উল্লেখ্য যে, পণ্য চলাচলের উপর ধার্যকৃত শুল্ক আদায়ের সাথে যুক্ত ছিল হয়রানি, বিলম্ব এবং অবৈধ আদায়।[৮৩] ১৮৩৬ সালে বাংলা সরকার পণ্য চলাচলের উপর ধার্যকৃত কর রহিত করে বটে, কিন্তু ততোদিনে ভারতের তুলাজাত পণ্য উৎপাদকেরা ধ্বংস হয়ে যায়।

এই স্বদেশী হস্তশিল্পের অবক্ষয়ের আরেকটি কারণ হলো অভিজাত ও বড় জমিদার পরিবারগুলির পতন। এই পরিবারগুলির প্রত্যেকটিরই বস্ত্র সরবরাহকারী দল ছিল। বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকেই উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার অবসান হয়। ফলে চাহিদার অভাবে সবচেয়ে মিহি মসলিনের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়।।[৮৪] এছাড়া শক্তিচালিত তাঁতের কাপড়ের উজ্জ্বল রঙ এবং উন্নতমানের সমাপনী কাজও স্থানীয় লোকদের রুচিকে আকৃষ্ট করে। সব বিদেশী পণ্যের প্রতি ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তীব্র আকর্ষণও এদেশে বিলেতি পণ্যের প্রসারে সাহায্য করে।

এভাবে তুলাজাত বয়নশিল্প শুধু বিদেশী বাজারই হারায় নি, ১৮১৩-১৪ সাল থেকে গ্রেট বৃটেনের শিল্পগুলির দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে নিজের বাজারও হারায়। ১৮২৪ সাল থেকে বাংলায় বৃটেনের তৈরি সুতা এবং পাকানো তুলার বিপুল আমদানি শুরু হয়। ১৮২৪ সাল থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ সুতা কাটার লোক হয়ে পড়ে বেকার, তাদের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্দশা ও দুর্ভোগ। ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। এই বিপর্যয় এত ভয়াবহ ছিল যে, ১৮৩৪ সালে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেলও মন্তব্য করেন, "ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এ ধরনের দুর্দশার কোন নজির নেই। তুলাজাত পণ্য

৮১. ঐ, 99-100.

৮২. A. Tripathi, *Trade,* 210.

৮৩. Rohinimohan Chaudhuri, *The Evolution of Indian Industries,* (Calcutta 1939), 326-29.

৮৪. J. C. Sinha, "Dacca Muslin Industry", 48.

উৎপাদনকারী তাঁতীদের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হচ্ছে।"৮৫ ১৮২০ ও ১৮৩০ সালের বছরগুলিতে এই অবক্ষয় অত্যন্ত দ্রুত ঘটলেও পুরো উনিশ শতক ধরেই তা বিরাজমান ছিল।

সারণি ১.৭ : ১৮১৬-১৭ থেকে ১৮৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় আমদানিকৃত তুলাজাত বস্ত্রপণ্যের এবং তুলাজাত সুতা ও পাকানো তুলার মূল্য (সিক্কা টাকায়)

সন	আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের মূল্য	যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত বস্ত্রপণ্যের মূল্য	আমদানিকৃত সুতা ও পাকানো তুলার মূল্য	যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত সুতা ও পাকানো তুলার মূল্য
১৮১৬-১৭	পাওয়া যায় নি	৩,১৩,১০২	শূন্য	শূন্য
১৮১৭-১৮	"	১১,২০,৯০৯	"	"
১৮১৮-১৯	"	২৬,৫৫ ,১৯২	"	"
১৮১৯-২০	"	১৫,৮৫,৮৯৮	"	"
১৮২০-২১	৩৪,৫২,৮৫১	২৫,৫৫,৯০৮	"	"
১৮২১-২২	৫৭,৯৬,৮৩১	৪৬,৮১,৮৭০	৪,৯৩০	"
১৮২২-২৩	৭৩,৪১,৪৯৩	৬৫,৭৭,২৭৯	শূন্য	"
১৮২৩-২৪	৪২,১৫,৫৪৮	৩৭,১৬,২৭৮	১১,৮৩৪	"
১৮২৪-২৫	৫৬,০৫,৭৪৬	৪৬,২৭,৭০৫	১,২৪,৮১১	৮১,১৪৫
১৮২৫-২৬	৪৪,১৬,৪০১	৩৬,৮৫,৬৬৭	১,৪৯,৮৬৭	১,৪১,৩০৫
১৮২৬-২৭	৪৯,০৮,৯৭২	৩৮,৮২,২৬৭	৮,২৪,৩৬২	১৮,৪২,১১০
১৮২৮-২৯	৮০,৯২,৮০৯	৭৭,৫৫,৭৪০	৩৪,৮২,৭৩০	৩৩,০০ ,১৮৬
১৮২৯-৩০	৫৪,২৯,৫৪০	৫০,৮৩,৪৪০	১৫,৬৩,৭৭০	১৪,৪৩,৬৯২
১৮৩০-৩১	৬৬,৩৫,৮৬৪	অস্পষ্ট	৩৩,৩৩,১৫৩	৩১,৯৮,৩৪৫
১৮৩১-৩২	৫০,৮২,২২৮	৪৫,১৯,৭২৪	৪৫,৬৫,৭৫১	৪৪,৮৪,১৪৫
১৮৩২-৩৩	৫০,৬৪,১৮৫	৪৩,৯৬,৩৯৯	২৫,৪৫,৪৪০	২২,৮৫ ,৭৫৮
১৮৩৩-৩৪	৫৩,৭০,২৬৬	৪৪,০২,৫৮১	২৬,৮২,৬৫৭	২৪,০৯,৭৯৭
১৮৩৪-৩৫	৫৪,০৭,০০৬	অস্পষ্ট	৩০,৪৮,৯১৭	২৯,৪৩,২৭৯
১৮৩৫-৩৬	৫০,৯৭,৯১৭	৪৪,২৪,১৩৪	৩৮,৭২,৮৪২	৩৬,৯৮,৩৫৬
১৮৩৬-৩৭	৮৪,৩৪,১৫৩	৭৫,২৯,২৫৫	৪৬,৫৪,৯১০	৪১,৮৬,৩০৭
১৮৩৭-৩৮	৬১,৫৫,১১২	৫৪,৫৭,৭৫০	৪৫,৮৯,৬১০	৪৪,০২,৪৭৩

উৎস : India Office Records, P/174/33; *Bengal Commercial Reports,* 1821-22,ঐ, 1829-30, P/174/49, ঐ, 1837-38.

৮৫. S. N. Gupta, *British,* 36-37.

২.০ রেশমশিল্প

রেশমের আদি আবিষ্কার এবং রেশম উৎপাদনপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন চীনে। পরে চীন থেকে এর প্রচলন যায় পারস্য, ভারত, জাপান এবং সাধারণভাবে প্রাচ্যের দেশগুলিতে। যদিও কখন এবং কিভাবে বাংলায় এই শিল্পের গোড়াপত্তন হয় তা এখন আর বলা সম্ভব নয়, তবু বলা যায় যে, গৌড়ে শেষ হিন্দু রাজত্বকালে এখানে রেশমের উৎপাদন শুরু হয়। রেশমের তৈরি কাপড় তখন ঢাকা, সোনারগাঁও এবং সপ্তগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে রপ্তানি করা হতো। মুসলিম বিজয়ের পর কিছু ধর্মীয় বিধিনিষেধের ফলে এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, কিন্তু দ্রুত এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে। স্থানীয় লোককথা অনুযায়ী, সীতা বসানী নামে এক ব্যক্তি মহানন্দা নদীর কুলে পুনরায় রেশম পোকার চাষ করে। পনেরো শতকের প্রথমদিকে চীনদেশের প্রচারক দলের বর্ণনায় এই শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবুল ফজলের মতে, আকবরের রাজত্বকালে সরকার ঘোড়াঘাটে (রাজশাহী) বিপুল পরিমাণ রেশমবস্ত্র উৎপন্ন হতো। প্রথমদিকের ইউরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনাতেও এসব অঞ্চলে খুব কম দামে প্রচুর পরিমাণে ভাল জাতের কাঁচা রেশম পাওয়া যেতো বলে উল্লেখ রয়েছে। ১৬২০ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেশম সংগ্রহের জন্য পাটনায় একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করে। ১৬৩০ সালে উড়িষ্যার উপকূলেও তারা একই প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ১৬৫০ সালে কোম্পানি শুধু বাংলা থেকেই সরাসরি রেশম আমদানি করে।

১৬৫৮ সালের দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে কিছু দূরে কাশিমবাজারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজের কারখানা স্থাপন করে। এর আগে ১৬৫৩ সালে একই অঞ্চলে ওলন্দাজেরাও তাদের কারখানা স্থাপন করেছিল। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার ১৬৬৬ সালে বাংলা পরিভ্রমণ করেন। তিনি এখানে এত বিপুল পরিমাণ তুলা ও রেশম দেখতে পান যে, তাঁর মনে হয়, এই রাজ্যটি শুধুমাত্র হিন্দুস্থান বা মহান মুগলদের সাম্রাজ্যেরই শুধু নয়, বরং আশেপাশের সব রাজ্যের, এমনকি ইউরোপেরও তুলা ও রেশমের সাধারণ ভাণ্ডার।[৮৬] আরেকজন পরিভ্রমণকারী ব্যাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ারের হিসাব মতে, সতেরো শতকের মাঝামাঝি কাশিমবাজারে বছরে যে কাঁচা রেশম উৎপাদিত হয় তার পরিমাণ ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। তাঁর মতে, এই পরিমাণ থেকে ০.৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড গুজরাট এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরিত হতো এবং কিছু অংশ আবার তাতার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এশিয়ায় বিপণন হতো। ওলন্দাজেরাও প্রতি বছর কাশিমবাজারে উৎপাদিত কাঁচা রেশম থেকে ০.৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড জাপান বা হল্যান্ডে রপ্তানি করতো আর বাকি এক মিলিয়ন পাউন্ড বাংলায় রেশমবস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহার করা হতো।[৮৭] বাংলায় কাঁচা রেশমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ইংরেজ কোম্পানি ১৬৮৬ সালে মালদহে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রেশম এজেন্সি খোলে। এর পর পরই ইউরোপীয় বিনিয়োগ এবং

৮৬. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, Vol. I, 439.

৮৭. J. B. Tavernier, *Travels in India*, (Ball's edition), Vol. II, (London 1889), 2-3.

উদ্যোগের কারণে আরো অনেকগুলি রেশম কারখানা স্থাপিত হয়। যেমন কুমারখালি, সোনামুখি, রাধানগর, ঘাটাল, রামপুর বোয়ালিয়া, সুরপুর, গনুটিয়া, জঙ্গীপুর, সারদা এবং লক্ষ্মীপুর। আঠারো শতকের মাঝামাঝি এই ব্যবসা খুব প্রসারলাভ করে। এ সময়ে মুর্শিদাবাদের কাস্টমস অফিসে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করা হয়। অবশ্য এ হিসাবে ইউরোপীয়দের বিনিয়োগের কথা ধরা হয় নি।

২.১ মালবেরী চাষ এবং পালন

ভারতের রেশমশিল্প প্রধানত বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কারণ, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল মালবেরী চাষের অনুকূল ছিল না। বরেন্দ্র অঞ্চলের শক্ত আঠালো মাটিতে এই গাছটি সবচেয়ে ভাল জন্মে। এজন্য মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় এর চাষ করা হয় সবচেয়ে বেশি। তবে দিনাজপুরের দক্ষিণাংশ, রংপুর এবং বগুড়ার পশ্চিমাংশেও এই গাছ সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এসব স্থানের মধ্যে নিঃসন্দেহে মুর্শিদাবাদই ছিল মালবেরী চাষাবাদের প্রাণকেন্দ্র। এমনকি ১৮৭৬ সালের মতো এত বিলম্বেও ৫০,০০০ বিঘা (১৭,০০০ একর) জমিতে মালবেরীর চাষ হতো বলে এক হিসাবে দেখা যায়।[৮৮] মালদহ ছিল অন্যতম জেলা, যেখানে ব্যাপকভাবে মালবেরীর চাষ হতো এবং গুটিপোকা পালন করা হতো। এই জেলার কালেক্টরের মতে, প্রতি বছর ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ বিঘা বা প্রায় ২০,০০০ একর জমিতে মালবেরীর চাষ হতো। এটা অবশ্য ছিল কালেক্টরের সর্বনিম্ন হিসাব। তাঁর মতে, অনুকূল বছরে চাষাবাদের জমির পরিমাণ এই হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি হতো।[৮৯] সতেরো এবং আঠারো শতকের সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের আমলে রাজশাহী জেলাতে মালবেরীর চাষ অনেক বেড়ে যায়।

বৃটিশ শাসনের গোড়াতেই কোম্পানির সরকার মালবেরী গাছের এবং গুটি পোকার গুণগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়। এর কারণ, উৎপাদনের এবং ভিন্ন ভিন্ন রেশম গুটির ও বান্ড-এর (Bunds) গুণগত মানের ক্ষেত্রে বিরাট তারতম্য ছিল। এছাড়া মারাঠাদের হামলার ফলে বিপুল সংখ্যক উৎপাদনকারী তাদের কাজ পরিত্যাগ করে। ফলে গাছের গুণগত মানের ক্ষেত্রে অবনতি দেখা দেয়। ১৭৬৭ সালে বাংলার গভর্নর হ্যারি ভেরেলস্ট ব্যক্তিগতভাবে মালবেরী চাষের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব রকম উৎসাহ প্রদান করার জন্য জমিদারদের অনুরোধ জানান। ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রাধান্য পাওয়ায় মালবেরী চাষের ক্ষেত্রে বেশ ভাটা পড়ে। এসময়ে কোম্পানি চাষীদের মালবেরী চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য খাজনার হার হ্রাস করে।[৯০] বাস্তবে কোম্পানির স্বার্থের

৮৮. Statistical Account of Murshidabad, 152 in W. W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. IX, *Districts of Murshidabad and Pabna* (London 1876).

৮৯. Hunter, *Statistical Account*, Vol. VII, Maldah, 96-97.

৯০. দেখুন বর্তমান খণ্ডের একাদশ অধ্যায়।

দু'টি খাত— বাণিজ্যিক খাত ও রাজস্বখাতে দ্বন্দ্ব পরে সংঘর্ষের রূপ নেয়। এর ফলে রেশম খাতে বিনিয়োগ হয় ক্ষতিগ্রস্ত।[৯১] রেশম গুটি উৎপাদনকারীরা উচ্চহারে খাজনা দিতে থাকে। তাতে রেশমের দাম বেড়ে যায়। ১৭৭১ সালে জেনারেল কীড বাংলা সরকারের প্রচেষ্টায় সম্পূরক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে চীন থেকে 'বম্বিকস মোরি'র কিছু ডিম নিয়ে আসেন। কিন্তু তাতে সম্ভবত বিদ্যমান অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নি। ১৭৭৫ সালে কলকাতায় কোম্পানির রেশম বিনিয়োগ তত্ত্বাবধায়ক রেশম উৎপাদনকে তার বিশেষ গবেষণার বিষয়বস্তু করে গবেষণানিবন্ধ রচনা করেন। ঐ নিবন্ধে গুটিপোকা প্রতিপালনের যথাযথ স্থানগুলির বর্ণনা দেয়া হয় এবং কি ধরনের মাটিতে মালবেরী চাষ করা যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। কিভাবে গুটিপোকার ডিম ফোটানো যায়, গুটিপোকাকে খাওয়ানো যায়, এগুলির অসুখ ও চিকিৎসা কি, রেশমের খোসার গঠন এবং কিভাবে এগুলি বাছাই করা হবে এবং সবশেষে কিভাবে রেশমের রিল তৈরি করা হবে এসব বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।[৯২] গুটিপোকা এবং মালবেরীর চারা সরবরাহের সুবিধার্থে ১৭৮০-এর শেষেরদিকে কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটি নার্সারি স্থাপন করা হয়। আরো পরে শান্তিপুরের রেসিডেন্টকে অনধিক ২৫,০০০ টাকা ব্যয়ে মালবেরীর বড় বড় নার্সারি স্থাপনের এবং ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু এতে কোন স্থায়ী কার্যকরী ফললাভ সম্ভব হয় নি। "১৮৩৫ সালে যে পদ্ধতিতে এবং যে ধরনের মালবেরীর চাষ করা হতো তা ছিল একশ' বছর আগের মতোই। নতুন ধরনের গুটিপোকা চালু করার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু চীন থেকে যে পোকা আনা হয়েছিল তা সফলভাবে প্রজনন করা সম্ভব হয় নি। এছাড়া এসব উদ্যোগকে সফল করার মতো তেমন আন্তরিকতাও তখন পরিলক্ষিত হয় নি"।[৯৩]

২.২ কাঁচা রেশম উৎপাদন এবং রপ্তানি

যদিও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই শিল্পটির রেশমগুটি চাষের প্রত্যক্ষ যত্ন নেয় নি, তবু রেশম উৎপাদনের ব্যাপারে এটি যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। তারা কাঁচা এবং যন্ত্রোৎপাদিত রেশমের জন্য অনেক কারখানা স্থাপন করে এবং উৎপাদিত পণ্য ইংল্যান্ডে রপ্তানির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ক্রমশ তারা অবস্থার চাপে পড়ে কাঁচা রেশম উৎপাদন ও রপ্তানি করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এর পিছনে অবশ্য কতগুলি কারণ ছিল। কাঁচা রেশমের ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৫৭ সালের পর বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি কাঁচা রেশম উৎপাদনের দিকে ক্রমশ

৯১. M Huq, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698-1784,* (Dhaka 1964), 217.

৯২. Abdul Ali, "The Silk Industry in Bengal in the Days of John Company", *Bengal Past and Present,* (1925), 36.

৯৩. Warner, *The Silk Industry of the United Kingdom : Its Origin and Development,* (London n. d.), 383-84.

মনোযোগ দেয়। ১৭৬৯ সালে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস ঘোষণা করে, "কাঁচা রেশমের ব্যবসা ছাড়া আমাদের ব্যবসার আর কোন শাখা নেই যেটাকে আমরা সম্প্রসারিত করতে অধিকতর আগ্রহী হতে পারি এবং আমরা চাইবো যে, যারা এখন রেশম বয়ন শিল্পে ব্যস্ত তারা সেটা ছেড়ে দিয়ে কাঁচা রেশম পেঁচানোর কাজে এগিয়ে আসুক।"[৯৪] পরে যখন চীন থেকে আমদানি সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং ইউরোপে সরবরাহ হয়ে পড়ে অনিশ্চিত, তখন কাঁচা রেশম উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়।

রপ্তানিনীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কোম্পানি বাংলার কাঁচা রেশমের গুণগত মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। এই কাঁচা রেশম ছিল একাধারে অমসৃণ এবং ভাঙা ভাঙা। বাংলার কাঁচা রেশমের নিম্নমানের কারণ নির্ণয়ের জন্য ১৭৫৭ সালে রিচার্ড ওয়াইল্ডারকে কাশিমবাজার পাঠানো হয়। ওয়াইল্ডার ১৭৬১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলায় কর্মরত ছিলেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে তিনি রেশম পেঁচানোর জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। পদ্মার পশ্চিম তীরে বসবাসরত গ্রামবাসীদেরকে রেশমের রিল বানানোর কৌশলও তিনি শেখান। তিনি কোম্পানির বিভিন্ন রেশম কারখানাও পরিদর্শন করেন। কাশিমবাজারের কারখানায় তাঁর রেশম পাকানোর মেশিনটি বেশ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়। এই মেশিনের মাধ্যমে তাদের ত্রুটিপূর্ণ রেশম পাকানোর ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংশোধন হয়। চামিয়ার নামক আর এক ভদ্রলোককে ১৭৬৯ সালে কাঁচা রেশম পাকানোর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি পরের বছরই মারা যান। ১৭৭০ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ওয়াইজ, রবিনসন ও অবার্টকে কাঁচা রেশম পাকানোর তত্ত্বাবধায়করূপে পাঠান। তাদের সঙ্গে রিল বানানোর জন্য কর্মচারী এবং ইতালি ও ফ্রান্স থেকে নির্বাচিত যন্ত্রী দেয়া হয়। হস্তচালিত যন্ত্র এবং কারিগরি যন্ত্রের মডেল তাদেরকে দেয়া হয় যেন তারা কাজ শুরু করতে পারে। ১৭৭১ সালে আরো একদল সুতা পাকানোর লোক ইতালি থেকে আনীত হয়। এদের সম্মিলিত প্রয়াসে কাশিমবাজার, বোয়ালিয়া, কুমারখালি এবং রংপুরে গুটি হতে রেশম নিষ্কাশনের যন্ত্র তৈরি হয় ও এগুলির প্রত্যেকটি একশ' ফার্নেস পর্যন্ত ধারণ করতে পারতো। "১৭৭০ ও ১৭৭৫ সালের মধ্যে কোম্পানির কারখানাগুলিতে ইতালীয় পদ্ধতিতে রিল করা চালু হয় এবং উৎপাদনের মানও বেশি বৃদ্ধি পায়।[৯৫] ইতালীয় পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৭৮০ সালে বমগার্স্টনার, ব্রিগন্টি, ফ্রেশার্ড এবং পগিওকে অন্তর্ভুক্ত করে আরো একদল যন্ত্রী পাঠানো হয়। কোম্পানির এই অবিরত উদ্যোগের ফলে রিল করার কাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

৯৪. Despatches to Bengal, Vols. 3 & 17, March 1769, cited in K. M. Mohsin, "অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৬, ১১৫ ।

৯৫. Report on an Inquiry into the Silk Industry in India, (by Maxwell-Lefroy and E. C. Ansorge), Vol. 1, (Calcutta 1917), 9.

সারণি ২.১ গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক বাংলা থেকে ১৭৭৩-১৮৩৫ সালে আমদানিকৃত কাঁচা রেশমের পরিমাণ (ক্ষুদ্র পাউন্ড ওজনে)

সন	পরিমাণ	সন	পরিমাণ
১৭৭৩	১,৪৫,৭৭৭	১৮০৫	৮,৩৫,৯০৪
১৭৭৪	২,১৩,৫৪৯	১৮০৬	৪,০৮,৫২৩
১৭৭৫	২,০৮,৮৮১	১৮০৭	৪,৯৩,৫৮৫
১৭৭৬	৫,১৫,৯১৩	১৮০৮	৩,৭৮,৪৯৮
১৭৭৭	৫,৬৩,১২১	১৮০৯	১,৬২,৭৪৭
১৭৭৮	৬,০২,৯৬৪	১৮১০	৫,৮৪,৭১৮
১৭৭৯	৭,৩৭,৫৬০	১৮১১	৪,০৪,৭৫৬
১৭৮০	২,৩৫,২১৬	১৮১২	৯,৮২,৪২৭
১৭৮১	৭,৮৫,৬৭৩	১৮১৩	১০,৮৪,৩৫
১৭৮২	৭৭,৬১০	১৮১৪	৮,৩৬,৯৬৬
১৭৮৩	৬,১১,০৭১	১৮১৫	৮,০২,২৮৬
১৭৮৪	১,৪৯,৩৯৪	১৮১৬	৭,৭৯,৭৬৪
১৭৮৫	৩,২৪,৩০৭	১৮১৭	৫০২,৩৩৫
১৭৮৬	২,৫২,৯৮৫	১৮১৮	১,১৬০,৯৭৬
১৭৮৭	১,৭৮,১৮০	১৮১৯	৭৫১,০২৭
১৭৮৮	৩,০৫,৯৬৫	১৮২০	১০,৭১,৪৪৭
১৭৮৯	৪,২৭,২৬৩	১৮২১	৯,৯০,৪৬৩
১৭৯০	৩,২০,৮২৬	১৮২২	১,০৪২,৬১৭
১৭৯১	৩,৭৩,৫০৩	১৮২৩	১১,৬১,১৮৬
১৭৯২	৩,৮০,১০৭	১৮২৪	৯,৩১.৬৪৯
১৭৯৩	৭,৩৬,০৮১	১৮২৫	৯,১৯,৪৩৬
১৭৯৪	৫,২১,৪৬০	১৮২৬	১,২৩৭,০২৩
১৭৯৫	৩,৮০,৩৫২	১৮২৭	১.০২৬.০৩৯
১৭৯৬	৩,৪৭,৯৩৬	১৮২৮	১,১৩৬,৩০৯
১৭৯৭	৯২,২০৪	১৮২৯	১৩,৮৭,৭৫৪
১৭৯৮	৩,৫৩,৩৯৪	১৮৩০	১১,৮৬,১৬৩
১৭৯৯	৬,৪৪,৮১৯	১৮৩১	১০,৯৪,৮৭৭
১৮০০	৫,৮৩,০৮৬	১৮৩২	৯,৫৬,৪৫৩
১৮০১	৪,৪৪,৮৬২	১৮৩৩	৭,৫০,৯৮০
১৮০২	২,৪৪,৮০৯	১৮৩৪	৮,১০,৬৪১
১৮০৩	৪,০৯,০৯৩	১৮৩৫	৭,২৭,৫৩৫
১৮০৪	৬,২১,৭১০		

উৎস : George Watt, A *Dictionary of the Economic Products of India*, Vol. VI, Part III. (second reprint, Delhi 1972), 189, 195.

সুতা পাকানোর পদ্ধতিগুলির উন্নতির ফলে ১৭৭২ সাল হতে বাংলা থেকে রেশম নিষ্কাশন যন্ত্রে গুটানো রেশম রপ্তানি শুরু হয়। পুরনো স্থানীয় পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েও ১৭৭৫ সালের আগে নতুন পদ্ধতি সম্পূর্ণ কার্যকর হয় নি। অন্তবর্তীকালীন সময় কাটে দালান তৈরি, ফার্নেস ও রিল বসানো, কারিগরদের শিক্ষাদান এবং তার চেয়ে বড় কথা, ১৭৬৯-৭০ সালের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্রভাব কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টায়। এই বছরগুলিতে গড়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮৭,৪৯৪ ক্ষুদ্র পাউন্ড।[৯৬] পরবর্তী বছরগুলিতে রপ্তানির পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত এর গড় ছিল ৫৬০,২৮৩ ক্ষুদ্র পাউন্ড (সারণি ২.১)। কিন্তু কোম্পানি এই সম্প্রসারিত রপ্তানিবাণিজ্য থেকে লাভবান হতে পারে নি। বরং উল্লিখিত বছরগুলিতে ৮৮৪,৭৪৪ পাঃ লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়।[৯৭] এর কারণ হিসেবে বলা হয়, যেসব ঠিকাদার কোম্পানির পণ্য সরবরাহ করতো, তারা ছিল চরম দুর্নীতিপরায়ণ এবং কোম্পানির স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন।"কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়; উৎপাদনকারীরা নির্যাতিত হয় এবং এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করা হয় অতিরিক্ত মূল্যে।"[৯৮] রেশমের ব্যবসাকে লাভজনক করার লক্ষ্যে এরপর লর্ড কর্নওয়ালিস কয়েকটি বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। ১৭৮৭ সালে তিনি এজেন্সি পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাশিমবাজার কারখানার মর্যাদাকে 'চীফশিপ' থেকে 'রেসিডেন্সির' পর্যায়ে নামিয়ে আনেন। "... চুক্তিতে সরবরাহের পদ্ধতি রহিত হয় এবং এর বিকল্প হিসেবে এজেন্সি প্রথা চালু করে দুর্নীতির পথ রুদ্ধ করা হয়; প্রচলিত ব্যবস্থায় ত্রুটিগুলির সংশোধন সাধন করা হয়; উৎপাদনকারীরা স্বস্তিলাভ করে; বস্ত্রপণ্য পুনরায় বাজার পায় এবং সবচেয়ে পছন্দের পণ্য যথাযথ ও হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা হয়।"[৯৯] ভবিষ্যতে লোকসানের পথ বন্ধ করার জন্য ১৭৯৬ সালে আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফ্লোরেনটাইন্স ও সারসেনেন্টস নামের বস্ত্রাদি ছাড়াও ভেলভেট ও রিবনে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির বাংলা রেশম ইংল্যান্ডে এনে অরগেনজাইনে চুবিয়ে নেয়া হতো। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের সময়ের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে উদ্ভূত টালমাটাল অবস্থা সত্ত্বেও কোম্পানি এসময় বেশ অর্থোপার্জন করে। সংস্কারগুলি কোম্পানির জন্য সুফল বয়ে আনে এবং আঠারো বছরে কোম্পানি ৬১৬,৭৮১ পাউন্ড নীট লাভ করে। প্রতি বছর এই লাভের গড় হচ্ছে ৩৪,২৬৬ পাউন্ড অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ (সারণি ২.২)। মহাদেশীয় অবরোধ চাপিয়ে দেবার ফলে এবং ১৮১১ সাল থেকে ইউরোপীয় রেশমের আমদানি বন্ধ হবার ফলে বাংলার কাঁচা রেশমের বাজার আরো তেজিভাব অর্জন করে। কাঁচা রেশমের সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে বৃটিশ উৎপাদকেরা

৯৬. George Watt, *Economic Products,* Vol. VI, Part III, 186.

৯৭. ঐ।

৯৮. ঐ, 187

৯৯. ঐ।

তাদের এবং বৃটিশ রেশম ব্যবসায়ীদের অধীনে কর্মরত দরিদ্র শ্রেণীকে শত্রুপক্ষের খামখেয়ালিপূর্ণ বাণিজ্যনীতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে আবেদন করে।[১০০] বাংলা সরকারকে বিষয়টি অবহিত করার পর রপ্তানি চাঙ্গা করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৮৩০ সাল অব্দি এ ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। এরপর অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে রপ্তানিবাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এসব কারখানার নতুন মালিক হয় ইউরোপীয় ফার্ম। ফার্মগুলির মধ্যে প্রধান হলো ওয়াটসন এন্ড কোম্পানি, জেমস ল্যায়াল এন্ড কোম্পানি, লুইস পেইয়েন এ্যান্ড কোম্পানি এবং বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি।

সারাণ ২.২ : ১৭৮৬-১৮০৩ সালে রেশম ব্যবসা খাতে কোম্পানির লাভালাভের বিবরণ (অঙ্কের হিসাব পাউন্ডে)

সন	জাহাজভাড়া ও অন্যান্য খরচসহ মোট সংগ্রহমূল্য	ইংল্যান্ডে বিক্রিত মূল্য	লাভ	লোকসান
১৭৮৬	১,৯২,৮৯৮	১,৯৮,৫০৭	৫,৬০৯	
১৭৮৭	১,৩৩,৭৯৫	১,৪৫,৭১২	১১,৯১৭	
১৭৮৮	২,১২,৩৫৭	২,২১,৮৮৮	৯,৫৩১	
১৭৮৯	২,৭৬,৭৩২	২,৮৯,২৭১	১২,৫৩৯	
১৭৯০	২,৬৮,৭৯০	৩,০২,৯৯৩	৩৪,২০৩	
১৭৯১	২,৯০,১৫৪	৩,২০,৩৯৫	৩০,২৩০	
১৭৯২	২,৬২,৯০২	২,৭৬,৩১৭	১৩,৪১৫	
১৭৯৩	২,৭৪,৫৫৩	২,২১,৩২৯	—	৫৩,২২৪
১৭৯৪	২,৯০,৪১৯	৩,০৯,৭৪৩	১৯,৩২৪	
১৭৯৫	৩,৭৮,৫১২	৩,৮১,৩৮৫	২,৮৭৩	
১৭৯৬	৩,৩৫,৩১৫	৩,২৭,৪২৭	—	৭,৮৮৮
১৭৯৭	২,৬২,৯১৭	২,৫৮,৬৪৪	—	৪,২৭৩
১৭৯৮	২,৭৭,৯৯০	৩,২২,৮৭৩	৪৪,৮৮৩	
১৭৯৯	৩,২৪,৪৬০	৩,৯০,১৪৯	৬৫,৬৮৯	
১৮০০	২,০৮,৯৬৯	২,৯৭,৬৪৫	৮৮,৬৭৬	
১৮০১	২,৬২,৪২৮	৩,৯৫,৪১০	১,৩২,৯৮২	
১৮০২	১,৫৬,৫০২	২,৬৯,২৪৯	১,১২,৭৪৭	
১৮০৩	১,৯৫,১১৭	২,৯২,৬৫৯	৯৭,৫৪২	
মোট	৪৬,০৪,৮১৫	৫,২২১,৫৯৬	৬,৮২৯৬৬	৬৫,৩৮৫

উৎস : George Watt, ঐ 190

১০০. এ খণ্ডের একাদশ অধ্যায় দেখুন।

কোম্পানিগুলি রপ্তানিবাণিজ্য চাঙ্গা রাখে এবং ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত পরবর্তী বিশ বছরে রেশম রপ্তানি সম্প্রসারণে সাফল্যলাভ করে। এসময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রতি বছর গড়ে ১৪,৩৫,২২২ পাউন্ড।[১০১] বেশ কিছু সময় পর্যন্ত বাংলার কাঁচা রেশম রপ্তানিতে প্রবল তেজিভাব বজায় থাকে। ১৮৫০-এর দশকে ও ১৮৬০-এর দশকের প্রথমদিকে রেশম গুটিপোকায় মারাত্মক ব্যাধির সংক্রমণ ঘটলে ইউরোপের রেশমশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু বাংলা রেশমের বাজার অব্যাহত থাকে। ১৮৬০-এর দশকে ইউরোপে রেশমশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং উন্নততর মানের রেশম উৎপন্ন হয়। এর ফলে ও অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতের জন্য (যা পরে আলোচনা করা হবে) বাংলার রেশমশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদেশের কাঁচা রেশমের রপ্তানি ১৮৭০ সাল থেকে দ্রুত কমতে থাকে। ১৮২০ সাল থেকে রিল করা মালবেরী রেশমের রপ্তানি এক মিলিয়ন পাউন্ড ওজন ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে (যে বছর বর্জ্য এবং বন্য রেশমের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়) ভারতের রপ্তানি দাঁড়ায় এক মিলিয়ন সাত লক্ষ পাউন্ড। বিশ বছর পর রিল করা মালবেরী রেশমের বিক্রি দাঁড়ায় আগের পরিমাণের মাত্র চার ভাগের এক ভাগ। বিগত চার বছরে (১৮৮৭-৮৮ থেকে ১৮৯০-৯১) এর গড় দাঁড়ায় চার লক্ষ পাউন্ড।[১০২] পরবর্তী বছরগুলিতে ভারত থেকে বিদেশে কাঁচা রেশম রপ্তানি ক্রমশ কমতে থাকে। ১৯২১-২২ সালে তা দাঁড়ায় সাত লাখ টাকারও নীচে, যা ছিল সে বছর কলকাতা থেকে রপ্তানিবাণিজ্যের মাত্র শতকরা ০.০৮ ভাগ।[১০৩]

সমুদ্রপথে বিদেশে কাঁচা রেশম রপ্তানি করা ছাড়াও রেশমের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের আগে মুর্শিদাবাদে প্রায় দশজন ভারতীয় বণিক অবস্থান করতো, যারা একত্রে ১৩,০০০ থেকে ২০,০০০ মণ পর্যন্ত কাঁচা রেশম সমুদ্রপথে বোম্বে এবং সুরাটে রপ্তানি করে।[১০৪] ১৭৬৫ সালে সুরাটে যে কাঁচা রেশম ও

১০১. Warner, *"Silk Industry"*, 384

১০২. Watt, *Economic Products*, 201 The actual figures of raw silk exported from British India, other than Tasar and wild silk, were as follows

1886-87	410,640	lbs.
1887-88	361,869	"
1888-89	381,878	"
1889-90	502,301	"
1890-91	369,007	"

দেখুন, Watt, ঐ, 199

১০৩. *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1921-22*, 14 There had been a growth of a traffic in waste and wild silks from about 1858 but that too had diminished as the figure indicates However, the "entire returns of raw silk, sent from India during the administration of the East India Company be accepted as having been reeled silk." Watt, *Economic Products*, 196.

১০৪. N K Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol I, 112.

বস্ত্রপণ্য রপ্তানি করা হয় তার পরিমাণ ছিল ১৯৫ বেল এবং এর মূল্য ২,৫৭,৬৫০ টাকা।[১০৫] স্থলপথ ও জলপথে নিজামদের রাজ্যেও কাঁচা রেশম রপ্তানি করা হতো। সেখানে এই রেশম দিয়ে পরিধেয় কাপড় তৈরি করা হতো। এ ছাড়াও স্থলপথে নাগপুর, বেনারস, মির্জাপুর প্রভৃতি ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলির বাজারেও কাঁচা রেশম

সারণি ২. ৩ : ১৯০২-০৩ সন থেকে ১৯২১-২২ সন পর্যন্ত বাংলা থেকে বিদেশে যে কাঁচা রেশম রপ্তানি করা হয় তার পরিমাণ (পাউন্ডে) এবং মূল্য (টাকায়)

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯০২-০৩	৫,৯৭,৫৯৭	৪৬,৩৩,৫৭৮
১৯০৩-০৪	৫,০৬,৮৪২	৪০,৩৬,৪৯৯
১৯০৪-০৫	৪,০৮,৩৭৬	৩১,৭৪,১৩১
১৯০৫-০৬	৪,৮৬,১২৪	৩৭,৩০,৫৮২
১৯০৬-০৭	৬,৩৪,৯৮২	৫০,১৩,২২৪
১৯০৭-০৮	৫,১২,১৪২	৪১,৩৩,৫৫৯
১৯০৮-০৯	৪,৫৩,১২৮	৩৪,০৫,৫২৮
১৯০৯-১০	৩,১৯,৭০২	২৩,০১,১০০
১৯১০-১১	৩,২৭,৯৪৭	২৩,১২,৬০৫
১৯১১-১২	১,৯০,৪২৫	১৪,০৪,০৫১
১৯১২-১৩	১,০৪,৫৮৭	৭,৭৮,৭৬৮
১৯১৩-১৪	৫২,৯৬১	৪,৬৫,০৫৫
১৯১৪-১৫	২৮,৯০৫	২,৬৯,৫৬০
১৯১৫-১৬	২৩,৮৩৭	২,০৬,৪০০
১৯১৬-১৭	৭০,৪৬৭	৮,১৮,৩৬৬
১৯১৭-১৮	৪৪,৩০৩	৫,২৬,৬৪০
১৯১৮-১৯	৫৩,০২৪	৮,৫২,৮৬০
১৯১৯-২০	২১,৪৯৪	৩,০৭,০১০
১৯২০-২১	১৬,৪১৮	৩,১৫,৩৬০
১৯২১-২২	২০,৩১৭	৩,৮২,৯৫৫

উৎস : *Report on the Administration of Bengal*, 1911-12, 24 ; ঐ, 1921-22, 25. যে অঙ্ক দেখানো হয়েছে তা থেকে রেশম নিষ্কাশন বর্জ্য এবং রেশমগুটির পরিমাণ ও মূল্য বাদ দেয়া হয়েছে।

১০৫. Eur Ms. D 281, উদ্ধৃত Sinha, 128.

রপ্তানি করা হতো। পুনা, লাহোর, মুলতান এবং মধ্য ভারতের ছত্তরপুরেও কাঁচা রেশম পাঠানো হতো। আঠারো শতকের শেষেরদিক থেকে যেসব ব্যক্তি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল (কোম্পানির জাহাজের কমান্ডার ও কর্মকর্তাবৃন্দ) এবং ১৭৯৩ সালের আইন দ্বারা যাদের বিনাশুল্কে পণ্য বহনের সুবিধা দেয়া হয়েছিল, তারাও করমন্ডল ও মালাবার উপকূলে কাঁচা রেশম রপ্তানি করতো। লন্ডন, আরব এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, পিউলো পেনাং এবং এর পূর্বাঞ্চলীয় অনেক স্থানেই যেতো তাদের সামগ্রী।

সারণি ২.৪ : ১৯০২-০৩ সাল থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে উপকূলীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে যে কাচা রেশম রপ্তানি করা হয় তার পরিমাণ (পাউন্ডে) এবং মূল্য (টাকায়)

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯০২-০৩	৩০,৪৭০	১,৭৪,১৮৪
১৯০৩-০৪	২৩,৭৪০	১,২৮,৮৬০
১৯০৪-০৫	২০,৭৯৫	১,১০,৭২৫
১৯০৫-০৬	১৭,৭৬৫	১,০৫,৫৯৬
১৯০৬-০৭	১৬,৮৩০	১,১৭,৩৪০
১৯০৭-০৮	২২,৬৪৫	১,৭৮,৭০৩
১৯০৮-০৯	২৬,৭০৮	১,৮৭,৭৬৬
১৯০৯-১০	১৯,২০৪	১,৫৫,৪৪০
১৯১০-১১	১৭,৪০৮	১,৫৯,৬৬০
১৯১১-১২	১৫,৩৩৬	১,৪৪,৯৫০

উৎস : *Report on the Administration of Bengal,* 1911-12, 24.

১৭৯৫-৯৬ সাল থেকে ১৮০৫-০৬ সাল পর্যন্ত তারা উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে ১.৬১ কোটি সিক্কা টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম রপ্তানি করে। এর মধ্যে লন্ডনে সরবরাহ করা হয় মাত্র ৪০ লক্ষ সিক্কা টাকা মূল্যের পণ্য।[১০৬] কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দশকে কাঁচা রেশমের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ক্রমশ মন্দা দেখা দেয়। এর উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো প্রায় সব উপকূলীয় অঞ্চলে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া। ১৮৭৭-৭৮ সালে বাংলা থেকে অন্যান্য প্রদেশে কাঁচা রেশমের উপকূলীয় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৮৪,৮৮৮ পাউন্ড (এর মধ্যে মালবেরী রেশম ছাড়া অন্য রেশমও ছিল)।[১০৭] কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে এই বাণিজ্য কমতে

১০৬. Watt, *Economic Products,* 191

১০৭. *Report on the Administration of Bengal, 1911-12,* 24.

কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। ১৯০২-০৩ সাল থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরের গড় পরিমাণ ছিল মাত্র ২১,০৯০ পাউন্ড এবং এর মূল্য ছিল ১,৪৬,৩২২ টাকা (সারণি ২.৪)।

২.৩ রেশমি বস্ত্র উৎপাদন এবং রপ্তানি

রেশমি বস্ত্রপণ্য এবং মিশ্রিত বস্ত্র উৎপাদন এক সময় প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান এবং রাজশাহী বিভাগে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল। বস্তুত সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক রপ্তানিপণ্য ছিল রেশমি বস্ত্র। সাধারণত ইংল্যান্ডে তৈরি হতো না এরকম বস্ত্র, যেমন, সারসেনেট, তাফতা এবং অন্যান্য সাদামাটা বা রেখাঙ্কিত রেশম ও পেলেংস আমদানি করা হতো। এতদিন পর্যন্ত ফ্রান্স, ইতালি বা হল্যান্ড থেকে সমজাতীয় যে বস্ত্র আমদানি করা হতো এগুলির দাম ছিল তার তুলনায় অনেক সস্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রেশমি এবং মিশ্রিত রেশমবস্ত্রের উৎপাদন দীর্ঘদিন উৎসাহলাভ করে নি। ১৬৭৩ সালে ও পুনরায় ১৬৮১ সালে স্পাইটেলফিল্ডস-এর তাঁতীরা অভিযোগ করে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক পাকানো রেশম এবং অন্যান্য চটকদার পরিধেয় বস্ত্র আমদানির ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের ক্রোধ এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, ১৬৯৭ সালে তারা লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউজ আক্রমণ করে। ফলে ১৭০০ সালে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হয়— "এতদ্দ্বারা এখন থেকে গ্রেট বৃটেনে পাকানো সিল্কের চুড়ি অথবা রেশম মিশিয়ে তৈরি কোন বস্তু পরিধান বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হলো।" প্রথম তিন জর্জের রাজত্বকালেও অনুরূপ আইন পাশ করা হয়। এই আইনগুলি অবশ্য কোম্পানির পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে নি। এজন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন দেশে পুনঃরপ্তানির লক্ষ্যে নিয়মিত পাকানো সিল্ক রপ্তানি অব্যাহত রাখে। কোন কোন অঞ্চলে, যেমন কাশিমবাজার, মালদহ ও শান্তিপুরে কোম্পানি বস্ত্রপণ্যের উৎপাদন চালিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘকাল ধরে বাংলা থেকে প্রধানতম যে পণ্যটি রপ্তানি করা হতো, তার নাম কোরা বা সাদামাটা ভারতীয় অরঞ্জিত রেশমি বস্ত্রপণ্য। এগুলি ইংল্যান্ডে আমদানি করা হতো প্রধানত ছাপানোর জন্য এবং পরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রপ্তানি করার লক্ষ্যে। ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ সালে যথাক্রমে ৩,২৬,০০০ এবং ৩,৯০,০০০ খণ্ড কোরা আমদানি করা হয়। এ থেকে যথাক্রমে ১৬,০০০ ও ৩৮,০০০ খণ্ড মাত্র দেশে ব্যবহারের জন্য রেখে দেয়া হয়।[১০৮] ইউরোপে রপ্তানির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হলো বন্দনা বা ছাপানো ভারতীয় রুমাল। অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য রুমালও থাকতো। কম দাম ও ভারতীয় রেশমের ব্যাপারে ফরাসীদের আগ্রহের ফলে এই ব্যবসা বেশ প্রসারলাভ করে। ১৮৩৭ সালে

১০৮. R. C. Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age*, 117.

ইংল্যান্ড থেকে শুধুমাত্র ফ্রান্সেই ১,৭৪,৫০০ পাউন্ড মূল্যের বন্দনা ও অন্যান্য রুমাল রপ্তানি করা হয়। কোম্পানির অন্য একটি রপ্তানিপণ্যের নাম 'চোপ্পা'। বিপুল সংখ্যায় বিদেশে রপ্তানি করা হতো সোনার ব্রোকেড, যেগুলিকে 'কিনকব' নামে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য মিহি রেশমবস্ত্রের উৎপাদন ১৮৯০ সাল নাগাদ অত্যন্ত কমে যায়। আসামের মুগা রেশম দিয়ে ঢাকায় *কাসিদা* নামের একটি বিশেষ ধরনের বস্ত্র বয়ন করা হতো। এটা ছিল নকশা করা মসলিন বস্ত্রখন্ড। সচারচর মুসলমানরা নামাজের সময় এ বস্ত্র পরিধান করতো। এটা দিয়ে পাগড়ীও বাঁধা হতো। বয়ন করার সময় এটার উপর নকশার ছাপ দেয়া হতো এবং মহিলারা পরে এটার উপর কারুকাজ করতো। আরব ও তুরস্কের লোকদের কাছে এই বস্ত্র ছিল খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু তুর্কীদের ক্ষমতায় ভাটা পড়ার পর কাসিদা রপ্তানি বহুলাংশে কমে যায়। "পূর্বে তুরস্কের প্রতিটি সৈন্যই কাসিদার পাগড়ী ব্যবহার করতো। আজকাল শুধু উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই এধরনের পাগড়ী ব্যবহার করে থাকে। সাধারণ সৈনিকেরা এখন ব্যবহার করে 'ফেজ'।"[১০৯] ডঃ টেইলরের সময় ঢাকায় বছরে প্রায় ১,২০,০০০ খণ্ড বস্ত্র তৈরি হতো। ১৯০৭-০৮ সালের দিকে ঢাকা থেকে যে কাসিদা রপ্তানি করা হয় তার মোট মূল্য ছিল প্রায় দু'লাখ টাকা।[১১০] রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিশোধিত তুলা এবং আসামের রেশম দিয়ে ঢাকায় আজিজি নামের বাফতা বস্ত্রও উৎপাদন করা হতো। এই বস্ত্র ইতিপূর্বে রপ্তানি করা হতো এবং ইহুদীরা তা পরিধান করতো। ১৮৯০ সাল নাগাদ এই বস্ত্রের বয়ন বেশ কমে আসে।[১১১]

বিদেশে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত বস্ত্র ছাড়াও দেশে বিভিন্ন ধরনের রেশমবস্ত্রের বেশ চাহিদা ছিল। সমগ্র ভারতের হিন্দু জনগণ কতগুলি ধর্মোৎসবের সময়ে স্থানীয় রেশমের কাপড় ব্যবহার করতো। খুংরু এবং গুটি হতে নিষ্কাশিত রেশম দিয়ে অজস্র চাদর, ধুতি, শাড়ি ও জরি উৎপন্ন হতো। মোটাবস্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হতো খুংরু রেশম এবং মিহিবস্ত্রের জন্য গুটি নিষ্কাশিত রেশম। সম্পূর্ণ খণ্ড ছাড়াও উড়িষ্যা ও উত্তর ভারতে রপ্তানির জন্য মটকার থান (মালবেরী রেশমের বিদীর্ণ গুটি দিয়ে) তৈরি করা হতো। স্যুট, ফ্রক ও অন্যান্য মোটাবস্ত্র তৈরি করার জন্য মটকা ব্যবহার করা হতো। এই বস্ত্রের দাম ছিল বেশ সস্তা। হাতেকাটা সুতার তৈরি বলে এটা অমসৃণ ছিল। বাঁকুড়া ও বীরভূমে তসর থান দিয়ে এক ধরনের বস্ত্র তৈরি করা হতো। ইরি থানের স্থানীয় ব্যবসা ছিল বেশ জমজমাট। এটি এককালে দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় উৎপন্ন হতো। রপ্তানির জন্য মুর্শিদাবাদেও এটা উৎপন্ন হতো। ঢাকা, ভাগলপুর, বাঁকুড়া এবং মালদহে বাফতা নামের তসর ও তুলামিশ্রিত বস্ত্র বয়ন করা হতো। এধরনের বস্ত্রে লম্বালম্বি টানা সুতা ছিল তসরের আর পড়েনের সুতা ছিল তুলার।

১০৯. G N. Gupta, *The Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam from 1907-08*, 11

১১০. ঐ।

১১১. E. W. Collin, *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal*, (Calcutta, 1890), 10.

এই শিল্পের অবক্ষয় ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। ডক্টর বি. হ্যামিল্টনের হিসাব অনুযায়ী ১৮১০ সালে মালদহ থেকে প্রতি বছর রপ্তানিকৃত বস্ত্রের মূল্য ছিল ২,৫০,০০০ টাকা বা ২৫,০০০ পাউন্ড। ১৮৭৬ সালে তা কমে গিয়ে হয় ৬,০০০ টাকা বা ৬০০ পাউন্ড।[১১২] ১৮৭৫ সালে মুর্শিদাবাদে উৎপন্ন রেশমের দাম ছিল ছয় লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৮৯০ সাল নাগাদ এই শিল্পটি বিলীন হয়ে যায়।[১১৩] কর্মসংস্থানের অবস্থা থেকেও অবক্ষয়ের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯০১ সালে বাংলায় রেশম সুতা কাটায় ও বয়নে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ৫০,৩৯৩ জন। ১৯২১ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ১৩,৫৮৭ জনে এবং তাদের মধ্যে সুতাকাটায় নিয়োজিত ছিল ৪,৫২৬ জন আর বয়নে নিয়োজিত ছিল ৯,০৬১ জন।[১১৪] যারা সুতাকাটায় নিয়োজিত ছিল তাদের শতকরা ৯২.৫৩ ভাগই ছিল মালদহ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। রেশম দিয়ে বুননের কাজ প্রধানত বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে এই কাজে যথাক্রমে ৩,২৪০ জন এবং ২,৯১৮ জন নিয়োজিত ছিল। ৯৫৭ জন লোক নিয়ে বীরভূমের অবস্থান ছিল তৃতীয়।[১১৫] বাংলার রেশম বয়ন শিল্পে তাদের অংশের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩৫.৭৬, ৩২.২০ ও ১০.৫৬ ভাগ। এই শিল্পটির দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে বিদেশী রেশমের তৈরি পণ্যের আমদানির পথ প্রশস্ত হয়। এতে ১৯০৪-০৫ সালে ১৪ লক্ষ টাকারও বেশি এবং ১৯২০-২১ সাল নাগাদ ৩২ লক্ষ টাকা এই দেশকে আমদানিতে ব্যয় করতে হয়।[১১৬]

২.৪ রেশমশিল্পের অবনতি

রেশমশিল্পের অবনতির অনেকগুলি কারণ উল্লেখ করা যায়। এর একটি হচ্ছে গুটিপোকার উপর অত্যন্ত বিষাক্ত ও সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ। চারটি প্রধান ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো পেইব্রিন বা 'কাটা'। এটি রেশমের একটি মহামারী রোগ। মুখার্জির মতে, ১৮৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় এই রোগ ছিল অপরিচিত। ডিম্বাবস্থা অথবা পোকাসৃষ্টির অবস্থায় এই ব্যাধি শুরু হয়। এতে তিরিশ দিনের মধ্যে অর্থাৎ সুতাকাটার অবস্থায় পৌঁছার আগেই পোকার মৃত্যু ঘটে। ১৯০৬ সালে যে রেশম কমিটি আলোচনায় মিলিত হয় তার সদস্যদের নিশ্চিত অভিমত এই যে, পেইব্রিনের আক্রমণের জন্যই প্রধানত বাংলায় মালবেরী রেশম উৎপাদনের ক্রমাবনতি অব্যাহত থাকে। অন্যান্য যেসমস্ত রোগ পোকাকে আক্রমণ করে, পোকা ও গাছ ধ্বংস করে, তা হলো মাসকারডাইন, ফ্লেচারি ও গ্রেসারি। বাংলায় মাসকারডাইন 'চূনা' বা 'চূনাকীট' নামে পরিচিত। এর উৎস হলো এক প্রকার ক্ষুদ্র ছত্রাক বা ফাংগাস। 'ফ্লেচারি বা কালাশিরা'

১১২. W W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol. VII, Maldah, 98.

১১৩. E. W, Collin, *Bengal,* 8.

১১৪. *Census of India, 1921,* Vol. V, Bengal, Part I, Report (by W. H. Thompson), 402-03.

১১৫. ঐ, 103.

১১৬. *Statistics of British India,* Part II, Commercial, 1909-10, (Calcutta 1911), 18; *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1921-22,* 4.

সাধারণত শালফা নামে পরিচিত। এর কারণ হলো পোকার বদহজম। গ্রেসারি বা 'রাসা' রোগ আগেও বাংলায় বর্তমান ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগের কারণ হলো অনুপযুক্ত আহার এবং ক্রটিপূর্ণ বায়ুচলাচল ব্যবস্থা। বিভিন্ন রকমের পরভোজী ও অন্যান্য শত্রু, বিশেষকরে মাছির আক্রমণও যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইংল্যান্ডে ধার্য অসম শুল্ক এই শিল্পটির অচল হয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ। বৃটিশ জাহাজে করে ভারতে আনীত বৃটেনে উৎপাদিত রেশমসামগ্রীর জন্য যেখানে কর দিতে হতো শতকরা ৩.৫ ভাগ, সেখানে ভারত থেকে বৃটেনে আমদানিকৃত রেশমসামগ্রীর জন্য কর দিতে হতো শতকরা ২০ ভাগ বা তারও বেশি।[১১৭] ভারতে উৎপন্ন রেশমসামগ্রী বৃটেনে উৎপন্ন রেশমসামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হলেও বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে এই কর ছিল যৌক্তিক। নানা কারণে বিদেশীরা বৃটিশ পণ্যের চেয়ে ভারতীয় পণ্য বেশি পছন্দ করতো। পার্লামেন্টের একটি বিবরণ থেকে উদ্ধৃত নিম্নে প্রদত্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, শুরুতে ভারতীয় পণ্যের চেয়ে বৃটিশ পণ্য সামান্য অগ্রগামী ছিল এবং ফরাসী ক্রেতারা এটাকে বেশি পছন্দ করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় পণ্য বৃটিশ পণ্যকে প্রায় পুরোপুরি বিতাড়িত করে দেয়।

সারণি ২.৫ : ১৮৩২-১৮৩৯ সালে বৃটেন থেকে ফ্রান্সে রপ্তানিকৃত বৃটিশ ও ভারতীয় রেশমপণ্যের মূল্য (পাউন্ডে)

সন	বৃটেনে উৎপাদিত রেশমসামগ্রী	ভারতীয় বন্দনা এবং অন্যান্য রুমাল
১৮৩২	৫০,৬০০	২৯,৫০০
১৮৩৩	৩৬,৭০০	৬০,৪০০
১৮৩৪	৩২,৭০০	৭৭,৭০০
১৮৩৫	১৬,৮০০	১,১৪,৪০০
১৮৩৬	১৫,৬০০	১,০৭,৬০০
১৮৩৭	১০,০০০	১,৭৪,৫০০
১৮৩৮	৯,৪০০	২,০২,২০০
১৮৩৯	৫,৫০০	১,৬৮,৫০০

উৎস : আর. সি. দত্ত, *দি ইকোনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়ান এজ*, (প্রথম পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী ১৯৮৫), ১১৯। পার্লামেন্টের দলিল দস্তাবেজ (Parliamentary Papers) থেকে উদ্ধৃত রিপোর্ট।

১১৭. Select Committee of the House of Lords, 1840, উদ্ধৃত R. C. Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age*, 117-18.

এর ব্যাখ্যা খুব সোজা। যখন ফ্রান্সে প্রথম বৃটেনে উৎপন্ন পণ্য রপ্তানি করা হয়, তখন সেখানে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এর ফলে ফরাসী ক্রেতারা বৃটিশ পণ্যই বেশি পছন্দ করতো। যখন এই ব্যবস্থা রহিত হয় এবং ভারতীয় পণ্য ফ্রান্সে প্রবেশের সুযোগ পায়, তখনই ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।[১১৮] যদি করের সমতা বিধান করা হতো, তাহলে বাংলায় উৎপন্ন রেশমসামগ্রী সম্ভবত অন্যান্য ইউরোপীয় বাজার দখল করার পাশাপাশি বৃটিশ বাজারও যে দখল করতো তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বৃটিশ উৎপাদনকারীরা করের সমতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। টমাস কোপ ১৮৪০ সালে পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেন যে, "এটি (করের সমতা) এখানকার ব্যবসা ধ্বংস করার মতো অবস্থার সৃষ্টি করতো; এবং... এখানকার লোকজন বেকার হয়ে পড়তো...তারা হয়ে পড়তো নিঃস্ব ও বেপরোয়া...তারা সমাজের বাকি অংশের উপর বোঝা হয়ে পড়তো...এবং এর ফলে একটি বড় অংশের মূলধনও হয়ে পড়তো বেকার। এটা বিদেশীদের হাতে সেই বিনিয়োগ তুলে দিত যা দিয়ে আমাদের চলার কথা।"[১১৯]

বাংলায় উৎপন্ন রেশমের দোষ-ত্রুটিও এর অবনতির অন্যতম কারণ। জাপান ও চীনের গুটিপোকার তুলনায় বাংলার নিম্নমানের গুটি থেকে মাত্র এক চতুর্থাংশ লম্বা সুতা পাওয়া যেতো। এই প্রদেশে গুটিপোকা থেকে রেশম নিষ্কাশনকালে সুতা কেবলই নিঃসৃত হতে থাকতো এবং যে নিষ্কাশন করতো সে কেবলি নতুন সুতা যেমন-তেমন করে পেঁচিয়ে দিত। সেজন্য রেশম মসৃণ এবং সমান শক্তির হতো না। সমান পরিচ্ছন্নতাও এতে পাওয়া যেতো না। যখনই কোন নতুন সুতা লাগানো হতো, তখন এটাকে একটা বড়শির মতো মনে হতো এবং খোলাচোখে এটাকে মনে হতো রেশম সুতার উপর ক্ষুদ্র একটি তুলার ফেঁসোর মতো।[১২০] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিষ্কাশন যন্ত্রের পরিবর্তে এর অধিকাংশই দেশজ চরকায় অথবা 'ঘাইস' -এ পেঁচানো হতো। এর ফলে ময়লামুক্ত, আঠাহীন ও আগাগোড়া মসৃণ রেশমের মিহিসুতা পাওয়া আরো অসম্ভব হয়ে পড়তো। এতে বর্জ্য, খোলসহীন শামুকবিশেষ প্রভৃতি অপদ্রব্য লেগে থাকার সম্ভাবনা ছিল। বাংলার রেশমকে যথাযথভাবে বাছাই বা শ্রেণীভেদও করা হতো না। এসব দোষ-ত্রুটি থাকতো বলে তাঁতীদের পক্ষে তাঁতে এদেশীয় রেশম ব্যবহার করা কষ্টকর হয়ে পড়তো। অথচ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত রেশমি সুতা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মসৃণ ও উত্তমরূপে প্রস্তুত।

১১৮. ঐ, 118-19.

১১৯. প্রাগুক্ত, 119-20

১২০. Evidence of J Goodman of Messrs Anderson, Wright & Co, Merchants and Agents, Calcutta, before the Indian Industrial Commission, দেখুন Minutes of Evidence, Vol II (Parliamentary Papers, XVIII), 172

অধিকন্তু বেশিরভাগ তাঁতী যেসব মাকু ছুঁড়ে মারা তাঁত ব্যবহার করতো, সেগুলির যান্ত্রিক উন্নতিসাধনের প্রয়োজন ছিল। এসব বিবিধ অসুবিধার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এ অঞ্চলের রেশমের চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যায়। ভারতের অন্যান্য অংশেও অবস্থা দাঁড়ায় অনুরূপ। বাংলার শিল্প বিভাগের পরিচালক এ. টি. ওয়াটসন বলেন, বোম্বে ও পাঞ্জাবের রেশম কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আসে চীন, জাপান, ফ্রান্স এবং ইতালি থেকে। ঐসব স্থানে উৎপাদিত রেশম বাংলায় উৎপাদিত রেশমের তুলনায় ভারতের বাজারে বেশি আদৃত হচ্ছে।[১২১]

এসব ত্রুটির ফলে বাংলায় রেশমের চাহিদা যে শুধু সীমিত হয়ে পড়ে তা-ই নয়, এর দামও যথেষ্ট কমে যায়। ১৮৫৫-৫৬ সালে এ অঞ্চলে উৎপাদিত এক সের রেশমের দাম ছিল ২২ টা. ১৫ আনা এবং ১৯১৪-১৫ সালে এই দাম কমে গিয়ে দাঁড়ায় টা. ১৩-৬-২ পাইতে।[১২২] অন্যান্য দেশের দামের চেয়ে কম দাম বিশিষ্ট হওয়া ছাড়া বাংলার রেশমের চাহিদার আর তেমন কোন কারণ ছিল না।[১২৩] বাস্তবিকপক্ষে বাংলার রেশমের দাম শুধু যে জাপান, ফ্রান্স বা ইতালির রেশমের দামের চেয়ে কম ছিল তাই নয়, এর দাম হাঙ্গেরির রেশমের দামের চেয়েও কম ছিল। কিন্তু বাংলার রেশমের বাজারদর পড়ে গেলেও উৎপাদনখরচ কিন্তু কমে নি। ১৮৬০-এর দশকে যখন বাংলায় কাঁচা রেশমের চড়ামূল্য ছিল, সেসময় ভূস্বামীরা যেসব জমিতে মালবেরীর চাষ হতো সেখান থেকে অত্যধিক কর আদায় করতো (কোন কোন ক্ষেত্রে করের পরিমাণ ছিল প্রতি একরে ৫০ টাকা)। তখন গুটিপোকা চাষীরা এ পরিমাণ কর প্রদানে সমর্থ ছিল। কিন্তু পরে বাংলার কাঁচা রেশমের দাম ভীষণভাবে পড়ে যাওয়ার পরও কর অপরিবর্তিত থেকে যায়। শ্রমিকদের নগদ অর্থে দেয়া মজুরিও ক্রমশ বেড়ে যায়। কিন্তু রেশম উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারীদের বর্ধিত পারিশ্রমিক প্রদানের সামর্থ্য তখন ছিল না। রেশম চাষাবাদ অলাভজনক হয়ে পড়ায় তারা পাট ও ধান উৎপাদনের পথ বেছে নেয়। গোলআলু ও অন্যান্য শাকসব্জি উৎপাদনের দিকেও তারা ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ছিল ইউরোপীয় ফার্মগুলির ক্রমপ্রত্যাহার। এই ফার্মগুলিই বাংলায় বিনিয়োগ হিসেবে রেশমনিষ্কাশন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। "বিশ বছর আগে বেশ কয়েকটি ফার্ম এই কাজে নিয়োজিত ছিল। রেশম উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে যেখানে সেখানে রেশমনিষ্কাশন কারখানা দেখা যেতো। এই কারখানাগুলিতে রপ্তানির জন্য রেশম রিল করা হতো।"[১২৪] এই ফার্মগুলি কাঁচা রেশমের ক্ষেত্রে অর্থলগ্নিকারী,

১২১. GOB, *Proceedings of the Agricultural and Industries Department* (Industries), December 1925, Nos. 9-10, 12.

১২২. *Report of the Indian Tariff Board regarding the Grant of Protection to the Sericulture Industry*, (Delhi 1933), 15.

১২৩. *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1912-13*, (Calcutta 1913), 25

১২৪. *Report on an Inquiry into the Silk Industry of India*, 10-11.

শিল্পপতি ও বাজারজাতকারীর ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু যখন তারা অত্যন্ত বেকায়দায় পড়লো, তখন তারাই এই ব্যবসা পরিত্যাগ করলো। "ইউরোপীয় ফার্মগুলি তখনই ব্যবসা ছেড়ে দিল, যখন কাঁচা রেশমের দাম এত কমে গেল যে, তারা রেশমগুটির জন্য যে মূল্য দিতে পারতো তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেশমগুটি সংগ্রহ করা যেতো না, যার দ্বারা রেশমনিষ্কাশন যন্ত্রগুলি ভালভাবে চালু রাখা যায়। একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ও কারখানার জন্য বিপুল ব্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল। ব্যবসা যখন পড়ে গেল তখন তা চালিয়ে যাওয়া আর লাভজনক ছিল না।[১২৫] তাদের প্রত্যাহারের ফলে বাংলার রেশম উৎপাদনকারীদের মধ্যে বিশ্বাসের সঙ্কট দেখা দেয় এবং এর ফলে শিল্পটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

জাপান ও চীন কর্তৃক অব্যাহতভাবে সস্তা রেশমসামগ্রী বাজারজাতকরণ এবং যুক্তরাজ্য থেকে কৃত্রিম রেশমি সুতা ও বস্ত্রপণ্যের আগমন এ দেশের রেশমশিল্পের উপর মারাত্মক আঘাত হানে। ইতিমধ্যে সঙ্কুচিত বাজারকে তা একেবারে অর্থহীন করে তোলে। চীনা রেশমের বিপুল আগমনের প্রধান কারণ হলো হ্রাসকৃত বিনিময় ভর্তুকি ব্যবস্থা। আংশিকভাবে এর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো উৎপাদনের অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি। জাপান থেকে ক্রমবর্ধমান ফরমায়েশের কারণ ছিল "মূল্য পড়ে যাওয়া এবং জাপানী বিনিময়ের হার কমে যাওয়া"।[১২৬] এছাড়াও আরো গুরুতর বিপদ দেখা দিল কৃত্রিম রেশমি সুতা ও বস্ত্রপণ্যের দিক থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার আকারে, কারণ এসব কৃত্রিম সুতা ও বস্ত্র "ধৌত করা সহজ এবং এগুলির রং টেকসই"। আর এগুলি দামেও সস্তা। কৃত্রিম রেশমখচিত সুতীবস্ত্রও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে এবং বৈচিত্র্যে বাজারে আসতে শুরু করে। তবুও একথা বলা যায় যে, যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেলে এক সময়ের এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পকে সম্ভবত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যেতো। ইউরোপেও সংক্রামক ব্যাধি ও পরভোজী জীবাণু দ্বারা গুটিপোকা আক্রান্ত হয় এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্যে এই আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের এবং জাপান ও চীনের রেশম উৎপাদনের ইতিহাসেও এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সাহায্যের উপমা বিধৃত রয়েছে। ফ্রান্সের সরকার রেশমগুটি উৎপাদনকারী এবং রিল প্রস্তুতকারকদের অনুদান হিসেবে অর্থপ্রদান করে। ইতালিতেও রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক অনুদান এবং বিশেষ অর্থসাহায্য প্রদান করা হতো। সিন্ডিকেট ও সমবায় সংস্থাগুলি এককালীন অনুদানের আকারে এবং বাৎসরিক আবর্তক গ্রান্টের আকারে অর্থসাহায্য পেতো। জাপানে রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য যেসব প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল তা ছিল ব্যাপক এবং বিশেষ আইনের দ্বারা পরিচালিত। জনগণকে রেশমগুটির ভাণ্ডার স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গুটি শুকানোর যন্ত্র স্থাপন এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য ১৯২৫ সাল থেকে তিরিশ বছরের জন্য জাপান সরকার বিশেষ অনুদান মঞ্জুর করে। এমনকি চীনেও দক্ষিণ চীন প্রাদেশিক সরকার শতকরা চার ভাগ হার সুদে রেশম উৎপাদনকারীদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। স্পেন, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি

১২৫. ঐ, 12.

১২৬. *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1924-25,* (Calcutta 1925), 15

ও তুরস্কের মতো অন্যান্য দেশও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য দিয়ে রেশম উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করে।[১২৭] অন্যদিকে ভারতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা ঐসব দেশ থেকে যে চ্যালেঞ্জ আসে তা মোকাবেলা করার জন্য তেমন কিছুই করে নি। ১৯৩৪ সালে বৃটিশ শাসনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এই শিল্প আমদানি-রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক সহায়তা লাভ করে, তবুও খোদ এই সংরক্ষণ প্রদানকারী ভারত সরকারও যে পরিমাণ সংরক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল তার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। অপরদিকে ১৯২০-এর দশকে ভারতে দু'টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এর একটি হলো ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত ভাগলপুর সিল্ক ইনস্টিটিউট আর অন্যটি ১৯২৫ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্ট সিল্ক উইভিং এ্যান্ড ডাইং ইনস্টিটিউট। এ দু'টি থেকে কিছু তরুণ প্রশিক্ষণ লাভ করে। তারা নৈপুণ্য অর্জন করে বেরিয়েও আসে, কিন্তু অর্থ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য বেশিদিন এই পেশায় টিকে থাকতে পারে নি। বহরমপুরের সিল্ক ইনস্টিটিউট থেকে কারিগরি কোর্সে যে ১২২ জন ছাত্র পাশ করে, তাদের মাত্র ৩৯ জন ১৯৩৫ সালে তখনও এই পেশায় নিয়োজিত ছিল।[১২৮] রেশমশিল্পের উন্নতিসাধন ও কল্যাণের জন্য ১৯৩১ সালের স্টেট এইড টু ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাক্টের অধীনে ১৯৩৭ সালের জুন পর্যন্ত মোট বিতরিত রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৩,৩২৫ টাকা।[১২৯]

৩.০ জাহাজনির্মাণ শিল্প

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অধিবাসীরা সমুদ্রগামী জাতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। এদেশের নাবিকদের নৈপুণ্য ও সাহস, উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উদ্যম এবং অভিবাসীদের উৎসাহ যুগ যুগ ধরে বাংলাকে সমুদ্রের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে এবং পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রের অধিশ্বরী হিসেবে তার গর্বিত অবস্থান অর্জন করতে ও দীর্ঘদিন তা বজায় রাখতে সহায়তা করে। বাণিজ্য ও ধর্মের স্বার্থে, কখনও কখনও রাজ্যবিস্তারের জন্য সাহসের সঙ্গে সমুদ্রের বিপদের মুখোমুখি হয়ে সেই সুদূর অতীতে বাঙালিরা তাদের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছে।[১৩০] ঐতিহাসিক ডাও-এর ভাষায়, "এই বাঙালিরাই কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের পত্তন করে, সেখান থেকেই সমুদ্রের পরপারে বিজয় অভিযান পরিচালনা করে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জাভা ও অন্যান্য দ্বীপমালায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে।"[১৩১] বাংলার নাবিকেরা সুদূর চীন, জাপান, সুমাত্রা ও জাভায় গমন করে। তারা করমন্ডল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, ট্যানাসেরিন (বার্মা) এবং সিংহলের উপকূলেও অভিযান

১২৭. Government of Bengal, Proceedings of the Department of Agriculture and Industries (Agriculture), April 1932, Nos. 3-4, 17-18

১২৮. *Bengal Legislative Council Debates*, August 26, 1935, Vol. XLVI, No. 2, 403.

১২৯. ঐ, September 17, 1937, Vol. III, 236.

১৩০. Atul Chandra, *History of Bengal, Mughal Period*, (Calcutta 1968), 500.

১৩১. উদ্ধৃত Atul Chandra, ঐ, 502.

চালায়। সমুদ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে বাঙালিরা, বিশেষকরে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার লোকেরা যে নৈপুণ্য অর্জন করে তার মূলে রয়েছে তাদের চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা। বাংলার ছিল দীর্ঘ উপকূল আর এর সংযোগ ছিল এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডের সঙ্গে। পশ্চিমে তার যোগাযোগ ছিল আফ্রিকার সাথে, পূর্বে ছিল বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে। সামুদ্রিক কর্মকাণ্ড বিস্তারের জন্য প্রকৃতিপ্রদত্ত সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার অবস্থান ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অনুকূল। জালের ন্যায় বিস্তৃত নদীনালা এদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক। এর ফলে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটে।

চর্যাপদ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল এবং পূর্ববঙ্গগীতিকার মতো প্রথমদিকের উপাখ্যানগুলিতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিশাল বিশাল নৌকা নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। মুগল সম্রাট আকবর বাংলায় একটি রাজকীয় নৌঘাঁটি পত্তন করে তা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁর নৌ-বিভাগের নাম ছিল নাওয়ারা। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সময়ে শায়েস্তা খান জাহাজনির্মাণ ও মেরামতের জন্য ঢাকায় একটি বিরাট শিপইয়ার্ড তৈরি করেন। তিনি হুগলী, বালাসোর, সুরাট, চিলমারী, যশোর ও কড়িবাড়ি প্রভৃতি বন্দরসমূহে যতো বেশি সম্ভব জাহাজ নির্মাণের হুকুম জারি করেন। তাঁর নৌবহরের সাহায্যে তিনি ১৬৬৬ সালে মগ-ফিরিঙ্গিদের নৌশক্তিকে নির্মূল করতে সমর্থ হন। পরবর্তী মুগল সম্রাটেরা নৌ-বাহিনীকে অবহেলা করলেও দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে পণ্যদ্রব্য পরিবহনের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রকমের পণ্যবাহী নৌকা নির্মাণ করতেন। প্যাটেলা, বোরা, প্যালওয়ার প্রভৃতি কয়েক রকমের নৌকা পাটনা থেকে হুগলীতে এবং সেখান থেকে উড়িষ্যা উপকূলের পিপলি ও বালাসোরে সাধারণত শোরা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হতো। কথিত আছে যে, প্যাটেলা শ্রেণীর নৌকাগুলির ১৫০ থেকে ২০০ টন পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা ছিল।[১৩২]

৩.১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজনির্মাণ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের পর পরই ১৭৫৮ সালে বৃটিশ জাহাজ নোঙ্গরের সুবিধার্থে একটি ডক প্রতিষ্ঠা করাব প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে "শীতকালে এসব জাহাজ এখানে থাকতে চাইলে অবস্থান করতে পারে।"[১৩৩] কিন্তু এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। এছাড়া ১৭৮০ সালের আগে বাংলায় যে দু'টি জাহাজ নির্মিত হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে, সে দু'টি সম্পর্কেও

১৩২. R. Mookerji, *Indian Shipping A History of the Sea-borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times*, (London 1912), 235,

১৩৩. W H Carey, *The Good Old Days of Honourable John Company*, (Calcutta 1907), Vol. II, 114.

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু জানা যায় না। এ দু'টি জাহাজের একটি সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল ১৭৬৯ সালে, অন্যটি ১৭৭০ সালে।[১৩৪] কিন্তু ১৭৮০ সালে হায়দার আলির কর্ণাটক অভিযানের ফলে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাই শেষ পর্যন্ত বাংলায় জাহাজনির্মাণ শিল্প পুনরুজ্জীবিত করতে ইংরেজ কোম্পানিকে প্রভাবিত করে। কোম্পানি ১৭৭২ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামের মতো জেলাগুলি থেকে খাদ্যশস্য ও ফোর্ট সেন্ট জর্জ-এ সৈন্য পরিবহনের জন্য জাহাজনির্মাণের চেষ্টা করে। এ্যাক্টে কোম্পানিকে ভারতে উপকূলীয় বাণিজ্য প্রতিরক্ষার জন্য জাহাজনির্মাণ করা বা ভাড়া করার অধিকার দেয়া হয়।[১৩৫] ১৭৮০ সালে সিলেটের কালেক্টর মিঃ লিন্ডসে ৪০০ টন ধারণক্ষম একটি জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। পরে ২০টি জাহাজের একটি বহরও তিনি গঠন করেন। প্রথমোক্ত জাহাজে করে তিনি মাদ্রাজে চাল প্রেরণ করেন।[১৩৬] ইতিপূর্বে এই প্রদেশের নিজস্ব বাণিজ্যের জন্য সুরাট, বোম্বে, জার্মানি ও পেগুতে তৈরি জাহাজ ব্যবহার করা হতো।

কলকাতা অবশ্য অনতিবিলম্বে নিয়মিত জাহাজনির্মাণ শিল্পের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সরকারের চীফ ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল হেনরি ওয়াটসন কলকাতার সুবিধাজনক অবস্থানের বিষয়টি অনুধাবন করেন এবং জাহাজনির্মাণ, মেরামত, যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যজাহাজ সজ্জিত করার সবরকম সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ডক, একটি সামুদ্রিক জাহাজঘাট (Yard) প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছ থেকে খিদিরপুরে জমি বরাদ্দ করিয়ে নিতে সক্ষম হন। ১৭৮০ সালে তিনি কাজ শুরু করেন। এতে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।[১৩৭] ১৭৮১ সালে তিনি 'ননসাচ' নামক ৪০০ টন ধারণক্ষম ফ্রিগেটটির উদ্বোধন করেন। এরপর ৩৯০ টন ধারণক্ষম 'সারপ্রাইজ' ফ্রিগেটটিও তিনি সমুদ্রে চালু করেন। এই দু'টি ফ্রিগেটকে ৩২টি কামানে সজ্জিত করা হয়। তাঁর নিজের নির্দেশে স্থানীয় কর্মীরা এ দু'টি নির্মাণ করে। এগুলির গতি, দ্রুত পণ্যবোঝাই, খালাস করা, অনির্ধারিত সময়েও সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ততা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার মাসিক ১০,০০০ টাকা ভাড়ায় ১৭৮৩ সালে 'সারপ্রাইজ' ফ্রিগেটটি রিকুইজিশন করে। আগের বছর একইভাবে 'ননসাচ' ফ্রিগেটটি চীনে আফিম বহন করার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়, আর এবারই সর্বপ্রথম কোম্পানির খাতে চীনে আফিম চালান দেয়া শুরু হয়।[১৩৮]

১৩৪. ঐ, 115.

১৩৫. R. Mookerji, *Indian Shipping*, 247.

১৩৬. ঐ।

১৩৭. S. B. Singh, *European Agency Houses in Bengal, 1783-1833* (Calcutta 1966), 19.

১৩৮. Singh, *Bengal*, 19.

এদেশে তৈরি জাহাজের সাফল্য অন্যান্য শিল্পোদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করে। আকারে ছোট হলেও সরকারের পাইলট জাহাজের জন্য ১৭৯০ সালে কলকাতার বংশালে প্রথম একটি শুকনো ডক নির্মাণ করা হয়।[১৩৯] এর পর পর কয়েকটি বড় আকারের ডক নির্মিত হয়। ১৭৯৬ সালে বেকন সাহেব সুলকিয়াতে একটি ডক প্রতিষ্ঠা করেন। এতে 'অর্ফিউস' নামের ফ্রিগেটটি সর্বপ্রথম টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮০৩ সালে ডব্লিউ. ওয়াডেল খিদিরপুর ডকটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন কোম্পানির প্রথম প্রধান নির্মাতা। জেমস ও রবার্ট কিড তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। প্রায় তিরিশ বছর যাবৎ এই দু'জন বাংলা অঞ্চলে জাহাজনির্মাণ ও মেরামত কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং অনেকগুলি চমৎকার জাহাজ নির্মাণ করেন। তাঁদের নির্মিত জাহাজের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জন্যও তাঁরা জাহাজ নির্মাণ করেন। টিটাগড়, কাশিপুর, হাওড়া ও ফোর্ট গ্লস্টারের ডকগুলিতেও জাহাজনির্মাণ শুরু হয়। এই ডকগুলির সব কটাই ছিল হুগলী নদীর কূলে।

এক হিসাব মতে, ১৭৮১ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত নির্মিত জাহাজের সংখ্যা ছিল ৩৭৬। এগুলির মধ্যে ১৮১১-২৮ সালে ফোর্ট গ্লস্টারে নির্মিত হয় ২৭টি জাহাজ। এগুলির ধারণক্ষমতা ছিল ৯,৩২২ টন।[১৪০] বাংলায় নির্মিত বড় জাহাজগুলির একটির নাম ছিল 'হেস্টিংস', যার ধারণক্ষমতা ছিল ১৭০৫ টন। বৃটিশ নৌবাহিনীর জন্য এটিতে ৭৪টি কামান সজ্জিত করা হয়। এটির নির্মাতা ছিল মেসার্স কিড এন্ড কোম্পানি। আর একটি জাহাজের নাম ছিল 'কাউন্টেস অব সাদারল্যান্ড'। এটির ধারণক্ষমতা ছিল ১৪৫০ টন। এটি নির্মিত হয় টিটাগড়ে ১৮০০ সালে। অন্য দু'টি জাহাজ 'ক্যাসল হান্টলি' ও 'ভ্যানসিটার্ট' নির্মিত হয় খিদিরপুরে, ১৮১২ ও ১৮১৩ সালে। এ দু'টির প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা ছিল ১২০০ টন। এ দু'টি নির্মিত হয় কোম্পানির বাণিজ্যের জন্য।[১৪১] আমরা সঙ্গতভাবেই এ নিয়ে গর্ব করতে পারি যে, ৮৯ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ 'ডায়না' ভারতে তৈরি প্রথম বাষ্পীয় শক্তিচালিত জাহাজ। ১৮২৩ সালে কিডের খিদিরপুরস্থ ডকইয়ার্ডে এটি নির্মিত হয়।[১৪২] আঠারো শতকের শেষদিকে জাহাজনির্মাণে নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি এব্যাপারে সপ্রশংস মন্তব্য করেন। ১৮০০ সালে তিনি লিখেন :

> কলকাতা বন্দরে বর্তমানে মজুত জাহাজের মোট ধারণক্ষমতা এবং বাংলায় ইতিমধ্যেই জাহাজনির্মাণ কৌশল উৎকর্ষের যে পর্যায়ে পৌঁছেছে (আরো দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনাপূর্ণ এবং কাঠের প্রচুর এবং ক্রমবর্ধমান সরবরাহের দ্বারা মদদপুষ্ট), তা থেকে এটা নিশ্চিত যে, এই বন্দর সব

১৩৯. R. Mookerji, *Indian Shipping*, 248.

১৪০. Singh, *Bengal*, 22.

১৪১. ঐ, Carey, *John Company*, 116-17.

১৪২. Evan Cotton, *East Indiamen : The East India Company's Maritime Service*, (ed). Charles Fawcett, (London 1949), 123. The ship was dismantled in 1836.

সময়েই এ অঞ্চলের বেসরকারি বৃটিশ বণিকদের মালামাল লন্ডন বন্দর পর্যন্ত বহন করার মতো প্রয়োজনীয় ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের যোগান দিতে পারবে।[১৪৩]

সারণি ৩.১ : কলকাতা বন্দরে ১৭৮১-১৮৪৬ সালে তৈরি জাহাজের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা (টনে)

সন	জাহাজের সংখ্যা	ধারণক্ষমতা
১৭৮১-১৮০০	৩৫	১৭,০২০
১৮০০-১৮০৫	৭৫	৩২,৫০৭
১৮০৬-১৮১৩	৭১	৩৩,৭১৯
১৮১৪-১৮২১	৯৫	৪১,৬৮৬
১৮২২-১৮২৯	৬১	১২,৪৪৯
১৮৩০-১৮৩৭	৩৬	১১,৫৩৮
১৮৩৭-১৮৪৬	৮৩	১০,১৫০

উৎস : ডব্লিউ. এইচ. কেরি, *দি গুড ওল্ড ডেইজ অব অনারেবল জন কোম্পানি*, ভলিউম-২, ১১৬, ১১৯-২০, (কলকাতা ১৯০৭)। হিসাবে ১৮০০ সাল এবং ১৮৩৭ সালকে দু'বার ধরায় হিসাবটি কিছুটা অসম্পূর্ণ।

লেঃ কর্নেল এ. ওয়াকারও সামুদ্রিক পরিবহনশিল্পে এ অঞ্চলের তৈরি জাহাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রামাণিক বক্তব্য রেখেছেন। ১৮১১ সালে তিনি লিখেন, "বাংলায় উত্তম জাহাজ নির্মিত হতে পারে, এবং এর সংখ্যা আরো বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়...।"[১৪৪] একই বছর বাল্টজার সলভাইনস নামক একজন ফরাসী মন্তব্য করেন, "ভারতীয় জাহাজে সৌষ্ঠব এবং প্রয়োজনীয়তার সমন্বয় ঘটেছে এবং এগুলি চমৎকার কর্মকৌশলের উত্তম আদর্শ।"[১৪৫]

অনেকগুলি কারণে বাংলায় জাহাজনির্মাণ শিল্পের বিকাশ সাধিত হয়। যেসব অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার সুবিস্তৃত সীমারেখা রয়েছে, সেসব অঞ্চল থেকে অত্যন্ত ভাল কাঠের সরবরাহ ছিল প্রচুর : যেসব কাঠ দিয়ে বাংলার জাহাজ নির্মিত হতো, সে সম্পর্কে ১৮০২ সালে এন্টর্নি ল্যামবার্ট লিখেন :

> এগুলির মধ্যে ছিল পেগু থেকে আমদানি করা টিককাঠ (সেগুন) এবং তক্তা ; বিহার, অযোধ্যা এবং বাংলা ও বিহারের উত্তরাঞ্চলীয় সীমারেখা দিয়ে যে পাহাড়শ্রেণী, তার মধ্যকার অফুরন্ত বন থেকে সংগৃহীত শাল এবং শিশুকাঠ। জাহাজের রিব, নী ও ব্রেস্ট-হুক বা কাঠামোটি সাধারণত

১৪৩. উদ্ধৃত William Digby, *'Prosperous' British India*, (New Delhi 1969), 86.

১৪৪. উদ্ধৃত S. N Gupta, *British*, 4-5.

১৪৫. ঐ।

> শিশুকাঠ দিয়ে তৈরি হতো, বীম ও ভিতরের তক্তাগুলি ছিল শালকাঠের এবং তলা, পার্শ্ব, ডেক, হাল, পিছন দিক ইত্যাদি তৈরি হতো টিক দিয়ে। জাহাজ নির্মাণের জন্য টিকের কার্যকারিতা ও এর স্থায়িত্ব এত বহুলবিদিত যে তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন,... শিশু ও শালকাঠের মধ্যে প্রথমোক্তটি আকার, আকৃতি, দৃঢ় গঠন ইত্যাদি দিক থেকে জাহাজ তৈরির জন্য চমৎকারভাবে উপযোগী। এছাড়াও এই কাঠ থেকে সব আকারের এবং আয়তনের বাঁকানো কাঠ এবং 'নী' তৈরি করা যায় এবং তা পূর্ণ আকৃতির এবং যেকোন মাপের জাহাজের জন্যই, এমনকি প্রথম শ্রেণীর একটি যুদ্ধজাহাজের জন্যও উত্তম। দ্বিতীয়টির কাঠ দিয়ে তৈরি করা যায় উত্তম বীম, 'নী' এবং ভিতরের তক্তা।[১৪৬]

খুব সস্তা দরে প্রচুর সংখ্যক স্থানীয় কারিগর এবং শ্রমিক সহজলভ্য ছিল। যদিও তারা সঠিক অর্থে দক্ষ জাহাজপ্রকৌশলী ছিল না, তাদের বৃহদায়তন নৌকানির্মাণের উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ছিল। বিদেশী ফার্ম এবং নির্মাতাদের দক্ষ পরিচালনায় তারা উত্তম জাহাজ-ছুতোর হিসেবে প্রমাণিত হয়।

স্থানীয় দক্ষ কারিগর এবং কাঁচামালের পর্যাপ্ততা ও সহজলভ্যতা ছাড়াও সেসময় দেশের সম্প্রসারণশীল আঞ্চলিক ও উপকূলীয় বাণিজ্যও নিঃসন্দেহে শিল্পটিকে উৎসাহিত করে। কলকাতার আঞ্চলিক জাহাজগুলি বিশেষকরে দু'ধরনের রপ্তানিবাণিজ্যের জন্য নিয়োজিত ছিল, এর একটি খাদ্যশস্যের অন্যটি আফিমের। উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের কারণে ফোর্ট সেন্ট জর্জ প্রেসিডেন্সিতে বিশেষকরে চাল বহন করা এজেন্সি হাউজসমূহের জন্য বিরাট লাভের উৎস হয়ে উঠে। অধিকন্তু করমন্ডল উপকূল থেকে লবণ আমদানি করতে গিয়ে কলকাতার ব্যক্তিমালিকানাধীন জাহাজগুলি লাভজনক কাজ পায়। ১৭৯০-এর দশক ও ১৮০০-র দশকে তীব্র খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয়ায় দেশীয় জাহাজে করে লন্ডনে চাল বহন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে নিজেদের খাতে আপৎকালীন পণ্যসামগ্রী বহন করার জন্য কোন কোন এজেন্সি হাউজ জাহাজনির্মাণের ফরমায়েশ দেয়। একমাত্র ১৮০০-০১ সালেই লন্ডনে চাল বহন করার জন্য পনেরোটি ভারতীয় জাহাজ ভাড়া করা হয়।[১৪৭] ভারতে তৈরি জাহাজের ভাড়া খাটার এটা ছিল এক চমৎকার সুযোগ। ইংল্যান্ডে বৃটিশ সরকার ক্ষয়ক্ষতি হলে প্রতি হন্দর ওজনের জন্য পূর্ণমূল্য বত্রিশ শিলিং প্রদানের গ্যারান্টি দেয়।[১৪৮] ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট এদেশের জাহাজ ব্যবসাকে আরো উদ্দীপ্ত

১৪৬. উদ্ধৃত R. Mookerji, *Indian Shipping,* 248-49. Bengal ships, built of teak and *saul,* were greatly superior to the "oaken Walls of old England'. They were preferred to any other for durability and wear It was calculated that every ship in the navy of Great Britain was renewed every twelve years. On the other hand, teak wood built vessels lasted fifty years and upwards. দেখুন the testimony of Lt. Col. A Walker in W. Digby, *'Prosperous' British India,* 86; Carey, *Good Old Days,* 116.

১৪৭. Besides the 15 ships taken up in India for conveyance of rice to London, another 22 ships licensed in England came to Bengal for the same purpose. One American ship was also permitted to proceed to Calcutta to convey rice to London. Altogether about 4,80,164 maunds of rice valued at Rs. 9,77,795 was sent to England in 1801 দেখুন Singh, *Bengal,* 108.

১৪৮. ঐ, 106

করে। এর দ্বারা কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান ঘটে। ইউরোপের বেসরকারি ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিতে শুরু করে এবং কয়েকটি এজেন্সি হাউজ নিজেদের জাহাজে করে ভারত থেকে চিনি, তুলা, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য পণ্য বহন করার অনুমতি প্রার্থনা করে।

মুনাফার উচ্চহারের জন্যও শিল্পটির বিকাশ ঘটে। একটি জাহাজ যদি মাদ্রাজে প্রতি ব্যাগের ভাড়া ২.৫০ টাকা করে ৪০,০০০ ব্যাগ চাল নিয়ে বছরে চারবার যাতায়াত করতে পারে, তাহলে জাহাজের মালিক প্রতি বছর ৯,০০০ পাউন্ডের বেশি মুনাফা অর্জনের আশা করতে পারে।[১৪৯] ফলে, কোম্পানির কর্মচারীরা এবং দায়হীন বণিকেরা জাহাজনির্মাণে তাদের সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি লাভজনক পথের সন্ধান পায়।[১৫০] এছাড়া স্থানীয় সম্পদের বিনিয়োগও ছিল বেশ উৎসাহজনক। ১৭৮১ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত প্রতি টনের জন্য ২০০ টাকা গড়ে খরচ করে অন্ততপক্ষে ১৫০,০০০ টনের জাহাজ নির্মাণের জন্য কমপক্ষে তিন কোটি এবং তদূর্ধ্ব টাকা ব্যয় করা হয়।[১৫১] ১৮১৩ সালের আগে কলকাতায় যেসব বড় বিদেশী জাহাজের ফার্ম উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করে, সেগুলি হলো ফেয়ারলি ফারগুসন এন্ড কোং ; হোগ, ডেভিডসন এন্ড কোম্পানি; হিউ এ্যাটকিন রিড; পামার এন্ড কোং; এডওয়ার্ড ব্রাইটম্যান এবং জোহানেস সারকিজ। মেসার্স ফেয়ারলি ফারগুসনের জাহাজের সংখ্যা ছিল নয়টি। এদের প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা ছিল ৪০০ টন। মেসার্স হোগ, ডেভিডসন এন্ড কোম্পানির জাহাজের সংখ্যা ছিল পাঁচটি। আর উল্লিখিত অন্যান্য ফার্মগুলির প্রত্যেকটির দু'টি করে জাহাজ ছিল। ১৮১৩ সাল নাগাদ গোলাম হোসেনের বড় বড় চারটি জাহাজ ছিল। এদেশীয় অন্যান্য মালিকের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ সাদেক, রামদুলাল দে ও দোরাবজী বাইরামজী।[১৫২] সম্ভবত বাইরামজী কাওয়াজী, সাইদ হোসাইন এবং সাইদ মোহাম্মদও জাহাজের মালিক ছিলেন। উপকূলীয় ও উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে তাদের ব্যাপক ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। কতিপয় ইউরোপীয়-ভারতীয় ধনপতিও যুগ্মভাবে কয়েকটি জাহাজের মালিক ছিলেন।

বাংলায় জাহাজনির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ যতোই অনুকূল থাকুক না কেন, এর বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এই শিল্প কখনো ভালভাবে বিকশিত হতে পারতো না। জাহাজনির্মাণ শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কলকাতা সরকার ১৭৯৫ সালের নভেম্বরে সমুদ্রপথে এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহ থেকে আমদানিকৃত কাঠের উপর থেকে কাস্টমস শুল্ক রহিত করে। এছাড়া আঞ্চলিক ও উপকূলীয় বাণিজ্য ভারতে তৈরি জাহাজের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এতে স্থানীয়

১৪৯. ঐ, 21.

১৫০. ঐ, 5.

১৫১. দেখুন, Table 3.1; R. Mookerji, *Indian Shipping,* 248.

১৫২. ঐ, Singh. *Bengal,* 21.

জাহাজনির্মাণ শিল্প বিপুলভাবে লাভবান হয়। অন্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার, বিশেষকরে লর্ড ওয়েলেসলিও ভারতে তৈরি জাহাজের প্রতি একান্ত আন্তরিক উৎসাহ-সমর্থন প্রদান করেন। আর এই সমর্থন ছিল পুরাতন লন্ডনভিত্তিক জাহাজশিল্প স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে। এই স্বার্থের অংশীদারেরা কোম্পানির জন্য জাহাজনির্মাণের একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছিল। বাংলায় তৈরি জাহাজকে লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করতে অনুমতি দেয়ায় তারা আক্রান্তবোধ করছিল। অধিকন্তু তারা আরো ভয় পেয়েছিল এজন্যে যে, বাংলায় তৈরি জাহাজ অনেক কম হারে ভাড়া করা যেতো। তাছাড়া এজেন্সি হাউজগুলি ৩০,০০০ টনের মতো মাল বহনের জন্য জাহাজ ভাড়া করতো।[১৫৩] এসময় হেনরি ডানডাস ছিলেন ইন্ডিয়া বোর্ড এবং যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের প্রধান। তিনি ১৭৯৭ সালের ১ জুলাই এব্যাপারে বোর্ডের নীতি ব্যাখ্যা করে কমিটি অব শিপবিল্ডারস অব দি টেমস্-এর কাছে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ না রেখে লিখেন, "ইন্ডিয়ায় অবস্থিত বৃটিশ রাজ্যগুলি এখন গ্রেট বৃটেনের সার্বভৌমত্বের অধীন। সেখানে নির্মিত জাহাজগুলি বৃটেনে নির্মিত জাহাজগুলির মতো একই রকমের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কানাডা বা সাম্রাজ্যের অধীন অন্য যেকোন দেশের জাহাজের মতোই সুযোগ-সুবিধা এসব জাহাজ পাবে।"[১৫৪]

ডানডাসের প্রচেষ্টা ডেভিড স্কট কর্তৃক বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই সমর্থিত হয়। ১৭৯৬ ও ১৮০১ সালে স্কট ছিলেন ইন্ডিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৭৯৫ ও ১৮০০-০১ সালে তিনি ছিলেন এই বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান। ওয়েলেসলি যে ভারতে তৈরি জাহাজকে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে মাল পরিবহনের জন্য যাতায়াতে সমর্থন দিয়েছিলেন তার পিছনে ছিল উপরোক্ত দুই ব্যক্তির উৎসাহ। অবশ্য ভারতে তৈরি জাহাজের চলাচলকে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে কোম্পানিকে ইংল্যান্ডে অত্যধিক ভাড়ায় অতিরিক্ত জাহাজ ভাড়া করে যে লোকসান দিতে হয় তা থেকে শুধু রক্ষা পাবার বিষয়টি এবং বাংলায় ব্যবসারত যেসব বৃটিশ বণিক রয়েছে তাদের স্বল্পব্যয়ে ব্যবসা করতে ও দেশে লাভজনকভাবে নিজেদের সম্পদ প্রেরণ করতে সহায়তা করা ছাড়াও অন্য কারণ ছিল। সম্পদের অভাব

১৫৩. Ships were chartered and were not owned by the Company. Private individuals, who were known as 'Ship's husbands' were given the right to build ships which the Company bound itself to charter at stipulated rates. This is how the 'system of hereditary bottoms' came into existence. The rates of freightage fluctuated very much and were between £22 and £47 a ton from 1773 to 1795 দেখুন Cotton, *East Indiamen*, 48-49; C H. Philips. *The East India Company, 1784-1834* (Manchester 1961), 80-81. The British merchants in Bengal offered to let them at £12 per ton in peace and £16 in war if they were allowed to load the ships themselves or to procure cargoes from private traders. দেখুন, Tripathi, *Trade*, 40-41.

১৫৪. Tripathi, *Trade*, 47-48.

সত্ত্বেও ভারত থেকে বড় বড় অঙ্কের বিনিয়োগের ফরমায়েশ, যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বহনের খরচবৃদ্ধি এবং জাহাজ তৈরির কাঠ ও নাবিকের দুষ্প্রাপ্যতা ডানডাসকে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। অন্যদিকে এজেন্সি হাউজগুলির জন্য ওয়েলেসলির কিছু করার প্রয়োজন ছিল। কারণ তাঁর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে এদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এজেন্সি হাউজগুলি নিজেদের স্বার্থেই যুদ্ধবিগ্রহে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। তারা আশা করেছিল, যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তারা প্রচুর কন্ট্রাক্ট পাবে, বাধ্যতামূলক স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানির মাধ্যমে তাদের আর্থিক সঙ্কট লাঘব হবে, সেই সাথে খুলে যাবে সুদে সরকারি ঋণ বিনিয়োগের সম্ভাবনার দ্বার। তাদের এই সমর্থনের বিনিময়ে তারা নিজেদের জাহাজে করেই পণ্যপ্রেরণের সুবিধা দাবি করেছিল, যার ফলে তারা এই জাহাজে করেই ইংল্যান্ড থেকে তাদের অতি প্রয়োজনীয় মূলধন আমদানি করতে পারবে। ওয়েলেসলি তাদের এই সুবিধা দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন নি, বিশেষকরে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, কোম্পানির চাহিদার সংকোচন ভারতে উৎপাদন ও রাজস্বআয় ব্যাহত করবে। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের কারণেও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর অভিজাতসুলভ ঔদ্ধত্য জন বেব ও কোর্টের মধ্যকার ষড়যন্ত্রের ফলে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়।[১৫৫] ওয়েলেসলি যে ভারতে তৈরি জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তার আরো একটি কারণ, যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার মতো নিরপেক্ষ দেশসমূহের ব্যক্তিমালিকানাধীন জাহাজ ভারত ও ইউরোপের মধ্যেকার বৈদেশিক বাণিজ্যের বহুলাংশ কব্জা করে নিয়েছিল।[১৫৬] সেজন্য তিনি এই মতে উপনীত হন যে, নিরপেক্ষ শক্তির জাহাজের পরিবর্তে এ দেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যাদি এ দেশের নিজস্ব জাহাজে করেই ইউরোপে নিয়ে যাওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যেসব বিদেশী বণিক রপ্তানিবাণিজ্য নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিচ্ছিল, তিনি চাচ্ছিলেন যে, তাদের পরিবর্তে ভারতীয় বণিকেরাই এই ব্যবসাটা চালিয়ে যাবে।[১৫৭]

৩.২ : জাহাজনির্মাণ শিল্পের ক্রমাবনতি

কোর্ট অব ডিরেক্টরস ও ভারত সরকারের সমর্থন ও উৎসাহে ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ছিল স্বল্পায়ু। যখন থেকে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ভারতীয় জাহাজে করে

১৫৫. ঐ, 61.

১৫৬. উদাহরণস্বরূপ the American trade with Calcutta tripled in extent between 1795 and 1800. Being neutral, their rates of insurance was lower and they had also the access to ports from which the English were excluded C N. Parkinson, *War in the Eastern Seas*, (London, 1954), 45-46. Nor were the American ships expensively built for the Indian trade nor for political purposes; they could also sail without waiting for convoy Consequently, their average rate of freight was £20 a ton compared with the Company's 35 a ton. দেখুন C. H. Philips, *East India Company*, 107.

১৫৭. Cotton, *East Indiamen*, 46.

লন্ডনে পরিবহন করা শুরু হয়, তখন থেকেই বৃটেনের জাহাজ ব্যবসায়ীরা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থে টেইলর লন্ডন বন্দরে ভারতে তৈরি জাহাজের প্রথম আগমনের ফলে যে ক্রোধ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল সে সম্পর্কে বলেন:

> লন্ডন বন্দরে ভারতে নির্মিত জাহাজে করে ভারতে উৎপন্ন পণ্যের আগমনের ফলে একচেটিয়া জাহাজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, টেমস নদীতে কোন শত্রু জাহাজবহরের উপস্থিতির ফলে উদ্ভূত আলোড়নও তাকে অতিক্রম করতে পারতো না। লন্ডন বন্দরের জাহাজনির্মাতারা সতর্কবাণী তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়; তারা ঘোষণা করে যে, তাদের ব্যবসা ধ্বংসোম্মুখ এবং জাহাজনির্মাণে নিয়োজিত ইংল্যান্ডের সব ছুতার মিস্ত্রিদের পরিবার নিশ্চিত ক্ষুৎপীড়িত হবার মুখে।[১৫৮]

ভারতে নির্মিত জাহাজের অনেকগুলি সুবিধা ছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল পণ্য পরিবহনে কম ভাড়া। ১৭৯৫ সালে জাহাজের মালিকেরা সব রকম পণ্যের জন্য প্রতি টন ১৬ পাউন্ড হারে ২০,০০০ টন পণ্য পরিবহনের সুযোগ প্রদান করে। কেবল বস্ত্রপণ্যের জন্য তারা টনপ্রতি ২০ পাউন্ড দাবি করে। ১৭৯৯-১৮০০ সালে বোর্ড প্রতি টন ২২ পাউন্ড হারে তিনটি জাহাজ ভাড়া করে। অন্যদিকে কোম্পানি জাহাজভাড়া আদায় করতো প্রতি টন ৩৫ পাউন্ড হারে। এছাড়া ইভান কটন উল্লেখ করেন :

> ভারতে নির্মিত এই জাহাজগুলি নিয়মিত ইন্ডিয়াগামী (ইন্ডিয়াম্যান) জাহাজ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত মানের ছিল। গতিতে এগুলি নিয়মিত জাহাজগুলিকে ছাড়িয়ে যেতো, মাল উঠানো-নামানোর কাজ অনেক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতো এবং কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ইন্ডিয়াম্যানদের জন্য নির্ধারিত ইউরোপীয় পণ্য ইংল্যান্ড থেকে অনির্ধারিত সময়ে বহন করে এগুলি ঐতিহ্য ভঙ্গ করেছিল।[১৫৯]

অতএব ভারতের বেসরকারি জাহাজের মালিকদের হাত থেকে নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্য রক্ষার জন্য বৃটিশ জাহাজমালিকেরা একটি সুসঙ্ঘবদ্ধ পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। তারা ছোট ৫০০ টনের জাহাজে করে ১০,০০০ টন পণ্য পরিবহনের সুযোগ প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল কম জাহাজভাড়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ দেয়া এবং ভারতে নির্মিত জাহাজের প্রয়োজনীয়তা দূর করা। এব্যাপারে তারা একটি প্রচারাভিযানও শুরু করে। লন্ডনে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে এ দলটি খুব সহজেই মালিকবর্গকে পত্র-পত্রিকায় ও প্যামফ্লেটে তাদের পক্ষে লেখালেখি করার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। সংখ্যার অনুপাতে তাদের প্রভাব অত্যধিক হওয়ায় বিশেষকরে ডিরেক্টর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। ওয়েলেসলি কর্তৃক ভারতে নির্মিত জাহাজকে উৎসাহিত করার নীতিকে তারা কোম্পানির ও জাতীয় স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক বলে গণ্য করে এবং তার ও ডানডাসের

১৫৮. Digby, *India,* 79.

১৫৯. Cotton, *East Indiamen,* 46

বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তারা কলকাতার এজেন্সি হাউজগুলির হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ভারতে নির্মিত জাহাজ দিয়ে ব্যবসার বিরুদ্ধে সমালোচনায় কোর্ট অব ডিরেক্টরস অদ্ভুত সব যুক্তি উত্থাপন করা শুরু করে। তাদের একটি লেখায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, লস্করদের অর্থাৎ ভারতীয় নাবিকদের বৃটেনে অবতরণ করতে দিলে ভারতে তাদের সাম্রাজ্য শাসন হুমকির সম্মুখীন হবে। ১৮০১ সালে এ বিষয়ে কোর্ট লেখে :

> দেশে ফেরার পর তারা (ভারতীয় নাবিকেরা) আমাদের সম্পর্কে যেসব অবজ্ঞাপূর্ণ বিবরণ ছড়ায় তা আমাদের এশীয় প্রজাদের মনের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। এর ফলে আমাদের চরিত্র সম্পর্কে তাদের মনে যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল, যা এতদিন প্রাচ্যে আমাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে, তা ক্রমশ অত্যন্ত বাজে ধারণায় পরিণত হবে। যদি একবার তারা এই ক্ষুব্ধ উপলব্ধিতে উপনীত হয় যে, এ পর্যন্ত তারা আমাদের অত্যন্ত বেশি মর্যাদা দিয়েছে বা খুব বেশি সম্মান দেখিয়েছে, তাহলে এর প্রভাব আমাদের অত্যন্ত স্বার্থবিরুদ্ধ প্রমাণিত হতে পারে।[১৬০]

ভারতীয় জাহাজ এবং ভারতীয় নাবিক খাটানোর ব্যাপারে এর পর পরই কোর্ট অব ডিরেক্টরস নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে। ১৮০২ সালের ১৬ জুনে লিখিত একটি সাধারণ চিঠিতে কোর্ট গভর্নর জেনারেলকে উদ্দেশ করে এই শর্তারোপ করে যে, এ পর্যন্ত প্রাইভেট বণিকদের জন্য প্রতিবছর জাহাজে করে ৩,০০০ টন মালামাল পরিবহনের যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত তিন, চার বা পাঁচ হাজার টনের বরাদ্দও তারা দাবি করতে পারে, যা তাদেরকে বরাদ্দ করা যেতে পারে। এজন্য যেসব জাহাজের প্রয়োজন হতে পারে সেসব হয় গ্রেট বৃটেনে নয়তো ভারতে নির্মাণ করতে হবে এবং কোম্পানি সেসব ভাড়া করে নিজেদের মালামাল লন্ডনে পরিবহনের জন্য প্রাইভেট বণিকদের কাছে ভাড়া দেবে। এছাড়া কোর্ট আরো নির্দেশ দেয় যে, এভাবে যেসব জাহাজ ভাড়া করা হবে সেসবের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ নাবিকদল ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত হতে হবে; জাহাজভাড়ার হার টনপ্রতি ১৪ পাউন্ডের বেশি হবে না এবং জাহাজ এই শর্তে সমুদ্রযাত্রা করবে যে, এগুলো আর ভারতে ফিরে আসতে পারবে না, ইংল্যান্ডেই বিক্রি হয়ে যাবে।

এই নির্দেশনামা ভারতীয় জাহাজমালিকদেরকে নিঃশর্তে নিজেদের জাহাজে মালামাল পরিবহনের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত করে। তাছাড়া ১৮০৩ সালের এপ্রিল থেকে দু'বছর পর্যন্ত ভারতে নির্মিত জাহাজ খাটাতে হবে—প্রধানমন্ত্রী এ্যাডিংটনের এই সিদ্ধান্তের (যা আরও বর্ধিত করা হবে বলে এজেন্সি হাউজগুলি সঠিকভাবে বা ভ্রমাত্মকভাবে মনে করেছিল) ফলে জাহাজনির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে যে জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হয়েছিল তার উপর উল্লিখিত চিঠিটির প্রভাব ছিল বেলুন ফুটো করে দেয়ার মতো। ১৮১৪ সালে বৃটিশ

১৬০. Digby, *India*, 102-03.

পার্লামেন্ট আরো একটি আইন পাশ করে। তা হলো, কোন জাহাজই, এমন কি বৃটিশ মালিকানাধীন হলেও তা লন্ডনে প্রবেশ করতে পারবে না, যদি না তার নাবিকদের তিন-চতুর্থাংশ বৃটিশ হয়। জাহাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা সরকারের উপর প্রভাব খাটিয়ে ভারতীয় জাহাজ যেন বৃটেনে নিবন্ধিত হবার পূর্ণ সুবিধা না পায় সে ব্যবস্থাও করে নিয়েছিল। ১৮১৬ সালের জানুয়ারিতে বা এর আগে নির্মিত ৩৫০ টনের বেশি ধারণক্ষম জাহাজকে মাত্র সীমিত সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছিল।[১৬১] ভারতে নির্মিত জাহাজকে বৃটেনে নিবন্ধিত হবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে যেসব বন্দরের সঙ্গে বৃটেনের পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল, ভারতীয় জাহাজকে সেসব বন্দরের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। ১৮১১ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে বৃটেনের নয় এরকম সব জাহাজের উপর বৈষম্যমূলক আমদানিশুল্কও আরোপিত হয়। এই শুল্কহার 'ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর'।[১৬২] এভাবে ১৮২০ সালের আগেই ভারতীয় জাহাজের কার্যত শুধু ইংল্যান্ডে যাওয়াই নিষিদ্ধ করা হয় নি, বরং অন্যান্য ইউরোপীয় ও বিদেশী বন্দর থেকেও একে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এখন এর একমাত্র অক্ষুণ্ন বিচরণক্ষেত্র হলো দেশের লাভজনক অভ্যন্তরীণ ব্যবসা এবং তা বছরের পর বছর সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৮১৩ সাল থেকে যেসব বৃটিশ জাহাজমালিক ও বণিক ভারতের সঙ্গে ব্যাপক লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল (কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার রহিত করার পর), তারা এখন উপকূলীয় বাণিজ্যের সুবিধাদিও দাবি করে বসে। ১৮২৩ সালের কনসোলিডেটিং এ্যাক্ট দ্বারা বৃটিশ জাহাজকে এসব সুবিধাদিও দেয়া হয়। বৃটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতার অনেকগুলি এজেন্সি হাউজের তীব্র প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত অসার প্রমাণিত হয়। তাদের অনেকগুলি জাহাজ বেকার হয়ে পড়ে।[১৬৩]

অন্যান্য অনেকগুলি কারণের জন্য এই শিল্পটি গুরুতরভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। প্রথমত, তখন ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে অর্থবাজারে যে টানাপড়েন শুরু হয়, তাতে কলকাতার এজেন্সি হাউজগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই একই সময়ে গ্রেট বৃটেনে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তাতে দুর্দশা আরো তীব্র হয়। এর ফলে মেসার্স পামার এন্ড কোম্পানিসহ অনেক এজেন্সি হাউজ তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। এ থেকে আবার ভারতীয় ধনপতিরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ প্রত্যাহার করে নেয়। দ্বিতীয় যে কারণে বাংলার জাহাজ চলাচল

১৬১. Singh, *Bengal,* 21

১৬২. S N. Gupta, *British,* 37, The nascent Indian ship-building industry was beginning to damage the well established British shipbuilders because its cost structure was found economical by the British users of merchantmen Hence the British shipbuilders clamoured for a duty on India-built shipping which would make the buyer indifferent as to where he purchased his ship. S Ambirajan, *Classical Political Economy and British Policy in India,* (Cambridge 1978). 189.

১৬৩ . Singh, *Bengal,* 130

নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা প্রায় এই সময়েই ঘটে। যন্ত্রকৌশলজনিত উদ্ভাবনের ফলে বৃটিশ নৌ-পরিবহন শিল্পে মূল্যমানের প্রচুর হ্রাস ঘটে। জাহাজভাড়া প্রতি টনের জন্য ৬ পাঃ থেকে ৮ পাঃ পর্যন্ত কমিয়ে আনা যেতো।[১৬৪] তুলনামূলকভাবে সস্তা বৃটিশ জাহাজগুলির চলাচল এবং নেভিগেশন আইনের প্রয়োগের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতে নির্মিত জাহাজের পরাজয় ছিল অবধারিত। এসব কারণে ইতিপূর্বে আমেরিকান জাহাজেরও পরাজয় ঘটে। ভারতীয় এবং বৃটিশ জাহাজের ভাড়ার পার্থক্য ছিল পরেরটির অনুকূলে শতকরা ৩০ ভাগ। গত বিশ বছর বিরাজমান ভাড়ার তুলনায় জাহাজভাড়া কমে গিয়েছিল তিন ভাগের দুই ভাগ। আর বৃটিশ জাহাজগুলি বন্দর থেকে বন্দরে তাদের বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছিল আইনের শর্ত উপেক্ষা করে।[১৬৫] উপরের দু'টি কারণ ছাড়াও বাংলার (সে অর্থে সমগ্র ভারতের) জাহাজ চলাচল এসময় মাস্কটের ইমামের সম্প্রসারিত জাহাজবহর থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। এ সব কিছুর পুঞ্জীভূত প্রভাবের ফলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের জাহাজনির্মাণ শিল্প মারাত্মক দুর্দশায় পড়ে। ১৮১৪-২১ সালে যেখানে গড়ে ন্যূনপক্ষে ৫,২১১ টন জাহাজ নির্মিত হয়েছে, ১৮২২-২৯ সালে সেখানে এই গড় পড়ে গিয়ে হয় ১,৫৫৬ টন ; ১৮৩০-৩৭ সালে হয় ১,৪৪২ টন, এবং ১৮৩৭-৪৬ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ১,০১৫ টনে।[১৬৬] ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে বাংলার জাহাজশিল্পের ক্রমাবনতি এত দ্রুত ঘটে যে, নবনির্মিত জাহাজগুলি পুরাতনগুলির স্থলাভিষিক্ত হবার মতো যথেষ্ট ছিল না। এই পরিস্থিতিতে লাভবান হচ্ছিল ইউরোপীয় জাহাজগুলি (প্রধানত বৃটিশ), এবং ভারতীয় বৃটিশ বন্দরে স্থানীয় জাহাজগুলির তুলনায় এগুলির মাল বহনক্ষমতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল (সারণি ৩.২)। অবশেষে ১৮৬৩ সালের এপ্রিলে জাহাজনির্মাণ শিল্প চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। এটা ঘটে বৃটিশ রাজ কর্তৃক ভারত সরকারের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই। এর ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উইলিয়াম ডিগবি বলেন, "যেভাবে পশ্চিমা বিশ্বের সমুদ্রেশ্বরী প্রাচ্যের সমুদ্রেশ্বরীকে মারণাঘাত হেনে কুপোকাত করে,তার চেয়ে অন্য কোন কিছুই আমাকে এত প্রবলভাবে আক্রান্ত করে নি।"[১৬৭]

এভাবে বাংলার সামুদ্রিক পরিবহন শিল্পকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলার বিস্ময়কর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, স্বদেশে বৃটিশ সরকার ভারতীয় জাহাজ চলাচল শিল্পের কণ্ঠরোধ করার সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতীয় জাহাজ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা না করার সিদ্ধান্তটি নেয়া হয় লন্ডনে কার্যকর ক্ষমতাধর বৃটিশ জাহাজশিল্প স্বার্থগোষ্ঠীর

১৬৪. Tripathi, *Trade*, 131

১৬৫. ঐ, 252.

১৬৬. দেখুন সারণি ৩.১।

১৬৭. Digby, *India*, 88

উদ্যোগে। ইংল্যান্ডের সরকার এই স্বার্থগোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং ভারতের সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুবিধাবৃদ্ধির জন্য অতঃপর যথাযথ আইন, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান পাশ করে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এধরনের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলার জাহাজশিল্প চূড়ান্তভাবে ইংল্যান্ডের জাহাজশিল্পের কাছে পরাজিত হবে।

সারণি ৩.২ ঃ ১৮৪১ ও ১৮৫৪ সালে ভারতের বৃটিশ বন্দরে স্বদেশী জাহাজসহ যেসব জাহাজ ভিড়ে এবং মাল খালাস করে তাদের সংখ্যা এবং ধারণক্ষমতা

সন	যেসব জাহাজ ভিড়েছে তার সংখ্যা		মাল খালাসকারী জাহাজের সংখ্যা		মোট	
	জাহাজ সমূহ	টনে ওজন	জাহাজ সমূহ	টনে ওজন	জাহাজ সমূহ	টনে ওজন
১৮৪১	২৫,৮৮৭	১০,৫০,৮৮৭	২৬,৫৮৯	১১,৩০,৪৩৭	৫২,৪৭৬	২১,৮১,৩৬০
১৮৫৪	১২,৭৮৯	১,৫৫,৩০০	১৩,২৯২	১৬,৮১,২৭১	২৬,০৮১	৩২,৩৫,৫৭১

ইউরোপীয় এবং দেশীয় জাহাজের সংখ্যা এবং টনের হিসাবে পণ্যপরিবহন ক্ষমতার তুলনামূলক বিবরণ

ইউরোপীয় জাহাজসমূহ

সন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন
১৮৪১	১,৩৯০	৪৫৯.২৯৫	১,৫৮৭	৪,৯৫,২৯১	২,৯৭৭	৯,৫৪,৫৮৬
১৮৫৪	২,৮১৩	১.১০৪.২৪৪	৩,২২৩	১২,৩০,৫৭০	৬,০৩৬	২৩,৩৪,৮৯৪

দেশীয় জাহাজসমূহ

সন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন	জাহাজ	টন
১৮৪১	২৪,৪৯৭	৫,৯১,৫৯২	২৫,০০২	৬,৩৫,১৮২	৪৯,৪৯৯	১২,২৬,৭৭৪
১৮৫৪	৯,৯৭৬	৪,৫০,০৫৬	১০,০৬৯	৪,৫০,৭০১	২০,০৪৫	৯,০০,৭৫৭

উৎস : জন বিগস, ইন্ডিয়া এ্যান্ড ইউরোপ কমপেয়ারড ঃ বিং এ পপুলার ভিউ অব দি প্রেজেন্ট স্টেট এ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্টাস অব আওয়ার ইস্টার্ন কন্টিনেন্টাল এম্পায়ার (লন্ডন ১৮৭৫), ৯৬।

৪.০ লবণশিল্প

বাংলার চারশ' মাইল দীর্ঘ ও একশ' বিশ মাইল গভীরতাবিশিষ্ট কটক থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলরেখা বরাবর লবণ উৎপন্ন হতো। এই এলাকার মাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

এই যে, তা প্রাকৃতিকভাবেই লবণকণায় পরিপূর্ণ।[১৬৮] এজন্য তা ছিল লবণ উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। এই এলাকায় দু'টি প্রক্রিয়ায় লবণ উৎপাদিত হতো। এর একটি হলো সূর্যালোকে সমুদ্রের জল বাষ্পীকরণ পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণকে কুরকুচ বলা হতো। পুঙ্গা ধরনের লবণ উৎপন্ন হতো সমুদ্রের ঘন লবণাক্ত জল সিদ্ধ করে। এ দু'ধরনের লবণের মধ্যে পুঙ্গা ধরনের লবণ বা সিদ্ধলবণ ছিল ভোক্তাদের অধিকতর প্রিয়। তা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হতো। অন্যদিকে হিন্দু জনগণের কিছু অংশ সূর্যালোকে শুকানো কুরকুচ ধরনের লবণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য শুভ মনে করতো। এই লবণের বাজার ছিল কিছুটা সীমিত।

প্রাচীনকাল থেকেই লবণ রাজস্ব আয়ের একটি উৎস হলেও এ খাতে আয় ছিল কিছুটা সীমিত। মুগল আমলে এর দায়িত্ব একচেটিয়া হিসেবে কোন আনুকূল্যপ্রাপ্তকে বা আনুকূল্যপ্রাপ্তদের দেয়া হতো বা সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হতো। কিন্তু মুগল আমলে একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য না ছিল কোন সামর্থ্য না ছিল কোন সংস্থা। তাছাড়া সরকারকে সারাক্ষণ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কর্মরত চোরাচালানীদের কথা ভাবতে হতো। বোল্টের মতে, নবাব আলিবর্দীর আমলে চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাট টাকায় প্রতি একশ' মণ লবণ বিক্রি হতো।[১৬৯]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইউরোপীয়রা প্রথমবারের মতো লবণ ব্যবসায়ে যোগদান করে। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসার জন্য একটি 'এক্সক্লুসিভ সোসাইটি' বা একচেটিয়া সংস্থা গঠন করে। এর লভ্যাংশ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় যেন সেবছর আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য রহিত করার ফলে কোম্পানির কর্মচারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হয়। ঠিকাদার হিসেবে ক্রয় ও বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোনভাবে সোসাইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবসা না করার জন্য সবাইকে নিষেধ করে দেয়া হয়। অন্য কথায়, এই পদক্ষেপ ছিল ব্যবসা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা। কোম্পানির সরকারকে মূল্যানুসারে শতকরা ৩৫ ভাগ শুল্কআয় বরাদ্দ করা হয়। পরে এটা বৃদ্ধি করে করা হয় ৫০ ভাগ।[১৭০] এই 'এক্সক্লুসিভ সোসাইটি'র অধীনে লবণের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৫ সালে এই সোসাইটি গঠন করার আগে যেখানে প্রতি ১০০ মণ লবণের দাম ছিল ১২৫ টাকা, সোসাইটি গঠন করার পর ১৭৬৬ ও ১৭৬৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ২৪৭ টাকা এবং ২৩১ টাকা।[১৭১] সোসাইটিকে একচেটিয়া ও অভিনব বিবেচনা করে ১৭৬৮ সালের অক্টোবরে কোর্ট অব ডিরেক্টরস এটি বিলুপ্ত করে দেয়।

১৬৮. John William Kaye, *The Administration of the East India Company*, (London 1853), 671

১৬৯. *Midnapore Salt Papers*, Introduction, 2.

১৭০. A. M. Serajuddin, 'The Salt Monopoly of the East India Company's Government in Bengal', *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, XXI: III, 304-05

১৭১. N. K. Singh, *The Economic History*, Vol. 1, 216.

অতঃপর খোলা এবং মুক্ত একটি পদ্ধতি সদ্যবিলুপ্ত সোসাইটির স্থলাভিষিক্ত হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কোম্পানির সরকারকে শতকরা ৩০ ভাগ আবগারি কর প্রদান সাপেক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু এক্সক্লুসিভ সোসাইটির অসাধু আচরণের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে অনেক কম হয়। কারণ তাদের পুরনো মজুত বিক্রির অজুহাতে সোসাইটি বণিকদের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করে। ১৭৬৫ সালে গঠিত হবার পর ছয় বছরের মধ্যে সোসাইটি এত বিপুল পরিমাণ লবণ চোরাচালান করে যে, ১৭৭৩ সালে 'কমিটি অব সিক্রেসি'র হিসাব মতে সরকার মোট ৪০ লক্ষের অধিক টাকার বিক্রয়কর থেকে বঞ্চিত হয়।[১৭২] অধিকন্তু, লবণের ব্যবসা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলেও বাস্তবে এই ব্যবসা কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হয়। মুৎসুদ্দিদের এজেন্সির মাধ্যমে ইউরোপীয়রা লবণ ব্যবসায়ের চুক্তিতে বেনামে সংশ্লিষ্ট থাকা অব্যাহত রাখে।

সরকারের সম্পদবৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস লবণ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা সরাসরি সরকারের হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭৭২ সালে পাঁচ বছর মেয়াদে তিনি ঠিকাদারদের কাছে লবণ উৎপাদনের ইজারা দেন। এতে ঠিকাদাররা একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে সব উৎপাদিত লবণ কোম্পানির কর্মকর্তাদেরকে সরবরাহ করবে এবং তারা তা সরবরাহ করবে লবণ বণিকদের কাছে। লবণ ব্যবসায়ীরা আগেভাগেই ঠিকাদারদের অগ্রিম অর্থ প্রদান এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্মত হয়। লবণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার ঠিকাদারদের উপর ন্যস্ত করে ১৭৭৭ সালের জুলাইতে এই ব্যবস্থা সংশোধন করা হয়। কিন্তু এ সংস্কার আদৌ সফল হয় নি। স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতির প্রচলন ছিল। সর্বোত্তম লবণখামারগুলি তারা বেনামি লেনদেনের মাধ্যমে নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রাখতো। এভাবে তারা সরকারকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে। তারপরও করমন্ডল উপকূল ও মারাঠা অধ্যুষিত জেলাগুলি থেকে সস্তাদরের লবণের বিরাট চালান আসার ফলে কোম্পানির বিক্রয়কেন্দ্রে বাংলার উৎপাদিত লবণের দাম পড়ে যায়।[১৭৩]

১৭২. *Parliamentary Report* of the Commons on Salt in British India, 1856, উদ্ধৃত *Midnapore Salt Papers*, Introduction. 4.

১৭৩. The Coromandel salt was of *kurkutch* variety and was, therefore, much cheaper than the *pungah* variety manufactured in Bengal. "Madras salt is inferior, and sells at a much lower price though a much higher price is given by the Company than for their own.' (*Report from the Select Committee of the House of Lords,1830,* p. 413). It was even proposed that the Coromandel salt might undergo a process of purification at Calcutta which would adopt it perfectly to the Bengal market (*Midnapore Salt Papers*, Introduction. 8) The coast salt was imported in the interest of British ship owners. In 1775, no less than 11, 33,686 Mds. of Madras and Orissa salt was imported which led to a loss in the Company s sales. The government imposed a duty of Rs. 30 per 100 mds. on salt imported in country boats but salt imported in boats of European construction and navigated by Europeans was not affected

একথা বলা যায় যে, ১৭৮০ সাল পর্যন্ত লবণের উৎপাদন ছিল ব্যবসায়ী মহলের ব্যবস্থাপনাধীন এবং তারা 'মালঙ্গি'দের (লবণ শ্রমিক) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতো ও তাদের অগ্রিম প্রদান করতো। কোম্পানিসরকারের আগে এই ব্যবসায়ের মুনাফা যেতো স্থানীয়দের হাতে। কিন্তু বাংলায় বৃটিশদের ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, ইংরেজরা শীঘ্রই এই ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লবণের কোন ব্যবসায়ে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা এই ব্যবসায়ে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে। "যদিও লবণ ব্যবসায়ের এই দিকটি (উৎপাদনের দিক) ১৭৮১ সালের এজেন্সি সিস্টেম চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয়দের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তথাপি ইংরেজ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের স্বার্থ ছিল ব্যাপক। তারা সরাসরি চুক্তিতে আবদ্ধ না হলেও স্থানীয়দের নামে চুক্তিতে আবদ্ধ হতো।"[১৭৪]

১৭৮১ সালে সরকার ইজারাব্যবস্থা রহিত করে এজেন্সিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে লবণরাজস্ব প্রশাসনে একটি পরিবর্তন আনয়ন করে। এ. এম. সিরাজুদ্দীন যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, "এই ব্যবস্থায় অভিনবত্ব কিছু ছিল না। সরকারের প্রয়োজন ছিল রাজস্ববৃদ্ধির এবং এরই ব্যবস্থা করা হয়েছে এই সংস্কারের মাধ্যমে। বিপুল সংস্থাপন ব্যবস্থাই এই সংস্কারের নতুন দিক।"[১৭৫] এই পরিকল্পনার অধীনে এদেশের লবণ উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ছয়টি এজেন্সির মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। এগুলি হলো 'হিজলি', 'তামলুক', 'চব্বিশ পরগনা', 'রায় মঙ্গল', 'ভুলুয়া' এবং 'চট্টগ্রাম'। এগুলির তত্ত্বাবধানে থাকবে কোম্পানির এজেন্ট, যারা উৎপাদকদের দাদন প্রদান করবে। বছরে কি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হবে এবং নগদ টাকায় কি মূল্যে তা বিক্রয় করা হবে তা প্রত্যেকবার মৌসুমের শুরুতে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত এবং প্রকাশিত হবে। এভাবে যে লবণ উৎপন্ন হতো তার একাংশ বিভিন্ন এজেন্সিতে অবস্থিত সরকারের গোলায় মজুত করা হতো, একাংশ পাঠানো হতো কলকাতার সন্নিকটে অবস্থিত সুলকিয়াস্থ কোম্পানির গুদামে। অনির্ধারিত পরিমাণে লবণ নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করা হতো। লবণের উৎপাদনমূল্য ও ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত পাইকারিমূল্যের মধ্যে যে তারতম্য তা-ই ছিল লবণ থেকে আদায়কৃত শুল্ক। সরকার এভাবে শুধু লবণ উৎপাদনের উপরই নয়, লবণ বিক্রির উপরও সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার পর সরকারি খাত ছাড়া অন্য খাতে লবণ আমদানি বন্ধ হয়ে যায়।

লবণের মতো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে হেস্টিংস যতো বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব ততোটাই আদায় করেছিলেন। সে হিসেবে হেস্টিংসের লবণরাজস্ব প্রশাসন

১৭৪. M Huq, *Bengal*, 25.

১৭৫. A. M. Serajuddin, 'The Collapse of the Salt Industry of Bengal in the 19th Century', in the *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, XXIX 1: 1984, 21.

বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে বলে মনে হয়। আগের ৮,৪২৭ প্যাউন্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে নতুন ব্যবস্থার প্রথম বছরে (১৭৮১-৮২) ৩,২১,৯১২ পাউন্ড রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৮২-৮৩ এবং ১৭৮৩-৮৪ সালে লবণরাজস্ব থেকে আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ৬,০৫,৬৪৬ এবং ৬,০৩,০৭৬ পাউন্ড। ১৭৮৬-৮৭ থেকে ১৭৯১-৯২ সাল পর্যন্ত (উভয় বছর হিসাবে ধরে) ছয় বছরে রাজস্বের গড় হলো ৯,৩৫,৩১৯ পাউন্ড।[১৭৬] ১৭৯৩ সালে বোর্ড অব ট্রেড গঠনের ফলে লবণরাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার আরো অনেক উন্নতি হয়। ১৮১০ থেকে ১৮১২ সালে লবণ বিক্রি থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হয় তা হলো ১৩,৬০,১৮০ পাঃ।[১৭৭] পরবর্তী বছরগুলিতে রাজস্ব আরো বৃদ্ধি পায়। সারণি ৪.২-তে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হবার পর লবণ থেকে কোম্পানির আয় এত বিপুল পরিমাণে

সারণি ৪.১ : ১৭৬৬-১৭৮৪ সালে লবণ থেকে কোম্পানির রাজস্ব আয় (পাউন্ডে)

সন	প্রাপ্ত টাকার অংক	সন	প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক
১৭৬৬-৬৭	১,১৮৯২৬	১৭৭৫-৭৬	১,৪৭৩ (-)
১৭৬৭-৬৮	১,১৪,২১৮	১৭৭৬-৭৭	১,৩৯,০১২
১৭৬৮-৬৯	চিহ্নিত করা হয়নি	১৭৭৭-৭৮	৫৪,১৬০
১৭৬৯-৭০	১৬,৯০৭	১৭৭৮-৭৯	৬৩,৬৯৭
১৭৭০-৭১	৭০,৯১৪	১৭৭৯-৮০	৩২,২৮৭
১৭৭১-৭২	৬১,৬৬৩	১৭৮০-৮১	৮,৪২৭
১৭৭২-৭৩	৪৫,০২৭	১৭৮১-৮২	৩,২১,৯১২
১৭৭৩-৭৪	২,২৯,১৯২	১৭৮২-৮৩	৬,০৫,৬৪৬
১৭৭৪-৭৫	১,৩০,২৬৩	১৭৮৩-৪	৬,০৩,০৭৬

উৎস : মজহারুল হক, *দি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিজ ল্যান্ড পলিসি এন্ড কমার্স ইন বেঙ্গল. ১৬৯৮-১৭৮৪,* (ঢাকা ১৯৬৪), ২৫৩।

বেড়ে যায় যে, তা কোম্পানির রাজস্বআয়ের দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হয়। এভাবে লবণরাজস্বের অবস্থান হয় ঠিক ভূমিরাজস্বের পরেই এবং এর পরিমাণ দাঁড়ায় বাংলা থেকে সর্বমোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ।[১৭৮] অতি সুসংগঠিতভাবে

১৭৬. P. Ray. *"History of Taxation of Salt under the Rule of the East India Company", The Calcutta Review,* January 1930, 38

১৭৭. *Midnapore Salt Papers,* Introduction, 5-6

১৭৮. A M Serajuddin, "Salt Monopoly", 308.

লবণসম্পদ আহরণের ফলে লবণ খাতে রাজস্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০৩ সালে উড়িষ্যাতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের দুই দশকের মধ্যে তা ভূমিরাজস্বকেও অতিক্রম করে যায়।

সারণি ৪.২ : ১৮২২-২৭, ১৮৩৯-৫০ সালে বাংলায় লবণ থেকে প্রাপ্ত মোট রাজস্ব (টাকায়)

সন	প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক	সন	প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক
১৮২২	২,০৪,৭৫,৪১২	১৮৪২-৪৩	১,৬৪,৩৩,৪১২
১৮২৩	১,৯০,৩৯,৫১৪	১৮৪৩-৪৪	১,৫৫,৭৮,০১০
১৮২৪	১,৮১,৯১,৩০১	১৮৪৪-৪৫	১,৬০,৪২,৭৩০
১৮২৫	১,৮৪,৪৩,৬৯৮	১৮৪৫-৪৬	১,৪৯,০৯,০২১
১৮২৬	১,৮৭,৩৫,৭৩৩	১৮৪৬-৪৭	১,৬২,৭৯,৭২৫
১৮২৭	২,০৫,৩৬,৮৭২	১৮৪৭-৪৮	১,৬৫,৮৩,৬৬৪
১৮৩৯-৪০	১,৬১,৯৪,১৮৮	১৮৪৮-৪৯	১,৪১,৪৪,৩২১
১৮৪০-৪১	১,৬৩,৮০,০৮৪	১৮৪৯-৫০	১,৬১,০৭,৩৮৪
১৮৪১-৪২	১,৫৭,৫০,৯৬৭		

উৎস : এ. ত্রিপাঠি, *ট্রেড এন্ড ফাইনান্স*, ২৬০; জন কেই, প্রাগুক্ত, ৬৭০।

লবণ থেকে সরকারের বাৎসরিক ১,০০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ পাউন্ড রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা বহুগুণ ছাড়িয়ে যায়।[১৭৯] এটা নিশ্চিতভাবেই অল্প শুল্কহারে আরো অধিক বিপণন সম্ভব করে, বেশি মুনাফা অর্জন সম্পর্কিত বোর্ডের যে বিঘোষিত নীতি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। একমণ লবণ উৎপাদনের মূল্য যেখানে এক টাকার অর্ধেক এবং সবচেয়ে উত্তরের জেলাগুলিতে ১২ বা ১৪ আনা, সেখানে বিক্রয়মূল্য ছিল উৎপাদনমূল্যের শতকরা ৬০০ থেকে ৮০০ ভাগ বেশি।[১৮০] অবস্থা যে এমন ছিল তা সহজেই সরকারি নিলামে (সারণি ৪.৩) প্রতি একশ' মণ লবণের গড় মূল্য থেকে বোঝা যায়। অত্যন্ত চড়া এই বিক্রয়মূল্যের জন্য দায়ী ছিল মূলত একটি নির্দিষ্ট হারে আবগারি আরোপের নীতি। আবগারির এই হার ছিল প্রতিমণ লবণের জন্য তিন টাকা চার আনা। এরকম উচ্চ আবগারি কর আরোপের ফলে বছরে গড়ে লবণের দাম একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করার আগে যা ছিল তার চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।[১৮১]

১৭৯. *Midnapore Salt Papers*, Introduction , 6.

১৮০. *Report of the Select Committee of the House of Lords*, 1830, 42 .

১৮১. ঐ, 217.

সরকারের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে অবশ্য লবণের উপর এভাবে উচ্চহারে শুল্ক আরোপ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সরকারের মতে, লবণের উপর আরোপিত শুল্কই হচ্ছে রাষ্ট্রের অর্থখাতে জনগণের একমাত্র অবদান। "যেখানে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষ ধানক্ষেতের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে, কৃষকের কটিতে থাকে শুধু একটি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড এবং তাদের গৃহস্থালির দ্রব্য বলতে থাকে কয়েকটি হাঁড়ি, সেখানে অর্থনৈতিক কলাকৌশল ও বিচার-বিবেচনা দেখানোর মতো বিস্তৃত ক্ষেত্র নেই। পঞ্চাশটি পৃথক পথে ইংরেজ শুল্ক আদায়কারীরা গরিব মানুষদেরকে করের জন্য পাকড়াও করতে পারতো। কিন্তু ভারতে দিনমজুরদের পর্ণকুটিরের দিকে যাবার পথ ছিল অল্প কয়েকটি এবং শুল্ক সংগ্রাহককে সেসব পথেই অগ্রসর হতে হবে অথবা একেবারেই করের পথ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।"[১৮২]

সারণি ৪.৩ : ১৭৯০-১৮২৭ সাল পর্যন্ত (বিভিন্ন বছরে) নিলামে প্রতি ১০০ মণ লবণের মূল্য (টাকায়)

সন	প্রাপ্ত মূল্য
১৭৯০	২৩৪ এবং ৩১৪-এর মধ্যে
১৭৯৬-৯৭	৩০৮(গড়ে)
১৭৯৮	৩০৬ এবং ৩৮০ এর মধ্যে
১৮০৩-১৮০৪	৩৪২ (গড়ে)
১৮২২	৪১৮
১৮২৫	৩৯০
১৮২৬	৪১৯
১৮২৭	৪১৫

উৎস : *মিদনাপুর সল্ট পেপারস*, ৬; এ, ত্রিপাঠী, *ট্রেড এন্ড ফাইনান্স*, ২৬০,

তারা সাধারণ লোকের উপর লবণশুল্ককে বোঝা বলেও মনে করে নি। হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রতিটি ভোক্তা লবণের জন্য গড়ে বছরে ১২ আনা প্রদান করে। প্রতি মাসে একজন মজুরের পারিশ্রমিক তিন টাকা ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, কলকাতায় সারা বছরের জন্য একজন শ্রমিকের লবণ বাবদ খরচ হবে পাঁচ দিনের পারিশ্রমিক। শাসক শ্রেণীর মতে, এভাবে বিচার করলে "শ্রমের উপর লবণশুল্কের চাপকে কোনমতেই কঠোর বলে অভিহিত করা যাবে না।"[১৮৩] এই শুল্কের ক্ষেত্রে আরেকটি সুবিধা ছিল এই

১৮২. J. W. Kaye, *The Administration of the East India Company* (London 1853), 142-43.

১৮৩. ঐ, 668.

যে, শুল্ক কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই শুল্ক আরোপ করা যেতো এবং তা আদায় করাও সুবিধাজনক ছিল।

শুল্কমুক্ত লবণ ব্যবসায়ের বিরোধীরা, লোকহিতৈষীরা, সংবাদপত্র ও জনগণ শুল্কারোপকে এই বলে আক্রমণ করে যে, এই শুল্ক অনুপাতহীন, অন্যায় এবং কুৎসিতভাবে নিষ্ঠুর। তারা দেখিয়ে দেয় যে, এই শুল্ক মোটেও হালকা নয়, বরং তা ছিল জনগণের উপর একটি দুঃসহ বোঝা। লবণের পাইকারি ক্রেতারা একটা কৌশল অবলম্বন করে। তারা সব লবণ না উঠিয়ে সরকারি গুদাম ঘরে একটা অংশ রেখে আসতো এবং বাজারে কম সরবরাহের সুযোগে সর্বাধিক মুনাফা লুটে নিত। এ ধরনের মজুতদারির ফলে লবণের খুচরা মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে লবণের গড় ব্যবহার যায় কমে। বোর্ড তাদের নিজেদের বেলায় 'দ্বিতীয় একচেটিয়া অধিকারীর' অস্তিত্ব অস্বীকার করলো বটে, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে যে, তাদের হিসাব ছিল সম্পূর্ণ ভুল। ১৮৩৬-৩৭ সালে নির্ধারিত মূল্য এবং উন্মুক্ত গুদামঘরের নতুন ব্যবস্থা চালু হলে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে লবণের উপর কর ক্রমশ কমিয়ে প্রতিমণে ২ টাকা ৮ আনায় নামিয়ে আনা হলে ১৮৪০-এর দশকে লবণের ব্যবহার শতকরা প্রায় ২৪ ভাগের মতো বেড়ে যায়।[১৮৪]

বোর্ড কর্তৃক লবণ সংক্রান্ত বিষয়টি আনাড়ির মতো পরিচালনার ফলে লবণের দাম এত বেড়ে যায় যে, এর ফলে বহু লোক বাধ্য হয়ে লতাপাতা পুড়িয়ে তার ছাইভস্ম থেকে লবণের বিকল্প বের করে অনেক দূষিত, এমন কি তিক্ত জিনিস ব্যবহার করে। বুকানন, কোলব্রুক এবং পরে রামমোহন রায় এ ব্যাপারে তথ্য প্রদান করেন। মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাংলার যেসব অঞ্চলে লবণাক্ততা বেশি সেসব অঞ্চলে গোপনে লবণের উৎপাদন শুরু হয় এবং তা বন্ধ করার জন্য সরকারকে ব্যাপক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। চড়ামূল্যের ফলে কোম্পানির গুদাম থেকে বের করে আনার পর বিশেষকরে পাইকারি ব্যবসায়ীরা লবণে ভেজাল মেশাতে উৎসাহিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, এদের হাতে "উত্তম, বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যবস্তুটি" হয়ে উঠে আর্বজনার স্তূপ। প্রধানত বালি দিয়ে ভেজালকৃত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ২৫ থেকে ৫০ ভাগ।[১৮৫] সমসাময়িক একজন আক্ষেপ করে বলেন, "যেখানে প্রত্যেক বাজারেই মরিচ, চিনি, মশলা, তরকারির জিনিসপত্র এবং ঔষধ অনন্য বিশুদ্ধতায় ও সস্তায় পাওয়া যায়, সেখানে বিশটি শহর ঘুরেও কোথাও কোম্পানির গুদাম অথবা খাদ্য সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত বিভাগ থেকে যে স্বচ্ছ দানা সরবরাহ করা হয় তার মতো দেখতে এবং তার মতো রঙের লবণ পাওয়া অসম্ভব।"[১৮৬]

১৮৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন Kaye, *East India Company*, 665-66.

১৮৫. A M Serajuddin, "Salt Monopoly", 316.

১৮৬. "Religious Aspects of the Charter Question", *The Calcutta Review*, XIX, (1853), 137.

৪.২ লবণশিল্পের ক্রমাবনতি

লবণশিল্প যে শুধুমাত্র দেশের ভিতর থেকেই সমালোচিত ও আক্রান্ত হয়েছিল তা নয়, এটি প্রতিপক্ষেরও তীব্র আক্রমণের শিকার হয়। এই প্রতিপক্ষের বেশির ভাগই ছিল ইংল্যান্ডের বণিক গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের ব্যবস্থা শুধুমাত্র কালের সঙ্গেই অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, তা ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের সঙ্গেও ছিল সামঞ্জস্যহীন। এই এ্যাক্টের ফলে কোম্পানি ভারতের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং সব ইংরেজ বণিকের জন্য এই উপমহাদেশের বাজারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অধিকন্তু ব্যবসায়ী হিসেবে তারা যদি বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্যসব পণ্য রপ্তানি করতে পারে, তাহলে শুধু লবণের ক্ষেত্রে কেন বিধি-নিষেধ বলবৎ থাকবে? তারা এর মধ্যেও কোন যুক্তি খুঁজে পায় নি যে, যখন বিকল্প উৎস থেকে অধিকতর উন্নতমানের এবং সস্তা লবণ সংগ্রহ করা সম্ভব, তখন সাধারণ মানুষের উপর কেন অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যের বোঝা চাপানো হবে? রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের আওতায় যেসব জেলায় লবণ উৎপন্ন হয়, সেসব জেলায় মালঙ্গিরা যে নির্যাতনমূলক ও অমানবিক ব্যবহারের শিকার সেকথা তুলে ধরতেও তারা পিছপা হয় নি।

উপরের যুক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত মনে হলেও এদের সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে এবং একমাত্র সত্য ছিল না। বস্তুত, ১৮১৭ সালের রেগুলেশন ১১ দ্বারা সরকার থেকে লাইসেন্স নিয়ে তাদের নিজেদের খাতে প্রতিমণ লবণের জন্য ৩ টাকা শুল্ক দিয়ে বাংলায় লবণ আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয়। এর পরের বছরই গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল বিদেশ থেকে লবণ আমদানির উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করেন ও সিদ্ধান্ত নেন যে, আমদানিকারকগণকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিতে হবে যেন দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী লবণ পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। কিন্তু লবণ আমদানির প্রথম পর্যায়গুলিতে বৃটিশ লবণ উৎপাদনকারীদের মনে বরাবরই সন্দেহ ছিল যে, লবণ ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে কোম্পানি হয়তো বাজারে বিপুল পরিমাণ লবণ ছাড়বে এবং এভাবে বিদেশী লবণ আমদানিকারকদের লোকসান ঘটাবে। তা সত্ত্বেও ১৮২০-এর দশকে বিদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ আমদানি করা হয়। ১৮৩২ সালে আমদানি করা হয় দুই লাখ মণ লবণ। এতে মুনাফার পরিমাণ ছিল মণপ্রতি আট আনা। বাংলার বাজারের তৎকালীন অবস্থায় এই মুনাফার হার অন্য যেকোন ব্যবসায়ের মুনাফার হারের চেয়ে ছিল বেশি।[১৮৭]

কিন্তু যেখানে লক্ষ্য ছিল সমগ্র বাংলার লবণের বাজার করায়ত্ত করা, সেখানে উল্লিখিত বৃদ্ধি সামান্যই সান্ত্বনার কারণ ছিল। বিশেষত ইংল্যান্ড তখন বিপুল পরিমাণ

১৮৭. S. Choudhury, *Economic History of Colonialism, A Study of British Salt Policy in Orissa* (Delhi 1979), 105-07.

লবণ সরবরাহে সমর্থ ছিল। তার কারণ, ১৮২৫ সালে ইংল্যান্ডে লবণশুল্ক রহিত করার ফলে সেখানে লবণশিল্প বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়। এজন্য বৃটেনের লবণ উৎপাদনকারীরা বাংলায় লবণের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল, যেমন জাহাজে মাল বোঝাইকারী ও বয়নশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই আন্দোলনের ফলে হাউজ অব কমন্সের একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, যার চেয়ারম্যান হন জর্জ উইলব্রাহাম। কমিটির দায়িত্ব হলো বৃটিশভারতে লবণ সরবরাহের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। কমিটি সরকারের একচেটিয়া অধিকারের স্থলে এক্সাইজ এন্ড কাস্টমসের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা সুপারিশ করে। কমিটি অভিমত ব্যক্ত করে যে, উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সরকার রাষ্ট্রের জন্য সরকারি রাজস্বের প্রাপ্য অংশ আদায় করতে সক্ষম হবে। কঠোর প্রকৃতির পরিবর্তন পরিহার করার জন্য কতগুলি অন্তবর্তীকালীন সুপারিশ প্রদান করা হয়। এর প্রথমটি হলো সরকারি গুদাম থেকে সারা বছরই লবণ বিক্রির ব্যবস্থা করা, এমনকি ১০০ মণের সমান স্বল্প পরিমাণে হলেও; দ্বিতীয়টি হলো, লবণের উৎপাদনমূল্যের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট হারের কর আরোপ করে এর বিক্রয়মূল্য ধার্য করা। তৃতীয় সুপারিশ হলো, স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন লবণের উপর কর যে হারে বলবৎ আছে তার সমান হারে কর দেয়ার পর বিদেশী লবণ বিক্রির অনুমতি দেয়া। এছাড়াও কমিটি আরো সুপারিশ করে যে, করের হার গত দশ বছরের সরকারের নীট মুনাফার গড় হারের চেয়ে বেশি যেন না হয়।[১৮৮]

স্থানীয় লবণের উপর শুল্কের হারের সমান হারে আমদানিশুল্ক দিয়ে বাংলায় বিদেশী লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা এ দেশের লবণ উৎপাদন শিল্পের উপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলে। এর ফলে স্থানীয় লবণ উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পায়। বিদেশী লবণের উৎপাদনব্যয় তুলনামূলকভাবে কম এবং এর ফলে তারা বাংলায় উৎপন্ন লবণের বিক্রয়মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে তাদের লবণ বাজারে ছাড়তে পারতো। তাছাড়া গুণেও বিদেশী লবণ অনেক উচ্চমানের। ১৮৪৭ সালে বাংলার সাধারণ লবণের দাম ছিল গড়ে ৯৫ টাকা এবং ৭৫ টাকা। বিপরীতে বৃটেনে তৈরি সাধারণ গুদামজাত লবণের দাম ছিল ৮০ টাকা এবং সাধারণ লবণের দাম ছিল ৫০ টাকা।[১৮৯] ১৮৪৫-৪৬ সালে কমপক্ষে ১৫,৮১,৯৮৬ মণ ও ১৮৫১-৫২ সালে ২৯ লক্ষ মণ বিদেশী লবণ বাংলার বন্দরগুলিতে আনা হয়। পরের চালানটির পরিমাণ সেই বছরের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ব্যবহারের শতকরা ৫৬.৫০ ভাগ ছিল।[১৯০] পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে ২৪ পরগনা এজেন্সি বাতিল করতে এবং চট্টগ্রামে লবণ উৎপাদন স্থগিত রাখতে হয়।

১৮৮. Kaye, *East India Company*, 666

১৮৯. A. M Serajuddin, "Collapse of the Salt Industry," 28.

১৯০. ঐ, S. Choudhury, *Economic History*, 108.

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, মূল্যের তারতম্যের জন্য বাজারে বিদেশী লবণের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলার লবণ প্রতিষ্ঠানের সতর্ক ও উত্তম ব্যবস্থাপনার দ্বারা তখনও এই লবণকে বিদেশী লবণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখা যেতো। লবণ বিভাগটির ছিল একটি ব্যয়বহুল প্রশাসনযন্ত্রের বোঝা এবং এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক সংস্থার মতো পরিচালিত হয় নি। এই বিভাগটিতে নিযুক্ত ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বেতনের হার যে শুধু উচ্চ ছিল তাই নয়, বিভাগটিতে একটি বিশাল প্রতিরোধক বাহিনীও ছিল। এ বাহিনীর কাজ ছিল কটক থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপকূল বরাবর লবণের বেআইনি উৎপাদন বন্ধ করা। এছাড়া এই বিভাগের মূল্য নির্ধারণের নীতিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। দেশীয় লবণের ক্রয়মূল্য অযৌক্তিক ও অহেতুকভাবে বাড়ানো হয়। ১৮৩৪ সালে চার্লস ট্রেভেলিয়ান তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট 'আপন দি ইনল্যান্ড কাস্টমস এন্ড টাউন ডিউটিজ অন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'-তে এই ব্যবস্থার ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলেন, "সরকার এবং জনগণের ব্যয় আরো বেশি পরিমাণে লাঘব করে একই পদ্ধতিতে লবণরাজস্ব সংগ্রহ করা যেতো।"[১৯১] কিন্তু সরকার ব্যয় কমানোর জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, তারা ক্রমশ দেশীয় লবণ উৎপাদন হ্রাস করে আমদানির মাধ্যমে বিদেশী লবণ সরবরাহকে উৎসাহিত করার পক্ষে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৩২ সালে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য সেই পরিকল্পনাটি ইতিমধ্যেই বাৎলিয়ে দিয়েছিল। কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, "আমদানির মাধ্যমে লবণ সরবরাহকে উৎসাহিত করার পন্থা অবলম্বন করা হবে সরকার কর্তৃক লবণ উৎপাদনের বিকল্প।" কিন্তু কমিটি উপদেশ দেয় যে, "দেশী লবণ উৎপাদন এখনই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত অবিচক্ষণতার কাজ হবে।" কাজেই, "আশা করা যায় যে, দেশীয় লবণ উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস করা হবে এবং একাজ ঐসব জেলা থেকেই শুরু করতে হবে যেখানে উৎপাদনব্যয় এবং জীবননাশ হয় সবচেয়ে বেশি। ততোদিন বিপুল পরিমাণ লবণ বিদেশ থেকে সরবরাহ করা হবে, যতোদিন কাস্টমসশুল্কের আওতায় যথেষ্ট লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া নিরাপদ বিবেচিত হবে। এরপর সরকার শুধু ঐসব জেলাতেই লবণ উৎপাদনের অনুমতি দিবেন (যদি এরকম কোন জেলা থাকে), যেখানে লাভজনকভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হবে।"[১৯২] তাই স্বাভাবিকভাবেই, সংস্কার সাধনের দ্বারা লবণ বিভাগকে দক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারের কোন উৎসাহই দেখা যায় নি।

১৯১. Charles E Trevelyan, Report upon the Inland customs and Town Duties of the Bengal Presidency, (ed), T Banerjee, (Calcutta reprint, 1976), 319-20 Therein he elaborated his plan as to how this was possible to raise the entire amount of revenue spending much lesser resources

১৯২. *Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, 1832*, (London 1833), 89.

অবশ্য সরকারকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। লবণ তৈরি ও বিপণনের উপর একচেটিয়া অধিকার রহিত করার জন্য হৈ চৈ করার ফলে ১৮৫৬ সালে জর্জ প্লাউডেনের অধীনে আরো একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। প্লাউডেন কমিটি লবণের একচেটিয়া ব্যবসার স্থলে ক্রমশ এক্সাইজ ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করে। সরকার যখন দেখল যে, তারা শুধু লবণের উৎপাদক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা দেশী লবণ শিল্পের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং এক্ষেত্রে সব রকমের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার একটি চমৎকার সুযোগ পায়। এটা কার্যকর করা হয় ১৮৬৩ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের পরিবর্তে এক্সাইজ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থাধীনে লাইসেন্স ব্যতীত লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয় এবং এ ধরনের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় উড়িষ্যার বালাসোর, কটক ও পুরী এই তিনটি জেলায় ও সাগর দ্বীপে এবং ২৪-পরগনা জেলায়। এই ব্যবস্থাধীনে লবণের উৎপাদন প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে নি। ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৭৫-৭৬ সালে যথাক্রমে মাত্র ৫.৮৫ এবং এবং ৩.২৩ লক্ষ মণ লবণ উপন্ন হয়।[১৯৩] অন্যদিকে ১৮৭৯-৮০ সালে আমদানি পৌঁছে সর্বোচ্চ ৮৬.৫০ লক্ষ মণে। এর বেশিরভাগই আসে গ্রেট বৃটেন থেকে।[১৯৪]

লবণশিল্পের ক্রমাবনতির ফলে সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত হয় মালঙ্গিরা। কারণ, তাদের প্রায় সবাই বংশপরম্পরায় এই পেশায় নিয়োজিত ছিল। শ্রমিকরা লাইসেন্স-প্রাপ্ত লবণের ঠিকাদারদের আওতায় এসে পড়ে এবং এই ঠিকাদারেরা, যারা লবণ উৎপাদন করতো ধার করা মূলধন দিয়ে, তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে অসহায় শ্রমিকদেরকে শোষণ করতো। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মালঙ্গিরা অনেকে এক্সাইজ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের অধীনে কাজ করার চেয়ে অনাহারে থাকাটা শ্রেয়তর মনে করতো। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতে বহু মালঙ্গি চিরতরে হারিয়ে যায়। অন্যান্য অনেকেই বিকল্প কাজের সন্ধানে পরিবার-পরিজনদের পিছনে ফেলে বেরিয়ে পড়ে। এসব পরিবারও সম্ভবত সংস্থানের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শ্রমিকের অভাবে লবণাক্ত অঞ্চলের জমিদারেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা লবণ উৎপাদনের জন্য তাদের জমি দীর্ঘকালের জন্য সরকারকে লীজ দিয়েছিল; যখন তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল, তখন তাদের অনেকেই সরকারের রাজস্ব প্রদানে অপারগ হয়ে পড়লো এবং এভাবেই তারা হয়ে পড়লো নিঃস্ব।

৫.০ চিনিশিল্প

এমন প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে ধারণা করা যায় যে, চিনি উৎপাদনের আদি স্থান ছিল ভারত। উৎপাদনশিল্পের এই শাখাটির সাফল্য এত ব্যাপক ছিল যে, আখের চাষ এবং

১৯৩. *Report on the Administration of Bengal, 1875-76,* (Calcutta 1877), 329.

১৯৪. ঐ, *1879-80,* (Calcutta 1880), 44.

চিনি উৎপাদন পদ্ধতি অধ্যয়ন করার জন্য চীন সম্রাট তাই সুং (৬২৭-৬৫০ খৃঃ) বিহারে একদল চীনা ছাত্র প্রেরণ করেন। মুসলিম শাসনামলেও এই শিল্প সমৃদ্ধির পর্যায়ে ছিল। পনেরো শতকের চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাংলায় চিনির প্রাচুর্য ছিল এবং অন্যান্য দেশে এ অঞ্চল থেকে চিনি রপ্তানি করা হতো। ষোল শতকের শুরুতে এ অঞ্চল ভ্রমণকারী বারবোসা এবং ভার্তেমা উল্লেখ করেছেন যে, বাংলায় উৎপাদিত চিনির গুণগত মান অত্যন্ত উন্নত এবং বহু জাহাজে করে এই চিনি ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো। বারবোসা আরো উল্লেখ করেছেন যে, সেসময় চিনি ছিল বাংলার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য এবং এর আকার ছিল পাউডারের মতো। এই চিনি কাঁচা চামড়ার মোড়কে আবৃত করে পাঠানো হতো। ১৬৬৬ সালে বার্নিয়ার উল্লেখ করেন, "বাংলায় রয়েছে চিনির প্রাচুর্য। গোলকুণ্ডা এবং কর্ণাটকে এই চিনি সরবরাহ করা হয়। এদু'টি স্থানে চিনি মোটেও উৎপন্ন হয় না। মক্কা ও বসরা শহরের উপর দিয়ে এই চিনি যায় আরবে এবং মেসোপটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়ে পারস্যে।"[১৯৫] টেভার্নিয়ারও অনুরূপ বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে চিনির ব্যবসায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সতেরো শতকের মাঝামাঝি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে পরিশোধিত চিনি এবং মিছরির অনিয়মিত বাণিজ্য শুরু করে। ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলার উদ্বৃত্ত চিনি বোম্বে, মাদ্রাজ, মালাবার, সুরাট ও সিন্ধুর মতো ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে রপ্তানি হতো। ভারতের বাইরে এই চিনি রপ্তানি হতো মস্কট, মক্কা, জেদ্দা এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহে। কলকাতা অধিকৃত হবার পূর্ববর্তী সময়ে (১৭৫৬) বাৎসরিক চিনি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ মণ। এ থেকে লাভ হতো প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের মতো এবং তা পরিশোধ করা হতো সাধারণত ধাতব মুদ্রায়। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর থেকে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যে সাধারণ ক্রমাবনতি ঘটে এবং পশ্চিম ভারতের বাজারে জাভায় উৎপাদিত চিনির যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তার ফলে এই লাভজনক ব্যবসায় ভাটা পড়ে।[১৯৬]

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উন্নতমানের আখ উৎপাদনের জন্য গঙ্গা অববাহিকার সুনাম রয়েছে। বৃটিশদের আগমনের পূর্বে সমগ্র উত্তর ভারতে এবং বাংলার গোরখপুর পর্যন্ত, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ বিভাগে গুড় থেকে প্রথম শ্রেণীর সাদা চিনি উৎপন্ন হতো। ১৭৯৩ সালে বেনারসের ভারপ্রাপ্ত রেসিডেন্ট পি, ট্রিভস সব অঞ্চলে, বিশেষকরে জৈনপুর, গাজীপুর, বেনারস ও মির্জাপুর জেলার অংশবিশেষে আখের চাষ দেখতে পান। চার্লস ট্রেভেলিয়ান লিখেন, "বেনারস প্রদেশটি হচ্ছে আমাদের জ্যামাইকা, এটি ভারতের সবচেয়ে বেশি চিনি উৎপাদনকারী জেলা।"[১৯৭] এসব অঞ্চলে আখ ও চিনির উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণ হলো, এ অঞ্চল গঙ্গার সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল, তাই মাটি ছিল

১৯৫. উদ্ধৃত M. Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol IB, (Riyadh 1985), 943.

১৯৬. J. C. Sinha, *Economic Annals,* 36.

১৯৭. Rohinimohan Chaudhuri, *Industries,* 13

উর্বর। উপরন্তু এখানে উৎপন্ন হতো এক প্রকার সরু ধরনের আখ, যা এখানকার জলবায়ুর জন্য ছিল অত্যন্ত উপযোগী। আখ পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত চিনির মূল উৎস হিসেবে বলবৎ থাকলেও, এখান থেকে যে মোটা বাদামি চিনি বা গুড় পাওয়া যেতো তার উৎস ছিল প্রধানত খেজুর গাছ, আখ নয়। বাংলার এই বাদামি গুড় খেজুরের রস থেকে তৈরি করা হতো। খেজুর গাছ প্রধানত যশোর, বর্ধমান, বারাসত এবং নদীয়া জেলায় বেশি দেখা যেতো।

৫.১ ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত চিনিশিল্পের অবস্থা

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে চিনি উৎপন্ন হতো তা প্রধানত ভারতেই ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করতো। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পরও বেনারসের চিনি বাংলা ও বিহারের অন্যান্য অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতে এবং পশ্চিমের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি করা হতো। ১৭৮৭-৮৮ সাল থেকে ১৭৯১-৯২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বেনারসে উৎপন্ন ৪,৭৯,৩৬৩ মণ চিনি বিহার এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করে। এই পরিমাণ হচ্ছে বেনারস থেকে মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ (এ পরিমাণের মধ্যে বাংলা থেকে পুনঃরপ্তানিও ধরা হয়েছে)। ১৭৯১ সাল থেকে বাংলায় উৎপন্ন চিনি পুনরায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে। এই বছরই হাইতি এবং সেন্ট ডোমিঙ্গোতে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ শেতাঙ্গ জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং শ্বেতাঙ্গদের পাইকারিভাবে হত্যা করে। ফলে চিনির সবচেয়ে বেশি উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারী অর্থনীতিটি বিলীন হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে চিনির উচ্চমূল্যের সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার চিনি পুনঃরপ্তানি করতে শুরু করে। ১৭৯১ সালে প্রায় ৪,০৫০ হন্দর চিনি লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে নিলাম হয়। ১৭৯৫ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয় ১৬১,৮২৯ হন্দর।[১৯৮] বিপ্লবী যুদ্ধের সমাপ্তি এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে শুরু করে। সারণি ৫.১ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এসব সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে রপ্তানিপণ্য হিসেবে চিনির গুরুত্ব ছিল না। চিনি রপ্তানির অন্যতম প্রধান বাধা ছিল ইংল্যান্ডে প্রতি হন্দর চিনির উপর আরোপিত ৮ থেকে ২০ শিলিং আমদানিশুল্ক।[১৯৯] অধিকন্তু উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সমুদ্রযাত্রার কারণে জাহাজভাড়া বেড়ে যায়। কিন্তু সেসময় কার্যত চিনিই একমাত্র গুরুভার পণ্য ছিল, যা কোম্পানির হাল্কা পণ্যবাহী জাহাজের জন্য কোন রকম ক্ষতি ছাড়াই স্থৈর্যদায়ক দ্রব্য (ballast) হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারতো। এজন্য কোম্পানি বাংলা থেকে উন্নতমানের চিনি সংগ্রহ অব্যাহত রাখে।

১৯৮. K. P. Mishra, *Benares in Transition, 1738-1795,* (New Delhi 1975), 140, footnote 2.

১৯৯. Shahid Amin, *Sugarcane and Sugar in Gorakhpur: An Inquiry into Peasant Production for Capitalist Enterprise in Colonial India,* (New Delhi 1984), 16.

সারণি ৫.১ : ১৮১৪-১৫ সাল থেকে ১৮১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে পৃথিবীর সব অঞ্চলে এবং যুক্তরাজ্যে রপ্তানি কৃত চিনির মূল্য (সিক্কা টাকায়)

সন	মোট রপ্তানি	যুক্তরাজ্যে রপ্তানি
১৮১৪-১৫	২১,১৪,৬৮৯	৮,৯৪,২৫২
১৮১৫-১৬	২৩,২৩,৯২৭	৮,১৭,৩৫,৭
১৮১৬-১৭	৩৪,১৯,৪১১	১০,৪৩,৭১৩
১৮১৭-১৮	৩৮,৮১,৩৯৭	১২,৪৯,০১২

উৎস : এ. ত্রিপাঠী, *ট্রেড এন্ড ফাইনান্স*, ২৮৮।

চিনি সংগ্রহে আগ্রহী হলেও কোম্পানি যেভাবে আফিম উৎপাদনে নিজেদের নিয়োজিত করে, সেভাবে চিনির চাষাবাদ এবং উৎপাদনে নিজেদের নিয়োজিত করে নি। তারা শুধু এমন ধনবান বণিক, যারা ঋণ পরিশোধে সমর্থ, বিশ্বাসযোগ্য এবং অধিক পরিমাণে চিনি সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল, তাদের কাছ থেকেই সরাসরি বিনিময়যোগ্য ঋণপত্রের মাধ্যমে চিনি ক্রয় করতো। বণিকদের অনুপস্থিতিতে কোম্পানি চিনি উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চিনি ক্রয় করতো। এই উৎপাদনকারীরা কোম্পানি থেকে অগ্রিম নিয়ে নিজেদের কাজ করতো। তাদের পালায় চিনি উৎপাদনকারীরা আখ চাষীদেরকে তাদের প্রাপ্ত অগ্রিম থেকে অগ্রিম দিত এবং বাজারদরের চেয়ে কমদরে কাঁচা চিনি সংগ্রহ করতো। আখের চাষাবাদে এবং চিনি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সরকারের অনীহার জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কিছু কারণের কথা বলা হয়ে থাকে। চিনির উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার মতো সরকারের না ছিল যথেষ্ট অর্থনৈতিক সম্পদ, না ছিল উপযুক্ত প্রশাসনকাঠামো। আফিমের তুলনায় চিনির উৎপাদন ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। অধিকন্তু চিনির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার যেকোন প্রচেষ্টা বা দেশীয় বণিকদের স্থানচ্যুত করার যেকোন প্রয়াস হয় অত্যন্ত কঠিন হতো, নয়তো চেষ্টা করলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারতো; কারণ অপরিশোধিত চিনির অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল ব্যাপক, আফিমের মতো এত সীমিত নয়। আফিম উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিদেশে রপ্তানি করা। এছাড়া উদ্বৃত্ত সব চিনি ক্রয় করার মতো যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতা কোম্পানির ছিল না। অধিকন্তু ইউরোপে রপ্তানিপণ্য হিসেবে ভারতীয় চিনি শুধু মাঝে মাঝেই প্রয়োজনীয় ছিল। এই চিনিকে ইউরোপীয় বাজারে পশ্চিম ভারত, চীন এবং জাভার চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হতো। আখচাষে এবং চিনি উৎপাদনে জড়িত না হলেও ইক্ষু মাড়াইকারীদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব পুরোপুরিই বহাল ছিল। "আগামগ্রহীতা উৎপাদককে শুধু চিনি দিয়েই তার গৃহীত অগ্রিম পরিশোধ করতে হতো না, তার কারখানায় উৎপন্ন সব চিনি আড়ংয়ে সরবরাহও করতে হতো।"[২০০] অধিকন্তু

২০০. Shahid Amin, ঐ, 17.

চিনি উৎপাদনকারীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কোম্পানি শুধুমাত্র সর্বোত্তম চিনি গ্রহণ করার নিশ্চয়তা দিত। সেই সর্বোত্তম চিনি না পেলে চিনি উৎপাদকারীদেরকে কুঠির কাছে দায়বদ্ধ রাখা হতো।

১৮১৩ সালে প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের কাছে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা উন্মুক্ত করা এবং ১৮২০-এর দশকে মধ্য ভারতে শান্তি স্থাপনের পর চিনির চাহিদাবৃদ্ধি বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনার জন্ম দেয়। প্রথমত, এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়। বেনারসে প্রেরিত প্রথম বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট জন লয়েড ১৭৮৯ সালে তাঁর নিয়োগকর্তাদের কাছে লিখেন যে, গাজীপুর জেলায় প্রতিবছর যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তা হিসাব করলে প্রায় ৩০,০০০ মণ হয় এবং তাঁর বর্ণনায় এই চিনির দাম দাঁড়ায় ১,৮০,০০০ টাকা। তিনি আরো জানান যে, ১৮৩১-৩২ সালে একই জেলায় যে পরিমাণ চিনির উপর কর দিতে হয় তা হলো ২,৬১,১৩৩ মণ এবং এর মূল্য ২০,৭৩,৮৬৮ টাকা।[২০১] আঠারো শতকের প্রথমদিকে গাজীপুর বেনারস কোম্পানির চিনির চাহিদার বেশিরভাগ সরবরাহ করতো। ১৮২০-এর দশকে এই দু'টি জেলা ছাড়া আজমগড়ও বিপুল পরিমাণ চিনি উৎপন্ন করে। ১৮৩০-এর দশকের শেষেরদিকে আজমগড় ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিনি উৎপাদনকারী জেলায় পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, অবাধ বাণিজ্যের ফলে স্থানীয় বাজারের উপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। চিনি ক্রয়ের জন্য বেনারসে প্রধান প্রধান এজেন্সি হাউজগুলির গোমস্তা ছিল। এই পণ্যের জন্য প্রতিযোগিতা এত তীব্র ছিল যে, স্বয়ং কোম্পানির প্রতিনিধিকেও উচ্চমূল্যে চিনি ক্রয় করতে হতো। কোম্পানির স্বার্থের উপর এটি ছিল একটি হতবুদ্ধি করে দেয়ার মতো আঘাত। কারণ আড়ং-এ দাম কম থাকলেই শুধু কোম্পানি ব্যবসা করতে পারতো। কিন্তু দাম কম থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বড় বড় প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা তাদের স্টক ধরে রেখে এবং বাজারদরের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চিনির দাম নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। "অগ্রিম প্রদান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল আগে থেকেই চিনি উৎপাদনকারীদের দায়বদ্ধ করে তাদের কাছ থেকে বাজারদরের চেয়ে মণপ্রতি আট আনা কম দামে কোম্পানির প্রতিনিধিকে চিনি ক্রয় করতে সক্ষম করা। কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীরা কোম্পানিকে চালে হারিয়ে দেয়। তারা বাজারদরকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, প্রতিমণ চিনির দাম আসল দামের চেয়ে আট আনা বেশি প্রতীয়মান হয়। নিজের চিনি সংগ্রহ নীতিতে কোম্পানি নিজেই কুপোকাত হয়।[২০২] তৃতীয়ত, এজেন্সি হাউজগুলি ও কোম্পানির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ১৮২৪ সালে এর দাম শতকরা ২৯ ভাগ বেড়ে যায়। ১৮২৪-২৫ সালে বেনারসের বাণিজ্য প্রতিনিধিকে কোম্পানির খাতে ইতিপূর্বেকার

২০১. C. E. Trevelyan, *Report upon the Inland Customs,* 111.

২০২. Shahid Amin, *Sugarcane,* 20-21.

২,৫০০ মণের পরিবর্তে ৪,০০০ মণ চিনি ক্রয়ের নির্দেশ দেয়া হয়। ১৮২৮ সালে এই পরিমাণ বাড়িয়ে ৬,০০০ মণে উন্নীত করা হয়। এর ফলে বাংলার চিনির দাম কোম্পানির আগের বছরের চিনিতে বিনিয়োগের খরচের চেয়েও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বেড়ে যায়।[২০৩] ১৮৩০ সাল পর্যন্ত কোম্পানি ৬,০০০ মণ করে চিনির ফরমায়েশ দিয়ে চলে। কিন্তু এরপর শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ সালে কোম্পানিকে বাণিজ্যের এ শাখা গুটিয়ে ফেলতে হয়। কারণ লন্ডনে এ সময় চিনির দাম কমে যায়। দাম কমা শুরু হয় ১৮২৯ সাল থেকে। কিন্তু লন্ডনে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে কোম্পানিকে এই বিনিয়োগ বলবৎ রাখতে হয়। দেশের কোষাগারের উপর সাধারণ যে চাপ ছিল তা কমানোর জন্য এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।[২০৪] কিন্তু যেসব প্রাইভেট ব্যবসায়ী ভারতের সঙ্গে কোম্পানির চেয়ে বেশি লাভজনক হারে বৃটিশদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, ইংল্যান্ডে বাণিজ্যের মন্দা সত্ত্বেও তারা তাদের বিনিয়োগ অব্যাহত রাখে। ইংল্যান্ডে এই মন্দা ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৫.২ ১৮৩৬-১৯০০ সাল পর্যন্ত চিনিশিল্পের অবস্থা : বিদেশে রপ্তানি

আগের অংশে আমরা দেখেছি কিভাবে কার্যকর চাহিদার প্রভাবে ভারতীয় চিনিশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। বাস্তবে এই শিল্পের যে অবস্থা ছিল, তার চেয়েও দ্রুত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বৃটেনে ভারতের চিনি রপ্তানি বৃটিশ সরকার কর্তৃক পশ্চিম ভারতীয় চিনির প্রতি অধিকতর আনুকূল্য দেখানোর ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় চিনির প্রতিহন্দর ওজনের জন্য যেখানে ৩৭ শিলিং শুল্ক দিতে হতো, সেখানে পশ্চিম ভারতীয় চিনির জন্য দিতে হতো মাত্র ২৭ শিলিং। এভাবে ভারতীয় চিনির উপর সর্বমোট যে পরিমাণ কর আরোপিত হতো, তা জর্জ টাকার নামের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রলোকের মতে প্রাথমিক মূল্যের চেয়েও প্রায় শতকরা ২০০ ভাগ বেশি। এই অবিবেচনা আরো প্রকটভাবে প্রকাশ পায় যখন ভারতে উৎপাদিত এক প্রকার চিনির (চিটাগুড়ের) উপর আরো ৫ শিলিং কর আরোপ করা হয়। এছাড়াও বৃটেন থেকে পুনঃরপ্তানি হলে পশ্চিম ভারতীয় প্রতিটন চিনির জন্য প্রতিহন্দর ওজনে ৩ শিলিং করে ভর্তুকিও প্রদান করা হয়। এই অসম কর আরোপ করা না হলে পশ্চিম ভারতীয় বণিকরা একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতো না।[২০৫]

অনেক ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টের মতে, পশ্চিম ভারতীয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই দুই দল উৎপাদনকারীর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল 'সাধারণ বিচারের' পরিপন্থী

২০৩. S. B Singh, *European Agency Houses in Bengal, 1783-1833,* (Calcutta 1966), 126.

২০৪. ঐ, 127-28.

২০৫. C. H. Philips, *East India Company,* 250.

এবং 'পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ'। সিভিল সার্ভেন্টদের কথা বাদ দিলেও রিকার্ডো, ম্যাককুলক এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো অর্থনীতিবিদরাও প্রবলভাবে এই নীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। *Parliamentary History and Review* শীর্ষক নিবন্ধে মিল পশ্চিম ভারতীয় চিনির প্রতি যে আনুকূল্য প্রদর্শিত হচ্ছিল তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেন। মিল যুক্তি দেখান যে, "যদি কর সমান করা হয়, তাহলে করারোপিত পণ্যগুলি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে কম দামে পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায়, তাহলে এই বৈষম্যমূলক শুল্ক ইংল্যান্ডের জনগণের উপর করের সমতুল্য, এবং এর উদ্দেশ্য হলো লোকসানমুখী একটি ব্যবসা চালিয়ে যেতে পশ্চিম ভারতীয়দের সহায়তা করা। যদি পাওয়া না যায়, তাহলে এই করের লক্ষ্যই হলো এরকম কোন বিপদ প্রতিহত করা। একারণে এই কর প্রত্যাহার করা উচিত।"[২০৬] কোম্পানির চেয়ারম্যান উইগ্রামের নেতৃত্বে পূর্ব ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও বেশ সক্রিয় ছিল এবং তারা ১৮২২ সালে পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতীয় চিনির উপর আরোপিত করের সমতা আনার চেষ্টা করে। বিষয়টি নিয়ে পর পর কয়েকবার জেনারেল কোর্ট মিটিংয়ে পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এসব মিটিংয়ে এই সাধারণ মত ব্যক্ত করা হয় যে, "সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশগুলিকে অযৌক্তিক আনুকূল্য দিয়ে ভারতকে ধ্বংস করা।"[২০৭] স্যার চার্লস ফোর্বস নামে একজন প্রাইভেট ব্যবসায়ী এরকম প্রস্তাব করেন যে, কোম্পানির সকল পরিচালককে হাউজ অব কমন্সে আসন দেয়া হোক এবং এর ফলে হয়তো তাদের আর্জি আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। ১৮২৩ সালে কোম্পানি পার্লামেন্টের একটি সিলেক্ট কমিটি গঠনের দাবি করে। কিন্তু তাদের দাবি ৩৪ থেকে ১২৭ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নাকচ হয়ে যায়। করের সমতা কামনা করে পরবর্তীতে বোর্ড অব ট্রেডের কাছে অনেক আবেদন পেশ করা হয়। কিন্তু বোর্ডের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হাসকিসন ভারতীয় চিনির উপর কর লাঘব করতে ক্ষমতাশালী পশ্চিম ভারতীয় চিনির স্বার্থরক্ষাকারী মহলকে রাজি করাতে পারেন নি। অবশেষে ১৮৩৬ সালে বিজয় আসে। এসময় পার্লামেন্ট এই মর্মে একটি আইন পাশ করে যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিনি আমদানির অনুরূপ শর্তে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে চিনি আনা যাবে। এর অর্থ হলো, উভয় দেশের চিনির প্রতিহন্দর ওজনের জন্য কর দিতে হবে ২৪ শিলিং।[২০৮] কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় রামের উপর করের কোন পরিবর্তন করা হয় নি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এসময়ে ইংল্যান্ডে আমদানির পর প্রতি গ্যালন ভারতীয় রামের জন্য শুল্ক দিতে হতো ১৫ শিলিং এবং এর বিপরীতে প্রতি গ্যালন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রামের জন্য

২০৬. দেখুন, S. Ambirajan. *Classical Political Economy*, 191.

২০৭. C. H. Philips, *East India Company*, 250.

২০৮. Evidence of J. C. Melville before the Select Committee of the House of Commons, 1840, উদ্ধৃত R. Dutt, *Victorian Age*, 100.

দিতে হতো মাত্র ৯ শিলিং, যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রাম ছিল বেশি কড়া। ভারতীয় রাম উৎপাদিত হতো গুড় থেকে। রামের ক্ষেত্রে করের অসমতা চিনি এবং রাম উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর ছিল। এছাড়াও এই অসমতা ভারতের অধিবাসীদের মনে এই তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয় যে, বেশি আনুকূল্যপ্রাপ্ত দেশের স্বার্থের বেদীতে তখনও তাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। ১৮৪০ সালে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে সি. ই. ট্রেভেলিয়ান রামের ক্ষেত্রেও শুল্কের সমতা বিধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, "শুধু একটি ক্ষেত্রে সমতাবিধান করা কৌতুকেরই নামান্তর; সমতাবিধান করতে হলে আখ থেকে যতো প্রকার পণ্য উৎপাদন করা হয় তার সবক'টির উপরই শুল্কহার সমান করতে হবে।[২০৯]

তবুও পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় চিনির উপর করের সমতাবিধান করার ফলে লন্ডনে ভারতীয় চিনির এক বিশাল বাজারের দ্বার খুলে যায় (সারণি ৫.২)। শুল্কের সমতাবিধান ছাড়াও এ সময় ক্যারিবীয় দেশে ক্রীতদাসমুক্তিও ভারতীয় চিনির রপ্তানিবাজারের অনুকূলে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রীতদাসমুক্তির পর পরই বৃটিশ গায়ানার চিনির দাম শতকরা ২৮ ভাগ বেড়ে যায়। ভারতের অনুকূলে আর যে বিষয়টি অবদান রাখে তা হলো "বৃটেনে পণ্য আনার জাহাজভাড়া হ্রাস, বিশেষকরে যেসব জাহাজ নিউ সাউথ ওয়েলসে দেশান্তরীদের রেখে কলকাতা বন্দর হয়ে ফেরত যেতো। একটি ভারতীয় সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত করে স্যার জন ব্যাগশ বলেন, "পূর্ববর্তী কোন সময়েই কোন একটি পণ্যের ব্যবসায়ে এমন বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত বিরল। এই আকস্মিক বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করার মতো ভারতের সম্পদবিকাশের আর কোন নজিরই পাওয়া যায় না।"[২১০]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের আখচাষ সম্প্রসারণের ফলে লন্ডনে ভারতীয় চিনির রপ্তানিবৃদ্ধি সম্ভব হয়। ১৮৩০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৮৪০-এর দশকের শুরুতে ক্যারিবীয় অঞ্চলে চিনির ব্যবসা বিঘ্নিত হলে অনেক ইউরোপীয় আখ চাষবাদকারী ভারতে আগমন করে। পাশাপাশি মরিশাসের অনেক আখচাষীও একই পন্থা অবলম্বন করে। এসব ইউরোপীয় সরাসরি কৃষকদের আগাম প্রদান করে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়োগ করে। এসব কারণেই ভারতের আখ উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৬ সালে গোরখপুরে যেখানে প্রায় ১০,০০০ একর জমিতে আখ উৎপাদন করা হয়, সেখানে ১৮৪৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫০,০০০ একরে।[২১১] আখের চাষাবাদ ছাড়াও এসব ইউরোপীয় বাষ্পশক্তিচালিত ফ্যাক্টরি স্থাপনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে। আখ থেকে সরাসরি চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যে আজিজপুর, মতিহারী, বেলসুন্দ, বরচাকিয়া, গোরখপুর এবং রোসায় ফ্যাক্টরি চালু করা হয়। এসব ফ্যাক্টরির মধ্যে রাম ও চিনি উৎপাদনের জন্য

২০৯. ঐ, 104.

২১০. R. Dutt, *Victorian Age*, 126

২১১. Shahid Amin, *Sugarcane*, 35

প্রখ্যাত রোসা ফ্যাক্টরিটি মেসার্স কেরু এ্যান্ড কোম্পানি কর্তৃক শাহজাহানপুরে স্থাপন করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, ভারতের সেনাবাহিনী যে পরিমাণ রাম পান করতো, তার প্রায় সবটুকুই এক সময়ে এই রোসা ফ্যাক্টরি থেকে সরবরাহ করা হতো। এর মোট পরিমাণ ছিল ৫২,২৫০ গ্যালন।[২১২] গুড় শোধনাগারের উপর ভিত্তি করে বাংলায় অনেক শিল্প চালু করা হয়। এসবের মধ্যে কলকাতার কাছে দুবাহতে অবস্থিত এ্যালবিয়ন ও ব্যালিকল ছিল বৃহত্তম। দুবাহ প্রতি বছর ৭,০০০ টন চিনি উৎপাদন করতে পারতো এবং সে সময়ে এটি ছিল "বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে বেশি সুসজ্জিত চিনি কারখানা"।[২১৩] ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের কারখানার পাশাপাশি চিনি কারখানা নামের দেশীয় শোধনাগারও স্থাপন করা হয়। বিশেষকরে গোরখপুরে এধরনের কারখানা স্থাপন করা হয়, কারণ এখানে জ্বালানির সরবরাহ ছিল প্রচুর এবং ভূমি-খাজনার হার ছিল কম। সেখানকার কারখানার মালিকরা কলকাতার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এজেন্টদের সঙ্গে দেশীয় পদ্ধতিতে পরিশোধিত চিনির জমজমাট ব্যবসা করে যাচ্ছিল।

সারণি ৫.২ : ১৮৩৩-৪৭ সালে কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডে চিনি রপ্তানি

সন	পরিমাণ (টনে)
১৮৩৩-৩৪	১,৫৫৪
১৮৩৪-৩৫	২,৪৩৫
১৮৩৫-৩৬	৭,৫২৫
১৮৩৬-৩৭	১৪,০৩৩
১৮৩৭-৩৮	২২,৯৫৬
১৮৩৮-৩৯	২৭,৪০৩
১৮৩৯-৪০	২৮,৪০১
১৮৪০-৪১	৬৬,০৩১
১৮৪১-৪২	৫৫,৮২৩
১৮৪২-৪৩	৬০,৫০৫
১৮৪৩-৪৪	৫৯,০৯৫
১৮৪৪-৪৫	৫৮,৩৮৫
১৮৪৫-৪৬	৬৭,০০০
১৮৪৬-৪৭	৮০,০২১
১৮৪৭(মে-অক্টোবর)	৩৫,৬০১

উৎস : *পার্লামেন্টারি পেপার,* ১৮৪৭-৪৮, XXIII, পার্ট ১, ২৫,৩২

২১২. W. H. Carey, *John Company,* 413.

২১৩. M. P. Gandhi, *The Indian Sugar Industry,* 5.

চিনির এরকম তেজী ব্যবসা অবশ্য দীর্ঘ সময় বলবৎ থাকে নি। ১৮৪৬ সালে কবডেনিজমের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শুল্কনীতি মুক্তবাণিজ্যের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে ক্রীতদাস কর্তৃক উৎপাদিত চিনি এবং মুক্তশ্রমে উৎপাদিত চিনি সমতার ভিত্তিতে বৃটেনে প্রবেশাধিকার পায়। এর ফলে হঠাৎ করেই লন্ডনের বাজারে চিনির দাম মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় এবং এর সঙ্গে কমে যায় বৃটেনে ভারতীয় চিনির রপ্তানিও। রপ্তানিবাজারের এই সঙ্কোচনের ফলে অনেকগুলি সদ্যস্থাপিত চিনির প্রতিষ্ঠানে ধ্বস নামে এবং এর সাথে ভেঙে যায় অনেক চিনি শিল্পোদ্যোক্তার স্বপ্ন। যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পটিকে পরিচালিত করে চিনির দাম কমাতে পারলেই শুধু ব্যবসাটি টিকিয়ে রাখা যেতো, কিন্তু এটা করতে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এছাড়াও ছিল অন্যান্য নির্বুদ্ধিতা, যেগুলির প্রতি ১৯০১ সালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমিটি মতপ্রকাশ করে :

> তড়িঘড়ি করে ফরমাশ দেয়া বেশিরভাগ চিনিকল-যন্ত্রপাতিই পরে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়; এগুলি ব্যবহার করার জন্য যেসব লোক নিয়োগ করা হয় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। ভেঙে যাওয়া যন্ত্রপাতি মেরামত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না; সে সময়ে কার্যত যোগাযোগ ছিল একমাত্র নদীপথে; দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য যাত্রায় যন্ত্রের অনেক খুচরা অংশ হারিয়ে যায়। সে সময়ে যে ধরনের চিনি উৎপাদিত হতো সে ধরনের চিনির কোন চাহিদা দেশে ছিল না। নৌকাযোগে কলকাতায় পরিবহনকালে পথিমধ্যে চিনি খোয়া যেতো। নৌকার ছিদ্র দিয়ে পানি ঢুকে প্রচুর পরিমাণ চিনির অপচয় ঘটতো এবং প্রায়শই নৌকা ও পণ্য একেবারেই নদীগর্ভে হারিয়ে যেতো। ঐ চিনি বা তার যা-কিছু অবশিষ্ট থাকতো তা শেষ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছতো। একটি দীর্ঘ পথ চলার সময়ে যখন কারখানার চিনি পড়তায় বেশি হতো, তখন এই চিনি নিকটতর অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচে উৎপাদিত চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোন লাভজনক বাজার পেতো না। অধিকন্তু এই শিল্পটি যখন মাত্র শুরু করা হয়, তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া ঘোষিত হয় এবং এতে সমগ্র ভারতের ব্যবসায়ী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। চিনি উৎপাদকগণ দেখে যে, নতুন কোন শিল্পের জন্য তো দূরের কথা, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের জন্যও ঋণ পাওয়া কঠিন। অল্পদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে, নতুন শিল্পের ভিত্তি সঠিক ছিল না এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই নতুন শিল্পের সাফল্যের সম্ভাবনাও ছিল কম।[২১৪]

এসময়ে ইউরোপে বিট থেকে উৎপন্ন চিনিশিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। বেশিরভাগ দেশেই সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পটির প্রসার ঘটে। ১৮৭০ সাল নাগাদ ইউরোপের বিটচিনিশিল্প বিশ্বের মোট চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চিনি প্রতিযোগিতামূলক দামে সরবরাহ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিনি আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শুধু ইংল্যান্ডই শোধনাগারের জন্য ভারত থেকে কাঁচা

২১৪. *Report of the Committee appointed to inquire into the prospects of cultivation of Sugar by Indigo Planters of Bihar,* (Calcutta 1901), Para 19

চিনি (অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোলাই করার জন্য নিম্নমানের চিনি) আমদানি অব্যাহত রাখে (সারণি ৫.৩), কারণ এসময়ে বৃটেনে অনেকগুলি শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে, 'উৎপাদনসহায়ক অনুদান' (Bounty System) ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে বাংলার রপ্তানিবাণিজ্যের একটি প্রধান পণ্যের দ্রুত অবলুপ্তি ঘটে।

সারণি ৫.৩ : ১৮৭২-৭৩ থেকে ১৮৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে বিদেশী বন্দরে চিনি রপ্তানি

সন	মোট রপ্তানি (হন্দর ওজনে)	মূল্য (হাজার টাকায়)	যুক্তরাজ্যে রপ্তানি (হন্দর ওজনে)	মূল্য (হাজার টাকায়)
১৮৭২-৭৩	১৭১	১৮,২৯	১৪৪	১৪,৫৩
১৮৭৩-৭৪	১৩৬	১৩,২৮	১১৫	১০,৩৬
১৮৭৪-৭৫	১০৭	১০,১৪	৮৭	৭,৫৪
১৮৭৫-৭৬	৮৪	৮,১১	৫৮	৪,৭৭
১৮৭৬-৭৭	৬৩৭	৬৮,৫৩	পাওয়া যায় নি	পাওয়া যায় নি

উৎস : *রিপোর্ট অন দি এডমিনিস্ট্রেশন অব বেঙ্গল*, ১৮৭৫-৭৬, (কলকাতা ১৮৭৭), ২২৬; *ঐ*, ১৮৭৬-৭৭, ১৬৬।

৫.৩ চিনির উৎপাদন ও ভুক্তি, ১৯০০-১৯৪৭

নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলার চিনির চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে উঠানামা করলেও বাংলার অভ্যন্তরে চিনির একটি সুনিশ্চিত বাজার ছিল। ব্যবহৃত চিনির মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন। সারা বাংলায় এই অপরিশোধিত চিনি গুড় নামে পরিচিত ছিল। গুড়ের প্রধান উৎস ছিল আখের রস। এই রসকে কোন প্রকার প্রক্রিয়াজাত না করে ঘন করতে করতে কঠিন অবস্থায় আনা হতো। অল্প পরিমাণ ক্ষার বা অন্য কোন শোধন করার উপাদান মেশানো এবং সরানো ছাড়া এই রস পরিশোধনের আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো না। গ্রামের জনসাধারণ এই আকারেই গুড় খেতো। খাদ্য ও পানীয়কে মিষ্টি করার জন্যই যে শুধু গুড় ব্যবহৃত হতো তা নয়, একটি প্রধান আহার্যদ্রব্য হিসেবেও এটা ব্যবহৃত হতো। গুড়ের গন্ধ ও স্বাদ ছিল চমৎকার এবং এই গুড় ছিল খুবই পুষ্টিকর। এজন্যে গ্রামের লোকেরা সাদা চিনির চেয়ে গুড় বেশি পছন্দ করতো। তবে শহরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গুড়ের ব্যবহার হতো। তামাকের সঙ্গে মেশানোর জন্য তামাক ব্যবসায়ীদের কাছেও গুড়ের চাহিদা ছিল প্রচুর। যারা সুরা তৈরি করতো তাদের কাছেও গুড়ের চাহিদা ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তুলনামূলকভাবে গুড় ছিল সস্তা। এসব কারণে বহুল পরিমাণে গুড়ের উৎপাদন এবং ব্যবহার অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকে চিনি তৈরির জন্য

শোধনাগারে খুবই কম গুড় ব্যবহার করা হতো। ১৯২৩-২৪ সাল পর্যন্তও ভারতে মোট উৎপাদিত আখের শতকরা ৭১ ভাগ ব্যবহৃত হতো গুড় তৈরির জন্য এবং শতকরা ৫ ভাগেরও কম ব্যবহৃত হতো ফ্যাক্টরিতে চিনি উৎপাদনের জন্য বা শোধনাগারে গুড়কে চিনিতে রূপান্তরিত করার জন্য।[২১৫] এই বছর ভারতে মাথাপিছু চিনি ও গুড়ের ব্যবহার ছিল ২১.২ পাউন্ড এবং এর মধ্যে গুড়ের পরিমাণ ছিল ১৬.৫ পাউন্ড ও চিনির পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৭ পাউন্ড।[২১৬] আশা করা হয়েছিল যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে চা পানের অভ্যেস বাড়লে, মিষ্টির ব্যবসায়ে গুড়ের পরিবর্তে চিনির ব্যবহার হতে থাকলে এবং চিনিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে গুড়ের ব্যবহার ক্রমশ কমে যাবে। কিন্তু কার্যত তা হয় নি। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে চিনি ও গুড়ের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিসংখ্যানে পূর্ববর্তী ধারণারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এই বছর মাথাপিছু ব্যবহৃত মোট ২৫ পাউন্ড চিনি ও গুড়ের মধ্যে গুড়ের ভাগ ছিল ১৮.৫ পাউন্ড ও চিনির ভাগ ছিল মাত্র ৬.৫ পাউন্ড।[২১৭] দেশের জনগণের বৃহদংশের মধ্যে গুড়ের প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর হওয়ায় গুড়শিল্পের ক্রমোন্নতি হতে থাকে।

প্রাসঙ্গিক উপাত্তের অভাবে অন্তত ১৮৯০-৯১ সালের আগের বছরগুলিতে বাংলায় মোট কি পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হতো তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে উক্ত বছরে ভারতে মোট যতো একর জমিতে আখের চাষ হয়েছে তার মধ্যে ১,১২৬,৭৮১ একর বা শতকরা ৪১ ভাগ জমি ছিল বাংলায়।[২১৮] কিন্তু ১৮৯৮-৯৯ সাল নাগাদ এ প্রদেশের আখচাষের জমির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে কমে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ৩৩.৯৮ ভাগে। ১৯০৮-০৯ সালে এই পরিমাণ আরো কমে দাঁড়ায় শতকরা ২২.৫ ভাগে। ১৯৩২-৩৩ সালে বাংলায় মোট ২,৩৩,০০০ এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে মোট ২,৫৭,০০০ একর জমিতে আখের চাষ হয়। "আখচাষের জমির পরিমাণের হিসেবে ভারতে বাংলার স্থান এখন চতুর্থ। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, বিশ শতকের শুরুতে বাংলার স্থান ছিল দ্বিতীয়।"[২১৯] যশোর জেলার একটি গ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এইচ. ই. এনেট জানান যে, সাধারণত এক বিঘা (এক একরের এক তৃতীয়াংশ) জমি হতে প্রায় ২০ থেকে ৩০ মণ পর্যন্ত গুড় পাওয়া যেতো। কিন্তু অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রতি একরে সচরাচর ৩৭ মণ গুড় উৎপন্ন হতো। এই সূত্র আরো উল্লেখ করে, প্রধানত উন্নত জাতের আখের প্রচলনের পর

২১৫. M. P Gandhi, *Sugar Industry,* Table 12, 55.

২১৬. ঐ, Table 16, 66

২১৭. M. P. Gandhi (edited), *Sugar Industry,* (Bombay 1943), Table 5, XXXVI.

২১৮. Frederick Noel Paton *Notes on Sugar in India,* (Calcutta 1911), 27. From the returns, it appears that Bengal's sugarcane acreage was the largest in British India. It was followed by that of the United Provinces which had 1,104,334 acres under sugarcane in 1890-91.

২১৯. M. P. Gandhi (ed), *Sugar Industry* , 90

থেকে উৎপাদন বেড়ে প্রতি একরে ৫০ মণে দাঁড়িয়েছে। প্রতি একরে যদি ৪০ মণ গুড় এবং উৎপাদিত আখের মোট ৭০ ভাগই গুড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, তাহলে মোটামুটি এই হিসাবে ১৯৩৩-৩৪ সালে আখ থেকে মোট উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৬২,০০০ টন। বলাই বাহুল্য যে, উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকের বছরগুলিতে আখচাষের জমির পরিমাণ বহুলাংশে বেশি থাকার ফলে এর চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হয়েছে।

আখের গুড় উৎপাদন ছাড়াও খেজুরের রস থেকে চিনি উৎপাদনের জন্যও বাংলার খ্যাতি ছিল। নদীয়া জেলার পূর্বাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খেজুর গাছ জন্মানো হতো। খেজুর রস থেকে চিনি তৈরি ছিল যশোর জেলার একটি প্রধান কুটিরশিল্প। ফরিদপুরে খেজুর রস এবং আখের রস এ দু'টি থেকেই চিনি উৎপাদিত হতো। "যশোর জেলায়, নদীয়া জেলার কিছু অংশে, বশিরহাট ও সাতক্ষীরা মহকুমায় এবং ২৪-পরগনায় ব্যাপকভাবে খেজুর গাছের চাষ এবং খেজুর রস থেকে চিনি উৎপাদন করা হয় এবং কিছুটা হয় ফরিদপুরেও। রায়তদের জন্য খেজুর গাছের চাষ ছিল জনপ্রিয় এবং লাভজনক। তারা বাড়ির চারদিকে, ক্ষেতের আলে সারে সারে এবং মাঝে মাঝে বিরাট এলাকা জুড়ে বিশাল উন্মুক্ত বাগানেও এই গাছ রোপণ করে।[২২০] এক বিঘা জমিতে সাধারণত প্রায় ১০০টি গাছ লাগানো হয়। সাত বছরের মধ্যেই গাছগুলি লাভজনক হয়ে উঠে এবং ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত ফলন প্রদান করে। শীতকালে প্রতিটি গাছের রস থেকে প্রায় একমণ অপরিশোধিত চিনি পাওয়া যায়। ১৯৪০-এর দশকের প্রথমদিকে এই শিল্পটি ২৪ পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর এবং ফরিদপুরের মতো জেলাগুলিতে বর্তমান ছিল। এ সময়ে প্রতি বছর মোট প্রায় ১,০০,০০০ টন গুড় উৎপাদিত হয়।[২২১]

উনিশ শতকে বাংলায় উৎপাদিত পরিশোধিত বা অপরিশোধিত চিনির অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ছিল ব্যাপক। এক এলাকার উদ্বৃত্ত চিনি দেশীয় নৌকা, স্টিমার, ট্রেন বা সড়ক পথ দিয়ে ঘাটতি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হতো। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যে তথ্য পাওয়া যায় যদিও তা সম্পূর্ণ নয়, তবুও তা থেকে ১৮৭৬-৭৭ সালের চিনির অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণের এবং মূল্যের নিম্নলিখিত হিসাবটি আমরা পাই[২২২]:

পরিমাণ (মণের হিসাবে)	মূল্য (টাকার হিসাবে)
পরিশোধিত চিনি ১৫,৮৫,০০০	১,৯০,২০,০০০
অপরিশোধিত চিনি ২৯,৬১,০০০	১,১৮,৪৩,০০০

২২০. *Report on the Administration of Bengal, 1876-77,* (Calcutta 1878), 194.

২২১. M. P. Gandhi (ed), *Sugar Industry,* 68, 70.

২২২. *Report on the Administration of Bengal, 1875-76,* (Calcutta 1877), 174.

প্রধানত যশোর, নদীয়া, ২৪-পরগনা ও ফরিদপুর থেকে চিনি রপ্তানি হতো। যশোর ছিল বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিনি উৎপাদনকারী জেলা এবং এই জেলা থেকে মোট ৭,৭৫,০০০ মণ চিনি রপ্তানি করা হতো। নদীয়া জেলা থেকে চিনি রপ্তানির পরিমাণ ২,০০,০০০ মণেরও কম ছিল। ২৪-পরগনা জেলা থেকে ২,৭৫,০০০ মণ অপরিশোধিত এবং ১,৫০,০০০ মণ পরিশোধিত চিনি রপ্তানি করা হয়। আর ফরিদপুর জেলা থেকে রপ্তানি হয় ২,০০,০০০ মণেরও বেশি।[২২৩] এসব জেলা থেকে কলকাতা, বাকেরগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে চিনি রপ্তানি করা হতো। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের মাধ্যমে কলকাতা ২,৭৫,০০০ মণ অপরিশোধিত চিনি, ২৪-পরগনা থেকে যা সরবরাহ করা হতো তার প্রায় সবটুকু এবং যশোর ও নদীয়া থেকে নদীপথে যা রপ্তানি হতো তার বেশিরভাগ আমদানি করতো। যশোর জেলার উত্তরাংশে চাল প্রেরণের বিনিময়ে ঝালকাঠি ও নলছিটি তাদের বিশাল বাজারে যশোর থেকে চিনি আমদানি করতো। যশোর ও ফরিদপুর থেকে সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জও চিনি আমদানি করতো। আখ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে পরিশোধিত চিনির স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য ছোট ছোট শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছিল। নদীয়া জেলার প্রধান চিনি শোধনাগার ছিল শান্তিপুর শহরে। এখানে প্রায় ৩০টি কারখানা ছিল এবং কাজের মৌসুমে এসব কারখানায় প্রায় ৫০০ শ্রমিক কাজ করতো। বনগাঁও ও রানাঘাট মহকুমাতেও শোধনাগার ছিল। যশোরের কোট চাঁদপুর এবং অন্যান্য স্থানেও কারখানা ছিল। ফরিদপুরে পরিশোধনের কাজ চলতো প্রধানত গোয়ালন্দ মহকুমায়। ২৪-পরগনা জেলার সাতক্ষীরা এবং বশিরহাট মহকুমায় প্রায় ২৩০টির মতো শোধনাগার ছিল বলে জানা যায়।

৫.৪ চিনিশিল্পের ক্রমাবনতি

প্রায় ১৮৯০ সাল পর্যন্ত চিনিতে বাংলা মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অধিকন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলা এই পণ্যের একটি প্রধান সরবরাহকারী দেশ ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দশকে তার রপ্তানি বাণিজ্যই যে শুধু শেষ হয়ে গেল তা-ই নয়, দেশের জনগণের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণ চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ১৮৮৪-৮৫ সাল থেকে ১৮৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সমুদ্রপথে কলকাতা বন্দরে যে বিদেশী চিনি আমদানি করা হয় তার গড় হলো ৬,২৬৪ টন পরিশোধিত এবং ৩,২৮৫ টন অপরিশোধিত আখ এবং বীটের চিনি।[২২৪] ১৯০৯-১০ সালে আমদানির পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৩১,১০১ টন পরিশোধিত এবং ৬৮,৯৪৩ টন অপরিশোধিত চিনি।[২২৫] ১৯০০-০১ সালে বাংলা

২২৩. ঐ, *1876-77*, 195.

২২৪. Noel Paton, *Notes on Sugar*, 20-21.

২২৫ ঐ।

প্রদেশে যে চিনি আমদানি করা হয় তার মূল্য দাঁড়ায় ১.৬০ কোটি রুপি। এই অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬.৬৫ কোটি রুপি এবং এটি হলো ১৯১৪-১৫ সাল থেকে ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরের গড় চিনির মূল্য। এই মূল্য আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২১-২২ সাল নাগাদ ১২.৪৪ কোটি রুপিতে দাঁড়ায়।[২২৬] উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, এসময়ে চিনির আমদানি বিপুলভাবে বেড়ে যায়।

বাংলায় আখচাষের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্যই বিদেশ থেকে চিনি আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সময়ে খাদ্যশস্যের দাম বেশ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকেরা আরো খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে। তারা পাটচাষের দিকেও মনোযোগ দেয়। কিন্তু "এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, চিনিও একটি খাদ্যশস্য এবং খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি এটিরও মূল্যবৃদ্ধি না হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টতই এর বিশেষ কোন নিরুৎসাহজনক কারণ রয়েছে"।[২২৭] একরপ্রতি আখের ফলন কম হওয়াটা ঐসব নিরুৎসাহজনক কারণগুলির মধ্যে একটি এবং এর ফলে আখের চাষাবাদ অলাভজনক হয়ে পড়ে। অথচ এর বিপরীতে উন্নত জাতের আখের এবং উন্নততর পদ্ধতির চাষাবাদের প্রচলনের ফলে জাভা ও মরিশাসের কোন কোন অঞ্চলে আখের একরপ্রতি ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতে একরপ্রতি ফলনের পারিমাণ কমই থেকে যায়। নোয়েল ডিয়ারের মতে প্রতি একরে ৬০ টন আখের ফলনকে অত্যন্ত উচ্চফলন হিসেবে অভিহিত কর. যেতে পারে এবং ৪০ টনকে অভিহিত করা যেতে পারে গড়পড়তার চেয়ে বেশি। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালেও ভারতে আখের একরপ্রতি গড় উৎপাদন ছিল মাত্র ১২.৩ টন।[২২৮]

ফলন কম হওয়া ছাড়াও সনাতন পদ্ধতিতে রস নিষ্কাশন এবং আখ ও গুড় উৎপাদনের ফলে যে অপচয় হতো তাও বাংলার চিনিশিল্পের ক্রমাবনতির জন্য যথেষ্ট দায়ী। সাধারণত আখচাষীরাই গুড় উৎপাদন করতো। তারা আখ পেষণ করে রস নিষ্কাশন এবং পরে রস সিদ্ধ করার ক্ষেত্রে মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি ব্যবহার করতো। তারা ঘানি বা কাঠের তৈরি হামানদিস্তা এবং মুষলের পেষণযন্ত্র ব্যবহার করতো। এই যন্ত্রে হামানদিস্তার পাশে সংযুক্ত একটি লিভারের সাহায্যে মুষল ঘোরানো হতো। তারা চাকিও ব্যবহার করতো। চাকিতে স্ক্রু আঁটা সমান্তরাল দু'টি কাঠের রোলার ছিল। কিন্তু ক্রমশ এগুলির ব্যবহার কমে গিয়ে লৌহনির্মিত পেষণযন্ত্র চালু হয় এবং ১৯১৬ সাল নাগাদ রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায়, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলায়, চট্টগ্রাম বিভাগের বৃহদংশে লোহার

২২৬. *Statistics of British India,* Part II, Commercial, 1909-10, (Calcutta 1911), 18, *Report on the Maritime Trade of Bengal, 1921-22,* 40.

২২৭. Noel Paton, *Notes on Sugar,* 35.

২২৮. M. P. Gandhi (ed.), *Sugar Industry,* Table 10, XXXIX

পেষণযন্ত্রই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। চুল্লী ও কড়াই তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় বটে, "কিন্তু মূল পদ্ধতিগুলি ছিল সেই একশ' বছর আগের মতোই—একটি উন্মুক্ত কড়াইয়ের মধ্যে টাটকা আখের রসকে জ্বাল দিয়ে বেশ ঘন করা।"[২২৯] কিন্তু মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভারতীয় আখের মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কমই থাকতো। বস্তুত ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের মতে, রস নিষ্কাশনে অদক্ষ সনাতন পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করার ফলে ভারতে উৎপাদিত আখের প্রায় এক তৃতীয়াংশই নষ্ট হয়ে যেতো। এ ব্যাপারে ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সুগার কমিটি মন্তব্য করে :

> আখের মধ্যে যে পরিমাণ চিনি থাকে, একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ফ্যাক্টরিতে কমপক্ষে তার শতকরা ৯৬ ভাগ নিষ্কাশন করা যায়, এবং জ্বাল দেয়ার প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে রসের মধ্যে যে শর্করা আছে, উৎপাদিত চিনি হিসেবে তার শতকরা ৯০ ভাগ সংরক্ষণ করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, আখের মধ্যে প্রকৃতই যে শর্করা থাকে তার প্রায় শতকরা ৮৬.৪ ভাগই চিনি হিসেবে লাভ করা যায়।[২৩০]

অথচ, বাংলার আখ থেকে শর্করার পরিমাণ মাত্র শতকরা ৫২ ভাগ।[২৩১]

বাজারে বিদেশী চিনির অবাধ আমদানি এই শিল্পটির ক্রমাবনতির জন্য কম দায়ী নয়। জাভা, মরিশাস ও ফরমোজার মতো অঞ্চলগুলিতে চিনি উৎপাদনের কৌশলের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হয়। সস্তায় উন্নততর জাতের আখ উৎপাদনের লক্ষ্যে শুধু যে শিল্পটির কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়েই বিধিবদ্ধ গবেষণা হয় তাই নয়, শিল্পটির উৎপাদন সম্পর্কিত দিকগুলিরও সমানভাবে উন্নতি সাধন করা হয়। এর ফলে বর্তমান শতকের প্রথম ষোল বছরে ভারতে জাভায় উৎপাদিত চিনির দাম শতকরা ২৫ ভাগ কমে যায় (অথচ এর বিপরীতে ভারতের অপরিশোধিত চিনির দাম বেড়ে যায় শতকরা ২৬ ভাগ) এবং এর ফলে বাংলায় আখ থেকে উৎপাদিত বিদেশী চিনির আমদানি অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যায় (সারণি ৫.৪)। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মানি থেকে অনুদানপ্রাপ্ত চিনির আমদানিও এ দেশের চিনির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমবর্ধমান আমদানির ফলে শুধু যে ছোট ছোট পরিশোধনাগারগুলিই বন্ধ হয়ে যায় তা-ই নয়, আখের আবাদও সমানুপাতে সঙ্কুচিত হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচন ঘটে কর্মের।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এই গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় শিল্পটির দ্রুত অবনতির জন্য দায়ী; সরকার বরাবর নিষ্ক্রিয় থেকে যায় এবং শিল্পটির পুনরুজ্জীবনের জন্য সময় মতো সঠিক পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকে। "এটা উল্লেখ করতেই হবে যে, সরকার কখনও দেশের কৃষি, গ্রামীণ এবং শিল্প অর্থনীতিতে চিনি উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের পূর্ণ তাৎপর্য

২২৯. ঐ, 63

২৩০. *Report of the Indian Sugar Committee*, (Simla 1920), 260.

২৩১. M. P. Gandhi (ed), *The Indian Sugar Industry*, (1942 annual), 28

অনুধাবন করতে পারে নি।"[২৩২] জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মতো দেশগুলোর গৃহীত নীতির তুলনায় এই নীতি ছিল বৈসাদৃশ্যমূলক, কারণ এসব দেশে বীটের চিনি রপ্তানিতে উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকার অনুদান প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে জাভা, মরিশাস, ফরমোজা, হাওয়াই এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো অঞ্চলগুলিতে চিনিশিল্পের উন্নয়নের জন্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সারণি ৫.৪ : ১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৯০৯-১০ পর্যন্ত সমুদ্রপথে বিদেশ থেকে কলকাতায় আমদানিকৃত আখ এবং বীটজাত চিনির (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত) পরিমাণ (টনে) এবং মূল্য (টাকায়)

সন		আখের চিনি (পরিমাণ)	মূল্য	বীটের চিনি (পরিমাণ)	মূল্য
পাঁচ বছরের গড় যে সালে বছর শেষ হয়	১৮৯০-৯১	১৪,২৭৬	২৪,৪১,৫৩৮	৩,৭২২	৮,৯২, ০২২
	১৮৯৫-৯৬	২২,৭৭৫	৪১,৪৮,৩১১	৩,৫১৬	৮,৭৩,৩৫১
	১৯০০-০১	৪২,৬০৬	৬৫,৮১,৫৮০	১৯,৬৫৯	৪৪,১২,৭০০
	১৯০৫-০৬	৮৬,৭৫৯	১,৩৫,৯৩,৭২৫	২৭,৬৭৯	৫৬,০০,৬৮০
যে বছরের হিসাব ধরা হয়েছে	১৯০৬-০৭	১,৮০,৪৮৯	২,১৯,১০,৪০৩	৬২,৭৪৯	১,১১,৫২,২০২
	১৯০৭-০৮	১,৭৯,১৪২	৩,৬৮,৬০,১৫০	৩,৯২৩	৯,৪৪,২৯০
	১৯০৮-০৯	২,৬৯,৫৮২	৪,৩২,৩৩,৫৮৯	১৩,১২৪	২৮,৯৭,৯৫৩
	১৯০৯-১০	২,৮৯,৩২৯	৪,৭৭,৩২,৭৬২	১০,৭১৫	২৪,৯০,২৯৮

উৎস : ফ্রেডারিক নোয়েল পেটন, *Notes on Sugar in India*, (Calcutta 1911), 20-21

"অন্যান্য অনেক দেশে সরকার স্বীয় উদ্যোগে বা অর্থসাহায্য দিয়ে চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার জন্য সহায়তাদান করতো। কিন্তু সে রকম সহায়তাদানের জন্য যথার্থ অর্থে ভারতে কোন সরকারি চিনি গবেষণা বিভাগ বা দপ্তর ছিল না।"[২৩৩] একথা অবশ্য সত্য যে, ১৮৯৪-৯৫ সাল থেকে ভারত সরকার আমদানিকৃত সব চিনির উপর শতকরা ৫ ভাগ আমদানিশুল্ক আরোপ করে এবং এরপর ১৯১৬ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে

২৩২. M. P. Gandhi (ed.), *Sugar Industry*, 14

২৩৩. A K Bagchi, *Private Investment in India, 1900-1939*, (Cambridge 1972), 369

তা বৃদ্ধি করে। কিন্তু এর সবই করা হয়েছিল সরকারি রাজস্ববৃদ্ধির জন্য। আমদানিশুল্ক ছাড়াও দামের সমতাবিধানের জন্য সরকার ১৮৯৯ সালে ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে আমদানিকৃত বীটজাত চিনির উপর শুল্ক আরোপ করে। কিন্তু সরকার ভুলে যায় যে, শুধু বীটের চিনিই ভারতের পরিশোধিত চিনির শত্রু ছিল না। মরিশাস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে উৎপাদিত আখের চিনিও ভারতীয় চিনির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী ছিল। আসলে সরকারের যা করা উচিত ছিল তা হলো বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সব চিনির উপরই শুল্ক আরোপ করা—সে বীটের চিনিই হোক বা আখের চিনিই হোক। দেখা যাচ্ছে যে, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বাজার থেকে মরিশাস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের আখচাষী এবং চিনি উৎপাদকদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়িত করতে তাদের সাহায্য করা, যাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছিল না।[২৩৪] অধিকন্তু, সরকার যদি সত্যি সত্যি ভারতীয় চিনিশিল্পের পুনরুজ্জীবনে এবং এই শিল্পকে উৎসাহদানে আগ্রহী হতো, তাহলে দেশীয় শিল্পকে সরাসরি সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করতো এবং আখচাষ ও চিনি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের চেষ্টা করতো। ভারত সরকার ১৯১৯ সালে সরকারের কৃষি বিষয়ক পরামর্শদাতা জে. মেককেনা'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি (পরে এটি ইন্ডিয়ান সুগার কমিটি নামে পরিচিত হয়) নিয়োগ করে। কমিটির দায়িত্ব ছিল এই শিল্পের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করা এবং এগুলির উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেয়া। এই কমিটি একটি অনুকূল এবং বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু কমিটির প্রদত্ত সুপারিশমালা কার্যকর করার জন্য দ্রুত কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি।

৫.৫ ট্যারিফ রক্ষা এবং চিনিশিল্পের বিকাশ

একটি সুগার কমিটিকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ১৯২৯ সালে যে ইম্পেরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিচার্স প্রতিষ্ঠিত হয়, তা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচনা হয়। যেমন ১৯২৯ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সুগার কমিটি যেসব সুপারিশ করে তার অন্যতম ছিল ভারতের চিনিশিল্পকে সংরক্ষণসুবিধা দেয়া হবে কি-না এ প্রশ্নে ট্যারিফ বোর্ডের মাধ্যমে তদন্ত করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো। ভারত সরকার এসব সুপারিশ গ্রহণ করে এবং সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় চিনিশিল্পের দাবির বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ১৯৩০ সালের মে মাসে ট্যারিফ বোর্ডকে নির্দেশ দেয়। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে ট্যারিফ বোর্ড তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে।

ট্যারিফ বোর্ড এই শিল্প সংরক্ষণের দাবির বিষয়টি পরীক্ষা করে এবং শিল্পটি সংরক্ষণের জন্য একটি ১৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সংরক্ষণের প্রথম সাত বছরের জন্য বোর্ড প্রতিহন্দর ওজন চিনির উপর টাঃ ৭-৪-০ সংরক্ষণশুল্ক ধার্য করার

২৩৪. Bipan Chandra, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India,* (New Delhi), 258

প্রস্তাব করে এবং পরবর্তী আট বছরের জন্য প্রস্তাব করে প্রতিহন্দর ওজনে টাঃ ৬-৪-০ শুল্কের। ভারত সরকার বোর্ডের সুপারিশসমূহ গ্রহণ করে এবং ১৯৩২ সালে আইনসভায় সুগার ইন্ডাস্ট্রি (প্রোটেকশন) এ্যাক্ট পাশ করে। এই এ্যাক্টের দ্বারা চিনিশিল্পের উন্নতিবিধানের এবং বিকাশের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৩৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সব ধরনের চিনির উপর প্রতিহন্দর ওজনে টাঃ ৭-৪-০ হারে সংরক্ষণশুল্ক আরোপ করা হয়। আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ১৯৪৬ সালে প্রথম আট বছর মেয়াদ শেষ হবার আগেই নিরূপণ করা দরকার ট্যারিফ নীতি চালু রাখা উচিত কিনা, চালু রাখলে কি হারে ট্যারিফ বসানো উচিত। ট্যারিফশুল্ক ছাড়া এ সময় রাজস্বশুল্কও আরোপিত হয়।

সারণি ৫.৫ : ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত উৎপাদনশীল চিনিকলের সংখ্যা

প্রদেশ	১৯৩১-৩২	১৯৪১-৪২
যুক্তপ্রদেশ	১৪	৭০
বিহার	১২	৩১
পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০১	০৪
মাদ্রাজ	০২	১১
বোম্বে	০২	১০
বাংলা	শূন্য	০৯
উড়িষ্যা	শূন্য	০২
ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ	শূন্য	১৩
ভারতে মোট চিনিকলের সংখ্যা	৩২	১৫০

উৎস : এম. পি, গান্ধী (সম্পাদিত), *দি ইন্ডিয়ান সুগার ইন্ডাস্ট্রি*, (১৯৪২ বাৎসরিক), বোম্বে ১৯৪৩), XXXIV.

একটি পর্যাপ্ত শুল্কপ্রাচীরের সহায়তায় ভারতে চিনিশিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বাস্তবিকপক্ষে বিকাশের দ্রুততা এবং নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ভারতীয় এই শিল্পটির সঙ্গে খুব কম শিল্পেরই তুলনা করা যায়। ১৯৩১-৩২ সাল থেকে দশ বছরের মধ্যেই ভারতে চিনির কারখানা ৩২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০-এ উন্নীত হয় (সারণি ৫.৫)। ১৯৪১-৪২ সালে এই বাংলা প্রদেশে (বিহার ও উড়িষ্যা বাদ দিয়ে, কারণ এ দু'টি তখন পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়েছে) ৯টি চিনিকল চালু ছিল এবং এগুলি ছিল ৩,১৩,৬০০ টন আখ থেকে রস নিষ্কাশন করার ক্ষমতাসম্পন্ন। সে বছর এই কারখানাগুলি ২৩,৭০০ টন চিনি উৎপাদন

করে।[২৩৫] অথচ ট্যারিফ সংরক্ষণের পূর্বে বাংলায় কোন আধুনিক চিনিকলই ছিল না। অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষকরে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার ফলে এখানে চিনিশিল্প আর বিকশিত হতে পারে নি। এই দু'টি প্রদেশে আখের দাম ছিল তুলনামূলকভাবে কম এবং কারখানাগুলিতে চিনি নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল বেশি। "কিন্তু বাংলা সম্পর্কে বলতে হয় যে, এই প্রদেশে বিরাজমান আখমাড়াই কলের ব্যাপ্তি এবং চিনি নিষ্কাশনের শতকরা নিম্নহার প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বলে মনে হয় এবং এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এই ক্ষেত্রে এই প্রদেশের সম্ভাবনাসমূহ এখনও বিকশিত হবার উপযুক্ত সুযোগ পায় নি।"[২৩৬]

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বৃটিশ শাসনামলে বাংলার একদা খ্যাত চিনিশিল্পের ভাগ্য নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৭৫৭ সালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাপ্রবাহের ফলে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার অর্থনীতি সাধারণভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং এর ফলে চিনিশিল্পেরও ক্রমাবনতি ঘটে। 'ব্ল্যাক রিবেলিয়ন' এবং ১৮১৩ সালে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেবার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও বৃটিশ বন্দরগুলিতে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান চিনির তুলনায় বৃটিশ ভারতীয় চিনির উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপের ফলে এই শিল্প অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ১৮৩৬ সালে চিনির উপর শুল্কের সমতাবিধান করা হলেও রামের ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। ১৮৪৬ সাল থেকেই বৃটিশ সরকার বেশ উদ্যমের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করতে থাকে এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ভারতীয় চিনি ক্রমশ বিতাড়িত হয়। এই অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভারতও অচিরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী চিনি আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়। উন্নতজাতের আখের চাষাবাদ ও চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নততর পদ্ধতি প্রচলনে রাষ্ট্রীয় অবহেলা, বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বীট ও আখ থেকে চিনিউৎপাদন শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি এই শিল্পের ক্রমাবনতিকে ত্বরান্বিত করে। আমদানিশুল্ক এবং ভারতে বীট থেকে উৎপাদিত চিনির উপর ভারসাম্যরক্ষাকারী শুল্কসমূহও ক্রমাবনতির ধারা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত ক্রমাগতই বিদেশী চিনির অবাধ বাজারে পরিণত হয়। ১৯১৯ সালে ভারত সরকার চিনিশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর এবং এর উন্নতিবিধানের ব্যাপারে প্রস্তাব রাখার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেও প্রায় দশ বছর যাবৎ এই কমিটির সুপারিশমালা ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশের আলোকে এই শিল্পের সংরক্ষণব্যবস্থা গ্রহণ করার পরই শুধু শিল্পটি পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাংলার পক্ষে হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধার তখনও সুদূরপরাহতই থেকে যায়।

২৩৫ M P Gandhi (ed), *Sugar Induastry*, Table 3, xxxiv

২৩৬. T. R Sharma, *Location of Industries in India*, (Bombay 1946), 130

উপসংহার

শিল্পবিপ্লবের আগে বাংলায় ছিল একটি সুসমন্বিত অর্থনীতি। প্রাক-শিল্পযুগের অভিধায় এদেশের কৃষি এবং উৎপাদিত পণ্যের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। গঙ্গা এবং এর শাখা-প্রশাখার পলিমাটি জমে এদেশের মাটি ছিল বেশ উর্বর ও সমৃদ্ধ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এ মাটিতে চাষাবাদ হয়ে উঠে সহজ ও লাভজনক। এ কারণে স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। অন্যদিকে, এখানে উৎপাদিত পণ্যের মানও নেহাৎ খারাপ ছিল না। বয়নশিল্প, চিনি, জাহাজনির্মাণ এবং লবণশিল্প ছাড়াও সমগ্র প্রদেশে আরো বিচিত্র রকমের কারুশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠে। এসব শিল্প শুধু বাংলার জনগণের প্রয়োজনই মেটায় নি, বিদেশের বাজারের চাহিদাও মিটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় লৌহ ও ইস্পাত, পিতল ও কাঁসানির্মিত দ্রব্য, হাতির দাঁতের তৈরি জিনিস, পাটজাত দ্রব্য, মৃৎপাত্র ইত্যাদি। এভাবে দেখা যায় যে, বাংলায় মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশাগুলির একটি চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

এই সময়ের বাংলার কারুশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের একটি চমৎকার দিক হলো এসব শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য। কারিগর ও কারুশিল্পীরা স্ব স্ব কাজে নিজেদের দক্ষ করে তুলতো, একজন স্বর্ণকার যেমন রূপা নিয়ে কাজ করতো না, তেমনি একজন রৌপ্যকারও স্বর্ণ নিয়ে কাজ করতো না। এই বৈশিষ্ট্য ছিল ইউরোপে বিরাজমান বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। ইউরোপে শ্রমিকদের বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টির তখনও উদ্ভব হয় নি। এ অঞ্চলে শ্রমের জটিল বিভাজনের ফলে, এমনকি একটি বিশেষ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও—যেমন সুতাজাত বয়নশিল্পে দক্ষ কারিগরেরা তুলনামূলকভাবে কম খরচে অতি চমৎকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতো। যুগে যুগে বিদেশীদের কাছে বাংলার শিল্পপণ্যের চাহিদার এটি হচ্ছে অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে বার্ডউড মন্তব্য করেন যে, বাস্তবিকই "৩,০০০ বছর ধরে সমগ্র বিশ্ব ভারতে উৎপাদিত শিল্পপণ্য ক্রয়ের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করে চলেছে।"[২৩৭]

এক্ষেত্রে বৃটেনও কোন ব্যতিক্রম নয়। সেই আদিকাল থেকেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানিপণ্যগুলির মধ্যে (বেসরকারি ব্যবসায়ী এবং লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীর রপ্তানিপণ্যও) বাংলার মসলিন ও ক্যালিকো এবং কাঁচা ও যন্ত্রোৎপাদিত রেশমদ্রব্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৯০-এর দশকে বৃটিশ ব্যবহারকারীদের কাছে এদেশের বস্ত্রপণ্য এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, সংশ্লিষ্ট মহল পার্লামেন্টের কাছে এই মর্মে আবেদন করে যে, ভারত থেকে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত বস্ত্রপণ্যের আমদানি বন্ধ করা হোক, কারণ এসব পণ্য দেশের উলের তৈরি পণ্যবাজারের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। এর ফলে ভারতীয় বস্ত্রপণ্যের উপর

---

২৩৭. George Birdwood, *The Industrial Arts of India*, Vol. I, (London 1880), 136.

শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হলেও সংশ্লিষ্ট মহল গৃহীত পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় বলে মত প্রকাশ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উত্থাপন করা হয় যে, তারা এখন নিজ দেশের জনগণের কল্যাণ এবং চাকরির প্রত্যাশার চেয়ে মুগল প্রজাদের কল্যাণ, তাদের দেশের উন্নতি ও তাদের চাকরির প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। সমসাময়িক চটুল কবিতায়ও ইংরেজ কোম্পানির সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। ১৭০০ সালে লেখা এমন একটি কবিতায় বলা হয় :

তারা যখন ভারতে তৈরি পণ্যকে উৎসাহ দেয়,
ইংরেজদের চাকরি তারা কেড়ে নেয়
এমন হলে কীভাবে ভাড়াটিয়ারা ভাড়া শোধ করবে
যখন ব্যবসা এবং টাকা-পয়সা ভারতের পথে চলবে,
জনগণ বাঁচবে কী করে, করই বা দেবে কী করে
দরিদ্ররা যখন কাজ চায়, ফিরে যায় ঘরে ?
যেসব পণ্য এসব জাহাজে করে হয় আনা
ইংল্যান্ডে ওগুলি কখনো ছিল না জানা।[২৩৮]

এর ফল কখনো ভাল হবার কথা নয়। এর আগেই ১৬৯৭ সালে স্পাইটেলফিল্ডের তাঁতীরা লন্ডনে অবস্থিত ইন্ডিয়া হাউজ আক্রমণ করে। বৃটিশ বস্ত্রপণ্য উৎপাদকেরা ১৭০০ সালে এবং পুনরায় ১৭২০ সালে পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে তুলাজাত পণ্যের (ছাপানো এবং রঞ্জিত ক্যালিকো) আমদানির উপর বিধি-নিষেধ আরোপে এবং কয়েক ধরনের মসলিন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করাতে সফল হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালেও এধরনের আইন পাশ করা হয়। এরপর থেকে কোম্পানি শুধু কন্টিনেন্টে এবং অন্য দেশে পুনঃরপ্তানির জন্যই তৈরিপণ্য আমদানি করে। আঠারো শতকের শুরুতে এভাবেই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিশীল কোম্পানির সঙ্গে ইংল্যান্ডের বর্ধিষ্ণু শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

ইতিমধ্যে, বার্ষিক মাত্র ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে সম্রাট ফররুখশিয়র ১৭১৭ সালে এক ফরমানবলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করেন। এর ফলে কোম্পানি ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলায় তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে পরাক্রমশালী মুগল সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবার পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা ঘোলাজলে মাছ ধরতে তাদের উৎসাহিত করে। নিতান্তই শঠতা, ছলনা এবং প্রতারণার দ্বারা ১৭৫৭ সালে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে

২৩৮. England's Almanac, 1700. উদ্ধৃত Shafaat Ahmad Khan, *The East India Trade in the XVIIth Century*, (London 1923), 215.

উঠে এবং ১৭৬৫ সালের মধ্যে এদেশের অঘোষিত সরকারে পরিণত হয় এবং এভাবে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ একীভূত করে। এসময়ে কোম্পানির লোলুপতা সব সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং কোম্পানির কর্মচারীরাও হয়ে পড়ে লোভাতুর। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য এবং শিল্পশ্রমিকদের উপর ইংরেজ বণিকদের অত্যাচার, বিবিধ বিধি-নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ এবং শর্তারোপ একত্রিত হয়ে বিভিন্ন রকমের পণ্য উৎপাদনে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি লবণ উৎপাদনও এ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। এই পণ্যটির ব্যবসা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জনগণের নিত্যব্যবহার্য এই পণ্যটির দাম বেড়ে আকাশচুম্বী হয়ে উঠে। সে যাই হোক, ভারতে উৎপাদিত পণ্যাদি রপ্তানি করে লাভবান হওয়ার জন্য উৎপাদনের অনুকূলে অবস্থান নেয়ায় কোম্পানিকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে। জাহাজনির্মাণ শিল্প গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্যও কোম্পানি ধন্যবাদার্হ। কোম্পানির এই নীতি দেশের সরকারের বণিকসুলভ নীতির বেশ পরিপন্থী ছিল, কারণ সরকারের নীতি ছিল ইংল্যান্ডে কারখানায় পণ্য উৎপাদনের এবং কাঁচামাল ও স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা রপ্তানির অনুকূল।

কিন্তু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাচ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন তার লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে নি। উনিশ শতকের শুরুতেই ইংল্যান্ডের শিল্প পুঁজিবাদ একটি দুর্জয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হয় এবং কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে দেখা দেয়। বিভিন্ন স্বার্থবাদী মহল, বিশেষকরে বস্ত্রপণ্যের এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবসায়ের ধরনের পুনর্বিন্যাস দাবি করে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠে। ভারত এবং ইংল্যান্ড এই দুই দেশেই কলকারখানায় উৎপাদনভিত্তিক শিল্প থাকাটাকে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বেমানান বলে গণ্য করা হয়। "সংক্ষেপে সেসময়ে শ্রমের একটি নতুন আন্তর্জাতিক বিভাজনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বৃটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারীরূপে ভারতের প্রাথমিক ভূমিকার নতুন সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়োজন দেখা দেয়।"[২৩৯] এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। একটি সুউচ্চ শুল্কপ্রাচীর এবং আমদানির উপর বিধি-নিষেধের আড়ালে থেকে ইংল্যান্ডের কলকারখানায় উৎপাদিত বস্ত্রপণ্য এখন খোদ ভারতভূমিতেই ভারতে উৎপাদিত পণ্যকে হ্রাসকৃত মূল্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করার অবস্থানে পৌঁছে। এভাবে ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানির চার্টার নবায়নের সময় আসে, তখন কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার রহিত করে সব ইংরেজের জন্যই ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং এভাবেই বৃটেনের শিল্পপতিবুর্জোয়াদের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য অবাধে ভারতের বিরাট বাজারে প্রবেশের সুযোগ পায়।[২৪০]

১৮০০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে এবং ভারতে গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে বৃটিশ বস্ত্রপণ্য ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যাদির সহায়তার জন্য আইনকানুনের একটি

২৩৯. Barber, *British Economic Thought and India, 1600-1858,* (Oxford 1975), 123.

২৪০. R. Mukherjee, *The Rise and Fall of the East India Company,* (Bombay 1973), 403.

বিস্তৃত বেড়াজাল তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়। এ ধরনের বণিকসুলভ ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে ভারতের এককালের প্রখ্যাত তুলাজাত বস্ত্রপণ্য ও লবণশিল্পের অবনতি ঘটে। ভারতের জাহাজনির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণ বন্ধ করার জন্য জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত আইন-কানুনও কঠোরতর করা হয়। ভারতীয় শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধনের লক্ষ্যে ভারতেও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞামূলক আইন ও হুকুম জারি করা হয়। অভ্যন্তরীণ শুল্কারোপ ছিল ঐসব পদক্ষেপের অন্যতম। আরেকটি পদক্ষেপ ছিল নামমাত্র শুল্ক প্রদান করে বস্ত্রপণ্যের আমদানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রপ্তানিবৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানাজাত বিদেশী পণ্যের জন্য নিজের বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া বা দেশজ শিল্পকে এমন অবস্থায় উন্নীত করা যেন তা বিদেশী শিল্পের সঙ্গে সমান শর্তে প্রতিযোগিতা করতে পারে, ইত্যাদি যেসব সংশোধনমূলক বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে থাকে, উপনিবেশ হওয়ার ফলে এবং রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের জন্য ভারত তার কোনটিই গ্রহণ করতে পারে নি।[২৪১]

সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং অবাধ বাণিজ্যের সাফল্যের ফলে বাংলার শিল্পসমূহের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠে। ইংল্যান্ডে এখানকার চিনির প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। সমস্যাগুলি নিরসনযোগ্য হলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় এদেশের এককালের গৌরবময় রেশমশিল্পও ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাট, রেলপথ এবং নৌপথের সম্প্রসারণ, সমুদ্রবন্দরসমূহের উন্নতিসাধন এবং শুল্করহিতকরণের ফলে কারখানায় তৈরি উৎপাদিত পণ্যসমূহ অবাধে বাজারে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং স্থানীয় শিল্পের ধ্বংস ডেকে আনে। "আমদানিব্যবসা ভারতীয় শিল্পসমূহের উপর যে আঘাত হানে তা তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ভারতে ব্যবসার ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এসময়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিরাট স্থানচ্যুতি ঘটেছে এবং ভারত থেকে ভিন্নখাত ধরে মুনাফা চলে গেছে ইংরেজদের পকেটে।"[২৪২]

সে যাই হোক, এটি একটি মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা যে, তৎকালীন সরকার সম্পদের উৎসের সম্প্রসারণের জন্য শিল্পোন্নতির ব্যাপারে সচেষ্ট না হয়ে সুপরিকল্পিত এবং বিধিবদ্ধভাবে এদেশের প্রাচীন কলা এবং শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধন করার নীতি অনুসরণ করেছে। এর পরিণতিতে দেশ আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং নগরায়ণ বন্ধ হয়ে যায় ও বাংলার বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র কৃষিজাত সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষি, জলবায়ু, আবহাওয়া এবং প্রকৃতিদত্ত উর্বরতার সংযোগের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়

২৪১. Helen B. Lamb, "The 'State' and Economic Development in India," in Simon Kuznets (et al.) (edited), *Economic Growth: Brazil, India, Japan,* (Duke University Press 1955), 468.

২৪২. P. Padmanabha, Pillai, *Economic Conditions of India,* (London 1925), 27

জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ও অভাবের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে (স্থায়ী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ফলে মানুষের কর্মপ্রেরণা ও উদ্যমও হারিয়ে যায়)। একথা অবশ্য ঠিক যে, বিদেশী মূলধন দিয়ে দেশের কয়েকটি বিশালায়তন আধুনিক শিল্প স্থাপন করা হয়। কিন্তু এসব শিল্প থেকে যে লাভ হয় তা পাচার হয়ে যায় এবং এর দ্বারা বিদেশীরা সম্পদশালী হয়ে উঠে। এভাবে সতেরো ও আঠারো শতকে একদা যে অঞ্চল "উৎপাদিত পণ্যের বাজারে নিরাপদে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারতো"[২৪৩] এসময়ে তা অনেক পিছনে পড়ে যায় এবং ১৯১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী স্কটল্যান্ডের মাথাপিছু ৪৫ পাউন্ড আয়ের তুলনায় এদেশের মাথাপিছু আয় এসে পৌঁছে মাত্র ২ পাউন্ডে।[২৪৪] তাছাড়া মাথাপিছু উৎপাদিত পণ্যের মূল্য দাঁড়ায় মিশরের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ এবং মেক্সিকোর তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ।[২৪৫] অন্য কথায়, বৃটিশ শাসনামলে এদেশের অর্থনীতি প্রাক-শিল্পযুগের স্তরে অচল হয়ে থাকে এবং এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসে শূন্যের কোঠারও নীচে।[২৪৬] বৃটিশ শাসনের অবসানে অবনত হয়ে পড়া দেশটির করুণ এবং অসহায় অবস্থা সমসাময়িক একটি কবিতায় সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে

পেটে ভাত নেই
হাতে কাজ নেই
ঘরে শিল্প নেই
বিদেশীর জিনিসে চলে ঘর
তাই
গায়ে জ্বর মনে ডর
চাই
কাজ+ভাত = শক্তি।

২৪৩. Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal from 1704 to 1740,* (Calcutta 1969), 172-73

২৪৪. C S. Deole, *The State in relation to Indian Industries,* (Bombay 1916), 3

২৪৫. B. R. Tomlinson, *The Political Economy of the Raj, 1914-1947,* (London 1979), 32.

২৪৬. For an interesting summary on the debate relating to 'arrested' economic development in India under British rule, দেখুন Mufakkharul Islam, 'The Debate on the Question of "Arrested" Economic Development in Indian sub-Continent under British Rule', in মানববিদ্যা বক্তৃতা (উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, n d), 1-52. Prof. Islam takes a very generous and charitable view of many of the criticisms levelled at the pre-industrial Indian society by the imperialist writers and yet could not help conclude that the Indian economy was capable of transformation to industrial capitalism This possibility was frustrated by the colonial government which deliberately and systematically foiled her take-off into modern economic development..

১৩

শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ

বিনায়ক সেন*

ভূমিকা

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অবহেলিত দিক হিসেবে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের প্রসঙ্গটি সাম্প্রতিক বছরগুলোয় উত্তরোত্তর মনোযোগ লাভ করছে। ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও প্রসঙ্গটির তাৎপর্য বিদ্যমান। সঙ্গত কারণে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের প্রসঙ্গটি অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি নানা শাস্ত্রগত বিবেচনার দাবি করে। সে প্রেক্ষিতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে শিল্পখাতের বিকাশের উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে থাকলেও বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশপ্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সীমিত। ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করে সময়ের সাথে বাঙালি পুঁজির বিবর্তনের ধারা, বিশেষত এর অন্তর্নিহিত যুক্তিভিত্তি এই অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে যে সময়পর্বের উল্লেখ স্থান পেয়েছে তার ব্যাপ্তি উনিশ শতকের সূচনা থেকে বাংলায় বৃটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত।

অধ্যায়টি সাতটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের (সরবরাহগত) সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে স্থান পেয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী-শিল্পোদ্যোক্তাদের উত্থানপর্ব। তৃতীয় অনুচ্ছেদে ১৮৪৭ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থবাজারে মন্দা ও সঙ্কটের

* রিসার্চ ফেলো, বি. আই. ডি. এস, ঢাকা।

প্রেক্ষাপটে বাংলার 'ক্ষুদে মাপের শিল্পবিপ্লবের' পরিসমাপ্তির কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাত থেকে বাঙালি পুঁজি কিভাবে গতিমুখ পরিবর্তন করে আকৃষ্ট হলো জমি ও বাণিজ্যবহির্ভূত পেশার প্রতি, তার একটি বিবরণ দেয়া হয়েছে চতুর্থ অনুচ্ছেদে। এই পর্বে যেসব বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা আধুনিক শিল্প-কারখানা গড়ার ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে হলেও প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয় এই অধ্যায়ে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে স্বদেশী যুগের মধ্যবিত্তভিত্তিক ভদ্রলোক-শিল্পোদ্যোক্তাদের উপর। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোয় বাংলার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রাগ্রসর শ্রেণী হিসেবে মাড়োয়ারি শিল্পোদ্যোক্তাদের আত্মপ্রকাশ বিধৃত হয়েছে। কি কি প্রভাবকের কারণে এই পর্বে মাড়োয়ারি পুঁজির তুলনায় বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশ পিছিয়ে পড়ে তা সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই পর্বে। সপ্তম অনুচ্ছেদে ১৯৪৭ সাল অবধি পূর্ব বাংলায় মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন খাতে শিল্পোদ্যোক্তাদের উপর আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের প্রসঙ্গটি।

১.১ বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে অনগ্রসরতার প্রচলিত ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন যখন শেষ হওয়ার পথে, তখনই বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে অনগ্রসরতার বিষয়টি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। অনগ্রসরতার বিষয়ে চমকপ্রদ এক ঐকমত্য দেখা যায় বৃটিশ আমলা, স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক, বৃটিশ পুঁজির নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের ব্যবসায়ী, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য, মফস্বল কলেজের শিক্ষক প্রমুখের চিন্তাধারার মধ্যে। গত শতকের সত্তরের দশকে ভোলানাথ চন্দ্র 'A Voice for the Commerce and Manufactures of India' প্রবন্ধে বাংলার সব অর্থনৈতিক উপসর্গের মূল খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্পায়নে ভদ্র সম্প্রদায়ের আগ্রহহীনতার মধ্যে। ভদ্র সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর আবেদন ছিল—তারা যেন শিল্পায়নকে তাঁদের উন্নয়নচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেন। শিল্পায়নের এই তাগিদ সমভাবেই অনুভব করেছিলেন যেমন একদিকে রমেশ চন্দ্র দত্তের মতো উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা, তেমনি অন্যদিকে বিপিন চন্দ্র পাল এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মতো চরমপন্থী রাজনীতিকেরা। ১৮৯৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রধান যুক্তি ছিল বেকার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে শিল্পোদ্যোক্তাসুলভ প্রেষণা জাগিয়ে তোলা। এসব তরুণ মূলত 'সরকারি বাঁধা চাকুরি অথবা তা না পেলে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি' পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন।[১] বাঙালি সম্পদশালী ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে

১. S. Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, (New Delhi 1973), 95.

শিল্পোদ্যোক্তাসুলভ আগ্রহের অভাব স্বদেশী যুগের বিভিন্ন লেখার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একই সুর লক্ষ্য করা যায় ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ই. ডব্লিউ. কলিনের 'Report on the Existing Arts and Industries in Bengal' শীর্ষক প্রতিবেদনে। এতে বাঙালি ধনাঢ্য শ্রেণী 'উদ্যমহীনতা' এবং 'নতুন কল-কারখানা' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।[২] ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইনসভার একজন সদস্য লক্ষ্য করেন যে, বাঙালিরা আদৌ 'শিল্পমনা' নয় এবং ১৯৪২ সালে আইনসভার আরেকজন সদস্যের মন্তব্যেও একই ধারণা ব্যক্ত হয়। বাঙালিদের মধ্যে 'শিল্পপ্রবৃত্তি মরে গেছে' এই বলে তিনি বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাকে সহায়তা দেবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার এই হতদ্দশা নিয়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মধ্যে একই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চট্টগামের বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হাবিবুর রহমান মন্তব্য করেছিলেন যে, চাটগাঁয়ের ব্যবসায়ীদের 'একান্ত ব্যবসায়ী মনস্তত্ত্ব' নিহিত 'ঝুঁকি না নেওয়া' এবং 'দ্রুত ধনিক হওয়ার' মানসিকতার মধ্যে। এরা সাধারণত 'শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে' নিরুৎসাহী; তার চেয়ে বরং এরা 'মনোহারী দোকান অথবা রেস্টুরেন্ট খুলতেই আগ্রহী, যেখানে দ্রুত কেনাবেচা চালান যায়।'[৩]

কেন বাঙালি সম্পদশালী শ্রেণী সময়ের বিবর্তনে বৃহদায়তন খাতমুখী স্থায়িত্বশীল এক শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারলো না এ নিয়ে মোটা দাগে দু'ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একটি ব্যাখ্যা মতে, বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশে ব্যর্থতার কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ও বৈষম্যমূলক নীতি এবং সামগ্রিকভাবে সহায়ক অর্থনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতি ; 'সহজতর ব্যাখ্যা হলো, আধুনিক শিল্পখাতে প্রবেশ বৈদেশিক বাণিজ্য, পাইকারি ব্যবসা এবং অর্থায়ন খাতের উপর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়।'[৪] একে ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক যুক্তি বলা যেতে পারে। এই যুক্তি প্রদর্শনের একটি অসুবিধে হলো, সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক পর্বে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বাধাগ্রস্ত বিকাশ এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেলেও কি কি প্রভাবকের কারণে স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ী গ্রুপের (যেমন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের) তুলনায় বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তারা পিছিয়ে পড়লো তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অথবা এই যুক্তি দিয়ে যদি বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার তুলনামূলক অনগ্রসরতাকে

২. A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal, 1900-1939.* (Dhaka 1983), 134.

৩. H. Rahman, "Chittagong since Partition", *Pakistian Economic Journal,* 1:3 (1950), 65-81.

৪. Sarkar, *Swadeshi Movement,* 135.

ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে একথাকে প্রামাণ্য ধরে নিতে হয় যে, শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে বাঙালিরা স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ী গ্রুপের তুলনায় ঔপনিবেশিক শাসকদের অপেক্ষাকৃত বেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিল। ব্যবসা ও শিল্পে বিদ্যমান ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণকে টিকিয়ে রাখার পশ্চাতে যে ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দানের ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে বাগচী (১৯৭২) স্পষ্টতই 'racial alignment'-এর বড় একটি ভূমিকা খুঁজে পান।[৫] ক্লিং (১৯৭৫) উপরোক্ত থিসিসের সপক্ষেই এসে দাঁড়ান যখন তিনি বলেন যে, 'অর্থনীতির আধুনিক খাতে বাঙালি ব্যবসায়ীদের অবস্থানের অবনতির' পিছনে কাজ করেছে 'বাঙালিদের বিরুদ্ধে বেসরকারি ও সরকারি বৃটিশদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক বঞ্চনা।'[৬] সন্দেহ নেই যে, বাঙালিরা ঔপনিবেশিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল; কিন্তু অন্যান্য স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তার তুলনায় তারা অনেক বেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে, এর সপক্ষে যথেষ্ট তথ্যগত ভিত্তি যুগিয়ে থিসিসটিকে কখনোই সপ্রমাণ করা হয় নি। বিপরীতে বরং কেউ যুক্তি রাখতে পারেন যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণে ভুক্তভোগী হওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালিদের অবস্থানে অন্যান্য স্থানীয় ব্যবসায়ী-গ্রুপ থেকে বড় একটা পার্থক্য দেখা যায় না। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বস্ত্রশিল্পের অবাঙালি স্থানীয় মালিকেরাও ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রচণ্ড বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হয়েছিলেন, যা বাঙালিদের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। মরিসের (১৯৬৭) পর্যবেক্ষণ এই মতে সায় যোগায়—'বস্ত্রখাতের ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের লড়াকু মনোভাবের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য ছিল এখানেই যে, এরা এমন একটি খাতে প্রবেশ করেছিল, যেখানে বৃটেনের সাথে প্রতিযোগিতা সবচেয়ে তীব্র হওয়ার কথা, ম্যানচেস্টারের তরফ থেকে রাজনৈতিক চাপ যেখানে ছিল সবচেয়ে প্রবল এবং সেখানে বস্তুত কোন প্রকার ট্যারিফ রক্ষাবন্ধনী ছাড়াই তাদেরকে টিকে থাকতে হয়েছিল।'[৭]

বলা দরকার যে, ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক মতের প্রবক্তারাও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে শিল্পোদ্যোগগত ভিন্নতা লক্ষ্য করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাগচী (১৯৭২) লক্ষ্য করেছেন যে, 'বাঙালি মধ্যবিত্ত শিল্পোদ্যোক্তা উৎসাহী না হলেও' 'মাড়োয়ারি ও উত্তর ভারতের বৈশ্যরা' শিল্পপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল।[৮] কিন্তু, এটুকু লক্ষ্য

৫. A. K. Bagchi, *Private Investment in India 1900-1939*, (Cambridge 1972), 205.

৬. B. B. Kling, "Economic Foundations of the Bengal Renaissance" in R. Baumer (ed.), *Aspects of Bengali History and Society*, (New Delhi 1975), 63.

৭. M. D. Morris, " Values as an Obstacle to Economic Growth in South Asia: An Historical Survey", *Journal of Economic History*, 27: 4 (1967), 599.

৮. Bagchi, *Private Investment*, 205.

করার পর ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা সরবরাহের পশ্চাতে কি কি প্রভাবক কাজ করেছে তা বিশ্লেষণে তিনি অগ্রসর হন নি। স্পষ্টতই বাগচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ওয়েবারীয় ধারার যুক্তিকে ভ্রান্তিমূলক বলে প্রমাণ করা, যে যুক্তি মতে 'পূর্ব ভারতে ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর তুলনামূলক অনুপস্থিতির সব দায়দায়িত্ব' চাপিয়ে দেয়া হয় বিরাজমান 'মূল্যবোধ' অথবা 'বর্ণপ্রথাউদ্ভূত নিয়ন্ত্রণবিধির উপর।'[৯] এই সূত্রে অন্যরাও, যেমন মরিস (১৯৬৭), সিংগার (১৯৭৩), ফক্স (১৯৭৩) প্রমুখ বলার চেষ্টা করেছেন যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আঞ্চলিক যে তারতম্য চোখে পড়ে তা ব্যাখ্যার জন্য 'হিন্দু মূল্যবোধের' মতো রহস্যপূর্ণ কোন ধারণা অথবা পশ্চাৎপদ 'ঐতিহ্যের' যুক্তি কোনটিকেই অবলম্বন করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বাজার-সুযোগের তারতম্য এবং আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট। কিন্তু এই প্রস্তাবনাটিকে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যকার স্থানীয় শিল্পোদ্যোগগত তারতম্যকে ব্যাখ্যা করবার পদ্ধতিগত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও একই অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে প্রভেদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা কতটা প্রয়োগ করা সম্ভব? এই প্রস্তাবনার আলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার অভ্যন্তরীণ পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে বাঙালিদের পরিবর্তে মাড়োয়ারিরা এবং তারাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'লড়াকু শিল্পোদ্যোক্তা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে?[১০] অথবা কেন বাংলার সুবর্ণবণিক গোষ্ঠী, যাদেরকে ১৭৫০ সালের পূর্বে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 'বেনিয়ার সমতুল্য' ভাবা হতো[১১] এবং যারা ব্যবসা ও মহাজনি বৃত্তিতে বংশানুক্রমে পারদর্শী ছিল, তারা ঔপনিবেশিক আমলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ইতিহাসে প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়াতে পারলো না? কেন স্বদেশী যুগের 'ভদ্রলোক শিল্পোদ্যোক্তারা' বাংলায় কোন পাটকল স্থাপনের জন্য অগ্রসর হলো না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের ব্যাপৃত রাখলো তথাকথিত 'science-industries' খাতে, যেখানে তাদের সাফল্য ছিল নিতান্ত নগণ্য? স্পষ্টতই একই অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসায়ী গ্রুপ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে (এমনকি তারা একই ভাষাগোষ্ঠী বা ধর্মীয় পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও) বিদ্যমান 'বাজার-সুযোগ' গ্রহণে মাত্রাভেদ ছিল। মরিস (১৯৬৭) নিজেও এই সমস্যাটি অনুভব করেন যখন তিনি

---

৯. ঐ।

১০. এখানে বলা দরকার যে, বাংলায় বৃটিশ শাসনের পূর্বেই মাড়োয়ারিরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। সে আমলের উল্লেখযোগ্য ধনকুবেরদের (জগৎশেঠসহ) প্রায় সকলেই ছিল মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের।

১১. D.R. Gadgil, *Origins of the Modern Indian Business Class. An Interim Report*, (New York 1959), 18.

বলেন যে, ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক যুক্তি 'সরাসরি ব্যাখ্যা দিতে পারে না কেন উনিশ শতকের গ্রামাঞ্চলে যেসব অর্থকরী সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটছিল তার ফায়দা লোটে বাঙালিরা নয়, মাড়োয়ারিরাই।'[১২]

ঔপনিবেশিক আমলে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর অনগ্রসরতার ব্যাখ্যা হিসেবে অন্য মতটি এরকম—ভারতীয় মূল্যবোধ এবং সমাজকাঠামো (যেটি উপরোক্ত মূল্যবোধের ধারক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। এই মতের উৎস সন্ধান করতে গেলে ভারত প্রসঙ্গে ম্যাক্স ওয়েবারের ধারণার সমীপবর্তী হতে হয়। ওয়েবার মনে করেছেন যে, ভারতের ব্যবসায়ী ও বণিকেরা 'প্রোটেস্টান্ট মতাদর্শ' এবং 'পুঁজিবাদের ভাবধারা' থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে সবসময়ই 'সনাতন' ও 'আধুনিক'-এর ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন। এভাবে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধব্যবস্থা আধুনিকায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এধরনের যুক্তি প্রদর্শনে অবশ্য বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা নিম্নে আলোচিত হলো।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, মূল্যবোধকেন্দ্রিক ওয়েবারীয় ধারার যুক্তিও[১৩] বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্তা গ্রুপের কর্মকাণ্ডের তারতম্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। যদি ওয়েবারের প্রতিপাদ্যকে মেনে নেই যে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতে রয়েছে একক (হিন্দু) মূল্যবোধব্যবস্থার প্রাধান্য,[১৪] তাহলে একই মূল্যবোধের অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও মাড়োয়ারি, নাটুকোট্টাই, চেট্টিয়ার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের তুলনায় বাঙালি ব্যবসায়ী ও শিল্পপুঁজির অনগ্রসরতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো?

উপরোক্ত মূল্যবোধকেন্দ্রিক যুক্তির একটি অপেক্ষাকৃত নমনীয় ধরন পাওয়া যায় পার্সিদের উত্থান সম্পর্কিত ড্যানিয়েল বুকাননের লেখায়। পার্সিদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বুকানন এমন কিছু সনাক্তসূচক চিহ্ন তুলে ধরেন, যা ওয়েবারীয় চিন্তাধারাকে মনে করিয়ে দেয়: "জাতিগত ও সংস্কৃতিগত বিচারে এরা নিজেদেরকে কখনোই অন্য কোন ভারতীয় গ্রুপের সাথে অঙ্গীকৃত করে দেখে নি এবং একারণেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সম্ভবপর হয়েছিল।"[১৫] ওয়েবারের মতো বুকাননও

---

১২. Morris ," *Values as an Obstacle* " ,601.

১৩. অবশ্য এক্ষেত্রে ওয়েবারের অনেক পূর্বসূরি এবং অনেক অনুসারী ছিল। আঠারো শতকের পর্যবেক্ষকদের মধ্যে Dubois, Trevelyan প্রমুখ সনাতনী মূল্যবোধকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করতেন।

১৪. M. Weber, *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, (New York 1958).

১৫. D. H. Buchanan, *The Development of Capitalistic Enterprise in India*, (London 1966), 144.

বর্ণপ্রথা না থাকার অর্থনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরেন, যদিও তাঁর লেখায় সমস্যাটির ভিন্ন এক মাত্রা তুলে ধরা হয় : "প্রতিবন্ধকতাসৃষ্টিকারী বর্ণপ্রথা না থাকায় এবং বিদেশভ্রমণ বা ভিনদেশী আচার অনসুরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভারতীয় ভীতি থেকে মুক্ত হওয়ায় পার্সিরা ব্যাপক হারে ইউরোপভ্রমণ করেছিল, অনেক দ্রুত ইউরোপীয় ধারা, বিশেষত ইউরোপীয় ব্যবসাপদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছিল।'[১৬] অর্থাৎ এই যুক্তি অনুসারে, সনাতন মূল্যবোধে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাকে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের পথে অনতিক্রম্য কোন বাধা হিসেবে দেখা সঙ্গত হবে না। সনাতনী বানিয়ার পক্ষে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধজনিত ঘাটতি দূর করে আধুনিক শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত হওয়া সম্ভব হবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করবে বিদেশী পুঁজির সাথে মুৎসুদ্দিসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার সামর্থ্যের উপর, বিশেষকরে বিদেশী ব্যবসাপদ্ধতি অনুসরণ করতে সে কতোটা আগ্রহী হয় তার উপর। কিন্তু একথা মানলে আরেকটি সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। পার্সিদের মতো উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি ব্যবসায়ীরাও 'বিদেশী আচার', 'ইউরোপীয় ধারা' এবং ইউরোপীয় ব্যবসাপদ্ধতি' গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না বা কম উদগ্রীব ছিল না। তাহলে তারা কেন ১৮৫০ সালের পরে কালক্রমে একটি গতিশীল শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারলো না?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হয়তো কেউ দিতে চাইতে পারেন একথা বলে যে, পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ী-সংস্কৃতি অনুযায়ী পার্সিদের ছিল সম্প্রদায়ের ভিতরে পরস্পরকে সহায়তাদানকারী সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক, যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতাকেন্দ্রিক বণিকদের মধ্যে সম্ভবত ছিল না। এই আন্তঃসম্প্রদায় নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতি কিছুটা হলেও ব্যাখ্যা করে কেন ১৮৪০-এর দশকের শেষদিকে শেয়ারবাজারের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় মোকাবেলার সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত বাঙালি ব্যবসায়ীদের ছিল না। এধরনের ব্যাখ্যার দু'টি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রথমত, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতরে পরস্পরকে সহায়তাদানকারী নেটওয়ার্ক (যা অনেকাংশেই পারিবারিক আত্মীয়তাভিত্তিক হতো) ভারতের অধিকাংশ বনেদি ব্যবসায়ী গ্রুপের ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। বাংলাতেও এটা দেখা যায়। সুবর্ণবণিক, সাহা প্রমুখ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুঁজি, তথ্য, দক্ষতা প্রভৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ নেটওয়ার্ক বরাবর থেকে গিয়েছিল। একই কথা বলা চলে চট্টগ্রামের মুসলিম সওদাগরদের ক্ষেত্রেও, যারা বিশ শতকের প্রথমার্ধে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় বাণিজ্যে সক্রিয় ছিল। কিন্তু এসব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কোনটিই কালক্রমে (স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে) শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারে নি। কেউ বলতে পারেন যে, এসব সম্প্রদায়ের পেশাগত সংস্কৃতি ছিল সনাতনী ধাঁচের।

১৬. ঐ।

কিন্তু তাতে করে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটে না। সাহা বা সওদাগর সম্প্রদায়ের অন্তত কিছু ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই ১৯৪৭-উত্তর পাকিস্তানের মুসলিম ব্যবসায়ী মেমনদের মতো তাদের 'সনাতনী' প্রবণতাজাত ঘাটতি পুষিয়ে নিয়ে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারতো, অংশীদার হতে পারতো আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার। দ্বিতীয়ত, একান্নবর্তী পরিবারপ্রথার সম্প্রসারণ হিসেবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতরে পরস্পরকে সহায়তা দানের যে নেটওয়ার্ক-প্রথা তা শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের প্রাথমিক স্তরের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও জয়েন্ট-স্টক ধারার বাণিজ্যিক সংগঠনের মধ্যে বিকাশের যে সম্ভাবনা রয়েছে তার সাথে কোনভাবেই তুলনীয় নয়। জয়েন্ট-স্টক ধারার সংগঠন ইউরোপীয় বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এদিক থেকে দেখলে বলতেই হবে যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি ব্যবসায়ীরা, যারা জয়েন্টস্টক পদ্ধতিতে বাণিজ্যসংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তারা অনেকটাই ওয়েবারীয় অর্থে 'rational capitalism'-এর ছকের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। অন্তত তাদের ছক যে বাণিজ্যসংগঠনের দিক দিয়ে (ওয়েবারীয় যুক্তি মানলে) ভারতের অন্যান্য স্থানের অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একান্নবর্তী পরিবারভিত্তিক নেটওয়ার্ক-প্রথার 'pariah capitalism'-এর চেয়ে উন্নততর ছিল একথা হয়তো বলা চলে। অথচ বাস্তবে দেখা গেল যে, আপাতদৃষ্টিতে 'প্রাগ্রসর' বাঙালি পুঁজি কালক্রমে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ অকিঞ্চিৎকর এক ব্যবসায়ী শ্রেণীতে পর্যবসিত হলো; পক্ষান্তরে অবাঙালি পুঁজি (আপাতদৃষ্টিতে 'অনগ্রসর' ধরনের বাণিজ্যসংগঠন নিয়ে) পাট, বস্ত্র ও কয়লাশিল্পে বৃটিশ পুঁজির একাধিপত্যের প্রতি উত্তরোত্তর হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এ থেকে অন্তত এটুকু সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, এককালের pariah capitalistও অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত হতে পারে।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে, শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশে বিদ্যমান মূল্যবোধের বা (সম্ভবত আরো যেটা গুরুত্বপূর্ণ) প্রচলিত সমাজকাঠামোর (যা কিনা উপরোক্ত মূল্যবোধকে ধারণ করে) গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা নেই। অমর্ত্য সেনের *Economics and Ethics* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মেইজি পর্বের শিল্পবিকাশ ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের (Japanese ethos) তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মূল্যবোধ কোন একটি খাতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কিভাবে উৎসাহিত করতে পারে তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে স্বদেশী যুগেই। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সালে স্বদেশী ভাবাদর্শের প্রভাব বাংলার তাঁতশিল্পের বিকাশে খুবই সহায়ক হয়েছিল। মূল্যবোধ নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে। ১৮৫০ সালের পর বাংলায় 'ভদ্রলোক-কালচার'-এর উত্থানের ফলে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। উচ্চবর্ণের বাঙালির পুঁজি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে স্থানান্তরিত হয়ে জমি ও ব্যবসাবহির্ভূত পেশার প্রতি ঝুঁকতে থাকে। অন্যদিকে, বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যাদের বিচরণ ছিল,

তারা মূলত নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী ও কারিগর সম্প্রদায়ভুক্ত। শেষোক্তদের মধ্যে সাহা, বণিক, পাল, তেলী, পোদ্দার, শীল, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য, যাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল নিম্নে, আর পুঁজিও ছিল কম।

ওয়েবারীয় যুক্তির আরো একটি প্রতিপাদ্য ছিল, আমদানিকৃত পুঁজিবাদ যতবারই সনাতনী ধারাকে ভাঙতে চেয়েছে, ততবারই বর্ণপ্রথা এসে এই ধারাকে টিকিয়ে রেখেছে।[১৭] ফলে দেখা যায় যে, আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় অংশ নেবার পরও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সনাতনী মনোবৃত্তি যায় নি। আধুনিক খাতের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা প্রায়শই ফটকাবাজি মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, যা শিল্পপুঁজির বিকাশকে শ্লথতর করে তোলে। এবং এই কারণে ওয়েবার ভেবেছেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীর কালক্রমে শিল্পপতি হওয়ার প্রক্রিয়াটি কখনোই সম্পন্ন হবে না।[১৮] বাগচীর (১৯৭২) একটি মন্তব্য এ প্রেক্ষিতে স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেছিলেন যে, বাঙালিরা 'শিল্পে প্রবেশ করে নি, কেননা তারা ব্যবসায়ে অধিকতর উৎসাহী ছিল' এ ধারার যুক্তি মূল সমস্যার সমাধান করে না। কেননা, 'বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্টদেরও ব্যবসায়ে বড় ধরনের স্বার্থ নিহিত ছিল।'[১৯] এই সাথে যোগ করা যায় যে, ফটকাবাজি মনোবৃত্তি স্থানীয়-অস্থানীয় অনেক ব্যবসায়ী গ্রুপের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ১৮৬০-এর দশকে কলকাতার শেয়ারবাজারে চা-শিল্পকে ঘিরে ফটকাবাজির যে ধুম পড়েছিল তাতে মূলত অংশ নিয়েছিল ইউরোপীয় বণিকশ্রেণী।[২০] এ প্রসঙ্গে *Friend of India* লিখেছিল : 'গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, এমনকি যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলে পরিচিত তাঁরা এই প্রতারণা হতে দিয়েছেন ও ফটকাবাজদের সমর্থন যুগিয়েছেন' (রুংটা ১৯৭০, ৯৯)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে যদি 'ফটকাবাজি মনোবৃত্তি' থেকে গিয়ে থাকে, তবে তা তৎকালীন সামগ্রিক পরিবেশ বা

১৭. M. Weber, *The Religion of India*, translated and edited by H.H Gerth and D. Martindale, (The Free press 1958), 123.

১৮. ঐ, 325.

১৯. Bagchi, *Private Investment*, 205.

২০ এ প্রেক্ষিতে একটি প্রাসঙ্গিক গবেষণাব মন্তব্য নিম্নরূপ :

লন্ডন এবং কলকাতার বাজারে একের পর এক কোম্পানি গজাতে লাগলো। বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এমন চা-বাগানের জন্যও বিনিয়োগ করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হতে থাকলো। যখন শেয়ারবাজারে বিপর্যয় নামলো, তখন দেখা গেল, অনেক ইংরেজই (যাদেরকে উপরোক্ত চা-কোম্পানিগুলো পরিচালনা করতে পাঠানো হয়েছিল) মাঝপথে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, R. S. Rungta, *The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900*, (Cambridge 1970), 98-99.

অবস্থার কারণেও উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। সেরকম পরিবেশে বা অবস্থায় বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীরাও অনুরূপ আচরণ করতো না এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না।

উপরের আলোচনা অনেকাংশেই অতি-সরলীকৃত। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, পূর্ব ভারতে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে মূল্যবোধের যে ভূমিকাই থাকুক, ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট সামাজিক কাঠামো থেকে পৃথক করে এই মূল্যবোধকে বোঝা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ 'হিন্দু মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকেই' বিবেচনায় নেয়া যাক। এই বিশেষ মূল্যবোধকে আবশ্যিকভাবেই শিল্পোদ্যোগবিরোধী বলে অনেকেই বিচার করে থাকেন। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায় নি। পক্ষান্তরে উনিশ শতকের শেষদিকের কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত বাণিজ্যবহির্ভূত পেশাসমূহকেই শ্রেয়তর বলে জ্ঞান করতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসের কোন সময়পর্বের বিচারে বলা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট ও বিশ্লেষণ না করে 'হিন্দু মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ' জাতীয় প্রত্যয়ের কথা তুলে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশ-সমস্যাকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। মূল্যবোধকে গতিশীল নিক্তিতে বিচার করে দেখতে হবে কিভাবে এবং কোন নির্দিষ্ট সময়পর্বে বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ জন্ম নিল এবং কিভাবে তা ঐ পর্বের বাঙালি সম্পদশালী শ্রেণীর বিনিয়োগসিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করলো।

এই অধ্যায়ের আলোচনার উপসংহারে বলতে হয় যে, উপরোক্ত মতসমূহের কোনটিই এলাকা, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গ্রুপভেদে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশে তারতম্যের একক ব্যাখ্যা হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। কোন একটি মতই ইতিহাসের নানা পর্বে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশে যেসব প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় তাকে সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত অধিকাংশ মতই প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়, যা কোন নির্দিষ্ট (একটি বা একাধিক) সময়পর্বে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের (বা তার অনগ্রসরতার) কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে হয়তো তুলে ধরতে সক্ষম। বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশের অভাব সম্পর্কে আলোচনায় ঔপনিবেশিক শোষণকেন্দ্রিক যুক্তি এবং মূল্যবোধকেন্দ্রিক যুক্তি কোনটিকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক সম্ভবত তেমন লাভজনক হবে না। হেগেল যেমন মনে করতেন, দুই চরমপন্থী অবস্থানের মধ্যে প্রকৃত সমাধান নয়, প্রকৃত সমস্যা নিহিত। মনে হয়, এক্ষেত্রেও কোন একটি বিশেষ মতের অনুবর্তী না হয়ে বা কোন পূর্বনির্ধারিত ব্যাখ্যাকাঠামোকে কি করে বাংলার বাণিজ্য ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণ করা যায় সে চেষ্টায় ব্যাপৃত না হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন পর্বে বাঙালি পুঁজির পথপরিক্রমার ঐতিহাসিক যুক্তিপরম্পরাকে বোঝাই হবে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ দৃষ্টিভঙ্গি। এরকম একটি প্রয়াসই এ অধ্যায়ে নেয়া হয়েছে।

১.২ বাঙালি শিল্পোদ্যোগের প্রাথমিক পর্ব (১৮০০-১৮৫০)

১৮০০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বাঙালি ব্যবসায়ীরাই ছিল বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রণী। শুধু অভ্যন্তরীণ নয়, বহির্বাণিজ্যেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অনেকে ইউরোপীয় পুঁজির সঙ্গে যৌথ কারবারে নেমেছিল। এই নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে বাংলায় বৃটিশদের বাণিজ্যিক তৎপরতার পটভূমিতে। ক্লিং দেখিয়েছেন, ষোল শতকে বাংলায় বৃটিশদের বাণিজ্য শুরুর প্রাক্কালে "বাঙালি সাবেকি বণিক সম্প্রদায়কে হটিয়ে দিয়েছিল উত্তর ভারতীয়রা। তারা বাংলার রেশম ও সুতীবস্ত্রের লোভনীয় ব্যবসা বাঙালিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আঠারো শতকে বৃটিশরা বাংলার বাণিজ্য হস্তগত করেছিল বাঙালিদের কাছ থেকে নয়, বরং মাড়োয়ারি, পাঠান, কাশ্মীরী ও অন্যান্য বহিরাগতদের হাত থেকে।"[২১] সম্ভবত বৃটিশ পুঁজির এই বাণিজ্যদখলের ফলে সাবেকি বাঙালি বণিক সম্প্রদায় (যাদের মধ্যে দাদনি বণিকরা ও দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহ ছিল) নিতান্ত ক্ষুদে ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছিল। ডি. আর. গ্যাডগিলের বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের স্থানীয় বণিক সম্প্রদায়ের তুলনায় বাংলার বাঙালি বণিকদের অবস্থা ছিল 'অনেকটা অদ্ভুত', এখানেও 'অন্যান্য অঞ্চলের বানিয়াদের সমতুল্য ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ বাঙালি বণিক সম্প্রদায় ছিল, যেমন সুবর্ণ বণিক। কিন্তু ১৭৫০ সালে বাংলার ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্যে এদের শক্তিশালী অবস্থান চোখে পড়ে না। ১৭৫০ সালে বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি ততোদিনে অংশত হলেও বৃটিশ ও ইউরোপীয়দের আগমনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে।[২২] সুবর্ণ বণিক, তেলী প্রভৃতি ঐতিহ্যগত বণিক সম্প্রদায় বাংলার নিম্ন-সামাজিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এদের ক্রমঅধঃপতন বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজে কোনো উদ্বেগের সঞ্চার করে নি। বৃটিশ পুঁজি কেবল উত্তর ভারতীয় ও সাবেকি বাঙালি বণিকদের বিতাড়িতই করে নি, তাদের স্থলে কলকাতায় গড়ে তুলেছিল এক নতুন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এই নতুন ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই এসেছে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ থেকে। বাণিজ্যে এদের 'আগে কোনো অবস্থান ছিল না' এবং এরা প্রবেশ করেছে 'বৃটিশ বানিয়াদের সহকারী ও এজেন্টরূপে।'[২৩] এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলায় বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে কেবল বাণিজ্যিক পূর্বঅভিজ্ঞতাহীন বাঙালিদেরই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ক্লিং-এর বিবরণ (১৯৭৫) থেকে জানা যায় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ-এজেন্টদের মধ্যে শেঠ, বসাক, বণিক প্রভৃতি নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন, সতেরো শতকের শেষাংশে

২১. Kling, "Economic Foundations", 27.

২২. Gadgil, *Origins*, 18

২৩. ঐ।

কলকাতা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশরা কিছু শেঠ ও বসাক পল্লী বানিয়েছিল। বাঙালি নিম্নবর্ণের তাঁতীরা ষোল শতকে পর্তুগীজদের সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে বয়নের সঙ্গে বাণিজ্যও শিখেছিল। বৃটিশ শাসনের প্রথমদিকে কোম্পানির এজেন্ট, দালাল ও বানিয়া হয়ে অনেক শেঠ ও বসাক বিপুল ভাগ্য গড়েছিল। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার বড় ব্যবসায়ীদের তালিকায় যাদের দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণের। এতে বোঝা যায় যে, কোম্পানির মধ্যস্বত্বভোগী ও বৃটিশ বেসরকারি বাণিজ্যের এজেন্ট হিসেবে পরে এসেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পেশাজীবী ও প্রশাসনিক কর্মচারীরা আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে উঠে।

এই নতুন ধনাঢ্য বণিক শ্রেণী ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারিপ্রথা প্রবর্তনের পরে তাদের ধনসম্পদের একটা অংশ ভূসম্পত্তিতে নিয়োজিত করে। এর পরবর্তী সময়ে যা ঘটে তাকে বলা যায় 'পুঁজির কৃষিকরণের' প্রথম ঢেউ। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, এর ফলে আধুনিক শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য এটা ঠিক নয় যে, বাঙালির পুঁজি একমাত্র ভূমিক্রয়ে ব্যয়িত হয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে কলকাতার এই নতুন বাঙালি এলিট প্রথাগত মন্দির ও ঘাট নির্মাণ ছাড়াও নতুন নতুন বাড়ি তৈরি করে আমদানিকৃত পশ্চিমা পণ্য তা সাজিয়েছে। ভারতের উত্তরাঞ্চলের বানিয়ারা এমনটা করে নি। তবে বাঙালি ধনিক শ্রেণী বিলাসী জীবনযাপন সত্ত্বেও উৎপাদনে বিনিয়োগ থেকে বিরত ছিল না। এমনকি তারা বাণিজ্য, জাহাজ মেরামত, গুদামজাতকরণ, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যাঙ্কিং-এ বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে যৌথ কারবারও গড়ে তুলেছিল। ব্লায়ার বি. ক্লিং-এর বিবরণে দেখা যায় যে, ১৮৩৪ সালের পরে বৃটিশ ও বাঙালি ব্যবসায়ীরা যৌথভাবে বাষ্পচালিত মালবাহী জাহাজ, কয়লাখনি, নীলশিল্প, চা-বাগান, বাষ্পচালিত নৌকা ও রেলপথনির্মাণ প্রকল্পে পুঁজি খাটিয়েছে। বাঙালি বানিয়ারা তাদের সমৃদ্ধির যুগে কলকাতার 'বাণিজ্যিক অবকাঠামো' স্বরূপ একটি 'বণিক সমিতি' ও 'বাণিজ্যিক সংবাদপত্র'ও গড়ে তুলেছিল। এক কথায়, আইনানুগ যৌথ কারবারে তাদের সাফল্য তখন ইউরোপীয় মানের তুলনায় কম ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে যে, কলকাতার বাঙালি বণিকরা তাদের কারবার শুরু করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে। তারা বৃটিশ বেসরকারি পুঁজিরও উল্লেখযোগ্য মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। আঠারো শতকে বাঙালি বণিকদের কদর ছিল অভ্যন্তরীণ বাজার ও সরবরাহের উৎস সম্পর্কে খোঁজ-খবর জানার জন্য। স্থানীয় বাজার সম্পর্কে বৃটিশদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যবর্তীদের দাম কমে যায়। বাঙালি বণিকদের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয় ১৮১৩ সালের মুক্ত বাণিজ্য সনদ গৃহীত হওয়ার পরে।

এসময় 'বৃটেন থেকে যে নতুন ভাগ্যান্বেষীরা অল্প পুঁজি নিয়ে এসেছিল' তারা "পুঁজির জন্য"[২৪] স্থানীয় বণিকদের দ্বারস্থ হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে ধারণা করা যায় যে, আন্তর্জাতিক রপ্তানিবাণিজ্যে নিয়োজিত কলকাতার এজেন্সি হাউজগুলোকে যেসব ব্যাঙ্কিং কোম্পানি টাকা দিত, সেগুলোতেই প্রধানত বাঙালিদের পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছিল। রুংটা মন্তব্য করেছেন যে, বাঙালি বণিক শ্রেণীর 'পুঁজি ও উদ্যোগ' ছাড়া ঐ সময় বাংলায় একটিও উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানি গড়ে উঠে নি।[২৫] দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রধানত অবাঙালি ও বৃটিশ পুঁজির যৌথ উদ্যোগে গঠিত কয়েকটি ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তা-পরিচালকদের তালিকায় বাঙালির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল—মহারাজা সুখময়; ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রমথনাথ দে (হাজি মোহাম্মদ ইস্পাহানীসহ); ঢাকা ব্যাঙ্ক—খাজা আলিমুল্লাহ, বাবু নন্দলাল দত্ত, কাজী আবদুল গনি; বেনারস ব্যাঙ্ক–বাবু হরি চন্দ; আগ্রা সেভিংস ফান্ড—পীতাম্বর দত্ত।[২৬]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় বাঙালি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রুপ ছিল নিঃসন্দেহে ঠাকুর পরিবার। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই গ্রুপের নেতৃপুরুষ এবং তৎকালের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণ ও আফিম বিভাগে প্রধান দীউয়ান হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি নীল কারখানা স্থাপন করেন, চিনি উৎপাদন করেন এবং বিখ্যাত 'কার, ঠাকুর এন্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও অংশীদার ছিলেন, সেগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (১৮২৯), দি স্টিম টাগ এসোসিয়েশন (১৮৩৭), দি বেঙ্গল টি এসোসিয়েশন (১৮৩৯), দি বেঙ্গল কোল কোম্পানি (১৮৪৩) ও দি ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি (১৮৪৪)। ১৯৪৫ সালে এইসব কোম্পানির সম্মিলিত পুঁজির পরিমাণ বহু লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি গঠিত হওয়ার আগে তিনি কলকাতা-রানীগঞ্জ রেলপথ নির্মাণে এক-তৃতীয়াংশ পুঁজি যোগান দিতে চেয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, দ্বারকানাথের প্রায় সব কোম্পানিই স্থানীয় ইউরোপীয় পুঁজির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না, কারণ উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতার বাঙালি এলিটরা নিজেদেরকে শিল্প-বাণিজ্যে বৃটিশের অংশীদার বলেই ভাবতো। এখানে বরং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, তখনকার

---

২৪. Kling, "Economic Foundation", 29

২৫. Rungta, *Rise of Business Corporations*, 19.

২৬. ঐ।

অগ্রণী বাঙালি উদ্যোক্তারা রাজধানীর বৃটিশ 'স্বাধীন ব্যবসায়ীদের' সঙ্গেই নিজেদের জড়িত করেছিলেন এবং সম্মিলিতভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। দ্বারকানাথ রপ্তানিমুখী খাতগুলোর বিকাশ এবং বিশ্ববাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কামনা করতেন। তিনি চাইতেন যে, এতে বৃটিশ পুঁজি, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বাংলায় আসবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে শিক্ষিত, সংস্কারকামী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হবে।[২৭]

ঠাকুর পরিবার ছাড়া কলকাতায় ঐ সময়ে প্রভাবশালী বাঙালি বণিক পরিবার আরো ছিল, যেমন রামদুলাল দে, দিগম্বর মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী। মুখার্জি অন্তত 'পাঁচটি বড় দল' সনাক্ত করেছেন, যারা কলকাতায় উচ্চ মর্যাদা অর্জন ও সহায়-সম্পদ নিয়ন্ত্রণের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল।[২৮] এঁরা হলেন ঠাকুর পরিবার, রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দে, বিশ্বনাথ মতিলাল ও কালীনাথ মুন্সি। আরো কিছু ছোট দল ছিল শিবনারায়ণ ঘোষ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিবার, পাথুরিয়াঘাটা ও চোরবাগানের (যা ছিল সুবর্ণ বণিকদের এলাকা) মল্লিক পরিবার, নীলকমল ব্যানার্জি প্রমুখের নেতৃত্বে। এসব দল সৃষ্টির মূলে ছিল এক নব্য ধনিকগোষ্ঠীর উদ্ভব, যাদের ধনাগম ঘটেছিল অংশত জমি এবং তার সঙ্গে

২৭. আঠারো শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে পুঁজির চাহিদা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। ইউরোপীয় পরিচালনাধীন কলকাতাকেন্দ্রিক এজেন্সি হাউজের সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে এই চাহিদাবৃদ্ধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। ১৯০০ সালে এরকম এজেন্সির সংখ্যা ছিল ১৫টি; ১৮২৮ সালে ২৭টি, ১৮৩৫ সালে ৬১টি, ১৮৪৬ সালে ৯৩টি। অবশ্য এসব এজেন্সির হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র ছিল বড় আকারের প্রতিষ্ঠান; অধিকাংশের কর্মকাণ্ডই ছিল সীমিত পরিসরের এবং পুঁজি ছিল স্বল্প (Kling 1975, 29)। Buchanan (1966) ও ইঙ্গিত করেছেন যে, ইউরোপীয় 'free merchants'রা যখন ভারতের মাটিতে পা দেয়, তখন তাদের ছিল সামান্যই পুঁজি। নীলচাষের কুঠিয়ালদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'কুঠিয়ালরা কদাচিৎ ইউরোপ থেকে পুঁজি নিয়ে আসতো। ১৮৩০ সালের আগে কেউই পুঁজি নিয়ে আসে নি। পরিবর্তে ভারতীয়দের, কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারী অথবা কলকাতার এজেন্সি হাউজের কাছ থেকে এরা পুঁজি সংগ্রহ করতো' (৩৭)। এটা বোঝা শক্ত দ্বারকানাথ যখন 'মুক্ত-বাণিজ্য সাম্রাজ্যবাদের' পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, তখন তিনি এর সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কিনা। এই মুক্ত-বাণিজ্য সাম্রাজ্যবাদই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের অবরুদ্ধ শিল্পবিকাশের জন্য দায়ী। এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, দ্বারকানাথ ও রামমোহন বৃটিশ শাসনের ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। কিন্তু সম্ভবত আধুনিকীকরণের দায়দায়িত্ব নেয়া এলিটের অংশ হিসেবে তারা মনে করেছিলেন যে, ভারতের জন্য উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত ছক হবে সহযোগিতা ও সংঘাতের একটি ছক। একে স্থানীয় এলিট গোষ্ঠীর 'আধুনিকীকরণ প্রকল্প'ও বলা যেতে পারে, যে প্রকল্পের মোদ্দা কথা ছিল বৃটিশ পুঁজির সাথে সমান শর্তে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কে অংশ নেয়া।

২৮. S.N. Mukherjee, "Daladali in Calcutta in the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 9·1 (1975), 71.

বাণিজ্য ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে যৌথ কারবার থেকে। এদের অবস্থান ছিল সাবেকি সামন্ত অভিজাত শ্রেণী ও কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের মাঝামাঝি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশের একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক ছিল আধুনিক শক্তিচালিত স্থায়ী কারখানা স্থাপনে অংশগ্রহণ। এরা পুঁজির জন্য রপ্তানিশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতো। এসব লক্ষণ বিবেচনায় ক্লিং মন্তব্য করেছেন যে, ১৮৪০ সালে কলকাতা 'একটা ছোট আকারের শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে' ছিল।[২৯] ১৮৪৪ সালে জে. এইচ. স্টককুয়েলার নামে একজন সাংবাদিক লিখেছেন, "কলকাতায় প্রবেশ করতে নদীর দুই ধারে চতুর্দিকেই চোখে পড়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধোঁয়াউঠা চিমনি, অসংখ্য কারখানার সমাবেশ, আর এগুলো নিয়েই বহু বৃটিশ শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা।"[৩০] ঐ সময় বৃটেনের সব ক'টি উপনিবেশের মধ্যে বাংলা ছিল বাষ্পশক্তির ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে। নদী ও সমুদ্রগামী স্টিমার, মালবাহী জাহাজ, চিনি শোধনাগার, জাহাজ মেরামতি, কয়লাখনি, আটা ও চাউলকল, রেশমশিল্প ও কাগজকলে এবং সুতাকাটা, বয়ন ও সুতীবস্ত্র রং করা প্রভৃতি কাজে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহৃত হতো এবং 'সবই ছিল কলকাতার আশেপাশে।'[৩১] উনিশ শতকের অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কলকাতার উত্তরে হুগলী নদীর ধার ধরে হুগলী, হাওড়া, শিবপুর ও সুলকিয়ার শহরতলীতে কারখানার বিস্তার ঘটে। এসব এলাকায় গড়ে উঠে চিনিকল, রাম ডিস্টিলারি, সুতার টাকু তৈরির কারখানা, বিস্কুট ফ্যাক্টরি, চালকল, সরিষা ভাঙার কল, বাষ্পশক্তিচালিত লোহাঢালাই কারখানা, কাগজকল প্রভৃতি।

১.৩ ১৮৪৭ সালের ধ্বস এবং বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণীর সঙ্কট

বাঙালি উচ্চবর্ণের বণিকদের এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই শ্রেণীর বিলুপ্তির কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। সম্ভবত এদের অভাবিতপূর্ব পতনের একাধিক কারণ একত্রে দেখা দিয়েছিল। প্রথম কারণ হলো ১৮৪৭ সালের একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সঙ্কট, যার ধাক্কায় রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলো ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ধ্বসে পড়েছিল। এসব কোম্পানির দায় সীমাবদ্ধ ছিল না (সীমাবদ্ধ দায়ভিত্তিক কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয় ১৮৫০-এর দশকে)। সঙ্কটটা শুরু হয়েছিল বৃটেনে রেলপথ নির্মাণের হিড়িক পড়ার এবং রেলশেয়ারের আকস্মিক পতনের ফলে। এতে বিশ্বব্যাপী সকল উপনিবেশ থেকে পণ্যপরিবাহী

২৯. Kling, "Economic Foundations", 29.

৩০. ঐ।

৩১. Buchanan, *Capitalistic Enterprise*, 127-28.

জাহাজকোম্পানিগুলো দেউলিয়া হয়ে পড়ে। কলকাতার বাণিজ্যিক এজেন্টদের অধিকাংশই নীলচাষের উপর নির্ভর করে তাদের পুঁজি খাটিয়েছিল, ফলে তাদের সর্বাধিক ক্ষতি হয়। গত শতকের মধ্য-চল্লিশের দশকের বাণিজ্যসঙ্কট বৃটিশ ও স্থানীয় উভয় পুঁজিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন দেখা দেয়, বাঙালি বণিক শ্রেণীর ধ্বংস এতটা ব্যাপক হয়েছিল কেন যার ফলে সকল বাঙালির 'বাণিজ্যিক উদ্যম' প্রায় উবে গেল ? ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জোর দিয়েই বলা যায় যে, প্রথমদিকের বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক ভিত্তি ছিল সঙ্কীর্ণ। অনেকটা এ কারণে ১৮৪০-এর দশকের আকস্মিক পতন অনেক পর্যবেক্ষকের কাছে বাঙালি ধনিক শ্রেণীর 'বাণিজ্যিক উদ্যমের' অবসানের করুণ যুগের সূচনা বলে মনে হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি বণিকদের সঙ্কীর্ণ সামাজিক ভিত্তির কারণ একাধিক এবং এ বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সর্বাগ্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো আঠারো শতকের শেষার্ধে দাদনি বণিকদের প্রায় যুগব্যাপী ক্রমপতন। দাদনি বণিকরা গোমস্তাদের মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভোগী চাকুরে ছিল না। এরা ছিল স্থানীয় স্বাধীন ব্যবসায়ী। চুক্তিভিত্তিতে কোম্পানির কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে এরা ব্যবসা করতো, তবে লাভ-লোকসানের দায় ছিল সম্পূর্ণ নিজেদের। চুক্তিভিত্তি- বাণিজ্যে কোম্পানির সঙ্গে উৎপাদকদের কোনো সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। দাদনি বণিকরা প্রাথমিক ধনতন্ত্রের সনাতনী 'পুটিং আউট মারচেন্ট'দের ভূমিকা পালন করতো। এরকম চুক্তিপদ্ধতি শুরু হয়েছিল সতেরো শতকে এবং আঠারো শতকের প্রথমার্ধে। কোম্পানির বাণিজ্যে তা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে ১৭৫০ সালের আগেই এই পদ্ধতির উপর আঘাত আসে এবং ১৭৫৩ সালে কোম্পানি তা পরিত্যাগ করে। তখন থেকে পণ্যসংগ্রহের জন্য কোম্পানি 'এজেন্সিপ্রথা' গ্রহণ করে।'[৩২] এটা কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো, বিশেষত গোমস্তাদের দ্বারা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 'দালাল' বা 'পাইকার' বলে অভিহিত মধ্যস্বত্বভোগীদের কাজে লাগানো হতো। এজেন্সিপ্রথা প্রবর্তনের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে কোম্পানির মনোপলি কায়েম হয়। ফলে স্থানীয় উৎপাদকরা কোম্পানির গোমস্তাদের উৎপীড়নের শিকার হয়। বিশেষত ১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে কোম্পানির ক্ষমতা ও প্রভাব প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় গোমস্তারা উৎপাদকদের উপর একতরফা কঠিন কঠিন শর্ত আরোপ করতে থাকে। গোমস্তাদের পিছনে ছিল রেসিডেন্ট ও কোম্পানির অন্যান্য জুনিয়র অফিসার।

পুরনো 'চুক্তিপদ্ধতি'র পরিবর্তে পুরোপুরি 'এজেন্সিপ্রথা' প্রবর্তন বাঙালি ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিকাশকে দারুণ প্রভাবিত করে। স্বাধীনচেতা দাদনি ব্যবসায়ীরা ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোম্পানির চাকুরি নিলেও অধিকাংশই ব্যবসা ত্যাগ করে। ফলে আঠারো শতক শেষ হওয়ার আগেই গোমস্তারা বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধান চরিত্ররূপে আবির্ভূত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সরাসরি পূর্বসূরি হলো এই গোমস্তাকুল। বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত দাদনি ব্যবসায়ীদের পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। বিষয়টা গবেষণাসাপেক্ষ। তবে নিঃসন্দেহে দাদনিদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ খুব সহজে ঘটে নি। কোম্পানি আমলে মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প সম্পর্কে কে. এম. মহসীনের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ১৭৭১ সাল পর্যন্ত দাদনি ব্যবসায়ীরা তাদের হৃত অবস্থা ফিরে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে। কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা বুঝতে পারেন যে, এজেন্সিপ্রথা দুর্নীতি ও অসৎ কারবারের জন্ম দিয়েছে। ফলে অন্তত রেশমি কাপড় ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনের বিষয় কোম্পানি বিবেচনা করেছিল। এই সুযোগে দাদনি ব্যবসায়ীরা তাদের হৃত অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানির কাছে বেশ কিছু দাবি জানায়। সবচেয়ে জোরালো দাবিটি ছিল, 'কোম্পানির নিযুক্ত সকল গোমস্তাকে প্রত্যাহার করতে হবে।' তারা কোম্পানির একতরফা মূল্য নির্ধারণের অবসান দাবি করে। তাদের আরো দাবি ছিল, চুক্তিতে বর্ণিত মানের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের কাপড় দিলে বোনাস দিতে হবে এবং তার চেয়ে নিম্নমানের কাপড় দিলে ব্যবসায়ীরা কোম্পানিকে আনুপাতিক মূল্য ফেরত দেবে। রেশমি কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রধান প্রধান দাদনি ব্যবসায়ী ছিল বাঙালি এবং এদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই উচ্চবর্ণের। কৃষ্ণ শর্মা, নন্দলাল শর্মা, কৃষ্ণ চন্দ্র, বৈদ্যনাথ, ইন্দ্রনারায়ণ দত্ত, রামকৃষ্ণ দাস, জগৎ কুণ্ড, কৃষ্ণকান্ত, রাধা মাধব, জগন্নাথ দাস, গৌর চৌধুরী প্রভৃতি নামের তালিকা থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। কোম্পানির 'ক্যালকাটা কাউন্সিল' সঙ্গে সঙ্গেই এদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৭৭৬ সালে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী (কোর্ট অব ডিরেক্টরস) সংস্কারকে কেবল এই বলে সমর্থন করে যে, "কোম্পানিকে পণ্য সরবরাহ করার মতো যোগ্য কোনো 'দেশী' ব্যবসায়ী নেই।"[৩৩] শিল্প ও বাণিজ্যে স্বাধীনচেতা দাদনি ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের ফলে বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণীর সামাজিক ভিত্তি বহুলাংশে দুর্বল হয়ে যায়। এর পরে পরেই ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব ভারতের কয়েকজন বড় বণিকের পতন ঘটায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মালিকানাধীন (যেমন সুবর্ণ বণিক) দেশজ ব্যাঙ্কিং হাউজগুলোর ক্রমাবনতির পাশাপাশি ১৮০৯ সালে

---

৩৩. প্রাগুক্ত

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল গঠন কলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সামাজিক ভিত্তি আরও দুর্বল করে দেয়। ব্যবসার বিভিন্ন চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে বৃটিশ উদ্যোক্তারা যতোই অর্থনীতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করে, ততোই বাঙালি ব্যবসায়ীদের স্বাধীনচেতা অংশটি কোম্পানির পোষা বানিয়াদের হাতে তাদের অবস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এক নির্মম অসম প্রতিযোগিতা ও শাসকদের তীব্র চাপের মধ্য দিয়ে। দাদনি ব্যবসায়ী ও দেশজ ব্যাঙ্কারদের ক্রমঅবলুপ্তির ফলে সামাজিক ক্ষতি ছিল বিরাট, যা কোম্পানির পোষ্য বানিয়াদের থেকে উদ্ভূত বিখ্যাত কলকাতা বণিকগোষ্ঠীর সাফল্য দিয়েও কখনো পূরণ হয় নি। এজেন্সি হাউজ উদ্যোক্তাদের নবোদ্ভূত শ্রেণীটি আগাগোড়াই সঙ্কীর্ণ সামাজিক ভিত্তিজনিত দুর্বলতায় ভুগেছে। কোম্পানি শাসনের কারণে বাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিপুল অংশ পেশাচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এজেন্সি হাউজগুলো ছিল এই স্বাধীন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। লন্ডন শেয়ারবাজারের পতনের ধাক্কায় এই হাউজগুলোই শুধু দেউলিয়া হয় নি, গোটা বঙ্গীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে। মধ্য উনিশ শতকের ঐ ধ্বসের পরবর্তী কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ক্লিং তা বর্ণনা করেছেন এভাবে : "(লন্ডন) ধ্বসের পরে ব্যবসায়ীরা তাদের ভাগ্যবিপর্যয়কে মেনে নিল এবং কলকাতা হয়ে দাঁড়ালো বিশুদ্ধ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় একটি পরগাছা নগরী, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রজননভূমির পরিবর্তে ঔপনিবেশিক শোষণের স্নায়ুকেন্দ্র।"[৩৪]

১.৪ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির শিল্প-বাণিজ্যউদ্যোগ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির পুঁজি প্রধানত জমি ও অবাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োজিত হয়। বিনিয়োগচরিত্রের এই পরিবর্তন শিল্প-বাণিজ্যউদ্যোগের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৫০-এর পরবর্তী তিন দশকে বাংলায় একদিকে ছোট ছোট জমিদার ও অন্যদিকে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু) 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এর একাধিক কারণ আছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতেই সরকারকে দেয় রাজস্ব (১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী) ও প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত খাজনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়।"[৩৫] ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন 'দখলিস্বত্বের' সঙ্গে প্রকৃত চাষাবাদকে যুক্ত করে নি। বিপরীতে ঐ আইনের ফলে এমন একটি রাজনৈতিক-আইনগত কাঠামো গড়ে উঠেছিল যার ফলে 'দখলি রায়ত'দের মধ্যে অকৃষক লীজপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক

৩৪. Kling, "Ecnomic Foundations", 37-38.

৩৫. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, S. Islam, *Rent and Raiyat*, (Dhaka 1987).

বেশি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে 'বিরাট এক খাজনাভোগী স্বার্থের কাঠামো' গড়ে উঠতে দেখা যায়।[৩৬] এভাবে ছোট আকারের ভূসম্পত্তির মালিক খাজনাভোগী একটি শ্রেণীর ব্যাপক ভিত্তিক প্রসারের পাশাপাশি ক্রমে গড়ে উঠে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু) 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী', যারা অবাণিজ্যিক পেশাগুলোতে নিয়োজিত হয়। কোম্পানিশাসনের শেষদিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্রের আরো বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কারণে এ ধরনের পেশায় পদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এই নতুন অবাণিজ্যিক পেশার সুযোগবৃদ্ধির ফলে ছোট তালুকের মালিক খাজনাভোগী শ্রেণীই (ক্ষুদে ভূস্বামী ও জমিদার) সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। চাকুরিতে প্রবেশের একমাত্র উপায় ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা ঐ একই গোষ্ঠীর করায়ত্ত থাকে, যারা ক্রমে বাঙালি ভদ্রলোক বলে পরিচিত একটি মর্যাদাবান গোষ্ঠী হিসেবে দেখা দেয়। একদিকে অকৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ভূসম্পত্তির মালিকানা চলে আসা এবং অন্যদিকে তাদেরই চাকুরিপেশায় প্রবেশ বাঙালি পুঁজির স্থানান্তরে বিরাট ভূমিকা রাখে। একই ব্যক্তিকে খাজনাভোগী জমিদার ও চাকুরিজীবী উভয় ভূমিকায় দেখা যায় যদিও কোন্ উৎস থেকে আয় বেশি বা কম আসছে তা নির্ভর করে ব্যক্তি বা পরিবারটি নগরকেন্দ্রের না মফস্বলের, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উচ্চস্তরের না নিম্নস্তরের তার উপর। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশের, বিশেষত মফস্বলের চাকুরিজীবীদের আয়ের প্রধানতম উৎস ছিল জমির খাজনা। পক্ষান্তরে বেশ কিছু ছোট জমিদার খাজনার অর্থ দিয়ে সংসারও ভালভাবে চালাতে পারতো না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পরিস্থিতি মধ্যবিত্তের ঐ জমি-চাকুরি সংযোগটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। রেল ও জাহাজ চলাচলের উন্নতির ফলে যোগাযোগব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং 'মুদ্রা অর্থনীতি' (Money Economy) দুঃখজনকভাবে শিল্পের কদর না বাড়িয়ে বরং জমির দাম বাড়িয়ে দিয়ে জমিতে বিনিয়োগ খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বাঙালি পেশাজীবী ও কর্মচারীদের বেতনের উদ্বৃত্ত টাকা প্রধানত জমিতে বিনিয়োজিত হতে থাকে। বাঙালি বিত্তবান শ্রেণীর অবাণিজ্যিক মনোবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় রেলপথ নির্মাণের প্রথম পর্বে (১৮৪০-৫০), পুঁজি সংগ্রহের জন্য ছাড়া রেলশেয়ার ক্রয়ে তাদের অনীহা থেকে।[৩৭]

---

৩৬. S Islam, *Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interests*, (Calcutta 1986), Chapters 2 and 3.

৩৭. ১৮৫৪ সালের ৩০মে'র একটি চিঠিতে লর্ড ডালহৌসি স্যার চার্লস উডকে লিখছেন : 'স্থানীয় পুঁজিপতিরা রেলওয়ের কোন শেয়ার কিনবে না। সুতরাং আপনার হিসেব থেকে তাদের বাদ রাখতে পারেন।' এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের থেকে পুঁজি সংগ্রহ করেই রেলওয়ে নির্মাণ করতে হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে বলা দরকার যে, রেলওয়ের শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগে ইংল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা গিয়েছিল কেবলমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক ন্যূনতম ৪.৫ থেকে ৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করার ফলেই। অন্তিম বিচারে অবশ্য ভারতীয় করদাতারাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক উপরোক্ত লভ্যাংশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যুগিয়েছিল।

তবে ক্রমশ তারা বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে তোলে। অবশ্য তা সীমিত ছিল সরকারি বন্ড ও সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের মধ্যে। কেননা এতে সুদের হার আকর্ষণীয় ছিল। তাদের এই বিনিয়োগ প্রধানত জনসেবামূলক খাতের বিকাশে সাহায্য করেছিল। সরকার এ খাতেই অধিকাংশ সঞ্চয়পত্র ছাড়তো। বিভিন্ন সময়ে বিত্তবানরা বেসরকারি কোম্পানিগুলোর বন্ড ও শেয়ারেও পুঁজি খাটায়। পাট, কয়লা ও চা-বাগান খাতে তৎপর এসব কোম্পানি তখন পর্যন্ত প্রায় একচেটিয়াভাবে ছিল বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জমির মালিকানা, অবাণিজ্যিক পেশা, সরকারি ঋণ ও সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ ইত্যাদি খাতে বাঙালি পুঁজি স্থানান্তরের ক্রমবর্ধমান ঝোঁককে সহজাত উৎপাদনবিমুখ প্রবণতার নিদর্শন বলে গণ্য করা উচিত নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৮২) পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, তথাকথিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী পুরোপুরিভাবে ঔপনিবেশিকতা কর্তৃক আরোপিত পরিস্থিতির ফসল : জমি ভোগদখলের ব্যবস্থা এবং দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় প্রবেশের ব্যাপারকে নিরুৎসাহিতকরণ ও দেশজ প্রস্তুতকরণশিল্পের ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে এমন এক মৌলিক প্রবেশের ব্যাপারকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং দেশজ প্রস্তুতকরণশিল্পের ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে এমন এক মৌলিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠে, যা থেকে জন্ম নেয় সামাজিক উৎপাদনপরিবেশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা এবং এ ব্যাপারে একেবারে আগ্রহহীন কমিশন আদায় ও ভোগকারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই শ্রেণী।"[৩৮] সে সময়ে পূর্ব ভারতে বিদ্যমান সার্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অবশ্য কিছু কিছু নিদর্শন থেকে দেখা যায় যে, বাঙালি উদ্যোক্তারা আধুনিক খাতসমূহেও প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। এ নিদর্শন অসম্পূর্ণ হলেও এ সময়ে বাঙালি শিল্পোদ্যোগে ঘাটতির সকল দায় বর্ণগত সঙ্কীর্ণতা বা 'মূল্যবোধের' উপর ঢালাওভাবে চাপিয়ে যে প্রচলিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা সংশোধনের জন্য এটা যথেষ্ট।

কয়লাশিল্পে বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য থাকলেও এই খাতে বাঙালি পুঁজির উপস্থিতি একেবারে অনুল্লেখযোগ্য ছিল না। এস. কে. সেনের বিবরণ (১৯৮১) থেকে দেখা যায় যে, "বস্তুত গোটা কয়লাশিল্প বাঙালি পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল" (পৃঃ ৭০)। ১৮৯৭ সালে বর্ধমান বিভাগে ভারতীয় মালিকানায় ৪০টির মতো কয়লাখনি ছিল। এর মধ্যে অবাঙালিরা যুক্ত ছিল মাত্র দু'টির সঙ্গে। এসব খনির অধিকাংশই ছিল ছোট এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন। তবে কমপক্ষে ৪টি বাঙালি কোম্পানি আর. এল. দত্ত এন্ড কোং, ভোলানাথ ধর এন্ড কোং, যজ্ঞেশ্বর রায় এন্ড কোং এবং নায়েক এন্ড কোং এখানে তৎপর ছিল। অনুরূপভাবে ১৮৯০-এর দশকের শেষ নাগাদ ছোট নাগপুরের মানভূম

৩৮. P. Chatterjee, "Agrarian Structure in Pre-partition Bengal", in *Perspectives in Social Sciences, 2: Three Studies in the Agrarian Structure in Bengal,* (Calcutta 1982), 121-122.

জেলায় বাঙালি মালিকানাধীন ৬২টির মতো খনি ছিল (প্রাগুক্ত)। বাঙালি কয়লাখনিমালিকদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন এ. সি. লায়েক এবং এন. সি. সরকার। যাদব ব্যানার্জির সাথে মিলে এ. সি. লায়েক ঝারিয়ায় সর্বপ্রথম কয়লাখনি চালানোর উদ্যোগ নেন। এন. সি. সরকার তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানিতে (একটি বৃটিশ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান) কেরানি হিসেবে। তিনি চারটি কয়লাখনি কিনেন। পরবর্তী বছরগুলোতে এন. সি. সরকার এন্ড সন্স ম্যানেজিং এজেন্ট হিসেবে ৮টি কয়লাকোম্পানির নিয়ন্ত্রণভার লাভ করে এবং আধুনিক ধারার অন্যান্য শিল্পখাতেও প্রভাববিস্তার করে (ইটখোলা, চুনা ও সিমেন্ট কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি)। অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে এসমস্ত কয়লাখনির জন্য বিপুল পুঁজির প্রয়োজন ছিল না। বাঙালি পুঁজির মালিকানাধীন অধিকাংশ খনি ছিল পিট কয়লার ছোট খনি। সবচেয়ে ভাল কয়লাখনিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলো।

এই সময়ে চা-বাগান খাতেও বাঙালি পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি চা-কোম্পানির অধিকাংশই ছিল বাঙালি মালিকানায়। অধিকাংশ বাঙালি উদ্যোক্তা ছিলেন শহুরে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর', যেমন আইনজীবী জয় চন্দ্র সান্যাল ছিলেন ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জলপাইগুড়ি টি কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালক। চায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন গোপাল ঘোষ (তিনি সরকারি অফিসে কেরানি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে ৬টি চা-কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন), তারিনি প্রসাদ রায় (তিনি ১৮৮৯ সালে আঞ্জুমান টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পর্যায়ক্রমে ১৬টি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন), প্রসন্ন দেব রায়কত (বিশিষ্ট জমিদার এবং একাধিক চা-কোম্পানির উদ্যোক্তা) প্রভৃতি। একাধিক কারণ এই খাতে বাঙালি পুঁজি প্রবেশের সুযোগ এনে দিয়েছিল। খাস জমিতে চাষ হতো, যা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করা যেতো। এছাড়াও চা-বাগান চালু করতে বড় ধরনের পুঁজি লাগতো না। উৎপাদনপ্রক্রিয়া ছিল সরল ও সস্তা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ আদিবাসী শ্রমিকের কোনো ঘাটতি ছিল না।

অন্যান্য খাতে বাঙালি পুঁজি একেবারে অকিঞ্চিৎকর ছিল না। এগুলোর মধ্যে ছিল সাধারণভাবে অবাঙালিদের প্রাধান্যপুষ্ট পাট ও সুতীবস্ত্র শিল্প। এ ব্যাপারে কয়েকটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কলকাতা থেকে হুগলী নদীর কয়েক মাইল উজানে রিষড়ায় ১৮৫৪ সালে ভারতের পাটকল স্থাপিত হয়। এই মিল প্রতিষ্ঠায় জর্জ অকল্যান্ডকে সাহায্য করেছিলেন বিশ্বম্ভর সেন; এই প্রথম উদ্যোগে তিনি আধাআধি অংশীদার না হলেও একজন গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। সে সময়ে বওরিয়া কটন মিল ও ফোর্ট গ্লসটার জুট মিল নামে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মিল স্থাপনে বাঙালি পুঁজি জড়িত থাকার আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শ্যাম রুংটা (১৯৮৫)। এই বিবরণে দেখা যায় যে, ১৮৭৩ সালের ৯ অক্টোবর বওরিয়া

কোম্পানির মোট ৯৯ জন শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন বাঙালি।[৩৯] এম.এন. দাস ছিলেন এই কোম্পানির একমাত্র সেলস এজেন্ট। বাঙালি শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা ১৮৭৩ সালের ৭ জন থেকে বেড়ে ১৮৮০ সালে ৫১ এবং ১৮৯০ সালে ৫৩ জনে দাঁড়ায়। ফোর্ট গ্লসটার জুট ম্যানুফেকচারিং কোম্পানির প্রথম তালিকাতেও অনুরূপ চিত্র দেখা যায়। ১৮৭৪ সালে এর শেয়ারহোল্ডার ছিলেন ১১৯ জন। এঁদের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন বাঙালি।[৪০] ফোর্ট গ্লসটার মিলে বাঙালি শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা বেড়ে ১৮৯০ সালে ২০ জনে দাঁড়ায়।

এসমস্ত মিলের হিসাব থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালি পুঁজির বিশিষ্ট অবস্থান কালের বিবর্তনে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল এবং ১৮৯০ সাল নাগাদ বিদ্যমান বাণিজ্যের দৃশ্যপটে মাড়োয়ারিদের প্রাধান্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। 'দেশীয় শেয়ারদালাল'দের পরিবর্তিত অবস্থানের মধ্যেও এই ঝোঁক দৃঢ়ভাবে ধরা পড়ে। থ্যাকারের *বেঙ্গল ডিরেক্টরি* ১৮৭৫-এ 'দেশীয় শেয়ারদালাল'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নামগুলোর প্রায় সবাই বাঙালি। এতে ধারণা করা যায় যে, মাড়োয়ারিরা সে সময় পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নি। অবশ্য পরবর্তী দুই দশকে মাড়োয়ারিরা কলকাতার শেয়ারবাজারে দালাল ও ফটকাবাজ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করে।

এই আলোচনা থেকে সাধারণভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বেরিয়ে আসে—কেন বাঙালিদের পরিবর্তে মাড়োয়ারিরা বাংলার সম্প্রসারমান বাণিজ্যিক সুবিধার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে এবং তিন দশকের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নেতৃত্বদানকারী, উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছিল ? কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (বিশেষকরে পাট) নিয়ন্ত্রণ করতো—একে শুধু দূরকল্পী প্রশ্নরূপে গণ্য করলে চলবে না। বাংলায় মাড়োয়ারি পুঁজির অভ্যুদয় পরিষ্কারভাবে বাণিজ্যিক পুঁজি থেকে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলে। মড়োয়ারিরা প্রথমে পাট ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ১৮৮০ সাল নাগাদ তারা তাতে সফল হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশিষ্ট কাঁচা পাট রপ্তানিকারকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা একাধিক জুট প্রেসিং ও বেলিং কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ক্রমেই প্রভাবশালী হয়ে উঠে। কলকাতা স্টক মার্কেটে দালাল ও ফটকাবাজ হিসেবে তাদের গুরুত্ব অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তাদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। আর. এস. রুংটা (১৯৭০) উল্লেখ

---

৩৯. S. Rungta, "Bowreah Cotton and Fort Gloster Jute Mills, 1872-1900", *The Indian Economic and Social History Review*, 22: 2, (1985), 114.

৪০. ঐ।

করেছেন যে, 'মাড়োয়ারিদের কান মাটিতে ছিল বিধায়' তারা 'শেয়ারবাজারে প্রভাব সৃষ্টিকারী খবর সবার আগে পেতো এবং গুজব ছড়িয়ে বাজারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজে তাদের সাথে কেউ পেরে উঠতো না।'[৪১] সুতীবস্ত্রকলের তুলনায় পাটকলের শেয়ারের ব্যাপারে মাড়োয়ারিদের অধিকতর আগ্রহের কারণও এই ছিল যে, সে সময়ে কলকাতার শেয়ারবাজারে পাটকলের শেয়ার নিয়ে বেশ জোরালো লেনদেন হতো। এর সাথে ফটকাবাজিতে তাদের প্রবাদতুল্য আগ্রহের কথাও যোগ করা যায়। যেমন, ১৮৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে 'যখন কলকাতার শেয়ারবাজার ছিল স্বর্ণখনি কোম্পানিগুলোকে নিয়ে ফটকাবাজিতে ভরপুর, তখন এমনকি ইউরোপীয়রাও বাজার থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা লোটার ব্যাপারে তাদের দক্ষতা দেখে তাজ্জব বনে যেতো।'[৪২]

মাড়োয়ারি পুঁজির উত্থান সমকালীন পর্যবেক্ষকদের নজর এড়িয়ে যায় নি। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে : "প্রায় এই সময়ে (১৮৯১-৯২) আরেকটি বিষয় আমার চিন্তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করতে শুরু করে ... দুঃসাহসী অবাঙালিরা, বিশেষকরে রাজপুতনার বন্ধ্যা মরুভূমি থেকে আগত মাড়োয়ারিরা শুধু কলকাতায় নয়, বরং বাংলার অভ্যন্তরেও ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করছিল এবং আমদানি ও রপ্তানির সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিচ্ছিল।"[৪৩] সে সময়কার উচ্চবর্ণের বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর ভাবাদর্শে এর প্রতিক্রিয়া কতটুকু স্থান পেয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, বিশেষকরে পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে মাড়োয়ারি পুঁজির প্রাধান্যের বিষয়টি (গোড়া থেকে পাট ব্যবসায়ে বাঙালি পুঁজির উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের কথা বিবেচনায় আনলে) আরও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের ভূমিকা মূলত সীমাবদ্ধ থাকলেও তারা এক সময়ে এর মধ্যে ভাগ্যের আনুকূল্য বেশ ভালভাবেই লাভ করেছিল। ঢাকা বিভাগ সংক্রান্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৮৭২-৭৩ সাল নাগাদ 'দেশজ উৎপাদিত পণ্য কেনার জন্য বিপুল অংকের টাকা দেশে আসছে। এর একটা বড় অংশ তাদের হাতে চলে যাচ্ছে, যারা চাষীদের কাছ থেকে রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়।"[৪৪] পাট অর্থনীতির অধিকাংশ মুনাফা ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যেতো। কারণ 'কৃষকরা সচ্ছল এবং শিক্ষিত হলেই কেবল' তাদের পক্ষে 'সঠিক সময়ে বিক্রি এবং সঠিক পরিমাণ জমি চাষ করে' বৈদেশিক বাণিজ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। সাধারণত বাজারের সংকেত আসতো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এবং 'ব্যাপারী বা মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রায়ই বাংলার সাধারণ কৃষকদের প্রতারণা করতো'।

৪১. Rungta, *Rise of Business Corporations*, 166.
৪২. ঐ।
৪৩. Sarkar, *Swadeshi Movement*, 94.
৪৪. A Sen, 'Agrarian Structure and Tenancy Laws in Bengal, 1850-1900", in *Perspectives*, (Calcutta), 17.

এফ. এইচ. বি. স্ক্রাইনের ১৮৯২ সালের মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা হয়েছে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পাট ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে কিভাবে পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন শহরের বিকাশ ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে অবক্ষয়ের পর ঢাকা 'পাট ব্যবসার মধ্যে তার সাবেক অবলম্বন রেশম ও মসলিনের বিকল্প খুঁজে পেয়েছিল'। নারায়ণগঞ্জ ছিল 'পাট বেলিংয়ের বৃহত্তম কেন্দ্র'। স্ক্রাইন সিরাজগঞ্জকে 'ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে পাট ব্যবসা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কেন্দ্র' বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র করের *Report on the Cultivation of Jute in Bengal*-এর কথা স্মরণ করা যায়। তাতে তিনি ১৮৭৭ সালে পাট উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মাঝে বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী মধ্যস্বত্বভোগীসহ বাংলার পাট ব্যবসার সক্রিয় নেটওয়ার্কের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

কয়েকটি কারণে পাট ব্যবসায়ে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে মাড়োয়ারিদের অভ্যুদয় ঘটে। এক্ষেত্রে নিয়োজিত বাঙালি ব্যবসায়ী পুঁজি ছিল অল্প। তাই তারা ছিল প্রতিকূল অবস্থানে। পক্ষান্তরে বানিয়া মাড়োয়ারির পুঁজি বেশি থাকায় সে একই সঙ্গে মহাজন ও আড়তদারের কাজ করতে পারতো; সে একজন বেলার এবং কলকাতাভিত্তিক পাটকলগুলোতে একজন সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করতে পারতো; এমনকি ডান্ডিভিত্তিক পাট প্রস্তুতকারকদের কাছে সে কাঁচাপাট রপ্তানি করতে পারতো। তদুপরি পাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত অধিকাংশ বাঙালি ব্যবসায়ী ছিল সাহা শ্রেণীর নিম্নবর্ণের হিন্দু। পূর্ববঙ্গের কিছু অংশে বাঙালি মুসলিমরাও পাট ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। বিপরীত পক্ষে, অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু তাদের 'উদ্বৃত্ত' নিয়ে লাভজনকভাবে জমির মালিকানা ও অবাণিজ্যিক পেশাব ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। 'নিচের দিক থেকে পুঁজিবাদ' বিকাশের ক্ষেত্রে এর অন্তত তিনটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। প্রথমত, শহরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 'বৃহৎ' বাঙালি পুঁজি পাট ব্যবসার উচ্চ পর্যায়ে কার্যত অনুপস্থিত ছিল। ১৮৬০-এর দশকের শেষার্ধে ও ১৮৭০-এর দশকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বাইরে থেকে আগত মাড়োয়ারি পুঁজি ব্যাপকভাবে এই শূন্যস্থান পূরণ করে।[৪৫] দ্বিতীয়ত, ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে জমি ও অবাণিজ্যিক পেশার দিকে ধাবিত 'বৃহৎ' বাঙালি পুঁজি পরবর্তীকালে ভদ্রলোক শ্রেণীর আবির্ভাবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জন্ম থেকে বর্ণগতভাবে স্পর্শকাতর এই শ্রেণী সাধারণভাবে উৎপাদক শ্রেণীর সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে। এমনকি নিম্নবর্ণের ব্যাপারি ও ফড়িয়াদেরকে অচ্ছ্যুৎ বলে গণ্য

৪৫. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি *ভদ্রলোক*-সংস্কৃতি থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি *বাবু* সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েছে। বাবুরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত ছিলেন না। নীল ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে বাবুদের অংশগ্রহণ এই সূত্রে মনে পড়বে। পক্ষান্তরে, ভদ্রলোক-সংস্কৃতির মধ্যে শিল্পোদ্যোক্তাবিরোধী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজি ভাষা অধ্যয়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা অর্জন করার সুবাদেই ভদ্রলোকের মর্যাদা অর্জন করা যেতো। পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিচরণ ছিল নিতান্তই বিরল, তার কারণও সম্ভবত ভদ্রলোকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নিহিত।

করা হতো। সাহা সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কিরকম হেয় চোখে দেখা হতো এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ তারা প্রায়ই বাণিজ্য ও মহাজনির ক্ষেত্রে মাড়োয়ারিদের সাথে প্রতিযোগিতা করতো।[৪৬] এই বর্ণগতভাবে স্পর্শকাতর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনাতেও বিদ্যমান থাকায় নিম্নবর্ণের বাঙালি ব্যবসায়ীরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত উচ্চবর্ণের বাঙালিদের কাছ থেকে কোনো কার্যকর সহায়তা বা সম্প্রদায়গত সমর্থন পায় নি। বাঙালি মুসলিম ব্যবসায়ীরাও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছ থেকে কোনো রকম সহায়তা পায় নি। (এখানে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সংক্রান্ত কোন রকম আলোচনার অনুপস্থিতি স্মরণ করা যেতে পারে।) ব্যাপকভাবে পাট ব্যবসায়ে অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে সম্প্রদায়গত সমর্থন ছিল বিশেষভাবে অপর্যাপ্ত। ফলে বাঙালি ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাড়োয়ারি পুঁজির কার্যকর প্রতিযোগী হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পায়।[৪৬] এটা সর্বজনবিদিত যে, মাড়োয়ারিরা তাদের সমাজে বিদ্যমান বানিয়া নেটওয়ার্কের ঘনিষ্ঠ সমর্থন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পেয়েছিল। তৃতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ঘৃণার চোখে দেখা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারও পক্ষে ভদ্রলোক শ্রেণীতে উঠে আসার ব্যাপারটা একেবারে অসাধ্য ছিল না। যেমন, উচ্চশিক্ষা লাভ ও ব্যবসাবহির্ভূত পেশা গ্রহণ করে সাহা সম্প্রদায়ের কোন লোক ভদ্রলোক শ্রেণীতে ঢুকে পড়তে পারতো। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ভদ্রলোক হবার জন্য নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেকে ব্যবসা থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে জমি ক্রয়ে এবং অন্যান্য অবাণিজ্যিক পেশায় মন দেয়। ফলে মাড়োয়ারি পুঁজির বিপরীতে বাঙালি বাণিজ্যিক পুঁজির অবস্থান আরও নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

৪৬. 'বৃহৎ' মাড়োয়ারি পুঁজি প্রাথমিকভাবে কিভাবে সংগৃহীত হয়েছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অবশ্য এ থেকে পাওয়া যায় না এবং বিষয়টি পৃথক গবেষণার দাবি রাখে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে সুতার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ফটকাবাজির যে ধূম পড়ে যায়, সেটি মাড়োয়ারির পুঁজি সঞ্চয়নের একটি বড় উৎস হতে পারে। এই ফটকাবাজির সুবাদে সঞ্চিত পুঁজির দ্বারাই বোম্বের বস্ত্রকলগুলোতে প্রাথমিক পুঁজির যোগান হয়েছিল (১৮৭০-এর দশকে এসব বস্ত্রকল দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)। এরকম মনে করার অবকাশ আছে যে, ফটকাবাজির সুবাদে সঞ্চিত পুঁজির একাংশ পাটের অর্থনীতি বিকাশ লাভের সাথে সাথে বাংলায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকবে। ১৮৬০-এর দশকে অবশ্য কলকাতার শেয়ারবাজারও চা-কোম্পানির সূত্র ধরে ফটকাবাজির জোয়ারে তেজী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে এটি সীমিত ছিল মূলত বৃটিশ বেসরকারি পুঁজির মধ্যেই। সুনীল সেনও (১৯৮১) এরকম ধারণাকে প্রকারান্তরে সমর্থন করেন যখন তিনি বলেন যে, মাড়োয়ারিরা, যারা 'লগ্নি ও ব্যবসায়ী পুঁজিপতি' হিসেবে পরবর্তীতে বিকাশলাভ করেছিল, তাদের প্রাথমিক পুঁজির উৎস ছিল ' ব্যাঙ্ক ও মহাজনি ব্যবসা এবং আফিম, সুতা, রূপা এবং সোনার ব্যবসায় ফটকাবাজি'। রাজপুতানায় পুঁজিবিনিয়োগ ক্রমশ অলাভজনক হয়ে পড়ার সাথে সাথে মাড়োয়ারিরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে'(পৃ-৫৭)। দেখুন, S. K. Sen. পাদটীকা, ৭২।

এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হয়তো কতিপয় বাঙালি ব্যবসায়ী (বিশেষকরে পাট ব্যবসায়ে জড়িত সাহাগণ) মাড়োয়ারি পুঁজির ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সত্যিকারভাবে চেষ্টা করেছিল। এমনকি তাদের কেউ কেউ কলকাতায় বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কেউ কেউ ডান্ডির প্রস্তুতকারকদের কাছে সরাসরি কাঁচা পাট পর্যন্ত সরবরাহ করেছিল। তবে এসব ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সার্বিকভাবে, প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মাড়োয়ারি পুঁজি পাট ব্যবসায়ে উচ্চস্তরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে চলেছিল এবং সময়ের বিবর্তনে পাট সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ ও সরবরাহের এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। এভাবে ঔপনিবেশিক আমলে উৎপাদিত বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর জীবনসূত্র তাদের হাতে চলে যায়।

১.৫ বাংলার স্বদেশী উদ্যোক্তাগণ

বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে আধুনিক ধারায় শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা বাঙালি শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্তমান আলোচনায় বাঙালি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প থেকে ভিন্নতর আধুনিক ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরই মূলত আলোকপাত করা হবে। স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরিগুলোর (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ) উপর এই ইচ্ছাকৃত আলোকপাতের মূল কারণ দু'টি। প্রথমত,স্বদেশী চেতনার শেকড় ১৮৭০-এর দশকে খুঁজে পাওয়া গেলেও 'অর্থনৈতিক স্বদেশী'র ভাবনা সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে বিশ শতকের প্রথম দশকে।[৪৭] পুরোপুরি বাঙালি মালিকানায় এবং জোরালো স্বদেশী চেতনায় ফ্যাক্টরির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঘটনা উনিশ শতকের শেষার্ধে গুটিকয়েক মাত্র চোখে পড়ে। ১৮৬৭ সালে হাওড়ার কাছে প্রতিষ্ঠিত কিশোরীলাল মুখার্জীর শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস্ এগুলোর অন্যতম। ১৯০৮ সালের স্বদেশী যুগেও ১১০ জন কর্মী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে শিল্পস্থাপনের একমাত্র সফল প্রচেষ্টা হচ্ছে ১৮৯৩ সালে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালস। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন তুঙ্গে উঠার আগে আধুনিক ধারায় একের পর এক স্বদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ঘটনা আর দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক স্বদেশীর ভাবনায় গোড়ার দিকে ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের

---

৪৭. অর্থনৈতিক স্বদেশীবাদের ভাবাদর্শগত ভিত্তি সম্পর্কে সুমিত সরকারের (১৯৭৩) ভাষ্যের সারার্থ নিম্নরূপ : আমাদানিবিকল্প দেশজ পণ্য যদি আমদানিকৃত দ্রব্যের তুলনায় অধিক ব্যয়বহুল এবং অপেক্ষাকৃত নিচু মানেরও হয়, তা হলেও ক্রেতাসাধারণকে দেশজ পণ্যই কিনতে হবে এবং যাদেরই কিছুটা পুঁজি আছে তাদের কর্তব্য হলো এসব আমদানি-বিকল্প পণ্যের উৎপাদনে পুঁজিবিনিয়োগ করা (এমনকি প্রথমদিকে ঐসব শিল্পে মুনাফা অত্যন্ত নগণ্য হলেও) এবং এভাবে তারা তাদের দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে পারেন।

ব্যাপারে গভীর উৎকণ্ঠা থাকলেও ১৯০৫-১৯০৭ সালের স্বদেশী চেতনায় এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এর পাশাপাশি আধুনিক ধারায় শিল্পস্থাপনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে। এ কথা সত্য যে, বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনের ফলে তাঁতের কাপড়ের নতুন চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় হস্তচালিত তাঁতশিল্প কিছু সময়ের জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। তবে ক্রমশ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে কুটিরশিল্প থেকে শহুরে আধুনিক শিল্পকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এই সময়কালে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রায় ঐকমত্য ছিল।

ফ্যাক্টরি ধরনের স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই বললেই চলে। তবে সারণি ২-এ প্রদত্ত উপাত্ত পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের ধরন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট দিক ধরা পড়ে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, সে সময়কার দু'টি প্রধান খাত পাট ও বস্ত্রশিল্পে স্বদেশী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি ছিল একেবারে নগণ্য। পাটকলের ক্ষেত্রে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান ছিল পুরোপুরি অনুপস্থিত। সুতীবস্ত্র খাতে গুটিকয়েক স্বদেশী উদ্যোগের মধ্যে ছিল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল (১৯০৬), কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল (১৯০৮), বেঙ্গল হোসিয়ারি কোং (১৯০৮) এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন সুতাবয়ন প্রতিষ্ঠান।[৪৮] অন্যদিকে স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রাধান্য ছিল বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ শিল্পের। বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পগুলোর মধ্যে ছিল রাসায়নিক শিল্প (রঞ্জনশিল্প, সাবান, প্রসাধন ইত্যাদি) ও ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়া, খনি, ধাতুশিল্প ও অধাতব (কাঁচ, পোরসেলিন ও সিরামিক) শিল্প।

যে ধরনের সামাজিক ভিত্তি থেকে স্বদেশী উদ্যোক্তারা এসেছিলেন, সম্ভবত তারই কারণে তাঁদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট খাতের প্রতি এই বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। প্রায় সব ক'জন উদ্যোক্তাই ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজিশিক্ষিত ভদ্রলোক। 'এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইন্ডিয়ানস' (১৯০৪) প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল কারিগরি প্রশিক্ষণলাভের জন্য বিদেশ গমনেচ্ছু যুবকদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা। বাংলায় কারিগরি শিক্ষার আন্দোলনকে আধুনিক ধারায় শিল্পস্থাপন, বিশেষকরে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট শিল্পবিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখা হয়েছিল।[৪৯] একথা সত্য যে, পূর্ব ভারতে পাট ও বস্ত্রশিল্পের উপর বৃটিশ বাণিজ্যিক

৪৮. ১৯০৬ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু করা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন কারখানা ছিল না। বোম্বের শিল্পপতি গোবর্ধন দাস খাটাও-এর কাছ থেকে মিলটি কেনা হয়; এর পূর্বতন নাম ছিল সিরামপুর লক্ষ্মী তুলসী কটন মিলস। অনুরূপভাবে বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানিও (১৯০৮) খিদিরপুরের একটি পুরনো হোসিয়ারির সংস্করণ ছিল।

৪৯. পরবর্তীতে এসোসিয়েশনের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের দ্বারা বেশ কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস-এর সত্যসুন্দর দেব, ক্যালকাটা কেমিক্যালস-এর কে. সি. দাস এবং আর. এন. সেন, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ কোম্পানির এস. এম. বোস এ প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে 'বিবিধ' বলে কথিত খাত ছাড়া শিল্পে বিনিয়োগের বিকল্প সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। তবে এ ব্যাপারে সম্ভবত দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যাও এক বড় ভূমিকা পালন করেছে। এসব খাতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন ছিল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্বঅভিজ্ঞতা ও চুলচেরা জ্ঞান। উদীয়মান স্বদেশী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এর কোনটাই ছিল না। এছাড়া বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট শিল্প খুব সহজেই শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর আধুনিক হয়ে উঠার বাসনাকে জাগ্রত করতে পেরেছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ সময়ে স্থাপিত একাধিক প্রতিষ্ঠানে মুসলিম পুঁজির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।[৫০] বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অন্যতম উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলেন বগুড়ার জমিদার আবদুস সোবহান চৌধুরী। টাঙ্গাইলের জমিদার আবদুল হালিম গজনবী বউবাজারের সুপরিচিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড বেঙ্গল কোম্পানির মালিক ছিলেন। তিনি একাধিক স্বদেশী শিল্পোদ্যোগে অংশ নেন। এম. এন. দত্ত ও বিচারপতি শরফুদ্দিন যৌথ উদ্যোগে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন (ইউরেকা পোরসেলিন ওয়ার্কস)। একক মুসলিম মালিকানার স্বদেশী প্রতিষ্ঠানও ছিল। যেমন আবদুস সোবহান চৌধুরী ও আবদুল হালিম গজনবী দু'লাখ টাকা মূলধন দিয়ে বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের মুসলিম ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ এক লাখ টাকা পুঁজি দিয়ে বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি স্থাপন করেন। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন মুন্সি কালা মিয়া। এই কোম্পানি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম থেকে আকিয়াব ও রেঙ্গুনে সাফল্যের সঙ্গে যাত্রিবাহী জাহাজ সার্ভিস চালাতো। এমনকি ১৯০৯ সালে কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের ৭.৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল।

১৯০৭-০৮ সালের দিকে অর্থনৈতিক স্বদেশী ভাবনায় শিল্প গড়ে তোলার পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করার দিকে পরিবর্তন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং পরিবহন, ব্যাঙ্ক ও বীমা খাতের প্রতি। সম্ভবত এসব খাতকে বিনিয়োগের জন্য অধিকতর নিরাপদ ও দ্রুত মুনাফা অর্জনকারী রূপে বিবেচনা করা হয়েছিল। অবশ্য ব্যাঙ্ক ও বীমা খাতে স্বদেশী উদ্যোগ তেমন সফল হয় নি। এ খাতের অধিকাংশ উদ্যোক্তা ছিলেন এমন শ্রেণীর (জমিদার ও রাজনীতিবিদ), যাঁদের এসব ব্যবসা সম্পর্কে তেমন কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল না। তদুপরি তাঁদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈষম্যমূলক বিধি-বিধানের কবলে পড়তে হয়েছিল। যেমন, এই সময়ে বাঙালি

---

৫০. সুমিত সরকারের তথ্য থেকে ধারণা হয় যে, মুসলিম শিল্পোদ্যোক্তার বিকাশেও স্বদেশী ভাবধারার প্রভাব এসে পড়েছিল। কিন্তু স্বদেশী যুগে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি থাকায় ধারণা করা শক্ত অর্থনৈতিক স্বদেশীবাদের প্রতি মুসলিম পুঁজি কিভাবে এবং কতটা সাড়া দিয়েছিল। যাহোক, বিষয়টি পৃথক গবেষণার দাবি রাখে।

মালিকানায় একাধিক নৌ-পরিবহন কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল। ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টিম সার্ভিস (১৮৯৭), বেঙ্গল মহাজন ফ্লোটিলা কোম্পানি (১৯০৮) ও কো-অপারেটিভ নেভিগেশন লিঃ (১৯০৮)-এর মতো কোম্পানিগুলো ৭ থেকে ১২ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড শেয়ার হোল্ডারদের দিচ্ছিল। অবশ্য ইংরেজ নৌ-পরিবহন কোম্পানিগুলো গলাকাটা প্রতিযোগিতা (ইচ্ছাকৃতভাবে ভাড়া কমিয়ে গ্রাহক সংগ্রহের তীব্র প্রতিযোগিতা) শুরু করলে এসব কোম্পানি বেশিদিন টিকতে পারে নি। তদুপরি ইউরোপীয় মালিকানাধীন পাটকলগুলো দেশী জাহাজে আনীত মাল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এক প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট ১০ কোটি টাকা মূলধনের প্রায় ২০টি দেশীয় নৌ-পরিবহন কোম্পানিকে এভাবে ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ব্যবসা থেকে হটিয়ে দেয়া হয়।[৫১]

স্বদেশী বাণিজ্যের সাফল্যের সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন করা কঠিন। গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বেশিদিন টিকে নি। সুমিত সরকারের মতে, 'নড়বড়ে একগুচ্ছ ভোগ্যপণ্য শিল্প এবং সেইসঙ্গে গুটিকয়েক ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ও বীমা প্রতিষ্ঠান—এই হচ্ছে মোট যোগফল। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে শিল্প পুনরুজ্জীবনের যে স্বপ্ন ছিল তার সাথে এটা মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'[৫২] অর্থনৈতিক স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হবার একটি বড় কারণ হচ্ছে, এ আন্দোলনে স্বদেশী আদর্শ চালু হওয়ার আগে থেকে যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল তারা বাঙালি ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের সমর্থন সুসংহত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে সময়কার একজন পর্যবেক্ষক এ. জে. জি. কুসিংয়ের মতে, 'এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আসে নি, এসেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয় থেকে' (সরকার ১৯৭৩, ১৩৫)। স্বদেশী উদ্যোগের উদ্যোক্তা হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের প্রশ্নটিকে বাংলায় শিক্ষিত বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সাথে যুক্ত করে দেখতে হবে।

তবে, শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য স্বকর্মসংস্থানের ধরন হিসেবেও স্বদেশী উদ্যোগের ভাবনা তেমন একটা সফল হয় নি। ন্যাশনাল ফান্ড বয়ন বিদ্যালয় কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের কেন্দ্রে উন্নততর শ্রেণীর ফ্লাই-শাটল তাঁতের সাহায্যে ভদ্রলোক যুবকদের বয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তারা এ ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের ব্যাপক ব্যর্থতার পটভূমিতে যথাযথ পণ্যসামগ্রী

---

৫১. Sarkar, *Swadeshi Movement*, 133.

৫২. ঐ, 134.

নির্ধারণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উৎপাদকদের দিকে মূলত লক্ষ্য রেখে স্বদেশী অর্থনৈতিক মডেল গড়ে তুললে হয়তো ফল ভাল হতো। প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উৎপাদকদের সহায়তাদানের লক্ষ্যে জে. সি. ঘোষের সমিতি স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (দু'লাখ টাকা মূলধন নিয়ে) গড়ে উঠেছিল। এতে উক্ত পরিকল্পনাই ফুটে উঠেছিল স্পষ্টভাবে। কিন্তু 'নতুন এবং উত্তেজনাকর রাজনীতি এর অনেক কর্মীকে আচ্ছন্ন করে ফেলায়'[৫৩] এর কাজকর্ম গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হবার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এসব সামাজিক শক্তিকে নতুন সম্পদ, প্রযুক্তিদক্ষতা, তথ্য ইত্যাদি দিয়ে পুষ্ট করার ব্যর্থতাই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শিল্পায়নের উদ্ভট প্রচেষ্টার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এর সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি। এটা বাংলায় অর্থনৈতিক স্বদেশী আদর্শের উত্থানের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক প্রেক্ষিত থেকে দেখলে বলতে হয়, অর্থনৈতিক স্বদেশী আদর্শ ছিল আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালি ভদ্রলোকদের পরিচালনায় এক প্রতিবাদ আন্দোলন। এতে সদ্যোজাত বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার প্রতিফলন ছিল না।[৫৪]

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সুফলভোগী ছিল অবাঙালি শিল্প ও বাণিজ্যপুঁজি। বাংলার তাঁতীদের ব্যবহৃত সুতা আসতো বোম্বে ও আহমদাবাদের সুতাকলগুলো থেকে। এছাড়াও এসব মিল স্বদেশী বাজারে কাপড় সরবরাহ করতো। মিলে প্রস্তুত স্বদেশী কাপড়ের মান ও দাম নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যেতো। এগুলোর দাম ছিল আমদানিকৃত কাপড়ের দামের দ্বিগুণেরও বেশি। এভাবে বোম্বে ও আহমদাবাদের মিলমালিকগণ বাংলার স্বদেশী চেতনার কাছ থেকে গগনচুম্বী মুনাফা লুটে নিতে পেরেছিল (সেসময় এসমস্ত মিলে কর্মসময় বাড়িয়ে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করা হয়েছিল)। এ ছাড়াও, স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৬-১৯০৭ সালে এদের মূল্যধ্বস ঠেকাতে সাহায্য করে। এ সময় জাপানী প্রতিযোগিতার ফলে বোম্বের মিলসমূহে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির অন্যতম প্রধান উৎস চীনের সুতার বাজার প্রায় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বাংলায় স্বদেশী কাপড়ের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরাও (তাদের মধ্যে বাঙালি এবং মাড়োয়ারি উভয়েই ছিল) বাড়তি দাম থেকে বেশ ভাল মুনাফা অর্জন করে। বিদেশী পণ্য বর্জনের

---

৫৩. প্রাগুক্ত, 115.

৫৪. অর্থনৈতিক স্বদেশীবাদের লক্ষ্যে যে আন্দোলনের শুরু তার উত্তরোত্তর রাজনীতিলিপ্ততা অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians-এর প্রতিষ্ঠাতা J. C. Ghosh এসোসিয়েশনের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত Small Industries Development Co.-র কাজে হতাশ হয়ে এ. সি. ব্যানার্জীকে লিখেছিলেন : This is the result of leaving everything to one man and enjoying yourself with tamashas, bonfires and speeches on swadeshi and all such futile nonsense' (Sumit Sarkar, *Swadeshi Movement*, 115).

ফলে বাজারে বিক্রেতাদের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সুযোগ নিয়ে অসৎভাবে দাম বাড়িয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত সে সময় ছিল। ম্যানচেস্টারের কাপড় আমদানিকারক এক শ্রেণীর মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী অবশ্য গোটা বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ম্যানচেস্টার চেম্বারের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় কলকাতার মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমার্স বঙ্গভঙ্গ রহিত করার আহ্বান জানিয়ে বলে, অন্যথায় 'আমরা নির্মূল হয়ে যাবো এবং পরবর্তী চুক্তি করতে পারবো না।' ১৯০৬ সালের ২২ মে *বাঙালি* পত্রিকাটি মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদেরকে 'স্বদেশী আন্দোলনের ঘৃণ্যতম শত্রু' বলে নিন্দা করে। কিন্তু উচ্চবর্ণের বাঙালি পুঁজির স্বদেশী স্বপ্ন কখনো পূরণ হয় নি। বরং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে মাড়োয়ারি পুঁজি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কয়েক বছরের মধ্যে মাড়োয়ারি পুঁজি শুধু বাঙালি পুঁজির উপর আধিপত্যই বিস্তার করে নি, বরং একাধিক আধুনিক শিল্পে এতদিন পর্যন্ত নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারকারী ইউরোপীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথেও গোপন যুদ্ধ শুরু করে।

১.৬ যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে দেশীয় উদ্যোগ : মাড়োয়ারি বনাম বাঙালি পুঁজি

যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে শিল্পখাতে উদ্যোগসমূহের চরিত্রের দিকে গভীরভাবে নজর দিলে দেখা যায় যে, প্রচলিত অর্থে ইউরোপীয় পুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য বলে গণ্য করা হতো এমন সব ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেশীয় পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। পাটশিল্প সম্পর্কে আওয়ালের সমীক্ষা (১৯৮৩) এবং গোস্বামীর কাজ (১৯৯১) থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আধুনিক শিল্পের অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজি ইউরোপীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। ১৯২০-এর দশকে পুরোপুরি স্বদেশী মালিকানায় ৭টির মতো পাটকল স্থাপিত হয়।[৫৫] দেশীয় উদ্যোগে পাটকল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোক্তারা ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজসমূহের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পাটকোম্পানিগুলোতে ব্যাপকভাবে অর্থবিনিয়োগ করে। ফলে বৃটিশ মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোতে দেশীয় পরিচালকদের অংশ সময়ের আবর্তনে বেড়ে যেতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১১ সালে ৫০টি পাটকোম্পানির সবগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো শুধুমাত্র ইউরোপীয় ডিরেক্টরগণ দ্বারা।[৫৬] ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত ৫৯ শতাংশ পাটকলকোম্পানিতে মাড়োয়ারি পরিচালকদের অংশগ্রহণ

---

৫৫. ইন্দোরের স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ, কলকাতার বিড়লারা এবং দারভাঙ্গার মহারাজা ১৯২০-এর দশকের শুরুতে পাটকল স্থাপনে এগিয়ে আসেন। উক্ত দশকের শেষার্ধের পাটকলমালিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—আদমজী হাজী দাউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদমজী জুট মিল, বি. এল ইলিয়াস কর্তৃক স্থাপিত আগ্রাপারা জুট মিল, রাজা জানকী নাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রেমচান্দ জুট মিল, দয়ারাম এ্যান্ড সনস্-এর জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।

৫৬. Awwal, *Industrial Development*, 142.

ছিল।[৫৭] পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারক শিল্পের পাশাপাশি জুট প্রেসিং শিল্পেও স্থানীয় পুঁজির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। ১৯২১ সালের শুমারি মোতাবেক ১৮৮টি জুট প্রেসিং কোম্পানির মধ্যে স্থানীয় মালিকানায় ছিল ১১৩টি। ১৯১১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫২টি। এমনকি চা-শিল্পেও, যেখানে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় পুঁজির আধিপত্য ছিল, দেশীয় উদ্যোক্তারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে থাকেন; যেমন, মোট চা-বাগানগুলোতে ১৯১১ সালে দেশীয় মালিকানা ছিল ১৫ শতাংশ। ১৯২১ সালে সেটা বেড়ে ৩২ শতাংশে দাঁড়ায়। তদুপরি ১১টি ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত চা-কোম্পানিতে দেশীয় পরিচালকগণও ছিলেন। বাংলায় কয়লাখনি মালিকানার ক্ষেত্রে দেশীয় পরিচালকবর্গের অংশগ্রহণবিশিষ্ট ইউরোপীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং পুরোপুরি দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানির সংখ্যা ১৯১১ সালের ৫৪ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ১৯২১ সালে ৫৮ শতাংশে দাঁড়ায়। দেশী কোম্পানির প্রায় সবগুলো অবশ্য ছিল ছোট কয়লাখনি। ফলে গুটিকয়েক বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ কয়লাখনি কোম্পানি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এ শিল্পে প্রাধান্যবিস্তার করে থাকে। সাধারণ প্রকৌশলশিল্পেও অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৭ সালে বাংলায় ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়ে চালু প্রায় সবক'টি বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ছিল বৃটিশ মালিকানাধীন। কয়লাখনি ও সাধারণ প্রকৌশলশিল্পের বিপরীতে সুতা ও বস্ত্রশিল্প স্থানীয় পুঁজিকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করে। ১৯৩৭ সালে বাংলায় চালু থাকা ২৬টি কটনমিলের মধ্যে ২৪টির মালিকানা ছিল দেশীয় উদ্যোক্তাদের হাতে। দেশীয় পুঁজি চিনিকলগুলোতেও প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে ১০টি মিল চালু ছিল সেগুলোর মধ্যে ৮টির মতো ছিল স্থানীয় মালিকানাধীন। অনুরূপভাবে থ্যাকারের *ইন্ডিয়ান ডিরেক্টরির* বিবরণ অনুযায়ী ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলায় ৬৯টির মত কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি চালু ছিল, সেগুলোর অধিকাংশের মালিক ছিলেন দেশীয় উদ্যোক্তারা। মৃৎশিল্প, ইট ও টালি প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও দেশীয় পুঁজির একটা বড় অংশ নিয়োজিত ছিল। ১৯২১ সালের শুমারিপ্রতিবেদন মোতাবেক ৪১২টি ইট, টালি ও ফায়ারব্রিক ফ্যাক্টরির মধ্যে ৩৮৭টির মতো ছিল সরাসরি দেশীয় মালিকানায়।

উপরোক্ত হিসাব থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলার দেশীয় উদ্যোক্তারা আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে নি, যদিও তাদেরকে প্রতিকূল নিয়ম-নীতি ও অনিশ্চিত বাজারের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল। যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে নবলব্ধ সুযোগগুলো কাজে লাগাতে তারা জোর প্রচেষ্টা চালায়। তারা আধুনিক ধারায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রচুর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। ওয়েবারীয় অভিমতে তাদেরকে যেভাবে 'অনুৎপাদনশীল' ভাবমূর্তিতে দেখানো হয়েছে এটা কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

৫৭. O. Goswami, *Industry, Trade and Peasant Society : The Jute Economy of Eastern India, 1900-1947*, (Oxford University Press 1991), 107.

এ সময়ের বড় ধরনের উদ্যোগসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিসেবে মাড়োয়ারি পুঁজির উত্থান। ১৯২০-এর দশকের শেষ নাগাদ পাটশিল্পে মাড়োয়ারি পুঁজি ইউরোপীয় পুঁজির অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। ১৯২০-এর দশকের গোড়া থেকে ইউরোপীয় পত্র-পত্রিকায় মাড়োয়ারিদেরকে 'দস্যু', 'বহিরাগত', 'স্বল্পদৃষ্টির শিল্পপতি' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হতো।[৫৮] এখানে যে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, কেন এ সময়ে বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ক্রমপ্রসারমান নতুন সুযোগগুলোর প্রায় পুরো ফায়দা বাঙালি পুঁজির পরিবর্তে মাড়োয়ারি পুঁজির থলিতে জমা হলো ? এই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে জানার জন্য দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দিক খতিয়ে দেখতে হবে : এর একটি সেসব কারণগুলোর উপর আলোকপাত করে, যা আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাড়োয়ারি পুঁজির প্রবেশে সহায়তা করেছিল; অপরটি সেসব কারণকে চিহ্নিত করে, যেগুলো বাঙালি উদ্যোগসমূহের বিকাশ বিঘ্নিত করেছিল। যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে দেশীয় উদ্যোগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট ঘাটতি থাকলেও উপরোক্ত বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যামূলক পর্যবেক্ষণ করা যায়।

মাড়োয়ারি উদ্যোক্তাদের উত্থানের পটভূমির প্রতি নজর রাখলে এটি তেমন আশ্চর্যজনক মনে হবে না কেন পাটশিল্পে মাড়োয়ারিরাই ছিল প্রথম 'হামলাকারী'। পাটশিল্পে প্রবেশের আগে মাড়োয়ারিরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিল, জুট বেলিং কোম্পানিগুলোর অধিকাংশের মালিকানা দখল করেছিল এবং দালাল ও ফটকা ব্যবসায়ী হিসেবে কলকাতা স্টক-এক্সচেঞ্জের প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। তাই এটা স্বাভাবিক ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোয় যখন পাটশিল্পে মুনাফার হার তুঙ্গে উঠে, তখন মাড়োয়ারি পুঁজি পাটকলের উদ্যোক্তা হিসেবে ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য মাড়োয়ারিদের দ্বারা নতুন ইউনিট স্থাপন ছিল আধুনিক শিল্পে তাদের প্রবেশের একটি ধরন মাত্র। এমনকি এটা পাটশিল্পে মাড়োয়ারি পুঁজি প্রবেশের প্রধান ধরনও ছিল না। গোস্বামী লিখেছেন, ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের কক্ষপথের বাইরে নতুন ফ্যাক্টরি স্থাপন করার ক্ষেত্রে 'ভারতীয়রা ছিল ঔপনিবেশিক বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রিত খেলায় গুরুত্বহীন লীগ খেলোয়াড় মাত্র। এ প্রসঙ্গে গবেষকরা অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় ধরনটি এড়িয়ে গেছেন। ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলোতে অব্যাহতভাবে শেয়ার কিনে এক পর্যায়ে বিশেষকরে মাড়োয়ারিরা পরিচালকমণ্ডলীতে পর্যন্ত স্থান করে নেয়।[৫৯] ২০ ও ৩০-

---

৫৮. O Goswami, "Then Came The Marwaris: Some Aspects of the Changes in The Pattern of Industrial Control in Eastern India", *The Indian Economic and Social History Review*, 22: 3 (1985), 225-250.

৫৯. Goswami, *Industry, Trade*, 100.

এর দশকে পাটখাতে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার ক্রমবর্ধমান সমস্যা এ ধরনের পরোক্ষ ও গোপন প্রবেশের বাসনাকে আরও উস্কে দিয়ে থাকবে। ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলো কর্তৃক 'নিয়ন্ত্রিত' ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য শেয়ার অর্জনের জন্য মাড়োয়ারিরা দু'টি প্রধান পদ্ধতি অবলম্বন করে। প্রথম পদ্ধতি ছিল শুধুমাত্র শেয়ার কেনা। এসব শেয়ার কেনা হতো ক্ষুদ্র শেয়ারহোল্ডার বা এমন কারো কাছ থেকে (যেমন অংশীদারের বন্ধু, বয়স্কা বিধবা, পেনশনভোগী ও কোম্পানির বেতনভোগী কর্মকর্তা), যারা এককালীন লাভের জন্য স্বেচ্ছায় এসব শেয়ার বিক্রি করতেন। যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোয় এটা ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। পরিচালকমহলে ঢুকে পড়ার অন্য পদ্ধতি ছিল ইউরোপীয় মালিকানাধীন ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও ঋণদান সংক্রান্ত যোগাযোগ গড়ে তোলা। সঙ্কটের সময় মাড়োয়ারিরা এজেন্সিগুলোকে কম সুদে ঋণ দিত এবং বিনিময়ে পাটকলের মোটা অংকের শেয়ার কিনে বিদেশীদের সমকক্ষ পরিচালক হয়ে বসতো। ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেলে এটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেসময় পাটকলগুলোতে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অনেক বহিরাগত কোম্পানির বাড়তি তহবিলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কয়লাশিল্পে প্রাধান্যবিস্তারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঝোঁক দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীতে পরিবর্তনের ধারা অনেক কম লক্ষণীয়।[৬০]

মাড়োয়ারিদের বিপরীতে বাঙালি উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম মোটেও সন্তোষজনক ছিল না।[৬১] এর জন্যে একাধিক কারণ দায়ী। ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে বাঙালি পুঁজি অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ঊর্ধ্বতন স্তরে কার্যত নিজের উপস্থিতি হারিয়ে ফেলে। দালাল ও ফটকা হিসেবে কলকাতা স্টক-এক্সচেঞ্জেও বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। এটা ছিল মাড়োয়ারি পুঁজির অবস্থানের একেবারে বিপরীত। মাড়োয়ারি পুঁজির ক্ষমতার প্রধান উৎস ছিল ব্যবসাখাতে অর্জিত মুনাফা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মতোই তখনো জমি ও অবাণিজ্যিক পেশাই ছিল বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম বিত্তশালী শ্রেণীর প্রধান বিচরণক্ষেত্র। তদুপরি ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাবের ফলে আধুনিক শিল্পে কার্যকরভাবে প্রবেশ উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোক্তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। পাটশিল্পের বেলায় এ কথা বিশেষভাবে খাটে। সেই খাতে দেশীয় উদ্যোগের বিকাশ ঘটেছিল প্রথমত ব্যবসা থেকে শিল্পে রূপান্তরের ফল থেকে।

৬০. ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সিনিয়ন্ত্রিত কোম্পানিসমূহের মধ্যে বোর্ডে মাড়োয়ারি পরিচালক আছে এরকম কোম্পানির সংখ্যা ছিল কয়লাশিল্পে মাত্র ১৯ শতাংশ, কিন্তু পাটশিল্পে ৫৭ শতাংশ।

৬১. বলা দরকার যে, এই পর্বের বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তা বলতে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত-উদ্ভূত (এবং অনেকটাই উচ্চবর্ণঘেঁষা) ভদ্রলোক শিল্পোদ্যোক্তাদের উপরই আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

সম্ভাবনাময় বাঙালি উদ্যোক্তাদের আধুনিক শিল্পে প্রবেশের পথে আর একটা অন্তরায় ছিল পুঁজির অভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২০-এর দশকে স্থাপিত পাটকল ইউনিটগুলোর প্রকৃত নির্মাণব্যয় ছিল যুদ্ধপূর্বকালীন মিলগুলোর ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি (একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী তাঁতপ্রতি ব্যয় ৫,৫০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল ৯,৬০০ টাকা)। বেসরকারি শিল্পে রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা ছিল না বিধায় সম্ভাব্য বাঙালি উদ্যোক্তাদের সামনে দু'টি মাত্র পথ খোলা ছিল—শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বিদ্যমান পুঁজির বাজার থেকে কাজ শুরু করার মতো পুঁজি সংগ্রহ এবং অন্যথায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শহুরে ঋণদাতাদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ। পুঁজির বাজারের সুযোগ কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায় নি। বাঙালি উদ্যোক্তারা বাঙালি বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আরো কিছু কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন, যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে উচ্চবর্ণের বাঙালি বিত্তশালী শ্রেণীর মাত্র গুটিকয়েক উদ্যোক্তা আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। স্বদেশী উদ্যোগসমূহের ক্রমাগত অবক্ষয়ের ফলে উচ্চবর্ণের বাঙালি বিত্তশালী শ্রেণী উৎপাদনশীল উদ্যোগে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে আগের চেয়ে আরো বেশি অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আভিজাত্যে ছিলেন অগ্রগণ্য, তাঁদেরকে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলোতে 'সাক্ষীগোপাল পরিচালক' হিসেবে কাজ করতে আমন্ত্রণ জানানো হতো। ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকমণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য বছরের পর বছর তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত মাড়োয়ারিদের একেবারে বিপরীতে বাঙালি অভিজাত 'পুতুল পরিচালকগণ' কখনো বৃটিশপরিচালিত প্রতিষ্ঠান দখল করে নেবার প্রেরণা অনুভব করেন নি।[৬২] বেসরকারি ঋণদাতাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের দ্বিতীয় পন্থাও ছিল সীমিত। ঘরোয়া ঋণদানের বাজারে মাড়োয়ারিদের প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ। মাড়োয়ারি মহাজনেরা দালাল ব্যবসায়ীদের অগ্রিম ঋণ দিত, পুঁজির তীব্র সঙ্কটকালে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিত এবং মাড়োয়ারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক লগ্নির এক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে বাঙালি উদ্যোক্তাদের সম্ভবত মাড়োয়ারি মহাজনদের উপর ভরসা করার মতো অবস্থা ছিল না। এ ছাড়াও মাড়োয়ারি মহাজনদের কাছ থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিলে তা

---

৬২. বিভিন্ন কারণে বাঙালি বিনিয়োগকারীরা পুঁজির বাজারে আস্থা অর্জন করতে পারে নি। Awwal(1983)-এ যেমন, ভুয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নামে জনসাধারণের কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহের মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত-উদ্ভূত ভদ্রলোক-শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্বতন অভিজ্ঞতার অভাবও এই অনাস্থার পিছনে কাজ করে থাকবে।

হতো ব্যাপকভাবে শর্তকণ্টকিত।[৬৩] দৃষ্টান্তস্বরূপ, আওয়াল উল্লেখ করেছেন যে, 'যখন হঠাৎকরে টাকার দরকার হতো এবং তহবিল থাকতো শূন্য, তখন উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণকে মহাজন ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে হতো। এসব ক্ষেত্রে সুদ দিতে হতো ব্যাঙ্ক ও ঋণদাতা অফিসগুলোর চেয়ে অনেক বেশি হারে, যা উঠানামা করতো বার্ষিক শতকরা ৯ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে।'[৬৪]

উদ্যোগবিরোধী মানসিকতার মতো দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যাও এক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববঙ্গের সাহা এবং চট্টগ্রামের মুসলিম ব্যবসায়ীদের (সওদাগর) মতো দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অবমাননাকর মনোভাবের মধ্যে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়। সওদাগরগণ অভ্যন্তরীণ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল (বিশেষকরে বার্মা-বাংলা বাণিজ্যপথে)। ১৯৩০-এর দশকের শেষ নাগাদ এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলো যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির মালিক হতে পেরেছিল, যা আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যেতো। কিন্তু সরকারের নেতিবাচক মনোভাব এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনে কর্মরত বাঙালি ভদ্রলোকদের বর্ণবাদী মানসিকতার কারণে তা হতে পারে নি। এমনকি বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠিত হবার পরও বাঙালি রাজনীতিক ও বেসামরিক আমলাদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগবিরোধী প্রবণতা বিরাজমান ছিল। এ ব্যাপারে বাঙালি শিল্পোদ্যোগ চাঙ্গা করার লক্ষ্যে গৃহীত ১৯৩১ সালের বেঙ্গল স্টেট এইড টু ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাক্ট-এর ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য। আওয়াল উল্লেখ করেছেন, এমনকি ১৯৩৫ সালের শেষ নাগাদ বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রথম বৈঠকের প্রায় ২৭ মাস পরও 'একজন দরখাস্তকারী কোনরকম সাহায্য পায় নি।'[৬৫] ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত 'মাত্র দু'লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল এবং কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে ১০ হাজার টাকার বেশি দেয়া হয় নি।'[৬৬] বরং, ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে প্রাদেশিক সরকারের পাশকরা কিছু আইন শুধু যে বাঙালি পুঁজির স্বার্থের সহায়ক হয় নি তাই নয়, উপরন্তু ইউরোপীয় পুঁজির জন্য গুরুত্বপূর্ণ

৬৩. প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর পর পর বাঙালি মালিকানাধীন বেশ কিছু ব্যাঙ্ক ও Loan Office প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র ময়মনসিংহেই বাঙালি মালিকানাধীন অন্তত ৫টি ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এগুলো হলো গৌরীপুর ময়মনসিংহ ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক, সিলেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা মডার্ন ব্যাঙ্ক, মডেল ব্যাঙ্ক। তবে এসব প্রতিষ্ঠান মূলত মফস্বলেই সক্রিয় ছিল এবং প্রধানত ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের ঋণ দিত। ঋণের গড় পরিমাণ ছিল স্বল্প অর্থাৎ আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহে ঐসব ব্যাঙ্ক ও Loan Office সম্ভবত সমর্থ ছিল না। যাহোক, ১৯২০-এর দশকে এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায় এবং এভাবে বাঙালি শিল্পপুঁজির জন্য অর্থ যোগানোর একটি সম্ভাব্য সূত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৬৪. Awwal, *Industrial Development*, 128.

৬৫. প্রাগুক্ত, 120.

৬৬. ঐ, 120-121.

আনুকূল্যের বিধান এতে ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মন্দাপরবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপীয় পুঁজির প্রভাবাধীন ইন্ডিয়ান জুট মিল্স এসোসিয়েশন (আই. জে. এম. এ) একটা কর্মকালীন সময় অধ্যাদেশ জারি করার জন্য বাংলার প্রাদেশিক সরকারের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তদ্বির করেছিল। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অধ্যাদেশটি পাশ হয়। এই সাফল্যের কারণ ছিল অন্যত্র : 'ফজলুল হকের নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব সেই ৩৫ জন সদস্যের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল, যাঁরা বঙ্গীয় বিধানসভায় বহিরাগত পুঁজির প্রভাবাধীন শিল্প ও বাণিজ্যিক সমিতিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতো।'[৬৭] তদুপরি মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁদের সাথে বৃটিশ বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানগুলোর কোন না কোনভাবে যোগাযোগ ছিল। ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের বেশ কিছু শেয়ার ছিল ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত পাটশিল্পে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাটকল-শেয়ারের মালিক অর্থমন্ত্রী নলিনী রঞ্জন সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'বর্তমান সরকার বৃটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করবেই'।[৬৮] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন এবং বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউজগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন।[৬৯] মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার শাসনামলেও এক্ষেত্রে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। ১৯৪০-এর দশকে বিরাজমান নীতিগত পরিবেশেও অবাঙালি পুঁজি ছিল প্রধান সুবিধাভোগী। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, অবাঙালি মুসলিম পুঁজিও সে সময় কিছুটা সরকারি আনুকূল্য ও সমর্থন লাভ করেছিল। অবশ্য বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোগের বিকাশের প্রশ্নটি কখনও মুসলিম লীগ সরকারের পর্যাপ্ত দৃষ্টিআকর্ষণ করতে পারে নি।[৭০]

---

৬৭. Goswami. *Industry. Trade*. 145.

৬৮. ঐ, 146.

৬৯. ঐ।

৭০. কলকাতায় ১৯৩২ সালে মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি পৃথক চেম্বার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চেম্বার প্রথম থেকেই অবাঙালি পুঁজির নিয়ন্ত্রণে ছিল; ইস্পাহানী ও আদমজী গ্রুপদ্বয় ছিল এই চেম্বারের সবচাইতে প্রভাবশালী সদস্য। ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লীগ সমর্থকদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মুসলিম চেম্বার অব কমার্স গড়ে উঠে। তবে এসব চেম্বারের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য ব্যবসায়ীদের এক মঞ্চে সংগঠিত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এসব চেম্বার প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজনৈতিক সমর্থন লাভের বাইরে বাঙালি (মুসলিম) শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তাদানের কোন লক্ষ্য এসব চেম্বার গঠনের পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে নি। আর. তাই দেখা যায় যে, 'পাকিস্তান অর্জনের পর লীগ এই ক্ষেত্রটি পরিত্যাগ করে'। দেখুন, S. A. Kochanek, *Interest Groups and Development: Business and Politics in Pakistan*, (Oxford 1983), 120। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে All-India Federation of Muslim Chambers of Commerce প্রসঙ্গে এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী পরবর্তীতে লিখেছিলেন : "জিন্নাহ সাহেবের আরো একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। এবার তিনি মুসলিমদেরকে ঐক্যের আরো একটি উপায় হাতে তুলে দিলেন, ব্যবসা ও শিল্পে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল" (Kochanek 1983, 109)। স্পষ্টতই লীগ নেতৃত্বের কাছে বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোক্তা গড়ে তোলা কোন জরুরি বিষয় বলে প্রতিভাত হয় নি, বরং ইস্যুটিকে ভবিষ্যতের পাকিস্তানী রাষ্ট্রের একটি কাজ বলে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

কলকাতার অবাঙালি মুসলিম ব্যবসায়ী এবং মুসলিম লীগেব মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইস্পাহানী পরিবার লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল এবং লীগের দলীয় কাঠামোয় তাদের নেতৃত্বের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আদমজীর মতো অন্যান্যরা লীগের তৎপরতা ও প্রকল্পসমূহে অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারে বিড়লাদের ন্যায় ভূমিকা পালন করে। এরা কলকাতার মেমনদের সমর্থন লীগের পিছনে জড়ো করে। পর্যায়ক্রমে মাড়োয়ারি পুঁজির পাশাপাশি এসব পরিবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের প্রধান সুবিধাভোগীতে পরিণত হয়। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে আরো গবেষণা হওয়া প্রয়োজন, তবু মনে হয় যে, লীগের দলীয় কাঠামোর এবং প্রাদেশিক সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাবে সম্ভাব্য বাঙালি মুসলিম উদ্যোক্তারা রাষ্ট্রীয় ঋণসাহায্য, লাইসেন্স, পারমিট, টেন্ডার, কন্ট্রাক্ট ও সাপ্লাই অর্ডারের সামান্যই সুযোগ নিতে পেরেছিল।'[৭১]

দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণ থেকেও একাধিক স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ. সি. লায়েক এবং যাদব ব্যানার্জী ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তাদের দু'জন, যারা ঝারিয়ায় কয়লাখনি কিনেছিলেন। ১৯১১ সালে এঁদের প্রতিষ্ঠানকে অসচ্ছল ঘোষণা করা হয়। তার বড় কারণ এই যে, 'লায়েক এবং ব্যানার্জীর ছেলে ও নাতিরা কয়লাখনি চালানোর চেয়ে জমিক্রয়ের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।'[৭২] একই কারণ ১৯২০-এর দশকে এন. সি. সরকার এন্ড সন্স (এই প্রতিষ্ঠানটি এক সময় ৮টি কয়লাখনি এবং অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতো)-এর অবক্ষয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঙালি বিত্তশালী শ্রেণীর দ্রুত বড়লোক হওয়ার মানসিকতাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর প্রযুক্তি ও বাজার, শিল্পোদ্যোগের প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে

---

৭১. মুসলিম লীগের দলীয় কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত মুসলিম ব্যবসায়ী বৃত্তেও পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনের ইস্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। ১৯৪৩ সালের পরে কোন সময়ে জিন্নাহকে লেখা এম. এ. এইচ. ইস্পাহানীর একটি চিঠি থেকে এর আভাস মেলে। জিন্নাহ চেয়েছিলেন যে, All-India Federation of Muslim Chambers of Commerce-এর সভাপতির দায়িত্ব যেন আদমজী-দাউদের উপরই বর্তায়। আদমজী এই দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না এবং এম. এ. এইচ ইস্পাহানীকে অনুরোধ করা হয় যাতে তিনি তাঁর ভ্রাতা ইস্পাহানীকে এই দায়িত্ব গ্রহণে রাজি কবাতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে ইস্পাহানী জিন্নাহকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার সারার্থ নিম্নরূপ : 'আমার ভ্রাতার পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করা সম্ভব হবে না, কেননা এতে করে অনেকেই ফেডারেশনকে হেয় করার নিন্দা ছড়াবে। গত আঠারো মাস ধরেই বিরুদ্ধ পক্ষরা বলে আসছে যে, ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য ইস্পাহানীরা যে কাজ করছে এবং এই লক্ষ্যে অর্থব্যয় করছে তার কারণ তারা একে কুক্ষিগত করতে চায় এবং নিজেদের স্বার্থে একে ব্যবহার করতে চায়', (Kohanek, *Interest Groups*, 109) ।

৭২. S.K. Sen, *Studies in Economic Policy and Development of India, 1848-1926*, (Calcutta 1966), 71.

যে, ১৮৭৯ ও ১৯৩৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জলপাইগুড়িতে বাঙালি মালিকানায় কয়েকটি চা-বাগান গড়ে উঠে। অবশ্য এসব উদ্যোগের সাফল্য ছিল সীমিত। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এর উদ্যোক্তাদের (অধিকাংশই আইনজীবী) দ্রুত বড়লোক হবার পাগলামি। একই মানসিকতার কারণে কয়েকটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়, যার ফলে বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের মনে আস্থা আরো কমে যায়। এ সময়কার বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধারণভাবে শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কোন মানসিকতা ছিল না। এই মডেল পরে বাঙালির বাণিজ্যিক চিন্তার অংশে পরিণত হয়। হিন্দু ও মুসলিম বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সমভাবে প্রযোজ্য।

উপরে আলোচিত কারণসমূহ দ্বারা এমন কোন ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের ভূমিকা দেশীয় শিল্পোদ্যোগের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করার ব্যাপারে কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা বাঙালি ও অবাঙালি উদ্যোক্তাদের মধ্যে তেমন কোন বৈষম্য সৃষ্টি করতো না, যদিও 'প্রথম প্রজন্মের' বাঙালি উদ্যোক্তারা সে সময় অনুকূল পরিবেশের অভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ বাঙালি বিনিয়োগকারী অবাণিজ্যিক পটভূমি থেকে এসেছিল বলে কেবলমাত্র সহায়ক অর্থনৈতিক পরিবেশ তাদেরকে ক্রমশ শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত করতে পারতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এ ব্যাপারে চরম নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, এমনকি যেসব ক্ষেত্রে বাঙালিরা বিনিয়োগের কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রেও মাড়োয়ারি পুঁজি মুখ্য প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল কয়লা, চা, চালকল এবং 'বিবিধ' শিল্প, যেসব খাতে প্রথমদিকে মাড়োয়ারি পুঁজির অবস্থান ছিল একেবারে নগণ্য। ১৯৪০-এর দশকে মাড়োয়ারিরা রানীগঞ্জ ও ঝারিয়ার প্রায় অর্ধেক খনির মালিক হয়ে যায়। সে সময় মাড়োয়ারিরা বিদেশী মালিকানাধীন কয়লাকোম্পানিগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারহোল্ডারে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বলা হতো যে মাড়োয়ারিরা ইঞ্জিনিয়ারিং, লোহা ও ইস্পাত, ফার্মাসিউটিক্যালস ও সিমেন্টের মতো আধুনিক শিল্পতৎপরতা থেকে দূরে থাকতে চায়। কারণ তারা 'নিজেদের জানা ব্যবসাগুলোতেই থাকতে চাইতো।'[৭৩] কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালের পর মাড়োয়ারিরা এসব শিল্পে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ে, যদিও আগে তারা এগুলো এড়িয়ে চলেছিল।

৭৩. Goswami, " Marwaris", 241

এ পর্যন্ত আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে বৃহৎ ফ্যাক্টরি ধারার বাঙালি (হিন্দু) উদ্যোগসমূহের উপর। বাঙালি শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসের একাধিক দিক এ আলোচনায় তেমন দৃষ্টিআকর্ষণ করে নি। অন্যান্যের মধ্যে এগুলো হচ্ছে—পূর্ববঙ্গে বাঙালি শিল্পোদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাঙালি শিল্পোদ্যোগ এবং বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোগ। এ সমস্ত দিকের প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ এই রচনার আওতায় প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে পূর্ববঙ্গে বাঙালি (মুসলিম) উদ্যোগের ধরন ও গঠন সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১.৭ পূর্ববঙ্গে বাঙালি উদ্যোগের ধরন ও গঠন

পূর্ববঙ্গে বাঙালি শিল্পোদ্যোগের ধরন ও গঠন সম্পর্কে বিশ্লেষণে যাবার আগে এ ব্যাপারে প্রাপ্ত শিল্পসংক্রান্ত পরিসংখ্যানের মান সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখা যথাযথ বলে মনে করি। সারণি ৩ ও ৪-এ শুধু ১৯৩৪ সালের ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট-এর ২ (জে) ধারার অধীনে রেজিস্ট্রীকৃত অর্থাৎ ২০ বা ততোধিক কর্মী ও শক্তিচালিত মেশিনপত্র রয়েছে এমন সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। তাই এই সংজ্ঞা অনুসারে পূর্ববঙ্গে রেজিস্ট্রীকৃত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের একটা চিত্র পাওয়া যায়। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফ্যাক্টরিজ এ্যাক্ট-এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হলেও সর্বক্ষেত্রে তা করা হতো না। ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের তেমন কঠোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেশবিভাগের আগে শ্রম অধিদপ্তরের অফিসে এমনকি একজনও ফুলটাইম ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর ছিলেন না।[৭৪] তাই, সারণি ৩ ও ৪-এ প্রদত্ত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যে আরো বেশি ছিল তা ধরে নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের পুরো সংখ্যা ও খাতওয়ারি বিভাজনের ব্যাপারে দু'টি সূত্রের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উপাত্ত (সারণি ৪) অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। এতে ১৯৪৫ সালের ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ রুলস-এর আওতায় পরিচালিত শুমারির অধীনে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত তথ্য দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪-এ লক্ষ্য করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। বৃহৎ আধুনিক শিল্পোদ্যোগ কার্যত সুতীবস্ত্রখাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ববঙ্গের আধুনিক উদ্যোক্তাদের মধ্যে সে সময়কার সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন সূর্য কুমার বসু (এবং পরবর্তীতে তাঁর ছেলে

---

৭৪. A. F. A. Husain, *Human and Social Impact of Technological Change in Pakistan*, Vol. 1, (London 1957), 107.

সুনীল কুমার বসু ও অনিল কুমার বসু)। ১৯৪৭ সালে বিদ্যমান ১২টি সুতীবস্ত্রমিলের মধ্যে বৃহত্তম ৪টির মালিক ছিলেন সূর্য কুমার বসু। এগুলো হচ্ছে চিত্তরঞ্জন কটন মিল (ধানঘর), ঢাকেশ্বরী কটন মিল (গোদনাইল) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল। একই গোষ্ঠী বোস গ্লাস ওয়ার্কস এবং আরো একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল। ১৯৩০-এর দশকের শেষ নাগাদ ঢাকেশ্বরী কটন মিল বাংলার সবচেয়ে লাভজনক মিলগুলোর অন্যতম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত সুতীবস্ত্রমিলের প্রায় সবগুলোই ছিল পুরোপুরি বাঙালি মালিকানাধীন। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের ৫৮টি জুট প্রেসিং মিল-এর মধ্যে অধিকসংখ্যক ছিল অবাঙালি পুঁজির অধীন। এগুলোর মধ্যে ল্যান্ডাল এ্যান্ড ক্লার্ক লিঃ একাই কমপক্ষে ১১টি জুট প্রেসিং মিল নিয়ন্ত্রণ করতো। এগুলো ছড়িয়ে ছিল সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা (মদনগঞ্জ), নরসিংদী, ঢাকা (লোহাগঞ্জ), সরিষাবাড়ি, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, আখাউড়া ইত্যাদি স্থানে। অপর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি র‍্যালী ব্রাদার্স লিঃ সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সোনাকান্দা (নারায়ণগঞ্জ), সরিষাবাড়ি, চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানে ৮টি জুট প্রেসিং মিল নিয়ন্ত্রণ করতো। আরেকটি বহিরাগত প্রতিষ্ঠান সিম এ্যান্ড কোং লিঃ ৫টি জুট প্রেসিং মিলের মালিক ছিল। এভাবে এ তিনটি গোষ্ঠী একত্রে পূর্ববঙ্গের সকল জুট প্রেসিং মিলের ৪১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। এতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ঘনীভবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলোর লক্ষণীয় বিচরণের আর একটা ক্ষেত্র ছিল চা-উৎপাদন : পূর্ববঙ্গে (অধিকাংশ সিলেটে) ১১৬টি 'রেজিস্ট্রীকৃত' চা-ফ্যাক্টরির ৯০ শতাংশের বেশির মালিক ছিল বিদেশী পুঁজি। জুট প্রেসিং মিলের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারিরা ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। পূর্ববঙ্গে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রেজিস্ট্রীকৃত চালকলের মালিক ছিল মাড়োয়ারিরা। জুট প্রেসিং, চা-ফ্যাক্টরি ও চালকলগুলোকে বাদ দিলে পূর্ববঙ্গে সে সময়কার মোট আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে ১১৭-তে দাঁড়াবে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিল্পায়ন হয়েছিল অত্যন্ত সীমিত মাত্রায়। এতে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির সে সময়কার বৈশিষ্ট্যসমূহও ধরা পড়ে। অধিকন্তু এই ১১৭টি প্রতিষ্ঠানের বড় অংশ মোটেও আধুনিক 'বৃহৎ' ফ্যাক্টরির প্রতিনিধিত্ব করতো না এবং বস্তুত এগুলো ছিল মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠানের অবস্থানে।

আগেই দেখানো হয়েছে যে, অধিকাংশ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মালিক ছিল বাঙালি পুঁজি। সারণি ৫-এ প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যে 'রেজিস্ট্রীকৃত' ও 'রেজিস্ট্রিবিহীন' ধরনের প্রতিষ্ঠানকে হিসাবে ধরা হয়েছে। এসমস্ত প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যাপক পরিধি বিবেচনায় আনলে এটা ভাবা অবাস্তব হবে না যে বাঙালির মধ্যে উৎপাদনপ্রবৃত্তির মোটেও

'মৃত্যু' ঘটে নি।[৭৫] বিপরীতপক্ষে ক্ষুদ্র বাঙালি শিল্পোদ্যোগের তাৎপর্যপূর্ণ প্রসার লক্ষ্য করা যায়, যাকে 'নিচের থেকে পুঁজিবাদ'-এর ব্যাপকতর প্রক্রিয়ার অংশ বলে ধরা যেতে পারে। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সারণি ৫-এ প্রদত্ত উপাত্ত বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে 'উদ্যোগ গ্রহণে সহজাত স্পৃহার অভাব' সংক্রান্ত জাতিকেন্দ্রিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।[৭৬] খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (মেশিনে প্রস্তুত সোডাপানি, লজেন্স/ক্যান্ডি শিল্প, বিস্কুট ও কনফেকশনারি), রঞ্জনশিল্প, তেল ও ময়দার কল, সাবান প্রস্তুতকরণ, বিড়ি বানানো, ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং (বাক্স,ট্রাঙ্ক, কেবিনেট, সিন্দুক তৈরিসহ), মোমবাতি তৈরি, কাঠের আসবাব, ছাপাখানা, হোসিয়ারি শিল্প, ট্যানারি, বাঁশের কাজ ইত্যাদি বিচিত্র সব খাতে বাঙালি মুসলিম উদ্যোগের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গুটি কয়েক সামগ্রী বাদে শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি একক গুরুত্বপূর্ণ খাতে মুসলিম পুঁজির কোন না কোন মাত্রায় বিচরণের তথ্যও এক্ষেত্রে মনে রাখা যেতে পারে।

এখানে তর্ক উঠতে পারে যে, বাঙালি মুসলিম পুঁজির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশ বস্তুত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, তাই এগুলোকে আধুনিক (পুঁজিবাদী) উদ্যোগের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা যায় না। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৈদেশিক শাসকদের জন্য কৃষিজ পশ্চাৎভূমিরূপে সেবাপ্রদানকারী পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির সার্বিক পশ্চাৎপদতাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলে বাঙালি মুসলিম শিল্পোদ্যোগের উপরোক্ত খতিয়ান কোনো মতেই তাৎপর্যহীন বলে মনে হবে না। সুতীবস্ত্র ও কাঁচশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু দৃষ্টান্ত বাদ দিলে ক্ষুদ্র উদ্যোগই ছিল বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলিম পুঁজির শিল্পবিনিয়োগের প্রধান পন্থা। আর 'ক্ষুদ্র' থেকে 'বৃহৎ' শিল্পায়নে তাদের পরবর্তী রূপান্তরের সম্ভাবনা ছিল প্রধানত রাষ্ট্র কর্তৃক অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এটা অবশ্য পরবর্তী সময়ের এক ভিন্ন ইতিহাস, যখন পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলায় আধা-ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে এসমস্ত উদ্যোক্তার প্রায় সকলকেই পূর্ব বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে হয়েছিল।

---

৭৫. উল্লেখ্য যে, ৫ নং সারণিতে প্রদর্শিত পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাংশ অবাঙালি মুসলিম উদ্যোক্তাদের মালিকানায় ছিল বলে মনে হয়। তবে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে এদের আলাদা করে সনাক্ত করা সহজ নয়।

৭৬. বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্যোক্তামূলক দক্ষতা ও সামর্থ্যের অভাবের কারণ হিসেবে অনেক সময় এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, মেমন বা চিনিয়টিদের মতো বংশ পরম্পরায় ব্যবসায়ী গ্রুপসমূহ এই অঞ্চলে ছিল না। ৫ নং সারণি থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিল্পোদ্যোক্তাসুলভ প্রেষণা (যা প্রতিফলিত হয়েছিল মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে) বিরাজমান ছিল, যা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকে প্রশ্নাকীর্ণ না করে পারে না।

সারণি ১ : বাংলায় আধুনিক শিল্পের খাতওয়ারি বন্টন, ১৮১৭-৫০

খাত / নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/ স্থায়িত্ব
ক. নৌ-পরিবহণ	
১. বেঙ্গল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ এসোসিয়েশন	কলকাতা (১৮৩৮)
২. ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি	কলকাতা (১৮৩০)
৩. স্টিম টাগ এসোসিয়েশন	কলকাতা (১৮৩৭)
৪. ইউনিয়ন স্টিম টাগ এসোসিয়েশন	কলকাতা (১৮৫০)
৫. ইস্টার্ন স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৮)
৬. বেনারস এন্ড মির্জাপুর স্টিম কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৭)
৭. ক্যালকাটা স্টিম ফেরি ব্রিজ কোম্পানি	কলকাতা (১৮৩৯)
৮. ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৪)
খ. কয়লা	
৯. বেঙ্গল কোল কোম্পানি	কলকাতা (১৮২০)
১০. সিলেট কোল কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৭)
গ. নীল	
১১. বেঙ্গল ইনডিগো কোম্পানি	কলকাতা (১৮৪৮)
ঘ. বাগান	
১২. আসাম কোম্পানি	কলকাতা (১৮৩৯)
ঙ. সুতীকল	
১৩. বওরিয়া কটন মিলস	কলকাতা (১৮১৭-১৮)
১৪. নিউ ফোর্টগ্লস্টার মিলস কোম্পানি	কলকাতা(১৮৩০)
চ. অন্যান্য	
১৫. বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি	কলকাতা(১৮৩৮)

উৎস : আর. এস. রুংতা, *দি রাইজ অব বিজনেস কর্পোরেশনস ইন ইন্ডিয়া, ১৮৫১-১৯০০* (কেমব্রিজ ১৯৭০), ২৭৪-২৭৫।

সারণি ২ : বাঙালি ভদ্রলোক উদ্যোক্তাদের কয়েকটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান (১৮৬৭-১৯১৪)

উদ্যোক্তাদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১. কিশোরীলাল মুখার্জী	শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস (১৮৬৭)
২. প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	বেঙ্গল কেমিক্যালস (১৮৯৩)
৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ইনল্যান্ড রিভার স্টিম নেভিগেশন (১৮৮৪)
৪. আনন্দমোহন বসু	তেজপুর চা-বাগান (১৮৮০-এর দশক)
৫. আনন্দমোহন বসু, ভগবান চন্দ্র বসু	ব্যাঙ্ক (১৮৮০-এর দশক)
৬. পার্বতীশংকর চৌধুরী	পিট কয়লা খনি থেকে আলকাতরা ও কালি প্রস্তুত
৭. সত্যসুন্দর দেব, মনীন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, হেমচন্দ্র সেন	পোটারি ওয়ার্কস (১৯০৬)
৮. এ. পি. ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	দিয়াশলাই কারখানা
৯. কে. সি. দাস, আর. এন. সেন	ক্যালকাটা কেমিক্যালস
১০. এস. এম. বোস	বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানি
১১. সি. কে. সেন	জবাকুসুম তেল প্রস্তুত
১২. এইচ. বোস	কুন্তলীন হেয়ার অয়েল প্রস্তুত
১৩. সত্যচরণ বসু	বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস
১৪. এম. এন. দত্ত, বিচারপতি শরফুদ্দিন	ইউরেকা পোরসেলিন ওয়ার্কস
১৫. উপেন্দ্রনাথ সেন, মনীন্দ্র নন্দী সূর্যকান্ত আচার্য্য, সীতানাথ রায় আবদুস সোবহান চৌধুরী নলীনবিহারী সরকার	বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস (১৯০৬)
১৬. মোহিনী মোহন চক্রবর্তী, জগৎ কিশোর চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মোহিনী মিলস, কুষ্টিয়া (১৯০৮)
১৭. -	ক্যালকাটা উইভিং কোম্পানি (১৯০৭)
১৮. ত্রিপুরা কোম্পানির সাথে যুক্ত উদ্যোক্তাগণ	কটন জিনিং ফ্যাক্টরি (১৯০৭)
১৯. -	জলপাইগুড়ি পাইওনিয়ার উইভিং মিল (১৯০৭)
২০. আবদুস সোবহান চৌধুরী, আবদুল	বেঙ্গল হোসিয়ারি কোং (১৯০৮)

উদ্যোক্তাদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
হালিম গজনভী	
২১. -	পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানি (১৯০৫)
২২. বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, শিশির বসু	ট্যানারি কারখানা
২৩. নীলরতন সরকার,সুরেন্দ্রনাথ রায়, বিরাজমোহন দাস	ন্যাশনাল ট্যানারি (১৯০৫)
২৪. বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, নীলরতন সরকার, মধুসূদন দাস, পণ্ডিত মোহন দাস, পণ্ডিত মোহন কৃষ্ণ ধর	বুট এন্ড ইকুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি কোং (১৯০৪)
২৫. 'কার এ্যান্ড মহালনবিস'-এর সঙ্গে নীলরতন সরকার	ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি (১৯০৬)
২৬. -	বেঙ্গল সোপ কোম্পানি
২৭. -	ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরি
২৮. -	বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি
২৯. রাসবিহারী ঘোষ, পি. সি. রায়, এ. পি. ঘোষ	বন্দে মাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরি (১৯৭০)
৩০. রাজা পিয়ারী মুখার্জী, পি. মিটার	ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (১৯০৯)
৩১. -	ম্যাচ ফ্যাক্টরি, নড়াইল (১৯০৭)
৩২. -	গ্লোব সিগারেট কোম্পানি
৩৩. -	ইস্ট ইন্ডিয়া সিগারেট কোম্পানি
৩৪. -	বেঙ্গল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি
৩৫. প্রমথনাথ বসু, যোগেন্দ্র ঘোষ, বিপ্রদাস পাল চৌধুরী	রংপুর টোবাকো কোম্পানি (১৯০৭)
৩৬. যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য	স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (ব্যাঙ্ক) (১৯০৬)
৩৭. যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য	বেঙ্গল বাটন ফ্যাক্টরি (১৯০৭)
৩৮. যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য	পেনসিল প্রস্তুতকরণ ইউনিট (১৯০৭)
৩৯. জে. পি. বোস	কালি প্রস্তুতকরণ ইউনিট (১৯০৬)
৪০. -	কাগজকল (টিটাগড়)
৪১. -	কাগজকল (কাঁকিনারা)
৪২. -	কাগজকল (রানীগঞ্জ)
৪৩. ময়ূরভঞ্জের মহারাজা	মডার্ন পেপার প্লান্ট (পরিকল্পিত)

উদ্যোক্তাদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
৪৪. নগেন্দ্রনাথ মজুমদার	মনোরমা ক্যান্ডল ফ্যাক্টরি (১৯০৭)
৪৫. -	ন্যাশনাল অয়েল মিল (১৯০৭)
৪৬. -	সুগার ওয়ার্কস (১৯০৬)

উৎস : সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল*, ১৯০৩-১৯০৮, (নিউ দিল্লী ১৯৭৩) থেকে সংকলিত।

সারণি ৩ : পূর্ববঙ্গ সরকারের শ্রম পরিদপ্তরে রেজিস্ট্রীকৃত বিভিন্ন খাতের কারখানার তালিকা এবং শ্রমিকসংখ্যা (১৯৪৭) *

খাতসমূহ	ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ কারখানার সংখ্যা	ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা
১. সরকারি এবং স্থানীয় অর্থে পরিচালিত কারখানা	১৬	৯,২২০
২. অন্যান্য কারখানা (মৌসুমি) সর্বমোট	১৭০	১৮,৯০২
(ক) খাদ্য,পানীয় এবং তামাক	১১৬	৯,৭০২
(খ) জিন এ্যান্ড প্রেস (পাট, সুতা)	৫৪	৯,১৭২
৩. অন্যান্য কারখানা (স্থায়ী) সর্বমোট		
(ক) বস্ত্রকল	১৭	৯,৮৫০
(খ) প্রকৌশল শিল্প	২৫	২,৯৩৯
(গ) খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৬৩	৩,৭৯৮
(ঘ) রাসায়নিক এবং চোলাই কারখানা	৯	৩২৩
(ঙ) কাগজ এবং ছাপাখানা	৩	৭৮
(চ) কাঠ, পাথর এবং কাচ	৬	৯৬১
(ছ) চামড়া	১	২৮২
(জ) বিবিধ	১	৯৮
মোট	৩১১	৪৬,৪৫১

* কেবল শক্তিচালিত এবং কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানার সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

উৎস : এ. এফ. এ. হোসেন, *হিউম্যান এ্যান্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অব টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ*, খণ্ড ১, (লন্ডন ১৯৫৬), ১০৯।

সারণি ৪ : পূর্ব বাংলার বিভিন্ন খাতের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তালিকা (বাণিজ্যিক উপাত্ত অনুসন্ধান বিভাগের তথ্য অনুসারে, ১৯৪৭)

খাতসমূহ / উৎপাদনের প্রকার	ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১. চাউলকল	৮৩
২. বিস্কুট তৈরি (বেকারি ও কনফেকশনারিসহ)	১
৩. ফল এবং সব্জি প্রক্রিয়াকরণ	২
৪. চিনি	১০
৫. চোলাই কারখানা	১
৬. ভেষজ তেল	৩
৭. সিমেন্ট	১
৮. কাচ ও কাচপাত্র	৩
৯. দিয়াশলাই	৪
১০. সুতী (সুতা কাটা ও বয়ন)	১২
১১. পশমি বস্ত্র	১
১২. ঔষধসহ রাসায়নিক দ্রব্য	১
১৩. সাধারণ প্রকৌশল এবং বৈদ্যুতিক প্রকৌশল	১৯
১৪. জ্বালানি তেল পরিশোধন	২
১৫. করাত কল	৪
১৬. চা-উৎপাদন	১১৬
১৭. মুদ্রণ (লিথোগ্রাফ এবং বই বাঁধাইসহ)	৬
১৮. হোসিয়ারি এবং আন্যান্য বোনা কাপড়	১৩
১৯. কটন জিনিং এবং প্রেসিং	৫
২০. জুট প্রেসিং	৫৮
২১. বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রূপান্তরকরণ	৮
২২. জাহাজনির্মাণ এবং মেরামত (শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ডসহ)	৬
২৩. রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, মেরামত কারখানা এবং রেল ইঞ্জিন কারখানা	১২
২৪. অন্যান্য শিল্প	৩
সর্বমোট	৩৭৪

মন্তব্য : উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ১৯৩৪ সালের কারখানা আইনের ২ (জে) ধারায় রেজিস্ট্রীকৃত অর্থাৎ যেগুলোতে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত এবং যার উৎপাদন কার্যক্রমের কোন-না-কোন অংশ শক্তিচালিত।

উৎস : পাকিস্তানের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান তালিকা, বাণিজ্যিক তথ্যানুসন্ধান বিভাগ এবং শিল্প পরিসংখ্যান শাখা, (করাচী ১৯৪৯),১-৩।

সারণি ৫ : পূর্ব বাংলার মুসলিম উদ্যোগ (১৯৪৭-৫০)

উৎপাদনের প্রকার	পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১. ঔষধ	৬৪	১৭
২. বিস্কুট এবং কনফেকশনারি	২৯৩	১৯০
৩. সিমেন্ট	২	১
৪. খনিজ এসিড	১	-
৫. সেলুলয়েড	২	-
৬. প্রসাধনী	২	-
৭. চোলাইকৃত মদ ও স্পিরিট	১	-
৮. রঞ্জনশিল্প	২১	১২
৯. ফ্লোরিং টাইলস	৭	১
১০. কাচের জিনিস	৫	১
১১. দিয়াশলাই	১২	৪
১২. তেলকল	৯০	৩৬
১৩. রং এবং বার্নিশ	১	-
১৪. প্লাস্টিক	১৪	১১
১৫. সাবান	১০১	৪২
১৬. সোডিয়াম সিলিকেট	২	১
১৭. লবণ	৫	৪
১৮. চিনি	১১	১
১৯. তামাক	১	-
২০. বিড়ি	১৭৭	৯৯
২১. কৃষিপণ্যাদি	১২	৪
২২. এলুমিনিয়াম শিল্প	৪	-
২৩. বন্দুক মেরামত	১	-
২৪. ব্যাজ ও বোতাম	৪	৩
২৫. ব্যাটারি	১০	৩
২৬. বোল্টু, নাট এবং ওয়াশার	৫	২
২৭. বাক্স, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি	১১৬	৪৩
২৮. বালতি	৮	২
২৯. কাঠের আসবাবপত্র ও সিন্দুক	৬৪	২৯
৩০. গরুর গাড়ির চাকা	১	-
৩১. ঢালাই (লৌহ এবং অলৌহ)	১৫	৩

উৎপাদনের প্রকার	পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
৩২. খড়কাটা কল	১	-
৩৩. মোমবাতি	৩৯	২৪
৩৪. সুতাকল মেশিন এবং যন্ত্রাংশ	১	-
৩৫. ছুরি, কাঁটা, চামচ শিল্প	৩৬	২
৩৬. ড্রাম	২	১
৩৭. বৈদ্যুতিক পাত	৪	২
৩৮. সাধারণ প্রকৌশল	৭০	২৩
৩৯. বরফকল	১৯	৩
৪০. তালা	১	-
৪১. সোডা লেমনেড	৫২	১৩
৪২. যান্ত্রিক করাত	৩৪	২২
৪৩. মেশিনারি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ	১	-
৪৪. বাদ্যযন্ত্র	৩	
৪৫. ছাপাখানা	৭৩	১৯
৪৬. জুট প্রেস	৪৭	৭
৪৭. চাল ভাঙ্গার মেশিন	৫	-
৪৮. রিজেজ	৫	২
৪৯. রিভেট	৪	১
৫০. নির্মাণকাজ	৫	৩
৫১. খেলনা (শিশুদের)	২	১
৫২. ওয়াটার ফিটিংস (পিতল এবং ধাতব)	১	-
৫৩. ট্যানারি	৪৬	৩২
৫৪. জুতা এবং চামড়াপণ্যাদি	৫১	২৩
৫৫. হোসিয়ারি শিল্প	২৭১	২৮
৫৬. বস্ত্রবয়ন শিল্প	৫৫	২৪
৫৭. থ্রেড বল	২	১
৫৮. বেতের জিনিস	১৮১	১৭৯
৫৯. ছাইদানি	১	১
৬০. ব্যায়ামসরঞ্জাম	৩	২
৬১. শঙ্খশিল্প	১	১
৬২. কাঠের আসবাবপত্র	৬৭	৪১
৬৩. হাড়ের কল	২	১

উৎপাদনের প্রকার	পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পূর্ব বাংলায় মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
৬৪. ব্রাশ কারখানা	১	১
৬৫. বুনন কারখানা	৪	১
৬৬. বই বাঁধাই শিল্প	৫	৩
৬৭. সুতাকল	২২	২
৬৮. নারিকেলের ছোবড়ার শিল্প	২	২
৬৯. চিরুনি প্রস্তুতকারক	৫	৫
৭০. ডালকল	১৮	১৭
৭১. ময়দাকল	৭৯	৩৩
৭২. কালি	১	-
৭৩. জামদানী বস্ত্র	১	-
৭৪. রাবারসামগ্রী	২	-
৭৫. গহনাশিল্প	১৪	৪
৭৬. লজেন্স/ মিছরি শিল্প	৬৬	৪৫
৭৭. আয়না কারখানা	১	-
৭৮. কেশ তৈল	১	১
৭৯. গহনা পালিশ	২	২
৮০. কাগজশিল্প (হস্তনির্মিত)	১৩	১২
৮১. চাল, ডাল. আটা এবং তেলকল	১১৫	৩৯
৮২. চালকল	১৭০	৩৯
৮৩. শ্লেট প্রস্তুত	৩	-
৮৪. আখমাড়াই যন্ত্র	২	-
৮৫. সুরকি কল	৮	-
৮৬. টিন ও কামারের কাজ	২২	৫
৮৭. ছাতা কারখানা	১৫	১০

উৎস : পাকিস্তান সরকারের সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত *পাকিস্তান ম্যানুফ্যাক-চারার্স ডিরেক্টরি*, ১৯৫১ থেকে হিসাব করে বের করা হয়েছে।

মন্তব্য :

১. পণ্যসামগ্রীর ধরনের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করায় বিভিন্ন উপখাতের ইউনিটগুলি একাধিক বার হিসাবে এসে পড়া স্বাভাবিক।

২. পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে বেশিই হবে। কেননা প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মালিকের ধর্মীয় পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি।

৩. বড় এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উভয়ের হিসাব নেওয়া হয়েছে। তবে ধারণা করা যায় যে অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র।

১৪

রাষ্ট্র ও শিল্প : ১৮৮০-১৯৪২

ইফতিখার-উল-আউয়াল*

বাংলায় বৃটিশ শাসনের প্রায় দুশ' বছর পরেও শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে প্রদেশটির অবস্থা শোচনীয় থেকে যায়। জনগণের উদ্যোগ ও শিল্পপ্রবণতার অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, বাজারের সঙ্কীর্ণতা, অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো, পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব, জনগণের অন-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বহু কারণকে প্রদেশটির শিল্পক্ষেত্রে এ স্বল্প অগ্রগতির জন্য দায়ী করা হয়। যাহোক, অধিকাংশ প্রতিকূল কারণ যে একেবারেই দূর করা সম্ভব ছিল না এমন নয়। অসীম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে শুধু শিল্পোন্নয়নের বাধাগুলিই অপসারণ করতে সক্ষম ছিল না, যথাযথ নীতি নির্ধারণব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই শিল্পোন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করতেও সক্ষম ছিল।

জাপান ও পাশ্চাত্যের শিল্পায়নে রাষ্ট্রের উদ্যোগী ভূমিকা এই দিক থেকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতের জনগণ রাষ্ট্রের ঠিক এই ভূমিকাই দাবি করেছিল। তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো যে, সরকার ও জনগণের যৌথ সহযোগিতায় ভারতের তার সব প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিশ্বের উৎপাদক দেশগুলির উচ্চতর পর্যায়ে না হলেও অন্তত পক্ষে সমপর্যায়ে না পৌঁছার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।[১] কিন্তু তাদের প্রত্যাশা কি পূরণ

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধ আকারে এ অংশটি প্রথম প্রকাশিত হয় *Studies in History*, 5, 1 N. S. (1989) জার্নালে। এখানে পুনঃপ্রকাশের অনুমতিদানের জন্য প্রকাশক Sage Publications (New Delhi)-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

১. Sir Ibrahim Rahimtoola in the *Indian Legislative Council*, 21 March 1916; দেখুন, *India Office Record* (এখন থেকে IOR), L/E/7/855.

হয়েছিল ? সরকারের সকল পর্যায়ের প্রশাসন কি এই শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল ? যদি দিয়ে থাকে, তবে এই শিল্পোন্নয়নে তারা কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিল ?

যাই হোক, এই অধ্যায়ে বাংলায় শিল্পায়নের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানে রাষ্ট্র কি ভূমিকা পালন করেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যায়টি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। শুল্ক, মালামাল ক্রয়, মূলধন সরবরাহ ও শিল্প-উদ্যোগ সম্পর্কিত নীতিগত ব্যবস্থাদি প্রথম চার ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অংশে রয়েছে আলোচ্য সময়ে সরকারের শিল্প-কর্মকাণ্ডের একটি সাধারণ সমীক্ষা।

১

পৃথিবীর সকল শিল্পোন্নত দেশ কোন না কোন সময়ে শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক প্রবিধানমালা গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় দেশগুলি উচ্চহারে শুল্ক আরোপনীতি গ্রহণ করে। ফ্রান্সের ছিল নিজস্ব অতিমাত্রায় সংরক্ষণবাদী নীতি। জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করে এবং ১৮৪০-এর দশকে প্রায় সব শুল্কের হার বাড়িয়ে দেয়। আমদানির উপর রাশিয়ার ছিল নানা আরোপনীতি। বেলজিয়াম যখন সংযুক্ত নেদারল্যান্ডের অংশ ছিল, তখন (১৮১৫-১৮৩০) ১৮২১ ও ১৮২২ সালের আইনের অধীনে সংরক্ষণসুবিধা ভোগ করে এবং পরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। হল্যান্ড ১৮৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেলজিয়ামের সাথে সংযুক্ত থাকাকালীন সময়ে প্রবর্তিত শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করতে শুরু করে নি।[২] ইউরোপ মহাদেশের শুল্কব্যবস্থা ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও (স্মরণযোগ্য যে শুল্ক কখনো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নি, তা হ্রাস করা হয় মাত্র) ১৮৭০-এর দশক থেকে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩]

১৮৭৯ সালে জার্মানি নিশ্চিতভাবে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করে এবং এই নীতির বদৌলতে দেশটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করে।[৪]

২. Shepherd Bancroft Clough and Charles Woolsey Cole, *Economic History of Europe*, (Boston 1968), 479, 608.

৩. ঐ, 610-11. Alcroft and Richardson also testify that 'tariffs, usually at increasingly higher rates were introduced intermittently by most important trading countries in the forty years before 1914. Derek H Alcroft and Harry W. Richardson, *The British Economy, 1870-1939*, (London 1969), 78.

৪. *Report of the Indian Fiscal Commission, 1921-22*, (Simla 1922), 33.

১৮৮১ সালে ফ্রান্সও অবাধ বাণিজ্যপ্রবণতা থেকে সরে দাঁড়ায়, যার প্রতি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের কোন সমর্থন ছিল না।[৫] মহাদেশের বাইরে গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অতি সংরক্ষণমূলক শুল্কব্যবস্থা চালু ছিল।[৬] ১৮৯৯ সালে চুক্তির গণ্ডি ও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে জাপানও সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রবর্তন করার জন্য তার স্বায়ত্তশাসনকে কাজে লাগায়।[৭] বৃটিশ 'উপনিবেশগুলিও ব্যতিক্রমহীনভাবে উচ্চশুল্কের দ্বারা তাদের শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের স্বার্থে শুল্কনীতি প্রণয়ন করার অধিকার কাজে লাগায়।[৮] এমনকি ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, অন্য সকল দেশের মতোই তার শিল্পভিত্তি অতিসংরক্ষণপদ্ধতির আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] অন্যান্য দেশের উদাহরণ ছাড়াও শুল্কপ্রবিধানমালা অবলম্বনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক যুক্তিও ছিল প্রবল।[১০] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শুরু থেকেই ভারতের শুল্কনীতি ভারত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় নি (যদিও তা হওয়া উচিত ছিল), নিয়ন্ত্রিত হয়েছে হোয়াইট হল থেকে বৃটিশ-রাজ কর্তৃক। তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ বৃটিশ স্বার্থের অধীন হয়ে পড়ে। দৃশ্যত যে অবাধ বাণিজ্যনীতি ইংল্যান্ডের জন্য ছিল খুব লাভজনক তা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের বাণিজ্যনীতির ফলাফল সর্বনাশা। যে কয়টি ক্ষুদ্রশিল্প ভারতের ছিল, যেমন তাঁতশিল্প, রেশম ও চিনিশিল্প, সেগুলি বিদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এ অসম প্রতিযোগিতা ভারতের কতিপয় শিল্প ধ্বংস করা ছাড়াও আধুনিক শিল্পের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে এবং আধুনিক শিল্পকে যদি প্রাথমিক

৫. ঐ, 33

৬. ঐ।

৭. ঐ।

৮. প্রাগুক্ত, *The Friend of India* লিখেছে : "The Australian Protectionists have evidently not the slightest desire to encourage inter-imperial trade. What they want to encourage is the development of Australian manufactures, and their programme is to make the Australian taxpayer provide the money for the development Not only will all important categories of manufactured goods be heavily taxed, from whatever part of the world they may come, but also heavy money bounties are to be paid to encourage the export from Australia of iron and steel goods and of textiles It is argued that infant industries can not be expected to struggle unaided against the well-equipped factories and workshops of the old world", *The Friend of India*, 12 July 1900, 5.

৯. দেখুন, Ralph Davis, "The Rise of Protection in England, 1689-1786", in the *Economic History Review*, Second Series, XIX, (1966), 306-317.

১০. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Vol. I, edited by Edwin Cannan, (London 1904), 422-23.

পর্যায়ে বিদেশের প্রাগ্রসর প্রতিযোগীদের থেকে রক্ষা করা যেতো, তবে তার উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হতো।

শিল্পের উন্নতিসাধন করতে হলে যে বাণিজ্যিক নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে ভারতীয় জনসাধারণ উপলব্ধি করতে শুরু করে। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে মোরারজী গোকুলদাশ সরকারের কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন যে, অবাধ বাণিজ্যনীতি থেকে সরে আসা প্রয়োজন যাতে ভারতে নতুন শিল্প ও উৎপাদকদের উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর মতে, রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতিমালা থেকে এইরূপ সরে আসাকে বাধ্যতামূলকভাবে এসব নীতির লঙ্ঘন বলে ধরা যায় না, বরং একে ভারতীয় সমাজের অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা যায়।[১১]

স্যার লোপার সেলপৌনডায়ার ভারতে সদ্য গড়ে উঠা শিল্পের জন্য আর্থিক সংরক্ষণের পক্ষে প্রবল জনমত লক্ষ্য করেন। তিনি নিজেই মত পোষণ করেন যে, যখন কল-কারখানায় তৈরি পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা হয়, যে পণ্যের নিজ দেশে সংরক্ষিত বাজারের প্রাথমিক সুবিধা রয়েছে, তখনই সেই প্রয়াস হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও প্রকৃতই ধ্বংসাত্মক।[১২] মাদ্রাজের স্কুল অব আর্টস্ এ্যান্ড কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আলফ্রেড স্যাটারটন সরকারের কাছে পেশকৃত তাঁর স্মারকলিপিতে পরিস্থিতির নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন :

> বাণিজ্যিক সমস্যাগুলিই হচ্ছে মূল সমস্যা, এবং এমনকি সমস্যাগুলির আংশিক সমাধানও সম্ভবত ভারতে শিল্পবিস্তারের পথ প্রশস্ত করবে এবং এই শিল্পবিস্তার বাস্তবিকই ভারতের উন্নতিবিধানের সহায়ক হবে। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশে সুসংগঠিত এবং উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত উৎপাদনসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। প্রাথমিকভাবে বিরূপ পরিস্থিতিতে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কি করা যেতে পারে তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে।[১৩]

বিপুল জনমত, অন্য দেশের উদাহরণ এবং বৈধ অর্থনৈতিক যুক্তি সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ভারতের শুল্কসমস্যা পুনর্বিবেচনা করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে, যখন ভারতের অধিকতর শিল্পোন্নয়নের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করার জন্য ভারতীয় শিল্প

১১. Notes by Morarji Gokaldas, C. I. E., on the Duty of Government in Fostering Industries দেখুন, IOR. L/PAR/1/176, 217-19

১২. *Industrial India*, Vol. III, No. 10 October 1906, 287

১৩. *The Indian Agriculturist*, 1 May 1901, 145

কমিশন গঠন করা হয়।[১৪] ১৯১৯ সালে যখন সেক্রেটারি অব স্টেট এবং ভারত সরকারের মধ্যে সম্পর্কের বিষয় পরীক্ষা করার জন্য গঠিত যৌথ সিলেক্ট কমিটি তার সুপারিশে এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, হোয়াইট হল থেকে আর্থিক নীতির নিরবচ্ছিন্ন পরিচালনায় ভারত এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে সুসম্পর্কের হানি হতে পারে, তখনই বৃটিশ সরকার নতি স্বীকার করে।[১৫] সেক্রেটারি অব স্টেট ১৯২১ সালের ৩০ জুন কমিটির সুপারিশ গ্রহণের বিষয়টি ভারত সরকারকে জানায়। ভারত সরকারের শুল্কনীতি সম্পর্কিত সকল সুবিধা ও স্বার্থ পরীক্ষা করার জন্য ভারত সরকার ১৯২১ সালের ৭ অক্টোবর একটি অর্থনৈতিক কমিশন নিয়োগ করে।[১৬]

ভারতীয় অর্থনৈতিক কমিশন শিল্পোন্নয়নের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে যতদূর সম্ভব জনগণের উপর শুল্কের বোঝা হালকা করার জন্য একটি পক্ষপাতমূলক নীতির পক্ষে মত প্রকাশ করে। সংরক্ষণীয় শিল্প নির্বাচনে তা তিনটি মৌলিক শর্ত আরোপ করে। শর্তগুলো হচ্ছে—প্রথমত, অবশ্যই শিল্পে প্রাকৃতিক সুবিধা, সস্তায় বিদ্যুৎ, যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহ এবং বিপুল দেশীয় বাজার থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, শিল্প হবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার দেশের স্বার্থে সংরক্ষণ ব্যতীত মোটেই কিংবা আশানুরূপ ত্বরিত গতিতে অগ্রগতিলাভের সম্ভাবনা নেই ; তৃতীয়ত, শিল্পকে এমন হতে হবে, যা পরিণামে সংরক্ষণ ব্যতীত বিশ্বপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে সক্ষম হবে।[১৭] ভারত সরকার সুপারিশগুলি গ্রহণ করে এবং শুল্কনীতিকে কার্যকর করে তোলার জন্য ১৯২৪ সালের জুন মাসে একটি শুল্কবোর্ড গঠন করে। এর প্রধান কাজ ছিল সংরক্ষণের আবেদনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসমূহ ভারত সরকারের কাছে পেশ করা।

শুল্কবোর্ড বহু আবেদনপত্র পরীক্ষা করে এবং যথাযোগ্য আবেদনগুলি সুপারিশ করে সরকারের কাছে পেশ করে। যেসকল শিল্প সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয়, সেগুলি থেকে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৬-২৭ সালে সুতীবস্ত্র শিল্প সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয় এবং কলকারখানার সংখ্যা ও তাদের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ সালে বাংলায় একুশটি কাপড়ের কল ছিল এবং ১৯৩৬ সালে এর সংখ্যা চৌষট্টিতে

১৪. দেখুন, ভারতীয় বিধানসভায় স্যার উইলিয়ম ক্লার্কের বক্তৃতা, ১৯১৬।

১৫. *Report from the Joint Select Committee on the Government of India Bill,* Vol. I, Report and Proceedings (Parliamentary Paper IV of 1919), II, Clause 33.

১৬. *Report of the Indian Fiscal Commission, 1921-22*, iv.

১৭. ঐ, 54-55

বৃদ্ধি পায়।[১৮] ১৯২৬-২৭ সালে বাংলার কাপড়ের কলগুলি ৩১.৫৪ মিলিয়ন পাউন্ড সুতা কাটে এবং ৭.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বস্ত্র বয়ন করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই সুতার পরিমাণ ৪৫.৭০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং বস্ত্রের পরিমাণ ৪৩.৮ মিলিয়ন পাউন্ড বৃদ্ধি পায়।[১৯] অনুরূপভাবে প্রধানত বিদেশী প্রতিযোগিতার কারণে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত একটি আধুনিক চিনির কলও বাংলায় ছিল না এবং এই বছর চিনিশিল্প সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয়েছিল। যাই হোক, ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলায় দৈনিক মোট ৫০০০ টন পেষণক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি চিনির কল ছিল।[২০] সুতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে বোম্বে এবং অন্যান্য এলাকা এবং চিনির ক্ষেত্রে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার থেকে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা না হলে এই দু'টি শিল্প—সুতীবস্ত্র ও চিনি সংরক্ষণমূলক শুল্ক থেকে সম্ভবত অনেক উপকৃত হতো।

লৌহ ও ইস্পাত ছিল আরেকটি শিল্প। ১৯২৪ সালে এই শিল্পের যে সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয় তাতে এর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বাংলায় মেসার্স স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ এ্যান্ড কোম্পানি বালীগঞ্জে হুকুমচাঁদ বৈদ্যুতিক ইস্পাত কারখানা চালু করে। এখানে উৎপাদিত ইস্পাত ছিল অতি উচ্চ মানসম্পন্ন এবং বৃটিশ প্রকৌশলমানে প্রথম শ্রেণীর সাথে তা তুলনীয়।[২১] বাংলায় অন্য দু'টি বড় শিল্প—লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানিও উপকৃত হয়। প্রথমটি ছিল বাংলা লৌহ কোম্পানি[২২] এবং এটি কাঁচা লোহা, ঢালাই লোহার পাইপ, বেড়া নির্মাণের খুঁটি এবং সকেট, রেল-চেয়ার ও স্লিপার উৎপাদনে ছিল বিশিষ্ট। এই জাতীয় পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাংলা পৃথিবীর কোন দেশের কাছে হার মানে নি।[২৩] অন্যটি ছিল ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি এবং এটি ১৯১৮ সালের মার্চে তিন কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে স্থাপিত হয়।[২৪] এ দু'টি কোম্পানি ১৯৩৬ সালে একটি সংযোজিত কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং সমন্বিত কোম্পানি হিসেবে

---

১৮. Report *of the Indian Tariff Board regarding the grant of protection to the Cotton Textile Industry*, Calcutta, 1932, 9-10, and Government of Bengal, Department of Industries, *Bulletin No 75, Cotton Mill Industry in Bengal*, Alipore, 1943, 6

১৯. *Statistical Abstract for British India with Statistics, where available, relating to certain Indian states from 1921-22 to 1930-31,* (London 1933), 754-57, ঐ, 1930-31 to 1939-40, (London 1943), 626-29.

২০. *Sugar Technologist's Association (of India) Year Book, 1939-40,* (Cawnpur n. d), appendices on the List of Sugar Factories and Refineries existing in India in the year 1938-39, list A, 14-15. For a study of the growth of sugar mill industry under tariff protection, see A K. Bagchi, *Private Investment in India*, (Cambridge 1972), 359-90.

২১. *The Indian Railway Gazette*, June 1925, 212-13.

২২. দেখুন, *Report on the Administration of Bengal, 1921-22*, 41.

২৩. *The Englishman* (Annual Financial Review), 4 March 1918, 9

২৪. *Report on the Administration of Bengal, 1921-22,* 41.

এটি বর্তমানে বার্ষিক ৮৫০,০০০ টন কাঁচা লোহা এবং ১০০,০০০ টন ঢালাই লোহার পাইপ, স্লিপার ও সাধারণ ঢালাই লোহা উৎপাদনে সক্ষম।[২৫] ১৯৩৭ সালে কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত উৎপাদনের জন্য স্টিল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল নামে একটি নতুন কোম্পানি গঠন করা হয়। স্টিল কর্পোরেশন প্লান্ট আসানসোলের কাছে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানির চুল্লীর পাশেই স্থাপিত হয় এবং একটি চুক্তির শর্তানুসারে কর্পোরেশনটি ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানির কাছ থেকে উত্তপ্ত ধাতু লাভ করতো।[২৬] সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে কর্পোরেশন ইমারতি দ্রব্য, ভারী রেল, পাত (কালো ও দস্তালিপ্ত), লোহার দণ্ড, ইস্পাত ও যন্ত্রের জন্য ইস্পাত উৎপাদন করতো।[২৭] প্রধানত সংরক্ষণের কারণে লৌহ ও ইস্পাতশিল্প দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।[২৮] এর প্রভাবাধীনে জাহাজনির্মাণ শিল্পেরও উন্নতি হয়। যৌথ লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজনির্মাণ কোম্পানির মোট সংখ্যা ১৯২০-২১ সালে ছিল ২৯টি। এই সংখ্যা ১৯২৫-২৬ সালে ৩৯টি এবং ১৯৩০-৩১ সালে ৫৯টি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে বাংলায় এরকম কোম্পানির সংখ্যা ৬৯-এর কম ছিল না।[২৯]

পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন আরো দ্রুত হতে পারতো সরকার যদি এই শিল্পোন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাস্তবিক পক্ষে আন্তরিক হতো। বহুক্ষেত্রেই শুল্কবোর্ডের সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয় নি কিংবা কেবল আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারী রাসায়নিক শিল্পের কথা বলা যেতে পারে।[৩০] অনেক সময় সরকার কাচশিল্পের ক্ষেত্রে কঠোর ও অনমনীয় ব্যাখ্যা সম্বলিত শর্ত আরোপ করেছে। এই শিল্প কেবল সোডাভস্মের কারণে সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই সোডাভস্ম এমন একটি কাঁচামাল, যা এই কাচশিল্পের উৎপাদনের জন্য আমদানি করতে হতো।[৩১]

২

কোন এক সময়ে যখন সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় দাবিকে নিশ্চিতভাবে বাতিল করে দেয়া হয়, তখন সরকারের সামরিক-বেসামরিক বিভাগগুলির জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটের

---

২৫. *Report of the Indian Tariff Board on the continuance of protection to the Iron and Steel Industry*, (Bombay 1947), 9
২৬. ঐ, 10
২৭. ঐ।
২৮. ঐ, 6
২৯. Department of Industries, *Bengal Bulletin No 83, Report on the Growth of Joint-Stock Companies in Bengal*, Alipore, 1939, 11.
৩০. IOR Economic and Overseas Department Collections, File No. L/E/9/1027.
৩১. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 27 February 1939, Vol. I, 335.

অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত স্থানীয়ভাবে গুদামজাতকরণ নীতিমালায় ভারতীয় উৎপাদনস্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এই সব মালের প্রত্যেকটি—সবচেয়ে বড় কলকব্‌জা থেকে শুরু করে দরজার সবচেয়ে ছোট পেরেক পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হতো।[৩২] এই ধরনের অসাধু কারবার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে *দি স্টেটস্‌ম্যান* এবং *দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* বলেছে :

> স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণ সুবিস্তৃত সেতু ও ছাদের জন্য ইন্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে যেরূপ উন্নতমানের ও সস্তা উপকরণ লাভ করা যায় সেরূপ উন্নতমানের সস্তা উপকরণ যদি উৎপাদন করতে পারে, তবে কাণ্ডজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে কেন তা করতে দেয়া যাবে না ? এমনকি শুধু যখন তাদের স্বার্থ বিপন্ন হয় এবং যে রাষ্ট্রের শ্রমে তারা আত্মনিয়োগ করে, যে রাষ্ট্রের সাজসরঞ্জাম উৎপাদনে তারা যথাযথভাবে উৎসাহিত হয়ে কালক্রমে নিজেদেরকে কাজে লাগাবে, সেই রাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হয় (যদিও ব্যাপারটি বাস্তবিক পক্ষে তা নয়), তখন তাদেরকে তা কেন করতে দেয়া যাবে না ? সর্বোপরি, একটি কঠিন বিধি হিসেবে এটি কেন প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে নির্মাণাধীন রেলপথের ক্ষেত্রে সমগ্র প্রয়োজনীয় সরবরাহ পূর্বেকার মতো সেক্রেটারি অব স্টেটকে ফরমাশ প্রদানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে বলা হয়েছে ? এক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম (আকস্মিক বা অদৃষ্টপূর্ব জরুরি বিষয় না হলে) আরোপ করতে পারা যাবে না ? যদি স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণ মানসম্পন্ন এবং সেক্রেটারি অব স্টেটের মাধ্যমে যেরূপ সস্তায় স্লিপার কিংবা রেল অথবা এমনকি রেল-ইঞ্জিন পাওয়া যায় সেরূপ উক্ত বস্তুগুলি উৎপাদন করতে পারে, তাহলে তারা সরেজমিনে থেকেও কেন ন্যায্য, সৎ এবং জাতীয় সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে না ? ন্যায়পরায়ণতা ও বিবেকবুদ্ধির স্পর্শ থাকবে এরূপ কোন উত্তরও দেয়া সম্ভব হবে না, তবে এমন উত্তর হয়তো আছে যেটি কখনো দেয়া যাবে না কিংবা যে উত্তরটি যারা ঐ সকল স্টোরবিধি তৈরি করেছিলেন তাঁদের উপর সীমাহীন কলঙ্ক লেপন করবে।[৩৩]

জনগণের সমালোচনার ফলে স্টোরবিধি পরবর্তী সময়ে পরিবর্তন করা হয়। ১৯০৪ সালের পরিবর্তিত বিধিমালার অধীনে ভারত সরকার ও স্থানীয় সরকারের কয়েক জন কর্মকর্তাকে অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ টাকা মূল্যের স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন মাল ক্রয়ের ক্ষমতা দেয়া হয়।[৩৪] যাই হোক, নির্দেশমালায় ত্রুটি থাকার কারণে এমনকি সরকারের এই নীতিও সম্পূর্ণ কার্যকর করে তোলা সম্ভব হয় নি। বিধিমালা বরং অনুমতিজনকরূপেই গঠন করা হয় এবং এতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান প্রয়োজনীয় বিবেচিত

৩২. IOR: L/PAR/1/176. দেখুন *Note* by Moratji Gokaldas.

৩৩. *The Statesman and Friend of India,* 21 November 1891, 2.

৩৪. IOR: Vol. 7861, *Bengal General Proceedings* (Misc.), November 1908, No. 79, 455.

হয় নি।[৩৫] অধিকন্তু বিধিমালা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা ছিল, যেক্ষেত্রে অবশ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও ইংল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের মূল্য ও গুণগত মান তুলনা করার প্রয়োজন হতো।[৩৬] আমদানিকৃত উপকরণ থেকে ভারতে কোন্ দ্রব্য তৈরি বা আংশিকভাবে তৈরি অবস্থায় ভারতে আমদানি করা যাবে না—এরকম শর্তে তা ব্যাখ্যার জটিলতা কম ছিল না।[৩৭] এসব ত্রুটির ফল এই যে, ভারতে সরকারি বিভাগগুলির ব্যবহারের জন্য মাল ক্রয় করতে নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করার জন্য গঠিত কমিটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভোক্তা বিভাগগুলির চাহিদা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পায় যে, ১৯০৪-০৫ সালে লন্ডনে ৪৬৭,৩১৯ পাউন্ড মূল্যের ফরমাশ দেয়া হয়, যা সম্ভবত স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা মেটানো যেতো।[৩৮] *দি স্টেটস্ম্যান* জানায় :

> কমিটি মনে করে যে, ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের শক্তি ও দক্ষতা পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগানো হচ্ছে না ... ভারতীয় প্রস্তুতকারকগণ বর্তমানে তাদের উপর সরকারি বিভাগ কর্তৃক অর্পিত কাজের চেয়ে আরো অধিক পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম ও আগ্রহী বলে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করে ...।[৩৯]

১৯০৮ সালে গভর্নর জেনারেল সম্ভবত ১৯০৬ সালের কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি প্রশাসনিক বিভাগের মাল ক্রয়ের জন্য ২৫০ টাকা পর্যন্ত অর্থসীমা পুনর্নির্ধারণ করেন, যা ভারতে বিভাগসমূহের প্রধান, বিভাগীয় কমিশনার এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক নির্বাচিতব্য কালেক্টর পদমর্যাদার বা কালেক্টর পদের উচ্চতর পদমর্যাদার অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত হতে পারে।[৪০] ইন্ডিয়া অফিসে মালের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ফরমাশগুলি অন্তর্ভুক্ত করার আগে সেগুলি সতর্কতার সাথে বাছাই করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়।[৪১] স্টোরবিধিমালায় এসব সংশোধন কিন্তু স্থানীয় উৎপাদন অনুমোদনকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রশংসনীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। তা করতে না পারার একটি সম্ভাব্য কারণ হয়তো ছিল ১৯২২ সালের আগে ভারতে যথোপযুক্ত ক্রয়এজেন্সিগুলির অনুপস্থিতি। ফলে স্থানীয় উৎপাদিত

৩৫. দেখুন, IOR: Vol. 8139, *Bengal General Proceedings* (Misc.), August 1909, Nos 12-15, 187

৩৬. ঐ।

৩৭. ঐ।

৩৮. *The Statesman*, 22 July 1909, 14

৩৯. ঐ।

৪০. IOR. Vol 7861, *Bengal General Proceedings* (Misc.), November 1908, No. 79, 455.

৪১. *The Statesman*, 22 July, 1909, 14.

দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে সেসব দ্রব্যের সন্ধানে থাকতে হতো যেগুলি ছিল মূল্যের দিক থেকে সন্তোষজনক ও অনুকূল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের সঙ্গে রপ্তানিবাণিজ্য চালিয়ে যেতে ইংল্যান্ডের অক্ষমতার কারণে প্রথমবারের মতো ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাগণ অস্থায়ীভাবে হলেও উন্নতিসাধনের সুযোগ পায়। মালভাড়া কমানোর জন্য বৃটেন থেকে ভারতে রপ্তানি- নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা তৈরি করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর নিয়ম-বিধি প্রণীত হয়। বিভিন্ন সরকার ও বিদেশী সেনাবাহিনীর কাছে মাল সরবরাহের সময় যুদ্ধোপকরণ বোর্ড অন্যসব বিভাগ-কর্পোরেশন ও রেল কোম্পানি একত্রে যে পরিমাণ কিনতে পারে তার দ্বিগুণ মাল নিজেই কিনতে থাকে। এতে কিছু কিছু শিল্প-কারখানার উদ্ভব হয়।[৪২]

যুদ্ধের পরে ভারতীয় শিল্প কমিশনের সুপারিশমালা অনুযায়ী রেল বোর্ডের সদস্য এফ. ডি. কোচম্যানের নেতৃত্বে মালক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ভারতীয় স্টোর বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এতে বলা হয় যে, এই বিভাগ ভারত সরকারের সকল কেন্দ্রীয় বিভাগের পক্ষে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে সকল বিভাগ এই কমিটির সহায়তা গ্রহণ করবে।[৪৩] কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার জনসাধারণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় স্টোর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে।[৪৪] যদিও ভারতীয় স্টোর বিভাগের কাজ দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বহু বিভাগ উপকৃত হয়, কোম্পানি রেলওয়ে, ভারতীয় রাজ্য এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করে, তথাপি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর কাজ ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বাধ্যতামূলক ছিল না।[৪৫] ১৯৩৩ সালের ১ জানুয়ারি যে 'রুপী (rupee) টেন্ডার পদ্ধতি' কার্যকর করা হয় তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। এ সংক্রান্ত বিধিতে নিম্নোক্ত ক্রম অনুযায়ী মাল ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল :

> প্রথমত, যেসব দ্রব্য কাঁচামালের আকারে ভারতে উৎপন্ন হয় কিংবা ভারতে উৎপাদিত কাঁচামাল থেকে তৈরি হয়, সেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, মাল ক্রয়ের বেলায় এসব দ্রব্যের মান হবে যথেষ্ট ভাল;

৪২. J. C. K. Peterson, 'Industrial Development in Bengal', *Englishman*, (Annual Financial Review), 4 March 1918, 11

৪৩. *Report of the Stores, Printing and Stationery Sub-Committee of the Retrenchment Advisory Committee*, September 1932, (Simla 1932), 9, A. G. Clow, *The State and Industry*, (Calcutta 1928), 84-85

৪৪. *Administration Report of the Indian Stores Department, 1929-30*, I.

৪৫. ঐ।

> দ্বিতীয়ত, যেসব দ্রব্য আমদানিকৃত উপকরণ থেকে ভারতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তৈরি হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, মাল ক্রয়ের লক্ষ্যে এসব দ্রব্যের মান হবে ভাল;
>
> তৃতীয়ত, যেসব বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে মজুদ করে রাখা হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, সেগুলি যথোপযুক্ত ধরনের ও প্রয়োজনীয় মানের হবে;
>
> চতুর্থত, বিদেশে তৈরি দ্রব্যের ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, সেগুলি বিশেষভাবে আমদানি করতে হবে।[৪৬]

নতুন বিধিমালা চালু হওয়ার ফলে দিল্লীর ভারতীয় স্টোর বিভাগ এমনকি চাকা ও চক্রনেমী, মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ, বয়লার টিউব, পরিবহন ফ্লাট ও ফেরি-মঞ্চ, বাতিঘর সরঞ্জাম এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতির ন্যায় দ্রব্যও ক্রয় করে, যা পূর্বে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো।[৪৭] স্থানীয় দ্রব্য ক্রয়ের এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে দিল্লীর ভারতীয় স্টোর বিভাগ বার্ষিক প্রায় নয় কোটি টাকার মাল ক্রয় করে এবং অধিকাংশ মালই বাংলা থেকে ক্রয় করা হয়, যা ছিল প্রধানত বস্ত্র ও চামড়াজাত দ্রব্য, যান্ত্রিক লোহালক্কড় ও বিবিধ বস্তু।[৪৮]

১৯২৬ সালে ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলিকেও তাদের নিজেদের স্টোরবিধি প্রণয়ন করার অধিকার প্রদান করে। একই বছর আগস্টে প্রকাশিত নতুন বিধিমালার মৌলিক নীতি ছিল স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা। সরকারি বিভাগ ও কর্মকর্তাগণকে ভারতীয় স্টোর বিভাগ ও দিল্লীর সহায়তা পরিপূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রধানত বিধিমালায় পরিবর্তনের কারণে ভারতে উৎপাদিত মালের সরকারি নিজস্ব ক্রয়ের পরিমাণ ১৯১৪-১৫ সালে ৩,১৭,৮৩৮ টাকা থেকে ১৯১৯-৩০ সালে ২৩,৮১,০০০ টাকায় উন্নীত হয়।[৪৯] ১৯৩৩ সালে বাংলা সরকার 'রুপী টেন্ডার' পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করে তোলার জন্য বিধিমালা সংশোধন করে এবং এই সংশোধিত বিধিমালার প্রধান দিকগুলি ছিল বাংলায় উৎপাদিত বা তৈরি দ্রব্যের মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানীয় ক্রয়ের উপর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা অপসারণ এবং বাংলায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের ব্যাপারে সীমিত পরিমাণ অগ্রাধিকার অনুমোদন।[৫০] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলা সরকারের কোন স্থানীয় ক্রয়এজেন্সি না থাকার কারণে সময়ে সময়ে

---

৪৬. ঐ, 2-3.

৪৭. ঐ, 1931-32, 2

৪৮. Iftikhar-ul-Awwal, *The Industrial Development of Bengal, 1900-1939*, (Delhi 1982), Table 2.3, and *Administration Report of the Indian Stores Department, 1929-30*, 63-64, Appendix-VII.

৪৯. IOR, Vol 12049, *Bengal Revenue Proceedings* (Industries), September 1935, No 22, 57.

৫০. ঐ।

প্রণীত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। এরকম একটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়ে ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। কিন্তু যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার জন্য পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যায়।[৫১]

৩

বাংলার আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি) হাতে প্রচুর আমানত[৫২] থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে শিল্পক্ষেত্র থেকে কম-বেশি দূরে রাখে, কারণ ব্যাঙ্কের আওতার বাইরে তাদের তহবিলের কোন বৃহৎ অংশ আটকে থাকা তারা যথাযথ বলে মনে করে নি। কেবল যেসব শিল্প সফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং পাট, চা ও বৃহৎ কয়লাখনি কোম্পানিগুলির ন্যায় বাঞ্ছনীয় জামিনের ব্যবস্থা করতে পারতো, সেসব শিল্পেরই তাদের চালু মূলধনের একটি অংশ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনুমোদিত নামে কিংবা যে মাল তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করা যেতো সেই মাল বন্ধক রেখে জামিনের ব্যবস্থা করতে অক্ষম মধ্যম আকারের শিল্পগুলিকে এমনকি এই ধরনের স্বল্পমেয়াদি ঋণ লাভ করতেও অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। তারা বিশেষ মাত্রায় এই অসুবিধা ভোগ করতো, কারণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে ব্যাঙ্কের চাহিদা পূরণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হতো, যে ব্যাঙ্কের পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন ইউরোপীয়। এভাবে ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি শিল্পের জন্য অর্থসংস্থানের ব্যাপারে অতিসংরক্ষণনীতি অনুসরণ করতো। অথচ জার্মানি ১৮৭০ সাল থেকে ব্যাঙ্কের সাধারণ লেনদেন (আমানত-জমা আকর্ষণ, টাকা ধার এবং বিল ভাঙানো) ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ সরবরাহ করে শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৫৩] এই পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য আদর্শ উদ্যোগ ছিল ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্যারিস ক্রেডিট মবিলায়ার।[৫৪]

৫১. *Report of the Committee on Public Accounts of the Bengal Legislative Assembly on the Appropriation Accounts and Finance Accounts of the Government of Bengal for the year 1940-41 and the Audit Reports, thereon*, (Alipore 1943), 12

৫২. Some idea of the holdings of the Indian commercial banks can be gauged from the deposits of the Bengal Circle of the Imperial Bank of India for the last week of March 1925 The amounts shown below are in lakhs of rupees:

	European	Indian	Bank's	Total
Current Account Deposits	3,96	7,53	3 95	15,44
Fixed Deposits	2,55	9.96	.5	12,56

দেখুন, *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30*, Vol. I, (Calcutta 1930), 39

৫৩. Supplementary written evidence of G Findlay Shirras to the Indian Industrial Commission, *1916-18*, Vol V, 804-10.

৫৪. ঐ, 805, 811

সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মূলধনবাজারের অনুপস্থিতিতে সরকার তার আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ঋণব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি গঠনমূলক উপায় অবলম্বন করে এগিয়ে আসতে পারতো। এ প্রসঙ্গে এম. জি. রণদে যথাযথই মন্তব্য করেন :

> প্রদেশের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করার প্রয়োজন নেই। প্রদেশ যদি কেবল এজেন্সিকে সংগঠিত করে তাকে কাজে লাগায়, তা হলেই যেকোন পরিমাণ তহবিল পাওয়া যাবে। ডাকঘর ও সঞ্চয়ব্যাঙ্কগুলির আমানত হাতেই আছে। তবে যে কাজটি করা দরকার তা হলো সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের সংগঠিত করা।[৫৫]

কিন্তু সরকার তাদের 'শিল্পে হাত দিওনা' নীতি অব্যাহত রাখলো। তার ফল হলো এই যে, নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য মূলধন হাতে মজুদ থাকা সত্ত্বেও মূলধনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী শিল্পের বিস্তারসাধনের জন্য ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি। ভারতীয় শিল্প কমিশনের একটি শিল্পব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, যে শিল্পব্যাঙ্ককে কমিশন এই সকল অসুবিধা দূরীকরণে এবং শিল্পের প্রতি সাহায্য প্রদানে প্রবলভাবে কার্যকর একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করে, তা ১৯১৯ সালে শিল্পোন্নয়নের বিষয় প্রাদেশিকীকরণের সাথে সাথে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৫৬] বাংলা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি মন্তব্য করে যে, "এধরনের কতিপয় উপায় বা কৌশলের অভাবে 'বাংলার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি' উন্নতিলাভ করছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে এবং অন্যগুলি তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখতে বাধ্য হয়।"[৫৭]

১৯৩১ সালে যদিও বাংলা সরকার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে 'শিল্পে বঙ্গীয় প্রদেশ সাহায্য আইন' পাশ করে, তবুও প্রধানত এই আইন বলবৎ করার জন্য সরকারের প্রতিবন্ধক বিধি প্রণয়ন করার কারণে এ আইন ব্যর্থ হয়। ঋণের জন্য বিভিন্ন আবেদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯৩২ সালের অক্টোবরে একটি শিল্পবোর্ড গঠন করা হয় এবং একই বছর নভেম্বরে কতিপয় বিধি এ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত হয়। এই বিধিগুলি অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। বোর্ডের কাছে

৫৫. Rao Bahadur Mahadev Govind Ranade, "The Reorganization of Real Credit in India', *Report of the First Industrial Conference held at Poona*, (Poona 1891), 61-62. The amount of money in the Savings Bank in Bengal proper totalled, for example, 5.49 and 5 91 crore rupees in the years 1927 28 and 1928-29 respectively Besides, Indian Post Offices also dealt with 'Cash certificates' In 1927-28, the amount realized by issue of cash certificates was 1 crore and 12 lakh Rupees, দেখুন, *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee, 1929-30*, Vol III, Evidence---Part II, 11-13.

৫৬. *Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18*, (London 1919), 182.

৫৭. *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry committee, 1929-30*, Vol. 1, Report, 122

যখন বিধিগুলি অনুমোদিত হয়ে আসে, তখন বিধিগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোনটির ব্যাপারে গুরুতর আপত্তি দেখা দেয়। প্রথমত, বিধিমালায় যেকোন ঋণ বা আগামের জন্য জামানতের প্রশ্নে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ে যে নিয়মটি আরোপ করা হয় তা হলো—"এই আইনের অধীনে অনুমোদিত প্রতিটি ঋণের অনুকূলে শিল্পমালিকের সমগ্র পরিসম্পদের বন্ধক বা চলতি ব্যয় অথবা বন্ধক ও চলতি ব্যয় উভয়ের মাধ্যমে জামানত প্রদান করতে হবে।"[৫৮]

বন্ধকের জন্য প্রদেয় সম্পত্তির আদায়যোগ্য মূল্য ঋণের বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি হবে এবং সহজে উসুল করা যাবে এবং দায় থেকে মুক্ত থাকতে এইরূপ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়াও বোর্ডের জন্য প্রয়োজন হতো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অধিকাংশ আবেদনকারী ঋণের জন্য এই কঠিন শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয় নি। সম্ভবত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অক্ষমতার কথা চিন্তা করে মহিশূর প্রদেশ তাদের 'শিল্পে প্রাদেশিক সাহায্য আইনে' ঋণ ও আগামের জন্য জামানতের বিধি অন্তর্ভুক্ত করে নি।[৫৯] এমনকি বাংলায় এই আইন কার্যকর করার সময়ে দেখা যায় যে, আগাম প্রদত্ত ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশই অনাদায়যোগ্য ও অপরিশোধ্য ঋণ বলে বিবেচিত হয়।[৬০] দ্বিতীয়ত, কোন শিল্পকে সাহায্য প্রদান করার জন্য বোর্ডকে কোন আর্থিক ক্ষমতা বিধিমালায় প্রদান করা হয় নি। এই ক্ষমতা না থাকার কারণে সাহায্যের নিমিত্ত প্রতিটি আবেদনপত্র সরকার কর্তৃক গ্রহণ কিংবা বাতিলের জন্য প্রেরণ করা হয়। এভাবে বোর্ড কেবল ঋণের আবেদনপত্র প্রেরণের জন্য একটি কমিটিতে রূপান্তরিত হয়।[৬১] তৃতীয়ত, এই বিধিমালায় আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপত্তি কিংবা প্রতিবাদ থাকলে তা আহ্বান করার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়। কলকাতার দু'টি দৈনিক পত্রিকার পরপর তিনটি সংখ্যা ও কতিপয় মফস্বলের পত্রিকায় ঢালাও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আপত্তি আহ্বান করা

৫৮. Bangladesh Secretariat Records (এখন থেকে BSR): Bundle No. *3, Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Industries)*, September 1933, No 7, 4

৫৯. BSR Bundle No 8, *Proceedings of the Agriculture and Industries Department* (Industries), B Proceedings, File No 21/20 of 1938.

৬০. BSR· Bundle No. 2, *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Industries)*, B Proceedings, File No 3C/12 of 1936. Perhaps the only case where a sum was granted to one G. G Cruickshank, Prop., Montgomery Dairy, 12 Tapsia Road, Tiljala, Calcutta. দেখুন, Iftikhar-ul-Awwal, "Genesis and Operation of the Bengal State Aid to Industries Act, 1931" in *The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XVII No. 4, 415

৬১. In July 1936 although the government did relax rules and delegate to the Board the power to dispose of applications for aid up to a sum of Rs 5,000, it was withdrawn in 1938 to bring it into conformity with the provisions of the Government of India Act, 1935 দেখুন, Iftikhar-ul-Awwal, "*Genesis and Operation*", 415-16.

হয়। এটি ছিল আবেদনকারীদের বিতাড়িত করার একটি নিশ্চিত পন্থা। কাউন্সিলের একজন সদস্য উল্লেখ করেন : "জনসাধারণ এটিকে অত্যন্ত অপমানজনক বিবেচনা করে এবং সাহায্যের জন্য তারা বোর্ডের কাছে আসতে খুব সঙ্কোচ বোধ করে।"[৬২] এছাড়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানও ঋণের আবেদনপত্র বিলিবন্টনে বিলম্বের কারণ ঘটায়, "ফলে অনেক সময় আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন সৃষ্টিকারী পরিস্থিতির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে।"[৬৩] অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই আবেদনকারীকে সাহায্য প্রদান করা হবে না বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচের কবলে পড়তে হয়। সরকার বিভিন্ন সময়ে বোর্ড কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১৯৩৬ সালে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আবেদন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আপত্তি আহ্বানের বিষয়ে বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রদান করে এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে এর পরিমাণ তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[৬৪] বিধিমালার ত্রুটি ছাড়াও বোর্ডের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করার জন্য সরকার একটি দীর্ঘসূত্রী নীতিও অনুসরণ করে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত বোর্ডের প্রথম বৈঠকের পর প্রায় ১৭ মাস যাবৎ একজন আবেদনকারীও কোন সাহায্য পায় নি এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে প্রাদেশিক সাহায্য হিসেবে ১৩২ জন আবেদনকারীকে (৩৫৮ জন আবেদনকারীর মধ্যে) মাত্র ৩.১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। যারা এই মঞ্জুরি পায় তাদের প্রতি জনের সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২,৩৬৫ টাকা মাত্র।[৬৫] নগদ ঋণসুবিধার দিক থেকে আমাদের জ্ঞাত একটি মাত্র ঘটনা রয়েছে, যেখানে ১০ বছর মেয়াদে রেশমশিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৯৩৬ সালে ২৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।[৬৬] আইনটির অন্যান্য বিধি কোন নির্দিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক কারণ ছাড়াই অকার্যকর থেকে যায়।

স্থানীয় সরকারও 'শিল্পঋণ সিন্ডিকেট লিমিটেড' নামক একটি শিল্পব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করার একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার কিছু বেশি 'পেইড-আপ' মূলধন নিয়ে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সিন্ডিকেট ছিল ভারতীয় কোম্পানি আইনের অধীনে একটি নিবন্ধিত কোম্পানি। সিন্ডিকেটের অন্যান্য বিশেষ দিক ছিল :

৬২. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 28 March 1935, Vol XLV, No 2, 683.

৬৩ *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Ind.)*, March 1938, No. 6, 7

৬৪. ঐ, Bundle No 5, B Proceedings, File No. 1R/5 of 1938 and the *Annual Report of the Board of Industries, Bengal for the year 1936-37*, 1-2

৬৫. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 28 March 1935, Vol XLV, No. 2, 678; and Awwal, "Genesis and Operation", 417

৬৬. *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Ind.)*, September 1936, Nos. 1-3, 3-8.

ক. পাঁচ বছরের জন্য সরকারকে সিন্ডিকেটের প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্যই ২০,০০০ টাকা প্রদান করতে হতো।

খ. সরকারি তহবিল থেকে প্রদত্ত প্রথম ঋণ বাবদ ক্ষতির অর্ধাংশ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকার পূরণ করতো। অনুরূপভাবে যাদেরকে প্রথম ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল তাদের অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ থেকে পরবর্তী যে ঋণ প্রদান করা হবে সেই ঋণের জন্য উদ্ভূত ক্ষতির প্রথম অর্ধাংশের দায়দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।

গ. ঋণসাহায্য সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী সরকার এবং সিন্ডিকেটের সম্মত ব্যবস্থাদির অধীনে নিয়মানুগভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এরকম পরীক্ষাকাজের মধ্যে কারিগরি পরামর্শ ও নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঘ. সিন্ডিকেট সরকারি সাহায্য নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে অথবা সরকারি সাহায্য না নিয়ে কাজ করে যাবে অথবা অবলুপ্ত হবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্দেশ্যে দশ বছব পরে সিন্ডিকেটের অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে।[৬৭]

দুর্ভাগ্যবশত, যে উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৩৮ সালের ৩১ মার্চ আর্থিক বছরের শেষে সিন্ডিকেট মাত্র উনিশটি শিল্পে ৯০ হাজার টাকার অধিক অর্থসংস্থান করে এবং এই টাকার মধ্যে ১৮,২১১ টাকা (হাল নাগাদ সুদের পরিমাণসহ) অনাদায়ী থেকে যায়।[৬৮] অধিকন্তু, কোন ক্ষেত্রেই এক ব্যক্তিকে ১৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত ঋণ প্রদান কর হয় নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই টাকার পরিমাণ ১,০০০-এর কিছু বেশি ছিল।[৬৯] উদ্দেশ্য সাধনে সিন্ডিকেটের অকৃতকার্যতার কারণ হিসেবে বাংলা শিল্প জরিপ কমিটি সাংগঠনিক দুর্বলতাকে দায়ী করে।[৭০] সরকার নিজের পক্ষ থেকে সিন্ডিকেটের কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটি দূরীকরণের কোন প্রয়াস না চালিয়ে সম্মত শর্তসমূহ লঙ্ঘনের জন্য কেবল সিন্ডিকেটের সাথে নিজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে।[৭১]

সরকারের আরেকটি প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এটি ছিল আটক রাজনৈতিক বন্দি প্রশিক্ষণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে যেসব বিপথগামী রাজবন্দি পিতলের বাদ্যযন্ত্র, কাঁসার দ্রব্য ও ছুরি-কাঁচি, মৃন্ময়পাত্র এবং ছাতা নির্মাণের বিশেষ

৬৭. *Report of the Bengal Industrial Survey Committee, 1948*, 326; and *Report on the Administration of Bengal, 1935-36*, xxii.

৬৮. *Proceedings of the Agriculture and Industries Department (Ind.)*, November 1940, Nos. 17-20 16-18

৬৯. ঐ, No. 19-20, 18.

৭০. *Report of the Bengal Industrial Survey Committee*, 326.

৭১. ঐ।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো, তাদেরকে ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত চার বছরে সাড়ে ছয় লাখ টাকার বেশি ঋণ প্রদান করা হয়।[৭২] সরকারি অর্থসাহায্য নিয়ে দু'টি মৃন্ময়পাত্রের কারখানা, আটটি পিতলের বাদ্যযন্ত্র, কাঁসা ও ছুরি-কাঁচির কারখানা এবং বারোটি ছাতার কারখানা শুরু করা হয়।[৭৩] কিন্তু প্রধানত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্তব্যে অবহেলা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে আটক বন্দি প্রকল্পটি সরকারি অর্থের অপচয় করে এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৭৪]

সরকারি বয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশ করা ছাত্রদেরকেও স্বাধীনভাবে তাদের পেশা চালিয়ে যেতে সক্ষম করে তোলার জন্য অল্প পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ১৯২১-২২ সাল থেকে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য এরকম মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৬০,৪৪৭ টাকা অর্থাৎ গড়ে ৩,৩৫৮ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।[৭৫] প্রতিবছর এসব ঋণের সুদের পরিমাণ ছিল ৬.৫ শতাংশ এবং তা ২৪টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ছিল।[৭৬]

এভাবে বেসরকারি শিল্পোদ্যোগে প্রদেশের অর্থনৈতিক সাহায্য ছিল সম্পূর্ণরূপে অপ্রতুল। বঙ্গীয় সরকার প্রদেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সাথে শিল্পোদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যাপারে একটি সমঝোতায় আসে। এটি অবশ্য একটি কঠিন ব্যাপার ছিল না, কেননা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উৎপাদনমূলক উদ্যোগে সাহায্য প্রদান করতে অনিচ্ছুক ছিল না যদি সরকার এসব শিল্পে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিনিয়োজিত অর্থের অনুপাতে জামিন থাকতে সম্মত হয়।[৭৭] যেহেতু এরকম কোন জামিনের সম্ভাবনা ছিল না, সেহেতু শিল্পসমূহ মূলধনের অন্যতম সুলভ উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারও সমাজের যেসব সম্প্রদায় মূলধন সৃষ্টি করছে তাদের কাছ থেকে সঞ্চয় সহজলভ্য করতে এবং সেই অর্থ তাদেরকে প্রদান করতে পারতো, যাদের উৎপাদনমূলক বিনিয়োগের জন্য ঋণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তখনকার সরকার এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছিল, যা ছিল শিল্পায়নের জন্য প্রত্যক্ষ বাধাস্বরূপ।

৭২. Report of the Committee on Public Accounts of the Bengal Legislative Assembly, 1940 41

৭৩. ঐ।

৭৪. A Government investigation was undertaken by M. N. Chatterjee on the financial position of factories and farms started under the Detenu Training and Setting-up Scheme. Mr Chatterjee in his report listed various irregularities responsible for the breakdown of the scheme. ঐ, 30

৭৫. Awwal, *Industrial Development*, 228.

৭৬. ঐ।

৭৭. *Indian Industrial Commission*, Vol II (Evidence), (Parliamentary Paper XVIII of 1919), 132.

৪

ভারতে বৃটিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এই মর্মে অভিযোগ করতেন যে, বাংলার স্থানীয় জনগণের মধ্যে শিল্পোদ্যোগের প্রেরণা কম-বেশি অনুপস্থিত। তাঁদের মতে, এই শিল্পোদ্যোগের অভাবই এলাকার সীমিত মাত্রার শিল্পোন্নয়ন এবং বাংলার অর্থনৈতিক দুর্ভোগের জন্য দায়ী ছিল। ১৮৯০ সালে ই. ডব্লিউ. কলিন তাঁর বাংলায় বিদ্যমান শিল্পকলা ও শিল্প (Industry) সংক্রান্ত প্রতিবেদনে 'শিল্পোদ্যোগের অভাব' এবং নতুন উৎপাদন সৃষ্টিতে ব্যর্থতার জন্য বাংলার পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।[৭৮] মেসার্স টেলারি কোম্পানির এস. জে. টেলারি ১৯০০ সালে কলকাতার বৃটিশ ভারতীয় এসোসিয়েশনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় জনসাধারণকে এই শিল্পোদ্যোগের অভাবের জন্য দায়ী করেন। টেলারি বলেন, ভারতের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বেসরকারি উদ্যোগের অভাবই হলো এই অবস্থার প্রধান কারণ।[৭৯] পরবর্তী সময়ে *ক্যাপিটাল* পত্রিকা একই অভিমত প্রদান করে এবং ১৯২৯ সালে মন্তব্য করে যে, শিল্পোদ্যোগে অনুপ্রেরণা এবং এর জন্য দক্ষতার অভাবের কারণে বাঙালিই তার দারিদ্র্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।[৮০] ভারতীয়দের মধ্যে শিল্পোদ্যোগের অভাব রয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়, তার সাথে ঐতিহাসিক সত্যের কোন মিল নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, এই এলাকার মানুষ প্রচুর শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে, যা পৃথিবীর কোন জাতির চেয়ে কম নয়। যেমন ১৯১৮ সালে ভারতীয় শিল্প কমিশন লিখে :

> কোন এক সময়ে যখন আধুনিক শিল্পপ্রক্রিয়ার জন্মস্থান পশ্চিম ইউরোপে অসভ্য উপজাতিরা বাস করতো, তখন ভারত তার শাসকদের ধনদৌলত এবং কারিগরদের উৎপাদনদক্ষতার জন্য ছিল বিখ্যাত। এবং এমনকি অনেক পরেও পাশ্চাত্যের বণিকফটকাবাজরা যখন ভারতে প্রথম উপস্থিত হয়, তখন কোন অংশেই এই দেশের শিল্পের অগ্রগতি ও প্রসার উন্নত ইউরোপীয় জাতিদের শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নতির তুলনায় কম ছিল না।[৮১]

এমনকি, উনিশ শতকের প্রথমাংশে যখন বৃটিশেরা ভারতে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তখন বাঙালিরা তাদের সাথে যৌথ কারবার গড়ে তুলে। কিন্তু বাঙালি ব্যবসায়ীরা বৃটিশ অংশীদারদের প্রতারণা, শঠতা এবং অতি ফটকাবাজির দরুন প্রকৃতপক্ষে কলকাতার এই অনিশ্চিত বা বিপজ্জনক ব্যবসাকর্ম থেকে পরে সরে পড়ে।

---

৭৮. E W Collin, *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal*, (Calcutta 1890), 14

৭৯. *The Indian Agriculturist*, 1 October 1900, 305-06

৮০. *Capital*, 21 February 1929, 389

৮১. *Indian Industrial Commission, 1916-18*, Report 1.

"ইউরোপীয় ব্যবসা সম্পর্কে একটি অবিশ্বাস বাঙালির চিন্তাচেতনায় প্রতিষ্ঠালাভ করে।"[৮২] আবার বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় শিল্পকর্মতৎপরতার একটি আকস্মিক ও চমৎকার সম্প্রসারণ ঘটায়। যদিও আন্দোলনটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়, তথাপি যে আকাঙ্ক্ষা এই আন্দোলনের জন্ম দেয় তা কোনভাবেই হ্রাস পায় নি।[৮৩]

আলফ্রেড চ্যাটারটনের মতে, তিনটি উপায়ে কোন ব্যক্তি শিল্পনায়কের গুণ অর্জন করতে পারেন। প্রথমত তাঁকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত অর্জন করতে হবে প্রযুক্তিবিদ্যার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তৃতীয়ত অর্জন করতে হবে কার্যপরিচালনা ও ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে, শিক্ষা বিভাগ বিজ্ঞান কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রথম শিক্ষাটি দিতে পারে। দ্বিতীয় শিক্ষা অর্জন করা যেতে পারে কেবল কর্মশালা ও কলকারখানায় এবং তৃতীয় শিক্ষা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কিংবা ব্যবসা পরিচালনার পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব।[৮৪] চ্যাটারটন শিল্পোদ্যোগমূলক গুণের উন্নয়নে

সারণি ১ : বাংলার প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, ১ জানুয়ারি ১৯৩৫

	প্রতিষ্ঠানের ধরন	মোট সংখ্যা
ক.	প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়	২
খ.	কলেজিয়েট পর্যায়ের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান	২
গ.	সরকারের মালিকানাধীন প্রযুক্তি ও শিল্প স্কুল	৪৯
ঘ.	স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাধীন প্রযুক্তি ও শিল্প স্কুল	৫
ঙ.	বেসরকারি সাহায্যাধীন প্রযুক্তি ও শিল্প স্কুল	৭৬

উৎস : *Bengal Revenue Proceedings*, (Industries), September 1935, No 22, 42.

যে তিনটি উপায়ের রূপরেখা দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যাপারে সরকারের চূড়ান্ত ভূমিকা ছিল। শিল্প ও প্রযুক্তিশিক্ষা সম্পর্কে যতোই বলা হোক না কেন, সে ব্যাপারে প্রদেশ ততোদূর অগ্রসর হতে পারে নি। যদিও বাংলা সরকার পাঠ্যক্রমে শিল্প ও

৮২. দেখুন, N K Sinha, "Indian Business Enterprise Its Failure in Calcutta (1800-1848)", in *Bengal Past and Present*, Diamond Jubilee Number, 1967, 120.

৮৩. Confidential letter dated 26 November 1915 from the Government of India to the Secretary of State for India in IOR L/E/7/855.

৮৪. Sir Alfred Chatterton, 'Indian Industries', *Capital*, 13 February 1929, 327

প্রযুক্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল, তথাপি সরকার শিক্ষার পাঠক্রমে একটি আলাদা শাখা তৈরি করে বা অন্য কোন উপায়ে সর্বোচ্চ প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। ১৯২০ সালে প্রযুক্তি ও শিল্পশিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার শিল্পবিভাগের কাছে হস্তান্তরের পূর্বে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের দশ বছরের কম সময় লাগে নি।[৮৫]

প্রকৃত ফলাফল এই ছিল যে, তখন পর্যন্ত প্রযুক্তিশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি শাখা বলে মনে করা হতো এবং প্রযুক্তিশিক্ষা নিয়মিত শিক্ষাকর্তৃপক্ষের আয়ত্তাধীন ছিল। এই শিক্ষাকর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই পুঁথিগত শিক্ষার প্রতিই মনোনিবেশ করে এবং সে শিক্ষাতেই তাদের দক্ষতা ছিল। এমনকি যখন তারা প্রযুক্তিশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, তখন শিল্পের প্রয়োজনীয় বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি অজ্ঞতা বাস্তব প্রক্রিয়ার উপর শিল্পআন্দোলন পরিচালিত করা তাদের জন্য অসম্ভব করে তোলে। এমনকি প্রযুক্তি ও শিল্পস্কুলগুলি হস্তান্তরের পরও এই প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই কর্মকার ও ছুতারের পেশার মতো বিভিন্ন পেশার জন্য কেবল প্রাথমিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবেই থেকে যায়।

প্রাদেশিক রেলকর্মশালাগুলিতেও প্রযুক্তিশিক্ষা ও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। কিন্তু এগুলি ছাত্রভর্তির ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক নীতি অনুসরণ করতো। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২০ সালে কাঁচড়াপাড়া রেলকর্মশালায় যে বাহাত্তর জন ভারতীয় ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র এক জনকে ভর্তি করা হয় এবং অন্য দিকে আট জন এ্যাংলো-ভারতীয় আবেদনকারীর মধ্যে তিন জনকে ভর্তি করা হয়।[৮৬] কর্মশালার বেতনক্রমও ভারতীয়দের কাছে ন্যায্য ছিল না (সারণি ২ দ্র.)। বাংলা-নাগপুর রেলওয়ে টেকনিক্যাল স্কুল আরো পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এ্যাংলো-ভারতীয় শিক্ষানবিসদের বছরে পঁয়ত্রিশ জন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৩১ সালে অতিরিক্ত ৭০ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভারতীয়কে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৮৭] ১৯৩৯ সালের শেষদিকে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল শিবপুরে দু'টি প্রকৌশল কলেজ ও ঢাকায় আহসানউল্লাহ কারিগরি স্কুল এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেবল ওভারশিয়ার ও সাব-ওভারশিয়ারের পাঠ্যক্রম চালু ছিল। স্নাতক (বি. ই.) ডিগ্রি পর্যন্ত পরিচালিত উচ্চ

৮৫. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1920*, 4

৮৬. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 19 December 1921, Vol. VI, 23-24

৮৭. *Eighth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the years 1927-32*, (Calcutta, 1933), 117.

প্রকৌশল প্রশিক্ষণ কেবল শিবপুর কলেজে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ কলেজে চার বছরের পাঠ্যক্রমশেষে এক বছরের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স ছিল। কলকাতা ও ঢাকার দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতার একটি কলেজে বাণিজ্যিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। বিজ্ঞানশিক্ষা মানবিক শিক্ষার চেয়ে সাধারণত কম প্রচলিত ছিল।

সারাণ ২ : ১৯২১ সালে কাচড়াপাড়া রেল কমশালায় এ্যাংলো-ভারতায় এবং ভারতায় শিক্ষানবিসদের বৃত্তি (প্রতি মাসে টাকায়)

বছর	এ্যাংলো-ভারতীয় শিক্ষানবিসদের জন্য	ভারতীয় (প্রথম শ্রেণী) শিক্ষানবিসদের জন্য
প্রথম	৫০	২২
দ্বিতীয়	৬০	২৬
তৃতীয়	৭০	৩০
চতুর্থ	৮০	৩৪
পঞ্চম	১০০	৩৮
ষষ্ঠ	১২০	প্রযোজ্য নয়

সূত্র : *Bengal Legislative Council Proceedings*, 19 December 1921, Vol VI, 23 25.

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানশিক্ষা অর্জনের সুযোগ যেখানে কম ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল, সেখানে প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার ক্ষেত্র ছিল আরো সীমিত। যথেষ্ট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অভাব থাকার কারণে শিবপুরের ছাত্ররা যথেষ্ট পরিমাণে তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগে ব্যর্থ হতো।[৮৮] শিল্প ও প্রযুক্তি স্কুল থেকে ছাত্ররা পাশ করে এসে স্থানীয় চাকুরিতে নিয়োজিত হতো এবং গ্রামীণ কারিগরদের দ্বারা নির্মিত সবচেয়ে অমসৃণ দ্রব্যের মতো বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও তারা পেতো না।[৮৯] অন্যদিকে জাপানে ১৮৭০ ও ১৮৮৩ সালের মধ্যে মডেল কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯০]

৮৮ J G Cumming, *Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908 with Special Reference to the Industrial Survey of 1890*, (Part II of Special Report), (Calcutta 1908), 5

৮৯. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1926*, 4

৯০. S Uyehara, *The Industry and Trade of Japan*, (London 1936), 10-11, G. C Allen, 'Factors in Japan's Economic Growth' in C D Cowan edited, *The Economic Development of China and Japan*, (London 1964), 195, Yasuzo Horie, 'Modern Entrepreneurship in Meiji Japan', in William W Lockwood edited, *The State and Economic Enterprise in Japan, Essays in the Political Economy of Growth*, (Princeton 1965), 183-208

এই মডেল কারখানাগুলি থেকেই শিল্পনেতা, ব্যবস্থাপক ও দক্ষ শ্রমিকগণ সমগ্র জাপানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক হারে শিল্পের প্রসারে অবদান রাখে।[৯১] এধরনের কারখানার গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতীয় শিল্প কমিশন ১৯১৮ সালে এবং এর আগে জি. এম. গুপ্ত ১৯০৮ সালে অনুরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেন।[৯২] কিন্তু মডেল কারখানার এই প্রত্যয় লর্ড মোর্লি অনুমোদন করেন নি। মাদ্রাজ সরকারের (এই সরকার একটি অগ্রণী কারখানার জন্য তাঁর অনুমোদন চেয়েছিল) কাছে তাঁর একটি পত্রে তিনি লিখেন :

> যে নীতিটি আমি অনুমোদন করতে প্রস্তুত তা হলো এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নত পদ্ধতির সঙ্গে জনগণকে পরিচিত করার জন্য প্রাদেশিক তহবিল থেকে ব্যয় করা যেতে পারে; এর চেয়ে বেশি ব্যয় করা রাষ্ট্রের উচিত হবে না, তবে বাণিজ্যিক সুবিধার সাথে এই সকল উন্নয়নপদ্ধতি কাজে লাগানো যায় কিনা তা সরেজমিনে দেখার দায়িত্ব বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দেয়াই উচিত। এখানে নির্দেশিত আওতার মধ্যে আমি যতোটুকু মনে করি, শিল্প সম্মেলনে যেসব লক্ষ্য ছিল সেগুলোর সবই শিল্প ও প্রযুক্তি স্কুলের দ্বারা অর্জিত হতে পারে; এবং এই ধরনের স্কুলগুলিতেই নতুন শিল্প ও প্রক্রিয়াসমূহের জ্ঞান প্রদান করা যেতে পারে, নতুন সরঞ্জামাদির ব্যবহার উত্তমরূপে শিখানো যেতে পারে এবং কারিগরদের প্রযুক্তিদক্ষতা বেশ দ্রুত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। চামড়ার স্কুলে ক্রোম ট্যানিং দেখানো ও শিখানো যেতে পারে, বয়ন স্কুলে দেশীয় তাঁতের উন্নতিবিধান করা যেতে পারে এবং এই উন্নয়নের সুবিধা প্রদর্শন করা যেতে পারে। স্কুলগুলি যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যায়, তবে সেগুলি থেকে বেসরকারি পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক এবং অন্য সকল তথ্য সরবরাহ করা যাবে। যাতে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি এবং জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে চামড়া ও বয়ন স্কুলগুলিকে সরকারি কারখানায় রূপান্তরিতকরণ আমার কাম্য। একটি শিল্পতথ্য ব্যুরো প্রতিষ্ঠা অথবা এইরূপ একটি কেন্দ্র থেকে নতুন শিল্প, প্রক্রিয়া বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বুদ্ধি-পরামর্শ প্রদানে আমার আপত্তি নেই, যদি বেসরকারি উদ্যোগে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে কিছু করা না হয়।[৯৩]

এইভাবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে তাদের সীমিত প্রযুক্তিজ্ঞান, বাণিজ্যিক শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সম্মুখীন হতে হয়। তাদেরকে কেবল প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম অর্জন করতে হয় নি, যথেষ্ট আর্থিক সম্পদও লাভ করতে হয়েছিল এবং কেবল তাদের উৎপন্নদ্রব্যের বাজার গড়ে তুলতে এবং দক্ষ সংগঠন বজায় রাখতে হয় নি, তবে

৯১. Yasuzo Horie, 'Modern Entrepreneurship in Meiji Japan'

৯২. G N. Gupta, *A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-08*, (Shillong 1908), 112-17; and *Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18*, (London 1919), 135-36.

৯৩. দেখুন, Confidential letter dated 26 November 1915 from the Government of India to the Secretary of State for India in IOR. L/E/7/855

প্রত্যাশিত ভোগের চাহিদা মেটাতে এবং ভাল জনসংযোগ রক্ষা করতে নতুন দ্রব্য তৈরি করার পরিকল্পনাও করতে হয়েছিল। তাদেরকে প্লান্টের অবয়ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল এবং নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে, উৎপাদনব্যয় নিরূপণ করতে এবং দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ, পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিবহনসংযোগ স্থাপন এবং মেরামতের দোকান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে শুরু থেকেই ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তারা তাদের ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল, যাদের প্রযুক্তি-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াও ছিল বহু বছরের ব্যবহারিক ও বাস্তব জ্ঞান।

৫

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত বাংলা প্রদেশ শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নে যতোদূর সম্ভব অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের পরিসরে এই দূরে থাকার নীতিটির চমৎকার সমর্থন পাওয়া যায়। গভর্নর জেনারেল-এর কাউন্সিলের অর্থসদস্য সি. ই. ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় :

> শিল্পের এই শাখায় ইংল্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়াটা ছিল ভারতের সম্পদরাজিকে ভুল পথে চালিত করার শামিল। অন্যদিকে, ভারতের উর্বর ভূমি ও আবহাওয়ায় উৎপন্ন মূল্যবান কৃষিপণ্য তৈরি করেছে নিজস্ব সম্পদ এবং এই সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না প্রয়োজনীয় শ্রম ও মূলধনের অভাবের দরুন। লাভজনক প্রয়াস থেকে অলাভজনক প্রয়াসে উৎপাদনের এই সকল উপাদানকে নিয়ে আসা নিশ্চয়ই একটি ভুল পদক্ষেপ। আমাদের সঠিক কর্মপন্থা হলো বর্ণভিত্তিক শ্রমবিভাগকে অটুট রাখা ... বুরওয়াই অথবা অন্য কোন লৌহকারখানা যদি ভারতে লাভজনকভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে, তবে এজন্য বেসরকারি শিল্পের উদ্যোগ এবং নিয়োজিত মূলধনের অভাব হবার কথা নয়।[৯৪]

স্যার ই. সি. বাক পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেন যে, বেসরকারি উদ্যোগ প্রায় সর্বদাই প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচের ভয়ে ব্যাহত হয়।[৯৫] পুঁজিমালিকরা তাদের অর্থ নিরাপত্তা বিধানকৃত ব্যবসায়ে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দিত এবং যেসকল নতুন শিল্পোদ্যোগের প্রতি সরকার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান করতো সেসকল শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো।[৯৬] উপরোক্ত পরিস্থিতিতে দেশের শিল্পোন্নয়ন ছিল সামান্য এবং যে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি বিদেশী সরবরাহ বা

৯৪. IOR MSS Eur F. 78, File No. 59/8B, Sir Charles Wood Collection দেখুন, Minute by the Hon'ble Sir C. E. Trevelyan on the Burwai Iron Works, Calcutta, 13 June 1863

৯৫. Sir E. C. Buck, *Report on Practical and Technical Education*, (Calcutta 1901), 37-38.

সরবরাহের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল থেকে যায়। তৎকালীন সামরিক ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রক জে. সি. কে. প্যাটারসন বিদেশী আমদানির উপর এই নির্ভরশীলতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি *দি ইংলিশম্যান* পত্রিকায় লিখেন :

> বাংলার দু'টি প্রধান শিল্প, উদাহরণস্বরূপ, পাট ও চা-শিল্প প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে ইউরোপের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ইংল্যান্ডের কাঁচা চামড়া উৎপাদনকারীদের সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যেতো, তবে হুগলীর তীরস্থ অধিকাংশ কলকারখানাও বন্ধ করে দিতে হতো। কলকারখানায় ব্যবহৃত অন্য অধিকাংশ চামড়ার বস্তা, যেমন পিকার বেন, বেল আকারে পাকানো চামড়া, চামড়ার কটিবন্ধের উপাদান ইত্যাদি এবং সকল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি পর্যায়ের দ্রব্যও ইউরোপ থেকে আসতো।
>
> অনেক ভারতীয় চা-পণ্য বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বাক্সে প্যাক করা হতো এবং এখনো তাই করা হয়। রাশিয়া, কানাডা বা জাপান থেকে খোলা বাক্স আমদানি করা হতো এবং ইংল্যান্ড বা আমেরিকা থেকে ধাতুনির্মিত সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন মতো আনা হতো। খোলা বাক্স দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় লৌহনির্মিত আংটা, পেরেক ও ক্লিপও বিদেশ থেকে আনা হতো। এসব সরবরাহ ছাড়া চা প্যাকিং করা সম্ভব হতো না ... বাগানের জন্য ব্যবহৃত গাছের ডালপালা কাটার কাঁচি, নিড়ানি, কাঁটাওয়ালা কুড়াল ও কোদালি এবং বস্তুত চা-উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতিও আমদানি করা হতো। এসব উদাহরণ ভারতে বৈদেশিক সরবরাহের উপর আমাদের নির্ভরশীলতার চিত্র প্রতিভাত করে।[৯৭]

যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় ও জনগণের প্রবল দাবিতে ১৯১৮ সালে ভারতে অধিক শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি শিল্প কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের ১৯১৮ সালে পেশকৃত রিপোর্ট পূর্বেকার অবাধ নীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কতিপয় মৌলিক প্রস্তাব ব্যক্ত করে।[৯৮] এসব প্রস্তাবে অন্যগুলির মধ্যে ছিল প্রদেশসমূহের স্থায়ী শিল্পবিভাগ গঠন, শিল্পে প্রদেশের প্রত্যক্ষ সাহায্য, পথিকৃৎ এবং প্রদর্শক কারখানা প্রতিষ্ঠা, রাজকীয় রাসায়নিক কৃত্যক ও রাজকীয় শিল্পকৃত্যক প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক প্রদেশে রাজকীয় শিল্পবিভাগের অধীনে মাল ক্রয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা সৃষ্টি ইত্যাদি।[৯৯] দুর্ভাগ্যবশত কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ পরিণামে যুদ্ধ বন্ধের ও ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের অধীনে প্রদেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের বিষয়টি হস্তান্তরের সাথে

---

৯৭. J. C. K. Peterson, 'Industrial Development in Bengal', *The Englishman* (Annual Financial Review), 4 March 1918, 11

৯৮. Clive Dewey, 'The Government of India's New Industrial Policy, 1905-25: A Study in Failure', a paper presented at the Institute of Commonwealth Studies (Post-graduate Seminar) on 10 July 1975.

৯৯. *Indian Industrial Commission, Summary of Recommendations,* 229-42.

সাথে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও রাষ্ট্রের সহায়তাপ্রাপ্ত শিল্পের উন্নয়নের জন্য সকল স্তরের ভারতীয় জনগণের উচ্চাশা এইভাবে প্রতারণার শিকার হয়।

যাই হোক, ভারতীয় শিল্প কমিশনের একটি ইতিবাচক ফল হলো ১৯২০ সালে বাংলায় একটি স্থায়ী শিল্পবিভাগ প্রতিষ্ঠা (পূর্বে ১৯১৭ সালে অস্থায়ীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়)।[১০০] কিন্তু এই বিভাগের জন্য অপর্যাপ্ত সম্পদ বণ্টনের দরুন প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর কর্মকাণ্ড সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে।[১০১] এমনকি যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি এই বিভাগ পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিল, সেই কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে যতোটুকুর জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ততোটুকু।[১০২]

যে তাঁতের সুতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের অধিক কুটিরশিল্পশ্রমিক ও তাদের উপর নির্ভরশীল[১০৩] ব্যক্তিদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হতো, সেই ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং তৈরি পণ্যের গুণ ও মান উন্নয়নের জন্য 'উন্নত যন্ত্রপাতিসহ দক্ষ বয়নের কারুকার্য প্রদর্শনের কর্মসূচি সরকার প্রণয়ন করে। উন্নত যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল তাঁতের উড়ন মাকু, পিট তাঁতের জন্য উড়ন মাকুস্লেসমূহ, মোচড়ানো যন্ত্র, অলঙ্করণমূলক কাজের জন্য উন্নত উবিসমূহ এবং এমনকি বয়ন ধাঁচের জন্য জ্যাকুয়ার্ড যন্ত্র।[১০৪] সুতরাং এই বিভাগের কাজকর্মের ফলে এবং জনগণের মাঝে আন্তঃযোগাযোগের দরুন উড়ন মাকু তাঁত এবং অন্যান্য উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২১ সালে পরিচালিত একটি শিল্প জরিপে বাংলায় উড়ন মাকু সংযোজিত আছে এমন প্রায় ৩০ শতাংশ তাঁত দেখা যায়।[১০৫] ১৯৪২ সালে এই পরিমাণ ৬৭ শতাংশে বৃদ্ধি পায়।[১০৬] উড়ন

১০০. With the establishment of a temporary Department of Industries in 1917 a temporary Director was also appointed. But till the end of 1919, the post of the Director of Industries was held by the Controller of Munitions and the combined officer was called Combined Controller of Munitions and the Director of Industries দেখুন *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal*, October 1917 to December 1919. 1

১০১. Awwal, *Industrial Development*, Appendix I, 239

১০২. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1934-35*, 1.

১০৩. Out of nearly a million people supported by the cottage industries of the province, at least half a million were dependent on hand weaving industry alone. দেখুন, *Census of India, 1921*, Vol V, *Bengal*, Part I, Report, (Calcutta 1923), 400, and *Report on the Administration of Bengal, 1917-18*, ii

১০৪. Awwal, *Industrial Development*, 49.

১০৫. *Census of India, 1921*, Vol V, *Bengal*, Part I, Report, 400-01.

১০৬. *Report of the Fact-finding Committee* (Handloom and Mills), (Delhi 1942), 32.

মাকু তাঁতের সাহায্যে শ্রমিকেরা উৎপাদন দ্বিগুণ করে এবং এই সকল তাঁতের মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু অতি শক্ত ও টেকসই প্রমাণিত হওয়ায় বয়নশিল্পীরা এই সকল ব্যবস্থা থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়।[১০৭] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুতার অনিয়মিত সরবরাহ, তাঁতের স্বতন্ত্র দ্রব্যগুলির বিপণনে অসুবিধা ও আর্থিক সমস্যা তাঁতশিল্পীদের বর্ধিত উৎপাদনের উপকারিতা লাভে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।[১০৮] সমবায় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার যে-সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে এতে কোন সন্দেহ ছিল না। তবে আর্থিক কারণে এবং সরকারের দিক থেকে শক্তিশালী ভূমিকার অভাবের দরুন এই চেষ্টা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মোট ৫৪৬টি সদস্যপদ সহ ৩৫৫টি তাঁতী সমবায় সমিতি ছিল এবং এই সদস্যপদের সংখ্যা বাংলার মোট তাঁতীসংখ্যার ২.৩ শতাংশ।[১০৯] যাই হোক, বাংলায় শিল্প জরিপের মতামত অনুযায়ী, শিল্প সাধারণত মহাজনের করায়ত্ত থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মহাজন তাঁতীদের কাছে সুতার ঋণদাতা ও সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করতো এবং বাজারে তৈরি পণ্যের বেচাকেনাও করতো। তাঁতী সম্প্রদায় ও বাজারের মধ্যে মহাজনদের এই হস্তক্ষেপের কারণ হলো তাঁতশ্রমিকদের পেশাগত সংগঠনের অভাব এবং এই তাঁতশ্রমিকদের একমাত্র অসুবিধাই হলো তাদের তহবিল বা মূলধনের অভাব।[১১০]

কলকাতা গবেষণা ট্যানারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯১৯ সালে সরকার চামড়া ট্যানকরণের ক্ষেত্রে শিল্পে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রথম এগিয়ে আসে এবং ১৯২৫ সালে এই গবেষণা ট্যানারি বাংলা চামড়া ট্যানিং ইন্সটিটিউটে রূপান্তরিত হয়। এই ইন্সটিটিউট মফস্বলের চর্মকার এবং ভদ্র পরিবারের যুবকদের জন্য শিক্ষানবিশি ক্লাশের ব্যবস্থা করে। এটি প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এর দু'টি ইতস্তত ভ্রমণশীল ট্যানকরণ পরিদর্শক পার্টির মাধ্যমে ট্যানকরণের আধুনিক উন্নত প্রক্রিয়াও প্রদর্শন করে। কিন্তু ইন্সটিটিউটে সম্পাদিত প্রকৃত গবেষণাকর্ম থেকে সবচেয়ে লাভজনক ফল পাওয়া যায়। এতে সকল বাস্তব উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ মানের আমদানিকৃত চামড়ার সমান পর্যায়ের চামড়াই প্রচুর পরিমাণে কলকাতায় প্রস্তুত করা হতো।[১১১] ক্রোমিয়াম দ্বারা ট্যানকরণের পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রচলন এবং বাংলার চর্মকারদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ

---

১০৭. Awwal, *Industrial Development*, 211-12

১০৮. ঐ, 222-28

১০৯. *Bengal Legislative Council Proceedings*, 17 February 1943, First Session, 11.

১১০. *Bengal Industrial Survey Committee*, 45

১১১. IOR, Vol 11988, *Bengal Revenue Proceedings (Industries)*, March 1933, Nos 1-2, 15.

দ্বারা ট্যানকরণের উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে এ অগ্রগতি সম্ভব হয়। ফলে কলকাতায় অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির ট্যানকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলি একত্রে ১৯৩১-৩২ সালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের পঞ্চাশ লক্ষ বর্গফুট ক্রোমিয়াম দ্বারা ট্যানকৃত উচ্চমানের চামড়া উৎপাদন করে।[১১২] অধিকন্তু, কলকাতার চামড়া ট্যানকারীরা প্রচুর পরিমাণে জুতার তলির চামড়া ও বার্নিশ করা চামড়াও উৎপাদন করে। ১৯৩২ সালে অটোয়া বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে ক্রোমিয়াম চামড়াশিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকৃত উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এই চুক্তিতে বেসরকারি প্রয়াসে গত ত্রিশ বছরে শিল্প যতোটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে, মাত্র তিন বছরে তা তদপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রগতি সাধন করার সুযোগ লাভ করে।[১১৩] কিন্তু যেহেতু গবেষণা ও বাজার প্রসারণের মাধ্যমে ট্যানকরণ শিল্পে লব্ধ অগ্রগতি থেকে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধা গ্রামে যে বিপুল সংখ্যক চর্মকার থাকে ও কাজ করে তাদের কাছে পৌঁছে নি, সেহেতু তাদের আর্থিক অবস্থা মানবেতর অবস্থায়ই থেকে যায়।

সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য কুটিরশিল্পের (মৃৎশিল্প, ছুরিকাঁচি শিল্প, সাবান-তৈরি, কাঁসা-পিতল, রং ও বার্নিশকরণ শিল্প) উন্নয়নের জন্য সরকার ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে একজন শিল্পরসায়নবিদ নিয়োগ করে। পরবর্তী বছরে একজন শিল্পপ্রকৌশলীও নিয়োগ করা হয়। এই সকল কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল অন্যান্য চালু শিল্পের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, যথা কুটিরশিল্পের শ্রম রক্ষণকারী যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং নির্দিষ্ট স্থানে বাজার স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ব্যবহার সম্পর্কিত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। উন্নত ধরনের কুমারের চাক উদ্ভাবন ছাড়াও শিল্পপ্রকৌশলী নতুন মৃৎপাত্র পোড়ানোর চুল্লী এবং মৃৎশিল্পের জন্য উপযোগী বলে প্রমাণিত অলঙ্করণময় শিল্প চকচকে করার নতুন প্রক্রিয়াও প্রচলন করেন।[১১৪] কুমারদের আয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্য চকচকে মৃৎশিল্প তৈরি করার পন্থা অবলম্বন দ্বারা তাদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসও নেয়া হয়। অন্যান্য কুটিরশিল্প নিয়ে শিল্পবিভাগ স্বল্পমেয়াদি প্রদর্শন কর্মসূচি প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে প্রস্তুতকরণপ্রক্রিয়া উন্নয়নের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করা হয়। যাই হোক, এসব সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রতিটি স্থানে তাদের নির্দেশ ও পরামর্শের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি।[১১৫]

১৯৩২-৩৩ সালে যে বেকারত্রাণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়, তার অধীনে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অতি-প্রসারিত প্রদর্শনীসমূহ পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল পারিশ্রমিকমূলক পেশা কার্যকর করার জন্য বেকার ভদ্রলোকদের নতুন ও উন্নত পদ্ধতির

১১২. *Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, 1931-32,* 20
১১৩. ঐ, *1935-36,* 23.
১১৪. ঐ, *1930-31,* 17, *Report on the Administration of Bengal, 1934-35,* 159
১১৫. *Bengal Legislative Council Proceedings,* 29 March 1933, Vol. XLI, No. 2, 710-12

প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ দেয়া (এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী কাজ প্রতিহত করা)।[১১৬] এই কর্মসূচির অধীনে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ও দেশীয় শিল্পে আটাশটি প্রদর্শনীদল সৃষ্টি করা হয়েছিল। নির্বাচিত শিল্পগুলির মধ্যে ছিল পাট ও উলের বস্ত্র উৎপাদন, বুট ও জুতা তৈরি ও কাঁসার ধাতুদ্রব্য নির্মাণ, সাবান তৈরি, ছুরি-কাঁচি তৈরি ও মৃৎশিল্প। ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত এক হাজারের অধিক ছাত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ২৪১ জন ছাত্র স্বাধীনভাবে কারখানা খোলে এবং ১৬৬ জন ছাত্র চাকুরি লাভ করে (শিল্পবিভাগ এ সংখ্যাই দাবি করেছিল)।[১১৭] বাংলা সরকারের দাবি অনুযায়ী কর্মসূচিটি যেকোনভাবেই হোক কৃতকার্যতার দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত, কর্মসূচির জন্য কেবল বার্ষিক ১০০,০০০ টাকা অনুমোদন করা হয়।[১১৮] এই অল্প পরিমাণ টাকা বেশি এলাকায় প্রশিক্ষণসুবিধার বিস্তার বাধ্যতামূলকভাবে সীমিত করে দেয়। দ্বিতীয়ত, যেসকল ছাত্র ব্যবসা করতে চাইতো তাদেরকে ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা কর্মসূচিতে ছিল না। শিল্পবিভাগ যেকোন ধরনের আর্থিক দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করতো না, তবে আর্থিক অসুবিধার ক্ষেত্রে ছাত্ররা প্রাদেশিক শিল্পসাহায্য আইনের অধীনে শিল্পঋণের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে গণ্য হতো।[১১৯] দুর্ভাগ্যবশত আইনের বিধানগুলির সঙ্কীর্ণতার দরুন উক্ত আইনের অধীনে ঋণলাভ করা কষ্টকর হতো।[১২০] আরেকটি অসুবিধা ছিল কুটিরশিল্পদ্রব্যের বিপণনব্যবস্থা নিয়ে। বাংলার শিল্পসমূহের পরিচালক এস. সি. মিত্র বলেন, "যতোক্ষণ পর্যন্ত দু'টি বিষয় অর্থ ও বিপণন এই প্রাদেশিক শিল্পসাহায্য আইনের আওতায় নিয়ে আসা না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি সাধারণভাবে মনে করি, এ কর্মসূচির কার্যকারিতার ব্যাপারটি অনুসন্ধানযোগ্য হতে পারে না।"[১২১]

ইতিমধ্যেই উল্লিখিত কুটিরশিল্পদ্রব্য বিপণনের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রয়াসে আশাব্যঞ্জক অনেক কিছু করা হয়েছিল। সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার সমস্যাটি নিরসনের চেষ্টা করে। কিন্তু দু'টি কারণের জন্য তাদের উক্ত প্রয়াস সফল হতে পারে নি। প্রথমত তাঁতবস্ত্র

---

১১৬. বিস্তারিত দেখুন, Iftikhar-ul-Awwal, "The Problem of Middle Class Educated Unemployment in Bengal, 1912-1942" in *Indian Economic and Social History Review*, XIX, 1, 41-42

১১৭. IOR: Vol. 12075, *Bengal Revenue Proceedings (Industries)*, December 1936, Nos. 13-14, 22

১১৮. Awwal, "Middle Class Unemployment", 42.

১১৯. BSR, Bundle No. 5, *Proceedings of the Department of Agriculture and Industries (Industries)*, B Proceedings, File No 1C/19 of 1937. দেখুন, *Note* on the scheme for helping educated young men in starting small scale industries, 3.

১২০. Awwal, *Genesis and Operation*, 409-19

১২১. BSR, Bundle No. 4, *Proceedings of the Department of Agriculture and Industries (Industries)*, B. Proceedings, March 1938, No. 26B, 2. দেখুন, S. C. Mitter's *minute*, dated 4 January 1938.

বয়নের ক্ষেত্রে কলের সুতার জন্য দাবিকৃত উচ্চমূল্যের কারণে এবং দ্বিতীয়ত সমবায় শিল্পইউনিয়নসমূহের অতিরিক্ত উপরিব্যয়ের দরুন সরকারের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে তাঁতশিল্পের সুতীবস্ত্রের ন্যূনতম বাজারমূল্য, যে মূল্যে অনুরূপ মানের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি হতো, সেই মূল্যের চাইতে অনেক বেশি হতে দেখা যায়।[১২২] ১৯২৯ সালে শিল্পইউনিয়নগুলিকে তাদের তৈরি পণ্য বিলিবণ্টন করার ব্যাপারে অসুবিধা দূর করার জন্য 'বাংলা প্রাদেশিক সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড' নামে একটি প্রাদেশিক সংগঠনে সম্মিলিত করা হয়। কিন্তু 'বাংলা প্রাদেশিক সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড'-এর ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট তহবিলের অভাবে এবং যে ঋণকৃত মূলধনের জন্য সমিতিকে উচ্চহারে সুদ প্রদান করতে হতো সেই মূলধন নিয়ে প্রধানত কাজ করার কারণে এই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানটি শিল্পইউনিয়নগুলির সাহায্যে নিজেকে বেশি নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয় নি এবং কলকাতায় কেবল একটি বিক্রয়ডিপো তৈরিপণ্য প্রদর্শনের জন্য চালিয়ে যায়।[১২৩] সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয় নি এরকম সমবায় বিপণনপদ্ধতি ছাড়াও সরকার প্রেসিডেন্সির[১২৪] দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য লেডি কারমাইকেল কর্তৃক ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশীয় শিল্প এসোসিয়েশন এবং সকল প্রকারের গ্রামীণ হস্তশিল্পে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে গঠিত শিল্পমিশন ও এসোসিয়েশন-এর উৎপন্নদ্রব্য বিক্রি করতে একটি কেন্দ্রীয় ডিপোর ব্যবস্থা করার জন্য উইলিংডনের কাউন্টেস-এর অনুমোদন ও আনুকূল্যে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত গুড কমপ্যানিওনস-এর মতো এসোসিয়েশনগুলিকে ঋণ ও অর্থসাহায্য প্রদান করে।[১২৫]

উপসংহার

ভারতে বৃটিশ সরকার অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় সকল খাতেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মকাণ্ড সহজতর করার জন্য সরকার রাস্তা-ঘাট প্রসারিত করে, রেলপথ তৈরি করে, খাল খনন করে, উন্নত সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ করে এবং অভ্যন্তরীণ বহিঃশুল্ক রহিত করে। ১৮৭০ সাল থেকে সরকার কৃষির উৎসাহ সৃষ্টি ও উন্নয়নে

---

১২২. Awwal, *Industrial Development*, 224.

১২৩. ঐ, 226.

১২৪. The inaugural ceremony was held at Government House on the 16 December 1916 with Lady Carmichael in the chair. The actual organisation commenced in February 1917 and the working of the Association took a practical form during July 1917 when the Sale Depot was formally opened by Lady Ronaldshay, Lady Carmichael having left India. The Headquarters of the Association were then at 3, Hogg Street, Calcutta. দেখুন, *The Bengal Home Industries Association: Annual Report with Accounts for the year ending 31 March, 1935*, (Protiva Press, Calcutta, n. d. 3). The work of this organisation is detailed in Iftikhar-ul-Awwal, "Activities of the Bengal Home Industries Association, 1917-1940", in the *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, XXIV-VI (1979-81), 179-88.

১২৫. IOR Vol 12018, *Bengal Revenue Proceedings (Industries)*, September 1934, Nos. 12-14, 21-22

মনোযোগ দেয়। সরকারের এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রদেশে কৃষি ও বাণিজ্য বিস্তারলাভ করলেও সরকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যর্থ হয়।[১২৬] বস্তুত এ অবস্থার কারণ এই যে, সরকারি নীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ প্রয়াসটি ছিল ভারতীয় অর্থনীতির সফল উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম ও ক্ষতিকর। যে শিল্পোন্নয়ন ছিল তখনকার জন্য অতি জরুরি তাকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়।[১২৭] শিল্পোন্নয়নকে সরকারি পরিচালনার বাইরে রাখা হয়।[১২৮] বাজার হারাবার ভয়ে বৃটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করার পরিবর্তে বরং শিল্পোন্নয়নের পথে অসংখ্য বাধার সৃষ্টি করে। বিদেশী রাষ্ট্রের পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য মুমূর্ষু শিল্পের নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তুলনামূলক মান ও মূল্যসম্পন্ন দেশীয় দ্রব্য লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের প্রতি অত্যধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হতো। শিল্পোদ্যোক্তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো না কিংবা প্রদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদি সৃষ্টি করা হয় নি। বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অতি সামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় অথবা বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো না। এইরূপ বিরুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিবেশের প্রভাবে প্রদেশে কতিপয় অর্থনৈতিক 'এনক্লেভ' ছাড়া শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি ছিল নগণ্য। পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ অনুমোদন করার পর শিল্প সম্প্রসারণের পথে গৃহীত কোন প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে আনুষঙ্গিক উদ্দীপক সমর্থন ও কর্মকাণ্ডের অভাবে কার্যকর হতে পারে নি। এভাবে শক্তিশালী শিল্পঅবকাঠামো সৃষ্টিতে সুদূরপ্রসারী প্রাদেশিক সাহায্যের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা বৃটিশ শাসনকালে কেবল একটি অসার কল্পনাই থেকে যায়।

---

১২৬. India's per capita income during the last quarter of the nineteenth century remained one of the lowest in the world Estimates ranged from Rs. 18 calculated by Digby in 1899 to Rs. 39.5 by Atkinson in 1895. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, V. V Bhatt. *Aspects of Economic Change and Policy in India, 1800-1960,* (Bombay 1963), 18-25 The economic condition of the general masses were still worse due to great inequalities in the distribution of wealth

১২৭. Even the Famine Commission of 1879 agreed that ·

. . at the root of much of the poverty of the people of India and of the risks to which they are exposed in seasons of scarcity lies the unfortunate circumstances that agriculture forms almost the sole occupation of the mass of the population, and that no remedy for present evils can be completed, which does not include the introduction of a diversity of occupations through which the surplus population may be drawn from agricultural pursuits and led to earn the means of subsistence in manufactures or some such occupations. *Report of the Indian Famine Commission* (Parliamentary Papers LII of 1880), Part II, 175

১২৮. Agricultural activities, leaving aside industrial development, were undertaken mainly to extract raw materials for British industries and not for industrial use within the country. India had become during this period a kind of complement to western Europe, giving out raw material and food and taking from it manufactured articles Such an expansion of trade based upon primary products of the soil was indeed of questionable benefit to the country. In the second decade of the twentieth century, according to Deole, 73 percent of the export trade was of unfinished goods and 77 percent of the imports of manufactured articles. দেখুন, C. S. Deole, *The State in Relation to Indian Industries,* (Bombay 1916), 7.

১৫

গ্রামীণ ঋণিতা

রতন লাল চক্রবর্ত্তী*

বাংলার কৃষকের ঋণিতা সর্বজনবিদিত। প্রাচীনকাল হতেই ঋণের ব্যবস্থা ও ব্যবহার ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঋণদান, সুদের হার ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বিস্তৃত বিধান রয়েছে, যা তৎকালীন সমাজে ঋণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধের মঙ্গলকাব্যসমূহে ঋণপ্রদানকে মহাজনি ব্যবসা হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখা যায় এবং একই সাথে দ্রব্য ও অর্থ উভয় ঋণের প্রচলন ছিল লক্ষণীয়।[১] বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সময়কালে লিখিত ফার্সি গ্রন্থ *রিসালা-ই-জিরাত* গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে যে, রাজস্ব প্রদান বা অত্যধিক করভার এবং কখনো কখনো খরা, গবাদিপশু ক্রয়, বিয়ে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার জন্য কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকে।[২]

ঋণিতার কারণ

ঋণিতার কারণ নিয়ে সমকালীন গবেষক ও লেখকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অন্যদিকে সাধারণভাবে কৃষকের ঋণিতার জন্য বহুবিধ কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমির স্বল্প উৎপাদিকাশক্তি, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা, উৎপাদনহানি ও পশুশক্তির ক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, অবমূল্যায়ন (depreciation), কৃষকের স্বাস্থ্যহানি, ভূমি হতে ধীর ও অনিশ্চিত মজুরি, অমিতব্যয়িতা, পৈতৃক ঋণ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা, ভূমিতে

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. এ ব্যাপারে বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন, Ghanaram Chakraborty, *Sri Dharmamangala*, Piyush Kanti Mahapatra (ed.), (Calcutta 1962), 123; Ram Das Adhak, *Annada Mangala* or *Sri Dharma Purana*, Basanta Kumar Chattopadhyaya (ed.), (Calcutta 1345 B.S.), 185, Divz Ram Dev, *Avaya Mangala*, Ashutosh Das (ed.), (Calcutta 1957), 63-65, Kabikankan Mukundaram Chakraborty, *Chandi Mangala*, Bijan Bhattacharji (ed.), (Calcutta 1966), 129

২. Anonymous, *Risala-i-Zirat* (c 1750), উদ্ধৃত Irfan Habib, "Usury in Medieval India", *Comparative Studies in Society and History*, VI, (1963-64), 394.

অধিকারহীনতা, ভূমিরাজস্বনীতি, অধিক সুদের হার, মূল্যবৃদ্ধি, বিকল্প পুঁজির অভাব, বিকল্প পেশার (subsidiary) অভাব, অর্থনৈতিক সমতার ভারসাম্যহীনতা (loss of economic equilibrium) ইত্যাদি বহুবিধ কারণের উল্লেখ সমকালীন রচনা ও বিবরণীতে লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক যুগে রচিত এসব বিবরণীর অধিকাংশ স্থানেই কৃষকের ঋণের দায়-দায়িত্ব কৃষকের উপরই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে কৃষকের অমিতব্যয়িতা, যেমন বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের চেয়ে অধিক ব্যয়ের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। কৃষকের সার্বিক জীবনে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলাফল এসব আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে নি।[৩] কেউ কেউ মত পোষণ করেন যে, অত্যধিক রাজস্বদাবি ও অর্থকরী ফসল উৎপাদন ঋণিতার সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। এই দলের মতে, মাত্রাতিরিক্ত রাজস্বদাবি কৃষককে অতিরিক্ত অর্থকরী ফসল উৎপাদনে বাধ্য করে। ফলে কৃষকের জীবিকার জন্য ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু এই অনুমিতি সম্পর্কে অন্য একটি গবেষকদল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন যে, টাকায় রাজস্ব গ্রহণ বা অর্থকরী ফসল উৎপাদন এ দুয়ের সাথে ঋণিতার কোন সম্পর্ক নেই। শেষোক্ত দলের মতে, কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন গ্রামীণ ঋণিতাকে জটিল করে তুলেছে। নদীর নাব্যতা হ্রাস বাংলার কতিপয় অঞ্চলে জমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস করেছে এবং এর ফলে বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।[৪]

ঋণিতার সাথে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়টি সম্প্রতি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়াকে যারা আরোপিত ও কৃত্রিম বলে মনে করেন তাদের মতে এই প্রক্রিয়াটি ঋণিতার কারণ হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে যারা স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃষিঅর্থনীতির অনিবার্য কারণ হিসেবে গ্রহণ করেন, তারা কৃষির বাণিজ্যিকীকরণমাত্রার সাথে কৃষিঋণ ও সুদের হারের কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করেন নি।[৫] বাংলায় ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা সম্ভবত ছিল বেশি। তারা কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ঋণগ্রস্ত হয় নি, প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প উৎপাদনের জন্যই ঋণগ্রস্ত

৩. Daniel and Alice Thorner, *Land and Labour India*, (Bombay 1962), 108.

৪. Ratan Lal Chakraborty, *Rural Indebtedness in Bengal*, Unpublished Ph.D. thesis, Dhaka University, 1988, 18-19.

৫. Akbar Ali Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal, 1890-1914: A Neo-Classical Analysis*, (Dhaka 1982), 11; Binay Bhusan Chaudhuri,"Rural Credit Relation in Bengal, 1859-1885", *Indian Economic and Social History Review*, VI: 3 (1968), 204; M. Mufakharul Islam, "Problems of Agricultural Indebtedness in British India: Some Traditional Views Reconsidered", *Calcutta Historical Journal*, VI, (1982), 33; মনোজ কুমার সান্যাল, "ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে ঋণ ও জমি হস্তান্তরের সমস্যা : একটি জেলাওয়ারী সমীক্ষা", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৪র্থ খণ্ড, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), (কলকাতা ১৯৮৯), ২৫১-৬১।

হয়েছে। তবে এ বিতর্ক অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বিনয় চৌধুরী একটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, যেসব অঞ্চল জীবিকার অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেসব অঞ্চলে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ কৃষকের উপর অধিকতর ঋণের বোঝা চাপিয়েছে। অবশ্য এসব কৃষকের ঋণলভ্যতার সুযোগও ছিল বেশি। কৃষিঋণের এই অবস্থার সাথে ভূমিঅধিকার ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটিকে অনিবার্যভাবেই যুক্ত করা হয়েছে।[৬]

সরকারিভাবে ঋণের কারণ হিসেবে কৃষক সম্প্রদায়ের অমিতব্যয়িতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভারতের কৃষি সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Agriculture in India) এবং দুর্ভিক্ষ কমিশনের বিবরণীসমূহে কৃষকের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাত্রা ও সাধ্যাতীত ব্যয়ের উপর আলোকপাত করে এগুলোকে কৃষকের ঋণের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৭] কিন্তু এসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, কৃষিজীবী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনও ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অত্যধিক ব্যয় করে কেন ঋণগ্রস্ত হয় না ? প্রকৃতপক্ষে কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় আয় ছিল কম এবং প্রয়োজনই তাকে ঋণগ্রস্ত হতে বাধ্য করে। এ ছাড়া কৃষক একটি অনিশ্চিত অর্থনৈতিক জীবনে বাস করে, যেখানে খরা, বন্যা, ঝড়, মহামারী তার অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে বার বার তাকে ঋণগ্রস্ত করে তোলে এবং মহাজন এই অবস্থাটির সুযোগ গ্রহণ করে। ঋণের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ ঋণিতার মাত্রাকে অনুধাবন করা সম্ভব। ১৯৪০-এর দশকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোট ঋণিতার পরিমাণ, কৃষকপ্রতি ঋণের গড় এবং প্রতি একর চাষযোগ্য জমির উপর ঋণের গড় পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১ হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলার ঋণিতার অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতির দ্বারা সঠিকভাবে ঋণিতার মাত্রা নিরূপণ করা সমীচীন নয়। কেননা এর সাথে ভূমি অধিকারের পরিমাণও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৬. Binay Bhusan Chaudhuri, "Rural Credit Relation in Bengal, 1859-1885", *Indian Economic and Social History Review*, VI. 3 (1969), 203-57; Rajat and Ratna Roy, "The Dynamics of a Continuity of Rural Bengal under the British Imperium: A Study of Quasy-stable Equilibrium in Underdeveloped Societies in a Changing World", *Indian Economic and Social History Review*, X. 2 (1973), 103-128.

৭. Famine Commission of India, Answer given to the Famine Commissioner of Bengal, 1878, *Proceedings of the Lieutenant Governor General of Bengal*, Revenue Department, December, 1878, Vol 82, para, 9.

সারণি ১ : ভারতের প্রদেশভিত্তিক ঋণিতার সাংখ্যিক বিবরণ, ১৯৪০

প্রদেশ	মোট ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	প্রতি কৃষিজীবীর ঋণিতার গড়	প্রতি একর চাষযোগ্য জমির উপর ঋণিতার গড়
বাংলা	১০০ কোটি	৩১	৪৩
আসাম	২২ "	৩১	৩৭
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৫ "	৩১	৬৩
বোম্বে	৮১ "	৪৯	২৫
মধ্য প্রদেশ	৩৬ "	৩০	১৪
মাদ্রাজ	১৫০ "	৫০	৪৪
পাঞ্জাব	১৩৫ "	৯২	৫০
যুক্ত প্রদেশ	১২৪ "	৩৬	৩৬

উৎস : N C Abhyaukar, *Provincial Debt on Legislation in Relation to Rural Credit*, (New Delhi Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, 1940), 5.

সারণি ২ : ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চাষাবাদকৃত ও চাষযোগ্য ভূমির সাংখ্যিক বিবরণ, ১৯২০

প্রদেশ	প্রতি '.ক্রশ' জন সাধারণ চাষীর জন্য চাষযোগ্য ভূমির গড়	প্রতি কৃষিজীবীর চাষাবাদকৃত ভূমির পরিমাণের গড়
বাংলা	৩১২ একর	০.৫৭
আসাম	২৯৬ "	পাওয়া যায় নি
বিহার ও উড়িষ্যা	৩০৯ "	০.৮২
বোম্বে	১২১৫ "	২.০১
মধ্য প্রদেশ	৮৪৮ "	পাওয়া যায় নি
মাদ্রাজ	৪১৯ "	১.১৪
পাঞ্জাব	৯১৮ "	১.৮০
যুক্ত প্রদেশ	২৫১ "	০.৯২

উৎস : N C Abhyaukar, *Provincial Debt Legislation in Relation to Rural Credit*, 6

উপরোক্ত সারণি ২ হতে সহজেই জানা যায় যে, বাংলায় চাষযোগ্য ভূমির গড় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম ছিল। বাংলার জমির একরপ্রতি উৎপাদন ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশের একরপ্রতি উৎপাদনের চেয়ে কম ছিল। অন্যদিকে বাংলায় জনসংখ্যার চাপ ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এই অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ ঋণিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলার কৃষকের অর্থনৈতিক জীবনে মহাজনের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। পেশাগত মহাজন ছাড়াও দোকানদার, জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামী এবং বিধবা রমণী এই মহাজনি ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন।[৮] বিশ শতকের প্রথমদিক হতে এ দেশে কাবুলী মহাজনদের প্রভাব কমতে থাকে এবং দেশীয় মহাজনদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। এর প্রধান কারণ ছিল পাটসহ অর্থকরী ফসলের চাষ। কিন্তু দেশীয় মহাজনদের ঋণদানতৎপরতা ক্রমশ বাংলার কৃষকদের জন্য এক দুর্দশাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কেননা ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে জমি বন্ধক রাখার শর্ত এবং শেষ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের অনিবার্য ফল ভূমিহস্তান্তর গ্রামীণ কৃষককুলের অর্থনৈতিক জীবনে মারাত্মক ফল বয়ে আনে। কেননা ভূমি বন্ধক বা হস্তান্তরের ফলে কৃষক হয় বর্গাদার নয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। কিন্তু ঋণিতার বিষয়টি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলেও সমস্যাটি বিশ শতকের অর্থনৈতিক মন্দার পূর্ব পর্যন্ত কোন জটিল সমস্যায় পরিণত হয় নি। এ সম্পর্কে সরকারি পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ এবং সুষ্ঠু ঋণব্যবস্থার জন্য কিছু কিছু আইনগত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও সমস্ত পরিস্থিতি ছিল মহাজন-স্বার্থের অনুকূল।

বাংলার ঋণিতার বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে সৃষ্ট মন্দার কারণে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষিঅর্থনীতিকে অর্থনৈতিক মন্দা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[৯] অর্থনৈতিক মন্দার ফলে পাট ও চালসহ কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়, কিন্তু কৃষকের পরিশোধযোগ্য রাজস্ব ও মহাজনি সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে। উল্লেখ্য যে, 'বাংলার চাষী' তার উৎপাদিত কৃষিদ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারাই রাজস্ব ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করে। বাংলায় উৎপাদিত কৃষিদ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ধান ও পাট এবং এ দু'টি কৃষিদ্রব্যের মূল্য অর্থনৈতিক মন্দার ফলে আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। ফলে কৃষক একদিকে জমিদারের রাজস্ব প্রদানে, অন্যদিকে মহাজনের দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ১৯২৮ সালে লক্ষ্য করা গেলেও বাংলায় এর প্রভাব পড়ে ১৯৩০ সাল হতে। সারণি ৩-এ অর্থনৈতিক মন্দার সময় বাংলার ধান ও পাটের মূল্যের ক্রমঅধোগতি লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত সারণি হতে জানা যায় যে, ধানের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে শতকরা ৫৪ ভাগ হ্রাস পায়। ১৯৩৭ সালে ধানের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তখন তা ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ নিচে ছিল। অন্যদিকে পাটের মূল্য ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৩-৩৪ সালে শতকরা ৫৭ ভাগ হ্রাস পায়। একই সাথে ঐ সময়ে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়।

৮. Ratan Lal Chakraborty *Rural Indebtedness in Bengal*, Unpublished Ph.D. thesis, Dhaka University, 1988, 44-81

৯. Omkar Goswami, "Agriculture in Slump. The Peasant Economy in East and North Bengal in the 1930s", *Indian Economic and Social History Review*, Vol. 21, Part-3, 1984, 338.

সারণি ৩ : ধান ও পাটের মূল্যতালিকা, ১৯২৮-১৯৩৭
(১৯২৯=১০০)

বছর	ধান	পাট
১৯২৮	১১১.৯	১০৭.৩
১৯২৯	১০০.০	১০০.০
১৯৩০	৭৩.১	৫৪.৯
১৯৩১	৫৫.৮	৫৪.৪
১৯৩২	৪৫.৯	৫০.০
১৯৩৩	৫৫.১	৪৩.৯
১৯৩৪	৫৫.১	৪৩.৫
১৯৩৫	৫৩.৩	৬২.২
১৯৩৬	৫৮.৯	৭১.৩
১৯৩৭	৫৭.৬	৭৭.৮

উৎস : *Season and Crop Reports of Bengal*, 1928-1937.

প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস না পেলেও কৃষিদ্রব্যের [illegible]

কৃষক সম্প্রদায় নিয়মিত ভূমিকর প্রদানে অক্ষম হলে ভূস্বামীগণও রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক মন্দা বাংলার প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের জীবনে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই মন্দা বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে নতুন ধারার সূচনা করে। এর ফলে মহাজন ঋণসঙ্কোচনের সুযোগ গ্রহণ করে ও ঋণী কৃষকের উৎকৃষ্ট ভূমিসমূহ ক্রয় করতে থাকে। ফলে বহুসংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হয়ে বর্গাচাষী ও কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। মহাজনরা তাদের ধারের অর্থ ও সুদ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে আদালতের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের জমিজমা হস্তগত করে।

প্রলম্বিত অর্থনৈতিক মন্দা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায় এবং এই অসন্তোষ জমিদার ও মহাজনবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯১৮-১৯ সালের বার্ষিক ভূমিরাজস্ববিবরণীতে কৃষকঅসন্তোষের তথ্য দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে এই অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকদের পূর্ববর্তী ভূমি অধিকারের দাবির পরিবর্তে ঋণমুক্তির দাবি প্রাধান্য লাভ করে। ১৯২৮ সালে ঢাকার মানিকগঞ্জের মুসলমান ও নমশূদ্র বর্গাচাষীরা মহাজনি ব্যবসায়ী সাহাদের ভূমি চাষ করতে অস্বীকার করে। ১৯২৯ সালে নারায়ণগঞ্জে হিন্দু মহাজন ও মুসলমান চাষী-খাতকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহাজনবিরোধী

আন্দোলন গড়ে উঠে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে, যেখানে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার ধারক যুব কমরেড লীগ কৃষকদেরকে মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।[১০] ১৯২৯ সালে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া গ্রামের চাষী-খাতকরা সেখানকার ঈশ্বরচন্দ্র শীল নামে জনৈক মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করে তার কাছে গচ্ছিত তমসুকপত্রগুলো ফেরত চায়। চাষী-খাতকরা সুদাসল মোট ২৫০ টাকার মধ্যে ৯০ টাকা তমসুকপত্র প্রত্যর্পণের বিনিময়ে ফেরত দিতে রাজি ছিল। একই প্রকৃতির ঘটনা ময়মনসিংহের এগারো সিন্ধু, জাঙ্গালিয়া, মজিদপুর, বাহাদিয়া, মালপাড়া, শুক্রাবাদ, মির্জাপুর, জামালপুর ও গোবিন্দপুরে লক্ষ্য করা যায়। রক্তক্ষয়ী ঘটনার অবতারণা ঘটে জাঙ্গালিয়া গ্রামে, যেখানে তমসুকপত্র ফেরতদানের দাবি অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামে জনৈক জমিদার মহাজন আটজন চাষী-খাতককে হত্যা করে। এই জন্য ক্ষুদ্র চাষী-খাতকরা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে হত্যা করে এবং তমসুকপত্রসমূহ ছিঁড়ে ফেলে।[১১] এসময় মহাজনবিরোধী আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মহাজনের কাছে তমসুকপত্র প্রত্যর্পণ দাবি এবং দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে মহাজনের বাড়ি আক্রমণ। কিশোরগঞ্জের এই মহাজনবিরোধী আন্দোলন এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিশোরগঞ্জে মহাজনবিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে নোয়াখালী ও ঢাকা হতে মুসলমান নেতৃবৃন্দ (মোল্লাগণ) কিশোরগঞ্জে এসে মহাজনবিরোধী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে রূপ দেয়। ঢাকা ও কলকাতার পত্র-পত্রিকা এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করলেও সরকারিভাবে এই আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে গণ্য করা হয়, কেননা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহাজনই চাষী-খাতক আন্দোলনকারীদের মূল লক্ষ্য ছিল। উল্লেখ্য যে, কিশোরগঞ্জের আন্দোলনে হিন্দু জমিদার অপেক্ষা হিন্দু মহাজনই ছিল চাষী-খাতকদের প্রধান লক্ষ্য। কেননা ভূমিকরের চেয়ে ঋণ ও সুদের চাপই ছিল চাষী-খাতকদের উপর বেশি। মহাজনবিরোধী আন্দোলন ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় সংঘটিত হবার প্রধান কারণ এই যে, এ দু'টি জেলা ছিল পাট উৎপাদনকারী প্রধান জেলা এবং এ জেলা দুটিতে মহাজন ও খাতকের সংখ্যা অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশি ছিল।[১২] সুতরাং অর্থনৈতিক মন্দা অনিবার্যভাবে এ জেলা দু'টিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অর্থনৈতিক মন্দার সময় চাষী-খাতকের সঙ্গে জমিদার-মহাজনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৩৩ সালে রাজশাহীতে মৌলবি আবদুর রশীদের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ চাষী-খাতক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চাষীরা মাত্রাতিরিক্ত করভারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জমিদারকে প্রদেয় করের সাথে মূল্যের সামঞ্জস্যবিধানের দাবি উত্থাপন করে। নোয়াখালী

১০. Tajul Islam Hashmi, *Peasant and Politics in East Bengal, 1920-1947*, Unpublished Ph.D thesis, University of Western Australia, 1986.

১১. Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934 The Politics of Protest*, (Delhi 1987), 104-14

১২. ঐ।

ও ত্রিপুরার কৃষক সমিতিও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এসময় চাষী-খাতকদের আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ১৯৩১ সালে কৃষক সমিতি মীরাটের বন্দিদের মুক্তির দাবিটি তাদের ইউনিয়ন বোর্ডের খাজনা ও ঋণের সুদের হার হ্রাসের দাবির সাথে সমভাবে উত্থাপন করে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অবস্থা সমানভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন হিসেবে চিহ্নিত কোন কোন জেলার কৃষক সমিতি এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অন্যদিকে মহাজন ও ভূস্বামীরাও চাষী-খাতকদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে বাধাদানের জন্য অনুরূপভাবে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। কুমিল্লার নবীনগরে জমিদার ও মহাজনরা শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করে এবং তাঁরা কৃষক সমিতির এসব তৎপরতাকে কমিউনিস্ট তৎপরতা হিসেবে আখ্যায়িত করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানকার চাষী-খাতক খাজনা প্রদান ও ঋণ প্রত্যর্পণ বন্ধ করে দেয়। ১৯৩২ সালে চাঁদপুর পুরান বাজার মুসলিম যুবক সমিতি বাংলার কৃষক সমিতির উৎসাহে একটি সভা আহ্বান করে, যেখানে রণজিৎ বর্মা নামে জনৈক ব্যক্তি মহাজনি ব্যবসার উপর এক বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে একদল কৃষক নবীগঞ্জের বলসিদ গ্রামের জনৈক তালুকদার মহাজনকে আক্রমণ করে। উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার পর ত্রিপুরা কৃষক ও শ্রমিক সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। সরকার এ পর্যায়ে কিছু নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও চাষী-খাতক আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করতে সক্ষম হয় নি। ১৯৩৪ সালের পুলিশ প্রশাসন বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, এসব ঘটনার পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে এবং কৃষক সমিতির পরিচালিত এই আন্দোলনের লক্ষ্য হলো ধনী মহাজনদের সম্পদ লুঠ করা এবং তাদের ঋণ সম্পর্কিত দলিলপত্র বিনষ্ট করা।[১৩] ত্রিপুরার চাষী-খাতকদের এই জমিদার-মহাজনবিরোধী আন্দোলন বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪ সালে বগুড়ায় প্রজানেতা রজীব উদ্দীন তরফদার চাষী-খাতকদের মধ্যে ঋণ ও কর লাঘবের দাবি প্রচার করে চাষী-খাতকদের এই আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-এর দশকে পরিচালিত চাষী-খাতকদের আন্দোলন গ্রামীণ ঋণিতা সম্পর্কে সরকারি মনোভাবের পরিবর্তন আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারও সরকারি সংস্থায় বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হয়। বাংলার সমকালীন লেখক ও চিন্তাবিদরাও চাষী-খাতকের আন্দোলনের সাথে কমিউনিস্ট তৎপরতা ও কমিউনিজমভীতিকে একীভূত করে ফেলেন। কেননা এই আন্দোলনে চাষী-খাতকরা তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যেমন কৃষক সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

১৩. *Report on the Police Administration on the Bengal Presidency*, 1934, *Proceedings* of the Government of Bengal, Police Department, September, 1935, 19

বাংলায় ব্যাপক চাষী-খাতক আন্দোলন, মহাজন ও খাতকদের সম্পর্কের ক্রমাবনতি এবং এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সরকারের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৩৩ সালে বৃটিশ ভারতীয় নিখিল ভারত ভূস্বামীসভার এক সম্মেলনে সভাপতি বিজয় চাঁদ মাহতাব অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টি সামনে রেখে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণভার লাঘব ও গ্রামীণ ঋণব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বক্তব্য পেশ করেন।[১৪] এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূস্বামীদের ঋণিতার দায় হতে অব্যাহতি দেবার জন্য ঋণসালিশী বোর্ড ও জমিবন্ধকি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঋণসালিশী বোর্ড গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ছাড়াও নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়।[১৫] বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম জরিপকারী জে. সি. জ্যাক চাষী-খাতকের ঋণমুক্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সুদের হার হ্রাস, ঋণের আসল পরিমাণ অর্থ মহাজনকে প্রত্যর্পণ ও নতুন করে ঋণগ্রস্ত না হবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এস. জি. পানান্দিকার সমবায় ঋণ সমিতি গঠনের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ লাঘব করার পরামর্শ প্রদান করেন। সমকালীন লেখক এস. সি. মিত্র ঋণকে সর্বদা চাষী-খাতকের পরিশোধক্ষমতার সীমার মধ্যে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৬] প্রকৃতপক্ষে এসব প্রস্তাব একটি উত্তম ব্যাঙ্কব্যবস্থা গঠনের দিকনির্দেশ প্রদান করে। এরই ফলে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি বাংলার ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে কৃষিঋণিতার উপর মন্তব্য করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটির বিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে যে, কেবল বর্তমান ঋণভার লাঘবের মধ্যেই ঋণিতার সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টা নিহিত নয়, বরং কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিসরবরাহ বৃদ্ধি করাও একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।[১৭] ১৯৩৩ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয় অর্থনৈতিক মন্দা ও পাটের মূল্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনার জন্য। একই বছর বাংলা সরকার কেবিনেট অর্থনৈতিক কমিটি গঠন করে প্রশাসনিক ও আইনগতভাবে বিদ্যমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার উদ্যোগ নেয়।

১৪. Resolutions of the All Bengal Landholders Conference, 13 August, 1933, Government of Bengal (hereafter abbreviated as G.O B.), B Proceedings (hereafter abbreviated as B-Prods), Co-operative Credit and Rural Indebtedness, (hereafter Abbreviated as C.C R.I.), Co-operative Societies Branch (hereafter abbreviated as C.S.), Bundle No 1, July 1936, Progs. No. 2-3.

১৫. বাংলায় মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947*, (New Delhi 1976), 67, B.R. Khan, *Politics in Bengal*, (Dhaka 1987), 19.

১৬. S.C Mitter, *A Recovery Plan for Bengal*, (Calcutta 1934), 159.

১৭ *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee*, Vol. I, 75

প্রকৃতপক্ষে এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রমাগ্রসরমান সন্ত্রাসী ও কমিউনিস্ট তৎপরতা প্রতিরোধের জন্য অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করা। কেবিনেট অর্থনৈতিক কমিটি সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নত ঋণব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে মতপ্রকাশ করে। অর্থাৎ এই কমিটি ঋণিতার মাত্রা হ্রাসের জন্য আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং একই সাথে চাষী-খাতকের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য জমিবন্ধকি ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গঠন, সুষ্ঠু বাজারব্যবস্থা সৃষ্টি, লোন কোম্পানি ও মফস্বল ব্যাঙ্ক পুনর্গঠন, জমিদারি ক্রয় ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ করে। ঋণনিষ্পত্তি, ঋণের সুবিধা ও সুদের হার হ্রাস সম্পর্কে কেবিনেট কমিটির মতামত ছিল এই যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পেলে এসব বিষয়ে গৃহীত কোন ব্যবস্থা সুচারুরূপে কার্যকর করা সম্ভব হবে না।[১৮] যাই হোক, ১৯৩৩ সালে অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়, যা ১৯৩৪ সালে বাংলার ঋণিতার উপর বিশদ বিবরণী পেশ করে ও কৃষকের ঋণিতার অবসানের জন্য ঋণসালিশের ব্যবস্থা এবং কৃষকের প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদ হতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ করে। ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের বিষয়টি ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ঋণিতার অবসানের জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ে ভারতের সর্বত্র স্বতন্ত্র আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশই ছিল এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।[১৯] প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বতন্ত্র আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ ছিল, বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিব্যবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল স্বতন্ত্র। অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ডের সুপারিশক্রমেই ঋণিতার উপর একটি বিল প্রণয়ন করা হয় এবং তা স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।[২০] সিলেক্ট কমিটি এই বিলটিতে সামান্য পরিবর্তন করে এবং আলোচনার জন্য তা বঙ্গীয় আইন পরিষদে উপস্থাপন করে।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক বিলের আইনগত দিক সম্পর্কে আলোচনার আগে ঋণিতা ও ভূমিহস্তান্তর সম্পর্কিত ইতিপূর্বে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সঙ্গত কারণেই প্রয়োজন। বাংলায় কোম্পানিশাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৭৭২ সালে ঋণ ও সুদের হারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য কোম্পানির কমিটি অব সার্কিট মাসিক শতকরা ২ টাকা হারে সুদ

১৮. *The Case for a Comprehensive Plan of Economic Development in Bengal*—A Brochure circulated by the cabinet Economic Committee, 1933-34, G.O.B , B-Prods., C.C.R.R I , Rural Indebtedness Branch (hereafter abbreviated as R I.), Bundle No 14, May 1946, Progs. Nos. 149 -50.

১৯. Government of Bengal, *Report on the Activities of the Board of Economic Enquiry during the years 1936-37 to 1938-39,* (Compiled by Nihar Chandra Chakraborty), (Alipore 1939), 11

২০. Krishna Kumar Sharma, "The Provincial Economic Conference", *Mysore Journal of Economics*, XX. 7 (1934), 375

ধার্য করে এবং একই সাথে শর্ত আরোপ করে যে, কিস্তি অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য ঋণ ধার্য হলে নতুন কোন সুদ আরোপ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এ দেশে ঋণের বিষয় মীমাংসার সর্বপ্রথম আইনানুগ পদক্ষেপ। ১৭৭৩ সালে প্রবর্তিত 'নর্থ রেগুলেটিং এ্যাক্ট' অনুসারে ভারতে অবস্থানরত ইউরোপীয়দের কাছ থেকে ১২% হারে সুদ গ্রহণের নীতি প্রবর্তন করা হয়। ১৮৫৫ সালে ২৭ নং আইন প্রবর্তন করে সুদের হার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি আদালতের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এর ফলে সুদের হার প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ে এবং খাতকের অবস্থান পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হয়।[২১] অন্যদিকে এই আইনবলে ঋণব্যবসায়ের একচেটিয়া বাজার ভেঙে যায়। একই সাথে প্রাচীন ভারতীয় Damdupat আইন কার্যকরী থাকে, যেখানে সর্বমোট সুদের অর্থকে লগ্নীকৃত মূল অর্থের ঊর্ধ্বে কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নয় বলে বিধি ছিল। একইভাবে ১৯০১ সালে ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত মহাজনি আইন অনুসরণ করে ভারতে ১৯১৮ সালে লগ্নি আইন পাশ করা হয়, যেখানে সুদের হার মাত্রাতিরিক্ত হলে এবং ঋণের আদান-প্রদান বিধিযোগ্য না হলে ঋণগ্রহীতাকে সুদ ও আসল হতে অব্যাহতি প্রদানের শর্ত ছিল। এই আইন নগদ অথবা দ্রব্য উভয় ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল এবং বিধি অনুযায়ী ঋণের আদানপ্রদান সম্পাদিত হলে আদালতকে মহাজনের অনুপস্থিতিতেই একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে রাজকীয় কৃষি কমিশন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯২৬ সালে পূর্ববর্তী লগ্নি আইন সংশোধন করা হয়, যেখানে খাতককে ঋণমুক্তির জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের পূর্বে খাতক ও মহাজন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আইনগত পদক্ষেপ ছিল ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় মহাজনি আইন। বাংলার মহাজন, ব্যবসায়ী, কুসিদজীবী, জমিদার, তালুকদার, কৃষক, মজুর ও খাতক সকলেই এই আইনের আওতায় আসে এবং এই আইন ঋণের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রচলন করে সনাতন ঋণসম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনে। মুহম্মদ আজিজুল হক ১৯৩৩ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বঙ্গীয় মহাজনি আইনের প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা আইন পরিষদের সমর্থন পেয়ে আইনের রূপ লাভ করে। ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় মহাজনি আইন এর আগে প্রদত্ত নিরাপদ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫% এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫% বেশি সুদ ধার্য করাকে অযৌক্তিক ঘোষণা করে।[২২] প্রাচীন Damdupat আইন অনুসরণ করে বঙ্গীয় মহাজনি আইন শর্ত আরোপ করে যে, মূল ঋণের পরিমাণের অধিক সুদের অর্থদাবিতে আদালতে কোন ডিক্রি জারি করা যাবে না। এক

২১. K G Sivaswamy, *Legislative Protection and Relief of Agriculturist Debtors in India,* (Poona 1939), Publication No 8

২২. *Bengal Board of Economic Enquiry Report,* 1935, Supplement to the *Calcutta Gazette,* 24 January, 1935, 143

কথায় বলা যেতে পারে যে, বঙ্গীয় মহাজনি আইন মহাজনের অপ্রতিহত ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস করে, কেননা এই আইনে খাতককে ঋণগ্রহণ সম্পর্কিত সকল নথিপত্র যথাযথভাবে মহাজন কর্তৃক প্রদানের শর্ত থাকে। অন্যদিকে মহাজনদের লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়মিত রেজিস্টার সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই আইনে নিরাপদ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬% এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮% সুদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। বঙ্গীয় মহাজনি আইন সমকালীন কায়েমি স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক সমালোচিত হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই আইন খাতককে প্রয়োজনে সুবিচার লাভের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ ও অধিকার প্রদান করে।

বাংলার চাষীর চাষাবাদ ও জীবিকানির্বাহের জন্য ঋণের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র চাষী-খাতককে ঋণের ক্ষেত্রে আইনগত নিরাপত্তাদানের পাশাপাশি চাষীর প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানোর ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াস নেয়। কেননা বাংলার চাষী ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে এবং তাদের ঘিরে জমিদারের সনাতন প্রভাববলয় ভেঙে পড়ে। ১৮৫৭ সালে দাক্ষিণাত্যে মারাত্মক কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিলে 'Deccan Agriculturists Relief Act' আইন পাশ করে বৃটিশ সরকার সেখানে ঋণের জন্য স্থায়ীভাবে ভূমিবিক্রয় বন্ধ করে দেয়। ১৮৮০ এবং ১৯০১ সালের ফেমিন কমিশন ঋণসমস্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলে লর্ড ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন সমবায় সমিতি গঠনের সম্ভাব্যতা নিরূপণের প্রয়াস গ্রহণ করে। এই কমিটির সুপারিশক্রমে রাইফেইসেন মডেলে সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ করা হয়।[২৩] কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সময় এই আইন পাশ হলে জনগণ সমবায় সমিতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, যার ফলে সমবায় আন্দোলন প্রয়োজনীয় জনসমর্থন লাভ করে নি। বিভিন্ন সময়ে সমবায় ঋণদান সমিতি আইনের বিভিন্ন সংশোধন সাধিত হলেও বিভিন্ন কারণে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

চাষী-খাতকদের দুর্দশা মোচনের জন্য অবলম্বিত আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আইনের ব্যবহার বাংলার অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বহন করে। ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষিজীবীর ঋণ তার পরিশোধক্ষমতার সীমায় কমিয়ে এনে খাতক ও মহাজনের মধ্যে মীমাংসা করা। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালে চাষী-খাতক আইন পাশ হবার আগে পূর্ব বাংলায় কমপক্ষে দুইবার

---

২৩. Unlimited liability, limited area of operation and small membership were the basic features of Raiffeisen model for Co-operative Society. G.O B., B-Prods., C.C.R.I., C.S., Bundle No. 20, July 1947, Progs. Nos. 1-2

অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ১৯১৮ সালে পাবনায় সমবায় সমিতির অনুপ্রেরণায় কুসিদ আইনের মাধ্যমে ঋণনিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে ১৯৩৪ সালে প্রবল কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে কুমিল্লার চাঁদপুরে মহকুমা প্রশাসক আবদুল আজিজের নিরলস প্রচেষ্টায় ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করে স্থানীয়ভাবে চাষী-খাতক ও মহাজনদের মধ্যে মীমাংসার প্রয়াস নেয়া হয়।[২৪] আবদুল আজিজ ব্যক্তিগতভাবে মহাজনদের সাথে বৈঠক করেন এবং জনসভার মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা করেন। চাষী-খাতক ও মহাজন উভয়ের সাগ্রহ সম্মতিতে ঋণনিষ্পত্তির জন্য গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে বেসরকারিভাবে গঠিত ঋণসালিশী বোর্ডে মহাজন ও খাতক হতে সমান সংখ্যক সদস্য নেয়া হয়। এই বোর্ডের মহাজন-সদস্য মহাজনগণই নির্বাচন করে এবং সদস্যদের মধ্য হতে মহকুমা প্রশাসক দুইজন মহাজনকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেন। অন্যদিকে খাতক-সদস্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত করা হয়। এ পর্যায়ে যেসব ঋণসালিশী বোর্ড বিতর্কিত হয় এবং জনসমর্থন হারিয়ে ফেলে, সেগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, চাঁদপুরে পরীক্ষামূলক ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্ষমতার অধীনে খাজনাকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি। যাই হোক, কয়েকটি ধাপে ও পদ্ধতিতে সুদাসলে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে খাতকের পরিশোধসীমার মধ্যে আনা হয় এবং কিস্তিবন্দি অনুযায়ী ধার্যকৃত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপরোক্ত কর্মতৎপরতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে চাঁদপুরে ৩৯টি ঋণসালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা খাতকের ঋণের ভার লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারিভাবে দাবি করা হয়েছে যে, চাঁদপুরে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ঋণসালিশী বোর্ড প্রবল কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে রহিতকরণ, খাতক ও মহাজনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধন, ঋণভার লাঘবকরণ, কর ও ঋণ পরিশোধের পরিবেশ সৃষ্টিকরণসহ কৃষি উন্নয়নের পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ঋণসালিশী বোর্ডের গঠন ও কর্মতৎপরতায় ইতিপূর্বে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত চাঁদপুর ঋণসালিশী বোর্ডের গঠন ও কর্মতৎপরতার নীতিমালা আংশিকভাবে অনুসৃত হয়।

বাংলার রাজনীতিতে সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হবার পর; কেননা এই আইনে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করে সাধারণ মানুষকে ভোটদানের অধিকার প্রদান করা হয়। অনিবার্যভাবে এই আইনের প্রভাব রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায়, যে পর্যায়ে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে। আইন পরিষদে এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির

২৪. Debt Conciliation Boards in Chandpur, G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., R.I., Bundle No 15, December 1946, 1

লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার তৎকালীন মুসলমান নেতৃত্ব যদিও ভূমিস্বার্থজড়িত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও তাঁরা কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্যে সোচ্চার হন। মহাজন ও খাতকের সম্পর্ক উন্নয়নে সরকারিভাবে ঘোষিত আইন-পরিকল্পনাকে এ. কে. ফজলুল হক ও আবদুর রহিমের নেতৃত্বে গঠিত নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সমিতি সমর্থনদান করে। অনুরূপভাবে হিন্দু নেতা জে. এল. ব্যানার্জী, নরেশ সেনগুপ্ত ও অতুল গুপ্তও কৃষকদের ঋণভার লাঘবের দাবি সমর্থন করেন।[২৫]

সাধারণভাবে ধারণা রয়েছে যে, এ. কে. ফজলুল হক কৃষকদের 'ঘটি-বাটি' উদ্ধারের জন্য ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করেছিলেন। এসব বক্তব্য ছিল রাজনৈতিক নির্বাচনে ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারের অংশ, যার কোন ঐতিহাসিক সারবত্তা নেই।[২৬] প্রকৃতপক্ষে এই আইনটির উদ্যোক্তা ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং এই আইনের কিছু অংশ প্রয়োগের সময় মন্ত্রী হিসেবে স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে খাজা নাজিমুদ্দিন বঙ্গীয় আইন পরিষদে বাংলার গ্রামীণ ঋণিতা বিল উত্থাপন করেন। আইন পরিষদে প্রলম্বিত বিতর্কের পর এই বিলটি 'সিলেক্ট কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়, যেখানে বিলটিতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়।[২৭] বিলটি পুনরায় ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় আইন পরিষদে উত্থাপিত হয় এবং এটি পাশ করতে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রবল বিতর্ক ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। যাইহোক, ১৯৩৫ সালের ২৩ নভেম্বর বিলটি আইন পরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৩৬ সালের ৬ এপ্রিল বাংলার গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে তা বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনে পরিণত হয়। বাংলার ঋণভারে জর্জরিত ধ্বংসোন্মুখ চাষী-খাতককে রক্ষাকল্পে এই আইন ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের নীতিমালা প্রণয়ন করে। ঋণসালিশী বোর্ডকে প্রয়োজনে চাষী-খাতককে দেউলিয়া ঘোষণার ক্ষমতা, নিষ্পত্তির সময় মহাজনকে কিছু নগদ অর্থপ্রদানের শর্ত, ঋণসালিশী বোর্ডের গঠনকে নিরপেক্ষ করা ইত্যাদি নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে এই আইন ঋণসম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে।[২৮] কেননা বাংলার কৃষিঅর্থনীতিতে মহাজনরাই ছিল প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগানদার। মহাজনি পুঁজি কোনক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা অনিবার্যভাবে কৃষিউৎপাদন ব্যাহত করবে, কেননা কৃষিক্ষেত্রে মহাজনের বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয় নি, যা প্রয়োজনে কৃষকের পুঁজির চাহিদা পূরণ করবে। সুতরাং মহাজনদের স্বার্থও অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা এই আইনে ছিল।

২৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা ১৯৭৬), ৩য় সংস্করণ, ২৪-২৫।

২৬. G O B., B-Prods, C C R.I, R I, Bundle No 14, May 1946, Progs Nos. 149-50.

২৭. *Report of the Select Committee on the Bengal Relief of Indebtedness Bill*, 1935, উদ্ধৃত A C Chose, *The Bengal Agricultural Debtors Act: Bengal Act VII of 1936*, (Calcutta 1941, second edition), XI-XIII

২৮. Kumud Nath Bhaumik, *The Bengal Agricultural Debtors Act : Bengal Act VII of 1936.*, (second edition, Calcutta 1937), 74-88

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যেমন সংগঠন, প্রশাসন ও কার্যপদ্ধতি। এই আইনের মাধ্যমে দুই প্রকারের ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করা হয়। প্রথম প্রকার ছিল সাধারণ ঋণসালিশী বোর্ড, যা ইতিপূর্বে বেসরকারিভাবে চাঁদপুরে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছামূলক ঋণসালিশী বোর্ডের অনুকরণে গঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋণসালিশী বোর্ড ছিল প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ড, যা বাধ্যতামূলক ঋণনিষ্পত্তির বিষয় বিবেচনা করার ক্ষমতাসম্পন্ন, যখন মহাজন ঋণনিষ্পত্তিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ কতগুলো ক্ষমতা ছিল। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাথে ঋণনিষ্পত্তির জন্য অন্য একশ্রেণীর বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ড ছিল।[২৯] উদ্যোগী, উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা স্থানীয়ভাবে ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের প্রচেষ্টা প্রথমদিকে লক্ষ্য করা গেলেও ক্রমশ এই নীতি বর্জিত হয়ে নতুনভাবে ঋণসালিশী বোর্ড সংগঠিত হয়।

ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ও ক্রমবর্ধমান খরার পরিপ্রেক্ষিতে ঋণসালিশী বোর্ডে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উঠে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' প্রদানের পর বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জাতীয় চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রেও এর যথাযথ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।[৩০] এমনকি শেষেরদিকে তফসিলী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিও নিশ্চিত করা হয়। ফলে ঋণসালিশী বোর্ডের প্রতিষ্ঠালগ্নের ধারণার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে নি।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতায় কয়েকটি নির্দিষ্ট বিকল্প ছিল।[৩১] যেমন—

ক. পারস্পরিক সম্মতিতে ঋণনিষ্পত্তি;

খ. মহাজন ও খাতক কেউ সম্মত না হলে মোট ঋণের শতকরা ৬০ ভাগ ঋণের বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি;

গ. দখলি মর্টগেজ-এর ঋণ বাধ্যতামূলকভাবে নিষ্পত্তি;

ঘ. কোন বিশেষ ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঋণের সার্টিফিকেটমাত্র দান;

ঙ. খাতককে দেউলিয়া ঘোষণার মাধ্যমে ঋণনিষ্পত্তি।

জনগণের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ঋণসালিশী বোর্ডের সহজ ও সরল কার্যবিধি প্রণীত হয়। বারো আনা কোর্ট-ফি প্রদানের মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে মহাজন বা খাতক ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে পারতেন। ঋণনিষ্পত্তির জন্য খাতক আবেদন করলে মহাজনকে ঐ ঋণ সম্পর্কে আনুপূর্বিক বর্ণনা

২৯. Assistant Secretary, C C R.I , R I , to Officer-in-Charge, Reserve Bank of India, Bombay, 31 March 1944, G O B , B-Prods , C C.R i , R I., Bundle No 11, November 1944, Progs Nos 456-57

৩০. G O.B., B Prods , C C R I , R I , Bundle No 2, September, 1940, Progs No 630.

৩১. G.O B , *Rural Indebtedness and how the Law deals with it,* a lecture delivered at the Settlement Training Camp In Mymensingh District in December, 1939 (Alipore 1940), 9

প্রদান করতে হতো এবং একইভাবে মহাজন ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদন করলে খাতককে আনুপূর্বিকভাবে ঐ ঋণের এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে হতো। তবে খাতক কর্তৃক ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ ঋণের অংশীদারদের নাম, মহাজনদের নাম, মহাজনদের দাবিকৃত ও আসল অর্থের পরিমাণ, খাতক কর্তৃক স্বীকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণগ্রহণের শর্ত ও বৃত্তান্ত, খাতকের জমিজমা ও অন্যান্য হস্তান্তরযোগ্য সম্পদের এবং এসব সম্পর্কে দীউয়ানি আদালতে কোন মোকদ্দমা থাকলে তার আনুপূর্বিক বিবরণ দেবার অপরিহার্য শর্ত ছিল। অনুরূপ শর্ত ঋণনিষ্পত্তির জন্য মহাজনের আবেদন বা খাতকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহাজন কর্তৃক আনুপূর্বিক বিবরণদানের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হতো। ঋণনিষ্পত্তির জন্য খাতকের আবেদনপত্র পাবার পর ঋণসালিশী বোর্ড তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই আবেদনপত্রে বর্ণিত মহাজনদের, অংশীদারি খাতকদের ও ভূস্বামীদের সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতো। সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার প্রতি সাধারণ জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা।[৩২] ঋণসালিশী বোর্ড কর্তৃক খাতকের কোন আবেদন বিবেচিত হবার পূর্বে খাতক একজন চাষী-খাতক কিনা, ঋণসালিশী বোর্ডে এই আবেদন নিষ্পত্তি হবার যোগ্য কিনা অর্থাৎ আবেদনপত্রে বর্ণিত ঋণের অর্থ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে কিনা এবং বর্ণিত ঋণ বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনে উল্লেখিত 'ঋণের' সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা এসব বিবেচনা করার একান্ত অপরিহার্য শর্ত ছিল। ঋণসালিশী বোর্ডের পরবর্তী কার্যক্রম ছিল ঋণের অর্থ নিরূপণ করা ও রোয়েদাদ প্রদান করা। ঋণের অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে খাতকের মোট আয়-ব্যয় ও উদ্বৃত্তআয় পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, কেননা এই উদ্বৃত্তআয়ের উপরই রোয়েদাদ প্রস্তুত করা হতো। খাতক একেবারেই অক্ষম হলে তাকে দেউলিয়া ঘোষণা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কেননা বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল পরিশোধ্য ঋণ খাতকের পরিশোধক্ষমতার সীমার মধ্যে এনে নিষ্পত্তি করা।[৩৩] যাইহোক, মহাজনদের এক অংশ রাজি হলে বা মহাজনদের কেউই ঋণনিষ্পত্তিতে রাজি না হলেও ঋণসালিশী বোর্ড হয় ঋণনিষ্পত্তি নয়তো ঋণ সম্পর্কিত মোকদ্দমাটি বিশেষ ঋণসালিশী বোর্ডে পাঠাতে পারতো। উল্লেখ্য, ঋণসালিশী বোর্ড কর্তৃক খাতকের আবেদনে বর্ণিত ঋণ নিরূপণ করার পূর্বদিন পর্যন্ত খাতকের বকেয়া রাজস্ব ঋণ হিসেবে গৃহীত হতো।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাতকের ঋণ বাবদ বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন মেয়াদের জমিবন্ধক ছিল। এসব বন্ধকি রেহানি, দাখিল রেহানি, জায়সুদি, কট্-কবলা, বন্ধকি কট্,

৩২. *Lecture Note on the Working of the Bengal Agricultural Debtors Act, 1935,* delivered at the Settlement Training Camp in Barisal District by Deputy Director, D C. E.C., G.O.B , B-Prods , C C.R.I , R. I., Bundle No. 8, June 1942, Progs. Nos 673-74.

৩৩. Extract from a letter of the Collector of Mymensingh, 2 September 1940, G.O.B., B-Prods., C.C R.I , R I., Bundle No. 2 , July, 1941, Progs. No. 6

খাইখালাসি, সুদি কট্ ইত্যাদি নামে ও প্রকৃতিতে পরিচিত ছিল এবং এগুলো হস্তান্তর করার অধিকারবিহীন বা উপস্বত্বভোগের অধিকারসমর্পিত ছিল। ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে দখলিস্বত্ব ভোগের অধিকারী রায়তও উপরোক্ত বন্ধক প্রদানের ক্ষমতাধিকারী হয়।[৩৪] ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে এসব বন্ধকের মেয়াদ ১৫ বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হলে অনেক চাষী-খাতক তাদের বন্ধকিজমি ফেরত পায়। এই আইন একই সাথে খাতকের অতিরিক্ত দেনার প্রবণতা গুণগতভাবেই হ্রাস করে এবং এর অতীতের সকল বন্ধকিজমির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ খাতকের ঋণনির্ভরযোগ্যতাকেও সীমিত করে। একই সাথে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনী বন্ধকিজমির বিষয়টিকে ঋণসালিশী বোর্ডের ক্ষমতাধীন করে।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। এসব সমালোচনার ভিত্তি ছিল সমকালীন অর্থনৈতিক তত্ত্ব। বলা হয়েছে যে, ঋণনিষ্পত্তিতে ঋণ সরবরাহের বিষয়টি অনুপস্থিত, ফলে ভবিষ্যতে চাষীরা আবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে এসব সমালোচনা এবং ঋণসালিশী বোর্ডের কার্য পরিচালনাকালে অনুভূত বোর্ডের কতগুলো ত্রুটি বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধন অনিবার্য করে তোলে। ফলে ১৯৩৭, ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনী ঋণসালিশী বোর্ডের ক্ষমতাকে অধিকতর শক্তিশালী করে অস্বীকারকারী মহাজনকে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। ঋণনিষ্পত্তির বিষয়ে বিলম্ব সাধারণভাবে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিশেষভাবে কৃষিপুঁজির যোগানকে বিঘ্নিত করে। ফলে দ্রুত ঋণনিষ্পত্তির জন্য ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনীতে ঋণসালিশী বোর্ডকে বিশেষ প্রয়োজনে চাষী-খাতককে দেউলিয়া ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের সংশোধনীর জন্য আইন পরিষদে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাবে এসব উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৩৫] ১৯৩৭ সালে আইন পরিষদের পাঁচজন সদস্য বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের যে সংশোধনীর প্রস্তাব করেন, সেখানে 'খাতক' ও 'ঋণ'-এর সংজ্ঞা, বন্ধকিজমি ও ঋণসালিশী বোর্ডকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪০ সালে খান সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন ব্যক্তিগতভাবে আইন পরিষদে চাষী-খাতক আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেন, যেখানে বাধ্যতামূলক ঋণনিষ্পত্তি ও মহাজনদের উপর কতগুলো শর্ত

৩৪ Bengal Tenancy Act of 1938 — Conference to Discuss amendment G.O.B., A-Progs., Revenue Department, Land Revenue, January 1939, Progs. No. 2188, 1

৩৫. Speech of Hon'ble Mukanda Behari Mullick, 31 March 1939, *Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 209, G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., R.I., Bundle No. 14, May 1946, Progs. Nos. 36-37, G.O.B., A-Prods., C.C.R.I., R.I., July 1942, Progs. No. 25, Appendix-A; G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., R.I., Bundle No. 14, May 1940, Progs. Nos. 36-37; G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., R.I., Bundle No. 6, July 1940, Progs. No. 12º

আরোপ ইত্যাদি বিষয় উত্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আইন পরিষদে নির্বাচিত কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যরাই ব্যক্তিগতভাবে এই আইনের বিভিন্ন সংশোধনীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে মির্জা আবদুল গোলাম হাফিজের প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ইতিপূর্বে দীউয়ানি আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ভূমিবিক্রয় বন্ধ, বন্ধকিজমি পুনরুদ্ধার ও ব্যাঙ্কঋণকে চাষী-খাতক আইনে নিষ্পত্তি করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাবে এসব সংশোধনী গৃহীত হয় নি। তবে 'খাতক' শব্দের সংজ্ঞা এবং 'খাতক' হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবিসমূহ তৎকালীন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা ও চাহিদা সম্পর্কে আলোকপাত করে। বন্ধকিজমি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে চাষী, মহাজন ও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবেই মহাজনশ্রেণী ছিল এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার সূচনা হতেই করপ্রদান ও করকে ঋণ হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে চাষী-খাতক করপ্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। বাকেরগঞ্জ ভূস্বামী সভা চাষী-খাতক কর্তৃক করপ্রদান স্থগিতকরণের পর পরই এ বিষয়ে সরকারি তদন্ত হয় এবং জেলা কালেক্টরদের বিবরণীতে চাষী-খাতকদের করপ্রদানে অনীহার কথা বলা হয়। এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন যে, কর পরিশোধ করা না হলে ঋণসালিশী বোর্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদন গ্রাহ্য হবে না। করপ্রদানে অনিচ্ছার ব্যাপারে তৎকালীন কমিউনিস্টদের সাথে যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে বাকেরগঞ্জ ভূস্বামী সভা।[৩৬] জমিদারি ব্যবস্থার অবসান, চাষীকে জমির মালিকানা প্রদান, জমিদারদের উৎখাত ইত্যাদি কমিউনিস্টদের বক্তব্যের সাথে রাজস্ব প্রদানে কৃষকের অনীহার যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করা হয়। করপ্রদান না করার প্রবণতা এত মারাত্মক পর্যায়ে গিয়েছিল যে, বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের নিয়মিত করপ্রদানের আহ্বান জানান।[৩৭] (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য, করপ্রদান না করার বিষয়টি বাংলার একক ঘটনা নয়, অথবা একে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের প্রয়োগের প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করাও সমীচীন নয়। এই সমস্যাটি ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কের সাথে জড়িত একটি বিষয়। ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন এবং বিশেষভাবে ১৯২১ সালে বারদৌলীতে প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর 'করপ্রদান না করার' সিদ্ধান্তের প্রভাব লক্ষণীয়। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীর 'ডান্ডি সল্ট মার্চ' ও ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকার কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত করপ্রদান না করার আন্দোলনে পরিণত হয়। চম্পারণ, সরণ, পাটনা, মুঙ্গের, সাহাবাদ ও বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে চৌকিদারি ট্যাক্স প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলায় চৌকিদারি ট্যাক্স না

৩৬. Memorial of the Bakerganj Landholders' Association, 25 May 1939, G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., R.I. ,Bundle-I, September 1940, Progs No. 541.

৩৭. Collector of Tippera to Secretary to the Board of Revenue, 16 June, 1939, G. O. B., B-Prods., C. C. R. I., R. I., Bundle-I, July 1940, Progs Nos 12-13

দেয়ার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ভূমিকর প্রদান না করার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন বাংলায় কৃষকদের মধ্যে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব গড়ে তোলে। একই সাথে কৃষক সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা কৃষকদের সচেতন করে তোলে। ১৯৩০-এর দশক হতে বাংলায় কৃষকদের জমিদারবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় এই মনোভাব ক্রমশ জমিদার ও মহাজনবিরোধী কার্যকলাপের বিস্তার ঘটায়।[৩৮] এক্ষেত্রে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের প্রবর্তন কেবলমাত্র একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু করপ্রদান না করার মনোভাব ও সিদ্ধান্ত চাষী-খাতক আইনের কার্যকারিতা ও কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির যোগানের বিরুদ্ধে কাজ করে।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার সময় উল্লেখযোগ্য ঋণসংঙ্কোচন লক্ষণীয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, কৃষক সম্প্রদায় কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণসংগ্রহে ব্যর্থ হয়। সরকারিভাবে মনে করা হয় যে, ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার ফলেই এই ঋণসঙ্কোচনসঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে। ১৯৩৭ সালে দিনাজপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার ফ্রাঙ্ক ওয়েন বেল সরকারি নির্দেশে ঋণসঙ্কোচন সম্পর্কে একটি জরিপকাজ পরিচালনা করেন।[৩৯] এ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রেরিত একটি প্রশ্নমালা প্রচারের মাধ্যমে ঋণসংঙ্কোচন সম্পর্কে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেন তাতে দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক জেলা প্রশাসক একে অর্থনৈতিক মন্দাজনিত সাময়িক বিষয় বলে মনে করেন। তবে ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের ফলে ঋণসংঙ্কোচনের বিষয়টি মহাজনদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট কি-না এবিষয়ে অভিন্ন মতামত পাওয়া যায় নি। যাইহোক, ঋণসঙ্কোচনজনিত অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিরসন করার জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণভার লাঘবের প্রয়াস গ্রহণ করা হলেও কৃষকদের নতুন করে ঋণিতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কৃষিবাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের বিকল্প কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক মন্দার সময় প্রলম্বিত অর্থনৈতিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে কৃষকরা জীবিকানির্বাহ ও কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য ভূমিবিক্রয়ে বাধ্য হয়। তৎকালীন ভূমিবিক্রয়ের পরিসংখ্যান হতে এ তথ্য সহজেই অনুমেয়।

ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের পর হতেই ভূস্বামী, মহাজন ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, যা এই বোর্ডের সঠিক কর্মতৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে সরকারি প্রশাসন বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে একদিকে গ্রাম পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে

৩৮. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Shirin Mehta, *The Peasantry and Nationalism: A Study of the Bardoli Satyagraha*, (New Delhi 1984); D.N. Dhanagare, *Peasant Movements in India, 1920-1950*, (Delhi 1983), 94-95, 105-106 and 199-25; Sunil Sen, *Peasant Movements in India: Mid-Nineteenth and Twentieth Centuries*, (Calcutta 1982), 42-52.

৩৯. Frank Owen Bell, Additional Papers Correspondence with Debt Settlement and Rural Credit India Office Library MSS. Eur. D 733, Sl No 26.

ঋণসালিশী বোর্ডকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে, অন্যদিকে ভূস্বামী, মহাজন ও খাতকের সনাতন সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রেখে কৃষির উৎপাদন ও উন্নতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তৎপর হয়। কেননা কৃষির ক্ষেত্রে মহাজনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ব্যতীত বাংলা সরকারের পক্ষে পৃথকভাবে অর্থ যোগানো সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। একদিকে ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ কর্মচারীদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সভা আহ্বান করে বক্তৃতার মাধ্যমে ঋণসালিশী বোর্ডের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে তোলার প্রয়াস ছিল উল্লেখযোগ্য। যাদুলণ্ঠনের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন ছিল গণসচেতনতা কর্মসূচির একটি বাস্তব পদ্ধতি। এসব চিত্রে ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মকাণ্ড এবং মহাজন ও খাতকের সুসম্পর্কের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ অফিসার, পাটচাষ সীমাবদ্ধকরণের জন্য নিয়োজিত অফিসার ও স্বাস্থ্য অফিসার প্রমুখকে এই গণজাগরণমূলক কাজে নিয়োগ করা হয়। বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা *বাংলার কথার* প্রতিটি সংখ্যায় ঋণসালিশী বোর্ডের তৎপরতার তথ্য বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করা হয়। ফরিদপুর জেলার 'ঝাসি' নামক ঋণসালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান *খাতক* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঋণসালিশী বোর্ডের তথ্যাদি প্রচারের মাধ্যমে জনসমর্থন সংগ্রহ করা।[৪০] এ ছাড়া জনগণের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টির জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এর মধ্যে 'মাটির মায়া' চলচ্চিত্র উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন লাভ করে।[৪১]

অর্থনৈতিক মন্দার ফল হিসেবে রায়তিজমি মহাজন ও অকৃষিজীবীদের কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং এর ফলে বর্গাচাষী ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসময় প্রণীত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট বিবরণীতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এবিষয়ে সাধারণ ধারণা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কানুনগোদের বিবরণীতে অর্থনৈতিক মন্দার পর হতে লক্ষণীয়ভাবে ভূমিহস্তান্তরের উল্লেখ রয়েছে। নিবিড় পাটচাষের জেলাগুলোতে ভূমিহস্তান্তরের হারও অনেক বেশি ছিল এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময় পাটের মূল্যই সবচেয়ে বেশি কমে যায়। যাইহোক, পরের পৃষ্ঠার সারণি ৫ হতে ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে রায়তি ভূমি হস্তান্তরের পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

৪০. *Tour Diary* of Khan Sahib Md Raziuddin Ali, Deputy Director, D.C., E.C, G.O.B., B-Prods., C.C.R.I., R.I Bundle-8, May 1942, Progs Nos 311-12

৪১. Following films were produced by the Publicity Department, Government of Bengal.

১. *করিমের কেরামতি*—প্রভাষ চাঁদ পাঠক, মহকুমা কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও।

২. *ঋণমুক্তি*—কেদারনাথ চ্যাটার্জী, স্পেশাল অফিসার, জেলা কর্মকর্তা, পাবনা।

৩. *মাটির মায়া*— খান সাহিব এম. আর. আলী, উপ-পরিচালক, জেলা কর্মকর্তা, পাবনা।

৪. *ফাতেমার বাজুবন্ধ।*

Assistant Secretary, C.C.R.I., to Collector of Dinajpur, 8 November 1941, G.O.B., B-Prods, C.C.R.I., R.I, Bundle -10 July 1943, Progs Nos 196-97.

সারণি ৫ : রায়তি ভূমি হস্তান্তর, ১৯২৮-১৯৪০

জেলার নাম	জরিপকৃত অংশ	বিগত ১২ বছরে হস্তান্তরকৃত জমি		হস্তান্তরকৃত জমি চাষাবাদের প্রকৃতি			
		অংশ	%	স্বত্বহীন ক্রেতা কর্তৃক চাষ	বর্গাদার কর্তৃক চাষ	শ্রমিক দ্বারা চাষ	রায়ত দ্বারা চাষ
বাকেরগঞ্জ	১,৭৫২.৬৬	৯৯.৯৭	৫.৭	৫৬.০৯	৪৩.৮৮	-	-
বাঁকুড়া	৫,৪৭৯.৮৬	৩৬৮.০৫	৬.৭	৪৮.৪৭	৭৭.০৬	৩৬.৯৯	২০৫.৩৩
বীরভূম	৩,৩৭৫.৫৮	২২৬.৩৪	৬.৭	৪৬.৩২	৯২.৮২	৮৭.২০	-
বগুড়া	১,৯৮৪.৪৫	৫৯.২৩	৩	২৮.৩৭	১৮.৬০	০.৫০	১১.৭৬
বর্ধমান	৪,৭৫৯ ১৫	১৮৫.৮৩	৩.৮	৮২.৩২	৩৫.৩৬	৩৮.১৫	-
চট্টগ্রাম	১,৬৯৩.৪৫	১৬৪.৯০	৯.৭	৭৯.৯৭	২০.৫০	৫.৪২	৫৯.০১
ঢাকা	১,০৮২.২৭	৫৩.৪৬	৪.৯	২৩.৩১	২২.৮৬	৫.৯৯	১.৩০
দিনাজপুর	৬,৫১২.২২	২৫০.৮৪	৩.৮	১৪৭.৩১	৮৭.২৩	১৬.১৩	.১৭
ফরিদপুর	১,৭৯৬.৫৪	১২০.১৯	৬.৬	৯০.৭৯	২৪.৫৩	-	৪.৮৭
হুগলী	২,২২৮.০৯	৬০.৮৩	২.৭	২৯.৯৩	২৫.৭২	৫.১৮	-
হাওড়া	১,১৮৬.৩০	২৪.২৯	২.০২	৭.২৯	১৬.৮০	০.২০	-
জলপাইগুড়ি	৪,৬৪৫.০৬	৪৩৯.৯৬	৯.৪	৬৬.০৬	১৮৫.৫৯	১৪.৯৩	১৭৩.৩৮
যশোর	৫,১৩৩.৭৫	৪৩১.০৫	৮.৩	১০২.১৪	১৩৬.৩৫	১৩.৩২	১৭৯.২৪
খুলনা	১,৭০১.৬৮	৭২.৬৩	৪.২	৩১.৫৬	৪১.০৭	-	-
মালদহ	১,১০৭.৯৩	৭৭.০২	৬.৯	৪৮.৫১	১৭.৯৫	-	১০.৫৬
মেদিনীপুর	৪,৬৯৩.৬৪	৩৪৯.৬৪	৭.৪	১২০.০৩	১৭৫.৮১	৩৯.১৪	১৪.০৬
মুর্শিদাবাদ	৫,০৭০.৬২	৬৩৮.৭৪	১২.৫	১২৭.৯৫	১৫২.৬৫	১.০০	৩৫৭.১৪
ময়মনসিংহ	৩,৫৯৭.৫৫	২০১.৯৩	৫.৫	৮৮.৭৮	১০৫.৩৩	-	৭.৮২
নদীয়া	৪,০০৮.৫৭	৮৭৭.৫০	২১.৮	৫৭০.২৪	১৭২.০০	২৭.৬০	১০৭.৬৬
নোয়াখালী	১,২০৮.৪৩	৬৫.৭৪	৫.৫	৬৩.৪২	২.০৬	০.২৬	-
পাবনা	১,৬৭৩.২৮	৬৫.৭৬	৩.৮	৫১.২৩	১৪.৫৩	-	-
রাজশাহী	৫,৬১৭.৮৪	১৯৬.৭৮	৩.৫	৬৮.৬২	৩৭.৮৫	-	৯৯.৩১
রংপুর	৭,৯৬৪.৩০	৩৮০.৬০	৪.৭	৮০.৬০	১৪৪.৯২	১০.৭৩	১৪৪.৩৫
ত্রিপুরা	২,১১২.৯১	৯৯.৩৯	৪.২	৫৯.৬৫	১০.৪১	১৩.৬১	১৫.৭২
২৪-পরগনা	৫,০৮৩.৪২	৪১২.৬৮	৮.১	১৩৩.১৫	১৯০.৪১	২৫.০৫	৬৪.০৭
মোট	৮৫,৪৭০.০৪	৫,৯২৩,৩৫	৬.৯	২,২৫২.১১ অথবা হস্তান্তরিত ভূমির ৩৮%	১,৮৮২.২৯ অথবা হস্তান্তরিত ভূমির ৩১.৭%	৮৪১.৪০ অথবা হস্তান্তরিত ভূমির ৫.৭%	১,৪৪৭.৫৫ অথবা হস্তান্তরিত ভূমির ২৪.৬%

উৎস : *Report of the Land Revenue Commission*, Bengal. (Alipore Bengal Government Press 1940), Vol II, 120-21

উক্ত সারণিতে লক্ষ্য করা যায় যে, জরিপকৃত ভূমির ৭% হস্তান্তরিত হয়েছে ১৯২৮-১৯৪০ সালের মধ্যে। এর মধ্যে ৩৮% ক্রেতা নিজেরাই চাষ করে এবং ৩১.৭% বর্গাচাষ, ৫.৭% শ্রমিক দ্বারা এবং ২৪.৬% স্বত্বহীন রায়ত দ্বারা চাষ করা হয়। অন্যদিকে হস্তান্তরিত ভূমির ৫৩.৩% অকৃষিজীবীদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। ভূমিহস্তান্তরের এই প্রবণতা রোধে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হলেও কিছু বাস্তব বাধা ছিল। প্রথমত, ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন দখলি রায়তকে ভূমিঅধিকারের ক্ষমতা প্রদান করে এবং এই আইন পাশ ছিল প্রলম্বিত আন্দোলনের ফল। এ ছাড়া ভূমিহস্তান্তরের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে ভূমির মূল্য হ্রাস পেতো, যা ঋণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়।[৪২] শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় কৃষিজমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স পাশের মাধ্যমে অকৃষি-জীবীদের কাছে ভূমিহস্তান্তর রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

একদিকে অর্থনৈতিক মন্দা এবং অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় বাংলা পতিত হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে, যা মনুষ্যসৃষ্ট বলে গণ্য হয়। এসময় ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে বিঘ্নিত হয়, কেননা চাষী-খাতকের পক্ষে কোন নগদ অর্থ বা কিস্তি প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়ে। একই সাথে ঋণসংঙ্কোচনও উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বড় চাষীকে সাহায্য করেছে, কেননা ক্ষুদ্র চাষী গুণগতভাবেই বাজারজাত করার জন্য কম উৎপাদন করতে পারে। দুর্ভিক্ষের হাত হতে বাঁচার জন্য শেষ সম্বল হিসেবে মানুষ অতি কম মূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[৪৩] নিচের সারণি হতে বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

সারণি ৬ হতে দুর্ভিক্ষকালীন ভূমিহস্তান্তরের ধারণা পাওয়া যায়। যদিও ব্যক্তিপর্যায়ে ভূমি অধিকার ও হস্তান্তরের কোন তথ্য নেই এবং এসম্পর্কিত কোন তথ্য পাবার সম্ভাবনাও নেই, সেজন্য ভূমিহস্তান্তর সম্পর্কিত পরিসাংখ্যিক তথ্য সতর্কতার সাথে ব্যবহারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে উপরোক্ত সারণি থেকে ১৯৩১ হতে ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালের ভূমিহস্তান্তরের পরিসাংখ্যিক তথ্য নিঃসন্দেহে ব্যাপকতার দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী ৬৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে দুর্ভিক্ষের সময় ২.৬ লক্ষ পরিবার তাদের সমুদয় ভূমি হারায় এবং ৯.২ লক্ষ পরিবার

৪২. *Memorandum of the Revenue Department*, 6 June 1940, (Alipore 1940), 4

৪৩. Collector of Tippera to Secretary, C C.R.I, 22 June 1942, G.O B., B-Prods., C C.R.I., C.S., Bundle -10, July 1942, Progs No 464.

তাদের আংশিক ভূমি হারায়।[৪৪] এর ফলে ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় কৃষিজমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স পাশের মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন করা হয় যে, ১৯৪৩ সালে সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা মূল্যের ভূমিহস্তান্তরকারী এই অর্ডিন্যান্স পাশের ২ বছরের মধ্যে সুদসহ ক্রয়মূল্য প্রদান করে হস্তান্তরিত ভূমি ফেরত পাবে; ভূমি হস্তান্তরকারী নগদ অর্থের মাধ্যমে ভূমি প্রত্যর্পণ নিশ্চিত না করতে পারলেও ১০ বছর পর এই ভূমির জন্য কোন প্রকার অর্থ প্রদান ছাড়াই ভূমির মালিকানা ফিরে পাবে।[৪৫]

সারণি ৬ : বাংলার ভূমি হস্তান্তর, ১৯৩১-১৯৪৩

বছর	রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের সংখ্যা (১,০০,০০০)			প্রতি দলিলে গড় মূল্য (টাকায়)		
	বিক্রয়	ইজারা	বন্ধক	বিক্রয়	ইজারা	বন্ধক
১৯৩১	২.২১	১.৭২	৩.৭৬	২৫০	৬২.৯	১৭৩
১৯৩২	২.৪১	১.৭৫	৩.৩৮	২১৭	৩৬.৫	১৬২
১৯৩৩	২.৫৫	১.৭৮	৩.১৩	২০৮	৩২.০	১৫৮
১৯৩৪	৩.০১	২.১৪	৩.৪৯	১৮৩	৩২.০	১২৯
১৯৩৫	৩.২৪	২.৪৬	৩.৫৭	১৮১	৫৪.৭	১৪১
১৯৩৬	৩.৪১	২.৭১	৩.৫২	১৭৯	৩৮.৩	১৩৭
১৯৩৭	৩.৩৪	২.৯৯	৩.০২	১৮২	৩৩.৪	১৩৩
১৯৩৮	৪.১২	২.৯৬	১.৬৪	১৭৮	৩৯.৭	১৭৫
১৯৩৯	৬.৫৪	৩.০৬	১.৫৪	১৬৩	৩৫.০	১৪০
১৯৪০	৬.৪৬	৩.৩০	১.৬০	১৮৫	৩৮.৪	১২৫
১৯৪১	৭.৯৪	৩.৪৯	১.৫১	১৫৮	৪২.৩	১২০
১৯৪২	৯.১৬	৩.৪৫	১.০৬	১৭২	৪৭.৬	১১০
১৯৪৩	১৬.৯৮	৫.৬৮	১.৮৩	১৮৭	৫১.৪	১০৬

উৎস : Karunamoy Mukherji. *The Problems of Land Transfer: A Study of the Problems of Land Alienation in Bengal,* (Calcutta Visva-Bharati 1957), 117

৪৪. Binay Bhusan, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1885-1947", *Indian Historical Review*, II· 1 (1975), 139

৪৫. Assistant Secretary,C.C.R.I , to Officer-in-Charge, Reserve Bank of India, Bombay, 4 December 1944 G O B., B-Progs., C.C.R I., R.I , Bundle-11, November 1944, Progs. Nos 456-57.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে প্রদেশব্যাপী যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয়। বাংলার যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন কমিটি ঋণিতার বিষয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করে। এই কমিটি ঋণিতার বিষয়টিকে প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর এই দু'ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। প্রতিষেধক হিসেবে সমবায় আন্দোলন ও আরোগ্যকর হিসেবে ১৯৪০ সালে প্রবর্তিত বঙ্গীয় মহাজনি আইন প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন প্রচলিত ছিল বিধায় বঙ্গীয় মহাজনি আইনের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার অদ্যাবধি হয় নি। সুতরাং আশা প্রকাশ করা হয় যে, ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতা বন্ধ হলে জনসাধারণ বঙ্গীয় মহাজনি আইনের আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করবে। অবশ্য এসময় খাতকদের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে বলে মনে করা হয়; বিশেষত ঋণের সরবরাহ সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হয়। এপর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের পক্ষে মতামত লক্ষ্য করা গেলেও তা কার্যকরী করা হয় নি। বাংলার চাষী-খাতকের ভবিষ্যৎ ঋণের বিষয়টি অর্থবিভাগ গ্রহণ করে। এই বিভাগ ঋণসমস্যা সমাধানে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিবন্ধকি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় চাষী-খাতকের দুর্দশার সময় কৃষিঋণ প্রদানের বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে এ বিষয়ে ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশ ছিল সমবায় আন্দোলন জোরদার করার। উল্লেখ্য, বাংলার মহাজনদের ঋণব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি কোনভাবেই আর গুরুত্ব লাভ করে নি। কেবলমাত্র তৎকালীন ঋণ ও সমবায় বিভাগের সচিব ই. ডব্লিউ. হল্যান্ড মহাজনি পুঁজিকে সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবহারের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে হল্যান্ডের উত্থাপিত বিষয়টি ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা; কিন্তু সঙ্গতকারণেই তা সফল হয় নি।[৪৬] কেননা ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতায় ভীত মহাজনশ্রেণী গ্রামীণ বাজার থেকে তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ঋণনীতি এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একদিকে ঋণ সম্পর্কে গণচেতনা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে কৃষকের আয়বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। কৃষকের আয়বৃদ্ধির জন্য অর্থকরী ফসল নির্বাচন, চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ, উন্নততর কৃষিযন্ত্রপাতি ও সারের ব্যবহার, বাজারব্যবস্থা ও গুদামজাত করার সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের

৪৬. G.O.B., B-Prods., C C R I., C. S., Bundle-11, December 1942, Progs. Nos. 217.

উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৪৭] কিন্তু রাউল্যান্ড কমিটির বিবরণীতে মহাজনশ্রেণীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং কোন কোন স্থানে মহাজনদেরকেও আগের মতো খাতকের ঋণের বিষয়ে উৎসাহী হতে দেখা যায়।[৪৮]

১৯৩৬ সালে ঋণসালিশী বোর্ড পাঁচ বছরের জন্য গঠন করা হয় এবং ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কার্যকাল আরো দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার জন্য প্রলম্বিত অর্থনৈতিক দুর্দশা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সর্বোপরি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলার চাষী-খাতককে অধিকাংশ ভূমি বন্ধক বা হস্তান্তর করতে বাধ্য করে। ফলে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যকাল আরো দুই বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯৪০ সালের আগে সম্পাদিত ঋণচুক্তি এই আইনের অধীনে আনা হয়। সবশেষে ১৯৪৪-৪৫ সালে বঙ্গীয় প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি বা রাউল্যান্ড কমিটির সুপারিশক্রমে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এসময়ে কর্মরত ঋণসালিশী বোর্ডের বিশেষ অফিসারদের দ্রুত ঋণমোকদ্দমার বিষয় নিষ্পত্তি করে বোর্ডের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একই সময়ে কলকাতা পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কার্যক্রমের ফলাফল অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৪৯] উল্লেখ্য, ভবিষ্যৎ ঋণের বিষয়টি এই কমিটির তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করে গৃহীত হবে বলে আশা পোষণ করা হয়।

১৯৩৬ সাল হতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাংলার ১৬টি জেলায় ঋণসালিশী বোর্ডের অব্যাহত কর্মতৎপরতা ছিল এবং ১৯৪৫ সালে রাউল্যান্ড কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ঋণসালিশী বোর্ড বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাংলার ঋণসালিশী বোর্ডে ৩৩,৯৪,৬১৪টি ঋণনিষ্পত্তির আবেদন জমা পড়ে, যার ৫৫.২% খাতক এবং ৪৪.৮% মহাজন কর্তৃক জমা দেয়া হয়। এই সব আবেদনপত্রের মধ্যে ২৮,৮৩,৬০৮টি আবেদনপত্র খারিজ ও স্থানান্তর করা হয়; ঋণসালিশী বোর্ডের কাছে পেশকৃত আবেদনপত্রে মোট ৭৮,৪০,২৬,৪৫৬ টাকার ঋণনিষ্পত্তির দাবি উত্থাপিত হয় এবং ঋণসালিশী বোর্ড কর্তৃক মোট ৩২,১৭,১৯,১৩২ টাকা ঋণ দাবিযোগ্য বলে স্বীকৃত হয় এবং ১৮,৬৫,৬৪,১৭৩ টাকার ঋণের অনুকূলে রোয়েদাদ প্রদান করা হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, নিষ্পত্তির জন্য দাবিকৃত মোট অর্থের ৫৮.৯% দাবিযোগ্য ঋণ হিসেবে গৃহীত হয় এবং দাবিযোগ্য ঋণের

৪৭. G.O.B., B-Prods, C.C.R.I., C.X Bundle-8, June 1942, Progs. Nos. 673-74

৪৮. Government of Bengal, *Report of the Bengal Administration Enquiry Committee*, 1944-45, (*Rowlands Committee Report*, NIPA reprint series), (Alipore 1945), 74.

৪৯. G.O.B., B-Prods., Agriculture, Co-operative Credit and Rural Indebtedness Department Credit Branch, Bundle-1, October 1951, Progs. No. 23

৭৬.২%-এর অনুকূলে রোয়েদাদ প্রদান করা হয়।[৫০] ঋণসালিশী বোর্ড খুব সচেতনভাবে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের দেউলিয়া ঘোষণার শর্ত ব্যবহার করে নি। এখন প্রশ্ন উঠে বাংলার মোট ঋণ কত ছিল? ১৯২৮ সালে গঠিত বাংলার প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি বাংলার মোট গ্রামীণ ঋণ ১০০ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করে।[৫১] এই মোট ঋণের হিসাবের মধ্যে আসল ও সুদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলার অর্থনৈতিক তদন্ত কমিটি আসল হতে সুদ বাদ দিয়ে মোট ঋণ ধার্য করে।[৫২] বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন পাশ হওয়ার সময় সরকারপক্ষ হতে ধারণা করা হয়েছিল যে, মোট ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ঋণসালিশী বোর্ডে পেশকৃত আবেদনপত্রে দেখা যায় যে, মোট দাবিকৃত ঋণের পরিমাণ ৭৯ কোটি টাকা। ১৯৪০-এর দশকে দাবিকৃত ঋণ সম্পর্কে পরিচালিত কয়েকটি জরিপে এই ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি দেখা যায়।[৫৩] অবশ্য এসব জরিপে কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী উভয়েরই ঋণ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কোন কোন জরিপ দুর্ভিক্ষপরবর্তী পরিস্থিতিতে পরিচালিত হয়েছিল বলে এখানে অতিরিক্ত ঋণিতার আভাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য একই সাথে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিকে মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ঋণসালিশী বোর্ডের কা‸ক্রম সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত তথ্য অপ্রতুল। সমগ্র বাংলা সম্পর্কে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য পাওয়া গেলেও জেলাওয়ারি তথ্য ১৯৪২ সালের পর আর পাওয়া যায় না। ফলে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যক্রমের জেলাওয়ারি পরিসংখ্যানগত আলোচনার ক্ষেত্রে সময়সীমা অনিবার্যভাবে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সীমিত রাখতে আমরা বাধ্য। যাইহোক, ঋণশালিসী বোর্ডে পেশকৃত আবেদনপত্রে দাবিকৃত ঋণের পরিমাণ, স্থিরীকৃত ঋণের পরিমাণ ও রোয়েদাদপ্রদত্ত ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে বাংলার জেলাওয়ারি বিবরণ নিম্নরূপ :

৫০. *G.O B., B-Progs , C.C.R I., R.I.*, Bundle - 12, June, 1945, Progs No 173-75 ঋণসালিশী বোর্ড সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন শ্যামাপ্রসাদ দত্ত, "ঋণ শালিসী বোর্ড (১৯৩৬-৪৭): একটি সমীক্ষা", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৩-২৭।

৫১. *Bengal Provincial Banking Enquiry Committee Report, 1929-1930,* Calcutta 1930, Vol 1, 65.

৫২. *Preliminary Report of the Board of Economic Enquiry on Rural Indebtedness,* 1935, Supplement to the *Calcutta Gazette*, January - June, 1935, 108.

৫৩. H.S.M. Ishaque, *Agricultural Statistics by Plot to Plot Enumeration in Bengal,* 1944-45, (Alipore 1946), 55

সারণি ৭ : বাংলার ঋণসালিশী বোর্ডের কাছে আবেদনকৃত ঋণের দাবিকৃত, স্থিরীকৃত ও প্রদত্ত রোয়েদাদের বিবরণী

(১৯৪২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত)

জেলা	দাবিকৃত ঋণের অর্থের পরিমাণ (১০ লক্ষ)	স্থিরীকৃত ঋণের অর্থের পরিমাণ (হাজারে)	দাবিকৃত ঋণের % স্থিরীকৃত	প্রদত্ত রোয়েদাদ -এর পরিমাণ	দাবিকৃত ঋণের % রোয়েদাদ	স্থিরীকৃত ঋণের % রোয়েদাদ
বাকেরগঞ্জ	২১.১	১১৪.৮	৫৪.৩	৭৯.৯	৩৭.৪	৬৯.৬
বগুড়া	২১.৬	১৩৫.৮	৬২.৯	৫৮.০	২৬.৯	৪২.৮
চট্টগ্রাম	১৩.০	৫১.৪	৩৯.৫	৩৬.০	২৭.৭	৭০.০
ঢাকা	১৫.৩	৯৭.৪	৬৩.৭	৫৭.৪	৩৭.৮	৫৯.৩
ফরিদপুর	১৫.২	৬৪.৬	৪২.৫	৫৫.২	৩৬.৩	৮৫.৪
খুলনা	৮.৬	৪৫.৯	৫২.৯	৩৫.০	৪০.৪	৭৬.৩
ময়মনসিংহ	১০১.৬	৮৪৮.০	৮৩.৮	১৮২.২	১৭.৯	২১.৫
নোয়াখালী	১৫.৪	৯৫.০	৬১.৩	৫৪.৬	৩৫.৩	৫৭.৫
পাবনা	১৩.২	৮৯.৪	৬৭.৬	৬২.২	৪৭.০	৬৯.৫
রাজশাহী	১০.৯	৬০.৫	৫৫.৫	৪৬.৪	৪২.৬	৭৬.৭
ত্রিপুরা	২৮.৯	১৪৭.৬	৫১.০	৭৬.৩	২৬.৩	৫১.৬
বাকুঁড়া	৫.৪	৩৬.৫	৬৬.৫	৩০.৫	৫৫.৭	৮৩.৬
বীরভূম	৩.০	৩৭.৩	৭৩.৫	২৭.৭	৫৪.৬	৭৪.৪
বর্ধমান	৬.৩	৫০.৪	৭৯.০	৩৭.৯	৫৯.৪	৭৫.২
হুগলী	৩.৭	২৮.৩	৭৫.১	২৩.২	৬১.৭	৮২.১
হাওড়া	২.৫	১৮.৯	৭৫.৪	১৪.৪	৫৭.৮	৭৬.৬
যশোর	১৪.৫	১০২.২	৭০.৩	৪৬.৫	৩২.০	৪৫.৫
মালদহ	৫.৬	৪০.৭	৮০.২	২৭.৭	৫৪.৭	৬৮.২
মুর্শিদাবাদ	৬.৩	৪০.৩	৬৩.১	৩৫.০	৫৪.৮	৮৬.৮
মেদিনীপুর	১৫.৮	৭৯.৪	৫০.০	৬০.১	৩৭.৯	৭৫.৬
নদীয়া	২.৪	১৮.৮	৭৮.০	১৪.৮	৬১.৪	৭৮.৭
২৪-পরগনা	৬.৯	৫০.৬	৭৩.২	৩৯.৬	৫৭.৪	৭৮.৪
দিনাজপুর	১৫.৪	১০৬.১	৬৮.৭	৭১.৫	৪৬.৩	৬৭.৩
জলপাইগুড়ি	৩.৭	৩২.০	৮৫.৫	২৩.৯	৬৩.৯	৭৪.৭
রংপুর	১২.১	৮৮.০	৭২.৬	৬৮.১	৫৬.২	৭৭.৪
মোট	৩৭০.২	২৪৮০.৬	৬৬.৮	১২৬৫.৪	৩৩.৯৬	৫০.৮(

উৎস : G.O.B., B-Progs., C.C.R.I., R.I., Bundle-10, June 1943, Progs. No. 334-409.

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋণনিষ্পত্তির জন্য ঋণসালিশী বোর্ড দু'টি পর্যায়ে দাবিকৃত ঋণ হ্রাস করে খাতকের পরিশোধক্ষমতার সীমায় আনয়ন করে। এ দু'টি ধাপ হলো দাবিকৃত ঋণের পর ঋণ স্থিরকরণ এবং রোয়েদাদ প্রদান। উভয় ক্ষেত্রেই ঋণসালিশী বোর্ড ঋণের পরিমাণকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করে। যাইহোক, উপরোক্ত সারণি হতে লক্ষ্য করা যায় যে, ঋণসালিশী বোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাবিকৃত ঋণের মোট ৫১% হতে ৮০% ঋণ হিসেবে ধার্য করে এবং চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ঢাকা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার ক্ষেত্রে এই তথ্য প্রযোজ্য হয়। জেলাভিত্তিক দাবিকৃত ঋণ ধার্যকরণ ও এ বাবদ রোয়েদাদ প্রদানের পরিসংখ্যান আমাদের একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করে যে, নিবিড় পাটচাষের সাথে ঋণিতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ পাটচাষ যেসব অঞ্চলে বেশি, ঋণিতাও সেখানে বেশি। আর অর্থনৈতিক মন্দা পাটের মূল্যকে বেশি প্রভাবিত করেছে বলেই ঋণিতার বিষয়টি এ সময় সর্বাপেক্ষা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।[৫৪] অন্যদিকে নিবিড় পাটচাষের অঞ্চলসমূহে ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যকারিতাও ছিল অনেক বেশি। ঋণসালিশী বোর্ডের কাছে পেশকৃত খাতক ও মহাজনের আবেদনপত্রের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৩৬ সাল হতে ১৯৪১ সালের মধ্যে মহাজনরাই ঋণনিষ্পত্তি করার জন্য ৪৫% আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। বিপুল পরিমাণ আবেদনপত্র মহাজন কর্তৃক জমা দেবার একটি বিশেষ কারণ হলো, রাজস্বকে ঋণ হিসেবে বিবেচনা করার ফলশ্রুতিতে রাজস্বদাবি হিসেবে বহুসংখ্যক ভূস্বামী মহাজন দেওয়ানি মোকদ্দমার আশ্রয়গ্রহণ না করে ঋণসালিশী বোর্ডে আবেদনপত্র জমা দেয়।[৫৫] অন্যদিকে মহাজনরাও ঋণনিষ্পত্তিতে রাজি ছিলেন, কেননা ঋণনিষ্পত্তি ছিল মহাজনের স্বার্থের অনুকূলে—দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ঋণের সুদ হিসেবে আদায়কৃত অর্থ আসলের চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতা ছিল তাদের জন্য লাভজনক। এজন্যই অধিকাংশ মহাজন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঋণনিষ্পত্তির জন্য আবেদন করে।

ঋণসালিশী বোর্ডের কর্মতৎপরতার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ঋণসালিশী বোর্ডের কার্যকারিতা সম্পর্কে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার খুবই আশাবাদী ছিলেন। খাতকদের দীর্ঘদিনের ঋণ থেকে মুক্তিদান আপাতত সম্ভব হলেও এই বোর্ডের কর্মতৎপরতা কোন দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। এই আইনে মহাজন ও ভূস্বামীরাই তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হয়েছে—একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের সাহায্যে তাদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কিয়দংশ আদায় করা সম্ভব হয়েছে। বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন বাংলার কৃষকদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য প্রণীত হলেও এই আইনের ব্যবহার

৫৪. Deputy Director, D C Presidency Division to Joint Secretary, C.C.R I., G.O.B, B-Prods., C.C.R.I., R I., Bundle - October 1941, Progs. Nos 62-63.

৫৫. District officer of Pabna to Joint Secretary, C.C.R.I., 12 November 1940, G.O.B., B-Prods., C.C.R.I, R.I, Bundle-6, January 1941, Progs. No. 244.

ঋণসঙ্কোচনের জন্য কতকাংশে দায়ী ছিল। কেননা মহাজনরা ক্রমশ গ্রাম হতে তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে মূলত পুঁজির নিরাপত্তার কারণেই। উল্লেখ্য, ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মহাজন ও খাতকের মধ্যে ঋণনিষ্পত্তি করা হলেও খাতকের ভবিষ্যৎ ঋণের বিষয়টিকে কোনভাবেই গুরুত্ব দেয়া হয় নি। অন্যদিকে মহাজনের পুঁজির নিরাপত্তার অভাব হওয়ায় মহাজনও খাতককে ঋণপ্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ফলে খাতকের ভূমিবিক্রয় ব্যতীত অর্থসংগ্রহের অন্য কোন উপায় ছিল না। ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন দখলি কৃষকের ভূমিহস্তান্তরের সুযোগসহ বিভিন্ন সুবিধার সৃষ্টি করে। ফলে একদিকে কৃষক ভূমির অধিকার পেলেও ভূমিহস্তান্তরের ক্ষমতা তাকে নিঃস্ব করার প্রক্রিয়ার সূচনা করে। ফলে পূর্ববর্তী সময়ের জমিবন্ধকির প্রক্রিয়া ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায় এবং ভূমিবিক্রয়ের চাপ সৃষ্টি হয়। নিচের সারণি হতে ভূমিবন্ধক ও ভূমিবিক্রয়ের তুলনামূলক তথ্য পাওয়া যাবে।[৫৬]

সারণি : ৮ বাংলার ভূমিবিক্রয় ও বন্ধক, ১৯৩০-১৯৪২

বছর	বিক্রয়ের সংখ্যা (দলিল)	বন্ধকের সংখ্যা (দলিল)
১৯৩০	১,২৯,১৮৪	৫,১০,৯৭৪
১৯৩১	১,০৫,৭০১	৩,৭৬,৪২২
১৯৩২	১,১৪,৬১৯	৩,৩৮,৯৪৫
১৯৩৩	১,২০,৪৯২	৩,১৩,৪৩১
১৯৩৪	১,৪৭,৬১৯	৩,৪৯,৪০০
১৯৩৫	১,৬০,৩৪১	৩,৫৭,২৯৭
১৯৩৬	১,৭২,৯৫৬	৩,৫২,৪৬৯
১৯৩৭	১,৬৪,৮১৯	৩,০২,৫২৯
১৯৩৮	২,৬৪,৫৮৩	১,৬৪,৮৯৫
১৯৩৯	৫,০০,২২৪	১,৫৪,৭৮০
১৯৪০	৫,০২,৩৫৭	১,৬০,১৫২
১৯৪১	৬,৩৪,১১৩	১,৫১,৫৫৩
১৯৪২	৭,৪৯,৪৯৫	১,০৬,০৮৮

উৎস : *Report on the Administration of the Registration Department for the Years 1930-1940*

৫৬. Sugata Bose, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947,* (Cambridge 1986), 146-49.

উপরোক্ত সারণিতে লক্ষ্য করা যায় যে, বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন ও বঙ্গীয় মহাজনি আইনের প্রভাবে ভূমিবন্ধক হ্রাস পায় এবং ভূমিবিক্রয় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৯ সাল হতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে ভূমিহস্তান্তরে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়।[৫৭] ভূমিহস্তান্তরের ফলাফল গ্রামীণ সমাজে ছিল ভয়াবহ। বহুসংখ্যক কৃষক বর্গাদার বা ক্ষেতমজুরে পরিণত হয় এবং ধনী কৃষক বিত্তশালীতে পরিণত হয়। সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী না হওয়ার কারণে ভূমিহস্তান্তর রোধ করে কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল রাখার কোন উপায়ও ছিল না। মহাজনদের পুঁজিপ্রত্যাহার ও সুনির্দিষ্ট ঋণনীতির অভাবে কৃষক সম্প্রদায় ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কেননা কৃষকদের ব্যক্তিগত জীবনেও কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য ঋণ ছিল অপরিহার্য। বাংলার চাষী-খাতকদের ঋণিতা দূরীকরণের জন্য ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে চাষী-খাতককে সাময়িক সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু এই নীতি ও ব্যবস্থা চাষী-খাতকের ঋণসমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে নি। অধিকন্তু এ সময় বিভিন্ন ব্যবস্থাগ্রহণ ও আইনপ্রণয়ন শেষ পর্যন্ত কৃষকের জীবনে দুর্দশার সৃষ্টি করে এবং গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করে। ধনী কৃষক আরও বিত্তশালীতে উন্নীত হয় এবং মাঝারি কৃষক ভাগচাষী ও দিনমজুরে পরিণত হয়।

পরিশিষ্ট

বিজ্ঞপ্তিপত্র

বাঙলা দেশের অনেক স্থান এমন রহিয়াছে যেখানে এ বৎসর বন্যায় কোন ক্ষতি করে নাই কিম্বা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় নাই। সেই সকল অঞ্চলে বেশ ভাল ফসল জন্মিয়াছে এবং শস্যের দামও অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী। কিন্তু আমি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, ঐ সকল জায়গায়ও কৃষকগণ সরকার, জমিদার ও তালুকদারগণের ন্যায্য পাওনা খাজনা আদায় দিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন বছর কৃষকগণ বন্যায় খুব কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও সরকার, জমিদার ও তালুকদারগণের প্রাপ্য খাজনা শোধ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি বা ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আজ অন্যরূপ হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? অনেকে মনে করেন যে, সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ-সালিসী আইনের জন্যই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এই সব আইনের ফলে প্রজাগণ যে সুখ-সুবিধা পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। বাকী খাজনার সুদের হার ১২।।০ সাড়ে বার টাকার স্থলে কমাইয়া ৬। সোয়া ছয় টাকা করায় রায়তগণ ঠিক সময়ে তাঁহাদের দেয় খাজনা জমা দিতেছেন না। চৈত্র মাসের শেষ কিস্তিতে নূতন আইনে বিধিবদ্ধ অল্প সুদে খাজনা শোধ করিবেন বলিয়া কৃষকগণ অনেক স্থানে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

বাঙলা দেশের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী প্রজা-সাধারণের উপকার করার জন্য সকল সময়েই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরই সকলের আগে প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখিবার ও বৃদ্ধি করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। ভারতবর্ষে অন্য

৫৭. Binay Bhusan Chaudhuri, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1885-1947", *Indian Historical Review*, II· 1 (1975), 145

সকল প্রদেশের পূর্ব্বে বাঙলা দেশেই সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া আইন সভায় পাশ করিয়া তাহা প্রচলন করা হইয়াছে। এখন এই সুবিধা পাইয়া রায়তগণ যদি মনে করেন যে, খাজনা দিতে হইবে না, বা যখন ইচ্ছা তখন দিলেই হইবে, অথবা না দিলেও চিন্তার কারণ নাই, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় হইবে। সরকার প্রজা-সাধারণের হিতের জন্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে সকল রকম সাহায্য ও সহযোগ কামনা করেন। জমিদারগণ যদি ঠিক সময় রায়তগণের নিকট হইতে খাজনা না পান, তাহা হইলে তাঁহারা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় দিবেন কি করিয়া? যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হইলে সরকারের শাসন ব্যাপারে কি উপস্থিত হইবে? তাহার ফলে জনসাধারণের হিতজনক কার্য্যে আরও অগ্রসর হওয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। বাঙলা দেশে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া কেহই কামনা করেন না।

যদি সত্যই এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা হইলে সরকারকে বাধ্য হইয়া উহার প্রতিকারের জন্য নূতন আইন তৈরী করিতে হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী মনে করেন, এখন হইতেই রায়তগণ নিজেদের স্বার্থের কথা বুঝিয়া ন্যায় ও আইনসঙ্গতভাবে কাজ করিবেন যেন মন্ত্রিমণ্ডলীকেও বাধ্য হইয়া কোনরূপ অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না হয়।

সালিসী আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? যাহাতে বাঙলা দেশের দরিদ্র ও ঋণজর্জ্জরিত কৃষকগণ তাঁহাদের ঋণভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এবং প্রকৃত ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিবার সুযোগ পান সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইনের সুবিধা পাইয়া যদি কেহ জমিদার খাজনা অথবা মহাজনকে দেয় ঋণ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে তবে তাহা অত্যন্ত ... ও ক্ষতিকর হইবে। আমি আশা করি যে, কৃষকগণ এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া সেই অনুসারে কাজ করিবেন। যে সকল লোক খাজনা ও ঋণ শোধ করিতে নিষেধ করে, রায়তগণ যেন ঐসব আন্দোলনবাজ লোকের কথা না শোনে। নিজ নিজ দেয় খাজনা ও ঋণ যথাসাধ্য সময়মত পরিশোধ করিয়া বাঙলা দেশের কৃষকগণ সুখ-শান্তি ভোগ করুন এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা না দেখান ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। সকলেই যেন মনে রাখেন যে, পল্লী অঞ্চলের যাবতীয় মঙ্গল, বিশেষভাবে চাষী ভাইদের অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, বাঙলার জনসাধারণের রায়তগণের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

এ. কে. ফজলুল হক

বাঙলা দেশের প্রধান-মন্ত্রী।

১৬

সাতচল্লিশ-উত্তর সময়ে শিল্প এবং শিল্পসম্পর্ক

মমতাজ উদ্দিন আহমেদ*

১. ভূমিকা

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাকিস্তানের কৃষিজমি ছাড়া পরিচিত কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় ছিল না, ছিল না কোনো আধুনিক শিল্প, ব্যাংকিং কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থা। নগণ্য পরিমাণ প্রাথমিক স˙াদ নিয়ে পাকিস্তান যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তা খুবই কঠিন প্রমাণিত হয় দেশের দু'অংশ এক হাজার মাইল (কিংবা সমুদ্রপথে তিন হাজার মাইল) ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পৃথক সম্পদভিত্তি এবং পৃথক আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উক্ত দু'টি অংশ পাকিস্তানকে নানাবিধ তীব্র আঞ্চলিক উন্নয়নসমস্যার সম্মুখীন করে।

যদিও তৎকালীন পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চলের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দের অসমতা এবং আরো অনেক জটিল কারণে[১] এই দু'টি অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অসম হয়েছিল, বালাদেশের পক্ষে এই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রশ্নটি থেকে যায় সবচেয়ে দুঃসাধ্য। যদিও পাকিস্তানের শিল্পায়নসাফল্য, বিশেষত ষাটের দশকে তার শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির চোখে পড়ার মতো উচু হার (লিউইস, এস. আর. ১৯৭০, পাপানেক, পি.এফ. ১৯৬৮, আইবিআরডি, ১৯৭০) ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে, বাংলাদেশে শিল্পপ্রবৃদ্ধি পিছিয়ে ছিল এবং এখানকার অর্থনীতি থেকে যায় প্রধানত কৃষিভিত্তিক। সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার এবং

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আন্তঃআঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও গবেষক কর্তৃক নিবিড় অনুসন্ধানের বিষয় ছিল (দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজহার উদ্দিন, ১৯৭৫, এস. আর. লিউইস, ১৯৭০; জে. জে. স্টার্ন, ১৯৬৮; এ, সেনগুপ্ত, ১৯৭২; এ, রহমান, ১৯৬৩, এস. ইসলাম, ১৯৬৩)।

অব্যাহত দারিদ্র্যই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। দু'দশকের গোটা সময় ব্যাপী, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছিল মাত্র শতকরা বার্ষিক ০.৪% হারে, যা ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্ন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো রয়ে যায় পশ্চাৎপদ, এমনকি ১৯৬৪-৬৫ সালেও গড় জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ছিল প্রায় ৬০%। বিপরীত দিকে, পণ্যোৎপাদন ও নির্মাণসহ শিল্পখাতের অবদান ছিল জিডিপি-র মাত্র ১২%। শিল্পখাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদানও রয়ে যায় তাৎপর্যহীন, জিডিপি-র মাত্র ৭%। শিল্পে সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিত বিশেষ উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সুচিন্তিত প্রয়াস সত্ত্বেও মধ্য ষাটের দশকে বৃহৎ বেসরকারি শিল্পে মোট কর্মসংস্থানের এক-তৃতীয়াংশেরও কম এবং মোট উৎপাদনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ অর্জিত হয় বাংলাদেশে (আইবিআরডি, ১৯৭০)। এভাবেই শিল্পোন্নয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ পাকিস্তানের জন্য একটি অমীমাংসিত উন্নয়ন সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। পাঠক এবং অবহিত পর্যবেক্ষকদের সামনে এটা এই উভয়সঙ্কট হাজির করে যে, যদিও ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছরে পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক সরকারগুলো কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির একটি বড় লক্ষ্য ছিল দ্রুত শিল্পায়ন, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খুব সামন্যই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছিল কিংবা কোনো গতিশীল শিল্পপ্রবৃদ্ধি ঘটেছিল।

এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করা। একে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে রেখে চেষ্টা করা হয়েছে শিল্পায়নের জন্য অনুসৃত নীতি ও কৌশলের, প্রাপ্ত ফলাফলের এবং ১৯৪৭-৭১ সময়কালে বাংলাদেশে শিল্পায়নের ধারা পরিচালনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল, সেসবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করার।

এই অধ্যায়টি সংগঠিত করতে গিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশ-অর্থনীতির প্রধান বৈষিষ্ট্যগুলোর রূপরেখা দেয়া হযেছে দ্বিতীয় অংশে। পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক সরকারগুলো কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশল এবং সেসব বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সরকারি সহায়তা কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তৃতীয় অংশে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প-উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন এবং আয় বণ্টন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর এর অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে চতুর্থ অংশে। যেহেতু শিল্পপ্রবৃদ্ধির উপর শ্রম আইন এবং শিল্প-সম্পর্কেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে পঞ্চম অংশে। ১৯৪৭-৭১ সময়কালে গৃহীত শিল্পায়ন প্রয়াসের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে পরিস্ফুট প্রধান তথ্যগুলোর ভিত্তিতে শেষ অংশে প্রদান করা হয়েছে কিছু উপসংহারমূলক মন্তব্য।

২, দেশভাগের সময় বাংলাদেশ অর্থনীতির অবস্থা এবং শিল্পোন্নয়নের পক্ষে যুক্তি

পাকিস্তানের সঙ্গে পঁচিশ বছরের অংশীদারিত্ব শেষে ১৯৭১ সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতাকে দেখতে হবে এমন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়।

দেশভাগের সময় বাংলাদেশের ছিল প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল ভূমি এবং প্রায় ৪৩ মিলিয়ন অধিবাসী। প্রধানত গ্রামীণ এবং কৃষিজীবী একটি জনগোষ্ঠী নিয়ে এর ছিল দুর্বল পরিবহন, দুর্বল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সামান্য আধুনিক শিল্প। ১৯৬১ সালেও মোট জনসংখ্যার ৯৫% বাস করতো গ্রামে এবং শ্রমশক্তির ৮৬% নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। ১৯৪৯-৫০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ছিল ৬৫% এবং শিল্পের অবদান ছিল মাত্র ৩.৯%। মাথাপিছু উৎপাদন ছিল মাত্র ৩০৫.০০ টাকা; ১৯৪৭ সালের পর প্রথম দশকে তা স্থির থাকে কিংবা হ্রাস পায়। দারিদ্র্য এবং স্থবিরতার সকল প্রকার নিদর্শনকে ধারণ করে বাংলাদেশ অনেক বিদেশী কর্তৃক চিহ্নিত হয় অর্ধ-সংগঠিত জলাভূমির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে (পাপানেক, জি. এফ. ১৯৬৮-এ উদ্ধৃত)।

দেশভাগের সময় আধুনিক শিল্পখাতের মুষ্টিমেয় বৃহদায়তন শিল্প ইউনিট বাংলাদেশের ভাগে পড়েছিল। এর মধ্যে ছিল ২৫৮ টি তাঁত এবং ৯৯,০০০টি মাকু সহ ১০টি সুতার কল, মোট ৩৯,০০০ টন উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি চিনিকল, ১,০০,০০০ টন উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এবং বেশ কতগুলো জুট রোলিং প্রসেস (রকিবুদ্দিন, ১৯৭৬)। ঐতিহ্যবাহী উৎপাদক হিসেবে ১৯৫০-এর দশকে বিশ্বের মোট পাটের প্রায় ৭৫% উৎপাদন করা সত্ত্বেও বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে তদানীন্তন ভারতের ১১২টি পাটকলের একটিও স্থাপিত হয় নি। বাংলাদেশে মূল শিল্প কর্মকাণ্ড বলতে ছিল নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মুগল আমল থেকে যা গ্রামীণ শিল্প হিসেবে পরিচিত। জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের মোট অবদানের (৩.৯ ভাগ) সিংহভাগ আসতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে; তাতে বৃহদায়তন শিল্পের ভাগ ছিল ৫০%-এর সামান্য বেশি। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার মোট শিল্প কারখানাসমূহের মাত্র ১২% আসে বাংলাদেশের ভাগে।

এভাবেই উপকরণ প্রাপ্তি, প্রাথমিক সম্পদ-অবস্থা কিংবা প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনার বিচারে বাংলাদেশে ছিল মূলত একটি মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত ধান-পাট অর্থনীতি। শিল্প পটভূমি বলতে কার্যত সেখানে কিছুই ছিলনা। অবশ্য যদিও গোটা পঞ্চাশের দশকব্যাপী পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে পশ্চাৎপদ থেকে যায়, শিল্পের সম্ভাব্য বিকাশক্ষমতার বিচারে উভয় প্রদেশ প্রায় সমান পর্যায়ে ছিল। শিল্পের কাঁচামাল এবং খনিজ দ্রব্য প্রাপ্তির বিচারে দু'টিই ছিল দরিদ্র। দু'টি অংশই ছিল প্রায় সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান, আধুনিক শিল্প প্রায় ছিলই না এবং উৎপাদিত ভোগ্য পণ্য এবং

পুঁজিসামগ্রীর জন্য এরা নির্ভর করতো আমদানির উপর। পূর্ব অংশে কাঁচা পাট এবং পশ্চিম অংশে কাঁচা তুলা সংশ্লিষ্ট টেক্সটাইল শিল্পের দ্রুততর বিকাশে সহায়তা করে। এ দু'টি ব্যতীত অন্যান্য কৃষিসামগ্রীর প্রাপ্যতা এবং গ্যাস ও অন্যকিছু খনিজের সঞ্চয় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের অন্য কোনো অধিকতর সুবিধা প্রদান করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (FFYP) উল্লেখ করা হয়েছিল যে, "দু'টি অংশের মধ্যে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক সুবিধার মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পার্থক্য ছিল না।" (FFYP, ১৯৫৫)। আরো আগ্রহোদ্দীপকভাবে আইয়ুব আমলে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের অন্যতম স্থপতি মাহবুবুল হক কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমের উপর পূর্বকে বরং একটি অগ্রগামী অবস্থান প্রদান করেন এবং পাকিস্তানের পরিকল্পনাপ্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর ব্যাপক প্রশংসিত গ্রন্থে ঘোষণা করেন, "যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলে পূর্ব অংশ গোটা পাকিস্তানের শস্যভাণ্ডারে পরিণত হতে পারে"। (মাহবুব-উল হক, ১৯৬৩)

অবশ্য কৌতুকাবহ ব্যাপার এই যে পাকিস্তানের সাথে সিকি শতাব্দীর অর্থনৈতিক মেলবন্ধনের কালে কৃষি ও শিল্পে স্থবিরতার কারণে বাংলাদেশ দারিদ্র্য এবং অধঃপতনে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। নিম্ন মাথাপিছু আয় এবং উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রান্তিকালে যদিও কৃষি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবেই, কিন্তু সমগ্র শ্রমশক্তি ফলপ্রসূভাবে এবং ক্রমবর্ধমান প্রকৃত মজুরিতে কৃষিতে নিয়োজিত হতে পারে না। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব নয় যদি না শিল্প ও সেবা খাতের সম্প্রসারণভিত্তিক বিশাল কোন পেশাগত বণ্টনের পরিবর্তন ঘটে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্থানীয় মালিকানায় শিল্পায়নের কিছু অগ্রগতি হয়, টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি থেকে শিল্পে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে তা সহায়তা করে নি। বিপুল সরকারি সহায়তার আওতায় শিল্পায়নের যে অগ্রগতি ঘটে, তা দুষ্প্রাপ্য সম্পদের অপচয়পূর্ণ ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রতি সচেতন অবহেলার প্রতিফলন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নেই বাংলাদেশের ছিল প্রাথমিক তুলনামূলক সুবিধা।

পাকিস্তান আমলে অনুসৃত শিল্পায়ন নীতি এবং কৌশল

দেশভাগের দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক নৈরাজ্য এবং রাজনৈতিক গোলযোগের পটভূমিতে পাকিস্তান গ্রহণ করে পঞ্চাশের দশকের প্রথাগত উন্নয়ন কৌশল, জোর দেয় মাথাপিছু আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধির উপর, যা অর্জিত হবে দেশীয় বাজারনির্ভর শিল্পোন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে এবং যা সাধারণভাবে বেসরকারি উদ্যোগনির্ভর আমদানিবিকল্প শিল্পায়ন নামে (আইএসআই) পরিচিত। ১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে অধিকাংশ বৃহৎ অনুন্নত দেশ কর্তৃক এই উন্নয়ন কৌশলই অনুসৃত হয়, যা যথাযথ সক্রিয় সরকারি হস্তক্ষেপের সহায়তায় আমদানিবিকল্প শিল্পায়নের মাধ্যমে দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চেয়েছিল।[২]

২. বিবেচনাধীন সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্পায়ন-অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত লিটল প্রমুখ (১৯৭০) এবং বি ব্যালাসা প্রমুখ (১৯৭১) রচিত গ্রন্থ।

শিল্পায়ন সম্পর্কে প্রথম নীতি ঘোষণা

পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে শিল্পনীতি প্রণয়ন করে এবং নভেম্বরে একে আরো বিশদ করে। ঘোষণা থেকে বেরিয়ে আসা শিল্পায়ন এবং পরবর্তী দু'দশকে অনুসৃত শিল্পায়ন নীতির মূল দু'টি বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) শিল্পোন্নয়ন অর্জিত হবে বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে এবং (২) সক্রিয় অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই সরকার শিল্পায়নে অগ্রগতি সাধন করবে। প্রাথমিক বছরগুলোতে বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভর করার পাকিস্তানী অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়েছে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) বিধৃত সাধারণ নীতির মধ্যেও। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বেসরকারি উদ্যোগের প্রতি অর্থনৈতিক এবং শিল্পোন্নয়ন নীতির সাধারণ ধারাকে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করে, "শিল্পে ব্যক্তিমালিকানার প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন না হলে সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলা হচ্ছে একটি প্রতিশ্রুত জাতীয় নীতি।" যেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (SFYP, ১৯৬০-৬৫) প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকাকে আলাদা করে দিয়েছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতকে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল (পৃ. ২২৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (TFYP, ১৯৬৫-৭০) প্রথম দু'টি পরিকল্পনার তুলনায় অধিকতর পরিষ্কারভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের প্রাধান্যকে তুলে ধরেছিল।[৩]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরাসরি উৎপাদনমূলক বিনিয়োগকে বিকশিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব দেয়া হয় বেসরকারি খাতকে। সকল পরিকল্পনায়ই শিল্পোন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতের উপর মৌলিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। অবশ্য শিল্পোন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা সর্বাধিক পরিষ্কার স্বীকৃতি পায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বক্তব্যের মাধ্যমে যে, যে গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেসরকারি উদ্যোগ সর্বাধিক সঞ্চারিত হতে পারতো, সে হচ্ছে আধুনিক শিল্পখাত (TFYP পৃ. ১০৩)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিষ্কার বলা হয়েছিল, প্রকৃত অর্থে কোনো সরকারি শিল্পখাত থাকবে না এবং সরকার সরাসরি অংশ নেবে শুধু সেসব খাত ও উৎপাদনব্যবস্থায়, যেখানে বৃহৎ ঝুঁকি এবং কম মুনাফার কারণে বেসরকারি পুঁজি এগিয়ে আসবে না।

সরাসরি সরকারি অংশগ্রহণ কেবল সেসকল আধুনিক শিল্পকলকারখানায় সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হয়, যেগুলোতে রয়েছে উচ্চ মাত্রার কারিগরি জটিলতা, বৃহৎ পুঁজির প্রয়োজনীয়তা এবং তুলনামূলক নিম্ন মুনাফা এবং যেসব ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ অঞ্চলে

৩. আলোচ্য সময়ে বেসরকারি ও সরকারি খাতের উন্নয়নে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালা আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান (১৯৮০)।

শিল্পসুবিধাবলী ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি, শিল্পে সরকারি বিনিয়োগ হওয়া দরকার ছিল পরিপূরক এবং বেসরকারি বিনিয়োগের সঙ্গে প্রতিযোগিতাবর্জিত।

শিল্পায়নে বেসরকারি উদ্যোগ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীলতার যুক্তি ছিল এই যে, অনুসৃত শিল্পায়ন কৌশল শিল্প ও ব্যবসায়ে উদ্যোগী এবং উদ্যমী ব্যক্তিদেরকে আকর্ষণ করবে, শিল্পোদ্যোগ, প্রেরণা এবং নেতৃত্বকে আকর্ষণ করবে, প্রতিভা ও দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে। এটাও বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, বেসরকারি উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদান অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবস্থাপনার জন্ম দেবে, পুঁজির উৎপাদনশীল ব্যবহার এবং মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ ঘটাবে, এবং উদ্ভাবন ও নতুন প্রয়োগকে উৎসাহিত করবে। এমন বিশ্বাসে উৎসাহিত হয়ে সরকার প্রস্তুত ছিল শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বেসরকারি বিনিয়োগকারীদেরকে আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানে। সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে বেসরকারি খাতে শিল্পকারখানা স্থাপনে সাহায্য করার জন্য নিম্নে আলোচিত ব্যাপকধর্মী উন্নতিবর্ধক সহায়তা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ছিল প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন, শিল্পএস্টেট সুবিধা প্রদান, উন্নত ভৌত পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত ইকুয়িটি ক্যাপিটাল সরবরাহ, ইত্যাদি।

পাকিস্তানে শিল্পবিকাশে উৎসাহ প্রদানকারী প্রধান সরকারি নীতিসমূহ এবং সহায়ক সেবা

১৯৫৮ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আইয়ুব খানের সরকারপ্রধান থাকার পূর্বে পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাঠামোয় বহু পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও দু'দু'টি দশকব্যাপী পাকিস্তানের শিল্পায়ন নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তখন সরকারের একটি মৌল লক্ষ্য হিসেবে শিল্পায়ন অর্জিত হতে পারতো প্রাথমিকভাবে বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে (রেহমান সোবহান প্রমুখ, ১৯৮০)। তদনুযায়ী সরকার অনেকটা ধর্মীয়ভাবে নানা নীতি অনুসরণ করে এবং একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যার আওতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারতেন। অত্যন্ত উদার বেসরকারি শিল্পবিনিয়োগ নীতি এবং উচ্চমানের সংরক্ষণবাদ দ্রুত শিল্পায়ন অর্জনের জন্য প্রদত্ত সহায়তাসেবার ভিত্তি ছিল।

একটি নবজাত রাষ্ট্রের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের শিল্পকারখানা শুরু করার মতো পুঁজি না থাকায় সরকার তাদের সাহায্য করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানের পূর্বে এ্যাড হক ভিত্তিতে ঋণ সরবরাহ করতো (জি.এফ. পাপানেক, ১৯৬৭, পৃ. ৮৭)। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় এবং ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংস্থা হিসাবে স্থাপিত হয় পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (PIFCO)। PIFCO প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসমূহে ঋণ প্রদান করতো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠায় PIFCO কোনো অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নি, কারণ নতুন শিল্পকারখানা

প্রতিষ্ঠায় PIFCO-এর ঋণ প্রদানের ক্ষমতা ছিল না। PIFCO-কে ১৯৫৭ সালে রূপান্তরিত করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (আইডিবিপি)-এ এবং নতুন ও পুরনো উভয় প্রকার শিল্পকারখানায় ঋণ প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৫৭ সালে আরেকটি অর্থসংস্থা পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (পিআইসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন কিংবা প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানাসমূহ সম্প্রসারণে ইকুইটি পুঁজি সরবরাহ কিংবা ঋণ প্রদানের জন্য। পিআইসিআইসি-রও উন্নয়নমূলক সহায়তাসেবা প্রদানের কথা ছিল। আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি দুই-ই স্থানীয় এবং বৈদেশিক উভয় ধরনের মুদ্রায় ঋণ দিতে পারতো। ১৯৬৯-এর শেষ পর্যন্ত স্থানীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা মিলে আইডিবিপি ঋণ দিয়েছিল মোট ১৮০.৪ কোটি টাকা, যার ৪৮% অংশ পায় বাংলাদেশ। এই পরিমাণ অর্থ ২২৯টি উৎপাদক ইউনিটের নিকট ১৬২০টি ঋণের মাধ্যমে দেয়া হয়। অবশ্য ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫৮১টি প্রকল্পে পিআইসিআইসি'র বিনিয়োগকৃত মোট ঋণের (১৩৮৬.১৭ কোটি টাকা) মাত্র ২৭% অংশ পায় বাংলাদেশ। মিলিতভাবে ষাটের দশকে পাকিস্তানের দু'অংশে বিচিত্র ধরনের শিল্পপ্রকল্পে দু'টি সংস্থা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ-অর্থ প্রদান করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের দু'টি প্রদেশে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র, চিনি, ইস্পাত, কাগজ এবং বোর্ড, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, ঔষধ এবং খাদ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি তৈরির শিল্পকলকারখানা ইত্যাদি শিল্পকারখানা উল্লেখযোগ্য (আহমেদ রকিবউদ্দিন, ১৯৭৬)[৪]।

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পখাতে উন্নয়নের বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানে আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি যে ভূমিকা পালন করে, তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে আরো কতগুলো ক্ষুদ্রতর সংস্থা, যেমন ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফাণ্ড (EPF), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশান অব পাকিস্তান (আইসিপি) এবং পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশান (ইপসিক)। উদীয়মান ক্ষুদ্র বাঙালি বিনিয়োগকারীদেরকে ইকুইটি সমর্থন প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬০-এর দশকে ইপিএফ এবং আইসিপি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিনিয়োগকারীদের ব্যাংকঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে লিকুইডিটির সমস্যা ছিল। দু'টি সংস্থার মধ্যে উদীয়মান বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাদের ইকুইটি সমর্থন প্রদানে কমবেশি সফল ছিল আইসিপি, যা স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে ইকুইটিতে বিনিয়োগ করেছিল ৩.৯১ কোটি টাকা, যা ছিল পাকিস্তানের দু'অংশে মোট বিতরণকৃত টাকার ৬৭% (রেহমান সোবহানপ্রমুখ, ১৯৮০)। ইপসিক (বাংলাদেশে যার পুনঃনামকরণ

৪ তবুও জি. এফ. পাপানেক (১৯৬৭) জোর দিয়ে বলেছেন যে এই দু'টি সংস্থা তাদের কাঠামোগত এবং কর্মকাণ্ডগত অনমনীয় ভূমিকার কারণে পাকিস্তানের প্রাথমিক শিল্পায়ন প্রতিষ্ঠায় তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নি।

হয়েছে বিসিক) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের শিল্পোদ্যোগমূলক সমর্থন প্রদানের জন্য। অবশ্য নানা প্রকার পরিচালনাগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রতিষ্ঠান তার উন্নতিবর্ধক কাজে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে নি। তবুও তা প্রাক-স্বাধীনতা বাংলাদেশে ১০০৮টি প্রকল্পে অর্থ যোগান দেয়। তাঁত, বেত ও বাঁশের সামগ্রী, চামড়া এবং কাঠের দ্রব্য প্রস্তুতকারী ছোট ছোট বিচিত্র শিল্পকারখানা স্থাপনে এই সংস্থা ৫৭ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশান (পিআইডিসি), পরে যা দ্বিখণ্ডিত হয় এবং ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে পরিচিত হয়। শিল্পোন্নয়নে সহায়তাদান এবং বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে ইকুইটি অর্থ, ব্যবস্থাপনাগত সমর্থন ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় সক্ষম করে তোলার জন্যই ১৯৫০ সালে পিআইডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর যুক্তিসূত্র ছিল শিল্পোদ্যোগগত বিকল্পের পরিবর্তে শিল্পোদ্যোগগত সমর্থন প্রদান (রেহমান সোবহান প্রমুখ, ১৯৮৮)। এর সনদ অনুযায়ী যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ এগিয়ে আসছিল না, পিআইডিসি এবং পরবর্তীতে ইপিআইডিসি সেখানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে এবং তারপর ব্যক্তি-বিনিয়োগকারীরা দায়িত্বভার নিতে সক্ষম হলে তার ইকুইটিস্বার্থ এবং ব্যবস্থাপনাগত সমর্থন প্রত্যাহার করতে।

ইপিআইডিসি বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে শিল্পবিকাশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি সরকারি খাতেও যেখানে ব্যক্তিপুঁজি এগিয়ে আসছিল না, সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও দায়বদ্ধ ছিল। কর্ণফুলী কাগজের কল হচ্ছে একটি প্রধান বৃহদায়তন শিল্প, যা প্রথম ইপিআইডিসি-র মালিকানায় সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরে বেসরকারি খাতে বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৬৯-৭০ সালে আধুনিক শিল্প খাতে মোট স্থায়ী সম্পদের প্রায় ৩৬% সরকারি মালিকানাভুক্ত ছিল।

ইপিআইডিসি একটি মোক্ষম ভূমিকা পালন করে পূর্ব পাকিস্তানে, যেখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগ ছিল মারাত্মকভাবে কম। প্রকৃতপক্ষে, শুধু আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নয়, বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের বিকাশেও ইপিআইডিসি ষাটের দশকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রেহমান সোবহান প্রমুখকে উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে, "বাঙালি পাতি বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে বৃহৎ শিল্পপতি এবং বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টির সরকারি নীতির একটি বড় হাতিয়ার ছিল ইপিআইডিসি।"

১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ইপিআইডিসি হয় নিজে নতুবা যৌথ উদ্যোগ হিসেবে ব্যক্তিখাতের সঙ্গে একযোগে ৭৪টি উৎপাদনকারী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীনতালাভের সময় বাংলাদেশে আধুনিক

শিল্পখাতে বিনিয়োগকৃত মোট সম্পদের ৩৪% অংশ ছিল ইপিআইডিসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্পখাতসমূহে। ইপিআইডিসি প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পগুলো ছড়িয়ে ছিল ব্যাপক বিচিত্র পরিধির উৎপাদন কর্মকাণ্ডে, যেমন, পাট, টেক্সটাইল, কাগজজাত পণ্য, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধসামগ্রী, জাহাজ নির্মাণ ও প্রকৌশল, চিনি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি, মেশিনটুলস এবং ডিজেল ইঞ্জিন শিল্পসমূহে।[৫]

প্রবৃদ্ধি এবং মুনাফা বৃদ্ধির সহায়ক নীতিসমূহ

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টিকে লালনের জন্য পরিকল্পিত ইকুইটি এবং ঋণপুঁজির উদার সরবরাহের বাইরেও সরকার বিভিন্ন পরিবর্ধক উদ্দীপক এবং সহায়তাসেবা প্রদান করে, যা শিল্পের বিকাশকে প্রভাবিত করে তাদের মুনাফা অর্জনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে। শিল্পসমূহকে প্রদত্ত উদ্দীপকের দীর্ঘ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ত্বরান্বিত ক্ষয়ক্ষতিভাতা, ট্যাক্স মওকুফ এবং পুনর্বিনিয়োগকৃত আয়কে কর্পোরেশন এবং ব্যক্তিগত আয়কর থেকে অব্যাহতি প্রদানের মাধ্যমে ট্রাক্স মওকুফ। অভ্যন্তরীণ বিক্রয় এবং আবগারী কর থেকে রপ্তানিকেও অব্যাহতি দেয়া হয়, রপ্তানি থেকে অর্জিত আয়ের অংশের উপর ছিল কর হ্রাস (এস. আর. লিউইস, ১৯৭০)। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিল্পসমূহকে সংরক্ষণসুবিধা দেয়া হয় (স্থানীয় মুদ্রায়) উৎপাদন-উপকরণের মূল্যহ্রাস এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে। এটা করা হতো ইমপোর্ট লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের আওতায়।[৬] বিশেষত বড় শিল্পপতিদেরকে যন্ত্র, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য মধ্যবর্তী দ্রব্য আমদানির অনুমতি দেয়া হতো অবমূল্যায়িত বৈদেশিক মুদ্রায়, যা তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হতো আমদানি লাইসেন্সিং এবং এক্সপোর্ট বোনাস ব্যবস্থার মাধ্যমে। সরকারি বিনিময়হার সর্বদা বেশ বড়োভাবে স্থানীয় মুদ্রার অতিমূল্যায়ন করতো, যার ফলে আমদানিকারকরা আমদানিকৃত উপকরণের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় বিশ্ববাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম প্রদান করতো।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি থেকে প্রবর্তিত ব্যাপক আমদানি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা শিল্পপতিদেরকে বিপুল সুবিধা দিয়েছিল। সরকার কর্তৃক একটি শিল্প-প্রকল্প অনুমোদনের পরে উৎপাদক অনুমোদিত শিল্পপ্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি

৫. বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের শিল্প এবং শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ও উন্নতি সাধনে ইপিআইডিসি পালিত পথিকৃতের ভূমিকার খুঁটিনাটি এবং সমালোচনামূলক মূল্যায়নের জন্য রেহমান সোবহান প্রমুখ রচিত গ্রন্থ (১৯৮০) এবং জি. এফ. পাপানেক রচিত গ্রন্থ (১৯৬৭) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

৬. ইমপোর্ট লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের মাধ্যমে শিল্পসমূহ যে বিপুল সংরক্ষণসুবিধা ভোগ করতো, তার একটি অতি চুম্বক বিশ্লেষণ রয়েছে কিউ. কে. আহমদ রচিত গ্রন্থে (১৯৭৮)।

লাইসেন্স পেয়ে যেতো। শিল্পোদ্যোক্তা একজন কোটামালিক (কিংবা শিল্প আমদানিকারক) হিসেবে বিবেচিত হতেন, যা তাকে তার নিজস্ব শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামাল আমদানির নিয়মিত সুযোগ করে দিত শিল্প লাইসেন্সের মাধ্যমে।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে প্রবর্তিত এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের আওতায় বোনাস-সুবিধা ভোগকারী একজন রপ্তানিকারক তার বৈদেশিক মুদ্রা আয় পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকে জমা দিত। সম মানের রুপী সে গ্রহণ করতো এবং তার সঙ্গে বাড়তি একটি ভাউচার তাকে ক্ষমতা দিত সরকারি হারে বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে। এই ভাউচার বিক্রি করে সে তার রপ্তানিমূল্যের ২০%, ৩০% কিংবা ৪০% বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করতে পারতো। ভাউচারটি অবাধে হস্তান্তরযোগ্য ছিল এবং এটিকে সরকারি হারে বৈদেশিক মুদ্রা কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতো (ক) বাণিজ্যিক ও শিল্প সামগ্রী আমদানির জন্য, (খ) ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য এবং (গ) বিদেশে বাণিজ্যিক অফিস খোলা এবং পরিচালনার জন্য (কিউ. কে. আহমদ, ১৯৭৮)। বোনাস সুবিধাদি প্রধানত রপ্তানিশিল্পের বিকাশে সুযোগ প্রদান করে রপ্তানির বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা প্রাপ্তিতে সুবিধাদানের মাধ্যমে। যদিও স্কীমটি সাধারণভাবে সকল রপ্তানিশিল্পকে সাবসিডি দেয়,পাটজাত শিল্পই ছিল প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক লাভবান।[৭]

শিল্পবিকাশ প্রভাবিত করার জন্য প্রদত্ত নীতি এবং উদ্দীপকের প্রতি শিল্প-উদ্যোক্তাদের প্রতিক্রিয়া

১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্রুততর হার অর্জনের জন্য পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার সরকারি নীতির মূল তাগিদের সঙ্গে সংগতি রেখে আর্থিক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়ক সুবিধাদির একটি ব্যাপক বিন্যাস সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাদের নিকট সহজলভ্য করে তোলা হয় শিল্পকারখানা শুরু ও পরিচালনায় তাদেরকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে। অবশ্য যেহেতু পাকিস্তান প্রাথমিকভাবে শিল্পোদ্যোক্তাদের সংখ্যাস্বল্পতায় ভুগেছিল, শুরুতে বেসরকারি ব্যক্তিখাতের তরফ থেকে সাড়াটা ছিল অসন্তোষজনক। তাছাড়া, দেশভাগের পরের বছরগুলোতে নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। তথাপি, ভারত, বার্মা এবং পূর্ব আফ্রিকা থেকে পাকিস্তানে আগত মুসলমানদের দ্বারা গঠিত এক দল শিল্পোদ্যোক্তা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পরিমিত পুঁজি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প ও ব্যবসায়ী উদ্যোগের সাথে তাদের অতীত সংযোগের সূত্রে সঞ্চিত কিছু কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পোদ্যোগমূলক দক্ষতা। তারা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে বিনিয়োগ করতে শুরু করলো। উপরন্তু কোরীয় যুদ্ধের তেজি ভাবের সময় যে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা ভাগ্য গড়ে নিয়েছিল, তাদের কেউ কেউ প্রথম দলে যোগ দেয়। কিন্তু এদের দু'দলই

৭. স্কীমটির পরিচালনা এবং এ থেকে রপ্তানিকারকদের প্রাপ্ত লাভের খুঁটিনাটির জন্য দেখুন, কিউ. কে. আহমদ (১৯৬৬) এবং এইচ, জে, ক্রুটোন প্রমুখ (১৯৬৩) রচিত বই।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ করতে অনিচ্ছুক ছিল সম্ভবত ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার অভাব এবং সরকারি সিদ্ধান্ত ও সুযোগসুবিধাসমূহের সহজলভ্যতার সুযোগের অভাবের কারণে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচী থেকে দূরে অবস্থান করলে করাচীতে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোর সঙ্গে দূরত্বের সৃষ্টি হতো এবং সুযোগ-সুবিধাদি সহজলভ্য হতো না।[৮]

যাই হোক, বহিরাগত পরিবারদের অন্যতম আদমজী পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে পাটশিল্পে বিদ্যমান মুনাফা লাভের আকর্ষণীয় সুযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। ১৯৪৯ সালে সরকার প্রতিটি ১০০০ তাঁতের তিনটি পাট শিল্পের ইউনিট প্রতিষ্ঠার আদমজী কর্তৃক প্রস্তুত একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। সরকার এ প্রকল্পের প্রাথমিক বাধাগুলো সহজেই অতিক্রম করার লক্ষ্যে আদমজীদেরকে প্রকল্পের জন্য আমদানিখাতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করে এবং এতে একটি ইকুইটি-স্বার্থ গ্রহণ করে (যা পরে মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত হবে) এবং এইভাবে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। এভাবেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সফল অংশীদারিত্বের আওতায় পাটজাত দ্রব্য তৈরির মধ্য দিয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়, যা পরবর্তী দু'দশকে প্রাক-স্বাধীনতা বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলে।

অবশ্য ১৯৫০-এর দশক এবং ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশের ব্যক্তিখাতে অস্থানীয়গণ (পশ্চিম পাকিস্তানীরা) প্রাধান্য বিস্তার করে। আধুনিক পুঁজিবাদী খাতেই তাদের প্রাধান্য আরো প্রকট ছিল। রেহমান সোবহান প্রমুখের (১৯৮০) মতে, স্বাধীনতালাভের সময় অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক শিল্পখাতে স্থায়ী শিল্প মূলধনের ৪৭% এবং বেসরকারি শিল্পসম্পদের ৭২% অংশের মালিক ছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাংকিং, বীমা এবং অন্যান্য খাতেও অবাঙালিদের সমান প্রাধান্য ছিল। বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি এবং শিল্পোদ্যোগমূলক দক্ষতার মালিক হওয়া ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় সরকারপ্রদত্ত উদার সহায়তা ও সমর্থনসেবার সুযোগ গ্রহণেও তারা ভালো অবস্থানে ছিল। দেশটি পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে থাকায় এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে অস্থানীয় বিনিয়োগকারীরাই বাংলাদেশে শিল্পকলকারখানার পাকিস্তানী মালিকানা পরিবর্ধনে আমলাদের অনুসৃত পক্ষপাতদুষ্ট সক্রিয় নীতি থেকে লাভবান হবে।[৯]

৮. ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের দ্রুত শিল্পোন্নয়নে বিবিধ ব্যক্তি শিল্পোদ্যোক্তাদের দ্বারা পালিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিশদ বিশ্লেষণের জন্যে দেখুন, জি. এফ. পাপানেক রচিত গ্রন্থ (১৯৬৮)।

৯. সমগ্র পাকিস্তানে এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পখাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অবাঙালিদের হাতে পুঁজি সঞ্চয়ন ও কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটির জন্য দেখুন রেহমান সোবহান প্রমুখ রচিত গ্রন্থ (১৯৮০, পঞ্চাশ অধ্যায়)।

বাংলাদেশী শিল্পে অবাঙালি মালিকানার সংখ্যাধিক্য বাঙালিদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং মধ্য-ষাটের দশক থেকে তা অব্যাহত থাকা অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। ষাটের দশকের শুরুতে আঞ্চলিক উন্নয়নে বর্ধিত বৈষম্যের দরুন প্রবল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যখন তুঙ্গে, তখন সরকার পূর্ব পাকিস্তানে একটি শক্ত শিল্পভিত্তি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। রেহমান সোবহান এবং মুজাফফর আহমদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটা ছিল পূর্বাঞ্চলে আইয়ুবের জন্য একটি নিরাপদ ক্ষমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাঙালি পাতি বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে একটি পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য আইয়ুব সরকারের সচেতন প্রয়াস। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গেই লেখকদ্বয় ইপিআইডিসি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাঙালি পাতি বুর্জোয়াদের মধ্য থেকেই পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে তোলার প্রয়াসকে বিচার করতে চান।

কিছু কিছু ঘটনায় বিশেষ অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানায় বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলার সচেতন প্রচেষ্টা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।[১০] প্রত্যক্ষ সরকারি উদ্যোগ এবং তাগিদে ৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৩৪টি বাঙালি নিয়ন্ত্রিত পাট শিল্পকারখানা সৃষ্টি করা হয়, ২১ কোটি টাকা মূল্যের ২৪টি টেক্সটাইল সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। গড়ে পাটকলগুলোতে বিনিয়োগের ২৪% অংশ যোগায় বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাগণ, পাবলিক ইকুইটি থেকে আসে ১৯% এবং অগ্রিম সরকারি ঋণ থেকে আসে ৫৭%। এইভাবে ইপিআইডিসি প্রদত্ত প্রবল উৎসাহ ও সমর্থনের আওতায় মধ্য-ষাটের দশক থেকে শিল্পে বাঙালি উদ্যোগ বিকশিত হতে শুরু করে। বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা আগে থেকে ব্যবসায়ে এবং ক্ষুদ্র শিল্প কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন এবং সেভাবে কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছিলেন, তারা শিল্পোদ্যোগে যথেষ্ট বিশেষ প্রবণতা প্রদর্শন করেন। যদিও মধ্য-ষাটের দশক থেকেই বাঙালি শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠে এবং তখন থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে, সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ন স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বেশি এগিয়ে যায়।

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে অর্জিত শিল্পোন্নয়নের একটি সামগ্রিক চিত্র

পূর্বের অংশে আমরা আধুনিক শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশকে উৎসাহিত করায় সরকারের মূলনীতি এবং উন্নয়নমূলক সহায়ক সেবা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা ছিল পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির একটি মূল ভিত্তি। এই অংশে আমরা শিল্পায়নে অর্জিত প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নমাত্রা পরীক্ষা করে দেখবো এবং শিল্পের কাঠামো এবং

১০. ২৭২টি শিল্প ইউনিট সৃষ্টিতে আর্থিক সংস্থাসমূহকে নেতৃত্ব দানের ভূমিকা পালন করে আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি এবং ক্ষুদ্র বাঙালি বুর্জোয়াদের মালিকানায় ১০০৮টি শিল্প ইউনিট স্থাপনে সমর্থন যোগায় ইপসিক।

কার্যকারিতার সঙ্গে সেগুলোকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত নীতিমালার মধ্যে সম্পর্ক সন্ধানে প্রয়াসী হবো।

আধুনিক শিল্পের বিকাশ

যদিও ১৯৪৭ সালের একটি নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করায় কিছুটা বাড়িয়ে বলা হয়, তথাপি ১৯৬০-এর দশকের শেষে এসে বাংলাদেশের শিল্পখাতের ভিত্তি যথেষ্ট ব্যাপ্ত হয়েছে বলা যায়। (সারণি ১.১)। আধুনিক শিল্পখাতের অবদান (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প খাত মিলিয়ে) ১৯৫৯-৬০-এর উপকরণ-খরচে হিসাব করলে ১৯৪৯-৫০-এর ৩.০% থেকে বেড়ে ১৯৬৯-৭০-এ দাঁড়ায় ৭.৭৮%-এ। বিপরীতভাবে একই সময়কালে কৃষিখাতের অবদান কমে যায় ৬৫% থেকে ৫৩%-এ, গোটা অর্থনীতিতে তা একটি পরিবর্তনশীল উৎপাদনকাঠামোকে নির্দেশ করে। অবশ্য নীচের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাবে, সামগ্রিক শিল্পপ্রবৃদ্ধির গতি ছিল ধীর এবং তা শিল্পোৎপাদনকাঠামোর আধুনিকতামুখী রূপান্তরের উপর সামান্যই প্রভাব ফেলে।

সারনী ১.১ : খাতওয়ারী মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৫৯-৬০-এর উপকরণ মূল্যের হিসাবে মিলিয়ন টাকায়)

	১৯৪৯-৫০	১৯৬৯-৭০
কৃষি	৭৩৯২	১১৪৬৯
	(৬৫.৪৩)	(৫৩.৩৩)
উৎপাদন	৩৩৯	১৬৭২
	(৩.০০)	(৭.৭৮
বৃহদায়তন শিল্প	৬৯	৭৮৩
	(০.৬১)	(৩.৬৪)
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২৭০	৮৮৯
	(২.৩৯	(৪.১৩)
অন্যান্য কর্মকাণ্ড	৩৫৬৭	৮৩৬৩
	(৩১.৫৭)	(৩৮.৮৯)
সর্বমোট :	১১২৯৮	২১৫০৪
	(১০০.০০)	(১০০.০০)

উৎস . আলমগীর এবং বার্লেজ. (১৯৭৪)

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো স্তম্ভের শতকরা হার

বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ

স্বাধীনতার পূর্বে শিল্পায়নের একটি মন্দা হারের মধ্য দিয়ে বিকশিত বাংলাদেশের শিল্পকাঠামোর দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) অল্প কয়েকটি বড় শিল্পের প্রাধান্য এবং (২) স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উন্নয়ন। ১৯৬৮-৬৯ সালে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত ৩,১৩০টি শিল্পের মধ্যে ৭৯১টি ছিল টেক্সটাইল, ৫৭৬টি রাসায়নিক, ৪০৬টি খাদ্য, ২৫৭টি ধাতব, ২০৭টি পাদুকা, ১৪৯টি চামড়াজাত এবং ১৪৩টি মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পর্কিত শিল্প। এই নিবন্ধনকৃত ইউনিটগুলোর মধ্যে টেক্সটাইল, খাদ্য এবং রসায়নিক দ্রব্য ছিল তিনটি প্রধান ধরন, মোট শিল্প কারখানার প্রায় ৫৭% ছিল এদের আওতায়। সারণি ১.২-এর তথ্য থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তা হলো, এগুলোই ছিল সেই সব শিল্প, শিল্পোৎপাদনে অবদানের দিক থেকে যেগুলো ছিল প্রধান। এভাবেই শিল্পকাঠামো সেই সব শিল্পের প্রাধান্যকে নির্দেশ করে, যাদের উৎপাদন ছিল স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালভিত্তিক। কার্যত তা পাকিস্তানে অনুসৃত অতীত প্রবৃদ্ধিনীতির প্রতিফলন, যার আওতায় গুরুত্ব পায় পাট, বস্ত্র, চা-প্রক্রিয়াকরণ, চিনি, উদ্ভিজ্জ (vegetable) তেল, সিগারেট, কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট, দিয়াশলাই, ইউরিয়া সার এবং সিমেন্টের মত এমন সব শিল্পের উন্নয়ন, যা কৃষিজ কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের ভিত্তিতে পরিচালিত।[১১] এই শিল্পগুলো ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কর্মকাণ্ডের প্রতিনিধি, যা পাকিস্তানের সাথে দু'দশকের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের সময়কালে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করে নি।

নিবন্ধনকৃত বৃহদায়তন শিল্পের বাইরে অনেক অনিবন্ধনকৃত ইউনিটও ছিল, যেগুলোর অধিকাংশ ছিল কুটির শিল্প ইউনিট। বাংলাদেশ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত ১৯৫৯ সালের একটি সমীক্ষা মোতাবেক, গ্রামীণ এলাকায় ছিল ৩৩০,৪০০ টি শিল্প ইউনিট, যার ৮২% ছিল কুটির শিল্প ধরনের। প্রাক-বাংলাদেশ সময়ের অর্থনীতি প্রবলভাবে নির্ভরশীল ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর, যা ছিল শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগসুবিধা প্রদানকারী এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অখাদ্য ভোগ্য দ্রব্য বস্ত্রের সরবরাহকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৬০-এর দশকে ক্ষুদ্র ও বৃহদায়ন শিল্প মিলিতভাবে যে শ্রমশক্তি নিয়োগ করতো, কুটির শিল্প করতো তার তিন গুণেরও অধিক শ্রমশক্তি এবং তা যোগান দিত কাপড়ের ৬৪% অংশ, ক্ষুদ্র শিল্প যোগান দিত ২৬% এবং বৃহদায়তন কারখানা যোগান দিত মাত্র ১০% (এ. আর. খান, ১৯৭২)।

[১১] সমর্থন করেছে একটি IBRD (১৯৭০) সমীক্ষা, যা ষাটের দশকে পাকিস্তান কর্তৃক অনুসৃত শিল্পায়ন নীতির প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নকে।

সারণি ১.২ : বাংলাদেশের কতিপয় আধুনিক শিল্পের উৎপাদন

	১৯৫৪-৫৫	১৯৬৯-৬০	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৯-৭০	গড় বার্ষিক উৎপাদনহার (১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৬৯-৭০)
পাট উৎপাদনকারী (০০০টন)	১০৩	২৬৫	২৮৯	৫৮০	১২.২
সুতো (মিলিয়ন পাউন্ড)	২৩	৪৯	৬৪	১০৬	১০.৭
সুতীবস্ত্র (মিলিয়ন পাউন্ড)	৬৫	৬২	৪৯	৫৯	-০.৫
চা (মিলিয়ন পাউণ্ড)	৫৩.৮	৫০.৩	৬২.৩	৫৯.৬	১.৭
চিনি (০০০ টন)	৪৭	৬১	৭৭	৮৯	৪.৩
ভোজ্য তৈল (০০০ টন)	-	১.৮	৪.৯	৬.৪	১৩.৫
সিগারেট (মিলিয়ন)	০.৪	১.১	৫.৫	১৭.৮	২৮.৮
কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট (০০০ টন)	১৯.২	৩৯.২	৭৮.৮	৭৭.৯	৯.৮
রেয়ন কাপড় (মিলিয়ন গজ)	-	০.৩	০.১	৫.০	৩২.৫
দেশলাই (মিলিয়ন গ্রাম)	২.৪	৮.৬	১০.৭	১৩.০	১১.৯
সার (ইউরিয়া) (০০০ টন)	-	-	৭২	৯৪	৫.৫
সিমেন্ট (০০০ টন)	৫০	৬১	৫৬	৫৩	০.৪
ইস্পাত (০০০টন)	-	-	-	৫৪	-
ডিজেল ইঞ্জিন (সংখ্যা)	-	-	-	১২৮৪	-
মোটর যান সংযোজিত (সংখ্যা)	-	-	-	৪৫৫	-
মোটর সাইকেল (সংখ্যা)	-	-	-	৯৩৫	-
বাই সাইকেল (সংখ্যা)	-	-	-	৭২৯৫	-
রেডিও (সংখ্যা	-	-	-	৬০০০	-

উৎস : পাকিস্তান সরকার (অর্থ মন্ত্রণালয়), *পাকিস্তান ইকনোমিক সার্ভে, ১৯৭০-৭১;* বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ ইকনোমিক সার্ভে, ১৯৭৩-৭৪*, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, *স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশ*, ১৯৮২।

অবশ্য পাকিস্তানী শাসনামলে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সন্ধান করে, দেখা হয় নি। পাকিস্তান সরকার একটি শিল্পায়ন নীতি অনুসরণ করে, যা আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নকে উৎসাহিত করে এবং সুবিধা প্রদান করে, এবং অবহেলা করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে, যদিও পূর্ব বাংলার প্রাথমিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সম্পদপ্রাপ্তি এই সব শিল্পের উন্নয়নের জন্যই বেশি উপযোগী ছিল।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি সরকারের কেবল গতানুগতিক দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। এই সব শিল্পের সম্ভাবনাময় গুণের প্রতি পর পর সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও পরিকল্পনাগুলোতে তারা সমগ্র সরকারি খাতের আর্থিক বরাদ্দের মাত্র ১/২% লাভ করে। সারণি ১.৩-এ প্রদত্ত তথ্যে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। পরিহাসের ব্যাপার এই যে, এতদসত্ত্বেও সরকারি খাতের মোট ব্যয়বরাদ্দের অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটে নি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি সরকারের কেবল গতানুগতিক দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। এই সব শিল্পের সম্ভাবনাময় গুণের প্রতি পর পর সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও পরিকল্পনাগুলোতে তারা সমগ্র সরকারি খাতের আর্থিক বরাদ্দের মাত্র ১/২% লাভ করে। সারণি ১.৩-এ প্রদত্ত তথ্যে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। পরিহাসের ব্যাপার এই যে, সরকারি খাতের মোট ব্যয়বরাদ্দের অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থা স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশ আমলেও কোনো উন্নতি লাভ করে নি।[১২] তারপরও আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে যে যৎসামান্য বিনিয়োগের পরিকল্পনা হয়েছিল, সময়মত তহবিল অবমুক্ত না করায় তা বাস্তব কাজে লাগানোটা ছিল লক্ষ্য থেকে আরো অনেক পিছিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বাধীনতাপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগানোর সীমা ছিল যথাক্রমে ২৫% এবং ৫২%। এর সঙ্গে সংগঠিত পুঁজি বাজারে এবং সাবসিডি প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ ও আমদানিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধরনের ইউনিটসমূহের সীমিত প্রবেশাধিকার, কাঁচামালের অভাব, কারিগরি পশ্চাৎপদতা, বিপণন সমস্যা, বাণিজ্যিক এবং কারিগরি সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি সমস্যা যুক্ত হয়ে এই সব শিল্প দীর্ঘকাল ধারাবাহিক ধীরগতি প্রবৃদ্ধির সমস্যায় ভুগতে থাকে। এই সেক্টরের প্রবৃদ্ধিকে পরিবর্ধন ও সমর্থন দানের প্রধান সংস্থা হিসেবে ইপসিক তাৎপর্যপূর্ণভাবে কার্যকর হয় নি।

সারণি ১.৩ : প্রাক-স্বাধীনতা বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য সরকারি খাতের বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকায়)

পরিকল্পনাকাল	সরকারি খাতে বরাদ্দ	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বরাদ্দ	১ এর % হিসেবে ৩
প্রপপ (১৯৫৫-৬০)	৭৫০০	৮৬.৫	১.১৪
দ্বিপপ (১৯৬০-৬৫)	১১৫০০	১৫০.০	২.১৭
তৃপপ (১৯৬৫-৭০)	৩০০০০	৩১৬.৭০	১. ০৫

উৎস : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

১২ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেই (১৯৮৫-১৯৯০) শুধু ১৯৮৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পকে একটি "অগ্রাধিকার খাত" হিসেবে প্রথম বার স্বীকার করে নেয়া হয় এবং এই খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিল্পঋণের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিস্ময়কর নয় যে, যদিও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ কর্মসংস্থানের অধিকাংশ যোগান দেয় (ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ১৯৬৯-৭০-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০-এ ৮৭%), বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় তাদের যোগকৃত মূল্য ছিল দুঃখজনকভাবে কম। শিল্পখাতে বিরাজমান কাঠামোগত দ্বৈততার প্রমাণ এটা। তিন ধরনের শিল্পের মধ্যকার উৎপাদনগত দক্ষতার পরিমাণে পার্থক্যের কারণে এ. আর. খান একে বলেছিলেন শিল্পগত ত্রিভুজতা। এই তিন ধরনের শিল্পের মধ্যকার সংগঠনগত এবং কারিগরি ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে কড়াকড়ি আন্তঃতুলনার সমস্যাগুলোকে বাদ দিলেও এ আর খানের ১৯৭২) হিসাব দেখিয়েছিল যে কুটিরশিল্পে মাথাপিছু প্রত্যেক শ্রমিকের যোগ করা মূল্য অত্যন্ত কম, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে $\frac{১}{৯}$ এবং বৃহদায়তন শিল্পে $\frac{১}{১০}$। যদিও এত কম শ্রম উৎপাদনশীলতা অর্থনৈতিকভাবে তাদের অব্যাহত টিকে থাকার সামর্থ্যকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ প্রায় করেই না বলা চলে, তাদের অব্যাহত ক্রিয়াশীলতা নির্দেশ করে যে সেখানে নিয়োজিত প্রমশক্তিকে অবশেষে কর্মসংস্থানের একটি উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যাদের নিজেদের মধ্যে ঘটতে থাকে অনেক কাজ ভাগ করে নেয়া। পরিবারভিত্তিক শিল্প ইউনিট হিসেবে কুটির শিল্প ভাড়াকৃত শ্রম সামান্যই ব্যবহার করে। তারা ঐতিহ্যগত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং খুব স্বল্প মাত্রার অর্থলগ্নি করে বিধায় এদেরকে কৃষির অধিকতর কাছাকাছি উৎপাদন ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যদিও তুলনামূলকভাবে কম স্পষ্ট, তবুও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রমিকপ্রতি যোগকৃত মূল্য বৃহদায়তন শিল্পে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের চেয়ে ২.৩ গুণ বেশি। বিপরীতভাবে, পুঁজিক্ষমতা বৃহদায়তন শিল্পে সর্বোচ্চ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের তুলনায় পুঁজি-শ্রম অনুপাত সেখানে সাত গুণেরও বেশি। এটা বৃহদায়তন শিল্পের উচ্চতর শ্রমউৎপাদনশীলতার সুবিধাকে নস্যাৎ করে দেয়, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুঁজিউৎপাদনশীলতা (কিংবা পুঁজি/যোগকৃত মূল্যের অনুপাত)-কে করে তোলে বৃহদায়ন শিল্পের তিন গুণ। পুঁজির প্রতিটি এককপ্রতি সৃষ্ট উদ্বৃত্তও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় প্রায় ৩.৩০ গুণ বেশি।

উচ্চতর পুঁজিউৎপাদনশীলতা এবং বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত এই দু'টি এককেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্তৃক অধিকতর অর্থনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ব্যক্তিপুঁজি বৃহদায়তন শিল্পে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতাই দেখাতে থাকে। তুলনামূলক উপকরণমূল্যের এককেই কেবল বৃহদায়তন শিল্পের অধিকতর আকর্ষণহীনতার আপাতগ্রাহ্য কারণ দেখানো যেতো। ওভারইনভয়েসিং, ইমপোর্ট লাইসেন্সের দুষ্প্রাপ্যতা প্রিমিয়াম, সস্তা ব্যাংক ঋণ ইত্যাদি থেকে যেসব বাড়তি সুযোগ বৃহদায়তন শিল্প ভোগ করতো, তা-ই বৃহৎ শিল্পপতিদের জন্য পুঁজির মূল্যকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তুলনায় কমিয়ে রাখে। অবশ্য বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য প্রদত্ত উৎসাহসমূহ মূলত নির্দিষ্ট ছিল তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী

শিল্পপতিদের জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) শিল্পায়নের জন্য নয়। আমদানি লাইসেন্স বিতরণ, বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি, বিনিয়োগবণ্টন নিয়ন্ত্রণ এবং সরকার গৃহীত অন্যান্য নীতিসমূহও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পের কাঠামো

সারণি ১.৪ ১৯৬৯-৭০ সালে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং মূল্য সংযোজনের এককে ২০টি আধুনিক শিল্পের অবদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পসমূহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এ সারণিতে দেখা যাবে। সারণির তথ্য থেকে দেখা যায় যে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং মূল্য যুক্ত হওয়ার একটি বড় কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে অল্প কয়েকটি শিল্পখাতে। এভাবেই টেক্সটাইল (পাট এবং তুলা একত্রে), খাদ্য, তামাক, রসায়ন, কাগজ এবং কাগজজাত সামগ্রী ইত্যাদি শিল্পে ১৯৬৯-৭০ সালে ঘটেছে শিল্পের মোট কর্মসংস্থান এবং মূল্য সংযোজনের ৮৭% এবং উৎপাদনের ৮২% অংশ। যদিও পাট এবং টেক্সটাইলের জন্য পৃথক তথ্য পাওয়া যায় না, টেক্সটাইলের মধ্যে পাটই ছিল বৃহত্তম শিল্প, যা উৎপাদন করেছে প্রায় সবটাই রপ্তানিবাজারের জন্য। যেখানে অনেকগুলো সমীক্ষাতে রপ্তানিমুখিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের দ্রুত শিল্পায়নের একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে (যেমন, আইবিআরডি, ১৯৭০; এস আর লিউইস, ১৯৭০), পাটই (কাঁচামাল এবং পাটজাত পণ্য দুই-ই) এখানে পালন করেছিল প্রধান ভূমিকা। বাংলাদেশের পাটশিল্পের সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত ছিল এক্সপোর্ট বোনাস স্কীমের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে এবং প্রকৃত অর্থে কোন প্রতিযোগিতামূলক ব্যয়কাঠামোর মধ্যে নয় (কিউ. কে. আহমদ, ১৯৭৮)।

পাটের পরে সুতীবস্ত্রই (সুতা এবং বস্ত্র তৈরি) ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম বৃহদায়তন শিল্প, যা প্রাথমিকভাবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা অনুযায়ী চালিত এবং এর উৎপাদন ছিল আমাদানিকৃত কাঁচামালভিত্তিক।[১৩] টেক্সটাইলের পরে স্থান খাদ্যশিল্পের, যা শিল্প কর্মসংস্থানের ১৩%, মোট উৎপাদনের ২০% এবং মূল্য সংযোজনের ১৫% যোগান দিচ্ছিল। এর পর ছিল চা-প্রক্রিয়াকার্য, যা ছিল অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় বাজারের অনুবর্তী। এর পর ছিল চিনি এবং ভোজ্য তৈল, যা ছিল মূলত দেশীয় বাজারমুখী। তামাক ছিল পরবর্তী বৃহত্তম বৃহদায়তন শিল্প, যা যোগান দিত মূল্য সংযোজনের ১০.৩% অংশ এবং এর পরেই স্থান ছিল রসায়ন শিল্পের, যা যোগান দিত উৎপাদনের ৯.৩%, মূল্য সংযোজনের ১০.৭% এবং মোট শিল্প কর্মসংস্থানের ৭.৭%। রসায়ন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল সার, দেশলাই এবং দেশীয় ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য।

১৩. ১৯৪৭-৭৬ সময়কালে বাংলাদেশের বৃহদায়ন সুতাবস্ত্র কলের গুরুত্ব, বিকাশ এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের একটি অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের জন্য দেখুন এন. চৌধুরী রচিত গ্রন্থ, ১৯৭৭।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে মূলধনদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল খুবই কম। দেশের একমাত্র ইস্পাত কলটি ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে স্থাপিত হয় ১,৫০,০০০ টনের ক্ষুদ্র উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে (ভূঁইয়া প্রমুখ, ১৯৯৩)। যন্ত্রপাতি উৎপাদনের মধ্যে ১৯৭২ সালে ঢাকার নিকটে একটি মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। যানবাহন সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছিল কিছু ভারী যান, মটর সাইকেল এবং বাইসাইকেল ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সংযোজনের মাধ্যমে।

শিল্পসামগ্রীর চূড়ান্ত ব্যবহারের বিচারে ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প খাতের কাঠামো বিশেষায়িত ছিল মধ্যবর্তী সামগ্রী (intermediate goods) শিল্পের প্রাধান্য দ্বারা। সারণি ১.৫-এর তথ্য যেমন দেখিয়ে দেয়, মধ্যবর্তী সামগ্রীশিল্পেই ছিল শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের ৭৫%, মোট উৎপাদনের ৫৩% এবং সংযুক্ত মূল্যের ৫৮%। মধ্যবর্তী সামগ্রীশিল্পের মধ্যে প্রধান শিল্প ছিল টেক্সটাইল এবং রসায়ন। ভোগ্যদ্রব্য শিল্প আসে এর পরে এবং শিল্প কর্মসংস্থানের ১৯.৩% অংশ, মোট উৎপাদনের ৩৪.৭% এবং মূল্য সংযোজনের ৩৪.৫% ঘটে এই খাতে। এই ধরনের শিল্পইউনিটসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল খাদ্য এবং তামাক। মূলধনদ্রব্য উৎপাদন ছিল ক্ষুদ্রতম ধরন। আলোচ্য সময়ে দেশে যে একটি সংকীর্ণ এবং প্রাক-আধুনিক শিল্পভিত্তি ছিল, ক্ষুদ্র পর্যায়ের মূলধনদ্রব্যের উৎপাদন তারই প্রতিফলন নির্দেশ করে।

সারণি ১.৫ : বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পখাতে কর্মসংস্থান, সংযুক্ত মূল্য এবং মোট উৎপাদনকাঠামো (১৯৬৯-৭০ সালে শতকরা হারে)

	কর্মসংস্থান	মোট উৎপাদন	সংযুক্ত মূল্য
ভোগ্য সামগ্রী	১১.৩	৩৪.৭	৩৪.৫
খাদ্য	২৩.০	২০.৩	১৫.১
তামাক	২.০	১০.৩	১৩.৫
মধ্যবর্তী সামগ্রী	৭৫.০	৫৩.৫	৫৭.৬
টেক্সটাইল	৬৩.৫	৩৮.৩	৪৪.২
রসায়ন	৭.৭	৯.৩	১০.৭
পুঁজি দ্রব্য	৪.৫	৭.৭	৬.০
অন্যান্য	১.২	৪.০	১.৯
মোট :	১০০.	১০০.০	১০০.০

উৎস : সারণি ১.৪ এর অনুরূপ

বৃহদায়তন শিল্পের অর্থনৈতিক দক্ষতা

একটি সীমিত সম্পদের দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে উৎপাদনগত দক্ষতার মাত্রা এবং সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে প্রবৃদ্ধি কতটা ব্যয়বহুল হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দিক থেকে বৃহদায়তন শিল্পসমূহের দক্ষতা অনেকটা হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে। অনেকগুলো সমীক্ষা (এ. আর. খান ১৯৭২, কিউ. কে. আহমদ ১৯৭৮, এইচ. জে. ব্রুটন ১৯৬৩, ডব্লিউ. সি. গর্ডন ১৯৭০ এবং বি. বালাসা ১৯৬৫ প্রভৃতি) উপাদানঘনত্ব, উপাদান-উৎপাদনশীলতা এবং বৃহদায়তন শিল্পের মুনাফা অর্জন বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বৃহদায়তন শিল্পসমূহের উৎপাদনদক্ষতা এবং বাস্তব উপযোগিতা প্রতিফলিত করেছে সম্পদের মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন, যা চালিত হয়েছে অনভিপ্রেত সহায়তাসেবা প্রদান দ্বারা। শিল্পকারখানাসমূহ সর্বদা তুলনামূলক মুখ্য সুবিধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অনেক বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে উপকরণঘনত্ব ও উপকরণপ্রাপ্তির প্রতি ব্যাপক ব্যবধান লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে থাকা উচিত ছিল শ্রমের প্রাচুর্য এবং পুঁজির স্বল্পতা, সেখানে শিল্পগুলো ছিল পুঁজিঘন। অধিকাংশ শিল্প ভুগেছে উৎপাদনক্ষমতার স্বল্প ব্যবহারজনিত সমস্যায় (ডব্লিউ. সি. গর্ডন, ১৯৭০)। উপরন্তু, অধিকাংশ শিল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক উপযোগিতা ব্যক্তিগত উপযোগিতা থেকে কেবল নীচুই ছিল না, কখনও কখনও তাদের সম্প্রসারণ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করার জন্য অত্যধিক নীচু ছিল।

বৃহদায়তন শিল্পগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো অদক্ষ উৎপাদনকাঠামো ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি সহায়ক সেবাকাঠামোর ফলাফল। কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত দেশীয় মূল্যকাঠামো এবং অতিরিক্ত সংরক্ষণের আওতায় শিল্পকারখানাসমূহ অতি মূল্যায়িত মুদ্রা, আমদানি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা, ইমপোর্ট বোনাস স্কীম, উচু ট্যারিফ প্রোটেকশন ইত্যাদি সহায়তা বৃহদায়তন শিল্পের জন্য একটি অনুপযোগী পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

এভাবেই স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে ব্যাপক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ। শিল্পগুলো বিপুল সংরক্ষণসুবিধা ভোগ করতো, যা বিশ্ববাজারে বিভাজিত মূল্যস্তরের চেয়ে অনেক উপরে আভ্যন্তরীণ দামকে বাড়িয়ে দিত। শিল্পগুলোকে প্রদত্ত বিপুল এবং অসঙ্গতিপূর্ণ সংরক্ষণ একটি বিকৃত মূল্যকাঠামোর জন্ম দিয়েছিল, যার সাথে সামাজিক বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সম্পদের অগ্রহণযোগ্য খাতওয়ারী বণ্টন। বিভিন্ন সংরক্ষণ এবং সমর্থনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিপুল ভর্তুকি এবং সংরক্ষণ অত্যন্ত অদক্ষ এবং ব্যয়বহুল শিল্পের জন্যও আকর্ষণীয় মুনাফা নিশ্চিত করেছিল, যাতে করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনক্ষমতার সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে উদ্যোক্তারা খুব শিথিল মনোভাব গ্রহণ করতে পারতো। ফলে, কৃত্রিমভাবে অধিক

অভ্যন্তরীণ দামে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পগুলোর অবদান জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের মাধ্যমে প্রকাশিত হারের তুলনায় কম ছিল। এইভাবে বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতির ফল দাঁড়ায় একটি অদক্ষ শিল্পকাঠামোর উৎপত্তি। অবশ্য, এটা ছিল এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার আরো অনেক দেশের অভিজ্ঞতার অনুরূপ, যারা অত্যধিক সংরক্ষণের ভিত্তিতে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অবলম্বন করে।

প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানের জন্য লিউইস এবং গুইসিঙ্গার হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, কার্যকর সংরক্ষণের এমন মাত্রা কতিপয় শিল্প ভোগ করছিল যে তা ব্যবহৃত উপকরণের মূল্যে কিছুই যোগ করে নি। অন্য কথায়, এই সব শিল্পে (চিনি, ভোজ্য তেল, মোটর যান) মূল্য সংযোজন ছিল ঋণাত্মক (২.৭ সারণি, ভূঁইয়া প্রমুখ, ১৯৯৩)।

যদিও স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের জন্য শিল্পদক্ষতা পরিমাপে সংরক্ষণের কার্যকর হার সম্পর্কিত কোনো প্রায়োগিক সমীক্ষা পাওয়া যায় না, পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক শিল্পখাতের অদক্ষতার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় এ. আর. খান (১৯৭২) কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায়, যা প্রকৃত মূল্যের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্প কর্তৃক অর্জিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত মুনাফার তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে সমীক্ষাটি উপসংহার টানে যে বিভিন্ন শিল্পের (সার ব্যতীত) সামাজিক উপযোগিতা তাদের ব্যক্তিগত উপযোগ অর্জনের তুলনায় অনেক কম ছিল। কাতপয় শিল্পের ক্ষেত্রে পরিচালিত ঋণের হিসাব থেকে দেখা যায় যে চিনি, সিগারেট এবং কাগজ শিল্প ঋণাত্মক সামাজিক উপযোগিতার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সমাজের প্রকৃত আয়ে এ সকল শিল্পের অবদান ছিল ঋণাত্মক।

শিল্প প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে এর প্রভাব

কোনো অর্থনীতির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উপর শিল্পায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে দেশীয় পণ্যের গঠন ও পরিমাণের উপর এর মারাত্মক প্রভাব। সারণি ১.৬-এ উপস্থাপিত তথ্য দেখায় যে, বাংলাদেশে ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০ সময়কালের মধ্যে জিডিপি-র খাতওয়ারী গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। জিডিপি-তে শিল্প-উৎপাদনের অংশ ১৯৪৯-৫০-এ ৩.৯% থেকে ১৯৬৯-৭০-এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৯%-এ। জিডিপি-র খাতওয়ারী অংশ থেকে দেখা যায়, আধুনিক শিল্পখাতের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি মূলত চালিত হয়েছিল বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা, যা ১৯৪৯-৫০-এর ০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯-৭০-এ ৬.০%-এ পৌছায়। বিপরীতভাবে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অবদান ১৯৪৯-৫০-এর ৩.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৬৯-৭০-এ ২.৯%-এ পৌঁছায়। যদিও বৃহদায়তন শিল্পের প্রবৃদ্ধি ছিল নির্মাণ এবং উপযোগ শিল্পের প্রবৃদ্ধির দ্বিগুণ এবং অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির ৬/৭ গুণ, জিডিপি-তে আধুনিক শিল্পের মোট অংশকে কোনোভাবেই আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ কর্তৃক অর্জিত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির হারের একটি নির্দেশক হিসেবে নেয়া যাবে না।

সারণি ১.৬ : বাংলাদেশে জাতীয় আয় এবং জিডিপি-র খাতওয়ারী বণ্টনে পরিবর্তন (১৯৫৯-৬০-এর দামের এককে)

	১৯৪৯-৫০	১৯৫৪-৫৫	১৯৬০-৬১	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৯-৭০	১৯৪৯-৫০ / ১৯৬৯-৭০ সময়কালে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)
জিডিপি (মিলিয়ন রুপী)	১২.২৭৪	১৩.৮১৬	১৫.৩১০	১৮.৭৩৪	২২.৩১৭	৩.০
জিডিপি (মাথাপিছু রুপী)	-	২৯৩২৯০	২৮৭	২৯০	৩১৬	০.৩৮
জিডিপি-র খাতওয়ারী অংশ (%) :						
কৃষি	৬৫.২	৬৩.০	৬২.৬	৫৫.৯	৫৫.৩	২.১
পণ্যোৎপাদন	৩.৯	৪.৭	৬.৪	৮.২	৮.৯	৭.৩
বৃহদায়তন	০.৬	১.৪	৩.০	৫.০	৬.০	১৫.৫
ক্ষুদ্রায়তন	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.১	২.৯	২.৩
নির্মাণ এবং উপযোগ	৫.৬	৬.৬	৭.৫	১২.২	১২.৮	৭.৩
সেবা	২৫.৩	২৫.৭	২৩.৫	২৩.৭	২৩.০	২.৫
মোট জিডিপি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস : ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৪-৫৫-এর জন্য টি. এম. খান এবং এ বার্গানের "মেজারমেন্ট অব স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইন দা পাকিস্তান ইকনোমি", পাকিস্তান ডেভেলপমেন্ট রিভিউ, গ্রীষ্ম ১৯৬৬; ১৯৬০-৬১ থেকে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ইস্ট পাকিস্তান ইকনোমিক সার্ভে, ১৯৬৯-৭০।

অবশ্য, ১৯৫০ এবং '৬০-এর দশকের শিল্পায়নের প্রভাবে অর্থনীতিতে উৎপাদন-কাঠামোর সামান্য পরিবর্তন ঘটে, যার নির্দেশক ছিল জিডিপি-তে কৃষির হ্রাসপ্রাপ্ত অবদান। যদিও উৎপাদনকাঠামোর অনুরূপ পরিবর্তন সচরাচর মাথাপিছু বৃদ্ধির সঙ্গে একযোগে ঘটে, একই সময়ে মাথাপিছু আয়ে তেমন লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এটা নির্দেশ করে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে দু'দশকের শিল্পায়ন অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে অত্যন্ত প্রান্তিক কিছু প্রভাব ফেলে। সারণিটি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০

থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছর সময়কালে মাথাপিছু আয় ২৯৩ রুপী থেকে ৩১৬ রুপীতে দাঁড়ায়। এটা ছিল খুব নিম্ন পর্যায় থেকে ৮% বৃদ্ধি, গড়ে বার্ষিক বৃদ্ধি ০.৪%-এর কম।[১৪] বৃহদায়তন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে মাথাপিছু আয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। এই সত্যটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় যে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল (এ. আর. খান, ১৯৭২)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪৯-৫০/১৯৬৯-৭০ সময়কালের এই তিনটি খাত যথাক্রমে ২.১%, ২.৩% এবং ২.৫% হারে বিকাশ লাভ করে একই সময়ে, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বার্ষিক ২.৬% হারে।

তথাপি অর্থনীতির কাঠামোর উপর শিল্পায়নের অপর একটি প্রত্যাশিত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব শ্রমশক্তির পেশাগত কাঠামোয় পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে শ্রমশক্তি গঠনের ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তনকে আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে (১৯৬৯-৭০ সময়ের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির তথ্যের অনুপস্থিতিতে) বিশ্লেষণ করে ভূঁইয়া উপসংহারে পৌছান যে সমগ্র জনশক্তির ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্প খাতের অবদান কমে গিয়ে অথবা অপরিবর্তিত থেকে ১৯৬১-র ৪.৮% রয়ে যায়। এর অর্থ এই যে ১৯৬১-৭৪ সময়কালে বর্ধমান শ্রমশক্তির খুব সামান্য অংশ আধুনিক শিল্পখাত কর্তৃক আত্মীকৃত হয়। যদিও জিডিপি-তে আধুনিক শিল্পখাতের একটি বর্ধমান অবদান, কর্মসংস্থানে অবদানের ক্ষেত্রে স্থবিরাবস্থার বিপরীতে বর্ধমান উৎপাদনশীলতাকেই নির্দেশ করে, মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিতে এর কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে নি।

আয় বণ্টনের দিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের এবং ইমপোর্ট লাইসেন্সিং-এর ব্যবস্থার ফলে কৃষিখাত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ চলে যায় শিল্পখাতে এবং শহরে ভোক্তাদের কাছ থেকে নতুন শিল্পপতিদের কাছে, যারা সুযোগমূল্যের অনেক কম দামে বৈদেশিক মুদ্রা হাতে পায়। সুবিধাভোগী নতুন শিল্পপতিরা অত্যন্ত সংরক্ষিত দেশীয় বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি করার সুযোগ লাভ করায় অস্বাভাবিক উচ্চ মুনাফা উপার্জনে সক্ষম হয়। এছাড়াও ইমপোর্ট লাইসেন্সিং, উচ্চ ডেপ্রিসিয়েশন এবং কর মওকুফ থেকে নানাবিধ অপ্রত্যাশিত লাভ তো ছিলই।

অতএব, উপসংহারে বলা যেতে পারে, পাকিস্তানের সাথে দু'দশকের অধিক সময়ের অংশীদারিত্বের সময়কালে বাংলাদেশে একটি মৃদু হারের শিল্পায়ন ঘটে, যা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। আধুনিক শিল্পখাতে অস্থানীয় মালিকানায় শুধু গুটি কয়েক বৃহদায়তন শিল্প গড়ে উঠে, যেগুলো অত্যন্ত উদার সরকারি

---

১৪. প্রশ্নমূলক পদ্ধতি গ্রহণ থেকে সৃষ্ট জিডিপি-র অতিমূল্যায়নের কারণে এমনকি এই সংখ্যাটিকেও অতিরঞ্জিত বিবেচনা করা হয়। এ ব্যাপারে পাঠক ভূঁইয়া প্রমুখের (১৯৯৩) রচনা ব্যবহার করতে পারেন।

পৃষ্ঠাপোষকতা লাভের ফলে একটি বিকৃত মুল্যকাঠামোর জন্ম দেয়। এর ফলে উপকরণ ব্যবহারে মারাত্মক অদক্ষতা এবং সম্পদের অযৌক্তিক বরাদ্দ ঘটে। ফলে আধুনিক শিল্পখাতের প্রকৃত অবদান দৃশ্যমান অবদান থেকে অনেক নীচে থেকে যায়। ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পসমূহ পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বৈষম্যমূলক সরকারি নীতির অধীনে অবনতি কিংবা স্থবিরতার সম্মুখীন হয়।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্ক

শিল্প বিকাশের উপর শ্রম আইন এবং শিল্পসম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে স্থিতিশীল এবং সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত সুস্থ শিল্পসম্পর্কে আজকাল শিল্পের অধিক উৎপাদনশীলতা এবং উন্নত শিল্পদক্ষতা বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত বিবেচনা করা হয়। যদিও শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সহযোগিতাই হচ্ছে ফলপ্রসূ শিল্পসম্পর্কের ভিত্তি, বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে ছিল সংঘাতমূলক। শ্রমসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য সঙ্গত আইনী এবং নীতিগত ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটি সহযোগিতার চেতনা বিকশিত করার পক্ষে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। শিল্পশান্তি এবং অগ্রগতির পক্ষে নিবর্তনমূলক হওয়া ছাড়াও দেশেব শ্রমসম্পর্কের দৈন্য তার তুলনামূলকভাবে দুর্বল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার জন্য দায়ী হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রবন্ধের এই অংশে আমরা স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্ক চর্চার প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্কের আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশে শ্রমআইন প্রণয়নের ইতিহাস শুরু হয় বৃটিশ ভারতে। ১৮৮১ সালে জারিকৃত এবং বহু সংশোধনীর পর ভারত সরকার কর্তৃক শেষ পর্যন্ত প্রবর্তিত প্রথম ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্টের পরে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমআইন প্রণীত হয়, যেমন মাইনস এ্যাক্ট, পেমেন্ট অব ওয়েজেস এ্যাক্ট, ওয়ার্কম্যানস কমপেনসেশান এ্যাক্ট, মেটারনিটি বেনিফিটস এ্যাক্ট, এমপ্লয়মেন্ট অব চিলড্রেন এ্যাক্ট, ট্রেড ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট ইত্যাদি, যা নিয়োগের শর্তসমূহ বেঁধে দেয়। পাকিস্তান সরকার বৃটিশ ভারতের সকল শ্রমআইন উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ ও প্রবর্তন করে।[১৫] পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান সেগুলো উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে এবং এখানে শ্রম প্রশাসন ও শিল্পসম্পর্ক বিষয়ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমআইনগুলো প্রাসঙ্গিক পূর্বতন আইন সংশোধনীর

---

১৫. বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তন, সমসাময়িক শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থা ও আচরণ এবং দেশের শিল্প বিকাশের প্রক্রিয়ার উপর তাদের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন এম. ইউ. আহমেদ (১৯৬৬) রচিত গ্রন্থ।

পর ১৯৬৫ সনে পুনঃপ্রণীত হয়।[১৬] এগুলো ছিল ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের এমপ্লয়মেন্ট অব লেবার (স্ট্যান্ডিং অর্ডারস্) এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়নস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের লেবার ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট (রেগুলেশন অব এমপ্লয়মেন্ট) এ্যাক্ট। ১৯৬৯ সালে ১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়নস্ এ্যাক্ট এবং লেবার ডিসপিউটস্ এ্যাক্টকে সমন্বিত করে একক একটি আইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ তৈরি করা হয়। শ্রমআইনসমূহের পৃথক বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্সপেকশন অব ফ্যাক্টরীজ অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্টস্ ১৯৭০ সালে গঠিত হয় শ্রম এবং জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে।

১৯৬৯ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত শিল্পসম্পর্ক অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ শিল্পসম্পর্কসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং শিল্পবিরোধ সমাধানের ব্যবস্থা করে। যদিও পরবর্তীকালে বহুবার সংশোধিত হয়, আইআরও, ১৯৬৯ই বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, কারণ এটি নিম্নোক্ত বিষয় সংক্রান্ত সকল আইনকে সংহত করেছিল :

(ক) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন;

(খ) নিয়োগকর্তা এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ; এবং

(গ) তাদের মধ্যে কোনো বিবাদ কিংবা পার্থক্য এড়ানো এবং নিরসন ।

আইআরও, ১৯৬৯-এর ধারাগুলো মোতাবেক শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের স্ব-স্ব ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হতে পারতো। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, নিবন্ধন এবং ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনবহি সংরক্ষণ, নিবন্ধনসনদ প্রদান এবং বাতিলকরণ, নিয়োগকর্তাদের অন্যায় শ্রম-আচরণ, শ্রমিকদের অন্যায় শ্রম-আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত ধারা অর্ডিন্যান্সে রাখা হয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়নকে এবং ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশনসমূহকে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধন করাতে হতো। কোনো শিল্পকারখানায় নিয়োগকৃত শ্রমিকদের কমপক্ষে ৩০% ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হলে এই ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্য। ব্যাঙের ছাতার মতো ট্রেড ইউনিয়ন গজানোকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই নিবন্ধনের জন্য এই ন্যূনতম প্রয়োজনের সীমারেখা নির্ধারিত রাখা হয়েছিল।

---

১৬. শ্রমিক শক্তির কর্মকাণ্ড এবং নিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার জন্য স্বাধীনতার সময় প্রযোজ্য সকল আইন এবং অর্ডিন্যান্সকে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ঐভাবে পায় ১৯১৯-১৯৭১ সময়কালে অনুমোদিত ২৯টি আই এল ও কনভেনশন, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ অনুমোদন করে আরো দু'টি কনভেনশন এবং এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১-এ।

আইআরও, ১৯৬৯-এর আওতাধীন আইনসমূহে শ্রমিকদের জন্য মজুরি, ফ্রিঞ্জ বেনিফিট, চাকুরির অবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কল্যাণসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে শিল্পবিরোধ উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে। তাদের অভিযোগ প্রচার-প্রকাশের জন্য তারা ধর্মঘটের পথও গ্রহণ করতে পারে।

এ আইনের আওতায় নিয়োগকর্তাদেরও বিশেষ পরিস্থিতিতে লকআউট ঘোষণার অধিকার রয়েছে। আলাপ-আলোচনা, আপোসরফা, সালিশ এবং মামলার মাধ্যমে শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির বিধানও আইআরও, ১৯৬৯-এর আইনসমূহে রয়েছে। এতে শ্রমিকদের পক্ষে শ্রমবিরোধ উত্থাপন এবং আলাপ-আলোচনার জন্য কালেকটিভ বারগেনিং এজেন্ট (সিবিএ)-কেই একমাত্র বৈধ সংস্থা হিসেবে রাখা হয়।

যদিও আইআরও, ১৯৬৯-ই বাংলাদেশে শিল্পসম্পর্কের ব্যাপারে এবং একে নিয়ন্ত্রণের প্রধান আইন হিসেবে ছিল এবং এখনও রয়েছে, কাজের পরিবেশ, কাজের অবস্থা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ এবং নিয়োগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তাদি সম্পর্কে শ্রমিকস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বহু আইন বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে। ১৯৩১ সালে শ্রম বিষয়ক রয়্যাল কমিশন কর্তৃক তার প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময় থেকেই সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রম বিষয়ক আইন প্রণয়ন শুরু হয়। বৃটিশ ভারত এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান থেকে ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমিকদের অধিকার, নিয়োগকর্তার অধিকার এবং দায়িত্ব[১৭] সম্পর্কিত ২৩টি বিষয়ে[১৮] শ্রম আইন রয়েছে। এগুলির আওতায় প্রণীত আইন এবং নিয়ম এখন বাংলাদেশে ৪৬টি আইন এবং অর্ডিন্যান্সে বিধৃত, যেগুলো একত্রে সংগঠিত শিল্পখাতে কর্মচারীদের জীবন ও কাজের শর্ত নির্ধারণ করে।

শ্রমসম্পর্কের জন্য শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হচ্ছে সমন্বয়কারী সংস্থা, শ্রম বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব লেবার) প্রদান করে শ্রমসম্পর্কে সেবা। শ্রমসম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব চারটি শ্রমসম্পর্ক ইনস্টিটিউটের উপর অর্পিত রয়েছে।

বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক এবং শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সহযোগিতার অবস্থা

অগণিত আইন এবং নিয়ম দ্বারা প্রদত্ত ব্যাপক আইনী সমর্থন সত্ত্বেও বাংলাদেশে শ্রমসম্পর্ক একটি সুষ্ঠু শ্রমসম্পর্কের পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের মধ্যে একটি সহযোগিতার চেতনা বিকশিত করার পক্ষে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে। ফলে, দেশের অধিকাংশ বড় শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

---

১৭. এসব আইনকানুন এবং তাদের বিষয় ও পরিধির খুঁটিনাটি পাওয়া যাবে খান রচিত গ্রন্থে (১৯৮১)।

১৮. এগুলো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনের ধারাগুলোর খুঁটিনাটি বিষয়ে জানার জন্য দেখুন আই এলও প্রদত্ত তথ্য (১৯৯৫)।

নৈরাজ্যবাদী শিল্পসম্পর্কের জন্য যেসব উপাদানকে কারণ বলে মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে—অতিমাত্রায় বিভক্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, ব্যবস্থাপনা এবং ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে স্বাস্থ্যকর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিকাশের অন্তরায় আদর্শগত সংঘাত, কালেকটিভ বারগেনিং প্রসেস এবং শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তিতে আইনবহির্ভূত সরকারি হস্তক্ষেপ, শ্রমআইনের যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব এবং বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির অপর্যাপ্ততা।

খণ্ডীকৃত এবং অতি-রাজনৈতিকীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো

বৃটিশ ভারত থেকে বাংলাদেশ উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করে একটি ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো, যা পূর্ববর্তী একশত বছর বিবর্তিত হয় গণআন্দোলন এবং শ্রমিকবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে, যার সাথে সম্পর্ক ছিল রাজনৈতিক দলসমূহের। ১৯৪৭-এর পূর্বেকার স্বাধীনতা সংগ্রাম দেশে ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর বিন্যাস নির্ধারণ করে দেয়, যা শিল্পকারখানাসমূহে অত্যন্ত বেশি সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দ্বারা সাধারণভাবে চিহ্নিত।[১৯]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং সামরিক শাসনসমূহ একটি গঠনমূলক এবং শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর বিকাশকে ব্যাহত করে। বাঙালি শ্রমিক এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সর্বদাই একটি প্রবল অনাস্থা ছিল, কেননা শেষোক্তদের অধিকাংশ ছিল অস্থানীয়। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পরও কারখানা এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্তির কারণে ট্রেড ইউনিয়নের কোনো গঠনমূলক কাঠামো গড়ে উঠে নি। ফলে, স্বাভাবিক সময়ে শ্রমিকদের কল্যাণ বৃদ্ধিতে ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো থেকে যায় দুর্বল এবং তারা রাজনৈতিক জাগরণের সময়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং অন্যান্য একপেশে কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে হয়ে উঠে শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে বহু সংখ্যক দুর্বল, অত্যন্ত রাজনৈতিকীকৃত এবং তীব্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত ইউনিয়নসমূহই হচ্ছে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য অধিকাংশ দক্ষিণ এশীয় দেশে শিল্পসম্পর্ক কাঠামোর একটি ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৬)।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের রাজনৈতিক সংযোগ (যেমন, স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে "শ্রমিক লীগ"-এর সংযোগ) সামগ্রিক শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থায় টানাপড়েন সৃষ্টি করে এবং শিল্প ও ফ্যাক্টরীতে সুষ্ঠু পরিচালনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়। রাজনৈতিক পার্থক্যজনিত রাজনৈতিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত আন্তঃইউনিয়ন এবং অন্তঃইউনিয়ন বিরোধ, উৎপাদনে বিঘ্ন, ঘন ঘন হরতাল এবং ধর্মঘট ইত্যাদি গভীর শ্রমিকবিশৃঙ্খলা এবং একটি উত্তেজনাকর শ্রমবাজার পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

---

১৯. এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত ' পাওয়া যাবে এম. ইউ. আহমেদ রচিত গ্রন্থে (১৯৯৬)

বিশেষত রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্পগুলোতে মজুরি বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ নিয়োগকর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকে অবহেলা করতে শ্রমিকদেরকে উৎসাহিত করে। এটা কারখানা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংলাপকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে এবং অনেক রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিখাতের শিল্পকে ট্রেড ইউনিয়নের চাপের মুখে অবিহিত মজুরি বৃদ্ধির দিকে ঠেলে দেয়।

জনসংখ্যার সাক্ষরতার সামগ্রিক নিম্নহার (৩৮%)-এর ফল হিসেবে গড় বাংলাদেশী শ্রমিকের নিম্নমানের শিক্ষা হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিকীকরণ এবং বিভক্তিকরণের আর একটি কারণ। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের অতিরিক্ত রাজনৈতিকীকরণ বিশেষত কারখানা পর্যায়ে শিল্পের ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। শেষ ফল এই দাঁড়ায়, শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সর্বদা উত্তেজনাপূর্ণ থাকে এবং পরিকল্পনা মাফিক স্বাভাবিক উৎপাদন কর্মসূচি পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আদমজী পাট কলে ইউনিয়নের জঙ্গিপনার ফলে পুনঃপুনঃ উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

সময়োচিত এবং যথাযথভাবে বিভিন্ন শ্রম আইন কার্যকরকরণের অভাবে শিল্পখাত ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দ্বারা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের পরিদর্শনযন্ত্র সর্বদাই শ্রম আইন কার্যকরকরণ এবং একটি কার্যকর শিল্পসম্পর্ক সৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত ও দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবে কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের কল্যাণসুবিধাদি সংক্রান্ত আইনী ধারা বাস্তবায়নকে মনিটরিং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট এস্টাব্লিশমেন্ট কখনোই কার্যকর এবং যোগ্য হতে পারে নি।

একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পসম্পর্কযন্ত্রকে রক্ষা ও বিকশিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে কারখানা পর্যায়ে কালেকটিভ বারগেনিং-এর সুষ্ঠু চর্চার উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উচ্চতর দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা সম্ভব যদি বর্ধিত দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতার লাভ কার্যকর কালেকটিভ বারগেনিং ব্যবস্থার চর্চার মাধ্যমে উভয় পক্ষ ন্যায্যভাবে ভাগ করে নেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সাংগঠনিক দক্ষতা (কারখানা পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার স্বায়ত্তশাসন), আইনগত ব্যবস্থা (সিবিএ প্রতিনিধিদের কার্যকর কাজ নিশ্চিতকরণ) এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত উপাদানের (প্রতিপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি) মতো পূর্বশর্তগুলোর কোনো একটিও বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল নেই। কালেকটিভ বারগেনিংকে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিকাশের কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করার পরিবেশও নেই।

নানা কারণে নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকপ্রেষণার মাধ্যমে উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইআরও, ১৯৬৯ প্রদত্ত "অংশগ্রহণ পরিষদ"গুলোও ঠিকভাবে কাজ করে নি। ব্যবস্থাপনা ও

শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার চেতনার বিকাশ এবং বৃদ্ধির পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত বাধাসমূহ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অতিরিক্ত রাজনৈতিকীকরণ, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার অভাব, সিবিএ-র মাত্রাতিরোক্ত হস্তক্ষেপ, শ্রমিকদের উচ্চহারে নিরক্ষরতা এবং তাদের প্রেষণা ও অঙ্গীকারের অভাব ইত্যাদি।

সর্বশেষে বলা যায় যে, সংঘাতমুখী শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক যেখানে বহু শিল্প-বিরোধে ইন্ধন যোগায়, সেখানে বিরোধ নিরসনের বর্তমান ব্যবস্থাও সন্তোষজনক কিংবা কার্যকর নয়। বিরোধ নিরসন প্রক্রিয়ার বর্তমান পদ্ধতিসমূহ বাংলাদেশে শ্রমিক এবং নিয়োগকারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিবেচনা করা হয় (আইএলও / বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৩, আহমেদ প্রমুখ, ১৯৯৩ এবং মেহেরুল্লা, ১৯৯৬)। আপোসের মাধ্যমে শিল্পবিরোধ নিরসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রম-আদালতগুলোর অসন্তোষজনক কাজকর্মের পেছনে চিহ্নিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো জটিল কর্মপদ্ধতি, আপোসব্যবস্থাকারীদের নিম্ন পদমর্যাদা এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অত্যধিক বিলম্ব।

উপসংহারমূলক মন্তব্য

১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে পাকিস্তানের সঙ্গে সিকি শতাব্দী ব্যাপী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কালে বাংলাদেশ কেবল মৃদু শিল্পোন্নয়ন অর্জন করেছিল। যদিও জিডিপি-তে আধুনিক শিল্পখাতের অবদান ১৯৪৯-৫০ সালের সামান্য ৩.০% থেকে বেড়ে ১৯৬৯-৭০ সালে ৭.৭৮% হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দুর্বল শিল্পভিত্তি যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, সামগ্রিক শিল্পবিকাশের গতি ছিল ধীর এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর আধুনিকায়নধর্মী রূপান্তরে তার প্রভাব ছিল সামান্য।

১৯৬০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প দেশীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামাল আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যেই সীমিত ছিল। এই বৃহদায়তন শিল্পগুলো বিকাশলাভ করে অধিকাংশ অবাঙালি মালিকানায় এবং বিপুল সংরক্ষণসুবিধার আকারে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের মাধ্যমে। ফলে সামাজিক ত্যাগের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি বিকৃত মূল্যকাঠামোর উন্মেষ ঘটে, যা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বণ্টনের জন্ম দেয়। এতে উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অদক্ষতা সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় উৎপাদনে আধুনিক শিল্পখাতের অবদান দৃশ্যমান অবদানের তুলনায় অনেক কমে যায়।

সম্পদের সামান্য বরাদ্দ এবং অপর্যাপ্ত উন্নয়নমূলক সমর্থনসেবা ও উৎসাহ প্রাপ্তির ফলে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প অর্জন করে অতি সামান্য প্রবৃদ্ধি। যদিও ভারতবিভাগের সময়কার প্রাথমিক অবস্থা এবং সম্পদ প্রাপ্তির অবস্থা ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির পক্ষে, সরকারঅনুসৃত নেতিবাচক নীতির আওতায় এই শিল্পগুলো স্থবিরতায় ভুগতে থাকে।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে শিল্পায়নের নিম্নহার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির উপর কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে নি। ১৯৫০-৭০ সময়কালে এ দেশে মাথাপিছু আয় অর্জন করে বার্ষিক ০.৪% প্রবৃদ্ধি, যা জাতীয় অর্থনীতি এবং সাধারণ জনতার জীবনযাত্রার মানের সামগ্রিক বিকাশের উপর সামান্য প্রভাবকেই নির্দেশ করে ।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে বিকশিত আধুনিক শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার, উৎপাদনকাঠামো এবং মালিকানাবিন্যাস নিশ্চিতই ছিল পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত নীতির ফল। তৎসত্ত্বেও কতগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিশেষত ১৯৫০-এর দশকে নীতি নির্ধারকদের গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের ধারা সৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আধুনিক শিল্পের কাঠামো এবং তাদের ভৌগোলিক অবস্থান— এ দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল পাকিস্তানের রাজধানী (করাচী) এবং অভিবাসী ব্যবসায়ী ও বণিকদের অবস্থান দ্বারা। এসব ব্যবসায়ী ও বণিক দেশবিভাগের সময়ে ভারত থেকে পাকিস্তানে এসে করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রশাসনিক চরিত্রটিও পালন করে একটি মোক্ষম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যা পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পোদ্যোক্তাদের সহায়তা করে। পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পোদ্যোক্তাদের পক্ষে বাণিজ্যিক আমদানি বন্টনের একটি সচেতন পক্ষপাতপূর্ণ নীতি, বিনিয়োগদ্রব্য (capital goods) আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিতে তাদের অধিকতর সুবিধালাভ এবং প্রাথমিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত আয় পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর ইত্যাদি ছিল পশ্চিম পকিস্তানে আধুনিক শিল্পের দ্রুত বিকাশের উপায়স্বরূপ।

বাংলাদেশ শ্রম সম্পর্কিত আইনকানুনের একটি ব্যাপক কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে, যা তাকে দেয় একটি সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ় আইনগত ভিত্তি। কিন্তু, কর্মচারীদের জীবন ও কাজ এবং নিয়োগকর্তাদের অধিকার নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিল্পসম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা এবং সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমঝোতার অভাব কারখানা ও জাতীয় উভয় পর্যায়েই কার্যকর দ্বিপক্ষীয় এবং ত্রিপক্ষীয় শিল্পসম্পর্ক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। একটি আগ্রাসী ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো, ট্রেড ইউনিয়নের বহুমাত্রিকতা এবং অতি রাজনৈতিকীকরণ, কালেকটিভ বারগেনিং ব্যবস্থার অকার্যকর পরিচালনা এবং সর্বোপরি শ্রমিক এবং অস্থানীয় নিয়োগকর্তাদের মধ্যে অবিশ্বাসের অনুভূতি ইত্যাদি একটি বৈরী শিল্পসম্পর্ক সৃষ্টি করে। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাবজনিত বৈরী পরিবেশ রক্ষণশীল ও ভীরু বাঙালি উদ্যোক্তাদের শিল্পে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অবাঙালি উদ্যোক্তার প্রতি সর্বদাই একটি ক্ষোভের অনুভূতি এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি সংঘাতময় সম্পর্ক অবাঙালিদের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য বাংলাদেশকে আরো প্রকটভাবে অস্থিতিশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

১৭

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সুনীল কুমার মুনশি*

ভারতে বৃটিশ শাসনের শুরুতে বাংলা প্রদেশের মূলভাগটি গড়ে উঠেছিল বাংলা নামক ভৌগোলিক এলাকাটি নিয়ে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ব-দ্বীপ। বাংলা ব-দ্বীপটি হলো আরো বড় অঞ্চলের অংশ, যার নাম বাংলা অববাহিকা, তার অপর দু'টি অংশ হলো উত্তর বাংলা অববাহিকা ও সিলেট অববাহিকা।

কেবল আয়তন ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেই নয়, কয়েক হাজার নদী, শাখানদী ও স্রোতস্বী প্রণালীর মধ্যেই নিহিত ছিল প্রকৃতপক্ষে এই বিশাল অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য, যা এই অঞ্চলের পরিবহনব্যবস্থা ও তার বিকাশের ধরন নির্ধারণ করেছে। বাংলা অববাহিকাটি এত সমতল ও নিচু যে কোথাও তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০ ফুটের (৬ মিটার) বেশি উঁচু নয়। বর্ষার সময় এটি এমন এক ব্যাপক জলাবদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয় যে, বিভিন্ন মাপের ও আকারের নৌকাকেই বহু বছর ধরে এখানকার একমাত্র সম্ভাব্য পরিবহন হিসেবে ধরা হতো। এই ধরনের অঞ্চলে সবসময়ের উপযোগী রাস্তা ও রেলপথ গড়ে তোলা কেবল সম্ভব ছিল উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে। কারণ জলভাগগুলোর বাধা পেরোনোর জন্য জলভাগের উপর এ বাঁধে রয়েছে সেতু ও কালভার্ট। স্বভাবতই এটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল পরিকল্পনা।

অতীতের উত্তরাধিকার.

বাংলা অববাহিকার সড়ক ও অভ্যন্তরীণ জলপথ সম্বন্ধে আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* (১৫৯৮) গ্রন্থে সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। ইরফান হাবিব তাঁর

অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, সেন্টার ফর সোশাল সাইন্সেস, কলকাতা।

এই অধ্যায়টি লিখতে আমি প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি আমার রচিত গ্রন্থ *Geography of Transportation in Eastern India under the British Raj,* (Calcutta 1980)-এর উপর।

An Atlas of the Mughal Empire[১] (1982) গ্রন্থে বাংলা অববাহিকাস্থ বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত উঁচু সড়ক ও বাঁধের যে বিবরণ *আইন-ই-আকবরী*তে রয়েছে, তা এভাবে পুনরুল্লেখ করেন :

১. ক১ ঢাকা থেকে উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে সংগ্রামগড় (নোয়াখালী জেলাধীন ?) পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক। আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রথমদিকে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান কর্তৃক এটি নির্মিত হয়।

২. ক১ ভগদ্বার থেকে কুচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক, যা মুগল শাসনের বহু পূর্বে প্রাচীনকালে নির্মিত। এটি উত্তর বাংলার কামতাপুর থেকে ভোটমারী, ধাপ, মালং, পীরগঞ্জ ও ভগদ্বার হয়ে ঘোড়াঘাট গিয়ে শেষ হয়েছে।

৩. ক১ রাঙ্গামাটি থেকে কুচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক।

শেষ সড়ক দু'টি কুচবিহারের অধিকাংশ অঞ্চল সংযুক্ত করে ২৪ ক্রোশ (সম্ভবত ভুলক্রমে ৬৪ ক্রোশের স্থলে ২৪ ক্রোশ বলা হয়েছে) পরিমাণ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ও উঁচু বাঁধ ধরে নির্মিত প্রতিরক্ষাদুর্গকে যুক্ত করার দিক বিবেচনায় রেখে তৈরি। হাবিবের মতে, এ সড়ক হচ্ছে দুর্গ এলাকার দুই প্রান্তিক সীমানা ও বাহারবান্দ ও বিটারবান্দের মধ্য দিয়ে নির্মিত বাঁধ, যা প্রতিরক্ষাদুর্গ এলাকাকে অন্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে একটি সুচিহ্নিত ভৌগোলিক রূপ দিয়েছে। কিন্তু এ দু'টি সড়কের উল্লেখ ছাড়া উল্লিখিত বাঁধের কোন বাস্তব অস্তিত্ব আধুনিক বিবরণীতে পাওয়া যায় না।

আকবরের শাসনামলে যে অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সামুদ্রিক যোগাযোগব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, হাবিব তাঁর গ্রন্থে তাও তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ অতিশয় সাধারণধর্মী এবং গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রধান প্রবাহপথ ও 'ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার প্রবাহপথের' বাইরে তিনি নতুন কোন তথ্য সংযোজন করতে পারেন নি।

আইন-ই-আকবরীতে চারটি সমুদ্রবন্দরের উল্লেখ রয়েছে—(১) ঢাকার নিম্নদেশে শ্রীপুর, (২) চট্টগ্রাম, (৩) পতেঙ্গা ও (৪) রামু।

আইন-ই-আকবরী ও অন্যান্য তথ্যসূত্রকে ভিত্তি করে ইরফান হাবিব বিভিন্ন নদীর উপর ৯টি সেতুর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো মুগল আমলের যোগাযোগব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে আমাদের সাহায্য করবে। এর মধ্যে ছিল : (১) উত্তর রাজমহল সেতু, (২) দক্ষিণ দুগাছী সেতু, (৩) দিনাজপুরের দু'টি প্রস্তরনির্মিত সেতু, (৪) পাগলা সেতু (যা মীর জুমলার সময় ইট দ্বারা নির্মিত), (৫) পাগলা ও ঢাকার মধ্যকার সেতু, (৬) সোনারগাঁর নিকটস্থ সেতু, (৭) শ্রীপুরের পশ্চিমের সেতুদ্বয় (প্রথমটি মীর কাদিমে এবং অপরটি তালতলায় অবস্থিত। উভয়ের তিনটি করে প্রধান ফটক ছিল। মীর কাদিম সেতুটি দৈর্ঘ্যে ছিল ১৭৩ ফুট)।

১. Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire*, (Delhi 1982).

আমরা পরবর্তীতে দেখব যে, সে সময়ে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথে নানা ধরনের দেশীয় নৌকা এবং সড়ক বা উঁচু বাঁধ কিংবা গ্রামীণ পথে মালামাল বহনকারী পশুচালিত যান এবং মানুষ স্বয়ং নিজে। বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, বিশেষকরে মহিলাদের যাতায়াতের জন্য মানুষবাহিত পালকি ব্যবহার করা হতো। অবশ্য ঘোড়ার গাড়ির প্রচলনও ছিল। প্রাক-বৃটিশ যুগের এক সড়কযানবাহনশুমারি থেকে যাতায়াতের মাধ্যম সংক্রান্ত উপরোক্ত তথ্যসমূহ পাওয়া যায়।

সেসময়ে এমন বহু সড়ক ছিল, যার উপর দিয়ে কদাচিৎ যানবাহন চলাচল করতো। গুরুত্বপূর্ণ নগরের চতুর্দিক ঘিরে কিছু কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য রাস্তাঘাট ছিল বটে, কিন্তু এগুলোর মধ্যে খুব কম সংখ্যকই পাকা ছিল।

বাংলা অববাহিকায় বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত সড়ক এবং খালগুলির প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেন মেজর জেমস রেনেল।[২] তিনি ছিলেন ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলার জরিপকাজের প্রথম অধিকর্তা (সার্ভেয়র জেনারেল)। তৎকালীন বাংলার সর্বপ্রথম জরিপকাজ সুসম্পন্ন করার কৃতিত্ব রেনেলেরই প্রাপ্য। তিনি এ জরিপশেষে ১২ মাইল স্কেলের মানচিত্র প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে প্রধান প্রধান সড়কগুলি এবং অন্তর্দেশীয় জলপথগুলি দেখিয়ে রেনেল দু'টি পৃথক মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। দু'টি মানচিত্রই বাংলা অববাহিকায় প্রাক-বৃটিশ পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

হিন্দুস্থানের এই মানচিত্রে রেনেল কলকাতাকে কেন্দ্র করে এর সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সংযোগ সৃষ্টিকারী প্রধান ৬টি স্থলপথের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ২টি স্থলপথ আজকের বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম পথটি মুর্শিদাবাদ থেকে উত্তরাঞ্চলে সমতলভূমির উপর দিয়ে রাজশাহী হয়ে পদ্মা নদী অতিক্রম করে গেছে। দ্বিতীয় পথটি গেছে বাংলা ব-দ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চল অতিক্রম করে ঢাকা ও সিলেটে। অসংখ্য নদী ও খাল অতিক্রম করায় এটিই ছিল সবচেয়ে দুরতিক্রম্য স্থলপথ। রেনেলের হিসাবে কলকাতা থেকে ঢাকার সঠিক দূরত্ব ১৭৭ মাইল, আর চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩১৭ মাইল। কিন্তু এসব পথের অধিকাংশই ছিল উন্নত ধরনের পায়ে চলার রাস্তা মাত্র, যা কেবল শুষ্ক আবহাওয়ার দিনগুলোতেই ব্যবহার করা যেতো। ফ্রানসিস বুকানন[৩] উল্লেখ করেছেন, বর্ষার সময় রাস্তাগুলি এমন খারাপ হয়ে যেতো যে পিঠে বোঝা নিয়ে গরু-ঘোড়া পর্যন্ত তা দিয়ে চলতে পারতো না, ফলে অভ্যন্তরীণ সমস্ত বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যেতো।

২. James Rennell, *Memoir of a Map of Hindoostan or the Moghul Empire*, (London 1788) It was a supplement to his *Bengal Atlas* (1781).

৩. Francis Buchanan, *An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-12*, Book III, (Patna 1928), 705.

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সড়কের অবস্থা সম্পর্কে মিলিটারি বোর্ড[৪] বলে যে, ঢাকা ও বাউলিয়ার মধ্যে এমন এক মাইল সড়কও পাওয়া যাবে না, যাকে পাকা বলা যায়।

ইংরেজ রাজত্বের পূর্বকালে সড়কের অবস্থা ও এজন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ননীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯০৮ সালে *ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার* লিখছে :

> ১৮৩৯-এ দিল্লীর সঙ্গে কলকাতার সংযোগ ঘটাতে যখন চক্রযান-উপযোগী বাঁধানো রাস্তা নির্মাণের কঠিন উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন ভারতে বলা যায় তেমন কোন আধুনিক সড়কই ছিল না। পূর্ব ভারত ছাড়া বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সমভূমিপ্রধান ভারতে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতাই ছিল না। এমনকি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ভারতীয় সেনারা রাস্তা ছাড়াই ও খুব একটা কষ্ট না করেও কার্য সম্পাদন করতে শিখেছিল।[৫]

তবে, স্যার জি. চেসনে তাঁর *ইন্ডিয়ান পলিটিতে* লিখেছেন :

> রাস্তাহীন একটি দেশের অবস্থা অনুযায়ী সমগ্র সামরিক পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় শান্তিকালীন মামুলি প্রয়োজনের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতির তেমন বাস্তব পার্থক্য ছিল না। সমস্ত আনুষঙ্গিক সামরিক ব্যবস্থাপনাগুলি সেইদিকে দৃষ্টি রেখে করা হতো যাতে সেনাবাহিনীকে দেশের যেকোন দিক অতিক্রম করতে প্রস্তুত রাখা যায়। তাছাড়া প্রায় কোন অবকাশ ছাড়াই বাহিনীগুলিকে এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে বদলি করা হতো আর তাদেরও এই কাজ করতে হতো যুদ্ধ চালানোর মতো সমান কষ্ট করেই।[৬]

সড়ক চলাচলোপযোগী রাখা ও সড়কে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু মুগলদের মতো বৃটিশদেরও চোখ এড়ায় নি। কোম্পানিশাসনের গোড়ার দিনগুলিতে সড়ক উন্নয়নের বিষয়টি শুরু হয় প্রধানত সামরিক বাহিনীর চলাচল ও ডাকব্যবস্থার স্বার্থে। চক্রযান চলাচলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল একমাত্র গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করার পরে। বাংলায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে সড়কনির্মাণ ও তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় জমিদারদের উপর ১৮২২ সালের সপ্তম ও ১৮৩৩ সালের নবম রেগুলেশন অনুযায়ী। সড়কনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের তহবিল গড়ার জন্য প্রতিটি জমিদারির সম্পত্তির উপর এক শতাংশ হারে কর ধার্য করা হয়। দেশের প্রতিটি প্রেসিডেন্সি এলাকার জন্য ১টি করে প্রধান সড়ক নির্মিত হয়, যেগুলি ছিল মিলিটারি বোর্ডের অধীনে।

আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ব ভারতের, বিশেষকরে বাংলা অববাহিকার পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। এই অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বঙ্গ-অববাহিকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নদীগুলিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুগলশাসনের শেষভাগে যখন

---

৪. *Note* from the Military Board to Hon'ble J A. Dorin, Deputy Governor General of Bengal, 1854

৫. *Imperial Gazetteer of India*, 1908, Vol. III, 402.

৬. ঐ।

ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে আসতে শুরু করলো, তখন নদীগুলি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকে এই অঞ্চলের নদীতীরবর্তী অঞ্চল বরাবর বাণিজ্য উন্নয়ন এখানকার অন্তর্দেশীয় জলপথের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

পদ্মাই ছিল প্রাথমিক যোগসূত্র—পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যে ও পশ্চিমে গঙ্গার সঙ্গে। রেলপথ নির্মিত হওয়ার আগে এটিই ছিল ঢাকা, পাটনা ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, যা বাণিজ্যিক পণ্যপরিবহনে ব্যবহৃত হতো। আঠারো শতকের শেষে একেবারে সন্ন্যাসিকাটা পর্যন্ত মহানন্দাকে সাংবাৎসরিক নৌ-চলাচলের প্রধান ব্যবস্থা বলে রেনেল দেখিয়েছিলেন। এর অল্পকাল পরেই এই নদীটি সম্পর্কে বুকানন তাঁর বিবরণে বলেছেন যে, বাণিজ্যের বিবেচনায় নদীটি সেই সময়ে জাতীয় মর্যাদার অধিকারী ছিল।

উত্তরবঙ্গের সুরমা উপত্যকা, উত্তর কাছাড়ের পাহাড়ী এলাকা ও চট্টগ্রামে যোগাযোগের জন্য রেলপথ নির্মাণের আগে ব্রহ্মপুত্র নদীই উত্তর-পূর্ব ও অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল। চা ও পাটশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় পথের মর্যাদা পেলো।

জলধারণক্ষমতার দিক থেকে মেঘনা ছোট ছিল বটে, কিন্তু বর্ষার সময় এ নদী যে পরিমাণ জল ছাড়তো তা গঙ্গার প্রায় ১৫-২০ শতাংশ। মারকুলি পর্যন্ত মেঘনার জোয়ার-ভাটা প্রবাহিত হতো।

জলপথে মাল চলাচলের দিক থেকে মেঘনা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উনিশ শতকের শুরুর দিকে এটিই ছিল ত্রিপুরা পর্যন্ত একমাত্র জলপথ, যেখান দিয়ে সারা বছর ধরে ১০০ মণ পণ্যপরিবহনে সক্ষম নৌকা চলতে পারতো। মেঘনার শাখানদীগুলির মধ্যে সুরমা ও কুশিয়ারা জলপথের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোমতি, ডাকাতিয়া ও তিতাসের উপর দিয়েও অনেক দূর পর্যন্ত একশ' মণ ভারবাহী নৌযান চলতে পারতো। বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী সেদিক থেকে ছোট শাখানদী ছিল, যে দু'টি ঢাকা জেলার সন্নিকটে মেঘনায় মিশেছে। কিন্তু ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নদীতীরবর্তী এলাকার বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে এই শাখানদী দু'টির গুরুত্ব ছিল ঐ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি।

পদ্মার শাখানদীগুলি বয়ে গেছে পদ্মা-মেঘনা ও ভাগীরথী-হুগলীর মধ্যবর্তী বিশাল ত্রিকোণাকার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের অন্তর্দেশীয় জলপথে এই অঞ্চলটি স্বর্গ হিসেবে গণ্য হয়।

বাংলার অন্তর্দেশীয় জলপথের বিবরণে কলকাতার সঙ্গে ঢাকা, দিনাজপুর ও রংপুরের সংযোগস্থাপনকারী ৮টি পথের উল্লেখ করেছেন রেনেল। এগুলি হলো জলঙ্গী,

সুন্দরবনাঞ্চল, বেলেঘাটা ও চিচুন্দি খাড়িগুলি দিয়ে ঢাকা অভিমুখী পথ ও ট্যাঙ্গন, পুনর্ভবা ও জাফরগঞ্জ দিয়ে দিনাজপুর অভিমুখী পথ। রংপুরের ক্ষেত্রে শুকনো ও বর্ষার মওসুমে দু'টি পথকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হতো।

রেনেল উল্লেখ করেছেন যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখানদীগুলির জলপথ দিয়ে প্রায় ৩০ হাজার মাঝির কর্মসংস্থান গড়ে উঠেছিল। এই পথে বছরে ২০ লক্ষ পাউন্ড স্টারলিং মূল্যের বাণিজ্যিক পণ্যের আমদানি-রপ্তানি চলতো। লবণ ও বিপুল পরিমাণ খাদ্যই ছিল বাণিজ্যের প্রধান উপাদান। কিন্তু অভ্যন্তরীণ জলপথ দিয়ে পরিবহন অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলকাতা থেকে নৌকায় ঢাকা পৌঁছুতে পুরো মাস লেগে যেতো।

১৭৯২ সালে প্রকাশিত রেনেলের *নেভিগেশন অব বেঙ্গল* মানচিত্রে বলা হয়েছে : ঠিক ব-দ্বীপ এলাকা দিয়ে নৌ-চলাচলের প্রধান পথগুলির মধ্যে ছিল বনগাঁর ভাটিতে ইছামতি, কোটচাঁদপুরের ভাটিতে কাবাডাক, মুরলির ভাটিতে ভৈরব, নলডাঙ্গার ভাটিতে চিত্রা, মাগুরা এবং মধুমতির মধ্যকার নবগঙ্গা, চন্দনা-মধুমতি-বালেশ্বর-হরিণঘাটার সমুদ্র পর্যন্ত পুরো দৈর্ঘ্য, আড়িয়াল খাঁ, বরিশাল, গলাচিপা ও নলছিটি। এই এলাকায় প্রতিটি নদী সব মওসুমে ব-দ্বীপের উজানের অংশের সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশের সুন্দর যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব করেছিল।

আঠারো শতকের পরে ব-দ্বীপের দক্ষিণ অংশে নদীগুলির মধ্যে সংযোগ থাকার ফলে সেখানে একটি প্রকৃত অর্থে জলপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সারা বছরের বাণিজ্যিক কাজকর্ম প্রধানত উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখী ছিল। দক্ষিণমুখী বাণিজ্যপথ সুন্দরবনে আসার পর পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম অভিমুখে, নতুবা পশ্চিমে কলকাতা অভিমুখে যেতো। পূর্ব-পশ্চিমে বাণিজ্য দু'টি সমান্তরাল পথে হতো—একটি ছিল ভিতর দিকে, অপরটি বাইরের দিকে।

সুন্দরবনে নদী দিয়ে নৌ-চলাচল সবসময়েই ছিল যেমন কষ্টসাধ্য তেমন দুঃসাহসিক ব্যাপার, বিশেষকরে জঙ্গলের জন্য। একদিকে যেমন বন্যজন্তুর উপদ্রব ছিল, তেমনি ছিল না কোন আশ্রয়স্থল এবং প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল জলস্রোত।

কর্ণফুলী লুসাই পাহাড় থেকে এসে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এই পথে এর বাম তীর বরাবর ৫টি ও ডানদিকেও ৫টি শাখানদী যুক্ত হয়েছে। কিন্তু কর্ণফুলীর খাড়া ঢালের দরুন রেনেল কখনো একে অন্তর্দেশীয় জলপথের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেন নি। তবে হান্টার লিখেছেন যে, উৎপত্তিস্থল থেকে একশ' মাইল দূরে রাঙ্গামাটির উজানে কাসালঙ পর্যন্ত এই নদীটি জলপথের উপযোগী ছিল। এই দূরত্ব পর্যন্ত মোটামুটি বছরের সব সময়ই ৪ টনী দেশী নৌকা যাতায়াত করতে পারতো। আর কাসালঙ ছাড়িয়ে আরো ২০ মাইল পর্যন্ত এ নদীতে ছোট ছোট নৌযান চলতো।

বৃটিশ রাজ আমলে সড়ক

বৃটিশ রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বছর পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারি ব্যয় মূলত প্রধান সড়কপথগুলির জন্যই করা হতো সম্ভবত এই কারণে যে, পূর্ব ভারতে তখনো বাণিজ্যিক পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ বা বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের তেমন প্রসার ঘটে নি। তার উপর রেলপথ ও বাষ্পচালিত নৌ-চলাচলের উপযোগী জলপথের উন্নয়নে সরকার বেসরকারি অর্থসংস্থানের উপরই প্রধানত নির্ভর করতো। গোড়ার দিকে এ দু'টি উন্নয়নকাজই সাধারণ সড়কনির্মাণের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৬৭-৬৮ সালের রিপোর্টে[৭] উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৃটিশ রাজের খরচের বড় অংশই ব্যয়িত হয়েছে দীর্ঘ সড়কপথগুলির জন্য।

১৮৬০-৬১ সালের বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসন সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্টে[৮] পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার রেলপথের সংযোগ-সড়কগুলি সম্পর্কে জানা যায়। নীচে সেগুলির তালিকা দেয়া হলো :

সারণি ১ : পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার রেলপথের বিবরণ

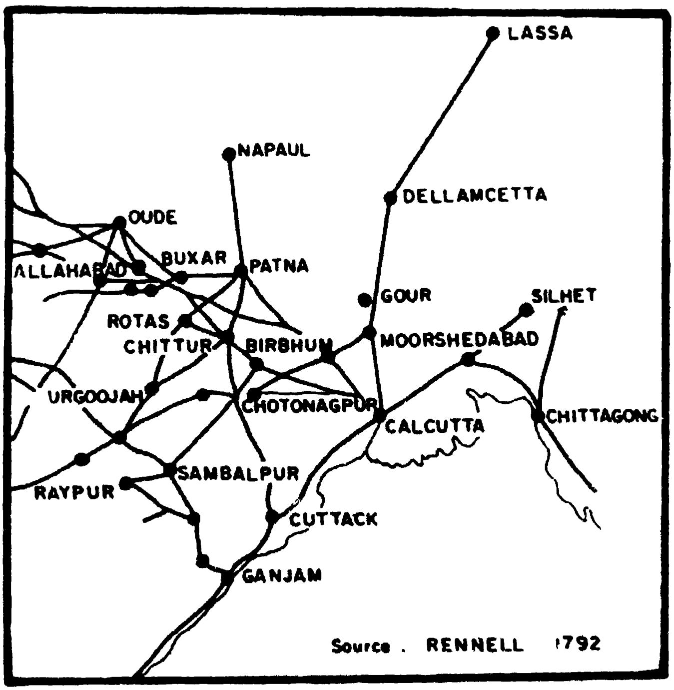
	যেখান থেকে	যেখান পর্যন্ত	দৈর্ঘ্য (মাইলে)
১.	কৃষ্ণনগর	বগুলা স্টেশন	১১
২.	শান্তিপুর	রানাঘাট স্টেশন	১১
৩.	কামারখালি	কুষ্টিয়া স্টেশন	১৩
৪.	যশোর	বগুলা স্টেশন	৪০
৫.	বনগাঁ	হামিদপুর (চাকদা স্টেশনের কাছে)	২০
৬.	ফরিদপুর	কোটচাঁদপুর স্টেশন	৭০
৭.	কোটচাঁদপুর	কিষেণগঞ্জ স্টেশন	২৩
৮.	বাউলিয়া ফেরী	জিয়াগঞ্জ স্টেশন	২৪
৯.	বহরমপুর	আলমডাঙ্গা স্টেশন	৫৫
১০.	ইশাপুর	বাজার খাল স্টেশন	৮
১১.	ঝিনাইদহ	চুয়াডাঙ্গা স্টেশন	২৩$\frac{১}{২}$
১২.	গোরাকালা ঘাট	আলমডাঙ্গা স্টেশন	৩১
	সর্বমোট		৩২৯$\frac{১}{২}$

৭. *Annual Report on the Administration of Bengal Presidency, 1867-68*, Government of Bengal, Revenue Department, Calcutta.

৮. *Annual Report, 1860-61*

১৮৭০-৭১ সালের রিপোর্টের[৯] অন্তর্ভুক্ত মানচিত্রে পূর্ব ভারতে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দেখানো হয়েছে। সেগুলি সম্পূর্ণ বাঁধানো ছিল না। প্রতিটির উৎপত্তি প্রধানত কলকাতা থেকে ও প্রতিটি সড়ক অন্তত আধ ডজন করে সাবেকি সড়ককে নিজের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

পূর্ব ভারতের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মধ্যে তিনটির উপর বাংলাদেশের সড়কগুলির উন্নয়ন নির্ভরশীল ছিল। সেগুলি হলো : (ক) দার্জিলিং ট্রাঙ্ক রোড, যা কলকাতা ও দার্জিলিংকে বহরমপুর, ভগবানগোলা, গোদাগরি, দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ি অঞ্চলের মাধ্যমে যুক্ত করেছে; (খ) যশোর রোড, যা কলকাতা থেকে বনগাঁ ও যশোর দিয়ে ফরিদপুর গেছে; (গ) চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোড, এটি দাউদকান্দি, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামকে সংযুক্ত করেছে, যার দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল। বাঁধানো না হলেও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছিল। এই তিনটি ট্রাঙ্ক রোডের পাশাপাশি আরেকটি উল্লেখযোগ্য রাস্তা ছিল, যেটি দার্জিলিং ট্রাঙ্ক রোড থেকে দিনাজপুর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত গেছে।



চিত্র ১ : পূর্বভারতের সড়কসমূহ

৯. *Annual Report, 1870-71.*

১৮৮০-৮১ সাল নাগাদ সড়ক সংক্রান্ত নীতিমালার ক্ষেত্রে সরকার যে চিন্তাভাবনা করেছে তা স্পষ্ট হলো। ক্রমাগত কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের ফলে ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে দুর্গম অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংহত করে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এই প্রথম অনুভূত হতে লাগলো।

১৯০০ সাল নাগাদ বাংলার পাবলিক কর্তৃপক্ষ যেসব সড়ক সংরক্ষণ করতো তাতে রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের সড়কের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ :

সারণি ২ : বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষণকৃত সড়কসমূহের দৈর্ঘ্য

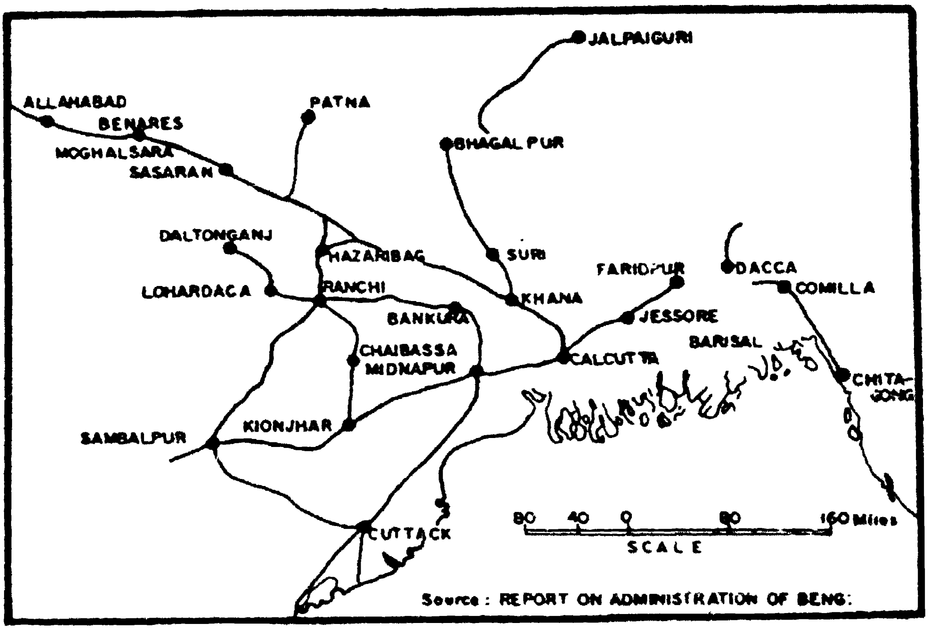
বিভাগ	পূর্তবিভাগের বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	পূর্তবিভাগের অ-বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দেয়া বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অ- বাঁধানো রাস্তার দৈর্ঘ্য (মাইলে)	মোট বাঁধানো রাস্তা (মাইলে)	মোট অ-বাঁধানো রাস্তা (মাইলে)
রাজশাহী	১৫১$\frac{১}{২}$	২২২	১৩৩$\frac{১}{৮}$	৪,৮০৩$\frac{৩}{৪}$	২৮৪$\frac{৫}{৮}$	৫,০২৫$\frac{১}{৪}$
ঢাকা	-	-	৬০$\frac{১}{৪}$	১,৩৯৫$\frac{৩}{৮}$	৬০$\frac{১}{৪}$	১,৩৯৫$\frac{৩}{৪}$
চট্টগ্রাম	-	-	১৫	১,৩৬১$\frac{১}{৪}$	১৫	১,৩৬১$\frac{১}{৪}$
প্রেসিডেন্সি	১৪$\frac{৫}{১২}$	-	৫২০$\frac{১}{৮}$	৪,৫১৫$\frac{৩}{৪}$	৫৩৪$\frac{১৩}{২৪}$	৪,৫১৫$\frac{১}{৪}$

সূত্র : *বাৎসরিক প্রতিবেদন*, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রশাসন, ১৯০০-০১।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সব আবহাওয়ার উপযোগী নতুন সড়ক নির্মাণ এবং অন্য সড়কগুলো বাঁধানোর কাজ বিঘ্নিত করেছিল। নির্মাণসামগ্রী বহনের উপযোগী রেল ওয়াগনের যোগান হ্রাস পেয়েছিল। এছাড়া, ইংল্যান্ড থেকে আসা বিপুল পরিমাণ স্টিল জয়েন্টগুলির যোগানও যুদ্ধের ফলে আটকা পড়েছিল। অবশ্য, কিছু প্রধান সড়ক বাঁধানোর এবং চওড়া করার কাজ চলেছিল মন্থরগতিতে। যেমন কলকাতা-যশোর রোড ও চট্টগ্রাম জেলার ট্রাঙ্ক রোড।

বাংলা সরকার তার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবের মাধ্যমে ১৯৩৪ সালের ২৬ এপ্রিল বিভাগীয় কমিশনারদের কাছে, জেলা সদরসমূহে, বাংলার রেল প্রশাসন ও অন্যান্য দপ্তরে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল। তাতে এ. জে. কিংকে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয় ও তাঁকে একটি সড়ক সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তাব করার নির্দেশ দেয়া হয়। ঐ নির্দেশনামায় বলা হয়, "এপর্যন্ত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অর্থের

যোগান দেয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলে এই প্রদেশে সড়ক উন্নয়নের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি।" এ পরিপ্রেক্ষিতে সড়কনির্মাণের সময় যাতে জল জমে না যায় সেজন্য জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় মনে রেখে যেন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং যে যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে তার সম্ভাবনার বিষয়টি যেন বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। এমনভাবে সড়কগুলি নির্মাণ ও উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয় যাতে সেগুলি ইতিমধ্যে গড়ে উঠা পাকা বা প্রধান সড়ক, স্টেশন, নগর ও গুরুত্বপূর্ণ বাজার বা হাটে গিয়ে মেশা শাখাপথ হয়ে উঠে। রেলপথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা যতোদূর সম্ভব পরিহার করতে বলা হয়।



চিত্র ২ : পূর্বভারতের সড়কসমূহ, ১৯০০ সন

বাংলা সরকারের কাছে এ. জে. কিং-এর পেশকৃত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের বিশদ রিপোর্টটি[১০] ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। তাতে বাংলা সম্পর্কে বলা হয়, "বলা যেতে পারে যে, দেশের প্রতি ২ মাইলের জন্য পাকা বা কাঁচা যাই হোক না কেন, রাস্তা আছে।" কাজেই সেদিক থেকে একথাও বলা যেতে পারে যে, বাংলা অববাহিকায় রাস্তার প্রয়োজন ভালোই মিটেছে। কিন্তু রিপোর্টে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ উক্ত সড়কগুলির অধিকাংশই কেবল যাতায়াত বা পরিবহনের অনুপযুক্ত ছিল না, দেশী দু'চাকার গাড়ি দিয়েও সারা বছর এতে চলাচলে অসুবিধা হতো। সড়কগুলির এই করুণ অবস্থার ৪টি কারণ হলো: (ক) যে মাটি দিয়ে সড়কগুলি নির্মিত হয়েছিল তা অনুপযুক্ত ছিল, (খ) সংযোগবিহীন বড় বড় বিচ্ছিন্ন অংশ ছিল (বিভিন্ন জেলায় ৬৫০টি স্থান এরকম ছিল), যেসব স্থানে পারাপার করার প্রয়োজন হতো, (গ) বর্ষার সময়ে রাস্তার নিম্নাংশগুলি প্লাবিত হয়ে যেতো, (গ) রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচলব্যবস্থা

বাংলা ব-দ্বীপের নদীপথে স্টিমার চলাচল শুরু হয় বৃটিশ নৌবিভাগের প্রাক্তন অফিসার জেমস জনস্টনের উদ্যোগে। ১৮২৫ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে 'এন্টারপ্রাইজ'কে নিয়ে এসেছিলেন। ১৮২৯ সালে বাংলার নদীপথে মেরিন বোর্ড চালিত সকল স্টিমারের অস্থায়ী কমান্ডার নিযুক্ত হন জনস্টন। ১৮৩০ সালে তাঁকে ভারতীয় নদীপথে চলাচলের উপযুক্ত স্টিমারের নকশা প্রণয়নের পরামর্শদানের জন্য দেশে পাঠানো হয়। কিন্তু জনস্টনের আগেও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে গঙ্গার উপর দিয়ে বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের উদাহরণ আছে। তবে এগুলোর অধিকাংশই পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হতো।

গঙ্গার উপর দিয়ে নিয়মিত স্টিমার চলাচল শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এবং সেটি ১৮৩৪ সালের আগে নয়। তখন স্টিমারের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং দীর্ঘ সময় অন্তর এগুলো যাতায়াত করতো, যার ফলে ভাড়াও ছিল বেশি এবং বুকিং পাওয়াও অনিশ্চিত ছিল। এগুলি প্রধানত একমাস অন্তর যাতায়াত করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের বহন এবং কলকাতা ও দেশের অনেক ভিতরে পণ্যপরিবহনের কাজেই এগুলি ব্যবহৃত হতো।

দি ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন (আই. জি. এস. এন.) কোম্পানি নামে একটি বৃটিশ ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানির কাজ শুরু হয় ১৮৪৪ সালে। আরো অনেকে এই ধরনের উদ্যোগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। ফলে ১৮৬০-এর মধ্যে বাংলা অববাহিকায় নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে আরো ৫টি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি গড়ে উঠে।

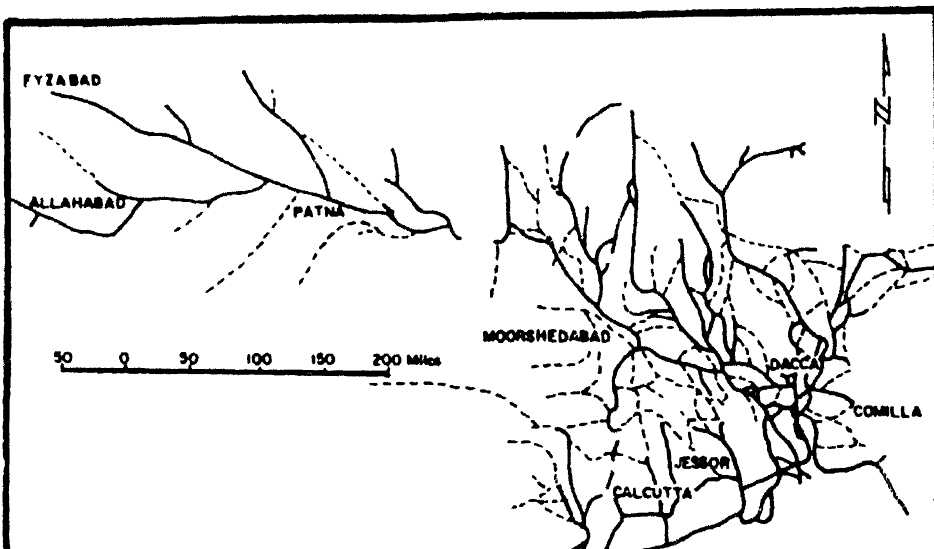
আলফ্রেড ব্রেম[১১] উল্লেখ করেছেন ১৮৫৭ সালে ভারতীয় বিদ্রোহের সময় এই নবগঠিত স্টিমার চলাচল ব্যবস্থা কিভাবে শাসকদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।

১০. A. J. King, *Comprehensive Report on Road Development Projects in Bengal,* Vol. I, Government of Bengal, (Calcutta 1938), 85.

১১. Alfred Brame, *Indian General Navigation and Railway Company Limited Bengal, Assam, Bihar and Orissa,* compiled by Playne and Wright, (London 1917).

অন্তর্দেশীয় বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর সাফল্যের পর্বটি অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। যোগাযোগের ব্যবস্থা হিসেবে এই অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচলের একচেটিয়া অবস্থার পরিবর্তনের একাধিক কারণ রয়েছে। দ্রুততর এবং আরো নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে ১৮৬০ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে বহু সেচপ্রকল্প শুরু হওয়ার ফলে গঙ্গার উজানের দিকের অঞ্চলে নৌ-চলাচল ব্যবস্থা হ্রাস পেতে লাগলো এবং নদীখাতের ক্রমাগত পরিবর্তন হওয়ার কারণে প্রণালীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ উপেক্ষিত হতে থাকলো।

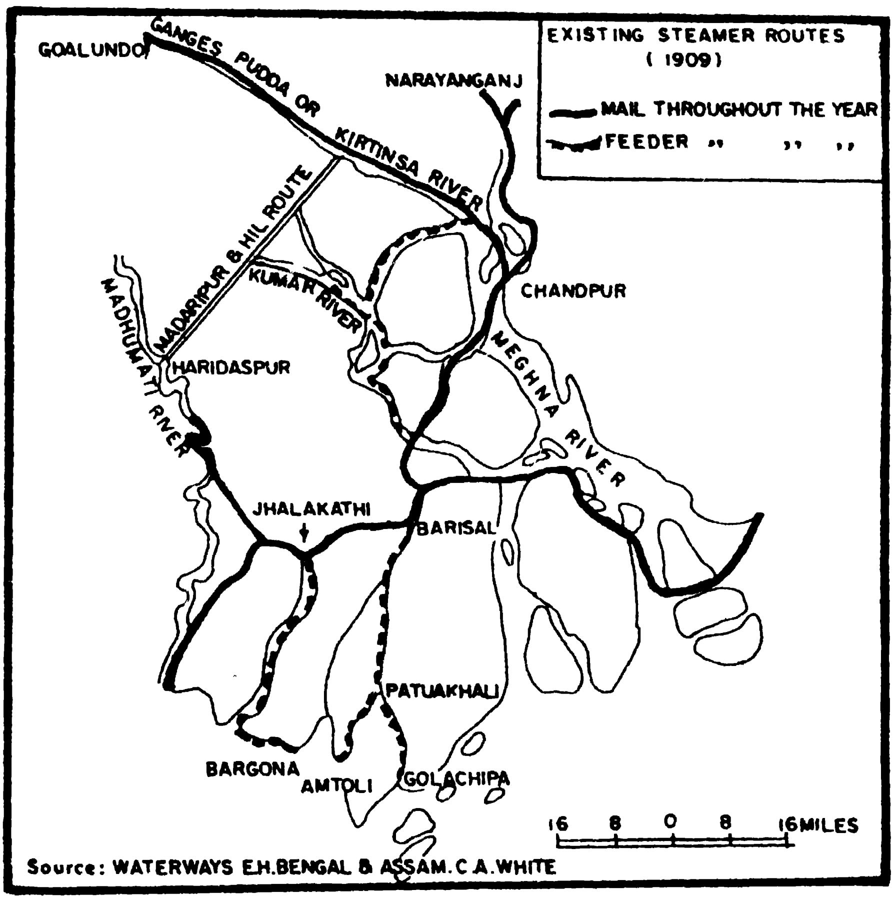
এই সবকিছুর ফলে আই. জি. এস. এন. কোম্পানিকে ১৮৬৮-৭০ সময়কালে তার একাধিক জাহাজকে বসিয়ে দিতে হলো।



চিত্র ৩ : ভারতীয় নৌপথ

ব্রহ্মপুত্র দিয়ে নিয়মিত স্টিমার চলাচল শুরু হয়েছিল ১৮৬০ সালে। এর সাফল্যে ১৮৬৩ সালে সুরমা উপত্যকায় বাষ্পচালিত নৌযান চলাচল শুরু হয়। ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার এই ব্যবস্থা বেশি বেশি করে আই. জি. এস. এন. কোম্পানির নজর কাড়তে লাগলো। ফলে গঙ্গার নৌ-চলাচল ব্যবস্থায় মন্দা আসে এবং অবশেষে ১৮৭৪ সালে সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

আই. জি. এস. এন. কোম্পানি ছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য কোম্পানি হলো রিভার স্টিম কোম্পানি। ১৮৭৩ সালে এটি রিভার স্টিম নেভিগেশন কোম্পানিতে (আর. এস. এন.) পরিণত হয়। অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে ১৮৬২ সালে এর অনুপ্রবেশ। আর. এস. এন. কোম্পানি শীঘ্রই আই. জি. এস. এন. কোম্পানির অনুরূপ নৌ-চলাচলের সমস্ত পথই প্রতিষ্ঠা করলো। সেগুলি হলো কলকাতা ও আসামের মধ্যে বাংলাদেশ হয়ে যোগাযোগের পথ। কিন্তু উনিশ শতকের আশির দশকের শেষদিকে একই পথ দিয়ে দু'টি সংস্থার স্বাধীনভাবে জাহাজ চালানোর ক্ষেত্রে ক্রমাগত অসুবিধা দেখা দিতে লাগলো। এই পরিস্থিতি ঐ দু'টি সংস্থাকে একটি চুক্তি সম্পাদনের দিকে চালিত করলো ১৮৮৯ সালে। এতে বলা হয় যে, সকল প্রধান পথে যৌথভাবে কাজ চালানো হবে। ভবিষ্যতের সব রকম সম্প্রসারণ, বোঝাপড়া এবং চুক্তির নিয়মগুলিকেও যৌথ উদ্যোগে আনা হয়। তবে কোম্পানি দু'টি নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেছিল।



চিত্র ৪ : স্টিমার চলাচল পথ, ১৯০৯

১৮৯৬ সালে আই. জি. এস. এন. কোম্পানি ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে ময়মনসিংহকে সংযুক্ত করার রেলপথ নির্মাণের এক মঞ্জুরি পায়। ১৮৯৯ সালে এটি এর সদর দপ্তর লন্ডনে নিয়ে যাবার অনুমতি পায় এবং নাম পরিবর্তন করে এর নতুন নাম রাখে ইন্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন এ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড।

স্টিমারগুলি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ও সেগুলোর শাখাপথ ধরে চলাচল করতো। প্রথমটি হলো কলকাতা ও পাটনার মধ্যে গঙ্গা ডেসপ্যাচ সার্ভিস, যা সারাবছর ধরেই চলতো। দ্বিতীয় পথটি ছিল ব্রহ্মপুত্র দিয়ে গঙ্গা ও ডিব্রুগড়ের মধ্যে।

কলকাতা-ডিব্রুগড় পথটি সারাবছর ধরে খোলা থাকতো। এটি দিয়ে দৈনিক যাতায়াত ও সাপ্তাহিক পণ্যপরিবহন চলতো। এগুলি যেতো সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে।

সপ্তাহে তিনবার যাতায়াতের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম এবং বরিশালের মধ্যে আরেকটি প্রধান পথ ছিল, যা দিয়ে সারাবছর যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতো। কাছাড় বিভাগে প্রধান পথটি সারাবছর চালু থাকতো, যা কলকাতা থেকে প্রসারিত হয়ে শিলচর পর্যন্ত গিয়েছিল। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য জমা হলে এতে সাপ্তাহিক সার্ভিস দেয়া হতো। এই পথটিই কলকাতা-নারায়ণগঞ্জ সরাসরি সাপ্তাহিক সার্ভিস হিসেবে মেঘনা নদীতে গিয়ে সামান্য বাঁদিকে বেঁকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছাতো।

একটি প্রধান পথ ছিল নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরের মধ্যে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পথগুলি খুলনা ও নারায়ণগঞ্জের সংযোগ ঘটাতো সারাবছর, আর খুলনা ও চাঁদপুরের যোগাযোগ ঘটাতো কেবল বর্ষার সময়। পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা ও আসাম মিলিয়ে ৫টি পথ ছিল—আসাম পথ, চট্টগ্রাম পথ, কাছাড় পথ, উত্তর-পশ্চিম পথ ও বরিশাল পথ।

প্রধান নদীপথের সাথে যেসব শাখাপথ যুক্ত ছিল, সেগুলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নৌ-পরিবহনের গুরুত্ব তুলে ধরে।

ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ারে আছে, বিশ শতকের প্রথম দশকে পদ্মা দিয়ে স্টিমার চলতো দামুকদিয়া ঘাট, রামপুর-বোয়ালিয়া ও গোদাগারির মধ্যে, আর ইংলিশ বাজার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে চলতো ইংলিশ বাজার ও সুলতানগঞ্জের মধ্যে। পদ্মার নিম্নভাগে যেখানে নদীটি মেঘনার সঙ্গে যৌথ মোহনায় মিলিত হয়েছে, সেই অংশ দিয়ে নদীপথে স্টিমার ও দেশী নৌকা চলতো সব ঋতুতে। গোয়ালন্দে যেখানে পদ্মা উত্তর থেকে আগত যমুনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেখানে স্রোত এত তীব্র ছিল ও জলরাশির মিলনের ফলে "এত অসংখ্য ঘূর্ণির সৃষ্টি হতো যে, বিশালকায় ও শক্তিশালী স্টিমারগুলি আসামের পথে প্রায়ই এগুতে পারতো না এবং নদী শান্ত হওয়া পর্যন্ত ... দিনের পর দিন ... দাঁড়িয়ে থাকতো।"[১২]

১২. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, 1878,* 20 Vols., Vol V, reprinted in India by D K Publishing House, (New Delhi 1974), 261

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচল ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কমিটির রিপোর্ট[১৩] অনুযায়ী সেই সময় থেকেই পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে কয়েকটি জলপথের উন্নত রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও এই উদ্যোগ নেয়া হয়। তখনো একইভাবে রেলপথের ঘাটতির কারণে জলপথের প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

এই শতকের গোড়ায় বড় বড় স্টিমারস্টেশনগুলি দিয়ে প্রতি মাসে যাতায়াতের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জ ছিল তালিকার শীর্ষে (২৩২ বার); এরপর ছিল যথাক্রমে খুলনা (১৯২ বার), গোয়ালন্দ (১৭৮), বরিশাল (১১৮),কলকাতা (১০৮), পটুয়াখালী (৯০), চাঁদপুর (৭৬), মারকুলি জং (৬০), শিলচর (৪৬), ডিব্রুগড় (৪৪), সিরাজগঞ্জ (৩৮), সিলেট (৩৮) এবং গৌহাটি (৩৪)।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার[১৪] নারায়ণগঞ্জকে 'দেশী সামগ্রী বেচাকেনার এক উৎকৃষ্ট গঞ্জ' বলে বর্ণনা করেছেন। খুলনা শহরকে *ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার* বলেছে সুন্দরবন অঞ্চলের রাজধানী। গোয়ালন্দ ছিল পূর্ববাংলার রাষ্ট্রীয় জলপথ ও বহু গুরুত্বপূর্ণ স্টিমারপথের সমাপ্তিস্থল ও বিপুল পরিমাণ পরিবহনযোগ্য বাণিজ্যপণ্যের মজুদ- কেন্দ্র। বাংলা ও আসামের মধ্যে নদীতীরবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে বরিশালের স্থান ছিল চতুর্থ। চাঁদপুর ছিল অতি দ্রুত গড়ে উঠা শহর এবং পাট- ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জনসংখ্যার বিচারে এটি খুব বড় কিছু না হলেও মেঘনার বুকে নৌযান বদলের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

সিরাজগঞ্জ ছিল উত্তর-পূর্ব বাংলার জেলাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মজুদ ও সরবরাহকেন্দ্র। এর ঠিক পশ্চাৎদেশে পাবনা ছিল উৎপাদন ও পণ্যভোগের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বাকেরগঞ্জের ঝালকাঠি ছিল পূর্ববাংলার সর্ববৃহৎ কাঠব্যবসাকেন্দ্র। রাজশাহী জেলায় পদ্মার তীরে রামপুর বোয়ালিয়া ছিল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এভাবে তালিকা অনেক বাড়ানো যায়। আমরা সেদিকে না গিয়ে বরং এটুকু বলতে পারি যে, অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচল এভাবে বাংলা ব-দ্বীপের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তার কেন্দ্রগুলি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল।

রেলপথ যখন এলো

লর্ড ডালহৌসির[১৫] ১৮৫৩ সালের *মিনিট অন রেলওয়েজ*-এ বড় বড় শহর ও সেনাছাউনিস্থলগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী প্রধান পথগুলির প্রথম পূর্ণাঙ্গ নকশা আছে।

১৩. *Report of the Inland Water Transport Committee*, (Chairman: Gokhale), Government of India, (New Delhi 1959).

১৪. W. W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*.

১৫. Lord Dalhousie, *Minute* by the Most Noble the Governor General dated the 20th April, 1853.

ইতিমধ্যে ১৮৬৯ সাল থেকে লর্ড মেয়ো প্রধান পথগুলির সঙ্গে সংযুক্ত উপপথগুলি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদনশীল জেলাগুলিকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে সমগ্র দেশকে উন্মুক্ত করা। ভারতে রেলপথের সূচনার প্রথম দুই দশকের মধ্যে প্রধান পথের মৌলিক কাঠামোটি নির্মাণ শেষ হয়েছিল ও তারপর শাখাপথগুলি গড়ে তোলার এবং কম প্রশস্ত ছোট ছোট পথ সস্তায় নির্মাণের পর্ব শুরু হয়।

পূর্ববাংলার বাণিজ্যের জন্য ১৮৬২ সালে রাষ্ট্রীয় রেলপথ চালু হয়। কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া ও দামুকদিয়া পর্যন্ত নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে নামে একটি পথ, পরে যেটি ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে মিশে যায়, তা কুষ্টিয়ার বিপরীত দিকে গঙ্গার উত্তরকূল থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর একটি পূর্বদিকে ধুবরি পর্যন্ত এগিয়ে যায়, আর পশ্চিমদিকে কাটিহার পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে উত্তর বিহারের সঙ্গে আসাম ও উত্তরবাংলার সংযোগ ঘটায়। রেলপথের আরেকটি সম্প্রসারণ কলকাতাকে যশোর ও খুলনার সঙ্গে ব-দ্বীপের উত্তরাংশের মধ্য দিয়ে যুক্ত করে। কিন্তু ভূখণ্ড সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার দরুন দু'টি পৃথক বিভাগ এই অঞ্চলে গড়ে উঠে। একটি ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ও অপরটি চট্টগ্রামের সঙ্গে চাঁদপুর, কুমিল্লা ও লাকসামকে যুক্ত করে।

১৮৯০-৯১ সালের মধ্যে ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে সিস্টেমের ৭৮২$\frac{২}{৫}$ মাইল রেলপথের প্রসার ঘটে। পূর্বাঞ্চলীয়, দক্ষিণাঞ্চলীয় ও বর্তমানে সংযুক্ত নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে লাইনের অংশসহ বাংলার উত্তরাঞ্চল জুড়ে এই প্রসার ঘটে। এর মধ্যে ২৫৪$\frac{২}{৫}$ মাইল ব্রডগেজ, ৪৯১ মাইল মিটারগেজ ও ৩৭ মাইল রেলপথ ২ ফুট ২ ইঞ্চি গেজসম্পন্ন ছিল।

আসাম-বাংলা রেলপথটি রাষ্ট্রীয় পথ হিসেবে নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয় ১৮৯১ সালে এবং নির্মাণ কোম্পানিটি গঠিত হয় ১৮৯২ সালে। ১৯০৩ সালের মধ্যে প্রায় ৩৪২ মাইল রেললাইন স্থাপন করা হয় মৈশাসন থেকে করিমগঞ্জ হয়ে তিনসুকিয়া পর্যন্ত। এই পথটি শিলচর থেকে দক্ষিণ দিকে বর্ধিত হয়েছিল সুরমা উপত্যকার পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্ত চট্টগ্রাম পর্যন্ত। এই পথেরই দ্বিতীয় শাখাটি আসাম উপত্যকার দক্ষিণে গৌহাটি থেকে তিনসুকিয়া পর্যন্ত গিয়েছিল ও সুরমা উপত্যকার শাখার সঙ্গে উত্তর কাছাড় পাহাড়ে প্রবিষ্ট লাইনটি দ্বারা লুমডিং-এ সংযোজিত হয়েছিল। রেলপথটির কাজ ১৮৯১ সালে শুরু হওয়ার পাঁচ বছর পর চাঁদপুর থেকে বদরপুর পর্যন্ত প্রায় ১১৫ মাইল যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯০৩ সাল নাগাদ। পুরনো নোয়াখালীর রেলপথটি ওল্ড আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা ১৯০৫ সালের শেষভাগ নাগাদ তৈরি হয়েছিল। সরকার এটা কিনে নেয় ও ১৯০৬ সালে একে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অঙ্গীভূত করা হয়।

এল. এস. এস. ও'মালী[১৬] তাঁর *বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা এ্যান্ড সিকিম* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৯১২ সালের মধ্যে প্রদেশভিত্তিক চালু রেললাইনের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ ছিল।

সারণি ৩ : রেলপথের দৈর্ঘ্য (মাইলে)

রেলপথ	বাংলা	বিহার ও উড়িষ্যা
আসাম-বাংলা	২১৭	-
বাংলা-ডুয়ার্স	১৫৩	-
বাংলা-নাগপুর	৩৩৩	৮৩৩
বাংলা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	-	৯২৮
পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা	১২৬৪	১৭০
পূর্ব ভারত	৩৯৪	১০৪০
মোট	২৩৬১	২৯৭১

[illegible]
ব্রডগেজ। মিটারগেজ ছিল পদ্মার উত্তরে আর ব্রডগেজ ছিল পদ্মার দক্ষিণে। গঙ্গার উপর সারার কাছে একটি সেতু নির্মিত হবার ফলে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতে সান্তাহার পর্যন্ত ব্রডগেজের প্রসারণ ঘটেছিল। অন্যত্র এ দুই ব্যবস্থার মধ্যে স্টিমারফেরি দিয়ে সংযোগ ঘটানো হতো।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে মিটারগেজ লাইন চালু হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। এটি আসামকে চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। কলকাতার সঙ্গে সংযোগ ঘটতো চাঁদপুরগামী একটি শাখা লাইন দিয়ে; আর ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে ট্রেন ধরার জন্য গোয়ালন্দ পর্যন্ত স্টিমার যেতো।

বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে চালু হয় ১৮৯৫ সালে। এটি ছিল মিটারগেজে এবং তা ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও লালমনিরহাটে যুক্ত ছিল।

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কলকাতা থেকে উত্তরাঞ্চল, বাংলার পূর্বাঞ্চল ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগে এটিকে বলা হতো ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। এটি কুচবিহার রেলওয়েকে (৩৩ মাইল) চালু রেখেছিল এবং কলকাতা থেকে খুলনা পর্যন্ত বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের লাইনটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

ইম্পেরিয়াল গেজেটের মানচিত্র[১৭] খণ্ডে ১৯৩১ সালের 'রেলওয়েজ এ্যান্ড ইনল্যান্ড নেভিগেশন' সম্পর্কিত একটি মানচিত্র আছে। এটি বাংলাদেশের মধ্যে রেলপথের বিস্তার পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেকার পরিস্থিতি দেখিয়েছে। ততোদিনে প্রায় সমগ্র

১৬. L S S O'Malley, *Bengal Bihar, Orissa and Sikkim,* 254
১৭. *The Imperial Gazetteer of India* Vol. XXVI. new (revised) Edition, Oxford. 1931.

দক্ষিণ ও উত্তর বাংলা ব্রডগেজ লাইনের আওতায় এসে গিয়েছিল। মিটারগেজ লাইন চাঁদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামকে লাকসাম, আখাউড়া, বদরপুর ও শিলচরের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। আরেকটি ছোট মিটারগেজ পথ চালু ছিল নেত্রকোণা-ময়মনসিংহ-ঢাকার মধ্যে।

এই রেলপথগুলি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে লাভজনক হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন বিবরণে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন এর উল্লেখ আছে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে। ১৮৮০-৮১ সালের রিপোর্টটি[১৮] নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে সম্বন্ধে বলেছে :

> এর যাতায়াতব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, এবং শাখাপথগুলি সদ্য কাজ শুরু করলেও এই পথে পণ্যপরিবহনের মোট পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটেছে ১৮৭৮-৭৯তে ২১.৩৯ শতাংশ ও ১৮৭৯-৮০তে ৮৬.৯১ শতাংশ হারে। লেনদেনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

দশ বছর পরে ১৮৯০-৯১ সালের রিপোর্ট[১৯] ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের কাজ নিয়ে একটি সাধারণ সমীক্ষার ফল প্রকাশ করে ও সন্তোষ প্রকাশ করে বলে, "গঙ্গার উত্তরের রেলপথগুলির সম্ভাবনা দারুণ আশাব্যঞ্জক। আসাম-বিহার বিভাগ দিয়ে যাতায়াত দ্রুত বেড়ে চলেছে। ঢাকা লাইনে এখন মুনাফা হচ্ছে ও আরো উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।"

১৯২১-২২ সালের মধ্যে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে রেলপথে উপার্জনতালিকার শীর্ষে উঠে এলো চক, চুন, চুনাপাথর, কয়লা ও কোক, ইউরোপীয় সুতীর সামগ্রী, কাঁচা পাট, থলে, কাপড়, মসলাপাতি, চা ও তামাক পরিবহন করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে রেলপথ উন্নয়নের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ১৯২৩ সালে কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক সমস্ত রেলপথকে আবশ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অধীনে আনার সিদ্ধান্তটি। অবশেষে ঠিক হয়েছিল যে, চুক্তির মেয়াদকালের শেষে সমস্ত রেলপথকে ভারত সরকার অধিগ্রহণ করবে।

রেলপথ স্থাপনের ফলে অর্থনীতি ও জনবসতির বিস্তার ও সংযোগস্থলগুলির প্রসারের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এলো, তাতে বাণিজ্যসঙ্কটের দরুন কয়েকটি মাত্র শহরই পথে বসলো। ১৯১১ সালে *দি সেনসাস অব ইন্ডিয়া* লিখেছে যে, বেশ কিছু শহরের লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো 'নদীভিত্তিক না হয়ে রেলভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার'।

কলকাতা বন্দরের সঙ্গে পূর্বভারতের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে যুক্ত করে রেলের এক নতুন পণ্যচলাচলব্যবস্থা কায়েমের ফলে বহু শহরের উপর এর পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল। পূর্বভারতের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী দেশী শিল্পে কর্মরত বা তার উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যার ভয়াবহ হ্রাসের মধ্যেই এই ব্যাপারটা অনুমান করা যায়।

১৮. *Annual Report 1880-81*
১৯. *Annual Report, 1890-91*

১৯২১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলার রেশম, পশম, পিতল, তামা, ধাতু, সুতা তৈরি, তাঁত বুনন, চামড়া ও বাস্কেট তৈরি শিল্পে শ্রমিক ও তাঁদের উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা ১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়ে অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।

শেষ পর্যায়

ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলা ব-দ্বীপের রেলপথ ও সড়ক উন্নয়নের চিত্রটি দিয়েছেন এ. জে. কিং তাঁর *কমপ্রিহেনসিভ রিপোর্ট অন রোড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস ইন বেঙ্গল*-এ। কিং-এর ১৯৩৮ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৩৮ সালে স্টিমারচলাচলের মোট পথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২০০০ মাইল। প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থায় মোট ১৪টি রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৩৫৭ মাইল। সড়ক সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রদেশের মধ্যে তৎকালীন বাঁধানো ও কাঁচা সব রকমের রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৯১৯৩৬ মাইল। এর জেলাওয়ারি হিসাব নিম্নরূপ :

সারণি ৪ : সড়ক ও রেলপথসমূহ

জেলা	রেলপথ	রাস্তা (মাইলে)	
		(ক) সরকারি	(খ) জেলা বোর্ডের
যশোর	৬৬.০	৩৮.০	৩৯০.৯
খুলনা	৩৬.০	-	২১৯.১
ঢাকা	১১৮.০	-	২৫৩.৮
ময়মনসিংহ	২৩০.০	-	৪১৬.১
ফরিদপুর	৯০.০	-	২৮৯.৬
বাকেরগঞ্জ	-	-	৩৬৬.৪
চট্টগ্রাম	৯৭.০	৪৮.৯	২৩৮.৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম	-	-	-
নোয়াখালী	৪৮.০	১৩.৯	২০২.৮
দিনাজপুর	১৩১.০	১৪.০	৪৩১.৩
রাজশাহী	১০১.০	-	৫৯০.৬
রংপুর	২০৫.০	-	৭৬৩.০
বগুড়া	৮৬.০	-	৩৪২.৮
পাবনা	৬৯.০	-	৩৯৬.৬
মালদহ	৮৫.৫	-	৩১৭.৬
২৪-পরগনা	১৪৭.০	৬০.১	৪০৬.১
নদীয়া	১৮০.০	-	৪৯১.২
মর্শিদাবাদ	১৩৪.০	-	২০৯.৪

১৯৩৮ সালে প্রদেশে ৮টি স্টিমারকোম্পানি ছিল। এগুলি হলো (১) ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন এ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড, (২) রিভার স্টিম নেভিগেশন

কোম্পানি লিমিটেড, (৩) বেঙ্গল-আসাম স্টিম সার্ভিস কোম্পানি, (৪) বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড, (৫) ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টিম সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড, (৬) ঘাটাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড, (৭) চাঁদবালি রিভার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড এবং (৮) বঙ্গীয় ইনল্যান্ড স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড।

এইভাবে, বৃটিশরা যখন এই দেশ ত্যাগ করে, তখন বাংলা ব-দ্বীপটি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের এক সারি কেন্দ্রসহ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার একটি মৌলিক কাঠামো লাভ করেছিল। অন্তর্দেশীয় নৌ-চলাচল থেকে রেলপথ পর্যন্ত পরিবহন ব্যবস্থার ধরনের পার্থক্যসহ মৌলিক সব পার্থক্যের উপর ঐ কেন্দ্রগুলির বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে।

এটা এখন সবাই মানেন যে, রেলপথের প্রচলন ও নতুন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার সাবেকি শিল্পের অধঃপতনের শুরু। ১৮১৭ সালে এককভাবে ১৫২ লাখ টাকার সূক্ষ্ম মসলিনের রপ্তানিকারক ঢাকা বিকাশলাভ করেছিল এর উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে। কেবল উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে নয়, জমজমাট বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠেছিল ঢাকার মতো আরো কয়েকটি কেন্দ্র। এটি এখন আর তর্কের ব্যাপার নয় যে, কলকাতার সঙ্গে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে রেলপথ বাংলা ব-দ্বীপটির যে ব্যাপক সংখ্যক শহরের বাণিজ্যকে দখল করে নিল, সেগুলি ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিকাশরুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছালো। রেলপথের মধ্যে না পড়ার দরুন আরো অনেক শহর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু রেলপথ উন্নয়নের এই পর্যায়ে কলকাতারই পশ্চাৎভূমির অন্তর্গত বেশ কিছু ছোট নগরকেন্দ্রকে পরোক্ষভাবে শিল্পহীনতা ও জনসংখ্যার ঘাটতির জন্য ক্ষতিস্বীকার করতে হয়।

কিন্তু বাংলা ব-দ্বীপটি একটি সুবিধার ব্যাপারে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা ছিল। সেটি হলো, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ভূখণ্ডে রেলপথ প্রকৃতপক্ষে কখনো নৌ-চলাচল ব্যবস্থার স্থান দখল করতে পাবে নি এবং ফলশ্রুতিতে তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক আমলের সবচেয়ে প্রভাবশালী শহর কলকাতার একচ্ছত্র প্রভাব থেকে এই অঞ্চলের অনেক কেন্দ্রকেই মুক্ত থাকতে ভৌগোলিকভাবে সাহায্য করেছে।

১৮

মজুর শ্রেণীর অর্থনীতি

ভেলাম ফান স্বেন্ডেল*

উপক্রমণিকা[১]

গ্রামীণ মজুরদের কথা কেন আমরা এত কম জানি ?

বাংলাদেশ তার দারিদ্র্যের জন্যই আজকাল বেশি পরিচিত। তীব্র সম্পদসঙ্কটের ফলে তার কোটি কোটি নাগরিক আজ মানবেতর জীবনের মুখোমুখি। বেঁচে থাকার জন্য তাদের অপরিমেয় সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণতিতে পরিবেশের অবনতি, আর্থিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পুরাতন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভাঙন, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বেশিকরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেশের বিশিষ্ট জমিদারদের বংশধর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত ভুঁইফোড়দের নিয়ে গঠিত এলিট শ্রেণীকে বিদেশী সরকারেরা তথাকথিত উন্নয়নের জন্য দেশের অভিভাবকের আসনে বসিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিকদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য এক জীবনধারা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ব্যর্থ দেশ হিসেবেই থেকে গেল।

বাংলাদেশের সমাজবিষয়ক সমীক্ষাও একইভাবে অনুন্নত। অবশ্য গত বিশ বছর ধরে 'উন্নয়নের জিগির' অনেক সমীক্ষার জন্ম দিয়েছে; তার বেশির ভাগই নীতিসমস্যার সঙ্কীর্ণ গলিতে আবর্তিত হয়েছে। খুব অল্পসংখ্যক সমীক্ষা প্রকৃত গবেষণার ফসল। ফলে বেশিরভাগ সমীক্ষায় দেশের বহুবিধ সমস্যার কারণসমূহ সঠিকভাবে নিরীক্ষা না করেই তার সমাধানের পথ দেখাতে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের এবং বিদেশের

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, এরাসমাস বিশ্ববিদ্যালয়, রটারডাম, নেদারল্যান্ড।

১. Faraizi এবং আমার কৃত গবেষণার আর এক সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই প্রবন্ধ। সেখানে বাংলার গ্রামীণ মজুরদের বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। দেখুন Willem Van Schendel and Aminul Haque Faraizi, *Rural Labourers in Bengal, 1880 to 1980,* (Rotterdam 1984); Willem Van Schendel, "Rural Transformation in Bangladesh and West Bengal, 1880-1980", *Journal of Social Studies,* 28 (1985), 17-41

সামাজিক ঐতিহাসিকবৃন্দ বর্তমানে সত্যিকার অর্থে এদেশের গণদারিদ্র্যের কারণ ও ফলাফলের সমীক্ষায় অবদান রাখছেন, যা যথার্থ বলে প্রমাণিত হতে পারে। ক্রমে ক্রমে আমরা বাংলাদেশে বহুদিন বিরাজমান ধারাকে লক্ষ্য করতে এবং ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছি। অনুন্নত অবস্থায় মূল নিয়ামক নির্ধারণে ঔপনিবেশিকতাবাদকেন্দ্রিক সহজ-সরল ও অগভীর ব্যাখ্যা অথবা বিপরীতে বাঙালি সংস্কৃতির অসম্পূর্ণতাব নিছক অনুমাননির্ভর ধারণাভিত্তিক ব্যাখ্যাকে অতিক্রম করে আরো গভীরে আমরা যাবো। নতুন ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সারা পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হবে, যে প্রক্রিয়ার ফলে 'দরিদ্র পৃথিবী' গত দুশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে 'তৃতীয় বিশ্বের' সীমানার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আরো নিরীক্ষা করবো কোন্ বিশেষ সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং কিভাবে বাংলাদেশে ঐ প্রক্রিয়া সহজে প্রবেশ করেছে বা ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকেও সমীক্ষার আওতায় এনে এই নতুন ধারায় বাংলাদেশের সামাজিক রূপান্তরেব বৈশিষ্ট্যগুলোও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে।

আমার এ আলোচনায় সেই রূপান্তরের একটি দিক আমি তুলে ধরতে চাই। তা হচ্ছে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে একটি গ্রামীণ সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব। বাংলাদেশের বিশাল গ্রামীণ জনসংখ্যা এবং বৃটিশ আমলের পর্যাপ্ত সহজলভ্য তথ্যাবলীর উপস্থিতি সত্ত্বেও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই সময়ের গ্রামীণ মজুর এবং গ্রামীণ বাজারের উদ্ভব সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। এর পেছনে তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, গ্রামীণ মজুরেরা ঔপনিবেশিক শাসকদের চিন্তার বিষয় ছিল না। কেননা পূর্ব বাংলা এমন কোন উপনিবেশ ছিল না, যেখানে ইউরোপীয় খামারমালিক ও শিল্পপতিদের জন্য বিরাট সংখ্যক এদেশীয় মজুরের প্রয়োজন ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে নীলচাষের জন্য স্থাপিত খামারগুলো ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ শিল্প (প্রথমে রেশম ও পরে পাট) পূর্ব বাংলায় বিদ্যমান ছিল না, ছিল পশ্চিম বাংলার কলকাতায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে বা অন্য কোন দূরান্তে নয়া বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনকালে বাংলার মজুরেরা বহির্গমনে আদৌ অংশগ্রহণ করে নি বিধায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষও তাদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো কোন কিছু পায় নি। আসাম ও সিলেটের[২] চা-বাগানগুলোর জন্য বেশিরভাগ মজুর সংগ্রহ করা হয় পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপজাতীয়[৩] অধিবাসীদের থেকে। যদিও ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে

বাংলাভাষী সিলেট জেলা ১৮৭৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আসাম প্রদেশেব অংশ ছিল।

ভাবতীয় উপমহাদেশে অল্পসংখ্যক লোকগোষ্ঠীকে (যাদের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রধান জনগোষ্ঠীগুলো থেকে আলাদা) 'উপজাতি' নামের পুরনো রীতিতে চিহ্নিত কবা হয়। এই শব্দটি ভুল এই কাবণে যে এই অভিধাটি এই কল্পকথাকেই স্থায়িত্বদান কবে যে, এসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী প্রধান জাতিগুলোর চেয়ে কম সভ্য এবং সমজাতিক বৈশিষ্ট্যেব অধিকারী পৃথক জাতিগোষ্ঠী তথা উপজাতি। দক্ষিণ এশিয়াব সমাজে এই শব্দের খুব বেশি সহজ ব্যবহাবেব ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও সৃষ্টি হয়ে চলেছে এমন এক মানসিকতা, যা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে হত্যা পর্যন্ত করতে প্রণোদিত করতে পাবে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আজকের প্রভাবশালী জাতি হচ্ছে বাঙালি এবং সংখ্যালঘু হচ্ছে সাওতাল, ওঁবাও, কোচ, গারো, হাজং, খাসী, মনিপুরী, চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, সাক, বাউম, পংখুয়া, লুসাই, টংগচেঙ্গিয়া, ক্রুংগবিয়াংগ, খিয়াংগ, খুমী এবং ম্রু।

মজুর প্রেরণের বন্দর হিসেবে কলকাতা উল্লেখযোগ্য হয়ে পড়ে, তথাপি মজুরদের প্রায় সবাই ছিল বিহার এবং উত্তর প্রদেশের।

তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলার গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কোন আগ্রহই ছিল না; কেননা নিবিড় তদারকি ছাড়াই জমিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচুর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে যখন বৃটিশেরা কৃষি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে শুরু করে, তখন তাদের দৃষ্টি ছিল ভূমিমালিক কৃষকদের দিকে, মজুরদের দিকে নয়।

এই সমস্ত কারণে ঔপনিবেশিক দলিলপত্রে গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে ধারাবাহিক বা সম্পর্কযুক্ত তথ্য পাওয়া যায় না এবং বিক্ষিপ্ত তথ্য থেকে সে বিষয়ের স্বরূপ উদঘাটন ছিল এক দুরূহ কাজ। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ঐতি হাসিকগণ প্রথমে উন্নততর তথ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। ফলে, ঔপনিবেশিক গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটতে থাকে, বিশেষকরে এর ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে।

কিন্তু এতে কি লাভ হতে পারে? এমন অবস্থায় বিদ্যমান উৎস-দলিলসমূহ কি ঐতিহাসিকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না? তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ইতিহাসের ছাত্ররা বহুলাংশে এই সনাতন উৎসের উপর, বিশেষকরে বিপুল সরকারি দলিলের উপর বেশিকরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ বিদেশে, বিশেষকরে আফ্রিকায় এমনটি দেখা যায় না। কিন্তু যেসমস্ত সমস্যা আজ পৃথিবীব্যাপী সামাজিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তার সবগুলোকে বিবেচনায় আনতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে সরকারি দলিলের বাইরেও যেতে হবে। সাধারণ মানুষ, নারীসমাজ, মজুর এবং সংখ্যালঘুশ্রেণী (উল্ফের আখ্যা অনুযায়ী[৪] এখনো যাদের বেশিরভাগ 'ইতিহাসহীন মানুষের দল') সম্পর্কে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তথা ধারণা পুনর্গঠন নতুন উৎস-দলিল পরীক্ষার এবং নতুন গবেষণার দাবি রাখে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপেক্ষিত এক প্রয়োজনীয় দলিল হচ্ছে পুঁথি-সাহিত্য, যাকে ভিত্তি করে রফিউদ্দিন আহমেদ গ্রামীণ মুসলিম পরিচিতির এক অনুপম সমীক্ষা পরিবেশন করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নৃবিদ্যার বিকাশের উপস্থাপনার জন্য অলিখিত উৎসসমূহকে আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে ব্যবহার করতে হবে।[৫] শুধু এভাবেই যেসব ধারণা মজুর, নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের সামাজিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী হিসেবে তুলে না ধরে পরিস্থিতির নগণ্য শিকারে পরিণত করেছে, সেসব ধারণা পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে।

৪. Eric R. Wolf, *Europe and the People without History*, (Berkeley, etc. 1982)

৫. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity*, (Delhi 1981). ঐতিহাসিক পুনর্গঠনে মৌখিক উৎসের ব্যবহার সম্বলিত সমীক্ষার জন্য দেখুন, Adrienne Cooper, *Sharecropping and Sharecoppers' Struggles in Bengal, 1930-1950*, (অপ্রকাশিত Ph D থিসিস, University of Sussex 1984), বা আমার *Peasant Mobility: The Odds of Life in Rural Bangladesh*, (Assex 1981/Delhi 1982).

বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের ইতিহাসের বেশিরভাগই আরো অজানা রয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে মৌলিক ইতিহাস প্রণয়ন (অলিখিত উৎসের ব্যবহার) আমাদের অভিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ মজুরদের সমীক্ষা অত্যন্ত জরুরি, যা হবে এদের ইতিহাসের প্রধান নিয়ামক।

কেন এই মজুরদের সমীক্ষা ?

ধনতান্ত্রিক বিশ্বঅর্থনীতির উদ্ভব আধুনিক ইতিহাসে প্রাধান্যবিস্তার করেছে। তাই পুঁজিবাদের শেকড়, এর গতিশীলতা, পর্যায়সমূহ ও সম্ভাব্য পতন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক সমাজের এবং উপনিবেশোত্তর সমাজের সমীক্ষা ইউরোপীয় সমাজসমূহে ক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের অনেক প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। শুরুতে পুঁজিবাদের প্রভাব দেখা যায় সমাজের আংশিক এলাকায়, এর পর পুরো সমাজে এবং পরিশেষে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু এর প্রভাব সব সময় সমান ছিল না।

পুঁজিবাদী অগ্রগতির বহুমুখী চরিত্র গবেষণার নতুন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যার বেশিরভাগ জড়িত ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশোত্তর সমাজের কৃষিখাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন ও বিশ্লেষণের সঙ্গে। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক সমাজে কৃষিকে দূরবর্তী বাজারমুখী পণ্যউৎপাদনের উদ্দেশ্যে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভব সম্পর্কে অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষক বা গ্রামীণ সর্বহারা ও উৎপাদন-উপকরণের মালিক বা গ্রামীণ ধনীদের মধ্যে বিভাজন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। বরঞ্চ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অনেক সমাজেই কৃষিউৎপাদন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাঠামোগতভাবে অধনতান্ত্রিক থেকে যায়। এই অবস্থাকে পুঁজির অধীনে শ্রমের 'সত্যিকার' অবলুপ্তি না বলে 'বাহ্যিক' অবলুপ্তি বলা চলে। এই সমাজগুলোতে খামার, মহাল, খনি বা কারখানায় নিয়োজিত কৃষিমজুরদের শ্রমকে 'প্রত্যক্ষ' আত্মসাতের মাধ্যমে শোষণ করা হতো না, কিন্তু শ্রমের পরিবর্তে কৃষক-মজুরদের সৃষ্ট বস্তুকে আত্মসাতের মাধ্যমে 'পরোক্ষভাবে' শোষণ করা হতো।[৬]

ঔপনিবেশিক শাসন বিলুপ্তির পর এই ধরনের সমাজগুলোতে কি পরিমাণ পুঁজিবাদ প্রসারলাভ করেছিল ? দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানীদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গগুলো ছিল কৃষির উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা, প্রজাস্বত্ব, উৎপাদনকারীর বাজারমুখী চেতনা, ঋণ, ভূমি ও শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজির অধিকারভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পুঁজি সংগঠন।

---

৬. Waterbury দেখিয়েছেন যে, এই ধরনের বিপরীতমুখী শোষণপ্রক্রিয়া একই উপনিবেশের অঞ্চলসমূহে প্রভাবশালী হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুসংস্থানগত, সামাজিক কাঠামোগত, ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাবে। দেখুন, Ronald Waterbury, "Non-Revolutionary Peasants : Oaxaca Compared to Morelos in the Mexican Revolution", *Comparative Studies in Society and History*, (1975), 410-441

এই বিতর্কে প্রকাশ পায় যে, সমসাময়িক দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ অঞ্চলে পুঁজিবাদী চেতনার বিকাশ ঘটেছে, যদিও আকারে ও গতিতে এলাকাগত বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।[৭] কিন্তু এই চেতনার গুরুত্ব সম্পর্কে বেশ মতভেদ রয়েছে। উৎপাদনের পুঁজিবাদী সম্পর্ক কোন্ মাত্রায় দক্ষিণ এশিয়ার কৃষিতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় ? উৎপাদনের কি কোন পুঁজিবাদী পদ্ধতি আছে ? যদি তাই হয়, তবে আমরা উৎপাদনের অপুঁজিবাদী সম্পর্কের বিদ্যমানতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো ? এই প্রশ্নগুলো শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, এসব সমাজের উন্নয়ননীতিতেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রবণতা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আগেই ধারণা করা ভুল হবে যে, অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিপুঁজির এলাকাগুলো (যেমন পাঞ্জাব, গুজরাটের কিছু অংশ এবং তামিলনাড়ু) 'পথপ্রদর্শক' এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ধীরগতিসম্পন্ন হলেও মোটামুটিভাবে একই ধারা অনুসরণ করছে। শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্বের পরিমাপে বলা যেতে পারে যে, পুঁজিবাদ ক্রমাগত উন্নতির পথ দেখিয়েছে। কিন্তু কোন বিশেষ সমাজের বা সমাজের অংশের গতিশীলতা সর্বদাই বৈসাদৃশ্য, অস্থিরতা এবং বিপরীতমুখিতার দ্বারা চিহ্নিত। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সুদীর্ঘকালের পুঁজিবাদী উন্নয়নের এক তুলনামূলক সমীক্ষা করা দরকার। বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল আঞ্চলিক বা সাম্প্রতিক চেহারার বিশ্লেষণ বর্তমানে বহুমুখী প্রসারতা প্রদর্শনকারী এলাকাগুলোর অব্যাহত পুঁজিবাদী উন্নয়নের গভীরে দৃষ্টিনিক্ষেপের সুযোগ করে দিতে পারে। বিপরীতভাবে এই ধরনের বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং বর্তমানে পিছিয়ে থাকা কয়েক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উন্নতির নবপ্রচেষ্টার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে পারে।

যাই হোক, 'অনগ্রসরতা'র এই ধারণা স্বয়ং গতিশীলতাকে অবমূল্যায়ন করে, যা ঐ এলাকাগুলোতে উচ্চকিত পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যতিরেকেই বহমান ছিল। এই ধরনের অঞ্চলে কখনো সামাজিক স্থিরতা দেখা যায় না, এমনকি পুঁজিবাদী উন্নয়নে কিছুটা বদ্ধতা দেখা দিলেও স্থানীয় সমাজে রূপান্তরের জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া কাজ করে এবং এই প্রক্রিয়াগুলোকে দক্ষিণ এশিয়ায় পুঁজিবাদের সম্যক বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেয়া যায় না।

এই বিতর্কে উত্তর-পূর্বের এক বিরাট অঞ্চলকে আলাদা করে অপেক্ষাকৃত বদ্ধ এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদপূর্ব কাঠামোর কেন্দ্রভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা রয়েছে। কতিপয় গ্রন্থকার এই এলাকার গ্রামীণ সমাজকে আধাসামন্ততান্ত্রিক আখ্যায় আখ্যায়িত করার পক্ষে মত প্রকাশ

---

৭. D McEachern-এর "The Mode of Production in India", *Journal of Contemporary Asia*, 6 4 (1976), 444-457; এবং Alice Thorner-এর "Semi-Feudalism or Capitalism ? Contemporary Debate on Classes and Modes of Production in India", *Economic and Political Weekly*, (December 4-18, 1982), 1961-1968, 1993-1999 and 2061-2066-এ উৎপাদনপ্রক্রিয়ার উপর বিতর্কের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যেতে পারে।

করেছেন এবং তাঁরা সেসব বৈশিষ্ট্যের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন, যেগুলোকে ভূমিসংক্রান্ত পুঁজিবাদের শ্বাসরুদ্ধকর সূচনা হিসেবে ধরা হয়। অন্যেরা আবার এই আধাসামন্ততান্ত্রিক ধারণাকে সমালোচনা করেছেন এই বলে যে উত্তর-পূর্বের কৃষিতে পুঁজিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল না এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাম্প্রতিককালে আরো বিকশিত হয়েছে।[৮] আবার এটা স্থবিরতা বনাম গতিশীলতার কোন সমস্যা নয়, আর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। আসলে যা দরকার, তা হচ্ছে উত্তর-পূর্বের সমাজগুলো রূপান্তরের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা বিশ্লেষণ করা এবং বুঝতে চেষ্টা করা কিভাবে এই রূপান্তর বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের সাথে এবং স্থানীয় ভূমিসংক্রান্ত বিধানগুলোর সাথে সম্পর্কিত।

গ্রামীণ মজুরদের সমীক্ষা বাংলাদেশে এই রূপান্তরের মাত্র একটা মাত্রার উপর আলোকপাত করে। তা এযাবৎ পুঁজিবাদী কৃষকদের উদ্ভবকে ঘিরে যে আলোচনা চলেছে এবং যা আশ্চর্যজনকভাবে তাদের যুক্তিসম্মত প্রতিপক্ষ গ্রামীণ মুক্ত সর্বহারা শ্রেণী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই আলোচনাকে ব্যাপকতা দিতে সাহায্য করতে পারে।

১৮৮০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যবর্তী গ্রামীণ মজুর

এই আলোচনার সময়কাল ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বেশ কয়েকটি কারণেই ১৮৮০ সালকে আমি প্রারম্ভিক সময় হিসেবে নির্বাচিত করেছি। পূর্ব বাংলার কৃষি গত শতাব্দী থেকে উন্নতির পথে পা বাড়ায় এবং ১৮৮০ সালের দিকে রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষিজ পণ্য বাজারজাতকরণে এবং পরিকল্পিত উৎপাদনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতির সাথে বিশ্বঅর্থনীতির সংযোগসাধন ত্বরান্বিত হয়। এ এমন এক চূড়ান্ত সময়, যখন আন্তর্জাতিক ব্যবসার তরঙ্গ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে বেশ কয়েকটা কারণে ; যেমন সুয়েজ খাল উন্মোচন, বাষ্পীয় জলযানের উন্নয়ন, তারবার্তায় যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং শুল্কনীতির ব্যাপারে বৃটিশ ভারতীয় সরকারের উদার মনোভাবগ্রহণ। এই উন্নতির ফলে গ্রামীণ পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে।

আমাদের অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক সময় হিসেবে ১৮৮০-এর দশককে নির্বাচনের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এই সময় বহুবিধ আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তনের সন্ধিক্ষণ এবং অবশেষে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশে তা সহায়ক হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার বন্ধ করা এবং প্রজাবর্গের কয়েক ভাগকে মিলিত হবার অনুমতি

৮. Amit Bhaduri, "A Study in Agricultural Backwardness under Semi-Feudalism", *Economic Journal*, 38, 329 (1973), 120-137, James K Boyce's *Agrarian Impasses in Bengal Institutional Constraints to Technological Change*, (Oxford 1987), 41-44 , B K Jahangir, *Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh*, (Dacca 1979)

দিয়ে উৎপাদনকারী কৃষকের দীর্ঘতর সময়ব্যাপী পণ্যবপ্তানির ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। যারা এতদিন ধরে ভূমিরাজস্ব ও খাজনার মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত ভোগ করছিল (যেমন জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী), এই ব্যবস্থা তাদের কিছুটা ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু আর এক ধনী কৃষকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে, যারা ব্যবসা ও ঋণের এই নতুন পথে সম্পদশালী হতে থাকে। এইসব নীতির ফলেই ১৮৮০-এর দশক থেকে পরবর্তীকালে গ্রামীণ শ্রেণীভেদের এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয় এবং পরিণতিতে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকেরা আংশিকভাবে ভূমিচ্যুত হতে থাকে।

সর্বশেষে, এই প্রারম্ভিক সময় নির্বাচনের কিছু পদ্ধতিগত কারণও রয়েছে। ১৮৮০ সালের আগেকার গ্রামীণ পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তথ্য খুবই অপর্যাপ্ত এবং তার মান সর্বদাই সন্দেহজনক। এমনকি অতি সাম্প্রতিককালের বিষয়েও তথ্যের উৎস সম্পর্কে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কিন্তু ১৮৮০ সালের পর গ্রামীণ মজুরদের সম্পর্কে প্রায়শ এবং কিছুটা বিশদভাবেই তথ্য পাওয়া যেতে থাকে। প্রথম দিকে তথ্যের বেশির ভাগ আসে সরকারি রেকর্ড থেকে। কিন্তু আলোচ্য সময়ের শেষভাগে অধিকতর স্বাধীন উৎস-দলিল পাওয়া যায়। তা হলেও বেশির ভাগ সময়েই প্রামাণ্য দলিলের অভাব থেকে যায়। অধিকন্তু বিভিন্ন প্রকারে যেসব উৎসের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়, তার তুলনামূলক বিচার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাদের দেয়া তথ্যের মধ্যে শুধু যে সময় ও স্থানের পার্থক্যই থাকে তাই নয়, তা্দের ধাবণার মাত্রারও পার্থক্য থাকে ছোট্ট গ্রাম থেকে সারা বাংলা জুড়ে। কিন্তু এর চেয়েও বড় সমস্যা মজুরের সংজ্ঞার পার্থক্য। এমনকি লোকগণনার মতো উৎস থেকে গৃহীত তথ্যের মাত্র একটি ধারার মধ্যেও সংজ্ঞার এই সমস্যা দেখা যায়। এব পরে থেকে যায় মানের প্রশ্ন। নিম্নমানের গবেষণার জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদেব সম্পর্কে প্রাপ্ত অনেক তথ্যই বিকৃত। এক্ষেত্রে যে গ্রামীণ মজুরদের উপর নির্ভর করা হয়েছিল তাদের তথ্য গোপন করার বা তারা যে মজুরির উপর নির্ভরশীল তা গোপন করার প্রবণতা দেখা দেয়। পরিশেষে, বাংলাদেশের মজুর শ্রেণীর উপর আগেকার সমীক্ষাগুলোতে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্যাবলীর সমন্বয়ের অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে বর্তমান সমীক্ষাকে এক সাধারণ অনুসন্ধানের পর্যায়ে অবনমিত করতে হয়েছে, যাব মধ্যে কিছু চূড়ান্ত বিষয় শুধু উল্লেখ করা সম্ভব।[৯]

৯. ১৮৮০ সালের পূর্বেকার বাংলার গ্রামীণ মজুবদের উপর প্রাথমিক গবেষণার কাজ অনেক বাকি বয়েছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ে এবং ঔপনিবেশিক আমলের প্রাবম্ভিক সময়ের শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহেব সমীক্ষায় গ্রামীণ কাবখানার মজুরদের সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যেতে পাবে। (দেখুন, Prakash, Mitra, Baru এবং Mohsin)। এই সমস্ত কারখানায় সর্বহারার উদ্ভব সম্পর্কে কোন সমন্বিত চিন্তাধারা এবং কয়েকটি কারখানা বিলুপ্তির পর মজুরদের ভাগ্য সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। দাসমজুর এবং দাসপ্রথার প্রামাণ্য তথ্যের জন্য দেখুন, Chattopadhyay and Sarkar ঐ সময়ের পূর্ণ কালের জন্য বাংলাদেশের শহুরে মজুরদের ঐতিহাসিক গবেষণার ব্যাপারে ঐ একই সত্য দেখা যায়।

পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব আরো বেশি করে চোখে পড়ে, যখন দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বিবরণ লোকগণনার মতো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত উৎসের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। লোকগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯০০ সালের দিকে সারা বাংলাদেশে মাত্র ৬ লক্ষ গ্রামীণ লোক ছিল, যাদের মূল পেশা ছিল মজুরগিরি। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে এই সংখ্যা ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ লক্ষে পৌঁছায়। যা প্রকাশ পেয়েছে, বাস্তবে আনুপাতিক বৃদ্ধি ছিল তার চেয়েও বেশি। এই শতাব্দীর আদমশুমারির হিসাবে প্রতি ১৪ জন কৃষকের মধ্যে ১ জন ছিল সম্পূর্ণভাবে মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল (বা ৭%)। ১৯৭০-এর দশকে অনুরূপ ৪ জনে কমপক্ষে ১ জন উল্লেখ করা হয়েছে (বা ২৭%)।[১০]

এই সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই সন্দেহাতীত নয় এবং এগুলোর সমালোচনামূলক নিরীক্ষার সুযোগ আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এগুলো থেকে প্রতিফলিত হয় যে, গ্রামীণ বাংলাদেশের জনজীবনে শ্রমের চাহিদা বছরের পর বছর নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখ্য পেশা হিসেবে শ্রমে নিযুক্ত জনসংখ্যার সাথে আরো রয়েছে অসংখ্য গ্রামীণ শ্রমজীবী, যাদের সহায়ক আয়ের উৎস হচ্ছে শ্রমমজুরি। যদিও সারা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়া যায় না, তথাপি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০-এর দশকের মধ্যপর্যায়ে গ্রামীণ উপার্জনক্ষম মানুষের অর্ধেকের মতো লোক জীবনধারণে হয় মুখ্য আয়ের জন্য, নয় সহায়ক আয়ের জন্য শ্রমমজুরির উপর নির্ভরশীল।

এই তথ্যগুলোর ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ধারণা করা যেতে পারে যে, গ্রামীণ বাংলাদেশে জীবনধারণের উপায় হিসেবে শ্রম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক-কালের বাংলাদেশে

বাংলাদেশের শহুরে মজুরদের উপর প্রায় সব সমীক্ষাই বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল কলকাতার (যা বর্তমানে ভারতে) শ্রমিকদের নিয়েই পরিচালিত। পশ্চিম বাংলার চেয়ে প্রথাগতভাবে শিল্পে অনুন্নত দেশ বাংলাদেশের শহুরে শ্রমিকদের এক সমন্বিত ইতিহাস লেখা এখনও বাকি রয়েছে। চক্রবর্তীর কলকাতার উপর সমীক্ষার মধ্যে অনেক তথ্য আছে, যা ১৮৯০ সাল থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

Om Prakash *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720*, (Princeton, N J 1985) Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833*, (Calcutta 1978) Balai Barui, *The Salt Industry of Bengal, 1757-1800 A Study in the Interaction of British Monopoly Control and Indigenous Enterprise*, (Calcutta 1985), Khan Mohammad Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad, 1765-1793*, (Dhaka 1973). Amal Kumar Chattopadhyay, *Slavery in the Bengal Presidency, 1772-1843*, (London 1977), Tanika Sarkar, "Bondage in the Colonial Context" in Utsa Patnaik and Manjari Dingwaney (eds), *Chains of Servitude Bondage and Slavery in India*, (Madras 1985), 97-126 Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History Bengal 1890-1940* , (Princeton, N J. 1989)

১০. *Census of India, 1901*, Vol IV, *Report on the Census of Assam, 1901*, (Shillong 1902), 72 Volume IV /A Tables I, II, XV, Volume VI, *The Lower Provinces of Bengal and their Feudatories*, Part I , *The Report*, by E A Gait, (Calcutta 1902), 488-497, Part II, Table XV, Government of West Bengal, *Economic Review, 1979-80*, (Alipore 1980), 8-9, 191-195: Government of the People's Republic of Bangladesh, *Population Census of Bangladesh, 1974*, National Volume Report & Tables, (Dacca 1977), 34 35, 555-558

সামাজিক রূপান্তরে শ্রম এক চূড়ান্ত মাত্রা যুক্ত করেছে। আমরা এই বৃদ্ধির উপর সমীক্ষা চালাবো আর আমাদের সংজ্ঞায় গ্রামীণ মজুর হবে কৃষিতে বা অন্য কোন গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমিক, যারা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপায়কে নিয়ন্ত্রণ করে না বা শ্রমপ্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে না এবং যারা শুধু তাদের কাজের বিনিময়ে নগদ টাকা বা অন্য কোন দ্রব্য পায়। আমরা আরো দেখবো যে, সর্বদা শ্রমিক শ্রেণীকে খুব তীক্ষ্ণভাবে ভাগ করা যায় না, বিশেষকরে যেখানে ভাগচাষী এবং চাষী আছে। অতএব আমাদের এই সংজ্ঞা কাজ চালানোর সংজ্ঞা হিসেবেই থাকবে।

উনিশ শতকের শেষভাগে 'নিম্নশ্রেণী' : ডাফরিন রিপোর্ট

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বহুলাংশ এখনো লিখিত দলিলের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। তাই বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অন্তত এই সময়ের গ্রামীণ মজুর ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের উপর একটা বিশদ বিবরণের উৎস আছে আর তা হচ্ছে বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর জনগণের অবস্থার উপর রিপোর্ট, যা 'ডাফরিন (তৎকালীন ভাইসরয়) রিপোর্ট' নামেই বেশি পরিচিত। এতে ছিল বৃটিশ ভারতীয় সরকারের গোপন অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাবলী। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল :

> ভারতের অধিকাংশ জনগণ দৈনন্দিন খাদ্যাভাবে ভুগছে– অবিরাম উত্থাপিত এই দাবির পিছনে আদৌ কোন ভিত্তি আছে কিনা তা নির্ধারণ করা।[১১]

এই অনুসন্ধানের সময় সারা বাংলাদেশের প্রায় ১০০টি গ্রামে সরকারি কর্মচারীরা তথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যাপক সমীক্ষা চালায় এবং তা প্রতিনিধিত্বমূলক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা। অনুসন্ধানের প্রারম্ভে গ্রামীণ জনগণকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : চাষী, কারিগর, মজুর ও ভিক্ষুক। অনুসন্ধানকারীদেরকে প্রত্যেক শ্রেণী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়। এই ধরনের গবেষণায় অনুসৃত নীতির দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও (যা কতিপয় অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি)[১২] বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য ও তুলনামূলক বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবত কৃষিমজুরদের বিষয়ে রিপোর্টটিতে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক উপসংহার টানা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত প্রাপ্ত মতামতের পরিপন্থী নিম্নরূপ বক্তব্য সেই অনুসন্ধানে পাওয়া যায় :

> যেখানে বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে সেখানেই দেখা গেছে যে, অনুরূপ মজুরেরা অগণিত এবং এ বিবরণ প্রায়ই সরকারিভাবে দেওয়া হয়ে থাকে ... যে বাংলাদেশে সাধারণভাবে বা বিশেষ কয়েকটি জেলায় খুবই কম সংখ্যক ভূমিহীন মজুর আছে, এমন বক্তব্যের আদৌ কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।[১৩]

১১. *Dufferin Report (Report on the Conditions of the Lower Classes of Population in Bengal,* (Calcutta 1888), *India Office Records* IOR L/E/7/185, Covering Statement by P. Nolan, 1882, 12

১২. *Dufferin Report,* Presidency Division Report by A. Smith, 1888, Chittagong Division Report by D. R. Lyall, I

১৩. *Dufferin Report,* Covering Statement By P. Nolan, 1888.

বাস্তবিকই, গ্রামনিরীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ বাংলাদেশের গৃহস্থালির শতকরা ২৬ ভাগের একমাত্র বা মূল পেশা হচ্ছে মজুরি। গরিষ্ঠতম অনুপাত দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে, বিশেষকরে মেদিনীপুর (৪৩%), মালদহ (৪২%) ও মুর্শিদাবাদে (৩০%) এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম জেলাতে (২৩%)। লঘিষ্ঠতম অনুপাত দেখা যায় উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে। শেষোক্ত এলাকায় তার অনুপাত বিশেষভাবে কম—ময়মনসিংহে ৪%, ত্রিপুরায় ৬% ও নোয়াখালীতে ৬%। এই সংখ্যাগুলো যদিও অনুমিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি, তবু তা সম্পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে নি। গ্রামীণ বাংলাদেশে মজুরি ছাড়া আরো আয়ের উৎস ছিল। কেননা নিরীক্ষিত গ্রামগুলোর শতকরা ১৪ থেকে ৬৩ ভাগ সংসারে মজুরির পাশাপাশি অন্য যে আয়ের উৎস ছিল তা সাধারণত চাষাবাদ। একমাত্র মুখ্য বা সহযোগী আয়ের উৎস হিসেবে সারা বাংলাদেশে মজুরির উপর নির্ভরশীল গৃহস্থালির অনুপাত ছিল ৩৯%। আবার অঞ্চলগত পার্থক্যও দেখা গেছে ত্রিপুরায় প্রায় ২০% থেকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৫০%-এর অধিক পর্যন্ত। কিন্তু এই তথ্যের মান বিচার করলে তা আয়ের উৎস হিসেবে মজুরির এই আঞ্চলিক তারতম্যের বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত প্রদানের অনুমোদন দেয় না।

ডাফরিন রিপোর্টে গ্রামীণ মজুরদের সংখ্যা যা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিবেচনা করে বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল এবং এর ফলে পর্যবেক্ষকদের মনে গ্রামীণ বাংলাদেশে মজুরদের সংখ্যা খুবই নগণ্য বলে ধারণা বিদ্যমান থাকে। এই ধারণাকে আরো দৃঢ় করেছিল লোকগণনাসহ পরবর্তী সময়ের অনেক রিপোর্ট। এগুলোর কোনটাই ১৮৮০ সালের সমীক্ষার মতো বিশদ তথ্যসম্বলিত ছিল না এবং পূর্বেকার আদমশুমারির বিবরণের উপর ডাফরিন রিপোর্টের মন্তব্য পরবর্তীকালের রিপোর্টগুলোর উপরেও বর্তাতে পারে। ফলে তাদের (কৃষিমজুরদের) সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য খুবই অপ্রতুল এবং সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়।[১৪]

শ্রমশক্তির গঠনপ্রণালী

এই শ্রমশক্তি কিভাবে গঠিত হয়েছিল ? ডাফরিন রিপোর্টে লিঙ্গ, বয়স এবং অংশগ্রহণের মাত্রাকে ভিত্তি করে বিভাগ দেখানো হয়েছিল। শুধু চাষীদের মধ্যে নয়, মজুরদের মধ্যেও লিঙ্গভেদে বিভাজন স্পষ্ট ছিল। যেসব মহিলা নিজ গ্রামে বা বাড়ির আশেপাশে কাজ খুঁজতো, তাদেরকে ধানক্ষেতের কাজে লাগানো হতো না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম মাঝেমধ্যে ঘটতো উত্তরবঙ্গে। মহিলাদের ধান রোপন এবং কাটার সময় কাজে লাগানো হলেও কখনো লাঙল চালনার কাজে লাগানো হতো না। অপরপক্ষে অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ধান ভেনে নারীমজুরদের অর্থ আয় করা ছিল সাধারণ নিয়ম আর এই

১৪. ঐ

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বার পুরুষদের জন্য ছিল বন্ধ। অবশ্য মজুরির বিনিময়ে ধান মাড়াইয়ের কাজ, ধান সিদ্ধ করার কাজ, গৃহস্থালিতে চাকরানীর কাজ এবং তসরের সুতো বা চট বোনার কাজে মেয়েদের নিয়োগের কথা খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে, পুরুষ মজুরেরা তাদের আয়ের প্রায় সবটুকুই ক্ষেতের কাজ থেকে উপার্জন করতো বলে বর্ণিত। এই আয়ে যখন কুলাতো না, তখন ফসল তোলার মরসুমের পর তারা ঘরামির কাজে, পুকুর কাটার কাজে বা কুলির কাজে লেগে যেতো। কয়েক এলাকায় আমরা ভিন্ন ধরনের কাজের সাক্ষাৎ পাই—পাটকলে, ইটের ভাটায় বা রেশম কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে বা নৌকার মাঝি বা দাঁড়ি হিসেবে, গাড়োয়ান বা কাঠুরিয়া হিসেবে, সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিক হিসেবে, ইঞ্জিনে কয়লা যোগানদার হিসেবে বা সরকারি হস্তীশিকারে ঢুলি হিসেবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও দিনমজুর হিসেবে আয়ের যোগান দিত। সাধারণত তারা তাদের পিতা-মাতার সাথে একই কাজে নিযুক্ত থাকতো। এই সাথে ছেলেরা প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গবাদি পশুর রাখালি করে আয় করতে পারতো।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে ভূমিহীন বা দিনমজুরির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল লোকের হার বেশ কম ছিল। তবে প্রামাণ্য তথ্যে দেখা যায় যে, কৃষক শ্রেণীর এক বিরাট অংশ খণ্ডকালীন মজুর ছিল। পূর্বাঞ্চলের গৃহস্থালির সঙ্গে যুক্ত জনগণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মজুরগিরির সাথে নিজের জমিতে বা বর্গায় নেয়া জমিতে চাষ করতো এবং মাঝেমধ্যে কারিগরি কাজ বা ব্যবসাও করতো। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালীর কয়েকটি গ্রামের উপর বিশদ সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত গ্রামের বাসিন্দার ৬% ছিল ভূমিহীন (অর্থাৎ তাদের চাষাবাদের জমি ছিল না, কিন্তু বসতবাটি ছিল) এবং তারা কৃষিমজুর হিসেবে জীবনযাপন করতো। আর ৩৩% একসঙ্গে মজুর ও চাষী হিসেবে অথবা কোন কোন সময়ে কারিগর হিসেবে কাজ করে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করতো। মজুরিআয়ের প্রয়োজনীয়তার তারতম্যও ঘটতো ব্যাপকভাবে। কিন্তু গড়পড়তায় সারা বছরের আয়ের অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি আয় আসতো মজুরি থেকে। এতে দেখা যায় যে, মজুরিআয়ের উপর নির্ভরশীল বাসিন্দার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ছিল ভূমিহীন এবং শ্রমমজুরি বাবদ সমগ্র আয়ের তিন-চতুর্থাংশ আয় করতো খণ্ডকালীন মজুরেরা। স্পষ্টত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুধু ভূমিহীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে না। বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের সকল প্রতিবেদন থেকে একই চিত্র পাওয়া যায়। সেখানকার গ্রামীণ মজুরদের মধ্যে ভূমিহীন মজুরেরা সমগ্র আয়ের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের মজুরের চেয়ে বেশি অংশ আয় করতো।[১৫] একমাত্র ব্যতিক্রম সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের চট্টগ্রাম, যেখানে ভূমিহীনের সংখ্যার হার অনেক বেশি (জরিপকৃত ১১টি গ্রামের বাসিন্দার ২৩% এবং অন্য

১৫. ব্যতিক্রমের জন্য দেখুন, *Dufferin Report*, Burdwan Division Report by N.S Alexander, 1888, 2.

৯টি গ্রামের বাসিন্দার ৪৪%) এবং মজুরগিরির উপর চরমমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল যথাক্রমে ৫৫% এবং ৭৪% বাসিন্দা।[১৬]

শ্রমিক সম্পর্ক

যদিও ডাফরিনের অনুসন্ধানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য ও অভাবের পরিমাণ নির্ণয় করা, তথাপি ঐ রিপোর্টে বিশদভাবে বলা হয়েছিল যে, গ্রামবাংলায় তিন ধরনের মজুরের সহাবস্থান ছিল : নৈমিত্তিক দিনমজুর, বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক মজুর এবং নানা ধরনের মরসুমি মজুর। ১৮৮০-এর দশকে নৈমিত্তিক দিনমজুরিই ছিল গ্রামীণ মজুর নিয়োগের প্রধান ধরন। কিন্তু মওসুমভিত্তিতে এবং স্থানীয় শস্যফলানোর রীতির হেরফেরে তাদের নিয়োগধরনেও তারতম্য ঘটতো। আবার শ্রমচাহিদা সব সময়ে মজুরি দিয়ে মেটানো হতো না। মজুরিব্যবস্থা না রেখে শুধু সুযোগসুবিধার পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমেও শ্রমিক পরিবর্তনের রীতি ক্ষুদে কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত (স্থানীয়ভাবে এদেরকে বদলা, গান্টু ইত্যাদি বলা হতো) ছিল। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মজুরিশ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ছিল একই রকম; পার্থক্য ছিল শুধু মজুরির পরিমাণে এবং তা প্রদানের মাধ্যমের মধ্যে।[১৭] পুরুষ মজুরদের বেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মজুরি নগদ টাকায় দেয়া হতো। সেই সাথে মনিব দুপুর বেলার খাবারও দিত। অনেক সময় তামাক, গোসলের জন্য তেল এবং সকালের নাশতার জন্য চিড়া-মুড়িও দেয়া হতো। প্রদেয় সমগ্র মজুরির মধ্যে জিনিসের চেয়ে নগদ টাকার অংশ সাধারণত বেশি থাকতো। কিন্তু মহিলাদের কম হারে মজুরি দেয়া হতো। তাদের মজুরি দ্রব্য দিয়েই মেটানো হতো, কোন খাবার বা অন্য কিছু দেয়া হতো না। সাধারণত ধান ভানার জন্য চালের দশ ভাগের এক ভাগ হিসেবে মজুরি দেয়া হতো।

১৮৮৮ সালের প্রথমদিকের মাসগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত-মজুরদের মজুরির পরিমাণ ছিল মোটা পরিষ্কার চাল ২ সের থেকে ৯ সের পর্যন্ত।[১৮] লঘিষ্ঠ হার

---

১৬. *Dufferin Report.* Chittagong Division Report by D. R. Lyall, 1888,13, Chittagong District Report by A. Manson,2, Chittagong Tehsildar Report by Babu Haripada Ghose, I

১৭ দেখুন, Van Schendel and Faraizi, *Rural Labourers*, 14.

১৮ বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মজুরির হার নিয়ে তুলনা করা খুবই কঠিন। এই সমীক্ষায় আমি মজুরির হারকে চাউলের তুল্যে প্রকাশ করেছি। নগদ টাকা ও জিনিসপত্র প্রদানের মূল্যও হিসাব করে যোগ করা হয়েছে। এইভাবে সমগ্র পরিমাণকে মোট পরিষ্কার চাউলের দাম দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। এইভাবে দৈনিক মজুরি মোটা চাউলের সেরের তুলনায় প্রকাশ করা হয়েছে (১সের=০.৯ কেজি), যেহেতু চাল ছিল সমগ্র সমীক্ষাকালে গরিব বাঙালির প্রধান খাবার। অবশ্য একথা বলতে চাওয়া হয় নি যে, মজুরেরা বা তাদের পরিবারের লোকেরা ঐ পরিমাণ চাউল খেয়ে ফেলতো, সংসারের অন্য খরচও মিটাতো ঐ দৈনিক মজুরি থেকে।

দেখা যায় পশ্চিম বাংলায় এবং গরিষ্ঠ হার দেখা যায় পূর্ব বাংলায়। এর ফলে পূর্বাঞ্চলের চাষীরা তুলনামূলকভাবে অধিক সচ্ছল ছিল। যতোই পশ্চিম দিকে যাওয়া যেতো এই সচ্ছলতার হার ততোই হ্রাস পেতে পেতে বিহারে এসে ন্যূনতম হারে পৌঁছাতো। ডাফরিন রিপোর্টের অনুসন্ধানকারীরা পূর্ব বাংলার কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অনেক সময় অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করেছেন। লারমিনি বলেন, চাহিদা অনুযায়ী পূর্ব বাংলার কৃষকেরা সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল ছিল।[১৯] লায়াল বিশেষভাবে বলেন :

> একথা দিবালোকের মতো সত্য যে বাংলাদেশের রায়তদের অবস্থা বিহারের রায়তদের চেয়ে ভালো। বাংলাদেশের রায়ত ও বিহারের রায়তের অনুপাত হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগের বেশিরভাগ অংশের রায়তের সাথে বাংলাদেশের রায়তের অনুপাত। সে প্রভূত পরিমাণে সচ্ছল, ভালভাবে জীবনযাপন করে, ভাল পোশাক পরে এবং সবদিক দিয়েই মধ্যবাংলা বা এমনকি ঢাকা ও ফরিদপুরের রায়তের চেয়েও আরামদায়ক অবস্থায় আছে। আবামের সাধারণ মাত্রার এই বিভাগের রায়তদের সাথে শুধু বাকেরগঞ্জের রায়তদের তুলনা করা যেতে পারে।[২০]

পূর্ব বাংলার মজুরেরা পশ্চিম বাংলার মজুরদের তুলনায় প্রায়ই অধিকতর জমাজমির অধিকারী থাকায় স্পষ্টত এক ভালো অবস্থানে থেকে তাদের মনিবদের সাথে বেশি মজুরির বিষয়ে দরকষাকষি করতে পারতো এবং তাদের মনিবেরাও অধিকতর সচ্ছল থাকায় তা প্রদানে সক্ষম ছিল।

ডাফরিনের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জেলায় দিনমজুরেরা বছরে মাত্র ছয় থেকে নয় মাস পর্যন্ত কৃষি বা অকৃষিকাজ জোটাতে পারতো। বিবরণে দেখা যায়, বিশেষকরে পশ্চিম বাংলায় ও চট্টগ্রামে কাজকর্ম পাওয়ার সমস্যা মেটানোর প্রয়োজনে মজুরদের মওসুমি স্থানান্তর ঘটতো। পূর্ব বাংলায় এই প্রচরণশীলতা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই গ্রাম থেকে গ্রামের মধ্যে এবং মাটি কাটার বা শীত মওসুমে ধান কাটার কাজের মধ্যে সীমিত ছিল। প্রতি বছরেই এই কাজ না পাওয়ার দিনগুলোতে টিকে থাকার জন্য মজুরেরা ভিন্ন এক উপায় অবলম্বন করতো। তা হচ্ছে ভরণপোষণের জন্য কর্জ করা। ডাফরিন রিপোর্টে এই রীতির উল্লেখ রয়েছে। আগত বছরের সবচেয়ে ভরা মওসুমে সবচেয়ে কম হারের মজুরিতে শ্রম দিয়ে আসল ও সুদ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতিতে ধান বা অন্য কোন খাদ্যশস্য কর্জ নেয়াই ছিল সাধারণ রীতি। এভাবে ঋণিতা নৈমিত্তিক দিনমজুরি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অধিকতর স্থায়ী পদ্ধতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ডাফরিন রিপোর্টের তথ্য অনুসারে বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক বা বারোমেসে মজুরগিরি ছিল দ্বিতীয় প্রধানতম শ্রমিকসম্পর্ক। এর সাধারণ ভিত্তি ছিল ঋণিতা এবং তা একমাত্র দিনাজপুর ব্যতীত

---

১৯. *Dufferin Report*, Dacca Division Report by W R Larminie, 1888, 1.

২০. *Dufferin Report*, Chittagong Division Report by D. R Lyall, 1888,1 আরো দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 16

বাংলাদেশের সর্বত্রই বর্তমান ছিল। অবশ্য বংশগত ঋণদানের উল্লেখ ছিল না।[২১] কিন্তু বারোমেসে মজুরদের সংখ্যার মাত্রা নির্ধারণে এই রিপোর্ট আমাদেরকে খুব বেশি সাহায্য করে না। অবশ্য এতে এই জটিল সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক তারতম্যের বিবরণ পাওয়া যায়। পুরুষ ভূমিদাসদের বার্ষিক মজুরি নগদ টাকায় (যার বেশিরভাগ আগাম দেয়া থাকতো) এবং খাবার, তামাক, তেল ও কাপড়চোপড় দিয়ে মেটানো হতো। এই রিপোর্টে কোন নারীমজুরের উল্লেখ নেই। অবশ্য পরবর্তী রিপোর্টে তার উল্লেখ দেখা যায়। পশ্চিম বাংলার জেলাগুলোর কোন কোন অঞ্চলে ভূমিদাসদের চাষাবাদের জন্য চাকরান নামে কিছু জমি দেয়া হতো। এই ব্যবস্থা এই শ্রেণীর মজুর থেকে ভাগচাষীর পার্থক্য নিরূপণে সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার কোন কোন জেলার বেলায় ঐ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয় নি।[২২] মজুরদেরকে মনিবদের গৃহেই থাকতে হতো, অবশ্য আলাদা ঘর করে। অনেক সময় তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে গৃহস্থের কাজে সাহায্য করতে হতো। সারা বছরে সবকিছু মিলিয়ে ভূমিদাসেরা ১২০০ সের থেকে ১৫০০ সের পর্যন্ত মোটা পরিষ্কার চাউলের তুল্য অর্থ উপার্জন করতো, যা দৈনিক হারে ৩ থেকে ৪ সের পরিমাণ দাঁড়ায়। বালক মজুরেরা শুধুমাত্র থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার বিনিময়েই কাজ শুরু করতো। তার বয়স বারো বছর পার হলে নগদ টাকা মজুরি হিসেবে যোগ হতো এবং তখন থেকে তার আয় সর্বসাকুল্যে বছরে দাঁড়াতো ৭০০ থেকে ১১০০ সেরের সমান।[২৩] ডাফরিন রিপোর্ট অনুযায়ী মওসুমি মজুরগিরি ছিল তৃতীয় প্রধানতম শ্রমিকসম্পর্ক। শীতকালে এদের প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশি। মওসুমি কাজ দুই থেকে ছয় মাস স্থায়ী হতো এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফসল পাকার মওসুম অনুযায়ী প্রচরণশীল মজুরদেরকে সাধারণভাবে কাজে লাগানো হতো। কিন্তু মাটি কাটার কাজ, যানবাহনের কাজ, তামাকে ঘাঁট বাঁধার কাজ এবং আরো নানা ধরনের কাজ এই মওসুমি ভ্রাম্যমান মজুরদের উপর খুব বেশি নির্ভর করতো। ডাফরিনের অনুসন্ধান অনুসারে অর্ধেক কাজের বেলায় ধান ও খাবার দিয়ে এবং বাকি অর্ধেকের বেলায় নগদ টাকা ও খাবার দিয়ে মওসুমি মজুরদের মজুরি মেটানো হতো। ধানের অংশ সাধারণভাবে কাটা ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হতো। তবে তারতম্যও ছিল—কোন সময় বারো ভাগের এক ভাগ, কোন সময় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

২১. উত্তর বাংলায় কিছু বংশগত দাসশ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যায়। Lowis জানান যে, ঋণ ও কাজের বোঝা পিতা থেকে পুত্রে বর্তাতো; Nolan জানান যে, দিনাজপুরে মজুর শ্রেণী প্রায়ই ঋণভারে জর্জরিত এবং মহাজনের কাছে সারাজীবনের জন্য দাস হয়ে থাকতো। এই দাসগিরি অনেক সময়ে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতো পিতার ঋণকে নিজের ঋণ হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে। বিপরীতক্রমে *Dufferin Report*-এ বিহারের দাসশ্রমিক (কামাইয়া) সম্পর্কে বহু বিবরণ রয়েছে। *Dufferin Report*, Rajshahi Division Report by E. E. Lowis, 1888, 4, Covering Statement by P. Nolan,4.

২২. *Dufferin Report*, Report for Burdwan, Birbhum, Nadia, Murshidabad, Dinajpur and Malda.

২৩. দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 18-19.

মওসুমি মজুরেরা মাসে ৯০ থেকে ২৬০ সের পর্যন্ত মোটা পরিষ্কার চালের তুল্য আয় করতো। পূর্ব বাংলায় অবশ্য আয়ের হার বেশি ছিল। চট্টগ্রাম থেকে আরাকানে বা সংলগ্ন বার্মার উপকূলে গিয়ে কর্মরত ফসল কাটার মজুরেরা অনেক বেশি আয় করতো, চট্টগ্রামের চালের তুলনায় যা ছিল ৩২০ থেকে ৬০০ সেরের সমান।[২৪] এই ভ্রাম্যমান মজুরদের অনেকেই ছিল নিজ বাড়িতে জমির মালিক। একই ধারায়—

> দক্ষিণভাগের চেয়ে আগেই ধান পেকে যাবার কারণে খুলনা জেলার উত্তরভাগের অনেক চাষী নিজেদের ধান কাটার পর সুন্দরবন এলাকায় চলে যেতো এবং সেখানে ফসল কাটার কাজ করে আয় করতো।[২৫]

এই তথ্য অনুসারে মওসুমি মজুরদের এই প্রচরণশীলতাকে তাদের নিজেদের এলাকায় জীবিকা অর্জনের সুযোগের অভাবের নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করলে সুস্পষ্টভাবে ভুল করা হবে। উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে বাংলাদেশে মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকেরাও এই মওসুমি মজুরদের প্রচরণশীলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করেছে বছরের এমন সময়ে, যখন তাদের বসে বসে দিন কাটানো ছাড়া উপায় থাকতো না। এই ব্যাপারে গ্রামীণ মজুর ও চাষীদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গেলে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে।[২৬]

গ্রামীণ মজুরদের উত্থান : ১৮৮০-১৯৮০

বাংলাদেশে কৃষকবিনাশ প্রক্রিয়া

গত একশ' বছর ধরে গ্রামীণ সচ্ছলতার সাধারণ অবনতি সম্পর্কে বাংলাদেশের ইতিহাসের সকল গবেষকই একমত। উনিশ শতকের শেষভাগে কৃষকদের সত্তাবিনাশী বেশ কয়েকটা প্রক্রিয়া শুরু হয়। 'কৃষকবিনাশ' শব্দটির দ্বারা সেই প্রক্রিয়াসমূহের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সামাজিক ভেদাভেদ সৃষ্টি এবং স্বাধীন কৃষিউৎপাদন ক্রমান্বয়ে অবহেলার মাধ্যমে স্বাধীন কৃষককে অনুৎপাদনশীল করে তোলা।

২৪ *Dufferin Report*, Chittagong Division Report by D R Lyall, 1888,1

২৫. *Dufferin Report*, Presidency Division Report by A Smith,1888,20 স্থানবদলকারী মজুর এইভাবে অতিরিক্ত ৫০০ সের ধান (বা ৮ মণ চাল) পেতে পারতো। উত্তর বাংলার জন্যও ঐ একই ধরনের ব্যবস্থা ছিল।

২৬. নদীয়ার কালেক্টর জোর দিয়ে বলেন : কোন শ্রেণীর জন্য সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। চাষীদের বিরাট দল নিজেদের জমিতে এবং অপরের জমিতেও মজুরের কাজ করতো। মজুরদের নিজেদেরই জোত ছিল। কারিগরেরাও সাধারণ মজুরের কাজ করতো এবং ছোটোখাট চাষাবাদ দ্বারা আয়ের সম্পূরণ ঘটাতো। যারা ভিক্ষে করে দিন কাটাতো, সারা বছর ধরে তারা ঐভাবে চলতো না। *Dufferin Report*, Presidency Division Report by A. Smith, 1888; cf I, ঐ, 20; Chittagong Division Report by D R. Lyall, I.

অধিকাংশ কৃষক ক্রমান্বয়ে চাষাবাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে, গ্রামীণ সমাজে মেরুকরণ দেখা দেয়—একদিকে অল্প সংখ্যক শক্তিশালী ভূস্বামী/মহাজন/বণিকদের দল অন্যদিকে কোন না কোনভাবে ভূমিচ্যুত বিপুলসংখ্যক ভাগচাষী/মজুর/ভিক্ষুকদের দল। যে মাত্রায় এই শ্রেণী গ্রামীণ উৎপাদকদের (যাদেরকে বলা যেতে পারে স্বাধীন এবং পরিবারখামারমুখী কৃষক সম্প্রদায়) স্থান দখল করছিল, সেই মাত্রায় সমাজে কৃষকদের বিনাশ সাধিত হচ্ছিল বলা যেতে পারে। আমাদের সময়ের শুরুতে বাংলাদেশে এই কৃষকবিনাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে দেখা যায়।[২৭] এই সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বেশিকরে ব্যবসায়িক পণ্যে রূপান্তরিত হয় বিশেষকরে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে, যেখানে 'নগদ টাকার নতুন ফসল' পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এই প্রবৃদ্ধি নতুন এক গ্রামীণ ক্ষমতাধর গোষ্ঠী সৃষ্টি করে, যাদের ক্রমবর্ধমান ঋণ ও পণ্যের বাজারে প্রবেশাধিকার ছিল এবং তারা খাজনার মাধ্যম ব্যতিরেকেই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করতো। এই দলকে কোন কোন সময়ে জোতদার বলা হতো এবং তারা সনাতন জমিদারদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। ক্রমে ক্রমে উদ্বৃত্ত ভোগের আর্থিক কর্মকাণ্ড বহির্ভূত ধারা (বিশেষকরে জমির খাজনা এবং বেআইনি টাকা আদায় বা আবওয়াব আদায়, যা জমিদারি প্রথার বিশেষত্ব ছিল) পরিবর্তিত হয়ে আর্থিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে থাকে। জোতদারদের বিজয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদিও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদেরকে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র জমিদারদের হাতছাড়া করতে পারে নি, কেননা তাদের কাছ থেকেই ভূমিরাজস্ব আদায় হতো। তথাপি নতুন আইন এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোতদারদের প্রভাবাধীনে গ্রামীণ সামাজিক বৈষম্যের এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল।

কৃষকবিনাশ বা স্বাধীন কৃষকশ্রেণীর অবনতি তিন ধরনের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল; যথা গ্রামীণ ঋণিতা বৃদ্ধি, ভূমিবদলের ব্যাপকতা এবং শস্য ভাগাভাগির মাত্রাবৃদ্ধি। গ্রামীণ ঋণিতাকে কৃষকবিনাশের সাথে সম্পর্কিত করা ঠিক নয় (তা হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদক কৃষকের ঋণগ্রহণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারতো এবং সেই সাথে কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারতো[২৮])। কিন্তু বাংলাদেশে তাই ঘটেছিল। ভূমি-কৃষকের উৎপাদন অনুপাত হ্রাস, কৃষির চেয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবণতা, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কোন কোন অঞ্চলে নদীসিকস্তির জন্য জমিতে উৎপাদনহার হ্রাস এবং মহামারী ইত্যাদি কারণসমূহ ঋণিতাকে ক্রমান্বয়ে ভোগমুখী করে তোলে এবং এইভাবে তা স্বাধীন চাষাবাদে

---

২৭ Binay Bhusan Chaudhuri কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ দেখুন, "The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1888-1947," *Indian Historical Review*, (July 1975), 105-165; Alan Smalley, "The Colonial State and Agrarian Structure in Bengal", *Journal of Contemporary Asia*, 13 2 (1983), 176-197 Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 27-36, Sugata Bose, *Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics 1919-1947*, (Cambridge 1986)

২৮. তুলনীয় Chaudhuri, 1975

অবহেলার এক মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নগরায়ণ এবং নগদ টাকার ফসলের উদ্ভব উভয়েই খাদ্যশস্যের বাজার বৃদ্ধি করে। কৃষিউৎপাদনে দেখা দেয় স্থবিরতা। যাই হোক, ঋণব্যবস্থা গ্রামীণ এক উঠতি দলের খাদ্য যোগাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ঐ একই সময়ে ভূমিহস্তান্তর ও ভূমিবাজার বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৫ সালের পর প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে আইনত ভূমিহস্তান্তর করা সহজতর হয়। কৃষিপণ্যের ব্যবসার ফলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ঋণিতা কৃষককে জমি হাতছাড়া করতে বাধ্য করে। কিন্তু তখনো কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন হয়ে যাবার প্রক্রিয়া খুব বেশি করে শুরু হয় নি, বরঞ্চ শস্যভাগাভাগির দ্রুত বিস্তার এই সময়ের গ্রামীণ বাংলাদেশে পরিবর্তনের প্রভাব ফেলে। প্রধানত নির্ধারিত খাজনার পরিবর্তে এবং নতুন চাষকৃত জমির বেলায় এই শস্যভাগাভাগি হতো।

উৎপাদকদের সর্বহারা করার কার্যকর পদ্ধতির চেয়ে এই শস্যভাগাভাগির পদ্ধতি ভূস্বামী মহাজনদের চার রকমের সুবিধা সৃষ্টি করে। প্রথমত, বিক্ষিপ্ত এবং খণ্ডিত ধানী জমিতে চাষাবাদে কোন বিনিয়োগ ছাড়াই শ্রমের বিনিময়ে ধনী কৃষকের ঋণআদায়ের ব্যবস্থা থাকে। দ্বিতীয়ত, চাষাবাদের ঝামেলা ভাগচাষীদের পোহাতে হয়। শস্যহানি হলেও এই ভাগাভাগির ফলে মহাজনের শস্যের অংশ ভাগচাষীদের শোধ করতে হতো। তৃতীয়ত এই ব্যবস্থা মজুরির বিনিময়ে শ্রমবিনিয়োগের চেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদক কৃষকদের অধিক হারে শ্রমবিনিয়োগ নিশ্চিত করে। চতুর্থত, পুরাতন ঋণব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না করেই শস্যভাগাভাগি অব্যাহত থাকে, কেননা উৎপাদক চাষীরা আরো অধিক হারে ঋণের উপর নির্ভরশীল হতে থাকে।[২৯] ধার্যকৃত নগদ টাকার চেয়ে শস্যভাগাভাগির ব্যবস্থা আরো আকর্ষণীয় ছিল, কারণ, টাকার মানের ক্রমঅবমূল্যায়নেও শর্তের কোন পরিবর্তন করা হতো না। অপরদিকে চাষাবাদে টিকে থাকার অন্য কোন উপায় না থাকায় ধনীরা বাধ্য হতো শস্যভাগাভাগির ব্যবস্থা মেনে নিতে। তারা চাষাবাদের বাইরে কোথায় কাজ পাবে ? তাদের জন্য এই ভাগচাষব্যবস্থা তাদেরকে দিনমজুরগিরি করার চেয়ে অনেক দীর্ঘমেয়াদি নিশ্চয়তা দিত, একটু বেশি মর্যাদা দিত এবং হয়তো বা একটু বেশি উপার্জনও দিত।

ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের ভূমির উপরিকাঠামোর উপর অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বিতর্ক এই জোতদার ও ভাগচাষীদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে বেশি করে দৃষ্টিগোচর করেছে।[৩০] কিন্তু এই সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তাকে খুব বড় করে দেখা উচিত

২৯. 'Dependency Web'-এর বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে Adrienne Cooper-এর "Share-croppers and Landlords in Bengal, 1930-50 The Dependency Web and its Implications", *Journal of Peasant Studies*, 10 2-3 (January- April 1983), 226-255.

৩০. দৃষ্টান্তস্বরূপ, Rajat and Ratna Ray, "The Dynamics of Continuity in Rural Bengal under the British Imperialism: A Study of Quasi-Stable Equilibrium in Underdeveloped Societies in a Changing World", *Indian Economic and Social History Review*, 10 2 (June 1973), 103-28, Binay Bhusan Chaudhuri, "Rural Power Structure and Agricultural Productivity in Eastern India, 1757-1947," in Meghnad Desai et al (eds), *Agrarian Power and Agricultural Productivity in South Asia*, (Dellhi 1984), 100-170; Rajat Kanta Ray, "The Retreat of the Jotdars ?" *Indian Economic and Social History Review*, 25 2 (1988), 237-247.

নয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে জোতদারদের অনিশ্চিত অবস্থানের জন্য তাদের পক্ষে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন করে পুঁজিবাদী ধারা অনুসরণের পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করানো অসম্ভব ছিল। জমিদারি কর আদায় এবং পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের ও তাদের প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর ধার্য কর আদায় রাষ্ট্রের রাজস্বের মূলভিত্তি থাকায় রাষ্ট্র কৃষক সম্প্রদায়কে তখনো রক্ষা করে চলতে থাকে। এই কারণেই উঠতি কৃষিপুঁজির দ্বারা কৃষকদের উচ্ছেদসাধন বাধাগ্রস্ত হয়। গ্রামীণ শ্রমশক্তির ব্যাপকভাবে সর্বহারা হবার প্রক্রিয়া নয়, বরং শস্যভাগাভাগির বিস্তারই ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে কৃষকবিনাশ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধ প্রকৃতির ইঙ্গিত প্রদান করে।

অধিকন্তু এই ভাগচাষব্যবস্থা সর্বত্র ছিল না। তখনো এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাথমিক চাষী খুব বেশি ঋণের শিকার হয়ে পড়ে নি এবং স্বনির্ভর চাষাবাদব্যবস্থা চালিয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে, এটাও উপলব্ধির বিষয় যে গ্রামীণ মজুরদের বিশেষ এক শ্রেণীর উপস্থিতিকে নিবিড় কৃষকবিনাশের পরিণতি বলে গণ্য করা চলে না। ডাফরিন রিপোর্টেও দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষভাগে এই কৃষকবিনাশের ত্বরান্বিত অবস্থার অনেক আগেও ঐ মজুরশ্রেণীর উপস্থিতি ছিল। যখন জোতদারগণ তাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং জমিতে শস্যভাগাভাগির ব্যবস্থা লাভ করে, তখন কিভাবে মজুরশ্রেণী খেয়ে পরে বেঁচে থাকতো সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ১৮৮০-এর দশক থেকে তাদের ইতিহাসের কিছু চিত্ররূপ নিচে তুলে ধরা হলো।

গ্রামীণ মজুরদের অনুপাত : বৃটিশ আমল

ডাফরিন রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা দেখেছি যে, ১৮৮৮ সালে সমগ্র গ্রামীণ বাসিন্দার প্রায় ২৬%-এর মজুরগিরি ছিল মুখ্য বা একমাত্র পেশা, অপরদিকে অন্য ১৩%-এর বেঁচে থাকা নির্ভর করতো মজুরগিরির সহায়ক আয়ের উপর। এই হিসেবে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রামীণ মানুষের জন্য শ্রমমজুরি ছিল জীবনধারণের সম্পূর্ণ বা আংশিক উপায়। তারপর গ্রামীণ মজুরদের ব্যাপারে তুলনামূলক কোন নিরীক্ষা আর করা হয় নি এবং গ্রামীণ মজুরদের বিষয়ে আদমশুমারির তথ্য কমই কাজে লাগে; কেননা এর মধ্যে সংজ্ঞা, ক্রমবিন্যাস, অবগণনা ও বিকৃতির সমস্যা দেখা দেয়।[৩১] এই কারণে আদমশুমারিতে প্রতীয়মান অনুপাত ও গতিধারা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়, এমনকি বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যবশত ঔপনিবেশিক যুগের শেষ আমলের বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের অনুপাত সম্পর্কে লোকগণনার তথ্য ব্যতীত অন্য কোন তথ্য একেবারে নেই বললেই চলে। গ্রামীণ

৩১. Surendra J Patel, *Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan* (Bombay 1952), 25-28, Nripendra Bandopadhyaya, "Causes of Sharp Increase in Agricultural Labourers, 1961-71: A Case Study of Social-Existence Forms of Labour in North Bengal", *Economic and Political Weekly*, (Review of Agriculture, December 1977), A 111-A 126; M Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946 A Quantitative Study*, (Cambridge 1978), 139-141

বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি থেকে (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভূমিহীনতা, মজুরগিরির উপর নির্ভরশীলতা এবং অভাবের পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থ) এবং মাঝেমধ্যে জেলা গেজেটিয়ার বা ভূমিজরিপ ও বন্দোবস্ত রিপোর্ট থেকে আমরা কিছু না কিছু তথ্য জানতে পারি। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তথ্য প্রতিনিধিত্ব এবং নির্ভরশীলতাব বিষয়ে আমাদেরকে বরং আরো ঝামেলায় ফেলে।

সাধারণভাবে বাংলাদেশের শ্রমনির্ভর জনগোষ্ঠীর আয়তন সম্পর্কে অনাগ্রহই ছিল এই আমলের বিশেষ প্রবণতা। এই অনাগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবেই এক বিপরীত ধারা, যেখানে ঔপনিবেশিক সরকার কৃষকের ঋণিতা এবং অকৃষিকাজে কৃষিজমি হস্তান্তরের বিষয়ে তন্দ্রালস আগ্রহ দেখিয়েছে। কর আদায় এবং কৃষিউৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের বিষয়ে কৃষকবিনাশমূলক সরকারি স্বার্থ সুস্পষ্টভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। এক ধরনের গ্রামীণ মজুরের উদ্ভব তখন পর্যন্ত কোন ভয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয় নি। ঔপনিবেশিক শাসন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারি রিপোর্টে বা সাধারণ অভিমতে বাংলাদেশে গ্রামীণ মজুরদের দুর্লভতার কল্পচিত্রের প্রকাশ অব্যাহত থাকে। অবশ্য সঠিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুটা ইঙ্গিত পাই। বাকেরগঞ্জ জেলায় ভূমিজরিপ ও বন্দোবস্ত (১৯০০-১৯০৮) প্রক্রিয়া চলাকালে বেশ বড় একটি অঞ্চলের গ্রামগুলোর প্রতিটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়েছিল। সেই অনুসন্ধানে দেখা যায় যে :

> প্রতি পাঁচটি কৃষকপরিবারের মধ্যে একটি সচ্ছল অবস্থায়, তিনটি আরামদায়ক অবস্থায় এবং একটি সংগ্রামরত অবস্থায় আছে। এই শেষভাগের মধ্যে রয়েছে সেই সব পরিবার যারা নিজেদের খায়খোরাকি অর্জন করার মতো যথেষ্ট জমি ইজারায় নিতে পারে না এবং শ্রম বিক্রয়ে বাধ্য হয়। অবশ্য তাদের সব সময়েই পর্যাপ্ত খাবার ও আশ্রয় আছে।[৩৩২]

আরো বিশদ তথ্য পাওয়া যায় ফরিদপুর জেলার জরিপে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৯ সাল অবধি পরিচালিত এক বিখ্যাত সমীক্ষায় জ্যাক লক্ষ্য করেছিলেন যে, জনসংখ্যার ২৮% কৃষিমজুরিতে নিয়োজিত। অকৃষিমজুর সম্পর্কে তথ্য ছিল অসম্পূর্ণ। কিন্তু কৃষি পরিবারের ৪৪%-এর কোন না কোন অকৃষি সহায়ক আয়ের উৎস ছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল বাড়ির কাজ ও চাকরবাকরের কাজ, মাছ ধরা ও তাঁতের কাজ। এভাবে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা তাদের আয়ের কিছু অংশের জন্য শ্রমের উপর নির্ভর করতো এবং তারাই যে সবসময়ে দরিদ্রতম ছিল, তাও নয় :

> গরিব পরিবারগুলোর মধ্যে কৃষিমজুরের অনুপাত স্বাভাবিকভাবেই ধনী পরিবারদের অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তাই বলে যে মাত্রায় চিন্তা করা হচ্ছে তা নয়। পাটচাষের মজুরিতে ভালো আয় নিঃসন্দেহে ধনীদের যোগদান ঘটায় এবং মোটামুটিভাবে অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের অধিকাংশকে নিজ গ্রামে প্রতিবেশীদের সামনে মজুরের কাজ করার সঙ্কোচ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পার্শ্ববর্তী জেলায় ফসল তোলার কাজে দেখা যেতো। সচ্ছল কৃষকের ২২%,

৩২. J C, Jack, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in Bakarganj District, 1900-1908*, (Calcutta 1915), 77

কর্মসচ্ছল কৃষকের ৩২% এবং যারা অভাবের উর্ধ্বে তাদের ৩৬% এবং অভাবগ্রস্তদের ৩৭% গণনায় কৃষিমজুর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সম্ভবত এমনও হতে পারে যে, এদের কেউই সম্পূর্ণভাবে কৃষিমজুর ছিল না অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় 'labour' শব্দের অর্থে মজুর ছিল। সকলেরই জমি ছিল, হয়তো পরিমাণে কারো খুবই কম ছিল আবার কারো হয়তো অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ের অনুপাতে কম ছিল। ইংল্যান্ডে ভূমিহীন মজুর সাধারণ ব্যাপার, অথচ ফরিদপুরে এমন মজুর একেবারে অজ্ঞাত এবং পূর্ব বাংলার অন্যত্রও খুবই দুর্লভ ছিল। কৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল অভাবি মজুরদের অনুপাত খুব বেশি ছিল না। কেননা এই শ্রেণীর মধ্যে ছিল বৃদ্ধদের দল, যারা কাজের অনুপযুক্ত এবং তেমন পরিবারসমূহ, যাদের উপার্জনক্ষম লোকটি অসময়ে মারা গেছে। প্রতি ১০০ পরিবারে দেখা যায় যে, ৩৫টি পরিবার তাদের নিজেদের জমির ফসল দিয়েই সম্পূর্ণ অন্নসংস্থান করতো, ২৫টি পরিবারে সম্পূর্ণ খরচ চালাতে বাড়তি উপার্জনের প্রয়োজন হতো এবং ৪০টি পরিবার খাদ্যশস্য কিনে খেতো, কেননা, তারা পাটচাষ করা পছন্দ করতো এবং তা করতে না পারলে তাদের খাবারের সঙ্কুলান হয় না; কিন্তু নিশ্চিতভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা পাটচাষ করা বেশি পছন্দ করতো বলে তাদের এমন অবস্থায় পড়তে হতো।[৩৩]

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে মজুরদের অনুপাত জানার জন্য তথ্যানুসন্ধান করা হয় নি। ভূমিরাজস্ব কমিশন প্রতি জেলার আদর্শ গ্রামগুলোতে প্রায় ২০,০০০ পরিবারের মধ্যে তথ্যানুসন্ধান চালায় এবং দেখতে পায় যে, তাদের ২২.৫% মুখ্যত বা সম্পূর্ণত কৃষিমজুরির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।[৩৪] আবারো অকৃষি শ্রমমজুরির উপার্জনের ক্ষেত্রটি অনাবিষ্কৃতই থেকে গেল। অধিকন্তু, পরিসংখ্যানগুলো শুধু সেই পরিবারদেরকেই গণ্য করেছে, যাদের মুখ্য বা সম্পূর্ণ আয়ের উৎস হচ্ছে কৃষিমজুরি। ফলে মজুরি যাদের সহায়ক পেশা তাদের সংখ্যা বাদ পড়ে গেল।

পঞ্চাশ বছর আগের ডাফরিন রিপোর্টে প্রকাশিত আঞ্চলিক তারতম্যের সত্যতা ভূমিরাজস্ব কমিশন প্রতিপাদন করেছিল। বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানার জেলা-গুলোতে মজুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং পূর্ব বা উত্তরে সবচেয়ে কম। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোর তথ্য ততো পরিষ্কার নয়। উদাহরণস্বরূপ, যশোর জেলার বিবরণে দেখা যায় যে, পরিবারগুলোর মাত্র ৮% মুখ্যত বা সম্পূর্ণত কৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল, অথচ পার্শ্ববর্তী জেলা খুলনায় এই হার ৪২%-এ দাঁড়িয়েছিল এবং তা ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের যেকোন জেলার জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যা।[৩৫]

৩৩. J C Jack, *The Economic Life of a Bengal District ; A Study*, (Delhi 1975), (Reprint, original date of publications 1916), 84-86 ১৯২৭ সালে ফরিদপুরের তালমা গ্রামের সমীক্ষার দ্বারা এই সাধারণ ধারণা সত্যায়িত। Government of Bengal, *Royal Commission on Agriculture in India, Report*, Volume V. Evidence Taken in the Bengal Presidency, (Bombay 1927). 487-490. তুলনীয় Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 39.

৩৪. Government of Bengal. Report of the *Land Revenue Commission, Bengal* (Alipore), Vol I ,117, (এই রিপোর্ট Floud Report নামে পরিচিত)।

৩৫. সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি দেখা যায় দুটো জরিপের মধ্যে : মেদিনীপুরে (১৮৮৮ : ৪৩% এবং ১৯৩৯ : ২৫%) খুলনায়, (১৮৮৮ : ২০%-এর কম এবং ১৯৩৯ : ৪২%) এবং চট্টগ্রামে (১৮৮৮ : ২৩% এবং ১৯৩৯ : ১২%)। আরো তথ্য ব্যতীত এই সংখ্যা সম্পর্কে কোন রকম বিচার করা বা তারতম্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

পরিশেষে, ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার অর্থনৈতিক কারণসমূহ এবং এই দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া[৩৬] সম্পর্কে সঠিক ধারণালাভের জন্য ১৯৪৪ সালে শেষবারের মতো সারা বাংলাদেশে জরিপ করা হয়েছিল। ১৫০০০-এরও বেশি পরিবারের এক নমুনার ভিত্তিতে এই জরিপে দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষের ঠিক আগে এদের ৩৪% আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল ছিল। তার মধ্যে ১৬.৫% যুক্তভাবে চাষাবাদ ও কৃষিমজুরির উপর, অপর ১৬.৫% সম্পূর্ণভাবে কৃষিমজুরির উপর এবং বাকি ১% শুধুমাত্র অকৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল ছিল।[৩৭] দুর্ভিক্ষের পর ১৯৪৪ সালের মে মাসে এই মাত্রার পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক আমল শেষ হলে বাংলাদেশের গ্রামীণ বাসিন্দাদের কমপক্ষে এক পঞ্চমাংশ সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত শ্রমমজুরির উপর নির্ভরশীল হয়, আর যদি এর সাথে সহযোগী পেশা হিসেবে শ্রমের তথ্য যোগ করি, তবে এই অনুপাত কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশে বা প্রায় দুই কোটি মানুষে পৌঁছায়।[৩৮] এই চিত্র ১৮৮৮ সাল থেকে গ্রামীণ মজুরদের অনুপাতের এক অটল অবস্থান প্রকাশ করে। মাঝারি ধরনের কৃষকবিনাশপরিস্থিতির মধ্যে এই অনুপাতের আশানুরূপ বৃদ্ধি তো ঘটেই নি, বরং হ্রাস পেয়েছে। ১৮৮৮ সালে সম্পূর্ণভাবে বা মুখ্যত শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল সকল বাসিন্দার ২৬% এবং মজুরি যাদের সহযোগী পেশা ছিল তাদের যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৩৯%। তথ্যের মান এবং মিশ্র জরিপের ভিন্নধর্মী জরিপের তুল্যমূল্য বিচারের পদ্ধতিগত অসুবিধার কথা বিচার করলে এই হ্রাস প্রকৃতপক্ষে বাস্তব নাও হতে পারে। ঔপনিবেশিক আমলের শেষভাগে বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের অনুপাতের অটল অবস্থানের উপর জোর দেয়া অধিকতর বিচক্ষণতার এবং অধিকতর যথার্থতার পরিচায়ক। অঙ্কের পূর্ণমানের হিসেবে অবশ্য ১৮৮০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে সংখ্যার বেশ বৃদ্ধি ঘটে; খুব কম করে হিসেব করলেও প্রায় ৭০ লক্ষ বাঙালি শ্রমমজুরিনির্ভর দলের সাথে যোগ দেয়।

১৯৪৭ সালের পর গ্রামীণ মজুরদের অনুপাত

১৯৪৭ সালের পরে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় এবং বাংলা বিভক্ত হয়। বাংলার পশ্চিমাংশের জেলাগুলো পশ্চিম বাংলা নামে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং বাংলার পূর্বাংশের জেলাগুলো (বাংলার ও

৩৬. P.C. Mahalanobis et al., "A Sample Survey of After-Effects of the Bengal Famine of 1943", *Sankhya, The Indian Journal of Statistics*, 7·4 (1946), 337

৩৭. প্রাগুক্ত, 365.

৩৮. জনসংখ্যার সংখ্যাগুলো দেখুন, *Census of India, 1941*, Vol IV. Bengal. Tables by R. A. Dutch, (Delhi 1942), 6.

বাংলার জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) পাকিস্তানে যোগদান করে এবং পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের পরে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী সময়ের সাথে তুলনার ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি করে বিশেষকরে এই কারণে যে এই সময়ে অনেক জেলার সীমানায় পরিবর্তন ঘটানো হয় এবং পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানে অনেক এলাকা যুক্ত হয়। এই জটিলতার ফলে ঔপনিবেশিক আমল এবং পরবর্তী আমলে সর্বহারা হবার ধারার সমীক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৩৯ সালের ভূমিরাজস্ব কমিশন দেখতে পায় যে, সমগ্র গ্রামীণ বাসিন্দাদের ২২.৫% প্রধানত বা সম্পূর্ণ কৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল। আর আট বছর পরের পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮% এবং ২৯%।[৩৯] ১৯৪৭ সালের পরে পূর্ব বাংলার মজুরদের অনুপাতের পরিবর্তন ব্যাপক জরিপ এবং সেই সাথে অনেক ছোট ছোট সমীক্ষা থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কৃষিবিষয়ক মহাজরিপের তথ্যাবলী প্রকাশ করে। প্রথম দফায় দেখা যায় যে, নমুনা গ্রামগুলোর জনসংখ্যার ১৩%-এর প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষিমজুরি। এলাকাভিত্তিক সামান্য তারতম্যও দেখা যায়। উপকূল এলাকায়, সিলেটে এবং উত্তর অঞ্চলে এই হার ছিল ১০% থেকে ১২% এবং পূর্বের পাহাড়ী অঞ্চলে, পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে এই হার দেখা যায় ১৪% থেকে ১৫%। এই পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের তুলনায় (যেখানে জেলা হিসেবে মজুরগিরির অনুপাত ছিল কম) মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের (যেখানে ঐ অনুপাত ছিল বেশি) মধ্যে বিরাজমান এলাকাভিত্তিক পূর্বেকার পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে।[৪০] ঐ একই জরিপের ষষ্ঠ দফায় ১৯৬৩-৬৪ সালে এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে চাষীদেরকে জমির সাথে সম্পর্কিত করে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। বিবরণে প্রকাশ যে, চাষীদের ২৫% মজুরগিরি করে উপার্জন করে, ১৮% ছিল পুরোপুরি সার্বক্ষণিক মজুর, ৪% যৌথভাবে মজুর এবং ভাগচাষী এবং ৩% গৃহস্থবাড়ির চাকরবাকর। এই উপার্জনকারী চাষীদের তিন-পঞ্চমাংশ ছিল ভূমিহীন।[৪১]

---

৩৯. সবচেয়ে জরুরি সতর্কসঙ্কেত এখানে যে, ১৯৩৯ সালের সংখ্যায় বেশ কয়েকটি জেলা বাদ দেয়া হয়, ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর যেগুলো পশ্চিম বাংলায় (কুচবিহার, পরে পুরুলিয়া) এবং পূর্ব বাংলায় (সিলেট এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল) যুক্ত হয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার আনুপাতিক হিসেবের পদ্ধতির জন্য দেখুন Karunamoy Mukherjee, *The Problems of Land Transfer A Study of the Problems of Land Alienation in Bengal*, (Santiniketan 1957) 133-134.

৪০. Government of East Pakistan, East Pakistan Bureau of Statistics, *Master Survey of Agriculture in East Pakistan . Report on First Round: A Sample Survey of the Basic Characteristics of Villages in East Pakistan*, (Dhaka 1965), 25.

৪১. Government of East Pakistan, East Pakistan Bureau of Statistics, *Master Survey of Agriculture in East Pakistan (Sixth Round): Report on the Composition of Rural Households in East Pakistan and their Production, Distribution and Marketing of Agricultural Crops in 1964-65*, (Dhaka 1966), 28

১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ জরিপ প্রায়ই চালানো হতো। কিন্তু তাদের বেশির ভাগের মধ্যে উপার্জনকারী জনসংখ্যা সম্পর্কে হয় স্বল্প তথ্য আছে, না হয় কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই বা সেগুলো পাওয়া যায় আদমশুমারিতে প্রাপ্ত খুবই বিতর্কমূলক তথ্য থেকে। যাই হোক, ১৯৭৭ সালে আর একটা কৃষিজরিপ হয়। ততোদিনে দেশটি 'বাংলাদেশ' রূপে বিশ্বমানচিত্রে স্থান পেয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ৪২% গ্রামীণ গৃহস্থালিতে কৃষিকাজের একটা অংশ ভাড়াকরা মজুর দিয়ে সম্পন্ন করা হতো এবং বেশির ভাগের কাজ ছিল পারিবারিক শ্রম। আরো দেখা যায় যে, ৭% গৃহস্থালিতে এই ভাড়াটে মজুরেরা প্রায় সব কাজ করতো। জরিপের আগের সপ্তাহে (১৯৭৭ সালের এপ্রিল ও মে মাসে জরিপ করা হয়েছিল) সমগ্র ৪ কোটি ৬০ লক্ষ কৃষিজীবী জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ মজুর ভাড়া খাটিয়েছে, যার মধ্যে ৯% (বা ১৬ লক্ষ, ১৯৬০ সালের হিসাবে ৩৯% বৃদ্ধি) ছিল সার্বক্ষণিক মজুর, ১৯% ছিল অস্থায়ী এবং ৭২% নৈমিত্তিক। সমগ্র কৃষিমজুর বাসিন্দার ২৯% তাদের নিজেদের কোন জমি চাষ করতো না এবং এই বিষয়ে কোন আঞ্চলিক তারতম্যের উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি।[৪২] ব্যাপক ভিত্তিক জরিপে সংগৃহীত তথ্যের সাথে ১৯৭১ সালের পর পরিচালিত বেশ কিছু গ্রামীণ সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিশদ প্রামাণ্য তথ্য যোগ করা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালে ঢাকা জেলার এক গ্রামসমীক্ষায় আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী প্রকাশ করেন যে, যাদের মুখ্য পেশা কৃষির সাথে সম্পর্কিত ছিল এমন বাসিন্দার ২৫% ছিল ভূমিহীন মজুর।[৪৩] ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা (পূর্বের ত্রিপুরা) জেলার মতলব থানার এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৯ বছরের বেশি বয়স্ক প্রায় ৯২০০০ গ্রামবাসীর ২৬%-এর মূল পেশা ছিল মজুরগিরি, যার মধ্যে ১৬% কৃষিমজুর এবং ১০% অকৃষিমজুর।[৪৪] দুর্ভাগ্যবশত উভয় সমীক্ষাতেই সহযোগী পেশা হিসেবে মজুরগিরির উপর কোন তথ্য নেই।

ঐ একই বছরে পাবনা জেলার ৪০০০ গ্রামের উপর এক সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যায় যে, পরিবারের কর্তাদের ৩৬%-এর মূল পেশা হচ্ছে মজুরগিরি এবং মজুরদের সংসারগুলোর প্রতি পাঁচটির মধ্যে একটি ভূমিহীন।[৪৫] বরিশাল (পূর্বের বাকেরগঞ্জ) জেলার এক গ্রামের মোট পরিবারের ২৭%-এর একমাত্র পেশা মজুরগিরি এবং মজুরগিরির খণ্ডকালীন পেশায় রয়েছে আরো ২৮%।[৪৬] বগুড়া জেলার এক গ্রামে ওয়েস্টারগার্ড সমীক্ষায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকটি গ্রামে খান এবং তাঁর সহযোগীদের সমীক্ষায়

৪২. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Report on the Agricultural Census of Bangladesh, 1977*, (Dacca 1981), National Volume, 36-38, 47,49,294.

৪৩. Anwarulllah Chowdhury, *A Bangladesh Village . A Study of Social Stratification*, (Dacca 1978), 57.

৪৪. K.M Ashraful Aziz, *Kinship in Bangladesh*, (Dacca 1979), 139.

৪৫. Benchmark Survey—এর উদ্ধৃতি থেকে John P Thorp, *Power Among the Farmers of Daripalla A Bangladesh Village Study*, (Dacca 1978), 121.

৪৬. ১৯৭৪ সনে স্বপন আদনান ও অন্যান্যদের কৃত গবেষণা : *Differentiation and Class Structure in Village Shamaj*, Working Paper No. 8, (Dacca 1977), (mimeo), 22.

ঐ একই ধারা লক্ষ্য করা যায়।[৪৭] যশোর জেলার গ্রামগুলোতে সিদ্দিকীর[৪৮] প্রাপ্ত নিম্নহারের সাথে ১৯৭৭-৭৯ সালে পরিচালিত রংপুর, বগুড়া ও কুমিল্লার সাতটি গ্রামের সমীক্ষায় প্রাপ্ত নিম্নহারের মিল রয়েছে। এসব গ্রামে সমস্ত পরিবারের শতকরা ১৬ থেকে ৩৮ ভাগ তাদের সম্পূর্ণ আয় বা আয়ের বেশি অংশ উপার্জন করে মজুরগিরির মাধ্যমে (কৃষি এবং অকৃষি উভয়বিধ)। সেই সময়ে দেখা যায়, পরিবারগুলোর শতকরা ২১ থেকে ৬৬ ভাগ কৃষিমজুরির মাধ্যমে কিছু না কিছু আয় করেছে।[৪৯] এই বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলী এই দাবি রাখে যে, দেশভাগ হবার পর থেকে পূর্ব বাংলায় মজুরিশ্রম আরো অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং মূল পেশা হিসেবে তা ১৯৩৯ সালের ১৮% থেকে ১৯৬০-এর দশকে ২১% এবং ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে ২৫% থেকে ৩৮%-এ দাঁড়ায়। সহযোগী পেশা হিসেবে মজুরগিরির সংখ্যাগত অবস্থান সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ১১ থেকে ২৪ ভাগের মধ্যে এ সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল।[৫০] এই তথ্যগুলো সমন্বিত করলে এই যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার টানা যেতে পারে যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে গ্রামীণ পরিবারের প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি লোক হয় সম্পূর্ণভাবে না হয় আংশিকভাবে মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময়ে ১৮৮৮ সাল ও ১৯৩৯ সালের অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেছে।[৫১]

গ্রামীণ মজুরদের সচলতা

বাংলাদেশে যে শুধু স্থানীয় লোকরাই শ্রমকে পণ্য হিসেবে কাজে লাগাতো তাই নয়, মওসুমি বা স্থায়ী কর্মসংস্থানের স্থলগুলোতে গ্রামীণ মজুরেরা যাতায়াত করতো এবং

৪৭. ১৯৭৫-৭৬-এর এক গবেষণায় Westergaard দেখতে পান যে, ২৬% গৃহস্থালি সম্পূর্ণভাবে এবং ২৭% আংশিকভাবে শ্রমমজুরির উপর নির্ভরশীল। খান এবং অন্যরা চট্টগ্রাম ও ঢাকা শহরের কাছাকাছি দুটো গ্রামের বিবরণে জানিয়েছেন যে, সমগ্র শ্রমশক্তির এক চতুর্থাংশের দিনমজুরি ছিল মুখ্য পেশা এবং এর অর্ধেক ছিল কৃষিমজুর। Kirsten Westergaard, *Boringram An Economic and Social Analysis of a Village in Bangladesh*, (Bogra n. d), 12,15, 17-18, 48, Azizur R Khan et al , *Employment, Income and the Mobilisation of Local Resourses A Study of Two Bangladesh Villages*, (Bangkok 1981),13.

৪৮. তিনি জানান, ১৩% গৃহস্থালি প্রধানত মজুরির উপর নির্ভরশীল, যার দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কৃষিজমি আছে। কামাল সিদ্দিকী, *The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh* , (Dhaka 1982), 169-170

৪৯. Willem Van Schendel, *Peasant Mobility: The Odds of Life in Rural Bangladesh,* (Assex 1981), (New Delhi 1982), 303, 314-315, 321-22

৫০. ঐ, 302, 315 322.

৫১. জেলার অভ্যন্তরের তারতম্য আন্তঃজেলা তারতম্যের মতোই ব্যাপক বলে বর্তমানে জানানো হচ্ছে এবং শ্রমের উপর বেশি বা কম নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে এখন আর অঞ্চলবিভাগ সম্ভব নয়। আরও দেখুন Government of the Peoples Repubulic of Bangladesh, *Population Census of Bangladesh 1974*, National Volume ; Report, Tables (Dacca 1977), 555-558.

এইভাবে চলাচলের এক দীর্ঘমেয়াদি ধারা সৃষ্টি করেছিল। যদিও প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে এই মজুর স্থানান্তরের অনেক কারণ বর্ণিত হয়েছে, তবু বাংলাদেশের মজুরদের স্থানান্তরে যাবার এই ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে এখনো পূর্ণ সমীক্ষা চালানোর কাজ বাকি রয়েে। আমরা বলেছি যে, শুধু দীর্ঘমেয়াদি এবং দূরপাল্লার স্থানান্তর গমন, বিশেষকরে বৃটিশ .বতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশান্তরে যাবার বিষয়ে সরকারি স্বার্থ পরিলক্ষিত হয়। দূরত্ব যতো কমে আসে, তথ্যও ততো কমে যায়। তাই জেলার অভ্যন্তরে চলাচে: চেয়ে আন্তঃজেলা চলাচলের তথ্য আরো সম্পূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন ধরনের মজুরদের এই চলাচলের পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি আমাদেরকে কোন হিসাব দিতে পারে না।

সুদূরে চলাচল

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি (রেলপথ, স্টিমার) উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশ থেকে সুদূরে চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করে। আমাদের সমীক্ষায় আলোচ্য সময়ের শুরুতে নিয়মিত মজুর চলাচলের চার ধরনের স্রোতোধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত ভিনদেশী বা বিহারী মজুরদের কথা উল্লেখ করা যায়। বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে যা উত্তরপ্রদেশ) থেকে লোকেরা শীতকালে বাংলাদেশে মজুর-গিরির জন্য আসতো এবং বসন্তকালে বা গ্রীষ্মকালের প্রথমদিকে বাড়ি ফিরে যেতো। প্রায়ই তারা দলে দলে চলাচল করতো এবং সারা বাংলাদেশেই তাদেরকে দেখা যেতো, বিশেষকরে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে। তারা সাধারণ মজুরের কাজ করতো, সামনে যে কাজই পেতো তাতেই লেগে যেতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের প্রধান ফসল আমন ধান কাটার কাজে শ্রম বিক্রয় করতো। কিন্তু অনেকে আবার কুলিগিরির কাজ, মাটি কাটার কাজ এবং পাল্কী বহনের কাজও করতো। মেয়েরাও ধান কাটার কাজ এবং মাটি কাটার কাজ করতো। তারা বিশেষকরে ধান ভানার কাজ এবং ধান রোপার কাজ করতো। অনেকে আবার দীর্ঘমেয়াদিভাবে স্থানান্তরী হয়ে বাংলাদেশে অনেক বছরের জন্য বসবাস করতো এবং তাদের অনেকে বাড়িতে চাকরবাকরের কাজে, বরকন্দাজ হিসেবে, পাইক হিসেবে, গ্রাম চৌকিদারিতে, রেলশ্রমিক হিসেবে এবং কারখানাশ্রমিক হিসেবেও নিয়োজিত থাকতো। শুধুমাত্র কলকাতার শিল্পকেন্দ্রসমূহে এবং বর্ধমানের কয়লা ও লৌহখনিগুলোতেই ভিনদেশী মজুরেরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়।[৫২] বাংলাদেশে সর্বত্র স্থানীয়

৫২. অনেক Statistical Accounts, District Gagetteers and Survey এবং Settlement Reports-এ এই ধরনের দেশান্তরীদের কথা বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ O' Donnell, Sachse, and Bell । আরো তথ্যের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 47. শিল্প শ্রমিকদের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, Das Gupta, C. J. O'Donnell, *Statistical Account of the District of Bogra* in W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, (London 1876), VIII 67-68; F A. Sachse, *Bengal District Gazetteers ; Mymensingh,* (Calcutta 1917), 34, 68, 86-87; and F.O. Bell, *Final Report in the Survey and Settlement Operations in the District of Dinajpur, 1934-1940,* (Alipore 1942), 23; Ranajit Das Gupta, "Factory Labour in Eastern India : Sources of Supply, 1855-1946, Some Preliminary Findings", *Indian Economic and Social History Review*, 13 (1976), 277-329).

মজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে এই ভিনদেশী মজুরদের নিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ সীমিত হয়ে পড়ে। দেশভাগের ফলে হঠাৎ করেই পূর্ব পাকিস্তানে এই আগমন থেমে যায় এবং পশ্চিম বাংলাতেও ১৯৪৭ সালের পরে ভিনদেশী মজুরের গুরুত্ব কমে যায়।[৫৩]

দার্জিলিং, সিলেট এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় চা-বাগান প্রতিষ্ঠার পর এই সমস্ত চা-বাগানের কুলিদেরকে ঘিরে গড়ে উঠে দ্বিতীয় স্রোতোধারা। অধিকাংশ বৃটিশ মালিকানায় এই চা-বাগানগুলোতে বহুদূরের লোক লাগানো হতো। এদের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, বিহার, নেপাল, সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, এমনকি মাদ্রাজের লোকও ছিল। চা-বাগানের কুলিদেরকে এক বিন্যস্ত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হতো এবং বিশেষ চা-বাগানের জন্য এক বা একাধিক অঞ্চলের লোকদের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি করা স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। স্থানীয় মজুরেরাও কোন কোন সময়ে বাগানে কাজ করতো এবং চা-বাগানের কুলিরাও চুক্তিবদ্ধ হবার পর অনেক সময় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতো। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের নিয়োগব্যবস্থায় তাদের সাথে স্থানীয় কৃষকদের সম্পর্ক খুব কমই থাকতো। পুঁজিবাদী বাগানএলাকা এবং আশেপাশের কৃষিঅর্থনীতি এই দুই ধরনের পৃথক মজুরবাজার সৃষ্টি করে, যেখানে মজুর চলাচল দুই ধরনের বৃত্তের বৈশিষ্ট্য আনয়ন করে।[৫৪] দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের চা-বাগানে অবস্থানরত মজুরেরা তাদের জন্মভূমির সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বন্দি সর্বহারায় পরিণত হয়। প্রয়োজনবোধে চা-বাগানগুলো তখন স্থানীয়ভাবে নৈমিত্তিক মজুর নিয়োগ করতো।[৫৫] সুদূরে চলাচলের তৃতীয় ধরনের ধারা ছিল দেশান্তরী হওয়া। এর মধ্যে ছিল দুই ধরনের মজুর—চুক্তিবদ্ধ মজুর এবং বার্মা বা অপর কোন বৃটিশ উপনিবেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে গমনকারী মজুর। বাংলাদেশ থেকে স্থায়ীভাবে দেশান্তরে গমনে, বিশেষকরে বার্মায় গমনে ঔপনিবেশিক সরকার উৎসাহ যোগাতো :

> বার্মায় যেকোন মজুর কয়েক বছরের মধ্যে কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করতে পারতো। তাদেরকে বেশ অনুকূল হারে শুধুমাত্র সরকারি রাজস্ব দিতে হতো এবং তারা সমস্ত ঝক্কিঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পারতো। এই বিবেচনা চট্টগ্রামবাসীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে, তারা প্রবাসী বাঙালীদের সংখ্যার ব্যাপক যোজনাকারী হয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড় অংশে পরিণত হয়।[৫৬]

৫৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ, Chattopadhyaya, A 199-A 120.

৫৪. তুলনীয় B.C. Allen, *Assam District Gazetteers,* Volume 11: Sylhet, (Calcutta 1905), 68; J.B. Kindarsley, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Chittagong 1923-1933,* (Alipore 1939), 12; Bondyopadhyaya, A 114-A 115, Sharit Bhawmik, *Class Formation in the Plantation System* ,(New Delhi 1981).

৫৫. A.B.M Khalid, "Some Problems of the Tea Industry in Post-Liberation Bangladesh." *The Dacca University Studies* 23, Part (June 1975), 61-82; Dan Jones, *Tea and Justice. British Tea Companies and the Tea Workers of Bangladesh* , (London 1986)

৫৬. Philip Nolan, *Report on Emigration from Bengal to Burma and How to Promote it,* (Calcutta 1888),5, তুল্য A. Narayana Rao, *Indian Labour in Burma,* (Rangoon 1933). বিশেষকরে চতুর্থ অধ্যায়।

কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এভাবে স্থায়ী অভিবাসী হওয়ার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি করার পরবর্তী প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং তা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে অন্য কোন অঞ্চলে, বিশেষকরে মাদ্রাজে এরকম চেষ্টা চালাতে বাধ্য করে।[৫৭] কিন্তু তাই বলে চট্টগ্রাম থেকে অভিবাসী হওয়ার ধারা থেমে যায় নি। এখানকার মানুষ পায়ে হেঁটে বার্মায় যেতো। অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলা থেকে পার্বত্য ত্রিপুরায় (যা বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরা) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল থেকে এবং ময়মনসিংহ ও পাবনা থেকেও আসামে অভিবাসী হবার প্রবণতা অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চুক্তিবদ্ধ মজুরদের দল কলকাতা বন্দর দিয়ে বিরাট সংখ্যায় বাংলাদেশ ত্যাগ করতো। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই ছিল বিহারী, বাঙালি নয়। অবশ্য বিপুল সংখ্যক মজুরের দেশান্তরে যাবার ঘটনা বাংলাদেশেও ঘটেছিল। তা হলো চট্টগ্রাম এলাকার গ্রামীণ মজুদেরর মওসুমি কাজে বার্মায় যাওয়া, যেখানে তারা আরাকানের উর্বর উপকূলভাগে প্রধানত ফসল কাটার কাজই করতো এবং তাদের সাহায্য ছাড়া আরাকানের ধান রপ্তানির জন্য প্রস্তুত এবং সংগ্রহ করা যেতো না।[৫৮] বার্মার বন্দরে তারা কুলির কাজ এবং অনেক সময় মাঝিমাল্লার কাজও পেতো। শতাব্দীশেষে বার্মায় প্রায় ৭৯,০০০ চট্টগ্রামবাসী ছিল।[৫৯] ১৯৩০-এর দশকে বার্মায় ভারতীয়বিরোধী দাঙ্গার ফলে এবং ১৯৪৮ সালে সে দেশটির স্বাধীনতার ফলে মওসমি ও স্থায়ীভাবে দেশান্তর গমনে ভাটা পড়ে। তথাপি অবৈধভাবে বাঙালীরা ততোদিন পর্যন্ত চুপিসারে আরাকানে ঢুকতে থাকে (যেখানে বাংলাদেশের রোহিংগা উপজাতির বিপুল সংখ্যক প্রবাসীরা সনাক্তকরণ এড়িয়ে যায়) যতোদিন বার্মা সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করে। ১৯৭৮ সালে এ নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করা হয়। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ রোহিংগা উপজাতীয় শরণার্থী চট্টগ্রামের জেলাসমূহে ভীড় জমায় এবং ছয় মাস ধরে ক্যাম্পে বাস করতে থাকে এবং ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ও বার্মা সরকার এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালাতে থাকে।[৬০]

পূর্ব বাংলা থেকে অন্যভাবে অন্যান্য দেশে অভিবাসী হতো নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মজুরেরা, যারা বহুকাল ধরে সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিক, কয়লাযোগানদার ও বাবুর্চির কাজ করতো।[৬১] এদের কেউ কেউ যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে থেকে যায় এবং ঐ দেশে তারাই ছিল বাঙালি জাতির আদি প্রবাসী।

---

৫৭. Cheng Siok-Hwa. *The Rice Industry of Burma 1852-1940*, (Kuala Lumpore 1968), 118-120

৫৮. Nolan. *Report on Emigration*, 7.

৫৯. এই স্থানবদলকারীদের ৮২% ছিল পুরুষ, যা মওসুমি স্থানান্তরের আধিক্য বুঝায়। L. S. S. O'Malley, *Eastern Bengal Distrct Gazetteers Chittagong*, (Calcutta 1808), 51.

৬০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন *Far Eastern Economic Review*, ১৯৭৮ সালের মে ১৯ ও ২৬, জুন ৯ ও ২১ এবং নভেম্বরের ৩ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যাসমূহ।

৬১. Dinkar D. Desai, *Maritime Labour in India*, (Bombay 1940)

সর্বশেষ এবং সুদূরে প্রবাসী মজুরদের চতুর্থ ধারার মধ্যে ছিল জঙ্গল কাটার দিশারী দল—প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, বিহারের দক্ষিণ অঞ্চল, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের সাঁওতাল, ওঁরাও এবং মুণ্ডা উপজাতীয় বাসিন্দারা। উত্তর বাংলায় বিশেষকরে বরেন্দ্রভূমিতে কাজের জন্য তাদেরকে আনা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণত তাদেরকে জমির উপর কোন স্বত্ব দেয়া হতো না। ফলে এরা জমি আবাদ করার পরপরই মজুর হয়ে যেতো বা কোন নতুন জমি উদ্ধারের কাজের জন্য অন্যত্র চলে যেতো। দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনে ঐ একই ধারা দেখা যায়, যেখানে এই জঙ্গলকাটার দলের অধিকাংশই ছিল বাঙালী।[৬২]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মজুরদের চলাচল

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মজুরদের স্বাভাবিক চলাচল ছিল। অধিকাংশ চলাচল ছিল মওসুমি। শীতকালে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে ফসল পাকার মওসুমকে অনুসরণ করে তারা চলাচল করতো। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকেই ছিল সাধারণভাবে চলাচলের ধারা, যেখানে মজুরি বেশি হারে পাবার সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু এই চলাচলের ভিন্ন ভিন্ন পথ ছিল। কোন কোন সময় এক পথ আর এক পথকে আড়াআড়িভাবেও অতিক্রম করতো। এইভাবে এক উল্লেখযোগ্য দলের প্রবাহ ছিল নদীয়া, পাবনা এবং রাজশাহী থেকে রংপুরের পথে। আর এক ধারা ছিল নোয়াখালী থেকে ত্রিপুরার পথে। আরো একটা ধারার যাত্রাপথ ছিল ফরিদপুর থেকে ঢাকা হয়ে ময়মনসিংহ বা সিলেট পর্যন্ত। ঐ একই সময়ে ফসল কাটার দল উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতো। তারা নদীয়া, যশোর এবং ফরিদপুর জেলা থেকে বাকেরগঞ্জ, খুলনা এবং ২৪-পরগনায় যেতো। যদিও তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে, তবুও ফসল কাটার মজুরদের এই চলাচলের বিষয় ঔপনিবেশিক আমলে বা তারপরে কখনই বিশ্লেষণ করা হয় নি এবং এই বিষয়ে কাজ করা এই সমীক্ষার আওতার বাইরে ছিল।[৬৩] বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিম্নবর্ণিত চার ধরনের চলাচলের প্রত্যেকটা সম্পর্কে আরো গভীর নিরীক্ষা প্রয়োজন।

দক্ষিণ বাংলার মওসুমি মজুরদের ভাষায় ভাটিতে যাওয়ার অর্থ সুন্দরবনের জলাভূমিতে যাওয়া। ষোল শতকে গঙ্গার মোহনার কাছে নৌচলাচলের প্রদেশের নাম ছিল 'ভাটি', যে নাম আজো টিকে আছে।[৬৪] উনিশ শতকে সুন্দরবন এলাকায় জমি উদ্ধারের

৬২ দেখুন, 'Donnell, 167-168, L.S S O'Malley, *Bengal District Gazetteers. Rajshahi,* (Calcutta 1916). 51-52, 76-77, Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century,* (Rotterdam 1984)

৬৩. ১৯০৫-১৯২৫-এর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে মওসুমি স্থানান্তরের ধারার বিষয়ে রেখাচিত্র আছে এবং ১৮৯৯-১৯৪২-এর জরিপ এবং বন্দোবস্ত বিবরণীতেই দেখা যায় খুবই ঘন পরস্পর অতিক্রমকারী গতিধারা, কিন্তু প্রত্যেক ধারার মাত্রা সম্পর্কে খুবই কম তথ্য আছে। সূত্রের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 51

৬৪. *Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division,* (Calcutta 1864), 129 n.

কাজে ভাটিতে যেতে তিন ধরনের দলকে লক্ষ্য করা যেতো—মওসুমি ফসল কাটার দল, মওসুমি চাষীর দল এবং বসতিস্থাপনকারীর দল। ১৮৭৬ সালে প্রথমোক্ত দুই দলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপে :

> ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জের উত্তরাংশের রায়তেরা ফসল কাটার মওসুমে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে ঠিক সেভাবেই যাতায়াত করে যেভাবে আইরিশ মজুরেরা ফল সংগ্রহ ও খড় তৈরির কাজে ইংল্যান্ডে আসতো এবং কাজের শেষে ফিরে যেতো। বাকেরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানের মজুরেরা জুন মাসে ধান বোনার কাজে সুন্দরবনে যেতো এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকতো। তারপর হয় তাদের পাওনা ধান নিয়ে, না হয় ধানগুলো ঐখানেই বিক্রি করে তারা বাড়ি ফিরে আসতো। আমার মনে হয়েছে, একথা আমি যোগ করতে পারি যে এই জেলার এটাই ছিল প্রায় সর্বজনীন রীতি যে, যদি পরিবারে একজনের বেশি পুরুষ থাকে, তাহলে সেই পরিবার বছরে এক বা একাধিক জনকে সুন্দরবন পাঠাবে।[৬৫]

শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে যখন স্থায়ীভাবে মজুরদের স্থানান্তরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং জলাভূমিতে চলাচলকারী এসব মজুর দিয়ে চাষাবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন চলাচলকারী মজুরেরা মওসুমি ফসল কাটার কাজের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে এবং এইভাবে সুন্দরবন এলাকায় ফসল কাটার উপর কৃষিমজুরগণ নির্ভরশীল হয়ে যায়। ১৯১৪ সালের দিকে বাকেরগঞ্জে শ্রমপরিস্থিতি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র সেন নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন :

> প্রাচুর্য থাকার ফলে অধিকাংশ লোক, বিশেষকরে হাওলাদার ও জোতদারেরা কায়িক পরিশ্রমের প্রতি জন্মগতভাবে বিরূপ ছিল এবং একে মানহানিকর মনে করতো। ধান রোপার মওসুমে অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট মাসে লোকদের মধ্যে কিছুটা কাজ করার প্রবণতা দেখা যেতো। সাধারণ মাত্রার উপরে যাদের অবস্থান এবং যারা জনমজুর দিয়ে তাদের জমিতে চাষাবাদ ও ধান রোপার কাজ করাতে সক্ষম ছিল, তারা ব্যতীত এই সময়ে অন্য লোকেরা লাঙ্গল, গরু, বীজধান ও ধানের চারা নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। যে মুহূর্তে এই মওসুম শেষ হতো, তারা হাত-পা ধুয়ে হাল্কা হয়ে পরবর্তী মওসুম না আসা পর্যন্ত সুদীর্ঘ আরামের আমেজে নিমগ্ন থাকতো। ফসল কাটার মওসুমে চাষীরা তাদের জমিতে খুবই কম যেতো। এই সময়ে ঢাকা ও ফরিদপুর থেকে জনমজুরেরা এসে ফসল কাটার সব কাজ করে দিত।[৬৬]

'ভাটি'এলাকায় দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধির ফলে স্পষ্টত স্থানান্তরীদের গঠনকাঠামো বদলে যায় এবং অবশেষে মওসুমি জনমজুরেরাই প্রাধান্য পেতে থাকে।[৬৭]

ভাটি এলাকায় মওসুমি স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে সম্ভবত বাংলাদেশের অন্য এলাকাতেও দুই ধরনের স্থানান্তর দেখা যায়, যে প্রক্রিয়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী

৬৫. Bengal General Proceedings (Miscellaneous), September, 1876 (IOR P/871), 281 (p 7 of *Annual General Administration Report*, Dacca Division, 1875-76)

৬৬. Ramesh Chandra Sen, *Final Report of the Survey and Settlement of the Tushkhali Government Estate in the District of Bakarganj, 1912-1916*, (Calcutta 1916), 17.

৬৭. আরো দেখুন, Harun-er-Rashid, *Geography of Bangladesh*, (Dacca 1977), 511 -514

কৃষক এবং গ্রামীণ মজুরদের পার্থক্য নিরূপণের ব্যাপারে এক সমস্যা সৃষ্টি করে। এই দ্বিবিধ স্থানান্তর সম্পর্কে ১৯১৬ সালে জ্যাক খুব তীক্ষ্ণভাবে মন্তব্য করেন :

> ফরিদপুরের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক গ্রামে ধান কাটার সব কাজ নদীয়া জেলার মতো আশেপাশের জেলা থেকে আগত কৃষিমজুরদের দিয়ে করানো হতো। কার্যকালীন সপ্তাহ বা পক্ষকালব্যাপী মনিবেরাই তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতো। ইতিমধ্যে সেই মনিব নিজে তার কয়েকজন প্রতিবেশীকে সাথে নিয়ে নৌকাযোগে বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের উর্বর জমিতে চলে যেতো। সেখানকার কৃষকদের বেশ সম্পন্ন অবস্থা ছিল এবং নিজেদের ফসল কাটার ব্যাপারে তাদের আত্মম্ভরিতা ছিল এবং তারা সর্বদাই অন্য জেলা থেকে আগত জনমজুর দিয়ে কাজ চালাতো। এখানে মজুর তার খাবার পেতো এবং মজুরি হিসেবে পেতো ফসলের এক-পঞ্চমাংশ। এখানে ফসল এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো যে তার প্রাপ্ত অংশ দিয়ে তার পরিবারের সারা বছরের চালের সমস্যা মিটে যেতো এবং তার নিজের জমির ফসলকাটার মজুরি বাবদ যে পরিমাণ শস্য দিতে হতো তার চেয়ে তা ছিল অনেক অনেক বেশি।[৬৮]

মওসুমি মজুরদের বাজার, এমনকি ফসল কাটার মজুরদের বাজারও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তা না হলে নদীয়ার মজুরেরা ফরিদপুরের নিম্নহারের মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকবে কেন, যখন তার চেয়ে খুব বেশি দূরে না গিয়েই বেশি আয় করা যেতো ? মনে হতে পারে যে, এই মওসুমি নিয়োগের ব্যাপারে ফরিদপুরের ফসলকাটিয়েদের সাথে বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের মনিবদের বহুদিনের সম্পর্ক ছিল, যা হয়তো নদীয়া থেকে আগত মজুরদের কাজ দিতে বাধার সৃষ্টি করতো। কিন্তু বর্তমানে এই দ্বিবিধ স্থানান্তর সম্পর্কে এত কম জানা যায় যে কোন উপসংহারে আসা যায় না।

বড় বড় নদীতে চর জেগে কৃষিজমির উদ্ভব হতো। সেই চরে যাওয়া ছিল স্থানান্তরের তৃতীয় ধরনের উল্লেখযোগ্য ধারা। নদীতে যখন বিশাল জলরাশি ভেদ করে চর জেগে উঠতো, তা মূলভূমির লোকদের মধ্যে ঐ চরে যাবার আকর্ষণ সৃষ্টি করতো। প্রথম প্রথম তারা মূলভূমিতে থেকেই চরে চাষাবাদ শুরু করতো। কিন্তু পরে চরেই ছোট ছোট কুঁড়েঘর বানিয়ে তারা নতুন আবাস গড়ে তুলতো। এই ধরনের আবাদিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন। কেউ কেউ তাদের এই নতুন চরের জমিতে ভালো ফসল ফলাতো, যে কারণে তারা আয়ের জন্য মজুরির কাজ ছেড়ে দিত। অন্যেরা চাষাবাদ এবং ছোটোখাট ব্যবসা করতো বা ফসল কাটার মওসুমে দ্বিবিধ স্থানান্তরের রীতি বহাল রাখার জন্য জনমজুর আমদানি করতো।[৬৯] কিন্তু চরের চাষাবাদ ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীনদের জন্য একটা ব্যবস্থা হিসেবে কখনো দেখা দেয় নি। পক্ষান্তরে, স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে ঐ জমির দখল নিয়ে তীব্র সাংঘাত শুরু হতো এবং দাঙ্গা-ফ্যাসাদের উৎসভূমি হিসেবেই চর চিহ্নিত হতে থাকে। এই অবস্থা চলতে থাকে এবং আরো

৬৮. Jack, *The Economic Life* 42

৬৯ দৃষ্টান্তস্বরূপ, J. C Jack, *Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District 1904 to 1914*, (Calcutta 1916), 14, G.E Lambourn, *Bengal District Gazetteers: Malda*, (Calcutta 1918),33, 58, 65, L. S. S O "Malley, *Bengal District Gazetteers, Faridpur*, (Calcutta 1925), 79

ধানীজমির অভাবে তিক্ততাও অব্যাহত থাকে। চরে যাওয়ার এই ধারার প্রভাবে বাংলাদেশের লোকেরা উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আসামে চলে যায় এবং দক্ষিণের বহু নদনদী বেয়ে বঙ্গোপসাগরের ভয়ঙ্কর চরগুলোতে উপস্থিত হয়।[৭০]

যদিও গ্রাম থেকে শহরে গমন হচ্ছে চতুর্থ ধরনের স্থানান্তরী হবার ধারা এবং যার উপর অনেক গবেষণা হয়েছে, তথাপি কলকাতা মহানগরীর বাইরে এই গ্রাম-শহরে স্থানান্তরের ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। এমনকি কলকাতার ক্ষেত্রেও বেশির ভাগ তথ্যই কিছু সীমাবদ্ধ শিল্পকারখানায় শ্রমিক সরবরাহের সাথে এবং সর্বহারা মজুরে পরিণত হবার সাথে সম্পর্কিত।[৭১] বিশ শতকের শুরুতে শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল ভিনদেশী, যদিও মওসুমি মিলশ্রমিক হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে, যথা মেদিনীপুর ও পাবনা থেকে তারা আসতো।[৭২] এতে মনে হয়, কলকাতায় আগত অধিকাংশ বাঙালিশ্রমিক সম্ভবত কম সুবিধার কাজ পেতো, যেমন কুলি, বাড়ির চাকর, ডকশ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, রিকশাওয়ালা, বেশ্যা, পিওন ও পাহারাদারের কাজ বা গৃহভিত্তিক বা ছোটখাটো কারখানায় শ্রমিকের কাজ। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ, পরে দেশভাগ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্বাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কলকাতার নোংরা বস্তিতে বা রাস্তায় বসবাসকারীদের উপর চালানো জরিপে দেখা যায় যে, এদের অধিকাংশই আগমন করেছিল আশেপাশের জেলা থেকে, বিশেষকরে ২৪-পরগনা থেকে।[৭৩] ১৯৬০ সাল পার না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় শহরে যাবার ঐ ধারা পরিলক্ষিত হয় নি। কিন্তু এই সময়ে স্থানবদলকারী দুঃস্থ মানুষদের ঢাকা আগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতার মতো ঢাকা শহরেও বেশির ভাগ লোক আশেপাশের জেলা থেকে এসেছিল এবং এরা ইতিপূর্বে গ্রামে মজুরি

৭০. Shapan Adnan et al., 'Land, Power and Violence in Barisal Villages", Dacca The Village Study Group 1976 (Mimeo); Nilufar Matin, *Landless Mobilization and Development of Coastal Areas in Bangladesh,* (Dhaka/London) 1986), Michael Nebelung, *Mobilization and Organization of Small Peasants and Agricultural Labourers in Rural Bangladesh, Importance and Perspectives of a Development Strategy employed by Non-Governmental Organisations,* (Berlin 1988)

৭১. দাসগুপ্ত, ১৯৭৬, এই প্রবন্ধতে উল্লেখ করেন। আরো দেখুন, চক্রবর্তী এবং রণজিৎ দাসগুপ্ত, "Material Conditions and Behavioral Aspects of Calcutta Working Class 1875-1899", *Occassional Paper No 2,* (Calcutta 1979), (Mimeo).

৭২. দেখুন, B Foley, *Report on Labour in Bengal,* (Calcutta 1906) আরও সূত্রের জন্য দেখুন Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 53

৭৩. দাস এবং প্রকাশ পূর্ব বাংলা থেকে শরণার্থী সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন; Singh, De Souza ও Sinha রাস্তার বস্তিবাসীদের কথা বলেছেন। Tarakchandra Das, *Bengal Famine (1943) as Revealed in a Survey of the Destitutes in Calcutta,* (Calcutta 1949); Kauti B. Pakrasi, *The uprooted A Sociological Study of the Refugees of West Bengal, India,* (Calcutta 1971), Andrea Menefee Singh and Alfred De Souza, *The Urban Poor , Slum and Pavement Dwellers in the Major Cities of India,* (New Delhi 1980) , 30,32, 36-37 and Dikshit Sinha, *Life in a Calcutta Slum,* S. Sinha (ed), *Cultural Profile of Calcutta,* (Calcutta 1972), 88.

খেটে বা ভিক্ষে করে দিন চালাতো এবং তাদের অধিকাংশের বাড়ি বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ জেলায়।[৭৪]

স্থানবদলের ধারা পরিবর্তন

উনিশ শতকের শেষে বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরেরা খুবই গতিশীল ছিল। অধিক হারে মজুরির জন্য মজুরদের খুব বেশি পূর্বমুখী মওসুমি চলাচল ছিল। তখন মজুর বিহার থেকে বাংলাদেশ হয়ে আসামে যেতো। বাংলাদেশের আঞ্চলিক আর্থিক অবস্থায় শস্যউৎপাদন এবং ভূমি-মানুষের হারের তারতম্যের ফলে স্থানবদলের এই স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয় এবং বাংলাদেশেরই কোন কোন অঞ্চল তাদেরকে আকৃষ্ট করে। এরকম তিনটি প্রধান অঞ্চল ছিল—উত্তর বাংলা (জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কুচবিহার, রংপুর ও বগুড়া), দক্ষিণের ভাটি অঞ্চল (বাকেরগঞ্জ, খুলনা এবং ২৪-পরগনা) এবং উত্তর-পূর্বে বোরো ধান চাষের অধীনে মেঘনার নিম্নাঞ্চল (ময়মনসিংহ ও সিলেট)। এ অঞ্চলগুলোর আকর্ষণ এবং সেই সাথে দ্বিবিধ স্থানবদলের উন্নত ধারা পূর্বমুখী শুধু মজুরিভিত্তিক মওসুমি স্থানবদলের আকর্ষণের জন্য ছিল এক সতর্কসংকেত।

স্থায়ী স্থানবদলের ধারা প্রায়ই মওসুমি স্থানবদলের রূপ নিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপনের সুযোগ হ্রাস পেয়ে যায়। স্থায়ীভাবে বসতির আশায় যারা যেতো তারা দেখতে পেলো যে জনমজুরি ছাড়া আর কোন কাজ নেই। 'যে যায় পাবনা, তার নেই ভাবনা'[৭৫] -এর মতো স্থানবদলের উৎসাহব্যঞ্জক প্রবাদবাক্য বিলীন হতে থাকে। বিশ শতকের বাংলাদেশে অনেক কারণ এই স্থানবদলের ধারাকে আরো পাল্টে দেয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, গ্রামীণ লোকসংখ্যার মধ্যে মজুরদের অধিক হারে বৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক আমলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিককালের উচ্চফলনশীল ধানের প্রবর্তন সম্পর্কিত যৌক্তিক পরিবর্তন। ফলে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে মওসুমি মজুর চলাচলের পূর্বমুখী ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মওসুমি মজুরদের চলাচলেরই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে যায়।

এখন যেহেতু সর্বত্রই মজুরের আধিক্য রয়েছে এবং চাষাবাদচক্রের মওসুমের বিশেষ তুঙ্গ পর্যায়েই শুধু এর স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই মজুর চলাচলের সাফল্য সংগঠন ও পরিকল্পনার উপর বেশি নির্ভরশীল হতে থাকে। বাংলাদেশে ভাসমান, বাস্তুহারা, সর্বকালীন ভবঘুরে শ্রেণীর উদ্ভব এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে, যারা হয় ভিক্ষাবৃত্তি না হয় ছোটখাটো কাজের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এই 'ভাসমান' লোকের দল শুধু যে নিয়মিত

৭৪. Sayeda Rowshan Qadir, *Bastees of Dacca: A Study of Squatter Settlement* (Dacca 1975), 20-26, *The Vagrants of Dacca City A Socio-Economic Survey, 1975,* (Dacca 1978) 46-48.

৭৫. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers, Pabna* (Calcutta 1923), 31.

স্থানবদলকারী মজুরদের কাজ পাবার ক্ষেত্রেই হার মানায় (এরা খুবই নিম্নহারে কাজ নিতে পারে, কেননা এদের আর যাতায়াতখরচ মিটাতে হয় না) তাই নয়, এই মজুরেরা মওসুমি কাজের জন্য স্থানত্যাগের সাথে সাথে ভাসমান লোকেরা তাদের স্থান ভালভাবেই দখল করে। মওসুমি চলাচলে অভ্যস্ত অনেক মজুর স্থানবদল করা বন্ধ করে বাড়িতে থেকেই কাজ সামলায়। অন্যেরা আরো দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে ও সুদূরের মালিকদের সাথে অগ্রিম মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে তাদের মওসুমি কাজের সামাল দেয়।

উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের অভাবজনিত বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্পদ খুবই সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের চাপ ধীরে ধীরে মজুরদের স্থানবদলের ধারাকে কোণঠাসা করে ফেলে, যে চলাচলের ধারা শতাব্দীব্যাপী গ্রামীণ মজুরদের আয়ের জন্য এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে শুধু বাঁচার তাগিদেই লোকেরা স্থানবদল করতো। অধিকন্তু লাভের চেয়ে চলাচলের খরচও বেড়ে যায়। ফলে স্থানবদলকারী মজুরেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাসমান শ্রেণী আয়ের জন্য চলাচল করতে থাকে এবং পরিকল্পিত শ্রেণী আরো বেশি সংগঠিত হতে থাকে এবং চলাচলের ব্যাপারে আর্থিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিতে থাকে।[৭৬] সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত এবং সুসংগঠিত এই দুই চরম মাত্রার স্থানবদলকারী মজুরশ্রেণীর সাথে খোলা বাজারে স্থানবদলকারী মজুরদের এক তৃতীয় শ্রেণীকে নতুন নতুন ফসল এবং নতুন প্রযুক্তি সংযোগের ফলে কোন কোন স্থানে বর্ধনশীল অথচ এক অনিশ্চিত মওসুমি নিয়োগের সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়। স্থানবদলকারী এই মজুরের দলকে গ্রামের হাটবাজারে শ্রম বিক্রয়ের জন্য জমায়েত হতে দেখা যায় এবং এরা আশেপাশের এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ মজুরি প্রদানকারীর খামারে কাজে যায়। কতদিনের কাজ এবং কি ধরনের মজুরি পাওয়া যাবে তা নিয়ে দরাদরিশেষে চুক্তি হয়।[৭৭]

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্যবেক্ষকগণ জানান যে, পূর্বেকার দশকগুলোতে কথিত মজুরদের ভৌগোলিক স্থানান্তরের মাত্রা বাড়তে থাকে।[৭৮] একই সাথে ভিনদেশীদেরকে বাঙালি মজুরেরা উৎখাত করে। মজুর চলাচলের ধারা সীমিত এবং পৃথক হতে খুব বেশি দেরি হয় না। যা থাকে তা হলো, গ্রামীণ মজুরেরা সহজেই কৃষিকাজের সাথে অকৃষিকাজে রপ্ত হয়ে যায় এবং গ্রামীণ নিয়োগ থেকে শহুরে নিয়োগের জন্য চলাচল করতে থাকে। বিশেষ এক সময়ে বা মওসুমকে অন্যের চেয়ে বেশি করে কাজ দিতে পারছে এবং কে

৭৬. সূত্রের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 55-56। ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও ঢাকার মধ্যে মজুর স্থানান্তরের জটিল ধরন সম্পর্কে বিশদ গবেষণা আমিনুল হক ফরায়জির Ph D থিসিসে প্রকাশিত হবে, La Trobe University (Australia)

৭৭. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 211-212, তুল্য Bandyopadhyaya, A,120

৭৮. দৃষ্টান্ত J. N. Gupta, *District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam : Bogra,* (Allahabad 1910), 91

বেশি মজুরি দিতে পারছে, তার বাইরে স্থানবদলকারী মজুরদের কাছে অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রের সীমানা অর্থহীন হয়ে যায়।

কর্মসংস্থান এবং মজুরি

আলোচ্য সময়ে গ্রামীণ মজুরদের সমাগম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তা ১৮৮০ সালে একজনের স্থলে ১৯৭০ সালে চারজনে দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রমের চাহিদার কি অবস্থা ? কারা এদের কাজ দিয়েছিল এবং কোন্ শর্তে ? কিভাবেই বা অবশেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল ? এসব প্রশ্নের প্রতিই আমরা এখন দৃষ্টি দেবো।

নিয়োগকর্তা

বাংলাদেশের কৃষিমজুরদের নিয়োগকর্তারা যে কোন সংগঠিত শ্রেণী তা মনে করা ভুল হবে। বরং আমাদের তথ্যে দেখা যায় যে, এদের প্রায় সবাই কোন না কোন সময় জনমজুর খাটিয়েছে। বড় বড় ভূস্বামী ১৮৮০-এর দশকের সময় থেকে পরবর্তী সময়ে জনমজুরদের পরিবর্তে ভাগচাষীদের দিয়ে তাদের জমি চাষাবাদ করাতো।[৭৯] কিন্তু তারা নিজ জোতের জমি প্রায়ই জনমজুর দিয়ে চাষাবাদ করাতো। বেগারশ্রম বা ভূস্বামীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম দেবার রীতি এই সময় একেবারেই উঠে গিয়েছিল। যে প্রামাণ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মনিবের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ হিসাব করা যায় না। কিন্তু সর্বশেষ গবেষণায়ও এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে বড় বড় জমিদার, ঊর্ধ্বতন মধ্যস্বত্বভোগী বা জোতদারেরা গ্রামীণ মজুরদের সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা ছিল।[৮০] স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা হয় যে, সাধারণ চাষীরাই বেশিরভাগ জনমজুর খাটাতো, বিশেষকরে ভরা মওসুমে, যখন পরিবারের সদস্যদের দ্বারা কাজ আর কুলানো যেতো না।

শ্রমবিনিময়পদ্ধতিতে চাষীরা বিনা মজুরিতেও লোক খাটাতে পারতো এবং জমিতে চাষ দেয়া, মই দেয়া এবং পাট জাগ দেয়া, আঁশ ছড়ানো ও শুকানোর সময়ে এই ব্যবস্থার বেশ প্রচলন ছিল। ১৯০০-এর দশকের প্রথমদিকে ছোট ছোট চাষীদের মধ্যে জনমজুর খাটানোর পরিবর্তে মনে হয় এই শ্রমবিনিময়ই বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু সস্তায় জনমজুর খাটানোর সুযোগ বেশি হতে থাকার ফলে শ্রমবিনিময়রীতি কমতে থাকে।[৮১] পাটের ভাল দাম পাওয়ার ফলে সার্বিকভাবে অর্থনীতির প্রসার ঘটে। এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে

৭৯. এই ব্যাপারে বিরাট আঞ্চলিক তারতম্যের জন্য দেখুন, Bose

৮০. নজিরের জন্য দেখুন Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 58; কিন্তু তুলনীয় M. A. Momen, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Jessore, 1920-1924,* (Calcutta 1925), 49

৮১. আরো বিশদ আলোচনার জন্য এবং গ্রামীণ বাংলায় শ্রমবিনিময়ের উপর বিপুল নজিরের জন্য দেখুন Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 58-59.

মজুরগিরি গ্রামীণ বাংলাদেশে বিস্তারলাভ করে। অনেক চাষী জনমজুরের মজুরি মিটানোর জন্য টাকা কর্জ নিত এবং গ্রামীণ ঋণদানপদ্ধতিতে মজুরনিয়োগ একটা উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮২] ১৯৩০-এর দশকের মন্দার সময়ে ঋণ পাওয়ার সুযোগ হঠাৎ করে খুবই কমে যায় এবং কিছুকালের জন্য শ্রমবিনিময়রীতির পুনঃপ্রচলন করে নিয়োগকারীরা জনমজুরের খরচ কমানোর প্রয়াস পায়।[৮৩] কিন্তু দেশভাগের পর শ্রমবিনিময়ের ক্ষেত্রে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা শ্রম সম্পর্কিত বিষয়ে খুবই নগণ্য।[৮৪]

পরিবারখামারভিত্তিক স্বত্বাধিকারী চাষীরাই জনমজুর নিয়োগকারীদের বিরাট অংশে পরিণত হয়। তাদের অধিকাংশ মওসুমের সময় পারিবারিক শ্রমশক্তির ঘাটতি পূরণের জন্য নৈমিত্তিকভাবে মজুর নিয়োগ করতো। কিন্তু অনেকে আবার আরো স্থায়ীভাবে জনমজুর খাটাতো। এইভাবে অধিকতর সম্পন্ন কৃষকপরিবার, বিশেষকরে যেসব পরিবার চিন্তায় ও কাজে জোতদার হবার পথে, সেসব পরিবার বাৎসরিকভাবে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করতো। এ এমন এক সামাজিক উন্নতির মনোভাব, যেখানে কায়িক পরিশ্রম পরিহার করা আবশ্যক। কিন্তু ক্ষেতমজুরদের নিয়োগকারীদের আরো অনেক গৃহস্থালি ছিল, যাদের পারিবারিক ঐতিহ্য তাদের নিজেদের লাঙ্গল ধরার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতো (হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণের জন্য, যাদেরকে সাধারণত শরিফ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো)।[৮৫]

জনমজুর যে শুধু জোতদার, মধবিত্ত কৃষক বা বিশেষ শ্রেণীরাই খাটাতো তাই নয়, অবিশ্বাস্যভাবে যাদের নিজেদেরই ভরণপোষণ চলতো না, এমন ছোট ছোট চাষীও খাটাতো। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভাগচাষীরা, এমনকি খণ্ডকালীন জনমজুরেরাও জনমজুর খাটাতো।[৮৬] এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ছোট ছোট

৮২. তুল্য Binay Bhushan Chaudhuri,' "Rural Credit Relations in Bengal, 1859-1885," *Indian Economic and Social History Review,* (September 1969), 204-257 এবং তাঁর "The Process of Depeasantization."

৮৩ M. O Carter, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda, 1928-1935,* (Alipore 1939), 51

৮৪. দৃষ্টান্ত, Betsy Hartmann and James Boyce, *A Quiet Violence · View from a Bangladesh Village,* (San Fransisco /London 1983), 206.

৮৫. তুল্য, Marvin Davis, *Rank and Rivalry. The Politics of Inequality in Rural West Bengal,* (Cambridge 1983) , 50-69, 206 Van Schendel, *Peasant Mobility* 212-214; Ashok Rudra and Madan Mohan Mukhopadhyaya, "Hiring of Labour by Poor Peasants" *Economic and Political Weekly,* (January 10 1976), 34.

৮৬. ভাগচাষীদের জন্য দেখুন Sachse, Rudra এবং Clay; মজুরদের জন্য দেখুন, Prance, Jack, Habibullah এবং Farouk Rudra, এবং Rudra and Mukhopadhyaya, F. A, Sachse, *Mymensingh,* 70; Ashok Rudra, 'Sharecropping Arrangements in West Bengal", *Economic and Political Weekly,* 10, 39 (September 27, 1975), Edward J Clay, "Institutional Change and Agricultural Wages in Bangladesh," *Bangladesh Development Studies,* 4:4 (October 1976), 434-436;. B C Prance, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Riparian Areas of District Pabna Surveyed in the Course of the Faridpur District Settlement,* (Calcutta 1916),5, Jack, *Economic Life,* 42; M Habibullah and A. Farouk, *The Pattern of Agricultural Unemployment: A Case Study of an East Pakistan Village,* (Dacca 1962), 17; Rudra and Mukhopadhyaya, প্রাগুক্ত, 34.

গৃহস্থালিতেও ভরা মওসুমে লোক লাগানোর প্রয়োজনীয়তা ছিল অথবা ছোট গৃহস্থরা খরচ চালানোর জন্য এবং পূর্বের কৃত দেনা পরিশোধের জন্য প্রতিশ্রুত শ্রম দিতে বাধ্য হতো এমন সময়ে, যখন তাদের নিজেদের গৃহস্থালিতে কাজও বন্ধ রাখার উপায় নেই। গ্রামীণ মজুরদের বিভিন্নমুখিতা তৃতীয় উপাদান হতে পারে। কোন কোন কাজে কোন কোন মজুর অন্যের চেয়ে বেশি দক্ষ এবং কোন এক বিশেষ সময়ে কোন মজুর যে শ্রম বিক্রয় করেছে, পরিবর্তে সেই মাত্রাতেই শ্রম ক্রয় করেছে, ঠিক এমন নয়।[৮৭]

বাংলাদেশের কৃষিতে বছরের পর বছর কিভাবে জনমজুর নিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলা কঠিন। একদিকে ছোট ছোট চাষীর মধ্যে শ্রমবিনিময়ের অবনতি ঘটায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোকাবেলায় নিবিড় চাষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায়[৮৮] সর্বজনীনভাবে দুটো শস্য উৎপাদনব্যবস্থার উদ্ভব হয়। পাট-আখের মতো অধিক হারে শ্রমনিয়োজিত অর্থকরী ফসলের প্রসার ও উচ্চফলনশীল ধানের প্রচলন হয়েছে এবং শীতকালে সেচব্যবস্থার জন্য কৃষিমজুরদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, প্রণিধানযোগ্য কৃষকবিনাশ, কৃষিউৎপাদনের স্থবিরতা এবং অপ্রতুল সম্পদের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় গ্রামবাংলার সবচেয়ে বড় নিয়োগকারী মধ্যবিত্ত কৃষকদেব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, যার ফলে মজুরনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, বিভিন্ন মাত্রার ক্ষেত-খামারে সমগ্র শ্রমনিয়োগের তুলনায় মজুরনিয়োগের অনুপাতে কমই তারতম্য ঘটেছে।[৮৯] তা হলে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এই ধারণা করা চলে যে, ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মূলত স্থবির অর্থনীতি সত্ত্বেও কৃষিমজুরনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষিমজুরির বিষয়টা পুরুষদের দখলেই বেশি দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, মেয়েদের দ্বারা ধান ভানার ব্যবস্থা থেকে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি দ্বারা বা ধানকলে ধান ভানার মতো যান্ত্রিক পরিবর্তনের সাম্প্রতিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে শুধু পুরুষমজুর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।[৯০]

৮৭. Rudra and Mukhopadhyaya, প্রাগুক্ত, 36, Khan, 20-21 R. C, Dutt (1882), L S S O' Malley, *Bengal District Gazetteers Bankura* , (Calcutta 1908), 70

৮৮. তুল্য Boyce, *Agrarian Impasse*

৮৯. রুদ্র ও মুখোপাধ্যায় (১৯৭৬,৩৪) এর সত্যতা দেখতে পান ১৯৭০-এর দশকের প্রথমদিকে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায়। বর্তমানে এই তথ্য সমগ্র বাংলার জন্য প্রযোজ্য কিনা বলা অসম্ভব।

৯০ মেয়েদের ধান ভানা পেশার ব্যাপক নজির দিয়ে জেলার বিবরণী পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত, O' Donnell, 204, Jack, *Final Report Bakarganj*, 73; F.W Strong, *Eastern Bengal District Gezetteers. Dinajpur,* (Allahabad 1912), 79 আরও দেখুন S. V Ayyar and A K. Ahmed Khan," The Economics of a Bengal Village", *Indian Journal of Economics*, 4 3 (1926) 204, Mead Cain et al., "Class, Patriarchy and Women's Work in Bangladesh ", *Population and Development Review*, 5·3 (1979), 405-438, ধান ভানা এবং চালকলের জন্য দেখুন, Ramkrishna Mukherjee, *Six Villages of Bengal*, (Bombay 1971), Susan Fuller Alamgir, *Profile of Bangladesh, Women. Selected Aspects of Women's Roles and Status in Bangladesh*, (Dacca 1977)), 66 ; Jahanara Huq," Economic Activities of Women in Bangladesh The Rural Situation", Women for Women Research and Study Group (ed.) *The Situation of Women in Bangladesh*, (Dacca 1979), 139-182

কিন্তু অকৃষিমজুর নিয়োগের ব্যাপারটা কি ? অকৃষিমজুর নিয়োগকারীদেরকে তিনটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—সরকার, প্রাইভেট কোম্পানি এবং ব্যক্তিমালিক। আমাদের আলোচ্য সময়কালে সরকার অনিয়মিতভাবে গ্রামীণ মজুরদেরকে প্রধানত মাটি কাটার কাজে লাগিয়েছিল। প্রত্যেক শীতের সময় মওসুমি বৃষ্টিতে বিনষ্ট কাঁচা রাস্তা ও বাঁধ সংস্কার করতে হতো। ১৯৬০-এর পর অনেক মজুরই সেচকাজের এবং পানিব্যবস্থাপনার প্রকল্পসমূহে কাজ করে বেশ টাকা পায় এবং সরকারি বহু বিভাগ কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করিয়ে থাকে। সরকার খাদ্যমজুরি দেয়, কিন্তু সাধারণত মজুরদের নিয়োগকারী একজন ঠিকাদার থাকতো, যাকে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে নিযুক্ত করা হতো।[৯১] অনুরূপভাবে, দেশবিভাগের পরে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের প্রসার কুলি, ডাকপিওন, রেলশ্রমিক, পিওন, চৌকিদার, পুলিশ ও সৈন্য হিসেবে গ্রামীণ মজুরদের নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[৯২]

প্রাইভেট কোম্পানিগুলো সম্ভবত সরকারের ন্যায় গ্রামীণ মজুর নিয়োগের ব্যাপারে ততোখানি সুযোগ দেয় নি। তবে শহুরে বা গ্রামীণ কারখানার কাছাকাছি এলাকায় গ্রামীণ মজুরেরা কাবখানাশ্রমিক হিসেবে, বাস ও ট্রাকের শ্রমিক হিসেবে, ইটের ভাটার শ্রমিক হিসেবে এবং পিওন ও কুলি হিসেবে কাজ পেতো।[৯৩] কিন্তু আলোচ্য সময়ে অকৃষিমজুরদের বিরাট অংশকে কাজ দিয়েছে ব্যক্তিমালিকগণ। ঔপনিবেশিক আমলে ধনী মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের বাড়িতে চাকর রাখতে, কাছারিতে কেরানি-পিওন রাখতে এবং স্থানীয় কৃষকদের ভয় দেখানোর জন্য সশস্ত্র রক্ষী রাখতে এবং লোকলস্করবাহিনী রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[৯৪] যেখানে পতিত জঙ্গল পাওয়া যেতো, মধ্যস্বত্বভোগীরা সেখানে শিকারী ও কাঠুরের দল নিয়োগ করতো। আর এই শ্রেণীর লোকেরা সেচের কাজে বা বাঁধসংরক্ষণের জন্য বা বড় বড় দীঘি খননের জন্য বিপুল সংখ্যক মাটিয়াল মজুর নিয়োগ করতো। এগুলো ছিল এক ব্যয়বহুল মর্যাদাকর এবং আবহাওয়া শীতলকারী প্রকল্প।[৯৫] ১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের ফলে এই ধরনের নিয়োগ

৯১. মাটির কাজের পূর্বনজিরের জন্য দেখুন "Bengal Village Biographers", *Calcutta Review*, 31, (July-December 1858), 195-197; O' Donnell,167-168 এবং অন্যান্য জেলা গেজেটিয়ারসমূহ (বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 63 n); আধুনিক সমীক্ষার মধ্যে রয়েছে Rehman Sobhan, *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan*, (Dacca 1962), Stefan De Vylder and Daniel Asplund, *Contradictions and Distortions in a Rural Economy: The Case of Bangladesh*, (n p. 1979), 191-210 and Eirik G Jansen, *Rural Bangladesh , Competition for Scarce Resources*, (Oslo 1986),46-47, 262-265.

৯২. নজিরের জন্য দেখুন, Van Schendel and Faraizi, প্রাগুক্ত, 63n.

৯৩. ঐ।

৯৪. ঐ।

৯৫. Cf J. L. Sherwill, *A Geographical and Statistical Report of the Dinajpore District, 1863*, (Calcutta 1865), 4.

বহুলাংশে ব্যাহত হয়। গ্রামীণ সমাজের শিখরে যে নব্য এলিট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো তারা কম জাঁকজমকপূর্ণ জীবনধারার দিকে ঝুঁকে পড়লো, যার ফলে অকৃষিমজুরদের নিয়োগ অত্যন্ত হ্রাস পায়।[৯৬] জমিদারগণ ছাড়াও অনেক সম্পন্ন কৃষক অকৃষিকাজে মজুর লাগাতো। সহভৃত্য, কুলি, মাটিয়ালমজুর এবং ঘরামিরা এই কৃষকদের দ্বারা নিয়োজিত হতো।[৯৭] কারিগর, মাঝি, জেলে, দোকানদার এবং স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরাও মজুরির বিনিময়ে সহকারী নিয়োগ করতো।

এইভাবে দেখা যায় যে, অকৃষিমজুরদের নিয়োগের ব্যাপারে এক বিরাট সংখ্যক ভিন্নমুখী নিয়োগকারী ছিল। সাধারণত কৃষিকাজে যখন আয় হতো না, তখনই এই ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। তাই শীতকালে যখন ক্ষেতমজুরদের প্রকৃতপক্ষে কর্মহীন দিন কাটাতে হতো, তখন মাটি কাটার কাজ, দালানতৈরির কাজ, ঘরামির কাজ এবং ইট তৈরির কাজের মতো নানাবিধ কাজের বিকাশ দেখা যেতো। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি অবনতিতে মজুরিনির্ভর লোকদের কাছে উপার্জনের প্রধান উৎস হিসেবে কৃষিকাজ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, এর মওসুমি প্রকৃতি হারিয়ে গিয়ে তা স্থায়ী সংস্থানে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ বাংলাদেশের অনেক মজুরের এখন এই ধরনের কাজ পাওয়াও বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষি ও অকৃষিকাজের পার্থক্য তাদের কাছে অর্থহীন। তাই তারা আংশিকভাবে বিনা মজুরির কাজের উপর নির্ভর করেও জীবনে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। তারা ফসল তোলার পর মাঠে পড়ে থাকা ধান ও আলু সংগ্রহ করে, কুঁড়ো ঝেড়ে, গোবর, ছোবড়া ও শন যোগাড় করে বা গ্রামের পুকুর থেকে বেআইনিভাবে ছোট ছোট মাছ মেরে আপতিক আয় করে থাকে। উপার্জনের অভাবহেতু এই ধরনের পেশা তাদেরকে আরো দুর্বিনীত করে, ছোটখাটো চুরি, বেশ্যাবৃত্তি ও ভিক্ষা করার দিকে ঠেলে দেয়, যার সবগুলোই তখন বেড়েছে যখন গণদারিদ্র্য হয়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী।[৯৮]

কর্মসংস্থান এবং ঊনকর্মসংস্থান

উনিশ শতকের মধ্যসময়ে অনেক পর্যবেক্ষক মজুরির জন্য কাজ করার ব্যাপারে গ্রামবাংলার মানুষের অনীহার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। ১৮৬০-এর দশকে দিনাজপুর ও বগুড়ার অবস্থা পর্যালোচনা করার সময়ে শেরউইল মন্তব্য করেন :

> যদিও দেশটিতে যথেষ্ট লোকসংখ্যা আছে, কুলি বা মজুর পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। এমনকি বেসামরিক কেন্দ্রসমূহেও কর্তৃপক্ষের সাহায্য ব্যতীত কোন কাজের লোক বা কুলি পাওয়া বা

---

৯৬. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 173, 178

৯৭. ঘর ছাওয়ায় অসামান্য দক্ষতা প্রয়োজন। কিন্তু ঘরামিরা অঘরামিদের সহায়তায় দলবদ্ধভাবে কাজ করে। তুলনীয় Jenneke Arens and Jos Van Beurden, *Jagrupur, Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh*, (Calcutta 1980), 98-99

৯৮. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 79-81, 87-89, 106, 142 154-159,167-171, 226 230, 237 239-240 Siddiqui 355-375

টানাগাড়ি পাওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। আর যদি লোক পাওয়াই যায়, তবে লোকটি দিনের অর্ধেক সময় কাজ করে আর বাকি অর্ধেক সময় বোঝা টানে। যেকোন ধরনের কাজের প্রতি তারা ছিল বিমুখ।[৯৯]

ঐ একই সময়ে ত্রিপুরার (বর্তমানে কুমিল্লা) উপর আলোচনাকালে আরো স্পষ্টভাবে ব্রাউন মন্তব্য করেন :

> একটা কুলির মাসমাইনে পাঁচ টাকার কম ছিল না। কিন্তু যে কাজ সে করতো তার পরিমাণ এত কম যে তার জন্য দু'টাকা দিলেও বেশি দেয়া হতো। এই ধরনের উচ্চমূল্যের কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হয় না। চাষাবাদের জন্য জমির প্রাচুর্য এবং কৃষিকাজের বিপুল উপার্জনের মধ্যেই সেই কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। স্বাভাবিক হিসেবে একথা ধরে নিতে হবে যে কুলিরা তাদের কুলিগিরির প্রতি বা কুলিগিরি চালিয়ে যাওয়ার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী ছিল এবং অতি সত্বরই সে সেকাজ পরিত্যাগ করে আধুনিক বাঙালি কৃষকের আসর ও বাবু শ্রেণীর দলে যোগ দিত।[১০০]

একথা বলা ঠিক হবে না যে, সব সময়ে গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধির কারণেই মজুর পাওয়া দুর্লভ ছিল। বাংলাদেশের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের বহু এলাকায় এর কারণ ছিল বর্ধমান জ্বর (ম্যালেরিয়া)-এর প্রকোপে উচ্চহারে মৃত্যু, যা উনিশ শতকের শেষার্ধ ব্যাপী আঞ্চলিক রোগ হিসেবে থেকে যায়। বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী ও রংপুর জেলার সমগ্র এলাকায় এবং পাবনা ও বাঁকুড়া জেলার কিয়দংশে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে দেখা যায়। কিন্তু দিনাজপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোরে তা ছিল স্থির। গ্রামীণ গরিবদের মধ্যে যাদের অপর্যাপ্ত খাবার ছিল, মনে হয় তারা অতি সহজেই এই জ্বরে মারা যেতো। যারা বেঁচে যেতো তাদের প্রাণশক্তিও কমে যেতো এবং এর ফলে চাষাবাদএলাকারও বেশ অবনতি দেখা দেয়। এমনকি ফসল কাটার মজুরের অভাবে মাঠেই ফসল নষ্ট হবার দৃশ্যও দেখা যায়।[১০১] শতাব্দীর শেষদিকে এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করে।

সক্ষম লোক এবং ইচ্ছুক মজুরের অভাব সম্পর্কে আগ্রহী নিয়োগকর্তাদের অভিযোগ ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে এবং ১৯১০-এর দশকের মধ্যে এই অভিযোগ লোপ পায়। এই সময়ের মধ্যে নিয়োগব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্রামীণ মজুরের অভাব বা

৯৯. Sherwill, 11, তুলনীয় J. N. Gupta বগুড়ার মজুরদের উপর মন্তব্য, *District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam : Bogra,* (Allahabad 1910), 28.

১০০. J. F. Browne, *General Report on the Tipperah District,* (Calcutta 1866), 7.

১০১. L. S. S. O' Malley and Monomohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers: Hooghly,* (Calcutta 1912), 170; L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Jessore,* (Calcutta 1912), 84 ; Benay Chowdhury, "Agrarian Economy and Agrarian Relations in Bengal, 1859-1885," Narendra K Sinha (ed.) *The History of Bengal,* (1757-1905), (Calcutta University 1967), 241-244, Chaudhuri, "Rural Credit Relation", 163-164.

বেশি মজুরি দিয়ে মজুর যোগাড় করার সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে আর ব্যস্ত হতে হতো না। বরং লোকদের পুরোপুরি কর্মসংস্থান করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখনকার প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ্য অলসতার বিষয়ও উল্লেখিত হয়। কিন্তু তা এই কারণে নয় যে, যখন তাদের কিছুই করার থাকতো না তখন বেশ উচ্চহারে মজুরি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও দিনমজুর হিসেবে কাজ করার ব্যাপারে তাদের সাধারণ অনীহা থাকতো।[১০২] বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাব গ্রামীণ মজুরদেরকে বহুকাল ধরে মওসুমি স্থানান্তরে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু ১৮৮০-এর দশক থেকে মজুরের স্থানান্তরে গমনের যে প্রসার ঘটে তা অনেক বড় সমস্যার নিদর্শন বহন করে। প্রত্যেক স্থানেই জনমজুরের চাহিদার চেয়ে মজুরিআয়ের উপর নির্ভরতা আরো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অসমঞ্জস ধারা দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং বিশ শতকের বাংলাদেশের সমগ্র সামাজিক বন্ধনকে তা প্রভাবিত করেছিল।

কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বহারের হিসাব দেয়া অত্যন্ত কষ্টকর। বিশ শতক যতো অতিক্রান্ত হতে থাকে, গ্রামীণ মজুরের চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যের ততোই অবনতি হতে থাকে। বিশেষকরে দেশবিভাগের পরে বাংলাদেশে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, যা একদা অধিকতর ধনী অর্ধাংশ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭০ সালের দিকে বাংলাদেশে বেকারত্ব ও উনকর্মসংস্থানের হার ছিল সমগ্র গ্রামীণ শ্রমশক্তির ৩০% থেকে ৪০% অংশ।[১০৩] কিন্তু তখন বেকারত্ব ছিল খুবই সাময়িক ব্যাপার। তাই সমগ্র হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে।[১০৪] অধিকন্তু, প্রাপ্ত সংখ্যাগুলো সাধারণভাবে নির্ধারিত এবং এতে গ্রামীণ মজুরদের অসম্পূর্ণ কর্মসংস্থানের পৃথক তথ্যের অভাব রয়েছে।

শ্রমমজুরি

গ্রামীণ বাংলাদেশে মজুরিমাত্রা সম্পর্কে যেকোন আলোচনায় সমস্যা দেখা দেয়। ভিন্নধর্মী উৎস থেকে গ্রামীণ শ্রমমজুরির তথ্য সংগৃহীত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় মজুরির পার্থক্য নিরূপণে পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় পৃথক ভাবে সমীক্ষা

১০২. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Volume II; *Tipperah*, (London 1876), 387

১০৩. Iftikhar Ahmed, "Unemployment and Underemployment in Bangladesh Agriculture", *The Dacca University Study*, 22, Part A (June 1974), 79-94. Mohiuddin Khan Alamgir, *Bangladesh : A Case of Below Poverty Level Equilibrium Trap*, (Dacca 1979), 28-32; Mohiuddin Khan Alamgir, *Development Strategy for Bangladesh*, (Dacca 1980), 43-44 ; Government of the People's Republic of Bangladesh, *The Second Five Year Plan, 1980-1985* (Dacca 1980), Chapter VI, Barket-e-Khuda, "Measurement of Underemployment in Rural Bangladesh—An Alternative Approach," Wahiduddin Mahmud (ed.), *Development Issues in an Agrarian Economy—Bangladesh* (Dhaka 1981); Khan et al., 9-28. Hartmann and Boyce (202) জাতিসংঘের এক সমীক্ষার (১৯৭৭)-র উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে হার দেখানো হয়েছে ৪২%।

১০৪. খান এবং অন্যান্য, ২২-৩০; Mukherjee, *Six Villages*, 118-125

করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।[১০৫] প্রধান প্রধান অসুবিধার মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ মজুরিতে নগদ টাকা ও জিনিসের সংমিশ্রণ, দীর্ঘমেয়াদি মুদ্রাস্ফীতি এবং মজুর ও নিয়োগকারী শ্রেণীর মধ্যে ভিন্নমুখিতা, যা মজুরিহারের তারতম্য ঘটায়। ফলে, মজুরিহারের তথ্য সর্বদাই কাছাকাছি মাত্রার।

এই সব সতর্কসঙ্কেত থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্ত পরিসংখ্যানকে ভিত্তি করে কিছু প্রাথমিক মন্তব্য করা যেতে পারে। যেমন এটা স্পষ্ট যে, ১৮৮০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে মজুরিহারের অবনতি দেখা গেছে। কিন্তু ঐ অবনতি ঔপনিবেশিক আমলে খুবই কম ছিল। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২২টি জেলার গেজেটিয়ারে প্রকাশিত বিবরণ থেকে গ্রামীণ মজুরি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এটা সর্বদা পরিষ্কার ছিল না ঐ তথ্য কি শুধু নগদ টাকার বিবরণ দিচ্ছে, নাকি সম্পূর্ণ মজুরির পরিমাণ উল্লেখ করছে। যদি আমরা ধরে নিই যে, ঐ তথ্যের মধ্যে জিনিসপত্র (যেমন খাবার, নাস্তা ইত্যাদি) প্রদানও গণ্য করা হয়েছে এবং যদি আমরা আমাদের অনুসন্ধানকে অদক্ষ মজুরদের দৈনিক মজুরির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি[১০৬], যা ঐ তথ্যে ভালই প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলে জেলাওয়ারি মজুরির হার আমরা নিম্নরূপ দেখতে পাই :

অঞ্চল	দৈনিক মজুরির হার
পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ	পরিষ্কার মোটা চাউলের ২.৫ সেরের সমান
উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে	প্রায় ৪ সের
মধ্যাঞ্চলের জেলাসমূহ	প্রায় ৪-৫ সের
পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহ	প্রায় ৬ সের।[১০৭]

এই তথ্য ১৮৮৮ সালে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন ডাফরিন রিপোর্টে দৈনিক মজুরির মানে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ২ সের থেকে পূর্বাঞ্চলের ৯ সেরের মধ্যে তারতম্য থাকতো বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯১১ ও ১৯১৬ সালে বাংলাদেশের মজুরিশুমারিও[১০৮] এই প্রাপ্ত তথ্যকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করে।

১০৫. যদিও কোন সময় পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যাবে স্থানীয় মজুরির হার সম্পর্কে জেলা গেজেটিয়ারে এবং জরিপ ও বন্দোবস্ত বিবরণীতে।

১০৬. দক্ষতার সাধারণ মাপকাঠিতে 'দক্ষ' হিসেবে বিবেচিত না হলেও চাষাবাদে নিযুক্ত কৃষিমজুরদের বেশ দক্ষ হতে হয়। পরিসংখ্যানে তাদেরকে অদক্ষ মজুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। যাদেরকে দক্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছে (কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, কামার, ঘরামি) তাদের কোন নিয়মমাফিক প্রশিক্ষণ নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাই দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের ভেদাভেদটা সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছানির্ভর।

১০৭. Van Schendel and Faraizi. প্রাগুক্ত, 68n

১০৮. *Bengal Wage Census* অনুসারে চাউলের তুল্য মজুরিহার (সম্পূর্ণ মান মোটা চাউলের সেরে প্রকাশিত) এবং স্থানীয় চাউলের গড়পড়তা বাজারদর :

ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকে মজুরিহারের উঠানামা দেখা গেলেও পরিষ্কার কোন ধারা লক্ষ্য করা যায় না। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে প্রকৃত মজুরি ১৯১৬ সালের মাত্রার তুলনায় নীচে নেমে যায়। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে তা আবার বৃদ্ধি পেয়ে ঐ মাত্রার উপরে চলে যায়। কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে তা আবার নীচে নেমে যায়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আবার তা একবার উপরে উঠে।[১০৯] যদিও সমগ্র সময়ব্যাপী মজুরির নিম্নহারই বেশি করে দেখা দিত, তবু দেশবিভাগ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত অবনতি দেখা যায় নি। এই অবনতি প্রধানত দেখা যায় পূর্ব বাংলায়, যেখানে প্রকৃত মজুরির ধারা পরিষ্কারভাবে নিম্নমুখী ছিল, শুধুমাত্র দু'বারের জন্য (১৯৬০-৬৪ এবং ১৯৬৮-৭০) স্বল্পকালের বৃদ্ধি দ্বারা তা বাধা পেয়েছিল। ১৯৭০ সালের পর বাংলাদেশে মজুরিমাত্রা অভূতপূর্বভাবে সরাসরি নিম্নমুখী ধারায় নেমে এলো। এইভাবে ১৯৭৪-১৯৮২ সাল ব্যাপী গ্রামীণ বাংলাদেশের গড় দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র দু'সের চাউল।[১১০] এখন এই মাত্রা পশ্চিম বাংলার মাত্রার নীচে নেমে যায়, যা ১৯৭০-এর

	এপ্রিল/আগষ্ট	ডিসেম্বর	গেজেটিয়ারসমূহ
	১৯১১	১৯১৬	১৯০৮-১৮
পশ্চিমাঞ্চলের জেলায়	৩.১ সের*	২.৯ সের	২.৫ সের
মধ্যাঞ্চলের জেলায়	৩.৬ "	৩.৪ "	৪.৫ "
উত্তরাঞ্চলের জেলায়	৫.৪ "	৩.৮ "	৪.০০ "
পূর্বাঞ্চলের জেলায়	৪.৮ "	৩.৫ "	৬.০০ "

১০৯ পশ্চিম বাংলার সত্যিকার মজুরির জন্য দেখুন, Kamal Kumar Ghose . *Agricultural Labourers in India : A Study in the History of their Growth and Economic Condition,* (Calcutta 1969). Government of Bengal, *Report of the Land Revenue Commission Bengal* ('Floud Report') Volume II, 117

১১০. ১৯৭৪-১৯৮২ বাংলাদেশে চালের তুল্য গ্রামীণ মজুরির হিসাব ঃ

১৯৭৩-৭৪	১.৫ সের	১৯৭৮-৭৯	২.৪ সের
১৯৭৪-৭৫	১.৪ সের	১৯৭৯-৮৯	১.৯ "
১৯৭৫-৭৬	২.৪ "	১৯৮০-৮১	২.৪ "
১৯৭৬-৭৭	২.৩ "	১৯৮১-৮২	২.২ "
১৯৭৭-৭৮	২.১ "		

---

*এক সের=০.৯ কেজি।

উল্লেখ্য, Government of Bengal, Department of Agriculture, *Second Wage Census of Bengal* নেওয়া হয়েছিল ১৯১১ সালের এপ্রিলে (Calcutta 1912), 9, Government of Assam, Department of Agriculture, *Report on the Wages Census of Eastern Bengal and Assam in August 1911,* (Calcutta 1912), 16, Government of Bengal, Department of Agriculture,*Report on the Third Wage Census of Bengal in December 1916,* (Calcutta 1918).4, Government of Bengal Department of Land Records *Average Prices of Staple food Crop (Rice) in Bengal from 1887 to Date* (Calcutta 1924), 4-5, 10-11, 16-17, *জেলা গেজেটিয়ার, ১৯০৮-১৯১৮*।

দশকের শেষদিকে ৩.৪ সেরের কাছাকাছি উঠানামা করতো।[১১১] বাংলার উভয় অংশেই মওসুমি আয় ও বার্ষিক আয়ের একই রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

জীবনযাত্রার মান

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মজুরেরা খুব কষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়। এক শতাব্দী আগে কতিপয় মজুরের না খেয়ে থাকা আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, কিন্তু অনশন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠে নি এবং বিবরণ পাওয়া যায় যে, মজুরেরা সাধারণভাবে জীবনযাপন করার মতো যথেষ্ট আয় করতো এবং বাড়তি কাজে অনীহা প্রকাশ করতো। আজকের দিনে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর কাছে মজুরিআয়ের উপর নির্ভরতা প্রকট সমস্যার আকার নিয়েছে এবং শ্রমের নগণ্য পারিশ্রমিক তাদের জীবনযাত্রার অবিশ্বাস্য নিম্নমানের মাধ্যমে প্রতিফলিত।[১১২] পার্শ্ববর্তী দেশের সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার সরকারিভাবে দরিদ্র্যসীমা নির্ধারণে মোটেও মাথা ঘামায় নি। এর মাত্রা যাই হোক না কেন, জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই সীমার নীচে থেকে যাবে।[১১৩] আমরা বাংলাদেশে পরিলক্ষিত গ্রামীণ দারিদ্র্য সম্পর্কে অসংখ্য হৃদয়বিদারক বিবরণ উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকবো। দারিদ্র্য সম্পর্কে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং অধিকাংশ সময়ের জন্য কাজ জুটেও যায়, তাহলেও বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরেরা প্রতি বছরই কোন না কোন সময়ে অনশনের কবল থেকে কখনো রেহাই পায় না। সময়ে সময়ে তাদের একমাত্র খাদ্য 'ভাত' তাদের কাছে বিলাসী খাদ্যে পরিণত হয় এবং এক খণ্ডের বেশি কাপড় তাদের থাকা আশীর্বাদ বলে তারা ধারণা করতে শুরু করে। অপুষ্টিকর খাবার খেয়ে, নগণ্য কাপড় পরে, জীর্ণশীর্ণ ঘরে থেকে এবং সামান্য যত্নে লালিত হয়েও তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। তাই তাদের আয়ু হতে থাকে স্বল্প এবং তারা যতোটুকু বাঁচে, বড় তিক্তভাবেই বাঁচে।

শ্রমিকসম্পর্ক : ১৮৮০-১৯৭০

ডাফরিন রিপোর্ট পর্যালোচনাকালে আমরা দেখেছিলাম যে, ১৮৮০ সালের দিকে ঋণিতা শ্রমিকসম্পর্কের ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। নৈমিত্তিক দিনমজুরদের সাথে ভোগের জন্য ঋণ জড়িয়ে থাকতো এবং বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ মজুরদের ঘাড়ে থাকতো

হিসাব করার গ্রন্থপঞ্জী : Government of People's Republic of Bangladesh. *Economic Indicators of Bangladesh,* (Dacca Bangladesh Bureau of Statistics, May 1977), 51,65, Government of People's Republic of Bangladesh, *Statistical Pocket book of Bangladesh 1981*, (Dhaka 1982), 332-333, 348-349 তুল্য Rizwanul Islam. "What Has Been Happening to Rural Distribution in Bangladesh"? *Development and Change,* 10:3 (1979), 385-401.

১১১. Government of West Bengal, *Economic Review 1979-80,* (Alipore 1980) Volume 1, 32

১১২. দৃষ্টান্তস্বরূপ, Arens and Van Beurden, 100-104.

১১৩. তুল্য, Bengal, *Second Five Year Plan,* I, 1

বড় আকারের ঋণের বোঝা। মওসুমি নিয়োগে যদি স্থানবদলকারী মজুরেরা স্থান পেতো, তবে সেখানে কোন ঋণ থাকতো না। কিন্তু স্থানীয় মজুরদের যদি মওসুমিভাবে নিয়োগ করা হতো, সেখানে নগদ টাকা অগ্রিম নেবার প্রবণতা থাকতো।

সেই সময় হতে আমরা দেখেছি, না গ্রামীণ মজুরদের, না গ্রামীণ মনিবদের কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী ছিল। ফলে, শ্রমিকসম্পর্ক ছিল বহু ধারায় বিভক্ত এবং তাদেরকে কোনভাবেই একমাত্র চিহ্নিত শ্রেণীতে সমন্বিত করা যাবে না। আমরা অনুভব করি যে, গ্রামবাংলায় কোন কোন শ্রমিকসম্পর্কের (বা আরো ব্যাপকভাবে উৎপাদনসম্পর্কের) প্রাধান্য সম্পর্কে বিতর্ক এই বহুমুখী সম্পর্কের ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর নিরীক্ষা থেকে অনেক লাভবান হবে। প্রবন্ধাদিতে গবেষণালব্ধ প্রামাণ্য তথ্য আহরণের দিকে মোটেই নজর না দিয়ে গ্রামীণ বাংলাদেশের বিষয়ে এক তত্ত্বমূলক ধারণা চাপিয়ে দেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে যেসব প্রবন্ধে মাঠ পর্যায়ের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, সেসব প্রবন্ধে তথ্যাবলীকে ঐতিহাসিক এবং তত্ত্বমূলক কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। ফলে যেসব প্রবন্ধকে ভিত্তি করে আমরা আলোচনায় এসেছি, সেসব প্রবন্ধ অনেক প্রাথমিক সমস্যাকে প্রকাশ করে নি। এখানে তারই কিছু অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

উৎপাদনের উপায়ে মজুরদের প্রবেশাধিকার

এটা এমন এক ক্ষেত্র, যা সাধারণত খুবই সৌজন্যহীনভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচ্য সময়ে সর্বদাই এই অবস্থান জটিল ছিল। তথাপি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় নি। আংশিকভাবে এই জটিলতা এসেছে গ্রামবাংলার সীমিত কৃষকবিনাশের ধরন থেকে, যার ফলে অনেক মজুরই ছিল খণ্ডকালীন সময়ের জন্য। উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন চাষ, ভাগচাষ, হাতের কাজ, ছোটখাটো ব্যবসা, মাছ ধরা এবং এই ধরনের আরো অনেক উপায়ে মজুরির আয় যোগ করা। এসব বিবিধ কর্মকাণ্ডই তাদেরকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিতে পারতো। কিন্তু এখানে আমাদের লক্ষ্য শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক নির্ণয় করা। খণ্ডকালীন মজুরও মজুর হিসেবেই প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে এবং নিয়মিত মজুরদের অবশ্যই উৎপাদনে পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

এখানেও অনেক ভিন্নমুখিতা বিদ্যমান। একদিকে আমরা পাই এমন মজুর, যারা সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু অপরদিকে, এমন মজুরও রয়েছে, যাদের ভাগচাষী থেকে পৃথক করা খুবই কঠিন। সম্পূর্ণভাবে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে এমন মজুরের উদাহরণ হচ্ছে সিলেটের চা-বাগানের মজুর (যাদের মধ্যে নারীমজুরের সংখ্যাই বেশি), যে তার শ্রমশক্তিকে পুঁজিবাদী মাত্রায় বিক্রি করে বেঁচে থাকে। আরো এক ধরনের মজুর হচ্ছে ধান ভানার নারী, যারা তাদের মনিবের বাড়িতেই ঢেঁকিতে ধান ভানে। তৃতীয় ধরনের মজুর হচ্ছে বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক নিবাসী ক্ষেতমজুর,

যার নিজস্ব কোন কৃষিযন্ত্রাদি নেই এবং সে মালিকের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। কিন্তু গ্রামীণ মজুরদের অধিকাংশের কাছে কিছু কিছু উৎপাদনযন্ত্র থাকে। এদের মধ্যে ফসল কাটার মজুরেরা নিজেদের কাস্তে নিয়ে আসে এবং মাটি কাটাব মজুরেরা নিজেদের ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে আসে। এই উপকরণগুলোর দাম খুব বেশি নয় এবং এগুলো অনেক দিন টিকে থাকে। অবশ্য মজুরদের মালিকানায় বেশি দামি যন্ত্রপাতি খুব কম থাকে আর তাই সেগুলো মনিবদের কাজে ব্যবহার করার প্রশ্ন উঠে না। কৃষিকাজে লাঙ্গল ও লাঙ্গল টানার পশু (এ দুটো মিলে 'হাল' বলা হয়), মই, আঁচড়া, গরুগাড়ি ইত্যাদি মনিবেরাই দিয়ে থাকে এবং সেই সাথে তারা দেয় চাষের জমি, বোনার জন্য বীজ, রোপার জন্য চারা, সেচের জন্য পানি এবং ঝাড়া ও ভানার জন্য উপকরণাদি। চাষাবাদে এবং শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে এই যন্ত্রাদি ব্যবহারে মজুরেরা বুদ্ধি খাটিয়ে থাকে।

উৎপাদনের বৃহৎ উপায়ের মালিকানা, বিশেষকরে জমির মালিকানা লাভ গ্রামীণ মজুরদের জন্য সংজ্ঞার ভিত্তিতে অসম্ভব। তবে চুক্তিবলে তাদের কেউ কেউ সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। বীরভূমের কিষাণী বা কিষেণী ব্যবস্থা, ক্ষেতমজুরকে চাষাবাদের জন্য চাকরান জমি দেবার রীতি (বাংলাদেশের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী), কংকর রীতি (বাঁকুড়ায় ক্ষেতমজুরদেরকে ধান মাড়াইয়ের পর বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধান দেবার প্রথা) এখানে আলোচ্য।[১১৪] এই সুযোগ বাংলাদেশের সামান্য এক অঞ্চলের মজুরদের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আজকাল বাংলাদেশ থেকে এসব উধাও হয়ে গেছে এবং পশ্চিম বাংলাতেও এগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে।

নিয়োগের স্থিতিকাল

অর্ধেক দিন থেকে সারা জীবন পর্যন্ত নিয়োগের স্থিতিকালের তারতম্য ঘটে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রায়ই চার রকমের ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদি নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয় : ক্রীতদাস, যারা সারাজীবনের জন্য এমনকি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তিসাধ্য ছিল; ভূমিদাস, যারা বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়োজিত ছিল; মওসুমি মজুর, যারা দু'থেকে চার মাস থাকতো এবং নৈমিত্তিক দিনমজুর, যাদের স্থিতি কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত। কেন এই ভেদাভেদ, নিয়োগের স্থিতিকাল কিভাবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলেছিল এবং ১৮৮০ সাল থেকে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল ?

ক্রীতদাস

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে গ্রামীণ এবং পারিবারিক ক্রীতদাসপ্রথা সর্বজনীন ছিল। ক্রীতদাসেরা হচ্ছে এমন লোক, যাদেরকে প্রয়োজনের তাগিদে জোর করে ধরে এনে বা বিক্রি করে ক্রীতদাস বানানো হতো এবং সেই সাথে তাদের সন্তানেরাও ঐ

১১৪. Van Schendel and Faraizi প্রাগুক্ত, 86-90

অবস্থার শিকার হতো।[১১৫] ১৮৪৩ সালে ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদের পর এই লোকগুলোর ভাগ্য সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায় এবং একথা বলা কঠিন অতি সাম্প্রতিককালের কথিত ভূমিদাসেরা কি মাত্রায় অতীতের ক্রীতদাসপ্রথার প্রশাখা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (যাদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাস হিসেবে দেখা গেছে) বা এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার কিনা।[১১৬] উনিশ শতকের শেষের দিকে দাসমজুর বললে মজুর ও মনিবের মধ্যে লিখিত দাসখত আছে ঠিক তা বুঝাতো না। এটা ছিল রীতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা হতো বাধ্যতামূলক। ১৮৭৬ সালে রংপুরে এই সম্পর্ক যেভাবে বিদ্যমান ছিল তার মূলকথা নিম্নরূপ পাওয়া যায় :

> এই জেলার মধ্যে এটা কোন একজন মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে, সে কিছু টাকা কর্জ করে এবং পরে কাজ করে দিয়ে তা শোধ করে। এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে, যেখানে লোকেরা তাদের পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যও কাজ করছে।[১১৭]

এই ধরনের ঋণদাসের সন্ধান দিনাজপুর ও বর্ধমানেও পাওয়া যায়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বিহারের তুলনায় বাংলাদেশে তারা বিরল ছিল বলা যায়। বিহারে এই ক্রীতদাসকে বলা হয় *কামিয়্যা*।[১১৮] ১৯০০ সালের দিকে ক্রীতদাসেরা বাংলাদেশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু বিহারে ক্রীতদাসপ্রথা এখন পর্যন্ত প্রচলিত। দ্রুতহারে শ্রমিকজনগোষ্ঠীর উদ্ভব, মধ্যবর্তী একদল নিয়োগকারীর আবির্ভাব, যারা তাদের পূর্বসূরিদের রাজনৈতিক নখর ত্যাগ করেছিল এবং সম্ভবত বেশি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাসপ্রথাকে সমর্থনকারী জাতিভেদের কঠোর ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির কারণে এর অন্তর্ধান ঘটে থাকতে পারে।

বার্ষিক ক্ষেত পরিচর্যা

প্রকৃতিবিচারে এই কাজ যদিও মেয়াদের দিক থেকে দাসপ্রথার পরেই স্থান পায়, তবু তা একেবারে ভিন্নধর্মী। এর সঙ্গে জড়িত ঋণিতা এবং চুক্তির অলঙ্ঘনীয় শর্তাবলী। কিন্তু চুক্তিটি ছিল একটা সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। ভূমিদাসেরা ঠিক দাসমজুরদের মতো নয়। তাদের বার্ষিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে অন্য মালিকের কাছে চলে যেতে বাধা নেই। কিন্তু তাদের স্বাধীনতাকে অতি উচ্চ স্থান দেয়া ঠিক হবে না। মালিকের আরোপিত

১১৫. Chattopadhyaya, *Slavery*, 11 ff

১১৬. বিশ শতকের গোড়ার দিকের দাসপ্রথার বিরল নজিরের জন্য দেখুন, Malley's *Report of Muslim Slaves* (খানেজাদ গোলাম বন্দি) in Birbhum district, L S S O'Malley, *Bengal District Gazetteers; Birbhum*, (Calcutta 1910), 66

১১৭. W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Volume VII, Rangpur, (London 1876), 272

১১৮. আমরা এখানে দাসমজুরদেরকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছি, যার অর্থ ছিল দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দায়ে ঋণদাস। অন্যান্য সংজ্ঞার জন্য দেখুন, H V Nagesh "Forms of Un-free Labour in Indian Agriculture", *Economic and Political Weekly*, (September 26,1981 Review of Agriculture, A 109-A 115

দরকষাকষির ক্ষমতা তাদের সীমাবদ্ধ। বার্ষিক চুক্তি মজুরদের জন্য বেশ আকর্ষণীয় প্রস্তাব, কেননা এতে সম্পূর্ণ কৃষিউৎপাদনচক্রে নিয়োজিত থাকার নিরাপত্তা বিধান করা হয়, আগাম টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকে এবং মালিক-মজুরের সম্পর্কের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা থাকে। এর প্রধান অসুবিধা এই যে, চুক্তির সময়ে মজুরদের কোন স্বাধীনতা থাকে না, চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তারা একজন মালিকের অধীনেই কাজ করতে বাধ্য। গ্রামবাংলার মনিবেরা বহুদিন ধরে বার্ষিক চুক্তিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কেননা এই পদ্ধতি তাদেরকে স্থায়ী, সস্তা এবং সদা প্রস্তুত মজুর পাবার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। অধিকন্তু কৃষিমওসুমের প্রারম্ভে তুলনামূলকভাবে খুব কম মনিবই বিরাট অঙ্কের টাকা আগাম দিতে পারে। তাই এক বা একাধিক ভূমিদাস নিয়োগ করা সঙ্গতিসম্পন্নতা এবং বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। কিন্তু বার্ষিক চুক্তিপদ্ধতি মজুরদেরকে সুশৃঙ্খল এবং সবচেয়ে উৎপাদনমুখী করার ক্ষেত্রে অধিকতর অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। যদি ভূমিদাসদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়, তবে তারা পালিয়ে যায় এবং আগাম প্রদত্ত টাকা অনাদায়ী ঋণ হিসেবে খাতা থেকে বাদ দিতে হয়। যথাযথ তথ্যের অভাবে ১৮৮০-এর দশক থেকে বর্ষভিত্তিক খামার পরিচর্যা বেড়েছে না কমেছে তা বলা কঠিন। গ্রামসমীক্ষাগুলো বিশেষকরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অবনতির ইঙ্গিত প্রদান করে। কিন্তু বার্ষিক চুক্তি গ্রামবাংলায় এখনো অব্যাহত রয়েছে।[১১৯]

মওসুমি মজুর

মওসুমি মজুরের সুবিধা-অসুবিধা বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক মজুরদের মতো। শুধু পার্থক্য এই যে, এখানে চুক্তির মেয়াদ কয়েক মাসের জন্য এবং সর্বদাই ভরা মরসুমে মজুরকে কাজে লাগানো হয়। বারোমেসে মজুরদের চেয়ে মওসুমি মজুরদের আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়। কিন্তু এদের মজুরিও বেশি। সাধারণত পাট কাটার সময়ে, আমন ধান কাটার সময়ে এবং শীতকালে মাটি কাটার জন্যে এই মওসুমি চুক্তি করা হয়ে থাকে। এখানেও তথ্যের অভাবে বলা কঠিন ১৮৮০-এর দশক থেকে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তবে এই ধরনের চুক্তি কখনো বিরল হয় নি। যাইহোক, ১৯৬০-এর দশকের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ কর্মসূচির প্রথম ধাপ শুরু হলে এই পদ্ধতির বৃদ্ধির হার পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১২০]

---

১১৯. কুমিল্লায় এক গ্রামে ক্ষেতমজুর ব্যবহারকারী গৃহস্থালির অনুপাত ১৯৬০ সালের ৩৫% থেকে ১৯৭৮ সালে ২১% এ নেমে আসে। বীরভূম জেলার গ্রামে কৃষাণী/মহিনদারী চাকরদের দ্বারা চাষ করা গৃহস্থালির অনুপাত অনুরূপভাবে ১৯৩৯-৪০ সালের ৪৩% থেকে ১৯৭৪ সালে ৩৬%-এ নেমে যায়। Van Schendel, *Peasant Mobility*, 210,213. Khoda Newaj and Ashuk Rudra,"Agrarian Transformation in a District of West Bengal", *Economic and Political Weekly*, (March 29 1975, Review of Agriculture, A 23-A 23.

১২০. দেখুন, Just Faaland And J.R Parkinson, *Bangladesh, The Test Case of Development*, (Dacca 1976) 149 151. De Vylder and Asplund, 191-210. Alamgir, *Development Strategy*, 280

নৈমিত্তিক দিনমজুর

বাংলাদেশের সবচেয়ে কম মেয়াদি মজুরিচুক্তি হচ্ছে অর্ধেক দিন বা এক বেলা থেকে কয়েক দিন (এক হাট বা বাজার মেয়াদি[১২১]) পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণত এক দিনের জন্য বা কাজভিত্তিক মজুরি দেয়া হয়।[১২২] দৃশ্যত নৈমিত্তিক নিয়োগে মজুরদের সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু সেই সাথে সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তাও থাকে। ব্যস্ত মওসুমে দিনমজুরেরাও মজুরিবৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে থাকে, কিন্তু অলস মওসুমে তারা অনশনে কষ্ট পায়। বাস্তবে ঋণিতা দিনমজুরদের স্বাধীনতাকে অর্থাৎ মজুরবাজারে স্বাধীন সত্তা হিসেবে দরকষাকষির ক্ষমতাকে প্রচণ্ডভাবে খর্ব করে। পুনঃ পুনঃ বেকারত্ব ও অনশনের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা বাধ্য হয়ে ঋণ করে থাকে, যা শুধু দাদন হিসেবেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক ঋণ নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মজুরিশ্রমের দ্বারা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে এবং নিশ্চিতভাবে ভরা মওসুমেই তা দাবি করা হয়, যখন মজুর পাওয়া দুর্লভ এবং মজুরি সর্বোচ্চ থাকে। মজুরেরা এই দাদনের সম্পর্ক বিভিন্ন নিয়োগকারী বা ঋণদাতার সাথে একই সময়ে গড়ে তুলতে পারে। সবচেয়ে ভাল মওসুমে তাদের কর্মসংস্থানের স্বাধীনতা নানাভাবে ও নানা মাত্রায় খর্বিত হয়। ১৮৮০ সাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিরাট সংখ্যায় দিনমজুরের আর্বিভাব এর প্রমাণ। এখানেও যথাযথ তথ্য নেই, কিন্তু সমীক্ষাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এদেশে নৈমিত্তিক নিয়োগপদ্ধতির মাধ্যমেই মজুরনিয়োগ প্রসারতা লাভ করেছে অত্যধিকভাবে। আমাদের সমীক্ষার সময়ব্যাপী তাই নৈমিত্তিক দিনমজুরিই মজুরিচুক্তির একমাত্র ধরন, যা সুনির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রমিকবিরোধ

মজুরিহারের ক্রমাবনতির অবিরাম ধারা এবং চাহিদার চেয়েও মজুর সরবরাহের আরো দ্রুত বৃদ্ধি সম্পর্কে গ্রামীণ মজুরদের উপলব্ধি সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। তাদের অনেকে হয়তো এমন চিন্তা করতে পারে যে, তারা নৈর্ব্যক্তিক বাজারশক্তিকে প্রভাবিত করতে না পারার ফলে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। মজুরপর্যায়ের যেকোন দল উপলব্ধি করবে যে, এই অবস্থায় তাদের নিয়োগের আরো ভাল ও স্থিতিশীল শর্ত আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা কঠিন। কিন্তু সমবেত প্রচেষ্টা চালানো সব সময়েই কষ্টসাধ্য এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরদের জন্য তা বিশেষভাবে কষ্টসাধ্য। কেননা তারা কোন একক শ্রেণী সৃষ্টি করতে পারে নি এবং এই কারণে তারা সহজে সংগঠিত হতেও পারতো না। অধিকন্তু, তাদের অনেকেই মনিবের সাথে এমন পোষক-পোষ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, যা একাধারে তাদের পোষণ এবং নিরাপত্তাবিধান করে। অনুরূপ পৃষ্ঠপোষকতা

১২১ Van Schendel, *Peasant Mobility*, 212

১২২. ধার্যচুক্তি করে কোন কাজ বা কাজের অংশ করার বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন Clay, 429, 431, 436; Arens and Van Beurden, 95-114, and Hartmann and Boyce, 197

তাদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ উদ্ধারের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা। কিন্তু ঐ একই সময়ে তা তাদেরকে পৃথক করে ফেলেছে এবং মনিবের সাথে যৌথ দরকষাকষির যেকোন প্রচেষ্টা থেকে বিরত রেখেছে। এই কারণে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকে এই সর্বহারাদের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণে খুবই কম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে।[১২৩]

যখন শ্রমিকসম্পর্ক পোষক-পোষ্য সম্পর্ক হারাতে শুরু করে এবং আরো নৈর্ব্যক্তিক ও চুক্তিবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে, তখন শ্রমিকদের সমবেত প্রচেষ্টা আরো কার্যকর হতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহাসিকগণ দুঃখজনকভাবে এই সংগ্রামের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। ফলে, গ্রামীণ মজুরদেরকে এখনো পরিস্থিতির সাধারণ শিকার বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কৃষক আন্দোলনের উপর বর্ধিত হারে গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, কৃষকেরা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমরা গ্রামীণ বিরোধে মজুরদের ভূমিকা সম্পর্কে খুবই কম জানতে পারি। তারা কি গ্রামীণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নি ? তারা কি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল ? তারা কি এই ধরনের আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা অবহেলিত ছিল ?[১২৪] অথবা গবেষণাকারীরা কি তাদের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে নি ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে গ্রামবাংলার ইতিহাসের ব্যাপক সীমানার গভীরে প্রবেশ করতে এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করবে। এসব প্রশ্নের উত্তর কৃষক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ভূমিকার উপর, বিশেষকরে গ্রামীণ সংঘর্ষে 'মধ্যকৃষক'দের ভূমিকার উপর সাম্প্রতিক বিতর্কেও ইতিবাচক তথ্য-প্রমাণ প্রদান করবে।[১২৫] গ্রামীণ যৌথ কার্যাবলীতে মজুরদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ সমন্বয়ের অভাবে আমাদেরকে ছোটখাটো সংঘর্ষের ছিটেফোঁটা তথ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫০-এর দশকের দিকে রংপুরের এক গ্রামে মজুরেরা আশেপাশের গ্রামে প্রদত্ত হারে মজুরি পাবার জন্য ধর্মঘট করে এবং তারা স্থানীয় মনিবদেরকে স্থানীয় মজুরি বৃদ্ধি করে এলাকার হার উন্নীত করতে বাধ্য করে।[১২৬] এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, কাজের পরিবেশ এবং মজুরি বিষয়ে দরাদরির চলমান

১২৩. আধুনিক ইউরোপের বৈসাদৃশ্যের জন্য দেখুন, Catharina Lis and Hugo Soly, "Policing the Early Modern Proletariat, 1450-1850'; David Lecine সম্পাদিত *Proletarianization and Family History* (New York 1984), 163-228

১২৪. Sanil Sen এটা ধরে নিয়েছেন তার *Peasant Movement in India Mid-Nineteenth and Twentieth Century* গ্রন্থে (Calcutta 1982), 196-209, 250.

১২৫. Neil Charlesworth , The "Middle Peasant Thesis" and "The Roots of Rural Agitation in India, 1914-1947," *Journal of Peasant Studies* 7:3 (1980), 259-280, Daid Hardim, "The roots of Rural Agitation in India, 1914-1947 A Rejoinder to Charlesworth," *Journal of Peasant Studies*, 8 3 (1981), 367-380 Neil Charlesworth, "The Roots of Rural Agitation in India, 1914-1947 A Reply to Hardiman", *Journal of Peasant Studies*, 9,4 (1982), 266-276.

১২৬. Van Schendel, *Peasant Mobility*, 112

প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বহু গ্রামে ঐ রকম ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এই ঘটনাগুলো প্রবন্ধাদিতে স্থান পায় নি।[১২৭] প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে অবশ্য দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন বাংলাদেশের গ্রামীণ মজুরেরা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেইসাথে মনিবেরাও সে স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মজুরিহার ও কাজের পরিবেশের ক্রমাবনতি তাদেরকে আরো ভঙ্গুর করে তোলে, অবশ্য তাদের মনিবদের ভাষায় তারা আরো 'ব্যবহারযোগ্য'। এরপর মালিকদের দ্বারা মজুরদের পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রবণতা হ্রাস পায়। ফলে শ্রমিকরা শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠে এবং শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ে তোলে। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে কয়েকটি বড়ো শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হয়। যদি এসব সঙ্ঘ সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করতে পারতো, তা হলে এগুলো গ্রামের শ্রমিক সমাজকে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো এবং যুগ যুগ ধরে স্থবির বাংলার গ্রামীণ সমাজকে এক গতিময় ও প্রগতিশীল সমাজের রূপ দিতে পারতো।

নিঃস্ব থেকে সর্বহারা

ঋণিতা এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতার সাথে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সর্বহারার সৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তা ছিল ধীর গতিবিশিষ্ট। যখন ১৮৮০-এর দশক থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে মজুরিভিত্তিতে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন সকল গ্রামীণ মজুর উৎপাদনের উপায়ের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নি। ভূমিহীন এবং লাঙ্গলহীন মজুরদেরকে প্রথমদিকে পশ্চিম বাংলায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পরে ক্রমে ক্রমে বিপুল সংখ্যায় সর্বত্র দেখা যেতে থাকে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রামীণ মজুর তাদের ছোট্ট জমিকে আঁকড়ে ধরেই টিকে থাকে এবং আজো উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সংযোগ পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায় নি।

শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতার এই শ্লথগতি এই বহুল প্রচলিত ধারণার প্রতি সতর্কসঙ্কেত হিসেবে কাজ করছে যে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণগ্রস্ততার সাথে শ্রমমজুরির উপর নির্ভরতা যুক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে ঋণগ্রস্তদের সম্পূর্ণ ভূমিহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। গ্রামবাংলার মহাজনেরা ঋণ আদায়ের জন্য খাতকের জমি নিলাম করা ছাড়াও প্রায়ই ভিন্ন পথ ধরতো। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরাজমান অবস্থায় তাদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধকি ও ভাগচাষের কৌশল অবলম্বনের পথে যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই বেশি বুদ্ধির পরিচায়ক। যদি গ্রামীণ ঋণিতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হতো, তা হলে এতদিনে বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ সর্বহারা বাংলাদেশে দেখা দিত। পরিবর্তে প্রাথমিক আবাদকারী থেকে বিচ্ছিন্নতা কখনো শ্রমমজুরির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির সমহারে দেখা দেয় নি, এমনকি আমাদের সমীক্ষার শেষ সময়কাল পর্যন্ত অবস্থা এরকম। ভূমিহীনতাকে বাংলাদেশে

১২৭. ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামীণ মজুরদের সংঘাত সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Davis, 202-209

সর্বহারা হওয়ার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় সূচক হিসেবে ধরে নেবার বিষয়ে জোর তর্ক থাকলেও ১৯৭৭ সালে ভূমিহীনতা ছিল ৩৩%, অথচ কমপক্ষে অর্ধেক গ্রামীণ লোক মূল আয় বা সহায়ক আয়ের জন্য মজুরগিরির উপর নির্ভরশীল ছিল।[১২৮] অন্য কথায়, দুই-তৃতীয়াংশ মজুর সম্পূর্ণভাবে সর্বহারা এবং এক-তৃতীয়াংশ তখনো কিছু জমির মালিক ছিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অনুপাত ছিল জমির মালিকানার মাত্রা সংক্রান্ত। কিন্তু অনেক ভূমিহীন পরিবার ইজারায়, ভাগচাষে, এমনকি বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে জমি দখলে রাখে এবং চাষাবাদ করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণভাবে সর্বহারা হয়ে যাবার কার্যকরী অনুপাতকে হ্রাস করে দেয়।[১২৯] বিশ শতকের বাংলাদেশে যদিও সর্বহারা হওয়াটা গড়মাত্রায় ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছিল, তবু স্বতন্ত্র পরিবারে এই প্রক্রিয়া অতো সহজগ্রাহ্য ছিল না। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, পরিবার পর্যায়ে সর্বহারা হওয়ার এবং সর্বহারা থেকে বিচ্যুত হওয়ার দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া ভিন্নমুখী কারণের প্রভাবে জটিল পথে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়েছে।[১৩০] গ্রামীণ পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার উপর এই উপাদানগুলোর সমবেত প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আরো গবেষণা বাংলাদেশের সর্বহারার ধীর গতিধারা সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি করবে। অধিকন্তু, অনেক পরিবারে মজুরিআয়ের উপর নির্ভরতার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন মওসুমে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এটা মওসুমি নিয়োগের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে ঘটে থাকে। পারিবারিক পর্যায়ে পরিলক্ষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিময়তার ধারায় অনেক মজুরিনির্ভর পরিবারের অসম্পূর্ণ সর্বহারাত্ব এবং মজুর নিয়োগের সুনির্দিষ্ট মওসুম থাকার কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, উদ্বৃত্ত মজুর যে গ্রামীণ বাংলাদেশের এক বৈশিষ্ট্য এই সাধারণ ধারণাকে সমর্থন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।[১৩১]

শ্রমিকসম্পর্কের ক্রমবর্ধমান চুক্তিভিত্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতিকে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদের প্রভাবে গ্রামীণ জীবনের সবকিছুকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দাঁড় করানোর কারণ হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না। যেভাবে আমরা দেখেছি, উৎপাদনের পুঁজিবাদী সম্পর্ক আমাদের সমীক্ষার সময়কালে গ্রামীণ বাংলাদেশে কোন নাটকীয় উন্নয়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। গ্রামীণ মনিবদের দারিদ্র্যের ফলেই ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও মেয়াদের মাত্রায়

---

১২৮. ভূমিহীন বসতবাটি বলতে সেগুলোকেই ধরা হয়েছে যেগুলো বসতবাটি ছাড়া আর কোন জমির মালিকানার দাবি করে না এবং এই ধরনের গৃহস্থালি বসতবাটির মালিকানা দাবি করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। A. K. M. Ghulam Rabbani et al. *Summary Report of the 1977 Land Occupancy Survey of Rural Bangladesh* (Dacca 1977), Table III

১২৯. রংপুরে দেখা গেল সাধারণভাবে ভূমিহীনদের গৃহস্থালির ৫০% প্রকৃতপক্ষে ভূমিনিয়ন্ত্রণ করতো। Van Schendel, *Peasant Mobility*, 300-311, 304-311, 318-319.

১৩০. Van Schendel, *Peasant Mobility*

১৩১. তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ পর্যবেক্ষণের জন্য দেখুন, Hans P. Binswanger and Mark R. Rosentsweig *Contractual Arrangements, Employment, and Wages in Rural Labour Markets. A Critical Review* in Hans P. Binswanger and Mark R. Rosenzweig (eds.), *Contractual Arrangements, Employment, and Wages in Rural Labour Markets in Asia*, (New Haven and London 1984), 1-40

শ্রমিকসম্পর্কের উল্লেখযোগ্য সঙ্কোচন ঘটে অর্থাৎ পোষক-পোষ্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আমরা দেখিয়েছি যে, সমীক্ষার সময়ে ছোট ছোট জমির মালিক আরো বেশি করে জনমজুর নিয়োগ করেছে এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদি মজুরসংগ্রহের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। তারা দিনমজুর দিয়েই কাজ চালিয়েছে এবং তাদেরকে উৎপাদনঋণ/আগাম মজুরি দিয়ে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ নিয়োগ এবং শ্রমিকনিয়ন্ত্রণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি ছোট ছোট নিয়োগকারীদের স্বার্থ যে পরিমাণে জড়িত সেই পরিমাণে টিকে আছে।

১৮৮০ সালের পরে বাংলাদেশে তাই এক দীর্ঘমেয়াদি নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার কারণে প্রধানত সর্বহারার সৃষ্টি হয়েছে, কৃষিতে পুঁজিপতিদের দ্বারা বড় বড় জোতকে একীভূত করার বা ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের দ্বারা গ্রামীণ কারিগরদের শোষণের ফলে নয়। বাংলাদেশের দারিদ্র্য পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় অসম বিনিময়ের সাথে নিজেই সম্পর্কিত, যেখানে গ্রামীণ অর্থনীতি প্রধানত পাট এবং অন্যান্য নিম্নমূল্যের নগদ টাকার ফসল ও ভূমিরাজস্ব যুগিয়েছে উপযুক্ত প্রতিদান ছাড়াই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বাংলাদেশের প্রধান দুটি ব্যবসায়িক ফসল পাট ও ধান 'বাগানের ' ফসল নয়। এ দুয়ের জন্য বহুল পরিমাণে পুঁজি লাগে না এবং এই কারণে কৃষকের দ্বারাই লাভজনকভাবে তা উৎপন্ন করা যেতে পারে। এর ফলে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পরোক্ষভাবে শোষণের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয়েছে এবং তা লাভজনক হয়েছে, যাতে শ্রমকে আত্মসাৎ না করেও কৃষিমজুরদের উৎপাদিত পণ্য আত্মসাৎ করা যায়। পরবর্তীকালে উপনিবেশোত্তর সরকারসমূহ ঐ একই নীতি গ্রহণ করে এবং তাতে অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা রয়েছে যতো দিন পর্যন্ত কৃষকেরা অনবরত তাদেরকে কম দাম দেয়া সত্ত্বেও বাজারে ধান ও পাট বিক্রি করতে থাকবে। ব্যবসা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাজনা আদায় করে যারা উপার্জন করে, তাদের জন্য এই নীতি কম ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এই নীতি বহু গ্রামীণ উৎপাদনকারীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করছে, বিশেষকরে বিশ শতকের মধ্যভাগে, যখন থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় জমি দুর্লভ হতে থাকে। সেই সময় থেকে পরোক্ষ শোষণের অবিরাম উঁচু মাত্রা কৃষি-উৎপাদনকারীদের জীবনযাত্রার মানকে ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী করতে সাহায্য করেছে এবং এইভাবেই কৃষিতে স্থবিরতা এসেছে। কিন্তু সেই সাথে তা গ্রামীণ শ্রমসম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে এবং জনমজুরদের দীর্ঘমেয়াদি সর্বহারাকরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতির উদ্ভব সম্পর্কে আরো অনুসন্ধান করে বাংলাদেশের সমাজে তার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সনাক্ত করা এবং সেই সাথে বিশ্বপুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে তা ব্যাখ্যা করা বাংলাদেশী ঐতিহাসিকদের নতুন প্রজন্মের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে মাত্র দু'টি।

১৭

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশ

এম. আতাহারুল ইসলাম*

উনিশ শতকের বাংলার জনসংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা দরূহ, কারণ সেই সময়ের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি দুস্প্রাপ্য। তাই প্রাপ্ত খুবই সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ামকেব পারস্পারিক সম্পর্কের, বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে, জনসংখ্যার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলার মোট জনসংখ্যা বৃটিশ উপনিবেশের প্রারম্ভকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী কাল পর্যন্ত কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে।

ভারতের জনসংখ্যা খ্রিস্টীয় যুগের পূর্ববর্তীকালীন সময়ে ১০০ থেকে ১৪০ মিলিয়নের মধ্যে ছিল বলে ধারণা করা হয়। খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভকাল থেকে বৃটিশ উপনিবেশের শুরু পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালে এই মোট জনসংখ্যার কিছু সাময়িক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তা অপরিবর্তিত ছিল। ধারণা করা হয় যে ভারতের জনসংখ্যা খুবই ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে। সারণি ১-এ ১৬০০ থেকে ১৯৪১ সন পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যার হিসাব দেখানো হয়েছে। ১৯২১ সনের পূর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নগামী থাকার মূল কারণ ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগব্যাধি। দত্তের হিসাব অনুযায়ী, ১৭৭০-১৯০০ সময়কালে বিশটিরও বেশি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।[১] আগরওয়ালের মতে, ১৯২১ সনকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বিভাজন বৎসর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[২] ১৯২১ সনের পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি

*. অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. R C Dutt, *Famines and Land Assesment in India*, (London 1900), 16-17.

২. S. N Agarwal, *Inida's Population Problems (Bombay* 1972),41

পেয়েছে মূলত মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার কারণে। পূর্ববর্তী সকল সময়ের চেয়ে দ্রুত হারে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯২১ সন থেকে। একই সময়ে ভারতের অংশ হিসেবে বাংলার জনসংখ্যাও একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

যদিও ১৮৬৭-৭২ সনে ভারতে আদমশুমারি শুরু হয়, তার পূর্ববর্তী সময়ের জনসংখ্যার প্রাককলনও করা হয়েছে। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামকসমূহের পটভূমি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই পটভূমি বিশ্লেষণ করলে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহও নির্ধারণ করা সহজতর হবে। সারণি ২-এ ১৮৭১-১৯৪১ সময়কালে জন্মের সময় প্রত্যাশিত জীবনকাল দেখানো হয়েছে। এই সারণি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে গড় প্রত্যাশিত জীবনকাল ১৯২১-৩১ সময়কালে পূর্ববর্তী সব সময়ের চেয়ে বেশি ছিল এবং এই ধারা পরবর্তী সময়কালেও অব্যাহত থাকে। ভারতের মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত কারণসমূহ চিহ্নিত করা যায় : (১) যুদ্ধ এবং ডাকাতির ঘটনা হ্রাস পেয়েছিল, (২) দুর্ভিক্ষাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, (৩) মহামারীজনিত রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।[৩] যুদ্ধ এবং ডাকাতির ঘটনা হ্রাস পাওয়ার কারণে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছিল অনেকাংশে। কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রতিফলন মৃত্যুহার হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেনি বৃটিশ শাসনকালে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটার প্রেক্ষাপটে। ভাটিয়ার তথ্য অনুযায়ী প্রাক-বৃটিশ রাজত্বকালে প্রতি পঞ্চাশ বছরে একটি বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।[৪] কিন্তু ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮ সময়কালে ভারতে অন্তত বারোবার দুর্ভিক্ষ ও চারবার খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে। দুর্ভিক্ষাবস্থার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮৬০-১৯০৮ সময়কালে। ১৮৬৭ সনের দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের মতে, এই ধরনের দুর্ভিক্ষ ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষিকাজে নিয়োজিত মজুর ও ক্ষুদ্র চাষী।[৫]

১. প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবস্থা

প্রধান নদীসমূহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে মুগল ও কোম্পানি আমলে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে শহর, নগর ও ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পর্তুগীজরা বাংলায় আসে ১৫১৭ সনে। এ সময় মেঘনা নদী হয়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ে যাওয়ার যে নৌ-পথ ছিল, চট্টগ্রামকে মনে করা হতো তার প্রবেশপথ। গৌড়ের পতনের সাথে সাথে চট্টগ্রামেরও গুরুত্ব হ্রাস পায়, আর নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে উত্থান ঘটে সাতগাঁও-এর; তবে হুগলী

৩. K. Davis, *The Population of India and Pakistan* (New Jersey 1951), 38.

৪. B. M. Bhatia, *Famines in India-A Study in Some Aspects of Economic History of India*, 1860-1945 (Bombay 1963) 7.

৫. প্রাগুক্ত, ৪.

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সাতগাঁও তার গুরুত্ব হারায়। অতএব, বড় নদীগুলোর যথার্থ ভূমিকার দিকটি বিবেচনা না করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।[৬]

পূর্ব বাংলা ব্যাপকভাবে অসংখ্য নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পর্যাপ্ত পানিসম্পদের সহজপ্রাপ্যতার ফলে এখানে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। ফসল উৎপাদনের জন্য বলতে গেলে তেমন কোন শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো না এবং কৃষিউৎপাদন প্রকৃতির কৃপার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। ফসলহানির জন্য দায়ী ছিল অনাবৃষ্টিজনিত খরা ও অতিবৃষ্টিসৃষ্ট বন্যা। বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে নতুন ভূমি জেগে উঠলে সেখানে নতুন নতুন জনবসতি গড়ে উঠে এবং কৃষিকাজে এসবের নতুন যথোপযুক্ত ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৭] অষ্টাদশ শতক থেকেই বাংলায় ব-দ্বীপাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চল এবং মধুপুর ও সুন্দরবনের বনাঞ্চলে নতুন নতুন ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়। ১৮৯১-১৯৪৭ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিভূমি হ্রাসের ফলে ভূমি ব্যবহারের ধরনও পাল্টে যায়।[৮]

প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, ব-দ্বীপ অঞ্চল ক্রমশ পূর্ব দিকে সরে আসে। নবগঠিত ব-দ্বীপ অঞ্চলের পূর্বমুখী ক্রমাপসরণের ফলে পশ্চিমের ব-দ্বীপ অঞ্চল উৎপাদনশীল হয়ে পড়ে। সাংবাৎসরিক প্লাবণ দ্বারা বিধৌত ও পলিনিষিক্ত হওয়া থেকে মরা ব-দ্বীপ অঞ্চল বঞ্চিত হয়। খুলনার ব-দ্বীপ অঞ্চল সম্বন্ধে ফাওকাস [৯] লিখেছেন, 'গোটা জেলাটাই একটা খাঁটি ব-দ্বীপ, যা ভাগীরথী ও পদ্মা এ দু'টি প্রধান নদী কর্তৃক বাহিত হিমালয়ের Ineiss চুনা পাথর সমৃদ্ধ গঙ্গার কাদামাটিপ্রবাহ থেকে সৃষ্ট। ভাগীরথী হচ্ছে গঙ্গার দক্ষিণ প্রবাহী আদি শাখা, আর পদ্মা হলো গঙ্গারই পূর্বমুখী পরবর্তীকালীন আরেকটি শাখা। ষোল শতকের কোন এক সময়ে গঙ্গার বেশিরভাগ পানি ভাগীরথী থেকে পদ্মায় প্রবাহিত হতো। কিন্তু ভাগীরথী ও তার আদি মুখ সরস্বতী আদি গঙ্গা ও যমুনা হয়ে দক্ষিণ দিকে সাগরমুখী প্রবাহিত হলে গঙ্গা তার বাম তীরে পলিসঞ্চারী এক শক্তিমান শাখার জন্ম দেয়। ভৈরব (ভয়ঙ্কর) নামে অভিহিত দক্ষিণ–পূর্ব দিকে প্রবহমান এ নদীই খুলনা জেলার ব-দ্বীপ অঞ্চল সৃষ্টির মূখ্য উৎস হয়ে উঠে। ফরিদপুর জেলার ব-দ্বীপ অঞ্চলের অবস্থান বদলের প্রসঙ্গে জ্যাকও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[১০] রেনেলের জরিপের সময় (১৭৬৯) ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে পূর্বমুখী প্রবাহমান ছিল, আর ১৭৮৭ সালের মহাপ্লাবনের সময় গতিপথের পরিবর্তন ঘটে।

---

৬. J J A Campos, *History of the Portuguese in Bengal,* (Calcutta, 1919) 21

৭. A A Khan, *Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal—A Neo-Classical Analysis* (Dhaka 1982), 32.

৮. প্রাগুক্ত, 19

৯. L R Fawcus, *Final Report on the Khulna Settlement 1920-1926* (Calcutta 1927), 17 43-44

১০. *J C. Jack, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur District 1904-1914, (Calcutta 1916), 2-8.*

নোয়াখালীতে ভূমির ভাঙা-গড়া পালাক্রমে সংঘটিত হয়। ১৯১৪-১৯১৯ সময়কালের তুলনায় ১৯৭০, ১৮৩৬ ও ১৮৬৪ সনে নোয়াখালীতে স্থলভাগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি ছিল। ১৭৬৯ থেকে পদ্মা ও মেঘনা সম্মিলিত ধারায় পরিণত হয়। বর্ধিত মাত্রায় গঙ্গার পানি মেঘনায় প্রবেশের ফলে মেঘনা বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করে। ১৭৯৪ সন নাগাদ লক্ষীপুরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে। থমসনের মতে, এই ব-দ্বীপাঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের গর্ভে ক্রমশ জেগে উঠছিল।[১১]

১৯৬৯ ও ১৭৭১ সনের মধ্যে সম্পন্ন জরিপের ফসল যে রেনেলের মানচিত্র, তাতে রাজশাহীর বর্ণনা রয়েছে এক বন্ধুর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল হিসেবে। "লেটার্স অব স্পোর্টস ইন ইস্টার্ণ বেঙ্গল" থেকে ১৮৫০ সনে নেলসন উদ্ধৃত করেন[১২]:

> কৃষি-আবাদি অঞ্চলের পরে ছিল বারিন্দ, যার গঠনোপাদান ছিল শুষ্ক ও প্রায় অকেজো মাটি; আর নদীর অববাহিকাব তুলনায় এর অবস্থান এত ঊর্ধ্বে ছিল যে, কোন কোন সময় লোকমুখে এটি বারিন্দ-টিলা বলে কথিত হতো। এর বিশালতা, অনমনীয়তা ও শিকারের পক্ষে অনুপযোগিতা এবং অসন্তোষজনক পরিবেশ শিকারীদের কাছে এটিকে অনাকর্ষণীয় করে তোলে। তা সত্ত্বেও হরিণ, কুকুর, বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতির লালনক্ষেত্র হিসেবে এটি বিকশিত হতে থাকে।

নেলসনের সাক্ষ্যানুসারে কিছু অপরিসর ঝোপঝাড় বাদে জঙ্গলগুলো ১৯১২ সনের আগেই নির্মূল করা হয়।

১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পের ফলে ময়মনসিংহের কিছুসংখ্যক গ্রাম বালি ও পানিতে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এতে বোঝা যায় যে, সমগ্র দেওয়ানগঞ্জ ও শেরপুরের বৃহদংশ তখন ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল।[১৩] দিনাজপুরের জঙ্গল সাফ করে নতুন ভূমিতে জনবসতি গড়ে তোলা হয় ঊনিশ শতকে। অনুরূপ বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল হল পাবনা, ময়মনসিংহ, উত্তর ঢাকা, যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এই সব জঙ্গল সাফ করে জনবসতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীরূপে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতো বাংলায়। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্ভিক্ষ ও অনটনের মত মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম সঙ্কট, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ রাজের শাসনামলে ক্রমবর্ধমান বিনাশী ভূমিকা পালন করে। বাংলার লক্ষ লক্ষ জীবনসংহারী কয়েকটি মহাদুর্যোগের উল্লেখ ২নং সারণিতে করা হয়েছে।

---

১১. W H Nelson, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Noakhali, 1914 1919*, (Calcutta 1919), 12,15, 20-21.

১২. W H Nelson, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Rajshahi, 1912-1922*, (Calcutta 1923), 25 26

১৩. F A. Sachse, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymensingh, 1908-1919*, (Calcutta 1920), 15-16.

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বর্তমান অনুচ্ছেদে বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি চারটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে : (ক) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ (১৬০০-১৭৬০); (খ) অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের যুগ (১৭৬০-১৯২১); (গ) মৃত্যুহার হ্রাসের সূচনাপর্ব (১৯২১-১৯৪৭) এবং (ঘ) জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির যুগ (১৯৪৭ থেকে পরবর্তীকাল)। এসব পর্যায়ের ঐতিহাসিক পটভূমি পরবর্তী চতুর্থ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। এসব পর্যায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি-প্রবণতা নিম্নে আলোচিত হলো।

২.১ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ

বাংলায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটে মুগল শাসনামলে। কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির সুফল যেমন বিদেশীদের আকর্ষণ করে, তেমনি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বহিরাগতদের আকৃষ্ট করে। ষোল শতক থেকে কিছু সংখ্যক বৃহৎ নদীর পূর্বমুখী গতিপথে পরিবর্তন সূচিত হয়। পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন ও উন্নততর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ অন্যান্য অঞ্চলের বাস্তুত্যাগীদেরকে নবগঠিত এই ব-দ্বীপাঞ্চলে বসতি স্থাপনে প্রলুব্ধ করে। ১৮০০-১৯৪১ সময়কালে ভারতের জনসংখ্যার সাথে তুলনার ভিত্তিতে বাংলার জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত ৩ নং ছকে দেখানো হয়েছে। বাংলার জনসংখ্যার হার ১৮০০ সনের ১২.০৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৮৪৫ সনে ১৪.৯২-তে দাঁড়ায়, আবার ১৮৭১ সনে তা নেমে আসে ৯.১০ শতাংশে। ১৮৬৭ সনে ও তৎপরবর্তী বছরগুলোতে ভারতের জনসংখ্যার অবগণনাই হয়তো এর জন্য দায়ী[১৪]। যদি ধরা যায় যে, ১৬০০-১৯৪১ সময়কালে ভারত ও বাংলার জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান ছিল, তাহলে বাংলার জনসংখ্যা ৯.১০ মিলিয়নে ও ১২.০৮ মিলিয়নের মধ্যেই স্থিতিশীল থাকার কথা। বাংলার জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ১৮৩৪ এবং ১৮৪৫ সনে বেশি বলে মনে হয় (যথাক্রমে ১৩.৯ ও ১৪.৯ শতাংশ) মূলত ভারতের প্রাককলিত মোট জনসংখ্যার অবগণনার কারণে। বিসারিয়া ও বিসারিয়ার তথ্যেও এ ধরনের যুক্তির সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫] তাঁদের মতে, ভারতের জনসংখ্যা ১৮০০ এবং ১৮৫০ সনে যথাক্রমে ১৩৯-২১৪ এবং ১৮৩-২৪৭ মিলিয়নের মধ্যেই ছিল। অথচ সারণি ৪-এ দেখানো হয়েছে যে ভারতের জনসংখ্যা ১৮০০ সনে ছিল ১২০ মিলিয়ন এবং ১৮৫০ সনে ১৭৫ মিলিয়ন। মনে করা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে এই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল রাজস্ব কর্মকর্তাদের সহায়তায়। তাই এই ধরনের সূত্রে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যার প্রাককলিত হিসাবে বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় গুণগত মানের

১৪. K. Davis, *The population of India and Pakistan* (New Jersey 1951), 25-26.

১৫. L. Visaria and P. Visaria, *The Cambridge Economic History of India* (New Delhi 1982) Volume II c. 1957-c 1970, Capter V, 463-532

পার্থক্যের কারণে। বাংলার জনসংখ্যার হিসাবও করা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দেয়া রাজস্বের তথ্যের ভিত্তিতে। শুধু জন্ম-মৃত্যুর হারকেই যদি বাংলার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বলে স্বীকার করা হয়, তাহলেই কেবল উক্ত নির্ধারিত সংখ্যা সঠিক হতে পারে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের বাংলায় অভিবাসন সাপেক্ষে উক্ত সংখ্যা নিম্নমাত্রার কাছাকাছি বলে ধরে নেয়াই অধিক সমীচীন। ডেভিসের মতে, ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপক আন্তঃস্থানান্তর সংগঠিত হয়েছিল। ভারতের পুরুষদের এই আন্তঃস্থানান্তর ছিল পূর্বমুখী। ডেভিস দেখিয়েছেন যে, ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে এ আন্তঃস্থানান্তরের ফলে ভারতের অন্য সব আন্তঃপ্রদেশের তুলনায় বাংলারই ভাগে পড়ে সর্বাধিক সংখ্যক স্থানান্তরকারী।[১৬] পক্ষান্তরে রাব্বী যুক্তি দেখান যে, ১২০৩ সনে প্রথমবারের মত বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকে ১৭৬৫ সন পর্যন্ত এখানে মুসলমানরা এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে।[১৭] আর বহিরাগতদের বাংলায় আসার পশ্চাতে যে কারণগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে বাংলার সুরক্ষিত অবস্থান ও বাংলার ভূমির ব্যাপক উৎপাদিকাশক্তি। শপ্তদশ শতকের পরে বাংলায় আন্তঃস্থানান্তর প্রক্রিয়ার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল বলে ধারণা করা যায়। বহিরাগত এ জনগোষ্ঠীকে হিসাবে ধরলে ১৬০০ সনে বাংলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়নের কাছাকাছি হওয়াই সমীচীন।

রায় ও দাসগুপ্তের হিসাব অনুযায়ী ১৮০১ ও ১৮১১ সনে বাংলার জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪.০৫ ও ১৫.০৫ মিলিয়ন (৪নং সারণি দ্রষ্টব্য)।[১৮] ১৮০১-১৮১১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি ১৭৭০ সন পর্যন্ত প্রযোজ্য হয়, তবে সে হিসাবে ১৭৭০ সনে বাংলার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১১.৭৮ মিলিয়নে। ১৬০০-১৮০০ সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল, কেননা উক্ত সময়ে জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রায় সমান ছিল। বাংলার ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় যে, যদি ১৬০০-১৮০০ সময়কালে বাংলায় মাঝারি মাত্রার অভিবাসনও ঘটে থাকে, তাহলেও উক্ত সময়ে এখানকার জনসংখ্যা আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্রায়তনই থেকে থাকবে। অধিক সংখ্যক লোকাগম সংঘটিত হওয়ার বেলায় মুখ্য নিয়ামকই ছিল নদীসমূহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে জেগে উঠা নতুন ভূমি, যা সতেরো শতকের পরবর্তীকালেরই ঘটনা। এতে বোঝা যায় যে, ১৬০০-১৮০০ সময়কালে বাংলার জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি, তার মুখ্য কারণ ছিল প্রকৃত অভিবাসন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৬০০ সালে বাংলার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯ মিলিয়ন।

১৬ প্রাগুক্ত, 111

১৭. K F Rubbee. *The Origins of the Mussalmans of Bengal,* (Calcutta 1895), 6

১৮. S B Roy and A Das Gupta, "Population Estimates for Bangladesh", *Population Studies,* XXX 1 (1976) 17

২.২ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের যুগ

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা ও বৃটেনে শিল্পবিপ্লব ছিল সমকালীন ঘটনা। প্রাক-শিল্পবিপ্লব যুগে বাংলায় কৃষি ও শিল্পউৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল।

৪ নং সারণিতে ১৮০১-১৯৭৪ সময়কালে বাংলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে, ১৭৭০ সনে বাংলার জনসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণাটি ছিল এই যে, ১৮০১-১৮১১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার, তা ১৭৭০-১৮০১ সময়কালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ১৬০০-১৮০০ সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু বাংলার বেলায় এমনটি হওয়ার কোন তথ্য-প্রমাণ নেই; বরং উক্ত সময়ে বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান। বাংলার জনসংখ্যা ১৭৭০ সনের ১১.৭৯ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৮০১ সনে দাঁড়ায় ১৪.৫ মিলিয়নে এবং তা আরো বেড়ে ১৮৭১ সনে উন্নীত হয় ২৩.০২ মিলিয়নে। ১৮০১-১৯০১ সময়কালে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠে। ১৮০১-১৯২১ সময়কালে এ বৃদ্ধির হার ০.৫২ ও ০.৮৯ শতাংশে সীমিত থাকে। ১৮০১-১৮৮১ কালপর্বে বৃদ্ধির এ হার ছিল ০.০০৬৭ শতাংশ এবং পরবর্তী তিন দশকে এর লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটে। ১৯১১-১৯২১ আন্তঃশুমারিকালে বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল সর্বনিম্ন।

১৮৭২-১৯২১ সময়কালে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ৫ নং সারণির হিসাব থেকে সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়। ১৯১১-১৯২১ দশক ও ১৮৭২-১৯২১ সময়কালে পূর্ব বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৮.৩ ও ৭২.৪ শতাংশ। পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে শতকরা ৮.৩ হারের জনসংখ্যাগত যে অর্জন সে তুলনায় পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে শতকরা ৪.৯ হারে হ্রাস যথার্থই অর্থবহ। তবে এ থেকে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাজনিত কারণে পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় অভিগমনের ব্যাপ্তির মাত্রা পরোক্ষভাবে হলেও ধারণা করা যায়। তবে এ হ্রাসপ্রাপ্তির সিংহভাগের জন্য প্রধানত দায়ী ঐ অঞ্চলে মহামারীর আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব। ১৮৭২-১৯২১ সময়কালে পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার মাত্র ৫.৯; আর সে তুলনায় পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে এ বৃদ্ধির শতকরা হার যথাক্রমে ৭২.৪, ২৭.৮ ও ২৫.১।

১৯০১-১৯২১ সময়কালে স্থূল জন্মহারের তেমন অবনতি ঘটে নি, এবং ১৭৭০-১৯০১ সময়কালের জন্মহারের কোন উপাত্ত পাওয়া যায় না। তবুও ধারণা করা যেতে পারে যে, উক্ত কালে জন্মহার প্রায় পূর্ববর্তী মাত্রায় স্থির ছিল। ১৮৮১-১৯৭৪ সময়কালের জন্মহার ও মৃত্যুহার ৭ নং সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সারণি থেকে সুস্পষ্টই বোঝা যায় যে, ১৮৮১-১৯২১ সময়কালে স্থূল মৃত্যুহারের প্রবণতা ছিল ঊর্ধ্বমুখী আর সর্বোচ্চ স্থূল মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৪৭. ৩ লক্ষ্য করা যায় ১৯১১-২১ সময়কালে। এ সর্বোচ্চ মৃত্যুহারের জন্য সম্ভবত দায়ী ১৯১৮ সালের মহামারীরূপী ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব,

যার ফলে কমপক্ষে ৪০০,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে। ১৭৭০-১৯২১ সময়কালে বাংলায় উচ্চ মৃত্যুহারের জন্য দায়ী সুস্পষ্ট নিয়ামক ছিল তিনটি— (১) উপর্যুপরি মহামারীর প্রাদুর্ভাব, (২) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসন ও (৩) উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন।

বাংলার অধিবাসিরা ছিল মহামারীরূপী বিভিন্ন রোগের সহজ শিকার। কিছু রোগ আবার অনেক অঞ্চলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হতো। যক্ষ্মা, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধি বৃটিশ শাসনপূর্বকালে ভারতে খুব একটা দেখা যায় নি।[১৯] তবে মারাত্মক মহামারীরূপে কলেরা, গুটিবসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধি মাঝে মাঝে বাংলার জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিত। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধীয় যেসব তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায় তা অপ্রতুল ও অনির্ভরযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে, ৬ নং সারণিতে মৃত্যুর কারণভিত্তিক যে মৃত্যুহার দেখানো হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯০১-১৯১১ দশকে সংঘটিত মৃত্যুর তিন-চতুর্থাংশই ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যু ছিল। এসব মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষকে তা সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল গ্রামসর্দার অথবা চৌকিদারের। ডেভিস উল্লেখ করেছেন যে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অপারগ হলে তথ্য সরবরাহকারীরা সেক্ষেত্রে মৃত্যুর অজ্ঞাত কারণকে জ্বর বলে চালিয়ে দিত।[২০] এক্ষেত্রে টাইফয়েড, গুটিবসন্ত, নিউমোনিয়া ও ইত্যাকার কারণকেও হয়তো নিউমোনিয়ার শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকবে। একই সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বমোট মৃত্যুর ৭.৪ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল কলেরা। ভারতে বিপুল সংখ্যক লোকের মৃত্যুর কারণ বলে চিহ্নিত গুটিবসন্ত নামক রোগটি পুরনো ব্যাধিসমূহের অন্যতম বলে বিবেচিত হতো এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র এটি সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে এ রোগের টিকা ভারতে চালু করা হয়, যদিও এটি ইউরোপে উদ্ভাবিত হয় এর প্রায় একশত বছর আগে, ১৭৯৮ সনে।[২১] তবে ভারতে টিকা প্রবর্তিত হওয়ার অল্প ক'বছরের মধ্যেই গুটিবসন্ত রোগজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

কলেরা ছিল আরেকটি পুরানো ব্যাধি, যা বাংলায় বিপুল সংখ্যক লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কলেরার সর্বপ্রথম ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে সম্ভবত ১৮১৭-১৯ সনে এবং সম্ভবত বাংলাতেই এটি শুরু হয়ে থাকবে। মহামারীরূপী কলেরার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ১৮৬৩-১৮৬৫, ১৮৭৫-১৮৭৭, ১৮৯১-১৮৯২, ১৮৯৪-১৮৯৭, ১৯০০, ১৯০৫-১৯০৮, ১৯১৮-১৯১৯ ও ১৯২১ সনে ঘটেছিল বলে ডেভিস উল্লেখ করেছেন।[২২]

আরেকটি ছোঁয়াচে রোগ ছিল কালাজ্বর। কলেরার তুলনায় এর বিস্তার কম হলেও এর প্রাণঘাতী ভূমিকা ছিল অধিকতর মারাত্মক। ১৮৯১-১৯০১ সালের এক দশক মেয়াদে

১৯. K. Davies, *Population*, 45-47
২০. প্রাগুক্ত, 42
২১. প্রাগুক্ত, 47
২২. প্রাগুক্ত, 48

পশ্চিম বাংলার বহু গ্রাম কালাজ্বরের প্রকোপে উজাড় অথবা পবিত্যক্ত হয়ে যায়। ১৮৫৪ ও ১৮৭৫ সনে মহামারীরূপী কালাজ্বর পশ্চিম বাংলায় ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে এবং ১৮৯১ সন নাগাদ তা পূর্বমুখী ছড়িয়ে পড়ে। এর আরেক দফা প্রাদুর্ভাব ঘটে ১৯১৭-২৭ দশকে। তুলনামূলকভাবে কম মারাত্মক হলেও এতে বহুসংখ্যক লোক প্রাণ হারায়। এ রোগের মারাত্মক ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় ১৯২০-এর দশকের পর, যখন কালাজ্বরের সার্থক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়।[২৩]

উনিশ শতক নানা মারাত্মক মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের প্রাদুর্ভাব নিয়ে বাংলার জন্য দুঃসময় হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু বিশ শতকের সূচনা ঘটে যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তুমুল তৎপরতার মধ্য দিয়ে। কলকাতা হয়ে উঠে আমদানি ও রপ্তানি কর্মকাণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ১৮৮৯-১৯০৮ সময়কালে ভারতে রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটে আরও দশ হাজার মাইল। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য এবং খরার কবল থেকে ফসল রক্ষার লক্ষ্যে প্রায় অনুরূপ সময়ে সেচপ্রকল্প চালু করা হয়।[২৪] এসবের ফলে সৃষ্ট খাল, সড়ক ও রেলপথের বেড়ি ও বাঁধ পরিণত হয় মশার প্রজননক্ষেত্রে, যার মাধ্যমে বাংলায় ম্যালেরিয়ার বিস্তার ঘটে। ভারতের সর্বমোট মৃত্যুর বিশ শতাংশই ছিল ম্যালেরিয়াজনিত এবং সারণি ১০ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি হওয়া বিচিত্র নয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসনের ফলে বাংলার জনজীবনে অতিশয় আর্থিক দৈন্য নেমে আসে। আর এ কারণে ১৯৭০ সনে প্রথম দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বৃহত্তর বঙ্গের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (দশ মিলিয়নেরও অধিক) এ দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে।[২৫] বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্তও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আপেক্ষিক হারে উচ্চ ছিল না। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দুর্ভিক্ষ হওয়ার জন্য দায়ী করা যায় না। বারংবার দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী ছিল কৃষকদের স্থায়ী দারিদ্র্য, যা ছিল অধিক মাত্রায় ভূমির খাজনা নির্ধারণের কুফল। দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ সে অনুপাতে দিনমজুরের মজুরি বৃদ্ধি করা হয় নি।[২৬] দ্রব্যমূল্য ও মজুরির এ ব্যবধান উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব দুর্ভিক্ষ ও অনটনের সহজ শিকার হয় এই দিনমজুর শ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

২৩. J. E. Park and K. Park, *Preventive and Social Medicine*, (Jabbalpur 1985), 2-7

২৪. B. M. Bhatia, *Famines in India —A Study in Some Aspects of Economic History of India, 1860-1945*, (Bombay 1963), 196-200, 210

২৫. W.B. Arthur and G. McNicoll, "Analytical Survey of Population and Development in Bangladesh", *Population and Development Review*, IV · II (1976), 29

২৬. B. N. Bhatia., *Famines in India*, 24-26

বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়।[২৭] এর মাধ্যমে সূচিত দীর্ঘমেয়াদি ইজারাব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট যে অকৃষক জমিদার শ্রেণী, তারই নিয়ন্ত্রণে চলে যায় গ্রামীণ সম্পদ। এর প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, এটি প্রবর্তনের মাত্র দু'দশক কালের মধ্যেই অর্ধেক ভূ-সম্পত্তিরই মালিকানাসত্ব হাতবদল হয়ে যায়। কৃষিরায়তদের কাছ থেকে খাজনা উসুল করতে শুরু করে মধ্যস্বত্বভোগী একটি শ্রেণী। নতুন এ ব্যবস্থার আওতায় ভূমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে সৃষ্টি হয় এক নব্য শোষক শ্রেণীর। গ্রামীণ এলাকার কৃষিব্যবস্থায় এ প্রক্রিয়ায় এক সদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সঞ্চয়ের অভাবে ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষিমজুর সম্প্রদায় যেকোন দুর্ভিক্ষ ও অনটনের ছোবলে নেতিয়ে পড়ে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে পূর্ব বাংলা শুধু যে খাদ্যের ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তা-ই নয়, বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অক্ষুণ্ন ছিল। এমনকি কোম্পানি শাসনের প্রথম দিকে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চাউল রপ্তানি করা হতো।[২৮] ১৭৪৭ সনে ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত সুতীবস্ত্রের মূল্য ছিল ২৮.৫ লক্ষ রুপী। ১৮১৩ সন নাগাদ সুতীসামগ্রীর রপ্তানিমূল্যের পরিমাণ মাত্র ৩.৫ লক্ষ রুপীতে নেমে আসে।[২৯] কোম্পানির শাসনামলে বাংলার নিজস্ব শিল্পক্ষেত্রে অবনতির গতি যে কত দ্রুত ছিল তা বোঝার জন্য এ তথ্যই যথেষ্ট।

২.৩ ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহারের সূচনা

বাংলার জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৯২১-১৯৪১ সময়কাল একটি সুচিহ্নিত পর্যায়। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত ১৭৭০-১৯২১ সময়কালে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয় ছিল প্রায় সমান। তবে গুটিবসন্ত ও কালাজ্বরসহ কিছু কিছু রোগ নতুন টিকা ও ঔষধ প্রবর্তনের ফলে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াভুক্ত হচ্ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রবণতার এই প্রাথমিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের লক্ষণীয় দিকটি ছিল ১৯২১-১৯৪৭ সময়কালে মৃত্যুহারের ক্রমহ্রাসের প্রবণতা।

৪ নং সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯২১ সনে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৩৩.৩ মিলিয়ন আর এর মাত্র বিশ বছর পরেই ১৯৪১ সনেব আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা আরও ৯ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯৩১ সনের মধ্যবর্তী আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা আরো ৯ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯৩১ সনের মধ্যবর্তী আন্তঃশুমারিকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ০.৬৭ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৩১-১৯৪১ সময়কালে দ্বিগুণ হয়ে যায়। ৭ নং

২৭. S Islam, *Rent and Raiyat : Society and Economy of Eastern Bengal, 1859- 1928,* (Dhaka 1989), 12.

২৮ N. Ahmed. *A New Economic Geography of Bangladesh,* (New Delhi 1976), 55.

২৯. B C Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers—Dhaka* (Allahabad 1912), 21.

সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সময়ে জন্মহারের মাত্রা মোটামুটি ১৯২১ সনের মতোই ছিল, কিন্তু মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়; যেমন, ১৯১১-১৯২১ সনে হাজারপ্রতি ৪৭.৩ জনের স্থলে ১৯২১-১৯৩১ দশকে এ হার কমে হয় ৪১.৭ আর পরবর্তী দশকে (১৯৩১-১৯৪১) তা আরো কমে গিয়ে হয় প্রতি হাজারে ৩৭.৮ জন।

১৯৪১ সনের আদমশুমারিতে অতি-গণনাবশত ১৯৩১-১৯৪১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্ধারিত হিসাব প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বেশি বলেই মনে হয়। ১৯৪০ সনে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় রাজ্যসমূহের হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে ভারতবিভক্তির যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এ মাত্রাতিরিক্ত গণনা প্রশ্রয় পায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অধিক জনসংখ্যা দেখায়। জন্মহার ও মৃত্যুহারের হিসাব দেখে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৩১-১৯৪১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কেবল মৃত্যুহারের অধোগতিই দায়ী নয়।

২,৪ জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির যুগ

১৯২১-১৯৪৭ সময়কালে মৃত্যুহারের অধোগতি লক্ষ্য করা গেছে। বাংলার ইতিহাসে ভয়াবহতম মহাদুর্ভিক্ষসমূহের একটি সংঘটিত হয় ১৯৪৩ সনে। এতে প্রাণহানি ঘটে ২ থেকে ২.৫ মিলিয়ন লোকের।[৩০] অতএব, ১৯৫১ সনের পরবর্তী আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ অধোগতির মূল কারণগুলো ছিল ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ এবং কলেরা ও গুটি বসন্তের মহামারী।

বাংলার জনসংখ্যা ১৯৫১ সনে ছিল ৪১.৯ মিলিয়ন, যা বেড়ে ১৯৬১ সনে হয় ৫০.৮ মিলিয়ন এবং তা আরো বেড়ে ১৯৭৪ সনে দাঁড়ায় ৭১.৩ মিলিয়ন। মাত্র তিনশ' বছরে ৭০ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ঘটনা বাংলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হলো, নিরঙ্কুশ সংখ্যার ভিত্তিতে বলতে গেলে, মাত্র ২৩ বছরের যে বর্ধিত লোকসংখ্যা (প্রায় ২৯.৪ মিলিয়ন), তা ১৯০১ সনের হিসাবকৃত মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

১৯৪৭ সনে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্ব বাংলা ও ভারতের মধ্যে ব্যাপক শরণার্থী বিনিময় ঘটে। হিসাবে দেখা গেছে যে, ১৯৪১-১৯৫১ দশক ও ১৯৫১-১৯৬১ দশকে দেশত্যাগপূর্বক যথাক্রমে কমপক্ষে ১.৮ মিলিয়ন ও ১.১ মিলিয়নেরও বেশি লোক পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে গমন করে।[৩১] বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী যুগেই কেবল জন্মহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিঞ্চিত ভাটা নজরে পড়ে। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা যুগের হিসাব

৩০. W. B. Arthur And G. McNicoll, *Population and Development in Bangladesh*, 29.

৩১. S. G. Roy and A. Das Gupta, "Population Estimates", 18

থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১-১৯৭১ সময়কালে জন্মহারের মাত্রা প্রায় স্থির ছিল। তবে হাজারপ্রতি যে মৃত্যুহার ১৯৪১-১৯৫১ দশকে ৪০.৭ জন ছিল, তা হ্রাস পেয়ে ১৯৬২-৬৫ সময়ে হয় প্রতি হাজারে ১৮.৫ জন। ১৯৭১ সনের স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলে মৃত্যুহারের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৪ সনে । প্রায় দু'দশকের মধ্যে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় বাংলার জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মৃত্যুহারের এ নিম্নমুখী গতি অর্জন সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ব্যবস্থাদির ক্রমাগত সাফল্যের ফলে, আর এগুলোর শুভ সূচনা ঘটে বিশ শতকের গোড়ার দিকে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, উদরাময় প্রভৃতির মতো ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে টিকা, উন্নতমানের ঔষধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নের ফলে।

সারণি ৮ ও ৯-এ দেখানো হয়েছে বাংলার জনসংখ্যার জেলাওয়ারী তারতম্য। ১৯০১-১৯৭৪ সময়কালে জনসংখ্যার এক চমকপ্রদ শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। জেলাসমূহে জনসংখ্যার তারতম্যগত প্রকৃতি সুচিহ্নিত করার জন্য তিনটি পৃথক পর্যায়ে তা বিবেচনা করা হয়েছে : (১) উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহারের যুগ (১৯০১-১৯২১), (২) ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহারের সূচনাপর্ব (১৯২১-১৯৪১) এবং (৩) মৃত্যুহার হ্রাসের যুগ (১৯৫১-১৯৭৪)। সংশ্লিষ্ট সারণির ভিত্তিতে নিম্নরূপ শ্রেণীপ্রকরণ করা হয়েছে :

ক. সব ক'টি পর্যায়েই খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড়পড়তা হারেব চেয়ে অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে;

খ. বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার জনসংখ্যা ১৯৫১ সনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিব গড়পড়তা হারেব চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পায়, তবে ১৯৫০ সনের পববর্তীকালে এসব জেলাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার সমগ্র দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিব শতকরা হারের নীচে নেমে যায়।

গ) রংপুর ও বগুড়ার জনসংখ্যা ১৯০১-১৯২১ দশক ও ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে উচ্চতর হারে বৃদ্ধি পায়; তবে ১৯২১-১৯৪১ সময়কালে এ বৃদ্ধি তেমন বেশি ছিল না।

ঘ. যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনার জনসংখ্যা ১৯০১-১৯২১ সময়কালে হ্রাস পায় এবং ১৯২১-১৯৪১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শ্লথ গতিতে। কিন্তু ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে তা বেড়ে যায় দ্রুততম গতিতে, বিশেষকরে যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায়।

জেলাসমূহের জনসংখ্যার তারতম্যের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষণীয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবে ১৯০১-১৯৭৪ সময়কালে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামত্যাগী মানুষ শহরমুখো হওয়ায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলায় বাড়তি লোকজনের সমাবেশ ঘটে। সুন্দরবনের জলাবদ্ধতা দূরীভূত হওয়ায় খুলনাতেও বাড়তি লোকের আগমন ঘটে। বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি কৃষিপ্রধান জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৯৫১ সনের পূর্ব পর্যন্ত বেশ লক্ষণীয় ছিল। বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই জেলাগুলো অধিক জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত ছিল।

জনসংখ্যাধিক্যের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এসব জেলা ছেড়ে বাস্তুত্যাগীরা অন্য জেলায় বসতি স্থাপন করে। এ অবস্থায় ময়মনসিংহ জেলা থেকে বহু লোকের আসামে পাড়ি জমানোর ঘটনাটি সহজেই নজরে পড়ে। উক্ত সাধারণ নিয়মেরই আরেকটা ফল হচ্ছে এই যে, ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে এসব জেলায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ক্রমাগত নিম্নমুখী ছিল।

১৯২১-১৯৪১ সময়কালে রংপুর ও বগুড়ায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতি বাংলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কম ছিল। বাংলা থেকে আসামগামী দেশত্যাগীদের মধ্যে ময়মনসিংহের লোক ছাড়াও ছিল রংপুর, বগুড়া ও পাবনার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাস্তুত্যাগী। ১৯৩১ সন নাগাদ বাংলা ছেড়ে আসামে পাড়ি জমায় ৪,০০,০০০ লোক। এদের মধ্যে ১,০০,০০০ লোক ছিল শুধু ময়মনসিংহ থেকেই।[৩২] অত্যধিক ঘনবসতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯২১-১৯৪১ সময়কালে এসব জেলার অধিবাসিদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ চলে যায় আসাম, কুচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। রংপুরকে গণ্য করা হতো বাংলার অন্যতম প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে আর বগুড়া ছিল বাংলার ইতিহাসখ্যাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহের অন্যতম। ১৯০১ সনের আগে এ দু'টি জেলায় জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে এবং তা ১৯০১-১৯২১ সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর কিছুকাল এ বৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী ছিল। কিন্তু পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর নতুনকরে এসব জেলার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং রংপুরের সৈয়দপুর ও লালমনিরহাটে রেলওয়ে কারখানা ও আবাসিক ইমারতাদি নির্মিত হয়। এর ফলে অনেক লোক অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভীড় করে রংপুরে।[৩৩]

নদীর মৃতপ্রায় অবস্থা, নতুন পলির অভাব, বিস্তীর্ণ মাঠের অনুর্বরতা প্রভৃতি কারণে ১৯০১-১৯২১ সময়কালে যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনার জনসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৫১ সনের পর ঐসব জেলার যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটে এবং কৃষিখাতের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেয়া হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে এসব জেলার জনসংখ্যাও খুব উচ্চহারে বৃদ্ধি পায়।

১৮৯০-এর দশকের আগে পর্যন্ত দিনাজপুরের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে নি। অতঃপর সাঁওতাল অভিবাসনকারীরা দিনাজপুরে বসতি স্থাপন শুরু করলে সেখানে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২১ সনের পর বাংলার জনসংখ্যা ক্রমশ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও দিনাজপুরের কোন কোন অঞ্চলে জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি লক্ষ্য করা যায়।[৩৪] অপরপক্ষে, বাংলাদেশের সামগ্রিক বিবেচনায় রাজশাহীতে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব

৩২. N Ahmed, *Economic Geography*, 118 119

৩৩ প্রাগুক্ত, 179

৩৪. F O Bell, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Dinajpur, 1934-40*, (Alipore 1942), 1-9

মোটামুটিভাবে বজায় ছিল। ১৭৬৯-১৭৭১ সময়কালে রেনেলের জরিপ-প্রতিবেদনে রাজশাহীর বর্ণনা রয়েছে একটি জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর অঞ্চল হিসেবে। রাজশাহীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় অপরিবর্তিত। নেলসনের মতে, রেশমশিল্পের অবক্ষয় ও ভূমির উর্বরতার ক্রমাবনতির ফলে ১৮৭২ সনের পর থেকে রাজশাহীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।[৩৫] ১৯২৩ সন নাগাদ অধিকাংশ জঙ্গল সাফ করা হয় এবং এর ফলে জলবায়ুগত পরিবর্তনও ছিল লক্ষণীয়। ১৯৫১ সনের পর উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, নবতর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ও কৃষির উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দিনাজপুর ও রাজশাহীর জনসংখ্যা ৮৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

মৃত্যুহার হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় ১৯২১-১৯৪৭ সময়কালে এবং তা ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে জন্মহারের মাত্রা স্থির থাকে। ১৯১১-১৯২১ দশকে জন্ম ও মৃত্যুর স্থূলহার ছিল যথাক্রমে ৫২.৯ ও ৪৭.৩ শতাংশ আর ১৯৬২-১৯৬৫ সময়কালে স্থূল জন্মহার ছিল ৫৫.০; কিন্তু স্থূল মৃত্যুহার ১৮.৫ শতাংশে হ্রাস পায়। অতএব, ১৯২১-১৯৭১ সময়কালে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি, তার কারণ ছিল ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহার। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহার লক্ষ্য করা যায় সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অভিবাসন

জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মুখ্য উপাদানসমূহের মধ্যে অভিবাসন অন্যতম। বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির বেলায় অভিবাসনের ভূমিকা দু'টি আলাদা পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা যায়। মুসলিম শাসনকালে বাংলায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা ছিল। আর প্রধান প্রধান নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন ভূমি জেগে উঠে। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যেমন অন্যান্য দেশ থেকে, তেমনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহিরাগতদেরকে আকৃষ্ট করে। তবে বাংলার কোন কোন জেলায় বিশ শতক থেকে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কৃষিভূমির উপর চাপ এতই বেড়ে যায় যে, এসব জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাসিন্দা বাস্তুত্যাগ করে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে চলে যায়। অভিবাসন সংক্রান্ত প্রাপ্ত উপাত্ত নিতান্তই অপ্রতুল। এ তথ্যের একমাত্র উৎস হচ্ছে আদমশুমারি সূত্রে প্রাপ্ত জন্মস্থান বিষয়ক উপাত্ত। ডেভিসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ভারতের ক্ষেত্রে এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রবণতা পূর্বমুখী।[৩৬] উত্তর ভারতে পুরুষদের পূর্বমুখী এই অভিবাসনের মুখ্য কারণ ছিল বাংলার শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ও নগর জীবনব্যবস্থার বিকাশ। ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে জনসংখ্যার জন্মস্থানভিত্তিক যে উপাত্ত

---

৩৫. W H Nelson, *Survey Operations in Rajshahi*, 25-26

৩৬. K Davis, *Population*, 118-119

তা থেকে ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের মধ্যকার জনসংখ্যার বাটোয়ারা ও আপেক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধির বিন্যাসগত অবস্থান সারণি ১০-এ দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, মহীশুর, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশসহ বাংলা প্রদেশের উপরই সর্বাধিক অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ছিল। ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে এসব প্রদেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির সাথে বিপুল সংখ্যক অতিরিক্ত লোকসংখ্যাও যুক্ত হয়েছিল। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাপুঞ্জের অধিকাংশই ঘটেছিল ১৮৯১ সন পর্যন্ত। পরবর্তী দশকগুলোতে এ প্রবণতায় ভাটা পড়ে। তবে ১৯১১ সন থেকে জনসংখ্যার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে।

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গসহ বাংলায় ১৮৮১-১৯২১ সময়কালে যে প্রকৃত অভিবাসন ঘটে,তা সারণি ১১-তে দেখানো হয়েছে। ১৮৮১ সনে প্রকৃত অভিবাসনকারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ০.২৮ মিলিয়ন, ১৯১১ সন নাগাদ তা বেড়ে ০.৭১ মিলিয়নে উন্নীত হয়। আবার ১৯১১-১৯২০ সময়কালে প্রকৃত অভিবাসনকারীর সংখ্যা পূর্ববর্তী ০.৭১ মিলিয়ন থেকে অকস্মাৎ হ্রাস পেয়ে ০.১৩ মিলিয়নে নেমে আসে।

বাংলার কোন কোন জেলায় জনসংখ্যার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধির ফলে বাংলা থেকে বহির্গমনের সূচনা হয় ১৯০০ সনের পরে। বাংলায় জন্মগ্রহণকারী যে বাস্তুত্যাগী জনগোষ্ঠী আসামে বসতিস্থাপন করে, ১২ নং সারণিতে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। বাংলার এসব বাস্তুত্যাগীর অধিকাংশই ছিল কৃষক এবং এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ময়মনসিংহ থেকেই সেখানে গমন করে। ডেভিসের মতে, ১৯৩১ সনের পরে আসামমুখী এ বহির্গমন দ্রুত হ্রাস পায়। প্রায় একই সময়ে অনুরূপ বহির্গমন ঘটে রংপুর, পাবনা ও বগুড়া থেকে আসাম, কুচবিহার ও জলপাইগুড়িতে, চট্টগ্রাম থেকে বার্মার আরাকানে এবং কুমিল্লা ও নোয়াখালী থেকে ত্রিপুরায়।[৩৭]

৪. জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক বাটোয়ারা

১২০৩ সনে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের সময় থেকেই বাংলার জনসংখ্যার গঠনপ্রক্রিয়ায় ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে এসেছে, আর এর লক্ষণীয় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে এখানকার আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যাগত কাঠামোর উপর। বাংলার জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি, তার সাথে ধর্মের একটি কৌতুহলোদ্দীপক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। বাংলার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতির সম্যক উপলব্ধির জন্য তাই ধর্মকেও অন্যতম মানদন্ড রূপে বিবেচনায় নেয়া উচিত।

১৮৭২ সনের আদমশুমারির আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল।[৩৮] ১৯০১-১৯৬৯ সময়কালে বিভিন্ন আদমশুমারির ভিত্তিতে জনসংখ্যার

৩৭. N. Ahmed, *Economic Geography*, 178-80

৩৮. F. A. Saches, *Survey Operations in Mymensingh*, 15-16

ধর্মভিত্তিক অবস্থান সারণি ১৩তে দেখানো হয়েছে। ১৯০১ সনে বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬১ শতাংশ মুসলমান, প্রায় ৩১ শতাংশ হিন্দু এবং অবশিষ্ট ৭ শতাংশ ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৩১-১৯৬১ সময়কালে মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে হিন্দুদের সংখ্যা ১৯০১ সনের ৩১.৪৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৪১ সনে হয় ২৮ শতাংশ এবং ১৯৬১ সনে তা আরো হ্রাস পেয়ে হয় ১৮.৪৫ শতাংশ। মুসলমানদের অনুপাত ১৯০১ সনের ৬১.৩৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৪১ সনে হয় ৭০.০৪ শতাংশ এবং ১৯৬১ সনে তা আরো উন্নীত হয় ৮০.৪৩ শতাংশে। পূর্ব বাংলা থেকে অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশে বহির্গামীদের প্রকৃত সংখ্যা ১৯৪১-১৯৫১ দশক ও ১৯৫১-১৯৬১ দশকে ছিল যথাক্রমে ১.৮ ও ১.১ মিলিয়ন। তবে মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য শুধু অভিবাসনই এককভাবে দায়ী নয়।

প্রতি দুই আদমশুমারির অন্তর্বর্তীকালে মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধির বিষয়টি প্রামাণ্য নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। এক্ষেত্রে তিনটি নিয়ামক বিবেচ্য : (১) বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চতর হারের কারণ ছিল এখানকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, উন্নততর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও নবগঠিত ব-দ্বীপাঞ্চল; (২) মুসলমানরা প্রধানত কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল এবং (৩) ইসলামের অনুকূলে বেশিরভাগ ধর্মান্তর প্রাক-বৃটিশ যুগেই ঘটেছিল এবং বৃটিশ যুগে খুবই নগণ্য সংখ্যক হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল।[৩৯] এসব নিয়ামক ও তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক সংখ্যাধিক্যের কারণ বোধগম্য হয়। ১৯৪১ সনের আদমশুমারির উপাত্তের ভিত্তিতে ডেভিস দেখিয়েছেন যে, পূর্ব বাংলার ৭৫ শতাংশ পুরুষই নিয়োজিত ছিল কাঁচামাল উৎপাদনে, যা ছিল মুখ্যত কৃষিজ ও গবাদিপশুজাত, অথচ পশ্চিম বাংলায় এ হার ছিল ৫৩.৩ শতাংশ।[৪০] ফাউকাস মন্তব্য করেন যে, খুলনা জেলার কৃষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ছিল কঠোর পরিশ্রমী মুসলমান আর সেখানকার মোট অধিবাসিদের মধ্যে মুসলমান ছিল শতকরা ৭৭ ভাগ।[৪১] অন্যান্য জেলার ভূমি জরিপ ও খাজনা নির্ধারণী প্রতিবেদনসমূহেও অনুরূপ মন্তব্যাদি প্রামাণ্য নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। লুইস মন্তব্য করেন যে, মোট মুসলমান জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশই কৃষিতে নিয়োজিত ছিল, অথচ হিন্দু জনসংখ্যার মাত্র ৬৭ শতাংশ অনুরূপ কাজে নিয়োজিত ছিল।[৪২]

কৃষি পেশা সচরাচর সম্প্রসারিত পারিবারিক কাঠামোর ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে প্রাক-বিপ্লব যুগের বিভিন্ন দেশের পারিবারিক কাঠামো পর্যবেক্ষণে।

৩৯. W. W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VIII (London 1876), 48.

৪০. K Davis, *Population*, 202

৪১. L R Fawcus, *Report on Khulna Settlement*, 43

৪২. A L. Clay, *Principal of the Heads— History and Statistice of the Dhaka Division* (Calcutta 1868) 2, 138

কল্ডওয়েলের মতে, সব আদিম সমাজ এবং প্রায় সকল প্রাচীনপন্থী সমাজে সম্পদের প্রকৃত প্রবাহ সন্তান থেকে পিতা-মাতার দিকেই গড়ায়।[৪৩] এমন অবস্থায় উচ্চ জন্মহারই হলো এর যৌক্তিক পরিণতি। পূর্ব বাংলার কৃষকদের মধ্যে আপেক্ষিক উচ্চ জন্মহারের ব্যাখ্যা এই মূলনীতির কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যায়। মুসলমান সম্প্রদায় আনুপাতিকভাবে অধিকতর সংখ্যায় কৃষিকর্মে নিয়োজিত থাকায় পূর্ব বাংলার কৃষিপ্রধান এই পরিবেশে তাদের মধ্যে উচ্চতর মাত্রার জন্মহার বিদ্যমান থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

১২০৩-১৭৬৫ সময়কালে বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য দু'টি কারণকে দায়ী করা যায় : (১) বাংলার ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদনের প্রাচুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাস্তুত্যাগী মুসলমানরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করে[৪৪] এবং (২) মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করারও কিছু কিছু ঘটনা ঘটে। ধর্মান্তরের অনুপাত বৃটিশ শাসনকালে দ্রুত হ্রাস পায়। উল্লেখিত কারণগুলোসহ আরো কিছু নিয়ামক বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল; যেমন : (১) হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যদের মধ্যে বহুবিবাহের ঘটনা নিতান্তই বিরল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রতি প্রশ্রয় ছিল উদারভিত্তিক; (২) হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ছিল নিষিদ্ধ; কিন্তু ইসলামে বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকায় মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহে বাধা ছিলনা; (৩) মুসলমানদের উন্নত খাদ্যাভ্যাসও তাদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল, যা মুসলিম নারীদের প্রজননগত আচরণের সাথে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কযুক্ত।[৪৫]

৫. উপসংহার

আধুনিক যুগের সূচনাকাল থেকে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলোর ক্রমপরিবর্তনের যে প্রকৃতি, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপাদানগুলোতে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের নিরিখে চারটি পর্যায় সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা যায়। যেমন : অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ; অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও অনটনের যুগ; মৃত্যুহার সঙ্কোচনের যুগ ও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির যুগ।

১৬০০-১৭৬০ সময়কাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভরাজোয়ার লক্ষণীয়। জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই ছিল খুব বেশি এবং বাংলায় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিও ছিল খুবই সামান্য। তবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এই যুগে ভারতের অন্যান্য

৪৩. J. C. Caldwell, "Toward a Restatement of Demographic Transition Theory" *Population and Development Review,* 11. 3 &4, 321-66.

৪৪. K. F. Rubbee, *Mussalmans of Bengal,* 6.

৪৫. B. C. Allen, *District Gazetters–Dhaka,* 60-63.

অঞ্চল থেকে বাস্তুত্যাগীদের বিপুল সংখ্যায় বাংলায় বসতিস্থাপনের ফলে এখানকার জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে যায়। কয়েকটি বড় নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন ভূমি জেগে উঠে এবং পূর্ব বাংলায় কৃষি-উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের ফলে বাংলায় বৈষয়িক সমৃদ্ধি আরো ব্যাপকতা লাভ করে। যুগপৎ কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপাদনের সুসমন্বয়ের ফলে বাংলায় অর্থনীতি হয়ে উঠে ভারসাম্যপূর্ণ।

১৭৬০ সনের মহাদুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করে। ১৭৭০ সন থেকে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ও তীব্রতা দুই-ই দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজস্ব শিল্পের ধ্বংসসাধন ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ামকগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে এমন একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে, যারা তাদের মজুরি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের মধ্যকার বিরাজমান দুস্তর ব্যবধানের কারণে দুর্ভিক্ষের দুঃসহ আঘাত প্রতিহত করতে অপারগ ছিল। ক্ষেতমজুর, তাঁতী এবং ক্ষুদে কৃষকদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল এই দুর্ভাগা সামাজিক শ্রেণীটি। এভাবেই বাংলার অধিবাসিদের এক বিরাট অংশ দুর্ভিক্ষের করুণ শিকারে পরিণত হয়। কৃষিভূমির উপর চাপ বেড়ে যায় দারুণভাবে। ১৭৭০ সালের আগে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মাত্রা উভয়ই নির্ভরশীল ছিল প্রধানত পরিবেশগত অবস্থার উপর। কিন্তু বৃটিশ শাসনকালে মনুষ্যসৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত নতুন যে চালিকাশক্তি, তা ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এরই ফলে মৃত্যুহার হয় অপরিবর্তিত থাকে অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে জৈব চিকিৎসাবিজ্ঞানে একাধিক্রমে বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী উদ্ভাবনের ফলে অতি অল্প সময়ে বিশ্বজুড়ে মৃত্যুহারে এক ব্যাপক শুভ পরিবর্তন সূচিত হয়। বেশিরভাগ ঘাতক ছোঁয়াচে রোগ উপযুক্ত গণস্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাসে ১৯২১ সন একটি বিভাজন বছর হিসেবে চিহ্নিত। ১৯২১ সনের পরে ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহারের সূচনা সহজেই নজরে পড়ে। ১৯০০ সনের পরে দুর্ভিক্ষের উপর্যুপরি প্রাদুর্ভাব কমলেও মৃত্যুহার হ্রাসের মুখ্য কারণ হিসেবে রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নকেই চিহ্নিত করতে হয়।

স্বাধীন দেশ হিসেবে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর থেকে বাংলার জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলছিল। স্থূল মৃত্যুহার ১৯১১-১৯২১ দশকে ৪৭.৩ শতাংশ থেকে ১৯৬২-৬৫ সময়ে ১৮.৫ শতাংশে নেমে আসে। তবে স্থূল জন্মহার উক্ত পর্বে প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে। মৃত্যুহারের দ্রুত হ্রাসের ফলে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে।

দু'টি কারণে বাংলা থেকে বহির্গমন ও বাংলায় অভিগমন ঘটে—(১) মুসলিম শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অন্যান্য রাজ্য থেকে বহিরাগতদেরকে বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং (২) ১৮৮১-১৯১১ সময়কালে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাংলা থেকে বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়। কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, বাংলা থেকে বহির্গমনকারীরা অধিকাংশই ছিল কৃষক এবং এমনকি নতুন গন্তব্যে বসতিস্থাপনের পরও তারা কৃষিতেই নিয়োজিত থেকেছে। পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বাস্তবতা ১৮৭২ সনের আদমশুমারি পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। ঐ সময় থেকে পরবর্তী প্রতিটি আদমশুমারিতে বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধি প্রামাণ্যভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রাক-শিল্পবিপ্লব পরিস্থিতিতে যৌথপরিবার প্রথা টিকেছিল। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সন্তানের উপার্জন পিতা-মাতার হাতে বর্তানো সাপেক্ষে অধিক সন্তান আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তদুপরি, সন্তানদেরকে গণ্য করা হয় বার্ধক্যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তারূপে। বর্তমান সময়ে বাংলার জনসংখ্যার মৃত্যুহার উচ্চপর্যায়ে নেমে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকাল (১৯৭১) পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান জন্মহারের কোন সূচনা উল্লেখযোগ্য রূপ পরিগ্রহ করে নি।

সারণি ১ : ভারতের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান, ১৬০০-১৯৪১সন পর্যন্ত

সন	জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)
১৬০০	১০০
১৮০০	১২০
১৮৩৪	১৩০
১৮৪৫	১৩০
১৮৫৫	১৭৫
১৮৬৭	১৯৪
১৮৭১	২২৫
১৮৮১	২৫৭
১৮৯১	২৮২
১৯০১	১৮৫
১৯১১	৩০৩
১৯২১	৩০৫
১৯৩১	৩৩৮
১৯৪১	৩৮৯

উৎস : K. Davis, *The Population of India and Pakistan*, 1951, 15-27.

সারণি ২ : বিগত দুশ' বছরে বাংলায় সংঘটিত বিপর্যয় ও দুর্যোগ

সন	ঘটনা	মৃতের সংখ্যা
১৭৬৯-১৭৭৬	বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ	পূর্ব বাংলায় এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ হলেও এটি বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে ছিনিয়ে নেয়।
১৭৮৪-১৭৮৮	বন্যা ও দুর্ভিক্ষ, ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথে আমূল পরিবর্তন	অজ্ঞাত
১৮২২	বাকেরগঞ্জে জলোচ্ছ্বাস	২৭০০
১৮৭৩-১৮৭৪	দুর্ভিক্ষ	অজ্ঞাত
১৮৭৬	বাকেরগঞ্জে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	৪,০০,০০০ জন
১৮৮৪-৮৫	দুর্ভিক্ষ	অজ্ঞাত
১৮৯৭	চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড়	১৭৫,০০০ জন
১৯১৮-১৯১৯	মহামারীরূপী ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪,০০,০০০ জন
১৯৪৩	বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ	২ থেকে ২.৫ মিলিয়ন

উৎস : W B Arthur and G McNicoll, *An Analytical Survey of Populaion and Development in Bangladesh*, 1976, 29.

সারণি ৩ : ১৮০০-১৯৪১ সন পর্যন্ত ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাভাত্তক অবস্থানও তার শতকরা হার

সন	মোট জনসংখ্যা ভারত (মিলিয়ন হিসাবে)	মোট জনসংখ্যা বাংলা (মিলিয়ন হিসাবে)	বাংলার জনসংখ্যার শতকরা হার
১৮০০	১২০	১৪.৫	১২.০৮
১৮৩৪	১৩০	১৮.১	১৩.৯২
১৮৪৫	১৩০	১৯.৪	১৪.৯২
১৮৫৫	১৭৫	২০.৯	১১.৯৪
১৮৬৭	১৯৪	২২.৬	১১.৬৫
১৮৭১	২২৫	২৩.২	৯.১০
১৮৮১	২৫৭	২৪.৮	৯.৬৫
১৮৯১	২৮২	২৬.৯	৯.৫৪
১৯০১	২৮৫	২৮.৯	১০.১৪
১৯১১	৩০৩	৩১.৬	১০.৪৩
১৯২১	৩০৫	৩৩.৩	১০.৯২
১৯৩১	৩৩৮	৩৫.৬	১০.৫৩
১৯৪১	৩৮৯	৪২.০	১০.৭৯

উৎস : ১. ভারতের জনসংখ্যার জন্য সারণি ১ দ্রষ্টব্য।

২. S G Roy and A Das Gupta, *Population Estimates for Bangladesh, Population Studies*, XXX: 1(1976), 17

সারণি ৪ : আদমশুমারিপূর্ব ও আদমশুমারি ভিত্তিক বাংলার মোট জনসংখ্যার দশকওয়ারী পরিসংখ্যান ও বৃদ্ধির হার

সন	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)	বৃদ্ধির হার%
১৮০১	১৪.৫	
১৮১১	১৫.৫	০.০০৬৭
১৮২১	১৬.৫	০.০০৬৩
১৮৩১	১৭.৭	০.০০৭০
১৮৪১	১৮.৯	০.০০৬৬
১৮৫১	২০.৩	০.০০৭১
১৮৬১	২১.৭	০.০০৬৭
১৮৭১	২৩.২	০.০০৬৭
১৮৮১	২৪.৮	০.০০৬৭
১৮৯১	২৬.৯	০.০০৮১
১৯০১	২৮.৯	০.০০৭২
১৯১১	৩১.৬	০.০০৮৯
১৯২১	৩৩.৩	০.০০৫২
১৯৩১	৩৫.৬	০.০০৬৭
১৯৪১	৪২.০	০.০১৬৫
১৯৫১	৪১.৯	-০.০০২
১৯৬১	৫০.৮	০.০১৯৩
১৯৭৪	৭১.৩	০.০২৬১

উৎস : সারণি ৩-এর সূত্র দ্রষ্টব্য।

সারণি ৫: প্রাকৃতিক বিভাজনভিত্তিক বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে আঞ্চলিক তারতম্যের পরিসংখ্যান : ১৯১১-১৯২১ মেয়াদে

প্রাকৃতিক বিভাগ	শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার তারতম্য ১৯১১-১৯২১	শতকরা হিসাবে জনসংখ্যার তারতম্য ১৮৭২-১৯২১
পশ্চিম বাংলা	-৪.৯	-৫.৯
মধ্যবঙ্গ	+১.৪	+২৭.৮
উত্তরবঙ্গ	+১.৯	+২৫.১
পূর্ববাংলা	+৮.৩	+৭২.৪
বাংলা	+২.৮	+৩৭.২

উৎস : B. Narayan, *Population in India*, (1925), 157.

সারণি ৬ : মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান এবং বাছাইকৃত কয়েক বছরের সুনির্দিষ্ট কারণজনিত মৃত্যুর তুলনামূলক শতকরা হিসাব

সুনির্দিষ্ট কারণ	হাজারপ্রতি মৃত্যুর হার ১৯৫০-১৯৬০	মোট মৃত্যুর শতকরা হার ১৯০১-১৯১১	মোট মৃত্যুর শতকরা হার ১৯৫০-১৯৬০
ওলাওঠা (কলেরা)	০.৫	৭.৪	২.৫
গুটিবসন্ত	০.২	-	১.০
ম্যালেরিয়া	৩.০	৭২.৩	১৪.৮
টাইফয়েড	৩.০	-	১৪.৯
সন্তান প্রসব সংক্রান্ত	২.০	-	৯.৯
যক্ষ্মা	২.৫	-	১২.৪
শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগ	১.০	০.৫	৯.৯
উদরাময় (ডায়রিয়া)	৩.০	২.৫	১৪.৯
অন্যান্য কারণ	৫.০	১৭.৩	২৪.৭
মোট	২০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস : ESCAP, *Population of Bangladesh*, (1981), 59.

সারণি ৭ : ১৮৮১-১৯৭৪ সময়কালে বাংলার জনসংখ্যার জন্ম ও মৃত্যুর স্থূলহারের হিসাব (দশকওয়ারী)

সন	স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)
১৮৮১-১৮৯১	-	৪১.৩
১৮৯১-১৯০১	-	৪৪.৪
১৯০১-১৯১১	৫৩.৮	৪৫.৬
১৯১১-১৯২১	৫২.৯	৪৭.৩
১৯২১-১৯৩১	৫০.৪	৪১.৭
১৯৩১-১৯৪১	৫২.৭	৩৭.৮
১৯৪১-১৯৫১	৪৯.৪	৪০.৭
১৯৫১-১৯৬১	৫১.৩	২৯.৭
১৯৬২-১৯৬৫	৫৫.০	১৮.৫
১৯৬৫-১৯৭৪	৪৮.৩	১৯.৪

উৎস : ESCAP, *Population of Bangladesh*, (1981), 45-65.

সারণি ৮ : জেলাওয়ারী প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ১৯০১-১৯৬১

জেলা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪
দিনাজপুর	৪৪৭	৪৬৭	৪৮৭	৪৯৩	৫৩৪	৫৪১	৬৮৩	৯৮৫
রংপুর	৬৫৫	৭২৫	৭৬১	৭৮৮	৮৭১	৮৬৯	১১৩০	১৪৮৬
বগুড়া	৬০৪	৬৯৫	৭৪০	৭৬৬	৮৬১	৮৭৩	১০৭৩	১৪৭২
রাজশাহী	৫৩৩	৫৬০	৫৬৮	৫৫৮	৬১৬	৬১৮	৭৮৭	১১৬৮
পাবনা	৮৩৭	৮৪২	৮১৮	৮৪৯	১০০১	৯৩৬	১১৫৭	১৪৭৭
কুষ্টিয়া	৬৬৯	৬৩৬	৫৯২	৬১১	৬৯৫	৬৬৮	৮৮২	১৩৭৪
যশোহর	৬৪৮	৬২৮	৬২৪	৬০৯	৬৬৫	৬৫৬	৮৭৭	১২৮৭
খুলনা	৩১১	৩৩৮	৩৬১	৩৯৯	৪৭৭	৫০৯	৬০০	৭৬৮
বাকেরগঞ্জ	৬৯২	৭২৮	৭৯২	৮৯০	১০৬১	১০১৪	১১৮৭	১২৯১
ময়মনসিংহ	৬৩৮	৭৩৬	৭৮৭	৮৩৫	৯৮০	৯৪০	১১৪১	১৫১৩
ঢাকা	৯৮০	১০৯৭	১১৮৭	১২৯২	১৫৮২	১৫২৫	১৯০৯	২৬৪৩
ফরিদপুর	৭৪৬	৮০৭	৮৪৯	৯০৪	১১০৭	১১৪৪	১৩১১	১৫০৭
সিলেট	৪২৯	৪৭৩	৪৮৫	৫২১	৫৯৮	৬৪৬	৭৩৭	৯৯৫
কুমিল্লা	৮৭৪	১০০৪	১১০২	১২৫০	১৫৭৮	১৫৫০	১৭৯৪	২২৪৫
নোয়াখালী	৬৩৩	৭২৯	৮৩০	৯৬৬	১২৫৬	১২৭৬	১৪৬৮	১৫৯১
চট্টগ্রাম	৫৬০	৬২২	৬৬৫	৬৩৯	৮৯০	৯৫৯	১১৩৯	১৯৭১
পা. চট্টগ্রাম	২৫	৩০	৩৪	৪২	৪৯	৫৭	৭৫	১০০
বাংলাদেশ	৫৫৭	৬০৮	৬৪০	৬৮৫	৮০৯	৮০৮	৯৭৯	১২৮৪

উৎস : ESCAP, *Population of Bangladesh*, (1981), 21.

সারণি ৯ : ১৯০১-১৯২১, ১৯২১-১৯৪১ ও ১৯৫১-১৯৭৪ সময়কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার লোকসংখ্যার তারতম্য

জেলা	শতকরা হিসাবে তারতম্য ১৯০১-১৯২১	শতকরা হিসাবে তারতম্য ১৯২১-১৯৪১	শতকরা হিসাবে তারতম্য ১৯৫১-১৯৭৪
রাজশাহী	৯.৮০	১৩.৮৩	৮৫.৫৯
দিনাজপুর	৮.৩৫	৯.৫০	৮৯.৭৮
রংপুর	১৬.০২	১৪.৪৩	৮৬.৭৬
বগুড়া	২২.৪৭	১৬.৪১	৭৪.৫৪
রাজশাহী	৬.৫৮	৮.৪০	৯৩.৫৭
পাবনা	-২.২৯	২২.৪৩	৭৭.৬৫
খুলনা	৬.৩৯	২৫.২৫	৭২.২৬
কুষ্টিয়া	-১১.৫৩	১৭.৪৩	১১৩.০৪
যশোহর	-৩.৭৭	৬.৭৫	১০৩.০৫
খুলনা	১৬.১০	৩২.১০	৭১.৪০
বাকেরগঞ্জ	১৪.৪৪	৩৪.০০	৪৯.০১
ঢাকা	২০.৬৪	২৮.৪২	৬৮.৭৪
ময়মনসিংহ	২৩.৪৬	২৪.৫১	৬৬.৭২
ঢাকা	২১.১৭	৩৩.১৭	৮৬.৮৯
ফরিদপুর	১৩.৭৭	৩০.৩০	৪৬.৩২
চট্টগ্রাম	২১.৫৬	৩৭.০০	৫৮.৯৮
সিলেট	১৩.১৩	২৩.২৪	৫৫.৫৬
কুমিল্লা	২৬.০৪	৪৩.১৯	৫৩.৪৫
নোয়াখালী	৩১.১৪	৫১.২৮	৫৬.১৪
চট্টগ্রাম	১৮.৫১	৩৩.৯৬	৭১.৮০
পা. চট্টগ্রাম	৩৮.৮৫	৪২.৬০	৭৬.৯০
বাংলাদেশ	১৪.৯৫	২৬.০৯	৭০.৪৬

উৎস : ESCAP Country Report, *Population of Bangladesh*, (1981), 16,21

সারণি ১০ : জন্মস্থানগত সংখ্যার ভিত্তিতে ১৮৯১-১৯৩১ সময়কালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যকার জনসংখ্যার সংযোজন/বিয়োজনের হিসাব (হাজারে)

রাজ্য	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	মোট
মহীশূর	৪৪	১৬৮	১৭৪	২০৫	২১১	৮০৭
পাঞ্জাব ও আগ্রা	৮	-	৩৪	৮৪	১৮৭	৩১৩
বাংলা	৪৪১	-	৯৮	১২৬	১৫৫	৮২০
মধ্য প্রদেশ	৫৫০	-	৭৫	৫৪	১৩৫	৮১৪
বিহার ও উড়িষ্যা	-	-	২৩২	১৫৩	১০৫	৪৯০

উৎস : K. Davis, *The Population of India and Pakistan,* 111.

সারণি ১১ : ১৮৮১-১৯২১ সময়কালে বাংলায় আগত বাস্তুত্যাগীদের প্রকৃত সংখ্যা

সময়	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট বহিরাগত (মিলিয়ন
১৮৮১	২১.৬৪	০.২৮
১৮৯১	২৩.৮৪	০.৫২
১৯০১	২৫.৯৩	০.৫৫
১৯১১	২৬.৬৬	০.৭১
১৯২১	৩০.৩৭	০.১৩

উৎস : A. A. Khan, Some Aspects of Peasant Behaviour in Bengal-A New-Classical Analysis (1982), 121.

সারণি ১২ : আসামে বসতিস্থাপনকারী বঙ্গজ বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যাবৃদ্ধির হিসাব, ১৯১১-১৯৩১.

বছর	বাংলায় জন্ম মোট (হাজারে)	ময়মনসিংহ (হাজারে)	আসাম উপত্যকায় গনণাকৃত	ময়মনসিংহে জন্ম ও আসাম উপত্যকায় বসবাসরত বাঙালির শতকরা হিসাব
১৯১১	১৯৪	৩৭	১২০	৩০.৮
১৯২১	১৭৬	১৭২	৩০১	৫৭.১
১৯৩১	৫৭৫	৩১১	৪৯৬	৬২.৭

উৎস : K. Davis, *The Population of India and Pakistan,* (1951), 118.

সারণি ১৩ : আদমশুমারি অনুযায়ী ১৯০১-১৯৬১ সময়কালে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক তুলনামূলক অবস্থান

আদমশুমারির বছর	মুসলমান(%)	হিন্দু(%)	অন্য ধর্মাবলম্বী (%)
১৯০১	৬১.৩৪	৩১.৪৬	৭.২০
১৯১১	৬১.৬৭	৩১.২৯	৭.০৪
১৯২১	৬৪.৪৯	৩১.৪৮	৪.০৩
১৯৩১	৬৮.৩৮	২৮.৮৬	২.৭৬
১৯৪১	৭০.০৪	২৮.০০	১.৯৬
১৯৫১	৭৬.৮৫	২২.০৪	১.১১
১৯৬১	৮০.৪৩	১৮.৪৫	১.১২

উৎস : M. A. Rahim, *An Appraisal of Census Populations of Pakistan from 1901 to 1961* (1969), 25

২০

ভূমি সংস্কার

কামাল সিদ্দিকী*

ভূমি সংস্কারের বিষয়বস্তু

একটি দেশের ভূমি সংস্কার দ্বারা (ক) জমির মালিকানা ও আবাদি জমির একক এবং (খ) জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অংশ সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ধারিত হয়। এ দু'টি উপাদান আবার জমির উৎপাদনক্ষমতা এবং উৎপাদনসংগঠন ও উৎপাদনকৌশলকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। যাহোক, যেখানে কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন সীমিত সেখানে ভূমিই (এবং ফলস্বরূপ শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ) সম্পদের প্রধান উৎস। ফলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ এলাকায় ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণের মাত্রা দ্বারা সম্পদের বণ্টন নির্ধারিত হয়। যেহেতু শ্রম ব্যতীত ভূমি থেকে আয় সম্ভব নয়, তাই ভূমিতে শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্কের ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে সম্পত্তির মালিকানার ধরনের সাথে জড়িত। ভূমিস্বত্ব-সম্পর্ক তাই ক্ষমতা-সম্পর্কের অনুরূপ হয়ে থাকে, যেখানে ক্ষমতা হলো "একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ এবং অন্যান্য মৌলিক উপাদান, যেমন আনুগত্য, রাজনৈতিক দায়িত্ব প্রভৃতিসহ সমাজের সম্পদরাজি সমাবেশ করার সাধারণ সামর্থ্য।[১]

সুতরাং একটি ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা নিম্নোক্ত মানদণ্ডের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় :

ক. বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক কিনা ;

খ. এ ব্যবস্থা উৎপাদনের সাথে যারা প্রকৃতই জড়িত তাদের স্বার্থের অনুকূল কিনা ;

* সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১. T Parsons and N Smelser, *Economy and Society*, (New Delhi 1956), 115

গ. এ ব্যবস্থা ক্ষমতার সমবণ্টন নীতি স্বীকার করে কিনা ;

ঘ. এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে (ধরে নেয়া যাক যে, সংশ্লিষ্ট দেশটি কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নের নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়) পর্যাপ্ত অর্থ যোগানোর নিশ্চয়তা দেয় কিনা যাতে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যেকোন পরিবর্তনকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ভূমি সংস্কার বলা যেতে পারে। কিন্তু ভূমি সংস্কারকে অর্থপূর্ণ করতে হলে একে অবশ্যই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পূরণ করতে হবে। এ বিষয়টির উপর জোর দেয়া প্রয়োজন, কেননা ইদানিং ভূমিসংক্রান্ত সব ধরনের কর্মসূচি ও কার্যাবলীকেই ভূমি সংস্কার হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসবের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরার লক্ষ্যে নিচে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

'ভূমি সংস্কার'-এর উদ্যোগ যেসব ক্ষেত্রে নেয়া হয় সেখানে বাস্তব অবস্থার কারণে অর্থাৎ ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্কের স্বরূপ বিরোধমূলক হওয়ায় ভূমিব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কিন্তু সচরাচর কিছু লোকদেখানো সংস্কার সাধন করা হয় সেখানকার প্রকৃত ভূমিসংস্কার ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশের ভূমি সংস্কার ও পুনঃবন্দোবস্ত কর্মসূচি।

ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি 'সমাজকল্যাণমূলক' কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং সম্পূর্ণভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের ভূমি সংস্কার সমাজে বিদ্যমান অসমতা ও অবিচারের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য পশ্চিমা দাতারাও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য অনুরূপ 'সীমিত' সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ করে থাকে। দাতাদের বিবেচনায় বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর রাষ্ট্রের গোটা কাঠামো ভেঙে পড়বে যদি না ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 'যন্ত্রণার উপশম' হয়। কিছু পরিমাণ ভূমি সংস্কার ব্যতীত খাদ্য উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর এর ফলে এমনকি পি.এল. ৪৮০ বা অন্য ধরনের সাহায্য প্রদানের মাধ্যমেও বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কটজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব না হওয়ার দরুন অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশসমূহে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় একটি কৌশল হিসেবে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধি। সাধারণত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র খামার বড় খামারের তুলনায় অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল এবং এটাই ভূমিবণ্টনের পক্ষে সাধারণ বড় যুক্তি। বহু পেশাদার অর্থনীতিবিদও এ ধরনের যুক্তি সমর্থন করে থাকেন। তৃতীয় বিশ্বের শিল্পপতিদের কেউ কেউ ভূমি সংস্কারকে কৃষিউৎপাদনে অধিকতর

সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন এবং ধরে নেয়া হয় যে, কৃষি ও অন্যান্য খাতে খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য এর ফলে হ্রাস পাবে, যা তাদের মুনাফা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে। তারা কোনক্রমেই ভূমি সংস্কারকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসম সম্পর্ক ও অবস্থা দূরীকরণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন না।

ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

যে ভূমিব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে জমির পুনর্বণ্টন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের জন্য যে শুধু জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, এর ফলে তাদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তিও তৈরি হয়ে থাকে। কেননা এর ফলে তারা জমি লাভ করে ও সম্পদ অর্জন করে এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য হ্রাস পায়, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঐক্য যৌথখামার চালু, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং আদর্শ উৎপাদন ইউনিট গঠন ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়, যা সংস্কারপূর্ব কৃষিকাঠামোতে অর্জন করা সম্ভবপর নয়। এই স্বল্পমেয়াদি সহযোগিতার পরিবেশকে স্বেচ্ছাক্রিয় শ্রমঘন কাজের মাধ্যমে অবকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন :

ক. চাষাবাদে, বিশেষকরে ফসলের মওসুমে, কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং শ্রমবিনিময় ;

খ. সংযোগ-রাস্তা, সেচ-খাল, জলাধার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপযোগী অবকাঠামো বিনির্মাণ ;

গ. মাছের চাষ, জলসেচ এবং নৌচলাচলের জন্য মজাপুকুর, মরানদী ও খাল পুনঃখনন ;

ঘ. সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড।

যেসব দেশ ঔপনিবেশিক, নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে মূলধন সংস্থান করতে অক্ষম হয়েছে, কিন্তু অধিকতর উৎপাদন এবং 'স্বনির্ভরতা' অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য ও বেসরকারি বিদেশী বিনিয়োগের উপর ন্যূনতম নির্ভরতা এবং শুধুমাত্র সমশর্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সৃষ্টি করতে আগ্রহী, সেসব দেশের জন্য এই কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের খাজনা এবং রাজস্ব হ্রাস করা হলে তারা অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন ভাগচাষ ব্যবসাতে মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশ ভূমিমালিকেরা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উৎপাদনব্যয় ভাগাভাগি করা হয় না।

গ. এ ব্যবস্থা ক্ষমতার সমবন্টন নীতি স্বীকার করে কিনা ;

ঘ. এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে (ধরে নেয়া যাক যে, সংশ্লিষ্ট দেশটি কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নের নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়) পর্যাপ্ত অর্থ যোগানোর নিশ্চয়তা দেয় কিনা যাতে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যেকোন পরিবর্তনকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ভূমি সংস্কার বলা যেতে পারে। কিন্তু ভূমি সংস্কারকে অর্থপূর্ণ করতে হলে একে অবশ্যই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পূরণ করতে হবে। এ বিষয়টির উপর জোর দেয়া প্রয়োজন, কেননা ইদানিং ভূমিসংক্রান্ত সব ধরনের কর্মসূচি ও কার্যাবলীকেই ভূমি সংস্কার হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসবের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরার লক্ষ্যে নিচে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

'ভূমি সংস্কার'-এর উদ্যোগ যেসব ক্ষেত্রে নেয়া হয় সেখানে বাস্তব অবস্থার কারণে অর্থাৎ ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্কের স্বরূপ বিরোধমূলক হওয়ায় ভূমিব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কিন্তু সচরাচর কিছু লোকদেখানো সংস্কার সাধন করা হয় সেখানকার প্রকৃত ভূমিসংস্কার ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশের ভূমি সংস্কার ও পুনঃবন্দোবস্ত কর্মসূচি।

ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি 'সমাজকল্যাণমূলক' কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং সম্পূর্ণভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরনের ভূমি সংস্কার সমাজে বিদ্যমান অসমতা ও অবিচারের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য পশ্চিমা দাতারাও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য অনুরূপ 'সীমিত' সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ করে থাকে। দাতাদের বিবেচনায় বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর রাষ্ট্রের গোটা কাঠামো ভেঙে পড়বে যদি না ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 'যন্ত্রণার উপশম' হয়। কিছু পরিমাণ ভূমি সংস্কার ব্যতীত খাদ্য উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। আর এর ফলে এমনকি পি.এল. ৪৮০ বা অন্য ধরনের সাহায্য প্রদানের মাধ্যমেও বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কটজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব না হওয়ার দরুন অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশসমূহে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। ভূমি সংস্কারকে দেখা হয় একটি কৌশল হিসেবে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধি। সাধারণত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র খামার বড় খামারের তুলনায় অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল এবং এটাই ভূমিবন্টনের পক্ষে সাধারণ বড় যুক্তি। বহু পেশাদার অর্থনীতিবিদও এ ধরনের যুক্তি সমর্থন করে থাকেন। তৃতীয় বিশ্বের শিল্পপতিদের কেউ কেউ ভূমি সংস্কারকে কৃষিউৎপাদনে অধিকতর

সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন এবং ধরে নেয়া হয় যে, কৃষি ও অন্যান্য খাতে খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য এর ফলে হ্রাস পাবে, যা তাদের মুনাফা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে। তারা কোনক্রমেই ভূমি সংস্কারকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসম সম্পর্ক ও অবস্থা দূরীকরণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন না।

ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

যে ভূমিব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে জমির পুনর্বণ্টন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের জন্য যে শুধু জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, এর ফলে তাদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তিও তৈরি হয়ে থাকে। কেননা এর ফলে তারা জমি লাভ করে ও সম্পদ অর্জন করে এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য হ্রাস পায়, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঐক্য যৌথখামার চালু, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং আদর্শ উৎপাদন ইউনিট গঠন ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়, যা সংস্কারপূর্ব কৃষিকাঠামোতে অর্জন করা সম্ভবপর নয়। এই স্বল্পমেয়াদি সহযোগিতার পরিবেশকে স্বেচ্ছাক্রিয় শ্রমঘন কাজের মাধ্যমে অবকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন :

ক. চাষাবাদে, বিশেষকরে ফসলের মওসুমে, কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং শ্রমবিনিময় ;

খ. সংযোগ-রাস্তা, সেচ-খাল, জলাধার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপযোগী অবকাঠামো বিনির্মাণ ;

গ. মাছের চাষ, জলসেচ এবং নৌচলাচলের জন্য মজাপুকুর, মরানদী ও খাল পুনঃখনন ;

ঘ. সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড।

যেসব দেশ ঔপনিবেশিক, নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে মূলধন সংস্থান করতে অক্ষম হয়েছে, কিন্তু অধিকতর উৎপাদন এবং 'স্বনির্ভরতা' অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য ও বেসরকারি বিদেশী বিনিয়োগের উপর ন্যূনতম নির্ভরতা এবং শুধুমাত্র সমশর্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সৃষ্টি করতে আগ্রহী, সেসব দেশের জন্য এই কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের খাজনা এবং রাজস্ব হ্রাস করা হলে তারা অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন ভাগচাষ ব্যবসাতে মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশ ভূমিমালিকেরা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উৎপাদনব্যয় ভাগাভাগি করা হয় না।

ফলে দেখা যায়, একজন ভাগচাষী আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ভূমিমালিকের চেয়ে কম উৎসাহী হয়, কেননা যদিও উপকরণের অধিকতর ব্যবহার করে সে যে বাড়তি উৎপাদন করবে তার অংশ মালিককে দিতে হবে, উৎপাদনব্যয়ের বর্ধিত অংশটুকু তাকে একাই বহন করতে হবে। তবু যদি ভোগ্যদ্রব্যের অভাবের চাপে এবং জমি থেকে উৎখাত হওয়ার ভয়ে সে উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়, তাহলে সেই বর্ধিত উৎপাদন হবে তার অতিরিক্ত নিজস্ব শ্রম বিনিয়োগের ফসল। অনুরূপভাবে, যখন খাজনা ফসলের বদলে টাকায় দেয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং খাজনা ও রাজস্ব প্রদানের সময় এবং এদের কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকতর নমনীয়তার সুযোগ থাকে, তখন এবং সেক্ষেত্রে অত্যধিক খাজনা আদায় এবং আদায়কারীর স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায় এবং একই কারণে অধিকতর উৎপাদন ও বিনিয়োগে কৃষকদের উৎসাহ ও উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়।

কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগীর খাজনা আদায় ব্যবস্থার অবসান হলে জমির প্রকৃত মালিকরা চাষাবাদের ঝুঁকি এবং দায়িত্ব নিতে উদ্যোগী হয়। এর ফলে ব্যক্তির স্থলে সমষ্টির হাতে কৃষি-উদ্বৃত্ত জমা হয় এবং সেই সাথে এর সামাজিক ব্যবহারের পরিধিও বেড়ে যায়। ভূমির উপর প্রকৃত চাষীদের স্থায়ী স্বত্বাধিকার তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে কৃষিউৎপাদন ও বিনিয়োগবৃদ্ধির সহায়ক হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি ভূমিখণ্ডের একত্রীকরণ এবং কৃষিসমবায় গঠন করা হলে ফসল কাটার যন্ত্র, ট্রাক্টর, বিদ্যুৎচালিত পাম্প, সেচের জল, কীটনাশক যন্ত্র এসব উন্নততর উৎপাদন-উপকরণের ব্যবহারের ফলে অধিকতর উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বর্তমানে পাম্প মেশিনের দ্বারা কম জমিতে জলসেচের কারণ হলো জমির খণ্ডিত অবস্থান। জমি একত্রীকরণের অর্থ হচ্ছে, সীমানানির্দেশক সনাতন আলব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমে জমি পুনরুদ্ধার এবং যেসব দেশে ভূমি-ব্যক্তি অনুপাত প্রতিকূল, সেসব দেশের জন্য এরকম ব্যবস্থা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে, জমির বিক্ষিপ্ত অবস্থান চাষাবাদে অদক্ষতা ও অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে উৎপাদনব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ভূমি পুনর্বণ্টন ও খাজনা হ্রাস অধিকতর উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ বাড়াতে পারে যদি সংস্কারপূর্ব ভূমিকাঠামোর সাথে যুক্ত ভূস্বামীরা অপচয়জনিত ভোগ, ফটকা ব্যবসা, চড়া সুদের কারবার এবং জমিক্রয়ের মতো উৎপাদনবিরোধী কর্মকাণ্ড সামাজিকভাবে পরিত্যাগ করে।

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে ভূমি হচ্ছে উৎপাদনের প্রধান উপাদান। তা ছাড়া ভূমি সামাজিক মর্যাদারও উৎস। ফলত ভূমিবণ্টন এবং ভূমিস্বত্বের সংস্কার সমাজে

বিদ্যমান রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণ এবং আদর্শগত আধিপত্য এবং চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তনে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে। এর অর্থ হলো, পরিবর্তিত রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় নতুন নীতিমালা গ্রহণ করবে এবং নতুন কাঠামো গড়ে তুলবে। যেহেতু সংস্কারোত্তর সমাজের প্রবল শ্রেণীগুলি হবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং যেহেতু এরা পূর্বতন প্রবল শ্রেণীগুলির তুলনায় অধিকতর উৎপাদনক্ষম, সেহেতু এসব নীতি ও প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি করবে এবং একই সাথে সামাজিক উৎপাদনে অধিকতর সমতাপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করবে।

ভূমি সংস্কারের প্রক্রিয়া

ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত পদক্ষেপসমূহ হলো (ক) ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এবং পরে রাজনৈতিক দল কর্তৃক ভূমি সংস্কার নীতি ঘোষণা, (খ) সংসদীয় আইন, অর্ডিন্যান্স, রেগুলেশন্স ইত্যাদি আকারে অধিকতর সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং (গ) ভূমি সংস্কার কার্যকর করার জন্য এর বাস্তবায়নকাল, বাস্তবায়নকৌশল, বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত নীতিকাঠামো সুনির্দিষ্টকরণ।

এমন ক্ষেত্রে একদিকে ভূমি সংস্কারের মতাদর্শ এবং অন্যদিকে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করা প্রয়োজন।[২] কেননা এমনও হতে পারে, যখন ভূমি সংস্কারের মতাদর্শ হয় বাহ্যত ভূস্বামীবিরোধী ও কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল, তখন ভূমি সংস্কার কর্মসূচি হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপরীতে ধনী কৃষক এমনকি ভূস্বামীদের স্বার্থের পক্ষে। মিরডালের ভাষায়, "ভূমিতে ভূস্বামীদের স্বত্বাধিকার বা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা—এ দুই অবস্থার যে-কোনটির চেয়ে খারাপ হচ্ছে সেটি, যেখানে কৃষকদের হাতে জমি দেয়ার মতো বৈপ্লবিক কর্মসূচি রয়েছে কিন্তু সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের আইনগত দিক খুবই দুর্বল ও অকার্যকর। কেননা, এরকম পরিস্থিতিতে ভূমিমালিকানার রূপ সম্বন্ধে সৃষ্টি হয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।"[৩] মিরডাল যা বলেন নি, অথচ বাস্তবে যা ঘটে, তা হচ্ছে, এমনি পরিস্থিতিতে কৃষকদের জন্য ভূস্বামীদের চেয়ে অধিকতর না হলেও তাদের মতোই এক অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

---

২. P C Joshi, *Land Reform and Agrarian Change in India and Pakistan Since 1947*, (Delhi 1970), 11-12.

৩. G. Myrdal, Address to the Second Plenary Meeting, *Report of World Land Reform* , (1966), 66

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার ভূমিব্যবস্থা এবং পরবর্তী সংস্কার

বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরতে হলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার কৃষিকাঠামো কিরকম ছিল সর্বাগ্রে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে তাত্ত্বিকভাবে জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে অর্পিত থাকলেও জমির প্রকৃত দখলিস্বত্ব ছিল সাধারণ চাষীদের হাতে।[৪] বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বৃটিশ সরকার ১৭৯৩ সালে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। এই নতুন ব্যবস্থাধীনে ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভূমি ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর এবং ইচ্ছামতো ইজারা দেবার অধিকারসহ ভূমির মালিকানা জমিদারদের হাতে অর্পণ করা হয়। কৃষকরা তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে বৃটিশ কর্তৃক সৃষ্ট জমিদারদের অধীনস্থ প্রজায় পরিণত হয়। এই কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্বের নয়-দশমাংশ জমিদারদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিতে হতো। কিন্তু রাষ্ট্রকে তারা একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারের পরিবর্তে একটি স্থির অঙ্কের অর্থ প্রদান করতো, যার ফলে ভবিষ্যতে জমিদারির মূল্য যাই হোক না কেন (মূল্যবৃদ্ধি ছিল অবধারিত, কেননা জমিদারির সাথে বিরাট বন এবং চাষাবাদযোগ্য বিস্তৃত পতিত জমিও জমিদারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল), জমিদাররা স্থায়ীভাবে ধার্যকৃত অঙ্কের অর্থ প্রদান করার শর্তে বংশ পরম্পরায় তাদের জমিদারি ভোগ করতে পারতো। প্রজাদের উপর নিপীড়ন করার ব্যাপক ক্ষমতাও জমিদারদের ছিল।[৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পিছনে বৃটিশদের দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। রাজনৈতিকভাবে বৃটিশ শাসন ছিল এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নিপতিত এবং তাদের প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক মিত্রের। এই রাজস্ব আদায়কারী শ্রেণীকে কোম্পানি একটি স্থানীয় শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিল, যারা স্থায়ীভাবে ভারতে বৃটিশ স্বার্থের সাথে সংযুক্ত থাকবে। অর্থনৈতিকভাবে প্রথমদিককার বৃটিশ শাসন (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। ফলে তাদের প্রয়োজন ছিল এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করা, যারা বর্ষশেষে বৃটিশদের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করে যাবে।[৬] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৃটিশরা জমিদারি ব্যবস্থা (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) সমগ্র ভারতব্যাপী প্রবর্তন করে নি। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধা এবং স্থানীয় অবস্থাই তাদের প্রধান বিবেচ্য

৪. R Mukherjee, *Land Problem in India,* (Calcutta 1933), 16.

৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal. A Study of its Operation, 1790-1819,* (Dhaka 1978)

৬. Bipan Chandra, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India,* (New Delhi 1966), 456 66

ছিল। যেমন, দক্ষিণ ভারতে তারা 'রায়তওয়ারি' ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যে ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির পরিবর্তে জমির বন্দোবস্ত সরকারি রাজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা চাষীদের দেয়া হয়। অন্যদিকে, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক অঞ্চলে 'মহলওয়ারি' ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এর অর্থ হলো জমির বন্দোবস্ত গ্রামের ব্যক্তি-চাষীদের মধ্যে না দিয়ে সমগ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়কে দেয়া। এ ব্যবস্থায় গ্রামীণ সম্প্রদায়কে সমষ্টিগতভাবে (মোড়লের মাধ্যমে) জমির রাজস্ব প্রদান করতে হতো। এ ধরনের ব্যবস্থা মূলত যেসব এলাকায় গ্রামসংগঠন বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল এবং যেখানে জমির সম্প্রদায়গত মালিকানার দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল, সেসব এলাকায় প্রবর্তন করা হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণভাবে বাংলার অর্থনীতি এবং বিশেষকরে বাঙালি কৃষকশ্রেণীর জন্য একটি ভয়ানক ক্ষতিকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা সৃষ্ট কৃষিকাঠামোর বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায় :

ক. ফসলের অবস্থা নির্বিশেষে অত্যধিক খাজনা আরোপ (যেমন আবওয়াব, অবৈধভাবে খাজনা আদায়, ঘন ঘন কৃষকদের দেয় খাজনা বৃদ্ধি ইত্যাদি) এবং তা আদায়ে জবরদস্তিমূলক পন্থা অবলম্বন;

খ. চরম অসম ভূমিমালিকানা ব্যবস্থা;

গ. উৎপাদন ও বিনিয়োগের ঝুঁকি ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত অনুপস্থিত ভূস্বামী-ব্যবস্থা ;

ঘ. জমিদার এবং প্রকৃত চাষীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর অবস্থান :

ঙ. নিরাপত্তাহীন প্রজাস্বত্ব (অর্থাৎ দখলহীন রায়ত, নিম্ন-রায়ত এবং বর্গাদার);

চ. চাষীদের উপর অর্থনীতির নিয়মবহির্ভূত চাপ;

ছ. চরম সুদখোর মহাজন এবং ব্যবসায়ীদের হাতে কৃষকদের অতি সহজে শোষিত হওয়ার অবস্থা বিরাজ করা।[৭]

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বণ্টনের উপর এধরনের একটি কৃষিকাঠামোর অনিষ্টকর প্রভাব সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই।[৮] অধিকন্তু, সম্পত্তি সম্পর্কিত এই নতুন আইনের সমগুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিকও ছিল। জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমিদার শ্রেণী তাদের অনর্জিত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে দেশের মধ্যে বৃটিশ শাসন সুদৃঢ়করণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থা আবার অন্যদিকে অসম বাণিজ্য, ভারতে বিনিয়োগকৃত বৃটিশ পুঁজির মুনাফা পাচার, লন্ডনে ভারতসচিবের অফিস পরিচালনার জন্য

---

৭. কামাল সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, (ঢাকা ১৯৮১), ২২-২৩।

৮. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure*, (Calcutta 1988).

ব্যয়িতব্য অর্থের যোগান এবং ভারতে নিযুক্ত বৃটিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, আয় ও সঞ্চয় থেকে কর্তন ইত্যাদি উপায়ে বৃটিশ কর্তৃক ভারতে অব্যাহত লুণ্ঠনের প্রকৃত ভিত্তি তৈরি করে।[৯] বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলায় কৃষকসম্পর্কের মাঝে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়, যার ফলে অনেক আন্দোলন দেখা দিতে থাকে এবং এসব আন্দোলন ক্রমান্বয়ে অধিকতর সংগঠিত জঙ্গি রূপ লাভ করে। এ ধরনের আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, উনিশ শতকের প্রথমভাগের ওহাবী এবং ফরায়জী আন্দোলন ১৮৫০ দশকের নীল বিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৩ সালের পাবনা এবং বগুড়া বিদ্রোহ প্রভৃতি। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় বক্তব্যের প্রাধান্য থাকলেও এসব আন্দোলন ছিল মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরূপ প্রভাব, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে (যা কার্যত বৃটিশবিরোধীও) কৃষক-অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পরবর্তীকালে ভূমি সম্পর্কিত যে কতিপয় আইন পাশ করা হয়েছিল সেগুলো ছিল প্রধানত ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ শান্ত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।[১০]

১৭৯৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা এবং ন্যায্য খাজনা এই দ্বিবিধ বিষয় নিশ্চিত করার ব্যাপারে ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।[১১] কিন্তু জমিদার শ্রেণীর চাপের মুখে এসব পদক্ষেপ প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং কদাচিৎ কৃষক শ্রেণীর উপকারে আসে। ১৯৩৮ সালে ফজলুল হক সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি ভূমিরাজস্ব কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন ১৯৪০ সালে পেশকৃত এর রিপোর্টে ক্ষতিপূরণসহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থের বিলোপ এবং বিদ্যমান ভাগচাষ ব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশ করে। কিন্তু পরবর্তী সাত বছর বিভিন্ন কারণে, যেমন, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে জটিল ও তিক্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এবং এধরনের অন্যান্য ঘটনার জন্য এ রিপোর্ট কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

এদিকে ১৯৪৬-৪৭ সালের 'তেভাগা আন্দোলনের' পটভূমিতে বঙ্গীয় সরকার 'বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৪৭' নামে একটি বিল উত্থাপন করে, যা ফসলের উপর

৯. Bipan Chandra. *Economic Nationalism in India*

১০. সুপ্রকাশ রায়. *ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*. (কলকাতা ১৯৭২)।

১১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, *Rent and Raiyat: Society and Economy of Eastern Bengal, 1859-1928*, (Dhaka 1989)

ভাগচাষীর অর্ধেকের পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ এবং আরো অধিক সুবিধাজনক প্রজাস্বত্ব অনুমোদন করে। কিন্তু আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে এ উদ্যোগও শেষ পর্যন্ত অকার্যকর থেকে যায়।[১২]

বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক পটভূমি

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের কাছে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে সরকারের পক্ষে কোন সংস্কার সাধন করাও সম্ভব হয় নি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। যদিও ১৯৬২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়, তবুও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত স্বৈরাচারী কায়দায় পূর্ব বাংলা শাসিত হতে থাকে। অভ্যুত্থানের পর দেশে আবার সামরিক আইন জারি হয় এবং এর পরে সংঘটিত হয় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

উল্লেখযোগ্য ভূমি সংস্কার : ১৯৪৭-উত্তরকালে

১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশে অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কার আইন প্রণীত হয়। এগুলি হচ্ছে—

ক. পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল এবং প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০;

খ. ১৯৭২ সালে ঘোষিত রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ভূমি সংস্কার আদেশ;

গ. বাংলাদেশ ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪।

পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল এবং প্রজাস্বত্ব আইনের পশ্চাতে দু'টি আশু বিবেচ্য দিক ছিল : (১) এ পর্যন্ত ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন সম্ভবপর না হওয়া এবং ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় উপস্থাপিত জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব বিল এবং বর্গাদার বিল শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত না হওয়া; (২) পাকিস্তান সৃষ্টির পর জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ভূমি সংস্কারের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। তাই ভূমি সংস্কারের পক্ষে কিছু

S. K. Sen, *Agrarian Struggle in Bengal* (1946-47), (New Delhi 1942); D. N. Dhanagare, "Peasant Protest and Politics, The Tebhaga Movement in Bengal (1946-47)", *Journal of Peasant Studies*, London, 3.3, (April 1976), 360-78.

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে, ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলা সরকার আইনসভায় 'পূর্ব বাংলা জমিদারি দখল এবং প্রজাস্বত্ব বিল' উপস্থাপন করেন। ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা এবং সংশোধনীর পর পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এ আইনের প্রধান শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

ক. রাষ্ট্র কর্তৃক জমিতে সব ধরনের খাজনা আদায়কারী স্বার্থের বিলোপ করা হবে, যাতে জমির প্রকৃত চাষীরা সরকারের প্রত্যক্ষ প্রজায় পরিণত হয়। সকল রায়তকে (এখন থেকে 'মালিক' নামে আখ্যাত) তাদের পছন্দ মতো জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে জমির উপর উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হবে।[১৩]

খ. ভবিষ্যতে জমি ভাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। তবে ভাগচাষকে ভাড়া হিসেবে বিবেচনা না করে মজুরি-শ্রমের মাধ্যমে চাষের সমতুল্য গণ্য করা হবে। অন্যকথায়, উল্লিখিত 'বর্গাদার বিলে'র মাধ্যমে ভাগচাষীদের যে রকম সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এ আইন ঠিক তদ্রূপ সুবিধাই প্রদান করবে।

গ. পরিবারপ্রতি ৩৩.৩ একরের অধিক চাষযোগ্য জমি দখল রোধ করা হবে। কিন্তু বৃক্ষ রোপণ, বাগান, ফলচাষ, শক্তিচালিত বৃহৎ খামার এবং বৃহদাকারের দুগ্ধখামারের ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ সীমা শিথিল করা হবে। অধিকৃত অতিরিক্ত জমি তিন একরের কম জমির মালিক প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

ঘ. মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (ওয়াকফুল লিল্লাহ ও ওয়াকফুল আওলাদ) এবং হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে খাজনা গ্রহণকারী সম্পত্তিকে সরকারি অধিগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য রক্ষিত ধর্মীয় সম্পত্তির (ওয়াকফুল আওলাদ) ক্ষেত্রে ১২৫ একর পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করা হবে না, তবে যেখানে এরকম সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণে (অর্থাৎ 'ওয়াকফুল লিল্লাহ') ব্যবহৃত হয়, সেখানে কোন সর্বোচ্চ সীমা থাকবে না।

ঙ. খাজনা আদায়কারী স্বার্থ অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক পর্যায়ক্রমিকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি থেকে অর্জিত বার্ষিক প্রকৃত আয়ের সমতুল্য অর্থ স্থায়ীভাবে প্রতি বছর প্রদানের নীতি গৃহীত হবে। কিন্তু ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্টকৃত ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার অন্যান্য সাধারণ সম্পত্তির মতো হবে।

চ. রাষ্ট্র কর্তৃক 'অতিরিক্ত' জমি অধিগ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে ঐ জমি থেকে অর্জিত বাৎসরিক প্রকৃত আয়ের ৫ গুণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান থাকবে। পূর্বের মতো সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রকৃত লাভের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্থায়ীভাবে প্রতি বছর প্রদান করার নিয়ম থাকবে। অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার সাধারণ সম্পত্তির মতো হবে।

---

১৩ Government of East Pakistan, *Report of the Land Revenue Commission*, (Dhaka 1959).

ছ. ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় অথবা ঋণপত্রে অথবা উভয় উপায়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকবে। ঋণপত্র হবে অ-হস্তান্তরযোগ্য এবং সর্বোচ্চ চল্লিশটি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এবং এর জন্য শতকরা ৩ ভাগ হারে সুদ আদায় করা হবে।

জ. জমির সর্বোচ্চ খাজনা বাৎসরিক মোট উৎপাদনের এক দশমাংশের অধিক হবে না। উৎপাদনের পরিমাণ নির্বিশেষে বাৎসরিক ফসল-খাজনা যা ময়মনসিংহে প্রচলিত এবং 'টংক' নামে খ্যাত, তা বাতিল হবে। কার্যত এর অর্থ হলো, ফসল-খাজনার পরিমাণ উৎপাদনেব অর্ধেকের বেশি হবে না।

ঝ. 'মজুরিবিহীন শ্রম' ব্যবস্থা, যা সিলেটে 'নানকার' নামে পরিচিত, তা বিলোপ করা হবে। এ ব্যবস্থাধীনে জমিদারদের জমি ব্যবহার করার বিনিময়ে নানকারদের জমিদারকে বেগার শ্রম প্রদান করতে হতো।

ঞ. গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ লোক যারা গ্রামের তিন-চতুর্থাংশ আবাদি জমির মালিক, তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক গ্রামের সমস্ত জোত একত্রীকরণের বিধান করা হবে।

ট. কোন জোতকে এমনভাবে খণ্ডিত করা যাবে না, যার কোন অংশেরই খাজনা এক টাকার কম।

ঠ. জমির হস্তান্তর শুধুমাত্র প্রকৃত কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়। এ সময় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বেশি এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনী জনসভা এবং দলীয় মেনিফেস্টোতে আওয়ামী লীগ জনগণের সম্মুখে অনেক উদার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। সুতরাং নতুন সরকার ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির কতিপয় আদেশ ঘোষণা করে। এসবের মাধ্যমে পরিবারপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা পুনরায় ১ শত বিঘায় (৩৩.৩ একর) নামিয়ে আনা, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন, ২৫ বিঘা (৮.৩ একর) পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, নতুন জেগে উঠা চরের দখল লাভের ক্ষেত্রে কৃষকদের দেয়া পূর্বের কতিপয় অধিকার সরকারের হাতে ফিরিয়ে নেয়া, 'সায়ের মহলের' সরকারি খাস জমির (যেমন হাট-বাজার, জলাশয়, ফেরিঘাট, ছোট ছোট খনি ইত্যাদি) 'ইজারাদারি' বিলোপ এবং শোষণমূলক শর্তে কৃষিজমি বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ করা হবে বলে স্থির হয়।

বাংলাদেশ ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর আওতায় ১৯৮৪ সালে তৃতীয় দফা ভূমি সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এরশাদ সরকারের ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরে ১৯৮২ সালে প্রথম ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের দু'টি আশু বাধ্যবাধকতা ছিল : (১) একটি নির্বাচিত বৈধ সরকারকে উচ্ছেদ করে জারিকৃত সামরিক শাসনকে বৈধতার প্রলেপ দান এবং (২) দাতাদের পক্ষ থেকে অন্তত ন্যূনতম ভূমি সংস্কারের জন্য অব্যাহত চাপ।

ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণীত এই অধ্যাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক. পরিবারপ্রতি বিদ্যমান জমির সর্বোচ্চ সীমা কমানো হবে না। তবে যেসব পরিবারের ৬০ বিঘা (২০ একর) পর্যন্ত জমি রয়েছে তারা আর নতুন জমির মালিক হতে পারবে না।

খ. জমির উপর ভাগচাষীর স্বত্বাধিকার স্বীকৃত হয়। ভাগচাষী জমির মালিকের সাথে ৫ বৎসর মেয়াদি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হারে বর্গাদার ও জমির মালিক লাভ করবে, বাকি এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনের ব্যয়ভার বহনের আনুপাতিক হারে বর্গাদার ও মালিকের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

গ. 'বেনামী' মালিকানাকে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

ঘ. কৃষিশ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৩.৫ কিলোগ্রাম চাউল অথবা এর সমমূল্যের নগদ অর্থ স্থির হয়।

ঙ. কাউকে তার বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়।

চ একমাত্র ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে খাসজমি বণ্টনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।[১৪]

'৪৭-উত্তর ভূমি সংস্কার আইনসমূহের প্রভাব

'৪৭-উত্তর ভূমি সংস্কার আইনগুলি যদি আদৌ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে, তবে দুর্ভাগ্যবশত তা হয়েছে আংশিকভাবে। প্রতিবারই দেখা গেছে বাস্তব অবস্থার প্রকৃত প্রয়োজন এবং প্রণীত ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান। মূল আইনেও অনেক দুর্বল দিক ছিল, যেমন প্রথমত ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে নতুন করে 'পরিবার'কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। দ্বিতীয়ত পরবর্তীকালের সংশোধনীর মাধ্যমে আইনের কোন কোন ধারাকে গুরুত্বহীন এমনকি সম্পূর্ণ উল্টো করে দেয়া হয়। এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো ১৯৬১ সালে পরিবারপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা থেকে ৩৭৫ বিঘায় উন্নীতকরণ। শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন কর্মকৌশল ও কাঠামোর অভাবে সমাজের একেবারে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রণীত ভূমি সংস্কার আইন খুব কমই বাস্তবায়িত হয়েছে।

সুতরাং, প্রকৃত অর্থে ভূমি সংস্কার আইনসমূহের দ্বারা কেবল নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে —

ক. জমিদারি ব্যবস্থা এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থের বিলোপ সাধন;

খ. খুবই সামান্য পরিমাণ খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন;

১৪. Kamal Siddiqui, *Land Reforms and Land Management in Bangladesh and West Bengal A Comparative Study*, (Dhaka 1988)

গ. অধিক সংখ্যক কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিত করে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং একটি স্বতন্ত্র ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন।

'৪৭-উত্তর বিভিন্ন ভূমি সংস্কার কর্মসূচির ফলাফল

ক. ব্যক্তি জমিদারদের স্থলে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে এক বিশেষ ধরনের জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সাধারণভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় ব্যাপক অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং দৈনন্দিন ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমি-কর্মকর্তাদের দ্বারা সাধারণ জনগণকে হয়রানি। অধিকন্তু, জমিদারি ব্যবস্থা চালু থাকাকালীন সময়ে অত্যাচারী জমিদাররাও সাধারণ কৃষকদের প্রতি যে রকম ব্যক্তিগত আগ্রহ ও দায়িত্বের পরিচয় দিত তা থেকেও এসব কৃষক বঞ্চিত হয়।

খ. ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপসমূহ গ্রামাঞ্চলের ক্রমাবনতিশীল ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্ক রোধ করতে ব্যর্থ হয় যার ফলে দেখা দেয় ব্যাপক ভূমিহীনতা (যেখানে ভূমিই উৎপাদনের প্রধান উপায় সেখানে গ্রামের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ লোকই ভূমিহীন হয়), বর্গাচাষী ও মজুরি-শ্রমিকের দরকষাকষির ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতাহীনতা, চরম সুদখোর মহাজন, ফটকা ব্যবসায়ী এবং সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি এবং মাথাপিছু উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তির শ্লথ প্রবৃদ্ধি।

গ. ভূমির উপর একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগে গ্রামের ধনিক শ্রেণী মজুরিশ্রমিক, বর্গাচাষী, প্রান্তিক চাষী এবং ঋণগ্রস্তদের তাদের উপর আরো নির্ভরশীল করে তোলে। এই অবস্থা আবার ধনিক শ্রেণীকে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে গ্রাম এলাকায় সহজেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

সংক্ষেপে, ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও ভূমি-ব্যক্তি সম্পর্কের প্রধান দ্বন্দ্ব সেই অবস্থায়ই রয়ে গেছে, যেমনটি ছিল ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার পর। অর্থাৎ, যারা প্রকৃতই কৃষিউৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, তারা সাধারণভাবে মালিকানা ও জমির উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং যারা জমির মালিক এবং ভূমিনিয়ন্ত্রণক্ষমতা চর্চা করে থাকে, তারা উৎপাদনের ঝুঁকি এবং দায়িত্ব থেকে দূরে অবস্থান নেয়। অবশ্যই এ সমস্যার একটি বৈজ্ঞানিক সমাধান ছাড়া বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদন এবং বণ্টন সমতার দ্বৈত সমস্যা নিরসন সম্ভব নয়।

২১

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি

রেহমান সোবহান*

পরিধি

এ অধ্যায়ে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সে সময় পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পাকিস্তানের নাগরিক ছিল। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, বাঙালি জাতীয় চেতনার বিকাশের ইতিহাস পূর্ববর্তী আরো কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি বাঙালিদের চেতনায় সংক্রমিত হতে শুরু করে। এ চেতনার প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটে পাকিস্তানের জন্য বাঙালি মুসলমানদের সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ব বাংলার জনমন থেকে আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি দূর করতে পাকিস্তান সরকার ব্যর্থ হয় এবং এ ব্যর্থতা ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোকে জোরদার করে তোলে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সহায়তা করে। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিভিন্ন দিক। কাজেই এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রাক-১৯৪৭ কালপর্ব সম্পর্কে মাত্র ভাসাভাসাভাবেই আলোচনা করা হবে।

এ কথা বলা যায় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রাম এ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয় যে, বাঙালিদেরকে নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা না দেয়াতেই অঞ্চলটি আপেক্ষিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাঙালিদের ক্ষমতার হিস্যা

* ফেলো, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

পাওয়ার এবং পূর্ব বাংলা অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন লাভের লড়াইকে ঘিরে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে পাকিস্তানে যে একটি সম্মিলিত জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠে নি তার কারণ ছিল বাঙালিদেরকে ক্ষমতার অংশ প্রদান কিংবা স্বায়ত্তশাসন দানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর অস্বীকৃতি। ক্ষমতা বহুল পরিমাণে পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে দেয়ার এ বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বিলিবণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে ন্যস্ত থাকার ফলে। পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতার এ বাস্তবতা এবং ক্ষমতার চাবিকাঠি হাতে না পাওয়ায় বঞ্চনার প্রতিকারে অপারগতাজনিত হতাশা বাঙালিদের মনে সদাজাগ্রত ছিল। এটাই তাদের বঞ্চনাবোধকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলে।

বর্তমান অধ্যায়টি ছয়টি অংশে বিভক্ত। সূচনায় রয়েছে বঞ্চনা ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত কিছু ধারণাগত বিষয়ের উপর আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিদের অংশগ্রহণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বঞ্চনা যে আকার ধারণ করে তার বস্তুগত মাত্রা বা পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা। বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি তীব্রতর করে তোলার ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার নীতিসমূহ কি ভূমিকা পালন করেছে তা-ই চতুর্থ অংশের আলোচ্য বিষয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাব কিভাবে প্রভাববিস্তার করেছে এবং তা বাঙালিদের বঞ্চনার অনুভূতিকে কিভাবে প্রবলতর করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে পঞ্চম অংশে। বাঙালিদের এ বঞ্চনাবোধ দূরীকরণে পাকিস্তান সরকারের ব্যর্থতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে কতটুকু ত্বরান্বিত করেছে সেটা আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ ও শেষ অংশে।

ধারণাগত বিষয়সমূহ

জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে জাতীয়তাবাদ কথাটা দ্বারা কি বোঝাতে চাই সেটাই আগে উপলব্ধি করতে হবে। এ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জাতীয়তাবাদকে ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ একটি স্থানে বসবাসরত একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয়ের অনুভূতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। অনুরূপ জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই চিন্তাচেতনা, সমৃদ্ধি, গোষ্ঠীগত ক্রিয়াকলাপ, সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া, নিজ ভূখণ্ডের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদেরকে অপর জনগোষ্ঠীগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখতে হবে। এ রকম সংজ্ঞায়নে স্পষ্টত অনেক দুর্বলতা রয়েছে, যেহেতু গোষ্ঠীগত চেতনা বা অনুভূতি উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। একটা জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে সমপ্রকৃতির হলেও তার মধ্যে জাতি, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম ও পৃথক সামাজিক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত অসঙ্গতি থাকা সম্ভব। একটি ভূখণ্ডের অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের মধ্যেও অসঙ্গতি থাকতে পারে, যা গ্রামকে গ্রাম থেকে, জেলাকে জেলা

থেকে, কিংবা প্রদেশকে প্রদেশ থেকে বিভক্ত করতে পারে। একটি জাতিসত্তা অপর জনগোষ্ঠীর তুলনায় পণ্যসম্পদ, সরকারি চাকুরি, উৎপাদনী সম্পদ, উৎপাদনের উপায়সমূহ নিয়ন্ত্রণ, নীতিনির্ধারণ ও বণ্টনপ্রক্রিয়ায় কতটুকু পরিমাণে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা করার ক্ষমতা রাখে তা থেকেই বঞ্চনার ধারণা সৃষ্টি হয়। কাজেই জাতীয় একত্ববোধ হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীর তুলনায় কতটা বঞ্চিত হচ্ছে সেটা নিরূপণের অনেক উপায়ের অন্যতম।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিদের অংশগ্রহণের অর্থনৈতিক ভিত্তি

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য যেহেতু জাতীয়তাবাদের তত্ত্বীয় বিষয়ে নতুন কিছু সংযোজন নয়, সুতরাং আমরা কেবল আমাদের ধারণাগত সমস্যাটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যেই সীমিত রাখতে চাই। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক আন্তসম্পর্কগুলোর দিকে তাকাতে গেলে বাংলাদেশের বাংলাভাষী জনগণের ইতিহাস এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার বাংলাভাষী জনগণের ইতিহাসকে এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হবে। আসলে কিন্তু এ অঞ্চলের বাংলাভাষী মুসলিমরা একটি পৃথক জাতীয় পরিচিতির দাবি তুলেছিল, যা তাদেরকে বিভাগপূর্ব (প্রাক-১৯৪৭) ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে স্থান করে দেয়। তবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বাঙালি মুসলিমদের জাতীয় পরিচিতির একটা স্থানগত ভিত্তির দরকার ছিল। গোড়ার দিকে বাংলা ও আসামকে নিয়ে এ ভিত্তি গঠিত বলে মনে করা হতো। ভারতবিভাগের প্রাক্কালে এখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগুরু।[১] প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে তৎকালীন শাসক বৃটিশ সরকারের তৈরি ১৯৪৬-এর কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় এরকমই অনুমান করা হয়েছিল।[২] ঐ পরিকল্পনায় উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারতে তিনটি উপরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, জাতীয় যোগাযোগব্যবস্থা ও কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ে যৎসামান্য ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়েছিল।

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতবিভাগের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার ভূখণ্ডগত সীমানা নতুনভাবে নির্ধারণ করে, যার মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ ও আসামের

১. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, (Dhaka 1987).

২. H. V. Hodson, *The Great Divide*, (London 1969).

মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা পড়ে।[৩] প্রস্তাবিত ভূখণ্ডে মুসলিম বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো। মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত আবাসস্থল হিসেবে বাংলা ও আসামের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোর 'কীটদষ্ট ও খণ্ডিত' পাকিস্তানে যোগদানের চিন্তাটা মেনে নেয়া হয় একমাত্র তখনই, যখন কংগ্রেস হাইকমান্ড ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম বাংলার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গোটা সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজধানী লাহোরসহ পাঞ্জাবের সেরা অংশগুলো নিয়ে গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের কথা চিন্তা করে 'কীটদষ্ট ও খণ্ডিত' পাকিস্তানের কথা বলেন নি। তিনি তখন ভাবছিলেন বাংলার কথা, যা তার রাজধানী হারিয়েছে, ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলগুলোর অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্পএলাকাটি ও ভারতের বৃহত্তর নৌ-বন্দরগুলোর অন্যতম প্রধান নৌ-বন্দরটি হারিয়েছে এবং বাংলার অনগ্রসর কৃষিপ্রধান পশ্চাৎভূমি আর আসামের চা-উৎপাদনকারী জেলা সিলেটকে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছে। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে অভিব্যক্তি ঘটেছিল তাকে এভাবে শেষপর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ কর্তৃক পুনর্নির্ধারিত সীমানায় পূর্ব বাংলা ও সিলেটের অন্তর্গত ভূখণ্ডে ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসেবে নিজের জাতীয় পরিচিতি তুলে ধরতে হয়। এ সীমানার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করে নিতে হয় বিপুল সংখ্যক অমুসলিমকে, যারা ছিল ভারত ও বাংলা ভাগের সময় পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ২০%।[৪] ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎস যা-ই থাকুক না কেন, ঐ তারিখের পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেবল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ভূভাগের জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জাতীয়তাবাদের এ সংজ্ঞার মধ্যে অমুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ—ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত লোকেরা সংজ্ঞায়নের দরুন নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাক্রমে বাদ পড়ে যায়। আমাদের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আর বর্তমান বাংলাদেশের গারোপাহাড় এলাকার স্বল্প সংখ্যক অবাঙালি উপজাতিগুলোর অবস্থান অস্পষ্ট থেকে যায়।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা

এ অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের কিছু প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে যেহেতু এতে বাংলার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বঞ্চনার চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং বিশেষত বাঙালি মুসলিমরা কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা ও হিন্দু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তুলনায় নিজেদেরকে বঞ্চিত বোধ করতো। ঐ বঞ্চনার মূলে ছিল এ সত্য যে, পশ্চিম বাংলা ছিল পূর্ব বাংলার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। পূর্ব বাংলাতেও মুসলিমরা অনুভব করতো যে, অর্থনৈতিক জীবনে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য নেই, সেখানে রয়েছে অপর

---

৩. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*

৪. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, (USA 1972), Table 11 7

সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য। ভূমির মালিকানা ছিল প্রধানত হিন্দু জমিদারদের হাতে। মুসলিমরা ছিল হিন্দু জমিদারদের রায়ত কিম্বা ক্ষুদ্র চাষী। মধ্যবর্তী আর্থিক কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের হাতে এবং কোনো কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল মাড়োয়ারিদের হাতে। পুঁজিবাদী শিল্প বলতে যা-কিছু ছিল তার মালিকানা ছিল বৃটিশদের হাতে। যেমন, সিলেটের চা-শিল্প এবং পূর্ব বাংলার নদীপথে সংযোগ রক্ষাকারী যান্ত্রিক নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা; কয়েকটি কাপড়ের কল ও একটি চিনিকল নিয়ে যে সামান্য আধুনিক পণ্যউৎপাদনশিল্প গড়ে উঠে তার মালিক ছিল বাঙালি হিন্দুরা। শহরাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যও তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো। আমলাতন্ত্র, শিক্ষকতা ও আইন ব্যবসাতেও তাদেরই প্রাধান্য ছিল। পূর্ব বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসের এ প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হচ্ছে তথ্য হিসেবে বাঙালি মুসলমানদের নিজেদেরকে একটি বঞ্চিত শ্রেণী হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্য। এ গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায় প্রাক-১৯৪৭ পূর্ব বাংলার সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে অধিকতর সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানে সক্ষম হবে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহে লক্ষ্য করা যাবে যে, ১৯৪৭ সাল নাগাদ বাংলায় একটি মধ্যস্বত্বভোগী মুসলিম জোতদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে আর সরকারি চাকুরিতে মুসলিম বাঙালিদের অনুপাত পদমর্যাদার দিক থেকে না হোক, অন্তত সংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫]

বাঙালি মুসলমানরা এমন একটা শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিল, যেখানে তারা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তারা আশা করছিল ভূমিস্বত্বলাভের, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে শিক্ষা, সরকারি চাকুরি ও বিভিন্ন পেশায় নিজেদেরকে এগিয়ে নেয়ার, পূর্ব বাংলায় শিল্পের অবকাঠামো গড়ে তোলার এবং এ অঞ্চলে শিল্পায়ন ঘটাবার। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিম উদ্যোগের অস্তিত্ব কার্যত ছিল না বলে তারা আশা করছিল যে, সম্পদ সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের দুটো কাজ রাষ্ট্রই শুরু করবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বাধিক জোর দেয়। ভারতের মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে তাদের জাতীয় পরিচয় বেছে নিয়েছিল বলে তাদের পক্ষে জাতীয় ক্ষমতার কেবল এমন একটা কাঠামোই কল্পনা করা সম্ভব ছিল, যেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রাধান্য নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও পেশাসমূহে হিন্দু প্রাধান্য থাকায় রাষ্ট্রশক্তির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করার উপায় হিসেবে দেখা হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা ভারতের শ্রেণী, জাতি, বর্ণ অথবা ভূখণ্ডগত বৈষম্যগুলোর প্রতি খুব সামান্যই নজর দিয়েছে। ভারতের উত্তর-

৫. Ahmad Kamal, "The Decline of the Muslim League and the Ascendancy of the Bureaucracy in East Pakistan, 1947-54", Ph D Thesis, (Australian National University, Canberra 1989)

পশ্চিমাংশে মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে প্রবল ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ছিল না। সেখানকার মুসলিম সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে ভারতের অপরাপর অংশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের বা আপেক্ষিকভাবে বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলিমদের সাথে এক নৌকায় তুলে দেয়া হয়। অথচ তখনকার পরিস্থিতিতে একজন বাঙালি প্রজা বা রায়তের পরিপ্রেক্ষিত আর পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতি সর্দার ও সিন্ধুর ওয়াদেরা বা অভিজাত ভূস্বামীদের পরিপ্রেক্ষিত ছিল কিছুটা ভিন্ন। বাঙালি প্রজা আইন পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তার দৈনন্দিন জীবনের উপর থেকে হিন্দু জমিদার-মহাজনদের কর্তৃত্ব অপসারণের জন্য। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতীয় সর্দার এবং সিন্ধুর ওয়াদেরা ভূস্বামীরা চেয়েছিল হিন্দু প্রাধান্যযুক্ত কেন্দ্রের অনধিকারমূলক হস্তক্ষেপ থেকে তাদের প্রাদেশিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রাধান্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ক্ষমতা।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম ভূস্বামী ও পূর্ব বাংলার কৃষকরা এমন একটা রাষ্ট্র চেয়েছিল, যা তাদেরকে স্ব স্ব অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিচালনার সুযোগ এনে দেবে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান আন্দোলন তাদেরকে জাতীয় ক্ষমতা না হোক, অন্তত স্থানীয় ক্ষমতা দখলের জন্য হাত মেলাবার একটা সুবিধা এনে দেয়। ভারতের মুসলিমদের স্বাধীন জাতীয় ক্ষমতালাভের সংগ্রামের উদ্ভব ঘটেছিল নিজস্ব বিষয়াদি পরিচালনার জন্য যথাযথ রাজনৈতিক স্বাধিকার নিশ্চিতকরণে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলির ব্যর্থতা থেকে। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের জন্য এ স্বায়ত্তশাসনক্ষমতার লক্ষ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রাধান্য খর্ব করে নিজেদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান ঘটানো। লাহোর প্রস্তাবে দু'টি স্বতন্ত্র মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। কাজেই প্রস্তাবটি ছিল পরিকল্পিত অথবা আকস্মিকভাবে ভারতের এ দুটো অঞ্চলের[৬] মুসলিমদের উদ্বেগের ফসল।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলার বাঙালিরা যে রাষ্ট্রটির উত্তরাধিকার লাভ করে তার অংশীদার হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিমরা এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক লোকসহ ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলো থেকে আগত উদ্বাস্তুরা। নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এ উদ্বাস্তু নাগরিকরা ভারতের নানা অঞ্চল ও পটভূমি থেকে এসে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। যেসব সামাজিক শক্তিকে নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়, সেগুলোর মধ্যে বাঙালিদের উচ্চাভিলাষী প্রত্যাশা ছিল সর্বাধিক। ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও কারিগরি বৃত্তির ক্ষেত্রে মুসলিমদের বেশ ভালো অবস্থান ছিল। হিন্দিভাষী উত্তরাঞ্চলে মুসলিমরা ছিল প্রধান শ্রেণী ভূস্বামী ও পেশাজীবীদের অংশ। তাদের মাতৃভাষা উর্দু ছিল এ অঞ্চলের উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মাতৃভাষা।

---

৬. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*

এভাবে দেখা গেল যে, যেসব জনগোষ্ঠী পাকিস্তান পেলো, তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার বাঙালিরাই কেবল পর্যায়ক্রমে উত্তর ভারতের মুগল ও তাদের অনুচরদের, বৃটিশ শাসকদের ও হিন্দু জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের শিকার হয়েছিল। সুতরাং পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদতা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর এ অঞ্চলের জনগণের নিয়ন্ত্রণ না থাকার সাথে সম্পর্কিত। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভের আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। এটা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের চেতনার মধ্যে স্থায়ীভাবে কাজ করতে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত হবে না।

বাঙালিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা

কতিপয় ধারণাগত প্রশ্ন

অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক উভয়ভাবেই দেখা যেতে পারে। দারিদ্র্যপীড়িত কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনার পরিমাপ সুনিশ্চিতভাবে করা যায় সে কতো ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে বা কতো কম জিনিসপত্র, মালামাল ইত্যাদি তার আছে সেটা বিবেচনা করে। অপরাপর ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা ভূখণ্ডের সম্পদ ও সুবিধাদির বিচারে বঞ্চনা আপেক্ষিকও হতে পারে। বাঙালিদের জন্য একটি জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে বঞ্চনা প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমাদেরকে একটি মিলিত জাতীয় আবাসস্থলে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের কথা বিবেচনায় রেখে বিষয়টার প্রতি নজর দিতে হবে। বিশ্লেষণে আমরা উৎপাদনশীল উপায়উপকরণ, অস্থাবর সম্পত্তি ও চাকুরির উপর অধিকার বা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বঞ্চনার পরিমাপ করবো। এসব বঞ্চনা দেশীয় ও বৈদেশিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব এবং শেষপর্যন্ত নীতিনির্ধারণপ্রক্রিয়ার উপর কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিদ্যমান বঞ্চনার সাথে সম্পর্কিত হবে।

এ পরিচ্ছেদে পূর্ব বাংলা (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) ও সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করে এর আপেক্ষিকতার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা হবে। এটা করা হবে প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের অঞ্চলসমূহ ও পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ)-এর মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে উৎপাদনী সম্পদের বিন্যাসের প্রতিও অবশ্য দৃষ্টিপাত করা হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বাঙালিদের ঐতিহাসিকভাবে অনুভূত আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান ছিল স্থানীয় অর্থনীতির উপর বাইরের লোকদের কর্তৃত্ব।

আঞ্চলিক হিসাবে পৃথকীকরণ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অদ্ভুত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটি পৃথকীকরণের ধারণাকে অধিকতর পরিমেয় করে তোলে। দু'টি আঞ্চলিক অর্থনীতিকে দু'টি স্বতন্ত্র

অর্থনীতিরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে।[৭] তা সম্ভব হয় প্রতিটি অঞ্চলের জি. ডি. পি. ও জি. এন. পি, সঞ্চয়বিনিয়োগ, শ্রম ও পুঁজির আন্তঃআঞ্চলিক গতিবিধির মোটামুটি হিসাব নির্ধারণ, বাণিজ্য ও প্রদত্ত অর্থের স্বতন্ত্র মূল্যহারের পৃথক ব্যালেন্স প্রস্তুতকরণ এবং বাজেটের মাধ্যমে ও বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের আলাদা হিসাব প্রণয়নে।

সমস্যা দেখা দেয় কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিসমূহের খরচ ও সুবিধাদির হিসাব নির্ধারণের সময়। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সংগৃহীত রাজস্বের হিসাব রাজস্ব সংগ্রহের আঞ্চলিক উৎসগুলো থেকে সব সময় পাওয়া যেতো বটে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানে সমিতিভুক্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর নিজ নিজ হেড অফিস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কর দেয়ার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় না। আদমজী, বাওয়ানী, আমিন, দাউদ প্রভৃতি কতিপয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আয়ের একটি বড় অংশ আসতো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে। অথচ তারা ট্যাক্স দিত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত তাদের হেড অফিস থেকে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে, টেলিযোগাযোগ ও রেলওয়ের মতো খাতে অঞ্চলবিশেষকে সুনির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বরাদ্দ করা যথেষ্ট সহজ ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বৈদেশিক সার্ভিসসমূহ ও প্রতিরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যয় প্রধানত কর্মচারী ও দপ্তরসমূহের জন্য হলেও এবং এসব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৃহত্তর অংশ পশ্চিম পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এসব বিভাগের বা সার্ভিসের চাকুরিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের লোকদের সম অধিকার রয়েছে বলে গণ্য করা হতো, এবং এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য ব্যয় নির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা হতো। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা দৃঢ়ভাবে এ অবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সুফলসমূহ যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানই পায়, সেহেতু এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটা যথাযথ অংশ বা হার অনুযায়ী ঐ সব ব্যয় ভাগ করা উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও অর্থবরাদ্দের সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে এটাও দেখা যায় যে, বিভিন্ন সার্ভিসের চাকুরির সুফলও পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানই অনেক বেশি ভোগ করে। ঐ সব সুফল পক্ষপাতহীনভাবে বণ্টন করা হচ্ছে বলে মেনে নিতে বাঙালিরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এরকম

৭. Rehman Sobhan, "How to build Pakistan into a well-knit Nation", *Paper* Presented at a Conference conveyed by the Pakistan Bureau of National Integration in Lahore in September 1961 (mimeo). The concept of two economy was discussed by the conference of Bengali Economists on the First Five Years Plan, held in Dhaka in 1956, and by a number of other Bengali economists such as the late Dr A Sadeque, Director, Bureau of Statistics and the late Dr Habibur Rahman of the Pakistan Planning Commission.

'অবরাদ্দযোগ্য' সম্পদ বণ্টনের পরিমাপ করতে গিয়ে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা দেখেন যে, চাকুরি এবং কেন্দ্রীয় ব্যয় অন্যায়ভাবে অঞ্চলবিশেষে চলে গেছে।[৮]

এসব দাবি ও অভিযোগের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ ও অর্থের বেশিরভাগ কোথায় যায় সেটার হিসাব নেয়াটা সম্ভব করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণাকে এটা পরিমাণগতভাবে কিছুটা নিখুঁত করে তোলে। আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে এমন অপরাপর দেশে পূর্ব পাকিস্তানের আপেক্ষিক বঞ্চনার মতো ব্যাপার এতোটা চট করে নজরে পড়ে না। কেবল আঞ্চলিক বৈষম্যের পরিমাপই নয়, বছরের পর বছর ধরে এর গতিধারার নকশা তৈরি ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ ও ক্ষমতা অর্থনীতিবিদদের নাগালের মধ্যে থাকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসাব নিরূপণ

বৈষম্যের অতি সহজ প্রাপ্য পরিমাপটি আঞ্চলিক জি ডি পি ও মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত। আঞ্চলিক মাথাপিছু আয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের যেকোন সূচক হাতের কাছেই রয়েছে।[৯] এসব হিসাবের বেশিরভাগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের জাতীয় আয় সংক্রান্ত হিসাব থেকে নেয়া উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বলে বছরে বছরে বিভিন্ন উৎসের হিসাবে গরমিল দেখা যায়। এসব পরিসংখ্যানগত বিভিন্নতার কোনটা সঠিক বা কতটা সঠিক সে বিচারে না গিয়ে আমরা পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণেতা অর্থনীতিবিদদের জন্য পেশকৃত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের দুটো পৃথক রিপোর্টে প্রদত্ত মাথাপিছু বৈষম্যের হিসাবকে কাজে লাগাতে পারি। তবে আঞ্চলিক অর্থনীতির বৈষম্যের পূর্ণতর বিবরণ দানের জন্য আমরা অন্যান্য উপাত্তের প্রতিও দৃষ্টিপাত করবো।

যেসব তথ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে দেখা যায়, ভারতবিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশ যে অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয় তাতে তাদের বিকাশের স্তরে কোন তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য ছিল না।[১০] উভয় অঞ্চলের শিল্পভিত্তিই ছিল উপেক্ষণীয়।[১১] তবে পশ্চিম পাকিস্তান

৮. দেখুন, *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plans*, Government of Pakistan, (Comments of E. P. Members)

৯. T. M. Khan and A. Bergen, "Measurement of Structural Change in the Pakistan Economy: A Review of the National Income Estimates 1949-50 to 1963-64", *PDR*, Summer 1966, M. Huq, *The Strategy of Economic Planning-A Case Study of Pakistan*, (Karachi 1963)

১০. ঐ।

১১. G. Papanek, *Pakistan's Development—Social Goals and Private Incentives*, (Harvard University Press 1966)

রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থার সুবিধা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি থেকে একটা উন্নততর অবকাঠামো লাভ করে।[১২] উভয় অংশের জি. ডি. পি. প্রায় সমানই ছিল।[১৩] দেশজাত উৎপন্নদ্রব্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জি ডি পি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য পরিমাণে বেশি এবং তা ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে।[১৪] তবে জি. ডি. পি.-এর অবরাদ্দযোগ্য অংশগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের সাথে যুক্ত করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে সামান্য পরিমাণে বেশি ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের মাত্রা বেশি হবার কারণেই এটি ঘটে। ১৯৪৯-৫০ সালে জি. ডি. পি.-এর পশ্চিম পাকিস্তানী হিস্যা ছিল ৫০.৫%। ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা বেড়ে ৫২.৫% শতাংশে দাঁড়ায়। এ ব্যবধান ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ আরো প্রসারিত হয়ে পাকিস্তানের জি. ডি. পি.-তে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ দাঁড়ায় ৫৭.৪%।[১৫]

কাঠামোগত পরিবর্তনে ভিন্নতা

এসব আঞ্চলিক বৈষম্য দেখিয়ে দেয় যে, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জি. ডি. পি. পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে দ্রুততার সাথে বর্ধিত হয়।[১৬] পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ১.৯%-এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হারের গড় ছিল ৩.৭%। ষাটের দশকে এ ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের ৪.৩%-এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৪%-এ।

পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির এ দ্রুততর বিকাশের হার পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির সাথে তুলনায় উচ্চতর হারে বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য আনয়নের ফল। ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের ক্ষেত্রে শিল্পের হিস্যা ৭% থেকে ১০%-এ উন্নীত হয়।[১৭] একই সময়ে শিল্পখাতের মধ্যে বৃহৎশিল্পের হিস্যা দাঁড়ায় ৪১% থেকে ৭২%। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫% থেকে ৪৩%। পাকিস্তানের উভয় অংশে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ এভাবেই ঘটেছিল। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোৎপাদন ৩২

---

১২. World Bank, *Bangladesh Development in a Rural Economy*, 3 Vol., (Washington D C 1974)

১৩. Khan and Bergen, "Measurement of Structrul Change".

১৪. দেখুন, *Reports of the Economists on the Fourth Five Year Plans*, Government of Pakistan, (Comments of W P Member)

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. ঐ।

১৭. Huq, *Strategy of Economic Planning*

কোটি থেকে ৬৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৮০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়।[১৮] এ থেকেই বোঝা যায় যে, শিল্পের বিকাশ পাকিস্তানের উভয় অংশে ঘটলেও পঞ্চাশের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যবধান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির দ্রুততর উন্নতি ও কাঠামোগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি ষাটের দশকেও অনুরূপ বৈষম্যকে স্থায়ী রাখার পরিবেশ তৈরি করে।

এ একই সময়ের মধ্যে ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের জি. ডি. পি.-তে শিল্পের হিস্যা ১৬%-এ বর্ধিত হয়, পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় ৮.৯%।[১৯]

সারণি ১ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অঙ্কে)

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান (২-১)	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত (২-১) $\left(\frac{২-১}{২}\right)$ স১০০
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎস : সারণি ১.১ ও ১.২। পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের *রিপোর্ট* (পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের রিপোর্ট)।

রপ্তানি খাতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ১৯৫৫-৬০ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানিবাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮.৬% ভাগ।[২০] ১৯৬০-৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির হিস্যা ৪০.৫%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫-৭০ সালের তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণকে অতিক্রম করে ৫০.২%-এ দাঁড়ায়।

১৮. Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic Growth and Interregional Trade*, (Karachi 1963)

১৯. Khan and Bergen. "Measurement of Structural Change," Table 3.1

২০. World Bank. *Bangladesh Development*

পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানির ক্ষেত্রে শুধু যে পশ্চিম পাকিস্তানকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছিল তা-ই নয়, এর রপ্তানিকাঠামো গোটা পাকিস্তানী শাসনামলে অত্যধিক পরিমাণে পাটনির্ভর থেকে যায়। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আন্তর্জাতিক ও আন্তঃআঞ্চলিক রপ্তানিবাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৭৬.১০ শতাংশ।[২১] ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পাটের উপর পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভরশীলতা সামান্য পরিমাণে হ্রাস পায় এবং মোট আঞ্চলিক রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা দাঁড়ায় ৬৯.৫ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে, গোড়ার দিকে বিদেশে পাকিস্তানের মোট রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৯০.৫ শতাংশ। আরো সাম্প্রতিককালে এটা ৯১.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানিকাঠামোর মধ্যে যে পরিবর্তন আনা হয় সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানমুখী। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা, সুতা ও সুতীবস্ত্রের উপর তার যে নির্ভরশীলতা ছিল সেটার অবসান ঘটে।[২২]

জীবনযাত্রামানের বৈষম্য

পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির অধিকতর দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখীকরণ অনিবার্যভাবে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ১ নং সারণিতে মাথাপিছু আয়বৈষম্যের একটি মোটামুটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যায় ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে। ১৯৫০-এর দশকে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে ৫০ শতাংশ এবং ১৯৬০-এর দশকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে বৈষম্য ছিল ৩২.৫ শতাংশ, ১৯৬৯-৭০ সালে এটা দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ।

তর্ক তোলা হয়েছে যে, এসব হিসাবে উচ্চহারের ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কম করে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মাথাপিছু আয়ের হিসাব তৈরি করার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে টাকার আপেক্ষিক কম ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি।[২৩] পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাল ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গমের মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করলেই এ বৈষম্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্যালোরিযুক্ত চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে যায়। এ সত্যটি অনুভব করেন মাহবুবুল হক। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন এক টন চালের দাম ছিল ৫১৮ টাকা, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম ছিল ৩৩৪ টাকা। ঐ সময় এক টন গমের দাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ৫১৭ টাকা, পশ্চিম

২১. ঐ।

২২. *Pakistan Statistical Year Book (PSYB)*, 1968

২৩. Huq, *Strategy of Economic Planning:* Khan and Bergen, "Measurement of Structrul Change", A Ghafur, "A Comparison of Interregional Purchasing Power of Real Wages in Pakistan," *PDR*, Winter 1967

পাকিস্তানে ২৬৭ টাকা।[২৪] এ সত্যের ভিত্তিতে মাহবুবুল হক আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা নতুন করে তৈরি করেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ সালে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। জনাব হক দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত পদ্ধতির হিসাবে এ বৈষম্যটা ৬০ শতাংশের স্থলে মাত্র ২৭ শতাংশ হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এক মণ চালের দাম ছিল ৪২. টাকা ৩৭ পয়সা আর পশ্চিম পাকিস্তানে এক মণ গমের দাম ছিল ২২ টাকা। তখন যদি জনাব হকের পদ্ধতিতে হিসাব করা হতো, তাহলে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১ শতাংশে পৌঁছতো।[২৫]

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য-সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে বিরাজমান বৈষম্য। ২ নং সারণিতে আমরা ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে মূল ভোগ্যবস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রবণতা তুলে ধরেছি। প্রাপ্ত প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদি ভোগের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে বৈষম্য তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়, যদিও অপরিশোধিত ও পরিশোধিত চিনির চাহিদা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি এবং কালক্রমে এ বৈষম্য বেড়ে চলে।

অত্যন্ত স্থূল বৈষম্য সৃষ্টি হয় কারখানাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কাপড়, কাগজ, সিগারেট, দিয়াশলাই ও বিদ্যুৎশক্তির মাথাপিছু ব্যবহারের মাত্রা পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষণীয়ভাবে অনেক বেশি। এতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি তথা শিল্পায়নের দ্রুততর গতি প্রতিফলিত হয়। এ বৈষম্য বছর বছর বেড়ে চলে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের গৃহস্থালির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত জরিপ রিপোর্টে প্রাপ্ত মোটামুটি মাথাপিছু ভোগের প্রবণতাগুলোর দিকে তাকালে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দ্রুততর গতিতে শিল্পায়ন সংক্রান্ত বক্তব্যটি আরো সুদৃঢ় হয়। ২ নং সারণিতে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের জরিপে আমরা দেখি যে, ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় ১৯৬০ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে।

পণ্যদ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের অনুরূপ বৈষম্য দেখা দেয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদির সুযোগলাভের ক্ষেত্রে। ৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে যে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণকেন্দ্র নির্মাণ, হাসপাতালের বেডসংখ্যা ও ডিসপেনসারির সংখ্যা এবং ডাক্তার ও নার্সদের সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি এটা মেনে নিলেও দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের জনগণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায়

২৪ Huq *Strategy of Economic Planning*

২৫. *Pakistan Economic Survey (PES), 1969-70,* Table 38

অত্যন্ত কম এবং এ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বছরের পর বছর ব্যাপী প্রায় কিছুই করা হয় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির অনুপাত ঐতিহ্যগতভাবে বেশি ছিল। কিন্তু ৩ নং সারণি ইঙ্গিত করে যে, ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রসংখ্যার অনুপাত বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসাবে রাস্তা, রেলপথ, মোটরগাড়ি ও ব্যবহারাধীন রেডিওর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে এসব বৈষম্য আরো ব্যাপক হয়। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাইলের হিসাবে রাস্তা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে রাস্তার দৈর্ঘ্য তখনো ২০ হাজার মাইলের বেশি থেকে যায়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তায় ২ লক্ষের বেশি মোটরগাড়ি চলাচল করতে থাকে। এ বৈষম্য অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের নদীমাতৃক প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা ও যানবাহন বৃদ্ধির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের নদীপথের অনুরূপ সম্প্রসারণ ঘটে নি। স্থায়ীভাবে নাব্য নদীপথের মাইলের হিসাবে ১৯৫৯-৬০ সালে তা ছিল ২৬৬৮ মাইল এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা দাঁড়ায় ৩৩৫২ মাইল।[২৬]

বাঙালিদের বিশ্বাস জন্মে যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভাল খায়, ভাল পরে, উন্নততর স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও শিক্ষালাভ করে, উন্নততর যানবাহন, টেলিযোগাযোগব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসহ অধিকতর উন্নত পরিবেশে বাস করে। এ বিশ্বাস তাদের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধারণাকে তীব্র করে। এমনি করে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসমূহ অধিকাংশ বাঙালির এ বিশ্বাসকেই শুধু বদ্ধমূল করে যে, স্বাধীনতার সুযোগগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের লোকরাই অনেক বেশি পরিমাণে ভোগ করে।

বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা

অঞ্চলসমূহের উত্তরাধিকার

পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক বিশ্বাস জন্মে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের মূলে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি ও বরাদ্দমূলক সিদ্ধান্তসমূহ। এ অভিমত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ও বাজারশক্তিগুলোর অবদানকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের উপর কিছু বেশি ক্ষমতা

২৬. প্রাগুক্ত

আরোপ করে। কাঠামোগত উত্তরাধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল ছিল না, যদিও রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাসহ তার ছিল একটা উন্নততর অবকাঠামো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বৃষ্টি হতো অনেক বেশি পরিমাণে, এখানকার জমি ছিল অধিকতর উর্বর এবং এখানে ছিল নদীপথে মালামাল ও যাত্রীপরিবহনের একটি বেশ উন্নত ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিসম্ভাবনা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল বলে বিশ্বাস করার কোন কারণই ছিল না, যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমির উৎপাদনক্ষমতাও ছিল বেশি। শিল্পক্ষমতার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের মতোই শোচনীয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আর কিছু না থাকলেও একটি অনেক উন্নত গ্রামীণ শিল্পাঞ্চল ছিল। তাঁতশিল্প এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের বস্ত্রের যোগান দিতে পারতো।

শিক্ষাসম্পদের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে নিকৃষ্ট ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের স্তর এখানে উৎকৃষ্টতর ছিল, যদিও পশ্চাৎপদতার মাত্রায় তেমন কোন ইতরবিশেষ ছিল না।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীসমূহে অফিসার-কর্মচারী, উচ্চ পদাধিকারী প্রশাসক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংখ্যা ও অবস্থানের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান সুস্পষ্টভাবে বেশি লাভবান হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছিল বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লোকভর্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাকিস্তান যে সশস্ত্র বাহিনীগুলো পায় সেগুলো ছিল প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে গঠিত, অনেকগুলো ক্যান্টনমেন্ট এবং অর্ডন্যান্স ডিপোর অবস্থানও ছিল সেখানে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানবিক সম্পদের মধ্যে ব্যবসায়ী-কারবারীরা ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবিভক্ত ভারতের ব্যবসাজগতে মুসলিম ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের স্থান ছিল অতি নগণ্য। এ নগণ্য অবস্থার কারণেই করাচীর হারুন, কলকাতার আদমজী-ইস্পাহানীদের মতো ব্যবসায়ী পরিবার পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। স্যার আদমজী, হাজি দাউদ, মির্জা আহমদ ইস্পাহানী ও তাঁর ছোট ভাই হাসান ইস্পাহানী পর্যায়ক্রমে বাংলার মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।[২৭] এসব ব্যবসায়ী ছিলেন পশ্চিম ভারতের ইসমাঈলী, বোহ্‌রা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। চিনিওটীরা এসেছিলেন পাঞ্জাব থেকে। ইরানী বংশোদ্ভূত ইস্পাহানীরা প্রধানত ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার কাছ থেকে কিছু পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।[২৮] কিন্তু তাঁরা ছিলেন

২৭. Harun-or Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*
২৮. ঐ।

অধিকতর শক্তিশালী হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাববলয়ের অধীন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল শহরাঞ্চলের মাড়োয়ারি, গুজরাটী ও পার্সী গোত্রের লোকদের।

মুসলিম ব্যবসায়ীরা ভেবেছিলেন, পাকিস্তান হবে এমন একটি দেশ, যেখানে হিন্দুদের প্রতিযোগিতার হুমকি থাকবে না এবং যেখানে তারা বিনা প্রতিযোগিতায় পুঁজির প্রসার ঘটাতে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দু ও শিখরা দলে দলে দেশত্যাগ করলে ঐ অঞ্চলে একটা বড় রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প বলতে যা-কিছু ছিল তা হিন্দু ও শিখরা নিয়ন্ত্রণ করতো। ওরা চলে যাওয়ায় ভারত থেকে আগত মুসলিম উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ীরা এ শূন্যতা পূরণের আশা করেছিল। সুতরাং এসব পরিবারের অনেকেই যে দেশান্তরী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। করাচী ছিল পশ্চিম ভারতে তাদের পিতৃভূমির কাছাকাছি এবং সংস্কৃতিগতভাবেও পাকিস্তানের ঐ অঞ্চলের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্ব বাংলায়ও ঘটে। তবে এখানকার স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভুত্বকারী হিন্দু ও মাড়োয়ারিরা এ অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যাবার কোন প্রবল তাগিদ অনুভব না করায় এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের মতো শূন্যতার সৃষ্টি হয় নি। এর ফলে ভারত থেকে উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীরা এখানে আসতে উৎসাহবোধ করে নি। কিন্তু কলকাতাভিত্তিক ব্যবসায়ী পরিবার ঢাকায় এসে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করে। তবে তাদের মধ্যে একমাত্র ইস্পাহানীরা এবং চামড়ার কারবারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিনিওটী আমিন পরিবার ঢাকায় তাদের সদর দপ্তর স্থাপন করে।

বাজারশক্তিগুলোর ভূমিকা

উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে যে অসমঞ্জস কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়, তা উন্নয়নপ্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে বাজারশক্তিসমূহের সীমাবদ্ধতাকে আবারো প্রকটিত করে তোলে। এ কথা বারবার বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারের আকার বড় হওয়ায় সেখানে অর্থনৈতিক বিকাশে গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৪৯-৫০ সালের জি ডিপি-এর হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জি ডি পি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছুটা বেশি (পূর্ব পাকিস্তানে ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা)।[২৯] জিডিপি-এর আকারই প্রাথমিকভাবে বাজারের আকার স্থির করে। বাজারের সাথে যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের করাচীতে অবস্থান, তার নিরাপত্তা ও বেসামরিক খাতে ব্যয়, চাকুরি ইত্যাদিকে যুক্ত করি, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারসম্ভাবনা কিছু পরিমাণে বেশি দাঁড়ায় বৈকি।

২৯. Khan and Bergen, "Measurement of Structural Change" Table A-2.

তবে পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানিআয়ের প্রধান উৎস থেকে যায়। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে অর্জিত সকল বৈদেশিক মুদ্রার ৫১.৫% আসে পূর্ব পকিস্তানের রপ্তানি থেকে।[৩০]

এর বিপরীতে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অনিয়ন্ত্রিত আমদানির সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সকল আমদানির ৭০% গ্রাস করে। এতে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানিক্ষমতা বেশি।[৩১] তবে আমদানির চাহিদা গড়ে উঠে যতোটা না সমষ্টিগত চাহিদা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি আয়ের বণ্টন থেকে। এভাবে মনে হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর আমদানিচাহিদাসম্পন্ন অধিকতর সচ্ছল মানুষের একটা বৃহত্তর শ্রেণী রয়েছে। তদুপরি, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষাখাতে ক্রয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ব্যয় এবং কেন্দ্রের করাচীতে অবস্থান—এগুলো আমদানিগ্রাসী। জনগণের চাহিদা, দাবি ও উন্নয়নের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে এভাবে ক্ষমতাকেন্দ্রের অবস্থান ও আয়ের ভিত্তিতে আমদানিচাহিদা নির্ধারিত হতে দেয়া ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তান হলেও তার প্রধান ব্যবহারকারী হতে দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে।

তখন থেকে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, উদার আমদানির এ পর্যায় চলাকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পুঞ্জীভূত পাকিস্তানের স্টার্লিংউদ্বৃত্তের হিস্যা এবং তার বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পায়। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার উপরও কিছুকাল ধরে ভয়ানক চাপ পড়ে এবং টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি করতে হয়।

ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বসতিস্থাপনকারী উদ্বাস্তু বণিকশ্রেণী আমদানিবাণিজ্যের উপর একচেটিয়া দখল কায়েম করে এবং এ বাণিজ্য থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। এসব মুনাফাই পরে ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে বীজ-পুঁজি যোগায়। শিল্পায়নের এ প্রক্রিয়াকে কঠোরভাবে আমদানিনিরোধ ও মুদ্রার বিনিময়হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সংরক্ষণ দিয়ে জোরদার করে তোলা হয়।[৩২]

এটা সুস্পষ্ট যে, কিছুটা উন্নততর বাহ্যিক অবকাঠামো, কেন্দ্রীয় সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সদর দপ্তরের অবস্থিতি, পশ্চিম পাকিস্তানে বসতিস্থাপনের ইচ্ছা নিয়ে আগত উদ্বাস্তু পেশাজীবী ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর অংশের আকস্মিক উপস্থিতি ইত্যাদি ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তান উত্তরাধিকারসূত্রে কতিপয় নিশ্চিত সুবিধা লাভ করে। ১৯৪৯-

৩০. Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic Growth.*

৩১. ঐ।

৩২. A R Khan, *The Economy of Bangladesh,* (London 1972)

৫২ কালপর্বে আমদানি উদারকরণের পর্যায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে বিপুল পুজি সঞ্চিত হয়। ঐ পর্যায়ে পাকিস্তান যদি অবাধ অর্থনীতি গ্রহণ করতো, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান হয়তো পূর্ব পাকিস্তান থেকে এগিয়ে যেতো। ক্রমবর্ধিষ্ণু কার্যকারণসম্বন্ধের নিয়ম এসব বৈষম্যকে স্পষ্টতর করে তুলতো।[৩৩]

কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে দেখা যায়, কোরীয় যুদ্ধের দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার আকস্মিক অবসানের পরে বাজার নয়, বরং রাষ্ট্রই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে কোথায় কি পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ ও অর্থনৈতিক তৎপরতা চলবে সেটাকে প্রভাবিত করার প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ সরাসরি রাষ্ট্রীয় নীতির এখতিয়ারে ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্র কর্তৃক বা প্রদেশ কর্তৃক বিতরিত হতো, ওটা কোন্ অঞ্চলে ব্যয় করা হবে, কোন খাত অগ্রাধিকার পাবে এবং প্রায় ঐ গোটা সময়টায় বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তি লাভবান হবেন—এসবই রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটা শিল্পায়নের স্থান ও গতিপ্রকৃতি, তাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা কোন্ অঞ্চলে কতটুকু রয়েছে এবং আমদানি ও পুঁজিসঞ্চয়জনিত চলতি ভোগের পরিমাণ কোন্ অঞ্চলে কতটা হবে এসবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের পুরো সময়টায় টাকার অতিরিক্ত মূল্যনির্ধারণের দ্বারাই এসব করা সম্ভব হয়। টাকার মূল্যবৃদ্ধি পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিখাতকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করে নি, বরং আমদানিকারক কিংবা শিল্পপতি হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা হস্তগত করাকে উৎসাহিত করে। এমনি করে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইচ্ছামতো সম্পদ ও অনুগ্রহ বণ্টনের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা প্রসঙ্গে

পাকিস্তানের রপ্তানিআয় থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সাথে বছরের পর বছর ধরে বৈদেশিক সাহায্য যোগ হয়। ১৯৫০-৫১ সালের কোরীয় যুদ্ধকালীন রমরমা অবস্থার সময়টা বাদে ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে স্থায়ী ঘাটতি চলতে থাকে। প্রাথমিকভাবে এ ঘাটতি পূরণ করা হয় জমা স্টার্লিং ব্যালেন্স ক্ষয় করে। ১৯৫৩-৫৪ সালের পরে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার খাতে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রবাহিত অর্থ পাকিস্তানের আমদানি ও উন্নয়নের জন্য বর্ধিষ্ণু হারে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৬১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তান মঞ্জুরি ও ঋণ বাবদ আনুমানিক ৬ বিলিয়ন ডলার পায়।[৩৪] ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানের আমদানির ৪৪% আসে এ অর্থ থেকে।[৩৫] এতে বোঝা যায় যে, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি বৈদেশিক মুদ্রার উপর দাবিকে

---

৩৩. Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*

৩৪. *Pakistan Economic Survey*, 1969-70

৩৫. পাকিস্তানের আমদানিব্যয়ের হিসাবের তালিকা পাবেন A. M. A. Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation*, (Dhaka 1979) গ্রন্থে।

জোরদার করে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অঞ্চলগুলোর মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনের সিদ্ধান্তগুলোও প্রধানত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই থেকে যায়, যেহেতু বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল প্রচুর এবং প্রাপ্ত সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশি।

রাষ্ট্রের নিয়ামক ভূমিকা

আঞ্চলিক উন্নয়নের ছাঁচকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবধান অতি গুরুত্বপূর্ণ থেকে যাওয়ায় আঞ্চলিক উন্নয়নের ভারসাম্যকে প্রভাবিতকরণে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারী হিসেবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল নিয়ামক। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পাকিস্তান সরকার রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ১১৩ বিলিয়ন টাকা খরচ করে।[৩৬] আঞ্চলিক অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদা স্থির করার ব্যাপারে এটা রাষ্ট্রকে রীতিমতো অসাধারণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রদান করে। এ ব্যয়ের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারটি আঞ্চলিক পণ্যের বাজার ও জনকল্যাণব্যবস্থাগুলোর উপর একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এ ব্যয়ের যে অংশ উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তার পরিমাণ ছিল ৫০ বিলিয়ন টাকা। এটা অবকাঠামো, সরকারি খাতে শিল্পবিকাশ ও মানবিক সম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নক্ষমতার উপর প্রভাববিস্তার করে। বেসরকারি খাতের বিকাশও কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকারি ঋণ ও ভর্তুকি এবং অপ্রত্যক্ষভাবে অবকাঠামো ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থবিনিয়োগ দ্বারা, সরকারি ব্যয়ে সৃষ্ট বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং সরকারি নীতির চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। এগুলো অর্থনৈতিক তৎপরতার উৎসাহপ্রদায়ক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। আমরা নিম্নে বর্ণিত সরকারি হস্তক্ষেপের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, যথা, সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ, সরকারি ব্যয়ের জন্য অর্থপ্রদান এবং সরকারি নীতির গতিপথ বা লক্ষ্য ইত্যাদিতে আঞ্চলিক পক্ষপাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবো।

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পক্ষপাতও আমরা দেখবো ৪ নং সারণিতে। এতে দেখা যাবে যে, ১৯৫৯-৭০ কালপর্বে রাজস্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তান সকল ব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ পায়। সারণিতে প্রদত্ত পরবর্তী সময়ের মধ্যে এই প্রবণতার কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থিতি কোথায় সেটা বিবেচনা করলে আঞ্চলিক

---

৩৬. Rounaq Jahan, *Pakistan*, Table III 1, 62

ব্যয়ের এ নমুনা পুরোপুরি বিস্ময়কর ঠেকবে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে অবস্থান করে করাচীতে এবং পরে ইসলামাবাদে। তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ার অর্থ ছিল এই যে, প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় প্রধানত সেখানেই হতো। সশস্ত্র বাহিনীসমূহের গঠনে দেখা গেছে যে, সেনাবাহিনীতে জওয়ানদের মধ্যে ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৭.৪ জন, বিমানবাহিনীতে ২৮ জন এবং নৌবাহিনীতে ২৮.৮ জন।[৩৭] অফিসারদের অনুপাত ছিল আরো নিম্নে। আমলাতন্ত্রের মধ্যে ১৯৬৬ সাল অবধি প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় অফিসারদের শতকরা মাত্র ৩০ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানী।[৩৮] কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নতর পদের চাকুরিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল আরো কম। এসব কর্মচারী ছিল প্রধানত করাচীবাসী।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য ব্যয়, স্টোরগুলোর জন্য কেনাকাটার ব্যয়, আবাসিক ভবনাদি ও দপ্তরসমূহের বেসামরিক বিনির্মাণের ব্যয়, বৈদ্যুতিকশক্তি, টেলিযোগাযোগ ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ব্যয় প্রধানত করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। অনুরূপ কেন্দ্রীয় ব্যয় দ্বারাই গড়ে উঠে করাচী, রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে ইসলামাবাদে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতীয় রাজধানী। এসব ব্যয়ের দরুন সৃষ্ট নিয়োগের বেশিরভাগও পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত ব্যয়সমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে পণ্যদ্রব্যাদি ও জনসেবামূলক ব্যবস্থার চাহিদা বৃদ্ধি দ্বারা বেসরকারি অর্থনৈতিক তৎপরতাকে জোরদার করে তোলে।

বাঙালিরা রাজস্বব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এ গুরুতর অসমতাকে পাকিস্তানের দুই অংশের অসমতা স্থায়ীকরণের নিয়ামক কারণ রূপে দেখে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে 'প্যারিটি' বা সমতার দাবি, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানাদির অংশবিশেষ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের দাবি কেবল ক্ষমতা, চাকুরি ও সিদ্ধান্তগ্রহণক্ষমতার অংশীদার হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই উঠে নি, ঐ দাবিগুলো উঠেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য ব্যয়ের সুফল লাভের প্রত্যাশায়। প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরির জন্য বাঙালিদের যোগ্যতা কম—এ অভিমত বাঙালিরা কখনো মেনে নেয় নি। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সি. এস. পি.) মতো উচ্চতর পদের প্রথম শ্রেণীর চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা প্রবর্তন আদিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান করাচীতে হওয়ার দরুন সৃষ্ট অসমতা ও বিভাগকালে ভারত সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অসমতাকে কখনো দূর করতে পারে নি। সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের নিযুক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে দৈহিক সামর্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা হয়। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনীসমূহের বিকাশ প্রমাণ করে যে, সশস্ত্রবাহিনীর চাকুরিতে নিয়োগলাভের জন্য

৩৭. ঐ।

৩৮. প্রাগুক্ত

উপযুক্ত বাঙালির কোন অভাব ছিল না এবং নিয়মিত উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং শরীরচর্চা যেকোন জাতিসত্তার জনগনের দৈহিক স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে। পাকিস্তান সরকার যদি শুরু থেকে সচেতনভাবে বেসামরিক ও সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরিতে সমতা আনার চেষ্টা করতো, তাহলে হয়তো দশ বছরের মধ্যে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হতো। সেক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকারের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বাঙালিদেরধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হতো।

উন্নয়নব্যয়

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের মূল কারণ থেকে যায় সরকারি উন্নয়নব্যয় বণ্টনে পক্ষপাত। পাকিস্তানে শুরু থেকেই জাতীয় সংসদে এ মর্মে প্রশ্ন উঠতে থাকে যে, সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান তার প্রাপ্য হিস্যার চাইতে কম পাচ্ছে। ১৯৫০-৫৫ সালের প্রাক-পরিকল্পনা আমলে সরকারি উন্নয়নব্যয়ের মাত্র ৭০ কোটি টাকা জোটে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান পায় ২০০ কোটি টাকা।[৩৯] বণ্টনবরাদ্দে এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের কি যুক্তি থাকতে পারে তা কখনো স্পষ্ট করে বলা হয় নি। সরকারি ব্যয়বরাদ্দের পশ্চাতে কোন কৌশলগত চিন্তা ছিল না—এ কথা বলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানকে সরকারি ব্যয়ের শতকরা মাত্র ৩৬ ভাগ প্রদানকে আর কোনক্রমেই যুক্তিগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। আদায়কৃত ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দাঁড়ায় আরো করুণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারি ব্যয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পায় পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৫৬ সালে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমালোচনা করেন। তাঁরা শুধু সরকারি সম্পদের অধিকতর পক্ষপাতশূন্য বণ্টনই নয়, পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্র উৎপাদনকারী ও ভোক্তা ইউনিটরূপে গণ্য করারও দাবি তোলেন। তাঁরা পাকিস্তানকে একটি অখণ্ড পরিকল্পনাসত্তা হিসেবে না দেখে দুটো অর্থনীতি হিসেবে গণ্য করার এবং দুই অর্থনীতির জন্য দু'টি পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলেন।[৪০]

---

৩৯. দেখুন, *Report of the Panel of Economists on the Fourth Five year Plans*, Government of Pakistan, (Comments of E P Members).

৪০. S V Khan, "A measure of economic growth in East and West Pakistan", *PDR*, Autumn-1961
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত (১৮-২১ ডিসেম্বর ১৯৫৬) পাকিস্তান ইকোনমিক এ্যাসোসিয়েশন-এব এক সম্মেলনে একাধিক বাঙালি অর্থনীতিবিদ পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। যেমন, এস. এম. মুজিবুর রহমান সম্মেলনে পঠিত তাঁর প্রবন্ধে দুই অর্থনীতির সমর্থনে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন ঃ 'But we cannot ignore the hard reality and here got to admit that there are actually two economics in the country -- The superstructure of political oneness must be built on economic twoness and let us nurture this twoness so far it is congenial to the whole gamut of our economic life." দেখুন S M Mujibur Rahman, "Inter Zonal Trade in Pakistan", *Pakistan Economic Journal*, Vol 7 (March 1957), No 1

পাকিস্তানী নীতিনির্ধারকরা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অর্থববাদ্দেব বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতেন যে, প্রদেশটির পরিশোষণক্ষমতা কম। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারকে পরিকল্পনার অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো। বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও প্রশাসকরা যুক্তি দেখাতেন যে, পরিশোষণক্ষমতা তহবিল প্রদান ও কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারেব কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর-এ উভয়ের উপর নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি অবকাঠামোর : আপেক্ষিক দুর্বলতা এমনিতেই পরিশোষণে বাধা সৃষ্টি করে। ১৯৫১-৫২ সালে কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮.৬ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ০.৫।[৪১] ১৯৫০-এর দশকে বিদ্যুৎশক্তিখাতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল অর্থবিনিয়োগের ফলে ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ সেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার ২৮.৮ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়। সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহারেব পরিমাণ অতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ১.৬ কিলোওয়াটে পৌঁছে। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পাশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা বৃদ্ধি পায় ৫৬০৩ মাইল, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তা বৃদ্ধি পায় মাত্র ৪৬০ মাইল।[৪২]

পূর্ব পাকিস্তানের তহবিল ব্যবহারে বিলম্বের কারণ ছিল ঝামেলাপূর্ণ অনুমোদনপ্রক্রিয়া। চার চারটি পৃথক সংস্থা দ্বারা এখানে যেকোন বড় প্রজেক্ট অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। সংস্থাগুলো হচ্ছে : প্রাদেশিক উন্নয়ন ওয়ার্কিং পার্টি, প্রাদেশিক প্ল্যানিং কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ওয়ার্কিং পার্টি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালনা কমিটি (একনেক)। এরকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যতো দ্রুততার সাথে স্কিমগুলো অনুমোদন করতো ও পরে তহবিল ছাড়তো, সেটা সম্পদের ব্যবহারকে ততোটা প্রভাবিত করতো। তবে এমনকি তহবিল ছাড়ার পরেও বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিতে বাধা-বিঘ্ন, ইস্পাত ও সিমেন্ট ইত্যাদি উপকরণ (পূর্ব পাকিস্তানে যেগুলোর ঘাটতি ছিল) সংগ্রহে বিঘ্ন, বিদ্যুৎ সববরাহের স্বল্পতা, যানবাহন ও যোগাযোগের অপর্যাপ্ততা প্রজেক্টগুলোকে বিলম্বিত করে দিতে পারতো। পরিকল্পনায় বরাদ্দ ও বাস্তবায়নহারের ক্ষেত্রে যে অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈষম্য প্রশ্নে বিতর্ক

১৯৬০-৬৫ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে আঞ্চলিক বরাদ্দ ও তার সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নাদি কিছুটা গভীরভাবে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপর আলোচনার প্রস্তুতি উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ড তৎকালে করাচীতে অবস্থিত

---

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. ঐ।

পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট-এ কর্মরত আখলাকুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন রিডার মোশাররফ হোসেইন ও তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত বর্তমান প্রবন্ধকারকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান স্থিরীকরণে বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ওয়ার্কিং গ্রুপের আলোচনায় অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে অংশগ্রহন করেন। তাঁরা আঞ্চলিক পরিকল্পনায় সম্পদের বন্টনকে জনসংখ্যার আকারের সাথে সম্পর্কিত করার গুরুত্বের কথা এবং ১৯৫০-এর দশকে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে অসমতা ঘটেছে তা সংশোধনের কথা বলেন। এসব আলোচনায় সিদ্ধান্তগ্রহণক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবায়নক্ষমতার উন্নয়ন, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের (পিআইডিসি) দ্বিধাবিভক্তি এবং কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের উপর জোর দেয়া হয়।

পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন মোটেই এসব যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তখন দেশে সামরিক আইন চালু থাকায় বাঙালি অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন সেমিনার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেসব প্রশ্নে সামান্য বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেসব প্রশ্ন রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে উত্থাপন করার উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল, পরিকল্পনাব্যয়ের শতকরা ৪১ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।[৪৩] প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় এটা অনেক বেশি। প্রথম পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে আদায়কৃত বিনিয়োগ ছিল শতকরা মাত্র ২০ ভাগ।[৪৪] দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে একটা আঞ্চলিক অসমতার ব্যাপার রয়েছে সেটাকে বিশদভাবে স্বীকার করে নি। এ পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়, তবে যুক্তি দেখায় যে, ঐতিহাসিকভাবে কোন দেশেই সকল অঞ্চলে একই সাথে এবং সমহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে নি।[৪৫]

সুতরাং এটা বিস্ময়কর নয় যে, আঞ্চলিক প্রশ্ন আবারো পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকাশনা উপলক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে আয়োজিত এক বর্ধিত সেমিনারে পরিকল্পনাটির প্রথম সমালোচনা উচ্চারিত হয়। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগদানকারী নূরুল ইসলাম ও বর্তমান প্রবন্ধকার, পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যানেজিং

---

৪৩. Huq, *Strategy of Economic Planning*, Table 55.

৪৪. দেখুন, *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five year Plans*, Government of Pakistan, (Comments of E P. Members).

৪৫. Government of Pakistan, *The Second Five year Plans*, 1960-65.

ডিরেক্টর এম. রশিদসহ কয়েকজন বাঙালি সিএসপি অফিসার আঞ্চলিকতার প্রশ্নে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সাইদ হাসান, প্রধান অর্থনীতিবিদ এম. এল. কোরেশী, কমিশনের যুগ্ম প্রধান অর্থনীতিবিদ আফতাব আহমদ খান, উপ-প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল হক এবং পাকিস্তানের নীতিনির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ বেসামরিক আমলারা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এন. হুদা ও মাযহারুল হক অংশগ্রহণ করেন। প্যানেল আঞ্চলিক প্রশ্নকে খাটো করে দেখে এবং মেনে নেয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির গতিশীলতার দরুন ঐ অঞ্চলে অধিকতর বিনিয়োগ হওয়া উচিত। তবে তাঁরা যুক্তি দেন যে, দ্রুত বিকাশশীল অঞ্চল থেকে এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা দরকার যাতে সেখানে উন্নয়ন দ্রুততর হয়।[৪৬] একটা সুপারিশে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে উন্নততর আঞ্চলিক ভারসাম্যের তাগিদে পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু লাভজনক বিনিয়োগ বাদ দেয়া উচিত, তবে যে সীমার মধ্যে সে নীতি কাজ করবে তা সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের হারে কোন গুরুত্ব হ্রাস পেতে দেখা না যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির উৎপাদনক্ষমতা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগহার পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে বেশি—এমন অযাচাইকৃত ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে এ কথা বলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৫ ভাগের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে সঞ্চয়ের হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট বিনিয়োগহার ছিল ৭%, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩%।[৪৭]

পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পরিশোষণক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্যানেল প্রস্তাব করে যে, কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকৌশলী ও প্রশাসনিক কর্মচারী মোতায়েনের মাধ্যমে কেন্দ্রের উচিত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাদলিল এবং অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের মধ্যে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে যে, পাকিস্তানের অর্থনীতি অখণ্ড এবং সেখানে আঞ্চলিক অসমতা দূরীকরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে গেলে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ বিঘ্নিত হতে পারে। এই দুশ্চিন্তা তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলাকালেও কেন্দ্রীয় পরিকল্পক ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের মন ঘিরে থাকে।

৪৬. দেখুন, *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five year Plans*, Government of Pakistan.

৪৭. Huq, *Strategy of Economic Planning* Tables 28, 29

বলাবাহুল্য, পরবর্তী তথ্য-প্রমাণে দেখা গেছে যে, বিনিয়োগদক্ষতার ক্ষেত্রে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন শ্রেষ্ঠতা ছিল না, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের জন্য উচ্চতর সঞ্চয়ও তার ছিল না, বরং প্রাক-পরিকল্পনা ব্যয় হিসেবে সিন্ধু অববাহিকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিনিয়োগ এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা হ্রাসকল্পে বিনিয়োগকে হিসাবের মধ্যে ধরলে প্রমাণিত হবে যে, ভেল্কিবাজি করে পরিকল্পনার মধ্যে অধিকতর আঞ্চলিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার কথা বলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় ও আয়ের বৈষম্যকে স্থায়ী করে রাখা হয়।

দুই অর্থনীতির ধীকল্প

প্ল্যানিং ও সম্পদ বন্টনের ভিত্তি হিসেবে একটি অখণ্ড জাতীয় অর্থনীতির ধী-কল্প (idea) দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পরপরই পরিত্যক্ত হয়। ১৯৬১ সাল নাগাদ বিতর্কটি সেমিনারকক্ষ ও সরকারি চেম্বারগুলো থেকে রাজপথে ও প্রচারমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আইয়ুবের মার্শাল ল' সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে গণতান্ত্রিক সমাবেশ জোরদার হয়ে উঠার সাথে সাথে আঞ্চলিক বৈষম্য ও সম্পদ বরাদ্দের বৈষম্য বাঙালিদের দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে দেখা হয় মার্শাল ল' পরিকল্পনা হিসেবে, যা পূর্ববর্তী দশকে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনাকে সংশোধনের পরিবর্তে সেই একই অবিচার স্থায়ী করার জন্য সরকারি নীতি ও সম্পদকে ব্যবহারের চেষ্টা করে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উন্নয়নক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ও প্রদেশগুলোর হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের উপর জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিছু কিছু বাঙালি অর্থনীতিবিদ এ সময় বাঙালিদেরমধ্যে জাতীয় অধিকার ও দাবিদাওয়াভিত্তিক যে আন্দোলন গড়ে উঠছিল তার মুখ্য প্রচারক হয়ে পড়েন। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত সেমিনারগুলোতে পাকিস্তানের অখণ্ড জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রচলিত কল্পকাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।[৪৮]

এসব অর্থনীতিবিদদের কারো কারো দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত ছাত্রআন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জঙ্গিপনা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করে। তা না হলে প্রশ্নটি সেমিনারকক্ষগুলোতে পণ্ডিতী বিতর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যেতো। ১৯৬১ সালে ঢাকা সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সাথে এক আলোচনাবৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে স্থানীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অধিকতর মুখর, তাঁদের জোরালো যুক্তি প্রেসিডেন্টকে বিচ্ছিন্ন ও নিরুত্তর করে দেয় এবং প্রবীণতম অর্থনীতিবিদগণ অধিকতর সহনীয় ভাষায় তাঁদের মতামত ব্যাখ্যা করেন। পরে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক অসমতার সমস্যাটিকে স্বীকৃতি দেন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি সম্পদ বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি জাতীয় অর্থকমিশন গঠন করেন।

৪৮. Rehman Sobhan, "How to build Pakistan"

ফিন্যান্স কমিশন

প্রথম ফিন্যান্স কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে। এই প্রথম পাকিস্তানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নে আলোচনার জন্য একটি সরকারি কমিটির প্রথম বৈঠক বসে।[৪৯] কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডি কে পাওয়ার, এম রশীদ, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থসচিব আবুল খায়ের এবং নূরুল ইসলাম। বর্তমান প্রবন্ধকার কমিশনকে সহায়তা করেন। তিনি জনাব নূরুল ইসলামের সাথে একত্রে কাজ করে একটা রিপোর্ট তৈরি করেন, যা পরে কমিশনের পৃথক রিপোর্ট হয়ে দাঁড়ায়। তিনটি রিপোর্ট পেশ করা হয়---একটি পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের তরফ থেকে, একটি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের পক্ষ থেকে এবং একটি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক। পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের রিপোর্টে মাথাপিছু আয়বৈষম্যে শতকরা হিসাবের দিকে দৃষ্টি রেখে জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সম্পদসমূহ বরাদ্দের জন্য একটি সুসমন্বয়কারী ফর্মুলার কথা বলা হয়। বলা হয় যে, বৈষম্য দূরীকৃত হওয়া মাত্রই জনসংখ্যার অনুপাত সংক্রান্ত ফর্মুলাটি প্রদত্ত হবে। সে সময় পাকিস্তানে সংবিধান প্রণীত হচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা এ ফর্মুলাটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। তবে কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা বৈষম্য বিলোপে সরাসরি ব্যবহার করা উচিত এমন সব রাজস্বসম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আস্থা স্থাপন করেন। এটা ছিল রাজস্বের স্থানীয় সংগ্রহের ভিত্তিতে রাজস্বখাতে প্রাপ্ত আয় আরো বেশি পরিমাণে প্রদেশগুলোর হাতে রেখে দেয়ার যে দাবি কমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা তুলেছিলেন সেটার প্রতি চ্যালেঞ্জ। চাকুরিসুবিধা, আয়বৃদ্ধি ও এর উপায় সৃষ্টি, বাজারের বিকাশ ও নগরায়ণের উপর স্থানীয় প্রভাবের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নবহির্ভূত বরাদ্দ আরো বেশি হওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। তাঁরা পরিশোষণক্ষমতাকে বিঘ্ন হিসেবে না দেখে উন্নয়নের একটা উপায় হিসেবে দেখেন এবং প্রজেক্টগুলোর বাধাবিপত্তি উত্তরণে বৈদেশিক কারিগরি সাহায্য ব্যবহারের কথা বলেন।

আঞ্চলিক প্রশ্নে জনগণের উদ্বেগ যখন চরমে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন ফিন্যান্স কমিশনের মধ্যে এ বিতর্ক চলতে থাকায় আইয়ুব সরকার ১৯৬২ সালের সংবিধানে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়বৈষম্য হ্রাসের স্পষ্ট উদ্দেশ্যে সরকারি সম্পদ বণ্টনের অঙ্গীকারটি অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়। ১৯৬০ এর মধ্যভাগে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশনা ও ১৯৬২ সালের প্রথমদিকে সংবিধানের প্রকাশনাকালের মধ্যে এটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একটি নাটকীয় মতপরিবর্তন। সংবিধান গৃহীত হবার পর বৈষম্যহ্রাসের সাংবিধানিক লক্ষ্য পূরণে

৪৯. দেখুন, *Reports of the Panel of Economists on the Fourth Five Year Plans.* Government of Pakistan. (Comments of E P Members).

অগ্রগতি পর্যালোচনাকল্পে দ্বিতীয় অর্থ-কমিশন নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বৈষম্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য উপাত্তের অভাবে কমিশনের কাজ ব্যাহত হয় এবং তত্বীয় পরিকল্পনা বৈষম্য দূরীকরণে কতটা সফল হবে তা অনুমান করতে কমিশন অক্ষম হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৬৫ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় এমন একটা সময়ে, যখন আঞ্চলিক বরাদ্দের প্রশ্নে জনগণের বিতর্ক সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও আঞ্চলিক অর্থবরাদ্দের প্রশ্নকে পরিকল্পনাবিষয়ক বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পিত বিনিয়োগের ৫১ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়ার কথা বলা হয়। সরকারি ব্যয়ের ৫৩ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে হবে বলে নির্দিষ্ট হয় এবং বেসরকারি বিনিয়োগে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সিন্ধু অববাহিকা উন্নয়নে পরিকল্পনাবহির্ভূতভাবে ব্যয়িত ৩৬০ কোটি টাকা ছিল বণ্টনের পাল্লাকে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কার্যত তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন সময়ে সরকারি বিনিয়োগের শতকরা ৫৫ ভাগ ব্যয়িত হয় পাশ্চিম পাকিস্তানে। এতে পরিকল্পনাকে বৈষম্য হ্রাসকল্পে কাজে লাগানোর সাংবিধানিক অঙ্গীকার অপূর্ণ থেকে যায়। পরিকল্পনাকালের মধ্যে বৈষম্য ১৯৬৪-৬৫ সালের শতকরা ৪৫.৪ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ৬১.৫ শতাংশে বর্ধিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলে মোশাররফ হোসেন এবং এ প্রবন্ধকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্যানেলের আলোচনায় আঞ্চলিক বৈষম্য, সরকারি খাতের ভূমিকা ও ভূমিসংস্কার বিষয়ে বিতর্ক এমন তীব্র হয়ে উঠে যে, প্যানেলের চেয়ারম্যান কমিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ এম এল. কোরেশী দুই বা তিনটি বৈঠকের পরই প্যানেলের আলোচনা হঠাৎ এবং অসময়ে বন্ধ করে দেন।

আঞ্চলিক বৈষম্য প্রশ্নে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পার্লামেন্টের এমন কোন অধিবেশনই চলে নি, যেখানে বৈষম্য বিষয়টি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সাথে যোগ দিয়ে বৈষম্যকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেন। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে (আর. টি. সি) আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি মূলত আঞ্চলিক অসমতাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়। এতে পাকিস্তানে দুই অর্থনীতিযুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। ছয় দফার তিনটি দফা অর্থ, রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অঞ্চলগুলোর হাতে অর্পণ

সংক্রান্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। তবে ছয় দফা প্রণয়নের সাথে কোন অর্থনীতিবিদই জড়িত ছিলেন না, যদিও বাঙালি অর্থনীতিবিদদের রচনাসমূহ উক্ত কর্মসূচিকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত করে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতাদের সাথে বসে অর্থনৈতিক সমস্যাদি আলোচনা করেন।

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। আন্দোলনের লক্ষ্য বৈষম্য দূরীকরণের দিক থেকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে সরে যায়। ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকে আইয়ুব সরকার যে রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়, তা নিরসন ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ইসলামাবাদে এক গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। কারাগার থেকে সদ্যমুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য পেশকালে তাঁকে সহায়তাদানের জন্য তিনজন প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের সংশোধনী প্রণয়নের জন্য ডক্টর কামাল হোসেনকে আমন্ত্রণ জানান।

আইয়ুব সরকারের পতনের পরে ১৯৬৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী লড়াইয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফাই ছিল মূল রণধ্বনি। তার মানে, বৈষম্যের ইস্যুটি আবার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" শিরোনামে আওয়ামী লীগ কর্তৃক তৈরি পোস্টারটি নির্বাচনী প্রচারের অত্যন্ত ফলপ্রদ হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ পোস্টারটিতে আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বঞ্চনা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা যেসব পরিসংখ্যান এক সময় তুলে ধরেছিলেন সেগুলো সন্নিবেশিত হয়। পোস্টারটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি পরিবারের রাজনৈতিক সচেতনতার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমবর্ধমানভাবে বাংলাদেশ বলে মনে করা হতে থাকে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ছয় দফার ইস্যুতে যখন নির্বাচনী প্রচারণা অভিযান চলছে সে অবস্থায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন একটি গৌণ দৃশ্যে পরিণত হয়। খসড়া পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৮০০ কোটি টাকার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৭০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৪৯.৩ ভাগ। তবে তখনকার আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল পরিকল্পনা কমিশনকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসকল্পে পরিকল্পনাটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে বলে। পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৯.৪ বিলিয়ন টাকা (সরকারি খাতে ২৯.৪ বিলিয়ন + বেসরকারি খাতে ১০ বিলিয়ন টাকা)

এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৫.৬ বিলিয়ন টাকা (সরকারি খাতে ১৯.৬ বিলিয়ন + বেসরকারি খাতে ১৬ বিলিয়ন টাকা)।[৫০] এই প্রথমবার পূর্ব পাকিস্তানকে পরিকল্পনার বৃহত্তর হিস্যা প্রদান করা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যালোচনার জন্য গঠিত অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ ছিলেন মাযহারুল হক, নূরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান ও বর্তমান লেখক। বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ পরিকল্পনা কমিশনের তদানীন্তন মুখ্য অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বের অধীনে এ কারণে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান যে, যাঁদের তৈরি বণ্টননীতির দরুন আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্যানেলগুলোর ইতিহাসে সেই প্রথমবার পরিকল্পনা কমিশনের মুখ্য অর্থনীতিবিদ সভাপতির আসনে বসতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমিতির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাযহারুল হককে প্যানেলে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্যানেলের আলোচনার শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদগণ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক প্রশাসন কর্তৃক চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের মতে, কাজটি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের শেষে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকারের। তবে তাঁরা প্যানেলের কাজে অংশ নেন এ প্রত্যাশায় যে, আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে এবং সেগুলো দ্রুত দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তাঁরা বড় রকমের বক্তব্য রাখতে পারবেন।

আঞ্চলিক প্রশ্নে সৃষ্ট পার্থক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এমনকি ১৯৭০ সালে পাকিস্তান যখন আঞ্চলিক প্রশ্নের চাপে দ্রুত ভেঙে পড়ছিল, তখনো প্যানেলের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা ঐতিহাসিক অসমতাসমূহ দূর করার অঙ্গীকার প্রদানে তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানী সহকর্মীদের সাথে হাত মেলাতে পারেন নি। উভয় গ্রুপই জানতেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাঁদের কাজ রাজনীতিপ্রভাবিত অকার্যকর কসরৎ মাত্র। তবু তাঁরা দু'টি পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন।

বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ দু'টি বিকল্প মডেল উপস্থিত করেন। একটিতে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের পরিকল্পনার কথা বলা হয়, যার ৭৫ বিলিয়ন টাকার ৪০.৫ বিলিয়ন (৫৪%) পাবে পূর্ব পাকিস্তান এবং ৩৪.৫ বিলিয়ন (৪৬%) পাবে পশ্চিম পাকিস্তান। দ্বিতীয় মডেলটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পরিকল্পনার। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য পূর্বেকার অনুপাত অক্ষুণ্ন রেখে ৪৩.২ বিলিয়ন টাকা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এবং ৩৬.৮ বিলিয়ন টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

৫০. *Pakistan Economic Survey*, 1970-71

প্যানেলের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৬.৩৫ বিলিয়ন (৪৮%) টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয় ৩৮ বিলিয়ন টাকা। পরিকল্পিত ব্যয়ের পর্যায়গুলো অবশ্য এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষদিকে (১৯৭০-৭৫) পরিকল্পনাব্যয়ের ৫৪% হিস্যা পূর্ব পাকিস্তান পায়। আঞ্চলিক পুঁজির উৎপাদন অনুপাতে পেমেন্ট একাউন্টের আঞ্চলিক ব্যালেন্স, সম্পদের চলন্ত আঞ্চলিক স্থানান্তর ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় প্যানেলের সদস্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের এসব বিতর্ক কিছুটা অবাস্তব শোনায়।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত দলিলে এসব বিতর্কের রাজনৈতিক চরিত্রকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সংশোধিত পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বরাদ্দের অনুপাত পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের দেয়া অনুপাতের কাছাকাছি। প্যানেলের উভয় গ্রুপের সদস্যদের রিপোর্টে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়বৈষম্য, সম্পদের আন্তঃঅঞ্চল স্থানান্তর ইত্যাদির হিসাব সংক্রান্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকায় এগুলো পাকিস্তানের আঞ্চলিক প্রশ্ন বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসে পরিণত হয়েছে।

পাকিস্তানের পরিকল্পিত উন্নয়নের স্থিতিপত্র

পাকিস্তানে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের ২০ বছর শেষ হলে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৯৪৯-৫০-এর মাথাপিছু আয়ের ২১.৯ শতাংশ থেকে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯-৭০ সালে ৬১.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এ থেকেই বোঝা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্র বণ্টন ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৫৯-৭০ কালপর্বে সকল উন্নয়নব্যয়ের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছে। পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের আমলে এ বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এতে বোঝা যায় যে, জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক পরিকল্পনার আমলে মাথাপিছু বিনিয়োগে সুনিশ্চিত বৈষম্যসমূহ বেড়েই চলেছে। এভাবে মাথাপিছু উন্নয়নব্যয়ক্ষেত্রে বৈষম্য ১৯৫১-৫৫ সালের ৮৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৫-৭০ সালে ২৮১ টাকায় পৌঁছে।[৫১] তার মানে, মাথাপিছু বিনিয়োজিত সম্পদের ব্যবধান বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপ বরাদ্দব্যবস্থার অধীনে আন্তঃআঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি ছিল অবধারিত।

ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেসিও (আইকোর)-তে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ছোটখাটো উদ্যোগের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি উৎপাদনক্ষম ছিল। এর উপর ভিত্তি করে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া ও পশ্চিম পাকিস্তানী প্যানেলের অর্থনীতিবিদদের রিপোর্টে বরাদ্দের হিস্যা স্থির করা হয়। বিনিয়োগের পাল্লা

৫১. দেখুন, *Report of the Panel of Economists on the Fourth Plans*, Government of Pakistan, (Comments of E P Members)

পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ঝুঁকে থাকা সত্ত্বেও দুটো পরিকল্পনাকালে সরকার মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য হ্রাস করতে চায়। তাঁরা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে আইকোর নিচু থাকবে বলে ধরে নেন। এ অনুমানকে প্যানেলের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা চ্যালেঞ্জ করেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানে 'আইকোর' সত্যি কম হলে এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোর আমলেও তাই থাকলে পরিকল্পিত সর্বাধিক বৃদ্ধির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে আগের পরিকল্পনাগুলোর সময়ের চাইতে বরাদ্দের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে বেশি হবার কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকতর বিনিয়োগকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য অধিকতর বিনিয়োগদক্ষতার একই যুক্তি ব্যবহৃত হয়। কার্যত 'আইকোর' সংক্রান্ত তথ্যগুলোই দুর্বল। কাজেই, সম্পদ বরাদ্দকে প্রভাবিতকরণের ভিত্তি হিসেবে পুঁজির উৎপাদনশীলতার যুক্তি বাদ দেয়া এবং শুধু বরাদ্দের হিস্যা ও মাথাপিছু আয়ের দিকে তাকানোই নিরাপদ। বরাদ্দের হিস্যা ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য বছরের পর বছর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

বৈষম্য স্পষ্টকরণে বেসরকারি খাতের ভূমিকা[৫২]

মোটমাট ব্যয়ের উপাত্তগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা বেসরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনেক প্রবলতর বৈষম্যকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিই। সরকারি খাতের ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৭০ কালপর্বে ব্যয়ের ৪০% পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। কালক্রমে এ হিস্যা ১৯৫০-৫৫ সালের ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৫-৭০ সালে ৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। সরকারি উন্নয়নব্যয় স্বদেশে সংগৃহীত সরকারি সম্পদ ও বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ থেকে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহ করা হয়। এ দিক থেকে রাষ্ট্র কোন অঞ্চলকে বা কোন কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের মাধ্যমে তা সরাসরি প্রতিফলিত হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী নীতিনির্ধারক ও অর্থনীতিবিদরা যুক্তি দিয়ে এসেছেন যে, মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যের মূলে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি খাতের গতিময়তা। ১৯৫০-৭০ কালপর্বে বেসরকারি খাতে উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ নির্বাহ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৫০-৭০ সময়কালে মোট উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ বেসরকারি খাতে নির্বাহ করা হয় বিধায় (পশ্চিম পাকিস্তানে ৫১% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৩২%) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিনিয়োগবৈষম্যের মূল উৎস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বেসরকারি খাত। পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদগণ এটা স্বীকার করে নিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি খাত অধিকতর গতিময় হবার কারণেই রাষ্ট্রের উচিত পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। তাঁরা আরো

৫২. Figures in the Sector are derived from Table IV.

যুক্তি দেখান যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই পরিকল্পনা কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতের জন্য অবাস্তব বিনিয়োগলক্ষ্য স্থির করে দেয়। কমিশন ভাল করেই জানতো যে, ওসব লক্ষ্য কখনো বাস্তবায়িত হবে না। এটা প্রমাণিত হয় এ তথ্য দ্বারা যে, পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাত তার ব্যয়ের লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়ে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত কিংবা অতিক্রান্ত হয়। পরিকল্পনার শুরুতেই সার্বিক উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার কৃত্রিম ধারণা সৃষ্টির অভিসন্ধি নিয়েই কাজটি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদগণ যুক্তি দেখান যে, সার্বিক উন্নয়নব্যয়ে সমতা আনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয়ের হিস্যা বেশি প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলের বাঙালি সদস্যরা যুক্তি দেন যে, খসড়া পরিকল্পনার সুপারিশকৃত ৫৫% এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যত আদায়কৃত ৪৮%-এর স্থলে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ৬২% নির্ধারিত হোক। খসড়া পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ মোট পরিকল্পনাব্যয়ের ৩৮.৫ শতাংশ নির্ধারিত হয়। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা বেসরকারি বিনিয়োগের এ হিস্যাটি কাটছাঁট করার সুপারিশ করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতের যে আপেক্ষিক দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করেছি, তা দুই অঞ্চলের ভিন্ন রকম উত্তরাধিকারের অংশ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কোথাও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ব্যবসায়িক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। সিন্ধুতে ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হিন্দুরা নিয়ন্ত্রণ করতো। পাঞ্জাবের ব্যবসা-বাণিজ্যে শিখ ও হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। চামড়ার ব্যবসার সাথে যুক্ত পাঞ্জাবী মুসলিম চিনিওটীরা পাঞ্জাবের বাইরে ব্যবসা করতে পছন্দ করতো। বাংলায় বাঙালি মুসলিমরা সকল পর্যায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং ভারত থেকে আগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোই ব্যবসা-বাণিজ্যের পাল্লা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ভারী করে তোলে। তবে এ সম্প্রদায়ও পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা স্থাপনে রাতারাতি বিনিয়োগের জন্য বস্তা বস্তা সোনা নিয়ে পাকিস্তানে আসে নি। তারা এনেছিল ব্যবসাবুদ্ধি ও দক্ষতা। সেটা দ্বারা পাকিস্তানের সূচনাপর্বে বৈদেশিক মুদ্রা উদ্বৃত্ত থাকার বছরগুলোতে আমদানিবাণিজ্যের মাধ্যমে তারা বিপুল মুনাফা অর্জন করে। কোরীয় যুদ্ধের রমরমা অবস্থা ধ্বসে পড়ার পর এসব উদ্বৃত্ত সংরক্ষণশীল বাণিজ্যনীতির আওতায় শিল্পায়নের বীজ-পুঁজিরূপে কাজ করে।

এটা পরিষ্কার যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে উভয় অঞ্চলের শিল্পক্ষমতাই ছিল নগণ্য এবং বস্ত্র-উৎপাদন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমপরিমাণ ছিল। সিগারেট ও সিমেন্ট উৎপাদনে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা ছিল সামান্য। পূর্ব পাকিস্তান ছিল বড় রকমের চা-উৎপাদনকারী। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানায় নিয়োজিত কর্মীসংখ্যা ছিল ১১৭, ৩৫৫ জন, আর পূর্ব পাকিস্তানে এদের সংখ্যা ছিল ৫৫,০৭৪ জন। ১৯৫৪ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। সেখানে চাকুরিরত লোকের সংখ্যা প্রায় ৮৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় মাত্র ৩৩

হাজার। পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহদায়তন শিল্পউৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালের ২১ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।[৫৩] পশ্চিম পাকিস্তানে সুতার উৎপাদন ১৯৪৮-৪৯ সালের ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ডে উপনীত হয় এবং বস্ত্রের উৎপাদন একই সময়ে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ গজ থেকে ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ গজে বর্ধিত হয়।[৫৪] পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন সামান্যই বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প ও যানবাহন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ খাতগুলোতে বিনিয়োগ করা হয় ২১৩ কোটি টাকা।[৫৫] বেসরকারি খাতের বিকাশের আরেকটি পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে অঞ্চলগুলোর জন্য প্রদত্ত পুঁজির অনুমোদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে। ১৯৪৮-৫১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১০ কোটি ৬ লক্ষ টাকার পুঁজি প্রদান অনুমোদিত হয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অনুমোদিত হয় ৪২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।[৫৬] তা থেকে ৩০ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা (৭৩%) অনুমোদিত হয় করাচীর জন্য। এমনি করে পাকিস্তানে শিল্পায়নের গোড়ার দিকে করাচীতে বসবাসরত বহিরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর হাতে পুঞ্জীভূত বাণিজ্যিক পুঁজি একটি নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলোতে অবাধ অর্থনীতির অধীনে ব্যবসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র অবিন্যস্তভাবে যে কাজ করেছে সেটাই হয়তো পাকিস্তানে আদি পুঁজি গঠন বা পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারে। রাষ্ট্র তখনো বেসরকারি খাতে পুঁজি গঠনের জন্য অর্থ যোগানোর একটা তাৎপর্যপূর্ণ উৎস হয়ে উঠে নি। পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলোতে যে একমাত্র এজেন্সি হাতের কাছে ছিল তা হচ্ছে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (পিআইএফসি)। এর ২ কোটি টাকার আদায়কৃত মূলধনের শতকরা মাত্র ৫১ ভাগ ছিল সরকারের।[৫৭] বৈদেশিক মুদ্রার উপর হাত না থাকায় এর ঋণদান তৎপরতা দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে এটা কেবল শতকরা ৬ টাকা সুদে ঋণদান করতে থাকে। ১৯৪৯-৬০ সময়কালে পিআইএফসি প্রায় ২৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঋণদান করে। এর ৫৬ শতাংশ যায় বস্ত্রকারখানা ও পাটশিল্পে এবং অধিকাংশ যায় বৃহৎ কলকারখানার মালিকদের হাতে। ঐ প্রাথমিক যুগে বেসরকারি খাতে এ রকম সব বড় কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কাজেই এটা অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত হবে যে, পিআইএফসি থেকে খুব স্বল্প সংখ্যক

৫৩ Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic*

৫৪ ঐ।

৫৫ Haq, *Strategy of Economic Planning*

৫৬ *Pakistan Statistical Year Book 1968*

৫৭ S. A. Abbas and Beecher, Foreign Aid and Industrial Development of Pakistan (U.K. 1972)

বাঙালিই উপকার পেয়েছে, যদিও এর ঋণ কয়েকটি অবাঙালি পরিবার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত পাটকলে বিনিয়োগে সহায়তা করে।

এটাও অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, পাকিস্তানের প্রথম যুগের শুরুতে বেসরকারি শিল্পখাতে যে বিনিয়োগ হয় তা এসেছিল ব্যবসা এবং পরে পণ্য উৎপাদনে অর্জিত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ থেকে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এসব উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল পুঁজি বা অর্থ জমানোর ক্ষেত্রে 'যে যা পারো হাতিয়ে নাও' নীতির ফল হিসেবে। ১৯৫২ সালের পরে ব্যবসাভিত্তিক পুঁজিসঞ্চয় আমদানি লাইসেন্স প্রাপ্তির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকে। অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়হার, আমদানি সীমাবদ্ধকরণ এবং শিল্পখাতে আমদানি লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ—এসবের মানে দাঁড়ায় এই যে, বরাদ্দ সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। আমদানি লাইসেন্স বিতরণ এমনি করে কে কোথায় কি শিল্প স্থাপন করবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের একটা নীতিগত হাতিয়ারে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেখা যায় যে, পাকিস্তান সরকার ১১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বাণিজ্যিক আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ করেছে এবং তার ৬৭% পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানিকারকরা। এসব লাইসেন্স শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর সম্পদ এনে দেয়।

যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার শিল্পায়নের এই প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপত্তিস্থল, প্রাথমিক বাসস্থান ও নগদ টাকার উৎস যেখানেই হোক না কেন, তা বিচার না করে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগে বাধ্য করতে পারতো। অনুরূপভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৈধ বাণিজ্যিক আমদানির লাইসেন্সসমূহও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস ও কর্মরত ব্যবসায়ীদেরকে দেয়া যেতো। বাঙালিদেরকে পুঁজিসঞ্চয়ের একটা উৎস প্রদানের বিষয়টাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া যেতো। আঞ্চলিক বৈষম্য স্থায়ীকরণে বিনিয়োগের স্থান ও পুঁজিসঞ্চয়ের ক্ষমতা একটা বাজারসৃষ্ট শক্তি—এ ধারণাটি ১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তানের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকালীন অর্থনীতির ব্যাপারে কোনক্রমেই খাটে না।

শিল্পায়নের, বিশেষকরে মাঝারি ও বৃহৎশিল্পের গতিবেগ বৃদ্ধিকল্পে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন (পিআইডিসি) স্থাপন করে। কথা ছিল, এ সরকারি সংস্থাটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার জন্য সরাসরি কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় শিল্প স্থাপন করবে এবং শেষোক্তগুলো থেকে অবিলম্বে বা পর্যায়ক্রমে সরকারি হোল্ডিংসমূহ প্রত্যাহার করবে। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে পিআইডিসি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানেও তা সক্রিয় ছিল। ১৯৫২ সালে জন্মের সময় থেকে ১৯৭০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত পিআইডিসি ১১৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা

বিনিয়োগ করে পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৮টি শিল্পপ্রজেক্ট স্থাপন করে। এর ২০.৯% বিনিয়োগ আসে বেসরকারি খাত থেকে।[৫৮] পূর্ব পাকিস্তানে পিআইডিসি ১৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ৭৪ টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপন করে।[৫৯] এতে দেখা যায়, পিআইডিসি-এর ৬১ শতাংশ বিনিয়োগ যায় পূর্ব পাকিস্তানে। যুক্তি দেখানো যায় যে, বেসরকারি খাত পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী থাকার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য এসব সরকারি শিল্পবিনিয়োগের আরো বৃহত্তর অংশ পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পারতো।

১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তাকল্পে পিআইডিসি আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান শিল্প ঋণ কর্পোরেশন (পিআইসিআইসি) এবং ১৯৬১ সালে পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (আইডিবিপি) স্থাপন করে। ব্যাঙ্কটি পিআইএফসি ও-এর সম্পদ ও দায় অধিগ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকারও ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান বিনিয়োগ কর্পোরেশন এবং ১৯৭০ সালে ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ড গঠন করে। এসব এজেন্সি পাকিস্তানে বেসরকারি শিল্পকে উৎসাহ প্রদানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৬৫৭-৬০ সালের মধ্যে এসব এজেন্সি কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ৪৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ১৯২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রকল্পসমূহ।[৬০] কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ১৭২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (৪২%) পূর্ব পাকিস্তানে আসে।[৬১] পাকিস্তানের সরকারি উন্নয়ন ফিন্যান্স ইনস্টিটিউটসমূহের (পিডিএফআই) ঋণদান নীতি এটাই প্রতিপন্ন করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তারা বেসরকারি বিনিয়োগের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে হবার ব্যাপারটি সংশোধন করতে পারে নি, ফলে ১৯৫০ সালের মধ্যে বেসরকারি খাতের উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। পিডিএফআই কার্যত এসব বৈষম্যে উৎসাহ প্রদান করে, যেহেতু বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে সরকারি ঋণদান কার্যক্রম সবসময়েই অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এসেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতে অবাঙালিদের প্রাধান্য

পাকিস্তান আমলে যেটা কম নজরে পড়েছে তা হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ বলতে বাঙালিদের দ্বারা বিনিয়োগ বুঝাতো না। পাকিস্তানে

৫৮. *Pakistan Economic Survey*, 1970-71

৫৯. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladesh*, (Dhaka 1980).

৬০. ঐ।

৬১. Muinth, *Bangladesh*

গণবিতর্কের মূলকথা ছিল বিনিয়োগের স্থান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বাচন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ যাতে সেভাবেই হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও সম্পদকে কাজে লাগানো। কিন্তু কার্যত বাঙালি মুসলিমদের দুর্বল ব্যবসায়িক যোগ্যতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অবাঙালি মুসলিমরা অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিত্তবান ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে এ শ্রেণীটি ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে পিআইডিসি আনুমানিক ২২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার স্থির পরিসম্পৎসহ পূর্ব পাকিস্তানে ১২টি জুট মিল স্থাপন করে। এতে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে অবাঙালিদের অবস্থান যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে। জুটমিলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে।[৬২] ইপিআইডিসি এসব পাটকল স্থাপনে বৈদেশিক মুদ্রা যোগায়। পরবর্তীকালে তা ১৯৫৪ সালে কর্ণফুলী কাগজের মিলটি ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যে দাউদগোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করে। এ অঙ্কটি ছিল মিলটির প্রকৃত মূল্যের চাইতে অনেক কম।[৬৩] পূর্ব পাকিস্তানে পিআইসিআইসি এবং আইডিবিপি প্রদত্ত ঋণের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করে অবাঙালিরা।[৬৪] ১৯৬৯-৭০ সালে বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণদান ত্বরান্বিত করা হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে আইডিবিপি এবং পিআইসিআইসি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ৪২.২ শতাংশ অর্থাৎ ১০২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা কেবল বাঙালিদেরকেই দেয়া হয়। এটা করা হয় ইতিপূর্বে পিডিএফআই বাঙালিদেরকে উপেক্ষা করেছিল বলে।[৬৫] এ সময়টুকু (১৯৬৯-৭১) বাদ দিয়ে আমরা যদি ধরে নেই যে, ১৯৫৭-১৯৬৯ কালপর্বেই পিডিএফআই পূর্ব পাকিস্তানে তার সকল ঋণ অবাঙালিদেরকে দিয়েছিল, তাহলে দেখা যায় যে, ১৯৬৯ পর্যন্ত অবাঙালিরা পিডিএফআইসমূহের দেয়া ১১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণের ৬২ শতাংশ লাভ করেছে।[৬৬]

প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় স্পন্সরশীপ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আঞ্চলিক বাজারের প্রসারের সাথে বিনিয়োগের উৎস হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন অবাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা এদিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাক-মুহূর্তে পূর্ব

---

৬২. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public, Enterprise*

৬৩. T Hexner *EPIDC-A Conglomerate in East Pakistan*, (Harvard Institute of International Development 1969)

৬৪. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmede, *Pablic Enterprise.*

৬৫. ঐ।

৬৬. ঐ।

পাকিস্তানের শহরাঞ্চলীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে অবাঙালিদের কব্জায় ছিল।[৬৭] শিল্পখাতে তারা শতকরা ৪৭ ভাগ শিল্পপরিসম্পৎ নিয়ন্ত্রণ করতো। ইপিআইডিসি নিয়ন্ত্রণ করতো শতকরা ৩৪ ভাগ এবং বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল শতকরা ২৩ ভাগ। তবে বেসরকারি শিল্পখাতে অবাঙালিরা শতকরা ৭২ ভাগ শিল্পপরিসম্পৎ নিয়ন্ত্রণ করতো। অবাঙালিরা ২৮টি চা-বাগানও নিয়ন্ত্রণ করতো। চা-এর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ আসতো এ বাগানগুলো থেকে।

বাণিজ্যখাতে বড় আমদানি ক্যাটাগরিহোল্ডারদের শতকরা ৯৩ ভাগই ছিল অবাঙালি এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৫৭ জন ছিল মেমন সম্প্রদায়ভুক্ত।[৬৮] পাকিস্তানের দুই অংশের আন্তঃবাণিজ্যেও নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল অবাঙালিদের। অবাঙালিদেরকে আমদানি লাইসেন্স দেয়া হলে বহু ক্ষেত্রে তারা সেগুলো অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত অবাঙালিদেরকাছে বিক্রি করে দিত। মাত্র শতকরা ৯৫ জন তালিকাভুক্ত বাঙালি আমদানিকারক অত্যন্ত ছোট লাইসেন্সই পেতো।[৬৯] রপ্তানিবাণিজ্য অনুরূপভাবে অবাঙালিকবলিত ছিল। পাটের রপ্তানিবাণিজ্যে অবাঙালিদেরহিস্যা ছিল ২৫%, বাঙালিদের ৩৩% এবং বাকিটা নিয়ন্ত্রণ করতো বিদেশী ও সরকারি খাতের ধারকগণ। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের চা, কাগজ, কাগজজাত দ্রব্যাদি, দিয়াশলাই, ট্যাগ করা দ্রব্যাদি রপ্তানিতে অবাঙালিরাই ছিল প্রধান। পূর্ব পাকিস্তানের পাইকারি ব্যবসা এবং শহরাঞ্চলের খুচরা ব্যবসার বেশিরভাগও তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো।

ব্যাঙ্কিং-এর এলাকায় ডিপোজিটের শতকরা ৭০ ভাগই যেতো অবাঙালি ব্যাঙ্কগুলোতে। বীমা ব্যবসার বেশিরভাগ চালাতো অবাঙালি বীমা কোম্পানিগুলো।[৭০] অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে অতি বৃহত্তম জাহাজ-মালিকদের দুজনই ছিলেন অবাঙালি।

পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক অবাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক অর্থনৈতিক খাতও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতো। এর ফলেই তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য থেকে অর্জিত মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগের জন্য সেখানে নিয়ে যেতে পারতো। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ দ্রুততর করার প্রয়াসজনিত প্রবৃদ্ধি পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানির জন্য বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক বিকাশকে উৎসাহিত করে। ১৯৭১ সাল নাগাদ পূর্ব

---

৬৭. ঐ।

৬৮. H Papnek, *Entrepreneurs in East Pakistan*, South Asian Series Research Paper NO 16, Publishfd by Asian Studies Centre, Michigan State University, 1969

৬৯. ঐ।

৭০. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*

পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহদায়তন শিল্পখাতের ১৫ শতাংশ উৎপন্নদ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়।[৭১]

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করতে হলে সম্পদ যাতে বাঙালিদের হাতে যায় সে ব্যবস্থা করতে হতো। কিন্তু পাকিস্তানের অখণ্ড বহুজাতিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে এরকম জাতিভিত্তিক ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না, যদিও মালয়েশিয়াতে চীনাদের মুখোমুখি মালয়ীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এটা বহু বছর ধরে নীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। তদুপরি, সরকারি সম্পদাদি গ্রহণে ইচ্ছুক বাঙালি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তার সংখ্যাল্পতাও ছিল একটা সমস্যা। আমদানি লাইসেন্সসমূহ, শিল্পস্থাপনের অনুমতি এবং পিডিএফআই-এর ঋণ প্রায়ই চলে যেতো অবাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে। যাই হোক, ১৯৬০-এর দশকে পিডিএফআই-এর সম্পদসমূহ যাতে বাঙালি ব্যবসায়ীরা পায় সেজন্য একটা সচেতন প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং প্রথমবারের মতো একজন বাঙালিকে আইডিবিপি-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গণঅভ্যুত্থানের পরে পিডিএফআইগুলো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঋণদান তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় এবং বাঙালি আবেদনকারীদেরকে ঋণদান বৃদ্ধি করে।

বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ

বাঙালিদেরব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগের যোগ্যতা কম থাকায় ই পিআইডিসি-এর নেতৃত্বে সরকারি খাতকে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়ন জোরদারকরণে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সরকারি খাতকে বেসরকারি ব্যবসায়িক উদ্যোগের স্থান গ্রহণ করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানী আমলাতন্ত্র অর্থনীতিতে অবাঙালিদের অধিকতর প্রভুত্ব নিরোধের গুপ্ত কৌশলরূপে সরকারি খাতের সম্প্রসারণকে ব্যবহার করে। ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে ই পিআইডিসি বাঙালিদেরকে পাটশিল্পে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এটি বাঙালি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় ১০টি পাটকল স্থাপনের জন্য ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে।[৭২] পিডিএফআইসমূহ থেকে অধিকতর সাহায্য পাওয়ার ফলে উক্ত মিলগুলোর বাঙালি মালিকদেরকে মিলগুলো স্থাপনে প্রয়োজনীয় মোট বিনিয়োগ ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার শতকরা মাত্র ২০ ভাগ দিতে হয়। ইপিআইডিসি সুবিধাজনক শর্তে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা নিয়ে একটি কাপড়ের মিল ও ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকায় একটি চিনিকল থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে বাঙালি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়।[৭৩]

৭১. Computed from estimates of value added in manufacture in West Pakistan Reported in *Pakistan Economic Survey*, 1971 and estimates of interwing trade, reported in World Bank, *Bangladesh Development*.

৭২. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*.

৭৩. T. Hexner, *FPIDC*.

একটি বাঙালি উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে তোলার উপরোক্ত প্রয়াসসমূহের ফল হিসেবে স্বাধীনতা অর্জনকালে আধুনিক শিল্পখাতে স্থির পরিসম্পৎ-এর ১৮ শতাংশ ছিল বাঙালিদেরহাতে। তবে উক্ত বিনিয়োগগুলোর পাঁচ ষষ্ঠাংশই ছিল পাট ও বস্ত্রখাতে এবং একটি পুঁজি-প্রত্যাহৃত চিনিকলে। এতে বাঙালি উদ্যোগ ও মালিকানার বেশিরভাগই সীমাবদ্ধ থেকে যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কলকারখানায়।

ব্যাঙ্কিং খাতে বাঙালিরা ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ও দি ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন নামে দু'টি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। বীমাখাতে স্বাধীনতা অর্জনকালে বাঙালিদের ১২টি কোম্পানি ছিল।[৭৪] এগুলোর পরিসম্পৎ-এব হিস্যা ছিল অতি ক্ষুদ্র। এগুলো ব্যবসা করতো প্রধানত পাটরপ্তানি ক্ষেত্রে। বাঙালি পাট রপ্তানিকারকদের বেশিরভাগ স্মল শিপারস এসোসিয়েশনের সদস্য হলেও মিলিতভাবে পাটের মোট শিপমেন্টের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তারাই করতো। জহুরুল ইসলাম পরিবারের মতো কিছু সংখ্যক বাঙালি বেসামরিক বিনির্মাণের বড় বড় ঠিকাদারি পেতে শুরু করেছিল। সিভিল সার্ভিসের কোন কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আমলাতন্ত্রের মধ্যে তাঁদের যোগসংযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত লাভজনক ইনডেন্টিং ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েন। ইনডেন্টিং ব্যবসায়ে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও অবাঙালি প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। বাঙালি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্জিত এসব সাফল্যের অধিকাংশ ১৯৬০-এর দশকের এবং বিশেষকরে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগের ফসল, যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান চাপ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আমলাতন্ত্রের মধ্যে উপরে উঠার ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অধিকতর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ এনে দিচ্ছিল। তবে এই উদীয়মান বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিশ্রেণী অবাঙালিদের কনিষ্ঠ অংশীদার থেকে যায় এবং স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসাজগতে অবাঙালি প্রাধান্য অব্যাহত থাকে।

সুতরাং এটা যুক্তিসঙ্গত যে, ব্যবসা-শিল্পগত উদ্যোগের ব্যাপারটি সব সময় পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে কাজ করে। ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সমূহের আকস্মিক বসতিস্থাপনের দরুন পাকিস্তানের গোড়ার দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানই এগিয়ে ছিল। এটা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তোলে এবং আরো প্রসারিত করে। বাঙালি ও অবাঙালি উদ্যোক্তাদের মধ্যকার ব্যবধানও এর ফলে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে আমরা পরবর্তী অংশে দেখবো যে, অর্থনৈতিক নীতির দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই প্রধান প্রভাববিস্তারকারী হিসেবে থেকে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান প্রথম থেকে যে সুবিধা ভোগ করে তার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি ব্যবসাশিল্পকে উৎসাহদান ও সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, উভয় কাজই করতে পারতো।

৭৪. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*

রাষ্ট্র যে সামন্ত ও পেশাজীবী শ্রেণীগুলোকে শিল্পের ক্ষেত্রে টেনে আনার ব্যাপারে একটা নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬০-এর দশকে পাঞ্জাবী ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর দ্রুত উত্থানের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কোন রকম ব্যবসায়িক পশ্চাৎভূমিহীন এক ব্যক্তিকে পাকিস্তানের ৪৩ টি শীর্ষস্থানীয় পরিবারের অন্যতম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কি করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ছেলের শ্বশুর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশবাসী জেনারেল হাবিবুল্লাহ খান খট্টকের মালিকানাধীন গান্ধারা ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উত্থান। আজ লাহোর করাচীর মতোই পাকিস্তানের একটি গতিশীল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের একটি নতুন প্রজন্ম সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তেমনটি ঘটে নি।

বাঙালিরা তাদের নিজেদের দেশে এ বিদেশী উপস্থিতির ছায়ায় বাস করছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবসার সুযোগগুলোতে হাত দিতে পারছিল না। নতুন উদ্যোগ গ্রহণ বা ব্যবসার সুযোগলাভের জন্য করাচী-ইসলামাবাদে ছোটাছুটি করতে তারা বিরক্তিবোধ করতো এবং এসব কাজে অবাঙালি আমলারা বাঙালি ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো বলে তারা অসন্তুষ্ট হতো। গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অবাঙালি সিভিল সার্ভেন্টরাই পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় চালাতো। পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করার পর বাঙালিরা ইসলামাবাদের তুলনায় তাদের ক্ষমতাহীনতা এবং সম্পদ ও দায়িত্বের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণহীনতার দরুণ হতাশায় ভুগতো। বাঙালির আইডিবিপি'র মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং কেন্দ্রে সচিব পদে নিযুক্তিলাভ শুরু হবার পরেই কেবল বাঙালি ব্যবসায়ীদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, সুযোগের পাল্লা তাদের দিকে ঝুঁকছে। সুতরাং পাকিস্তান যেমন চিনিওটী ও মেমনদেরকে অবিভক্ত ভারতের মাড়োয়ারি ও গুজরাটি ব্যবসায়ীদের প্রধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল, তেমনি কেন্দ্রে বাঙালিদেব ক্ষমতালাভ এবং প্রদেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বর্ধিষ্ণু বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের জন্য অবাঙালি বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দেয়।

অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে পক্ষপাতিত্ব

সম্পদবরাদ্দ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ব-পশ্চিম বিরোধের কারণ হিসেবে থেকে যায়। সরকারি সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হতো সরকারি নীতি দ্বারা, যা অর্থনৈতিক তৎপরতার স্থান ও অর্থ যোগানোর উৎস উভয়কেই প্রভাবিত করতো। আমরা সরকারি নীতির চারটি এলাকার উপর দৃষ্টিপাত করবো। এগুলো অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বকে প্রতিফলিত করেছে, বঞ্চনাবোধকে সুদৃঢ় করেছে এবং এ বঞ্চনাবোধ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আগুনে ঘি ঢেলেছে। এ এলাকাগুলোর মধ্যে পড়ে বাণিজ্যনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের হার নির্ধারণ, ফেডারেল ফিন্যান্স ও বহিঃসম্পদ আহরণ নীতি।

বাণিজ্যিক নীতি

বাঙালিদের মনে অত্যন্ত গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল যে বিষয়টি, তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে বঞ্চনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রধান বাজার ছিল ভারত। পাকিস্তানের ৬৫ শতাংশ ভাগ পাট যেতো ভারতে এবং অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ রপ্তানি হতো বিশ্বের অন্যান্য দেশে।[৭৫] এ পরিস্থিতি শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার বৈষম্যকে প্রতিফলিত করেছে। ভারতের পাটকলগুলো ছিল পশ্চিম বাংলায়, আর সেরা পাট উৎপন্ন হতো পূর্ব বাংলায়। ১৯৪৭-এর পরেও ভারতের সাথে পাটের বাণিজ্য পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন থেকে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে পাট ও পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা উৎপাদন যাতে বন্ধ হয়ে না যায় প্রধানত সে কারণেই ১৯৪৭-এর পরে ভারতের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চলে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান তার উৎপাদিত কাঁচা তুলার শতকরা ৮০/৯০ ভাগ ভারতে রপ্তানি করেছে। ভারতবিভক্তির পরে কাঁচা পাট ও তুলার নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার সচেতন প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল নাগাদ উৎপন্ন কাঁচা পাটের ৪৮ শতাংশ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়, কিন্তু কাঁচা পাটের ১৮ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তুলা ফসলের ৪৩ শতাংশ তখনো ভারতেই রপ্তানি হতো।

১৯৪৯ সালে টাকার অবমূল্যায়নে ভারতের সাথে যোগ দিতে পাকিস্তানের অস্বীকৃতির পরিণাম হিসেবে ভারতের সাথে বাণিজ্যসম্পর্ক রহিত হবার ফলে পাট উৎপাদনকারীরা বিপদের সম্মুখীন হয়।[৭৬] এ বিরোধের গুণাগুণ যাই থাকুক না কেন, এর ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগের পুরো বোঝাটাই পড়ে পূর্ব বাংলার পাটচাষীদের ঘাড়ে। পাটের বিক্রি ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় পাটচাষীদের আয় মারাত্মকভাবে কমে যায়। পাটের মূল্যের সূচক ১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৯ সালের মার্চ এবং ১৯৫০-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০০ থেকে ৭১-এ নেমে আসে।[৭৭] আরো অধিকতর পতন থেকে রেহাই পাওয়া যায় আকস্মিকভাবে কোরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে। এতে পাটসহ সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য ও আয় অনেক বেড়ে যায়। পূর্ব বাংলার রপ্তানিআয় ১৯৪৯-৫০ সালের ৬২ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫০-৫১ সালে ১২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।[৭৮] এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হলো করাচীতে নির্ধারিত বাণিজ্যিক নীতি পূর্ব বাংলার উৎপাদকদের জীবনকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে তা দেখানোর জন্য।

---

৭৫. Akhlaqur Rahman, *Partition, Intergration, Economic.*

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. ঐ।

৭৮. ঐ।

ভারতে পাট রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতি পোষানো সম্ভব হয় পাটের বিকল্প বাজার সৃষ্টি হওয়ায় এবং পূর্ব বাংলা থেকে পাট রপ্তানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়ার পরিণতি হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী। পূর্ব ভারতে পাটের উৎপাদন ১৯৪৫-৪৬ সালের ১ কোটি ৫৭ লক্ষ গাঁট থেকে বেড়ে ১৯৫১-৫২ সালে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ গাঁট এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ৫ কোটি ২০ লক্ষ গাঁটে উন্নীত হয়।[৭৯] পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে রপ্তানি ১৯৪৫-৪৬ সালে ৪০ লক্ষ গাঁট থেকে ১৯৫১-৫২ সালে ২৬ লক্ষ গাঁটে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ২ লক্ষ গাঁটে নেমে আসে।

বিনিময়হার নীতি

বাঙালিদের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নীতির পার্থক্যমূলক চরিত্রের কুফল আমদানি ও বিনিময়হারনীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব দ্বারা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালে কোরীয় যুদ্ধকালীন রমরমা অবস্থার অবসান ঘটার পরে পাকিস্তান আমদানিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এটা পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাসে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নকে টিকিয়ে রাখে। এর দরুন বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক রেশনিং এবং উচ্চহারে আমদানিশুল্ক প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়। ১৯৫০-এর দশকে ১৯৫৫ সালের অবমূল্যায়নের সময় পর্যন্ত টাকার মূল্য ১০০% অতিরিক্ত ছিল।[৮০] ১৯৫৮ সালের পরে এ অতিরিক্ত মূল্যায়ন কিছু কমানো হলেও তা ১৯৬০-এর দশকেও শতকরা ৭৪ থেকে ১০০-এর মধ্যে থেকে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান দু'ভাবে এ বিশেষ নীতি-ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টাকার এ অতিরিক্ত মূল্যায়নের অর্থ ছিল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানিকারকরা পাচ্ছিল ভর্তুকি, আর পাট উৎপাদনকারীরা পাচ্ছিল তাদের রপ্তানির জন্য কম দাম। একজন প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ১৯৫৯-৬০-এর একটি মাত্র বছরে টাকার এ অতিরিক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে পাটচাষীদের আয় থেকে ৬.৪% গোপন কর আদায় করা হয়।[৮১] প্রথমদিকের ও শেষদিকের বছরগুলোতে টাকার আরো অতিরিক্ত মূল্যায়ন ঘটায় পাটচাষীদের আয়ের উপর এ কর ১০% পর্যন্ত উঠে থাকতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের আমদানিকারকরা অনুরূপ কোন সুবিধা পায় নি, যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের কঠোর আমদানিনীতির দ্বিতীয় পরিণাম ছিল বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিম

৭৯. ঐ।

৮০. A. I. Islam, 'An estimation of the extent of the overvaluation of the domestic currency at the official exchange rate. *PDR*, Spring 1970

৮১. A. R. Khan , *Economy of Bangladesh.*

পাকিস্তানী আমদানিকারকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। ১৯৫২ সাল থেকে পাকিস্তানের আমদানিবাজারে অবাধ নীতির অতি সামান্যই বজায় ছিল। টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নভিত্তিক বিনিময়হার বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহের চাইতে চাহিদাবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা স্থির হয় কারা আমদানির সুযোগ পাবে এবং সেভাবেই বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হয়।[৮২] বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের এ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে এ সত্যের মাধ্যমে যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে পাকিস্তানের মোট আমদানির ৬৯ শতাংশ যায় পশ্চিম পাকিস্তানে।[৮৩]

আমদানিতে এ আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের অংশবিশেষ উদ্ভূত হয়েছে বাজারের গতিময়তা থেকে। একটি বৃহত্তর ও অধিকতর গতিময় অর্থনীতি ভোগ্য, মধ্যবর্তী ও মূলধন দ্রব্যাদির আমদানিচাহিদা বৃদ্ধি করে। এর ফলে অধিকতর আনুকূল্যপ্রাপ্ত অঞ্চলের যে বিকাশ ঘটে সেটা আমদানির চাহিদা আরো বাড়িয়ে দেয়। এমনি করে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুততর উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ফলে সেখানে আমদানির জন্য বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি হয়। অবশ্য যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, অতিরিক্ত মূল্যায়নের কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের আমদানিচাহিদাই অপূর্ণ ছিল। কঠোর আমদানিনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অধীনে এক অঞ্চলের তুলনায় অপর অঞ্চলের আমদানিচাহিদা অধিকতরভাবে মেটানো নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার আওতায় থেকে যায়। পশ্চাৎপদ পূর্বাংশের উন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য সম্পদ প্রদানের প্রয়োজন থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের আনুকূলে অনুরূপ পার্থক্যমূলক আমদানিনীতি অনুসৃত হলে তা এ অঞ্চলে যে সম্পদ আকর্ষিত হতো সেটা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর আঞ্চলিক সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতো এবং উৎপাদন ও আয়ের বৈষম্য কমিয়ে আনতো।

কার্যত আমদানি রেশনিং ভিন্নমুখী কাজ করে। ১৯৫০-এর দশকে বাণিজ্যিক আমদানির জন্য প্রদত্ত নগদ আমদানি লাইসেন্সসমূহের সিংহভাগ কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানিকারকদের হাতে চলে যায় তা আমরা লক্ষ্য করেছি। আমদানি রেশনিং-এর পদ্ধতিটা এসেছে আমদানির অধিকার কাদের রয়েছে সেটা স্থির করার ব্যবস্থা থেকে। সেটার ভিত্তি ছিল ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকের ওজিএল নীতি, যেজন্য আমদানির বেশিরভাগ চলে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এ ব্যবস্থার অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে সৃষ্ট আদি বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থায়ী হয়ে পড়ে।[৮৪] ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পস্থাপনের জন্য যেসব আমদানি লাইসেন্স দেয়া

৮২. P Thomas, S N H Naqvi, N Chowdhury, *Basic Statistics Tables: Import Licensing in Pakistan, 1953-64*, Research Report No, 35, PIDE, 1965.

৮৩. Muhith, *Bangladesh*

৮৪. Thomas, Naqvi and Chowdhury, *Basic Statistics*

হয় সেগুলো পরবর্তীকালে শিল্পে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানকে আমদানি অধিকারের বৃহত্তর হিস্যা প্রদানের ভিত্তিতে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে ৯০% বাণিজ্যিক আমদানি লাইসেন্স দেয়ার সচেতন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন আমদানিকারক গ্রহণ (বাঙালি) এবং কিছুকালের জন্য কেবল পূর্বাংশেই শিল্পস্থাপনের অনুমতি দান ব্যতিরেকে এ ব্যবস্থার অধীনে আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান যে পশ্চিম পাকিস্তানের সমপর্যায়ে যেতে পারবে তার কোন উপায়ই ছিল না। অনুরূপ হস্তক্ষেপমূলক ব্যবস্থা স্পষ্টতই রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতো না এবং পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানির সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলার দরুন গুরুতর বাজারসমস্যাও সৃষ্টি করতো।

বিনিময়হার নীতিতে এ বিকৃতি এবং আমদানির অধিকার বরাদ্দে বিভেদাত্মক নীতির ফল আরো অবনতির দিকে যায় এ কারণে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাণিজ্যিক ও শিল্পখাতে আমদানিকারক হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় মূলত অবাঙালিরাই উপকৃত হয়। সুতরাং এ বাণিজ্যিক ও বিনিময়হার নীতি কেবল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ বরাদ্দের ব্যাপারেই অবিচার করে নি, পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে বাঙালি পাটউৎপাদনকারী ও অবাঙালি শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বরাদ্দের ক্ষেত্রেও অবিচার করেছে।

বাণিজ্যঘাটতি পূরণে অর্থসংস্থান

বাজারের স্থান ও কার্যকারণ সম্পর্কের বর্ধিষ্ণু গতিময়তার যুক্তি কিছুটা বেশি সহনীয় হতো যদি পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস না হতো। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে পাকিস্তানের মোট রপ্তানিআয়ের ৫৫ শতাংশ অর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান।[৮৫] তেইশ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল। এর মধ্যে ৩ বছর ছিল ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত। শেষ তিন বছরে অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পশ্চিমাংশে বহু বছর ধরে উচ্চহারে শিল্পবিনিয়োগের সুফল পাওয়া যেতে থাকে রপ্তানির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ও রপ্তানিকাঠামোর অধিকতর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫ বাদে ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানির চাইতে রপ্তানিতে একটানা উদ্বৃত্ত থাকে। শুধু শেষ তিন বছরে ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত আমদানিবৃদ্ধি ও রপ্তানিতে স্থবিরতার দরুন পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেবে ঘাটতি দেখা যায়। তুলনায় পুরো ২৩ বছরের মধ্যে ১৯৫০-৫১ ছাড়া বাকি প্রত্যেকটি বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। পশ্চিমের ২৩.২ বিলিয়ন টাকার ঘাটতির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৫ বিলিয়ন টাকা।[৮৬]

৮৫. ঐ।

৮৬. Thomas, Nuqvi and Chowdhury, *Basic Statistics*, Table 7, 8.

আঞ্চলিক বাণিজ্যের হিসাবে উপরোক্ত অসমতা থেকেই এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রুততর শিল্পায়ন, শিল্পের বিকাশ ও বৈচিত্র্যসাধনের খরচ যোগানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ স্থানান্তরিত হয়েছে, বিশেষকরে ১৯৫০-এর দশকে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাথে আন্তঃঅঞ্চল বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ছিল স্থায়ী ব্যাপার। এ অসমতা পরবর্তী সময়ে এবং ১৯৬০-৭০ সাল নাগাদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭.৫ বিলিয়ন টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানীরা দাবি করতো যে, বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের ক্ষতি আংশিকভাবে পুষিয়ে দেয়া হতো দুই অংশের আন্তঃঅঞ্চল বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত দ্বারা। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা এ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, পূর্ব-পশ্চিম অংশের বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তসমূহ টাকার অতিরিক্ত মূল্যায়নের কারণে তুলনীয় নয়। তদুপরি, পাকিস্তানে পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনশিল্পের অনুপস্থিতিতে উন্নয়ন ও কাঠামোগত পরিবর্তন চালিয়ে যাবার প্রয়োজনে একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রায় ওসব দ্রব্যাদি কিনতে হতো বলে টাকার উদ্বৃত্তের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্তের তুলনা করা চলে না।

বৈদেশিক সাহায্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য

বৈদেশিক সাহায্য বিদেশ থেকে অর্থপ্রাপ্তির একটা বড় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৫০-এর দশকের শেষদিক থেকে পাকিস্তান তার উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর ক্রমেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান ৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঋণ ও মঞ্জুরি পায়।[৮৭] এর মধ্যে ৫.৬ বিলিয়ন ডলার আসে ঋণ হিসেবে এবং ১.৪ বিলিয়ন ডলার আসে মঞ্জুরি হিসেবে।[৮৮] ঋণতহবিলের ২ বিলিয়ন ডলার প্রজেক্ট সাহায্য ও ০.৯ বিলিয়ন ডলার প্রজেক্টবহির্ভূত সাহায্য ছিল এবং ০.১৫ বিলিয়ন ডলার আসে মার্কিন পিএল ৪৮০-এর অধীনে খাদ্য ও পণ্যঋণ হিসেবে।[৮৯] মঞ্জুরি তহবিলের বেশিরভাগই খাদ্যসাহায্য। তবে তার মধ্যে কিছু প্রজেক্ট ও পণ্যসাহায্যও ছিল। ৫ নং সারণিতে এ সাহায্য ও ঋণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রদত্ত ৭.৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে পূর্ব পাকিস্তান পায় ২.০২ বিলিয়ন ডলার (২৬.৬%)। ১৯৪৭-৭০-এব মধ্যে প্রদত্ত তহবিলের প্রায় ৬.৪ বিলিয়ন

---

৮৭. ঐ।

৮৮. ঐ।

৮৯. প্রাগুক্ত।

ডলার কাজে লাগানো হয়। তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাজে লাগানো হয় ১.৯ বিলিয়ন ডলার (৩০%)।

বিদেশী সাহায্য পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে পাকিস্তানে উন্নয়নখাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১.৯৪ বিলিয়ন টাকা। হিসাবে দেখা যায়, এর ৬১.৫৮ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ ৬৭ শতাংশই ছিল প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য।[৯০] পশ্চিম পাকিস্তানের মোট ৬২ বিলিয়ন টাকা উন্নয়নব্যয়ের শতকরা ৬৮ ভাগই ছিল বৈদেশিক সাহায্য। পূর্ব পাকিস্তানের ৩০ বিলিয়ন উন্নয়নব্যয়ের ৬৪.৫% ছিল বৈদেশিক সাহায্য।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, উন্নয়নব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদত্ত বৈদেশিক সাহায্য ও তা ব্যয়ের সাথে অতিমাত্রায় সম্পর্কিত ছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, পূর্ব পাকিস্তান ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্যের ৩০ শতাংশ এবং মোট উন্নয়নব্যয়েরও ৩০ শতাংশ লাভ করে। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৈষম্যমূলকভাবে বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ প্রদান ও ব্যয় দুই অঞ্চলের উন্নয়নে বিদ্যমান বৈষম্যকে প্রভাবিত করে। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, বৈদেশিক সাহায্য হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাঙালিদের বঞ্চনাবোধকে আরো তীব্র করে তোলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের ন্যায্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আত্মসাতের প্রশ্নে উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর

পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক সাহায্যের অংশ পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারটি সম্পদ স্থানান্তরের প্রশ্নের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৫০-এর দশকে বাঙালিরা বিশ্বাস করতো যে, তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। এ স্থানান্তরের দরুন পূর্ব পাকিস্তানের যে ক্ষতি হয় সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যঘাটতি দ্বারা পূরণ হয় নি। যাহোক, এর সাথে যদি আমরা পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্যের অংশকে যোগ করি, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের অধিকতর ব্যাপক পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে।

এসব বিতর্কের অংশবিশেষের মধ্যে ধারণাগত বিভ্রান্তি ও হিসাবে গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলভুক্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদগণ অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে এটা স্পষ্ট করে দেন। ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০-এর মধ্যে সকল বছরে পাকিস্তানী টাকার যে অতিরিক্ত মূল্যায়ন হয়েছে তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অঙ্কে টাকার মূল্য

৯০. সারণি ৪-এ উপস্থাপিত হিসাব থেকে প্রাপ্ত।

নির্ধারণ করে তাঁরা আন্তঃঅঞ্চল ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের একটা কাছাকাছি হিসাব দাঁড় করাতে সক্ষম হন।

৬ নং সারণিতে আমরা অর্থনীতিবিদ প্যানেলের তৈরি আঞ্চলিক ব্যালেন্স অব পেমেন্টের মোটামুটি হিসাব তুলে ধরবো। ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত থাকে এবং সেটা অধিক মূল্যের হিসেবে ৫.৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি দাঁড়ায় ২১ বিলিয়ন টাকা। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে উভয় অঞ্চলেরই ঘাটতি হয়, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৩.৭ গুণ বেশি। উভয় অঞ্চলের ঘাটতি পূরণ হয় বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা। পশ্চিম পাকিস্তান এভাবে বৈদেশিক সাহায্যের বৃহত্তর হিস্যা লাভ করে। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও পেমেন্টের উদ্বৃত্ত এবং তৎসহ সকল বৈদেশিক সাহায্য আত্মসাৎ করে এবং এর জন্য আন্তঃঅঞ্চল রপ্তানির মাধ্যমে আংশিকভাবে মূল্য দিতে থাকে। ১৯৫০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত থাকার কারণে এখান থেকেই সম্পদ রপ্তানি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান কোন বৈদেশিক সাহায্য পায় নি। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আত্মসাৎকরণের মাধ্যমেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদের স্থানান্তর ঘটে। বৈদেশিক সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের 'প্রাপ্য' হিস্যা ও প্রাপ্ত হিস্যার পার্থক্য থেকেই বৈদেশিক সাহায্যের খাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ স্থানান্তরের হিসাব পাওয়া যায়।

৭ নং সারণিতে আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তরের একটা প্রাক্কলন পেশ করবো। অঙ্কগুলো প্যানেলের বাঙালি অর্থনীতিবিদদের তৈরি হিসাব থেকে নেয়া। সারণিতে দেখা যাবে যে, ১৯৫০-এর দশকে দায় পরিশোধের উদ্বৃত্ত থাকার কারণে ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তান ৮.৯৬ বিলিয়ন টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করে। তবে ১৯৬০-এর দশকে দায় পরিশোধের হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল। কিন্তু তবু পূর্ব পাকিস্তান তার বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য হিস্যা থেকে ১২.২ বিলিয়ন টাকা ছেড়ে দেয়, যার ফলে স্থানান্তরের পরিমাণ ১৯৫০-এর দশকের তুলনায় বেশ কিছুটা কম থাকে। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান মোট ১১.৮ বিলিয়ন টাকার সম্পদ স্থানান্তর করে, যা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে নিয়োজিত হয়। ওটা ছিল ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট উন্নয়নব্যয়ের ১৯ শতাংশ। উক্ত ১১.৮ বিলিয়ন টাকা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হলে এ অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ৩৯% ভাগ বৃদ্ধি পেতো।

সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে উচ্চতর অনুপাতে সম্পদ সমাবেশের ক্ষমতার কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুততর গতিতে উন্নয়ন ঘটেছে এমন ধারণা গুরুতর ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সঞ্চয় ও বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যাই পশ্চিম

পাকিস্তানকে তার সাধ্যের বাইরে উন্নয়ন সাধনে সক্ষম করে তোলে। ১৯৬০-৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ০.৯%-এর তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে সঞ্চয়ের হার ছিল ৪.৩%।[৯১]

পাকিস্তানের আপেক্ষিকভাবে অধিক পশ্চাৎপদ ও অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলটি তার সম্পদসমূহ ও গোটা দেশের নামে আনীত তার বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পাকিস্তানের অধিকতর উন্নত অংশের উন্নয়নের জন্য ছেড়ে দেয়, এটা সত্যি একটি নির্মম পরিহাস। ন্যায়পরায়ণতা ও গণতন্ত্র এর উল্টোটাই দাবি করতো। কাজেই সম্পদ স্থানান্তরের বিষয়টি যে তিক্ত বিতর্কের প্রশ্নে পরিণত হয় এবং বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চিত হবার চেতনাকে আর যেকোনো কিছুর চাইতে বেশি বদ্ধমূল করে দেয় তাতে বিস্ময়েব কিছু নেই।

ফেডারেল ফিন্যান্সের সমস্যা

বাণিজ্যিক ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ তো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অসমতা স্থায়ীকরণের একটা প্রধান মাধ্যমরূপে বিদ্যমান ছিলই, তার পাশাপাশি ফেডারেল ফিন্যান্স ব্যবস্থা ছিল আর একটা সমান্তরাল মাধ্যম। ফেডারেল বাজেটে রাজস্ব সংগৃহীত হয় উভয় অঞ্চলে রাজস্ব আদায় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত থেকে। পরে এসব রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার কিম্বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ দ্বারা দুই অঞ্চলের যেকোন অঞ্চলে ব্যয়িত হয়। একটি কারণ ছাড়া রাজস্ব সংগ্রহের হিসাব নিরূপণে স্বাভাবিকভাবে কোন সমস্যা ছিল না। সেই কারণটি হচ্ছে এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সদর দপ্তর, কিন্তু ব্যবসা করে উভয় অঞ্চলে এমন বহু কোম্পানি তাদের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়ে নিত তাদের সদর দপ্তরের মাধ্যমে। তদুপরি, জাহাজযোগে পশ্চিম পাকিস্তানে যেসব তৈরি ও আধা-তৈরি পণ্য প্রেরিত হতো সেগুলোর কাস্টমস ও আবগারি কর অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানী ভোক্তাদেরকেই দিতে হতো। কেন্দ্র তা সংগ্রহ করতো পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত আমদানিকারক ও প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে। হিসাবটা এমনভাবে করা হতো যাতে পূর্বাংশে প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহকৃত রাজস্ব আঞ্চলিক একাউন্টে আসলে জমা দেখানো হয়েছে তার ১০% ভাগ কম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের প্রকৃত প্রাক্কলনে পশ্চিম পাকিস্তানে সংগ্রহের উচ্চহার দেখা যায়। ১৯৬১ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ২২%।[৯২] ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, ঐ তিন বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ২৫.৫% থেকে ২৯.৮% পর্যন্ত কেন্দ্রীয় রাজস্ব

৯১. Rehman Sobhan, 'Who pays for development,' *Forum,* (Dhaka), February 28, 1970.

৯২. Rounaq Jahan, *Pakistan*

সংগৃহীত হয়।[৯৩] কেন্দ্রীয় রাজস্ব সংগ্রহ, উৎপাদন, বিক্রয় ও আয়ের উপর কাস্টমসশুল্ক ও করভিত্তিক হওয়ায় এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা আমদানি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থানের ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্যকে প্রতিফলিত করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় রাজস্বভাণ্ডারে পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতর অবদান থেকে উন্নয়নবৈষম্যের আরেকটি পরিমাপই শুধু পাওয়া যায়।

বৈষম্যের উৎসরূপে রাষ্ট্র

প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য খাতের মতো সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল বিরাট। ৪ নং সারণিতে সরকারি রাজস্বব্যয়ের পর্যালোচনা দ্বারা এটা তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ২৩%। তার মানে হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তান রাজস্বখাতে যা দিয়েছিল তার চাইতে সামান্য কম পেয়ে জমা-খরচের সমতার দিকে যাচ্ছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে পাচ্ছিল একটু বেশি। কার্যত রাজস্বের হিসাবে এ উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির মানে তেমন বেশি কিছু ছিল না, যেহেতু উন্নয়নের বৃহত্তর অংশের জন্য অর্থ যোগাতো বৈদেশিক সাহায্য। যাই হোক, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর মাত্রায় রাজস্বব্যয় সেখানকার অধিবাসীদের জন্য চাকুরির অধিকতর সুযোগ ও অর্থনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাবার কার্যকর চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

স্বাধীনতার পথ

এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি ও তাকে স্থায়ী করার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতে এর সরকারি ব্যয় বরাদ্দের নীতি, এর বৈদেশিক ব্যয়বরাদ্দের নীতি, এর বৈদেশিক সাহায্যবরাদ্দের নীতি ও বৈদেশিক মুদ্রাবরাদ্দের নীতি সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে। বিনিময়হার ও আমদানি সংক্রান্ত নীতিপদ্ধতি বেসরকারি খাতের জন্য একটা উৎসাহপ্রদায়ক কাঠামো সৃষ্টি করে, যা ছিল কৃষির চাইতে শিল্পের প্রতি এবং বাঙালিদের চাইতে অবাঙালিদের প্রতি বেশি অনুকূল। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন, কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেই আলোচনার ইতি টানা ঠিক হবে।

৯৩. Muhith, *Bangladesh*

গণতন্ত্র ও বৈষম্য

রাষ্ট্রযন্ত্রের গঠন অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি সহনীয় হতো। পাকিস্তান রাষ্ট্র তার গোটা অস্তিত্বকালে দেশ শাসনে বাঙালিদেরকে কার্যকর ভূমিকা পালন করা থেকে বঞ্চিত রাখে। পাকিস্তানের পুরো আমলব্যাপী প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল বশংবদ। ১৯৪৭ সালে একটা জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য কোন প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর মধ্যে ব্যালটের মাধ্যমে কেন্দ্রে একবারও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে নি। কাজেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা সঠিক হবে যে, পাকিস্তানের জন্মের পরবর্তী কয়েক বছর বাদে বাকি সময়ের কোন কেন্দ্রীয় আইনসভা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে গঠিত ছিল না।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগুরু। ভোটারসংখ্যার দিক থেকেও তাদের ছিল সংখ্যাধিক্য। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুপস্থিতি তাদের জন্য ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণভার বাঙালিদের কেউ কোন পর্যায়ে পায় নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে অর্ধেক সময়ের জন্য তিন জন বাঙালি প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন সাক্ষীগোপাল এবং একজন ছিলেন একটি কোয়ালিশনের সংখ্যালঘু অংশীদাররূপে ক্ষমতাসীন। কিন্তু আইনসভার কোন তোয়াক্কা না করে মাত্র ১৩ মাসের মধ্যে শেষোক্ত জনকে অপসারিত করা হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান দু'জন সৈনিক প্রেসিডেন্ট যোগায়। তাঁরা কেন্দ্রে অবিসংবাদী ও সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করেন।

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতার দরুন এবং জাতীয় আইনসভাসমূহের গুরুত্ব না থাকার কারণে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র, সশস্ত্রবাহিনী এবং শেষদিকে ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী কর্তৃক কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়। ঐ ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফেডারেল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার কেবল অভ্যন্তরীণ রাজস্বের মূল উৎসগুলো এবং বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানিআয় বরাদ্দের ক্ষমতাই হাতে রাখে নি, অর্থনীতি সংক্রান্ত সকল প্রধান নীতিনির্ধারক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলো ছিল কেন্দ্রের সৃষ্ট পুতুল।

কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীগুলোর কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষত তাদের উচ্চতর স্তরে প্রাধান্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের। ৮ নং সারণিতে কেন্দ্রের ক্ষমতাকাঠামোর গঠন কি রকম ছিল তার একটা চিত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার উচ্চতর স্তরগুলো থেকে বাঙালিদের কোটার পরিমাণ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। তা ঐ সারণিতে কম করে দেখানো হয়েছে। পাকিস্তানে ছিল মূলত অতিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার। আইয়ুব খান ও পরে খানের মতো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট থাকার মানে হচ্ছে

বাঙালিদেরকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে রাখা। পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন বাঙালি অর্থমন্ত্রী হন নি কিংবা বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা নিয়ন্ত্রণকারীর পদে কোন বাঙালি কখনো নিযুক্ত হন নি। ১৯৭১ সালে পরিকল্পনা কমিশন বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সে অবধি কোন বাঙালি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন নি। কোন বাঙালি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি হন নি। শুধু ১৯৬৯ সালে একজন বাঙালি প্রথমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোন বাঙালি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর হন নি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে কোন বাঙালি যুগ্ম-সচিবের পদ পর্যন্ত উঠতে পারেন নি। আর সশস্ত্রবাহিনীগুলো তো ছিল কমবেশি পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই একচেটিয়া।

কাজেই এ কথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বাঙালিদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চতর এবং এমনকি মাঝারি পদ থেকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রগুলো থেকে, বিশেষকরে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।

প্রাদেশিক সরকারকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা

১৯৫০-এর দশকে কেন্দ্রের প্রাথমিক অপকর্মগুলো পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম লীগ সরকার নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে। এগুলোই আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার দরুন তার কেন্দ্রের মোকাবেলা কবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। ১৯৫৪-৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ শাসনের কালে কেন্দ্রের কাছ থেকে সম্পদ দাবি ও প্রদেশের ক্ষমতা রক্ষার কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে প্রাদেশিক সরকারগুলোর অধীন প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রের উঁচু পদগুলোতে বসে ছিলেন আবাঙালিরা। সংস্কৃতি ও চাকুরিসূত্রে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকায় এসব অবাঙালি অফিসার কেন্দ্রের মোকাবেলায় তাঁদের বাঙালি মন্ত্রীদেরকে খুব কমই সমর্থন দিতেন। আওয়ামী লীগ সরকার আমলাতন্ত্রের বাইরে গিয়ে প্রবীণ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা বোর্ড গঠনের প্রয়াস নেয়। কিন্তু তাঁদের এসব প্রচেষ্টা প্রাদেশিক প্রশাসনকে অবাঙালি আমলাদের কবলমুক্ত করতে অথবা কেন্দ্রের সাথে তাদের আমলাতান্ত্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সফল হয় নি। ফলে, পরিকল্পনা বোর্ড প্রাদেশিক প্রশাসনের মধ্যে একটি নতুন কর্তৃত্বের উৎসরূপে কাজ করতে না পেরে কেন্দ্রের সাথে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে বাঙালিদের দাবিদাওয়া নিয়ে ওকালতির একটি সংস্থায় পরিণত হয়।

১৯৬০-এর দিকে বাঙালিরা প্রাদেশিক সচিবের পদ লাভ করতে শুরু করার পর কেন্দ্রের সাথে সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিতর্কে বাঙালিদের দাবি উত্থাপনের অধিকতর সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সামরিক আইন প্রবর্তন এবং

জাতীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রধান নির্বাহীর কুক্ষিগত হবার পর কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় স্তরে বাঙালি মন্ত্রী ও প্রাদেশিক গভর্নরদের চাকুরি প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশির অধীন হয়ে পড়েছিল। তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক মর্যাদা কিংবা রাজনৈতিক সমর্থন না থাকায় অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার উপর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যের বলয়ে বাঙালি আমলাদেরকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে কাজ চালাতে হয়, যেখানে বাঙালি মন্ত্রীরা কেন্দ্রের সাথে যেকোন মোকাবেলার সময় আসলেই তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারতেন না। প্রাদেশিক প্রশাসনের ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন প্রকৃতির দরুন অনুরূপ ওকালতির সুযোগ এমনিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রদেশে ও কেন্দ্রে কর্মরত বাঙালি আমলারা এভাবে প্রায় ক্ষেত্রেই গোপন তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করতে পেরেছেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষ সমর্থনকারী অর্থনীতিবিদদের পরামর্শদাতায় পরিণত হয়েছেন।

ব্যবসা খাতে বাঙালিদের কোণঠাসা অবস্থা

পাকিস্তানের ইতিহাসের গোটা সময়টায় বাঙালিরা অনুভব করে যে, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস, যথা প্রেসিডেন্ট পদ, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রধান পদ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সত্যিই তাদেরকে এসব পদের বাইরে রাখা হয়েছিল। জাতীয় ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে জাঁদরেল অবাঙালি ব্যবসায়ীদের উত্থানও বাঙালিদেরকে জোর দিয়ে কথা বলার কোন সুযোগ দেয় নি। যে ৪৩টি পরিবার পাকিস্তানী অর্থনীতির উপর প্রভুত্ব করতো, তাদের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন এ. কে. খান।[৯৪] ১৯৫৯ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, পাকিস্তানের সকল শিল্পপরিসম্পৎ-এর মাত্র ২.৫ ভাগ ছিল বাঙালি মুসলমানদের হাতে।[৯৫] সে পর্যায়ে যেসব বাঙালি হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা করতো, তাদের হাতে ছিল পরিসম্পৎ-এর শতকরা ৮.৫ ভাগ। এতে বাঙালি মালিকানাধীন পরিসম্পৎ দাঁড়ায় ১১%। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে হিন্দুদের মালিকানাধীন পরিসম্পৎ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের কাজ-কারবারগুলো অবাঙালি মুসলিমরা দখল করে নিচ্ছিল। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর সকল 'হিন্দু' পরিসম্পৎ (মাড়োয়ারিদের ২.৫%-এর যাকিছু অবশিষ্ট ছিল সেসব সহ) ১৯৬৫ সালের শত্রুসম্পত্তি অর্ডিন্যান্সের বলে বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়। এতে কার্যত বাঙালিদের হাতে থাকে শিল্পপরিসম্পৎ-এর শতকরা ৫ ভাগেরও কম। এভাবে বাঙালিদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল ধাপের বাইরে রাখার কাজটি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়। ক্লীব ও প্রতিনিধিত্বহীন রাষ্ট্রীয় আইনসভায় বাঙালিদের ৫০ শতাংশ আসন ছিল বটে, কিন্তু তাদের মন্ত্রীরা একজন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের খেয়ালখুশির অধীন থাকায় বাঙালিরা বরাবর পাকিস্তানের ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে।

৯৪. L J. White, *Industrial Concentration and Economic Power in Pakistan*, (Princeton, USA 1974)

৯৫. G Papanek, *Pakistan's Development*

বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে বাঙালি জনগণকে সুস্পষ্টভাবে বঞ্চিত করার ফলে বাঙালিরা জাতীয় ক্ষমতা থেকে তাদেরকে বাইরে রাখার ব্যাপারটিকে আঞ্চলিক বৈষম্যের সাথে এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্র কর্তৃক একচেটিয়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে। একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল জাতীয় ক্ষমতার হিস্যা লাভকল্পে বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামেরই অংশ। কিন্তু ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' প্রবর্তনের ফলে ১৯৫৯ সালের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচাল হওয়া, ১৯৬২ সালে প্রদেশগুলোকে কোন ক্ষমতা না দিয়ে প্রধান নির্বাহী ও কেন্দ্রের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার হরণ বাঙালিদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, তারা জাতীয় ক্ষমতার হিস্যা কখনো পাবে না। ১৯৬৩ সালে আওয়ামী লীগ নেতা এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু সেই একমাত্র ব্যক্তিটিকে দৃশ্যপট থেকে অপসারিত করে, যাঁর একটি জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলী ছিল এবং যিনি জাতীয় ক্ষমতা পেতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগে তাঁর, বিশেষকরে শেখ মুজিবুর রহমানের মতো উত্তরাধিকারীদের বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে, বাঙালিরা কোনদিন জাতীয় ক্ষমতা পাবে না এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে কখনো ন্যায়বিচার পাবে না। এরকম ধারণার যৌক্তিকতা আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে এটা ১৯৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদীয়মান নেতাদেরকে প্রভাবিত করে। এরকম একটা ধারণা বা বোধ থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৬৫ সালের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে বিরোধীপক্ষ আইয়ুব খানকে আসনচ্যুত করতে ব্যর্থ হবার পরে আওয়ামী লীগ এবং বেশিরভাগ অন্যদল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়োজিত করে।

আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ একটি ছয় দফা সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচি পেশ করে। পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষিত ছয় দফা দেখিয়ে দেয় যে, বাঙালি নেতৃত্ব আইয়ুবের অপসারণের মাধ্যমে জাতীয় ক্ষমতা দখলের চাইতে পাকিস্তানী শাসন থেকে বাঙালিদের মুক্তি ও তাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারেই অধিকতর আগ্রহী।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার দাবির মধ্যে বাঙালি মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি নিহিত ছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার যে দাবি তুলেছিলেন এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম[৯৬], তাও বাঙালি মুসলিমদের সেই দাবিরই পুনরুক্তি। লাহোর প্রস্তাবের পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ এবং

৯৬. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*

সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' এই উভয় উদ্যোগের পিছনে এ ধারণাই কাজ করেছিল যে, বাঙালিরা কখনো কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হিস্যা পাবে না, কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে একমাত্র স্বায়ত্তশাসন লাভের মাধ্যমে।

ছয় দফার উৎপত্তি হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১৯তম দফা থেকে। এতে বলা হয়েছিল :

> ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা এবং কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়সমূহ ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে আর সকল বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের বৈধ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা হবে। এমনকি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে থাকে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বর্তমান আনসার বাহিনীকে পুরাদস্তুর মিলিশিয়াতে পরিবর্তিত করা হবে।

পরবর্তী ১২ বছরে ১৯৫৪ সালে উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের এ দাবিটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখার দরুন ১৯৬৬ সালে এ দাবিটি আরো তীব্র ও চূড়ান্ত আকারে পুনরুজ্জীবিত হয়।

ছয় দফার ২য় দফায় ২১ দফার মতোই প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়টি কেন্দ্রের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থার উপর কেন্দ্রের এখতিয়ারকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তৃতীয় দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটো বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয় :

> পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
>
> অথবা, দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে এবং দুই অঞ্চলে দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে।

বিগত এক যুগের কেন্দ্রনির্ধারিত মুদ্রানীতির অভিজ্ঞতা থেকেই এ দাবিটি তোলা হয়েছিল। ছয় দফা কর্মসূচিতে মুদ্রানীতিকে আঞ্চলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাওয়া হয়েছিল অঞ্চলের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক তৎপরতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে। তৃতীয় দফায় ধরে নেয়া হয় যে, মুদ্রানীতির উপর আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে এ অঞ্চলে ব্যবসারত অবাঙালি ব্যবসায়ীরা তাদের পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্থানান্তরিত করতে পারবে না, অর্থাৎ এ অঞ্চল থেকে পুঁজিপাচার নিয়ন্ত্রিত হবে। মুদ্রার অবাধ বা সহজ বিনিময়যোগ্যতা গ্রহণ ও পুঁজির আন্তঃঅঞ্চল চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথাসহ

এ দফাটি কিছুটা পরস্পরবিরোধী। বাণিজ্যিক নীতির পরিবর্তে মুদ্রানীতির মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তর নিরোধের এ ধারণাটি ছিল কিছুটা ভ্রান্তিপূর্ণ, যেহেতু এতে ধরে নেয়া হয় যে, সম্পদ স্থানান্তরের উপায় বাণিজ্যিক চ্যানেল নয়, মুদ্রাব্যবস্থা।

ছয় দফার চতুর্থ দফা দাবি করে ঃ

> সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে ফেডারেশনভুক্ত আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আপনা হতেই আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর এ মর্মে বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এ ব্যবস্থা দ্বারা খাজনা-ট্যাক্স-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতাকে বাংলাদেশে সম্পদ সৃষ্টির উপায়রূপে এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করার নীতিগত হাতিয়াররূপে কাজে লাগাতে চাওয়া হয়েছিল। এতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করা হয়েছিল রাজস্বের একটা তোলা বা লেভি ব্যবস্থার মাধ্যমে। শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকবে যে আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত খাজনা-ট্যাক্স থেকে ফেডারেল সরকারের লেভি বা টাকা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হয়ে যাবে।

ছয় দফার এ দফাটিই কয়েকটি কারণে অত্যধিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং বলা হয় যে, এটাই নাকি ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ভণ্ডুল করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কৃতসংকল্প করে তোলে। কার্যত এ দফাটি প্রথমদিকে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই বেশি অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারতো। দেশজ রাজস্ব থেকে স্বীয় উন্নয়নের তহবিল যোগানোর দায় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে এ অঞ্চলের মধ্যে কার্যত আদায়কৃত জাতীয় রাজস্বের ৩০ শতাংশের উপর নির্ভর করতে হতো। উন্নয়নের নিম্ন স্তর এবং দুর্বল করভিত্তির কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায় গ্রহণ করার জন্য মোটা অঙ্কের রাজস্বউদ্বৃত্ত গড়ে তুলতে বাংলাদেশের অনেক সময় লেগে যেতো। এমনকি প্রদেশগুলো থেকে কেন্দ্রের জন্য দেয় লেভিকে আঞ্চলিক জিডিপি-এর আকারের ভিত্তিতে আনুপাতিক করা হলেও পশ্চিম পাকিস্তান তার প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোকে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সব রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারতো। অদ্ভুত শোনালেও সত্য এই যে, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা হাতে রেখেই একটি শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিরক্ষা বাজেটকে খর্ব করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় রাজস্ব পুনর্বণ্টন করতে পারতো। সেক্ষেত্রে বার্ষিক বাজেট হয়ে দাঁড়াতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, কেন্দ্রীয় মঞ্জুরির জন্য প্রদেশসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাবি এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু-করাচীর মতো অপেক্ষাকৃত ধনী প্রদেশগুলোর নিজেদের অঞ্চলে সংগৃহীত রাজস্বের বৃহত্তর অংশ নিজেদের অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য রেখে দেয়ার দাবির মধ্যে অবিরত দড়ি টানাটানির খেলা। আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় বাজেটের একটি লক্ষ্য ছিল

বাংলাদেশে সম্পদ হস্তান্তর করা। এই হস্তান্তর প্রশ্নে ছয় দফার চতুর্থ দফার দাবিটি ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুর জন্য এবং সেনাবাহিনীর জন্য সবচেয়ে বাস্তবমুখী প্রস্তাব। সেনাবাহিনীর জন্য চতুর্থ দফা স্বার্থহানিকর ছিল না এজন্য যে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত সেনাবাহিনীর রাজস্ব-বাজেট ছিল সমাজতান্ত্রিকভাবে গ্যারান্টিযুক্ত।

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের বিষয়ে পঞ্চম দফাটিই ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এতে বলা হয় :

> ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটসমূহের স্ব স্ব সবকারের অধীনে প্রত্যেক ইউনিটের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকতে হবে।
>
> ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটদ্বয় থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে।

পঞ্চম দফার এ অংশটি আপত্তিকর ছিল না। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে অনেক বেশি ছিল তখন এটা বৈপ্লবিক হতে পারতো। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের আয় কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল এবং তাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের দরুন এ ব্যবধান তাদের অনুকূলে প্রসারিত হতো। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ও পাটজাত দ্রব্যাদি, যা থেকে তার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ৯০% আসতো, তা একটি বিশ্বব্যাপী ক্ষয়িষ্ণু শিল্পে পরিণত হচ্ছিল। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ এই শেষ তিন বছরে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি হতে শুরু করে। কাজেই পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত আয় গ্রাস করার কোন সুযোগ ছিল না।

পঞ্চম দফার যে প্রস্তাবটি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে হজম করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে বলা হয় :

> শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী দেশের বৈদেশিক নীতির সাহায্যকাঠামোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সাহায্য সম্বন্ধে বিদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের ও আমদানি-রপ্তানি করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হতে ন্যস্ত থাকবে।

এ প্রস্তাব পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদেরকে গুরুতর ঝুঁকির সম্মুখীন করে। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানির ৪৫ শতাংশ তারা সরবরাহ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল তাদের মোট রপ্তানির ৪৮ শতাংশ।

পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার ও নিজের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের অধিকার থাকার মানে হলো সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক উৎসগুলো থেকে তার আমদানির অধিকার থাকা। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বেশি ভয় করছিল একারণে যে, সেরকম হলে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে সে রকম বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানী রপ্তানিকারকরা অধিকতর প্রতিযোগী হতো কিনা সেটা একটা তর্কের বিষয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু পণ্যের (যথা কাঁচা তুলা, তৈলবীজ, চাউল ইত্যাদি) পূর্ব পাকিস্তানে চাহিদা ছিল। এ চাহিদা প্রকৃতপক্ষে তৈরি হয়েছিল কৃত্রিমভাবে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে টাকার উচ্চমূল্য রক্ষার নীতিই ছিল ঐ চাহিদার কারণ।

সুতরাং, পূর্ব পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিদেশের সাথে আলোচনার অধিকারদান সংক্রান্ত প্রশ্নটিই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে অনুমান ছিল এই যে, (ক) বাঙালি আলোচকরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্যের যেটুকু পায় তার চাইতে অনেক বেশি আনতে পারবেন এবং (খ) বিদেশ থেকে আলোচনার মাধ্যমে আনীত সেই সাহায্য কাজে লাগানোব অধিকার থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা পশ্চিম পাকিস্তান হস্তগত করতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের হিস্যা হারানোর ব্যাপারটা যদি পশ্চিম পাকিস্তানী সাহায্য সংক্রান্ত আলোচকরা তাদের উচ্চতর আলোচনার দক্ষতা দ্বারা সামলাতে না পারতো, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উন্নয়নব্যয় অনেক বেশি পড়ে যেতো। চতুর্থ পরিকল্পনার প্যানেলভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদরা এবং ১৯৬৯-৭০-এর কান্ট্রি মেমোরেন্ডামে বিশ্বব্যাঙ্ক উপরোক্ত বক্তব্যই তুলে ধরে। উভয়ে যুক্তি দেখায় যে, স্বীয় পুঁজি ও মধ্যবর্তী পণ্যাদি আমদানির অর্থ যোগানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের কিছু কিছু অংশ আরো কয়েক বছর আত্মসাৎ করা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন। ১৯৭০ সাল অবধি আন্তঃআঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এরকম ঔপনিবেশিক ও অদূরদর্শী মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিল যে, স্বায়ত্তশাসন পেলে পূর্ব পাকিস্তান তার বৈদেশিক সাহায্যের অংশ ছাড়বেনা এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক উৎসগুলো থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনবে। এ সম্ভাবনাই পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদে মুখর করে তোলে। উক্ত সম্ভাবনা এবং প্রতিরক্ষা বাজেট সম্পর্কে সশস্ত্রবাহিনীগুলোর ভয়কে ঘিরেই হয়তো বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ছয় দফা কর্মসূচির তাৎপর্য বোঝাতে এবং দাবির উপর তাঁদের অবস্থানের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি অর্থনীতিবিদরা তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। এ পারস্পরিক ক্রিয়াটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে নেতৃবৃন্দ বুঝতে সক্ষম হন যে, ছয় দফা কার্যোপযোগী এবং এ

কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে একটা সংবিধান রচনা করা যেতে পারে; কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ছয় দফা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনায় বসার এবং তাদের সুনির্দিষ্ট আপত্তিগুলো তুলে ধরার বিন্দুমাত্র আগ্রহ পশ্চিম পাকিস্তানী কোন নেতাই দেখান নি। না ইয়াহিয়া খান ও তাঁর উপদেষ্টারা, না ভুট্টো ও তাঁর সহযোগীরা। ১৯৭১-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সঙ্গে আওয়ামী লীগের বৈঠক সাধারণ বিষয়ে মতামত বিনিময় ও বাগ্মিতা প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাতে অর্থবহ কিছুই হয় নি। পিপিপি কিংবা ইয়াহিয়া ছয় দফার সমালোচনায় কোন বাস্তব যুক্তি তুলে ধরেন নি।

ছয় দফার উপর বাস্তব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় একমাত্র ১৯৭১ সালের সেই সঙ্কটময় দিনগুলিতে, যখন ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ ও কামাল হোসেনের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনার জন্য জাস্টিস কর্নেলিয়াস ও কেন্দ্রীয় সরকারের লিগ্যাল ড্রাফটস্‌ম্যান কর্নেল হাসানসহ এম. এম. আহমদকে নিয়ে আসেন। আওয়ামী লীগের আলোচকদেরকে সহায়তা করে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের একটি দল। অর্থনীতিবিদরা বৈঠকে উত্থাপিত সকল অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগের আলোচকদের সাথে আলোচনা করেন। পাকিস্তানের অর্থনীতির এককালের ক্ষমতাবান 'মুগল' এম. এম. আহমদ ছয় দফার মূল অর্থনৈতিক দফাগুলো মেনে নেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় আলোচক দল ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাংবিধানিক পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ঐকমত্যে উপনীত হন।

তবে ঐ সময়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করা হবে রক্ত আর গুলিগোলা দিয়ে, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নয়। কিন্তু ২৩ মার্চ নাগাদ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করে ফেলেন। নির্বাচিত বাঙালি নেতারা ১৯৭১ সালের মার্চে সমসাময়িক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শাসন করছিলেন। তাঁদের আদেশ-নির্দেশ আমলাতন্ত্রের সকল অংশ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল, কিন্তু অবাঙালি ব্যবসায়ীরা ছিল আনুগত্য প্রদর্শনে অত্যন্ত নারাজ।

১৯৭১ সালের ১ মার্চের মধ্যেই প্রজন্মের পর প্রজন্মের রাজনৈতিক সংগ্রাম যা অর্জন করতে পারেনি সেটা অর্জিত হয়ে গিয়েছিল ১৯৭০-এর শেষে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের জন্য পরিচালিত প্রচার অভিযানে, দুই বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনসমাবেশের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনী অভিযান হয়ে উঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধাতুকে পিটিয়ে গঠন করার কামারশালা। ১৯৭১ সালের মার্চের স্ব-শাসন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইস্পাতকে কাঠিন্য প্রদানের নেহাই।

সারণি ২ : মূল ভোগ্যবস্তু ও ভোগ্যব্যয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রবণতা

পণ্য	মাথাপিছু পরিমাপের ইউনিট	১৯৫১/৫২		১৯৫৯/৬০		১৯৬৩/৬৪	
		পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
১. খাদ্য শস্য	প্রতি আউন্স, পি.ডি.	১৪.৯	১৫.৭	১৬.৫	১৫.২	১৬.৮	১৭.৪
২. চিনি	প্রতি আউন্স, পি. এম.	২৪.৫	৪৩.৭	২১.২	৭৫.৭	১০.২	৩৮.৪
৩. চা	প্রতি আউন্স, পি.এম.	০.১৩	০.৬	০.১৩	১.৩	০.১৬	১.১২
৪. দিয়াশলাই	না. পি. ওয়াই	৭.০	১০.০	১৩.০	১৬.০		
৫. কাপড়	গজ পি. এ.	১.৭	১.৪	৩.০	৯.০		
৬. সিগারেট	না. প্রতি পি. এ.	৫.০	৭৬.০৯	৩৩.০	১৮৩.০		
৭. কেরোসিন	গ্যালন পি. এ.	০ ৫	০.৫	০.৬	০ ৯		
৮. কাগজ	পাউন্ড পি. এ.	০.২	০.৫	০.৩	১.৪		
				১৯৬১			
৯. দুধ-মাখন	পাউন্ড পি. এম.			৩.৭	৯.৭	২.১	৮.৬
১০. গরু-খাসির মাংস ও মাছ	পাউন্ড পি. এম.			৩.১	০.৭	০.৪	১.৭
			১৯৬০		১৯৬৩/৬৪		১৯৬৬/৬৭
১১. গৃহস্থালি, টাকায়, মাসিক ভোগ্য ব্যয়		১২১.৯	১৪৩.৮	১২৩.২	১৭০.২	১৫১.৫	২১১.৪
১২. বৈষম্য % সূচক পশ্চিম-পূর্ব (*১০০) পূর্ব		১২১.৯ ২৬.৬	১৪৩.৮	১২৩.২ ৩০.৮	১৭০.২	১৫১.৫ ৪০.০০	২১১.৪

সূত্র : (১-৭) ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০ এর জন্য এম ইউ খান প্রদত্ত বিবরণ দেখুন। অবশিষ্টগুলো[illegible]

১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকরা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দলসমূহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাণীকে বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহে পৌঁছে দেন। এ বাণীর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রশ্ন এবং সমাপ্তিতে নিজেদের সমস্যা সমাধানে বাঙালিদেরকে ক্ষমতাদানের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সমাবেশের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ১৯৭১ সালের মার্চে স্ব-শাসনের প্রশ্নটি জোরদার হয়ে উঠেছিল। নির্বাচন স্ব-শাসনের জন্য রাজনৈতিক ম্যান্ডেট প্রদান করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে ৭ কোটি বাঙালির

সারণি ৩ : সামাজিক ও বাহ্য অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বৈষম্য

বিষয়	পরি-মাপের ইউনিট	১৯৫১/৫২		১৯৫৯/৬০		১৯৬৭/৬৮	
		পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
১. বিদ্যুৎ	কিলো-য়াট পি.এ.	০.৫	৮.৬	১.৬	২৮.৮	৩৭৮ মেগাওযাট (১৯৫৯-এর ডিসেম্বরে মোট জেনারেটিং কম্পাসিটি)	১৫৫৯ মেগাওযাট
২. রেলওয়ের রুট মাইলেজ	মাইল	১৬৮২	৫৩১৬	১৭১৪	৫৩২৭	১৭১২	৫৩৩৪
৩. রোড মাইলেজ	মাইল	৪০৫	১৭১৫২	১০৪০	১৯৬৮৪	২৫৮৮	২২৫০৮
৪. মোটর গাড়ির সংখ্যা				১৪৪১০	১০৯২২৮	৫৬২৮৫	২৫৯৩৯৫
৫. প্রদত্ত রেডিও লাইসেন্স		৮৮৪৮	৭০৫১৩	৩৭৭১৩	২৯৩৬০৭	৩৫৮২৪১	৭৩৮২১৫
৬. হাসপাতাল বেড		-	-	৪৯৭৩	২২১০০	৬৯৮৪ (১৯৬৬)	২৬২০০ (১৯৬৬)
৭. ডাক্তার		-	-	৫৪৯২	৬১৩২	৮৮১০০ (১৯৬৯)	১৩১০০০ (১৯৬৯)
				১৯৪৭/৪		১৯৫৯/৬০	১৯৬৬/৬৭
৮. প্রাইমারি স্কুল		২৯৬৩৩	৮৪১৩	৮	১৭৯০১	২৮২২৫	৩৩২৭১
৯. প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রভর্তি (মিলিয়নের হিসাবে)		২.০২	০ ৫৪	২৬৫১৩ ৩.১৮	১.৫৫	৪.৩১	২ ৭৪
১০. প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক		৭৫৬২৪	১৭৮২০	৭৮৪৬২	৪৪৮৪৮	৯৭২৫৬	৭৫৬৯৭
১১. মাধ্যমিক স্কুল		৩৪৮১	২৫৯৮	৩০৫৩	৩০৪৩	৪৩৯০	৪৫৬৩
১২. মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)		০.৫২৬	০.৫০৮	০.৫৩০	০ ৯১২	১ ০৫৭	১ ৫২৯
১৩. মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা		৭৪৩৬২	১৮৮৪৮	২৩৫৭১	৩১৩৫৫	৩৮২৮৩	৫৬২২৮
১৪. বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি		১৬২০	৬৫৪	৩৯৭০	৫০৮৪	৯৯৮৪	১৪৪২৫

উৎস : (বিদ্যুৎ, ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৯-৬০ ঃ এস. ইউ. খান, *পাকিস্তান ইকনমিক সার্ভে*, ১৯৬৯-৭০ (৬ ও

সারণি ৪ : পাকিস্তানে আঞ্চলিক ব্যয়, ১৯৫০/৫৭-১৯৬০/৭০

(১০ লক্ষ টাকার হিসাবে)

পূর্ব পাকিস্তান						পশ্চিম পাকিস্তান				
	রাজস্ব	মোট	উন্নয়ন সরকারি	বেসরকারি	মোট সরকারি (১+৩)	রাজস্ব	রাজস্ব মোট	উন্নয়ন সরকারি	উন্নয়ন বেসরকারি	মোট সরকারি (৬+৮)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৫০/৫১ ১৯৫৪/৫৫	১৭১০	১০০০	৭০০	৩০০	২৪১০	৭২০০	৪০০০	২০০০	২০০০	৯২০০
১৯৫৫/৫৬ ১৯৫৯/৬০	২৫৪০	২৭০০	১৯৭০	৭৩০	৪৫১০	৮৯৮০	৭৫৭০	৪৬৪০	২৯৩০	১৩৬২০
১৯৬০/৬১ ১৯৬৪/৬৫	৪৩৪০	৯৭০০	৬৭০০	৩০০০	১১০৪০	১২৮৪০	২৩৭১০	১৩০১০	১০৭০০	২৫৮৫০
১৯৬৫/৬৬ ১৯৬৯/৭০	৬৪৮০	১৬৫৬০	১১০৬০	৫৫০০	১৭৫৪০	২২২৩০	৩৫৬০০	১৯৬০০	১৬০০০	৪১৮৩০
সর্বমোট	১৫০৭০	২৯৯৬০	২০৪৩০	৯৫৩০	৩৫৫০০	৫১২৫০	৬১৯৮০	৩০৬৩০	৩১৬৩০	৮১৬০০
সর্বমোট বাদে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা (%)	২৩	৩০	৪০	২৩	৩৩					

উৎস : চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদ প্যানেলের *রিপোর্ট* ঃ সারণি ২ (পৃ. ৬)

স্ব-শাসনলাভের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য অবিসংবাদী ক্ষমতা দান করে। ১৯৭১-এর মার্চে মুজিব আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করে কার্যত বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক নীতির দিকনির্দেশনা ও সম্পদসমূহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যেকার আলোচনায় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত প্রধান পাকিস্তানী আলোচক এম. এম. আহমদ বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে যে নতুন বাস্তবতার উদ্ভব ঘটেছে তা মেনে নিয়েছেন। ছয় দফার অর্থনৈতিক দফাগুলোকে আইনগত স্বীকৃতিদানের জন্য প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংশোধনীগুলো তিনি গ্রহণ করে নেন।

বাঙালিদের এ স্ব-শাসন লাভের দাবিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বীকার করে নিতে পারলো না কেন? অধিকতর সুনির্দিষ্ট গবেষণা ছাড়া এর জবাব দিতে গেলে তা বড়জোর কল্পনানির্ভর এবং সেকারণেই বিতর্কমূলক হবে। লেখক অন্যত্র বিশদভাবে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন[৯৭]

৯৭. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, *Public Enterprise*

সারণি ৫ : প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের আঞ্চলিক বণ্টন ১৯৪৮/৪৯ —১৯৬৮/৬৯

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট
(ক) সর্বোচ্চ মূল্যে টাকায় রূপান্তরিত ডলার সাহায্যের ব্যয় (বিলিয়ন টাকার হিসাবে)			
১. ১৯৪৮/৪৯॥১৯৬০/৬১	৪.৮৪	১০.৭৭	১৫.৬১
%	৩১.০	৬৯.০	১০০
২. ১৯৬১/৬২॥১৯৬৮/৬৯	১৪.৪৯	৩১.৪৮	৪৫ ৯৭
%	৩১.৫	৬৮.৫	১০০
৩. মোট	১৯.৩৩	৪২.২৫	৬১.৫৮
%	৩১.৪	৬৮.৬ কেন্দ্র ৩৯২	১০০
(খ) ডলারে সাহায্য ব্যয় (মিলিয়ন ডলারের হিসাবে)	১৯৪১	৪১০৬	৬৪৩৯
%	৩০.১	৬৯.৯	১০০
(গ) মার্কিন ডলারে (১০ লক্ষ ডলার) প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য			
১. ১৯৪৭-৬০	৫৪২	১৫১৬	২০৫৮
%	২৬.৩	৭৩.৭	১০০
২. ১৯৬০-৭০	১৪৮২	৪১০০	৫৫৮২
%	২৬.৪	৭৩.৫	১০০
৩. মোট	২০২৪	৫৬১৬	৭৬৪০
%	২৬.৪	৭৩.৬	১০০
(ঘ) ডলারে ব্যয়িত সাহায্যের গঠন (১০ লক্ষ ডলারের হিসাবে)			
১. কারিগরি সহায়তাসহ প্রজেক্টসাহায্য	৮২৫ (২৫.২)	২১২৭	৩২৭১
%	৪২.৩	৫১.৮	৫০.৮
২. প্রজেক্টবহির্ভূত ও পণ্য-সাহায্য	৬৭১ (৩৪.৮)	১২৪৮	১৯২৭
%	৩৪.৬	৩০.৪	২৯.৯
৩. খাদ্য সাহায্য	৪৪৫ (৩৫.৯)	৭১১	১২৪১
%	২২.৯	১৯.৩	১৯.৩
৪. মোট	১৯৪১	৪১০৬	৬৪৩৯

উৎস : (ক) অর্থনীতিবিদদের প্যানেল (পূর্ব পাকিস্তান)
(খ), (গ), (ঘ), (মুহিত ১৯৭৮)।

সারণি ৬ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯)

(১০ লক্ষ টাকা)

সময়	মূল্য	পূর্ব	পশ্চিম
১৯৪৮/৪৯ থেকে	সাধারণ মূল্য	+৫৯২	-৮১১৬
১৯৬০/৬১	উচ্চমূল্য	+৫৩৬৮	-২০৯৮৯
১৯৬১/৬২ থেকে	সাধারণ মূল্য	-৬৫২৬	-১৮১৮০
১৯৬৮/৬৯	উচ্চমূল্য	-৯৩৮৬	-৩৪০৭৫
মোট		৫৯৩৪	-২৬২৯৬
১৯৪৮/৪৯ থেকে	সাধারণ মূল্য		
১৯৬৮/৬৯	উচ্চমূল্য	-৪০১৮	-৫৫০৬৪

উৎস : নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের *রিপোর্ট*। সারণি ১-ক, খ, গ, পৃ. ৭৬-৭৮

সারণি ৭ : পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর (১৯৪৮/৪৯—১৯৬৮/৬৯)

(১০ লক্ষ টাকার হিসাবে)

বিষয়	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬০/৬১	১৯৬১/৬২ থেকে ১৯৬৮/৬৯	১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮/৬৯
১. পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্য	৪৮৪০	১৪৪৯০	১৯৩৩০
২. জনসংখ্যার অনুপাতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর পূর্ব পাকিস্তানে প্রাপ্য হিস্যা	৪৪৩০	২৬৭১০	৩৫১৪০
৩. পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য স্থানান্তর (২-১)	+৩৫৯০	+১২২২০	+১৫৮১০
৪. পূর্ব পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট	+ ৫৩৭০	- ৯৩৯০	- ৪০২০
৫. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ স্থানান্তর (৩+৪)	+৪৯৬০	+২৮৩০	+১১৭৯০

উৎস : চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক প্যানেলের *রিপোর্ট*, সারণি ১, পৃ. ৭৫।

যে, সবচেয়ে বড় কারণ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তন। ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে যা ছিল মূলত ঐতিহ্যগতভাবে শহরাঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বেগপ্রভাবিত আন্দোলন, সেটাই এক বিরাট গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এ প্রবণতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬৮-৬৯-এর শীত কালের আইয়ুববিরোধী বিদ্রোহের মাধ্যমে। সে সময়

শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী রাজপথে ছাত্রদের সাথে যোগ দিয়ে আইয়ুবশাহীবিরোধী গণআন্দোলনে একটি নয়া শ্রেণীসচেতন জঙ্গিপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু স্ব-শাসনের দবিকে

সারণি ৮ : পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের আঞ্চলিক উৎপত্তিস্থল॥শতকরা কতজন বাঙালি

	বিষয়	সেনাবাহিনী	বিমানবাহিনী	নৌবাহিনী
১.	সামরিক সংস্থাপনা (১৯৬৩)			
	(ক) কমিশন্ড অফিসার	৫	১৭	১
	(খ) জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার	৭.৪		
	(গ) ওয়ারেন্ট অফিসার		১৩.২	
	(ঘ) অন্যান্য র‍্যাঙ্ক	৭.৪	২৮.০	
	(ঙ) শাখা অফিসার			৫
	(চ) চীফ পেটি অফিসার			১০.৪
	(ছ) পেটি অফিসার			১৭.৩
	(জ) লীডিং সীম্যান ও তার নিচে			২৮.৮
২.	আমলাতান্ত্রিক সংস্থাপনা (১৯৬৬)		পূর্ব	পশ্চিম
	কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে			
	প্রথম শ্রেণীর অফিসার		১৭০	৬৩১
	পশ্চিম-পূর্ব বৈষম্য ($\frac{WP-EP}{EP}\times$১০০)			২৭১
৩.	ব্যবসায়ী শিল্পপতি (১৯৫৯)			১১% (স্থির পরিসম্পৎ-এর শতকরা হিসাবে। বাঙালি মুসলিম ও বাঙালি হিন্দু মিলিয়ে)

উৎস : (১ ও ২) জাহান, ১৮৭২

(৩) পাপানেক, ১৯৬৭।

গ্রাম-গ্রামান্তরে নিয়ে যান এবং বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারকে বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ ১৯৬৯-৭১-এর নির্বাচনী অভিযানের মধ্য দিয়ে। এই বঞ্চনার সাথে যুক্ত হয়েছিল বাঙালিদের স্ব-শাসন প্রদানে অস্বীকৃতি, যার ফলে বাঙালি জনসাধারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের চালিকাশক্তিতে এবং ছয় দফা দাবির চূড়ান্ত জিম্মাদারে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে তারা জাতীয়তাবাদের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করে এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখন তাদের ম্যান্ডেট দ্বারা আবদ্ধ।

ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে শেখ মুজিব কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফা ম্যান্ডেটের প্রতি প্রকাশ্য অঙ্গীকার ঘোষণা করা। এই জনগণই ১৯৭১ সালের মার্চে শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্ব-শাসনকে টিকিয়ে রেখেছিল এবং ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরবর্তীকালে নিজেদের জীবন দিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আগ্রাসনের মোকাবেলা করেছিল। এই জনগণই বাংলাদেশকে বিদেশী দখলমুক্ত করার দাবিতে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিল ও প্রাণ দিয়েছিল।

জনগণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা না হলে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর ক্ষুধা মিটিয়ে তাদেরকে সম্ভবত মানিয়ে রাখতে সক্ষম হতো। ১৯৬০-এর দশকে এবং বেশিকরে ১৯৬৯-এর মার্চের পরে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির, একটি বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে তোলার, পাবলিক ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামের ধনী কৃষকদের দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদগুলোতে বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টদেরকে উন্নীত করার একটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এ প্রক্রিয়া হয়তো পূর্ণ অংশীদারিত্ব পর্যন্ত পৌঁছাতো না, কিংবা ছয় দফার স্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নেয়া পর্যন্ত এগুতো না, তবে এটা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর জন্য সুযোগের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারতো। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী মধ্যবিত্তকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে স্বশাসনের সংগ্রামকে বানচাল করার এ সম্ভাবনাটি শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে পড়েছিল। তিনি যে আন্দোলনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ও জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রক্ষক ও অভিভাবকে পরিণত করার সচেতন সিদ্ধান্ত নেন তার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের মধ্যবিত্ত নেতৃত্বকে বিভক্ত করে আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেয়ার ঐ সম্ভাবনাটিকে আগে থেকেই নস্যাৎ করে দেয়া।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হবার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, এ নেতৃত্বকে কিনে ফেলা যাবে না। হয় স্ব-শাসনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, যেমন তারা মেনে নিয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনাকালে, নতুবা বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দিতে হবে। তারা আন্দোলনের গণভিত্তি বুঝতে পারে নি এবং ১৯৬৯-৭১ সালের একটানা বিক্ষোভ-সমাবেশের ফলে জনগণের সচেতনতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তাও উপলব্ধি করতে পারে নি। এটাই মনে হয় তাদের ভ্রান্ত হিসাবের খতিয়ান। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র যে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবিগুলোকে জায়গা করে দিতে পারে নি তার চূড়ান্ত স্বীকৃতি হলো বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযান।

নির্ঘণ্ট

ছবির তালিকা



১ কারতালাব খানের মসজিদ, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)



২. খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদ, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

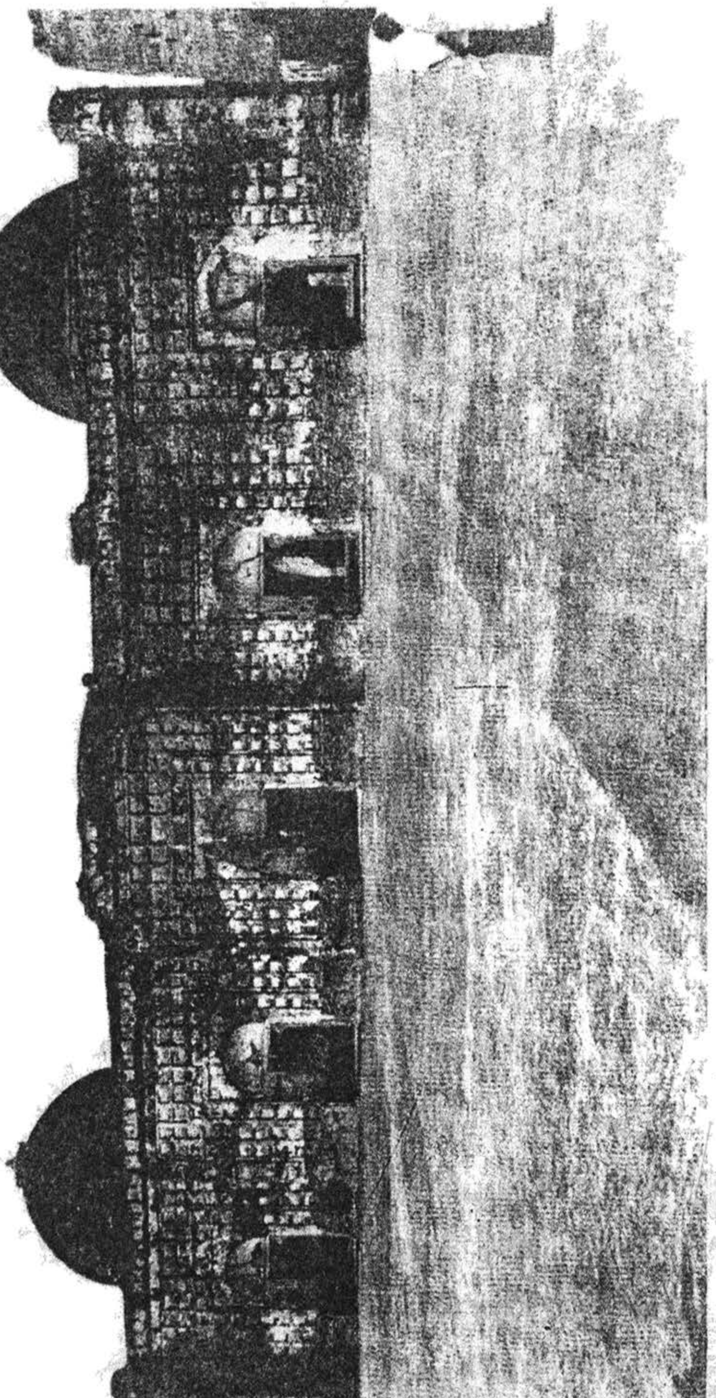
বাংলাদেশের ইতিহাস

১৭০৪-১৯৭১

তৃতীয় খণ্ড

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

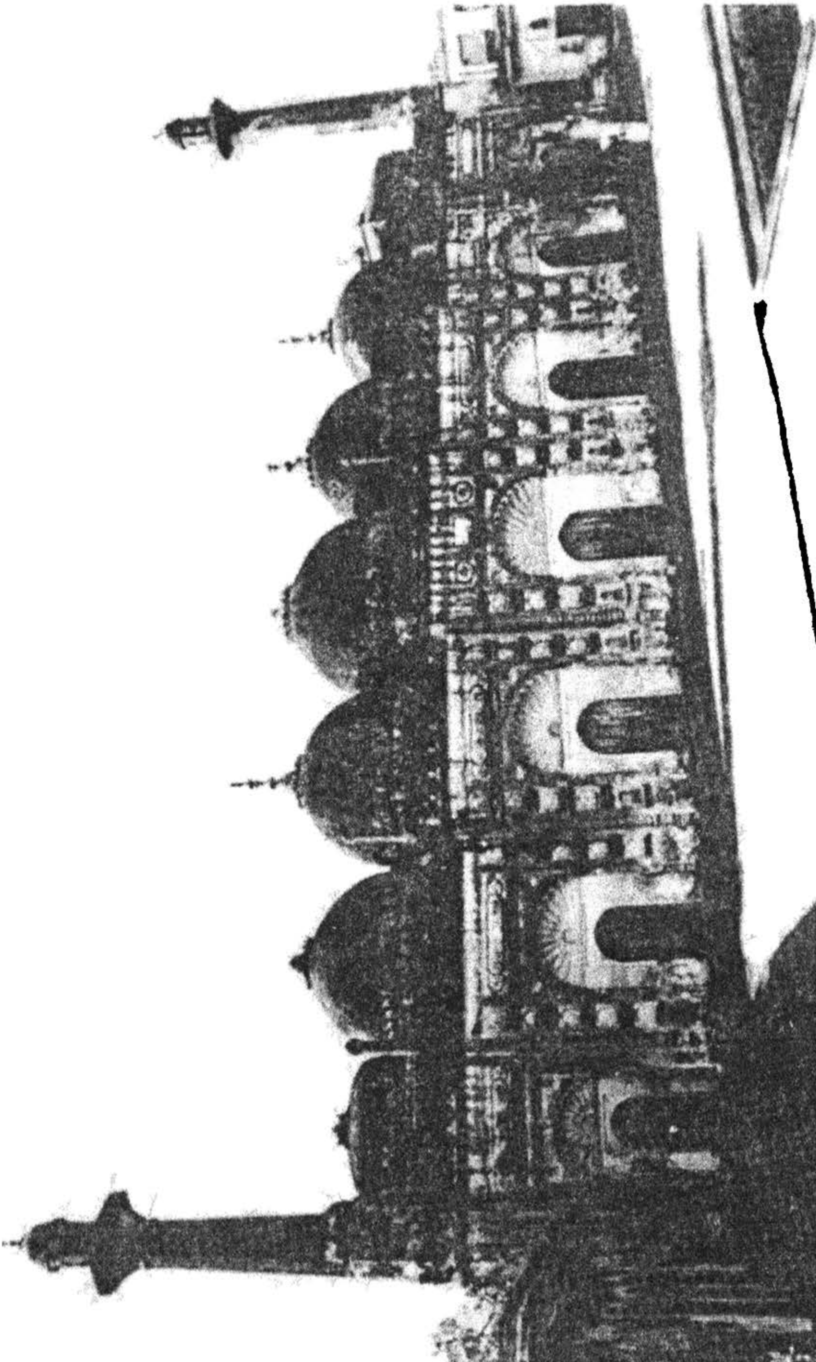


৭. কাটরা মসজিদ মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০০/ডিসেম্বর ১৯৯৩

শব্দগ্রন্থন : বীণাপাণি প্রেস, ১২/১এ বলাই সিংহ্ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচবণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রোগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন, ১৫৯/১-এ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২ হইতে অনিল হরি কর্তৃক মুদ্রিত



৪. চক মসজিদ, মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য : কা. এ্যাশার)

দ্বিতীয় সংস্করণ

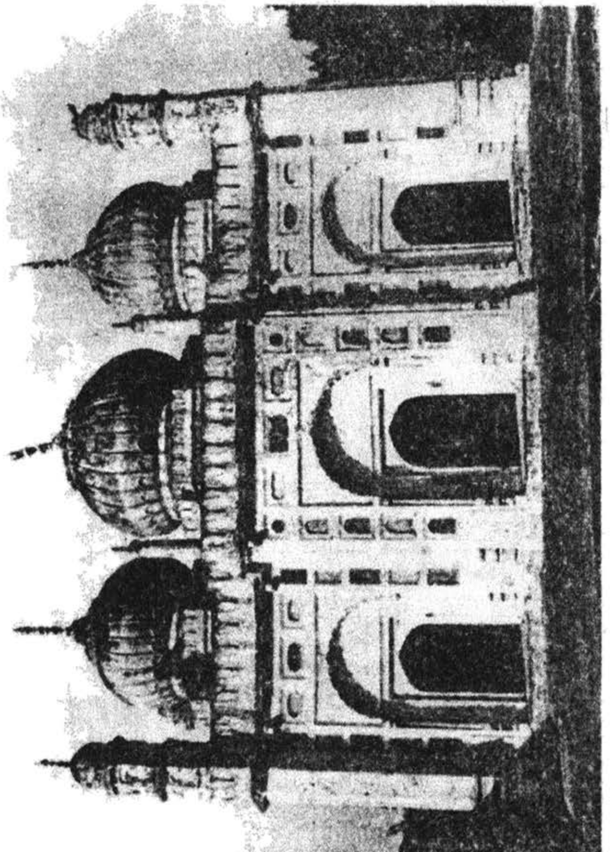
সম্পাদকের কথা

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) বিদ্বৎ সমাজে আদৃত হয়েছে। এর প্রথম সংস্করণ (শোভন ও সুলভ) নিঃশেষিত হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। গ্রন্থের ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ আগে শুরু হওয়ায় এর বাংলা ভাষ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটেছে এবং এর ফলে বাজারে বেশ কিছুকাল বইটি অপ্রাপ্য ছিল। এজন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও সম্পাদকীয় পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

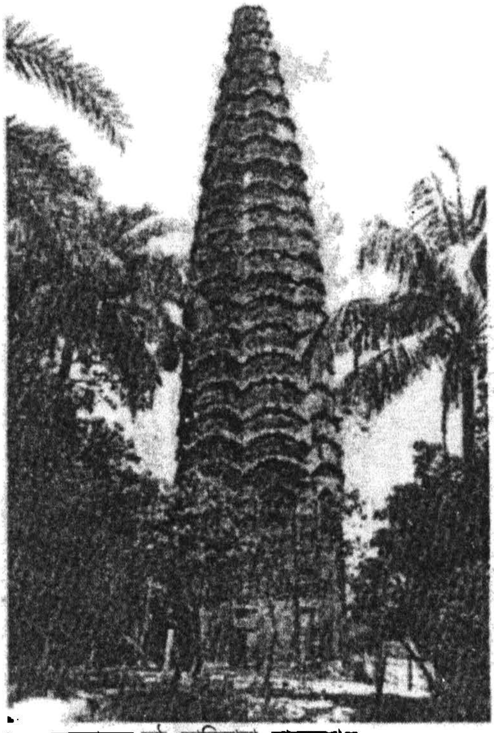
বর্তমান সংস্করণটি আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যেসব দিক অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে বা মোটেই আলোচিত হয় নি সেগুলি বর্তমান সংস্করণে নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেসব লেখা পুনরাবৃত্তিমূলক বা কম প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে বেশ কয়েকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পর্যালোচনা করে আরো সাবলীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যেসব লেখক, পর্যালোচক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব পণ্ডিতের লেখা প্রত্যাহার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি আমরা সবাই ক্ষমাপ্রার্থী।

মোট ৫১ জন পণ্ডিতের ৬৪টি লেখা নিয়ে বর্তমান সংস্করণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন খণ্ডের এ সুবিশাল গ্রন্থ কতটুকু অবদান রেখেছে এর মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত গ্রন্থটি সুধি সমাজে সমাদৃত আছে বলে মনে হয়। এটা গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত সকলের সাফল্য বলতে হবে।

বর্তমান সংস্করণের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল, প্রকাশনা কমিটি ও গ্রন্থের সম্পাদনা কমিটির কাছে। তবে এ সংস্করণ প্রকাশনায় যিনি সর্বাধিক সময় দিয়েছেন, ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য নিজ উদ্যোগেই দিনরাত পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন প্রকাশনা কনসালটেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি আমার নিজের কাজকে বহুলাংশে সোজা করে দিয়েছেন। তার প্রতি আমি সাতিশয় কৃতজ্ঞ। কম্পিউটার অপারেটর জুলফিকার আলী ভূট্টো ও দেলোয়ার হোসেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভূট্টো অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এশিয়াটিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল হাই ও কামরুল হাই বইটি যেন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য সব সময় তৎপর ছিলেন। গ্রন্থের সহ সম্পাদক অধ্যাপক সাজাহান মিয়া তার কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।



৫. ইতওয়ার খানের মসজিদ, মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

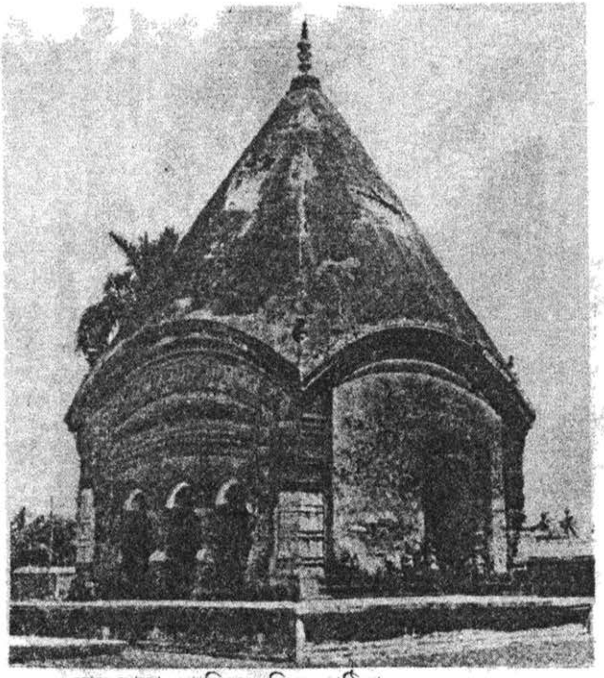


৬. সরকারের মঠ মাহিলারা, বাকেরগঞ্জ

(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)



৭. জোড়-বাংলা মন্দির, পাবনা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)



৮. চার-চালা গোবিন্দ মন্দির, পুঠিয়া
(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

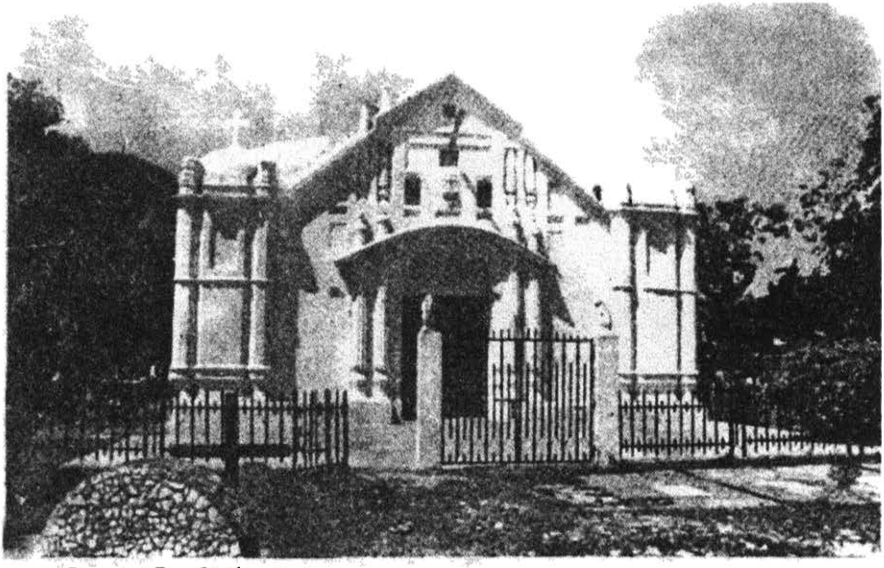


৯. কান্তজীর মন্দির দিনাজপুর। (সৌজন্য প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

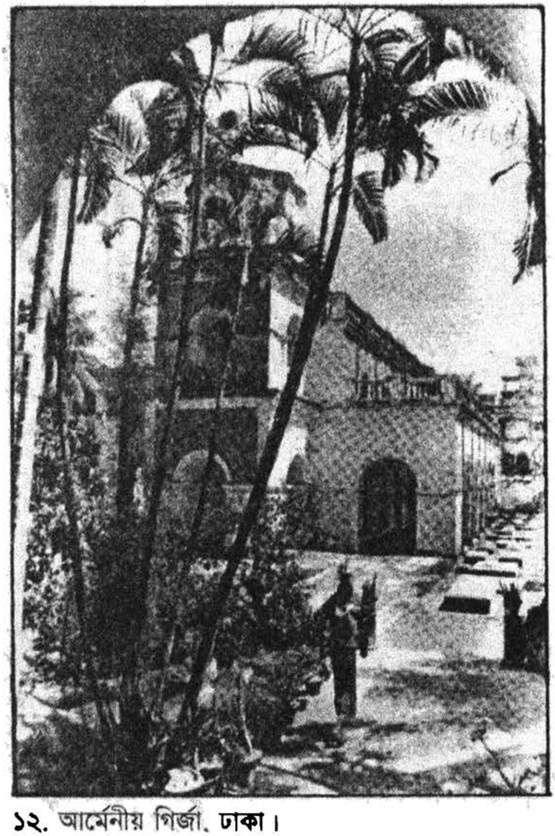


১০. রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতা। (সৌজন্য : জ. আর্চার)

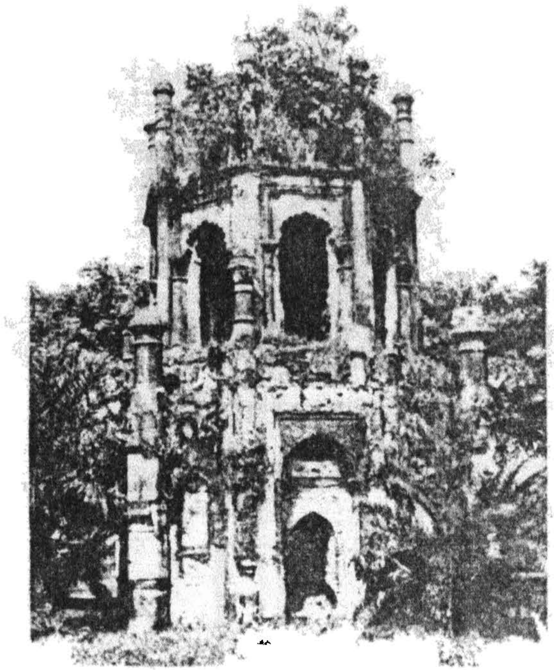
সূচিপত্র



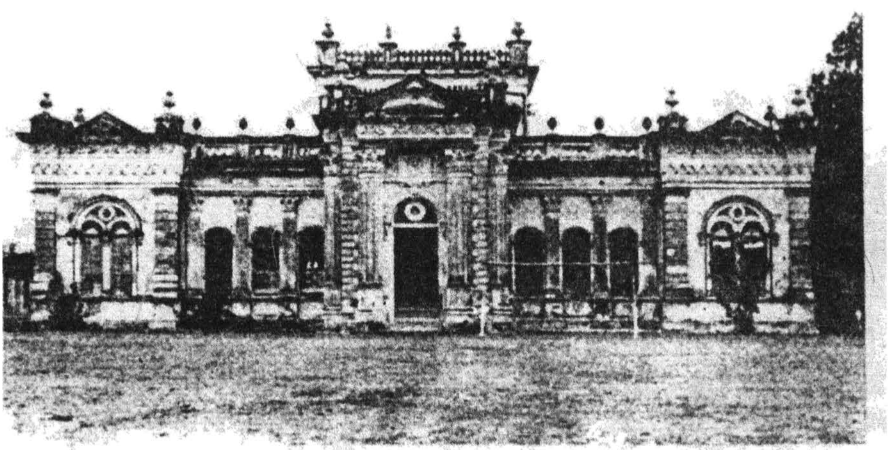
১১. হলি রোজারীর গির্জা, ঢাকা।



১২. আর্মেনীয় গির্জা, ঢাকা।



১৩. বেক-এর সমাধি সৌধ, ঢাকা।



১৪. রাজবাড়ী প্রাসাদ, নাটোর। (সৌজন্য প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ বাংলাদেশ সরকার)

১

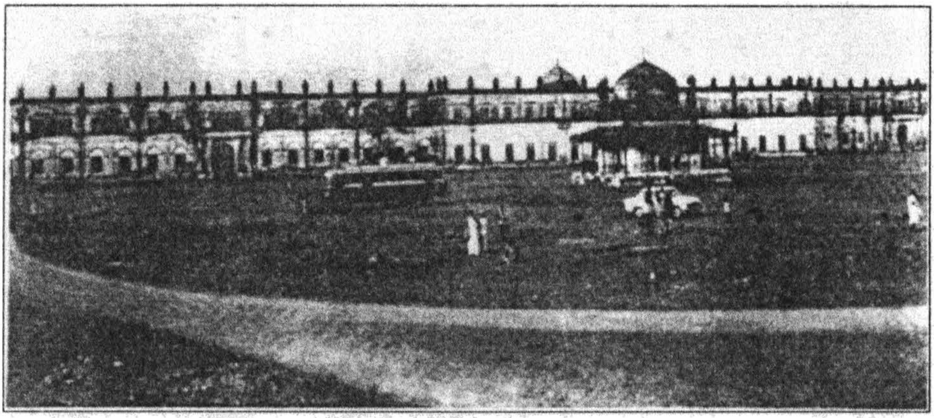
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

সিরাজুল ইসলাম*

এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়। বর্তমান খণ্ডে স্থান পেয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাদি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয় সবশেষে আলোচনা করা অনেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে এ যুক্তিতে যে, যেহেতু মানুষের ধীকল্প (idea), চিন্তা, কর্মপরিকল্পনা উৎপত্তিলাভ করে মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে, সেহেতু ঐতিহাসিক আলোচনায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত সমাজ-সংস্কৃতিই। মার্কসীয় চিন্তাবিদদের ধারণা, অর্থনীতিই হচ্ছে সকল সম্পর্কের নিয়ামক; স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতির আলোচনা স্থান পাওয়া উচিত সর্বাগ্রে। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ বিষয়ানুসারে সাজাতে গিয়ে পণ্ডিতগণ প্রথামাফিক রাজনৈতিক বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এ যুক্তিতে যে, ক্ষমতাই হচ্ছে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে ক্ষমতা কি ঘটনার কারণ না ফল এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক করা যেতে পারে। যাহোক, বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সরকার ও সরকারি ক্ষমতার প্রভাব সর্বগামী ও সর্বগ্রাসী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ শাসন করেছে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী, যাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি এবং সবশেষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাঙালি সমাজকে পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণেই। বাঙালি জাতির ধর্ম, বর্ণ, সংস্কার, অভ্যাস, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আইনকানুন প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদেশী শাসক শ্রেণীর ছাপ সুস্পষ্ট এবং সেটা রাজনৈতিক আধিপত্যেরই প্রত্যক্ষ ফল।

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



১৫. ইমামবাড়া, মুর্শিদাবাদ। (সৌজন্য ক্যা. এ্যাশার)



১৬. গোলাম মুহম্মদের মসজিদ, কলকাতা। (সৌজন্য ক্যা. এ্যাশার)

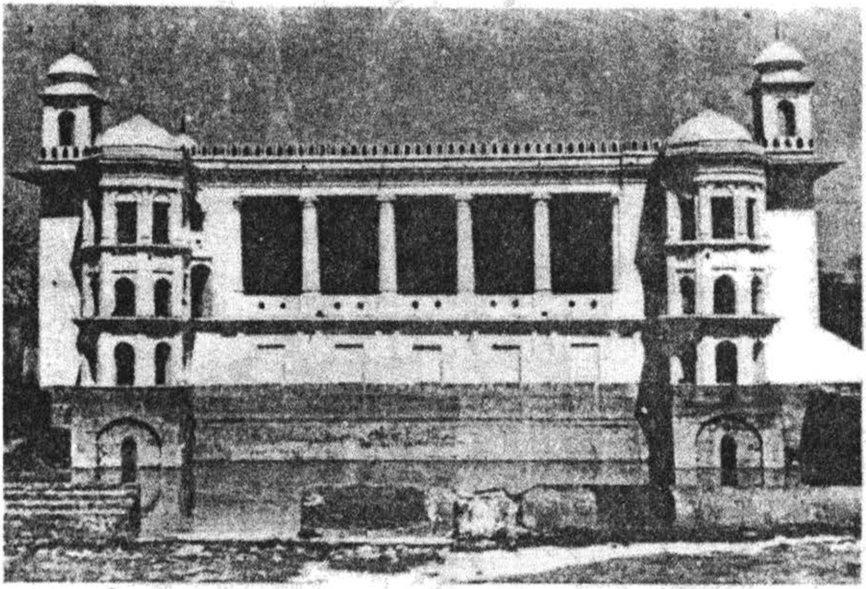
তবে, ইতিহাসকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত না করে একে একক ও অখণ্ডিতভাবে বিচার করাই সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত। ঘটনার গভীরে গিয়ে বিচার করলে স্পষ্টতই ধরা পড়ে যে, যাকিছু রাজনৈতিক তা সামাজিক-অর্থনৈতিক, এমনকি ধর্মীয়ও বটে। ইউরোপীয় চার্চ, ভারতীয় বর্ণ ও আফ্রিকার টটেমিজম-এর ইতিহাস এ বক্তব্যের সমর্থনে অকাট্য যুক্তি। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-বিশ্লেষণে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতিকে একে অপর থেকে পৃথক করে দেখার বিপদ লক্ষ্য করেই বৃটিশ ঐতিহাসিক জর্জ ট্রেভেলিয়ান তাঁর বিখ্যাত বৃটিশ সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে সামাজিক ইতিহাস কি এ মর্মে কোন সংজ্ঞা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। সাধারণভাবে তিনি শুধু মন্তব্য করেন, "সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে রাজনীতি ব্যতিরেকে একটি জাতির ইতিবৃত্ত"।[১] এ সংজ্ঞা দিয়ে তিনি এটাই বলার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছাড়া বাকি সবই সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করার বিপদ জেনেও আমরা একে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শাখায় বিচার করার চেষ্টা করছি এজন্য যে, আধুনিক ইতিহাসশাস্ত্র এত অগ্রগতি লাভ করেছে এবং মানবকর্মকাণ্ডকে ঐতিহাসিকগণ এত ব্যাপক ভিত্তিতে স্থাপন করে বিশ্লেষণ করছেন যে, ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসের সকল শাখার বিচার-বিশ্লেষণ অবিমিশ্রভাবে করা একদিকে যেমন এক দুঃসাধ্য কাজ, অপরদিকে পাঠকের জন্যও তা হবে অতি দুর্বোধ্য ও দুরতিপাঠ্য।

কোন জাতিরই সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠন সহজসাধ্য নয়। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে সামাজিক ইতিহাসের পরিধি অনেক বিশাল, অনেক ব্যাপক। একটি দেশের প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে অতীতের দৈনন্দিন জীবনে এর সকল মানুষের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড। সমাজে ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মকাণ্ড রূপলাভ করে পরিবারে, জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে, গ্রামে/শহরে তথা সমগ্র দেশে এবং সর্বস্তরে ব্যক্তির ঐ চিন্তা ও কর্মকাণ্ড অবধারিতভাবে প্রভাবিত হয় সমাজের ও রাষ্ট্রের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানাদি যেমন, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস, পাপ-পুণ্য ও ন্যায়নীতিবোধ, সমিতি, দল, শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম, প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি দ্বারা। এসবই সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এগুলির মূল্যায়ন থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে বিশেষ সমাজের গতিধারা।

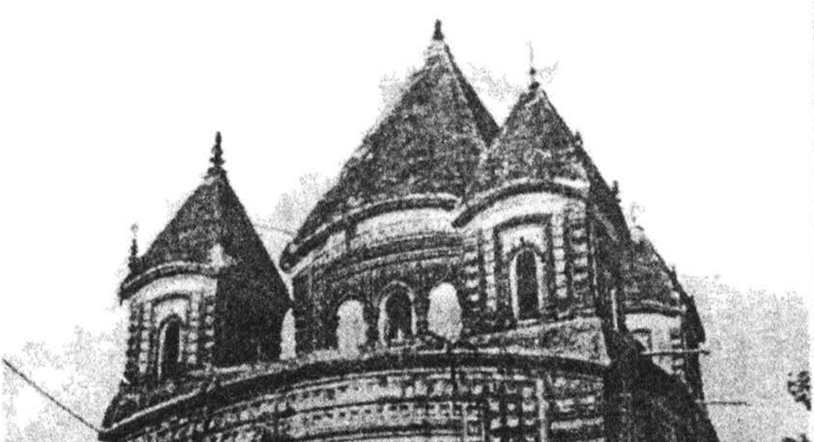
ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা। এই স্থিতিশীলতায় যারা অবদান রাখেন তারাই সমাজের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সদস্য। তবে সমাজ যেহেতু একটি জীবন্ত সত্তা, সেহেতু স্থিতিশীলতার পরিবেশেই সুপ্ত থাকে পরিবর্তনের বীজ। অঙ্কুরিত হবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের

---

১. G M. Trevelyan, *English Social History*, (London 1962 edition), vii



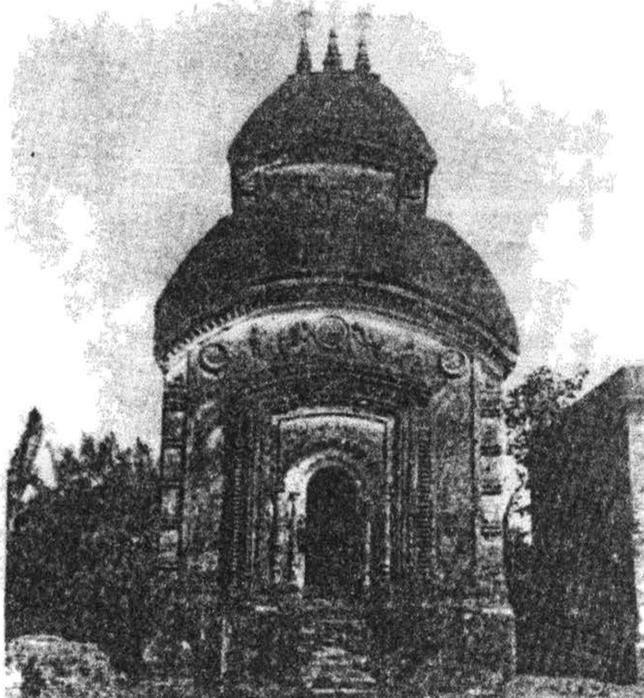
১৭. **হোসেনী দালান, ঢাকা।** (সৌজন্য : **প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ,** বাংলাদেশ সরকার)



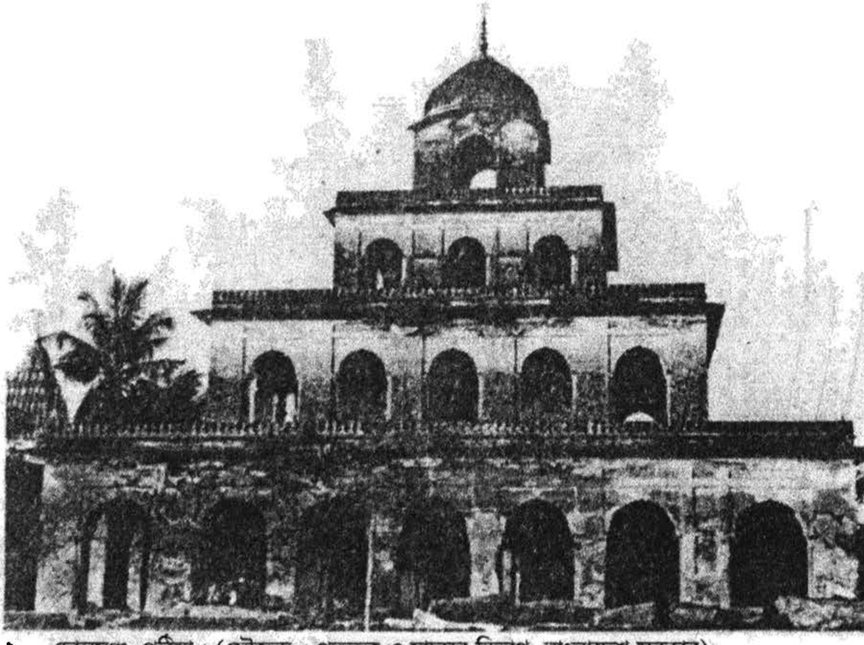
১৮. **পঞ্চরত্ন গোবিন্দ** মন্দির, পুঠিয়া (সৌজন্য : **প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর** বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

অপেক্ষায় থাকে সে বীজ। তাই আমরা দেখতে পাই, কখনো কখনো সমাজে এমন ব্যক্তিত্বেরও আবির্ভাব ঘটে, যিনি নতুন প্রশ্ন তোলেন, ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেন, সমাজে বিদ্যমান অবস্থায় দুর্বলতা চিহ্নিত করেন এবং আদর্শ হিসেবে অনুসরণের জন্য প্রদর্শন করেন নতুন পথ। এখানে নতুন পথপ্রদর্শক ও পুরাতনপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক। এ দ্বন্দ্বে যেকোন একটি শক্তি জয়লাভ করে বা উভয় শক্তির মধ্যে কখনো কখনো আপোষ-সমঝোতাও ঘটে। নতুন চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের বিজয় ঘটলে সমাজসত্তায় আসে নতুন গতিধারা, সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস। অতএব, সামাজিক সত্তা ও সংগঠনে, চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে সকল পরিবর্তন এবং পরিবর্তন আনয়নকারী ব্যক্তিত্বসহ সকল আন্দোলন ও বিপ্লবও সামাজিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজের সব সদস্য সমান মেধা ও কর্মক্ষমতার অধিকারী নয় এবং সবার রুচি-অভিরুচি, আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষও একমাত্রিক নয়। অতএব, পেশাগত ও মেধাগত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সমাজ সম্পর্ক ও সংগঠনে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি, অস্থিরতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে তাও সামাজিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিষয়। সমাজে মানুষ যেন সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে পারে সেজন্য প্রণীত হয় নানা রকম আইন-অনুশাসন, রীতিনীতি ও আচার-প্রথার নিয়মনিগড়। এসবের উৎপত্তি ও বিকাশ সনাক্ত করা এবং সামাজিক স্থৈর্য ও পরিবর্তনধারায় এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করাও সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম লক্ষ্য। এককথায়, সামাজিক ইতিহাসের ছায়া পড়ে সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজসত্তার সর্বক্ষেত্রে—ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, জাত, শ্রেণী, আচার-প্রথা, শিক্ষা, সমিতি-সংগঠন, সংস্কার-আন্দোলন, সাহিত্য, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎসব, স্থাপত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, লোকগাথা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আন্তঃশ্রেণী সম্পর্ক, দল ও দলাদলি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলায়। এসবই সামাজিক ইতিহাসের আওতাভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে হলে এসব উপাদানের কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু এই আদর্শ অর্জন করা সামাজিক ঐতিহাসিকের পক্ষে কতটুকু সম্ভব? প্রেক্ষাপটের প্রকৃতি ও বিশালতা তাঁকে বাধ্য করে বাছাইনীতি অবলম্বন করতে। প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে তিনি বাধ্য হন সমাজসত্তার সবদিক একযোগে আলোচনায় না এনে বিশেষ একটি সমস্যাকে বেছে নিয়ে এর গভীরে যেতে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ভাসা ভাসা বা স্রেফ আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যায় লেখকের অনুসন্ধানপদ্ধতির প্রশ্নটি। আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করলে ইতিহাস রূপকথায় পরিণত হবার ঝুঁকি থাকে। আংশিক উপাত্তকে ভিত্তিকরে সমগ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃ ও ভূ-বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন। সামাজিক ঐতিহাসিকও অনুরূপ পদ্ধতি ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

বিচার-বিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : মৌলিক সমস্যা এবং গৌণ বা অনুসম্ভূত সমস্যা। সমাজের নিজস্ব সত্তা ও ঐতিহ্যই মৌলিক সমস্যার উৎস। আর গৌণ সমস্যার উৎপত্তি হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপসর্গরূপে।



১৯. আট-চালা মন্দির, কুমিল্লা
(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)



২০. দোলমঞ্চ, পুঠিয়া। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

এই উপসর্গগুলি সমাজ-সংস্কৃতির মৌল প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কোন্ ধরনের সম্পর্ক তৈরি করে—প্রতিযোগিতার না সহযোগিতার, তা সনাক্ত করা সামাজিক ঐতিহাসিকের প্রথম কাজ; নচেৎ বিশ্লেষণ হবে পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং সিদ্ধান্তও হবে ভ্রান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নবাবি রাষ্ট্রকাঠামোয় দেশীয় আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর আবির্ভাবের ঘটনা। এই ঘটনাকে সমকালীন বর্ণ ও জাতভিত্তিক সমাজ কিভাবে দেখেছিল? প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় এই নব্যশ্রেণী সাদরে স্বীকৃত হয়েছিল, কেননা অনুসম্ভূত আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী সমাজের প্রতিষ্ঠিত বর্ণ ও জাতব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ না করে বরঞ্চ একে আরো জোরদার করেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শিক্ষাজাত তথাকথিত ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্ম বাবুদের বেলায় ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। নব্যশ্রেণী বর্ণ ও জাতব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা। তবে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নতুন শক্তি প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারলেও পরাজিত করতে পারে নি। পরিশেষে নব্যগোষ্ঠী সংস্কারের নামে মৌল ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিশে যেতে বাধ্য হয়। এককথায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সামাজিক ঐতিহাসিককে প্রথমেই জানতে হবে তার আলোচ্য সমস্যাটি মৌল না অনুসম্ভূত। অনুসম্ভূত হলে প্রথমেই বিচার করতে হবে কোন্ মূলকাণ্ড থেকে আলোচ্য শাখা বা প্রশাখাটি উদ্ভূত, তারপর দেখতে হবে মূলের সঙ্গে অনুসম্ভূত সমস্যার সম্পর্ক কি সংঘাতের না সহযোগিতার। আরো দেখতে হবে মূলের ভিতরেও মূল রয়েছে কিনা। যেমন, যুক্তিবাদী ইয়ং বেঙ্গলদের মূল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অভিভাবকগণ সবাই কট্টর রক্ষণশীল হিন্দু, যেমন ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস হিন্দু কলেজের ব্যবস্থাপক ও অভিভাবকগণ। তাহলে শুধু হিন্দু কলেজেই প্রতিবাদী যুক্তিবাদের উদয় হলো, অন্যান্য কলেজে অনুরূপ ঘটলো না কেন? কারণ অন্যান্য কলেজে হেনরি ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ার-এর মতো যুক্তিবাদী শিক্ষক ছিলেন না। মূল অন্বেষণে অনেক সময় দেখা যাবে যে, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয় এক উদ্দেশ্যে, কিন্তু ফল দাঁড়ায় আরেক। হিন্দু কলেজের স্থপতিদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করে ইঙ্গরাজের অধীনে চাকুরির জন্য উপযুক্ত করে তোলা—সনাতন ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা। কিন্তু কার্যত ঘটলো এর বিপরীত। গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি নিজের উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন ইংরেজ আমলাদের এদেশীয় ভাষা ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। কিন্তু পরিশেষে এই কলেজ পরিণত হলো বাংলাসহ ভারতীয় ভাষা উন্নয়নের এক অসাধারণ কেন্দ্রে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছিল ভারতীয়দেরকে 'চামড়ায় কালো অথচ রুচি-অভিরুচি-মনোভঙ্গিতে ইউরোপীয়' বানানোর জন্য। কিন্তু কার্যত তা না হয়ে ইংরেজিশিক্ষিতরা নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি আরো অনুরক্ত হয়ে উঠলো, বৃটিশবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো এবং



২১. প্যাগোডা, কক্সবাজার।
(সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

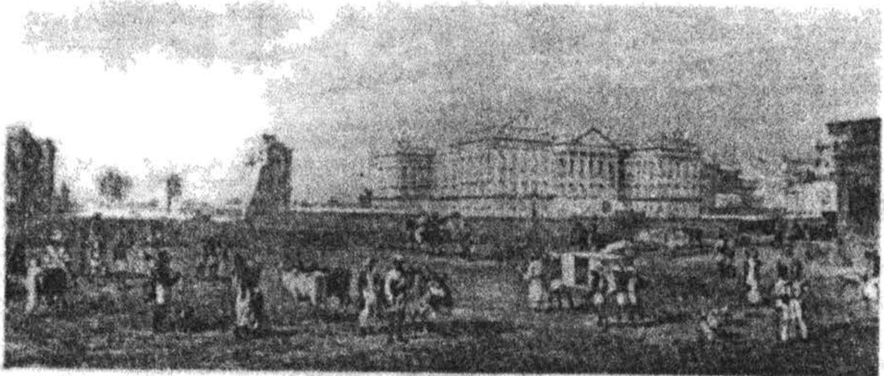


২২. কিয়াং,কক্সবাজার। (সৌজন্য প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

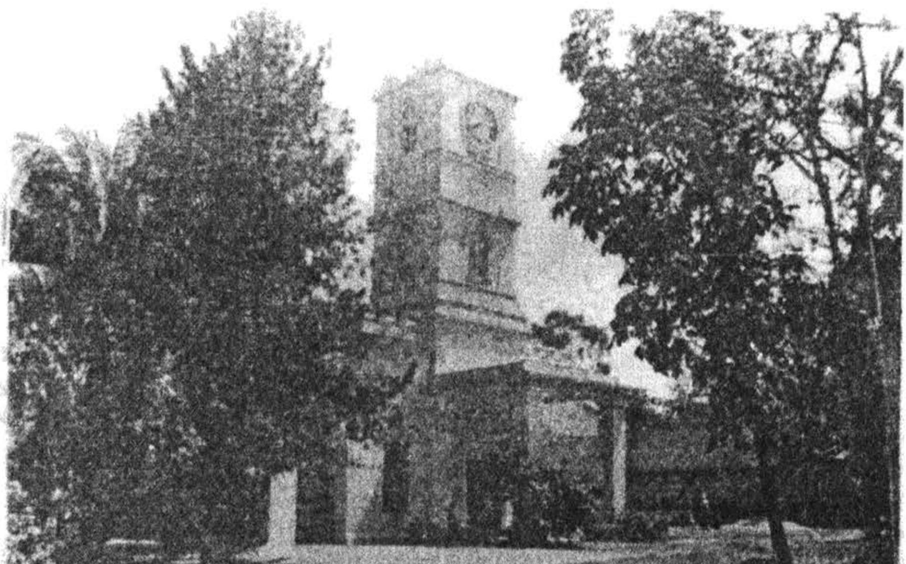
উদ্বুদ্ধ হলো জাতীয়তাবাদী চেতনায়। এহেন বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী ঠেকলেও সমস্যার মূলে পৌঁছাতে পারলে দেখা যাবে যে, ওটাই হওয়া স্বাভাবিক।

সামাজিক ইতিহাস রচনার একটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে প্রশ্ন উত্থাপন। সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেয়া অনেক সময় সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন তুলতে হবে প্রশ্নের খাতিরেই। অনেক সময় প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমেই অনুসন্ধানী গবেষক এমন সুরাহা পেয়ে যান, যা তার মূল তত্ত্বকাঠামোকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে পারে, দিতে পারে নতুন সত্যের সন্ধান। উপমাস্বরূপ ধরা যাক, আমরা ১৭০৪ সনের ঢাকা শহরের সমাজ ও সংস্কৃতির একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই। এ ব্যাপারে প্রাথমিক অনুসন্ধানে আমাদের প্রশ্ন হতে পারে—তখন শহরের জনসংখ্যা কত ছিল এবং কাদের নিয়ে গঠিত ছিল ঐ নগরসমাজ ? শহরের মোট লোকসংখ্যার কত অংশ ছিল অভিজাত এবং কত অংশ অনভিজাত ? কারা ঐ অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীর মানুষ ? অভিজাত-অনভিজাতের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল ? শহরে কতগুলো হাতি, ঘোড়া, উট, বলদ, গাভী বিচরণ করতো এবং কারা ছিল ওগুলোর মালিক এবং কেন এরা শহরে পশুপালন করতো ? শহরের কোন্ এলাকায় কারা বাস করতো এবং তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল ? শহরবাসীদের গৃহনির্মাণপদ্ধতি কি ছিল ? গৃহনির্মাণের জন্য কি কোন পরিকল্পনা ছিল ? শহরবাসীদের চলাচলের বাহন কি ছিল ? সুবাদারের হারেমের সদস্য কারা এবং কতজন ছিল ? হারেমে খোজা রাখা হতো কেন এবং কারা ছিল ঐ খোজা ? খোজা বানানোর প্রযুক্তি কি ছিল ? কাদেরকে খোজা করার জন্য বাছাই করা হতো ? শহরের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবাদি কি কি ছিল ? কিভাবে বিভিন্ন আমোদ-উৎসব উদযাপিত হতো ? সামাজিক নেতা কারা ছিলেন ? তাদের নেতৃত্বের ভিত্তি কি ছিল ? সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চায় কারা নিযুক্ত ছিলেন ? কারা ছিলেন তাদের পৃষ্ঠপোষক ? এমনিতরো অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, যা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বহুবিধ প্রশ্ন তোলা গেলেও উপাদান-উপকরণের অভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তবে সামাজিক ঐতিহাসিকদের মতে, শুধু উত্তর পাওয়ার জন্যই প্রশ্ন উত্থাপন নয়, অনুসন্ধানকে নিগূঢ় পর্যায়ে নিয়ে সত্য আবিষ্কারের অন্বেষায় সব রকম প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলতে হবে চিন্তাকে বহুমুখী করে তোলার জন্য। প্রকৃত প্রেক্ষাপটে কাহিনীকে সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করতে পারলেই সামাজিক ইতিহাস পরিবেশন করবে পূর্ণসত্য। এ সত্য কবিতার মতো। এখানে তথ্যের পাশাপাশি ক্রিয়াশীল থাকে লেখকের সহজাত অভিজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি।

তাহলে কিভাবে আমরা বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে অগ্রসর হতে পারি ? কোন্ তারিখ থেকে আরম্ভ করা যায় এই ইতিহাস ? ১৭০৪ সন থেকে আমরা রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেছি এই বোধগম্য কারণে যে, রাজধানী স্থানান্তরের মাধ্যমে এই তারিখ থেকে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক যুগান্তকারী



২৩. গভর্নমেন্ট হাউস, কলকাতা। (Chardes D'Dyly, *Views of Calcutta and its Environs*, (প্লেট-১ (লন্ডন ১৮৪৮)। সৌজন্য : জ. আর্চার)



২৪. সন্ত থমাসের গীর্জা ঢাকা।

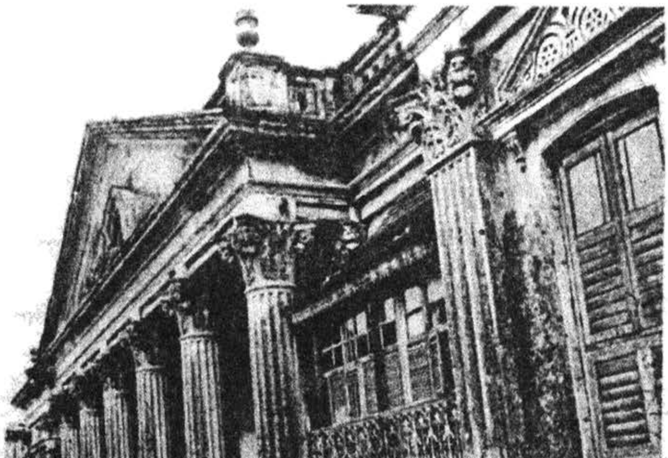
পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তো কোন বিশেষ সন-তারিখ ধরে সূচিত হয় না। বলা যাবে না ভরতনাট্যম কবে থেকে কারা শুরু করেছে, যেমন বলা যাবে না বৈষ্ণববাদ ঠিক কোন্ তারিখ থেকে কে সূচনা করেছে, কোন্ তারিখ থেকে খনার বচন তৈরি হয়েছে। হিন্দু সমাজে বর্ণ বা মুসলমান সমাজে শরাফত প্রতিষ্ঠানটি কোন নির্দিষ্ট তারিখ থেকে শুরু হয় নি। এসব প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ও প্রসার ঘটেছে শতাব্দীর ক্রোড়ে এবং ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে। তেমনি বিবাহ, একান্নবর্তী পরিবার, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্যাভ্যাস, আদব-কায়দা, কবিতা, গান-বাদ্য, শিল্প, কারুকার্য, খেলাধুলা, আমোদ-উৎসব ও আরো অসংখ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদির উদ্ভব ও বিকাশ কোন নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু বা শেষ হয় নি। একদিন শিকার অভিযান ছিল একটি রোমাঞ্চকর খেলা। এখন আর এর কোন অস্তিত্ব নেই। তেমনি নেই গণভোজ, বাঈজীনাচ, জলসাঘর, দাসপ্রথা, সতীপ্রথা, চড়ক, কীর্তনীয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গ্রামসরঞ্জামি, গ্রামপ্রধান, পঞ্চায়েত ও আরো কত প্রথা-প্রতিষ্ঠান। এসবের উত্থান-পতনপ্রক্রিয়া চলে মানুষের অলক্ষ্যে, অবচেতনে।

এমন অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলির উদ্ভব ঘটেছে অন্য এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থেকে। নতুন পরিস্থিতিতে এসব মৌল প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটলে এগুলোর অনুসম্ভূত প্রতিষ্ঠানেরও পতন ঘটে। যেমন, মুগল ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও বিচারব্যবস্থার প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামসরঞ্জামি, গ্রামপ্রধান, পঞ্চায়েত প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ আমলে ঐ মৌল প্রতিষ্ঠানগুলির বিলুপ্তি ঘটার পর এই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলিরও বিলুপ্তি ঘটে। এমনিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিলুপ্তি ঘটেছে গণভোজ, দাসপ্রথা, বাঈজীনাচ, জলসাঘর, সতীপ্রথা ইত্যাদি। আবার ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি, যেমন অফিসকেন্দ্রিক বাবু, কাছারিকেন্দ্রিক নায়েব-গোমস্তা, আদালতকেন্দ্রিক উকিল-মোক্তার, মামলাবাজ, নকলনবিশ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নানা পেশাদার শ্রেণী ।

কিন্তু এমন অনেক শাশ্বতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি সময়ের ব্যবধানে এবং নতুন পরিবেশে বিবর্তিত হয়, রূপ বদলায়, কিন্তু বিলুপ্ত হয় কদাচিৎ। এগুলি সমাজের অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত মৌল প্রতিষ্ঠান। যেমন ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎসব, বিবাহ, পরিবার, অলঙ্করণ, কারুশিল্প প্রভৃতি। সমাজের কোন্ দিকটি চিত্রিত করা হবে বা প্রধানত কোন্ সমস্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে এটা চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করা সামাজিক ঐতিহাসিকের প্রথম কাজ। রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার আপেক্ষিক সুবিধা এই যে, এটি আবর্তিত হয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে, এবং ঘটনা ঘটে বিশেষ সময়ে ও স্থানে এবং ঘটনার নেপথ্যে থাকে বিশেষ শক্তি, যা সহজেই সনাক্ত করা যায়। অতএব, সত্য উদঘাটনের জন্য আমরা ঘটনাস্থলে দাঁড়াতে পারি, ঘটনার নায়ক



২৫. নর্থব্রুক হল, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

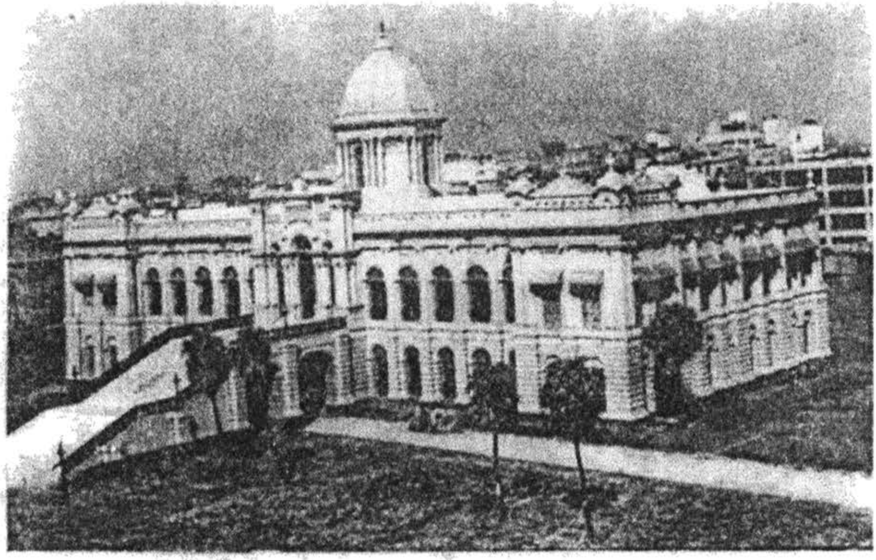


২৬. রূপলাল হাউস, ঢাকা। (সৌজন্য প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

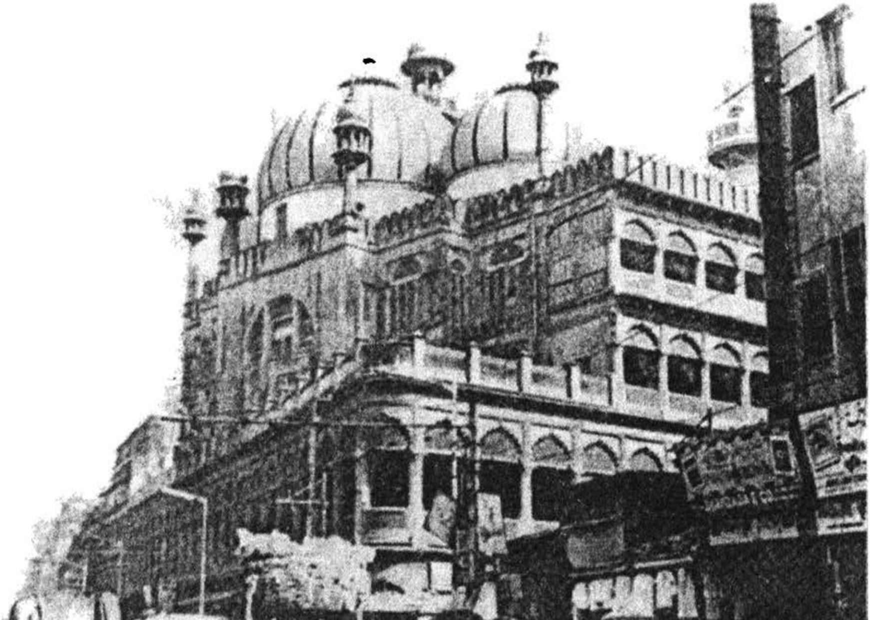
ও পরিবেশকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে পারি; কিন্তু এ সুবিধাটি সামাজিক ঐতিহাসিক ভোগ করেন না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা একদিকে যেমন ঘটে বিশাল সময় ও স্থানের পরিসরে, অপরদিকে এর ব্যাপ্তিও থাকে প্রায় সীমাহীন। অনির্দিষ্ট সময় ও স্থানের পরিমণ্ডলে সামাজিক ঐতিহাসিকের বিবেচনার জন্য রয়েছে অসংখ্য বিষয়। শুধু ব্যক্তিত্ব চিত্রণ করলেই আমরা পাই সমাজপতি, সংস্কারক, ধর্মনেতা, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক, বাউল, চিত্রকর, বাদক, গায়ক, নাট্যকার, নর্তক-নর্তকী, ক্রিড়াবিদ, শিক্ষাবিদ ও আরো অনেককে। বিমূর্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা, যেমন শ্রেণী, বর্ণ, জাত, সমাজবিন্যাস, সামাজিক দ্বন্দ্ব, আচার-প্রথা, রেওয়াজ-দস্তুর, ক্ষমতা, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি। গ্রাম, শহর, বস্তি, বাস্তুহারাও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্গত। শুধু কারুশিল্প নিয়েই বহু খণ্ডের গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব, যদিও এটা মোটেই আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোন বড় অংশ দখল করে নেই। উপমাস্বরূপ, শ্রী রামকান্ত চক্রবর্তী বাংলার বৈষ্ণববাদের মাত্র কতিপয় দিকে আলোকপাত করে এক বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২] অনুরূপভাবে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশাল আকারের খণ্ডের পর খণ্ড ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করা সম্ভব । কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির সকল সমস্যাকে একত্রীভূত করে একটি বিশেষ গ্রন্থ একজন বিশেষ পণ্ডিত লিখতে গেলে দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁকে অনেক কিছুই বলি দিতে হবে এবং নিঃসন্দেহে এর প্রথম শিকার হবে সত্য। এককথায়, যেহেতু গোটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস একসঙ্গে একজনের পক্ষে সফলভাবে রচনা করা সম্ভব নয়, সেহেতু লেখককে বাছাইনীতি অবলম্বন করতেই হবে। হাজারো বিষয়ের মধ্যে বিচারের জন্য যেকোন একটিকে বাছাই করা বাঞ্ছনীয়, নচেৎ সমস্যার গভীরে গিয়ে মৌলিক অনুসন্ধান চালানো অসম্ভব। নির্বাচিত বিষয়টি হবে এমন, যা বিদ্যমান সাহিত্যে অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত বা একেবারেই অনালোচিত। যেসব বিষয় নিয়ে পণ্ডিতগণ ইতিমধ্যেই আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন, সেসব বিষয় পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে তখনই, যখন নতুন তথ্য বা ব্যাখ্যার আলোকে প্রচলিত সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন বা সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সমাজ-সংস্কৃতি গভীরভাবে সম্পর্কিত রাজনীতি-অর্থনীতির সঙ্গে। একটির উপর অপরটির প্রভাববিস্তারের মাত্রা নির্ভর করে ক্ষমতাকাঠামোর উপর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামো যদি সমাজকাঠামো থেকে উৎসারিত না হয়, অন্য কথায়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জনগণের ভূমিকা যদি থাকে গৌণ বা শূন্য, তাহলে ক্ষমতাকাঠামোর উপর সমাজকাঠামোর প্রভাবও থাকবে অনুরূপ। এক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকা অস্বাভাবিক। এখানে জীবন্ত সত্তা হিসেবে সমাজের রূপ

২. Ramakanta Chakrabarty, *Vaishnavism in Bengal, 1486-1900*, (Calcutta 1985).



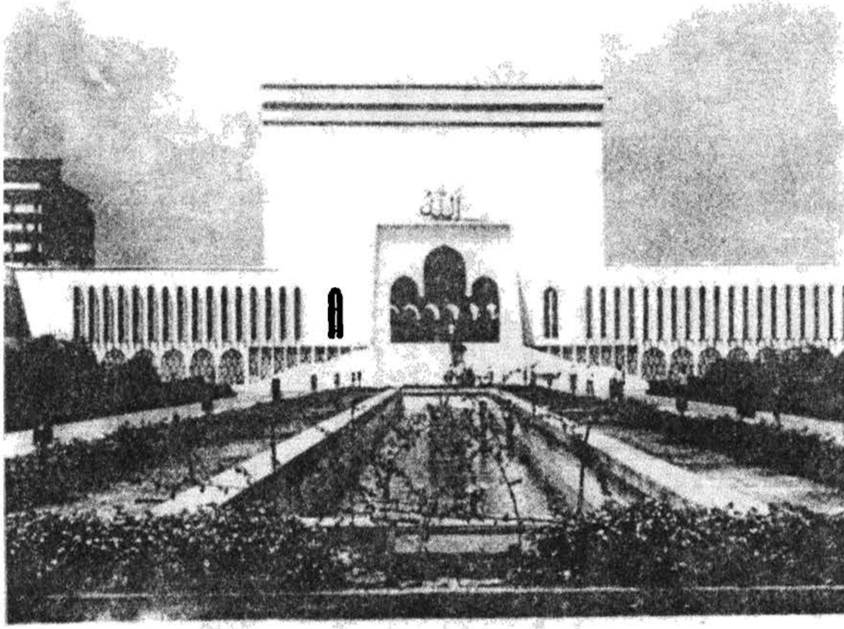
২৭. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)



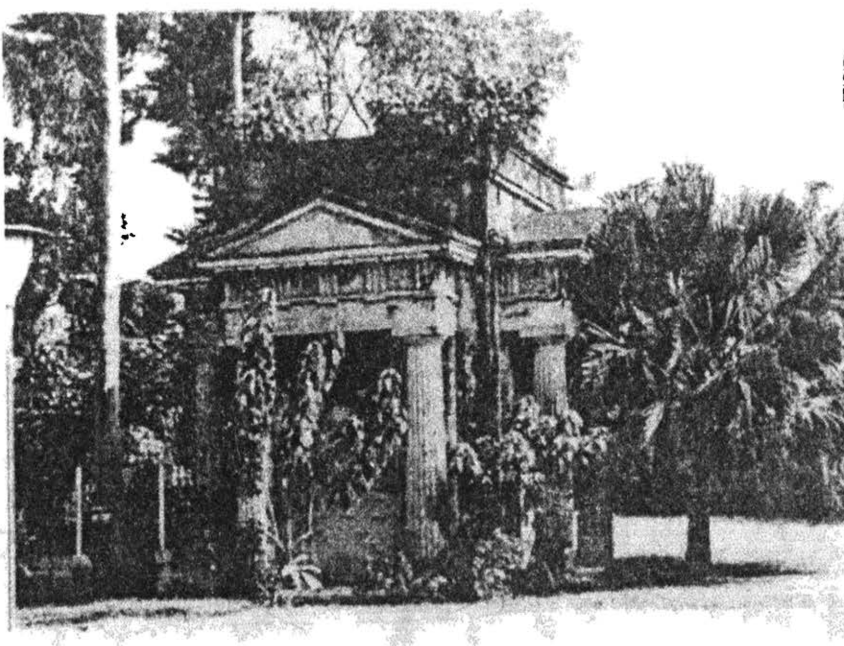
২৮. নাখোদা মসজিদ, কলকাতা। (সৌজন্য : ক্যা. এ্যাশার)

বদলালেও আর্থ-রাজনীতিক রূপ থাকে প্রায় অপরিবর্তিত। কারণ, ক্ষমতাসীন শক্তিকাঠামোর রয়েছে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রেখে অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকে থাকার অসাধারণ গুণ। বর্ণবৈষম্য, আভিজাত্যিক আধিপত্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকাঠামোয় পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়। হতে পারে এ পরিবর্তনের গতি অত্যন্ত ধীর, কিন্তু কখনো তা স্থবির থাকে না। যেমন, ভারতচন্দ্রের যুগের কাব্যরূপ মধুসূদন দত্তের যুগে অচল, আর মধুসূদন যুগের কাব্যরীতি নজরুল ইসলামের যুগে হয়ে পড়ে অপ্রচলিত। কৌলীন্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, সতী, বাঈজীনাচ প্রভৃতি ছিল আঠারো শতকের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান সমাজের মূল্যবোধ ভিন্নরূপ। আঠারো শতকের শিল্প ও স্থাপত্যরীতি আর বর্তমানের শিল্প ও স্থাপত্যরীতি এক নয়। কিন্তু আঠারো শতকের ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে বর্তমান ক্ষমতাকাঠামোর এখনো বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। নবাবি যুগের মুৎসুদ্দি, ফৌজদার, কোতোয়াল, আমিল, কানুনগোরা যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ও সরকারি আমলারাও প্রায় একই ক্ষমতার অধিকারী। পার্থক্য শুধু রূপ ও নামকরণের। নবাবি যুগের শেঠ-বসাক পরিবার আর বর্তমানের একচেটিয়া পারিবারিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যেও পার্থক্য নেহাতই নামের। নবাবি যুগে ক্ষমতাসীনরা অনুকম্পা প্রদর্শনের বিনিময়ে অধস্তনের কাছ থেকে গ্রহণ করতো সেলামি, নজরানা, পেশকাশ, তুহুরি, ভেট, উপরি ইত্যাদি। এই অনুপার্জিত নগদ লাভের চর্চাটি এখনো চলছে, কিন্তু ভিন্ন নামে ও কায়দায়। আঠারো শতকে সুবাদারসহ আমলা-মুৎসুদ্দিরা বেনামীতে ব্যবসা করতো, এই বিশ শতকেও এ অপবাদ থেকে সরকার ও সরকারি আমলারা মুক্ত নয়। অর্থাৎ, আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি সমাজ থেকে উত্থিত না হয়, তাহলে বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোর প্রবণতা থাকে পরিবর্তনকে রোধ করার দিকে। তখন সমাজ এগিয়ে চললেও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী থাকে স্থিতিশীল, যার ফলে সমাজ ও ক্ষমতাসীনের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক, যা অনেক সময় রক্তাক্ত সংঘাতেরও রূপ নিতে পারে। পলাশী থেকে পাকিস্তানের শেষদিন পর্যন্ত সকল বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, আন্দোলন এবং সবশেষে বাংলাদেশ বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনা এ তত্ত্বকাঠামোয় ফেলে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের কোন ভূমিকাই ছিল না, তবুও সরকার ও সমাজের মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কদাচিৎ। অথচ বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই শাসক-শাসিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এ বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? বৃটিশপূর্ব সরকারের লক্ষ্য ছিল বংশীয় শাসন ও আধিপত্য কায়েম করা এবং সে লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয় রাজানুগত এক শক্তিশালী সুবিধাভোগী সামরিক-বেসামরিক রাষ্ট্রীয় অভিজাত শ্রেণীব্যবস্থা। এই অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য স্থিতিশীল রাখার জন্য একই মডেলে সৃষ্টি করা হয় অধীনস্থ আঞ্চলিক



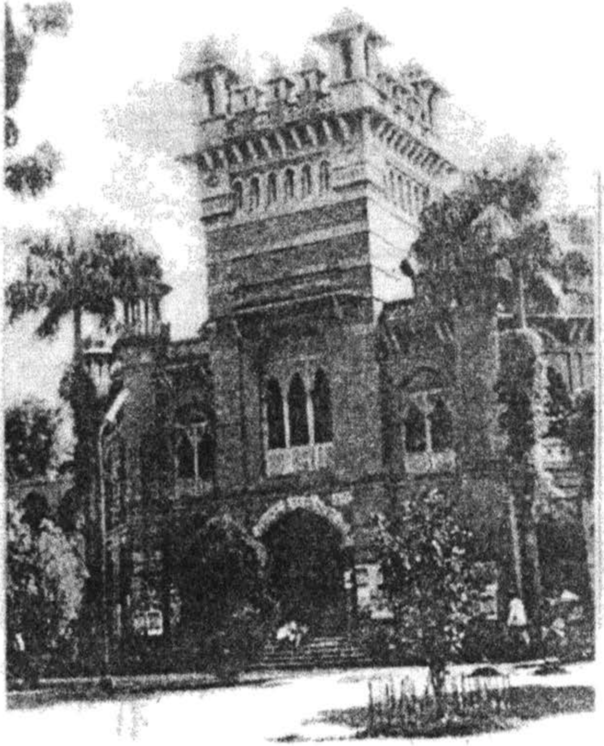
২৯. বায়তুল মোকাররম মসজিদ ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)



৩০. গ্রিক মেমোরিয়েল, ঢাকা।

অভিজাত শ্রেণী, যার ভিত্তি ছিল ধর্ম, বর্ণ ও ভূমিনিয়ন্ত্রণ। আঞ্চলিক অভিজাত শ্রেণীর অধীনে সাধারণ মানুষের দর্শনে পারলৌকিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় যেন জাগতিকতা তাদেরকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে না তোলে। ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠে পরজাগতিক। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি, জীবনমান, মানবিক অধিকার প্রভৃতি প্রশ্নে সমাজ থাকে উদাসীন। ধর্ম, বর্ণ ও সনাতন প্রথা-প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না ঘটলে রাষ্ট্রক্ষমতায় কে আসে কে যায় এ সম্পর্কে জনগণ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে মধ্যযুগীয় সরকার কখনো আঘাত করে নি, ফলে প্রতিঘাতও আসে নি। তাছাড়া, রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় শাসনকে কখনো স্থানীয় পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত করা হয় নি, যেজন্য স্থানীয় সমাজ ছিল এর চিরাচরিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত এক আধা-স্বাধীন সত্তা। অতএব, এ ব্যবস্থায় সরকার ও সমাজের মধ্যে বিরোধের অবকাশ ছিল ক্ষীণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিঘাতে উচ্চ ও আঞ্চলিক অভিজাত শ্রেণীর পতন ঘটে; দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। উৎপাদন উপায়ের উপর উৎপাদক শ্রেণী তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ পৌঁছায় গ্রামের পর্ণকুটির পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে এমনসব আইন-কানুন ও প্রশাসনব্যবস্থা প্রণীত হয়, যা শুধু মানুষের জাগতিক স্বার্থকেই নয়, তাদের চিরাচরিত ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থাকেও আঘাত করে। সুতরাং, সরকারের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্য ছিল মূলত কোম্পানি আমলের। কোম্পানি-উত্তর যুগের দ্বন্দ্ব ছিল ভিন্নরূপ। কোম্পানি শাসনের প্রভাবে ক্রমশ একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এমন সচেতনতা সৃষ্টি হয় যে, প্রশাসন পরিচালনায় দেশীয়দের অংশগ্রহণ আরো সম্প্রসারিত করার জন্য উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এরা সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলে। সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা যে হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে সে হারে শাসিতের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর উদারনীতি বৃদ্ধি পায় নি, ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের এমন অবনতি ঘটতে থাকে যে, পরিশেষে বিশ শতকের প্রথম পাদে এসে বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশ এমনকি বৃটিশবিরোধী সন্ত্রাসী তৎপরতা পর্যন্ত শুরু করে।

আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, সমাজের সমগ্র দিক অন্তর্ভুক্ত করে কোন একক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। বৃহৎ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করলে সামাজিক ঐতিহাসিককে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর নির্ভর করে স্থির করতে হবে তিনি পাঠকের সামনে কি বক্তব্য পরিবেশন করতে চান এবং আরো স্থির করতে হবে সফলভাবে সে বক্তব্যটি উত্থাপন করার জন্য তিনি কি গবেষণাপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। একটি সাধারণ সফল কৌশল হচ্ছে ঘটনার বিকাশপ্রবণতার মূলধারাটি সনাক্ত করা। মূলধারার যথার্থ পর্যালোচনা করা সম্ভব হলে এর অন্তর্নিহিত উপধারাগুলি



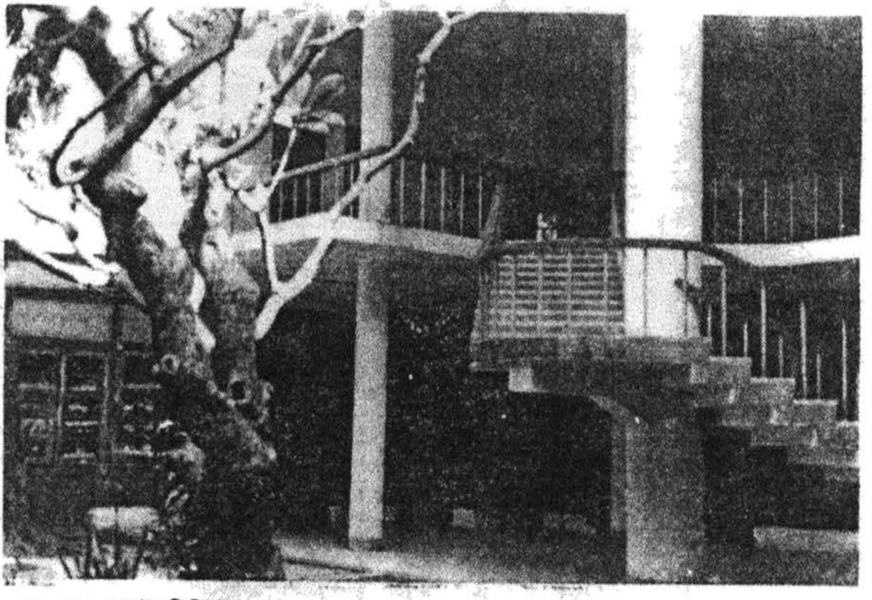
৩১. কার্জন হল, ঢাকা।



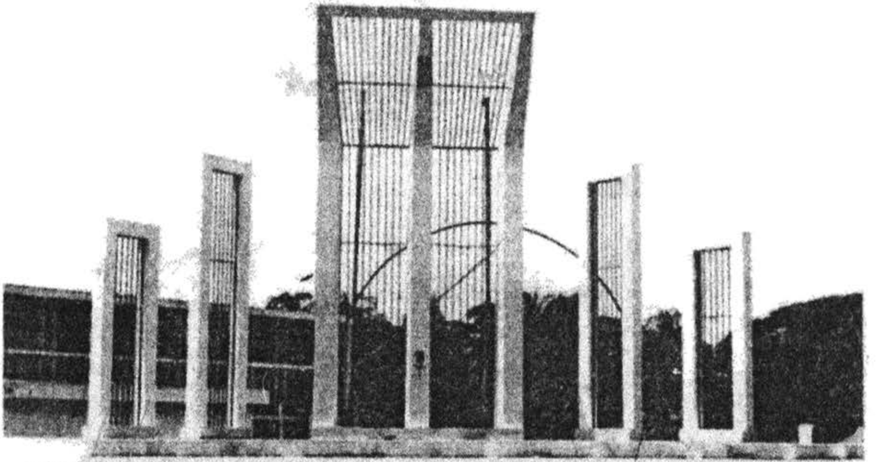
৩২. পুরনো হাইকোর্ট, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

সহজভাবেই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। উপমাস্বরূপ, আমরা যদি নবাবি আভিজাত্যের আচার-অভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে পৃথক পৃথকভাবে দেশের সকল অভিজাত পরিবারের কাহিনী পরিবেশন করে পাঠককে ভারাক্রান্ত না করে শুধু মুর্শিদাবাদ দরবারের চিত্রটি তুলে ধরাই যথেষ্ট। কারণ এটা সর্বজনবিদিত যে, আচার-আচরণে দেশের সকল অভিজাত পরিবার মুর্শিদাবাদ দরবারকে অন্ধ অনুকরণ করতো। এ নমুনাপদ্ধতি অবলম্বন করে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তাদের সামাজিক ইতিহাসের মূলধারাভিত্তিক আলোচনা করেছেন । যেমন তারা পনেরো, ষোল ও সতেরো শতকের ইউরোপীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন রেনেসাঁ, রিফর্মেশন, প্রটেস্টানটিজম, হিউম্যানিজম, রোমানটিসিজম প্রভৃতি মূলধারায় ফেলে। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নে অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ না করে অবলম্বন করা হয়েছে এক ধরনের পঞ্জিকাপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রচ্ছন্নভাবে আমরা সমাজের অনেককিছু খুটিনাটি বিষয় পাই, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সমগ্রকে দেখতে পাই না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে, সতেরো ও আঠারো শতকে হিন্দু বর্ণ ও পৌত্তলিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। এ প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটে নানা আন্দোলন ও নতুন পৌত্তলিক প্রতীক প্রবর্তনের মাধ্যমে। এই প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অখণ্ডভাবে এবং সামগ্রিকভাবে বিচার না করে খণ্ডিতভাবে দেখানো হয়েছে, যার ফলে আমরা প্রটেস্টানটিজম-এর মতো কোন সাধারণ বোধগম্য মূলধারার আন্দোলন দেখি না, দেখি শুধু নতুন দেবদেবীর নাম, নতুন ধর্মাচারপন্থীদের, যেমন বৈষ্ণববাদী,সখীভব, রামানুজী, রামানন্দী, কবিরপন্থী, নানকপন্থী, চার্বাকপন্থী, রাধাবল্লভী, সৌরপত্ত, গণপত্ত, শক্তি, দুর্গা, কালী, তারা, মনসা, তন্ত্র, চরণদাসী, কর্তাভজা, স্পষ্টদেখা, স্বামীনারায়ণ, বলরামী, সাতনামী ও আরো বহু মতবাদ-বিশ্বাসের অনুসারী, পূজক-পূজারী। এসবই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ইউরোপে প্রতিবাদ ঘটেছিল পোপের বিরুদ্ধে, এখানে ঘটেছে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইউরোপের প্রতিবাদকে আখ্যায়িত করা হয়েছে প্রটেস্টানটিজম নামে আর বাংলার অনুরূপ প্রতিবাদের ঘটনাগুলোকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে একটি জড় পঞ্জিকারূপে, যেখানে আমরা পাই হাজারো দেবদেবীর নাম, শুভ-অশুভ দিবস, পূজাপার্বণে করণীয়-অকরণীয় বিষয়, শুচি-অশুচি, শ্লোকের শুদ্ধাশুদ্ধির কথা। এই পঞ্জিকা-ইতিহাসে আমরা হাজারো নতুন মতবাদ, নতুন দেবদেবীর সন্ধান পাই বটে, কিন্তু যে সামাজিক মানস-মনোভঙ্গি, পরিবেশ ও প্রস্তুতি ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে এসবের অভ্যুত্থান ঘটালো এর কোন সামগ্রিক চিত্র আমরা পাই না।

সতেরো ও আঠারো শতকের নতুন চিন্তার ধারা তৈরি করেছে মূলত অ-ব্রাহ্মণ মনীষীরা। তাদের চিন্তাধারা এবং ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রতি ছিল এক অভাবনীয় চ্যালেঞ্জ। স্বাভাবিক কারণেই ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সৃষ্ট ঐতিহ্যভঙ্গকারী আন্দোলনসমূহ ছিল ঐতিহ্যানুগত বর্ণহিন্দুদের চোখে 'অবক্ষয়',



৩৩. চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।



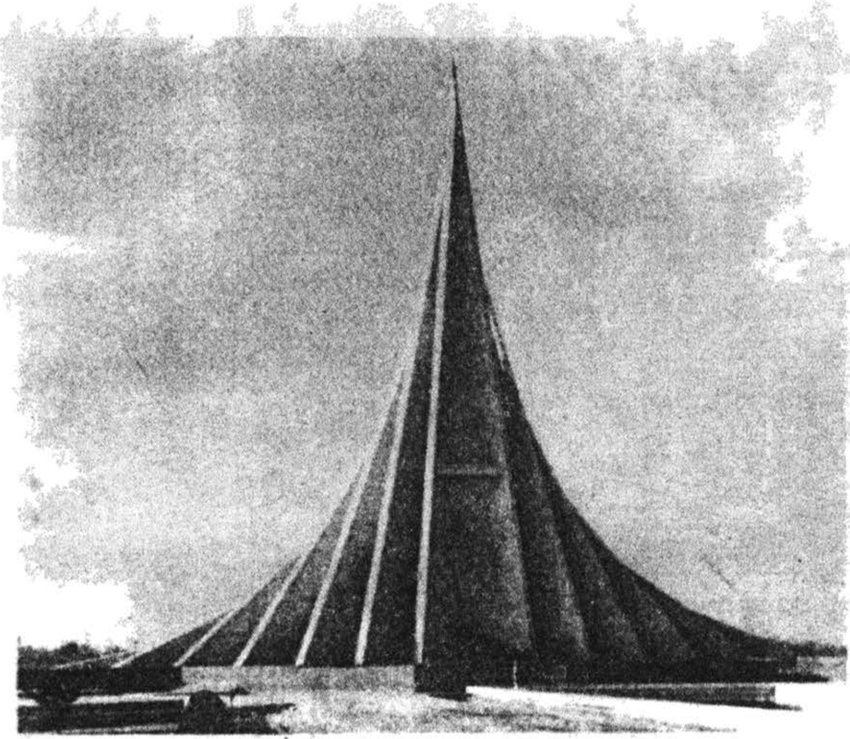
৩৪. শহীদ মিনার, ঢাকা। (সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)

'বিকৃত রুচি' ও 'চারিত্রিক অধঃপতন'। এ অপবাদগুলি প্রথম শোনা যায় কলকাতার রক্ষণশীল দলপতিদের আশ্রিত পণ্ডিতদের মুখে। কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এবং ইউরোপীয়দের সান্নিধ্যে এসে কলকাতায় একটি দেশীয় ধনাঢ্য বানিয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের বিষয়টি আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ধনাঢ্য বানিয়া শ্রেণীটির উদ্ভব ও বিকাশ যেহেতু ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু আমাদের প্রত্যাশা করা অমূলক নয় যে, ঐ ঐশ্বর্যশালী বানিয়ারাই হবে বাংলায় আধুনিকতার অগ্রপথিক। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, বানিয়ারা শুধু প্রচণ্ড রক্ষণশীলই নয়, তারা হচ্ছে বর্ণবাদের শ্রেষ্ঠ ধ্বজাধারী এবং নতুন প্রতিবাদী চিন্তাধারার পরম বিরোধী পক্ষ। তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় বর্ণবাদের পুনরুত্থান আন্দোলন, যে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণ্যবিরোধী মতবাদকে 'অবক্ষয়িত' ও 'বিকৃত রুচিসম্পন্ন' বলে আখ্যায়িত করে সাধারণ সমাজ কর্তৃক একে বর্জন করার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

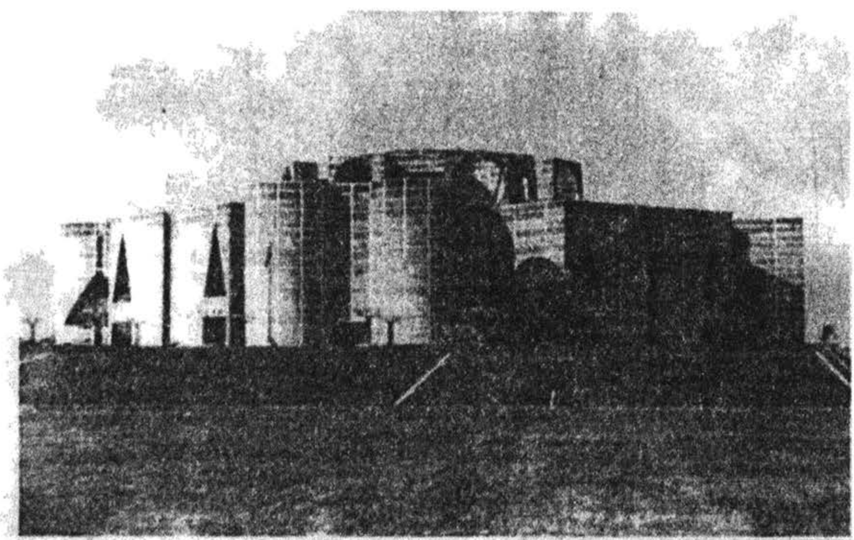
কলকাতা তথা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কলকাতাকেন্দ্রিক রক্ষণশীল বানিয়া পরিবারগুলির প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। তাদের সৃষ্ট পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, স্কুল-কলেজগুলিতে সতেরো-আঠারো শতকের ভিন্নমতবাদকে বিকৃত রুচির ধারক বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি বিশ শতকের অনেক ঐতিহাসিক আলোচনায়ও উক্ত সময়ে সমাজে 'বিকৃত রুচির' প্রাদুর্ভাবের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এ মর্মে যে, মুগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণে সমাজের বাঁধন ঢিলে হয়ে পড়ে এবং সর্বত্র সুরুচি ও সদাচরণে অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু মুগল সাম্রাজ্যের পতন কি আসলে কোনভাবে সমকালীন বাঙালি সমাজকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল ? উত্তর ভারতের বেলায় তা হয়তো সত্য হতে পারে—কে.কে. দত্ত যেমন মতপ্রকাশ করেছেন যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ায় সমাজে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল।[৩] কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সুবা বাংলার আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অবস্থার এমন উন্নতি ঘটে এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও এমন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, যা সার্বিকভাবে বিচার করলে বলা যায় যে, আঠারো শতকের প্রথমভাগ ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ। এ যুগে মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, নাটোর, বিক্রমপুর, ঢাকা প্রভৃতি ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় কর্মকোলাহলপূর্ণ কেন্দ্র। এ যুগে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জমিদারপরিবারগুলি ও সরকার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার জন্য উদারভাবে লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি দান করে।[৪] এর প্রভাবে এ যুগে শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে ঘটে

৩. Kalikinkar Datta, *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century, 1707–1813*, (Calcutta 1961), 10

৪. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856*, (Dhaka 1977 reprint), 171-175



৩৫. জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার, ঢাকা। সৌজন্য : প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার)



৩৬. সংসদ ভবন, ঢাকা। (সৌজন্য প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ বাংলাদেশ সরকার)

অভূতপূর্ব জাগরণ।[৫] তাহলে কিসের ভিত্তিতে আমরা প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগকে অধঃপতিত, অবক্ষয়িত ও বিকৃত পর্ব বলে বর্ণনা করতে পারি ? আঠারো শতকের তথাকথিত নৈতিক সঙ্কটের প্রসঙ্গ তুলে অবধারিতভাবে উদাহরণ দেয়া হয় ভারতচন্দ্রের ঐতিহ্যবহির্ভূত নারী-পুরুষ সম্পর্কের কথা। কিন্তু সেটা কি ভারতচন্দ্র ও তাঁর শ্রেণীর বিকৃত রুচি নাকি ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির হঠকারিতা ও নিপীড়নমূলক নৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ? উল্লেখ্য যে, রেনেসাঁ-যুগের সৃষ্টিশীলতাও সমকালীন রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক অনুরূপভাবে 'অবক্ষয়ের' ও 'বিকৃতি'র অপবাদ লাভ করেছিল। আঠারো শতকের নবজাগরণের দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে অঙ্কুরেই এর বিনাশ। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও অন্যান্য সকল ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে যখন নতুন প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো এবং নবাবি শাসন ও নবোত্থিত ভূস্বামী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় যখন শিল্প-সংস্কৃতিসেবীরা এক নতুন দিগন্তে পৌঁছার প্রয়াস পেলো, তখনই হঠাৎ অবসান ঘটলো বাংলার স্বাধীনতার এবং এর সঙ্গে স্তিমিত হয়ে গেল নব্যধারার সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতা। কোম্পানির শাসনে সুগম হলো কলকাতার রক্ষণশীল বানিয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ। তবে আঠারো শতকের চ্যালেঞ্জ একেবারে তলিয়ে যায় নি। নতুন করে এর আবির্ভাব ঘটলো রামমোহন ও তাঁর শ্রেণীর মাধ্যমে। মানবগোষ্ঠীর ঐক্য, সৃষ্টিকর্তার ঐক্য, পৌত্তলিকতার নিরর্থকতা প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রশ্ন ইতিপূর্বে তুলেছিলেন চরণ দাস (জন্ম ১৭০৩), আলকচাঁদ (মৃ.১৭৬৯), রামশরণ পাল, রূপরাম কবিরাজ, বলরাম হরি, ইয়ারি শাহ (মৃ.১৭২৫), ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন, লালন শাহ এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহর বঙ্গীয় অনুসারীগণ, সেসব প্রশ্নই আরো সুসংগঠিত ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন রামমোহন রায়। রামমোহন অবশ্য তাঁর পূর্বসূরিদের অবদানের কথা কোথাও স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। সতেরো শতকের সাহিত্যধারার অন্তত তিনটি নতুন উপাদান যোগ হয়েছে আঠারো শতকে। এগুলি হচ্ছে দোভাষী পুঁথি, শাক্তপদ এবং কবিওয়ালা। দোভাষী পুঁথি ছিল বাংলার সঙ্গে আরবি, ফার্সি, উর্দু মিশিয়ে পদ্যে ভাব প্রকাশের এক অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন প্রধানত মুসলিম লেখকগণ, যদিও ভারতচন্দ্রসহ অনেক হিন্দু লেখকও এ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। দোভাষী পুঁথির বিষয়বস্তুও ছিল বিদেশী, কিন্তু সাহিত্যের এ অভিনব ধারা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। দোভাষী পুঁথির প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানি আমলে মৌলবাদী হিন্দু পণ্ডিতরাও চেষ্টা করেছে সংস্কৃতঘেষা বাংলা প্রবর্তন করতে। তবে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বাংলা ভাষাকে এর স্বাভাবিক গতিধারা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রাচীনপন্থী ছাড়া হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে বাংলা ভাষাকেই সাহিত্যের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) গদ্যরীতির প্রশংসায় বঙ্কিমচন্দ্র যেমন

৫ দেখুন এ খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়, ওয়াকিল আহমদ, "আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য"।



৩৭. বাদশাহ মুহম্মদ শাহের প্রতিকৃতি, আঠারো শতক
(সৌজন্য বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর ঢাকা)



৩৮. কালীঘাট পট উনিশ শতক।
(সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)

বলেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। ... যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।"[৬]

উনিশ শতকের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাঙালির বহুভাষাচর্চা। ধর্মীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন, ঔপনিবেশিক সরকারের শিক্ষানীতি, ইউরোপে প্রাচ্য ভাষাবিষয়ক গবেষণা, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উপর ব্যাপক গবেষণা ও চর্চার ফলে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্যচর্চা এমন প্রসার লাভ করে যে, এমনকি এসব ভাষায় অনেক সংবাদপত্র-সাময়িকী পর্যন্ত প্রকাশিত হতে দেখা যায়।[৭] কিন্তু এই বহুভাষিক চর্চার ঐতিহ্য বিশ শতকে এসে নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পরিণতির প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বৈপ্লবিক অগ্রগতি ও জাতীয়তাবাদের বিকাশকে।

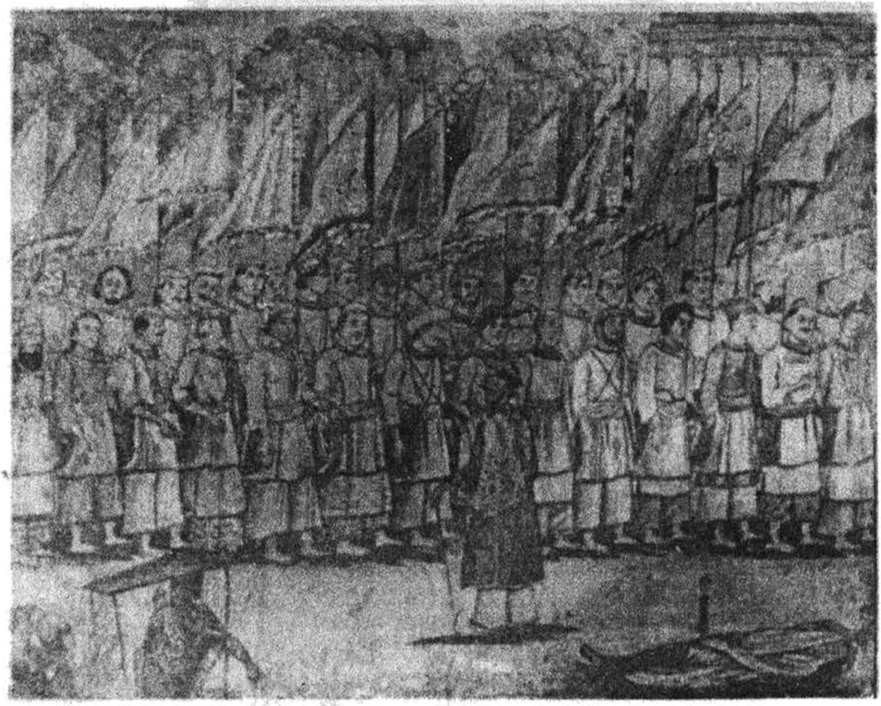
সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালি জাতিগঠনপ্রক্রিয়া গতিলাভ করে প্রধানত দু'টি কেন্দ্রে—একটি গ্রাম আরেকটি শহর। এ দু'টিকে আলাদাভাবে বিচার করতে হবে এজন্য যে, উৎপাদন, জীবনযাত্রা ও সাংগঠনিকভাবে গ্রাম ও শহর একে অপর থেকে অনেক ভিন্ন। গ্রাম ও শহরের ভিন্নতা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে। গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আর শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়। বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, নবাবি যুগে মুসলমান সম্প্রদায় গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে এসে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের অতিক্রম করে গেলেও শহরে তাদের সংখ্যালঘুত্ব আগের চেয়ে আরো অনেক বেড়ে যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং শহুরে সমাজে হিন্দু প্রাধান্যবিস্তারের বিষয়টি ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বটে।

নগরায়ণ ও নগরসমাজের সমস্যাদিতে লক্ষ্য করার অনেকগুলি দিক রয়েছে। নবাবি যুগের নগরায়ণ ও ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ণের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা দরকার। পার্থক্যবিচারের মাপকাঠি হতে পারে জনসংখ্যা, ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক সংখ্যানুপাত, পেশা, সুযোগ-সুবিধা, শহর-গ্রামসম্পর্ক, উৎপাদনসম্পর্ক, বসতিবিন্যাস, নাগরিক সমাজসংগঠন ও সমাজসম্পর্ক, শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসম্পর্ক, নগর-প্রশাসনব্যবস্থা ইত্যাদি।

---

৬. সারোয়ার জাহান, "বঙ্কিমচন্দ্র", উদ্ধৃত ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রতিভা : স্বাতন্ত্র্য বিচার*, (ঢাকা ১৯৮৭), ১৩।

৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ*, (ঢাকা ১৯৮৬)।



৩৯. মিছিল দৃশ্য, উনিশ শতক। (সৌজন্য   বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)



৪০. হস্তলিপি, উনিশ শতক। (সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)

কৃষি ও কুটিরশিল্পপ্রধান অর্থনীতি ও সামরিক আভিজাত্যপ্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে সেনাছাউনি আর প্রশাসনসদরের মধ্যেই নগর সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। এ প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি সতেরো শতকের নগরায়ণে। কিন্তু আঠারো শতকের প্রারম্ভে নগরায়ণে আসে নতুন স্রোতোধারা, নতুন বৈচিত্র্য। বিশ্বযোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন, ইউরোপে বাণিজ্যবিপ্লব, বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, বাংলার রপ্তানিবাণিজ্য বৃদ্ধি, একটি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, নবাবি শাসননীতির ফলে একটি প্রশাসন ও ভূভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুদয় এবং সর্বোপরি বাংলার বিভিন্ন উৎপাদন ও যোগাযোগকেন্দ্রে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যিক বসতি স্থাপন প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ বাংলার নগরায়ণপ্রক্রিয়ায় আনে নতুন উপাদান, নতুন চাপ, নতুন পরিবেশ। এসবের ফলে আমরা দেখতে পাই নগরায়ণে দ্রুতগতি, দেশের সর্বত্র ছোটবড় নগরবসতি, যেমন প্রশাসনিক সদর শহর মুর্শিদাবাদ, বাণিজ্যিক শহর ঢাকা, কাশিমবাজার, কামারখালী; বিদেশী বাণিজ্যিক বসতিশহর কলকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর; জমিদারি শহর বর্ধমান, নদীয়া, নাটোর, দিনাজপুর, রাজনগর এবং আরো অসংখ্য শহরতুল্য হাট, বাজার, গঞ্জ ইত্যাদি জমিদারি শহর ছাড়া বাকি সব নগরকেন্দ্রে ঘটেছিল বহুজাতিক সমাবেশ।

কিন্তু আঠারো শতকের প্রথমার্ধে গড়ে উঠা ঐসব শহরবসতি শীর্ণরূপ ধারণ করে এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। ব্যতিক্রম শুধু নতুন রাজধানী শহর কলকাতা। ঔপনিবেশিক শাসন সৃষ্টি করলো এক নতুন পরিস্থিতি, যার অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে ধ্বংস হলো নবাবি নগরায়ণ এবং এরই ধ্বংসস্তুপের উপর এককভাবে গড়ে উঠলো মহানগরী কলকাতা। সারা বাংলা তথা সমগ্র উত্তর ভারত পরিণত হলো কলকাতার পশ্চাদ্‌ভূমিতে। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হলো জেলা শহর—কলকাতার শাসক শ্রেণীর ভাষায় মফস্বল শহর।[৮] বাংলায় নগরায়ণের এই উত্থান-পতনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সুগভীর। আমরা অনুমান করতে পারি যে, একটি শহরের উত্থান মানে ঐ শহরকে কেন্দ্র করে নাগরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি শহুরে সমাজের উদ্ভব, আর এর পতন মানে ঐ শহুরে সমাজের বিলয়। আমরা আরো অনুমান করতে পারি যে, কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে বিশেষ কোন নগরের অবলুপ্তি ঘটলে জাতীয় জীবনে এর প্রভাব পড়বে একরকম, আর এ প্রভাবের প্রকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করবে যদি একটি বাদে একযোগে বাকি সবক'টি শহর আবার গ্রামীণ জীবনে রূপান্তরিত হয়। ঠিক তাই ঘটেছিল আঠারো শতকের শেষার্ধে। নবাবি যুগে বিকশিত বাণিজ্যিক শ্রেণী, দ্রুত সম্প্রসারণশীল বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রশাসনিক আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী, ভূ-নিয়ন্ত্রক রাজা-মহারাজা শ্রেণী,

---

৮. Sirajul Islam, "Life in the Mofussal Towns of Nineteenth Century Bengal", in Kenneth Balhatchet and John Harrison (eds.), *The City in South Asia : Pre-Modern and Modern*, (London 1980), 225 - 230



৪১. "ঝড়ে গরু" কালি ও মোম, ১৯৭২-৭৩। জয়নুল আবেদীন। (সৌজন বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)

আধা-স্বাধীন নবাবি রাষ্ট্রের আমির-ওমরাহ, কোতোয়াল-কানুনগো, ফৌজ ও ফৌজদার প্রভৃতি শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাতেই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শ্রেণীর নগরকেন্দ্র। বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ায় শহরভিত্তিক শ্রেণীসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে নবাবি নগরায়ণেরও অবলুপ্তি ঘটে। নবাবি শাসক শ্রেণীর পতনের প্রশ্নটি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু যা এখনো তাদের বিবেচনায় তেমন আসে নি সেটি হচ্ছে পতিত শাসক শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল শহুরে নানা পেশাজীবী শ্রেণীর ভাগ্য এবং সমাজ-সংস্কৃতির উপর এর প্রভাব-পরিণতি।

ঔপনিবেশিক নগরায়ণ নবাবি নগরায়ণের সঙ্গে তুলনীয় নয়। নবাবি আমলে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল কোন না কোন উৎপাদন বা ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে। এমনকি রাজধানী মুর্শিদাবাদও ছিল নানাভাবে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৯] ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের পরও এ নগরের লোকসংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, কারণ এর ফলে ঢাকার উৎপাদনব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য লক্ষণীয়ভাবে ব্যাহত হয় নি।[১০]

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মফস্বল শহরগুলির আবির্ভাব ঘটে জেলাপ্রশাসনকে কেন্দ্র করে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, যেজন্য মফস্বল শহরগুলির জনসংখ্যা সীমিত থাকে এর প্রশাসনিক প্রয়োজনের মধ্যে, অর্থাৎ সরকারি জেলা কর্মকর্তা-কর্মচারী, অধস্তন পিয়ন-দারোয়ান-বরকন্দাজ, উকিল-মোক্তার আর এদের ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী কিছুসংখ্যক দোকানি, কারিগর, ঠিকাদার, ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মফস্বল শহরগুলি ছিল প্রায় নারীবর্জিত, কারণ এসব সদ্য গজিয়ে উঠা মফস্বল শহরে পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিবেশ তখনো তৈরি হয় নি। গ্রামই ছিল মানুষের স্থায়ী ঠিকানা ও পরিচয়। চাকুরেদের জন্য শহর ছিল অস্থায়ী নিবাস। স্বাভাবিক কারণেই পূজা-পার্বণ, ঈদ বা অন্য কোন সামাজিক উৎসবে সরকারি ছুটি হলে মানুষ ছুটে যেতো পৈত্রিক নিবাস গ্রামে, শহর হয়ে পড়তো জনশূন্য। বেভারিজের ভাষায়, "শহরে তখন থাকতো শুধু বেশ্যা (সেযুগের ভাষায় পেশাগার), যাদের শহর ছেড়ে যাবার জন্য ছিল না অন্য কোন স্থান।"[১১]

কিন্তু নবাবি যুগের নগর ছিল এর বাসিন্দাদের স্থায়ী বসতি। তাঁতী, কামার, কুমোর, পোদ্দার, গোয়ালা, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, পটুয়া, সূত্রধর, সর্দার (পালকিবাহক), মিস্ত্রি, বায়েন-গায়েন, কায়েত (কেরানি), কারিগর, কসাই, মাহুত, ধোবা, ধাঙ্গড়, ডোম, বাগদি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা ছিল স্থায়ী পেশাজীবী নগরবাসী। পেশা ও বর্ণ অনুসারে এরা

---

৯. Khan M. Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad, 1765-1793*, (Dhaka 1964), 79-81.
১০. Abdul Karim, *Dacca · The Mughal Capital'*, (Dhaka 1964), 79-81.
১১. H Beveridge, *The District of Bakarganj : Its History and Statistics*, (London 1876, reprint Barisal 1970), 329



৪২. "তিন কন্যা" তৈলচিত্র, ১৯৮৩, কামরুল হাসান।

(সৌজন্য : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা)।

সপরিবারে বসবাস করতো শহরের বিভিন্ন মহল্লায়, যেগুলি ছিল তাদের স্থায়ী আবাসস্থল। যেমন মুগল আমলে পেশা অনুসারে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার নাম ছিল তাঁতীবাজার, বানিয়ানগর, কামারনগর, কুমারটুলী, পটুয়াটুলী (চিত্রকরদের মহল্লা), সূত্রাপুর (ছুতোরদের স্থান), শাঁখারীবাজার, যুগীনগর, কায়েতটুলী ইত্যাদি। শহরসীমার ভিতরে এগুলি ছিল সামাজিকভাবে এক একটি আবাসিক পেশাপল্লী। গ্রামের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল মূলত উৎপাদন বিনিময়ের।

সনাতন নগরায়ণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর সামাজিক স্থৈর্য। এক পেশা থেকে অন্য পেশায় গমন আচারসিদ্ধ ছিল না। বসতিবিন্যাসও ছিল পেশা ও বর্ণভিত্তিক। এক বসতির লোক অন্য বসতিতে গিয়ে তার পেশা পরিচালনা করতে পারতো না। টোলা, টুলী, খানা, মহল্লা, পাড়া, বাজার, গোলা, চক, ঘাট, বন্দর, পট্টি, বাড়ি, বাড়িয়া, বাগ প্রভৃতি ছিল বসতিসমূহের সাধারণ শেষনাম এবং নাম থেকেই বোঝা যেতো কোন্ এলাকায় কাদের বাস এবং কি তাদের উৎপাদন ও পেশা। নবাবি নগরবসতির আরেকটি দিক এই যে, এখানে উৎপাদন, বিক্রয় ও বাসস্থান একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত রাখা হয়, যা ছিল সমকালীন ইউরোপীয় নগরবসতিরও বৈশিষ্ট্য।

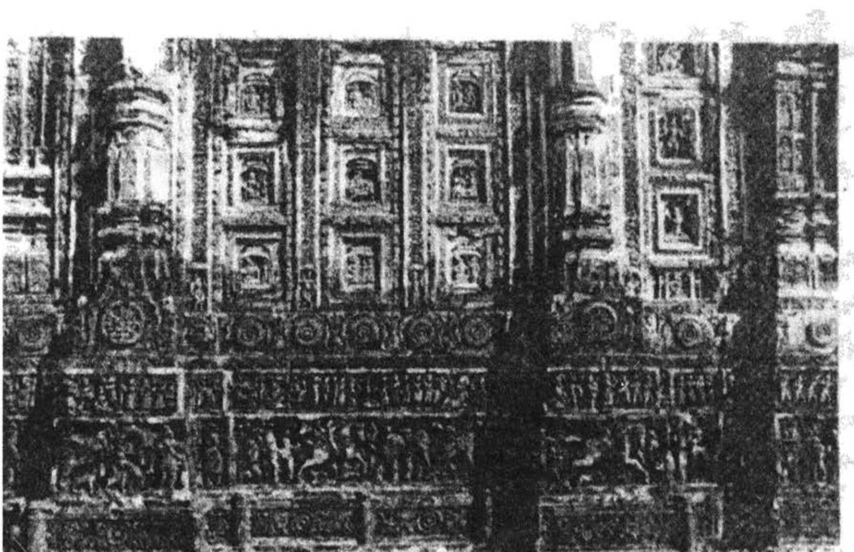
নবাবি আমলের নগরবসতি ও পেশাবিন্যাসের অসচল অনড় বৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাধীনে ক্রমশই অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তবে এটা ঠিক যে, অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও সনাতন নগরায়ণের পেশা ও বর্ণভিত্তিক বসতি ও সমাজবিন্যাস দীর্ঘকাল টিকে থাকে। প্রদীপ সিংহ দেখিয়েছেন যে, বর্ণ ও গোষ্ঠীভিত্তিক বসতিবিন্যাস ও দলাদলি কলকাতায় লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান ছিল উনিশ শতকের শেষ দশকেও। তাঁর মতে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে শিল্পায়নবিহীন নগরায়ণ।[১২]

নবাবি বা ঔপনিবেশিক সব আমলেই নগরের জনসংখ্যা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। হতে পারে নবাবি আমলের নাগরিক সমাজ ছিল বৃটিশ আমলের চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু তখনো গোটা জনগোষ্ঠীর এক দশমাংশও নগরবাসী ছিল বলে মনে হয় না। উনিশ শতকের শেষভাগে সারা বাংলায় জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ফলে গ্রাম থেকে শহরে আগমনের প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু তবুও বিশ শতকের শুরুতে দেখা যায় যে, প্রকৃত শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা পাঁচ ভাগের কম।[১৩] গ্রাম ও শহরের এ আনুপাতিক বৈষম্য চলতে থাকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত।

---

১২. Pradip Sinha, "Social Change", in N K Sinha (ed), *The History of Bengal, 1757-1905*, (Calcutta 1967), 384

১৩. *Census of India* 1901, "Bengal Report", 480-81.



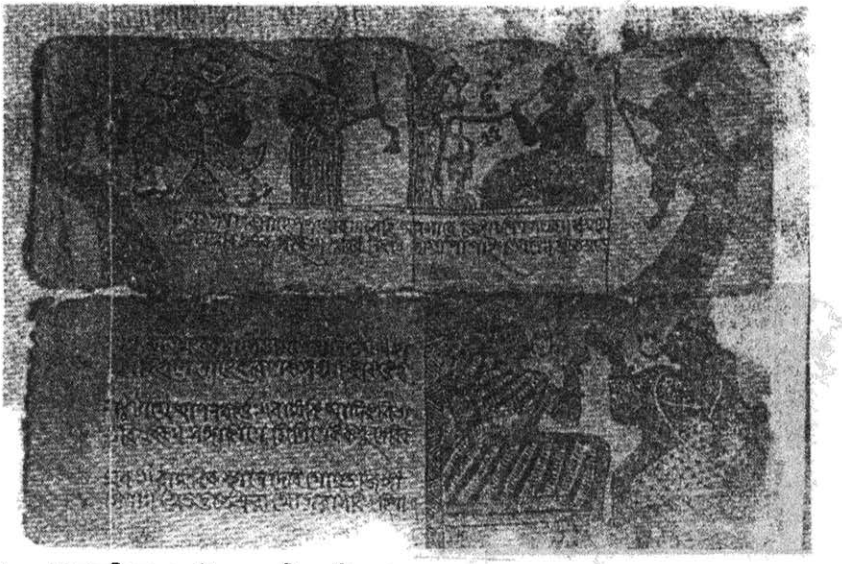
৪৩. কান্তজীর মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক, দিনাজপুর।

অতএব এককথায় বলা যায় যে, বাঙালি সমাজ মানেই গ্রামীণ সমাজ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি সমাজ এবং এর প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে গ্রামকে কেন্দ্র করেই। গ্রামীণ প্রথা-প্রতিষ্ঠান শহুরে সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে অতি প্রত্যক্ষভাবে। বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত শহরে বিদ্যমান আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, রীতিনীতি, পরিবার, গোষ্ঠী, উৎসবাদি ছিল গ্রামেরই অনুকরণ মাত্র। নগর গ্রামের মানুষকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে শুধু কর্মসংস্থানের অভাবের জন্যই নয়, সাংস্কৃতিক কারণেও।[১৪] গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি প্রায় একই রকম হলেও সাংগঠনিকভাবে গ্রাম ছিল অনেক বেশি সুসংহত ও সুশৃঙ্খল। গ্রামের মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো গ্রামেই। জীবিকার জন্য গ্রামত্যাগ করার প্রয়োজন পড়লে মানুষ অভিবাসন করতো গ্রামাঞ্চলেরই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। যেমন, ১৮৯৬ সনের লেবার কমিশন লক্ষ্য করে যে, কলকাতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলেও নদীয়ার মজুরেরা নিকটস্থ কলকাতায় গিয়ে শ্রম বিক্রি না করে চলে যেতো সুদূর সুন্দরবন এলাকায় ।

বাংলার প্রতিটি গ্রামের, প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে এর নিজস্ব ইতিহাস। প্রতিটি নদ-নদীর রয়েছে নিরন্তর ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস, রয়েছে প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী হাট, বাজার, গঞ্জের উৎপত্তি ও বিকাশের কাহিনী। গ্রামীণ বাংলার মানুষের আচার, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, উৎসব-অনুষ্ঠান, লোকগীতি, লোকশিল্প, কবিগান, যাত্রা, ভোজবাজি, লাঠিয়াল সবই ইতিহাস রচনার আকর্ষণীয় বিষয়। কিন্তু সে ইতিহাস এখনো লিখা হয় নি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় গ্রামের ইতিহাস লিখার প্রয়োজনীয়তাকে আরো তীব্র করে তুলেছে সন্দেহ নেই। গ্রামের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এর প্রত্যয়কাঠামো কি হবে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামের কি কোন রাজনৈতিক ইতিহাস আছে ? সর্বযুগে গ্রামীণ সমাজ অবস্থান করেছে শাসিতের দলে। কৌলীন্য ও আভিজাত্যের যুগে কৃষক শ্রেণীর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা থাকার কথা নয়। তখন তাদের ভূমিকা ছিল শুধু উৎপাদনের, আর অকৃষক উচ্চবর্ণের অবস্থান ছিল ভোগের। ঔপনিবেশিক যুগে গ্রাম ছিল রাজস্বসংগ্রহের ক্ষেত্র। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে নির্বাচিত সংসদ ও সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে গ্রামীণ মানুষ লাভ করে ভোটদানের রাজনৈতিক অধিকার। ভোটার হিসেবে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিতে গুরুত্ব অর্জন করে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে নি। তবে বিশ শতকের গোড়া থেকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখে শোনা যায় 'ভিলেজ পলিটিকস' বা গ্রাম্য রাজনীতির কথা, যা আসলে ছিল বৃটিশ প্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য নেতৃবর্গের গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামোয় তাদের সনাতন ক্ষমতা বজায় রাখার রাজনীতি। এ রাজনীতি বস্তুত নেতিবাচক এবং

---

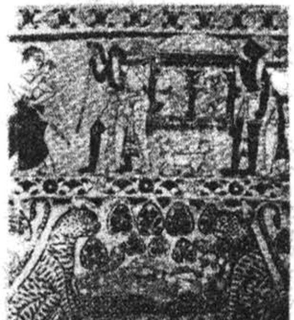
১৪. Sirajul Islam, "Mofussal Towns", 245 - 47.



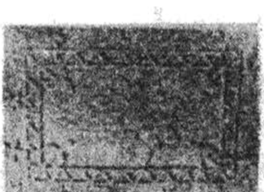
১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের পট, ময়মনসিংহ, বিশ শতক



২. গাজীর পট, ময়মনসিংহ, বিশ শতক



৩. রূপকথা পট, পশ্চিমবঙ্গ, উনিশ শতক



৪. খোদাইকৃত পিঁড়ি, নোয়াখালী, উনিশ শতক



৬. মুখোশ চিত্র (লাউ) ময়মনসিংহ, বিশ শতক



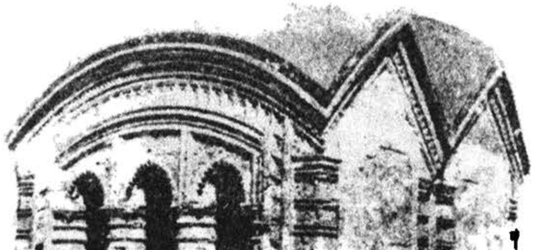
৫. লক্ষ্মীসরা, বিক্রমপুর, ঢাকা, বিঁশ শতক

সাংগঠনিকভাবে অস্বীকৃত। এককথায়, গ্রাম বরাবরই ছিল উৎপাদনকেন্দ্র, ক্ষমতার কেন্দ্র নয়। সুতরাং গ্রামের তেমন কোন ইতিবাচক রাজনৈতিক ইতিহাস নেই, নেতিবাচক ভিলেজ পলিটিকস ছাড়া। কিন্তু এর সামাজিক ইতিহাসের পরিধি বিশাল। আমাদের প্রত্যয়মতে গ্রামের সমাজ, সামাজিক সংগঠন, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বসতিবিন্যাস, কৃষিবিন্যাস, ধর্মবিশ্বাস, উৎসবাদি এমনই ঐতিহ্যবাহী ও বর্ণাঢ্য যে, এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা না করলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস মোটেই পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করতে পারে না।

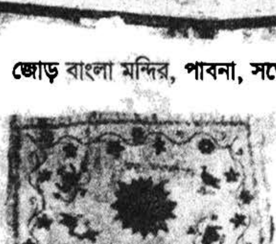
গ্রামীণ ইতিহাস পুনর্গঠনকাঠামোর প্রথমেই স্থান পাওয়া উচিত বসতিবিন্যাস, কারণ বসতিবিন্যাসে নিহিত আছে গ্রামের আদিকথা এবং সমাজসংগঠনের অন্তর্নিহিত অর্থ। প্রতিটি গ্রামের বসতিচরিত্র পৃথকভাবে যাচাই করা অসম্ভব এবং হয়তো এর প্রয়োজনও নেই। কারণ, গ্রাম অসংখ্য হলেও বসতির বৈশিষ্ট্য কিন্তু অসংখ্য নয়। বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছে বিশেষ ধরনের গ্রামীণ বসতি। গ্রামীণ বসতির ঐ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলে গোটা গ্রামীণ বসতিব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা তৈরি করা সম্ভব। এ ধারণা থেকে আমরা লাভ করতে পারি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সমন্বয় ও সমঝোতার সামগ্রিক চিত্র। এ চিত্র বসতিসম্পর্কিত ঐসব সমস্যা বিশ্লেষণের সহায়ক হতে পারে, যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতি ও মানুষের সহজাত সমন্বয় থেকে আগত। যেমন, গৃহনির্মাণকৌশল, পোশাক-পরিচ্ছদ, যোগাযোগপ্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। একজন বিদেশীর চোখে বাংলার সব গ্রামই একই রকম ও একঘেয়ে ঠেকতে পারে, কারণ তিনি দেখছেন শুধু এর বাহ্যিক দিক, বাঁশবনঘেরা একই রকম কুটিরগুচ্ছ, একই রকম লতাগুল্ম-বৃক্ষরাজি ও একই রকম কৃষক-মজুর-কারিগর। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়ে গঠিত এর ভিতরের উপাদানগুলি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল যে এর প্রকৃত ছবি অঙ্কন খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পরিবার, গোষ্ঠী, জীবন, চিন্তা, কর্মকাণ্ড, সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানাদি, উৎপাদন, ভোগবিলাস, আনন্দ-উৎসব, সংগঠন, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি উপাদান সম্বলিত প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে এর দীর্ঘ ইতিহাস। উৎপাদন, সংগঠন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলের চেয়ে এত ভিন্ন হতে পারে যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, দুই অঞ্চলের দু'টি সমাজ যেন দু'টি আলাদা জগত। এ পরিস্থিতিকেই প্রবাদে বলা হয়েছে— 'এক অঞ্চলের বুলি অন্য অঞ্চলে গালি'। এমনকি একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে কাঠামোগত ভিন্নতা থাকতে পারে। যেমন, যেকোন একটি অঞ্চলের পাশাপাশি দু'টি গ্রামের সমাজসংগঠনের কথা ধরা যাক। একটি গ্রামের সমাজ গঠিত কৃষক, কুম্ভকার, চর্মকার, জেলে, তাঁতী, ধোপা, সূত্রধর, বেপারি ও বেদে সমবায়ে, আর অপর একটি গ্রামের সমাজ গঠিত শুধু কৃষক বা জেলে বা যেকোন একটি



৭. জামে মসজিদ, আতিয়া, টাঙ্গাইল, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ



৮. জোড় বাংলা মন্দির, পাবনা, সতেরো শতক



১০. নকশি কাথা (বরের আসন কাথা), শেরপুর, জামালপুর, বিশ শতকের প্রথমার্ধ



৯. নকশি কাঁথা

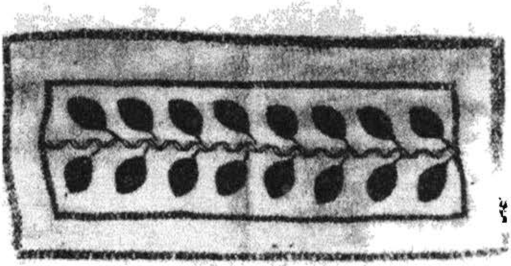
পেশাজীবী শ্রেণী নিয়ে। একই অঞ্চলে অবস্থিত হলেও উক্ত দু'টি গ্রামের সমাজকাঠামো ও সমাজসম্পর্ক হবে ভিন্ন প্রকৃতির। একইভাবে, কোন নতুন জেগে উঠা চরে একটি গ্রামের পত্তন হলে এর সমাজকাঠামো পার্শ্ববর্তী স্থায়ী গ্রামের সমাজকাঠামোর চেয়ে হবে ভিন্নতর। আমাদের বক্তব্য এই যে, আঞ্চলিকভাবে গ্রামীণ সমাজ-সংগঠন-সংস্কৃতি একে অপর থেকে ভিন্নতো বটেই, এমনকি পরিবেশ-প্রতিবেশে একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের সমাজকাঠামোর মধ্যেও ভিন্নতা বিরাজ করতে পারে। অতএব, বিবেচনার জন্য এক বা একাধিক গ্রাম বা অঞ্চলকে ইউনিট হিসেবে গ্রহণ করলে সে গ্রাম বা ইউনিট সম্পর্কে তথ্যলাভ করতে পারি বটে, কিন্তু এ থেকে গোটা গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির সঠিক চিত্র পাওয়া অসম্ভব।

সব গ্রামের আয়তন সমান নয়, আবার সব গ্রামের বসতিব্যবস্থাও একই রকম নয়। কোন কোন গ্রাম অনেক বড়, আবার কোন কোন গ্রাম অনেক ছোট। মনে রাখা দরকার যে, ক্ষুদ্র গ্রামটি ইচ্ছে করলেই বড় আকার ধারণ করতে পারে না। গ্রামের বিদ্যমান সম্পদ যতো লোককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার বেশি লোকসংখ্যা গ্রামে অবস্থান করা সম্ভব নয়। শহরের বেলায়ও অবশ্য একই কথা প্রযোজ্য। মৃত্যু ও বহিরভিবাসনের মাধ্যমে লোকসংখ্যা সম্পদানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। বহিরভিবাসনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পত্তন হয় নতুন গ্রামের এবং এ প্রক্রিয়া চলছে অনাদিকাল থেকে। প্রশ্ন উঠে, কিসের ভিত্তিতে এই প্রাকৃতিক ছাটাইপ্রক্রিয়া চলে? কারা গ্রামত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বসতিস্থাপনে বাধ্য হয়? অনুমান করা যায় যে, গ্রামে যারা প্রান্তিক বা ভূমিহীন হয়ে পড়ে বা গ্রামীণ সমাজ কর্তৃক যারা পরিত্যক্ত হয়, তারাই গ্রামত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বসতিস্থাপন করে। কিভাবে কিছু গ্রামবাসী ভূমিহীন বা অগ্রহণযোগ্য হয় সেটি আরেক বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর উত্তর থেকে বেরিয়ে আসবে গ্রামের অভ্যন্তরীণ জীবনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্বরূপ ও সম্পর্ক। গ্রামের বাড়তি বা পরিত্যক্ত মানুষ যত্রতত্র গিয়ে বসতিস্থাপন করে না। নতুন গ্রাম পত্তনে তারা বিবেচনা করে নানা বিষয়, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মূল গ্রাম থেকে দূরত্ব। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানগত কারণে তারা পৈত্রিক গ্রামের পাশাপাশি স্থানে গিয়েই বসতিস্থাপন করার প্রবণতা দেখায়।[১৫] অন্যান্য বিবেচনার মধ্যে থাকে ভূস্বামীর সঙ্গে আবাদের শর্তাবলী, মাটির উৎপাদনক্ষমতা, পানির উৎস ও যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি।

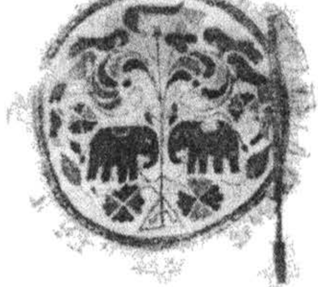
গ্রামের জনসংখ্যা যেমন নিয়ন্ত্রিত হয় এর বিদ্যমান সম্পদ দ্বারা, তেমনি গ্রামের বসতিব্যবস্থাও নির্ধারিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা। নদীর পাড়ে প্রতিষ্ঠিত বসতি লম্বালম্বি, আর বন্যামুক্ত সমতল এলাকায় গ্রাম পত্তন হয় দীঘি বা কোন জলাশয়কে কেন্দ্র

---

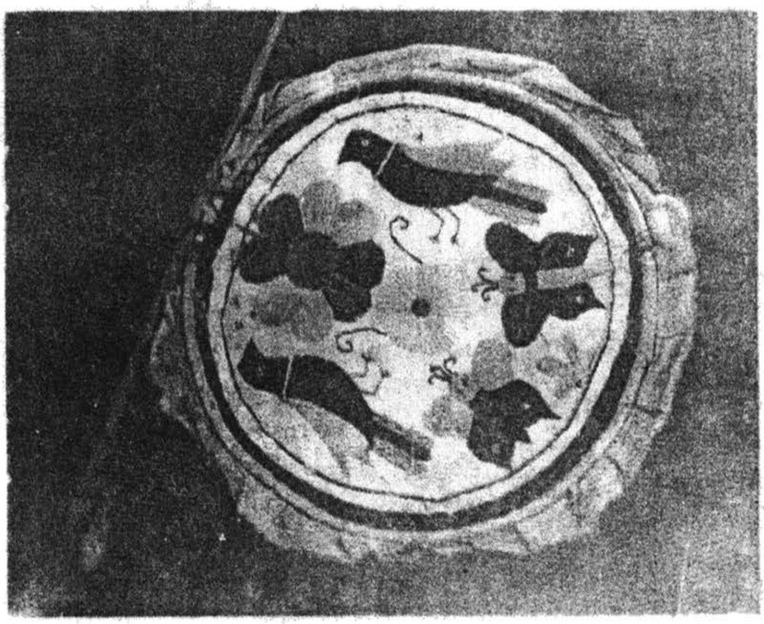
১৫. Sirajul Islam, *Villages in the Haor-Basin of Bangladesh*, (Tokyo 1985), 23 - 28.



১১. আরশিলতা, ময়মনসিংহ, বিশ শতক প্রথমার্ধে



১২. নকশি পাখা, ময়মনিসংহ, বিশ শতক



১৩. নকশি পাখা,



১৪. নকশি পিঠা, আমসত্ত্বের ছাঁচ, পাবনা, বিশ শতক



১৫. বাঁশের কুলা, বিশ শতক

করে এবং এক্ষেত্রে গ্রামের বসতিরূপ হয় গোলাকার। দক্ষিণ বাংলার অধিকাংশ এলাকার কৃষিভূমি সমতল ও বন্যামুক্ত। অতএব সেখানে গ্রামের বসতবাড়ি থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেখানে কৃষক তার কৃষিভূমির কোন এক সুবিধাজনক জায়গায় গড়ে তোলে তার বসতবাড়ি। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অর্থাৎ হাওর এবং উত্তাল নদীবক্ষে চর এলাকায় গ্রামবসতি থাকে বিশাল আকারের এবং গৃহনির্মাণপদ্ধতি থাকে সামান্য খড়কুটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[১৬] এসব এলাকার সমাজসংগঠন ও ব্যক্তিগত জীবনধারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের অসীম সাহস, অসম ভূমিনিয়ন্ত্রণ, দলাদলি, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ইত্যাদি। ঠিক বিপরীত পরিবেশে উত্তরবঙ্গে গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সলজ্জ সারল্য ও অলস জীবন। পরিবেশ-প্রকৃতিই সেখানে তৈরি করেছে বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জোতদার-আধিয়ার সম্পর্ক।[১৭]

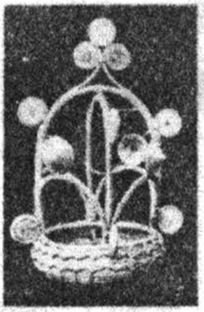
অতীত জীবন সম্পর্কে প্রত্যেক গ্রামেরই রয়েছে মৌখিক কিংবদন্তি, লোকজ শিল্প-সাহিত্য, যা গ্রামের ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে লিখিত আকারে জমি সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ ছাড়া গ্রাম সম্পর্কে গবেষকের কাছে আর তেমন কোন উপাদান-উপকরণ নেই। লিখিত তথ্যের অভাবে গ্রামীণ সমাজের বৃত্তান্তের জন্য ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের উচিত জীবন্ত গ্রামকেই তাদের উপাদান-উপকরণের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। যেসব অঞ্চলে নগরায়ণের প্রভাব ক্ষীণ, সেসব অঞ্চলের গ্রামগুলির পরিবার, গোষ্ঠী. ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, উপকথা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি বিষয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে যে, গ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রস্তুতের জন্য এগুলোকে ইতিহাসের জীবন্ত উপাদান-উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[১৮]

গৃহায়নরীতি, গৃহায়নসামগ্রী, বসতিবিন্যাস, অভিবাসন, বাজার, জমির মালিকানাকাঠামো, মামলা-মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, শাস্তি ও পুরস্কার, গবাদি পশু, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি সবই গ্রামীণ সত্তার বাহ্যিক দিক। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতির গভীরে পৌঁছে এর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে হলে অনুসন্ধানীকে এর বাহ্যিক জগতকে অতিক্রম করে মানুষের সঙ্গে মাটি ও জলের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত অর্থ আবিষ্কার করতে হবে। কৃষকের দর্শনে শিবের ভূমিকা কৃষি-সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত। শিবের স্ত্রী দুর্গার অপর

১৬. F Gastrell, *Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Fureedpore and Bakkergunge*, (Calcutta 1868), 6

১৭. Francis Buchanan's *Survey of Rongpore*, 1807, (India Office MS records in microfilm at Dhaka University Library), 328 - 29

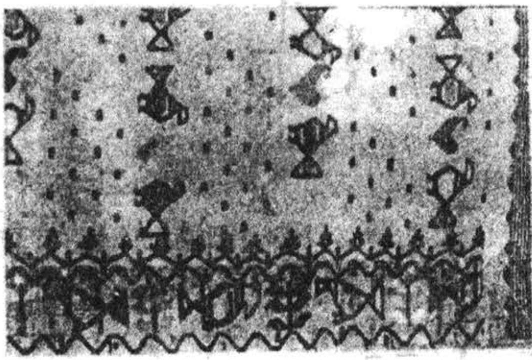
১৮. এ সমস্যার উপর শক্তিশালী তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছেন Robert Redfield, *The Little Community The Viewpoints for the Study of a Human Whole*, (Chicago 1955) গ্রন্থে।



১৬. বাঁশের ঝাঁপি, বিশ শতক



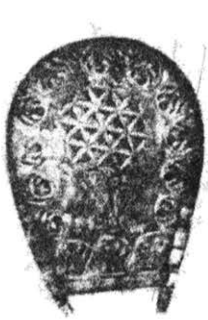
১৭. নকশি পাটি, জায়নামাজ, সিলেট, বিশ শতক



১৮. জামদানি, সোনারগাঁ, লোকশিল্প যাদুঘরের কর্মশালায় প্রস্তুত, বিশ শতক



১৯. পিতলের সের, ময়মনসিংহ, বিশ শতক



২০. পিতলের কুলা, কুমিল্লা, উনিশ শতক

নাম অন্নদা, অন্নপূর্ণা। কৃষকের জীবনকে নবান্নের আনন্দে ভরপুর করে তোলে অন্নপূর্ণার অনুকম্পা। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, বৃষ্টি, খরা, প্লাবন, লাঙ্গল, মহামারী, গবাদিপশুর মড়ক, মৎস্য, বৃক্ষ-লতা সব কিছুর দায়িত্বে রয়েছে কোন না কোন দৈবশক্তি। অজস্র নামের ঐসব দেবদেবীদের মধ্যে আছে আবার নানা বিবাদ-বিসংবাদ। অতএব, এক দেবতা বা দেবীকে তুষ্ট করতে গিয়ে যেন অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদেবী রুষ্ট না হয়ে উঠে সেজন্য গ্রামবাসীকে নিতে হয়েছে নানা ছল-চাতুরির আশ্রয়। মুসলিম কৃষকসমাজেও ছিল নানা আচার-প্রথা, যা কৃষির অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করে থাকে, যেমন বৃষ্টির জন্য গণপ্রার্থনা; মহামারী, গো-মড়ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পীর-ফকিরের কাছে মানত; স্থল ও নৌপথে ভ্রমণে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ দরগা-খানকায় দোয়া-প্রার্থনা; জিন-পরীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঝাড়ফুকের আশ্রয়গ্রহণ: অধিক ফলনের জন্য মুষ্টি রাখা; বাড়িতে সম্পত্তি ও মাঠে ফসলচুরি রোধ করার জন্য যথাক্রমে বাড়িবন্ধ ও ক্ষেতবন্ধ দোয়া প্রয়োগ ইত্যাদি ঐশী উপাদানের আশ্রয় নেয়া। কৃষকের ধীকল্পে জন্ম-মৃত্যু, খরা-প্লাবন, অধিক ফলন বা ফসলহানি, গবাদি পশুর মড়ক, ফলমূল, মাছ-মাংসের প্রাচুর্য বা অভাব সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ঐশ্বরিক খেয়ালখুশিমতো। কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ মানুষ তার সত্তার সঙ্গে ভূস্বামী থেকে সৌরশক্তি পর্যন্ত যে বৃহৎ কল্পজগৎ নির্মাণ দ্বারা বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান তৈরি করেছে, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞানী উদাসীন হলে তারা হয়তো গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির শুধু বাহ্যিক দিকটিই সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু এর মূলে পৌঁছাতে পারবেন না।

ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো যেকোন একটি গ্রাম বা অঞ্চলের এমন বিশেষ উপাদান অবলম্বন করে অনুসন্ধান শুরু করা, যে উপাদানটি যোগায় ঐ পরিবেশে মানুষের জীবন-জীবিকার মূল প্রেরণাশক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি জেলেগ্রামের জীবিকা বাস্তবতা লাভ করে জাল ও বড়শিকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে অন্যান্য বিষয় আসে আনুষঙ্গিকভাবে। উনিশ শতকে সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল ধান। যেমন অন্যান্য অঞ্চলে ছিল পাট, রেশমপোকা, তামাক, আফিম বা অন্যকিছু। সমাজ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ঐ প্রধান জীবিকা-উৎস থেকে বেরিয়ে আসে এবং মানুষের কল্পনা ও বাস্তব জীবনে ঐ উৎসশক্তিই প্রাধান্য পায়। যেমন, নদীবাহিত অঞ্চলে জেলেগ্রামের দেবদেবী এবং পূজনীয়-আরাধ্য সম্পর্কযুক্ত জল ও মাছের সঙ্গে। অনুরূপভাবে অরণ্যচারী পাহাড়ী মানুষের আরাধ্য আবার অন্য কিছু। বাকেরগঞ্জে ধান ছিল জীবিকার এমনি এক কেন্দ্রীয় বস্তু যে, পূজা-পার্বণ, বিবাহ, শুভযাত্রা, শুভাগমন ও সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ে ধান-দুর্বার ব্যবহার ছিল সর্বজনীন। বিবাহযোগ্য পুত্রের জন্য কন্যা নির্বাচন করতে গিয়ে কৃষক, কুম্ভকার, কর্মকার, জেলে, গোয়ালা, তাঁতী প্রভৃতি পেশাজীবীর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন



২১. কাঁসার পাত্র, বিশ শতক



২২. মৃৎপাত্রের কলস,
খুলনা, বিশ শতক



২৩. মন্দিরের টেরাকোটা, করতাল
বাদিকা, ঈশ্বরীপুর, খুলনা, বিশ শতক

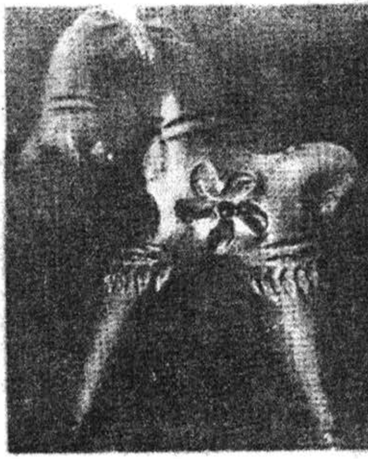


২৪. পোড়ামাটির পুতুল, ময়মনসিংহ, বিশ শতক

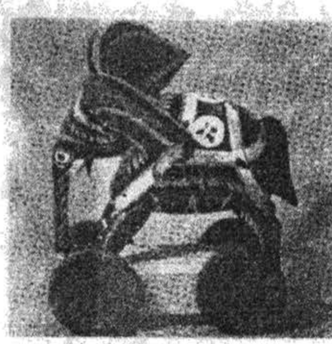
মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকে। ঐ মানদণ্ডটি জীবন-জীবিকার প্রধান উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সমাজবিশ্লেষণে ঐ মানদণ্ডটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

ঐ উৎস আবিষ্কারের পর অনুসন্ধানীর জন্য থাকে আরো অনেক জটিল সমস্যা। যেমন, ভূমিনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, ভূমিব্যবহার, বিনিময়ব্যবস্থা, সমাজবিন্যাস ও কাঠামো এবং বিবাহ, পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, পাপ-পুণ্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি স্থায়ী সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠানাদি। বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক নির্ণয় গবেষকের জন্য আরেকটি বড় বিবেচ্য বিষয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কের ভিত্তি ভূমিরাজস্বসংগ্রহ এবং ভূমিব্যবস্থা। ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও সমাজসম্পর্ককে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মুগল সরকার রায়তকে জমির ভোগদখল দিয়েছে, কিন্তু মালিকানা রেখেছে নিজের হাতে। ফৌজদার, কানুনগো, জমিদার, পাটোয়ারি, গ্রামপ্রধান প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে প্রত্যক্ষভাবে। এ ব্যবস্থাধীনে ভূমিতে কৃষকের বংশানুক্রমিক ভোগদখলের অধিকার ছিল, কিন্তু ভূমিহস্তান্তরের অধিকার ছিল না। এর আর্থ-সামাজিক ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, সরকারকে রাজস্বপ্রদান সাপেক্ষে সবাই যেহেতু জমি আবাদ করতে পারতো এবং কোন আবাদি জমিই যেহেতু হস্তান্তর করা যেতো না এবং যেহেতু আবাদের জন্য আশেপাশে পাওয়া যেতো বিস্তর কৃষিযোগ্য পতিত জমি, সেহেতু ভূমিহীনতা সমস্যারও উদ্ভব হয় নি। গ্রামে ভূমিহীনতার সমস্যা না থাকায় সৃষ্টি হলো কৃষিশ্রমিক সমস্যার। মজুরের অভাবে কৃষিকর্ম নির্ভর করেছে শুধু পারিবারিক শ্রমের উপর। এ ব্যবস্থায় ভূমিহীনতার যেমন ভয় ছিল না, তেমনি ভূমিকর্ষণ করে বিত্তশালী হবার সম্ভাবনাও ছিল ক্ষীণ। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ ছিল অর্থনৈতিকভাবে এক বৈষম্যহীন সত্তা। শ্রমবাজার না থাকায় সৃষ্টি করা হলো আন্তঃপরিবার শ্রমবিনিময়ব্যবস্থা। গ্রাম পর্যায়ে বাজার অর্থনীতি না থাকায় সৃষ্টি করা হলো পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা। পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বিনিময়, শ্রমের সঙ্গে শ্রমের। অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ভূমি চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হলো কৃষিদাস ও বেগারব্যবস্থা।

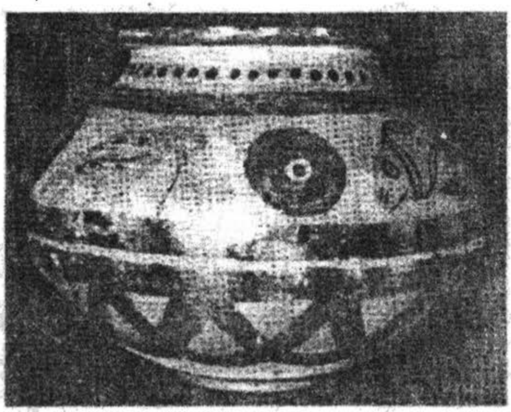
এরকম ব্যবস্থায় গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও সামাজিক স্থিতিশীলতা গড়ে উঠেছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার উপর। শাহ রায়ত বা গ্রামপতি ছিল গ্রামের কর্তা। তাকে পরামর্শ দিত গ্রামপঞ্চায়েত। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধিমান ও সততা-সহযোগিতায় সেরা লোকদের নিয়ে গঠিত হতো ঐ পঞ্চায়েত। প্রতি গোষ্ঠী ও পাড়া থেকে বাছাইকৃত কর্মোদ্যোগী যুবকদের নিয়ে গঠিত হতো গ্রামসরঞ্জামি নামে এক গ্রামসভা । এ প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল গ্রামের সাধারণ সমস্যা দেখা, যেমন গ্রামের নিরাপত্তাবিধান এবং বাঁধ, রাস্তা, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। এগুলি ছাড়া ছিল আরো অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেগুলি সমাজকে স্থিতিশীল, একতাবদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তায় পরিণত করতে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে। এর মূলে রয়েছে ঐ বিশেষ ভূমিব্যবস্থা ও উৎপাদনসম্পর্ক।



২৫. মাটির গোড়া, ময়মনসিংহ, বিশ শতক



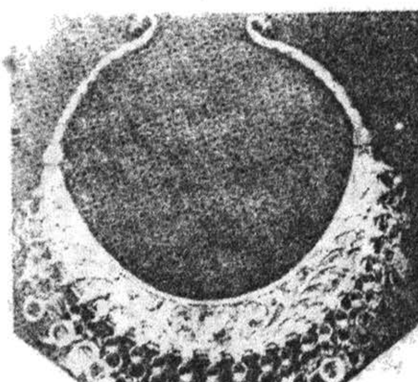
২৬. চাকাওয়ালা কাঠের হাতি,
সোনারগাঁ, বিশ শতক



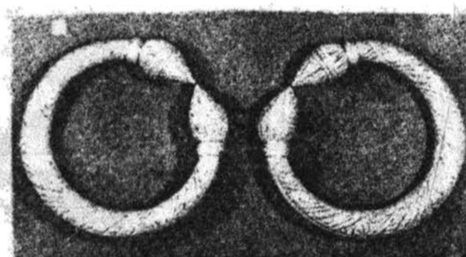
২৭. সখের হাঁড়ি, রাজশাহী



২৮. রৌপ্য অলঙ্কার, সাতনরী হার,
কিশোরগঞ্জ, বিশ শতক



২৯. রৌপ্য অলঙ্কার, হাঁসুলীসখের হাঁড়ি,
রাজশাহী ঢাকা, বিশ শতক



৩০. রৌপ্য অলঙ্কার, খাড়ু, ঢাকা, বিশ শতক

মুগল ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলো ঔপনিবেশিক যুগে এবং এর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবর্তন ঘটলো সনাতন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ও সম্পর্কেরও। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ব্যবস্থায় জমির একচ্ছত্র মালিকানাস্বত্ব প্রদান করা হলো জমিদারকে। এ ব্যবস্থাধীনে রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তের সরাসরি সম্পর্ক ছিন্ন হলো। সাবেক সরকারআশ্রিত ভোগদখলকার রায়ত এখন পরিণত হলো জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায়। সেই শাহ্ রায়ত বা গ্রামপ্রধান, গ্রামপঞ্চায়েত, গ্রামসরঞ্জামি, পাটোয়ারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্থান দখল করলো জমিদার-তালুকদার, ইজারাদার, তহশিলদার ও তাদের নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ। কাজি-কানুনগোর স্থান দখল করলো জেলা আদালত। গ্রাম পর্যন্ত বাজার অর্থনীতি প্রসারিত হবার ফলে ক্রমে তিরোহিত হলো পূর্বেকার পণ্য ও শ্রম বিনিময়ব্যবস্থা এবং তদ্‌ভিত্তিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের এক উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ত স্থবিরতা দূরীভূত করে পুঁজিবাদ প্রবর্তন করা। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সনাতন সমাজকাঠামো ও সমাজবিন্যাস ওলটপালট হয়ে গেলেও গ্রামীণ অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত পুঁজিবাদের সঞ্চার হয় নি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে সৃষ্টি হয় এক বহুস্তরবিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী সমাজ। তালুকদার, ওসাত তালুকদার, পত্তনিদার, দার-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার, হাওলাদার, নিম-হাওলাদার, ওসাত-নিম-হাওলাদার, মিরাসদার, মিরাস-ইজারাদার, জোতদার প্রভৃতি বিচিত্র নামের এইসব মধ্যস্বত্বাধিকারীরা কৃষিউৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হলেও তারা জীবিকানির্বাহ করেছে অনর্জিত কৃষিআয় থেকে এবং তাদের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষা দেবার ব্যয়ভারও বহন করা হয়েছে ঐ অনর্জিত কৃষিআয় থেকেই। জমিদার থেকে গ্রামের জোতদার পর্যন্ত সবাই নির্ভর করেছে কৃষকের খাজনার উপর। ভূমিনিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় সম্পর্কটি দাঁড়ালো এই যে, উৎপাদনে লিপ্ত থাকে কৃষক-মজুর আর সে উৎপাদন ভোগ করে উপরস্থ জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী সমাজ। অনিবার্য কারণবশতই এই ব্যবস্থায় কৃষকের নেহাত খায়খোরাকি বাদে সকল উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা হয় খাজনা, সেস, সেলামি, আবওয়াব আকারে।

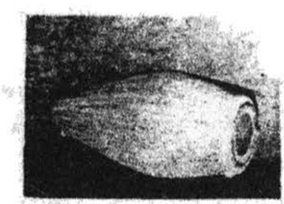
ভূস্বামী ও অন্যান্য পরজীবী শ্রেণীর শোষণ অনেক সময় প্রজাকুলকে প্রতিরোধের পথে ঠেলে দেয়। কৃষক-ভূস্বামী সম্পর্কে ঘোরতর অবনতি ঘটে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। পাবনাসহ বিভিন্ন জেলায় কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে ঔপনিবেশিক সরকার বাধ্য হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে। এ পরিবর্তনধারা সূচিত হয় ১৮৫৯ সনের খাজনা আইন-এর মাধ্যমে। ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্কে বড় রকমের পরিবর্তন আনা হয় ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-এর মাধ্যমে। এই আইন প্রণয়নের ফলে কৃষক লাভ করলো ভূস্বামীকে সেলামি প্রদানসাপেক্ষে ভূমিহস্তান্তরের অধিকার। ভূমিতে প্রজার অধিকার আরো জোরদার করা হয় ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সনের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা।



৩১. লোকবাদ্যযন্ত্র, একতারা, বাউল
সঙ্গীত, পরিবেশনা, বিশ শতক



৩২. লোকবাদ্যযন্ত্র, সারিন্দা, ফরিদপুর, বিশ শতক



৩৩. লোকবাদ্যযন্ত্র, খোল, বিশ শতক

ভূমিতে প্রজার স্বত্বপ্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ঐ সম্পর্কে সম্পদ বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণে দেখা দেয় অভূতপূর্ব বৈষম্য। প্রজা কর্তৃক ভূমিহস্তান্তর ও ভূমিবন্ধক দেবার অধিকার লাভের ফলে গ্রামপর্যায়ে সৃষ্টি হলো ভূমি কেনাবেচার বাজার। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখতে পাই ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন মজুরশ্রেণীর আবির্ভাব এবং গ্রামীণ ঋণিতা। ক্রমাগত স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষকের সংখ্যাহ্রাস ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মজুরির হার, অন্যকথায় মজুরের ক্রয়ক্ষমতাও দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। জীবিকার অন্বেষণে প্রান্তিকীকৃত ও ভূমিহীন মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করে শহরে। এর ফলে নগরায়ণে পড়ে নতুন চাপ, যোগ হয় নতুন মাত্রা।

আঠারো শতকে ভাষাসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিকতা ছিল এমনি প্রকট যে, এর মধ্যে 'জাতীয়' উপাদান চিহ্নিত করা ছিল খুবই কঠিন। ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়া অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ছিল আঞ্চলিকভাবে একে অন্যের চেয়ে এত আলাদা যে, মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ড, আত্মীয়তা ও অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ রেখেছে নিজেদের গ্রাম ও অঞ্চলের মধ্যেই। এ বিচ্ছিন্নতা সামাজিকভাবে মানুষকে এমনই এক সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল যে, এদের চোখে নিজের অঞ্চলটি ছিল তাদের দেশ আর অন্য অঞ্চল ছিল বিদেশ। 'বিদেশে' যাবার প্রাক্কালে এবং 'বিদেশে' অবস্থানকালে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহসঙ্গীত গ্রামীণ সংস্কৃতির এক বিশেষ দিক। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই 'দেশ' ও 'বিদেশ' ব্যাপারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দেশ-বিদেশকে অতিক্রম করে সমন্বিত বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে।

গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। জীবিকার তাগিদে গ্রাম বা অঞ্চল ছেড়ে গ্রামীণ মানুষের 'ভিনদেশে' যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অতএব আন্তঃঅঞ্চল গমনাগমনের দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। 'ভিনদেশে' বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বা 'ভিনদেশে'র রেওয়াজ পালন করা ছিল রীতিবিরুদ্ধ কাজ। অতএব, এহেন সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ভাষাশৈলী, শব্দসমাহার, প্রকাশভঙ্গি, প্রবাদ-প্রবচন, উচ্চারণ, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, রীতিনীতি, রেওয়াজ, আচার-আচরণ, ব্যবহারবিধি, লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, রন্ধনপ্রণালী প্রভৃতি বিকশিত হয়েছে এমন আঞ্চলিক চরিত্র নিয়ে যে, এখানে 'জাতীয়' বা সাধারণ বাঙালি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া ভার। এমনকি ধর্মীয় আচার-প্রথার মধ্যেও সুস্পষ্ট আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আঞ্চলিকতার প্রাচীর ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে উনিশ শতকের গোড়া থেকে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সত্তার পতন, বাজার অর্থনীতির বিকাশ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, আইন-আদালত, আধুনিক নগরায়ণ, শিক্ষাব্যবস্থা, আভিজাত্যের পতন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের বিকাশ, আন্তঃজেলা যোগাযোগ উন্নয়ন, জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে সভা-সমিতি গঠন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, সংস্কার আন্দোলন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি অঙ্গনে অনুকরণীয় জাতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ও অন্যান্য কারণ মানুষকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গীয়, এমনকি ভারতীয় পর্যায়ে তাদের পরিচয় উন্নীত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কিন্তু বঙ্গবোধের উদয় আঞ্চলিকতার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে একথা বলা যায় না। কলকাতা এবং অন্যান্য মফস্বল শহরে আঞ্চলিক সমিতিগুলির কার্যক্রম, সুযোগ-সুবিধা বিতরণে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও পরিবারের অঞ্চলপ্রীতি, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে আঞ্চলিক তৎপরতা, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কস্থাপনে অঞ্চলের অগ্রাধিকার পরিষ্কার ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এমনকি বিশ শতকের চল্লিশের দশকেও 'দেশী ভাই'-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। দেখা গেছে শহরের কোন কোন পেশায়, কলকারখানা বা দপ্তরে বিশেষ অঞ্চলের লোকদের আধিপত্য। বসতিবিন্যাসেও দেখা যায় যে, বিশেষ অঞ্চলের লোকেরা শহরের একটি বিশেষ এলাকাকে বেছে নিয়েছে। 'দেশী ভাই' সমস্যাটি স্বাভাবিক কারণেই পরিলক্ষিত হয় শহরে, যেখানে চাকুরি, পেশা ও কর্মসংস্থানের জন্য সমাগম ঘটেছে সকল অঞ্চলের মানুষের। এ সমস্যা বাঙালি জাতিত্ববোধের অগ্রযাত্রাকে আসলে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, কিন্তু ব্যাহত করে নি। তবে, আঞ্চলিকতাবোধ থেকে শহরকে অস্থায়ী ও গ্রামকে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করার মনোভঙ্গি সৃষ্টি হওয়ায় সুসমন্বিত শহুরে সমাজ গঠনে অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার নগরায়ণে যেমন দেখতে পাই অতি সংগঠিত ও সুসমন্বিত নাগরিক সমাজের উত্থান, তেমনটি এখানে ঘটেনি বললেই চলে।[১৯]

'অঞ্চল' থেকে উত্তরণ ঘটার মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষে যেসব কারণ ছিল ক্রিয়াশীল, সেসব কারণের মধ্যেই আবার নিহিত ছিল জাতিভেদের বীজ। নবাবি শাসনামলে সমাজের উচ্চস্তরে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ও হিন্দু আমলা-মুৎসুদ্দি- জমিদার-বানিয়া শ্রেণীর মধ্যে ছিল অসাধারণ সহযোগিতা-সম্প্রীতির সম্পর্ক। নিম্নস্তরেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্পর্ক। বঙ্গে ইসলামচর্চায় প্রচুর হিন্দু উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-উৎসবাদিতে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল না। প্রজা হিসেবে গ্রামের সাধারণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবারই অধিকার ছিল সমান এবং তাদের আর্থিক অবস্থাও ছিল প্রায় অভিন্ন। স্বাভাবিক কারণেই গ্রামীণ সমাজে সাম্প্রদায়িকতা ছিল অজ্ঞাত।[২০] কিন্তু উনিশ

---

১৯. A.D.King, "Colonialism and the Development of Modern South Asian City : Some Theoretical Considerations" in *City in South Asia*, 2.

২০. Syed Razi Wasti, *Memoirs and other Writings of Syed Ameer Ali*, (Delhi 1985 reprint), 18.

শতকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উভয় ধর্মেই সংস্কার- আন্দোলনের ফলে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে ঐক্যমুখী ধর্মসমন্বয়জাত উপাদান ছিল সেগুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দু'টি ভিন্ন স্রোতোধারা সৃষ্টি হলো।

এদিকে আঠারো শতকের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীনতা উনিশ শতকে এসে চরম বৈষম্যের রূপ ধারণ করলো। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে মুসলিম অভিজাত শাসক শ্রেণীর পতন ঘটলো বটে, কিন্তু ভূমিনিয়ন্ত্রণ ও ভূমিরাজস্ব শাসনের মাধ্যমে হিন্দু ভূস্বামী ও আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণী বহুলাংশে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। এরাই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম শতাব্দীর স্তম্ভ এবং এদের প্রজন্মই গঠন করে প্রাথমিক ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের 'বাবু' শ্রেণী এবং ঐ বাবুদের দ্বারাই প্রথম গঠিত হয় ঔপনিবেশিক শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আনুগত্য ও ইংরেজি শিক্ষার বলে রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করলো ঐ বাবু শ্রেণী। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ও ঔপনিবেশিক শহুরে জনগোষ্ঠীতে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকে নামেমাত্র। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল বাবুদেরই একচেটিয়া আধিপত্য। উগ্র বাবুদের মধ্যে এমনকি অনেকে বাঙালি বলতে শুধু হিন্দুদের বোঝানোর চেষ্টা করে এবং 'হিন্দু মেলা' জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে 'হিন্দু রাজ' কায়েমের প্রত্যয় ঘোষণা করে। সুসমন্বিত বাঙালি জাতি গঠনপ্রক্রিয়ায় এর প্রভাব ছিল মারাত্মক। কারণ এরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান নেতৃত্বও চিন্তা করতে শুরু করে 'ইসলামী হুকুমত' প্রতিষ্ঠার।

এ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বৃটিশ রাজ। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করলো উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর এর চূড়ান্ত সাফল্যে অবদান রাখলো একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে উত্তর ভারতীয় মুসলিম রাজনীতি। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'হিন্দু রাজ' ও 'ইসলামী হুকুমত' প্রত্যয়দু'টি ছিল দুই সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যশিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[২১] দেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি লোক বাস করতো পল্লী অঞ্চলে, যেখানে মানুষ 'অঞ্চল'কেই পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করেছে, সম্প্রদায়কে নয়।

গ্রামবাংলার মানুষের মনোভাবকে শহুরে বর্ণহিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ততোটা গুরুত্ব দেয় নি, যতোটা দিয়েছে মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব। মুসলমান ও হিন্দু নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি সংহতি ঘোষণা করেছে লখনৌ চুক্তিতে (১৯১৬), অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনে (১৯১৯-২২), বেঙ্গল প্যাক্টে (১৯২৩), এ.কে. ফজলুল হকের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠনে (১৯৩৭, ১৯৪১) এবং 'সর্বশেষ' হোসেন

---

২১. এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন বজলুর রহমান খান *Politics in Bengal, 1927 - 1936* (Dhaka 1987) শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাবে (১৯৪৭)। কিন্তু দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদের (১৯১১) পর থেকে বঙ্গীয় বর্ণহিন্দু রাজনীতিতে ক্রমশই প্রাধান্য লাভ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বাংলার মুসলমান নেতৃত্ব সরকার গঠনের যে ক্ষমতা লাভ করলো, সে ক্ষমতাকাঠামো আর কখনো বদলানো যাবে না এমন একটি ভীতি বাঙালি বর্ণহিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তারা তখন ঝুঁকে পড়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে হিন্দু আধিপত্য তাদের অধিকতর আকৃষ্ট করে। তখন থেকেই বাঙালি স্বকীয়তা রক্ষায় কৃষক প্রজা পার্টি, বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও অন্যান্য মুসলিম ও তফসিলী দল-সমিতিগুলিই ছিল সবচেয়ে বেশি তৎপর।

যে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের কাছে ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগ ছিল 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ', যারা বাংলাভূমি ও বাঙালি জাতির ঐক্য বজায় রাখার জন্য আয়োজন করেছিল রাখিবন্ধন উৎসবের এবং যাদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার ঐ ব্যবস্থাকে রদ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করার পক্ষে রায় দিল। ইতিহাসের এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। সমাজ বদলায়, এর সঙ্গে বদলায় সমাজে বাস করার সিদ্ধান্তসমূহও। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে বাঙালি জীবনসত্তা সংক্রান্ত ১৯০৫ সনের সিদ্ধান্তসমূহ ১৯৪৭-এ এসে সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়লো, যেমন বাঙালি মুসলিম উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ১৯৪৭ সনের 'পাকিস্তান' সিদ্ধান্ত সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়লো ১৯৬০-এর দশকে এসে।

বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদে দীক্ষাগ্রহণের মতো বঙ্গীয় মুসলিম নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ঘটেছিল, কিন্তু তা ছিল আপেক্ষিকভাবে অনেক ধীরগতিতে। দেখা যায় যে, পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বিকাশের পাশাপাশি তারা প্রণয়ন করছে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের রূপরেখাও। মুসলিম সুধীজন কর্তৃক স্থাপিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৪২), পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২) প্রভৃতি ছিল লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক নিখিল বঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি। এ প্রবণতারই সর্বশেষ প্রকাশ ঘটে দেশবিভাগের প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রস্তাবে'।[২২] কিন্তু ১৯৪০-এর পর থেকে বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে বৃটিশ রাজের অবস্থানে এমন দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যে, সাধারণ সমাজ ঘটনাপ্রবাহ থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। বৃটিশ রাজের রেখে যাওয়া রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারার প্রতিযোগিতায় মত্ত শহরভিত্তিক হিন্দু ভদ্রলোক ও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে গৌণ হয়ে গেল বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-

---

২২. দেখুন, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হারুন-অর-রশিদ রচিত নিবন্ধ, "অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ"।

ঐতিহ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন, মাটি ও মানুষের সম্পর্ক। হিন্দু ভদ্রলোকের দেশভাগাভাগির প্রস্তাব মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী মেনে নেয় এবং এ ভাগাভাগিতে পৌরোহিত্য করে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজ। ক্ষমতায় আসার সময় বৃটিশরা লাভ করেছিল মানুষ ও সম্পদের দিক থেকে একটি বৃহৎ একক বঙ্গরাজ্য আর ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবার সময় এরা একে ভাগ করে গেল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দু'টি অংশে। আপাতদৃষ্টিতে দেশবিভাগের মাধ্যমে উভয় শ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ হলো—বিশেষ অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রলোক মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে রেহাই পেলো আর অন্য অঞ্চলের মুসলিমরা রেহাই পেলো সেখানকার হিন্দু জমিদার, মহাজন, আমলাদের আধিপত্য থেকে।

১৯৪৭-এর বাংলাবিভাগের ঘটনা বাঙালির ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারার মধ্যে পড়ে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দূর অতীতে এ অঞ্চলের অসংখ্য স্থানীয় রাজা, মহারাজা, ভূস্বামীদের পরাভূত করে প্রথম বৃহত্তর বঙ্গশাহী প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানি আমলে এবং শাহী সুলতানদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বিকাশলাভ করে বঙ্গভাষা, বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি। বাংলা ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি আরো সুসংহত হয় পাঠান ও মুগল শাসনামলে, যখন বাংলাকে প্রতিবেশী অহম, ত্রিপুরা, আরাকান, উড়িষ্যা ও পশ্চিম-উত্তরাঞ্চলীয় আগ্রাসন থেকে সযত্নে রক্ষা করে সৃষ্টি করা হয় এর নিজস্ব সত্তা ও পরিচয়।[২৩] তখনই উৎপত্তিলাভ করে বঙ্গসমাজ-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ। মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয় প্রায় স্বাধীন নবাবি রাষ্ট্রব্যবস্থা। ফলে আঠারো শতকের শেষ অব্দি, এমনকি উনিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্তও বঙ্গসংস্কৃতি ছিল হিন্দু-মুসলমানের অভিন্ন উত্তরাধিকার।

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এবং এর ফলশ্রুতিতে দেশবিভাগ বাঙালি সংস্কৃতির এই অভিন্ন উত্তরাধিকারকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করতে সক্ষম হলেও অচিরেই পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার সচেতন ছিল এবং সে ব্যবধানকে অতিক্রম করার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছিল বিশেষ ভাষা ও শিক্ষানীতি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন্স। কিন্তু পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে গণভিত্তিক করা সম্ভব তো হয়ই নি, উপরন্তু পাকিস্তান অর্জনে শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন এমন বহু নেতা পর্যন্ত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে আস্থা হারিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এর সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলন থেকে। বাঙালি তার সভ্যতা-সংস্কৃতির শেকড় সন্ধানের এক নতুন যাত্রা শুরু করে এ আন্দোলনের মাধ্যমে এবং সে অন্বেষারই যৌক্তিক পরিণতি ষাটের দশকের প্রথম স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, যা অনতিকাল পরেই রূপ নিল একাত্তরের বাংলাদেশ বিপ্লবে।

---

২৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন M. R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal 1494-1538 : A Socio-Political Study*, (Dhaka 1965)

২

নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিভিত্তিক সমাজ

শিরীণ আখতার*

প্রাক আধুনিক বাংলায় সমাজের মূল ধারকশক্তি হিসেবে ভূসম্পত্তি ছিল সমাজের প্রায় সকল কাঁচামাল সরবরাহ, জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং এর 'মালিকের' সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের ভিত্তি। এ দেশের বিভিন্ন ভূম্যধিকারের বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রকৃত অবস্থা কার্যত ও ন্যায়ত এমনই জটিল যে এর মধ্য থেকে আলোচ্য সময়ের ভূমির স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না। *আইন-ই আকবরীতে*[১] সমকালীন ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তেমন কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। সতেরো শতকের রাজস্ব-ইতিহাসের মৌলিক তথ্যসূত্রের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। তবে মুগল প্রশাসনিক ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৫৮২ সালের *তুমার-তাকসীম-জমা* (বণ্টক রাজস্ব তালিকা) প্রবর্তনের পর সময়ের প্রয়োজনে বেশ কিছু পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন করা হয়। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং দেশের জটিল ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি-অর্থনীতির বেশ পরিবর্তন ঘটে। আঠারো শতকের প্রথম দিকে সুবা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় মুগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ভাঙন এবং আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুদয়ের কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান ও আর্থিক বিনিয়োগের ধরন পরিবর্তিত হতে থাকে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিবর্তন

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভূসম্পত্তির মালিকানা সরাসরি শাহী শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলেও বাংলার অবস্থা ছিল ভিন্নতর। একটি পরস্পর সম্পর্কিত সম্প্রদায়ের উপর বাংলার

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

১. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, 3 Vols., Vol. I, H, Blochmann (tr), Calcutta. 1927: Vols. II and III, H. S. Jarrett (tr), Calcutta, 1949, 1948.

রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সরাসরি কৃষকদের সাথে জমি বন্দোবস্তের লক্ষ্যে সৃষ্ট সম্রাট আকবরের *জবতি* বা *প্রবিধান*-এর বাস্তবায়ন ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অঞ্চল সুদূর সুবা বাংলার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সুবা বাংলা, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল ছিল সমতল এবং নদীবিধৌত। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে সমগ্র এলাকা পূর্ণ বা আংশিক প্লাবিত হতো। এ কারণে জমির সীমানা নির্ধারণ ও লেখ্যপ্রমাণ (দলিল) প্রস্তুত করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

অধিকন্তু জালের মতো বিস্তৃত নদী,খাল ও ঘন জঙ্গলের কারণে যাতায়াত ও সৈন্য পরিবহন ছিল দুরূহ। ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো *রায়তওয়ারী* ব্যবস্থা বা একক গ্রামভিত্তিক চাষপদ্ধতি বাংলাদেশে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল।[২] মধ্যবর্তী কৃষক, বংশানুক্রমিকভাবেই হোক বা *মনসবদার* এবং *মজুমদার, চৌধুরী* প্রভৃতি আংশিক কর্মকর্তা কিংবা ভূঁইয়ার মতো আঞ্চলিক প্রধান হোক, মুগলদের ভাষায় 'জমিদার' হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এর অন্তর্নিহিত নীতি ছিল ভূমির বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূসম্পর্কিত সকল ব্যক্তিকে একই আখ্যা প্রদান করে সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারে পৃথক স্থানীয় অধিবাসী ও কেন্দ্রীয় শাসনকর্তার মধ্যে এমন একটা বশংবদ সম্প্রদায় গড়ে তোলা, যারা এই দুই গোষ্ঠীর যোগসূত্র রক্ষাকারী ও সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে।[৩] অন্যদিকে ত্রিপুরা বা কুচবিহারের রাজাদের মতো স্বশাসিত করদ নৃপতি, বর্ধমানের মহারাজার মতো বড় জমিদার, কিংবা জমিদারি খাজনা হিসেবে মাত্র এক রুপী দু'আনা *জমা* (রাজস্ব) প্রদানকারী চট্টগ্রামের দেবী বসন্তের মতো পাতি ভূস্বামী[৪] এদের সবাইকে একই শ্রেণীভুক্ত করে মুগলরা তাদের ঐতিহ্যিক ক্ষুদ্র নৃপতিদেরকে অবদমিত রাখার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় শাসকের সাথে জমিদার শ্রেণীভুক্ত রাজন্যবর্গের সম্পর্ক অন্যান্য অধিকাংশ জমিদারদের মতো রাজস্বভিত্তিক না হয়ে মূলত সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন মধ্যবর্তী ও পাতি জমিদারদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর এবং বাদশাহী *সনদে* তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া ছিল।[৫] একটি বিষয় উল্লেখ্য, ফার্সি 'জমিনদার' শব্দের অর্থ ভূসম্পত্তির অধিকারী, অথচ সুবা বাংলায় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ভূসম্পত্তির খাজনা আদায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে জমিদার বলা হতো। ফলে, এ অঞ্চলের জমিদার প্রকারান্তরে জমির প্রকৃত মালিক না হয়েও খাজনা

---

২. *Ain* II, 44-45; B. H. Baden-Powell, "Origin of the Zamindari Estates in Bengal". *Quarterly Journal of Economics*, 1896, Vol. XI, 40.

৩. R. F. Frykenberg, "The Traditional Process of Power in South India: A Historical Analysis of Local Influence". R. F. Frykenberg (ed.), *Land control and Social Structure in Indian History* (New Delhi 1979), 223.

৪. A. M. Serajuddin, The Revenue Administration of *Chittagong* (London University Ph. D. Dissertation, 1964). 303, 338.

৫. ১৭৩৫ ও ১৭৩৬ সালে রাজশাহীর জমিদার রাজা রামকান্তকে প্রদত্ত সনদ, J. Shore's Minute, April, 1788, quoted in W. K. Firminger (ed).) The Fifty Report. I, vii.

আদায়ের মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। জমির মালিক প্রকৃতপক্ষে ছিল *রায়ত*, যার নাম গ্রামের *পাটোয়ারি* তালিকাবদ্ধ করতো।[৬] আঠারো শতকে একচেটিয়া জমিদারি ব্যবস্থাপনার উদ্ভব এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে জমিদারদের উপর নবাবদের নির্ভরশীলতা কৃষিব্যবস্থাকে জটিল করে তুলেছিল এবং জমির মালিকানার বিষয়টি জটিলতর হয়ে উঠে। ফলে বৃটিশ শাসক কর্তৃক জমিদার এবং *তালুকদারগণ*ই জমির প্রকৃত মালিক বলে পরিগণিত হতে থাকলো, যাকে বৃটেনের জমিদারি ব্যবস্থার ছায়া হিসেবে দেখা যেতে পারে। ফলে জমির স্বত্বাধিকারী হিসেবে বিভিন্ন জমির মালিকদের প্রকৃত অবস্থা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আইনানুগ করা হলো।

মুগল শাসনামলে সরকারি তালিকায় একজন জমিদারকে চিহ্নিত করা হলো সরকারি রাজস্ব আদায়কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে। এ ছাড়া জমিদারদের উপর অর্পিত দায়দায়িত্বের অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করে বেসরকারিভাবেও বেশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রাম বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে একই প্রকার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হতো। সুবিধার্থে সৃষ্ট *হুজুরী তালুকদার* (স্বাধীন তালুকদার) পদে নিয়োগপ্রাপ্তরা সরাসরি তাদের খাজনা *খালসায়* প্রদান করতো, বিনিময়ে জমিদারদের পরেই তারা সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করতো।[৭] সুবা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে নানা আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম প্রতিপালনের দায়িত্বে পরবর্তী পদমর্যাদায় ছিল *মুজকুরী* (অধস্তন) *তালুকদার, তরফদার, তপ্পাদার, দিহিদার, হাওলাদার* প্রভৃতি পদের লোকজন। এ ছাড়া ধর্মীয় কার্যক্রম বা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নামমাত্র খাজনায় বা বিনা খাজনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জমির বন্দোবস্ত দেয়া হয়, এগুলি *ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, মদদ-মাশ* নামে পরিচিতি লাভ করে।[৮] জমিদারদের যেসকল ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা রাজনৈতিক অনুসারী জমিদারদের জমিদারি পেতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল, তাদেরকে বিনা খাজনায় জমিদারগণ কিছু জমি বরাদ্দ দিতেন। এর পরিবর্তে জমিদারগণ বার্ষিক খাজনা থেকে রেয়াত পেতেন।[৯] এভাবে, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার জমিদারিতে সৃষ্ট *লাখেরাজদার* (নিষ্কর ভূস্বামী) বনাঞ্চল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন ও দূরবর্তী অঞ্চলের উপর নজর রাখার শর্তে *জঙ্গলবাড়ি* তালুক নামে মধ্যস্বত্বাধিকারীর উদ্ভব ঘটায়।[১০] তদুপরি আঠারো শতকে সৃষ্ট বৃহৎ জমিদারিগুলি দেশের

---

৬. Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society* C1760-1850 (New Delhi 1979), 7-8; Ainslie T. Embree, "Landholding in Indian and British Institutions", in Frykenberg (ed.), *Lnad Control and Social Structure*, 42-43.

৭. British Museum Additional Manuscripts (henceforth referred to as B. M. Add. MSS) 29, 086, 3a; S. Islam The *Permanent Settlement in Bengal*,(Dhaka 1979),5

৮. H. Blochmann (tr.), *Ain*, I., 140-141; Shah Nawaz Khan and Abdul Haqq, *The Maasir-ul-Umara*, I. H. Beveridge (tr.), (Calcutta 1911), 525.

৯. *Proceedings of the Controllng Council of Revenue at Murshidabad* (পরবর্তীতে P. C. C. R. M.), April 30, 1771, V, 118.

১০. S. Islam. "The Problem of Madhya-Svatva in Nineteenth Century Bengal". *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol XXXII. 1987, 5.

বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে এককভাবে দেখাশুনা করা সম্ভব ছিল না বলে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নতুনভাবে সৃষ্ট ভূম্যধিকারী শ্রেণীর দুর্বল শক্তির ভিত্তির কারণেও মধ্যবর্তী রাজস্ব আদায়কারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। উত্তর ভারতে সাধারণত গোষ্ঠীভিত্তিক জমিদারি ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও বাংলার জমিদারি শক্তিধর ব্যক্তি বা পরিবারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের এ ভিত্তি সংহত করার জন্য বড় জমিদারগণ সাধারণত অনেকগুলি ক্ষুদে জমিদার সৃষ্টি করেন। অনেক সময় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল না বলে ভূমি ভোগদখলে যথেষ্ট জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

সতেরো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের প্রথম দিকে ভূমি ব্যবস্থাপনার এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে অনেককে জমিদারি ক্ষমতা অর্পণ করেন। মুর্শিদকুলী খানও কেন্দ্রে অধিক পরিমাণে ও নিয়মিত খাজনা পাঠাবার তাগিদে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ 'মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং বহু সংখ্যক অনুচর পরিবৃত স্থানীয় শাসকের সাথে পরিচিত' বাংলার জনগণের দৃষ্টিতে ভূসম্পত্তি এবং তদসম্পৃক্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্মানের নিদর্শন বলে পরিগণিত হতো। জমিদারি বা তালুকদারি ক্ষমতা প্রাপ্তির সাথে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারণেই এই উদ্যোগ গ্রহণে অনেকেই সচেষ্ট থাকতো। বিনিয়োগের ভিন্ন কোন আকর্ষণীয় সুযোগের অনুপস্থিতিতে জমিই বিনিয়োগের সবচেয়ে নিশ্চিত ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। মুর্শিদকুলী খান তাঁর পৌত্র মির্জা আসাদুল্লাহর নামে কুলহেরিয়ার জমিদারি[১১] ক্রয়ের কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন :

> পরবর্তী বংশধরেরা ভবিষ্যতে ভাগ্যবিড়ম্বিত হলে যেন আহার্যের সংস্থান করতে পারে, তাদের প্রাণপ্রাচুর্য যেন অটুট রাখতে পারে, সরকারি রাজস্ব পরিশোধের পর যেন কিছু অতিরিক্ত অর্থ লাভ করতে পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।[১২]

ভান্সিটার্টের রচনা থেকে এই ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় :

> সামরিক বা আর্থিক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির উন্নতি দেখা দিলে, সে প্রথমেই তার নিজ গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী দু'তিনটি গ্রামের কর্তৃত্ব অর্জনে আগ্রহী হয়, যাতে অবসরে সেখানে তার পরিবারের সঙ্গে বৈভবের মধ্যে কালাতিপাত করতে পারে। সে ব্যক্তি বহিরাগত হলে এমন কিছু অর্জনে আগ্রহী হয়, যা ভাগ্যবিড়ম্বনাব সময়ে তার আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখা দেবে। তখন সে পাঁচ-ছয়টি গ্রাম স্থানীয় জমিদারের নিকট থেকে ক্রয় করে বা নবাবের নিকট থেকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পত্তনি গ্রহণ করে। তার মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।[১৩]

---

১১. মুর্শিদাবাদ জেলার চুনাখালী পরগনায় অবস্থিত।

১২. Salim Allah, *Tawarikh-i-Bangalah*, F. Gladwin (tr.), (Calcutta 1788), 100-101.

১৩. "March from Ballasore to Sambulpoore" Geogre Vansittart Papers, Dep. b. 66. 6.

ইংল্যান্ডের মতো বাংলাতেও আঠারো শতকের জমিদারগণ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[১৪] সমাজের বিভিন্ন পেশা ও বিচিত্র সংস্কৃতির ব্যক্তি, অর্থাৎ নিম্নতম করণিক, আইন ও সামরিক পেশাজীবীরা ভূমির মালিক হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চতর পদে উন্নীত হয়। বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজে কেবলমাত্র জমিদারি পেশা সমানভাবে গ্রহণীয় হওয়ায় সকল বর্ণের লোকই এ পেশা গ্রহণে আগ্রহী ছিল।[১৫] যদিও বাংলার জমিদারদের মধ্যে কায়স্থ বর্ণের ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য ছিল, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জমিদারও দেখা যায়। নিম্নবর্ণের তিলি, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, বাগদী বর্ণের জমিদারও ছিল। অন্যদিকে দরবারের প্রশাসনিক ও সামরিক চাকুরির সুযোগ কমে গেলে মুসলমানরা কলম ও তলোয়ারের কাজের বিকল্প হিসেবে চাষভিত্তিক কাজে ঝুঁকে পড়লো।[১৬] নবাবি আমলে জমিদারি কার্যক্রমে মুসলমানদের অংশগ্রহণের হার যথেষ্ট কম ছিল।[১৭] (সারণি ১)

সারণি ১ : বর্ণ/গোত্রভেদে উল্লেখযোগ্য জমিদারদের তালিকা

জমিদারি	বর্ণ/ গোত্র
বীরভূম	পাঠান
বিষ্ণুপুর	রাজপুত
বর্ধমান	ক্ষত্রিয়
কলিকাতা	ইংরেজ
দিঘাপাতিয়া	তিলি
দিনাজপুর	কায়স্থ
ফতেসিং	ব্রাহ্মণ
ইদ্রকপুর	কায়স্থ
যশোর (চাঁচড়া)	কায়স্থ
লস্করপুর	ব্রাহ্মণ
মাহমুদশাহী (নলডাঙ্গা	ব্রাহ্মণ
মেদিনীপুর	সদ্‌গোপ, কৈবর্ত (চাষী) এবং অন্যান্য
মোমেনশাহী	ব্রাহ্মণ
মুক্তাগাছা	ব্রাহ্মণ
নদীয়া	ব্রাহ্মণ
পাচেত	রাজপুত

১৪. G. E. Mingay, *English Landed Society in the Eighteenth Century*, (London 1963), 26.

১৫. Collection of 'Smritis' quoted in G. S. Ghuyra, *Caste and Race in India* (London, 1932).

১৬. K. F. Rubbee, *The Origin of the Musulmans of Bengal* (Calcutta, 1895), 10.

১৭. A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society* (Dhaka 1980), 28-63.

জমিদারি	বর্ণ/ গোত্র
জমিদারি	বর্ণ/ গোত্র
রাজনগর	বৈদ্য
রাজশাহী	ব্রাহ্মণ
রোকনপুর	কায়স্থ
সরাইল	পাঠান
শিলবর্ষ	সৈয়দ
ত্রিপুরা	রাজপুত

সূত্র : S. Akhtar, *The Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772*, (Dhaka 1982), 21, Ratnalekha Ray, *Change*, 27-30.

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সুবা বাংলা কার্যত স্বাধীন নবাবি শাসনের অধীনে আসে। এ সময়ের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আরও লক্ষণীয় ছিল মুর্শিদকুলী খানের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব, মারাঠাদের উপর্যুপরি আক্রমণ,পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা গ্রহণ। ১৭৬৫ সালে কোম্পানিকে দীউয়ানি প্রদান এবং পরবর্তীতে ১৭৭২ সালে কোম্পানি কর্তৃক পূর্ণ দীউয়ানি ক্ষমতা লাভ এ উপমহাদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময়ের অস্থিতিশীল অবস্থায় উচ্চশ্রেণী, সামরিক ব্যক্তি, ক্ষমতাশালী কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করে। জমিদারগণও জমির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। এ টানাপড়েনের সময় সুবা বাংলার জমিদারশ্রেণী ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনায় মুর্শিদকুলী খানের কার্যকাল (১৭০০ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত ও ১৭১০ থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে সুবার দীউয়ান হিসেবে এবং ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত সুবাদার হিসেবে) গুরুত্বহ। ১৭১৩ সালে ফর্‌রুখশিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনের পর প্রাদেশিক কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য কেন্দ্র থেকে মনসবদার পাঠানোর কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বাংলায় আশ্রয় বা চাকুরির আশায় ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকে আসলেও[১৮] দিল্লী, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে মুগল কর্মকর্তাদের নিয়মিত বদলিব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সুবা বাংলার প্রায় সমস্ত উচ্চতর পদগুলি তখনও মুর্শিদকুলী খানের আত্মীয়-পরিজনেরাই দখল করেছিল।[১৯] কিন্তু তাদের পেছনে মুগল *মনসবদারির* নিয়মানুগ সামরিক বা প্রশাসনিক সমর্থন ছিল না। তদুপরি এও প্রতীয়মান যে ১৭২০-এর দশকে শাহী উজির নিজাম-উল-মুলক-এর আর্থিক কৃচ্ছ্রতার কারণে আঞ্চলিক মনসবদারগণ তাদের আধিপত্য হারিয়েছিলেন।[২০] করিমের ব্যাখ্যানুযায়ী মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের নিকট

১৮. রেজা খানের পরিবারের মত অন্যান্যরা।

১৯. A Karim, *Murshid Kuli Khan and His Times* (Dhaka 1963), 69-70

২০ Report of the English Council at Calcutta, Bengal Public Consultations (পরবর্তীতে B P C), April 16, 1772, RI/5

বরাবর বর্ধিত হারে রাজস্ব প্রেরণে সক্ষম ছিলেন বলেই দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন।[২১] এ কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি এমন এক শ্রেণীর জমিদারদের সাথে সমঝোতায় আসেন, যারা ছোট ছোট ভূস্বামীদের কাছ থেকে অধিক খাজনা আদায় করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।[২২]

১৭২২ সালের পরিবর্তিত রাজস্ব বন্দোবস্ত, *জমা-কামিল-তুমারী* (সম্পূর্ণ রাজস্বতালিকা) দ্বারা ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদারদেরকে *চাকলাদার* (চাকলা ছিল নতুন এক প্রশাসনিক অঞ্চল) হিসেবে মনোনীত কতিপয় বড় জমিদারদের অধীনস্ত করা হয় এবং তাদের কাছেই ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ খাজনা দিতে বাধ্য থাকতো।[২৩] ১৭২৮ সালে সুজা খান প্রবর্তিত *জমা-তুমারী-তাশখিস* (সংশোধিত রাজস্বতালিকা) উপর্যুক্ত ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে ৬১৫টি পরগনা এবং ত্রিপুরা নিয়ে বিস্তৃত সুবা বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে ১৫টি বৃহৎ জমিদারিতে বিভক্ত করে। এই জমিদারিগুলির দেয় খাজনা ছিল পঁয়ষট্টি লক্ষ রুপী—সুবা বাংলার বাৎসরিক খাজনার প্রায় অর্ধেক (সারণি ২); বাকী পরগনাগুলি ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। এটা প্রতীয়মান যে ক্ষুদ্র জমিদারদের কার্যক্রমের তদারকি করার জন্য বৃহৎ জমিদারগণ নিয়োগ পেতেন কর্মকর্তা হিসেবে, জমির মালিক হিসেবে নয়। এ প্রেক্ষিতে মুর্শিদকুলী খান বাংলার প্রাচীন জমিদার শ্রেণীকে ধ্বংস করে দেন[২৪] বলে প্রচলিত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মসনবদার ও জমিদার এবং প্রভাবশালী জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারী ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন সূচিত হয়, সেটা নিশ্চিত। আঠারো শতাব্দীতে আয়তন ও দেয় খাজনার পরিমানের ভিত্তিতে বংশানুক্রমিক জমিদারি একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়।

সারণি ২ : ১৫টি প্রধান জমিদারির খাজনা

জমিদারি	পরগনার সংখ্যা	বার্ষিক খাজনা (রুপী)
বীরভূম	২২	৬৬,৫০৯
বিষ্ণুপুর	২	১,২৯,৮০৩
বর্ধমান	৫৭	২০,৪৭,৫০৬
কলিকাতা	২৭	২,২২,৯৬৮
দিনাজপুর	৮৯	৪,৬২,৯৬৪

২১. A. Karim, *Murshid Kuli Khan*, 79, 89-93

২২. P. B Calkins, "The Formation of Regionally Oriented Ruling Group in Bengal 1700-1740", *The Journal of South Asian Studies (J. S A. S)*, 1970, 800, 803.

২৩. N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, II (Calcutta 1968), 16-17.

২৪. J. N, Sarker (ed.) *History of Bengal*, II (Dhaka 1948), 409.

জমিদারি	পরগনার সংখ্যা	বার্ষিক খাজনা (রুপী)
ফতেসিং	১১	১,৮৬,৪২১
ইদ্রাকপুর	৬০	৮১,৯৭৫
যশোর (চাঁচড়া)	২৩	১,৮৭,৭৫৪
লস্করপুর	১৫	১,২৫,৫১৬
মাহমুদশাহী (নলডাঙ্গা)	২৯	১,১০,৬৩৩
নদীয়া	৭৩	৫,৯৪,৮৪৬
পাচেত	২	৮,২০৩
রাজশাহী	১৩৯	১৬,৯৬,০৮৭
রোকনপুর	৬৬ (সম্পূর্ণ বা ভগ্নাংশ)	২,৪২,৯৪৩
ত্রিপুরা (আদি স্বাধীন পার্বত্য ত্রিপুরার অংশ)		৪৭,৯৯৩
মোট ১৫টি	৬১৫	৬২,১২,১২১

সূত্র : J. Grant, "Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal in W. K. Firminger (ed.), *The Fifth Report* 3 Vols, (Calcutta 1917-1918); "The Territorial Aristocracy of Bengal", *The Calcutta Review*, 1872, 1873, Vols, LIV, LV; N, K, Sinha, *Economic History of Bengal*, 170; Ratnalekha Ray,*Change*, 28-29.

এ সম্পর্কে কলকিন বলেন, 'আঞ্চলিক জমিদার-শাসকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সাথে মুগলদের একটি অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে'। তিনি আরও বলেন, দেশের মধ্যে বড় বড় ব্যাংকার, অর্থ লগ্নিকারী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহকারীরা এ অংশীদারিত্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খানের ক্ষমতারোহণের সুবিধার জন্য সরফরাজ খানকে উৎখাত করতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিভিত্তিকা রাখে।[২৫] এই তিন শ্রেণীর সুবিধার্থে উদ্ভূত ক্ষমতার নতুন এই বিভাজন সমাজে এক নুতন মাত্রা সংযোজন করে। নবাবি সংকটকালে জমিদারগণ এক মুহূর্ত সময় ব্যয় না করে তাদের জন্য মঙ্গলকর পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। নবাব সুজা খানের প্রতি প্রতীকী বশ্যতা ও হৃদ্যতা প্রদর্শনকারী অনেক জমিদার নবাব সরফরাজ খানের স্বার্থ উপেক্ষাপূর্বক নবাব উৎখাতকারী আলিবর্দী খানের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে দ্বিধা করে নি।[২৬] আবার, ১৭৫৬-৬৫-এর অস্থিতিশীল বছরগুলোতে মুখ্য জমিদারগণ তাদের স্বাধিকার ও আর্থিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে প্রথমে ইংরেজ ও মীর জাফর আলী খানকে সমর্থনপূর্বক নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটায়; পরে প্রাপ্ত সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে তারা ইংরেজ ও নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধাচরণ করে। আঠারো শতকের

---

২৫. P B. Calkins, *J S. A. S.*, 1970, 800, 803-806.

২৬. F Gladwin (tr), *Tawarikh*, 122, 161, 166.

বড় জমিদারদের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রসঙ্গটি এ আলোকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সে সময়ে বেনারস অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পর্কে Cohn[২৭] ও Misra[২৮] মন্তব্য করেন যে বৃহৎ জমিদারির ক্রমবৃদ্ধি অযোধ্যার নবাবদের নীতিমালার কারণে কিম্বা তাদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে গড়ে উঠে নি। একইভাবে ধরে নেয়া যায়, প্রধান জমিদারবৃন্দ কর্তৃক চাকলাদারি ক্ষমতার অপব্যবহার বাংলার নবাবদের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধেই হয়েছিল।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশ এবং রাজস্ব আদায়পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কারণে আলোচ্য সময়ে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছিল কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা নির্ণয়ে এ সময়ে উদ্ভূত সামরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট ভূমিকা রাখে, বাংলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণে মুগলরা আঞ্চলিক প্রধানদের সামরিক সহযোগিতার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নবাবদের আর্থিক ও সামরিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বড় জমিদারদের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করা যায়।

প্রভুত্ব স্থাপনের দীর্ঘ পদ্ধতি,অধিকতর ভূখন্ড দখল এবং পরবর্তীতে স্থিতিশীলতা ও শান্তিরক্ষার কাজে বিশ্বস্ত আর্থিক কর্মীগোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। মুর্শিদকুলী খানের আগে ভূসম্পত্তির যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তাতে শুধু ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরই পরিবর্তন ঘটে, কার্যক্রমের নয়। ফলে তাদের দায়-দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত অথবা উর্ধতন-অধস্তনের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ভূমির সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ্ এ ধরনের মুসলিম নীতিমালার প্রয়োগপরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে নি। এ সময়ের দু'টি পরিবর্তন—সরকারের অংশ ১/৩ বা ১/২-এ বৃদ্ধিকরণ এবং খাজনা হিসেবে পণ্যের পরিবর্তে অর্থ প্রদান[২৯] বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলী খানের *মাল-জমিনী* পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। খাজনা বৃদ্ধিকরণ এবং সময়ানুযায়ী খাজনা আদায় ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। মুশিদকুলী এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রথমত বাংলার উর্বর জমিতে বরাদ্দকৃত জায়গীরগুলিকে উড়িষ্যার অপেক্ষাকৃত কম উর্বর ভূমিতে স্থানান্তরিত করে অধিক রাজস্ব আদায়ের পথ সুগম করেন। দ্বিতীয়ত তিনি সমগ্র ভূমি জরিপ করিয়ে গত কয়েক বছরের গড় উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব ধার্য করেন এবং তৃতীয়ত *আমিল* নিয়োগ করে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়হ্রাস ও দ্রুত অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্যে তিনি সুবাকে পূর্বের ৩৪টি *সরকারের* স্থলে ১৩টি *চাকলায়* বিভক্ত করেন এবং ছোট জমিদারদেরকে *চাকলাদারদের* অধীনস্ত করে দেন। যদিও ফৌজদার ও আমিল চাকলায়

---

২৭ B S. Cohn, "Political Systems in Eighteenth Century India : The Benaras Region", *Journal of the American Oriental Society*, 1962, 314-315, Also "Structural Change in Indian Society 1595-1885", Frykenberg (ed), *Land Control*, 85.

২৯. F. Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, A Constable (tr.) (Westminster 1891), 224-225; W H Moreland, *From Akbar to Aurangzeb*, (London 1923), 247-248

কর্মরত থাকতেন, মুর্শিদকুলী রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে কিছু বাছাই করা বড় জমিদারকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। নিয়ম লঙ্ঘনকারী জমিদার অথবা অধস্তন কৃষকদের চিহ্নিত করে বাদ দেন, আয়ের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধানে আমিলদের নিয়োগ করেন। এভাবে যখন তিনি টোডরমলের বন্দোবস্ত সংশোধনে সক্ষম হন, তখন নির্দিষ্ট পরিমাণের খাজনা নির্ধারিত সময়ে জমাদানের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন।[৩০] অবশ্য তাঁর জোটবদ্ধকরণ নীতি (Policy of agglomeration) ক্ষুদ্র জমিদারের সংখ্যা হ্রাসে কোন দ্রুত ফল লাভ করে নি, কারণ মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক বিভক্ত ১৬৬০টি পরগনার মধ্যে ১০৪৫টি পরগনাতে তখনও হুজুরী তালুকদার সহ অনেক ক্ষুদ্র পাতি জমিদার খাজনা প্রদান করতেন।[৩১] প্রধান জমিদারদের খালসার উপর খবরদারি করার নীতিমালায় তাদের ক্ষমতা ও অবস্থান যুক্ত হয়েছিল। অধিকন্তু, প্রতিশ্রুতিশীল জমিদারদের সরকারি দায়িত্ব অর্পণের সুযোগ প্রদানের ফলে রাজদরবারে তাদের ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে তাদের এই ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বেড়ে যায়। এ কারণে আঠারো শতকের মাঝামাঝি রাজস্বব্যবস্থাপকের ভূমিকা থেকে ভূস্বামীর পদে রূপান্তরের প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়।[৩২]

ভূমি ব্যবস্থাপনার বিন্যাস সরকার কর্তৃক ক্ষমতা ব্যবহারের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। জমিদারদের সব সময়ে সবকিছু আয়ত্তে রাখতে হতো। কিন্তু আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর কেবল মীর কাশিমের সময়কাল বাদ দিয়ে সুবা বাংলার প্রশাসন জমিদারদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ অথবা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো শক্তিশালী ছিল না। অধিকন্তু, কেন্দ্র থেকে কোন সহায়তা না পাওয়ায় উপর্যুপরি মারাঠা অভিযানের সম্মুখীন নবাবগণ জমিদারদের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এক পর্যায়ে আলিবর্দী খান মারাঠা নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে সমঝোতায় আসার জন্য বর্ধমানের রাজার সহায়তা ও প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করেছিলেন।[৩৩] পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় জমিদারগণ দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের প্রভাব বিস্তারের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। নবাবদের সহায়তা প্রদানের বিনিময়ে তারা অনেক বেশি স্বায়ত্তশাসন এবং তাদের ভূখণ্ডের সম্প্রসারণে নবাবের হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতেন। অবশ্য, অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদারদের খাজনা প্রদানে অপারগতার কারণে ক্ষমতাচ্যুত করা হতো এবং তাদের জমিদারি নবাব বা ফৌজদারের পছন্দনীয় ব্যক্তিদের দিয়ে দেয়া হতো।[৩৪] আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে রাজনৈতিক মিত্রদেরকে জমির বন্দোবস্ত দেয়ার অনেক দৃষ্টান্তও আছে।[৩৫]

---

৩০. J. N. Sarkar (ed.) *History of Bengal*, II, 408-409.

৩১. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 16-17.

৩২. B. H. Baden-Powell, *The Land Systems of British India*, I (Oxford 1892), 183-186.

৩৩. Ghulam Hussain Tabatabai, *Sier-al-Mutakhkherin*, Haji Mustafa (tr.) (Calcutta 1902), 382.

৩৪. Board of Revenue Consultations (পরবর্তীতে B. R. C), April 6. 1773, R49/39; *Bengal District Gazetters* (পরবর্তীতে *B. D. G.)* Midnapur, 225.

৩৫. G. Vansittart to Controlling Council of Revenue at Murshidabad (পরবর্তীতে C. C. R. M.)., October 16, 1770, *P C. C. R M* December 31, 1770, II, 144.

সুবা বাংলায় বৃটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের পর ভূমি ব্যবস্থাপনার পরবর্তী কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়। পলাশী (১৭৫৭) ও বক্সারে (১৭৬৪) ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়ের সাথে সাথে একদিকে নবাবদের আধিপত্যের অবসান হয়, অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। নতুন নবাব মীর জাফর আলী খান তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পূর্বতন নবাব কর্তৃক কলকাতা অবরোধকালীন কোম্পানির ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় ১৭৫৮ সালের প্রারম্ভে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও ঢাকার কয়েকটি জমিদারির রাজস্বআয় কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এত বিস্তৃত এলাকার খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনা দেশের নিগূঢ় অর্থনৈতিক সংকটেরই পরিচায়ক।[৩৬] এ ব্যবস্থা ছিল গভীর তাৎপর্যবহ, কারণ তা কোম্পানির নিকট দেশের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চলে চাওয়ার পথ সুগম করে। ১৭৬০ সালে মীর জাফর কোম্পানির নির্দেশে নিতান্ত অনিচ্ছায় উমিচাঁদকে বর্ধমানের দীউয়ান নিযুক্ত করেন[৩৭], যা একজন মুখ্য জমিদারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ব্যাপারে প্রথাগত ক্ষমতার সঙ্কোচন ঘটায়। মীর জাফরের দেউলিয়া সরকার কোম্পানির সকল দাবি পূর্ণ করতে অপারগ হওয়ায় কোম্পানি দেশের উপশাসকের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রার্থী মীর কাশিমের সাথে একটি সমঝোতায় আসে। ১৭৬০ সালে সুবার নিয়মিত রাজস্বব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বাংলার রাজস্ব আয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্জনকারী বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের জায়গীরদারি কোম্পানির হাতে অর্পণ করা হয়।[৩৮] অবশেষে, ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্রাট শাহ আলম বার্ষিক মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি ক্ষমতা কোম্পানিকে অর্পণ করে তাকে সমগ্র এলাকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৩৯] ফলে নবাবদের সাথে জমিদারদের অংশীদারিত্বের সম্পর্ক শেষ হয়ে এক নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় সুবার প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকিতে নিযুক্ত সুবাদার বা নওয়াব, *দীউয়ান-ই-সুবা* এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রতিনিধিরা চুক্তিবদ্ধ রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন না। মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক আঞ্চলিক অর্ধ-স্বাধীন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হলেও জমিদার শ্রেণী রাজ্যের খাজনা আদায়ের ঠিকাদার হিসেবে রায়ত ও সরকারের মধ্যবর্তী লভ্যাংশ আদায় করে নিত। কিন্তু বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের ক্ষমতা হস্তান্তর ও সুবার প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণের পাশাপাশি নবাবকে এক নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে দীউয়ানি ক্ষমতা কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হওয়ার কারণে জমিদারগণ এতকাল রায়ত ও সরকারের মাঝে যে কাজ করতো তা কোম্পানির হাতে চলে গেল।

---

৩৬. A M. Khan, *The Transition in Bengal* 1756-1775, (Cambridge 1969), 23

৩৭ Hastings to Clive, January 19, 1760, B. M Add MSS, 29096, 201, see also the petition of the Rani of Burdwan, B R. C , December 27, 1774, R49/48.

৩৮. *B. P. C.* November 10, 1760, RI/32, 644-645.

৩৯. Haji Mustafa (tr), *Sier* III, 9, C. U. Aitchison, *A Collectin of Treaties, Engagements and Sanads* II, (Calcutta 1930), 241

ফলে রাজস্ব-ইজারাদারের অবস্থান বদলে গেল কোম্পানির খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল নিম্নতর ইজারাদার হিসেবে। এর পর থেকে সম্রাটকে নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে এ এলাকার সকল সুযোগ কোম্পানির ভোগদখলে চলে যায়।

প্রাক-আধুনিক ভারতের বেসামরিক প্রশাসন মূলত রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত। ফলে ভূমির মালিকানা প্রাপ্তির সঙ্গে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্বও বর্তায়। অধিকাংশ মধ্যস্তরের কর্মকর্তা রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ, কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় ও প্রাপ্ত অর্থ কর্তৃপক্ষকে প্রদান এবং এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান ও প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে সৈন্য সরবরাহে বাধ্য থাকতো।[৪০] জমিদারদের রাজস্ব, আইন-শৃঙ্খলা ও সৈন্য সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পর্কে একটি সার্বিক জরিপ করলে জানা যাবে খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত উৎপাদনের অংশ লাভ ও স্থানীয় ঐতিহ্যগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে শক্তি ও কর্তৃত্বের অধিকারী এ ভূম্যধিকারী শ্রেণী তাদের উপর অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য কতটা যোগ্য ছিল।

রাজস্ব কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

অধস্তন স্থানীয় সরকারের প্রধান হিসেবে জমিদারশ্রেণীর প্রধান দায়িত্ব ছিল নিয়মিত খাজনা আদায় করা ও সময়মতো তা কেন্দ্রে পাঠানো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দায়িত্বের প্রকৃত রূপায়ণের উপর নির্ভরশীল ছিল সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক। জমিদারি অধিকার প্রদানের সনদে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, জমিদার রাজভাণ্ডারে *পেশ্‌কাশ* (জরিমানা/উপহার) ইত্যাদি এবং *কিস্তিবন্দি* অনুযায়ী[৪১] উদ্বৃত্ত জমা দেবে, নির্দিষ্ট নিয়মে প্রতি বছর *মুজকুরাত*[৪২] বা *নানকার*[৪৩] প্রভৃতির প্রাপ্য গ্রহণপূর্বক ভূসম্পত্তির সার্বিক আয় প্রভৃতি যথানিয়মে জমা দেবে।[৪৪] এ প্রধান দায়িত্বের পাশাপাশি এও বলা হয়, জমিদার ও তালুকদাররা 'রায়তদের সৌহার্দ্য অর্জন করবে ও তাদের উৎসাহিত করবে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী হবে'।[৪৫]

বাংলার জমিদার *পেশকাশি বা মাল্‌-ওয়াজিবী* যাই হোন না কেন, এক নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতেন[৪৬] এবং এ হার অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বৃদ্ধি করা হতো। যদিও মুর্শিদকুলী খান জমির পরিমাপ করে একটি খাজনার তালিকা তৈরি করেছিলেন, বাংলার সকল অংশে

---

৪০. S. Nurul Hasan, "Zamindars under the Mughals" in Frykenberg (ed.) *Land Control*, 26, 28.

৪১. বাৎসরিক জমার কিস্তির পরিমাণ, তারিখ ইত্যাদি সম্বলিত চুক্তি।

৪২. জমিদারি পরিচালনা ও খাজনা আদায় খরচ সহ জমিদারের ব্যক্তিগত ভাতা এবং ধর্মীয় ও দাতব্য বিষয়ক খুচরা খরচাদি।

৪৩. জীবনধারণের নিমিত্ত মঞ্জুরীকৃত ভাতা।

৪৪. রাজশাহীর জমিদার রাজা রামকান্তকে প্রদত্ত সনদ, W. K. Firminger (ed.), *The Fifth Report* I, xivivivii.

৪৫. ঐ।

৪৬. *Ain.* II, 141; Chahar Gulshan, J. N. Sarkar (tr.) *India of Aurgangzib,* (Calcutta 1901).

এ হার যথাযথভাবে প্রযোজ্য হতো কি না তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি।[৪৭] মাল-ওয়াজিবী জমিদারগণ রাজস্ব আদায় করতেন কৃষিযোগ্য ভূমির উপর ভিত্তি করে। জমিদারদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল জঙ্গল ও পতিত জমি উদ্ধার করা। উদ্ধারকৃত ভূমির উন্নতির একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোন খাজনা দিতে হতো না।[৪৮] জমিদারগণ সরকারকে উদ্ধারকৃত ভূমির জন্য অধিক হারে খাজনা দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতেন, ফলে অধিক হারে পতিত জমি ও জঙ্গল উন্নয়নে তাদের তেমন আগ্রহ থাকতো না। উদ্ধারকৃত ভূমিকে *খামার* বলা হতো, যার উৎপাদন কৃষক আর জমিদারদের মধ্যে ভাগাভাগি হতো। এর মাধ্যমে জমিদারগণ একটা নিয়মিত অতিরিক্ত আয় পেতেন।[৪৯] উদাহরণস্বরূপ, দিনাজপুরের জমিদারিতে খামার থেকে ৩০,০০০ রুপী আয় হতো, যা ভ্যানসিটার্ট-এর মতে উক্ত খাতে অধিকাংশ জমিদারের প্রাপ্তির চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম।[৫০] এতে অনুমেয় যে বড় জমিদারদের প্রকৃত আয় ছিল তাদের খাজনা থেকে প্রাপ্ত আয়ের অনেক বেশি। সুবাদারগণ এ বিষয়ে অবহিত হবার কারণে সম্ভবত জমিদারদের উপর আবওয়াব (সেস) ধার্য করা হতো। এমনই একটি সেস, *নজরানা মুকাররারি* ছিল রাজ দরবারে জমিদারদের খরচের যোগান দেবার একটি স্থায়ী আর্থিক সুবিধা, যার মাধ্যমে জমিদারগণ রাজস্ব মওকুফসহ বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করতো এবং *হুস্তাবুদ*-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আমিলদের তাৎক্ষণিক খবরদারি থেকে পরিত্রাণ পেতো। বস্তুত এভাবেই জমিদারগণ রাজদরবারে দুই ঈদের সময় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে নজরানা পাঠানোর খরচ পুষিয়ে নিত।[৫১]

সুবাদারি আবওয়াব ধার্য করার নীতি ছিল প্রচলিত প্রথাবিরোধী। প্রাথমিকভাবে কিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রথা মুর্শিদকুলী চালু করেন, কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে এর হার অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন, রাজনগর জমিদারিতে বার্ষিক খাজনা ৩২,৯০০ রুপী হলেও আবওয়াব ছিল ৫১,৭৬১ রুপী।[৫২] মীর কাশিমের অধীনে আবওয়াব থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ছিল খালসা ও জায়গীর থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমান। আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি যে আমিল ও *শাজাওয়াল* নিয়োগ করেন, তাতে জমিদারদের আয় এবং কিছু প্রচলিত সুবিধা কমে যায়।[৫৩] কিছু মুখ্য জমিদারদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার চাপে রায়ত ও নিম্ন কৃষকরা

---

৪৭. A. Karim, *Murshid Quli Khan*, 83.

৪৮. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 7-8.

৪৯. J. Shores Minute, September 18, 1789. W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, II, 479.

৫০. G. Vansittart to Controlling Council, October 16, 1770, P. C. C. R. M., December 31, 1770, II, 144.

৫১. J. Grant, "Historical and Comparative Analysis", in W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, II, II, 209.

৫২. Proceedings of the Committee of Circuit at Dacca (পরবর্তীতে P. C. C. D.,) October 8, 1772, R70/15, 314.

৫৩. J. Shore's minute, June 18, 1789, paras 33-37, 45, 66, in W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, 9, 12, 17.

দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। খেলাফী ও অনাদায়ী জমিদারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।[৫৪] অন্যদিকে জমি কিম্বা রায়তদের কল্যাণের প্রতি অনাগ্রহী অস্থানীয় ও সাময়িকভাবে নিয়োজিত আমিল বা শাজাওয়ালদের হাতে কৃষকরা যথেষ্ট নিগৃহীত হতে থাকে।

ভূম্যধিকারীগণ ভূমিরাজস্ব ব্যতীত সড়ক, সীমান্ত ও ফেরীর জন্য আদায়কৃত *রাহদারি* ও ব্যবসায়ীদের ভূমি বা আবাসস্থলের উপর প্রযোজ্য *পান্ডেরীর* সমন্বিত রাজস্ব সায়ের (tolls and excise) আদায় ও বিলিবণ্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ঘাট বা *চৌকি* এবং হাট খাজনার মতো এই খাজনাও জমিদারের এলাকার সকল দ্রব্য ও সেগুলির পরিবহন এবং বাজারে এগুলি বিক্রয়ের সুবিধার উপর ধার্য করা হতো। হাট, বাজার বা গঞ্জে সরকারি শুল্ক আদায়কেন্দ্রের পাশাপাশি জমিদারগণ তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব কেন্দ্র স্থাপন করতেন। নিয়োগকৃত কর্মচারী বাজারের খাজনা ধার্য করতো, ওজন, পরিমাণ এবং বিক্রীত মালামালের মান পরীক্ষা করতো।[৫৫] যেসকল জমিদার তাদের এলাকার ঘাট ও হাটের দায়িত্ব গ্রহণ করতো, তাদেরকে খাজনা দিতে হতো, তবে যে স্থানে বাজার বা শুল্ককেন্দ্র স্থাপিত হতো সে জায়গার খাজনা মওকুফ করা হতো।[৫৬]

জমিদারি খাজনার এক ভিন্ন ধরনের উৎস ছিল *বাজি-জমা*। জরিমানা, ক্রোক এবং ব্রাহ্মণ ও মৌলবিদেরকে প্রদত্ত বিবাহের সম্মানির উপর ধার্য হালদারি বা *মারোচা* নামক কর প্রভৃতি থেকে বাজি-জমা আদায় হতো।[৫৭] বাজি-জমার উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল নিঃসন্তান মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি। গৃহে প্রস্তুত মদ, সরকারি জমিতে গবাদি পশু চরানো, কাঠ বা খড় কাটার উপর ধার্য খাজনাও এই খাতে ধরা হতো।

প্রতি অর্থবছরের প্রারম্ভে দুই ধরনের পত্তনি, সরকারের সাথে জমিদারের মধ্যে *সদর বন্দোবস্ত* এবং রায়তের সাথে জমিদারের মধ্যে *মফস্বল* বন্দোবস্ত সম্পাদিত হতো। মুর্শিদাবাদের খালশায় পুন্যাহ[৫৮] অনুষ্ঠানে সদর বন্দোবস্তে পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক হিসাবনিকাশ করা হতো এবং পরবর্তী বছরের চুক্তি সম্পাদিত হতো।[৫৯] জমিদারগণ তালুকদার-*কুতকিন্দারদের* সাথে এবং যেসকল রায়ত সরাসরি জমিদারদের খাজনা দিত তাদের সাথে হিসাব মিটাতেন ও নতুন চুক্তি করতেন। সকল জেলার গ্রাম থেকে মহকুমা,

---

৫৪. Reza Khan's Note,May 25, 1775. *Calendar of Persian Correspondence*, 1662. (Henceforth referred to as C P C.), IV

৫৫. দীনেশ চন্দ্র সেন, *সমশের গাজীর পুঁথি, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়*, ২য় খন্ড, (কলিকাতা ১৯১৪), ১৮৫৩।

৫৬. H Cottrell to B. R., January 17, 1771 P C C. R M February 4, 1771, III, 103

৫৭. C. W. B. Rous to Hastings, August 19, 1772, *Letter Copy Book of the Supervisor of Rajshahi* (henceforth referred to as L. C. B S.R.,), 47.

৫৮. পূন্যাহ জমিদারদেরকে খিলাত অথবা সম্মানে ভূষিত করা এবং জমিদার কর্তৃক নবাব ও দরবারের অন্যান্য উচ্চ পদস্থদেরকে নজরানা দেবারও অনুষ্ঠান ছিল।

৫৯. A Karim, *Musshid Quli Khan*, 90

মহকুমা থেকে মূল কাছারিতে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে এই সকল কাজ করা হতো।[৬০] কৃষিজমির খাজনা কিস্তির মাধ্যমে ফসল উঠার সময় আদায় করা হতো, অন্যদিকে আবাসিক কর ও সায়ের প্রতি মাসে আদায় করা হতো।[৬১]

জমিদারদের উপর প্রযোজ্য খাজনা নির্দিষ্ট হারে থাকলেও জমিদারগণ প্রত্যেক কৃষকের খাজনার হার ইচ্ছানুযায়ী ধার্য করতে পারতো। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে খাজনার হার নির্ণয় করা দুরূহ। জমির উৎপাদনশক্তির বিভিন্নতা, শ্রমের মজুরি, সেচব্যবস্থার সুবিধা এবং স্থানীয় সামাজিক ও ভূমিভিত্তিক প্রথার কারণে বিভিন্ন প্রকার খাজনাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়। কৃষকপিছু উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ *আসল* (মূল খাজনা) হিসেবে স্থির করা হয়।[৬২] সরকারি ফরমানে কোন অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিষিদ্ধ ছিল, অধিকন্তু অভাবী রায়তদের তৈজসপত্র, বীজ, হাতিয়ার এবং *তাকাভী* (ঋণ) দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হতো।[৬৩] কিন্তু বাস্তবে, টোডরমল ও মুর্শিদকুলী খানের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষকদের কাছ থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আবওয়াব এবং *মাথট* (মাথাপিছু ধার্য কর) আদায় করা হতো। এর ফলে মোট আদায় অনেক বেড়ে যায়। মুর্শিদকুলী খানের সময়ের বিঘা বা কানিপ্রতি দশ আনা খাজনা ১৭৬১ সালে ২ রুপীতে উন্নীত করা হয়।[৬৪] বিঘাপ্রতি ভাড়া আবওয়াব আর মাথট বাদেই ২২ রুপীর কম ছিল না।[৬৫]

খাজনা সুষ্ঠুভাবে আদায়ের লক্ষ্যে বড় বড় জমিদারিকে কয়েকটি পরগনা, তরফ, *তপ্পা* বা *দিহিতে* বিভক্ত করা হতো। এ সকল বিভক্তিতে একটি করে *কাছারি* স্থাপন করা হতো, যেখানে জমিদারের কাজ সম্পাদন করা হতো। এসকল কাছারির দায়িত্বে থাকতো নায়েব। পরগনাকাছারিতে কয়েক জন কর্মচারী থাকতো, এদের সংখ্যা পরগনার এলাকা ও গুরুত্বের উপর নির্ভর করতো।[৬৬] যে দুই ব্যক্তি গ্রামের খাজনার বিষয়টি দেখাশুনা করতো

---

৬০. C W B Rous to R, Becher,June 22, 1770, L. C B S R , 24

৬১. Aurangzib's farmans in J N. Sarkar, "The Revenue Regulations of Aurangzib". *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* 1906, II, 228.

৬২ *Risalat-i-Zirat* (1750), Edinburg MS., 144, f12b.

৬৩. Roy Royan's answer, J H. Harington, *Extract from Harington's Analysis* (Calcutta, 1866), 164

৬৪. B M Add MSS. 19504, 44 পাণ্ডুলিপিটিতে ১৬২ বঙ্গাব্দ (১৭৫৫-১৭৫৬) এবং ১১৬৭ বঙ্গাব্দে (১৭৬০-১৭৬১) একজন খুদকাস্ত ও একজন পাইকাস্ত রায়তকে দানকৃত দু'টি পাট্টা রয়েছে। প্রথমটিতে ২ রুপী হারে আবাদযোগ্য ও আবাসযোগ্য জমির খাজনার কথা লিপিবদ্ধ। দ্বিতীয় পাট্টায় আঞ্চলিক আবওয়াব হিসিবে অতিরিক্ত দেয় সম্পর্কে বলা আছে।

৬৫. Hastings' Minute, B. R. C , November 12, 1776, R49/65.

৬৬. C. C R. M. to Board of Revenue, (পরবর্তীতে B. R) June 23, 1774· B R. C., June 28, 1774, R49/46.

তাদের মধ্যে *কর্মচারী* খাজনা সংগ্রহ আর ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকতো। পাটোয়ারি জমির নথি সংরক্ষণ করতো আর আদায় হিসাববদ্ধ করতো। *হালসানাহ* নামক একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা রায়তপিছু জমির পরিমাপ ও সীমানা নির্ণয় করতো, নতুন রায়তকে জমি বরাদ্দ দিত এবং যে জমির খাজনা ফসলের মাধ্যমে আদায় করা হতো তার ফসল আদায় করতো।[৬৭] এই সকল গ্রাম পর্যায়ের কর্মকর্তাকে গ্রামের *মণ্ডল* (মোড়ল) সহায়তা করতো।[৬৮] গ্রামের কোন কোন অংশের কৃষকদের মধ্যে দেয় খাজনা বণ্টন করে দিতে এক বা দুই জন মণ্ডল আমিনকে সহায়তা করতো। একই সাথে গ্রামে অধিক পরিমাণ ভূমি কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যগত ও সরকারি প্রধান হিসেবে মণ্ডলকে দায়িত্ব দেয়া হতো।[৬৯] এ কারণে এই এলাকায় আগত নতুন বসতি স্থাপনকারীদেরকে উৎসাহিত করা তার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। একচেটিয়া জমিদারদের উপর অধিক হারে নির্ভরশীলতা এবং মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে আমিলদের পুনঃ পুনঃ নিযুক্তি হেতু গ্রামপ্রধানদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমিত হয়ে যায়। এ পর্যায়ে মণ্ডল জমিদারি কর্মকর্তায় পরিণত হয়, যাকে জমিদার নিয়োগদান ও বরখাস্ত করতে পারতেন। রাজস্বপুলিশ হিসেবে মণ্ডল এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।[৭০]

মধ্যম বা বড় জমিদারিতে প্রশাসন দু'ধরনের কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হতো। রাজবাড়ীর কর্মীবাহিনীকে *হুজুরী*, এবং পরগনা বা গ্রাম এলাকায় খাজনা আদায় ও জমিদারি কাজকর্ম প্রতিপালনে ব্যাপৃতদের *মফস্বল* নামে আখ্যায়িত করা হতো।[৭১] প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে ছিল সাধারণত কেন্দ্রে স্থাপিত *সদর কাছারি* বা প্রধান কার্যালয়, যার প্রধান *দীউয়ান* সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড তদারক করতেন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। *বকশি* একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং সকল ব্যয়ভার তাঁর তদারকিতে নির্বাহ করা হতো। অন্য উল্লেখযোগ্য কর্মচারী *উকিল* জমিদারি *আদালত* বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জমিদারের প্রতিনিধিত্ব করতেন।[৭২]

জমিদারির এ দীর্ঘ প্রশাসনিক সূত্রের এক অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল এই যে নিম্ন পর্যায়ে *আমলা* জমিদারের নিকট জমি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না দিয়ে অন্য কর্মচারীর যোগসাজশে

৬৭.. B. M. Add. MSS. 29, 086, 3.

৬৮. এছাড়াও কোন কোন অঞ্চলে মুকাদ্দাম, মুখিয়া বা পরমানিক বলা হতো।

৬৯. W. H. Moreland, *The Agrarian System of Moslem India* (Cambridge 1929), 135.

৭০. I. Habib, *The Agrarian System of Mughal India* (London 1963), 132, 134, J. Grose to C. C. R. M , October 31, 1770, P C C. D., November 15, 1770, I, 194-195.

৭১. C Russell to H. Verelst, August I, 1767, para 15, B. P. C, September 28, 1767. RI/41.

৭২. C P C., IV, 2038.

জমিদারকে সহজেই প্রবঞ্চিত করতে পারতো। *নায়েব* ও গোমস্তা প্রায়শই যথার্থ বিত্তশালী, সুখ্যাত ও সৎ ছিল না এবং রায়তদের সাথে প্রতারণাপূর্ণ লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে ব্যাপৃত থাকতো[৭৩]। আবার আমলাদের কূটকৌশলে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থতা হেতু জমিদারির একাংশ বিক্রয় হলেও এ সকল নীতিহীন আমলা প্রকাশ্যে অথবা বেনামীতে সেসব জমি কিনে নিত।[৭৪] জমিদারের মৃত্যুতে বা জমিদারের অবর্তমানে দীউয়ান বা গোমস্তা তাঁর নাবালক সন্তানের অর্থ নানাভাবে আত্মসাৎ করতো, জমি বেনামীতে বেহাত করতো এবং সমগ্র জমিদারিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতো।[৭৫]

জমিদারির বিস্তৃত ও বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলির ব্যবস্থাপনার চাপ লাঘবের উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা আদায়ের সুবিধাজনক পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্বাধীন জমিদারগণ নিম্ন কৃষক *কুত্‌কিন্দার* বা তালুকদারদের সাথে চুক্তি করে পত্তনি দিতেন। সুবার কোন কোন এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা এ ধরনের কৃষকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। ঢাকা জেলার কোন কোন জমিদারের *নিজ-জমার* পরিমাণ তালুকদারি জমার চেয়ে কম ছিল।[৭৬] অন্যদিকে, জমিদারগণ কখনও কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে জমি কর্ষণের অযোগ্য আখ্যায়িত হওয়ার কারণে সরকারের রাজস্ব খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোন কোন জমিদার তার জমিদারির বিস্তীর্ণ এলাকাকে বাজি-তালুক হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর আশ্রিত, আস্থাভাজন বা অধস্তনদের *বন্দোবস্ত* দিত। অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ব্যক্তিগত বিনোদনের জন্য পৃথককৃত তালুক নিম্নতর হারে ভাড়ায় প্রদান করে জমিদার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত খাজনা আদায়ে তৎপর থাকতেন। সুপারভাইজার রাউস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী রাজশাহী জমিদারিতে কিছু কিছু তালুক কেবল রানী ভবানীর আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসই নয়, তার দেওয়ান দয়ারামেরও আয়ের উৎস ছিল।[৭৭] এ ধরনের নিম্ন হারের জমি

---

৭৩. C. W. B. Rous to R. Becher, June 22, 1770, L. C. B. S. R., 24.

৭৪ C. P. C., II, 895.

৭৫. R. Wilmot to R. Becher, October 22, 1770, P. C C R. M. October 29, 1770, 1131-132.

৭৬.

জমিদারী	স্বীয় জমা	তালুকদারের জমা	মোট সমা	তালুকের সংখ্যা
পরগনা জালালপুর	১১,০০০	৭৬,০০১	৮৭,০০১	২,১২৮
পরগনা চন্দ্রদ্বীপ	১৭,০০০	৭২,৭২৫	৮৯,৭২৫	৪০০
পরগনা বিক্রমপুর	২,০১০	২৫,৬৪২	২৭,৬৫২	২৬৮
পরগনা রাজনগর	৯২,৫৫৫	২,০১,১১৮	২,৯৩,৬৭৩	৪০০
তপ্পা মৈসুরদী	৪০০০	১৪,০০৪	১৮,০০৪	৫৬১
পরগনা ইসাখাবাদ	১,৭০০	২,০০০	৩,০০০	২০০
তপ্পা হায়দ্রাবাদ	১,২৩৫	৭৫০	১,০৮৫	২০০

৭৭. P. C. C. R. M., June 10, 1771, V, 254.

পরবর্তীতে সরকারের ব্যপক ক্ষতি বয়ে আনে। অধিকন্তু, তালুক সৃষ্টির কারণে বাংলার কৃষকসমাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই জমিদারের অধীনে সকল রায়ত সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো না। ফলে দুর্দশাগ্রস্ত রায়তদের অনেকে জমি ত্যাগ করতে বাধ্য হতো।[৭৮]

দেশের সকল স্থানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে জমিদারদের আবশ্যকতা ও অধিকার সমরূপ ছিল না। তাদেরকে কমপক্ষে ৫ শতাংশ হারে রেয়াত দেয়ার বিধানের আওতাধীন *নানকর* নামক নিষ্কর জমি বরাদ্দ দেয়া হতো।[৭৯] জমিদারগণ বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত মালিকানা অথবা *হক-ই-জমিদারি* নামক ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আদায়ের অংশীদারিত্ব ভোগ করতেন। বাংলায় এ ব্যবস্থা *রসুম* (নিয়মিত খাজনার অতিরিক্ত পাওনা) নামে পরিচিত ছিল।[৮০] প্রাপ্ত হার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের ছিল। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আঠারো শতকের জমিদারগণ মোট আদায়ের ১০% রসুম আদায় করতেন।[৮১]

মুগল শাসনামলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বহুমাত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। রাজধানীর সর্বোচ্চ পদ *দীউয়ান-ই-সুবা* থেকে আরম্ভ করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে গ্রামের পাটোয়ারি পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার রাজস্ব আদায় ও বিলি-বণ্টনে নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। ফৌজদারগণ পুরোপরি ও সময়মতো রাজস্ব আদায়ে দায়বদ্ধ ছিল।[৮২] *কানুনগো দফতর* গ্রাম, ভূমি, নির্ধারিত রাজস্ব, বিক্রয়ের দলিল এবং স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান, এবং বিশেষত ইচ্ছাকৃতভাবে জমির তথ্য গোপন ও হস্তান্তর এবং রায়তদের উপর অধিক খাজনা আরোপ প্রভৃতি পর্যালোচনা করে একটি তালিকা প্রণয়ন করে জমিদারদের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতো।[৮৩] রাজস্ব আদায় ও তদারকির জন্য প্রতি সরকারে একজন প্রধান *আমিল* থাকতেন, যাঁকে পরগনা ও গ্রাম পর্যায়ে *আমিল, শিকদার,* আমিন, *বিতিক্চি, মুনসিফ, থানাদার, পাটোয়ারি* পদের ব্যক্তিবর্গ সহায়তা করতো।[৮৪] এছাড়া চৌধুরী ও মণ্ডলদের কাছ থেকেও সহায়তা পাওয়া যেত। আমিলদের স্ব স্ব এলাকার কানুনগোদের নিকট খাজনার প্রকৃত জমা, বকেয়া, হ্রাস-বৃদ্ধি ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব জমা দিতে হতো, এবং কানুনগো জমিদারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হিসাবের সাথে সেগুলি মিলিয়ে দেখতেন। আমিলদের সাধারণত বড় জমিদারিতে নিয়োগ দেয়া হতো না, তবে কোন নিয়মের লঙ্ঘন তদন্ত করতে এবং অস্থায়ীভাবে রাজস্ব-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার

---

৭৮ Select Committee Consultations (পরবর্তীতে S C. C.), August 16, 1769, R/A, 9.

৭৯. *Reports, House of Commons*. IV, 95; I. Habib, *Agrarian System*, 173-174.

৮০. N K. Sinha, *Economic History of Bengal*, II, 14.

৮১. *Risalah-i-Zirat* (1750). Edinburgh Ms., 144, fllb; B. R. C , August 3, 1773, R49/41

৮২. B. M Add. MSS OR. 19505, 7a; P. Saran, *The Provincial Government of the Mughals* (Allahabad 1941) 208

৮৩ কানুনগোদের আবেদন পত্র, B R. C , May 25, 1774, R49/49.

৮৪. *Ain*, II, 46.

জন্য নিয়োগ দেয়া হতো।[৮৫] মুর্শিদকুলী খানের সময়ের পর থেকে আমিলদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। অপর গুরুত্বপূর্ণ অফিসার *সাজোয়াল* ভূস্বামী বা রায়তদের কাছ থেকে অনাদায়ী খাজনা আদায় করার জন্য নিয়োজিত হতো।[৮৬] এছাড়াও *ওয়াকাই-নিগার* (ঘটনাবলীর বিবরণরক্ষক) এবং *সাওয়ানি-নিগার* (পত্রলেখক)-এর দায়িত্ব ছিল নিজেদের এলাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা। হাট-বাজারে মাপ-জোখের উপরে নজর রাখার জন্য নিয়োজিত ছিল *মুহতাসিব*। ১৭৭১ সালে দিনাজপুর থেকে কট্রেলের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তখনও শাহী কর্মচারী হিসেবে সম্মানিত, ওয়াকাই-নিগার, সাওয়ানি-নিগার এবং মুহতাসিবগণ জমিদারদের উপর খবরদারি করার জন্য নিয়োজিত ছিল।[৮৭]

জমিদার-রায়ত সম্পর্ক

মুগল শাসনামলে সুবার সর্বময় দায়িত্ব যেমন ছিল সম্রাটের হাতে, জমিদারিতে জমিদারের তেমনই একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল এবং রায়তদের সন্তুষ্টির উপরই জমিদারির উন্নতি নির্ভর করতো। স্বার্থগত দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও রায়তদের অধিকার ও ঐতিহ্যগত সুবিধা সংরক্ষণ জমিদারদের দায়িত্ব ছিল, কারণ তাদের শ্রমের উপরই জমিদারদের সুখ-শান্তি নির্ভর করতো। রায়তদের সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে উৎসাহ দানের জন্য আদিষ্ট বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব-পত্তনিদারদের সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধ করে দেয়া হতো যেন তারা রায়তদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি না করে। জমিদারদের প্রদত্ত সনদে নির্দেশ দেয়া হতো জমিদারি ক্ষমতারোপের পাশাপাশি 'রায়ত ও সাধারণ জনগণের সাথে প্রশংসনীয় ব্যবহার করতে'।[৮৮] এই তাত্ত্বিক আচরণের বিষয় ছাড়াও সমসাময়িক পরিব্রাজকদের রচনা ও সাহিত্যে দেখা যায়, জমিদার ও রায়তশ্রেণী পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার্থে মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় রাখতো। জমির উপর কোন বিশেষ চাপ না থাকায় জমির মালিক ও প্রজাদের অধিকার নিশ্চিত করা হতো। একই সাথে, পর্যাপ্ত কৃষকের অভাবে জমিদারগণ রায়তদের জমি ত্যাগ করে চলে যাওয়া থেকে বিরত করতো এবং তাদেরকে সকল কৃষিযোগ্য জমি চাষ করতে উদ্বুদ্ধ করতো।[৮৯]

বহুধাপবিশিষ্ট ভূমিভিত্তিক সমাজে যেমন বিভিন্ন ধাপের রাজস্ব-আদায়কারী ছিল, তেমনি বিভিন্ন প্রকারের রায়তও ছিল। কৃষকদের সাথে জমিদারদের দু'ধরনের চুক্তি

---

৮৫ Reza Khan's Account, February 1775, Francis MSS, Eur. E. 28, 345.

৮৬. Haji Mustafa (tr.), *Sier* I, 325.

৮৭. Cottrell to Controlling Council, P C C R M., July 2, 1771, V 337.

৮৮. J. Shore's Minute, April, 1788 quoted in W. K. Firminger (ed.)., *Fifth Report*, I. xi.

৮৯. S. Nurul Hasan, "Zamindars Under the Mughals", R. E. Frykenberg (ed.), *Land Control*, 20, শিনকিচি তানিগুচি, "বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে দিনাজপুর জমিদারির প্রশাসনিক কাঠামো", নিবন্ধটি এস.ইউ. আহমদ সম্পাদিত "দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য" শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ১৮৪।

সম্পাদিত হতো—রেওয়াজ মাফিক ও চুক্তিভিত্তিক। প্রথম ক্ষেত্রে খাজনা *নিরক্* পদ্ধতিতে ধার্য করা হতো, অর্থাৎ এক বিঘা জমিতে উৎপাদিত পণ্যের ধরন ও মোট উৎপাদন এবং সেই এলাকার প্রচলিত সংস্কারের উপর ভিত্তি করে বিঘাপ্রতি হার নির্ধারিত হতো।[৯০] বংশপরম্পরায় যে রায়ত নিজের জমিতে চাষাবাদ করতো, *খুদকাস্ত* নামে অভিহিত সে রায়ত নির্ধারিত হারে নিরক্ প্রদান করতো। বিধিবদ্ধভাবে জমির স্বত্বাধিকারী হওয়ায় এদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন *পাট্টা* দেয়া হতো না বা তারা নিজেরাও পাট্টা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না, কারণ তাদের ধারণা ছিল, এর কারণে তারা জমিদারের আজ্ঞাবাহক হয়ে যাবে, এবং জমিদার পরবর্তীতে যাকে ইচ্ছা তাকে জমির পত্তনি দেবে।[৯১] জমিদারকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান সাপেক্ষে *পাইকাস্ত* (অনাবাসিক) রায়তরা আবাদি বা অনাবাদি জমি যে ধরনেরই হোক না কেন, তার পাট্টা লাভ করতো।[৯২] খুদকাস্ত রায়তরা প্রাক-মুগল যুগের জমির মালিক বা গ্রামসমাজের সদস্যের খণ্ডিত অংশ।[৯৩] পাইকাস্তদের জমির প্রতি কোন আগ্রহ না থাকলেও তারা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে কাজ করতো। সবচেয়ে নিম্নতম রায়ত ছিল *আধিয়ার*, বর্গাদার বা ভূমিহীন কৃষক, যারা অন্যের জমিতে কাজের বিনিময়ে ফসলের ভাগ পেত।[৯৪] বিত্তশালী রায়ত ও *শাহ্ রায়ত*দের অধীন অনেক জমি থাকতো, যার সবটুকু তারা নিজের কৃষক দিয়ে চাষ করাতে পারতো না, অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কিষাণদেরকে দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশের বিনিময়ে চাষ করিয়ে নিত। শাহ্ রায়তরা অর্থশালী হওয়ায় ঋণ প্রদানে সক্ষম ছিল, ফলে এরা অনেক কম মূল্যে জমি চাষ করিয়ে নিতে পারতো। আঠারো শতকের দিকে উচ্চতর ভূমি-অধিকারিক ও নিম্নতম রায়তের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের জমির মালিক থাকার কারণে এই দু'শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছে। বৃহৎ জমিদারিতে, যেখানে প্রকৃত ব্যবস্থাপনা দীউয়ান, চৌধুরী আর গোমস্তাদের হাতে ন্যস্ত থাকতো, সেখানে মণ্ডল, প্রামাণিক বা সম্পদশালী রায়তদের সাথে সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা ছিল, কারণ তারা নিজেদেরকে ঐ শ্রেণীর কর্মচারীদের থেকে উচ্চ শ্রেণীর বলে মনে করতো, এবং কৃষকদের অধিকার খর্ব করতে ব্যাপৃত থাকতো।

কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দীউয়ানি লাভের পর ঐতিহ্যগত ভূমি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। বংশানুক্রমিক শাসকদের কার্যক্রম পরিবর্তিত হয়ে গেল নগণ্য রাজস্ব-ঠিকাদার ব্যবস্থাপনায়। বিভিন্ন জেলায় ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ, তুচ্ছ

---

৯০. Royroyan's answer, J. H. Harington, *Extract*, 155.

৯১. S. Bird to B. R., January 14, 1788, Board of Revenue Proceedings (পরবর্তীতে B. R. P). May 6, 1788, R70/41.

৯২. ঐ।

৯৩. R. H. Hollingbury. *The Zemindary Settlement of Bengal*, Vol. I, (London 1868), 8.

৯৪ S. Islam, *Permanent Settlement*, 5.

কারণে আমিল, *শাজাওয়াল বা ওয়াদ্দার* প্রভৃতি কর্মচারী প্রেরণ, জমিদারদের প্রচলিত অধিকার খর্ব করে উচ্চতর দরদাতার নিকট জমির পত্তনি দেয়া বা সেটা *খাস* হিসেবে রাখা[৯৫] জমিদারি শাসনব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি করে। জমিদারগণ তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। সুপারভাইজারদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা খর্ব করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও জমিদারগণ তাদের জমিদারি এলাকার জরিপ ও প্রকৃত মূল্যায়ন করার কাজে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। তারা সার্ভেয়ার জেনারেল রেনেল-এর দলকে সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রতিপালনে অনীহা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাঁর কার্যক্রম বন্ধ করতে অস্ত্র ধারণও করেছিল।[৯৬] জমিদারদের সব প্রতিবাদ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সুপারভাইজারগণ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী থাকে এবং জমিদার ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীদের অনাদায়ী খাজনা আদায়ে শিথিলতার কোন সুযোগ দেয়া হয় নি। সুপারভাইজারদের নিয়োগের ফলে জমিদারদের স্বায়ত্তশাসিত অবস্থার ক্ষতি হতে থাকে। ১৭৭৪ সালের ১৪ মে জারিকৃত নির্দেশবলে জমিদারদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আরও খর্ব করা হয়। এ সময় থেকে সুপারভাইজারগণ দীউয়ানের পাশাপাশি বোর্ড অব রেভিনিউ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কালেক্টরের মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং রাজস্ব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে সম্পূর্ণভাবে চলে আসে।[৯৭] এরপরই আবওয়াব আদায় নিষিদ্ধ করা হয়। খাজনার কিস্তি ফসল কাটার সময়ে নির্ধারণ করা হলে সঠিক সময়ে খাজনা দেবার জন্য তাদের আর ঋণ করার প্রয়োজন থাকলো না। সকল জমিদারি *চৌকি* বিলোপ করা হলো। কালেক্টরদের নির্দেশ দেয়া হলো তারা যেন প্রতি পরগনার প্রতিটি খামারের প্রকৃত খাজনার হার প্রস্তুত করে সর্বোচ্চ জমার হিসাব নির্ণয়পূর্বক আয় হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করে। সে সাথে সকল জমিদারি চৌকি উচ্ছেদ করা হয়।[৯৮]

জমিদার শ্রেণী ও পুলিশব্যবস্থা

সুবার সার্বিক ফৌজদারি ও পুলিশ প্রশাসন ফৌজদারের হাতে ন্যস্ত থাকলেও তারা গ্রামাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে জমিদার শ্রেণীর উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জমিদারদেরকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি মুগল আমলেই সূচিত হয় নি, অতীতে গ্রামপ্রধান সমাজপতি হিসেবে পুলিশকার্যক্রম সংগঠন করতেন। সময়ের বিবর্তনে গ্রামপ্রধানের এই দায়িত্ব জমিদারদের উপর ন্যস্ত হয়।[৯৯] একই সাথে আর্থিক ও প্রশাসনিক

---

৯৫. C. P. C., II, 1476; R. Wilmot to R. Becher, October 22, 1770, *P. C. C. R. M.*, October 29, 1770, I, 132; W. Harwood to Controlling Council of Revenue at Murshidabad, P C. C. R. M., October 28, 1770; October 6, 1770, I, 170.

৯৬. J. Rennell to Controlling Council, *P C. C. R. M.*, December 9, 1770, December 20, 1770, II, 98-99.

৯৭. *P. C. C. R. M.*, May 14, 1772, R 67/54.

৯৮. ঐ

৯৯. B B. Misra, *The Judicial Administration of the East India Company in Bengal*, (Delhi 1961), 66; I. Habib, *Agrarian System*, 132-134.

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে জমিদারগণ তাদের বিপুল আঞ্চলিক ক্ষমতার বলে সমগ্র এলাকার প্রকৃত অভিভাবকে পরিণত হয়ে পড়েন। বাদশাহী সনদে পুলিশ প্রশাসনের বিষয়টিও সংযোজিত হয়। বাংলায় আলিবর্দী পদ্ধতির কথা আলোচনাকালে রেজা খান উল্লেখ করেছেন, জমিদারগণ প্রকৃত পুলিশব্যবস্থা চালু রাখতেন এবং এর সর্বপ্রকার দায়িত্বের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।[১০০] এই কার্যক্রম ক্ষুদ্র জমিদারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।[১০১] তৎকালীন পুলিশ-প্রশাসন সম্পর্কে পর্যালোচনাকালে একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে গ্রামীণ বাংলার পুলিশ প্রশাসনের সাথে এ যুগের পুলিশব্যবস্থার কোন মিল পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব আদায়কারী কিছু কর্মচারীর উপর এই পুলিশী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। যেমন, *গ্রাম-সরঞ্জামী পাইক* জমিদারের খাজনা আদায়, জমির ফসল পাহারা দেয়া, রাহাজানি বন্ধ করা এবং হাট-বাজার ও মেলাস্থলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপৃত থাকতো।[১০২] বর্ধমান, রাজশাহী, নদীয়া এবং দিনাজপুরের মতো বড় জমিদারিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একদল কর্মচারী নিয়োজিত থাকলেও ক্ষুদ্র জমিদারিতে সঙ্গত কারণে একই কর্মচারী খাজনা আদায়ের পাশাপাশি শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টিও দেখাশুনা করতো। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, কিছু কিছু প্রধান কর্তৃক প্রাপ্ত স্বাতন্ত্র্য এবং সুবার কোন কোন এলাকার অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার কারণে বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল ভিন্নতর। বাংলার পশ্চিম সীমান্তের কিছু লুণ্ঠনজীবী জমিদারের লাঠিয়ালবাহিনী শান্তি ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতো।[১০৩] বীরভূম জেলায় দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতিকারীদের উপদ্রব হতে নদীর ঘাট ও গিরিপথ প্রতিরক্ষার কাজে অনেক দুর্গ স্থাপন করা হয়। সামরিক ছাউনির মতো *থানা* স্থাপন করে থানাদার ও তার অধীনস্ত *চৌকিদার, ঘাটওয়াল* পুলিশী কার্যক্রম ও রাজস্ব আদায় সম্পাদন করতো।[১০৪] ১৭২৫ সাল থেকে বর্ধমান জমিদারির রাজস্ব আদায় ও ফৌজদারি কার্যক্রম প্রতিপালনে রাজা সরাসরি নবাবের নিকট জবাবদিহি করতেন, কেবল ডাকাতি জাতীয় গুরুতর ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব কাটোয়ার ফৌজদারকে প্রদান করা হতো।[১০৫]

---

১০০. Reza Khan's Note, February, 1775, Francis MSS, Eur. E. 28, 35.

১০১. চাকলা যশোহরের হোগলা পরগনানার জমিদার ও চৌধুরী প্রাণকিষেণ সিংকে প্রদত্ত সনদ, B. M Add MSS., 19505, 10a, এবং রেজা খান কর্তৃক মালদহের জমিদার ও চৌধুরীদের কাছে জারিকৃত সমন, P C. C R. M, March 7, 1771, IV, 61, ঘটনার বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে।

১০২. W. W, Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol IV. (London 1875), 84.

১০৩. D. J. McNeil, *Report on the Village Watch of the Lower Provinces of Bengal* (Calcutta 1866), 63; N Majumdar *Justice and Police in Bengal* (Calcutta, 1960), 51-52.

১০৪. C. Keating to Cornwallis, October 16, 1789, *West Bengal District Records*, Birbhum, 18; W. W. Hunter, The Annals of Rural Bengal (London 1897), 326-327.

১০৫. Burdwan Diwan's Representation, April 28, 1775, B. R. C., May 29, 1775, R49/53.

বড় বড় জমিদারিতে দুর্গাকার সেনাছাউনির মতো থানা গড়ে তুলে নিয়মিত পুলিশব্যবস্থা চালু রাখা হয়।[১০৬] এ কার্যক্রমে থানাই ছিল সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এর অধীনে চৌকি বা ফাঁড়ি নামে উপকেন্দ্রের কর্মচারীদের নাম ছিল *চৌকিদার, পাইক* ও পিয়ন। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমানে ১০০টি থানা এবং ৪২২টি চৌকি ছিল। এতে ৪৪৬ জন চৌকিদার, ১০৭৪ জন *পাইক* ও ৭৫ জন পিয়ন কর্মরত ছিল।[১০৭] এই সকল চৌকির মুখ্য দায়িত্ব ছিল অপরাধীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা, জনপথ ও নৌপথ নির্বিঘ্ন রাখা এবং ঘটমান অপরাধের খবর নিকটবর্তী থানায় প্রেরণ করা।[১০৮] শহর বা লোকালয়ে প্রবেশকারী আগন্তুকদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তালিকাভুক্ত করা চৌকিদারদের দায়িত্ব ছিল। অন্যদিকে চৌকিদাররা উদ্ধারকৃত মালামাল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতো।[১০৯] মুর্শিদকুলী খান যখন নতুন থানা সংস্থাপন করেন, পুলিশ প্রশাসনের এই কাঠামো তখন আরও শক্তিশালী হয়।[১১০]

মুগল আমলে জমিদারি এলাকায় স্থাপিত থানা সহ পুলিশ প্রশাসনে ফৌজদারের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। নবাবি বাংলায় বিশেষ করে পলাশীর যুদ্ধের পর থানাগুলি জমিদারদের অধীন হয়ে পড়ে। ১৭৭৬ সালে রেজা খান লিপিবদ্ধ করেন—'বর্তমানে ফৌজদারগণ জমিদার বা তালুকদারদের নিকট হতে আদৌ কোন সহায়তা পান না'।[১১১] প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি আমলে প্রবর্তিত অস্থায়ী রাজস্ব ইজারাদারি ব্যবস্থা চালুর পর প্রচলিত পুলিশব্যবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। ১৭৭২ সালে হেস্টিংস্ প্রবর্তিত পাঁচশালা ইজারাদারি ব্যবস্থায় পুলিশী দায়িত্ব পালন থেকে ইজারাদারদের অব্যাহতি দেয়ার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। এ যাবৎকাল জমিদারগণ যে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছিলেন, ১৭৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর জারিকৃত পুলিশ রেগুলেশনবলে তা একেবারে রহিত করা হয়।

---

১০৬. J. N Sarkar, *Bengal Nawabs* (Calcutta 1952). 4; T. Raychaudhuri, *Bengal Under Akbar and Jahangir*, (Delhi 1969). 12.

১০৭. B. R. C., July 8, 1784, R50/52; L. Mercer to B. R., December 6, 1790: Board of Revenue and Judicial Consultations, March 18, 1971, R127/72.

১০৮. ভারতচন্দ্র রায়, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী,* (কলিকাতা ১৯৮৯), ৬৭

যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসা করিয়া মানা
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও
কি জাতি কি নাম ধর কোন ব্যবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও।

১০৯. J. Z. Holwell, *Interesting Historical Events*, I., (London london 1766), 199.

১১০. F. Gladwin (tr.), *Ain*, II, 108.

১১১. C. P. C., V. 422

ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও বিচারব্যবস্থা

এলাকার নির্বাহী প্রধান হওয়ায় মুখ্য জমিদারগণ বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[১১২] ন্যায়বিচারের স্বার্থে নিপীড়িত প্রজাগণ সরাসরি সম্রাটের নিকট অভিযোগ করতে পারতো। একবার আওরঙ্গজেবের নিকট দায়েরকৃত এক মুসলিম প্রজার অভিযোগ আঞ্চলিক হিন্দু রাজার (সুসং) নিকট অবিলম্বে বিচার করার জন্য পাঠানো হয়।[১১৩] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ১৬৯৮ সালে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারি দেয়ার সময় তারা সেখানকার জমিদারদের বিচারকের ভূমিকায় দেখতে পায়।[১১৪] প্রকৃতপক্ষে নিজ এলাকায় আধিপত্য রক্ষার স্বার্থেই জমিদারদের বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি নিহিত ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মকাণ্ড জমিদারদেরকে তাদের প্রজা ও কর্মচারীদের উপর তদারকি করার এক মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। জমিদারদেরকে এ ব্যবস্থাপনার বাইরে রাখা হলে কৃষক ও অধীনস্তদের উপর তাদের ক্ষমতা খর্বিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। প্রজাদের উপর বিচারক্ষমতা প্রয়োগের কল্যাণকর দিকও ছিল। এর ফলে জমিদারিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতো না। জমিদারগণ তাদের এলাকায় জজ-মেজিস্ট্রেসি ব্যবস্থা চালু রাখায় আর্থিকভাবে লাভবান হতো এবং লাভের কারণে আদালত স্থাপনে উৎসাহিত ছিল। আদালতে জারি করা জরিমানা জমিদার হিসেবে তাদেরই প্রাপ্য বলে ধরে নেয়া হতো।[১১৫] মামলাগুলো ফৌজদার বা থানাদারের হাতে গেলে জমিদারের আর্থিক ক্ষতি হতো। জমিদারি এলাকায় চুরি বা ডাকাতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে জমিদার বাধ্য ছিলেন।[১১৬] তবে প্রতীয়মান হয় যে, জমিদারগণ সাধারণত তাদের কাছারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ডেকে সান্তনামূলক কথাবার্তা বলে ক্ষতিপূরণ প্রদান বিলম্বিত করতেন অথবা ক্ষতিগ্রস্তকে চুপ করিয়ে দিতেন। এমনকি মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যক্রমে জমিদারগণ কাজীর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করতেন।[১১৭] প্রশাসনিক বা ফৌজদারি প্রশাসনে বড় জমিদারদের অংশগ্রহণের কারণে বিচার ব্যবস্থাপনার ভাগ ক্ষুদ্র জমিদারগণও পেত। *চৌধুরীরা* (পরগনা প্রধান), যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জমিদার[১১৮], তাদের এলাকার বর্ণ সংক্রান্ত জটিলতা,

---

১১২. N. Manucci, *Storia Do Mogar* III, W. Irvine (tr.) (London 1908), 48.

১১৩. T. Raychaudhuri, *Akbar and Jahangir*, 22-23.

১১৪. J. S. Stavorinus, *Voyages to East Indies*, (London, 1798), 459; W. Bolts, *Consideratins on India Affairs*, I, (London 1772), 80-82.

১১৫. The Seventh Report ... *Reports, House of Common*, IV, 324; Home Miscellaneous Series, (পরবর্তীতে H. M. S.), 325. 9.

১১৬. রাজা রামকান্তকে প্রদত্ত সনদ, W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, I.

১১৭ *P. C. C. R. M.*, January 20, 1772, IX, 61; C. P. C., II. 312

১১৮. I. Habib, Agrarian System, 29; B. R., Grover, "Nature of Land Rights in Mughal India", *Indian Economic and Social History Review*, 1963, I., 14.

চুরি বা ক্ষুদ্র ঝগড়াঝাটির বিচার করে জরিমানা ধার্য করতেন।[১১৯] কোন সুনির্দিষ্ট আদালত না থাকায় ক্ষুদ্র জমিরারগণ জেল বা মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মত অপরাধের মামলা নিকটস্থ থানাদার বা কাজীর কাছে প্রেরণ করতেন। জমিদারদের কাছারিতে বর্ণভিত্তিক বিবাদের বিচার করা হতো। উচ্চ বর্ণের জমিদারগণ এই সকল বর্ণভিত্তিক বিবাদ মিটাবার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।[১২০] কিন্তু মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহালের আধা-স্বাধীন সদগোপ রাজা নিম্নবর্ণের হওয়া সত্ত্বেও জরুরি কারণে নিজেরাই বর্ণ সংক্রান্ত বিবাদের জটিলতা নিরসনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।[১২১] সাধারণত এই সকল বর্ণ সংক্রান্ত জটিলতা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে নিষ্পত্তি করা হতো। কিন্তু পঞ্চায়েত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে পারলে বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হলে জমিদারের কাছে আপীল করা যেত। এ অধিষ্ঠানিক ক্ষমতা ছাড়াও অনেক জমিদার নিয়ম ভঙ্গ করে জরিমানাকৃত অর্থ আত্মসাৎ করার লোভে নিজেরাই এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতেন।[১২২]

একই ব্যাক্তর হাতে নির্বাহী ও বিচারক্ষমতা প্রত্যর্পণ করায় অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল। যদিও জমিদারি বিচার ছিল সহজলভ্য, দ্রুত এবং সুলভ, কিন্তু এর সাথে জমিদার বা তার আমলার ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত থাকলে জমিদার নির্দ্বিধায় বিচারের পাল্লা তার নিজের বা নিজের আস্থাভাজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। মুর্শিদকুলী খান জমিদারদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে একটি শক্তিশালী প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর প্রশাসন দৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। সলিম আল্লাহ লিখেছেন, মুর্শিদকুলী খানের সময় কোন জমিদার বা আমলা অত্যাচার করলে শাস্তি পেতে হতো।[১২৩] আলিবর্দী খানের কঠোর শাসনামলে জমিদারগণ দ্রুততার সাথে অভিযোগসমূহ গ্রহণ ও বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন।[১২৪] কিন্তু সম্রাটের ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এবং পরবর্তী নবাবদের দুর্বলতা ও অনীহার ফলে রায়তরা তাদের আঞ্চলিক ভূস্বামীর কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে। এমনকি তালুকদার, তরফদার বা তপ্পাদাররা জমি হারাবার ভয়ে শক্তিশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সাহস পেত না।

ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও সামরিক দায়দায়িত্ব

মুগল আমলে জমিদারদের, বিশেষ করে বৃহৎ জমিদারদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সামরিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হতো। সামরিক গভর্ণর হিসেবে ফৌজদার অল্প কিছু সৈন্য সহ সুবার প্রাথমিক সুব্যবস্থার দায়িত্বে থাকতেন। কোন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বহিঃশক্তির

---

১১৯. George Vansittart Papers, Dep. B. 69, 121; N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, 11, 15.

১২০. L. S. S. O'Malley, *Indian Caste Customs* (Cambridge 1932); 72; ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী, ১২

১২১. B. D. G., Midnapur, 57, 60.

১২২. L. S. S. O'Malley, Op. Cil.

১২৩. F. Gladwin (gr.), *Twarikh.*, 115-116.

১২৪. Reza Khan's Note, February, 1775, Francis MSS, Eur. E. 28, 345.

আক্রমণের সময় ফৌজদারদের সহায়তা করা অত্যাবশ্যক ছিল।[১২৫] মুগলরা আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের ক্ষমতা খর্ব করে জমিদার শ্রেণীভুক্ত করলেও তাদের পূর্বের ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পূর্ণ খর্ব করে নি। সম্রাটের প্রত্যাশা এবং আঞ্চলিক প্রধানের স্বার্থের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ ছিল উভয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন।[১২৬]

এ নীতির অনুসরণে জমিদারগণ সম্রাটের কার্যক্রমে মনসবদার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতেন এবং মনসবের গুরুত্ব অনুযায়ী জায়গীর প্রদান করা হতো। *আলমগীরনামায়* উল্লেখিত আছে যে চট্টগ্রামের এক জমিদার মুনওয়ারকে ১৫০০ *সওয়ার* (ঘোড়সওয়ার) মনসব দেয়া হয়েছিল।[১২৭] চট্টগ্রামের কিছু জমিদারের হাজারী উপাধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এরাও মনসবদার ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে মনসবদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১২৮] সম্রাট শাহ্ আলম ১১৭২ হিজরীতে (১৭৫৮-১৭৫৯ খৃস্টাব্দ) মহারাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্র রায়কে পাঁচ হাজারী ঘোড়াসওয়ারের মনসবদারি দান করেন।[১২৯]

বাংলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে মুগল শাসকগণ তাঁদের সামরিক শক্তির জন্য জমিদারদের উপর নির্ভর করতেন। অন্যদিকে মুগলরা নৌযুদ্ধ বিষয়ে মোটেই অভিজ্ঞ ছিল না, অথচ বাংলার নদীবিধৌত অঞ্চলের বিদ্রোহ-বিপ্লব দমনে এবং সুবায় পরিব্যাপ্ত মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচার প্রতিরোধে নৌশক্তির প্রয়োজন ছিল।[১৩০] মুগলরা বাংলার দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে উপনীত হয়ে দেখতে পেল, কেবল শুষ্ক মৌসুম ছাড়া তাদের ঘোড়সওয়ার বা গোলন্দাজ বাহিনী একেবারে অকার্যকর। পরবর্তী শাসকগণ আঞ্চলিক পদাতিক ও *নৌয়ারা* (যুদ্ধের নৌকা)-এর উপর নির্ভর করতেন।

এ ছাড়াও মুখ্য জমিদারদের অর্ধ-স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় তাদের সামরিক শক্তির মধ্যে। নিজ নিজ রাজ্যের প্রধান হিসেবে রাজাদের দাবি প্রভু হিসেবে তাঁদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্রাটের রাজস্ব আদায়কারীর ক্ষমতা বা অধিকারের সংমিশ্রণকে অনিবার্য করে তোলে। তাছাড়া সে সময়ে খাজনা আদায়, খাজনা বহনের দায়িত্ব পালন এবং প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও সামরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল।

জমিদারগণ তাদের সামর্থ্য, শক্তি ও নিজ এলাকার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের জন্য সংগ্রহ করে রাখতেন। আইনের ভাষ্য অনুযায়ী

---

১২৫. J. Shore's Minute, April 2, 1788 and June 18, 1789, W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, 81; N. A. Siddiqi, 35.

১২৬. S. N. Hasan, "Zamindars under the Mughals", in Frykenberg (ed.), *Land Control*, 17, 21.

১২৭. Munshi Muhammad Qazim, *Alamgirnamah*, 956; see also M. Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*, (London 1966), 79.

১২৮. ভারতচন্দ্র রায়, গ্রন্থাবলী, ৭।

১২৯. "The Territorial Aristocracy of Bengal -The Burdwan Raj", *The Calcutta Review*, LIV, 174.

১৩০. S. Manrique, Traveles . ... II, Luard and Hosten (tr.), Oxford 1927), 278.

সুবা বাংলার জমিদারদের কাছে ২৩,৩৩০ পদাতিক, ৪,০১,১৫০ গোলন্দাজ, ১৭০ হাতি, ৪,২৬০ বন্দুক ও ৪,৪০০টি নৌকা মওজুদ ছিল।[১৩১] *খুলাসাতুত্তাওয়ারিখ* (১৬৯৫)-এর বর্ণানানুসারে সুবাকে ৪২০০ বন্দুক ও ৪৪০০ নৌকাসহ চুক্তি মোতাবেক খাজনা প্রদান করতে হতো।[১৩২] যুদ্ধজয়ের পর সম্রাটের ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীর নিয়মিত চাহিদা স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। তবুও জমিদারগণ পদাতিক বাহিনী ও নৌবাহিনীর পাশাপাশি গোলন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী মোতায়েন রাখতেন নিজেদের এবং আঠারো শতকে নবাবের প্রয়োজনে। ফলে ঢাকার নিম্নাঞ্চলের এবং দুর্গসহ সমুদ্র ও উপকূলবর্তী ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম), রাঙ্গামাটি ও সিলেটের জমিদারদের নিয়মিতভাবে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি গোলন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী সরবরাহ করতে হতো।[১৩৩] একইভাবে সুবা বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের জমিদারদের নৌ-জাহাজ সরবরাহ করতে হতো। শুধু জমির *হিসসাজাত* (ব্যক্তিগত অংশ) উপভোগের বিনিময়ে চন্দ্রদ্বীপ[১৩৪]-এর রাজাকে প্রতি'টিতে ৩২ জন মাল্লাসহ ৪২টি *কোশা* নৌকা সরবরাহ করতে হতো।[১৩৫] সরাইলের জমিদারকে নবাবের নৌবহরে ৪০টি যুদ্ধনৌকা সরবরাহ করতে হতো।[১৩৬] বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পাচেত-এর জমিদার বাংলার পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফলে এরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঘোড়সওয়ার সহ বড় সামরিক বাহিনী প্রতিপালন করতেন। *ধর্মমঙ্গল*প্রণেতা ও বীরভূমের রাজার উকিল নরসিংহ বসু লিখেছেন, রাজা সকল সময় উন্নতমানের ২০০০ ঘোড়সওয়ার বাহিনী এবং ১২০০ ঢালী প্রতিপালন করতেন।[১৩৭] এই সংখ্যা হয়ত অতিরঞ্জিত নয়, কারণ বীরভূমের বাজা আসাদুজ্জামান নবাব মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ২০,০০০ পদাতিক ও ৫০০০ ঘোড়সওয়ার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।[১৩৮] বিষ্ণুপুরের রাজার ঘাটওয়াল-এর অধীনে ৫,৪৭৬ জন সশস্ত্র যোদ্ধা গিরিপথগুলি রক্ষা করতো।[১৩৯] ১৭৬৭ সালে মানভূম হতে প্রেরিত এক পত্রে জানা যায় যে, পরগনা পাহারা দেবার জন্য যেকোন জমিদারেরই ২০০০ জনের কম পেশাদারি যোদ্ধা ছিল না।[১৪০] জঙ্গলমহল জমিদারদের সামরিক শক্তি তাদের প্রজাদের উপর নির্ভর করতো, যাদেরকে তারা মুখ্যত প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার

---

১৩১. H. S Jarrett (tr), Ain , 129.

১৩২. Khuasatu-t-Tawarikh, J N Sarkar (tr.), *The India of Aurangzib*, 46

১৩৩ J. Grant, Historical and Comparative Analysis, W K Firminger (ed), *Fifth Report*, II, 203

১৩৪. চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা সরকার বাকলার একটি পরগণা ছিল। পরবর্তীতে তা বাখরগঞ্জ বেশীর ভাগে পরিণত হয়।

১৩৫. W. Douglas to B R., April 6, 1790, B R P., April 29, 1790, R 71/24

১৩৬. Eastern Bengal District Gazetteers, Tippera, 114

১৩৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খন্ড, (কলিকাতা ১৯১৪), ৪৫৬।

১৩৮. Haji Mustafa (tr), Seir, 395

১৩৯. B M Add. MSS., 29, 088, 16.

১৪০. *Bengal District Records, Midnapur*, I, 109.

করতেন।[১৪১] সুবার অন্যান্য স্থানে বৃহৎ জমিদারগণ তাদের নিজেদের প্রয়োজন ও মর্যাদা অনুযায়ী নিয়মিত বাহিনী প্রতিপালন করতেন। এছাড়াও তারা জরুরি প্রয়োজনে চাষীদের নিয়ে অনিয়মিত বাহিনীও গঠন করতেন। ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীগণ মূলত অনিয়মিত পদাতিক বাহিনীর উপর নির্ভর করতেন বলে প্রতীয়মান হয়।[১৪২]

সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে জমিদার শ্রেণী সামরিক শক্তি রক্ষাণাবেক্ষণে যথেষ্ট যত্নশীল থাকলেও সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাসের সাথে সাথে জমিদারদের উপর নবাবের কর্তৃত্ব কমে যেতে থাকে, ফলে জমিদারগণ প্রয়োজনের সময় সৈন্য সংগ্রহ ও সরবরাহে অনীহা প্রকাশে দ্বিধাবোধ করেন নি।

আঠারো শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে এ অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধনৌকা হ্রাসের কারণে ব্যক্তিগত জায়গীর ও *চাকরান* জমি পুনর্গ্রহণ করা হয়। এর ফলে অবশ্য জমিদার শ্রেণীর এলাকা সঙ্কুচিত হতো না, কারণ জমির মালিকানা জমিদারদেরই থাকতো, বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে তারা খাজনা দিতেন। কিন্তু জমিদারদের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হওয়ায় কিছু কিছু এলাকায় প্রজাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে তাদের নিজেদের জমিদারিও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, কারণ বহু নিয়মিত সৈনিক কর্মচ্যুত হয়ে চুরি-ডাকাতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।[১৪৩]

জমিদার শ্রেণী ও সমসাময়িক সমাজ

প্রাক-বৃটিশ যুগে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে ক্ষয়প্রাপ্ত মুগল শাসনের শূন্যস্থান পূরণে এই জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সীমান্তবর্তী জমিদারগণ, যারা সদাসর্বদাই এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছেন, তারা ছাড়াও সুবার অভ্যন্তরে রাজস্ব আদায়কারী ভূম্যধিকারীগণ শক্তিশালী হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা নিজেরাই এক নিজস্ব জমিদারি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে এবং রাজসভা ও ব্যক্তিগত জীবনধারা তৈরি করে তাদের আড়ম্বর ও বৈভব নিয়ে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত থাকতেন। জমিদারগণ তাদের এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তারা নিজ নিজ এলাকার প্রজাদের উপর সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন, যার কিছু আইনানুগ হলেও বাকীগুলো প্রচলিত বিধানবলে মেনে নেয়া হতো। মধ্যযুগের সমস্ত প্রবণতা জমিদার-রায়ত সম্পর্কের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট। আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত বিবরণের সত্যতা প্রতিভাত হয় যখন দেখা যায় যে, প্রজারা জমিদারদেরকে রাজা বা মহারাজা উপাধিতে আখ্যায়িত করতো। প্রচলিত বিধান

---

১৪১ E. Baber to B R , February 6, 1883, *Bengal District Records, Midnapur IV*, 107

১৪২ J Rennell to R, Becher, December 9, 1770, P. C. C R. M , December 20, 1770, II, 98.

১৪৩. Hasting's Minute, B. R C , 19. 1774, R 49/54.

অনুযায়ী জমিদারের সাথে দেখা করতে গেলে প্রজাকে নজরানা নিয়ে যেতে হতো। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার পার্থক্য সমাজের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

উন্নয়ন কার্যক্রম বা শিক্ষাবিস্তার সংক্রান্ত সমাজকল্যাণমূলক কাজ তদারকি করার জন্য কোন বিশেষ বিভাগ না থাকায় মুগল শাসকগণ গ্রামাঞ্চলে এই সকল কার্যক্রম পরিচালনার বা এজন্য উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জমিদারদের উপর নির্ভর করতেন। চলাচলকারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সম্রাটের মতো উৎকণ্ঠা জমিদারদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।[১৪৪] সম্রাটের মনোবাঞ্ছা পূরণ, ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অথবা নিজেদের নাম কীর্তিত করতে জমিদারগণ সড়ক, সেতু ও সরাই নির্মাণ করতেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সরকারের নির্দেশের পাশাপাশি রায়তদের প্রয়োজনে এবং সেই সাথে সমাজকল্যাণমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে জমিদারগণ পুকুর, দীঘি ও খাল খনন করাতেন, কৃষির উন্নয়নে বাঁধ তৈরি করাতেন। অনেক জমিদার শিক্ষার উন্নয়ন সাধনে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। পাঠশালা, টোল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম ও রওশনাবাদের জমিদারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৪৫] তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটে। সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতেরও যেমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি আবার তাদের ব্যক্তিগত বদান্যতারও বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাক-বৃটিশ যুগের জমিদারগণ তাদের নিজস্ব এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন না। কানুনগো বা চৌধুরী পদে নিযুক্তরাও তাদের নিজেদের এলাকার জমিদার থাকতেন। নাগরিক জীবনের মোহনীয় রূপ বাংলার জমিদারদের অনুপ্রাণিত করতো না এবং জমিদারদের প্রকাশ্য কার্যক্রম সাধারণত তার 'ক্ষুদ্র রাজত্বের' অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিছু মাত্রায় তাদের বৈভব ও রীতিনীতি ছিল নবাব ও সম্রাটের দরবারের সংস্পর্শে পরিস্ফুটিত। বড় জমিদারদের দরবার নবাবের দরবারের অনুকরণে সাজানো হতো এবং পোষাক, খাদ্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যে বিদ্যমান ছিল মুগল প্রভাব।[১৪৬] এভাবেই মুগল সংস্কৃতির সাথে দেশীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হতে থাকে।

বেশ কিছু জমিদারের বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের কারণে স্থানীয় হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ঘটে। সকল জমিদার ও উচ্চপদস্থদের চাহিদার কারণে সূক্ষ্ম সুতী ও রেশম বস্ত্রশিল্প, অলঙ্কারশিল্প ও অলঙ্কৃত অস্ত্রশিল্পের প্রসার হতে দেখা যায়। নদীয়ার বুররান ও শান্তিপুর অঞ্চলের সূক্ষ্ম তুলা ও রেশম বস্ত্রশিল্প নদীয়ার রাজার পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি এ অঞ্চলের কুশলী বয়নকারীদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। ঘোড়াঘাট,

১৪৪. W. Irvine (tr.), Storia, 116; Naib Diwan's Note, *P C. C R. M.*, April 11, 1771, V. 54.

১৪৫. Ghulam Hussain Salim, *Riad-al-Salatin,* Abduz Salam (tr.), (Calcutta 1904), ২৫৭; দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য, ২, ১৮৫৪।

১৪৬. D. C. Sen, *Glimpses of Bengal Life*, (Calcutta 1925), 39-40, 45-46.

সন্তোষ ও দিনাজপুরের জমিদারদের বুদ্দল এলাকার *মলমল*, *সাননো* আর *তাজীব* উল্লেখের দাবি রাখে।[১৪৭] 'হিন্দুস্থানের কোমল বিলাসবহুল রপ্তানীকৃত রেশমের তিন-চতুর্থাংশ উৎপন্ন হতো রাজশাহী জমিদারিতে'।[১৪৮]

অন্যদিকে মুখ্য জমিদারদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের কারণে সমাজে অর্থের চলাচল গতিশীলতা পায়। জমিদারদের পারিবারিক জীবন কোন অংশেই 'জাঁকজমকপূর্ণ দরবার'-এর কম ছিল না। নানা অনুষ্ঠানের জাঁকজমক তাদের উচ্চতর অবস্থানের পরিচায়ক ছিল। তারা বিবাহ, অন্নপ্রাশন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত ব্যয় করতেন এবং সে কারণে অবধারিতভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন।

জমিদারদের বিভিন্ন ভবন, দুর্গ, মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ উপলক্ষে অনেকের কর্মসংস্থান হয়। জমিদারগণ পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজ নিজ শহরকে চমকপ্রদ করে সাজাতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের 'শিবনিবাস' ও রাজা রাধাবল্লভের 'রাজানগর' কেবল নিপুণ শিল্পীর স্থাপত্যশিল্পই প্রদর্শন করে না, জমিদার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা এ ধরনের কাজে জমিদারের পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করার মতো মানসিকতাও প্রকাশ করে।[১৪৯] বিলাসদ্রব্য ব্যবহার এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ভবননির্মাণ কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনৈতিক জীবনে শুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরস্টার বলেন :

> ব্যক্তিগত সম্পদ সাধারণত স্থানীয়ভাবে আহরিত ও ব্যয়িত হতো। কঠোরতা ও অত্যাচারের মাধ্যমে সংগৃহীত হলেও তা তাদের অনেক বিলাসিতার খাতে ব্যয়িত হতো, ফলে মুদ্রাসঙ্কট ছাড়াই দেশের উন্নতি ও অলঙ্করণ হতো।[১৫০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভূমিভিত্তিক শ্রেণীর জীবন ও কর্মকাণ্ড গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কোম্পানি সরকার কর্তৃক জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা লোপ এবং বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধাদি হ্রাস সমাজের উপর, বিশেষ করে ভূমিভিত্তিক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী এবং তাদের অনুগৃহীতদের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত নিরীক্ষা থেকে বহু ধাপবিশিষ্ট পিরামিডের আকারবিশিষ্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চিত্রটি প্রতিভাত হয়। সর্বোচ্চ ধাপে ছিলেন সম্রাট, যাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছেন

---

১৪৭. কে, রায়, ক্ষীতিশবংশাবলীচরিত (কলিকাতা ১৮৭৫), ৩৫।

১৪৮. J. Grant, *Historical and Comparative Analysis*, W. K. Firminger (ed.), *Fifth Report*, II, 194.

১৪৯. D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta 1911), 679-680.

১৫০. G. Foster, *A Journey from Bengal to England*, I (London 1808), 6.

সুবাদার বা নবাব। পরবর্তী ধাপে ছিলেন জমিদার এবং স্বাধীন তালুকদার আর তৃতীয় ধাপে ছিলেন সরকার বা জমিদার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্মকর্তা। চতুর্থ ধাপে ছিলেন স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী, যাঁরা বিভিন্ন প্রাধিকার প্রাপ্ত। পঞ্চমত ছিলেন গ্রামপ্রধান ও বিত্তশালী রায়ত (*মণ্ডল, পরামানিক, বাসুনিয়া, শাহরায়ত*)। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল সাধারণ কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমজীবী (*কিশান, মজুর)*। এই সকল পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত উপাদান প্রাক-আধুনিক কৃষিভিত্তিক চূড়ান্ত আর্থ-রাজনৈতিক স্তরবিন্যাসকে রূপায়িত করে। আঠারো শতকের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক শ্রেণীই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুগল শাসনামলে বাংলার রাজস্ব আদায়ে মধ্যশক্তির নিয়োগ এবং পরগনা নামে প্রশাসনিক ও রাজস্ব অঞ্চল গঠনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের একক হিসেবে গ্রাম ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জমিদারগণ কর্তৃক গ্রামপ্রধানের অধিকার খর্ব হওয়ায় ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আঠারো শতকের প্রারম্ভে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মত শান্তি ও সমৃদ্ধির অভাব সুবা বাংলায় ছিল না। সুবা বাংলা অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কেবল জমিদার শ্রেণীর কারণেই নয়, অনুক্রমিক নবাবদের বিচক্ষণ শাসনের কারণেও তা সম্ভব হয়েছিল। উৎপাদিত পণ্যের অংশ নিয়ে রাজকীয় সরকার ও জমিদারদের নিরন্তর দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই দুই দলই অর্থনৈতিক শোষণের অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন ভূমিমালিকদের মধ্যে শোষণপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ সকল গণস্বার্থবিরোধী কার্যক্রমে কৃষক শ্রেণী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উন্নত প্রশাসনিক ক্ষমতার উপস্থিতিতে বিভিন্ন স্তরের ভূম্যধিকারী শ্রেণীকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সার্বিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক শ্রেণীর ভূম্যধিকারীকে অধিকতর সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক শাসকগণ প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে দিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারে সমর্থ হয়। কিন্তু অন্যদিকে নবাবদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং শক্তিশালী জমিদারগণ তাদের অবস্থা সুসংহত করতে ব্যাপৃত থাকে।

মুগল কর্তৃত্বের ক্ষয় ও উপর্যুপরি মারাঠা অভিযানের ফলে বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম নবাবি শাসনের কারণে ভূম্যধিকারী শ্রেণী তাদের নিজেদের শক্তিবৃদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকে। মারাঠা অভিযানের এক পর্যায়ে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জমিদারগণ এত বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের উকিলদের মাধ্যমে মারাঠাদের অর্থ দিয়ে শান্ত করতে সচেষ্ট হন।[১৫১] পরবর্তীতে কোম্পানির সাথে নবাবদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে নবাবের সাথে ঊর্ধতন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সম্পর্কেও ফাটল ধরে। ফলে দেখা যায়, কিছু মুখ্য জমিদার পলাশীর যুদ্ধে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজেদেরকে জড়িত করে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ক্লাইভের সাথে বীরভূম, বর্ধমান, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারদের যোগাযোগ প্রমাণ করে যে তারা তাদের আনুগত্য নবাবের পরিবর্তে

---

১৫১. F Gladwin (tr), *Tawarikh* , 196

ইংরেজদের প্রতি প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে।[১৫২] কিন্তু জমিদারদের স্বার্থ আর ইংরেজদের স্বার্থ অভিন্ন ছিল না। নবাব বা ইংরেজদেব সাথে তাদের সখ্যতা ততদিনই স্থায়ী ছিল যতদিন তাদের পরস্পরের স্বার্থ অভিন্ন ছিল না। নবাব বা ইংরেজদের সাথে তাদের সখ্যতা ততদিনই স্থায়ী ছিল যতদিন তাদের পরস্পরের স্বার্থ বিঘ্নিত না হতো। যে পত্রে রাজা আসাদুজ্জামান ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন :

> কিন্তু আপনাকে ইহা জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি যে, আমি জমিদার, যদি নবাব আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করেন, আমার সাথে আপনাদের বন্ধুত্ব হবে মারাত্মক ক্ষতিকর। কথা দিন যে, সেক্ষেত্রে আপনারা আমার স্বার্থ রক্ষা করবেন। এ ব্যাপারে আমাকে লিখে জানাবেন।[১৫৩]

পলাশীর যুদ্ধের কারণে আকস্মিক কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কোম্পানিকে দীউয়ানী প্রদানের ফলে জমিদারদের ভাগ্য নবাবদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, কারণ কোম্পানি অন্তত বেশ কিছুকাল প্রচলিত পদ্ধতি ব্যহত না করার নীতি গ্রহণ করে। বাংলার এই অস্থিতিশীল অবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের জমিদারগণ তাদের নিজেদের আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা ও প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাহজাদা আলী গওহর (শাহআলম-২)-এর নেতৃত্বে দলবদ্ধ হতে থাকে, এবং বাংলা ও বিহারে তার সামরিক শক্তি প্রয়োগকে তারা স্বাগত জানায়।[১৫৪] বিদ্যমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অসন্তুষ্টি ইংরেজ ও নবাব উভয়েরই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার, অর্পিত জেলাগুলোর জমিদারগণ তাদের অবস্থানকে ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালায় এবং এ লক্ষ্যে প্রায়শই কোম্পানির সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মেদিনীপুর জেলা রেকর্ডে এ ধরণের অনেক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজদের আধিপত্যবাদ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্য বর্ধমানের জমিদার আলী গওহর মারাঠা, এমনকি ফকিরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগসাজশ করেন[১৫৫], যা কিনা পূর্ববর্তী বছরগুলোতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধে নবাবের সাথে একাত্মতা ঘোষণার মতো ঘটনার সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থান। এমতাবস্থায়, কোম্পানি অনুগত জমিদার সৃষ্টির প্রয়াসে বিশেষ অবস্থা মোকাবেলার জন্য সৈন্য সংরক্ষণের খরচ বাবদ এক লক্ষ রুপীর বিনিময়ে পাচেতের বরখাস্তকৃত রাজাকে পুনর্বহাল করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।[১৫৬] অতএব এই সময়ে (১৭৬৩)

---

১৫২ W Tookes' Account, Orme MSS, O V 19, B. M Add MSS, 29, 209, 4, Burdwan Raja's letter Rec , June 27, 1757, Home Miscellaneous Series, 193, 170-171

১৫৩ Rec , June 26, 1757, H M S 193, 196

১৫৪. Golam Ali Khan, *Shah Alamnamah*, I, (Calcutta 1912), 115, 145, Haji Mustafa (tr), Seir, 332

১৫৫ Captain A. White to Select Committee, December 29, 1760; S S. C., January 5, 1761, R/A, 3

১৫৬ Select Committee Consultations, October 8, 176', J Long, *Selections*, 569

মীর কাশিম বীরভূম, বর্ধমান এবং নরহাট সমাই[১৫৭]-এর রাজাদের ঔদ্ধত্য সহ্য না করে তাদেরকে আক্রমণপূর্বক পরাজিত করেন।[১৫৮]

এভাবেই নবাবি আমলে ভূম্যধিকারী সমাজে স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময়কালে প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদারগোষ্ঠীর লক্ষণীয় উত্থানে গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন সূচিত হয়। আসলে অন্তবর্তী'কাল বলে এ সময়টা ছিল একদিকে নবাব এবং শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরপক্ষে নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সংঘাতের পর্যায়, যার পরিসমাপ্তি ঘটে এতদঞ্চলে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে ভূম্যধিকারীদের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত থাকায় তারা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে ভিন্নতর আচরণ করতো। একারণেই বিশেষত আঠারো শতকের ৫০ এবং ৬০-এর দশকে স্বার্থের সংঘাত স্পষ্টতর হয় এবং প্রধান জমিদারগণ তাদের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নতুন প্রভুদের চাপে অতিষ্ট হয়ে পড়ে। দীউয়ানির পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর কোম্পানি সরকার ভূস্বামীগোষ্ঠী এবং রায়তদের সাথে প্রথামাফিক স্থানিক ক্ষমতা ভাগাভাগির অবসান ঘটায়। সামরিক ও পুলিশী দায়িত্ব হারিয়ে বড় জমিদারদের ক্ষমতা নেহাতই রাজস্ব আদায় ও জমা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিশেষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) রাজস্ব ও ভূমি ভোগদখল ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে তা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

১৫৭. বিহারে অবস্থিত।

১৫৮ Haji Mustafa (tr.), *Sier*, 395-396.

৩

মুগল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

জগদীশ নারায়ণ সরকার*

আকবরের আমলে মুগলদের বাংলা বিজয় ছিল অসম্পূর্ণ। বিজয়ের পূর্ণ কার্যকারিতা অনুভূত হয় জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে। বাংলায় মুগল শাসন কিছু নতুন শক্তির বিকাশ সূচিত করেছিল, যা বাংলার জীবনযাত্রা বহুলাংশে পরিবর্তন করে দেয় এবং যার প্রভাব এখন পর্যন্ত কোন না কোনভাবে বিদ্যমান। বাংলায় মুগল শাসনের ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের বিলোপ ঘটে এবং কেন্দ্রীয় শাসনমুখী প্রবণতা প্রকাশ পায়। আঞ্চলিক মানসিকতার পরিবর্তে রাজনৈতিক সংহতির মনোভাব গড়ে উঠে এবং কেন্দ্রীয় ও বিদগ্ধ শাসন বাংলার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়। এর ফলে বাংলা একই রকম শাসনব্যবস্থা, আইন, সরকারি ভাষা, কর্মচারী ও মুদ্রা নিয়ে সর্বভারতীয় কাঠামোর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। এই কালপর্বের প্রতিভাবান শাসকগণ বাংলায় তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রাজনৈতিক সংহতির কারণে মুগল আমলে দীর্ঘকাল শান্তি বজায় ছিল, যার ফলে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। এটাই বাংলায় মুগল শাসনের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুগলদের বাংলা জয়ের অব্যবহিত পরে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয়, যা মানুষের জীবনযাত্রাকে বহু ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও পরিশ্রমী তুর্কী, মুগল, ইরানী এবং অন্যান্য জাতির অনুপ্রবেশের ফলে বাংলায় এক নতুন শক্তি ও সামর্থ্যের জাগরণ ঘটে। ইসলাম নতুনভাবে জন্মলাভ করে। ভ্রাম্যমাণ সাধু ও ধর্মপ্রচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুশৃঙ্খল ও স্থায়ী মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষিত শাসক,

* অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৯১ সনের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি এ অধ্যায়টি রচনা সম্পন্ন করেন।

আরবি ভাষায় পারদর্শী মুসলমান পণ্ডিত, উলেমা, কবি, ডাক্তার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ চাকুরির আশায় এই প্রদেশে আগমন করেন এবং এখানে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতির প্রসার ঘটান। বাঙালি মুসলমান সমাজ এই সমস্ত উৎস থেকে নতুন জীবনীশক্তি লাভ করেছিল। সতেরো শতকে বাংলার সাথে পশ্চিমের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারলাভ করে এবং বাংলা ও পারস্যের মধ্যে সমুদ্রপথে যাতায়াত স্থলপথের তুলনায় খুবই সহজ ও লাভজনক হয়ে উঠে। পারস্য থেকে শিক্ষিত শিয়া পণ্ডিত, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কারিগরেরা বাংলায় আগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পারস্য দেশে সাফাভীদের পতন, অসহনীয় সরকারি উৎপীড়ন এবং শাসনের অব্যবস্থার ফলে বহু পারস্যদেশীয় শিয়া তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। বাংলায় শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শাসক মুর্শিদকুলী খানের সময়ে এই অনুপ্রবেশ চরম আকার ধারণ করে। এর ফলে বাংলার সমাজে ও সংস্কৃতিতে নতুন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, "ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। বাংলার সঙ্কীর্ণ একাকীত্ব ঘুচে যায়।"[১]

এতেই শেষ নয়। উত্তর ভারতের বহু পর্যটক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী ও সৈনিক এবং অন্যান্য পর্যায়ের মানুষও বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারাও এখানে এসে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বর্ধমানের জমিদার পরিবার, মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের মাড়োয়ারি ব্যাঙ্কার পরিবার, কলকাতায় আমিরচাঁদের (উমিচাঁদ) পাঞ্জাবী ব্যবসাযী পরিবার এবং পাটনার মহারাজা সিতাব রায়ের (যিনি কোম্পানিশাসনের প্রথমদিকে নায়েব-নাজিম পদে উন্নীত হয়েছিলেন) উল্লেখ করা যায়। পূর্বে জলবায়ুর কারণে বাংলাকে বলা হতো দোজখ-ই-পুর আজনিমাত (উত্তমদের জন্য দোজখ)। কিন্তু মুগল শাসনামলে এই দুর্নাম ধীরে ধীরে ঘুচে যায়। পরবর্তীকালে বাংলা জান্নাত নামে অভিহিত হয়, যার ফলে দলে দলে বিদেশের লোক বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংমিশ্রণের ফলে বাংলায় অনিবার্যভাবে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঐক্যপ্রক্রিয়া সুলতানদের আমলে আরম্ভ হয়েছিল[২], কিন্তু মুগলদের সময়ে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অতএব একে মুগল ঐতিহ্যের স্বাক্ষর হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রথমদিকে বাংলার মুসলমান বিজেতাগণ একই ধর্ম, ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে অটল প্রাচীরের মতো বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের শাসনামলে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছিল। তাঁদের রাজবংশের পর্যায়ক্রমিক

---

১. J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, Vol. II, (Dhaka 1948), 224-25.

২. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা ১৯৮২), ১৩-১৪।

পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁরা ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজ ও খাজনাসংগ্রহ প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ফলে সামাজিক একীভবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সামাজিক একীভবন বলতে সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণ একত্ব বোঝায় না; বিভিন্ন জীবনধারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাশাপাশি সক্রিয় থাকে, যার বহু নিদর্শন সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

মুসলিম প্রভাব হিন্দু সমাজের সাধারণ মানুষ ও সাধু সম্প্রদায় ব্যতীত উচ্চ বংশীয় হিন্দুদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক আচারব্যবহারে প্রতিফলিত হয় এবং মুসলমানরাও সমভাবে ভারতীয় খাদ্য, পোশাক ও অন্যান্য অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়। মুগল আমলে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও হস্তশিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। তাদের কেউ অভ্যাস ও প্রয়োজনের তাগিদে নিরামিষভোজী আবার কেউ আমিষভোজী ছিল, যা এখনও বর্তমান। সাধারণত কোন এলাকায় উৎপন্ন প্রধান শস্য উক্ত এলাকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল। ম্যানরিকের ভাষায়, বাংলায় সব সম্প্রদায়ই প্রতিদিন ভাত, রাতভর পানিতে ভেজানো ভাত (পান্তাভাত), লবণ, সব্জি (শাক) সহযোগে আহার করতো। সে রীতি এখনও প্রচলিত আছে। অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তিরা ঘি, মাখন, দুধ, বিভিন্ন দুগ্ধজাত খাদ্য ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করতো। সতেরো শতকের শেষভাগে বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। মুকুন্দরাম উচ্চবংশীয় হিন্দুদের সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। মুসলমানরা সাধারণত ভাজা রুটি এবং মুরগি বা গোমাংস সহযোগে আহার করতো। কিন্তু উচ্চবংশীয় ও ধনবান মুসলমানরা চাউলজাত খাদ্য ও প্রায় পঞ্চাশ রকমের খাদ্য গ্রহণ করতো, যার মধ্যে থাকতো বিরিয়ানি, কিমা, পোলাও, দমপোক্ত মুরগি, কাবাব, সামুসা, বাকরখানি, বরফ বা মাখনসহ তাজা ফলমূল এবং ভাতের পুডিং।

মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার পর ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত ধনী হিন্দুদের খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় আমিষ জাতীয় খাদ্য, যেমন পোলাও, বিরিয়ানি, কাবাব ও কোপ্তা স্থান পেয়েছিল এবং জনপ্রিয় খাদ্য হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বাড়িতে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ধনবানদের অনুকরণে ভোজসভার আয়োজন করা হতো। রোম, চীন ও মিসরের সাথে দীর্ঘকালব্যাপী সংস্পর্শের কারণে পারস্য সমাজের ভোজনরীতি ভারতে প্রচলিত হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা হিন্দুদের রন্ধনপ্রণালী ও ভোজনরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এ পর্যায়ের খাদ্যের মধ্যে ছিল পান, রন্ধনকৃত খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, মসলা ও লঙ্কা।

সাধারণভাবে রন্ধনশালায় হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক বাসন-কোসন ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত আছে। হিন্দুরা পিতল ও তামার এবং মুসলমানরা পিতলের দ্রব্যাদি ব্যবহার করতো। উচ্চবংশীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সোনা ও রূপার বাসন ব্যবহারের যে ঐতিহ্য ছিল তা হ্রাস পেয়েছে এবং চিনামাটি ও কাচের তৈরি বাসন-কোসনের

ব্যবহারপদ্ধতি চালু হয়েছে। শালগাছের পাতা বা কলাপাতা থালা হিসেবে ব্যবহারের রীতি এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। মুসলমান পরিবারে ঘরের মেঝেতে প্রসারিত দস্তরখানায় একসঙ্গে আহার করার প্রথা বর্তমানে চালু থাকলেও হিন্দু পরিবারে স্বামীর আহারের পর স্ত্রীর আহার গ্রহণের ঐতিহ্যগত প্রথা এখন বিরল।[৩] বিত্তবানদের মধ্যে পানীয় ও মিষ্টি পানীয় (শরবত) ঠাণ্ডা করার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। এখন ঠাণ্ডা করার মাধ্যম হিসেবে যবক্ষারের পরিবর্তে বরফ ব্যবহার করা হয়। ঐশ্বর্যশালীরা মাদকদ্রব্যের মধ্যে সুরা পান করতো: দেশীয় বিভিন্ন সুরা, যেমন আরক, নীরু, মহুয়া, খেরা, বাদওয়ার, জাগরে (কাল চিনি) ও টোডি (তাড়ি) ব্যবহার করতো। উৎকৃষ্ট বিদেশী সুরা পারস্য ও পর্তুগাল থেকে আমদানি করা হতো। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানরা সুরাপান থেকে বিরত থাকতো। কারণ সুরাপানকে তারা পাপাচার বলে মনে করতো এবং এ সম্পর্কে রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।[৪] কিন্তু এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল এবং অতিরিক্ত মদ্যপান ও অসদাচরণের জন্য শাস্তিও দেয়া হতো। মাদক হিসেবে এখনকার মতো আফিং, ভাঙ ও তামাকও ব্যবহৃত হতো। বিনোদনের সস্তা মাধ্যম হিসেবে তামাক জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি পান, চা এবং আরব থেকে আমদানিকৃত কফি মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

বাংলায় রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ কদাচিৎ নির্মাণ করা হতো। এমনকি মুগল সুবাদারগণ প্রায়ই তাঁবুতে অবস্থান করতেন। শায়েস্তা খান কাঠের তৈরি প্রাসাদে বাস করতেন। ধনিক শ্রেণী বাঁশ ও কাঠ দ্বারা বাড়ি নির্মাণ করতেন। তাঁরা ইমারত কমই নির্মাণ করতেন। গ্রামে ধনী জমিদারদের বাড়ি কতকগুলো চালাঘর নিয়ে গঠিত হতো। দরিদ্রদের কুঁড়েঘর ছিল জীর্ণ, জানালাবিহীন। এর মেঝে গোবর দ্বারা নিকানো থাকতো। ঘুমানোর জন্য পাটি এবং রান্নার জন্য একটি বা দু'টি পাত্র থাকতো। গ্রামীণ দরিদ্রদের গৃহায়নের এই ধারা কিছু কিছু আধুনিক নগর উন্নয়নের ছোঁয়া ব্যতীত আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

ঐশ্বর্যশালীদের ঘর পারস্য, তুরস্ক, কাশ্মীর ও লাহোর থেকে আনীত কারুকার্যখচিত বিলাসবহুল কার্পেট দ্বারা আচ্ছাদিত থাকতো। কার্পেটের উপর জাজিম, শতরঞ্জি ও বালুচি বিছানো থাকতো। গুজরাট ও বেনারস থেকে আনীত বড় বড় নলাকার তাকিয়া, জাঁকজমকপূর্ণ পর্দা এবং সিন্ধু প্রদেশ থেকে আনীত সূচিকার্যখচিত চামড়ার দ্রব্যাদি বৈঠকখানায় (দেয়ানখানা) শোভিত থাকতো। আসবাবপত্র এখনকার তুলনায় কম বৈচিত্র্যময় ছিল। টেবিল, চেয়ার ও গদিমোড়া চেয়ার সাধারণত ব্যবহৃত হতো না। কিন্তু কার্পেট, চাদর, আয়না ও রন্ধনদ্রব্যাদির ব্যবহার ছিল প্রচুর। তাঁবুতে মখমল, ব্রোকেড ও

---

৩. Jagadish Narayan Sarkar, *Hindu- Muslim Relations in Medieval Bengal*, (Calcutta 1985), Chapter II

৪. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, প্রথম খণ্ড, ৫৮-৫৯।

রেশমের বাঁধুনি দেয়া থাকতো। সমসাময়িক সাহিত্যে বাঁশ ও বেতের তৈরি মুণ্ডা (মোড়া) এবং কাঠের আসনের (পিঁড়ি) উল্লেখ পাওয়া যায়। টেবিল ব্যবহার করা হতো না। বিছানা, পাটি অথবা মাদুর দ্বারা কাজ চালানো হতো।

ধনী মুসলমানদের সরকারি পোশাক ছিল রেশম অথবা সুতীর তৈরি পায়জামা, চাপকান, মখমল ও ব্রোকেডের চুড়িদার পায়জামা, সুন্দর অসিসহ সাদা কোমরবন্দ এবং টুপি ও পাগড়ি। মুসলমানরা কিছু কিছু মূল্যবান ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, যেমন পাগড়ি, চিরা ইত্যাদি ব্যবহার করতো। সুলতানগণ এবং মুগলরা নানাবিধ সরঞ্জামসহ হিন্দুদের ছত্র (ছাতা) ব্যবহার করতো। সাধারণত মুসলমানরা ঘরে নানা বর্ণের লুঙ্গি এবং হিন্দুরা ধুতি ব্যবহার করতো এবং হিন্দুরা খালি মাথায় ও খালি পায়ে অথবা কাষ্ঠপাদুকা পায়ে দিয়ে চলাফেরা করতো। হিন্দু জমিদারগণ পোশাক-পরিচ্ছদে ধনী মুসলমানদের অনুকরণ করতেন। উচ্চবংশের মুসলমান মহিলারা সালওয়ার-কামিজ, ঘাঘরা, উলের তৈরি কাবা, কাশ্মীরী শাল, সুতী বা রেশমের তৈরি দোপাট্টা ব্যবহার করতেন এবং মাথায় ঘোমটা দিতেন। তাঁরা সাধারণত ঘরের বাইরে বোরখা ব্যবহার করতেন। ধনী হিন্দু মহিলারা আঁকিয়া বা চোলি সহ মূল্যবান শাড়ি অথবা ছোট জ্যাকেট, দোপাট্টা এবং কখনও কখনও চাদর বা আচ্ছাদনও ব্যবহার করতেন। সাধারণত হিন্দু মহিলারা সুতীর শাড়ি দ্বারা সারা দেহ আবৃত করে রাখতেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দরিদ্রদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। কৃষক বা শ্রমিকরা লেংটি ব্যবহার করতো। চুলে কলপ দেয়া, চুল কাটা এবং টাকের যত্নের জন্য সুপরিচিত নিয়ম মেনে চলা হতো। সাবান, পাউডার বা ক্রিমের বিকল্প ছিল। সুগন্ধিও ব্যবহার করা হতো। হিন্দু মহিলারা মাথার সিঁথিতে সিঁদুর, চোখে কাজল এবং দাঁতে মিসি ব্যবহার করতো। বর্তমানকালে প্রসাধনসামগ্রীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও দরিদ্ররা এখনও পুরাতন ও সস্তা জিনিস ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে ধনী মুসলমানরা শিকার, তরবারি খেলা প্রভৃতি পছন্দ করতেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কাবাডি, নৌকাবাইচ, ঘুড়ি উড়ানো, নকল যুদ্ধ, কানামাছি, গাছে চড়া, বাঘচাল এবং আরও কিছু খেলা জনপ্রিয় ছিল।[৫] এছাড়া প্রচলিত ছিল যাদুখেলা, শারীরিক কসরত, নাটক, রামলীলা বা রামায়ণের নাট্যরূপ, যা মুসলমানরাও উপভোগ করতো। মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা করতো। মেলা ও তীর্থস্থান দর্শন ছিল গ্রামের উভয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রিয়। পুরুষ ও মহিলারা আগ্রহের সাথে এজন্য অপেক্ষা করতো।[৬] গৃহাভ্যন্তরীণ খেলাধুলার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানরা কবিতা পাঠের আসর, গল্প বলা, গান-বাজনা এবং নৃত্য উপভোগ করতো। মুসলমান কবিরা স্বরচিত ফার্সি কবিতা এবং বিখ্যাত ইরানী কবির কবিতা পাঠ করতেন ও দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন।[৭]

---

৫. J. N. Dasgupta, *Bengal in the 16th Century*, (Calcutta 1914), 186.

৬. "Chaitanya Bhagavata" in *Indian Culture*, X, (1943), 121.

৭. *Baharistan-i-Ghaibi*, Vol. I, tr. M. I. Borah, (Assam 1936), 138.

কে. এম. আশরাফের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের উৎসব ছিল একান্তভাবে ধর্মীয়। কট্টরপন্থী মুসলমানদের জীবনযাত্রায় সামাজিক উৎসবের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের উৎসবসমূহ একান্তভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও ঋতু-ভিত্তিক ছিল। উভয় সম্প্রদায়ই তাদের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় উৎসবসমূহ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করতো। এই ধারা স্থানীয়ভাবে কিছু পরিবর্তনসহ আজও প্রচলিত আছে। মুসলমানদের উৎসবে সাজসজ্জার অনুপ্রবেশ হিন্দুদের প্রভাবের ফলে ঘটেছিল। এই সময়ে দুই সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিত এবং নিজেদের ব্যথা-বেদনা ও আনন্দ ভাগ করে নিত। মুসলমানদের উৎসব হিন্দুদের উৎসবের মতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হতো। হিন্দুরা খাজা-খিজিরের উৎসবে এবং মুসলমানদের ভোজসভায় যোগ দিত। তারা কোরানের বাণী মনোযোগ দিয়ে শুনতো। মুসলমানরা হিন্দুদের উৎসবে, যেমন বসন্ত পঞ্চমী, হোলি, দিওয়ালি উৎসবে যোগ দিত। মহররমের গভীর তাৎপর্য মুসলমানদের মনে যে আবেগময় অনুভূতির জন্ম দিত তার পরিচয় পাওয়া যায় পুঁথিসাহিত্য, জারীগান এবং লৌকিকতার সাথে পালিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। হিন্দুরাও এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মতে, তাজিয়া মিছিলে যেসব 'পাঞ্জে' ও 'আলেম' ব্যবহার করা হতো, তাতে হিন্দুদের প্রভাব ছিল। বিহার ও বাংলার গ্রামে, যেখানে শিয়া মুসলমানদের আধিক্য ছিল, সেখানে জাঁকজমকের সাথে ভাবগম্ভীর পরিবেশে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাজিয়া মিছিলের আয়োজন করা হতো। আঠারো শতকের মুসলমান সংস্কারকদের মতে, এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে প্রতিমাপূজার দ্বারা প্রভাবিত বিধর্মী কার্যকলাপরূপে (যেমন দুর্গাপূজার বিসর্জন ও রথযাত্রা অনুষ্ঠান) গণ্য করা হতো। ইমামবাড়ায় যে মূকাভিনয় করা হয় তার সাথে হিন্দুদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য আছে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বুকানন দেখতে পান যে, পাটনা ও বিহার থেকে যে চৌদ্দশ' তাজিয়া বের করা হয় তার মধ্যে ছয়শ' ছিল হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত। তিনি আরও দেখতে পান যে, ভাগলপুরের হিন্দুরা মুসলমানদের মতোই উৎসবে অংশগ্রহণ করতো (২ ফেব্রুয়ারি ১৮১১)। নীচ বংশোদ্ভূত হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐসব মিছিলে অংশগ্রহণ করতো। আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শান, যিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন, তিনি নিয়মিত হোলি উৎসবে যোগ দিতেন। আলিবর্দীর পরিবারের শাহামত জঙ্গ, শওকত জঙ্গ, সিরাজউদ্দৌলা ও অন্যান্য সদস্য এবং মীর জাফর এই উৎসব উপভোগ করতেন। হোলি উপলক্ষে গান-বাজনা সহযোগে ভোজন, রং ছিটানো এবং আবির মাখানো আজও আনন্দোৎসব হিসেবে পালিত হয়।

তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক আচার-আচরণ ও উৎসবের বৃত্তান্ত সমসাময়িক সাহিত্য ও ভ্রমণবৃত্তান্তে সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে। ঐসব উৎসবের সাথে বর্তমানে প্রচলিত উৎসবের সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক দম্পতি বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে

বসবাস করতে পারতো না। হিন্দুদের দুই বর্ণের মধ্যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তা প্রচলিত ছিল। শত শত বছর ধরে এই দুই সম্প্রদায় তাদের বিবাহপ্রথা ও অনুষ্ঠান একইভাবে পালন করে যাচ্ছে। যৌতুকপ্রথাও প্রচলিত ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুত্রসন্তান লাভের জন্য প্রবল আগ্রহ ছিল। হিন্দুরা তাদের প্রধান দশটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে ছয়টি পালন করতো। যেমন জন্মোৎসব (জলকর্ম), চুলকাটার অনুষ্ঠান (মুণ্ডন), মুখে ভাত (অন্নপ্রাশন) ও নাম রাখা (নামকরণ), প্রথম বিদ্যালয়ে গমন (বিদ্যারম্ভ), পবিত্র সুতা ধারণ অনুষ্ঠান (উপনয়ন) এবং বিবাহ।[৮]

মুসলমান শিশুদের জন্মলগ্নে ও বাল্যকালে যেসব অনুষ্ঠান পালন করা হতো সেসব অনুষ্ঠানের সাথে হিন্দুদের অনুষ্ঠানের কিছু কিছু সাদৃশ্য ছিল। যেমন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত 'সালগিরা' (জন্মদিনের গিঁঠ) অনুষ্ঠানের সাথে হিন্দুদের 'জন্মগাঁউথ' অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য ছিল। এই সময়ে নবজাত শিশুর মুখে মধু দেয়া হতো, শিশুর কানে আজানধ্বনি দেয়া হতো, সপ্তম দিবসে 'আকিকা' দেয়া হতো, যদিও আকিকা পালনের নির্দিষ্ট সময় ছিল না। শিশুর চার বছর চার মাস চার দিন বয়সের সময় স্কুলে (মক্তব) পাঠিয়ে পড়ালেখা (বিসমিল্লাহ উৎসব) শুরু করা হতো। 'সুন্নত' (খৎনা) অনুষ্ঠান জাঁকজমকের সাথে পালন করা হতো। মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেয়ের বাগদান (মাঙ্গনি) অনুষ্ঠান এবং বিবাহের সময় সাজসজ্জা (হল্‌ফ ও নূহ),যা হিন্দু কনের 'সোলাহ শৃঙ্গার' অনুষ্ঠানের অনুরূপ এবং কনে ও বরের গায়ে বিশেষ সুগন্ধিচূর্ণ লাগানো এবং বিয়ের গান (সুহাগ) প্রভৃতি অনুষ্ঠান হিন্দু মহিলাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠান আগে বেশ অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং গান-বাজনা, নৃত্যগীত ও মদ্যপানের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজে যৌতুকপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে, যা ইসলাম ধর্মে নিন্দনীয় ছিল। যৌতুক হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা মাঝে মাঝে দাবি করা হতো। ইসলাম ধর্মে আইনসম্মত বিধবাবিবাহ হিন্দু প্রভাবের ফলে মুসলমানরা পছন্দ করতো না। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিকে মুজাহিদ আন্দোলনের সময় এই মতের বিরোধিতা করা হয়েছিল। বেগম হাসনা আলি তাঁর বারো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যে, কোন মুসলমান বিধবা মহিলার পুনর্বিবাহ তার নজরে আসে নি, এমনকি মুসলমান মহিলারা তাঁদের বাগদত্ত পুরুষের মৃত্যুর পরও অবিবাহিত থাকতেন।[৯]

---

৮. R. C. Majumdar (ed.), *History of Bengal*, Vol. I, (Dhaka 1943), 600; Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam*, 46-70; M. W. Mirza in V. D. Mahajan, *Delhi Sultanate*, 712-1526 A. D., (New Delhi 1978), 611.

৯. Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam*, 46-70; M. W. Mirza in V. D. Mahajan, Delhi Sultanate, 712-1526 A. D. (New Delhi 1978), 611.

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান গুরুত্ব সহকারে পালন করা হতো। আবুল ফজল বর্ণনা করেছেন যে, বাংলায় (হিন্দু) মৃত্যুপথযাত্রীকে নদীর তীরে নিয়ে তার দেহের নিম্নাংশ পানিতে নিমজ্জিত রাখা হতো, যাকে 'অন্তর্জলি' বলা হতো। শবদাহের পরে 'উদকর্ম,' 'অশৌচ', 'অস্থিসঞ্চয়ন', 'শান্তিকর্ম' এবং 'সপিন্দাকর্ম' অনুষ্ঠান পালন করা হতো। শিশু ও সাধু ব্যক্তিদের পানিতে সমাধিস্থ বা বিসর্জন দেয়া হতো। শোক পালনের সময় কিছু কিছু অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে পালন করা হতো। যেমন নখ কাটা, চুল-দাড়ি মুণ্ডন, ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ এবং জমকালো পোশাক পরিধান। কিছু কিছু রীতির ব্যতিক্রমসহ (যথা মাটিতে শয়ন করা, দিনে একবার আহার করা) এই ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হতো। সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী শোক পালনের ত্রয়োদশ বা ত্রিশতম দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করা হতো। এই সময় কাঙালিভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো ও দান করা হতো। শ্রাদ্ধবার্ষিকীও পালন করা হতো। বিশেষত গঙ্গায় মৃতদেহের হাড় ও ছাই বিসর্জন দেয়া হতো।

মুসলমানরা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখ পশ্চিমমুখী (মক্কার দিকে) করে রাখতো। শয্যাপার্শ্বে কোরান রাখা হতো এবং উচ্চৈঃস্বরে সূরা ইয়াসিন ও কলেমা পড়া হতো। মক্কা থেকে আনীত জমজমের পানি পাওয়া গেলে মুখে দেয়া হতো। মৃতদেহ কাপড় দিয়ে আবৃত করে সমাধিস্থ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। কিছু কিছু মুসলমান তাদের পূর্বপুরুষদের অভিজাত হিন্দু বর্ণশ্রেণীতে জন্মের কারণে বা হিন্দু রীতিনীতির প্রভাবে ভারতীয় প্রথা, যথা সতী জওহর (মহিলাদের সম্মানরক্ষার্থে স্বেচ্ছায় সহমরণ) অনুসরণ করতেন। এসব প্রথা বাংলায় মুগল সৈন্য ও সেনাপতিদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সদ্য বিধবা মুসলমান মহিলা হিন্দু বিধবার মতো হাতের কাঁচের চুড়ি ভেঙে ফেলতেন এবং সোনার অলঙ্কার ও জমকালো পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকতেন। চল্লিশ দিন পর কবর জিয়ারত করা হতো এবং দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্রাদি ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা হতো।

মুসলমানদের নম্র স্বভাব-চরিত্র, যেমন ধীরে, মধুর ও নরম সুরে সামাজিক অনুষ্ঠানে কথা বলা, নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে পান-সুপারি বিতরণ করা এবং বিদায়ের সময় নম্রভাবে সঙ্গ দেয়া তাদের আভিজাত্য ও ভদ্র স্বভাব এবং উচ্চশিক্ষার পরিচয় বহন করতো।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি,বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্ভাষণের রীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এসব রীতির কিছু এখনও প্রচলিত আছে এবং কিছু বিলুপ্ত হয়েছে। উত্তর ভারতে হিন্দুরা সমবয়স্কদের রাম-রাম ও বাংলায় নমস্কার বলে সম্ভাষণ করতো। বয়স্কদের সম্ভাষণ করার জন্য হাত জোড় করে মাথার উপরে উঠানো হতো। সামাজিক অনুষ্ঠানে ছোটরা মাথা নীচু করে পা স্পর্শ করতো। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলে শিক্ষক ও রাজার সম্মুখে নতজানু হয়ে সম্মান দেখাতো। ব্রাহ্মণরা হাত জোড় করে সম্মান দেখাতো।

মুসলমানরা সবাই একে অপরকে সালাম দিত। একজন আস্‌সালামু-আলাইকুম বললে আরেক জন তার জবাবে ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম বলতো। পরস্পরে কোলাকুলি ও করমর্দন প্রচলিত ছিল। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্ভাষণের ক্ষেত্রে কপালে হাত ঠেকিয়ে দেহকে একটু বাঁকানো হতো। মুগল শাসক ও জমিদারগণ তাঁদের দরবারে কুর্নিশ ও তসলিম দেয়ার রীতির প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এই রীতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। কদমবুচি-রীতি এখনও প্রচলিত আছে, যা বোধ হয় রাজকীয় দরবারে প্রচলিত রীতির অনুসরণে করা হয়।

ইসলামে বর্ণপ্রথার সম্প্রসারণ খুবই জটিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য রূপ ধারণ করেছিল। ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সমতা শিক্ষা দেয়। কিন্তু ভারতে মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বর্ণপ্রথা এবং রাজপুতদের রক্ষণশীলতা অনুসরণ করতো। বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ বলেছেন, "আমরা হিন্দুদের কাছ থেকে সামাজিক বর্ণপ্রথা শিখেছি বা পেয়েছি। বিজেতার উপর বিজিত জাতির এটি এক প্রকার নীরব প্রতিশোধ।" ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫৩) ঘোষণা সম্বলিত *ইনশাহ-ই-মাহরু* মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যের সর্বপ্রথম সাহিত্যিক প্রমাণ। ইসলামী আইন যদিও বৈষম্য অনুমোদন করে না, তবুও কার্যক্ষেত্রে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথা শুরু হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেছিল। ভারতে ইসলামের প্রসারের উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল জনগণের নিপীড়নমূলক বর্ণপ্রথা থেকে মুক্তিলাভ এবং মুসলমান সমাজে উচ্চ পদমর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা। কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তাদের সামাজিক বৈষম্য দূর হয় নি। এর ফলে অভিন্ন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথার সূত্রপাত হয় সরকারের উঁচু পদে এবং সেনাদলে আসীন বিদেশী বহিরাগত মুসলমান, বিশেষত তুর্কী, আরব এবং ইরানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবির মানসিকতা থেকে। এমনকি শহুরে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তাদের পূর্বেকার সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার মানসিকতার কারণে তাদের সঙ্গে গ্রামীণ নিম্নবংশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার সামাজিক দূরত্ব রাতারাতি দূরীভূত হয় নি। পরোক্ষভাবে ধর্মান্তরিতকরণ বলতে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক জীবনধারাকে পরিবর্তন বোঝায় না। হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বর্ণাশ্রমপ্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) প্রচলিত ছিল,যা কোন কোন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন উচ্চবংশীয় অর্থাৎ আশরাফ পর্যায়ের সৈয়দ, শেখ, মুগল ও পাঠান প্রত্যেক গোত্রই পরিবার ও উপজাতি হিসেবে বিভক্ত ছিল। নিম্নবংশীয় মুসলমানদের (আতরাফ) মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাত-নাম প্রচলিত ছিল, যেমন জেলে, তেলী, যোগী ইত্যাদি। এই ধরনের শ্রেণীর বেশিরভাগই হিন্দুদের পূর্বেকার গোত্রীয় বা সামাজিক নাম থেকে এসেছে। তাদের পুরাতন বহু গোত্রীয় অভ্যাস (যেমন পানাহার, বিবাহ) এখনও প্রচলিত আছে। হিন্দুদের মতো মুসলমানদের মধ্যেও শ্রেণীসচেতনতা এবং বিবাহসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ছিল। যদিও

নীতিগতভাবে অসবর্ণ বিবাহ এবং নিম্নজাতের সঙ্গে উচ্চজাতের খাওয়াদাওয়ায় কোন বাধা ছিল না, তথাপি বাস্তবে তা প্রচলিত ছিল না। অসবর্ণ বিবাহ কেবল আশরাফ শ্রেণীর বিভিন্ন উপশ্রেণীর মধ্যে অপ্রচলিত ছিল তা নয়, তা একই শ্রেণীর মধ্যেও কদাচিৎ ঘটতো।

সামাজিক বিভিন্নতা ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের মতো ব্যবসাভিত্তিক শ্রেণীবিভেদও দেখা দেয়। বুকানন বিহার ও পাটনায় আটত্রিশ প্রকার নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যেমন তাঁতী, দর্জি, জরিকর্মী পর্যায়ের লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা উঁচুগোত্রের সাথে সংস্রব রাখতো না। বিহার ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গোত্রভেদ গভীর শিকড়বিস্তার করেছিল এবং কিছু কিছু পেশা গোত্রপ্রথার বাইরে ছিল। বার্নিয়ার বলেছেন, "সূচিকর্মকার তাঁর ছেলেকে ঐ পেশায় নিয়োজিত রাখতেন, স্বর্ণকার তাঁর ছেলেকে স্বর্ণকার হিসেবে গড়ে তুলতেন এবং ডাক্তার তাঁর ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতেন। একই পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রীতি কঠোরভাবে পালিত হতো।"[১০]

নীতিগতভাবে ইসলাম হলো এক ঈশ্বর, এক নবী, এক ধর্মগ্রন্থ, এক আইন ও এক ভ্রাতৃত্ববোধের ধর্ম। এটি একটি অবতীর্ণ ধর্ম এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে এটি প্রধানত হিন্দুধর্মের বিপরীত। হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ বিভিন্ন দেব-দেবী ও অসংখ্য অবতারের (অসীম শক্তির বিভিন্ন রূপ) সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ গড়ে উঠেছে এবং গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা চালু হয়েছে।[১১] মৌলিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও ভারতে বসবাসরত বিদেশী মুসলমানরা কালক্রমে ভারতীয় হয়ে যায়। বহিরাগত মুসলমানরা ভারতীয় আবহাওয়ায় শত শত বছর যাবৎ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সাথে বসবাস করে এবং হিন্দু মহিলাদের বিবাহ করে তাদের রক্তের শুদ্ধতা, গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য এবং বৈদেশিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং কোন কোন দিক দিয়ে হিন্দুদের সাথে একীভূত হয়ে অকৃত্রিম ভারতীয় বলে গণ্য হয়। এমনকি মসজিদ, দরগাহ ও বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ ও রাজনীতিতে হিন্দুদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং হিন্দু নামসমূহ বহাল থাকে। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা তাদের পূর্বের বংশগৌরব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বভাব-চরিত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ অনুসরণ করতো। গোবরডাঙ্গার পীর ঠাকুরবাড়ির আশ্রম প্রতিপাদন করে যে তৎকালীন সমাজের কট্টর মুসলমানরা একজন মুসলমান পীরের হিন্দু নাম রাখার মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পান নি।[১২]

---

১০. Bernier, *Travels*, 258.

১১. হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো তথ্যের জন্য দেখুন, M. Tutus, *Indian Islam*, (London 1930) 176; F. W. Thomas, *Mutual Influence of Muhammadans and Hindus in India*, 12.

১২. Titus, *Islam in India and Pakistan*, 44.

হিন্দুধর্ম তার বিপুল আত্তীকরণক্ষমতা নিয়ে মুসলমান বিজেতাদেরকে পূর্ববর্তী বিজেতাদের মতো হিন্দুদের সঙ্গে একীভূত করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ ধর্মীয় মেরুকরণ ও সামাজিক বৈষম্য। কিন্তু ভারতে, বিশেষকরে বাংলা ও বিহারে শত শত বছর হিন্দু-মুসলমানের সহ-অবস্থান এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে একটি জনপ্রিয় ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা ও বিহারে মুসলমানরা অন্যান্য এলাকার তুলনায় অধিক সংখ্যায় বাস করতো এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা যৌথভাবে অন্যান্য এলাকার তুলনায় অধিক ছিল। এই দুই প্রদেশে মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন হিন্দুদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকের জীবনে পারস্পরিকভাবে কিছু লোকগাথা, আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যেগুলোতে হিন্দুধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলো পবিত্র কোরানের শিক্ষার বিরোধী ছিল। জাতিগতভাবে সম্পূর্ণ মিশ্রিত না হলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল। উচ্চস্তরের মানুষের জীবনে না হলেও সাধারণ স্তরের মানুষের জীবনে ধর্মীয় মিশ্রণের ব্যাপ্তি এতই বেশি ছিল যে, উনিশ শতকের শুরুতে মুজাহিদীন আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী রচিত *হিদায়াত-উল-মুমিনিন* গ্রন্থে দুঃখের সাথে মন্তব্য করা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলিম দেশের চেয়ে ভারতে ইসলাম ও কুফরকে অধিক পরিমাণে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। অন্য কোন মুসলিম দেশে এমনটি দেখা যায় নি।[১৩]

ভারতে ইসলামের এমন রূপান্তর হওয়ার বিভিন্ন কারণ ছিল। শুধু আবহাওয়ার কারণে এমন হয় নি। বহু বহির্ভারতীয়, এমনকি বিশ্বজনীন জনপ্রিয় উপাদান এর জন্য দায়ী ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কিছু উপাদান এসেছিল বিশ্বজনীন, সর্বপ্রাণবাদী, কুসংস্কারমূলক লোকবিশ্বাস থেকে, যার শেকড় নিহিত ছিল বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিকাশপ্রাপ্ত ধর্মসমূহে। এসব ধর্মের কিছু ছিল ইসলামপূর্ব কালে অথবা মুসলমান কর্তৃক আফ্রো-এশীয় দেশসমূহ বিজয়কালে অর্জিত। অন্যগুলো উদ্ভূত হয়েছে জনপ্রিয় হিন্দু অধ্যাত্মবাদ থেকে, যেগুলি বিশেষভাবে নিম্নবংশীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ ও হিন্দু উপপত্নী গ্রহণের ফলে গড়ে উঠেছিল।[১৪] নতুন ধর্মান্তরিতরা, যারা প্রতিমাপূজা ও পালা-পার্বণ উদ্‌যাপনে অভ্যস্ত ছিল, তারা সহজে দেব-দেবী ও পৌরাণিক কল্পকথাশূন্য একেশ্বরবাদী ইসলামের সরল ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে নি। বাংলায় মুসলমানরা ইসলামের জন্মস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতো। কিন্তু বিজেতাগণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। সংখ্যার

১৩. "Notices of the peculiar tenets held by the followers of Syed Ahmed", taken chiefly from *Sirat-ul-Mustaqim,* written by Maulvi Mohammad Ismail in *Journal of The Asiatic Society of Bengal,* I (1832), 489; J. N. Sarkar, *Islam in Bengal,* (Calcutta 1972), 72

১৪. Mrs M. Hasan Ali."Observations on the Mussalmans in India," (London 1917), 206

দিক দিয়ে ক্ষুদ্র এই শক্তির পক্ষে অন্য দেশ থেকে অভিবাসীদের আগমন সত্ত্বেও অগণিত বৈরী জনসাধারণের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় বিশ্বাস ও প্রথাকে অক্ষুণ্ন রেখে ধর্মান্তরিত করাই সহজ পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এ ধর্মান্তরগ্রহণ অসম্পূর্ণই থেকে যেতো, কারণ সদ্য ধর্মান্তরিতরা নতুন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বা কার্যকারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতো এবং নতুন ধর্মীয় নিয়মকানুনগুলো মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতো না। সদ্য ধর্মান্তরিতরা শুধু নামেই মুসলমান ছিল, বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব ছিল ক্ষীণ। সেখানে তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদে হিন্দু নিয়ম-কানুনই মেনে চলতো। এদের উপর বিদ্বজ্জনদের প্রভাব ছিল অতি সামান্য। গ্রামে নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু কারিগরদের মধ্যে পুরাতন ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন থেকে গিয়েছিল।

এভাবে বাংলায় নতুন ধর্মান্তরিতরা ইসলাম ধর্মে তাদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং উপাসনার রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ওহাবী-ফরায়জীদের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমান গ্রামবাসীরা তাদের হিন্দু বন্ধুদের সাথে দুর্গাপূজা ব্যতীত কৃষ্ণ ও শীতলার (বসন্ত রোগের দেবী) উপাসনা করতো এবং বিবাহের দিন ধার্য করার জন্য হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ গ্রহণ করতো। বিশ শতকের প্রথমভাগে রাজশাহী এলাকার মুসলমানরা মনসাবিসর্জন উপলক্ষে গান (মনসা ভাসানোর গান) রচনা করতো। অন্য অঞ্চলে মুসলমানরা শিব-পার্বতীর সম্মানে স্তোত্র লিখতো এবং লক্ষ্মী (ধনের দেবী) স্মরণে ধর্মসঙ্গীত রচনা করতো।[15]

এমন অবস্থা উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ১৯১১ সালের জরিপ-প্রতিবেদনে এমন কিছু সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। যেমন (ক) কর্তাভজা গোত্রের জনক আউল চাঁদ বাংলার নদীয়া জেলায় শিষ্যদের মধ্যে 'সত্যধর্ম' প্রচার করতেন। তাঁর শিষ্যরা ধর্মে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। (খ) পাঁচু ফকিরগণ মুসলমানদের দীক্ষা দিতেন, যাঁরা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন। (গ) রামবল্লভীরা হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করতো। (ঘ) আহেবধানীরা মুসলমানদের সাথে আহার করতো। (ঙ) গোঁসাইজামিরা বৈষ্ণব ছিল। তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল, যারা পাঁচ বার প্রার্থনা করতো এবং ধনীদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে দরিদ্র ও পঙ্গুদের মধ্যে বিতরণ করতো। (চ) বৈরাগীরা বৈষ্ণব ছিল, যারা বেদ বা কোরানে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু সতেরো শতকে তাঁদের মধ্যে উচ্চবংশীয়

১৫. *Imperial Gazetteer*, II, 289 ff.; D. C. Sen, *History of Bengali Language and Literature*, (Calcutta 1917), 793, 796-98, 368.

মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। (ছ) শক্তির উপাসক সন্ন্যাসীরা মুসলমানদের অধীনে কাজ করতো। (জ) বাংলার এক মুসলমান গ্রামের মুকাদ্দাম একজন ধর্মপ্রচারককে (১৮৫০) জানিয়েছিলেন যে, নবীজী এক বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং (ঝ) *যোগীরা নবীজীকে গোরখনাথের শিষ্য বলে মনে করতো।* অন্য যোগীরা মুসলমানদের মতো প্রার্থনা করতো ও গোমাংস ভক্ষণ করতো।[১৬]

মধ্যযুগীয় ভারতে জনপ্রিয় ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিকভাবে সংমিশ্রিত হতে সাহায্য করেছিল। এজন্য পীর ও সুফিদের অবদান ছিল যথেষ্ট। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, মধ্যযুগীয় ভারতে পীরদের প্রার্থনাপ্রথা হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রে প্রার্থনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর মতে, বাংলায় ইসলামী ভাবধারার গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় অবদান হিসেবে এই বৈশিষ্ট্য ভারতের প্রতিটি শহর ও গ্রামে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রতিফলিত হতো। পীর শব্দের অর্থ প্রধান। পীর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং শাহ, শেখ, মুর্শিদ বা ওস্তাদ, সুফি বা ওয়ালী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হতেন। তাঁরা অনুসারীদের (মুরিদ) আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করতেন। যদিও সব পীরই সুফি ছিলেন, কিন্তু সব সুফিই পীর ছিলেন না। গার্সিন ডি. ট্যাসির (১৮৩১) মতে, ভারতীয় মুসলমানদের কাছে পীরগণ হিন্দুদের বহুসংখ্যক দেবতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। মুসলমানরা যেমন কিছু সংখ্যক ভারতীয় সাধুকে শ্রদ্ধা করতো, তেমনি সাধারণ হিন্দু, এমনকি কিছু কিছু কট্টরপন্থী হিন্দুও মুসলমান পীরদের শ্রদ্ধা করতো। মুঙ্গেরের শাহ লোহাউমি ও পশ্চিম পাটনার পশতু সাধু শাহ আরজানির সমাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দর্শন করতে যেতো। হিন্দু ও মুসলমানদের এমন সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে বাংলায় অসংখ্য পীরের আরাধনা শুরু হয়, যেমন সত্যপীর, মানিকপীর, কালুগাজী, বড় খাঁ গাজী এবং অন্যান্য। লোককবির ভাষায় : "হিন্দুর দেবতা হইল মুসলমানের পীর/দুই কুলে লয়ে সেবা হইল জাহির।" অর্থাৎ হিন্দু দেবতারা মুসলমানদের কাছে পীর বলে পরিচিতি লাভ করেছে, যার ফলে তারা উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। সেকালের গুরু-চেলা সম্বন্ধ বর্তমান পীর-মুরিদ সম্পর্কের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।[১৭]

প্রাচীনকালে নিহত মুসলমান যোদ্ধাদের গাজী বা পীর হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো। প্রাচীন পীরদের আস্তানা হিন্দুদের কাছে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য হতো। হিন্দুদের জনপ্রিয় ধর্মীয় সাহিত্য *মঙ্গলকাব্য* এবং অন্যান্য কবিতায় বাংলার পীরদের ও তাঁদের আশ্রমের

১৬. *Census Report,* 1911, I; *Encyclopaedia of Islam,* II, 491; D. C. Sen, *Chaitanya and His Age,* (Calcutta 1922), 350.

১৭. ক্ষিতিমোহন সেন, *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা; কাব্যমালঞ্চ,* (সম্পাদিত) আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম, ১৯৪৫, ৩০; *Asiatic Journal,* IV (1831), 75-76.

উল্লেখ আছে এবং দিগ্বন্দনা রয়েছে। সতেরো শতকের শেষভাগে সীতারাম দাস তাঁর বর্ণনায় এ পর্যায়ের অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন গড় মান্দারনের পীর ইসমাইল, পাণ্ডুয়ার সুফি খান (সুভি খান ?), বড় পাণ্ডুয়ার নূর কুতুব আলম, পীর বদর, ত্রিবেনীর জাফর খান গাজী, হিজলির পীর মাচাণ্ডালি শরিফ (তাজ খান), বর্ধমানের বাহ্‌রাম সাক্কা (বৈরাম শাক্কারা) এবং অন্যান্য। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একাত্মতাবোধ গড়ে উঠেছিল তার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের মনোভাব দূর হয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু ইতিহাসবিদ আইনী তত্ত্বের ভিত্তিতে এই দুই সম্প্রদায়ের যে অব্যাহত ও অবিরাম হানাহানি ও অসহিষ্ণুতার বিবরণ দিয়েছেন তা অনেকাংশে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।[১৮]

সুফিরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন, যা পরে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রচনা করেছিল। অনেকে ধর্মীয় নির্দেশ-আদেশ শিক্ষা দিতেন, যা পরে শিক্ষার প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। জনসাধারণ সুফিদের অতুলনীয় চরিত্র, সহিষ্ণুতা, নিষ্পাপ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন দেখে মুগ্ধ হতো এবং তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হতো। জনসাধারণ আরও বিশ্বাস করতো যে, পীরগণ অতিমানবীয় গুণাবলীর অধিকারী, যেমন রোগমুক্ত করা, দরিদ্র ও অসুস্থ ব্যক্তিদের দুঃখ-বেদনা দূর করা, বন্ধ্যা রমণীদের বন্ধ্যাত্ব দূর করা, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হওয়া, ভবিষ্যদ্বাণী করা, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, সুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু আনয়ন করা অথবা কোন স্থানে অতিবৃষ্টি সৃষ্টি করার ক্ষমতা। জনগণ সুফিদের কাছ থেকে বিপদমুক্তির জন্য মাদুলি, আংটি এবং এই ধরনের জিনিস নিত। সুন্দরবনে যেখানে বাঘের উৎপাত ছিল, সেখানে বসবাসরত হিন্দু ও মুসলমানরা পীরদের অনুগ্রহ লাভের জন্য জীবিত পীরদের উদ্দেশে অথবা মৃত পীরদের আত্মার উদ্দেশে মানত প্রদান করতো।

জনসেবা সুফিদের প্রধান কার্যাবলীর অন্যতম ছিল, যেমন দারিদ্র্য, অসুস্থ, অসহায়, ভিক্ষুক ও ভ্রমণকারীদের সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের আশ্রম, খানকাহ্ ও মেহমানখানা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকতো। স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের জীবিত পীরদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হিন্দুদের গুরু বা গোসাঁইদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অনুরূপ ছিল। হিন্দুরা যেমন গুরুদের সামনে নত হতো, তেমনি মুরিদরা পীরের সামনে সেজদা করতো। কট্টর মুসলমানদের কাছে এ কাজ খুবই নিন্দনীয় ছিল।[১৯] মসজিদে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে পীরের উপাসনা করতে মুসলমানরা বেশি পছন্দ করতো। জীবিত অবস্থায়

---

১৮. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, (কলকাতা ১৯৮১); J. N. Sarkar, *Hindu-Muslim Relations,* 117, f. n.

১৯. Aziz Ahmad, Intellectual History of Islam in India, (Edinburgh 1969), 46; J. N. Sarkar, Islam in Bengal, 32-33.

পীরগণ জনসাধারণের সেবা লাভ করতো এবং মৃত অবস্থায় তাঁদের দরগাহ্ উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদের তীর্থস্থানে পরিণত হতো, যেমন গোরখপুরের মনসুরগঞ্জে আবদুল কাদেরের দরগাহ্। হিন্দুদের মধ্যে যেমন পুরি, বৃন্দাবন ও বেনারসের মতো তীর্থস্থানগুলিতে যাওয়ার প্রবল ঝোঁক ছিল, তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও পবিত্র দরগাহে যাওয়ার তীব্র আগ্রহ ছিল। নানা উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এসব পবিত্র স্থানে গমন করতো, যেমন মনস্কামনা পূরণ, জাগতিক মোক্ষলাভ, উচ্চপদ বা ধনলাভ, রোগমুক্তি ইত্যাদি। মুসলমান সাধুরা জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের দরগাহ্সমূহের অধিকাংশ পূর্বেকার স্থানীয় তান্ত্রিক গুরুদের নির্মিত টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অতিবিশ্বাসী জনসাধারণের উপর তাঁদের প্রভাব ছিল সুগভীর। মুসলমান সাধুদের এসব স্থান আগের দিনের মতোই জনগণকে আকর্ষণ করতো। নামমাত্র ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করতো না। বাংলার প্রাচীন ভাষা, আচার-আচরণ ও জীবনধারা আগের মতোই ইসলামের সাথে মিশে যেতে থাকে।[২০]

হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে কট্টর সুফিদের অবদান থাকলেও তাঁরা বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী ও বেশরিয়তি অধর্মীয় প্রথা (মালামি) প্রবর্তন করেছিলেন। তন্মধ্যে সোহ্রাওয়ার্দীয়া গোত্রের শাখা জালালী, কাদেরীয়া গোত্রের শাখা নওশাহী ও বিনাওয়া, কলন্দর (ইরানী ও ভারতীয়), মাজজুবি (সম্পৃক্ত), হায়দরী এবং বহুল প্রচারিত মাদারী অন্যতম। কিছু বেশরিয়তি সুফি বাংলায় হজরতী, গোবরাই ও পাগলনাথী অনুসারীর সূত্রপাত করেছিলেন, যাদের উপর শক্তি উপাসনার প্রভাব ছিল এবং যাদের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু। উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন ঐসব সুফির সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করতো। ভিন্নপন্থী সুফিদের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু প্রথা কট্টর সুফিদের মধ্যেও দেখা যেতো, যেগুলি ভারতের বাইরে ইসলামী প্রথার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এমন একটি প্রথা ছিল গলায় বা হাতে তাবিজ ব্যবহার করা, যা দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগ ধরনের অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হতো। এই প্রথা ভারত ও মুসলিম জগতের অন্যত্র চালু ছিল। তাবিজের মধ্যে কোরানের বাণী বা ধর্মীয় বাক্য লিপিবদ্ধ থাকতো। শিয়ারা 'ইমাম দেমিন' ব্যবহার করতো, যা বাজুবন্ধে একটি বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে একটি বা অধিক মুদ্রার আকারে স্থাপন করা হতো।

ভারতীয় মুসলমানদের অনেকে হিন্দু যোগীদের মতো নানা মত ও পথের অনুসারী ফকিরদের নিয়ে বহুসংখ্যক দল গঠন করেছিলেন। উনিশ শতক নাগাদ এই ধরনের চারটি প্রধান দলের আর্বিভাব হয়, যেমন জালালী, মাদারী, বিনাওয়াজ ও অর্জুনশাহী। অর্জুনশাহী আবার বহু শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। সহজিয়া ফকিররা মেয়েদের মতো পোশাক

---

২০. J. N. Sarkar. *"Islam in Bengal"*, 76-78

পরিধান করতো এবং মুর্শিদদের সম্মুখে নৃত্য করতো ও গান গাইতো। অধিকাংশ ফকির ইসলামী নীতিমালার বিরোধী কাজ করতো।

মরমী প্রভাব

ভারতের বিভিন্ন অংশে, এমনকি বাংলায় বিভিন্ন অপরিচিত পীর বা পৌরাণিক ব্যক্তির সাথে জড়িত সংশ্লেষণবাদী সম্প্রদায় বা মতবাদ প্রাচীন লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এগুলি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু এগুলিকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মতবাদ হিসেবে গণ্য করা হতো। এগুলির মধ্যে কিছু সর্বপ্রাণবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যার গভীর প্রভাব সারা বিশ্বে ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মাঝে বিদ্যমান এবং সম্ভবত এর মূলে রয়েছে হিন্দুধর্মের প্রাচীন মতবাদ।

উপমহাদেশে মুসলিম প্রভাবের প্রথম সূচনা হয় সিন্ধুতে। এই সময়ে সংশ্লেষণবাদী বিশ্বাসের লক্ষণীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা লালু দরিয়াপন্থীদের দ্বারা অবতার হিসেবে পূজিত আনদারুলালকে সিন্ধু নদীর প্রতীক হিসেবে পূজা করতো। তাঁকে মুসলমানরা খিজির বলে এবং পাতিয়ালার জাঠরা জেন্দা পীর বলে গণ্য করতো। মুসলমানরা খাজা খিজিরকে ভক্তি করতো, কারণ তাঁকে সমুদ্র, নদী এবং পানির সাথে জড়িত এবং নূহ্ নবীর আত্মীয় বলে মনে করা হতো। তাঁকে 'জীবনের জলের উৎসের আবিষ্কর্তা', জাহাজডুবি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বক্তা এবং নাবিকদের উদ্ধারকর্তা বলে মনে করা হতো। তিনি মাছের উপর চড়তেন বলে মনে করা হতো এবং বন্যা ও খরার সময় তাঁর উপাসনা করা হতো। তেরো শতকেও হামিদ কলন্দর ও অন্য মুসলমানরা হানজ-ই-সামসী (ইলতুৎমিশ কর্তৃক নির্মিত পুকুর)-কে ভক্তি করতেন, যা পানির পীরের সাথে জড়িত বলে মনে করা হতো।

ভারতের বিভিন্ন অংশে খিজিরকে হিন্দুদের নিম্নতর স্থানীয় দেবতার সমতুল্য গণ্য করা হতো। মধ্যযুগে দু'জন পানির পীরের বর্ণনা পাওয়া যায়—সিন্ধুতে দরিয়া পীর এবং বাংলায় পীর বদর। বাংলায় পানির পীরের অনুষ্ঠান (খোয়াজ, ভেরা বা বেরা, ফ্লীট) মুসলমান এবং হিন্দু জেলে ও মাঝিরা ভাদ্র মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) পালন করতো। ঐ সময়ে নৌকা পানিতে ভাসিয়ে ফল, ফুল ও দীপ জ্বালিয়ে ঐ অনুষ্ঠান পালন করা হতো। সিরাজউদ্দৌলা এই উৎসব পালন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে উইলিয়ম হজেস তা ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদে প্রত্যক্ষ করেছিলেন (১৭৮০-৮৩)। ১৮২১ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব এই উৎসব দেখেছিলেন। বাংলায় প্রত্যেক নাবিক ও জেলে ভ্রমণ অথবা ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় পীর বদরের নাম নিত। চট্টগ্রামে ২৯ রমজান তাঁর দরগাতে লোকসমাগম হয়। তিনি জীবৎকালে নিভৃতে প্রার্থনা করতেন (চিল্লা)। তাঁকে চট্টগ্রামের বদরউদ্দিন বদর-ই-আলম

এবং আঠারো শতকের প্রারম্ভে আগত পর্তুগীজ বেস গোয়েল পিয়ারিস বোথিলো বলে চিহ্নিত করা হয়, যিনি একটি ভাসমান শিলার উপর চড়ে এসেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হতো।

সিরীয় ইহুদী, শাহ বা শেখ মাদারের অনুসারী মাদারী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল পারস্য দেশে এবং সৈয়দ বদিউদ্দিন (মাদার) নামে একজন সুফি মাদারী মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি ছিলেন মাকেরানপুরের পীর। এই সম্প্রদায় হিন্দু যোগী, খৃস্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম থেকে তাদের মতবাদ গ্রহণ করেছিল। তাদের মরমী ডাক ছিল দ্ব্যর্থবোধক 'দম মাদার'। এর দু'টি অর্থ—'মাদারই জীবন' এবং 'শ্বাস নিও না'। বাংলায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানরা সমভাবে মাদার জের্দা উৎসব পালন করতো। পূর্ণিয়া ও রংপুরে বুকানন অসংখ্য মাদারী ফকিরের সন্ধান পান। তাদের অনেকে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো শরীরে ছাই লেপন করতো, উলঙ্গ থাকতো ও আগুনের মধ্য দিয়ে গমন করতো। তাদের একটি উপশাখা তালি দেয়া কাপড় (খিড়কা) পরিধান করতো। তাদের 'খিড়কাধারী মাদারী' বলা হতো।[২১]

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষকরে মুসলমান সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে 'পাঁচ পীরের' প্রার্থনা খুবই জনপ্রিয় ছিল। কৃষকরা বিপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাঁদের উপাসনা করতো। এসব সম্প্রদায়ের উৎপত্তির বর্ণনা বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পাঁচ সংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংখ্যা দ্বারা হাতের পাঁচ আঙ্গুলকে বোঝানো হতো, যার প্রতিলিপি হিন্দুদের বাড়ির দরজার উপর মন্ত্রস্বরূপ লিখে রাখা হতো। শিয়া মুসলমানদের কাছে মহরমের পাঞ্জা ছিল 'পাঞ্জাতনের' পাঁচটি উর্ধ্বমুখী প্রতীক (নবী, আলি, ফাতেমা, হাসান ও হোসেন)। সম্ভবত এই সংখ্যাটি পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীকে বোঝাতো এবং এই ধারণা পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছিল। বাংলার নাবিকেরা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য এদের উপাসনা করতো। মুসলমানরা আল্লাহ্, নবী, পাঁচ পীর, বদর এবং অন্যদের নাম উচ্চারণ করতো। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচ পীরের পরিচয় নিশ্চিতভাবে জানা ছিল না। এই পাঁচ পীরের মধ্যে ছিলেন দুই জন হিন্দু—ভাইরূন ও সতী (মুসলমানদের কাছে আমিনা নামে পরিচিত) এবং তিন জন মুসলমান আজাব সালার, হাতিল পীর এবং রাজিব সালার। বাংলায় ছিলেন মানিক পীর (বদর পীর ?), গুরু পীর, কুম্ভীরা পীর ও মাদারী পীর। কিন্তু তাঁদের স্মরণে কোন অনুষ্ঠান হতো না। জেম্স ওয়াইজ সোনারগাঁয়ে পাঁচ পীরের দরগাহের পাঁচটি অসম্পূর্ণ সমাধির সন্ধান পান, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রার্থনা করতো। একে ইসলাম ও সর্বপ্রাণবাদের একীভবন বলে মনে করা হতো। অন্য কথায় এ ছিল পীরদের কাহিনী সম্বলিত

---

২১. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, IX, 600 ff.; Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam, 272-73;* Hodges, *Travels*, 35; J. N. Sarkar, *Islam in Bengal*, 9.

সর্বপ্রাণবাদ। এই ধর্মীয় মতবাদ মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব বা পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। পশ্চিম বাংলার কিছু অঞ্চলে, যেমন মেদিনীপুর ও বর্ধমানে এখনও পাঁচ পীরের উপাসনা করা হয়।

পাঁচ পীরের মতবাদের সাথে গাজী মিয়ার মতবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। গাজী মিয়া ভারাইচের সালার মাসুদ নামে পরিচিত ছিলেন এবং ১৩০৪ সালে হিন্দুদের সাথে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। মুহুরা গাজীর (মোবরা বা পীর গাজী মুবারক আলি সাহেব) দরগাহ্ শিয়ালদহের ঘুটিয়ারী শরিফে অবস্থিত।[২২]

পানির পীরের মতো বাংলায় কিছু জঙ্গলের পীরও ছিলেন, যেমন পীর ঝরিয়াঁ (বনের পীর) ও গুগা পীর (সর্পরাজ জহির পীর নামে পরিচিত)। তাঁরা সম্ভবত সিন্ধুর জঙ্গলের দেবতাদের অনুরূপ ছিলেন। বাংলার সুন্দরবনের জঙ্গল ও নদী বাঘ, কুমির ও সর্পে পরিপূর্ণ ছিল। হিন্দু-মুসলমান কাঠুরিয়ারা এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব পৌরাণিক পীরের পূজা করতো। যেমন ২৪-পরগনার মহুরা (মবরা বা মুবারক) গাজী, বদ্বীপের পূর্বপার্শ্বের হাকিয়া নদীর তীরবর্তী জিন্দা গাজী, হিন্দুদের কালু রায় ও দক্ষিণা রায় (যিনি বাঘে চড়তেন)। জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে ও পানিতে নামার প্রাক্কালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় এসব ধর্মীয় স্থানে (কিছু মাটি স্তূপ করে রাখা স্থান) উপাসনা করতো। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদের প্রার্থনার আচার-আচরণ ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট কিছু মুসলমান সম্প্রদায় ছিল, যারা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে হিন্দুদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করা যেতো। বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণ একই রকম ছিল। কিশোরগঞ্জ উপজেলার (বর্তমানে জেলা) মুসলমানদের মধ্যে 'খুদা কা ঘর' (আল্লাহর ঘর) এবং 'বিষহরি মাই কা ঘর' (মা বিষহরি বা সর্পদেবীর ঘর) উভয়ই ছিল। প্রত্যেক গ্রামে কালীস্থান (কালীমন্দির) ছিল। প্রত্যেক মুসলমান গৃহে আল্লাহর ঘর (খুদা-ই-ঘর) ছিল। জনগণ উভয় স্থানেই প্রার্থনা করতো। এমনকি মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি অংশ ভগবতী দেবীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতো। উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা করতো। উপাস্য দেব-দেবীর মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল দেবতা মহারাজ, যার

---

২২. *Census Report,* 1951; *West Bengal District Hand-book,* 24 Parganas, XLIV-V, 359.

২৩. *District Gazetteer : Purnea,* 58; J. N. Sarkar, *Thoughts and Trends of Cultural Contacts in Medieval India,* 44-51.

২৪. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trade of Eastern Bengal,* (London 1884), 35; *Asiatic Journal,* IV, 75-76.

প্রতীক ছিল বাঁশ ও কুলা, ধনুক, পুরাতন মাছ ধরার জাল এবং বড়শি। ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু বৈষ্ণব মুসলমান অন্যান্য মুসলমানের সাথে একসাথে আহার করতো না। তারা তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতো।[২৩]

উনিশ শতকে বাংলায় মরমীরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে যারা আচার-আচরণে পবিত্র আইন মেনে চলতো, তাদের বলা হতো 'বাশর' বা 'সালিক'। তাদেরকে অন্যান্য বেশর ও মাজজুবদের (যাদের আচার-আচরণ ভিন্ন ছিল) চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করা হতো।[২৪]

মোল্লাতন্ত্র

যদিও ইসলামে যাজকত্বের কোন স্থান নেই, তথাপি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান যাজকদের অর্থাৎ মোল্লাদের প্রভাবের বর্ণনা আছে। গ্রামের মুসলমানরা অর্থের বিনিময়ে ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণে পারদর্শী মোল্লাদের পরামর্শ গ্রহণ করতো। নুসরাত শাহের আমলের এক শিলালিপির বর্ণনায় সমাজে মসজিদের ভারপ্রাপ্ত মোল্লার প্রভাব সম্বন্ধে জানা যায়। সমাজে তাঁর স্থান ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা পুরোহিতের অনুরূপ।[২৫]

জনপ্রিয় মতবাদ : সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের উপাসনা

হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শত শত বছরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে তাদের উপাস্য একই রকম হয়ে দাঁড়ায়। এক সম্প্রদায় দুঃখ-দুর্দশা বা অসুস্থতার সময় দেব-দেবী বা পীরের উপাসনায় সুফল না পেলে অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্যের শরণাপন্ন হতো। বুকানন লক্ষ্য করেছেন যে, রংপুরে ব্রাহ্মণ, মোল্লা ও ফকিরদের মধ্যে এই রকম প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী গোরখপুরে উচ্চবংশীয় বিদেশী মুসলমানরাও হিন্দু রমণীদের মাধ্যমে হিন্দুদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হতো। অনুরূপভাবে বাংলায় কোন ধরনের মূর্তির মাধ্যম ছাড়াই মুসলমান ও হিন্দুরা যথাক্রমে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের উপাসনা করতো। উপাস্যকে অত্যন্ত সৎস্বভাববিশিষ্ট এবং যেকোন তুচ্ছ বিষয়ও সম্পাদনে সদাপ্রস্তুত বলে মনে করা হতো। পাহাড়পুরে বৌদ্ধ মঠের সত্যভিটা খননের সময় মুসলমানদের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল।[২৬]

নবীর পদচিহ্ন

ঢাকার পূর্বদিকে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী কদম রসুল এবং গৌড়ের কদম রসুল ভবন ও বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো কদম রসুল ভবনসমূহকে গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের

---

২৫. Mukundaram, *Kavikankan Chandi*, 343-44; *Padma Puran*, (ed) B. K. Bhattacharya, 54, J. N. Sarkar, *Hindu-Muslim Relations*, 75-76

২৬. Martin, *Eastern India*, II, 145, 445-46, J N. Sarkar. *Hindu-Muslim Relation*, 75-76.

সাথে এবং কদম রসুলের মুতাওয়াল্লি বা তত্ত্বাবধায়কদের গয়ওয়াল ব্রাহ্মণদের সাথে তুলনা করা যায়। এই ঐতিহ্য বর্ধমানের ধর্মপাদুকায়, মোয়াজ্জেমপুরে শাহ লঙ্গরের দরগাহে (এখানে নবীর পদচিহ্ন আছে) এবং উত্তর বাংলায় পীরগঞ্জে ইসমাইল গাজীর পবিত্র স্থানের উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে বর্তমান।

এযাবৎ বিদ্যমান স্থানীয় প্রথা এবং লোকগাথা

মুগল যুগে ও বর্তমান সময়ের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় প্রথা ও কুসংস্কারপূর্ণ লোকগাথার সংশ্লেষণমুখী প্রভাব হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। এর কিছু কিছু এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে। বিদেশী মুসলমানরা যে এ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল তা নয়, তবে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এগুলিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দুদের মতো বিদেশী ও দেশী মুসলমানদের হস্তরেখাবিশারদ (নাজুমি বা নায়ুমি)-এর প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। এমনকি মুগল শাসকরা যুদ্ধযাত্রার শুভ সময় জানার জন্য তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বাংলার সুবাদার ও নবাবরা কোন সামরিক অভিযানের জন্য বা অন্য কারণে বহির্গমনের উদ্দেশ্যে হস্তরেখাবিশারদদের উপদেশ গ্রহণ করতেন। মির্জা নাথনের *বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে* এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। এছাড়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনীবিদ্যা ও ইন্দ্রজালের প্রতি আকর্ষণ ছিল। জাদুবিদ্যার প্রতিও বিশ্বাস ছিল। ভারতীয় মুসলমানরাও অশুভ শক্তিকে ভয় করতো। মুসলমানদের শুফলি-আমল হিন্দুদের শত্রু বা দুষ্ট দেবতা দমনের জন্য ময়লা-আর্বজনা ভক্ষণ বা তা ব্যবহারের রীতির অনুরূপ ছিল।

হিন্দু মহিলাদের মতো মুসলমান মহিলারা গর্ভে পুত্রসন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে নানা রীতিনীতি অনুসরণ করতো এবং মন্ত্রপূত পানীয় ও ঔষধ পান করতো। কিন্তু অনেক সময় তা গর্ভবতীর জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতো। অজ্ঞ মুসলমানরা মনস্কামনা পূরণের জন্য মৃত হিন্দুদের চিতাভস্ম ব্যবহার করতো। মানুষের উপর চন্দ্রের প্রভাব স্বীকার করা হতো। হিন্দু ও মুসলমানরা গর্ভবতী মহিলাদের উপর সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের কুপ্রভাব সম্বন্ধে ভীত ছিল এবং ঐ সময়ে শান্তভাবে শয়ন করতে ও অভুক্ত থাকতে বলা হতো। সপ্তাহের বিশেষ দিন, যেমন বুধ বা বৃহস্পতিবার শিশুর জন্মের জন্য অশুভ বলে মনে করা হতো। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী ষষ্ঠ দিন (ছঠি) মাতার রক্ত দূষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার দিন বলে গণ্য হতো। মুসলমান মহিলাদের চাঁদের আলোতে রাখা পানি পান করানো হতো। হৃদরোগ থেকে আরোগ্যলাভের জন্য হিন্দুদের সোমরস পান করার প্রথা থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ই ভূত-প্রেত, যেমন মতি বা উম্মা-ই-শিবইয়ানকে (শিশুদের মা) ১৮ মাস বয়সী সন্তানের খিঁচুনি রোগের কারণ বলে মনে করতো। আঞ্চলিক রীতির প্রভাবে বাংলার মুসলমান সমাজে শিশু যে ঘরে জন্মগ্রহণ করতো (সুতিকাগার বা

অশুচিঘর) সেই ঘরে কিছু আচার সম্পন্ন করা হতো এবং খৎনা ও বিবাহ উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।[২৭]

বিকলাঙ্গ বা দরিদ্র ব্যক্তির বদনজরের ভয় ছিল একটি সাধারণ কুসংস্কার এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও এই কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। কিছুটা বিদেশ থেকে এবং কিছুটা দেশীয় সংস্কার থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল। প্যান-এশিয়ান মুসলমানদের 'নিথার' উৎসব ছিল অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করার বা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান, যা হিন্দুদের উতরা বা আরতি উৎসবের অনুরূপ। বদনজরের মোকাবেলা করবার জন্য নাম গোপন রাখা হতো বা নামের সংখ্যা বাড়ানো হতো। এমনকি মুগল শাসকরাও এই উদ্দেশ্যে অসংখ্য নাম ধারণ করতেন। হিন্দুরা লেবুকে এর প্রতিষেধক মনে করতো। কোন ব্যক্তিকে ভূত-প্রেতের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য পাখা বা গাছের শাখা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক দেয়া হতো। একে হিন্দুদের রীতি (পশু বা মুরগি হত্যা করা বা মুক্ত করা) অথবা অন্য মুসলিম দেশ হতে আমদানিকৃত রীতি বলে মনে করা হতো। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোরানের আয়াত বা অন্য পবিত্র বাণী পাঠ করা হতো।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষকরে বাংলায় অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা বসন্ত রোগের দেবী শীতলার উপাসনা করতো। হিন্দুরা কলেরা রোগের দেবী ওলাদেবীর এবং মুসলমানরা ওলাবিবির উপাসনা করতো। অবসাদ, বিষাদ ও মূর্ছারোগগ্রস্ত মহিলারা অমঙ্গলকারী সাধু মহিউদ্দিন ওরফে শেখ সাদ্দুর তুষ্টি সাধন করতো। এই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম সাধু অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতেন। তেরো শতকে আমরোহাতে অবস্থিত একটি মসজিদে তাঁর আশ্রম ছিল।

উদার ও কট্টরপন্থীদের মধ্যে বিরোধ

অতীতকালে সকল দেশের সমাজ কট্টর ও উদার মতাবলম্বী পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল। মুগল যুগেও এই রকম অবস্থা বিদ্যমান ছিল। আকবরের উদারনৈতিক মতবাদ কট্টর ও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী শেখ আহমেদ সিরহিন্দীর নকশবন্দি মতবাদের সৃষ্টি করেছিল, যা আওরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০২-৬৩) শিক্ষায় উজ্জীবিত মুজাহিদীন আন্দোলনের মধ্যে এই মতবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যাকে ভুল করে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ওয়ালিউল্লাহর ছেলে আবদুল আজিজের একজন অনুসারী সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী শুরু করেন। এই আন্দোলন ছিল ভারতে গ্রামভিত্তিক প্রথম ইসলামী জনপ্রিয়

---

২৭. Hughes, *Dictionary of Islam*, 114-15, 221-22; *Baharistan-i-Ghaibi*, tr. M. I. Borah, II, 671-72; Jafar Sharif, *Qanun-i-Islam*, 2-6, 31-35, 84, 338.

গণআন্দোলন। বাংলায় মৌলিক ফরায়জী আন্দোলন শুরু করেন হানাফী মতবাদের শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর সন্তান দুদু মিয়া। পরে এই আন্দোলন তীতুমীরের সময় (১৮৩১) জঙ্গি রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে আপোষবিমুখ (গায়ের মুকাল্লিদ) আহল-ই-হাদিসের অগভীর ও বাস্তবতাবিমুখ মৌলবাদী মতবাদ (যা ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে) বহুঈশ্বরবাদী (শির্‌ক) ও অন্যান্য নতুন মতবাদের (বিদা) প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য

কেবল সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত ব্যতীত সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একীকরণ এবং এই অঞ্চলে অর্জিত অর্থনৈতিক উন্নতি বাংলাসহ সমগ্র ভারতে মুগল শাসনের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে। শিক্ষা, সাহিত্য ও ললিতকলায় এর প্রতিফলন ঘটে।

শিক্ষা

বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি হচ্ছে জ্ঞানপ্রসারের পূর্বশর্ত। সুলতানি যুগের তুলনায় মুগল আমলে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল বেশি। উভয় ক্ষেত্রেই মুগল শাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা অন্য সামাজিক কার্যকলাপের মতোই প্রাক-আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। তুর্কীদের বিজয়ের কয়েক শতক পরেও হিন্দুরা তিমুরীদের নেতৃত্বে শিক্ষার আলোকবর্তিকা তাদের নিজেদের পাণ্ডিত্যের আলোকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করেছিল। সুলতানদের আমলে মুসলমানদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা একই ধারায় প্রসারলাভ করেছিল। অন্যান্য স্থানের মতো দারুল ইসলামেও এর প্রতিফলন ঘটেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামে ও শহরে পাঠশালা ও মক্তবের মাধ্যমে বিস্তারলাভ করেছিল, যেখানে পণ্ডিত ও মৌলবিরা (মুকাদ্দাম বা মুকুন্দরামের মখদুম) শিক্ষাদান করতেন। মুদ্রিত বই না থাকায় এখানে ছাত্রদের হস্তলিপি পড়ানো হতো এবং অর্থ না বুঝেই মুখস্থ করার জন্য ছাত্রদের বাধ্য করা হতো। চার পর্যায়ে চারটি মাধ্যমে লেখা অভ্যাস করতে হতো—তালপাতা, কদলীপাতা, কাগজ, মাটি ও বালু। শ্লেট, পেন্সিল বা ব্ল্যাকবোর্ডের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাথমিক গণনা শুভঙ্কর ও নামতা (পহর) পদ্ধতিতে শেখানো হতো। হিন্দু বালক-বালিকারা সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান, পুরাণ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করতো। মুগল যুগে মুসলমান বালক-বালিকাদের এখনকার মতো প্রাথমিক ব্যাকরণ (আমাদনামা), চিঠি-পত্র লেখা, শেখ সাদি (গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ) ও ফেরদৌসির কাব্য, কোরান মুখস্তকরণ ও আরবি হস্তলিপিবিদ্যা বিনা বেতনে শিক্ষাদান করা হতো। হিন্দু শিক্ষকগণ ধনীদের কাছ থেকে ভাতা পেতেন। মুসলমান শিক্ষকগণ

বেতন, বৃত্তি ও ভাতা পেতেন। উচ্চ ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য শহরে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা ও কলেজ ছিল, যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রের ভুমিকা পালন করতো। হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষার স্থানগুলি টোল ও চতুষ্পাঠী নামে পরিচিত ছিল। তাছাড়া কিছু কিছু উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রও ছিল। বাংলায় প্রাক-মুগল আমলের কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরও বিকাশলাভ করেছিল। এগুলো অবস্থিত ছিল পাণ্ডুয়া, সোনার গাঁ, সাতগাঁও, ঘোড়াঘাট, নাগৌর (বীরভূম), বাঘা (রাজশাহী) ও চালগামে। মুগল আমলেও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যেমন ঢাকার বড় কাটরা, ছোট কাটরা ও লালবাগ এবং মুর্শিদাবাদের কাটরা মাদ্রাসা। পাটনা, আজিমাবাদ ও পূর্ণিয়াতেও এধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন*-এর প্রণেতা গোলাম হোসেইন আলিবর্দীর শাহী দরবারের ফার্সি ভাষায় পারদর্শী বিদ্বান ও বিখ্যাত অধ্যাপকদের চারশ' ছাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আজিমাবাদে জয়নুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করতো। ইতিহাসবিদগণ বিহারের কাজি গোলাম মুজাফ্ফরের নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি আলিবর্দীর পরিচিত ছিলেন এবং যাঁকে মুর্শিদাবাদের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল, যদিও তখন বহু ইরানীয় অভিবাসী পণ্ডিত বিহার ও পাটনায় বসবাস করতেন। গোলাম ইয়াহিয়া মুফতি, জিয়াউল্লাহ মীর ওয়াহিদ, মৌলবি লাল মোহাম্মদ, শেখ হেদায়েতউল্লাহ আবদুল হাদী ও গোলাম হোসেইন পূর্ণিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা পূর্ণিয়ার উপ-প্রশাসক সৈয়দ আহমদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[২৮]

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বাংলায় তিন রকম প্রতিষ্ঠান ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল : (১) ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য (কবিতা ও নাটক), অলঙ্কারশাস্ত্র ও পুরাণ; (২) আইন—'দায়ভাগ', 'মিতাক্ষরা' ও 'প্রাচীন স্মৃতি', যা বাংলার যশোরের এক ব্রাহ্মণ শূলপাণি রচনা করেন এবং 'শ্রদ্ধা চিন্তামণি,' যা মিথিলার বাচস্পতি মিশ্র রচনা করেন; নদীয়ার রঘুনন্দন রচিত গ্রন্থ আইন শিক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল; (৩) ন্যায়শাস্ত্র (যুক্তিবিদ্যা)। ন্যায়শাস্ত্র পর্যায়ের অধিবিদ্যার জন্য বাংলার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং তা বাংলার পণ্ডিতদের গর্বের বিষয় ছিল। ভারতে অন্য কোথাও এই শাস্ত্র এত গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হতো না। চিকিৎসাবিদ্যা. দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতির্বিদ্যা ও 'তন্ত্র' কেবল ব্রাহ্মণরাই নয়, বৈদ্য ও কায়স্থরাও অধ্যয়ন করতো। উইলিয়ম এ্যাডাম তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং এই শাস্ত্রের অনুরাগীদের জ্ঞানের গভীরতার সাথে সাথে তাদের নম্রতা ও সরলতার উল্লেখ করেছেন।[২৯] নদীয়া ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। নদীয়া, শান্তিপুর ও গোপালপাড়ায় তার শাখা ছিল। নদীয়া ছিল ন্যায়শাস্ত্রের দু'টি শাখার জন্মস্থান, যার একটি বাসুদেব সর্বভৌম এবং অপরটি তাঁর ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি প্রতিষ্ঠা

---

২৮. "Siyar-ul-Mutakherin," II, 135, 175-76

২৯. Adam's *Reports* 113, 169-70; Martin, *Eastern India*, II, 715-17.

করেছিলেন এবং তা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিখ্যাত কেন্দ্র মিথিলাকে পর্যন্ত নিষ্প্রভ করে দেয়। সুষ্ঠু সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা না থাকার কারণে বড় বড় জমিদার, যথা নাটোরের রানী ভবানী, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, দ্বারভাঙ্গার রাজা ও আরো অনেকের পৃষ্ঠপোষকতায় এ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

মুগল শাসনের এক অনন্য অবদান ছিল ফার্সি ভাষায় পারদর্শী হিন্দু শাসকশ্রেণী। বাংলায় নবাবি শাসনের আমলে সংস্কৃতিবান হিন্দুরা ফার্সি ভাষাকে শিক্ষার অন্যতম বাহন বলে গণ্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ ফার্সি ভাষায় পারদর্শী কতিপয় পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, যিনি *ধর্মমঙ্গলের* কবি রামচন্দ্র মুনশির কাছে ফার্সি ভাষা শিক্ষালাভ করেন; আলিবর্দীর বিভিন্ন হিন্দু কর্মচারী, যাঁদের মধ্যে ছিলেন আলিবর্দীর দীউয়ান রাজা কিরাতচাঁদ (রায়রায়ান আলমচাঁদের পুত্র), যিনি হিন্দুদের মধ্যে ফার্সি ভাষায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন এবং রাজা রামনারায়ণ (রঙ্গলালের পুত্র), যিনি পরবর্তীকালে বিহারের উপশাসক হয়েছিলেন এবং যাঁর আরবি ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শিতা ছিল, ফার্সি ও উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবি মহারাজা কল্যাণ সিংহ (রাজা সিতাব রায়ের পুত্র) এবং রাজা নবকৃষ্ণ, যিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের শিক্ষক ছিলেন। এ্যাডামের মতে, বাংলার যে পাঁচটি জেলায় তিনি ভ্রমণ করেছিলেন সেখানে ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অধিক ছিল।[৩০]

বাংলায় মক্তব ও মাদ্রাসাব্যবস্থা মুগল শাসনামলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থা বৃটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হয়, যা পরবর্তীকালেও বলবৎ ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অনেক ফার্সি স্কুলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলায় ফার্সি স্কুলের অনুসরণে বৃটিশ প্রশাসকরা ইঙ্গ-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। আধুনিক প্রাচ্যভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে বাংলার মুসলমানদের জন্য কলকাতা মাদ্রাসা ও হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হাজি মুহম্মদ মহসিন মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রদান করেন।

শিক্ষাব্যবস্থা কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মুগল শাসনের এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। প্রাথমিক স্তরে মহিলাদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়িতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হতো। মুগল দরবারের বহু রাজকন্যা ও হেরেমের মহিলারা বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তন্মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রোকেয়া বেগম, যাঁর স্বামী

৩০. Adam's *Reports*, 293.

ছিলেন সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহ জঙ্গ, শায়েস্তা খানের দুই কন্যা ইরান দুখত (পরী বিবি) এবং তুরান দুখত (বিবন বিবি), মুর্শিদকুলীর কন্যা এবং শুজাউদ্দিন মোহাম্মদ খানের স্ত্রী জিন্নাত-উন-নেসা এবং তাঁর কন্যাদ্বয় নফিসা বেগম ও দুর্দানা বেগম, আলিবর্দীর স্ত্রী শরফুন্নেসা, তাঁর কন্যা মেহের-উন-নেসা (ঘসেটি বেগম), মায়মুনা বেগম এবং আমিনা বেগম, আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও আতাউল্লাহ খানের স্ত্রী রাবেয়া বেগম। এ্যাডামের বর্ণনায় জানা যায়, সমসাময়িক সাহিত্যে তৎকালীন শিক্ষিত মহিলাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত মহিলা ছিলেন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের নায়িকা রাজকন্যা বিদ্যা তাঁর হবু স্বামীকে দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মের তর্কে পরাজিত করেছিলেন।

মুগল আমলে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সাথে পাঠাগার উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বহু পূর্বে মুসলমানরা কাগজের প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানার (মুগল আমলের শেষপ্রান্তে যার প্রচলন শুরু হয়েছিল) অভাবে ভাল হস্তলিপিকার ও নকলনবিশদের দ্বারা পুস্তক লিখিয়ে প্রকাশ করা হতো। তাঁরা মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিটি বড় শহরে ভিড় করতেন। কোন ব্যক্তির নিজস্ব পাঠাগারকে আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করা হতো। মুগল রাজধানীগুলিতে বহু পাঠাগার ছিল। বাংলায় ইসলাম খান চিশ্‌তীর পাঠাগারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি পাঠাগারের জন্য বই লিপিবদ্ধ করার কাজে লিপিকার নিয়োজিত করেছিলেন। মির্জা নাথনের বর্ণনায় রয়েছে, লিপিকার মির্জা মোহাম্মদকে ইসলাম খান চিশ্‌তীর[৩১] পাঠাগারের জন্য তিনি বই নকল করতে দেখেছেন। মুর্শিদকুলী খানের একটি মনোরম পাঠাগার ছিল এবং তিনি নিজেই কোরান নকল করতেন। এ্যাডামের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বাংলার মাদ্রাসাগুলোয় ছাত্ররা তাদের নিজস্ব বই নকল করতো। স্যার যদুনাথ সরকার স্বীকার করেছেন এবং আমাদেরকেও স্বীকার করতে হবে যে, পাণ্ডুলিপি নকল ও পুস্তক বিতরণের মাধ্যমে মুসলমানরা (বিশেষকরে মুগলরা) জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। অথচ হিন্দু লেখকেরা সাধারণত তাঁদের রচনাবলী গোপন রাখতেন।[৩২]

মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ থেকেই মুসলমানরা আরবি ও ফার্সি ভাষায় বই লিখতে শুরু করে।[৩৩] কিন্তু মুগল বাংলায় ফার্সি ভাষা প্রশাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ার ফলে বাংলায় বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসিত কিছু কিছু সীমান্তরাষ্ট্রে, যেমন রোসাং (আরাকান এবং ত্রিপুরা) রাজ্যে বিকশিত হয় বলে যে ধারণা করা হয় তা অর্ধসত্য বলে প্রতীয়মান হয়। একথা সত্য যে, তুর্কীদের বাংলাবিজয়ের পর প্রায় এক শতাব্দী বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা স্তিমিত ছিল। সমাজ ও সংস্কৃতির চালিকাশক্তি হিসেবে সংস্কৃত ভাষা এ ভাষার পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে

৩১. *Baharistan-i-Ghaibi,* Vol. I, 155.

৩২. J. N. Sarkar, India Through the Ages, (Calcutta 1928), 52.

৩৩. Aziz Ahmad, *Intellectual History,* 113 ff.

পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে চৌদ্দ শতকে ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পরে এক নতুন উজ্জীবনের সৃষ্টি হয়। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব মতবাদ বিকশিত হওয়ার ফলে বাংলার পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব পদাবলী, কড়চা সাহিত্য এবং সাধুদের জীবনবৃত্তান্ত রচনা শুরু করেন। এছাড়াও ব্রতগীত পাঁচালী (দেব-দেবীর সম্মানে রচিত ধর্মীয় পদাবলী), যেমন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং নাথপন্থী যোগী সিদ্ধাকথা রচিত হয়েছিল।

মুগল আমলে বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি সাধিত হয়। যদিও তখন সুলতানি আমলের মতো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না, তথাপি দেশের অবারিত শান্তি ও সমৃদ্ধির কারণে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারে ফার্সি ও আরবি সাহিত্য এবং ইসলামী ঐতিহ্যের মূল্যবান অবদান এবং উচ্চবংশীয়দের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা ভাষার উন্নয়নের পথে সহায়কশক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি এবং পারস্যের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারার সংস্পর্শে আসে। অসংখ্য ইরানী ও তুর্কী কর্মচারী, সুফি, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ী বাংলায় আসতে থাকে। ফলে চিন্তাধারার উন্নতি সাধিত হয়, যা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত করে। মুসলমানদের পুঁথিসাহিত্যের মধ্যে বহু আরবি ও ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে, যা বাংলা ভাষার শব্দকোষকে সমৃদ্ধ করে।

ষোল শতকের শেষভাগ হতে বহু মুসলমান কবি ও লেখক বাংলা ভাষায় লেখার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এদের নেতা ছিলেন সৈয়দ সুলতান (১৫৩০-১৬৪৮)। তিনি চট্টগ্রামের এক পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর *ওফাত-ই-রসুল* গ্রন্থে তিনি আরবি ভাষায় বাঙালি মুসলমানদের অজ্ঞতার কারণে নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন যেন তারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং হিন্দু কাব্যগাথা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তিনি তাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের ব্যাপারে শেখ আহমদের (মুজাদ্দিদ-ই-আলফে-সানি) প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কেবল *নবীবংশ* (নবীপরিবারের ইতিহাস) রচনা করেন নি, দু'টি মরমী গাথাও রচনা করেন, যেমন *জ্ঞান চৌতিশা* ও *জ্ঞান প্রদীপ*। এসব রচনায় সুফিবাদ ও যোগবাদের সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল। এই দলের আরও দুই জন সদস্য হলেন *নূরনামা* (নবীর জন্মবৃত্তান্ত) ও *নসিহতনামা* (ইসলামী আদর্শ ও প্রথা) রচয়িতা শেখ পরাণ (১৫৫০-১৬১৫) এবং নসরুল্লাহ, যাঁদের দু'জনই চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শেখ পরাণের মতো হাজি মোহাম্মদ নুরজামাল ইসলামী মৌলিক নীতি সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে ইসলামের মৌলিক আদর্শের বর্ণনা আছে। বিখ্যাত রাস্তি খান পরিবারের মোহাম্মদ খান তাঁর শিক্ষক সৈয়দ সুলতানের মতো ধর্মীয় ও মরমী সাহিত্য

রচনা করেন। তাঁর রচিত *মুকতুল হোসেন* মহরমের সময় বাংলাদেশে পাঠ করা হতো। সন্দ্বীপের আবদুল হাকিম একজন মেধাবি কবি ছিলেন। তিনি প্রেম-উপাখ্যান বিষয়ক সাতটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর *নূরনামায়* বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করেন। তিনি বাংলায় বসবাসরত বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা ভাষায় অজ্ঞতাকে ঘৃণা করতেন। এমনকি তিনি তাদের জারজ বলে অভিহিত করেছিলেন। মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহশালায় মুসলমানদের লেখা এই জাতীয় প্রচুর পুস্তক পাওয়া যায়।

বাঙালি মুসলমানদের ফার্সি ও হিন্দি ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে রোমান্টিক কবিতার উৎপত্তি হয়। হিন্দু কবিদের রচনার প্রধান বিষয় ছিল দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা। অন্যদিকে মুসলমান কবিরা রোমান্টিক বর্ণনামূলক কাব্য ও প্রেমসঙ্গীত রচনা অপ্রতিরোধ্য গতিতে চালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রেমউপাখ্যান *বিদ্যাসুন্দর* ছিল প্রথম প্রেমগীতি, যা হিন্দুরা রচনা করেছিলেন। সতেরো শতকের একমাত্র মুসলমান কবি ছিলেন শাবারিদ খান। সতেরো শতকে ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় রচিত প্রেমউপাখ্যানমূলক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত দু'টি প্রেমজ ও রূপক কাব্য উত্তর ভারতীয় সুফি কবি কুতবন (১৫০০ খৃ.) রচিত *মৃগাবত* এবং মালিক মোহাম্মদ জায়সী (১৪৯৩-১৫৪২) রচিত *পদুমাবত* রোসাং (আরাকান) রাজদরবারের দুই জন কবি বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁদের একজন ছিলেন চট্টগ্রামের দৌলত কাজি (১৬০০-১৬৩৮), যিনি আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি *সতীময়নার* রচয়িতা ছিলেন, যার ভিত্তি ছিল হিন্দু ধর্মীয় মৈনসাত এবং বারমাস্যার গীতিকার লোর চন্দ্রানী। অন্যজন ছিলেন আলাওল। তিনি ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাঙালি কবিদের মধ্যে উচ্চসম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল জায়সীর হিন্দি রূপক কাব্য *পদুমাবতের* বাংলা অনুবাদ *পদ্মাবতী* এবং দৌলত কাজির *সতীময়না*। তাঁর রচিত কাব্য *সয়ফুল-মুলক বদিউজ্জামাল* আরব্য রজনী উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তাঁর দু'টি বর্ণনামূলক কাব্য *সপ্ত পয়কর* এবং *সিকান্দারনামা* নিজামী গজনভীর আদর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। আলাওল কেবল তাঁর উপমা, বর্ণনাদক্ষতা এবং রচনাপদ্ধতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, মানবজীবনের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্যও খ্যাত ছিলেন। তাঁর কবিতায় জীবনের বিভিন্ন সময়ের সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছিল, যার প্রভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়েছিল।

রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে ইজ্জতুল্লাহ বাঙালির ফার্সি রচনার অনুকরণে নওয়াজিশ খান *গুলে বকাওলী* রচনা করেছিলেন। খলিফা ওসমানের বংশধর বলে দাবিদার চট্টগ্রামের মোঃ ওয়াজির আলি *শাহনামা* (নাসল-ই-ইসলামাবাদ নামেও পরিচিত) রচনা

করেছিলেন। গ্রন্থটি সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ এবং আরবি অপভ্রংশ দ্বারা পরিপূর্ণ। কুমিল্লার শেখ সাদি রচনা করেছিলেন *গদা মল্লিকা* নামের বিখ্যাত প্রেম-উপাখ্যান। এর বিষয়বস্তু ছিল রাজকন্যা মল্লিকা ও আবদুল্লাহ্ গদার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্ক। আবদুল্লাহ্ গদাকে রাজকন্যার ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে হাজারটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

সতেরো শতকে ত্রিপুরার বহু কবি প্রেম-উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর ফার্সির অনুকরণে *জেবল মুলক শামারুখ* রচনা করেছিলেন। শুকুর মোহাম্মদ রাজা গোপীচন্দ্র ও রানী ময়নামতীর প্রাচীন গাথার উপর ভিত্তি করে *ময়নামতীর গান* রচনা করেছিলেন। মোহাম্মদ রফিউদ্দিন *জেবল মুলক শামারুখ* এবং মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক *সয়ফুল মুলক লালবেনু* রচনা করেছিলেন।

ষোল শতকের শেষভাগে ও সতেরো শতকের প্রথমভাগে বাংলায় আমদানিকৃত আরবি ও ফার্সি সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে মুসলমান বীর, নবী ও খলিফাদের গৌরবগাথা রচিত হয়। এগুলিকে হিন্দু পুরাণ পাঁচালীর অনুকরণে মুসলিম 'পুরাণ পাঁচালী' বলা হতো। এগুলি দুই ধরনের ছিল––নবী বিষয়ক এবং খলিফা বিষয়ক। নবী বিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে *নবীবংশ, রসুলবিজয়, রসুলনামা* ও *মোহম্মদ বিজয়*। এগুলি ষোল শতকে বিভিন্ন কবি, বিশেষত মোহাম্মদ খান, সৈয়দ সুলতান, নসরুল্লাহ্ খান, চট্টগ্রামের মনসুর, উত্তর বাংলার হায়াত মামুদ, পশ্চিম বাংলার গরিবুল্লাহ এবং আঠারো শতকে বীরভূমের (?) হিন্দু কবি রাধাচরণ গোপ কর্তৃক রচিত হয়েছিল। সৈয়দ সুলতান *নবীবংশ* ও *জঙ্গনামা* (খলিফাদের যুদ্ধ ও বিজয় এবং অন্তর্কলহের বিবরণ) রচনা করেছিলেন।

পনেরো শতকে ত্রিপুরায় অসাম্প্রদায়িক রচনার মধ্যে আমরা পাই দুই ভ্রাতা শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর (১৪০৭-৯৩) রচিত *রাজমালা,* যাতে রাজপরিবারের বর্ণনা আছে। এই রচনায় বাংলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি নওয়াজিশ খান পাঠান প্রশংসা পর্যায়ে দু'টি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি চট্টগ্রামের গভর্নর হোসেন খানের পরিবার প্রসঙ্গে এবং অপরটি জরওয়ার সিংহ কীর্তির জমিদারি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে।

মুগল যুগে হিন্দু ও মুসলমান লেখক ও কবিদের রচনায় প্রাক-মুগল যুগের উদার মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায় এবং এতে দুই সম্প্রদায়ের মরমী ভক্তিবাদের সমন্বয় ঘটে। সাহিত্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ষোল শতকে সহজ সাধনা সুফি মতবাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছিল। হিন্দু কবিরা তাঁদের দেব-দেবীদের রহস্য সম্পর্কে কাব্য রচনা করলেও মুসলমান কবিরা অপভ্রংশ যুগের রোমান্টিক কাব্য রচনা চালিয়ে যান।

সুফি যোগী ভক্ত কবি সৈয়দ সুলতান এক তান্ত্রিক নিবন্ধে যোগ (*জ্ঞানপ্রদীপ* অথবা *জ্ঞানচৌতিশা*) সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি তাঁর রচনার নাম সংস্কৃত *হরিবংশের* অনুকরণে

নবীবংশ রেখেছিলেন, যার মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের অনেক তথ্য ছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনায় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব ছিল। এতে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাপ্তি ও ধর্মীয় উদারতার পরিচয় মেলে। বিশেষকরে, সতেরো শতকের শেষভাগে পীর ও সুফিদের বিজয়ী, লুণ্ঠনকারী, শাসক অথবা গুণী সাধু হিসেবে বর্ণনা করে যেসব সাহিত্য রচিত হয় সেগুলি 'পীরপাঁচালি' ও 'পীরগাথা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শ্রীচৈতন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব দূর করেন এবং মুসলমান পীর ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবার উদ্দেশ্যে ধর্মনির্বিশেষে সকলের মধ্যে 'কৃষ্ণভক্তি' ও 'নামনিষ্ঠা' প্রচার করেন যাতে একজন হিন্দু একজন মুসলমান সাধুর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করতে পারে। পীরগাথাগুলিতে বৌদ্ধদের 'ধর্মঠাকুর', মুসলমানদের 'পীর' ও হিন্দুদের 'নারায়ণের' সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বিকাশমান মুগল যুগের শেষ পর্যায়ে 'সত্যপীরের' গল্প ও 'পুঁথি'র মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মকে একীভূত করার প্রথম প্রয়াস নেয়া হয়। এ পর্যায়ে দুই সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। বাংলা থেকে আসামের বিস্তৃত অঞ্চলে এসব গাথার লিপিকার ছিলেন হিন্দু এবং গায়ক ছিলেন মুসলমান। সকল পাঁচালীর মধ্যে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের পাচনা গ্রামের ফয়জুল্লাহ রচিত পাঁচালী ছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুই সম্প্রদায়ের উপাস্যের অর্থাৎ আল্লাহ, মোহাম্মদ, পাঞ্জাতন পীর এবং অন্যান্য 'পীর' ও 'পীরানি'র গুণকীর্তন করে তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে একই নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করেন। সবচেয়ে বড়ো ও সাবলীল পাঁচালী রচনা করেন বাউল দরবেশ সম্প্রদায়ের মুসলমান গুরু তাহের মাহমুদের হিন্দু শিষ্য কৃষ্ণহরি সরকার (দাস)। এখানে একজন অবিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যার সন্তান সত্যপীর একেশ্বরবাদের উল্লেখ করে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও ইসলামের বৈপরীত্য খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর ভাষায় :

এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই
... ...
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।

(অর্থাৎ ব্রহ্ম এক। দু'জন ব্রহ্মের অস্তিত্ব নেই। নিরঞ্জন গোঁসাই একমাত্র প্রভু। নিরঞ্জনের অন্য নাম বিসমিল্লাহ। বিষ্ণু ও বিসমিল্লাহ ভিন্ন নয়।)

সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, বিষ্ণু, বিসমিল্লাহ, আল্লাহ, নিরঞ্জন সবই এক নামে বিলীন হয়েছে। অতএব আচার্য আর. সি. মজুমদারের মতে, সত্যপীর মুসলমানদের দেব এবং সত্যনারায়ণ হিন্দুদের দেব ছিলেন—এই কথা সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না অন্তত যখন এরকম উপাসনার সূত্রপাত হয়, তখন।

সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা ব-দ্বীপে অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুরু হয়। সেই সময়ে সর্প, ব্যাঘ্র এবং কুমিরে পরিপূর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল, ২৪-পরগনা, যশোর, খুলনা ও

নোয়াখালীর উভয় সম্প্রদায়ের লোক স্থানীয় দেব-দেবীর উপাসনা করতো। এর ফলে নতুন জনপ্রিয় পুরাণের সঙ্গে অসম্পর্কিত স্থানীয় দেব-দেবীর গুণকীর্তনমূলক কাব্য অথবা গাথা (মঙ্গলকাব্য বা কথা) রচিত হয়। এগুলিকে 'আঠারো ভিটার পাঁচালী' বলা হতো।

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছিল। গোড়ার দিকে আপোস ও পুনর্মিলন দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়ে ফেলা হতো। বড় খাঁ গাজী নামের পীর ও তাঁর মিত্র কালু শাহ দক্ষিণ রায় ও তাঁর মিত্র কালু রায়কে দক্ষিণ বাংলার এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরিশেষে তাঁদের মধ্যে পুনর্মিলন হয়। হিন্দুদের ত্রাণকর্তা দেব-দেবীদের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্দেশ্যে এবং ধর্ম ও কবিতার প্রতি জনসাধারণের গভীর অনুরাগ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা মুসলিম পীর ও তাঁদের স্ত্রীদের (পীরানি) নিয়ে অনুরূপ গাথা রচনা করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সর্পদেবীকে মনসা নামে উপাসনা করতো। ব্যাঘ্রদেবকে দক্ষিণ রায় এবং কুমিরদেবকে কালু রায় ভজন করতো। কালু রায়ের মিত্র (কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত *রায়মঙ্গল*, ১৬০৮ শকাব্দ/১৬৮৬-৮৭ খৃ.) মুসলমানদের বড় খান গাজী ও মাগার পীর কালু শাহ নামে পরিচিতি লাভ করেন। বনের দেবী বনদুর্গা বা বনদেবী (মঙ্গলচণ্ডীকথায় বর্ণিত) হিন্দু শিকারী, কাঠুরে, মেষপালক ও মধু সংগ্রহকারীদের শুভসাধক দেবী ছিলেন। তাঁকে মুসলমানদের 'পাঁচালী'তে (জহুরানামা) একইভাবে বনবিবি এবং বনবিবির তলা (স্থান) নামে এখনও পশ্চিম বাংলায় পূজা করা হয়। অনাথ ফকির মানিক পীরকে শীবের প্রতিরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। পীর মাচনদালি (পূর্ব বাংলার মাচরাপীর) নাথগুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ এবং যুদ্ধরত পীর মসনদ-ই-আলীর মিশ্র রূপ বলে বর্ণিত হয়েছে। গোরাচাঁদ নামে একজন হিন্দু ঠাকুর ধর্মান্তরিত হওয়ার পর বর্ধমান ও ২৪-পরগনার পীর গোরাচাঁদ নামে তাঁর হিন্দু নাম বহাল রাখেন।

সতেরো শতকে পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট (সিলেট), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের বাণী বৈষ্ণব ভাবধারায় পরিপুষ্ট মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ প্রচার করেছিলেন। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী ১৬২ জন শ্লোকরচয়িতা ৯০০ শ্লোক রচনা করেছিলেন। তাঁদের সাহিত্যিক মান যদিও উচ্চ ছিল না, তথাপি শ্লোকগুলির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল সুগভীর। এগুলি থেকে তাঁদের মানসিক ক্রমবিকাশ চিহ্নিত করা যায়, যা বাংলার সকল মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। ইসলাম ধর্মে দীক্ষালাভের পরেও ধর্মান্তরিতদের পুরনো প্রবৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায় নি এবং সেগুলি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল। বৈষ্ণব মতবাদের রাধাকৃষ্ণের মিলনের সাথে সুফি মতবাদের পরমেশ্বর ও আত্মার মিলনকে তুলনা করা হতো। এ প্রসঙ্গে আমরা সতেরো শতকের আলাওল, সৈয়দ মুর্তজা ও নওয়াজিশ খান এবং আঠারো শতকের আলি রেজা (যিনি কানু ফকির নামে বেশি পরিচিত), লাল মোহাম্মদ (ময়মনসিংহ জেলা) এবং অন্যদের নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা সকলে হরেকৃষ্ণ নামের মধ্যে সারবস্তু খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সম্প্রদায় ও শ্রেণীর উর্ধ্বে সকল ধর্ম যে এক তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।

কিছু সংখ্যক মুসলমান বৈষ্ণব কবি শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উপর ভিত্তি করেই গান রচনা করেন নি কিংবা বারমাস্যা লিখেন নি, তাঁরা হিন্দুদের দেব-দেবীদের নিজেদের দেব-দেবী বলে মনে করতেন এবং কালী ও নাথ সাহিত্যও (শুকুর মাহমুদ) রচনা করেছিলেন। বহু মুসলমান ভক্ত 'যোগশাস্ত্র' অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এর আদর্শ ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, এ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছিলেন। এমনকি আলি রেজার যোগশাস্ত্রের উপর রচিত *জ্ঞানসাগর* গ্রন্থে 'সাতচক্র'কে স্বীকার করে নেয়ায় জনপ্রিয় হিন্দু ও মুসলমান মতবাদের এক অনন্য মিশ্রণ ঘটেছে।

স্থাপত্য

হিন্দু ও মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের মধ্যে মৌলিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মুগল যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মতো স্থাপত্যশিল্পেও উভয়ের এক আশ্চর্যজনক সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে স্থাপত্যশিল্প পূর্ণতালাভ করে এবং গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে, সুলতানি যুগে যার কোন তুলনা মিলে না। মুগল যুগে বাংলার স্থাপত্যশিল্পে এখানকার ভৌগোলিক ও পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো এবং স্থানীয় আদর্শ ও আচার-আচরণের উপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছিল। বৃষ্টি ও বন্যা ছাদের নির্মাণকাজ ব্যাহত করতো এবং পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বৃহৎ ও শক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু পলিমাটিনির্মিত ইষ্টকের প্রাচুর্যের ফলে প্রচুর সংখ্যক ইষ্টকনির্মিত অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। গ্রামের জনসাধারণ প্রচুর বাঁশের তৈরি হালকা কাঠামোর সাথে বাঁকানো ও ঢালু চাল পছন্দ করতো। এছাড়া পলিমাটির সাথে বালু মিশ্রিত করে (কঠিন ও পোক্ত হওয়ার জন্য) দেব-দেবী, জন্তু, উদ্ভিদ ও গাছপালার বিশেষ টেরাকোটাশিল্প নির্মাণ করা হতো।

মুগল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে বাংলার অট্টালিকার আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়, যেমন প্রশস্ত প্রবেশদ্বার, টেরাকোটাসজ্জিত দেয়ালের পরিবর্তে চুন ও বালির প্লাস্টারকৃত দেয়াল, কারুকার্যমণ্ডিত খিলান, বিশেষত চৌকোণাকৃতি সূঁচালো খিলান, একটি বা তিনটি বা ততোধিক গম্বুজ। এসব বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বেসামরিক ও সামরিক ধর্মীয় ও লোকায়ত অট্টালিকা এবং সমাধিতে পরিস্ফুট হয়েছিল। এগুলি মুগলরা দিল্লীর মুগল স্থাপত্যরীতির অংশ হিসেবে বাংলায় প্রবর্তন করেছিল। পরবর্তীকালে এর দ্বারা স্থানীয় স্থাপত্যরীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে কতিপয় মসজিদের নাম করা যায়, যেগুলি ইষ্টক ও প্লাস্টার দ্বারা দিল্লীর রীতি অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। ঢাকার জাহাঙ্গীরনগরে শাহ সুজার (১৬৪৯-১৭০৬) আমলে প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলি ছিল চার প্রকারের—বাংলো আকৃতির, এক গম্বুজওয়ালা, তিন গম্বুজওয়ালা এবং উচ্চস্থানে নির্মিত। ঢাকার বহু প্রাচীন সমাধি মুগল স্থাপত্যের স্বাক্ষর বহন করে। সাধারণ বেসামরিক অট্টালিকাগুলিও খুবই আকর্ষণীয় ছিল। কারণ এগুলি বাংলার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের পরিচয় বহন করতো। এগুলির মধ্যে ছিল কিছু ফতেহপুর সিক্রির অট্টালিকার অনুরূপ দ্বিতল ভবন, সরাই এবং

ব্যবসায়ীদের বাসস্থান (কাটরা দালান)। মুগলদের কাটরা দালানের ধ্বংসাবশেষ শেরপুরে (বগুড়া জেলা) পাওয়া গেছে। ঢাকার বড় কাটরা সুজার বাসস্থান হিসেবে মুগল স্থাপত্যের অনুকরণে মরুসরাইয়ের আকারে নির্মিত হয়েছিল (১৬৪৪), যেখানে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত অঙ্গন ঘিরে অসংখ্য কক্ষ ছিল। এর গম্বুজ ও খিলানগুলিতে সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল। শায়েস্তা খানও (১৬৬৫) একই পরিকল্পনায় ছোট কাটরা নির্মাণ করেছিলেন।

মুগল স্থাপত্যের প্রভাব শিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও তার চতুষ্পার্শ্বে লক্ষ্য করা যেতো। মুর্শিদকুলী খান একে বহু রাজপ্রাসাদ দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন, যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল 'চেহেল সাতুন' ও 'কাটরা মসজিদ'। তিনি ও সিরাজউদ্দৌলা ইমামবাড়াও নির্মাণ করেছিলেন। সামরিক স্থাপত্যেও বাংলায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুলতানি যুগে নদীর সঙ্গমস্থলে জলবেষ্টিত মাটির দুর্গ তৈরি হতো, যেমন গৌড়ের দুর্গ। মুগল যুগেও এমন দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে সোনাকান্দা, খিজিরপুর এবং মুন্সীগঞ্জে ইসলাম খান নির্মিত দুর্গ এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। শাহজাদা আজম যে দুর্গের নির্মাণকাজ আরম্ভ করেছিলেন তাও অসমাপ্ত থেকে যায়।[৩৪]

৩৪. স্থাপত্যের জন্য দেখুন, A. H.Dani."Muslim Architecture in Bengal."(Dhaka 1963).

৪

রাষ্ট্র ও শিক্ষা

জাহেদা আহমদ*

বাংলায় পাশ্চাত্যশিক্ষা : যাত্রাশুরু

মেকলের বিজয়

আঠারো শতকের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রক্রিয়ায় সার্বিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল গোটা বাংলায়। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতবদলের অভিঘাতে ভেঙ্গে পড়েছিল এদেশে বিদ্যমান পুরনো ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো। ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল জীবনের নানা ক্ষেত্রে। ফলে জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল। প্রধান কারণ ছিল উপযুক্ত আনুকূল্যের অভাব। স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা সমাজের উচ্চবিত্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের ইউরোপীয় স্বশ্রেণীভুক্তদের চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন মনোবৃত্তির ছিলেন। সেজন্য দেখা যায় যে, শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য ভারতীয় উচ্চবর্গীয়রা ব্যক্তিগতভাবে বেসরকারি উদ্যোগকে জমিজমা ও আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে সহায়তা করতেন। সে যুগে এভাবেই উচ্চবিত্তরা এদেশে ন্যূনতম সাধারণ শিক্ষার একটা অতিশয় প্রাথমিক কাঠামো চালু রাখার দায়িত্ব পালনের প্রয়াস পেতেন। মনে রাখতে হবে যে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা সে যুগে পূর্ব-পশ্চিমের কোনো দেশেই ছিল না যদিও তৎকালীন পাশ্চাত্যে সংগঠিত চার্চ এ দায়িত্ব বেশ কিছুটা পালন করতো।

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্রমশ ফিরে আসতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসকরা এতকাল যাবৎ এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিশেষ করে তাদের শাসনামলের প্রথম দিকে এ নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। একে তো এদেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা ছিলই, তদুপরি নবলব্ধ রাষ্ট্রক্ষমতা সংহতকরণের কাজই অগ্রাধিকার পেয়েছিল তাদের কাছে। অথচ এদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন ধারার আবাহন জরুরি ছিল খুবই। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক বন্ধ্যাত্বের কারণে জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছিল তাতে মৌলিক সৃজনশীলতার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় আবদ্ধ ছিল নিজ নিজ সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার গতানুগতিক গণ্ডিতে। মক্তব-মাদ্রাসা ও টোল-চতুষ্পাঠীসমূহে শিক্ষা ছিল প্রাচীন ও ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক, যেখানে কূপমণ্ডুকতা ও মুখস্থবিদ্যার অপ্রতিহত প্রাধান্যের দরুন শিল্প, সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে পারে নি।

শাস্ত্রশাসিত সমাজের সার্বিক এই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে উঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন স্থানীয় শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ। পাশ্চাত্যের উদীয়মান নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরুর প্রস্তুতি নিলেন তারা। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় মিশনারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় নব্য ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি ও তাদের ইউরোপীয় সহযোগীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরি, জন মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, আলেকজান্ডার ডাফ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অবদান স্মরণীয়। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউরোপের পার্থিব সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে তার জ্ঞানভাণ্ডার। কাজেই এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারতীয় আন্দোলনের সূচনা হয় অবিভক্ত বাংলাদেশেই,রামমোহন রায় ছিলেন যার পুরোধা।

কোম্পানির সরকার প্রথমদিকে এতে তেমন কোন উৎসাহ দেখায় নি। বরঞ্চ তাদের ঝোঁক ছিল সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি। তাই দেখি, কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের আনুকূল্যে, ১৭৯২ সালে জোনাথন ডানকান প্রতিষ্ঠা করেন কাশী সংস্কৃত কলেজ। পরবর্তীকালে 'প্রাচ্যবাদী' নামে পরিচিত এই সনাতনপন্থীরা ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের অধীনে প্রদত্ত বার্ষিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষা অনুদান তাঁদের পছন্দসই সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যার্থে ব্যয় করতে থাকেন। কিন্তু ১৮৩০–এর দশকের শুরু থেকে এই সব প্রাচ্যবাদী পিছু হটতে থাকেন পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির মুখে। এই বিতর্কের অবসান ঘটে ১৮৩৫ সালে, যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের বিখ্যাত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে এদেশে ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান-

বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসারকে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেন। সরকারি নীতির এই পরিবর্তনের ফলে ক্রমে বাংলায় বেশ কিছু সংখ্যক সরকার-পরিচালিত, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ইংরেজি স্কুল ও কলেজ গড়ে উঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আসতো প্রধানত বাংলার উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো থেকে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের আরো দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। এর একটি হচ্ছে ১৮৩৭ সালে সরকারি অফিস-আদালতসমূহে ফার্সির বদলে ইংরেজি ভাষা চালু এবং ১৮৪৫ সালে সরকারি চাকুরিতে ইংরেজিশিক্ষিতদের অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি প্রবর্তন।[১] এই দুই রাষ্ট্রীয় নীতির সম্মিলিত প্রায়োগিক যোগফল দাঁড়ালো এই যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা স্বর্ণপ্রসবিনী হয়ে উঠলো এই শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য। কিংবদন্তির রাজা মিডাসের সোনালী স্পর্শের যাদু যেন সঞ্চারিত হলো আধুনিক শিক্ষার মধ্যে। যাবতীয় পার্থিব সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠিতে পরিণত হলো এই শিক্ষা।

'ইংরেজি মানে টাকা'

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এই কয়েক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের মাটিতে বেশ বিকাশলাভ করলেও এর পুরোটাই অনেকখানি এলোমেলো ও খামখেয়ালিভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড অভাব ছিল সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিমালার এবং একে নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও পরিচালনা করার মতো দক্ষ সুবিন্যস্ত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের। তাই ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন নবায়নের আগে বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটি ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে। এরই ভিত্তিতে বোর্ড অব কন্ট্রোলের তৎকালীন সভাপতি স্যার চার্লস উড তাঁর বিখ্যাত ১৮৫৪ সালের শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রণয়ন করেন। এতে প্রথমবারের মতো এদেশে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একটা সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে এতে বেন্টিঙ্ক-এর লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করে বলা হয়, "এদেশের সরকারি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হবে উন্নততর ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের তথা ইউরোপীয় জ্ঞানের প্রসার।" এতে বলা হয় যে, শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও মাতৃভাষার ব্যবহার চলবে। প্রতিটি প্রদেশে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য বিদ্যমান অপেশাদার কমিটির স্থলে জনশিক্ষা

---

১. ১৮২৮ সালে রাজশাহীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আট বছর পর সরকার এটি অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এটি রূপান্তরিত হয় রাজশাহী সরকারি কলেজে। অনুরূপভাবে ১৮৩৬ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পরে যার নতুন নামকরণ হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। ঢাকা সরকারি কলেজের যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৬ সালে। নিকি পগোজ নামে ঢাকাবাসী একজন আর্মেনীয় জমিদার ঢাকার পগোজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পরিচালকের অধীনে অধিকতর অর্থবরাদ্দসহ একটি জনশিক্ষা বিভাগ স্থাপন করা হবে। ঐ সময়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উক্ত প্রস্তাবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। ভারতবর্ষে বিরাজমান পরিস্থিতিতে লন্ডন মডেলই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। কারণ কম খরচে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু সম্ভব ছিল না। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার আরো সম্প্রসারণের জন্য হাইস্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং স্কুল-কলেজে মেধাবি ছাত্রদের বৃত্তি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। চার্লস উড আশা করেছিলেন যে, এভাবেই এখানে তথাকথিত 'নিম্নমুখী পরিস্রবণ তত্ত্বের' ক্ষতিকর দিকগুলো দূর করা সম্ভব হবে। ততোদিনে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এযাবৎ অনুসৃত এই তত্ত্বের প্রভাবে "সরকারি নীতি মূলত সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য অতি উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করেছিল।"

কিন্তু শিক্ষাসম্প্রসারণের যেকোন কর্মসূচি পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দের নিশ্চয়তা ছাড়া অর্থবহ হতে পারে না। কিন্তু এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ডেসপ্যাচ "শিক্ষাব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছা আছে"—এধরনের অস্পষ্ট উক্তি করে পাশ কাটানোর প্রয়াস পায়। সরকার যেহেতু পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান করতে পারবে না, কাজেই ডেসপ্যাচের প্রণেতারা প্রস্তাবিত সরকারি অনুদান বা গ্রান্ট-ইন-এইড-এর মাধ্যমে কিছু শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার প্রস্তাব রাখেন। ডেসপ্যাচের মুখবন্ধে তাঁরা ভারতবাসীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বকে সরকারের 'পবিত্র কর্তব্য' বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু উপসংহারে তাঁরা সেই কর্তব্যের সীমানাটুকু টানেন এভাবে—"আমরা সেই সময়ের প্রত্যাশায় আছি যখন প্রস্তাবিত সরকারি অনুদানপ্রথার ক্রমবিস্তৃতির ফলে সম্পূর্ণরূপে সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি সম্ভব হবে। তদুপরি এমন দিনও আসতে পারে, যখন বিদ্যমান সরকারি প্রতিষ্ঠানের, বিশেষকরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিই কোন ক্ষতি পরিহার করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্থানীয় সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।" এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরকারি কোষাগারের দৈন্য কাটিয়ে উঠার জন্য বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলো, ছাত্রবেতন এবং দানশীল দেশবাসীকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই উৎসগুলো অনেকখানি সহায়ক হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

তা সত্ত্বেও ডেসপ্যাচের প্রস্তাবের অনেকগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বাংলায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান জেলাশহরগুলোতে বেসরকারি উদ্যোগের জন্য অনুকরণীয় মডেল হিসেবে সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নতুন গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠাকে

উৎসাহিত করে। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতন তুলনামূলকভাবে কম এবং ভর্তির নিয়মকানুন অধিকতর শিথিল ছিল। সরকারের লক্ষ্য ছিল খরচ না বাড়িয়ে শিক্ষাকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলা এবং এ লক্ষ্য অর্জনে অনেকখানি সাফল্য এসেছিল সন্দেহ নেই। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ বেশিদিন সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। কাজেই সাধারণ্যে হান্টার কমিশন নামে খ্যাত ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষাকমিশন বাধ্য হয় কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করতে, যাতে করে ব্যক্তিউদ্যোগকে যুগপৎ উৎসাহদান এবং কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষাখাতে ব্যক্তিউদ্যোগের বৃহত্তর ভূমিকার কথা বলে হান্টার কমিশন খুব নতুন কিছু করেন নি, বরং যা করেছে তা হলো বাস্তবে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ার বাতাবরণ সৃষ্টি।

পরবর্তী দুই দশকে কলেজিয়েট ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এই প্রবৃদ্ধি আরো ত্বরান্বিত হয় যদিও এটা ঘটেছিল মূলত বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ ততোদিনে প্রবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ব্যতিরেকেই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাতেই উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেছিল সর্বাধিক। সর্বোচ্চ সংখ্যক কলেজ, স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ ঘটেছিল এই প্রদেশেই। যেমন ১৯০২ সালে সারা ভারতবর্ষের কলেজছাত্রের প্রায় অর্ধেকই অধ্যয়নরত ছিল এই বাংলা প্রদেশে। ভারতবর্ষের ৩,০৯৭টি স্কুলের মধ্যে ১,৪৮১টি অবস্থিত ছিল বাংলায়।[২] প্রতিটি জেলায় মাধ্যমিক স্কুলের গড় সংখ্যা বাংলায় যেখানে ছিল ৩০টি, সেখানে মাদ্রাজে ছিল ২০টি, বোম্বেতে ১৭টি এবং যুক্তপ্রদেশে ৪টি।[৩]

বাংলার কলেজসমূহের অনেকগুলোই কালের বিবর্তনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাই স্কুল থেকে কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাংলায় উচ্চশিক্ষাবিস্তার প্রক্রিয়ার এটা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বটে। একেবারে শুরুতেই দেখতে পাই, হিন্দু কলেজের যাত্রা শুরু (১৮১৭) হিন্দু বিদ্যালয় থেকে। একই পথপরিক্রমায় আসে হুগলী কলেজ (১৮৩৬), ঢাকা কলেজ (১৮৪১), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৫), বহরমপুর কলেজ (১৮৫৩), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), জগন্নাথ কলেজ (১৮৮৪), নড়াইল কলেজ (১৮৮৬), ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), মুরারীচাঁদ কলেজ (১৮৯১), এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৯৮) এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯)। বাংলায় কলকাতা ও ঢাকা ছাড়া জেলাশহরগুলোতেও কলেজ গড়ে উঠেছিল, যা বোম্বে বা মাদ্রাজের বেলায় ঘটে নি। বহু কলেজের জন্য স্থানীয় জমিদারগণ জমিজমা, ভবন এবং কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

২. *ভারতের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ১৯০২-০৭, ২য় খণ্ড, সারণি নং ৭৫।

৩. *ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ১৮৯৭-১৯০২, ১ম খণ্ড, ৯৬।

কিন্তু ব্যয়ের সিংহভাগই এসেছে ছাত্রবেতন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যৎসামান্য সরকারি অনুদান থেকে। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন শিক্ষকদের কাজ করতে হয়েছে স্বল্পবেতনে এবং পাঠ্যক্রমে ব্যয়বহুল বিজ্ঞানশিক্ষার স্থলে প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক বিদ্যার বিষয়গুলো। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যদিও সংখ্যার হিসেবে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে উল্লেখযোগ্য হারে।

১৮৮২ সালে বাংলায় ৩০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল সরকারি কলেজে। কিন্তু ১৯০২ সালে মোট ৮০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রের এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল সরকারি কলেজে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সরকারি কলেজগুলোতে ছাত্রসংখ্যা মোটামুটি স্থির ছিল, কিন্তু প্রাইভেট কলেজগুলোতে ছাত্রসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে।[৪] অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশগুলোর তুলনায় বাংলায় উচ্চশিক্ষা ছিল মোটামুটি সস্তা। কলেজছাত্রপ্রতি গড় বার্ষিক ব্যয় এবং ছাত্রপ্রতি বেতনও সর্বাপেক্ষা কম ছিল বাংলায়।[৫] কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রও সবচেয়ে বেশি ছিল এখানে। মানবিক বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রিধারীদের এবং অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাও ছিল বেশি।[৬] মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলার অবস্থা ছিল ভারতীয় সব প্রদেশের শীর্ষে। ১৯০১-০২ সালে ৩০৯৭টি ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেকই ছিল বাংলায়।[৭] এখানে প্রতি ১০৪ বর্গমাইলে একটি করে ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। এই হার ছিল পূর্ববঙ্গে প্রতি ১১৫ বর্গমাইলে, মাদ্রাজে প্রতি ৩৮০ বর্গমাইলে, বোম্বেতে প্রতি ৩৯৩ বর্গমাইলে এবং যুক্তপ্রদেশে প্রতি ৫৬৭ বর্গমাইলে একটি করে। কলেজগুলোর মতো এসব স্কুলেরও অধিকাংশই ছিল বেসরকারি। অনেকগুলো চলতো কোন সরকারি অনুদান ছাড়াই। সারা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশেই এসব স্কুলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।[৮] এসব স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যাও এখানে ছিল সবচেয়ে বেশি এবং এদেরই সংখ্যা বেড়ে চলছিল তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উনিশ শতকের শেষ নাগাদ পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিশেষকরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকেন্দ্রিক উচ্চতর পাশ্চাত্য এ বাংলার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের একান্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বাঙালি সমাজে এই যে পরিবর্তন এসেছিল তা পাশ্চাত্যের দ্রুত অগ্রসরমান দেশসমূহে চলমান আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন থেকে তেমন ভিন্নধর্মী কিছু ছিল না। কিন্তু বাস্তবে ঔপনিবেশিক বাংলার সঙ্গে পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলির তফাৎ ছিল আকাশ-পাতাল। পাশ্চাত্যের দেশে

---

৪. *ভারতের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ২য় খণ্ড, ৬২,সারণি ৪০।
৫. *ভারতের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯১২-১৭*, ২য় খণ্ড, ১৩০, সারণি ৪৬।
৬. *ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট, ১৮৯৭-১৯০২*, ২য় খণ্ড, ৫৯, সারণি ৩৩।
৭. *ভারতের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*, ২য় খণ্ড, ২৩১, সারণি ৬১
৮. *ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট, ১৮৯৭-১৯০২* , ১ম খণ্ড, ৯৬।

দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। আর সেই অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে তাদের ক্রমসম্প্রসারমান কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবদান ছিল মুখ্য। এই উন্নয়নই প্রকারান্তরে গোটা অর্থনীতিতে বিপুল ও বর্ধমান হারে কর্মসংস্থানের দ্বার খুলে দিয়েছিল। ফলে উচ্চশিক্ষার ফসল উদ্যমী তরুণরা উপকৃত হয়েছিল বিশেষভাবে। বৃটিশশাসিত বাংলায় তা সম্ভব ছিল না, কারণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা বাংলার অর্থনীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছিল। কাজেই বাংলার জনসমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে তার বেড়ে উঠার কোনো সুযোগ ছিল না। এমনকি বাংলার কৃষিপ্রধান অর্থনীতিও তার রুগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে শিক্ষার সম্পসারণে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে নি। তার মানে এই নয় যে ছোট-বড় মিলিয়ে বাংলার জমিদারদের এদেশে শিক্ষার প্রসারে কোনো অবদান ছিল না। বরং উল্টোটাই ঘটেছিল বলা যায়। বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারি উদ্যোগ যে অতি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল সেই কর্মকাণ্ডে বাংলার অনেক জমিদার সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন।

এ ছিল উচ্চবর্গীয়দের তৎপরতা। সমাজের নীচতলায় অধিষ্ঠান ছিল যাদের, সেই চাষী-তাঁতী-কামার-কুমোর-জেলেসহ অন্যান্য নিম্ন পেশাজীবীদের অবস্থান কী ছিল ? তারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হলেও অক্ষরজ্ঞান কিংবা তার চেয়ে অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাদের অবস্থান এই বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ছিল নেহাতই অকিঞ্চিৎকর । বাংলায় বিগত শতবর্ষব্যাপী শিক্ষা আন্দোলনের ঢেউ তাদের স্পর্শও করে নি। বিশ শতকে এসে দেখা গেল, চিত্রটা কিছুটা হলেও পাল্টাচ্ছে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব সময়ে পাটের বাজারে যে তেজীভাব দেখা দিয়েছিল তার প্রভাবে বাংলার এবং বিশেষ করে পূর্ব বাংলার স্বল্পআয়সম্পন্ন পাটচাষীর কিছু বাড়তি অর্থসমাগম ঘটেছিল। নবলব্ধ সেই আর্থিক সঙ্গতি ওই পরিবারগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের পুত্রসন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে। এরপর থেকে সমাজের ওই স্তরে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তাদের সংখ্যা ধীরলয়ে হলেও বাড়তে থাকে।

অতএব বাংলায় আধুনিক শিক্ষার জন্য যে প্রবল চাহিদার সৃষ্টি হয়েছিল তার পেছনে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতি, এক কথায় অর্থনীতির প্রয়োজন চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে নি। বরং এক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা হলো বাঙালি বর্ণহিন্দু (ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ), যারা সচরাচর 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত, তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করেই বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা তার তৎকালীন আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করেছে। বাংলার সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীরূপে এদের চিরকালীন পরিচয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় শিক্ষা-দীক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য বহন করে এসেছে এরা। পৃথিবীর আর কোথাও এ ধরনের দীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন এবং আয়তনে ও গুরুত্বে এদের সমতুল্য একটি

জনগোষ্ঠীর তুলনা মেলা ভার হবে। আবহমান কাল থেকেই বাংলার শাসককুল—দেশী-বিদেশী কিংবা হিন্দু-মুসলিম-ইংরেজ নির্বিশেষে—এই বর্ণহিন্দু গোষ্ঠী থেকেই তাদের অধস্তন কর্মচারী তো বটেই, এমনকি অধিকাংশ পদস্থ কর্মকর্তাও নিয়োগ করে এসেছিলেন। এই ভদ্রলোক গোষ্ঠীর পক্ষে এতকালের পরিচিত কিন্তু বিদেশী ভাষা ফার্সি থেকে নবাগত বিদেশী ভাষা ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বরণ করে নেয়া খুব সহজ ছিল বৈকি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, একই নতুন ভাষা শেখাটা তাদের শ্রেণীস্বার্থে বড় প্রয়োজনও ছিল। কারণ সরকারি চাকরি বা উচ্চতর পেশার জন্য ইংরেজি ভাষা ততদিনে একমাত্র চাচিকাঠিতে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশ্চাৎপদতার কারণে মধ্যবিত্তের চাকরির সুযোগ ছিল একেবারেই সীমিত। সে কারণে এই উপমহাদেশে এদের জন্য রাষ্ট্রই হয়ে দাঁড়ায় চাকরির সবচেয়ে বড় উৎস। উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন চাকরির বেলা তো বটেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মধ্যবিত্তের এত আগ্রহের কারণ নিহিত ছিল ওখানেই। একথা মনে রেখেই ১৮৩৫ সালে মেকলে তাঁর সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "বাজারই এই শিক্ষার ভবিষ্যৎ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে"। অনরূপ মন্তব্য করেছিলেন প্রায় দু'দশক পর লর্ড এলেনবরো। বৃটিশ পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটিকে তিনি বলেছিলেন, ভারতে "ইংরেজি ভাষা মানেই হচ্ছে টাকা"। মধ্যবিত্তের চাকরির এই চাহিদা অবশ্য বৃত্তবন্দি হয়ে পড়েছিল সুপরিচিত সংকীর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে। উচ্চতর শিক্ষার পরিক্রমণপথ এভাবেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, যা থেকে উত্তরণ ইংরেজ আমলে সম্ভব হয় নি। মধ্যবিত্তের এই আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনউদ্যোগের আকর্ষণীয় প্রকাশ ঘটিয়েছিল, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল লক্ষণীয়ভাবে। এ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার এলিট চরিত্র বোঝার জন্য তথ্য-উপাত্ত-পরিসংখ্যানের চেয়ে এই ব্যাপারটিই যথেষ্ট।

তবে, সংখ্যায় বাড়তে থাকলেও তদনুপাতে এখানে লেখাপড়ার গুণগত মানের তেমন উন্নতি হচ্ছিল না। জনাকীর্ণ শ্রেণীকক্ষ, অপর্যাপ্ত ভবন ও সাজ-সরঞ্জাম, স্বল্পবেতনভুক অযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, নিম্নমানের পাঠ্যক্রম, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ও অঞ্চলভেদে শিক্ষার অসম বিস্তার, মানববিদ্যার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক—এসব বিভিন্ন কারণে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছিল। লর্ড কার্জন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আইনের মাধ্যমে এই গলদগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর পশ্চাতে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সরকার কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত সস্তা নিম্নমানের শিক্ষাব্যবস্থা বিক্ষুব্ধ বৃটিশবিরোধী নাগরিকই তৈরি করছে, কাজেই এর রাশ টেনে ধরতে হবে। কিন্তু এর প্রতিবিধানকল্পে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা তিনি নিলেন তাতে তাঁর অভীষ্ট পুরোপুরি সিদ্ধ হয় নি। এতে মানের উন্নতি তেমন সাধিত হয় নি, শিক্ষার

সম্প্রসারণ শ্লথ হয় নি এবং শিক্ষাকাঠামোর ভারতীয়করণ আরো ত্বরান্বিত হয়। ফলে উচ্চস্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আগের মতোই নাগালের বাইরে থেকে যায়।

সংস্কার ও পুনর্গঠন

এভাবে কার্জনীয় সংস্কারের পটভূমিতেই সূচিত হয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ভূমিকা ও চরিত্র পরিবর্তনের পালা। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলির কাজ ছিল সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রি প্রদান, কলেজগুলি অধিভুক্তকরণ এবং বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতিদান করা। শিক্ষাদানের আসল দায়িত্ব অর্পিত ছিল কলেজের উপর। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম নিজস্ব পরিচালনায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ও উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম চালু করে।

কাজ এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে, যার ফলে দেখা যায় যে, ১৯২০ সালের মধ্যেই পুরো স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান কার্যক্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার কেন্দ্র হিসেবেও এই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

কার্জনের উল্লিখিত পদক্ষেপের চেয়েও অধিকতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিতর্কিত ছিল তাঁর আর একটি ব্যবস্থা, বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ এই অঞ্চলের, বিশেষকরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষাসংস্কার ও পুনর্গঠনের কর্মসূচিকে জোরদার করে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে গুটিকয়েক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। এই লক্ষ্যগুলি ছিল মূলত বঙ্গভঙ্গের বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ। স্বভাবতই তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ও চাকুরিনীতিতে এই লক্ষ্যগুলির প্রভাব পড়েছিল। এই সরকার চেয়েছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বর্ণহিন্দুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটির ভিত্তিটাকে দুর্বল করে কালক্রমে তা উৎখাতের পথ প্রশস্ত করতে এবং সেই শূন্যস্থানে একটি মুসলমান প্রতিপক্ষ শ্রেণীও গড়ে তুলতে। এই বর্ণহিন্দুরা ভূমিমালিকানা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অগ্রণী ভূমিকার জন্য বাংলার, বিশেষকরে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, প্রশাসনে এবং বিভিন্ন পেশায় প্রায় নিশ্ছিদ্র একাধিপত্য কায়েম করতে পেরেছিল। সমাজের সর্বস্তরে এবং বিশেষকরে শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অনগ্রসরতার আবেগময় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা উইলিয়ম হান্টার উপস্থাপন করেছিলেন ১৮৭১ সালে। তারপর থেকেই মুসলিম পশ্চাৎপদতার বিষয় নিয়ে আমাদের ইংরেজ শাসকরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

নিঃসন্দেহে, বাঙালি হিন্দুদের তুলনায় বাঙালি মুসলমানরা অন্যান্য অনেক কিছুর মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল বহু পশ্চাদ্‌বর্তী'। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯০১ সালে একমাত্র কলকাতাতেই শিক্ষার জন্য যা ব্যয় হতো তা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলায় মোট শিক্ষাব্যয়ের চেয়েও বেশি। অবিভক্ত বাংলায় ১৯০৩-১৯০৪ সালে সাধারণ কলেজগুলোতে মোট ৮০০৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬৩ জন, বি. এ. শ্রেণীর ২৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৩ জন এবং এম.এ. শ্রেণীর ৭৯ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল মুসলমান।[৯] বঙ্গভঙ্গের ফলে সরকার এবং তার মুসলমান মিত্রদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে দুর্বল কিন্তু সংখ্যায় শক্তিশালী বাঙালি মুসলমানদের পক্ষে নতুন এই রাজনৈতিক মানচিত্র বদলের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বেশি দেরি হয় নি। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি বঙ্গবিভাগের উল্লেখযোগ্য স্থায়ী সুফলের একটি হিসেবে অবশ্যই গণ্য হতে পারে।

তাই দেখা যায়, নতুন প্রাদেশিক সরকার এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই অঞ্চলে শিক্ষা পুনর্গঠনের এক উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তাঁর স্বল্পস্থায়ী কার্যকালে শিক্ষার উন্নয়নে খুব একটা কিছু করে উঠতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর সূচিত সমুদয় নীতিমালা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহেরও গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথম জনশিক্ষা পরিচালক হিসেবে ফুলার বেছে নিয়েছিলেন আই. ই. এস. (Indian Educational Service)-এর হেনরি শার্পকে। সুদক্ষ, দৃঢ়চিত্ত এবং অত্যুৎসাহী হেনরি শার্প শীঘ্রই বাঙালি সমাজে পরিচিত হয়ে উঠেন তাঁর মুসলমানঘেঁষা নীতি ও পূর্ববঙ্গপ্রীতির কারণে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পূর্ণ সমর্থনের ভিত্তিতে হেনরি শার্প এই প্রদেশের স্কুল-কলেজগুলির গুণগত মান বেশ কিছুটা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান। তদুপরি মুসলমানদের চাহিদা অনুযায়ী তিনি তাদের জন্য বিশেষ সহায়তাদানের কর্মসূচি চালু করেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর ও পেশাভিত্তিক শিক্ষাস্তরে (professional education) অধিকতর বৃত্তির ব্যবস্থাসহ সরকারি ও অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে ৮ শতাংশ আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করেন। তিনি বৃহৎ মাদ্রাসাগুলির জন্য আরো বেশিকরে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করেন, গোটা দুই মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়কে সাহায্য প্রদান করেন এবং বেশিকরে হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু করেন।[১০]

সরকারি শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে একচেটিয়া হিন্দু নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানো। শর্তসাপেক্ষ অনুদানের মাধ্যমে সরকার প্রায় সবগুলি

---

৯. Z.H. Zaidi, *The Partition of Bengal and its Annulment, 1902-11*, 348-49.

১০. *পূর্ব বাংলা ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট*, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২, ১ম খণ্ড, ৮১।

বেসরকারি কলেজের উপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারকে তার শিক্ষাউন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও ঢেলে সাজানো বেসরকারি কলেজগুলির যৌথ উদ্যোগের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। আর তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবাসিক সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে সরকার যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাতে ১৯১২ সাল নাগাদ প্রায় প্রতিটি সরকারি হাইস্কুলে একটি করে মুসলিম হোস্টেল গড়ে উঠে। মুসলিম শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে—ঢাকায় একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা, জনশিক্ষা ও পরিদর্শন (Inspectorate) দপ্তরের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন, মাদ্রাসা পাঠ্যসূচিতে সেক্যুলার বিষয় অন্তর্ভুক্তিকল্পে মাদ্রাসা কারিকুলামের সংস্কার।[১১] নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও মাত্র সাত বছর সময়ের মধ্যে সরকারের কৃতিত্ব বেশ চোখে পড়ার মতো। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা ও সরকারি নীতির সম্মিলিত প্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ সরকারি ও অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি কলেজগুলোর আয়তন, ভৌত সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষকদের গুণগত মানের বাঞ্ছনীয় উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। এর ফলে ১৯১১ সালের শেষ নাগাদ প্রদেশের পাঁচটি বিভাগের সব ক'টিতে সরকারি কলেজ দেখা যায় এবং একটি ছাড়া সবগুলিরই বি. এ. পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি ছিল। সে যাই হোক, মূলত অর্থের অভাবেই মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে গৃহীত সরকারি উদ্যোগকে সরকারি সেক্টরেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। তবে, স্বল্পস্থায়ী এই সরকারের শিক্ষানীতির উজ্জ্বলতম অর্জন ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কিত ঘোষণা। এই ঘোষণাকে আমরা স্বচ্ছন্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতির অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল বলে ধরে নিতে পারি।

এই সময়ের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যানও সেই কথাই বলে। প্রদেশের মোট শিক্ষাব্যয় ১৯০৬-০৭ সালে ১৩,২৮,১২৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১১-১২ সালে দাঁড়ায় ২৫,৩৩,৫৬৯ টাকা। এই টাকার সিংহভাগই খরচ হয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য[১২] এবং এর ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল। তার প্রমাণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাদের সংখ্যা ১৯০৬ সালে ৩,৬৪,৮০৩ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১১-১২ সালে হয়েছিল ৫,৩৩,৩৩৩ জন। এই বৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় ছিল এক থেকে দেড় গুণ বেশি।[১৩]

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল এই পাঁচ বছর সময়ে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোট

১১. ঐ, ১-২, ২৬-৩৪।

১২. ঐ, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, সারণি ২৭, ১৫ ।

১৩. ঐ, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, সারণি ২৮, ১৬।

ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৩১,৯০০ (১৯০১-১৯০২) থেকে ৪,২৫,০০০ জন (১৯০৬-১৯০৯) এবং ৫,৭৫,৭০০ জন (১৯১১-১২) হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার প্রতি ঝোঁকটাও ছিল লক্ষণীয়। ১৯০৬-০৭ সাল থেকে ১৯১১-১২ সালের সময়সীমায় প্রাথমিক স্তরে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ, মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১৫৮ ভাগ এবং কলেজস্তরে শতকরা ৪০৭ ভাগ হারে।[১৪] এই বিদ্যার্থীদের সিংহভাগই পাঠরত ছিল সবকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কারণ সর্বতোভাবে হিন্দুপ্রভাবিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তারা পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। ১৯০৬-০৭ সালে সারা পূর্ববঙ্গ ও আসামে এফ. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদের মধ্যে ১২ জন (শতকরা ৪.৩ ভাগ) এবং স্নাতকদের মধ্যে মাত্র ১ জন (শতকরা ২.৪ জন) ছিল মুসলমান। ১৯১১-১২ সালে মুসলমান স্নাতকদের হার ছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ (কলা) ও শতকরা ৯.৬ ভাগ (বিজ্ঞান)।[১৫]

পূর্ববঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের এই সরকারি নীতি বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর যুক্তবাংলার সরকারও শেষ অবধি বজায় রেখেছিল। সরকারি উৎসাহদানের নীতি ছাড়া আরো একটি কারণেও পূর্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বেড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে কিছুটা কাঁচা টাকা এসেছিল। বিশেষ করে পাটের কল্যাণে এই সময়ে পাটচাষীদের ঘরে যে কিছুটা উদ্বৃত্ত অর্থাগম হয়েছিল তার একাংশ তারা তাদের ছেলেদের উচ্চতর শিক্ষায় বিনিয়োগ করেছিল। শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর বর্ণহিন্দুরা এতে প্রমাদ গুণেছিল। এতকাল লোভনীয় সরকারি চাকরিক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত। এখন সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নব্যশিক্ষিত মুসলমানদের আবির্ভাব তাদেরকে তাদের অগ্রগামী অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য স্বভাবতই আরো সঙ্কল্পবদ্ধ করে তোলে। এই সম্প্রদায়গত প্রতিযোগিতার প্রতিফলন ঘটে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসারে।

ঢাকার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় : একটি নতুন মডেল

দুই বাংলার পুনরেকত্রীকরণকে বঙ্গীয় মুসলমানদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ঢাকায় অদূর ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় একটি মুসলমান প্রতিনিধিদলের কাছে সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। মুসলমান সমাজের ক্ষোভ ও আশঙ্কাকে প্রশমিত করা ছিল এই ঘোষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু আরো উদ্দেশ্য ছিল।

---

১৪. ঐ, সারণি ২১৬ ও ২২৪, ২য় খণ্ড, *British Policy and Administration in Bengal, 1905-1912.*

১৫. *পূর্ববঙ্গ ও আসাম শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯০৭-০৮, ১৯১১-১২* ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, সারণি ১৫৮।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষরূপে ভারত সরকার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মডেল হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জনসমক্ষে স্থাপন করতে চেয়েছিল। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে এককেন্দ্রিক (unitary),আবাসিক এবং নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সরাসরি শিক্ষাদানকারী (teaching) উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়ে এর কোনটাই ছিল না। যদিও এই ঘোষণার প্রায় এক যুগ পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়, তথাপি এই ঘোষণার পর ভারতে যতোগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সবগুলিই ছিল ঢাকার অনুকরণে স্থাপিত।

কলকাতার ঘটনাপ্রবাহ

ঢাকায় উচ্চশিক্ষার বিস্তার নিয়ে যখন এইসব চিন্তাভাবনা-পরিকল্পনা চলছিল, তখন কলকাতার ঘটনাপ্রবাহ একেবারে স্তিমিত হয়ে থাকে নি। সেই ১৯০৬ সাল থেকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে সেখানে ব্যাপক পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ছত্রছায়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিচালনা-কারী প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাদান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার কাজটি শুরু হয় তাঁরই নেতৃত্বে।[১৬] প্রথমদিকে অতি সতর্ক ও সীমিত মাত্রায় শুরু হলেও ঢাকা ঘোষণা এই প্রক্রিয়াকে অতি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঢাকা ঘোষণার ফলে সাধারণভাবে বাঙালি হিন্দুদের মনে যে তীব্র বিদ্বেষ, ভীতি ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯১২ সালের পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণকাজ চলে অত্যধিক দ্রুত গতিতে। এভাবেই আশুতোষ বাংলার প্রধানতম বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সরকারি রাজস্বের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।[১৭] সময় ও অর্থ দুটোই ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই কলকাতা

---

১৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হন মিন্টো। তিনি অর্থনীতি বিভাগে অর্থনীতির অধ্যাপক পদে নিয়োগলাভ করেন। অর্থনীতির এই অধ্যাপক পদ ১৯০৯ সালে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে সৃষ্টি করা হয়।

১৭. ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর স্যাডলার কমিশনের কাছে দেয়া গোপন প্রতিবেদনে আশুতোষ জোর দিয়ে বলেন, "ঢাকাকে অবশ্যই সীমিত পরিসরে ও যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হবে। অবশ্য যদি তাকে একটি রাষ্ট্রপরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে কৃত্রিমভাবে কলকাতার চেয়ে উচ্চ আসনে বসানোর চেষ্টা করা হয় তবে ভিন্ন কথা।" অতঃপর তিনি একটি 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ' প্রশ্ন উত্থাপন করেন—'যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহলে কি কলকাতা মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হবে? যদি না হয়, তাহলে কে অগ্রাধিকার পাবে? ... ঢাকার জন্য আমরা যাই করি না কেন, বাংলায় কলকাতার স্থান সর্বাগ্রে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। কাজেই এধরনের একটি উন্নত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়া একটি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ হবে।' ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা, আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত দলিলপত্রের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদনটি রক্ষিত আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সরকারি সমর্থন বা পদক্ষেপ ছাড়াই যথাসম্ভব দ্রুত যতো এগুনো যায় ততোটাই অগ্রসর হওয়া একান্ত জরুরি ছিল। শিক্ষক পদে প্রথম নিয়োগের পরে আরো বেশ কিছু শিক্ষকপদ সৃষ্টি করা হয়। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, ১৯১৭-১৮ সাল নাগাদ যখন বাংলায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম পুরোপুরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২০২ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন।[১৮] উক্ত সময়ে অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ১৯ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭২ জন-এ দাঁড়ায়।[১৯] অর্থসংগ্রহের জন্য আশুতোষ ধনাঢ্য নাগরিকগণ ও সরকার উভয়ের শরণাপন্ন হন। সরকার প্রথমদিকে কিছুটা অনুকূল মনোভাব দেখালেও ক্রমে আশুতোষের কার্যপদ্ধতির প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। আশুতোষ তাঁর আচরণ সংশোধন না করলে নতুন কোন অনুদান আর দেয়া হবে না—সরকার একথা তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। কিন্তু বেসরকারি বদান্যতা আকর্ষণের ক্ষেত্রে আশুতোষ এর চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল এই ছ'বছরে তিনি বিত্তশালী বাঙালি হিন্দুদের কাছ থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।[২০] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট ভারত সরকার সবকিছু পর্যালোচনার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কিন্তু বাংলা সরকার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার শঙ্করন নায়ারের প্রবল চাপের মুখে সরকার আশুতোষকেই সেই কমিটির প্রধান নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত এই কমিটির রিপোর্টে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিনের কার্যাবলীকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করে কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন এবং অধিকতর সরকারি অনুদানের সুপারিশ করা হয়।

এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাসংস্কার কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সীমিত— এতকাল যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলোমেলোভাবে গড়ে উঠা স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান কার্যক্রমকে কিছুটা সুশৃঙ্খল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে নিয়ে আসা। একই সঙ্গে সরকার এই আশাও পোষণ করেছিলেন যে, এর ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে। কিন্তু দেখা গেল, কমিটির রিপোর্ট সরকারের আশানুরূপ হয় নি। শেষ ভরসাস্থল হিসেবে ছিল প্রস্তাবিত বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, যা কিনা এই সব অনভিপ্রেত পরিস্থিতির অবসানকল্পে রিপোর্ট প্রণয়ন করবে। এই কারণে সরকার এই কমিশনকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও রিপোর্টের

---

১৮. *স্যাডলার রিপোর্ট*, ১৩শ খণ্ড, ১১২-১৩।

১৯. ঐ, ২য় খণ্ড, ৪৪।

২০. আশুতোষ সংগ্রহ।

ব্যাপক দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। এভাবেই সৃষ্টি হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯১৭-১৯), যা এর চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাডলারের নামানুসারে স্যাডলার কমিশন নামেও পরিচিত। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিযুক্ত এই কমিশন ১৯১৯ সালের শেষদিকে এর রিপোর্ট পেশ করে।

এই কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাডলার ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অন্যান্য সদস্য ছিলেন : র‍্যামজে মুইর, অধ্যাপক, আধুনিক ইতিহাস, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়; জে. ডব্লিউ. গ্রেগরি, ভূতত্ত্বের অধ্যাপক, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়; পি. জে. হার্টগ, একাডেমিক রেজিস্ট্রার, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। এছাড়াও ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; জিয়াউদ্দিন আহমদ, অঙ্কের অধ্যাপক, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়; ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্নেল, বাংলার ডি. পি. আই. এবং জর্জ এন্ডারসন, সহকারী সচিব, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার।

স্যাডলার রিপোর্ট : স্বপ্ন বনাম দেউলিয়াত্ব

দু'বছরের ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর কমিশন এর রিপোর্ট পেশ করে। সারা বৃটিশ আমলে এরকম বিস্তারিত রিপোর্ট আর একটিও পাওয়া যাবে না। এই সুবৃহৎ রিপোর্টে কমিশন বাংলার সমাজে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যাপক আকাঙ্ক্ষার বিবরণ প্রদান করে।[২১] কিন্তু গোটা শিক্ষাব্যবস্থা তাঁদের কাছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে বলে তাঁরা সুদূরপ্রসারী ও ব্যয়বহুল সংস্কারের সুপারিশ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বাংলা ও যুক্তরাজ্যের একটা তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরেন, কারণ জনসংখ্যার বিচারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে মোটামুটি একটা সমতা ছিল। সাড়ে চার কোটি লোক অধ্যুষিত এই দুই অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যাও ছিল সমান—মোটামুটি ছাব্বিশ হাজারের মতো। কিন্তু দুটো বড় রকমের তফাত ছিল দু'য়ের মধ্যে। প্রথমত, বাংলায় আনুমানিকভাবে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্র মানবিক বিদ্যায় ডিগ্রিলাভ করছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলায় যেখানে একটিমাত্র বেশ বড় আকারের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেখানে যুক্তরাজ্যে ছিল আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয়।[২২]

ছাত্রসংখ্যার এই বিপুল আয়তন কমিশনকে অভিভূত করেছিল ঠিকই, কিন্তু কমিশন এর চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছিল আর একটি কারণে। তা এই যে, পাশ্চাত্যের মতো এখানে শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে আধুনিক উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহের

---

২১. রিপোর্টের মূল প্রতিবেদনটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। পরিশিষ্ট আছে আরো আটটি খণ্ডে।
২২. *স্যাডলার রিপোর্ট*, ১ম খণ্ড, ২০-২১ ।

সৃষ্টি হয় নি; বরঞ্চ প্রধানত 'সামাজিক আচরণবিধি, প্রথা ও ঐতিহ্যের' প্রভাবে এখানে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে।[২৩] কমিশন আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন উচ্চশিক্ষার এই ক্রমবর্ধমান প্রসার 'এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রলেতারিয়েত'-এর জন্ম দেবে, যারা পরিণামে দেশের 'বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যকে আরো প্রকট করে তুলবে।'[২৪]

বিদ্যমান উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণের পর কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এখানকার "কলেজগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন ফলপ্রসূ সম্মিলন ঘটে নি", যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুষ্ঠু সাংগঠনিক ভিত্তিও এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি।[২৫] স্পষ্টতই এক্ষেত্রে সংস্কার ও পুনর্গঠনের একটা ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের কোন দিকই কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারকর্মসূচির বাইরে থাকে নি। বিভিন্ন প্রশাসনিক ও একাডেমিক সংস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষাদানব্যবস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই কমিশন এর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছে। কমিশন বিদ্যমান সিনেটকে কোর্ট নামে অভিহিত করে এবং সুপারিশ করে যে, সিনেটের পরিসর আরো বড় করে সেখানে গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যপদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা পূরণ করতে হবে, আর সিন্ডিকেটকে আরো ছোট করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব দিতে হবে। সিন্ডিকেটের অবশ্যই উপযুক্ত আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা থাকতে হবে। তবে বিশুদ্ধ একাডেমিক বিষয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে সিন্ডিকেট সাধারণত মাথা ঘামাবে না। এই ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষক ও অধিভুক্ত (constituent) কলেজগুলির প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের উপর।[২৬] অনুরূপভাবে কমিশন হাইকোর্টের একজন বিচারপতির সমান বেতন, ভাতা ও পদমর্যাদাসম্পন্ন সার্বক্ষণিক বেতনভোগী উপাচার্যের পদ সৃষ্টিরও সুপারিশ করে।[২৭]

সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি হওয়া উচিত এ বিষয়টি কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে। নানা ঐতিহাসিক কারণে এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বিপুল—একথা স্বীকার করে নিয়ে কমিশন মন্তব্য করে যে, "সরকারি নিয়ন্ত্রণ যেখানে এত বিস্তৃত ও ব্যাপক, সেখানে সর্বোত্তম ফল আশা করা যায়

---

২৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ২৪।
২৪. ঐ, ১ম খণ্ড, ২২-২৩।
২৫. ঐ, ১ম খণ্ড, ৭৭।
২৬. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৭।
২৭. ঐ ৪র্থ খণ্ড, ৩৮২-৩৮৩।

না।"[২৮] কাজেই কমিশনের প্রস্তাব ছিল একাডেমিক ও দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর স্বাধীনতা দেয়ার, চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার যদিও সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ভারত সরকার যা প্রত্যাশা করেছিল কমিশন সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগটি বিলোপ অথবা কাটছাঁট করার সুপারিশ করে নি। কমিশন বাংলার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন ও জটিল ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির মধ্যে সম্পর্ক সুবিন্যস্ত হবে এবং প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্থান খুঁজে পাবে। কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিমটিও পরীক্ষা করে দেখেছিল। এখানেও সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে কমিশন ১৯১২ সালের নাথান কমিটির সুপারিশ বাতিল করে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রস্তাব রেখেছিল। উল্লেখ্য, নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মতো একটি পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছিল। এর বদলে কমিশন ঢাকাকে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব দেয় যাতে করে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, আর্থিক বিধিব্যবস্থা ও সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দায়িত্ব পাবে।[২৯]

উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি প্রধান সংস্থায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কমিশন কতিপয় সুপারিশ পেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কমিশন বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও তীব্র মুসলিম ক্ষোভ ও চাপের প্রভাবে তাঁরা এই পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করতে বাধ্য হয়। তবে কমিশন 'গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক পদগুলিতে' জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করে।

মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব স্তরে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জী-বনের লক্ষ্যে কমিশন এর সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করেছিল। বিদ্যমান অবস্থাদৃষ্টে কমিশন বিচলিত বোধ করেছিল, তাই বাংলার তরুণ প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যতের ছবি রিপোর্টে তুলে ধরেছিল। কমিশনের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে এই অতি কঠোর বাস্তব সত্যটি কমিশনের রিপোর্টে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। অতিশয়োক্তি হবে জেনেও কমিশন সেকথা উল্লেখ করেছে অসংখ্যবার। সত্য

---

২৮. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, ২৬০। সরকারি কলেজের সংখ্যা ছিল সাত। বারোটি ছিল অনুদানপ্রাপ্ত এবং চৌদ্দটি ছিল সম্পূর্ণ অনুদানহীন।

২৯. বাংলা সরকারকে লিখিত ই. ই. বিস-এর লিখিত ৯ জুলাই ১৯১৯ ভারত সরকার, শিক্ষা, ই, ১৬, এ ২৬, অক্টোবর ১৯১৯.

বটে, সরকার এর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে নি। এই ব্যর্থতা বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক অসারত্বকেই প্রমাণিত করে।

দ্বৈত শাসনাধীন বাংলায় শিক্ষা : দায়িত্ব প্রচুর সম্পদ কম

বস্তুত পরবর্তী তিন দশক ছিল বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির অঙ্গনে উত্তাল ঘটনাপ্রবাহের যুগ। কিছুটা সেই কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বলা যায় এক ধরনের বন্ধ্যাত্বই বিরাজ করছিল। প্রথমত, সরকার এবং জনগণ উভয়েই রাজনৈতিক ইস্যু ও আন্দোলন নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার দরুন শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ভাবার অবকাশ তাদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, নানা কারণে বাংলার জন্য এই বছরগুলি ছিল নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটেরও কাল। ফলে সরকারি রাজস্বের সামান্য অংশই শিক্ষাক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য ব্যয় করা যেতো। স্বভাবতই উভয়বিধ কারণে সরকার অথবা জনগণ কারো পক্ষেই শিক্ষা নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করার আগ্রহ ছিল না।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের অধীনে ভারতে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রবর্তিত হয়। একই সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থায়ও বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। শাসন সংস্কারের ফলে দশ লক্ষ লোক নতুন করে ভোটাধিকার লাভ করে। এদের অনেকেই ছিল মুসলমান। এই ভোটাররা সুবৃহৎ আইন পরিষদে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত করতো। এভাবে যেসব মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতেন তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নতুন সংবিধানে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ের ভিত্তি তৈরি করা। ফল দাঁড়ালো এই যে, অগ্রসর হিন্দুরাও নিজেদের এতকালের কায়েমি স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য একটা পালটা জঙ্গি উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ইঙ্গ-মুসলিম আঁতাতের মুখে তাদের সেই প্রতিরোধ টিকতে পারে নি। এক অনিবার্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ দুই সম্প্রদায়কে পরস্পর থেকে আরো দূরে ঠেলে দিল। সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও হানাহানি এবং প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ও সমর্থিত আইন অমান্য আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের প্রভাবে এই বছরগুলো ছিল ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে এক দুঃখজনক উন্মাদনার যুগ।

এর ফলে বাংলার অর্থনীতি ও প্রশাসন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সারাক্ষণ নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত কোণঠাসা সরকারের পক্ষে একেবারে সম্ভব ছিল না কোন রকম জরুরি সংস্কার অথবা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছাড়াও এই সময়ের মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটও সরকারকে বাধ্য করেছিল ব্যয়সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করতে। শিক্ষাক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটে নি। স্বাভাবিকভাবেই সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ভারত সরকার স্যাডলার কমিশনের শুধুমাত্র সেসব সুপারিশ নিয়েই আইন প্রণয়নের প্রস্তুতি নিয়েছিল যেগুলো বাস্তবায়নে কোন অর্থব্যয়ের দরকার হবে না। কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারের আর্থিক দায়িত্ব এড়াবার জন্য ভারত সরকার উল্লিখিত আইন পাশের পর পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। এদিকে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারও সংস্কার কর্মসূচির জন্য বাড়তি অর্থব্যয়ে অপারগতা প্রকাশ করে।[৩০] ভারত সচিব মন্টেগু ভারত সরকারের আর্থিক দায়িত্ব এড়ানোর অপপ্রয়াসের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কারণ কমিশনের সংস্কার কর্মসূচির জন্য অর্থসংস্থানের প্রশ্নটিকে তিনি যথার্থই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তরকেই দায়িত্ব এড়ানোর সহজ পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রাদেশিক সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সংশোধনের গুটিকয়েক দায়সারা উদ্যোগ নিয়েছিল মাত্র। কিন্তু আশুতোষের আমল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেঁকে বসা বাঙালি হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সরকার হটে আসতে বাধ্য হয়। এর বদলে এখানে ওখানে ছোটখাটো সংশোধনের দ্বারা যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু কাজই সরকার করেছিল। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত একটি সংস্থা সিনেটে সরকার মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে দেয়। অনুরূপভাবে ১৯৩০ সালে হাসান সোহরাওয়ার্দীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করে সরকার মুসলিম ক্ষোভ প্রশমনের আরো একটি প্রয়াস পায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে সরকারকে সঙ্গত কারণেই কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছিল। একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতবাসীর সামনে সরাসরি শিক্ষা ও গবেষণাকাজে নিয়োজিত একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলরূপে থাকবে, অন্যদিকে এর কাজ হবে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। সুবৃহৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ঢাকা

---

৩০. ১৯২১-২২ সালে বাংলা সরকারের মোট বার্ষিক রাজস্বআয় ছিল ৮৩২.৪৪ লক্ষ টাকা। স্যাডলার কমিশন প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটাল ব্যয় এবং বছরে ৮০ লক্ষ টাকা পৌনঃপুনিক ব্যয়। *ভারতের ৮ম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট*—১৯১৭-১৮/১৯২১-২২, ১৪। ঐ বছর বাংলা সরকারের মোট বার্ষিক শিক্ষাবাজেট ছিল ১,৩৫,৪৫,০৪৫ টাকা। *বাংলা সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট*, ১৯১৭-২২, সাধারণ সারণি ৪।

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ক্ষুদ্রায়তন। কিন্তু এটা ছিল পরিচ্ছন্ন, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রশান্ত পরিবেশে নীরবে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকাজ চলছিল। জাতীয় অথবা প্রাদেশিক রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক জীবনধারাকে খুব একটা বিঘ্নিত করতে পারে নি।

কিন্তু এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য খুঁজতে হবে অন্যত্র। যে লক্ষ্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করেছিল, সন্দেহাতীতভাবে সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে হিন্দুদের অধিকাংশই সুনজরে দেখে নি। প্রথমত, এই প্রস্তাবকে তারা সরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের একটা অপচেষ্টা বলে মনে করেছিল। তদুপরি ঢাকায় স্থাপিত আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় অবধারিতভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে সঙ্কুচিত করবে এবং তার প্রত্যাশিত অর্থের উপর ভাগ বসাবে বলে তারা মনে করতো। তাদের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের রূপ নিতে যাচ্ছে, কারণ মুসলমানদের দাবির মুখে স্যাডলার কমিশন এবং ভারত ও বাংলা সরকার এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সংস্থাসমূহে বিশেষ মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রেখেছে।[৩১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের অভাবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ দীর্ঘদিন থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিল। ১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে মুসলমানদের এই ক্ষোভ দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টে (১৯২১-২৪) মোট ১৭১ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন মুসলমান। তবে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ জন অধ্যাপক ও রিডারের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন মুসলমান, সেহেতু এই ৪০ জন মুসলমানের বেশিরভাগই ছিলেন চ্যান্সেলরের মনোনীত সদস্য। এই ৪০ জনের মধ্যে ৩১ জনই ছিলেন 'খান বাহাদুর' এবং 'খান সাহেব' খেতাব- প্রাপ্ত। প্রথম নির্বাহী কাউন্সিলের মোট ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন এবং প্রথম একাডেমিক কাউন্সিলের মোট ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মুসলমান।[৩২] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর তফাতটা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় এবং মুসলিম হলে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করেছিল। তদুপরি মুসলমান ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়ে যা করা সম্ভব ছিল না তা হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষায়,

---

৩১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। G B. Gen-Edn. 14-1. A75-84, April 1920.

৩২. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার,* ১৯২১-২২, ১৯২৪-২৫।

বিশেষকরে উচ্চতর পর্যায়ে মুসলিম অনগ্রসরতা ছিল প্রধান অন্তরায়। ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়, তখন মোট ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮ জন ছিলেন মুসলমান। আবার এই ৮ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন আরবি ও ফার্সির শিক্ষক।[৩৩] পঁচিশ বছর পরে ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১২৪ জনের মধ্যে ২৪ জনে। এতে উন্নতি হয়েছে অবশ্যই। তবে তা আহামরি কিছু নয়।[৩৪] কারণ সংখ্যাবৃদ্ধি যেটুকু ঘটেছিল তা মূলত ছিল ওই গতানুগতিক ধারায়—শিক্ষকদের ১৪ জন ছিলেন আরবি, ফার্সি ও উর্দু বিষয়ের এবং ৪ জন ছিলেন আইন ও শিক্ষা বিষয়ের। এর পাশাপাশি ৪৫ জন বিজ্ঞান ও অর্থনীতিবিদ্যার শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান। অনুরূপ ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছিল ছাত্রদের মধ্যেও। ১৯২১ সালে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল মুসলমান ছাত্রদের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। ১৯৩৭ সালে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল মোট ১৭৫৪ ছাত্রের মধ্যে ৩৯৫ জন। অর্থাৎ তখনো হিন্দুরা সংখ্যায় প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি ছিল।[৩৫]

আলোচ্য সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা বি.এ. ও এম. এ. ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়—১৯২২ সালে ৫৩ জন, ১৯৩২ সালে ১৬৪ জন এবং ১৯৩৮ সালে ২১০ জন।[৩৬] কিন্তু উদীয়মান বাঙালি মুসলিম সত্তার বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কেবলমাত্র সংখ্যার নিরিখে বিচার করা ঠিক হবে না।[৩৭] কারণ দেখা যাচ্ছে যে, মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম হলকে কেন্দ্র করে হলের আবাসিক এবং অনাবাসিক ছাত্রদের সংগঠিত ও যৌথ কার্যক্রমের একটি পরিমণ্ডল কালক্রমে গড়ে উঠেছিল। মুসলিম হলের প্রথম প্রাধ্যক্ষ এ. এফ. রহমান তাঁর দু'জন কনিষ্ঠ সহকর্মী ফখরুদ্দীন আহমদ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহযোগিতায় সচেতনভাবে এই হলকে ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট ও ইসলামী ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি আবাসিক হল হিসেবে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। আবাসিক ছাত্রদের জন্য নামাজ ছিল অবশ্য পালনীয়। প্রতি শুক্রবার ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর নিয়মিত আলোচনাসভা বসতো এবং রবিবারের অপরাহ্ন নির্দিষ্ট ছিল

---

৩৩. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯২১*। দুজন মুসলমান শিক্ষক হচ্ছেন এ. এফ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং অক্সফোর্ড স্নাতক এ. এফ. রহমান। এ. এফ. রহমান প্রথমে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের রিডার ছিলেন। তিনি পরে ঢাকায় যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য হন। মুহম্মদ শহীদুলাহ্ ছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক।

৩৪ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৩৫-৩৬।*

৩৫. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট,* ১৯২১ এবং ১৯৩৭-৩৮।

৩৬. ঐ।

৩৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে মওলানা আকরম খাঁ মন্তব্য করেন, "হিন্দুরা যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করেছে তথাপি এটাকে 'ঢাকেশ্বরী বিদ্যাপীঠ' বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। কারণ যদিও এখানে মুসলমানদের 'প্রবেশ নিষেধ', এই ধরনের কোন নিষেধাজ্ঞা কলকাতাস্থ হিন্দুদের সেই প্রাইভেট জমিদারি 'কাশী বিদ্যাপীঠে'র মতো অতো কড়াকড়িভাবে মানা হয় না, তথাপি অবস্থা এখানেও খুব একটা সুবিধাজনক নয়।" *মাসিক মোহাম্মদী,* মাঘ ১৩৪৩, ২৮৩-২৮৪।

কোরান ক্লাসের জন্য।[৩৮] ছাত্ররা সুপরিচিত মুসলমানী পোশাক, যেমন শেরওয়ানি, চুড়িদার ও টুপি পরবে এটাও প্রায় অলিখিত একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[৩৯] হলের ছাত্রসংসদ নানা ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, যেমন সাপ্তাহিক বিতর্ক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, নাট্যানুষ্ঠান, হলবার্ষিকী প্রকাশনা এবং বার্ষিক প্রীতিভোজ ইত্যাদির আয়োজন করতো। শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি তদানীন্তন ঢাকার সামাজিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল।[৪০]

মুসলিম হলে ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২১-২২ সালে ছাত্রসংখ্যা ১৭৮ জন (৭৫ জন আবাসিক) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৯-৩০ সালে ৪১৮ (২৪২ জন আবাসিক) জনে দাঁড়ায়, যদিও ১৯৩১ সালের আগে এই হলের কোন স্থায়ী ভবন ছিল না। এই বছর ৩০০ আসনবিশিষ্ট বর্তমান ভবনটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। এই হলে এসেম্বলি ও প্রার্থনাগৃহ, ছাত্রমিলনায়তন, পাঠকক্ষ, ডাইনিং হল, টিউটোরিয়াল কক্ষ এবং প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়।[৪১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিকভাবে মুসলমান ছাত্ররা যে বিচ্ছিন্নতা ও হীনমন্যতার শিকার হতো এখানকার পরিবেশ ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হলের আবাসিক জীবনের মূল সুরটি ছিল সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির। অবারিতদ্বার শিক্ষকবৃন্দ ও সহানুভূতিশীল প্রশাসনও সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরো একটি বিষয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯২৪ সালে এই বৃত্তির সংখ্যা ছিল ৪০। এছাড়াও ছিল হলের নিজস্ব স্টাইপেন্ড এবং নওয়াব নবাব আলি ট্রাস্টফান্ডের স্টাইপেন্ড। বাংলা তথা ভারতের মুসলমান ছাত্রদের জন্য সবচেয়ে বেশি দান-অনুদানের সমাবেশ ঘটেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়েই।[৪২]

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এই ধরনের আয়োজন নিশ্চিতরূপে শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে ঈর্ষান্বিত ও বিক্ষুব্ধ করেছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতি বছর হিন্দু প্রতিনিধিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অর্থবরাদ্দ কমানোর চেষ্টা করতেন।[৪৩] সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এই তীব্রতা দেখে সরকার ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি বার্ষিক বরাদ্দকে স্ট্যাটিউটরি গ্রান্টে পরিবর্তিত করে নেয়। এই উপলক্ষে আনীত বিলের উপর সদস্যরা যেভাবে ভোট দিয়েছিলেন তাতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষণগুলো সুস্পষ্টভাবে ধরা

---

৩৮. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯২২-২৩, ৪ এবং ২৩।

৩৯. সৈয়দ মুস্তাফা আলী, *আত্মকথা* , ৯২ এবং আবুল ফজল, *রেখাচিত্র* , ১৩৪।

৪০. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯২২-২৩, ২৩।

৪১. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট।*

৪২. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯২৩-২৪।

৪৩. *বঙ্গীয় আইন পরিষদ প্রসিডিংস*, ১৭ মার্চ ১৯২১, বাজেট আলোচনা, ২১৮-১৯, ২৩৭-২৩৯

পড়েছিল। এত তিক্ততা সত্ত্বেও একথা না বলে উপায় নেই যে, পুরো বৃটিশ আমলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্রই ছিল হিন্দু, আর শিক্ষকদের বেলায় তো কোন কথাই নেই।[৪৪] তা সত্ত্বেও একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে বাঙালি মুসলমানের চোখে মুসলিম হল সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সারা বাংলায় একমাত্র উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে অন্তত সংখ্যার দিক থেকে তাদের উপস্থিতি নগণ্য ছিল না এবং যার ফলে এখানে হিন্দু সমাজের অবজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নাসিকতা থেকে মুক্ত থেকে তারা সক্ষম হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে নিজেদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তার পরিচয় রাখতে।

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের ক্ষেত্রে মুসলিম হলের ছাত্রদের প্রভাব সম্পর্কে বাড়িয়ে বলার বিশেষ অবকাশ নেই। এই হলের ছাত্ররাই পরবর্তীকালে সরকারি চাকুরি ও বিভিন্ন পেশায় মধ্যস্তরের পদগুলো পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন আর এদেরকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলার উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের পেশাগত বিকাশের চিত্রটা এদিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচ বছরে ৪৫ জন মুসলমান ছাত্র পাশ করে বেরিয়ে আসেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে তাঁরা কি অবস্থানে পৌঁছেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে তা বিধৃত আছে। এঁদের মধ্যে একজন যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় ফরেস্ট সার্ভিসে; একজন মনোনয়ন পেয়েছিলেন ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে; তিনজন ডেপুটি কালেক্টর, দু'জন ইনকামট্যাক্স অফিসার, তিনজন সহকারী ইনকামট্যাক্স অফিসার, ন'জন সাব-ডেপুটি কালেক্টর, এগারোজন কলেজপ্রভাষক, দু'জন গ্রন্থা-গারিক, একজন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর, একজন সুপারিনটেনডেন্ট, একজন মাদ্রাসা-প্রিন্সিপাল, পাঁচজন সহকারী স্কুলশিক্ষক, একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, একজন কুমিল্লা সমবায় সমিতির অডিটর, দু'জন এক্সাইজ সাব-ইন্সপেক্টর এবং দু'জন কেরানির পদ লাভ করেছিলেন।[৪৫]

এই প্রথম প্রজন্মের অনেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পাঁচজন পাকিস্তানের মন্ত্রীপদে আসীন হয়েছিলেন, তিনজন পূর্ব বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন; একজন হাইকোর্টের বিচারপতি, তিনজন উপাচার্য, একজন মুসলিম লীগের চীফ হুইপ, একজন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার এবং আর একজন (আলতাফ হোসেন) কলকাতা থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী মুখপত্র *মর্নিং নিউজ*-এর সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রায় অর্ধেকই এসেছিলেন গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামী, জোতদার, তালুকদার এবং সম্পন্ন কৃষক পরিবার থেকে। অন্যরা ছিলেন শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এঁদের প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার থেকে কিছু না কিছু আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন। এঁরা যথাসময়ে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এলিট হিসেবে এঁরাই

---

৪৪. যেমন, ১৯৩৬-৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৩৫৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৯৪৬ জন ছিল হিন্দু।

৪৫. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট*, ১৯৩০, ১৯৩১ এবং ১৯৩২।

সমাজকে কূপমণ্ডূকতা ও গোঁড়ামির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেন। এদেশের ইংরেজ শাসকরা এই অঞ্চলে আধিপত্যকারী হিন্দুদের প্রতিপক্ষ হিসেবে যে মুসলিম নেতৃত্ব কামনা করেছিলেন, সেই ভূমিকা পালনেও ঢাকার শিক্ষিতদের আমরা দেখতে পাই। অতএব একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে এভাবেই সরকারি শিক্ষানীতির অনেকগুলো লক্ষ্যের সম্মিলিত প্রতিফলন ঘটেছিল মুসলিম হলের মধ্যে।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের অধীনে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়ী একজন দেশীয় মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। এতে প্রথমদিকে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল বটে, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থিক সঙ্কট মিলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত একান্ত জরুরি সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজগুলোও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উন্নতির বদলে অধোগতি এসেছিল। ফলে ভারতের শিক্ষাজগতে বাংলা তার এতকালের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

এই নৈরাশ্যের অন্ধকারেও দু'একটি আশার আলো যে ছিল না তা নয়। যদিও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বা ব্যতিক্রমধর্মী উন্নতি কিছুই ঘটে নি, তথাপি সার্বিক রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশকে মোটেই ছোট করে দেখা যাবে না। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। এখানে পুনর্গঠনের কথা বহুবার বলা হলেও কিছুই করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা। এই প্রদেশের অধিবাসীরা শিক্ষা অর্জনের উদগ্র আগ্রহে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেরাই এগিয়ে এসেছিল। সরকার অনুদানের মাধ্যমে কিছুটা সাহায্য করেছে বটে, তবে অনেকের ব্যক্তিগত উদ্যোগই ছিল প্রধান সহায়কশক্তি। সন্দেহ নেই, এই পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান তেমন উঁচু ছিল না; পেশাগত, বৃত্তিমূলক এবং নারীশিক্ষাও পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এ দিকগুলো বাদ দিলে শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

ঔপনিবেশিক শাসনে শিক্ষা

বিশের দশকের শুরুতে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের অধীনে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রাদেশিক আইন পরিষদের কাছে দায়ী একজন দেশীয় মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হয়। এই নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রথমদিকে সচেতন জনসমাজে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল বটে, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। নতুন প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের আওতায় ভোটাধিকারের সীমানা বেশ খানিকটা বাড়ানো হয়েছিল। এতে করে সরকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র আরো উন্নত হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তো সত্য যে তৎকালীন বাংলায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের গণরাজনীতির (mass politics) অভ্যুদয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বসংঘাত

বৃদ্ধিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। মানুষের জীবনে শিক্ষা উন্নতি-অগ্রগতির হাতিয়ার, পছন্দসই কর্মসংস্থানেরও সদর রাস্তা ওটা। কাজেই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা খাতের জন্য নির্ধারিত সীমিত সহায়সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য হিন্দু-মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়ে উঠে অনিবার্যভাবেই (সারণি ১ দ্র.)

সারণি ১ : ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলায় শিক্ষাখাতে ব্যয়কৃত অর্থের একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ (শতকরা হার)

ব্যয়ের খাত	টাকা	সরকারি	স্থানীয় সংস্থা	ফিস	অন্যান্য উৎস
নির্দেশনা ও পরিদর্শন	১৫,৫৭, ৪৪৭	৯৩.৫%	৬.৪%	-	.১
বিশ্ববিদ্যালয়	২৯,৭৭,২২৩	৩০.৯%	-	৫৪.৬	১৪.৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা	৩৪,৩৬৬	-	-	১০০.০০	-
বিবিধ	৫৫,০৪,১৫৬	৩৩.৩%	৫.৮%	২১.৩	৩৯.৬
	১,০০,৭৩,১৯২	৪১.৮	৪.২	২৮.১	২৫.৯
পুরুষ					
১. সাধারণ মহাবিদ্যালয়	৩৭,৩৩,৫৪৯	৩৩.৫	.১	৫৮.৭	৭.৭
২. পেশাশিক্ষা মহাবিদ্যালয়	১৭,২২,৪৬৪	৬৪.৪	-	৩৩.৪	২.২
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	১,১৭,৮০,৪০৭	১৫.৫	.২	৭২.১	১২.২
৪. মধ্য বিদ্যালয়	৩০,১৮,৫০২	৭.৭	১২.৯	৬৩.৫	১৫.৯
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৭,৪৭,৬২৫	৩২.৮	২৫.২	৩০.৮	১১.২
৬. বিশেষ বিদ্যালয়	৪৩,২২,৮৫৩	৪৪.২	৯.৫	২৬.৩	২০.০
	৩,১৩,২৫,৪০০	২৭.৩	৮.১	৫২.৩	১২.৩
মহিলা					
১. সাধারণ মহাবিদ্যালয়	১, ৫৮,৮০৫	৪৬.৮	-	৪৫.০	৮.২
২. পেশাশিক্ষা মহাবিদ্যালয়	২৭,৬২০	১০০.০০	-	-	-
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	১৬,৩৮,২৯০	৩৫.৫	৪.৩	৪৭.৪	১২.৮
৪. মধ্য বিদ্যালয়	৩,৮০,১৩১	৩০.২	৮.৯	২৬.৮	৩৪.১
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬,২১,৫৬৫	২৭.৮	৩৯.৩	১২.১	২০.৮
৬. বিশেষ বিদ্যালয়	২.৮৩,৪৩৬	৪০.২	১০.৯	১৫.৭	৩৩.২
	৪১,০৯,৮৪৭	৩৩.২	১৮.৮	২৮.৯	১৯.১
সর্বমোট	৪,৫৫,০৮,৪৩৯	৩১.০	৮.২	৪৪.৯	১৫.৯

উৎস : *Quenquennial Report on the Progress of Education in Bengal, 1932-1937*, part 1, 180. *Bengal Administration Report 1925-26.*

ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন আরো অস্থিতিশীল এবং উত্তপ্ত হতে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তীব্র আর্থিক সঙ্কট। আর এ দুয়ের সম্মিলনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত ও পরিকল্পিত একান্ত জরুরি সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপা পড়ে যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অগ্রযাত্রার বদলে অধোগতি এসেছিল। ফলে ভারতের শিক্ষাজগতে বাংলা তার এতকালের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়ে।

স্বভাবতই এ ধরনের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে বাংলার শিক্ষাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা বড় ধরনের অগ্রগতি কিছু হওয়ার কথা নয়। তবু সার্বিক এই হতাশার কালো মেঘের মধ্যেও আশার দু'একটি রজতরেখাও দেখা দিয়েছিল। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল এসবের পেছনে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন এবং সরকারি-বেসরকারি আর্থিক সহায়তা থাকার কারণে। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে দু'টি ক্ষেত্র, যেখানে রাষ্ট্র তার যথার্থ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ, স্বাধীন দেশগুলিতে হাওয়া বইছিল ঠিক বিপরীত দিকেই। সেসব দেশে দেখি, যতই দিন যাচ্ছিল ততই মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে পুরনো ধ্যান-ধারণা পথ করে দিচ্ছিল নতুনের। শিক্ষার এ দুই স্তর যতটা পারা যায় বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এ ধরনের ধারণা দ্রুত পিছু হটছিল। তার বদলে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে এবং রাষ্ট্রীয় অনুদানে সেসব দেশে মাধ্যমিক ও কারিগরি বিদ্যালয়ের একটি সুবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল কাঠামো গড়ে উঠেছিল। তার বিপরীত চিত্র দেখতে পাই পরাধীন, ঔপনিবেশিক বাংলায়। এখানে শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভরশীলতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বৃটিশ ভারতে বাংলা ছিল এমন একটি প্রদেশ যেখানে নাগরিক সমাজ নিজেদের জন্য শিক্ষার খানিকটা সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে নিজেরাই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, যদিও সরকার অনুদানের মাধ্যমে কিছুটা সাহায্য করেছে বৈকি। এতে করে এই স্তরে শিক্ষার গুণগত মান তেমন উঁচু হতে পারে নি, বিঘ্নিত হয়েছে পেশাগত, বৃত্তিমূলক এবং নারী শিক্ষার অগ্রগতি। এসব দিক বাদ দিলে শুধুমাত্র সংখ্যার নিরিখে শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘটেছিল বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

দেশবিভাগ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশবিভাগ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। অবিভক্ত বাংলার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা (১৯৫৬ সালে নামবদল করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়) পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কিন্তু এতকালের অবহেলিত, কলকাতার

পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে শোষিত পূর্ব বাংলা দেশবিভাগের ফলে প্রশাসনিক সদর দপ্তর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, উত্তম বন্দর, যোগাযোগ-নেটওয়ার্ক সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কলকাতাকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় পরিবর্তনের ঢেউ এসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। নিজের স্বল্প পুঁজি ও সম্পদ নিয়ে পূর্ব বাংলাকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হয়। পুঞ্জীভূত সমস্যার চাপ সরকারের জন্যও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

গোড়ারদিকে নতুন কোন কিছু শুরু করার চেয়ে প্রদেশের বিপর্যস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করাটাই ছিল অধিকতর জরুরি। অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো সমাধা করতেই সরকারের সবটুকু শক্তি ও সময় ব্যয়িত হয়। বিপুল সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী ও শিক্ষকের দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ, নতুন কর্মচারী নিয়োগ, আসাম প্রদেশ থেকে সিলেট জেলার পাকিস্তানভুক্তির ফলে পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন এবং নিত্যনতুন গজিয়ে উঠা বিবিধ সমস্যার মোকাবেলা—এতোসব কাজ নিয়ে নতুন সরকারকে স্বাভাবিকভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। মোটকথা, দেশবিভাগের ফলে বিধ্বস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখাই ছিল সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ।

দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কেবলমাত্র ঢাকা শহর ছাড়া সারা বাংলায় মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলার স্কুল-কলেজের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এখতিয়ার আর থাকলো না। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র আবাসিক শিক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় বিধায় অধিভুক্তকরণের কোন ক্ষমতা তার ছিল না। এই অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৪৭' নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা স্তরের উর্ধ্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তকরণের ক্ষমতা লাভ করে। একই অধ্যাদেশের দ্বারা ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারি শিক্ষা বোর্ডের স্থলে পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডকে মাধ্যমিক শিক্ষা তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই অধ্যাদেশ জারির ফলে অর্ধশতেরও বেশি প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজ এবং আরো বহু সংখ্যক টেকনিক্যাল ও পেশাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ১,৩০০ স্কুলও পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় চলে আসে। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের পরিসর অনেক বেড়ে যায়, নতুন দায়িত্বও যোগ হয়। তাছাড়াও এই অধ্যাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, নির্বাহী কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল এবং বিভিন্ন অনুষদ পুনর্গঠন করে। সকল প্রথম গ্রেড কলেজের অধ্যক্ষদের এসব সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দেশবিভাগের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অনুষদে ১৭টি বিভাগ ছিল।[৪৬] এখন সারা প্রদেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এসে পড়ে। হিন্দুদের বিপুল হারে দেশত্যাগের ফলে শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। এছাড়াও উপযুক্ত ভবনের অভাব এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমান ছাত্রদের আগমন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাহত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ৯৯৬ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৪৮ জনে দাঁড়ায়। ফলে বাসস্থানের অভাব আরো তীব্র হয়।[৪৭] সকল ধরনের উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকগুলো নতুন বিভাগ ও কোর্স চালু করা হয়। আহসানউল্লাহ প্রকৌশল বিদ্যালয়কে প্রকৌশল কলেজে (বর্তমান বুয়েট) রূপান্তরিত করে নতুন একটি প্রকৌশল অনুষদের গোড়াপত্তন করা হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে। ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও আরো কয়েকটি মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়, ঢাকায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট এবং কুমিল্লায় একটি পশুচিকিৎসা কলেজ (সবগুলোই সরকারপরিচালিত) প্রতিষ্ঠা করা হয় উচ্চতর টেকনিক্যাল ও পেশাজীবী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।[৪৮]

১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় ৫৫টি কলেজ ছিল (দুটো মেয়েদের) এবং এদের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৪,২৯১ জন। এই ৫৫টি কলেজের মধ্যে মাত্র ৮টি ছিল সরকারপরিচালিত। এগুলোর জন্য সরকারের বছরে ব্যয় হতো ৫৫৪,০৫১ টাকা। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড়ে বছরে খরচ হতো সরকারি কলেজে ৩৯০ টাকা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩২ টাকা।[৪৯]

আগের মতোই মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল মধ্য-ইংরেজি, মধ্য-বাংলা এবং উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। এই মধ্য স্কুলগুলো—ইংরেজি ও বাংলা উভয়ই পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই দুটো শ্রেণী নিয়ে গঠিত ছিল। তফাতের মধ্যে প্রথমটিতে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক আর দ্বিতীয়টিতে ঐচ্ছিক ছিল। তুলনামূলকভাবে এগুলো গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের কাছাকাছি ছিল এবং এগুলোতে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের চেয়ে খরচও কম হতো। এদিক থেকে এদের একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল বৈকি। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববঙ্গে ২,১২৫টি মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। প্রায় দুই লাখ ছাত্র-ছাত্রী এগুলোতে অধ্যয়নরত ছিল। এখানে মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০টি। ছাত্র-ছাত্রী ছিল ছয় হাজারের কিছু কম। অতএব এগুলো ছিল দ্রুত বিলীয়মান প্রতিষ্ঠান—এদের অর্ধেকই ছিল সরকারি, যেখানে মধ্য-

---

৪৬. M. A. Rahim, *History of the University of Dhaka,* ১৯৮১, ৮৪.

৪৭. *পূর্ব বাংলা শিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-৪৮*।

৪৮. ঐ, ২২।

৪৯. ঐ।

ইংরেজি বিদ্যালয়ের মাত্র ১৩টি ছিল সরকারপরিচালিত। ১৯৪৭-৪৮ সালে মধ্য-ইংরেজি বালক বিদ্যালয়গুলোতে মোট বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪,৭৬,৪৮৬ টাকা। এ অর্থের এক-তৃতীয়াংশেরও কম এসেছিল সরকারি কোষাগার থেকে, বাকিটা আসতো ছাত্রবেতন ও অন্যান্য বেসরকারি উৎস থেকে।[৫০]

মাধ্যমিক স্তরের শেষ চারটি শ্রেণী নিয়ে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় গঠিত ছিল। এর সমাপ্তিপর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কারিগরি কিংবা পেশাশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ছাড়পত্র মিলতো। মধ্যস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো আর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো শিক্ষাবিভাগ এবং পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৩০৬টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৩,৩১,০৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছিল। এই স্কুলগুলির মধ্যে মাত্র ৩৩টি ছিল সরকারি, ৭১৩টি অনুদানপ্রাপ্ত এবং অবশিষ্টগুলো ছিল সম্পূর্ণ অনুদানবহির্ভূত।

সারণি ২ : উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়খাতে ব্যয়, ১৯৪৭-৪৮ (উৎস অনুসারে)

	বালক	বালিকা
সরকারি	২৪,৩৬,৪৩৯	৪,১৮,৯৫৩
জেলাবোর্ড	৩২,৮৯২	৪,৪৪৭
মিউনিসিপ্যালিটি	২৫৫	১১,৭৪৫
ছাত্রবেতন	৯৬,৩০,৩৫২	৩,৮৪,৮৬১
অন্যান্য	১৪,২৩,৮১৯	১,০৭,১৪৩
মোট	১,৩৫,২৩,৭৫৭	৯২,৭৩,১৪৯

উৎস : *পূর্ব বাংলায় জনশিক্ষা রিপোর্ট, ১৯৪৭-৪৮*, ১৮।

উপরে উদ্ধৃত পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে একথাই প্রমাণ করে যে, দেশবিভাগের প্রাক্কালে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পূর্ব বাংলার উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে উপরের স্তর বাদে প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই দেখা যায়, মোট ব্যয়ের সিংহভাগই এসেছে ছাত্রবেতন এবং অন্যান্য উৎস থেকে এবং সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য।

শিক্ষানীতি

পাকিস্তানের শুরু থেকে তার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা বা রিপোর্ট প্রণয়ন কম হয় নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন দেশে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য

---

৫০. প্রাগুক্ত, ১৪-১৫।

বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করে। অনুরূপভাবে ১৯৫১ সালের শিক্ষা সম্মেলন, ১৯৫২ সালের বঙ্গীয় শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি এবং ১৯৫৭ সালের পূর্ববঙ্গের শিক্ষা সংস্কার কমিশনের তরফ থেকে নানাবিধ সুপারিশ ও পরামর্শ পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও, শিক্ষা উন্নয়নের ব্যাপারে ষষ্ঠ বার্ষিক জাতীয় পরিকল্পনা (১৯৫২) এবং তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিস্তারিত আলোচনার পর বিভিন্ন সুপারিশ রাখা হয়। আরো ছিল শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সুপারিশমালা। আইয়ুব আমলে দু'টি অতি বিতর্কিত শিক্ষা কমিশনের সাক্ষাৎ মেলে। এদের একটি ছিল ১৯৫৯ সালের শরিফ কমিশন, যার দায়িত্ব ছিল একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করা। দ্বিতীয়টি ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্রদের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণবিধান সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার জন্য গঠিত হয়েছিল। সর্বশেষ উদ্যোগটি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগের সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আইয়ুবের পতনের অল্প পরে গৃহীত হয়েছিল। বিদ্যমান শিক্ষানীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে ত্রুটি চিহ্নিত করে প্রতিকারের উপায়নির্দেশ এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল। এইসব আলোচনা, পর্যালোচনা, তথ্য-পরিসংখ্যান, রিপোর্ট, জরিপ ও সমীক্ষার মিলিত ফসল হিসেবে পাকিস্তানের শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচীতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাবিদদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নতুন রাষ্ট্রের আদর্শ ও চাহিদার আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। পাঁচদিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার সব দিক পর্যালোচনার পর বেশ কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একটি প্রস্তাবে পাকিস্তান সরকারকে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে উপদেশ ও সহায়তা দানের জন্য প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীগণ, উপাচার্যবর্গ, জনশিক্ষা পরিচালকবৃন্দ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমবায়ে একটি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাজকর্ম সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে উপাচার্য ও সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন করার জন্যও সম্মেলনে প্রস্তাব রাখা হয়। তবে আমাদের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল দু'টি। একটিতে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, অতএব এই রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী আদর্শ ও নীতির আলোকে গড়ে উঠবে। বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামের মূলনীতিগুলোকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠা চাই। নবগঠিত উপদেষ্টা বোর্ড প্রদেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের জন্য একটি সার্কুলার প্রণয়ন করে। এই সার্কুলারটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমে নিজেই তৈরি করেছিল। তবে এর চেয়ে অনেক বেশি বিতর্কিত ও উত্তেজনাকর ছিল ভাষা সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তটি। এই সম্মেলন উর্দুকে

পাকিস্তানের সরকারি ভাষা বলে স্বীকার করে নেয় এবং যেসকল এলাকায় উর্দু শিক্ষার মাধ্যম নয় সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে উর্দুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৫১] বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বাঙালিদের কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল একথা সর্বজনবিদিত। এ অঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক উর্দুশিক্ষার প্রস্তাবটিও তেমন কোন গুরুত্ব পায় নি।

সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন—এই ছিল কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকারি শিক্ষানীতির দু'টি প্রধান লক্ষ্য। এটা অবশ্য নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না। কারণ একটি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ এবং বিশেষকরে পূর্ব বাংলার মতো একটি জনবহুল অঞ্চলের পক্ষে কেবলমাত্র টিকে থাকার জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং এর গুণগত উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। দেশভাগের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬০) ছিল সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল, যাতে সরকারি শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। এতে বলা হয় :

> মাধ্যমিক শিক্ষাকে দেশের ইতিহাস ও আদর্শ প্রচারের শক্তিশালী বাহন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; ব্যক্তির চরিত্র ও আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টিতে এই শিক্ষার নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকতে হবে; শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে মানববিদ্যা ও গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে এবং বিদ্যার্থীদের জন্য কৃষি, শিক্ষকতা, সমাজকল্যাণ, ব্যবসা ও শিল্পে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাজেই লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা ... কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অকালে সঙ্কীর্ণ বিশেষ শিক্ষার দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা না করে বরং তাদের জন্য উত্তম সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।[৫২]

পূর্ববঙ্গের জন্য ৫০০ উচ্চ বিদ্যালয়কে মান উন্নয়নের জন্য অনুদান দেয়া, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা, পাঠ্যসূচিকে বহুমুখী করা, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার নির্মাণ, উন্নয়ন করা, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ভবন নির্মাণ করার প্রস্তাব রাখা হয়। কুড়িটি উচ্চবিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কৃষিকোর্স চালু করা এবং আরো ১৬টি উচ্চবিদ্যালয়ে কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আরো প্রস্তাব করা হয় যে, কিছু সংখ্যক উন্নততর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উন্নীত করে এবং দুর্বল উচ্চবিদ্যালয়কে অবনমিত করে জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হবে; তদুপরি বিদ্যমান স্কুলগুলোর কতকগুলোকে উন্নত করে আশিটিকে বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করার কথাও বলা হয়।[৫৩]

---

৫১. ১৯৪৮ সালে ৭-৯ জুন করাচীতে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের প্রথম সভায় এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হয়েছিল। তখন রাজকুমার চক্রবর্তী প্রস্তাবের ভাষাসংক্রান্ত অংশের বিরোধিতা করেন। রাজকুমার চক্রবর্তী এই বোর্ডে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হয়ে গিয়েছিলেন। চক্রবর্তী তাঁর নোটে পাকিস্তানী ছাত্রদের উর্দু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে উর্দুকে কয়েকটি বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষণীয় ভাষার একটি করার পক্ষপাতী ছিলেন।

৫২. পাকিস্তান সরকার, *প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা* (১৯৫৫-৬০), ৫২।

৫৩. প্রাগুক্ত।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার (১৯৫৬ সালে এই নতুন নামকরণ হয়) ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে। তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনের সদস্যরা হলেন মাহমুদ হাসান, পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি; কুদরত-ই-খুদা, পরিচালক, আঞ্চলিক গবেষণাগার, ঢাকা; আখতার হামিদ খান, অধ্যক্ষ, কুমিল্লা ভিক্টোরিরা কলেজ; আবুল লেইস, অবসরপ্রাপ্ত ডি. পি. আই. আসাম; জি. সি. দেব, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ডি. পি. আই. আবদুল হাকিম, সদস্য-সচিব।

একই বছর কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে। শিক্ষার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েও কমিশন জাতির সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য পরিকল্পিত ও সুসমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করে। এতে বলা হয় যে, দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের বিষচক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। আমাদের দারিদ্র্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁজিবিনিয়োগের বড় অন্তরায়। দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে কমিশন আমাদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, শিল্পে অনুন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত দুর্বলতাকে দায়ী করে। অতএব ব্যাপক গণসাক্ষরতা এবং উপরের স্তরে বহুমুখীকরণসহ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারি শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে কমিশন মতপ্রকাশ করে।[৫৪]

কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে নিম্নলিখিত চারটির যেকোন একটি আকারে সংগঠিত করার পরামর্শ দেয় : (ক) ১১টি শ্রেণীসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়; (খ) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট পাঁচটি শ্রেণীর হাইস্কুল, (গ) প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ৮টি শ্রেণী নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জুনিয়র হাইস্কুল; (ঘ) নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি শ্রেণী নিয়ে একটি সিনিয়র হাইস্কুল। বলা হয় যে, এসব বিদ্যালয়ে সকলের জন্য অত্যাবশ্যক একটি মূল পাঠ্যসূচি থাকবে। পাশাপাশি প্রতিটি বিদ্যার্থীর বয়স, স্থানীয় পরিবেশ ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা, মানসিক গড়ন ও অভিরুচি অনুযায়ী বহুমুখী কোর্সের উদার ব্যবস্থাও থাকবে। এসব বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমাদের নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্যকরূপে অনুধাবন ও মোকাবেলা করার বুদ্ধিমত্তা ও দেশপ্রেম গড়ে উঠবে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করে। দেশে বিদ্যমান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সামগ্রিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে মূলত স্থানীয় উদ্যোগে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছিল। কাজেই কমিশন মনে করে, অদূর ভবিষ্যতে সব ধরনের প্রতিষ্ঠান, এমনকি সংস্কারকৃত এবং প্রাচীনপন্থী মাদ্রাসাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে একটা সমন্বিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

---

৫৪. পূর্ব পাকিস্তান সরকার, *শিক্ষা সংস্কার কমিশন রিপোর্ট*, ১৯৫৭, ১৮-১৯।

এ ধরনের একটি ব্যবস্থার জন্য ভাল বেতন, কাজের পরিবেশ ও উন্নতির সম্ভাবনাসহ উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সমাজের সর্বস্তর ও দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক বিনিয়োগের দরকার হবে। কিন্তু এটা এমনি একটা প্রয়োজন, যা পর্যায়ক্রমে মেটাতে হবে। আরো দু'টি সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে কমিশন জোর দেয়। তা হলো বাধ্যতামূলক ভাষাশিক্ষা ও নারীশিক্ষা। প্রথমটির ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এই যে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষাই (শিক্ষার মাধ্যম) বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষণীয় ভাষা হওয়া উচিত। জুনিয়র হাইস্কুল পর্যায়ে একজন বিদ্যার্থী দু'টি ভাষা শিক্ষা করবে। দ্বিতীয়ত, একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত।[৫৫]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ, কারিগরি ও পেশাভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে মূলত উন্নততর শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত হোস্টেল, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়া হয়। নতুন নতুন ভবন নির্মাণের চেয়ে উল্লিখিত প্রয়োজন মেটানোর উপর পরিকল্পনায় অধিকতর জোর দেয়া হয়। একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা নেহাত জরুরি—প্রথম পরিকল্পনার এই ঘোষণার কথা মনে রেখে প্রাদেশিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রদেশের উচ্চতর শিক্ষার চাহিদা নির্ধারণ করেছিল।[৫৬]

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি। দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৭১টি কলেজ ছিল। তন্মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একেবারেই নতুন--বলা যায় নামমাত্র। অনুরূপ জনসংখ্যা অধ্যুষিত যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল কুড়িটি এবং বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কলেজও ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার চেয়ে চারগুণ বেশি জনসংখ্যার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ১,৮৫৫টি। আর সমসংখ্যক জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ৩০০টি (৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ)। পূর্ব পাকিস্তানের চেয়েও কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত ছিল। যুক্তরাজ্যে এ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৮৪,০০০ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৭,২০,০০০ জন। যুক্তরাজ্য উচ্চশিক্ষায় যা ব্যয় করতো তার শতকরা একভাগ ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে। আর যুক্তরাষ্ট্রের দু'হাজার কোটি ডলার ব্যয়ের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়ের অঙ্ক ছিল সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। ১৯৫৩-৫৪ সালে সকল প্রকার শিক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছিল ৭,২৭,৩৩,৭৬৬ টাকা। টাকার পরিমাণে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে এই তুলনা যতোই মর্মান্তিক মনে হোক, শিক্ষার গুণগত মান ও বিষয়বস্তুর তুলনামূলক চিত্র যে আরো অনেক বেশি হতাশাব্যঞ্জক ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৫৫. প্রাগুক্ত, ২০-২১।
৫৬. ঐ, ৩৮-৩৯।

অর্থকৃচ্ছ্রতার এই প্রেক্ষাপটে কমিশন অসমন্বিত শিক্ষাপ্রসারের চেয়ে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির গুণগত মান উন্নয়নের উপরই বেশি জোর দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও চট্টগ্রামে একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব কমিশনের কাছে খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতো কমিশনও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটি গঠনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জনের সুপারিশ করে।

সরকারি শিক্ষানীতির এই ছিল মূল রূপরেখা—শিক্ষাকাঠামোতে গুণগত মানের দারিদ্র্য দূর করা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে যথাসম্ভব শিক্ষাপ্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে অর্জন একেবারে তুচ্ছ না হলেও প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হয়েছিল। কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া সত্ত্বেও দক্ষ জনশক্তি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে রয়ে যায়। অন্যদিকে মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষার গুণগত মানেও তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি।

তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে 'জাতিগঠনে শিক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ' এই তত্ত্বকে খুবই প্রাধান্য দেয়া হয়। ততোদিনে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে মানবসম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্যতা দেশে-বিদেশে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইতিমধ্যে তৎকালীন সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে এর রিপোর্ট পেশ করে।[৫৭] দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই ৬০ ও ৭০-এর দশকের জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন, দিকনির্দেশনা দান ও বাস্তবায়নকৌশল নিরূপণে উক্ত কমিশনের সুপারিশকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

কমিশন শিক্ষাকে উৎপাদনশীল কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের সুপারিশ প্রণয়ন করে। শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশেষকরে উচ্চতর পর্যায়ে গুণগতমান উন্নয়ন, যাতে করে এই ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা অন্যান্য উন্নত দেশের শিক্ষিতদের তুলনায় সন্তোষজনকভাবে দাঁড়াতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে উত্তরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতির প্রয়োজন একটি পুনর্গঠিত ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা। বিশেষকরে উচ্চতর পর্যায়ে মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, পাকিস্তানের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও এর পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি ছিল কমিশনের লক্ষ্য।

---

৫৭. পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শিক্ষাসচিব এস. এম. শরিফ ছিলেন এই কমিশনের প্রধান। অন্যরা হলেন পেশোয়ার, করাচী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ; আণবিক শক্তি কমিশনের একজন সদস্য; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক; সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড; অধ্যক্ষ, পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একজন কলেজ-অধ্যক্ষ। এগারো সদস্যের এই কমিশনে মাত্র চারজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং তিনজন ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কমিশন সুপারিশ করে : (ক) আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করতে হবে, (খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচিতে গুটিকয়েক বাধ্যতামূলক বিষয়ের পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয় রাখতে হবে, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে, (ঘ) সম্মান ও পাস ডিগ্রি কোর্সের স্থায়িত্ব তিন বছর করতে হবে, (ঙ) মেধাবি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্তরের পর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে এবং (চ) নারীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।[৫৮]

শিক্ষাব্যয়

এই প্রশ্নটি শিক্ষা কমিশনকে যথেষ্ট ভাবিত করেছিল যে শিক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করেছি, এযাবৎকাল শিক্ষা সম্প্রসারণের পিছনে ব্যক্তিগত উদ্যোগই সবচেয়ে সক্রিয় ছিল, রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল ন্যূনতম। যেহেতু সরকারি ব্যয়ের সিংহভাগই ব্যয়িত হয়েছে বিশেষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পিছনে, সেহেতু বিদ্যমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের অধিকাংশ এবং কলেজের অনেকগুলিই বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে এদের বেশিরভাগই কোনমতে টিকে থাকার সংগ্রামে নিরত থাকতো। কিন্তু যেহেতু কমিশন শিক্ষাকে "একটি ব্যয়বহুল সমাজসেবামূলক উদ্যোগ" হিসেবে না দেখে বরঞ্চ বিনিয়োগ ও সম্পদসৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে দেখেছিল, সেজন্য এটি সরকার এবং জনগণ উভয়কেই আরো বেশিকরে এই ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। কমিশন স্বীকার করেছিল যে, সরকার কখনো নিরঙ্কুশভাবে অথবা অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করে নি। "যেহেতু আমরা দরিদ্র, সেজন্য আমাদেরকে এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বাড়তি ত্যাগস্বীকার করতে হবে যাতে আমাদের দারিদ্র্য লাঘব হতে পারে।"[৫৯] কাজেই কমিশনের মতে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার ও জনগণের সমানভাবে বহন করা উচিত, আর মাধ্যমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের তিন-পঞ্চমাংশ ছাত্রবেতন থেকে মেটানো হোক এবং উচ্চতর শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের যতোটুকু জনসাধারণ বর্তমানে বহন করে থাকে তার চেয়ে আরো অধিক হারে জনসাধারণের বহন করা বাঞ্ছনীয়। এই মতেরই প্রতিধ্বনি করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়, "যদি শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজন উত্তমরূপে মেটাতে হয়, তাহলে সরকারি সম্পদের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগের উপর আরো অধিকভাবে নির্ভর করতে হবে।"[৬০] উন্নততর শিক্ষার জন্য বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে সবগুলো উৎসই, যেমন কর, ছাত্রবেতন, নাগরিক বদান্যতা, সরকারি ঋণ ও বিদেশী দাতার দান ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, এই প্রথমবারের মতো একটি সরকারি দলিলে

৫৮. কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন অধ্যায়।
৫৯. *শরিফ কমিশন রিপোর্ট*, ৩৪৭।
৬০. *দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা*, ৩৪১।

সরকারের পরিবর্তে বেসরকারি উদ্যোগকে আরো ব্যাপকভাবে শিক্ষাউন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।[৬১]

কিন্তু কমিশন যাই সুপারিশ করুক, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগ বরাবরই মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। নিচের সারণিগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সারণি ৩ : পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাব্যয়, ১৯৬১-৬২ (উৎস অনুসারে)

মোট ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার		
খাত	টাকা	সরকার	স্থানীয় সরকার	বেতন	অন্যান্য
১. বিশ্ববিদ্যালয়	৬৮,৯১,৮৫৪	৭৮.৪	-	২০.৮	০.৪
পুরুষ					
২. সাধারণ কলেজ	৯৫,৬৬,৩৮৪	৩৭.৪	-	৫৫.২	৭.৪
৩. পেশাশিক্ষার কলেজ	৪৫,৮৬,৯০৫	৭৯.৪	০.২	১৮.১	২.৩
৪. উচ্চবিদ্যালয়	৩,২১, ৪৮,৬৩৫	২৪.৩	০.১	৫৫.৭	১৯.৯
৫. জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয়	৩৭,৫৩,১৫৪	২১.৬	২.২	৪৬.৬	২৮.৬
৬. মধ্য স্কুল	১০,২২,৪০৩	২৫.০	৭.৫	৩৯.২	২৮.৩
মহিলা					
১. সাধারণ কলেজ	৯,৬৮,৪৮৯	৫৫.৯	১.৬	২২.৬	১৯.৯
২. পেশাশিক্ষার কলেজ	১. ০,৬৪৯	১০০.০	-		
৩. উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫.[illegible] ১,৯৪৭	৩৭.৭	১.১	৩৭.৯	২৩.৩
৪. জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	৬,৩৬,৬০০	৩১.৮	৩.৬	৩২.৪	৩২.২
৫. মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়	৮,১৩৪	৩৩.৩	৪৭.৫	-	১৯.২
পুরুষ		**১৯৬৪-৬৫**			
১. বিশ্ববিদ্যালয়	১,৪২,৯৮,৮৬৪	৬৫.৯	-	১৭.৪	১৬.৭
২. সাধারণ কলেজ	১,৭৯,৩৩,৭৮৪	৩৩.৯	.০৯	৫৩.৯	১১.৩
৩. পেশাশিক্ষার কলেজ	৫৪,৭১,১০৭	৯৪.০	১.০	৪.৯	০.১
৪. উচ্চ বিদ্যালয়	৫,০৭,১১২	২৬.৭	০.৬	৫৬.৫	১৬.২
৫. জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও মধ্য স্কুল	৮৫,৩৪,৮৪১	২৭.১	৩.৪	৪৫.৯	২৩.৬

উৎস : পূর্ব পাকিস্তান সরকার, *পূর্ব পাকিস্তান জনশিক্ষা বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৬১-৬২, ৬৪-৬৫* এবং পূর্ব পাকিস্তান জনশিক্ষা, *পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৬০-৬১, ১৯৬৪-৬৫,* ২৬-২৭।

৬১. এই মতের সঙ্গে পূর্বেকার সরকারি মতের তুলনা করা যেতে পারে। যেমন ১৯৪৯ সালে ১৪-১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের তৃতীয় সভায় রাজকুমার চক্রবর্তী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির প্রস্তাব করেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ অসুস্থতার লক্ষণ বলে। বোর্ড একবাক্যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। পূর্ববঙ্গেও সরকারি কোন রিপোর্টেই রাষ্ট্রের ভূমিকা কমানোর পক্ষে ওকালতি করা হয় নি।

এই সারণিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬১-৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে সরকারের মোট ব্যয় কেবল পেশাভিত্তিক শিক্ষা বাদে বেসরকারি খাত থেকে খরচের চেয়ে কম ছিল। পরবর্তী পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ক্ষেত্রে সরকারি খরচের শতকরা হার আরো নেমে যায় এবং তা মাধ্যমিক ক্ষেত্রে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র।

বিস্তৃতি ও বৈষম্য

সে যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তান তার প্রায় সিকি শতাব্দী জীবনে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের উন্নতির মুখ দেখেছিল বৈকি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছিল, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছিল, সকল উৎস থেকে ব্যয়ের মাত্রাও বেড়েছিল। সারণি ৪-এ তা লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না। ১৯৬১ সালে পাঁচ কোটি লোকের (১৯৬১ সালের লোকগণনা) বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানে হাইস্কুল ছিল দু'হাজারেরও কম আর ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৪,৭৫,১৩৭ জন।[৬২] দু'টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪,২৭৯ জন এবং আরো ১,৪০০ জন দু'টি উচ্চ পেশাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছিল।[৬৩] গ্রামাঞ্চলে কোন সাধারণ শিক্ষার কলেজ ছিল না এবং ১,৫৬১টি উচ্চ বিদ্যালয়ে (দু'টি ছিল সরকারি) ৩,৪৭,২৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়ন করছিল।[৬৪] খরচের কথা বিবেচনা করলে দেখতে পাই, ১৯৬১-৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মোট শিক্ষাবাজেট ছিল ১৩ কোটি টাকার কিছু কম।[৬৫]

স্বভাবতই অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষকরে সচেতন জনসাধারণের মধ্যে। অসন্তোষের মাত্রা আরো তীব্র হতে শুরু করলো যখন মানুষ বুঝতে পারলো যে, পূর্ব পাকিস্তান জনসংখ্যার দিক থেকে বড় অংশ হয়েও ন্যায্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল তো দূরের কথা, এমনকি সমান ভাগও পাচ্ছিল না। পাকিস্তানের বাঙালিবিদ্বেষী শাসকচক্রের হাতে বাঙালিরা সর্বক্ষেত্রে যে বঞ্চনার শিকার হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চনা ছিল তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নীতি ও কার্যক্রমের সমালোচনা, বিশেষকরে শিক্ষাক্ষেত্রে, শুরু হয়েছিল একেবারে গোড়ার দিকেই।

শিক্ষার মাধ্যম ছিল এমনি একটি বিষয়, যা শিক্ষাজীবনের সার্বিক উন্নতি-অবনতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। যতোই দিন যাচ্ছিল ততোই বোঝা যাচ্ছিল যে, বাঙালি জাতিকে সাংস্কৃতিক দাসত্বে আবদ্ধ করার একটা হীন চক্রান্ত হিসেবেই উর্দুকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে সেদিন বাঙালি জাতি সাফল্যের সঙ্গে সেই চক্রান্তের জাল ছিন্ন করেছিল।

---

৬২. পূর্ব পাকিস্তান সরকার, শিক্ষা পরিসংখ্যান, সারণি ৪।

৬৩. ঐ, সারণি ৭।

৬৪. পূর্ব পাকিস্তান সরকার, *বার্ষিক শিক্ষা রিপোর্ট* ১৯৬১- ৬২, ১২২।

৬৫. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা ১৯৮৭), ১৮৯।

সারণি ৪ : এক নজরে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, ১৯৪৭-৬৮

	বিশ্ববিদ্যালয়				ডিগ্রি কলেজ			
বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট ব্যয়	সরকারি ব্যয়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট ব্যয়	সরকারি ব্যয়
১৯৪৭/৪৮	১	১,৬৯৩	১২,৮৭,০৫৮	৯,২২,৭০০	৩১	পাওয়া যায় নি	২০,৯৪,৫৬৯	৭,৯৩০,৩৯
১৯৫৭/৫৮	২	৩,১৫০	৩৭,০৪,৮৯৯	২৬,৭৫,০৯৫	৪২	৩০,৭৪৩	৫,৫১,৯৬৩	২৬,১০,৭৫৫
১৯৬৭/৬৮	৩	৩৮,৫২৪	১,৩৩,৬৯,৯৫০	৮২,৮৮,৮০০	১০৭	১,৪৯,৬০৭	৩,১০,০৫,৭৮৫	১,০৩,৫১,০৬৮
	ইন্টারমিডিয়েট কলেজ				**হাই স্কুল**			
১৯৪৭/৪৮	২০	পাওয়া যায় নি	৬,৩৩,২০৭	২,৯৯,৫৭৪	১,৩০৬	৩,৩১,০৭৪	১,৪৪,৫০,৯০৬	২৮,৫৫,৩৯২
১৯৫৭/৫৮	৩৭	৬,৭১৯	১৩,২৬,৯৬৬	৬,৫০,৮৩৪	১,৬৩৮	৩,৯২,৯৩৯	২,৩৪,৯৯,২৪২	৭০,২৯,৩৮৩
১৯৬৭/৬৮	১০৮	৩১,৩৪৫	৫৮,০৭,২৯২	১৮,২৮,০৪৪	৩,১০৮	১০,২২,৪৬৫	৯,৯৮,১৯,১৯৭	৩,২০,১৩,৯৬৪

উৎস : East Pakistan Government, *Stetistical Information on Education in East Pakistan 1970*, Tables IV, V, VI, VII.

বাংলা ভাষা তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছিল ঠিকই, তবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল বিরতিহীন, নিরবচ্ছিন্ন। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ- বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমবায়ে গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। উদ্দেশ্য ছিল দেশভাগের পর অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শাসক দল মুসলিম লীগকে প্রতিহত করা। যুক্তফ্রন্ট 'ছয় বছরের স্বৈরাচার' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল যাতে নানা ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্যের একটা বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।[৬৬] এটি ছিল বেসরকারি সূত্রে সন্নিবেশিত তথ্য-প্রমাণ। সরকারি সূত্রগুলো অতো উচ্চকণ্ঠ না হলেও কোন অংশেই কম পীড়াদায়ক ছিল না। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া গেল:

সারণি ৫ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা—বিদ্যার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষাব্যয় সারসংক্ষেপ (১৯৪৭-৫৪)

সময়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষক	মোট সরকারি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)
		পূর্ব পাকিস্তান		
১৯৪৭-৪৮	৩৫,৪৮৪	২৭,১৯,৫৩৩	৯৯,০০৯	১২.৪
১৯৫২-৫৩	৩১,৫৮২	৩৩,২৪,১৫৬	৮৯,০০৯	৪৩.৬
১৯৫৬-৫৭	৩২,১৫৪	৩৪,৮৮,২৩০	৯৪,৬৯৮	৪৩.২
		পশ্চিম পাকিস্তান		
১৯৪৭-৪৮	১১,১৯৩	১০,৭৬,২৪৮	৩৬,৬৬৮	২২.৩
১৯৫২-৫৩	১৫,২৯৩	১৮,৩১,৪৮০	৫০,৬৬৩	৬০.৭
১৯৫৬-৫৭	২০,৩০৮	২৩,৫৫,৬৫০	৬৮,৯২২	৯৭.১

উৎস : পাকিস্তান সরকার, *পাকিস্তানে শিক্ষা পরিসংখ্যান ১৯৪৭-৫৭,* সারণি ২ ও ৩।

সারণি ৬ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়

	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
সময়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	মোট সরকারী ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	মোট সরকারি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)
১৯৪৭-৪৮	৩,৪৮১	৫,২৬,০২০	২.৪	২,৫৯৮	৫০৮,০৩৯	৫.১
১৯৫২-৫৩	৩,১৪৩	৪,৫৩,৪৪১	৮.৬	২,০১৮	৬২১,৫৭৮	১২.৬
১৯৫৬-৫৭	৩,০৮৪	৪,৯৭,৫৯৯	৬.৪	২,৬৭২	৮২৮,৭১৫	২৪.৪
১৯৬৫-৬৬	৪,১০৮	৯,৫৬,২০৬	৫৩.২৬	৪,৪৪৩	১,৪৪৯,৪১৭	৬৭.৩৫

উৎস · শিক্ষা পরিসংখ্যান, পাকিস্তান॥১৯৪৭-৫৭, সারণি ৮,৯ এবং *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক ১৯৬৮,* সারণি ১৭৩,১৭৪,১৯৫,১৯৬।

---

৬৬. *পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা পরিসংখ্যান,* সারণি ১৮।

সারণি ৭ : পরিসংখ্যান : সাধারণ কলেজ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান

	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
সময়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী
১৯৪৭-৪৮	৫০	১৮,৫৫৬	৪০	১৩,৫৫৫
১৯৫২-৫৩	৭১	২১,৪৮৮	৫৮	৩০,১১৬
১৯৫৬-৫৭	৬৭	২৯,১৫৮	৮৫	৪৫,৮৭৮
১৯৬৫	১৬১	১,২৫,৫৯৭	২২৮	১,৩৪,৩১৯
		পেশা শিক্ষার কলেজ		
১৯৪৭-৪৮	৫	৭৭৮	২১	৪,৩৬৮
১৯৫২-৫৩	৬	১,৯০৭	২৪	৬,৪৪৯
১৯৫৬-৫৭	১১	২,৮৮৭	৩২	৯, ৫১৯
১৯৬৫	২১	৬,১৭৩	৩৩	১১,৭৩৫

উৎস : পাকিস্তান সরকার॥ *শিক্ষা পরিসংখ্যান, ১৯৪৭-৫৭*, সারণি ১৭ ও ১৮ এবং *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৬৮*, সারণি ১৮৪-১৮৫।

সারণি ৮ : বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান

	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	মোট সরকারি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী	মোট সরকারি ব্যয়
১৯৪৭-৪৮	১	১,৬২০	১.০	২	৬৪৪	১.৯
১৯৫২-৫৩	১	২,৩০৪	৪.৭	৪	১,৬৮৬	৮.৫
১৯৫৬-৫৭	২	৩,১২৫	৫.৫	৪	৩,১০৬	১৪.৯
১৯৬৫	২	৬,৭২৯	১০.৮৫ (১৯৬৪-৬৫ সময়ে)	৪	১০,০৬৮	৫৬.২ (১৯৬৪-৬৫ সময়ে)

উৎস : *পাকিস্তানের শিক্ষা পরিসংখ্যান, ১৯৪৭-৫৭*, সারণি ১৯ এবং ২৪ এবং *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক*, সারণি ১৮৮, ১৮৯, ১৯২।

সারণি ৯ : মোট সরকারি শিক্ষাব্যয়

(মিলিয়ন টাকা)

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	১২.৪	২২.৩
১৯৫২-৫৩	৪৩.৬	৬০.৭
১৯৫৬-৫৭	৪৩.২	৯৬.১
১৯৬৭-৬৮	৩৪৮.৬	৩৬৫:৩

উৎস : *পাকিস্তানের শিক্ষা পরিসংখ্যান ১৯৪৭-৪৮* এবং ১৯৬৭-৬৮ এর জন্য *পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক, ১৯৬৮*, সারণি ১৯৮ ও ১৯৯।

শিক্ষা ও রাজনীতি

উল্লিখিত সারণিগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দেশবিভাগের প্রাক্কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ব্যাপকতর শিক্ষাভিত্তি নিয়ে। প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যার (পেশাশিক্ষার ক্ষেত্র ব্যতিরেকে) বিচারে এটা সত্য ছিল, যদিও ব্যয়ের দিক থেকে একথা বলা যায় না। কিন্তু ৫০ ও ৬০-এর দশকে অধিকতর শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল। দুর্লভ অর্থ-সম্পদ ভাগাভাগির প্রতিযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল।[৬৭]

যে উচ্চাশা, উদ্দীপনা ও দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বাঙালিরা পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছিল, বিভাগোত্তর পাকিস্তানে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে তা ক্রমে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের জন্মের পর এক দশকের মধ্যেই বাঙালিরা, বিশেষকরে তাদের মধ্যে যারা সচেতন তারা বুঝে নিয়েছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরে শুধু প্রভুর বদল হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়। এর ফলে বাঙালিদের মনে জন্ম নিয়েছে হতাশা, হতাশা থেকে ক্রোধ এবং এ ক্রোধ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয়েছে তাদের মরণপণ স্বাধিকার সংগ্রাম।

আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পূর্ব পাকিস্তান প্রথমে চেয়েছে ফেডারেল সংবিধানের অধীনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে। সেই আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সেই দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এদেশেরই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এসব সচেতন, জাগ্রত নারী-পুরুষের চোখেই পাকিস্তানী শাসনের ঔপনিবেশিক চরিত্রটি ধরা পড়েছিল সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে প্রকটভাবে। পাকিস্তানী শোষণ এদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের গতিকে যেভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছিল তার প্রবল চাপ এরা অনুভব করতে পেরেছিল তীব্রভাবে। দেশপ্রেমের কথা বাদ দিলেও এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ হিসেবে নিজেদের বাঁচার তাগিদেই বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানী শাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে। কারণ সামনে এগোবার আর কোন পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না।

নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। সেদিন ছাত্ররাই ছিল বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রদূত এবং সক্রিয় কর্মী। রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ নবতর মাত্রা ও তীব্রতা লাভ করে ষাটের দশকে

---

৬৭. পাকিস্তান সরকার, *ছাত্রসমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ কমিশন রিপোর্ট*, ১৪৭।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে। এক দশকব্যাপী আইয়ুবী স্বৈরাচার আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যকে দুঃসহ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় সকল বাঙালি বাধ্য হয়েছিল ছয় দফা আন্দোলনের ছত্রছায়ায় স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের এক মোহনায় এসে মিলিত হতে।

আইয়ুবশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রঅসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে সামরিক শাসনের প্রথম থেকেই। গোলযোগের সূত্রপাত হয় যখন সরকার শরিফ কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হলো। সরকারি নির্দেশে শরিফ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছিল। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে আইয়ুব সরকার ১৯৬১ সালে জারিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণা-ধীনে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। কালো আইন নামে অভিহিত এই অর্ডিন্যান্সগুলো সরকারের হাতে অভূতপূর্ব ও নিরঙ্কুশ নতুন ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো যেন পরিণত হয়েছিল সরকারের একেকটি বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট ও নির্বাহী কাউন্সিলের (বর্তমান সিনেট ও সিন্ডিকেটের সমতুল্য) সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছিল। নির্বাচনপ্রথা উঠিয়ে দেয়া হয়। চ্যান্সেলরের সম্মতি সাপেক্ষে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন সংস্থা কর্তৃক পাশকৃত যেকোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত করতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাশকৃত কোন আইন বা অর্ডারকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার হরণ করা হয়। চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন যদি তিনি মনে করতেন যে পরিস্থিতির আলোকে এর প্রয়োজন আছে। এতসব ক্ষমতাদানের পরও চ্যান্সেলরকে যেকোন অর্ডার জারি করার বিধিবহির্ভূত ক্ষমতা দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

এসব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষকরে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণরূপে এবং কলেজগুলো থেকে কিছু কম পরিমাণে সরকার-বিরোধী তৎপরতার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। সেই ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই চিন্তা ও কর্ম উভয়বিধ ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের লালনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন সেসব চিন্তাবিদ, লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা ও মূল্যবোধকে শাণিত করেছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংহতি দান করেছিলেন। দলে দলে আরো বেরিয়ে এসেছিলেন পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা এবং বেসর-কারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও শিল্প-উদ্যোক্তারা। এঁরাই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্ফীত করেছিলেন, যাঁরা ৬০-এর দশকে এসে প্রত্যক্ষ করেন পাকিস্তানী শাসক মহল কেমন করে তাদের অর্থনৈতিক আকাঙক্ষা ও প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

কিন্তু আইয়ুবচক্রের কাছে আরো বেশি প্রত্যক্ষ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, যারা ছিল ক্রমবর্ধমান সরকারবিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠক।[৬৮] ১৯৬২ সালের পর থেকেই ছাত্রদের সরকারবিরোধী বিক্ষোভের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এই তীব্রতর ছাত্রবিক্ষোভের কারণগুলো যেমন ছিল শিক্ষাসংক্রান্ত তেমনি রাজনৈতিকও। তাদের দাবিগুলোই তার প্রমাণ। তারা চেয়েছিল সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, স্বৈরতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৬১ বাতিল ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তানসহ অন্যান্য প্রদেশের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র, সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি, ছাত্রসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার।[৬৯] তখন শিক্ষাসংক্রান্ত অভিযোগাগুলো রাজনৈতিক অভিযোগ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হতো। কাজেই ছাত্রদের শিক্ষাসংক্রান্ত দাবিগুলো বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছিল।

ছাত্রবিক্ষোভের মোকাবেলায় সরকার বেছে নিয়েছিল নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের পথ। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা, ব্যাপক ধরপাকড়, জেল-জুলুম, বহিষ্কার, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা প্রত্যাহার, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন.এস.এফ) নামধারী সরকারসমর্থিত তথাকথিত ছাত্র সংগঠনের গুণ্ডা কর্তৃক ছাত্রদের উপর দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার এসব আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে।[৭০] সরকার ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করে। হামুদুর রহমান ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। যদিও এটি ছাত্রসমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ কমিশন নামে অভিহিত হয়েছিল, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এটি কোন শিক্ষা কমিশন ছিল না।[৭১] এর প্রধান কাজ ছিল ছাত্র-অসন্তোষের কারণ খুঁজে বের করে প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ প্রদান করা। ১৯৬৫ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে কমিশন "উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির অভিযোগ"-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উপসংহারে বলে যে, "(১৯৬১ সালের অধ্যাদেশের অধীনে) যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল তাতে বিরাজমান অবস্থায় আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয়

---

৬৮. 'শহীদ দিবস' ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩, ছাত্রদের প্রকাশিত পুস্তিকা; 'শিক্ষা দিবস' ১৭ সেপ্টেম্বর এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, সরকারের বর্ণমালা সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ। সবগুলো তথ্য এসেছে বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র,* ২য় খণ্ড, ২০৮, ২১৪, ৩৭২।

৬৯. ঐ, এগারো দফা- ১৫৪।

৭০. *দৈনিক আজাদ*, ২৩ ও ২৬ মার্চ, ২৮ এপ্রিল ও ৫ মে ১৯৬৪।

৭১. কমিশনের অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন—এস. এ. মাহমুদ, বিচারপতি, পশ্চিম পাকিস্তান হাই কোর্ট; মমতাজউদ্দীন আহমদ, উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাসির আহমদ, সভাপতি, পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

নি, বরং হিতে বিপরীতই হয়েছে।"[৭২] তাঁদের প্রস্তাব ছিল উপযুক্ত রক্ষাকবচসহ সিনেট ও সিন্ডিকেটকে পুনর্বহালকরণ যাতে করে 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তিবর্গ অনুপ্রবেশ করতে না পারে অথবা পারলেও কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারে। অতি সীমিত মাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থায় নির্বাচনপ্রথার সুপারিশ করা হয়। এর বেশি কিছু করতে কমিশন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কমিশন স্বীকার করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে একজন রাজনৈতিক গভর্নরের নিযুক্তিকে অত্যন্ত উত্তপ্ত একটি ইস্যুতে পরিণত করেছে। কিন্তু তাঁরা এতে কোন দোষ দেখতে পান নি।[৭৩] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একমাত্র সিনেট ও সিন্ডিকেট ইস্যু ছাড়া কমিশন বিরাজমান শিক্ষাকাঠামোতে আর কোন মৌলিক পরিবর্তনের সুপারিশ করে নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসংগঠনগুলো সম্বন্ধে কমিশনের বিরূপ মনোভাব বাঙালি ছাত্রদের কাছে এর প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাই তুলে ধরেছিল। কাজেই শরিফ কমিশনের মতো এই কমিশনকেও ছাত্ররা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে।

পাকিস্তানের উভয় অংশে তীব্র ছাত্রবিক্ষোভ[৭৪] ও গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে আইয়ুবশাসনের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আইয়ুবের উত্তরসূরিদের সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার নৈতিক শক্তি ও সাহস মোটেই ছিল না। ফলে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কালক্রমে এসে মিশে যায় একাত্তরে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে।

পূর্ব বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ঘটলো সেই ঘটনা, যা প্রথম ঘটেছিল ৪০-এর দশকে পাকিস্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে। সেবারের মতো এবারও বাংলার উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফসল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান অসহনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু এককভাবে এটা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না যদি না তারা নিজেদের শ্রেণীগত বিভাজনের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসে ব্যাপক গণমানুষের কাতারে যেয়ে দাঁড়াতো। শিক্ষিত শ্রেণী এবং জনতার এই ঐক্য ও মৈত্রীতেই নিহিত ছিল বাঙালির মুক্তি।

---

৭২. ঐ, *কমিশন রিপোর্ট*-১৯৬৫, ৫।

৭৩. ঐ, ১৪৯।

৭৪. আইয়ুব খানের পতনের পরে ইয়াহিয়া খান ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আর একটি কমিশন গঠন করেছিলেন এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে। পাকিস্তান শিক্ষা মন্ত্রণালয় নূর খান কমিশনের রিপোর্ট 'নতুন শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব' নামে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ করেছিল। এই প্রস্তাবগুলো উদার, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চরিত্রের ছিল এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্পষ্টতই এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যসমূহ দূর করা। কিন্তু ততোক্ষণে বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে এগুলো চিরতরের জন্য ইতিহাসের পাদটীকায় স্থান লাভ করে।

৫

নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী

শরীফ উদ্দিন আহমেদ*

বাংলার নগরজীবনের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য ধরেই বলা যায়, উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের বিনিময়কে কেন্দ্র করেই মূলত কৃষিভিত্তিক এই ভূখণ্ডে নগর গড়ে উঠে। এ ধরনের বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একটি সুবিধাজনক স্থান, যেখানে বিক্রেতা-ক্রেতার উপস্থিতিসহ জনসাধারণ নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে। ফলে নদীর তীর, রাজপথ ও অবস্থানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকাগুলোকে ঘিরে কৃষিজাত পণ্যবিনিময়কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিল। এই বিনিময়কেন্দ্রগুলোই কালক্রমে নগরকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। জীবনযাপনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ এবং কর প্রদান করার জন্য উৎপাদিত উদ্বৃত্তপণ্য বিক্রির প্রয়োজন ছিল। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ী শ্রেণীর সাহায্য-সহযোগিতা ছিল তাৎপর্যবহ। তারা দোকান ও ঘরবাড়ি তৈরি শুরু করে এবং ক্রমে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় শিল্পী ও কারিগরশ্রেণী। এভাবে জনবসতি বাড়তে থাকায় এক সময় এই 'নিউক্লিয়াস'কে (nucleus) কেন্দ্র করেই শহুরে কাঠামো গড়ে উঠে। শতাব্দীকাল ধরে এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

বাণিজ্যিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও শিল্পায়নপ্রসূত অন্যান্য অনেক কারণে নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটে। এই সমস্ত কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় অনেক নগর এবং শহর গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে অনেকগুলোই ক্ষমতা, উৎপাদন, কর্তৃত্ব ও শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শহরগুলোর মধ্যে হিন্দুযুগের তাম্রলিপ্তি, কর্ণ-সুবর্ণ, বর্ধমান, বিক্রমপুর, রামাবতী, লখনৌতি, পুন্ড্রনগর ও কোটিবর্ষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুপরবর্তী মুসলমান যুগের সমধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো হলো গৌড়, একডালা, সাতগাঁও, হুগলী, চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম), সোনারগাঁও, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ।[১] কিন্তু নদীমাতৃক এই বাংলার আবহাওয়া শহরগুলোর টিকে থাকার অন্তরায় হওয়ায় এগুলোর স্থায়িত্ব ছিল খুবই স্বল্পকালীন। তা সত্ত্বেও সতেরো শতকে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা, রাজমহল, হুগলী, বালাসোর ও কাশিমবাজার উল্লেখযোগ্য।[২]

বাংলায় নগরায়ণের সনাতন প্রক্রিয়া আঠারো শতকেও অব্যাহত ছিল। দেখা যায়, নবাবি শাসনামলে এ দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোকে ঘিরে বেশ কিছু নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো ছাড়াও জমিদারদের বা প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহকদের আবাসস্থলকে ঘিরেও বেশ কিছু শহর গড়ে উঠেছিল। চলিষ্ণু সময়ের ভাঁজে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এই সমস্ত আবাসস্থলকে ঘিরে গড়ে উঠা শহরগুলোই বিবর্তিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক শহরে রূপান্তরিত হয়। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে জমিদারবাড়িকেন্দ্রিক শহরগুলো ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেমন বর্ধমানের রাজার আবাসস্থলকে ঘিরে বর্ধমান শহর, রাজশাহীর রানী ভবানীর নাটোর এবং নদীয়ার রাজার কৃষ্ণনগর। কিছুটা অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট থাকা সত্ত্বেও সমকালীন ভক্তকবি রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য থেকে সে সময়ের শহরগুলোর অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। মনে করা হয় যে, দীর্ঘ এই কাব্যটি নবাব মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর (৩০ জুন ১৭২৭) অল্প কয়েক বছর পরে রচিত হয়। ভক্তকবি রামপ্রসাদ বর্ধমান শহরের নিম্নরূপ বর্ণনা দেন :

প্রভাতে উদয়াদিত্য সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত
প্রবেশিলা বীর সিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে
তিলেক নাহিক তালভঙ্গ ।
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা এই রসে রাত্রদিবা
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ ॥
পরস্পর সুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটুক
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।

১. Barrie M. Morrison, *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*, (Delhi 1980), 12.

২. K. M. Karim, The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, (Dhaka 1947), 170-71.

. . .   . . .

কল্পতরু তুল্য ভূপ   আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশ জনেক।
চৌদিকে চৌপাড়িময়   পাঠ চায় পড়ুয়া চায়
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী   বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী ॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই   অতিথির সীমা নাই
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ   ভূত-ভবিষ্যত প্রাজ্ঞ
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥[৩]

১৭৬৩ সালের বর্ণনায়ও নদীয়ার রাজার কৃষ্ণনগর সুন্দর ও মনোরম অট্টালিকা- সমৃদ্ধ একটি প্রাণবন্ত শহর হিসেবে বিধৃত হয়েছে।[৪] উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকে বাংলার নতুন শহরগুলোর বেশিরভাগই গড়ে উঠেছিল বণিকদের শহর হিসেবে। সমকালীন নগরায়ণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই সময়ের বহু শহরই ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমার ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ের প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসাকেন্দ্র ও কারখানা স্থাপন করেছিল, যে স্থানগুলো পরবর্তীকালে শহরে রূপান্তরিত হয়। কলকাতা ছাড়া এ ধরনের জাঁকালো শহরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, মালদহ, লক্ষ্মীপুর, জগদিয়া ও কুমারখালী। এসব শহরের অনেকগুলোতেই নগরায়ণের ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে, যেমন—কারখানাশ্রমিকদের ভিন্ন বাসস্থান, উপাসনালয় ইত্যাদি।

আজকে যা পশ্চিমবঙ্গ, আঠারো শতকে সেখানকার প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শহরই ছিল হুগলী ও ভাগীরথী নদীর তীর ধরে, যার উত্তর দিকে শেষপ্রান্তে ছিল দেশের প্রধান শহর নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদ, আর দক্ষিণপ্রান্তে ইংরেজদের কলকাতা। মুর্শিদাবাদ আসলে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক একটি মিশ্র শহর। কিন্তু হুগলীর তীরে অবস্থিত অন্য সব শহরই ছিল মূলত বণিক আর কারিগরদের। এগুলোকে বরং বাজারশহরই বলা যেতে পারে, যেগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল একটি বড় বাজারের উপস্থিতি আর তাকে কেন্দ্র করে আরো কিছু ছোট ছোট বাজার বা গঞ্জ।

---

৩. ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, *বিদ্যাসুন্দর*, প্রকাশনা : টবর চক্রবর্তী, (দ্বিতীয় সংস্করণ), (কলকাতা ১৩১৩), ১৪-১৫।

8. *Account by Warren Hastings*, quoted in P.J. Marshall, *The New Cambridge History of India, Bengal: The British Bridgehead*, (Hyderabad 1987), 16.

আঠারো শতকের মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ শহরে উন্নীত হয় এবং এ দু'টি শহরেরই ছিল বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমি এবং উভয়েরই এক লক্ষ করে অধিবাসী ছিল বলে ধরা হয়। তবে মুর্শিদাবাদের লোকসংখ্যা যে আরো বেশি ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। যেহেতু জনসংখ্যার সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই, তাই অনুমান করা হয় যে, ১৭৫০ সালের দিকে মুর্শিদাবাদে অন্ততপক্ষে ৬ থেকে ৭ লক্ষ লোক বাস করতো।[৫] দেশের রাজধানীশহর হিসেবে মুর্শিদাবাদ এই অঞ্চলের মুখ্য নগরীতে পরিণত হয় এবং সম্ভবত ১৭০৪ সালের শুরু থেকেই এই শহর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল হয়ে উঠে। এটি ছিল প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্র, সামরিক শক্তির প্রধান ঘাঁটি, রেশমবস্ত্র বিনিময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, ভোগবিলাসের প্রধান স্থল এবং প্রদেশের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

মনে করা হয়, মুর্শিদাবাদ যখন তার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির শিখরে, তখন এর বিস্তৃতি ছিল দৈর্ঘ্যে দশ মাইল আর প্রস্থে তিন মাইল।[৬] এই সময়কার নগরায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য, যা প্রায় সব শহরেই বিদ্যমান ছিল, তা হচ্ছে বসতি স্থাপনের কয়েকটি বিশেষ ধারা। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ উভয় শহরেই বণিক সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় তাদের নিজস্ব মন্দির, মসজিদ ও গীর্জাকে ঘিরে আবাসভূমি গড়ে তুলেছিল। এমনকি, ভিন্ন ভিন্ন কারিগরেরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় যেসব স্থানে বাস করতো সেগুলোকেও সাধারণভাবে তলা, তৌলা, পাড়া বা মহল্লা বলা হতো। মুর্শিদাবাদে বসতিএলাকাগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল পেশার ভিত্তিতে—জহরতুলী (অলঙ্কার তৈরিকারকদের আবাস), কুমারপুর (কুমারদের এলাকা), গৌখানা (গোয়ালদের বাসস্থান), কাঠগোলা (কাঠব্যবসায়ীদের আবাস) এবং চিনিতলা (চিনিবিক্রেতাদের বাসস্থান)। আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকের মধ্যে কলকাতাতেও তেমনিভাবে তাঁতী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, কামার, দর্জি ও কাঁসারিদের ভিন্ন ভিন্ন আবাসস্থল গড়ে উঠেছিল।[৭]

প্রাক-বৃটিশ মুর্শিদাবাদের নাগরিক জীবন ও সমাজবিন্যাসের আরো পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। ষোল শতকের শেষভাগে মাকসুম খান নামে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ খুব শীঘ্রই রেশম ও রেশমবস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বাজারে উন্নীত হয় এবং পরবর্তী শতকের প্রথমদিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী নির্বাচিত হয়। বাণিজ্যনগর থেকে রাজধানীতে উত্তরণ স্বাভাবিকভাবেই মুর্শিদাবাদের অবস্থানগত মান অতি উচ্চপর্যায়ে

---

৫. K.M. Mohsin, 'Murshidabad in the Eighteenth Century' in K. Ballhatchet and J. Harrison (eds). *The City in South Asia: Pre-Modern and Modern*, (London 1980), 77

৬. ঐ, 76.

৭. Marshall, *Bengal*, 17.

নিয়ে যায়। কিন্তু এধরনের উত্তরণের ফলে মুর্শিদাবাদ তার ব্যবসায়িক গুরুত্ব হারায় নি। এর ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা এবং সমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমি এ গুরুত্ব সুনিশ্চিতভাবে বজায় রাখে। উপরন্তু রাজধানী নির্বাচিত হওয়ার ফলে এর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাত্রা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃহৎ আকারের ব্যবসা, উৎপাদন এবং গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানিকেন্দ্র হিসেবে মুর্শিদাবাদের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় মুর্শিদাবাদের ক্রমাগত নাগরিক উন্নয়ন, যা শিল্প, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব অর্জনের মধ্যে বিকাশলাভ করে, তা নগরবিন্যাসের উপর সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। নগরের সার্বিক বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় বাজার-এলাকা, যা 'চক' নামে পরিচিত ছিল। এখান থেকেই শহরের প্রধান সড়কটি উত্তর-দক্ষিণে বেরিয়ে যায় এবং অন্য রাস্তাগুলো এই সড়কে লম্বালম্বিভাবে এসে মিশে যায়। এই সমস্ত ছোট ছোট রাস্তার উপরেই ছোট ও বড় ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান স্থাপন করে আর এগুলো থেকেই নানা গলি বেরিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, কারিগরি ও শিল্পপাড়ায় শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে পড়ে। এইসব পাড়া এক এক ধরনের ব্যবসা বা শিল্পের নামানুসারে গড়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় যে এলাকায় থাকতো সেগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল মহাজনতলা এবং মুগলটোলা নামে।

নগরের এই মূল প্রাণকেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত ছিল আরো অনেক নতুন বাসভূমি। বিশেষকরে মুর্শিদাবাদ যখন বাংলার প্রধান নগর ও একই সাথে ধনীদের শহরে রূপান্তরিত হয়, তখন এই বৈশিষ্ট্যটি আরো বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠে। শহরটির বিকাশের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করা না হলেও প্রশাসনিক অট্টালিকা, বাজার আর কর্মস্থান কোথায় কোথায় গড়ে তোলা হবে তার একটি মোটামুটি নকশা ছিল। নবাবগণ তাঁদের প্রাসাদ আর কার্যালয় স্বাভাবিকভাবেই গড়ে তুলেছিলেন সবচেয়ে সুন্দর এবং সুবিধাজনক স্থানে। শহরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং অভিজাত শ্রেণীর পরিবারগুলোও নবাবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাদের ইমারত তৈরি করে 'শহরের মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী স্থানে অথবা নদীর তীরে'। সম্ভবত এই কারণেই নদীর তীর ধরে শহরটির প্রসার বেশি ঘটে; ফলে শহরটি প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্যেই অধিক বিস্তার লাভ করে ।[৮]

শহরবৃদ্ধির সাথে সাথে অধিবাসীদের সুবিধার্থে নতুন নতুন গঞ্জ, বাজার আর ঘাট স্থাপিত হয়। যদিও মুর্শিদাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ভাগীরথী নদী থেকেই সরবরাহ করা হতো, তথাপি শহরবাসীর আরো সুবিধার জন্য বড় বড় পুকুর খনন এবং ঝিলগুলো সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভাগীরথীর উভয় তীরেই গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ শহরটি।

---

৮. K. M. Mohsin,'Murshidabad in the Eighteenth Century' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 80.

নবাবপরিবার, অভিজাত শ্রেণী, উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, ব্যাঙ্কার, এশীয় ও ইউরোপীয় বণিক, ব্যবসায়ী, আড়তদার, মুৎসুদ্দি, দালাল, কারিগর, শিল্পী, চাকুরিজীবী, দাস, চিত্তবিনোদনকারী, বাদক, পণ্ডিত ব্যক্তি, শিক্ষক, স্থপতি, গৃহনির্মাণকারী এবং শ্রমিকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল শহরটির নাগরিক মানবগোষ্ঠী।

নয়নাভিরাম প্রাসাদ, বাগান, মসজিদ, বিশালকায় ইমারত, বৃহৎ পুকুর ও ঝিল শহরটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। সেই সাথে প্রচুর বাজার আর কেনাবেচার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ধনী-দরিদ্র সবারই চাহিদা মেটাতে পারতো। রেশমবস্ত্র, হাতির দাঁতের সামগ্রী, পিতলের জিনিসপত্র, সোনা ও রূপার তৈরি অলঙ্কার প্রভৃতির বিকিকিনিতে শহরের বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলো ব্যস্ত হয়ে উঠতো। নবাবি দরবার, সামরিক বাহিনী, বণিক-ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কারিগরদের উপস্থিতি শহরের সম্পদবৃদ্ধি অনিবার্য করে তোলে এবং একই সাথে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য মূলধন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহেরও প্রসার ঘটায়।

শহরের বিস্তার এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ধনী পরিবারগুলোর অনেকগুলোই শহরের মধ্যস্থল থেকে সরে গিয়ে শহরতলীতে বসবাস শুরু করে। এসব এলাকায় জায়গারও অভাব ছিল না। ফলে তারা বিরাট এলাকা নিয়ে তাদের সুবিশাল ইমারত, বাগান, মসজিদ, মন্দির তৈরি করেন, যার সাথে সংযুক্ত হয় বড় বড় ঝিল।

শহরের মধ্যভাগটি উত্তরে মহিমপুর থেকে দক্ষিণে লালবাগ পর্যন্ত লম্বায় প্রায় পাঁচ মাইল আর চওড়ায় আড়াই মাইল বিস্তৃত ছিল। এই মহিমপুরেই ধনকুবের জগৎশেঠদের বাসভবন ছিল। কালে ভাগীরথীর উভয় তীরের এই এলাকাটি জনাকীর্ণ হয়ে উঠে বিভিন্ন অফিস, দোকান, বাজার এবং কারিগর ও শিল্পীদের বাসস্থান গড়ে উঠার ফলে। এই মধ্যস্থলটি আবার হরেক রকম ছোট ছোট গলি ও চোরাগলি দ্বারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এখান থেকে এসব পথ বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে মিশে যায়।. জনাকীর্ণ শহরকেন্দ্রের দক্ষিণে চার মাইল দূরে কাশিমবাজার ও বহরমপুরে ইউরোপীয়রা তাদের কুঠিবাড়ি ও বসতি গড়ে তোলে। যদিও শহরের দক্ষিণাঞ্চলটি, বিশেষকরে ইউরোপীয়দের এলাকাটি প্রথমদিকে বেশ ফাঁকা ছিল, কিন্তু অচিরেই এই সম্পূর্ণ এলাকাটির চেহারাই পালটে যায়। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের ফলে কাশিমবাজার ও বহরমপুরও জনাকীর্ণ এলাকায় রূপান্তরিত হয়। বহু সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা নিয়ে গড়ে উঠা বৃহৎ, জনবহুল এবং অত্যন্ত সম্পদশালী মুর্শিদাবাদ শহর বিদেশী পর্যটকদের মানসপটে অনুরূপ আর একটি শহরের ছবি ফুটিয়ে তোলে। এমনি এক পর্যটকের মন্তব্য, "মুর্শিদাবাদ শহরটি ঠিক লন্ডনের মতোই বৃহৎ, জনবহুল এবং সমৃদ্ধ। দু'টি শহরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম শহরটিতে এমন অনেক লোক আছেন যাদের বিষয়-সম্পত্তি নিঃসন্দেহে পরের শহরটির সবচেয়ে ধনীর চেয়েও অনেক বেশি।"[৯]

৯. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, 76.

মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে হুগলীতীরের অপর শহরগুলোর তেমন কোন শহুরে বৈশিষ্ট্য ছিল না । চন্দননগর, চুঁচুড়া বা হুগলীকে যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা হয়, তাহলে বলতে হয়, এদের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা যতোই থাকুক না কেন, পর্যটকদের কাছে এগুলো যে কেবল বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলেই প্রতীয়মান হতো তাই নয়, বরঞ্চ এগুলি নিতান্তই কতগুলো গ্রামের অগোছালো সমাবেশ বলে মনে হতো।[১০] এ রকম ধারণা মোটেই ভ্রান্ত নয়, কেননা আঠারো শতকের এই জাতীয় শহরগুলোর সাথে গ্রামের তেমন কোন তফাৎ ছিল না। বস্তুত সেসময় গ্রামেরই ছিল প্রাধান্য। তবে এই প্রাধান্য গেঁয়ো অনগ্রসরতার প্রাধান্য নয়, বরঞ্চ তা ছিল একটি উৎপাদনমুখী গ্রামীণ কর্মধারারই প্রাধান্য। বিশেষকরে হুগলী অববাহিকার গ্রামগুলো সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য, যেখানে কৃষিজাত পণ্যের বেশিরভাগই বাজারজাত করা হতো। এই গ্রামগুলোতে কুটিরশিল্পে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হতো।[১১]

গঙ্গার পূর্বাঞ্চল, যা সাধারণভাবে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল, আঠারো শতকে ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সেখানেও নগরায়ণের ধারা ঐতিহ্যগতভাবেই সক্রিয় ছিল। অবশ্য এই সময়ে এই অঞ্চলে বড় ধরনের শহর-নগর ছিল খুবই বিরল এবং এ অঞ্চলটিতেও ছিল গ্রামের আধিপত্য। আর এখানেও এই প্রাধান্য দাঁড়িয়ে ছিল দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর। এই অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে উৎপাদিত হতো বিপুল পরিমাণে নানাবিধ কৃষিপণ্য। এখানকার অনেক গ্রামেই কুটিরশিল্পে উৎপন্ন হতো অত্যন্ত উন্নতমানের সামগ্রী এবং সেসব পণ্যসামগ্রী নিয়মিত দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের জন্য বাজারজাত করা হতো। এখানকার গ্রামাঞ্চলেই প্রস্তুত হতো বিখ্যাত মসলিন, যা ভারতের অন্যান্য স্থানসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো।[১২]

আঠারো শতকে এই অঞ্চলের প্রধান নগর ছিল ঢাকা। যদিও ১৭০৪ সালে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় এর গুরুত্ব ও গৌরব অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়, তথাপি সমগ্র আঠারো শতক ধরে এটিই পূর্ব বাংলার প্রধান শহর হিসেবে পরিগণিত ছিল।[১৩] এছাড়াও ঢাকা ছিল মুগল আমলে পূর্ব বাংলায় নগরায়ণ ও নাগরিক জীবনের এক আদর্শ রূপ। বৃটিশপূর্ব যুগে তাই এই অঞ্চলের নাগরিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে সতেরো ও আঠারো শতকে ঢাকার প্রসার ও প্রসিদ্ধি পর্যালোচনা করতে হয়।

---

১০. Marshall, *Bengal*, 17

১১. প্রাগুক্ত, 17

১২. আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, (ঢাকা ১৯৬৫), ৯-১৬।

১৩. দেখুন, Abdul Karim *Dacca the Mughal Capital*, (Dacca 1964); also Sharif Uddin Ahmed, *Dacca--A Study in Urban History and Development*, (London 1986)

অখ্যাত একটি ক্ষুদ্র স্থান থেকে রাতারাতি ঢাকা রাজধানীশহরে রূপান্তরিত হওয়ার নেপথ্যে ছিল এ অঞ্চলকে ঘিরে মুগলদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। নগরায়ণের অন্যতম উপাদান রাজনৈতিক গুরুত্বই ছিল মূলত শহর হিসেবে ঢাকার উত্থানের প্রধান কারণ। এই রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভের আগে ঢাকা সীমিত সামরিক ক্ষমতা এবং ব্যবসা ও প্রশাসনের ক্ষুদ্র কেন্দ্র বৈ আর কিছু ছিল না।[১৪] কাজেই এর নগরগুরুত্ব ছিল সামান্যই।

সতেরো শতকের প্রথমার্দিক পর্যন্ত নদীবহুল পূর্ববঙ্গ ছিল মুগল সাম্রাজ্যবহির্ভূত। মুগল সাম্রাজ্যকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক সীমান্তের শেষ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এবং এই অঞ্চলের স্বাধীন পাঠান গোষ্ঠীপতিদের দমন করতে এবং কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী জমিদার বা ক্ষুদে শাসকদের বশে আনতে প্রদেশের মুগল সুবাদার নবাব ইসলাম খান চিশতি ঢাকাকে তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করেন; কেননা এর অবস্থানের কারণে কৌশলগত সুবিধা ছিল ব্যাপক। ১৬১০ সালের জুলাই মাসে তিনি এক বিরাট পদাতিক ও নৌবাহিনী এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ঢাকায় এসে পৌঁছান। ছোট্ট থানা বা সামরিক ফাঁড়ি ঢাকা রাতারাতি একটি জনবহুল এলাকায় রূপান্তরিত হলো এবং তাৎক্ষণিকভাবে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করলো। যদিও প্রথমদিকে ঢাকাকে একটি সৈন্যছাউনির মতো দেখাচ্ছিল, তবুও সবকিছু যাচাই করলে মনে হয়, ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে স্থায়িত্ব দেবার বিষয়ে ইসলাম খানের কোন দ্বিধা ছিল না।

ঢাকা শহরের ক্রমবিকাশ ও বিস্তার মধ্যযুগে নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী- বিন্যাসের এক আকর্ষণীয় চিত্র প্রকাশ করে। এখানকার পুরনো সামরিক দুর্গটি, যেখানে এসে ইসলাম খান প্রথম তাঁর ছাউনি ফেলেন, তা নতুন রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত হয় এবং তাকে ঘিরে অন্যান্য বসতিএলাকা গড়ে উঠতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গটি সুবাদারের দপ্তর ও বাসস্থানের জন্য খুবই ক্ষুদ্রাকার ছিল। এ কারণে নতুন অট্টালিকানির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অট্টালিকানির্মাণ ছিল দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম খানের তৈরি সুবাদারের প্রাসাদ, মসজিদ, বাদশাহী বাজার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার জন্য নির্মিত বাড়িঘর নিয়ে যে এলাকা গড়ে উঠে, তা মুগল ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সুবাদারের বাসস্থানই ছিল মুগল ঢাকার বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। যদিও ঢাকার সম্প্রসারণে কোন সুচিন্তিত নকশা অনুসরণ করা হয় নি, তবুও এর নতুন সামাজিক

১৪. Habiba Khatun, 'Pre-Mughal Dhaka', in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, (Dhaka 1991), 634.

বিন্যাস ও বসতি সে যুগের ভাবনা এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠে। দুর্গের পশ্চিমদিকে সুবাদারের বাসস্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে নানা সরকারি প্রশাসনিক ভবন এবং তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসস্থান—দেওয়ানবাজার, বখশীবাজার, মুগলটুলী, কায়েতটুলী (হিন্দু কেরানিদের এলাকা) এবং এমনি ধরনের অনেক বসতি। দুর্গের পূর্বদিকে যা ছিল পুরনো বসতি, সেখানে নতুন নতুন বাজার গড়ে উঠলো আর গড়ে উঠলো বিভিন্ন কুটিরশিল্পী ও কারিগরদের বিশেষ এলাকা—যেমন বাংলাবাজার, পাটুয়াটুলী, শাঁখারীবাজার এবং তাঁতীবাজার।

উত্তরদিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু সমতল ভূমিগুলো স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, অভিজাত পরিবার ও বড় ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। সেখানে তারা তাদের নিজস্ব এলাকা গড়ে তোলেন, প্রাসাদোপম বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরি করেন। এটাই ছিল মুগল ঢাকার শহরতলী। আরো উত্তরে তেজগাঁও এলাকায় এবং পরে অন্যত্র ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো তাদের কুঠিসমূহ প্রতিষ্ঠা করে।[১৫] এখানেই তৈরি হতো ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে রপ্তানির জন্য বিশেষ নকশার রকমারি বস্ত্রসামগ্রীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ।

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা একটি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বের বিরাট এলাকা জুড়ে এর বিস্তৃতি ঘটে আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা। মুগল আমলে ঢাকা যখন তার সমৃদ্ধির তুঙ্গে উঠে, বলা হয়ে থাকে তখন এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় নয় লক্ষ। আর এ নগরটি বুড়ীগঙ্গার তীর ধরে প্রায় দশ মাইল আর ভিতরদিকে প্রায় আড়াই মাইল পর্যন্ত প্রসার লাভ করে।[১৬] এই পরিসংখ্যান যদি সম্পূর্ণ সত্য নাও হয়, তবুও সমসাময়িককালের পর্যটকদের বিবরণ এবং অন্যান্য উপাদান-উপকরণের সূত্র ধরে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সতেরো শতকের শেষদিকে ঢাকা বাংলার অন্যতম বৃহৎ এবং জনবহুল নগর হিসেবে গড়ে উঠে। কবির ভাষায় এটি ছিল 'প্রাচ্যের শহরগুলোর রানী'।

যেহেতু রাজনৈতিক তাগিদে ঢাকার গোড়াপত্তন হয় এবং ঢাকা প্রথমদিকে উৎপাদনের সঙ্গে ছিল সম্পর্কহীন, সেহেতু গোড়ারদিকে এর অস্তিত্ব ছিল নেহাতই পরনির্ভরশীল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরটি এর প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতো, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছুই দিতে পারতো না। প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে সারা দেশের রাজস্ব দিয়ে ঢাকার প্রয়োজন মেটানো হতো। একই সাথে দেশের সার্বিক

১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখুন, Karim, *Dacca*, Chapter III.

১৬. দেখুন, Ahmed. *Dacca*, 13.

সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ঢাকার শ্রীবৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। কিন্তু অচিরেই ঢাকার চেহারায় মৌলিক পরিবর্তন আসে, যখন ঢাকা তার নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই শহরটির সত্যিকারের নগরায়ণ ঘটে। ঢাকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। মূলত এই উত্তরণ সম্ভব হয় ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। এর অবস্থান ছিল এক উর্বর প্রশস্ত নিম্নভূমি এলাকার শেষ উচ্চস্থলে, যা একই সাথে শহরটির সাথে এক সম্পদশালী পশ্চাদ্‌ভূমির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ ঘটায় এবং সমগ্র দেশের সাথে নদীপথে যোগাযোগের চমৎকার সুবিধা করে দেয়।

ঢাকার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুগল শাসকগোষ্ঠী, তাঁদের সহযোগীবৃন্দ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কারিগর ও শিল্পীগণ। শাসকগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, বণিক, ব্যাঙ্কার এবং কারিগরদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকার নিজস্ব একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠে। এভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে উঠার সাথে সাথে ঢাকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী ও নগরবাসীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে শহরকে গড়ে তুলতে এবং একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে অর্থবিনিয়োগের মাধ্যমে। কোন নগরপরিকল্পনা অনুসরণ করা না হলেও ঢাকা মধ্যযুগের একটি সুন্দর শহর হিসেবে গড়ে উঠে। প্রাসাদ-অট্টালিকা, মসজিদ, মন্দির, ঘাট, রাস্তা আর বাজারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মধ্যযুগের এই শহরটি। শহরটির যোগাযোগব্যবস্থা, হাট-বাজার সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার এবং সেই সঙ্গে শহরের পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার গুরুদায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের উপর, যিনি একই সাথে ছিলেন শহরের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, ঢাকার মতো বড় একটা শহরের স্বাভাবিক পৌর সমস্যা এবং এর সাথে সংযুক্ত নানা ধরনের জটিলতাগুলোকে কিভাবে পৌরকর্তারা নিয়ন্ত্রণ করতেন বা এক্ষেত্রে কিরকম সফলতা তারা লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বিস্তারিত কিছুই বলা সম্ভব নয়।

অবশ্য মুগল যুগে ঢাকার সমাজ ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ঢাকার সমাজ মূলত মুগল শাসকগোষ্ঠী, বণিক-ব্যবসায়ী, জমিদার ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত ছিল। সেবামূলক কাজে বেতন এবং মজুরিভোগী শ্রেণীর উপস্থিতিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সমাজের উচ্চাসনে ছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি সুবাদার, অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান দীউয়ান, বকশী (সৈন্য, শ্রমিক প্রভৃতিকে বেতনাদি প্রদানের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এবং অন্যান্য উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দুইই ছিল। এঁদের পরেই ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ, যাঁদের অনেকেরই ঢাকা শহরের আশেপাশে বা দূরবর্তী এলাকায় বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ছিল। এই সমস্ত উচ্চস্তরের মানুষই ঢাকার সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এর সাংস্কৃতিক জীবনকেও

পরিচালিত করতেন। শহরের সাধারণ মানুষেরা এদের জীবনধারার অনেক কিছুই অনুসরণ করতো। কিন্তু ঢাকার নাগরিক জীবনে পেশা কিংবা ব্যবসা ও শিল্পকে কেন্দ্র করে কোন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে নি।

ঢাকায় বিপুল সংখ্যক কারিগর, শিল্পী ও শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতি ঢাকার শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতির ইঙ্গিত বহন করে। এই জনসংখ্যার বেশিরভাগই আবার জড়িত ছিল বস্ত্রশিল্পের সাথে।

মুগল যুগে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, এমনকি এপর্যায়ে সারা বাংলার জনজীবনে ঢাকার অবদান ছিল প্রশ্নাতীত। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং শহরের অনেক মানুষ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে জীবিকানির্বাহ করতো, যাদের আর্থ-সামাজিক জীবন ঢাকার সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। যে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন ঢাকা থেকে বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হতো, আসলে এর বেশিরভাগই আসতো ঢাকার পশ্চাদ্‌ভূমি, যেমন সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতবাধী, জঙ্গলবাড়ী এবং বাজিতপুর থেকে।[১৭] ঢাকা থেকেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো, কেননা ঢাকার অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল এই অঞ্চলের প্রধান শুল্কদপ্তর শাহবন্দর।[১৮] ঢাকা শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক কিছুই এর পশ্চাদ্‌ভূমি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে অনুসৃত হতো।

নবাবি আমলে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল চট্টগ্রাম। বস্তুত চট্টগ্রাম একটি অতি প্রাচীন শহর এবং এর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নাগরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এটি একটি বন্দরশহর হিসেবে বেড়ে উঠে। সতেরো শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, কিন্তু এর পরে আরাকানী মগদের ঘন ঘন আক্রমণ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের হামলার কারণে এর উন্নয়ন ব্যাহত হয়।[১৯] তাই আঠারো শতকে একটি ক্ষুদ্র বন্দর এবং সামান্য ব্যবসাকেন্দ্রের উর্ধ্বে শহরটির উত্তরণ ঘটে নি, যদিও মাঝেমধ্যে আরব, পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকেরা এই বন্দরে ভিড়তেন। দুর্ভাগ্যবশত মুগল যুগে চট্টগ্রামের সমাজ ও নগরবিন্যাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

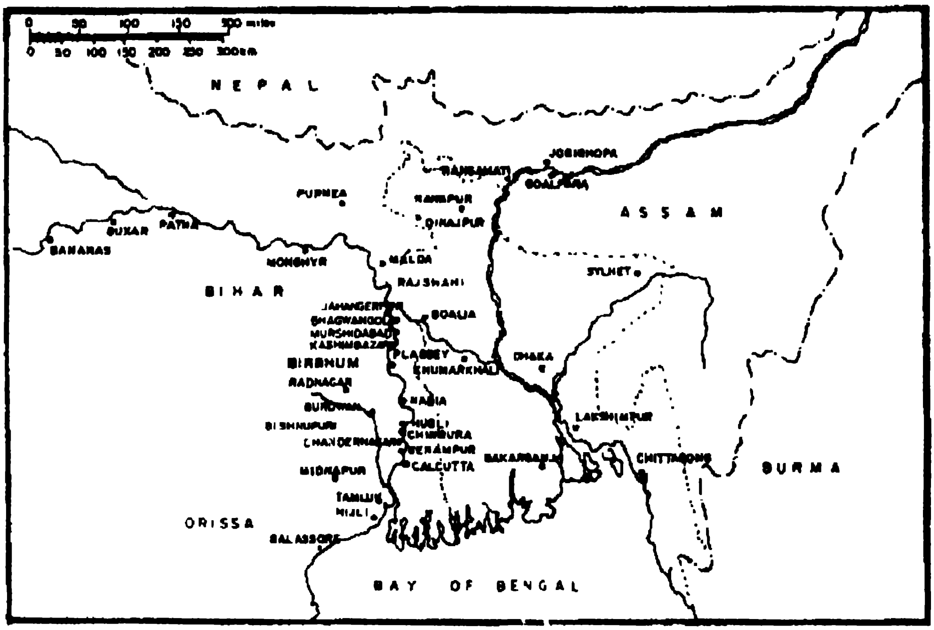
---

১৭. করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ১২।

১৮. K.M. Mohsin, 'Commercial and Industrial Aspects of Dhaka in the Eighteenth Century' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 69.

১৯. Abdul Karim, Murshid Quli Khan and his Times, (LOPPO), 1963), 214.

নবাবি আমলের শেষপর্যায়ে এবং ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে এই অঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল বাকেরগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর এবং সিলেট। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আঠারো শতকে প্রাক-বৃটিশ যুগের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নগরগুলোর মধ্যে ৯টি ছিল এই অঞ্চলে, যেগুলো এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হচ্ছে দিনাজপুর, রংপুর, নাটোর, কুমারখালি, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, সিলেট, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রাম (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।



ADAPTED FROM MARSHALL 1879

মানচিত্র ১ : আঠারো শতকের নগরকেন্দ্রসমূহ

বৃটিশ শাসনামলে নগরায়ণ

১৭৬০-এর দশকে বাংলার নতুন শাসক হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান বাংলায় নগরায়ণের ঐতিহ্যগত ধারায় আমূল পরিবর্তন আনে। অতীতে রাজনৈতিক কারণ বাদ দিলে মূলত ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই নগরায়ণপ্রক্রিয়া চালু ছিল। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রাচীনকালে বাংলায় বড় ধরনের নগর বা শহর খুব বেশি ছিল না, তথাপি ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা ও প্রশাসনের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে অনেক ছোটখাটো শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার মতো রাজধানী ও উপরাজধানী শহরগুলোর অবনতি ঘটায়, তেমনি কোম্পানির

প্রশাসনিক,ব্যবসায়িক ও রাজস্বনীতি এদেশের সার্বিক নগরায়ণপ্রক্রিয়ায় এক গভীর পরিবর্তন সাধন করে। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যনীতি অভ্যন্তরীণ দেশীয় ব্যবসাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় এবং এই সাথে অন্যান্য বিদেশী বণিকদের ব্যবসা ও বসতিসমূহ ধ্বংস করে তাদেরকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। ক্ষতিকর শুল্কব্যবস্থা, রাজস্বনীতি এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত সুতীবস্ত্র ও সুতার আধিক্য এদেশীয় বস্ত্রশিল্প ও বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক নগরগুলোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।[২০]

একই সময়ে কোম্পানিপ্রণীত ভূমিরাজস্বব্যবস্থা এদেশীয় অনেক ধনাঢ্য জমিদারের সর্বনাশ ডেকে আনলে তাঁদের শাসনকেন্দ্রগুলো, যেগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ শহর, সেগুলোরও অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ভাগ্যপরিবর্তনের সাথে সাথে ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুরুতে তাই কোম্পানির শাসন বাংলায় নগরবিলুপ্তিপ্রক্রিয়ার পথ প্রশস্ত করে।[২১] এ প্রসঙ্গে রজনী পামে দত্তের ক্লাসিক উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : "পুরাতন জনবহুল নগরীগুলো, যেমন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ (যে শহরটিকে ১৭৫৯ সালে ক্লাইভ বর্ণনা করেছিলেন ঠিক লন্ডনের মতোই বিস্তৃত, জনবহুল এবং প্রাচুর্যপূর্ণ), সুরাট (গুজরাট) এবং এমনি আরো শহর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির ফলে এমনই জনশূন্য হলো যে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বা বহিঃশক্তির বিজয়ও এগুলোকে তেমনভাবে বিধ্বস্ত করতে পারতোনা।"[২২]

যাহোক, এ অঞ্চলে বৃটিশদের আবির্ভাবকে শুধু এক অন্ধকার যুগের সূচনা বলে মনে করা উচিত হবেনা, তাদের শাসনামলে অনেক ভাল কিছুও হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি নগরায়ণের কথাই ধরি, তাহলে বলতে হবে যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। তবে এসময়ে নগরায়ণের রূপ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। নতুন ধাঁচের নগরায়ণ হয় খুব ধীর গতিতে। তবে তার চেয়েও বড় কথা, এসময়ের নগরায়ণের উপর স্পষ্টভাবেই ঔপনিবেশিক ছায়া প্রতিফলিত হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক কালপর্বের নগরায়ণকে একজন বিশেষজ্ঞ তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এসময়ের এই প্রক্রিয়া

---

২০. আরো দেখুন, N K. Sinha, *The Economic History of Bengal from Plassey to Permanent Settlement*, 2 Vols. (Calcutta 1956-68); also *The Economic History of Bengal, 1793-1848*, Vol. 3, (Calcutta 1970).

২১. Mohammad A. Mohit, 'History of Urban Growth and Concentration in Dhaka. An Analysis of Spatial Organisation of Power and Authority' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 618, also S. Bhattacharya, 'Regional Economy of Eastern India' in Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India* , (Cambridge 1983), 270-331.

২২. R. Palme Dutt, *India Today* ,(Bombay 1947), 102.

ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি।[২৩] একই ভঙ্গিতে লিখতে গিয়ে মুনিস রাজা ও অন্যেরা মন্তব্য করেছেন :

> স্থান সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া, যা নাকি ওতপ্রোতভাবে জায়গাব্যবহারনীতির সাথে সম্পর্কিত, তা নগরায়ণকে গুণগত এবং সংখ্যাগত উভয়ভাবেই প্রভাবিত করেছিল। আধিপত্য ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক (বৃটেন এখানে কর্তৃত্বপূর্ণ শাসক এবং ভারতবর্ষ নির্ভরশীল উপনিবেশ) শহরগুলির দেশীয় উৎপাদনকর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং অতীতে তারা যে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরিতে এক ধরনের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল তা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে এক রকমের নগরঅনীহা ও বিনগরায়ণপ্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া নতুন দু'টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এক হচ্ছে উপগ্রহগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শহরের (satellite primate) আবির্ভাব, আরেকটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শহুরে ব্যবস্থার দুর্বলতা। ফলে বেশিরভাগ শহরকেন্দ্রগুলোতেই অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দেখা দিল এবং এদের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ছিল খুবই সীমিত। ঔপনিবেশিক শহর-নগরগুলোর অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব প্রতিফলিত হয় তাদের সঙ্কুচিত শিল্পবুনিয়াদে, যা কেবল ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ভীষণভাবে বেড়ে যায় তৃতীয় পর্যায়ক্রমের কর্মকাণ্ড, যা ছিল সম্পূর্ণভাবেই অনুৎপাদনমুখী।[২৪]

এই প্রেক্ষাপটে কলকাতার উদ্ভব ঘটে উপগ্রহগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ শহর হিসেবে। আর একই সময়ে বাংলার প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপেও এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত সমগ্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কলকাতার পশ্চাদভূমিতে পরিণত হয়। আর এই বিশাল পশ্চাদ্ভূমি থেকে সব ধরনের কাঁচামাল, এমনকি শিল্পজাত দ্রব্যও এখানে প্রেরণ করা হতো বিক্রয় এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার জন্য।

আরেকটি কারণেও কলকাতার অভ্যুদয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে এক নতুন ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এর অভ্যুদয়। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার, নতুন ধরনের সাধারণ ও পেশাদারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা, ছাপাখানার উদ্ভব এবং খবরের কাগজের আবির্ভাব সব কিছু মিলে কলকাতায় এক নতুন ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির জন্ম হয় এবং এই সংস্কৃতি বিশেষ এক ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে, যা ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয় নি। দেশীয় মানুষ, যারা কলকাতার আদিবাসী ছিল অথবা যারা এখানে এসে বসবাস শুরু করে, তারা এই নব্য মানসিক চেতনা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। এদের মধ্যে অনেকেই এই নতুন শিক্ষা ও উদার চিন্তাজগতের সঙ্গে সোৎসাহে সংযুক্ত হন, যারা পরবর্তীকালে উপমহাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করেন। রাজা রামমোহন রায় এমনই এক পরিবেশের প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার মিলনের অগ্রদূত। তাঁর

---

২৩. Mohit, 'History of Urban Growth' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 618.

২৪. উদ্ধৃত, Mohit, ঐ, 618-19.

ব্যক্তিগত চেতনা, নানাবিধ সংস্কারআন্দোলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড তাঁকে পরিশেষে ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। এই আধুনিকতা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক নগরায়ণের অতিরিক্ত উপাঙ্গ অবশেষে দেশের ঐতিহ্যগত জীবনধারায় গভীরভাবে রেখাপাত করে।

যে বিশেষ ধারায় কলকাতা বাংলার সর্বপ্রধান শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়, তা দেশের সামগ্রিক নগরায়ণপ্রক্রিয়ার উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অন্যান্য শহর-নগরগুলোর স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এ অঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য শহর-নগরগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্পকর্মকে ক্ষুণ্ন করেই কলকাতা সমৃদ্ধ হতে থাকে।[২৫]

নগরায়ণের বিস্তার না হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির প্রশাসনিক পদক্ষেপ দেশে এক নতুন ধরনের কেন্দ্র (nucleus) প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো হলো দেশের অভ্যন্তরে জেলা প্রশাসনের কেন্দ্র, যা অচিরেই শহররূপে বিকশিত হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে আরো নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে, যেগুলোর সূত্রপাত হয় ব্যবসা ও শিল্পকে কেন্দ্র করে অথবা বিশেষ ধরনের সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে উপলক্ষ করে। তবে একথা সত্য যে, ইংরেজ আমলে নগরায়ণপ্রক্রিয়া ছিল খুবই মন্থর। কেবল কলকাতা-হাওড়াবলয় বাদ দিলে শিল্পকার্য "শহর-নগর সৃষ্টি বা অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেনি ... নতুন শহর গড়ে উঠেছে সেই সমস্ত অবস্থানেই, যেমন রেললাইনের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গমস্থলে, নদীপথের কোন প্রধান এলাকায় বা জনসমষ্টির কেন্দ্রীয় স্থানে, যেগুলোকে ঔপনিবেশিক শাসকেরা নির্বাচন করেছিলেন প্রশাসনিক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য।"[২৬]

কলকাতা ও তার শহরতলীর বাইরের শহরগুলোকে বৃটিশ আমলে সাধারণভাবে এগুলোর বর্গীয় নামেই বর্ণনা করা হতো আর তা হচ্ছে মফস্বল বা আঞ্চলিক শহর। এভাবে যখন এগুলোকে বর্ণনা করা হয়, তখন তা মহানগরীর সাথে এগুলোর এক ধরনের অভাবী-আত্মীয়সুলভ সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এই শহরগুলো ধীরে ধীরে অনেক নাগরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং এর ফলে এগুলো আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে চমকপ্রদভাবে পৃথক হয়ে পড়ে। তবুও বলাবাহুল্য যে, এ শহরগুলো কলকাতার মতো উন্নত হতে পারে নি বলে এগুলো মহানগরীর সমাজ ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।

২৫. Serajul Arephin, 'The Urban Pattern of Rajshahi, in S A. Akanda (ed.), *The District of Rajshahi—Its Past and Present*, (Dhaka 1983), 162.

২৬. A.H.N.A Chowdhury and A.C. Das,"The Role of Settlement Planning in National Development" উদ্ধৃত Mohit, 'History of Urban Growth' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 620.

নিঃসন্দেহে কলকাতা হচ্ছে বাংলায় বৃটিশ আমলের নগরায়ণের চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি। যদিও বেশ কিছু কাল পর্যন্ত এটি ঠিক শহরের রূপ নেয় নি, তবুও এটি সবসময়েই একটি বৃহৎ জনসমাগমের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। এই জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই অকৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে আর ক্রমশই এই শহরের অধিবাসীদের বসবাসের এবং তাদের সামাজিক শ্রেণীবিভাগের ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। শহরটির এই বিকাশ বহুকাল ধরেই বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, যারা এমনকি তাদের বাসস্থানের জন্য শহরের একাংশ নির্ধারিত করে নেয়, যা অচিরেই তথাকথিত শ্বেতাঙ্গশহর নামে পরিচিতি পায়। দেশীয়দের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মানুষ প্রায় প্রথম থেকেই কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে ১৬৯০ সালে এই শহরের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, যখন এটি ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টিমাত্র এবং এর অধিবাসীদের প্রায় সবাই ছিল তাঁতী ও জেলে, তখনই কলকাতা বণিক, ব্যবসায়ী, কেরানি, কারিগর, ভূমিমালিক প্রভৃতি সব ধরনের মানুষেরই বসবাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়। আর অচিরেই এটি যখন বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীতে উন্নীত হয়. তখন এখানে এসে বাস করতে শুরু করেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার ও অন্যান্য পেশার লোকজন। আসলে কলকাতা ১৭৫৭ সালের আগেই একটি, প্রধান নগরী হিসেবে বেড়ে উঠে।[২৭] ১৭৫০ সালে এই শহরে প্রায় ১,২০,০০০ লোক বাস করতো বলে অনুমান করা হয়।[২৮] এসময় থেকেই কলকাতা আরো অভিবাসীকে আকর্ষণ করতে থাকে, বিশেষকরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় অনেকেই এখানে ভিড় জমায়। কোম্পানির বর্ধিত ব্যবসা শুধু সেই সমস্ত দেশীয় লোককেই কলকাতায় আসতে সুযোগ করে দেয় নি, যারা কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিল, তারা ছাড়া অন্যান্য বহু দেশীয় বণিক ও তাদের কর্মচারীদেরও কলকাতায় আসতে প্রলুব্ধ করে।

১৭৫০-এর দশক থেকে কলকাতার সম্প্রসারণ ও অগ্রযাত্রা একেবারে বিস্ময়কর। ২৩ জুন ১৭৫৭ সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ রাতারাতি কলকাতার সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল। সামরিক দিক থেকে কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হলো। এ সময় থেকেই একটা বড় সৈন্যবাহিনী সবসময়ই কলকাতায় অবস্থান করতো। ১৭৭২ সালে কোম্পানি যখন সরাসরি দেশশাসন করার দায়িত্ব নেয়, তখন থেকেই কলকাতা এ অঞ্চলের প্রশাসনিক রাজধানীতে উন্নীত হয়। এসময়েই পুরনো

---

২৭. Marshall, *Bengal*, 159.

২৮. A K. Roy, ' A Short History of Calcutta' in the *Census of India 1901*, *Bengal*, Part VII, 59-62.

রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে প্রধান প্রধান কার্যালয়গুলো কলকাতার চৌহদ্দিতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে আরো লোক কলকাতায় আসতে উদ্গ্রীব হন, যাঁরা সরকারি কাজ করতে চান অথবা সরকারের সাথে যাঁদের নানা ধরনের লেনদেন রয়েছে, যেমন জমিদারদের প্রতিনিধি (মুৎসুদ্দি), যাঁরা এখানে বসবাস করতে উৎসাহিত হলেন। এমনকি পরবর্তীকালে জমিদারদের অনেকেই এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। ভৃত্য, দারোয়ান আর সাধারণ শ্রমিক এবং এমনি জাতীয় গরিব মানুষেরাও কলকাতায় আসতে শুরু করে। এদের অনেকেই 'কোথাও কোথাও কুঁড়েঘর তুলতো, আবার কেউ কেউ আকাশের নিচেই নিদ্রা যেতো'। এক দশকের মধ্যেই অর্থাৎ ১৭৮০-এর দশকে কলকাতার আসল রূপই পাল্টে গেল। এসময় কলকাতাকে দেখলে মনে হতো, "ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও তালগোল পাকানো, বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো বাড়ি, কুঁড়েঘর, ছাউনি, অলি-গলি ও বাঁকানো রাস্তা, নর্দমা, ডোবা, পুকুর সবকিছু মিলে এমন এক দূষিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যা মানবিক বোধশক্তি বা স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।"[২৯] ১৮২২ সালে কলকাতার লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল দুই লক্ষে। একই সময়ে কলকাতায় প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ লোক আশেপাশের অঞ্চল থেকে কাজ করতে আসতো। কলকাতার শহরতলীর বিস্তার কলকাতার মতোই চমকপ্রদ। ১৮৩৪ সালে চার্লস ট্রাভেলিয়ন লিখেন যে, "হুগলীর ডান ধারে কলকাতার কাছ থেকেই গ্রামের পর গ্রাম একটা মালার মতো প্রায় পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ছিল।"[৩০]

উনিশ শতকের কলকাতার সমাজচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেন :

> বিলাস আর বড়াইপূর্ণ অমিতব্যয়ী জমিদার, সে যুগের মনস্তাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, দেশী কেরানি বা কুইলড্রাইভার, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে আর্মেনীয়, ইস্ট ইন্ডিয়ান আর পর্তুগীজ টুপিওয়ালাদের হটিয়ে দিয়ে সরকারি ও ব্যবসাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় কাজ করছেন; সফল উকিলবাবু, যিনি মামলা-মোকদ্দমায় ভরা পরিবেশে, যেখানে কোন কোন মামলা বংশপরম্পরায় চলে আসছে, জাঁকালো ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন; ডাক্তার, যাঁরা বদ্যিদের (দেশীয় চিকিৎসক) হটিয়ে দিয়েছেন—এঁরাই ছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি।[৩১]

কিন্তু এ সময় পর্যন্ত কলকাতায় কোন বাঙালি বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোগীকে দেখা যায়নি।

---

২৯. A. Mitra, 'Calcutta City' in the *Census of India*, 1951, Vol. VI, Part III, (Calcutta 1954), 8.

৩০. Marshall, *Bengal*, 160.

৩১. Sinha, *The Economic History of Bengal, 1793-1848*, Vol. 3, 132.

উনিশ শতকের শেষদিকে কলকাতার বিশালতা, তার নাগরিক জীবনের জটিলতা, বিপুল জনসংখ্যা এবং বিভিন্ন ধরনের জীবিকা, বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন একেবারে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ছিল, তেমনি ভূসংস্থান ও পরিবেশকে উপেক্ষা করে শহরটির অপরিকল্পিত অস্বাভাবিক প্রসারও ছিল দিনের মত স্পষ্ট। এই অস্থির অবস্থা কবি রুডইয়ার্ড কিপলিংকে যোগায় এক ধরনের অনুপ্রেরণা, যেখান থেকে উৎসারিত হয় নিচের কবিতাটি :

Thus the midday halt more's
the pity of Charnock—
Grew a city.
As the fungus sprouts chaotic
from its bed
So it spread
Chance-directed, chance-erected,
laid and built
On the silt—
Palace, byre, hovel, poverty and
pride
Side by side,
And, above the packed and
pestilential town
Death looked down. [৩২]

মহানগরীর বাইরের মফস্বল শহরগুলো বা নতুন শিল্প ও বাণিজ্যশহরগুলোর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। বৃটিশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ১৪৪ বছর পরে সম্পন্ন ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয় : "বাংলার সাধারণ শহরগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নামেমাত্র শহর। মফস্বলের অনেক পৌরস্থান (যেগুলোকে সরকারিভাবে শহর বলে স্বীকৃতি

---

৩২. P. Chowdhury and A. Mukhopadhyay, *Calcutta . People and Empire— Gleanings from old Journals*, (Calcutta 1976), VI.

দেয়া হয়েছে) হয় অধিক বেড়ে উঠা গ্রাম, নয়তো এদের উপান্ত এলাকাগুলো একেবারেই গ্রামীণ।"[৩৩]

উনিশ শতকে কলকাতার বাইরে বাংলার নাগরিক জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, "মফস্বল শহরগুলো হচ্ছে বিশাল গ্রামীণ সমুদ্রের মধ্যে কতগুলো ক্ষুদ্র দ্বীপ"।[৩৪] ১৮৭২, ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায় যে, বিশাল গ্রামীণ সমুদ্রের মধ্যে গড়ে উঠা এই ক্ষুদ্র দ্বীপাকৃতি শহরগুলো সংখ্যায় যেমন বৃদ্ধি পায় নি, তেমনি এগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য কোন দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিও গড়ে উঠে নি। নিম্নে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে এ বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়[৩৫] :

জনসংখ্যা অনুপাতে শহর	বিভিন্ন আদমশুমারিতে প্রাপ্ত সংখ্যা		
	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১
৫,০০০-১০,০০০	১৭৯	১৪৬	১২১
১০,০০০-১৫,০০০	৪২	৪৯	৩৮
১৫,০০-২০,০০০	৮	১৪	১৮
২০,০০০-৫০,০০০	২৩	২২	২৮
৫০,০০০-তদূর্ধ্ব	১১	১১	১০

যদিও এই মফস্বল শহরগুলোর সাথে বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত পুরনো বা নতুন শহরগুলোর, যেমন ঢাকা ও কলকাতার অথবা সদ্য গড়ে উঠা শিল্পনগর, যেমন হাওড়ার অনেক পার্থক্য ছিল, তবুও এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির শহরের মধ্যে যে সাদৃশ্য ছিল না তাও নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এই মফস্বল শহরগুলোর অধিকাংশেরই উদ্ভব হয়েছিল মূলত প্রধান প্রশাসনকেন্দ্র বা তাদের সহায়ক উপপ্রধানকেন্দ্র হিসেবে। স্থানগুলোকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচনের পিছনে ছিল মুখ্যত এদের নিজস্ব অবস্থানগত গুরুত্ব এবং সম্পূরক সুবিধা। কালক্রমে এই ছোট্ট ছোট্ট জায়গাগুলো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে ও নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় আর একই সাথে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ এবং নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করে। কিন্তু

৩৩. *Census of India, 1901, Bengal*, Part III, *Report*, 480-81

৩৪. M.S. Islam, 'Life in the Mufassal Towns of Nineteenth Century Bengal' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 225-26.

৩৫. *Census of India, 1901, Bengal, Report*, 138.

সর্বোপরি এই স্থানগুলো বাংলার আবহমানকালের ঐতিহ্যবাহী জীবনে বয়ে আনে এক নতুন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই এই সমস্ত শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্রমে শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারের আগ্রহ বাড়ার ফলে এই শহরগুলো এক নতুন ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষিতেই এগুলোর গুরুত্ব ও বিস্তৃতি উভয়ই ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, যদিও এর গতি ছিল খুব শ্লথ। শুরুতে কাছারি বলে খ্যাত সরকারের প্রশাসনিক কার্যালয়গুলোই ছিল এই সমস্ত শহরের প্রাণকেন্দ্র।[৩৬] মূলত সরকারি অফিসের ইউরোপীয় ও দেশীয় কর্মকর্তা এবং তাদের অধীনস্থ কর্মচারীরাই ছিল এই শহরগুলোর আদি বাসিন্দা এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, বণিক, কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণীর আগমন শহরের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও বিস্তৃতিতে সহায়তা করে। তথাপি কোম্পানিশাসনের শেষ পর্যন্ত এই মফস্বল শহরগুলোর অস্তিত্ব পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল সরকারি প্রয়োজনীয়তা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের উপর। আর যেহেতু এই প্রয়োজনীয়তা এবং কর্মকাণ্ড ছিল খুবই সীমিত, তাই সত্যিকার অর্থে এই শহরগুলোর নাগরিক বৈশিষ্ট্য ছিল খুবই নগণ্য। 'সংক্ষেপে বলতে হয়, বৃটিশ শাসকদের জেলাপ্রশাসনের কাঠামোকে ঘিরে গড়ে উঠা বেশিরভাগ মফস্বল শহরই ছিল মূলত সেবামুখী।'[৩৭]

পরবর্তীকালে ১৮৫৮ সালে বৃটিশরাজ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ এবং জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের বিপুল বিস্তার, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুবিধা উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে, বিশেষকরে স্টিমার চলাচল এবং বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার ফলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এর ফলে কেবল সেবামুখী শহরগুলো সেবা ও উৎপাদনমুখী উভয় বৈশিষ্ট্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠে। তা সত্ত্বেও এই নগরায়ণের ভিত্তি এতই সঙ্কীর্ণ উপাদানের উপর নির্ভরশীল ছিল যে দীর্ঘকাল ধরে এই শহরগুলো প্রধানত পরগাছারূপেই বেঁচে ছিল।

বৃটিশ আমলে নগরায়ণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মফস্বল শহরগুলোর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা। এমনকি এগুলো স্থাপনের সময় সরকার চিন্তাও করে নি যে

---

৩৬. Islam, 'Life in the Mufassal Towns' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 236.

৩৭. ঐ, 231.

এগুলোই একদিন স্থায়ী শহররূপে টিকে থাকবে। এই মফস্বল শহরগুলোর পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেন :

> মফস্বল শহরগুলোর বিস্তার ও স্বরূপ কোন নির্দিষ্ট শহরপরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠে নি। এগুলো গড়ে উঠেছে মূলত স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, জমির মালিকানা এবং সামাজিক গঠনপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং নগর তার আপন গতিতেই গড়ে উঠে; বিশেষকরে যেখানে ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল সেই জায়গাকে ঘিরেই গড়ে উঠে, এককথায় শহর গড়ে উঠে মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং প্রধান বাজারকে ঘিরে। কোম্পানিআমলের প্রায় পুরো সময়টাতেই কোর্ট-কাছারিগুলোকে কেন্দ্র করেই বেশিরভাগ মফস্বল শহরের বিকাশ ঘটেছিল। এগুলোই ছিল শহরের কেন্দ্রীয় স্থান বা প্রাণকেন্দ্র। ১৮৫৯ সালের ঠাকবস্ত জরিপকারীরা এই মর্মে লিপিবদ্ধ করেন যে প্রশাসন বা কাছারিপাড়াই হচ্ছে শহরের কেন্দ্রস্থল, আর ব্যবসা ও বাসস্থানের জায়গাগুলো মিশ্রিতভাবে গড়ে উঠেছে উপকণ্ঠ এলাকা হিসেবে। উনিশ শতকের শেষদিকে মফস্বল শহরগুলোর ভারকেন্দ্র কাছারিচত্বর থেকে বাণিজ্যিক এলাকায় সরে যায় এবং এই পরিবর্তন ঘটে মূলত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, যাতায়াতব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য ও অপ্রধান শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগমনের ফলে।[৩৮]

বিশ শতকের একেবারে গোড়ারদিকে এই সমস্ত মফস্বল শহরকে পরি-কল্পিতভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যদিও এই শহরগুলোর অপরিকল্পিত বিকাশ পরবর্তী সময়ে পৌর এবং স্বাস্থ্য-সমস্যার সৃষ্টি করে, যেগুলো সময়ের অগ্রগতিতে খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তবুও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, বিশ শতকের প্রারম্ভে এই শহরগুলোর নাগরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এই শহরগুলোর অধিকাংশই নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "এই ছোট্ট শহরগুলোর সাথে তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খুব কমই মিল রয়েছে। এগুলোকে গ্রামাঞ্চলের আবাসভূমি থেকে ভিন্ন ধরনের বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হচ্ছে প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং অল্পবিস্তর সবগুলোই হচ্ছে ব্যবসাকেন্দ্র এবং এই শহরগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত"।[৩৯]

নিম্নের জনসংখ্যা বিষয়ক ছক থেকে এই শতাব্দীর শুরুতে বাংলার নগরকেন্দ্রগুলোর জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি চিত্র পাওয়া যায় :

---

৩৮. প্রাগুক্ত, 232.

৩৯. *Census of India, 1921, Bengal*, Vol. V, Part I, *Report*, para 77.

নগরায়ণের ক্রমসম্প্রসারণ

	১৯২১		১৯১১		১৯০১		১৮৯১		মোট জনসংখ্যার শতকরা হার			
	স্থান সংখ্যা	লোকসংখ্যা	স্থান সংখ্যা	লোকসংখ্যা	স্থান সংখ্যা	লোকসংখ্যা	স্থান সংখ্যা	লে. ক সংখ্যা	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
বাংলার সর্বমোট জনসংখ্যা	-	৪৭৫৯২৪৬২	-	৪৬৩০৫১৭০	-	৪২৮৮১৩৫৯	-	৩৯৮০৫৫২৭	-	-	-	-
নগর এলাকা	১৩৫	৩২১১৩০৪	১২৪	২৯৬৮২৪৭	১২২	২৫৯৯১৫৮	১০৬	২২২৩৩৭৮	৬.৭	৬.৪	৬.১	৫.৬
১. ৫০০০০ বা তদূর্দ্ধ জনসংখ্যার শহর	৩	১২২৪৬০২	৩	১১৮৩৬২৪	২	১০০৫৩৯০	২	৭৯৮৯১১	২.৬	২.৬	২.৩	২.০
২. ৫০০০০-১০০০০০ জনসংখ্যার শহর	৪	২৪১৬০৬	২	১০৪১৮১	১	৮৯৭৩৩	১	৮১৫৮৫	০.৫	০.২	০.২	০.২
৩. ২০০০০-৫০০০০ জনসংখ্যার শহর	৩৩	৮৮৬৭৭৪	২৮	৭৯৬৯৯৮	১৮	৫০৪৫৮৪	১৬	৪৬০৬২৬	১.৯	১.৭	১.২	১.২
৪. ১০০০০-২০১০০ জনসংখ্যার শহর	৩৭	৫১৭৬৮৬	৪০	৫৮০৮৯৩	৪৭	৬৮২১৬৬	৪১	৫৭৪৮৭৫	১.১	১.৩	১.৬	১.৪
৫. ৫০০০-১০০০০ জনসংখ্যার শহর	৪০	২৮৪৯৭৫	৩৪	২৫১১১৫	৩৭	২৭০৯২০	৩৪	২৬৫১৮৬	০.৬	০.৫	০.৬	০.৭
৬. ৫০০০ এর কম জনসংখ্যার শহর	১৮	৫৭৩৬১	১৭	৫১১৩৬	১৭	৪৬৩৬৫	১২	৪২১৯৫	০.১	০.১	০.১	০.১
পল্লী এলাকা		৪৪৩৮১১৫৮		৪৩৩৩৬৯২৩		৪০২৮২২০১		৩৭৫৮২১৪৯	৯৩.৩	৯৩.৬	৯৩.৯	৯৪.৪

উৎস : *Census of India*, 1921

১৯২০ সালের মধ্যেই বাংলার নগর ও শহরের সংখ্যা এবং তাদের লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও ১৯২১ সালে নগরের লোকসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬.৭ শতাংশ, যা সর্বভারতীয় শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ ১০ ভাগের চেয়েও কম। জনসংখ্যা, শিল্প, বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সুবিধাদির বিচারে ১৯২১ সালে বাংলার ১৩৫টি শহরের মধ্যে মাত্র দু'টিকে প্রকৃত অর্থে নগররূপে আখ্যায়িত করা যায়। এ দু'টি হলো কলকাতা ও ঢাকা। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে ১৩,২৭,৫৪৭ জন নাগরিক অধ্যুষিত কলকাতা সন্দেহাতীতভাবে বাংলার বৃহত্তম নগরকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়। এই সময়ের মধ্যে এই শহরের পরিধি অনেক বিস্তারলাভ করে এবং এর শহরতলী কাশীপুর-চিৎপুর, মানিকটোলা, টালিগঞ্জ, সাউথ সাবার্ব, গার্ডেন রীচ ও হাওড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইতিমধ্যে ঢাকাও পূর্ব বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে আবির্ভূত হয়। ঢাকা এমন একটি অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, যেখানে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। ফলে ঢাকার ক্রমবিকাশ ছিল সন্দেহাতীত। ১৯২১ সালে এর জনসংখ্যা ১৮৭২ সালের তুলনায় ৭৪.১ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং এসময় ৩৭৬২ একর আয়তনের ভূখণ্ডে ১,১৯,৪৫০ জন লোক বসবাস করতো। এই বৃদ্ধি পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধিকেই প্রতিফলিত করে। এখানে বলা দরকার যে, পূর্ব বাংলায় ঢাকাই ছিল প্রধান শহর, কলকাতা নয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী থাকায় এর জনসংখ্যা আরো ২১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মাত্র সাত বছর প্রাদেশিক রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকার পর বঙ্গভঙ্গ রদ ও ১৯১২ সালে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা হারানো ঢাকার জন্য ছিল একটি বড় ধরনের বিপর্যয়।

এই বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বাংলার সবচেয়ে উর্বর কৃষিএলাকায় অবস্থানের কারণে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ঢাকার উন্নতি ছিল অব্যাহত। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে এই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা দশ ভাগ এবং এই সংখ্যা ছিল নিঃসন্দেহে বাংলার অন্যান্য মফস্বল শহরের লোকসংখ্যা এবং নগরকেন্দ্রের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় বেশি। ১৯২০-এর দশকে ভারতের নগরগুলোর মধ্যে ঢাকার স্থান ছিল আটাশতম।[৪০]

বিশের দশকে বাংলার অন্যান্য শহরগুলো চরিত্রগতভাবে ছিল বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এগুলোকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীকে বলা যায় 'নিদ্রালু মফস্বল শহর' (sleepy country town), যেগুলোর কোন সুসংবদ্ধ শিল্প-কারখানা ছিল না, কেবল

৪০. *Census of India, 1921, Bengal, Report*, para 78.

স্থানীয় ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে সামান্য গুরুত্ব ছিল। কেননা এই শহরগুলো আশেপাশের গ্রামের জনগণের মধ্যে যারা হাতের কাছে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন লবণ, কাপড়, কেরোসিন তেল পেতো না, তাদেরকে সেগুলো সরবরাহ করতো। এই শ্রেণীভুক্ত শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলত জেলা ও মহকুমা সদর দপ্তর এবং পুরনো ঐতিহাসিক শহর, যেমন মুর্শিদাবাদ, পুরাতন মালদহ, নদীয়া ও অন্যান্য অগুরুত্বপূর্ণ শহর। অন্য শ্রেণীভুক্ত শহরগুলোর মধ্যে ছিল হুগলী নদীর তীর ধরে গড়ে উঠা বিভিন্ন শিল্পনগরী, রেলপথনগরী এবং পাটক্রয়ের বৃহৎ কেন্দ্রশহরগুলো, যেমন কাশিপুর-চিৎপুর, মানিকটোলা, হাওড়া, তিতাগড়, নৈহাটি, কুমারহাটি, ঝালকাঠি, খড়গপুর, সৈয়দপুর, আসানসোল, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং চট্টগ্রামের মতো শহর, যেগুলো শিল্প ও বাণিজ্য, পাট কেনা-বেচা এবং রেলওয়ে জংশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।[৪১] ১৮৭১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত এই দু'ধরনের শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ নিচের ছক থেকে জানতে পারা যাবে :

জনসংখ্যা	জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার					
সাল	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২
	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৮৯১-০১	১৮৮১-৯১	১৮৭২-৮১	
মফস্বল শহর	১৩৮৬০	১৩৫৮৭	১৩০৩৪	১৩০২৯	১২৭৯৮	১৩৫২৩
	+২.০	+৪.২	০	১.৮	-৫.৩	
শিল্প ও বাণিজ্য	৩০৮৬৪	২৮৮৮৮	২২১৯৯	২০০০৯	১৭২৩৩	১৮৭৪২
শহর	+৬.৮	+৩০.১	+১০.৯	+১৬.১	-৮.১	

সূত্র : *Census of India*. Vol. V. *Bengal Report*. para 82.

উপরের ছক থেকে বোঝা যায় যে, অর্ধশতাব্দী ধরেও এই মফস্বল শহরগুলোর জনসংখ্যার তেমন বৃদ্ধি বা বিস্তৃতি ঘটে নি এবং এগুলো এই সময়কার ইউরোপীয় শহরগুলোর চেয়ে ছিল অনেক ছোট এবং এদের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্বও ছিল বিস্তর।[৪২] তবে প্রতিনিধিত্বশীল নব্য শিল্প ও বাণিজ্যশহরগুলোর আয়তন সাধারণ মফস্বল শহরগুলোর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর এগুলো ১৮৮১ সালের পর থেকে খুব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। তা সত্ত্বেও এই সমস্ত অপ্রধান, বিশেষত তথাকথিত 'নিদ্রালু' মফস্বল শহর ধারাবাহিকভাবে ক্রমশ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছিল। উনিশ শতকের গোড়ারদিকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়েউঠা এই শহরগুলো শতাব্দীর মধ্যভাগেই

৪১. প্রাগুক্ত, para ৪0.

৪২. ঐ, para ৪2

ইউরোপীয় এবং এদেশীয় অভিজাতদের আগমনের ফলে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্ররূপে আর এক ধাপ অগ্রগতি লাভ করে। শতাব্দীর শেষভাগে আইনজীবীদের উত্থান এই সমস্ত এলাকায় স্বাধীন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় এবং একই সাথে এই আইনজীবীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে এই শহরগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমসম্প্রসারণের ফলে স্কুল, কলেজ, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাপাখানার ক্রমবৃদ্ধিও এই শহরগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। প্রশাসনিক বিবর্তন ও শিক্ষার উন্নতির ফলে বিরাজমান কৃষ্টির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটলো তা জন্ম দিল এক নতুন মূল্যবোধের, যা পূর্বের কৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও এলো অনেক নতুন রীতি এবং ধারা, যা দেশের আপামর জনসাধারণের অনুসরণের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। এই সমস্ত মফস্বল শহর এবং মহানগরী থেকে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তারা খুব শীঘ্রই চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের জগতে আধুনিকতার পতাকা বহন করতে শুরু করে। এই শহর ও নগরকেন্দ্রগুলো তাই বাংলার নবজাগরণের প্রাণবন্ত কেন্দ্র হয়ে উঠলো। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশে এক নতুন নাগরিক সভ্যতারও সূচনা করে। বাংলার এই নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন নগর ও শহর যে অবদান রেখেছিল তা লক্ষণীয়।

বৃটিশ শাসনের প্রায় পুরো সময় জুড়েই কলকাতা বাংলার নব্য নাগরিক সংস্কৃতিতে তার আধিপত্য বজায় বাখে আর নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বর্ণবৈষম্যে পীড়িত হিন্দু সমাজের সংস্কার করার সক্রিয় প্রচেষ্টা, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের এক নতুন ধারার জন্ম, এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনও কলকাতাতেই প্রথম আরম্ভ হয়। আর এই সমস্ত আন্দোলনের ঢেউ ধীরে ধীরে সমগ্র দেশকেই স্পর্শ করে। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয় এই কলকাতা থেকেই। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একক শক্তি, যা বাংলার সমাজজীবনের স্বরূপ পরিবর্তন করে দেয়, সেই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রও ছিল এই কলকাতা।

যদিও কলকাতার নেতৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত, তবুও অন্যান্য নগরকেন্দ্রগুলোও বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা 'পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উৎস' হিসেবে তার অবস্থান বজায় রাখতে সমর্থ হয়, এমনকি তার হারানো মর্যাদার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি কেন্দ্র এবং নতুন কৃষ্টির উৎস হিসেবে যার প্রকাশ ঘটে ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মসভা আন্দোলনের ক্রমবৃদ্ধিতে।[৪৩] একইভাবে অন্যান্য 'ছোট ছোট শহর ও নগরগুলো যেমন একাধারে ছিল

---

৪৩. Ranu Basu. "A note on Urbanism in Nineteenth Century India The Urban Areas in Bengal, 1850-1872", *Bengal Past and Present*, Part I, Serial No. 188, (Calcutta Januray—June 1980), Vol. XCIX, 14.

কলকাতা থেকে নতুন নতুন দিকনির্দেশনা ও চিন্তার গ্রাহক, তেমনি অন্যদিকে তাদের আশেপাশের এলাকায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে নব্যশক্তির কেন্দ্রও'[৪৪] ছিল প্রধান নগরকেন্দ্রগুলো. যেমন ঢাকা, মেদিনীপুর ও বর্ধমান ছিল ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই সমস্ত শহর তাদের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর জীবন ও সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

অভিজাত মুসলমানদের আবাস মুর্শিদাবাদও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। 'এমনকি ছোট ছোট শহরগুলোও, যেমন যশোর, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা ও রংপুর এদের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতো এবং গ্রামাঞ্চলের সাথে বড় বড় কেন্দ্রগুলোর সংযোগ স্থাপন করতো।'[৪৫]

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি সেই সময়ের শহর ও নগরের অধিবাসীদের সবাইকে সম্পূর্ণভাবে শহুরে বলা যাবে না এ ইঙ্গিত আমরা আগেই দিয়েছি। কেননা এদের সবাই যে অকৃষিজীবীর পেশায় নিয়োজিত ছিল তা নয়, এদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকাজ ও গোশালার ব্যবসা করে জীবিকানির্বাহ করতো। এমনকি খোদ কলকাতাতেও বহু সংখ্যক কর্মজীবী পুরুষ কৃষিকাজ এবং পশুপালন করতো।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধিকাংশ অধিবাসীই জীবিকানির্বাহ করতো চিরাচরিত শহুরে কাজকর্ম করেই, যেমন চাকুরি, ব্যবসা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প-কলকারখানা ও বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে কাজ। একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিল্পকর্ম এসময়ে মূলত ঐতিহ্যগত ও বিশেষ নৈপুণ্যপূর্ণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সমস্ত শহুরে জীবনে আবার এমন কতকগুলো উপাদান বিরাজমান ছিল, যা সাধারণভাবে 'প্রাক-শিল্প' যুগের নগরায়ণের স্বাক্ষর বহন করে। "যেমন বাস্তুসংস্থানবিন্যাসে (ecological organisation) পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন শ্রেণীর বা ভিন্ন পেশাদারদের অবস্থান এবং অধিবাসীদের গাদাগাদি করে থাকা; ক্ষুদ্র একটি বাছাই করা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হাতে সমাজনিয়ন্ত্রণক্ষমতা ও সামাজিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ; বাছাই করা শ্রেণী বা এলিটদের সাথে সাধারণ অধিবাসীদের সংযোগহীনতা এবং কেবল বাছাই করা শ্রেণীর পুরুষদের মধ্যেই শিক্ষাদান সীমাবদ্ধকরণ। প্রাক-শিল্প যুগের এই সমস্ত মৌলিক বিষয় শহরে বিদ্যমান থাকায় শহুরে এবং গ্রাম্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিকট-সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ অব্যাহত থাকে। . . .তবে সাধারণভাবে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, বাংলার শহুরে

—

৪৪. ঐ, 14.

৪৫. প্রাগুক্ত, 15.

এলাকাগুলো 'আধুনিক' জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে এবং সমাজপরিবর্তনের ধারাকে সহায়তা করে, এমনকি অপর সভ্যতা থেকে প্রথাদি গ্রহণপ্রণালীরও বিকাশ ঘটায়।"[৪৬]

যদিও বৃটিশ আমলে নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল শ্লথ, তবুও নগরকেন্দ্রগুলোর পৌর জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কার্যব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছিল। এটা ছিল ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার তথা ভারতীয় নগরজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল জনগণের অংশগ্রহণনীতি, যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে বিবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের রূপ লাভ করে। গত দুই শতকে বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিবর্তন আলোচনার প্রসঙ্গ যদিও এটা নয়, তবুও বলা প্রয়োজন, প্রাথমিক পর্যায়ে নগর ও শহর উন্নয়ন কমিটি এবং পরবর্তীকালে পৌরসভা ও কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশস্ত রাস্তা ও সরকারি ভবনাদি নির্মাণ, পানিসরবরাহব্যবস্থা, রাস্তার বাতি, আবর্জনা দূরীকরণ ও পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা স্থাপন এবং স্বাস্থ্যপরিচর্যার সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তনের ফলে নগর ও শহরগুলোতে আধুনিক জীবনযাত্রার উদ্ভব হয়।[৪৭]

এসব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সব জায়গায় এক সাথে আসে নি। যদিও কলকাতায় এগুলো বেশ আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু মফস্বল শহরগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে এসবের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পৌর সুযোগ-সুবিধার অভাব শুধু যে নগর-কেন্দ্রগুলোকে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর করেই রেখেছিল তাই নয়, বরং এর অনুপস্থিতিতে কিছু কাল পর্যন্ত আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে এগুলোকে আলাদা করা যায় নি। এমনকি ১৮৮০-এর দশকেও অধিকাংশ মফস্বল শহরই ছিল 'নোংরা, রোগ-ব্যাধিতে পরিপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পৌর সুযোগ-সুবিধা বিবর্জিত।'[৪৮] যাই হোক, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও স্যানিটারি পরিদর্শকদের সমালোচনা ও অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে অধিকাংশ শহর ও নগরই বিভিন্ন পৌর সুবিধা পেতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেখানকার আবাসিক অবস্থারও উন্নতি হয়। কিন্তু এই উন্নতি প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে

৪৬. ঐ, 15-16.

৪৭. For a history of the development of these institutions and civic facilities in, for example, Calcutta and Dhaka দেখুন, S W Goode, *Municipal Calcutta Its Institutions and their Origin and Growth*, (Edinburgh 1916), Sharif Uddin Ahmed, *Dacca—A Study in Urban History and Development*

৪৮. Islam, 'Life in the Mufassal Towns' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 249

পারে নি মূলত আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে।[৪৯] একথা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, শহুরে জীবনের মান উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত বাঙালিরা শহরে বাস করার জন্য তেমন আকর্ষণ বোধ করতো না। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "তারা শহরে থাকাকে বেশ অপছন্দ করতো এবং এই অপছন্দের ব্যাপারটিকে এরা যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। উকিল, কেরানি, স্কুলশিক্ষক, এমনকি দোকানদার পর্যন্ত যাদের কাজই শহরে, এদের প্রত্যেকেরই গ্রামে হয় নিজের না হয় পারিবারিক বাড়ি রয়েছে। সেখানে তাদের পরিবার শহরের চেয়ে খুব অল্পব্যয়েই বসবাস করতে পারে। ফলে দু'জায়গায় দু'টি পৃথক গৃহস্থালি রাখার প্রচলন বৃদ্ধিই পাচ্ছে।"[৫০] এই পরিস্থিতির পরিবর্তন অবশ্য ধীরে ধীরে আসে।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলো প্রতিষ্ঠা এবং স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন নাগরিকদের সমাজজীবনে নিয়ে আসে এক অভিনব উপাদানবৈশিষ্ট্য। শুরুতে এই নতুন পৌরসভাগুলোকে কেন্দ্র করেই শহরের নানা শ্রেণী ও দলের মধ্যে সমাজসেবার এক ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে। পৌরসভাগুলো নগরের জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার এক যুগান্তকারী সেতুবন্ধ হয়ে উঠলো এবং শহুরে সম্প্রদায়ের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুও হয়ে দাঁড়ালো। অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে নগরজীবনের মান উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পরিবেশ অর্জনের সম্ভাবনা দেখলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুব শীঘ্রই এই প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের রঙ্গমঞ্চে (arena) পরিণত হলো এবং এ লড়াই গোটা জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে ফেললো। ১৮৮০-এর দশকে যখন বড়লাট লর্ড রিপন স্থানীয় সরকারকাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে এসে এগুলোকে স্থানীয় লোকদের জন্য রাজনৈতিক শিক্ষার অঙ্গনে পরিণত করলেন, তখন এগুলো হয়ে উঠলো রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের উপযুক্ত স্থান আর তাকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শুরু হলো পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক আর দলাদলি।[৫১] তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, এই পৌরসভাগুলোই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের লালনক্ষেত্ররূপে কাজ করেছিল। আর একারণেই বাংলার নগর-শহরগুলোর এক নতুন ভাবমূর্তি তৈরি হলো।

যদিও ইংরেজ আমলে নগরায়ণের গতি ছিল খুবই মন্থর, তবু বাংলার শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা গ্রামের মানুষের সংখ্যার চেয়ে দ্রুত লয়ে বেড়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা

৪৯. *Bengal Municipal Administration Report, 1921-22*, para 23, 8-9.

৫০. *Census of India, 1921, Bengal, Report*, para 86.

৫১. দেখুন, R. Roy, *Urban Roots of Indian Nationalism—Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875-1939*, (New Delhi 1979).

যেতে পারে, ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত এক দশকের মধ্যে শহরে জনসংখ্যা বেড়েছিল ১৬ শতাংশ আর তুলনামূলকভাবে একই সময়ে গ্রামে মানুষের সংখ্যা বেড়েছিল মাত্র ৬.৭ শতাংশ।[৫২]

শহর ও নগরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় দিক হলো এসব কেন্দ্রে হিন্দু জনসংখ্যার আধিক্য। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, সমগ্র বাংলার শহরে অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশই ছিল হিন্দু, যদিও তারা ছিল বাংলার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায়, সমগ্র বাংলায় প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন মুসলমান শহরে বাস করতো, আর হিন্দুদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ১১২ জন।[৫৩] এই বছর বাংলার শহরে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩৬,৮৪,৩৩০ জন। এর মধ্যে হিন্দু ছিল ২৫,৪১,০৬২ জন আর মুসলমান ১০,২৯,৩৭৪ জন।[৫৪] বাংলার শহরে জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুদের আধিক্য ১৯২১ সালের আদমশুমারির নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায় :

শহুরে জনসংখ্যার প্রতি হাজারে সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুপাত

অঞ্চল	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য ধর্মাবলম্বী
সমগ্র বাংলা	৬৯৪	২৭৪	৩২
পশ্চিম বাংলা	৮০৮	১৭৪	১৮
মধ্য বাংলা	৬৯৬	২৫৬	৪৮
উত্তর বাংলা	৫৭৯	৩৬৭	৩৪
পূর্ব বাংলা ঢাকা বিভাগ	৫৬২	৪২৭	১১
পূর্ব বাংলা চট্টগ্রাম বিভাগ	৫০২	৪৫৯	৩৯

সূত্র : *Census of India, 1921*, Vol. V, Part I, para 89.

১৯২১ সালের আদমশুমারিতে উল্লেখ করা হয়, সেসময় কলকাতা ও এর শহরতলীতে প্রতি এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৭০৯ জন, মুসলমানদের সংখ্যা ২৪৫ জন এবং খৃস্টানদের সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। উনিশ শতকে

৫২. *Census of India, 1931, Bengal*, Vo. I, 76-77.

৫৩. ঐ, 82.

৫৪. ঐ, Vol. II, 16, Imperial Table V.

কলকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগতই কমতে থাকে। ১৯২১ সালে এমনকি ঢাকাতেও হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, যা ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের একটি শহর হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং যা ছিল মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলে অবস্থিত—প্রতি হাজারে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৫৭৯ জন আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪১৩ জন। বিশ বছর আগে এই অনুপাত ছিল প্রতি হাজারে হিন্দু জনসংখ্যা ৫৩৫ জন আর মুসলমান জনসংখ্যা ৪৫৭ জন। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "বাংলায় এমন শহর খুব কমই আছে যেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। এ ধরনের কিছু শহর হচ্ছে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, মালদহের নবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান।"[৫৫]

নিচের সারণিতে ১৯২১ সালে কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য শহরএলাকায় প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অবস্থান এবং একই সাথে সারা বাংলায় প্রতি এক হাজার জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক চিত্র দেখানো হয়েছে :

বাংলায় এবং বাংলার বিভিন্ন শহরে প্রতি হাজার জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুপাত

অঞ্চল	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	অন্যান্য ধর্মাবলম্বী
কলকাতা শহর	৭০৮	২৩০	৪৩	১৯
সাধারণ শিল্প বা বাণিজ্যিক শহর	৭১১	২৭২	১৪	৩
সাধারণ মফস্বল শহর	৬৯১	২৯১	৭	৬
সারা বাংলা	৪৩৭	৫৩৫	২	২৬

জনসংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক এই চিত্র[৫৬] প্রদেশটির সামাজিক বিবর্তনই নির্দেশ করে। এ অঞ্চলের হিন্দুরা অনেক আগে থেকেই বৃটিশ শাসকবর্গের খুব নিকট-সংস্পর্শে আসে এবং নতুন শাসন প্রবর্তনের ফলপ্রসূত নানাবিধ সুযোগ গ্রহণ করে। মুসলমানরা, যারা ছিল প্রদেশের অপর প্রধান সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, তারা ইংরেজদের নৈকট্য থেকে অনেকদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। নবোদ্ভূত ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি কলকাতায় হিন্দুরা আঠারো শতকের প্রথমদিক থেকেই বিপুল সংখ্যায় এসে বসতি শুরু করে এবং এই

৫৫. *Census of India, 1921, Bengal,* para 89.

৫৬. প্রাগুক্ত, para 89.

প্রক্রিয়া বৃটিশদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে আরো জোরদার হয়। আঠারো শতকের শেষদিক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত কলকাতা হয়ে উঠলো ভাগ্যান্বেষী এবং আমোদ-প্রমোদকামী হিন্দুদের বাসভূমি। এই অভিবাসন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। বিহারের দরিদ্র হিন্দু কুলি থেকে শুরু করে গ্রামবাংলার ভূমিনির্ভর নব্য অভিজাতদের অনেকেই এসে কলকাতায় বাসা বাঁধে। নতুন শাসকদের সুবাদে উদ্ভূত শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক সুবিধাগুলোও পেশাদার হিন্দু সম্প্রদায় খুব তাড়াতাড়িই গ্রহণ করে; আর এরাই সরকারি ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর নিচু ও মধ্যস্তরের আসনগুলো দখল করে। এই প্রক্রিয়া কলকাতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি মফস্বল শহরগুলোতেও ঘটে। এমনকি, সেই সমস্ত নতুন শিল্প ও বাণিজ্যিক শহর, যেগুলো সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠে, সেখানেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একই সাথে ১৯৩০-এর দশক থেকে হিন্দুদের মধ্যে শহুরে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে মন্তব্য করা হয়, "হিন্দুরা এখন খুব দ্রুতগতিতেই শহুরে জীবনকে গ্রহণ করছে এবং সেই সমস্ত পেশা গ্রহণ করছে যেগুলো বিশেষকরে শহরেই পাওয়া সম্ভব।" জনসংখ্যা বিষয়ক এই বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব, যারা সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি এবং স্বাধীন পেশাও অবলম্বন করে। এই শ্রেণীটির উদ্ভবের কারণ মূলত বৃটিশদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। কর্নওয়ালিসের আইনব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে এদের অগ্রগতির সূচনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে হিন্দুদের মধ্যে 'বিশেষ আইনপেশাদারি শ্রেণীর' বিকাশের কথা। বস্তুত এই পেশায় হিন্দুরাই পুরো বৃটিশ যুগে তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। এই হিন্দু আইনজীবীরা অচিরেই তাদের নিজেদের প্রভাববিস্তারের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং মহানগরী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র মফস্বল শহরগুলোতেও নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হন। তাদের এই পেশাগত কর্তৃত্বের বদৌলতে তারা "নতুন বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।"[৫৭] শহুরে হিন্দুরা আইন ছাড়াও শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা ও ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেন।

এই শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি প্রথম থেকেই দেশের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাদের এই দৃষ্টি ও কৌতূহল অচিরেই নানাবিধ সংস্কারআন্দোলনের জন্ম দেয়।[৫৮] তাদের এই আন্দোলন ও দেশের আধুনিকীকরণপ্রয়াস একটি নতুন সংস্কৃতিরও জন্ম দেয়, যার ফলে শহরগুলোর সামাজিক প্রভাব ও গুরুত্ব

৫৭. Islam. 'Life in the Mufassal Towns' in Ballhatchet and Harrison (eds.), *The City in South Asia*, 240.

৫৮. P. Sinha, *Nineteenth Century Bengal—Aspects of Social History*, (Calcutta 1965).

উভয়ই বৃদ্ধি পায়। সন্দেহাতীতভাবে এই বিষয়ে নেতৃত্বদান করে কলকাতা শহর। তবে চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের এই নতুন ঢেউ ধীরে ধীরে সব শহরেই এসে পৌঁছায় প্রধানত মহানগরী থেকে প্রচার ও প্রত্যক্ষ সহায়তার মাধ্যমে।[৫৯]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নগরভিত্তিক এই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনীতিতেও খুব আগেভাগেই তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অবশেষে তাদের আবির্ভাব এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। একইভাবে বিলম্বে হলেও উনিশ শতকের শেষদিকে এক মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এদেরও উত্থান ঘটে শহর-নগরকে ভিত্তি করেই। আর এদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সরকারি চাকুরিক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এবং স্বাধীন পেশাদারি ব্যবসায়ে, যেমন আইন ও চিকিৎসায় তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রেখেছিল।[৬০] তাই এপর্যন্ত রাজনৈতিক মঞ্চে তাদের উপস্থিতি প্রধানত নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করা এবং তা আরো বৃদ্ধির জন্যই নিবেদিত ছিল। ঠিক এই সময়ে রাজনীতিসচেতন অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের, বিশেষকরে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক কৌশলের ধারা পরিবর্তন করলো এবং তারা রাজনৈতিক দাবাখেলার গুটি চালতে শুরু করলো মুসলমান মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখার জন্য। বৃহৎ পরিসরে অথবা খুব দ্রুতগতিতে দেশের শিল্পায়ন এবং সার্থক নগরায়ণের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তথা সমগ্র দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই ধরনের উন্নয়নের অভাবে সীমিত কর্মক্ষেত্র ও সুযোগকে কেন্দ্র করেই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সামাজিক সংগঠনের অস্থিতিস্থাপকতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা এই প্রতিযোগিতাকে যে অচিরেই সংঘাতের মুখে ঠেলে দেবে তা ছিল প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এই প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ রাজনীতিই শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হলো। শহুরে মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনীতিতে যোগদান তাই হয়ে উঠলো অপরিহার্য। পরিশেষে রাজনৈতিক খেলা যেভাবে পরিচালিত হয় তা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্ম দেয়। স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতি—যাও ছিল শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা প্রভাবিত—যথাসময়ে সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে বিভক্ত হয়ে পড়লো এবং এরই পরিণতি ঘটলো সাম্প্রদায়িকতার

৫৯. দেখুন শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* (কলকাতা ১৯০৭, ১৯৭৭ সংস্করণ), ২৩১-৩২।

৬০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য আরো দেখুন, Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal, 1927-36,* (Dhaka, 1987), 45-46, *et passim* আরো দেখুন, Sharif Uddin Ahmed, *Dacca,* 83-84.

ভিত্তিতে দেশবিভাগের মাধ্যমে। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে সৃষ্টি করা হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র।

পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলা) আবির্ভাব ঘটলো। প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রদেশ অভিজাত, উচ্চশ্রেণীর এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত দ্বারা শাসিত হতে লাগলো। বিদেশী শাসনের অবসানের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে একটি নতুন মুসলমান রাষ্ট্র গড়ে তোলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা অর্থনৈতিক অগ্রসরতা এবং সামাজিক পরিবর্তন অর্জনের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করলো। তাই পাকিস্তানের স্বল্পস্থায়ী প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের ক্ষেত্রেও এক প্রচণ্ড গতিবেগ লক্ষ্য করা গেল। দেশবিভাগের সাথে সাথে ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের অভিবাসনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন শহরে রাতারাতি জনসংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেলো, বিশেষভাবে ঢাকা শহরে।[৬১] একই সাথে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকার উদ্ভব, চট্টগ্রাম শহরকে দেশের বৃহত্তম বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাঠামোগত শক্তিবৃদ্ধি ও নানা সুবিধাদি প্রদান, সরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি উদ্যমকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দেশকে শিল্প ও বাণিজ্যিকভাবে উন্নত করা, মফস্বল শহরগুলোতে শিল্পএলাকা গড়ে তোলা এবং অনেক নতুন নতুন প্রশাসনিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সবকিছু মিলে পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের প্রক্রিয়া জোরদার করে তোলে।

অবশ্য প্রথমদিকে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তার অল্পই অর্জিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অগ্রগতির পূর্বশর্ত হলো সঠিক নীতিমালা উদ্ভাবন এবং তা কার্যে পরিণত করা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানে সব গুরুত্বপূর্ণ নীতি, সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে শুরু হলো, কেননা ইতিমধ্যেই তারা সমগ্র দেশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ অচিরেই এমন সব নীতি অবলম্বন করতে শুরু করলেন যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে শুধু যে উপেক্ষাই প্রদর্শন করা হলো তাই নয়, এমনকি যে যৎসামান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এখানে শুরু হলো সেখানেও পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হলো। তারা পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ এবং এই প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করার পদক্ষেপগুলোকে উৎসাহ প্রদান করতে শুরু করলেন। পাকিস্তানের সার্বিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও অন্যায়ভাবে

---

৬১. দেখুন, Papiya Ghosh, "The 1946 Riot and the Exodus of Bihari Muslims to Dhaka" in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 275-83

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করলো এবং এর সবই পশ্চিম পাকিস্তানেই স্থাপন করা হলো, যার ফলে সেখানে নগরায়ণকে আরো উৎসাহিত এবং ত্বরান্বিত করা হলো। শেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগ খুবই কম হওয়ার দরুন এখানে শিল্পের উন্নয়ন শ্লথ হয়ে গেল এবং পরিণামে এই প্রদেশটি ক্রমাগত কৃষিনির্ভর হয়ে পড়লো এবং এখানকার অর্থনীতি কেবল প্রাণধারণের অর্থনীতিতে পরিণত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্পখাতে উন্নয়ন তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়লো। আর এগুলো সবই পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণপ্রক্রিয়াকে মন্থর করে দিল।

তা সত্ত্বেও শহরে জনসংখ্যার অনুপাত কিন্তু পরিমিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ কালপর্বে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রতিবছর গড়ে ৩.৮ শতাংশ, যখন সারা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১.৯ শতাংশ, যদিও এই বৃদ্ধি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক কম। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে শহরে জনসংখ্যা ছিল প্রদেশের সমগ্র জনসংখ্যার ১৭.৮ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে একই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের শহরে জনসংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার ৪.৪ শতাংশ।[৬২] নিচের সারণি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শহরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটি চিত্র পাওয়া যায় :

১৯৫১-৬১ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে নগরজনসংখ্যা ও সামগ্রিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমানুপাতিক হার

আদমশুমারিকাল	নগর জনগোষ্ঠীর শতকরা হার	জনসংখ্যা বৃদ্ধি	
		নগর	সারাদেশ
১৯৫১	৪.৩৪	৩.০	০.৫
১৯৬১	৫.১৯	৩.৮	১.৯
১৯৭৪	৮.৭৮	৬.৯	২.৬
১৯৮১	১৫.১৮	৭.৬	২.৯

সূত্র : *Statistical Yearbook of Bangladesh, 1980,* 54.

পাকিস্তান আমলে নগরায়ণপ্রক্রিয়া নতুন নতুন শহরও সৃষ্টি করেছিল। '১৯৫১ সালে মোট শহরের সংখ্যা ছিল ৬২ আর তা ১৯৬১ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৭-এ ...।'[৬৩]

৬২. Mohit, 'History of Urban Growth' in Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, 624
৬৩. ঐ, 624.

এই বৃদ্ধি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রসারতা উভয় কারণেই ঘটে। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে, ক্ষুদ্র শহরগুলো বৃটিশ আমলের ধারা অনুযায়ী অবনতির দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু মাঝারি আর বড় শহরগুলোর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।[৬৪] এই ধারা গড়ে উঠার কারণ ছিল দেশে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মতো পরিকল্পনার অভাব এবং দেশে বিদ্যমান সাধারণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা। এই পরিস্থিতির জন্য সরকারি নীতিও খানিকটা দায়ী, কেননা সরকার কেবল কিছু সংখ্যক শহর-নগরের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনের বিশেষ কিছু দিকের উন্নতি সাধনের জন্যই একান্তভাবে মনোযোগ দেয়, আর অবহেলা করে একটি সুপরিকল্পিত ও ভারসাম্যময় সার্বিক অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধিকে। তাই লক্ষ্য করা গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে নগরায়ণের এক বিশেষ রূপ। 'যদিও শহরে জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধি ঘটে ... তবে এর বিভাজন থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কেবল বড় বড় শহরে, যেমন ঢাকা ও চট্টগ্রামে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।' শহর-নগরকেন্দ্রগুলোর সামাজিক গঠন কিন্তু বৃটিশ আমল থেকে ভিন্ন রূপ নেয়। প্রায় সব শহরেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর এই জনসংখ্যার মধ্যে দেখা দেয় বৈচিত্র্য। শহরগুলোতে পুরনো বিশিষ্ট হিন্দুদের, এমনকি সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর হিন্দুদেরও অবস্থান তেমন লক্ষ্য করা যায় না, কেননা এদের বেশিরভাগই এইসব স্থান ছেড়ে ভারতে চলে যায়। তাদের শূন্যস্থান ধীরে ধীরে এবং কোন কোন স্থানে খুব দ্রুতগতিতেই অবাঙালি মুসলমান উদ্বাস্তুরা এবং গ্রাম থেকে আসা মুসলমান বাঙালিরা পূরণ করে ফেলে। হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে শহরগুলোতে আসতে থাকে, বিশেষকরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়, যেখানে কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল। পাকিস্তান আমলে ঢাকার এই পরিবর্তিত অবস্থার এক প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক আহমদ হাসান দানী তার *ঢাকা* গ্রন্থে। তিনি মন্তব্য করেন, "মানুষের সে কি এক বিচিত্র সমাবেশ; বাঙালি, বিহারী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, পাঠান সবাই ক্লান্তপদবিক্ষেপে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে তাদের বিভিন্ন রঙের কাপড় পরে আর নানা ভাষায় কথা বলতে বলতে।"[৬৫]

যখন ঢাকায় নতুন নতুন কার্যালয়ে কাজ এবং নতুন নতুন ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হয়, তখন বাঙালি মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অভাবে উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বগুলো উত্তর ভারত থেকে আগত বয়োজ্যেষ্ঠ সরকারি আমলাদের দ্বারা পূরণ করা হয়। শুধু বড় বড় ব্যবসাই নয়, এমনকি বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যবস্থাপনাতেও দিল্লী, গুজরাট, কাথিয়াওয়াড় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত বণিকশ্রেণীর মুসলমানেরা এগিয়ে আসে, কেননা

৬৪. ঐ, 624

৬৫. Ahmed Hasan Dani *Dacca - A Record of Its Changing Fortunes*, (Dacca 1962), 155.

মুসলমান বাঙালিরা এসব ক্ষেত্রে তেমন উদ্যোগ দেখাতে পারে নি।' অধ্যাপক দানী অবশ্য লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙালিরা, বিশেষকরে বাঙালি যুবকশ্রেণী অতি সত্বরই উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রাদেশিক রাজধানী নানা রকমের নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে আর সেগুলো তারা তড়িঘড়ি গ্রহণ করতে থাকে। তারা এগিয়ে এসেছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে', সেই সমস্ত সরকারি-বেসরকারি পদ পূরণ করতে, যেগুলো তখন শূন্য ছিল আর 'তখন পূরণ করা হচ্ছিল' এবং সার্বিকভাবে দেশের ব্যবসা, শিল্প ও সরকার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে। হিন্দু মাড়োয়ারি শ্রেণী, যারা এ পর্যন্ত সারা পূর্ব বাংলায় ব্যবসা ও বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছিল, তারা এখন প্রথমবারের মতো এই নতুন শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলো। ১৯৬০-এর দশকের প্রথমদিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন শহরে স্থাপিত নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সবগুলোই ছিল অবাঙালি মুসলমানদের হাতে। আগা খানী, বোহরা, দিল্লীওয়ালা এবং চিনোতিরা (পাঞ্জাবের চিনোতি থেকে আগত বণিকগণ) শিল্প ও উচ্চপর্যায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে অতি দ্রুত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে, আর স্থানীয় মুসলমানদের হাতে থেকে যায় ছোটখাটো দোকান আর ক্ষুদ্র ব্যবসা। তাহলেও বাঙালি মুসলমান যুবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে বহু বাঙালি যুবক উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে এগিয়ে আসতে থাকে। ফলে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা বহুসংখ্যক উচ্চ সরকারি চাকুরিতে আসীন হয় এবং অন্যান্য পেশাতেও ক্রমে উন্নতিলাভ করতে থাকে। তবু একথা বলতেই হয়, বাঙালি মুসলমানরা শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন পারদর্শিতা দেখাতে পারে নি। ঢাকার তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে দানী বলেন, "এটি বিভাগপূর্ব ঢাকার সামাজিক জীবনের ঠিক উল্টো একটি অবস্থা। সেই যুগের অভিজাতবর্গের এখন আর তেমন কেউ নেই। এখনকার প্রধান ব্যবসায়ী শ্রেণী হচ্ছে একদল নতুন আগন্তুক, যাদের বিরাজমান পরিস্থিতিতে মূলধন বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করার মতো সম্পদ ও উদ্ভাবনী শক্তি দুইই রয়েছে, আর এ দু'টি দিয়েই তারা ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করবে, তবে এর পূর্বশর্ত হচ্ছে শান্তিপূর্ণ অবস্থা এবং দৃঢ় প্রশাসন। তরুণ মুসলমান বাঙালিরা হচ্ছে একটি উঠতি প্রজন্ম, যারা ১৯৬২ সালের মধ্যেই সরকারি অফিস-আদালতে নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। একথা অবশ্য বলতেই হয় যে, ঢাকায় অধিক হারে মানুষের আগমন এখনও থেমে যায় নি। এছাড়া দেশে এখনও বহু সমস্যা রয়েছে যেগুলোর সমাধান হওয়া দরকার।"[৬৬]

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দেশের দু'টি অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তিক্ত সম্পর্ক এবং স্থানীয় বাঙালি ও ভারত-পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে আগত নতুন অভিবাসনকারীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। সমান সুযোগ ও জাতীয় সম্পদের ভাগবাটোয়ারা

---

৬৬. প্রাগুক্ত, 156.

সংক্রান্ত প্রশ্নেই এই সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি একটি নব্য পেশাদারি ও চাকুরিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দেয়, যে শ্রেণীটি দেশের উভয় অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে এবং স্পষ্টভাবে দেশের সকল কর্মক্ষেত্রে অবাঙালি রাজনীতিবিদ ও আমলাদের প্রাধান্যকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে। এই উভয় ব্যাপারই তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। এই পর্যায়ে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক ঐক্যবোধ তার ভিত্তি হারিয়ে ফেললো, যখন বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুভূতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ উপেক্ষা করলো। ঢাকায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জোরালো ঘোষণা 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' সুপ্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় আঘাত হানে, যা অচিরেই একটি দুর্বার গণআন্দোলনের রূপ নেয়। জাতীয়তাবাদী শক্তি আরো দৃঢ় ও গতিবান হয়ে উঠলো যখন পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

জাতীয়তাবাদের উত্তাল ঝড়ের ইঙ্গিত প্রদান করলো নতুন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের উদ্ভব ঘটেছিল দেশের শহর-নগরগুলোতে এবং যারা রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সোচ্চার আর সক্রিয় হয়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্রসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য হাজার হাজার বাঙালি যুবক গ্রামাঞ্চল থেকে দেশের বিভিন্ন শহর ও নগরে আসে। তারাও ক্রমে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। মুক্তির দাবি তাই আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

এই নবজাগ্রত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ছাত্রসমাজ পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈষম্যমূলক উন্নয়ন ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার চিত্র সারা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরে। এরা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে একটি ঔপনিবেশিক ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরাই ১৯৫২ সালে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন শুরু করে এবং পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যে একটি পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের এই আন্দোলন ক্রমে আরো তীব্রতা লাভ করে বৃহত্তর গণআন্দোলনের রূপ নেয় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ফলে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে, মুক্ত করেছে এ ভূখণ্ডকে অবহেলিত শোষিত অবস্থা থেকে। দেশে নগরায়ণের ক্ষেত্রে আবার এসেছে জীবনের জোয়ার, কেননা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল বিস্তার ঘটেছে নানা উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের এবং বৃহত্তর জনজীবনে এসেছে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য আর এরই ছোঁয়া লেগেছে শহরগুলোর শ্রীবৃদ্ধিতে। কিন্তু একটি বড় রকমের সমস্যা বাংলাদেশের শহর ও নগরগুলোর উন্নয়নে বার বার বাধা সৃষ্টি

করছে। তা হচ্ছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে গ্রামের হাজার হাজার মানুষ গ্রামে তাদের কোন কর্মসংস্থান না থাকার কারণে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে শহরের দিকে। গ্রাম থেকে শহরে অতিরিক্ত মানুষের আগমনে এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশের শহর ও নগরগুলোতে নানা কঠিন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার সাথে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। তাই অতিরিক্ত মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে শহর-নগরগুলোতে বেকার লোকের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। বেকারত্ব, অপ্রতুল গৃহসংস্থান, সীমিত পানিসরবরাহ, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎব্যবস্থা, অপ্রতুল যাতায়াত ও যানবাহনের সমস্যা শহর-নগরগুলোকে সমস্যার আবর্তে নিক্ষেপ করছে, যেখানে লক্ষ্য করা যায় কেবল বস্তিবৃদ্ধি আর ভবঘুরেদের বসতির বিস্তার। এমনিভাবেই কি শহর-নগরগুলো ক্ষমতা, উৎপাদন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠার আগেই জনসংখ্যার চাপে দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যে ভেসে যাবে? এই প্রশ্নই এখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ চিন্তাশীল মানুষের মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

৬

মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন

মঈনুদ্দীন আহমেদ খান*

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম ও সমাজচিন্তা মূলত ব্যাপ্ত ছিল সনাতন বিশ্বাস ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান-ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে। আভিজাত্যভিত্তিক শাসনকে বহাল রাখার জন্য মুগল সরকার অপরিবর্তনের ধারাকে সমুন্নত রেখেছে। কিন্তু অপরিবর্তনের ঐতিহ্য দারুণভাবে প্রভাবিত হলো বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর অত্যল্পকালের মধ্যে পতনশীল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয় বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অবক্ষয়। স্বাভাবিক কারণেই সমাজের উপর আভিজাত্যের প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকতায় একই সময়ে একটি নব্য সংস্কারমনা শ্রেণী গড়ে উঠে। পাশ্চাত্যপুষ্ট এই নব্য শ্রেণীর একটি লক্ষ্য ছিল সনাতন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন। মুসলিম সমাজেও একই সময়ে কতিপয় সংস্কারমনা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। এই পরিবর্তনধারার প্রথম পর্ব সূচিত হয় উনিশ শতকের প্রথমভাগে হাজি শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক। মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় প্রায় একই সময়ে। বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে প্রধানত ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে।

বাংলায় ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পুরুষ হাজি শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ধর্মচিন্তায় আলোকপ্রাপ্ত হন প্রধানত তিনজন ইসলামী চিন্তাবিদের প্রভাবে। তাঁরা হলেন আরবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭), শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩) এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১)। কিন্তু শরীয়তউল্লাহ একটি বিশেষ ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারে ব্রতী হন। ঐ প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়, ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে একদিকে ইংরেজদের বিজয়, অন্যদিকে দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বাংলার নবাব মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। ক্রমান্বয়ে তাদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা বিধ্বস্ত হয় এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। আর তাদের সামাজিক জীবন পতিত হয় ধ্বংসের মুখে। ১৭৬৫ সালে মুগল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীউয়ানিলাভ বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম ছয়-সাত দশকে বাংলার মুসলিম সমাজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা অভাবনীয়।

১৮৪২ সালে ডেমপিয়র নামক একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা সেযুগের কোম্পানিশাসনকে অতিস্বৈরতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন এবং বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনকে একটি কদর্য বিপ্লব তথা 'লোথসাম রেভুলিউশন' নামে আখ্যায়িত করেন।[১] প্রখ্যাত প্রশাসক ও লেখক উইলিয়াম হান্টার বলেন : "কোম্পানি আমলের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত লোকের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ছিল, আর পঁচাত্তর বছরব্যাপী ইংরেজশাসনের পর তাদের মধ্যে সচ্ছল পরিবার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।"[২] সমসাময়িক অন্য একজন ডাক্তার ও প্রশাসক জেমস ওয়াইজ শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে বিস্মিত হন। তিনি বলেন : "ইংরেজ আমলে পঁচাত্তর বছর অতিবাহিত হতে না হতেই এদেশের মুসলমান জনসাধারণ রাখালহীন মেষপালের মতো হয়ে পড়েছিল।"[৩]

প্রখ্যাত ধর্মসংস্কারক হাজি শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘকাল আরব দেশে অবস্থান করে ১৮১৮ সালে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা দেখে হতবাক হন এবং বলেন যে, বাংলায় ইসলামের বৃক্ষকে তিনি ঈমানের পানির অভাবে মৃতপ্রায় দেখতে পান। জৌনপুরের প্রখ্যাত আলেম মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরী ১৮৩৬ সালে বাংলায় আগমন করেন। এখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখে তিনি বলেন যে, ইংরেজ আমলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লেও কোথাও বাংলার মতো এত করুণ ও শোচনীয় রূপ ধারণ করে নি।[৪] তাই হাজি শরীয়তউল্লাহ ও মওলানা জৌনপুরী বাংলায় ইসলামপ্রচার অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন।

---

১. *Calcutta Review*, 1944. দেখুন, 'Police Report'.

২. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, (Calcutta 1936).

৩. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, (London 1884), 21.

৪. মৌলবী কেরামত আলি, *কওল-আল-ছাবিত* (উর্দু), ৩, দেখুন, Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *History of the Faraidi Movement*, (Karachi 1965), 150.

ইসলামে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পৃক্ত এবং একই সূত্রে গ্রথিত। এগুলির যেকোন এক স্তরের অবক্ষয় অন্যগুলিকেও জরাগ্রস্ত করে তোলে। যতোদিন বাংলায় ইসলামী সমাজব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, ততোদিন মুসলিম সমাজে প্রতিবেশী ধর্মসম্প্রদায়সমূহের অনৈসলামিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণের অনুপ্রবেশ তেমন নজরে পড়ে নি। কিন্তু পলাশীউত্তর যুগে যখন বাংলায় ইসলামের অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং মুসলমানরা চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়লো, তখন তারা এ দুরবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে নিজেদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলো এবং এ সমাজে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করলো ।

ইসলামী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আরো লক্ষণীয় যে, আঠারো শতক থেকে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে মুসলিম দুনিয়ায় কমপক্ষে তিন ধরনের সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম (১) রাষ্ট্র ও সমাজের অবক্ষয় রোধের জন্য আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। অতঃপর (২) উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসলীলা থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার তাগিদে মুসলিম আধুনিকতাবাদ বা মুসলিম আধুনিক সংস্কার আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে (৩) বিশ শতকের শেষ নাগাদ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজে গভীর আবেগতাড়িত 'পুনর্জাগরণের' যে ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে তা এর প্রবক্তাদের মুখে ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ইসলামী বিপ্লববাদ' নামে উচ্চারিত হচ্ছে।

বিগত ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, প্রথমত, দিল্লীর মুগল সম্রাটদের আমলেই সুলতানি বাংলার পূর্ববর্তী তুর্কী ও পাঠান আমির-ওমরাহদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয় আর সমান্তরালভাবে এদেশের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে দিল্লী থেকে প্রেরিত মুগল মনসবদারদের হাতে চলে যায়। এতে বাঙালি মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে মুর্শিদকুলী খানের যথাক্রমে সুবা বাংলার দীউয়ানি, সুবাদারি ও নবাবিতে প্রতিষ্ঠালাভ এদেশে একটি নতুন প্রশাসনিক ধারা ও রাজনৈতিক তৎপরতার জন্ম দেয়। এই নতুন প্রশাসনিক ধারা নিম্নস্তরে জেলা ও মহকুমা (তথা সরকার ও পরগনা) প্রশাসনে হিন্দু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাধান্য এবং উচ্চস্তরের প্রশাসনে মুর্শিদকুলী খানের সদ্যাগত ইরানী বন্ধু-বান্ধব ও নিকট-আত্মীয়দের (যারা ক্রমান্বয়ে মুর্শিদকুলী খানের সুপারিশক্রমে দিল্লীর বাদশা কর্তৃক বিভিন্ন স্তরের মনসবদারি লাভ করে) কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়।[৫]

ধর্মান্তরিত মুসলিম হিসেবে মুর্শিদকুলী ধর্মীয় দিক থেকে গোঁড়া ছিলেন এবং হিন্দু জমিদারদের প্রতি কঠোর ছিলেন, বিশেষত জমির রাজস্ব আদায়ে বিলম্ব হলে তাদের কঠিন

---

৫. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan And His Times*, (Dhaka 1963), 15.

শাস্তি দিতেন। শিয়া মুসলমান হিসেবে তিনি সুন্নি ওলামার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। তাই নবাবি আমলে সুন্নিদের প্রতিপত্তি সরকারি মহলে হ্রাস পায়। তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাঁরা সুবা বাংলার নতুন শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হন, তারা সবাই ছিলেন বহিরাগত শিয়া। অন্যদিকে বাংলার মুসলিম অধিবাসীরা তুর্কী ও পাঠানদের প্রভাবে সবাই ছিল সুন্নি। কাজেই বহিরাগত শিয়াদের প্রাধান্যবিশিষ্ট প্রশাসন এবং সুন্নি জনসমাজের ধর্মীয় রীতিনীতি তথা ধর্মীয় ও প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণার বৈসাদৃশ্যের কারণে প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব, অসামঞ্জস্য ও পরস্পরিক সন্দেহের সৃষ্টি হয়। শিয়া প্রশাসকগণ সুন্নি মুসলমানদের প্রতি রাজনৈতিক ভয় পোষণ করায় প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সাথে তাদের এক প্রকার জঘন্য হঠকারী প্রশাসনিক নীতি সংযুক্ত হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে যতোদূর সম্ভব তারা প্রশাসনের নিম্নস্তরে হিন্দু কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে অভ্যস্ত হয় এবং উপরের স্তরে একদিকে হিন্দুদেরকে জমিদারি প্রদান করে কঠোর নিয়ন্ত্রণভিত্তিক ভূমিব্যবস্থা কায়েম করে, অন্যদিকে বহিরাগত শিয়া ও অবাঙালি, বিশেষত মাড়োয়ারি বণিকগোষ্ঠীর হিন্দুদের সাহায্যে সরকার পরিচালনা করে। তারা ঐতিহ্যবাহী প্রতিপত্তিশালী সুন্নি মুসলমানদের পাশ কাটিয়ে যায়। ফলে, বাঙালি মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা হারিয়ে ফেলে। অতএব, পলাশীপূর্ব এবং পলাশীউত্তর যুগে বাংলার অবক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজে আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অক্ষম ছিল। তাই মুসলিম উচ্চশিক্ষিত স্তর থেকে নেতৃত্বের উন্মেষ না হওয়ায় সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ এ শূন্যতা পূরণ করে এবং তাদের জীবনবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এ পর্যায়ে ১৮১৮ সালে হাজি শরীয়তউল্লাহ সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্য থেকে ফরায়জী আন্দোলন শুরু করেন।

হাজি শরীয়তউল্লাহ এবং ফরায়জী আন্দোলনের সূচনা

হাজি শরীয়তউল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজের অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। তিনি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘকাল বিদেশভ্রমণের মাধ্যমে অর্জিত প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে জনসাধারণের দুঃখমোচনের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের কালসীমা ছিল ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৪০ সাল।

হাজি শরীয়তউল্লাহর পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। তিনি শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন হন ও চাচা আযিমুদ্দিনের সংসারে লালিতপালিত হন। তিনি বাল্যকালে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন । তেরো বছর বয়সে কোন অজ্ঞাত কারণে গৃহত্যাগ করে তিনি কলকাতায় চলে যান । সেখানে তিনি ধর্মপ্রাণ মওলানা বশরত আলির সান্নিধ্য ও আশ্রয় লাভ করেন। এই স্নেহপ্রবণ মওলানার কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং আরবি-ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ফুরফুরায় গমন করেন। তিনি ফুরফুরায় কিছুকাল আরবি-ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের পর মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত

তাঁর অন্য এক চাচা আশিক মুহাম্মদের কাছে যান। আশিক মুহাম্মদ মুর্শিদাবাদ কোর্টে কর্মরত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বালক শরীয়তউল্লাহ চাচা-চাচীর কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হন এবং চাচার তত্ত্বাবধানে আরবি-ফার্সি শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভ করেন। কিছুকাল পর তাঁর চাচা আশিক মুহাম্মদ জন্মভূমি দর্শনের উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে সপরিবারে ফরিদপুরের দিকে রওনা হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পথিমধ্যে নৌকাডুবির ফলে তাঁর চাচা-চাচী উভয়েই মারা যান। তিনি নিজে প্রাণে রক্ষা পান। এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর যুবক শরীয়তউল্লাহ বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর একমাত্র আশ্রয়স্থল কলকাতার মওলানা বশরত আলির কাছে ফিরে যান। মওলানা বশরত আলি একজন স্বাধীনচেতা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। বাংলায় তখন বিদেশী ও বিজাতীয় অর্থগৃধ্নু ইংরেজ বণিকদের শোষণমূলক ও হঠকারী প্রশাসনে জনগণের জীবনযাত্রা ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর সঙ্কটে পতিত হওয়ায় তিনি এদেশকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বসবাসের অযোগ্য বিবেচনা করেন এবং অন্যত্র হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। যুবক শরীয়তউল্লাহ সানন্দে তাঁর সফরসঙ্গী হন এবং ১৭৯৯ সালে উভয়ে একত্রে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন শরীয়তউল্লাহর বয়স ছিল বিশ বছর।

পবিত্র মক্কা নগরীতে শরীয়তউল্লাহ জ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং আরবি সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ফিকাহশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য তিনি তাহের ছোম্বল নামে একজন খ্যাতনামা আলেমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহের ছোম্বল হানাফী মযহাবের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। হানাফী ফিকাহ্তে তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি 'ক্ষুদে আবু হানিফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শরীয়তউল্লাহ তাঁর সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করে ফিকাহ্ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অধিকন্তু তিনি তাহের ছোম্বলের কাছে কাদেরিয়া তরিকায় বায়েত হন এবং সুফিতত্ত্বের আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর দীর্ঘ আঠারো বছর মক্কায় অবস্থান করার পর আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[৬]

বর্ণিত আছে যে, ফরিদপুরে উপস্থিত হয়ে দিনের শেষভাগে যখন হাজি শরীয়তউল্লাহ পিতৃগৃহে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর চাচা আযিমুদ্দিন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে একজন হাজির আগমনের কথা প্রচারিত হলে হাজিদর্শনের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। সবাই তাঁকে অভিবাদন করে ও তাঁর দোয়াপ্রার্থী হয়। মাগরিবের সময় উপস্থিত হলে পরিস্থিতি বুঝে তিনি নিজেই আজান দেন। কিন্তু আজানশেষে তাঁর চতুর্দিকে কাউকেও উপস্থিত না পেয়ে বিফলমনোরথ হয়ে তিনি নিজে একাকী মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তিনি যেদিকেই যান মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও আর্থিক দুরবস্থা দেখতে পান। জনসমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও স্পর্শকাতরতার বিপুল বিস্তার ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁকে ব্যথিত করে।

৬. Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *Titu Mir and His Followers*, (Dhaka 1980), 7.

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে প্রশাসনের নামে কোম্পানির ঔপনিবেশিক শোষণ এবং কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার শিখণ্ডী হিসেবে নিয়োজিত গোমস্তাদের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার গণমানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা হাজি শরীয়তউল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির দাপটে এবং বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের লেজুড় এদেশীয় অনুসারী, ইংরেজ নীলকর, নব প্রতিষ্ঠিত ব্যারনজাতীয় জমিদার এবং জোতদার শ্রেণীর অত্যাচারের যাঁতাকলে আইনের নামে ও প্রশাসনিক শক্তিবলে নিষ্পেষিত অসহায়, দারিদ্র্যপীড়িত ও হতাশাগ্রস্ত বাঙালি কৃষকদের অবস্থা হাজি শরীয়তউল্লাহ ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছেন।

হাজি শরীয়তউল্লাহ দেশের সমাজকে এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জাগতিক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আদেশ-উপদেশ, অনুরোধ-উপরোধের কোন সুফল তিনি পেলেন না। তাই তিনি তাঁর ওস্তাদের নির্দেশলাভের জন্য পুনরায় পবিত্র মক্কা নগরীতে ফিরে যান। এরপর ওস্তাদ তাহের ছোম্বলের আশিস শিরোধার্য করে ১৮২০ সাল অর্থাৎ ১২২৭ বাংলা সনে তিনি দ্বিতীয়বার বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'ফরায়জী আন্দোলন' আরম্ভ করেন। একারণে তাঁর প্রাথমিক শিষ্যদের 'সাতাশ সনি ফরায়জী' বলা হয়।[৭]

ফরায়জী আন্দোলনের স্বরূপ

ফরায়জী আন্দোলন প্রকারান্তরে আরবের ওহাবী আন্দোলনের[৮] কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমধর্মী একটি শাখা ছিল। আরবের এই আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিম বিশ্বের নানা দেশে অনুরূপ অনেকগুলি সংস্কার আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। সেগুলির মধ্যে উত্তর আফ্রিকার সনুসী আন্দোলন, মিশর ও সিরিয়ার সলফী আন্দোলন, সুদান থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার ফুলানী আন্দোলন, বাংলার ফরায়জী আন্দোলন, উত্তর ভারতের তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া ও আহলে হাদীস আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার পাদুরী ও মুহাম্মদীয়া আন্দোলন অন্যতম।[৯]

একজন আধুনিক আরব ঐতিহাসিক আহমদ মোস্তফা আবু হাকীমা বলেন :

> সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের একত্ববাদের ভিত্তি ছিল অনমনীয় ও অলঙ্ঘনীয় আল্লাহর একত্বের ধারণা। শেখ মুহাম্মদের এ ধর্মনীতিতে কোন নতুনত্ব ছিল না অথবা তিনি এধরনের কিছু করতেও চান নি। একজন সংস্কারক হিসেবে শেখ মুহাম্মদ তাঁর সহচরদের

---

৭. প্রাগুক্ত।

৮. ঐ।

৯. ঐ, 16-17.

> পাপপঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যখন তারা আল-কুরআনের প্রদর্শিত পথ থেকে সরে গিয়ে মুসলিমদের ধর্মনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী আল-কুরআনের নির্দেশের প্রতি ফিরিয়ে আনতে এবং রসূলুল্লাহ ও তাঁর পুণ্যবান সহচরদের নির্দেশ কার্যকরী করার দিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।[১০]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলনের এই ছিল মর্মবাণী।

অতি সরল কথায়, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ব্যক্তিজীবনে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মৌলনীতি প্রতিষ্ঠা করা, যার মূলকথা হচ্ছে :

ক আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই ;

খ. আল-কুরআনের নির্দেশ ও রসুলের সুন্নত বা জীবনপন্থাই একমাত্র অনুসরণীয় ;

গ. আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা যাবে না ;

ঘ. ধর্মানুষ্ঠানে যেকোন প্রকার বেদাত বা নতুন আচার-আচরণ সংযোজন করা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে এবং মূল অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে এবং পরস্পর সহযোগিতা ও বিরামহীন জেহাদের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মৌলিক নীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। হাম্বলী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁর অনুসারী পরবর্তী ইমামগণ সবাই উপরোক্ত নীতিসমূহের কঠোর অনুসারী ছিলেন, যেমন ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়্যিম জাউযিয়া, যাঁরা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের পূর্বসূরি ছিলেন।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে ফরায়জী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরীয়তউল্লাহ হানাফী মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং প্রথম যুগের হানাফী ইমামদের তথা ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ শায়বানীর মতামতের যথার্থতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি হানাফী ফিকাহ্‌র উপর সমধিক জোর দেন। আরবের ওহাবীদের বক্তব্য ছিল : "রসুলুল্লাহকে যে কাজ যেভাবে করতে দেখা গেছে, হাদীসের প্রমাণ শিরোধার্য করে সেভাবে সে কাজ সম্পন্ন করো—এটাই ইসলাম।" অন্যদিকে ফরায়জীদের কথা হলো : "রসুলুল্লাহ্‌র কর্মধারার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করে হানাফী ইমামগণ যেভাবে ইসলামের সরল সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন, তদনুযায়ী আমল করো।" তদুপরি ওহাবীরা সুফিবাদকে ইসলামের আদিযুগবহির্ভূত ঐতিহ্যরূপে বিবেচনা করে থাকে এবং একে নব আবিষ্কৃত ধর্মনীতি তথা বেদাতরূপে গণ্য করে তা বর্জন করার উপদেশ প্রদান করে। পক্ষান্তরে,

১০. দেখুন, Ahmad Mustafa Abu Hakima, *History of Eastern Arabia, 1750-1800 : The Rise and Development of Bahrain and Kuwait,* (Beirut 1965), 125.

ফরায়জীরা সুফিবাদের সমর্থক এবং আল্লাহর সান্নিধ্যলাভে সুফিবাদের কার্যকারিতায় বিশ্বাসী ও কাদেরীয়া তরিকার অনুসারী।

তা সত্ত্বেও ওহাবীদের মতোই ফরায়জীরা মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদের বিশুদ্ধ ধারণার প্রতিফলন কামনা করে, রসুলের সুন্নতের অনুসরণে মানবজীবন পরিচালনার অঙ্গীকার ঘোষণা করে, ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীন ন্যায়পরায়ণতা ও জুলুমহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেদন বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্প ব্যক্ত করে। তারা বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনব্যবস্থার কর্মময় অঙ্গনে মানুষের জীবনযাপনপদ্ধতি থেকে শেরেক, বেদাত, সংস্কার ও দুর্নীতি দূর করা এবং ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসরণে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনকে সুসংহত, আনন্দদায়ক ও সুখময় করে তোলার আদর্শে নিবেদিত ছিল। এককথায়, ফরায়জী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে 'প্রথম কাজ প্রথমে করার নীতিতে উদ্বুদ্ধ করে ইসলামের মৌলিক নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

হাজি শরীয়তউল্লাহ্ ধর্মীয় অবশ্যকরণীয় তথা ফরজ কাজগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার উপর জোর দেন যাতে অতিরিক্ত কর্তব্যের তথা নফল কাজের কারণে অবশ্যকরণীয় কর্মকাণ্ড ব্যাহত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফাতেহা, ওয়াজ ও মিলাদ, যেগুলি নফল বা অতিরিক্ত কাজের পর্যায়ে পড়ে, সেগুলি যেন সালাত, যাকাত, সওম ইত্যাদি ফরজ কাজগুলির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে না পড়ে। তাঁর উপদেশ হলো, প্রথমে ফরজ পরে নফল। অনুরূপভাবে তিনি অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক সামাজিক আচার-ব্যবহার বা ধর্মীয় রীতিনীতির নামে ফরজ বা অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে জঘন্য পাপ বলে গণ্য করেন। তিনি সবাইকে ফরজ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাই এ আন্দোলন 'ফরায়জী' আন্দোলন নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

স্মর্তব্য যে, স্বাধীন সুলতানি আমলের বাংলায় স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচারকাজ পরিচালিত হতো। সে যুগের পুঁথিসাহিত্যিকরা এ রীতির প্রচলন করেন। কিন্তু মুগল আমলের শেষদিকে, বিশেষত সুবাদার ইব্রাহিম খানের সময় থেকে এদেশে ফার্সি ভাষার উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়। ফার্সির সাথে উর্দু ভাষার প্রচলনও বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে আরবি-ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত আলেমগণ বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করেন এবং ফার্সি ও উর্দু ভাষায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করার রীতির বহুল প্রচলন করেন।[১১]

হাজি শরীয়তউল্লাহ এ রীতি ভঙ্গ করে বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচারের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সরল বাংলা ভাষায় তওবা, কলেমা, অঙ্গীকার ইত্যাদি পাঠের বয়েত গ্রহণ করেন। পীর-মুরিদির ক্ষেত্রে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য তিনি 'পীর' ও 'মুরিদ' শব্দ বর্জন

১১. আবদুল হালী ইসলামাবাদী, *ছাইফাতুল আমল ওয়া মিরাআতুল আহওয়াল* (ফার্সি), (কলকাতা ১৮৮৭), ৪০।

করেন। যারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাদেরকে তিনি গ্রাম-গঞ্জের প্রচলিত ভাষায় শাগরেদ উপাধি প্রদান করেন এবং নিজেকে ওস্তাদ বলে পরিচয় দেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাদেরীয়া তরিকায় বয়েত করান এবং জিকির অনুশীলনের তালিম দেন। তিনি মানুষের স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দেন।

তিনি মানুষের চিন্তা-ভাবনায় ধর্মকে সহজবোধ্য করার প্রয়াস পান এবং দরিদ্রদের লক্ষ্য করে বলেন, তাদের ধর্মীয় ফরজ মাত্র তিনটি—কলেমা, নামাজ ও রোজা। তবে তিনি একথাও বলেন যে, বিত্তশালীদের বেলায় যাকাত আদায় করা ও হজ্ব সমাপন বা কুরবানি করাও ফরজ। তিনি প্রচার করেন যে, এই পাঁচটি ফরজ ইসলামের মৌলভিত্তি এবং মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয়।[১২] তিনি বলেন যে ফরজ শুধু ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়; ধর্মীয় কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করা যেমন ফরজ, তেমনি পার্থিব কর্তব্যগুলিও অবশ্য পালনীয়।

তৎকালে ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি এলাকায় সদ্যপ্রসূত সন্তানের নাড়ি কাটা একটি কুসংস্কারে পরিণত হয়। ধাত্রীর কাজ ও নাড়ি কাটার কাজ 'দাই' বা 'ধাই' নামে পরিচিত পেশাজীবী নারীদের একচেটিয়া ছিল। তখন 'নাড়ি কাটা' একটি হীন কাজরূপে গণ্য হতো। সময় মতো দাই পাওয়া না গেলে অপবাদের ভয়ে কেউ একাজ করতো না। এমনকি সদ্যপ্রসূত সন্তানকে নাড়ি না কাটা-অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হতো। হাজি শরীয়তউল্লাহ্ নাড়ি কাটা সন্তানের পিতার কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন। তাই বিরুদ্ধবাদী মুসলমানরা ফরায়জীদেরকে 'নাড়ি-কাটা' বলে বিদ্রূপ করতো ।[১৩]

হাজি শরীয়তউল্লাহ্ মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের অন্তর্গত আচার 'চাট্টি' তথা প্রসূতির গৃহে মাসাধিককাল ধরে অবিরত বাতি জ্বালিয়ে রাখার প্রথা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাট্টি বা পুট্টি ও চিল্লার প্রথা, মহররম উপলক্ষে মূর্তিপূজার সমতুল্য নানা প্রকার কুপ্রথা এবং মৃতের সৎকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ফাতেহা ও ওরসের নানা প্রকার রেওয়াজ, মিলাদ উদযাপন ইত্যাদি শেরেক ও বেদাত বলে গণ্য করেন এবং এসব আচার-অনুষ্ঠান ফরায়জী সমাজ থেকে রহিত করেন।[১৪]

তদুপরি হিন্দু জমিদারদের অধীনে মুসলিম প্রজারা দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতিপূজা উপলক্ষে চাঁদা প্রদান করতে বাধ্য ছিল। হাজি শরীয়তউল্লাহ্ হিন্দুদের পূজায় চাঁদা দেওয়া, পূজা-উৎসবে যোগদান করা ও পূজার প্রসাদ খাওয়া শেরেকের সামিল বলে গণ্য করেন এবং এগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। খৎনা, কানফোড়ানি ও বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর ও সাধারণভাবে উদযাপন করার জন্য তিনি সবাইকে

১২. Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *History of the Faraidi Movement,* 222.

১৩. ঐ, 250.

১৪. ঐ, 243.

উপদেশ দেন এবং এগুলি উপলক্ষে জাঁকজমক, শরিয়তবিরোধী নাচ-গান, বাদ্যবাদন ও অপব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এগুলি ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[১৫]

উপরোক্ত কারণে হিন্দু জমিদার ও জোতদার শ্রেণী তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়, বিশেষত তাঁর ডাকে মুসলিম প্রজা ও চাষীদের ক্রমবর্ধমান একতা তাদেরকে শঙ্কিত করে তোলে। অন্যদিকে বেদাত ও শেরেক থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য হাজি শরীয়তুল্লাহর আপোসহীন সংগ্রাম কিছু সংখ্যক প্রাচীনপন্থী তথা রক্ষণশীল মুসলমানকেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তখন বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় কাজের সাথে ফাতেহা, ওরস, মিলাদ, মহররমের তাজিয়া মিছিল, জারী গানের আসর ইত্যাদি একাকার হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি বর্জনের ফরায়জী প্রবণতা রক্ষণশীলদেরকে কোথাও কোথাও মারমুখী করে তোলে এবং তারা হিন্দু জমিদারদের কাছে ফরায়জীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে।

আসলে শত শত বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে হিন্দু-বৌদ্ধদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, বিয়ের মাধ্যমে হিন্দু-বৌদ্ধ মেয়েদের ধর্মান্তরিতকরণ এবং প্রতিবেশী হিন্দু-বৌদ্ধদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবে বাঙালি মুসলিম সমাজে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ ও বর্ণভেদের ন্যায় কিছুটা ভেদনীতির প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের ক্ষেত্রে এগুলি লক্ষ্য করা যেতো। তেলি বা কলু, পাল্কিবাহক বা কাহার, জোলা বা তাঁতী, কসাই, জেলে ইত্যাদি পেশাজীবীদের অন্যরা ঘৃণার চোখে দেখতো এবং নীচ জাত মনে করতো। হাজি শরীয়তউল্লাহ এসব ইসলামবিরোধী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর বারবাব জোর দেন এবং সর্বপ্রকার ভেদনীতি দূর করতে প্রয়াসী হন। অধিকন্তু তিনি শ্রমলব্ধ উপার্জন তথা হালাল রুজিকে মুসলমানদের জীবনধারার মৌলভিত্তি বলে প্রচার করেন। তিনি প্রচার করেন যে, 'হালাল রুজি ইবাদতের পূর্বশর্ত, যারা জুলুম-অত্যাচার করে জীবিকানির্বাহ করে, আল্লাহ তাদের ইবাদত কবুল করেন না।' তিনি বিভিন্ন পেশা ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত লোকদেরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাদেরকে 'কারিগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি এমনকি জোলা, কলু, কামার প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পকর্মীদেরকেও কারিগর উপাধি ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

হাজি শরীয়তউল্লাহ এভাবে সমাজ থেকে ভেদনীতি, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে শ্রমের মর্যাদাভিত্তিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে ফরায়জীদের মধ্যে সুদৃঢ় একতা গড়ে তোলেন । তিনি প্রচার করেন যে, মানুষ মূলত একই আদমের সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই; যেকোন ভাইয়ের বিপদে-আপদে সাহায্য করা অন্য ভাইদের কর্তব্য। তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকেই জমির প্রকৃত মালিক বলে ঘোষণা করেন। তিনি কোরানের এই বাণী উদ্ধৃত

১৫. প্রাগুক্ত।

করেন : "প্রচেষ্টার (অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও শ্রমের) ফলাফল ছাড়া মানুষের কিছুই প্রাপ্য নাই" এবং দাবি করেন যে, কোরানের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জমির আবাদকারী অর্থাৎ চাষীই জমির প্রকৃত মালিক এবং জমির ফসল চাষীরই প্রাপ্য এবং তাতে জমিদারের কোন অধিকার নেই। তিনি জমিদার ও জোতদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমিকরের অতিরিক্ত অবৈধ আবওয়াব প্রদান করতে চাষীদেরকে নিষেধ করেন। জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের বলে ভূমিকরের অতিরিক্ত নানা প্রকার আবওয়াব প্রজাদের উপর আরোপ করেছিল। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর পত্তনিদারেরও উদ্ভব হয়েছিল। জমিদারগণ পত্তনিদারদের জমির মধ্যস্বত্ব ও কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে কলকাতায় বসবাস করতো, আবার পত্তনিদাররা দরপত্তনিদারদের এ ক্ষমতা প্রদান করতো। এক ইংরেজ সমালোচকের মতে, এভাবে মালিকানাস্বত্ব এক স্তর থেকে নীচে অন্য স্তরে যেতে যেতে স্তরবিন্যাসের পঞ্চম স্তর অর্থাৎ সর্বনিম্নের স্তর চাষীর উপর গিয়ে ঠেকতো। এমনিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যাঁতাকল তৈরি হয়েছিল বাঙালি প্রজা-চাষীদের শোষণের জন্য। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাজি শরীয়তউল্লাহর ব্যাপক প্রচারণা ও সক্রিয় সংগ্রাম এমনকি হিন্দু প্রজা ও চাষীদেরকেও ফরায়জীদের দলভুক্ত করেছিল।

ফরায়জী মতবাদ সকল মুসলমান গ্রহণ করে নি। এ মতবাদের বিরোধী মুসলমানদের সহযোগিতায় ক্ষুব্ধ জমিদারগণ অনেক সময় ফরায়জীদের উপর নির্যাতন চালায়। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার রামনগর নামক গ্রামে ফরায়জীদের সাথে প্রাচীনপন্থী মুসলমানদের এক বিবাদ বাধে এবং তা শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাহাঙ্গামার রূপ নেয়। প্রাচীনপন্থীরা হিন্দু জমিদারদের কাছে ফরায়জীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। জমিদারগণ তৎক্ষণাৎ সে সুযোগ গ্রহণ করে হাজি শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মন্দির আক্রমণ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করে এবং সরকারের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে রামনগরের পার্শ্ববর্তী তাদের প্রধান প্রচারকেন্দ্র নয়াবাড়ি থেকে বহিষ্কার করে।

এ ঘটনার পর হাজি শরীয়তউল্লাহ্ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি নয়াবাড়ি থেকে তাঁর প্রচারকেন্দ্র মাদারীপুরের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন, যেখানে তাঁর বংশীয় লোকরা তখনও বসবাস করছিলেন। সেখান থেকে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ফরায়জী আন্দোলন পরিচালনা করেন। এর পরে তাঁর জীবদ্দশায় ফরায়জীদেরকে আর কোন প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হতে দেখা যায় নি।

বাহাদুরপুর থেকে তিনি নৌকাযোগে ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও কুমিল্লার নদীবন্দরগুলির আওতাভুক্ত এলাকাসমূহে অনবরত যাতায়াত করে মুসলিম জনসাধারণকে ফরায়জী আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁর জীবদ্দশায় এসব

এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ফরায়জী আন্দোলনের সপক্ষে বিপুল সাড়া জাগে এবং বহুসংখ্যক মুসলমান সক্রিয়ভাবে ফরায়জী আন্দোলনে যোগদান করে।

ইংরেজ সরকার বা যেকোন অমুসলিম সরকারের অধীনে মুসলমানদের ঈদ ও জুম্মার নামাজ পড়া অত্যাবশ্যকীয় নয় বলে শরীয়তউল্লাহ্ মনে করেন। তাঁর মতে, এই নামাজ আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি শর্তের প্রধান দু'টি শর্ত ইসলামী শাসন এবং মুসলিম শাসকের অথবা তাঁর প্রতিনিধির শাসন কোথাও বিদ্যমান নেই। অতএব তিনি জনগণকে জুম্মার বদলে জোহরের নামাজ আদায় করার উপদেশ দেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ করে দেশকে মুক্ত না করা পর্যন্ত এদেশের মুসলমানরা শরীয়ত অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনযাপন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। আবার অন্যদিকে রসুলুল্লাহর মদীনানীতি অনুসরণ করে সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তিনি বাংলার মুসলিম সমাজে পুরনো পঞ্চায়েতি সমাজব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান।

১৮৪০ সালে হাজি শরীয়তউল্লাহ ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহম্মদ ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তখন দুদু মিয়া সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন সম্ভবত তিনি ওহাবীদের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁদের কাছ থেকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের ভাবধারা এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অদম্য প্রেরণা লাভ করেন।

দুদু মিয়া ফরায়জী নেতৃত্ব গ্রহণ করেই পিতার মধ্যম পন্থা পরিহার করেন। তখন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, যার মোকাবেলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বলে নিরীহ জনগণের উপর দেশীয় জমিদার ও নীলকরদের যথেচ্ছ নিপীড়ন চোখ বুজে সহ্য করতে তিনি রাজি ছিলেন না। সব কিছু চিন্তা করে তিনি দৃঢ়তার সাথে এদের অত্যাচার প্রতিরোধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমত তিনি ফরায়জীদের 'হকের লড়াই' তথা ন্যায়ের সংগ্রামের জন্য তাঁর নেতৃত্বে গ্রাম-গঞ্জের সর্বস্তরের জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করার প্রয়াস পান। দ্বিতীয়ত তিনি পঞ্চায়েতব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ফরায়জী সমাজব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন। তিনি গ্রাম-গঞ্জের ফরায়জীদের প্রাথমিকভাবে ফরায়জী অধ্যুষিত এলাকায় 'ফরায়জী গাঁও' প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন এবং প্রতি গ্রামে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন করে 'গাঁওখলিফা' নিযুক্ত করেন। থানা ও সার্কেল পর্যায়ে তিনি 'গির্দ' (অর্থাৎ সার্কেল) এলাকা গঠন করেন এবং গাঁওখলিফাদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাতে একজন করে 'গির্দখলিফা' নিযুক্ত করেন। সর্বোপরি গির্দখলিফাদের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ও উচ্চ পর্যায়ে তিনি কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয় খলিফা নিযুক্ত করেন, যাঁরা বাহাদুরপুরে তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনমতো নানা দিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরিত হতেন।

গাঁওখলিফা গ্রাম পর্যায়ে ফরায়জীদের মধ্যে সর্বপ্রকার ঝগড়া-বিবাদ, নালিশ ও আবেদন নেতৃস্থানীয় লোকজনের পরামর্শে আদেশ, উপদেশ এবং প্রয়োজনবোধে সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতেন। গাঁওখলিফা কোন সমস্যা সমাধান করতে অপারগ হলে অথবা উচ্চ পর্যায়ের সমস্যা দেখা দিলে তা আঞ্চলিক খলিফার কাছে পাঠাতেন এবং আঞ্চলিক খলিফা তাঁর অধস্তন গাঁওখলিফাদের পরামর্শে বা সহায়তায় সালিশের মাধ্যমে তা সমাধান করে দিতেন। আরো জটিল সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য একজন ঊর্ধ্বতন খলিফার কাছে প্রেরিত হতো। তিনি প্রয়োজনমতো কেন্দ্রীয় খলিফা ও গাঁওখলিফাদের সহায়তা ও পরামর্শে ঐ সমস্যা সমাধান করতেন অথবা তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদের বাহাদুরপুরে আহ্বান করা হতো এবং ঊর্ধ্বতন খলিফাদের পরামর্শে স্বয়ং দুদু মিয়া তার নিষ্পত্তি করে দিতেন।

এভাবে দুদু মিয়া ফরায়জী খিলাফতব্যবস্থার পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণকে একতাবদ্ধ করার জন্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজসংগঠন পঞ্চায়েতব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সুসংহত খিলাফতব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমিক পদবিন্যস্ত খলিফাদের নেতৃত্বে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে পক্ষপাতহীনভাবে সম্পূর্ণরূপে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান নির্বিশেষ সকল স্তরের জনগণের ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন। কোর্ট-কর্মচারীদের দুর্নীতি, মিথ্যা সাক্ষী, ঘুষ ইত্যাদির মোকাবেলায় তাঁর সালিশী ব্যবস্থা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ফরায়জী অধ্যুষিত এলাকা থেকে কোর্ট-কাছারিতে মোকদ্দমা দায়ের করা এক রকম বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি খিলাফত ও পঞ্চায়েতব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে চালু করেন যে, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর পুত্র নয়া মিয়ার আমলে একজন মহকুমা প্রশাসক নবীন সেন এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ফরায়জী খিলাফত ও পঞ্চায়েতব্যবস্থা 'রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র' ব্যবস্থার সমতুল্য ছিল এবং নয়া মিয়ার সাথে তাঁর সহযোগিতার চুক্তি তাঁর সফল প্রশাসনের চাবিকাঠি ছিল।

দ্বিতীয়ত, অত্যাচারী জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের লাঠিয়ালবাহিনীর মোকাবেলায় তিনি পাল্টা একটি স্বেচ্ছাসেবক ফরায়জী লাঠিয়ালবাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর সাহায্যে তিনি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বেশ কয়েকটি দাঙ্গা এবং যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে এমনভাবে দমন করেন যে, ফরায়জী অধ্যুষিত এলাকায় চাষীদের উপর জমিদার শ্রেণীর নিপীড়ন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্রাম-গঞ্জে শান্তি বিরাজ করে।

তৃতীয়ত, তিনি একটি ফরায়জী ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠন করেন এবং এতে একটি সাধারণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক ফরায়জী ভাইকে আপদে-বিপদে সাহায্য করা অন্য ভাইদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কোন ফরায়জী বা সাধারণ চাষী যেকোন ধরনের বিপদে পড়লে ভ্রাতৃতহবিল থেকে তাকে সাহায্য প্রদান করা হতো। এমনকি কোর্ট-কাছারিতে

জমিদার-জোতদারদের দায়েরকৃত নানাবিধ মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ হিসেবে মামলা পরিচালনা করার জন্যও এ তহবিল থেকে তারা সাহায্য লাভ করতো। একটি লোকসঙ্গীতের ভাষায় :

দুদু মিয়া তাম দিয়া রাজ্য ভালা করে,
ফরায়জীর হাতে লাঠি ফাল পারিয়া ফিরে,
ওস্তাদ দুদু মিয়া।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে বৃটিশ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দি করে কলকাতার আলিপুর জেলহাজতে আবদ্ধ করে রাখে। ১৮৬২ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকা শহরের বংশাল সড়কে বসবাস শুরু করেন এবং একই সালে পরলোকগমন করেন।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নয়া মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়জী আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু নয়া মিয়ার উত্তরসূরি সয়ীদউদ্দিন ওহাবীবিরোধী দমননীতির কোপানল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বৃটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন এবং খান বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। তাঁর পুত্র বাদশা মিয়ার সময় বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী আবির্ভূত হলে গ্রামীণ গণআন্দোলন হিসেবে ফরায়জী আন্দোলন ক্রমশ সীমিত ও স্তিমিত হয়ে আসে।

তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের সূচনা

বাংলাদেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন হচ্ছে 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রবক্তা সৈয়দ আহমদ শহীদ মক্কা নগরীতে অবস্থানকালে বাংলাদেশের মীর নিসার আলী তিতুমীর তাঁর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সম্ভবত সৈয়দ আহমদের সাথে তিতুমীর সীমান্ত প্রদেশে গমন করেন। ১৮২৭ সালের দিকে তিতুমীর বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন ও 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া'র প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় চমকপ্রদভাবে 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলন গড়ে তোলেন।

বাংলায় ওহাবী আন্দোলন বলতে উপমহাদেশের 'তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া' আন্দোলনকেই বিশেষভাবে বোঝানো হয়। উনিশ শতকের বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের তিনটি পর্যায় বা স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত ১৮২১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এর উত্তাল তরঙ্গ বাংলার আনাচেকানাচে বিপুল সাড়া জাগায়। বাঙালি মুসলমানরা মনেপ্রাণে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে শেষ যুগের

'ইমাম মেহেদি' বলে বিবেচনা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে নদীর স্রোতের মতো কলকাতার দিকে ছুটে আসে। এভাবে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসেন, তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার চুনতি গ্রামের 'বড় মৌলবী' নামে পরিচিত মওলানা আবদুল হাকিম, মীরসরাইনিবাসী সুফি নূর মুহাম্মদ এবং নোয়াখালী জেলার মওলানা ইমামুদ্দিন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে এঁরা সৈয়দ সাহেবের খিলাফত লাভ করেন। পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বিঘোষিত জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য এঁদের প্রভাবে ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত সময়ে হাজার হাজার বাঙালি মুসলিম যুবক সাড়ে তিন হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে সীমান্ত প্রদেশের ইউসুফ জাঈ ও সিতান্নায় উপস্থিত হয়। পরবর্তী তিন দশকে (১৮৩১-১৮৬৩) বাংলাদেশ থেকে জেহাদের উদ্দেশ্যে 'টাকা ও মানুষের স্রোত' সীমান্ত প্রদেশে বৃটিশ সরকারের অগোচরে সংগোপনে অবিরাম বয়ে গেছে বলে হান্টার মন্তব্য করেন।

দ্বিতীয় দফায় ১৮২৭ সালে বাংলার স্বনামধন্য প্রথম স্বাধীনতাযোদ্ধা তিতুমীর সৈয়দ আহমদের আদেশে সীমান্ত প্রদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার দ্বিতীয় প্রবাহের সূচনা করেন, যা ১৮৩১ সালে বৃটিশবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের রূপ নেয়। এ পর্বটির সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য তিতুমীরের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীর

তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলি। তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদ্রাসায় তিনি আরবি-ফার্সি অধ্যয়ন করেন এবং একই সাথে স্থানীয় এক আখড়ায় শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ নেন। তিনি কুস্তিখেলায় সুনাম অর্জন করেন এবং কুস্তিখেলার কৌশল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালের দিকে কলকাতা গমন করেন। সেখানে তিনি মির্জা গোলাম আম্বিয়া নামে দিল্লীর বাদশাহী পরিবারের একজন সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, যিনি মির্জাপুর এলাকার জমিদার ছিলেন।

ইংরেজ সরকারের দলিলপত্রে তিতুমীরকে ১৮১৫ খৃস্টাব্দ নাগাদ কোন এক হিন্দু জমিদারের কর্মচারীরূপে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত এক অপরাধী হিসেবে দেখানো হয় এবং একারণে তিনি একবার গ্রেফতার হন বলে উল্লেখ করা হয়। হান্টার মন্তব্য করেন, বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৮২২-১৮২৩ সালে তিনি কলকাতায় মির্জা গোলাম আম্বিয়ার সান্নিধ্যে আসেন। অতঃপর মির্জা আম্বিয়ার সাহচর্যে তিনি হজ্ব করতে পবিত্র মক্কা নগরী গমন করেন। সেখানে তিনি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই আদেশে ১৮২৭ সালে বাংলায় ফিরে এসে চব্বিশ পরগনা জেলার নারকেলবাড়িয়ার হায়দরপুর গ্রামে নিবাস স্থাপন করেন। অবশেষে সৈয়দ আহমদের বিশুদ্ধপন্থী ধর্মসংস্কারের

মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার আদর্শে তিনি প্রচারকাজে আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে যে, মির্জা আম্বিয়া তাঁকে এজন্য একটি বৃত্তিও প্রদান করেন।

ইংরেজ সরকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮২৮ সালে তিতুমীর নতুন বেশভূষায় সজ্জিত তিন-চারশ' শিষ্যের একটি আলাদা সংস্কারপন্থী দল গঠন করে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাঁর এ দলটি যমুনা ও ইছামতি নদীর উভয় তীরে প্রায় ১৮/২০ মাইল দীর্ঘ ও ১২/১৪ মাইল প্রস্থ এক বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে, যা নদীয়া জেলা থেকে চব্বিশ পরগনা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার চাষীদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেন।

তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের বেশভূষায় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করার কারণ হলো, তদানীন্তন বাংলার সাধারণ মুসলমানরা হিন্দুদের মতো ধুতি পরতে অভ্যস্ত ছিল; কিন্তু কাছা বা গোছ দিয়ে ধুতি পরে নামাজ আদায়ে অসুবিধা হতো; তাই তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের কাছা বা গোছ খুলে তহবন্দের মতো ধুতি পরতে নির্দেশ দেন। হাজি শরীয়তউল্লাহও ফরায়জীদের কাছাখোলা কাপড় পরতে আদেশ দেন। তাই তাঁর অনুসারীদের "কাছাখোলা, জোলার পোলা, খাঁটি মুসলমান" বলে বর্ণনা করা হতো। অধিকন্তু ইসলামের সুন্নত মোতাবেক তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের কাটছাট করে ছিমছাম দাড়ি রাখার নিদের্শ দেন।

তিতুমীরের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মুসলমানদের যেসব নিয়ম-নীতি মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেন তন্মধ্যে প্রধান হলো : (ক) একমাত্র আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে মান্য করা এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক না করা; (খ) কোন পীর, দরবেশ, ওস্তাদ, ফকির, শাগরেদ, দরগাহ, মাজার, কবর বা অন্য কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক না করা, কিম্বা তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা ও মানত না করা, তাদেরকে উপহারসামগ্রী প্রদান না করা, এমনকি আল্লাহর কাছে সুপারিশের মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করা, কেননা এগুলি শেরেকের অন্তর্ভুক্ত; (গ) স্থানীয় অনৈসলামিক রীতি, প্রথা, অভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার পরিহার করা, এমনকি কোরান ও হাদিসের ভিত্তিহীন উপায়ে ফাতেহা, ওরস, মিলাদ, কিয়াম, মহররম উদযাপন ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকা, কেননা এগুলি তিনি বেদাত অর্থাৎ নব-উদ্ভূত ধর্মানুষ্ঠানের নামে কুসংস্কার বলে মনে করেন।

তিতুমীরের এ আন্দোলন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন এবং আরবে প্রবর্তিত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের মুয়াহহিদুন আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সনাতন আচার-অনুষ্ঠানের পরিপন্থী হওয়ায় এগুলির প্রচারণা এবং এগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ ও তৎপরতা ক্রমান্বয়ে তিতুমীরের অনুসারীদের সাথে ফরায়জীদের মতোই প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

জমিদার শ্রেণী তিতুমীরের সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রজাদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান একাত্মতা প্রথম থেকেই উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে আসছিল। এখন মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে রক্ষণশীলদের সাথে সংস্কারপন্থীদের এই বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে তারা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদেরকে সহায়তার নামে তথাকথিত অশান্তি ও কোন্দল সৃষ্টিকারী তিতুমীরের অনুসারীদের দমন করতে সংস্কারপন্থীদের উপর 'দাড়ি ট্যাক্স' নামে এক রকম কর আরোপ করে এবং জমিদারি আইনের অপব্যবহার করে তাদেরকে নানাভাবে নাজেহাল করতে থাকে।

এভাবে তিতুমীরের আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রাণাঘাট এলাকায় সাতজন বৃহৎ হিন্দু জমিদার একজোট হয় এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা, শান্তিভঙ্গ, মুসলিম রাজত্ব তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র, হিন্দু ধর্মের ক্ষতিসাধন এবং হিন্দু ধর্মস্থানের পবিত্রতাহানি, তদুপরি হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর বিদ্বেষমূলক সাম্প্রদায়িক আক্রমণের অজুহাতে কলকাতার হিন্দু পত্র-পত্রিকায় এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা শুরু করে। অন্যদিকে ইংরেজ নীলকররাও তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে তিতুমীরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠে এবং তাঁর দলকে ধর্মীয় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী তথা 'রিলিজিয়াস ব্যান্ডিত' নামে আখ্যায়িত করে।

পত্র-পত্রিকার সমর্থন, নীলকরদের সহযোগিতা এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষপাতমূলক আচরণের সুযোগ নিয়ে হিন্দু জমিদারগণ কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারি এলাকা পুঁরায় তিতুমীরের শিষ্যদের কাছ থেকে 'দাড়ি ট্যাক্স' আদায় করতে তৎপর হয়। এ ট্যাক্সের হার ছিল অত্যন্ত চড়া—জনপ্রতি আড়াই টাকা, যা দিয়ে তখনকার দিনে সাত/আট মন ধান অথবা একটি গরু ক্রয় করা যেতো। কিন্তু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদেব রায়ের জমিদারি এলাকা সফদরপুরে, যেখানে তিতুমীরের শিষ্যরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করতো, সেখানে জমিদারের আমলারা 'দাড়ি ট্যাক্স' আদায় করতে গিয়ে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

সফদরপুরে তিতুমীরের শিষ্যরা একটি ভগ্নপ্রায় পুরনো ঐতিহ্যবাহী মসজিদ মেরামত করে তাতে তাদের প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এখানে তারা জমিদারদের অন্যায় তৎপরতা প্রতিরোধ করার জন্য একতাবদ্ধ হয় ও প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। অন্যদিকে 'দাড়ি ট্যাক্স' আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জমিদারগণ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। জমিদারের আমলাদের ভূমিকর আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, তাদের উপর সহিংস আক্রমণ এবং তাদেরকে মারধর ও বন্দি করে রাখার অভিযোগ তুলে কৃষ্ণদেব রায় সদলবলে তিতুমীরের উপর চড়াও হয়। ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল শুক্রবার। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সফদরপুর মসজিদে সেদিন মহা সমারোহে আম-জিয়াফতের ব্যবস্থা ছিল। জুমার নামাজের সময় মসজিদে প্রচুর মুসল্লি ছিল এবং মসজিদে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। এ

অবস্থায় কৃষ্ণদেব উক্ত মসজিদে চড়াও হয়ে দু'জন মুসল্লিকে হত্যা করে, কয়েকজনকে আহত করে এবং মসজিদঘরটি অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। তদুপরি কৃষ্ণদেব আশেপাশের কয়েকটি বাড়িঘর লুণ্ঠন করিয়ে তাঁর কর্মচারীদের জোরপূর্বক আটক করে রাখা হয়েছে বলে নিকটবর্তী কলিংগা পুলিশ ফাঁড়িতে এজাহার প্রদান করেন। সাথে সাথে তিতুমীরের শিষ্যরা জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে এ মর্মে পাল্টা এজাহার দায়ের করে যে, তিনি তাদের মসজিদ আক্রমণ করেছেন, মসজিদঘরে অগ্নিসংযোগ করেছেন, মসজিদটি পুড়িয়ে দিয়েছেন, নরহত্যা করেছেন, ঘরবাড়ি লুট করেছেন এবং জনগণকে মারধর করেছেন।

কলিংগা পুলিশ ফাঁড়ির জমাদার এমন গুরুতর বিষয়ে তদন্ত করা তাঁর ক্ষমতাবহির্ভূত বিবেচনা করে পার্শ্ববর্তী বশিরহাট থানার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে তদন্তে নিযুক্ত করার জন্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। বশিরহাটের দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী অভিযোগ দু'টির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ আঠারো দিন পরে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় গ্রামবাসীদের এজাহারের বিরুদ্ধে আরো একটি পাল্টা এজাহার দায়ের করেন, যাতে তিনি অভিযোগ করেন যে, সফদরপুর গ্রামের অধিবাসীরা তাঁর তিন জন কর্মচারীকে আক্রমণ করে মারধর করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা সাজানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের মসজিদটি নিজেরাই পুড়িয়ে দিয়েছে। এতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত এজাহারে যেসব লোককে সাক্ষীরূপে দেখানো হয়েছিল তাদের সবাইকে এবং অন্যান্য বহু লোককে অভিযুক্ত করেন। সন্দেহর্জা হলেও শেষোক্ত এজাহারটি পাওয়া মাত্র দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ এর তদন্তে হাত দেন এবং জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদানকারী ও অন্যান্য অনেককে বন্দি করে হাজতে পাঠিয়ে দেন। ফলে তিতুমীরের পক্ষে অন্যান্য যারা সাক্ষী ছিল তাদেরকেও গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। তখন দারোগা এজাহার তিনটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করেন এবং ঘটনার উৎস সম্বন্ধে নিশ্চুপ থেকে জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির কোন সাক্ষী-প্রমাণ না থাকার অজুহাতে জমিদারের অনুকূলে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

দারোগার প্রতিবেদন পাঠ করে বারাসত মহকুমার যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি কিছুসংখ্যক নতুন সাক্ষী তলব করেন। তাদের সাক্ষ্যে দারোগার প্রতিবেদনের বিপরীত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এজাহার সম্পর্কে তদন্তের সময় তিতুমীরপক্ষীয় সাক্ষীদের অনুপস্থিতি এবং দারোগা কর্তৃক তাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ না করা প্রভৃতি কারণে কলভিন রিপোর্টের ভাষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট 'অনন্যোপায় হয়ে' ১৮৩১ সালের ২ সেপ্টেম্বর সফদরপুর গ্রামের অধিবাসীদের মামলাটি খারিজ করে দেন।

১৭৯৯ সালের ৭নং রেগুলেশনবলে ভূমিকর অনাদায়ের জন্য প্রজাদের সরাসরি বন্দি করার ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে জমিদারগণ প্রতিপক্ষের সাক্ষীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মিথ্যা মোকদ্দমা চব্বিশ পরগনার জেলা সদরে দায়ের করে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে

বাধ্য করে। কলভিনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এদের এসব ঘৃণ্য অপকৌশলই তিতুমীরের শিষ্যদেরকে শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

আদালতের রায়ের কপি বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটকোর্ট থেকে গ্রহণ করে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। কলভিন মন্তব্য করেন যে, তবুও তারা আইনের প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার লাভের জন্য আরো একবার চেষ্টা করে। ১৮৩১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আপিল করার জন্য উক্ত মোকদ্দমার নথি ও রায়ের কপি নিয়ে গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে তাদের একদল কর্মী কলকাতায় গমন করে। কিন্তু তারা কমিশনারের কোর্টে আপিল করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। ব্যর্থতার কারণ আপাতত কমিশনার সার্কিটে সফররত থাকায় কলকাতায় তাঁর অনুপস্থিতি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাথে আলাপ-আলোচনার ফলে তাদের ধারণা হয় যে, একজন ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মকর্তা অন্য একজন ইংরেজ কর্মকর্তার রায় নাকচ করবে না। বিশেষত ইংরেজ প্রশাসকদের সাথে জমিদারদের ঘনিষ্ঠতা প্রজাদের ন্যায়বিচার লাভ করার পথে প্রতিবন্ধক হয় । তাদের এই ব্যর্থতা এবং জমিদারদের উস্কানি ও শাস্তিমূলক তৎপরতা তাদেরকে হাঙ্গামার পথে পা বাড়াতে বাধ্য করে।

সফদরপুরের ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও মর্মান্তিক ছিল এবং এর পরিণতি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক জিয়াফত উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ও সমবেত বিপুল সংখ্যক মুসল্লির উপর জুমার নামাজরত অবস্থায় হিন্দু জমিদারের নেতৃত্বে ভাড়াটিয়া হিন্দু লাঠিয়ালরা প্রকাশ্য দিবালোকে মারাত্মক আক্রমণ চালায়। থানা-পুলিশের কর্মকর্তার সহায়তায় ও ইংরেজ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এমনকি মুসলমানদের দাড়ির উপর ট্যাক্স বসিয়ে মুসলমানদের পর্যুদস্ত করার এই হীন প্রচেষ্টা স্বাধীনতার মাহাত্ম্য ও অধীনতার গ্লানি সম্বন্ধে তিতুমীরের অনুসারীদেরকে সচেতন করে তোলে। আদালতে আইনের প্রহসন ও ন্যায়বিচারের অবসান তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল।

তা সত্ত্বেও তিতুমীরের শিষ্যরা এই সংঘাতকে অন্য চোখে দেখে। এই সংঘাতে প্রতিবেশী হিন্দু জনসাধারণ নিরপেক্ষ ছিল অর্থাৎ তারা অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের পক্ষে ছিল না, আবার তিতুমীরের বিরুদ্ধেও ছিল না। জমিদারগণ ভাড়াটিয়া ও বেতনভোগী লাঠিয়ালের মাধ্যমে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। অতএব, তিতুমীরের শিষ্যরা এ দাঙ্গাকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে গ্রহণ করে নি। তাই তারা কৃষ্ণদেবের হামলার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণদেব রায়ের গ্রাম আক্রমণের সংকল্প গ্রহণ করে। অধিকন্তু চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রাণাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকার জোটবদ্ধ হিন্দু জমিদারদের চক্রান্ত, দাড়িট্যাক্স, কোর্টে মামলা-মোকদ্দমার হয়রানি, লাঠিয়ালদের আক্রমণ এবং ইংরেজ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের কারণে কোণঠাসা হয়ে অবশেষে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হয় ।

নারকেলবাড়িয়ায় তিতুমীরের একজন ধনাঢ্য শিষ্য মুয়ীজুদ্দিন বিশ্বাসের একটি ষাট একর প্রশস্ত কৃষিখামার ছিল। এখানেই তিতুমীরের শীষ্যরা অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাঁশের খুঁটি দিয়ে এটাকে ঘিরে নেয়। উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের লাঠিয়ালবাহিনীর আক্রমণ থেকে জায়গাটিকে সংরক্ষিত করা। পরে এটা তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে এ বাঁশের কেল্লায় তিতুমীরের শিষ্যরা জমায়েত হতে থাকে। এদের দমন করার জন্য প্রথম থেকেই তারাগোনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ নাগ, নগরপুরের জমিদার গৌর প্রসাদ চৌধুরী, পুঁরার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, সরফরাজপুরের জমিদার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, কুরগাছির জমিদার প্রমুখ একজোট ছিল। নদীয়া ও রাণাঘাটের হিন্দু জমিদারও তাদের সঙ্গে হাত মিলায়। লাঠিয়াল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে তারা তিতুমীরের শিষ্যদের বাধা প্রদান করার প্রস্তুতি নেয়। এমনকি কালিপ্রসন্নের অনুরোধে কলকাতার জনৈক লাটু বাবু দুইশ' 'হাবশী লাঠিয়াল' গোবরাদাঙ্গায় প্রেরণ করে।

তিতুমীরের শিষ্যরা ৬ নভেম্বর বাঁশের কেল্লা থেকে বের হয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের গ্রামে হানা দেয় এবং পুঁরার বাজারে উপস্থিত হয়ে মসজিদ পোড়ানোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি গরু জবাই করে বাজারের কালীমন্দিরের দেয়ালে গরুর রক্ত ছিটিয়ে দেয় এবং গরুর চার পা মন্দিরের সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে নারকেলবাড়িয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। এতে বাধা প্রদান করতে গেলে কয়েকজন লোককে প্রহার করা ছাড়া তাদের দ্বারা সঙ্ঘটিত কোন দুষ্কর্ম বা প্রাণহানিকর ঘটনার তথ্য এ অভিযানের বেলায় পাওয়া যায় না।

পরদিন ৭ নভেম্বর তারা পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলার লাউঘাটির দিকে যাত্রা করে। ঐ গ্রামে তিতুমীরের বহু শিষ্য ছিল। সেখানে খাওয়ার জন্য গরু জবাই করতে গেলে দু'জন ব্রাহ্মণ তাদের বাধা দেয়। ফলে ভীষণ হাঙ্গামা বেঁধে যায়। আসলে কৃষ্ণদেব রায়ের ভাই গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় ও সরফরাজপুরের জমিদার কালিপ্রসন্ন বিপুল সংখ্যক লাঠিয়াল নিয়ে তিতুমীরের শিষ্যদের মোকাবেলা করতে সেদিকে অগ্রসর হয়। অধিকন্তু হিন্দু জমিদারদের সাথে ইংরেজ নীলকররাও জোটবদ্ধ হয়েছিল। মোল্লাহাটি নীল কারখানার ম্যানেজার ডেভিস একদল লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে এখানে জমিদারদের পক্ষে যোগদান করে। তদুপরি কলকাতা থেকে প্রেরিত দুইশ' 'হাবশী লাঠিয়াল'ও এখানে মোতায়েন ছিল।

ফলে লাউঘাটিতে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় এবং দেশী কায়দায় বহুক্ষণ ধরে দাঙ্গাযুদ্ধ চলার পর তিতুমীরের শিষ্যদের সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রগতির মুখে জমিদার ও নীলকরদের লাঠিয়ালবাহিনী পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। যুদ্ধে দেবনাথ রায় নিহত

হয় ও অন্যরা দিকবিদিক পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করে। ডেভিস তার বাহিনী নিয়ে তিতুমীরের শিষ্যদের পৃথকভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কলভিন বলেন, উক্ত লাউঘাটির দাঙ্গার পর জমিদার ও নীলকরদের শক্তি চূর্ণ হয়ে যায়। ফলে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঐ বিস্তীর্ণ এলাকায় তিতুমীরের শিষ্যদের প্রভুত্ব কায়েম হয়। সুজন মাঝির গানের সুরে তিতুমীরের বিজয়গাথা জনমনে স্বাধীনতার নতুন উদ্দীপনা জাগায়।[১৬]

আলেকজান্ডারের পুলিশী অভিযান

লাউঘাটিতে ডেভিসের পরাজয় নীলকর পিরন স্টরমকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারা একযোগে সরকারের কাছে তাদের নিরাপত্তাবিধানের জন্য এবং পুলিশী সাহায্য প্রদানের জন্য আবেদন করে। এ আবেদনে সাড়া দিয়ে বারাসতের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার বহু সংখ্যক সিপাহি, বরকন্দাজ ও পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ১৫ নভেম্বর নারকেলবাড়িয়ায় উপনীত হন।

পরদিন ১৬ নভেম্বর এ বাহিনী তিতুমীরের শিষ্যদের মোকাবেলা করতে অগ্রসর হলে গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে পাঁচ/ছয়শ' লোক সাধারণ লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, যেমন ঢাল, তলোয়ার, দা, কিরিচ, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিপাহি ও বরকন্দাজদের বন্দুকের গুলি তাদের ক্ষিপ্রগতির মুখে অকেজো প্রতিপন্ন হয়। বলা হয়ে থাকে যে, তাদের ভয় দেখাবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার প্রথমে তাদের প্রতি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করার হুকুম দেন। কিন্তু সিপাহি-বরকন্দাজরা ফাঁকা আওয়াজ করার পর দ্বিতীয়বার বন্দুক ভর্তি করার সময় পায় নি। এত ক্ষিপ্রগতিতে তিতুমীরের শিষ্যরা এদের মোকাবেলা করে যে, এরা নিরুপায় হয়ে দিকবিদিক পালাতে আরম্ভ করে।

শুধু তাই নয়, এ যুদ্ধে সরকারি বাহিনীর ১০ জন সিপাহি, ৩ জন বরকন্দাজ ও ১ জন জমাদার নিহত হয় এবং ১ জন হাবিলদার মারাত্মকভাবে আহত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার পালিয়ে রক্ষা পান। এসময়ে বশিরহাট থানার দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী তিতুমীরের শিষ্যদের নাগালে পড়ে; তাকে তারা কেল্লার মধ্যে নিয়ে যায় ও সম্ভবত পরে হত্যা করে।

নারকেলবাড়িয়ার বিজয় তিতুমীরের শিষ্যদেরকে উল্লসিত করে। এতে জমিদারদের উচিত সাজা হয়েছে মনে করে তারা নীলকরদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। বরগুনায় অবস্থিত উইলিয়ম স্টরমের নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক পিরন জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করেছিল এবং তাদের যোগসাজশে যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। পিরন পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু নীলকুঠিটি তারা ধ্বংস করে দেয়। নিকটবর্তী

১৬. Muin-Ud-Din Ahmad Khan, *Titu Mir*, 18-21.

হুগলীতে স্টরমের দ্বিতীয় নীলকুঠিটিও তারা ধ্বংস করে এবং এর তত্ত্বাবধায়ক হেনরি ব্রন্ডকে সপরিবারে বন্দি করে নারকেলবাড়িয়ায় নিয়ে আসে এবং আনুগত্যের শপথ নিয়ে ছেড়ে দেয়।

স্মিথের পুলিশী অভিযান

অন্যদিকে নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ ৭ নভেম্বর লাউঘাটার দাঙ্গাযুদ্ধ সম্বন্ধে কলকাতায় কোম্পানি সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি থমসনকে ১৪ নভেম্বর একটি বার্তা প্রেরণ করে অবহিত করেন। পরদিন ১৫ নভেম্বর ইছামতি নদীর যে প্রান্তে তিতুমীরের শিষ্যরা একত্রিত হয়েছিল, তিনি রুদ্রপুর অঞ্চল দিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। স্মিথের সঙ্গে দুইশ' থেকে তিনশ' সিপাহি, বরকন্দাজ, পুলিশ ও অন্যান্য লোক ছিল। তাদের বহন করার জন্য হাতি, ঘোড়া, পানসি, বজরা, জালিবোট, ডিঙ্গি, পাল্কি, এমনকি বাবুর্চিবোটও মজুত ছিল। তাদের কাছে বারো থেকে চৌদ্দটি দোনলা মাস্কেট বন্দুক ছিল এবং অন্যরা নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আর তাদের মোকাবেলায় তিতুমীরের শিষ্যদের সংখ্যা ছিল ছয় থেকে আটশ'। কিন্তু একস্থানে তিতুমীরের শিষ্যরা এমন অতর্কিতে তাদের একটি বোট টেনে হিচড়ে কূলে তুলে ফেলে যে, হতচকিত হয়ে সরকারি বাহিনীর লোকরা যে যেদিক পারে পালাতে আরম্ভ করে। স্মিথ ও অন্যান্য ইংরেজরা বন্দুকের আওয়াজ করতে করতে নদীর অপর পারে গিয়ে এক মাইল পথ দৌড়ে অতিক্রম করে হাতিতে চড়ে পালিয়ে যায়।

দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত দু'টি জেলা থেকে দু'টি পৃথক পুলিশী অভিযানের ব্যর্থতায় উক্ত বিস্তীর্ণ এলাকার প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করে বার্তা প্রেরণ করেন যে, এ ঘটনাবলীর পরে কোন দারোগা এই এলাকার থানাসমূহে অবস্থান করতে আর সাহস পাবে না। অতএব, সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বিদ্রোহীদের নির্মূল না করা পর্যন্ত এই এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সামরিক অভিযান

বারাসত ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ নভেম্বর মেজর স্কট হার্ডিং-এর নেতৃত্বে এক রেজিমেন্ট পদাতিক বাহিনী এবং ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ডের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য, এক ব্যাচ গোলন্দাজ সৈন্য ও দু'টি ভারী কামান সম্বলিত একটি সৈন্যবাহিনী কলকাতা থেকে নারকেলবাড়িয়ার দিকে রওনা হয়। ১৯ নভেম্বর শনিবার সকালে ঘন ঘন কামান দেগে সৈন্যবাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তিতুমীরের ছিল না। তবুও তারা আত্মসমর্পণ না করে শাহাদতবরণ করেন। বাঁশবাড়িয়া পরিণত হয় রক্ত, লাশ আর পোড়ামাটির এক বিধ্বস্ত জনপদে।

এই যুদ্ধে তিতুমীরসহ প্রায় ৫০ জন যোদ্ধা প্রাণ হারান, প্রায় ৩০ জন আহত হন ও ২৫০ জন বন্দি হন। এরপর আশেপাশের গ্রাম থেকে আরো অনেককে গ্রেফতার করা হয় এবং সর্বমোট ৩৫০ জনকে আলিপুর জেল হাজতে চালান দেয়া হয়।

একই বছর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তিতুমীরের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এবং তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের উপর চরম আঘাত নেমে আসে। হান্টারের মতে, পাটনায় সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্য মওলানা বেলায়েত আলি ও মওলানা এনায়েত আলি আবার নতুন করে এ আন্দোলন শুরু করেন।[১৭] মওলানা বেলায়েত আলি সৈয়দ আহমদের প্রধান খলিফা ছিলেন। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁকেই তাদের নেতা নির্বাচন করে এবং তিনি সৈয়দ আহমদের খলিফাদের বেছে বেছে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। এ প্রক্রিয়ায় মওলানা এনায়েত আলি ১৮৩২ সালের দিকে বাংলায় আগমন করেন। তিনি দীর্ঘ সময় বাংলায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে ইসলাম সম্পর্কে ওয়াজ, নসিহত ও জেহাদের মর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৮৪০ সালের দিকে তিনি যশোর জেলার হাকিমপুর গ্রামে তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা ফরায়জী কেন্দ্রস্থল ফরিদপুর জেলার পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় দু'টি সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। পরবর্তী পঞ্চাশের দশকে মওলানা এনায়েত আলি বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জেহাদ পরিচালনার জন্য সীমান্ত প্রদেশে গমন করে পাটনার মওলানা ইয়াহিয়া আলিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। মওলানা ইয়াহিয়া আলি ফরায়জীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং দুদু মিয়া জনশক্তি ও টাকাপয়সা দিয়ে জেহাদপ্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন।

মওলানা এনায়েত আলি ও ইয়াহিয়া আলির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিরামহীন প্রচারের ফলে বাংলার উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলি, যেমন দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, যশোর, চব্বিশ পরগনা ও কলকাতায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে পাটনায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার খলিফাদের নেতৃত্বাধীন সঙ্ঘটি 'আহলে হাদিস' নামে অভিহিত হলে উক্ত এলাকার বিপুল সংখ্যক সৈয়দপন্থীরা আহলে হাদিস বা হাদিসপন্থী বলে পরিচিত হয়। পক্ষান্তরে বাংলার পূর্বাঞ্চল, যেমন যশোরের পূর্বাংশ, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট ও আসাম প্রদেশে ফরায়জী প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে।

১৮৫০-এর দশকে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবের শিখ রাজত্ব বৃটিশের কুক্ষিগত হলে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার শিখবিরোধী সংগ্রাম বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। মওলানা এনায়েত আলি ও সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যান্য খলিফাদের দ্বারা পরিচালিত সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধে এবং বৃটিশ ভারতের অভ্যন্তরে গ্রেফতারকৃত

১৭. Hunter, *The Indian Musaln*

সন্দেহভাজন লোকদের মধ্যে বহুসংখ্যক বাঙালি মুসলমানের অবস্থিতি লক্ষ্য করে বৃটিশ সরকার বিস্মিত হয়। পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালিয়ে সরকার বিপুল পরিমাণ বৃটিশবিরোধী গোপন তৎপরতার তথ্য উদ্‌ঘাটন করে। এগুলির ভিত্তিতে পাঁচটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার অনুষ্ঠিত হয়— আম্বালার বিচার (১৮৬৪), পাটনার বিচার (১৮৬৫), মালদহের বিচার (১৮৭০), রাজমহলের বিচার (১৮৭০) এবং বৃহৎ ওহাবী বিচার (১৮৭০-৭১)। এসব বিচার বাংলায় তরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রমাণ করে।

বাংলায় ফরায়জী ও তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া বা তথাকথিত ওহাবী আন্দোলন মুসলমানদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে এবং মুসলিম সমাজে সুদূরপ্রসারী নবচেতনার সৃষ্টি করে।

ফরায়জী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের ফরায়জী আন্দোলন ও তিতুমীরের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উভয়ের মধ্যে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় রোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধের তৎপরতা প্রতিভাত হয়। এই ধর্মীয়-সামাজিক সংগ্রাম উত্তর ভারতের তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া এবং অন্যান্য স্থানে সঙ্ঘটিত ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনগুলির সাথে একাত্মতা সূচিত করে।

কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বাংলার মুসলিম সমাজ উত্তর ভারতের মুসলিম সমাজের এক শতাব্দীকাল আগেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে বসেছিল এবং উনিশ শতকে তা পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত হয়। পক্ষান্তরে, উত্তর ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের আশা তখনো প্রবল ছিল। অধিকন্তু উত্তর ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন ছিল নগর ও শহরকেন্দ্রিক আর বাংলায় এর প্রকৃতি ছিল গ্রামভিত্তিক ও প্রধানত গ্রাম-গঞ্জে প্রসারিত।

অতএব, উত্তর ভারতে সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং দারুল ইসলাম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এরপর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও জেহাদে পর্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলার গ্রাম-গঞ্জের আর্থ-সামাজিক সঙ্কট নিরসনের উদ্দেশ্যে ফরায়জী আন্দোলন ও তিতুমীরের তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া সংগ্রাম গণমানুষের নীতিগত অধিকার সংরক্ষণ বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপ নেয় এবং বিশুদ্ধ ইসলামের সামাজিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকদের নবপ্রতিষ্ঠিত ডিউক ও ব্যারন ধরনের নীলকর-জমিদারদের সামন্তবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

শাহ্ ইসমাইল শহীদের একদল অনুসারী সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রধান খলিফা মওলানা বেলায়েত আলির 'আমল বিল-হাদীস' বা 'হাদিসের ভিত্তিতে কর্মসাধন' মতবাদের আলোকে কঠোর বিশুদ্ধবাদী 'আহলে হাদীস' আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। ১৮৫০-এর দশকে মওলানা নযীর হোসাইন দিল্লীতে এর কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। ধীরে ধীরে 'আহলে হাদীস' একটি বিশুদ্ধবাদী ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বাংলার উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

আহলে হাদিস আন্দোলনের বক্তব্য হলো : ইসলাম ধর্মের মৌল ভিত্তি কোরান ও হাদিসের বাইরে কোন কাজ করা ইসলামবিরোধী।

আহলে হাদিস দলভুক্ত মুসলমানরা কোন মযহাবের রীতি অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। তাদের অভিমত হলো, ইমামদের অনুসরণ করা ঐ পর্যন্ত বৈধ যে পর্যন্ত একমাত্র রসুলের অনুসরণ করার জন্য তাঁদেরকে অনুসরণ করা হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির বা দলের অন্ধ অনুকরণ তথা 'তকলীদে জামেদ' ইসলামে বৈধ নয়। একারণে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদেরকে 'মযহাববিহীন' তথা 'লা মযহাবী' বলে অপবাদ দেয়।

উত্তরোত্তর এরকম বহু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব মুসলমানদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্কে লিপ্ত করে। অন্যদিকে সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীলদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থানগ্রহণ ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করে। বর্তমানে বিশেষত তথাকথিত ওহাবী-সুন্নি দ্বন্দ্ব এরই একটি নেতিবাচক ফল।

অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলায় মুসলমানদের ধর্মসংস্কার আন্দোলন এদেশের মুসলমানদেরকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সজাগ ও সচেতন করে তোলে।

৭

উনিশ শতকে হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন

প্রীতি কুমার মিত্র*

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাসের একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন, যা ধর্ম ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিল। এসব পরিবর্তনকেই রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইংরেজ কর্তৃক এ দেশ দখল এবং তারপর চিরায়ত ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার যে সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তা থেকেই উনিশ শতকের হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব। আধুনিক ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালি হিন্দুরা দেখতে পেলো যে, পাশ্চাত্য আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে তারা অপ্রস্তুত। সুতরাং তখনকার হিন্দু সমাজকাঠামো ও ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিসীমায় যতোটা সম্ভব পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের সপক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লো।

এক. ধর্মীয় সংস্কার

উনিশ শতকের বাংলায় হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান দু'টি পর্যায় ছিল : ১. ব্রাহ্ম আন্দোলন, যা শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থাংশ কালব্যাপী বিকশিত হয় এবং ২. নব্যহিন্দু আন্দোলন, যা তার পরে প্রাধান্য লাভ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম আন্দোলন হিন্দু বহুদেববাদের একটি একেশ্বরবাদী বিকল্প হাজির করে এবং ধর্মে অযৌক্তিকতা দূর করার প্রয়াস পায়। নব্যহিন্দু আন্দোলন ধর্মীয় বহুত্বের সমস্যাকে মোকাবেলা করে এক ব্যাপক সর্বেশ্বরবাদ দিয়ে, যা নতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও অন্তহীন বিতণ্ডার পরিবর্তে ঐক্য ও পুনরুজ্জীবনের ডাক দেয়।

---

* অধ্যাপক (ইতিহাস), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

একেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জ : ব্রাহ্ম আন্দোলন (আনু. ১৮১৫-৯০)

উদ্ভব : ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)-এর মুখ্য প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু ধর্মকে সেমিটিক আদলের একটি একেশ্বরবাদী ধর্মে রূপান্তরিত করা। আরবি-ফার্সি শিক্ষার মাধ্যমে অল্প বয়সে ইসলামের সঙ্গে পরিচিতিই সম্ভবত একেশ্বরবাদের প্রতি রামমোহনের আনুগত্যের মূল কারণ। একই সাথে সংস্কৃতশাস্ত্রে শিক্ষালাভের ফলে তিনি হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে নিহিত একেশ্বরবাদী উপাদানটিকে অন্য সবকিছু থেকে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেলা কালেক্টর জন ডিগবির অধীনে চাকুরি (১৮০৫-১৪) ও তাঁর সাথে বন্ধুত্বের সুবাদে রামমোহন ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন তথা খৃস্টধর্ম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় লাভ করেন। ফলে তাঁর একেশ্বরবাদী প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়।

রামমোহন ১৮০৩-০৪ সালে সর্বপ্রথম *তুহফাৎ-উল-মুওআহ্হিদীন* [এক ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য উপহার] নামে আরবি (ভূমিকা মাত্র) ও ফার্সি (মূল পাঠ) ভাষায় লেখা একখানি পুস্তিকায় বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক একেশ্ববাদের পক্ষে তাঁর যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন। এক দশক নীরব[১] থাকার পর ১৮১৪ সালে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় থেকে তিনি পুনরায় ধর্মবিষয়ে ব্যাপকভাবে লিখতে শুরু করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে তিনি বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বেদান্ত বিষয়ক আটখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[২] ফলে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের একটা সাহসী পুনর্ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, যাতে ঐ অদ্বৈতবাদকে সেমিটিক ধাঁচের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে পরিণত করার চেষ্টা ছিল।[৩] এসব লেখার মধ্য দিয়ে রামমোহন হিন্দু বহুদেববাদের বিরুদ্ধে এক হুমকি হয়ে দেখা দেন। তাছাড়া পবিত্র বেদ দেশী ভাষায় অনুবাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে চিরাচরিত নিষেধাজ্ঞা ছিল, এই অনুশীলন তার প্রতি রামমোহনের অবজ্ঞা সূচিত করে।

---

১. আমরা জানি না রামমোহন *তুহ্ফাৎ*-এর মুখবন্ধে প্রতিশ্রুত *মনাজরাৎ-উল-আদিয়ান* [বিভিন্ন ধর্মসংক্রান্ত বিতর্ক] শীর্ষক তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বইটি আদৌ রচনা করেছিলেন কিনা।

২. *এসব গ্রন্থের মধ্যে ছিল বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার;* এই দুই বই-এর হিন্দি অনুবাদ; *কেনোপনিষৎ ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ*—এই চার উপনিষদের ইংরেজি তরজমা; এবং *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।*

৩. রামমোহন যে অদ্বৈত বেদান্ত পছন্দ করতেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল আমহার্স্টকে লেখা তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত চিঠিতে, যেখানে তিনি বলেন : "দৃশ্যমান বস্তুসমূহের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই এই কথা বিশ্বাস করতে শেখায় যে বেদান্ত, সেই দর্শন পড়ে তরুণেরা সমাজের যোগ্যতর সদস্য হতে পারবে না ...।" অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা.), *রামমোহন রচনাবলী*, (কলকাতা ১৯৭৩), ৪৩৫ [অতঃপর *রামমোহন রচনাবলী* রূপে উল্লেখিত]। এই অসম্পূর্ণতা নিরসনের জন্যই তিনি সচেতনভাবে বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে তাঁর প্রথম জীবনে শেখা ইসলামী ভগবৎতত্ত্বের আলোকে একটি দৃঢ় একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত করেছিলেন।

রামমোহনের এসব ধর্মবিষয়ক লেখার মূলকথাটি ছিল এই যে, বেদান্ত একটি শুদ্ধ একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রণালী শিক্ষা দেয় এবং এটিই হিন্দু শাস্ত্রসমূহের একমাত্র অভ্রান্ত অংশ; অনুরূপভাবে পৌরাণিক গ্রন্থসমূহের কর্তৃত্ব এবং সমকালীন হিন্দুধর্মে ব্যবহৃত আচারবিচার তথা পৌত্তলিক উপাসনাপদ্ধতি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের বিপরীতে ধর্মনিষ্ঠদের প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক ও প্রচণ্ড। রামমোহনের নব্যমত উচ্ছেদ করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও উপাসনাপদ্ধতিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একের পর এক লেখনী হাতে এগিয়ে আসেন সাতজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, যাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ। তাঁদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রামমোহন প্রত্যেকের জন্য একখানি প্রত্যুত্তর প্রকাশ করলেন। এভাবে এক দশকব্যাপী (১৮১৬-২৬) এই বিতণ্ডায় উভয়পক্ষে চারটি ভাষায় (বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি) বিশখানার বেশি বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।[৪] এই তর্কযুদ্ধে রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (আ. ১৭৮৮-১৮৫১) নামে দু'জন বিখ্যাত পণ্ডিত, যাঁরা সরকারি চাকুরি করতেন। আর ছিলেন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নামে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় বৈদিক বিদ্বান। উপরে যে প্রকাশনাগুলির কথা বলা হলো তা ছাড়াও দুখানা সাময়িকীকে অবলম্বন করে জমে উঠেছিল রামমোহন ও গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যকার বিতর্ক—একদিকে ছিল রামমোহনের নিজের *সম্বাদ কৌমুদী* এবং অপরদিকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রক্ষণশীল পত্রিকা *সমাচারচন্দ্রিকা*।

হিন্দুদের সাথে পরিচালিত বৃহত্তর দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আবার রামমোহনকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল খৃস্টান মিশনারিদের সঙ্গে আর একটি ছোট দ্বন্দ্বে—ঐশী সত্তার প্রকৃতি সংক্রান্ত ঐ একই প্রশ্ন নিয়ে। অদ্বৈতবাদী ও বহুদেববাদী ব্রাহ্মণদের মতোই ত্রি-ঈশ্বরবাদী খৃস্টানদের কাছেও রামমোহনের একেশ্বরবাদ সমান বিসদৃশ লেগেছিল। ১৮২০ সালে *প্রিসেপ্টস অব যীজস্ : দি গাইড টু পীস এ্যান্ড হ্যাপিনেস* [যীশুর অনুশাসনসমূহ : শান্তি ও সুখের পথনির্দেশক] শীর্ষক এক পুস্তিকায় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি নৈতিক অনুশাসনগুলিকে "মুক্ত চিন্তার অনুশীলনকারীদের আপত্তি ও সন্দেহের অবকাশবিশিষ্ট" "অন্যান্য অনুচ্ছেদ"[৫] থেকে বাছাই করে আলাদাভাবে দেখান। এতে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে অবস্থানরত ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা প্রচণ্ড আঘাত পান এবং ঐ 'বুদ্ধিমান হীদেন'—এর আক্রমণ থেকে নিজেদের বদ্ধবিশ্বাস (ডগ্‌ম্যা)-কে রক্ষা করার

৪. উদাহরণস্বরূপ, রামমোহনের লেখা *উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার* (১৮১৬-১৭), *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮), *সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০)*, *কবিতাকারের সহিত বিচার* (১৮২০), *চারি প্রশ্নের উত্তর* (১৮২২); এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের লেখা *বেদান্তচন্দ্রিকা, চারি প্রশ্ন* (১৮২২), *পাষণ্ডপীড়ন* (১৮২৩) ইত্যাদি।

৫. *দি ইংলিশ ওয়ার্কস অব রাজা রামমোহন রায়* [রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজি রচনাবলী], (এলাহাবাদ ১৯০৬), ৪৮৪।

জন্য এগিয়ে আসেন। ফলে যে বিতণ্ডা শুরু হয় তা চার বছর (১৮২০-২৩) চালু থাকে এবং সেসময়ে *প্রিসেপ্ট*-এর বিরুদ্ধে মিশনারিদের প্রতিক্রিয়ার জবাবে রামমোহন প্রায় ছয়শ' পৃষ্ঠাব্যাপী তিনখানি *অ্যাপীল্স টু ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক* [খৃস্টীয় জনগণের প্রতি আবেদন] রচনা করেন। ১৮২১ সালে মিশনারিদের অন্যতম উইলিয়ম এ্যাডামকে রামমোহন একত্ববাদী (ইউনিটারিয়ান) খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। 'দ্বিতীয় পতিতআদম'-এর ঘটনা ঐ উত্তপ্ত বিতর্কে নতুন জ্বালানি নিক্ষেপ করে এবং তখন তা চলতে থাকে শ্রীরামপুর মিশনারিদের *সমাচারদর্পণ* এবং রামমোহনের *ব্রাহ্মণ সেবধি : মিশনারি ও ব্রাহ্মণ* নামে দু'টি সাময়িকীর পৃষ্ঠায়। এর পরে ১৮২৩ সালের মে মাসে রামমোহন ত্রি-ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে *পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ* নামে একখানি বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করেন। সবশেষে ১৮২৩-এর মে-জুনে তিনি দু'টি সাময়িকীতে জনৈক ডক্টর আর. টাইটলারের সাথে ঐ একই প্রশ্নে এক চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। রামমোহনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার প্রশংসা করে ১৮২৪ সালের মে মাসে *ইন্ডিয়া গেজেট* পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে "ধর্মবিদ্যার ক্ষেত্রে এক প্রকাণ্ড যোদ্ধা, যিনি এখনো কোন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মখোমুখি হন নি"[৬] বলে বর্ণনা করেন।

দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে বছরের পর বছর ধরে উত্তপ্ত বিতর্কে সাফল্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া রামমোহন আরো একটি কাজ করেন। তা হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যা উত্তরকালে তাঁর ধর্মীয় ভাবনাগুলি প্রচার করে এবং সেগুলিকে সংস্কারপন্থী হিন্দুদের জন্য একটি সংগঠিত ধর্মমতের রূপ দান করে। ১৮১৫ সালে রামমোহন স্থাপন করেছিলেন 'আত্মীয়সভা' নামে এক আলোচনাগোষ্ঠী। এর পর ১৮২১ সালে স্থাপন করলেন 'ইউনিটারিয়ান কমিটি', যা ভারতে একেশ্বরবাদের বিকাশে অবদান রেখেছিল। উভয় সংগঠনই জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয় এবং অচিরেই বিলুপ্ত হয়। অবশেষে ১৮২৮ সালে তিনি স্থাপন করলেন 'ব্রাহ্ম সমাজ', যা সাধারণ্যে 'ব্রহ্মসভা' নামে পরিচিত ছিল এবং সকল ধর্মাবলম্বী একেশ্বরবাদীদের মিলনকেন্দ্র ও অসাম্প্রদায়িক উপাসনার মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিষ্ঠাবান হিন্দুদের 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয় ১৮৩০ সালের জানুয়ারিতে রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)-এর উদ্যোগে। পরবর্তী নভেম্বরে রামমোহন বৃটেনের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং তিন বছর পর সেদেশের ব্রিস্টল নগরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে দেশে সমর্থন ও নেতৃত্বের অভাবে ব্রাহ্ম সমাজের অবনতি হতে থাকে এবং ১৮৪০-এর দশকে এটি যখন নামমাত্র সংগঠনে পর্যবসিত তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) একে পুনরুজ্জীবিত করেন।

বিকাশ : রামমোহন রায়ের বন্ধু এবং ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)-এর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজে লেখাপড়া করেন এবং পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়নের ফলে সন্দেহ ও অতৃপ্তিতে ভুগতে থাকেন, যা পরিণামে রামমোহন

---

৬. উদ্ধৃত, মদনমোহন গরাই, *রামমোহন ঃ সময় জীবন সাধনা* (কলকাতা ১৯৬৬), ১১৭।

সম্পাদিত *ঈশোপনিষদ-এর* 'একটি উড়ন্ত ছেঁড়া পাতা'[৭] পাঠে দূর হয়। অচিরে তিনি একজন মরমী একেশ্বরবাদী এবং বেদ ও বৈদিক জ্ঞানের বিশিষ্ট সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। নিজের স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তভিত্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার করতে থাকেন। অবশেষে ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর তিনি বিশ জন সঙ্গীসহ রামমোহনের ধর্ম গ্রহণ করেন। রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নতুন নেতা হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে ঐ আন্দোলনকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মের রূপ দান করেন, যে ধর্মের একটি পৃথক নাম (ব্রাহ্মধর্ম), একগুচ্ছ মূল বিশ্বাস (ব্রাহ্মধর্ম বীজ), একটি উপাসনাপদ্ধতি, একখানি ধর্মগ্রন্থ (ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ), নিজস্ব উৎসব ও অনুসারীদের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। ১৮৫০-এর মধ্যেই এসব কিছু সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু তার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বেদের অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে এক দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

১৮৪৪-৪৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ খৃস্টান মিশনারিদের আক্রমণ থেকে বেদকে রক্ষা করার কাজে হাত দিলেন। এই বিতর্কের এক পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথের সহচর ও *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) বেদের অভ্রান্ততায় দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেন। ব্যাপক গবেষণা ও গভীর চিন্তাভাবনার পর দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বেদ ও পরে উপনিষদসমূহকে ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে মেনে নেয়া থেকে বিরত হন। পরিবর্তে তিনি শরণ নিলেন প্রধান প্রধান উপনিষদ থেকে বাছাই করা উদ্ধৃতিসমূহের একটি সঙ্কলনের, যাকে একখানা নতুন (ব্রাহ্মী) উপনিষদ বলা যেতে পারে এবং যার নাম তিনি দিলেন *ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ*।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রতিবাদ সেখানেই থেমে থাকে নি। তিনি চাইলেন ব্রাহ্মধর্মকে একটি ঈশবাদী (deist) বিশ্বাসে পরিণত করতে[৮], যার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানে আস্থা স্থাপন ও তার শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভব হবে এবং প্রার্থনা প্রভৃতির মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে যোগাযোগ রাখার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। তাঁর সাথে যোগসাজশে পত্রিকা কমিটির (এই কমিটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দাখিলকৃত লেখাগুলি পরীক্ষা করে নির্বাচন করতো) অন্যতম সদস্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁর জাগতিক মানবতাবাদ ও সমাজসংস্কার কর্মসূচি প্রচারে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকাকে ব্যবহার করতে লাগলেন।[৯] কিন্তু ১৮৫৯ সাল নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে এই ঈশবাদী ও মানবতাবাদী আক্রমণ

---

৭. *বেঙ্গল হরকরা* (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭), উদ্ধৃত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর* (১৯১৬), ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৭১), ৫১।

৮. *তদেব*, ১৯৪।

৯. উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু বিধবাবিবাহ সম্পর্কে লেখা বিদ্যাসাগরের প্রথম সন্দর্ভ *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা* সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল এবং মার্চে তার সমর্থনে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল।

প্রতিহত করে আরো বেশি রক্ষণশীলতা ও কর্তৃত্বপরায়ণতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। ১৮৫৫ সালে পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে অক্ষয়কুমারকে অপসারণ করা হয়। জাগতিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় হওয়ার কারণে তত্ত্ববোধিনী সভাকে দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়ে দেন। সভার সাথে সাথে তাঁর সম্পাদক বিদ্যাসাগরও বিদায় নিলেন এবং বিলুপ্ত হলো পেপার কমিটি। আসলে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে প্রসার-লাভ করেছিল। কাজকর্ম চালানোর জন্য তাঁর আর অব্রাহ্মদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর সহচর রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, দেবেন্দ্রনাথ হিসাব করে দেখলেন, তখন যেসব 'কর্মতৎপর উন্নত' ব্রাহ্মদের পাওয়া যাচ্ছিল তাদের নিয়েই তিনি এগিয়ে যেতে পারবেন এবং এভাবে মতামতের দ্বন্দ্বও পরিহার করতে পারবেন।[১০]

এসব 'কর্মতৎপর উন্নত' ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪), যিনি ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে অতি দ্রুত দেবেন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মী হয়ে উঠেন। তিনি রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রাহ্ম আন্দোলনের তৃতীয় ঐতিহাসিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য যেন নির্দিষ্ট হয়েই ছিলেন। পরপর ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটি নির্বাহী পদে থেকে কেশবচন্দ্র সমাজে নতুন প্রাণসঞ্চার করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি পান। অসাধারণ বাগ্মী এবং প্রাণবন্ত তারুণ্য ও গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেশব বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম, হিন্দু ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের জনগণকে সমভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমনকি বৃটিশ শাসকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য তিনি কয়েকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, দু'টি সাময়িকী সম্পাদনা করেন এবং নিজ ধর্ম সংরক্ষণে খৃস্টান মিশনারিদের সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০-১৯০৫), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-৯৯), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) প্রমুখ শিক্ষিত হিন্দু তরুণেরা দলে দলে কেশবের আন্দোলনে যোগ দেন। এসব উদ্যমী অনুচরকে নিয়ে কেশব উত্তরোত্তর সাফল্যের শিখরে আরোহণ করতে থাকেন।

সংগঠন ও প্রচারের কাজ কেশবের উপর ন্যস্ত করে দেবেন্দ্রনাথ পুনরুদ্দীপ্ত ব্রাহ্ম সমাজের নামমাত্র প্রধান থেকে আরো বই লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর *ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস* (১৮৫৯-৬০) এবং *ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান* (১৮৬০-৬১) গ্রন্থ ব্রাহ্মদের ধর্মতত্ত্বের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করে। ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় মতবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে অবদান রাখার আর কোন অবকাশ না থাকায় কেশব ও তাঁর অনুসারীরা সমাজসংস্কার ও ব্যাপক ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন অভাবনীয় বিস্তার

---

১০. রাজনারায়ণ বসুর প্রতিবেদন, উদ্ধৃত যোগেশচন্দ্র বাগল, *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা* নং ৪৫,৩য় সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৫৭), ৩৪।

লাভ করে সারা বৃটিশ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কেশবচন্দ্রের অভ্যুত্থানের বছরগুলোতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর ও ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বাড়তে থাকে। ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে তিনি দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ ও প্রচার করেন এবং বিভিন্ন শহর ও নগরে নতুন নতুন সমাজ স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১৮৪৯ সালে ৫০০ থেকে ১৮৬৪ সালে ২০০০-এ উন্নীত হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ১৮৫৮ সালে ১১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৭৮ সালে ১২৪টিতে দাঁড়ায়। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ব্রাহ্মদের একুশটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।[১১] কেশবের গতিশীল নেতৃত্বের ফলেই এ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। কিন্তু ১৮৬৭ সাল থেকে 'মহর্ষি' উপাধিধারী দেবেন্দ্রনাথ বস্তুত নিষ্ক্রিয় এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতি উদাসীন রয়ে গেলেন।[১২]

এসব কৃতিত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও ব্রাহ্ম আন্দোলন একটি মস্ত বড় ধাক্কা খেলো যখন সমাজসংস্কার ও ব্রাহ্মসমাজের গণতন্ত্রায়নের প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। কেশবচন্দ্র যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসনকে শাস্ত্রের উপরে স্থান দিতে চাইলেন। অথচ দেবেন্দ্রনাথ তখনো শাস্ত্রকেই কর্তৃত্বের উৎস বলে মনে করতেন। প্রধানত যুক্তির ভিত্তিতে কেশব ও তাঁর অনুবর্তীরা জাতিভেদ ও পর্দাপ্রথা বিলোপ, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ এবং ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সংস্কার চালু করতে চাইলেন। তাঁরা আরো চাইলেন, ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের অবসান হোক এবং 'সমাজে' গণতান্ত্রিক প্রশাসন চালু হোক।[১৩] দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীদের কাছে এগুলি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই এই সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো সমাজের বিভক্তি। ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। এই বিভক্তির পর দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন পুরনো সমাজ, যা এখন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত, তা একটি উপাসকগোষ্ঠীতে পর্যবসিত হলো এবং তাদের কোনো সামাজিক, শিক্ষা সংক্রান্ত ও ধর্মপ্রচার বিষয়ক কার্যক্রম থাকলো না।[১৪]

সমাজের এই বিভক্তি মহর্ষির প্রভাব থেকে কেশবকে মুক্ত করলো। দক্ষিণ এশিয়ার নানা অঞ্চলে আন্দোলনের প্রসার ঘটানো ছাড়াও কেশবের কাজকর্মের একটি আন্তর্জাতিক দিক ছিল। তিনি পাশ্চাত্যের একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং নিজের বিতর্ক ও বক্তৃতায় যীশুখৃস্ট ও খৃস্টধর্মের প্রতি সর্বোচ্চ অনুরাগ প্রকাশ করতেন। ১৮৭০ সালে তাঁর লন্ডনভ্রমণ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। রানী ভিক্টোরিয়া (রা. ১৮৩৭-১৯০১)

---

১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৭৫), ১৭২।

১২. চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,* ৩৭১-৭৫।

১৩. মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ১৭৩-৭৪; দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতিতে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্তির বিস্তৃত বিবরণের জন্য পড়ুন, শিবনাথ শাস্ত্রী, *হিস্ট্রি অব দ্য ব্রাহ্মসমাজ* [ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস], (১৯১১-১২), ২য় সং, (কলকাতা ১৯৭৪), ৯৬-১১৫।

১৪. চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,* ৩৭২-৭৬।

ও জন স্টুয়ার্ট মিল সহ বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং বিলেতে তিনি একজন অতি জনপ্রিয় ও সম্মানিত আগন্তুক হিসেবে বিবেচিত হন। ঐ বছরই দেশে ফিরে তিনি একটি বিস্তারিত সমাজসেবা কর্মসূচি হাতে নেন, যার লক্ষ্য ছিল নারী ও শ্রমিক।

ভাঙন : প্রজ্বলিত স্বদেশপ্রেম ও বিকাশমান জাতীয়তাবাদের পরিমণ্ডলে বৃটেন, বৃটিশ শাসন ও খৃস্টধর্মের প্রতি কেশবের অনুরাগ স্পষ্টতই অনভিপ্রেত ছিল এবং তাঁর জনপ্রিয়তা কমে আসতে লাগলো। ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আত্মপরিচয়ের মূল প্রশ্নটি সামনে এলো, তখন কেশব ও তাঁর অনুসারীরা নিজেদেরকে অহিন্দু বলে ঘোষণা করলেন। এভাবে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মূলধারা থেকে তাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। তাছাড়া অবতার, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি কতিপয় বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস ও আচরণ গ্রহণ করে কেশব ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদ থেকেও যথেষ্ট দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর তরুণ অনুসারীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এ প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি দেখা গেল ১৮৭৮ সালে সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত কুচবিহার বিবাহের সময়। নিজের ধর্মের অনুশাসন এবং ১৮৭২-এর সিভিল ম্যারেজ আইন (যে আইন পাশ করানোর জন্য কেশব সংগ্রাম করেছিলেন) দুই-ই লঙ্ঘন করে কেশব তাঁর নাবালিকা কন্যার বিয়ে দিলেন কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজার সাথে হিন্দু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে,যা ছিল ব্রাহ্ম বিবেচনায় পৌত্তলিকতার নামান্তর। তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই যে, কেশব ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন বলে দাবি করে তাঁর আদর্শচ্যুতিকে বৈধ করার প্রয়াস পেলেন। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে তাঁর সম্প্রদায় আবারো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং বিদ্রোহীরা ১৮৭৮ সালের মে মাসে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। এই ঘটনার পর কেশব তাঁর ধর্মকে ঢেলে সাজিয়ে 'নব বিধান' নামে এক সমন্বয়ী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করলেন, যার মধ্যে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম থেকে নেয়া উপাদানসমূহের সাথে সক্রেটিস, কার্লাইল, এমার্সন প্রমুখ মহৎ চিন্তাবিদের শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল। এই নতুন ধর্মমতকে যতোই বিশ্বজনীন ও নানা সূত্রজাত মনে হোক না কেন, এখানেও কেশবের রাজনৈতিক আনুগত্যের নীতি এবং খৃস্টীয় বিশ্বজনীনতার নামে ভারতে বৃটিশ শাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টার প্রতিফলন ছিল। তাঁর সাময়িকী *নববিধান*-এ লেখা হয়েছিল :

> বৃটিশ ভারত শাসন করছেন যীশুখৃস্ট বৃটিশ সরকার নয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য জয় করা ও ধরে রাখার জন্য ইংল্যান্ড ঐ শক্তিমান মহাপুরুষের জীবন ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক দুর্জয় নৈতিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। ভারতবর্ষরূপ এই উজ্জ্বল মহামূল্যবান মুকুটের যোগ্য ছিলেন একমাত্র যীশুই এবং এটি তাঁরই থাকবে।[১৫]

---

১৫. *নিউ ডিসপেনসেশন*, উদ্ধৃত, এফ. ম্যাক্সমুলার, *রামমোহন টু রামকৃষ্ণ* [রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ], (১৮৮৪-৯৯), (কলকাতা ১৯৫২), ৬২।

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আবেগ যখন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই সময়ে এরকম একটি ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই বেশি অনুসারী সংগ্রহ করতে পারে নি।[১৬] ১৮৮৪ সালে কেশবের অকালমৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর ধর্ম ও অনুসারী দলটি অচিরে ক্ষীয়মান হয়ে আসতে লাগলো।

বস্তুত কেশবচন্দ্র সেন উনিশ শতকে বাংলায় হিন্দু জাগরণের ইতিহাসে এক কালবিরুদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কারণ তিনি সত্তর ও আশির দশকে এমন সব সমস্যা ও ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন যেগুলি ঐতিহাসিকভাবে বিশ ও তিরিশের দশকের বিষয় ছিল। ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু কেশবচন্দ্রের মতো যুগের চেতনা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় নি। গোষ্ঠী হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল 'সমাজে' যৌথ নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রের চর্চা এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করে যাওয়া। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খাপ খাইয়ে নেয়ার এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও ব্রাহ্মরা আর যুগের নেতা রইলেন না। সময়ের প্রবণতায় দেশ ও জাতির সেবার এক সাধারণ প্রতিযোগিতায় তাঁরাও সামিল হলেন মাত্র। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁদের আর দেয়ার কিছু ছিল না। কেশবচন্দ্রের *নববিধান* এ বিষয়ে শেষকথা বলে দিয়েছিল। বস্তুত, সংগঠন হিসেবে সাধারণ বাহ্মসমাজ প্রধানত সেক্যুলার ছিল এবং তাতে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার অভাব ছিল। আবার ধর্মীয় দিক থেকে একেশ্বরবাদে বদ্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রতিমাদির প্রতি পরিপূর্ণ বিরাগ এমন এক কানাগলির সৃষ্টি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও (১৮৪১-৯৯) পরিত্যাগ করে তাঁর পূর্বতন বৈষ্ণব ধর্মে ফিরে যান ১৮৮৮ সালে। এই ঘটনা ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার অবসান এবং ব্রাহ্ম একরূপতার উপরে হিন্দু বহুত্ববাদের বিজয় সূচিত করে। ১৮৮০-এর দশকের শেষে ধর্ম হিসেবে ব্রাহ্মধর্ম শক্তিহীন হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদের সংখ্যাও কমে যেতে থাকে।

সর্বেশ্বরবাদ : ধর্মসঙ্কটের নব্যহিন্দু সমাধান

পটভূমি : আদি ব্রাহ্ম সূত্রপাত

ব্রাহ্মধর্ম ছিল চিরায়ত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্রোহ এবং এই চ্যালেঞ্জ তথা খৃস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। এই ঘটনা 'নব্যহিন্দু আন্দোলন' নামে পরিচিত। এটি কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং কিছু গুরত্বপূর্ণ সংস্কারও এর অন্তর্গত ছিল। এই আন্দোলন খাঁটি সমালোচনার আলোকে এবং দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মে এক সংস্কার আনয়ন করে। সাধারণ হিন্দু ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মরা এবং এমনকি 'হিন্দু ক্যাথলিক' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও নব্যহিন্দু আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। আসলে আদি ব্রাহ্মরাই ষাটের দশকের শেষাংশে ও

সত্তরের দশকের প্রারম্ভে আন্দোলনটির সূচনা করেন। পরে হিন্দু সংস্কারক গোষ্ঠীগুলির অভ্যুদয় হয়।

এই আপাত অসঙ্গতির পশ্চাতে যে কারণ বিদ্যমান ছিল তা হচ্ছে এই যে, ঐতিহাসিকভাবে নব্যহিন্দু আন্দোলন ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের সঙ্গে অবিভাজ্য ছিল এবং ঐ দু'টি জিনিসই চার দশক ধরে সমান্তরালভাবে বিকশিত হওয়ার পর বিশ শতকের প্রথম দশকে এসে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিশে যায়। সিপাহী ও নীল বিদ্রোহের পটভূমিতে ১৮৬০-এর দশকে এক ভারতীয় জাতির ধারণা কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ও ব্রাহ্মদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং একটা সত্যিকারের 'জাতীয়' চেতনা নগরীকে পেয়ে বসে। দেবেন্দ্রনাথের দু'জন ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) ও নবগোপাল মিত্র (১৮৪১-৯৪) সহ বেশ কয়েক জন আদি ব্রাহ্ম এই পরিবর্তনে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৮৬৫ ও ১৮৬৭-এর মধ্যে নবগোপাল *ন্যাশনাল পেপার* [জাতীয় পত্রিকা], ন্যাশনাল সোসাইটি [জাতীয় সমিতি] এবং ন্যাশনাল ফেয়ার [জাতীয় মেলা]-এর জন্ম দেন। জাতীয় মেলা ১৮৬৭ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর বেশ বড় আকারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং তা নবলব্ধ জাতীয়তাবাদের অনুভূতিকে বিপুলভাবে উজ্জীবিত করে। এই আবহাওয়া দীর্ঘকাল যাবৎ সমালোচনাজর্জর হিন্দুধর্মের জন্য সুবর্ণসুযোগ এনে দেয় নিজেকে জাতীয় ধর্ম বা সংস্কৃতি হিসেবে সগৌরবে পরিচয় দেয়ার। 'হিন্দু' এখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের নাম না হয়ে সমগ্র ভারতীয় জাতির নাম হয়ে দাঁড়ালো। বস্তুত 'জাতীয় মেলা' জনসাধারণের কাছে 'হিন্দু মেলা' নামে পরিচিত হয় এবং সেভাবেই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

জাতীয় আত্মপরিচয়ের এই প্রসঙ্গে আদি ব্রাহ্মরা সাথে সাথে নিজেদের হিন্দু বলে ঘোষণা করলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই নব্যহিন্দু আন্দোলনে প্রথম মঞ্চ তথা পথপ্রদর্শক চিন্তাবিদ সরবরাহ করেন; বস্তুত বলা চলে, রাজনারায়ণ বসু নিজেই আন্দোলনের উদ্বোধন করেন, যখন ১৮৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ দেবেন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত নবগোপালের ন্যাশনাল সোসাইটির অধিবেশনে তিনি "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" শীর্ষক এক নিবন্ধ পাঠ করলেন। এ প্রবন্ধ রচনার পটভূমিতে ছিল কেশবচন্দ্র সেনের চমক সৃষ্টিকারী ঘোষণা যে তাঁর দলের ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়। দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ নিজেদের হিন্দু পরিচয় পুনর্ব্যক্ত করে হিন্দুত্বকে ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতি বলে বর্ণনা করেন এবং ঘোষণা দেন যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের পরিমার্জিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনারায়ণের বক্তৃতা ভারতে ও ইংল্যান্ডে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং তাঁকে হিন্দুধর্মের ত্রাণকর্তা হিসেবে সনাক্ত করা হয়। সাধারণ হিন্দুরা তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান, কারণ তাঁরা তাঁর বক্তৃতা থেকে খুবই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং খৃস্টধর্মের সাথে সাংস্কৃতিক বিরোধে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। এভাবে রাজনারায়ণ,

দেবেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল এই তিন আদি ব্রাহ্মনেতা অনেকটা আত্মপরিচয়ের সঙ্কটজাত রাজনৈতিক তাগিদেই নব্যহিন্দু আন্দোলনের উদ্বোধন ঘটালেন। একবার শুরু হওয়ার পর আন্দোলন যথারীতি তার স্বকীয় গতি লাভ করলো এবং অচিরেই তা চলে গেল সাধারণ হিন্দুদের হাতে, যারা এখন নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য যোগ্য বুদ্ধিজীবী সরবরাহে সক্ষম ছিলেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক হিন্দুধর্ম : ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এসব বুদ্ধিজীবীর মধ্যে প্রধান ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), যিনি তাঁর মাসিক *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র অনুকূলে সমালোচনা প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ ভারতে শক্তিশালী ও নতুন তেজে উদ্দীপ্ত এক হিন্দু 'জাতি'র যে কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিম তার বিশেষ প্রশংসা করেন। হিন্দুধর্মের রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কিত রাজনারায়ণের অন্তর্দৃষ্টি বঙ্কিম গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে *বঙ্গদর্শন-এর* পাতায় যুক্তিবাদী ভঙ্গিতে ভারতের অতীত পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি নিজেই ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সম্পাদক ও প্রধান লেখক হিসেবে ১৮৭৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ধারাবাহিক নিবন্ধমালায় বঙ্কিম ও তাঁর সহযোগীরা যেসব হিন্দু রাজা মুসলিম আক্রমণকারীদের গতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁদের কাপুরুষত্বের কলঙ্ক মোচন করতে সচেষ্ট হন এবং প্রাচীনকালের হিন্দুদের গুণাবলী তথা চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের মহিমাকীর্তন করেন। তবে পুনরুত্থানবাদী চরিত্রের উৎকট অন্ধ স্বাদেশিকতার পরিবর্তে তাঁরা সমালোচনাত্মক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তাই তাঁরা প্রাচীন ভারতীয়দের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথাও যথারীতি আলোচনা করেন, যেমন জাতীয় ঐক্যচেতনার অভাব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি, বাগ্মিতার পরিবর্তে নির্জনতা ও চিন্তাশীলতাকে পছন্দ করা, নারীস্বাধীনতার অনুপস্থিতি, পরবর্তী ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব, নিম্নবর্গের মানুষদের বঞ্চনা, এবং জাতিভেদপ্রথার মাধ্যমে বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।[১৭]

এসব কিছুর ভিতরেই একটা জাতীয়তাবাদী সুর বিদ্যমান ছিল এবং ১৮৭০-এর দশকে সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও নাটকের মাধ্যমে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের যে ঐকতান চলছিল তার সাথে তাল রেখে বঙ্কিমের হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা একটি স্বদেশপ্রেমের ধারা ধরে এগোতে থাকে। *বঙ্গদর্শন-এ* প্রকাশিত 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে বাঙালি হিন্দুর রণরঙ্গিনী মাতৃদেবী দুর্গার মাটির প্রতিমায় বঙ্কিম মাতৃভূমি বাংলাকে তার সুবর্ণময় চিরকালীনতায় অবলোকন করেন। এই কল্পনার আরো জোরালো প্রকাশ ঘটে ১৮৭৫

---

১৭. এসব মতামত *বঙ্গদর্শন-এর* যেসমস্ত নিবন্ধে ব্যক্ত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল 'ভারত-কলঙ্ক' (এপ্রিল-মে ১৮৭২), 'মানুষ জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়?', (মে-জুন ১৮৭২), 'বঙ্গদেশের কৃষক' (আগস্ট ১৮৭২, মার্চ ১৮৭৩) এবং 'সাম্য' (১৮৭৪-৭৫), 'ভারত-মহিলা' (জানুয়ারি-এপ্রিল ১৮৭৬)।

সালে রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত বাংলা গান 'বন্দে মাতরম্' [মাতাকে বন্দনা করি]-এর মাধ্যমে, যে গানের মোহনীয় সুরে বাংলা মাকে সর্বশক্তিশালিনী দুর্গাদেবী হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। 'বন্দে মাতরম্' পরে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত রাজনৈতিক উপন্যাস *আনন্দমঠ*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ উপন্যাসে 'সন্তান'রা তাদের দেশকে সেবা করেছে মাতৃদেবী হিসেবে, যিনি সকল আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি।

ইতিমধ্যে উক্ত ধারণাটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪)-এর হাতে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ভূদেব ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও কবি মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত হিন্দুধর্মে অবিচল থাকেন। পুরাণ ইতিহাসের এক উচ্চতর রূপ, যা অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিকতর নির্ভুলভাবে ভারতীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটায়—এই মত ব্যক্ত করে ভূদেব ১৮৭৬ সালে 'ধর্মবিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যা করতে উদ্যত'[১৮] হয়ে এবং 'হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন'[১৯] -এর উদ্দেশ্যে *পুষ্পাঞ্জলি* নামে এক নবপুরাণ প্রকাশ করেন। এতে লেখকের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে বর্ণনা করা হয় এক অনন্য দেবী রূপে, যিনি সতত তাঁর অসংখ্য সন্তানকে মাতৃভাবে অন্নদান করে চলেছেন।[২০] গোটা বইটিতে ভূদেব *বেদ-এর* উল্লেখ খুব কম করেছেন এবং কখনো *বেদ*-এর অপৌরুষেয়ত্বের কথা বলেননি। পরিবর্তে তিনি প্রকৃতিকেই একমাত্র ঐশী গ্রন্থ বলে ঘোষণা করে বলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রসমূহের অর্থ অনুধাবন করতে হলে ঐ গ্রন্থখানিকে আগে বুঝে নিতে হবে।[২১]

পুরাণে দেবদেবীবাহুল্যের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে ভূদেব বলেন যে, বিভিন্ন ভাব ও বস্তুর প্রতীকী উপস্থাপনার এটি একটি রূপকাশ্রিত কৌশলমাত্র। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আচরিত ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে যে দেশে তার উদ্ভব ঘটেছে সে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে। জীবদেহের পরিবর্তন এবং ভূগোল ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মের বিবর্তন ঘটে। ভূদেবের মতে, ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ হওয়ায় এই দেশ সকল ধর্মের প্রকৃত সমন্বয় সাধনে সক্ষম। মানুষের ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতি-গোষ্ঠীগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ ভৌগোলিক পার্থক্য; এবং মানব জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করা কঠিন নয়। স্বদেশবাসী মানুষের প্রতি তথা সকল সৃষ্টবস্তুর প্রতি ভালবাসা এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভূদেব পুরাণে কথিত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ও জীবন-মৃত্যু-পুনর্জন্মের চক্রসমূহের অন্তহীন পরম্পরার পুনরুল্লেখ করেন। এক ধরনের আধ্যাত্মিক

---

১৮. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *পুষ্পাঞ্জলি, ভূদেব রচনাসম্ভার,* প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ৩য় পরিবর্ধিত সং, (কলকাতা ১৯৬৮), ৩৭৬।

১৯. উদ্ধৃত, শিপ্রা লাহিড়ী, *ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য,* (কলকাতা ১৯৭৬), ১৯৯।

২০. *ভূদেব রচনাসম্ভার,* ৩৮১।

২১. *তদেব,* ৩৭৯।

ডারউইনবাদের অবতারণা করে তিনি আরো বলেন, পশুত্ব থেকে বিবর্তিত হয়ে যেমন মানবতা এসেছে, তেমনি তা উদ্বর্তিত হচ্ছে দেবত্বের দিকে। অবশেষে ভূদেব তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনার উপসংহার টানেন এই অজ্ঞেয়বাদী মন্তব্য দিয়ে যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাসহ কেউই সৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ সত্তার রহস্য অবগত নন।[২২]

এভাবে ভূদেব পুরাণের গুরুত্ব, সকল সৃষ্টির একত্ব, মানুষের দেবত্ব এবং বিশ্বে পরিবর্তনের বৃত্তাকার বিন্যাসের প্রতি জোর দিয়ে নব্যহিন্দু ধর্মমতের ভিত্তি স্থাপন করলেন। পরে এই ধারণাগুলি সুসংহত করে তিনি তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২) গ্রন্থের শক্তিশালী নিবন্ধমালায় আরো সার্থকভাবে উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি উপনীত হন এক বিশাল সর্বেশ্বরবাদে, যা ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ মানব জাতির জন্য ধর্মসমন্বয়ের প্রাকৃতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।[২৩] *পুষ্পাঞ্জলি* নিশ্চিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের উপর ছাপ ফেলেছিল এবং তিনি ১৮৮২ সালে মন্তব্য করেন যে, হিন্দুদের যেসব কাহিনীকে ইউরোপীয়রা উপহাস করে থাকেন, *পুষ্পাঞ্জলি* প্রণেতার "সহৃদয় আলোচনা"র ফলে সেগুলি থেকে "এমন সব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে, যা মহত্ত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোন কিছুর চেয়েই হীন নয়।"[২৪]

বাংলাকে মাতৃভূমিরূপে বন্দনাকারী 'বন্দে মাতরম্' গানটির অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও বঙ্কিমের *আনন্দমঠ* (১৮৮২) সত্যিকার অর্থে বাংলার শাক্ত ঐতিহ্য থেকে প্রশস্ত ভারতীয় হিন্দুধর্মের মহাকাব্যিক ঐতিহ্যে সরে যাওয়ার সঙ্কেত দেয়। *আনন্দমঠ ভগবদ্গীতা* প্রচারিত 'নিষ্কাম কর্ম'-এর আদর্শভিত্তিক জঙ্গি হিন্দু স্বাদেশিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার প্রয়াস পায়। বঙ্কিম তাঁর অত্যন্ত অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপূর্ণ উপন্যাস *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪)-তে নিষ্কাম কর্মের ধারণাটিকে আরো বিস্তৃত করেন। ঐ উপন্যাসের উপসংহার টানা হয়েছে গীতায় কৃষ্ণের সেই বিখ্যাত ঘোষণা দিয়ে, যেখানে তিনি বলেন যে, দুর্জনের বিনাশ, সজ্জনের ত্রাণ ও পৃথিবীতে সদ্ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন।[২৫] কৃষ্ণ ও গীতার উল্লেখের ফলে বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম আর মাতৃদেবীসেবক বঙ্গভূমিতে আবদ্ধ রইলো না, বরং এক প্রশস্ত সর্বভারতীয় মাত্রা গ্রহণ করলো।[২৬]

---

২২. *তদেব*, ৩৭৮-৭৯, ৪০৪, ৪০৭-১৩, ৪২৮-৩৩, ৪৪০-৪১।

২৩. *তদেব*, ১৫৪, ১৫৮, ২৬৩।

২৪. দেখুন, *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় বঙ্কিমের চিঠি, (২৮ অক্টোবর ১৮৮২), পুনর্মুদ্রিত, *বঙ্কিম রচনাবলী* , ৩য় খণ্ড (*কালেকশন অব ইংলিশ ওয়ার্কস্* [ইংরেজি রচনার সংকলন]), যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, (কলকাতা ১৯৬৯), ২১২।

২৫. *ভগবদ্গীতা*, ৪.৮; দেখুন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ২ খণ্ড, (কলকাতা ১৯৫৬, ১০ম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮), ১ : ৮৭২।

২৬. এক নতুন হিন্দুধর্মের প্রবক্তা হিসেবে বাংলা থেকে সর্বভারতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরণের ধারণা উপস্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী, *দি এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ : ইন্ডিয়া বিটুইন ১৮৯০ এ্যান্ড ১৯১০* [চরমপন্থী চ্যালেঞ্জ : ১৮৯০ ও ১৯১০-এর মধ্যবর্তীকালে ভারতবর্ষ], (নতুন দিল্লী ১৯৬৭), ৪।

জাতিগোষ্ঠীগত ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় শত্রুভাব। ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে রেভারেন্ড ডব্লিউ. ডব্লিউ. হেস্টির সাথে ধর্ম হিসেবে হিন্দুত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে এক বিতর্ক লড়তে হয়।[২৭] হিন্দু উপাসনায় প্রতিমার ব্যবহার এবং ব্রাহ্মণদের বেদান্তদর্শনের উপর হেস্টির আক্রমণের জবাবে বঙ্কিম তাঁর কথিত 'র‍্যাশনাল হিন্দুইজম' বা যুক্তিসিদ্ধ হিন্দুধর্মের এক রূপরেখা উপস্থাপন করেন। এই ধর্ম *বেদ* ও *বেদান্তের* উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং প্রতিমাপূজা ও জাতিভেদপ্রথা ছিল এর 'আবরণ' মাত্র। *ভগবদগীতা, পুরাণ* ও ভক্তিবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বঙ্কিম ঘোষণা করেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈততা এবং প্রেমের মাধ্যমে তাদের মিলনের তত্ত্বই হিন্দুধর্মের সারবস্তু। আলোচনায় বিশ্ব-আত্মার প্রতীক হিসেবে কৃষ্ণেরও উল্লেখ থাকে। বিতর্কে বঙ্কিম অবশ্য জাগতিক বিষয়ের অনুসন্ধানে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব সানন্দে মেনে নেন।[২৮] এখানে স্মরণীয়, ১৮৭০-এর দশকে ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম ইউরোপের ভৌত ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগপৎ বিচরণ করেছিলেন।[২৯]

হেস্টি-বঙ্কিম বিতর্ক সত্যিই বঙ্কিমের নতুন হিন্দুধর্মের একটা রূপরেখা প্রস্তুত করে দেয়। পরে *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬-৯২) ও *ধর্মতত্ত্ব* (১৮৮৮) নামে দুই বৃহদাকার গ্রন্থে বঙ্কিম ঐ রূপরেখার পুষ্টি ঘটান। এই নতুন ধর্ম ছিল একটি সমন্বয়ী মত, যার আধ্যাত্মিক মূল প্রাচীন ভারতে প্রোথিত থাকলেও আধুনিক ইউরোপ থেকে নেয়া ধ্যান-ধারণা দ্বারা এর সর্বাঙ্গ পুনর্গঠিত। *কৃষ্ণচরিত্রতে* বঙ্কিম চেষ্টা করেন কৃষ্ণকে তুলে ধরতে এক ঐতিহাসিক মহামানব হিসেবে, যিনি ইতিহাসের ঊষালগ্নে ভারতে এক রাজনৈতিক ও নৈতিক ঐক্যের সূত্রপাত করেছিলেন। বঙ্কিম *মহাভারতে* সন্নিবিষ্ট লোককাহিনী, পুরাণকথা ও পরবর্তী প্রক্ষেপের আবর্জনা সরিয়ে কৃষ্ণের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ঘটান এবং তাঁকে 'হিন্দুদের মধ্যে বিজ্ঞতম ও মহত্তম' বলে সনাক্ত করেন।[৩০] কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার সপক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়ে বঙ্কিম তাঁকে বুদ্ধ বা যীশুর মতো অত্যুচ্চ ঐতিহাসিক প্রফেটের

---

২৭. প্রেসবাইটারিয়ান মিশনারি এবং জেনারেল এ্যাসেম্বলি'জ ইন্সটিটিউশনের অধ্যক্ষ হেস্টি কলকাতার একটা বড় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক রীতি প্রত্যক্ষ করে ভীষণ বিরক্ত হন। ১৮৮২ সালের ২৩,২৬,২৯ *সেপ্টেম্বর* তারিখে *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি চিঠিতে তিনি হিন্দুধর্মের উপর তাঁর আক্রমণ শুরু করেন। এই চিঠিগুলির যে জবাব বঙ্কিম দিয়েছিলেন তা এবং হেস্টির প্রত্যুত্তর ঐ একই কাগজে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

২৮. *বঙ্কিম রচনাবলী,* ৩য় খণ্ড, ২০৯-১৮।

২৯. *বঙ্গদর্শন-এ* বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলি *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫) নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়; আর বেন্থাম, মিল ও কোঁতের প্রভাবে লিখিত মানুষ ও সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী পরে *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭-৯২) নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৩০. বুদ্ধ সম্পর্কে রিস ডেভিড্‌সের উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণের জন্য গ্রহণ করেন, *'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী* ২: ৫৮৩।

হিন্দু প্রতিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কৃষ্ণকে 'একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট ও রামচন্দ্র' বলে অভিহিত করেন।[৩১]

এই পুনর্গঠিত কৃষ্ণ ছিলেন *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে বঙ্কিম 'অনুশীলন ধর্ম' নামে হিন্দু- ধর্মের যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তারই দৃষ্টান্তস্থল। 'অনুশীলন' ছিল ইউরোপীয় দৃষ্টবাদ ও উপযোগবাদ দ্বারা পরিমার্জিত হিন্দুধর্ম থেকে নির্মিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই নতুন ধর্মমতের নির্দিষ্ট রূপ দান করতে গিয়ে বঙ্কিম সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে উপাদান নেয়ার সময় খুব সতর্কভাবে সেগুলি যাচাই করেন এবং হিন্দুধর্মের আধুনিক সমালোচনাসমূহের কথা বিশেষভাবে মনে রাখেন। এভাবে অনুশীলনধর্মে বঙ্কিম বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করেন; মনুস্মৃতিকে বিপথ প্রদর্শনকারী ক্ষতিকর বস্তু, এবং মধ্যযুগীয় বাঙালি স্মৃতিকার রঘুনন্দনকে জনহিতবিহীন বাজে জিনিস বলে প্রত্যাখ্যান করেন; স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন; এবং তাঁর নিজ সময়ে হিন্দু সমাজে যে অসংখ্য লৌকিক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল সেগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করেন।[৩২] বস্তুত বঙ্কিম সুস্পষ্টভাবে শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮)-র পুনরুত্থানবাদী হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেন।[৩৩] উল্লেখ্য, তর্ক-চূড়ামণি চাইতেন মধ্যযুগের শেষভাগে প্রচলিত হিন্দুধর্মের রূপটির আক্ষরিক পুনঃস্থাপন। তাই বলা হয়, নব্য হিন্দুবাদের প্রফেট বঙ্কিম ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার চেয়ে মোটেই কম বিদ্রোহী ছিলেন না।

বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ধর্ম ছিল এমন একটা জিনিস, "যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয়...।"[৩৪] এই ধর্মের ভিত্তিমূলে ছিল না কোন দৈববাণী : "আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করি না।" আবার তিনি স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) বা ঈশবাদে (Deism) বিশ্বাসী ছিলেন না এবং মরণোত্তর অস্তিত্বের আনুমানিক ধারণাকে তাঁর ধর্মের ভিত্তি করতে চান নি। তিনি বলেন, "ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি।"[৩৫] এই নৈসর্গিক ভিত্তি আর কিছুই নয়, বরং মানুষ যে সতত সুখের পিছনে ধাবিত হয় সেই জাগতিক ব্যাপারটি। মানুষের সর্বোচ্চ সুখ বলতে বুঝতে হবে তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও নান্দনিক বৃত্তিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু সেজন্য দরকার একটি নিয়ন্ত্রক উপাদান যাতে ঐ বৃত্তিগুলির মধ্যে কোন সংঘর্ষ না ঘটে এবং একটি সুসমঞ্জস ও সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত হয়। এই ভারসাম্য

---

৩১. *ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী* ২, ৫৯৪।

৩২. এসব তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, কৃষ্ণচরিত্র* এবং *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে পাওয়া যায়। *বঙ্কিম রচনাবলী* ২ : ৫০৭, ৬০৫, ৭৭৬-৭৭৭, ৭৭৯।

৩৩. *দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, বঙ্কিম রচনাবলী* ২ : ৭৭৬।

৩৪. *তদেব,* ৭৭৮।

৩৫. *তদেব,* ৭৯২।

লাভের উপায় হচ্ছে অন্য সকল বৃত্তিকে 'ভক্তি' নামক প্রবৃত্তির অধীনে স্থাপন করা। আর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন এমন এক ব্যক্তি-ঈশ্বরের প্রতি সশ্রদ্ধ ভালবাসাই ভক্তি। এমন সর্বেশ্বরবাদমূলক ঈশ্বরের প্রতি এরূপ ভক্তি গোটা মানব জাতির প্রতিই শুধু নয়, ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা অপরিহার্য করে তোলে। অপরপক্ষে একেশ্বরবাদী ঈশ্বর, যিনি মানুষের জগৎ থেকে অনেক দূরে বিশ্বকে অতিক্রম করে অবস্থান করছেন, তাঁর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে একটি বহিঃস্থিত কর্ম, যার সঙ্গে মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি স্বভাবজাত স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই। সর্বেশ্বরবাদ ভক্তিকে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি সাধারণ ও যুগপৎ প্রেমে পরিণত করলো। "অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে"[৩৬] —খৃস্টান ও ব্রাহ্ম প্রতিদ্বন্দ্বীদের একেশ্বরবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়েই যেন বঙ্কিম এ কথাটি বলেন। মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়াই উত্তম ঈশ্বর-আরাধনা। আর বহুল প্রচলিত যেসব উপাসনা তা একেশ্বরবাদী কিংবা বহুদেববাদী হোক, পৌত্তলিক হোক কিংবা না হোক, 'সেসব উপাসনা হচ্ছে একটি গৌণ বিষয়, যা কেবল উপাসকের চিত্তশুদ্ধির সীমিত প্রয়োজনই মাত্র সিদ্ধ করে।'[৩৭]

মহাভারতভিত্তিক ধর্মের তাগিদেই বঙ্কিমকে ভগবদগীতার একটি নতুন ভাষ্য রচনার দায়িত্ব নিতে হলো, যাতে তিনি দেখাতে পারেন যে তাঁর নিজের ধর্মীয় ধারণাসমূহের শিকড় যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণের উপদেশবাণীর মধ্যেই নিহিত ছিল। নিঃস্বার্থ মানবসেবাতেই যে ঈশ্বরভক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর এই ধারণাটিকে গীতার 'নিষ্কাম কর্ম' মতবাদের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার দরকার ছিল। গীতার সনাতনী ভাষ্যকারেরা 'কর্ম' শব্দের অর্থ করেছিলেন বৈদিক যাগযজ্ঞ। বঙ্কিম স্বীয় ভাষ্যে তাঁদের থেকে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। 'কর্ম' শব্দের উক্ত অর্থ যে কেবল সেকেলে ছিল তা-ই নয়, গীতায় শব্দটির সামগ্রিক প্রয়োগের আলোকে তা অন্যায্যও ছিল বটে। আর গীতা এমন একটি ধর্মগ্রন্থ, যা বেদের সমালোচনায় সোচ্চার। বঙ্কিম 'কর্ম' শব্দের জাগতিক ও আভিধানিক অর্থ 'কাজ' হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং বুঝলেন যে, এটি একটি জীবনবিধান থেকে কম কিছু নয়। 'কর্ম' এখন খুব ভালভাবেই নিঃস্বার্থ মানবসেবাকেও বোঝাতে পারলো। এই নতুন ব্যাখ্যার ফলে হিন্দুধর্মের আদর্শের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। যে ধর্ম এতদিন ব্যক্তিগত মুক্তির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বলে পরিচিত ছিল, তা এখন সমাজের কাজ হাতে নিতে সক্ষম বলে দেখানো হলো। যে মানবিক সেবার আদর্শ অনেক শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল, এভাবে বঙ্কিম তা পুনরুদ্ধার করলেন। ভারতের অবনতির ব্যাখ্যাতেও তিনি এই

---

৩৬. *ধর্মতত্ত্ব*, বঙ্কিম রচনাবলী ২ : ৬৪৯।

৩৭. বঙ্কিমের ধর্মের এই সংক্ষিপ্তসার প্রধানত তাঁর *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থভিত্তিক এবং রাখালচন্দ্র নাথ, *দ্য নিউ হিন্দু মুভমেন্ট ১৮৮৬-১৯১১* [নব হিন্দু আন্দোলন ১৮৮৬-১৯১১] (কলম্বিয়া, মিসৌরি ১৯৮২), ৮৫-৯০ থেকে শব্দান্তরিত।

বিস্মৃতিকে যুক্ত করতে চাইলেন : এদেশের ধর্মপরায়ণ মানুষেরা চিরদিন কর্মহীন মানুষ হিসেবে থেকে দুঃখজনকভাবে নিজেদেরকে 'জ্ঞানমার্গের' অনুসারী বলে দাবি করে এসেছেন।[৩৮]

সমকালীন রাজনীতিসঞ্চারিত নব্যহিন্দুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন চলছিল তা আরো জোরদার হয় গীতা ও কৃষ্ণচরিত্রের বঙ্কিমকৃত পুনর্ব্যাখ্যার ফলে। এই নব্যবৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-৯৯), যিনি ১৮৬৭ সালের পরে কেশবচন্দ্র সেনের আমূল সংস্কারবাদী ব্রাহ্মধর্মে প্রবর্ধিত বৈষ্ণব প্রভাবের জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁর পূর্বেকার চৈতন্য-বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের সাম্য ও আবেগের চেতনার সঙ্গে নবগৃহীত ধর্মের যুক্তিগ্রাহ্য সংস্কারবাদের সংযুক্তি ঘটিয়ে গোস্বামী ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিকে ও ১৮৭০-এর দশকে পূর্ববাংলার নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর হিন্দু যুবকদের মধ্যে কেশবের ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু গোস্বামীর বৈষ্ণব ভাব বেশি প্রকট হয়ে পড়লে তিনি ১৮৮৬ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদ থেকে বিতাড়িত হন। তারপর নব্য বৈষ্ণববাদের একজন গতিশীল গুরু হিসেবে গোস্বামী অনেক অনুসারী সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভবিষ্যৎ স্বদেশী আন্দোলনের চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮), এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-১৯১৯)।[৩৯] এঁদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) উনিশ শতকের শেষদিকে নব্যবৈষ্ণববাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। নিজেকে যুগপৎ কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বলে ঘোষণা করে পূর্ববাংলার বরিশালনিবাসী এই তাপসপ্রকৃতির সামাজিক সক্রিয়তাবাদী ১৮৮৭ সালে *ভক্তিযোগ* নামে ব্যবহারিক ধর্মচর্চার এক বিধিপুস্তক প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ নব্যহিন্দুভাবাপন্ন দেশপ্রেমিক গৃহস্থদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

প্রচারমূলক হিন্দুধর্ম : রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

অশ্বিনীকুমারের তিন গুরুর মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬) ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে নব্যহিন্দুবাদের সর্বপ্রধান গুরু হিসেবে আবির্ভূত হন। যে সময়ে

---

৩৮. এই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বিবরণ বঙ্কিমের *শ্রীমদভগবদ্গীতা* (আংশিক ভাষ্য), *ধর্মতত্ত্ব* ও *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থভিত্তিক এবং নাথ, *নিউ হিন্দু মুভমেন্ট*, ৯০-৯৩ থেকে আহৃত। দেশের শিক্ষিত সমাজের উপর বঙ্কিমের *গীতার* বিরাট প্রভাব পড়েছিল। মুসলমান ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের কাছে যথাক্রমে কোরান ও বাইবেলের যে মর্যাদা, *গীতা* শীঘ্রই অনুরূপ মর্যাদার স্থান গ্রহণ করলো। বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো আধুনিক ভাষ্যকারদের কৃত *গীতার* ভাষ্যগুলির প্রত্যেকটিই কর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বঙ্কিমের অনুসরণ করে। *তদেব*, ৯২-৯৪।

৩৯. সুমিত সরকার, *দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮* [বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৩-১৯০৮], (নতুন দিল্লী ১৯৭৩), ২৮।

ভূদেব ও বঙ্কিম তাঁদের ভাবনাগুলিকে স্পষ্ট রূপদান করতে ব্যস্ত ছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেন মারাত্মক আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন কলকাতার আধ্যাত্মিক জীবনে অন্য অনেকের উপর আধিপত্য বিস্তার করছিলেন রামকৃষ্ণ। কলকাতার উত্তরে নবপ্রতিষ্ঠিত (১৮৫৫) দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রায়-নিরক্ষর পুরোহিত রামকৃষ্ণ উনিশ শতকের বাংলায় সংস্কারকবর্গের সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম ছিলেন। হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্য নেতাদের মতো তাঁর ইংরেজি বা সংস্কৃত শিক্ষা ছিল না, ইউরোপীয় ভাবধারার সাথে আদৌ কোন পরিচয় ছিল না, ছিল না কোন নাগরিক কৃত্রিমতা। পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায় অবস্থিত তাঁর জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় তিনি কথা বলতেন। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি বহু সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের মনে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত তাঁর ধ্যান-ধারণার ছাপ ফেলেছিলেন; কারণ সেগুলি ছিল যেমন অনন্য, তেমনি অপরাপর মতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্য। কলকাতার অনেক ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন আদিম সরলতায় মণ্ডিত এক সাধু পুরুষকে, যিনি পুরাগত ও আধুনিক কালের সকল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। এসব জিজ্ঞাসুদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, যিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করতে গিয়ে রামকৃষ্ণের মধ্যে খুঁজে পান মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো একজন সত্যিকার আধ্যাত্মিক মানুষকে। ১৮৭৫ সালের দিকে কেশবচন্দ্র তাঁর *ইন্ডিয়ান মিরর* ও *সুলভ সমাচার* সাময়িকী দু'টিতে দক্ষিণেশ্বরের ঐ সাধক সম্পর্কে বিশেষ প্রচারণা দেন। রামকৃষ্ণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর কাছে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃস্টান, সুফি, সাধু, পণ্ডিত, অভিনেতা, বুদ্ধিজীবী ও সব রকম সাধারণ আগন্তুকের ভিড় বাড়তে থাকে। এঁরা বছরের পর বছর তাঁর ধর্মালোচনা শুনতে থাকেন। তিনি নিজেও অনেক ব্যক্তির সাথে দেখা করে এবং অনেক সমাবেশে উপস্থিত হয়ে মতবিনিময় ও অন্যদের মূল্যায়ন করতেন।

এই প্রক্রিয়ায় রামকৃষ্ণ অনেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ প্রথম সারির ব্রাহ্মগণ। ব্রাহ্মধর্মে কেশবের আগেই বিজয়কৃষ্ণ ভক্তির প্রচলন করেছিলেন। এখন ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দেখার রামকৃষ্ণীয় ধারণাটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করলো। কেশবের 'নববিধান'-এ ধর্ম সম্পর্কে রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ দেখা যায়।[৪০] বিজয়কৃষ্ণ যে পুনরায় সাকার উপাসনার বিকল্প গ্রহণ করেছিলেন এই ব্যাপারে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। এমনকি শিবনাথ শাস্ত্রীকেও দেখা গেছে ঈশ্বরকে মা বলে সম্বোধন করতে।[৪১] কিন্তু যে তরুণ জিজ্ঞাসু

৪০. প্রফুল্ল কুমার দাস, "সমসাময়িক বাংলার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব", স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী চৈতন্যানন্দ (সম্পা.), *বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ*, ২য় সং, (কলকাতা ১৯৮৮), ৩০৮।

৪১. *তদেব*, ৩০৮-০৯।

একেবারে ব্রাহ্মমহল ছেড়ে এসে রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হলেন তিনি ছিলেন প্রতিভাবান নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রের মতো আরো কিছু সংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু তরুণ রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণের কিছু আগে গুরু রামকৃষ্ণ তাঁদের বারো জনকে (নরেন্দ্রনাথসহ) সন্ন্যাসজীবনে দীক্ষা দেন। এভাবে প্রতিষ্ঠাতার নিজের চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীসঙ্ঘের জন্ম হলো।

রামকৃষ্ণ কোন নতুন ধর্ম প্রচার করেন নি, কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নি, সৃষ্টি করেন নি জটিল কোন ধর্মমত। তিনি বহুদেববাদ, প্রতিমাপূজা ও গুরুবাদসহ পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকেই সমর্থন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে পৌরাণিক দেবদেবী এক পরমেশ্বরের বিবিধ গুণের প্রতিনিধিত্ব করেন। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে তিনি অদ্বৈত বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদ সমর্থন করেন, কিন্তু তা থেকে 'মায়া'র ধারণাটি বাদ দেন। এভাবে তিনি পৌরাণিক বহুদেববাদ দ্বারা ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদের শুষ্কতা পরিহার করেন এবং মায়া পরিত্যাগ করে তিনি তাঁর ধর্মকে শঙ্করাচার্যের উদাসীনতা থেকে রক্ষা করেন। রামকৃষ্ণ একজন আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন এবং তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক জীবন ছিল একটি আনন্দময় ব্যাপার। বস্তুত 'আনন্দ' শব্দটি তাঁর ধর্মীয় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ।[৪২] রামকৃষ্ণ আরো শিক্ষা দেন যে, ধর্ম জিনিসটি সমাজসংস্কার বা কতগুলি ধরাবাঁধা নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্যের ব্যাপার নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে দিব্যজ্ঞান লাভের ব্যাপার। আসলে ব্যক্তিগত দিব্যজ্ঞান লাভ ঐ সময় বেশ কয়েকজন ধর্মনেতার অদম্য আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে উঠে। এই জিজ্ঞাসুদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ছাড়া আরো ছিলেন কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, যেজন্য তিনি একবার হিমালয়ে গিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক চৈতন্য লাভের আশায়। এ ছিল রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট বিদ্যায়তনিক ও যুক্তিবাদী ধরনের ধার্মিকতা থেকে একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ব্যক্তিগত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বাইরের জ্ঞান কিংবা আচার পালন অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিঃশর্ত বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সাথে মিলনের নিমিত্ত এক অকৃত্রিম আকুতি। সনাতন হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার যে তিনটি পথের নির্দেশ আছে, রামকৃষ্ণ সেগুলির মধ্যে ভক্তিকেই সাধারণ নরনারীর জন্য সবচেয়ে উপযোগী বলে তাঁর পছন্দের কথা ব্যক্ত করেন, যদিও জ্ঞান ও কর্মের যাথার্থ্যও তিনি যথারীতি স্বীকার করেছেন। বেদ বা শাস্ত্র নয়, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির বিবেকের অনুশাসনই আধ্যা-ত্মিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী বলে রামকৃষ্ণ মনে করতেন। এর অর্থ ঈশ্বরলাভের জন্য সৃজনশীল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পদ্ধতি এবং উপাসনায় বহুপথ অবলম্বনের স্বীকৃতি। নিজ ধর্মজীবনে রামকৃষ্ণ চিরাচরিত নিয়ম ও প্রথা ভঙ্গ করে এক স্বনির্দেশিত পথ অনুসরণ করতেন। তিনি আরো দাবি করেন যে,

---

৪২. রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীদের সকলেরই সন্ন্যাস নামের শেষে 'আনন্দ' শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধর্মের অনুমোদিত বিবিধ পথ ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করে তিনি দেখেছেন যে, সেগুলি সবই আধ্যাত্মিক প্রগতির সঠিক পন্থা বটে। এই পদ্ধতিতে তিনি উপনীত হন তাঁর বিখ্যাত "যতো মত ততো পথ"-এর নীতিতে, অর্থাৎ যতো ধর্মমত আছে আধ্যাত্মিক রাস্তাও রয়েছে ততোগুলি। এর সরল অর্থ ছিল এই যে, পৃথিবীর ধর্মসমূহ একই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার বিবিধ পন্থা মাত্র। কিন্তু সমন্বয়ের নামে নানাধর্মের মিশ্রণ ঘটানোর কোন আহ্বান ছিল না এতে। ধর্মসমূহের বাইরের একরূপতার পরিবর্তে রামকৃষ্ণ তাদের ভেতরের একত্বের উপর জোর দিতেন। কোন জটিল নব্যমত নয়, বরং একই লক্ষ্যের অভিমুখে সহযাত্রী হিসেবে বিভিন্ন ধর্মমত এবং নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে সহানুভূতি ও সদ্ভাব থাকতে হবে—এই ছিল "যতো মত ততো পথ"-এর নির্দেশ। রামকৃষ্ণ তাঁর বিশিষ্ট সর্বেশ্বরবাদ (অদ্বৈত বেদান্ত থেকে 'মায়া' বাদ দিলে যা থাকে) থেকে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-র আদর্শ নিষ্কাশিত করেন।

উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি একজন মহান অধ্যাত্মবাদী ছিলেন, যিনি ধর্মের বাইরের দিকগুলি নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং পাশ্চাত্য জড়বাদের আক্রমণ—এই উভয় থেকে ধর্মের আধ্যাত্মিক মর্মটিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে গেছেন। পৃথিবীর ধর্মসমূহের আধ্যাত্মিক অভিন্নতার উপর জোর দিয়ে তিনি সাধারণভাবে সকল ধর্মের পক্ষেই কাজ করেছিলেন, কেবল হিন্দুধর্মের পক্ষে নয়। এই স্তরে তিনি প্রকৃতপক্ষে এক বিশ্বসংহতির জন্য কাজ করেছিলেন, যা আর্নল্ড টয়েনবি লক্ষ্য করেছেন। ১৯৭০ সালে টয়েনবি উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবীর ধর্মগুলির মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সাক্ষ্য দেন তার সঙ্গে সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার নীতি মিলে এমন একটি মনোভাব ও চেতনা সৃষ্টি করে, যা গোটা মানবজাতির পক্ষে এক সাথে একটি পরিবাররূপে বেড়ে উঠা সম্ভব করে তুলতে পারে।[৪৩]

অপর একটি সঙ্কীর্ণতর স্তরে রামকৃষ্ণের ধর্মীয় দর্শন পূর্বপুরুষের ধর্মে শিক্ষিত হিন্দুদের আস্থা ফিরিয়ে আনে এবং তাদের দীর্ঘকাল লালিত হীনমন্যতার অবসান ঘটায়। হিন্দু তরুণেরা তাদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসই শুধু ফিরে পেল না, তারা গর্ববোধ করতে লাগলো তাদের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ধর্মীয় উত্তরাধিকারের জন্য, যার প্রশস্ত অঙ্গনে সকল ধর্মের সত্যসমূহ নিহিত আছে বলে তাদের ধারণা জন্মালো। সহজবোধ্য রূপক ও লোককাহিনী ব্যবহার করে এবং উপস্থাপনায় সাধারণভাবে পুরাণের লৌকিক স্বাদ মিশিয়ে রামকৃষ্ণ ধর্মে প্রাণবন্ততা, মাধুর্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আসেন, যা ব্রাহ্ম ও মিশনারি ঐতিহ্যে অজানা ছিল। মোটের উপর রামকৃষ্ণের পুনর্ব্যাখ্যা হিন্দুধর্মকে এমন একটি অবস্থানে এনে দাঁড় করালো যেখান থেকে একটি গতিশীল ধর্ম হিসেবে যাত্রা শুরু করা তার পক্ষে সম্ভব

৪৩. *স্বামী গহনানন্দ*, *শ্রীরামকৃষ্ণ এ্যান্ড হিজ ইউনিক ম্যাসেজ* [শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অনন্য বাণী] ৩য় সং, (লন্ডন ১৯৭০), সাত (মুখবন্ধ)

হলো। আধুনিক হিন্দুধর্মের এই নতুন পর্যায়ের নায়ক ছিলেন রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। এখন আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরাবো।

উনিশ শতকের শেষ দশকে বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এক নব্য বেদান্তের উদ্ভব ঘটিয়ে নব্যহিন্দুবাদের বিবর্তন সম্পূর্ণ করেন। নব্যহিন্দুবাদ মোটেই কোন একক আন্দোলন ছিল না। আদি ব্রাহ্মদের দ্বারা হিন্দুধর্মের পুনর্মূল্যায়ন থেকে শুরু হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সহযোগী হিসেবে এর বিকাশ চলতে থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের নব্যশাক্তবাদ (দুর্গাকে দেশমাতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা) ও নব্যকৃষ্ণবাদের মধ্য দিয়ে। এই শেষোক্ত মতটি বিজয়কৃষ্ণের নব্যবৈষ্ণববাদের সহায়ক হয়। বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য অশ্বিনীকুমার দত্তের নব্যভক্তিবাদ ওই ধারাকে আরো পুষ্ট করে। অবশেষে বিবেকানন্দ নব্যবেদান্তের উপসংহার দিয়ে শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই নব্যহিন্দুবাদের আবর্তন সম্পূর্ণ করলেন।

গড়ে উঠার বছরগুলোতে নরেন্দ্রনাথের (১৮৮৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের আগে বিবেকানন্দের গৃহনাম) মধ্যে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজ শ্রেণীর (মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু) নানা উদ্বেগ। ১৮৭০-এর দশকে তিনি শরীরচর্চার জন্য নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল জিমনেসিয়াম বা জাতীয় ব্যায়ামাগারে যেতেন এবং সতত যাতায়াতের ফলে হিন্দুমেলাও তাঁর মনের উপর ছাপ ফেলে।[৪৪] যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি লেখাপড়া করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং রেভারেন্ড হেস্টির জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৮৮৪ সালে বি. এ. পাশ করেন। কলেজে পড়ার বছরগুলোতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে বিরাট ওলটপালট চলতে থাকে এবং তিনি "হিন্দু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিদ্রোহী হয়ে উঠেন।"[৪৫] এই মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের তিন উপ-সম্প্রদায়েরই দ্বারস্থ হন। কিন্তু প্রশান্তির সাক্ষাৎ পান নি কোথাও। এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর সতীর্থ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন :

> মিলের *থ্রী এসেজ অন রিলিজ্যন* [ধর্মবিষয়ক তিনটি নিবন্ধ] তাঁর [নরেন্দ্রনাথের] বাল্যকালীন ঈশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মসমাজ থেকে পাওয়া সহজ আশাবাদ বিধ্বস্ত করে দেয় [আস্তিক্যের সপক্ষে]।

---

৪৪. কয়েক বছর পর ১৮৮৬ সালে নরেন্দ্রনাথ জনৈক বন্ধুর সাথে *সঙ্গীত কল্পতরু* নামে যে বৃহদায়তন গানের সঙ্কলন প্রকাশ করেন তাতে হিন্দুমেলার অনেক গান 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে স্থান পায়। প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য*, (কলকাতা ১৯৬৩), ৬ (মুখবন্ধ)।

৪৫. *দ্য লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ বাই হিজ ঈস্টার্ন এ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসসাইপল্‌স্* [স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যদের প্রণীত তাঁর জীবনী] ২ খ., ৫ম সং, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, (কলকাতা ১৯৭৯-৮১), ১ ঃ ১০৩ (অতঃপর *দ্য লাইফ* রূপে উল্লেখিত)।

> কারণ ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুক্তি আঁকড়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। তখন কোন বন্ধু তাঁকে হিউমের সন্দেহবাদ এবং হারবার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়তত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসাহিত করে এবং ক্রমে তাঁর অবিশ্বাস এক স্থায়ী দার্শনিক সন্দেহবাদের রূপ নেয়।[৪৬]

তবে পরিণামে নরেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ঐ ক্লিষ্ট সন্দেহবাদীর উপর জয়লাভ করে। বিশেষত শেলীর কবিতাবলী তাঁর ভেতরকার রোমান্টিক আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন ঘটায় :

> বুদ্ধিবৃত্তিক সৌন্দর্যচেতনার উদ্দেশ্যে লেখা শেলীর স্তোত্র, তাঁর নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের সর্বব্যাপিত্ব এবং তাঁর সহস্রবর্ষব্যাপী গৌরবোজ্জ্বল মানবতার কল্পনা নরেন্দ্রনাথকে আন্দোলিত করে।... বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রেম যন্ত্র মাত্র রইলো না। তার মধ্যে ঐক্যের এক আধ্যাত্মিক সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল।[৪৭]

অপরিহার্যভাবেই নরেন্দ্রনাথের রোমান্টিক চিত্ত রামকৃষ্ণের সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিকতায় স্বস্তি খুঁজে পেল, যেহেতু রামকৃষ্ণের বৈশ্বিক চেতনা সকল বহুত্বকে দ্রবীভূত করেছিল এক চরম অদ্বৈত তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্নতায়।

রামকৃষ্ণের অদ্বৈত বেদান্ত নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সন্ধিৎসা মেটালেও ঐ সময়ে তাঁর দেশ যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর যেসব প্রশ্ন ছিল সেগুলির জবাব দিতে পারে নি। এই অসম্পূর্ণতার মোকাবেলার জন্য নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য উৎসের দ্বারস্থ হন। এসব উৎসের অন্যতম ছিল গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা। এখানে তিনি দুঃখক্লিষ্ট মানবজাতির জন্য করুণার সন্ধান পান। তাই তিনি সানন্দে প্রস্তাব দেন : "তাহলে আসুন আমরা ব্রাহ্মণদের বিস্ময়কর মেধার সাথে ঐ মহান গুরুর [অর্থাৎ বুদ্ধের] হৃদয়, উন্নত আত্মা এবং বিস্ময়কর মানবিকায়নশক্তির সংযোগ সাধন করি।"[৪৮] কালে এই যৌগিক বেদান্ত ইসলাম থেকেও 'শক্তি' উপাদানটি আহরণের প্রয়াস পায় :

> ইসলামের সহায়তা ছাড়া বেদান্তের তত্ত্বসমূহ, তা যতোই চমৎকার ও বিস্ময়কর হোক না কেন, বিশাল মানবসমাজের কাছে পুরোপুরি নিরর্থক। ... আমাদের নিজ মাতৃভূমির জন্য হিন্দুত্ব ও ইসলাম এই দুই মহান ব্যবস্থার সংযোগ। অর্থাৎ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামিক শরীরই হচ্ছে একমাত্র আশা।[৪৯]

এভাবে দেখা যায়, বেদান্তের বিশ্বজনীনতা, বৌদ্ধধর্মের মানবতা এবং ইসলামের শক্তি (অন্য কথায় ব্রাহ্মণ্য মস্তিষ্ক, বৌদ্ধ অন্তঃকরণ এবং ইসলামিক শরীর) সংযোগেই তৈরি হয়েছিল বিবেকানন্দের সমন্বয়ী ধর্ম, যা তাঁর মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করবে বলে অনুমান

---

৪৬. তদেব, ১ : ১০৭।

৪৭. শীলের প্রতিবেদন, তদেব, ১ : ১০৮।

৪৮. বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি, অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর, *বিশ্ব-বিবেক,* (কলকাতা ১৯৬৩), ৪৪৫।

৪৯. ১৮৯৮ সালে জনৈক মুসলিম গুণগ্রাহীর কাছে বিবেকানন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করেন। *দ্য লাইফ,* ২ : ৩৩৩।

করা হয়েছিল। এছাড়া খৃস্টধর্মের দৃষ্টান্ত, বিশেষত এর চমৎকার সংগঠন, সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। বস্তুত তাঁর দেশবাসী মানুষকে সেবা দানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যন্ত্র হিসেবে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে যে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন তা ছিল খৃস্টীয় গীর্জারই একটি প্রাতিষ্ঠানিক অনুকরণ।

এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল পাশ্চাত্যের বস্তুগত সাফল্যের তুলনায় ভারতের চরম দুরবস্থার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দ লাভ করেছিলেন, তা। ১৮৯০ সালে তিনি ভারতের সকল অঞ্চলে ব্যাপক ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষ করেন এক বিশাল সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এবং তাঁর স্বদেশবাসী জনগণের চরম দুর্দশা। এই অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তরে এক আহত জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করে এবং লক্ষ লক্ষ পদদলিত মানুষের উদ্ধার সাধনের জন্য এক গভীর উদ্বেগের জন্ম দেয়। তিন বছর পর শিকাগোর 'পার্লামেন্ট অব রিলিজ্যন'-এ বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক উপস্থিতি এবং আরো পরে আমেরিকা ও ইউরোপে তাঁর ব্যাপক ভ্রমণের ফলে ভারতের অবিশ্বাস্য রকমের অবনত অবস্থা এবং জাতি হিসেবে দেশটির সুগভীর অধঃপতনের বিষয়টি তাঁর বিবেকের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বদেশ ও উন্নত বিশ্বে এই সব চোখ-খুলে-দেয়া ভ্রমণের পরিণতিতে ১৮৯৫ সালের মধ্যেই বিবেকানন্দ প্রণয়ন করেন ভারত তথা পৃথিবীর প্রতি তাঁর দেয় বার্তা, যাকে তিনি বলতেন 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' বা ব্যবহারিক বেদান্ত।

বিবেকানন্দের নতুন ধর্মে মানবসেবা ছাড়া অপর উপাদান ছিল শক্তি। 'শক্তি' বলতে তিনি বুঝতেন নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বিশেষত শারীরিক শক্তি। শক্তিই তাঁর মিশনের প্রধান সুর বলে মনে হয় : "আমার ধর্মের সারবস্তু হচ্ছে শক্তি। যে ধর্ম অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে না সে ধর্ম ধর্মই নয় এবং শক্তির চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।"[৫০] আরো বিখ্যাত একটি উক্তি হচ্ছে : "*ভগবদ্‌গীতার* চেয়ে ফুটবলের মাধ্যমে তোমরা ঈশ্বরের বেশি কাছে পৌঁছতে পারবে।"[৫১] আর সেই *গীতাও* বুঝতে হবে একমাত্র শক্তির নিরিখেই : "*গীতা* তোমরা আরো ভাল বুঝতে পারবে তোমাদের হাতের পেশীর সাহায্যে।... আমি যা চাই তা হচ্ছে লোহার তৈরি পেশী আর ইস্পাতের তৈরি স্নায়ু...।"[৫২] উপরেই জানানো হয়েছে, বিবেকানন্দ আসলে একটি শক্তির ধর্ম সৃষ্টির জন্যই বেদান্ত ও ইসলামের সমন্বয়ের কথা

---

৫০. অশ্বিনীকুমার দত্তের সাথে বিবেকানন্দের আলোচনা, *দ্য লাইফ*, ২, ৩৫৪।

৫১. উদ্ধৃত, বারবারা সাদার্ড, "বিবেকানন্দ : দ্য সার্চ ফর এথিক্যাল ভ্যালুজ এ্যান্ড ন্যাশনাল প্রগ্রেস আন্ডার ইন্ডিজেনাস লিডারশিপ' [বিবেকানন্দ : দেশীয় নেতৃত্বের অধীনে নৈতিক মূল্যবোধ ও জাতীয় প্রগতির সন্ধান], জগদীশ প্রসাদ শর্মা (সম্পা.) *ইন্ডিভিজুয়ালস এ্যান্ড আইডিয়াজ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া : নাইন ইন্টারপ্রেটেটিভ স্টাডীজ* [আধুনিক ভারতে ব্যক্তিত্ব ও ভাবনা : নয়টি ব্যাখ্যামূলক নিবন্ধ], (কলকাতা ১৯৮২), ১৩৬।

৫২. উদ্ধৃত ত্রিপাঠী *এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ*, ২৩।

ভেবেছিলেন। শক্তসমর্থ দেহ, স্পন্দিত গতিভঙ্গি ও উজ্জ্বল চোখের অধিকারী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বই যেন ছিল তাঁর শক্তির বাণীর প্রতিমূর্তি; এবং সত্যি সত্যিই তিনি 'যোদ্ধা সন্ন্যাসী', 'অশ্বারোহী সাধু', 'ঘূর্ণিঝড়ের মতো হিন্দু', 'পাহলোয়ান স্বামী' এই ধরনের নানা নামে বর্ণিত হয়েছেন।

রামকৃষ্ণের "যতো মত ততো পথ" সূত্র প্রয়োগ করে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বহু সংখ্যক সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে এক নতুন ঐক্য আনার প্রয়াস পান। এসব সম্প্রদায় ও মতকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার বিভিন্ন পথ হিসেবে দেখা হলো। কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে ধর্মের নামে প্রচলিত যেকোন আজেবাজে আচরণকে বিনা প্রশ্নে অনুমোদন দিতে হবে। আসলে বিবেকানন্দ তান্ত্রিক বামাচার ও রাধাকৃষ্ণভক্তের মতো সম্প্রদায়গুলির কঠোর সমালোচনা করেছেন তাদের নৈতিক নৈরাজ্যের জন্য। অপরপক্ষে তিনি "যতো মত ততো পথ" ধারণাটির বিস্তার সাধন করে সকল ধর্মের ঐক্যও ঘোষণা করেন। তাঁর মতে আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা হিসেবে সকল ধর্মই সমভাবে সত্য, যদিও বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদই মূল বিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত; এর কারণ তার দার্শনিক প্রশস্ততা তথা অন্যান্য মতের সাথে তার খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা। এই ব্যাপারটিকে একটা ধর্মসমন্বয় বলে যে প্রায়ই দাবি করা হয়ে থাকে তা আসলে ঠিক নয়। বরং এটি ছিল সহনশীলতা, সহযোগিতা এবং পরস্পর বোঝাপড়ার একটি ব্যবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্ররচিত *গীতার* ভাষ্যে (বিশেষত ৪.১১ শ্লোক) ধর্মীয় বহুলতা ও অসহনশীলতার এই বৈদান্তিক সমাধানের সমর্থন ছিল।[৫৩] বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার এই নতুন পরিকল্পনায় হিন্দুধর্মের কেন্দ্রীয় অবস্থান, ইতিহাসে এর চিরন্তনতা, বেদান্তের প্রশস্ত সর্বেশ্বরবাদ এবং তা থেকে উৎসারিত মানবসেবার নীতি—এই সব কিছু মিলে হিন্দুধর্মের জন্য 'সকল ধর্মের মাতৃস্বরূপ' পদবিটির যাথার্থ্যের উপলব্ধি আনে।

ধর্মপ্রবক্তা হিসেবে বিবেকানন্দ বিশ্বের সামনে রামকৃষ্ণের পুনর্ব্যাখ্যাত হিন্দু ধর্মকে একটি মাতৃধর্মরূপে পেশ করেন এবং সকল ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির আহ্বান জানান। উপরন্তু তিনি দক্ষিণ এশীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে না দেখে এক উচ্চতর কৃষ্টির দু'টি সম্ভাবনাময় উপাদান হিসেবে অবলোকন করেন। তিনি মনে করেন, তাদের উভয়েরই সবলতা ও দুর্বলতার দিক আছে এবং পারস্পরিক সুবিধার্থে সেগুলির একটি অপরটির অভাব পূরণ করতে পারে। বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় 'জড়বাদী' পাশ্চাত্যের রয়েছে ভারতের কাছ থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ নেয়ার প্রয়োজন, আর ভারতকে অবশ্যই পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিখতে হবে বিজ্ঞান এবং সমাজপ্রগতির কৌশল। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সহযোগিতার এই আহ্বানে বিবেকানন্দ বিশ্বে এক নতুন সাংস্কৃতিক ঐকতানের কল্পনা করেন এবং নব্যহিন্দু আন্দোলনের শুরু থেকে ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাচর্চার যে আদর্শ অনুসৃত হয়ে আসছিল তার প্রতি সমর্থন দেন। অতএব ভারত শুধু একতরফাভাবে পাশ্চাত্য থেকে ঋণই নেবে না, বিনিময়ে কিছু দিতেও পারবে। সে

---

৫৩. দেখুন, *বঙ্কিম রচনাবলী* ২:৭৬৭-৭০।

পাশ্চাত্যের ভৌত সমৃদ্ধির সাথে নিজের আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার বাণিজ্য করবে। মনে হলো, ভারত ও পাশ্চাত্যের দুই ভিন্ন ধরনের পরস্পর সম্পূরক সঙ্কটে বিবেকানন্দ উভয়ের ত্রাণকর্তা হিসেবে অবস্থান নিয়েছেন।

ভারতের পুনরুজ্জীবন ও পাশ্চাত্য জগতে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারের জন্য নিজের 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন স্বামী ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারত, আমেরিকা ও ইউরোপে তার শাখা স্থাপিত হয়। উক্ত দুই কার্যক্রমের কোনটাই আজ পর্যন্ত পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় নি, কিন্তু মিশন দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান সেবা দিতে পেরেছে এবং পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্মের মর্যাদা ও ঐ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে বিবেকানন্দের নেতৃত্বে হিন্দুধর্ম ভারতে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে এবং পাশ্চাত্য জগতে জড়বাদের উত্থানকে চ্যালেঞ্জ করে একটি আত্মনির্ভরশীল মিশনারি ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বিবেকানন্দ নব্যহিন্দুবাদের তাত্ত্বিক বিকাশ সম্পূর্ণ করে তাকে সামাজিক ও নৈতিক নেতৃত্ব তথা অগ্রবর্তী প্রচারবাদী ভূমিকা গ্রহণের পথে স্থাপন করেন। তাঁর নব্যহিন্দু চেতনা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে বিকাশ- লাভ করে। বাংলায় স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে তথাকথিত চরমপন্থী রাজনীতির উপর নব্যহিন্দু আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ এবং ভগিনী নিবেদিতার মতো চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ মুখ্যত বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে স্বদেশী যুগের রাজনীতি ও চিন্তাধারায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন কোন অবদান রাখেন নি বললেই চলে। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে বাংলা সাহিত্যের উপর নব্যহিন্দুবাদের বিরাট প্রভাবের মূল্যায়ন এ প্রবন্ধের আওতার বাইরে। তবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যম যে কিছু সময়ের জন্য নব্যহিন্দুবাদের প্রেরণাধীন ছিল, এই ঘটনা থেকেই ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুমান করা যায়।[৫৪] বস্তুত যেমনটি আমরা আগেই দেখে এসেছি, নব্যহিন্দু আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্মের সাথে সাথে এবং বরাবরই তার একটি নিজস্ব রাজনৈতিক চরিত্র ছিল। এটি কেবল হিন্দু বহুত্ববাদের প্রতি খৃস্টান ও ব্রাহ্মধর্মের একেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জের জবাবই ছিল না, বরং ভারতের জাতীয়তা ও স্বাধীনতার প্রতি উপনি-বেশবাদী চ্যালেঞ্জেরও প্রত্যুত্তর ছিল।

---

৫৪. রবীন্দ্রনাথের লেখায় ক্রমবর্ধমান নব্যহিন্দু প্রভাবের জন্য দেখুন, সরকার, *স্বদেশী মুভমেন্ট*, ৫৩-৫৫; আরো দেখুন নাথ, *নিউ হিন্দু মুভমেন্ট*, ২৫৬-৫৭। বাংলা সাহিত্যের উপর নব্যহিন্দু আধিপত্যের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* , ২য় সং. সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, (কলকাতা ১৯৮১)।

দুই. সামাজিক সংস্কার

গোটা উনিশ শতক জুড়েই ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ধরনের সংস্কারকদের কাছেই সমাজসংস্কার একটি প্রধান বিষয় ছিল। রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই সময়ের দুই সর্বপ্রধান সমাজসংস্কারক। তাঁদের দু'জনের মধ্যবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গল দল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কার কার্যক্রম ছিল। আর নব্যহিন্দু আন্দোলন সমাজসংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের ধারণা প্রবর্তন করে।

নারীমুক্তি

গোটা উনিশ শতক ধরে হিন্দু সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল নারী জাতির মুক্তি। রামমোহন রায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় হিন্দু মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, সাধারণ উচ্চশিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরা-ধিকার, এবং নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আরো তুলে ধরতে চেষ্টা করেন হিন্দু নারীদের সেই সব অধিকার, যা প্রাচীন আইনপ্রণেতারা তাদেরকে দিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল।[৫৫] কিন্তু নারীমুক্তির সপক্ষে রামমোহন বাস্তবে যে আন্দোলনটি পরিচালনা করেছিলেন তা হলো সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন।

সতী নারীর বেঁচে থাকার অধিকার

ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণার মাঝখানেই রামমোহন অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন সতীদাহ সংক্রান্ত এক চলমান বিতর্কে, কারণ সতীদাহে হিন্দুধর্মের অনুমোদন আছে বলে মনে করা হতো। তাঁর অংশগ্রহণের সাথে সাথে ঐ দ্বিধাগ্রস্ত বিতর্ক এক শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নিল, যার ফলে তাঁর নিজের নেতৃত্বাধীন মুষ্টিমেয় উদারপন্থী এবং বৃহত্তর নিষ্ঠাবান হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট মেরুকরণ ঘটে গেল। বীভৎস সতীদাহ প্রথা বিলোপের পক্ষ সমর্থন করে রামমোহন ১৮১৮ সালে *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* শীর্ষক চমৎকার বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করলেন এবং সেটিকে অচিরে *এ কনফারেন্স বিটুঈন এ্যান এ্যাডভোকেট ফর এ্যান্ড এ্যান অপোনেন্ট অব দ্য প্রাকটিস অব বার্নিং উইডোজ এ্যালাইভ* নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এখান থেকেই শুরু হলো রামমোহন ও নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মধ্যে বারো বছর (১৮১৮-৩০) স্থায়ী এক দীর্ঘায়িত দ্বন্দ্ব। বিরাট সৎসাহস, গভীর

---

৫৫. রামমোহনের *দ্বিতীয় সম্বাদ*, 'ব্রীফ রিমার্কস' এবং *চারি প্রশ্নের উত্তর*-এ নারীর অধিকারের সপক্ষে বক্তব্য আছে। দেখুন, *রামমোহন রচনাবলী*, ২০২, ২৫৮-৫৯, ৪৯৩-৫০১।

সহানুভূতি, দীপ্যমান বাকপটুতা, অনতিক্রান্ত পাণ্ডিত্য এবং ধর্মযোদ্ধাসুলভ উদ্দীপনা নিয়ে রামমোহন ঐ বিতর্ক লড়তে থাকেন এবং পর্যায়ক্রমে *দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯), সেটির ইংরেজি অনুবাদ (১৮২০) এবং কয়েক বছর পর সতীদাহসমর্থক ও ব্যক্তিগত আক্রমণে নিয়োজিত গোঁড়া পুস্তিকালেখকদের জবাবে আরো দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৫৬]

প্রধানত রামমোহন পরিচালিত আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে একটি আইন (১৮২৯ সালের রেগুলেশন ১২) পাশ করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হলো, যদিও তিনি নিজে জনসাধারণের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক এ ধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। সংস্কারপন্থী ও নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মধ্যকার বিরোধ কিন্তু সেখানেই থেমে গেল না, বরং তা রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' (স্থাপিত ১৮২৮) ও নিষ্ঠাবানদের 'ধর্মসভা' (স্থাপিত ১৮৩০) নামক দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী সমিতি ও তাদের মুখপত্রদ্বয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিল। নৈষ্ঠিক হিন্দুরা ঐ আইনের বিরুদ্ধে দু'টি আবেদনপত্র পেশ করেন—একটি গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর কাছে এবং সেটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আর একটি (তারিখ ৭ জুলাই ১৮৩২) লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে, যেখানে এই দ্বিতীয় আবেদনও উপেক্ষিত হয়।

বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার

কলকাতার ইংরেজি মাধ্যম হিন্দু কলেজে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়াতেন হেনরি ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। তিনি একদল তরুণ হিন্দু ছাত্রকে চরম যুক্তিবাদে দীক্ষা দিলে তারা হিন্দুধর্মকে পুরোপুরি চ্যালেঞ্জ করে বসে। ১৮৩০ সালের নভেম্বরে রামমোহন বৃটেনের উদ্দেশে দেশত্যাগ করলে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত এসব ডিরোজিওপন্থীর উপরই বর্তালো সংস্কারবাদের উত্তরাধিকার। ধর্মসভার সদস্যদেরকে স্বাভাবিক শত্রু হিসেবে জ্ঞান করে ১৮২৮ থেকে ১৮৪৩ সালের মধ্যে নিজেদের পরিচালিত পাঁচটি সাময়িকীতে তাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ জারি রাখেন। উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে তাঁরা যেসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন সেসবের একটা ছিল নারী বিষয়ক সমস্যা। তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেন এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে তাঁরা হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রশ্নটি বিশদভাবে আলোচনা করেন। কারণ সতীদাহ বন্ধ হওয়ার পরে বিধবাদের বাড়তি সংখ্যা একটা ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছিল। তাঁদের পত্রিকা *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* ১৮৪২ সালের এপ্রিল ও জুলাই মাসে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করে, যাতে বিধবাবিবাহের

---

৫৬. রামমোহনের শেষ দুটি প্রকাশনা ছিল (১) *সহমরণ বিষয়* (১৮২৯), (২) *এ্যান এ্যাবস্ট্রাক্ট অব আরগুমেন্টস রিগার্ডিং দ্য বার্নিং অব উইডোজ, কনসিডার্ড এ রিলিজিয়াস রাইট* [ধর্মীয় আচার হিসেবে বিবেচিত সতীদাহ সম্পর্কিত বিতর্কের সারসংক্ষেপ] (১৮৩০)। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রকাশনার মধ্যে ছিল পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশ রচিত *বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ* (১৮২৯)।

প্রশ্নটি পুনর্নিরীক্ষণ করা হয় এবং এই সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষে আন্দোলনের জন্য একটি কর্মপদ্ধতিও নির্দেশ করা হয়।[৫৭] ১৮৪৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত আর একটি নিবন্ধেও বিধবাবিবাহ নিরোধের মতো হিন্দু সামাজিক বিধিনিষেধের সমালোচনা করা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তির ভিত্তিতেই এধরনের বিবাহের সপক্ষে বক্তব্য রাখা হয়।[৫৮] এই প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণকারী নানা সামাজিক দলের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় চলতে থাকে। এই বিতর্কে ধর্মসভা ও ডিরোজিওপন্থীরা দুই চরম প্রান্তের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

এই পটভূমির উপরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) তাঁর বিখ্যাত বিধবা-বিবাহ তথা সাধারণভাবে নারীমুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ডিরোজীয়ানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে সংস্কারপন্থী মাসিক *সর্বশুভকরী পত্রিকায়* 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বাল্যবিবাহকে বাংলায় বালিকাবিধবার সংখ্যাধিক্যের একটি কারণ হিসেবে নির্দেশ করে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় হিন্দু বিধবাদের দুর্দশার বর্ণনা দেন। 'নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার'কে নিন্দা করে তিনি চিন্তাশীল লোকদের প্রতি ঐসব শাস্ত্রবিধি ও প্রথাকে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আবেদন রাখেন। তাছাড়া তিনি বিধবাবিবাহের অনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশের সন্ধানে থাকেন এবং ১৮৫৪ সালে সফল হন। খৃস্টায় যুগের প্রথমদিকে রচিত *পরাশরসংহিতা* বিধান দেয় :

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
>
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ (৪.৩০)
>
> [স্বামী নিরুদ্দেশ হলে কিংবা মারা গেলে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে অথবা পুরুষত্বহীন হলে কিংবা সমাজচ্যুত হলে—এই পাঁচ প্রকার বিপত্তিতে স্ত্রীদের অন্য পতিগ্রহণ বিধিসম্মত।]

এটি ছিল সেই শাস্ত্রীয় নির্দেশ, যা একদা ডিরোজীয়ান পত্রিকা *বেঙ্গল স্পেক্টেটর-এ* উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর অবিলম্বে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* শিরোনামে এক নাতিদীর্ঘ সন্দর্ভ রচনা করেন এবং তা ১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। ২৫ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় লেখক প্রধানত শাস্ত্রবাক্য এবং কিছুটা যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুকূলে জোরালো বক্তব্য রাখেন। পুস্তিকাটি জনসাধারণ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম দুই হাজার কপি এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে আরো তেরো হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা সাথে

---

৫৭. নিবন্ধ দু'টি সঙ্কলিত, বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ৫ খণ্ড, (কলকাতা ১৯৬২-৬৮), ৩ : ৭৭-৮০, ৯০-৯২ (অতঃপর *সমাজচিত্র* রূপে উল্লেখিত)।

৫৮. এই নিবন্ধের উদ্ধৃতি, অমর দত্ত, *ডিরোজিও ও ডিরোজীয়ানস,* (কলকাতা ১৯৭৩), ৮১।

সাথে চার-পাঁচটি পুস্তিকা লিখে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। এর ফলে উদ্ভূত বিতর্ক কলকাতার ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রগুলোকে প্রায় দখল করে নিল। প্রভাবশালী ব্রাহ্ম সাময়িকী *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) বিধবাবিবাহের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। তিনি ঐ পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা পুনর্মুদ্রণ করলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) এবং তাঁর সমর্থনে লিখলেন এক জোরালো সম্পাদকীয় (মার্চ ১৮৫৫)। বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণের সম্পূরক হিসেবে নয় দফা যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য পেশ করে অক্ষয়কুমার নিবন্ধ শেষ করেছেন মানবহৃদয়ের কাছে একটি আবেগময় আবেদন রেখে।

বিতর্ক চলতে থাকে মাসের পর মাস এবং বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় বিষয়টির উপর এক বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। অজস্র কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, প্রহসন, নাটক, গল্প ও নকশা রচিত হয় এই ডামাডোলে। নিষ্ঠাবানদের নেতা রাধাকান্ত দেব বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে মুখোমুখি বিতর্কের আহ্বান জানান। সেই বিতর্কে বিদ্যাসাগর জয়লাভ করেন, কিন্তু গোঁড়াদের বিরোধিতার অবসান হয় না। ধর্মসভা ও 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উত্তরে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে ১৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় পুস্তকে সংযত ভাষায় তাঁর বহুতর প্রতিদ্বন্দ্বীর সকল যুক্তি খণ্ডন করেন। এই বইয়ে তিনি দুঃখ ও বিস্ময়ের সাথে মন্তব্য করেন যে, ভারতে প্রথা ও কুসংস্কার শাস্ত্র অপেক্ষাও অধিক কর্তৃত্বের অধিকারী। উপসংহারে তিনি অতুলনীয় ভাষায় সব দেশের নির্যাতিত নারীসমাজের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেন এবং তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষকে বিচারবুদ্ধিবিহীন ও নীতিবোধবর্জিত বলে অভিযুক্ত করেন।

বিদ্যাসাগর জানতেন যে, আইনগত ব্যবস্থা না থাকলে শুধু বাচনিক বিজয় যথেষ্ট হবে না। তাই তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে সরকারের কাছে এক আবেদন পেশ করেন (৪ অক্টোবর ১৮৫৫)। এতে তাঁর নিজের সহ ৯৮৮ জনের স্বাক্ষর ছিল। অচিরেই একটি বিধবাবিবাহ বিল তৈরি হলো লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আলোচনার জন্য। এ বিলের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আবেদন পড়লো। আবেদনকারীদের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, বিধবাবিবাহ হিন্দু আইন, প্রথা ও ধর্মের পরিপন্থী এবং এর সমর্থনে আইন পাশ করলে তা ব্যাপক সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্ম দেবে। কোন কোন আবেদনে গুরুতর রাজনৈতিক পরিণতির আভাসও দেয়া হয়েছিল। আবার বিলটিকে সমর্থন করেও কতিপয় আবেদন পেশ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৩৭৫টি স্বাক্ষরসম্বলিত ডিরোজিওপন্থীদের একটি আবেদন। এতে সম্পূর্ণ অযাজকীয় বিবাহের ব্যবস্থাসহ আরো আমূল পরিবর্তনসূচক আইন পাশের আহ্বান জানানো হয়। অবশেষে ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিলটি কোন পরিবর্তন ছাড়াই আইনে (১৮৫৬ সালের ১৫ নং আইন) পরিণত হলে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইনগত বাধা দূর হয়।

এখন বিদ্যাসাগর আইনটির বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উদ্যত হলেন। এ ছিল হিন্দু সামাজিক অধিষ্ঠানের সাথে তাঁর মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত। সামাজিক নির্যাতন, গুণ্ডামি ও মামলা-মোকদ্দমার ঝুঁকি নিয়ে তিনি নিজ ব্যয়ে তরুণী বিধবাদের বিয়ে দিতে শুরু করলেন। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রথম বিধবাবিবাহ হয়ে গেল। এমন আরো অনেক বিধবার বিয়ে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এভাবে এগারো বছরে (১৮৫৬-৬৭) তিনি অন্যূন ষাটটি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং এতে ৮২,০০০ রূপীর অধিক অর্থ ব্যয় করে নিজেকে বিপুল পরিমাণ ঋণে নিমজ্জিত করে ফেলেন। এই অভিযানে বিদ্যাসাগর ডিরোজিওপন্থীদের পাশাপাশি ব্রাহ্মসমাজের একাংশের এবং অনেক সাধারণ হিন্দুর নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলেন।

বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন

দ্বিতীয় যে সামাজিক সংস্কারে বিদ্যাসাগর হাত দিয়েছিলেন তা হলো বহুবিবাহ, বিশেষত বাঙালি কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত অতি অদ্ভুত ধরণের বহুবিবাহ নিবারণ।[৫৯] বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আবেদন দাখিলের তিন মাসেরও কম সময়ে তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাশের প্রার্থনা জানিয়ে সরকারের কাছে অনুরূপ আর একটি আবেদন পেশ করেন (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫)। বহুবিবাহের দোষ দেখিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* উপর তার প্রভাব খাটান। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের চেয়ে বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। বিদ্যাসাগরের আবেদনের পর হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষরসম্বলিত আরো ১২৮টি আবেদনে ঐ একই প্রার্থনা জানানো হয়। অপরপক্ষে রাধাকান্ত দেব হিন্দু বহুবিবাহের সমর্থনে এক আবেদন পেশ করেন। ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে সরকার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া বিল তৈরি করে। এমন সময় সিপাহি অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যাওয়ায় আর কোন অগ্রগতি হয় নি। সঙ্কট কেটে গেলে সরকার সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়াকে ঐ সঙ্কটের জন্য আংশিক দায়ী করে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একদল ভারতীয়ও সংস্কারের নামে বিদেশী সরকারকে সমাজ ও ধর্মের ব্যাপারে নাক গলাতে দেয়ার ধারণার বিরোধিতা করেন। তবে সংস্কারবাদীরা সরকারি হস্তক্ষেপে কুলীনদের বহুবিবাহ বন্ধ করার ধারণা ত্যাগ করেন নি। ষাটের দশকের মধ্যভাগে প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপিত হয়। আবেদনের পর আবেদন আসতে থাকে এবং বিদ্যাসাগর আইন দ্বারা হিন্দু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার আবেদন নিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিসিল বিডনের কাছে প্রেরিত

৫৯. কুলীন ব্রাহ্মণেরা চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ততোধিক বিয়ে করতো, কিন্তু বাস করতো এক বা দুই স্ত্রীর সাথে। বাকিরা তাদের পিতামাতা ও ভাইদের সাথে থেকে বঞ্চনাময় জীবনযাপন করতো। আর তাদের স্বামীরা মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে আসতো স্রেফ টাকা-পয়সা আদায় করতে।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬) এক প্রতিনিধিদলে যোগ দেন। এ ব্যাপারে বিডনের প্রাদেশিক সরকারের সহানুভূতি থাকলেও ভারত সরকার রাজনীতির খাতিরে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। দু'জন ইংরেজ এবং বিদ্যাসাগরসহ পাঁচজন ভারতীয় সমবায়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭) যে, যদিও ঐ কুপ্রথা বিলক্ষণ বিদ্যমান, শিক্ষা ও সমাজসচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঐ প্রথার বিরুদ্ধে কোন আইন পাশের সুপারিশ করা হলো না। তবে ভিন্নমত পোষণ করে বিদ্যাসাগর লিখলেন : "আমি একমত হচ্ছি না..., একটি ঘোষণামূলক আইন পাশ করা যেতে পারতো ... ।"[৬০]

এই প্রবীণ সংস্কারক উপলব্ধি করলেন যে, এদেশে বৃটিশের পরোপকারেচ্ছার দিন আর নেই। সরকারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিদ্যাসাগর কলম হাতে তুলে নিলেন এবং বহুবিবাহের কদাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৭১ সালে একটি সংস্কারবাদী সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য তিনি ১৮৬৬ সালে রচিত তাঁর একখানা পুস্তকের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করলেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিস্ময়কর সমাবেশ ছাড়াও বইটিতে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায় বহুবিবাহের চমকপ্রদ পরিসংখ্যানগত উপাত্ত ছিল। ইতিমধ্যে আঠারোশ' সত্তর দশকের কঠিন সময় এসে পড়েছিল এবং বিদ্যাসাগর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হিন্দু নিষ্ঠাবানদের তরফ থেকে নতুন আক্রমণের সম্মুখীন হলেন। বিদ্যাসাগরের পুরনো সমর্থক তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬-৮৫) এখন তাঁর বিপক্ষে গেলেন এবং বহুবিবাহ সমর্থন করে সংস্কৃত ভাষায় এক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। আরো কয়েকজন পণ্ডিতও লিখলেন অনুরূপ বইপুস্তক, যাদের অধিকাংশেরই ভাষা ছিল গালিগালাজপূর্ণ। জবাবে বিদ্যাসাগর গোঁড়াদের সকল যুক্তি খণ্ডন করে আরো বড় একখানা বই লিখলেন (এপ্রিল ১৮৭৩)। তর্কবাচস্পতি কুৎসিত ভাষায় জবাব দিলে বিদ্যাসাগর দুখানি বেনামী পুস্তিকায় তা খণ্ডন করেন। যদিও বিদ্যাসাগরের এসব প্রচেষ্টা সাথে সাথেই কোন অনুকূল ফল প্রসব করে নি, কিন্তু দীর্ঘকালের বিচারে তা বিধবাবিবাহ আন্দোলনের চেয়ে বেশি সফল হয়েছিল। শতাব্দীর শেষ নাগাদ কুলীন বহুবিবাহ আর সমাজের মারাত্মক কোন সমস্যারূপে বিদ্যমান ছিল না।

বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন

বিদ্যাসাগর মনে করতেন, বাংলায় কম বয়সী বিধবার সংখ্যাধিক্যের একটা মূল কারণ বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন। তবে নাবালক ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়ার কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার কাজটি হাতে নেন কেশবচন্দ্র সেন। বিদ্যাসাগর যখন নৈষ্ঠিক হিন্দুদের সাথে তাঁর সংস্কারবাদী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ব্রাহ্মসমাজের

---

৬০. প্রতিবেদনটি পুনর্মুদ্রিত, অরবিন্দ গুহ [ইন্দ্র মিত্র], *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* (কলকাতা ১৯৬৯), ৭৭২-৮৩। উদ্ধৃতিটি ৭৮২-৮৩ পৃষ্ঠায়।

অভ্যন্তরেও অনুরূপ এক দ্বন্দ্ব চলছিল। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন প্রবীণ দল এক ধরনের সাবধানী রক্ষণশীলতা অবলম্বন করে চলছিলেন। তাঁদের মতে, উচ্চশ্রেণীদ্বারা পরিচালিত জাগতিক সংস্কার ধর্মের আধ্যাত্মিকতা তথা ব্যাপক জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর। অপরদিকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর তরুণ অনুসারীরা সমাজসংস্কারকে ব্রাহ্ম কর্মসূচির অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। এই মতভেদ এবং অন্যান্য কারণে ১৮৬৬ সালের ভাঙন ঘটে যায় এবং নবগঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্বীয় সদস্যবর্গের মধ্যে কতিপয় সংস্কার প্রবর্তন করে। ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে এক সফল ভ্রমণশেষে দেশে ফিরে কেশবচন্দ্র তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের তরুণ বর-কনেদের জন্য অযাজকীয় বিয়ের আইন পাশের দাবিতে তাঁর অগ্রগামী বিদ্যাসাগরের অনুকরণে এক আন্দোলন শুরু করেন। এর পরিণতিতে ১৮৭২ সালের ৩ নং আইন পাশ হয়, যাতে বিধান দেয়া হয় যে, যেসমস্ত বর ও কনের বয়স যথাক্রমে আঠারো ও চৌদ্দ বছরের কম নয় এবং যারা নিজেদেরকে হিন্দু, মুসলমান বা খৃস্টান নয় বলে ঘোষণা দেবে তারা আদালতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ঐ আইনে স্ত্রীদেরকেও বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু 'হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃস্টান নই' এরকম ঘোষণা দেয়ার শর্ত যুক্ত হওয়ায় আইনটির বাল্যবিবাহরোধের উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয় নি।

বৈধব্যের উচ্চহার ছাড়াও শিশুবধূর আর একটা বিপদ ছিল তার প্রাপ্তবয়স্ক 'স্বামী' কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার আশঙ্কা। দশ বছরের কম বয়সী বালিকার সাথে সঙ্গম ধর্ষণ বলে ঘোষণা করে ১৮৬০ সালে যে আইন পাশ হয়েছিল তাতে বিদ্যাসাগরের হাত ছিল। ১৮৮৪ সালে বি. এম. মালাবারী নামক পার্সি সাংবাদিক বাল্যবিবাহ ও চিরবৈধব্যের বিশেষ উল্লেখপূর্বক হিন্দু সমাজের কুপ্রথাগুলির উপর তাঁর 'নোটস' বা মন্তব্য প্রকাশ করলে প্রশ্নটি পুনরায় উত্থাপিত হয়। মালাবারী বৃটিশ ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ করে ঐ সমস্যার উপর বহু বক্তৃতা দেন, এমনকি ইংল্যান্ডে গিয়ে বৃটিশ জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। তিনি চেয়েছিলেন, হিন্দু সমাজে শিশুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হোক।

মালাবারীর আন্দোলন ভারতে বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং বাংলার চিন্তাশীল হিন্দুরাও ঐ প্রশ্নে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। জাতীয়তাবাদী ও নব্যহিন্দুবাদী আবহাওয়ায় সাধারণ প্রতিক্রিয়া স্বভাবত নেতিবাচক ছিল। ভাইসরয় ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮) এবং ভারতে প্রধান ইংরেজ কর্মকর্তারাও চেয়েছিলেন হিন্দু জনমত আন্দোলনের অনুকূলে মোড় না নেয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে। ইতিমধ্যে ১৮৯০ সালে ফুলমণির ধর্ষণ মামলা পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক হরি মাইতি তার দশ বছর বয়সী স্ত্রী ফুলমণির উপর বলাৎকার করলে মেয়েটি মারা যায়। কিন্তু আদালত মাইতিকে বেকসুর খালাস দেয় এই যুক্তিতে যে, ঘটনার সময় ফুলমণি তার দশম জন্ম দিন অতিক্রম করেছিল বলে তার ক্ষেত্রে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রযোজ্য ছিল না। এই

ঘটনা মালাবারীর আন্দোলনে বাড়তি গতিসঞ্চার করে। কলকাতার হেলথ সোসাইটি [স্বাস্থ্য সমিতি] এবং পঞ্চান্ন জন মহিলা ডাক্তার বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করার অনুরোধ জানিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান। কিন্তু মালাবারীর শিষ্য দয়ারাম গিদুমল সহবাস সম্মতি আইনের খসড়ায় এমন একটি আপোস ফরমুলা উপস্থাপন করলেন, যাতে বাল্যবিবাহ সরাসরি নিষিদ্ধ করতে না চেয়ে শুধু এই বিধান রাখা হলো যে বারো বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম ফৌজদারি আইনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই বিল হিন্দুদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং হিন্দুরা ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা করতে থাকে। পুনরুত্থানবাদী শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) বিলটির বিরুদ্ধে বাংলায় শোরগোল তুললেন, এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর বিবাহের পর যৌনসঙ্গমের নির্ধারিত বয়সসীমার পরিবর্তে "প্রথম ঋতুর সময়" এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে বিলে পরিবর্তন আনতে চাইলেন। এতে সম্ভবত হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বিদ্যাসাগর যে গুরুত্বারোপ করতেন তারই প্রতিফলন ছিল। বিলটি ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগরের সংশোধনী ছাড়াই পাশ হয়ে যায়। নব্য হিন্দু বুদ্ধিজীবী হিসেবে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ বিল সম্পর্কে বরাবর নীরবতা অবলম্বন করে থাকলেও সেটি পাশ হয়ে যাওয়ার পর মালাবারীর পদ্ধতিকে আক্রমণ করেন : "কিন্তু আমরা মালাবারী ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না।"[৬১] বঙ্কিম আসলে সংস্কারটির বিরোধী ছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্তু তিনি সংস্কারকদের অনুসৃত পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, যে পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু সমাজের চরম মর্যাদাহানিকর চিত্র অঙ্কন করা এবং একটা একক সামাজিক ব্যাধি দূর করতে আইন পাশের জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বঙ্কিম আরো অভিযোগ করেন যে, সমাজসংস্কার নয়, নিজের জন্য খ্যাতি অর্জনই ছিল মালাবারীর আসল উদ্দেশ্য।[৬২]

নারীর শিক্ষালাভের অধিকার

বাল্যবিবাহের ফলে শুধু বালবৈধব্য আর যৌন নির্যাতনের ঘটনাই ঘটতো এমন নয়, ঐ প্রথা মেয়েদের বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা নেয়ার পক্ষেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই নারীমুক্তির কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তথাপি বৃহত্তর অর্থে সত্যিকার অর্থবহ নারীমুক্তির জন্য অপরিহার্য ছিল একটি স্ত্রীশিক্ষা কার্যক্রম। উনিশ শতকের শুরুতে সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাঙালি নারীসমাজ প্রায় পুরোটাই নিরক্ষর ছিল। এই সামগ্রিক অন্ধকারের কারণগুলির মধ্যে ছিল ১. বাল্যবিবাহ, ২. পর্দার নামে মহিলাদের গৃহবন্দি করে রাখা, ৩. লেখাপড়া

৬১. *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৫০৩

৬২. তদেব, ৫০৬।

শিখলে মেয়েরা বিধবা হয় এমন কুসংস্কার, ৪. স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে পুরুষদের আগ্রহের অভাব, ৫. মহিলা শিক্ষিকার অভাব এবং ৬. ঔপনিবেশিক সরকারের অনীহা। তবে উনিশ শতকেব প্রথমদিকের সংস্কারকদের কেউ নারীশিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন এমন কথা জানা যায় না, যদিও রামমোহন রায় মেয়েদের সাধারণ ও উচ্চতর শিক্ষার অনুকূলে লিখেছিলেন।

খৃস্টান মিশনারিরাই স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসেন এবং কতিপয় বিত্তশালী হিন্দু তাঁদের সহযোগিতা করেন। মিশনারিরা ১৮১৯ সালে ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি [কলকাতা তরুণী সমিতি] স্থাপন করে বেশ কয়েকটি স্কুলে শত শত বালিকাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। বিশের দশকে স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু তখন ছাত্রীরা সবাই ছিল সমাজের নিম্নপর্যায়ভুক্ত। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খৃস্টীয় ধ্যানধারণা সঞ্চারের ভয়ে এবং নিম্নবর্ণের মেয়েদের সাথে ক্লাস করার ব্যাপারে কুসংস্কারের জন্য নিজ নিজ কন্যাকে ঐসব প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক হিন্দু লেখক *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণীয় কুসংস্কারগুলির সমালোচনা করা হয়। রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কলকাতা ও অন্য কয়েকটি শহরে বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

১৮৪৯ সালে যখন জে. ই. ড্রিংকওয়াটার বীটন (১৮০১-৫১) কয়েকজন ডিরোজীয়ান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং গুটি কয়েক সনাতনী হিন্দুর সহযোগিতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল [হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়] স্থাপন করলেন, তখন তা একটা বিশেষ সামাজিক তাৎপর্যময় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। ডিরোজীয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৭৮) স্কুলের জন্য অনেক টাকা দান করেন এবং স্কুলের নিজস্ব বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় বাসগৃহের একাংশে স্কুল বসতে দেন। বিদ্যাসাগর অনেক বছর যাবৎ স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারি ছিলেন। প্রখ্যাত প্রগতিশীল লেখক ও শিক্ষাবিদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮) তাঁর দুই মেয়েকে ঐ স্কুলে ভর্তি করেন। এখানে পঠন, হাতের লেখা, পাটিগণিত, পদার্থবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সেলাই, বাংলা ও ইংরেজি শেখানো হতো। স্কুলে বেতন ছিল না, ছিল না খৃস্টান কিংবা কোন নিম্নবর্ণের ছাত্রী। কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলা হতো এবং যেসব ছাত্রীর নিজস্ব যান ছিল না তাদের জন্য স্কুলকর্তৃপক্ষ পর্দাদেয়া গাড়ির ব্যবস্থা রেখেছিলেন। স্কুলের গাড়ির গায়ে বিদ্যাসাগর খোদাই করিয়ে দিয়েছিলেন *মহানির্বাণতন্ত্র-এর* একটি যথার্থ শ্লোক, যার অর্থ মেয়েদেরকেও অত্যন্ত যত্নের সাথে লালনপালন করতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে।[৬৩] এসব সত্ত্বেও রক্ষণশীল হিন্দুরা বীটনের স্কুলের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকেন। ল্যান্ড হোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েশন বা জমিদারসভা এর বিরোধিতা করেছিল এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-৫৯) বালিকাদের স্কুলে যাওয়াকে বিদ্রূপ করে ঝাঁঝালো ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন। পক্ষান্তরে ডিরোজিওপন্থীরা, ব্রাহ্মগণ,

৬৩. *"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত :"—মহানির্বাণতন্ত্র,* ৮.৪৭।

বিদ্যাসাগর ও উদারমনা হিন্দুরা স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তির অনুকূলে বক্তব্য রাখেন, লেখেন, কাজ করেন। রক্ষণশীলদের নেতা রাধাকান্ত দেব কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের স্কুলশিক্ষার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং নিজের বাড়িতেই তাদের জন্য একটি স্কুল চালাতেন। *সংবাদ প্রভাকর, সোমপ্রকাশ* প্রভৃতি সাময়িকী স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখে।

বীটন স্কুল ১৮৫৬ সালে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিদ্যাসাগর তার অর্থনৈতিক সম্পাদক থেকে যান। ১৮৬২ সালে তিনি প্রতিবেদন দেন যে, স্কুলটি ভাল অগ্রগতি করছে, ছাত্রীসংখ্যা বাড়ছে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।[৬৪] এই আশাবাদের ভিত্তি খুব দৃঢ় ছিল না, কারণ ১৮৬৮ সালে *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যে, স্কুলটিতে মাত্র ৩০ জন ছাত্রী অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা লাভ করছে।[৬৫] তবে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগরের নিজস্ব কার্যক্রম ছিল। লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডের (১৮৫৬-৬২) আশ্বাসের উপর নির্ভর করে তিনি স্পেশাল ইনস্‌পেক্টর অব স্কুলস্ [বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ পরিদর্শক] হিসেবে কলকাতার নিকটবর্তী চারটি জেলায় ১৮৫৭-৫৮ সালের নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু ভারত সরকার এবং ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ স্কুলগুলির ভার নিতে অস্বীকার করলে বিদ্যাসাগর বিপুল ঋণের ভারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অনেক হয়রানির পর সরকার অবশেষে ঋণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়, কিন্তু স্কুলগুলি চালু রাখার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। এই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে স্বদেশপ্রেমিক বিদ্যাসাগর ঐ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে বিপন্ন বিদ্যালয়গুলির জন্য কলকাতার বিত্তবান নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে একটি তহবিল খোলেন। এভাবে স্কুলগুলি রক্ষা পেলো এবং নতুন নতুন স্কুলও বসলো।

১৮৬৬-৬৭ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঐ বছর বালিকাদের জন্য ২৮১টি স্কুল ছিল এবং সেগুলিতে ৫৬৩১ জন ছাত্রী লেখাপড়া করতো।[৬৬] ইতিমধ্যে বৃটিশ জনসেবাব্রতী মেরি কার্পেন্টার (১৮০৭-৭৭) ১৮৬৬ সালে কলকাতায় আসেন। সরকারি সাহায্য ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি ১৮৬৯ সালে একটি ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল [শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়] স্থাপন করেন। সামাজিক প্রস্তুতির অভাবের কথা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। তিন বছর পর নর্ম্যাল স্কুল উঠে গেলে তাঁর কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের পরে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুসারীরা সত্তরের দশকে স্ত্রীশিক্ষার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। তবে তাঁদের প্রচেষ্টা প্রধানত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রক্ষণশীল উচ্চবর্ণমহলে পর্দাপ্রথা স্ত্রীশিক্ষার প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি

---

৬৪. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ,* ৩য় খণ্ড একত্রে, (কলকাতা ১৯৭৩), ৪৫২-৫৩।

৬৫. ঐ, ২২৮।

৬৬. ঘোষ, *সমাজচিত্র,* ৪ : ৫১৯।

করেছিল। এজন্য খৃস্টীয় মিশনারিরা ষাটের দশকে 'জেনানা শিক্ষা'র এক কার্যক্রম শুরু করেন। বেতনভোগী শিক্ষিকারা রক্ষণশীল বাড়িগুলোতে গিয়ে ছাত্রীদের শিক্ষাদান করতেন। বেতনের উচ্চহার এবং ছাত্রীদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় এই ব্যবস্থাকে একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বিস্তৃত হতে দেয় নি। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা বাড়িতে তাঁদের স্ত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৬২ সালে আত্মীয়-স্বজনের দৈহিক বাধার মুখে কেশবচন্দ্র তাঁর তরুণী স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে এক ব্রাহ্ম উপাসক সমাবেশে নিয়ে গিয়ে পর্দাপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। ১৮৬৩ সালে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা 'ব্রাহ্ম বন্ধুসভা' স্থাপন করে এক বিস্তারিত সমাজসংস্কার কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হন। ১৮৬৬-এর বিভক্তির পর ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল অংশ কেশবচন্দ্রকে অনুসরণ করে এবং রক্ষণশীল অংশ দেবেন্দ্রনাথের সাথে থেকে যায়। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র মহিলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন এবং তার দু'বছর পর একটি শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের ছাত্রীরা পরে গড়ে তোলেন একটি নারীমঙ্গল সমিতি, যা মেয়েদের সমস্যা ও প্রগতি নিয়ে আলোচনার ফোরাম হিসেবে কাজ করতে থাকে। এরকম একটা সমিতি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল এবং তাঁরা ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পাবনা ও রাজশাহীর মতো দূরবর্তী জেলাগুলোতে বসবাসকারী ব্রাহ্ম মহিলাদের জন্য ডাকযোগে শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণভাবে নারীজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির লক্ষ্যে কেশব সেনের স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবী 'আর্য নারীসমাজ' স্থাপন করেন (১৮৭৭)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মহিলারা 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' গঠন করেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বর্ণকুমারী দেবী স্থাপন করেন 'সখী সমিতি' (১৮৮৬)। জেলাগুলোতেও একই ধরনের বেশ কিছু সংগঠন কাজ করতে থাকে। ব্রাহ্ম সংস্কারবাদীরা মাসিক *বামাবোধিনী পত্রিকা*, সাপ্তাহিক *অবলাবান্ধব* (১৮৬৯), মাসিক *পরিচারিকা* (১৮৭৮) প্রভৃতি মহিলা সাময়িকী প্রকাশ করেন।

কেশবপন্থী ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মদের ঐকান্তিক সংস্কারনীতির বিপরীতে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির সামাজিক বিমুক্তির প্রশ্নে আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ এক অদ্ভুত রক্ষণশীলতা অবলম্বন করেন। ১৮৭৮ সালে কাদম্বিনী বসু স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরপর আরো তরুণী পাশ করেন। এতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে নৈষ্ঠিক আদি ব্রাহ্মরা দ্রুত তত্ত্ব দাঁড় করালেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলি মেয়েদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বেশি কঠিন এবং সেগুলি নিয়ে লেখাপড়া করতে গেলে তাদের নারীসুলভ গুণাবলীর মারাত্মক ক্ষতি হবে।[৬৭] কিন্তু এসব জ্ঞানবিস্তারবিমুখ লোকদের একেবারে হতাশ করে কাদম্বিনী ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু

৬৭. 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, মার্চ ১৮৮১। পুনর্মুদ্রিত, ঘোষ, *সমাজচিত্র*, ২ : ৩৬২-৬৬।

করলেন। ঐ বছরে বি.এ. ডিগ্রি অর্জনকারী দ্বিতীয় মহিলা ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু, যিনি ১৮৮৪ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ এম. এ. পাশ করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক আবেগময় কবিতায় ঐ দুই কৃতী নারীকে অভিনন্দন জানান।[৬৮] আর প্রবীণ বিদ্যাসাগর ক্যাসেল সম্পাদিত এক খণ্ড *ইলাস্ট্রেটেড শেক্সপিয়র* উপহার দিয়ে মেধাবি চন্দ্রমুখীকে সম্মানিত করেন। ১৮৮৭ সাল থেকে মহিলারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে বসার অধিকার পেলেন এবং তাঁদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি হতে লাগলো। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হলে শিক্ষিত ভারতীয় মহিলারা একটি স্মারক কমিটি গঠন করেন এবং তহবিল সংগ্রহ করে তাঁদের সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে হৃদয়বান বান্ধব বিদ্যাসাগরের নামে বীটন স্কুলে একটি ছাত্রীবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চশিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙালি মহিলারা উনিশ শতকের শেষপাদে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, সমাজসেবা তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো নানাক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেন। তবে এই অগ্রগতির বিস্তার ছিল খুবই সীমিত এবং তার প্রায় পুরোটাই ব্রাহ্মসম্প্রদায় ও উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের একাংশের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থেকে যায়। মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের দেশে বৃটিশ উপনিবেশবাদ যে ধরনের আর্থ-সামাজিক জঙ্গমতার জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত ছিল ঐ সীমাবদ্ধতার কারণ।

তিন. সংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্র

জাতিভেদবিরোধী আলোচনা

উনিশ শতকে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত আন্দোলন হয় নি, যদিও ঐ প্রথা ও তার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দসহ কয়েকজন সংস্কারক প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছিলেন। রামমোহন তাঁর লেখার অনেক জায়গায় জাতিভেদের কুফল সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং *বজ্রসূচি* নামক যে মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থে জাতিভেদকে কঠোর ভর্ৎসনাময় ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে সেটিরও আংশিক তরজমা করেছিলেন। ডিরোজিওপন্থীরাও হিন্দুধর্মের অন্য সকল প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস ও আচরণের মতো জাতিভেদেরও কঠোর সমালোচনা করেন। ডিরোজীয়ান রামতনু লাহিড়ী ও ব্রাহ্ম রাখালদাস হালদার তাঁদের ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষদের শেষ চিহ্নরূপে বিদ্যমান উপবীতসূত্র পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণদের সাথে কায়স্থ জাতীয় ছাত্রদেরও বেদের পাঠক্রমে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেন। অব্রাহ্মণ বংশীয় কেশবচন্দ্র সেনকে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদ দিয়েছিলেন। পরে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুচর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপবীত ত্যাগ, ব্রাহ্মদের মধ্যে জাতিভেদ বিলোপ, অসবর্ণ বিবাহ এবং জাতির প্রসঙ্গ উহ্য রেখে পৌরোহিত্য করার অধিকারসহ

৬৮. 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে' শীর্ষক কবিতা, *হেমচন্দ্র রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, (কলকাতা ১৯৭১), ৪১৮-১৯।

আরো মৌলিক সংস্কার দাবি করেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে আর একজন উদ্যমী সক্রিয়তাবাদী ছিলেন কেশবানুসারী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫)। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তিনি নিজে 'অস্পৃশ্য' লোকদের সাথে আহার করে এবং তাদেরকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য' শীর্ষক লেখা দু'টিতে জাতিভেদকে আক্রমণ করেন এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিকে নিকৃষ্ট সমাজতত্ত্ব বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও মনে করতেন, জাতিভেদ কেবল বিদেশী দখলদারির আমলেই জরুরি। তাছাড়া তিনি একটি নমনীয় জাতিপ্রথার কল্পনা করেছিলেন, যেখানে একটি বিশেষ আচরণবিধি অনুসরণ করে ব্যক্তি সামা-জিক সোপান ধরে উপরে উঠতে পারতো।[৬৯] জাতিপ্রথার এসব সমালোচনা প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল করে দেয় এবং এর প্রয়োজনীয়তা, বৈধতা ও ঐতিহাসিক ফলাফল সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু সংস্কারকদের অর্ধোদ্যম, ব্রাহ্ম আন্দোলনের ব্যর্থতা, পুনরুত্থানবাদীদের বিরোধিতা ও নব্যহিন্দুদের ঔদাসীন্যের ফলে সামগ্রিকভাবে জাতিপ্রথায় কোন বড় পরিবর্তন সাধিত হয় নি।

মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন

১৮৫০-এর দশক নাগাদ কলকাতার যুবসমাজে, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষিত গোষ্ঠীটিতে পানাসক্তি ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করেছিল। সমকালীন বাংলা সাহিত্য ঔপনিবেশিক ইঙ্গবঙ্গ কৃষ্টির এই দোষাবহ দিকটির অজস্র সাক্ষ্য বহন করে।[৭০] ১৮৬০ সাল নাগাদ একাধিক সাহিত্যকর্মে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতে শুরু করে। এসব লেখার মধ্যে ছিল মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রহসন *চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা* (১৮৫৮), প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) উপন্যাস *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) ও নক্‌শা *মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়* (১৮৫৯), মাইকেল মধুসুদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০), এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭০) *হুতোম পেঁচার নক্‌শা* (১৮৬২-৬৪)। ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে 'ভারত সংস্কারক সভা' *মদ না গরল* নামে একখানি পত্রিকা বের করলে আন্দোলনটি সংগঠিত আকার লাভ করে। সভা পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার এক হাজার কপি বিনা মূল্যে বিতরণ করতো।[৭১] ব্রাহ্ম নেতা রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরে একটি সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে বিরোধিতা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।[৭২]

---

৬৯. মুখোপাধ্যায়, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সামাজিক প্রবন্ধ*। দেখুন, *ভূদেব রচনাসম্ভার*, ৮৯-৯১, ৩৭০-৭১, ৩৭৩-৭৪।

৭০. পাশ্চাত্য শিক্ষা কিভাবে কলকাতার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে মদ্যপানের ভয়ংকর বিস্তার ঘটিয়েছিল তার একটি সুষ্ঠু বিবরণের জন্য দেখুন, নীলিমা ইব্রাহিম, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক* (ঢাকা, ১৯৬৪), ৮৪-৯৮।

৭১. জয়ন্ত গোস্বামী, *সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন* (কলকাতা, ১৯৭৪), ১০৬।

৭২. রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, ৩য় সং., (কলকাতা, ১৯৫২), ৮২।

এরপর বিখ্যাত 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি' (বঙ্গীয় মদ্যপান নিবারণী সভা) স্থাপিত হয় ১৮৬৩ সালে। প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ সরকার (১৮৩২-৭৫) হিন্দু কলেজে শিক্ষিত প্রগতিমনা সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং বিদ্যাসাগরের সংস্কার কর্মসূচির সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। সোসাইটি *ওয়েল-উইশার* (মঙ্গলকামী) নামে একখানি ইংরেজি ও *হিতসাধক* নামে একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে। সোসাইটির কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) শীর্ষক প্রহসন লিখে স্বয়ং কবি মধুসুদনকেই ইংরেজিশিক্ষিত, মিলটন্-আওড়ানো, মাতাল নিমচাঁদ দত্ত রূপে চিত্রিত করলেন। অন্যান্য লেখকদের রচিত অনুরূপ আরো নাট্যরচনা দ্রুতগতিতে প্রকাশিত হতে লাগলো। এগুলোর মধ্যে ছিল নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বারুণী-বিলাস* (১৮৬৭), জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের *সুধা না গরল* (১৮৭০) এবং মদনমোহন মিত্রের *মনোরমা* (১৮৭২)। ১৮৭০-এর দশকে কেশবচন্দ্র সেনের *সুলভ সমাচার* পত্রিকা পানদোষের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ চালাতে থাকে। ক্রমে আন্দোলনের কিছু ফল ফলতে শুরু করলো এবং উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ব্রাহ্ম ও নব্যহিন্দু নীতিবোধ ধীরে ধীরে ইঙ্গবঙ্গ কৃষ্টির উপরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তবে পানদোষ সহজে নির্মূল হতে চায় নি। ১৮৮৯ সালেও স্বয়ং পানদোষে দুষ্ট নাট্যকার-অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা *প্রফুল্ল* নাটকে (যাতে তিনি নিজেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন) এক কঠোর আত্মসমালোচনার অবতারণা করেন। অর্থাৎ একজন মদ্যপ নিজেই পানাসক্তি নিবারণ আন্দোলনে সামিল হলেন। ১৮৯০-এর দশকেও 'কালনা চরিত্র সংশোধনী সভা'র মত অনেক সংস্থা বাঙালি তরুণদের মধ্য থেকে পানাসক্তি উচ্ছেদ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল।[৭৩]

শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা মোচনের আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষ দিকের সংস্কারবাদীদের কয়েকজন শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থাকে নিজেদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৮৪০-এর দশকের প্রথম দিকে ডিরোজিয়ানদের মুখপত্র *বেঙ্গল স্পেকটেটর* (বঙ্গদর্শক)-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারি শোষণে বাংলার কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে লেখা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনাকালে (১৮৪৩-৫৫) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* কৃষকদের, বিশেষত নীলচাষীদের করুণ অবস্থার উপর নিবন্ধ প্রকাশ করতো। ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহের সময় শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১ ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-৮৬) বিদ্রোহী রাইয়তদের অনুকূলে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* (হিন্দু দেশব্রতী) ও *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় অনেক লিখেছিলেন। ওই বিদ্রোহ শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যার প্রতি শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের দুঃখবিমোচনের জন্য শিক্ষিত শ্রেণীর

৭৩. গোস্বামী, *বাংলা প্রহসন,* ১১০-১১। কালনা পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা শহর।

উদ্বেগ প্রতিফলিত হয় অনেক লেখা ও কাজের মধ্যে। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) রচিত বিখ্যাত নাটক *নীলদর্পণ* (১৮৬০)-এ নীলচাষীদের দুর্দশা ও নীলকর সাহেবদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র আঁকা হয়। *নীলদর্পণের* অনুকরণে রচিত মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)-এর *জমিদার দর্পণ* (১৮৭৩) কৃষকদের উপর জমিদারি অত্যাচারের জ্বলন্ত আলেখ্য। অনুরূপভাবে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় রচিত *চা-কর দর্পণ* (১৮৭৫) আসামে চা-বাগানের শ্রমিকদের করুণ দশার প্রতি শিক্ষিত জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১৮৭০-এর দশকে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের যুগেও যাঁরা সংস্কারবাদ ও বৃটিশ আনুগত্য সোৎসাহে ধরে ছিলেন, সেই কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুসারীরা সমাজ-সংস্কারকেই তাঁদের ধর্মবহির্ভূত কাজকর্মের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। ১৮৭০ সালে বিলাত থেকে ফিরে কেশবচন্দ্র সমাজসংস্কারের এক বর্ধিত কর্মসূচি হাতে নেন, যার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণও ছিল। *সুলভ সমাচার* নামে তিনি একটি পত্রিকা বের করেন, যার প্রতি কপির দাম ছিল মাত্র এক পয়সা : দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই পত্রিকা অনেক বছর ধরে নিম্নবর্গের মানুষদের পক্ষে লিখেছিল। কেশবের অনুসারী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫) শ্রমিকদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় ও 'শ্রমজীবী সমিতি' (১৮৭০) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশ করেন *ভারত শ্রমজীবী* পত্রিকা [৭৪], এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই কেশবের অপর শিষ্য শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) 'শ্রমজীবী' শীর্ষক কবিতায় সকল শ্রমিককে জেগে উঠার এবং অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।[৭৫] আরো দুই কেশবপন্থী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮) ও রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৩৬-১৯০১) শ্রমিকদের জন্য কাজ করতে এগিয়ে আসেন। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক হিসেবে দ্বারকানাথ অন্যদের সাথে মিলে কৃষকদেরকে 'রাইয়ত সভা'য় সংগঠিত করে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার জন্য কাজ করেন। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য দ্বারকানাথের কাজ আরো উল্লেখযোগ্য। তিনি ও রামকুমার বিদ্যারত্ন আসামে গিয়ে চা-বাগানের কুলিদের (অর্থাৎ শ্রমিকদের) সাথে বাস করে বাগানের বাস্তব পরিস্থিতি কাছ থেকে দেখেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা বাগানমালিকদের নির্মম শোষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন আকারে *সঞ্জীবন* ও *বেঙ্গলি* পত্রিকায় সত্তরের দশকের শেষ দিকে ও আশির দশকে প্রকাশিত হয়। আসামের কুলিদের জীবন নিয়ে লেখা দ্বারকানাথের "স্লেভরি ইন ইন্ডিয়া" শীর্ষক ধারাবাহিক *বেঙ্গলি* পত্রিকায় ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়, এবং ১৮৮৭ সালে রামকুমার বের করেন তাঁর *কুলিকাহিনী* গ্রন্থ। ১৮৮৭ সালেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রমিকদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার আদায় করতে

---

৭৪. বসু, *চরিতাভিধান*, ৫০৮।

৭৫. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, *পিটিশন টু এজিটেশন : বেঙ্গল, ১৮৫৭-১৮৮৫*, আবেদন থেকে আন্দোলন : বাংলা ১৮৫৭-১৮৫৮, কোলকাতা ও নয়া দিল্লী, ১৯৮৫), ১৯৭।

সক্ষম হন দ্বারকানাথ। ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে কুলি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এসব আন্দোলনের ফলে চা-বাগানের শ্রমিক সংক্রান্ত আইন ১৮৮৯, ১৮৯৩ ও ১৯০১ সালে সংশোধিত হয়ে কুলিদের অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি ঘটায়।[৭৬]

শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশামুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন উনিশ শতকে কোনো প্রশংসনীয় সফলতা পায় নি। এ বিষয়ে প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের কাজই ছিল সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের সক্রিয়তাবাদের শেষ পর্যায়, এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন হিসেবে তাদের নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও এখানেই মেলে। শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যার প্রতি আগ্রহ কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ধরনের দোটানার অনুপ্রবেশ ঘটায়। যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থার জন্য হিন্দুধর্ম নয়, বরং বৃটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই দায়ী ছিল, তাই ঐ শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন বৃটিশ শাসকদের অসন্তুষ্টির কারণ ঘটাতে পারতো। ফলে ঐ আন্দোলন কেশবের রাজানুগত্যের নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এই শ্রমিকসমস্যা নিয়েই কেশব, দ্বারকানাথ ও রামকুমারকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হতে হয়। এই বৈপরীত্য বিশ শতকে ব্রাহ্মদেরকে কঠিন সংকটে ফেলে দেয়। তাঁদেরকে হয় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হতে হয়, নতুবা ধর্মবিশ্বাস ও বৃটিশ আনুগত্যে অবিচল থেকে জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব ও গুরুত্ব হারাতে হয়।

সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বিরোধী আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাল্যবিবাহ ছাড়া অপর যে নির্দিষ্ট সংস্কার প্রশ্ন নিয়ে কথঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা হচ্ছে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, যা ছিল মধ্যযুগের ধর্মীয় কর্তৃত্বের আরোপিত বিবিধ বিধিনিষেধের একটি। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ও কেশবচন্দ্র সেনের ইংল্যান্ড ভ্রমণ সত্ত্বেও গোঁড়া হিন্দুরা সমুদ্রপথে বিদেশ গমনের ঘোরতর বিরোধী থেকে যায়, এবং ঐ নিষেধাজ্ঞা লঙ ঘনকারীরা সামাজিক শাস্তিস্বরূপ সমাজচ্যুতি ও আনুষঙ্গিক নানা অক্ষমতার শিকার হতেন। কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক বিনয়কৃষ্ণ দেব (১৮৬৬-১৯১২) ১৮৯০-এর দশকের প্রথমে নিষেধাজ্ঞাটি বাতিল করার জন্য এক আন্দোলন শুরু করেন। সমুদ্রযাত্রার সপক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থন চেয়ে বিনয়কৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিনয়কৃষ্ণের চিঠির উত্তরে (জুলাই ১৮৯২) বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়ে বলেন যে, শাস্ত্র অবলম্বনে সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা নিরর্থক। কারণ

> সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে,—দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত।... ধর্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (religious and moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা

৭৬. এই অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহ নেয়া হয়েছে, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, *পিটিশন টু এজিটেশন*, পৃ. ২০৪-০৯ থেকে।

> গ্রন্থবিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। ... দেশাচার পরিবর্তনের জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ নীতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা সমর্থন করেন এই যুক্তির ভিত্তিতে যে কাজটি ধর্মশাস্ত্রবিরোধী হলেও সমাজের জন্য হিতকর এবং হিন্দুদের 'সনাতন ধর্ম' বা শাশ্বত নীতিমালার পরিপন্থী নয়।[৭৭]

এখানে আমরা উনিশ শতকীয় সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি নব্যহিন্দু মনোভাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এই নিবন্ধের পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা বিষয়টি আলোচনা করতে যাচ্ছি। তবে বিনয়কৃষ্ণ দেবের তৎপরতা আসলে ছিল একটা অপ্রয়োজনীয় ইস্যু নিয়ে, কেননা জনগণের মন থেকে ঐ সংস্কারের প্রভাব দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল। ১৮৯৩ সালে হিন্দুধর্মের প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকা গেলেন পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বক্তব্য উপস্থাপন করতে।

চার. নব্যহিন্দু বিকল্প

উনিশ শতকী সংস্কারবাদের নব্যহিন্দু সমালোচনা

সমাজসংস্কার সম্পর্কে নব্যহিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্রাহ্মদের তথা বিদ্যাসাগরের মতো ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কারকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নব্যহিন্দু চেতনায় যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছিল তা কখনো ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে সংস্কার গ্রহণের ধারণা গলাধঃকরণ করতে পারে নি। সংস্কারকরা সামাজিক কুপ্রথার সমালোচনা করায় সমগ্র হিন্দু সভ্যতার উপর যে নিন্দা আরোপিত হয়েছিল তাও নব্যহিন্দুদের চরম বিরক্তির কারণ ছিল। তাছাড়া সংস্কারকদের অনুসৃত বিক্ষিপ্ত ও সীমিত সংস্কারকার্যক্রমের ব্যর্থতা ১৮৮০-এর দশক নাগাদ সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপলব্ধি করলেন যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল—১. জাগতিকতা ও বিদেশী রীতির অনুকরণপ্রবণতা; ২. সংস্কারকের ব্যক্তিগত বাহাদুরি প্রদর্শন; ৩. ঐতিহ্যবাহী পুরাগত পাণ্ডিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; ৪. দেশের ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগিতা লাভের জন্য সংস্কারকদের স্থূল আগ্রহাতিশয্য। তাই ভূদেব অভিযোগ করেন যে, হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা ঐসব সংস্কারকের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল না।[৭৮] এই পটভূমিতে সমাজের সমস্যার প্রতি নব্যহিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একদিকে জাতীয়তাবাদী এবং অপরদিকে সামগ্রিকতাবাদী। হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ ও অন্তর্কলহ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন পদক্ষেপের সাথে তাঁরা সহযোগিতা করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা সংস্কারের চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন পুনরুজ্জীবন ও প্রবৃদ্ধির কার্যক্রম অর্থাৎ নির্বাচিত ব্যাধির পৃথক পৃথক প্রতিবিধানের পরিবর্তে সাধারণভাবে জনগণের চেতনার উদ্বোধন।

---

৭৭. বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা বঙ্কিমের চিঠি (২৩ জুলাই ১৮৯২). *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৯২৬-২৭।
৭৮. মুখোপাধ্যায়, *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২), *ভূদেব রচনাসম্ভার*, ২৫৭।

সংরক্ষণের মাধ্যমে সংস্কার

ভূদেব মুখোপাধ্যায় আরো উপলব্ধি করেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবর্তমানে সমাজসংস্কার সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর অর্থ এই নয় যে সমাজেরও মৃত্যু ঘটেছে; আর যথাসময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় সমাজকে যেকোন মূল্যে রক্ষা করতেই হবে।।[৭৯] এরকম আত্মশাসন তেমন কোন সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। রাজনৈতিক পরাধীনতার সময়ে জাতিভেদের কড়াকড়ি সমাজ সংরক্ষণের জন্য জরুরি। স্বাধীন অবস্থায় জাতিপ্রথায় স্বতঃস্ফূর্ত শিথিলতা আসবে এবং আদিবাসী ও নিম্নজাতীয় মানুষেরা সোপান বেয়ে জাতিপ্রথার সর্বোচ্চ শিখরেও আরোহণ করতে সক্ষম হবে।[৮০] এ ছিল ১৮৭৫ সালে ভূদেবের অবস্থান। কিন্তু ১৮৯২ সাল নাগাদ তিনি এ অবস্থান থেকে সরে যান এবং জাতিপ্রথার কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস হয় যে, ভারতের অপ্রতিবিধেয় জাতিগোষ্ঠীগত অনেকত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঐ প্রথার নৈসর্গিক মূল। তবে তিনি অসবর্ণবিবাহ রোধের মাধ্যমে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষাতেই মাত্র আগ্রহী ছিলেন। জাতিগত পেশা অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করায় তাঁর আপত্তি ছিল না।[৮১] নারী জাতির অবরোধপ্রথার ব্যাপারে ভূদেব তত্ত্ব দিলেন যে, এটি বিদেশী দখলদারি ও তজ্জনিত সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সরাসরি ফল। বিদেশী শাসন ও স্বৈরাচারী সরকারের অবসান ঘটলে সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই অবরোধপ্রথা বিলুপ্ত হবে এবং বহুবিবাহ বহুলাংশে কমে যাবে। অবরোধ বিদায় নিলে বহির্গামী মহিলাদের পোশাক-আশাকেও কিছু পরিবর্তন আসবে।[৮২]

ভূদেব সমাজসংস্কার সম্পর্কে তাঁর ধারণাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২) গ্রন্থে। ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞান সীমিত ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় তার নীতিসমূহ ভূদেবের মতে ভারতীয় সমাজে প্রযোজ্য নয়। পাশ্চাত্যের সাম্যের ধারণা ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক অসাম্যের উপরেই হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সমাজের সংস্কার ঐ মুহূর্তের প্রয়োজন ছিল না, বরং প্রয়োজন ছিল ঐ সমাজ সংরক্ষণ, ঐ সমাজে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজ করা। সমাজসংস্কারের কাজে তড়িঘড়ি করার কোন দরকার ছিল না ভূদেবের মতে। আর সমাজসংস্কারের যেকোন প্রচেষ্টার আগে সমাজকে অবশ্যই ধৈর্যসহকারে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। যেসব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা সমাজের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল, কেবল তাঁরাই সামাজিক নিয়ম সংস্কারের কাজ হাতে নিতে পারেন।

---

৭৯. তদেব, ৪৯।

৮০. *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, তদেব, ৩৭০-৭১, ৩৭৩-৭৪।

৮১. *সামাজিক প্রবন্ধ*, তদেব, ৯০, ১৯২-৯৩, ১৯৯।

৮২. *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, তদেব, ৩৬৮, ৩৭২।

অন্যদের সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টার ফলে বিশৃঙ্খলা এবং দেশের সামাজিক নিয়ম ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি মহাত্মারাও হয়তো সকল বিষয়ে একমত হবেন না এবং আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে কোন 'নেতৃ মহাপুরুষ'-এর আগমনের। মসিহ্ ধরনের এই মহানায়ক হবেন একজন সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁর এমন বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা থাকবে যে, তিনি সকল মতের এক মহাসমন্বয় ঘটিয়ে পরিবর্তন, সংস্কার ও প্রগতির জন্য সর্বতোভাবে সঠিক পন্থাটি উদ্ভাবন করতে পারবেন।[৮৩]

সাধারণভাবে ভূদেব সমাজসংস্কারের এই নীতিমালাগুলো নির্ধারণ করেন : ১. সংস্কার অবশ্যই জাগতিক ভোগের পথ পরিহার করে নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করবে; ২. এর লক্ষ্য হতে হবে হিন্দু সমাজ সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা; ৩. এতে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার পরিবর্তে সাধারণভাবে সমাজের নেতৃবর্গের সমর্থন থাকতে হবে; এবং ৪. ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাথে পরামর্শ করে তবে হিন্দু সমাজের জন্য সংস্কারনীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং রচিত সংস্কারপরিকল্পনায় তাঁদের সমর্থন থাকতে হবে। উপসংহারে ভূদেব অর্থনৈতিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজসংস্কারের কৌশল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন :

> স্বদেশীয় বিদ্যার বাহুল্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা এবং প্রচার, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, যৌথ কারবার বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প রক্ষা ও বাণিজ্য বিস্তার; সালিসি প্রণালীর সম্বর্ধন, সদাচার পালন—এইরূপ বিষয়গুলিতে চেষ্টার দ্বারা সমাজের যে সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহাতে দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অনভিমতি হইতে পারে না, তাহাতে রাজসাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্মের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের রক্ষা-সাধন হয়।[৮৪]

পুনরুজ্জীবনের দর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ মানব কৃষ্ণ সমাজসংস্কারের ধার ধারেন না, বরং তাঁর লক্ষ্য :"দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন, ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন...। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনিই ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না।"[৮৫] সমাজপরিবর্তনের পূর্বশর্ত হিসেবে 'ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি'র এই ধারণা বঙ্কিম পুনর্ব্যক্ত করেন ১৮৯২ সালে বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত একটি চিঠিতে।[৮৬]

জাতিপ্রথা ও নারী জাতির সমস্যা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র উদার মত পোষণ করতেন, কিন্তু তিনি উপর তলা থেকে ঐসব কুপ্রথা উচ্ছেদের জন্য কোন শোরগোল তোলা থেকে বিরত

---

৮৩. *সামাজিক প্রবন্ধ*, তদেব, ২৯,৪৫-৪৮, ৯৯-১০১, ১১৯-২১, ১৮১, ১৯৬, ২১৯-২০, ২২২, ২২৭-২৯।

৮৪. তদেব, ২৫৭।

৮৫. "কৃষ্ণচরিত্র", *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৫০৬।

৮৬. তদেব , ৯২৬।

থাকেন। শিক্ষার মাধ্যমে প্রশস্ততর চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে তিনি সেগুলির উচ্ছেদ কামনা করতেন। জাতিপ্রথা ও নারীত্বের ধারণার নতুন ব্যাখ্যাও বঙ্কিম দিয়েছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি জাতিপ্রথাকে আক্রমণ করেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেন যে, ভারতের অধঃপতন ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা বুদ্ধিবৃত্তিক অবনতির একটা পরস্পরসম্পর্কিত প্রক্রিয়া, যা প্রথমে বৈশ্য-শূদ্র জনতার অবনমন ঘটায় এবং তারপর উল্টো অবক্ষয়িত উচ্চবর্ণের উপর আঘাত হানে।[৮৭] ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *সাম্য* পুস্তিকায় বঙ্কিম এই ধারণা পুনর্ব্যক্ত করেন।

অতএব বঙ্কিম গণশিক্ষা ও অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের সাধারণ উন্নয়ন ঘটানোর প্রস্তাব রাখেন। তাঁর মতে, এমনকি "সঙ্কর জাতির বাহুল্য...আধুনিক সমাজের উপকারী।"[৮৮] ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বহুবিবাহবিরোধী পুস্তিকার সমালোচনা (*বঙ্গদর্শন*, জুন ১৮৭৩) করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেন যে, সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য ধর্মশাস্ত্রসমূহের উপর বিদ্যাসাগরের নির্ভরশীলতা নীতিগতভাবে ভ্রান্ত, কারণ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি কোন ঐক্যবদ্ধ বিধিমালা ধারণ করে না এবং ওগুলি বিপরীত উদ্দেশ্যেও সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি ভারতের অবনতির জন্যও ধর্মশাস্ত্রগুলির সংখ্যাধিক্য ও পরস্পরবিরোধিতাকে দায়ী করেন।[৮৯] 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ তিনি ধর্মশাস্ত্রগুলিকে নিম্নবর্ণের মানুষদের আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণদের তৈরি ফাঁদ বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং *সাম্যতে* ঐ অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন। পরবর্তী অনেক লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মশাস্ত্রগুলিকে ক্ষতিকর প্রবৃদ্ধি বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৯০] সংস্কারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রভিত্তিক প্রচেষ্টাকে এভাবে বাতিল করে দিয়ে বঙ্কিম 'নারী প্রশ্নে' তাঁর নিজস্ব সমাধান পেশ করার অবকাশ পান। *সাম্য*-তে তিনি শিক্ষায় নারীর অধিকার, বিধবার পুনর্বিবাহ, অবরোধপ্রথার অবসান, বহুবিবাহ নিরসন, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং পেশা অবলম্বনপূর্বক তাদের অর্থ উপার্জনের অধিকারের সপক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই সমুদয় দোষের একমাত্র প্রতিকার হিসেবে বঙ্কিম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেন : "শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।'[৯১] তারপর স্বীয় উপন্যাসগুলিতে বীরাঙ্গনা নারীকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে তিনি নারীত্বের ধারণাই পাল্টে দেয়ার প্রয়াস পান।

---

৮৭. *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৩০২-০৪।

৮৮. *গীতার* ৩.২৪ শ্লোকের বঙ্কিমকৃত ভাষ্য, তদেব, ৭৫৯।

৮৯. তদেব, ৩১৫-১৭।

৯০. *কৃষ্ণচরিত্র, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম*, এবং বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত পত্র (২৩ জুলাই ১৮৯২); তদেব, ৫৬৭, ৭৭৭, ৯২৭।

৯১. তদেব, ৩৩৯-৪০৬। উদ্ধৃতি ৪০৬ পৃষ্ঠায়।

দ্রৌপদীকে নিয়ে লেখা দুই অংশে বিভক্ত একটি নিবন্ধে বঙ্কিম গর্বিতা ও নিজ অধিকার সম্পর্কে মুখরা ঐ পাণ্ডবমহিষীকে হিন্দু ঐতিহ্যের প্রথম সারির মহিলাদের মধ্যে (সীতাসহ একত্র) সর্বোচ্চ স্থান দেন।[৯২]

সামাজিক উন্নতির ধারণা

স্বামী বিবেকানন্দও সমাজসংস্কারের প্রতি অনুরূপ অবিশ্বাস ব্যক্ত করে সামাজিক প্রশ্নের মোকাবেলা করার জন্য এক বিকল্প পথের প্রস্তাব দেন। রামমোহন রায়ের মতো তিনি জাতিভেদের কুসংস্কার ও নারী জাতির অবনমনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। তিনি বলেন: "ভারতে দু'টি অমঙ্গল বিদ্যমান—নারীকে পদদলিত করা আর জাতিভেদের বিধিনিষেধের যাঁতাকলে দরিদ্র শ্রেণীকে নিষ্পেষণ করা।"[৯৩] কিন্তু এসব দোষের বিরুদ্ধে সংস্কারবাদীদের পদ্ধতি তিনি অনুমোদন করেন নি। জাতীয়তাবাদী ভঙ্গিতে তিনি সামাজিক ব্যাপারে সংস্কারবাদীদের হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ঐ হস্তক্ষেপের ফলে পরস্পরবিরোধী পক্ষগুলির মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল এবং গালিগালাজপূর্ণ ভাষায় লেখা বিপুলায়তন এক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যা 'জাতিগোষ্ঠীর', 'দেশের' ও 'জাতির' জন্য লজ্জাজনক। বিবেকানন্দ আরো উপলব্ধি করেন, "গত এক শতাব্দী যাবৎ যেসব সংস্কারের জন্য আন্দোলন করা হয়েছে তার বেশির ভাগই ছিল আলঙ্কারিক।"[৯৪] সংস্কারবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তিনি মন্তব্য করেন :

> বিধবাবিবাহের প্রশ্ন ভারতীয় মহিলাদের শতকরা সত্তর জনকে স্পর্শ করে নি এবং এরকম সকল প্রশ্নই জনগণকে বাদ দিয়ে কেবল যারা শিক্ষিত সেই উচ্চবর্ণের লোকদের কাছেই পৌঁছায়।[৯৫]

এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে বিবেকানন্দ সামাজিক উন্নতির এক সামগ্রিক পরিকল্পনার রূপরেখা দেন ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে দেয়া 'মাই প্ল্যান অব ক্যাম্পেইন' শীর্ষক

---

৯২. দ্রৌপদী', তদেব, ১৯৮-২০০।

৯৩. স্বামী বিবেকানন্দ, *আওয়ার উইমেন* [আমাদের নারী], ৪৮; উদ্ধৃত, রমা চৌধুরী, "সোশিও-লজিক্যাল ভিউজ অব স্বামী বিবেকানন্দ এ্যান্ড হিজ আইডিয়াজ অব সোশ্যাল রিফর্ম, আপলিফট অব উইমেন এ্যান্ড ম্যাসেস" [স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক মতামত এবং তাঁর সমাজসংস্কার সম্পর্কিত ধারণা—নারী ও জনগণের উন্নয়ন]; আর. সি. মজুমদার (সম্পা.), *স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টেনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম* [স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ], (কলকাতা ১৯৬৩), ৪০০। ভাষান্তরিত।

৯৪. স্বামী বিবেকানন্দ, 'মাই প্ল্যান অব ক্যাম্পেইন' [আমার অভিযান পরিকল্পনা], *কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ* [স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনা], ৮ খণ্ড, মায়াবতী মেমোরিয়াল সং., ১২ শ পুনর্মু., (কলকাতা ১৯৭৯), ৩ : ২১৫-১৬। ভাষান্তরিত।

৯৫. তদেব, ২১৬।

বিখ্যাত ভাষণে। সেখানে তিনি মনশ্চক্ষে দেখেন দেশের এক সার্বিক আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন, যা আসবে জনগণের মধ্যে উপনিষদের এই বাণী প্রচারের মাধ্যমে যে তারা পরমাত্মা থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। এই সর্বেশ্বরবাদ থেকেই তিনি নির্মাণ করেন এক ব্যাপক সমাজসেবা কর্মসূচি, যার মধ্যে ছিল : ১. গণশিক্ষা, ২. দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা এবং ৩. প্রতীচ্যের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক লেনদেন অর্থাৎ হিন্দু আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিনিময়ে বিজ্ঞান তথা সামাজিক ও বৈষয়িক প্রগতির কলাকৌশল আমদানি।[৯৬] এই কর্মসূচিতে নারীর একটি বিশেষ স্থান ছিল। স্বীয় অনুসারীদের তাগিদ দিয়ে বিবেকানন্দ বলেন : "কখনো ভুলো না আসল কথা হচ্ছে : নারীসমাজ ও জনগণ।"[৯৭] এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের যন্ত্র হিসেবে তিনি ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। নারীত্বের একটা নতুন ধারণা প্রণয়নের জন্য বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ বাংলার শক্তি-তান্ত্রিক ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করেন নি। নারীর বীর প্রকৃতি ছাড়াও তাদের মধ্যেকার মাতৃত্বকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই সমুদয় ধ্যান-ধারণা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আলোচ্য তিনজন নব্যহিন্দু নেতার কেউই উনিশ শতকের সংস্কারকদের শ্রেণীতে পড়েন না। সংস্কারকদের বিরোধী তো তাঁরা ছিলেনই, তাছাড়া নিজস্ব কোন আন্দোলন গড়ে তোলার অবকাশও তাঁরা পান নি বললেই চলে। ভূদেব ও বঙ্কিমের প্রচেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক, আর বিবেকানন্দ স্বীয় ভাবধারায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পপুলিস্ট বা জনপ্রিয়তাবাদী ভঙ্গিতে ভ্রমণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর আদর্শ মোতাবেক গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। ইতিহাসে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রকৃত অবদান ছিল অনুপ্রেরণামূলক, ততোটা বাস্তব নয়। ঐতিহাসিক কারণে ঐ প্রেরণা যতোটা না সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল, তার চেয়ে বেশি ফলিয়েছিল রাজনৈতিক ফল।

পাঁচ. বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার

বাঙালি হিন্দুর বুদ্ধিবৃত্তিক রূপান্তরের কাহিনী এতো বিরাট যে তার যথাযোগ্য আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক উপাদান ছিল হিন্দুদের চিন্তাধারায় কতিপয় ইউরোপীয় দার্শনিক ধারণার আমদানি। রামমোহন রায় তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন শুরু করেন এক জোরালো যুক্তিবাদ অবলম্বন করে। এই যুক্তিবাদ এবং পরে উপযোগবাদ ছিল বহুদেববাদ ও

---

৯৬. নাথ, *নিউ হিন্দু মুভমেন্ট*, ১৫৩।

৯৭. সিস্টার নিবেদিতা, *দ্য মাস্টার এ্যাজ আই স হিম* [গুরুজীকে আমি যেমন দেখেছি], ৩য় সং, ৩৫৭; উদ্ধৃত, রমা চৌধুরী, 'সোশিওলজিক্যাল ভিউজ অব স্বামী বিবেকানন্দ', আর. সি. মজুমদার, *সেন্টেনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম*, ৪০০।

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই-এ তাঁর প্রধান অস্ত্র। যুক্তিবাদই নিয়ন্ত্রণ করতো ডিরোজীয়ানদের চিন্তাধারা এবং বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার রূপদানেও যুক্তিবাদের ভূমিকা ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে যুক্তিবাদ বিজ্ঞানবাদের রূপ নেয় এবং শতাব্দীর শেষাংশে বিজ্ঞান বাঙালি হিন্দুর একটি প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহজাগতিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছিল অক্ষয়কুমার তথা বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন দত্ত এই দুই মুখ্য মানববাদীর মধ্যে। ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাঙালি হিন্দুর চিন্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে জাতীয়তাবাদ। এই ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের রচনায় তথা শতাব্দীর শেষ তিন দশককালের বিশাল নব্যহিন্দু সাহিত্যে। ঐ একই সময়ে জাতীয়তাবাদী আবেগকে শক্তি যোগাতে ইতিহাসচর্চার একটি বলবান ধারাও গড়ে ওঠে। অগুস্ত কোঁতের দৃষ্টবাদ, চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ, এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের সমাজবাদ উনিশ শতকের শেষাংশে বাঙালি হিন্দুর চিন্তাধারায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল।

উপসংহার

উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন বাংলায় হিন্দু সমাজ ও চিন্তাধারায় ব্যাপক রূপান্তর আনে। হিন্দু বহুদেববাদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদী চ্যালেঞ্জ দিয়ে শুরু হয়েছিল যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন, তা পরিণতি পেল হিন্দুধর্মের এক সর্বেশ্বরবাদী পুনরুপস্থাপনে, যার লক্ষ্য ছিল সকল ধর্মের মাঝে বিদ্যমান মৌলিক ঐক্য (একরূপতা নয়) [unity, not uniformity] তথা তাদের সম্ভাব্য পারস্পরিক সহযোগিতার মর্মবাণী প্রচার করে ধর্মীয় সংঘর্ষের অবসান ঘটানো। সমাজসংস্কার আন্দোলন কতিপয় হিন্দু ও ঔপনিবেশিক অনাচার দূর করতে সমর্থ হয়েছিল এবং নারীমুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। কিন্তু এই আন্দোলন যেমন ছিল বিক্ষিপ্ত তেমনই নির্ভর করতো ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের নীতি ও খামখেয়ালির উপর, এবং শেষ পর্যন্ত শতাব্দীর অন্তিম পাদে জাতীয়তাবাদের যুগে তা নেহাৎ কালাতিক্রান্ত ব্যাপার বলে প্রতিভাত হয়। তখন সংস্কারের স্থান দখল করলো এর নব্যহিন্দু বিকল্প অর্থাৎ পুনরুজ্জীবন ও সমাজসেবা।

কিন্তু পুনরুজ্জীবন ও সেবার কর্মসূচিও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। তার কারণ ছিল দেশটি বিদেশীদের ঔপনিবেশিক দখলে থাকার ফলে যে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তজ্জনিত জরুরি পরিস্থিতি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অন্য সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে দেখা দিল। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী, মুসলমান এবং সন্ত্রাসবাদী, গান্ধীবাদী ও কমিউনিস্ট—সবাই মিলে বিশ শতককে সংঘাত ও সংঘর্ষময় এক কঠিন সময়ে পরিণত করলো। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বালিকাবধূ ও নিরক্ষরতা রয়ে গেল কম গুরুত্বপূর্ণ সব অবহেলিত এলাকায়। সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন দুই-ই অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে ছিল পুরোপুরি হিন্দু এবং এই সীমাবদ্ধতা তাদেরকে কখনো কখনো অহিন্দুদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে নব্যহিন্দুদের পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচি হিন্দু

জাতীয়তাবাদের সাথে মিলে হিন্দু স্বাদেশিকতার আধিপত্যের সম্ভাবনাকে বড় করে তুললো। এর ফলে সৃষ্টি হলো মুসলিম প্রতিক্রিয়া এবং এভাবেই বিশ শতকের বিশাল হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা ত্বরান্বিত হলো।

তবে উনিশ শতকে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের যে আন্দোলন হয়েছিল তার ফলই ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু চিন্তাধারায় যুক্তিবাদ ও মানববাদ ফিরে আসে। বিজ্ঞান তথা সহনশক্তি এবং চিন্তার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এই দুই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নতুন সাহিত্য, নতুন বিজ্ঞান, নতুন শিল্পকলা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদানের ধারণা শতাব্দীশেষে হিন্দুমনের উল্লেখযোগ্য আধুনিকায়নের সুস্পষ্ট নিদর্শন। স্থানাভাবের কারণে এই অসাধারণ ঘটনার একটি স্পষ্ট রূপরেখা এখানে দেয়া গেল না। তবে নিশ্চিন্তে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলায় উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারআন্দোলন সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের এক অবিরত প্রক্রিয়ার সূচনা করে, যা ঐ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রসারিত হয়।

৮

আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য

ওয়াকিল আহমদ*

আঠারো শতককে বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ বলা হয়। অবক্ষয় সমাজে ছিল, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে। সমাজে অবক্ষয় কখন, কিভাবে আসে ? বিশেষজ্ঞের মতে—"শাসকশ্রেণীর ইতিবাচক ভূমিকা যখন নিঃশেষিত হয়ে যায় তখন আসে তার অবক্ষয়ের অধ্যায়। সেই অধ্যায়ে তার ভাবাদর্শগত প্রতিনিধিদের রচনায়ও নেমে আসে ঘন কালো ও বীভৎস ছায়া।"[১] শাসকশ্রেণী তথা প্রভুশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেলে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা অবনমিত হয়। নেতৃত্বহীন সমাজে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, নীতিহীনতা, স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। এমন সামাজিক অবস্থায় কোন মহৎ সাহিত্য রচিত হয় না, বরং পূর্বের ধারা রস-রুচি-আদর্শের দিক দিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিষ্প্রভ হয়।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতে মুগলশক্তির পতন শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাভূত ও ক্লাইভ জয়ী হন। পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে রাষ্ট্রক্ষমতা সামন্তপ্রভু থেকে বণিক-প্রতিনিধির করতলগত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ক্লাইভ কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন। ক্লাইভের সাথে যোগ দেন দেশীয় বণিক জগৎশেঠ। বিদেশী ও দেশী বণিকশক্তির ঐক্য জোরদার হয়ে উঠে, যা দমন করার ক্ষমতা স্বৈরাচারী সামন্তপ্রভুর ছিল না। পলাশীর

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, *মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, (কলিকাতা ১৯৮৭), ১০

প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার পতন ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ক্লাইভ-জগৎশেঠের জয় ছিল উঠতি ধনতন্ত্রের জয়। আঠারো শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরকে এই সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের জয়-পরাজয়ের প্রস্তুতিপর্ব এবং পরের পঞ্চাশ বছরকে চূড়ান্ত পরিণতিপর্ব বলে আখ্যায়িত করা যায়। আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ও পরিবর্তনশীল অবস্থার সমান্তরালে দেখা যায়। যেহেতু সামন্তপ্রভুর পতনের যুগ তার ভাবাদর্শগত ইতিবাচক দিকগুলি ধরে রাখতে পারে নি, সেহেতু এ-সময়ের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মতো সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও অবক্ষয় নেমে আসে। উদীয়মান বণিকশক্তির প্রতিষ্ঠার পর্বেও সমাজ কালান্তরের মধ্য দিয়ে যায়; এই নব্যশ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ তখনও গড়ে উঠে নি। ফলে কালান্তর যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নি, বরং ভাব-ভাষা-রীতি-রুচির দিক দিয়ে আরও অবনতি ঘটে। সাহিত্যের সঙ্গে যুগের ও সমাজের সম্পর্ক ও ভূমিকার কথা মনে রেখে আমরা আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন করবো। আলোচনার সুবিধার জন্য এ সাহিত্যকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—বিষয় ও চিন্তা, আঙ্গিক ও রীতি এবং ভাষা।

বিষয় ও চিন্তা (Theme and Thoughts)

আঠারো শতকে কোন্ কোন্ ধারার কাব্য রচিত হয়? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায়, পূর্ববর্তী শতকে যেসব শাখার কাব্য রচিত হয়, সেসব শাখার কাব্য এ শতকেও রচিত হয়। উপরন্তু তিনটি নতুন কাব্যধারা সংযুক্ত হয়—দোভাষী পুঁথি, শাক্তপদ ও কবিওয়ালা গান। এ-ধারার রচনা কাব্যগুণবিবর্জিত. কিন্তু বেশ জনপ্রিয় ছিল। আঠারো শতকে চিঠিপত্র. দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্রে গদ্যের ব্যবহার ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক গদ্য ছিল না। গদ্যে সাহিত্য রচনার আর্ট ও আদর্শ লেখকগণ আঠারো শতকে আয়ত্ত করতে পারেন নি, উনিশ শতকে তা আয়ত্ত করেন।

মধ্যযুগের শতকভিত্তিক পরিসংখ্যান নিলে লক্ষ্য করা যায় যে এ শতকে তুলনামূলকভাবে কবি ও কাব্যের সংখ্যা অধিক; তবে দু'চার জন ছাড়া প্রতিভাবান কবি ছিলেন না। অর্থাৎ কাব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এর মান নিম্নগামী ছিল। এর কারণ একটিই—দেশ ও জাতির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক-নৈতিক অবক্ষয়।

আঠারো শতকে অধিক সংখ্যায় কাব্য রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষার দিগন্ত প্রসারিত হয়। সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম বাংলা ভাষাবিদ্বেষী এক শ্রেণীর পাঠকের প্রতি

কটূক্তি করেন।[২] অনুমিত হয়, রাজভাষা ফার্সির প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল। আঠারো শতকের ফার্সি-উর্দু-হিন্দি ভাষার প্রভাবেই দোভাষী পুঁথির ভাষা ও কাব্যরীতির উদ্ভব হয়। "যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে" বলে ভারতচন্দ্র এক তত্ত্ব দিয়ে বসেন এবং নিজেও আরবি-ফার্সি মিশ্রভাষার অংশত অনুশীলন করেন।[৩] তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যাপক ও অবাধ চর্চা এ শতকে জাতির ইতিহাসে একটি ইতিবাচক দিক নির্দেশিত করে। আমরা জানি, বাংলা ভাষা বাঙালির জাতিসত্তার প্রতীক। রাজনৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যেও বাংলার মানুষ বাংলা ভাষার মাধ্যমে স্বীয় ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে আঠারো শতকের ব্যতিক্রমধর্মী এ অবদানের গুরুত্বকে স্বীকার করতে হয়। দোভাষী পুঁথির কাব্যরীতি ও ভারতচন্দ্রের কাব্যতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত টিকে নি। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-৬০), রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-৮১), ঘনরাম চক্রবর্তী ও হেয়াত মাহমুদ (১৬৯৫-১৭৬৫) এযুগের গৌরবময় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব।

বিষয়বস্তুর বিচারে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, অনুবাদকাব্য, প্রণয়োপাখ্যান, পীরপাঁচালী, দোভাষী পুঁথি, শাক্তপদ ও কবিওয়ালা গান এ যুগের প্রধান ধারা। বিবিধের মধ্যে পড়ে ধর্মশাস্ত্র, সঙ্গীত-জ্যোতিষ, জ্ঞানশাস্ত্র ইত্যাদি। এ সময়ের প্রধান প্রধান কবি ও কাব্যের নাম-ধাম-কাল সম্বলিত একটি তালিকা এভাবে তৈরি করা যায়[৪] :

---

২. "যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি ॥ দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়াএ। নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যায়।"- *নূরনামা*, রাজিয়া সুলতানা (সম্পাদিত), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, (ঢাকা ১৯৮৯), ৪২৭।

৩. অনুদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে দিল্লীতে মানসিংহ-ভবানন্দের মধ্যকার কথোপকথনে আরবি-ফার্সি-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত বাংলার ব্যবহার আছে। এধরনের ভাষা ব্যবহারের পূর্বে ভারতচন্দ্র পাঠকের কাছে এই তত্ত্ব দেন—"উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥ পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥ না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥ প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে। যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে ॥ " ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, (কলিকাতা ১৯৬৩, ৩য় সংস্করণ), ৩০৩।

৪. তালিকাটি প্রণয়নে নিচের পুস্তকগুলির সাহায্য নিয়েছি :
   - ক. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, (কলিকাতা ১৯৬৫, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৪)
   - খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা ১৩৭৪)।
   - গ. অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৬)।
   - ঘ. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (ঢাকা ১৯৫৫)।
   - ঙ. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৩, ৩য় সংস্করণ)।

মঙ্গলকাব্য

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
চণ্ডীমঙ্গল	মুক্তারাম সেন	দেয়াঙ্গ (চট্টগ্রাম)	সারদামঙ্গল	১৭৪৭
	জয়নারায়ণ রায়	জপসা (ঢাকা)	চণ্ডীমঙ্গল	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
	রামানন্দ যতি	-	অভয়ামঙ্গল	১৭৬৬
	ভবানীশঙ্কর দাস	চক্রশালা (চট্টগ্রাম)	গৌরীমঙ্গল	১৭৮০
			পঞ্চালিকা	-
	শিবচন্দ্র সেন	-	গৌরীমঙ্গল	-
	হরিশচন্দ্র বসু	কালিয়াগ্রাম (রংপুর)	চণ্ডীবিজয়	১৭৩০
	রামশঙ্কর দেব	ধর্মদা গ্রাম (হুগলী)	অভয়ামঙ্গল	-
অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়	ভুরশুট (হাওড়া)	অন্নদামঙ্গল	১৭৫২
	রামপ্রসাদ সেন	কুমারহট্ট (হুগলী)	কালিকামঙ্গল	-
	দ্বিজ রাধাকান্ত	কলিকাতা	শ্যামামঙ্গল	১৭৬৭
	মধুসূদন চক্রবর্তী	দক্ষিণ রাঢ়	কালিকামঙ্গল	-
	নিধিরাম আচার্য	চট্টগ্রাম	কালিকামঙ্গল	১৭৫৬
মনসামঙ্গল	জীবনকৃষ্ণ মৈত্র	লাহিড়ীপাড়া (বগুড়া)	পদ্মাপুরাণ	১৭৪৪
	রামজীবন বিদ্যাভূষণ	বাঁশখালি (চট্টগ্রাম)	মনসামঙ্গল	১৭০৪
	দ্বিজ বাণেশ্বর	রাইপুর	মনসামঙ্গল	১৭১৯
	রাজা রাজসিংহ	সুসঙ্গ (উত্তরবঙ্গ)	মনসামঙ্গল	আঠারো শতকের শেষভাগ
	ষষ্ঠীবর দত্ত	শ্রীহট্ট	পদ্মাপুরাণ	ঐ
ধর্মমঙ্গল	ঘনরাম চক্রবর্তী	কৃষ্ণপুর (বর্ধমান)	ধর্মমঙ্গল	১৭১১
	নরসিংহ বসু	শাঁখারী (বর্ধমান)	ধর্মমঙ্গল	আঠারো শতকের প্রথমার্ধ
	মাণিকরাম গাঙ্গুলি	বেলডিহার (হুগলী)	ধর্মমঙ্গল	১৭৮১
	রামকান্ত রায়	সেহারা (বর্ধমান)	ধর্মমঙ্গল	১৭৮৩
	রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে	চামোট (বিষ্ণুপুর)	ধর্মপুরাণ	১৭৩৩

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
	সহদেব চক্রবর্তী	রাধানগর (হুগলী)	অনিলপুরাণ	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
অন্যান্য মঙ্গল	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	যদুপুর (মেদিনীপুর)	শিব-সঙ্কীর্তন	১৭১২
	কৃষ্ণরাম দাস	-	রায়মঙ্গল	-
	রামজীবন বিদ্যাভূষণ	বাঁশখালি	সূর্যমঙ্গল	১৭১০
	গঙ্গাধর দাস	বিনাইপুর (মুর্শিদাবাদ)	কিরীটীমঙ্গল	১৭৬৫
	দুর্গাদাস মুখুজ্জে	উলাগ্রাম	গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী	-
		বৈষ্ণবকাব্য		
কৃষ্ণমঙ্গল	অভিরাম দাস	মল্লভূমি	গোবিন্দবিজয়	-
	বলরাম দাস	-	কৃষ্ণলীলামৃত	১৭০৩
	শঙ্কর চক্রবর্তী	পানুয়া (বিষ্ণুপুর)	গোবিন্দমঙ্গল	১৭০২-১২
	ঘনশ্যাম দাস	-	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	-
	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	যদুপুর	গোবিন্দমঙ্গল	-
	প্রভুরাম	-	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	-
	রমানাথ	-	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	-
চৈতন্য ও মহান্ত জীবনী	প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র)	কুলনগর (বর্ধমান)	চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী	১৭১২-১৩
	রামরত্ন	সিলেট	চৈতন্যসংহিতা	-
	জগজ্জীবন মিশ্র	সিলেট	শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী	-
	নরহরি চক্রবর্তী	সৈয়দাবাদ (মুর্শিদাবাদ)	ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ
বৈষ্ণবপদ-সংকলন	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	দেবগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)	ক্ষণদাগীতচিন্তামণি	১৭০৪
	নরহরি চক্রবর্তী	সৈয়দাবাদ	গীতচন্দ্রোদয় ও গৌরচরিত্র চিন্তামণি	-
	রাধামোহন ঠাকুর	মালহাটি (মুর্শিদাবাদ)	পদামৃতসমুদ্র	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ
	নটবর দাস	-	রসকলিকা	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
	বৈষ্ণবদাস	টেঞা-বৈদ্যপুর (মুর্শিদাবাদ)	পদকল্পতরু	ঐ
	গৌরসুন্দর দাস	-	কীর্তনানন্দ	ঐ
	রাধামুকুন্দ দাস	–	মুকুন্দানন্দ	ঐ
	দীনবন্ধু দাস	শ্রীখণ্ড	সঙ্কীর্তনামৃত	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
অন্যান্য বৈষ্ণবকাব্য	ভগীরথ বন্ধু	-	বংশীশিক্ষা (বৈষ্ণবতত্ত্ব)	১৭১৬–১৭
	জয়নারায়ণ সেন	-	হরিলীলা	১৭৭২

অনুবাদকাব্য

পুরাণ	শঙ্কর চক্রবর্তী	পানুয়া	বাল্মীকিপুরাণ	–
	শিবচন্দ্র সেন	সেনহাটি	সারদামঙ্গল	-
	গঙ্গারাম দত্ত	নড়াইল (যশোর)	উষাহরণ	১৭৭০
	ফকির রাম (কবিভূষণ)	বাঁকুড়া	অঙ্গদ রায়বার	১৭০৩
	জগৎরাম রায়	ভুলুই গ্রাম (বর্ধমান)	অদ্ভুত রামায়ণ	১৭৭১
	রামানন্দ ঘোষ	–	রামায়ণ	১৭৮০
	কৃষ্ণদাস পণ্ডিত	উত্তরবঙ্গ	শ্রীরাম পাঁচালী	—
ইসলামী শাস্ত্র—	মুহম্মদ মুকীম	নোয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)	ফায়েদুল মুকতদী	১৭৭৩
কাহিনী-পুরাণ	শেখ মনসুর	-	সিরনামা	১৭০৩
	হেয়াত মাহমুদ	ঝাড়বিশিলা (রংপুর)	জঙ্গনামা	১৭২৩
			হিতজ্ঞানবাণী	১৭৫৩
			আম্বিয়াবাণী	১৭৫৭
	মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক	বেদরাবাদ (নোয়াখালী)	ফক্করনামা	-
	আলী রজা	ওশখাইন (চট্টগ্রাম)	সিরাজকুলুব	আঠারো শতকের মধ্যভাগ
	মুহম্মদ আলী	ইদিলপুর (চট্টগ্রাম)	হয়রতুল ফিকাহ	ঐ
	মুহম্মদ কাসিম	যুগীদিয়া	সিরাজুল কুলুব	১৭৯০

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
		(নোয়াখালী)	হিতোপদেশ	—
	সৈয়দ নুরুদ্দীন	চট্টগ্রাম	দকায়িকুল হকায়িক	১৭৯০
			রাহাতুল কুলুব	১৭৯৬
		প্রণয়োপাখ্যান		
	শাহ গরীবুল্লাহ	বালিয়াহাফেজপুর (হুগলী)	ইউসুফ-জোলেখা	১৭৬৫
	মুহম্মদ রজা	বখৎপুর (চট্টগ্রাম)	তমীম গোলাল	আঠারো শতকের প্রথম ভাগ
	মুহম্মদ মুকীম	নোয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)	গুলে বকাওলী	১৭৬০
	মুহম্মদ উজীর আলী	চারিয়া (চট্টগ্রাম)	শাহনামা	১৭১১-১৮
	শেখ সাদী	ত্রিপুরা	গদামল্লিকা	১৭১৫
	শেরবাজ	ঐ	মল্লিকার হাজার সওয়াল	১৭৩১
	মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক	বেদরাবাদ (নোয়াখালী)	সয়ফুলমুলক-লালবানু	১৭৭০
	মুহম্মদ আলী	ইদিলপুর (চট্টগ্রাম)	শাহপরী-মল্লিকজাদা	–
	সৈয়দ হামজা	অদুনা (হাওড়া)	মধুমালতী	১৭৯০
	করিমুল্লাহ আঠারো	মুরাদপুর (চট্টগ্রাম)	শতকের মধ্যভাগ	মৃগাবতী
		সুফিপদ		
	আলী রজা	ওশখাইন (চট্টগ্রাম)		
	সিরতাজ		–	-
	নূর মোহাম্মদ		–	-
		পীর–পাঁচালী		
	ভারতচন্দ্র রায়	ভুরশুট	সত্যনারায়ণের ব্রতকথা	১৭৩৭

কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
ফকীররাম দাস	বাঁকুড়া	সখীসোনা	১৭২০
রামেশ্বর ভট্টাচার্য		সত্যপীরের কথা	আঠারো শতকের প্রথমভাগ
শ্রীবল্লভ	-	মদনসুন্দরের পালা	-
আরিফ	তাজপুর (দক্ষিণ রাঢ়)	লালমোনের কেচ্ছা	–
ফৈজুল্লা	পাচনা (হাওড়া)	সত্যপীরের পাঁচালী	আঠারো শতকের শেষভাগ
ফকির মহাম্মদ	আজিমাবাদ	মানিকপীরের গীত	ঐ
শঙ্কর আচার্য	-	সত্যপীরের পাঁচালী	ঐ
		দোভাষী পুঁথি	
শাহ গরীবুল্লাহ	বালিয়া হাফেজপুর	আমীর হামজা (১ম অংশ)	১৭৬৬
		সোনাভান	১৭২০
		সত্যপীরের পুঁথি	–
সৈয়দ হামজা	অদুনা (হুগলী)	আমীর হামজা (২য় অংশ)	১৭৯৪
		জৈগুনের পুঁথি	১৭৯৭
		শাক্তপদ	
রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১)	কুমারহট্ট (বর্ধমান)		—
দ্বিজ রামপ্রসাদ -	মহেশ্বরদি (ঢাকা)		—
কমলাকান্ত (১৭৭২-১৮২১)	অম্বিকা-কালনা		—
		কবিওয়ালা গান	
রাসু (১৭৩৪–১৮০৫)	গোন্দলপাড়া (হাওড়া)		
নৃসিংহ (১৭৩৮ –১৮০২)	ঐ (উভয়ে সহোদর ছিলেন)		
হরুঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২)	শিমুলিয়া (কলকাতা)		
নিতাই বৈরাগী (১৭৪৭–১৮২১)	চন্দননগর (হুগলী)		
নিধু গুপ্ত (১৭৫৫-১৮৫২)	চাপতা (হুগলী)		
কালি মির্জা (১৭৫০-১৮২৫)	পাটমহলপল্লী (হুগলী)		

	কবি	স্থান	কাব্য	রচনাকাল (খৃস্টাব্দ)
			বিবিধ	
	বিজয়রাম সেন	-	তীর্থমঙ্গল	১৭৭০
	গঙ্গারাম	ধরীশ্বর (কিশোরগঞ্জ)	মহারাষ্ট্রপুরাণ	১৭৫১
	জগৎরাম রায়	ভুলুই গ্রাম (বর্ধমান)	আত্মবোধ	১৭৭৮
	ভারতচন্দ্র রায়	ভুরশুট (বর্ধমান)	রসমঞ্জরী	–
	রাধাকান্ত মিশ্র	কলকাতা	শ্যামাসঙ্গীত	১৭৬৭

উপরের তালিকাটি কতক বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে, যথা—১. বাংলা সাহিত্যরচনার ধারাবাহিকতা ছিল, রাষ্ট্রবিপ্লব, বর্গীর লুণ্ঠন, কোম্পানির শোষণ, যুদ্ধ, মন্বন্তর সাহিত্যরচনায় কোন প্রভাব ফেলে নি, শূন্যতাও সৃষ্টি করে নি। ২. বাংলার সব প্রধান অঞ্চলেই কবিগণ আবির্ভূত হন; পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বঙ্গের ভেদ ছিল না। তবে কতক শাখা অঞ্চলবিশেষে জনপ্রিয় ছিল। ৩. হিন্দু ও মুসলমান কবিগণ স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাব্যরচনা করেন—মিলন হয় নি, সংঘর্ষও বাধে নি; দু-একটি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সুর আছে। ৪. চৈতন্যদেব সাহিত্যকে দরবার থেকে বৈষ্ণব-আখড়ায় নিয়ে যান; আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্য দরবার, দরগাহ, আখড়া, গণআসর প্রভৃতি নানা স্থানে প্রসারলাভ করে। কোন কোন বিষয়ের পাঠক-শ্রোতাও পাল্টে যায়। ৫. পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি বেশি, নতুন ধারার উদ্ভাবন সামান্য, অর্থাৎ বাংলার কবিগণ সৃজনশীল হয়ে উঠেন নি, অনুকরণ-অনুসরণ দ্বারা বৃত্তাবদ্ধ ছিলেন। ৬. কাব্যের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্র, কাব্য ও ঐতিহ্য থেকে; কবিগণ স্থানীয়, ভারতীয় ও আরবীয়-ইরানীয় ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। ৭. ভাষাতে কিঞ্চিৎ নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, তা জনপ্রিয়ও হয়; কিন্তু কৃত্রিম বলে শেষ পর্যন্ত টিকে নি। ৮. পদ ও গানের তুলনায় আখ্যানকাব্যের সংখ্যা বেশি; কোন কোন আখ্যান বিরাটাকার। উদ্যমহীন, গতিহীন, অনুকরণপ্রবণ মানসিকতা থেকে এরকম হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মঙ্গলকাব্য

লৌকিক, পৌরাণিক, অর্ধ-পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক নানা কাব্য পূর্বে রচিত হয়েছে, আঠারো শতকেও রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যের প্রধান চারটি ধারা মনসা, চণ্ডী, কালিকা ও ধর্মঠাকুরের পূজাভিত্তিক কাব্য। এছাড়াও শিব, শীতলা, ষষ্ঠী, সরস্বতী, সূর্য, গঙ্গা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শক্তিভিত্তিক মঙ্গলকাব্যও রচিত হয়। এসব দেবশক্তির

মাহাত্ম্যকীর্তন ও পূজার অর্থ হলো প্রতিদানে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ। মনসা সর্পের দেবী, মনসাপূজা করলে সর্পের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চাঁদ, বেহুলা ও সনকা মনসার পূজা করে সর্পদংশনে মৃত সন্তান ও হৃত সম্পদ ফিরে পায়। চণ্ডীর পূজা করে ব্যাধসন্তান কালকেতু ও বণিকপুত্র শ্রীমন্ত বিপদ থেকে মুক্তি পায় ও ধনসম্পদ লাভ করে, এমনকি রাজ্যেরও অধিকারী হয়। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করেন, তিনি ভক্তকে সন্তানের বরদানও করেন। ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী তাঁর পূজা করে বীরপুত্র লাউসেনকে লাভ করে। অন্নদামঙ্গলের নায়ক সুন্দর অন্নদাদেবীর পূজা ও স্তব করে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পায়, রাজকুমারী বিদ্যাকে লাভ করে, শ্বশুরের রাজ্যও পায়; অপর চরিত্র ভবানন্দ মজুমদার দেবীর কৃপায় দৈবধনের অধিকারী হয় এবং কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পায়। শিব কৃষির দেবতা, শীতলা বসন্তের দেবী, ষষ্ঠী সন্তানের দেবী; সূর্য কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করেন, সরস্বতী বিদ্যা দান করেন। অনগ্রসর সমাজের মানুষ এসব দেবদেবীর পরিকল্পনা করে—সমাজবিজ্ঞান এমনই ব্যাখ্যা দেয়। আত্মবল, বুদ্ধিবল, জ্ঞান ও শ্রমশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে দৈব ও অলৌকিকভাবে তারা সবকিছু আয়ত্ত করতে চায়। তুর্কীবিজয়োত্তর যুগে উচ্চবর্গের শিক্ষিত কবিগণ এসব দেবদেবীর মাহাত্ম্যভিত্তিক কাব্য রচনা করে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। গোপাল হালদার বলেন, "প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল হিন্দু সমাজের ও হিন্দু সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রেরণা, প্রতিরোধের সাহিত্য।"[৫] সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এই উক্তির সত্যতা মেনে নিয়েও বলা যায়, বাংলার কবিগণ বিজিত, শাসিত, শোষিত অনগ্রসর শ্রেণীকে জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আলিবাবার ধনপ্রাপ্তি অথবা আলাউদ্দিনের যাদুর প্রদীপপ্রাপ্তি ব্যক্তির অর্জন নয়, দৈব বা অলৌকিক দান—তা সমাজকে স্বপ্ন দেখায়; সমাজকে কর্মক্ষম, উদ্যোগী ও সংগ্রামী করে না। পীর-পাঁচালীতে পীরকে দেবতার স্থানে বসিয়ে সন্তানের বর দান, ধন দান, ব্যাধি নিরাময় ইত্যাদি চিত্র অঙ্কন দ্বারা বৈষয়িক ইচ্ছা ও মনস্কামনা পূরণ করা হয়েছে। এ কাজটি হিন্দু কবির মতো মুসলমান কবিও করেছেন। আসলে সামন্ত সমাজের ফলই এমন। সামন্তবাদী চেতনা প্রভুভক্ত হতে শেখায়, প্রভুদ্রোহী হতে শেখায় না। যেখানে ব্যক্তি-অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, সেখানে দৈবনির্ভরতা, অদৃষ্টবাদ, অলৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশে আঠারো শতক পর্যন্ত সামন্ত শাসন ও সমাজব্যবস্থা অটুট ছিল। এ যুগের সাহিত্যেও তার প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল।

মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ, বাংলার জাতীয় কাব্য। কাব্যের বিষয়, চরিত্র, জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, আচার, বিশ্বাস, পোশাক, খাদ্য, আবেগ, প্রেম, কলহ, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছু মিলিয়ে এগুলিতে বাংলার ও

৫. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৩), ৩য় সংস্করণ), ৪৬-৪৭

বাঙালির খাঁটি চিত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ, মনসামঙ্গলে বণিক, অন্নদামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে সামন্ত, শিবমঙ্গলে কৃষকপরিবারের কথা আছে। প্রধান চরিত্রের চারপাশে অজস্র নরনারী ভিড় করে আছে। কালকেতু, বেহুলা, শ্রীমন্ত, সুন্দর, ভবানন্দ, লাউসেনের সহায় তাদের ইষ্টদেবতা, কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল, হীরা মালিনী, ঈশ্বরী পাটনী, ইছাই ঘোষ, হরিহর বাইতি ইত্যাদি মানবচরিত্র দেবতার বরপুত্র নয়, রক্তমাংসের মানুষ—নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি অথবা শান্তি পায়। মানুষের এসব চিত্র ও চরিত্র কবিরা পরিচিত সমাজ থেকেই গ্রহণ করেছেন। ধর্মের খোলসটুকু বাদ দিলে মানুষ ও পরিবারের যে পূর্ণাঙ্গ বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়, তাতে এগুলিকে সেকালের উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যায়।

অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্র রায়, মনসামঙ্গলের জগজ্জীবন ঘোষাল, ধর্মমঙ্গলের ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিক গাঙ্গুলী, শিবমঙ্গলের রামেশ্বর ভট্টাচার্য এ যুগের এ ধারার প্রধান কবি। তবে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উর্ধ্বে। তাঁকে মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে ৪০টাকা বেতনের রাজকবি ছিলেন। তিনি বাংলা ব্যতীত সংস্কৃত ও ফার্সি জানতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে জমিদারপুত্র ছিলেন। বর্ধমান মহারাজার কোপে পড়ে একসময় কারারুদ্ধ হন। ভারতচন্দ্রের বংশ, বিত্ত, শিক্ষা, জীবিকা, অভিজ্ঞতা কবিকে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অধিকারী করেছে। এদিক থেকে কেবল আলাওলের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয়।

ভারতচন্দ্র পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন, আর এর তিন বছর পরে মৃত্যুবরণ করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সিরাজউদ্দৌলার অপসারণের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন। বর্গীর দস্যুবৃত্তির কথা তাঁর জানা আছে। অপরদিকে মুর্শিদাবাদের নবাবদরবারের বৈভব-বিলাসিতার কথাও তাঁর জানা আছে। *অন্নদামঙ্গলের* মূল অংশ বিদ্যাসুন্দর আখ্যানকাব্য, এব বহিরাবরণে মানসিংহভবানন্দ উপাখ্যান আছে—এটি ভারতচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত। কাব্যের শুরুতে দেবখণ্ড আছে। পুরাণ, ইতিহাস, লৌকিক আখ্যান—এই তিনের সমন্বয়ে ভারতচন্দ্র 'নতুন মঙ্গল গান' রচনা করেন। *অন্নদামঙ্গলে* ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মের বন্ধন বেশ শিথিল। তাঁর কাব্যে মানবজীবনের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ধর্মের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। এই জীবনকথাতে এসেছে তাঁর যুগের রস ও রুচি, যাকে অশ্লীল বলে সরাসরি অভিযোগ করা হয়। রাজার ও সভাসদদের আনন্দবিধানের জন্য রচিত এই কাব্যে ভোগ-বিলাস, অশ্লীলতা যেমন, তেমনি নাগরিক বৈদগ্ধ্য, লিপিচাতুর্য এসেছে। তিনি অশ্লীলতাকে নাগরিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ও লিপিচাতুর্যের আবরণ দিয়েছেন, আর এখানেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। "বাণিজ্যে

লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ।"—কবির এই উক্তিতে যুগের প্রতিধ্বনি আছে; কৃষি-অর্থনীতি অপেক্ষা ব্যবসায়-অর্থনীতির গৌরবকীর্তন আছে। উদীয়মান বণিকশক্তির ইঙ্গিতবহ তা। তবু সামগ্রিক বিচারে ভারতচন্দ্র যুগের সৃষ্টি, যুগের স্রষ্টা নন।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পর ঘনরাম চক্রবর্তীর স্থান। তিনি বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা পান, তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' (১৭১১) রচিত হয় গুরুর নির্দেশে। ধর্মঠাকুর নিম্ন জাতির পূজ্য। কাব্যের নায়ক লাউসেন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র বীর চরিত্র। কালকেতু বলবান, কিন্তু বীর চরিত্র নয়, চাঁদ সদাগর দৃঢ়চেতা ও আপোষহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, তবু বীর চরিত্রের ভাবমূর্তি তার নেই। সামন্তপুত্র লাউসেন কুলেশীলে, বিদ্যায় ব্যবহারে প্রকৃত বীরের ভূমিকা পালন করে। মাতুল মহামদ উৎপীড়কের ভূমিকা নিলে লাউসেন তাকে মল্লযুদ্ধে পরাভূত ও বশীভূত করে। এছাড়া একাধিক সামন্ত রাজার ও জীবজন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করে লাউসেন জয়ী হয়েছে। এতে বীররস আছে, আদিরসও আছে। 'আখড়া পালা'য় ছদ্মবেশিনী দেবী, 'জামতি পালা'য় রঙ্গিনী নটী এবং 'গোলাহাট পালা'য় গণিকা সুরিক্ষা লাউসেনকে প্রলোভিত ও বশীভূত করার জন্য যেরূপ আচরণ করে তা রুচি ও নীতিকে ছাড়িয়ে যায়। এখানেও যুগ কবিকে গ্রাস করেছে। সুকুমার সেন বলেছেন, "ঘনরামের রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা।"[৬] এটি কবির ভাষার গুণ, বিষয়ের গুণ নয়। তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষা ও পরিবেশ থেকে তিনি রচনার এই প্রসন্নতাগুণ অর্জন করেন। ঘনরামের একটি পঙ্‌ক্তি এমন: "রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ / দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান।" রাজার মঙ্গল ও দেশের কল্যাণচিন্তা ঘনরামের ছিল; এজন্য কাব্যে বাহুবল ও নৈতিকবলের উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "রামেশ্বর, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর এই তিন জন মঙ্গলকাব্যের কবি এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।"[৭] রামেশ্বর ভট্টাচার্য *শিব সঙ্কীর্তন* (১৭১২) রচনা করেন। পৌরাণিক দেবতা শিব-পার্বতীর পারিবারিক কাহিনী নিয়ে এটি রচিত। শিবের জীবিকা কৃষি ও ভিক্ষাবৃত্তি। শিব নামে দেবতা কিন্তু কাব্যে তিনি একজন দরিদ্র কৃষক। শিবপরিবারের আড়ালে দরিদ্র কৃষকপরিবারের গার্হস্থ্যজীবন চিত্রিত করে রামেশ্বর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি মেদিনীপুরের যদুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহ ও তৎপুত্র যশোমন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজসভায় 'পুরাণ

৬. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, (কলিকাতা ১৯৬৫), ১৮১।

৭. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, তৃতীয় খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৬৬), ৯২০।

পাঠ' করে শোনানো তাঁর কাজ ছিল। রাজার নির্দেশে তিনি কাব্য রচনা করেন।[৮] রামেশ্বরের *সত্যপীরের ব্রতকথায়* হিন্দি-উর্দু-ফার্সির ব্যবহার আছে। রামেশ্বর সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর কাব্য মালিন্যমুক্ত ও রুচিপূর্ণ ছিল। "পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল", "দারিদ্র্য দোষের পর দোষ আর নাই", "অনর্থের বীজ অর্থ মত্ততার ঘর" ইত্যাদি প্রাজ্ঞোক্তির মধ্যে কবির চিন্তাশক্তি ও বাকচাতুর্য প্রকাশিত হয়। বাণিজ্যের মূল পুঁজি ও প্রবঞ্চনা—এ সত্য সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তা সর্ববঙ্গীয়, এমনকি আসাম-উড়িষ্যা ও বিহারেও এ-কাব্য রচিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলে জলমগ্নতার কারণে সর্পের উপদ্রব বেশি, এ কাব্যের চর্চাও বেশি। জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, ষষ্ঠীবর দত্ত, রামজীবন বিদ্যাভূষণ প্রমুখের কাব্যে পূর্বসূরিদের অনুসরণ আছে, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, বংশীদাস, নারায়ণদেব, কেতকাদাস প্রমুখের চেয়ে তাঁদের প্রতিভা উচ্চ ছিল না। মনসামঙ্গলের কাহিনীর দু'টি অংশ—দেবখণ্ড ও মানবখণ্ড। মানবখণ্ডে চাঁদসদাগর-বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। শিবভক্ত চাঁদবেনে মনসার পূজা দিতে অস্বীকৃতি জানালে দেবীর কোপে তাঁর সর্বনাশ হয়। তিনি সপ্তপুত্র, সপ্তডিঙ্গা হারান এবং নিজেও জীবনান্ত দুর্ভোগে পড়েন। শেষে পূজা দিয়ে তিনি সবকিছু ফিরে পান। দেবশক্তির সাথে মানবশক্তির এই সংগ্রামে সেকালের প্রভুশক্তির সাথে প্রজাপুঞ্জের লড়াইয়ের ছবি আছে। বণিকশক্তি মাথা তুলেছে, কিন্তু সামন্তপ্রভুর কাছে নতিস্বীকার করেছে।

বৈষ্ণবকাব্য

শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রেম-ভক্তিবাদের ধর্ম। যেকোন মানুষ দীক্ষা নিয়ে পরম বৈষ্ণব হতে পারে। শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত হিন্দুসমাজে এ আদর্শ বিপ্লব নিয়ে আসে। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুসারীগণ বাংলায় বৈষ্ণবপদ, চৈতন্য ও মোহান্তজীবনী, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি রচনা করে বৈষ্ণব আন্দোলনে জোয়ার সঞ্চার করেন। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-একত্ববাদের আদর্শের আলোকে বৈষ্ণবধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে চৈতন্যদেব প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ও বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী মানুষকে আধ্যাত্মিক আশ্রয় দেন। ষোল ও সতেরো শতক বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির যুগ। আঠারো শতকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বৈষ্ণব সাহিত্যের মান ও পরিমাণ হ্রাস পায়, বৃত্তাবদ্ধ ভাবস্রোতের ন্যায় তা গতি ও দ্যুতি হারিয়ে ফেলে। কৃষ্ণমঙ্গলে কৃষ্ণলীলা,

৮. "পূর্ব বাস যদুপুরে/হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে/রাজা রামসিংহ কৈল প্রীতি। স্থাপিয়া কৌশিকী তটে/বসিয়া পুরাণ পাঠে/রচাইল মধুর সঙ্গীত ॥" *শিবসঙ্কীর্তন*, ঐ, ৮৯১।

চৈতন্যজীবনীতে চৈতন্যলীলা এবং পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমলীলা আছে। এ যুগের কোন জীবনীকার ও কবি পূর্ববর্তী জীবনীকার ও কবির সমকক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। পূর্বসূরিদের ধারা টিকিয়ে রেখেছেন এটাই তাঁদের কৃতিত্ব। কৃষ্ণমঙ্গলের প্রধান উৎস ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদি। তাঁরা কৃষ্ণকে ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো 'আদর্শ পুরুষ' করে মূল্যায়ন করেন নি। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের মধ্যে *ভক্তিরত্নাকর* নরহরি চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গোপাল হালদার একে 'বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিশ্বকোষতুল্য' গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] পদসঙ্কলকগণ স্বয়ং পদকর্তাও ছিলেন। তাঁরা বড় বড় গ্রন্থের সঙ্কলন করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। *ক্ষণদাগীতিচিন্তামণি*তে তিনশ'র অধিক, *পদামৃতসমুদ্রে* ৭৪৬টি, *পদকল্পতরু*তে তিন হাজারের অধিক, *কীর্তনানন্দে* ৬৫১টি, *মুকুন্দানন্দে* ৬৫৯টি পদ সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলনগুলি বিস্মৃতি ও ধ্বংস থেকে বৈষ্ণবপদকে রক্ষা করেছে। কৃষ্ণমঙ্গল, জীবনীগ্রন্থ ও শাস্ত্রকাব্যে যে তত্ত্ব আছে বৈষ্ণবপদে তাকে কাব্যস্ফূর্তি দেওয়া হয়েছে—ভক্তি ও বিশ্বাস সে-তত্ত্বে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করে। আঠারো শতকে কবির আবেগ ও আন্তরিকতা কমে আসায় সারবস্তুহীন ভাষা ও ছন্দ কর্মে পরিণত হয়। কোন অবৈষ্ণব পদকর্তা বা জীবনীকার নেই; বৈষ্ণবতত্ত্বে অবিশ্বাসীর পক্ষে পদরচনা সম্ভব নয়। মুসলিম পদকর্তা রাধাকৃষ্ণের রূপকে সুফিপদ রচনা করেন। বৈষ্ণবকাব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাহিত্য, কিন্তু রচনাগুণে তা সকল শ্রেণীর মানুষের আস্বাদ্য ও উপভোগ্য।

অনুবাদকাব্য

অনুবাদ ভাষান্তর শিল্প। সমাজে চাহিদা সৃষ্টি হলে অনুবাদ হয়। মধ্যযুগে সংস্কৃত *রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত* গ্রন্থের কাব্যানুবাদ এই চাহিদার ফসল। অনুরূপভাবে আরবি-ফার্সি গ্রন্থেরও কাব্যানুবাদ হয়। অনুবাদকর্মের মাধ্যমে ভারতীয় ও আরবীয়-ইরানীয় ঐতিহ্য বাংলায় প্রবেশ করে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে 'matter of Sanskrit' (সংস্কৃতের উপাদান) ও 'matter of Arabic-Persian' (আরবি-ফার্সির উপাদান) বলেছেন। সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি—তিনটি ধ্রুপদী ভাষা (classic language)। ঐসব ভাষার মহাকাব্য, রোমান্স, ধর্ম ও জ্ঞানশাস্ত্রের অনুবাদ হয়। আঠারো শতকে রামায়ণের অনুবাদক-কবির সংখ্যা ২০ জন। এঁদের মধ্যে ফকির রাম কবিভূষণ *অঙ্গদের রায়বার* (১৭০৩), শঙ্কর চক্রবর্তী *বাল্মীকি পুরাণ* (১৭০২), জগৎরাম রায় *অদ্ভুত রামায়ণ* (১৭৭১), রামানন্দ ঘোষ *রামায়ণ* (১৭৮০), রামানন্দ যতি *অদ্ভুত রামায়ণ* (১৭৬২) রচনা করেন। মহাভারতের অনুসরণে রচিত হয় দ্বৈপায়ন দাসের *অশ্বমেধ পর্ব*, নন্দরামের *দ্রোণপর্ব*, কৃষ্ণানন্দ বসুর *শান্তিপর্ব*, দ্বিজ কৃষ্ণরামের *অশ্বমেধ পর্ব*, দ্বিজ গোবর্ধনের *গঙ্গাপর্ব*, রামলোচনের *নারীপর্ব*, রাজারাম দত্তের *দণ্ডীপর্ব*, কবিচন্দ্রের *দাতাকর্ণ পর্ব* ইত্যাদি। গঙ্গাদাস সেন সমগ্র *মহাভারত*

---

৯. *প্রাগুক্ত*, ১৮৭।

অনুবাদ করেন। কৃষ্ণমঙ্গল *ভাগবতের* অনুসরণে রচিত। *রামায়ণ-মহাভারতের* আংশিক অনুবাদই বেশি, পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কম। এগুলির কোনটি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের অনুবাদের সমকক্ষতা লাভ করে নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল ও ব্যর্থ অনুকরণ হয়েছে। *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* অধিকাংশ অনুবাদক পশ্চিমবঙ্গের, দু-একজন উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। কৃষ্ণমঙ্গল শ্রীহট্টেও রচিত হয়েছে। রাম-সীতা নৈতিক আদর্শের, রাধা-কৃষ্ণ প্রেমাদর্শের প্রতীক। এদেশে একজন মীরাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন নি, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য রামভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তির আধিক্য বেশি। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা কবিওয়ালাদেরও গানের বিষয় হয়েছে। "কানু ছাড়া গীত নেই, রাধা ছাড়া সাধা নেই" ইত্যাদি প্রবাদ এই আধিক্য থেকে এসেছে।

আরবি-ফার্সি ভাষা জানে না এমন পাঠকের কাছে ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য ঐসব ভাষার উৎস থেকে বাংলা কাব্য রচনা করেন বলে মধ্যযুগের অধিকাংশ মুসলমান কবি আত্মকথায় উল্লেখ করেন। *কিফায়িতুল-মুসল্লীন* (১৬৩৮) গ্রন্থে শেখ মুত্তালিবের একটি বক্তব্য এমন :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ ॥
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
এই পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥

দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬৩) কোরানের ফার্সি অনুবাদ করলে মৌলবাদীরা তাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান।[১০] পাপভয় ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ইসলামী ধর্মকথার ভাষান্তরণের এই প্রয়াসের পিছনে আছে সমাজের অজ্ঞ মানুষকে জ্ঞানদান করা। বাংলার কবিগণ ভাষান্তরকর্মের মাধ্যমে আরব-ইরানের উপাদান এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত মুসলিম সমাজকে আলোকিত করা এবং ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করা। তালিকায় যেসব গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, সেগুলির অধিকাংশ ধর্ম ও নীতিমূলক গ্রন্থ। কিছু ইতিহাস ও রোমান্সেরও অনুবাদ হয়েছে।

কবিগণ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও রংপুরের অধিবাসী ছিলেন। হেয়াত মাহমুদ ছাড়া সবাই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। কাব্যগুলির মধ্যে *আম্বিয়াবাণী* (১৭৫৭), *সিরাজুল কুলুব* (১৭৯০), *দকায়িকুল হক্কায়িক* (১৭৯০) ও *রাহাতুল কুলুব* (১৭৯৬) আকারে বিরাট গ্রন্থ।

১০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা ১৩৭৪, পরিমার্জিত সংস্করণ),২৬৫।

পয়ার ও ত্রিপদী মিলিয়ে প্রথম গ্রন্থের চরণসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার।[১১] শেষ গ্রন্থ *রাহাতুল কুলুবে* উনিশটি অধ্যায় আছে, যথা—কিয়ামতের কথা, কিয়ামতের ভয়, পিতামাতার হক, দোজখের কথা, বিহিশ্‌তের কথা, রেবাখোরের কথা, রোজা-নামাজের কথা, সুরাপানের কথা, নামাজের পুণ্য, কোরানপাঠের পুণ্য, স্ত্রীপুরুষের দায়, মিথ্যা বলার পাপ, পরচর্চার দোষ, হাসদের (ঈর্ষার) কথা, নেকীর কথা, ক্ষমার কথা, অছিয়তের বয়ান ও বিবিধ প্রস্তাব।[১২] ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠনের জন্যই যে গ্রন্থখানি প্রণীত তা এই সূচিমালা থেকে বোঝা যায়। বলাবাহুল্য, এ কাব্য শিল্পসৃষ্টির জন্য রচিত হয় নি।

অনুবাদের এ-ধারায় হেয়াত মাহমুদ ও সৈয়দ নুরুদ্দীন শ্রেষ্ঠ কবি। উভয়ে চারখানি করে কাব্য রচনা করেন।[১৩] তাঁরা উভয়ে আরবি ও ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ উঁচু দরের আলেমও ছিলেন। হেয়াত মাহমুদ কাজি পদে বৃত ছিলেন। তিনি আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এবং সৈয়দ নুরুদ্দীন দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য রচনা করেন। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাঁদের কাব্যজীবনকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। বরং নিস্পৃহতাই লক্ষীভূত হয়। এর কারণ এমন হতে পারে যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজপুরুষ দিবেন, প্রজা হিসেবে তাঁদের করণীয় কিছু ছিল না। তাঁরা সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার হাল ধরেন এবং সেখানেই সফলতা অর্জন করেন। বিষয়গুণে তাঁরা শ্লীলতা ও সুরুচির পরিচয় দেন। হেয়াত মাহমুদের রচনায় অনেক কাব্যোক্তি আছে, যেগুলি তাঁর প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তির ধারক। যেমন—"পরদেশে বিদ্যা বন্ধু করে নানা হিত।", "বিনা শ্রমে ধন বিদ্যা তপস্যা না হয়।", "তিক্ত গুড়ে সুধা দিলে মিষ্ট নাহি হয়।", "জলের উদ্দেশে জল হেট মুখে ধায়।", "মূর্খ মিত্র হৈতে ভাল জ্ঞানী শত্রু যেই।", "কৃপণের ধন যেন বৃদ্ধের যুবতি।" এসব কাব্যোক্তির অধিকাংশই কবির স্বরচিত ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ভাষা শিষ্ট ও শুদ্ধ।

প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমান কবির সৃজনশীল ধারা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা কাহিনীকাব্য। এগুলিকে রোমান্স বলেও আখ্যায়িত করা হয়। *ইউসুফ-জোলেখা* প্রণেতা শাহ মুহম্মদ সগীর, *লায়লী-মজনু* প্রণেতা দৌলত উজির বাহরাম খান, *সতীময়না-লোরচন্দ্রানী* প্রণেতা কাজী

১১. মযহারুল ইসলাম (সম্পাদিত), *কবি হেয়াত মামুদ,* (রাজশাহী, ১৯৬১) গ্রন্থ থেকে এ সংখ্যা নিয়েছি।

১২. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* (ঢাকা ১৯৫৫), ২৮৯।

১৩. হেয়াত মাহমুদ, *জঙ্গনামা* (১৭২৩), *সর্বভেদবাণী, হিতজ্ঞানবাণী* (১৭৫৩),ও *আম্বিয়াবাণী* (১৭৫৭); সৈয়দ নুরুদ্দীন, *দাকায়িকুল হকায়িক* (১৭৯০), *মুসার সওয়াল, রাহাতুল কুলুব* (১৭৯৬) ও *হিতোপদেশ* (১৭৯৬)।

দৌলত ও *পদ্মাবতী* প্রণেতা আলাওল যেমন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, আঠারো শতকের কোন কবি তা পারেন নি। তাঁরা পূর্বধারার উজ্জ্বলতাকে ম্লান ও নিষ্প্রভ করেছেন। মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* এবং গরীবুল্লাহর *ইউসুফ-জোলেখা* (১৭৫৩), মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী* এবং আমীর হামজার *মধুমালতী* (১৭৯০), নওয়াজিশ খানের *গুলে বকাওলী* এবং মুহম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী* (১৭৬০) ইত্যাদি কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায় এ দুর্বলতা ও অপকর্ষের চিত্র ধরা পড়ে। গরীবুল্লাহ ও আমীর হামজা হুগলীর অধিবাসী, অন্য কবিগণ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় আবির্ভূত হন। এ-অঞ্চলে ইসলামী শাস্ত্রকাব্য ও কাহিনীকাব্য বেশি রচিত হয়েছে।

প্রণয়োপাখ্যানের বিষয়বস্তু প্রেম। ভারত ও আরব-ইরান এসব আখ্যানের উৎসভূমি। ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় রচিত মূল কাব্যে সুফিমতের আধ্যাত্মিক প্রেমের রূপক আছে। বাংলায় তা লৌকিক প্রেমের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে বাংলার কবিগণ সাধক নন, পাঠকেরও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নেই। প্রেমকাহিনীতেই পাঠক আকৃষ্ট। *গুলে বকাওলী* (১৭৬০), *মধুমালতী* (১৭৯০), *শাহপরী মল্লিকজাদা* (১৭১৫), *মৃগাবতী* ইত্যাদি কাব্যের নায়ক মানবপুত্র, নায়িকা পরীকন্যা। কাব্যগুলি নায়ক-নায়িকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, রূপতৃষ্ণা, দেহসম্ভোগের পাশাপাশি রাক্ষস, দৈত্য, যাদু, দুর্গম অভিযাত্রা ইত্যাদির অলৌকিক গালগল্পে পরিপূর্ণ। মধ্যযুগের সাহিত্য ধর্মশাসিত কিন্তু এই একটি শাখায় ধর্মকথা নেই।

প্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি; প্রেমকে সফল করে তোলার জন্য নায়কগণ সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এবং সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে; রোমান্টিক প্রেমকাব্য মিলনাত্মক, বিয়োগান্তক নয়। কবিদের জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এমনটি হয়েছে। উল্লেখ্য যে ভারতীয় ঐতিহ্যে কিন্তু ট্রাজেডি নেই, প্রয়োজনে এমনকি স্বর্গেও মিলন দেখানো হয়।

শাস্ত্রকাব্য ও প্রণয়কাব্যের বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে একটি সত্য ধরা পড়ে যে কবিগণ ভারত ও আরব-ইরানের ইসলামিক ও অনৈসলামিক উপাদান ব্যবহার করে বাংলা কাব্যের দিগন্ত প্রসারিত করেন। হিন্দু কবিগণ হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির চর্চা করেন, মুসলমান কবিগণ মুসলিম সমাজ ও ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করেন। কেউ কারও সীমানা ছাড়িয়ে যান নি, এজন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধও নেই। তাঁরা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। ভাষার রাজ্যেও হিন্দু-মুসলমান ভেদরেখা টানা যায় না। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিম সমাজ দেশমৃত্তিকার গভীরে শিকড় বিস্তার

করেছে। মুসলিম পদকর্তাদের 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি' বলা হয়; ভাবে সাদৃশ্য ও ভাষায় একাত্মতা থেকেই তাদের এমন নামকরণ হয়েছে।

পীর-পাঁচালী

মুসলমান পীরের উপর হিন্দুর দেবতার মাহাত্ম্য আরোপ করে সত্যপীর, মানিকপীর, বনবিবি ইত্যাদি লৌকিক পীরের উদ্ভব। মঙ্গলকাব্যের ধারায় তাঁদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক লোককাহিনীকে কাব্যরূপ দিয়ে 'সত্যপীরের পাঁচালী', 'মানিকপীরের গীত', 'বনবিবির জহুরনামা' রচিত হয়। ভারতচন্দ্রও সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেন। এতেই এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সত্যপীর ভক্তকে রোগ-শোক-দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে পারেন। মানিক পীর গরু ও বনবিবি বনের কাঠ-মাছ-মধু-পাতা সংগ্রহকারীকে রক্ষা করেন। পাঁচালীর কাহিনী স্থানিক ও মৌলিক। পীর-পাঁচালীর শিল্পমূল্য তুচ্ছ, তবে তা সাধারণ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গেঁথেছে—এখানেই এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব নিহিত।

দোভাষী পুঁথি

দোভাষী পুঁথিতে বিষয়বস্তু পূর্বের ধারার সাথে অভিন্ন, কিন্তু ভাষাভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু আরবি-ফার্সি-হিন্দি শব্দের মিশ্রণ নয়, পদবিন্যাস ও বাক্যগঠনেও ঐসব ভাষারীতির প্রভাব পড়েছে। এমনকি, উর্দু-ফার্সির নিয়মে গ্রন্থের শুরু হয় ডান দিক থেকে। ভাষাবৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে জেমস লঙ একে 'মুসলমানী বাংলা', সুকুমার সেন 'ইসলামি বাংলা', আনিসুজ্জামান 'মিশ্র ভাষা' বলে অভিহিত করেন। সাহিত্যের অঙ্গনে 'দোভাষী পুঁথি' অভিধাটিই গূঢ়ার্থ (connotation) লাভ করেছে। পুঁথির ভাষা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, আঠারো শতকে এর উদ্ভব। এ শতকে দু'জন প্রধান কবি শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা কাব্য রচনা করে খ্যাত হয়েছেন। উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। হুগলী-হাওড়ার মুসলিম পরিবারে দোভাষী কাব্যের উদ্ভব হয়, পরে সারা বাংলাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ-বিশ শতক পর্যন্ত বহু সংখ্যক পুঁথি রচিত ও মুদ্রিত হয়। পুঁথি পাঠেরও স্বতন্ত্র রীতি আছে; আসরে বসে সুর করে পাঠ করা একটি সাধারণ রীতি। এভাবে পুঁথি পাঠের ও শ্রবণের মধ্যে মাদকতা আছে। নিম্নবিত্তের স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মুসলমানের কাছে দোভাষী পুঁথি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলে ক্রমশ এ-ধারার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। বর্তমানে তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে।

গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার একত্রে সমাপ্ত *আমীর হামজা* বৃহৎ কাব্য। ইরানের শাহ নওশেরওয়ানের সাথে খলিফা ওসমানের যুদ্ধ এতে বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গে অজস্র উপকাহিনী আছে, অলৌকিক ও কাল্পনিক ঘটনা আছে; এটি মূলত বীররসের কাব্য।

কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত *জঙ্গনামা* করুণ রসের কাব্য। এই উভয় ধারার রচনা মুসলিম সমাজে আদৃত হয়েছিল। মুসলিম সমাজ রাষ্ট্রের বিজয়কে বীররস এবং পরাজয়কে করুণরস দিয়ে অনুভব করেছে। গরীবুল্লাহর *সোনাভানের পুঁথি* (১৭২০) এবং সৈয়দ হামজার *জৈগুনের পুঁথি* (১৭৯৭) যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম। যুদ্ধ করে রাজ্যজয়ের সাথে সম্পদ ও রমণীলাভের সরলরৈখিক কাহিনী দ্বারা দোভাষী পুঁথির বিরাট ঐতিহ্য গড়ে উঠে। এগুলির অতীত ঐতিহ্যে ডুবে থেকে এক প্রকার আত্মপ্রসাদলাভের প্রবণতা কাজ করেছে। এগুলিতে উচ্চ ভাব, জাতীয় আদর্শ, জীবনদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি বা নিগূঢ় শিল্পচেতনার অভাব আছে। দোভাষী পুঁথির ধনাত্মক দিকটি এই যে, বাংলা সাহিত্য দরবার ও শিক্ষিত শ্রেণীর সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে জনসাধারণের উন্মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে। "দেশেতে রোজগার নাই / এ খাতের হেতা ভাই / আসিয়াছি রোজগার খাতিরে।" (*আমীর হামজা*)—গরীবুল্লাহর এই উক্তিতে সমকালের ছায়াপাত আছে। মানুষ চাকুরির সন্ধানে 'দেশ' বা বাস্তুভূমি ত্যাগ করছে। সমাজে পরিবর্তন এসেছে।

শাক্তপদাবলী

শাক্তপদ বা শ্যামাসঙ্গীতে কালীদেবীর পূজা-আরাধনা ও চরণাশ্রয়ের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। স্বামী-বক্ষারূঢ়া নৃমুণ্ডমালিনী, খড়গধারিণী এই দেবী শক্তির প্রতীক। তাঁর কাছে ভক্তি নিবেদন ও তাঁর কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ার ফল। "মা আর ঘুরাবি কত, কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত।"— রামপ্রসাদের এই উক্তির মধ্যে গভীর বেদনা আছে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সামাজিক নির্যাতন, রাজনৈতিক সঙ্কটের মিশ্রণে এই বেদনার উৎপত্তি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ মধ্যভাগে যখন সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন দুর্বিপাক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভক্তহৃদয় আদ্যাশক্তির কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করিয়া বাস্তব দুঃখ নৈরাশ্যের কবল হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে। এই জন্য দেখা যাইতেছে যাহারা উচ্ছৃঙ্খল শাসকের খামখেয়ালে সর্বস্বান্ত হইতেছিল, যে সমস্ত ধনাঢ্য ভূস্বামী নবাবী লীলার ইন্ধন জোগাইতে গিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে শ্যামা মায়ের নিকট অন্তরের আকুতি নিবেদন করিয়াছে। তাঁহারা সুখের কথা বলিলেও বাস্তব দুঃখকে বৈরাগ্যের গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন নাই।[১৪]

শাক্তপদের দু'টি শাখা—এক. হর-পার্বতীর পারিবারিক জীবনাশ্রিত আগমনী ও বিজয়া গীত; দুই.কালিকা বা শ্যামার মাতৃরূপের ভজন-পূজন বিষয়ক অধ্যাত্ম গান। রামপ্রসাদ ও

---

১৪. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* তৃতীয় খণ্ড, ১১১৭।

কমলাকান্তের অধ্যাত্মতত্ত্বের শ্যামাসঙ্গীত ভাবে ও সুরে উৎকৃষ্ট। কোন কোন পদে অধ্যাত্মকথার আবরণ ভেদ করে ব্যক্তির আবেগ ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আত্মঃপ্রকাশ করেছে। মা ও সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন করে ভক্তিরসের গীতোচ্ছ্বাস ও কাব্যাস্বাদন আঠারো শতকের অভিনব অবদান। অনেক মহারাজা ও তাঁদের দেওয়ান শাক্তগান লেখেন। তাঁরা অনেকে কোম্পানির শোষণে বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। মহারাজ নন্দকুমারও (মৃত্যু ১৭৭৫) শাক্তপদ রচনা করেন।[১৫] অভিজাত শিক্ষিত শ্রেণীর চর্চায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় শাক্তপদের শিল্পগুণ সমকালের অন্য শাখার তুলনায় উন্নত ও মননসম্পৃক্ত।

কবিওয়ালা গান

'কবি' শব্দের সাথে বৃত্তিবাচক 'ওয়ালা' প্রত্যয় যোগ করে কবিওয়ালা শব্দের উৎপত্তি। যাঁরা কবিতাকে জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁরাই কবিওয়ালা। জনতার আসরে তাৎক্ষণিকভাবে সুর-ছন্দ যোগে কবিতা রচনা করে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। কবিগণ জনতাকে তুষ্ট করেন, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ পান। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এ এক অভিনব কাব্যানুশীলন। অতীতে গায়েন পূজার মণ্ডপে অথবা সামাজিক উৎসবে অন্য কবির কাব্য গান করে শোনাতেন। কবিগানে কবি স্বয়ং রচনার ও গাওয়ার কাজ তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করেন। এমন পেশাজীবী কবির রচনার মান উচ্চ হতে পারে না। কবিগণ দরবার ছেড়ে সরাসরি জনতার মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। এই জনতাকে আনন্দদান করা কবিগানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জনতাকে 'হঠাৎ রাজা' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায় :

> ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। . . . তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।[১৬]

জনতাই কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ও রস-আনন্দভোগী। এতে লিখিত সাহিত্যের সৃজনশীলতা ও শিল্পসুষমা থাকতে পারে না। কথার চটক আর অলঙ্কারের চাতুর্য দ্বারা গানকে মনোমুগ্ধকর ও শ্রুতিসুখকর করে তোলার দিকে কবিগণ জোর দেন।

কবিওয়ালা গানের মুখ্য বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা বলেন। কবিওয়ালারা বৈষ্ণব ছিলেন না। তাঁরা সমাজের

---

১৫. প্রাগুক্ত, ১১৭৬-৭৯।
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*, (বিশ্বভারতী ১৯৬৪), ৭৯।

নানা স্তর থেকে আসেন। তাঁরা ধর্মীয়ভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন না। তাঁদের প্রতিভারও অভাব ছিল। উপরন্তু যুগ, পরিবেশ, শ্রোতা পাল্টে যাওয়ায় তাঁরা চাইলেও আধ্যাত্মিকতার মোড়ক দিতে পারতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ছিল অবলম্বন মাত্র—কবিরা নরনারীর বাস্তব প্রেমকেই চিত্রিত করেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ছাড়াও হরগৌরী ও রাম-সীতার লীলা কবিওয়ালা গানের বিষয়ভুক্ত হয়েছে।

আঠারো শতকে এ-ধারার প্রধান কবি ছিলেন গোজলা গুঁই, রাসু (১৭৩৪-১৮০৫), নৃসিংহ (১৭৩৮-১৮০২), হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২), নিতাই বৈরাগী (১৭৪৭-১৮২১), নিধুগুপ্ত (১৭৫৫-১৮৫২), কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২৫) প্রমুখ। তাঁরা সকলেই স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁরা পূর্বে গান বেঁধে আসরে গেয়ে শোনাতেন, কিন্তু ক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে গেয়ে শোনানোর রীতি দাঁড়িয়ে যায়। কবিগান, দাঁড়া কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খেউড়, টপ্পা, তরজা ইত্যাদি ধারার কবিওয়ালা গান রচিত হয়।

হরু ঠাকুর 'কবির লড়াই'-এ অংশ গ্রহণ করতেন, প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাম বসু ও কেষ্টা মুচি। নিতাই বৈরাগীর ভাষা সহজ, প্রকাশভঙ্গি ছিল অনায়াস ও অনর্গল। নিধু গুপ্ত টপ্পাগায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। টপ্পা আদিরসাত্মক প্রণয়গীতি। তিনি খেউড় ও হাফ-আখড়াই রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, "ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত।"[১৭] এর ভাব ও রস উভয়ই অশ্লীল। কবিওয়ালা গানের জন্মভূমি কলকাতা শহর, পরে তা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। কবিগণ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে কলকাতায় সমবেত হন। প্রথমে হিন্দু কবির, পরে মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রধান লক্ষণ অশ্লীলতা ও নীতিহীনতা—কবিওয়ালা গানের ভাবে, রসে, ভাষায়, ভঙ্গিতে ব্যতিক্রম ছাড়া এই বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

আঙ্গিক ও রীতি (Form and Style)

মধ্যযুগে গদ্য ছিল না, পদ্য ছিল। সব কিছু ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত হতো। উনিশ শতকে গদ্যের ব্যবহার শুরু হয়। পদ্য বলতে পয়ারবদ্ধ চরণরাশিকে বোঝায়। দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী পয়ার কাব্যের প্রধান বাহন ছিল। আট ও ছয় মাত্রার দ্বিপার্বিক চরণ দ্বারা দ্বিপদী পয়ার গঠিত। ত্রিপদীর চরণসংখ্যা তিন, চতুষ্পদীর চরণসংখ্যা চার—ছয় ও আট মাত্রার পর্বভেদে লঘু ও গুরু ত্রিপদী-চতুষ্পদী পয়ার ছিল। দশ মাত্রার চরণ 'দিগক্ষরা', এগার মাত্রার চরণ 'একাবলী' ছন্দ নামে অভিহিত ছিল। প্রতি চরণে পূর্ণ বাক্য ও প্রতি দুই চরণের অন্তে মিল দ্বিপদী পয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আঠারো শতকের

১৭. সুশীলকুমার দে, *নানা প্রবন্ধ,* (কলিকাতা ১৯৫৪), ১১৭।

পদ্যশাসিত কাব্যে ফর্মের দিক থেকে তিনটি প্রধান রূপ লক্ষ্য করা যায়—এক. আখ্যান, কাহিনী বা পাঁচালীকাব্য; দুই. গীতিকবিতা; তিন খণ্ডকবিতা। মঙ্গলকাব্য, প্রণয়োপাখ্যান, জীবনীকাব্য, অনুবাদকাব্য, দোভাষী পুঁথি হচ্ছে আখ্যানাশ্রিত পাঁচালীকাব্য। বৈষ্ণবপদ, সুফিপদ, শাক্তপদ, কবিওয়ালা গান গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত। *রাগতালনামা, যোগকলন্দর, কুর্সিনামা* ইত্যাদিকে খণ্ডকাব্য বলা যায়।

শ্রীরাম পাঁচালী, ভারত পাঁচালী, মনসার পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী, কৃষ্ণের পাঁচালী ইত্যাদি নাম বহুল প্রচলিত। আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্য *পদ্মাবতী পাঞ্চালী* নামে ১৮৬৯ সালে হাবিবি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।[১৮] সংস্কৃত 'পাঞ্চালিকা' থেকে পাঁচালী শব্দের উৎপত্তি। আভিধানিক অর্থ "তান লয়ে গান করিবার উপযোগী ছন্দোবদ্ধ রচনা"।[১৯] বিশেষ অর্থ "(১) গান, (২) সাজ বাজান, (৩) ছড়া কাটান, (৪) গানের লড়াই, (৫) নাচ—এই পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লড়াই"। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন পাঁচালীর এরকম অর্থ করেন।[২০] গানের সুর অর্থেও পাঁচালী শব্দের ব্যবহার আছে, পঞ্চাল বা কনৌজ থেকে এ সুর বাংলাদেশে আসে।[২১] ক্ষুদিরাম দাস বলেন, "পাঁচালী হল গান করার একটা বিশিষ্ট রীতি ও পদ্ধতি।—পদচারণার সঙ্গে এই বিশেষ ঢঙটি সংশ্লিষ্ট বলে পাদ> পাঙ+ চাল+ই বিশেষণবোধক, এরকম ব্যুৎপত্তিই যথাযথ বলে মনে হয়।"[২২] কেউ কেউ পয়ার ছন্দকেও পাঁচালী বলেছেন।[২৩]

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক, সুর-তাল-ছন্দযোগে রচিত মধ্যযুগের আখ্যায়িকা গীতি (narrative song) এখন পাঁচালী বা কাহিনীকাব্য নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য রচনায় বাঙালির প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করেছে। গীতিকবিতায় আবেগ প্রকাশিত হয়েছে; আখ্যানকাব্যে আবেগ, জ্ঞান, দর্শন সব ধরনের অভিব্যক্তি বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। এজন্য এ ফর্মের ব্যাপক অনুশীলন হয়েছে। মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও পিনদ্ধতা রক্ষিত হয় নি। তা পারিবারিক, সামাজিক, মানবিক

---

১৮. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ৩৩০(৩য় সংস্করণ।

১৯. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষার অভিধান,* দ্বিতীয় ভাগ, (কলিকাতা ১৯৩৭, ২য় সংস্করণ), ১৩৩০-৩১।

২০. ঐ, ১৩৩০।

২১. আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বাইশ কবির মনসামঙ্গল,* (কলকাতা ১৯৬২, ২য় সংস্করণ), ২৮৬।

২২. ক্ষুদিরাম দাস, *বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও রীতি,* (কলকাতা, সালের উল্লেখ নেই), ২০৪।

২৩. *বাইশ কবির মনসামঙ্গল* , ২৮৭ (পাদটীকা)।

চেতনাশ্রিত নর-নারীর জীবনকাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দি ও ফার্সির আধ্যাত্মিক রূপককাব্য বাংলা অনুবাদে আবেগ, কল্পনা, স্বপ্নের মিশ্রণে রোমান্সকাব্যে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি দেবকথা ও মানবকথার মিশ্রণে সম্প্রদায়গত আখ্যানকাব্যের (communal poetry) রূপ লাভ করেছে। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুণে এগুলিকে জাতীয় আখ্যানকাব্য (national poetry) রূপেও আখ্যাত করা হয়।[২৪] এ শ্রেণীর কাব্যই অধিক সংখ্যায় রচিত হয়েছে। পূজার মণ্ডপে পালাকারে একাধিক দিবস ধরে পেশাদার গায়েন এগুলি গান করে শোনান।[২৫] যেগুলিকে 'দোভাষী পুঁথি' বলা হয়, সেগুলিও মূলত বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য। পুরাণ, ইতিহাস, কল্পনার মিশ্রণে আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। গদ্যময় পয়ার ছন্দের স্বচ্ছন্দতা এবং মাদকতা কবিদের এ-ধরনের রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে। "মহাভারতের কথা অমৃত সমান/কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান", অথবা "অন্নপূর্ণা উত্তরিলা/গাঙ্গিনীর তীরে/পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে"। "কাশীরাম দাস অমৃত সমান মহাভারতের কথা বলেন, পুণ্যবান শুনেন" এবং "অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উত্তরিলা, পার কর বলিয়া পাটনীরে ডাকিলা"—এমন সরল বাক্য দু'টিই চরণে বিন্যস্ত হয়ে পয়ার ছন্দের দোলা ও বেগ সঞ্চার করেছে। গৃহে, উৎসবে, পূজার মণ্ডপে, দরবারে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এসব কাব্য পাঠ অথবা শ্রবণ করে বাঙালি কাব্যরসপিপাসা মিটিয়েছে ও আনন্দ উপভোগ করেছে। আঠারো শতক অবধি এ ধারা অব্যাহত ছিল। সেকালে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল, অনুলিপি করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। তথাপি বড় বড় কাহিনীকাব্য রচিত ও লিপিকৃত হয়ে ধ্বংসের কবল থেকে সেগুলিকে রক্ষা করেছে। কোন কোন কাব্য পবিত্র জ্ঞানে অন্যকে স্পর্শও করতে দেয়া হয় নি। বলা হয়, সংস্কৃত অনুবাদকাব্য ও মঙ্গলকাব্য রচনা করে হিন্দু কবিগণ ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছেন; আরবি-ফার্সি কাব্যের অনুবাদ ও প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে মুসলমান কবিগণ ধর্মের প্রভাব ও সমাজের বিস্তার চেয়েছেন। কিন্তু উভয়ের ভাষা ও আঙ্গিক এক। আখ্যানকাব্যকে হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছে। ভাষায় ও আঙ্গিকে ঐক্য এসেছে, বিষয়ে ও লক্ষ্যে ঐক্য আসে নি।

মঙ্গলকাব্যের গঠনগত রূপ আছে। দেববন্দনা, গুরুবন্দনা, রাজস্তুতি, আত্মপরিচয় দিয়ে মূল কাব্যের শুরু। মানবখণ্ডে জন্ম, বিবাহ, রূপসজ্জা, রন্ধন, বারমাস্যা, ছদ্মবেশে দেবতার আবির্ভাব, বরদান, ধনপ্রাপ্তি, ভাগ্যোন্নতি, সঙ্কটোত্তরণ, মিলন, মৃত্যু, স্বর্গারোহণ—এরকম

---

২৪. ঐ, ৪ (ভূমিকা)।

২৫. চণ্ডীমঙ্গল আট দিনে, ধর্মমঙ্গল বার দিনে এবং মনসামঙ্গল ত্রিশ দিনে গেয়ে শেষ করা হতো। ঐ, ৩য় (ভূমিকা)।

ছকে কাহিনী বিন্যস্ত হয়। মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক ও ছন্দের সঙ্গে প্রণয়কাব্যের নিকটসাদৃশ্য আছে। কাজী দৌলত তাঁর *সতীময়না-লোরচন্দ্রানী* কাব্যকে 'রসের পাঁচালী' এবং পয়ারকে 'পাঞ্চালীর ছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন।[২৬] হাম্‌দ, নাত, পীরস্তুতি, রাজপ্রশস্তি, আত্মপরিচয় দিয়ে মূল কাব্যের সূত্রপাত হয়। নায়ক-নায়িকার জন্ম, বাল্যশিক্ষা, রূপসজ্জা, দর্শন, রূপানুরাগ, রাজা ও রাজপ্রাসাদের বর্ণনা, নায়কের গৃহত্যাগ ও অভিযাত্রা, দুঃখবরণ, বারমাস্যা, দৈবানুগ্রহ লাভ, নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ ও মিলন, বিবাহ, দেহসম্ভোগ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, রাজ্যপালন, মৃত্যু—এরকম ঘটনাবিন্যাসে কাহিনীকাঠামো রচিত।

আঠারো শতকে *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কম হয়েছে, খণ্ড খণ্ড উপাখ্যানের অনুবাদ হয়েছে বেশি। সমাজের মানুষের দীর্ঘ অবসর কমে এসেছে; একটি কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে—মঙ্গলকাব্যের ও প্রণয়কাব্যের কাহিনীও তাই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী হয়ে উঠেছে। দেববন্দনা, গুরুবন্দনা, রাজস্তুতি, আত্মকথা দিয়ে এসব উপাখ্যানও শুরু হয়েছে। গল্পরস সঞ্চার এ সমস্ত কাহিনীকাব্যের মৌলিক আবেদন ছিল।

বৈষ্ণবপদ, সুফিপদ, শাক্তপদ, কবিওয়ালা গান একাধারে গান ও গীতিকবিতা। অর্থাৎ গান হিসেবে আস্বাদ্য, কবিতা হিসেবেও আস্বাদ্য। সম্প্রদায়গত ধর্মীয় আবেগ ও চেতনার ফল বলে উক্ত নামে এগুলির পরিচয়, কবির নামে পরিচয় নেই। বিষয় নির্বাচনে কবিদের স্বাধীনতা ছিল না, কেননা তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত হন নি। তাঁরা একটি অখণ্ড ভাবকে আবেগের ভাষায় ছন্দোবন্ধনে ও ধ্বনিলালিত্যে পরিস্ফুট করেছেন। এসব কবিতার আয়তন ছোট। বৈষ্ণবপদ, সুফীপদ ও শাক্তপদের মাত্রাসংখ্যা এবং চরণসংখ্যা প্রায় সমমাপের, তবে কবিওয়ালা গানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অবয়বে ও চরণে হেরফের আছে। অক্ষরবৃত্তের দ্বিপদী-ত্রিপদী পয়ার বৈষ্ণবপদ, সুফিপদ, শাক্তপদেরও বাহন। আঠারো শতকে কোন প্রতিভাধর বৈষ্ণবকবি ছিলেন না, বৈষ্ণবপদ গতানুগতিক অনুবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। যুগের চেতনা ও চাহিদা থেকে শ্যামাসঙ্গীত উদ্ভূত হয় এবং রামপ্রসাদের মতো শক্তিধর কবির চর্চায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্ষুদিরাম দাসের মতে, আঠারো শতকে বৈষ্ণবপদ "প্রতিঘাতরূপী লৌকিক ভাষায় নির্মিত শ্যামাসঙ্গীতের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।"[২৭]

শ্যামা-কালী-দুর্গা-পার্বতী নিয়ে রচিত নতুন ধারার শ্যামাসঙ্গীতে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবের সূক্ষ্মতা এবং ভাষার ধ্বনিসৌন্দর্য নেই, রামপ্রসাদী গানের ভাবে ভাষায় প্রত্যক্ষতা

২৬. মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (সম্পাদিত), *সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী*, (ঢাকা ১৯৬৯), ৫৩ ও ৯৭।

২৭. *বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, ২৩৪।

আছে, সুরে চারুত্ব ও সর্বজনীনতা আছে। "প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ / আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।"—সাধক কবি রামপ্রসাদের গানের একটি দৃষ্টান্ত। বাংলা প্রবাদকে সার্থকভাবে গানের চরণে বিন্যস্ত করে প্রকাশভঙ্গিতে চাতুর্য ও বক্রতা আনেন তিনি। এটি তাঁর গানের বিশিষ্ট বাক্‌রীতি। বৈষ্ণবগীতির ভাবালুতার স্থলে শ্যামাসঙ্গীতে আবেগের সাথে বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটেছে। কবির ব্যক্তিহৃদয়ের উষ্ণতাও এতে বেশি। ছোটবড় চরণ দ্বারা স্তবক রচনায় তিনি নতুনত্ব এনেছেন। সুকুমার সেন বলেন, "রামপ্রসাদের কাব্যের একটি গুণ ঘরোয়া ভাবের প্রকাশ।"[২৮] দেবতাকে মাতৃসম্বোধন করে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপনেও নতুনত্ব আছে। উনিশ শতকে দেবমাতা থেকে দেশমাতৃকার কল্পনা আসে।

কবিওয়ালা গান বিভিন্ন শ্রেণীর। 'দাঁড়া কবি' বা 'কবির লড়াই' একটি জনপ্রিয় শাখা। আসরে দুজন কবি 'চাপান-উতোর' ভঙ্গিতে গান গেয়ে পরস্পরকে আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ করেন। "বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত ছিল কবিগানের প্রধান অঙ্গ এবং এই অর্থে ইহা পুরাতন বৈষ্ণবসাহিত্যের এক অভিনব শাখা।"[২৯] কবিওয়ালারা বৈষ্ণবকবিতার উত্তরসূরি, কিন্তু তাঁদের রচনায় তারা ভাবে-ভাষায়-রসে পূর্বের গুণ ধরে রাখতে পারে নি । বিষয় ও আঙ্গিক প্রথাগত ও যান্ত্রিক (conventional and mechanical) হয়ে পড়ে। কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তর যখন চরমে উঠে, তখন সে অংশের নাম হয় খেউড়, এটি গালাগালি ও অশ্লীলতায় পর্যবসিত হয়। এখান থেকেই 'খিস্তি-খেউড়' কথার উদ্ভব হয়েছে।

ছড়ার মাধ্যমে দুই কবির যে লড়াই হয়, তাকে 'তর্জা' বলে।। আরবি 'তর্‌জি' থেকে তরজা শব্দ এসেছে, অর্থ প্রত্যুত্তর। যে গানের প্রতিপক্ষ আছে এবং জয়-পরাজয় আছে, তাতে হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন বেশি হয়। তর্জাতে শ্লীল-অশ্লীলের বালাই ছিল না।

নিধু গুপ্ত 'টপ্পা' গানের প্রবর্তক। হিন্দি টপ্পা শব্দের অর্থ 'লম্ফ', রূঢ়ার্থ 'সংক্ষিপ্ত'। খেয়াল গানের আরও সংক্ষিপ্ত রূপ টপ্পা—অস্থায়ী ও অন্তরা এই দুই 'তুক' নিয়ে গঠিত। সুশীলকুমার দে বলেন, "আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। ...ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"[৩০] "সাধিলে করিব মান কত মনে করি/দেখিলে

২৮. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ৪৯৪।

২৯. *নানা নিবন্ধ,* ১১৭।

৩০. প্রাগুক্ত, ১১৬।

তাহার মুখ তখনি পাসরি।"—নিধুগুপ্ত। "বধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে/শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে/নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো/সুধা বরিষিলো শ্রবণে।"—নিতাই বৈরাগী। টপ্পা গানের এসব দৃষ্টান্তে রাধার প্রেম মুখ্য বিষয়। তবে রাধা উপলক্ষ্য মাত্র; প্রকৃতপক্ষে এতে মানবপ্রেমের আকুতি ব্যক্ত হয়েছে।

আখড়াই, হাফ-আখড়াই কবিওয়ালা গানের আর একটি শাখা। এর পরিচয় দিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন :

> কবিগানকে পাঁচালী কীর্তনের ঢঙ ছাড়িয়ে নূতন করে ঢালাই করে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণ উদ্ভাবন করলেন আখড়াইয়ের। তিনটি মাত্র গানে তা গঠিত : প্রথম 'মালসী' তারপর প্রণয়গীতি, শেষ 'প্রভাতী'। এই আখড়াই রীতিমত কালোয়াতি ব্যাপার, নানাবিধ যন্ত্রযোগে তা গীত হত। কাজেই তা আরও ছেঁটেকেটে সরল করে তৈরী হল লঘু পাকের হাফ-আখড়াই।[৩১]

শ্রোতার ইন্দ্রিয়-উত্তেজনাকর এসব গানের সাময়িক ও ব্যবসায়িক মূল্য ছিল, স্থায়ী শৈল্পিক মূল্য ছিল না। নগর কলকাতার সাংস্কৃতিক রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতরজন তুষ্টকারী এসব সঙ্গীত ও কাব্যচর্চা তিরোহিত হয়।

দোভাষী পুঁথি আখ্যানকাব্য হলেও এর কাব্যরীতি (poetic diction) সম্পর্কে কিছু স্বতন্ত্র বক্তব্য আছে। এক কথায় এটি মিশ্র ভাষারীতির কাব্য। মিশ্রণ এসেছে শব্দাবলী, ব্যাকরণ ও বাক্‌রীতিতে।[৩২] বাংলা, উর্দু, হিন্দি, আরবি-ফার্সি ভাষার শব্দ, বাংলার সঙ্গে উর্দু-হিন্দির বাক্যরীতি পুঁথির ভাষার ভিত্তি রচনা করেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুসলমানী বাংলা' বাংলার মুসলিম সমাজের কোন অঞ্চলের মুখের ভাষা নয়, এটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। এ ভাষার উৎস কলকাতার হাট-বাজারে ছোটখাটো ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার কথাবার্তায় নিহিত আছে। তাঁর ভাষায় :

> One of the features of 'Musalmani Bengali', which demonstrates its rather artificial character, is the frequent use of Hindustani words and forms . . .which has no existence in the Bengali as spoken by the Musalmans in the villages within the different dialectical areas. 'Musalmani Bengali' thus savours of the mixed Bengali-Hindustani-Awadhi jargon which is heard in the bazars of Calcutta among Muhamedan working classes, cabmen, petty traders and others, who speaks Calcutta Bengali and Hindustani equally badly, and unlike the Muhamedan masses in the country have no proper dialect.[৩৩]

৩১. *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, ২৩৮।

৩২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, (কলিকাতা ১৯৭১), ১০৮-১০।

৩৩. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language* ,Vol.1, (Calcutta 1926), 211-12.

বাংলা কাব্যে এধরনের মিশ্ররীতির ভাষার আংশিক ব্যবহার ২৪-পরগনার কবি বিপ্রদাসের *মনসাবিজয়* (১৪৯৫), বর্ধমানের কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* (১৫৯৮), বর্ধমানের কবি দ্বিজ গিরিধরের *সত্যপীরের পাঁচালী* (১৬৬৩), কলকাতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের *রায়মঙ্গল* (১৬৮৬), মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *সত্যপীরের পাঁচালী*, বর্ধমানের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* (১৭১১), ২৪-পরগনার কবি বল্লভের *সত্যনারায়ণের পুঁথি* (১৭১৫) ইত্যাদি রচনায় পরিলক্ষিত হয়।[৩৪] হাওড়ার ভুরশুট পরগনার কবি ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গলে* (১৭৫২) কিছু বেশি অংশ জুড়ে এ ভাষারীতির প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁর আগে হুগলীর বালিয়া-হাফেজপুরের কবি গরীবুল্লাহ *আমীর হামজা*, *সোনাভান* (১৭২০) ইত্যাদি কাব্য সম্পূর্ণ এ রীতিতে রচনা করেন। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ভাগে তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামজা ঐরকম কাব্য লিখেন। উনিশ শতকে কবির সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বাংলার নানা অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দু লেখকের পণ্ডিতী-বাংলার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমান কবি 'মুসলমানী বাংলা' রচনা করেন—এমন মত প্রচলিত আছে।[৩৫] কিন্তু আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। গরীবুল্লাহ যখন দোভাষী পুঁথি রচনা করেন, তখন এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোটেই ছিল না। ভারতচন্দ্রের উক্তি থেকে বোঝা যায়, হিন্দু সমাজে 'যাবনী মিশাল ভাষা' বোঝার পাঠক ছিল। ঐ ভাষায় কাব্যরস সৃষ্টি সম্ভব বলে তিনি দাবিও করেন। মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'দোভাষী বাংলা' ভাষার মূল কাঠামোটি 'সাধু ভাষা'; তবে সাধু ভাষার শব্দের প্রাকৃত ও সংস্কৃত মূলকে উপেক্ষা করে উর্দু-হিন্দি শব্দের মূলরূপকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা দোভাষী বাংলাব ছিল।[৩৬] "হাল হকিকত পুছে হানিফা খাতের/হানিফা স্বপন কথা করিল জাহির।"—*সোনাভান*। "যখন তোমার সাথে পহেলা পিরিত/করার করিলে তুমি আমার সহিত।। —*আমীর হামজা*। এ হলো দোভাষী পুঁথিতে ব্যবহৃত সাধু ভাষারীতি ও দ্বিপদী পয়ারের দৃষ্টান্ত। অক্ষরবৃত্তের চৌদ্দ মাত্রার চরণ দ্বারা এ পয়ারছন্দ রচিত। সুতরাং আখ্যায়িকাগীতির ও দোভাষী পুঁথির ছন্দোরীতি অভিন্ন। গরীবুল্লাহ পাঁচালীকাব্যের অনুরূপ পীরবন্দনা ও আত্মপরিচয় দিয়ে কাব্যের শুরু করেন। তবে দোভাষী পুঁথি গান করার জন্য রচিত হয় নি, পাঠ করার জন্য রচিত। সুর করে এ কাব্য পাঠ করা হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী চারপাশে বসে তা শোনে। এখানে পাঁচালীকাব্যের সাথে দোভাষী পুঁথির তফাৎ আছে।

৩৪. Kazi Abdul Mannan, *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal upto 1855*, (Dhaka 1974), 50-58

৩৫. ঐ, ১৪৯।

৩৬. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ৩০২।

গরীবুল্লাহর ও সৈয়দ হামজার রচিত *আমীর হামজা* কাব্যের চরণসংখ্যা ২৫ হাজার।[৩৭] বটতলার ছাপাখানার বদৌলতে বিরাটাকার এই কাব্যের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার সকল স্তরের মুসলমান *আমীর হামজা* ও অন্যান্য দোভাষী পুঁথি বছরের পর বছর আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছে ও কাব্যরসপিপাসা নিবৃত্ত করেছে।

আলী রজার *জ্ঞানসাগর, ধ্যানমালা, যোগকলন্দর,* মুহম্মদ কাসিমের *হিতোপদেশ,* হেয়াত মাহমুদের *সর্বভেদবাণী* ইত্যাদি সঙ্গীত, যোগতত্ত্ব, সুফিতত্ত্ব ও নীতিশিক্ষার ক্ষুদ্রকাব্যকে খণ্ডকবিতা বলে অভিহিত করা যায়।[৩৭] কাব্যের শুরুতে সংক্ষেপে পীরস্তুতি ও আত্মকথা প্রথাগতভাবে এসব রচনাতেও আছে। এতে প্রচলিত অক্ষরবৃত্তের পয়ারছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। "হৃদয়-প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার/কৃপা কর গাঁথিবারে আগম বিচার।।"—আলী রজা। "যার বিদ্যা নাই সে না জানে ভালমন্দ/শিরে দুই চক্ষু আছে তথাপি সে অন্ধ।"—হেয়াত মাহমুদ। পয়ারছন্দের ধারণ ও বাহনক্ষমতা ছিল অপরিমিত। সারা মধ্যযুগের বাঙালির হৃদয় ও মন, বোধ ও বুদ্ধি পয়ারের ছন্দদোলায় স্ফুরিত ও আন্দোলিত হয়েছে।

ভাষা (Language)

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস, সংস্কার নানা বিষয়ে ভেদ আছে, সাতচল্লিশ সালে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রে ভেদরেখা রচিত হয় নি। এই বাংলা ভাষাই আমাদের আত্মার ও অস্তিত্বের মুখ্য পরিচয়। আমাদের জাতীয়তা ও স্বাধীনতা অর্জনের মূলে আছে ভাষাচেতনা ও ভাষাপ্রীতি। প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ঠিকই বুঝেছিলেন—"রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন।" তিনি "বচন রতন মণি যতনে পুরিয়া" *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। আবদুল হাকিমের ভাষাপ্রীতি ছিল অসাধারণ ও আপোষহীন। আলাওল অতি উচ্চ ও উন্নত ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

আঠারো শতকের কবিগণ কাব্যোৎকর্ষ সাধন করতে পারেন নি, তবে কেউ কেউ ভাষার চারুত্ব ও পারিপাট্য সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সেবা ও দান আছে। কবির রচনায় ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। বড়ু চণ্ডীদাস ও মুকুন্দরাম বড় কবি ছিলেন, কিন্তু দক্ষ ভাষাকর্মী ছিলেন না। ভারতচন্দ্র দক্ষ লিপিকুশলী ছিলেন। আলাওলও বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁরা উভয়ে নগরচেতনার কবি ছিলেন আর ভারতচন্দ্র ছিলেন আলাওলের উত্তরসূরি।

৩৭. ঐ,১৪১।

সিরাজউদ্দৌলার পতনে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়—বাংলার কবিগণ বিষয়টিকে এভাবে দেখেন নি। সরকারি কাজিপদে অধিষ্ঠিত থেকেই হেয়াত মাহমুদ পরের বছর *আম্বিয়াবাণী* কাব্য লিখেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হলে রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয়, গরীবুল্লাহ প্রয়াত হলে সৈয়দ হামজার আগমন ঘটে। কবিরা রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা হারালে 'হঠাৎ রাজা'র সমর্থন পান। কাব্য রচনার পথ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু রুদ্ধ হয় না। প্রজারা রাজা বানায় নি, সুতরাং রাজার বদল হলে প্রজারা বিচলিত হয় নি। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হলে প্রজার উপর তার দায় বর্তায়। জীবন অবক্ষয়ের দিকে গেছে, কাব্যে ও ভাষায় অবক্ষয়ের ছাপ পড়েছে। বিয়াল্লিশের বর্গী আক্রমণ, সাতান্নর পলাশীর যুদ্ধ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর জনজীবনের দুঃখকে বাড়িয়েছে। দুঃখবাদের আর্তি জেগেছে রামপ্রসাদের গানে। আরাধ্যা দেবী খড়গধারিণী মা হিসেবে শত্রুকে দমন করতে পারেন, আবার বরাভয়দাত্রী হিসেবে আশ্রয়ও দিতে পারেন। পাঠক-শ্রোতা দোভাষী পুঁথিতে আমীর হামজা, হাতেম তাই, হানিফার মতো বীরকে খুঁজেছে। এমন বীরপুরুষই জাতিকে মুক্তি দিতে পারে। অস্ত্রধারিণী কালী এবং যুদ্ধবাজ হামজা একই চেতনার দুই রূপ। অন্নদার কাজ শেষ হয়েছে, কালীর কাজ শুরু হয়েছে। এজন্যই ভারতচন্দ্রের ভাষা ও রামপ্রসাদের ভাষার মধ্যে তফাৎ এসেছে। কবিওয়ালারা কবিতাকে জনতার কাছে নিয়ে গেছেন। আখড়াই-খেউড়ের গানে যেরকম খিস্তি-খেউড় হয়, তাতে মার্জিত ও শ্লীল ভাষার স্থান থাকতে পারে না। জর্জ অরওয়েল বলেন, 'If thought corrupts language, language can also corrupt thought." বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন অনিবার্যভাবে ঘটেছে।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। সবাই তাঁর বাক্‌চাতুর্য ও লিপিকুশলতার প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" ভারতচন্দ্র বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সি ও হিন্দুস্থানী চারটি ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁর কাব্যের পাঠক নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার পারিষদবর্গ; গায়েন নীলমণি ভীমসাই গান করে তাঁদের শোনাতেন।[৩৮] "যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে" বলে ভারতচন্দ্র কাব্যরসের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও ভাষার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। *অন্নদামঙ্গলের* দেবলীলা, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ-ভবানন্দ—এই তিনটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানে নানা চরিত্র, নানা ঘটনা, নানা পরিবেশ ও অবস্থার বিবরণ আছে। ঝড়-বৃষ্টি-যুদ্ধের বর্ণনা. রূপবর্ণনা, প্রেমনিবেদন ও সম্ভোগের বর্ণনা, মালিনীর কুটনীবৃত্তি ও ঈশ্বরী পাটুনীর সরলতার

৩৮. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ৪৮৫-৮৬

বর্ণনা, পতিনিন্দা, বারমাসী, রন্ধনবর্ণনা, কালীস্তুতি, দেববন্দনা, বাদশাহ সেলিম ও ভবানন্দের বিতর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাষা হয়েছে বিভিন্ন ও বিচিত্র। কালীস্তুতির এক অর্থ দেবীপক্ষে, অপর অর্থ বিদ্যার পক্ষে গেছে। অন্নদার আত্মপরিচয়ও দ্ব্যর্থবোধক—"অতি বড় বিদ্যাপতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।" এ হলো নিন্দার ছলে শিবের স্তুতি। শব্দের মধ্যে অর্থ পুরে দিয়ে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি করেছেন তিনি। ক্ষুদিরাম দাস বলেন, কথ্য বাংলা ভারতচন্দ্রের রচনাচাতুর্যের ভিত্তি। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" অথবা "কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।" অথবা "সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি/দুয়া যদি চিনি দেন নিম হন তিনি ।" ইত্যাদি বাক্যে কথ্যভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে সংস্কৃতানুসারী অলঙ্কৃত চরণও আছে—"চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু/মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হইল ইন্দু।" তদ্ভব শব্দের ব্যবহারেও তিনি অনায়াস ছিলেন—"নিশান ফরফর/নিনাদ ধর ধর/কামান গরগর গাজে।" 'যাবনী মিশাল' ভাষার নমুনা—"অরে রে ।হিন্দুকে পুত/দেখলাও কাঁহা ভুত/নহি তুঝে করুঙ্গা দো টুক/ন হোয় সুন্নত দেকে/কলেমা পড়াঁও লেকে/জাতি লেঁউ খেলায়কে থুক।" দোভাষী পুঁথির ভাষার সাথে এ ভাষা একাত্ম। ভুরশুট পরগনার অধিবাসী ভারতচন্দ্র ও গরীবুল্লাহ এই ভাষা-ঐতিহ্যের অধিকারী। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন", "মন্দির পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়" ইত্যাদি প্রৌঢ়োক্তি ও প্রবাদের দ্বারা ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষার বাঁধুনিকে শক্ত করে এঁটেছেন। তিনি বিভিন্ন অলঙ্কার ও ছন্দের ব্যবহার দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য ও পারিপাট্য বৃদ্ধি করেছেন। আলাওল, ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একই পঙ্‌ক্তির—তিন যুগের তিনজন স্থপতি। মঙ্গলকাব্য ধারায় ঘনরাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ কবি কাব্যরচনা করে প্রতিভার ঈষৎ পরিচয় দেন, এবং বাংলা ভাষার চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁদের ভাষা স্বচ্ছন্দগামী এবং ছন্দ-অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। তাঁদের ভাষা কৃত্রিমতাবর্জিত ও জীবনসম্পৃক্ত। শিক্ষিত শ্রেণীর এই ভাষাই বাঙালির মানসম্মত (standard) ভাষা নির্মাণ করেছে। উনিশ শতকের পণ্ডিতী বাংলা টেকে নি, কেননা তা কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।

পদাবলী অন্তর্মুখী ও মঙ্গলকাব্য বহির্মুখী রচনা। ভাষা তার অনুগামী হয়েছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মতো কলাকার আঠারো শতকে জন্মগ্রহণ করেন নি, তবে তাঁদের অনুসারী আছেন। কেউ কেউ ছন্দোবৈচিত্র্য ও ধ্বনিমাধুর্য সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ পদ প্রাণহীন। তত্ত্ব ও কাব্যকে একসূত্রে বাঁধার কলাকুশলতা এযুগের কবিরা হারিয়ে ফেলেন। গোপাল হালদার বলেন, "অষ্টাদশ শতকের পদাবলী অজস্র এবং অধিকাংশই অসহ্য।"[৩৯] তাঁরা পদাবলীতে

—

৩৯. *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, ১৮

প্রাণসঞ্চার করতে পারেন নি বটে, কিন্তু দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে থেকে 'অজস্র' পদ রচনা করে ভাষার প্রতি অনুরাগ বজায় রাখেন।

মুসলমান কবিগণের মধ্যে হেয়াত মাহমুদের কবিকর্ম সর্বাধিক। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা অপ্রতুল। হেয়াত মাহমুদ আরবি-ফার্সি ভাষাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর *জঙ্গনামা* কাহিনীকাব্য, অন্যগুলি অনুবাদমূলক খণ্ডকাব্য। তিনি রাজপদে আসীন থাকলেও জন্মস্থানের চৌহদ্দির বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা হয় নি। স্বভাবকবি হিসেবে তিনি জ্ঞানের ও নীতির বিষয়কে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁর অনুবাদের কৃতিত্ব আছে, কিন্তু শিল্পকর্মের লিপিচাতুর্য নেই। পাঠ করার জন্য তাঁর কাব্য রচিত। *জঙ্গনামা* সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক, এ বর্ণনা অনায়াস, কিন্তু কারুকার্যহীন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের একটি বর্ণনা—"মাথার উপর তুলি দিল একপাক। জঙ্গিকে ঘুরায় যেন কুমারের চাক ॥ /আছাড়িয়া মারে তবে ভূমির উপর। /চূর্ণ হয়া পড়ে জঙ্গি তিন সমশ্বর ॥" উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার আছে, তথাপি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয় নি। মযহারুল ইসলাম বলেন,"নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতিনিধি হেয়াত মামুদের কবি-ভাষা আটপৌরে এবং তুলনামূলকভাবে সাধারণ, কিন্তু তাঁহার মূল আবেগের সঙ্গে দেশজ প্রাণের যোগটি অকৃত্রিম খাঁটি।"[৪০] আলী রজার ভাষা হেয়াত মাহমুদ থেকে উন্নত ও কাব্যধর্মী। তিনি আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার খুব কম করেছেন।

প্রণয়োপাখ্যানগুলিতে কোন কবিই পূর্বসুরির ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেন নি, প্রতিভার অভাবই তার প্রধান কারণ। গরীবুল্লাহর *ইউসুফ-জোলেখা*, সৈয়দ হামজার *মধুমালতী*, মুহম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী* ঈষৎ সফল কাব্য, এগুলিতে গল্প বলার আগ্রহ বেশি, শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস কম। এঁরা যে মাতৃভাষায় সাধারণ পাঠককে আনন্দদান করেছেন—এতেই তাঁদের তৃপ্তি।

ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীতে বাংলা ভাষায় কিছু নতুন মাত্রা যোগ করেন। গোপাল হালদার বলেন :

> সেই কৃত্রিমতার যুগে রামপ্রসাদের কাব্যে ও গীতে, ভাবে ও ভাষায় একটা অকৃত্রিমতা দেখা যায়, যা প্রায় ব্যতিক্রম। শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যসূত্রে বৈদগ্ধ্য ও রাজসভা দ্বারা আকৃষ্ট হলেও রামপ্রসাদ লোক-সমাজের থেকেই আপনার প্রাণের আশ্রয় ও সঙ্গীতপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।[৪১]

"বল মা আমি দাঁড়াই কোথা/আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।" 'ঘরোয়া ভাবে'র কবিতায় ঘরোয়া ভাষা এসেছে। লৌকিক প্রবাদ (proverb)-এর ব্যবহার দ্বারা গানকে

৪০. *কবি হেয়াত মামুদ*, ২৯৭।

৪১. *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম খণ্ড, ২২৯

অধিক অর্থবহ ও লোকগ্রাহ্য করে তুলেছেন তিনি। "ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিপদ/এ কহে নীল কমল ও কহে চাঁদ", "মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় কথায় করে ছলো।" রামপ্রসাদের এ ভাষা সরল ও গদ্যসদৃশ। এই কথ্যভঙ্গি কলকাতার ভদ্রশ্রেণীর মধ্য দিয়ে সারা দেশে আজও বহাল আছে। আঠারো শতকের অনেক কবি এ ঐতিহাসিক ভূমিকাটি পালন করেন।

কবিওয়ালারা এই কাজটি আরও বিস্তৃত ও ত্বরান্বিত করেন। কবির লড়াই, তর্জা সংলাপধর্মী রচনা। তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃত্রিম, আলঙ্কারিক, জটিল বাক্যের অবকাশই থাকে না। তত্ত্বকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে বৈষ্ণব পদকর্তারা ভাষাকে শাণিত ও পোশাকী করেছেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম ব্যক্ত করতে গিয়ে কবিওয়ালারা মুক্ত ছিলেন। তাঁরা বৈষ্ণব নন, কবিগান ভক্তিরসের গান নয়। নিধু গুপ্ত ব্যক্তিপ্রেমের কথাই বলেছেন। `ভালবাসবে বলে ভালবাসিনে/আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।" অথবা "নহে সুখী নহে দুখী প্রেম নাহি জানে/সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে।" নিধু গুপ্ত বুঝেছিলেন স্বদেশীয় ভাষার মর্ম; তাঁর উক্তি—"নানা দেশের নানা ভাষা/বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা।" আঠারো শতকের কবিদের অন্তরীণ প্রয়াস নিধু গুপ্তের এই উপলব্ধিতে সমাহৃত ও সমীভূত হয়েছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরাজিত জাতিকে কবিরা এখানে জিতিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাপ্রীতি রক্ষাকবচের মতো কাজ করেছে। কালী মির্জা উচ্চশিক্ষিত ও বহুদর্শী ছিলেন। তাঁর শাক্তপদের ভাষা পরিশীলিত ও পরিমার্জিত। "চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী/তরুণ যেন চরণ দুখানি ॥", "বধির অঙ্গে রণতরঙ্গে/নাচিছে শিবে যোগিনী সঙ্গে/লোলজিহ্বা শব পরে' উলঙ্গে।" তাঁর এ ভাষা সংস্কৃতানুসারী। তিনি বেনারস হয়ে দিল্লী যান এবং সেখানে উর্দু-ফার্সি ভাষা রপ্ত করেন। এরই প্রভাবে তিনি আত্মভাবের কবিতায় লিখেন, "দুনিয়াদারী কি ঝকমারী বানালে বেহাল/না পুরে মনের আশা হামেশা জঞ্জাল।"[৪২] কবিওয়ালাদের গানে ভাষার ব্যবহারে স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বেড়েছে। 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহার করার জন্য ভারতচন্দ্র পাঠকের কাছে জবাবদিহি করেন, কালী মির্জার জন্য তার প্রয়োজন হয় নি।

উপসংহার

কবি-সাহিত্যিকগণ সমাজের বিবেক। তাঁরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। যিনি চাঁদকে 'পদ্মফুল' হিসেবে দেখেন আর যিনি 'ঝলসানো রুটি' হিসেবে দেখেন, তাঁরা উভয়ে

৪২. উদ্ধৃত, নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'কালী মির্জা১৭৫০-১৮২৫), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (শ্রাবণ- আশ্বিন ১৩৯৭, কলিকাতা), ১৮৭-৮৮।

সমাজের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন—একজন আনন্দকে, অন্যজন বেদনাকে। সমাজে আনন্দ আছে, বেদনাও আছে। টি. এস. এলিয়ট বলেন, 'কবিতার জন্ম কবির 'বিশ্বাস' থেকে—"I can never see that poetry can ever be separated from something which I should call belief." মধ্যযুগের কবি সম্বন্ধেও একথা খাটে, কেবল মাত্রার তারতম্য আছে। মধ্যযুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ নয়, এজন্য বিশ্বাসের মাত্রা অল্প বা অস্পষ্ট; আধুনিক যুগ ব্যক্তিত্ববাদের যুগ, এজন্য বিশ্বাসের মাত্রা গাঢ় এবং প্রত্যক্ষ।

আমাদের দেশে আঠারো শতকের কবিরা সমাজের বিবেকরূপেই কাজ করেছেন। তাঁরা সমাজের অবক্ষয়, ধ্বংস, পঙ্গুত্ব দেখেছেন এবং কাব্যে চিত্রিত করেছেন। সমাজে ধর্মাধর্ম, ন্যায়বিচার, নীতিবোধ লোপ পেলে সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। উপরতলার ভোগ ভারতচন্দ্রের কাব্যে, নীচুতলার দুঃখ রামপ্রসাদের গানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে ভারতচন্দ্র এটাও বুঝেছিলেন যে নগর পুড়লে দেবালয়কে রক্ষা করা যায় না। রামপ্রসাদ জগৎ-সংসারের তাপানলে দগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু বিদ্রোহ করতে পারেন নি, তিনি দুঃখবাদের কবি, দুঃখজয়ের কবি নন; ষষ্ঠীবর ও জীবন মৈত্র চাঁদ সদাগরকে বিদ্রোহী পুরুষরূপে চিত্রিত করেও দেবীর কাছে তাঁর পরাভব ঘটিয়েছেন। পূর্বের এ ধারায় তাঁরা নতুন মহিমা আরোপ করতে পারেন নি। *ধর্মমঙ্গলের* লাউসেন বীর, দোভাষী পুঁথির আমীর হামজা, হানিফা বীর। দেশ পরাভূত, দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হলে বীর চাই, যুদ্ধ চাই। পরাভূত জাতির অনেক আক্রোশ, অনেক অশ্রু *ধর্মমঙ্গল, আমীর হামজা, জঙ্গনামা* কাব্যের মধ্যে আছে।

যুগ তার আপন গতিতে এগিয়ে যায়, ইতিহাসের চাকা থামে না। কবিওয়ালা গানে পরিবর্তিত যুগের নানা লক্ষণ প্রকটিত হয়েছে। ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে এই পরিবর্তনের বিবরণ আমরা পূর্বে প্রদান করেছি।

আঠারো শতকে প্রতিভা'বান কবি এক ভারতচন্দ্র ছাড়া দ্বিতীয় জন জন্মগ্রহণ করেন নি। কিন্তু ঐ শতকে কবি ও কাব্যের সংখ্যা অন্য শতকের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। তাঁরা বাংলা ভাষার সেবক ও প্রেমিক। 'স্বদেশীয় ভাষা' ব্যতীত আশা পূর্ণ হয় না' নিধু গুপ্তের এই অভিব্যক্তিতে ভাষাপ্রীতির প্রমাণ আছে। বিরোধের মধ্যে না গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান স্বধর্ম ও স্বসংস্কৃতির চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা উভয়ের সাধারণ সম্পদ, এখানে কোন ছেদচিহ্ন রচিত হয় নি। বৈষ্ণবপদের ও সুফিপদের কবিগণ দুই সম্প্রদায়ের, কিন্তু ভাষা এক। গরীবুল্লাহর কৃত্রিম ভাষা লোপ পায়, আলী রজা, হেয়াত মাহমুদ, সৈয়দ নুরুদ্দীনের ভাষা টিকে থাকে। এই ভাষার মধ্যেই বাংলার মুসলমানের প্রকৃত আত্মপরিচয় (identity) নিহিত আছে।

৩৭

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

হুমায়ুন আজাদ*

বাংলায় আঠারো ও উনিশ শতকের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। অন্ধকার মধ্যযুগ ও আলোকিত আধুনিক সময়ের মধ্যে যে দূরত্ব, তাই ব্যবহিত করে রেখেছে এ-দু'শতককে, যদিও কালের দিক দিয়ে এরা অব্যবহিত। আঠারো থেকে উনিশ শতকে প্রবেশ হচ্ছে নিরালোক থেকে আলোকে প্রবেশ, যে আলোর ছোঁয়া লাগে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের সব দিকে, আর তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে মধ্যবিত্ত বাঙালির বস্তু ও স্বপ্নলোক। ওই শিখায় মধ্যবিত্ত বাঙালির মনোজগতই আলোকিত হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি। এর পরিচয় বিচিত্র রঙে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। উনিশ শতক ও আগের আঠারো, সতেরো, ষোলো প্রভৃতি শতকের বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে একই বাংলা ভাষা ও বর্ণমালায়, রচনা করেছে বাঙালিরাই। তবু মনে হতে পারে এরা যেন ভিন্ন সাহিত্য, যেন একই বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে দুই ভিন্ন সাহিত্য। এর আধশতক আগে বাঙালি স্বাধীনতা হারায়; কিন্তু পরাধীনতা বাঙালিকে, অন্তত তার হিন্দুগোত্রটিকে পরাভূত না করে কাজ করে অভাবিত উদ্দীপকরূপে। উনিশ শতকের আগের বাংলা সাহিত্য ছিল প্রথাগত, সঙ্কীর্ণ, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ। তাতে ধরা পড়ে নি বাঙালির জীবন ও স্বপ্নের ব্যাপকতা এবং তাতে বিকশিত হয় নি সাহিত্যের সবগুলো শাখা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ সাহিত্য ছিল না, তার পুরোপুরি বিকাশ ঘটে নি। উনিশ শতকে ব্যাপক জীবন ব্যাপকরূপে আত্মপ্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে। যে সাহিত্য প্রায় হাজার বছর ধরে রচিত হচ্ছিল পদ্যে, যে পদ্য অধিকাংশ সময়ই ছিল গদ্য থেকেও নিরাবেগ, ছন্দহীন ও নিষ্প্রভ, উনিশ শতকে সে সাহিত্য হয়ে উঠে গদ্যপ্রাণ। যাতে শতাব্দী পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছিল অনুকরণপ্রবণ স্বভাবকবিদের শ্রান্তক্লান্ত আবেগ ও পুনরাবৃত্ত

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাখ্যান, মননশীলতা যার ছিল সম্পূর্ণ অচেনা, সে সাহিত্য থেকে লোপ পায় আবেগ, তাতে প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে মস্তিষ্ক। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠে মন থেকে মস্তিষ্কের সাহিত্য; আর তার কেন্দ্র কলকাতা। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র কলকাতা—এটাই স্থির করে দেয় বাংলা সাহিত্যের চরিত্র। উনিশ শতকের অনেক লেখক তাঁদের গ্রন্থকে 'অভিনব' বলে দাবি করেছেন। তাঁদের এ দাবি অতিশয়োক্তি ছিল না। উনিশ শতকপূর্ব বাংলা সাহিত্য পল্লীসাহিত্য; তার রচয়িতারা আধুনিক অর্থে শিক্ষিত ছিল না, উপভোগীরা ছিল অধিকাংশই নিরক্ষর, পৃষ্ঠপোষকেরাও ছিল সাহিত্যবোধহীন সামন্তপ্রভু। উনিশ শতকের লেখকেরা অধিকাংশই সুশিক্ষিত, পাঠকেরা শিক্ষিত অন্তত সাক্ষর; আর তাঁদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না বা পাঠকেরাই ছিল পৃষ্ঠপোষক। কলকাতা মধ্যবিত্তের নগর, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মধ্যবিত্তের সাহিত্য। এ সাহিত্যের স্রষ্টারা মধ্যবিত্ত, এর বিষয় মধ্যবিত্ত, এর উপভোগীরা মধ্যবিত্ত, যে মধ্যবিত্ত আবহমান পল্লীকে ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল নগরে, আর নগরকেই মেনে নিয়েছিল নিয়তি বলে। অধীত বিদ্যা ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এ শতকে, বদলে যায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা। আগের সাহিত্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, একান্তই বাঙালি প্রতিভার সৃষ্টি। কিন্তু উনিশ শতকে বাঙালি যেন হঠাৎ হারিয়ে ফেলে তার সনাতন স্বতঃস্ফূর্ততা, সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ঋণ করে ইউরোপীয়, বিশেষকরে ইংরেজি সাহিত্য থেকে। বাঙালি উনিশ শতকে অর্জন করে এক নতুন সৃষ্টিশীলতা, যা শুধু স্বভাব থেকে পাওয়া যায় না। তা সংগ্রহ করতে হয় অন্য সাহিত্য থেকে, অন্য গ্রন্থ থেকে। এ সৃষ্টিশীলতাকে ঋণাত্মক বলতে পারি; তবে তাকে অভিনব সৃষ্টিশীলতা বলাই যথার্থ, কেননা তা ঋণকে পরিণত করতে পেরেছিল অসামান্য পুঁজিতে, যা আগে আর কখনো ঘটে নি বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসে। আগের স্বাভাবিক প্রতিভায় বাঙালি লেখকেরা রচনা করেছিল পুনরাবৃত্তিপরায়ণ পদ্যোপাখ্যান ও পদাবলী। অবশ্য কেউ কেউ ছিল অসাধারণ। আর নতুন সৃষ্টিশীলতার দাক্ষিণ্যে উনিশ শতকের লেখকেরা বিকাশ ঘটান সাহিত্যের সমস্ত শাখার। একশো বছরে তাঁরা যা সৃষ্টি করেন, পরিমাণে তা আগের ন'শো বছরের সৃষ্টির তুলনায় অনেক বেশি তো বটেই। তবে এর চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এদের কোন তুলনা হয় না। উনিশ শতকে বাঙালির রূপান্তর ঘটে বাংলা সাহিত্যে; এর আগে এমন কখনো ঘটে নি। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য হচ্ছে অভিনব বাঙালির অভিনব সাহিত্য।

পাঠ্যপুস্তক দিয়েই সূচনা হয়েছিল শতাব্দীটির, কিন্তু অনতিবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক পেছনের বস্তুতে পরিণত হয়; শুরু হয় পত্র-পত্রিকায় তর্কবিতর্ক, সামাজিক-ধর্মীয় বাদানুবাদ, ঘটে মননশীলতার উন্মেষ; দেখা দেয় নকশা, উপাখ্যান; কবিতার রূপান্তর ঘটতে থাকে, সূচনা ঘটে নাটক-উপন্যাসের এবং বাংলা সাহিত্য রূপ নেয় এক পরিপূর্ণ বিকশিত সাহিত্যের। উনিশ শতকের, অন্তত এর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য প্রধানত গদ্যসাহিত্য এবং এ গদ্যের

বিকাশ ঘটানো উনিশ শতকের লেখকদের এক বড় কীর্তি। আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন এক অভিনব বাংলা ভাষা। যে আধারে তাঁরা পরিবেশন করেছেন তাঁদের আধেয়, তাকে তাঁরা গড়ে নিয়েছিলেন নিজেদের মতো। উনিশ শতকের সূচনাকালে বাংলা ভাষার এমন কোন রূপ ছিল না, যা অবলীলায় ব্যবহার করা যেতো পাঠ্যপুস্তকে বা প্রবন্ধে বা উপাখ্যান রচনায় বা বিতর্কমূলক রচনায়। উনিশ শতকের আগে কোন সর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষাই ছিল না। উত্তরাধিকারসূত্রে যে গদ্যকে তাঁরা পেয়েছিলেন, তার ছিল না কোন সুস্থিত রূপ; তার শব্দের ও বাক্যের রূপ ছিল অস্থির, অস্থিত। তাই তাঁদের গড়ে নিতে হয়েছিল একটি লেখ্য ভাষারূপ, যা এখন সাধুরীতি নামে বিখ্যাত। সাধুরীতি শুধু একটি গদ্যরীতি ছিল না, সেটি ছিল উনিশ শতকের অভিনব বাঙালির বাস্তব ও অবাস্তব, জীবন ও স্বপ্ন, আবেগ ও মেধা প্রকাশের অনিবার্য ভাষা। আঠারো শতকের সঙ্কীর্ণ বাংলা ভাষায় উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য রচিত হতে পারতো না, কারণ ওই ভাষার শব্দসম্ভারের ও বাক্যসংগঠনের সে শক্তি ছিল না। তাঁরা যে ভাষারীতি সৃষ্টি করেছিলেন, যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন তার অবয়ব, তা ছাড়া অন্য কোনো ভাষারীতি বা অবয়ব ছিল প্রায় অসম্ভব, আর ওই অবয়ব ছাড়া আর কোনো অবয়বে উনিশ শতকে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পন্ন হতো কিনা বলা মুশকিল। গদ্যের একটি শক্তিশালী, সুস্থিত রূপ আবিষ্কার ও তাতে জীবনকে বিচিত্ররূপে প্রকাশের যে অসামান্য কাজটি তাঁরা সম্পন্ন করেন, তাকে অভিহিত করতে পারি গদ্যবিপ্লব নামে। এ গদ্যবিপ্লব আধশতকের জন্য বাংলা সাহিত্যকে প্রায় কবিতা বা পদ্যহীন করে তুলেছিল—এ এক বড় ঘটনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

বাংলা ভাষায় যেহেতু প্রধানত রচিত হয় সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত এলাকার চর্চা আজো হয় না বাংলা ভাষায়, তাই বাংলায় লেখা সব কিছুই প্রথাগতভাবে গণ্য হয় সাহিত্যরূপে, বা সাহিত্যের আলোচনায় গৃহীত হয় এমন সব রচনা, যাকে সাহিত্য বলে গণ্য করা যায় না। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে যত্নের সাথে আলোচিত হয় অঙ্ক ও ভূগোল বই এবং আরো এমন অনেক বই, যেগুলোর সাহিত্যমূল্য থাকার কথাই উঠে না। ওগুলো সাহিত্য নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এমন অনেক বই বেরিয়েছে, যেগুলো বাঙালির মনোজগৎকে প্রসারিত করেছে, জীবনকে বদলে দিয়েছে প্রকাশ্যে বা গোপনে গোপনে, কিন্তু সেগুলোর সাহিত্যমূল্য নেই। বই লেখেন সাধারণত দুধরনের মানুষ—কর্মীরা ও স্বাপ্নিকেরা। কর্মীরা বাস্তব মানুষ ও সাধারণত সফল মানুষ। তাঁদের রচনার নানারকম মূল্য থাকে, শুধু সাহিত্যমূল্য থাকে না। আর স্বাপ্নিকেরা অবাস্তব মানুষ ও সাধারণত ব্যর্থ মানুষ। তাঁদের রচনার আর কোন মূল্য না থাকলেও চলে, না থাকলেই সম্ভবত ভাল হয়, যদি তার সাহিত্যমূল্য থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কর্মীদের কাল, দ্বিতীয়ার্ধ স্বাপ্নিকদের সময়। প্রথমার্ধ ভরে দেখা দিয়েছেন নানারকমের কর্মী, নানাধরনের মহত্ত্ব তাঁরা অর্জন করেছেন এবং তাঁরা পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, সামাজিক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন, সমাজসংস্কার করেছেন, অর্থাৎ তাঁরা লিখেছেন—ওই লেখাও তাঁদের কর্ম, স্বপ্ন বা সৃষ্টিশীলতা বা সাহিত্য নয়। দ্বিতীয়ার্ধে দেখা

দেন স্বাপ্নিকেরা, সৃষ্টিশীলেরা—লেখা যাঁদের কাছে কর্ম ছিল না, যাঁদের লক্ষ্য ছিল স্বপ্ন বা সাহিত্যসৃষ্টি। তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত লিপিবদ্ধ কর্মের ইতিহাস; ওই সময়ের কর্মীরা সৃষ্টি করেছেন স্বাপ্নিকদের জন্মের ক্ষেত্র। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কর্মের, দ্বিতীয়ার্ধ স্বপ্নের, সৃষ্টিশীলতার।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সূচনাটি ঠিক সাহিত্যিক ছিল না; তার শুরু হয়েছিল পাঠ্যপুস্তক দিয়ে। ওই পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছিল এমন শিক্ষার্থীদের জন্য, বাংলা যাদের মাতৃভাষা ছিল না; সম্ভবত তখনো তারা বাংলা শিখেও উঠে নি। যদি এক বছর পিছিয়ে যাই, ১৮০০ অব্দকেও ধরি উনিশ শতকের মধ্যে, তাহলে দেখি, বাংলা সাহিত্যের নতুন কালের সূচনা ঘটে ধর্মগ্রন্থ বাইবেল দিয়ে। পুরোহিত ও শিক্ষক একসাথে আবির্ভূত হয়েছিলেন শতাব্দীর শুরুতেই অপার্থিব ও পার্থিব জ্ঞান নিয়ে, আর এ দু'গোত্রের মানুষ সাহিত্যকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখেন। তবে সূচনাকালের বইগুলোর মূল্য সাহিত্যের জন্যে নয়, গদ্যের জন্যে। এর আগে গদ্য ছিল না এমন নয়; তবে যা ছিল তা দিয়ে বেশি কাজ চলতো না, স্বপ্ন তো চলতোই না; আর তাকে যে কাজে লাগানো যায় এটাই মনে পড়ে নি কারো, স্বপ্ন তো ছিল অনেক দূরের ব্যাপার। বাংলা গদ্য কিছুটা কাজ করতে শেখে, চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় আঠারো শতকের শেষদিকে বিদেশীদের লেখা আইনগ্রন্থে। উনিশ শতকের প্রথম বছরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষারূপে সুপরিকল্পিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ নতুন গদ্যের সূচনাকারী না হলেও এর পরিকল্পনাকারী উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)। ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে বেরোয় বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত বই, কেরি অনুবাদিত বাইবেলের *মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত।* ১৮০০ অব্দের মে মাসে ইংরেজ কর্মচারীদের দেশী ভাষা-সংস্কৃতি শেখানোর জন্য কলকাতায় স্থাপিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ; কেরি যোগ দেন সেখানে এবং বাঙালি পণ্ডিতদের সহায়তায় সৃষ্টি করেন পাঠ্যপুস্তক ও সচেতন গদ্যের ধারা। কেরি তাঁর দুজন সহকারী রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে (১৭৬২-১৮১৯) করে তোলেন উনিশ শতকের প্রথম গদ্যলেখক ও গ্রন্থকার, যা তাঁদের অমরতা এনে দিয়েছে। রামরাম ও মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন বিপরীত চরিত্রের, তাঁদের গদ্যও বিপরীত চরিত্রের। দু'টি বই বেরিয়েছিল রামরাম বসুর : *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১) ও *লিপিমালা* (১৮০২)। মৃত্যুঞ্জয়ের বই বেরিয়েছিল কয়েকটি : *বত্রিশ সিংহাসন* (১৮০২), *রাজাবলি* (১৮০৮), *হিতোপদেশ* (১৮০৮), *বেদান্তচন্দ্রিকা* (১৮১৭) ও *প্রবোধচন্দ্রিকা* (১৮৩৩)। তাঁর বইগুলো অনুবাদমূলক। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অধিকাংশ বাংলা বইই অনুবাদমূলক। কেরি দু'টি পাঠ্যবই লিখেছিলেন বাংলায় : *কথোপকথন* (১৮০১), *ইতিহাসমালা* (১৮১২) এবং ইংরেজিতে লিখেছিলেন *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (১৮০১), সঙ্কলন করেছিলেন বিস্ময়কর অভিধান *এ ডিকশনারি অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ* (দু'খণ্ড, ১৮১৫, ১৮২৫)। কেরি বাংলা ভাষার একজন প্রধান পরিকল্পনাকারী, যিনি বাংলা

গদ্যের অবয়ব পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আরো কয়েকজন গদ্যলেখক ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মে : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র* (১৮০৫), চণ্ডীচরণ মুনশি(১৭৬০-১৮০৮) হিন্দি থেকে অনুবাদ করেছিলেন *তোতা ইতিহাস* (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায় সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাপতির *পুরুষ পরীক্ষা* (১৮১৫)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বইগুলো পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পরিচিত; কিন্তু এগুলোর নেই পাঠ্যপুস্তকের মৌলিক চরিত্র; জ্ঞানার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়ার কোন লক্ষ্যই নেই এগুলোর, এগুলোকে গণ্য করতে পারি গদ্যরচনার নিরীক্ষারূপে। প্রকৃত পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন অন্যরা। সেগুলোর সাহিত্য বা গদ্যমূল্য নেই, তবে জ্ঞানগত অশেষ মূল্য রয়েছে। ওই পাঠ্যবইগুলো বদলে দিয়েছিল শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক ও বাঙালির চিন্তার জগৎ। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (প্রতিষ্ঠিত ১৮১৭), যার সদস্য ছিলেন রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) ও তারিণীচরণ মিত্রের (১৭৭২-১৮৩৭) মতো রক্ষণশীলেরা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু প্রথম পর্যায়ে সেগুলোও উপকথা-নীতিকথায় সীমাবদ্ধ থেকেছে, জ্ঞানের জগতকে প্রসারিত করে নি। শ্রীরামপুর কলেজেই সূচনা ঘটে প্রকৃত পাঠ্যপুস্তকের, যার লক্ষ্য জ্ঞানবিতরণ। শ্রীরামপুরের শিক্ষকেরা উপকথা থেকে জ্ঞানার্থীদের নিয়ে আসেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশ্বে। তাঁরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি বিদ্যার বই রচনা করে বাঙালির জ্ঞানের জগতকে রূপান্তরিত করে দেন। ফেলিকস কেরি (?-১৮২২) লিখেছিলেন *বিদ্যাহারাবলি* (১৮১৯), *ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণসঞ্চয়* (১৮২০)। পাদ্রি ইয়েটস লিখেছিলেন *পদার্থবিদ্যাসার* (১৮২৫), *জ্যোতির্বিদ্যা* (১৮৩৩)। পিয়ার্স লিখেছিলেন *ভূগোলবৃত্তান্ত* (১৮২৮), জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছিলেন *পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ* (১৮৩৩); জন মাক লিখেছিলেন *কিমিয়া বিদ্যার সার* (১৮৩৪)। এমন আরো অনেক বই বেরিয়েছিল; এবং জ্ঞানমনস্ক গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বাঙালিরাও, যার মহৎ উদাহরণ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিদ্যাকল্পদ্রুম* (১৩খণ্ড, ১৮৪৬-১৮৫১)। এসব পাঠ্যপুস্তকেই রচিত হয়েছিল অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ। আধুনিক বাঙালির জ্ঞানের বিশ্বটির প্রায় পুরোটাই ঋণাত্মক; আর এজগতে প্রচলিত যেসব পারিভাষিক শব্দ, তার প্রায় সবটাই অনুবাদমূলক ঋণের প্রক্রিয়ায় গঠিত। এসব পাঠ্যপুস্তকেই তার সূচনা ঘটেছিল; পরে সংশোধিত ও বিকশিত হয়েছিল বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ও জ্ঞানমনস্ক লেখকের হাতে। এসব বইয়ের সাহিত্যমূল্য নেই, কিন্তু এগুলো রূপান্তরিত করেছিল বাঙালিকে এবং গড়ে তুলেছিল উনিশ শতকের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনোজগৎ।

পাঠ্যপুস্তকের পরেই যা দেখা দেয়, তাকে বলা যায় সন্দর্ভজাতীয় রচনা। বাংলায় যেসব রচনাকে প্রবন্ধ বলা হয়, সেগুলোকে সন্দর্ভ বলাই ভাল; কারণ প্রবন্ধের স্বভাব ও সীমা দুইই অতিক্রম করেছে এগুলো। এগুলোতে পেশ করা হয়েছে নানা প্রতিপাদ্য, লেখকেরা তর্কবিতর্ক করেছেন, নানা বিষয় ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন, বক্তব্য উপস্থাপন

করেছেন। রচনাগুলো মননশীল; আর এগুলোর লক্ষ্য বিদ্যার্থীরা নয়, বয়স্ক সামাজিক মানুষেরা। এ ধারার সূচনাকারী রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। রামমোহন শিল্পী বা স্বাপ্নিক ছিলেন না, ছিলেন কর্মী; তাঁর রচনা তাঁর কর্মেরই লিখিতরূপ। রামমোহনের লেখা মূল্যবান কর্মের বা বিষয়ের জন্যে, গদ্যের জন্যে নয়। রামমোহনের সন্দর্ভগুলোর মধ্যে রয়েছে *বেদান্তগ্রন্থ* (১৮১৫), *বেদান্তসার* (১৮১৫)। এ দু'টি অনুবাদ। *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৭), *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* (১৮১৮), *পথ্যপ্রদান* (১৮২৩), *সহমরণ বিষয়* (১৮২৮) এসব বই তখন সাড়া জাগিয়েছিল, সমাজকে ধাক্কা দিয়েছিল; তবে তাঁর যে বইটি তাঁর মৃত্যুর পর নীরবে বেরিয়েছিল, সেটিকেই বেশি মূল্যবান মনে হয়। বইটি *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩)—বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক ব্যাকরণ বই। রামমোহনের ধারার গৌণ লেখকদের মধ্যে রয়েছেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (১৭৮৮-১৮৫১), তাঁর বই *পাষণ্ডপীড়ন* (১৮২৩); গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, তাঁর বই *জ্ঞানাঞ্জন* (১৮২১); গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তাঁর বই *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* (১৮২২); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), তাঁর বই *উপদেশকথা* (১৮৪০), *ষড়দর্শন সংবাদ* (১৮৬৭)। তবে তাঁর কীর্তি হচ্ছে তেরো খণ্ডের *বিদ্যাকল্পদ্রুম* (১৮৪৬-১৮৫১)। রাসসুন্দরী দাসী (১৮১০-১৮৯৮) একটি অন্তরঙ্গ আত্মজীবনী লিখেছিলেন *আমার জীবন* (১৮৬৮) নামে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রথম গবেষক। তিনি মধ্যযুগের কবিদের যে জীবনী রচনা করেছিলেন, তা বাংলা প্রাচীন সাহিত্যগবেষণার সূচনা করে। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *যৎকিঞ্চিৎ* (১৮৬৫), *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা* (১৮৭৯)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ছিলেন কবি-দার্শনিক, যদিও তিনি ধর্মচর্চা করেছেন, লিখেছেন গদ্য, কবিতা লেখেন নি কখনো। তাঁর গদ্য ছিল তাঁর সময়ের সবচেয়ে কবিত্বময়, স্নিগ্ধ, অন্তরঙ্গ গদ্য; রূপকে-চিত্রকল্পে সৌন্দর্যমণ্ডিত; অবয়বের দিক দিয়ে সুপরিকল্পিত ও পরিস্রুত। তাঁকে বলা যায় তাঁর সময়ের গদ্যের কবি। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে *ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ* (১৮৫১-৫২), *আত্মতত্ত্ববিদ্যা* (১৮৫২), *ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস* (১৮৬০), *মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ* (১৮৬০-৬৭) প্রভৃতি ও অতুলনীয় *আত্মজীবনী* (১৮৯৮)। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বাংলা গদ্যকে নিয়োগ করেছিলেন যুক্তি ও বিজ্ঞানমস্কতার চর্চায়। তাঁর প্রথম বই *ভূগোল* (১৮৪১)। এর পর তিনি বিদেশী বই অবলম্বনে লেখেন গুরুত্বপূর্ণ বই *বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (১৮৫২, ১৮৫৩), *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (১৮৭০, ১৮৮৩)। কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর *চারুপাঠ* (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯) খুব উপকারে এসেছিল বাংলার কিশোর শিক্ষার্থীদের। এসব বই বদলে দিয়েছিল বাঙালিকে। উনিশ শতকের সূচনাকালে একজন বয়স্ক প্রাজ্ঞ বাঙালি ও পঞ্চাশের দশকের একজন বয়স্ক প্রাজ্ঞ বাঙালির জ্ঞানজগতের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের প্রধান পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। এ সময়ের প্রায় সকলের গদ্যে ছাপ লেগে আছে কর্মী ও শ্রমিকের হাতের,

শিল্পীর হাতের ছোঁয়া খুবই দুর্লভ। বিদ্যাসাগর দেখা দেন প্রথম শিল্পীরূপে। তবে তিনি কর্মী ছিলেন না, চিত্রকর ছিলেন না, ছিলেন ভাস্কর। ভাস্কর যেমন বিকট পাথরের ভেতর থেকে বের করে আনেন স্থির সৌন্দর্য—যা কখনো ফেলে না অশ্রু, উপরন্তু কখনো হাসে না, বিদ্যাসাগরও তেমনি রচনা করেছিলেন বাংলা গদ্যের অচঞ্চল ধ্রুপদী সৌন্দর্য। তাঁর সময়ের প্রত্যেকের গদ্যেই কোন-না-কোন খুঁত পাওয়া যায়, শুধু নিখুঁত ছিলেন বিদ্যাসাগর। বাঙালি যে লিখিত মানভাষা সৃষ্টির সাধনা করে আসছিল আধশতক ধরে, তা পরিপূর্ণ সুস্থিতি লাভ করে বিদ্যাসাগরের রচনায়। বিদ্যাসাগরের লেখায় সুস্থিতি লাভ করে সাধুরীতির শব্দরূপ, সুসংগঠিত হয়ে উঠে বাক্যের কাঠামো এবং তিনি তাঁর গদ্যকে স্পন্দিত করেন ছন্দে, সঙ্গীতময় করে তোলেন ধ্বনির সুখকর পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের প্রধান পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রক। বিদ্যাসাগরের দু'টি সত্তা ছিল—একটি কর্মী, অন্যটি শিল্পী; তবে এ দু'টি সত্তার বিরোধ ছিল না তাঁর মধ্যে—ছিল গভীর মিলন; বা তাঁর শিল্পীসত্তাটিই ছিল প্রধান, তাঁর বাস্তব কাজসমূহও ছিল শিল্পসৃষ্টি। বিদ্যাসাগর প্রধানত অনুবাদক। তবে তাঁকে অনুবাদক বলা ঠিক নয়; তাঁকে বলা যেতে পারে পুনঃস্রষ্টা; কেননা তাঁর অনুবাদে মৌলিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম ছয় দশকের অধিকাংশ গ্রন্থই এখন মৃত, সেগুলো হারিয়ে গেলে খুব ক্ষতি হয় না; জীবিত শুধু বিদ্যাসাগরের রচনারাশি, যেগুলো হারানোর অর্থ হচ্ছে উনিশ শতকের প্রথম ছয় দশকের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের অবসান। তাঁর পুনঃসৃষ্ট গ্রন্থগুলোর মধ্যে *রয়েছে বেতাল-পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *কথামালা* (১৮৫৬), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯) প্রভৃতি; আর মৌলিক রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৩), *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৭১), *বিদ্যাসাগরচরিত* (১৮৯১) ও *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৯২)।

সন্দর্ভ শ্রেণীর ঢিলেঢালা গদ্যরচনা থেকে প্রবন্ধে উত্তরণ ঘটে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-১৮৯৪) রচনায়। যদিও সৃষ্টিশীল প্রবন্ধ রচনা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তবু তিনিই প্রথম বক্তব্য সংহত আকারে প্রকাশ করেন। তাঁর রচনার বিষয় সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি; আর এসব বিষয়ে তিনি সামাজিক তর্ক করেন নি, শিথিল ভঙ্গিতেও বক্তব্য প্রকাশ করেন নি, পেশ করেছেন সংহত বক্তব্য। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব* (১৮৫৬), *পুষ্পাঞ্জলি* (১৮৭৬), *পারিবারিক প্রবন্ধ* (১৮৮২), *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২), *আচার প্রবন্ধ* (১৮৯৫)। তাঁর কিছু প্রবন্ধ চমৎকার সাহিত্যসমালোচনা। তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৩০-১৮৮৫) একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধপুস্তিকা লিখেছিলেন *ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা* (১৮৫০) নামে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রধান জ্ঞানী। তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজিতে। বাংলায় তিনি যা লিখেছিলেন, তা তাঁর ঠিক পরিচয় বহন করে না। বাংলায়

তাঁর কীর্তি তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা *বিবিধার্থ সংগ্রহ* (১৮৫১) ও *রহস্যসন্দর্ভ* (১৮৬৩)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রই প্রথম *বিবিধার্থ সংগ্রহ*-এ গ্রন্থসমালোচনার সূচনা করেন। ১৮৫২ অব্দে বেরোয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ* নামক পুস্তিকা। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনা। রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) প্রবন্ধে ঘটেছে মননশীলতার গভীর প্রকাশ। তাঁর প্রধান গ্রন্থ *সেকাল আর একাল* (১৮৭৪), *হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের বৃত্তান্ত* (১৮৭৬), *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা* (১৮৭৮), *আত্মচরিত* (১৯০১)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)। তাঁর বইয়ের নাম *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭২,১৮৭৩)। ন্যায়রত্ন পুরনোপন্থী ছিলেন, তবে তাঁর সমালোচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যবোধের পরিচয় বহন করে। দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন চন্দ্রশেখর বসু (১৮৩৩-১৯১৩)। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *অধিকারতত্ত্ব* (১৮৭২), *বেদান্ত-প্রবেশ* (১৮৭৫), *পরলোকতত্ত্ব* (১৮৮৫), *প্রলয়তত্ত্ব* (১৮৮৬)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালির সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ১৮৭২ থেকে তিনি *বঙ্গদর্শন* প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে থাকেন; এবং এ পত্রিকাটি বাঙালির মননজগতে কালান্তর সাধন করে। *বঙ্গদর্শন*-এই প্রকাশিত হয় তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধেই প্রথম মিলন ঘটে সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার; প্রবন্ধ হয়ে উঠে সৃষ্টিশীল সাহিত্য। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং লিখেছেন ব্যঙ্গাত্মক রচনা, যেগুলোকে গণ্য করতে পারি সৃষ্টিশীল প্রবন্ধরূপে। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধেই প্রকাশ পেয়েছে অতুলনীয় মননশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি, ভাষাশক্তি ও ভাষাদক্ষতা। বঙ্কিমের প্রবন্ধে কোঁৎ ও লকের প্রভাব রয়েছে, তবে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে একান্তই মৌলিক। সাহিত্য-সমালোচনা ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময়ই অভ্রান্ত; আর বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্যসমালোচনারও সূচনাকারী তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থসমূহ—*বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), *বিবিধ সমালোচনা* (১৮৭৬), *সাম্য* (১৮৭৯), *প্রবন্ধপুস্তক* (১৮৭৯), *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬), *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭, ১৮৯২), *ধর্মতত্ত্ব* (১৮৮৮)। তাঁর *লোকরহস্য* (১৮৭৫) ও *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫) বেশ ভিন্ন চরিত্রের রচনাসংগ্রহ। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) তাঁর আন্তরিক রীতিতে কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *যাত্রা-সমালোচনা* (১৮৭৫), *বাল্যবিবাহ* (১৮৮২)। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) বাংলার অকালপ্রয়াত প্রতিভাদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একজন। কিছু চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি এবং লিখেছিলেন *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬৪) নামে একটি অনন্য বই। এটি ঠিক প্রবন্ধসংগ্রহ নয়; তবে এ বইতেই লেখা হয়েছিল উনিশ

শতকের শ্রেষ্ঠ চলতি গদ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) *স্বপ্ন-প্রয়াণ* (১৮৭৫) নামে একটি দার্শনিক-রূপক কাব্য লিখেছিলেন; কাব্যটি বাংলা কবিতালোকে একটি নিঃসঙ্গ গ্রন্থরূপে রয়ে গেছে এবং মননশীল প্রাবন্ধিক-দার্শনিক হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথের যেটুকু প্রাপ্য ছিল তাও পান নি তিনি। দার্শনিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য; এমনকি তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধও ছিল সে সময়ের জন্যে অভাবিত। উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা ভাষা বিশ্লেষণের যে একটি নতুন ধারার সূত্রপাত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার সূচনাকারী। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *ভ্রাতৃভাব* (১৮৬৩), *তত্ত্ববিদ্যা* (চার খণ্ড, ১৮৬৬-১৮৬৯), *অদ্বৈতমতের সমালোচনা* (১৮৯৬), *উপসর্গের অর্থবিচার* (১৮৯৭)। ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪০-১৯১৬)। তাঁর বই *ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা* (১৮৮২), *কেশবচরিত* (১৮৮৪)। বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২-১৮৯১) লিখেছিলেন *মানবতত্ত্ব* (১৮৮৩), *ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত* (১৮৯৭) প্রভৃতি বই। *বান্ধব* (১৮৭৪) পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছেন—*নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৬৯), *প্রভাত-চিন্তা* (১৮৭৭), *নিভৃত-চিন্তা* (১৮৮৩), *নিশীথ চিন্তা* (১৮৯৬) প্রভৃতি। সে সময় তিনি খ্যাতিও লাভ করেছিলেন; তবে তাঁর প্রবন্ধ ছিল গতানুগতিক ও আড়ম্বরপূর্ণ। প্রবল রক্ষণশীল চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) লিখেছিলেন *শকুন্তলাতত্ত্ব* (১৮৮১), *হিন্দুবিবাহ* (১৮৮৭), *হিন্দুত্ব* (১৮৯২)। রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) বাংলা ভাষায় সূচনা করেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা। এ বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাঁর কয়েকটি বই *ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা* (১৮৭২), *মহাকবি কালিদাস* (১৮৭২), *ঐতিহাসিক রহস্য* (১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৯), *ভারতরহস্য* (১৮৮৫)। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) লিখেছিলেন *নানা প্রবন্ধ* (১৮৮৫); অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) লিখেছিলেন *সমাজ সমালোচনা* (১৮৭৪), *আলোচনা* (১৮৮২)। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ছিলেন ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজ-ঐতিহাসিক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *এই কি ব্রাহ্মবিবাহ* (১৮৭৮), *জাতিভেদ* (১৮৮৪) এবং *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৮৯৭), যে বই তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। পূর্ণচন্দ্র বসু (?-?) এখন বিস্মৃত। তিনি লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ : *কাব্যসুন্দরী* (১৮৮০), *সমাজচিন্তা* (১৮৮২), *সাহিত্যচিন্তা* (১৮৯৬)। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) নাম করেছিলেন *উদভ্রান্ত প্রেম* (১৮৭৬) নামক একটি গদ্য-বিলাপ লিখে। তাঁর প্রবন্ধের বই *সারস্বত কুঞ্জ* (১৮৮৫), *স্ত্রী-চরিত্র* (১৮৯০)। রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) ছিলেন পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর কয়েকটি বই *জয়দেব চরিত* (১৮৭৩), *পাণিনি* (১৮৭৫), *ভারত-কাহিনী* (১৮৮৩), *স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (১৮৯৩), *আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়* (১৮৯৪)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫২-১৯৩১) মিলন ঘটিয়েছিলেন পাণ্ডিত্য ও সরসতার। তাঁর বই *ভারত-মহিলা* (১৮৮১), *বাল্মীকির জয়* (১৮৮২)। তবে তিনি অমর হয়ে আছেন *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও*

দোহার (১৯১৬) জন্যে। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) লিখেছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। তাঁর বইয়ের নাম *পৃথিবী* (১৮৮২)। শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) লিখেছিলেন *হজরত মুহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি* (১৮৮৭), *ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ* (১৮৯০)। রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৮) লিখেছিলেন *সমাজ ও সংস্কারক* (১৮৮৯), *প্রবন্ধ কৌমুদী* (১৮৯১)। মোজাম্মেল হক (১৮৬০) লিখেছিলেন *মহর্ষি মনসুর* (১৮৯৬), *ফেরদৌসী-চরিত* (১৮৯৮)। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬০-১৯০৩) লিখেছিলেন *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (১৮৮৮), *কবি বিদ্যাপতি* (১৮৯৫)। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) লিখেছিলেন সংস্কৃত *সাহিত্যের ইতিহাস* (১৮৮৮), *কবি বিদ্যাপতি* (১৮৯৫)। তিনি লিখেছিলেন তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে *সমরসিংহ* (১৮৮৩), *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৮), *সীতারাম রায়* (১৮৯৮)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা প্রবন্ধের নতুন ধারার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বঙ্কিমের প্রবন্ধে মননশীলতার প্রাধান্য আর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে প্রাধান্য কল্পনাপ্রতিভার। রবীন্দ্রনাথ মননশীলতা থেকে কল্পনায় অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে; তাই তাঁর চূড়ান্ত মননশীল প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে সৃষ্টিশীল, বাংলা সাহিত্যে যার তুলনা পাওয়া যায় না। তাঁর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিস্ময়কর। সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, দর্শন, জীবনী, ভ্রমণ, পত্র—বিচিত্র ধরনের রচনা লিখেছেন তিনি এবং লিখেছেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। সব ধরনের প্রবন্ধেই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অসামান্য কল্পনাশক্তি ও উপলব্ধির, অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির, বিশ্লেষণপ্রতিভার। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা অনন্য। পনেরো বছর বয়সেই বেরিয়েছিল তাঁর প্রথম সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ *ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখ-সঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী* (১৮৭৬) নামক এক গ্রন্থ-আলোচনামূলক রচনা এবং অনতিবিলম্বেই বেরোয় তাঁর প্রথম সাড়াজাগানো প্রবন্ধ *মেঘনাদবধকাব্য* (১৮৭৭)। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *বিবিধ প্রসঙ্গ* (১৮৮৩)। এরপর উনিশ শতকে বেরোয় *রামমোহন রায়* (১৮৮৫), *আলোচনা* (১৮৮৫), *চিঠিপত্র* (১৮৮৭), *সমালোচনা* (১৮৮৮), *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি* (১৮৯১, ১৮৯৩), *বিচিত্র প্রবন্ধ* (১৮৯৪), *পঞ্চভূত* (১৮৯৭)। এ ছাড়া এ সময়ে তিনি লিখেছিলেন প্রচুর ভাষা-সাহিত্য-সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ, যা গ্রন্থাকারে বেরোয় বিশ শতকে। উনিশ শতকেই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সামাজিক-রাজনীতিক প্রাবন্ধিকরূপে।

বাঙালির ইতিহাসে একবারই পরাভূত হয়েছিল কবিতা—উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। গদ্যের প্রবল বিপ্লবে বাংলা সাহিত্য থেকে যেন বিদায় নিয়েছিল কবিতা, যা বাংলা সাহিত্যের প্রাণ। সেটা ছিল কর্মের কাল, কবিতার কাল নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের

দশদিগন্ত জুড়ে পড়েছিল গদ্যের চর, শুকিয়ে গিয়েছিল কবিতার দীর্ঘ নদীটি, যা বয়ে এসেছে বাংলা ভাষার সূচনাকাল থেকে। এ সময়ে কোন কবি নেই বাংলায়; এ কবিতাহীন কালের একমাত্র 'কবি' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), যিনি বাস্তবের পদ্য লিখে কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক, তাঁর কবিতাও ছিল পদ্যসাংবাদিকতা, তবু তিনিই ওই সময়ের কবিসম্রাট। নিজের সম্পাদিত *সম্বাদ প্রভাকর*-এ (১৮৩১-১৮৫৯) তিনি নিজের কবিতা প্রকাশ করেছেন, তরুণদের সাহিত্য, বিশেষকরে কবিতা সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছেন এবং সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্য, যা তাঁর মহান কীর্তি। তাঁর কবিতা ছিল ওই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার পদ্যরূপ। তিনি ছিলেন পুরনো ও নতুনের মিশ্রণ, তবে পুরনোরই প্রাধান্য ছিল তাঁর মধ্যে; আর এ কারণেই বাংলা কবিতার শুকনো ধারাটিকে তিনি মুক্ত করতে পারেন নি। তবু তিনিই ছিলেন কবিতাশূন্য সময়ের একমাত্র কবি। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর এক বছর আগে বেরিয়েছিল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮) এবং পরে বেরিয়েছিল *কর্মদেবী* (১৮৬২), *শূরসুন্দরী* (১৮৬২), *কাঞ্চীকাবেরী* (১৮৭৯)। তাঁর রোমান্টিক পদ্যোপাখ্যানগুলোর কোন কোন পদ্যাংশ বিখ্যাত হয়েছিল, তবু তিনি ঠিক কবি ছিলেন না।

১৮৫৯ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অব্দ। এ বছর তিরোভাব ঘটে পুরনো কাল ও কবিতার শেষ প্রতিনিধি ঈশ্বর গুপ্তের এবং আবির্ভাব ঘটে আধুনিক কাল ও কবিতার প্রথম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)। এ বছর বেরোয় তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য *তিলোত্তমাসম্ভব* (১৮৫৯) এবং কালান্তর ঘটে বাংলা কবিতার। এ বছরকে গণ্য করতে পারি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত সূচনা-বছর হিসেবে। বোঝা যায়, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের কর্মীদের কাল শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে স্বাপ্নিকদের কাল। মধুসূদন আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব নতুন সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রতিভা, যে প্রতিভা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনেক আগে বুঝতে পারেন যে সারা বিশ্ব পর্যটন করে কবিতার বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মানোর কোন সম্ভাবনা নেই। মধুসূদন কাব্যের বীজ সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন পশ্চিম পৃথিবীতে এবং সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতাকে। শুধু কবিতা নয়, তিনি বদলে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকেই। তিনি সূচনা করেছিলেন প্রকৃত নাটকের ট্র্যাজেডি, কমেডি ও প্রহসনের; রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষার একমাত্র মহাকাব্য, সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা কবিতার অভিনব ভাষা ও ছন্দ; লিখেছিলেন অভাবিত পত্রকাব্য, পদাবলী ও চতুর্দশপদী। সব ক্ষেত্রেই অশেষ তাঁর সাফল্য। মধুসূদনের *তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য* হচ্ছে মহাকাব্য রচনা ও অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত সৃষ্টির উদ্যোগ, আর *মেঘনাদবধকাব্য* হচ্ছে তার সাফল্য। বাংলা কবিতার মহত্তম পরিকল্পনার নাম *মেঘনাদবধ*। এ কাব্যের পর আর কোন মহাকাব্য লেখা যেতে পারে না, এটা বুঝেছিলেন মধুসূদন; তাই তিনি ভিন্ন ধরনের কবিতার রাজ্য জয় করেছিলেন পরে; তবে তাঁর অনুসারীরা তা বোঝেন নি বলে ছদ্মমহাকাব্যে কবিতালোক ভরে তুলেছিলেন। এর

পর বেরোয় তাঁর *ব্রজাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬১), *বীরাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬২) ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (১৮৬৬), যার প্রতিটিই নিরীক্ষা হিসেবে অভিনব ও কাব্য হিসেবে অতুলনীয়। মধুসূদনের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তি ও অমর সংস্কার হয়ে থাকার জন্যে সর্বাংশে উপযুক্ত। মধুসূদনের অনুকরণে 'মহাকাব্য' লিখেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), এবং দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের কাব্য *বৃত্রসংহার* (১৮৭৫, ১৮৭৭); নবীনচন্দ্রের কাব্য *রৈবতক* (১৮৮৭), *কুরুক্ষেত্র* (১৮৯০), *প্রভাস* (১৮৯৬)। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রচুর কাব্য ও খণ্ডকবিতা লিখেছিলেন, সাড়াও জাগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের রচনার কাব্যমূল্য বেশি নয়, ওগুলো ব্যর্থতার মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মধুসূদন বাংলা কবিতার এক কালান্তর সম্পন্ন করেছিলেন, তবে তিনি ধ্রুপদী কবি; যাকে আধুনিক সংবেদনশীলতা বলা হয়, তাঁর কবিতা ঠিক তার প্রকাশ নয়। পশ্চিমে রোমান্টিকতাকে গণ্য করা হয় আধুনিক চেতনার প্রথম প্রকাশরূপে। আঠারো শতকের শেষদিকে ইউরোপে দেখা দেয় রোমান্টিকতা, যা দেখা দেয় ইউরোপীয় চৈতন্যের সঙ্কটরূপে আর চিরকালের জন্যে ফাটল ধরিয়ে দেয় ইউরোপীয় চিন্তাধারার মেরুদণ্ডে। কবি হয়ে উঠেন নিজের সৌরলোকে সূর্যের মতো; কবিতা হয়ে উঠে তাঁর নিজেরই চেতনার প্রকাশ। কবি বাহ্যজগতের অনুসারীর বদলে হয়ে উঠেন প্রদীপশিখার মতো, তাঁর কবিতাও ওই প্রদীপেরই শিখা। এ অর্থে বাংলা কবিতার প্রথম প্রকৃত আধুনিক ও রোমান্টিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)। মধুসূদন বদলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতার রূপ ও কাঠামো; বিহারীলাল বদলে দেন বাংলা কবিতার চৈতন্য, যা সেসময় সাড়া জাগায় নি; তবে পরিণামে জয় হয় বিহারীলালেরই। বিহারীলাল বাংলা কবিতার প্রথম অন্তরঙ্গ কবি, যাঁর কবিতা একান্তভাবে নিজের হৃদয়াবেগ ও স্বপ্নের প্রকাশ। বিহারীলাল অবশ্য কবি হিসেবে ছিলেন অসম প্রকৃতির—এক শ্লোক অবিস্মরণীয় কবিতা লেখার পরমুহূর্তেই তিনি পুরোপুরি অকবিতা লিখতে পারতেন। তাই তাঁর কবিতাবলী বহু লোকোত্তর শ্লোকগ্রস্ত হয়ে আছে বিপুল পরিমাণ পাংশু পংক্তির মধ্যে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সঙ্গীতশতক*-এই (১৮৬২) প্রকাশ পায় তাঁর রোমান্টিক প্রবণতা, তবে পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে তা রুদ্ধ হয়ে পড়ে ; কিন্তু আট বছর পরে প্রকাশিত *বঙ্গসুন্দরী* (১৮৭০) কাব্যে রোমান্টিক আবেগের বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটে। বিহারীলাল ছিলেন চরম রোমান্টিক ও অতীন্দ্রিয় স্বাপ্নিক, সমাজ-বহিরস্থিত, যার পরিচয় রয়েছে তাঁর *সারদামঙ্গল* (১৮৭৯) ও *সাধের আসন* (১৮৮৮) কাব্যে। বিহারীলালের অন্যান্য কাব্য *বন্ধুবিয়োগ* (১৮৭০), *নিসর্গসন্দর্শন* (১৮৭০), *প্রেমপ্রবাহিণী* (১৮৭০)। এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), মানকুমারী বসু

(১৮৬৩-১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) কবি হিসেবে খ্যাতি বা পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাসই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা হলো সুরেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ *মহিলা* (১৮৮০), দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ *স্বপ্নপ্রয়াণ* (১৮৭৫), গোবিন্দ দাসের কাব্যগ্রন্থ *প্রেম ও ফুল* (১৮৮৭), *কুঙ্কুম* (১৮৯১), *কস্তুরী* (১৮৯৫), দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যগ্রন্থ *ফুলবালা* (১৮৮০) *অশোকগুচ্ছ* (১৯০০), গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগ্রন্থ *কবিতাহার* (১৮৭৩), *অশ্রুকণা* (১৮৮৭), কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থ *অশ্রুমালা* (১৮৯৫), অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থ *প্রদীপ* (১৮৮৬), দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থ *আর্যগাথা* (১৮৮২), মানকুমারী বসুর কাব্যগ্রন্থ *কণকাঞ্জলি* (১৮৯৬), কামিনী রায়ের কাব্যগ্রন্থ *আলো ও ছায়া* (১৮৮৯)। এ সময়ে মহিলা কবিদের চমৎকার বিকাশ ঘটেছিল; তাঁদের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছিল নানা ধরনের নীতিকথা ও হাহাকার।

১৮৬১ এক মহাবর্ষ। এ বছর বেরোয় বাংলা ভাষার একমাত্র মহাকাব্য *মেঘনাদবধ* এবং জন্ম নেন বাংলা ভাষার মহত্তম কবি ও প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখিতা বিস্ময়কর; বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখা তিনি তুলনাহীনভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, একাই সঙ্কীর্ণ বাংলা সাহিত্যকে পরিণত করেছেন বিশ্বসাহিত্যে। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, গদ্য ও কাব্যনাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও আরো নানা শাখা তিনি ভরে দিয়েছেন অসামান্য সৃষ্টিশীলতায়। তাঁর রচনার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ দুইই বিস্ময়কর এবং বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় এখনো তিনিই শ্রেষ্ঠ। একটি শব্দে তাঁর পরিচয় দিতে হলে বলতে হবে, তিনি রোমান্টিক এবং তিনি বিশ্বরোমান্টিকতার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন শুরু হয়েছিল রোমান্টিক বহিরস্থিতরূপে, তবে তিনি ক্রমশ প্রবেশ করেন বস্তুজগতে। তাঁর শেষ রচনায়ও স্বাক্ষরিত হয়ে আছে তাঁর রোমান্টিক চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে নিজের গুরুরূপে স্বীকার করেছেন; তবে তাঁদের পার্থক্য এই যে বিহারীলাল ছিলেন স্বপ্নলোক থেকে নির্বাসিত, বস্তুজগতে প্রবাসী আর প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগতকেই রূপান্তরিত করেছিলেন স্বপ্নলোকে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতা স্বপ্নঘোরনিবিড় কবিতা। তাঁর এ সময়ের কাব্য ও কাব্যনাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে *কবি-কাহিনী* (১৮৭৮), *বন-ফুল* (১৮৮০,) *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১), *ভগ্নহৃদয়* (১৮৮১), *রুদ্রচণ্ড* (১৮৮১), *সন্ধ্যা সঙ্গীত* (১৮৮২), *কালমৃগয়া* (১৮৮২), *প্রভাত সঙ্গীত* (১৮৮৪), *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪), *শৈশব সঙ্গীত* (১৮৮৪), *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* (১৮৮৪)। এগুলোতে বহু ধারায় উৎসারিত হয়েছে রোমান্টিক বিষাদ ও বস্তুবিশ্বের সাথে খাপ না খাওয়ার যন্ত্রণা। ঘোরের কবিতা থেকে আলোকোজ্জ্বল পরিপূর্ণ কবিতায় তাঁর উত্তরণ ঘটে *ছবি ও গান* (১৮৮৪),*কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬), *মানসী* (১৮৯০) কাব্যে। উনিশ শতকের শেষ দশকে বেরোয় *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬), *কথা* (১৯০০), *কাহিনী* (১৯০০), *কল্পনা* (১৯০০), *ক্ষণিকা* (১৯০০) অর্থাৎ সেসব কাব্য, যেগুলোকে রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে গণ্য করা যায়। এসব কাব্য বাঙালির সংবেদনশীলতাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।

বাংলায় নাটকের সূচনা করেন গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৮) নামক এক রুশ পরিব্রাজক। তিনি ইংরেজি থেকে *ডিজগাইজ* এবং *লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর* নামে দু'টি নাটক অনুবাদ করেন। প্রথম নাটকটি ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ ও ২১ মার্চ ১৭৯৬ তারিখে অভিনীত হয়। নাটকটি ছিল প্রহসন। লেবেদেফ তখনই বাঙালি নাটকউপভোগীদের রুচির দোষ লক্ষ্য করেছিলেন, আর মধুসূদন এর ষাট বছরেরও বেশি পরে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে/মজে লোক রাঢ়বঙ্গে/নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়' (*শর্মিষ্ঠা*, ১৮৫৯) বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যের এ শাখাটিই জনগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত আর এখানেই শিল্পরুচির অভাব সবচেয়ে বেশি। লেবেদেফের নাট্যাভিনয়ের সাথে সাথে মৌলিক বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয় শুরু হয় নি, হতে আধশতকেরও বেশি সময় লেগেছিল। বাংলা মৌলিক নাটকের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৫২ সালে। এবছর বেরোয় জে. সি. গুপ্তের বিয়োগান্তক নাটক *কীর্তিবিলাস* ও তারাচরণ শিকদারের মিলনান্তক নাটক *ভদ্রার্জুন*। প্রথম প্রকাশিত হওয়াতেই এ দু'টির গৌরব। এরপর মধুসূদনের আবির্ভাবের আগে বেরোয় *মারচেন্ট অব ভেনিস* অবলম্বনে লেখা হরচন্দ্র ঘোষের (১৮১৭-১৮৮৪) *ভানুমতী-চিত্তবিলাস* (১৮৫৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবাবিবাহনাটক* (১৮৫৬)। এঁদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর নাটকের শিল্পমূল্য না থাকলেও ছিল বেশ অর্থ-সম্মান এবং 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে একটি উপাধি অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁর অন্যান্য নাট্যরূপী রচনার মধ্যে রয়েছে *বেণীসংহার* (১৮৫৩), *রত্নাবলী* (১৮৫৮), *নবনাটক* (১৮৬৫)। বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণের শ্রেষ্ঠ উপহার কোন নাটক নয়, একজন নাট্যকার; কারণ তাঁর *রত্নাবলী* নাটক দেখতে গিয়েই বাংলা নাটকের শোচনীয়তা দর্শনে ক্ষুব্ধ বোধ করেন মাইকেল মধুসূদন এবং আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত ও প্রধান নাট্যকার মধুসূদনের।

বাল্যকাল থেকেই বিপুল সাহিত্যপ্রস্তুতি নিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), তবে সাহিত্যের সব শাখায়ই তাঁর আবির্ভাব ঘটে আকস্মিকভাবে—এমনকি নাটকেও। হঠাৎ অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লেখেন তাঁর প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) এবং এটিই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা নাটক। মধুসূদন নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে। পুরাণ থেকে সমকালে আসতেও দেরি হয় নি মধুসূদনের। অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হয় তাঁর তীব্র ও আধুনিক প্রহসনযুগল *একেই কি বলে সভ্যতা* (১৮৬০) ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)—কাহিনী, সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে যে দু'টি আজো অতুলনীয়। এ বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় নাটক *পদ্মাবতী* (১৮৬০)। এ নাটকে তিনি মিলন ঘটিয়েছেন ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণের মধ্যে—নাটকের প্লট নেন তিনি গ্রিক পুরাণ থেকে, কিন্তু পাত্রপাত্রী নেন ভারতীয় পুরাণ থেকে। পরের বছর বেরোয় তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নাটক *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১), যে বছর বেরোয় তাঁর মহাকাব্য *মেঘনাদবধ* (১৮৬১)।

কৃষ্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি। মধুসূদন নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন টডের *এ্যানালস এ্যান্ড এন্টিকুইটিজ অব রাজস্থান* থেকে। এ নাটকে তিনি গ্রিক নিয়তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও ট্র্যাজিক হাহাকার ধ্বনিত করে তুলেছেন। মধুসূদনের পর গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৪)। দীনবন্ধু সমসাময়িক বিষয় গ্রহণ করেন তাঁর নাটকে; তবে তাঁর শিল্পরুচি উন্নত ছিল না। তাঁর ঝোঁক ছিল স্থূল বাস্তবতা উপস্থাপনের; তাই তাঁর পাত্রপাত্রীদের যতোটা জীবন্ত মনে হয়, ততোটা শিল্পসৃষ্টি মনে হয় না। তাঁর প্রতিভা মূলত প্রহসন রচনার প্রতিভা। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক *নীলদর্পণং নাম নাটকম* (১৮৬০) অর্থাৎ *নীলদর্পণ* ঢাকা থেকে বেরিয়েছিল। তাতে নাট্যকারের নাম ছিল না; বলা হয়েছিল 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম'। নীলকরদের নৃশংস অত্যাচার এ নাটকের বিষয়। নাটকটি সে সময়ে যে সাড়া জাগিয়েছিল, তা নাট্যিক ছিল না, ছিল সামাজিক-রাজনীতিক। তাই এটি এক উদ্দেশ্যসফল নাটক। তাঁর অন্যান্য নাটক ও প্রহসন *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬০), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬), *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *লীলাবতী* (১৮৬৭), *জামাই বারিক* (১৮৭২), *কমলে কামিনী* (১৮৭৩)। এগুলোর মধ্যে *সধবার একাদশী* তাঁর প্রতিভার পরিচয় বিশেষভাবে বহন করে। মনোমোহন বসু(১৮৩১-১৯১২) কয়েকটি সামাজিক ও অনেকগুলো পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। তিনি নাটককে গানে পরিপূর্ণ গীতাভিনয় বা অপেরায় পরিণত করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে রয়েছে *রামাভিষেক নাটক* (১৮৬৭), *প্রণয় পরীক্ষা* (১৮৬৯), *সতীনাটক* (১৮৭৩), *হরিশ্চন্দ্র নাটক* (১৮৭৫), *পার্থপরাজয় নাটক* (১৮৮১), *আনন্দময় নাটক* (১৮৯০)। প্রথম মুসলমান নাট্যকাররূপে দেখা দেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)। তাঁর নাটক-প্রহসনের নাম *বসন্তকুমারী নাটক* (১৮৭৩), *এর উপায় কি* (১৮৭৫)। তাঁর নাটক শিল্পমূল্যহীন। এ সময়ে অনেক নাটকের মতো রচনা লেখা হয়েছিল, সেগুলো অভিনীতও হয়েছিল, তবে সেগুলো সাহিত্যমূল্যহীন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা এবং তিনি নানা ধরনের নাটক লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম নাট্যরচনা *কিঞ্চিৎ জলযোগ* (১৮৭২) একটি একাঙ্ক প্রহসন, দ্বিতীয় প্রহসন হচ্ছে *এমন কর্ম আর করবো না* (১৮৭৭), পরে এর নাম হয় *অলীকবাবু*। তাঁর ইতিহাসের উপাদাননির্ভর নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে *পুরুবিক্রম নাটক* (১৮৭৪), *সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক* (১৮৭৫), *অশ্রুমতি নাটক* (১৮৭৯), *স্বপ্নময়ী নাটক* (১৮৮২)। তাঁর উপর প্রভাব পড়েছিল ফরাসী নাটকের। ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয় চেতনা জাগানো ও প্রচারের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। রোমান্সধর্মী ঐতিহাসিক উপাদান প্রথম ব্যবহার করেছিলেন মধুসূদন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ উপাদান স্বাদেশিকতা প্রচারের কাজে প্রথম ব্যবহার করেন, পরে যা গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে প্রবল ভাবাবেগে পরিণত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন অনেক নাটক; ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন মলিয়েরের *হঠাৎ*

নবাব (১৮৮৪), *দায়ে পড়ে দারগ্রহ* (১৯০২); সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন *অভিজ্ঞান-শকুন্তলা* (১৮৯৯), *উত্তর-চরিত* (১৯০০), *মালতীমাধব* (১৯০০), *রত্নাবলী* (১৯০০)। বিশ শতকে তিনি ইংরেজি নাটক ও আরো বেশ কয়েকটি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করেছিলেন। হিন্দু জাতীয়তা প্রচারের উদ্দেশ্যে *ভারতমাতা* (১৮৭৩), *ভারতে যবন* (১৮৭৪) নামে সাম্প্রদায়িক নাটক লিখেছিলেন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় ভাবোদ্দীপনামূলক নাটক লিখেছিলেন হরলাল রায়। তাঁর নাটকের নাম *হেমলতা* (১৮৭৩), *বঙ্গের সুখাবসান (* ১৮৭৪)। এসময়ে রোমহর্ষক মারদাঙ্গা নাটকের সূচনা করেন উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-১৮৯৫)। তাঁর নাটক হচ্ছে *শরৎ-সরোজিনী* (১৮৭৫), *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* (১৮৭৫)। গানে ভরপুর গীতিকানাটক লিখেছিলেন হরিমোহন রায়। তাঁর নাটকের নাম *সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন* (১৮৭৪), *পারিজাত-হরণ বা দেব-দুর্গতি* (১৮৭৪)। নাচগানে ভরপুর গীতিনাট্যের সূচনা করেছিলেন রামতারণ সান্ন্যাল। তাঁর এধরনের রচনার মধ্যে রয়েছে *প্রমোদকানন* (১৮৭৮), *রাসলীলা* (১৮৮০)। মনোমোহন বসুর ধারায় গীতাভিনয় লেখেন রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে *অনলে বিজলী* (১৮৭৮), *তারকসংহার* (১৮৮০)।

নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপকথা হয়ে আছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরবর্তী নাট্যকার ছিলেন না, তাঁর উদ্ভব-বিকাশ ঘটে রঙ্গমঞ্চের ভেতরে। তিনি ছিলেন অভিনেতা, সাধারণ নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ও নাট্যমঞ্চের পরিচালক এবং নাট্যকার। বাংলার সর্বাধিক সংখ্যক নাটকের তিনি রচয়িতা। তিনি পৌরাণিক, ভক্তিমূলক,সামাজিক, ঐতিহাসিক নানা ধরনের নাটক লিখেছিলেন; মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ভেঙে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে একটি নাট্যছন্দোরীতিরও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন; তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনি প্রবর্তক ছিলেন না। তিনি সব কিছুকেই সাধারণ দর্শকদের উপযোগী করে ব্যবহার করে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পুঁজি ছিল ভাবাবেগ ও প্রাকৃত রুচি। তাঁর পৌরাণিক নাটক *রাবণ-বধ* (১৮৮১), *সীতার বনবাস* (১৮৮২). *রামের বনবাস* (১৮৮২), *জনা* (১৮৯৪); ভক্তিমূলক নাটক *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৬), *বুদ্ধদেব-চরিত* (১৮৮৭), *বিল্বমঙ্গল* (১৮৮৮); সামাজিক নাটক *প্রফুল্ল* (১৮৮৯), *হারানিধি* (১৮৯০); প্রহসন *বড়দিনের বকশিশ* (১৮৯৪), *সভ্যতার পাণ্ডা* (১৮৯৪); গীতিনাট্য *স্বপ্নের ফুল* (১৮৯৪), *ফণির মণি* (১৮৯৬)। তাঁর নাটক সামাজিক ও শৈল্পিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে নি। গিরিশ ঘোষের মতো অমৃতলাল বসুও (১৮৫৩-১৯২৯) ছিলেন অভিনেতা-নাট্যকার, প্রধানত প্রহসনরচয়িতা। রক্ষণশীলতা তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রহসন *চোরের উপর বাটপাড়ি* (১৮৭৬), *বিবাহ-বিভ্রাট* (১৮৮৪), *চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে* ১৮৮৬, *বৌমা* (১৮৯৭), *গ্রাম্যবিভ্রাট* (১৮৯৮); তাঁর নাটক *তরুবালা* (১৮৯১), *বিমাতা* (১৮৯৩)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রহসন নিয়ে আবির্ভূত হন উনিশ শতকের শেষ দশকে। এ সময়ে তাঁর লেখা প্রহসন *কল্কি-অবতার* (১৮৯৫),

বিরহ (১৮৯৭), *ব্র্যহস্পর্শ* (১৯০০)। তাঁর প্রধান নাটকগুলো বেরোয় বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) কয়েকটি নাটক বেরিয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দশকে, বিশ শতকে বেরিয়েছিল বহু। *আলীবাবা* (১৮৯৭) তাঁর অতি জনপ্রিয় গীতিনাট্য।

বিশ্বসাহিত্যে কবিরাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারমাত্রই কবি; বাংলা সাহিত্যেও তাই। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই (১৮৬১-১৯৪১) শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বাংলা নাটককে রবীন্দ্রনাথ অশিল্প থেকে উত্তীর্ণ করেছিলেন শিল্পলোকে। স্থূল অপরিস্রুত বাস্তবতা, পরীর দেশের ইতিহাস, প্রাকৃত চিত্তবিনোদন থেকে তিনি উদ্ধার করেন বাংলা নাটককে এবং কবিত্ব, সাংকেতিকতা ও প্রতীকতায় বাংলা নাটককে 'অলীক কুনাট্য' থেকে মুক্তি দিয়ে পরিণত করেন শিল্পকলায়। রবীন্দ্রনাটকের মূলভাষা কবিতা; তিনি প্রধানত কাব্যনাট্যকার, যদিও গদ্যনাটকেও তাঁর সাথে তুলনীয় কেউ নেই বাংলা সাহিত্যে। প্রথাগত বাংলা নাটক হচ্ছে ঘটনার ঘনঘটা ও সংলাপের নামে দীর্ঘ বক্তৃতার সমষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক থেকে বিদায় দেন ঘটনাকে, রাখেন শুধু সেটুকু যার অভাবে কাহিনী মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। সংলাপে তিনি সঞ্চার করেন পরিমিতি ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা, যার অভাব রয়েছে সমগ্র বাংলা নাটকেই। তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—রোমান্টিকতা, প্রতীক ও সাংকেতিকতা এবং তাঁর অধিকাংশ নাটকই কোন না কোন বাণীর প্রকাশ। রবীন্দ্রসাহিত্যের আর কোন শাখায় বাণী বা তত্ত্বের এতোটা প্রাচুর্য পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁর প্রতিটি নাটকেই আবিষ্কার করা সম্ভব অন্তত একটি বাণী বা তত্ত্ব। নাটকের প্রধান লক্ষ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া, তবে অভিনীত ও জনপ্রিয় হওয়াই নাটকের শেষ সাফল্য নয়; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহ পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। নাটকের সাহিত্যমূল্য যাচাইয়ের একটি ভাল মানদণ্ড হচ্ছে পাঠযোগ্যতা। পড়ে যে নাটককে মূল্যবান মনে হয় সে নাটকই সাহিত্যমূল্যসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষায় প্রথম পাঠ্যনাটক লেখেন, যা অভিনীত হলে ভাল, না হলেও কোন ক্ষতি নেই, পড়েই তা উপভোগ, সম্ভবত পরমভাবে উপভোগ করা যায়। নাট্যকাররূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য নিয়ে : ১৮৮১ অব্দে বেরোয় তাঁর গীতিনাট্য *বাল্মীকিপ্রতিভা* ও কাব্যনাট্য *রুদ্রচণ্ড* এবং এরপর একের পর এক বেরোয় আরো গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য—*কালমৃগয়া* (১৮৮২), *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৪), *মায়ার খেলা* (১৮৮৮)। এ রচনাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা উদ্‌ঘাটন ও রচনা করে চলছিলেন নিজেকেই, যেমন *বাল্মীকিপ্রতিভা*'য় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ছদ্মবেশে স্থির করছেন নিজেরই চরিত্র। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর পরিপূর্ণতর কাব্যনাটক *রাজা ও রাণী* (১৮৮৯), *বিসর্জন* (১৮৯০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *মালিনী* (১৮৯৬)। এর মধ্যে *বিসর্জন* নাট্যিকভাবে ও *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যিকভাবে অত্যন্ত সফল। এ সময়ে তিনি রচনা করেন কিছু নাট্যকাব্য অর্থাৎ নাটকের আধারে কালোত্তর কবিতা *বিদায় অভিশাপ* (১৮৮৪), *গান্ধারীর আবেদন*

(১৮৯৭), *সতী* (১৮৯৭), *কর্ণ-কুন্তী সংবাদ* (১৮৯৯) প্রভৃতি। প্রচুর প্রহসনও তিনি লিখেছেন। তাঁর উনিশ শতকে লেখা প্রহসনের মধ্যে রয়েছে *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২), *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭)। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি রূপান্তর ঘটে বিশ শতকে।

উপন্যাস বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সভ্যতার নিজস্ব সাহিত্যআঙ্গিক। বাস্তবতা ও সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহ থেকে আঠারো শতকে পশ্চিমে আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের। পুঁজির সাথেও উপন্যাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং নীতি ও নারীদের সঙ্গেও এর সম্পর্ক নিবিড়। ইংরেজি সাহিত্যে কাহিনীর মোড়কে নারীদের নীতিকথা শেখানোর ও পুঁজিসৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপন্যাস লিখেছিলেন প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকেরা। বাংলা সাহিত্যেও ঘটে তাই—নারী, নীতি ও পুঁজি তিনটিই বিবেচনার মধ্যে ছিল বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদের। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উন্মেষ-বিকাশ ঘটে ইংরেজি উপন্যাসের প্রত্যক্ষ অনুসরণে। উনিশ শতকের বিশের দশকে দু-একটি নকশাধর্মী রচনায় বাস্তব সমাজচিত্র আঁকার চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সেগুলোকে উপন্যাস বলা যায় না, উপন্যাসের সামান্য আভাসও সেগুলোতে দেখা যায় না। এ ধরনের রচনার উদাহরণ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) *নববাবুবিলাস* (১৮২৫)। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে বেরোয় হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেনস-এর *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ;* কিন্তু প্রচারধর্মী এ পুস্তকটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), যিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে বিখ্যাত। তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) বাংলা ভাষায় সচেতনভাবে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস। প্যারীচাঁদ যদিও তাঁর উদ্যোগে পুরোপুরি সফল হন নি, তবু পুরোপুরি ব্যর্থও নন তিনি; বাংলা কথা-সাহিত্যের চরিত্র তিনি বদলে দিয়েছিলেন। *আলালের ঘরের দুলাল*কে বলা যায় উপন্যাসের খসড়া; উপন্যাসের সমস্ত উপাদান এতে রয়েছে, কিন্তু তা শিল্পরূপায়িত হয় নি। *আলালের ঘরের দুলাল*-এর ভাষাও ছিল একধরনের বিদ্রোহ। প্যারীচাঁদই প্রথম চলতি বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তবে সফল হন নি। তাঁর ভাষা সাধু-চলতির মিশ্ররূপ। উনিশ শতকে চলতি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠরূপ রচনা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নকশায়* (১৮৬২, ১৮৬৪)। বইটি অবশ্য উপন্যাস নয়। প্যারীচাঁদ আরো কয়েকটি উপন্যাস ধরনের বই লিখেছিলেন। তাঁর *অভেদী* (১৮৭১) ও *আধ্যাত্মিকা* (১৮৮০)-এর কোনটিই সফল হয় নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) *ঐতিহাসিক উপন্যাস*-এ (১৮৬২-৬৩) দু'টি কাহিনী আছে : *সফল স্বপ্ন* ও *অঙ্গুরীয় বিনিময়,* তবে এতে উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'উপাখ্যান'। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) লিখেছিলেন *বিচিত্রবীর্য* (১৮৩২), গোপীমোহন ঘোষ লিখেছিলেন *বিজয়বল্লভ* (১৮৬৩)। তবে এগুলো উপন্যাস হয়ে উঠে নি।

বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠদের একজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম শৈল্পিকভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এ আঙ্গিকটি। তিনিই এর বিকাশ সম্পন্ন করেন। তবে তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন উপন্যাসের মূল প্রেরণা থেকে। সমকালীন

বাস্তবতা ও জীবন উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্য থেকে পশ্চিমে সৃষ্ট হয়েছিল উপন্যাস; কিন্তু বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসকে দূরে সরিয়ে নেন সমকাল, বাস্তবতা ও সাধারণ মানুষের জীবন থেকে এবং সৃষ্টি করেন এক রোমান্সসাম্রাজ্য। শুধু নীতিটুকু তিনি রেখেছিলেন। শুরুতে তিনি ওয়াল্টার স্কটকে অনুসরণ করেছেন, যদিও স্কট থেকে অনেক অন্তর্দর্শী ও মহৎ তিনি। কিন্তু স্কটের প্ররোচনায়ই তিনি বাংলা উপন্যাসকে সরিয়ে নিয়েছিলেন বাস্তব ও সমকাল থেকে অবাস্তবে ও সুদূর কালে। তাঁর পাত্রপাত্রীরা সাধারণ মানুষ নয়, অসাধারণ তারা, তাদের জীবন পরিপূর্ণ অসাধারণ রোমাঞ্চকর ঘটনায়। চৌদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি, এর মাঝে দু'টিমাত্র—*বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* সমকালীন ও সামাজিক উপন্যাস; তবে এ দু'টির পাত্রপাত্রীরাও সাধারণ নয়, তাদের সমস্যাও অসাধারণ। বঙ্কিমের উপন্যাসে তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে অনুরাগ-ঘৃণা-কামনা-বাসনার মতো মানবিক প্রবৃত্তিরাশি এবং তার প্রকাশ ঘটেছে অসামান্য ভাষায়। প্রথম তিনি *রাজমোহনস ওয়াইফ* (১৮৬৪) নামে ইংরেজিতে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, তবে সেটি সফল হয় নি। বাংলায় লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* সফল হয়েছিল চরমভাবে; এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম খাঁটি উপন্যাস। তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন বাইশ বছরের। এ সময়ে তিনি রচনা করেন চৌদ্দটি উপন্যাস : *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮৪), *দেবীচৌধুরাণী* (১৮৮৪), *রাধারাণী* (১৮৮৬) ও *সীতারাম* (১৮৮৭)। বঙ্কিম শুধু ঔপন্যাসিক থাকতে চান নি, তিনি তাঁর জাতির পথপ্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করতে চেয়েছেন। তাঁর এ ভূমিকা তাঁকে এক গোত্রের কাছে করে তুলেছে মহাপুরুষ, আরেক গোত্রের কাছে শত্রু।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪০-১৯২১) দু'খণ্ডে একটি বড়ো উপন্যাস লিখেছিলেন *বঙ্গাধিপ পরাজয়* (১৮৬৯, ১৮৮৪) নামে। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনকে উপন্যাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *স্বর্ণলতা* (১৮৭৪)। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন : *কণ্ঠমালা* (১৮৭৭), *জাল প্রতাপচাঁদ* (১৮৮৩), *মাধবীলতা* (১৮৮৪) এবং লিখেছিলেন একটি চমৎকার ভ্রমণকাহিনী *পালামৌ* (১৮৮০-১৮৮২)। চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) লিখেছিলেন অনেকগুলো জীবনী-উপন্যাস, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মহারাজ নন্দকুমার* (১৮৮৫), *ঝান্সীর রাণী* (১৮৮৮)। শিক্ষামূলক তিনটি ভাল উপন্যাস লিখেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) : *মেজবৌ* (১৮৭৯), *নয়নতারা* (১৮৮৯), *যুগান্তর* (১৮৯৫)। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) প্রথম মুসলমান বাঙালি ঔপন্যাসিক। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯০) রূপকথাধর্মী। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ছ'টি উপন্যাস লিখেছিলেন। এর মাঝে চারটি রোমান্স-ঐতিহাসিক উপন্যাস : *বঙ্গবিজেতা* (১৮৭৪), *মাধবীকঙ্কন* (১৮৭৭), *মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত*

(১৮৭৮), *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (১৮৮৯); আর দু'টি সামাজিক উপন্যাস : *সংসার* (১৮৮৬), *সমাজ* (১৮৯৪)। দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) বাজারের কথা ভেবে উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম *মৃন্ময়ী* (১৮৭৪)—এটি বঙ্কিমের *কপালকুণ্ডলার* নতুন উপসংহার। তিনি ইংরেজি উপন্যাসের ভাবানুবাদ করেছেন, যেমন *কমলকুমারী, শুভ্রবসনা সুন্দরী;* তাছাড়া মৌলিক মূল্যহীন উপন্যাসও লিখেছেন : *বিমলা* (১৮৭৭), *দুই ভগিনী* (১৮৮১)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। তাঁর উপন্যাস *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬), *ছিন্নমুকুল* (১৮৭৯), *হুগলীর ইমামবাড়ী* (১৮৮৪), *স্নেহলতা* (১৮৯২), *কাহাকে* (১৮৯৮)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯৪০) *লীলা* (১৮৯২) জনপ্রিয় হয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) লিখেছিলেন *শক্তিকানন* (১৮৮৭), *ফুলজান* (১৮৯৪)। এ সময় ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসের একটি ধারাও সৃষ্টি হয়েছিল, তবে তা কখনো উচ্চমানের শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে নি। এধারার সূচনাকারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১১)। তাঁর উপন্যাসের নাম *কল্পতরু* (১৮৭৪)। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) লিখেছিলেন কয়েকটি ব্যঙ্গ-উপন্যাস : *মডেল-ভগিনী* (১৮৮৬-১৮৮৮), *চিনিবাস-চরিতামৃত* (১৮৯০), *কালাচাঁদ* (১৮৯৯)। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭-১৯১৯) লিখেছিলেন *কঙ্কাবতী* (১৮৯২)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একটি অসম্পূর্ণ ও দু'টি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছিলেন উনিশ শতকে; তবে এদের একটিও রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় বহন করে না। *করুণা* নামক একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস বেরিয়েছিল *ভারতীতে* (১৮৭৭-১৮৭৮); এবং এর পাঁচ বছর পর বেরোয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস *বউঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩), যখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। এটি ঐতিহাসিক রোমান্স এবং ব্যর্থ। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *রাজর্ষি*ও (১৮৮৭) ঐতিহাসিক রোমান্স, তবে রচনা হিসেবে প্রথমটি থেকে উৎকৃষ্ট। *রাজর্ষির* প্রথমাংশকে পরে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন কাব্যনাটক *বিসর্জন*-এ (১৮৯০)। উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেন নি। প্রচুর উপন্যাস লেখা হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এগুলোর অধিকাংশই ছিল পাঠকদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে রচিত। মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে অভিনব রূপকথারূপে দেখা দিয়েছিল উপন্যাস।

বাংলায় কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় শাখা ছোটগল্পের উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে। এর আগে বাংলায় গল্প ছিল, উপকথাও ছিল; কিন্তু ছোটগল্প ছিল না। এ আঙ্গিকটিও উনিশ শতকেই ঋণ করা হয় ইউরোপ থেকে। বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটগল্প লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২)। তাঁর গল্পের নাম *মধুমতী* (১৮৭৩)। এর পরেই *দামিনী* (১৮৭৪) ও *রামেশ্বরের অদৃষ্ট* (১৮৭৪) নামে দু'টি ছোটগল্প লেখেন বঙ্কিমেরই মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)। চব্বিশ পরগনার চট্টোপাধ্যায় পরিবারটি ছিল কথাশিল্পী পরিবার। তবে বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও পরিণতিলাভ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। ১৮৭৪ সালে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম

গল্প *ভিখারিনী,* যদিও সেটি ত্রুটিহীন ছোটগল্প হয়ে উঠে নি। স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের আগেই ছোটগল্প লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম ছোটগল্পের সঙ্কলনের নাম *নবকাহিনী* (১৮৯২)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯৪০) ছোটগল্পের বই *সংগ্রহ* বেরোয় ১৮৯২ সালে। যদিও ১৮৭৪ সালেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম গল্প লিখেছিলেন, তবে তাঁর প্রকৃত ছোটগল্প লেখা শুরু হয় ১৮৯০ থেকে। এ বছরেই বেরোয় তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্প : *পোস্টমাস্টার, দেনাপাওনা, ব্যবধান* প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্প লেখা হয়েছিল ১৮৯০-১৯০৩ অব্দের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষ দশকে তাঁর কয়েকটি গল্পসংগ্রহ বেরোয় : *ছোটগল্প* (১৮৯৪), *বিচিত্রগল্প* (১৮৯৪), *কথা-চতুষ্টয়* (১৮৯৪), *গল্প দশক* (১৮৯৫)। এসব সংগ্রহের গল্প নিয়ে ১৯০০ অব্দে বেরোয় *গল্পগুচ্ছ*-এর প্রথম খণ্ড। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বাংলার মানুষ, প্রকৃতি, কামনা-বাসনা লোকোত্তর শিল্পরূপ লাভ করে। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠে সম্পূর্ণ সাহিত্য। তাতে বিকাশ ঘটে সাহিত্যের সমস্ত শাখার আর রূপায়িত হয় জীবনের সম্পূর্ণ রূপ—বাস্তব ও স্বপ্ন। সেটি ছিল উদ্ভাবনার শতাব্দী। এর প্রায় প্রতিটি দশকেই উদ্ভাবিত হয়েছে কোন না কোন আঙ্গিক বা রীতি, যা হয় নি বিশ শতকেও। বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের চেতনা ও সংবেদনশীলতা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের অবয়ব রয়েছে উনিশ শতকের মতোই। তাই উনিশ শতক শুধু কালের দিক দিয়েই বিশ শতকের সন্নিকটবর্তী তা নয়, রক্তের সম্পর্কেও পরমাত্মীয়।

রচনাপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৪৬)

অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা,* দ্বিতীয় মুদ্রণ,(কলকাতা ১৯৮৮)

নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা,* পঞ্চম সংস্করণ, (কলকাতা ১৩৪৮)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনকথা,* পরিবর্ধিত সংস্করণ, (কলকাতা ১৯৬১)

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য,* চতুর্থ সংস্করণ, (কলকাতা ১৩৭৩)

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ (কলকাতা ১৩৮৬)

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,* (কলকাতা ১৯৭৬)

১০

বিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য

সৈয়দ আবুল মকসুদ*

১.

এই পরিচ্ছেদে বিশ শতকের বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে সৃষ্টিশীল গদ্য, যেমন উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা প্রভৃতি; তেমনি মননশীল গদ্য, যেমন প্রবন্ধ, জীবনী ও আত্মজীবনী, সমালোচনা, গবেষণামূলক সাহিত্যকর্ম প্রভৃতি। বাংলা নাটক রয়েছে এ আলোচনার বহির্ভূত। বিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরিমাণ বিপুল। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এখানে মোটামুটি প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি প্রধান ধারাগুলির একটি রূপরেখা দেয়া হলো।

সরকার ও শাসকশ্রেণী থেকে কখনোই বাংলা ভাষা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ধন্য হয় নি। শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে সাধারণ মানুষই এই ভাষাকে যেমন তাদের মুখের ভাষারূপে বাঁচিয়ে রেখেছে, তেমনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ মানুষই কবিতা ও গান রচনা করে তাদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করেছে। বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়েই এ ভাষা বিকশিত হয়েছে। রামমোহন রায়ই (১৭৭৪-১৮৩৩) বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক গদ্যলেখক। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত তাঁর পুস্তিকাগুলি প্রথম পর্যায়ের বাংলা গদ্যের সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন। তাঁর পর পরই আবির্ভাব ঘটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৮৬), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৮-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ

---

* বার্তা সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বা. স. স.)।

(১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ শক্তিশালী লেখকের। মাত্র ২৩ বছর বয়সে অক্ষয়চন্দ্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* (১৮৪৩) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকা মননশীল গদ্যের বিকাশে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছে। নতুন শিক্ষিত উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* অসামান্য সমাদৃত হয়। অক্ষয়কুমারের পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, "প্রবন্ধ-গৌরবে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী অল্পদিনের মধ্যেই দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিল। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন"[১] তা সত্ত্বেও। মূলত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* উদ্দেশ্য হলেও এই সাময়িকীতে "বিজ্ঞান, সমাজ, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের রচনাও স্থান পেত।"

বাংলা গদ্যের অগ্রগতিতে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯০) সম্পাদিত মাসিক *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২)। উনিশ শতক ছিলো *তত্ত্ববোধিনী* ও *বঙ্গদর্শন*-এর যুগ। যদিও এই সময় আরো বেশ কিছু উন্নতমানের পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে কেন্দ্র করে আবির্ভাব ঘটে বহু শক্তিশালী গদ্যলেখকের। *বঙ্গদর্শন*-এর মান—বাংলা সাধু ভাষার শৈলী ছিলো উন্নততর। সাহিত্য, সমাজ, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধ এবং উপন্যাস *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত হতো। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যরীতি ছিলো সাধু, কিন্তু কুড়ি শতকে প্রধান লেখকদের প্রকাশমাধ্যম হলো চলিত বাংলা ভাষা। সাধু বাংলা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হলেও চলিত ভাষাই বাহন হয়ে উঠে শ্রেষ্ঠ লেখকদের ভাব প্রকাশের। এমনকি দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ও এই চলিত ভাষায় লিখিত হয়। মননশীল গদ্য দিয়েই বাংলা গদ্যসাহিত্যের যাত্রাশুরু, তারপর বাংলা গদ্য বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে সৃষ্টিশীল রচনাসম্ভারে। কুড়ি শতকের বাংলা গদ্যের যাঁরা প্রধান নির্মাতা তাঁদের অনেকেরই জন্ম উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং তাঁদের অনেকেই গ্রন্থকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন গত শতকেই, কিন্তু কুড়ি শতকেও প্রকাশিত হয় তাঁদের অনেক প্রধান গ্রন্থ। এই নিবন্ধে লেখকদের বয়সের নয়, তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের কালকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ভাষার শুধু শ্রেষ্ঠ কবিই নন তিনি শ্রেষ্ঠ গল্পশিল্পীও । তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র* একটি ভ্রমণকাহিনী, প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খৃস্টাব্দে, কিন্তু পরবর্তী ষাট বছর তিনি অবিরাম লিখেছেন অজস্র গদ্যরচনা ঃ প্রবন্ধনিবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা, জার্নাল প্রভৃতি। অমূল্য চিঠিপত্রের লেখক হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। আত্মীয়স্বজন, সমকালীন লেখক-বুদ্ধিজীবী, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত-অপরিচিতদের কাছে লেখা তাঁর অগণিত

১. নবেন্দু সেন, *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর* (কলকাতা ১৯৭১) পৃ. ১৫।

চিঠিপত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর মনোজগৎ : তাঁর পর্যবেক্ষণ ও আত্মবিশ্লেষণ। তাঁর চিঠিপত্রে পাওয়া যায় শুধু একজন অন্তরঙ্গ মানুষকে নয়, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর অকপট মতামত। তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন *ছিন্নপত্রাবলী* (১৯১২) এবং *পথে ও পথের প্রান্তে* (১৯৩৮) ছাড়াও তাঁর মৃত্যুর পর এগার খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর পত্রাবলি। তাঁর পত্রসাহিত্যের পরিমাণ বিপুল।

রবীন্দ্রনাথ কোনোরকম চরমপন্থা ও সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতেন না। শান্তির প্রবক্তা হিসেবে হিংসার পথ তাঁকে আকর্ষণ করে নি, তাই বঙ্গভঙ্গের সেই অস্থির সময়ে তিনি উগ্রপন্থীদের কর্মকাণ্ডে সময় দেন নি। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের শুরু তা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তিনি নিজে একজন কঠোর ভূস্বামী ছিলেন, তবে সাধারণ জমিদার ও মহাজন কর্তৃক প্রজাপীড়ন তিনি নীতিগতভাবে সমর্থন করেন নি। গ্রামের অবহেলিত শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবীর প্রতি তাঁর এক ধরনের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধে। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা তাঁর চিন্তাজগৎকে প্রভাবিত করেছিল, যা তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। শহরের ধনী ও গ্রামীণ দরিদ্রদের ভেতরকার বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনায়। তিনি ছিলেন সংস্কারবাদী, সুতরাং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে। সকল ব্যাপারে বিদেশী সরকারের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। দেশবাসীকে দেখতে চেয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> "আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতে হইবে। ··· চাষীকে আমরা রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, ··· এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে।"

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তাঁর অনেক সমসাময়িকের চেয়ে প্রশস্ত। স্থায়ী বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে আন্তর্জাতিকতার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। যখন এই পৃথিবী জাতীয় ও জাতিগত-বর্ণগত সংঘর্ষে উত্তপ্ত ছিল তখন তিনি ইউরোপে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন : "···this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality."[২] (এই জাতীয়তাবাদ একটি নিষ্ঠুর মহামারীর মতো, যা বর্তমান যুগের মানবসমাজের উপর ছড়িয়ে প'ড়ে তার নৈতিক শক্তি ক্ষয় করছে।)

যেকোনো উপায়ে ইংরেজ শাসকদের বিদায় করে দিলেই দেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা আসবে তা বিশ্বাস করতেন না রবীন্দ্রনাথ। আত্মশক্তির বিকাশ না ঘটলে জাতির মুক্তি নেই। তাঁর ভাষায় :

---

২. Nationalism in the West, Nationalism, (1930) 16.

"আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় হইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসা হয় না, তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয় এমন কেহ আসিবে যার মুখের ব্যাস ও পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোট না হইতে পারে,· · ·" ।[৩]

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

"ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।"

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে অগ্রসর ও উদার। 'হিন্দু-মুসলমান'-এ তিনি লিখেছেন :

১. যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে ?

২. নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে; সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

জীবনের শেষ চার দশক রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে সৃষ্টিশীল ও কর্মময়। এই সময় তিনি অবিরাম লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ে। যেমন তাঁর গ্রন্থ রয়েছে শিক্ষা সম্পর্কে (*শিক্ষা* ১৯০৮, ১৩ খণ্ড *শান্তিনিকেতন* ১৯০৯-১২); ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে (*প্রাচীন শিক্ষা* ১৯০৭, *সাহিত্য* ১৯০৭, *আধুনিক সাহিত্য* ১৯০৭, *সাহিত্যের পথে* ১৯৩৬, *বাংলা ভাষা পরিচয়* ১৯৩৭ এবং *সাহিত্যের স্বরূপ* ১৯৪৩); এবং ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে (*আত্মশক্তি* ১৯০৫, *ভারতবর্ষ* ১৯০৬, *বিচিত্র প্রবন্ধ* ১৯০৭, *রাজা ও প্রজা* ১৯০৮, *সমূহ* ১৯০৮, *সমাজ* ১৯০৮, *স্বদেশ* ১৯০৮, *ধর্ম* ১৯০৯, *মানুষের ধর্ম* ১৯৩৩, *কালান্তর* ১৯৩৭ এবং *সভ্যতার সঙ্কট* ১৯৪১)।

একজন মহান ধর্মসংস্কারক বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) একজন বহুপ্রসূ গদ্যলেখক। তাঁর বিশ্ববীক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বাংলা গ্রন্থসমূহে, যেমন *পরিব্রাজক* (১৯০৩),

৩. পথ ও পথেয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খন্ড, পৃ. ৪৭৯।

ভাববার কথা (১৯০৫), *বর্তমান ভারত* (১৯০৫) এবং *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৯০৫)। তাঁর রচনাশৈলী সহজ-সরল, সাধারণের উপযোগী। তাঁর জীবনদর্শন ও চিন্তা সম্পর্কেও বিশ শতকে প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বাংলা ভাষায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে রচনার পরিমাণ বেড়েছে।

মননশীল প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৪-১৯৪৬) তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা *সবুজপত্র*-এর জন্যও বিখ্যাত। স্বদেশ, সমাজ, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। এ সকল বিষয়ে রয়েছে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *তেল-নুন-লকড়ি* সম্ভবত ১৯০৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *বীরবলের হালখাতা* (১৯১৭), *নানা-কথা* (১৯১৯) *আমাদের শিক্ষা* (১৯২০), *দু'ইয়ারকি* (১৯২১), *বীরবলের টিপ্পনী* (১৯২১), *রায়তের কথা* (১৯২৬), *নানা-চর্চা* (১৯৩২), *ঘরে-বাইরে* (১৯৩৬) এবং *প্রাচীন হিন্দুস্থান* (১৯৪০) বাংলা মননশীল সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু বিষয়কেও তিনি সহজ কিন্তু সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। *সবুজপত্র*-গোষ্ঠীর আর দু'জন শক্তিশালী প্রাবন্ধিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৮৮৯-১৯৮৪) শিক্ষা, সমাজ, জীবন ও ধর্ম বিষয়ে লিখেছেন। অতুলচন্দ্রের *শিক্ষা ও সভ্যতা* (১৯২৮), *কাব্যজিজ্ঞাসা* (১৯২৯) প্রভৃতি চিন্তাশীল রচনা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৬-১৯৬০) সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও সমাজ বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধসংকলন ও জার্নাল জাতীয় গ্রন্থ রয়েছে, যেমন *আমরা ও তোমরা, চিন্তয়সী, কথা ও সুর* এবং *বক্তব্য*।

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর *ভারত শিল্প* (১৯০৯) এবং *বাগেশ্বরী শিল্পকলা* (১৯৪১) বাংলাভাষায় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর রচনাশৈলীও সহজ ও সাবলীল। আরেকজন শিল্পী অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪) চারুকলা বিষয়ে লিখেছেন তাঁর *অজন্তা* (১৯১৩), *বাগ্‌গুহা ও রামগড়, ভারতের কারুশিল্প* (১৯৩৯), *ইউরোপের শিল্পকলা* (১৯৪০) প্রভৃতি অসামান্য গ্রন্থে।

এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) বাংলাভাষার একজন প্রধান গদ্যলেখক। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী, যদিও মুসলমান সভ্যতা সম্পর্কে রয়েছে তাঁর প্রচুর লেখা। তিনি একাধারে কথাশিল্পী ও প্রবন্ধকার। তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য বাঙালি জাতীয়তাবাদ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতি। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ভবিষ্যতের বাঙালি* (১৯৪৩), *মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ*, *জীবনের শিল্প* (১৯৪১), *আকবরের রাষ্ট্রসাধনা* (১৯৪৯), *ইসলামের পয়গাম, সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান* (১৩৫৫), *ভারতবর্ষ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৩৫০) প্রভৃতি।

৩.

বিশ শতকের প্রথম সাত দশকে বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের অসামান্য অগ্রগতি হয়। এই সময় বিখ্যাত ও অল্পখ্যাত অসংখ্য কথাশিল্পীর উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে সেগুলোর আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় উপন্যাসগুলি সম্পর্কেই আলোচনা সীমিত থাকছে।

নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পের স্রষ্টাও বটে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি উপন্যাস : *চোখের বালি* (১৯০১), *নৌকাডুবি* (১৯০৩) এবং *গোরা* (১৯০৯)। *চোখের বালি* ও *নৌকাডুবি* তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। *গোরা*-ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, শুধু তাই নয় বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উনিশ শতকের শেষদিকের বঙ্গীয় সমাজের উজ্জ্বল চিত্র এই উপন্যাস। "যুগসমস্যার প্রশ্ন বাদ দিলেও '*গোরা*'র মধ্যে কতগুলি শাশ্বত প্রশ্নের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"[৪] সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, হিন্দু মধ্যবিত্তের দেশাত্মবোধ প্রভৃতি এই উপন্যাসের উপজীব্য। *ঘরে বাইরে* (১৯১৬) এবং *চতুরঙ্গ* (১৯১৬)-তে তিনি সমকালীন রাজনীতির উপর আলো ফেলেছেন। পরিবার ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই দুটি উপন্যাসে মনোজগতের বিশ্লেষণও উপস্থিত। উপন্যাস দুটিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদীরা ক্ষুব্ধ হন। সম্ভবত তার জবাবেই তিনি বলেন, "দেশপ্রেমের অহংকার আমার জন্য নয়।"[৫] *যোগাযোগ* (১৯২৯), *শেষের কবিতা* (১৯২৯), *দুই বোন* (১৯৩৩), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪), *মালঞ্চ* (১৯৩৪)-তে উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দু-পরিবারের অন্তঃসারশূন্যতা, পরকীয়া প্রেম প্রভৃতি অসামান্য ভাষায় চিত্রিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ দশকে পারিবারিক জমিদারি তদারকির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্ব বঙ্গের শিলাইদহে অবস্থান করেন। তখন তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান। *গল্পগুচ্ছ* (১৯০০)-এর গল্পগুলি ১৯০৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৯৬২-তে ৯৩টি গল্পের সংকলন গল্পগুচ্ছ নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়। ছোটগল্পের লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ "ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তা-ই। বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটগল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং এমন সময়ে লেখেন, যখন ইংরেজি সাহিত্যেও ছোটগল্প নামক বস্তুটির চল হয় নি।"[৬] 'ঘাটের কথা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'পুত্রযজ্ঞ', 'মণিহারা', 'স্ত্রীর পত্র', 'রামমণির

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র জীবন-কথা*, ১৩৭৩, কলকাতা, পৃ. ৭৮।

৫. বিশ্বভারতীয় পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০, পৃ ৩১৬।

৬. বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ সংকলন*, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪৭।

ছেলে', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি', 'বলাই', 'নষ্টনীড়', 'মাস্টার মশাই', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। মানবজীবনের গভীরতম সুখদুঃখ অতি অল্পকথায় চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রগল্পগুচ্ছে। যখন তাঁর বহু কবিতার আবেদন থাকবে না তখনও তাঁর ছোটগল্প সংবেদনশীল পাঠককে মুগ্ধ করবে।

প্রমথ চৌধুরীও শক্তিশালী ছোটগল্পশিল্পী। তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে *আহুতি* (১৯১৯), *নীল লোহিত* (১৯৩৩), *নীল-লোহিতের আদিপ্রেম* (১৯৩৫), *ঘোষালের ত্রিকাল* (১৯৩৭) এবং *অনুকথা সপ্তক* (১৯৩৯)। তাঁর *গল্প-সমগ্র* রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৪১-এ। বিষয় ও রচনাশৈলী দু'দিক থেকেই তিনি নিজস্ব-চিহ্নিত। "জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ" করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, সুতরাং তাঁর গল্প বাস্তবধর্মী। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) লিখেছেন কয়েকটি অসামান্য হাস্যরাত্মক ছোটগল্প। রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ব্যঙ্গকৌতুকাশ্রিত গল্পের একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে *গড্ডালিকা* (১৩৩১), *কজ্জলী* (১৩৩৫) *চমৎকারী* (১৩৪৬), *গল্প কল্প* (১৩৫৭), *নীলতারা* (১৩৬৩) প্রভৃতি অসামান্য সাহিত্যকর্ম।

বাংলা উপন্যাসের মোহন যাদুকর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর প্রথম উপন্যাস *বড় দিদি* (১৯১৩) প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির হৃদয় জয় করেন। অনেক সমালোচকের মতে, এখনো তিনি বাংলা ভাষার অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস আকারে ছোট, কিন্তু শিল্প হিসেবে অসামান্য। পর পর প্রকাশিত হয় *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পণ্ডিত মশাই* (১৯১৪), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *চন্দ্রনাথ* (১৯১৬), *বৈকুণ্ঠের উইল* (১৯১৬), *অরক্ষণীয়া* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত ১ম খণ্ড* (১৯১৭), *শ্রীকান্ত ২য় খণ্ড* (১৯১৮), *শ্রীকান্ত ৩য় খণ্ড* (১৯২৭), *শ্রীকান্ত ৪র্থ খণ্ড* (১৯৩৩), *দেবদাস* (১৯১৭), *কাশীনাথ* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *স্বামী* (১৯১৮), *দত্তা* (১৯১৮), *গৃহদাহ* (১৯২০), *বামুনের মেয়ে* (১৯২৭), *দেনাপাওনা* (১৯৩০), *পথের দাবী* (১৯২৬), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১), *বিপ্রদাস* (১৯৩৫), *শুভদা* (১৯৩৮), *শেষের পরিচয়* (১৯৩৯) প্রভৃতি। গ্রামীণ সমাজের কলহবিবাদ, স্বার্থপরতা এবং নারীর প্রতি অবিচার তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সামন্তবাদী সমাজে নারীর অমর্যাদা শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করেছে। শোষিত বঞ্চিত অথচ স্নেহময়ী বাঙালি নারীর চিত্র এঁকেছেন তিনি অসামান্য দক্ষতায় ও প্রাঞ্জল ভাষায়। সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্বের মূল্য ছিল তাঁর কাছে অধিক। তথাকথিত সতীত্বের ধারণায় তাঁর আস্থা ছিল না। "সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে নর-নারী উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে" তাঁর এ বিশ্বাস তিনি তাঁর "নারীর মূল্য" প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংস্কারমুক্ত ও উদার। শুধু নারী নয়, সমাজের নানাশ্রেণীর অবহেলিত মানুষ উঠে এসেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। *শ্রীকান্ত* সহ তাঁর অনেক উপন্যাসেই আত্মজৈবনিক

উপাদান উপস্থিত। *লালু, নরেশ, হরিলক্ষী* প্রভৃতি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস *পথের দাবী* বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সমসাময়িক ও উত্তরকালের ঔপন্যাসিকদের উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব সামান্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে যেসকল মহিলা কথাশিল্পী জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) এবং নিরূপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৭৪)। অনুরূপা দেবীর *বাক্‌দত্তা* (১৯০৮), *মা* (১৯১৪), *মহানিশা* (১৯১৩), *উল্কা* (১৯১৬), *রামগড়* (১৯১৮) সহ প্রায় পঁচিশটি উপন্যাস রয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) একজন অসামান্য ছোটগল্পকার, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে *নবীন সন্ন্যাসী* (১৯১২) এবং *রত্নদ্বীপ* (১৯১৫) সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর ছোটগল্পের সংকলন *ষোড়শী* (১৮৯৫) এবং *দেশী বিদেশী* খুবই জনপ্রিয় ছিল। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৩৮) *পঙ্কতিলক* (১৯১৯) এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের *কাজরী* (১৯১৮), *আঁধি* (১৯২০) প্রভৃতি; জলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৮) *দুঃখিনী* (১৯০৯), *চোখের জল* (১৯২১), *করিম সেক* (১৯২২), *তিনপুরুষ* (১৯২৭) প্রভৃতি; নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (১৮৮২-১৯৬৪) *অগ্নিসংস্কার* (১৯২০), *পাপের ছাপ* (১৯২২) প্রভৃতি, জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) *লঘুগুরু* (১৯২৮), *অসাধু সিদ্ধান্ত* (১৯২৯), *মহিষী* (১৯২৯), *রোমন্থন* (১৯৩১) প্রভৃতি উপন্যাসে বাঙালি হিন্দুসমাজের চিত্র আঁকা হয়েছে। জগদীশ গুপ্তের ঝোঁক ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণের দিকে।

মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) *জোহরা* (১৯১৭), মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৭৮-১৯২৫) *আনোয়ারা* (১৯১৪), *গরীবের মেয়ে* (১৯২৩) প্রভৃতি, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) বঙ্কিম-অনুকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস *তারাবাই* (১৯০৮), *নূরউদ্দীন, ফিরোজা বেগম* এবং *রায় নন্দিনী* (১৯২৮) এবং কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *আবদুল্লাহ* (১৯৩৩) প্রভৃতিতে মুসলমান সমাজের চিত্র পাওয়া যায়, তবে তাঁদের চরিত্রচিত্রণ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত নয়। মূলত কবি হলেও শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) অনেকগুলো গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এস,ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) কিছুটা প্রমথ চৌধুরী দ্বারা প্রভাবিত, তবে তাঁর ভাষা বলিষ্ঠ। তাঁর *দরবেশের দোয়া, মাশুকের দরবার, বাদশাহী গল্প, ইরান-তুরাণের গল্প* (১৩৫১) প্রভৃতি প্রশংসিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষার প্রধান এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। ছোটগল্পকার হিসেবেই সাহিত্যের জগতে তাঁর আবির্ভাব। আদর্শ গদ্যলেখক তিনি নন, তবে তাঁর গদ্যও নিজস্বচিহ্নিত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ব্যথার দান* (১৯২২) তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থও বটে। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *রিক্তের বেদন* (১৯২৪)-এ সংকলিত হয়েছে আটটি গল্প, এবং তৃতীয়

এবং শেষ গল্পগ্রন্থ *শিউলি মালায়* (১৯৩১) রয়েছে চারটি গল্প। তাঁর বিদ্রোহীসত্তা মাঝেমাঝে ঝল্‌সে উঠলেও গল্পকার হিসেবে তিনি রোম্যান্টিক শিল্পী। নজরুল ইসলামের উপন্যাস মাত্র তিনটি : *বাঁধন হারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০) এবং *কুহেলিকা* (১৯৩১)। *বাঁধন হারা* বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। কবির বিদ্রোহীসত্তার প্রকাশ ঘটেছিল এই উপন্যাসে। *মৃত্যুক্ষুধা* এবং *কুহেলিকা*-য় আংশিকভাবে হলেও সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। *মৃত্যুক্ষুধা*-য় তিনি দেখিয়েছেন ক্ষুধার্ত মানুষের পরিণতি—ক্ষুধার কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস পরাজিত। *কুহেলিকার* বিষয়বস্তু উগ্রপন্থী রাজনীতি, যার প্রচলিত নাম সন্ত্রাসবাদ। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *চার অধ্যায়*-এ উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রতি যেমনটি নেতিবাচকভাবে কটাক্ষ করেছেন, নজরুল তা করেন নি। রাজনীতিতে ওই পথটির সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে *কুহিলিকা*-য়।

৪.

বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত সম্প্রসারিত করতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় কীর্তি। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) কর্তৃক চলচ্চিত্রায়নের পর এবং ইংরেজিসহ কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষায় অনুদিত হবার পর বহির্বিশ্বে এটি বাংলা উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। *পথের পাঁচালী*-র নায়ক অপু প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠা এক অসামান্য বালক এবং "বয়স বাড়লেও অপু বালকই থেকে যায়"। এটি একটি মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস, বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বাস্তবচিত্র।

বিভূতিভূষণের ৫০টি গ্রন্থের মধ্যে ১৭টি উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে *অপরাজিতা* (১৯৩২), *আদর্শ হিন্দু হোটেল* (১৯৪১), *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৮), *আরণ্যক* (১৯৩৮), *দেবযান* (১৯৪৪) এবং *ইছামতি* (১৯৫০) বাংলা উপন্যাসের অমূল্য সম্পদ। কিছু অসামান্য ছোটগল্পও তিনি লিখেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মেঘমল্লার* (১৯৩৮), *মৌরীফুল* (১৯৩২), *যাত্রাবদল* ১৯৩৮), *কিন্নরদল* (১৯৩৮) *জন্ম ও মৃত্যু* (১৯৩৭) এবং *মুখোস ও মুখশ্রী* (১৯৪৭)। বিভূতিভূষণের রচনার শৈলী এবং বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের থেকে স্বতন্ত্র। গ্রামবাংলার নিসর্গ বর্ণনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি একজন সমাজসজ্ঞান রোম্যান্টিক কথাশিল্পী।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৯৭) হলেন আর একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *নীলাঙ্গুরীয়* (১৯৫২), *কাঞ্চন মূল্য* (১৯৫৭) এবং *নবসন্ন্যাস* (১৯৪৯)। তাঁর *রাণুর প্রথম ভাগ* (১৯৩৮) এবং *রাণুর দ্বিতীয় ভাগ* (১৯৪০) অসামান্য জনপ্রিয় গল্পসংকলন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বঙ্গের বীরভূমের অধিবাসী। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বীরভূমের জীবন ও নিসর্গ। তাঁর প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণী* (১৯২৮) একটি সফল 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসেবে পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়। তবে এতে শুধু অঞ্চলের চিত্র নয়, চিরকালের মানবজীবনের কথাও বলা হয়েছে। ভারত-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *কবি* (১৯৪২), *গণদেবতা* (১৯৪২), *পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৩) এবং *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭)। সুখপাঠ্য এ সকল উপন্যাসে ঔপনিবেশিক ও সামন্তবাদী সমাজের প্রাঞ্জল চিত্র আঁকা হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের ও অন্যান্য গ্রন্থের সংখ্যা ১৩৭। তারাশঙ্কর ছিলেন একজন গান্ধীবাদী, সুতরাং সংস্কারপন্থী। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের বাংলার গ্রাম, প্রজা ও রায়তের সম্পর্ক, গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবিকার সন্ধানে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে গমন প্রভৃতি তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শুধু বাংলাভাষী নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় এবং আধা-উপজাতীয় মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখও তাঁর লেখার উপজীব্য।

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে গণমুখী এবং বহুপ্রসূ কথাশিল্পীদের অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন :

> Manik Bandyopadhyay with his first four or five volumes convinced us that he was about the most completely equipped writer in fiction we had ever had. We saw in him the froth subside, the passion of youth controlled by a marvelous maturity, the boldness of a rebel balanced by an artist's sense of proportion.[৭]

মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা মানিকের প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫)-তে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *জননী*। তাঁর অমর সৃষ্টি *পদ্মানদীর মাঝি* এবং *পুতুল নাচের ইতিকথা* ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। পদ্মানদীর জেলেদের কঠোর সংগ্রামী জীবন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে *পদ্মানদীর মাঝি*-তে; তা ছাড়া এ উপন্যাসে নরনারীর আদিম প্রবৃত্তিও তুলে ধরেছেন কথাশিল্পী। *পুতুল নাচের ইতিকথার* পটভূমি একটি অখ্যাত নিভৃত গ্রাম গাওদিয়া, কিন্তু এই উপন্যাসের আবেদন বিশ্বজনীন।

১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশক ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়। জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী আন্দোলন এই সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। তিনি ছিলেন বামপন্থী বলয়ের শিল্পী এবং অবিচল মার্ক্সবাদী। অনেক বাস্তববাদী শিল্পীর মতো জীবনের ও সমাজের শুধু উপরিভাগ তিনি তুলে ধরেন না, চরিত্রগুলোর অন্তরজীবন উদঘাটন করতে চান তিনি। পাপবিদ্ধ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দুঃসহ জীবন তিনি শুধু আঁকেন না,

৭. An Acre of Gveen Grass, Calcutta, 1982, 94-95.

তাদের যৌন প্রবণতাও তুলে ধরেন। *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬) এবং *অমৃতস্যপুত্র* (১৯৩৮) উপন্যাসে তিনি শহরের মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রিত করেছেন। *শহরতলী*-তে (দুই খণ্ড ১৯৪০, ১৯৪১) শিল্পাঞ্চলের দরিদ্র বস্তির ক্লেদাক্ত জীবন নিয়ে এসেছেন।

মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় শোষিত-বঞ্চিত সর্বহারাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর রচনায়। এজন্যে তাঁর শেষের দিকের লেখায় শৈল্পিক নির্লিপ্ততা কম—অনেকটা যেন প্রচারধর্মী। *চিহ্ন* (১৯৪৭) উপন্যাস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। অনেকগুলো অসামান্য ছোটগল্পও রয়েছে তাঁর, যেমন 'প্রাগৈতিহাসিক', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'আপিম' প্রভৃতি।

বনফুল নামেই প্রধানত পরিচিত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯) তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রচুর উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *তৃণখণ্ড* (১৯৩৫), *বৈতরণী তীরে* (১৯৩১), *কিছুক্ষণ* (১৯৩৭), *দ্বৈরথ* (১৯৩৭), *মন্ত্রমুগ্ধ* (১৯৩৮), *নির্মোক* (১৯৪০), *রাত্রি* (১৯৪১), *সে ও আমি* (১৯৪২), *জঙ্গম* (চার খণ্ড ১৯৪৩-৪৫), *অগ্নি* (১৯৪৬) এবং *ডানা* (তিন খণ্ড ১৯৪৮-৫৫)। তাঁর ছোটগল্পের আকার খুবই ছোট এবং সংহত।

৪৭-পূর্ব খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৪-১৯৬১), শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০১-?), আশালতা দেবী (?), গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৫৭), মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৮০), অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) প্রমুখ প্রধান।

মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়ার *নমিতা* (১৯১৮), *অভিশপ্ত সাধনা* (১৯২৭), *জন্ম অভিশপ্তা* (১৯২১) প্রভৃতি, আশাপূর্ণা দেবীর *প্রেম ও প্রয়োজন* (১৯৪৪), *অনির্বাণ* (১৯৪৫), *বলবার মত* (১৯৪৭) প্রভৃতি এবং আশালতা দেবীর *অন্ধকারের অন্তরেতে* (১৯২৫), *বিরহের অন্তরালে* (১৯৩৪), *দীপালী* (১৯৩২) *দুরন্ত যৌবন* (১৯৩৯), *জীবনের যাত্রাপথে* (১৯৩০) প্রভৃতি এবং প্রভাবতী দেবীর *অন্ধা* (১৯২১), *স্নেহের মূল্য, পথের শেষে* প্রভৃতি পরিচিতি লাভ করেছিল। তাঁদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী অনেক বেশি শক্তিশালী। শতাব্দীর প্রথমার্ধের মহিলা কথাশিল্পীদের মধ্যে মননশীলতা অনুপস্থিত, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার না করলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

মনোজ বসুর *ভুলি নাই* (১৯৪৩), *জলজঙ্গল* (১৯৫১) প্রভৃতি উপন্যাস এবং ছোটগল্প-সংকলন *বনমর্মর* (১৯৩২), প্রবোধকুমার সান্যালের *প্রিয় বান্ধবী* (১৯৩৩), *অগ্রগামী* (১৯৩৬), ভ্রমণকাহিনী *মহাপ্রস্থানের পথে* (১৯৩৩), *রাশিয়ার ডায়েরী* প্রভৃতি, প্রমথনাথ বিশীর *জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার* (১৯৩৮), *কোপবতী* (১৯৪১), *পদ্মা* (১৯৫৩), *কেরী সাহেবের মুন্সী* (১৯৫৮) প্রভৃতি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *বেদে* (১৯২৯), *কাকজ্যোৎস্না* (১৩৩৫), *বিবাহের চেয়ে বড়* (১৯৩৮), *প্রাচীর ও প্রান্তর* (১৯৩৯) প্রভৃতি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের *পাঁক* (১৯২৬), *মিছিল* (১৯৩৩) প্রভৃতি, এবং বুদ্ধদেব বসুর *যবনিকা পতন* (১৯৩২), *যে দিন ফুটলো কমল* (১৯৩৩), *ধূসর গোধূলি* (১৯৩৩), *একদা তুমি প্রিয়ে* (১৯৩৩), *সূর্যমুখী* (১৯৩৪), *বাসরঘর* (১৯৩৫), *কালো হাওয়া* (১৯৪২) প্রভৃতি রোম্যান্টিক উপন্যাস হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে প্রেমেন্দ্রের *পাঁক* সমাজসচেতন উপাখ্যানও বটে এবং *মিছিল* রাজনৈতিক উপন্যাস।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ১৯৩০-এর দশকের রোম্যান্টিক লেখকগণ ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে 'নতুন সাহিত্য' সৃষ্টি করবেন। তাঁদের মুখপত্র ছিল 'কল্লোল' পত্রিকা (১৯২৩-২৯)। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। উনিশ শতকের শেষ প্রজন্মের ফরাসী আধুনিক লেখকদের দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হন। তাঁদের অবদানের জন্য তাঁরা ঐতিহাসিক কারণেই শুধু বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হবেন। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রই ছিলেন অনেকাংশে বাস্তববাদী। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যসাহিত্যের দ্বারা পুষ্টি অর্জন করেছিলেন। পক্ষান্তরে তিরিশের সাহিত্যিকগণ পশ্চিম দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর সহযোগীরা। আবেগতাড়িত তরুণের মতো তাঁরা একই জিনিস যেন বারবার লিখেছেন, তাঁদের উত্তরণ ঘটেছে কদাচিৎ। ভালো কিছু কবিতা ও সমালোচনা-মূলক গদ্য ছাড়া বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কথাসাহিত্যে গভীর কিছু দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

'পরিচয়' সাহিত্যগোষ্ঠীর ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫) ও *আবর্ত* (১৯৩৭) তাঁর বন্ধুদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেও পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি, যদিও তিনি ছিলেন একজন মননশীল লেখক ও শিল্পী। পক্ষান্তরে সতীনাথ ভাদুড়ী ও মনীশ ঘটক অনেক গভীর। ভাদুড়ীর রাজনৈতিক উপন্যাস *জাগরী* (১৯৪৬) ১৯৪২-এর 'আগস্ট আন্দোলনে'র পটভূমিতে রচিত। নায়ক বিলু একজন কংগ্রেসী সমাজবাদী কর্মী। তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসি কার্যকর হবার রাতে কারাগারে তাঁর সঙ্গে তাঁর কংগ্রেসপন্থী পিতামাতা এবং কমিউনিষ্ট ভাই দেখা করতে যান। এই চার চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ এই উপন্যাসের উপজীব্য। জীবন যে রাজনৈতিক আদর্শ ও দলের চেয়ে বড় তাই প্রতিপন্ন হয়েছে *জাগরীতে*। প্রাকরণিক নিরীক্ষার প্রবণতা ভাদুড়ীর বৈশিষ্ট্য। তাঁর আর একটি অসামান্য কীর্তি *ঢোড়াই চরিত মানস* (দুই খণ্ড ১৯৪৯,

১৯৫১)। এটি বিহারের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার চিত্র। *গণনায়ক* (১৯৪৮) ও *চিত্রগুপ্তের* ফাইল (১৯৪৯)সহ ভাদুড়ীর উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচ এবং ছোটগল্পসংকলন সাতটি। মার্ক্সবাদী গোপাল হালদারের উপন্যাস *একদা* (১৯৩৯), *পঞ্চশরের পথ* (১৯৪৪), *তের শ পঞ্চাশ* (১৯৪৫), *ভাঙন* (১৯৪৭), *অন্যদিন* (১৯৫০) প্রভৃতি সমাজসচেতন রাজনৈতিক শিল্পকর্ম। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা বামপন্থী সংগঠনের কর্মী, যারা সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করে।

অমরেন্দ্র ঘোষ ১৯৪৭-এর পর বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিম বঙ্গে চলে যান। তাঁর কুড়িটির বেশি উপন্যাস ও শতাধিক ছোটোগল্পের মধ্যে *চর কাসেম* (১৯৪৯) জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাস করেন। পূর্ব বাংলার নদীতীরের মানুষের জীবন তাঁর লেখায় চিত্রিত হয়েছে। তাঁর আর দুটি উপন্যাস *পদ্মদীঘির বেদেনী* (১৯৪৯) এবং *ভাঙ্গছে শুধু ভাঙ্গছে* (১৯৫১)। তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীদের জীবন নিয়ে স্মরণীয় একটি উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ : *তিতাস একটি নদীর নাম*। এটি মাসিক 'মোহাম্মদী'তে ১৯৪০-এর দশকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে লেখকের অকালমৃত্যুর পর। প্রগতি লেখকসংঘের সদস্য এবং মার্ক্সবাদী লেখক সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) তরুণ বয়সে ঢাকায় ফ্যাসিবাদী শক্তির হাতে নিহত হন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁর উপন্যাস *বন্যা* প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ *সঙ্গীত ও অন্যান্য গল্প*। ১৯২০ এবং '৩০-এর দশকে বাঙালি মুসলমান মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বেগম রোকেয়া ছাড়া খ্যাতি অর্জন করেন নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, নাফিসা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন প্রমুখ। তাঁদের রচনা উন্নত না হলেও তাঁদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। তাঁরা মুসলমান সমাজের ছবি আঁকতে চেয়েছেন।

৫.

বিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে বহু পণ্ডিত আজীবন গভীর সাধনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) এ ক্ষেত্রে করেছেন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অসংখ্য মূল্যবান ও মৌলিক প্রবন্ধের বাইরে এ বিষয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ *হাজার বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* (১৯১৬)। অবশ্য তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি অসামান্য ইতিহাস দিনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)-এর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১৯১৬)। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর *সরল বাঙ্গালা সাহিত্য*, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়* (দু'খণ্ড), *বৃহদ্বঙ্গ* (দু'খণ্ড ১৯৩৫) প্রভৃতি।

বিশিষ্ট পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল গদ্যলেখক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *প্রকৃতি* (১৩০৩), *জিজ্ঞাসা* (১৩১০), *কর্মকথা*

(১৯১৩), *বিচিত্র প্রবন্ধ* (১৯১৪), *নানা কথা* (১৯২৪) এবং *বিচিত্র জগৎ* (১৯২০)। তাঁর *চরিতকথা* (১৯১৩) বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য আত্মজীবনী। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৪-১৯৪২) হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে প্রচুর লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে *গীতায় ঈশ্বরবাদ* (১৩১২), *উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব* (১৩১৮), *বেদান্ত পরিচয়* (১৩৩১), *কর্মবাদ ও জন্মান্তর* (১৩৩২), *যাজ্ঞবল্কের অদ্বৈতবাদ* (১৩৪৩), *প্রেমধর্ম* (১৩৪৫) এবং *উপনিষদে জড় ও জীবতত্ত্ব* (১৩৫৯)।

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) এবং প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) রবীন্দ্রনাথের দু'ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা। ক্ষিতিমোহন দর্শনের দুর্বোধ্য বিষয় সহজ ভাষায় লিখেছেন। তাঁর চারখণ্ড *কবীর* (১৯১৭), *ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা* (১৯৩০), *দাদু* (১৯৩৫), *ভারতের সংস্কৃতি* (১৯৪৩), *বাংলার সাধনা* (১৯৪৫), *জাতিভেদ* (১৯৪৬), *যুগগুরু রামমোহন* (১৯৫১) প্রভৃতি মূল্যমান গ্রন্থ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও অসাম্প্রদায়িক। প্রবোধচন্দ্র একজন বিশিষ্ট ছন্দোবিশেষজ্ঞ। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ* (১৯৪৭), *ছন্দ পরিক্রমা* (১৯৬৭), *ছন্দ জিজ্ঞাসা* (১৯৭৪), *বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্রমবিকাশ* (১৩৮৫), *ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ* (১৩৬৯) এবং *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা* (১৩৬৮)।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) একজন নিবেদিত সাহিত্য-গবেষক, যিনি অবহেলিত মুসলমান পুঁথি-লেখকদের সম্পর্কে অবিস্মরণীয় কাজ করেছেন। বহু পুঁথির কবিদের সম্পর্কে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রয়েছে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ। তাঁর *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য* (মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে ১৯৩৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি অসামান্য গ্রন্থ।

ভাষাবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাজের পরিমাণ অল্প হলেও তা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর *ভাষাতত্ত্ব* (১৯০৯) এবং *বাংলা ভাষা পরিচয়* (১৯৩৯) অসামান্য মৌলিকতার কারণেও। তবে বাংলা ভাষার দু'জন ভাষাবিজ্ঞানী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮০-১৯৬৯) এ বিষয়ে অবদান অনেক বিস্তৃত। চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* (১৯২৯)-য় বাংলাভাষার বিস্তৃত পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতা সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯০) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

> From the day when *Origin and Development of the Bengali Language* was published (1926) Sumiti Kumar Chatterjie was recognised as the leading Indian in the subject of Indian Linguistics…[৮]

---

৮. Scholar and Virtroso, Sukumar Sen, Salitya Akademi, New Delhi 1980, 30.

শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আর একজন সমকালীন সাহিত্যের ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

> "he occupies a pre-eminent place among the philologists of Indo-Pakistan sub-continent. Particularly his contributions to the historical aspect of Bengali philology is not only monumental, but also original in many respect.[৯]

মুহাম্মদ এনামুল হকের *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (১৯৫৭), *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য* (১৯৫৭) এবং *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস তাঁর অধ্যয়নের বিষয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষ ও তার বাইরের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধানে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী : "I feel a strong attachment to the study of cultural history of the Muslim, both in India and outside."[১০]

প্রাক-আধুনিক যুগের ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কেই শুধু নয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদ কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও কুড়ি শতকে ব্যাপক কাজ হয়েছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়াও প্রধান প্রায় সকল লেখক সম্পর্কে হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) লিখেছেন চার খন্ড *রবীন্দ্র-জীবনী,* যা বসওয়েলের' *জনসন*-এর সঙ্গে তুলনীয়। কথাশিল্পী ও সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)-এর *রবি-রশ্মি*, প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১-১৯৮৫) *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ* (দুই খন্ড), *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* (দুই খন্ড) এবং *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প* রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

৬.

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের প্রধান কবিদের সকলেই সমালোচকও। পাশ্চাত্যসাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এই কবি-সমালোচকগণ আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

---

৯. Muhammad Shahidullah Felicitation Volume-Edited by Muhammad Enamul Haq, Asiatic Society of Pakistan, 1966, Dhaka, XVI.

১০. A History of Sufism in Bengal, Muhammed Enamul Haq, Asiatic Society of Bangladesh, 1975, Preface-v.

তাঁর *কবিতার কথা* (১৯৫৬) প্রবন্ধগ্রন্থে আধুনিক কবিতার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময় লিখিত ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, কিন্তু গ্রন্থভুক্ত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬১) রয়েছে দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ: *স্বগত* (১৯৩৮) এবং *কুলায় ও কালপুরুষ* (১৯৫৮)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কিছু বিষয় এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিত্রকলা তাঁর আগ্রহের এলাকা। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে সার্থক নন, কিন্তু সমালোচক হিসেবে তিনি অসামান্য। তাঁর সাহিত্যসমালোচনা ও আলোচনামূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে—*হঠাৎ আলোর ঝলকানি* (১৯৩৫), *উত্তর তিরিশ* (১৯৪৫), *কালের পুতুল* (১৯৪৬), *রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য* (১৯৫৫), *স্বদেশ ও সংস্কৃতি* (১৯৫৭), *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৩), *প্রবন্ধ সংকলন* (১৯৬৬) এবং *কবি রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৬)। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮১) তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে *রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এলোমেলা জীবন ও শিল্পসাহিত্য* এবং *মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা* প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ে যাঁরা লিখেছেন কাজী আবদুল অদুদ তাঁদের অন্যতম। তাঁর *রবীন্দ্র কাব্য নাট্য* (১৯২৮) *সন্ধ্যা-সংগীত* থেকে *পলাতকা* পর্যন্ত সকল কবিতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আর একটি গ্রন্থ *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬২)। কবির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিশীল ও স্পষ্টবাদী। *নজরুল প্রতিভা* (১৯৪৯) তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক লেখকদের মধ্যে আরো যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯), অরবিন্দ পোদ্দার (১৯২০), দীপ্তি ত্রিপাঠী (?), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (?), আজহার উদ্দিন খান (১৯৩০-), অমলেন্দু বসু (১৯১২-১৯৯১) প্রমুখ। তবে সকলের মধ্যে সবচেয়ে দীপ্তিমান আবু সয়ীদ আইয়ুব। তাঁর প্রধান বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৯) রবীন্দ্রকাব্যবিশ্লেষণমূলক গ্রন্থের মধ্যে অনন্যসাধারণ। আধুনিক কবিতা ও উপন্যাস সম্পর্কে ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে খ্যাত অখ্যাত সমালোচকদের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা দুই বাংলায় অসংখ্য। তারমধ্যে মূল্যবান গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক।

৭.

আত্মজীবনী, জীবনী ও স্মৃতিকথা বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট জায়গা অধিকার করে আছে। উনিশ শতকের মহান গদ্যশিল্পী মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)- এর আত্মজীবনী *আমার জীবন* ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। *আমার জীবন* এবং তাঁর আর একটি আত্মজৈবনিক রচনা *বিবি কুলসুম* ((১৯১০) উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ নয়, তবে তাতে লেখ সম্পর্কেই শুদু জানা যায় না, তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের একটি চিত্রও পাওয়া যায়। ধর্ম ও সমাজসংস্কারক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৮৪৭-১৯১৯) লিখেছেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ : *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৪) এবং *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র* (১৯১০)। এ দুটি গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন তিনজন মহৎ বাঙালির জীবন, তাঁরা হলেন শিক্ষাব্রতী রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এবং কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুসমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের কর্ম ও রচনায় অনেক কল্যাণ সাধন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী *আত্মচরিত* (১৯১৮) তাঁর জীবন ও সময়ের একটি উজ্জ্বল দলিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) তাঁর 'সাহিত্য সাধক রচিতমালা' সিরিজে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রণয়ন করেছেন। অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য তাঁর খ্যাতি। বাংলাদেশের নাটক ও মঞ্চের ইতিবৃত্ত তাঁর *বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস* (১৯৩৪)। *বাঙ্গালা সাময়িক পত্র* (১৯৪০) তাঁর একটি অসামান্য গ্রন্থ, এতে বাংলা সাময়িকপত্র ও সাময়িকীর পরিচয় দেয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* (১৯১২) এবং *ছেলেবেলা* (১৯৪০), প্রমথ চৌধুরীর *আত্মচরিত* (১৯৪২) এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আপন কথা* (১৯৪৬) অসামান্য গ্রন্থ। তথ্যের চেয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে গ্রন্থগুলোয়। জসীম উদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) গদ্য সাধুরীতির তবে তা স্বাদু। তাঁর *জীবনকথা, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* এবং *যাঁদের দেখেছি* তথ্যসমৃদ্ধ অথচ সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা। কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)-এর *কাজী নজরুল প্রসঙ্গে* (১৯৫৯), *আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের সাথী* (১৯৬৬) এবং *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ* (১৯৬৯) তথ্যসমৃদ্ধ স্মৃতিচারণ।

বিশ শতকে বাংলা ভাষায় অসংখ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে, তবে তার অধিকাংশই উচুঁমানের সাহিত্য হয়ে উঠে নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপরিব্রাজক। তাঁর বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে কয়েকটি মূল্যবান ভ্রমণকাহিনীতে। তথ্যে ভারাক্রান্ত নয় তাঁর রচনা, তিনি প্রধানত ব্যক্ত করেছেন তাঁর অনুভূতি। তাঁর প্রথম গ্রন্থই ভ্রমণকাহিনী *য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র*, উনিশ শতকে প্রকাশিত। এই শতকে বেরিয়েছে তাঁর *জাপানযাত্রী* (১৯১৯), *যাত্রী* (১৯২৯), *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩১) এবং *জাপানে ও পারস্যে* (১৯৩৬)।

জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৬) লিখেছেন কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী : *প্রবাসচিত্র* (১৯০১), *হিমালয়* (১৯০২), *হিমালয় বক্ষে* (১৯০৫), *হিমাদ্রী* (১৯১৩), *মধ্যভারত* (১৯৩০) এবং *আমার ইউরোপ ভ্রমণ* (১৯১৫)। জসীম উদ্দীন লিখেছেন কয়েকটি ভ্রমণগ্রন্থ, যেমন *চলে মুসাফির* এবং *যে দেশে মানুষ বড়*। সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)-র *দেশে-বিদেশে* (১৯৪০) বাংলাভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় ভ্রমণবৃত্তান্ত। বহু

ভাষাবিদ এই পণ্ডিত ও কথাশিল্পীর রয়েছে আরো দুটি ভ্রমণকাহিনী : *জলে ডাঙ্গায়* (১৯৫৭) এবং *ভবঘুরে ও অন্যান্য* (১৯৬২)। বুদ্ধদেব বসুর *সব পেয়েছির দেশে* (১৯৪১) এবং *জাপানি জার্নাল* (১৯৬২) সাহিত্যরসসমৃদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪) রয়েছে কয়েকটি ভ্রমণগ্রন্থ, তারমধ্যে *পথে প্রবাসে* (১৯৩১) উল্লেখযোগ্য। ইব্রাহীম খাঁর (১৮৯৪-১৯৭৮) *ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র*, ইবনে ইমামের *জলেস্থলে*; জহুরুল হকের (১৯২২-১৯৯৮) *সাত সাঁতার* (১৯৫৭), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯-এর *বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী।

৮.

উনিশ শতকে শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানসম্প্রদায় উচু শ্রেণীর হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে। এমনকি ইংরেজিকে সরকারি ভাষা ঘোষণার আগে থেকেই হিন্দুরা শাসকদের ভাষা ইংরেজি রপ্ত করতে থাকেন। তাতে তাদের শুধু যে চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধা হয় তাই নয়, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে যেতে থাকেন। বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষা বর্জনের সিদ্ধান্তে মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে অন্তত অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে পড়ে।

উনিশ শতক মুসলমানদের জন্য ছিল কঠিন সময়। তারা ওই শতকের শেষ দিকে অথবা কুড়ি শতকের প্রথম দিকে এসে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা অনুধাবন করতে থাকে। বিশেষ করে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরোজা কিছুটা উন্মুক্ত হয়। পাশ্চাত্যশিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মুসলমান লেখকরা কোনো সৃষ্টিশীল মহৎসাহিত্য সৃষ্টিতে অসামান্য অবদান রাখতে না পারলেও চিন্তামূলক প্রবন্ধসাহিত্যে কুড়ি শতকের প্রথম দিকের মুসলমান লেখকদের অবদান সামান্য নয়। বিশেষ করে আর্থসামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁরা প্রচুর লিখেছেন, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের অবদান স্বীকার করতেই হবে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বেশ কিছুসংখ্যক শক্তিমান মুসলমান লেখক, সমাজসংস্কারক ও বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), রেয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮), মুন্শী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহম্মদ (১৮৬২-১৯৩৩), মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯০৫), মুন্শী মোহাম্মদ জমির উদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), সৈয়দ এমদাদ আলী ৯১৮৮০-১৯৫৬), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) এবং মুহম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৭৭-১৯৬৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচনার মান তাঁদের হিন্দু সমসাময়িকদের মতো উঁচু নয়, কিন্তু তাঁরা তাঁদের লেখায় সন্দেহাতীতভাবে

মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা এবং দেশপ্রেমের চেতনায় তাঁরা উজ্জীবিত ছিলেন। তাঁদের প্রায় সকলেরই রচনার প্রধান বিষয় ছিল ইসলাম,মুসলমান সমাজ এবং মুসলিম জগৎ। ইসলাম হয়ে উঠে তাঁদের একটি প্রেরণার উৎস। তাঁরা বঙ্কিম প্রমুখ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাবিত 'হিন্দু জাতীয়তা'র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উনিশ শতকের শেষ দিকের মুসলমান লেখকদের লড়াই করতে হয়েছে দুই ফ্রন্টে : হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রচারিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, এবং খৃস্টান ঔপনিবেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত খৃস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে। তা করতে গিয়ে লেখার বক্তব্যের উপর তাঁরা যতো জোর দিয়েছেন লেখার সাহিত্যেগুণের উপর ততোটা নয়। তাঁদের রচনা পরিমার্জিত নয়, আড়ষ্ট। এই সকল উত্তেজক লেখকদের চিন্তায়ও ছিল গলদ। তাঁরা তাঁদের জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটির মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন। তাঁরা বাঙালি, নাকি বাঙালি মুসলমান, নাকি শুধু মুসলমান সে-প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর তাঁদের রচনায় অনুপস্থিত। ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরা তাঁদের অবহেলা করে ঠেলে দিয়েছিল দূরে, তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় সরে গেল তাঁদের থেকে আরো খানিকটা দূরে। তাতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তায় ও কর্মে দূরত্ব না কমে বরং বাড়তে থাকে। তাঁদের অস্বচ্ছ চিন্তাধারায় মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ প্রভাবিত হয় এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাঙালি জাতির সংহতি। হিন্দুরাও মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যে কোনোরকম আগ্রহ প্রকাশ না করায় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হয়ে উঠে।

শুরু থেকেই হিন্দু লেখকরা যেমন সমকালীন বিষয়ের সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়েও প্রচুর লিখেছেন, সম্ভবত তাঁদের অনুকরণে মুসলমান লেখকরাও ইসলাম ধর্ম ও প্রাচীন মুসলিম সভ্যতা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে চেষ্টা করেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয়ের অনেকটাই অধিকার করে থাকে ইসলাম ও মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সভ্যতা, ইসলামের মহাপুরুষদের জীবন ও চিন্তাধারা অর্থাৎ মুসলমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা। ইসলামের মহাপুরুষদের এবং মুসলমান সাধুসন্তদের জীবনও তাঁরা বাংলাভাষায় লিখতে থাকেন। সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য অতি সামান্য, তবে তার ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নয়। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অনেকগুলি জীবনী প্রকাশিত হয় শতাব্দের প্রথম তিন চার দশকে। রেয়াজউদ্দিন আহমদের *হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিত* (১৯৩৭), মোহাম্মদ আকরম খাঁর *মোস্তফা চরিত* (১৯২৫), গোলাম মোস্তফার *বিশ্বনবী* (১৯৪২), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৭-১৯৬৪) *মরুভাস্কর* (১৯৪১), এয়াকুব আলি চৌধুরীর (১৮৮৭-১৯৩৮) *মানব মুকুট* (১৯১৬) এবং *নূরনবী* (১৯২৯) এবং মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর (১৮৯৮-১৯৭৫) '*নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ* (১৯৫০) সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান এবং এ সকল জীবনী খুবই জনপ্রিয় হয়। বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু লেখকও হযরত মুহম্মদের জীবনী প্রণয়ন করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৯১০), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) এবং রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭)।

গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে ১৯৪৭-পূর্ব মুসলমান লেখকদের অবদান অনুল্লেখযোগ্য। তা সত্ত্বেও সমকালে যাঁরা কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতিউর রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৯), শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কাজী আবদুল অদুদ (১৮৯৪-১৯৭৪), মাহবুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) এবং হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। এই সকল লেখকের রচনাবলিতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানপ্রধান গ্রামীণ সমাজের চিত্র পাওয়া যায়, তবে তা যথেষ্ট শিল্পিতভাবে পরিবেশিত হয় নি। আগেই উল্লেখিত কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* উপন্যাসে মুসলমানসমাজের আশরাফ-আতরাফ প্রসঙ্গ এবং উঠতি বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে।

জসীম উদ্দিন কবিতায় যেমন, তেমনি তিনি তাঁর সকল মাধ্যমেই গ্রামীণ জীবনের প্রাঞ্জল চিত্র আঁকবার প্রয়াস পেয়েছেন। গল্প-উপন্যাস তিনিও লিখেছেন। তাঁর *বোবা কাহিনী* সাধু ভাষায় রচিত, কিন্তু তাতে সহজভাবে প্রকাশ ঘটেছে পল্লীর কৃষিজীবী মানুষের অবিকৃত জীবন। মূলত প্রবন্ধকার লুৎফর রহমানের উপন্যাসগুলির নাম *বাসর উপহার*, *প্রীতি উপহার* এবং *রায়হান*। তিনি ছিলেন নীতিবাগীশ, উপন্যাসেও তিনি উচ্চ আদর্শ দ্বারা পাঠককে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। রোম্যান্টিক কবি শাহাদৎ হোসেন এক ডজনের বেশি উপন্যাস লিখেছেন, তবে কোনোটিই মানসম্মত নয়। আবদুল অদুদ তাঁর ছোটগল্প সংকলন *মীর পরিবার* (১৯১৯)-এর পরে উপন্যাস *নদীবক্ষে* (১৯২০)-তে চর এলাকার মানুষের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হুমায়ুন কবির-এর উপন্যাস *নদী ও নারী* (১৯৪২) পদ্মানদীতীরবর্তী মানুষের উপাখ্যান। মাহবুব উল আলমের *মোমেনের জবানবন্দী* (১৯৪৬) একটি আত্মজৈবনিক নক্শাধর্মী উপন্যাস, যেখানে নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৮০)-এর উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *সত্যমিথ্যা* (১৯৫৩) এবং *জীবন-ক্ষুধা* (১৯৫৫)। তিনি একজন অসামান্য ব্যঙ্গগল্পের লেখক। তাঁর ব্যঙ্গগল্পসংকলনগুলোর মধ্যে রয়েছে *আয়না* (১৯৩৫), *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৫), *আসমানী পর্দা* (১৯৫৭) এবং *গালিভারের সফরনামা* (১৯৫৯)। তাঁর গল্পে তিনি রাজনীতিক ও সামাজিক ভণ্ডামির সমালোচনা করেছেন। আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) উপন্যাস *চৌচির* (১৯৩৪), *সাহসিকা* (১৯৪৬), *জীবন পথের যাত্রী* (১৯৪৮) এবং *'আয়েশা* (১৯৫১) প্রচারধর্মী বক্তব্যে আড়ষ্ট। সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তিনি কথাশিল্পী হিসেবে সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি।

৯.

১৯২৬-এর জুনে কয়েকজন তরুণ লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংগঠনের পত্তন করেন। বাণিজ্য বিভাগের তরুণ অধ্যাপক আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। এই

সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'শিখা', সেই সূত্রে এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা 'শিখা গোষ্ঠী'র লেখক রূপে পরিচিত হন। সাহিত্য সমাজের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। তাঁরা ঘোষণা করেন : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মধ্যে ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল অদুদ, কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-৫৬), আবুল ফজল এবং আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)। তাঁরা সকলেই ছিলেন মূলত শক্তিশালী গদ্যলেখক। প্রথম পর্যায়ে সংগঠনটির সঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) যুক্ত ছিলেন, তবে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি প্যারিস চলে গেলে সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আবুল হুসেনের বক্তব্য :

> "আমাদের [বাঙালি মুসলমান সমাজের] যুগ যুগান্তরের আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানের অদম্য পিপাসা জাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা তো রাতারাতি হওয়া অসম্ভব। · · · এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোজন সাধন।"[১১]

সম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী এবং ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি জাতির ঐক্যে বিশ্বাসী আবুল হুসেন এই নিবন্ধে আরো বলেন :

> "কেহ হয়তো মনে করবেন এ সমাজের নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হওয়ায় হিন্দু সাহিত্যিকগণের কোন সম্পর্ক এতে নাই। কিন্তু এই বার্ষিক রিপোর্ট হতে আপনারা বুঝবেন যে এ-সমাজ কোন একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিংবা এ কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয় নাই। সাহিত্য সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য; আর সেই সাহিত্যে মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।"

মুসলিম সাহিত্য সমাজ এক যুগ টিকে থাকলেও প্রথম পাঁচ বছরই এই সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সংগঠনের উদ্যোগে অনেকগুলি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে হিন্দু-মুসলমান প্রগতিশীল সাহিত্যিকগণ সমাজ ও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হয় এইসব সম্মেলনে। প্রগতিশীল মুসলমান তরুণদের মধ্যে এই সংগঠন যতোই জনপ্রিয় হতে থাকে, ঢাকার রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতারা ততোই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। বিশেষ করে আবুল হুসেনের ধর্মসংক্রান্ত উদার সংস্কারমূলক চিন্তাধারায় তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তাফা দেন এবং স্বাধীন মত প্রকাশ সম্ভব নয় বলে ঘোষণা দিয়ে লেখালেখি বন্ধ রাখেন।

---

১১. বার্ষিক বিবরণী, *শিখা*, প্রথম বর্ষ. চৈত্র ১৩৩৩, ২১-২২।

ইংরেজি এবং বাংলা দু'ভাষাতেই আবুল হুসেন লিখেছেন। জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর তিনটি ছোট প্রবন্ধের বই। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অথচ অগ্রন্থিত তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ছোটগল্প প্রভৃতির সমন্বয়ে তাঁর ভাবশিষ্য আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *আবুল হুসেন রচনাবলী* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ অব্দে। তাঁর দুটি ছোট বই *বাংলার বলশী* (১৩৩২) এবং *বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা* (১৩৩৫) অসামান্য কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা পড়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেন : It has seldom been my lot to come across such a valuable brochure." বাঙালি মুসলমানের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনীহার সমালোচনা করে ১৯২০-এর দশকে তিনি বলেন :

> আমাদের শিক্ষা নাই—আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন হতে বিরোধ ক'রে বসেছি এবং দর্শন, বিজ্ঞান ও আর্টকে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি—এই ভয়ে, পাছে তাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম আমাদের এতই নাজুক! ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল, আর আমরা সে আঘাতে জাগতে ত চাই-ই নাই বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইয়োরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখান করেছি—কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুন ভুলের কোন সংশোধনের চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্তমানে আমরা আরো জোর করে আঁকড়ে ধরেছি।"

ঔপনিবেশিক ও সামন্তবাদী সমাজের নিপীড়িত কৃষকের অবস্থা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে *বাংলার বলশী* পুস্তকে। তিনি রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শে কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষক কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লবের দ্বারাই কৃষকের সমস্যার সমাধান হতে পারে। *মুসলিম কালচার* (১৯২৮) ইংরেজ চিন্তাবিদ মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল রচিত একটি গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

সাহিত্য সমাজ-এরই আর এক নেতা কাজী আবদুল অদুদ ছিলেন উদার মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ। মুসলমান সমাজের অন্ধত্ব ও গোঁড়ামিকে তিনিও কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি জাতির ঐক্যে বিশ্বাস করতেন এবং ছিলেন জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধী। ১৯৪৭-এর পরে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে কলকাতায় থেকে যান। অবিচল অসাম্প্রদায়িক অদুদ সরল ভাষায় কোরআন-এরও অনুবাদ করেছেন। *হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম* (১৯৬৬) তাঁর একটি মূলবান গ্রন্থ। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অদুদের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর *নবপর্যায়* (দুই খণ্ড, ১৩৩৩, ১৩৩৬), *পথ ও বিপথ* (১৯৪৬), *বাংলার জাগরণ* (১৩৬৩), *শাশ্বত বঙ্গ* (১৩৫৮), *সমাজ ও সাহিত্য* (১৩৪১) এবং *হিন্দু-মুসলমান বিরোধ* (১৩৪২) প্রভৃতি গ্রন্থে। *কবিগুরু গ্যেটে* (দুই খণ্ড, ১৩৫৩) এবং *শরৎচন্দ্র ও তারপর* (১৯৬১) তাঁর আর দুটি মূল্যবান গ্রন্থ। কাজী মোতাহের হোসেন বহুসংখ্যক সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের লেখক।

অনেকগুলো প্রবন্ধ সংকলিত হয় তাঁর *সঞ্চয়ন* (১৯৩৭) গ্রন্থে। মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৫) একজন মননশীল প্রাবন্ধিক। তাঁর দুই খণ্ড *পারস্য প্রতিভা* (১৯৩২) ক্লাসিক্যাল ফারসি সাহিত্যের মহান নির্মাতাদের সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। *মানুষের ধর্ম* (১৯৪০) তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যও নিজস্ব-চিহ্নিত, তবে পরিশীলিত নয়। সাময়িক বিষয় নিয়েই লিখেছেন নজরুল। তাঁর তিনটি প্রবন্ধ-পুস্তক *যুগবাণী* (১৯২২), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬) এবং *রুদ্র-মঙ্গল* (১৯২৬) সমকালীন রাজনীতিকে ধারণ করে রেখেছে। সরকারবিরোধী বক্তব্যের কারণে *যুগবাণী* বৃটিশ শাসক বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৬) একটি পুস্তিকা। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত কবি আদালতে যে ঐতিহাসিক জবানবন্দী দেন সেটাই তাঁর *রাজবন্দীর জবানবন্দী*। এমন ওজস্বী ভাষায় প্রদত্ত কোনো জবানবন্দী পৃথিবীর আর কোনো ভাষার কোনো কবি শিল্পী সাহিত্যিক দিয়েছেন বলে জানা যায় না। বাংলা সাহিত্যের এ এক অমূল্য সম্পদ। শুধু আবেগ নয় তিনি যুক্তিকে অবহেলা করেন নি। এজলাশে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন :

> "আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না।... আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলন্ডই ভারতের অধীনে হ'ত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতোই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থে নীত হতেন, তা হলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িযে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।"

মোতাহের হোসেন চৌধুরী পরিমাণে লিখেছেন অল্প, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলি বাংলা গদ্যের স্থায়ী সম্পদ। জীবদ্দশায় তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি *সংস্কৃতি-কথা* (১৯৫৭) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। তাঁর আর দুটি বই *সুখ* (১৯৬৮) বারট্র্যান্ড রাসেলের *The Conquest of Happines* এর ভাবানুবাদ, এবং *সভ্যতা* (১৯৬৫) ক্লাইভ বেল-এর *Civilization*-এর অনুসরণে লেখা। মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর অন্যতম কর্মী আবুল ফজল আমৃত্যু ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বিচিত্র কথা* (১৯৪০) *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা* (১৯৬০), *সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৬৪) এবং *সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র* (১৯৬৮)। তিনি যুক্তিবাদী লেখক ও বুদ্ধিজীবী, সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসনকে তিনি সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে সকল রকম ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামিরও তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে।'

১০.

১৯৪৭-এ যখন উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে তখন বাংলাদেশও দ্বিখণ্ডিত হয় : মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলা পরিণত হয় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে, অপরদিকে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম বঙ্গ হয় ভারতের একটি প্রদেশ। বাংলা বিভাগের ফলে বাংলা

সাহিত্যের অখণ্ডতা অবিভাজ্য থাকলো না। পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের লেখকরা হলেন দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক—তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা অভিন্ন হতে পারে না। বিভাগের আগে বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। প্রধান লেখকের রচনাবলি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো। পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীও বেরোতো সেখান থেকে। ইংরেজ শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুগল আমলে প্রতিষ্ঠিত অনগ্রসর ঢাকা নগরী অবিলম্বে হয়ে উঠলো 'পাকিস্তানী বাঙালী' লেখকদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এইভাবে ১৯৪৭ বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। ১৯৪৭ থেকে পূর্ব বাংলায় সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম অর্জন করে এক স্বতন্ত্র চারিত্র ও বৈশিষ্ট্য।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ-সহ শাসকবর্গ ঘোষণা করেন যে 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। গোটা দেশের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ ছিল বাংলাভাষী। শাসকদের এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেন বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক ও ছাত্র-যুব সমাজ। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আধিপত্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ শুরু করে 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে ঃ পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র-যুবক নিহত হন। আন্দোলনটি পরিণত হয় এক অভ্যুত্থানে। বাংলা ভাষার দাবি স্বীকৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার মর্যাদা। ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের লেখক বদরুদ্দীন উমর মন্তব্য করেছেন : "ভাষা-আন্দোলন শুধু জাতির নতুন সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে নি, বরং সেটি ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। বাঙালী মুসলমান কয়েক দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে তাদের জাতীয় পরিচয় বিস্মৃত হয়েছিল। শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি তার আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার করে, তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক জীবন পূর্ব বাংলার মাটিতে নতুনভাবে সঞ্চারিত হতে শুরু করে।"[১২]

১১

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছরের পাকিস্তানী শাসন আমলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর বিপুল অধিকাংশের শিল্পমূল্য সামান্য। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে গল্প ও উপন্যাসের লেখক হিসেবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), আবু রুশদ (১৯১৯), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েন উদ্দীন (১৯২৩-১৯৮৬), রশীদ করীম (১৯২৫), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আবু ইসহাক (১৯২৬), মিন্নাত আলী (১৯২৭), জহির রায়হান

১২. Lession of February 21, *The Wave*, February 21, 1969.

(১৯৩৩-১৯৭২), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-১৯৯৮), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫), আলাউদ্দীন আল আজাদ (১৯৩৪), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৪), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), শওকত আলী (১৯৩৫), আনোয়ার পাশা (১৯৩৫-১৯৭১), হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), রাজিয়া খান (১৯৩৬), বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬) এবং হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯)। তাঁদের অনেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে তাঁদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

পূর্ব বাংলার প্রথম পর্যায়ের কথাশিল্পীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সহজ ভাষা ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ। এখানে এক জেলার উপভাষার সঙ্গে অন্য জেলার উপভাষার ব্যবধান অনেক। উচ্চারণের পার্থক্য শুধু নয়, শব্দের অর্থেও যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। বিভাগোত্তরকালের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী শওকত ওসমান চল্লিশের দশকের প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ব বঙ্গে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *জননী* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে, তবে এটি রচিত হয় "১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ -এর মধ্যে"। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত *জননী*-র উপজীব্য মুসলমানপ্রধান গ্রামের সমাজের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা। তাঁর *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) প্রথাগত প্রকরণে রচিত নয়, নিরীক্ষাধর্মী ও রূপকাশ্রয়ী। এতে শোনা যায় মানবতার জয়ধ্বনি। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *সমাগম* (১৯৬৭), *চৌরসন্ধী* (১৯৬৯) এবং *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০)। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী ছোটগল্পলেখকও। তাঁর গল্পসংগ্রহগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পিঁজরাপোল* এবং *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প* (১৯৫১)। শওকত ওসমানের অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে। শেষ পর্যায়ে অসৃষ্টিশীল গদ্য তিনি লিখেছেন প্রচুর। মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে তিনিও সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'প্রথম আধুনিক বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিক' বলে খ্যাত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গ্রন্থের সংখ্যা সীমিত, কিন্তু শিল্পগুণে অসামান্য তাঁর রচনাবলি। তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে তিনটি উপন্যাস, তিনটি ছোটো নাটক-নাটিকা এবং পঞ্চাশটির মতো ছোটগল্প। তাঁর প্রথম গ্রন্থ একটি ছোটগল্পের সংকলন *নয়নচারা* প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। ১৩৫০ সনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত কয়েকটি অসামান্য গল্প রয়েছে এই গ্রন্থে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস *লাল সালু* (১৯৪৮) ধর্মব্যবসায়ী কবলিত গ্রামীণ মুসলমান সমাজের এক বাস্তব দলিল। অজ্ঞতা, ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কার, ধর্মের নামে শাসনশোষণ প্রভৃতি এই উপন্যাসের উপজীব্য, *লাল সালু* ইংরেজি অনুবাদ *Tree Without Roots* ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-সালে। তা ছাড়া উর্দু, ফরাসী, চেক এবং জার্মান ভাষায় *লাল সালু* অনূদিত হয়েছে। যে অল্প কয়েকটি বাংলা উপন্যাস বহির্বিশ্বে পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছে 'লাল সালু' তারমধ্যে অন্যতম। প্রথাগত প্রকরণে রচিত তবে *লাল সালু*-র বিষয়বস্তু খুবই সাহসী ও আকর্ষণীয়। নায়ক মজিদ একজন ভণ্ড পীর যে বাংলাদেশের এমন একটি এলাকায় তার আস্তানা পাতে যেখানে "শিষ্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি"। মুসলমানপ্রধান সমাজে অন্ধ-বিশ্বাসকে পুঁজি করে কিভাবে ধর্মব্যবসায়ীরা তাদের ভাগ্য গড়ে তোলে সেই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। দ্বিতীয় উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪)-র কাহিনী সামান্য : একটি যুবতী নারীর হত্যাকাণ্ড এবং সেটি ঘিরে এক যুবকের মনোবিশ্লেষণ। যে ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটায় নি সে-ই মামলায় জড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় অন্ধত্বের কথা এখানেও আছে। *চাঁদের অমাবস্যা* রচনার সময় ওয়ালীউল্লাহ্ কাফকা, সার্ত্রে এবং ক্যেম্যু-র ··· অস্তিত্ববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা উপস্থিত। তাঁর *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) বাংলা ভাষার এক অপূর্ব সৃষ্টি—এর পটভূমি যেন স্থান ও কালের উর্ধ্বে। 'চেতনা প্রবাহ রীতি'তে রচিত এই উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সমাজের খণ্ড খণ্ড চিত্র চিত্রশিল্পীর দক্ষতায় অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলোয় ওয়ালীউল্লাহ্ আধুনিকতা ও অসামান্য মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর কথাশিল্পের উপজীব্য হিসেবে রশীদ করীম বেছে নিয়েছেন শহরের মধ্যবিত্ত জীবন। কলকাতার মুসলমান মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে *তাঁর উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) এবং *প্রসন্ন পাষাণ* (১৯৬৩) উপন্যাসে। কলকাতায় লেখকের জন্ম এবং সেখানেই কাটে তাঁর যৌবন পর্যন্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বেশ পরে তাঁর অগ্রজ আবু রুশদ এবং তিনি পূর্ব বঙ্গে স্থায়ীভাবে চলে আসেন।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের প্রথম দিকের উপস্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *আলমডাঙ্গার উপাখ্যান* (১৯৫৪), *কাঁশবনের কন্যা* (১৯৫৪), *জীবন-কাব্য* (১৯৫৬) এবং *কাঞ্চনমালা* (১৯৫৬)। তাঁর ছোটগল্পের সংকলনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পথ জানা নাই* (১৯৫৬), *অনেক দিনের আশা* (১৯৫৬) এবং *শাহের বানু* (১৯৫৭)। এই শতাব্দীর প্রথম শ্রেণীর বাঙালি ঔপন্যাসিকদের সমকক্ষ তিনি নন, তবে পূর্ব বাংলার নদীবহুল দক্ষিণ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন গভীর মমতায় তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন। দক্ষিণ অঞ্চলের নদীর মাঝি, ক্ষেতখামারের দরিদ্র চাষী এবং নিসর্গ উপস্থিত *কাঁশবনের কন্যা*-য়। *কাঞ্চনমালা*-র উপজীব্য বেদে-জীবন। আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৬২) উপন্যাসে অন্তেবাসী গ্রামের মানুষের ছবি পাওয়া যায়। লেখকের ভাষা খুবই অনাভরণ।

শহীদুল্লাহ্ কায়সার রাজনীতি ও সমাজসচেতন বাম বলয়ের কথাশিল্পী। তাঁর প্রথম উপন্যাস *সারেং বউ* (১৯৬২) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলার পটভূমিতে রচিত। এক প্রবাসী সারেং-এর যুবতী পত্নীর একাকীত্বের সমস্যা আঁকা হয়েছে সহজ-সরল ভাষায়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *'সংশপ্তক'* (১৯৬৮)-এর পটভূমি বিরাট—ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের মানুষ উঠে এসেছে এতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময়কালীন বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের জীবন বেছে নিয়েছেন লেখক। শিল্প হিসেবে বিশেষ সার্থক না হলেও সামাজিক দলিল হিসেবে *সংশপ্তক* মূল্যহীন নয়। পক্ষান্তরে, তাঁর সমসাময়িক আলাউদ্দীন আল আজাদের *কর্ণফুলী* (১৯৬২) এবং *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪) শিল্প হিসেবে অনেক সার্থক এবং কাহিনী সুসংবদ্ধ। *কর্ণফুলী*র পটভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা। *ক্ষুধা ও আশা* দুর্ভিক্ষকবলিত বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য, যেখানে অন্তেবাসী মানুষরা জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত। পাকিস্তান-যুগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও শওকত ওসমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী হিসেবে আল আজাদ বিবেচিত হতেন। তিনি বামবলয়ের শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০) এবং *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২) ব্যক্তিজীবনভিত্তিক এবং ১৯৩০-এর রোমান্টিক লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি অনেকগুলি ভালো ছোটগল্পের রচয়িতা। তাঁর গল্পসংকলনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *জেগে আছি* (১৯৫০), *ধানকন্যা* (১৯৫১), *মৃগনাভী* (১৯৫৪), *অন্ধকার সিঁড়ি* (১৯৫৪), *উজান তরঙ্গে* (১৯৬২) এবং *যখন সৈকত* (১৯৬৭)। নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষদের সুখ-দুঃখ তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। সৈয়দ শামসুল হক একজন রোমান্টিক শিল্পী, যিনি শহরের উঠতি মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রিত করেছেন। তিনি একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী, তবে তাঁর অধিকাংশ মূল্যবান রচনা লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনেক পরে। স্বাধীনতাপূর্ব রচনাবলির মধ্যে রয়েছে *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *অনুপম দিন* (১৯৬২) এবং *সীমানা ছাড়িয়ে* (১৯৬৪) উপন্যাসত্রয় এবং *তাস* (১৯৫৪), *শীত বিকেল* (১৯৫৯), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪) প্রভৃতি ছোটগল্প-সংগ্রহ। তাঁর ভাষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শওকত আলী গভীর সমাজসচেতন কথাশিল্পী। তাঁর প্রধান রচনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর। পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয় একটি উপন্যাস *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩) এবং একটি গল্পগ্রন্থ *উন্মূল বাসনা* (১৯৬৮)। তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের লেখাগুলোই অধিকতর গভীর এবং মানুষের সংগ্রাম ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলোয়। হাসান আজিজুল হক একজন শক্তিশালী ছোটগল্পলেখক। আলোচ্য সময়পর্বে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গ্রন্থ *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* (১৯৬৪) এবং *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* (১৯৬৭)। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো নিপুণ হাতে অঙ্কিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বামপন্থী লেখকদের নির্মিত ধারারই তিনি অন্যতম প্রতিনিধি।

১২

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আধুনিক শিক্ষিত প্রবন্ধকারদের রচনার শৈলী ও বিষয়বস্তু তাঁদের পূর্বসূরিদের থেকে স্বতন্ত্র। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায় : মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে প্রাধান্য পায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে

সমকালীন সাহিত্য বিচারের আগ্রহ প্রকাশ পায় অধিকাংশ নতুন সমালোচকদের লেখায়। ষাটের দশকের অনেক লেখক তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেন আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটে অতি দ্রুত। তাঁদের অধীত গ্রন্থাবলিই বিষয়বস্তু হয়ে উঠে তাঁদের রচনার। তাতে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শক্তিশালী প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব ঘটে।

আবদুল হকের (১৯১৮-১৯৯৭) *ক্রান্তিকাল* (১৯৬২) এবং *সাহিত্য, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ* (১৯৬৮) দুটি মূল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থ। তিনি আবুল হুসেন, কাজী আবদুল অদুদ প্রমুখ 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের চিন্তাবিদদের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিশীল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখক। মোহাম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১৯৫৪) এবং *তোষামদ ও রাজনীতির ভাষা* (১৯৬৯) এবং আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) তাঁর *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮), *সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা* (১৯৬৯) এবং *জীবনে সমাজে সাহিত্যে* (১৯৭০)-তে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে নিহত নাট্যকার মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) একজন শক্তিশালী প্রবন্ধলেখক ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর *মীর মানস* (১৯৬৫) উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের গভীর পর্যালোচনা। তাঁর আর দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ *তুলনামূলক সমালোচনা* (১৯৬৯) এবং *বাংলা গদ্যরীতি* (১৯৭০) প্রশংসিত হয়েছে। আহমদ রফিক (১৯২৯) তাঁর *শিল্প সংস্কৃতি ও জীবন* (১৯৫৮) গ্রন্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করেছেন। হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), যিনি নিজে একজন কবি, আধুনিক কবিতার আলোচনা করেছেন তাঁর *আধুনিক কবি ও কবিতা* (১৯৬৫)-য়। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১) এবং আনোয়ার পাশা (১৯২৯-৭১) রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন। চৌধুরীর *রবি পরিক্রমা* (১৯৬৩) এবং *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা* (১৯৬৯)-তে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাঁরা উভয়েই ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীদের হাতে নিহত হন।

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক বদরুদ্দীন উমর (১৯৩২) মূলত রাজনৈতিক লেখক। তিনি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা আলোচনা করেছেন *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬), *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭) এবং *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* গ্রন্থত্রয়ে। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১৯৭০) একটি অসামান্য কাজ। প্রগতিশীল ধারার লেখক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬)-র স্বাধীনতার পরে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতি সম্পর্কে; স্বাধীনতার আগে বেরোয় তাঁর *অন্বেষণ*

(১৯৬৮)। কাজী দীন মুহম্মদের (১৯২৭) *সাহিত্য সম্ভার* (১৯৬৫), মুস্তফা নূরউল ইসলামের (১৯২৭) *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৮), আলাউদ্দিন আল আজাদের *শিল্পীর স্বাধীনতা* (১৯৬২), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬)-এর *স্বদেশ ও সংস্কৃতি* (১৯৬৮) এবং মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর (১৯৩৬) *নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৬৩), *সমকালীন সাহিত্যের ধারা* (১৯৬৫) এবং *মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৭), আনিসুজ্জামানের (১৯৩৬) *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪) এবং *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৯৬৯) এবং ওয়াকিল আহমদের (১৯৪১) *সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনিসুজ্জামান ও ওয়াকিল আহমদের কাজ গবেষণামূলক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেই তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবীর চৌধুরী (১৯২৩) এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮) সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনামূলক বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

আবু জাফর শামসুদ্দিনের (১৯১১-১৯৮৮) *চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য* (১৯৬৯) এবং *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (১৯৭৮), মোবাশ্বের আলীর (১৯৩১) *মধুসূদন ও নবজাগৃতি* (১৯৬৩) এবং *নজরুল প্রতিভা* (১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ।

১৩.

তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য ১৯৬০-এর দশকটি ছিল একটি আশার দশক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অসামান্য গতিবেগ সঞ্চার করে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা লেখকদের অনেকেই গভীরভাবে প্রভাবিত হন ঃ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁদেরও লক্ষ্য হয়ে উঠে। বহুসংখ্যক নতুন গদ্যলেখকের এই সময় আবির্ভাব ঘটে। প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকার চেয়ে অসংখ্য ছোটকাগজ—'লিটল ম্যাগাজিন হয়ে উঠে তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম। বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকাও ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) সম্পাদিত 'সমকাল' এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নতুন লেখকদের মুখপত্র আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (১৯৪০) সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময় নতুনধারার লেখকরা প্রথাগত লেখকদের বিরুদ্ধে অনেকটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ষাটের দশকের প্রতিশ্রুতিবান লেখকদের অধিকাংশই পরে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যান, তবে কেউ কেউ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে শক্তিশালী লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ষাটের দশকের নতুন লেখকদের অধিকাংশই ছিল অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল : জীবনবিমুখ রোম্যান্টিক পথ পরিহার করে তাঁরা জীবনঘনিষ্ট বাস্তববাদী ও বস্তুবাদী হয়ে উঠেন। তাঁদের গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যেমন আসে গুণগত পরিবর্তন তেমনি ভাষা, প্রকরণ, শৈলী প্রভৃতি

নিয়ে কেউ কেউ নিরীক্ষা করেন। কবিতার ক্ষেত্রে শুধু নয় গদ্য-লেখকদের জন্য এই দশকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় পূর্ব বাংলার বাংলা গদ্য অর্জন করে এক নতুন মাত্রা।

ষাটের তরুণ কথাশিল্পীদের প্রায় কেউই তখনো উপন্যাস রচনায় হাত দেননি, কিন্তু তাঁদের অনেকেই ছোটগল্পকার রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। হাসান আজিজুল হকের কথা আগে উল্লেখিত হয়েছে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের (১৯৩৯) *দুর্বিনীত কাল* (১৯৩৫) এবং *বহেনা সুবাতাস* (১৯৬৭), আবদুশ শাকুরের (১৯৪১) *'ক্ষীয়মান* (১৯৬১) এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩) *সত্যের মতো বদমাস* (১৯৬৮) ওই সময়ের গল্পগ্রন্থ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর প্রধান লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় স্বাধীনতার পরে। আবদুল শাকুর ব্যাঙ্গ কৌতুকে দক্ষ। ষাটের দশকের কেউ কেউ তিরিশের রোম্যান্টিকদের অনুকরণে যৌনতাকে তাঁদের লেখায় অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন যা কখনো অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং ক্ষুণ্ন হয়েছে শিল্প।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে পূর্ব বাংলার সৃষ্টিশীল ও মননশীল গদ্য ধারণ করেছে। তা করতে গিয়ে ভাষা, প্রকরণ ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। ষাটের দশকের লেখকগণ তাঁদের ভেতরের আর্তি—তাঁদের স্বপ্ন ও সমাজের বাস্তবতা—প্রকাশ করতে গিয়ে উপযুক্ত শক্তিশালী ভাষা নির্মাণ করেন। বহুযুগের গতানুগতিক কলকাতাভিত্তিক সাহিত্যের ভাষার বন্ধন থেকে তাঁরা পূর্ব বাংলার সাহিত্যের মুক্তি ঘটান। পরবর্তীকালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এখানে যে নতুন ধারার সাহিত্য গড়ে উঠে তার সূচনা ষাটের দশকেই।

১১

লোকসাহিত্য

ওয়াকিল আহমদ *

লোকসাহিত্য একটি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ। জার্মানিতে একটি প্রবাদ আছে, কোন জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় তার লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য, যা অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। যে সমাজের মানুষের ভাষা আছে, ভাব-ভাবনা আছে, আবেগকল্পনা আছে, সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষমতা আছে, সেই সমাজের মানুষ লোকসাহিত্যের অধিকারী হয়। অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা না থাকায় তারা তাদের সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে বিশাল জনগোষ্ঠী এই বিচিত্র শ্রেণীর ও বিপুল আয়তনের সাহিত্যভাণ্ডারকে লালন ও বহন করে। জনগণের এ সম্পদ সময়ের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে এসে তার ভাষাসমুদ্রে বিচরণ করে। লোকসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতাবর্জিত। রূপকথা, পুরাণ, জাতক ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য শাখায় কল্পনা ও কাল্পনিকতাব স্থান নেই। ব্যক্তি রচনা করলেও সমষ্টি তা লালন করে। এজন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। বিষয়বস্তু, ভাষাভঙ্গি ও রূপরীতিতে প্রচলিত ধারাই অনুসৃত হয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা ও উদ্ভাবনশক্তির অভাব আছে। তবে নতুন সৃষ্টির উল্লাস না থাকলেও লৌকিক সাহিত্য ও শিল্পকলায় আনন্দ, সৌন্দর্য, রসবোধ ও মূল্যবোধের অভাব থাকে না। গ্যেটে বলেন, "Folktale is the father of fiction and folksong is the mother of poetry"—লোককাহিনী ও লোকসঙ্গীত উপন্যাস ও কবিতার জনক-জননী। লৌকিক ছড়া লিখিত ছড়ার ছন্দ ও রীতিকে প্রভাবিত করে। প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা লিখিত সাহিত্যের

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার অঙ্গীভূত হয়। শিল্পকলার অনেক আঙ্গিক ও মটিফ লোকঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক কথায়, লোকসাহিত্য জাতির সংস্কৃতির নির্মাণ ও বিকাশ সাধন করে থাকে। বিশেষকরে, জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি সংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা। সমকালকে স্পর্শ করে তা প্রবাহিত ও প্রসারিত হয়। প্রয়োজনে পুরাতনকে বর্জন এবং নতুনকে গ্রহণ করে তা অগ্রসর হয়। একটি জাতির আত্মপরিচয়, প্রকৃতি ও চারিত্র্যধর্ম নির্মাণে ও মূল্যায়নে এর এমন ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেই আমরা 'লোকসাহিত্য' অধ্যায়ের পরিকল্পনা করেছি। আমাদের দেশের বিপুল লোকসম্পদের পূর্ণ পরিচিতি একটি প্রবন্ধে ধারণ করা কঠিন। বর্তমান অধ্যায়ে লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ—এই আটটি শাখায় বিভক্ত করে বাংলা লোকসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দান ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাহিত্য জীবনের জন্য, জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করার জন্য—লোকসাহিত্যে এই অভিধার পূর্ণ প্রতিফলন আছে। "নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলো ছারখার, অসময়ে হরিশ মলো, লঙের হলো কারাগার।" অথবা "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।" অথবা "শিশু মেয়ে বিয়ে দিয়ে চিত্ত হলো কালি।" ইত্যাদি উক্তি সাধারণ মানুষের ইতিহাস ও সমাজসচেতনতা থেকেই উৎসারিত হয়েছে। সমাজের উচ্চবর্গের ইতিহাস লেখা হয়েছে, নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখা হয় নি, লিখতে হলে তাদের সৃষ্ট উপাদানকে অবলম্বন করতে হবে। সাধারণভাবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই বর্তমান অধ্যায়ের বিষয় নির্বাচন, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

লোকসঙ্গীত (Folk-songs)

"বাংলাদেশ বানের দেশ, ধানের দেশ, গানের দেশ।" অথবা "বাঙালির গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গান।" এরকম লোক-উচ্চারণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো—বান হলে ভাল ধান হয়, ভাল ধান হলে কৃষকের মুখে হাসি ফুটে, তারা অবসর পায় ও গান-বাদ্য করে আনন্দ প্রকাশ করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ভাল ফসলের উপর কৃষকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সবুজ গাছপালা, পলিগঠিত সমতল, নরম মাটি, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, উর্বর মাটির অনায়াসলভ্য ফসল ও ঋতুবৈচিত্র্য বাংলার মানুষকে কল্পনাবিলাসী, আবেগধর্মী, শ্রমবিমুখ করে তুলেছে। অরণ্য-পর্বত-মরু-মেরুবাসীর মতো জীবিকা ও অস্তিত্বের জন্য এদের বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় না। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ সাময়িকভাবে ও আঞ্চলিকভাবে বাংলার জনজীবনকে ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করলেও বাংলার মানুষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে এসবের মোকাবেলা করেছে এবং বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত জীবন্ত শাখা হলো লোকসঙ্গীত। উচ্চ সঙ্গীতের মতো সুরই লোকসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দ। নানা কাঠামোর, নানা ভাবের, বিচিত্র সুরের লোকসঙ্গীত আছে। একক, দ্বৈত ও সমবেত সঙ্গীত আছে; আঞ্চলিক ও সর্ববঙ্গীয় সঙ্গীত আছে; আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সঙ্গীত আছে; সাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন সঙ্গীত আছে; মৌসুমি ও সর্বকালীন সঙ্গীত আছে; নারী ও পুরুষভেদে সঙ্গীত আছে; ঘর-জলসার ও মাঠ-ঘাটের সঙ্গীত আছে। যেহেতু সঙ্গীত ভাবপ্রধান, সেহেতু জাতির অন্তর্জীবনের প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ ইত্যাদি বিচিত্র ভাবাবেগ ও মর্মানুভূতির চিত্র এতে স্পন্দিত হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও বৃত্তি সঙ্গীতের ভাব, রস, রুচি ও সুরসৃষ্টিতে প্রভাব ফেলেছে। বাংলার প্রকৃতিও সঙ্গীতের ভাব, রস, সুর ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রভাব ফেলেছে। 'বারমাসির গান' প্রকৃতিভিত্তিক, 'ভাটিয়ালি গান' নদীভিত্তিক, 'ভাওয়াইয়া গান' প্রান্তরভিত্তিক। নদীর গতি, স্রোত, কূল, ঢেউ, পারাপার ভাটিয়ালি গানের ভাব ও সুরকে রূপ দিয়েছে। খোলা মাঠের বিস্তৃতি, রৌদ্রছায়া, দূরদিগন্ত, গাছপালা, মন্থর সময়, ক্লান্ত অপরাহ্ন ভাওয়াইয়া গানের ভাব ও সুরকে রূপ দিয়েছে। ব্রতের পূজা ব্রতের গানের ভাব ও সুরকে প্রভাবিত করেছে; বাউলের ধর্মসাধনা বাউল গানের ভাব ও সুরকে প্রভাবিত করেছে। মোহররমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জারি গানের ভাব ও সুর গঠন করেছে। এভাবে সারি, ঝুমুর, ঘাটু, ভাদো, টুসু, মুর্শিদী, গম্ভীরা ইত্যাদি গানের ভাব ও সুর বিচার করা যায়। বিষয়, উপলক্ষ গানের অবয়ব নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে। ধুয়া, অন্তরা, অস্থায়ী, আভোগ সম্বলিত দশ-বারো চরণের লোকসঙ্গীত আছে; ব্রতগান, মেয়েলি গীত, মাগনের গান, জারি গান, গম্ভীরা আকারে এর চেয়ে বড়; বারমাসি গানে ছয় ঋতুব্যাপী দুঃখানুভূতির বিবরণ থাকে, অতএব এ গান বেশ দীর্ঘ হয়। কবির লড়াই, আলকাপ, যাত্রাগান আরো দীর্ঘ হয়, কারণ সারারাত ধরে এগুলি পরিবেশন করতে হয়।

পেশাদার ও অপেশাদার গায়ক গান করে। পেশাদার 'গায়েন' বা 'বয়াতি' দল গঠন করে অর্থের বিনিময়ে আসরে গান গায়। 'কবিওয়াল' দলবল নিয়ে কবির লড়াই-এ অংশগ্রহণ করে। আলকাপের 'ছোকরা' ও ঘাটু গানের 'ঘাটু' পেশাদার গায়ক, উদাস 'বাউল' নিজেই গান করে অধ্যাত্মরসপিপাসা নিবৃত্ত করে। বৈরাগী-বোষ্টমী গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বিবাহাদি উপলক্ষে মেয়েলি গীত গাওয়ার জন্য পেশাদার 'গীদাল' আছে। তবে সাধারণ মেয়েরাও গীত গায়; গ্রামের প্রায় সব পরিবারের মেয়েরা গীত জানে, গীত গাইতে পারে, অনুষ্ঠানে অথবা অবসরযাপনে গীত গেয়েও থাকে। খেতে-খামারে কৃষক, মাঠে-প্রান্তরে রাখাল, নদীনালায় মাঝি-মাল্লা, পথে-ঘাটে শ্রমিক নিজেদের চিত্তবিনোদন, অবসরযাপন অথবা শ্রমলাঘবের জন্য গান গায়। কবির ভাষায় এর প্রতিধ্বনি আছে—"কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।"

লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। ভাব, চিত্র, কাহিনী অবলম্বনে ছন্দময় সুরাশ্রিত রচনাকে লোকসঙ্গীত বলা যায়। জর্জ হারজগ (George Herzog) বলেন, "Folksongs are best defined as songs which are current in the repertory of a folk-group."[১] অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "... it is oral circulation that is the best general criterion of what is a folk-song." সংজ্ঞাগুলি স্পষ্ট ও অর্থবাহী নয়। লোকসমাজে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ও সুর সংযোগে প্রচারিত রচনাকেই লোকসঙ্গীত বলা হয়েছে। কে. এইচ. ব্রুকভ্যান্ড বলেন, "The folksong is song with melody, which originated anonymously among unlettered folk in time past and which remained in currency for a considerable time as a rule for centuries."

বাংলা লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ-সঙ্কলন-আলোচনা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলার লোকসাহিত্য* (৩য় খণ্ড ১৯৬৫), *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর* (৪ খণ্ড), চিত্তরঞ্জন দেবের *পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ* (১৯৫৩), মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরীর *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি* (১৯৭৩), মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীনের *হারামণি* (বিবিধ খণ্ড), বাংলা একাডেমীর *লোকসাহিত্য-সংকলন* (বিভিন্ন খণ্ড) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নানা গ্রন্থের অধ্যায় হিসেবে লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ ও আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বাংলা লোকসঙ্গীতের বিচিত্র প্রকারভেদ আছে, প্রকারভেদে বিভিন্ন নামও আছে। প্রায় পঞ্চাশোর্ধ গানের নাম এরকম : আলকাপ গান, ওন্নিগান, কবিগান, কীর্তন, খেমটা, ক্ষেত নিড়ানীর গান, গম্ভীরা, গাজন, গাজীর গান, গোসা গান, ঘাটু গান, চটকা, ছাদ পিটানোর গান, জাগ গান, জারি গান, ঝাঁপান, ঝুমুর, তর্জা, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, ধামালী, ধূয়া গান, নাটুয়া গান, নৈলা গান, বৃষ্টির গান, নৌকা বাইচের গান, টুসু, পটুয়া গীত, বাউল গান, বাঘাই শিরনীর গান, বারমাসি, বিচার গান, বিচ্ছেদের গান, বেদের গান/সাপুড়ের গান, বৈঠকি গান, বোলান গান, ব্রতের গান, ভাওয়াইয়া/দোতারা গান, ভাটিয়ালি, ভাঁজো গান, ভাদু গান, রয়ানী, মর্সিয়া গীত, মাইজভাণ্ডারী গান, মাদারের গান, মানিক পীরের গান, মারফতী গান, মালসী, মাহুত বন্ধুর গান, মৈষালী গান, মুর্শিদী গান, মেয়েলি গীত/ সোহেলী গীত, যাত্রাগান, রাখালি গান, লেটোর গান, শিরালীর গান, সাইটোরের গান, সারি গান, হাতি খেদার গান, হাপুর গান, হাবু গান, হোলীর গান, হুদমার গান, হুলোই গান ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীতের শ্রেণীকরণ করা কঠিন। কোন কোন পণ্ডিত আঞ্চলিক ও সর্বাঞ্চলীয়, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, সাধারণ ও তত্ত্বপ্রধান, তালযুক্ত ও তালহীন, সংস্কারাগত ও সংস্কারনিরপেক্ষ—এমন স্থূলভাবে ভাগ করে নানা উপ-বিভাগ করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য আঞ্চলিক (regional), ব্যবহারিক (functional), আনুষ্ঠানিক (ritual), কর্ম (work) ও প্রেম (love)—এই পাঁচটি ভাগ করেন। আশরাফ সিদ্দিকী আঞ্চলিক, ব্যবহারিক, হাসিমূলক

---

১. Maria Edward Leach (ed.), *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend* (SDFML), Vol. 1, (New York 1949), 1033.

(humorous), কর্ম, প্রেম ও বারমাসি—এই ছয়টি ভাগ করেন। অঞ্চল, উপলক্ষ ও বিষয়ভিত্তিক এমন মিশ্র বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা বিষয়ভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য একটি শ্রেণীকরণ এভাবে করতে পারি :

১. প্রেম; ২. ধর্ম-আচার-সংস্কার; ৩. তত্ত্ব ও ভক্তি; ৪.কর্ম ও শ্রম; ৫. পেশা ও বৃত্তি; ৬. হাস্য-কৌতুক এবং ৭. মিশ্র ভাববিষয়।

বিষয়, অঞ্চল ও উপলক্ষভেদে সঙ্গীতগুলিকে নিম্নরূপ একটি সারণিতে বিন্যাস করা যায় :

সারণি ১

বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
প্রেম	আলকাপ	মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী	
	গোসাপ্সন	নোয়াখালী	
	ঘাটু গান	ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা	ঢোল, করতাল, মন্দিরা
	ঝুমুর গান	পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম	খোল, মাদল, করতাল
	বারমাসি	সর্বাঞ্চলীয়	
	বারাশে	পাবনা, ফরিদপুর, যশোর	
	ভাওয়াইয়া	রংপুর,দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার,	দোতারা
	মালসী	বগুড়া, রাজশাহী	
	মাহুত বন্ধুর গান		
	রাখালিয়া গান	রংপুর, দিনাজপুর	
	সাম্পান মাঝির গান	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী	
ধর্ম-আচার-সংস্কার	অহীরা গান	-	-
	কীর্তন	সর্বাঞ্চলীয়	শ্রীখোল, করতাল, মন্দিরা
	গম্ভীরা	মালদহ, রাজশাহী	হারমনিয়াম, তবলা খঞ্জনি, দোতারা
	গাজন	বীরভূম, মালদহ	

বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
	গাজীর গান	খুলনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ	-
	জাগ গান	উত্তরবঙ্গ	ঢোল, কাঁসি, নূপুর
	জারি গান	সর্বাঞ্চলীয়	দোতারা, ঢাক, ঢোল
	ঝাঁপান	—	-
	টুসু	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর	-
	ধামাইল গান	শ্রীহট্ট, ঢাকা	-
	নৈলার গান	-	
	বিচ্ছেদী গান	-	-
	ভাঁজো/ ভাদু	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম,	ঢোল
	ভাসান/রয়ানী	ময়মনসিংহ,	
	মাগনের গান	বরিশাল, ফরিদপুর	
	মর্সিয়া গান	মুর্শিদাবাদ,সিলেট	
	শিরালী গান	ময়মনসিংহ, সিলেট	শিঙ্গা
	হুদমা গান	রংপুর, দিনাজপুর	
	হোলীর গান/উরি গান	পশ্চিমবঙ্গ	
	মেছোনী খেলার গান	উত্তরবঙ্গ	
তত্ত্ব ও ভক্তি	বাউল গান	কুষ্টিয়া, যশোর, নদীয়া, খুলনা	একতারা, বাঁয়া
	ভাটিয়ালি	ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ	-
	মাইজভাণ্ডারী গান	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী	-
বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
	মারফতী গান	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী,কুমিল্লা	
	মুর্শিদী গান	সর্বাঞ্চলীয়	সারিন্দা

বিষয়	গান	অঞ্চল	বাদ্যযন্ত্র
কর্ম ও শ্রম	ক্ষেত নিড়ানীর গান	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা,সিলেট	সারিন্দা, খঞ্জনি
	ছাদ পিটানোর গান	ঢাকা, ময়মনসিংহ	সারিন্দা
	ধান কাটার গান	সর্বাঞ্চলীয়	সারিন্দা
	ধান ভানার গান	ঐ	-
	পাট কাটার গান	ঐ	-
	হাতি খেদানোর গান	চট্টগ্রাম	-
পেশা ও বৃত্তি	খেমটা	পুরুলিয়া, বীরভূম	-
	পটুয়া গীত	পশ্চিমবঙ্গ	
	পাল্কিওয়ালার গান	-	
	ফেরিওয়ালার গান	-	
	বেদের গান/সাপুড়ে গান	ময়মনসিংহ, ঢাকা	-
	বাওয়ালীর গান	খুলনা	-
	পুতুলনাচের গান	নদীয়া	
হাস্য-কৌতুক	চট্‌কা গান		-
	নাটুয়া গীত	রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ	ঢোলক, বাঁশি, বেহালা
	বোলান	মালদহ	
	লেটো	বর্ধমান	-
	হাবু গান	ঢাকা	
মিশ্র ভাববিষয়	কবি গান	সর্বাঞ্চলীয়	হারমনিয়াম, ঢোল, বাঁশি, করতাল, বেহালা
	মেয়েলি/সোহেলী গীত	ঐ	ঢোলক, মন্দিরা
	সারি গান	ঐ	কাঁশী, ঢোল, করতাল

লৌকিক বা পার্থিব প্রেম প্রেমমূলক গানের এবং অলৌকিক বা অপার্থিব প্রেম তত্ত্ব-ভক্তিমূলক গানের বিষয়বস্তু। প্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান অনুভূতি। লোকসঙ্গীতের একটি বিরাট অংশ প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। গান ও গীতিকা ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় এভাবে প্রেমের কথা নেই।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমের চিরন্তন প্রতীক। "কানু ছাড়া গীত নেই, রাধা ছাড়া সাধা নেই।" প্রবাদের মধ্যে এর স্বীকৃতি আছে। পার্থিব প্রেম, দেহজ কামনা-বাসনা, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ রাধাকৃষ্ণের আখ্যান অথবা খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আলকাপ, কবিগান, ঘাটু গান, ঝুমুর, বারমাসি, মেয়েলি গীত, যাত্রা গান, সারি গান, হোলীর গান ইত্যাদিতে রাধাকৃষ্ণের এধরনের রূপক আছে :

১. ঘাটু গান

কি হেরিলাম যমুনায় আসিয়া গো সজনী
বনমালী তরুয়া মূলে।
যাইতে যমুনার জলে
সেই কালা কদম তলে
ও রূপ চাইতে কলসী নিল স্রোতে ॥—সিলেট

২. ঝুমুর

শুন গো রাই, বলি তোরে তোর সঙ্গে পিরিতি করে
আমার এই তো হলো ঘটনা।
পরাহিয়ে ফুলের মালা দেখ প্রেম যাতনা দিও না,
গুণমণি চাঁদ বদনি আমায় ভুলে থেক না।
নব নব তরী ভাসে সব গেল তোরি দোষে,
সে তো আমার যাওয়া হলো না ॥ —মেদিনীপুর

৩. চট্কা

প্রেম জানে না রসিক কালাচাঁদ,
ও সে ঘুইরে মরে মোন
কতদিনে বঁধুর সনে হইবে দরশন।
হাটিয়া যাইতি নদীর জল
থাকলুম কি
থুকলুম কি
খলাল খলাল করে রে।
হায় হায় পরানের বন্ধুরে ॥ —রংপুর

৪. ধামাইল

যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
এমন মধুর মুরলী ধ্বনি দহিতেছে অঙ্গ।

আয় ললিতে আয় বিশাখে,
শ্যামকে এনে দে,
যায় যদি রাইর কুলমান
পাই যদি তারে
আমার মন হইয়াছে উড়লপাখী
প্রাণে প্রেম তরঙ্গ ॥

৫. বারমাসি

মাঘ না মাসেতে মাধব মতুরায় গমন।
দশদিক খোয়াকার নব বিন্দাবন।
ফাগুন মাসেতে সখি না ফুটে কোন ফুল।
আমার কুঞ্জে নাহি কৃষ্ণ কে করে কার দোল।
চৈত্রেতে চাতক পংখী জল দে জল দে করে
সে ডাক শুনিয়া আমার পরাণ বিদরে ॥ —কুমিল্লা

৬. বিচ্ছেদী

মন দুঃখে মরিবে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে।
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল
শ্রীরাধা বিহনে রে ।।

৭. সারি গান

সুন্দরী লো বাইরইয়া দেখ
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে ॥. . .
ভাল, আষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে ॥—ময়মনসিংহ

৮. হোলীর গান

নিধু বনে শ্যাম কিশোর সনে
খেলব হোলী আয় ॥
শ্যামল বরণ হৃদয় হরণ
আয় আয় সখি ধরি সে চরণ

শ্যাম যেন না পালায় ॥
আবীর ঢালিব শ্যামের গায়
খেলব হোলী আয় ॥

৯. আলকাপ

বনে কানুর বাঁশী বাজিল রে
সুর ও সোহাগে মন মাতিল রে ॥
পুলকে পুলকে উথলিয়া প্রেমে গদগদ হলো হিয়া।
মরমে শরমে আকুল প্রাণে
আমার মন ঘন ঘন বাজিল রে ॥ —মুর্শিদাবাদ

১০. মেয়েলি গীত

হায় গো জলে ঢেউ দিও না সখি
আমি জলের ঘাটে কৃষ্ণরূপ নেহারি।
এক কালা কদম্বতলে,
আর কালা যমুনা জলে
কোন কালা শ্যাম চিনিতে না পারি ॥

দৃষ্টান্তগুলিতে বহু নাম, যেমন রাধা, কৃষ্ণ, সুবল, বৃন্দাবন, মথুরা, যমুনা, বাঁশি, কদম্ব ইত্যাদি উচ্চারিত হয়েছে, এগুলি সহজেই গাড়িয়াল ভাই, রাখাল, মৈষাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু, মাঝি, সওদাগর, বানিয়া, নদী, হাওর, দোতারা, ভ্রমর ইত্যাদিতে পরিণত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত এ-ধরনের গানের অভাবও নেই। "ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।" (ভাওয়াইয়া), "আরে গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু।" (ঐ), "তোর্ষা নদী উতাল পাতাল কার বা চলে নাও।" (ঐ), "আমার বাড়ি যান ও মোর প্রাণের মৈষালরে।" (চট্‌কা), "ও মোর বানিয়া বন্ধুরে।" (ঐ), "সুজন মাঝিরে, কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও।" (ভাটিয়ালি), "ওরে ও ভ্রমরা, নিশীথে যাইও ফুলবনে।" (ঐ), "সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলো ধাইয়া।" (সারিগান), "আরে শোন রাখাল ভাইরে তোর মায়ে কইছে রে।" (রাখালিয়া গান) ইত্যাদি লোকসঙ্গীতে[২] রূপক-প্রতীক নেই, নিত্য পরিচিত মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির চিত্র আছে। গায়ক-গায়িকা নিজেদের আবেগ ও অনুভূতিকে আড়াল করার প্রয়োজন বোধ করে নি। তারা মনের কথা সহজ ভাষায় অকপটে প্রকাশের 'দুরন্ত সাহস' প্রদর্শন করেছে। "পীরিতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা

---

২. দৃষ্টান্তগুলি বুদ্ধদেব রায় প্রণীত *লোকগীতি-স্বরলিপি* (কলকাতা, ১৯৭৯) থেকে উৎকলিত।

ডোম।", "পীরিত রতন, পীরিত যতন পীরিত গলার হার/পীরিত কইরা যে জন মরে সফল জীবন তার।" —প্রেম সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেই পল্লীকবি ও গায়ক 'দুরন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছে; বলা যায়, এটা তাদের প্রেম-দর্শন। তবে এ প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, কন্টকাকীর্ণ ছিল; বিশেষকরে সমাজবন্ধন কঠোর হওয়ায় প্রেমে বিষাদের ও বেদনার সুর ফুটেছে বেশি। "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে ফাঁদ" উক্তিতে এরূপ প্রেমচেতনারই প্রতিফলন আছে। অন্য অভিজ্ঞতাও আছে—যথা "ছোটকালে পীরিত যেন কাঁঠালের আঠা/ছাড়াইলে না ছাড়ে ভাই এ বিষম লেঠা।"

বাংলা লোকসঙ্গীত প্রধানত চিত্রধর্মী। জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র কথায় ও সুরে অবলীলায় রূপ দেয় লোকশিল্পী। "গাও তোল গাও তোল কন্যা হে, কন্যা পেন্দো বিয়ার শাড়ী।", "ঘাটে ডিঙ্গা লাগাইয়া মাঝি পান খেয়া যাও।", "কত পাষাণ বাইন্দ্যাছ পতি মনেতে।", "জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া মন।", "লাল নীল চউর বাইয়া, হাটে যাওরে সোনার নাইয়া।" ইত্যাদি প্রেমসঙ্গীতে জীবনের খণ্ড চিত্র আবেগের ভাষায় রূপ পেয়েছে। এগুলিতে দেবভাব নেই, মানবভাবই প্রধান।

তত্ত্ব ও ভক্তিমূলক গানে আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত হয়েছে। দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দয়ালতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব নিয়ে রচিত হয়েছে বাউল, মুর্শিদী, মারফতী, মাইজভাণ্ডারী গান। প্রধানত বাউল, ফকির, বৈরাগী ও ভক্তশিষ্য এসব গানের চর্চা করে। জীবন, সংসার ও জগৎকে অনিত্য ও দুঃখময় ভেবে তারা আধ্যাত্মিক জগতে শান্তি ও মুক্তি খোঁজে। কেউ সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কেউ গুরু-মুর্শিদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে। "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।" (বাউল গান), "মন-মাঝি তোর বইঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না।" (ভাটিয়ালি গান), "নদীর কূল নাই, কিনার নাইরে।" (ঐ), "ভবনদী পার করে দাও দয়াল মুর্শিদ আমারে।" (মুর্শিদী), "ও কি চমৎকার ভাণ্ডারে এক আজব কারবার।" (মাইজভাণ্ডারী গান) ইত্যাদি এরূপ তত্ত্বসঙ্গীত, যেগুলিতে সংসারবিমুখ ভাব ও বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে এসব গানে। এদেশের লোকসঙ্গীতে ভক্তিরস এসব গানের মাধ্যমে প্রবেশ করে। ফার্সি গজল ভক্তিরসের উৎস, যা বৈষ্ণব পদাবলীকেও প্রভাবিত করেছে।

ধর্ম, সংস্কার, আচার ও ব্যবহারমূলক আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীতের ধারা ও সংখ্যা বেশি। প্রেমসঙ্গীত জাতির সাধারণ চিরন্তন সত্তাকে তুলে ধরে, কিন্তু অনুষ্ঠাননির্ভর সঙ্গীত জাতির বিশিষ্ট সত্তাকে ব্যক্ত করে। "আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে, ছায়া দেরে তুই" গানে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এমন আবেদন সরাসরি মেঘের দেবতার কাছেও করা হয়—''মেঘ রাজারে তুইনি সুদর ভাই/এক ঝাড়ি মেঘ দে ভিজ্যা ঘরে যাই।" এটি নৈল্যার বা বৃষ্টিপ্রার্থনার গান। মেঘকে দেবতা কল্পনা করে তার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। এটি

আদিম ধর্মবিশ্বাসের ফল : জড়বস্তুতে আত্মা আরোপ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মেঘের স্থলে আল্লাহর চেতনা আরোপ করা হয়েছে। ফসলের জন্য বৃষ্টি আবশ্যক। কৃষকের এই চাহিদা আদিম ও অকৃত্রিম। রংপুরের রাজবংশী কৃষকদের মধ্যে 'হুদমার গান' প্রচলিত আছে। হুদমা মেঘের দেবতা, কৃষক রমণীরা ক্ষেতে নগ্নভাবে নাচ-গান করে এবং পানি ঢেলে নকল চাষের অভিনয় করে। তাদের একটি গীত এরকম :

হিল হিলাইছে কমরটা মোর শির শিরাইছে গাও।
কোনঠে কি না গেইলে এলা হুদুমার দেখা পাও ॥
পাটানী খান পড়েছে খসিয়া,
আইসেক রে হুদুমা দেওয়া
তোর বাদে মুই আছ বসিয়া ॥—রংপুর

Like produces like— যাদুবিশ্বাসের এমন ধারণা থেকে বৃষ্টি ও চাষের অভিনয় করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ভাদু, টুসু, জাওয়া গান মূলত ব্রতকেন্দ্রিক। ভাদু ব্রত কুমারী মেয়েরা পালন করে নিজেদের সফল জীবনের আশায় ; জাওয়া শস্যোদ্‌গমের উৎসব (pre-harvest) আর ভাদু শস্যোৎসব (post harvest)। প্রাচীন যুগে লোকের দৃষ্টিতে ভূমির শস্যবতী ও নারীর সন্তানবতী হওয়া অভিন্ন ছিল। হিন্দু নারীসমাজে আরো অনেক ব্রত আছে, যেখানে সন্তান, শস্য, সম্পদ, জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে গান করা, ছড়া বলা ও আলপনা আঁকা হয়, এর সঙ্গে আছে নানা ধরনের স্ত্রী-আচার। এসব ব্রতের আচারে-বিশ্বাসে দেব-দেবী থাকলেও পরকালের মুক্তিচিন্তার স্থলে ইহকালের সুখ-শান্তি কামনা অধিক ব্যক্ত হয়। ব্রতের গানে পারিবারিক জীবনচিত্র ও ব্যবহারিক আবেগ-অনুভূতি ছড়িয়ে আছে।

শিব কৃষির দেবতা। শিবকে কেন্দ্র করে শিবের গাজন ও গম্ভীরা লোকোৎসব পালিত হয়। শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র নিয়ে গাজন গান রচিত হয়। আসলে এতে কৃষকজীবনেরই প্রতিবিম্ব থাকে :

ধান লাড় ধান লাড়, গোরী, আউলাইয়া মাথার কেশ।
জল চাইলে না দেও জল এই বা কোন দেশ ?
নেও ঝাড়ি, নেও পানি, দিও পানি, দেশ কেন নিন্দ ? —ময়মনসিংহ।

গম্ভীরা গানের জনপ্রিয়তা বেশি। এ গানের দুটি ধারা—একটি শিবের পারিবারিক জীবনচিত্র, অপরটি শিবের কাছে সাংসারিক জীবনের নানাবিধ অভাব-অভিযোগের বিবরণ। একটি গীতের কয়েকটি চরণ এমন :

শিব, তোমার লীলাখেলা কর অবসান,
বুঝি বাঁচে না আর জান।

অনাবৃষ্টি করয়া সৃষ্টি, মাটি করল্যা নষ্ট হে।
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কইর‌্যা, দেখছ নাকি কষ্ট হে ॥—মালদহ

গম্ভীরার এই ধারায় বর্তমানে 'নানা-নাতি'র অভিনয় ও সঙ্গীতের মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, ব্যক্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্নীতি প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ের সমালোচনা করা হয়।

ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে বোরো ধান রক্ষা করার জন্য 'শিরালী' নামের ওঝা শিঙ্গা বাজিয়ে ও মন্ত্র গেয়ে মেঘ তাড়ায়। এ প্রথা ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এধরনের কাজ করতে গিয়ে শিরালী বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে, তারও দৃষ্টান্ত আছে।

গোয়াইলার শিরনী ও গোরক্ষনাথের শিরনী আচার পালিত হয় গরুর উদ্দেশ্যে। শস্যের মতো গরুও সম্পদতুল্য। কৃষিকাজে গরুর ব্যবহার অপরিহার্য। গরু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিরনী মানত করা হয়; ঘরে ঘরে গান গেয়ে শিরনীর চাল-ডাল-অর্থ সংগ্রহ করা হয়. একে 'মাগনের গান' বলে।

হিন্দু সমাজে দেব-দেবীর উদ্দেশে যেমন ব্রতগান আছে, মুসলমান সমাজে পীর-পীরানির উদ্দেশে তেমনি 'জাগ গান' আছে। পীরের মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী দীর্ঘ রাত্রি জেগে গাওয়া হয়। গাজী পীর, মাদার পীর, খোযাজ খিজির, মানিক পীর, সোনা পীর ও বদর পীর লোকদৃষ্টিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী; তাঁরা সন্তানহীনাকে সন্তান দেন, রোগ-ব্যাধি দূর করেন, ধন-সম্পদ দান করেন, গরু-বাছুর রক্ষা করেন। মাগনের গানের মতো জাগ গান গেয়ে শিরনীর চাল-ডাল সংগ্রহ করা হয়। জাগ গানে পীরমাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও এগুলিতে ধর্মভাব সামান্যই আছে, প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক চেতনা ও কল্যাণবুদ্ধিই মুখ্য। গাজী পীরের উদ্দেশে নিবেদিত গান 'গাজীর গান' নামে পরিচিত। সন্তান, স্বাস্থ্য অথবা সম্পদের জন্য মানত করে গাজীর গানের পালার আয়োজন করা হয়। যেহেতু এগুলি আখ্যানধর্মী ও বিবৃতিমূলক, সেহেতু আকারে দীর্ঘ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যলীলা সংক্রান্ত জাগ গানও আছে।

মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'জারি গান' বা শোকসঙ্গীত মোহররম উপলক্ষে গাওয়া হয়। কারবালার শোকাবহ ও বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে ছোট ও বড় আকারের জারি গান প্রচলিত আছে। মহররমের মিছিল, তাজিয়া, দরগাহ, দুলদুল, ইমামবাড়া, মাতম, মর্সিয়া ইত্যাদির সঙ্গে জারি গান ও নাচে ইসলামের শিয়া-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। সখিনার বিলাপকে কেন্দ্র করে রচিত জারি গান করুণ রসে ভরপুর :

নিশি প্রভাতকালে কোকিল বলে, ওরে সখিনা
এ বেশে আর ঘুমিয়ে থেকো না

মাঝ-দরিয়ায় ডুবলো তোমার লাল ডিঙ্গাখানা ॥—যশোর

কারবালায় ফোরাত নদী আছে, নদীতে ডিঙ্গাও আছে, কিন্তু কোকিল নেই। নদী-নৌকা-কোকিল বাংলাদেশের চিত্র, এ পটভূমিতে বিলাপ রচিত হয়েছে। মৃত কাসেমের মায়ের বিলাপ এরকম :

ওরে বাপ কাসেম আলি, গেলিরে কোথায়
হায় হায়।
আমার মদিনার চাঁদ আঁধারে লুকায় ॥ —মুর্শিদাবাদ

জারিগান দলীয় সঙ্গীত; গায়েন ও দোহার মিলিতভাবে এ গান পরিবেশন করে। বর্তমানে জারি গানের বিষয়বস্তুর প্রসার ঘটেছে। 'ইসমাইলের কোরবানি' নিয়ে যেমন জারি আছে, তেমনি 'স্বাধীনতা দিবসের জারি'ও আছে।[৩] মোহররম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও মোহররম উপলক্ষে গীত জারি গানে ধর্মরস নেই; ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত জারি গানে মানবহৃদয়ের চিরন্তন আর্তি ও বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। জারি গানের প্রচলন আজও অব্যাহত আছে। নারীরা অন্তঃপুরে একই উপলক্ষে মাতম করে ও গান গায়—একে 'মর্সিয়া' বলে। সখিনার বিরহযাতনা ও আর্তনাদ গানের ভাষায় ও সুরে প্রকাশ পায়। এতে পতিহারা সখিনার ও সাধারণ বিধবার অন্তর্বেদনার মধ্যে তফাত থাকে না।[৪]

কর্মসঙ্গীত নামই প্রমাণ করে এটি শ্রম ও কর্মের সঙ্গে জড়িত লোকসঙ্গীত। কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা দানের সাথে শ্রমভার লাঘব এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে কর্মসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। ক্ষেত নিড়ানো, ধান-পাট কাটা, ধান ভানা ইত্যাদি কৃষিকাজই প্রধান, তবে দাঁড় টানা, ছাদ পিটানো, জাল বোনা, তাঁত বোনা, মাটি কাটা, ভারী বস্তু টানা বা তোলা ইত্যাদি কাজেও কর্মসঙ্গীতের চর্চা আছে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গীতের কথা ও সুরের সরাসরি সম্পর্ক আছে।

১. ক্ষেত নিড়ানির গান

আয়রে তরা ভুঁই নিড়াইতে যাই।
ভুঁই মোর গো মাতা-পিতা, ভুঁই মোর গো পুত।
ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ। ...
ওগো সপ্ত ডিঙ্গা মুধকরে যত ধান্য ধরে;
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে ॥—ময়মনসিংহ

---

৩. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি*, (ঢাকা ১৯৭৩)। ২৬১ ; *লোকসাহিত্য সংকলন*, ১৮শ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮১), ৬৩ ।

৪. *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি*, ২৮৪-৮৫।

২. পাট কাটার গান

পূবের থান আইলো বাতাস নদী হইল এক
দ্যাশ পিরথিমী সাগর কইরা চরায় নামলো ঢল।
জনা ভাইরে ॥
কাঁচি বাগী সঙ্গে লইয়ারে পাট কাটিতে চলো
জনা ভাইরে ॥—ঐ

৩. ধান ভানার গান

আমরা ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পার দিয়া
ঢেঁকি নাচে আমরা নাচি হেলিয়া দুলিয়া
আমরা ধান ভানিরে ॥—ঐ

৪. নৌকা বাইচের গান

রঙের নাও রঙের বৈঠা রঙে রঙে বাও।
পাতাম কাঠের নৌকা আমার উড়াল দিয়া যাও রে
উড়াল দিয়া যাও ॥
রঙে রঙে বাওরে বৈঠা রঙের দোহার গাইয়া
মধুমালার দেশে ডিঙি শীঘ্র যাওরে বাইয়া
রঙের নাও রঙের বৈঠা ॥—ঐ

৫. ছাদ পিটানোর গান

রঙিলা ভাসুর গো, তুমি কেন দেওর হইলা না।
তুমি যদি হইতারে দেওর খাইতা বাটার পান
আর রঙ্গ রসে কইতাম কথা জুড়াইতাম পরাণ ॥—ঢাকা

এসব গান এবং জীবন অভিন্ন। শাস্ত্রকথা ও নীতিকথা শ্রমসঙ্গীতে স্থান পায় নি। জীবনের সাধ-আহ্লাদ, রস-রসিকতা, উল্লাস-স্ফূর্তি গানের কথায়, ছন্দে ও সুরে ছড়িয়ে আছে। "প্রাণ জাগিলেই গান জাগে"[৫] এই কথার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি আছে কর্মসঙ্গীতে।

পটুয়ারা নিম্নশ্রেণীভুক্ত বৃত্তিজীবী মানুষ; ধর্মবিশ্বাসে না হিন্দু, না মুসলমান। তারা কাগজে, মৃৎভাণ্ডে পট আঁকে এবং পটের চিত্র অনুযায়ী গান রচনা করে, অতঃপর গ্রামে গ্রামে ও হাটে-গঞ্জে পট দেখিয়ে ও গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করে। তাদের পটের বিষয়বস্তু

৫. প্রাগুক্ত, ২।

রাধাকৃষ্ণ, রাম-সীতা, নিমাই সন্ন্যাস, গাজী পীর ইত্যাদির জীবন ও লীলাকাহিনী। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত 'পঞ্চকল্যাণী' পটে শিব, শ্যাম, সীতা, নিমাই ও অসতী নারীর চিত্র আছে; শ্যামসংক্রান্ত পটুয়া গানের কয়েকটি চরণ এরকম :

দেখ ভঙ্গী বাঁকা—
দেখ ভঙ্গী বাঁকা রাখাল সখা কদম্ব তলায়
বাজাইয়া মোহন বেণু গোপীর মন ভুলায় ॥
দেখ কুটনা বুড়ী—
দেখ কুটনা বুড়ী যুক্তি করে কুমন্ত্রণা দিয়া।
শ্যামের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় দিয়াছে ঘটাইয়া ॥
দেখ কাল ননদী—
দেখ কাল ননদী সদায় বাদী মজায় গণ্ডগোলে।
বলে দাদা, তোমার রাধা গিয়াছে জঙ্গলে ॥

তিনটি চিত্রকে তিন জোড়া চরণে বেঁধে গান রচিত হয়েছে। এ গান চিত্রধর্মী এবং জীবনধর্মী। পটুয়ার মতো বেদেরাও না হিন্দু, না মুসলমান। তারা অর্ধগৃহী, অর্ধ যাযাবর। বর্ষাকালে নৌকায় আশ্রয় নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। সাপ ধরা, সাপ খেলানো ও ওঝাগিরি প্রধান জীবিকা। এছাড়াও নানাবিধ ঔষধ বিক্রয় এবং চুড়ি ও সৌখিন দ্রব্য ফেরি করে তারা অর্থোপার্জন করে। সাপ ধরার মন্ত্র, সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র এবং সাপ খেলানোর গান বেদে নর-নারীর মুখ্য রচনা। রেকর্ডকৃত সাপ খেলানোর একটি গান নিম্নরূপ :

সাপ খেলা দেখবি যদি আয়রে সোনাবউ,
এমনি খেলা সাপের খেলা দেখেনি তো কেউ।
সাপে যখন ফণা ধরে
আলকাতরার মায় কাইনদ্যা মরে
মোড়াইতে মোড়াইতে সাপ গর্তে চইলা যায় ॥
সাপের বাঁশী যখন বাজে
হেইলা দুইলা সাপ যে নাচে
বাঁশীর সুরে তালে তালে খেলেরে সোনাবউ ॥[৬]—ঢাকা

মনসা ও বেহুলা-লক্ষীন্দর প্রসঙ্গ তাদের গানের প্রধান বিষয়বস্তু।

৬. *লোকগীতি-স্বরলিপি*, ১৪৬।

পুতুলনাচ দেখিয়ে ও গান গেয়ে জীবিকার্জন করে অপর এক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ। পুতুলনাচের প্রকৃতি ও বিষয় অনুযায়ী গান ছোট-বড় হয়। মঞ্চে যে পুতুলনাচ হয়, তা যৌথ শিল্প; সূত্রধর আড়ালে থেকে পুতুল নাচায়, যন্ত্রী যন্ত্র বাজায়, সরকার গান করে। দীর্ঘ কাহিনী পুতুল নাচিয়ে এবং পাঁচালি, কীর্তন, মালসী সুরে গান গেয়ে পরিবেশন করা হয়। মাঝেমধ্যে গদ্য সংলাপও থাকে। জীবনের খণ্ডচিত্র সম্বলিত পুতুলনাচ ও গান এক ব্যক্তি পরিবেশন করে। দাম্পত্য জীবনের সরস চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এজাতীয় একটি গানে :

ওলো সুন্দরি ! কার কথায় করাছো তুমি মন ভারি।
আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি।
কার কথায় করাছো তুমি মন ভারি ॥ ...
তুমি আমার রৌদ্রের ছাতা, শীতের কাথা, মশার মশারি।
তুমি আমার রসে ভরা রসগোল্লা, তুমি আমার ডালপুরি।
কার কথায় করাছো তুমি মন ভারি ॥

সমকালের প্রাত্যহিক জীবনকে স্পর্শ করে আছে পুতুলনাচ ও গান।

ফেরিওয়ালা ফেরি করতে করতে গান করে। আবার ফকির-বৈরাগী গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বাওয়ালীরা মধু সংগ্রহ করতে জঙ্গলে প্রবেশের মুখে বাঘবন্ধনের মন্ত্র উচ্চারণ করে। হাতিখেদার গান হাতি ধরার উদ্দেশ্যে রচিত ও গীত হয়। পেশার সঙ্গে রয়েছে এসব গানের নিবিড় সম্পর্ক। কর্ম ও জীবিকা উপলক্ষেই এ গান গাওয়া হয়, অন্য উপলক্ষে নয়। খেমটা নাচ ও গান ব্যবসায়বৃত্তির সঙ্গে জড়িত; এ উদ্দেশ্যে নাচনী দল আছে; এরা বাঈজীর গ্রামীণ সংস্করণ। প্রধানত নপুংসকেরা এ ধরনের নাচ-গান করে জীবিকা অর্জন করে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, লোকোৎসব ইত্যাদিতে নাচনীরা বা খেমটাওয়ালারা আমন্ত্রিত হয়ে যায় এবং নাচ-গান করে দর্শকের মনোরঞ্জন করে। গানের বিষয় লঘু রঙ্গরসাত্মক ও অশ্লীল হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম খেমটা গানের প্রধান বিষয়। চট্টগ্রামে একটি 'সাম্পান মাঝির গানে' গণচেতনা ও জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে :

কর্ণফুলি উজানে
কে কে যায় রে তোরা আমার সাম্পানে ॥
কর্ণফুলির উজানেতে চন্দ্রঘোনা আছে,
পাকিস্তান সরকার সেথায় পেপার মিল কইরাছে।
সেই মিলেতে কাগজ বানায় পাহাড়িয়া বাঁশবনে ॥—চট্টগ্রাম

চটকা, নাটুয়া, বোলান, লেটো, হাবু ইত্যাদি গানে রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অশ্লীলতা আছে। এছাড়াও আলকাপ, কবির লড়াই, খেমটা, মেয়েলি গীত, সারি, ঘাটু ইত্যাদি গানও অংশত ব্যঙ্গরসাত্মক। মূলত মনোরঞ্জনই এ ধরনের গানের উদ্দেশ্য। গ্রামজীবনের অভাব-অনটন, দুঃখ-শোক, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার মধ্যেও হাসির ঈষৎ রেখাটি যে বিলীন হয়ে যায় নি এসব গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অবৈধ ও পরকীয়া প্রেম, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও ঠাট্টা-মস্করার পাত্রকে অবলম্বন করে হাস্যরসের গানগুলি রচিত হয়।

১. চট্কা

আমার বাড়ী ছাড়িয়া কোথা যান,
দোহাই আল্লার মোর মাথা খান।
কাল মুরগীটা ওমন বইস্যাছে।
ক্ন্যা আশা দিলি, ভরসা দিলি,
কলার মোথাত মোক বসাইয়্যা থুলি,
সারা রাইত মোক মশা কামড়াইয়াছে ॥—কোচবিহার

২. নৌকা বাইচের গান

তোরা বাওরে বাও-
রঙীন বাঁশের বৈঠারে মাধব নাইয়ার নাও ॥
উড়িয়া যায় শুয়া পাখী তার পায়ে নেপুর
মাথাত থাবরাইয়া কান্দে বৈরাগী ঠাকুর ॥—সিলেট

৩. মেয়েলি গীত

নয়া দামান আইন্যাছে মিঠাই পঞ্চ দিনের বাসি রে,
মিঠাইর মধ্যে মশা মাছি উড়েরে ॥
নয়া দামান আইন্যাছে শাড়ি পঞ্চ সিকি দাম রে
শাড়ির মধ্যে ভাইয়াব্যাঙ নাচে রে ॥
দামানের মায়ের ক্ষীর খাইয়া
ওলা ভোলা হাসে রে,
এক সের দুধে দশ সের দিছে পানি রে ॥—টাঙ্গাইল

৪. পাট কাটার গান

ষাইট বছর বয়সে নানার মাজ্জায় হইছে বাত।
তবু নানার কথা যেমন ম্যাগে বজ্রপাত ॥

ষাইট বছর বয়স তোমার দন্ত হইছে লুড়া।
ধলা চুলে নানা আমার কবে হইছে বুড়া ॥
ওগো ও সুন্দর নানা শোন মন দিয়া।
এই পাট বেচিয়া তোমার দিমু এক খান বিয়া।
সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত ॥—টাঙ্গাইল

৫. কবির গান

চাপান : এই দুইটা পুলাপান, এদের সাথে কিসের গান।
এরা গানের কি জানে, আসরে উইঠ্যা গল টানে ॥

উতোর : আমরা পুলাপান কি জানি,
জোয়ানের কাম, বুড়ার কেবল হাতানি
আমরা পুলাপান কি জানি ॥—ময়মনসিংহ

সাময়িক উত্তেজনা ও লঘু রসিকতা এসব গানের মৌলিক আবেদন। সাধারণ মানুষের রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা এসব গানে মূর্ত হয়ে আছে।

মিশ্র ভাব ও বিষয় নিয়ে রচিত গানগুলি লোকসমাজে আজও প্রচলিত আছে। কবিগানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ক কাহিনী বা সমস্যাদি স্থান পায়। দাঁড়া কবি গানে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবিত বিষয় আলোচিত হয়। কবিয়াল স্বভাবকবি, দুই দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ধারায় কবির লড়াই চলে। কবিয়াল কবিতার ভাষায় ছন্দ ও সুর সংযোগে অনর্গল বলে যেতে পারেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি ধর্মীয় ও নীতিবিষয়ক হয়ে থাকে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমাখ্যানকে 'সখীসংবাদ', শ্যামার ভক্তিমূলক গানকে 'ভবানী বিষয়' বলে।[৭] উনিশ শতকে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে কবিগানের উৎপত্তি হয়। পরে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কবিগানের 'খেউড়' অংশ আদি রসাত্মক; এতে রুচির কোন বালাই থাকে না। 'খিস্তি-খেউড়' কথাটির সেখান থেকেই উৎপত্তি। কবিগান ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর, বাদ্য ও ভঙ্গী সংযোগে একটি সাঙ্গীতিক আবহ সৃষ্টি করে। শ্রোতৃগণ সারারাত ধরে তা শুনে মুগ্ধ হয় ও আনন্দ উপভোগ করে।

মেয়েলি গীত নারীসমাজের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিচিত্র ভাব-আলেখ্য। কন্যা-জায়া-জননীরূপে পরিবারে নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে সংসারতরঙ্গে যে ভাবলীলা উত্থিত হয়, মেয়েলি গীতে মেয়েলি কণ্ঠে তার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে। কুমারীজীবন, বিবাহিত জীবন ও সংসারজীবনের সুখ-দুঃখের নানা ঘটনা ও বিচিত্র ভাব নিয়ে মেয়েলি গীত রচিত হয়। বিবাহ

৭. *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি*, ২২৯।

উপলক্ষে রচিত মেয়েলি গীতের সংখ্যা সর্বাধিক। 'কনে দেখা' থেকে শুরু করে বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান 'ফিরানী' পর্যন্ত বিবাহের সর্বস্তরের আচার-অনুষ্ঠানে গীত গাওয়া হয়। পুরো বিবাহের আয়োজনটা মেয়েলি আচার এবং মেয়েলি গীত দ্বারা মালাকারে বেষ্টিত। ঢেঁকি যাঁতা, পাটা ইত্যাদিতে কাজ করে ও গীত গেয়ে পল্লীরমণী সারারাত কাটিয়ে দেয়। গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, খৎনা, কান ফোটান, সখি পাতান ইত্যাদি উপলক্ষে গীত আছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-বিরহ ও নাইয়রকেন্দ্রিক মেয়েলি গীতও আছে। এসব গীতে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ার, আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র ফুটে উঠে; এগুলিতে আধ্যাত্মিকতার বা তত্ত্বের লেশ মাত্র চিহ্ন নেই। "বরের বেটা মারলে চড়, কেঁদে কেটে তারই ঘর।"—এই দর্শনকে সর্বস্ব জ্ঞান করে নারী স্বামীর ঘরে জীবন অতিবাহিত করে। বড় ভাব, বড় চিন্তা গ্রামীণ নারীর সংসারজীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব হয় না। এ কারণে তাদের আচার ও গীতে বস্তুমুখী ও ইহমুখী চিন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

সারি গানের সঙ্গে নদী, নৌকা-মাঝি-মাল্লা, পারাপার ইত্যাদি জড়িত আছে। রাধা-কৃষ্ণ, গৌরী-মেনকা, রাম-সীতা লীলাবিষয়ক পুরাণাশ্রিত গান, নিমাই সন্ন্যাসমূলক ইতিহাসাশ্রিত গান এবং নর-নারীর প্রেম-বিরহমূলক বাস্তব জীবনাশ্রিত গান সারিগানের অন্তর্ভুক্ত। নৌকাবাইচ উপলক্ষে গীত সঙ্গীতসমূহ সারিগানের প্রধান অংশ, তবে সাধারণভাবে দাঁড়-গুণ টানা বা পাল তুলে নৌকা চালানোর সময়ও গান গাওয়া হয়। এতে উদ্দীপনামূলক কর্ম ও দেহতত্ত্বের গান স্থান পায় :

১) শ্যাম কালিয়া তোর পিরীতে মইলাম জ্বলিয়া।
ডিঙ্গা সাজাও মাঝি ভাই যমুনাতে যাই;
কোথা আছে দেইখ্যা আসি নাগর কানাই ॥

২) আবের কাকই কিন্ন্যা দে, সাধের দেওরাইয়ারে
আবের কাঁকই কিন্ন্যা দে ॥
আবের না কাঁকই তাতে চন্দনের ফোটা,
আচড়াইয়া মাথার কেশ করতাম গোটা গোটা ॥

৩) আষাড়িয়া নয়া পানি আইলরে ভাই দেশেতে।
আয় রে ও ভাই আয় রে সবাই আয়রে ডিঙ্গা বাইতে ॥
উথাল পানি উদাস হাওয়া, ঢেউ লাগে তাই অঙ্গেতে।
আইরে ডিঙ্গা বাইতে ॥—টাঙ্গাইল।

৪) মন পবনে বেগ উঠ্‌ঠ্যাছে ভক্তিব বাদাম দেও নৌকায়।
হরি বল নৌকা খোল সাধের জোয়ার যায় ॥

আগের নায়ের মাঝি ভাল,
তরী বাইয়া আগে গেল
গাছের নাইয়া ডাকদ্যা বলে, নাও লাগাইও প্রেমতলায় ।।

এখানে চারটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে; এগুলিতে সারি গানের বিষয়, সুর, তাল ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। গলায় গান এলে ভাবের অভাব হয় না। গান ও জীবন তখন একাকার হযে যায়। সারি গান বাংলার সর্বাঞ্চলীয় ও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত।

গীতিকা (Ballads)

গীতোপযোগী ছন্দোবদ্ধ জীবনালেখ্য গীতিকা নামে অভিহিত। এর কাহিনী মূলত সরলরৈখিক ও পূর্ণাঙ্গ। গায়েন দোহার ও বাদ্যকর সহযোগে আসরে গান করেন, চারপাশে সমবেত শ্রোতা তা শুনে আবেগে ও আনন্দে আপ্লুত হয়। গীতিকা পাঠেরও উপযোগী ঃ একজন পাঠক কাব্যপাঠের জ্ঞান, আনন্দ ও সৌন্দর্য আহরণ করতে পারে। নাটকীয়তা গীতিকার আরো একটি বৈশিষ্ট্য। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে গীতিকার আলেখ্য রচিত হয়। নাটকীয় ঘটনার বর্ণনায় নানা চরিত্রের সংলাপ, ক্রিয়া ও গতি সংবদ্ধ হয়। বিশেষত গায়েন যখন দোহার ও বাদ্যকরের সাহায্যে আসরে ঘুরেফিরে গীতিকা পরিবেশন করেন, তখন গীত-নাচ-অভিনযের সমন্বিত দৃশ্যটি ফুটে উঠে। পরিবেশনের গুণে গীতিকা লোকনাট্যের আমেজ এনে দেয়। পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানীর সংজ্ঞাতেও গীতিকার বিষয় ও রূপাঙ্গিকগত এসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ম্যাক এডওয়ার্ড লীচ বলেন :

> 1. A ballad is narrative. 2. A ballad is sung, 3. A ballad belongs to the folk in content, style and designation, 4. A ballad focuses on a single incident, 5. A ballad is impersonal, the action moving of itself by dialogue and incident quickly to the end.[৮]

পাশ্চাত্য গীতিকা ঘটনাপ্রধান, বাংলা গীতিকা বর্ণনাপ্রধান। এজন্যই পাশ্চাত্য দেশে ছোট ও বড় উভয় প্রকার গীতিকা আছে। আমাদের দেশের গীতিকা দীর্ঘ। দীনেশচন্দ্র সেন *মৈমনসিংহ গীতিকা* (১৯২৩) ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (৩ খণ্ড) প্রকাশ করেন। এগুলিতে সর্বমোট ৫৪টি গীতিকা আছে। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে *মোমেনশাহী গীতিকা* (১৯৭১), *সিলেট গীতিকা* ও *রংপুর গীতিকা* প্রকাশিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দেব *বাংলার লোক-গীতিকথা* (১৯৮৬) প্রকাশ করেছেন। এখানে ৯টি গীতিকা আছে। সেগুলির অধিকাংশ ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত। পুনরাবৃত্তি ও পাঠান্তর বাদ দিলেও গীতিকার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় শতাধিক।

---

৮. *SDFML*, 106.

গীতিকার প্রতিশব্দ হিসেবে 'গাথা', 'পালা' ও 'গীতিকথা' শব্দেরও প্রচলন আছে। *মৈমনসিংহ গীতিকার* অন্তর্গত 'মহুয়া'র চরণসংখ্যা ৭৫৫, 'মলুয়া'র চরণসংখ্যা ১,২৪৭। 'মহুয়া'র কবির নাম দ্বিজ কানাই, 'চন্দ্রাবতীর' কবির নাম নয়ান চাঁদ, 'দেওয়ানা মদিনা'র কবির নাম মনসুর বয়াতি। 'দস্যু কেনারামে'র রচয়িতা চন্দ্রাবতী। কবির নাম থাকলেও রচনার মধ্যে কবির স্বতন্ত্র কবিত্ব নেই। মৌখিক ধারার রচনা বলে এতে এক এক গায়েনের প্রভাব পড়েছে এবং এভাবে তা ব্যক্তির রচনা হয়েও সমষ্টির রচনায় রূপান্তরিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের অন্য অনেক রচনার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞ বলেন :

> After an individual ballad was imposed, then the folk came in. Ballads were oral. The folk took them over. Through the years of singing them the folk modified them, changed them, improved them sometimes, sometimes debased them, but the folk had their way with them, and over the years put their mark upon them.[৯]

গীতিকা লোকসাহিত্যের নবীনতম শাখা। দীর্ঘ কলেবর, নাট্যগীতের মিশ্র কলারীতি ও অন্যান্য শিল্পগুণ লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে লোকগীতিকা অন্তঃমধ্য যুগের রচনা, প্রাচীনযুগের রচনা নয়। তাঁদের ধারণা, দীক্ষিত লোকমানসই কেবল এরকম রচনা সৃষ্টি করতে পারে।

> Most scholars point out that the ballad is certainly the product of a primitive society, that it is highly artful and rather difficult form, that the music is intimately and fundamentally a part of it. All of this would argue for conscious trained authorship.[১০]

প্রধানত সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও নরনারীর সুখ-দুঃখের জীবনালেখ্য লোকগীতিকার কথাবস্তু। 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চনমালা', 'মধুমালা' ইত্যাদির কথাবস্তু রূপকথাধর্মী। বাকি গাথার কাহিনী, চরিত্র, পারিপার্শ্বিকতা বাস্তব। লোককাহিনীর পাত্র-পাত্রীর নাম নেই, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, রাজকন্যা, পরীকন্যা, রাক্ষস, যাদুগিন্নী, সওদাগর, ধোপা, মালিনী, সন্ন্যাসী, পীর-ফকির ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক নামে তারা পরিচিত; তাদের রাজ্য ও আবাসগৃহও আছে, কিন্তু ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই। গাথার অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী ব্যক্তিনামে পরিচিত। তাদের ব্যক্তিত্ব আছে, মনুষ্যত্ব আছে। তাদের রাজ্য ও আবাসের ঠিকানাও আছে। লোককাহিনীর সমাজকাঠামো আদিম সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু লোকগাথার সমাজকাঠামো মধ্যযুগ অতিক্রম করে যায় না।

---

৯. প্রাগুক্ত, 107.
১০. ঐ, 107.

বাংলার মধ্যযুগ ছিল সামন্তশাসিত; সামন্তসমাজের রীতিনীতি, আচার-বিশ্বাস, সঙ্কট-সংঘর্ষ, প্রেম-প্রীতি, ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত-বৃত্তির ভেদাভেদ নিয়ে গীতিকাগুলি রচিত হয়েছে। তবে এখানে ব্যতিক্রমও আছে। মধ্যযুগের শিষ্ট সাহিত্য ধর্মাশ্রিত। লোকসাহিত্যের অনেক শাখার মতো গীতিকাও ধর্মানুশাসন থেকে মুক্ত। বাংলা গীতিকায় নরনারীর বাস্তব জীবনের কথা আছে। এ জীবন মর্ত্যমুখী, বৈরাগ্যপন্থী বা স্বর্গমুখী নয়। *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালাগানে বর্ণিত জীবন ও সমাজ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন :

> এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙ্গালীর ঘরগুলিকে এতটা আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই। এখানে পাষাণ চাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি হয় নাই। এখানে ঘরের জিনিসকে শিকল দিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং রমণীদের জন্য পিঞ্জরা তৈরী হয় নাই।

তাঁর অপর উক্তি :

> এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রসমূহ প্রেমে দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই—চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে।[১১]

সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ ধারণ করেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইহজাগতিকতা, রুচি ও নৈতিকতার গুণে বাংলার গাথাগুলি স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা বহন করে।

পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানী বিষয়ানুসারে গীতিকাগুলিকে নিম্নরূপ ১২টি ভাগে বিভক্ত করেন :

১. অতিলৌকিক কাহিনীমূলক গীতিকা (ballads of the supernatural)
২. ধর্মীয় গীতিকা (religious ballads)
৩. রোমান্টিক বিয়োগান্তক গীতিকা (romantic tragedies)
৪. প্রেমোপাখ্যান (love and sentiment)
৫. রাখালি গীতিকা (pastorals)
৬. গৃহবিবাদ (domestic tragedies)
৭. ঐতিহাসিক গীতিকা (historical ballads)
৮. অপমৃত্যু ও বিপদ (accident and disaster)
৯. দস্যু (outlaws, pirates)
১০. আঞ্চলিক গীতিকা (regional ballads)
১১. লোকনায়ক (folk-hero)
১২. হাসির কাহিনী (humour)।[১২]

---

১১. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), *মৈমনসিংহ গীতিকা,* (কলিকাতা ১৯৫৮, ৩য় সংস্করণ) (ভূমিকা)।

১২. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য,* (ঢাকা ১৯৬৩), ৩০৭-০৮।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা গীতিকাগুলিকে দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন—১. মৈমনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ২. দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা। তাঁর মতে, বৃহত্তর মৈমনসিংহ হলো পূর্ববঙ্গ গীতিকার অঞ্চল আর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার অঞ্চল। 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'চৌধুরীর লড়াই', 'ভেলুয়া', 'কাফোন চোর', 'আয়না বিবি', 'কমল সদাগর', 'নুরুন্নেসা ও কবরের কথা' দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত গীতিকা। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের বাণিজ্যিক পেশা, দুঃসাহসিকতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি এসব গাথায় প্রকাশিত হয়েছে। সে তুলনায় পূর্ববঙ্গ গীতিকার ভাব ও বিষয় অধিকতর মানবিক গুণসম্পন্ন ও মাধুর্যমণ্ডিত। বাংলার এযাবৎ সংগৃহীত সামাজিক, ঐতিহাসিক, অলৌকিক লোকগাথাকে প্রেমমূলক, ধর্মীয়, বীরত্বসূচক, দস্যুতামূলক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সামাজিক ও রূপকথাশ্রিত গাথাগুলি অধিকাংশই প্রেমমূলক। ঐতিহাসিক গাথাগুলি বীরত্বব্যঞ্জক। তিন-চারটি গাথায় দস্যুবৃত্তির নিষ্ঠুরতার কথা আছে। পুরাণ-ইতিহাসমিশ্রিত নাথগীতিকা ধর্মাশ্রিত।

গাথাগুলির মৌলিক বিষয় নরনারীর প্রেম—বিবাহপূর্ব প্রেম, বিবাহোত্তর দাম্পত্য প্রেম, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ প্রেম ইত্যাদি। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ১০টি পালার মধ্যে ৯টি প্রেমমূলক, ১টি (দস্যু কেনারামের পালা) দস্যুতামূলক। প্রেম মানবহৃদয়ের মহৎ, বেগবান, চিরন্তন ও সর্বজনীন অনুভূতি। এ শক্তি সীমাহীন ও দুর্বার, প্রেমের জন্য প্রাণ তুচ্ছ বিবেচিত হয়। নিচে একটি সারণিতে গীতিকাগুলিতে উপস্থাপিত প্রেমের বিচিত্র রূপ, প্রকৃতি ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে :

সারণি ২

গীতিকা	নায়ক-নায়িকা	প্রেম-বিবাহ	প্রতিনায়ক/ প্রতিনায়িকা/ খলচরিত্র	প্রতিবন্ধকতা	পরিণাম
১	২	৩	৪	৫	৬
মহুয়া	মহুয়া (বেদের পালিত কন্যা), নদের চাঁদ (সম্পন্ন জোতদার)	বিবাহপূর্ব অসম প্রেম	সওদাগর ও সন্ন্যাসী	পালক পিতার দলীয় ও ব্যবসায়িক স্বার্থ	বিয়োগান্তক (বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করে মহুয়ার আত্মহত্যা)
মলুয়া	মলুয়া (কৃষককন্যা) চান্দ বিনোদ (কৃষকপুত্র)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	কাজী (সামন্ত প্রতিনিধি)	প্রতিনায়কের পরদারলোলু-পতা ও কামচেতনা	বিয়োগান্তক (মলুয়ার নদীতে আত্মবিসর্জন)

১	২	৩	৪	৫	৬
চন্দ্রাবতী	চন্দ্রাবতী (ব্রাহ্মণকন্যা), জয়ানন্দ (ব্রাহ্মণপুত্র)	সমস্তরে বিবাহপূর্ব প্রেম	যবনকন্যা (বিধর্মী)	জয়ানন্দের প্রতারণা ও ধর্মান্তর গ্রহণ	বিয়োগান্তক (জয়ানন্দের নদীতে আত্মবিসর্জন)
কমলা	কমলা (জোতদারকন্যা), প্রদীপকুমার (জমিদারপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	কারকুন (কর্মচারী)	কারকুনের ব্যর্থ প্রেম ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা	মিলনাত্মক
দেওয়ান ভাবনা	সুনাই (ব্রাহ্মণ-কন্যা), মাধব (ব্রাহ্মণপুত্র)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	দেওয়ান (সামন্ত প্রতিনিধি)	দেওয়ানের পরদার-লোলুপতা	বিয়োগান্তক (বিষপানে সুনাই-এর আত্মহত্যা)
রূপবতী	রূপবতী(রাজকন্যা). মদন (গৃহভৃত্য)	অসম বিবাহ	নবাব (সামন্ত প্রভু)	নবাবের রূপজ মোহ ও ভোগবাসনা	মিলনাত্মক
কঙ্ক ও লীলা	লীলা (ব্রাহ্মণকন্যা' কঙ্ক (পালিত চণ্ডালপুত্র)	বিবাহপূর্ব অসবর্ণ প্রেম	-	পিতা গর্গের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার	বিয়োগান্তক (বিরহ- যাতনায় লীলার মৃত্যু)
দেওয়ানা মদিনা	মদিনা(কৃষক-কন্যা), দুলাল (দেওয়ানপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	-	ভ্রাতা আলালের বংশীয় আভিজাত্য-চেতনা	বিয়োগান্তক (বিরহ -যাতনায় মদিনার মৃত্যু)
কাজল রেখা	কাজলরেখা (সওদাগরকন্যা), সূচরাজা (রাজপুত্র)	অসবর্ণ বিবাহ	কঙ্কণ দাসী	প্রতিনায়িকার প্রতারণা	মিলনাত্মক
ধোপার পাট	কাঞ্চনমালা (বণিককন্যা), জমিদারপুত্র	সমস্তরে বিবাহ	রুক্মিনী	প্রতিনায়িকার ঈর্ষাকাতরতা ও প্রতারণা	বিয়োগান্তক (কাঞ্চনমালার নদীতে আত্মবিসর্জন)

১	২	৩	৪	৫	৬
মৈষাল বন্ধু	সাজুতী (মহাজন-কন্যা), ডিঙ্গাধর (কৃষকপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	মঘুয়া ও কাঙ্গু রাজা (সামন্ত প্রভু)	বণিক মঘুয়া ও কাঙ্গুরাজার রূপজ মোহ ও কাম-প্রবৃত্তি	মিলনাত্মক
ভেলুয়া	ভেলুয়া (মহাজন-কন্যা), মদন (বণিকপুত্র)	বিবাহপূর্ব প্রেম ও বিবাহ	আবু রাজা (সামন্ত প্রভু)	প্রতিনায়কের রূপজ মোহ ও কামপ্রবৃত্তি,	মিলনাত্মক
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান	সখিনা (রাজকন্যা), ফিরোজ খাঁ (রাজা)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	-	পিতা উমর খাঁর প্রতিহিংসা-বৃত্তি	বিয়োগান্তক (স্বামীর তালাকনামা পেয়ে সখিনার আকস্মিক মৃত্যু)
মাঞ্জুরমা	মাঞ্জুরমা (গৃহস্থ-কন্যা), মনির ওঝা (বেদে)	বয়সগত বিসম বিবাহ	তরুণ হাসেন	প্রতিনায়কের সঙ্গে গৃহত্যাগ	বিয়োগান্তক (বৃদ্ধ মনিরের নদীতে আত্মবিসর্জন)
আয়না বিবি	আয়না বিবি (অনাথ কন্যা), মাসুদ উজ্জাল (সওদাগর পুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	--	মিথ্যা অপবাদ ও অবিচার	বিয়োগান্তক (আয়না বিবির আত্মহত্যা)
শ্যামরায়	ডোমকন্যা, শ্যাম রায় (রাজপুত্র)	অসবর্ণ পরকীয়া প্রেম ও বিবাহ	গাবর রাজা (সামন্ত প্রভু)	প্রতিনায়কের রূপতৃষ্ণা ও যৌনলালসা	বিয়োগান্তক (যুদ্ধে নিহত স্বামীর চিতায় সহমরণ বরণ)
শীলা-দেবী	শীলা (রাজকন্যা), রাজপুত্র	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	মুণ্ডা দস্যু	মুণ্ডার রূপজ মোহ ও কামপ্রবৃত্তি	বিয়োগান্তক (যুদ্ধে রাজ-পুত্রের মৃত্যু)
মুকুট রায়	রাজকুমারী, মুকুট রায় (রাজপুত্র)	সমস্তরে প্রেম ও বিবাহ	-	-	মিলনাত্মক

১	২	৩	৪	৫	৬
বগুলার বারমাসি	বগুলা (রাজকন্যা), বণিকপুত্র	অসবর্ণ বিবাহ	প্রণয়বঞ্চিত রাজপুত্র	প্রতিনায়কের রূপজ মোহ ও পরকীয়া প্রেম	মিলনাত্মক
ফুল-কুমারী	ফুলকুমারী (কৃষককন্যা), সোনামিয়া (জমিদারপুত্র)	অসম প্রেম ও বিবাহ	পরিবারের আভিজাত্যের গৌরব চেতনা	বিয়োগান্তক (বিরহ যন্ত্রণায়) প্রথমে নায়ক ও পরে নায়িকার মৃত্যু	

সারণিতে উল্লেখিত ২০টি গাথার মধ্যে ১৯টি গাথা *মৈমনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* থেকে সঙ্কলিত। গাথাগুলিতে নায়ক-নায়িকা বর্ণ-বিত্ত-কুল-ধর্মের দিক থেকে কেউ সমস্তরের ও কেউ অসমস্তরের। পরিণত বয়সে বিবাহ বা বিবাহপূর্ব প্রেম গাথা ছাড়া অন্য কোন রচনায় দুর্লভ। নায়ক-নায়িকার প্রেমে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামন্তপতি, সামন্ত প্রতিনিধি ও অন্যান্য বলবান ব্যক্তির রূপতৃষ্ণা, প্রণয়বাসনা, কামপ্রবৃত্তি, ভোগলালসার কথা আছে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, উচ্চবর্গের ইন্দ্রিয়াসক্তি, সম্ভোগপ্রিয়তা, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, সমাজের রক্ষণশীলতা, আভিজাত্যের অহঙ্কার, বহুবিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ এসব প্রেমগাথায় স্থান পেয়েছে। সারণির ২০টি গাথার মধ্যে ১২টি বিয়োগান্তক, ৮টি মিলনাত্মক। ভারতীয় কাহিনীতে বিরহ আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই; প্রয়োজনে এমনকি স্বর্গেও মিলন দেখানো হয়েছে। আরবীয়-ইরানী কাহিনী বিয়োগান্তক, সুফিতত্ত্বে আত্মা-পরমাত্মার প্রেম অনন্ত ও অতৃপ্ত। এজন্য কাহিনীকাব্যে নায়ক-নায়িকার মিলন দেখানো হয় নি। গাথাগুলিতে প্রেমের মিলন ও মৃত্যুর বিবরণ সমাজ ও মানবজীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে। এটিও বাংলা গাথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কৃষকপরিবার থেকে শুরু করে ধোপা, ডোম, বেদে, ব্রাহ্মণ, বণিক, জোতদার, রাজপরিবার পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর বিবরণ আছে। এতে কল্পনার আশ্রয় নেই, বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। বিষয় নির্বাচনে লোককবির স্বাধীনতা ও সমাজমনস্কতার কারণে মধ্যযুগের গাথাগুলিকে উপন্যাসকল্প রচনা বলা যায়। মধ্যযুগে ভারতীয় ও আরবীয়-ইরানী কাহিনী অবলম্বনে *ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সতীময়না-লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, সপ্ত পয়কর, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, গুলে বকাওলী* কাব্য রচিত হয়। গাথা রচনার প্রেরণা এসব রোমান্স কাব্য। রোমান্সের অনুসরণে নায়িকার অথবা নায়ক-নায়িকার নামে গাথার নামকরণ হয়েছে। মধ্যযুগেই গাথা রচনার শুরু ও সমাপ্তি, তবে গায়েন কর্তৃক এগুলি পরিবেশন এবং সাধারণ মানুষ কর্তৃক উপভোগ পরবর্তী যুগে অনেকাংশে হ্রাস পেলেও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

ময়মনসিংহে বোড়ো, হাজং, কোচ আদিবাসী বসবাস করে; তাদের ঐতিহ্য মাতৃতান্ত্রিক। পূর্ববঙ্গের গীতিকার নায়িকারা প্রেমের প্রকাশে ও পাত্র নির্বাচনে যেরকম স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছে তাতে মাতৃতান্ত্রিকতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। সকালে উঠে যার মুখ দেখবেন, তার হাতে কন্যা সমর্পণ করবেন 'রূপবতী' পালার রাজা রামচন্দ্রের এমনি অভিপ্রায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী; অতএব পাত্র নির্বাচনে পিতা ছিলেন নিঃশঙ্ক। রূপবতী পালায় এ-চেতনাই প্রস্তরীভূত (crystalised) হয়ে আছে। 'মানিকচন্দ্রের গানে' মা ময়নামতী মন্ত্রগুণী; সে মন্ত্রের সাহায্যে সতীত্ব পরীক্ষায় (chastity test) উত্তীর্ণ হয়েছে ও অন্যান্য বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এতে প্রাচীন যাদুবিশ্বাস ও সংস্কারই আছে। 'ভারইয়া রাজার কাহিনী'তে ভারইয়া রাজা ও বীরসিংহের মধ্যে মন্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে এ যুদ্ধ হতো দ্বৈত, এমনকি রাক্ষসের বিরুদ্ধে নায়ক যুদ্ধ করে বাহুবলে শত্রু নিধন করে জয়ী হয়।

অধিকাংশ প্রেম-পরিণয়ে ধর্ম-বর্ণ-বিত্তে অসম স্তর লক্ষ্য করা যায়। পল্লীকবিগণ এসব গাথা রচনা করে সামাজিক উদারতা ও বৈপ্লবিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। লীলার প্রেমলীলা পিতা গর্গ সমর্থন করেন নি ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের কারণে। অনুলোম বিবাহ সমাজ মেনে নেবে না। প্রতিলোম বিবাহও সমাজ মেনে নেবে না বলে ডোমকন্যার সাথে শ্যাম রায়ের প্রেম বিবাহের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করে নি। ডোমকন্যার মুখ দিয়ে কবি বলেন, "ছোটর সঙ্গে বড়র পীরিত বড়র জাতি যায় রে বন্ধু।" 'ধোপাব পাটে' ধোপাকন্যা কাঞ্চনমালা ও জমিদারপুত্রের প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। আভিজাত্যচেতনা থেকেই জমিদারপুত্র জমিদারকন্যা রুক্মিনীর পাণিগ্রহণ করে; বাল্যপ্রণয়ী কাঞ্চনমালাকে প্রত্যাখ্যান করে। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কাঞ্চনমালার পিতা বলেন, "বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত হয় অগঠন।" আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার কারণে দেওয়ানপুত্র দুলাল স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে। সে পুত্রকে বলেছে, "অসম্মানি অইবাম আমি তোমরারে লইয়া।" মদিনা কৃষককন্যা, ধনী ও উচ্চ দেওয়ানপরিবারে তার স্থান নেই। দুলাল মদিনাকে তালাক দেয়। 'ফুলকুমারী গাথা'র ফুলকুমারী কাজেম পাটনীর মেয়ে, জমিদারপুত্র সোনা মিয়া প্রণয়াসক্ত হয়ে বিবাহ করতে চাইলে বংশের অমর্যাদার কথা ভেবে মা বাধ সাধেন, সোনা মিয়া বিরহযন্ত্রণা ভোগ করে প্রাণ বিসর্জন দেয়। ফুলকুমারী তা জানতে পেরে উন্মাদিনী হয়ে যায়। এর পরিণাম বিয়োগান্তক।[১৩]

জয়ানন্দ যবনীকন্যার রূপজমোহে ধর্মান্তর গ্রহণ করলে বাল্যপ্রণয়ী চন্দ্রাবতী তাকে প্রত্যাখ্যান করে, পরবর্তী সময়ে অনুতপ্ত জয়ানন্দ প্রেমভিক্ষা করেও ক্ষমা পায় নি। কেননা, "অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার/যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।" এ সংস্কার

---

১৩. প্রাগুক্ত, ২৯৯-৩০০।

ধর্মভেদের। চন্দ্রাবতী ও বংশীদাস ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ; চন্দ্রাবতী 'রামায়ণ' এবং বংশীদাস 'মনসাভাসান' রচনা করেন। তাঁরা ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। বংশীদাসের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার 'যবনী'কে ক্ষমা করতে পারে নি, কিন্তু অবিবাহিত কন্যাকে ঘরে রেখেছেন সমাজের চক্ষুকে উপেক্ষা করে। এমনকি, বাল্যপ্রণয়ও সমর্থিত হয়েছে। গাথারচয়িতারা গৌরীদান প্রথার কথা ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। এখানেই তাঁরা বিপ্লব এনেছেন। যাযাবর বেদে সম্প্রদায় অনেক কিছুতে সংস্কারমুক্ত; বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতী স্বাধীনভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। কিন্তু অবাধ মেলামেশা করার এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়। এটা গোত্রচেতনার ফল : স্ব-গোত্রবিবাহ (endogamy) সমর্থন পায়, ভিন্ন গোত্রবিবাহ (exogamy) সমর্থন পায় না। হুমরা বেদে পালিত কন্যা মহুয়ার মনোনীত পাত্র জোতদার নদের চাঁদকে 'দুশ্মন' ভেবেছে; তার মতে 'সুজন খেলোযার' যোগ্যপাত্র। "আমার পালকপুত্র সুজন খেলোয়ার। বিয়া তারে কর কন্যা চলো মোদের সাথ।" দলনায়ক হিসেবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব তার, এর জন্য সে নদের চাঁদকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি।

প্রতিনায়কের ভূমিকায় রাজা, জমিদার, দেওয়ান, কাজি, সওদাগর, সন্ন্যাসী, সরকারি কর্মচারী ইত্যাদি চরিত্রই বেশি এসেছে। তারা অর্থশালী ও ক্ষমতাবান সামন্ত শ্রেণীভুক্ত। তারা ইন্দ্রিয়ের দাস—ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে যুদ্ধ, বলপ্রয়োগ, অপহরণ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, কূটকৌশল সবকিছুবই আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলা লোকগাথায় এ ধরনের চরিত্র এসেছে সামন্ত সমাজে বিরাজমান বাস্তব অবস্থাব কারণেই। গাথাকারগণ শ্রেণীচরিত্র হিসেবে এদের ঠিকভাবেই চিহ্নিত ও চিত্রিত করেছেন।

লোককাহিনী (Folktales)

গল্প শোনা মানুষেব চিরন্তন বাসনা। শিশুরা রূপকথার বিচিত্র গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে, তরুণ-যুবক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে শুনতে অনাস্বাদিত পুলক অনুভব করে, শ্রমজীবী মানুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প শুনে আনন্দ পায় ও কাজের প্রেরণা লাভ করে, পথিক বিশ্রামের সময় গল্প শুনে অবসর যাপন করে, শ্রমণ-যাজক-মোল্লা-পুরোহিত গল্প বলে ধর্মকথা, নীতিকথা প্রচার করে। সকল বয়সের মানুষের জন্য গল্প আছে; গল্পের উপযোগিতাও আছে, আছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা। গল্প মূলত আনন্দ দান করে; চিত্তবিনোদনের ও অবসরযাপনের উৎকৃষ্ট উপায় তা। গল্প ধর্ম-নীতি-জ্ঞান শিক্ষাদানও করে। গল্প গদ্যে রচিত। গল্প বলা হয়; যেকেউ গল্প বলতে পারে; তবে কথকের গল্পের আমেজ ও আকর্ষণ অতুলনীয়। বলার ভঙ্গি দ্বারা কথক গল্পে প্রাণসঞ্চার করে। এক অনুচ্ছেদের ছোট গল্প থেকে শুরু করে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত বলা যায় এমন বড় গল্পও আছে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-অন্তরীক্ষ পর্যন্ত গল্পের

আখ্যানের সীমানা বিস্তৃত; দেব-দৈত্য-জ্বীন-পরী-রাক্ষস খোক্ষস-ভূতপ্রেত-ডাইনী, রাজা-প্রজা, সাধু-সন্ন্যাসী-পীর-ফকির, কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, পশু-পাখী, নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, দিন-রাত্রি অজস্র বিষয় নিয়ে গল্প রচিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই গল্প লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। এ জনপ্রিয়তা এ যুগেও অক্ষুণ্ন আছে। তবে নগরসভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবের ফলে তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে রচিত বর্ণনামূলক গল্পকে লোককাহিনী বলা হয়। ছোট হোক, বড় হোক কাহিনীটি হবে পূর্ণাঙ্গ। একক ও সরলরৈখিক গল্প যেমন আছে, তেমন বিচিত্র শাখাসম্বলিত জটিল গল্পও আছে। বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর গল্প আকারে ছোট এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প বড় হয়। লোককাহিনীতে এক বা একাধিক 'মটিফ' (motif) থাকে। আমেরিকার লোকবিজ্ঞানী স্টিথ থম্পসনের মতে, মটিফ হলো কাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা ঐতিহ্যে বেঁচে থাকার মতো ক্ষমতা রাখে।[১৪] এ উদ্দেশ্যে মটিফের মধ্যে কিছু অসাধারণ এবং আকর্ষণীয় গুণ থাকে। রাশিয়ার লোকবিজ্ঞানী ভ্লাদিমির জে প্রপ একটি লোককাহিনীর অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতার (function) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কাহিনীর ঘটনাসমূহের কর্তা যা করে, তাই ক্রিয়াশীলতা। এই ক্রিয়াশীলতা স্বাধীন ও অপরিবর্তনীয়। গল্পের মৌল কাঠামো এক বা একাধিক ক্রিয়াশীলতা দ্বারা গঠিত হয়।[১৫]

বিশ্বে লোককাহিনীর উপর গবেষণা হয়েছে বেশি; এ বিষয়ে গবেষণার পদ্ধতিও বিবিধ, যথা :

১. তুলনামূলক পদ্ধতি;
২. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি;
৩. নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি;
৪. সমাজতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক পদ্ধতি;
৫. মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি;
৬. রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি।

---

১৪. A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. Stith Thompson, *The Folktales*, (New York 1956), 415.

১৫. Function is understood as an act of a character, defined from the point of view of its significance for the cause of action. Functions of characters serve as stalle, contrast elements in a tale, independent of how and by whom they are fulfilled. They constitute the fundamental components of a tale.

V.J. Propp, *Morphology of Folktale* (University of Texas Press, 1968), 14; মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণপদ্ধতি*, (কলকাতা ১৯৮২), ১২।

এর সঙ্গে লোককাহিনীর শ্রেণীকরণেরও চেষ্টা হয়েছে। ফিনল্যান্ডের লোকবিজ্ঞানী এ্যান্টি আর্নী স্থিথ থম্পসনের সহযোগিতায় বিশ্বের লোককাহিনীকে মোট ২৪৯৯ টি টাইপে (type) বিভক্ত করেন। তাঁদের মতে, জীবজন্তুর গল্পে ১-২৯৯ টি, রূপকথা-ম্যাজিক-রোমাঞ্চের গল্পে ৩০০-১১৯৯টি এবং হাসির গল্পে ১২০০-২৪৯৯টি টাইপ আছে।[১৬] থম্পসনের মতে, টাইপ হলো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী জনশ্রুতিমূলক কাহিনী, যা পূর্ণাঙ্গ কাহিনী হিসেবে পরিবেশিত হয় এবং যার ব্যাখ্যার জন্য অন্য কাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয় না।[১৭]

রাজপুত্র বড় হলে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আকাশপথে উড়াল দিল। জনমানবহীন রাজপুরীর এক কক্ষে এক ঘুমন্ত রাজকন্যাকে দেখলো, সোনার কাঠি-রূপার কাঠি পা-মাথার দিক বদল করে তাকে জাগিয়ে তুললো। রাজপুত্র রাজকন্যার কাছ থেকে রাক্ষসপুরীর ও রাক্ষসহত্যার খবর জানলো। রাজপুত্র কৌশলে পুকুরের তলদেশে কৌটায় রক্ষিত ভ্রমর হত্যা করে রাক্ষস নিধন করলো। অতঃপর সে রাজকন্যাকে উদ্ধার ও বিবাহ করলো এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলো। এ কাহিনীর টাইপ হলো 'রাক্ষসহত্যাকারীর কাহিনী' (টাইপ ৩০০)। এতে একাধিক মটিফ আছে—পাখাওয়ালা পক্ষীরাজ ঘোড়া মটিফ-বি, অজানা-অচেনা রাক্ষসপুরী মটিফ-ই, মন্ত্রপূত সোনার কাঠি, রূপার কাঠি মটিফ-ডি, রাক্ষসদের আত্মার প্রতীক ভ্রমর মটিফ-বি, রাজকন্যাকে বিবাহ মটিফ-টি ইত্যাদি। রাজপুত্রের অজানার উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা, রাক্ষসের আবির্ভাব, রাজপুত্র ও রাক্ষসের দ্বন্দ্বে রাক্ষসহত্যা, রাজকন্যাকে উদ্ধার ও বিবাহ এবং উভয়ের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—এই চারটি হলো ক্রিয়াশীলতা।

পাশ্চাত্যের এবং দেশের সমালোচকগণ বিষয় (theme), বিচারে অর্থ (meaning) ও রূপকল্প (form) বিচারে লোককাহিনীর শ্রেণীকরণ করেছেন। তাঁদের অনুসরণে একটি গ্রহণযোগ্য বিভাগের উল্লেখ নিচে করা হলো :

১. রূপকথা (fairy tale) ;
২. ব্রতকথা (religious tale) ;
৩. রোমাঞ্চকর কাহিনী (novella) ;
৪. বীরকাহিনী (hero tale) ;
৫. সন্তকাহিনী (sage tale) ;

---

১৬. Antti Arne and Stith Thompson, *The Types of Folktales*, (Helsinki 1964); আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*, (ঢাকা ১৯৬৩), ১৮৯-৯১।

১৭. A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale. *The Types of Folktales*, 415.

৬. পুরাকাহিনী (myth) ;

৭. স্থানিক কাহিনী (legend) ;

৮. পশুকাহিনী (animal tale) ;

৯. নীতিকথা (fables) ;

১০. হাস্য-ব্যঙ্গের কাহিনী (humorous tale) ;

১১. ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী (explanatory tale)।[১৮]

বাংলাদেশে প্রায় সব শ্রেণীর লোককাহিনী আছে। নভেলা বা রোমাঞ্চকর কাহিনীর উর্বর ভূমি আরব-পারস্য। 'আলি বাবা ও চল্লিশ চোর', 'হাতেম তাই', 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল', 'আলাউদ্দীনের প্রদীপ' ইত্যাদি কাহিনী *আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা* গ্রন্থ থেকে আগত। 'মধুমালা', 'রূপভান', 'চন্দ্রাবতী' ইত্যাদি দেশীয় কাহিনী। আমাদের দেশে বীরকাহিনীর অভাব আছে। *ধর্মমঙ্গল*-এর নায়ক লাউসেন একমাত্র বীরচরিত্র; তবে এ কাব্যের জনপ্রিয়তা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন রাজপরিবার, রাজবংশ নেই। বাংলার মানুষ যুগ যুগ ধরে শাসিত ও শোষিত হয়েছে। রাজারা বহিরাগত। এজন্য রাজত্বের শেষে রাজবংশ লোপ পেয়েছে। *মনসামঙ্গল*-এর চাঁদ সওদাগর প্রতিবাদী, বিদ্রোহী, নির্ভীক চরিত্র। তাঁর মধ্যে সাফারিং আছে বটে, কিন্তু ডুয়িং নেই, এজন্য বীর হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি নেই। বাংলার লোককাহিনীর নায়ক-নায়িকা দৈব বা অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল, কর্মের উপর নয় অর্থাৎ তারা দৈববলে বলীয়ান, বাহুবলে নয়। ভারতীয় কাহিনীর বৈশিষ্ট্য তাই। ভারতীয় কাহিনীতে রক্ষাকর্তা বা উদ্ধারকারী শক্তি দেবতা; ইউরোপের লোককাহিনীতে ত্রাণকর্তা বা সহায়কশক্তি ধর্মযাজক বা সন্ন্যাসী; আফ্রিকার লোককাহিনীতে এ কাজটি প্রেতাত্মা সম্পন্ন করে।[১৯] দেববাদ, অদৃষ্টবাদ ছাড়াও বাংলার নায়ক-নায়িকা যাদুবিদ্যার উপরও নির্ভর করে। শ্রম বা সংগ্রাম করে কোন কিছু অর্জন করার চেয়ে অলৌকিকভাবে অনায়াসে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তারা। ভোগবাদী কর্মকুণ্ঠ চেতনা থেকে এমন মনোভাবের জন্ম। মন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় এ সম্পর্কে আরো আলোকপাত করা হয়েছে। এটিকে বাংলার মানুষের জাতীয় চরিত্ররূপে চিহ্নিত করা যায়। সুকুমার সেন বলেন, এতে অনার্যের প্রভাব আছে। কোল-মুণ্ডা, সাঁওতালরা দৈব-অদৃষ্ট-যাদুর উপর বিশ্বাসী; তাদের ব্যবহারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক কিছুই এরকম বিশ্বাস-সংস্কার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। গুপ্তধন, পৈত্রিক সম্পদ, দান-যৌতুক, লুণ্ঠন ইত্যাদি উপায়ে আমাদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি; মেধা, বুদ্ধি ও শ্রম দ্বারা অর্জনের আগ্রহ বা ধৈর্য কম।

১৮. *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ৪৪৫-৪৭; লোকসাহিত্য, ১৮৭-৮৯; মুহম্মদ আবদুল হাফিজ, *লোককাহিনীর দিক্-দিগন্ত*, (ঢাকা ১৯৬৮), ৬-১৭।

১৯. *ফোকলোর চর্চায় রূপাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণপদ্ধতি*, ১১।

বাংলা লোককাহিনীতে মানবজীবন ও সমাজের অজস্র ছবি আছে। জাতির অনেক অজানা ইতিহাস এতে প্রচ্ছন্ন আছে, সমাজের সকল স্তরের মানুষ নিয়ে গল্প আছে। তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে এই ইতিহাস বেরিয়ে আসে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, জন্মান্তরবাদ, সতীনবিদ্বেষ, সৎমার ঈর্ষাকাতরতা, সবলের অত্যাচার, ধনীর ধনলিপ্সা, দরিদ্রের দুর্ভোগ, ধন ও বর্ণবৈষম্য, জাতি ও ধর্মভেদ, কৌলীন্যবিচার, দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা, দান-ধ্যান ইত্যাদি বহির্জীবনের ও অন্তর্জীবনের ছবি লোককাহিনীতে পাওয়া যায়। পূর্বের গল্পসারে জনশূন্য রাক্ষসপুরীতে রাজপুত্রের গমন মৃত্যুলোকের অন্ধকারে গমনের প্রতীক, সোনা ও রূপার কাঠি দ্বারা রাজকন্যার নিদ্রা ও জাগরণ জন্ম-মৃত্যুর প্রতীক, রাজকন্যাকে উদ্ধার করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পুনর্জন্মলাভের রূপক—এভাবে ব্যাখ্যা করেন কেউ কেউ।[২০] রাজা হলে সাত রানীর কথা আসে, ছোট রানী রাজার প্রিয়পাত্রী হন, অন্য রানীরা ঈর্ষাবশত তাঁকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলেন, ছোট রানী শেষ পর্যন্ত সফল হন এবং সুখী হন। এতে স্পষ্টতই বহুবিবাহের কথা আছে; বহুবিবাহের কুফলেরও কথা আছে। ছোট রানীর সফল হওয়াটা মটিফ-এল (successful youngest queen)।

ঠাকুরমার ঝুলির লালকমল-নীলকমল গল্পে কনিষ্ঠপুত্রের সফলতার কথা আছে। অপ্রতিশ্রুতিশীল সন্তানও শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য ও বিজয়ী হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। *ঢাকার লোককাহিনীর* অন্তর্গত চূড়ামণি কিস্‌সার সাতটি গল্পের প্রথম গল্পের নায়ক রাজপুত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়; পিতা তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু সে প্রাণে বাঁচে এবং সর্পদংশনে মৃত রাজকন্যাকে জীবিত করে ও বিবাহ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। উভয়ে সাদরে গৃহীত হয়।[২১] তার সাফল্যের মূলে আছে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীকথিত গুপ্তবিদ্যা—গাছের মন্ত্রপূত পাতা খেয়ে রাজপুত্র অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয় এবং অসাধ্য সাধন করে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম গল্পে রাজপরিবারে বাল্যবিবাহের কথা আছে। চূড়ামণি কিস্‌সার ষষ্ঠ গল্পের রাজকন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান করেছে, স্বামী এলে উপপতির প্ররোচনায় তাকে হত্যা করেছে।[২২] এতে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রকারান্তরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও আছে। তবে এ প্রতিবাদ সমাজের কানে পৌছে নি, এ প্রথাও লোপ পায় নি। গল্পে প্রধানত রাজা সরল প্রকৃতির ও উজির কুটিল প্রকৃতির হন। সওদাগর লোভী ও কামুক, মালী-নাপিত লোভী ও দুর্বলচিত্ত, সাধু-সন্ন্যাসী-পীর-দরবেশ সৎ ও অসৎ, জোলা ও জামাতা নির্বোধ, বামুন চতুর হয়।

---

২০. প্রাগুক্ত।

২১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *ঢাকার লোককাহিনী*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮০), ৩-১৯।

২২. ঐ, ৭৩-৮৬।

এর পাশাপাশি পশু-পাখির জগতে অনুরূপ চিত্র ও চরিত্র বর্ণিত হয়। শুক-সারি, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী উপকারী পাখি (benevolent bird), শৃগাল-কাক চতুর প্রাণী, কুমীর-বাঘ বোকা, বক ও মেষ সরল প্রকৃতির জীব। জীবজন্তু বিষয়ক গল্পে এ ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। চতুর কাক কলসীতে নুড়ি ফেলে তলার পানি পান করতে সক্ষম হয়। আবার যে কাক চড়ুই-এর বুকের মাংস খেতে চেয়েছিল, সে শেষ পর্যন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। এ হলো হিংসার পরিণাম—এ গল্পের এটাই নীতিশিক্ষা। প্রথম গল্পের শিক্ষা হলো—"ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।" পশু-পাখি সংক্রান্ত সকল গল্পেরই কোন না কোন উপদেশ বা নীতিকথা আছে। ক্ষুদ্র ইঁদুর জাল কেটে বন্দি সিংহকে মুক্ত করে—এটি পরোপকারের দৃষ্টান্ত। বাঘের গলার কাঁটা তুলে বক রেহাই পায় নি, তার আক্রমণে প্রাণ হারায়—এটা হলো কৃতঘ্নতা। খাঁচায় বন্দি বাঘকে পথিক ব্রাহ্মণ মুক্ত করে বিপদে পড়ে, কিন্তু পণ্ডিত শৃগালের চতুরতায় সে রক্ষা পায়, বাঘ খাঁচায় পুনরায় বন্দি হয়—অকৃতজ্ঞ এভাবেই শাস্তি পায়। নিরীহ মেষশাবককে বাঘ স্রোতের উজানের পানি ঘোলা করার অজুহাত দেখিয়ে ভক্ষণ করে।—এ হলো দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। হাঁস সোনার ডিম দেয়, এক সঙ্গে অধিক ডিমের লোভে মালিক হাঁস হত্যা করে সব হারায়—এটি লোভীর শাস্তি। সৎ কাঠুরিয়া সত্য কথা বলে জলদেবতার কাছ থেকে উপহার স্বরূপ নিজের লোহার কুঠারসহ রূপার ও সোনার কুঠার লাভ করে, কিন্তু লোভী ও অসৎ কাঠুরিয়া মিথ্যাচরণ করে সবই হারায়। 'কাঠুরিয়া ও কুঠার' গল্পের উপদেশ হলো "সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয়।" এভাবে বিচার করে দেখা যায়, লোকগল্পের জনশিক্ষামূলক তাৎপর্য আছে। বাংলার লোককাহিনীর এটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নিছক গল্পরস আস্বাদনের জন্য সারা রাত জেগে লোকে কাহিনী শোনে না, নীতি-উপদেশ-জ্ঞান শিক্ষালাভও করে থাকে।

রাজনীতিবিদ,ধর্মবেত্তা এবং শিক্ষকগণ নিজ নিজ বক্তব্যের অনুকূলে আজও নানা গল্পের অবতারণা করেন নিজের যুক্তিকে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। মাটির নিচে সোনা আছে, খুঁড়লে তা পাওয়া যায়—এই উপদেশ দিয়ে 'কৃষক ও কঞ্চি' গল্পের বৃদ্ধ চাষী নিজ সন্তানদের কৃষিকাজে প্ররোচিত করে। অবিচল এবং সনিষ্ঠ থেকে মন্থর গতিসম্পন্ন হয়েও কচ্ছপ খেয়ালি ও অহঙ্কারী দৌড়বিদ খরগোসকে পরাভূত করে। নিষ্ঠা সাফল্যের চাবিকাঠি, গর্ব পতনের মূল—এ শিক্ষাই 'কচ্ছপ ও খরগোস' গল্পে প্রচার করা হয়। গল্পের আসরে একজন মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবনের সমস্যা, সঙ্কট, সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করে আনন্দের জগতে প্রবেশ করে এবং নতুন করে বাঁচার প্রেরণা ও জীবনীশক্তি সঞ্চয় করে। মায়ের উপদেশ মতো ছেলে শ্বশুরবাড়িতে খেতে বসে শাশুড়ীর কথা উপেক্ষা করেও অল্প খায় এবং গভীর রাতে ক্ষুধার তাড়নায় রান্নাঘরে গিয়ে অন্ধকারে চুরির অপরাধে মার খায়। এ হলো বোকা জামাই-এর গল্প। অপর এক বোকা জামাতা রাজকন্যাকে বিয়ে করে; সে

মশারির মধ্যে প্রবেশের কৌশল জানে না, তাই মেঝেতে শুয়ে সারারাত কাটিয়ে দেয়। এসব গল্প নির্মল আনন্দ দেয়। অশ্লীল ও ভাঁড়ামিপূর্ণ গল্পও আছে। গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলি ভাঁড়ামিতে ও ব্যঙ্গরসে পূর্ণ। এগুলিও সাধারণ মানুষকে আনন্দের খোরাক জোগায়। গল্পরস, হাস্যরস ও নীতিশিক্ষার কারণে লোককাহিনীর আবেদন ও আকর্ষণ সমকালের প্রজন্মের কাছেও অম্লান হয়ে আছে।

লোকনাট্য (Folk-dramas)

আধুনিক নাটকের সংজ্ঞায় লোকনাট্যের কোন একক বা অভিন্ন ধারা নেই : উন্মুক্ত বা ঈষৎ আচ্ছাদিত আসরে নাচ, গান, বাদ্য, সংলাপ, অভিনয় সহযোগে লোকমনোরঞ্জক ও লোকশিক্ষামূলক নানা বিষয় পরিবেশিত হয়, যেমন ভাসান, যাত্রা, পালাগান, ঘাটু, গম্ভীরা, আলকাপ, কবিগান, পুতুলনাচ ইত্যাদি। এগুলির কোনটিতে গানের প্রাধান্য, কোনটিতে নাচের প্রাধান্য, আবার কোনটিতে অভিনয়ের প্রাধান্য। বিষয়, আঙ্গিক, পরিবেশনরীতি ও সময়স্থিতির দিক দিয়েও একটি থেকে অপরটির পার্থক্য আছে। স্থূলভাবে বিচারে এগুলিকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে স্পষ্টতই কোন অভিন্ন সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যায় না। আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি সহজ সরলরৈখিক সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—"গ্রামীণ সমাজে জনসাধাবণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য।" একজন গবেষকের অভিমত—"লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী-আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি সহজ সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীত, নৃত্য এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজু দৃঢ় ভাবভঙ্গীর দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ করা হয় তাই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য।" দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি প্রধানত 'যাত্রা'র কথা স্মরণে রেখে লেখা। লোকনাট্যের অন্য ধারায় এর সব লক্ষণ বিরাজ করে না।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, কাল্পনিক ও লৌকিক বিষয় এবং হাস্যকৌতুক নানা বিষয় নিয়ে এক এক ধারার লোকনাট্য রচিত হয়। যাত্রার বিষয়বৈচিত্র্য বেশি; কুশীলব, সংলাপ, অভিনয় সমন্বিত নাটকীয়তাও বেশি। পুরাণ, ইতিহাস, লোককাহিনী ও পালাগানভিত্তিক যাত্রা দেশের প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। আলকাপে পৌরাণিক ও সামাজিক উভয় বিষয় স্থান পায়। যাত্রার মতো আলকাপ সারারাত্রি ধরে চলে। আলকাপ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত। নাচ-গান-বাদ্য দিয়ে তা দীর্ঘায়িত করা হয়। গম্ভীরা মূলে শিব-শিবানীর গার্হস্থ্য জীবনের আলেখ্য ছিল। শিবের গাজন উপলক্ষে তা অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে গম্ভীরা সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, পরিবার যেকোন বিষয় নিয়ে রচিত হয় এবং 'নানা-নাতি'র ভূমিকায় নাচ-গান-বাদ্য-সংলাপ সহকারে পরিবেশিত হয়। ব্যঙ্গ-কৌতুক এর মুখ্য

রস। এটি একাঙ্কিকা নাটকের মতো, স্বল্পায়তনে স্বল্প সময়ে শেষ হয়। রাজশাহী-মালদহ জেলায় গম্ভীরা প্রচলিত। যাত্রা ও আলকাপ থেকে গম্ভীরার এখানেই পার্থক্য। প্রধানত আলকাপ ও গম্ভীরা গানরূপেই আঞ্চলিকভাবে পরিচিত। লোকমনোরঞ্জক ঘাটু মূলত গীতিনাট্য। গায়েন ও দোহার গান করে, আর 'ঘাটু' নামে বালক কিশোরীবেশে নাচে, বাদক বাজনা বাজায়; নৌকার পাটাতনে আসর বসে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা গান ও নাচের মাধ্যমে রাতভর অভিনীত হয়। আলকাপেও 'ছোকরা' নামে তরুণ যুবক যুবতীবেশে নাচ-গান করে। উভয়ের বিষয়বস্তুতে ও পরিবেশনায় অশ্লীলতা আছে, এইজন্য উভয়ের আসর লোকালয়ের বাইরে বসে। এদিক থেকে যাত্রা ও গম্ভীরা ভিন্নধর্মী—ছোটবড় নারীপুরুষ একত্রে বসে এগুলি উপভোগ করে। ঘাটু ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত। ভাসানের বিষয় বেহুলা-লক্ষীন্দরের জনপ্রিয় কাহিনী; 'ভাসানযাত্রা' নামেও এর পরিচয় আছে। ভূমিসমতল বৃত্তাকার মঞ্চে গায়েন পদ্ধতিতে এটি অভিনীত হয়।

কারবালার বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত জারি গান নৃত্য, বাদ্য, অভিনয় সহযোগে পরিবেশিত হয়। জারি গানের স্থান দরগাহ। মোহররম উপলক্ষে দশ-বারো জন তরুণ যুবক জারিদল গঠন করে এবং বৃত্তাকারে নেচে নেচে গান করে। একজন মূল গায়েন থাকে, অন্যরা দোহার হিসেবে ধুয়া গায় ও হাততালি দেয়। কারবালার কাহিনীকে ইমামচুরি, জয়নাবের বিলাপ, সখিনার বিবাহ ও বিলাপ, জয়নাল উদ্ধার ইত্যাদি পালায় বিভক্ত করে পরিবেশন করা হয়। জারির কথায় ও গানে, ভাবে ও ভাষায় ইসলামী ভাব সম্পূর্ণ বিরাজ করে। মুসলিম সম্প্রদায় এর উদ্ভাবক ও অনুশীলক। অভিনয়গুণের জন্য জারি গানকে রংপুরে 'জারিযাত্রা' বলা হয়।[২৩]

পুতুলনাচ লোকনাট্যের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। পুরাণ, লোককথা ও সমাজ-আশ্রিত যেকোন কাহিনীকে পুতুলের অভিনয় দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়। পুতুলের অঙ্গভঙ্গি সুতার সাহায্যে সূত্রধর এবং সংলাপ-সঙ্গীত কথক-গায়ক দ্বারা সম্পন্ন হয়। নেপথ্যে থেকে বাদ্যকর বাজনা বাজায়। এসব কারণে পুতুলনাচের জন্য বিশেষ ধরনের মঞ্চ ও মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হয়।

গীতাভিনয় সম্বলিত পালাগানকেও লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক জনপ্রিয় আখ্যান নিয়ে পালাগান রচিত হয়। বাইদ্যানীর পালা, গাজীর পালা, বনবিবির পালা, সখিনার পালা মূল গায়েন, দোহার, বাদক সহযোগে আসরে পরিবেশিত হয়। পালাগান বিষয়-রস-রুচির দিক থেকে উন্নত মানের রচনা। সকল স্তরের নর-নারী দিনের প্রকাশ্য আসরে এ ধরনের লোকনাট্য উপভোগ করে।

---

২৩. *লোকসাহিত্য সংকলন*, ১৮শ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা ১৯৮১), দশ (ভূমিকা)।

মঞ্চে বা আসরে লোকনাট্যের উপস্থাপনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি স্তর থাকে : এক. মূল কাহিনীর পূর্বস্তর—যথা প্রস্তাবনা, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, বন্দনা। দুই. মূল কাহিনীর অভ্যন্তরীণ স্তর—যথা অভিনয়, নৃত্য, গীত, কথা ও সংলাপ, বাদ্য, সঙ বা ভাঁড় ইত্যাদি। দলের প্রধান সরকার বা সূত্রধর শুরুতে আসরে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাবনা আকারে পালা-আখ্যান-কাহিনী সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করেন। তিনি অন্তর্ধান করলে বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান শুরু হয়; বাদকগণ মঞ্চে প্রকাশ্যে অথবা পাশে অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর সূত্রধর, দোহার ও নর্তক এসে দেব-দেবী, গুরু-জ্ঞানীগুণীর বন্দনা করেন। মূল কাহিনীর অভিনয়ে নাচ, বাদ্য ও সঙ আসে দর্শককে বিশ্রাম (relief) দেয়ার জন্য। রাম-সীতা, অর্জুন-দ্রৌপদী, রাধা-কৃষ্ণ, নিমাই সন্ন্যাস, বেহুলা-লক্ষীন্দর, ঈসা খাঁ দেওয়ান, ফিরোজ দেওয়ান, জয়নব-হাসান, সখিনা-কাসেম, হানিফা-জয়গুন, হাতেম তাই, রহিম বাদশা, রূপবান, বাইদ্যানী, কাজলরেখা ইত্যাদি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে লোকনাট্য রচিত ও পরিবেশিত হয়। বাংলার গ্রামে নর-নারী সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, অত্যাচার-পীড়ন, সংগ্রাম-বিরোধ, প্রেম-স্নেহ, লোভ-লালসা, ভোগ, যৌনতা-মিশ্রিত এসব কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়, দেব-দানব-নর-পরী, পশু-পাখি, যাদু-তন্ত্র-মন্ত্রের কাহিনী থেকে জীবনের বিচিত্র রূপের পরিচয় লাভ করে, বিচিত্র আবেগ-অনুভূতি-রসবোধের দোলায় আন্দোলিত হয়। কোন কোন কাহিনী থেকে তারা নীতি-উপদেশ শিক্ষা পায় : পাপে মৃত্যু, পুণ্যের জয় অথবা সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় অথবা অহঙ্কার পতনের মূল অথবা যে সহে সে রহে ইত্যাদি।

লোকনাট্যসংগ্রহ ও সঙ্কলনের অভাব আছে। বাংলা একাডেমীর *লোকসাহিত্য সংকলনে* (১৮শ খণ্ড) 'জারিযাত্রা' শিরোনামে কারবালার বিষাদময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি লোকনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। এটি রংপুর থেকে সংগৃহীত। এর মূল সংলাপ গদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে গান আছে। গানগুলি ঘটনাভিত্তিক, কাহিনীকে গতিশীল করে। আলকাপে গান আসে দর্শক-শ্রোতাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য, যাত্রার সঙের ভাঁড়ামিপনাও বিশ্রাম দেয়ার জন্য আসে। এদিক থেকে 'জারিযাত্রা'র গান মূল কাহিনীর প্রাণস্বরূপ, গম্ভীরার গানও আখ্যানের সাথে একাত্ম। আখ্যান ও গানকে আলাদা করা যায় না। উল্লিখিত জারিযাত্রার 'বন্দনা'র অংশবিশেষ এরকম :

পোতমে বন্দনা করি ধরমো নেরোনজন।
তাহারো চরণে হামার হাজারো সালাম ॥
ওত্তোরে বন্দনা করি মাবিয়ার শওর।
সেই জাগাতে বাদশাই করে এজিদ হারামখোর ॥

পশ্চিমে বন্দনা করি পারুজার মোকাম।
সেই জাগাতে তৈয়ার হইলো হাদিস আর কোরান ॥
দইকনে বন্দনা করি কালিদাও সাগর।
সেই সাগরোত ভাসায ডিঙ্গা চাঁদ সদাগব ॥
পুবোতে বন্দনা করি ভানুয়ার ভাস্‌কোর।
অজনি পোভাত হইলে দিন পড়ে নজর ॥...
ওস্তাদ গুরু বন্দি কমৌ জয়নাল মাস্টার নাম ॥
মোন দিয়া শোন সগ্‌গই জারি যাতরার গান ॥[২৪]

পালাগানের বন্দনার কাঠামোটিও অনুরূপ : বলা যায় লৌকিক বন্দনার এটিই মানসম্মত কাঠামো। *মৈমনসিংহ গীতিকার* মহুয়া পালার বন্দনাগীতে অনুরূপ দিগ্‌বন্দনা, সভার শ্রোতৃবন্দনা, গুরু-বন্দনার কথা আছে।[২৫]

বন্দনার মতো যেখানে পূজা-ভক্তি-পবিত্রতা আছে, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্য একত্রে স্থান করে নিয়েছে, কোথাও বিরোধ নেই। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির এটাই আবহমানকালের বৈশিষ্ট্য। মিলন-মিশ্রণের এই স্রোত মূল কাহিনীর মধ্যেও প্রবাহিত। বিশেষজ্ঞ বলেন :

> Mythological gods and goddesses, Sufi pirs and piranis had their share to contribute in enriching the themes. There are always some characters either in the form of mythological god or his representative who would come to the rescue of the honest people who suffer at the hands of the rural oppressors.[২৬]

লোকনাট্যের মানবচরিত্র সম্পর্কে মীরা গাঙ্গুলি বলেন :

> অত্যাচারী রাজা, জমিদার, মনুষ্যত্বহীন ও স্বার্থান্ধ দেওয়ান, নায়েব, অবিচারক সুবিধাবাদী সমাজপতি, ভ্রাতৃদ্রোহী, প্রতিহিংসাপরাযণ, নারীলোলুপ, কুসিদজীবী, বিভৎস স্বভাবের কাপালিক প্রমুখ যেমন লোকনাট্যের জায়গা জুড়িয়া বসে, তেমনি আবার কর্তব্যশীল, ভ্রাতৃবৎসল, অতিথিসেবাপরায়ণ, জনসেবী, স্বার্থত্যাগী, সহনশীল, প্রভুভক্ত, ধার্মিক, ভক্তিমান চরিত্রাদিও ইহাতে স্থান পাইযা থাকে।[২৭]

---

২৪. প্রাগুক্ত, ২৭।

২৫. *মৈমনসিংহ গীতিকা*।

২৬. শিশির মজুমদার, *উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য,* (কলকাতা ১৯৮৬), চ (ভূমিকা)।

২৭. মীরা গাঙ্গুলি, *বাংলা নাটকে লোক-প্রভাব*, (কলকাতা ১৩৮৯), ৯৫।

দেব, দেবকল্প মানব ও নরনারী চরিত্রআশ্রিত এসব নাট্যধর্মী রচনায় গ্রামের দর্শক-শ্রোতা নিজেদের জীবনের ছবিকে দেখে নানা আবেগে-অনুভূতিতে আপ্লুত হয়, রসধারায় সিক্ত হয়, যা বোধ-বুদ্ধিকে উজ্জীবিত করে। চিত্তবিনোদনের, জীবনবোধের এবং নীতিজ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে লোকনাট্যের জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত আছে।

ছড়া (Rhymes)

ছড়া শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিত। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসরযাপন, জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা ইত্যাদি কারণে ছড়ার চর্চা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লৌকিক ছড়া কেবল শিশুর জন্য রচিত হয় নি, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক, বয়স্ক সকল শ্রেণীর জন্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের নর-নারী বিভিন্ন উপলক্ষে ছড়ার চর্চা করে থাকে।

ছড়া লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। লোকসঙ্গীত, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির মতো ছড়া বর্তমানকালেও বহুলপ্রচলিত, সমাদৃত ও জীবন্ত। এর জনপ্রিয়তার কারণ বিবিধ :

১. ছড়া মূলত আবেগ-অনুভূতিজাত, বুদ্ধিজাত নয়।

২. ছড়ার চর্চায সব বযসের নাবী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে।

৩. ছড়ার বিষযবৈচিত্র্য আছে; লঘু-গুরু সব ধরনের বিষয এবং হাস্য-করুণ-ব্যঙ্গ নানা ধরনের রস নিযে রচিত হয।

৪. ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে, যা গতিশীল ও শ্রুতিমধুর।

৫. ছড়া আবৃত্তিসুখকর; এতে সঙ্গীত গীত হয, ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয, প্রবাদ প্রসঙ্গত বলা হয, ছড়া আবৃত্তি কবা হয়।

৬. ছড়ার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সরল, এজন্য তা সহজে হৃদযঙ্গম করা যায।

৭. ছড়া চিত্রবহুল ও ধ্বনিতৃপ্তকর বলে স্মৃতিতে ধবে রাখা সহজ হয।

৮. ছড়া চিত্তবিনোদনের নির্মল মাধ্যম, নৈতিকতার বিচারে তা শ্লীল ও রুচিসম্পন্ন।

৯. ছড়ার মধ্যে চিরত্ব আছে। বিশ্বের সব দেশে সব সমাজে ছড়ার প্রচলন আছে; এই সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতার গুণে ছড়া পুরাতন হয়েও চির নতুন।

ছড়ার জনপ্রিয়তার যে নয়টি গুণের কথা বলা হলো, এগুলিকে ছড়ার বৈশিষ্ট্যরূপেও আখ্যায়িত করা যায়। ছড়া পদ্যে রচিত। অন্ত্যমিলযোগে স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত ছড়ার অবয়ব দুই থেকে আট/দশ চরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে মাগন, ব্রত ও গল্পাশ্রিত ছড়ার চরণসংখ্যা বেশি হয়।

(১)

খোকা ঘুমো ঘুমো
শান্তিপুরের বাঘ এসেছে দারুন-হুমো।

(২)

আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই
মা গিয়াছেন গয়াকাশী, ডুগডুগি বাজাই।

(৩)

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনাব উপায় কি
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

(৪)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হলো, তিন কন্যা দান ॥
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান,
এককন্যা রাগ করে বাপের বাড়ী যান ॥
বাপে দিল তেল সিন্দুর মালী দিল ফুল,
এমন খোঁপা বেঁধে দিব হাজার টাকা মূল ॥

(৫)

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ঢাঁই মিরগেল ঝাঁঝর বাজে ॥
বাজতে বাজতে চললো ডুলি,
ডুলি গেল কমলাফুলি ॥
কমলাফুলির টিয়েটা,
সূর্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই,
পানের খিলি কিনে খাই ॥
পানটি হলো ভোমরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
হলুদ বনে হলুদ ফুল
মামার নামে টগর ফুল ॥

এগুলি বাংলার লৌকিক ছড়ার প্রতীকমূলক (typical) দৃষ্টান্ত। ছড়ার অবয়ব, বিষয়, ছন্দ, রস, ধ্বনিসৌন্দর্য, সমাজবোধ, ঐতিহ্যচেতনা, জীবনদৃষ্টি এগুলিতে ফুটে উঠেছে। শিব পৌরাণিক দেবতা; বর্গী ঐতিহাসিক মারাঠা সৈন্য; কৃষক, মালী, ঢুলি সমাজের শ্রমজীবী মানুষ; বাবা, মা, মামা, ভাই, কন্যা পরমাত্মীয়; বিবাহ সামাজিক অনুষ্ঠান; ডুগডুগি, ঢাঁই, মাদল, ঝাঁঝর, ঢোল লোকবাদ্য; বাঘ, বুলবুলি, টিয়া, ভোমরা বাংলাদেশের পশু-পাখি, কীট; ধান, পান, রসুন, বাংলাদেশের ফসল; গয়া-কাশী, তীর্থযাত্রা, শিবের গাজন, ধর্মানুষ্ঠান, তিন পাত্রে কন্যাদান, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদিতে দেশ-সমাজ-জাতির অতীত ও বর্তমানের নানা উপাদান রয়েছে। এর সাথে আছে দৈনন্দিন জীবনের ছবি—শিশুকে ঘুম পাড়ানো, দুই ভাইয়ের আনন্দোল্লাস, কৃষকের খাজনা দেয়ার বেদনা, বধূর রান্না, কন্যার রাগ করে বাপের বাড়ি গমন, তেল-সিন্দুর দিয়ে প্রসাধন, দামী খোঁপা বাঁধা, হাটে গমন , পান কিনে খাওয়া, মায়ে-ঝিয়ে বিবাদ ইত্যাদি। আবেগ-অনুভূতি-স্বপ্ন-কল্পনার মিশ্রণে ছড়া আনন্দ ও সৌন্দর্যের এক মনোরম শিল্পলোক সৃষ্টি করে।

ছড়াকে 'গ্রাম্য কবিতা' বলা হয় । কবিতা সৃজনশীল রচনা, এতে ব্যক্তির আবেগ ও কল্পনা বাণীরূপ লাভ করে। সমাজের সমষ্টিগত মানুষের আবেগ ও কল্পনার বাঙময় রূপ ছড়া। এতে বাস্তব ও কল্পিত বিষয়ের মিশ্রণ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ছড়ার অর্ধেক কল্পনার, অর্ধেক বাস্তবের। তিনি ছড়াকে 'স্বপ্নদর্শী' মনের সৃষ্টি বলেও উল্লেখ করেন। মানুষ, সমাজ, সংসার, প্রকৃতি, বিশ্বলোকের নানা চিত্র ছড়ায় প্রতিফলিত হয়। লোককবি যখন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখে, তখন তা হয় বাস্তব, আর যখন স্বপ্নদর্শী মন দিয়ে দেখে, তখন তা হয় কল্পিত।

উভয় বঙ্গে ছড়ার সংগ্রহ-সমীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থের একখানি ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত *বাংলার লোকসাহিত্য* (২য় খণ্ড, ১৯৬৩) এবং অপরখানি ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক রচিত *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা* (১৯৭৯)। প্রথম গ্রন্থে কথান্তরসহ প্রায় ১২০০টি ও দ্বিতীয় গ্রন্থে কথান্তর ব্যতিরেকে ৫২৫টি ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য সমাজ-রসতত্ত্বের দিক থেকে এবং নির্মলেন্দু ভৌমিক রূপতত্ত্বের দিক থেকে ছড়ার বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এছাড়াও ভবতারণ দত্ত '*বাংলাদেশের ছড়া*' (১৯৭০) গ্রন্থে ৮৭২টি ছড়া বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। বাংলাদেশে বদিউজ্জামান সম্পাদিত *লোকসাহিত্য সংকলনে* (১২শ খণ্ড, ১৯৭৫) ৫০০টি, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রণীত *যশোর-খুলনার ছড়া'য়* (১৯৬৩) ২৬০টি ছড়া সঙ্কলিত ও আলোচিত হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সঙ্কলন হলে বাংলা লৌকিক ছড়ার প্রকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব।

ছড়ার শ্রেণীবিভাজন এক একজন এক একভাবে করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থের আটটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন এভাবে : ঘুমপাড়ানি, ছেলেভুলানো, খেলা, কন্যা,

পরিবার, প্রকৃতিজগৎ, অতিপ্রাকৃত ও সাহিত্যিক ছড়া। সম্ভবত এটিই তাঁর ছড়া সম্পর্কিত শ্রেণীবিভাজন। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী 'ছেলে-মেয়েদের জন্য সৃষ্ট ছড়া' ও 'বয়স্কদের উদ্দেশ্যে কথিত ছড়া' এমন দুটি প্রধান বিভাগ করে প্রথম বিভাগের ১৯টি এবং দ্বিতীয় বিভাগের ১৫টি উপবিভাগ করেন। তাঁর বিভাজন ত্রুটিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল। নির্মলেন্দু ভৌমিক 'আনুষ্ঠানিক ছড়া' ও 'অনানুষ্ঠানিক ছড়া' এরকম দুটি প্রধান বিভাগ করে প্রথম বিভাগের ৩টি (বিবিধ বার্ষিক অনুষ্ঠান, কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবন, মানবজীবন ও জগৎ) এবং দ্বিতীয় বিভাগের ৫টি মুখ্য উপবিভাগ (মানবজীবন সম্পর্কীয়, সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি বিষয়ক, সাহিত্যিক বিষয়ক, নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক, বিচিত্র বিষয়ক) করেছেন। এ স্তরে উপবিভাগেরও বিভাগ আছে। 'মানবজীবন সম্পর্কীয়' ছড়ার পাঁচটি পর্যায় হলো 'ছেলেভুলানো ও শিশু সম্পর্কীয় ছড়া', 'খেলা, কৌতুক ও বিদ্রূপের ছড়া', 'দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন বিষয়ক' ছড়া, 'কর্মজীবন ও অবসরযাপন সংক্রান্ত ছড়া' এবং 'বৃত্তি বিষয়ক ছড়া'। তিনি সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি বিষয়ক ছড়াকে 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বিষয়ক ছড়া', 'সমাজ ও সামাজিক ব্যক্তি বিষয়ক ছড়া', 'সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়া' এবং 'স্থানের খ্যাতি-কুখ্যাতি বিষয়ক ছড়া' এই চারটি ভাগ করেন। নির্মলেন্দু ভৌমিকের শ্রেণীবিভাজনটি বৈজ্ঞানিক এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ, তবে জটিলতামুক্ত নয়। আমরা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য নিম্নরূপ একটি বিভাজনের পক্ষপাতী। এটি করা হয়েছে ছড়ার বিষয় গঠন, উপলক্ষ, উপযোগিতা ইত্যাদির সমন্বয় করে :

১. ছেলেভুলানো ও শিশুতোষ ছড়া ;
২. খেলার ছড়া ;
৩. পারিবারিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছড়া ;
৪. আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া ;
৫. ঐন্দ্রজালিক ছড়া ;
৬. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া ;
৭. শ্রম-পেশা বিষয়ক ছড়া ;
৮. নীতি ও শিক্ষামূলক ছড়া এবং
৯. বিবিধ ছড়া।

চেতন-অর্ধচেতন শিশুদের ভুলানো অথবা আনন্দ দেয়ার জন্য মা-বোন, দাদী-নানী, ধাত্রীর মতো বয়স্ক নারী যেসব ছড়া আবৃত্তি করে, সেসব ছেলেভুলানো ছড়া। শিশু-কিশোর বালক-বালিকা নিজেরাই ছড়া আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে। এটি তাদের চিত্তবিনোদন ও অবসরযাপনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এগুলিকে শিশুতোষ ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছড়া

মুখস্ত করে শিশু স্মৃতিশক্তির অনুশীলন করে, আবার ছড়ার চর্চা করে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে চিত্তবিকাশের সুযোগ পায়।

কিশোর-তরুণ-যুবক নানা বয়সের নর-নারী যেসব ছড়া বলে খেলা করে অথবা খেলা উপলক্ষে ছড়া বলে সেসব খেলার ছড়ার অন্তর্ভুক্ত। হাডুডু, বউছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, কানামাছি, গাছুয়া-গাছুয়া ইত্যাদি খেলার 'বোল' হিসেবে ছড়া বলা হয়। এটি মূল খেলার বাড়তি অঙ্গ—খেলায় অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য এসব ছড়া বলা হয়।

পরিবার ও সমাজের অতীত ও বর্তমানের নানা স্তরের নর-নারীর জীবন ও চরিত্র অবলম্বন করে ছড়া রচিত হয়েছে। এগুলিতে মা, কন্যা, বাবা, ভাই, বোন, বধূ, শ্বাশুড়ী, জামাতা ইত্যাদি আত্মীয়-স্বজন যেমন, তেমনি ধোপা, নাপিত, মালী, তাঁতী, কামার, দারোগা, পেয়াদা, জমিদার, রাজা ইত্যাদি সামাজিক মানুষও আছে। এসব ছড়ার অভ্যন্তরে একটি ব্যাপক সামাজিক পটভূমি আছে।

ব্রত, গাজন, মাগন, বৃষ্টি, বন্যা, ফসল, ব্যাধি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া আছে। এগুলিতে লৌকিক ধর্মানুভূতি ও সংস্কারাদি নিহিত আছে। ঐন্দ্রজালিক ছড়ায় আছে যাদু-মন্ত্রের প্রভাব। উভয় শ্রেণীর ছড়ায় নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের উপাদান আছে।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়ায় শিশু-কিশোরদের লঘু হাস্যরসের পরিচয় আছে। প্রধানত সমবয়সের ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, জামাতা, পশুপাখি ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ ও সমালোচনা করে অথবা আক্রমণ বা হেয় প্রতিপন্ন করে এসব ছড়া রচিত হয়। কতক কাজে শ্রমলাঘব করার ও প্রেরণা দেয়ার অথবা চিত্তবিনোদনের শ্রমবিষয়ক ছড়া আছে। বাইস্কোপ দেখানোর সময় ছড়া কেটে চিত্রের বর্ণনা দেযা হয়। এটি পেশার সঙ্গে যুক্ত। নীতি-উপদেশ, অঙ্ক-জ্যোতিষ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার জন্য ছড়া আছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সব শ্রেণীর ছড়ার বিভাজন সম্ভব নয়, তবে অধিকাংশ ছড়ার উপলক্ষ-উপযোগিতাভেদ সুস্পষ্ট। ছেলেভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, যাদুমন্ত্রের ছড়া, নীতি-উপদেশের ছড়া ও আচার-অনুষ্ঠানের ছড়াকে স্পষ্ট ভেদরেখা দ্বারা আলাদা করা যায়। খেলার ছড়া খেলা উপলক্ষে, ব্রতের ছড়া ব্রত-পার্বণ উপলক্ষে, মন্ত্রের ছড়া যাদুটোনা, বশীকরণ ক্রিয়ানুষ্ঠান উপলক্ষে বলা হয়। খেলার ছড়া মাগন উপলক্ষে বা মাগনের ছড়া খেলা উপলক্ষে বলা হয় না। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় যে ছড়া বলা হয় আর শ্রমিক দিয়ে ছাদ পিটানোব সময় যে ছড়া বলা হয়, তার বাণী, সুর, ছন্দ-স্পন্দন, বিষয়, আবেদন একরূপ হতে পারে না। এসব কারণে ছড়ার শ্রেণীকরণে ছড়াচর্চার উপলক্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ছড়া জীবনের সাথে যে কত ঘনিষ্ঠ, ছড়ায় অঙ্কিত মানুষ, পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি, পরিবেশ ইত্যাদির চিত্র বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যায়। এতে সমাজের খুঁটিনাটি চিত্র আছে, নরনারীর অন্তর্জীবনের ও বহির্জীবনের ছবি আছে, দেশের ভূমি-ঋতু, গাছপালা-পশুপাখির কথা আছে। এসব অসংখ্য ক্ষুদ্র খণ্ড ছবি বিন্যস্ত করলে দেশ ও জাতির অলিখিত ইতিহাস বেরিয়ে আসে।

পূর্বে উদ্ধৃত একটি ছড়ায় বর্গী কর্তৃক বাংলা আক্রমণের কথা আছে। এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। নবাব আলিবর্দীর (১৭৪০-৫৬) রাজত্বকালে বর্গীরা বাংলাদেশ কয়েকবার আক্রমণ, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, বিশেষকরে কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খাজনা দেয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ঘুমপাড়ানোর ছড়ায় জাতির এই ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কথা চিত্রিত হয়েছে। আরেকটি ছড়া :

জাত মারলে পাদ্রী ধরে,
ভাত মারলে নীল বাঁদরে।
বিড়াল চোখে হাঁদা হেমদো,
নীলকুঠির নীল মামদো।।

এটিরও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে—খৃস্টান পাদ্রী ধর্মনাশ করে এবং নীলকর সাহেব কৃষককে শোষণ করে। বাংলার মানুষ দেড়শ'-দুশ' বছর আগে এসব শোষণ-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। 'বাঁদর', 'মামদো' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে, তবে এতে প্রতিরোধের চেতনা নেই। বর্গীর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধের চেতনা নেই, শুধু প্রতিক্রিয়াজাত বেদনাবোধ আছে।

উপরে উদ্ধৃত ৪নং ছড়ায় বহুবিবাহের যে চিত্র আছে, তাতে এক পাত্রে তিন কন্যা সম্প্রদানের কথা আছে। বাংলা নাথগীতিকা 'গোপীচন্দ্রের গানে'র রাজপুত্র গোপীচন্দ্র রাজকন্যা অদুনাকে বিয়ে করে পদুনাকে দান হিসেবে লাভ করে। চণ্ডীমঙ্গল-এর বণিক খণ্ডের নায়ক ধনপতির স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা পরস্পরের খুল্লতাত ভগ্নী ছিল। মুসলিম আইনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অথবা তালাকের পর শ্যালিকাকে বিবাহ করা বৈধ বলে গণ্য হয়। সমাজতত্ত্বে এ ধরনের বহুবিবাহকে sororal polygyny বলে, এক পুরুষে একাধিক বোনের বিবাহ এ প্রথার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর আমেরিকার ক্রোদের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে।[২৮]

'বোন-সতীন'-এর কথা আছে একটি বিখ্যাত ছড়ায়, এর অংশবিশেষ এমন :

এতো বড়ো রঙ্গ জাদু এতো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥

২৮. সৈয়দ আলী নকী ও মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *নৃবিজ্ঞান*, (ঢাকা ১৯৮৯), ১৪৮।

নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো কন্যা, বোন-সতীনের ঘর ॥—রবীন্দ্র সংগ্রহ

হিন্দু বিবাহ-আইনে স্ত্রীর বর্তমানে শ্যালিকাকে বিবাহ করা যায়। Cross cousin, গোত্রবিবাহ প্রথা (endogamy) পৃথিবীর বহু উপজাতির মধ্যে ছিল, বর্তমানে উন্নত সমাজেও আছে। বাংলার সমাজব্যবস্থার শিকড়ও অত্যন্ত প্রাচীন, যা প্রথা-পদ্ধতি-আচার-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রসারিত।

মন্ত্রের ছড়ায় প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারের বীজ আরো সজীব ও প্রকট। বৃষ্টি আবাহনের জন্য বলা হয়, " আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দিব মেপে" আর বৃষ্টি বারণের জন্য বলা হয়, "লেবুর পাতায় করঞ্চা, এই মেঘখান উড়ে যা", কিংবা রৌদ্রের আকাঙ্ক্ষায় বলা হয়, "রৈদ দে রে রৈদানী,/চান্দের মার বকের হাত,/কলাতলায় গলা জল,/চচ্চর‍্যায়া রৈদ পড়।" বৃষ্টির মাগনে আচার পালনের সাথে ছড়াও বলা হয়। ছোট ছেলেমেয়ে মাথায় কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায় এবং ছড়া বলে মাগনের চাল-ডাল সংগ্রহ করে, গৃহস্থরা কুলায় পানি ঢালে; পানি দেহ বেয়ে মাটিতে পড়ে। এটি হলো বৃষ্টির নকল। এতে আছে সমপর্যায়ের যাদুর (sympathetic magic) বৈশিষ্ট্য। মাগনের ছড়ায় মেঘের দেবতাকে সরাসরি আবেদন জানানো হয় :

হ্যাদে লো বুন মেঘারানী,
হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানি।
ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি,
বড় ভুঁইতে হাটু পানি।
মেঘারানীর ঘরখানি পাথরেব মাঝে,
হেই বৃষ্টি নামলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কালো মেঘা ধলো মেঘা বাড়ী আছনি ?
গোলায আছে বীজ ধান বুনাইতে পারনি ?—ফরিদপুর

বৃষ্টির সঙ্গে ফসলের নিবিড় সম্পর্ক, বিশেষকরে প্রকৃতিনির্ভর কৃষিব্যবস্থায় সময়মতো এবং পরিমাণমতো বৃষ্টি কৃষকের প্রত্যাশিত; এই প্রত্যাশা মন্ত্রের ও মাগনের ছড়ায় ব্যক্ত হয়েছে। কৃষকদের দ্বারা ভূমিবরণ এবং শস্যের সাধভক্ষণ আচারে ভাল ও অধিক ফলনের আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে, এখানেও যাদুশক্তির প্রভাব আছে। ভূমিবরণের ছড়াটি এরকম :

বর বর বর বসুমতী বর
লটকাই লটকাই ধর।

পাড়া পড়শীর ভাগ্যে ধর
অতিথ পথিকের ভাগ্যে ধর
বসুমতীর বর ॥—চট্টগ্রাম

আর শস্যের সাধভক্ষণের ছড়ার ৪টি চরণ হলো :

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে,
সকল শস্যের গর্ভ বসে।
রামের হাতে গুমা,
ধান হইস তিন দুনা ॥—ময়মনসিংহ

সাধভক্ষণ আচারে উর্বরতাবাদ (fertility-cult)-এর স্পষ্ট প্রভাব আছে, যা প্রাচীন হয়েও সমকালীন ও সর্বজনীন। ব্রতের ছড়ায় আরাধ্য দেবতার কাছে মনস্কামনা ব্যক্ত করে ফলের প্রত্যাশা করা হয়। এখানে আবেদনটি প্রত্যক্ষ। 'দশপুত্তর ব্রতে'র ছড়া এরকম :

দশ পুত্তল পূজে যে, দশ ফল পায় সে।
মরিয়ে মনুষ্য হব, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লব।
সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব,
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব, কৌশল্যা শাশুড়ী পাব,
দশরথের মত শ্বশুর পাব, দুর্গার মত পা পাব,
শিবের মত বাপ পাব, লক্ষ্মী-সরস্বতী বোন পাব,
কার্তিক-গণেশ ভাই পাব, লব-কুশ ছেলে পাব,
কুন্তীর মত ধীরা হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব,
কলাবৌয়ের মত লজ্জাশীলা হব,
বিউলীর ডাল বর্ণ হব, দুর্বার মত লতিয়ে যাব ॥

চৈত্রসংক্রান্তির দিন তুলসীতলায় বালিকা মাটিতে কাঠির আঁচড় দিয়ে এক এক দেবতার মূর্তি আঁকে আর এমন কামনা ব্যক্ত করে। দেবকথায় ও পুরাণে এসব আদর্শ চরিত্র আছে; এদের গুণাবলী ধারণ করার অথবা সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার এরূপ আকাঙ্ক্ষায় ধর্মীয় চেতনা গৌণ, বৈষয়িক চেতনাই মুখ্য। সুস্থ, সুন্দর, আদর্শ জীবন তার কাম্য। এটাই তার জীবনদর্শন। যেখানে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ নেই, সেখানে আদর্শ চরিত্র ও জীবনের অনুসরণ কাম্য হওয়া স্বাভাবিক। 'ভাই-ফোঁটা ব্রতে' সহোদর ভাইয়ের সৌভাগ্য ও মঙ্গল কামনা করা হয়; 'লক্ষ্মীব্রতে' বাপ-ভাইয়ের নিরাপদ বাণিজ্যযাত্রার আকাঙ্ক্ষা করা হয়;

অধিক সন্তান, ভাল ফসল ও রোগ-শোক থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্রত আছে। ব্রত-মাগন-মন্ত্রের ছড়ায় ধর্মের মোড়কে বিষয়বুদ্ধিই ক্রিয়াশীল; পরকালের সুখ-স্বপ্ন-আনন্দ অনুপস্থিত। ইহবাদ বাংলার লৌকিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য।

মন্ত্র (Charms)

"আওলা চাল বকের পাক্।/যেমন পিঠা তেমন থাক্।"—এটি হলো পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র। পিঠা গ্রামীণ সমাজের একটি জনপ্রিয় সৌখিন খাদ্য। আত্মীয়-স্বজন-অতিথি আপ্যায়নে পিঠা পরিবেশিত হয়। কেউ ক্ষতি করতে চাইলে এই মন্ত্র পড়ে পিঠা নষ্ট করতে পারে। তৈরি খাবারে 'নজর' দিলে বদহজম হয়—এ বিশ্বাসও গ্রামের মানুষের আছে।

"থুথুড়ি মাছের মুড়ি,/যেথায় মাছেব ঘর/ আমার বড়শি গিয়া পড়।"—এটি বড়শি দিয়ে মাছ শিকারের মন্ত্র। বড়শিতে কেঁচো বা 'আটা' জড়িয়ে থুথু ছিটিয়ে এই মন্ত্র পড়ে ছিপ ফেললে মাছ ধরা পড়ে—এটাই বিশ্বাস।

"উঠ ফোট চোট/পাকিস্ না গলিস না/দোম্বল বাইন্ধ্যা উঠ"—কারো শরীরে ঘা বা ফৌড়া হলে এই মন্ত্র বলে তার রোগের বৃদ্ধি ঘটানো হয়, রোগী দীর্ঘকাল ধরে কষ্ট পায়। সাধারণ জ্বর-জ্বালা হলে রোগীকে পানিপড়া খাওয়ানো হয়; পীর-মোল্লা মন্ত্র পড়ে পানিতে ফুঁ দেন : "কাল ফিরানী কাল ফিরানী/জমজমের ঠাণ্ডা পানি।/খা আজরাইল পানি খা/এবার তুই ফিরে যা।"

ফসলের উপর যাতে মন্দ লোকের 'কুদৃষ্টি' না পড়ে এজন্য কৃষক বীজ বুনে ক্ষেতের চারপাশে পানি ছিটিযে দেয, আর ক্ষেতবন্ধনের মন্ত্র বলে : "জিও জালা, জিও/হাত ধুইয়া দিলাম পানি/ধান হইস্ পোড়া খানি/... আমার ক্ষেত দেখ্যা যে নজর লাগায,/তার মা-পুলা ভাতে মারা যায়।"

চোরের উৎপাত থেকে ঘরের সম্পদ রক্ষার জন্য 'চোরবন্দি মন্ত্র' আছে :

চোর-চোরানি গাছের পাতা।
যে চোর আইয়ো কাট মাথা ॥
ভাঙ্গা লাঙ্গল পুরান ঈশ।
চোর বান্ধলাম চৌদিশ ॥
আসব চোরা হাস্যা, মরব চোরা কাইন্দা।
ঘরের গিরির দুয়ার বান্দা ॥
তেলের হাঁড়িত চক্মক্ লুনের হাঁড়িত ফুল।
হিন্দের মুখ বাইন্ধা থইছি ন জন চোর ॥

ভূত-প্রেতের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য 'শরীর-বন্ধন মন্ত্র' আছে :

মণিমুক্তা দোলে মা মনসার গলে।
আমাকে দেখিয়া ভূত পিশাচ না চলে ॥
ডাক-ডাকিনী ভূতপ্রেত তোমরা পঞ্চ ভাই।
আমার শরীরে আসে কারো সাধ্য নাই ॥
কাঙ্গুরি কামিক্ষা মা চণ্ডীর আজ্ঞা হারিঝির পা।
দই মা কংকালী, দই মা ফুল্লরা, দই মা কালী ॥

এরকম বন্ধনমন্ত্র আরো আছে, যেমন 'অগ্নিবন্ধন মন্ত্র', 'সর্পবন্ধন মন্ত্র', 'বাঘের মুখ-খিলানি মন্ত্র', 'হাতিবন্ধন মন্ত্র', 'বোলতাবন্ধন মন্ত্র', 'বন্যা প্রতিরোধ মন্ত্র', 'গৃহবন্ধন মন্ত্র' ইত্যাদি। সাপে দংশন করলে 'বিষঝাড়া মন্ত্র', বাঘে কামড়ালে 'ঘা সারানো মন্ত্র,' ভূতে ধরলে 'ভূতঝাড়া মন্ত্র', শিংমাছের কাঁটা বিঁধলে 'বিষ নামানো মন্ত্র' ইত্যাদিও আছে। প্রথম মন্ত্রগুলি প্রতিরোধক, দ্বিতীয় মন্ত্রগুলি প্রতিষেধক। অন্যের ক্ষতি করার জন্য 'বাণমারা মন্ত্র' আছে, নারী-পুরুষ পরস্পরকে বশ করার জন্য 'বশীকরণ মন্ত্র'ও আছে। মন্ত্রগুলি দুই থেকে আট-দশ চরণে রচিত। কোনটি ছড়ার মতো আবৃত্তি করা হয়, কোনটি শ্লোকের মতো পাঠ করা হয়। মন্ত্রের ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐতিহ্য কোথাও আলাদাভাবে, কোথাও মিশ্রভাবে আছে। পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রের 'জমজম', 'আজরাইল', 'মনসা', 'চণ্ডী', 'কালী', 'হাড়িঝি', 'ডাক-ডাকিনী' ইত্যাদি হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ঐতিহ্যাগত। কোন মন্ত্রে দেব-দেবী, পীর-পীরানি বা ঐতিহাসিক ধার্মিক ব্যক্তির দোহাই আছে, কোন মন্ত্রে তা নেই। সাধারণ শব্দাশ্রয়ে মন্ত্র রচিত হয়েছে। মন্ত্রের ভাষায় কবিত্ব নেই, ভাষা প্রায় গদ্যাত্মক, অন্ত্যমিলেরও অভাব আছে। মন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য হলো, উপলক্ষ ও প্রয়োজন ছাড়া যখন তখন এবং যেখানে সেখানে মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। বন্ধনমন্ত্র দ্বারা বাণমারার কাজ চলে না, বাণমারা মন্ত্র দ্বারা বন্ধনের কাজ চলে না, অনুরূপভাবে ভূত-ঝাড়া মন্ত্র দ্বারা সাপের বিষ নামানো যায় না, সাপের বিষঝাড়া মন্ত্র দ্বারা ভূত-প্রেতে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা হয় না। বশীকরণ মন্ত্র দ্বারা বশীকরণের কাজ চলে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার নেই।

মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ ও চরণাশ্রিত কতকগুলি শব্দসমষ্টি। এতে মন্ত্রাচারীর বিশেষ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। মন্ত্র হলো "a wish which must without fail be fulfilled." মন্ত্র অব্যর্থ ফল প্রত্যাশা করে, এজন্য এতে আবেদন-নিবেদন অপেক্ষা দাবির সুর বেশি। শীতলা বসন্তের দেবী, মড়ক আকারে দেখা দিলে এই রোগে বহু লোক প্রাণ হারায়। ওঝা ধূলা পড়ে 'গ্রামবন্ধন' করে এই মন্ত্র পড়ে :

যাওরে শীতলা সইরা যাও
উত্তরে যাও, দক্ষিণে যাও
কামিখ্যার পর্বতে যাও
যদি না যাও
তবে মহাদেব আর পার্বতীর মাথা খাও ॥

মন্ত্রের এই ভাষায় অনুরোধ ও প্রভাব দুটোই আছে। বাংলা মন্ত্রের এটাই গঠন-কাঠামো। মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু লৌকিক ক্রিয়া, একে মন্ত্রাচার বলা হয়। মন্ত্রের মধ্যে যাদুগুণ (magic power) আছে। যাদু প্রাচীনতম ধর্ম; Animism বা সর্বপ্রাণবাদের পরবর্তী স্তর যাদু বা ইন্দ্রজাল। জীব-জড় সকল বস্তুতে প্রাণ বা আত্মা আছে, তা-ই সর্বপ্রাণবাদের মূলকথা। শুভ-অশুভ, ইষ্ট-অরি সকল শক্তির অধিকারী হওয়া অথবা তাকে বশে আনার ও নিয়ন্ত্রণ করার চেতনা থেকে ইন্দ্রজালের উদ্ভব। আর্চার টেলর অলৌকিক অপ্রাকৃত বস্তুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার অথবা বশীভূত করার কৌশলকে যাদু বলেন। তাঁর ভাষায় যাদু হলো—"The art of compulsion of the supernatural; also the art of controlling nature by supernatural means."[২৯]

যাদু প্রধানত দুই প্রকার—শুক্ল ইন্দ্রজাল (white magic) ও কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল (black magic)। শুক্ল ইন্দ্রজাল মঙ্গলজনক, কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল ধ্বংসাত্মক। যেমন ঝাড়ফুঁক চিকিৎসাদিতে যাদুব ফল মঙ্গলজনক; এসব প্রকাশ্যে অনুশীলিত হয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি অনিষ্টকর; এগুলি গোপনে নিষ্পন্ন হয়। হাঁ-ধর্মী যাদু (positive magic) এবং না-ধর্মী যাদু (negative magic) রূপেও শ্রেণীভেদ আছে। প্রধানত বিধি-নিষেধ (taboo) জাতীয় যাদুকে না-ধর্মী যাদু বলা হয়; অন্যগুলি হাঁ-ধর্মী যাদু। অন্তরপ্রকৃতির ও কার্যফলের দিক থেকেও অনুকরণধর্মী যাদু (imitative magic), সমপ্রক্রিয়ার যাদু (sympathetic magic), সদৃশ যাদু (homeopathic magic), সংক্রামক যাদু (contagious magic), প্রেতসংক্রান্ত যাদু (witchcraft), জ্যোতিষ বা আগাম কথা (divination) ইত্যাদি শ্রেণীতে যাদুর বিভাজন আছে।

মন্ত্র হলো যাদুর বাঙ্ময় রূপ। মন্ত্রের মধ্যে যাদুশক্তি আছে, মন্ত্র উচ্চারণ বা আবৃত্তি করে এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু ক্রিয়া বা আচার পালন করে যাদুশক্তির প্রকাশ ঘটাতে হয়। মাদুলি, তাবিজ, তাগা, কবজ ইত্যাদি বস্তুকে মন্ত্রপূত করলে যাদুগুণসম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে গুণী, ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, বেদে-বেদেনী, ধাত্রী, শিরালী প্রভৃতি পেশাদার ও অপেশাদার ব্যক্তি মন্ত্র জানেন এবং মন্ত্রের প্রয়োগ করেন।

---

২৯. *SDFML*, Vol. II. 760.

যাদুমন্ত্র গুপ্তবিদ্যা; সব কিছুতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। শিষ্য ছাড়া অন্যকে মন্ত্রশিক্ষা দেয়া যায় না। মন্ত্রের প্রতি শব্দের উচ্চারণ করতে হয়। বার-তিথি, ক্ষণকাল, স্থান-পাত্র ইত্যাদির বাছ-বিচার করে মন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়।

বাঙালির ব্যক্তি, গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনে নানা ক্ষেত্রে যাদুমন্ত্রের ব্যবহার আছে। মধ্যযুগের কাব্য, ব্রতকথা, লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ, লোকচিকিৎসা, কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশায় যাদুমন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আসামের কামাখ্যা ছিল মন্ত্রশিক্ষার কেন্দ্র, বাংলাদেশ থেকে লোক যাদুশিক্ষার জন্য সেখানে যেতো। পূর্বোক্ত গ্রামবন্ধনের মন্ত্রে 'কামিখ্যা পর্বতে'র উল্লেখ আছে। বাংলা লোককাহিনীতে বর্ণিত কায়ার পরিবর্তন বা আত্মার রূপান্তর (transformation of soul) একটি উল্লেখযোগ্য মটিফ; স্টিথ থম্পসন একে ডি-৬৯৯ সংখ্যক মটিফের অন্তর্ভুক্ত করেন। 'গোপীচন্দ্রের গানে' রাজমাতা ময়নামতী মন্ত্রজ্ঞানী ছিলেন। যমের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বহয়। পল্লীকবি বলেন :

মহামন্ত্র গিয়ান লৈল বুড়ি ময়না হৃদযে জপিয়া।
সোনার ভোমবা হৈল কাযা বদলিয়া ॥

ময়না গোদা যমকে তাড়া করেছেন; গোদা কায়া পরিবর্তন করলে ময়না 'মহামন্ত্রে'র সাহায্যে প্রতিপক্ষের উপযুক্ত রূপ ধারণ করে তাকে আক্রমণ করেন। তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে ইঁদুর ও বিড়াল, কৈতর ও বাজ, সরিষা ও ঘুঘু, মাছ ও পানকৌড়ি, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বৈষ্ণব ও মাছি ইত্যাদি রূপান্তর গ্রহণ, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার লড়াই হয়েছে। 'ভারইয়া রাজার কাহিনী'তে ভারইয়া রাজা ও বীরসিংহের বিভিন্ন রূপান্তরে আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক লড়াই-এর বিবরণ আছে। পল্লীকবি বলেন :

মায়ানার মন্তর পইড়া রাজা ধূলি উড়াইল।
মানুষ ভারইয়া রাজা বিরক্ষ হইল ॥

এখানে 'মায়ানার মন্তর' বা মায়ামন্ত্রের কথা আছে। এক রাজা গাছ হলে অন্য রাজা কুড়াল, ময়ূর হলে বাজ, মাছ হলে উদ হওয়ার বিবরণ আছে। শেষের চিত্রটি এমন :

তুবরী মন্তরে রাজা ভালা কোন কাম করে।
সাচান হইয়া রাজা শুনি পথে উড়ে ।।

'তুবরী মন্তরে' পাখী হওয়া যায়।—এ শ্রেণীর লোককাহিনীর ভিত্তি হলো magical conflict root; এক্ষেত্রে দুজন যাদুকর জীবন-মরণ সংগ্রাম করে ধ্বংস হয়।[৩০]

---

৩০. Saratchandra Mitra, 'On the cult of Sonaraya of Northern Bengal', *Journal of Departmental Letters*, Vol. VIII, (Calcutta 1922) , 177.

রূপকথার অসহায় নায়ক ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কাছ থেকে গাছের 'মন্ত্রপূত পাতা' ভক্ষণ করে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হয়, এমন বিবরণও বিরল নয়। ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলায় 'হিলারী' (শিলারী) পেশাদার মন্ত্রগুণী। ঝড়-বৃষ্টি-শিলা থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য হিলারীরা মাঠে গিয়ে মন্ত্রপাঠ করে ও শিঙ্গা বাজিয়ে মেঘ ও ঝড়-বৃষ্টি তাড়ায়। এ প্রথা আজও চালু আছে। তারা মন্ত্রের সাহায্যে গ্রামবন্ধনও করে থাকে :

নমঃশূদ্র যুগীনাথ গুরুমন্ত্র লৈয়া
হিলারীর পেশা করে সাধনা করিয়া ॥...
মন্ত্র দিয়া গাঁও বান্ধে শিখে মন্ত্রের গান
মন্ত্রের রাগিনী শিখে নানান গুণজ্ঞান ॥
বেদে-বেদেনী মন্ত্র পাঠ করে সাপ ধরে।
ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন
মনসা দেবী আমার মা।
ওলট পালট পাতার ফোঁড়
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে।
দুধরাজ, মনিরাজ, কার আজ্ঞা ?
বিষহরির আজ্ঞা ॥

ওঝা সাপে-কাটা রোগীর দেহ থেকে মন্ত্রপাঠ করে বিষ নামায়। এ রীতি আদি কালেব, অদ্যকালেরও :

উংকুর শুংকুর ডোসখোর ভাই।
কোন সাপে মারিছে কামুড় কও আমার ঠাঁই ॥
উত্তম পবর্ত শিরাইছে যে
সকল গরল শিরাইছে সে। ...
রব্বে রহিম খাড়া আকাশের বিষ পাতাল যা।
যদি বিষ ভাটি ছাইড়া উজান যাস
তবে পদ্মাদেবীর মাথা খাস ॥

পঞ্চম চরণ প্রক্ষিপ্ত, হিন্দুয়ানি ভাবের মন্ত্রে মুসলমানি ভাবের চরণ সংযুক্ত হয়েছে। এটি মুসলমান ওঝার কাজ। নিচের ভূত-ঝাড়া মন্ত্রে মুসলমানি ভাব পুরোপুরি বজায় আছে :

আমার নাম দিদার বকশ শুইন মন দিয়া।
আমার নামে ভূত-পেত্নী সবাইর কাঁপে হিয়া।

শেখ ফরিদের নাম লইয়া যদি মন্তর ঝাড়ি
হাজার গণ্ডা ভূত-পেত্নীরে উল্টাইবার পারি ॥
তোমার লাইগ্যা বইস্যা আছি, কও তোমার নাম।
কিবা জাত, কিবা গোত্, কোন খানেতে ধাম ?

বাউলী, মউল্যা, কাঠুরে বনে পাতা, মধু, কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের শিকার হয়। প্রবাদে আছে, "সাপের লেখা বাঘের দেখা"—কপালে লিখা থাকলে সাপে কাটে; কিন্তু বাঘের দেখা হলে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত মৃত্যু, এ মৃত্যুযন্ত্রণা বনাঞ্চলের অধিবাসীর নিত্যদিনের। 'বাঘের মুখ খিলান মন্ত্র' দ্বারা হিংস্র প্রাণীর মুখ বন্ধ করা হয় :

আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।
আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ
এই বার বেটা অন্ধ হোক।
এই হুকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগরে বাঘার দাঁত কপাটি।
যদি রে বাঘ নড়িস্ চড়িস্
খ্যাঁকশিয়ালীর দিব্যি তোকে।

মন্ত্র অজ্ঞ ও অসহায় মানুষের বাঁচার উপায় মাত্র। বিজ্ঞানের সূত্র ধরে তা রচিত হয় নি, বরং তা বিজ্ঞানের পরিপন্থী। মন্ত্রগুণে বিশ্বাস দৈবনির্ভরতা ও অদৃষ্টবাদে ভরসা বাড়িয়েছে, প্রকৃত মুক্তি দেয় নি, কোন কোন মন্ত্রাচারে রোগী সেবাজনিত উপকার পায়; এতে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক উপকারও আছে। অন্যথায় মন্ত্র সম্পর্কিত আর যাকিছু সবই 'ব্যর্থ পরিহাসে' পরিণত হয়।

হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ, দৈব দুর্বিপাক, অসুখ-বিসুখ দ্বারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা বাঁচার জন্য মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধের সংস্কৃতি একটি স্রোতে এসে মিশেছে। এই মিশ্র সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতি। এখানে 'রব্বে রহিম' ও 'পদ্মাদেবী' একত্রে মন্ত্রে স্থান পেয়েছে, কেননা সাপ যেমন হিন্দু-মুসলমান বিচার করে না, বিষের যন্ত্রণা মানুষভেদে ভিন্ন হয় না, তেমনি মন্ত্রের ভাষায় জাতিবিচার, ধর্মভেদ হয় নি। মন্ত্রের ভাষায় আল্লাহ্, রসুল, চণ্ডী, মনসা, শিব, পার্বতীর দোহাই থাকলেও তাতে আধ্যাত্মিকতা নেই, ঐহিক চেতনা ও স্বাস্থ্য , সম্পদ, সুখ, শান্তির বাসনা মুখ্য হয়ে উঠেছে। মন্ত্রের বাণীবন্ধ ও ভাষাকর্ম শিল্পগুণবর্জিত। উদ্দেশ্যধর্মী রচনায় বক্তব্য প্রাধান্য পায়, শিল্পসাধনা গৌণ হয়ে উঠে।

ধাঁধা (Riddles)

'ধন্দ' থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি : অর্থ 'সংশয়', 'দুরূহ সমস্যা' ইত্যাদি। ধাঁধার প্রতিশব্দ 'হেঁয়ালি', যা সংস্কৃত 'প্রহেলিকা' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। ধাঁধা হেঁয়ালি বা রহস্যপূর্ণ ভাষায় রচিত হয়। এটি মূলত একটি জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা বলে এর একটি উত্তরও আছে। উত্তরটি ধাঁধার ভাষায় পরোক্ষভাবে বিরাজ করে। মূল বিষয়কে আড়াল করে শব্দের জাল বুনে তা করা হয়। উত্তরদাতাকে এই উপমা-রূপক-প্রতীকের রহস্যভেদ করে উত্তর দিতে হয়। ধাঁধার চর্চায় কমপক্ষে দুজনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়—একজন ধাঁধা ধরে, অন্যজন উত্তর দেয়। 'সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস/মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ।'—এ ধাঁধার উত্তর 'লবণ'। রূপকের আশ্রয়ে এটি রচিত—'সাগর', 'লোকালয়', 'মা', 'পুত্র' প্রতীক শব্দ। সমুদ্রের পানি শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়, আবার পানিতে দিলে ঐ লবণ গলে যায়। ধাঁধা-বর্ণিত পুরো চিত্রটি যেমন পরোক্ষ, তেমনি বিভ্রান্তিকর। এটি নির্মাণে মস্তিষ্কের অনুশীলন দরকার হয়। উত্তরদাতাকেও চিন্তা করে বা মাথা ঘামিয়ে উত্তর দিতে হয়। ধাঁধা formulated thought বা নিগূঢ় চিন্তার ফল। সি. এফ. পটার বলেন :

> Contrary to common assumption that they are mere word puzzle proposed by punsters at evening parties, riddles rank with myth, fables, folktales and proverbs as one of the earliest and most widespread types of formulated thought.[৩১]

পটারের উক্তিতে একাধিক বক্তব্য আছে :

১. সাধারণ ধারণা অনুসারে ধাঁধা হলো বুদ্ধি বিহবলকর শব্দমালা।

২. সন্ধ্যাকালীন ভোজে কথক ধাঁধা বলে থাকে।

৩. ধাঁধা পুরাকাহিনী, রূপকথা, লোককাহিনী ও প্রবাদের মতো আদিকাল থেকে বহুলপ্রচলিত নিগূঢ় চিন্তার ফল।

অন্য সমালোচক mastery of thought বা চিন্তার দক্ষতার কথা বলেন। তিনি লিখেন, "It (riddle) presupposes a command of language, a mastery of thought and a powerful sense of rhythm," ধাঁধা রচনায় ভাষার উপর দখল, চিন্তার উপর দক্ষতা এবং ছন্দ সম্পর্কে প্রবল চেতনা থাকা দরকার। জার্মান লোকবিজ্ঞানী ফ্রেডরিক (Friedreich) বলেন, ধাঁধা হলো "an indirect presentation of an unknown object in order that the ingenuity of the hearer or reader may be exercised in finding it out,"

---

৩১. *SDFML*, Vol. II, 938.

ধাঁধা একটি অজানা বিষয়ের পরোক্ষ উক্তি। এটি এমনভাবে বিবৃত করা হয় যাতে শ্রোতা অথবা পাঠক তা খুঁজে বের করতে পারেন। এতে চিন্তাচর্চার অবকাশ আছে। তবে কথকের কাছে বিষয়টি অজানা থাকে না, শ্রোতা-পাঠকের কাছে অজানা থাকে। শব্দজালের সূত্র ধরে উপযুক্ত উত্তরটি বের করতে হয়। আর্চার টেলর ধাঁধার ভাষায় ধাঁধার সংজ্ঞা দিয়েছেন : "When first I appear I seem mysterious. But when I am explained I am nothing serious."

ধাঁধা রহস্যপূর্ণ রচনা, ব্যাখ্যা দ্বারা সেরহস্যভেদ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে চিন্তা করে উত্তর দেয়া কঠিন। শ্রুতি-স্মৃতি থেকে ধাঁধা ধরা হয়, আবার শ্রুতি-স্মৃতি থেকে উত্তরও দেয়া হয়। যেহেতু ধাঁধার প্রকাশভঙ্গি পরোক্ষ (indirect presentation), সেহেতু এতে উপযুক্ত চিত্র বা ব্যঞ্জনা থাকতে হয়। ধাঁধা রচনায় বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ আবশ্যক হয়। তবে এতে আবেগের স্থান নেই। এজন্য ধাঁধার অবয়ব দীর্ঘ হয় না। গদ্যে ও পদ্যে ধাঁধা রচিত হয়। সাধারণত গদ্যাত্মক একটি বাক্যে অথবা ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত দুটি থেকে চারটি চরণে ধাঁধা সমাপ্ত হয়। বুদ্ধি ও কল্পনার মিশ্রণ থাকায় ধাঁধা প্রাণহীন প্রশ্নোত্তরে পরিণত হয় না; বরং প্রতীক-রূপক-চিত্রকল্পের গুণে তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও রসধর্মী রচনার রূপ ধারণ করে। সামুদ্রিক ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তা থাকে, ধাঁধার প্রতীক-চিত্রকল্পের মধ্যে তেমনি উত্তর প্রচ্ছন্ন থাকে। বুদ্ধি, কল্পনা, কৌতূহল, রসবোধ মিলে ধাঁধায় একটি শিল্পীত মনের ছাপ ফুটে উঠে।

(১)

একটুখানি গাছে,
রাঙা বউটি নাচে। (মরিচ)

(২)

হায় তরমুজ করব কি
বোঁটা নাই তার ধরব কি ? (ডিম)

(৩)

এক মায়ের দুই ছেলে
কেউ কাউকে দেখতে নারে। (চোখ)

(৪)

কাঠের বেড়া ছনের ছাউনি
এর মধ্যে পুস্কনি। (নারিকেল)

(৫)

গাছে নাই, পাতায় নাই,
ফুলে আছে, ফলে আছে,
আর ডালে আছে। (ল-অক্ষর)

(৬)

দেশ আছে, মানুষ নাই,
সমুদ্রেতে জল নাই,
পাহাড়েতে পাথর নাই,
রেল-লাইনে গাড়ি নাই।
বন্দরেতে জিনিস নাই। (মানচিত্র)

এসব দৃষ্টান্তে বাংলা লৌকিক ধাঁধার রূপ ও রীতিগত (form and style) বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। এগুলিতে রচয়িতার চিন্তা, কল্পনা ও রসবোধের চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। গদ্যে রচিত ধাঁধাব সংখ্যা কম—দু'একটি এরকম : ১. 'কথায় আছে, কাজে নাই' (ঘোড়ার ডিম); ২.'খুললে ঘর, বন্দ করলে লাঠি।' (ছাতা); ৩. 'কোন ধানে চাল নাই ?' (অভিধান); ৪. 'কোন ড্রাইভার গাড়ি চালায় না ?' (স্ক্রু-ড্রাইভার)।

ধাঁধাকে লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখার একটি বলা হলেও যেহেতু এতে চিন্তাশক্তি ও প্রসাধনকলার ছাপ আছে, সেহেতু এটি পরবর্তীকালের রচনা হওয়াই সঙ্গত। গ্রিক পুরাণে ধাঁধা আছে; স্ফিঙ্কস ওডিপাসকে 'মানুষ' সম্পর্কীয় ধাঁধাটি ধরেছিল, ওডিপাস যথার্থ উত্তর দিয়ে থীবসের জনগণকে রক্ষা করে। উত্তর দিতে না পারলে তার মৃত্যু ছিল অবধারিত। স্ফিঙ্কস মানবমুখী সিংহদেহী একটি দানব, ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে পথিককে হত্যা করা তার একটি কূটকৌশল মাত্র। ধাঁধা এখানে কুচক্রীর হাতিয়ার হয়েছে। *মহাভারতে* বকরূপী যক্ষ পঞ্চপাণ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেন; ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব ব্যর্থ হয়ে প্রাণ হারান, কিন্তু যুধিষ্ঠির ধাঁধার উত্তর দিয়ে জলাশয় মুক্ত ও ভ্রাতাদের উদ্ধার করে জল পান করার সুযোগ পান। যক্ষ (মতান্তরে ধর্ম) অলৌকিক শক্তির অধিকারী; বুদ্ধির পরীক্ষায় মানুষ উত্তীর্ণ হয়েছে, মানুষ দেবতার ক্রীড়নক নয়; বুদ্ধিতে মানুষই শ্রেষ্ঠ। *বেতাল পঞ্চবিংশতি* গ্রন্থে শবরূপী বেতাল রাজা ত্রিবিক্রম সেনকে হেঁয়ালির ছলে প্রশ্ন করেন। রাজা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বরলাভ করেন।[৩২] ভারতের আদি গ্রন্থ *ঋগ্‌বেদে* ধাঁধা আছে। 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ অনুষ্ঠানে হোতৃ ও ব্রাহ্মণগণ একে অপরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতেন। রাজারা রাজ্যজয়ের অভিলাষে 'অশ্বমেধ

---

৩২. শীলা বসাক, *বাংলা ধাঁধাঁর বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়,* (কলকাতা, ১৯৯০), ২৬৮।

যজ্ঞে'র আয়োজন করতেন। এটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। *অথর্ববেদে* ৪১টি ধাঁধা আছে। এগারো শতকের লেখক সামদেব ভট্টাচার্য রচিত *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে রাজা বিনীতমতী রাজকন্যা উদয়বতীর ধাঁধার উত্তর দিয়ে তাঁকে পরাস্ত করেন এবং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এটি ছিল বিবাহের শর্ত।[৩৩] সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে ধর্ম, নীতি ও বিদ্যা শিক্ষামূলক বহু ধাঁধা ও তত্তুল্য আর্যা ও শ্লোক আছে। *গামণিচণ্ড* শীর্ষক বৌদ্ধজাতকে রাজপুত্র ১৪টি ধাঁধার উত্তর দিয়ে সিংহাসনে বসার সুযোগ পান। এখানে ধাঁধা রাজা নির্বাচনের উপায় হয়েছে।[৩৪] বৌদ্ধজাতকে বর-কনে নির্বাচনে বুদ্ধির পরীক্ষা হিসেবেও ধাঁধা ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৫] মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে, বিশেষকরে মঙ্গলকাব্যে ও নাথগীতিকায় বহু সংখ্যক ধাঁধা আছে। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলের* বণিক খণ্ডে মনুষ্য বাকশক্তিসম্পন্ন শুক পাখি ধনপতির রাজসভায় ১৩টি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে, সভাস্থ পণ্ডিতগণ সেগুলির উত্তর দেন। 'ডিম' সম্পর্কিত একটি ধাঁধা ছিল এমন :

বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার।
জুগি পুরুষ তাহে আছে নিরাকার ॥
যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গ্যা করে খান খান ॥[৩৬]

আঠারো শতকের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলির 'ধর্মমঙ্গলে' নায়ক লাউসেন ও নটী সুরিক্ষার মধ্যে ধাঁধার তর্কযুদ্ধ হয়। লাউসেন মোট ৮ টি ধাঁধার উত্তর দিয়ে নটীকে পরাস্ত ও বশীভূত করে। লাউসেন পরাজিত হলে তাকে শর্ত মোতাবেক দাসত্ব করতে হতো। রামকৃষ্ণ রায়ের *শিবায়ন* কাব্যে ঋষিপত্নীগণ বাসরঘরে শিবকে ৮টি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে, শিব সেগুলির উত্তর দেন। *গোপীচন্দ্রগানে* রাজপুত্র গোপীচন্দ্র স্বীয় জননী ময়নামতীকে যোগশাস্ত্র বিষয়ক ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। উদ্দেশ্য ছিল মাতার শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানপরীক্ষা।

ধাঁধাচর্চার উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ বিবিধ—এক. দানব-মানব ও লৌকিক-অলৌকিক শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব; এখানে জীবন-মরণের বাজি থাকে। দুই. যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানে ধাঁধা বলা হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। তিন. বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে বর-কনে ও বরপক্ষ-কনেপক্ষ ধাঁধাচর্চা করে প্রধানত বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য। এক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ধাঁধা বলা হয় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। চার. ধাঁধার উত্তর দিয়ে রাজকন্যা ও রাজত্ব

---

৩৩. ঐ, ২৬৮।

৩৪. ঐ, ২৬৯।

৩৫. ঐ, ২৬৯।

৩৬. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, (কলকাতা ১৯৭৫), ১২৫।

লাভ হয়। পাঁচ. ধাঁধার উত্তর দিয়ে বর লাভ হয় ও দণ্ড থেকে মুক্তি ঘটে। ছয়. ধাঁধার মাধ্যমে ধর্ম-নীতি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। সাত. ভোজসভায় আমোদপ্রমোদের অঙ্গ হিসেবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়।

বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসীরা বিবাহ, কৃষিকাজ, মৃতদেহ সৎকার, মন্ত্রাচার ও ধর্মানুষ্ঠানে ধাঁধার অনুশীলন করে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির বিবাহানুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে পাত্রপাত্রী নির্বাচন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের গঁড় উপজাতির লোকেরা মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হিসেবে ধাঁধার চর্চা করে; তারা বিবাহানুষ্ঠানেও বরপক্ষকে ধাঁধা-যুদ্ধে নাজেহাল করে। আসাম ও বাংলাদেশের অরণ্যচারী নাগা, কুকি, গারো, কোচ ও মুরং উপজাতির কৃষককুল ফসল পাকার সময় ধাঁধা বলে আনন্দ করে।[৩৭]

বিশ্বের অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও ধাঁধার প্রচলন আছে। আফ্রিকার বাথোঙ্গা গোত্রের মেয়েরা বৃষ্টির জন্য নগ্ন হয়ে নাচ-গান করে; এ সময় পুরুষ এসে উপস্থিত হলে তাকে ধাঁধা ধরে নাস্তানাবুদ করা হয়। তাদের ধারণা, এমন করলে বৃষ্টিপাত হয়। ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের সেলিবিসের অধিবাসীরা ধান পাকার ও কাটার সময় ধাঁধা বলে আমোদপ্রমোদ করে; এতে শস্যের ফলন বাড়ে। তারা শবদেহের সামনে ধাঁধা বলে অপদেবতাকে বিতাড়িত করে।[৩৮]

পূর্বে ও বর্তমানে আমাদের দেশে ধাঁধার চর্চা হয়েছে মূলত বিবাহোপলক্ষে বর ও কনে নির্বাচনে বুদ্ধি পরীক্ষায়, বিবাহবাসরে বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের প্রতিযোগিতায়, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অবসরযাপনে এবং অঙ্ক-অক্ষরজ্ঞাননীতি শিক্ষার খেলায় এবং কখন কখন গৃহস্থালি কাজকর্মের ফাঁকে চিত্তবিনোদনের অঙ্গ হিসেবে।

আমেরিকার লোকবিজ্ঞানী আর্চার টেলর *English Riddles From Oral Tradition* (১৯৫১) নামে একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাংলা ধাঁধার সঙ্কলনগ্রন্থের অভাব আছে। ব্যাপক জরিপ ও সমীক্ষা দ্বারা কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। বাংলা একাডেমী *বাংলাদেশের লোকধাঁধা*'(১৯৮০) শিরোনামে একখানি সঙ্কলন প্রকাশ করে। এতে ১৩টি জেলার সর্বমোট ১৩০২টি ধাঁধা সঙ্কলিত হয়েছে। কলকাতা থেকে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য *বাংলার লোকসাহিত্য* (৫ম খণ্ড) ও ডক্টর শীলা বসাক *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়* (১৯৯০) শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। শীলা বসাক উভয় বাংলার বিভিন্ন জেলা

---

৩৭. প্রাগুক্ত, ২৭৪-৭৫।

৩৮. ঐ, ২৭৭-৭৮।

ও স্থানের সর্বমোট ১২৩০টি ধাঁধা সংগৃহীত ও সঙ্কলিত করেন। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উভয় উদ্যোগ অসম্পূর্ণ, কারণ গ্রন্থে সকল স্থানের ধাঁধা সঙ্কলিত হয় নি।

ধাঁধার শ্রেণীকরণে মতবিরোধ আছে। হেলসিঙ্কির লোকবিজ্ঞানী 'উপমিত বস্তু' অনুসারে শ্রেণীকরণের প্রস্তাব দেন। আর্চার টেলর বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য অনুসারে বিভাজনের পক্ষপাতী। আশরাফ সিদ্দিকী উপমিত বস্তুর রূপবিচারে জীবজন্তু, গাছপালা, ব্যক্তি, বস্তু, রঙ, কার্যাবলী, বুদ্ধিপরীক্ষা, গল্প ইত্যাদি বিষয়ক ধাঁধার উল্লেখ করেন।[৩৯] আশুতোষ ভট্টাচার্য ধাঁধাকে লৌকিক ও সাহিত্যিক এই দুই ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে নর-নারী, প্রকৃতি, পশুপাখি, গ্রহ-নক্ষত্র, তৈজসপত্র, মানুষের আচার-ব্যবহার, অঙ্কের হিসাব, কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে বিভক্ত করেন। তিনি এমন বিভাজন কোথাও ধাঁধার বক্তব্য, কোথাও ধাঁধার উত্তর অনুযায়ী করেন।[৪০] ডক্টর শীলা বসাক উত্তরের বিষয় অনুযায়ী নর-নারী, দেব-দেবী, প্রকৃতি, গার্হস্থ্যজীবন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বাদ্যযন্ত্র, সংখ্যা, কাহিনী ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেন।[৪১]

প্রশ্ন ও উত্তর মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ ধাঁধা; উত্তরের বিষয়বস্তু-ব্যক্তি-ক্রিয়াগুণকে অবলম্বন করে ধাঁধার অবয়ব নির্মিত হয়। সাধারণত সাদৃশ্যবোধক রূপ-রঙ-গুণ-ধর্ম-ক্রিয়াদি দ্বারা ধাঁধার রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্প রচিত হয়। সাদৃশ্য বা তুলনা খুব নিখুঁত বা নৈকট্যবাচক হয়, তা-ও নয়। 'জলপিপি জলপিপি জলে করে বাস /হাড় নাই গোড় নাই মানুষ খাবার আশ।' (জোঁক), 'এক গাছে ছয় ফুল, ছয় ফুলে বার ফল।' (বৎসর, ঋতু ও মাস)। জলপিপি ও জোঁক পানিতে বাস করে এটুকুই সাদৃশ্য আছে—জোঁকের দেহে হাড় নেই, জোঁক মানুষের রক্ত খায়, দেহের গঠন ও স্বভাবের বিবরণ আছে। দ্বিতীয় ধাঁধায় কেবল সংখ্যায় মিল আছে; গাছ, ফুল, ফল দুরারোপিত সাদৃশ্য। প্রথমটিতে কৌতূহল, আনন্দ, রসবোধ, এমনকি সৌন্দর্যস্পৃহা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এগুলিতে চিত্তবিনোদন, বুদ্ধিপরীক্ষা (intelligence test) ও অঙ্কশিক্ষার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। জলপিপির উপর জোঁকের এবং গাছের উপর বৎসরের চিত্র ও ধর্ম আরোপিত হয়েছে; এখানে উত্তরটিই মুখ্য, উত্তরের কথা মনে রেখে ধাঁধার রূপকাঠামো ও অর্থব্যঞ্জনা নির্মিত হয়। এদিক থেকে উত্তর ধরে ধাঁধার শ্রেণীকরণ করা যায়। ঐ সূত্র ধরে একটি গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপে করা যায় :

১. মানুষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ : মানুষ, মানুষের দেহ, মানুষের ছায়া, আত্মা, জীবন, প্রাণ, মৃত্যু, শব, মুখমণ্ডল, মাথা, চুল, কপাল, চোখ, চোখের মণি, চোখের পাতা, ভুরু, অশ্রু, দৃষ্টি, নাক, কান, মুখগহ্বর, দাঁত, জিহবা, হাত, আঙ্গুল, বৃদ্ধাঙ্গুলি, কনুই, পেট, পাকস্থলী, নাভি, নাড়ি, লোম, স্তন, হাঁটু, পা, পদচিহ্ন।

---

৩৯. *লোকসাহিত্য,* ১২২-৩৯।
৪০. *বাংলার লোক-সাহিত্য,* ৫৩০-৬৮।
৪১. *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়,* ৩২।

২. পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নর-নারী : ভগবান, ব্রহ্মা-দুর্গা, পার্বতী, নারায়ণ, শালগ্রাম-শিলা, হরি, শিব, পঞ্চানন, হর-গৌরী, শিব-কালী, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, নীলাম্বর, বসুদেব, যম, জগন্নাথ, কার্তিক, গণেশ, কমলা, লক্ষ্মী, গঙ্গাদেবী, রাধা, মহামায়া, চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, যীশুখৃস্ট, মুহম্মদ, আকবর, আওরঙ্গজেব, শিবাজী, অশোক, পুলকেশী, কালাপাহাড়, বাল্মীকি, রত্নাকর, কৃত্তিবাস, কালিদাস, বিদ্যাসাগর, চাণক্য, খনা, বেহুলা, কালকেতু, দশরথ, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, লব-কুশ, অহল্যা, বামুন, কামার, গোয়ালা, পেয়াদা, কামলা, মুনি, সন্ন্যাসী, ব্যাপারী ইত্যাদি।

৩. প্রাণী ও প্রাণী-অঙ্গ : গরু, ষাঁড়, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, শূকর, কচ্ছপ, কাঁকড়া, কুমীর, ব্যাঙ, শামুক, শুশুক, হাঙর, উট, ক্যাঙারু, গণ্ডার, বাঘ, বানর, বেজী, শৃগাল, হরিণ, হাতি, কাক, কোকিল, কোকিলছানা, ঘুঘু, চড়াই, চিল, টিয়া, পায়রা, বক, বাজপাখি, বাদুড়, ময়ূর, মাছরাঙা, মুরগি, শকুন, শালিক, হাঁস, পিঁপড়া, আরশোলা, ইঁদুর, উইপোকা. উকুন, কাঠবিড়ালী, গিরগিটি, চামচিকা, ছারপোকা, জোঁক, মাছি, মশা, তুঁতপোকা, বিছা, বোলতা, মাকড়সা, শুঁয়াপোকা, সাপ, কেন্নো, কেঁচো, জোনাকি, টিকটিকি, ফড়িং ইত্যাদি।

৪. উদ্ভিদ ও ফলমূলাদি : বীজ, গাছ, পাতা, কলাপাতা, কলসীগাছ, কলাইগাছ, অশ্বথ, আদা, আনারস, আলোকলতা, আলকুশি, ইক্ষু, ওলগাছ, ওষধিগাছ, কদমগাছ, কচুগাছ, কচুরিপানা, কার্পাস, কুমড়া, খেজুরগাছ, গম, আলু, গোলমরিচ, ঘাস, চা-পাতা, চালতা, চোরকাঁটা, জলপাই, তসরগুটি, তালগাছ, তামাকপাতা, তিলগাছ, তেতুঁলগাছ, দেবদারুগাছ, ধানগাছ, মরিচ, নারিকেল, নিম. ঝিঁ. পদ্ম, পলাশ, পানিফল, পাট, পান, পাথরকুচি, পুঁই, পেঁয়াজ, পেঁপে, পোস্ত, ফণিমনসা, বটগাছ, বটপাতা, বকুল, বাঁশ, বিছুটিগাছ, বেগুন, বেত, বেল, ব্যাঙের ছাতা, ভুট্টা, মহুয়া, মানকচু, মুর্তাগাছ, মূলা, রসুন, লাউ, শশা, শাপলা, শিম, শেওলা, সজনেগাছ, সরিষা, সুপারি, হলুদ ইত্যাদি।

৫. প্রকৃতি ও নিসর্গ : আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, আঁধার, আলো, কালপুরুষ, কুয়াশা, ঘূর্ণি, ছায়া, জল, ঝড়, দিন, রাত্রি, দিনমণি, ধোঁয়া, নদী, পাহাড়, প্রাতঃসূর্য, বরফ, বসন্ত, মেঘ, বাতাস, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, রামধনু।

৬. খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র : খই, খিচুড়ি, ডিম, দুধ, ভাত, রুটি, পালং, কলা, তরমুজ, তাল, জাম, কাপড়, উনুন, ঢেঁকি, চিমটে, চরকা, চুড়ি, মানচিত্র, লাটিম, মশাল, মাচা, নৌকা, লাঙ্গল, গাড়ি, ঘোমটা, সিগারেট, হুক্কা, কবর, কলুর ঘানি, শিলপাটা, কলসী, কামারশালা, কাঁথা, খড়ের গাদা, গরুর খুঁটা, ঘোড়ার গাড়ি, তাস, হাঁড়ি, দেশলাই, দোকান ইত্যাদি।

৭. অক্ষর ও সংখ্যা : বিভিন্ন সংখ্যা, সন-তারিখ, ও একাধিক অক্ষরের শব্দ অবলম্বনে ধাঁধা রচিত হয়।

৮. বাদ্যযন্ত্র : একতারা, করতাল, খঞ্জনী, ঘন্টা, ঘুঙুর, ঢাক, ঢোল, বাঁশি, বীণা, বেহালা, মাদল, শঙ্খ, সেতার।

৯. ভাব ও ক্রিয়া : চুমা, লোভ, চুড়ি পরা, ঘোমটা দেয়া, গুণ টানা, মশলা বাটা, পান কোটা, নিদ্রা যাওয়া, উলু দেয়া, আহার করা, ঝাড় দেয়া, দাবা খেলা, চিড়ে কোটা, ধানভানা, মালা জপা, সাঁঝবাতি দেয়া, আছাড় খাওয়া ইত্যাদি।

উপলক্ষ যাই হোক, তাৎক্ষণিকভাবে যা মনে আসে, তাই বলা হয়। অর্থাৎ বিবাহ, খেলা বা কর্মোপলক্ষে স্বতন্ত্রভাবে কোন নির্দিষ্ট ধাঁধা নেই।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে ধাঁধা রচনা করা একটি জাতির কল্পনাশক্তি (imagination), বুদ্ধিবৃত্তি (intelligence), বস্তুজ্ঞান (knowledge), সৌন্দর্যচেতনা, কৌতুকবোধ ও চিত্তস্ফূর্তির পরিচায়ক। যেমন—

১. আকাশেতে আছি আমি গগনেতে নাই/কাননেতে আছি আমি অরণ্যেতে নাই। (ক-অক্ষর);

২. কাঁচাতে কাঁচবরণ সর্বলোকে খায়/পাকাতে সোনার বরণ গড়াগড়ি যায়।(বেগুন);

৩. পোযাকালে পিঁদে শাড়ী, জোয়ানকালে উলঙ্গ/বুড়াকালে মাথায় জটা, ভিতরে তার সুড়ঙ্গ। (বাঁশ);

৪. উড়তে পাখি ঝম্ ঝম্ বসতে পাখি লেদা/আহার করতে য্যায়া পাখি, লেজ পড়েছে বাঁধা। (ভুরি জাল);

৫. খাবার জিনিস নয়, তবু লোকে খায়/বৃদ্ধ খেলে করে হায় হায়/জোয়ান খেলে এদিক ওদিক চায়, শিশু খেলে কাঁদতে কাঁদতে যায়। (আছাড়);

৬. নীলকণ্ঠ গদাধর, তোমার পায়ে শত গড়/তুমি থাক ডালে, আমি থাকি খালে/তোমার আমার দেখা হবে মরণকালে। (মরিচ ও মাছ);

৭. খোদাব তৈযারী ঘর, নাহি কোন দুয়ার/যোগেন্দ্র পুরুষ এক থাকে নিরাহার/যখন পুরুষবর হয় বলবান/খোদার ঘর ভাইঙ্গা করে খান খান। (ডিম);

৮. তিন অক্ষরে নাম তার, পানিতে করে বাস/মাঝের অক্ষর বাদ দিলে ছুঁইতে চায় আকাশ। (চিতল);

৯. আগে যায় ফিরে চায়, ওটি তোমার কে/ওর শ্বশুর আমার শ্বশুরকে বাপ ডেকেছে। (শাশুড়ী ও পুত্রবধূ);

১০. সিন্দুরেতে ডগমগ কাজলের রেখা/এমন কে সুন্দরী কন্যা বনে হলো দেখা। (কুঁচ)।

বস্তুনিষ্ঠ ও জাগতিক চেতনার সঙ্গে কল্পনাচাতুর্যের মিশ্রণে ধাঁধাগুলি মোহনীয় হয়ে উঠেছে। মানুষ ও সমাজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, প্রকৃতি ও আবহাওয়া, খাদ্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র ইত্যাদি নিয়ে এরূপ ধাঁধা রচনার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনবাদী চেতনার পরিচয় আছে। বাংলার লোকমানস সাংস্কৃতিক জীবনে কৌতুক ও আনন্দকে ধরে রাখতে পেরেছে। জীবনের ক্লেদ, মালিন্য, অস্বচ্ছতা ধাঁধায় রেখাপাত করে নি। 'মাথায জটা', 'নীলকণ্ঠ গদাধর', 'যোগেন্দ্র

পুরুষ', 'খোদার ঘর' ইত্যাদিতে ঐতিহ্য এসেছে অনায়াসে। কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিম ভাষা কোথাও নেই। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনরস শুকিয়ে যায় নি, বরং কৌতুকে ও আনন্দে তা কখনো কখনো স্পন্দিত হয়ে নির্মল আলোকে ঝলকিত হয়। ধাঁধার চর্চার মধ্যে তার প্রমাণ আছে। পাশ্চাত্য লোকবিজ্ঞানী বলেন : "A genuine folk-riddle is a spontaneous expression, coming from the depths of the soul of a people or a race,.... Riddles are, therefore, in a real sense the vox populi".

একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর আত্মার মর্মস্থল থেকে ধাঁধা বেরিয়ে আসে বলে তাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। 'এক বাড়ির তিন বউ/এক পালাইলে রান্না খোও।' (উনুন) —এটি একান্নবর্তী পরিবারের অন্তরঙ্গতার ছবি। 'মামুরা সিন্নি রান্ধে খায়/আমাকে দেখ্যা দুয়ার দেয়।' (শামুক)—এখানে আত্মীয়তার মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। 'ধানের মধ্যে খামা/কুটুমের মধ্যে মামা।'—প্রবাদটি যখন রচিত হয়েছে তখন মামা ও ভাগ্নের মধ্যে মধুর সর্ম্পক ছিল, কিন্তু ধাঁধা রচনার সময় সে-সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে, সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণে এমনটি হয়েছে। 'একটুখানি গাছে/রাঙা বউটি নাচে।' (মরিচ), 'কালো বউয়ের কপালে চিক/জামাই এলে করে হিত।' (মাসকলাই)', 'ছোট ইটা ছেমরি,/নায়না ধোযনা এতই সুন্দরী।' (রসুন), 'তলে মাটি উপরে মাটি/মধ্যে সুন্দরী বেটি।' (হলুদ), 'ঘরের মধ্যে ঘর/ নাচে কন্যা-বর।' (মশারি) ইত্যাদি ধাঁধা পারিবারিক জীবনের সরস ও সজীব চিত্রকে ধারণ করে আছে। এগুলির অতীত নেই, এগুলি চির নতুন।

উপসংহারে ধাঁধার নিম্নরূপ ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায় :

১. ধাঁধা বুদ্ধি ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত; এতে জাতির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। ধাঁধায় আবেগের স্থান নেই।

২. ধাঁধা বস্তুধর্মী ও জীবনবাদী রচনা; এতে জাতির ইহজাগতিক (secular) চেতনার প্রকাশ আছে। ধাঁধায় ধর্মের কথা একেবারেই নেই।

৩. কৌতূহল ও কৌতুকবোধ থেকে ধাঁধার জন্ম; এতে জাতির সরস জীবনীশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ধাঁধায় নৈরাশ্যের চিত্র নেই।

৪. ধাঁধা প্রাচীন হয়েও চিরকালীন, জনশ্রুতিমূলক হয়েও সমকালীন। এর বিষয়বস্তু পরিচিত জগৎ থেকে নেয়া হয়। এজন্য এতে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই।

প্রবাদ (Proverbs)

লোকসাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে প্রবাদ সমকালকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে আছে। আধুনিক যুগে সব ধরনের রচনায় প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক,

সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, দৈনন্দিন কথাবার্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবাদের ব্যবহার অহরহ লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদ লোকসাহিত্যধারায় ক্ষুদ্রতম রচনা—একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত প্রবাদের অবয়বগত ব্যাপ্তি। 'বিষে বিষক্ষয়', 'পর্বতের মুষিক প্রসব', 'গরু মেরে জুতা দান', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে', 'অতি চালাকের গলায় দড়ি/অতি বোকার পায়ে বেড়ি' ইত্যাদি প্রবাদে দুই শব্দের বাক্য থেকে দুই চরণের বাক্য আছে। প্রবাদ যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা পূর্ণাঙ্গ ভাবদ্যোতক ও অর্থবহ হয়ে থাকে। প্রবাদ মানুষের সামাজিক বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং মূলত বুদ্ধিপ্রধান রচনা। দানাবাঁধা স্বচ্ছ স্ফটিকের সঙ্গে প্রবাদের উপমা দেয়া যায়। স্ফটিক একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফল। একটি প্রবাদ সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি থেকে জন্ম নেয়। 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'জোর যার, মুলুক তার', 'লাগে টাকা, দিবে গৌরীসেন', 'কোম্পানির মাল দরিয়া মে ঢাল', 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' ইত্যাদি প্রবাদের আটসাঁট গড়ন; এতে বাড়তি মেদ একটুও নেই। স্বল্প কথায় এত বেশি অর্থবহনক্ষমতা প্রবাদ ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য শাখায় নেই।

প্রবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো বিশেষ উক্তি বা কথন। [প্র-পূর্বক 'বাদ' (বদ্+অ) প্রবাদ) যে উক্তি লোকপরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে, তাই প্রবাদ। প্রবাদ পাথরের নুড়ির মতো : সমাজমানসে জন্ম নিয়ে জীবনস্রোতের অনেক পথপরিক্রমা করে একটি নিটোল রূপ লাভ করে। এর পরে তা আর ভাঙে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। 'ধান ভানতে শিবের গীত' অথবা 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রবাদটির মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন হয় নি। 'শিব' কৃষিদেবতা, 'মহীপাল' বাংলার পাল বংশের শক্তিশালী রাজা। প্রবাদের জন্মেতিহাসের দিক থেকে শিব আগে; অতএব এটি মৌলিক প্রবাদ; শিবের স্থলে মহীপাল পরে যুক্ত হয়েছে। সাধারণ কাজে বড় বিষয়ের অবতারণা করলে এই প্রবাদ বলা হয়। 'কোম্পানির মাল দরিয়া মে ঢাল' অথবা 'সরকারের মাল দরিয়া মে ঢাল' প্রবাদে কোম্পানি ও সরকার শব্দের স্থানবদল হয়েছে। 'সরকার' ও 'দরিয়া' ফার্সি শব্দ, 'কোম্পানি' ইংরেজি শব্দ। ফার্সি ভাষার সঙ্গে বাংলার মানুষের আগে পরিচয় হয়েছে, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরে পরিচয় হয়েছে। সুতরাং সরকারযুক্ত প্রবাদটি মৌলিক।

স্পেন দেশীয় সংজ্ঞায় প্রবাদের সৃষ্টিতে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়া হয়েছে : "A proverb is a short sentence based on long experience."—প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। ফরাসী পণ্ডিত বলেন, "Proverbs are crystalized forms of human experience."—প্রবাদ হলো মানুষের অভিজ্ঞতার স্ফটিকীকৃত রূপায়ণ। এ্যারিস্টটল জাতির জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার উপর জোর দেন। তাঁর মতে প্রবাদ হলো "Fragments of an elder wisdom."

সমাজের প্রবীণ মানুষের বুদ্ধির সারসংক্ষেপ হলো প্রবাদ। দার্শনিক বেকনও প্রবাদের মধ্যে একটি জাতির মেধা, বুদ্ধি ও চৈতন্যের প্রতিফলন দেখেছেন। তিনি বলেন, "The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs." আর্চার টেলরের সংজ্ঞাটি এরকম : "A proverb is a terse didactive statement that is current in tradition or, as an epigram says, the wisdom of many and the wit of one."[৪২] তাঁর মতে, প্রবাদ হলো ঐতিহ্যাশ্রিত নীতিশিক্ষামূলক নিটোল উক্তি, তিনি এ-ও বলেন যে, প্রবাদে একের বুদ্ধি ও বহুর জ্ঞান নিহিত আছে। ডবলিউ. সি. হ্যাজলিট প্রবাদকে লোকমনে ব্যাপ্ত সত্যের প্রকাশ বলেছেন; অলঙ্কার ও ছন্দের ভাষায় তা ব্যক্ত করা হয়। তাঁর ভাষায় : "An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a figure, periphrasis, antithesis or hyperbole."[৪৩] ডিজরেলি বলেন : "Proverbs were anterior to books, and formed the wisdom of the vulgar, and in the earliest ages were the unwritten laws of morality."

উপরের সংজ্ঞা থেকে প্রবাদ সম্পর্কে কতগুলি তথ্য পাওয়া যায়—এক. প্রবাদে জাতির 'দীর্ঘ অভিজ্ঞতা (long experience), 'পরিণত বুদ্ধি' (elder wisdom), 'নিটোল নীতিবাক্য' (terse didactive statement), 'নৈতিকতার অলিখিত বিধি' (unwritten laws of morality), এবং 'লোকমনে প্রবাহিত সত্যকথন' (words conveying a truth to the mind) প্রকাশিত হয়। দুই. প্রবাদের অবয়ব হলো 'একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য' (a short sentence), 'স্ফটিকীকৃত রূপ' (crystalized forms) ও 'শব্দগুচ্ছের সমন্বয়' (combination of words)। তিন. প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যাশ্রিত (current in tradition)। চার. উপমা, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের ভাষায় (by a figure, periphrasis, antithesis or hyperbole) প্রকাশিত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, একটি অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সংহত বাক্য হলে প্রবাদ হয়, অর্থপূর্ণ বাক্যাংশ প্রবাদ নয়—এগুলিকে 'বাগ্‌ধারা' (idioms) বা প্রবাদকল্প 'বাগ্‌ভঙ্গি' (proverbial phrases) নামে অভিহিত করা সঙ্গত। তবে বাংলায় কতক প্রবাদকল্প শব্দগুচ্ছকে, যেমন 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ', 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে', 'তেলেবেগুনে জ্বলে উঠা', 'কেঁচে-গণ্ডুষ করে লাগা' ইত্যাদিকে প্রবাদ থেকে আলাদা করা যায় না। অন্ত্যমিলবিশিষ্ট ও ছন্দোবদ্ধ দুই চরণের প্রবাদের সংখ্যাও অনেক।

(১)

উনা ভাতে দুনা বল,
অতি ভাতে রসাতল।

---

৪২. *SDFML*, 902 .

৪৩. W. C. Hazlitt, *A Dictionary of American Proverbs and Proverbial Phrases*, P. X.

(২)

বাকি, বাক্য, বাটপারি,
এই তিন নিয়ে দোকানদারি।

(৩)

অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখনষ্ট বরণে।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।

প্রবাদগুলিতে কেবল জীবনদৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি নয়, যথেষ্ট রসবোধ ও কৌতূহল প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাদে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। তা হলো এই যে, প্রবাদসৃষ্টির পেছনে একটি বিশেষ অর্থ আছে সত্য, কিন্তু প্রয়োগের কালে এর অর্থব্যাপ্তি ঘটে; মূল থেকে প্রয়োগের স্থান-কাল-পাত্রও পরিবর্তিত হয়ে যায়। 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' প্রবাদের জন্মোৎস হয়তো কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা; কিন্তু বর্তমানে এর প্রয়োগ ব্যাপ্তিলাভ করেছে; বাইরে সদ্ভাব, ভেতরে অসৎ উদ্দেশ্য—এমন যেকোন আচরণ বোঝাতে এরূপ প্রবাদের উল্লেখ করা হয়। 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', 'চোরের মার বড় গলা', 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি ধরা না পড়ে', 'চোরের মন সদাই পুলিশ পুলিশ করে' ইত্যাদি প্রবাদ শুধু চোর ও চৌর্যবৃত্তির কথা বোঝায় না, নানা শ্রেণীর অসৎ ব্যক্তি ও তাদের অসৎ কর্ম বোঝাতেও এসব প্রবাদের ব্যবহার হয়। 'ঘোলা পানিতে মাছ শিকার' একটি বাস্তব ঘটনা; কোন ঘটনার মাধ্যমে সামাজিক বা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার আচরণ বোঝাতে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা' প্রবাদটিও কোন এক নটের অদক্ষতা থেকে উৎসারিত; এখন অপটু, অদক্ষ, অক্ষম ব্যক্তি অজুহাত হিসেবে কিছু খাড়া করলে এই প্রবাদের উল্লেখ করা হয়। তবে নীতিশিক্ষা ও উপদেশমূলক প্রবাদগুলি বাচ্যার্থেই ব্যবহৃত হয়। পূর্বোল্লেখিত ৩টি প্রবাদের এমন ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। আরো দৃষ্টান্ত দেয়া যায়—'অন্ন দেখে দিবে ঘি/পাত্র দেখে দিবে ঝি', 'মাংসে মাংস বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল', 'শাক, অম্বল, পান্তা/তিন ওষুধের হন্তা', 'কথা, কড়া, কারসাজি/তিন কতে কবিরাজি', 'মশা, মোল্লা, শাঁখা/এই তিনে ঢাকা' ইত্যাদি বাদে ব্যক্তি বা স্থানের গুণ বা ধর্মবাচক প্রবাদের বাচ্যার্থই মুখ্য। তবে 'কড়ি থাকলে ভেড়াকান্ত'/দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত' বা 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে ফাঁদ' প্রবাদে ব্যঞ্জনা আছে। প্রথমটিতে বিত্ত সামাজিক মান-মর্যাদা বাড়ায়, দ্বিতীয়টিতে বিত্ত-বর্ণে সমতা না থাকলে সামাজিক সম্পর্কে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রবাদ লোকসাহিত্যের স্বতন্ত্র শাখা বটে, তবে প্রবাদের স্বাধীন ব্যবহার নেই; গদ্য ও পদ্য রচনার মধ্যে প্রবাদ প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হয়। এ দিক থেকে বাচ্য বা ব্যঞ্জনামূলক যাই হোক না কেন, প্রবাদের অর্থই মুখ্য।

প্রবাদ সম্পর্কে জার্মানদেশে বলা হয়, "As the country, so the proverb"—যে দেশ যেমন, তার প্রবাদও তেমনি। স্কটল্যান্ডে বলা হয়, 'As the people, so the proverb'—যেমন মানুষ, তেমনি তার প্রবাদ। উভয়ের সমন্বয় করে বলা যায়, যে দেশের যে রকম মানুষ, সে দেশের ও সে মানুষের প্রবাদও তেমনি। অর্থাৎ একটি দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, প্রাণী, সম্পদ, উৎপাদন ও জাতির জীবনের নানা ধারা, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, পরিবার, ঘর-সংসার ইত্যাদি বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়। বিপরীতভাবে বলা যায়, প্রবাদে একটি দেশের ও জাতির অন্তর্জীবনের নানা চিত্র পাওয়া যায়; এগুলি খণ্ড চিত্র, তবে খাঁটি চিত্র। কারণ প্রবাদ লোকমনের সত্যরূপ বহন করে (conveying a truth to the mind)। প্রবাদ বুদ্ধিপ্রধান রচনা, এজন্য অনুমিত হয় যে, লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা প্রবাদের আঙ্গিক গঠন (form) এবং প্রয়োগ-কৌশল (art of use) মানুষ পরবর্তীকালে আয়ত্ত করেছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দিতে মিশরের প্যাপিরাসের গল্পে প্রবাদ আছে। ভারতীয় বেদ-উপনিষদে প্রবাদ আছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে কয়েকটি প্রবাদ আছে। 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরি' প্রবাদটি চর্যাপদকর্তা ভুসুকু ব্যবহার করেন এগারো শতকে, চৌদ্দ শতকে বড়ু চণ্ডীদাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও* একই প্রবাদ ব্যবহার করেন; ষোল শতকে মুকুন্দরাম *চণ্ডীমঙ্গলে* তা ব্যবহার করেন। এ ধারা মধ্যযুগে অব্যাহত থাকে। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার ঘটে, প্রবাদের ব্যবহারও বহুল ও বিস্তৃত হয়।

Oxford Dictionary of English Proverbs গ্রন্থে দশ হাজার প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। বাংলা প্রবাদের এরকম সুপরিকল্পিত সঙ্কলনগ্রন্থ নেই। জেমস লঙ *প্রবাদমালা* (১৮৬৮) গ্রন্থে ২,৩৫৪টি প্রবাদ উৎকলিত করেন। কানাইলাল ঘোষাল *প্রবাদসংগ্রহ* (১৮৯০) গ্রন্থে ১,২১৮টি, দ্বারকানাথ বসু *প্রবাদপুস্তক* (১৮৯৩) গ্রন্থে ২,২৭১টি, সুবলচন্দ্র মিত্র *সরল বাংলা অভিধানে* (১৯০৯) ৩,২০১টি, সুশীলকুমার দে *বাংলা প্রবাদ* (১৩৫২) গ্রন্থে ৬,৬৮১টি প্রবাদ সঙ্কলিত করেন। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান দুই খণ্ডে *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* (১৯৭৬) প্রকাশ করেন। এতে মোট ৮,৮৪২টি (৩,৪৩৮+৫,৪০৪) প্রবাদ আছে। সুশীলকুমার দে অক্ষরানুক্রমিক প্রবাদ বিন্যস্ত করেন এবং মোহাম্মদ হানিফ পাঠান বিষয়ভিত্তিক প্রবাদ বিন্যস্ত করেন। প্রথম খণ্ডের সূচিপত্রে ৭১টি বিভাগ আছে, যথা নারী, স্বাস্থ্যনীতি, আপন-পর, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, দরিদ্র, ধনী-দরিদ্রের সম্বন্ধ, স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, পেটুক, নিষ্কর্মা, আহাম্মক, পরপ্রত্যাশী, চোর, শত্রু, কৃপণ, অপব্যয়ী, দাতা, নিন্দুক, ধূর্ত, অধর্ম, মধ্যপন্থী, উত্তম, ভীতু ও নির্ভীক, অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ, স্বার্থ, অধ্যবসায়, সংসর্গ, প্রেম-প্রীতি, পাপ-ভীতি, একতা, ব্যবহারবিধি, কপটতা, বাগাড়ম্বর, প্রতিজ্ঞা, সুযোগ, হুজুগ, পরিহাস, সুদিন ও দুর্দিন, আশা ও নৈরাশ্য, বিপদের উপর বিপদ, উভয়সঙ্কট, দো-দীল,

স্বভাব অপরিবর্তনীয়, পরের অনিষ্টচেষ্টা, পরকে দিয়ে বাহাদুরি, অনধিকারচর্চা, অতি কিছুই ভাল নয়, বিষম ব্যাপার, সর্বনাশা কর্ম, অদৃষ্ট, পরিচয়-লক্ষণ, স্থান-কাল-পাত্রভেদ, নতুন ও পুরাতনের মূল্যভেদ, পথচলার হুঁশিয়ারি, জোর-জুলুম, গোপনীয়তা রক্ষা, কথার মূল্য, দ্ব্যর্থবোধক কথা, জনমত, বিচার-বিভ্রাট, ক্ষতচিহ্ন লুপ্ত হয় না, গো-ধন প্রসঙ্গ, লিখন-পঠন, ক্ষণিকতা, বৈরাগ্য ও বিবিধ প্রবাদ। এরকম বিভাজনে প্রবাদের পরিধি, বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তবে একে বৈজ্ঞানিক বিভাজন বলা যায় না। কারণ এ বিভাজন কোথাও বিশিষ্ট শব্দ, কোথাও বিষয়, কোথাও অর্থ ধরে হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন—প্রকৃতি, নারী ও চারিত্র্য-নীতি। বার-তিথি-দিন-মাস-ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ সম্পর্কিত বচন, প্রকৃতিমূলক, মাতা, কন্যা, বধূ, শ্বাশুড়ী, ননদ, সতীন ইত্যাদি রক্ত-পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কিত, নারীমূলক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানবচরিত্রমূলক ও নীতিমূলক প্রবাদের উল্লেখ করেছেন তিনি।[৪৪] তাঁর এরূপ বিভাজন সঠিক, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। আমেরিকার লোকবিজ্ঞানী আর্চার টেলর ও বি. জে. হুইটিং প্রবাদগুলিকে বিষয় বা প্রধান বিশেষণ বা গুরুত্বপূর্ণ শব্দের নাম ধরে শ্রেণীবিভাগ করেন। আশরাফ সিদ্দিকী এমন রীতি অনুসরণে অক্ষরানুক্রমিক বিভাজন করেন। 'অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।', 'দুই সতীনের ঘর খোদায় রক্ষা কর', 'যদি বর্ষে আঘনে, রাজা যায় মাগনে'—এই তিনটি প্রবাদকে যথাক্রমে 'অল্প', 'সতীন' ও 'কৃষি' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি।[৪৫] এরকম বিভাগ দ্বারা প্রবাদের কোষ বা সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করা সুবিধাজনক, তবে প্রবাদের বিচার-বিশ্লেষণ এজাতীয় বিভাগ দ্বারা হয় না। বাচ্যার্থ হোক, ব্যঞ্জনার্থ হোক, প্রবাদের বিষয় (theme) ও অর্থ (meaning) দ্বারা বিভাগ যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা মনে করি। হাজার হাজার প্রবাদকে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা কঠিন। গ্রহণযোগ্য কয়েকটি মুখ্য বিভাগ এভাবে করা যায় : ১ প্রকৃতি ও নিসর্গ; ২. নারী ও পুরুষ; ৩. বৃত্তি ও বৃত্তিজীবী; ৪. মানবচরিত্র ও স্বভাবধর্ম; ৫. নীতি ও উপদেশ; ৬. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা; ৭. হাস্য-ব্যঙ্গ-নিন্দা-কৌতুক; ৮. প্রাণী ও জীবধর্ম; ৯. সমাজ-ধর্ম-দর্শন-অর্থনীতি-রাজনীতি; ১০. বিবিধ।

'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ', 'খাল কেটে কুমীর আনা', 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়', 'মরা হাতির লাখ টাকা দাম', 'হাতি কা দাঁত, মরদ কা বাত', 'হাতি খাদে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে', 'হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল', 'ঘুঘু দেখছ, ফাঁদ দেখনি', 'কাক ধূর্ত আর কাযেত ধূর্ত', 'মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার' ইত্যাদি প্রবাদে দেশের প্রাণিকুলের (fauna) পরিচয় আছে। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, অবস্থা প্রভৃতি বোঝাতে প্রবাদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। গণ্ডার ব্যতীত অন্য সকল প্রাণী বাংলাদেশের জীবজন্তুর অন্তর্ভুক্ত।

---

৪৪. *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ৬০৪-০৭।

৪৫. *লোকসাহিত্য*, ২৬৮-২৭২।

'মশা, মোল্লা, শাঁখা এই তিনে ঢাকা', 'ধান, ডাকাত, খাল এই তিনে বরিশাল', 'সারেঙ, শুঁটকি, দরগা এই তিনে চাঁটগা', 'জমিদার, গান, মৈষের শিং, এই তিনে মৈমনসিং', 'আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান এই তিনে বর্ধমান', 'ষাঁড়, রাঁড়, সন্ন্যাসী এই তিন নিয়ে হলো কাশী' ইত্যাদি প্রবাদ এক এক স্থানের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। প্রবাদগুলি বাচ্যার্থনির্ভর। 'বামুন, বাদল, বান দক্ষিণা পেলেই যান।' 'সাপ, শালা, জমিদার তিন নয় আপনার', 'শাক, অম্বল, পান্তা তিন ঔষুধের হন্তা', 'রাও, বাও, নারী তিন কয়েতের বৈরী', 'বাকি, বাক্য, বাটপারি এই তিনে দোকানদারি', 'অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ তিনের রেখ না চিন', 'দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি এ তিন বড় উপকারী', 'তাস, তামাক, পাশা তিন কর্মনাশা' ইত্যাদি প্রবাদও বাচ্যার্থনির্ভর। ব্যক্তি-বস্তু-বিষয়বাচক তিন শব্দ দ্বারা প্রবাদের অবয়ব গঠিত। এ্যালান ডান্ডিস কথিত 'তিনের সূত্র' (the law of three) অনুসারে এমনটি হয়েছে।[৪৬] ছন্দ ও অন্ত্যমিল স্মৃতিতে ধারণ করার সুবিধা আছে। বিচিত্র বিষয়কে কাঠামোগত ঐক্যের মধ্যে ব্যক্ত করায় এতে করে প্রবাদ রচয়িতাদের শিল্পীত মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'অর্থ অনর্থের মূল', 'অভাবে স্বভাব নষ্ট', 'এক কড়ার মুরোদ নাই, ভাত মারবার গোঁসাই', 'হাতে নেই কড়াবট, প্রাণ করে ছটফট', 'টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওযা যায়', 'হাট না বসতেই দাইড়ার কড়ি', 'পরের ধনে পোদ্দারি', 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি' ইত্যাদি প্রবাদ অর্থকেন্দ্রিক। সাধারণত অর্থের মন্দের দিকটি বেশি ফুটেছে। ধনবৈষম্য ও শ্রেণীশোষণের চিহ্ন আছে এসব প্রবাদে।

'চাচা আপন জান বাঁচা', 'আপ ভাল তো জগৎ ভাল', 'আপনা হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো হাত', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম, দেশ দশ নিজের ধাম', 'আপন চরকায় তেল দাও' ইত্যাদি প্রবাদে আত্মমুখী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। আবার 'একতাই বল', 'একের বোঝা দশের লাঠি', 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ', 'দশ চক্রে ভগবান ভূত', 'যেদিকে দশ সেদিকেই খোদা' প্রবাদগুলিতে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও ঐক্যবোধের পরিচয় আছে। এগুলি বাংলার মানুষের বিশ্ববীক্ষা (world-view) সম্পর্কে আলোকপাত করে। 'রাখে আল্লাহ মারে কে ?', 'কপালের লিখন না যায় খণ্ডন', 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়', 'খোদা যাকে দেয় ছপ্পর ফেড়ে দেয়' প্রবাদগুলিতে অদৃষ্টবাদের (fatalism) কথা আছে। 'খাটে খায় দ্বিগুণ পায়, বসে খাটায় অর্ধেক পায়', 'বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়' প্রবাদে কর্মবাদের লক্ষণ আছে। জগৎ-সংসারকে আদিকালে ধর্মবিশ্বাস, পরবর্তী যুগে দার্শনিক মতবাদ এবং আরো পরে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দ্বারা দেখা হয়; লোকবিজ্ঞানী একেই 'বিশ্ববীক্ষা' বলে অভিহিত করেন। বাংলার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে দৈব বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ ও

---

৪৬. Alan Dundes, (edited), *The Study of Folklore*, (New Jersey 1965), 131.

ভাববাদ প্রাধান্য পেয়েছে; বস্তুতন্ত্র বা যুক্তিবাদের স্থান খুব কম। শেষের দুটি প্রবাদে যুক্তি আছে। 'যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভাল', 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' প্রবাদ দুটিতে বিপরীতধর্মী দর্শন আছে। একটিতে বস্তুবাদী দর্শন, অপরটিতে নৈরাশ্যবাদী দর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

নর-নারীর স্বভাব-চরিত্র, পেশা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবাদের সংখ্যা অজস্র। পরিবার ও সমাজ সূত্রে রক্ত, জ্ঞাতি, স্বজন, পরিজন সম্পর্কিত যতো নর-নারী আছে, তাদের প্রায় সকলের স্বভাব-চরিত্র-আচরণ নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়েছে। প্রধানত এদের সমালোচনা করা হয়েছে; সমালোচনায় গুণ অপেক্ষা ত্রুটির দিক বেশি ধরা পড়েছে। এতে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের দিকটি সূচিত হয়। মা-বাবা, মামা-মামী, মাসী-পিসী, চাচা, দাদা, বধূ, শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, জা, ভাসুর, দেবর, শ্যালক-শ্যালিকা, নাতি-নাতিনী, সতীন, সৎমা, সখী ইত্যাদি সম্পর্কে শত শত প্রবাদ আছে। এগুলির মধ্যে বাবা, মা, মামা ইত্যাদি ব্যতীত অন্যদের নিন্দা-ব্যঙ্গ-হীনভাব দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। বিশেষত নারীর নিন্দা সমধিক। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, নারীবিষয়ক প্রবাদগুলির রচয়িতা নারীসমাজ; নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে আত্মীয়-স্বজনকে সুদৃষ্টিতে দেখা বা তার প্রতি সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।[৪৭]

'ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে', 'শাশুড়ী মল সকালে, খেয়ে দেয়ে সময় থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে', 'ননদিনী বায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কাল-সাপিনী', 'যমজামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা', 'শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি', 'দুই সতীনে ঘর, খোদাই রক্ষা কর' ইত্যাদি প্রবাদ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। যে সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃতি পায় না, সে সমাজে এমন প্রবাদ জন্মে ও লালিত হয়।

'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট', 'মোগল-পাঠান হদ্দ হলো ফার্সি পড়ে তাঁতী', 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট', 'ঢাল নাই তরোয়াল নাই, নিধিরাম পোদ্দার', 'আনাড়ি বৈদ্যে কান নষ্ট, কাঠমোল্লায় ঈমান নষ্ট', 'ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট', 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি', 'কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত', 'বামন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর', 'বামুন, বাক্স, বাঁশ তিনে বাস্তু নাশ', 'কড়ি দিয়ে কিনব দই, গয়লানী মোর কিসের সই', 'হাকিম নড়ে, হুকুম নড়ে না', 'ঝড়ে বক মরে, পীরের কেরামতি বাড়ে', 'চোরের নজর বোচকার দিকে', 'গাঁয়ের যুগী ভিক্ষা পায় না', 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', 'চালাক মাঝির ঘোপায় লা' ইত্যাদি প্রবাদে বিভিন্ন পেশার মানুষের চিত্র ও চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ প্রবাদ দ্ব্যর্থবোধক—বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের স্বভাবের ও আচরণের অনিষ্টকর ও অপ্রীতিকর দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। মানুষ দক্ষতা, সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে তবেই

৪৭. *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পৃ ৬০৪।

সমালোচনার পাত্র হয়। সমাজে ভাল মানুষের অভাব আছে, মন্দ লোকের অভাব নেই, সে বাস্তবে প্রতিবাদ করতে পারে নি, তাই প্রবাদে সমালোচক (critic) হয়ে উঠেছে। 'সাপ, শালা, জমিদার, তিন নয় আপনার' প্রবাদটিতে আছে সামাজিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। প্রবাদকার এখানে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যে সমাজে 'পোলা বেচ পুরী বেচ খাজনা দিয়া আগ হচ' অর্থাৎ পুত্র-কন্যা বিক্রি করে হলেও জমিদারের খাজনা দিতে হয়, সে সমাজে জমিদারের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে না, অবজ্ঞাই জাগে। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ', 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও', 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' ইত্যাদি প্রবাদে unwritten law of morality-র দৃষ্টান্ত আছে।

প্রবাদ ভাষার এক বিশাল ও অমূল্য সম্পদ। প্রবাদ বক্তব্যকে সুসংহত করে, ধারালো করে, অর্থবহ করে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "সুন্দরী, অলক-তিলকের ন্যায় প্রবাদবাক্যগুলি ভাষায় সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলে।"[৪৮] প্রবাদ ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যকে 'জনপদের হৃদয়কলরব' বলেছেন। আমরা উপরের আলোচনায় লোকসাহিত্যের সকল ধারার একটি রূপরেখা দিয়েছি। শুধু 'জনপদের হৃদযকলবব' নয়, জীবনেব সঙ্গে জীবনের যোগ, সমাজের অভ্যন্তরের নানা মাত্রিক চলমানতা, জাতিসত্তাব স্পন্দন, ঐতিহ্যরস, জীবনদর্শন, মূল্যবোধ, নৈতিক চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কেও আমরা আলোকপাত করেছি। লোকসাহিত্যের শিকড় মাটি আর মানুষের গভীরে, দেশের প্রকৃতি আর জনগণের জীবনে ডাল-পালা, ফুল-ফল বিস্তার করে শিল্প-সংস্কৃতির এক আনন্দ ও সৌন্দর্যলোক রচনা করেছে। বাংলার মানুষের তা নিজস্ব ও খাঁটি সম্পদ। 'তুমি হও বটবৃক্ষ, আমি হব লতা'— নারী পুরুষকে এমন দৃষ্টিতে দেখেছে। আর 'তুমি হও গহিন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি'—পুরুষ নারীকে এই দৃষ্টিতে দেখেছে। বিশ্ববাসী সম্পর্কে পল্লীকবির অভিব্যক্তি হলো—'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।' সমাজবন্ধন ও ধর্মবিশ্বাসকে উপেক্ষা করে বাংলার কবি চণ্ডীদাসও ঘোষণা করেন, 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' বাংলা লোকসাহিত্যের বিচিত্র ভাব ও সুরে এরকম জীবনবোধ ও মানবমহিমার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। রাশিয়ার লোকবিজ্ঞানী বলেন, "Folklore is an echo of the Past, but at the same time it is the vigorous voice of the Present."[৪৯] —ফোকলোর হলো একাধারে অতীতের প্রতিধ্বনি আর বর্তমানের প্রবল কণ্ঠস্বর। আশাকরি আমাদের আলোচনায় এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

৪৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী' (সভাপতির ভাষণ), *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, (ঢাকা ১৯৮৫), ৪২৫।

৪৯. Y. M. Sokotov, *Russian Folklore*, (New York 1980), 15.

১২

আরবি ফার্সি উর্দু সাহিত্য

আবদুস সোব্‌হান*

আরবি সাহিত্য

খৃস্টীয় তেরো শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পরপরই দেশের যেসব জায়গায় ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বসতি স্থাপন করেছিল সেসব জায়গায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। দেশের শাসকবর্গের ভাষা ফার্সি হলেও ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি প্রাধান্য পায়। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র অর্থাৎ মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসাগুলোর ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আরবি সাহিত্যের বিকাশলাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মসজিদ ও মাদ্রাসা ছাড়াও আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতাদের পরিচালিত শিক্ষালয়গুলোও দেশী-বিদেশী পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীদের পীঠস্থানে পরিণত হয় এবং তাঁরাও আরবি শিক্ষার প্রসারে প্রচুর অবদান রাখেন। ইসলামী শিক্ষার স্বাভাবিক নিয়মেই কুরআন ও হাদিস শিক্ষা এবং সেই সাথে 'সিরাত' (মহানবীর জীবনী) মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমের পুরোভাগে স্থান পায়। তার পরই স্থান পায় 'তফসীর' (ভাষ্য ও টীকা) এবং 'ফিকাহ্' (আইনবিজ্ঞান)। পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত ধর্মনিরপেক্ষ ও পেশাগত বিষয়সমূহ উচ্চতর শিক্ষার্থীরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়তে শুরু করে। বাংলার আরবি শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাসমূহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ছিল, কিন্তু ফার্সির বেলায় তা প্রযোজ্য ছিল না। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা দলে দলে ঐসব জায়গায় আসতে শুরু করে। এ ধরনের প্রখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল গৌড়, পাণ্ডুয়া, দারাসবাড়ি, রংপুর, সোনারগাঁও, ঢাকা, বাঘা, সিলেট ও চট্টগ্রামের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ। বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ (আশি) হাজার।

ফার্সি ভাষার অধ্যাপক, মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ, কলকাতা।

সবচেয়ে প্রাচীন যে আরবি পণ্ডিতের রচনা সংরক্ষণ করা হয়েছে তাঁর নাম কাজি রুকনউদ্দিন সমরকন্দী[১] তাঁকে বুখারার প্রখ্যাত হানাফী আইনবিদ সমরকন্দের অধিবাসী কাজি রুকনউদ্দিন আবু হামিদ মুহম্মদ আল-আমাদী বলে সনাক্ত করা হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দিন আলি মর্দান খিলজীর রাজত্বকালে (১২১০-১২১৩ খৃ.) বাংলায় কয়েক বছর চাকুরি করার পর তিনি ১২১৮-১৯ সালে বুখারায় ইন্তেকাল করেন। এই ভিজিটিং মুসলিম মনীষীই *অমৃতকুণ্ড*[২] নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি আরবিতে (এবং ফার্সিতেও) অনুবাদ করেন বলে ধারণা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশ, ইউরোপ ও ইরানের কয়েকটি পাঠাগারে এর কতিপয় পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

খৃষ্টীয় তেরো শতকের শেষদিকে শেখ শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামা কর্তৃক ঢাকার নিকটবর্তী সোনারগাঁ-এ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষালয়টি ছিল[৩] বলতে গেলে সভ্যজগতের এই অংশে আধ্যাত্মিক শিক্ষার আলোকবর্তিকা। সমকালীন বিখ্যাত সুফি সাধক শেখ শরাফউদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী সোনারগাঁও-এ শেখ তাওয়ামার কাছে বাইশ বছরকাল তফসীর ও হাদীস শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং বিহারের মানেরে প্রত্যাবর্তনের আগে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়। বিহারে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেখানে একই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, যা মধ্যযুগের একটি বিখ্যাত সুফি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সোনারগাঁও খানকাহ্‌টি এর প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল।

বাংলাদেশে আরবি শিক্ষার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল সিলেটে। খৃষ্টীয় চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাধক শাহ্ জালাল (মৃ. ১৩৪৭) কেন্দ্রটি স্থাপন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়ই এটি পরিচালিত হতো। যদিও সে সময়ের কোন আরবি পুস্তকের নমুনা আমাদের কাছে নেই, তবু এটা প্রায় নিশ্চিত যে শাহ্ জালালের শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু এবং এখান থেকেই ইসলামী ধর্মান্তরকরণপ্রয়াসের মূল কাঠামো গড়ে উঠে। এই সাধকের প্রচার থেকে নিঃসৃত ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বহু অলৌকিক কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

বাংলা যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে আসে, তখনই এ প্রদেশে আরবি সাহিত্যের বিকাশলাভ ঘটে। সৌভাগ্যবশত বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা একটি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি অনুসরণ করতেন এবং তার ফলে প্রাচ্যের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বিপুল

---

১. Abdul Karim, *Social History of the Muslims of Bengal*, (2nd revised edition, Chittagong 1985), 94-96.

২. *অমৃতকুণ্ড* ও তার লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *Journal Asiatique*, Tome CCXIII, 292-344; *Journal of the Pakistan Historical Society* I: I (Dacca 1953), 54-55; Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, (Riyadh 1985), 844.

৩. S. H. Masumi, Sonargaon, *Islamic Culture*, XXVII : I (Dacca 1953), 1-12.

গতিসঞ্চার হয়। ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে স্থানীয় ধর্মগুরুদের সৃজনশীল তৎপরতা আরো জোরদার হয় এবং তাঁরা আরবি ভাষায় তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন।[৪] এ সময়ের প্রথম সারির পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন মৌলবি ওবায়দুল্লাহ আল-উবায়দি (১৮৩৪-১৮৮৫)। তিনি কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন এবং পরে হুগলী কলেজে আরবির অধ্যাপক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। এরপর ১৮৭৪ সালে তিনি ঢাকায় চলে যান এবং কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসার আদর্শে সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে ১৮৮৫ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তা পরিচালনা করেন। তাঁর রচিত আরবি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *তাজকিরাত-উল-ফুহুম ফি তাহকিক-ই-মা'খাছ উল-উলুম, তারাজ আল-আজহার ফি সিভার-উল-ফালাসাফাত-উল-কিবির, তাশখিস-উল ইদরাক ফি হাকিকাত-উল-বারাকাত-উল আরদওয়া উজুদ-উল-আফলাক,দরাইয়াত-উল-আদব ফি লিসান-উল আরব, আল-মানাহিল-উল-সাফিয়া ফি মাসাইল-উল-জুরাফিয়াহ, লুব-উল-ইরাব* এবং *তাদরিব-উল-তুল্লাব*।[৫] তিনি তাঁর আরবি কবিতার একটি সঙ্কলনের পাণ্ডুলিপিও তৈরি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সঙ্কলনটি অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৭৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর আরবি ভাষার ব্যাকরণ বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ বইটি আরবি শিক্ষার প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উবায়দির অন্যতম শিক্ষক আবদুর রহিম গোরখপুরী[৬] (১৭৮৫-১৮৫৬) ছিলেন একজন যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ, কবি ও লেখক। তিনি বেশিরভাগ সময়ই কলকাতাবাসী ছিলেন, মাত্র বছর খানেক তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন এবং এখানে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর আরবি কাসিদা ও কবিতাগুলো রচনা করেন। তাঁর কিছু মৌলিক আরবি রচনা এবং অনুবাদগ্রন্থও আছে। এগুলোর মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের উপর লিখা তাঁর একটি গ্রন্থ হচ্ছে *আনওয়ার-উল-মাশরিকিয়াহ ফি আমর বিল মানতিকিয়া*। গ্রন্থটি ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ঢাকার আর একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন আবদুর রহিম খাকি। তিনি প্রশাসন বিভাগে চাকুরি করতেন। তিনি আরবিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন এবং নীতিশাস্ত্র বিষয়ক ফার্সি গ্রন্থ *জামী-উর-রমুজ* থেকে অংশবিশেষ আরবিতে অভিযোজন করেন। তিনি *কাসিদা বাদউল-আমালী* নামক আরবি গীতিকাব্যটি ফার্সিতে অনুবাদ করেন। মুহম্মদ ইসহাক বরদাওয়ানী (১৮৬৬-১৯৩৮) ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের

---

৪. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, S. K. Das, *Sahibs and Munshis of the Fort William College*. (New Delhi 1975).

৫. অধিকাংশ রচনাই লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়।

৬. A. F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh: Tradition and Transformation*, (Dhaka 1987), 24-31.

শিক্ষক ছিলেন এবং পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। তিনি আরবিতে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন, যেমন, *সিহ-উল-ওয়াউমুল ইলা ইলম্-ইল-উসুল*, *আল-হিকমাত-উল-বালিগা ফি মাকারিম-ইল-আখলাক ওয়াল-আদাব*, *আত-তাহকিকাত-উস-সুনিয়াহ* এবং *আল-নাউ-উল লামী*।

বাংলায় মুসলিম জাগরণের পাদপীঠ ঐতিহাসিক কলকাতা মাদ্রাসার[৭] সঙ্গে জড়িত ছিলেন জন্মগতভাবে বা বসতিস্থাপনসূত্রে পূর্ব বাংলার অধিবাসী আরবি ভাষায় সুদক্ষ পণ্ডিতবর্গ। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ খান বাহাদুর মুহম্মদ মুসা (মৃ. ১৯৬৪) ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় কয়েকটি উন্নতমানের গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলো হচ্ছে *তাহসিরিল মানতিক*, *তালিম-উল-ফারায়েজ*, *আল-বায়ান আল-আজহার ফি শারহ্-ই-ফিকাহ্ ইল-আকবর*, *রায়হানাত-উল-আদব*, *সুবহাত-উল-আদব*, *কিতাব-উল-ইনশা* এবং *কিতাব উল-আমালিহ*। আবদুর রহমান কাশগরি (১৯১২-১৯৭১) ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। তিনি কেবল প্রখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিতই ছিলেন না, আরবি ভাষায় একজন মেধাবি কবি, সমালোচক এবং আভিধানিকও ছিলেন। আরবিতে রচিত তাঁর বইগুলো হচ্ছে *আল-জাহরত* (কাব্যগ্রন্থ), *ইলা শাবাব-ইল-আলম-ইল-মুহম্মদ আল্লাহ-উ-আকবার সাহুফল হাক্কিল মাসলুল* এবং *মাতারিহুল ঘুরবা*। *আল-মুফিদ* শিরোনামে তিনি আরবি, উর্দু ও বাংলা এই তিন ভাষার একটি অত্যন্ত মূল্যবান অভিধানও সঙ্কলন করেন, যা ১৯৬১ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ঢাকার অন্যান্য সমকালীন আরবি সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ নাদভী (১৯০০-১৯৭২), শেখ আবদুর রহিম (১৯০৪-১৯৭৩), মওলানা জাফর আহমদ উসমানী(১৮৯২-১৯৭৪), মুফতি দীন মুহম্মদ খান (১৯০০-১৯৭৪), মুফতি আমিনুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪), মওলানা আবুল হুফ্ফাজ ফসিহ (১৯০১-১৯৭৪) এবং শামসুল উলেমা মওলানা বিলায়েত হোসেন (১৮৮৭-১৯৬৪)। বাংলাদেশে আরবি শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা সবাই অবদান রেখে গেছেন।

সুফী সাধকদের অভূতপূর্ব ও অবিরাম প্রচারকাজের ফলে ইসলামী অধ্যাত্মবাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষকরে চট্টগ্রাম এলাকা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এসব সুফি সাধকের অনেকেই সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই এলাকা ও তার আশেপাশে তাঁদের সমাধিও রয়েছে। কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতা তাঁদের এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হন।[৮] এরা হলেন সঙ্গীতগ্রন্থ *তাহকিকুল*

---

৭. কলকাতা মাদ্রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Abdus Sattar, *Tarikh-i-Madrasah Aliah*, (Dhaka 1959).

৮. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ*, (ঢাকা ১৯৮৬), ১১৭-১৫৬।

আজাবির ফিস সামা-ইন মাজামির-এঁর রচয়িতা মওলানা শাহ্ মুহম্মদ আবদুল হাই; *সহিফাত-উল-আমল ওয়া মির তাউল আহওয়াল* এবং *ওয়াজা-ইফ-উল মুজাককিরিন* গ্রন্থের লেখক আবদুল আলি দুররী; *মাজাল্লাতুল আদিব লি-আজাল্লাত-ইস-সন্দ্বীপ, আল-তারিফ-লিল আদিব ইজ-জারিফ, জাওয়ামি-উল-কলিম, শারহ্ সাবা মুয়াল্লিকা*, এবং *আল-মানতুক* গ্রন্থের রচয়িতা আবুল আওয়াল জৌনপুরী; *কাসাইদ-ই-আরবি, নাজম-উল-আফাইদ* ও *মাকাতিব* গ্রন্থের লেখক শাহ্ সুফি ওয়ালি আহমদ নিজামপুরী; *খায়ের-উজ-সুফি ওয়ালি আহমদ নিজামপুরী, খায়ের-উজ-জাদ ফি সায়ের-ইত-দাদ নিমাল আরুদজ ফি নাজ'ম-ইল-ফুরুজ* এবং *আজিজুল কালাম ফি মাধ-ই-খায়ারিল আনাম* পুস্তকের লেখক মুফতি মুহম্মদ আজিজুল হক (মৃ. ১৯৬০), *নিম-আর রাসা'ইল ফি নাজম্-ইল মাসা 'ইল, আনিস-ইল-আরব ফি নাফিস-ইল-আরব* এবং *জালিস-উত-তারাব* গ্রন্থের রচয়িতা নাজির আহমদ আনোয়ারী এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ের উপর আরবি ভাষার বহু ধর্মীয় প্রবন্ধের লেখক হাটহাজারী মাদ্রাসার মুফতি ফয়জুল্লা (মৃ. ১৯৭৬)। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী নোয়াখালী অঞ্চলেও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, মুহম্মদ আবদুল গনি, হাফিজ মুহম্মদ কোবাদ (মৃ. ১৯৭৫). মুহম্মদ নূরুল্লাহ (মৃ. ১৯৭২), নূর মুহম্মদ আজমী (মৃ. ১৯৭৩) এবং মমতাজউদ্দিন আহমদ (মৃ. ১৯৭৪)।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট শাহ্ জালালের আমল থেকেই সাংস্কৃতিক উন্নয়নতৎপরতায় তার প্রাধান্য বজায় রাখে। তবে ফার্সি ও উর্দুর মতো আরবিতেও এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদানের রেকর্ড পাওয়া যায় উনিশ শতক থেকে। মৌলিক রচনার দিক থেকে শহরের অভিজাত মজুমদার পরিবারের সউদ বখ্ত মজুমদার ও হামিদ বখত মজুমদার[৯] দু'জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। হামিদ বখত মজুমদার ব্যাপকভাবে বিভিন্ন আরবদেশ সফর করেন এবং আরবি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি তাঁর চাকর-বাকরদের সঙ্গেও সর্বদা আরবিতে কথা বলতেন। সব সময় সফরসঙ্গী হওয়ার ফলে তাঁর চাকরগণও আরবি জানতো। সিলেটের কাজি আবু মুহম্মদ আবদুল কাদির, যিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ইন্তেকাল করেন, তিনি কয়েকটি গবেষণামূলক আরবি পুস্তক রচনা করেন, যেমন *রিসালা-ই-রাদ-ই-মাকুল* (ওহাবীদের বিরুদ্ধে), *আল-ফাওয়াইদ-উল-কাদেরিয়া* এবং *আল-দররুল-আজহার ফি শার-ই-ফিক-ই-আকবর*। সিলেটের মওলানা আবু নসর ওয়াহিদ (মৃ. ১৯৮৫) ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এবং উন্নতমানের পাঠ্যবই লিখার মাধ্যমে আরবিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়

৯. Muhammad Bakht Majumdar, *Majumdar Family of Sylhet*, (Calcutta 1911), 7; *Bangladesh District Gazetteers* (Sylhet), Dhaka 1970.

ভূমিকা পালন করেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য পাঠ্যবইয়ের মধ্যে রয়েছে *মিরকাত-উল-আদব*, *বকুরাত-উল-আদব* এবং *নুকুব-আল উলুম*। আরবি ভাষার উৎকর্ষসাধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর ও পাবনারও অবদান রয়েছে। বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩) নদীমাতৃক এই দেশটির দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। রংপুরে তাঁর সমাধি রয়েছে। বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম হিসেবে বিবেচনা করা যাবে কিনা এই তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়টির উপর রচিত *নাসিমুল হারামাইন* একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় আরবি গ্রন্থ।

দিনাজপুরের কোরাইশ পরিবারের দু'ভাই আবদুল্লাহিল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২) এবং আবদুল্লাহিল কাফী (১৯০০-১৯৬০) শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আবদুল্লাহিল কাফী এক ডজন আরবি গ্রন্থ রচনা করেন। পাবনা থেকে মৌলবি সৈয়দ আবদুর রশিদ শাহজাদপুরী *তুহফাতুল আরব ওয়াল আজমফী মাদহ্-ই সাঈদ-ই-ওয়ালাদ-ই আদম* শিরোনামে একটি সুন্দর কাসিদা রচনা করেন এবং আবদুল ওয়াহিদ সুলাকি আরবি ভাষায় বেশ কয়েকটি অনুপম প্রবন্ধ লিখেন, যেগুলোর মধ্যে *তাহজিবুল কালাম ফি তা'লিমুল ইসলাম*, *আল-কাওলুল মুনির আলা ফওজুল কবির* এবং *তা লখিসুল আসিস মিন হাদিস-ই-আহলিল হাদিস* অন্যতম।

আধুনিক বাংলাদেশেও আরবি ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা সুস্থ ও সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে। কুরআন ও হাদিস সম্পর্কিত ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিশুদ্ধ সাহিত্যগুণসম্পন্ন বহু আরবি গ্রন্থ বিপুল উদ্যমের সাথে অনুবাদ ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আধুনিক আরবি শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষাশিক্ষার বহু গাইড-বই প্রকাশ্য বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ ও বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারগুলোও আজ বিভিন্ন আরবদেশ থেকে প্রাপ্ত আরবি সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকে প্লাবিত। সরকারি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনও বাংলাদেশে আরবি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফার্সি সাহিত্য

খৃস্টীয় তেরো শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনাধীনে আসার সময় থেকেই ফার্সি ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ঘটে।[১০] উর্বর বাংলায় ফার্সি ভাষাভাষী তুর্ক-আফগান বিজেতাদের বসতিস্থাপনের ফলে এখানে যে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের সূচনা হয়, পরবর্তী সাতাশ বছর ধরে তা অব্যাহত থাকে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসক শ্রেণীর ভাষা অর্থাৎ ফার্সির প্রভাব উন্নয়নশীল বাংলা

১০. Abdus Subhan, 'Persian Studies in Bengal', *Proceedings of the 28th International Orientalist Congress*, (Canberra 1971).

ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছায়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটায় অসংখ্য ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। মুসলমানগণ মূল বাংলায় গ্রন্থ রচনা বা ইসলামী পুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করেন। এমনকি, হিন্দু লেখকগণও তাঁদের বাংলা লেখায় ফার্সি শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁদের মুসলমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। বাস্তবে যেসব বিদেশী ভাষা বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করে, ফার্সি সেসবের মধ্যে সর্বপ্রাচীন।

মুসলিম শাসনের শুরুতেই বাংলাদেশে ফার্সি সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হয়। সুলতানদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ ইসলামী ধর্মশিক্ষার ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র হওয়া ছাড়াও ফার্সি শিক্ষাবিস্তারের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রে মূল ফার্সি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় স্থানীয় লোকদের সরাসরি অনুপ্রাণিত করে। তখনকার ক্ষমতাসীন রাজন্যবর্গ কেবল কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতাই করতেন না, তাঁরা নিজেরাও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতেন। মুসলিম সাধকদের প্রচারকাজের দ্বারাও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতি জোরদার হয় এবং বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তার ও সংহত করার কাজে তাঁরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞ সুফি ও তাঁদের ধর্মশালাসমূহ ফার্সি শিক্ষাবিস্তারে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।[১১]

বাংলাদেশে সঙ্কলিত প্রাচীনতম ফার্সি গ্রন্থটির সঙ্গে আলি মর্দান খান খিলজীর নাম জড়িত রয়েছে। তিনি ১২০৯ থেকে ১২১৩ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। এটা ছিল যোগবিদ্যার উপর রচিত সংস্কৃত পুস্তক *অমৃতকুণ্ড*-এর ফার্সি অনুবাদ। সমরকন্দের জনৈক কাজি রুকনউদ্দিন কর্তৃক এই বইটি অনুবাদের পেছনে একটি মজার কাহিনী আছে। বইটির আরবি সংস্করণের ভূমিকায় কাহিনীটির উল্লেখ আছে। কাহিনীটি হলো, ভোজর ব্রাহ্মণ নামক কামরূপের জনৈক বিখ্যাত যোগী সুলতান আলি মর্দান-এর রাজত্বকালে লক্ষণাবতীতে গিয়ে এক শুক্রবারে মসজিদে ঢুকে মুসলিম সাধকদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। জনগণ তাঁকে উক্ত কাজি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়। কাজি সাহেবের কাছে তিনি আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মহানবীর মতবাদ জানতে চান। এ ব্যাপারে কাজি সাহেব যে উত্তর দেন তাতে যোগী এত মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর রচিত *অমৃতকুণ্ড* বইটি কাজি সাহেবকে উপহার দেন। কাজি সাহেব বইটির বেশ প্রশংসা করেন। কাজি সাহেব প্রথমে ফার্সি ও পরে আরবিতে বইটি অনুবাদ করেন। কাজি রুকনউদ্দিনকে

---

১১. বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, M. A. Rahim, *Social And Cultural History of Bengal*, Vols. I & II (Karachi 1963 and 1967). আরো দ্রষ্টব্য, S. M. Ikram & P. Spear, *Cultural Heritage of Pakistan*, (Karachi 1955), 110-118

সমরকন্দনিবাসী বিখ্যাত হানাফি আইনজ্ঞ কাজি রুকনউদ্দিন আবু হামিদ মুহম্মদ বিন মুহম্মদ আলি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। ব্লখম্যানের মতে, আলি মর্দান খিলজীর শাসনামলে কাজি রুকনউদ্দিন কিছুকাল লক্ষণাবতীর কাজি হিসেবে চাকুরি করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১২১৮ সালে তিনি বোখারায় ইন্তেকাল করেন।[১২] কাজি *কিতাব আল-ইরশাদ* নামেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিন্দু যোগতন্ত্রের উপর লিখিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থটির ফার্সি সংস্করণ বাংলায় ফার্সি ভাষার প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করে।

সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অন্যতম ছিলেন বিশিষ্ট সাধক মওলানা শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামাহ। তাঁর পরিচালিত সোনারগাঁও খানকাহ্ সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম।[১৩] সুফিবাদের উপর লেখা তাঁর *মাকামাত* নামক গ্রন্থটি তাঁর জীবিতকালে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[১৪] *তারাস্‌সুলিল আইন আল মুলকি* শিরোনামে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিসঙ্কলনের দুটি চিঠি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, লাহোরের মুফতি সাঈদ নাসিরউদ্দিন জনৈক ব্যক্তির অনুরোধে *মাকামাত*-এর একটি লিপি সরবরাহ করেন।

মার্জিত ফার্সিতে লিখিত *নাম-ই-হক* নামক একটি ধর্মীয় পুস্তক ইসলামী শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এ বইয়ের অজ্ঞাতনামা লেখককে শরাফউদ্দিন আবু তাওয়ামাহ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। 'শরাফ' বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে শিক্ষালাভ করেন বলে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার ভিত্তিতেই এটা করা হয়। এই সাধকের শিক্ষার আলোকে তাঁর কোন শিষ্যও বইটি লিখে থাকতে পারেন।[১৫] *ফিক্‌হ* (ইসলামী আইনশাস্ত্র।) নামক একটি গ্রন্থও তাঁর রচনা বলে মনে করা হয়। ধর্মতত্ত্ব এবং সন্তজীবনীর উপরও সাধকগণ ফার্সিতে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন হচ্ছেন মখদুম শরিফউদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী। তিনি সুফি মতবাদের উপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ অবদানের জন্য শেখ আলাউল হক এবং হজরত নূর কুতব্-ই-আলম প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাটনার অধ্যাপক হাসান আসকারী শেষোক্ত ব্যক্তির কতিপয় ফার্সি পত্র (মকতুবাত) সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। খৃষ্টধর্মের প্রচার ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে এই সাধকের রচিত *আনিসুল ঘুরাবা* নামক অনুবাদ ও বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থটি থেকে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও ফার্সি ভাষায় তাঁর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরত নূর

---

১২. *Journal of the Pakistan Historical Society*, 1 : 1 (1953), 50-51.

১৩. Abdul Karim, *Social History*.

১৪. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1923, 274, 277.

১৫. বইটির লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, S. H. Masumi, 'Sonargaon'.

কুতব্-ই-আলম-এর পত্রগুলির মূল প্রতিপাদ্য সুফীতত্ত্ব হলেও একই সময়ে বাংলায় আগমনকারী অপর দুজন সুফির পত্রে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন মীর সাঈদ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানী এবং মওলানা মুজাফফর শামস বলখী। হাজি গরিব ইয়ামানী নামক সাঈদ জাহাঙ্গির সিমনানীর একজন শিষ্য তাঁর মতবাদের উপর ভিত্তি করে ফার্সি ভাষায় সুফিবাদের উপর *লাতা-ইফ-ইব্ আশরাফী* নামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৪৬৭ সালে আবদুল রাজ্জাক কর্তৃক সংগৃহীত তাঁর মকতুবাত (পত্রাবলী) থেকে তাঁর সাহিত্যিক সুরুচি ও সুফিবাদ সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ মেলে।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন ফার্সি অভিধান প্রণয়নের কৃতিত্বও বাংলার। *ফারহাৎ-ই-ইব্রাহিমী* নামক এ অভিধানটি ১৪৫৯ সালে মওলানা ইব্রাহিম কাও'য়াম ফারুকী জৌনপুরী কর্তৃক রচিত হয়। মাখদুম শরিফউদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হওয়ায় এটা *শরাফনামা* নামেই সমধিক পরিচিত। আবিসিনিয়ার ইলিয়াসশাহী রাজবংশের স্বল্পকালীন শাসনামলে সুলতান রোকনউদ্দিন বারবাক শাহ্ (১৪৫৯-৭৪)-এর রাজত্বকালে বইটি রচিত হয়। এই উল্লেখযোগ্য সঙ্কলনটি বাংলায় ফার্সি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির পরিচায়ক। সমকালীন কবি ও সাহিত্যকদের পরিচিতিমূলক জীবনবৃত্তান্তের সংযোজন বইটিকে আরো অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। এসব কবি ও সাহিত্যিকের মধ্যে অন্যতম হলেন মেধাবি কবি ও সাহিত্যিক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক আমির শাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমান। তিনিও *ফারহাঙ্গি আমির শাহাবুদ্দিন কিরমানী* নামক একটি ফার্সি অভিধানের কৃতী লেখক। ইব্রাহিম কাউওয়াম ফারুকী এই অভিধান থেকে বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অভিধানটি বর্তমানে চালু নেই। অভিধানটিতে আর যেসব কবির উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন আমির জয়েনউদ্দিন হারাবী মালিক-উশ-শুয়ারা, মনসুর শিরাজী, মালিক ইউসুফ বিন হামিদ, সাঈদ জালাল, সাঈদ মুহম্মদ রুকন্, সাঈদ হাসান এবং গ্রন্থকারের শিক্ষক শেখ ওয়াহিদী।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য যেসব শাখা ফার্সি সাহিত্যের আওতায় আসে সেসবের মধ্যে ছিল সমরবিদ্যা। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)-এর রাজত্বকালে সাঈদ মীর আলাভী নামে সুপরিচিত মুহম্মদ বুদাই ধনুর্বিদ্যার উপর *হিদায়াত-উররামী* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬] এটি ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মুসলমান লেখকগণ যে ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত উভয় শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন গ্রন্থটিতে তারই প্রমাণ আছে।

ক্ষমতাসীন রাজন্যবর্গের ঐতিহ্যবাহী পৃষ্ঠপোষকতায় গদ্যসাহিত্যের পাশাপাশি কাব্য সাহিত্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাংলার শাসনকর্তা এবং দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন

১৬. Charles Rieu, *Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum*, Vol. II, (London 1881), No. 489.

বলবনের পুত্র নাসিরউদ্দিন বুঘরা খান কবি ও সাহিত্যিক পরিবেষ্টিত থাকতে পছন্দ করতেন। এসব কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শামসউদ্দিন দবির ও কাজি আসির। সাহিত্যিক কৃতিত্বের বিবেচনায় শামসউদ্দিন দবিরকে বুঘরা খানের মীর মুনশি নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসায় তিনি স্তুতিকাব্য রচনা করেছিলেন, তা বাদাউনীর *মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*-এ উদ্ধৃত আছে। এই স্তুতিকাব্যের কবিই ১২৮২ সালে সুলতান বলবনের সঙ্গে বাংলায় আসার জন্য বিখ্যাত কবি আমির খসরুকে রাজি করিয়েছিলেন এবং তাঁরই কথায় আমির খসরু বাংলায় কয়েক বছর থাকার পর সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ (১৩৯২-১৪১০)-এর রাজত্বকালে বাংলায় ফার্সি কবিতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময়টাকে বাংলার পূর্বাঞ্চলে ফার্সি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যাত করা চলে।[১৭] এই সুলতানের শাসনকালেই শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবি হাফিজ শিরাজীর সঙ্গে বাংলার স্মরণীয় যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি বাংলার নাম উল্লেখসহ একটি ফার্সি গজল লিখে পাঠান। সেই গজলের একটি বিখ্যাত পংক্তি হচ্ছে :

শাক্কার শিকান শাবান্দ হামা তুতিয়ান-ই হিন্দ
যিন কান্দ-ই-ফারসিকে বা বাংগালা মিরওয়াদ

অর্থাৎ, 'বাংলায় গমনকারী এই ফার্সি মিছরি থেকে ভারতের সমস্ত তোতা চিনি তৈরি করবে।' অতএব দেখা যায়, বাংলার ইতিহাসে ১২০১ থেকে ১৫৭৬ সালব্যাপী বিস্তৃত সুলতানি আমলে উদার ও সংস্কৃতিমনা সুলতানদের শাসনকালে এ প্রদেশে ফার্সি শিক্ষার উন্নয়নের পথ সুগম হয়, যা পরবর্তী মুগল আমলেও লক্ষ্য করা যায়।

১৫৭৬ থেকে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত যখন বাংলা বিরাট মুগল সাম্রাজ্যের সুবাহ ছিল, তখনো পূর্ববর্তী আমলের মতোই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হয়।[১৮] ঐ সময়ের এবং তৎপরবর্তীকালের কাহিনী ও জীবনীকারগণ মুনিম খান, ইসলাম খান, কাসিম খান, শাহ সুজা, শায়েস্তা খান ও মীর জুমলা প্রমুখ মুগল শাসনকর্তার দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব শাসনকর্তার সবাই শিক্ষা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা ফার্সি কবিতাকে উৎসাহিত করতেন এবং তাঁদের আমলে বাংলায় আগত বহু ফার্সি কবিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মুহম্মদ শরিফ ইস্পাহানী আকবরের রাজত্বকালে বিখ্যাত জ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন। দীন-ই-ইলাহি প্রচারের জন্য আকবর কর্তৃক বাংলায় প্রেরিত শরিফ

১৭. Zuhuruddin Ahmad, *Pakistan men Farsi Adab*, Vol. II, (Lahore 1964-74), 610-11.

১৮. ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, S. M. Taifur, *Glimpses of Old Dhaka*. (Dhaka 1956).

আমুলীর সঙ্গী হিসেবে তিনি বাংলায় আগমন করেন। আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় আর একজন বহিরাগত কবি ছিলেন মির্জা জাফর বেগ কাজউইনী। এই বিখ্যাত কবি নিজামী গানজাবীর রীতিতে *শিরিন-উ-খুসরু* নামে একখানি মসনবী রচনা করেন। এমনকি বাংলায় মুগল সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহিদেরকেও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে দেখা যেতো। মির্জা নাথন নামক একজন নিম্নপদস্থ সামরিক অফিসারও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি *বাহারিস্তান-ই-গায়বি* নামে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই বিখ্যাত বইটিতে লোকমান, মীর কাসিম এবং মালিক মুবারক প্রমুখ বহু সৈনিক কবির নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন এবং সমরাঙ্গনে সিপাহিদের বিজয় ও বীরত্বকাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। মির্জা নাথন প্রায় বিশ বছরকাল বাংলায় চাকুরি করেন এবং তাঁর এই গ্রন্থে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলা ও আসামে যেসব ঘটনা ঘটে এবং তিনি নিজেও যেগুলির সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সেলিম তেহরানী, যিনি বাদশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন, তিনি একজন মেধাবি কবি ছিলেন। বাদশাহ্র রাজকবি আবু তালিব কলিম-এর সঙ্গে পেরে না উঠায় সেলিম বাংলায় আগমন করেন এবং ইসলাম খানের অন্যতম প্রিয় সহচরে পরিণত হন। তিনি বিভিন্ন ধরনের কবিতাসম্বলিত একখানি দিওয়ান এবং *কাজা-ও-কদর* নামে একখানি মসনবী রচনা করেন। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এটি ফয়জীর *নাল দামান*-এর সমতুল্য। ইস্পাহানে জন্মগ্রহণকারী মীর জুমলা একজন উঁচুদরের পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি *কুললিয়ৎ* নামে বিশ হাজার চরণবিশিষ্ট একখানি কাব্য রচনা করেন। মীর জুমলার ঐতিহাসিক শাহাবুদ্দিন তালিশ, যিনি কুচবিহার ও আসাম অভিযানে তাঁর প্রভুর সহগামী হন, ১৬৬৩ সালে *ফাতহ-ই-ইবরিয়া* নামে আসাম সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মীর জুমলার মৃত্যু থেকে ১৬৬৫ সালে চট্টগ্রাম জয় পর্যন্ত বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটে সেসবের বিবরণ রয়েছে।

মুগল আমলের আর একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন মুহম্মদ সাদিক। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও জীবনীগ্রন্থ *সুবহ-ই-সাদিক*-এর লেখক।[১৯] ১৬২৮ সালে শাহজাহান কর্তৃক প্রেরিত বাংলার শাসনকর্তা কাসিম খানের সঙ্গে তিনি বাংলায় আসেন। সাদিক অনেক বছরকাল জাহাঙ্গীরনগরে অবস্থান করেন এবং সেখানকার বহু জ্ঞানী-গুণীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৬৩৯ সালে শাহ্ সুজা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তিনি তাঁর দরবারে যোগ দেন। আট বছর পরিশ্রম করে ১৬৩৮ সালে তিনি যে বইটি শেষ করেন তা এই রাজপুত্রের নামেই উৎসর্গীকৃত হয়। এর পরও তিনি বহুদিন বেঁচে ছিলেন। ১৬৫২

---

১৯. M. I. Borah, *An Account of the Immigration of Persian Poets into Bengal, The Dacca University Studies*, I : I (Dacca 1935) 141-150.

সালে সমাপ্ত *শাহিদ-ই-সাদিক* নামক তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। *সুবহ্-ই-সাদিক*-এ জাহাঙ্গীরনগরে বসবাসকারী বেশ কিছু ফার্সি সাহিত্যিকের নাম এবং ফার্সি কবির কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন পেশায় সৈনিক ছিলেন। শাহ সুজার শিক্ষক মীর আলাউল মুল্‌ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন লজিক গ্রন্থ *মুহাজ্জাহ*, ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ *আনওয়ার-উল-হিদায়া* এবং জীবনীগ্রন্থ *সিরাত-উল-ওয়াসিত*। তিনি একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। *পাদশাহনামার* লেখক আবদুল হামিদ লাহুরী তাঁকে বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রতিরূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাই মীর আব'উল মা' আলিও ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও কবিতায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর *সুরায়-ই-ইখলাস*-এর তফ্‌সীর একখানি বিচার গ্রন্থ; *মুয়াজ্জাজুল উলুম* তাঁর নিজের রচিত কবিতার একটি সঙ্কলন এবং তাঁর ভাই মীর আলাউল মুলক-এর উপর তিনি একখানি স্মৃতিকথা রচনা করেন। সে যুগের অবশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মীর মুহম্মদ মাসুম। শাহ্ সুজার ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি *তারিখ-ই-সুজা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। হস্তলিপিকারদের মধ্যে যাঁরা ঐতিহাসিক ও কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান হায়দরী, সা'ঈদউদ্দিন মুহম্মদ মাশহাদী এবং মুহম্মদ হুসেইন মানেরী গাফফারীর নাম উল্লেখযোগ্য। আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ মু'আজ্জম-এর শাসনামলে ঢাকায় 'ওয়ালাহ হারাভী' নামে একজন প্রভাবশালী সুফি কবি বাস করতেন। ঢাকা সফরকালে মীর্জা আবদুল কাদির বেদিল-এর সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং বেদিল তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

আঠারো শতকের প্রথমভাগে মুর্শিদকুলী খান বাংলায় স্বাধীন সুবাদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দ্বন্দ্ববিধ্বস্ত ইরান এবং উত্তর ভারত থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে আরো অনেক কবি-সাহিত্যিকের আগমন ঘটে। সুবাহ বাংলার পূর্বাঞ্চল, বিশেষকরে ঢাকা থেকেও অনেক বুদ্ধিজীবী ও কবি সেখানে আগমন করেন। জাহাঙ্গীরনগরের ডেপুটি গভর্নর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান[২০] সুকবি ছিলেন। তিনি 'মাখমুর' ছদ্মনামে লিখতেন। ১৭৮৫-৮৬ সালে ঢাকার নওয়াব-নাজিম আলি হাসান ঢাকার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন। *তারিখ-ই-জাহাংগীরনগর* নামক এই ইতিহাস-বইটিতে আকবরের আমল (১৫৫৬-১৬০৫) থেকে তাঁর নিজের আমল পর্যন্ত ঢাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৭১৬ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার নাজিম নবাব নুসরত জঙ্গ *তারিখ-ই-নুসরতজঙ্গী*[২১] নামে একটি ফার্সি ইতিহাস রচনা করেন। ১৯০৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক কলকাতায় বইটি প্রকাশিত হয়।

---

২০. Mohar Ali. *Muslims of Bengal*, 586, 851.

২১. বিখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে সংস্করণটি তৈরি করেন।

বাংলার ইতিহাসের বৃটিশ আমলে, বিশেষকরে উনিশ শতকেও ফার্সি ভাষায় সাহিত্যচর্চার অসংখ্য প্রমাণ মেলে। এক্ষেত্রে ঢাকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ সময়ের সবচেয়ে নামী যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যায় তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পণ্ডিত, ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক আগা আহমদ আলি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ নাদির শাহের সঙ্গে ভারতে আগমন করেন। তাঁর দাদা আগা আবদুল আলি, যিনি সর্বপ্রথম ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত হস্তলিপিবিশারদ। আগা আহমদ আলি ১৭৮০ সালের দিকে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মুনশি মু'তাসিম বিল্লাহ নামক একজন স্থানীয় আলেম এবং কবি খাজা আসাদুল্লাহ্ কাউকাব (মৃ. ১৮৫৯)-এর কাছে ফার্সি ভাষা শিখেন। তাঁর পিতা সুজা'আত আলির মতো তিনিও বিরল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। কথিত আছে, তাঁর একটি সুন্দর ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল এবং তাতে দু'হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে আগা আহমদ আলি ঢাকার ব্যক্তিগত পাঠাগারসমূহে সংরক্ষিত সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ পড়ে শেষ করেন। এর অল্পকাল পরেই কলকাতায় তৎকালের দু'জন নেতৃস্থানীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক ই. বি. কাওয়েল এবং ডঃ এইচ. ব্লখম্যানের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি একজন খ্যাতিমান গবেষকে পরিণত হন। কলকাতা মাদ্রাসায় ফার্সির শিক্ষক হিসেবে চাকুরি করাকালে *মু আইরিদ-ই বুরহান* নামে একটি বই লিখে আগা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। *বুরহান-ই-কাতি* নামক একটি প্রাচীন ফার্সি অভিধানের বিরুদ্ধে মির্জা গালিব যে অভিযোগ করেন এই বইয়ে তা খণ্ডন করা হয়। আগা আহমদ আলির বইয়ের জবাবে গালিব *তিঘ-ই-তিজতার* নামে অপর একখানি বই লিখেন। এঁর প্রতিবাদে ১৮৬৮ সালে বাঙালি পণ্ডিত *শামসির-ই-তিজতার* নামে আরো একটি বই লিখেন। মির্জা-আগা বিতর্ক ভারতীয় উপমহাদেশের ফার্সি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত অধ্যায়। তাঁর অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ফার্সি চতুষ্পদী কবিতা সম্পর্কিত *রিসালা-ই-তারানা* এবং মসনবী ধরনের ফার্সি কবিতা সম্পর্কিত *হফ্‌ত আসমান*। কলকাতার রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর জন্য তিনি *সিকান্দারনামা-ই-নিজামী*, *ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীর*, *মা'সির-ই-আলমগিরি*, *মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ*, এবং *আকবরনামা* প্রভৃতি মূল্যবান ফার্সি তথ্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। বিখ্যাত গবেষক এ. এফ. এম. আবদুল আলির মতে, আগা ঢাকার ইতিহাস সম্পর্কিত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক *তারিখ-ই-ঢাকা* নামক গ্রন্থটিও সঙ্কলন করেন। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আগা আহমদ আলি ১৮৭৩ সালে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন এবং মির্জা সাহেবের লঙ্গরখানার নিকটস্থ গোরস্থানে তাঁকে কবর দেয়া হয়। বাংলাদেশে ফার্সি শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

গালিব সাহিত্য-বিতণ্ডার সঙ্গে ঢাকার দু'জন বিখ্যাত কবিও জড়িত ছিলেন। তাঁরা দিল্লীর কবির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন খাজা হায়দার জান শাইক, যাঁকে গালিব বুলবুল-ই-বাঙ্গালা (বাংলার বুলুবল) বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর ফার্সি

কবিতার একটি 'দিওয়ান' এবং একটি পত্র-গ্রন্থ রয়েছে। অপরজন হলেন সোনারগাঁও-এর মুনশি গোলাম মোস্তফা। তিনি তাঁর পত্রাবলী একটি আলাদা গ্রন্থে সঙ্কলন করে তার নামকরণ করেছিলেন *গারদ-ই-পাহাং-ই-গালিব*। শাইক ঢাকার বিখ্যাত খাজা পরিবারের লোক ছিলেন। উর্দু, ফার্সি ও সংস্কৃতে তাঁর অবদান শহরের প্রাচীনপন্থীরা এখনও স্মরণ করেন।[২২] ফার্সি জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় খাজা আবদুর রহিম সাবার নাম।[২৩] তাঁর *তারিখ-ই-কাশ্মিরিয়ান-ই-ঢাকা* নামক ফার্সি গদ্যগ্রন্থটি শহরের এই বিখ্যাত বংশের পারিবারিক ইতিহাসের এক তথ্যখনি। *মাকাতিব-ই-সাবা* নামে আবদুর রহিমের লেখা একটি ফার্সি পত্র-গ্রন্থও রয়েছে। খাজা গোত্রের আর একজন তরুণ খাজা আবদুল গাফ্ফার 'ওয়াফা' মেধাবি ফার্সি কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পত্রালাপের মাধ্যমে তিনি মির্জা গালিবেরও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ফার্সি কবি ও সাহিত্যিকদের পরম হিতৈষী খাজা আহসানউল্লাহ শাহিন[২৪] মির্জা মাহমুদ শিরাজী 'মাখমুর'কে বিশুদ্ধ ফার্সিতে ঢাকার ঐতিহাসিক ইমামবাড়া হোসেনী দালান-এর ইতিহাস লেখায় অনুপ্রাণিত করেন।

'বাংলায় উর্দু কবিতার জনক' বলে খ্যাত মৌলবি আবদুল গফুর নাসাখ[২৫] কাব্যক্ষেত্রে হাফিজ ইকরাম আহমদ জাইঘাম ও হাফিজ রশিদুন নবী ওয়াহশাত-এর শিষ্য ছিলেন। ফার্সিতেও তিনি সৃজনশীল কবিতা ও গদ্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ফার্সিতে তাঁর প্রধান বইটি হচ্ছে জীবনীগ্রন্থ *তাজকিরাতুল মা' আসিরি*। এটি অসমাপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এখন এটির কোন কপি সহজলভ্য নয়। নাসাখের সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আজাদ ও সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ ভ্রাতৃদ্বয়,[২৬] যাঁদেরকে আকবরের আমলের ফয়েজী ও আবুল ফজলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সৈয়দ মাহমুদ আজাদ একজন উঁচুদরের ফার্সি কবি ছিলেন। তাঁর কাসিদাগুলো সমাপ্তি ও গুণের দিক থেকে অনেক উন্নতমানের এবং খাকানী ও উরফীর মতো কবিদের রচনাগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর এবং উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় একজন দক্ষ লেখক। ফার্সি ভাষায়ও তাঁর পুরোপুরি দক্ষতা ছিল। সৈয়দ মুহম্মদ বাকির তাবাতাবাই ইরান থেকে এসে ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। ১৯১০ সালে তিনি এখানেই ইন্তেকাল করেন এবং হোসেনী দালানে তাঁর কবর রয়েছে। তাঁর লেখা সুমধুর গীতি ও

---

২২. Taifur, *Glimpses of Old Dhaka*, Appendix.

২৩. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সি সাহিত্য*, (ঢাকা ১৯৮৩), ৯৫-১০৩।

২৪. ঐ, ১০৭-১১৬।

২৫. নাসাখের জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Md. Sadrul Haque, *Nassakh: Hayat-O-Tasneef*, (Ph. D Thesis, University of Karachi, 1979) আরও দ্রষ্টব্য, Abdus Subhan (ed), *Autobiography of Nassakh*, (Calcutta 1986).

২৬. আজাদ ভ্রাতাদের জীবনবৃত্তান্তের জন্য দ্রষ্টব্য, *The Journal*, (The Weekly periodical of the Englishman, Calcutta), Dated 8th & 15th July 1906.

স্তুতিবাদমূলক কবিতাগুলো সাহিত্য-সমালোচকদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঢাকার স্বল্পপরিচিত ফার্সি কবিরা হলেন আবদুল মুনশি জাওকী, মুনশি ওয়ারিস আলি জিয়া, আগা মাহমুদ আলি, মসিহউদ্দিন শুরিস, কাজিমউদ্দিন সিদ্দিকী, মওলানা ফজলুল করিম, শাহ্ বুরহান উল্লাহ, মুনশি জালালউদ্দিন এবং মৌলবি মুয়াজ্জমউদ্দিন সাঈদ।

কিন্তু মওলানা উবায়দুল্লাহ আল-উবায়দী'র (১৮৩৪-১৮৮৫) অবদানের কথা উল্লেখ না করলে ফার্সি সাহিত্যে ঢাকার অবদানের কোন বিবরণই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তিনি ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এবং ঢাকায় অবস্থানকালে নিজেই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। আরবি ও ফার্সি ভাষায় স্বীকৃত পণ্ডিত উবায়দী পূর্বাঞ্চলের এই মহানগরীতে এ দুই ভাষার মেধাবি শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকদের এক মহান চক্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ফার্সি কবিতা গুণ ও আঙ্গিকের দিক থেকে[২৭] শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবি সা'দী, হাফিজ, জামী, সা'ইব, নাজিরী ও গালিব-এর কবিতার সমতুল্য। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *দাস্তান-ই-ফার্সি আমুজ*[২৮] ফার্সি ব্যাকরণের উপর একটি উন্নতমানের পুস্তক, যা আজও অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে গণ্য।

ঢাকা জেলার ইলাইচিপুর নিবাসী মৌলবি আবদুল করিম খাকি বৃটিশ প্রশাসনিক সার্ভিসের কর্মকর্তা হিসেবে রংপুর, ফরিদপুর ও মালদহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। আবদুল গফুর নাসাখ-এর মতো সরকারি কাজে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাহিত্যসাধনা চালিয়ে যান এবং নৈতিকতার উপর *রুমুজুল আখলাক, মিসবাহুল জিনান* এবং *ফাওয়াইদ-ই-খাকিয়া* নামে ফার্সি দিওয়ান রচনা করেন। উনিশ শতকের শেষদিকে খাকি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। আজিমপুর দায়রায় তাঁর সমাধি রয়েছে। আরবি ও উর্দুর মতো ফার্সি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে শহরের সাংস্কৃতিক জগতের প্রাচীনতম ব্যক্তি হেকিম হাবিবুর রহমানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রদেশে ফার্সি গবেষণা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি চলতি শতকের প্রথম ৫০ বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালান। তাঁর *সালাসা-ই-গাসসালা*[২৯] গ্রন্থে বাংলায় রচিত ১৭৩টি ফার্সি পুস্তকের বিবরণ আছে।

ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের *চট্টগ্রাম* অঞ্চলেরও ফার্সির উন্নয়নে অবদান রয়েছে।[৩০] এ জেলায় ফার্সির প্রথম নমুনা দেখতে পাওয়া যায় বুজুর্গ উমিদ খান ও হামজা খানের মসজিদ তথা সতেরো শতকের সত্তরের দশকে নির্মিত শাহবাজ খানের ঈদগার ফার্সি

---

২৭. *Diwan-i-Ubaidi*. (Calcutta 1940).

২৮. বইটি প্রথমে ১৮৭৩ সালে আগ্রা থেকে এবং পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

২৯. *সালাসা-ই-গাসসালার* ফার্সি অংশটি আরিফ নওশাকী কর্তৃক ১৯৮৮ সালে ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

৩০. *Bangladesh District Gazetteers* (Sylhet), Dhaka 1975.

শিলালিপিতে। আম্বরাবাদের মুনশি সিরাজউদ্দিনের ফার্সি পত্রাবলী আজও জেলার মাদ্রাসাছাত্রদের পাঠ্য। নওয়াব নুসরত জঙ্গ-এর রাজত্বকালে মির্জা মাহমুদ ও তাঁর পুত্র মুনশি আলি উন্নতমানের ফার্সি কবি ছিলেন। নওয়াব মুজাফফর জঙ্গ মুহম্মদ রেজা খানের ভাই হেকিম মুহম্মদ হোসেন আলাবী তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে চট্টগ্রামে বাস করার সময় এই জেলার ভেষজ লতাগুল্মের উপর *মাখজানুল আদবীয়া* নামে একটি বই লিখেন। জনৈক মুহম্মদ আফজাল আগফা হোসেন ও তাঁর বংশধরদের পরিবার সম্পর্কে ফার্সিতে *নসবনামা* নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। জেলার সবচেয়ে বিখ্যাত ফার্সি লেখক ছিলেন খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ। ১৮৭১ সালে তিনি *আহাদিসুল কাওয়ানিন*[৩১] নামে একটি বই লিখেন। এটি বৈশিষ্ট্যে অনেকটা চট্টগ্রামের গেজেটিয়ার জাতীয় গ্রন্থ ছিল এবং এতে একটি অতিরিক্ত অধ্যায় ছিল, যাতে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন* গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের নীতি সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তার সমালোচনা করা হয়। চট্টগ্রামের স্বল্পপরিচিত ফার্সি কবিদের মধ্যে ছিলেন সন্দ্বীপের মওলানা আবদুল আওয়াল, মুহম্মদ আবদুল আলি, মৌলবি ফয়জুল কবির শাউক, মৌলবি ফজুল্লাহ ইসলামাবাদী, মুহম্মদ সুলায়মান আরমান এবং আবদুল আলি দুররী।

সিলেট অঞ্চল ফার্সি শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মধ্যযুগেই এ অঞ্চল ফার্সি ভাষাভাষী মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হিজরী দশম শতকেই এ অঞ্চলে সৃজনশীল ফার্সি সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৩২] উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন, *মা'দানুল ফাওয়াউ*-এর লেখক সৈয়দ শাহ ইসরাইল এবং *জারারুল মুসান্নিক*-এর গ্রন্থকার বানিয়াচং-এর মুহাম্মদ আরশাদ। গেইলর সৈয়দ রায়হানউদ্দিন একজন বিশিষ্ট ফার্সি কবি ছিলেন। তিনি খোয়াবনামা ও *গুলবাকাওয়ালী* মসনবী রচনা করেন। সিলেটের মুনসেফ এবং নাসাখের বন্ধু নাসিরউদ্দিন আহমদ সামী ফার্সি ভাষায় *সুহাইল-ই-ইয়ামান* নামে হজরত শাহ্‌জালালের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সিলেটের মশার উপর *পুশশানামা* শীর্ষক একখানি সুন্দর ফার্সি মসনবীও রচনা করেন। আবদুল গফুর নাসাখ তার আত্মজীবনীতে এ বইয়ের কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। সিলেটের সম্ভ্রান্ত মজুমদার পরিবারের সদস্য আল্লাহ বক্‌শ মজুমদার হামেদ-এর *তুহফাতুল মুহসিনিন* ও *দিওয়ান-ই-হামেদ* এবং হামিদ বখত মজুমদার-এর ফার্সি ইতিহাস *আন-ই-হিন্দ* সিলেট অঞ্চলের সৃজনশীল ফার্সি সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[৩৩] সিলেটের অন্যান্য ফার্সি কবি, যাঁদের কবিতা আজও বর্তমান আছে, তাঁরা হলেন নাজির মুহম্মদ আব্দুল্লাহ আশুফতা, আবু মুহম্মদ আবদুল কাদির, আবুল হোসেন, আবদুর রহমান জিয়া, আবদুল মুন'ইম জাওকী, তাফাজ্জুল আলি ফাজলী এবং আবু মুহম্মদ খলিলুল্লাহ খলিল।

---

৩১. বইটি ১৮৭১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

৩২. *Bangladesh District Gazatteers* (Sylhet), Dhaka 1970.

৩৩. Abdul Jalil Bismil, *Sylhet men Urdu*, (Karachi 1983), 39-45, 75-78.

ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাজাপুরের কাজি পরিবার এক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক হচ্ছেন আবদুল গফুর নাসাখ, যাঁর নাম অন্যত্রও উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর পিতা কাজি ফকির মুহম্মদ প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলকাতার সদর দীউয়ানি আদালতে ওকালতি করতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিশ্বজনীন ইতিহাস *জামিউত তাওয়ারিখ*। এটি ১৮৩৬ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। ফকির মুহম্মদের অপর দুই পুত্র আবদুল হামিদ এবং আবদুল বারী সাঈদও সুকবি ছিলেন।

আবু মুইন আজদউদ্দীন আজুদ, শাহ্ সৈয়দ রেয়াজতউল্লাহ, নাসিরউদ্দিন সামী, সামসামউদ্দিন সামসাম এবং আশরাফউদ্দিন শারক্ কুমিল্লার নেতৃস্থানীয় ফার্সি কবি ছিলেন। বরিশালে জন্ম হয়েছিল মুহম্মদ ফাজিল, ইলাইচিরাম তালেব প্রমুখ কবির। ময়মনসিংহে ছিলেন কবি সৈয়দ নাজমুদ্দিন আহমদ 'নাদির' এবং মুহম্মদ আবদুল হাই আখতার। পাবনার সৈয়দ আবদুর রশিদ শাহজাদপুরী ছিলেন একজন সুফি প্রকৃতির পণ্ডিত। কিন্তু ফার্সি কবিতা রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং খাকানী ও উরফীর আদর্শে সুন্দর কাসিদা রচনা করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উর্দুর মতো ফার্সি চর্চাও ব্যাহত হয়। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফার্সি ভাষার মাধ্যমে অর্জিত দেশের মূল্যবান ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। ইরানের সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ফলে পাঠ্যবিষয় হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা ফার্সি ভাষা শিখছে। অন্যদিকে পাণ্ডুলিপি আকারে পাঠাগারসমূহে সংরক্ষিত ফার্সি গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ বিপুল তথ্য-উপকরণের প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিরাও দিন দিন আকৃষ্ট হচ্ছেন। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মরহুম এ. বি. এম. হবিবুল্লাহর প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলাদেশের ফার্সি ঐতিহ্যের প্রতি জ্ঞানী-গুণীদের আগ্রহ সৃষ্টিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উর্দু সাহিত্য

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলায় বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজে উর্দুর প্রচলন ঘটে। পূর্ব ভারতের এই নব অর্জিত রাজ্যটির প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইউরোপীয় অফিসারদের স্থানীয় হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেয়ার লোভনীয় চাকুরি নিয়ে অনেক উর্দু কবি ও সাহিত্যিক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করেন। প্রধানত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টায় এখানে আধুনিক উর্দু গদ্যরীতি এবং উর্দু ভাষাবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান ও শব্দার্থবিজ্ঞানের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন হয়। লখনৌ-এর সর্বশেষ নওয়াব ওয়াজিদ আলি শাহের নির্বাসনের সাথে সাথে লখনৌ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

কলকাতার মাটিয়াবুরুজ এলাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে বাংলার সর্বত্র উর্দু কবিতা প্রচলনের পথ আরো সুগম হয়।

কলকাতার পরে যে স্থানটিতে উর্দুর স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে সেটা হচ্ছে ঢাকা। সেখানকার বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও নওয়াবদের দরবারে উর্দু কবি ও সাহিত্যিকদের সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে এবং এর ফলে স্বাভাকিবভাবেই উর্দু সাহিত্যের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। দিল্লীর খাজা মীর-দার্দ-এর শিষ্য মির্জা জান তাপিশ[৩৪] ঢাকার নওয়াব নাজিম নওয়াব সৈয়দ আহমদ আলি খানের পারিষদ ছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের জন্য *শামসুল বায়ান ফি মুস্তালিহাত-ই-হিন্দুস্থান* শীর্ষক একটি উর্দু গ্রন্থ রচনা করেন। বইটিতে উর্দু বাগধারার (ইডিয়ম) সঠিক ব্যবহারপদ্ধতি দেখানো হয়েছে। *কাওয়াইদ-ই-জবান-ই-উর্দু* এবং *হিকায়েত-ই-বুজুরগান-ই-উর্দু* গ্রন্থ দুটির লেখক আবদুল কাদির রাঙ্গিন ১৮১১ খৃস্টাব্দে নওয়াব নুসরত জঙ্গ-এর দরবারে চাকুরি করতেন। সে সময়ে ঢাকায় বসবাসকারী অন্যান্য কবি হচ্ছেন মির্জা গোলাম হোসেন আতিশ ও তাঁর দুজন শিষ্য শেখ আহমদ জান এবং মীর আমিব আলি আশনা।

উর্দু কবিতা রচনা ও কবিতা পাঠের আসর সংগঠনের মাধ্যমে ঢাকার খাজা পরিবার বাংলার পূর্বাঞ্চলে উর্দু ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। খাজা হায়দার জান শাইক[৩৫] একজন অত্যন্ত সফল উর্দু ও ফার্সি কবি ছিলেন। মির্জা গালিব কলকাতায় এলে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। খাজা আসাদুল্লাহ কাউকাব (মৃ. ১৮৫৯) একটি উর্দু দিওয়ান রচনা করেন। অবশ্য তিনি প্রধানত ফার্সি ভাষায় লিখতেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখার দিক থেকে খাজা পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন খাজা আবদুর রহিম সাবা। ফার্সি ভাষায় তিনি একজন ভাল কবি ছিলেন। উর্দুতে তিনি একটি অসমাপ্ত রোমান্টিক মসনবী রচনা করেন। *দাস্তান-ই-সাবা* নামে রচিত এই বইটি এখনো প্রকাশিত হয় নি। খাজা আবদুল গনির ভাই খাজা আবদুল গাফফার আখতার একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। উর্দুতে রচিত তাঁর অনেক সুন্দর গজল রয়েছে। খাজা আবদুল গনির পুত্র খাজা আহসানউল্লাহ শাহীন কবিতা রচনায় আখতারের শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক উর্দু গান রচনা করেন যা স্থানীয় সাহিত্যমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি তাদের পারিবারিক ইতিহাসগ্রন্থ *আহসানুল কাসাস*-এর উর্দু সংস্করণ রচনা করেন। খাজা নূরুল্লাহ জাহাঙ্গীর উর্দুতে *মাচলিনামা* রচনা করেন এবং উক্ত বইটি নওয়াব আহসানউল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন। খাজা আতিকুল্লাহ শাইদা কবিতা ও গদ্য দুটোই

৩৪. Iqbal Azim, *Mashriqi Bengal men Urdu*, (Dhaka 1954), 25-29.

৩৫. ঢাকার খাজা পরিবার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Khwaja Ahsanullah, *Tarikh-i-Khandan-i-Kashmiriyan* (Urdu translation) in mass, available in Dhaka University Library; আরও দ্রষ্টব্য, Hakim Habibur Rahman, *Asudgan-i-Dhaka*, (Dhaka 1964) and *Dhaka Panchas Baras Pahle*, (Lahore 1949).

লিখতেন। তিনি *আফসানা-ই-ইব্রাতখিজ, দেব চৌধুরানী* এবং *খুদা-কি-শান* প্রভৃতি উপন্যাসও রচনা করেন। খাজা মোহাম্মদ আফজাল তাঁর সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঘটনাভিত্তিক কবিতা রচনায় বিশেষত্ব অর্জন করেন। খাজা আতিকুল্লাহ্ শাইদার পুত্র খাজা মোহাম্মদ আজম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাস *বড় বউ* উর্দুতে অনুবাদ করে উর্দু লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

উনিশ শতকে সমগ্র বাংলার উর্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আবদুল গফুর নাসাখ।[৩৬] তিনি সাধারণভাবে বাংলায় উর্দু কবিতার জনক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার রাজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নাসাখ উর্দু ভাষায় বিরল দক্ষতা অর্জন করেন। আরবি ও ফার্সি ভাষায়ও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত সমকালীন বাঙালি সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি (১৮৩৯-১৮৯৪) যথার্থভাবেই তাঁকে 'ইসলামের সার্থক সন্তান' বলে অভিহিত করেছেন। গ্রামবাংলার এই প্রখ্যাত উর্দু কবি তাঁর জন্মভূমিকে উর্দু কাব্যজগতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চমৎকার রচনার মাধ্যমে তিনি ব্যাপক সাহিত্যখ্যাতি অর্জন করেন। উর্দু কাব্যের পীঠস্থান দিল্লী ও লখনৌ থেকে বহু দূরে এক ভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ও লালিতপালিত একজন বাঙালির পক্ষে উর্দু সাহিত্যের দিকপালদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত স্বীকৃতিলাভ সত্যিকার অর্থেই কোন ছোটখাট কৃতিত্ব নয়। প্যারিস থেকে প্রকাশিত মান্থলি রিভিউসমূহে বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্য সাহিত্যবিশারদ গারসিন দ্য তাসিও এই কবির কবিতার প্রশংসা করেন। কবিতা রচনায় নাসাখ-এর হাতেখড়ি হয় রামপুরের হাফিজ রশিদুন নবী ওয়াহশাতের কাছে। পরে সেগুলো দেখেশুনে দিতেন বিখ্যাত সমসাময়িক পণ্ডিত, সুফি ও রসায়নবিদ হাফিজ ইকরাম আহমদ জায়গাম। নাসাখ-এর প্রধান প্রধান কাব্য ৪টি গ্রন্থে সঙ্কলন করা হয়েছে। গ্রন্থগুলো হলো *দফতর-ই-বিমিসাল, আশ আর-ই-নাসাখ, আরমাখান* এবং *আরমাখানি*। এগুলোতে দিল্লী ও লখনৌর উর্দু কবিতার মিলিত প্রভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। নাসাখ-এর কবিতা গালিব-এর কাছ থেকেও প্রশংসালাভ করে। কবির কাছে লেখা এক ব্যক্তিগত পত্রে গালিব তাঁর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং সেগুলোকে লখনৌর বিখ্যাত কবি নাসিখের কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। এই প্রশংসায় যেকোন উর্দু কবিই গর্ববোধ করতে পারেন। গদ্য সাহিত্যে নাসাখ-এর স্মৃতিকথা *সুখান-ই-শু-আরা* এখন পর্যন্ত ভারতের, বিশেষকরে বাংলার উর্দুভাষী জনগণের সাহিত্য সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যের একটি অপরিহার্য উৎস। তাঁর উর্দু আত্মজীবনী[৩৭] লেখকের ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক হলেও প্রদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বহু তথ্যসমৃদ্ধ একটি মূল্যবান গ্রন্থ এবং উনিশ

---

৩৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Sadrul Haque, *Nassakh: Hayat-o-Tasneef*.

৩৭. নাসাখের আত্মজীবনী *খুদনবীশ্‌ত্‌-ই-সাওয়ানিহ-হায়াত-ই-নাসাখ*, লেখক কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা ১৮৮৬।

শতকের ঘটনাবহুল বাংলার সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য একখানি নির্ভরযোগ্য তথ্যপুস্তক। বস্তুত নাসাখই একমাত্র উর্দু কবি যিনি দিল্লী ও লখনৌর উর্দু কাব্যলোকের সারাংশের সংমিশ্রণে একটি নিজস্ব নতুন উর্দু কাব্যরীতি উদ্ভাবনে সক্ষম হন, যা আজও প্রচলিত রয়েছে।

ঢাকার সৈয়দ মাহমুদ আজাদ ও সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ[৩৮] নাসাখ-এর সমসাময়িক ছিলেন। সৈয়দ মাহমুদ আজাদ দিল্লী কাব্যরীতির আদর্শে রচিত উর্দু গজলের একটি দিওয়ান সঙ্কলন করেন এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদ নিজের মধ্যে বাগ্মিতা ও ব্যঙ্গরসের অপূর্ব সমাবেশ ঘটান। সৈয়দ মোহাম্মদ-এর প্রবন্ধসঙ্কলনের নাম *খায়ালাত-ই-আজাদ*। লখনৌর বিখ্যাত উর্দু সাপ্তাহিক *আউধ পঞ্চ*-এ প্রবন্ধগুলো নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর যুগান্তকারী বই *নওয়াবি দরবার* ইউরোপীয় আদর্শে লেখা প্রথম উর্দু নাটক। বইটিতে মুসলমান রাজদরবারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়া যায়। ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট আরবি ও ফার্সি সাহিত্যিক মৌলবি উবায়দুল্লাহ্ আল উবায়দী সোহরাওয়ার্দীর একটি উর্দু গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর বিদুষী কন্যা খুজিস্তা আখতার বানু *কাউকাব-ই-দারী* ও *আয়না ই-ইব্রাত* প্রভৃতি জনপ্রিয় উর্দু পুস্তক রচনা করেন। এগুলো অবিভক্ত বাংলার উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই মাদ্রাসার সাথে জড়িত অপর একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন মৌলবি তাসাদ্দুক হোসেন।

ঢাকা জেলা সাব-রেজিস্টার অফিসের কর্মচারী রহমান আলি তাইশ (মৃ. ১৯০৬) শহরের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং কবি ও পণ্ডিত হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহানবীর প্রশংসায় রচিত তাঁর কবিতার সঙ্কলন *গুলজার-ইনা'ত*-এর বেশ কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ *গুলদাস্থা-ই-খেয়াল, গুলশান-ই-কুদরত, মা আরকা-ই-শহর-উ-দিহাত, মানাজিরা-ই-আহান-উ-জার* এবং *উর্দু দিওয়ান* প্রভৃতি সবই তাঁর জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু *তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা* নামের যে বইটি তাঁকে স্থায়ী খ্যাতি এনে দিয়েছিল সেটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বইটি ঢাকা শহরের একটি নির্ভরযোগ্য গেজেটিয়ার।

বাংলার সৃজনশীল উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান শতকে একমাত্র অসাধারণ সংযোজক বলে যাঁকে আখ্যাত করা যায় তিনি হলেন শিফা-উল-মুল্ক হাকিম হাবিবুর রহমান[৩৯] (১৮৮০-১৯৪৭)। তিনি ছিলেন ঢাকার শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যক্তি। পেশায় চিকিৎসক এই ব্যক্তিটি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ, সাংবাদিক এবং শ্রেষ্ঠ মানববিজ্ঞানী। *হায়াত-ই-সুকরাত* নামক উর্দু বইটি রচনা এবং আবদুল করিম খাকীর *রুমুজ-ই-আখলাক* বইটির উর্দু অনুবাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর

৩৮. *The Journal* (Englishman's weekly edition), 8th July and 15th July 1906.

৩৯. Iqbal Azim, *Mashriqi Bengal*, 110-116.

সাহিত্যজীবন শুরু করেন। *ঢাকা পঁচাশ বরস পহলে* এবং *আসুদগান-ই-ঢাকা* হচ্ছে তাঁর স্থান সংক্রান্ত গ্রন্থ। ১৯২১ সালে মুদ্রিত তাঁর জনপ্রিয় উর্দু পুস্তিকা *তারক-ই-মাওয়ালাত*-এ তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট না করার জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান রচনা হচ্ছে *সালাসা-ই-গাসসালা* গ্রন্থটি। তিন খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে বাংলার আরবি, ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে। হেকিম হাবিবুর রহমান ১৯০৬ সালে উর্দু সাপ্তাহিক *মাশরিক* এবং ১৯২১ সালে উর্দু মাসিক *যাদু* প্রকাশ করেন। বাংলার উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর এই উদ্যোগকে উর্দু সাংবাদিকতার সূচনা বলে গণ্য করা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাজা মোহাম্মদ আদিল এবং ফিদা আলি খান। খাজা মোহাম্মদ আদিল নিজে একজন সুকবি ছিলেন এবং সাপ্তাহিক *যাদু* পুনঃপ্রকাশ করে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তা পরিচালনা করেন। ফিদা আলি খান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বিষবৃক্ষ* সহজ উর্দুতে অনুবাদ করেন।

ডঃ আন্দালিব সাদানীর (১৯০৪-১৯৬৯) প্রশংসনীয় অবদানের উল্লেখ না করলে বর্তমান শতকের বাংলার উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাকিস্তানের জন্মের বহু আগেই কবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কারণ ১৯২৮ সালেই তিনি উর্দু ও ফার্সির অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদান সারা উর্দু বিশ্বে উন্নতমানের মৌলিক লেখা হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *নিশাত-ই-রাফতা, তাহকিক কি রওশানিমেঁ*, উর্দু গজল *গুই আউর দাউর-ই-হাজির, ছোট খোদা* (ছোট উপন্যাস) ও *সাঞ্চি কাহানিয়া*। এ ছাড়াও তাঁর লেখা বহু উর্দু নিবন্ধ উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিজ দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে ডঃ সাদানী নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষকরে বিহার ও পশ্চিম বাংলা থেকে উর্দু কবি ও সাহিত্যিক পূর্ব বাংলায় আগমন করেন। উর্দুভাষী বাস্তুত্যাগীগণ ঢাকাকে তাঁদের সাহিত্যকর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত করেন এবং *আঞ্জুমান তারাক্কি-ই-উর্দু, বাজম্-ই-আহবাব* প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। উর্দু ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আনাচেকানাচে দেশব্যাপী মোশায়েরার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ শরাফুল হোসাইনী (মৃ. ১৯৬০), ইসমাইল জবিহ্ (মৃ. ১৯৫৯), মির্জা ফকির মুহম্মদ (মৃ. ১৯৫৮), মওলানা তামান্না ইমাদি এবং হায়দার দেহলভী। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লামা রেজা আলি ওয়াহশাত[৪০] (মৃ. ১৯৫৬)। কবি হিসেবে তিনি তাঁর যুগের 'মির্জা গালিব' নামে

৪০. ওয়াহশাত-এর জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য,' Wafa Rashidi, *Hayat-i-Wahshat*, (Karachi 1982).

প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সাহিত্যিক কৃতিত্বের দিক থেকে তাঁকে কাজি নজরুল ইসলাম বা আল্লামা ইকবালের সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করা যায়। ওয়াহশাত বহু শিষ্য রেখে যান। তাঁদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছেন আসক বানারসি, আহমদ আহসান আশক্, ওয়াক রশিদী, কমর সিদ্দিকী এবং আমিরুল ইসলাম শারকি। ওয়াহশাত-এর অন্যতম ভক্ত শিষ্য অধ্যাপক সৈয়দ ইকবাল আজিম তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *মাশরিকি বাঙ্গাল মে উর্দু*-এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এটি এ বিষয়ে এখনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বাংলাদেশের উর্দু লেখকদের মধ্যে যাঁরা উর্দুভাষী জনগণের সাথে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে আহমদ আহসান আশকের নাম উল্লেখযোগ্য। নজরুল ইসলামের কিছু কবিতাসহ বাঙালি কবিদের অনেক কবিতা তিনি সাফল্যের সঙ্গে উর্দুতে অনুবাদ করেন। রফি আহম্মদ ফয়দীর *বাংলা তালিম* এবং ওয়াহিদ কায়সার নাদভীর *আসান বাংলা তালিম* উর্দুভাষী জনগণের মধ্যে বাংলা জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। বই দু'টি যথাক্রমে ১৯৬১ ও ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর আগে আবদুর রহমান বেখুদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক সঙ্কলিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থটি উর্দুতে অনুবাদ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তা প্রকাশিত হয়।

খাঁটি সাহিত্যসেবী ছাড়াও প্রশাসনিক সার্ভিসের কতিপয় সদস্য যেমন এফ. এ. করিম 'জিলী', সলিমুল্লাহ ফাহমী ও শাহাবুদ্দিন রহমতউল্লাহ প্রমুখও উৎকৃষ্ট উর্দু কবিতা ও উপন্যাস রচনা করেন। দেশের অন্যান্য ভাষার মতো উর্দু ভাষার উন্নয়ন সাধনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বৃটিশ ভারতে স্থানীয় ভাষায় সাংবাদিকতার মোটামুটি ব্যাপক প্রচলন হলেও পূর্বাঞ্চলে এক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। লর্ড কার্জনের শাসনামলে ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ বিভক্ত হলে এখানে উর্দু ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্ব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয়। সে সময়ের সর্বজনমান্য মুসলমান নেতা হাকিম হাবিবুর রহমান এক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি উর্দু ভাষায় মাসিক *মাশরিক* প্রকাশ করেন। এটিই পূর্ব বাংলার মাটিতে প্রকাশিত প্রথম উর্দু সাময়িকী। এ সাময়িকীটিতে মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় স্বার্থ সম্পর্কিত লেখার সমাবেশ ঘটতো। মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর লিখিত নিবন্ধাদি প্রকাশ করা ছাড়াও *মাশরিক* সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যবহুল লেখা প্রকাশ করতো। এতে প্রকাশিত বেশিরভাগ লেখা সম্পাদকের নিজের হলেও এ. এফ. এম. আবদুল আলি, সৈয়দ মাহমুদ আজাদ,

সৈয়দ শরাফুদ্দিন, মৌলবি নাজমুদ্দিন এবং খাজা মমতাজ জাহাঙ্গীর নাগরী প্রমুখ সাহিত্যিক এর সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অপর দু'টি উল্লেখযোগ্য মাসিক উর্দু পত্রিকা ছিল *যাদু* ও *আখতার*। *যাদু* পত্রিকাটিও হাকিম হাবিবুর রহমানই বের করেছিলেন। এটি দীর্ঘকাল চালু ছিল এবং সমগ্র উপমহাদেশের উর্দুপ্রেমিকদের মধ্যে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যাও ছিল ব্যাপক। *আখতারের* কেবল একটা সংখ্যাই বেরিয়েছিল। তবে বিষয়বস্তুর লালিত্যের দিক থেকে সেটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এটাতে নিয়াজ ফতেহ্পুরী, রেজা আলি ওয়াহ্শাত্, নাতিক লাখনভী, আজিজ লাখনভী, ওয়াকিফ বিহারী মায়েল এলাহাবাদী প্রমুখ কবি ও লেখকের রচনা ছাপা হয়েছিল। *আখতার*-এর সম্পাদক আবদুর রব সিদ্দিকী (১৮৯১-১৯৪৪), যিনি খালিদ বাঙালি নামে অধিক পরিচিত ছিলেন, তিনি প্রকৃতই উন্নত সাহিত্যরুচির লোক ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতা সুপণ্ডিত আবদুল হাই আখতার-এর কাছ থেকে তা লাভ করেছিলেন। পিতার নাম অনুসারেই তিনি মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। খালিদ বাঙালি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন।

১৩

সংস্কৃত সাহিত্য

পরেশচন্দ্র মণ্ডল*

বাংলায় সংস্কৃত চর্চা প্রথম কখন শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে আর্যভাষা 'সংস্কৃতের' চর্চা যে আরম্ভ হয় নি, এ ব্যাপারে সম্ভবত কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মৌর্য ও গুপ্তযুগের লেখমালার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, খৃস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের বা তারও পূর্বে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল।[১] এরই ফলস্বরূপ সপ্তম শতকের মধ্যেই সংস্কৃতচর্চা বাঙালির হাতে বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়, যাকে পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ 'গৌড়ীয় রীতি' নামে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন বাংলার গুপ্ত শাসনামলে সংস্কৃতচর্চা প্রসার লাভ করে এবং কিছু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থও রচিত হয়। এ সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চন্দ্রগোমীপ্রণীত *চান্দ্রব্যাকরণ*, গৌড়পাদ রচিত *গৌড়পাদ-কারিকা*, পালকাপ্যের *হস্ত্যায়ুর্বেদবিদ্যা* প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

প্রাক-নবাবি যুগে সংস্কৃতচর্চা

পালরাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় তাদের উদাবতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে তৎকালীন বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের চর্চা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলনের পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন চলতে থাকে। শ্রীধরকৃত *অদ্বয়সিদ্ধি*, চক্রপাণি দত্তের *আয়ুর্বেদ দীপিকা*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* প্রভৃতি কাব্য, কবি বিদ্যাধরের *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়*, শ্রীধরদাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত* ইত্যাদি সংগ্রহকাব্য পালযুগের সংস্কৃতচর্চার

---

* অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা ১৯৮১), ১৮২।

২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব*, (কলকাতা ১৩৮২ বা. স.), ৩৫৮-৫৯।

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।[৩] এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পালরাজগণের শাসনামলে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কীয় বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও রচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশে পালরাজদের পরে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সেনরাজদের অভ্যুদয় ঘটে। শাসকগোষ্ঠী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ধর্মে-কর্মে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময়ে সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্মৃতি ও সংস্কার অনুযায়ী সমাজগঠনে প্রয়াসী হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থাদি রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে এ ধর্মের প্রসার ঘটান। সেনরাজদের শাসনামলে সংস্কৃতচর্চা এত প্রসারলাভ করেছিল যে এই যুগকে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার 'সুবর্ণ যুগ'[৪] বলা হয়। সেন বংশের শাসকগণ ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী এবং তাঁরা প্রায় সকলে কবিতা রচনা করেছেন। রাজা বল্লাল সেন হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থে সংস্কৃত ভাষায় *ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর* নামে পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষণ সেনের পাঁচজন সভাকবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবরচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যখানি সংস্কৃত সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। সংক্ষেপে বলা যায়, পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, বল্লাল সেন, সর্বানন্দ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন ও শরণ এতজন পণ্ডিত ও কবির আবির্ভাব সেনযুগের বাংলাদেশকে নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত করেছিল।[৫]

মুসলিম শাসনামলে নানা কারণে সংস্কৃতচর্চায় শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। তবে মুসলিম শাসকদের মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যোৎসাহী শাসকের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বৃহস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, চতুর্ভুজ প্রমুখ বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি পণ্ডিত সংস্কৃতচর্চার ধারাটি প্রবহমান রাখতে প্রয়াসী হন।[৬]

এই সময় বাংলাদেশে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। নবদ্বীপের অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করতে আসতো। বৃন্দাবন দাস বিরচিত *চৈতন্যভাগবত* থেকে নবদ্বীপে তৎকালীন সংস্কৃতচর্চার অনুকূল অবস্থার কথা জানা যায়।[৭] সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।[৮] শূলপাণির *প্রায়শ্চিত্তবিবেক* ও *শ্রাদ্ধবিবেক*, মধুসূদন সরস্বতীর *অদ্বৈতসিদ্ধি, প্রস্থানভেদ*, রামানন্দতীর্থের *অদ্বৈত প্রকাশ* ও *অধ্যাত্মবিন্দু* প্রভৃতি দর্শনের উল্লেখযোগ্য

৩. R. C. Majumdar, *The History of Bengal*, Vol I, (University of Dhaka 1963), 310-17.

৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব*, (কলকাতা ১৩৮২), ৩৬৫।

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)*, (কলিকাতা ১৯৮১), ১৯৫।

৬. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুবাদক), (ঢাকা ১৯৮২), ২৭০-৭১।

৭. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীসুকুমার সেন (সম্পাদিত), (নতুন দিল্লী ১৯৮২), ৭।

৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, (কলকাতা ১৩৮৫), ৩৩৬-৩৫৬

গ্রন্থ। কাব্যচর্চার নিদর্শন হিসেবে রঘুনাথ দাস বিরচিত *দানকেলিচিন্তামণি*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *গোবিন্দলীলামৃত*, রামরাম শর্মার *মনোদূত*, রূপ গোস্বামীর *হংসদূত* ও *উদ্ধবসন্দেশ* প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়।

মধুসূদন সরস্বতীর *কুসুমাবচয়*, *রূপগোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী*, *বিদগ্ধমাধব*, কবিতার্কিকের *কৌতুকরত্নাকর*, গোপীনাথের *কৌতুকসর্বস্ব* এযুগের নাট্যরচনার নিদর্শন। অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যশাস্ত্র রচনাতেও বাঙালি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কবি কর্ণপুরের *অলঙ্কারকৌস্তুভ*, কবিচন্দ্রের *কাব্যচন্দ্রিকা*, বলদেবের *কাব্যকুস্তভ*, রূপ গোস্বামীর *নাটকচন্দ্রিকা*, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, *উজ্জ্বলনীলমণি* (বৈষ্ণব রসশাস্ত্র) প্রভৃতি গ্রন্থ বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাকরণ ও অভিধান রচনাতেও বাঙালির অবদান তুচ্ছ নয়। জীব গোস্বামীর *হরিনামামৃত ব্যাকরণ*, ভরত মল্লিকের *একবর্ণার্থসংগ্রহ* ও *দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ* প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার. স্মৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকলেও ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্যই নবদ্বীপ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। মহর্ষি গৌতম প্রবর্তিত ন্যায়দর্শন দীর্ঘকালের আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বারো শতকের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের হাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।[৯] এটিই নব্য-ন্যায়। মিথিলায় এই নব্য-ন্যায়ের উদ্ভব হলেও বাংলার নবদ্বীপই নব্য-ন্যায় চর্চার প্রকৃষ্ট স্থল রূপে চিহ্নিত হয়।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মিথিলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ছাত্রকে সেখান থেকে ন্যায়ের গ্রন্থাদি, এমনকি নোটপত্রাদি কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে দেয়া হতো না। ফলে ন্যায়চর্চা মিথিলাতেই ছিল সীমাবদ্ধ। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের ন্যায়ের ছাত্র বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য মিথিলায় অধ্যয়ন করে ন্যায়গ্রন্থ *তত্ত্বচিন্তামণি*সহ *কুসুমাঞ্জলির* পদ্যাংশ মুখস্থ করে নবদ্বীপে ফিরেন এবং এই স্মৃতিতে ধৃত গ্রন্থের সাহায্যে নবদ্বীপে নব্য-ন্যায়চর্চা শুরু করেন।[১০] তাঁর প্রধান শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে তর্কশাস্ত্রে পরাভূত করে নবদ্বীপের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রচিত *চিন্তামণিদীধিতি* নব্যন্যায়ের একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

পনেরো থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত বাংলাদেশই নব্য-ন্যায়চর্চার পীঠস্থান হিসেবে গণ্য হয়েছে। নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণির *চিন্তামণিদীধিতির* উপর জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬৯০) ও গদাধর ভট্টাচার্য (১৬৫০) কৃত টীকা অপূর্ব চিন্তার উপাদানরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। রঘুনাথ শিরোমণি নব্যন্যায় চর্চার মূল স্তম্ভ গড়ে তোলেন। আর সেখানে জগদীশ ও গদাধর এই দুই মনীষী নব্যন্যায়ের বিরাট সৌধ রচনা করেন। এঁদের পর

৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা ১৯৮৩), ২৯৫।

১০. Satischandra Vidyabhusana, *History of Indian Logic*, (Calcutta 1921), 462.

কুসুমাঞ্জলিকারিকার হরিদাসী টীকা (হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার), রঘুনাথ শিরোমণি রচিত গ্রন্থের মাথুরী টীকা (মথুরানাথ তর্কবাগীশ), *ভাষাপরিচ্ছেদ* ও *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* প্রভৃতি নানা রকম ন্যায়শাস্ত্রের টীকা ব্যাখ্যা নবদ্বীপসহ দেশের সমগ্র পণ্ডিত সমাজে পঠিত ও আলোচিত হতে থাকে।[১১]

আঠারো ও উনিশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্য

নব্য-ন্যায়চর্চার পাশাপাশি নব্যস্মৃতিও বাংলাদেশে অনুসৃত হয়ে থাকে। সতেরো ও আঠারো শতকের কয়েকজন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক এবং স্মৃতি-আচার্যের পরিচয় ও অবদান এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

এই ক্ষেত্রে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭ খৃ.)-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[১২] দীর্ঘ জীবনের অধিকারী এই মহাপণ্ডিত সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে *রামচরিত* নাটকাদি রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে *বিবাদভঙ্গার্ণব* নামে যে বিরাট গ্রন্থটি রচনা করে গেছেন এটিই তাঁকে যশস্বী করে রেখেছে। এই গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ দেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ (১৭৫৪- খৃ.)[১৩] নবদ্বীপ নিবাসী অপর একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ওয়ার্ড (Word) সাহেবের গ্রন্থে দেখা যায় ১৮১৭ সালে কৃষ্ণকান্তের ন্যায় চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫ জন। তিনি *ন্যায়রত্নাবলী, ন্যায়রত্নপ্রকাশিকা, তর্কামৃততরঙ্গিনী, ন্যায়পত্রী* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে বাংলাদেশের সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন[১৪] (১৮০৬-১৮৫৫ খৃ.) প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকদের মধ্যে অন্যতম। ছাত্রসমাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। তিনি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করে না গেলেও তাঁর রচিত পত্রিকাসমূহ দেশী-বিদেশী ছাত্রদের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল।

কালক্রমে উনিশ শতকে বাংলাদেশে নব্যস্মৃতির গৌরব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। এই পর্যায়ে নব্য স্মৃতিচর্চায় কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন[১৫] (১৮৫৪-১৯১৭ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৌলিক রচনা *উদ্ধার চন্দ্রিকা* (নিবন্ধ) ১৩১২

---

১১. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, "বাঙ্গালার সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের এক বিস্মৃত অধ্যায়", *দেশ,* ২০ জুন ১৯৮৭, ৪১।

১২. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান,* (কলকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), ২২৫-৩৩।

১৩. ঐ, ২১৩-১৯।

১৪. ঐ, ২২২-২৩।

১৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান,* (কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), ১৫৩।

বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সমুদ্র পার হয়ে যারা পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের হিন্দু সমাজে পুনর্গ্রহণ সমস্যা সম্পর্কিত ব্যাপারটি *উদ্ধার চন্দ্রিকার* বিষয়বস্তু। এছাড়া তিনি *মনুসংহিতা* প্রভৃতি কুড়িখানি ধর্মগ্রন্থেরও টীকা রচনা করে গেছেন।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত[১৬] (১২৩৬-১২৯৬ খৃ.) গোলোকনাথ ন্যায়রত্নের কৃতী সন্তান ও ছাত্র; বংশানুক্রমিক ধারায় তিনি ন্যায় চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে, নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের নির্বাণোন্মুখ উজ্জ্বলতার তিনি শেষ নিদর্শন। তিনি গদাধরীয় মুক্তিবাদ ও শক্তিবাদের টীকা রচনা করেন। তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থ *ন্যায়তত্ত্বপ্রবোধিনী* তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ও ছাত্র সর্বেশ্বর সার্বভৌম সমাপ্ত করেন।

নব্যন্যায়ের আর একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক হলেন মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন[১৭] (১২৪০ বঙ্গাব্দ)। আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তিত্বরূপে তিনি নন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থই পণ্ডিত সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। *ন্যায়প্রকাশ, বেদান্তপরিভাষাটীকা, অর্থসংগ্রহ* (মীমাংসা) গ্রন্থের টীকা, *তত্ত্বকৌমুদী* (সাংখ্য) টীকা এবং *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর টীকা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ। এ ছাড়া তিনি *বাতদূত* নামের একখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনামলে নবদ্বীপে ন্যায়ের পণ্ডিতদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ[১৮] (১২৫০-১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)-এর নাম সুপরিচিত। তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে নব্যন্যায়ের অধ্যাপক ও এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য হন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *সাংখ্যদীপনী*, *ন্যায়তত্ত্ববোধিনী*, *ন্যায়সপ্তপদার্থী*, *ন্যায়বার্তিক* (সম্পাদিত), *তত্ত্বচিন্তামণির মাথুরী টীকা* (সম্পাদিত), *ন্যায়কুসুমাঞ্জলির* টীকা, *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি বিবৃতি* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ[১৯] (১৮৭০-১৯৩৪ খৃ.) ভট্টপল্লী নিবাসী একজন বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত। সংস্কৃতচর্চা প্রবহমান রাখার জন্য তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গোবিন্দানন্দের *বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, শুদ্ধিকৌমুদী, দানক্রিয়াকৌমুদী, শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী* প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এ ছাড়াও অনিরুদ্ধ ভট্টের *হারলতা* ও *কৃত্যরত্নাকর, গৃহস্থরত্নাকর, বিবাদরত্নাকর, দন্ডবিবেক, রাজধর্মকৌস্তুভ* প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন।

---

১৬. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান*, (কলকাতা ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), ২২৪।

১৭. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, "বাঙ্গালীর সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের এক বিস্মৃত অধ্যায়", *দেশ* , ২০ জুন ১৯৮৭, ৪৩।

১৮. ঐ , ৪২-৪৩।

১৯. ঐ, ৪৪।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে নব্য-ন্যায়চর্চার ক্ষেত্রে যে বাঙালির নাম স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ[২০] (১৮৭৬-১৯৬১খৃ.)। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার ঊনশিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমিক ধারায় তিনি ছিলেন সংস্কৃতচর্চার উত্তরাধিকারী। পিতামহ কাশীচন্দ্র, পিতা গঙ্গাধর এবং বাংলার গৌরব দার্শনিক প্রবর মধুসূদন সরস্বতীর উত্তরসূরি হিসেবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্কৃতচর্চায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর রচিত *স্মৃতিচিন্তামণি* নব্যস্মৃতিচর্চায় এক প্রশংসনীয় সংযোজন। এই গ্রন্থে হিন্দু মাজে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্ম-কর্ম ও নিত্যকর্ম সম্পর্কে ব্যবস্থাসহ বঙ্গানুবাদ রয়েছে।

নবদ্বীপসহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে সংস্কৃতচর্চায় যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাদের পরিচয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মর্তব্য। এ ক্ষেত্রে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের[২১] (১৭১০-১৭৮২ খৃ.) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃতচর্চার জন্য ছিলেন অত্যুৎসাহী এবং এজন্য অর্থব্যয় করতেও ছিলেন মুক্তহস্ত। নদীয়ার বাইরে সুদূর বিক্রমপুর ও বাঁলার পণ্ডিতগণ পর্যন্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অর্থানুকূল্য ভোগ করেছেন। তিনি নদীয়ায় অনেক টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং সেগুলোর ব্যয়ভার বহনের জন্য করমুক্ত ভূসম্পত্তি দান করে সংস্কৃতচর্চার পথ প্রশস্ত করেন। সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য নদীয়ায় আগত বিদেশী ছাত্রদের জন্য তিনি মাসে দু'শ টাকা মাসোহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বিদ্যানুরাগী বিত্তবান ও জমিদারগণ দেশের শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ ও তিলকচাঁদ, নাটোরের রামকান্ত ও তাঁর স্ত্রী রাণী ভবানী, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ গোপাল সিংহ এবং ঢাকার রাজনগরের রাজবল্লভ সেন প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ সে যুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।[২২]

পূর্ব বাংলার রাজবল্লভ রাজনগরে টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব এবং পাঠশালা স্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান ছিলেন। মেধাবী ছাত্রদেরকে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করতেন। রাজনগরের নীলকণ্ঠ সার্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এবং কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত নামের তিনজন কৃতী ছাত্রকে তিনি রাজনগর থেকে সংস্কৃতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন।

এসময় নবদ্বীপ ছাড়া বাংলাদেশের ২৪-পরগণার ভাটপাড়া (ভট্টপল্লী), গুপ্তিপাড়া, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হাওড়ার বালী, ঢাকার রাজনগর ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের টোলসমূহেও উচ্চতর সংস্কৃতচর্চার ব্যবস্থা ছিল।[২৩]

---

২০. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান,* (কলকাতা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), ১৫৩।

২১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা,* (কলকাতা ১৯৮২), ১০৬।

২২. ঐ, ১০৬।

২৩. ঐ, ১১০।

আঠারো শতকের কবি দয়ারামবিরচিত *সারদামঙ্গল* নামের কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নবদ্বীপে নব্যন্যায় অধ্যাপনার জন্য পাঁচটি টোল ছিল; এ ছাড়া সপ্তগ্রাম, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানেও সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল।[২৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলেও নবদ্বীপে তথা বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার পরিচয় মেলে। লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে উইলিয়াম এ্যাডাম বাংলাদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ হতে ১৮৩৮ সালের মধ্যে তিনটি রিপোর্টে তিনি এদেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা হিসাবে বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্থানীয় বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫] দ্বিতীয় রিপোর্টে বলেছেন যে, রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমায় ৩৮টি সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল।[২৬] তৃতীয় রিপোর্টে তিনি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত জেলার পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়, তখন সারা বাংলাদেশে এক হাজার আট জন শিক্ষকের কাছে দশ হাজার আট শত জন ছাত্র অধ্যয়ন করছিল। টোলগুলোতে ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো।

এই বিখ্যাত রিপোর্ট তিনটিকে ভিত্তি করে কিছু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করে ১৮৬৮ সালে রেভারেন্ড জে. লং যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সেখানে বর্ণিত তথ্য অনুসারে সেসময়কার বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার অবস্থাটি জানা যায়। ১৮১১ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর[২৭] নদীয়ায় এবং ত্রিহুতে একটি করে মোট দুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যদিও বাস্তবায়িত হয় নি, তবুও নদীয়ায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাদের রিপোর্টে (৯ জুলাই ১৮১৬) বলা হয়েছে যে নদীয়ায় তখন ৪৬টি সংস্কৃত টোল ছিল। এগুলো স্থানীয় বিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৮০ জন। তবে নদীয়ায় ছাত্র ও টোলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ১৮১৬ সালের রিপোর্টে দেখা যায় ৪৬টি টোলে ৩৮০ জন ছাত্র, ১৮১৮ সালে ৩১টি টোলে ৭৪৭ জন ছাত্র, ১৮২১ সালে ২৫টি টোলে ৫০০-৬০০ জন ছাত্র ছিল। এ থেকে মনে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ কমে গেলেও ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গেছে।[২৮]

---

২৪. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুবাদক), (ঢাকা ১৯৮২), ২৩০।

২৫. সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা,* (কলকাতা ১৯৬৪), ১১৪।

২৬. ঐ, ১১৪।

২৭. Rev. J. Long, *Adam's Reports on Vernacular Education In Bengal and Behar,* (Calcutta 1868), 50.

২৮. ঐ, 50-51.

১৮১৮ সালের রিপোর্টে আরো দেখা যায়, তখন নদীয়ায় পাঁচ প্রকারের সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ৩১টি প্রতিষ্ঠানে ৭৪৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করছিল। এর মধ্যে নবদ্বীপেই নব্যন্যায় শিক্ষার ১৭টি কলেজে ছাত্র ছিল ৪৩২ জন। এছাড়া স্মৃতি, অলঙ্কার, জ্যোতিষ এবং ব্যাকরণ পড়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনেক ছাত্র পড়াশোনা করতো।[২৯]

ইউরোপীয় অবদান

সংস্কৃত সাহিত্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হলো কোম্পানি শাসনামলে। কোম্পানি কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচ্য সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিল। এই উৎসাহের প্রধান কারণ রাজনৈতিক। এই দেশকে সফল ও কার্যকরভাবে শাসন করার জন্য এ দেশের সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ছিল একটি বাস্তব প্রয়োজন। এ ছাড়া বিশ্বমানব ও বিশ্ব সভ্যতাকে জানার রেনেসাঁজাত স্পৃহাও অনেককে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাচ্যবিদ এবং কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট-এর বিচারক স্যার উইলিয়ম জোনস।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫) ছিলেন সংস্কৃতচর্চার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ছিলেন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত সংস্কৃতগুরু এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সরকারি পৃষ্ঠপোষক। হেস্টিংস-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম *Code of Gentoo Law* শীর্ষক বিখ্যাত হিন্দু আইন গ্রন্থটি সংকলিত হয়। সংকলন করেন নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড।[৩০] গ্রন্থের অনুক্রমণিকায় সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটি সম্ভবত সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় লেখা সর্বপ্রথম রচনা।

সতেরো শতকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয়গণ সংস্কৃতচর্চার প্রয়াস পান। ১৬০৬ সালে রবার্ট ডি. নোবিলি নামে জনৈক পাদ্রী দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতচর্চা শুরু করেন এবং ১৬৬৪ সালে জার্মান নাগরিক Heinrich Noth, ১৬৯৯ সালে Henxleden নামের অপর একজন জার্মান সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেন।[৩১] কিন্তু সংস্কৃত ভাষাচর্চা সম্পর্কে এই প্রয়াস ছিল বিচ্ছিন্ন এবং সুগঠিত পরিকল্পনা বহির্ভূত। ইউরোপীয়দের এই প্রাথমিক প্রয়াসে সংস্কৃত বিদেশীদের মধ্যে তেমন পরিচিতি লাভ করতে পারে নি।

সংস্কৃতচর্চার অগ্রদূত

ক. *জোনস*

বহু ভাষাবিদ আইনজ্ঞ উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৭৮৩ সালে কলকাতায় আসেন। তিনি এদেশে এসে উপলব্ধি

---

২৯. ঐ, 50-51.
৩০. বামনদাস বসু, পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা, *প্রবাসী*, ১২শ সংখ্যা, ৪০৭।
৩১. ঐ, ৪০৭।

করলেন যে, এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যে সংস্কৃত ভাষা সেটা আরো চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি চার্লস উইলকিনস-এর মতো আরো কয়েক জন পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতায় ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৩২] এই প্রাচ্যানুরাগীগণ মিলে স্থির করলেন যে, প্রাচ্যের সুপ্রাচীন ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে যে বিপুল সম্ভার রয়েছে তাকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের সাথে সাথে নতুন গবেষণাধর্মী কাজ-কর্ম, নতুন আবিষ্কার ইত্যাদির পথও পরিষ্কার হলো এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের একটি বাংলা সংস্করণের পুঁথি পেয়ে জোনস ১৭৮৭ সালে রামলোচন পণ্ডিতের নিকট তা পড়তে শুরু করেন। তিনি প্রথমে বইটি ল্যাটিনে অনুবাদ করেন এবং ঐ ল্যাটিন থেকে পুনরায় ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। *ফেটাল রিং* নামে তাঁর এই অনূদিত গ্রন্থ ১৭৮৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডসহ চতুর্দিকে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেল। লন্ডনেই সাত বছরের মধ্যে বইটির তিনটি সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সবার আগে জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ফস্টারের অনূদিত জার্মান সংস্করণও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তৎকালীন সাহিত্যসম্রাট গ্যেটে *শকুন্তলা* পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন :

> Would'st thou the young year's blossoms and
> the fruits of its decline,
> And all by which the soul is charmed, enraptured,
> feasted, fed ?
> Would'st thou the Earth and Heaven in one Sole
> name Combine ?
> I name thee, O Sakuntala ! and all atonce is said.

১৯১২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর্থার ডব্লিউ. রাইডার *শকুন্তলার* আমেরিকান অনুবাদের সংস্করণ বের করেন। এছাড়া রুশ, ডাচ, ড্যানিশ, সুইডিশ, পোলিশ, চেক, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষায় *শকুন্তলার* অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর চীন, ইউক্রেন, তুর্কীস্থান, পারস্য ও ইন্দোনেশিয়ায় *শকুন্তলার* প্রবেশ ঘটেছিল।[৩৩] সংস্কৃত নাটক *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর বিশ্ববিস্তৃতি ঘটিয়ে এবং এর স্রষ্টা কালিদাসকে বিশ্বকবির আসনে স্থাপন করে স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্যবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়ে রয়েছেন।

---

৩২. Kali Kinkar Datta, *A Social History of Modern India*, (New Delhi 1975), 104-05.

৩৩. প্রগতি রায়, 'শকুন্তলা-র বিদেশযাত্রা', *দেশ*, ১৪ এপ্রিল ১৯৯০, ৪১-৪৬।

এছাড়া বর্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত ধ্বনিবিজ্ঞান এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবেও জোনস-এর নাম উল্লেখিত হয়ে আছে। তিনি প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে সমস্ত ভাষার মূলে যে এক আদিম ভাষার চর্চা ছিল এ ব্যাপারে দৃঢ়মত পোষণ করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।[৩৪]

স্যার উইলিয়াম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণাসমূহ *এশিয়াটিক রিসার্চ* নামের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশ করে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি পাশ্চাত্য তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

খ. *কোলব্রুক*

স্যার উইলিয়াম জোনসের মৃত্যুর পর যেসব পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃতচর্চায় প্রভূত অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে হেনরি টমাস কোলব্রুকের (১৭৬৫-১৮৩৭) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৩ সালে কোলব্রুক বেঙ্গল সার্ভিসে রাইটারশীপ নিয়ে ভারতে আসেন এবং ১৭৮৬ সালে ত্রিহুতে রেভিনিউ কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে উৎসুক হন। তিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে সংস্কৃতচর্চা শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যে হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় রীতিনীতিসহ সমাজের ব্যবহারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন।[৩৫] হিন্দু সমাজজীবনে অনুসৃত সতীদাহ প্রথার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি *ঋগ্বেদের* ভিত্তিতে রচিত তাঁর 'On the Duties of a Faithful Hindu Widows' নামের প্রবন্ধটি এশিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে পাঠ করেন। তাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর এদেশীয় বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেবসহ উইলসন, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ প্রাচ্য ভাষাবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উক্ত প্রবন্ধে বিধৃত সতীদাহ প্রথার উৎস নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।[৩৬] ১৮৫৬ সালে উইলসন তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে *ঋগ্বেদে* সহমরণ সম্পর্কে বলা হয় নি, বরং বিধবার প্রতি জগতে বেঁচে থাকার নির্দেশ রয়েছে— "That the text of the *Rigveda* cited as authority for the burning of widows enjoins the very Contrary, and directs them to remain in the world."[৩৭]

১৮০১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় কোলব্রুক 'Sanskrit and Prakrit Languages' নামে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। এই নিবন্ধে তিনি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে রচিত বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের পরিচয় তুলে

৩৪. David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, (California 1969), 38.

৩৫. O. P Kejariwal, *The Asiatic Society of Bengal and The Discovery of India's Past*, (Delhi 1944), 78.

৩৬. ঐ, 78.

৩৭. H. H. Wilson, "On the supposed Vaidic authority for the burning of Hindu Widows, and on the funeral of the Hindus", *Journal of the Royal Asiatic Society of Ireland*, XVI (1856), 201.

ধরেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর অধ্যয়ন করে তিনি এ ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনায় উৎসাহিত হন এবং এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ১৮০৫ সালে তিনি পাণিনির ব্যাকরণ ও তার ভাষ্যসমূহের ভিত্তিতে *Grammar of the Sanskrit Language* নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩৮] সংস্কৃত ভাষা নিয়ে গবেষণা করে কোলব্রুক তাঁর পূর্ববর্তী গবেষক উইলিয়াম জোনস-এর মতকে খণ্ডন করে হিন্দির চেয়ে সংস্কৃতকে অধিকতর প্রাচীন ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৩৯]

সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদকর্মেও কোলব্রুক তাঁর যথোপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। ১৮০৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *হিতোপদেশ* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর এই অনুবাদ পূর্ববর্তী অনুবাদক জোনস ও উইলকিংস-এর গ্রন্থের তুলনায় বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কোলব্রুক সংস্কৃত অভিধান *অমর কোষের* অনুসরণে *Sanskrit Dictionary* প্রণয়ন করেন। এই অভিধানে শব্দের উৎস উল্লেখসহ প্রয়োগ সম্বন্ধেও কিঞ্চিত বিবরণ স্থান লাভ করেছে।[৪০]

হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ *ঋগ্বেদকে* নিয়ে কোলব্রুক গবেষণামূলক রচনা উপহার দিয়ে গেছেন। ১৮০৪ সালে তাঁর রচিত 'Essay on the Vedas or Sacred Writings of the Hindus' নামের প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির *The Asiatic Reasearches* পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৪১] সম্ভবত তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিত যিনি সায়নভাষ্যসহ *ঋগ্বেদ* গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি বৈদিক যুগকে ভারতীয় আর্য সভ্যতার সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করেন।[৪২] বিশ্লেষণাত্মক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তিনি *বেদ, পুরাণ* প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং এদেশের হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথার ঐতিহাসিক উৎস সন্ধান করেন। প্রসঙ্গত তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের সাথে তৎকালীন সমাজে অনুশীলিত রীতি-নীতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য নির্দেশ করে গেছেন। কোলব্রুকের *The Translation of Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance* বইটি প্রকাশিত হয় ১৮১০ সালে। এই গ্রন্থটির সহায়তায় এদেশে আগত ইউরোপীয়গণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত আইনে বিদ্যমান ধারা ও স্ববিরোধিতার স্বরূপ আধুনিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে বুঝবার সুযোগ পান। এ গ্রন্থ দুটি উইলিয়াম জোনস্ এবং তাঁর প্রধান পণ্ডিত তর্কপঞ্চানন কর্তৃক ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থ দুটিতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না

৩৮. Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 95.

৩৯. David Kopf *British Orientalism*, 88

৪০. প্রাগুক্ত, 88.

৪১. Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 98.

৪২. David Kopf, *British Orientalism*, 40.

থাকায় তা শিক্ষানবিশদের কাছে খুব একটা সমাদর লাভ করতে পারে নি বলে কোলব্রুক মনে করেন।[৪৩] অথচ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রশিক্ষণগ্রহণকারী কোম্পানির বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশে তথা ভারতে অনুসৃত হিন্দু আইন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে কোলব্রুক এদেশীয় আইন সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। এ কাজে অগ্রসর হয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, সর্বভারতে গ্রহণযোগ্য কোন বিশেষ একখানি হিন্দু আইনের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায় না। যে *মিতাক্ষরা*-কে দক্ষিণ ভারত ও বারানসিতে মেনে চলা হতো সেটা কিন্তু বাংলাদেশে পরিপূর্ণভাবে অনুশীলিত হয় নি। এদেশের আইনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোলব্রুকের গবেষণায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল।[৪৪] হিন্দু আইনের উপর কোলব্রুকের রচিত *ডাইজেস্ট* ১৭৯৮ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি দুই বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তবে এই গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে কোলব্রুক একজন মহান সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত হন।[৪৫] সংস্কৃত বিষয়ে তাঁর মেধা ও দীর্ঘ অনুশীলনের স্বীকৃতি হিসাবে ১৮০৫ সালে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দু আইন ও সংস্কৃত বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন।

হিন্দু ধর্মীয় উৎসবাদি সম্পর্কেও কোলব্রুকের লিখিত প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। 'His Essay on the Religious Ceremonies of the Hindus' নামের প্রবন্ধটি *Asiatic Reasearches* নামের গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় নির্দেশসহ সমাজজীবনের বাস্তব অনুশীলনের দিকটিও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এইভাবে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে কোলব্রুকের ধারণা হয় যে, হিন্দু ধর্মে বহু দেবদেবীর উপাসনার কথা থাকলেও হিন্দুগণ মূলত একেশ্বরবাদী। তিনি বলেন :

> If the doctrines of the Veda, and even those of the Puranas, be closely examined, the Hindu theology will be found consistent with monotheism, though it contains the seeds of polytheism and idolatry.[৪৬]

এছাড়া কোলব্রুক বেদান্ত দর্শনের শংকর, বল্লভ, মাধব, রামানুজ প্রমুখ আচার্যগণের দার্শনিক অবদান সম্পর্কেও উল্লেখ করে গেছেন। হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে কোলব্রুকের রচনা

---

৪৩. ঐ, ৪৪-৪৭.

৪৪. ঐ, ৪৭.

৪৫. Kejariwal *Asiatic Society of Bengal*, 91.

৪৬. H. T. Colebrooke, "On the Religious Ceremonies of the Hindus, and of the Brahminas especially", Essay II, *Asiatic Researches*, Vol. VII, 279.

প্রণিধানযোগ্য। তিনি *যজুর্বেদ, সামবেদ* এবং কালিদাসের *রঘুবংশকাব্য* অনুসরণে হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে তথ্যনির্ভর রচনা উপহার দেন। এ কথা সর্বজনবিদিত যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাত্ত ছিল মূলত সংস্কৃত ভাষায়। এদেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও লিপির নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ব্যবহার করে কোলব্রুক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও অতুলনীয় অবদান রেখেছেন।

কোলব্রুকের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও প্রাচীন বিজ্ঞান নতুন চিন্তা-চেতনার আঙ্গিকে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়। এই মহান সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ১৮১৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত থেকে কোলব্রুক সংস্কৃত চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

গ. *উইলসন*

কোলব্রুকের পর ইউরোপীয়দের মধ্যে সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহী ব্যক্তি হিসেবে প্রথমেই হোরাস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ডাক্তারের চাকুরি নিয়ে ভারতে আসেন। এদেশে আসার পর প্রাচ্যবিদ্যা, বিশেষ করে সংস্কৃতচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। উইলসন ১৮১৩ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কালিদাসের *মেঘদূত*। এই অনূদিত গ্রন্থটি বিশ্বের সুপরিচিত কালিদাসের কাব্য বলে তাৎক্ষণিকভাবে বেশ সাড়া জাগায়। এই অনুবাদ সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বলা হয়, "one of the most perfect translations that adorns the literature of the nation."[৪৭]

মেঘদূত অনুবাদের পর উইলসনের সংস্কৃতচর্চার প্রশংসনীয় প্রকল্প হলো *Sanskrit English Dictionary* রচনা। তাঁর অপর মহান কীর্তি হিসেবে *রাজতরঙ্গিনী* আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান গ্রন্থ *রাজতরঙ্গিনী* সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন :

> The fact remains that except Kalhana's Rajatarangini···there is no other historical text in the whole range of Sanskrit literature which makes even a near approach to it, or may be regarded as history in the proper sense of the term.[৪৮]

উইলসন *রাজতরঙ্গিনীর* ছয়টি সর্গের সমালোচনামূলক সারাংশ রচনাসহ এই গ্রন্থভিত্তিক ভারতীয় বিভিন্ন শাসকের কালানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করেন। *রাজতরঙ্গিনী*

---

৪৭. "Review of the Megha Dutt or cloud Messenger," *Asiatic Journal*, 1 (1816), 257.
৪৮. R. C. Majumdar, 'Ideas of History in Sanskrit Literature' in Philips (ed.), *Historians of India*, 25.

যেমন ভারতের অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরেছে, তেমনি উইলসনের প্রবন্ধ 'The Religious Sects of the Hindus' তদানীন্তন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় উপহার দিয়েছে। এছাড়া উইলসন *কূর্মপুরাণ* ও *অগ্নিপুরাণ* অবলম্বনে এদেশীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহেরও চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দুধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নের সূচনা করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে উইলসন ভারতীয় আর্যজাতির প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ *ঋগ্বেদের* সর্বপ্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন।

এই সময় পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যভাষাচর্চার প্রতিও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কর্নেল বোডেন (Colonel Boden) নামের জনৈক ইংরেজের অর্থানুকূল্যে বোডেন চেয়ার নামে একটি সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতে অভিজ্ঞ উইলসন সাহেবই প্রথম উক্ত অধ্যাপক পদে মনোনীত হন।[৪৯] তিনি ১৮৩২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি পদ ত্যাগ করে বোডেন চেয়ারে যোগদানের জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে প্রায় ৩০ বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত থেকে অনেক পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করে পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃতচর্চার পথ সুগম করে যান।

ঘ. *প্রিন্সেপ*

উইলসন *এশিয়াটিক সোসাইটির* সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে লন্ডনে চলে যাওয়ায় সোসাইটির সদস্যগণ জেমস্ প্রিন্সেপকে উক্ত পদের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা টাঁকশালের প্রধান নিরীক্ষক (Assay Master)। এই সময় উইলসন প্রিন্সেপকে প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে প্রিন্সেপ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮২৯ সনে কোম্পানির বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মকর্তা জে. ডি. হার্বার্ট (J. D. Herbert) *Gleanings in Science* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের তৎকালীন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের অবহিত করা এবং এদেশের উল্লেখযোগ্য অনুরূপ বিষয়সমূহ পাশ্চাত্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। হার্বার্ট কার্যান্তরে চলে যাওয়ায় প্রিন্সেপ ঐ পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং ১৮৩২ সালে সোসাইটির অনুমতিক্রমে *The Journal of the Asiatic Society* নাম দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেন।

স্থাপত্যবিদ্যা, রসায়ন ও পরিসংখ্যান বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত প্রিন্সেপের জ্ঞান-সাধনা এদেশের ইতিহাসচর্চার দিকে মোড় নেয়। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি পদে জেমস্ প্রিন্সেপের অবস্থানসময়ে (১৮৩২-১৮৩৫) এদেশ মহান আবিষ্কারে ভাস্বর হয়ে

---

৪৯. বামনদাস বসু, " পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা", *প্রবাসী* ,১২শ সংখ্যা, ৪০৯।

উঠে। এই সময় পুরাতত্ত্ব চর্চার (Indological Studies) ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরাতত্ত্বের স্থান পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ, মুদ্রা সংগ্রহ এবং তাতে উৎকীর্ণ লেখার পাঠোদ্ধার প্রভৃতি কাজের প্রতি প্রিন্সেপ আগ্রহী হন। ফলে পূর্ববর্তী গবেষক উইলিয়াম জোনস্, কোলব্রুক বা উইলসন যেখানে ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কক্ষে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি পাঠে ব্যস্ত থাকতেন, সেখানে জেমস প্রিন্সেপ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন।[৫০]

জেমস প্রিন্সেপ নিজে যেমন ছিলেন প্রতিভাশালী, তেমনি ছিলেন অন্যকে গবেষণা কাজে উৎসাহিত করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী।

তাঁর সমসাময়িক যেসব পাশ্চাত্য পণ্ডিত এদেশের ইতিহাসচর্চার উপাদানস্বরূপ প্রাচীন মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন আলেকজান্ডার বার্নেস (Alexander Burnes) তাদের অন্যতম। তাঁর সংগৃহীত মুদ্রাসমূহের ভিতর থেকে একটি বিশেষ মুদ্রার ভিত্তিতে রাজা কনিষ্কের পরিচয় তুলে ধরা হয়। টি. এস. বার্ট (T. S. Burt)-এর সহযোগিতায় প্রিন্সেপ ১৮৩৪ সালে এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখার পাঠোদ্ধার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের সঠিক পরিচয় উদ্ধারের প্রয়াস গ্রহণ করেন।[৫১] প্রসঙ্গত ডব্লিউ. এইচ. মিল (W. H. Mill)-এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরি নিয়ে এদেশে আসেন এবং দীর্ঘকাল হাওড়ার শিবপুর বিশপ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই দেশে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি পাঠের জটিলতা নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হন। তৎকালীন সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মিল গুপ্ত রাজবংশের একটি বংশতালিকা তৈরি করেন।[৫২]

প্রাচীন ভারততত্ত্ব উদ্ধারের অভিযানে জেমস প্রিন্সেপের সঙ্গে জে. স্টিভেনসন (J. Steveson)- এর নামও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তাঁর অনুসন্ধানপদ্ধতি অনুসৃত হলে অশোক শিলালিপির পাঠোদ্ধারকার্য আরো আগেই সম্পন্ন হতে পারতো বলে ধারণা করা হয়। ত্রিহুত লিপি ও সারনাথের খননকাজে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রস্তরলিপির পাঠোদ্ধার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কানিংহাম, প্রিন্সেপ, উইলসন, মিল প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ ভারতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।[৫৩]

১৮৩৫ সালে সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত "On the Connection of various ancient Hindu coins with the Grecian or Indo-Scythic series" এবং "Notices of Ancient Hindu Coins" নামের প্রিন্সেপের প্রবন্ধ দুটিতে প্রথমবারের মতো অনেক নতুন রাজা ও রাজবংশ

---

৫০. ঐ, Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 224.

৫১. ঐ, 169.

৫২. W. H. Mill, "Supplement to the Historical Remarks on the Allahabad Inscription", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, III· 2, 344.

৫৩. Kejariwal, *Asiatic Society of Bengal*, 185-87.

সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়, যা পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ভিন্ন ভিন্ন রাজার মুদ্রা অবলম্বনে প্রিন্সেপ ভারতে মুসলিম রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার উপাদান দিয়ে গেছেন। এছাড়া প্রিন্সেপের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে তাঁর মতে বাংলাদেশে পালবংশের উদ্ভব হলেও পালরাজগণ এক সময়ে সারা ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে কনৌজে তাদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।[৫৪]

জেমস প্রিন্সেপের সময়ে হগসন (Hodgson) এদেশে এসে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেন। তিনি ১৮২৪ সাল থেকে কয়েক বছরের মধ্যে নেপাল হতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধদের ৯৪টি পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটিকে উপহার দেন। হগসন শুধু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই করেন নি, নেপালী পণ্ডিতদের সহায়তায় মূল পাণ্ডুলিপির নিরীক্ষা ও পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। হগসনের আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়। তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে Eugene Burnouf বলেন : "(Hodgson was) the founder of the true study of Buddhism on the basis of the texts and original remains."[৫৫]

জেমস প্রিন্সেপ *এশিয়াটিক সোসাইটিতে* থাকা অবস্থায় এদেশের প্রাচীন মুদ্রা, লিপি, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ইত্যাদির সহায়তায় এদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের দ্বার উন্মোচন করে যান। প্রিন্সেপ পাঁচ বছর সোসাইটির সেক্রেটারি হিসেবে যে প্রকাশনা, মুদ্রা, লিপি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ করে গেছেন তাতে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল সমৃদ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় ১৮৩৮ সালে জেমস প্রিন্সেপ সোসাইটির সেক্রেটারি পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং চিকিৎসার জন্যে ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হয় এবং এক বৎসর রোগভোগের পর ১৮৪০ সালের ২২ এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য মনীষীদের অবদানসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উইলিয়াম জোনস ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষত সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাঁরা এদেশে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কোলব্রুক, ডেভিস, বুরু ও অন্যান্য। প্রাচীন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক মূল গ্রন্থাবলী নিয়ে উইলসন, প্যাটারসন, হগসন প্রমুখ ব্যক্তি গবেষণামূলক কাজ করে গেছেন। অপর দিকে প্রিন্সেপ, মিল,

---

৫৪. ঐ, 189.

৫৫. ঐ, 195.

কানিংহাম, বার্ট এবং আরো অনেক মনীষী প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, প্রত্নতত্ত্ব ও পদক সংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে এদেশের অতীত ঐতিহ্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের তালিকায় জার্মান দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার-এর নামটিও সংযোজনযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম *ঋগ্বেদ* সম্পাদনা করেন, তাঁর রচিত পুস্তকসমূহের সহায়তায় প্রাচ্যদেশের ভাষা ও জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

উইলসন-এর মৃত্যুর পর মনিয়ার উইলিয়ামস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বোডেন চেয়ারে স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি *Sanskrit English Dictionary, Indian Wisdom, Religious Life and Thought in Modern India* প্রভৃতি পুস্তক রচনা করে এদেশের সম্পদ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের লেখনীর মাধ্যমে সংস্কৃত যে সাড়া জাগিয়েছিল, সে সর্ম্পকে ম্যাকডোনেল তাঁর *History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"Since the Renaissance there has been no event of such worldwide significance in the history of culture as the discovery of Sanskrit literature in the later part of the eighteenth century."[৫৬]

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কার পাশ্চাত্য দেশে বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা এক সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ গবেষণা পরিচালনা কেন্দ্র হিসেবে পাশ্চাত্য দেশেও অনেক সোসাইটি গড়ে উঠেছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর পরই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যকারিতার মাধ্যমে সংস্কৃতচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত তরুণ সিভিলয়ানদের কর্মদক্ষতা ও নৈতিক গুণাবলী বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, এদেশবাসীর বিতর্কিত বিষয়সমূহ এদেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আর এজন্য এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সম্বন্ধে শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন।[৫৭]

---

৫৬. A. A. Macdonnell, *History of Sanskrit Literature*, (London 1917), 1.

৫৭. David Kopf, *British Orientalism*, 47.

কেরি (Dr. Carey), কোলব্রুক প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ছাড়াও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, গোলোকনাথ শর্মা, মুনশি নজুরুল্লা, আবদুর রহিম ও অন্যান্য প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ কলেজের শিক্ষাদান কার্যক্রমে নিযুক্ত ছিলেন।[৫৮] আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ভাষাসহ এদেশীয় প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দু-মুসলমান আইন, নীতিশাস্ত্র, গভর্নর জেনারেল পরিষদের আইনসমূহ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, গ্রিক, ল্যাটিন, ক্লাসিক্যাল ইংরেজি সাহিত্য, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জীব এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাস এই কলেজের পাঠ্য বিষয় রূপে গৃহীত হয়।[৫৯]

সে সময় দেশীয় ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকায় এই কলেজে নিযুক্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষকগণ প্রাচ্য ভাষায় (বাংলায়) পুস্তক রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে সংস্কৃতচর্চায় এই কলেজের অবদানও নগণ্য নয়। কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়, সেগুলো শ্রেণী বিন্যস্ত করে দেখা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে[৬০] সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ১৮০৫ থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে যে কয়খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

A Grammar of the Sanskrit Language, (Colebrooke 1805); An *Essay on the Principles of the Sanskrit Language* (H.P. Forster);*The Grammatical Sutras or Aphorisms etc.* of Panini with Selections from Various Commentators (Nagree Character, 1809).

মুগ্ধবোধ (১৮০৭) এবং *সিদ্ধান্তকৌমুদী* (দেবনাগরী অক্ষরে, ১৮১২) ব্যাকরণের পরেই সংস্কৃত অভিধানের কথা এসে পড়ে। এই সময় প্রকাশিত হয় *হেমচন্দ্র কোষ* (১৮০৭), *অমর কোষ* (১৮০৭, দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত), *অমর কোষ* (১৮০৮ কোলব্রুক) এবং এইচ. এইচ. উইলসন-এর *Sanskrit and English Dictionary* (১৮১৫)।

এদেশে প্রচলিত আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে *মিতাক্ষরা* (১৮১২), *মনুসংহিতা*, *দায়ভাগ* (১৮১৩), *বীরমিত্রোদয়* (১৮১৫), *দত্তকচন্দ্রিকা* (১৮১৭), *দায়ক্রমসংগ্রহ* (১৮১৮) প্রভৃতি স্মৃতি ও সংহিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নীরস ব্যাকরণ ও আইনের কাঠিন্যের মধ্যে শিক্ষার্থীদের যাতে সর্বক্ষণ বিচরণ করতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে সরস সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে *নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক* (১৮০৬), কেরি ও মার্শাল সম্পাদিত ইংরেজি অনুবাদ টীকাসহ মূল সংস্কৃত *রামায়ণ* (১৮০৬-১৮১০), *গীতগোবিন্দ* (দেবনাগরী অক্ষরে ১৮০৮), উইলসন

---

৫৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* পঞ্চম খণ্ড, (কলকাতা ১৯৮৫), ৬৪২।
৫৯. ঐ, ৬০৩।
৬০. David Kopf, *British Orientalism* 47.

সম্পাদিত ও ইংরেজি অনূদিত *মেঘদূত* (১৮১৩), *মাঘকাব্য* এবং *কিরাতার্জুনীয়ম* (১৮১৫), কোলব্রুক সম্পাদিত *হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত* (১৮০৬), *নলোদয়* (১৮১৪) ইত্যাদি কাব্য ও গল্পকাহিনীমূলক গ্রন্থ নির্বাচন করে অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে এই কলেজ সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে সময়োপযোগী অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, *ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের* প্রতিষ্ঠাতা *লর্ড ওয়েলেসলি* লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরদের বিনা অনুমতিতে কলেজ স্থাপন করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। কলেজটি তুলে দেবার নির্দেশ আসে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তখন লর্ড ওয়েলেসলি ১৪১টি অনুচ্ছেদে কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন এবং সেই ডেসপ্যাচ ডিরেক্টরদের সভায় পাঠিয়ে দেন। ওয়েলেসলির অকাট্য যুক্তিপূর্ণ পত্রের ফলে ১৮০৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর তাঁকে জানানো হয়, কলেজ আপাতত চলতে থাকবে। অপর দিকে এই কলেজ বন্ধ করে দেবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র ছিল সক্রিয়। এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন চার্লস গ্র্যান্ট। ভারতে কিভাবে ইংরেজি শিক্ষা ও খৃস্টান ধর্ম প্রচার করা যায় এজন্য তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনার সীমা ছিল না। ইংল্যান্ডের ডিরেক্টরগণ গ্র্যান্টের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং কোম্পানির নব নিযুক্ত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৮০৬ সালে হার্ট ফোর্ডে হেলিবেরি কলেজ (Haileybury College) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬১] সেখানে প্রাচ্য ভাষাসহ অন্যান্য সকল বিষয় পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ওখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রাচ্য ভাষার দুর্বলতা লক্ষ্য করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকেই উক্ত ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই কলেজের ব্যয়ভার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে হোল্ড ম্যাকেঞ্জি (Hold Mackenzie) ১৮২৫ সালে প্রস্তাব করেন যে, শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ব্যয়বহুল প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার চেয়ে ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে স্বল্প বেতনে কোম্পানির কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে।[৬২]

১৮২৮ সালে গভর্নরের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এসে জেনারেল *উইলিয়াম বেন্টিঙ্কও* ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতি বৈরী ভাব পোষণ করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি কলেজের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত অধ্যাপক সহ পণ্ডিত ও মুনশিদের প্রায় সকলকেই চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেন। অবশ্য কিছু শিক্ষকের পেনশন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে কলেজের একজন সচিব, দুজন পরীক্ষক এবং কয়েক জন মুনশি ছাত্রদের ভাষা শেখানোর কাজে নিযুক্ত থাকলেন।

এই নতুন নিয়মে কলেজে ক্লাশ নেয়া ও লেকচার দেয়ার সুযোগ রইল না। কলেজটি মৃতকল্প অবস্থায় আরো কিছু দিন টিকে ছিল। অবশেষে ১৮৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তদানীন্তন বড় লাট ডালহৌসি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটির বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।[৬৩]

৬১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, [পঞ্চম খণ্ড], (কলকাতা ১৯৮৫), ৬২৬

৬২. প্রাগুক্ত, ৬৩৭-৩৮।

৬৩. David Kopf, *British Orientalism*, 235.

১৮১৩ সালের চার্টার আইনে দেশে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সরকার শিক্ষানীতি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল, কেননা সরকারের নীতি নির্ধারকদের এক দল এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। অপর দল ছিল প্রাচ্যশিক্ষা বলবৎ রাখার পক্ষে। এই দলের পক্ষে ছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস। তাঁরই নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)।

এখানে উল্লেখ্য যে, এদেশের জনগণ কোন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতে বেশি উপকৃত হবেন এ নিয়ে তদানীন্তন বাংলার বিদ্বজ্জনের মধ্যেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। রাজা *রামমোহন রায়* (১৭৭২-১৮৩৩) ছিলেন এদেশী প্রগতিপন্থীদের অন্যতম। তিনি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানি পত্র লেখেন। সেই বিখ্যাত পত্রটির সারকথা হলো, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠান দ্বারা এদেশের ছাত্ররা নতুন কিছুই শিখবে না, বরং সুপ্রাচীন কাল থেকে যে ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা ও বেদবেদান্তের পঠন-পাঠন প্রচলিত আছে, সেটা নিয়েই প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। এদেশবাসীর সত্যিকার উন্নতির জন্য সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয় পড়াবার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের গড়ে তোলা উচিত। আর এজন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন ধীমান অধ্যাপক নিযুক্ত করতে পারলে এদেশবাসী শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে উপকৃত হবে।[৬৪]

রামমোহন রায় যখন এদেশীয় প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ঠিক তখনই অপরদিকে সংস্কৃতচর্চাকে সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ করার প্রচেষ্টায় রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি সংস্কৃত চর্চার প্রসারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করেন।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় রাজা রাধাকান্ত দেব বিশাল সংস্কৃত অভিধান *শব্দকল্পদ্রুম* সঙ্কলন করেন। তাঁর সঙ্কলিত এই অভিধানের সাহায্যেই উইলসন, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এদেশের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৫৭ সালে কলকাতার শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের বৃত্তি এবং কলেজের অধ্যাপকদের আকর্ষণীয় বেতনসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা করেন।

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ প্রগতিপন্থীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায়

---

৬৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*, (কলকাতা ১৯৭২), ১০২

ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত এই ছয় বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়।[৬৫] তবে এসব বিষয় ছাড়াও সময় সময় নতুন বিষয়ের সংযোগে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা বর্ধিত হয়েছে। যেমন ১৮২৬ সালে বৈদ্যক শ্রেণী ও জ্যোতিষ শিক্ষা; ১৮২৭ সালে ইংরেজি এবং ১৮৩৯ সালে বাংলা শ্রেণী খোলা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে (২২ জানুয়ারি ১৮৫১) প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানগণই এখানে পড়াশোনার সুযোগ পেতো। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দেশে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি থেকে কায়স্থ সন্তানগণ এবং ১৮৫৪ সাল থেকে সব ভদ্র হিন্দুদের সন্তানগণও সংস্কৃত কলেজে পড়বার সুযোগ লাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তিনি চারটি শিক্ষা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন।[৬৬]

প্রথম পরিকল্পনায় (১৮৪৬) তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ্যবিষয় এবং পাঠদানপ্রণালী ও সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে যে ইংরেজি পড়ানো হতো তার পাঠ্য বিষয় এবং পাঠদান প্রণালীর আমূল সংস্কার করারও প্রস্তাব রাখেন।

১৮৫০ সালে শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক মোয়েট সাহেবের নিকট বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, ইংরেজি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য বিষয় এবং পাঠদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে ইংরেজি চর্চা ঐচ্ছিক না রেখে আবশ্যিক করার প্রস্তাব রাখেন। এ রিপোর্টের উপসংহারে বিদ্যাসাগর বলেন যে, প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো বাস্তবায়িত হলে সংস্কৃত কলেজ অবশ্যই সংস্কৃতচর্চার যথার্থ কেন্দ্র হয়ে উঠবে আর উন্নত বাংলা সাহিত্যের উৎসভূমি হবে এই কলেজ এবং এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণই পরবর্তীকালে শিক্ষকরূপে জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় (বাংলায়) জ্ঞান ও সাহিত্যরস বিতরণে সমর্থ হবে।

১৮৫২ সালে প্রণীত তৃতীয় পরিকল্পনায় তিনি বলেন, উন্নত বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করাই বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্য সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করা আবশ্যক। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি ভালভাবে শিখলে তারাই সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার জ্ঞান নিয়ে উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

---

৬৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সেকালের সংস্কৃত কলেজ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* (চতুর্থ সংখ্যা), (কলকাতা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), ২৪৩।

৬৬. সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা ঃ বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্তা,* (কলকাতা ১৯৮৫), ৫২-৫৪।

১৮৫৩ সালে প্রণীত বিদ্যাসাগরের চতুর্থ পরিকল্পনায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন প্রথম উল্লেখ করা হয়। আর এজন্য বাংলা স্কুল স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম শিক্ষক তৈরি করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে এ ধরনের এক শ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলা দরকার এবং সেজন্য সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে তিনি তাঁর সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগরের চারটি পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বাঙালিকে সংস্কৃত ও ইংরেজি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমান অনুশীলনে আগ্রহী হতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা নিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ যাতে তিন-চার বছরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেজন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করে অনেক পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে সংস্কৃতচর্চার পথ সুগম করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর ই. বি. কাউয়েল (E. B. Cowell) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজকে স্কুল ও কলেজ এই দুভাগে বিভক্ত করেন। স্কুলের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন করেন।এখানে লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন ধারার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতচর্চার সূচনা হয় এবং এটাই ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ই. বি. কাউয়েলের পর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং তারপর ১৮৭৭ সালের ২০ মার্চ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সংস্কৃত চর্চার যথেষ্ট প্রসার ও উন্নতি সাধিত হয়। সংস্কৃত চর্চাকে আকর্ষণীয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে মহেশচন্দ্র সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা প্রবর্তন করেন[৬৭] এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত টোল ও চতুষ্পাঠীসমূহ সংস্কারে ব্রতী হন। তদানীন্তন ডি.পি. আই. ক্রফট্‌কে তিনি উপাধি পরীক্ষা পাঠক্রম তৈরি করে পাঠান এবং সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি ও বেদ এই চারটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৭৯ সালের ১৪ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজে প্রথম সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি যুবকদের সংস্কৃতচর্চায় আগ্রহ লক্ষ্য করে ১৮৮১ সালে মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজে উপাধি শ্রেণী খোলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা সংস্কৃত কলেজে উপাধি পরীক্ষা গ্রহণের (১৮৭৯) এক বৎসর আগেই অর্থাৎ ১৮৭৮ সাল থেকে ঢাকা সারস্বত-সমাজ সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণ করে উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল।[৬৮] এসময় বাংলাদেশে

---

৬৭. 'Oriental Studies', *Calcutta University Commission Report*, Vol. II, 1919, 90.

৬৮. সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা*, ১৭৯।

আরো কতগুলো সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা সারস্বত-সমাজের অনুকরণে পরীক্ষা গ্রহণ করে উপাধি দিতে থাকে। সংস্কৃতচর্চায় এরূপ বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য ১৮৮৪ সালে পুরাতন উপাধি (তর্কভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, বেদান্তবাগীশ ইত্যাদি) বর্জন করে তার পরিবর্তে তীর্থ উপাধি দানের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু উপাধির ক্ষেত্রেই নয়, কেন্দ্রীয়ভাবে সংস্কৃত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে সভাপতি করে একটি সংস্থাও গঠন করা হয়। পরে ১৯০৮ সলে বোর্ড অফ স্যাংসক্রিট একজামিনেশন (Board of Sanskrit Examination) গঠিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ পরীক্ষকরূপে তালিকাভুক্ত হন।[৬৯]

অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার টোল ও চতুষ্পাঠীসমূহ পরিদর্শন করে ডি,পি,আই ক্রফট্ সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠান তার ভিত্তিতে টোলের পণ্ডিত ও ছাত্রদের সন্তোষজনক পারিতোষিক প্রদানের প্রথা প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার টোল ও চতুষ্পাঠীসমূহ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ পায়।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল সংস্কৃত কলেজকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বিভক্ত করে স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজিসহ বাস্তব প্রয়োজনীয় অবস্থার উপযোগী বিষয়সমূহ স্কুলপাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই পদ্ধতির শিক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করে। অপরদিকে টোল ও চতুষ্পাঠী ভিত্তিক শিক্ষা ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। শাসক ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয় বলে বাংলাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সংস্কৃত শিক্ষার সনাতন ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে আধুনিক শিক্ষার সাথে সংস্কৃতচর্চা অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসেবে সংযুক্তি লাভ করে সাধারণ শিক্ষাঙ্গনে গৌণভাবে টিকে থাকে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের অবদান

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ছাত্রদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতচর্চার জন্য বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করে গেছেন। এখানে কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকের অবদান স্মর্তব্য।

১. জয় গোপাল তর্কালঙ্কার[৭০] (১৭৭২-১৮৪৫) যশোর জেলার অন্তর্গত বজরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকাল থেকে শুরু করে ২২ বছর পর্যন্ত এই কলেজে তিনি কাব্য ও সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত *শ্রী বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোক* গ্রন্থখানিতে ১১৯টি শ্লোক এবং পয়ার ছন্দে বাংলা অনুবাদ রয়েছে। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ *শিক্ষাসার*-এ স্থান

৬৯. 'Oriental Studies', *Calcutta University Commission Report,* 92.

৭০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সেকালের সংস্কৃত কলেজ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* ১৯-২৪।

পেয়েছে 'গুরুদক্ষিণা', 'চানক্য শ্লোক' ও শুভঙ্করকৃত 'আর্যা'। ১৮৩৭ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত *মহাভারতের* তৃতীয় খণ্ডের অন্যতম পরিশোধকও ছিলেন এই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

২. তারানাথ তর্কবাচস্পতি[৭১] (১৮১১-১৮৮৫) কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত ২৮ বছর ধরে ব্যাকরণের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি *বৈয়াকরণভূষণসার, র্ব্যামঞ্জুরী, সিদ্ধান্তকৌমুদী, ধাতুরূপআদর্শ* প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ টীকাসহ সম্পাদনা করেন। এছাড়া *কিরাতার্জনীয়, শিশুপালবধ,* কুমারসম্ভব ইত্যাদি কাব্যসহ *মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, মালবিকাগ্নিমিত্র* সংস্কৃত নাটকগুলোর তিনি সমালোচনামূলক সম্পাদনা করে গেছেন। তাঁর নিজস্ব টীকা ও ব্যাখ্যাসমেত *হিতোপদেশ, দশকুমারচরিত* এবং *কাদম্বরী* গদ্য সাহিত্য প্রকাশিত হয়।

৩. মদনমোহন তর্কালঙ্কার[৭২] (১৮১৭-১৮৫৮) নদীয়ার বিল্বগ্রাম নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের একজন অধ্যাপক ছিলেন। *বাসবদত্তা, খণ্ডনাখণ্ডখাদ্যম, কবিকল্পদ্রুম. আত্মতত্ত্ববিবেক, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী, মেঘদূত* প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ সম্পাদনা করে গেছেন তিনি।

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে সমাজ সংস্কারসহ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখে গেছেন। সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭৩] বেথুন সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পরবর্তীকালে প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের একটি প্রাথমিক পরিচয় দেয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। এছাড়া সংস্কৃতচর্চার সৌকর্য আনয়নের জন্য তিনি অনেক নাটক, ব্যাকরণ ও দর্শনের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত *ব্যাকরণকৌমুদীর* চারটি ভাগই ছাত্র সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। *রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত* প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থসহ *অভিজ্ঞানশকুন্তলম, উত্তরচরিত, হর্ষচরিত, সর্বদর্শনসংগ্রহ* ইত্যাদি নাটক ও গদ্য সাহিত্য সম্পাদনা করে তিনি সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন।

---

৭১. ঐ, ১৫৪-৫৭।

৭২. ঐ, ১৬৫-৬৭।

৭৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, (কলকাতা ১৯৬৫), ৩৪২।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃতচর্চার পরিমণ্ডলে লালিত হয়েও আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী। এরই ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় তাঁর শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে। তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য গ্রন্থ রচনা ও সঙ্কলন করে সংস্কৃতচর্চার আধুনিক যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করেন। *সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা* গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন :

> প্রথমেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই একবারে রঘুবংশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করা কোনক্রমেই শ্রেয়স্‌কর বোধ না হওয়াতে 'শিক্ষা সমাজের' সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ছাত্রেরা প্রথম অতিসরল বাঙ্গালা ভাষায় সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অতিসহজ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেক : তৎপরে সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে সিদ্ধান্তকৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক। তদ্‌ অনুসারে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সংকলন ও দুই, তিনখানি সহজ সংস্কৃত পুস্তক প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে প্রথম পাঠার্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নামে এই পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল।[৭৪]

বিদ্যাসাগর রচিত তিন খণ্ড *ঋজুপাঠ* সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার* ও *রামায়ণ-মহাভারত* থেকে নির্বাচিত অংশবিশেষ নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের স্থূলতা, ভাঁড়ামি, আদিরসাত্মক এবং অশ্লীল ধরনের আখ্যান পছন্দ করেন নি। তিনি তাঁর "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব"-এ *হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকদেরকে রুচিহীনতার জন্য সমালোচনা করেছেন।

৫. প্রমথনাথ তর্কভূষণ[৭৫] (১৮৬৫-১৯৪৪) ২৪-পরগনা জেলার ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তারাচরণ তর্করত্ন কাশীতে অধ্যাপকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৮ সালে প্রমথনাথ কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। পরে তিনি বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। তর্কভূষণ মহোদয় যেসব সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা ও অনুবাদ করেছেন সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *বিজয়প্রকাশ, রাসরসোদয়, বিশুদ্ধানন্দ চরিত, কোকিলদূত* ও *পূর্বমীমাংসার্থ সংগৃহীত টীকা*।

৬. যোগধ্যান মিশ্র[৭৬] সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই কলেজে ২৩ বছর অধ্যাপনার কাজে বহাল ছিলেন. সে সময় এই কলেজে যেসব ছাত্র

---

৭৪. *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), দেব কুমার বসু (সম্পাদিত), (কলকাতা ১৯৬৬), ৩০২।

৭৫. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ", *সাহিত্য সাধক চরিতমালা,* ১১শ খণ্ড, (কলকাতা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ), ২৫-২৮।

৭৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সেকালের সংস্কৃত কলেজ", *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* (প্রথমভাগ), ২৪৬-৪৭।

সাহিত্য ও অলঙ্কার নিয়ে অধ্যয়ন করতো তাদের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ভাস্কর আচার্যের *লীলাবতী ও বীজগণিত* ছিল পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

যোগধ্যান মিশ্র ১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদানের আগে দু'বছর উইলসন সাহেবের অধীনে গ্রন্থানুবাদকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কলকাতা বড় বাজারে সারসুধানিধি নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এখান থেকে তিনি হরচন্দ্র ও উইলস্টন সাহেবের সহযোগিতায় ১৮৪০ সালে *ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা* নামের গ্রন্থটি দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেন। যোগধ্যান মিশ্র ১৮৪৯ সালে কাশীতে দেহত্যাগ করেন।

৭. মধুসূদন গুপ্ত[৭৭] সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর আগে ক্ষুদিরাম বিশারদ এই শ্রেণী খোলার সময় থেকে অধ্যাপনা করছিলেন। কিন্তু রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি তিন বছর অধ্যাপনা করার পর চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৮৩২ সালে বৈদ্যক শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়। তবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৩৫ সালে বৈদ্যক শ্রেণী বন্ধ হয়ে যায়। তখন অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত এনাটমী অর্থাৎ শারীরবিদ্যা প্রথম ভাগ ১২৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালে ২৪ নভেম্বর তারিখে *সমাচার চন্দ্রিকায়* তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশিত হয়।

বাংলার নবজাগরণ

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মীয় জীবনে এক নতুন মুক্তচিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে: এটাই বাংলার নবজাগরণ। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে এই মুক্তচিন্তার সূচনা হয়।[৭৮] তবে এর প্রেক্ষাপটটিও উপেক্ষণীয় নয়। বাদশাহী আমলের অবক্ষয়ের শুরু থেকেই এদেশের জনজীবনে ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি ও অবাঞ্ছিত নৈতিক অধঃপতনের ফলে জাতি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনি এক দুঃসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ শাসন। এই নতুন শাসকদের সংস্পর্শে এসে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে নতুন পরিবেশ, নতুন ভাবধারা ও নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে এদেশবাসী সজাগ হয়ে উঠে। এই নবজাগরণের ফলে অন্ধ অনুকরণের স্থলে আসে যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ প্রভৃতি মুক্তচিন্তার প্রবণতা, অন্ধ রক্ষণশীলতার পরিবর্তে নৈতিক উদারতা গ্রহণের মানসিকতা। শুরু হয় সমাজজীবন থেকে কুসংস্কার দূর করার আন্দোলন। এই আন্দোলনের ধারাটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। সংস্কারমুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; অপরদিকে প্রাচীন সংস্কার ও

---

৭৭. ঐ, ২৫০।

৭৮. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা,* (দ্বিতীয় পর্যায়), (কলকাতা ১৯৭৮), ২৫।

ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা চালান রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিগণ।

এই নবজাগরণের ভাবধারায় উজ্জীবিত মনীষিগণ প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষার সময়োপযোগী রূপদানে যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন তা এখানে বিবেচ্য। এই পর্যায়ে প্রগতিপন্থীদের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজির দাপটে সংস্কৃত ভাষা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সংস্কৃতচর্চায় কোন জাগতিক উন্নতি সম্ভব নয় বলে মনে করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংস্কৃত চর্চা ছেড়ে ইংরেজির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে ক্লাসিক্যাল ভাষা হিসেবে সংস্কৃত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকল্প পাঠ্যরূপে পাঠ্যক্রমে রাখার ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে অনেকে এই ভাষা অনুশীলন করেন। এই পর্যায়ে যারা এই ভাষায় অধ্যাপনা ও গবেষণায় শ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) বহু প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য বাংলায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর টীকা-টিপ্পনী এই ভাষা সম্পর্কে অনেককে উৎসাহিত করে। তাঁর অনূদিত প্রতিটি নাটকে সংযোজিত হয়েছে একটি ছোট ভূমিকা, আর সেখানে স্থান পেয়েছে নাট্যকারের মন্তব্য। সংস্কৃতের প্রাচীন নাট্যকার ভাসের নাটক-নাটিকাগুলোসহ কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*, *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *বিক্রমোর্বশীয়*; ভবভূতির *উত্তরচরিত*, *মালতীমাধব*, *মহাবীরচরিত*; শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী*, *নাগানন্দ*; বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস*, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*; আচার্যক্ষেমীশ্বরের *চণ্ডকৌশিক*; ভট্টনারায়ণের *বেণীসংহার*; কৃষ্ণমিশ্রের *প্রবোধ চন্দ্রোদয়*, রাজশেখরের *বিদ্ধশালভঞ্জিকা*, *কর্পূরমঞ্জরী* *শ্রীহর্ষের প্রিয়দর্শিকা* এবং কাঞ্চনাচার্যের *ধনঞ্জয়বিজয়* শীর্ষক সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাট্য অনুবাদকর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মূল নাট্য গ্রন্থাদির আদর্শ পুঁথি সংগ্রহ ও তার পাঠ নির্ণয়। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁর অনুবাদ নাটকগুলো হয়েছে যেমন উপভোগ্য, তাঁর গ্রন্থ ভূমিকাগুলো হয়েছে তেমনি আলোকদিশারী। আরো লক্ষণীয় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূলানুসারী নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ এবং শিল্পীর সহৃদয় জীবনভাবনা নাট্যকার হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্মের পারিবারিক ঐতিহ্যকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

নবীনচন্দ্র দাস (১৮৫৩-১৯১৪)[৭৯] চট্টগ্রামের একজন বরেণ্য সন্তান। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। তিনি সংস্কৃত ও বাংলা চর্চায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

৭৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর', *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, চতুর্থ খণ্ড, (কলকাতা মাঘ ১৩৭০), ৫-৯।

তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'কবিগুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কবি গুণাকরের অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কালিদাসের *রঘুবংশ,* মাঘের *শিশুপালবধ*, ভারবির *কিরাতার্জুনীয়* প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। এই গ্রন্থগুলোর কাব্যিক অনুবাদসহ কবির জীবনী গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশ করে কবিগুণাকর বাংলা কাব্যের মাধ্যমে সংস্কৃত কাব্যের রস পরিবেশনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)[৮০] দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ও ঐতিহ্যের অনেক পুঁথি-পুস্তক আবিষ্কার ও প্রকাশ করে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথিসমূহের মধ্যে যেগুলো এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে—*বৃহদ্ধর্মপুরাণ, বৃহদস্বয়ম্ভূ পুরাণ, চিত্ত -বিশুদ্ধি-প্রকরণ,* আনন্দভট্টকৃত *বল্লালচরিত*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, অশ্বঘোষকৃত *সৌন্দরানন্দ* এবং আর্যদেবকৃত *চতুঃশতক*।

উল্লিখিত সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ সালে তিনি রামচরিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এই পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়।

হরপ্রসাদরচিত পুস্তক (অনূদিত ও সম্পাদিত) *সচিত্র রামায়ণে* বাল্মীকির *রামায়ণের* সরল-সহজ অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বাল্মীকির সাহিত্যকর্মের প্রতি যেমন, কালিদাসরচিত গ্রন্থাবলীর প্রতিও হরপ্রসাদ ছিলেন তেমনি অনুরাগী। তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধের পরিচয় মেলে। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-কে অবলম্বন করে তিনি রচনা করেন *শকুন্তলার মা, দুষ্মন্তের ভাঁড় মাধব্য, দুর্বাসার শাপ, শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী*। কালিদাসের অপর দু'খানি নাটকও হরপ্রসাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। *বিক্রমোর্বশীকে* অনুসরণ করে তিনি রচনা করলেন *উর্বশীবিদায়,* আর *মালবিকাগ্নিমিত্রের* নাটকে বিদূষকের চরিত্র তুলে ধরে তিনি *অগ্নিমিত্রের ভাঁড়* উপহার দেন। এই তিনখানি নাটককে নিয়েই রচিত হয় *কালিদাসের মেয়ে দেখানো, এক এক রাজার তিন তিন রাণী।* আবার কালিদাসের কাব্যগুলির প্রতিও হরপ্রসাদের অনুরাগ কম ছিল না। 'মেঘদূত ব্যাখ্যা', 'কুমার সম্ভব-সাতনা সতের সর্গ', 'রঘুবংশের গাঁথুনি', 'রঘুতে নারায়ণ', 'রঘু আগে কি কুমার আগে', 'অজবিলাপ', 'রতি বিলাপ', 'রঘুকাব্য বড় কিসে'?, 'রঘুবংশে বাল্যলীলা', 'রামের ছেলেবেলা', 'রঘুবংশের প্রেম', 'রঘুবংশে প্রেম ও বিরহ' ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রণয়নেব মধ্য দিয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সাথে বাংলা ভাষাভাষী বিদ্বজ্জনের পরিচয় ঘটিয়েছেন।

---

৮০. প্রাগুক্ত, সপ্তম খণ্ড, ১-৭২।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ[৮১] (১৮৭০-১৯২০) ফরিদপুর জেলার খালকুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত, পালি এবং তৎকালীন সরকারের ব্যবস্থাধীনে তিব্বতী ভাষায় অত্যন্ত গৌরবের সাথে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি, বাংলা, তিব্বতী, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯০৬ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল সতীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহু প্রাচীন তথ্য উদঘাটন করতে সমর্থ হন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত সংস্কৃত পুস্তকসমূহের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। তিনি *ভবভূতি এবং তাঁর নাটক* ও শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী* এই দুটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলো। ন্যায় দর্শনের উপর রচিত *আত্মতত্ত্ব প্রকাশ*, গৌতমের ন্যায়সূত্রের ইংরেজি অনুবাদ এবং *History of Indian logic* নামের গ্রন্থ রচনা করে সতীশচন্দ্র ভারতীয় দর্শনচর্চার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জননন্দিত *History of Indian logic* গ্রন্থটিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ—এ তিনভাগে তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ইংরেজি, বাংলা, তিব্বতী ভাষায় রচিত তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। অনন্য প্রতিভার অধিকারী সতীশচন্দ্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (১৯২০) জ্ঞানসাধনা করে গেছেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ[৮২] (১৮৭৬-১৯৬১খৃ.) সাবেক ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রধান কোটালিপাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামে ১৮৭৬ সালে (১২৮৩ বঙ্গাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৩১২ বঙ্গাব্দে নিজ গ্রামে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে ১৩৩৬ সালে তিনি কলকাতায় গিয়ে মহাভারতের একটি টীকাসহ বাংলা অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশে প্রয়াসী হন। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে তিনি বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মহাভারতের মূল ও নীলকণ্ঠের টীকা, নিজস্ব টীকা ও বাংলা অনুবাদ দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত স্মৃতিগ্রন্থের নাম *স্মৃতিচিন্তামণি* (প্রথম প্রকাশ নকিপুর, খুলনা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। এছাড়া সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্য প্রসিদ্ধ কাব্য ও নাটকসমূহের টীকাসহ অনুবাদ সংস্করণও তিনি প্রকাশ করেন। সংস্কৃতচর্চায় অমূল্য অবদান রাখার জন্য তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

---

৮১. Satischandra Vidyabhusana, *A History of Indian Logic*, (University of Calcutta 1921), XVII-XXV

৮২. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ", *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, ১১শ খণ্ড, (কলকাতা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ), ৩৪-৩৫।

নানা শাস্ত্রের পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ[৮৩] (১৮৮৭-১৯৬০ খৃ.) ১৮৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহীর রানী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ এবং পরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনাজীবনে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে মধুসূদন সরস্বতী রচিত *অদ্বৈতসিদ্ধির* টীকাসহ অনুবাদ সংস্করণ (১৯৩৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাসতীর্থের *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদসহ এতে পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর ভারতীয় *দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়* নামের স্বল্প পরিসরের গ্রন্থটিও পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট আদৃত হয়েছে।

উপসংহার

আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি না করে সংক্ষেপে বলা যায়, জীবন-জীবিকার সহায়ক ইংরেজি শিক্ষা এবং মাতৃভাষা বাংলার ক্রমোন্নতির ফলশ্রুতিতে সংস্কৃতচর্চা এ দেশে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর পর্যায়ে চলে গেছে। তবে এর উপযোগিত্য২ া একবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলদেব ঠাকুর প্রমুখ প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক সংস্কৃত উপাদান গ্রহণ করে তাঁদের রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। অনুরূপভাবে যাঁরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধান করে চলেছেন, তাঁদের নিকটও সংস্কৃতচর্চা আবশ্যক হয়ে রয়েছে। তাই দেখা যায়, সংস্কৃতচর্চা আজ গণমুখিতা পরিহার করে সুধী গবেষকগণের সাহচর্য পেয়ে চলেছে।

---

৮৩. ঐ, ৩১-৩৪।

১৪

সঙ্গীত

করুণাময় গোস্বামী*

উনিশ ও বিশ শতকের সঙ্গীত-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল আঠারো শতকে। পদাবলী কীর্তনের প্রবর্তক নরোত্তম ঠাকুর (রাজশাহী) পরলোকগমন করেন ১৬৮৭ সালে। তখন মুগল সরকার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। সে যুগের প্রতিনিধিত্বশীল সঙ্গীতরচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে। কোম্পানি ততোদিনে এদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সময়কালে সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে এবং বলা যায় যে, উনিশ শতকের সঙ্গীতের ধারা উৎসারিত হয়েছে এই সময়কালেই। এই পরিবর্তনধারার বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) প্রতিষ্ঠা করেন শাক্তপদ সঙ্গীতের ধারা। এঁরা শক্তিদেবীর উপর রচনা করেন অসংখ্য গীতিকবিতা। আঠারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কলকাতা একটি আধুনিক শহরের রূপ পরিগ্রহ করে এবং ইতিমধ্যেই শহরকেন্দ্রিক ধনী লোকেরা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। কলকাতাকেন্দ্রিক এই নতুন সঙ্গীতচর্চার পরিবেশে এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক সঙ্গীতের প্রথম পুরুষ রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১)। রামনিধির প্রভাবে সমকালীন দুটি সঙ্গীতধারা, যথা শাক্তপদ ও বৈষ্ণব পদাবলী ক্রমশ সঙ্গীতের মূলধারা থেকে বিদায় নেয়। ১৮৩৯ সালে যখন রামনিধি গুপ্ত মারা যান তখন বাংলার সঙ্গীতজগৎ মধ্যযুগীয় প্রভাব কাটিয়ে আধুনিক যুগের উজ্জ্বল মানবিক পথসন্ধানে ব্রতী হয়েছে।

চর্যা নামের একটি প্রামাণ্য সর্বভারতীয় প্রবন্ধগীতির মাধ্যমে বাংলা গান তথা বাংলা কাব্যসাহিত্যের সূত্রপাত। তেরো শতকের বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব রচিত *সঙ্গীতরত্নাকর* গ্রন্থে চর্যার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, এই গীতিপ্রবন্ধের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

সর্বভারতীয় মান্যতা ছিল। এর বাণীর আধুনিক অর্থে গীতোচিত দৈর্ঘ্য এবং একটি প্রথাসম্মত গায়নকলা বাংলা গানকে সূচনাতেই এক প্রকার সংহতি দান করেছিল। বারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ*-এর পদমালা গঠিত হয়েছিল ধ্রুব শ্রেণীর প্রবন্ধসঙ্গীতের আদর্শে। এটিও ছিল প্রাচীন ও বিপুলভাবে মান্য প্রবন্ধসঙ্গীতের একটি রূপ। চর্যাগীতি ও *গীতগোবিন্দ* এ-দুয়ের মাধ্যমেই বাংলা গানের সর্বভারতীয় রাগ-সাঙ্গীতিক পটভূমি গঠিত হয়। কিন্তু পনেরো শতকের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* এসে বাংলা গানের রচনা ও গায়নকলায় আঞ্চলিক সঙ্গীতরীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* বাংলার আঞ্চলিক প্রবন্ধ, রাগ ও গায়নকলার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে এই আঞ্চলিক প্রাবন্ধিকতা ও সাঙ্গীতিকতা হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের সঙ্গে মিলেমিশে অভাবিত স্ফূর্তি লাভ করে। পদাবলীর কাব্যগুণঋদ্ধ বাণীর সঙ্গে এই প্রাণবন্ত সমন্বয়ধর্মী সঙ্গীতকলার মিশ্রণে বাংলার কাব্যসঙ্গীতের একটি অসামান্য পর্যায় গড়ে উঠে। একে ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালির মহাদানরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৯০ সালের পর বাংলা গানের পটভূমিতে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০)-এর আবির্ভাব। রাগসঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল বলেই মনে হয়। সঙ্গীতপ্রেমী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারের উচ্চ সাঙ্গীতিক পরিবেশ থেকে তিনি এই অধিকার অর্জন করে থাকবেন। ভারতচন্দ্র নানাভাবে বাংলা গানের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছিলেন। দৈব মহিমা প্রচারমূলক আখ্যানসঙ্গীত মঙ্গলকাব্যের ধারায় অবতীর্ণ হলেও তাঁর রচনায় ক্রমেই সেই দৈবিকতার আবরণ ফিকে হয়ে আসে এবং তা মানবিক সঙ্গীতে পরিণত হবার প্রয়াস পায়। আখ্যানগীতির কাঠামোয় থেকেও যেভাবে তিনি খণ্ডগীতি রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন তাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দরের* আদি রসোচ্ছ্বাস পরবর্তীকালে যাত্রা, ঢপযাত্রা, কবিগানসহ নানা ধরনের গানে অনুসৃত হয়। কীর্তনসঙ্গীতের পরিমণ্ডলের বাইরে রাগাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনায়ও তিনি পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করেন। শাক্তপদ রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টাও ভারতচন্দ্রের রচনাতেই দেখা যায়। এই বিবেচনায় ভারতচন্দ্র রায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রামনিধি গুপ্ত উভয়েরই পূর্বসূরি।

বৈষ্ণব .পদাবলীর প্রবল স্রোত তখন ক্ষীয়মাণ। রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) উদিত হচ্ছেন শাক্তপদের অশেষ সম্ভাবনাময় সম্ভার নিয়ে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়:

> পূর্ণিমা প্রভাতে যেমন ম্লানায়মান চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে উদয়োন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা ক্রমশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ বাঙলার সাহিত্যাকাশে বৈষ্ণবকবিতার পূর্ণ চন্দ্র অস্তাচলে হেলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত সাধনার সৌরকরজাল প্রখর হইয়া উঠিল। বাঙলা সাহিত্যে শক্তিকেন্দ্র ও প্রাণস্পন্দনের আধার স্থানান্তরিত হইল। এই পরিবর্তনের ক্রমস্ফুরিত ইঙ্গিত ও বিক্ষিপ্ত ধারাগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রামপ্রসাদের সাধনায় ও গানে।[১]

---

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*, (কলকাতা ১৩৬৯), ৩।

রামপ্রসাদ সেন প্রবর্তিত শাক্তসঙ্গীতের এই ধারা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১) থেকে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক বাঙালি সঙ্গীতকার অগণিত শাক্তপদ রচনা করে এই ধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর দুই দশকের মধ্যেই টপ্পার সম্ভার নিয়ে বিহারের ছাপরা থেকে কলকাতার সঙ্গীতের আসরে এসে অবতীর্ণ হন রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) যিনি নিধুবাবু নামে ইতিহাসখ্যাত হয়েছেন। বিষয় ও সঙ্গীতকলায় টপ্পা ছিল এক নতুন ধরনের গান। টপ্পা প্রচলনের মাধ্যমে নিধুবাবু বাংলা কাব্যসঙ্গীত তথা বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত ঘটালেন। শ্যাম বা শ্যামার মাহাত্ম্যবর্ণনা ছিল তখন পর্যন্ত বাংলা কাব্যসঙ্গীতের প্রধান বিষয়। কিন্তু নিধুবাবু মানুষের হৃদয়বেদনাকে তাঁর টপ্পার বিষয় করে তুললেন। নরনারীর প্রেমসম্পর্ককে তিনি বর্ণনা করলেন তাঁর গানে। কোন প্রকার দৈবিকতা বা আধ্যাত্মিকতা রইলো না সেখানে। নরনারীর প্রেম একান্তই মর্ত্যবাসী মানুষের প্রেমরূপে বিধৃত হলো টপ্পায়। বাংলা কাব্যগীতির প্রবাহে মানবকেন্দ্রী সঙ্গীতের সম্ভাবনাময় সূচনা ঘটলো। সেই থেকে অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ প্রান্ত থেকে বাংলা কাব্যগীতির ক্ষেত্রে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এক ধারার কেন্দ্রে রইলো দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনা, আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যান, জগতোত্তর তৃষ্ণার প্রকাশ ইত্যাদি ; আরেক ধারার কেন্দ্রে রইলো মানুষের প্রেম, মানবজীবন সম্পর্কিত ইহজাগতিক বিষয়াদি। এক ধারাকে যদি বলা যায় ঈশ্বরকেন্দ্রী সঙ্গীত, অপর ধারাটিকে বলা যায় মানবকেন্দ্রী সঙ্গীত। এই মানবকেন্দ্রী সঙ্গীতের মাধ্যম হলো টপ্পা। হিন্দুস্থানী টপ্পার প্রতিষ্ঠাতা গোলাম নবী ওরফে শোরীর টপ্পার প্রেরণায় নিধুবাবু এই নব সঙ্গীতধারার সূচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি বাংলা গান তথা বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে আধুনিক যুগেরও সূত্রপাত ঘটাতে সমর্থ হন। মানবতা উপাদানই এই আধুনিকতার মূলকথা। যে দুটি লক্ষণকে ধারণ করে বাংলা কাব্যগীতির আধুনিক যুগ সূচিত হয়েছিল তার একটি হচ্ছে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ সর্বজনীন হৃদয়াবেগের প্রতিষ্ঠা এবং অপরটি হচ্ছে রোমান্টিক চেতনার উদ্ভাসন। এ দুটি লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল নিধুবাবুর ক্ষুদ্রবন্ধ টপ্পা গানে। বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় তিনি প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন মানবহৃদয়সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রোমান্টিকতার আভাসও তাঁর গানেই প্রথম মূর্ত হয়ে উঠে। সমালোচকের এ মন্তব্য যথার্থ মনে হয় যে :

> তিনি শুধু টপ্পারই প্রতিষ্ঠাতা নন, বলতে গেলে আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের প্রথম প্রেরণাও তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। যদি মন্ময়তা এবং সৌন্দর্যব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত আবেগ ও ললিত প্রকাশরীতি রোমান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণ হয়, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিহারীলালের পূর্বে রামনিধি গুপ্তই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম লিরিকরচয়িতা, তাঁর মধ্যেই আধুনিক যুগের রোমান্টিক চেতনার একটি সার্থক বিকাশ ঘটেছিল।[২] নিধুবাবু বাংলা গীতিকবিতার ধারায়

---

২. রাজ্যেশ্বর মিত্র, *বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক*, (কলকাতা ১৯৭৩), ৭

এমন একটি পরমাশ্চর্য বিস্ময়রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বাঙলাদেশে এমন গীতিকারের সাক্ষাৎ মেলে না যাঁর উপর নিধুবাবুর প্রভাব পড়ে নি।[৩]

নিধুবাবুর অপর অবদান, তিনিই বাংলা কাব্যসঙ্গীতকে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের কেন্দ্রীয় স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। বাংলা গানের সূচনা ঘটেছিল প্রবন্ধগীতির পটভূমিতে এবং তার একটি সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত ছিল। কিন্তু পদাবলী কীর্তনের ব্যাপক অভ্যুদয়ে সেই যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে পড়ে। আঠারো শতকের শেষদিক পর্যন্ত বাংলা গানের যে বিকাশ তাতে রাগসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতটি খুব বড় হয়ে দেখা দেয় নি। অন্তত দিল্লী, লখনৌ, বারানসী প্রভৃতি কেন্দ্রে বিকাশপ্রাপ্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কেন্দ্রীয় রূপের পরিপ্রেক্ষিতটি বড় হয়ে দেখা দেয় নি। মূল কেন্দ্র থেকে বাংলার দূরত্ব, মূল ধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতার অভাব প্রভৃতিই রাগসঙ্গীতের কেন্দ্রীয় রূপের সঙ্গে বাংলা কাব্যগীতির সম্পর্কের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে আঠারো শতকের শেষদিক থেকেই বাংলায় রাগসঙ্গীতচর্চা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে এবং ক্রমে কলকাতাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেই সূচনাপর্বের সর্বাগ্রগণ্য রূপকার ছিলেন নিধুবাবু। তিনিই গোলাম নবীর টপ্পাধারার সঙ্গে বাংলা টপ্পার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করেন। কালী মির্জা নামে খ্যাত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ও (১৭৫০-১৮২০) টপ্পার ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ স্থাপনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) খেয়ালের আদর্শে বাংলা গান রচনা শুরু করেন। বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) বাংলায় ধ্রুপদ রচনার সূত্রপাত ঘটান এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ ঘরানার পত্তন হয়। এইভাবে আঠারো শতকের শেষ প্রান্ত থেকে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের অন্তত তিন উল্লেখযোগ্য ধারার সঙ্গে অর্থাৎ টপ্পা, খেয়াল ও ধ্রুপদের সঙ্গে বাংলা গানের সংযোগ স্থাপিত হয়।

প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। খাঁটি টপ্পা গান রচনায় যেমন বিপুল উৎসাহ দেখা দেয়, তেমনি আখড়াই থেকে কথকতা, পাঁচালী থেকে ঢপ কীর্তন পর্যন্ত বাংলা গানের নানা শাখায় টপ্পার সঙ্গীতশৈলী বিস্তার লাভ করে। পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭), কথকতায় সিদ্ধ শ্রীধর কথক (জন্ম ১৮১৬), যাত্রাপালা রচয়িতা ও অভিনেতা গোবিন্দ অধিকারী (১৮০০-১৮৭২), অন্যতম আদি বাঙালি যন্ত্রী আশুতোষ দেব (১৮০৩-১৮৫৬), সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-১৮৭৩), উনিশ শতকের প্রথমদিকে আদি বাঙালি সঙ্গীতশাস্ত্রালোচক রাধামোহন সেন, এঁর সমসাময়িক জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক, নাট্যকার-সঙ্গীতকার-দেশব্রতী মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) প্রমুখ টপ্পা রচনায় ও গায়নে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) টপ্পানুরাগী ছিলেন। তিনি টপ্পা ও টপখেয়াল আঙ্গিকে গান রচনা

---

৩. অরুণকুমার বসু, *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত*, (কলকাতা ১৯৭৮), ১৫।

করেন। সুলেখক ও সুগায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৫-১৯৩৫) টপখেয়ালে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরও টপ্পার গভীর প্রভাব ছিল। টপ্পার সঙ্গীতপ্রবাহটি তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল ধরে টপ্পা ও টপ্পাপদ্ধতির গায়নকলা ছিল বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অতি বিশিষ্ট উপাদান। উনিশ শতকের নানা শাখায় শাখায়িত প্রেমসঙ্গীত টপ্পার ধারা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল।

উনিশ শতকে সঙ্গীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির যে মুখ্য অর্জন সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে আঠারো শতকে বাংলায় বিকাশপ্রাপ্ত একটি সঙ্গীতবিষয় সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সে হচ্ছে কবিগান। লোকসাঙ্গীতিক পর্যায়ের ব্যাপার হলেও কবিগানের ভিতর দিয়ে বাঙালির এক ধরনের প্রথাবদ্ধ সঙ্গীতচিন্তার প্রকাশ ঘটে। সঙ্গীতসমালোচক রাজ্যেশ্বর মিত্রের ধারণা, কাওয়ালী গানের ধারা থেকে কবিগানের উৎপত্তি।[৪] তবে তাঁর এ ধারণাটি দুর্বোধ্য মনে হয়। বরং মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও তার পরবর্তী বৈষ্ণবীয় পালাগানে কৃষ্ণ, রাধা, বড়াই ও সখীদের মধ্যে যে কথোপকথন ও প্রতর্ক, তার সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ কথকদের ছড়াকাটা প্রভৃতি যুক্ত হয়ে এই প্রশ্নোত্তরমূলক, দুই দলকেন্দ্রিক ও জয়-পরাজয়ভিত্তিক সঙ্গীতোপস্থাপনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, এটা পশ্চিম ভারত থেকে আমদানি করা ব্যাপার নয়। তবে একই সঙ্গে রাজ্যেশ্বর মিত্র যে বলেছেন, কবিগানের পর্যায় সংগঠনের ভিতর দিয়ে বাঙালির মৌলিক সঙ্গীতসংগঠনচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে,তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ধ্রুপদ সঙ্গীতের চতুর্স্তবক অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগভিত্তিক গঠনকলা এবং খেয়াল বা খেয়ালেতর সঙ্গীতের দ্বিস্তবক অর্থাৎ স্থায়ী ও অন্তরাভিত্তিক গঠনকলার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কবিগানের পর্যায়বিভাজন বাংলার একটি নিজস্ব ব্যাপার। চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ ও অন্তরা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে কবির গান আসরে উপস্থাপিত হয়। এগুলো সঙ্গীতোপস্থাপনায় বাঙালি লোককবির এক ধরনের কুশলতার সাক্ষ্য বহন করে। দাঁড়া বা এইসব পর্যায়যুক্ত সুশৃঙ্খল কবিগানের প্রবর্তক হিসেবে রঘুনাথ দাস (আ. ১৭২৫-১৭৯০)-এর নাম পাওয়া যায়। গোজলা গুঁই (আ. জন্ম ১৭০৪) আদি কবিয়াল হিসেবে পরিচিত। গোজলা গুঁই-এর শিষ্য লালু.নন্দলাল, রামজী ও রঘুনাথ দাস কবিগানের প্রারম্ভিক ভিত্তিটি রচনা করেন। আঠারো শতকের শেষদিক থেকেই ঘটে কবিগানের অসাধারণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি। রাসু (১৭৩৫-১৮০৭), নৃসিংহ (১৭৩৮-১৮০৭), হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২), নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৮), এন্টুনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ভবানী বেনে, রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) প্রমুখ কবিয়ালের দ্বারা আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কবি-গীতশৈলীর

---

৪. Rajyeshwar Mitra, 'Music' in N. K. Sinha (ed.), *The History of Bengal (1757-1905)*, (University of Calcutta 1967), 543.

প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিগানের জনপ্রিয়তা বাঙালি শ্রোতাসাধারণের মধ্যে অব্যাহত থাকে। চট্টগ্রামের রমেশ শীল ও মুর্শিদাবাদের শেখ গুমানি দেওয়ান একালের কবিগীতসংগঠনে বিশেষ অবদান রাখেন।

উনিশ শতক বাংলা শীলিত সঙ্গীতের বিবর্তনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কালপর্যায়। এই সময়ে বাংলা শীলিত সঙ্গীতের বিষয়গত বিকাশ যেমন বহুমুখী হয়ে উঠে, তেমনি এর রূপবন্ধগত বিকাশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি তৈরি হয়। রূপবন্ধগত বিকাশের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রমিত রূপবন্ধ অবলম্বনে বাংলা গানের বিকাশের ব্যাপারটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর সূচনাতেই নিধুবাবু বাংলায় টপ্পাসঙ্গীতের প্রবর্তন করেন। রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) খেয়াল অঙ্গে গীত রচনা করেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) তৈরি ধ্রুপদ গানের দৃষ্টান্তে সঙ্গীতকেন্দ্র বিষ্ণুপুরে বাংলায় ধ্রুপদ রচনার একটি পরম্পরা তৈরি হয়। খুব দ্রুত ধ্রুপদ গানের এই আবহটি কলকাতায় বিস্তারলাভ করে। হিন্দুস্থানী রূপবন্ধ অবলম্বনে বাংলায় গান রচনার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এর ফলে আধুনিক ও প্রামাণ্য রূপবন্ধ অবলম্বনে বাংলা গানের বিকাশের পথ উন্মোচিত হয়। পূর্ববর্তী যুগসমূহে আঞ্চলিক প্রবন্ধগীতির যে প্রভাব বাংলা গানে লক্ষ্য করা যায়, তাকে কাটিয়ে উঠে তখন থেকে একটি আধুনিক রাগসাঙ্গীতিক শৃঙ্খলার সঙ্গে বাংলা গানের গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শুধু বাণী রচনায় নয়, গায়নকলায়ও গানের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটতে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এর ফলে বাংলা গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রামাণ্য কেন্দ্রীয় ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বাংলা গানের সমৃদ্ধ বাণী অবলম্বনে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরীতির বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সার্বিক বিকাশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবন্ধের সঙ্গে এই যোগাযোগ সুদূরপ্রসারী অবদান রাখে। পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাধিত ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেই ছিল সূত্রপাত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রূপে, রসে ও ভাবে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে তোলার এক ঐতিহাসিক সুযোগ উপস্থিত হয় তখন থেকে। প্রেমসঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ও স্বদেশসঙ্গীত এই তিন ধারায় উনিশ শতকের বাংলা শীলিত সঙ্গীতের প্রধান বিকাশ ঘটে।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যগীতিতে মানবিক প্রেমানুভূতির রূপায়ণ একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। উল্লেখযোগ্য প্রধানত এ কারণে যে, সবধরনের দৈবী রূপক ভেদ করে মানুষের প্রেমানুভূতিকে বিশুদ্ধ ব্যক্তিমানুষের প্রেম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার যে পর্যায়ক্রমিক উত্তরণ ঘটছিল বাংলা গানে, উনিশ শতকের গোড়াতেই তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে। ভারতচন্দ্রের গানে এর সূচনা ঘটতে পারতো। কিন্তু সেখানে প্রেমের হৃদয়ঘটিত সৌকর্য বিলাসকেলিকলার চাতুর্যকে ভেদ করে এগোতে পারে নি। আঠারো শতকের কবিগীতরচয়িতারা এ কাজকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে ব্রজলীলার দূরত্ব থেকে নগরের লৌকিক সীমান্তে এনে দাঁড় করিয়ে

দিয়েছিলেন। কবিয়ালদের গানে বিধৃত বিরহ রাধা-কৃষ্ণের মাথুর বিরহের চেয়ে লৌকিক নায়ক-নায়িকার মিলনের ব্যর্থতারই অধিকতর সমীপবর্তী। নিধুবাবু প্রেমসঙ্গীতকে সেই সীমান্তটুকুও পার করিয়ে একান্তভাবে মানুষের হৃদয়সঙ্গীত করে তুলেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে "কবিসঙ্গীতের মধ্য দিয়েই প্রেমের প্রসঙ্গ বাংলা গানে প্রথম প্রবেশ করেছিল এবং নিধুবাবুই সর্বপ্রথম কবিসঙ্গীতের অন্যান্য অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে কেবল ব্যক্তিপ্রণয়ের রীতিতে প্রেমগীত রচনা করেছিলেন।"[৫] এই নব ব্যবহৃত গীতবিষয়ের জন্য নতুন সঙ্গীতবন্ধেরও প্রবর্তন করেছিলেন নিধুবাবু। এই প্রেমসঙ্গীতের বিরহ-বিষাদের ছোঁয়ালাগানো নায়ক-নায়িকা সম্পর্ককে সাঙ্গীতিকভাবে প্রকাশ করার জন্য তিনি টপ্পার মাধ্যম নিয়ে আবির্ভূত হলেন। হিন্দুস্থানী টপ্পার দ্রুত তান ও প্রচুর উল্লম্ফনযুক্ত সুরকর্তন পরিহার করে ঈষৎ বিলম্বিত লয়ে দানাদার, দোলায়িত তানযুক্ত, বিষাদে কাতর যে সুররূপটি তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, প্রধানত তাকে অবলম্বন করেই সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে বাংলা প্রেমসঙ্গীত পল্লবিত হয়ে উঠে। নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই গান বিষয়বিন্যাসের অজস্রতাসহ টপ্পার সঙ্গীতকলাকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছে।

পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা বাংলা প্রেমের গানের বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। স্বাধীন নির্বাচন, অনুরাগের অধিকার ঘোষণা প্রভৃতি এ গানে প্রতিফলিত হয়। তথাপি বিচ্ছেদই সেই নবাঙ্কুরিত প্রেমের গানের বড় কথা হয়ে দাঁড়ায়, নায়ক-নায়িকার হাহাকারই সেই গানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। প্রেমসঙ্গীতের এই ধারায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) আবির্ভাব এর অন্তর্গত রোমান্টিকতাকে আরো গভীর করে তুলতে সাহায্য করে। তিনিই প্রকৃতিকে ব্যক্তিচিত্তের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী করে তোলেন গানে, মানুষের হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের বর্ণিল পটভূমি হয়ে উঠে নিসর্গ। চিরন্তনী নারী সম্পর্কেও অপার রহস্যবোধ বিহারীলালের গানে ও কবিতায় অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। বিহারীলাল সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "এ কথা বলিতে পারি, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত সুরের এমন মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"[৬] নিধুবাবু-বিহারীলালের প্রেমসঙ্গীতের যে ধারা, পরবর্তীকালে সেটিই সঙ্গীতে ও বাণীতে অজস্রধার উচ্ছ্বাস লাভ করে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে প্রবর্তিত বাংলা কাব্যগীতির এক বিশিষ্ট ধারার নাম ব্রহ্মসঙ্গীত। ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক সঙ্গীত—এই অর্থে ব্রহ্মসঙ্গীত কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মোক্ত ব্রহ্মোপাসনাকে কেন্দ্র করে এই গীতধারার সূত্রপাত ঘটে। ব্রাহ্মধর্মোক্ত ঈশ্বর এক, অবিচ্ছেদ্য ও নিরাকার। ব্রহ্মসঙ্গীত নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনাগীতি। ব্রাহ্মধর্মের

---

৫. *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত,* ১০৬।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড,* (বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৪৮), ৪৩২।

মতো ব্রহ্মসঙ্গীতেরও প্রবর্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। ব্রহ্মসঙ্গীত নামটিও তাঁরই দেয়া। সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা ও চিত্তশুদ্ধির কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর প্রবল আস্থা ছিল। সঙ্গীতকে তিনি ব্রহ্মোপাসনার বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বছরই রামমোহনরচিত গীতিসংগ্রহগ্রন্থ *ব্রহ্মসঙ্গীত* প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রবর্তন বাংলা গানের ইতিহাসে একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এর ফলে একদিকে বাংলা ভক্তিগীতি কালক্রমে সৃষ্ট নানাবিধ পৌত্তলিক স্থূলতামুক্ত হয়ে ভক্তি প্রকাশের এক উচ্চাঙ্গ বিশুদ্ধলোকে উন্নীত হতে সমর্থ হয়, অপরদিকে এই গানে রাগসঙ্গীতবন্ধের ব্যবহারের ফলে বাংলা কাব্যগীতিতে রাগসাঙ্গীতিক পরিশীলন অর্জনে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

রামমোহনের আগ্রহে বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) সমাজমন্দিরে সঙ্গীতাচার্যরূপে নিযুক্ত হন। বিষ্ণু চক্রবর্তী আদি বাঙালি ধ্রুপদগুণীদের অন্যতম। তাঁর অবস্থানে এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে তাঁর ধ্রুপদোপম সুরযোজনার ফলে প্রথম থেকেই ব্রহ্মসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে একটি ধ্রুপদীয় সঙ্গীতাবহ গড়ে উঠে। সূচনায় রামমোহন ছাড়াও বেশ কয়েকজন গীতরচয়িতা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে বিষ্ণুর মতো সুরকার ও সঙ্গীতাচার্য এবং রামমোহন রায়ের বন্ধুস্থানীয় গীতরচয়িতাদের সাহচর্যে সূচনাকালেই ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি দৃঢ় সাঙ্গীতিক ও কাব্যিক ভিত্তি গড়ে উঠে। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পাঁচ বছর পরেই ইংল্যান্ডে রামমোহনের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর পর যাঁরাই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের সবাই ছিলেন সঙ্গীত-সংস্কৃতিবান পুরুষ। তাই রামমোহনপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসঙ্গীতাদর্শ কারো দ্বারা অবহেলিত হয় নি। কালক্রমে সমাজে ভাঙন দেখা দিয়েছে, মূল স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ কেউ নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তবে সর্বাবস্থায়ই ব্রহ্মসঙ্গীতাদর্শ বজায় থেকেছে। বরং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাঙ্গীতিক প্রয়াস দেখা দিয়েছে। ফলে ব্রহ্মসঙ্গীত বহুমুখী ও বিপুল হয়ে উঠেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)-এর উপর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্রুপদপ্রেমী ছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তীকেই তিনি সমাজে সঙ্গীতাচার্যরূপে বহাল রাখেন। সেজন্য তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদসঙ্গীত বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর মতানুসারীদের সঙ্গে মতভেদ দেখা দিলে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন (১৮৬৬)। এই সমাজের উপাসনাসঙ্গীতে কীর্তনসঙ্গীতের প্রভাব পড়ে। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ দেখা দিলে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪০-১৯১৬) প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলে (১৮৭৮) সেখানেও কীর্তনাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হতে থাকে। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন আদি

ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা অব্যাহত থাকে এবং এই ধারায়ই ব্রহ্মসঙ্গীতের সর্বোচ্চ রূপটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতেই বাণী ও সুরে ব্রহ্মসঙ্গীতের সর্বোচ্চ রূপের বিকাশ ঘটে।

ঐতিহাসিকভাবে একটি বিষয় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মসঙ্গীতরচয়িতাগণ নানাভাবে বাংলা শীলিত সঙ্গীতপ্রয়াসকে সংস্কারমুক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীতে একদিকে যেমন ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা হয়, অপরদিকে কীর্তন, বাউল সহ নানা ধরনের লোকসঙ্গীত, ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশিক সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরভঙ্গি এই উপাসনাসঙ্গীতের ধারায় এসে মিলিত হয়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "এইভাবে শতাব্দীকালের মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত যথার্থই এক সর্বসঙ্গীতের মিলনমহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে এবং বাঙলা কাব্যসঙ্গীতের পরিণতি ও ভবিষ্যৎকে অনাগতকালের অসীম সম্ভাবনায় মুক্তি দিয়েছে।"[৭]

উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের পাশাপাশি পৌত্তলিক হিন্দুধর্মসাধনায়ও নবজাগরণ দেখা দেয়। এই জাগরণের শাক্তধর্ম শাখায় নেতৃত্ব দেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৬-১৮৮৬) ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। বৈষ্ণব শাখায় নেতৃত্ব দেন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শিশির ঘোষ প্রমুখের প্রভাব প্রচলিত হিন্দু ধর্মভাবনায় যথেষ্ট বেগ সঞ্চার করে। ফলে শুরু থেকে নগরবাসী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্রাহ্মধর্মান্দোলন আরো সীমিত হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পৌত্তলিক ভক্তিসঙ্গীতেও নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়। শ্যামাসঙ্গীত ও শ্যামসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন সৃজনোদ্যম দেখা যায়। আবহমান হিন্দুধর্মসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর রচনায়।

মানুষের যে কয়টি হৃদয়বৃত্তি তার সৃজনশীল চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে দেশপ্রেম এর অন্যতম। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে দেশপ্রেমের গভীর অনুভব রূপায়িত হতে শুরু হয় এবং ক্রমে কয়েকটি কালপর্যায়ে এই সঙ্গীতধারা বিপুলভাবে পল্লবিত হয়ে উঠে। স্বদেশসঙ্গীত, স্বদেশী গান, মুক্তির গান, দেশাত্মবোধক গান প্রভৃতি নানা নামে এই দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতধারা আখ্যায়িত হয়েছে। এই সঙ্গীতপ্রবাহের মূল প্রেরণা ছিল রাজনৈতিক। ইংরেজবশ্যতা ও ইংরেজশাসনের সংস্পর্শে এসে এই রাজনৈতিক প্রেরণার উৎপত্তি ঘটে। ক্রমে দেশোন্নতি ও সামগ্রিক সামাজিক মুক্তির নানা আকাঙ্ক্ষা এসে এর সঙ্গে যুক্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশাত্মবোধক সাহিত্য, সঙ্গীত ও নানা চিন্তাশীল রচনা বাঙালির অন্তরে এই প্রেরণা সঞ্চারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আগেকার বাংলা গানে দেশের নিসর্গশোভা বা সমাজজীবনের বর্ণনা থাকলেও স্বদেশসঙ্গীত

---

৭. *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত*, ১৮১।

বলতে দেশপ্রেমনির্ভর যে শ্রেণীর গানের কথা বুঝি, তার যথার্থ বিকাশ এর আগে ঘটে নি। "ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই বাঙালির মনে স্বদেশপ্রেমের জন্ম হয়।"[৮] দেশবন্দনা, পূর্বগৌরবগাঁথা, জন্মধন্যতা প্রভৃতি চিরন্তন বোধ সেই পরাধীনতার বোধ থেকেই বিপুল বেগে উৎসারিত হয়ে উঠে।

এই গানের পটভূমি তৈরি হয়েছিল সাহিত্যের ব্যাপক আয়োজনে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)-এর কবিতায় স্বাদেশিকতার প্রথম স্পন্দন ধ্বনিত হতে থাকে। ক্রমে বহু কবি ও গীতিকার স্বদেশী প্রেরণায় গান রচনা করে বাংলা কাব্যগীতিতে এই নতুন ধারা যুক্ত করেন। "সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অতন্দ্র অনুরাগ ঘোষণা, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও দেবেন্দ্রনাথের *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* মাধ্যমে দেশভক্তির উদ্দীপক রচনা প্রকাশ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, হিন্দুমেলা, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন, *নীলদর্পণের* অনুবাদ প্রকাশ ও অভিনয় প্রভৃতি বিচিত্র বিবিধ ঘটনায় আমাদের স্বদেশচেতনার ইতিহাস উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে হিন্দুমেলাই সেই বৃহত্তম ঘটনা, বাঙলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ইতিহাসে যার প্রভাব সর্বাগ্রগণ্য।"[৯] এই মেলা সম্পর্কে *জীবনস্মৃতিতে* রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন :

> আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। সেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।[১০]

এই স্বাদেশিকতা প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হলো গান। "তৎকালীন জাতীয়তাবোধের স্ফুরণের অন্যতম মাধ্যম এবং জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হলো এযুগে রচিত স্বদেশী গানগুলিতে।"[১১]

এইভাবে সাহিত্যে দেশবোধের স্ফুরণের পটভূমিতে একটি মেলাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সম্ভাবনাময় সূচনা ঘটলো। ইতিহাসের দিক থেকে এই গীতধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : ১. প্রাক-বঙ্গভঙ্গ পর্যায়ে বা হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়ে রচিত গান, ২. বঙ্গভঙ্গ পর্যায় এবং ৩. বঙ্গভঙ্গপরবর্তী পর্যায়।

---

৮. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান,* (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী ১৯৮৩) ৯।

৯. *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত,* ১৯৪-১৯৫।

১০. *রবীন্দ্র রচনাবলী,* সপ্তদশ খণ্ড (কলকাতা ১৩৫০), ৩৪৮।

১১. *বাংলা স্বদেশী গান,* ৭।

হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনে (১৮৬৭) কোন গান গাওয়া হয়েছিল কিনা তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর দ্বিতীয় অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে গাওয়া হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) রচিত বিখ্যাত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি। মেলায় প্রায় প্রতি অধিবেশনেই উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে গানটি গাওয়া হতো। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গান ও জাতীয় সঙ্গীত পর্যায়ের রচনা। "এই গান প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত।"[১২] মেলা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) রচনা করেন একটি বিষাদ জাগানো দেশাত্মবোধক গান—'মলিন মুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারি'। ভারতবর্ষ এক মলিন, দুঃখভারাক্রান্ত, অশ্রুমতী নারীমূর্তিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে নটবেহাগ রাগে রচিত এ গানে। দেশমাতার ক্রন্দসী প্রতিমা ইতিপূর্বে কোন গীতবন্ধে এমনভাবে মূর্ত হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে সূচিত হয় উদ্দীপনার ধারা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান থেকে সূচিত হয় বিষাদের ধারা। হিন্দুমেলা যুগে এবং পরবর্তীকালে উদ্দীপনার ধারা প্রাধান্য লাভ করলেও মাতৃভূমির দুরবস্থা অবলম্বনেও প্রচুর বিষাদাত্মক গান রচিত হয় বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ধারায়। মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা মনোমোহন বসু রচিত স্বদেশী গান একাধিক অধিবেশনে গীত হয়। তাঁর গানে ইংরেজের অধীনতা ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র মর্মযাতনা প্রকাশ পেয়েছে। মেলার অন্যতম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) একটি গানে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন : 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)-এর 'ভারতসঙ্গীত', গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭)-এর 'কতকাল পরে বল ভারতরে', বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (১৮৩২-১৯০১)-এর 'এই কি সেই ভারত' প্রভৃতি গান হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে সাদরে গীত হয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)-এর 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' গানটি ছিল সেকালের দেশাত্মবোধের মন্ত্রতুল্য। হিন্দুমেলার শেষের দিককার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। এসব গানে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বিষাদের ভাবই প্রবল। *বঙ্গদর্শন*-এর ১২৮৭ চৈত্র সংখ্যায় 'বন্দে মাতরম' গানটি প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। এই সংগঠনের দেশব্রতে বুদ্ধিজীবীদের সহমর্মিতা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে প্রকাশিত হতে থাকে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গাওয়া হয়। কংগ্রেসের দ্বাদশ কলকাতা অধিবেশনে স্বরচিত সুরে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' গানটি পরিবেশন করেন। তখন থেকেই দেশাত্মবোধক গান হিসেবে এর জনপ্রিয়তা লাভের সূত্রপাত। সরলা দেবী চৌধুরানীর (১৮৭২-১৯৪৫) 'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী' গানটি ১৯০১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে গাওয়া হয়। এইভাবে বাংলা দেশাত্মবোধক গান এসে বঙ্গভঙ্গ পর্যায়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

১২. সুভাষ চৌধুরী, 'মুক্তির গান', *দেশ বিনোদন*, (কলকাতা ১৩৯১), ১৭৮।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যায়ে (১৯০৫-১৯১১) বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বলা হয় যে, "হিন্দুমেলা যুগে স্বদেশী গানের উদ্ভব, কিন্তু এর সার্থক বিকাশ ঘটেছে বঙ্গভঙ্গ যুগে।"[১৩] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়েছে বাংলা গানের ইতিহাসে এর অন্য কোন নজির নেই। বিখ্যাত থেকে অখ্যাত গীতিকাররা, এমনকি যাঁরা এর আগে গান লিখেন নি তাঁরা পর্যন্ত স্বাদেশিক আবেগে গীত রচনা করলেন। কলকাতা থেকে দূরবর্তী পল্লীশহরগুলোয় পর্যন্ত শত শত স্বদেশী গীতসঙ্কলন প্রকাশিত হলো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মুখ্য সঙ্গীতকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অমৃতলাল বসু, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনোমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ সমকালীন সঙ্গীতরচয়িতা বঙ্গভঙ্গের প্রেরণায় গান রচনা করেন।

বঙ্গভঙ্গপর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য গান রচনা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলো গান রচনা করেছিলেন। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি এসময়ই রচিত হয়। এসব গীত রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রচিত হলেও আন্দোলনের সাময়িকতায় গানগুলো আচ্ছন্ন হয় নি। দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি এইসব গানে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এযুগে রচিত অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছিলেন। বাউল সুরই বেশি। এর ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের সাঙ্গীতিক দিকটিও অনুভব করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত গানগুলো এযুগে যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল, তেমনি এদের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যও ছিল অন্য ধরনের। তাঁর 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধনধান্যপুষ্পভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' প্রভৃতি কালজয়ী স্বদেশসঙ্গীত সে সময়কার আন্দোলনে গভীর প্রেরণা জোগায়। এসব গানে প্রযুক্ত পাশ্চাত্য সুরঢঙ এবং সুরের ক্রমোত্থান ও ক্রমপতনের ভঙ্গিটি কেবল বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় নতুন বলে নয়, অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত বলেও অভিনন্দিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এ ধরনের রচনার সাহায্যে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের নতুন সাঙ্গীতিক পরিকল্পনার দিগন্ত উন্মোচিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতিও রচনা করেছিলেন।

রজনীকান্ত সেনের গানও বঙ্গভঙ্গ যুগে যথেষ্ট উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান গান হয়ে দাঁড়ায়। স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জনের যে উদ্দীপনা, তা রজনীকান্তের এই গানটিতে বিশিষ্ট রূপ লাভ করে।

---

১৩. *বাংলা স্বদেশী গান,* ৭।

অতুলপ্রসাদ সেন দেশাত্মবোধক গান বেশি রচনা করেন নি। তাঁর মোট তেরোটি স্বদেশী গানের প্রায় প্রতিটিই জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনের এক উত্তাল কেন্দ্র ছিল বরিশাল শহর। সেখানকার সংগ্রামের সঙ্গীতাত্মা ছিলেন মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। মুকুন্দের প্রেরণাদাতা অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) রচিত বেশ কয়েকটি স্বদেশী গানও বঙ্গভঙ্গ যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচয়িতারূপে মুকুন্দ শীঘ্রই বরিশালের সীমা অতিক্রম করেন এবং সারা বাংলার পটভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বাঙালি সঙ্গীতকার তাঁর মতো এমন বজ্রনাদী, এমন নির্ভয়, এমন অগ্নিগর্ভ গান রচনা করেন নি। মুকুন্দ দাস চারণকবিরূপে খ্যাত হয়েছিলেন। স্বদেশী যাত্রা ও জনজাগরণের গান নিয়ে তিনি দেশব্যাপী অক্লান্তভাবে পরিক্রমণ করেছেন। পরাধীনতা ও সামাজিক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে জনজাগরণে মুকুন্দ দাসের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা স্বদেশী গানের অধিকাংশ প্রবণতাই মুকুন্দ দাসের সঙ্গীত রচনায় রূপায়িত হয়েছিল। দেশকে মাতৃদেবতারূপে গণ্য করে গীতরচনার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল মুকুন্দ দাস তার বিশিষ্ট ধারক ছিলেন। দেশমাতৃকা আর শক্তিমাতৃকাকে একাকার করে তিনি গান রচনা করেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে গান রচনা করেছিলেন। নারী নির্যাতন, মজুদদারি, ভূমিহীন চাষীদের শোষণ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রেরণাদায়ক গান রচনা করেন মুকুন্দ দাস। স্বাধীন, শোষণমুক্ত ও কল্যাণকামী সমাজজীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর অন্তরে। তারই পবিত্র শিখাটি তিনি জ্বালিয়েছিলেন গানে। আর সে শিখাটি তিনি সর্বশক্তি দিয়ে বহন করে বেড়িয়েছেন আমৃত্যু, দেশবাসীর অন্তরে সঞ্চিত অন্ধকার দূর করার জন্য।

অশ্বিনীকুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কামিনী রায়, সরলা দেবী চৌধুরানী প্রমুখ বহু গীতরচয়িতা ও সঙ্গীতকার এই যুগে প্রচুর প্রেরণাদায়ক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ যুগ পর্যন্ত বাঙালির স্বদেশচেতনা প্রধানত গানেই মূর্ত হয়েছে। সেসব গানের একটি বিশিষ্ট অংশের বাণী সংরক্ষিত হলেও সুর সংরক্ষিত হয়েছে অতি সামান্য। অনেক গানের শিরোদেশে রাগতালনাম নির্দেশিত থাকলেও ঠিক কি সুরে সেসব গান গাওয়া হতো তা বোঝা যায় না। এই পর্বে গীত রচনায় উন্মাদনা এতই প্রবল ছিল যে, স্বদেশী গান রচনা করেন নি এমন বাঙালি কবি বা মনীষী খুঁজে পাওয়া ভার।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসে। স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য সঙ্গীতকারদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে পরলোকগমন করেন। অতুলপ্রসাদ স্বদেশী গান রচনার ধারা ত্যাগ করে ভিন্নতর সঙ্গীতস্রোতে নিমজ্জিত হন। সে যুগের মুখ্য সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথও প্রকাশ্য আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। দেশাত্মবোধক গান রচনায় তাঁর আর তখন উৎসাহ নেই। শুধুই রইলেন মুকুন্দ দাস তাঁর গান আর যাত্রা নিয়ে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যখন সূচনা তখন থেকেই বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। "এতো অনস্বীকার্য যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বৈপ্লবিক তথা সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তুলেছিল।"[১৪] এই পটভূমিতে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষদিক থেকে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারা যখন স্তিমিত হয়ে আসছিল, তখন বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল, প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু তাঁদের অসম সাহসী আত্মদানের মাধ্যমে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে এক রক্তাপ্লুত অধ্যায়ের সূচনা করেন এবং এর পরেই গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। তখনই বাংলা স্বদেশসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম। উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচয়িতাদের মৃত্যুতে বা সে ধারা থেকে সরে দাঁড়ানোয় সেক্ষেত্রে যে শূন্যতা দেখা দেয়, তা পূরণের উজ্জ্বল অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত হলেন নজরুল। সেই অগ্নিযুগের জন্য যে অগ্নিক্ষরা সঙ্গীতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল নজরুলের আবির্ভাবে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪), দিলীপকুমার রায় (১৮৯৬-১৯৮০), নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (মৃ. ১৯৭৪) প্রমুখও বঙ্গভঙ্গপরবর্তী এবং নজরুলের সমসাময়িক যুগকে দেশাত্মবোধক গান রচনায় সমৃদ্ধ করেন।

বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতির পঞ্চপ্রধানের প্রসঙ্গে যাবার আগে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত সাঙ্গীতিক ঘটনাবলী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত প্রয়োজন। কেননা, বাংলায় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত এবং বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যাপারগুলো এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বাঙালির রাগসঙ্গীতচর্চার সঙ্গেই এর সর্বোচ্চ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

আঠারো শতকের প্রথমদিক থেকেই মুগল সাম্রাজ্যের দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। তখন মুগল দরবার, রাজপুরুষ ও দরবারঘনিষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আশ্রিত সঙ্গীতজ্ঞরা ভাগ্যান্বেষণে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। ক্রমে তাঁদের অনেকেই বাংলায় আসেন এবং কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, চুঁচুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি সঙ্গীতকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮৩) সঙ্গীতসভায় কলাবতদের সমাবেশের যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনতে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত বিশিষ্ট গায়ক, বাদক ও নর্তকীরা তাঁর সভায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে সেখানকার উচ্চ সাঙ্গীতিক পরিবেশের কথা জানা যায়। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যতম আদি বাঙালি ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) রামমোহনের আমন্ত্রণে ব্রহ্মমন্দিরে যোগ দেন। তবে ইংরেজদের শাসনাধীন ভারতবর্ষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে কলকাতার আত্মপ্রকাশের পর এই স্থানটি বাংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত-সংস্কৃতিকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

---

১৪. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,* (কলকাতা ১৩৭৭), ৪১।

সেখানকার উঠতি ধনাঢ্য পরিবারগুলো রাগসঙ্গীতের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। দিল্লী অঞ্চল থেকে আগত অনেক কলাবত এঁদের গৃহে অধিষ্ঠিত হন। তবে হিন্দুস্থানী কলাবতদের বাংলায় আগমনের স্রোতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিপুল বেগ সঞ্চার করে। সে হচ্ছে লখনৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের কলকাতার মেটেবুরুজে আগমন। অযোগ্যতার অজুহাতে ইংরেজ সরকার ১৮৫৬ সালে ওয়াজিদ আলিকে নির্বাসিত করে। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে যোগসাজশ আছে এই অভিযোগে নবাবকে কিছু দিন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। ১৮৫৮ সালে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নবাব স্থায়ীভাবে মেটেবুরুজে বসবাস শুরু করেন। ওয়াজিদ আলি শাহ ছিলেন সঙ্গীতকলার উদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও ছিলেন কবি, গায়ক, বাদক ও নৃত্যবিদ। লখনৌ কথকনৃত্যঘরানার প্রবর্তক ও ঠুংরি প্রচলনকারী হিসেবে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর গুণপনায় ও উদার পৃষ্ঠপোষকতায় আকৃষ্ট হয়ে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যকলার দিকপাল-রূপকাররা লখনৌ দরবারে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের সঙ্গীতসভার পর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের সঙ্গীতসভাই উত্তর ভারতের সমৃদ্ধতম সঙ্গীতসভা। ওয়াজিদ আলি যখন কলকাতায় এলেন, তখন গোটা সঙ্গীতসভাই সঙ্গে নিয়ে এলেন। লখনৌর ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতসভা মেটেবুরুজে তথা কলকাতায় স্থানান্তরিত হলো। লখনৌ ঠুংরি ও কথকনৃত্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো কলকাতা। এলেন নৃত্যপটিয়সী বাঈজীর দল। কণ্ঠসঙ্গীতের অন্যান্য শাখা ও যন্ত্রসঙ্গীতের দিকপাল-গুণীরা এলেন। ওয়াজিদ আলির সঙ্গীতসভার প্রেরণায় শহর কলকাতাতেও হিন্দুস্থানী গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতার জোয়ার বয়ে গেল। সেজন্য ওয়াজিদ আলির মেটেবুরুজের সভাবহির্ভূত বহু গুণী কলকাতার নানা গৃহে অধিষ্ঠিত হতে থাকলেন। তাই সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে প্রথমে দিল্লী ও পরে লখনৌ ম্রিয়মান হয়ে পড়লে কলকাতা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মুখ্য কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সারা বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চার অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেখান থেকেই যোগাযোগ স্থাপন করে সঙ্গীতগুণীরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন জমিদারের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকেন। কলকাতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত ময়মনসিংহের গৌরীপুর, কালীপুর, রামগোপালপুর, ভবানীপুর, মুক্তাগাছা, শেরপুর থেকে রাজশাহীর নাটোর, তালন্দ জমিদারগৃহ পর্যন্ত দিকপাল গুণীদের আনাগোনায় মুখরিত হয়ে উঠে। এত দিন পর্যন্ত বাংলা ছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র থেকে দূরে। আঠারো শতক পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক রাগসঙ্গীতের যেসব তরঙ্গই বাংলা গানে এসে পৌঁছেছে, সেসব শীঘ্রই বাংলায় নিজস্ব সঙ্গীতবৈশিষ্ট্যে আত্মীকৃত হয়ে গেছে। শোরীর আদর্শে নিধুবাবু ও কালী মির্জার বাংলা টপ্পা প্রবর্তনার মধ্য দিয়েই আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কেন্দ্রীয় ধারার সঙ্গে বাংলা গানের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে নিধুবাবুর টপ্পা, রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের ধ্রুপদ, রঘুনাথ রায়ের খেয়াল প্রবর্তন এবং প্রবীণতর কয়েকটি সঙ্গীতসভার মাধ্যমে বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে ধারাটি এসে পৌঁছে, তা মেটেবুরুজের দরবারে বিপুলসংখ্যক হিন্দুস্থানী কলাবতের অধিষ্ঠান ও বাংলার নানা কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক গুণীর আগমনের ফলে এক বিরাট জলোচ্ছ্বাসের আকার ধারণ করে। বাংলার সঙ্গীতচর্চার বিশাল ক্ষেত্র এর প্রভাবে

আরো রাগসঙ্গীতানুগ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা হিন্দুস্থানের নানা কেন্দ্রে পল্লবিত ঘরানাসমূহের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের হিন্দুস্থানী গুণীরা বাংলার নানা সঙ্গীতকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে শিষ্য তৈরিতে নিয়োজিত হলে এখানেই বিভিন্ন ঘরানার বিকাশ ঘটতে থাকে। পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি আনন্দবাদ্যে এবং সেতার, সুরবাহার প্রভৃতি তারবাদ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষদিক থেকেই বাঙালি গুণীরা তালিম নিতে শুরু করেন এবং তখন থেকেই যন্ত্রবাদনে বাঙালিদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। অবশ্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বাঙালির আগ্রহ ও উদ্যমের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে কণ্ঠসঙ্গীতে। এর মধ্যে ধ্রুপদেও বাঙালির অতি বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং হিন্দুস্থানী ধ্রুপদকলার সর্বভারতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় গুণীদের মধ্যে বাঙালির স্থান হয় উল্লেখযোগ্য।

এক সময় বাংলায় বাঈজীদের বিপুল কদর ছিল। কলকাতাসহ বাংলার বড় শহরগুলোতে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাগানবাড়িতে বা মূল ভবনের ফরাশঘরে বা নাচমহলে তাঁদের আসর বসতো। সেখান থেকে সুদূর পল্লী অঞ্চলের ভূম্যধিকারীদের গৃহে পর্যন্ত তাঁরা মুজরো করতে যেতেন। এটাও ইংরেজ শাসনের প্রধান নগররূপে কলকাতার অভ্যুদয়েরই ফল। দিল্লী ম্রিয়মান, লখনৌ ম্রিয়মান, কলকাতায় জাঁকজমক ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানকার উঠতি ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য ভারতের নানা অঞ্চলের বাঈজীরা এসে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। ওয়াজিদ আলি শাহ্ তাঁর দরবারস্থ বা আশ্রিত বাঈজীদের নিয়ে কলকাতা এলে এই নগর বাঈজীসংস্কৃতির এক কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলায় ক্রমে বাঈজীসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থাকে। নিকি বাঈজী, অসরুন বাইজী, জীন্নত বাঈজী, বেগমজান, হিঙ্গুল বাঈজী, মির্জা জান, নান্নী জান, সুপন জান প্রমুখ কলকাতায় প্রথম যুগের বাঈজীদের অন্যতম। রাজা রামমোহন রায় নিকির গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে নিকির আসর হতো। তৎকালীন বিবরণে এঁর বিশেষ প্রশংসা পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের বাইজীদের মধ্যে শ্রীজান, মালকাজান, গওহরজান, হীরাবুলবুল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রাগসঙ্গীতে ও নৃত্যে এঁদের অধিকার কিংবদন্তির মতো হয়ে আছে।

উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে বাংলায় যখন হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রঙ্গীতে বাঙালির আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে, ঠিক তখন থেকেই বাঙালি সঙ্গীতালোচকদের হাতে বাংলা ভাষায় সঙ্গীতালোচনার ঐতিহ্য গড়ে উঠতে থাকে। এর সূচনা ঘটে রাধামোহন সেনের হাতে। ইনি টপ্পা রচনায়ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩), শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪), কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪) প্রমুখের মননশীল রচনাবলী অবলম্বনেই বাংলায় সঙ্গীতালোচনার প্রকৃত বুনিয়াদ গড়ে উঠে। ভারতীয় সঙ্গীত ও বিশ্বসঙ্গীতের ব্যাপক আলোচনার জন্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অতুলনীয় সম্মান ও যশ অর্জন করেছিলেন।

বাঙালির আধুনিককালের সঙ্গীত-সংস্কৃতির পঞ্চপ্রধান পুরুষের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে যাবার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)-এর কথা বলতেই হবে। বাঙালির

সঙ্গীত-সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি কিছুটা উপেক্ষিত। কিন্তু অতি ব্যাপক তাঁর অবদান। উনিশ শতকের সদ্যবিকশিত বহুমুখী সাঙ্গীতিক প্রেরণাকে তিনিই মূর্ত করে তুলেছিলেন তাঁর নানাবিধ কর্মকাণ্ডে। আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রচলনকারী, গীতিকার, সুরকার, সেতার-বেহালা-পিয়ানো বাদক, সঙ্গীতগবেষক, সঙ্গীতপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, সঙ্গীতসঙ্ঘ স্থাপনকারী ও পরিচালক প্রভৃতি নানা ভূমিকায় তিনি বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক কীর্তি। স্বরলিপি প্রবর্তন নিয়ে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তারই উৎকর্ষ ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আকারমাত্রিক স্বরলিপি প্রবর্তনায়। তদুপরি *স্বরলিপি, গীতিমালা, বীণাবাদিনী, সঙ্গীতপ্রকাশিকা* প্রভৃতি প্রকাশ করে এই স্বরলিপিপদ্ধতির প্রচারের জন্যও তিনি নিরন্তর প্রয়াস চালান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রীতিতে কিছু কিছু পরীক্ষামূলক সুরযোজনার কাজ করলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন রাগসঙ্গীতের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি সেকালের বাংলা গানের প্রচলিত সুরভঙ্গির সংস্কারেও ব্রতী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের প্রথম পর্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গঠিত হয়েছিল। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আরো একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের আগে তিনিই বাংলায় সম্পূর্ণ রচিত সুরের আদর্শ প্রবর্তন করেন। আগেকার যুগে বাংলা শীলিত সঙ্গীতে রাগের সাধারণ রূপ অবলম্বনে গান রচনা করা হতো। গায়ক তাঁর সাধ্যমতো উপস্থিত সুরবিহারের সাহায্যে গায়নকলায় বৈচিত্র্য সম্পাদন করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ রচিত সুরের আদর্শে বাংলা গানের বাণীবন্ধের মর্মানুসারী সুর রচনায় ব্রতী হন। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সুর রচনার এই ধারাকে অসামান্যভাবে ফলপ্রসূ করে তোলেন।

বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে আসার আগে বাংলা নাটকের গান সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। মঞ্চনাটকের শুরু থেকেই যাত্রার ঐতিহ্য অনুসরণে প্রচুর পরিমাণ বাংলা গান রচিত হতে থাকে এবং ক্রমে নাটকের গান ও আবহসঙ্গীতের প্রয়োজনে পেশাদার সুরকার, সঙ্গীতপরিচালক ও গায়কের আবির্ভাব ঘটে। ফলে আবহমান আত্মাভিমুখী বাংলা গানের পটভূমিতে একটি মনোরঞ্জনী ও পেশাদারি মাত্রা যোজিত হয়। ত্রিশের দশকে সবাক চিত্রের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা সঙ্গীতকলার এই পেশাদারি ও জনমনোরঞ্জনী প্রবাহের বিপুল প্রসার ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতায় বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটকের অভিনয় হয়। লেবেদেফ নামে জনৈক রুশ নাগরিক কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিতের সহযোগিতায় *দি ডিজগাইজ* নামে একটি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন এবং নাম দেন 'কাল্পনিক সংবদল'। সেই নাটকে ভারতচন্দ্র রায়ের *বিদ্যাসুন্দর*-এর গান সংযোজিত হয়। নাটকে গান না থাকলে শ্রোতা-দর্শকদের প্রতিক্রিয়া অনুকূল হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় ছিল। কেননা

পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক যাত্রাভিনয় ছিল সর্বাংশেই গীতপ্রধান উপস্থাপনা। তাই অভিনয়পিপাসুদের মধ্যে গান শোনার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছিল। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেমন ইংরেজি নাটকের আদর্শে রচিত ও ১৮৫২ সালে প্রকাশিত তারাচরণ শিকদারের *ভদ্রার্জুন* ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের *কীর্তিবিলাস* নাটক। তারাচরণ ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকে অভিজ্ঞ ছিলেন। যাত্রায় সঙ্গীতের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। সেকথা তিনি তাঁর নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন। তাঁর নাটকে গান প্রাধান্য লাভ করে নি। যোগেন্দ্র গুপ্তও *কীর্তিবিলাস*-এর ভূমিকায় যাত্রায় সঙ্গীতের বাহুল্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে সঙ্গীতরচয়িতা ও আদি বাঙালি যন্ত্রী আশুতোষ দেব সাতু বাবুর কলকাতার বাড়িতে বৈদ্য নন্দকুমার রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা মৌলিক নাটক *অভিজ্ঞান শকুন্তলার* অভিনয় হয়। এই নাটকে গানের ব্যবস্থা ছিল এবং গান রচনা করে দিয়েছিলেন কবিচন্দ্র নামে জনৈক গীতিকার। ১৮৫৮ সালে শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটিকা অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন *রত্নাবলী* রচনা করেন এবং সে বছরেরই জুলাই মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে এর অভিনয় হয়। এই নাটকে বারোটি গান ছিল এবং গান রচনা করে দিয়েছিলেন ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য গুরুদয়াল চৌধুরী। এতগুলো গান কেন যোজনা করতে গেলেন রামনারায়ণ? এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত এই যে, যাত্রার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যাত্রার সঙ্গীতসাফল্যই তাঁকে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। *রত্নাবলীর* বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ লিখেছিলেন :

> যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগের অসীম অশ্রদ্ধা আছে তথাপি এককালে সঙ্গীতমাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সঙ্গীত-সম্পদ নিতান্ত পরিবর্জিত হইলেও তাহাতে রস ও সৌন্দর্যের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। বোধ করি পাঠকমণ্ডলীও এ অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।

এ নাটকের সঙ্গীত পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান বাদন সংগঠন করেন। রাজ্যেশ্বর মিত্রের ধারণা, আখড়াই গানের যন্ত্রবাদনের মাধ্যমেই অর্কেস্ট্রা গঠন প্রচেষ্টার সূত্রপাত।[১৫] সেই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায়ই সঙ্গীতজ্ঞ যদুনাথ পালের সহায়তায় ক্ষেত্রমোহন অর্কেস্ট্রা বাদন সংগঠন করেন। রামনারায়ণের পরবর্তী নাটক *মালতীমাধব*-এর জন্যও বনোয়ারীলাল নামে জনৈক গীতিকার বেশ কয়েকটি গান রচনা করে দেন। জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চেও গীতিপ্রধান নাট্যাভিনয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। সঙ্গীতবিদ ও গীতিকার কালীপ্রসন্ন সিংহ যেসব নাটক রচনা করেন তাতে প্রচুর গান অন্তর্ভুক্ত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তও (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর নাটকে গান ব্যবহারের বেলায় সেকালের শ্রোতা-দর্শকদের অভিরুচির কথা ভেবেই হয়তো যথোচিত সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। যথেষ্ট গান

---

১৫. *The History of Bengal (1757-1905)*, 545.

প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁর নাটকে। তাঁর প্রেমের গানে নিধুবাবুর টপ্পার প্রভাব প্রচুর। সমসাময়িক নাট্যরচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) তাঁর নাটকে গান ব্যবহারের প্রচলিত রীতিকে তেমন প্রশ্রয় দেন নি।

তবে ১৮৭২ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের গৃহে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে আগেকার সৌখিন রঙ্গমঞ্চের তুলনায় নাটকে গানের ব্যবহার আরো বেড়ে যায়। এখন থেকে টিকিট বিক্রি করে পেশাদারি কৌশলে রঙ্গালয় চালাবার উদ্যোগ নেয়া হয়। ফলে শ্রোতা-দর্শকদের আকর্ষণ করার ব্যাপারটিকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হয়। তার জন্য গানের আকর্ষণী শক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যাপারটিকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাছাড়া তখন হিন্দুমেলায় স্বাদেশিক গানের উন্মাদনা চলছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখের নাটকেও দেশাত্মবোধক গানের প্রচুর ব্যবহার ঘটতে দেখা গেল।

প্রায় একই সময়ে গীতাভিনয়ের সূচনা ঘটে। নাট্যাভিনয় ও যাত্রাভিনয়ের সম্মিলনে গড়ে উঠেছিল গীতাভিনয়ের ঐতিহ্য। গীতাভিনয় ছিল গীতমুখ্য উপস্থাপনকলা। নির্মিত মঞ্চ নয়, বরং অস্থায়ী খোলা মঞ্চে একটি যবনিকা সম্বল করে গীতাভিনয় প্রদর্শিত হতো। তৎকালীন বিখ্যাত নাটকগুলিকে কাটছাঁট করে অর্থাৎ গদ্যসংলাপ কমিয়ে দিয়ে তাতে প্রচুর পরিমাণ গান যোজনা করে এই গীতবহুল গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৬৫ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *পদ্মাবতী* নাটকের গীতাভিনয় হয়েছিল। *সংবাদ প্রভাকরে* এর প্রশংসা করা হয় এবং এই গীতবহুল নাট্যোপস্থাপনার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হয়।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য ছিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। সঙ্গীত রচয়িতারূপে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাটকে তিনি প্রচুর পরিমাণে গান ব্যবহার করেছেন এবং নাটকের মুখবন্ধ ও ভাষণাদিতে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বিদেশী নাটকের আদর্শে বাংলা নাটককে গানশূন্য করা কখনোই অভিপ্রেত হতে পারে না, বরং সঙ্গীতগৌরবই বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্য। বাংলা নাটকে গীত সংযোজনের এই যে ধারা, গানের সাহায্যে জনমনোরঞ্জনের এই যে প্রচেষ্টা—একে একেবারে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মনোমোহনের ভাবশিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। তিনি ছিলেন অক্লান্ত গীতরচয়িতা। তাঁর রচিত ১৩৭০টি গানের প্রায় সবই নাটকের গান। এর মধ্যে অনেক গানই মঞ্চের বাইরে সুর ও কাব্যগুণে জনসাধারণের চিত্তে স্থান করে নিতে পেরেছিল। বাংলা মঞ্চকে কেন্দ্র করেই সুরকার-গীতিকার-গায়ক শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। গিরিশ ঘোষের বহু জনপ্রিয় গানের সুর রচনা করেন শশিভূষণ কর্মকার, বৈকুণ্ঠনাথ বসু ও রামতারণ সান্যাল। এঁরা সব ধরনের প্রাচীন ও প্রচলিত বাংলা গানের সুর আহরণ করে গিরিশ ঘোষের গানে যোজনা করেন। ফলে এঁর গান খাঁটি বাংলা সুরভঙ্গির ভাণ্ডারবিশেষে পরিণত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বিশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত যাঁরা নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অভিনেতা ও মঞ্চাধ্যক্ষ। ফলে জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা নাটক রচনা করতেন। তাঁরা প্রচুর পরিমাণে নৃত্যগীতের ব্যবহার করেছেন। যে ধরনের নাটকই হোক, বিষয়বস্তু যাই হোক, গান ব্যবহারে কেউ কোথাও কার্পণ্য করেন নি। এই সময়ে বাংলা নাট্যগীতি রচনায় যাঁরা বিশেষভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০১), অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২), প্রমথনাথ মিত্র, রাধানাথ মিত্র (১৮২৫-১৯২১), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) প্রমুখ।

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই ঐতিহাসিক জমকালো দিনগুলোয় আবির্ভূত হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। তিনি মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। উপরন্তু তাঁর নাট্যপ্রেরণা ছিল বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত। তথাপি নাটকে গানের ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করেন নি তিনি। বরং নাটকে তিনি প্রভূত পরিমাণে গান ব্যবহার করেছেন। নিজে গীতরচয়িতা ছিলেন বলে নাটকে গান ব্যবহারের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। তবে গানকে তিনি নাটকানুসারী করে তুলেছিলেন। সেকালের ব্যাপারটা এমন ছিল যে নাটকের পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবির কারণে না হলেও জনমনোরঞ্জনের জন্য গান শোনাতে হবে এমন একটা ধারা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে গানের ব্যবহারকে নাটকের পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছিলেন এবং অসামান্য সব গান সংযুক্ত করেছিলেন নাটকে, যেগুলো মঞ্চের সীমা অতিক্রম করে বাঙালির চিরকালীন গানের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

সৃজনশীল জীবনের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিনাট্য রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। এর আগে গীতিনাট্য রচনা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কুঞ্জবিহারী বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রাধানাথ মিত্র প্রমুখ। মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়ের গীতাভিনয় তো ছিলই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য পূর্ববর্তী সবকিছুকে অতিক্রম করে বাংলা নাট্যসঙ্গীতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। ক্রমে গীতিনাট্য, ঋতুনাট্য এবং সাধারণ নাটকে প্রচুর পরিমাণ গান ব্যবহারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যগীতিতে এক অসামান্য অধ্যায় সংযোজন করেন।

পরবর্তী যুগের নাট্যকাররাও নাটকে গান ব্যবহারের ধারা অব্যাহত রাখেন। তবে একথা ঠিক, নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারটা ধীরে ধীরেই গুরুত্ব পাচ্ছিল। শ্রোতা-দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছিল অভিনয়কলার কঠিন উপায়ের মাধ্যমে, সহজভাবে গান শুনিয়ে নয়। ত্রিশের দশকেও নাটকে গানের ব্যাপারটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ থেকে যে, সে যুগের অনেক বিখ্যাত নাট্যকারকে দেখি কাজী নজরুল ইসলামকে দিয়ে গান লিখিয়ে নিতে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন ও তৎপরবর্তীকালীন নাট্যকর্মে

যেভাবে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও পাশ্চাত্য শিল্পান্দোলনের অভিঘাত এসে লাগতে থাকে, তাতে সহজ মধুর কল্পনাবিলাস ও তার সহযোগী গানের ব্যবহার কমে যায়। মঞ্চসাফল্যের উপাদান হিসেবে গানের স্থানও নিতান্তই ম্লান হয়ে পড়ে। অভিনয়কলার সহায়ক উপাদান হিসেবে মঞ্চব্যবস্থাপনা, আলোকসম্পাত, শব্দনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারিগরি বিষয়ে বিপুল উৎকর্ষ ঘটে। এইসব কৌশলগত উৎকর্ষ মঞ্চকে বিপুল সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। নাট্যোপস্থাপনা অসামান্যভাবে গতিশীল হয়ে উঠে। বাংলা নাটকের অনেক দিনের পুরনো ধ্যানধারণার রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়। ফলে নাগরিক নাট্যায়োজনে গানের ভূমিকা কমে আসে।

এইভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে এসে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের বিকাশের এক বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের অতি ব্যাপক আয়োজন এবং নানা শাখায় বাংলা গানের বিকাশ এর পটভূমি তৈরি করে। এই যুগরচনার আভাস পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মে, তবে এর পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়ে মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের সারা চল্লিশের দশক এই পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সুবর্ণ যুগ রচনার কাজ চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব এক স্বর্ণোজ্জ্বল ঘটনা। বাংলা কাব্যগীতিকে উৎকর্ষের একটি বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে তিনি যে বিপুল ও বহুমুখী অবদান রাখেন তার মূল্যায়ন আজো শেষ হয় নি। প্রবন্ধে, অভিভাষণে, পত্রে, আলাপ-আলোচনায়, রোজনামচায় একদিকে যেমন তিনি অক্লান্তভাবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন, অপরদিকে আপন সঙ্গীতকর্মে তিনি এর পরমোন্নত রূপটিকেও প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে প্রেম, ব্রহ্মোপাসনা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বাংলা গানের বিকাশের যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার স্বর্ণাভ উত্তরণ ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায়। গভীর ব্যঞ্জনাময় বাণী ও তার মর্মানুসারী সুরের সম্মিলনে বাংলা কাব্যগীতির যে রূপটি তিনি নির্মাণ করেন তা আজো এক অনতিক্রম্য সৌন্দর্যের দ্যুতি ধারণ করে আছে। শ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রায় সমার্থক ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথ যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল বহুমুখী সংস্কৃতিচর্চার এক অসামান্য কেন্দ্রস্থল। সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবস্থান বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)-এর আমলে সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে এই বাড়ির অভ্যুদয় ঘটলেও এর সঙ্গে সাঙ্গীতিক আবহ যুক্ত হয়েছিল আরো আগে, দেবেন্দ্রনাথের পিতামহ রামলোচন ঠাকুর (১৭৫৪-১৮০৭)-এর সময়ে।

রামলোচনের পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতচর্চার ও পৃষ্ঠপোষকতার ঐতিহ্যের সূত্রপাত তাঁর আমল থেকেই। দেবেন্দ্রনাথের আমলে এসে এই ধারা বিশাল আকার ধারণ করে এবং বাংলা কাব্যসঙ্গীত রচনার ও চর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিশু তখন ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে এক মহা প্রস্তুতির পর্ব চলছিল। বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণীরা অধিষ্ঠিত আছেন এই বাড়িতে, আর তাঁদের তত্ত্বাবধানে বয়োজ্যেষ্ঠরা তালিম নিচ্ছেন। প্রথাবদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাঁর সঙ্গীতমানস ঋদ্ধ হয়েছিল প্রধানত গুণীদের সাহচর্যে। অসামান্য আহরণী ক্ষমতা দিয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেন। গীতরচনা ও সুরারোপের পথে রবীন্দ্রনাথকে তিনি অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান। শ্রীকণ্ঠ সিংহ, বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখের শিক্ষা ও সাহচর্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমানস গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

১৮৭৫ সালের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতরচনা শুরু করেন। তবে সমালোচকদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনার কাল হিসেবে ১৮৮১ সালকেই ধরা ভাল, কেননা "এই সময় থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা ক্রমপর্যায় করা সম্ভব, এর পূর্বেকার রচনা বিক্ষিপ্ত এবং সংখ্যায়ও খুব অল্প।"[১৬] সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনাকাল ৬১ বছর বিস্তৃত। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। তিনটি যুগপর্বে এই কালসীমা বিভক্ত। ১৮৮১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রথম যুগ, ১৯০১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ এবং ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তৃতীয় যুগ বিস্তৃত। প্রথম যুগকে বলা হয়েছে প্রস্তুতির যুগ, দ্বিতীয় যুগকে বলা হয়েছে পরীক্ষার যুগ এবং তৃতীয় যুগকে পরিণতির যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের গান সংগৃহীত সুরপ্রভাবিত। দ্বিতীয় যুগে প্রধানত সংগৃহীত সুরপ্রভাবিত গানের ধারা পরিত্যাগ করে তিনি রাগসঙ্গীতের ভিত্তিতে মৌলিক সুর রচনায় ব্রতী হন। লোকসঙ্গীত সম্পর্কেও এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়। রাবীন্দ্রিক তালগুলোও এই যুগে রচিত হয়। তৃতীয় যুগে এসে পাওয়া গেল প্রকৃত রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গীতিমালা। "পরিণত বয়সে নানা পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার শেষে যেসব সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন, এই শেষ যুগে তাই হলো প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসম্মত রবীন্দ্রসঙ্গীত। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এইসব গানই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান।"[১৭] এই যে পরিণত যুগের রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসুরের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুরের মর্মগ্রাহী মিশ্রণে এর সুরভঙ্গিটি গঠিত। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ "সৃষ্টির এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলেন। সে উৎস অতি নিকটেই ছিল, দ্বারের পাশে পল্লী

---

১৬. শুভ গুহঠাকুরতা, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা*, (কলকাতা ১৩৬৬), ৪।

১৭. প্রাগুক্ত, ১২।

গ্রামে। ... নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো তিনি এই পল্লীসঙ্গীত, এই লোকসঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ করলেন। এখানেই তাঁর প্রতিভা। জীবনের সমগ্র ধারাকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে বহমান করানো প্রতিভার কাজ। ... সেই জন্য রবিবাবুর গানের তৃতীয় স্তরে ভাটিয়ালি, বাউলের আগমন লক্ষ্য করি। এই যুগের গানে দরবারী সুরপদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়ালি- বাউলের মিশ্রণ হয়েছে। ... এই যুগের গানই তাঁর গানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। লোকসঙ্গীতের গ্রাম্যতা, তার অসংযত আবেগ ও চীৎকার যেমন এর মধ্যে নেই, তেমনি দরবারী সঙ্গীতের অজস্র তানের ও তালের নিরর্থক গুণ্ডামিও এর মধ্যে নেই। অথচ তাদের সদগুণ সবই রয়েছে, আনন্দের সব উচ্চাঙ্গের উপাদানই রয়েছে, রয়েছে লোকসঙ্গীতের ভাবসম্পদ এবং দরবারী সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য, ভদ্রতা ও শালীনতা।"[১৮]

গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলোকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম ও প্রকৃতি এই চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক নামে দুটি বিভাগও রয়েছে। পূজা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সাড়ে ছয়শত গান রচনা করেন। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারায়ই পূজা পর্যায়ের সঙ্গীতরচয়িতারূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। বিপুল সংখ্যক বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতাকে নিরাকার ব্রহ্মের স্তবগান রচনা করতে দেখা যায়। তবে এই গীতধারার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। সুর ও বাণীর উৎকর্ষে এই গানের ভিতর দিয়ে বাংলা ভক্তিগীতির কালজয়ী রূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঈশ্বরানুগত্যের গভীর অনুভব এই গানে এমন সুষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, তা বিশ্বাসী মানুষ মাত্রকেই অনুপ্রাণিত করে। তাই ব্রাহ্ম আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মস্তবসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নি। এ গান সাম্প্রদায়িক প্রার্থনাসঙ্গীতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি। একেশ্বরবোধের প্রমূর্ত সাঙ্গীতিক বাণীরূপে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত কালোত্তীর্ণ গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

স্বদেশ পর্যায়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত সংখ্যায় অল্প। স্বদেশী আবহে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার সূত্রপাত ঘটলেও এবং চিন্তায় ও কর্মে দেশহিতৈষণার গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে থাকলেও কবি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন সর্বমোট ৭০টির বেশি নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বেই (১৯০৫-১৯১১) রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক গান রচনায় সর্বাধিক মনোনিবেশ করেন। দু'একটি গানের কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সব উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গানই এই সময়ে রচিত। এসব গীতরচনার প্রধানবৈশিষ্ট্য এই যে, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রচিত হলেও আন্দোলনের সাময়িকতা এদের গ্রাস করতে পারে নি। দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি এসব গানে গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে। ফলে এ গান আন্দোলনের সাময়িকতাকে অতিক্রম করে বাঙালির চিরকালীন স্বদেশসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। এ যুগে রচিত অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে বাউল

---

১৮. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কথা ও সুর*, (কলকাতা ১৩৯০), ৫০।

সুরের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। দেশাত্মবোধক গীতিরচনাকে দেশের আবহমান সঙ্গীতে গ্রথিত করার মধ্যে যে কী গভীর জনসংলগ্নতার মাত্রা থাকে, তা রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক লোকজ আঙ্গিকের গানে উপলব্ধি করা যায়। পূর্ববর্তী যুগের রাগসঙ্গীত, বিশেষকরে খেয়াল ও টপ্পার সঙ্গে দেশাত্মবোধক গান রচনার ধারা থেকে রবীন্দ্রনাথের এই পদক্ষেপটি এক গভীর ব্যতিক্রম। এর ফলে বাংলা দেশাত্মবোধক গান রচনার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যময় সাঙ্গীতিকতার মাত্রা যোজিত হয় এবং তা পরবর্তী যুগের দেশাত্মবোধক গান রচনার প্রবাহকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

বাংলা কাব্যগীতির ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতালোচকরা একে বলেছেন ঋতুসঙ্গীত। ষড়ঋতুতে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে লীলাবৈচিত্র্য তা রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীতে যেমনটি রূপায়িত হয়েছে তেমন আর কারো রচনায় পাওয়া যায় না। এ শুধু আকাশে বাতাসে তরুলতায় পুষ্পপল্লবে ঋতুক্রমে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আসে তার রূপায়ণ মাত্র নয়, ঋতুক্রমে সংবেদী হৃদয়ের পরিবর্তনশীল ভাবোচ্ছ্বাসকেও এই গীতিমালায় সম্যক আস্বাদন করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক অতি গভীর। সব শ্রেণীর গানেই প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে মানবহৃদয়ের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। রাগসঙ্গীত পরিকল্পনায়ও প্রকৃতির গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতির কোলে লালিত। প্রকৃতির স্পন্দন মানুষের প্রাণে ও গানে আপনিতেই ধ্বনিত হয়ে উঠতো। নাগরিক সভ্যতার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকলো। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লুপ্তপ্রায় সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে তাকে গভীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর গানে; ঋতুউৎসবের প্রবর্তন করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রুদ্ধপ্রায় বাতায়নগুলোকে খুলে দিয়েছেন।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ কথাটির উপর যে, মানুষের জন্ম কেবল লোকালয়ে নয়, বিশাল বিশ্বে তার জন্ম; মানুষের চিত্তমহলের দ্বার খুলে বিশ্বপ্রকৃতিকে আহ্বান না করলে বিরাটের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলনসাধনের বড় উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎসব, প্রকৃতির গান ; গানের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির বিপুলতাকে, এর সজীব গভীর প্রভাবকে যতোটা উপলব্ধি করা যায় আর কোন কিছুতেই ততোটা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর ভাষায় :

> প্রকৃতির সঙ্গে গানের যতো নিকট-সম্পর্ক এমন আর কিছু না—আমি নিশ্চয় জানি এখন যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি, তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূর বিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি, .. কথাতো ওই একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্যনূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।[১৯]

---

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা,* (কলকাতা ১৯৬৬), ১৯৮।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে বাংলার ষড়ঋতুর লীলার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে আভ্যন্তর ছন্দটি বিকশিত হয়ে উঠছে তাকে আমরা নিবিড় করে পাই। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি ঋতুউৎসব, তাঁর অজস্র প্রকৃতির গান আমাদের মধ্যে এই বোধটিকেই তীব্র করে তোলে যে, মানবপ্রকৃতি আর বিশ্বপ্রকৃতি একটি অখণ্ড সূত্রে গাঁথা। প্রকৃতি বিষয়ক রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা তিনশ'র মতো। এর উপর রয়েছে শতাধিক ঋতুকালীন প্রেমসঙ্গীত। এদের সমবায়েই বাংলা প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সর্বোত্তম রূপটি গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ভুক্ত গানের সংখ্যা চারশ'র উপর। সংখ্যার দিক থেকে পূজাপর্যায়ের গানের পরই এর স্থান। প্রেমসঙ্গীত রচনার ধারাটি রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার প্রথম যুগ থেকে শেষ যুগ অবধি বিস্তৃত। এর মধ্যে কি সঙ্গীতে, কি বিষয়বস্তুতে আমরা একটা ক্রমোত্তরণ লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমদিককার গানে আমরা ব্যক্তির ভালবাসাকে পাই, তার একান্ত হৃদয়বেদনাকে পাই, আমাদের পরিচিত জীবনাবেষ্টনীকে পাই, যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সেখানে অনুভব করা যায়। কিন্তু শেষের দিকের গানে এমন আর পাওয়া যায় না। সেখানে ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তায় লীন হয়ে যায়, বিশেষ নির্বিশেষ হয়ে উঠে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে ব্যক্তিসত্তার স্থুল উপস্থিতি ছিল না কখনোই, কিন্তু পরিণত রচনায় ব্যক্তির প্রাণস্পন্দনের চেয়ে নিখিল মানবের প্রাণস্পন্দনই বেজে উঠে অতি গভীরভাবে। অনাবশ্যক হলেও প্রথম জীবনের গানে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সূত্রসন্ধান করে তাদের কোন না কোন পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা যায়, করলে তার এক রকম জৈবনিক অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু পরিণত যুগের গানে সে সূত্র অনাবশ্যক, সেখানে জীবনের চিরকালীন সূত্রটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। সে গান নির্বিশেষ ভালবাসার গান। যাকে উদ্দেশ করে সে গান রচিত হয়েছে, তিনি পরম আকাঙ্ক্ষিতা, কিন্তু অপ্রাপণীয়া। তাঁকে পেলে হয়তো জীবনের অনেক দুঃখ ঘোচে, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি চিরবিচ্ছেদের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা। প্রেমের গান পরিণামে দুঃখেরই গান, বিচ্ছেদেরই বাষ্পাকুল কথামালা। এই অশ্রুবাষ্প জমে উঠেছিল রামনিধি গুপ্তের গানে, রবীন্দ্রনাথের গানে তা বর্ষণ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান বেদনারই প্রমূর্ত বাণী। কোন কোন প্রেমের গানের ব্যঞ্জনা এমন হয়ে উঠেছে যে, সে গানের সঙ্গে পূজার গানের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁর বিচ্ছেদে কবির অন্তরাত্মা কাতর, তিনি যেন কোন অনির্দেশ্য রমণীসত্তা নন, যেন কবির জীবনদেবতা তিনি, যেন ব্রহ্মসঙ্গীতের জীবননাথ— এমনও ঘটে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন প্রেমের গানে।

ব্রহ্মসঙ্গীতের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানেও একটি উল্লেখযোগ্য সাঙ্গীতিক ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিককার সংগৃহীত সুরপ্রভাবিত গানের স্তর অতিক্রম করে এই গান রাগসঙ্গীতের কাঠামোয় মৌলিক সুর রচনার স্তরে এসে দাঁড়ায়। তারপর আসে পরিণত রবীন্দ্রসুর রচনার পালা, যে যুগে প্রেমের গানগুলোয় সহজ সুরের বাঁধুনীতে এক অসামান্য আর্তির রূপায়ণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গানগুলো বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অসামান্য গুরুত্ব লাভ করেছে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর যে গান আছে, গানের সংযোজনেও এসব অনুষ্ঠানে যে নতুন মাত্রা যোজিত হতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন করে জানালেন এসব রচনায়। নববর্ষ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, শিল্পোৎসব, বিবাহ, জন্মোৎসব, মৃত্যুশোকপালন প্রভৃতি উপলক্ষসহ নানা অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ যেসব গান রচনা করেছেন সেগুলো বাঙালির জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক আদর্শ ছিল ধ্রুপদীয়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন, "এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—এক দিকে তার বিপুলতা-গভীরতা, আর এক দিকে তার আত্মদমন, সুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।"[২০] গভীরতা, আত্মদমন ও সুসঙ্গতি এই তিনটি ধ্রুপদীয় বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল। বাণীবন্ধের গভীরতম আকুতিকে প্রকাশ করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাবীন্দ্রিক সাঙ্গীতিকতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এজন্যই খেয়াল, টপ্পা বা ঠুংরির নির্বাধ সুরবিহারের পথ ত্যাগ করে কবি ধ্রুপদীয় আত্মদমন ও সুসঙ্গতির পথ অবলম্বন করেছিলেন। পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সুরযোজনার ক্ষেত্রে তা দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ সঙ্গীতের স্তবক বিন্যাসরীতিকেও ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতেই স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগক্রমে চার স্তবকবিশিষ্ট আধুনিক বাংলা এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আগেকার বাংলা গীতরচনার রীতি ছিল সাঙ্গীতিক বিবেচনায় দুই স্তবকে বিভক্ত। গানের পদ দুইয়ের বেশি স্তবকে রচিত হলেও সঙ্গীতের দিক থেকে তা ছিল স্থায়ী ও অন্তরাক্রমে গঠিত। রবীন্দ্রনাথই চার স্তবকে গান রচনার প্রামাণ্য রূপটির প্রতিষ্ঠা দান করেন।

এমনিভাবে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যসঙ্গীতসাধনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় এসে এক উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করে। বাণী রচনায় ও সুরারোপণে বাংলা গানকে তিনি যে জায়গায় পেয়েছিলেন তা থেকে প্রায় একক প্রচেষ্টায় উৎকর্ষের এমন এক স্তরে একে উত্তীর্ণ করেছিলেন যে, ভাবতে বিস্ময় লাগে। একদিকে ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা যেমন তাঁর মধ্যে এসে সুবর্ণপ্রসূ হয়ে উঠেছিল, অপরদিকে প্রেমসঙ্গীতের ধারাটিও তাঁর রচনায় পরমোন্নত রূপ লাভ করেছিল। বাংলা প্রকৃতির গান তাঁরই অনন্য অবদান। পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের সামনে ছিল এই বিপুল রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রসঙ্গীতকলা পরবর্তীকালের জন্য আলোকবর্তিকারূপে কাজ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্মাতা দ্বিজেন্দ্রলাল। দেশাত্মবোধ, প্রেম ও হাস্য এই তিনটি বিষয় অবলম্বনেই প্রধানত তিনি গান রচনা করেন। কতিপয়

---

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, ১৬৫।

ভক্তিগীতিও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) ছিলেন অন্যতম আদি বাঙালি খেয়ালগায়ক ও খেয়াল অঙ্গে গীতরচয়িতা। বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছরের ছোট হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর চেয়ে ২৮ বছর আগে মারা যান এবং তাঁর পরিণত সঙ্গীতজীবনও রবীন্দ্রনাথের পরিণত রচনা পর্যায়ের অনেক আগেই শুরু হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতভঙ্গিকে অত্যন্ত রসসম্মতভাবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অঙ্গগত করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছেন। দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে সাধিত পূর্ব ও পশ্চিমের এই সমন্বয় বিশেষ দ্যোতনাবাহী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুরের ক্রমোত্থান ও ক্রমপতনের ভঙ্গিটি বাংলা গানের সুরযোজনার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। কালিদাস রায় অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন এ সম্পর্কে :

> সঙ্গীতের এই প্রাণোচ্ছল শক্তি আমাদের দেশে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রাণশক্তি ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সঞ্চার করেছেন। এই গীতগুলির অধিকাংশই কোরাস গর্ভগীত। এই গানগুলি যখন নানা রঙ্গমঞ্চে গাওয়া হত, তাতে উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হত। যে-সভামণ্ডপে গাওয়া হত সে-মণ্ডপ যেন গম্বুজের তলের মতো গম গম করত, যে পথে গাওয়া হত সে পথ যেন সুরগঙ্গায় পরিণত হত। ... বিলাতি সুরে যাকে বলে movement, তা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম এদেশের সুরে প্রবর্তন করেন। আমাদের দেশে সুরের বিস্তার হয় সচরাচর ধীরে সুস্থে, উদ্দীপনা বা উন্মাদনায় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালই লক্ষ্য করেন উন্মাদনার বা মাতামাতিরও সার্থকতা আছে—এতে স্বরগ্রামের পরিধি বা পরিসর বিস্তৃত হয় এবং এতে সুরের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়।[২১]

রাগসঙ্গীতের রূপবন্ধে পাশ্চাত্য কোরাসভঙ্গিম গায়নকলার প্রয়োগ দ্বিজেন্দ্রলালকে অভাবিত সাফল্য এনে দেয়। তিনি সামরিক মার্চ সঙ্গীতের ঢঙে সুরযোজনার ক্ষেত্রেও পথিকৃতের কর্ম সম্পাদন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানে বাণীরচনা ও সুরনির্মাণ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর গভীর সৃজনশীল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাগসুর ছিল তাঁর সুর রচনার ভিত্তি। কিন্তু প্রথাগত, প্রচলিত রাগসুরের অনুবর্তনকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তিনি রাগসুরের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই নতুন স্বর সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি টপ্পার ঢঙ এনেছেন, খেয়ালের ঢঙ এনেছেন, টপ্পায় ও খেয়ালে মিশিয়ে টপখেয়ালের ঢঙ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সর্বত্রই একটি স্বকীয়তা, বাণীবন্ধের মর্মানুসারিতার আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের আগে এই সুরপ্রক্রিয়ার বিষয়টি দ্বিজেন্দ্রলালেই সবচেয়ে প্রবলভাবে পাওয়া গিয়েছিল। হাস্যগীতি রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা হাস্যগীতির তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার এবং হাস্যরসাত্মক সঙ্গীতরচয়িতারূপেই বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ উভয় শ্রেণীর গানেই তাঁর সমতুল্য দক্ষতা ছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতভঙ্গিকে তিনি অসাধারণ কৌশলে তাঁর হাসির গানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে কালিদাস রায়ের মূল্যায়ন :

---

২১. কালিদাস রায়, 'প্রাককথন', দিলীপকুমার রায় সম্পাদিত, *দ্বিজেন্দ্র কাব্যসঞ্চয়ন*, (কলকাতা ১৯৬৯), ধ

> সুরকার হিসেবে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয় প্রথম হাসির গানে। এইসব গানে বাঙালির হৃদয়ের সহজ মাধুর্যের সঙ্গে বিলাতি সুরের প্রাণ-প্রাচুর্য সম্মিলিত হয়ে সকলকে চমকিত করেছিল। ... কবি নিজে যখন এই সব গান গাইতেন তখন হাসতে হাসতে সকলের বুকে পিঠে খিল ধরে যেত। তা কি শুধু কথার জন্য ? দরাজ উদীরিত সুরের জন্যই প্রধানত। গানগুলি শুধু পড়লেই হাসি পায়। আবৃত্তি শুনলে সে হাসির উদ্দীপনা বাড়ে, কিন্তু এর আসল সুরে গাওয়া শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়তে হয়। সুরকার কবি নিজে যখন গাইতেন তখন অট্টহাস্য রোধ করা কঠিন হত। বাণী ও সুরের অপূর্ব সম্মিলন যে কী অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারত তা এদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল।[২২]

গীতরচনা ও সুরকৃতিতে দূরপ্রসারী অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে যে স্থানটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রাপ্য ছিল তা তিনি পান নি। তাঁর সমকালে রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাবই এর প্রধান কারণ। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রগীতির সংরক্ষা, প্রচার ও মূল্যায়নের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ না থাকায় তা সঙ্গীতের প্রবহমান জনরুচি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলা কাব্যসঙ্গীতকে আধুনিক ও অন্তর্মুখী করে তোলার ক্ষেত্রে এবং এর সঙ্গে বিশ্বসঙ্গীতকে মেলাবার ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)

বাংলা কাব্যগীতির ইতিহাসে রজনীকান্ত সেন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। সুমধুর ভক্তিসঙ্গীত ও উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাত্মবোধক গান রচনার জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ সেন কবি ও গীতরচয়িতারূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই রজনীকান্ত গীত রচনায় ও গান গাওয়ায় আগ্রহ প্রদর্শন করেন। আইনজীবীরূপে রাজশাহীতে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর থেকেই তিনি সঙ্গীতকার ও গায়করূপে সুখ্যাত হন। ১৮৯৪ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজশাহী শহরে যান। সেখানে তাঁর মুখে হাসির গান শুনে রজনীকান্ত এই গানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন ও হাস্যগীতি রচনায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে (১৯০৫) সারা বাংলায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার যে বিপুল জোয়ার আসে রজনীকান্ত তাতে অংশগ্রহণ করেন। রজনীকান্ত সেনের জীবনে এর পর পরই বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে। পুত্র ও কন্যাবিয়োগের যন্ত্রণা সহ্য করে উঠতে না উঠতেই তিনি প্রথমে মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও পরে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীতরচনায় বিরাম ঘটে নি তখনো। কণ্ঠ রুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি গানও গেয়ে চলেছেন। রজনীকান্তের কবিতা ও গীতিসঙ্কলন গ্রন্থের সংখ্যা আট। তিনি তিনশ'র মতো গান রচনা করেন।

হাস্যগীতি, দেশাত্মবোধক গান ও ভক্তিগীতি এই তিন প্রধান শ্রেণীতে রজনীকান্ত সেনের গান বিভক্ত। রজনীকান্তের হাসির গান বর্তমানকালে গাওয়া হয় না বললেই চলে।

---

২২. কালিদাস রায়, প্রাগুক্ত, ঐ।

দেশাত্মবোধক গীত রচনার মধ্যে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি বর্তমান কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশাত্মবোধক গানে যেসব বিষয়ের সমাবেশ ঘটে সেগুলোর অধিকাংশই রজনীকান্তের রচনায় রূপায়িত হয়। তবে বিদেশী পণ্যবর্জনের ধারণাকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করে। "এই একটিমাত্র গানই বাঙালিকে দেশজ শিল্পের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করে। এই একটি মাত্র গানেই রজনীকান্ত দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন।"[২৩] রজনীকান্ত রচিত 'আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট', 'ফুলার কল্লে হুকুম জারি' গান দুটি ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল।

বাংলা কাব্যগীতির ধারায় ভক্তিগীতি রচয়িতারূপেই রজনীকান্ত সেনের মুখ্য প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণের এমন বিনম্র মধুর গান খুব কমই রচিত হয়েছে। অমৃততৃষ্ণার এমন ব্যাকুলতা, পরম সান্ত্বনা, পরম নির্ভরের এমন গীতরূপ বাংলা ভাষায় কমই দেখা যায়। দুঃখ যতো বেশি পেয়েছেন, যন্ত্রণা যতো গভীর হয়েছে, ঐশী করুণাকে তিনি ততোই নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। কোন অভিমান নেই, কোন ক্ষোভ নেই, জীবনে দুঃসহ বিপর্যয়কেও তিনি ঈশ্বরের দয়া হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সেই বোধকেই রূপায়িত করেছেন এক একটি গানে। 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর', 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে', 'আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু', 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়', 'তোমারি দেওয়া প্রাণে', 'আমি সকল কাজের পাই হে সময়', 'পাতকী বলিয়ে কি গো', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব' প্রভৃতি ভক্তিগীতিতে রজনীকান্ত নিত্যস্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন : "একথা বলিলে কুটিল ভবিষ্যদ্বাণী করা হইবে না যে, কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তিপদাবলীর জাহ্নবীতে যে-একটি চিরসলিলা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা অবিনশ্বর।"[২৪]

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)

বাংলা কাব্যগীতির সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনের পাশেই অতুলপ্রসাদ সেনের আসন। তিনি নানাভাবে বাংলা কাব্যগীতিপ্রবাহকে সমৃদ্ধিদান করেছিলেন। তবে হিন্দুস্থানী গানের ঢঙকে গভীর রসবত্তার সাথে বাংলা গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারটিকে তাঁর বিশেষ অবদানরূপে বিবেচনা করা হয়। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ঠুংরি গানের মনোরম চালকে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অঙ্গগত করে তিনি একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন।

---

২৩. রজনীকান্ত সেন, *কান্তকবি রচনা সম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, (কলকাতা ১৩৬৯)।

২৪. *কান্তকবি রচনাসম্ভার*।

ঢাকার লক্ষ্মীবাজার অঞ্চলে অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম। মাদারীপুর জেলার মগরগ্রামে তাঁদের আদি নিবাস। পিতা রামপ্রসাদ সেন, মাতা হেমন্তশশী দেবী। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে অতুলপ্রসাদ মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। কালীনারায়ণ ছিলেন ভক্তিগীতি রচয়িতা ও গায়ক। তাঁর সাহচর্য অতুলপ্রসাদকে সঙ্গীতের পথে আসতে অনুপ্রাণিত করে। ১৮৯০ সালে অতুলপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। কিছুদিন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করে তিনি ইংল্যান্ড যান ও সেখান থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতায় ও রংপুরে কিছুকাল আইনব্যবসা করে তিনি লখনৌ যান ও সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। অবশেষে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্গসংস্কৃতিতে অতুলপ্রসাদের শ্রেষ্ঠতম দান তাঁর গানগুলো লখনৌয়ে রচিত হয়। কর্মব্যস্ত ও বেদনাবিদ্ধ জীবনে সঙ্গীতই ছিল তাঁর অন্তরতম অবলম্বন এবং প্রাণের গভীরতম আকুতিটি তিনি গানেই প্রকাশ করে রেখে গেছেন।

অতুলপ্রসাদরচিত গানের সংখ্যা বেশি নয়। তিনি ২১০টির মতো গান রচনা করেছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে। দেবতা, প্রকৃতি, মানব, স্বদেশ প্রভৃতি বিবিধ পর্যায়ে গানগুলো বিভক্ত। গানের শ্রেণীকরণে তিনি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অতুলপ্রসাদের গানে দুটি সাঙ্গীতিক ধারার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারাটি হচ্ছে হিন্দুস্থানী, বিশেষকরে ঠুংরি। অতুলপ্রসাদ বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ঠুংরির সাঙ্গীতিকতাকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে বাউল ও কীর্তনের। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাউল-কীর্তনের সুরঢঙকে জারিত করে তাঁর গানে প্রয়োগ করেছিলেন, অতুলপ্রসাদও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

দেশপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি ও নরনারীর ভালবাসা হচ্ছে অতুলপ্রসাদের গানের প্রধান বিষয়বস্তু। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পর্যায়ে তিনি ১৪টি গান রচনা করেন। দেশের অতীত গৌরবের উপস্থাপনা, বর্তমান দুরবস্থায় খেদ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য উৎসাহ, মাতৃভাষাপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি প্রচলিত বিষয় অবলম্বনেই অতুলপ্রসাদ দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন। মাতৃভাষাপ্রীতির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা গানটি (মোদের গরব মোদের আশা) তাঁর রচনা। সাম্প্রদায়িক প্রীতি তথা হিন্দু-মুসলিম প্রীতির পটভূমিতে রামপ্রসাদী সুরে অতুলপ্রসাদরচিত 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে' গানটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথরচিত ও প্রসাদী সুরে গ্রথিত মিলন গান দ্বারা এক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অতুলপ্রসাদ সেন ৫৫টি ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। এই পর্যায়ের গানে বাউল ও কীর্তনাঙ্গ সুরের যেমন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটেছে, তেমনি এক ধরনের মরমী আকুলতা অধিকাংশ গানেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। রাগসঙ্গীতাঙ্গে রচিত গানগুলোতেও এই ধরনের আকুলতার প্রকাশ

ঘটতে দেখা যায়। এ ছিল অতুলপ্রসাদ সেনের বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশরীতি। তাঁর সঙ্গীতকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে সহজ, মধুর ও আকুলতামিশ্রিত প্রকাশভঙ্গিতে। তাঁর ভক্তিসঙ্গীতে এই সহজ, মরমী মাধুর্যেরই চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। নরনারীর ভালবাসা নিয়ে রচিত অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা ১০০-র উপর। "অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে আছে প্রিয়সঙ্গবিহীন করুণ আর্তি। ব্যক্তিজীবনে তিনি অসফলপ্রণয় ভিক্ষু। মিলনাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি তাঁর স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়। তাই তাঁর গানে যৌবনের স্বপ্নবিলাস নেই, বেদনা আছে, নেই আন্দোলিত বায়ুহিল্লোলে কামনার উল্লাস, রয়েছে নিঃসঙ্গতার নিঃশব্দময় দীর্ঘশ্বাস, কুলপ্লাবিত ধারাজল, বাদল রাতের তমসা আর বুকভাঙ্গা এক রাশ অভিমান।"[২৫] বাংলা প্রেমের গানের যে চিরন্তন বিষয় অর্থাৎ বিচ্ছেদবোধ, তাকেই অতুলপ্রসাদ রূপায়িত করেছিলেন স্বকীয় সঙ্গীতভঙ্গিতে, যা ছিল ঠুংরির নির্যাসে তৈরি; খেয়াল বা লোকসঙ্গীতের ঢঙও যখন এসে এই গানে মিশেছে, তখনও অতুলপ্রসাদের নিজস্ব সঙ্গীতভঙ্গিকে সহজেই চিনে নেয়া যায়, আকুলতা ও সহজ সৌকর্য যার প্রধান বিষয়। অতুলপ্রসাদ সেন দীর্ঘকাল বিলেতে ছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মতো পাশ্চাত্য সঙ্গীতকলাকে তিনি কখনো নিজের সঙ্গীতকর্মে ব্যবহার করেন নি। হিন্দুস্থানী লঘু রাগসঙ্গীত ও বাংলা লোকসঙ্গীত, বিশেষকরে বাউল ও কীর্তনের সুর ভেঙেই তিনি গান রচনা করেছেন। অনেক দিক থেকে তিনি সঙ্গীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সমীপবর্তী, কিন্তু অনেক দিক থেকে পৃথকও। এক ধরনের লঘু রাগসাঙ্গীতিক চালের মধ্যে তাঁর সঙ্গীতব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল একালের বাংলা গানের পঞ্চ প্রধান নির্মাতার মধ্যে অতুলপ্রসাদই গানকে তাঁর আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর গানের স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম দুই প্রধান বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতা এবং এঁদের রচনাকর্মই বাঙালির সঙ্গীতাকাঙ্ক্ষায় এখনো পর্যন্ত সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক। সঙ্গীত-সংস্কৃতির অতি প্রবল রবীন্দ্রযুগের মধ্যাহ্নকালেই নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এবং আবির্ভাবমাত্রই যেমন কবিতায়, তেমনি গানে নজরুল তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র অনেক, এর জন্য নজরুলের গৌরবও বিপুল। তবে এই দুই মহান সঙ্গীতরচয়িতার অবদানের সমগ্রতায়ই আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপের প্রতিষ্ঠা।

কৈশোরেই নজরুলের কবিত্ব ও সঙ্গীতপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। লেটোর দলের জন্য গান রচনার ভিতর দিয়েই নজরুল প্রাথমিক সঙ্গীতখ্যাতি লাভ করেন। সেসময় তিনি নানা

২৫. কনক দাস, 'অতুলপ্রসাদের গান', সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, *দেশ বিনোদন*, (কলকাতা ১৩৯১), ৬০।

ধরনের গান ছাড়াও কয়েকটি পালা রচনা করেন। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধশেষে করাচি থেকে কলকাতা ফেরার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে নজরুল ইসলামের সঙ্গীতকর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায়।

নজরুলের সঙ্গীতজীবনকে যদি কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়, তাহলে প্রথম পর্বটি হয় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচনামূলক। কবি সারাজীবনই কম-বেশি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন, তবে প্রথম পর্বে তিনি প্রধানত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচয়িতা। এই গীতিধারায় তিনি এক মহান যুগস্রষ্টারূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বহুবিস্তৃত অবদান সমকালে যেমন বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছে, পরবর্তীকালেও তা জনপ্রিয়তার সাথে গীত হয়েছে এবং নব সঙ্গীতপ্রয়াসে প্রেরণার উৎসরূপে গৃহীত হয়েছে। পরাধীনতাসহ নানা সামাজিক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মাধ্যম হিসেবে নজরুল তাঁর গানকে ভাষায়, ছন্দে এবং সুরে আবেদনের এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, সে গান সমকালকে অতিক্রম করে দেশবোধের স্থায়ী গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছে। যেসব গান বাঙালির চিরকালীন স্বদেশসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে সেসবের মধ্যে সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বিচারে কাজী নজরুল ইসলামের গানই সর্বাধিক।

বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুল যখন আবির্ভূত হন, তখন এ ক্ষেত্র থেকে প্রধান বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতাদের প্রস্থানের ফলে একদিকে যেমন শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে পূর্বরচিত গানগুলোও তখনকার বৃটিশবিরোধী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মর্মজ্বালাকে তেমন উপস্থাপিত করতে পারছিল না। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ নজরুল খুব সহজেই সেই অগ্নিক্ষরাকালের স্পন্দনকে তাঁর গানে তুলে ধরতে সক্ষম হলেন। বাংলা গানে বীররস রূপায়ণের এক নতুন যুগের সূচনা ঘটলো।

বক্তব্য প্রকাশের বিবেচনায় নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমন দেশবন্দনামূলক গান, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, নারীজাগরণমূলক গান, মুসলিম জাগরণমূলক গান, দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের আবহমান ধারায় নজরুল যেমন গান রচনা করেছেন, তেমনি নতুন কয়েকটি ধারাও তিনি সংযোজন করেছেন। পূর্বতন ধারাগুলোও তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্যে নতুন মাত্রা ধারণ করে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান নজরুলরচনায় বীররসের উন্মাদনাময় রূপায়ণে এক নতুন সংগ্রামী মাত্রা লাভ করেছে। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের বিশিষ্ট সংযোজন। হিন্দুমেলা যুগ থেকেই পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে নজরুলই বলতে গেলে বাংলায় প্রথম

গান রচনা করেন। এ ব্যাপারে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাঁকে বিশেষ প্রেরণা দান করে। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরই নজরুল এসব গান রচনা করেন। এসব গানের ভিতর দিয়ে তাঁর শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়। সাম্যবাদী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদ নজরুলের এক বিশিষ্ট অবদান। চল্লিশের দশকের শুরুতে সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণায় শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে গণনাট্যের মঞ্চ থেকে এক ধরনের গান গাওয়া হতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখ গীতিকার-সুরকার এই শ্রেণীর গান রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাম্যবাদী আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যগুলোই এইসব গানে প্রচারিত হতে থাকে। এই গানের নাম হয় 'গণসঙ্গীত'। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা লক্ষ্য করা যায় তখন থেকে। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শোষিত শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও শান্তির আকাঙ্ক্ষাও গণসঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে উঠে। গণনাট্যসঙ্ঘকে কেন্দ্র করে যদিও বাংলা গানের এই বিশিষ্ট ধারার বিকাশ, কিন্তু এর পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় কাজী নজরুল ইসলামের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে। গণসঙ্গীতের প্রধান আকাঙ্ক্ষাগুলো নজরুলের গানেই প্রথম রূপায়িত হয়। সেজন্য বাংলায় গণসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে নজরুলের রচনায় আমাদের পৌঁছতেই হয়।

নজরুল ইসলামের কিছু সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান মুসলিম জাগরণমূলক গান হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এইসব গানে তিনি নির্দিষ্টভাবে মুসলিম সমাজের প্রতি জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় মুসলিম জাগরণমূলক সঙ্গীতকর্মকে একটি নবধারার রচনার সূত্রপাতরূপে গণ্য করা যায়। নজরুলের আগে আর কোন প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি কবি মুসলিম জাগরণের বিষয় অবলম্বনে এমন প্রেরণাদায়ক সঙ্গীতমালা রচনা করেন নি। হিন্দুমেলা যুগ থেকে স্বদেশী যুগ পর্যন্ত সমাজজাগরণের গান রচিত হয়েছে প্রচুর। পূর্বগৌরবের উপস্থাপনে, আদর্শ ও ঐতিহ্যের সন্ধানে সেসব গানের ভিতর দিয়ে যে জাতীয় ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তার প্রায় সর্বাংশেই ছিল হিন্দু। ফলে জাগরণের সাধারণ আহ্বান জানানো হলেও মুসলমান সমাজের কোন প্রতিনিধিত্ব সেখানে ছিল না। তাই একটা শূন্যতা থেকেই যাচ্ছিল। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে বিরাজিত এই শূন্যতা মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন নজরুল। সাধারণভাবে রচিত তাঁর যে জাগরণী সঙ্গীত, তাতে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান তো জানালেনই, তাতে মুসলিম সমাজকেও উদ্বুদ্ধ করা হলো; আবার শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের প্রতি জেগে উঠবার আহ্বান ধ্বনিত করেও গান রচনা করলেন তিনি। এর ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। আধুনিক জীবনের আলোকে সংগ্রামের রক্তাক্ত আহ্বানে জেগে উঠবার জন্য বাঙালি মুসলমান সমাজকে অনুপ্রাণিত করার যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মুসলমানদের সামাজিক প্রগতির জন্য নজরুলের এই উদ্দীপনাময় সঙ্গীত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

বাংলা দেশাত্মবোধক গানের যে অংশটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান হিসেবে খ্যাত, তাতেও কাজী নজরুল ইসলাম বিশিষ্ট অবদান রেখেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনকে নজরুল তাঁর জীবনের অন্যতম মহান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালি কবি ও সঙ্গীতরচয়িতাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আকুতি তাঁর রচনায়ই সর্বোচ্চ রূপ লাভ করে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির ধারা দুটিকে তিনি তাঁর সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেই মিলিত ধারাটিকে উচ্ছ্রিত করে তুলেছিলেন নানা ধরনের রচনায়, বিশেষ করে কবিতায় ও গানে। আর কোন বাঙালি কবির মধ্যে এই ঘটনাটি এমন প্রবলভাবে ঘটে নি। আর কেউ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আদর্শকে সামনে রেখে নিজ রচনাকে উভয় সংস্কৃতির সহাবস্থানের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন নি। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সূচনাকাল থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে গান রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণা ছিল এই শ্রেণীর গানের মূল উদ্দিষ্ট। এ গানকে বলা হয়েছে মিলনগান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য বাঙালি দেশাত্মবোধক গীতরচয়িতা মিলনগান রচনা করেছেন। তবে সাম্প্রদায়িক মিলন কামনার অতি গভীর রূপায়ণ ঘটেছে নজরুল সঙ্গীতে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন/কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার' চরণদ্বয় বাংলা গানের ইতিহাসে প্রবাদসম খ্যাতি লাভ করেছে।

দেশাত্মবোধক গানের পর্যায়টি সমাপ্ত করতে না করতেই নজরুল একটি ভিন্নতর সঙ্গীতসৌন্দর্য সন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় একটি নতুন অধ্যায় সংযোজনে উৎসাহী হয়ে উঠেন। তিনি গজল রচনায় ব্রতী হন। গজল মূলত পারস্যসঙ্গীত। লঘু হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের পটভূমিতে উর্দু গীতিসাহিত্য অবলম্বনে বহু আগেই ভারতবর্ষে গজল সঙ্গীতধারার প্রবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বাংলায় গজল সঙ্গীতকলার বিস্তার সম্ভব হয়ে উঠে নি। নজরুলের আগে অতুলপ্রসাদ সেন অনধিক ছয়টি গজল শ্রেণীর গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি বাংলা গানের ধারায় যুগ রচনার মতো কিছু করে উঠতে পারেন নি এবং তাঁর গজল বাঙালি শ্রোতৃচিত্তকে প্রভাবিত করতেও সক্ষম হয় নি। কাজী নজরুল ইসলামই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে গজল যুগের প্রবর্তন করেন। বাংলায় যে গজল রচিত হতে পারে এবং তা যে এমন অসাধারণভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে সেকথা বাঙালি শ্রোতা ও রসজ্ঞরা বুঝতে পারলেন নজরুলের গজল শোনার পরই। বাংলা কাব্যগীতির প্রচলিত পরিস্থিতিতে নজরুলের গজল এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং এই ব্যতিক্রমী সঙ্গীতসৌন্দর্য বাঙালি সঙ্গীতরসিকদের চিত্ত এত দ্রুত জয় করেছিল যে গজল রচনার ফলাফল প্রত্যক্ষ করার জন্য কবিকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় নি। গীত হওয়ামাত্র শ্রোতাসাধারণ তাঁকে পরম আদরে বরণ করে নিল। গজলের অভিনব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করলেন দিলীপকুমার

রায়, নলিনীকান্ত সরকার, সাহানা দেবী প্রমুখ বরেণ্য গায়ক-গায়িকা। গজলের উচ্ছল রোমান্টিকতা, পারসিক অনুষঙ্গ, মাতানো সুরভঙ্গি বাঙালি সঙ্গীতামোদী সমাজের সামনে অকস্মাৎ যেন বিস্ময়ভরা আনন্দ নিয়ে উপস্থিত হলো। গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মকর্তারাও গজলখ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতেই নজরুলকে তাঁদের কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করতে উৎসাহবোধ করেন।

১৯২৮ সালের মার্চ মাসের দিকে গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে নজরুল ইসলামের যোগাযোগ ঘটে। প্রথমে কোম্পানির গীতিকার ও সুরকার এবং পরে প্রশিক্ষক ও প্রধান প্রশিক্ষকরূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে সেই থেকেই নজরুলের অসাধারণ ও বহুমুখী সৃজনশীল সঙ্গীতজীবনের বিকাশ। তখন থেকে কবি সর্বতোভাবে সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। সে সময়ে নজরুলের সঙ্গীতসাফল্যকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা কষ্টকর। তবে সক্রিয় জীবনের শেষের দিকে তিনি যে কলকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাকে এই সঙ্গে ধরে নিলে নজরুলের সঙ্গীতসাফল্যের প্রধান ক্ষেত্রগুলো ছিল রাগসঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত, আধুনিক গান, লোকসঙ্গীতানুগ গান প্রভৃতি। দেশাত্মবোধক গান ও গজলের কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলায় রেকর্ডসঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগটি তৈরি হয়েছিল নজরুলের রচনাকে কেন্দ্র করে। রেকর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, সবাক চিত্রের প্রচলন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গান সম্পর্কে যে ব্যাপক জনআকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল সেযুগে এবং তার পটভূমিতে সঙ্গীত ও চিত্রব্যবসায়ীরা যেভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিগুলো গড়ে তুলছিলেন, তার প্রতি সৃজনশীলভাবে নজরুল অত্যন্ত অনুকূল প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন এবং তিনি তাতে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সমুন্নত ধারায় ইসলামী ভক্তিগীতি রচনার ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। নজরুলপূর্ব যুগে হাম্‌দ, নাত প্রভৃতি ইসলামী ভক্তিগীতি পর্যায়ে বাংলায় যেসব গান রচিত হয়েছিল সেসব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকগীতি পর্যায়ের রচনায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাণী ও সুরগৌরবে সেসব গান আধুনিক জীবন ও সঙ্গীতমনস্ক মুসলমান সমাজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী ছিল না। নজরুলই যুগোপযোগীভাবে ইসলামী ভক্তিসঙ্গীত রচনার সূচনা করেন এবং বহু বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক গান রচনা করে ধারাটিকে একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। পরবর্তীকালে এ ধারায় যাকিছু কাজ হয়েছে নজরুলের গানই তার প্রেরণা ও পটভূমি।

বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের ইতিহাসে নজরুল ইসলামের হিন্দু ধর্মসঙ্গীত শ্রেণীর রচনাও এক অসামান্য অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এই পর্যায়ে নজরুলের সঙ্গীতরচনা এমন বিস্ময়করভাবে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় যে তাতে স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আর কোন বাঙালি ভক্তিসঙ্গীতরচয়িতার কর্মে হিন্দুধর্মসম্পৃক্ত বিষয়াদির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ সম্ভবত

ঘটে নি। ব্রহ্মসঙ্গীতধারা প্রবর্তিত হলে বাংলায় নিরাকার ঈশ্বরের স্তবগান রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং এই ধারায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের ফলে এক অবিচ্ছেদ্য ও নিরাকার ঈশ্বরের বন্দনাগীতি রচনার রীতি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে। ফলে আবহমান বাংলা ভক্তিগীতি রচনার ধারা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে নজরুলের রচনাকে কেন্দ্র করে আবহমান বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন ঘটে। অগ্রগণ্য শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতারূপে নজরুল বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

আধুনিক বাংলা গান নামে খ্যাত সঙ্গীতশ্রেণীর প্রবর্তনে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই গীতিধারা প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রেরণা তাঁর রচনা থেকে এসেছিল। জনবোধ্য ও জননন্দন সঙ্গীত রচনাই ছিল আধুনিক গীতিধারার প্রধান প্রবণতা। জনচিত্তমনস্কতা ছিল নজরুলপ্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে গ্রামোফোন, সবাকচিত্র প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জননন্দন সঙ্গীত রচনার এই ধারা যখন গড়ে উঠতে থাকলো, তখন অতি অনায়াসে তিনি এর নেতৃত্ব দিতে পারলেন। বাংলা প্রেমের গানের একটি অসাধারণ পর্ব নজরুলের আধুনিক গান শ্রেণীর রচনাকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত হয়ে উঠেছিল।

লোকসঙ্গীতানুগ বাংলা গান রচনার ক্ষেত্রেও কাজী নজরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের সুর অবলম্বনে গান রচনার যে ধারাটির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন বর্তমান শতকের গোড়ারদিকে, ত্রিশের দশকে এসে তা রেকর্ড কোম্পানি, চলচ্চিত্র ও বেতারকে কেন্দ্র করে বিপুল ও বহুমুখী হয়ে উঠেছিল। বহু জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতানুগ গান রচনা করে এবং লোকসঙ্গীতকে নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করার দৃষ্টান্তস্থানীয় কর্মসম্পাদন করে নজরুল বাংলা গানের প্রবাহকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সুরঢঙ অবলম্বনে লোকসঙ্গীতানুগ গান রচনা করেছিলেন, অতুলপ্রসাদও এই পথানুসারী ছিলেন, কিন্তু নজরুল ইসলাম ঝুমুর, ঝাপান, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি নানা ধরনের সঙ্গীতরূপ অবলম্বনে গান রচনা করে এই গীতধারাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। বিশেষকরে ঝুমুর সঙ্গীতানুগ বাংলা গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেন।

বাংলা গানের ক্ষেত্রে রাগসঙ্গীতের রূপায়ণের ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ এক অধ্যায় রচনা করেছিলেন। বাংলা গানের ইতিহাসে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নজরুলরচনায় বাংলা গান ও হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতকলার ব্যাপক সংযুক্তিতে বাংলা গানের জগৎ সুরসৌকুমার্যে উচ্ছলিত হয়ে উঠে। বেতার, রেকর্ডপ্রতিষ্ঠান ও সবাকচিত্রকে কেন্দ্র করে সুরসমুচ্ছল বাংলা গানের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সে যুগে, তার প্রধান প্রেরণা এসেছিল নজরুলের এই বিপুল ও বৈচিত্র্যময় রাগসঙ্গীতানুগ সঙ্গীতকর্ম থেকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী

সঙ্গীতকলার প্রথাসম্মত রূপায়ণের ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটে এবং রাগসঙ্গীত অবলম্বনে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নতুন উদ্যোগ দেখা দেয়। নিরীক্ষামূলক সঙ্গীতকর্মেও নজরুল অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি নবরাগ রচনায় উদ্যোগী হন ও লুপ্তপ্রায় রাগগুলোর পুনরুজ্জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এ পর্যায়ে রাগপ্রধান বাংলা গানের ভিত্তিরচনা নজরুলের এক ঐতিহাসিক সাঙ্গীতিক কীর্তি।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এসে বাঙালির সঙ্গীত-সংস্কৃতি এক ক্রান্তিকালে উপনীত হয়। আধুনিক সঙ্গীতকলার বিকাশ, গীতিকার-সুরকার-গায়ক শ্রমবিভাজন, রেকর্ডকরণপদ্ধতির যান্ত্রিক উৎকর্ষ, সবাকচিত্রের প্রবর্তন, সবাকচিত্রে নেপথ্য গায়নের বিকাশ, বেতারের সাঙ্গীতিক কর্মসূচির সম্প্রসারণ প্রভৃতির প্রভাবে আবহমান সাঙ্গীতিকতার অনেক উপাদান বর্জিত বা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং নতুন সঙ্গীতযুগের সূচনা ঘটে। নজরুল ছিলেন বিগত ও বিকাশমান যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ। তিনিই বাংলা গানের ধারায় আবহমানকালের শেষ প্রধান প্রতিনিধি।

সেই ক্রান্তিকালে উদ্ভিন্নমান আধুনিক সঙ্গীতযুগকে নির্মাণ করতে এসেছিলেন গীতিকাররূপে হীরেন বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুলসী লাহিড়ী, অনিল ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায়, বাণী কুমার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালকরূপে হীরেন বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুলসী লাহিড়ী, বিনয় গোস্বামী, হিমাংশু দত্ত, নিতাই মতিলাল, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, চিত্ত রায়, রাইচাঁদ বড়াল, বিষণচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক; এবং গায়ক-গায়িকারূপে আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী, কমলা ঝরিয়া, রাধা রাণী, শৈলদেবী, কে মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কানন দেবী, যূথিকা রায়, শচীন দেববর্মণ, আব্বাসউদ্দিন আহমদ, সত্য চৌধুরী, মৃণালকান্তি ঘোষ, জগন্ময় মিত্র, সুপ্রভা সরকার, কে. এল. সায়গল প্রমুখ। এইসব কৃতী সুরকার, সঙ্গীতপরিচালক, গায়ক-গায়িকা ও গীতিকারের অবদানে আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ রচিত হয়। এঁদের কর্মের পশ্চাৎপট তৈরি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের বিপুল সঙ্গীতরচনা। তবে এই ঐতিহ্যকে অসাধারণ সৃজনশীলতার সঙ্গে এঁরা নব নবভাবে ব্যবহার করেন এবং সারা ভারতবর্ষের আধুনিক সঙ্গীতপ্রয়াসকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন। বলতে গেলে পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত জনপ্রিয় ফিল্ম ও রেকর্ডসঙ্গীত এবং আধুনিক সঙ্গীতকলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেই ছিল সূত্রপাত। গণনাট্য আন্দোলনের কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষের একালের গোটা রোমান্টিক সঙ্গীতসাধনা এই ঐতিহ্যের অনুবর্তী।

১৯৪৩ সালের গণনাট্য আন্দোলন বাংলা গান এবং বৃহত্তর অর্থে বাঙালির যাবতীয় সৃজনশীল প্রয়াসের ব্যাপারে একটি অত্যন্ত প্রভাবক ঘটনা। এই আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে গণসঙ্গীত আন্দোলনের অন্যতম নির্মাতা হেমাঙ্গ বিশ্বাস জানিয়েছেন :

ত্রিশের দশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধে International Column-এ রালফ ফকস, কডওয়েল, লরকার মতো শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর আত্মদান সারা পৃথিবীতে প্রগতিবাদী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা নতুন দায়বদ্ধতার প্রেরণা জাগিয়েছিলো। সেই প্রেরণাতেই ১৯৩৫ সালে জন্ম নিয়েছিলো প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সর্বভারতীয় কৃষকসভা। লাল ঝান্ডার নীচে সংঘবদ্ধ কৃষকশ্রেণী ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থায় কৃষিবিপ্লবের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে নবসংস্কৃতি আন্দোলনের পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছিলো।

১৯৩৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনের প্যান্ডালে প্রেমচন্দকে প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পটভূমিতেই প্রগতি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার, কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার দায়িত্ব এসে গেলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় '৩৯ সালে। '৪১ সালে হিটলারের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। তখন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ফ্যাসিস্টরা, গড়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট। এরই মধ্যে ১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়। প্রগতি লেখক-শল্পী সংঘ থেকে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশের কারণ ছিলো। লেখকদের কারবার লিখিত শব্দ নিয়ে, তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ শিক্ষিতদের মধ্যে। কিন্তু আমরা যারা গান গাইতাম, নাটক করতাম তাদের আবেদন এই নিরক্ষর দেশে অনেক ব্যাপক জনতার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের। সুতরাং গণনাট্য সংঘের আলাদা সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ছিলো।[২৬]

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় বুলেটিনে এর কর্মাদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

নাটকে, সঙ্গীতে, নৃত্যে এ যাবৎ রূপায়িত প্রগতিশীল ভাবনাবলীকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সুসংহত ও শক্তিশালী করে তুলবে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের শিল্পকলাকে স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচার এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য জনগণ যে সংগ্রাম করছেন তার প্রকাশমাধ্যম ও সংগঠনমাধ্যমরূপে গড়ে তোলা। গণনাট্য সংঘ সংস্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংরক্ষা এবং জনগণকে তাদের সমস্যাবলীর কারণ ও সমাধান সম্পর্কে অবহিত করবে। সংঘ একত্ববোধ এবং সুন্দর ও ন্যায়ানুগ বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে দ্রুত সচেতন করে তুলবে।[২৭]

জনগণকে এই লক্ষ্যে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠলো গান—সমাজ পরিবর্তনের গান, শোষণমুক্ত সমাজ রচনার গান, মেহনতি মানুষের উত্থান ও বিজয়ের গান। গণনাট্য সঙ্ঘের স্কোয়াডগুলো কৃষক-শ্রমিক- মেহনতী মানুষের মধ্যে এই

---

২৬. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া,* (কলকাতা ১৯৯০), ৭৯।

২৭. সুধী প্রধান, *সংস্কৃতির প্রগতি,* (কলকাতা ১৩৮৯), ১৯৯।

গান গেয়ে বেড়াতে থাকলো। বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরীর মতো সঙ্গীতকাররা এগিয়ে এলেন সমাজ পরিবর্তনের গান রচনা করতে। প্রথমদিকে এই গানের কোন নাম ছিল না। পরে এর পরিচয় হলো গণসঙ্গীত নামে। সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যগুলো অর্জনে শোষিত মেহনতি মানুষকে অনুপ্রাণিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রেরণায় এই প্রথম বাঙালি গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকারা এগিয়ে এলেন। শোষিত শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও শান্তির আকাঙ্ক্ষাও এই গানে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। দেশাত্মবোধক বাংলা গানে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা গানের রূপ এমনই। একদিকে বহু শাখায়িত রোমান্টিক আধুনিক গান, অপরদিকে গণসঙ্গীতসহ নানা ধরনের দেশাত্মবোধক গান। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানসহ প্রচলিত সঙ্গীতও ছিল।

ভারতবিভাগোত্তরকালে কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের যে বিকাশ, তার মুখ্য প্রবাহটিকে রোমান্টিক আধুনিক গান হিসেবে অভিহিত করা যায়। চলচ্চিত্র, বেতার ও রেকর্ড কোম্পানির প্রয়াসের পটভূমিতে এই গীতধারার স্ফূর্তি। পূর্ববর্তী গীতিকার ও সুরকারদের সঙ্গে এসে আসন পাতলেন নতুন কিছু গীতিকবি ও সুরকার। প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠশিল্পীদেরও আবির্ভাব ঘটলো। এলেন মোহিনী চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গীতিকার এবং অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, দিলীপ সরকার, সুধীন দাশগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুরকার। হীরেন বসু ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতো অগ্রজ গীতিকার-সুরকাররাও নিজেদের যুক্ত রাখলেন এই প্রয়াসের সঙ্গে। এঁদের মিলিত প্রয়াসে আধুনিক রোমান্টিক বাংলা গানের মনোরম উচ্ছ্বাস ঘটে এবং নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে সেই ধারাটিই আজ অনুসৃত হচ্ছে। তবে পশ্চিম বাংলায় আধুনিক সঙ্গীতকলার পরিস্থিতি বর্তমানে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে স্পষ্ট অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একসময় যে কলকাতা সারা ভারতবর্ষের আধুনিক সঙ্গীতের পথপ্রদর্শক ছিল, সেখানেও পরম্পরাগত বাংলা কাব্যসঙ্গীতের পথ পরিত্যাগ করে অতি লঘু পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও হিন্দি ফিল্মের গানের অনুকরণ করতে দেখা যাচ্ছে। আধুনিক বাংলা গানের যে উজ্জ্বল যুগের সূত্রপাত ঘটেছিল বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শুরুতে, নানা ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও তা ষাটের দশকের শেষদিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু এর পর থেকেই সেই সমৃদ্ধ সঙ্গীতপ্রবাহে ভাটা পড়ে এবং গভীর সৃজনশীলতার পরিবর্তে ক্রমেই অনুকরণবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। অন্তত সত্তরের দশকে এসে সেসব লক্ষণই প্রকট হয়ে উঠে।

রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের যে বিকাশ, তার দুটি প্রধান স্রোতোধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একটি রোমান্টিক

প্রেমের গানের এবং অপরটি দেশাত্মবোধক গানের। কিন্তু এই বিষয়ে কিছু বলার আগে একটি কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে যে, ঢাকাকে সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শুরুর দিনগুলোয় তীব্র বেগ পেতে হয়। কেননা এত বড় একটা ভূমিকা পালনের পূর্বপ্রস্তুতি ঢাকার ছিল না। পরন্তু তখন সেখানে চলছিল এক দারুণ সাঙ্গীতিক শূন্যতা। ভারতবর্ষ তথা বাংলা বিভাগের পরিণামে পূর্ব বাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দুর ভারতে চলে যাবার পরিপ্রেক্ষিতেই এই শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চা প্রধানত হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান সমাজে সঙ্গীতচর্চা তখনো উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবিষ্ট হয় নি, আবছাভাবে একটা প্রারম্ভের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মাত্র। আবদুল আহাদ তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *আসা যাওয়ার পথের ধারে*-তে এই শূন্যতা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। আবদুল আহাদ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রশিক্ষক হিসেবে কলকাতায় খ্যাতি অর্জন করেন। বিভাগোত্তরকালে অনেক বাঙালি মুসলিম সঙ্গীতগুণীর মতো তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতারে যোগ দেন। পূর্ব বাংলায় সঙ্গীত-সংস্কৃতির সেবায় আবদুল আহাদ নানাভাবে কাজ করেন। তবে তাঁর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে সুরকার হিসেবে, আধুনিক ও দেশাত্মবোধক উভয় শ্রেণীর গানেরই সুরকার হিসেবে তিনি অতি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। শুরুর দিককার সাঙ্গীতিক শূন্যতা পূরণে তিনি অগ্রণীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আবদুল আহাদ তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থে যাঁরা সেই ভারতবিভাগপরবর্তী শূন্যতা মোচনে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সাঙ্গীতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁদের দৃষ্টান্তেই ধীরে ধীরে বাংলাদেশে একটি সঙ্গীত-সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠে এবং ক্রমে এই শূন্যতা বিমোচিত হয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আব্বাসউদ্দিন আহমদের কথা। তিনি ছিলেন জননন্দিত গায়ক। কলকাতা থেকে তিনিও ঢাকায় চলে আসেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই। বহুমুখী গায়নপ্রতিভার অধিকারী এই গুণী শুধু গায়করূপে নয়, সঙ্গীতসংগঠক হিসেবেও সেই শূন্যতার যুগটিকে কাটিয়ে উঠার ব্যাপারে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিমল রায়, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আফসারী খানম, অঞ্জলি রায়, শাহজাহান হাফিজ, সুলতান আলম, আবদুল হালিম চৌধুরী, শেখ লুৎফর রহমান, আবদুল লতিফ প্রমুখের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আবদুল আহাদ, যাঁরা গায়করূপে এবং যাঁদের কেউ কেউ গীতিকার, সুরকার ও গায়করূপে '৪৭-পরবর্তীকালে এদেশে সঙ্গীত-সংস্কৃতির সেবায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এর আগে আধুনিক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতপ্রবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। '৪৭-পরবর্তীকালে ঢাকায় আধুনিক গানের বিকাশের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। চলচ্চিত্র ও রেকর্ড কোম্পানির মতো পৃষ্ঠপোষক সংস্থা ছিল না। বেতারের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল

অপ্রতুল। ক্রমে বেতারের পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পায়, ষাটের দশকের প্রথমদিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা মেলে এবং এই দশকের শেষেরদিক থেকে টেলিভিশনও আধুনিক গানের বিশিষ্ট প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে রেকর্ড কোম্পানির কোন কার্যকর সেবা এখানে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। প্রথমত, ঢাকা বেতারকেন্দ্র এবং পরে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলায় আধুনিক গানের বিকাশ। সিকানদার আবু জাফর, আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখের মতো গীতিকার ও আবদুল আহাদ, সমর দাস প্রমুখের মতো সুরকারের স্মরণীয় অবদানে পূর্ব বাংলায় আধুনিক বাংলা গানের একটি উল্লেখযোগ্য ভিত্তি গড়ে উঠে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় সঙ্গীত-সংস্কৃতির আরো প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যময় স্পন্দন অনুভব করা যায় দেশাত্মবোধক গানের প্রবাহে। একথাটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশাত্মবোধক গান এক ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে জন্মলাভ করে। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের উদ্ভবের মূলেই রয়েছে এই সংঘর্ষের প্রেরণা। এখানকার সমাজমানসে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একেবারে সূচনায়ই দানা বাঁধতে শুরু করে।

এই যে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই দীর্ঘ সংঘর্ষ, এর প্রেরণায় বহু গান রচনা করা হয়েছে। পূর্বপ্রচলিত গানের সঙ্গে এই নবরচিত সঙ্গীতাবলীও পরম আদরে গাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের গণজাগরণী গানের সাথে সাথে গাওয়া হয়েছে পূর্ব বাংলায় রচিত গণসঙ্গীত। গণনাট্যের কর্মীদের সাথে পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের গণসঙ্গীত কর্মীরাও যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মুক্তাবিন্দুর মতো স্বদেশসঙ্গীত পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণাকে আরো গভীর এবং আরো সংক্রামক করে তুলেছে। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনা রবীন্দ্রনাথের গানে এক দৃঢ় নোঙর খুঁজে পায় যখন রাজনৈতিক আন্দোলন ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামের দিকে। তখন দেশাত্মবোধক গানও রচিত হতে থাকলো প্রচুর পরিমাণে। সমগ্র বাংলাদেশে স্বদেশসঙ্গীত রচনার এক প্রেরণা সঞ্চারিত হলো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর দেশাত্মবোধক বাংলা গান রচনার যে ধারাটি স্তিমিত হয়ে এসেছিল, নজরুলের রচনায় তা আবার বেগবান হয়ে উঠে। নজরুল ভিন্নতর সঙ্গীতে নিবিষ্ট হলে তাতে আবার মন্দা দেখা দেয়। গণনাট্য আন্দোলনে এসে আবার এক ধরনের দেশাত্মবোধক গান রচনায় উৎসাহ জাগে। কিন্তু সে ধারাটি গড়ে উঠতে না উঠতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী এবং শেষের দিকে স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পটভূমিতে বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচিত হতে থাকে এবং তাতে আবহমান সকল বিষয়ই স্থান পায়। একে বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নবজাগরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এই সময়ে রচিত গানগুলোর মধ্যে দুটি গানের উল্লেখ বিশেষভাবে

করতে হয়। দুটি গানই পূর্ব বাংলার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে অতি উল্লেখযোগ্য স্তম্ভবিশেষ। একটি গান ১৯৫২ সালে রচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গান : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এবং অপর গানটি ১৯৭১ সালে রচিত মুক্তিযুদ্ধের গান : 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। প্রথম গানটির বাণী রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী, সুরকার আলতাফ মাহমুদ। দ্বিতীয় গানটির বাণী রচয়িতা গাজী মাযহারুল আনোয়ার, সুরকার আনোয়ার পারভেজ। এ দুটি গানের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের ও তৎপরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মস্পন্দনকে অনুভব করা যায়।

১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে বাংলাদেশের সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে নির্মাণ করেছেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট সুরকার ও গীতিকারের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরকার হিসেবে এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল আহাদ, সমর দাস, খাদেম হোসেন খান, মীর কাশেম খান, আবেদ হোসেন খান, আবু বকর খান, মসিহ্ উল আলম, ধীর আলী, মনসুর আলী, রাজা হোসেন খান, সুধীন দাশ, রবীন ঘোষ, খান আতাউর রহমান, সুবল দাস, সত্য সাহা, প্রাণেশ দাস, সাধন সরকার, খন্দকার নূরুল আলম প্রমুখ। গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন সিকানদার আবু জাফর, ফররুখ আহমদ, সাইয়েদ সিদ্দিকী, আহসান হাবীব, মাসুদ করীম, আজীজুর রহমান, আবদুল লতিফ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, খান আতাউর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, গাজী মাযহারুল আনোয়ার প্রমুখ।

১৫

নাটক ও নাট্যকলা

সৈয়দ জামিল আহমেদ*

উৎপত্তির একদম গোড়া থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত কালপরিধির মধ্যে বাংলায় নাটক ও নাট্যকলা কিভাবে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়েছে, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এর সূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো। এই দুরূহ কাজে আমরা যথাসাধ্য তুলে ধরার উদ্যোগ নেবো সেসমস্ত লভ্য অভিনয়-উপাচার, যাকে নির্দেশ করা চলে যেকোন ত্রিমাত্রিক পরিবেশে দু'দল মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই জীবন্ত উপস্থাপনা হিসেবে; এবং যা "পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে চারপাশের সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের বেঁচে থাকার যৌথপ্রচেষ্টা দ্বারা।"[১] উল্লিখিত এই উপস্থাপনাটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্দিষ্ট ও একটি লিখিত পাঠের মাধ্যমে সংরক্ষিত, অথবা হতে পারে পুরোপুরি তাৎক্ষণিক ও মুখে মুখে প্রচারিত এবং এই দুইয়ের মাঝামাঝি থাকতে পারে এদের অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি-প্রকরণ। আমরা আলোচনার সুবিধার দিকটি বিবেচনা করে নাট্যকলার এক বিশেষ প্রকরণ হিসেবে এরপর থেকে পূর্বনির্দিষ্ট কাঠামোসম্পন্ন লিখিত 'পাঠ' (written text)-কে 'নাটক' (drama) নামে অভিহিত করবো।

অধিকাংশ পণ্ডিতজন যে মত সমর্থন করেছেন তা হলো, ঔপনিবেশিক শাসনের মিথষ্ক্রিয়ার ফল হিসেবেই উনিশ শতকে বাংলায় নাট্যকলার উদ্ভব ঘটে। বর্তমান অধ্যায়ে এর বিপরীতে প্রমাণ উত্থাপন করা হবে যে, গুটিকতক শহুরে অভিজাতের হাতে নয়, বরং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও বৃটিশ শাসনের বহুশত বছর আগে স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারাই নাট্যকলার গোড়াপত্তন হয়। বিবর্তনের এই জটিল ধারাবাহিক

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Ngugi Wa Thiongo, *Homecoming*, (London 1972), 2.

প্রক্রিয়াটি, যা ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশপরবর্তী নাট্যকলা আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই বাংলার জনগণের দ্বারা সৃষ্ট নাট্যকলার অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে। তাই এই পর্বের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণকে আলাদা দুটি বিস্তৃত পটভূমিতে বিভক্ত করে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করবো : (ক) বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য, এবং (খ) উপনিবেশ প্রভাবিত নাট্যকলা ও ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ।

ক. বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য

বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকাল থেকে কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রীতি-পদ্ধতি-কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। নিম্নোক্তভাবে আমরা সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি : ১. সংস্কৃত নাটক-রচনা সূত্র ও এর অনুসিদ্ধান্তসমূহ; ২. কথানাট্য; ৩. নাটগীত; ৪. জনগণের রসবোধ; ৫. মিশ্রনাট্য এবং ৬. পুতুলনাচ।

১. *সংস্কৃত নাটক-রচনা সূত্র ও এর অনুসিদ্ধান্তসমূহ*

এযাবৎ প্রাপ্ত সকল তথ্য ও নমুনা বিচারে বস্তুত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলা কখনো আর্য সংস্কৃত নাট্যকলার মূলধারা অনুসরণ করে চলে নি। এই মতের সমর্থন মেলে *নাট্যশাস্ত্র* (১৪/৪৩-৪৬)[২] নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে। খৃস্টজন্মের দুশ' বছর আগে ভরতমুনি রচিত এই গ্রন্থে বাংলায় প্রচলিত নাট্যধারা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তা 'ওড্র-মাগধী' রীতি অনুসরণ করে এবং আবেগদীপ্ত উত্তেজক সংলাপ ও অলঙ্কারবহুল শব্দ ব্যবহার এর বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য ও নাট্য-ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেকেই, যেমন বিশ্বনাথ (*সাহিত্যদর্পণে*), ধনিকা (*দশরূপার অবলোকে*), সারদা তানাইয়া (*ভাবপ্রকাশনে*) প্রমুখ ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত দশটি প্রধান নাট্যধারার অতিরিক্ত 'উপরূপক' নামক এক ধরনের ক্ষুদ্র নাট্যগুচ্ছের কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব অপ্রধান নাট্যগুচ্ছ তথা 'উপরূপক' ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মূলধারাবহির্ভূত হলেও জনগণের মাঝে এর ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তীকালে তা পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় এবং বেশ গুরুত্ব লাভ করে। আচার্য অভিনব তাঁর *অভিনবভারতী* গ্রন্থে উপরূপককে 'নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ' নামক এমন এক ধরনের নাট্যাভিনয়ের শ্রেণীভুক্ত করেছেন, যা সঙ্গীত ও নৃত্য সহযোগে মঞ্চস্থ হওয়ার বিষয়টির উপর জোর দেয়।[৩] এখানে এর কয়েকটি প্রকরণের নামোল্লেখ করা যায়, যেমন 'কাব্য' (এক রকম অনুকরণমূলক নাচ এবং গান ও নাচের

---

২. Bharatmuni, *Natyasastra : A Treatise on Hindu Natyakala and Histrionics*, trans. Manmohan Ghosh, (Calcutta 1967), XIV, 43-46, 248.

৩. G. H. Tarlekar, *Studies in the Natyasastra*, (Delhi 1976), 41.

যৌথ প্রদর্শনী), 'চিত্ররাগ কাব্য' (বিভিন্ন রাগ-রাগিনী সহযোগে গঠিত)[৪] , 'রাসক' (এক ধরনের নৃত্য, যার একাংশ গীতিনৃত্যের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়) এবং 'ভানি' (এক রকম গীতিনৃত্য)[৫] এ সবগুলোই স্পষ্টত বাংলার 'কথানাট্য ও নাটগীত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যেখানে নাচ ও গানের রয়েছে প্রধান ভূমিকা। আমরা পরে দেখবো সঙ্গীত এবং নৃত্য কিভাবে বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক উপাদানরূপে ভূমিকা পালন করে এসেছে। অধিকন্তু, ভানার 'রূপক' নামে *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত আদিতে জনপ্রিয়, স্বগতোক্তিমূলক ও একক অভিনেতা দ্বারা অভিনীত যে নাটক, তাও বৈশিষ্ট্যবিচারে বাংলার কথানাট্যের সঙ্গেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া *নাট্যশাস্ত্রে* দুই অথবা তিন জন অভিনেতা কর্তৃক সম্পাদিত 'বীথি' নামক আরো যে এক ধরনের একাঙ্কিকার সন্ধান পাওয়া যায়,তার সাথেও বাংলার 'নাটগীত' রীতির নাট্যাভিনয়ের অনেকাংশে মিল রয়েছে। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশের শাসনামলে (৭৫০-১১৬২ খৃ.) জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত সাগর নন্দী রচিত সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ বর্তমানে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। গ্রন্থটির নাম *নাটকলক্ষণরত্নকোষ* এবং এটি দশম শতকের শেষদিকে অথবা একাদশ শতকের প্রথমদিকে কোন এক সময় রচিত হয়ে থাকবে। সাগর নন্দী কয়েক ধরনের সংস্কৃত নাটকের একটি তালিকা প্রস্তুত করে গেছেন; যদি শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের ধারণা সঠিক হয়, তবে সেগুলো অবশ্যই রামকাহিনী[৬] অবলম্বনে রচিত বাংলা গান ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া নাট্যতত্ত্বের উপর রচিত এই গ্রন্থটির অস্তিত্ব দ্বারা নিশ্চিত করে অন্য কিছু বলা সম্ভব না হলেও এটা ধারণা করা যায় যে, তখনও সাহিত্যকর্মের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং সম্ভবত তা পাল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

বেশ নিকট-অতীতে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যকর্মের মধ্যে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* উল্লেখযোগ্য। জয়দেব বারো শতকের শেষদিকে বাংলার রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন। *গীতগোবিন্দকে* বিভিন্নভাবে 'চিত্ররাগকাব্য' এবং 'নাটগীত'[৭] শ্রেণীভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলফন্সো-কার্কালা *গীতগোবিন্দকে* ('কৃষ্ণ বিষয়ক গান') যাত্রাগানের বাচনাংশের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্য একটি একক ঐকতানের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।[৮] এসব পণ্ডিতজনের নিরীক্ষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে *গীতগোবিন্দের* অভ্যন্তরে গান ও নাচের বিপুল ভূমিকাকে স্বীকৃতিদান এবং

---

৪. ঐ, 42.
৫. Avaloka on *Dasharupaka*, Quoted by Surendra Nath Shastri in *Laws and Practice of Sanskrit Drama*, Vol. I, (Varanasi 1961), 145-146.
৬. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা ১৯৯১), ৪০৮।
৭. Tarlekar, *Natyasastra*, 42.
৮. John B. Alphonso-Karkala (ed.), *An Anthology of Indian Literature*, (Harmondsworth 1871), 503.

এতে চরিত্রায়ণের বিষয়টিকে (তিনটি চরিত্রের) গ্রহণ করে নেয়া। জয়দেব 'জনপ্রিয়' ও 'অভিজাত' এই দুয়ের মাঝে এক ধরনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে থাকবেন, এটাই সম্ভবপর। তিনি সেসময়ে প্রচলিত জনপ্রিয় রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানকে 'নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ উপরূপক' নামক সংস্কৃত ধ্রুপদ ঐতিহ্যের গঠনকাঠামোর মধ্যে একত্রিত করে পরিবেশন করেন এবং এমন একটি ধারা নির্মাণ করে যান, যা পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে অনুসৃত হয়েছে। পরে আমরা দেখবো, এহেন সংস্কৃত ঐতিহ্যচর্চা উনিশ শতকেও বৈষ্ণব ও অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল। রাজপৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই ধারার চর্চা ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর রূপলাভ করে এবং পরবর্তীকালে বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী *গীতগোবিন্দের* কাহিনী অবলম্বনে তাদের মাতৃভাষায় (বাংলায়) রচিত 'নাটগীত' ধাচের এক জনপ্রিয় নাট্যরীতির প্রচলন ঘটায়।

তেরো শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় তুর্কী বিজয় অভিযানের ফলে রাজসভাকেন্দ্রিক অভিজাত সংস্কৃত ঐতিহ্যচর্চা এক বিরাট ধাক্কা খায় এবং এর বিকাশ গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সাহিত্যবিশারদগণ পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজা শাসিত মিথিলা ও নেপালে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয়লাভ করেন। ফলে এই শিল্পচর্চা চৌদ্দ শতকের শেষে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক বাংলায় একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সালতানাত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত আর নতুন করে বঙ্গীয় মুসলিম রাজসভায় স্থানলাভ করতে পারে নি। ফলে বাংলায় সংস্কৃতচর্চার ধারা দিন দিন ক্ষয়িষ্ণুতার পথে ধাবিত হয়।

নেপালী রাজসভার কবিগণ কিন্তু বারো শতক থেকেই সংস্কৃত ভাষায় নাটকের মূলপাঠ লিখে আসছিলেন। এসবের অধিকাংশই রামকাহিনী বিষয়ক এবং এতে সঙ্গীতাধিক্যের দরুন তা 'চিত্ররাগকাব্য' শ্রেণীভুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।[৯] *গীতগোবিন্দের* এই ধারা মিথিলার রাজানুকূল্য লাভ করে এবং উমাপতি উপাধ্যায়ের সংস্কৃত ভাষায় রচিত *পারিজাতহরণ*-এর (১৩২৪ খৃ.) মাধ্যমে আরো অনেকদূর অগ্রসর হয়। এটি সঙ্গীতের সাহায্যে পদ আকারে পরিবেশন করা হতো এবং এর কৃষ্ণ বিষয়ক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পেতো বাদ্যযন্ত্রের সুললিত সুরমূর্ছনায়। মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি বিদ্যাপতিও (১৩২৪-১৪৭৫ খৃ.) এই ধারায় তাঁর *গোরক্ষবিজয়* (১৪০৩ খৃ.) রচনা করেন এবং অবধারিতভাবে মিথিলার রাজানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল। *গোরক্ষবিজয়* বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এটি বাংলাসহ চারটি ভাষায় রচিত একটি ক্ষুদ্র নাটক, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে নাথ সিদ্ধাচার্যগণ (এঁরা বাংলার প্রাচীন কবি ও সাধক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধধর্মের একটি শাখার প্রচার ও প্রতিনিধিত্ব করতেন। এঁদের প্রায় সকলেই বাঙালি

---

৯. সুকুমার সেন, *নাট নাট্য নাটক*, (কলকাতা ১৩৭২ বা. স.), ৭৬-৭৭। এগুলোকে সেন চিহ্নিত করেছেন 'সঙ্গীত নাটক' হিসেবে।

ছিলেন)। নাটকটির আখ্যানভাগের অভ্যন্তরে আরেকটি উপনাটক আছে, যা গোরক্ষনাথ কর্তৃক মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে অভিনীত হয়।

যাহোক, ষোড়শ শতকের সমগ্র বাংলাদেশ যে আন্দোলনটির দ্বারা প্লাবিত হয়, তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩০ খৃ.) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন। এই আন্দোলন বাংলার সমাজব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এটি ছিল সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদ, পীড়নমূলক হিন্দু বর্ণপ্রথা এবং বহিরাগত তুর্কী আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদস্বরূপ। চৈতন্যের বৈষ্ণববাদের ভিত্তি ছিল এই উদ্দীপনাময় সাধারণ বিশ্বাস যে, প্রেমই ঈশ্বর এবং এই মতবাদ জনসাধারণ ও অভিজাত শ্রেণী উভয় অংশেরই বিপুল সমর্থনলাভে সক্ষম হয়। শ্রীচৈতন্যের শিষ্যগণ সাফল্যজনকভাবে স্থানীয় নাট্যকলার কাঠামো উন্নয়নের পর সংস্কৃত ভাষা ও ঐতিহ্য অবলম্বনে এবং অভিজাত শ্রেণীর আনুকূল্যে ব্যাপকহারে নাট্যপাঠ রচনা শুরু করেন। এ বিষয়ে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করবো, কিন্তু এটা ঠিক যে, তা সত্ত্বেও তাঁরা জনপ্রিয় নাট্যকলার ঐতিহ্য এবং *গীতগোবিন্দের* প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের একজন শিষ্য রামানন্দ রায় উড়িষ্যার রাজা গজপতির রাজসভায় অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সংস্কৃত নাট্যপাঠ *জগন্নাথবল্লভ* (পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট এবং অষ্টচরিত্র সমন্বিত) রচনা করেন।[১০] যদিও *জগন্নাথবল্লভ* 'চিত্ররাগকাব্য' শ্রেণীভুক্ত ও *গীতগোবিন্দ* দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত, তবুও এর পূর্ববর্তী রচনাগুলোর সঙ্গে এটি অসদৃশ এর গদ্যে রচিত সংক্ষিপ্ত সংলাপের জন্য। ১৫৪২ সনে পরমানন্দ দাস (কবি কর্ণপুর, ১৫১৪) সংস্কৃত ভাষায় দশাঙ্কবিশিষ্ট একটি নাটক রচনা করেন চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে এবং এর নাম দেন *চৈতন্য চন্দ্রোদয়*।[১১] দৈবেকীনন্দন সিংহের সংস্কৃতে রচিত *গোপীনাথ বিজয়* এখন হারিয়ে গেছে।[১২] গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫৩৬-১৬১৩) কর্তৃক সম্ভবত সংস্কৃত ও ব্রজবুলি ভাষায় *সঙ্গীত মাধব* নামক যে নাট্যপাঠটি এসময়ে বাংলার কোন এক স্থানে রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়—তাও আজ কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[১৩] তবে এসবের মধ্যে 'যাত্রা' নাট্যরীতির ক্রমবিকাশে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এবং আজও অস্তিত্বশীল তিনটি কৃষ্ণবিষয়ক সংস্কৃত নাট্যপাঠ হচ্ছে রূপ গোস্বামী বিরচিত সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট *বিদগ্ধ মাধব* (১৫২৪), দশাঙ্কবিশিষ্ট *ললিত মাধব* (১৫২৯) এবং একাঙ্কিকা *দক্কেলী কৌমুদী* (১৫৪৯)। *দক্কেলী কৌমুদী* এমন একগুচ্ছ চরিত্র সমবায়ে গঠিত, যারা নিজেরা গান করে এবং গদ্যভাষায় কথা বলে। তাছাড়া এর প্রদর্শনীতে নৃত্যের আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১৪]

---

১০. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৩৩৭-৩৮।
১১. ঐ, ১৫৯-৬১।
১২. ঐ, ৩৮০।
১৩. ঐ, ৪০৯।
১৪. ঐ, ৯৫ এবং ১৩৯।

জগন্নাথবল্লভ ষোড়শ শতকের কোন এক সময় লোচন দাস কর্তৃক সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।[১৫] *বিদগ্ধ মাধব* ১৬০৭ সনে যদুনন্দন দাস কর্তৃক *রাধাকৃষ্ণলীলা রসকদম্ব* নামে অনূদিত হয়েছিল।[১৬] সতেরো শতকে অকিঞ্চন দাসও *জগন্নাথবল্লভ* অনুবাদ করেন।[১৭]

এসব ছাড়াও চৈতন্যদেবের বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ, যেমন বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত* এবং আরো অগণিত কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা ও গান জনসাধারণের মাঝে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সতেরো শতকে এসবেরই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় 'কৃষ্ণযাত্রা' বাংলার প্রধান নাট্যধারাসমূহের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ধারা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সতেরো শতক থেকে নেপালী রাজদরবারে রচিত বেশ কিছু নাটকের পাণ্ডুলিপি এখন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এগুলোর রচয়িতাদের মধ্যে রাজকবি রামভদ্রের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ললিতপুরের রাজা সিধিনার সিংহ মাল্লার পৃষ্ঠপোষকতায় (মৃ. ১৬৫৭) সংস্কৃত এবং মৈথিলী-ব্রজবুলি-বাংলার মিশ্র উপভাষায় *হরিশ্চন্দ্র নৃত্য* রচনা করেন। একই রাজসভায় জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক *গোপীচন্দ্র নাটক* নামে আরেকটি নাট্যপাঠ রচিত হয়, যার অধিকাংশ সংলাপ, গান ও কবিতার ভাষা ছিল বাংলা। ১৬৬৫ সনে রচিত রামভদ্রের আরেকটি নাটক সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো, সিধিনার সিংহ মাল্লার পুত্র রাজা শ্রীনিবাস মাল্লার উৎসাহে তিনি নাটকটি রচনা করেন এবং এর নাম দেন *ললিতকুবলয়াশ্ব মদালসাহরণোপাখ্যান শিবমহিমা নাটক*। নেপাল ও এর পার্শ্ববর্তী রাজ্য ভাটখাঁও থেকে যে তিনটি নাট্যপাঠ উদ্ধার করা গেছে তন্মধ্যে দুটোর রচয়িতা হলেন বানসামনি ওঝা। একটির নাম *মুদিত কুবলয়াশ্ব* নাটক (১৬২৮) এবং অপরটি *হরগৌরী বিবাহ নাটক* (১৬২৯)। ভাটখাঁওরাজ জয়জগজ্যোতি মাল্লা *কুঞ্জবিহারী নাটক*[১৮] নামের আরো একটি নাট্যপাঠ রচনার ক্ষেত্রে পালন করেন প্রশংসনীয় ভূমিকা। যাহোক, উল্লিখিত নাটকসমূহ আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এগুলো এই অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক ধ্রুপদী নাট্য ঐতিহ্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। এসময়ে মুসলিম শাসকবর্গের আনুকূল্য ছাড়া ধ্রুপদী দরবারি নাট্যকলা যে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মাধ্যমেই অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল এবং এক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দু সামন্ত ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, তা আমরা একরকম নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি।

---

১৫. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ৪৯। এই একই নাট্যপাঠ সতেরো শতকে সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন অকিঞ্চন দাস।

১৬. ঐ, ৫০।

১৭. ঐ, ৪৯।

১৮. সুকুমার সেন, *নাটক*, ৭৮, ৮৩।

বৈশিষ্ট্য অনুসারে দেখা যায়, সতেরো শতকে নেপাল রাজদরবারে অনুশীলিত নাট্যরচনার ধারা বারো শতক থেকে প্রচলিত 'চিত্ররাগকাব্য' নামক নাট্যরীতিকেই সাধারণভাবে অনুসরণ করে এসেছে। এসব নাটকে থাকতো সঙ্গীতের সমারোহ এবং কখনো এতে সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত হতো। কিন্তু গোড়ার দিককার নাট্যপাঠ থেকে এগুলোর স্বাতন্ত্র্য এই যে, এতে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সংক্ষিপ্ত গদ্যসংলাপ অধিকহারে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এতে জনপ্রিয় নাট্যকলার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। উপরে যে ছয়টি নাটক সম্পর্কে বলা হলো, এর মধ্যে *গোপীচন্দ্র নাটক* আমাদের কাছে বিপুলভাবে মূল্যবান শুধু এতে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার প্রাচুর্যের জন্য। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে, *হরগৌরী বিবাহ নাটক* মৈথিলী ভাষায় রচিত এবং উপরোক্ত ছয়টি নাট্যগুচ্ছের মধ্যে এতে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রভাব সবচেয়ে কম। এসব উদাহরণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তৎকালে পূর্ব ভারতে (বাংলা, আসাম ও নেপাল) নাট্য রচনার একটি নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছিল।[১৯] এই ধারার নাটকের বিশেষত্ব হলো, এগুলো ছিল চার অঙ্কে বিভক্ত এক একটি ক্ষুদ্র নাটক, যা শুরু হতো সূত্রধর-নটী নামক সংস্কৃত ঐতিহ্যের এক প্রারম্ভিকার দ্বারা। এতে গদ্য-সংলাপগুলো থাকতো সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সংস্কৃত শ্লোক ও গানসমূহ বাংলা ভাষায় পুনঃরচিত হয়ে গীত হতো। *মুদিত কুবলয়াশ্ব নাটকে* এর প্রারম্ভিকা সম্পর্কিত যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার অংশবিশেষ হচ্ছে এই রকম :

> নাটক শুরু হওয়ার প্রাক্কালে পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে মঞ্চসজ্জা সম্পন্ন হবে। এরপর নাটকের গায়ক (...) ও বাদকদল (...) সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ (...) করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক গান গাইবে। তারপর নান্দীপাঠ হবে। (...) যবনিকা পতনের পর সূত্রধর নান্দীশ্লোক পাঠ করবে (. . .)। নান্দীপাঠের পর সূত্রধর মঞ্চে আভির্ভূত হবে। করব রাগে ও যুতি তালে সে 'গণপতি' শ্লোকটি আবৃত্তি করবে এবং চতুষ্পার্শ্বে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে নৃত্যের তালে তালে গান গাইবে। ... (সূত্রধর বলবে), 'চলো, আমরা আর অহেতুক (অনুষ্ঠানে) বিলম্ব না করি।' সে মঞ্চের পশ্চাৎদিকে ফিরে তাকাবে এবং বলবে, 'প্রিয়ে, এখানে এসো' আর তৎক্ষণাৎ গান গাইতে গাইতে মঞ্চে এসে উপস্থিত হবে নটী।[২০]

বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ আঠারো শতকে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কৃত নাট্যপাঠ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রেমদাস ১৭১২ সনে কবি কর্ণপুরের *চৈতন্য চন্দ্রোদয়* অনুবাদ করেন *চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী* নামে। স্বরূপচরণ গোস্বামী ১৭৮৭-৮৮ সনে অনুবাদ করেন রূপ গোস্বামীর *ললিত মাধব নাটক* এবং এর নাম দেন *প্রেমকদম্ব*। একই শতকে গোপাল দাস

১৯. ঐ, ৭৬-৯৪।

২০. প্রাগুক্ত, ৮৫।

ও পরাণ দাস নামক দুজন বৈষ্ণব সাধু রামানন্দ রায়ের *জগন্নাথবল্লভ নাটক* পৃথকভাবে অনুবাদ করেন।[২১] অনুবাদকর্ম ছাড়া এসময়ে মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। এই শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়েই ভারতচন্দ্র রচনা করেন *চণ্ডী নাটক*। এই নাট্যপাঠটি অসম্পূর্ণ এবং এতে বাংলা, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি ও ফার্সি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের ভূমিকাংশ সংস্কৃত রীতি অনুসরণে রচিত। এতে সূত্রধর আবৃত্তি করে সংস্কৃত ভাষায় ও নটী কথা বলে মিশ্রবাংলা ও প্রাকৃতে। এছাড়া বিদ্যানাথ বাচস্পতি *চিত্রভজনা* নামে মিশ্রভাষার আরেকটি নাট্যপাঠ রচনা করেছিলেন, যা ১৭৭৭-৭৮ সনে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় মঞ্চস্থ হয়েছিল।[২২]

সংস্কৃত নাট্যপাঠ অনুবাদের ঝোঁক উনিশ শতকেও অব্যাহত থাকে, কিন্তু সেসব অনুবাদ বৈষ্ণববাদী কিংবা 'চিত্ররাগকাব্য উপরূপক' জাতীয় ছিল না, বরং এসময়ের অনুবাদগুলি ছিল প্রথাগত সংস্কৃত নাট্যকলার প্রধান স্রোতোবাহী। এসবের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক ছিল প্রহসনধর্মী। যেমন, *হাস্যার্ণব* অনূদিত হয়েছিল কবি জগদীশের দ্বারা ১৮২২ সনে এবং *ধূর্তনর্তক* ও *ধূর্তসমাগম*—এই দুই সংস্কৃত প্রহসনও একইভাবে অনূদিত হয়। কৃষ্ণ মিশ্রের ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক *প্রবোধচন্দ্রোদয়* অনূদিত হয়েছিল কাশিনাথ তর্কপঞ্চানন, গদাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি কর্তৃক *আত্মতত্ত্ব কৌমুদী* নামে। ১৮২৮ সনে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার অনুবাদ করেন গোপীনাথের *কৌতুকসর্বস্ব* নাটক। *শকুন্তলা* অনূদিত হয় রামতর্ক ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৮৪৮ সনে, নীলমনি পাল কর্তৃক *রত্নাবলী* অনূদিত হয় ১৮৪৯ সনে এবং রামগতি ন্যায়রত্ন অনুবাদ করেন *মহানাটক* ১৮৫১ সনে।[২৩]

উপরোক্ত অনুবাদ-নাটকসমূহের পর যোগেন্দ্রগুপ্ত রচিত *কীর্তিবিলাস*-ই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে গৌরব ধারণ করে আছে। নাটকটি রচিত হয় ১৮৫১ সনে এবং বৈশিষ্ট্যবিচারে বাংলা ভাষার প্রথম ট্র্যাজেডিও এটি। *কীর্তিবিলাস* যে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব অনুসরণে লিখিত, তার প্রমাণ এতে নান্দীপাঠের ব্যবহার এবং সূত্রধর ও নটী চরিত্রের উপস্থিতি। নাটকের ভাষা গদ্য ও পদ্যমিশ্রিত, কিন্তু বিশেষত গদ্যের ঢং কৃত্রিম এবং অতিরঞ্জন ভারাক্রান্ত। ১৮৫২ সনে আমরা পাই তারাচরণ শিকদার রচিত দ্বিতীয় মৌলিক বাংলা নাটক *ভদ্রার্জুন*। এর ভাষা সাবলীল ও সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত। যদিও নাটকটির এক-তৃতীয়াংশ রচিত হয়েছে পদ্যে, তবু এর সাফল্য এখানেই যে, এটি ভবিষ্যতের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য গদ্যভাষার জন্য একটি পথ তৈরি করে দিয়ে যায়।

---

২১. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ৩২৫-২৬, ৩৩৭।

২২. সাচ্চানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, (কলকাতা ১৯৭৪), ৩৯৭-৯৮।

২৩. ঐ, ৪০০।

আধুনিক রীতিতে প্রস্তুত মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হবার গৌরব বিবেচনা করলে বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত *কুলীন কুলসর্বস্ব*-কেই চিহ্নিত করতে হয়। এটি ১৮৫৪ সনে রচিত হলেও মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৫৭ সনে জয়রাম বসাকের কলকাতাস্থ বাড়িতে। ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটি মূলত একটি কমেডি এবং তা গদ্য-পদ্য উভয় ভাষারীতিতে নির্মিত। অবশ্য এর গদ্যাংশ সাহিত্যধর্মী ও কৃত্রিম। এতে সংস্কৃত ঐতিহ্যানুগ নান্দীর ব্যবহার এবং সূত্রধর-নটী চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি একে সংস্কৃত প্রথাগত নাট্যধারার কাছে ঋণী করে রেখেছে।[২৪] কিন্তু এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের মূলধারার বিরোধিতাও করে যখন আমরা দেখি, সমকালীন সামাজিক সমস্যা, যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয় নাটকটিতে তীক্ষ্ণ সমালোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যাহোক, সংস্কৃত নাটক অনুবাদের ধারা বাংলায় আরো কিছুকাল ধরে চললেও সমকালীন নাট্যচর্চার বিকাশে এর ভূমিকা ছিল গুরুত্বহীন। এ পর্যায়ে *বেণীসংহার* ও *রত্নাবলী* অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৫৮ সনে, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদ করেন *বিক্রমারবৈশ্য*। কিন্তু এসব অনুবাদপ্রচেষ্টা বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে সাহসী দিকনির্দেশনা দানে ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ক্রমবর্ধমান সামাজিক সচেতনতা এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁর প্রভাব সমাজদেহে যতোই দৃঢ়ভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছিল, সংস্কৃত নাট্যকলার আদর্শ মধ্য-উনিশ শতকী বাঙালি সমাজের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে ঠিক ততোখানি অক্ষমতা প্রদর্শন করছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তই (১৮২৪-১৮৭৩) এসময়ের একমাত্র সাহিত্যিক দিকপাল, যিনি এই ক্রান্তিকালে দুই যুগের সেতুবন্ধন হিসেবে আবির্ভূত হন এবং আধুনিক ইউরোপীয় কলাকৌশল প্রয়োগে বাংলা নাটককে সংস্কৃত নাট্যকলার একঘেয়ে প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। আমরা পরে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করবো, তবে এখানে এইটুকু বলে রাখা ভাল যে, এই মধ্য-উনিশ শতক থেকেই প্রকারান্তরে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব এবং এর সিদ্ধান্তসমূহের প্রভাব বাংলা নাট্যকলা থেকে ধীরে ধীরে নির্বাসিত হতে থাকে। শুধু শাস্ত্রীয় সাহিত্যের ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ হয়ে থেকে কিংবা পরোক্ষে স্থানীয় নাট্যকলায় কিছুটা প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেই সংস্কৃত নাট্যাদর্শ নবযুগের ঝোড়ো হাওয়ার মাঝে অসহায়ভাবে দুলতে থাকে।

বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যরীতিকে প্রভূত পরিমাণে বিকশিত করেছিল, যার একটি হলো 'কথানাট্য' এবং অন্যটি 'নাটগীত'। প্রথাগত সংস্কৃত নাট্যকলার মতো এগুলো কেবল পুনরাবৃত্তিমূলক যান্ত্রিক কলাকৌশল অথবা সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে নি, জনগণের সাথে সরাসরি সম্পর্কের মধ্য দিয়েই

২৪. প্রাগুক্ত, ৪০১-৬।

এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয় এবং কখনো জনগণই হয়ে দাঁড়াতো এর রচয়িতা ও একনিষ্ঠ সমর্থক। 'কথানাট্য' হলো এমন এক ধরনের প্রদর্শনী, যেখানে একজনমাত্র কুশীলব (গায়েন অথবা কথক) গদ্যে বা পদ্যছন্দে কাহিনী বর্ণনা করে যায়, কখনো নাচে, কিন্তু সকল সময় বিভিন্ন মেজাজের চরিত্রসমূহ অভিনয় করে দেখায়। এসময় পাশে বসে থাকা একদল কোরাস গায়ক (প্রায়ই এদের সংখ্যা হয়ে থাকে চার জন) তাদের কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নিঃসঙ্গ কুশীলবকে সহায়তা করে চলে। অন্যদিকে কথানাট্যের এমনতরো একক বর্ণনামূলক অভিনয়ের তুলনায় নাটগীত রীতিতে কিছু বাড়তি সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। এতে অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি তিনজন অভিনেতার আবির্ভাব ঘটে এবং একটি কোরাসদল বাদ্যযন্ত্র সহকারে কথানাট্যের মতোই তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে চলে। এমনিভাবে স্থানীয় জনপ্রিয় নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধ্রুপদী নাট্যকলা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল তার প্রমাণ মিলবে বিভিন্ন 'উপরূপক', বিশেষকরে 'নাট্যাত্মকপ্রবন্ধ'গুলো লক্ষ্য করলে। মধ্যযুগের হাতে-লিখা পাণ্ডুলিপিসমূহের প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জা কথানাট্য ও নাটগীত রীতির নাট্যপ্রদর্শনী সম্পর্কে ধারণা গঠনে আমাদের দৃষ্টিকে আরো সম্প্রসারিত করে দেয়।[২৫] তখন এসব নাট্যপ্রদর্শনীর জন্য কোন স্থায়ী সরকারি মঞ্চকাঠামো ছিল না। সাধারণত বাড়ির বহিরাঙ্গন, উপাসনালয়প্রাঙ্গণ, রাজবাড়ির কোন কক্ষ অথবা মেলাউৎসবাদির জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত মাঠই ছিল এসবের অনুষ্ঠানস্থল, যেখানে তিনদিক অথবা চতুর্দিক ঘিরে বিন্যস্ত থাকতো দর্শকের সারি এবং এর মাঝখানে মাটিতে মাদুর বিছানো স্থানে চলতো কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানমালা। এছাড়া দর্শকসংখ্যা আশাতিরিক্ত হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত উঁচু ঢিবি অথবা বাঁশের খুঁটির উপর কাঠের টুকরা স্থাপন দ্বারাও কখনো কিছুটা উন্নত ধরনের মঞ্চ তৈরি করা হতো। কথানাট্য অনুষ্ঠানের সময় যা সচরাচর দর্শকদের দৃষ্টি কাড়তো তা হলো কাহিনী বর্ণনাকারী কুশীলবের হস্তস্থিত একজোড়া করতাল ও অগ্রভাগে মিহি আঁশগুচ্ছ শোভিত ছোট্ট একটি ধর্মীয় লাঠি এবং তার পায়ের গোড়ালিসন্ধিতে বাঁধা ঘুঙুর। অবশ্য যদি অনুষ্ঠানের চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ না হতো, তবেই কেবল কুশীলবকে এমন সজ্জায় দেখা যেতো।

২. *কথানাট্য*

প্রায় হাজার বছরকাল আগে থেকেই যে বাংলায় কথানাট্য রীতির নাট্যানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তার নমুনা সহজেই উপস্থাপন করা যায়। কপিলা বাৎসায়ন "খৃস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ

---

২৫. "Arts of Bengal : The Heritage of Bangladesh and Eastern India", a brochure published on the occasion of an exhibition organized by the White Chapel Art Gallery, in collaboration with Victoria and Albert Museum, 9 November-30 December 1979, London, 14.

শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল *চর্যা* নামক এমন এক ধরনের গানের" অস্তিত্ব নির্দেশ করেন।[২৬] সাধারণভাবে 'চর্যাপদ' (সঠিক জীবনাচরণ সম্পর্কিত বাণী) নামে পরিচিত এসব গানের পাঠ রচয়িতাগণ প্রায় সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তবে নীতিশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত এই গানগুলির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, চর্যাপদগুলো নবম শতকেরও পূর্বকালের রচনা এবং কমপক্ষে সপ্তম শতক থেকে এসব গান রচিত হতে শুরু করে। 'বুদ্ধ নাটক'-এ (বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক নাটক) এরকম একটি চর্যার ব্যবহার লক্ষণীয় :

> বজ্রাচার্য নৃত্য করছে, দেবী গান গাইছে,
> বুদ্ধনাটক সকলেই বুঝতে পারে না।[২৭]

কিছু গবেষক অবশ্য হাজার বছরের পুরনো তিব্বতীয় রেখাচিত্রের অস্তিত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে দেখা যায় 'বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ' বিপুল সংখ্যক দর্শকের সামনে 'যোগাসনে' বসে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন।[২৮] এই সূত্রটুকু পাওয়ার পর আমাদের পক্ষে এটা ধারণা করা নিরাপদ হবে যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধুগণ জনগণের মধ্যে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারের জন্য এমন এক ধরনের নাট্যপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন, যা নাচ, গান এবং শারীরিক কসরৎ তথা যোগাচার সহযোগে প্রদর্শিত হতো।

কথানাট্য রীতির নাট্যপাঠের উপাদান অন্বেষণের জন্য যদি আমরা ইউরোপীয় নাট্যপাঠের ঐতিহ্যের অনুরূপ স্থানীয় নাট্যকলার সংলাপধর্মী উপকরণসমূহের মধ্যে অনুসন্ধান চালাই, তবে তা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়বে, কারণ কথানাট্য মূলত বর্ণনাত্মক অভিনয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর নাট্যপাঠের জন্য অভিনেতাগণ বরাবর নির্ভর করতো একরকম পরিমিত বর্ণনাধর্মী কবিতার উপর। সম্ভবত এসব কবিতা প্রথমাবস্থায় মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হতো এবং তেরো শতকের দিকেই কেবল তা লিপিবদ্ধ হতে শুরু করে।[২৯] এ ধরনের পরিমিত বর্ণনামূলক কবিতাগুলোর বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বিচার করলে আমরা এগুলোকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি :

---

২৬. Kapila Vatsayan *Traditional Indian Theatre : Multiple Streams*, (New Delhi 1980), 138.

২৭. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, (Dhaka 1966), text 17, 54.

২৮. Salim-al-Deen, "Folk Theatre Tradition in Bangladesh : Gram Theatre," brochure published on the occasion of the International Seminar on theatre Journals in Asia, organised by International Theatre Institute, Dhaka, January 17-19, 1991, pages not numbered. .

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, (কলকাতা ১৯৮৯)। ভট্টাচার্য বিশ্বাস করেন যে, তেরো শতকেও মঙ্গলকাব্য অস্তিত্বশীল ছিল (পৃ. ২৭)। তিনি মঙ্গলকাব্যে একধরনের মৌখিক বর্ণনা ও রচনাপদ্ধতির ঐতিহ্য সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক. *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* বর্ণিত আর্যদেবতা ও বীরগণের কাহিনীভিত্তিক কবিতা;

খ. মঙ্গলকাব্যসমূহে বর্ণিত স্থানীয় অনার্য দেবদেবীর কাহিনীভিত্তিক কবিতা;

গ. জঙ্গনামায় বর্ণিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বীর ও সাধুগণের কাহিনীভিত্তিক কবিতা;

ঘ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও ময়মনসিহ গীতিকায় দৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ লোককাহিনী ভিত্তিক কবিতা।

ক. আর্যদেবতা ও বীরদের কাহিনী কথানাট্যের মাঝে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যরীতির উদ্ভব ঘটায় : 'পাঁচালী', 'কথকতা' এবং 'কীর্তন।' কৃত্তিবাস ওঝার (জন্ম ১৩৯৯ খৃ.) *রামায়ণ*, কাশীরাম দাসের (সতেরো শতকের প্রথমদিকে) *মহাভারত*, কবীন্দ্রের (পনেরো শতকের শেষে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে) *ভারতপাঁচালী* এবং *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (১৪৭৩-১৪৮০ খৃ.) হলো মধ্যযুগীয় কবিদের হাতে রচিত অসংখ্য বর্ণনামূলক কাব্যসংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি, যেগুলো পাঁচালী ও কথকতা শ্রেণীর কথানাট্যে নাট্যপাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পাঁচালী আগে যেমন ছিল, এখনও পূর্বোল্লিখিত পাঠবর্ণনা পদ্ধতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে; যদিও এর কিছু পাঠ কোরাস সহযোগেও গাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঁচালী বর্ণনাকারী তার কাজ বসে বসেই সমাধা করে থাকে, কিন্তু সে এই অবস্থাতেও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দ্বারা এবং কণ্ঠস্বরের উঠানামা দ্বারা পাঠে বর্ণিত চরিত্রসমূহ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কপিলা বাৎসায়ন কথিত চর্যাসমূহ নবম শতাব্দীর বাংলায় অস্তিত্বশীল থেকে থাকে, তবে সেসব অবশ্যই পাঁচালী গায়কগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়ে এসেছে, যার সম্ভাব্য প্রাথমিক অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় ত্রয়োদশ শতকে এবং এর বিপুল জনপ্রিয়তা আসে পনেরো শতকে। এই সময় থেকেই প্রথম আমরা পাঁচালীর লিখিত পাঠ হাতে পাই। নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়, উনিশ শতকে এসেই কেবল পাঁচালীতে সংযুক্ত হয় সংলাপরীতি, কিন্তু তা অভিনীত হতে থাকে সেই একজন বর্ণনাকারী দ্বারাই। এসময়ে নতুন সংযোজন হিসেবে আরো আসে 'সঙ' চরিত্রটি। পাঁচালীর মধ্যে গান ও ছড়া আবৃত্তি অথবা নাচের মাধ্যমে সঙ চাইতো নির্দিষ্ট সামাজিক অসঙ্গতিগুলোকে হাস্যকরভাবে অনুকরণ করতে। উনিশ শতকী বাংলার সমসাময়িক সামাজিক বিষয়াদি, যেমন তালাকপ্রাপ্ত রমণীর পুনঃবিবাহ, আয়কর সমস্যা কিংবা প্রতীমাপূজাবিরোধী রাগী ইয়ংবেঙ্গল সম্পর্কিত পাঁচালী খুবই জনপ্রিয় ছিল।[৩০] এমনকি বর্তমানকালেও এই কাঠামোর অনুষ্ঠানমালা গ্রামবাংলায় আগের মতোই দর্শক-শ্রোতাদের চিত্ত বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করতে সমর্থ।

'কথকতা' উৎপত্তিলাভ করে পাঁচালীর পরে (সম্ভবত আঠারো শতকেও এটি অস্তিত্বশীল ছিল)[৩১] এবং পাঁচালীর সাথে এর পার্থক্য মূলত বর্ণনাকারীর ভূমিকা দ্বারা

---

৩০. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, (কলকাতা ১৯৭২), ২১০-১২।

৩১. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ৫০৯।

চিহ্নিত। এতে বর্ণনাকারী কুশীলব গদ্যভাষায় বর্ণনামূলক কবিতাবলী ব্যাখ্যা করে শোনায়, কাহিনীর চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে এবং শুধু বসা অবস্থানে থাকে না বলে চরিত্রচিত্রণে পাঁচালী-রীতির চেয়ে তার শারীরিক সুবিধা বেশি থাকে। যদিও এই নাট্যকাঠামোটি এখন মৃতপ্রায়, তবু গ্রামবাংলায় কোথাও কখনো 'কথকতা'র প্রদর্শনী আজও আমাদের চোখে পড়ে। ষোড়শ শতকে বাংলায় যে ঘোরতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় উপস্থিত হয়, সেসময় শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুসারীগণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় অখণ্ডতার এক অসাধারণ প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিলেন। এই কাজ সার্থকভাবে সম্পাদন করতে গিয়ে তাঁরা বিকশিত করেন এমন কিছু অনুষ্ঠান প্রকরণ, যা মানুষের আত্মিক উৎকর্ষলাভের বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাঁদের ধারণামতে, ঈশ্বরের নামসমূহের পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধ উচ্চারণ মুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সান্নিধ্যলাভের মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে নিশ্চিত ও দ্রুততম পথ হচ্ছে পরমাত্মার উদ্দেশে সম্মিলিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রেমই হওয়া উচিত সকল প্রকার ধর্মীয় অনুশীলনের মূলকথা।

এইভাবে লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত বিরল ঘটনাসমূহের একটি হিসেবে প্রমোদানুষ্ঠান বৈষ্ণবদের কাছে ধর্মীয় প্রার্থনার সমান মর্যাদা ও গুরুত্বে অধিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবদের দ্বারা উদ্ভাবিত দুটি অভিনয়রীতির একটি হলো কথানাট্যের অন্তর্গত 'কীর্তন'। প্রথমদিকে চৈতন্যের জীবিতাবস্থায় কীর্তন ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁরই প্রশংসাগীতি। এটি এমন একদল লোককে নিয়োজিত করে, যারা ভক্তিগদগদ চিত্তে মহাপ্রভুর নাম সমস্বরে ও সমমীড় সহযোগে গেয়ে থাকতো। সতেরো শতকের শুরুতে অনুষ্ঠিত একটি বৈষ্ণব উৎসবে একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক কোরাস সহযোগে গীত হওয়ার মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম 'পদাবলী কীর্তন' প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 'কৃষ্ণলীলা' বর্ণনাই ছিল পদাবলী কীর্তনের উদ্দেশ্য। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে এটি এমন এক জটিল সঙ্গীতকাঠামোয় রূপান্তর লাভ করে, যা 'মঙ্গলকাব্যের' বিস্তৃতিকেও অতিক্রম করে যায়।[৩২] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমরা একে এই রূপেই দেখি, কিন্তু তারপরই পদাবলী কীর্তন পরিণত হয় 'ধাপ কীর্তনে'। ধাপ কীর্তনে কাহিনী বর্ণনাকারী কুশীলবকে আমরা একই সাথে আবৃত্তি, গান, গদ্যবর্ণনা, নৃত্য ইত্যাদি সম্পাদন এবং বর্ণনামূলক অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রচিত্রণে প্রয়াসী হতে দেখি। এখানেও বর্ণনাকারীকে সহায়তা দেয়া হয় সম্মিলিত কোরাসধ্বনি ও বাদ্যবাদন দ্বারা। আমরা দেখতে পাই, এই তিন ধরনের কীর্তন আজো বাংলার গ্রামাঞ্চলে আগের মতোই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ ক'রছে।

---

৩২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য,* ১৭০-১৭১।

খ. আর্য দেবদেবী ছাড়াও বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে অনার্য দেবী, যেমন মনসা, চণ্ডী, শীতলা ও অনার্য দেবতা ধর্ম, সূর্য, শিব এবং আরো কিছু দেবতুল্য ব্যক্তিত্ব, যেমন 'সিদ্ধাচার্যগণ' প্রভৃতির প্রতি প্রবল আনুগত্য ও ভক্তিভাব বিদ্যমান ছিল। অনার্য দেবদেবীর প্রতি সম্মান ও প্রশংসাজ্ঞাপক অনুষ্ঠানাদি প্রধানত দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল— 'মঙ্গলকাব্য' এবং 'নাথগীতিকা'। মঙ্গলকাব্য রচিত হতো শক্তিসাধন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত দেবদেবীগণের প্রশংসা এবং এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান অনার্যচেতনাকে তুলে ধরে। তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে এধরনের বর্ণনামূলক অনুষ্ঠানপাঠ রচনা অব্যাহত থাকে। উন্নতমানের সাহিত্যকর্ম হওয়া ছাড়াও মঙ্গলকাব্য ছিল এমন এক ধরনের নাট্যপাঠ, যা একটি নিরক্ষর জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ভাববিনিময়ে সক্ষম সর্বাধিক উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এখানেও একজন বর্ণনাকারী কুশীলব গান ও নাচের দ্বারা কাহিনী বর্ণনা করে যেতো এবং বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করে দেখাতো, আর স্বাভাবিকভাবেই তাকে সহায়তা করা হতো একদল কোরাস গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রী দিয়ে।[৩৩] বাড়ির উঠোন, উপাসনালয় কিংবা মেলাচত্বরে প্রদর্শিত হতো মঙ্গলকাব্য অনুষ্ঠানমালা এবং একগুচ্ছ দর্শকশ্রোতা বৃত্তাকারে ঘিরে বসতো প্রদর্শনীস্থলকে। মঙ্গলকাব্য রচনাকাঠামোর একটি নির্দিষ্ট ছক ছিল। সম্পূর্ণ নাট্যপাঠটি অবিচ্ছিন্ন ষোলটি পর্বে বিভক্ত করে নিবেদন করা হতো, যার আটটি পর্ব অনুষ্ঠিত হতো দিনের বেলায় (দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) এবং বাকি আটটি রাতে (সূর্যাস্তের পর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত)। অনবরত চলার পরেও মঙ্গলকাব্যের ষোলটি পর্বের অনুষ্ঠানবৃত্ত সমাপ্ত হতে সাধারণত পুরো আটদিন আটরাত্রি লেগে যেতো। ব্যতিক্রম ছিল কেবল *মনসামঙ্গল* ও *ধর্মমঙ্গল* কাব্য। সর্পদেবী মনসার উদ্দেশে নিবেদিত মনসামঙ্গল অনুষ্ঠান শুধু দিনের বেলা প্রদর্শিত হতো এবং একাদিক্রমে ত্রিশ দিন পর্যন্ত চলতো। আর ধর্মদেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত ধর্মমঙ্গল অনুষ্ঠান চলতো একনাগাড়ে বারো দিন বারো রাত।

মঙ্গলকাব্যকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে মধ্যযুগে বাংলার জাতীয় নাট্যকলা হিসেবে। এটি ছিল একাধারে জনপ্রিয় ও অর্থব্যঞ্জনাময় এবং তা শুধু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করে নি, বরং মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অনুষ্ঠান হিসেবেও মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব আমাদের কাছে অত্যধিক।[৩৪] ষোড়শ শতকে বৈষ্ণববাদের সর্বপ্লাবী তরঙ্গাভিঘাত এই বৃত্তানুষ্ঠানের জয়যাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে নি, বরং এতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে কুলীন ব্রাহ্মণ্যচক্রের কাছে সাধারণ মানুষের এই দাবি যে, তাদের নিজস্ব জীবনদর্শনকেও দিতে হবে যথাযথ স্বীকৃতি। এর ফলে মঙ্গলকাব্যের অভ্যন্তরে নাটকীয়ভাবে মূর্ত হয়ে উঠতো শৈব-শাক্ত বিরোধ।

৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ৮৭-৮৮।

৩৪. প্রাগুক্ত, ১৪।

মঙ্গলকাব্যগুলো যে-যে দেবীর প্রশংসা কীর্তনার্থে নিবেদিত হতো সে-সে দেবীর নামানুসারেই কাব্যের নামকরণ হতো। একই বিষয়ে একাধিক কবি বন্দনাগীতির পাঠ রচনা করতেন। এভাবে আমরা মনসাদেবীর স্তুতিমূলক কাব্যকে *মনসামঙ্গল*, চণ্ডীদেবীর প্রশংসায় নিবেদিত কাব্যকে *চণ্ডীমঙ্গল*, ধর্মদেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত কাব্যকে *ধর্মমঙ্গলকাব্য* নামে আখ্যায়িত হতে দেখি। আঠারো শতকের পর থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলো এদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও কাঠামো থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। এমনটি হওয়ার কারণ হচ্ছে, ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের ফলে বাংলায় যে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তাতে জনসাধারণ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অথচ এতকাল গণমানুষের ত্রাতা হিসেবে পূজিত স্থানীয় দেবদেবীগুলো এই দুঃসময়ে নিষ্ক্রিয় থাকার দরুণ জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে স্রেফ অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়।[৩৫] কিন্তু তা সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যগুলোর গল্প-গাথা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকঐতিহ্যের মাঝে স্থান করে নেয় এবং এটাই পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ 'যাত্রা' নাট্যানুষ্ঠানের উদ্ভব ঘটাতে সহায়তা করে। এরই ফলশ্রুতিতে 'চণ্ডীমঙ্গল' রূপান্তরিত হয় 'চণ্ডীযাত্রায়' এবং 'মনসামঙ্গল' রূপলাভ করে 'ভাসানযাত্রার'। ভাসানযাত্রা বাংলার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বিশেষকরে বৃহত্তর বরিশালে আজও বিপুলভাবে জনপ্রিয়।

'নাথ বর্ণনামূলক সাহিত্য' মূলত নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের[৩৬] জন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই রচিত হতো, কিন্তু অবশেষে এটি এর নিজস্ব ধর্মীয় চরিত্র হারায় এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের কাছেও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রধানত মৌখিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও সাধারণের দ্বারা সৃষ্ট এসব গীতিকা মঙ্গলকাব্যের মতো বিভিন্ন স্তর বা পর্বে বিভক্ত নয়, বরং সবসময় এগুলো সমাপ্ত হতো এদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের মধ্য দিয়েই। গীতিকাগুলোর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গীতিকা ছিল নাথ সিদ্ধাচার্যদের প্রশস্তিমূলক এবং সম্ভবত এগুলোই *বুদ্ধনাটকের* সাথে হারিয়ে যাওয়া অতীতের যোগসূত্র পুনর্নির্মাণ করেছিল। মঙ্গলকাব্যের মতো নাথগীতিকা ভাগ্যবিধাতা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির পূজা করে নি, বরং মানবতা ও মানবশক্তির মাহাত্ম্য উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এর প্রদর্শনবৈশিষ্ট্য সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ ছিল, তবে যে-একটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল তা হলো, মঙ্গলকাব্য বর্ণনাকারীর মতো নাথগীতি বর্ণনাকারী কুশীলবের হাতে চামর ও পায়ে ঘুঙুর এই দুটি ধর্মীয় প্রতীক শোভা পেতো না। যথারীতি রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান হিসেবেই এগুলো জনসমক্ষে প্রদর্শিত হতো এবং একেকটি ভাববিষয় একের পর এক জুড়ে দিয়ে অনুষ্ঠানে গতিসঞ্চার করা হতো।[৩৭] নাথগীতিকার প্রকৃত

---

৩৫. ঐ, ১০০।

৩৬. বৌদ্ধধর্মের একটি আঞ্চলিক শাখা, যা পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের মূলধারার সঙ্গে মিশে যায়।

৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ৯১-৯৭, ১০০।

উদাহরণ হিসেবে ষোড়শ শতকে রচিত *গোরক্ষবিজয়* কাব্যের নাম করা যায়। মধ্যযুগের খ্যাতিমান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ এটি রচনা করেন। অবশ্য একই নামে কবি বিদ্যাপতির নাট্যপাঠ *গোরক্ষবিজয়* গ্রন্থখানি অন্তত পনেরো শতকের আগেও যে এদেশে নাথগীতিকা রচিত হতো সে ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বর্ণনাধর্মী রচনাগুলি ছিল মূলত রানী ময়নামতি ও তাঁর পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ঐতিহাসিক কথাকাহিনীভিত্তিক (যা 'গোপীচন্দ্রের গান' নামেই সুপরিচিত)। সতেরো ও আঠারো শতক পর্যন্ত এগুলো এদের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যা সচরাচর খুব কম নাট্যপাঠের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে।[৩৮] এই বর্ণনামূলক কাহিনীকাব্যের অবশিষ্ট কিছু অংশ 'মীননাথের গান' ও 'গোরক্ষনাথের গান' নামে আজও উত্তরবঙ্গে (বৃহত্তর রংপুরে) গীত হয়ে থাকে।[৩৯]

গ. কথানাট্যের তৃতীয় ধারাটি গঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বীর, আধ্যাত্মিক সাধক, মহানবী ও তাঁর পরিবারবর্গের জীবনকাহিনী অবলম্বনে। মুসলিম কবিদের দ্বারা রচিত এসব পরিমিত বর্ণনামূলক রচনা সাধারণভাবে পুঁথি নামে পরিচিত। বৈশিষ্ট্যবিচারে দেখা যায়, এসব পুঁথির ভাষা বাংলা হলেও তা প্রচুর পরিমাণ আরবি-ফার্সি শব্দ সহযোগে রচিত। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার, ১৫৭৬ সনে সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর এদেশে মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে আরবি-ফার্সি ভাষার কদর বৃদ্ধি পায়। ফলে মুসলিম কথাকারগণ রাজানুকূল্যপ্রাপ্ত এবং মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত এ দুটি ভাষা থেকে শব্দসম্ভার আত্মীকৃত করায় সম্যক উৎসাহী ছিলেন। মুসলিম খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ও বীরদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ষোড়শ শতকের এমনি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুঁথিগ্রন্থ হলো শেখ ফয়জুল্লাহর *সত্যপীরের পাঁচালী*, দৌলত উজির বাহরাম খানের *জঙ্গনামা*, সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*, *শবে মেরাজ*, *ওফাতে রসুল* ইত্যাদি। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার উপর রচিত সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথিগ্রন্থ হলো মুহম্মদ খানের *মুকতুল হোসেন* (১৬৪৬)। এই গ্রন্থের আদর্শে এরপর থেকে কারবালা বিষয়ক অসংখ্য পুঁথি রচিত হতে থাকে, যেগুলো সাধারণভাবে 'জঙ্গনামা' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

এটা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, ইসলামী ঐতিহ্যভিত্তিক পুঁথিসাহিত্য এর পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানকাঠামো থেকেই উদ্ভূত। সুকুমার সেন যুক্তি দেখান, মঙ্গলকাব্য যেভাবে গীত হতো, ইসলামী ভাবধারায় রচিত পুঁথিগুলিও প্রায় অনুরূপভাবেই পাঠ করা হতো।[৪০] সুকুমার সেনের এই মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে, কারণ, শেখ

---

৩৮. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ১৮৯।

৩৯. হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, (ঢাকা ১৯৮২), ২২।

৪০. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ৪৭৮।

ফয়জুল্লাহ সত্যপীর কাহিনী অবলম্বনে যে পুঁথিটি লিখেছেন তাকে তিনি 'পাঁচালী' নামেই অভিহিত করেছেন। সুতরাং একথা বলে সমাপ্তি টানা যায় যে, একটি অশিক্ষাপীড়িত সমাজে পুঁথি পাঠ করা হতো প্রায় পাঁচালীর অনুসরণে, এবং অবশ্যই ষোড়শ শতকের পূর্ব থেকে এই রীতি মৌখিকভাবে বিদ্যমান ছিল। আঠারো শতকে 'কথকতার' ধারা বর্ধিত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পুঁথিসাহিত্য এই ধারার অনুষ্ঠানকাঠামোকেও আত্মীকৃত করে নেয় এবং জন্ম দেয় 'গাজীর গান', 'মাদার পীরের গান' ও 'মানিক পীরের গান' যেগুলো আজও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে গীত হয়ে থাকে। 'জঙ্গনামা' অনুষ্ঠানটিও পাঁচালী থেকে কথকতা পর্যন্ত একইভাবে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে অবশেষে 'জারি' (শোকসঙ্গীত) নামে স্থানীয় জনসমাজে প্রভূত খ্যাতিলাভ করে। কোন অজ্ঞাত কারণে এজাতীয় আর সমস্ত পুঁথির চাইতে জারিগান অধিক সাফল্যলাভে সমর্থ হয় এবং কাহিনী বর্ণনাকারী কুশীলবের গৎবাধা কর্মকাণ্ডের সাথে 'কোরাস-নৃত্য' যুক্ত করে এটি গঠন করে এর এক অনন্য অনুষ্ঠানকাঠামো। বৃহত্তর ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে জনমনে আজও ব্যাপক প্রভাববিস্তার করে থাকা এই জারিঅনুষ্ঠানে বীরত্বব্যঞ্জক ও মর্মস্পর্শী ভাবসমূহের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর কোরাস-নৃত্যে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমবেশি পঁচিশ জন এবং এরা পায়ে ঘুঙুর পরিধান করে আর এদের প্রত্যেকের হাতে থাকে এককেটি সুদৃশ্য রুমাল। এর নৃত্যাংশটুকু সত্যিই ভারি উদ্দাম ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও অবশ্য জারিগান কোরাস-নৃত্য ছাড়াই পরিবেশিত হয়। এতে প্রায় দশ সদস্যের একদল বাদ্যযন্ত্রী একটি দৃঢ় বৃত্ত রচনা করে আসন গ্রহণ করে এবং বর্ণনাকারীকে কণ্ঠ ও যন্ত্রবাদনের দ্বারা সহায়তা দেয়। বর্ণনাকারী কুশীলব একাই বাদ্যযন্ত্রীদের সৃষ্ট বৃত্তের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচে, গান গায় অথবা আবৃত্তি করে এবং এই শিল্পীদের থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে উপস্থিত দর্শক–শ্রোতাগণ আবার আরেকটি বড় বৃত্ত রচনা করে মাটিতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকে। গবেষকগণ জারিকে আঠারো শতকের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানরীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪১] সুতরাং এই ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, এই অনুষ্ঠানরীতি সতেরো শতকেও *মুকতুল হোসেন* জাতীয় রচনার মাধ্যমে অস্তিত্বশীল ছিল, এবং নিঃসন্দেহে তা ছিল বর্ণনামূলক রচনাপাঠের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. খৃস্টীয় পনেরো শতকের গোড়াতেই ধর্মভাবমুক্ত ঐহিক বাণী সম্বলিত 'কথানাট্য' অনুষ্ঠানরীতির চতুর্থ ধারাটির উদ্ভব ঘটে প্রধানত রাজানুকূল্যপ্রাপ্ত মুসলমান কবিদের মাধ্যমে। তাঁরা পারস্যদেশীয় রচনাসমূহ সরাসরি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতেন অথবা সেসবের ছায়া অবলম্বনে কাহিনীকাব্য রচনা করতেন। সচরাচর পুঁথি নামে আখ্যায়িত এসব রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'প্রেম' এবং তা বৃহত্তর মানবতার ধারণা সম্পর্কে মানুষের মনে গভীর অনুসন্ধিৎসা জাগাতে পারতো। এতে থাকতো জীবনের সহজ আনন্দোচ্ছ্বাস, মানবিক সৌন্দর্য, নিসর্গপ্রীতি এবং শারীরিক কামনানুভূতির এক উজ্জ্বল প্রকাশরূপ। এই

৪১. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ৪৭৮।

ধারার আবির্ভাবের ফলেই বাংলায় প্রথমবারের মতো সাহিত্য ও শিল্পকলা ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরে গেল এবং এতে প্রাধান্য পেলো ও মূর্ত হয়ে উঠলো দেবতা নয়, রক্তমাংসে গড়া লৌকিক মানুষ। এই ধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম হচ্ছে : ষোল শতকে রচিত শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ জুলেখা;* দৌলত উজির বাহরাম খানের *লাইলি মজনু* এবং দোনা গাজীর *সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল;* সতেরো শতকে রচিত আলাওলের *হপ্ত পয়কর* ও *সয়ফুল মুলক;* আঠারো শতকে মোহাম্মদ মুকিম প্রণীত *গুলে বকাওলী* এবং উনিশ শতকী রচনার মধ্যে মোহাম্মদ খাতেরের *আলেফ-লায়লা*। বর্ণনামূলক এই পুঁথি অনুষ্ঠানে সচরাচর কথানাট্যের সকল বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেতো, কিন্তু প্রায়ই বর্ণনাকারী কুশীলব তার পায়ে ঘুঙুর ও হাতে ধর্মদণ্ড বহন করা থেকে বিরত থাকতো। বাংলার সর্বত্র অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এসব পুঁথিপ্রদর্শনীও সমান জনপ্রিয়তালাভে সক্ষম হয়।

সতেরো শতকে প্রধানত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্থানীয় লোককাহিনী অবলম্বনে ধর্মভাবমুক্ত এক ধরনের বর্ণনামূলক সাহিত্য রচিত হতে থাকে, যা এখন আমাদের কাছে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে সুপরিচিত। আকারে মঙ্গলকাব্যের চেয়ে হ্রস্ব এই গীতিকাগুলি নশ্বর মানুষের বিয়োগাত্মক প্রেমের করুণ পরিণতি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ধারণায় পূর্ণ। পুরোপুরি মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত এসব গীতিকা সর্বপ্রথম ১৯২৩ সনে সংগৃহীত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গীতিকাগুলিতে মানবতাবাদ, মানবীয় কামনা-বাসনা, বলিষ্ঠ নারীচরিত্রের উপস্থিতি এবং ধর্মীয়-নৈতিক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদস্পৃহা পরিলক্ষিত হয়, তা একে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করে। সতেরো শতক থেকে এসব গীতিকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে জনসমক্ষে কথানাট্যের রীতিতেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং সাধারণভাবে সকলের কাছে 'পালাগান' নামে খ্যাতিলাভ করেছে। এ সমস্ত পালাগানের পালাকারদের কেউ কেউ অনুষ্ঠানকে আরো বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে এতে অতি সাধারণ কিছু বাড়তি উপাদান (যেমন একটি বালিশকে ঘোড়া, মৃতব্যক্তি, বা ভারীবস্তুরূপে প্রদর্শন) সংযুক্ত করেন এবং মঞ্চে উপবিষ্ট কোরাস-গায়কদের মধ্য থেকে একজনকে বর্ণনাকারী কুশীলবের সাথে সংলাপে নিয়োজিত করেন। এর ফলে সমগ্র অনুষ্ঠানে নাটকীয়তা, উত্তেজনা, রসঘন মুহূর্ত ও বিষাদময়তা আগের চেয়ে আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে ফুঠে উঠার অবকাশ পায়। উনিশ শতকের কোন এক সময় এই গীতিকাগুলিতে 'যাত্রা' অনুষ্ঠানের প্রভাবে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং পূর্বে অনুসৃত সংলাপরীতি ও চরিত্রচিত্রণকলা সহকারেই এ থেকে 'বাইদ্যার গান' এবং আরো স্বল্প কয়েকটি অনুষ্ঠানপ্রকরণের উদ্ভব ঘটে।[৪২]

৩. *নাটগীত*

মধ্যযুগের অভিনয়কলাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল ত্রি-চরিত্রবিশিষ্ট *গীতগোবিন্দের* সাঙ্গীতিক আদর্শটি এবং এর কাঠামো থেকেই বিকাশলাভ করে নাটগীত

---

৪২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য,* ১০০।

রীতি। আমাদের মাতৃভাষায় রচিত প্রথম সুনির্দিষ্ট নাটগীত অনুষ্ঠানপাঠ হলো বড়ু চণ্ডীদাসের (১৩৭০-১৪৩৩ খৃ.) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এর মূল উপাদান আহরিত হয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ* ও *মহাভারত* থেকে। কপিলা বাৎসায়নের এ সংক্রান্ত উক্তি থেকে জানা যায় :

> সমগ্র কাহিনীটি পরিবেশন করা হতো ত্রি-চরিত্র—যথা কৃষ্ণ, রাধা এবং একজন বৃদ্ধা মহিলা বড়াই-এর গীতিধর্মী সংলাপের মধ্য দিয়ে। এই চরিত্রগুলোর নাটকীয় গঠনকৌশলের জন্য এটি মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও নাট্যপ্রদর্শনীর আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৪৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে একটি নাট্যপাঠ ছিল, এই মত সুকুমার সেন এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যও সমর্থন করেছেন।[৪৪] প্রচুর নৃত্যসহযোগে অনুষ্ঠিত এই নাট্যপাঠ সম্ভবত চক্রাকারে পরপর কয়েকদিন ব্যাপী প্রদর্শিত হতো। মধ্যযুগের বাংলায় নাটগীত রীতির অনুষ্ঠান যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কীর্তিবাস অনূদিত *রামায়ণের* নিম্নোক্ত শ্লোকে :

> নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
> কেহ বেদ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গল ॥
> নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
> পরম আনন্দে লোক আপনা পশরে ॥[৪৫]

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি (বিশেষত বিবাহোৎসব) এবং ধর্মীয় উৎসবে নাটগীত প্রদর্শিত হতো কখনো বাড়ির উঠোনে, গণমিলনায়তনে অথবা মন্দিরসংলগ্ন ময়দানে। 'নাটগীত' এবং 'নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ উপরূপক'-এর মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো ভাষাগত—প্রথমটি রচিত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায়, আর পরেরটি সংস্কৃতে।

তা ছাড়া যে-কেউ ধরে নিতে পারে যে, গণমাধ্যম হিসেবে এর গদ্য ও রম্য অংশে ধ্রুপদী মুদ্রার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক আবেগবাহী উপাদানই বেশি ব্যবহৃত হতো। নাটগীত সচরাচর উপাদান সংগ্রহ করতো *মহাভারত*, *রামায়ণ* ও *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ* থেকে, এবং ঘটনাক্রমে শুধু কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে নি বিধায় পরে ষোড়শ শতকের দিকে এটি মৌলিক গুরুত্বলাভে সক্ষম হয়। চরিত্রগতভাবে নাটগীতরীতি এর নিজস্ব কাঠামো থেকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঝেড়ে ফেলে এবং ষোড়শ শতকে বঙ্গীয় জনসমাজে ক্রমবর্ধমান কৃষ্ণ–ধারণার বিস্তৃতির দরুন এটি মূলত 'প্রেম' বিষয়ের মাঝেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মঙ্গলকাব্যের মতো এটিও সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার

---

৪৩. Kapila Vatsayan, *Theatre*, 139.

৪৪. সুকুমার সেন, *নাটক*, ৭৯ এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৪৫-৫২।

৪৫. উদ্ধৃত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ৯১।

উত্থানকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর ফলে প্রায়ই এতে কোনরকম সামাজিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না।

চীনা পর্যটক ফেই সিনের লেখায় তৎকালীন বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৯৩-১৪১০) রাজসভার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড় নগরী। সুলতানের দরবারে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রাজকীয় ভোজসভায় বিচিত্র বেশভূষাসজ্জিত ও বিবিধ অলঙ্কারপরিহিত রমণীকুলের নাচ-গান দেখে তিনি অত্যন্তমুগ্ধ হন এবং এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৪৬] এটা খুবই সম্ভব যে, ফেই সিন আসলে সুলতানের দরবারে একটি নাটগীত অনুষ্ঠানই প্রদর্শিত হতে দেখেছিলেন। যাহোক, নিচে সংযোজিত কতিপয় সাহিত্যপাঠের উদাহরণ থেকে অনুমান করা যাবে যে, মধ্যযুগের বাংলায় নাটগীতের ক্রমবিকাশমান একটি ঐতিহ্য বেশ ভালভাবেই বিরাজ করছিল। শেখ ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষবিজয়* (১৫৪৫-এর মধ্যে রচিত) কাব্যের এই পদাংশটুকু লক্ষ্য করা যাক :

নাট চর নাটুয়া তাল বহে ছলে।
তোহ্মার মাদলে কোন গুরু গুরু বোলে ॥[৪৭]

বলরাম দাসের (১৫৩০-১৬১০?) *প্রেমবিলাস*-এ পাওয়া যায় :

গৌর বরণ-মনি আভরণ
নাটুয়া মোহন বেশ।[৪৮]

এবং কৃষ্ণদাসের *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত* (১৬১৫) গ্রন্থে মিলবে :

প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা
দেখিলা সকল তাহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা।[৪৯]

চৈতন্যদেব স্বয়ং অন্তত তিনটি নাটগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বলে জানা যায়, যার মধ্যে দুটি প্রদর্শিত হয় নীলাচলে, সেখানকার রাজার সক্রিয় সহযোগিতায়। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* এই ঘটনার উল্লেখ আছে।[৫০]

চৈতন্যের আবির্ভাব এবং ষোড়শ শতকে বাংলায় বৈষ্ণব মতবাদের দ্রুত বিস্তৃতিকালে নাটগীত অনুষ্ঠানরীতি সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে পর্যাপ্ত

---

৪৬. এম. আর. তরফদার, "চৈনিক পর্যটকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, (ভাদ্র-অগ্রহায়ন ১৩৬৪ বা. স.), ৮০; উদ্ধৃত হাবিবুর রহমান, লোকসঙ্গীত, ৬।

৪৭. উদ্ধৃত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* ১ম খণ্ড, (ঢাকা ১৯৫৩), ২১।

৪৮. উদ্ধৃত আবদুর রহমান খান, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রমিক পরিচয়*, (ঢাকা ১৯৮৪), ১২৮।

৪৯. সুকুমার সেন, *নাটক*, ৯৮।

৫০. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৫৭-৫৮।

গুরুত্ব লাভ করে। বৃন্দাবন দাসকৃত অসমাপ্ত চৈতন্যজীবনী *চৈতন্য ভাগবতে* (১৫৪৮) এমন একটি অনুষ্ঠান-প্রদর্শনীর উল্লেখ আছে, যেখানে চৈতন্যদেব স্বয়ং রুক্মিণী চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। এ উপলক্ষে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির আঙিনায় শামিয়ানা ও পর্দা টাঙানো হয়েছিল। এ সময়ে এখানে শিল্পীদের পোশাক পরিবর্তন, প্রসাধন বা সাজগোজের জন্য আলাদা একটি কক্ষ (সাজঘর) সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সকলেই ছিলেন পুরুষ এবং তারা সাজঘরের আড়ালে থেকে নিজেদের এমনভাবে সজ্জিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন যে, দর্শকের সারিতে বসা ভক্ত-অনুসারীগণ মঞ্চে দণ্ডায়মান তাদের অনেককে ঠিকমতো চিনতেই পারে নি। অবশ্য অনুষ্ঠানটি অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়, কারণ চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তিমূলক প্রেমানুভূতি দ্বারা এত বেশি আপ্লুত হন যে, অভিনয় বন্ধ রেখে কোলের উপর কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। উপরোল্লেখিত অনুষ্ঠানটি যে নাটগীত ছাড়া আর কিছু ছিল না এবং এর সম্প্রসারিত রূপই যে 'কৃষ্ণযাত্রার' (আঠারো শতকে 'কালীয়দমন যাত্রা' নামে পরিচিত ছিল) জন্ম দিয়েছে, কপিলা বাৎসায়নের মতো গবেষকও সেটাই বিশ্বাস করেন।[৫১] আজ সমকালীন বাংলাদেশের সাধারণভাবে 'যাত্রা' নামক যে স্থানীয় নাট্যরীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এরই পূর্বসূরি হচ্ছে কৃষ্ণযাত্রা। সুকুমার সেন প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী চৈতন্য প্রবর্তিত 'যাত্রা' এখনো পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে স্থানীয় লোকরঞ্জক গোষ্ঠী 'নেটো'র দলে অনুশীলিত হতে দেখা যায়।[৫২]

ষোড়শ শতকের কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো এর অভিনেতাদের অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং বাদ্যযন্ত্র ও কোরাসের সমন্বয়ে গঠিত অর্কেস্ট্রা দলের সরাসরি উপস্থিতি একে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতো। কোরাস পরিচালনা করতো সম্ভবত একজন কাহিনী বর্ণনাকারী দলনেতা (অধিকারী)। গান (কুশীলবগণ, বর্ণনাকারী ও কোরাসের মাধ্যমে গীত) ও নাচ (কুশীলবগণ কর্তৃক পরিবেশিত) ছাড়াও কৃষ্ণযাত্রায় নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের সমাবেশ লক্ষণীয় :

ক. তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্যসংলাপ ব্যবহার, যা সংলাপরূপে ব্যবহৃত গানের চেয়ে আলাদা ;

খ. কেবল পুরুষ অভিনেতাগণ দ্বারা যাত্রার সকল চরিত্র উপস্থাপন ;

গ. রম্য অনুকাহিনীর উপস্থিতি ;

ঘ. কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনীর উপস্থিতি;

ঙ. ধ্রুপদী রাগভিত্তিক সঙ্গীতের উপস্থিতি;

চ. অঙ্গসজ্জা ও পোশাকের বিশিষ্ট ব্যবহার;

---

৫১. Kapila Vatsayan, *Theatre*. 140.

৫২. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১০।

ছ. প্রলম্বিত অনুষ্ঠান-প্রদর্শনী;

জ. দর্শক ও কলাকুশলীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা বিনিময়;

ঝ. কোন উঁচু মঞ্চ ও পর্দা ছাড়াই উন্মুক্ত স্থানে বৃত্তাকারে প্রদর্শনীর আয়োজন।[৫৩]

বৈশিষ্ট্যবিচারে দেখা যায়, নির্দিষ্টভাবে কৃষ্ণযাত্রা ও সাধারণভাবে নাটগীত রীতি নিজস্ব নাট্যকাঠামো থেকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করে শাস্ত্রোক্ত নয়টি প্রধান রসের অন্যতম 'শৃঙ্গার রসের' মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং বস্তুত ভক্তিমূলক প্রেমকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় কৃষ্ণযাত্রা 'পরমাত্মা' তথা কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বিবিধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রেমের বিচিত্র প্রকাশরূপকে ফুটিয়ে তুলতেই বেশি আগ্রহী ছিল। কেন আঠারো শতকে এসে ভারতীয় নাট্যকলা সাধারণভাবে উন্নতির পথ থেকে সরে গিয়ে অবনতির পথে বাঁক নিলো? এই প্রশ্নে ফভিয়ান বাওয়ার মনে করেন, "মানবীয় আবেগ-অভিজ্ঞতার বিশাল পরিসরকে উপেক্ষা করে কেবল প্রেমসম্পর্কের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আত্মমগ্ন থাকাই এই আধোগামিতার কারণ।"[৫৪]

সতেরো শতকে কৃষ্ণযাত্রার বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে তৎকালীন অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান-প্রদর্শনীতে পরিণত হওয়ার কারণ দ্বিবিধ : প্রথমত রূপ গোস্বামী ও অন্যান্যদের দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় রচিত বিপুল পরিমাণ সাহিত্যকর্ম এবং দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব মতবাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। বৈষ্ণববাদীদের অনেকেই কৃষ্ণযাত্রার পাঠ রচনা করেছেন বলে জানা যায় এবং এঁদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্যের অনুসারী চন্দ্রশেখর দাস ছিলেন অন্যতম। তাঁর রচিত কয়েকটি নাট্যপাঠের মাঝে প্রথমটির নাম *হরিবিলাস*।[৫৫] অন্যদিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করায় এবং চরিত্রে দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে কৃষ্ণযাত্রার আরেকটি অনুষ্ঠানপ্রকরণ গড়ে উঠে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন, বরং চেতন্যদেবই আবির্ভূত হন কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে। এই নতুন ধারার নাটগীত অনুষ্ঠানের নাম দেয়া হয় 'চৈতন্যযাত্রা'।

আঠারো শতকে বেশ কিছু ধর্মসম্প্রদায় ও উপাসক শ্রেণী তাদের কথানাট্যের বর্ণনামূলক ঐতিহ্য থেকে যাত্রারীতির বিকাশসাধনে সক্ষম হয়। যেমন 'শক্তিযাত্রার' উদ্ভব ঘটায় শাক্তগণ, 'নাথযাত্রা' রচনা করে নাথগণ এবং পাল রাজাদের জনপ্রিয় কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয় 'পালযাত্রা'।[৫৬] কিন্তু কৃষ্ণযাত্রা ও চৈতন্যযাত্রা বরাবর

---

৫৩. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৫৮-৫৯।

৫৪. Faubion Bowers, *Theatre in the East : A Survey of Asian Dance and Drama*, (New York 1956), 32.

৫৫. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ১৬৪।

৫৬. ঐ, ১৬৯।

অন্যসব যাত্রানুষ্ঠানের উপর এদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখে। যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আঠারো শতকে যাত্রাকাঠামোকে নতুন রূপে বিন্যস্ত করেছিল, তা হলো এতে 'নারদ' ও 'ব্যাসদেব'-এর মতো কিছু হাস্যরসাত্মক চরিত্রের সংযোজন এবং বিশেষকরে আঠারো শতকের শেষার্ধে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অর্জনের দিকে এর ক্রমাগ্রসরণ। এই পরিবর্তনের স্পষ্ট সাক্ষ্য মিলবে 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রায়', যার কাহিনী নির্মিত হয়েছে কবি ভারতচন্দ্র রচিত *অন্নদামঙ্গল কাব্যের* একটি অধ্যায় অবলম্বনে। সম্ভবত যাত্রানুষ্ঠানে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলেই পরবর্তীতে বাংলায় পেশাদার ভ্রাম্যমান বাদকদলের উদ্ভব ঘটে।[৫৭]

যাত্রা সচরাচর উন্মুক্ত স্থানেই প্রদর্শিত হতো। মন্দিরপ্রাঙ্গণ, সরকারি উৎসবময়দান এবং ধনী ব্যক্তিদের বসতবাড়ির উঠোনে এটি স্বচ্ছন্দে অনুষ্ঠিত হতে পারতো। বৃন্দাবন দাস প্রদত্ত বর্ণনা বিচার করলে দেখা যায়, ষোড়শ শতকে যাত্রা প্রদর্শনের জন্য কোন উঁচু মঞ্চের প্রয়োজন পড়ে নি। তাছাড়া আঠারো শতকে সাধারণ্যে যাত্রানুষ্ঠানের বর্ধিত জনপ্রিয়তা বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝানো হয়েছে এর প্রদর্শনীগুলোয় এক বিরাট সংখ্যক দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতির কথা। আর যেহেতু এটা ছিল নির্ভেজাল এক গণমাধ্যম, তাই এমন ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, দর্শকগণ প্রদর্শনীস্থানের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে আসনগ্রহণ করতো এবং অভিনেতা-কলাকুশলীদের অভিনয় যেন দর্শকগণ সহজেই দেখতে পারে সেজন্য অনুষ্ঠানস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি মাটির উঁচু ভিত্তি, বাঁশের খুঁটি অথবা কাঠ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করা হতো। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মনে করেন, রাত্রিকালীন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা সহজসাধ্য ছিল না বিধায় দিনের বেলাতেই যাত্রা অনুষ্ঠান করতে উদ্যোক্তারা বাধ্য হতো। এ সময়ে নাচ ও গান ছিল আগের মতোই অনুষ্ঠানের উপর একচ্ছত্র প্রভাবিস্তারকারী উপাদান। কিছু জনপ্রিয় গীতের সাথে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চাকে মানসম্মত মনে করা হতো আর এতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে 'ঢোলক' ছিল অপরিহার্যভাবে দৃশ্যমান।[৫৮] অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে ছিল মন্দিরা, করতাল ও খোল।[৫৯] যাত্রায় গীত প্রতিটি গানের শেষে অধিকারী প্রথাসম্মতভাবে মঞ্চে আগমন করতেন এবং নির্দিষ্ট গানের ব্যাখ্যামূলক একটি বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। এভাবে এই প্রদর্শনকাঠামোর মধ্য দিয়েই দীর্ঘকাল ধরে চলেছে যাত্রানুষ্ঠানের বিকাশ ও বিবর্তন, আর বাংলার যেসব অঞ্চলে আঠারো শতকী যাত্রা সর্বাধিক প্রসারলাভ করেছিল সেসবের মধ্যে বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া ও যশোর ছিল অন্যতম।[৬০]

---

৫৭. ঐ, ১৬৯-৭৩।

৫৮. প্রাগুক্ত, ১৬৯-৭৩।

৫৯. জিয়া হায়দার, "যাত্রার উপস্থাপনা পদ্ধতি", যাত্রা-উৎসব ১৯৭৮-৭৯ উপলক্ষে প্রকাশিত *পুস্তিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, (পৃষ্ঠানম্বর মুদ্রিত নেই)।

৬০. *গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য*, *লোকনাট্য*, ১৬৯-৭৩।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কালপর্বে স্থানীয় নাট্যকলার সবগুলো শাখাতেই সেসময়ের সামাজিক অধোগতির সাধারণ চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যাত্রাকে বিশেষত এর নাচ ও গানের মধ্যে নিহিত অশ্লীলতার অভিযোগে বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। তথাপি সাধারণ মানুষের কাছে এর আবেদন আগের মতোই বিদ্যমান ছিল। এসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এমন কয়েকটি যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যে কৃষ্ণযাত্রা (কালীয় দমনযাত্রা), চৈতন্যযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা ও ভাসানযাত্রার নাম উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে চণ্ডীযাত্রা এসেছে চণ্ডীমঙ্গল থেকে এবং ভাসানযাত্রা এসেছে মনসামঙ্গল থেকে।[৬১] আমাদের উল্লিখিত সময়কালেও যাত্রানুষ্ঠানে অস্তিমান ছিল সূত্রধর চরিত্রটি, যার কাজ ছিল অনুষ্ঠান চলাকালীন মূল কাহিনীর বিভিন্ন অংশকে গ্রথিত করতে কিছুক্ষণ পরপরই ধারাবর্ণনাসহ মঞ্চে আবির্ভূত হওয়া।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি পেশাদার যাত্রাদলের প্রযোজক-ব্যবস্থাপক মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম যাত্রানুষ্ঠানে কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করেন। সেসময়ে এই পদক্ষেপ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং ক্রমে তা সর্বত্র আদর্শ নমুনা হিসেবে গৃহীত হয়। তাঁর এই সংস্কারের ফলে নাট্যপাঠের সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি পায়, যেমনকরে এর আগেই গুরুত্বলাভ করেছিল গদ্যভাষায় সংলাপ রচনার বিষয়টি। তাছাড়া এই সংস্কার গদ্যরচনার কৌশলকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তখন বিভিন্ন যুগের নাট্যচরিত্র ও নাট্যপাঠের ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে সঙ্গতি রেখে সমসাময়িক কালের পরিধেয় সামগ্রীর মিশ্রণ ও সাযুজ্যবিধানের বিষয়টি ছিল প্রায় উপেক্ষিত। সংস্কারের ফলে এই ত্রুটি দূর করে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতা বজায় রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং অতি সাধারণ আকারে হলেও এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। যাত্রানুষ্ঠানে গীত প্রতিটি গানের সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়, তবে গানসংখ্যা আগের চেয়ে আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া ধ্রুপদী রাগ-রাগিনী ব্যবহারের প্রবণতা জন্ম দেয় নতুন রীতি ও মেজাজবিশিষ্ট জনপ্রিয় যাত্রাগীতি। আগে বিভিন্ন চরিত্রাভিনেতা যে যেভাবে পারতো নাচের মাধ্যমে অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করতো, কিন্তু এখন এই যথেচ্ছ চর্চা ব্যাহত হয়। স্বল্প সময়ের জন্য কেবল কয়েকজন নির্দিষ্ট চরিত্রাভিনেতাকেই নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হয় এবং নারীচরিত্রগুলি আগের মতোই পুরুষ দ্বারা অভিনীত হতে থাকে। কিন্তু গানের উৎকর্ষসাধনের জন্য এতে যুক্ত করা হয় ঐতিহ্যবাহী 'জুড়ি' প্রথা। এই প্রথায় পুরুষ অভিনেতার জন্য তার পরিবর্তে গান গেয়ে দিত অভিজ্ঞ পুরুষ কণ্ঠশিল্পী এবং নারী চরিত্রের জন্য গান গাইতে নেপথ্যে ব্যবহার করা হতো মানানসই

---

৬১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্য*, ১০০।

বালকশিল্পীকে। এতে কখনো গায়কদের সমবেত কোরাসও প্রয়োজনমতো জুড়ে দেয়া হতো।[৬২] এই সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশকিছু পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র, যেমন বেহালা, হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ইত্যাদি যাত্রা-অর্কেস্ট্রায় সংযুক্ত হয়ে একে আরো সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করে তোলে।[৬৩] অনুষ্ঠানের মধ্যে মাঝে মাঝে কণ্ঠসঙ্গীত প্রক্ষেপের ঐতিহ্যবাহী নিয়মটি পরিত্যক্ত হয়, তবে এই শতাব্দীর বিদায়লগ্নে ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের প্রভাবে এখানে অন্য একটি প্রথারও প্রচলন ঘটে। এটি হলো যাত্রানুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে কিছুক্ষণ প্রারম্ভিক অর্কেস্ট্রাবাদন পর্ব। আরেকটি প্রথা ছিল অনুষ্ঠান চলাকালে দর্শকদের কাছ থেকে দান বা বকশিস সংগ্রহ করা। এটি ছিল উনিশ শতকের অনুষ্ঠানাদিতে সাধারণভাবে দৃশ্যমান ঘটনা এবং আজো এর প্রচলন লক্ষ্য করা যাবে 'গাজীর গান' ও অন্যান্য কিছু স্থানীয় নাট্যানুষ্ঠানে। অবশ্য উনিশ শতক শেষ হওয়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে আমরা এই প্রথাটিকে কেবল যাত্রার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়তে দেখি।

উনিশ শতকী যাত্রানুষ্ঠানে আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংযোজন হলো 'সঙ' বা ভাঁড় চরিত্রের উপস্থাপনা। এসব সঙ বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করতো, তবে তাদের ভাঁড়ামো ছিল কিছুটা অশ্লীল প্রকৃতির।[৬৪] আজো যাত্রানুষ্ঠানে দুই কৌতুক-অঙ্কের মধ্যবর্তী অংশে এইসব সঙের সংক্ষিপ্ত অথচ সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৬৫]

বিশ শতকে যাত্রানুষ্ঠানে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমত, অনুষ্ঠানের প্রযোজক-ব্যবস্থাপক পদে 'অধিকারী'কে সংযুক্ত করা হয়; যিনি এরপর থেকে কলাকুশলী ও সাজসরঞ্জামসহ পুরো যাত্রাদলের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন। অথচ উনিশ শতক সমাপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত অধিকারীর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত নাট্যপাঠ রচনার মধ্যে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বর্ণনাকারীর ভূমিকাতেও তিনি অবতীর্ণ হতেন এবং সঙ্গীত ও নাট্যদৃশ্যের সাথে দর্শক-শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। কখনো কোন বিষয়ে তাকে উপস্থিত বক্তব্যও রাখতে হতো। বিশ শতকের শুরুতে অধিকারীর এই দায়িত্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নাটকের পাঠ রচনার জন্য তখন থেকে তার আর কোন ভূমিকা থাকলো না। তিনি পছন্দসই নাট্যপাঠ সংগ্রহের জন্য প্রায়শ দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করতেন—কখনো নগদ টাকা দিয়ে যাত্রাদলের বাইরে থেকে নাট্যপাঠ কিনে আনতেন, অথবা এ বাবদ নাটকলেখককে চুক্তি মোতাবেক প্রতি প্রদর্শনীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ

---

৬২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য,* ১৯৬-২০৬।

৬৩. জিয়া হায়দার, "যাত্রা"।

৬৪. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য,* ১৯৬-২০৬।

৬৫. সুকুমার সেন, *ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, ৪১১।

প্রদান করতেন। ফলে এরপর হতে যাত্রানুষ্ঠানে বর্ণনাকারীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় এবং এক সময় যাত্রা থেকে এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ বাদ পড়ে।

যাত্রানুষ্ঠানে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছিল তা হচ্ছে এতে 'বিবেক' নামক চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি। সর্বপ্রথম আমরা এই চরিত্রটি উপস্থাপিত হতে দেখি অহিভূষণ ভট্টাচার্যের *সুরাট উদ্ধার* নাটকে, উনিশ শতকের একেবারে শেষে।[৬৬] নৈতিকতা বিষয়ক নাটকে যেভাবে বিমূর্ত গুণাবলীতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হতো, প্রায় অনুরূপভাবে যাত্রার প্রধান চরিত্রগুলোর অভ্যন্তরীণ নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত করতে বিবেক অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতো। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, যাত্রানুষ্ঠান চলাকালীন যেকোন সময় যেকোন স্থানে হঠাৎ গান গাইতে গাইতে বিবেকের আগমন ঘটবে এবং কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট চরিত্রের উদ্দেশে অথবা ঘটনার উপর মন্তব্য করার পর পুনরায় সে দর্শকসারির পিছন দিক দিয়ে বিশ্রামকক্ষে ফিরে আসবে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিবেক চরিত্রটি আর বিমূর্ত থাকে নি; একে বাস্তব চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং এরপর প্রায়শ একজন উদাসী বাউলরূপেই আমরা একে যাত্রামঞ্চে আবির্ভূত হতে দেখি।[৬৭]

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি ছিল যাত্রানুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর এটা সাধিত হয়েছে বিশ শতকের প্রথমার্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে সাধারণভাবে নাটকের বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় উদ্দীপনামূলক পৌরাণিক উপাখ্যান ও সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ধর্মভাবমুক্ত লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকে থাকতো ধোঁয়াটে ভাবানুভূতিময় কাল্পনিকতা। এরকম বিসদৃশ অবস্থায় তখন একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মুকুন্দদাস ও তাঁর দল 'স্বদেশী যাত্রা পার্টি।' মুকুন্দদাস (একাধারে অভিনেতা, গায়ক, পরিচালক, নাট্যকার; জন্ম বরিশালে ১৮৭৯ সালে, মৃত্যু ১৯৩৫ সালে) তাঁর স্বদেশী যাত্রার মাধ্যমে প্রচলিত নাট্যকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন সাধন করেন। সমকালীন উত্তপ্ত সমাজ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ, উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম ও দেশপ্রেম, বর্ণপ্রথা, সামন্ত নির্যাতন ইত্যাদিকে তিনি সাফল্যের সাথে নাটকের বিষয়বস্তুরূপে প্রদর্শনে সক্ষম হন। ১৯০৫ সনে নিজস্ব যাত্রাদল প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুকুন্দদাস অদম্য নিষ্ঠা ও মনোবল সহকারে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে তিনি তাঁর যাত্রাদলের অনুষ্ঠান প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে নজিরবিহীন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। এসময়ে এই জনপ্রিয় প্রদর্শনী পণ্ড করতে পুলিশ বারবার হানা দিয়েছে তাঁর যাত্রামঞ্চে, ঔপনিবেশিক

---

৬৬. ব্রজেন্দ্র কুমার দে, "যাত্রার পালা", যাত্রা-উৎসব ১৯৭৮-৭৯ উপলক্ষে প্রকাশিত *পুস্তিকা,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, (পৃষ্ঠানম্বর মুদ্রিত নেই)।

৬৭. ঐ।

শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাঁর তিন-তিনটি নাটক এবং কারাভ্যন্তরে আবদ্ধ করে রেখেছে তাঁকে পুরো তিনটি বছর। বিশেষকরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালে তাঁর এই অবিস্মরণীয় ত্যাগ ও সংগ্রামী আদর্শের দ্বারা তিনি যাত্রানুষ্ঠানে আর্থ-সামাজিক সচেতনতা সংযুক্তির পথ উন্মুক্ত করে যান।[৬৮] কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত না চল্লিশের দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছলো, ততোক্ষণ পর্যন্ত নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়বস্তু যাত্রার ধর্মীয়পুরাণাশ্রয়ী প্রথাগত চরিত্রকে অতিক্রম করতে পারে নি। সাধারণভাবে সমাজ-রাজনৈতিক বিষয়গুলোর অন্যতম ছিল দেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমান একতা। অধিকন্তু, এ সময়ে পুরুষ অভিনেতা দ্বারা নারী চরিত্রে অভিনয়ের পুরনো চর্চার পরিবর্তে সরাসরি নারী অভিনেতাকে ব্যবহার করা হতে থাকলে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালে অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সনে ভারত-পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্রগঠনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা বিভক্ত হলে যাত্রানুষ্ঠান এক গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হয়। নবপর্যায়ে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান সরকার যাত্রার উন্নতিতে এ সময় খুব সামান্যই আগ্রহ দেখায়। অবশ্য এটা ঠিক যে, যাত্রার আয়োজক ও এর সাথে জড়িত অভিনয়শিল্পীগণ তখনকার অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় সমস্যাদি ও জাতীয় চাহিদার সঙ্গে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে যুক্ত করতে ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অধিকাংশ যাত্রানুষ্ঠানের বিষয় থাকতো হয় ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থূল দেশপ্রেম প্রদর্শন, নয়তো অতি-রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে সেকেলে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে আবেগভারাক্রান্ত প্রতিবাদ জ্ঞাপন। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে; যাত্রাকে এ সময় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নাটকরচয়িতার বিরাট ঘাটতিজনিত সমস্যারও মোকাবেলা করতে হয়েছে। যাহোক, এ সময়ে আমরা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা বরিশালে 'গুনাই যাত্রা' নামক এক ধরনের যাত্রানুষ্ঠানকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখি। গুনাইবিবি নাম্নী এক পল্লীরমণীর লৌকিক প্রেম ও তার জীবনের বেদনাময় করুণ ঘটনাবলী হচ্ছে এই যাত্রার উপজীব্য। যদিও লৌকিক কাহিনীর পাশাপাশি ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক যাত্রার অস্তিত্ব বজায় ছিল, তথাপি 'ভাসানযাত্রা' ও 'কৃষ্ণযাত্রার' নাচে-গানে সমৃদ্ধ লৌকিক কাঠামোটির বিকাশের সাথে সাথে এর অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন ব্রজেন্দ্র কুমার বিশ্বাস এবং একজন খ্যাতিমান অভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস।

সাধারণত যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় একটি ১৮´ × ১৫´ অথবা ২০´ × ১৮´ মাপের আয়তাকার মঞ্চে, যার চতুর্দিক উন্মুক্ত থাকে এবং তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মঞ্চটি নির্মিত হয় অস্থায়ীভাবে শুধু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। মঞ্চের দুই বিপরীত দিকে বাদ্যযন্ত্রীদলের সদস্যদের মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা থাকে। এজন্য প্রধান মঞ্চের সাথে যুক্তাবস্থায় তাদের জন্য ১´—৬´ উঁচু এবং ৩ ফুট চওড়া আরো দুটো সহায়ক কাঠামো নির্মিত হয়। মঞ্চের তৃতীয় দিকে প্রায় ৩০ ফুট দূরে অবস্থিত গ্রীনরুমটি মঞ্চের সঙ্গে ৩ ফুট চওড়াএকটি (অথবা দুটি)

৬৮. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ২৭৩

ঢালপথ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অভিনেতাগণ এই ঢালপথেই গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। দর্শকগণ মঞ্চের চতুর্দিকে (কখনো তিন দিকে) পরিবেষ্টন করে বসে এবং একটি ফাঁকা স্থান সংরক্ষিত রাখা হয় মহিলা দর্শনার্থীদের জন্য। প্রদর্শনী চলাকালীন আশেপাশের সমস্ত শূন্যস্থান দর্শকে পূর্ণ হয়ে যায়। দর্শকদের মাথার উপর টাঙানো থাকে তাঁবুর মতো একটি আচ্ছাদন, যা অনুষ্ঠানস্থলকে সুরক্ষিত রাখে। রাত্রিকালে শিশির ও কুয়াশাপাত থেকে অভিনেতা-কলাকুশলীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যাত্রামঞ্চের চারকোণায় চারটি খুঁটি পুতে তার উপর কাপড়ের অস্থায়ী ছাদ তৈরি করা হয়। স্থানীয় সুবিধা অনুসারে আলোর উৎস হিসেবে মঞ্চের চারকোণায় খুঁটিতে চারটি কোরোসিনের লণ্ঠন অথবা বৈদ্যুতিক বাতি ঝুলিয়ে রাখা হয়। সচরাচর রাত ন'টা বা দশটার দিকে প্রদর্শনী আরম্ভ হয়ে থাকে, কিন্তু এর অন্তত দু'ঘণ্টা আগে থেকেই মঞ্চে নিযুক্ত একজন ঘোষক ঘণ্টা বাজিয়ে অনবরত দর্শক-অভিনেতাদের একথা জানিয়ে যায় যে, মাত্র আর কিছুক্ষণ পরেই অনুষ্ঠানটি শুরু হতে যাচ্ছে। একই সময়ে বাদকদলের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রথম সতর্কীকরণ ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে গ্রীনরুম থেকে যাত্রাদলের সকল সদস্য (ষাট থেকে সত্তর জন) একসঙ্গে প্রার্থনাসঙ্গীত গেয়ে উঠে। প্রথম ঘণ্টাধ্বনির প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দ্বিতীয় আরেকটি ঘণ্টা বেজে উঠলে উপস্থিত বাদকদলের সদস্যগণ সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে আসনগ্রহণ করে প্রায় পৌনে একঘণ্টা যাবৎ ধীরলয়ে উদ্বোধনী বাজনা বাজিয়ে চলে। উদ্বোধনী বাজনা দর্শকদের কাছে এই বার্তা পৌছে দেয় যে, অনুষ্ঠান শুরুর চূড়ান্ত সময় ঘনিয়ে এসেছে। দর্শকদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অংশ এ সময়ে দ্রুত যার যার আসন গ্রহণ করে বসে পড়ে, ফলে যাত্রামঞ্চের চারপাশে আর তিল ধারণের স্থান থাকে না। বাদকগণ উদ্বোধনী বাজনা বাজিয়ে খানিক বিশ্রাম নেয় এবং যেইনা তৃতীয় ঘণ্টাটি বেজে উঠে, তৎক্ষণাৎ তারা ধীরলয়ের পরিবর্তে দ্রুতলয়ের বাজনা শুরু করে দেয়। এরপর যাত্রাদলের নাচিয়ে-গায়কগণ সমবেতভাবে গেয়ে উঠে একটি দেশাত্মবোধক গান। আগে এই দেশাত্মবোধক গানের পরিবর্তে অনুসৃত হতো একজন দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের হিন্দু প্রথাভিত্তিক ভক্তিমূলক কোরাসগীতি; কিন্তু '৪৭-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার (তথা পূর্ব পাকিস্তানের) যাত্রানুষ্ঠানে এর বদলে প্রবর্তিত হয় দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার রীতি। এই পরিবর্তন সাধিত না হয়ে উপায় ছিল না, কারণ ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতিমালায় ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ় স্থান অধিকার করে ছিল। যাহোক, দেশাত্মবোধক গানের পর ঘণ্টাকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় নাচ-গান, হাস্য-কৌতুক সমবায়ে গঠিত 'ভ্যারাইটি শো' বা বিচিত্রানুষ্ঠান। এটা ঠিক যে, এই 'ভ্যারাইটি শো'র কিছু অংশ পরিশীলিত দর্শকরুচির কাছে শালীনতার সীমা অতিক্রমকারী বলে মনে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতি সাধারণ দর্শকদের নিরতিশয় আগ্রহের দিকটি বিবেচনা করে এগুলো যাত্রানুষ্ঠানে বহাল রাখা হয়। বিচিত্রানুষ্ঠান শেষ হতে যখন মধ্যরাত গড়িয়ে যায়, ঠিক তক্ষুণি চতুর্থ ও চূড়ান্ত ঘণ্টাটি উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করে উঠে। এ সময়ে বাদকদল অন্যূন তিন মিনিটকাল অত্যন্ত দ্রুতলয়ে যন্ত্রসঙ্গীত বাজিয়ে যাত্রানুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা জারি করে চলে। শুরু হয় বৈশিষ্ট্যে অতি রোমাঞ্চকর, ভাষায় ওজস্বী এবং উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক

নাট্যকলার প্রভাবে পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট ও চার ঘণ্টাকাল দৈর্ঘ্যের এক অনন্য নাট্যানুষ্ঠান—'যাত্রা'।

অভিনয় চলাকালে অভিনেতাকে সংলাপ বলায় সাহায্য করার জন্য একজন 'প্রম্পটার' থাকে। প্রম্পটার বাদকদলের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নমঞ্চের এক কোণে বসে প্রতিটি গর্ভাঙ্ক, প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ নাট্যপাঠ নিম্নস্বরে আবৃত্তি করে যায়। প্রতিটি গর্ভাঙ্ক শেষ হওয়ার সংকেতস্বরূপ সে একটি ঘণ্টা বাজানোর সাথে সাথে আরম্ভ হয়ে যায় নাচ, গান, ভাঁড়ামি, কৌতুক ইত্যাদি এবং পরবর্তী গর্ভাঙ্ক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এসব দর্শকরঞ্জক বিষয় অনুষ্ঠানকে জমিয়ে রাখে।[৬৯] এভাবে পুরো প্রদর্শনীটি যখন সমাপ্ত হয়, তখন পূর্বের আকাশে ফুটে উঠে রক্তিম আভা—ভোর হওয়ার আর বেশি বাকি থাকে না।

নাটগীত অনুষ্ঠানরীতির ক্রমবিকাশ চিহ্নিত করে প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে আমরা আমাদের দেশে যাত্রানুষ্ঠানের বিবর্তনধারা প্রত্যক্ষ করেছি। যদিও যাত্রা হচ্ছে নাটগীত রীতির প্রধান শাখা, তথাপি এই রীতিকাঠামো থেকে উদ্ভূত অন্যান্য উপশাখাগুলির উত্থানও এসময়ে লক্ষ্য করা যায়। নিচে এরকম তিনটি উপশাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ঘাটু

একটি ঘাটুদলে থাকে 'সরকার' (দলনেতা ও মূল গায়ক), তার কোরাস/ অর্কেস্ট্রা সদস্যগণ এবং সচরাচর চারজন নাচিয়ে-অভিনেতা। এই নাচিয়ে-অভিনেতাদের নির্বাচন করা হয় বারো থেকে ষোল বছর বয়সী বালকদের মধ্য থেকে এবং তারা মূলত নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকে। উক্ত বালকেরা মাথায় মেয়েদের মতো করে লম্বা চুল রাখে এবং তাদের আনুষ্ঠানিক পোশাক হলো শাড়ি। এই অনুষ্ঠানরীতির নাম ঘাটু হওয়ার কারণ, এর প্রদর্শকেরা এদের নৌকা ঘাটে বেঁধে সেখানেই নৌকার পাটাতনের উপর অবস্থান নিয়ে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে থাকে। প্রধানত বর্ষা মওসুমেই এরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং ঘাটে ঘাটে অনুষ্ঠান দেখিয়ে আয়-রোজগারের চেষ্টা চালায়। এদের নৌকার পাটাতনের একপাশে অবস্থান নেয় কোরাস গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীগণ আর অন্যপাশে অভিনেতারা। স্বকণ্ঠে গীত গানগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা ছাড়াও এর অভিনেতারা কোরাস গায়কদের সহযোগিতায় কখনো কেবল বর্ণনামূলক কাহিনীই অভিনয় করে থাকে বা নৃত্যে অংশ নেয়। নাচিয়ে-অভিনেতাগণ ধ্রুপদী নৃত্যকলার নিয়ম-কানুন কিছুই অনুসরণ না করলেও রাতব্যাপী অনুষ্ঠিত তাদের নৃত্যানুষ্ঠান এতোই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত ও রুচিশীল যে, তা আমাদের মনে কার্যকরভাবে প্রেমের বিরহ-বেদনা জাগিয়ে তুলতে পারে। যদিও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে, তথাপি ঘাটু উপভোগ্য মূলত এর সম্পূর্ণ ধর্মভাবমুক্ত লৌকিক প্রেম ও আদিরসের জন্য।[৭০]

---

৬৯. জিয়া হায়দার, "যাত্রা"।

৭০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ২২৫-৩২, এবং ওয়াকিল আহমদ. *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, (ঢাকা ১৯৭৪), ১০৬-৮।

ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট নাট্যকাঠামো ছাড়াও নাটগীত রীতির সকল বৈশিষ্ট্যসহ এই অনুষ্ঠান প্রকরণটি প্রধানত উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে (পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেটের অংশবিশেষ) দৃশ্যগোচর হয়। স্বল্প কিছু গবেষকের মতে, এই অভিনয়রীতি ষোড়শ শতকের পূর্বকালেও বর্তমান ছিল। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করেন সিলেটবাসী সেই বৈষ্ণবকে, যিনি তরুণ বালকদের নিয়ে একটি নাটুকেদল গঠন করে সেসময় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানের অংশসমূহ অভিনয় করে বেড়াতেন।[৭১] যাহোক, বৈষ্ণবীয় ভক্তিচর্চাউদ্ভূত এই নাট্যরীতি সম্ভবত উনিশ শতকে এসেই লৌকিক ও পেশাদার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকবে। বিশ শতকে এসে এই ঘাটুর অভিনেতা ও এর দর্শকবৃন্দ বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল ত্যাগ করে মূলত গ্রামীণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

ছোকরানাচ

ঘাটুর মতো ছোকরানাচও কোন বিশেষ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় তাৎপর্য অনুসরণ করে প্রদর্শিত হয় না। এই দলে আছে 'গীদাল' (দলনেতা ও মূল কণ্ঠশিল্পী), বাদকদলের সদস্যরা এবং নাচিয়ে-অভিনেতাগণ, যাদের সকলেই পুরুষ। দলের সদস্যরা যে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিধান করে থাকে তা অনেকটা ঘাটুসদৃশ, তবে এদের বয়স প্রায়ই ঘাটু অভিনেতাদের চেয়ে বেশি হয় এবং এর নাচিয়ে-অভিনেতারা পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রেও অভিনয় করে থাকে।

ছোকরানাচের মূলবিষয় সাধারণভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। যেকোন ছোকরা প্রদর্শনীতে মূল কণ্ঠশিল্পী (গীদাল)। সে তার বাদকদলসহ প্রদর্শনীস্থলের একপাশে অবস্থান নিয়ে যে বর্ণনামূলক গান পরিবেশন করে চলে, অন্যান্য নাচিয়ে-অভিনেতারা একেই নৃত্য ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বিস্তৃত ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে। তবে অনুষ্ঠান চলাকালে অভিনেতাদের গীতি-সংলাপ এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় যে, তখন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট করেই ধরা পড়ে। বাংলাদেশের উত্তরাংশ, বিশেষত রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে যুবসমাজের মধ্যে ছোকরানাচ অনুষ্ঠান আজো এর প্রেমঘন হার্দিক আবেদনের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাধারণত গ্রামীণ মেলা অথবা বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের সময় ছোকরা নাচ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।[৭২]

অষ্টক

আর একটি অনুষ্ঠানরীতি, যা ঘাটু বা ছোকরানাচ থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রধানত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বৃহত্তর খুলনা জেলাতেই বেশিকরে চোখে পড়ে, তার নাম অষ্টক। সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক এই অনুষ্ঠানটি প্রদর্শিত হয়ে থাকে একদল তরুণী সমভিব্যাহারে। এতে কাহিনী বর্ণনাকারী মূল শিল্পী যখন শ্রীচৈতন্য বা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক

৭১. এম. সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী, "লোকসাহিত্যে ঘাটু গান", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৫ম খণ্ড, নং-২, (১৩৬৮ বা. স.), ৫৯; উদ্ধৃত ওয়াকিল আহমদ, *লোকনাট্য*, ১০৮।

৭২. আরও দেখুন ওয়াকিল আহমদ, ঐ, ১১০-১১।

গাথা সুর সহযোগে উপস্থাপন করে চলে, তখন ক্ষুদ্র একটি বাদকদল এতে অংশ নেয় এবং অনধিক চারজন তরুণী এর সমতালে নির্বাক অভিনয় ও নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। এই তরুণীরা একইসঙ্গে পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রেই রূপদান করায় পারঙ্গম।

জনগণের রসবোধ

সংস্কৃত নাট্যকলায় 'প্রহসন রূপক' ছাড়াও উৎকর্ষ বিচারে অসাধারণ স্বল্প কয়েকটি প্রহসনের সন্ধান আমরা পাই। উদাহরণস্বরূপ বোধায়ন কবি'র *ভাগবদ-অজ্জুকিয়াম,* মহেন্দ্র বিক্রমাবর্মণ-এর *মত্তবিলাসপ্রহসন* ও শঙ্খধরের *লতাকমলিকা*-র নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলোর উপস্থিতি এই ধারণাকেই সমর্থন করে যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে কৌতুকচর্চা বা রসচর্চার ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় একটি মজার ব্যাপার হলো, বর্ণসচেতন সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাদের লেখা নাটকে নিম্নবর্ণের চরিত্র সংযোজনের এতোই বিরোধী ছিলেন যে, এমনকি পেটুকেপনাসর্বস্ব 'বিদূষক' (ভাঁড়) নামক তুচ্ছ কৌতুক চরিত্রটিতেও তারা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণত্ব আরোপে কোনরকম সঙ্কোচবোধ করেন নি।

বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় কৌতুক-ঐতিহ্য বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝেও যে যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল তা বোঝা যায় এখানে প্রচলিত অসংখ্য হাস্যরসাত্মক গানের অস্তিত্ব দেখে। এসব গানের একাংশ আবার সংলাপ আকারে রচিত।[৭৩] উনিশ ও বিশ শতকে লিখিত অসংখ্য নাটক ছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্যে এবং প্রমোদানুষ্ঠানে যে রসচর্চা হতো তার প্রমাণ মিলবে নারায়ণদেবের *পদ্মপুরাণ* ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে, বিশেষকরে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলে*।[৭৪]

সুকুমার সেনের মতানুযায়ী, 'সঙ' (ভাঁড়)-কেন্দ্রিক একজাতীয় অনুষ্ঠানরীতি বাংলায় বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পনেরো শতকের পর পাঁচালীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় তা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।[৭৫] মধ্যযুগের ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের আনন্দোৎসব অথবা প্রমোদানুষ্ঠানে যেমন দেখা যেতো, তেমনি বাংলা অঞ্চলেও ক্ষমতাকাঠামোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার একটি মোক্ষম মাধ্যম হিসেবে সাধারণ মানুষের মাঝে সঙ অর্জন করেছিল প্রভূত জনপ্রিয়তা। এখানে অজস্র কৌতুক-গান, নাচ ও হাস্যরসাত্মক অভিনয়কলার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগের বাংলায় বিরাজমান ছিল এক বিশিষ্ট রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যদিও 'সঙ' রীতির অনুষ্ঠানটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে, তথাপি সুপ্রাচীন একটি ঐতিহ্যের অবশেষ আকারে এটি আজো গ্রামে-গঞ্জে 'বহুরূপী' নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টিকে আছে।

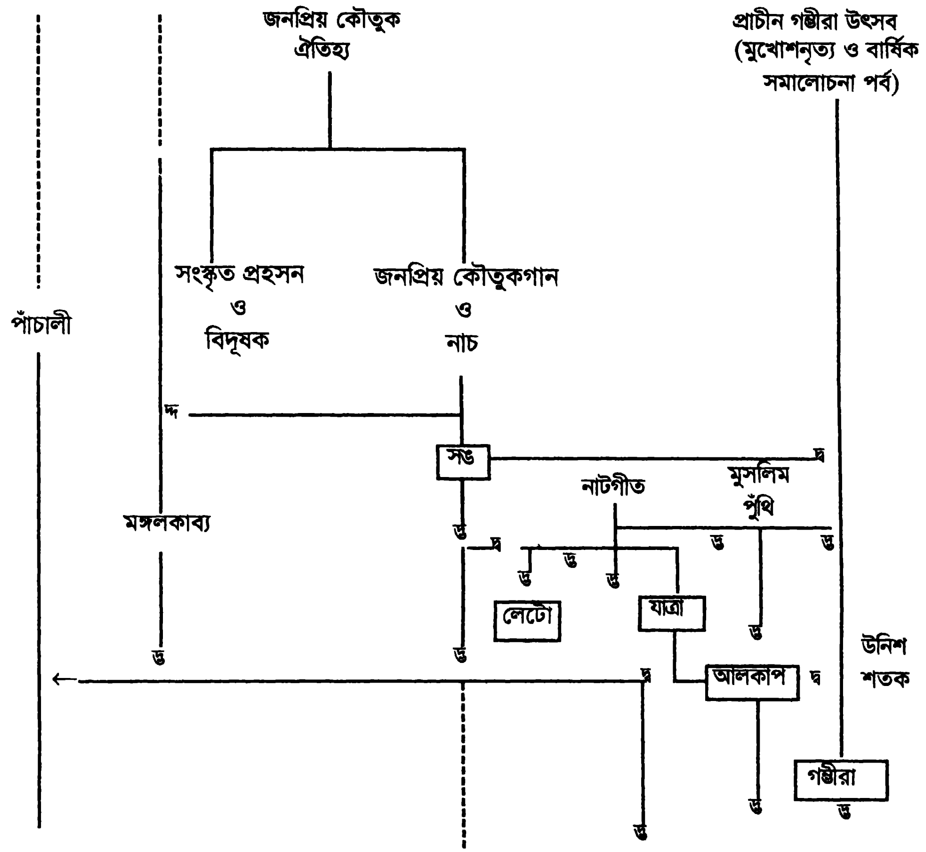
---

৭৩. দেখুন এম সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি,* (ঢাকা ১৯৭৩), ১৯৫-৯৯।

৭৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন বদ্যানাথ শীল, *বাংলা সাহিত্যের লোকনাট্যের ধারা,* (১৩৭৮ বা. স.)।

৭৫. সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১১।

বাংলায় এক সময়ে জনপ্রিয় এইসব রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠানরীতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা কঠিন।তার কারণ, এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত আজো সংগৃহীত হয় নি। তবে সুকুমার সেন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রদ্যোত ঘোষ, অশোক কুমার মিশ্র প্রমুখ গবেষকদের মতামতের উপর নির্ভর করে এর উদ্ভব সম্পর্কে নিম্নপ্রকল্পিত ছকটি উপস্থাপন করা যেতে পারে[৭৬]:



৭৬. দেখুন সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১১; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ২১১-১৩; প্রদ্যোৎ ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি ঃ গম্ভীরা*, (কলকাতা ১৯৮২); অশোক কুমার মিশ্র, *বাংলা প্রহসনের ইতিহাস*. (কলকাতা ১৯৮৮), ৩-৫।

এখানে ধরে নেয়া হচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাসহ সমগ্র ভারতীয় জনগণের মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের একটি সুপ্রাচীন ধারা অস্তিত্বশীল ছিল। এই কৌতুক-ঐতিহ্য দুটি পৃথক অনুষ্ঠানকাঠামোর জন্ম দেয়—একদিকে অভিজাত সংস্কৃত দরবারি নাট্যকলায় 'প্রহসন' ও কিছু নিয়মিত চরিত্র, যেমন 'বিদূষক', অন্যদিকে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৌতুক-অনুষ্ঠানরীতি। এসব অনুষ্ঠানপ্রকরণ, বিশেষকরে 'সঙ' রীতির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালের 'মঙ্গলকাব্য' ও অন্যান্য আরো কিছু অনুষ্ঠানে।[৭৭] পনেরো শতকের পূর্বকালে প্রধানত বিভিন্ন গণউৎসবাদিতে 'সঙ' তথা মার্কামারা বোকাটে গোছের এই চরিত্রটি কথানাট্যের কাছাকাছি রীতিতে অতিরঞ্জিত অনুকরণে সামাজিক অনাচার ও পীড়নের চিত্রগুলো তুলে ধরতো। সঙ যখন গান গাইতো, নাচতো এবং বিভিন্ন উপহাসজর্জরিত কৌতুকচরিত্রে অভিনয় করতো, তখন একদল বাদ্যযন্ত্রী ও কোরাসগায়ক বিচিত্র সুরমূর্ছনায় তাকে সহযোগিতা দিয়ে যেতো। সম্ভবত পনেরো শতকের ঠিক পরেই এই সঙ-রীতির অনুষ্ঠান থেকে নাটগীত ঐতিহ্যের প্রভাবে উদ্ভূত হয় 'লেটো'। লেটো আজো পশ্চিম বাংলায় বহুলপ্রচলিত। এতে আছে আগেই বাঁধা হয়েছে এমন সব গান ও একটি কাহিনী রূপরেখা। এই কাহিনীর অনুসরণে লেটোশিল্পীগণ নৃত্যে অংশ নেয় এবং নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় মুখে মুখে সংলাপ রচনা করে সহজ সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখে। যদিও লেটোর বিষয় হচ্ছে সমসাময়িক গ্রামীণ জীবনের সরস সমালোচনা, তবুও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অশ্লীলতার অভিযোগে কখনো একে ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। সাধারণত গ্রামীণ উৎসবাদি ও পল্লীর সাপ্তাহিক হাট-বাজারে লেটোর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পর্বটির ইতি ঘটে যখন 'পাঁচালী' ও 'যাত্রা' অন্য সব কিছুকে পেছনে ফেলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায় এবং উনিশ শতকে এসে ক্ষীয়মান সঙ-রীতি চূড়ান্তভাবে উল্লিখিত দুটি অনুষ্ঠানকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[৭৮] এরই অবশেষ হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের মালদহ এবং বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় আজো গম্ভীরা উৎসবের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

প্রদ্যোত ঘোষের মতে, গম্ভীরা উৎসব বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি অনার্য সভ্যতা থেকে আগত, এবং যদিও বিশ শতকের সূচনালগ্নেই প্রথম একে নাট্যকলা প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তথাপি বলা দরকার যে, এর রয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছরের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।[৭৯]

গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয় গ্রামের কোন উন্মুক্ত স্থানে এবং এর আগ্রহী দর্শকবৃন্দ আনুমানিক ১৬ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলাকার চক্র রচনা করে অনুষ্ঠানস্থলের চতুর্দিকে আসনগ্রহণ করে থাকে। অনার্য দেবতা শিবের প্রতি সম্মান দেখাতে গম্ভীরার আয়োজন করা হয় এবং

---

৭৭. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ৫৫৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, ২১১-১৩ এবং সুকুমার সেন, *ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৪১১।

৭৯. প্রদ্যোৎ ঘোষ, *লোকসংস্কৃতি*, ৫৮, ৬৮-৭১।

কোন মঞ্চ ছাড়াই সাধারণ সমতল ভূমিতে তা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানস্থলের অনতিদূরে এর সঙ্গে সংলগ্ন একটি গ্রীনরুমের ব্যবস্থা থাকে, যা নির্মিত হয় স্থানান্তরযোগ্য কিছু হালকা নির্মাণোপকরণ দ্বারা। গম্ভীরা ৬টি পর্বে বিভক্ত : ক. ভূমিকাপর্ব (যেখানে সকল অভিনেতা-কলাকুশলীকে দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়), খ. প্রার্থনাপর্ব (যেখানে শিবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এবং অভিনেতা-কলাকুশলীগণ তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করে তা থেকে মুক্তিলাভে শিবের সাহায্য প্রার্থনা করে), গ. দ্বৈতাভিনয় (যেখানে দুটি চরিত্র একটি বিদ্রূপনাট্যে অংশ নেয়), ঘ. চতুরাভিনয় (যেখানে চারটি চরিত্র একটি বিদ্রূপনাট্যে অংশ নিয়ে থাকে) ঙ. বর্ণনাপর্ব এবং চ. প্রতিবেদনপর্ব (যেখানে দুজন অভিনয়শিল্পী স্থানীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সমালোচনা পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয় আলোচিত সমস্যাগুলোর একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান উপস্থাপন দ্বারা। সমালোচনামূলক ও কৌতুকপূর্ণ এই গম্ভীরা অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে থাকে, যেখানে স্থানীয় জনসাধাবণ নিজ সম্প্রদায়কৃত সারা বছরের কর্মকাণ্ডগুলো মূল্যায়নের সুযোগ পায়। এতে কেবল সঙ্গীতাংশটুকুই থাকে পূর্বরচিত আর বাদবাকি গদ্যসংলাপ উপস্থিত মতো মুখে মুখে রচনা করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় নারীবিহীনভাবে শুধু পুরুষ অভিনেতা ও একদল বাদ্যযন্ত্রীর সহায়তায়।[৮০]

সম্ভবত এমন হয়ে থাকবে যে, উনিশ শতকে গম্ভীরা শুধুমাত্র এক ধরনের বর্ণনামূলক অনুষ্ঠানরীতি হিসেবেই বর্তমান ছিল। আজ এটি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা মূলত যাত্রা ও আলকাপ রীতির সঙ্গে এর পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার, গ্রহণ-বর্জনেরই ফলাফল। 'আলকাপ' (আরবীয় ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'কৌতুক') এখন পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না; সম্ভবত উনিশ শতকের দিকে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় সর্বপ্রথম এখানে এর প্রচলন ঘটায়। এতে আছে গান, নাচ ও কৌতুকপূর্ণ ছন্দ-কবিতা এবং দর্শকেরা সারারাতব্যাপী এই অনুষ্ঠান অতি আগ্রহের সাথে উপভোগ করে থাকে। অনুষ্ঠানে সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে রচিত রঙ্গ-কবিতা, অভিনয় এবং গানসহযোগে বর্ণিত কোন একটি জনপ্রিয় লোককাহিনীর উপস্থাপনা থাকে।[৮১] সম্ভবত নাটগীত ধারার অনুষ্ঠানরীতি এবং মুসলিম পুঁথি ঐতিহ্যের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই আলকাপ উদ্ভূত হয়ে থাকবে।[৮২]

আলকাপ অনুষ্ঠানে 'সঙ' একটি অপরিহার্য চরিত্র এবং চলতি ঘটনাবলী নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে দর্শকদের আনন্দ দেয়াই এখানে তার কাজ। অন্যদিকে যখন গম্ভীরা উৎসব শুরু হয়,

---

৮০. প্রাগুক্ত, ৫৬-৬৯।

৮১. ঐ, ৮৬-৮৯।

৮২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *লোকনাট্য*, ৫৫৫।

তখন সঙকে এক মজার কৌতুকমিছিল নিয়ে উৎসবস্থানের পথে পথে অগ্রসর হয়ে এলাকা প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়। বছরের উল্লেখযোগ্য বড় বড় সামাজিক অনিয়ম-অনাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সঙ এসময় প্রদর্শন করে থাকে তার নিজস্ব ধাঁচের অতিরঞ্জিত কৌতুকাভিনয়।[৮৩]

এতোক্ষণ ধরে যেসব কৌতুক-রঙ্গরীতি আলোচিত হলো, অধিকাংশ সময় সমাজের অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক সেসব হয়েছে অবহেলিত, কোণঠাসা এবং অশ্লীলতার অভিযোগে পরিত্যক্ত। কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রকৃত গণমাধ্যম হওয়ার দরুন শাসনক্ষমতার মূলকাঠামোকে সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জ করতে এসব অনুষ্ঠানরীতি যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা কিছুতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সঙ্গত কারণে আজকের আধুনিক গবেষকদের কাছে এটি অবশ্যই দাবি করতে পারে সবিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্ব।

৫. *মিশ্রনাট্য*

উপরে যেসব অনুষ্ঠানকাঠামো সম্বন্ধে আমরা অবগত হয়েছি, সেগুলোর পাশাপাশি বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী আরো কিছু অনুষ্ঠানরীতি উদ্ভাবন করে. যেগুলোর মধ্যে কোনরকম বর্ণনামূলক অথবা নাটকীয় চরিত্রাভিনয় অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও এদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য এগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে প্রধানত 'কবিগান' ও 'পাটুয়াগান' নামক এজাতীয় দুটো অনুষ্ঠানরীতি সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

'কবিগান' হলো বিতর্কের এমন একটি কাঠামো, যেখানে দু'জন পেশাদার চারণকবি পরস্পর বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বাদ্যযন্ত্র ও কোরাসের সহযোগিতায় মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমণাত্মক কবিতা রচনা করে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে ছুড়ে দেয়। বিপক্ষের ছুড়ে দেয়া এই ধাঁধা বা রসাল বক্তব্যের আড়ালে নিহিত সূক্ষ্ম যুক্তি খণ্ডনে যে ব্যর্থ হয়, প্রতিযোগিতায় তারই হার হয়। যদিও কবিগান মূলত ধর্মীয় চরিত্রসম্পন্ন, তথাপি বর্তমানে এটি এর অনুষ্ঠানপরিধির মধ্যে ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীমূলক বিষয়, এমনকি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক বা নৈতিক বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। গবেষকগণ এই প্রদর্শনীকাঠামোর উৎস নির্ণয়ে স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত। রক্ষণশীল মত এই ধারণা দিতে সচেষ্ট যে, এর উৎপত্তি ঘটেছে আঠারো শতকে। এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারীগণ বলতে চান, অন্ততপক্ষে ষোড়শ শতকেরই কোন এক সময় কবিগান উৎপত্তিলাভ করে থাকবে।[৮৪] মধ্য আঠারো শতকে সাধারণভাবে 'খেউড়' নামে পরিচিত

---

৮৩. প্রদ্যোৎ ঘোষ, *সংস্কৃতি,* ৯০-৯২।

৮৪. আরো তথ্যের জন্য দেখুন যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান,* (ঢাকা ১৯৮৫), ২৪-২৫।

কামোদ্দীপক বক্তব্য সংবলিত কবিগানের একটি শাখা পশ্চিম বঙ্গের শান্তিপুর ও এর আশেপাশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া বিভিন্ন লোকপ্রিয় ধাঁধা অবলম্বনে রচিত 'তর্জা'ও ছিল পশ্চিম বঙ্গের একটি জননন্দিত অনুষ্ঠানরীতি। পূর্বপরিকল্পিত গীতিকাঠামো সমবায়ে গঠিত 'দাড়াকবি' নামের আরেকটি আঠারো শতকী কবিগানরীতিও বেশ উল্লেখ করার মতো। এর গীতিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত গানগুলোর বিশেষত্ব এই যে, অনুষ্ঠানে সেসব গান বিতর্ক আকারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।[৮৫]

কবিগানে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল তাদের বিতর্ককে পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কোন কবিগান অনুষ্ঠানে একজন রাধার পক্ষ এবং অন্য প্রতিযোগী কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে পারস্পরিক যুক্তিবাণ নিক্ষেপে তৎপর হয়ে উঠে। অনুরূপভাবে এ দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালকে 'এজিদ-হোসেন', 'সত্য-মিথ্যা' কিংবা 'নারী-পুরুষ' ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী ভূমিকা বা চরিত্র অবলম্বনে তুমুল বিতর্কে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

বিখ্যাত কবিয়াল চট্টগ্রামের রমেশ শীল (১৯০৭-১৯৬৭) কবিগানের বিষয়বস্তুতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। তিনি মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব অবলম্বনে পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব, অথবা বুর্জোয়া সংস্কৃতি বনাম গণসংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে কবিগানের বিতর্ককাঠামোর মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন।[৮৬] তাঁর এই সাফল্যের ধারা আজও অব্যাহত আছে এবং আমরা দেখি, অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠানকাঠামো হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো কবিগান সবিশেষ সমাদৃত।

জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট আরেকটি স্থানীয় অনুষ্ঠানকাঠামো হচ্ছে 'পাটুয়াগান'। এতে এক ভ্রাম্যমাণ বাদকদল (প্রধানত বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং অংশত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় পরিদৃশ্যমান) গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বর্ণনামূলক গান ও হাতেআঁকা বিভিন্ন ধরনের ছবি সহযোগে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে থাকে। পাটুয়াগানের কলাকুশলীদের বেশভূষা ও আচার-পদ্ধতির সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের সাদৃশ্য থাকলেও লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এরা এই দুই সম্প্রদায়ের কোন একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। সম্ভবত গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী আচারপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের কারণেই এরা এই দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। এদের প্রদর্শিত অনুষ্ঠানকাঠামোটি অবশ্যই খুব পুরনো এবং এর উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একে সপ্তম শতকেরও পূর্বকালীন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৮৭] এতে চিত্রপ্রদর্শন ও বর্ণনার মাধ্যমে যে

৮৫. ঐ, ২৭-২৮।

৮৬. ঐ, ৩২।

৮৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ১৭৪।

কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয় তা সচরাচর বাংলার স্থানীয় অনার্য দেবীবৃন্দ (প্রধানত সর্পদেবী মনসা), আর্য দেবতা (রাম ও কৃষ্ণ) এবং মুসলিম সাধুপুরুষ ও ঐতিহ্যবাহী বীর প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে উল্লেখ্য যে, এতে যখন আর্য দেবদেবী বা চরিত্রের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তখন সেগুলোকে আর আর্যবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে মনে হয় না। কারণ, স্থানীয় অনার্য দেবদেবী ও চরিত্রের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য আরোপ করেই অনুষ্ঠানে এদের উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।[৮৮]

৬. *পুতুলনাচ*

পুতুলনাচ সম্পর্কে লিখিত *Bread and Puppet Theatre* গ্রন্থ প্রণেতা প্রখ্যাত পুতুলনাচিয়েদের অন্যতম আমেরিকার পিটার সুম্যান এমন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আজকের আধুনিক অভিনয়শিল্প মূলত পুতুলনাচ থেকেই অস্তিত্বলাভ করে থাকবে। বাংলাদেশের মুস্তাফা মনোয়ারসহ অন্যদের বিশ্বাস, ভারতের স্থানীয় মূর্তিপূজকদের তখনকার পদক্ষেপ থেকেই সর্বপ্রথম পুতুলনাচের উদ্ভব ঘটে, যখন তারা চাইলো তাদের উপাস্য নিস্পন্দ পুতুলগুলোয় কিছুটা গতিসঞ্চার করতে। এর ফলে ভক্তদের সামনে তাদের দেবদেবীর কৃতিত্বকাহিনীকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলে ধরা সম্ভব হলো। সুকুমার সেন এবং স্বল্প কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতীয় ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যকলা অন্তত আংশিকভাবে হলেও পুতুলনৃত্যকলা থেকে উদ্ভবলাভ করেছে। সুকুমার সেন আরো মনে করেন, কালীদাসের সময়ে তাঁর সংস্কৃত নাটক *শকুন্তলার* কিছু অংশ অভিনীত হয়েছিল পুতুলের সাহায্য নিয়েই। অধিকন্তু তাঁর মতে, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যপ্রদর্শক দল গঠিত হতো মূলত তিন প্রধান কুশীলব সমবায়ে—'সূত্রধর' বা হস্তস্থিত সুতার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পুতুল পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তি, একজন পুরুষ ও একজন নারী আবৃত্তিকার। নারী আবৃত্তিকার অবশ্য প্রয়োজনে সম্মুখনৃত্যেও অংশগ্রহণ করে থাকতো।

ভারতীয় পুতুলনাচের সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে জনপ্রিয় রীতিকাঠামো হচ্ছে 'সূত্রপুতুল', আর বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, এর উদ্ভব ঘটেছে কমপক্ষে তিনহাজার বছর আগে। অনুরূপভাবে সূত্রপুতুল রীতির পুতুলনাচ বাংলাদেশেও সর্বাধিক জনপ্রিয়। ধারণা করা হয়, অন্তত আটশ' বছর আগে অভিনয়শিল্পের এক প্রভাবশালী রীতিকাঠামো হিসেবে এই অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল।

বাংলায় সূত্র পুতুলরীতির পুতুলনাচের জন্য সচরাচর যে ধরনের সূত্রপুতুল ব্যবহৃত হয় সেসব ১০´´ থেকে ১২´´ বা বিরলে ১৮´´ উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এসব পুতুল কোমরের ঊর্ধ্বাংশে বাঁধা দুই অথবা তিনটি সুতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এগুলোর কোমরের নিম্নাংশ এমনভাবে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে যে তাতে পদযুগলই শুধু দেখা

৮৮. ঐ, ১৭৩।

যায়। যেসব উপকরণ সহযোগে পুতুলগুলো তৈরি করা হয় সেগুলো হচ্ছে ধানের তুষ, নলখাগড়ার মণ্ড, কাপড় ও ভাত দিয়ে বানানো এক ধরনের আঠা। কখনো পুতুলের মূলকাঠামোটি কাঠ দিয়েও তৈরি করা হয় এবং সেক্ষেত্রে কাঠামোর গায়ে তুষ ও কাদার মিশ্রণ লেপে দিয়ে তার উপর কাপড়ের আবরণ সেঁটে দেয়া হয়। দেখা গেছে, ঐতিহ্যগতভাবে দ্বি-চরিত্রবিশিষ্ট রাধা-কৃষ্ণ অনুষ্ঠান কাঠামোটিই পুতুলনাচের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পুতুলনাচ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বাংলায় দণ্ড বা বাঁশের তৈরি পুতুল নির্মাণের ইতিহাস কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়শ' বছরের পুরনো। সচরাচর বড় মেলা উৎসবে জনতা কর্তৃক পছন্দকৃত যেসব দণ্ডপুতুল দৃশ্যগোচর হয় তার আকার সূত্রপুতুল থেকে বেশ বড় হয়ে থাকে। এদের উচ্চতা তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত হতে পারে। একজন পুতুলনাচিয়ে এজাতীয় একটি পুতুলই কেবল নাচাতে পারে এবং শুধু দু'রকমভাবে পুতুলগুলোকে নাচানো সম্ভব—প্রথমত এদের অবস্থান পরিবর্তন দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত দুই হাতের উঠানামা দ্বারা। এছাড়া কোমর কিংবা নিম্নাঙ্গের কোনরকম সঞ্চালন এসব পুতুলের পক্ষে সম্ভব নয়। আজকের বাংলাদেশে কখনো দণ্ডপুতুলের উদ্ভব বা প্রসার ঘটে নি। আজো পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়াতেই কেবল এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অন্য দুটি পুতুলনির্মাণ রীতি 'দস্তানা' ও 'ছায়া'ও কিন্তু পূর্ব বঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত নয়। মনে করা হয়ে থাকে যে, আজ থেকে সত্তর বছর আগে পশ্চিম বঙ্গেই সর্বপ্রথম দস্তানাপুতুল তৈরির রীতি প্রবর্তিত হয়। সুকুমার সেনের মতানুযায়ী জাভার বিখ্যাত ছায়াপুতুল প্রকৃতপক্ষে এর উৎপত্তির জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের কাছেই ঋণী।

বাংলাদেশে পুতুলনৃত্যকলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এদেশের পুতুলনাচিয়েদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা মনোয়ার এখনো ঢাকায় এ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষায় রত এবং ইতিমধ্যেই তিনি এমন কিছু নতুন পুতুলনাচরীতি উদ্ভাবন করেছেন যা নিঃসন্দেহে সার্থকভাবে পাশ্চাত্যের অগ্রসরতাকে সাঙ্গীকৃত করতে সমর্থ হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের একদা ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ আজ অনেকটাই উৎকর্ষহীন হয়ে পড়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এর অধিকাংশ প্রদর্শনরীতিতেই এখন পুতুলের পাশাপাশি সংযুক্ত হয়েছে একদল জীবন্ত অভিনেতা, যারা সচরাচর অনুষ্ঠানে অশ্লীল নৃত্য পরিবেশনে অংশ নিয়ে থাকে। যাহোক, সবশেষে একথা স্বীকার করা ভাল যে, পুতুলনাচ বিষয়ে বাংলাদেশে এতো অল্প গবেষণা হয়েছে, যেজন্য এ অঞ্চলের এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠানরীতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমরা জানতেও পেরেছি খুব কম।

খ. উপনিবেশপ্রভাবিত নাট্যকলা ও ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এক গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছিল। দেশটি প্রথমে ইংল্যান্ডের শিল্পকারখানার কাঁচামাল সরবরাহকারী ও পরে

বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত হওয়ায় এদেশের সমাজ তথা জনগণের মাঝে জন্মলাভ করে এক ধরনের 'ঔপনিবেশিক মানসবৈকল্য'। এরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে স্পষ্ট হয়ে উঠে দ্বিধাবিভক্তি, যা বাংলার আবহমানকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একটি সুসমন্বিত একক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'গ্রামীণ' ও 'শহুরে'—এই দুই পৃথক পথে চালিত করে। শহুরে অভিজাত শ্রেণী, যারা সংখ্যালঘু কিন্তু অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান, তারা নিজেদের নগর-সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় ধাঁচে সাজাতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও এবং তা নতুন দিকনির্দেশে সক্ষম হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ও তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সাথে এটি সংযোগ হারিয়ে ফেলে। নাট্যকলার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতার প্রভাব ও পরিণতি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার শহুরে অভিজাত শ্রেণীর নাট্যকলা উনিশ শতকী ভারতীয় রাজনীতি-অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতাকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। নগর-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে কেবল '৪৭-পরবর্তীকালে, যখন এটি নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। যাহোক, আমাদের পক্ষে বাংলায় উপনিবেশপ্রভাবিত নাট্যকলার বিকাশ আলোচনা করা সুবিধাজনক হবে যদি মধ্য-আঠারো শতক থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সময়কালকে আমরা নিম্নোক্ত পাঁচটি কালপর্বে ভাগ করে নিই :

১. ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রবর্তন (১৭৫৩-মধ্য উনিশ শতক)
২. অনুকরণ, আত্মীকরণ ও গঠন (১৭৯৫-১৮৭০)
৩. কল্পনাবিলাস ও গণনাট্যশালা (১৮৭০-১৯২০)
৪. সমাজসচেতনতা ও জাতীয়তাবাদ : শিশির কুমার থেকে *নবান্ন* (১৯২০-১৯৪০)
৫. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্থানীয় নাট্যকলার উন্নয়ন (১৮৮১-১৯৩৯)

১. *ইউরোপীয় নাট্যকলা প্রবর্তন (১৭৫৩-মধ্য উনিশ শতক)*

ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় তাদের নিজ দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর পাশাপাশি ভারতে আরো একটি জিনিস বয়ে এনেছিল। এটি হচ্ছে স্থানীয় নাট্যকলার চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন এক ধরনের নাট্যকাঠামো।

যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সালের পলাশী ট্র্যাজেডির পর বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল, এবার তা তার প্রবাসী বৃটিশ বাণিজ্যিক কর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্য কলকাতায় নাট্যপ্রদর্শনী আয়োজনে উৎসাহ প্রদান শুরু করে। তখন সেসব প্রদর্শনীতে কেবল স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর সদস্যদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। পরবর্তীকালে ১৮২০ সনের পর এসব ইংরেজের সান্নিধ্যে আসা স্থানীয় অভিজাতদের মাধ্যমেই কলকাতার শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি প্রথম ইউরোপীয় নাট্যকলা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। কিন্তু এর আগে সকল নাটকই রচিত ও

মঞ্চস্থ হতো ইংরেজ দ্বারা, আর অভিনয়ের জন্য মঞ্চনির্মাণ ও নাট্য প্রদর্শনরীতি ছিল ইংল্যান্ডে বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় রীতিরই হুবহু অনুকৃতি মাত্র।

যতোদূর জানা যায়, বাংলায় সর্বপ্রথম ইংরেজ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় ১৭৫৩ সনে, এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ১৭৫৬ সনে কলকাতা নগর আক্রান্ত ও বিজিত হলে এটি এরপর বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৭৭৫ সনে প্রতিষ্ঠালাভ করে 'দি নিউ প্লে-হাউজ' (কলকাতা থিয়েটার নামেও প্রসিদ্ধ), যা ১৮০৮ সনে এর বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অনবরত শেক্সপিয়র, ম্যাসিঞ্জার, কংগ্রিভ, শেরিডান, ফারকুহার ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করে চলে। এসব নাট্যপ্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রবেশমূল্য ছিল অত্যন্ত বেশি এবং প্রথম অবস্থায় এর নারীচরিত্রে রূপদানের জন্য পুরুষ অভিনেতাদেরই ব্যবহার করা হতো। অবশ্য কয়েক বছর পর মঞ্চে নারীচরিত্রে নারীশিল্পী ব্যবহারের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে কলকাতা থিয়েটারও পূর্বতন রীতি পরিবর্তন করে মঞ্চে প্রথমবারের মতো নারীশিল্পী উপস্থাপন শুরু করে। এসময়ে আরো যেসব নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, এবারে সেগুলোর একটি কালক্রমিক তালিকায় চোখ বুলানো যাক। প্রথমেই আছে : মিসেস বৃস্টোর বাড়িতে স্থাপিত ক্ষুদ্র নাট্যশালা (১৭৮৯-৯০); হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (১৮৯৭-৯৮); এথেনিয়াম থিয়েটার (১৮১২-১৪); চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৪৯); সেনানিবাসস্থ দমদম থিয়েটার (১৮১৭-২৪); বৈটককোনা থিয়েটার (১৮২৪-২) এবং সাঁ সুসি থিয়েটার (১৮৩৯-৪৯)। এসব নাট্যশালার মধ্যে চৌরঙ্গি ও সাঁ সুসি থিয়েটারই ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতিলাভে সমর্থ হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরই একমাত্র বাঙালি ব্যক্তিত্ব, যিনি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। অবশ্য পরে তিনি এর মালিকানাস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বত্ব পরিবর্তনের ঠিক আগের দিনটিতেও এই থিয়েটার পরিচালিত হতো ইংরেজ দ্বারা, এখানে প্রদর্শিত নাটকগুলো সবই ছিল ইংরেজি (শেরিডান, গোল্ডস্মিথ, শেক্সপিয়র ও লন্ডনের মঞ্চসমূহের জনপ্রিয় নাটক) এবং এদের অভিনেতা, কলাকুশলী সবই ছিল ইংরেজ। সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বেশ ক'জন বাঙালি (দ্বারকানাথ ঠাকুর, মোতিলাল শীল, রাধামাধব ব্যানার্জী, রমানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য) এবং এই থিয়েটারটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে বৈষ্ণব চরণ আঢ্য, বিশেষত *ওথেলো* নাটকে তাঁর অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য (১৭ আগস্ট, ১৮৪৯)। আঢ্য ছাড়া এই থিয়েটারের বাকি সবাই ছিল ইংরেজ এবং এখানে শুধু ইংরেজি নাটকই মঞ্চস্থ হয়ে থাকতো।

ইংরেজি থিয়েটারের এই ধারা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাট্যশালা হচ্ছে : মিসেস লুইস এর থিয়েটার রয়েল, ফোর্ট উইলিয়মস্থ থিয়েটার রয়েল, অপেরা হাউজে মিসেস ইংলিশ-এর থিয়েটার, লিন্ডসে

থিয়েটার, গ্যারিসন থিয়েটার ইত্যাদি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থানীয় বাংলা থিয়েটার উত্থান লাভ করলে এসব ইংরেজি থিয়েটার পূর্বেকার সকল তাৎপর্য হারায়।[৮৯]

২. *অনুকরণ, আত্মীকরণ ও গঠন (১৭৯৫-১৮৭০)*

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র নাট্যরীতি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে একীভূত হয়ে গঠন করেছিল বাংলা নাটকের এক বিশিষ্ট রূপ ও কাঠামো। নাটগীত (প্রধানত যাত্রা), সংস্কৃত রীতি ও ইংরেজি রীতি এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নতুন ধারার বাংলা নাট্যকলা পরবর্তীকালে এদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

ইউরোপীয় রীতিতে প্রস্তুত আধুনিক মঞ্চে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত নাটক মঞ্চস্থ করার দুর্লভ কৃতিত্ব কোন বাঙালির নয়, গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) নামক জনৈক রুশদেশীয় নাট্যপ্রেমিক সম্পূর্ণ স্থানীয় কলাকুশলী (নারী ও পুরুষ) সমবায়ে ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর এই ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন করেন। নাট্যপাঠ হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন রিচার্ড জড্রেল (১৭৪৫-১৮৩১)-এর কৌতুকনাট্য *দি ডিজগাইজ*। তিনি নিজেই নাটকটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন (মলিয়েরের *লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর*-ও তিনি ভাষান্তরিত করেন) এবং কলকাতাস্থ ২৫ ডুমতোলা (বর্তমানে এজরা) স্ট্রিটে অবস্থিত বেঙ্গলি থিয়েটারে প্রথম এর মঞ্চ-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছর ১৭৯৬ সালের ২১ মার্চ একই স্থানে এটি দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের দর্শনীমূল্য ছিল অত্যন্ত বেশি (প্রথম প্রদর্শনীতে ৮ টাকা ও ৪ টাকা এবং দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে ১ স্বর্ণ মোহর)। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রতিটি প্রদর্শনীই ছিল অত্যন্ত জমজমাট এবং উপচে পড়া দর্শক-শ্রোতায় নাট্যশালা ছিল পরিপূর্ণ।[৯০]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি ভাষায় একটি নাটক লিখেন এবং এর নাম দেন *দি পারসিকিউটেড*। কিছু গবেষক দাবি করেন, ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর আদলে নাটক রচনার এটিই প্রথম কোন এদেশীয় উদ্যোগ।[৯১] কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইউরোপীয় নাট্যকলার, বিশেষত শেক্সপিয়রীয় নাট্যাদর্শ প্রচার ও চর্চায় যে দুটি প্রতিষ্ঠান পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা হলো হিন্দু কলেজ এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। একজন বিশুদ্ধ নাট্যামোদী, হিন্দু কলেজের আর. এল. রিচার্ডসন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কলকাতা থিয়েটারে পরিদৃশ্যমান শেক্সপিয়রীয় নাট্যাদর্শের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁর ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করতে চাইতেন। তাছাড়া স্কুল ও কলেজে নতুন প্রবর্তিত শিক্ষা কারিকুলামেও শেক্সপিয়রকে গ্রহণ করা হলো এর অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে। ফলে

---

৮৯. Sushil Mukherjee, *The Story of Calcutta Theatres : 1753-1980*, (Calcutta 1982), 2-7.

৯০. ঐ, 8-10.

৯১. কমলকুমার স্যান্যাল, *বাংলা নাটক সমীক্ষা*, (কলকাতা ১৯৭৬), ৫৯।

১৯২০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী শিক্ষাক্ষেত্রে শেক্সপিয়রীয় আদর্শ বজায় থাকে এবং ১৯৪০ সালের আগে কিছুতেই এর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করা সম্ভব হয় নি। ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি নাট্যশালা শেক্সপিয়রকে যে কতো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করায় নিয়োজিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই ঘটনায়, যখন ১৮৩১ সালে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তাঁর হিন্দু থিয়েটার উদ্বোধন করেছিলেন শেক্সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* (পঞ্চম পর্ব) এবং সংস্কৃত নাটক ভবভূতির *উত্তর রাম চরিত* (প্রথম পর্ব)-এর ভাষান্তরিত ইংরেজি নাট্যরূপ মঞ্চস্থ দ্বারা। হিন্দু থিয়েটার সক্রিয় ছিল বড়জোর এক বৎসর এবং এর কারণ সম্ভবত এই যে বাংলা ভাষায় নাটক মঞ্চায়নে এটি উৎসাহ প্রদর্শন না করে ইংরেজি ভাষাতেই নিজেদের সকল তৎপরতা সীমাবদ্ধ রেখেছিল।[৯২]

নিকট অতীতে ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকেও দুই নাট্যধারা—সংস্কৃত ও নাটগীত একত্রে এদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকাংশে বজায় রেখে চলেছিল, যদিও ইংরেজি নাট্যধারার চেয়ে এরা অধিক শক্তিশালী ছিল না। সংস্কৃত নাট্যকলার প্রতিক্রিয়া আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। একমাত্র নাটগীত ধারাটিই এদেশের মধ্যবিত্ত জনাংশের মধ্যে আগের মতো জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তার কারণ এই শ্রেণীটির ইংরেজি থিয়েটারে প্রবেশাধিকার প্রায় ছিলনা বললেই চলে। ১৮৫৩ সালে মঞ্চস্থ *বিদ্যাসুন্দর* নাটককে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। এর কৃতিত্ব এখানে যে এটি ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক যা ইউরোপীয় কলাকৌশলের দ্বারা উপস্থাপিত। নাটকটির বিশেষত্ব হলো, একে সেসময়ে জনপ্রিয় ধারার যাত্রানুষ্ঠান থেকে আধুনিক মঞ্চে তুলে আনা হয় এবং আরো পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকাহিনী থেকে বিযুক্ত হয়ে এটি যাত্রানুষ্ঠানে প্রদর্শনোপযোগী বিকাশ লাভ করেছিল। *বিদ্যাসুন্দর* নারী ও পুরুষ উভয় অভিনয়শিল্পী সহযোগে কলকাতায় নবীনচন্দ্রের বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। ধনবান ও সৌখিন বাঙালি সংস্কৃতামোদীরা নাটকটির নির্মাণব্যয় বাবদ দুই লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থই নিজেদের তহবিল থেকে মিটিয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অর্থের একটি বড় অংশই ব্যয়িত হয়েছিল ইংরেজদের কাছ থেকে মঞ্চসজ্জা-উপকরণ আমদানির পেছনে।[৯৩]

অন্যদিকে, দেশের শিক্ষায়তনগুলোতে শেক্সপিয়রীয় নাট্যাদর্শ ও ইউরোপীয় রোমান্টিক নাট্যনির্মাণরীতির প্রভাব অব্যাহত থাকে। ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা গর্ভনমেন্ট হাউজে অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাফল্যের সাথে *দি মারচেন্ট অব ভেনিস* নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এই সাফল্য কলেজের ছাত্রদের পরবর্তী বছরগুলোতে

---

৯২. Sushil Mukherjee, *Theatres*, 13-14.

৯৩. ঐ, 14-15.

আরো কিছু সংখ্যক ইংরেজি নাটক মঞ্চায়িত করতে উৎসাহ যোগায়। ১৮৫২ সালে মেট্রোপলিটান একাডেমির ছাত্ররা *জুলিয়াস সিজার* নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।[৯৪] ১৮৫৩ সালে *ভানুমতি চিত্তবিলাস* নামে প্রকাশিত হয় *দি মারচেন্ট অব ভেনিস* নাটকের হরচন্দ্র ঘোষকৃত বঙ্গানুবাদ। একই বছর ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রবৃন্দ উল্লিখিত নাটকটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু এসময়ে পূর্বোক্ত অনূদিত নাট্যপাঠের পরিবর্তে মূলপাঠই অনুসরণ করা হয়।[৯৫] ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রাক্তন ও উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে একটি নিয়মিত থিয়েটার কোম্পানি *দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার* প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯৫৩ সালের মধ্যে পেশাদার ইংরেজ অভিনেতাদের সাহায্যে মঞ্চস্থ করে যথাক্রমে *ওথেলো* (১৮৫৩), *দি মারচেন্ট অব ভেনিস* (১৮৫৪) এবং ১৮৫৫ সালে *হেনরি দ্য ফোর্থ* এর প্রথম পর্ব। এসময়ে বহু বাঙালি দর্শক এসব নাট্যানুষ্ঠানের চারপাশে ঔৎসুক্য সহকারে সমবেত হয়েছিল, যদিও ইংরেজি না জানার কারণে তারা নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে সক্ষম ছিল না।[৯৬] তথাপি, পরবর্তীকালের সুযোগ্য নাট্যকার সৃষ্টিতে এসব অনিয়মিত নাট্যানুষ্ঠান এবং নিয়মিত পেশাদার নাট্যপ্রদর্শনীর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

১৯৫০ সাল নাগাদ কলকাতার কয়েকজন ধনবান ব্যক্তির বাসভবনে স্থাপিত হয় আধুনিক মঞ্চসুবিধাযুক্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিগত নাট্যশালা। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৫৪) ইংরেজি ভাষায় মঞ্চস্থ করে *জুলিয়াস সিজার* নাটক; আশুতোষ দেবের (সতু বাবু) থিয়েটার ১৮৫৭ সালে প্রদর্শন করে *শকুন্তলা* নাটকের বঙ্গানুবাদ; কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যাৎসাহিনী থিয়েটার *বেনীসংহার* ও *বিক্রমোবর্শী* নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে ১৯৫৭ সালে। কিন্তু এসব নাট্যশালার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বেলগাছিয়া থিয়েটার (১৮৫৮-১৮৬১), যা বাঙালিদের স্থায়ী ও আধুনিক মঞ্চকাঠামো নির্মাণপ্রক্রিয়ার প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসেবে গৌরবের দাবিদার। পাইক পাড়ার রাজাগণ তাঁদের বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়িতে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই মনোরম নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু নাটক নয়, এর উচ্চাঙ্গের অর্কেস্ট্রা, যথানুপাতিক নেপথ্যসজ্জা, গ্যাস ও লাইম আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি ইংরেজ দর্শকদের জন্য সংস্কৃত *রত্নাবলী* নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, তিনি এই বেলগাছিয়া থিয়েটারের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম নাট্যজগতে আবির্ভূত হন। *রত্নাবলী* অনুবাদসূত্রে তিনি থিয়েটারের জন্য নাটক রচনায় উৎসাহবোধ করেন এবং বেলগাছিয়া থিয়েটার ১৮৫৯ সালে তাঁর প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা*

---

৯৪. P. Guha Thakurta, *The Bengali Drama*, (London 1930), 49-50.

৯৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস: ১৭৯৫-১৭৬*, (কলকাতা ১৯৩৩), ৩০ ও ৪০।

৯৬. P. Guha Thakurta, *Drama*, 50.

মঞ্চস্থ করে। এরপর থেকে মধুসূদন আরো নতুন নাটক ও প্রহসন লেখায় মনোনিবেশ করেন। তিনি লিখেন *পদ্মাবতী* (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৫), *একেই কি বলে সভ্যতা* (প্রকাশিত ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৯৬৫), *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (প্রকাশিত ১৯৬০, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭), *কৃষ্ণকুমারী* (প্রকাশিত ১৮৬১, প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৬৭) এবং *মায়াকানন* (প্রকাশিত ১৮৭৪)।

বাংলা থিয়েটারে সর্বপ্রথম মধুসূদনের হাতেই ইউরোপীয় নাটক রচনারীতির এক অপূর্ব আত্মীকরণ সুসম্পন্ন হয়। নাটকের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সচেতন ব্যবহার এই প্রথম এক পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাট্যকাঠামোর অঙ্গীভূত হয়। যদিও মধুসূদন ঘোষণা করেছিলেন, "সংস্কৃতের প্রতি দাসসুলভ মুগ্ধতার যে বেড়ি আমাদের উপর চেপে বসেছে, আমি তা ছুড়ে ফেলে দিতে চাই", তথাপি তিনি তাঁর এই ইচ্ছের যথার্থ প্রতিফলন অন্তত *শর্মিষ্ঠায়* ঘটাতে পারেন নি। সংস্কৃত নাটক *রত্নাবলী*-র গঠনকাঠামোর সাথে *শর্মিষ্ঠার* গঠন, বিশেষত এর পরিণতিসূচক সাদৃশ্য ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাঁর পরবর্তী নাটক *পদ্মাবতীর* গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো : ক. এতে সর্বপ্রথম মুক্তছন্দরীতি তথা অমিত্রাক্ষর রীতি ব্যবহার, যা বাংলা ভাষা এবং বাংলা থিয়েটারে সম্পূর্ণ অভিনব সংযোজন, খ. গ্রিক উপকথার (সোনালী আপেল) ব্যবহার এবং গ. ক্রমবর্ধমান শেক্সপিয়রীয় প্রভাব ও সংস্কৃত নাট্যরীতির ক্রমহ্রাসমান প্রভাব। তাঁর *কৃষ্ণকুমারী* নাটকটি বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি এবং প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক হওয়ার গৌরবও এর। মধুসূদন তাঁর জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত অন্তিম দিনগুলোতে লিখেছিলেন সর্বশেষ নাটক *মায়াকানন*। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা অনেকটা কৃত্রিম ও সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে উঠে। সম্ভবত বিরূপ সময়ের প্রতিঘাতে জর্জরিত মধুসূদন এসময়ে নাটক লেখায় তাঁর পূর্বেকার সকল প্রতিশ্রুতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সংস্কৃতমুগ্ধতার যে বেড়ি তিনি আমাদের ভাষা ও সাহিত্য থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত এই প্রতিভাবান যুগন্ধর নিজেই তাতে জড়িয়ে পড়েন।

যাহোক, মধুসূদন দত্তের অনন্য কীর্তিগাথার মাঝে কেবল প্রহসনগুলোই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এগুলোর ভাষা সরল, অন্তর্গত ব্যঙ্গবাক্য অতি ধারালো ও যুক্তিযুক্ত এবং এতে চরিত্রসমূহ এমন চমৎকার দক্ষতায় চিত্রিত যে এরা সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। *একেই কি বলে সভ্যতা*-য় মধুসূদন উনিশ শতকী এক অতি-আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের জীবনাচরণকে তীব্র বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন, যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত ছিল এবং বাঈজীনাচ, সুরাসক্তি ইত্যাদি নানাবিধ উশৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপে নিমজ্জিত থেকে এর মধ্যে সভ্যতা অনুসন্ধান করতো। তাঁর আরেকটি সার্থক প্রহসন *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*। সম্ভবত মলিয়েরের *তার্তুফ* থেকে তিনি এটি রচনায় প্রেরণা লাভ করে থাকবেন। সমাজের ভালমানুষির মুখোশ আঁটা প্রভাবশালী শ্রেণীটির ভণ্ডামি ও অসাধুতার স্বরূপ উন্মোচনই ছিল এর উদ্দেশ্য। পাইকপাড়ার রাজার অনুরোধে

লিখিত এই নাটকটি প্রদর্শনের জন্য মহড়া পর্যন্ত গেলেও দুর্ভাগ্যক্রমে এতে বিচলিত উল্লিখিত শ্রেণী প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করলে অবেশেষে মহড়া বন্ধ রেখে এর প্রদর্শনী বাতিল করতে হয়।[৯৭]

নাটকের কাহিনীবিন্যাসে বিভিন্ন ঘটনার ঐক্য সৃষ্টিতে মধুসূদন ছিলেন একজন সক্ষম কারিগর, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে নাটকীয় মুহূর্তের সংযোজনে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায়শ নিমজ্জিত হতো দীর্ঘ স্বগতোক্তির মাঝে এবং অপ্রয়োজনীয় নিসর্গ বর্ণনা ও একঘেয়ে সংলাপ নাটককে করে তুলতো ভারাক্রান্ত। তথাপি মধুসূদন অত্যন্ত সার্থকভাবে ইউরোপীয় নাট্যকলা, বিশেষভাবে শেক্সপিয়রীয় নাট্যকৌশলসমূহ বাংলা নাটকে প্রয়োগ করে ভবিষ্যৎ বাঙালি নাটক রচয়িতাদের জন্য পথনির্দেশনা রেখে যান। তিনি ছিলেন সংস্কৃত যুগ থেকে নতুন যুগে উত্তরণের সেতুবন্ধ স্বরূপ এবং সেজন্যে একজন প্রথাবিরোধী নতুনের প্রবর্তক সমাজের প্রথাপন্থী রক্ষণশীলদের কাছ থেকে যতোটুকু তিক্ত সমালোচনা ও বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তার সবটুকুই তাঁকে একাকী সইতে হয়েছিল।

মধুসূদনের সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্র (প্রকৃত নাম গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র, ১৮৩০-১৮৭৩) তাঁর পূর্বসূরির হাতে সদ্যগঠিত নাট্যকাঠামোকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দান করেন। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি শিক্ষালাভকারী দীনবন্ধু ডাক বিভাগে চাকুরিসূত্রে এক বিরাট গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। তিনি ১৮৬০ সালে লিখিত তাঁর *নীল দর্পণ* নাটকটি (প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৬১ সালে, ঢাকায়) প্রকাশ করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এই নাটকে তৎকালীন বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ নীলকর ও তাদের যথেচ্ছ নিপীড়ন-নির্যাতনকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। বহুজনের বিবেচনায় *নীল দর্পণ* 'জনপ্রিয় প্রতিবাদের এক বাস্তববাদী নাটক', কিন্তু ফলাফলের দিক থেকে এটি মেলোড্রামার অন্তর্ভুক্ত। রক্ত, নির্যাতন এবং জমির মালিক ও চাষীদের উপর নেমে আসা ভয়াবহ দুর্দশাচিত্রের ব্যবহার এতে অতি রোমাঞ্চকর ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। যাহোক, এই নাট্য প্রতিবাদ যে শহুরে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে কার্যকর অবদান রেখেছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে এরপর বাংলা নাটককে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আরো প্রায় অর্ধশতককাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যে পর্যন্ত না দেশ ও জনগণের সমাজ-রাজনৈতিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ কোন নতুন বিষয় উপস্থাপন করতে নাটকের ডাক পড়লো।

নীল দর্পণের পর দীনবন্ধু রচনা করেন *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬৩), *লীলাবতী* (১৮৬৭) ও *কমলে কামিনী* (১৯৭৩) নাটকত্রয় এবং তিনটি প্রহসন—*বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) ও *জামাই বারিক* (১৮৭১)। *নবীন তপস্বিনীর* কাহিনীনির্মাণ-

---

৯৭. Madhusudan's letter to Gour Basak, উদ্ধৃত, by P. Guha-Thakurta, *Drama*, 74.

কৌশলে দীনবন্ধু যে তাঁর পূর্বতন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এতে তিনি একাধারে এমনভাবে করুণরস ও হাস্যরসের অবতারণা করেন যে আমরা যেন এর ভিতর শেক্সপিয়রের *মেরি ওয়াইভস অব উইন্ডসর* কৌতুকনাট্যের অনুরণন শুনতে পাই। অন্যদিকে এক জটিল কাহিনীকাঠামোর অধীনে *লীলাবতীকে* বিন্যস্ত করে দীনবন্ধু নিঃসন্দেহে তার মৌলিকত্ব প্রমাণ করেছেন। নাটকটিতে তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রেমের সংঘাতময় পরিস্থিতি এবং সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণকে। দুর্ভাগ্যজনক যে এর প্রেমদৃশ্যগুলো হয়ে উঠেছে কৃত্রিম ও এতে অধিকাংশ চরিত্র অবতীর্ণ হয়েছে নিছক দ্বিমাত্রিক কার্ডবোর্ডসুলভ ভূমিকায়। *কমলে কামিনী* ঐতিহাসিক নাটক এবং দীনবন্ধু এতে বীররসের প্রবাহ সঞ্চার করতে চাইলেও কাহিনীনির্মাণগত দুর্বলতার জন্য তাঁর পরিকল্পনা সফল হয় নি। বরং নাটকের চেয়ে দীনবন্ধুর সার্থক প্রহসনগুলোর সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশিকরে ধরা পড়ে। সচরাচর হাস্যরসের মূর্ত প্রতীক বা একজন খাঁটি হাস্য যাদুকর'[৯৮] হিসেবে পরিচিত দীনবন্ধু মিত্র *সধবার একাদশী* প্রহসনে তথাকথিত প্রগতিশীলদের অন্তঃসারশূন্যতা ও তাদের পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকে ধরাশায়ী করতে তাঁর ব্যঙ্গ আক্রমণদক্ষতার পুরোটাই ব্যবহার করেছেন। *বিয়ে পাগলা বুড়ো*-তে তিনি যৌনবাতিকগ্রস্ত জনৈক বৃদ্ধের কার্যকলাপের নির্মম সমালোচনা দ্বারা প্রকারান্তরে সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণীর প্রতি তীব্র উপহাস ছুড়ে দেন। তাঁর এই দুটো প্রহসনেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট : প্রথমটিতে *একেই কি বলে সভ্যতার* ও দ্বিতীয়টিতে *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*-এর। *জামাই বারিক* দুটো কাহিনীর নিপুণ বিন্যাসে তৈরি প্রহসন, যেখানে বিদ্রূপ করা হয়েছে সেই বিদ্যমান সামাজিক প্রথাকে, যার কারণে একজন জামাতা আয়-রোজগার ছাড়াই নিশ্চিন্তে দিনের পর দিন কন্যার পিত্রালয়ে অবস্থানের অধিকার লাভ করে থাকে। অবশ্য শেক্সপিয়রের *টেমিং অব দি শ্রু* নাটকের সঙ্গে *জামাই বারিক*-এর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর মাধ্যমেই ইউরোপীয় নাট্যকলা বাংলা থিয়েটার অঙ্গনে সুদৃঢ় আসন গেড়ে বসে। অন্যদিকে, ১৮৬০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় প্রভাবের আওতায় অভিযোজিত হয়ে নাটগীত (বিশেষত যাত্রা) রীতি থেকে উদ্ভব ঘটে এক নতুন নাট্যপ্রকরণের, সাধারণ্যে যা 'গীতাভিনয় নামে' পরিচিতি লাভ করে। এতে থাকতো গানের ছড়াছড়ি এবং আধুনিক নাট্যমঞ্চে ব্যবহৃত যান্ত্রিক ও কৌশলগত সুবিধাদি ছাড়াই তা প্রদর্শিত হতো। প্রথম অবস্থায় এই ধারাটি ভারতীয় উপকথা এবং সংস্কৃত নাটকের প্রচলিত অনুবাদগুলির সীমিত কাহিনী-পরিসরে আবদ্ধ থাকে। এর সর্বপ্রথম

---

৯৮. Bankim Chandra's remark in *Dina Bandhu Jibani*, উদ্ধৃত, P. Guha Thakurta, *Drama*, 113.

নিদর্শন হচ্ছে ১৮৬৫ সালে আনন্দপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *শকুন্তলা* নাটক। এর অনুসরণে হরিমোহন রায় লিখেন *রত্নাবলী* (১৮৬৫-৬৬) এবং তিনকড়ি ঘোষাল রচনা করেন *সাবিত্রী সত্যবান* (১৮৬৫)। হরিমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে আসেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও সঙ্গীত রচয়িতা মনমোহন বসু এবং তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই ধারাটির পরিপূর্ণতা বিধানে সক্ষম হন। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সজ্ঞান প্রচেষ্টা ছিল বাংলা নাটকের সঙ্গে ইউরোপীয় নাট্যকলার সংমিশ্রণ ঘটানো, কিন্তু মনমোহন বসু এর বিপরীতে স্থানীয় নাট্যরীতি তথা যাত্রাকাঠামোকে আরো উন্নত রূপ দিতে প্রয়াসী হন। ফলে যাত্রার চেয়ে গীতাভিনয়ের কাহিনীকাঠামোয় আসে আরো দৃঢ়তা এবং একটি কেন্দ্রীয় ভাবস্রোত থাকায় তা যাত্রা অপেক্ষা বেশি গতিশীলতা লাভ করে। যাত্রায় ব্যবহৃত দীর্ঘ গানের পরিবর্তে এতে প্রচুর ছোট ছোট খণ্ডগান সংযোজিত হয়।

পূর্ববর্তী নাট্যধারাগুলির মতো গীতাভিনয় ভক্তিমূলক ও করুণ রসাশ্রয়ী ভাবাবেগের প্রতিই জোর দেয় বেশি। আর এই ধারার প্রাণপুরুষ মনমোহন বসু তাঁর নাটকের জন্য উপাদান সংগ্রহ করতেন প্রধানত সংস্কৃত নাট্যকলা থেকে। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে *রামাভিষেক* (১৮৬৭), *সতী* (১৮৭৩) ও *হরিশ্চন্দ্র* (১৮৭৫) বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল।

৩. *কল্পনাবিলাস ও গণনাট্যশালা (১৮৭০-১৯২০)*

দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ সালে বাংলার প্রথম গণনাট্যশালা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' উদ্বোধিত হলে সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস। কলকাতায় মধুসূদন স্যান্যালের আপার চিৎপুর রোডস্থ নিজস্ব বাসভবনে থিয়েটারটি স্থাপিত হয়। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের (১৮৬৯-১৮৭২) সাথে যুক্ত অত্যুৎসাহী একদল নাট্যপ্রেমিক যুবকের অক্লান্ত প্রচেষ্টাতে এটি প্রতিষ্ঠালাভ করে, যাঁদের একাংশ পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে পেশাদার থিয়েটার-তারকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করেন নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকবৃন্দসহ শহরের অনেক প্রভাবশালী গুণী ব্যক্তি। এভাবে একে একে গণনাট্যশালা ও পেশাদার নাট্যকোম্পানিগুলি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকলে কলকাতাভিত্তিক শহুরে নাট্যশিল্পে স্বল্পকালের মধ্যে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। এর কিছুকাল পর ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট আত্মপ্রকাশ করে বেঙ্গল থিয়েটার। ৯ বীডন রোডে মধুসূদনের *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এটি জনসমক্ষে আবির্ভূত হয় এবং অর্জন করে বাংলার লিখিত ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজস্ব থিয়েটারভবন থাকার গৌরব। *শর্মিষ্ঠা* নাটকটিও ইতিহাস সৃষ্টি করে, কারণ পেশাদার বাংলা নাট্যমঞ্চে সর্বপ্রথম এর প্রদর্শনীতেই নারীচরিত্রসমূহ চারজন নারী অভিনেত্রী (জগত্তারিনী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা) দ্বারা অভিনীত হয়। কলকাতার এসব গণনাট্যশালায় আলোকসজ্জার জন্য গ্যাসবাতির ব্যবহারকে আদর্শ বিবেচনা করা হতো, কিন্তু ৮ অক্টোবর ১৮৮৭ তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে *পাণ্ডব নির্বাসন* নাটকটি

প্রদর্শনের সময় সর্বপ্রথম ডায়নামোসৃষ্ট বিদ্যুৎ দ্বারা বাতি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে মঞ্চে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার রীতি প্রবর্তিত হয়।[৯৯]

গণনাট্যশালার ইতিহাসে এর প্রাথমিক বছরগুলো চিহ্নিত হয়ে আছে বৃটিশ রাজের প্রতি তিক্ত-কঠোর ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ রচনার দ্বারা এবং এই প্রক্রিয়া তুঙ্গে উঠে যখন সরকার কুখ্যাত 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৮৭৬' জারি করে বসে। যে নাট্যপ্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে এই আইন প্রবর্তন করা হয় তা হলো *জগানন্দ* ও *যুবরাজ* নামক একটি প্রহসন। ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এটি দি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়। এতে জগানন্দ রায় নামের একজন নেতৃস্থানীয় বাঙালি আইনজীবী প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে তাঁর বাসভবনে আমন্ত্রিত করে আনেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শঙ্খধ্বনি দিয়ে পুরনারীরা তাঁকে গৃহে বরণ করে নেয়—এমন একটি ঘটনায় উক্ত জগানন্দের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তীব্র ব্যঙ্গ-উপহাস। অনতিবিলম্বে নাটকটি নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহেই এটি ভিন্ন নামে (*হনুমান চরিত্র*) আবার নাট্যমঞ্চে ফিরে আসলে এর উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মে মাসের প্রথম দিন এ উপলক্ষে পুলিশকে বিদ্রূপ করে এক কৌতুকনাট্য প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তার আগের সন্ধ্যাতেই সবকার এক ঘোষণার দ্বারা কুৎসাপূর্ণ, সম্মানহানিকর, প্রজাবিদ্রোহমূলক ও অশ্লীলতাপূর্ণ নাট্যপ্রদর্শনী নিষিদ্ধকরণে পুলিশের হাতে অর্পণ করে বিপুল ক্ষমতা।[১০০] বাঙালিদের মধ্য থেকে তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে এই বিল পাস হয়ে যায়। এই আইনটি আজও বহাল আছে এবং সবধরনের নাগরিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের ক্ষেত্রে এখনো পূর্বাহ্নে পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

গণনাট্যশালাগুলোর অব্যাহত প্রতিষ্ঠা নাট্যশিল্পকে বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। ধনবান অভিজাততন্ত্রের পরিচারিকা হিসেবে এতদিন নাট্যকলাকে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল তা থেকে মুক্তি পেয়ে এবার সে এক ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মাঝে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায় এবং অর্জন করে নিজস্ব শক্তি ও বৈদগ্ধ। কিভাবে এটি সম্ভব হয়েছিল তা বুঝতে হলে আমাদের এই সময়ের সামাজিক অবস্থার চিত্রটি স্মরণ রাখা দরকার। এসময়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে সারা বাংলাময় অব্যাহত থেকেছে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ও ঐতিহ্যবাদের ক্রমিক উত্থান। বাংলার রেনেসাঁসে প্রতিমাপূজাবিরোধী প্রগতিশীল শক্তি এই শতকের প্রথম থেকে চেষ্টা করে আসছিল যাকিছু প্রথাগত তার সবটাই সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে; কিন্তু ষাটের দশক থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে লাগলো। অবশ্যই এই প্রতিক্রিয়ার গতিপথ ছিল প্রগতিশীল চিন্তা

---

৯৯. Sushil Mukharjee, *Theatres*, 53-54.

১০০. ঐ, 45-46.

ও কর্মকাণ্ডের বিপরীত দিকে, তথাপি ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯০০ সাল নাগাদ কলকাতার শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজ এর অভ্যন্তরে বিরাজিত প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মবিমুগ্ধতা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। নাট্যকলাও এই জাগরণের প্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে সর্বসাধারণের নাগালের মাঝে, আর দৃশ্যপটে এর নতুন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভূত হয় নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

১৮৭০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে নাট্যকলার উত্তরণ ঘটেছিল তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়, যা স্থায়ী হয়েছিল ১৯০৫ সাল পর্যন্ত, তা ছিল মূলত গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) প্রভাবিত কাল। এসময়ের নাটকসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো রচিত হয়েছে প্রধানত মিথ, সাধু-সন্তদের জীবন এবং ধর্মীয় বীরদের বীরত্বগাথা অবলম্বনে; যথার্থ ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনায়। প্রায় ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালে চলমান দৃশ্যপট অধিকার করতে শুরু করে দেশপ্রেমের চেতনাসঞ্জাত ঐতিহাসিক নাটক এবং যদিও এসময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করে চলেছিলেন, তথাপি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন তাঁর সমকক্ষ; অন্তত তা ধরা না হলে তাঁকে গিরিশচন্দ্রের উপরেই স্থান দিতে হয়। যুদ্ধপর্ব থেকে এর পরবর্তী স্বল্প কয়েক বছর পর্যন্ত বাণিজ্যিক নাট্যাঙ্গনে ক্রমাবনতি দশা লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত প্রধান নাট্যপ্রকরণ ছাড়াও এসময়ে রচিত হয়েছে সামাজিক নাটক, অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত কৌতুকনাট্য ও গীতাভিনয়। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তখনো শেক্সপিয়রীয় পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট রোমান্টিক বিষাদাত্মক নাটক রচনারীতিই ছিল বিশেষভাবে অনুসরণীয় আদর্শ। এর অভিনয়রীতি বড় আনুষ্ঠানিক ও অলঙ্কারবহুল, নাটক মেলোড্রামাসদৃশ এবং সাধারণ প্রবণতায় তা ছিল মূলত এক ধরনের "নাচ, গান, মঞ্চকৌশল ও চোখধাঁধানো ছলা-কলা সহযোগে গঠিত জীবনবিমুখ পলায়নবাদী চিত্তবিনোদন।"[১০১] এমনকি ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হওয়া স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত বছরগুলোতেও বাংলার বাণিজ্যিক নাট্যালয়গুলো সাধারণভাবে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকার চেষ্টা করেছে মূলত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য। কিন্তু এই অবস্থার প্রধান ব্যতিক্রম হচ্ছে ডি. এল. রায় ও গিরিশ ঘোষ এবং এঁদের কিছু ঐতিহাসিক নাটক।

১৮৫০-এর দশক থেকে সক্রিয় দুটি স্থানীয় নাট্যরীতির একটি হচ্ছে সংস্কৃত রীতি। আমরা দেখতে পাই, মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের পর এটি আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু অন্যটি অর্থাৎ নাটগীত রীতি গীতাভিনয়-এর মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

---

১০১. Rustom Bharucha, *Rehearsals of Revolution : The Political Theatre of Bengal*, (Honolulu 1983), 23.

ডামাডোলের মধ্যেও সক্রিয় থাকে। গিরিশ ঘোষ ও অন্য কয়েকজনের নাটকে এই রীতির প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাছাড়া রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যকর্মেও গীতাভিনয় রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। উন্মুক্ত যাত্রা প্রদর্শনী ও আধুনিক নাট্যমঞ্চ উভয়ের জন্য রচিত হয়েছে এই রীতির অসংখ্য নাটক। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে গীতাভিনয় দ্রুত এর জনপ্রিয়তা হারায় এবং ক্রমান্বয়ে তা জনসম্মুখ থেকে অপসৃত হয়। বলাবাহুল্য একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমেই বাংলার শহুরে সমাজে স্থানীয় নাট্যকলা এর নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

আমরা আগেই দেখেছি, মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র এই দু'জন বাংলা নাটকের সাথে ইউরোপীয় নাট্যকলার 'কাঠামো' এবং 'ভাবধারা' উভয়ের সংশ্লেষ ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসময়ে বঙ্গীয় সমাজে পুনর্জাগরণ দেখা দিলে 'ভাবধারা' তলিয়ে গিয়ে শুধু পশ্চিমা কাঠামোটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। গিরিশ ঘোষের কাছে শেক্সপিয়র ছিল আদর্শ নমুনা। তাঁর কথায়, "মহাকবি শেক্সপিয়র হচ্ছেন আমার আদর্শ। আমি তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।"[১০২] কিন্তু গিরিশ ঘোষের এই বক্তব্য সত্ত্বেও আমরা দেখি তাঁর আদর্শিক ভাবকাঠামো ও মানসসংগঠন কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* এবং কাশিরাম দাসের *মহাভারত* অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে।[১০৩] তাঁর মিথ-আশ্রয়ী নাটকগুলো সম্পর্কে একথা আরো বেশি করে খাটে, কেননা এতে যাত্রানুষ্ঠানের স্পষ্ট অনুরণন শোনা যায় এবং বিশেষকরে এতে যেন বয়ে যেতো ভক্তিরসের প্রবল বন্যা। এইসব নাটকে মনমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায় এবং তাঁদের গীতাভিনয়সমূহের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমাজ বিষয়ক নাটকের জন্য *নীলদর্পণ* ও ইতিহাস বিষয়ক নাটকের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে লাভ করেছেন অনুপ্রেরণা। তাঁর নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই দ্বিমাত্রিক; হয় সাদা নয় তো কালো এবং সেগুলো গঠিত এই মূলসূত্রানুসারে যে, সকল ক্ষেত্রেই কুনীতি পরাভূত হবে সুনীতির কাছে। কার্যত মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকে যে নারী চরিত্রগুলি পুরনো প্রথাবদ্ধ ভূমিকার খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল, গিরিশ ঘোষ তাদের পুনরায় চার দেয়ালের মাঝে অবরোধবাসিনীরূপে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তাঁর নারীরা কেউ কেউ যেন মাতৃত্বের এমন এক আদর্শ, যার কাছে বিচিত্র জগৎসংসার থেকে যায় সম্পূর্ণ অজানা, অপরিজ্ঞাত। তাঁর নারীরা সকলেই একেক জন আদর্শ স্ত্রী, যাদের নিঃশর্ত সতীত্ব ও সৎগুণাবলী খুঁজে পায় না এমন কোন প্রভু, যে তাকে রক্ষা করবে তার বৈরী স্বামীর হাত থেকে। তবে বাংলা থিয়েটারের ভাষাকে এক নতুন

---

১০২. গিরিশ ঘোষের উক্তি, কুমুদ বন্ধু মিত্র প্রণীত *গিরিশচন্দ্র নাট্য সাহিত্য* গ্রন্থে, পৃ. ৩৯। উদ্ধৃত অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* (কলকাতা ১৯৭৯), ১৮৪।

১০৩. অজিত কুমার ঘোষ, *ইতিহাস,* ১৮৪।

গঠনকাঠামো প্রদানের ক্ষেত্রে গিরিশ ঘোষের অবদান প্রশ্নাতীত। মধুসূদন ও দীনবন্ধুতে যে নাট্যভাষা হয়ে উঠেছিল কৃত্রিম এবং নিশ্চল, গিরিশ ঘোষের শক্তিশালী কলমের টানে তা লাভ করে গতি ও বহমানতা। তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন, তাঁর ভাষায়, "বিশুদ্ধ প্রয়োজনের তাগিদে"[১০৪] এবং প্রায় সত্তুরটি নাটক লিখে পরিগণিত হন একজন চূড়ান্ত সৃষ্টিপারদর্শী নাট্যকারে। তিনি তাঁর অধিকাংশ নাটকগুলোতে এর নায়কদের এক আদর্শায়িত চিত্র তুলে ধরেন, এদের উপর আরোপ করেন দেবত্ব এবং অতীতকে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে উত্থাপন করেন নির্ভেজাল রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। এর প্রমাণ মিলবে তাঁর নিম্নলিখিত নাটকগুলোয় : *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৬, শ্রী চৈতন্যের জীবনভিত্তিক), *প্রফুল্ল* (১৮৮৯, একটি মেলোড্রামা, যেখানে এক সমৃদ্ধিশালী বাঙালি পরিবারের পতন দেখানো হয়েছে), *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯০৬, ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক) এবং *আবু হোসেন* (একটি গীতাভিনয়)। এর মধ্যে শেষোক্ত দুটি ছাড়া এসময়ে তাঁর নাটকগুলোর যদিও তেমন করে আর পুনরুত্থান ঘটে নি, কিন্তু তবু বাংলা নাটককে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে উপভোগ্য ও জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর সাফল্য ছিল অসামান্য। একজন ব্যতিক্রমী বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা ও শক্তিশালী নাট্যপরিচালকের পরিচয় বাদেও 'চরিত্রাভিনয়', 'চরিত্রবর্ণন' এবং 'অভিনেতা প্রশিক্ষণ'-এর ক্ষেত্রে গিরিশ ঘোষ যে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধ প্রবর্তন করে গেছেন সেজন্যও তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।[১০৫]

গিরিশ ঘোষের সমসাময়িক আরো দুজন উল্লেখযোগ্য নাট্যরচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমৃতলাল বসু (১৮৫২-১৯২৯)। অমৃতলাল বসু একে তো নিজে ছিলেন একজন সুপরিচিত অভিনয়শিল্পী, তদুপরি বাঙালি সমাজে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কুপ্রভাব নিয়ে রচিত তাঁর ব্যঙ্গনাট্যগুলো তাঁকে বাড়তি খ্যাতি এনে দেয়। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবদান রেখে গেছেন কিছু বিদেশী ভাষার নাটকের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ সম্পাদন এবং কতগুলো ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে। শেক্সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* ও মলিয়েরের *লা বুর্জেঅস জেন্টিলহোমে* তাঁর অনূদিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাংলা থিয়েটার ভুবনে ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে বলা যায় যে সর্বপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে (*কৃষ্ণকুমারী*) এই ধারার সূচনা ঘটে, বিকশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বারা, সম্প্রসারিত হয় গিরিশ ঘোষের মাধ্যমে এবং ডি. এল. রায় একে চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিপক্বতা দান করেন। কোন সন্দেহ নেই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে তাঁর মৌলিক অবদান হচ্ছে নিখাঁদ স্বদেশপ্রেম, কিন্তু

---

১০৪. ঐ, ১৮২।

১০৫. Rustom Bharucha *Revolution*, 24.

নাট্যনির্মাণকৌশলগত দিকে তিনি তেমন সাফল্য দেখাতে পারেন নি, তাঁর নাটকগুলো প্রায়ই ঢিলেঢালা, দুর্বল ও অপ্রয়োজনীয় রকম দীর্ঘ।

ঐতিহাসিক নাটকের জন্য হাস্যরসাত্মক ও রোমান্টিক বাংলা গান রচনায় উৎকর্ষলাভকারী দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন পেশায় একজন সরকারি কর্মকর্তা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করার পর তিনি কিছুকাল ইংল্যান্ডে কৃষিবিদ্যার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৮৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগলাভ করেন। তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে *রানা প্রতাপ সিংহ* (১৯০৫), *নুরজাহান* (১৯০৮) ও *শাহজাহান* (১৯০৯) উল্লেখযোগ্য। ঐহিক ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ডি. এল. রায় আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ বাংলার দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করেন মর্ত্যবাসী মানুষের দিকে এবং এর দ্বারা বাংলা থিয়েটারের গতিপথেও আনেন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। বৈশিষ্ট্যবিচারে তাঁর সৃষ্টিকর্ম মানবতার বিজয়মহিমায় উদ্দীপ্ত, বস্তুজগতের প্রতি পুনর্জাগরিত আগ্রহে পরিপূর্ণ, কাহিনীনির্মাণের ক্ষেত্রে বেগবান এবং মানবিক দ্বন্দ্বসম্পৃক্ত ও ট্র্যাজিক অনুভূতিতে আপ্লুত। গিরিশ ঘোষের মতো তিনি সরাসরি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই সমস্ত ঔপনিবেশিক যুগের বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আদর্শস্থানীয়, যাঁরা শাসকজাতির সংস্কৃতিকে সাফল্যের সাথে আত্মীকৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলির মেজাজ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কি সার্থকভাবেই না শেক্সপিয়রীয় নাট্যকলার মর্মার্থ এতে গৃহীত হয়েছে! তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি অতিমানবীয়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান, বীরধর্মের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং পুরুষালি বীর্যবত্তাসম্পন্ন। বীরত্বব্যঞ্জক ভাবানুভূতি ব্যবহারে পারদর্শিতা এবং ভাষার অপূর্ব সংগঠনক্ষমতা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির সাফল্যের কারণ। কিন্তু এই ভাষারীতিই আবার কখনো একঘেয়ে হয়ে উঠেছে যখন সামাজিক পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতা নির্বিশেষে তাঁর সকল চরিত্র একই ভাষাভঙ্গিতে কথা বলেছে। তিনি তাঁর নাটক থেকে স্বগতোক্তি পরিহার করেন, চরিত্রচিত্রণে মোটা দাগের আশ্রয় নেন আবার একই সঙ্গে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলোয় সুচারুভাবে সামঞ্জস্য বজায় রাখেন। তাছাড়া চরিত্রগুলির অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ফুটিয়ে তুলে জটিল চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে তিনি এমন এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেন, যা বাংলা থিয়েটারে ইতিপূর্বে আর কখনো পরিলক্ষিত হয় নি।

৪. *সমাজসচেতনতা ও জাতীয়তাবাদ : শিশির কুমার থেকে নবান্ন (১৯২০-১৯৪০)*

গিরিশ ঘোষ ও ডি. এল. রায়ের মৃত্যু এবং প্রথম মহাযুদ্ধের অপচ্ছায়া দূরীভূত হওয়ার পর নাট্যনির্মাণরীতি ও নাট্যমঞ্চ উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা থিয়েটার বহন করছে এক অসাধারণ পরিবর্তনের সাক্ষ্য। এ সময় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক নাটকের চেয়ে সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রতি জনগণের বৃহত্তর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়; তথাপি যেসব পৌরাণিক নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করে সেসব নাটকের কেন্দ্রস্থলে

অতিপ্রাকৃতের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় 'মানুষ'। ফলে হিন্দু অবতার রামচন্দ্রের আবেদন অন্যান্য মহাকাব্যিক বীরদের থেকে বরং একজন মানবিক গুণসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ হিসেবেই অধিক ফুটে উঠতে থাকে। ঐতিহাসিক নাটক থেকে মেলোড্রামা অন্তর্হিত হয় এবং এতে ইতিহাসসমর্থিত সত্যতা প্রতিপাদনের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র, যার প্রতিফলন ঘটেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলোয়, তা বঙ্কিমী উপন্যাসের শক্তিশালী রোমান্টিকতা এবং গিরিশ ঘোষের নাটকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বাংলা থিয়েটারে গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়। পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাট্যকাঠামো অপসৃত হতে শুরু করে এবং ইবসেন ও বার্নার্ড'শ প্রবর্তিত কলাকৌশল সেস্থান অধিকার করতে থাকে, যদিও রোমান্টিক নাট্যকলার অস্তিত্ব বরাবরের মতো অক্ষুণ্নই রয়ে যায়। এসময়ে নাট্যনির্মাণরীতিতে ঝোঁক পরিবর্তনের বিষয়টিও লক্ষণীয়। শিশির কুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) প্রদর্শিত অভিনয়রীতি হয়ে উঠে কম অলঙ্কৃত তথা আনুষ্ঠানিক এবং অধিকতর স্বাভাবিক। অভিনয়কলা, ঘটনার অর্থপূর্ণ বিন্যাস ও অনাড়ম্বর ভাষাভঙ্গিকে একত্রে গ্রথিত করার বিষয়টিতেও গুরুত্বারোপ করা হয়। *রঘুবীর* নামক বিদ্যাবিনোদের একটি নাটকে শিশির কুমার ভাদুড়ী যেভাবে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সে সম্পর্কে বর্তমানকালের বাংলা নাট্যশালার সবচেয়ে প্রতিভাবান অভিনেতা শম্ভু মিত্র মন্তব্য করেন :

> যদি কেউ এটা উপলব্ধি করতে চাইতো যে, কীভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সীমানায় আবদ্ধ শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ক্রমে মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে, তবে তাকে অবশ্যই তাঁর (শিশিরের) অভিনয়কলা দেখতে হতো। যখন কেউ হেসে উঠার উপক্রম করতো, তখন হঠাৎ তিনি তাঁর সমস্ত হাস্যরস সংবরণ করে নিতেন। আমি অনুভব করতাম তিনি আমার সমস্ত অনুভূতিকে দ্রুত এক ভীতিপ্রদ পরিভ্রমণে আকাশের উর্ধ্বে অত্যুচ্চ স্থানে নিয়ে গিয়ে তারপর আমাকে ফেলে রেখে যেতেন একাকী—মৃত্যুর মুখোমুখি।[১০৬]

১৯৩১ সালে বাংলা থিয়েটারের আলোকসজ্জা ও সেট ডিজাইন প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনকল্পে আমেরিকা থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সতু সেন। তারই প্রচেষ্টায় মঞ্চের মেঝেতে সন্নিবেশিত বাতির (ফুটলাইট) প্রচলন উঠে গিয়ে মাথার উপর স্থাপিত নির্দেশনাত্মক আলোকব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রঙিন ব্যাকড্রপ প্রথার স্থলাভিষিক্ত হতে শুরু করে বক্স-সেট পদ্ধতি। সেট ডিজাইন ও পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কালসঙ্গতিহীনতা ক্রমান্বয়ে কালসচেতন ঐতিহাসিক নির্ভুলতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করে। নেপথ্যসঙ্গীত হিসেবে জীবন্ত অর্কেস্ট্রা ব্যবহারের ধারাও ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে। নাটকের মধ্যে গান ও নাচের গুণগত মান উন্নত হয় এবং পূর্ববর্তীকালে সচরাচর দৃশ্যমান একঝাঁক নাচিয়ে রমণী বা সখীদল ক্রমশ এর প্রায়োগিক মূল্য হারিয়ে নাট্যমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। এই সময়টি অবশ্য আরো একটি বিষয়ের উত্থান দ্বারা চিহ্নিত, আর তা হচ্ছে নাটকনির্মাণে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়কারী হিসেবে একজন

---

১০৬. Raka, *Bengali Theatre*, 98, quoted by Rustam Bharucha, *Revolution*, 33.

পরিচালকের আগমন, যিনি সবকিছুকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে সংস্থাপিত করবেন। সামাজিকভাবে এসময়ে সংস্কৃতমনা অভিজাত গোষ্ঠীর কাছে নাটক একটি শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে শুরু করে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর বহুসংখ্যক ব্যক্তি থিয়েটারকে জীবিকার্জনের এক মর্যাদাপূর্ণ উপায় হিসেবে বেছে নিতে থাকে।

এদিকে, চিত্রধর্মিতার প্রতি ক্রমবর্ধমান মোহ এবং সমসাময়িক সমাজবাস্তবতার আধিপত্য পূর্বকালীন অনুষ্ঠানরীতি 'গীতাভিনয়কে' ক্রমে কোণঠাসা করে ফেলে। একসময় তা দৃশ্যপট থেকে প্রায় মুছেই যায়। এই কালপর্বটি একদিকে শহুরে থিয়েটারের চিত্রধর্মিতার প্রতি মোহ এবং অন্যদিকে গ্রামীণ নাট্যকলার নিজস্ব নাট্যপ্রদর্শনরীতি এই দুয়ের মধ্যে নির্দেশ করছে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট পার্থক্য। এর একমাত্র লক্ষণীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও 'ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন' যে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এই কালপর্বের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন মন্মথ রায় (১৮৯৯), সচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭) এবং আরো স্বল্প কয়েকজন। মন্মথ রায় ছিলেন জেলাশহরের একজন আইনজীবী, যিনি খ্যতি অর্জন করেন ১৯২৩ সালে *মুক্তির ডাক* নামে একটি গুরুগম্ভীর একাঙ্কিকা লিখে এবং এরপর থেকেই তাঁর অনুসরণে একাঙ্কিকা রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়ে যায়। তিনি অনেকগুলো সাহিত্যপুরস্কার লাভ করেন আর তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আছে কয়েকটি পুরাণাশ্রয়ী নাটক, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যা পূর্ববর্তীকালের এজাতীয় রচনা থেকে পৃথক। মন্মথ রায়ের নাটকে সমকালীন প্রসঙ্গ ও চলতি ঘটনাবলীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩০ সালে রচিত তাঁর *কারাগার* নাটকটি বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এখানে তিনি *ভাগবত পুরাণ* থেকে বেছে নিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ সংক্রান্ত একটি সুপরিচিত কাহিনী, যেখানে ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে, একদিন এই শিশুটিই ধ্বংস করবে নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসক কংসকে। নাটকটি ছিল গান, নাচ ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাপক ব্যবহারে ভারাক্রান্ত এবং এটি অনুসরণ করেছে পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট গঠনকাঠামো, যা স্বল্পকাল পরে অন্যান্য নাট্যকারগণ পরিত্যাগ করেন। এছাড়া মন্মথ রায় আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন যাদের মধ্যে *খনা* (১৯৩৫) ও *মীরকাশিম* (১৯৩৮) উল্লেখযোগ্য। তিনি খ্যাতিলাভ করেন তাঁর সাবলীল সংলাপ, জমজমাট চিত্রকল্প, চরিত্রগুলোর অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলায় পারদর্শিতা ও সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা, চরম পরিণতি সৃষ্টিতে সাফল্য এবং নাট্যমধ্যে কার্যকর বিস্ময় উৎপাদন ও দ্রুতগতিশীল নাটকীয় কার্যকলাপ সংযোজনে কুশলীপনার জন্য। তিনি নাটকের বিস্তৃতি কমিয়ে একে আরো ছোট করে ফেলেন এবং পুরনো খণ্ডিত মুক্তছন্দ রীতির পরিবর্তে সহজ কিন্তু কাব্যিক গদ্যভাষা ব্যবহার করেন।[১০৭]

---

১০৭. Sushil Mukherjee, *Theatres*, 561-62.

সচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পেশায় ছিলেন সাংবাদিক এবং একজন দুর্দশাগ্রস্ত, পতিত রমণীর জীবন নিয়ে ১৯২৯ সালে লিখিত *রক্তকমল* নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পেশাতেই নিয়োজিত থাকেন। যখন নাটকের স্থায়িত্বকালের আদর্শ মান ছিল পাঁচ ঘণ্টা, তখন তিনি মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তাঁর নাটককে পাঁচটি দৃশ্যে বিন্যস্ত করে নির্মাণ করেন এবং প্রতিটি দৃশ্যের শেষে একজন বর্ণনাকারীর কণ্ঠে জুড়ে দেন একটি গান। এই গানগুলোর রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। আর্থিক বিবেচনায় নাটকটিকে সফল বলা না গেলেও ঠিক এর পরের বছরই তিনি আসেন একটি ঐতিহাসিক নাটক *গৈরিক পতাকা* নিয়ে। যখন দেশব্যাপী চলছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তুঙ্গ আইন অমান্য আন্দোলন, ঠিক তখনই গভীর আবেগমথিত ভাষায় স্বদেশপ্রেমের বাণী ঘোষণাকারী নাটকটি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত করে দেয়। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনকারী অপর ঐতিহাসিক নাটক হলো *সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৩৮)। ঐতিহাসিক নাটকগুলোয় তিনি পুরোপুরি ঐতিহ্যপন্থী এবং ডি. এল. রায়ের প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত। তথাপি বাংলা থিয়েটারে সচীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অবদান হচ্ছে সামাজিক চিন্তাভাবনা, যার মাধ্যমে তিনি নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকরীতি উভয়ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সূচিত করেছিলেন। তিনি পরিহার করেছেন পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাট্যকাঠামো এবং চরিত্রসমূহের মধ্যে উপযুক্ত মনস্তত্ত্ব আরোপে হয়েছেন সচেষ্ট। সচীন্দ্রনাথ তাঁর *ঝড়ের রাতে* (১৯৩১) নামক সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষাধর্মী সামাজিক নাটকে দৃষ্টিপাত করেছেন নারী-মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে এবং সমর্থন করেছেন নারীমুক্তির ধারণা। গণমানুষের সংগ্রাম সমর্থনকারী একজন অগ্রসর চিন্তার নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর নিজের লেখা *জননী* (১৯৩৩), *প্রলয়* (১৯৩৭), *নার্সিং হোম* (১৯৪০) ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় নাটক থাকা সত্ত্বেও তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবি, দেবদাস* প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদান করেন।[১০৮]

তাঁর সমসাময়িক বিধায়ক ভট্টাচার্য ১৯৩৮ সনে লিখিত *মেঘমুক্তি* নামক সামাজিক নাটকের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আবির্ভূত হন। তিনি পরিবর্তনশীল একটি সমাজে শহুরে মধ্যশ্রেণী এবং এর পরিবর্তনেরই অভিঘাতে '৩০ ও '৪০-এর দশকে এই শ্রেণীটির পারিবারিক জীবনে সৃষ্ট মূল্যবোধের সঙ্কটচিত্র অঙ্কনের জন্য সুপরিচিতি লাভ করেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে *মাটির ঘর* (১৯৩৯), *বিশ বছর আগে* (১৯৩৯), *রক্তের ডাক* (১৯৪১) ইত্যাদি অন্যতম। এসময়ে বাণিজ্যিক নাট্যশালাগুলোর কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয়, এমন এক জাতীয় পরিস্থিতিতে কলকাতাভিত্তিক বাণিজ্যিক নাট্যশালাগুলো তরল ভাবোচ্ছ্বাসসিক্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক মেলোড্রামাসমূহ মঞ্চায়নে

১০৮. প্রাগুক্ত, 562-63.

ব্যস্ত থেকেছে, যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ক্রমবর্ধমান গণঅসন্তোষ, ফেনায়িত হিংস্রতা এবং বৃটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তির দাবিতে ছিল আন্দোলনমুখর। যদি শিল্পমাধ্যমসমূহের ভূমিকা হতে হয় সঙ্কটমুহূর্তে নিজ সম্প্রদায়ের যৌক্তিক চেতনার বিশ্লেষণী মুল্যায়ন ও অন্তর্দৃষ্টি সংযোজন দ্বারা একে একটি আদর্শিক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করা, তবে সন্দেহ নেই শহুরে বাণিজ্যিক নাট্যালয়গুলো সে ভূমিকা পালনে হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ১৯৩৬ সালে নেতৃস্থানীয় ভারতীয় লেখকদের মধ্যে মুলুকরাজ আনন্দ, মুনশি প্রেমচাঁদ, সাজ্জাদ জহির ও অন্যান্যরা মিলে গঠন করেন 'প্রগতিশীল লেখকসঙ্ঘ' (PWA) এবং লখনৌতে অনুষ্ঠিত হয় এর প্রথম অধিবেশন। PWA-র দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায় ১৯৩৮ সালে। এতে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

> ভারতের নতুন সাহিত্যকে অবশ্যই আজ সংহতি প্রকাশ করতে হবে আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যাসমূহের সঙ্গে—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং রাজনৈতিক দমননীতি হতে উদ্ভূত সমস্যার সঙ্গে। যেসব বিষয় আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে বশ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা ও যুক্তিশূন্যতার পানে, আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বিবেচনায় সেসব প্রত্যাখ্যান করি। যেসব বিষয় আমাদের মধ্যে যৌক্তিক সমালোচনার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে; যা প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাসমূহকে যুক্তির আলোতে ফেলে পরীক্ষা করে দেখে; যা আমাদের সক্রিয় হতে, সঙ্ঘবদ্ধ ও রূপান্তরিত হতে সহায়তা করে, আমরা সেসব বিষয়কেই শুধু প্রগতিশীল বিবেচনায় গ্রহণ করি।[১০৯]

কিন্তু শিল্প ও সামন্তবাদের মধ্যে নিহিত আত্মকেন্দ্রিকতা এবং বৃহত্তর সমাজ-পরিমণ্ডলে বিরাজমান ঔপনিবেশিক শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সর্বপ্রথম যে সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তা এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় নি। ইতিমধ্যে বাংলার অধিকাংশ অগ্রণী লেখক-শিল্পীগণ (যামিনী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ) একতাবদ্ধ হয়ে ১৯৪২ সালে গঠন করেন 'ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী ইউনিয়ন'। নবগঠিত এই ইউনিয়ন কলকাতা, হাওড়া, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর নৈকট্যলাভের জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, যদিও এই সময় পর্যন্ত সংস্কৃতিতে কর্তৃত্বকারী মহল একে অবজ্ঞাই করে গেছে।[১১০] অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২ মে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে জন্মলাভ করে 'দি ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন' বা সংক্ষেপে IPTA।

PWA যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল IPTA তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এটি শহরভিত্তিক শিল্পীদের সংগঠিত করে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদেরকে

---

১০৯. From the amended manifesto of All-India Progressive Writers' Conference, Calcutta, 1938, quoted by Bharucha, *Revolution*, 37.

১১০. বিস্তারিত তথ্যের জন্যে দেখুন, Rustam Bharucha, *Revolution*, 37-39.

সাধারণ গণমানুষের কাতারে সামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। IPTA-র ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য দেশব্যাপী অশান্ত পরিস্থিতির কারণে বেশ ভালভাবেই অর্জিত হয়। একদিকে পুলিশী দমননীতির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, খাদ্যাভাব, শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট ও কৃষকদের অমানবিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে স্থানীয় নাট্যকলার বিভিন্ন শাখা কর্তৃক এইসব সমকালীন বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান রচনা—এই দ্বিধারিক অবস্থা IPTA-র জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। বাংলায় কবিগান-এর এক লোকশিল্পী কবিয়াল রমেশ শীল ক্রমবর্ধমান সামাজিক চেতনা ও নাট্যশিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং স্থানীয় অনুষ্ঠানরীতিতে সাধন করেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে রমেশ শীল তাঁর অনুষ্ঠানকাঠামো থেকে সামন্ত মরমীবাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এতে সংযোজন করেন স্বদেশপ্রেমের ধারণা ও শ্রেণীসচেতনতা। এদিকে মধ্য-চল্লিশের দশক প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তাপ ও ভস্মস্তূপের মাঝে ফেলে রেখে যায় বাংলা নামে এক ভূতুড়ে ভূখণ্ডে প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙালির কঙ্কালসার মৃতদেহ। ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৪৩ সালের ভয়ালতম দুর্ভিক্ষ, যা ছিল সম্পূর্ণভাবে একটি মানবসৃষ্ট দুর্বিপাক। ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধরত বৃটিশ সৈন্যদের জন্য এদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি শুরু হলে সারাদেশে ভয়ানক খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং পরিণামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

> আমি কলকাতার রাস্তায় একটি শিশুকে মৃতদেহগুলোর উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে অসহায়ভাবে তার মাতার বক্ষদেশ অনুসন্ধান করতে দেখলাম। (শিশুটি জানেনা ওর) মা ততোক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।[১১১]

মৃত্যু ও মানবিক দুর্দশার এই তাৎক্ষণিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে IPTA-র বাংলা শাখা মঞ্চস্থ করে বিজন ভট্টাচার্য লিখিত *নবান্ন* নাটকটি, যার পরিচালনায় যৌথভাবে ছিলেন শম্ভু মিত্র ও নাট্যকার নিজে। বাংলা থিয়েটারে *নবান্নর* প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রাথমিকভাবে এটি জনসমাজে নাট্যচর্চাকারীদের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। প্রশ্ন উঠে, যদি তারা পেশাদার নাট্যকর্মী হিসেবে বিদ্যমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থপূর্ণ নাটকসৃষ্টিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের সামনে আর কি কি বিকল্প পথ খোলা রইলো ? কলকাতার *নবান্ন*-পরবর্তী নাট্যকলা, যার সূত্রপাত ৫০-এর দশকের প্রথম থেকে, তা এরপর এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই গোড়াপত্তন করে গ্রুপ-থিয়েটার নামে এক নতুন নাট্যধারার। এর তাৎপর্য হলো এই যে, একদল আদর্শিকভাবে উদ্বুদ্ধ নাট্যকর্মী অর্জন করতে চাইলো এমন এক যোগ্যতা যে একই সঙ্গে তাঁদের কাজে সমাজ-রাজনৈতিক সংযুক্তি ও শিল্পোৎকর্ষ—

---

১১১. ঐ, 45 & 49.

দুইই বজায় থাকবে। সেসময়ে থিয়েটারের এই ধারণা আর্থিক দিক দিয়ে অলাভজনক ছিল বিধায় তারা সবাই নাটক থেকে অর্থগ্রহণে অসম্মত হন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবিকার প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প কর্মের সন্ধান করেন।

নাটকরচনা এবং নাটকপ্রদর্শনী উভয় ক্ষেত্রেই *নবান্ন* প্রবর্তন করেছিল এক নতুন যুগ। বিজন ভট্টাচার্য ঘরোয়া ভাষাভঙ্গি ও চূড়ান্ত নাটকীয় রীতিতে তাঁর বাস্তব উপলব্ধি ব্যক্ত করতে চাইতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> গণসংগ্রামের কাহিনীগুলো কিছুতেই আমাদের সময়কার বীরদের কারো চেয়ে কম মহত্ত্ব ধারণ করে না, এমনকি গ্রীক দেবতাদের কর্মকাণ্ড থেকেও এসব কম রোমাঞ্চকর নয়। ডাইওনিসীয় প্রথাসমূহ আমাদের দেশে আজও বিদ্যমান। শুধু প্রতীক্ষা এমন এক চোখের জন্য, যা এসব দেখবে এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনার্থে মঞ্চে নিয়ে যাবে। আর এতেই নিহিত আছে আমার শক্তির উৎস।[১১২]

ভট্টাচার্যের নাটকের চরিত্রগুলো অধিকাংশই বাস করে গ্রামীণ বাংলায় এবং তারা কথা বলে তাদের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক উপভাষায়। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, "আমি এদেশের সাধারণ মানুষকে খুব ভাল করে চিনি। কিভাবে তারা কথা বলে, হাসে, এবং আবেগ বিনিময় করে, তা আমি জানি।"[১১৩] *নবান্ন* নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য নিজে, তৃপ্তি ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্র, শোভা সেন প্রমুখ পরবর্তী কয়েক বছরে কলকাতা মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উপরন্তু নাটকে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ব্যবহার এবং জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কযুক্ত অভিনয়কলার জন্য তাঁরা একদিকে ইতিহাসও সৃষ্টি করে গেছেন।

সাধারণভাবে IPTA এবং নির্দিষ্টভাবে *নবান্ন* নাট্যকলায় সঞ্চার করে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা ও সচেতনতা। সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের সমস্যাগুলো আলোচনার জন্য একটি ফোরাম গঠনে পদক্ষেপ নিয়ে এটি থিয়েটারের মূল ধারণা ও কর্মতৎপরতাতেও আনে মৌলিক পরিবর্তন। *নবান্ন*-র পথ ধরে কলকাতায় সূচিত হয় গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলন এবং সৃষ্টি হয় বাংলাবিভক্তির এক দুর্দশাময় উপাখ্যান। কিন্তু বিভক্তিপরবর্তী পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যকলা সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এমন একটি নাট্যধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই, যা উল্লিখিত দুটি পর্বের সমান্তরালে বয়ে চলেছিল।

---

১১২. প্রাগুক্ত, 45.

১১৩. Samik Bandopadhaya's interview with Bijon Bhattacharya "Janasad-haraner Ami", published in the first issue of *Promu*, (Calcutta 1978), quoted by Rustam Bharucha, *Revolution*, 48.

৪. *রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্থানীয় নাট্যকলার উন্নয়ন (১৮৮১-১৯৩৯)*

গিরিশ ঘোষ, ডি. এল. রায় এবং গণনাট্যশালার অন্যান্যদের পাশাপাশি বাংলার বড় মাপের সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৬১-১৯৪১) প্রচুর নাটক লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলো অদ্বিতীয় এ কারণে যে, এতে মিশ্রণ ঘটেছে স্থানীয় নাট্যকলা, জীবন সম্পর্কিত এক সুগভীর ভারতীয় দর্শন (সেই সঙ্গে বেদের দার্শনিক অংশ উপনিষদ ও মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব) এবং ইউরোপীয় নাট্যকলা ও নাট্যনির্মাণ কৌশলের। মিশ্রণটি এতোই সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত যে, এতে কোন ফাঁক চোখে পড়ে না এবং তা প্রায় মূর্ত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এমন নয় যে তা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আবার তা অতিপাণ্ডিত্যপূর্ণ অলঙ্কৃত সাহিত্যিক ভাষাও নয়—তাঁর ভাষা 'কাব্যিক' এবং এর সহজ প্রবহমানতা আপাত দৃষ্টিগোচর বিষয়ের তলদেশ থেকে দরকারি জিনিসটি বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম। যে শক্তভিতের উপর তাঁর নাটকের কাহিনীগুলো সংস্থাপিত তা খুবই অন্তর্মুখী এবং মানবজীবনের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটন ও আত্মিক মুক্তিলাভের উপায় অনুসন্ধানে অভিলাষী। কয়েকটি মাত্র কৌতুকনাট্য বাদে বিরল অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সাধারণ নাট্যশালায় মঞ্চস্থ তাঁর নাটকগুলো তেমন সাফল্যলাভ করতে পারে নি। তথাপি তাঁর রচনা প্রমাণ করেছে যে, নাট্যকর্মী ও শিক্ষিত মহলে সেগুলো বিপুল প্রভাববিস্তারে সক্ষম। আমাদের যা স্মরণ রাখা জরুরি তা হলো, বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সার্থকভাবে লালন করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান নাট্যকর্মগুলো ধারণ করছে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি এক কালপরিধিকে। তিনি তাঁর নাট্যজীবন আরম্ভ করেন ১৮৮১ সনে *বাল্মিকী প্রতিভা* নামক গীতিনাট্য দিয়ে, এর কিছুকাল আগে তিনি জীবনের প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরেছেন এবং তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। গীতিনাট্যটিতে রবীন্দ্রনাথ সেসময়ে কলকাতায় জনপ্রিয় গীতাভিনয় (এর উৎপত্তি স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য থেকে এবং আমরা তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি) রীতি অনুসরণ করেন এবং ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাথে ইউরোপীয় উপাদান সংমিশ্রণে তাঁর অনবদ্য দক্ষতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভাষিক উৎকর্ষ দ্বারা একে আরো এগিয়ে নেন। *বাল্মিকী প্রতিভায়* প্রদর্শিত হয় এক রোমান্টিক অভিনয়কৌশল ও মঞ্চনকশা।[১১৪] (পারিপার্শ্বিক ব্যাকড্রপ : জীবন্ত গাছপালার শাখা দিয়ে তৈরি অরণ্যমধ্যে হরিণ, আলোকসজ্জা ও বজ্রবিদ্যুৎ ইত্যাদি) সহযোগে এটির হুবহু অনুকরণে ১৮৯৩ সালে প্রদর্শিত হয় *কাল মৃগয়া*। ১৮৮৪ সালে *প্রকৃতির প্রতিশোধ* ('সন্ন্যাসী' নামে ইংরেজিতে অনূদিত) নামে তাঁর একটি নাট্যধর্মী কবিতা প্রকাশিত হয়।

---

১১৪. অজিত কুমার ঘোষ, *ইতিহাস*, ৩১৪-১৫।

এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাঁর ভাষায় :

> এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কবিতাখানিকে আমার সমস্ত সাহিত্যকর্মের ভূমিকা হিসেবে দেখা যেতে পারে; অথবা এটা হতে পারে সেই ভিত্তিভূমি, যেখানে আমার সমস্ত লেখালেখির বসবাস—সেইখানে, সেই সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে।[১১৫]

এর কয়েক বছর পরে আরো দুটো চমৎকার নাটক তিনি আমাদের উপহার দেন—একটি *রাজা ও রানী* (১৮৮৯) এবং অপরটি *বিসর্জন* (১৮৯০)। এই দুটো নাটকেই রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়রীয় রোমান্টিক ট্র্যাজেডি নির্মাণের আপন দক্ষতা যাচাই করে নেন। পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাটক দুটোর ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সন্নিবেশিত নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে। *বিসর্জন* গোঁড়া ধর্মান্ধতাকে বর্জন করে মানববাদের ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং *রাজা ও রানী* সোচ্চার কণ্ঠে আত্মকেন্দ্রিক প্রেমের ব্যর্থতা ঘোষণা করেছে—আর অধিকাংশ রবীন্দ্র সমালোচকের মতে এ দুটোই তাঁর সবচেয়ে সেরা নাটক। কিন্তু এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ আর শেক্সপিয়রীয় রীতি অবলম্বনে নাটক লিখেন নি। এর পরিবর্তে ১৮৯২ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময় তিনি নিম্নোক্ত কতগুলো ছন্দোবদ্ধ নাটক রচনায় উৎসর্গ করেন, যেগুলো *মহাভারত*-এর একেকটি অনুকাহিনী (কেবল *সতী* বাদে, এটি নেয়া হয় মারাঠা ইতিহাস থেকে) অবলম্বনে লিখিত : *চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তি সম্বাদ* ও *লক্ষ্মীর পরীক্ষা*। সমালোচকগণ চিহ্নিত করেছেন যে, এইসব নাটক প্রকৃত নাটকীয় চরিত্রসম্পন্ন নয়, বরং বর্ণনামূলক কাব্য এবং নাটকের সংমিশ্রণজাত এক নতুন ধরনের মিশ্রসাহিত্য মাত্র। এসব নাটকের চরিত্রগুলো বহির্মুখী নয়, বরং এদের আচরণ সর্বাংশে অন্তর্মুখী। যে ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, এরা সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ উত্থাপন করে, সমালোচনা করে, আর্জি জানায় অথবা বিচারে প্রবৃত্ত হয়।[১১৬] যদি কেউ বাংলার স্থানীয় নাট্যকলার অন্তর্গত নাটগীতরীতিরই এক ক্রমবিকশিত রূপ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যপাঠগুলোকে গ্রহণ করে নিতে পারে, কেবল তবেই এসবের প্রকৃতি সহজে অনুধাবন করা যাবে। নাটগীত-এর মতো রবীন্দ্রনাথও এসব নাটকে চরিত্রসমূহের আত্মশক্তির অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন এবং নাটগীত রীতি অনুসরণে এগুলোতেও সংযোজন করেছেন অনধিক দুই অথবা তিনটি চরিত্র। যেমন : *বিদায় অভিশাপ*-এ চরিত্রসংখ্যা দুটি, *গান্ধারীর আবেদন*-এ প্রধান ৩টি, *কর্ণকুন্তি সম্বাদ*-এ ৩টি এবং *নরকবাস*-এ একটি কোরাস দলের সঙ্গে ৩টি চরিত্র।

---

১১৫. Rabindranath Tagore, *My Reminiscences*, (New York 1917), 239-40, উদ্ধৃত P. Guha Thakurta, *Drama*, 184.

১১৬. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ*, (কলকাতা ১৯৬৬), ১২-১৪।

নাটগীত অনুষ্ঠানে যেমন গান এবং শরীরী বাসনা ও ভক্তিরসের অধিক্য দেখা যেতো, রবীন্দ্রনাথ এর পরিবর্তে কাব্যরস সহ অন্যান্য রস ব্যবহার করেন। তাঁর এইসব নাটকের ঘটনাপ্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুঘটনার কার্যকারণসম্পর্কের মধ্যে বিকশিত না হয়ে বরং আপেক্ষিক রকম স্থির থাকে, যা নাট্যকারকে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো এমন এক সুবিধা প্রদান করে, যেখানে ধীরে ধীরে ঘটনাপ্রবাহের বিকাশ ঘটানো যায় এবং চরিত্রের গভীরে প্রবেশ সহজতর হয়।

কাব্যনাটক রচনার এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ দুটো কৌতুকনাটকও লিখেছিলেন। এর প্রথমটি হচ্ছে *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২), যা *শেষরক্ষা* নামে ১৯২৪ সালে পুনর্লিখিত হয় এবং দ্বিতীয়টি হলো *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭)। এই দুটি ১৯২৬ সালে লিখিত *চিরকুমার সভার* সঙ্গে একত্রে গঠন করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রধান কৌতুকরীতি। তীক্ষ্ণ, রসাল ও বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর কৌতুকনাটক এবং তৎকালীন কলকাতার রঙ্গালয়ে নির্মিত এজাতীয় নাটকের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান।

১৯০২ সালে 'রঙ্গমঞ্চ' নামে এক প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে তাঁর সমালোচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি এই মর্মে মত দেন যে, এইসব রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার চারদিক ঘিরে স্থান দখল করে থাকা 'মূল্যবান বাজে জিনিস'-গুলো অপসারণ করা দরকার। একই প্রবন্ধে তিনি যাত্রা অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন, যেখানে তিনি দেখতে পান দর্শক ও অভিনেতার মাঝে কোন কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হয় নি। ১৯১৬ সনে *ফাল্গুনী* নাটকের মুখবন্ধে তিনি আবারো ঘোষণা করেন, "মঞ্চে রং-করা ব্যাকড্রপ ব্যবহার অর্থহীন। আমরা চাই হৃদয়ের ব্যাকড্রপ, যেখানে সঙ্গীতের তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছবিটি।" ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণরীতির বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, যখন ১৯২৯ সনে *তপতী* নাটকের মুখবন্ধে আমরা তাঁকে এমন মন্তব্য করতে দেখি যেখানে তিনি অনুভব করছেন—আধুনিক ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের ব্যাকড্রপ এক বিরক্তিকর উপদ্রব ও ছেলেমি ছাড়া আর কিছু নয়।[১১৭] এটা ঠিক যে, ১৮৮০ সালের দিকে নাট্যনির্মাণরীতি ও এর কলাকৌশলগত দিক সম্পর্কে তাঁর অন্তরে যে ধারণা (*বাল্মিকী প্রতিভা* ও *বিসর্জন*-এ প্রকটিত) বিরাজ করতো তা সেই শতাব্দীর পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে অনেকটা দূরীভূত হয়। একটি যথার্থ নাট্যনির্মাণরীতির জন্য তাঁর আকুলতা তাঁকে কাব্যনাট্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে স্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাধারণভাবে প্রতীকী বা রূপকধর্মী নাটক নামে পরিচিত তাঁর সম্পূর্ণ নতুন নাট্যনির্মাণরীতি উপস্থাপনে সক্ষম হন নি।[১১৮] তাঁর এধরনের নাটকগুলো

১১৭. অজিত কুমার ঘোস, *ইতিহাস*, ৩১৬, ৩১৮।

১১৮. এই ধরনের নাটকের শ্রেণীপরিচয় চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সমালোচকগণ দ্বিধাবিভক্ত। তাই বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য আমরা এগুলোকে 'প্রতীকী-রূপকাত্মক'-এই অভিধায় অভিহিত করবো।

হচ্ছে : *সারদোৎসব* (১৯০৮), *রাজা* (১৯১১), *ডাকঘর* (১৯১২), *অচলায়তন* (১৯২২), *মুক্তধারা* (১৯২২) ও *রক্তকরবী* (১৯২৬)।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারে ইউরোপীয় প্রতীকবাদ আমদানি করেছিলেন সত্য, কিন্তু ইউরোপে যা ছিল বাস্তববাদ ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহ, বাংলায় তা-ই ছিল স্বাভাবিক জাতিগত বৈশিষ্ট্য মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতীকবাদী রূপকাত্মক নাটকগুলোর মধ্য দিয়ে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন এক 'জীবন দেবতা'কে, যিনি মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিরূপ এবং যাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গঠনের মধ্য দিয়ে জীবনের অদৃশ্যমান মর্মবস্তু উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।[১১৯] তাঁর নাটকে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী প্রেরণাদায়ক শক্তি উদ্ভূত হয় মানুষের সেই আত্মচেতনা হতে, যা জড় বস্তুর আধিপত্য থেকে নিরন্তর মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ, যেমন, *রক্তকরবী*-তে নন্দিনী, *ডাকঘর*-এ অমল, *অচলায়তন*-এ পঞ্চক এবং *মুক্তধারা*-য় অভিজিৎ—এরা সবাই সেই আত্মার মুক্তিসন্ধানী মানুষ, যারা বস্তুগত বাধা, বস্তুশৃঙ্খল ও বস্তুআবদ্ধতার বন্ধন শিথিল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। *অচলায়তন*-এ এই বস্তুবন্ধন হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী গোঁড়ামি, *ডাকঘর*-এ এটি জ্ঞানীলোকের অনড় আইনপ্রয়োগ দ্বারা লভ্য তথাকথিত নিরাপদ বিশ্ব, *মুক্তধারা*-য় এটি সাম্রাজ্যবাদ, *রক্তকরবী*-তে এর স্বরূপ হচ্ছে কঠোর বস্তুবাদ এবং *রাজা* নাটকে এটি বাহ্যিক সৌন্দর্য ও বস্তুগত ভোগসুখ মাত্র। এই সমস্ত রবীন্দ্রনাটকের অন্তর্নিহিত মূলসুরটি হলো—অশেষ যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়েই কেবল সত্যকে উপলব্ধি করা যায়; আর এর প্রমাণ মিলবে *মুক্তধারা*-তে অভিজিৎ এবং *রাজা* নাটকে সুদর্শন এই চরিত্র দুটির পরিণতি লক্ষ্য করলে। যাহোক, অজিত কুমার ঘোষ সঠিকভাবেই রবীন্দ্রনাট্যের মূলসুর চিহ্নিত করেন এভাবে যে, যন্ত্রণাভোগ ও দুঃখই জীবনের শেষকথা নয়, আত্মশক্তি এবং বস্তুর মধ্যকার অনন্ত সংগ্রামে আত্মশক্তিই জয়লাভ করবে; মৃত্যুতেই সব শেষ নয়, বরং মৃত্যুর মধ্যে বয়ে চলে জীবনের বিজয়গৌরব (*মুক্তধারা* ও *ডাকঘর* অনুসারে); অথবা এই আশাবাদ যে, কোন একদিন বস্তুর বন্ধন ছিন্ন হবেই হবে (*রক্তকরবী* অনুসারে)। আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে ট্র্যাজেডির ধারণা ছিল তাঁর স্বভাবের পরিপন্থী। ফলে তাঁর কোন একটি চরিত্রকে আমরা প্রগাঢ় দুঃখ-দুর্দশার নির্মম গ্রাসে পতিত হতে দেখি না। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমেই ট্র্যাজেডিকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্ভবত সঠিক কাজই করেছিলেন, যদিও *বিসর্জন* নাটকে তিনি এই রীতিতে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত তথাকথিত প্রতীকী-রূপকাত্মক নাটকগুলো আসলে একটি মিশ্রণ মাত্র—নাটগীত (সঙ্গীতের আধিক্য এবং ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টিতে কার্যকারণপদ্ধতির অনুপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত) ও ইউরোপীয় নাট্যকলার (মানবিক দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রনির্মাণের কতিপয় কৌশল প্রয়োগ দ্বারা

---

১১৯. প্রমথনাথ, *প্রবাহ*, ১৫৩।

চিহ্নিত) এক সচেতন সংশ্লেষণ ঘটানো হয়েছে এখানে। বস্তুর সঙ্গে আত্মশক্তির সংঘাত *রক্তকরবী* ও *মুক্তধারায়* প্রধান, *অচলায়তন*-এ তা তখনো প্রবল, *রাজা* নাটকে যুদ্ধের পর আর দৃশ্যমান নয় এবং *ডাকঘর*-এ এই সংঘাত প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এসব নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন, যদি সেসবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা তাদের উপর রোমান্টিকতা অথবা বাস্তববাদিতার আলো প্রক্ষেপ করি, তাহলে তা খুব সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। কারণ 'নন্দিনী' ও 'অমল' এসেছে *নাটগীত*-এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ধরে এবং তারা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় নিজেদের অস্তিত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট—যেমন করেছে বেহুলা, কৃষ্ণ ও ইমাম হোসেন। তাঁর ভ্রাম্যমাণ গায়ক চরিত্রের (*রাজা* ও *ডাকঘর*-এ ঠাকুর্দা এবং *অচলায়তন*-এ দাদা ঠাকুর) সাথে যাত্রানুষ্ঠানের 'বিবেক' ও রহস্যবাদী 'বাউল' চরিত্রদ্বয় অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার *অচলায়তন*-এ পঞ্চকের বিদ্রোহ এবং *ডাকঘর*-এ দূরকে কাছে পেতে অমলের আকুল প্রার্থনা—এ সবই রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল দর্শনের বিশেষ প্রভাব নির্দেশ করে। কিন্তু তিনি তাঁর নাটকের উপর স্থানীয় ঐতিহ্য সরাসরি চাপিয়ে দেন নি; তিনি যে এক ভিন্নতর যুগের প্রতিনিধি, সেই যুগসচেতনতা তাঁর মধ্যে ছিল। এদেশের স্থানীয় সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় প্রতীকবাদীদের ধারণাসমূহ প্রয়োজনমতো অভিযোজিত করেই তিনি তাঁর অনবদ্য নাট্যরীতি নির্মাণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর নাটগীত রীতির প্রভাব তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষদিকে আরো বৃদ্ধি পায়। তাঁর *শেষবর্ষণ, বসন্ত,* (১৯২৩), *নটরাজ ঋতু, রঙ্গশালা* (১৯২৭), *নবীন* (১৯৩১) এবং *শ্রাবণ-গাথা* (১৯৩৪) ইত্যাদিতে নাটকীয় উপাদানের অভাব এতো স্পষ্ট যে, স্বল্প কিছু পণ্ডিত তো এসবকে নাটক হিসেবে গ্রহণ করতেই স্বীকৃত নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাচ-গানের প্রাচুর্য দিয়ে চিহ্নিত এসব রচনা স্থানীয় নাট্যচর্চার নিরিখে অবশ্যই নাট্যপাঠ। বলা যায়, স্থানীয় নাট্যকলার এই নাচ-গানপ্রধান বৈশিষ্ট্য শেষজীবনে তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল, যখন তিনি রচনা করেন *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬), *চণ্ডালিকা* (১৯৩৮) ও *শ্যামা* (১৯৩৯)। লক্ষণীয় ব্যাপার যে, এই তিনটি নাটক রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনার একধরনের পুনর্লিখন মাত্র। গায়ক ও বাদক সমবায়ে গঠিত একটি কোরাস দল হচ্ছে তাঁর এই নাটকগুলোর অত্যাবশ্যকীয় অংশ। যদিও কোরাস দলের উপস্থিতি, গান, বাদ্যযন্ত্র ও নাচ, তুলনামূলকভাবে নাটকীয় সংঘাতের প্রতি কম গুরুত্বদান এবং সেইসাথে আত্মার গভীর অনুসন্ধানের আগ্রহ ও একটি কার্যকারণ সম্পর্কের সম্প্রতিক্রিয়াধারা নির্মাণের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের রসসৃষ্টি—এই সবকিছু রবীন্দ্র নাট্যকলার একটি অনন্য কাঠামো গঠনে সাহায্য করেছে, তথাপি আবারো বলতে হয়, স্থানিক নাট্যকলার প্রভাব এতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান। রবীন্দ্র চরিত্রগুলো যদিও বাস্তবতার ধারণা দিয়ে আঁকা নয়, তবুও কেউ একজন এর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা সহজেই অনুভব করতে পারেন। তাঁর নাট্যভাষা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য ভাষা নয় বটে, কিন্তু যা বাস্তবতাকে ফুটিয়ে

তোলে এই ভাষা তারই নির্যাসস্বরূপ এবং সে কারণে তা দৈনন্দিন জীবনের ভাষার চেয়েও অধিকতর 'বাস্তব'। তাঁর এই ভাষিক বাস্তবতা যে প্রক্রিয়ায় 'অন্তর্মানুষ'-এর অপরিমিত গভীরতা থেকে উদ্ভূত হয় তা স্থানীয় নাট্যরীতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাটকের সম্ভাব্য একমাত্র সফল পরিচালক শম্ভু মিত্র যথার্থই বলেন, "সমাজ-রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে অবস্থান করেও আমাদের সোনালী যুগের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথই সক্ষম হয়েছেন।"[১২০]

পূর্ব বাংলায় ইউরোপীয় রীতির নাট্যকলা

ঔপনিবেশিক আমল

পূর্ব বাংলার ঔপনিবেশিক যুগের শহুরে নাট্যকলার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন বেশ পরীক্ষাসাধ্য কাজ যখন বলা হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল স্রেফ অনুকরণের অনুকরণ মাত্র—

> কলকাতা ছিল বাংলা নাট্যকলার কেন্দ্র যা পশ্চিমকে অনুকরণ করতো এবং ঢাকা ছিল সেই কেন্দ্র যা অনুকরণ করতো কলকাতাকে। ঢাকায় কিছুই মৌলিক ছিল না, আর অনুকরণ ছিল বাছবিচারহীন, এমনকি কখনো অনুকরণ করা হতো কিছু না বুঝেই।[১২১]

আঠারো শতকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল মূলত জঙ্গলাকীর্ণ এবং জলাভূমিময়। উনিশ শতকের মধ্যে এসব অঞ্চল জনবসতি ও চাষাবাদের জন্য পরিষ্কার করে ফেলা হয়।[১২২] প্রায় ১৮৫০ সালের দিকে এখানে মাত্র গুটিকয়েক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ছোটখাটো শহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিল। এসব ক্ষুদ্র শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নদীপথ ছাড়া ছিল না অন্য কোন কার্যকর যোগাযোগব্যবস্থার অস্তিত্ব, এমনকি নগরবাসীর চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল না তেমন কোন উপায়-উপকরণ। এসব শহুরে বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন পেশাজীবীগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক, যারা তাদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়ির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে রক্ষা করে চলতো সামাজিক ও বৈষয়িক সম্পর্ক। এমন এক নীরস ও নিরানন্দ পরিবেশে এসব শহরবাসী শুধু যে 'নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য' উন্নততর সভ্য (যেহেতু তা পশ্চিমী) চিত্তবিনোদন বলেই ইউরোপীয় নাট্যরীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছিল তা নয়, তারা একে

---

১২০. Sombhu Mitra, "Building from Tagore", *The Drama Review*, 15 : 3 (1971), 204.

১২১. ব্রজগোপাল দাস, উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা,* (১৮৪৭-১৯৭১), (ঢাকা ১৯৮৮), ৪৮, লেখককৃত অনুবাদ।

১২২. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার,* (ঢাকা ১৯৮৫), ১৩।

সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমরূপেও বিবেচনা করেছিল। ফলে কলকাতায় যেভাবে সামন্ত-ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণীর উদ্যোগে এই শিল্পমাধ্যমটির গোড়াপত্তন হয়, পূর্ব বাংলায় ঠিক সেভাবে তা ঘটে নি। এখানে উদ্যোগ এসেছে জমিদার ছাড়াও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি আমলাদের উচ্চপদমর্যাদাধারী অংশকেও এই উদ্যোগের সঙ্গে শরিক হতে দেখা গেছে। পূর্ব বাংলার নাট্যকলা কলকাতার অনুকরণে গড়ে উঠলেও পরে এটি চরিত্রগতভাবে পৃথক রূপ ধারণ করে শুধু এই কারণে যে, গোড়া থেকেই এটি স্থানীয় শহুরে মধ্যশ্রেণীর কাছে উন্মুক্ত হতে পেরেছিল। অবশ্য এদেশে প্রবাস-জীবন যাপনরতদের মনোরঞ্জনের জন্য এদেরই দ্বারা সৃষ্ট ইংরেজি নাটককে কিছুতেই উল্লিখিত ধারার অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা যাবে না। ঢাকায় এরকম নাটক সর্বপ্রথম দর্শন করে বৃটিশ সিভিলিয়ান ও সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ১৮৫৭ সালের ১ জুন। এদিন বৃটিশ নৌসেনার দল মঞ্চস্থ করেছিল *ক্যাওস ইজ কাম এগেইন* এবং *অরিজিনাল* নামক দুটি কৌতুকনাট্য। অন্যদিকে উনিশ শতকী পূর্ব বাংলায় স্থানীয় উদ্যোগের ফলে নাট্যক্ষেত্রে তিনটি বিশেষ ধারা বিকাশ লাভ করে—(১) সৌখিন দলসমূহ, যারা বিশেষ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে নাট্যপ্রদর্শন করতো, (২) সামাজিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ সৌখিন দলসমূহ, যারা প্রায়ই দর্শনীর বিনিময়ে নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করতো এবং (৩) পেশাদার নাট্যপ্রতিষ্ঠানসমূহ।[১২৩]

পূর্ব বাংলায় আধুনিক মঞ্চকাঠামোয় মঞ্চস্থ সর্বপ্রথম নাটক হলো ১৮৫৬-৫৭ সনে বরিশালে প্রদর্শিত দুর্গাদাস করের *স্বর্ণশৃঙ্খল*। এটি লিখিত হয় ১৮৫৫ সনে, পরে ১৮৬৩ সনে ঢাকা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং আবার ১৮৬৩-র জুলাই মাসে বরিশালে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে নাটকটি পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।[১২৪] আধুনিক মঞ্চে আয়োজিত নাট্যপ্রদর্শনের আরেকটি প্রাথমিক উদাহরণ হচ্ছে যশোরের এক পল্লীগ্রামে ১৮৫০ সনের ১ জানুয়ারি স্কুলছাত্রদের দ্বারা অভিনীত *শকুন্তলা* নাটক।[১২৫] ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত নাটক হলো দীনবন্ধু মিত্রের *নীল দর্পণ* (১৮৬১)। মধুসূদনের *একেই কি বলে সভ্যতা* (১৯৭২) এবং এজাতীয় অন্যান্য নাটক নিয়ে ১৮৭০ সাল নাগাদ ঢাকার সৌখিন নাট্যদলগুলি আধুনিক মঞ্চে আবির্ভূত হলে তারা ঢাকাবাসীদের কাছ থেকে লাভ করে বিপুল সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা।

---

১২৩. ঐ, ২৩-১৪।

১২৪. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৩২-৩৩।

১২৫. ঐ, ৩৯।

১৮৭০ ও ১৮৮০ সালের মধ্যে সৌখিন নাট্যপ্রদর্শনী ঢাকার বাইরে, বিশেষত বিক্রমপুরের আশপাশের গ্রামগুলো (হাছারা, কালীপাড়া, শ্রীনগর বজ্রযোগিনী), পাবনা (মালঞ্চি), কুমারখালি (মহিষবাগান, মেখলা)[১২৬] এবং টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রামগুলোয় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঢাকার বাইরে নিম্নোক্ত অঞ্চলে সৌখিন নাট্যপ্রদর্শনী আয়োজিত হয় : কুষ্টিয়া (*জমিদার দর্পণ* ১৮৭১), শেরপুর (*একেই কি বলে সভ্যতা* ১৮৬৫), মুক্তাগাছা (মুক্তাগাছা এমেচার থিয়েটার পার্টি, ১৮৯৪), ফরিদপুর (ফরিদপুর টাউন থিয়েটার, ১৮৭০), ময়মনসিংহ (অমরাবতী নাট্যসমাজ, ১৮৯২), কুমিল্লা (১৮৮৫ সালের পর), রাজশাহী (উনিশ শতকের শেষে), যশোর (নিউ আর্য থিয়েটার, ১৮৮৫) এবং রংপুর (রংপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন, ১৮৯১)।[১২৭]

প্রথম স্থায়ী পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলা যায়, ঢাকা কলকাতাকে পথ দেখিয়েছিল। ১৮৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে ঢাকায় নির্মিত হয় ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হল।[১২৮] ঢাকাভিত্তিক সৌখিন নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই হলভবনটি পালন করেছিল ব্যাপক উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা। ১৮৯০ সালে ভবনটি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সেস্থলে গড়ে উঠে ক্রাউন থিয়েটার। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী নাট্যালয়গুলো গড়ে উঠেছিল জনগণের মধ্যশ্রেণীর উদ্যোগ ও প্রভাবশালী জমিদারদের সহযোগিতা—এই দুইয়ের সংযোগে। কোন কোন স্থানে, যেমন বগুড়া, ময়মনসিংহ ও রংপুরে প্রধান সরকারি কর্মকর্তাগণও নাট্যালয় নির্মাণপ্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এমন উদাহরণ আরো দেখতে পাওয়া যাবে রাজশাহীতে (গোপাল রায় নাট্যশালা ও ভিক্টোরিয়ান রঙ্গমঞ্চ, উনিশ শতকের শেষে), টাঙ্গাইলের সন্তোষে (সন্তোষ জমিদারের নাট্যশালা, ১৮৯০), যশোরে (অভিভূষণ বাবুর বাসভবন, ১৮৯০), কুমিল্লায় (কুমিল্লা টাউন হল বিল্ডিং, ১৮৮৫ এবং ১৯০৮ সালে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ), দিনাজপুরে (দি ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার, ১৯০৪), বগুড়ায় (এডওয়ার্ড ড্রামাটিক এসোসিয়েশন, ১৯০৫), রংপুরে (রংপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন, ১৯১০) এবং ময়মনসিংহের গৌরিপুরে (জমিদার বাড়ি, ১৮৯৪)।[১২৯]

সামাজিক ও শৈল্পিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ কিছু সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর প্রবেশপত্র বিক্রির মাধ্যমে নাট্যপ্রদর্শনের জন্য ঢাকায় ১৮৭০ সন নাগাদ থিয়েটার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও তাৎপর্য লাভ করে।

---

১২৬. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ২৯-৩০।

১২৭. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ২১-৪৫।

১২৮. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ২৮।

১২৯. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ২১-৪৫।

১৮৭১ সালে 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হল মঞ্চে তারা *শরৎ সরোজিনী, মেঘনাদ বধ, মহারাষ্ট্র কলঙ্ক* ইত্যাদি নাটক প্রদর্শন করে। নবাবপুর এ্যামেচার থিয়েটার কোম্পানি ছিল আরেকটি জনপ্রিয় নাট্যগোষ্ঠী, যা মঞ্চস্থ করে *শকুন্তলা*-র বাংলা নাট্যপাঠ (১৮৭১) এবং ১৮৯৮ সালের পরেও এই প্রতিষ্ঠান নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল বলে জানা যায়।[১৩০] আরো একটি নাট্যদল, যা গিরিশ ঘোষের *বিল্বমঙ্গল* প্রদর্শন করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা হচ্ছে ১৮৮৮-তে প্রতিষ্ঠিত ইলিসিয়াম থিয়েটার। এদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বুধ ও শনি—সপ্তাহের এই দুই দিন এরা নিয়মিত নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকতো।[১৩১] *নীল দর্পণ* নাটক প্রদর্শনকালে সরকার এই নাটকের বিশেষ কিছু অংশের জন্য আপত্তি জানানোর পর নাট্যদলটি আর বেশিদূর অগ্রসর হতে না পেরে অবশেষে বিলুপ্ত হয়।[১৩২] উনিশ শতকের আরো দুটো উল্লেখযোগ্য নাট্যগোষ্ঠী হচ্ছে 'সনাতন নাট্যসমাজ' (১৮৮৯-এ প্রতিষ্ঠিত) এবং 'অলিম্পিয়া থিয়েটার' (১৮৮৯), যারা এসময়ে ঢাকাই থিয়েটার জগতে পালন করেছে সক্রিয় ভূমিকা।

এছাড়া উর্দু ভাষায় নাট্যচর্চা ঢাকায় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং যতোদূর জানা যায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাঝে মাঝে উর্দু নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। এসবের মধ্যে 'ফারহাত আবজা' ১৮৯০ সালের মধ্যে নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনের যোগ্যতাসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এ দলটির রয়েছে সমসাময়িক নাট্যকার আলি নাফিস লিখিত ৩০টি উর্দু নাটক মঞ্চায়নের অনন্য কৃতিত্ব।[১৩৩]

ঢাকায় সর্বপ্রথম পেশাদার নাট্যচর্চার দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়, যখন ১৮৮২ সালের ৩০ মার্চ ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হলে 'পূর্ব বাঙলা নাট্য সমাজ' মনমোহন বসুর *রামাভিষেক* নাটকটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। সম্ভবত 'নাট্য সমাজ' ১৮৭২ সালের আগেও নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকতে পারে, যা আমাদের জানা নেই। তবে যেটুকু জানি তা হলো, তাদের অভিনীত *রামাভিষেক* নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং কিছু অজ্ঞাত কারণে ১৮৮৩ সালের দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হলে এরই কতিপয় সদস্য মিলে গঠন করেন 'ঢাকা থিয়েটার কোম্পানি' (১৮৮৩)। এঁদের অভিনীত নাটকের নাম ছিল *নবনাটক*।[১৩৪] ১৮৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে যে পর্যন্ত না ক্রাউন থিয়েটার

---

১৩০. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ৩২।
১৩১. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৭।
১৩২. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ৩৪।
১৩৩. ঐ, ৩৫।
১৩৪. ঐ, ৩৮।

প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, সে পর্যন্ত ঢাকার পেশাদার নাট্যচর্চা সম্পর্কে আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে পারি নি। ক্রাউন থিয়েটার সোম, বুধ ও শনি—সপ্তাহে এই তিন দিন রাতব্যাপী *চৈতন্যলীলা ও পূর্নচন্দ্র*-র মতো নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করতো।

পরবর্তীকালে থিয়েটারটি ঢাকার নবাবপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালে *দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরানী, বিজয় বসন্ত* ও অন্যান্য নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার কোম্পানি। কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি এই কোম্পানির প্রায় জন্মলগ্ন থেকে এতে অন্তত বছরাধিক কাল অভিনয় করেন বলে জানা যায়।[১৩৫]

দেশীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে জুন্নু বাঈ, আন্নু বাঈ ও নয়াবান প্রথমবারের মতো ঢাকার মঞ্চে আবির্ভূত হন ১৮৮০ সালে ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হলে অনুষ্ঠিত নাটক *ইন্দ্রসভা*-তে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।[১৩৬] স্থানীয় নাট্যানুষ্ঠান ছাড়াও কলকাতা থেকে আগত ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলও ঢাকায় তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসে ১৮৭৩ সালের ১২ জুন থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। তাদের প্রদর্শিত নাটকের মধ্যে ছিল *নীল দর্পণ, কৃষ্ণকুমারী, সধবার একাদশী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* ইত্যাদি। ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ সালে একবার এবং ১৯৭৯ সালে পুনর্বার ঢাকা সফর করে। বোম্বে থেকে এসে একটি দল ঢাকার দর্শকদের জন্য হিন্দিতে *ইন্দ্রসভা* নাটক প্রদর্শন করে যায়। এছাড়া 'স্টার কোম্পানি' ১৮৮৭ সালে এবং 'বীণা কোম্পানি' ১৮৮৮ সালে ঢাকা সফর করে।[১৩৭]

উনিশ শতকী নাট্যকলার সঙ্গে সাধারণভাবে পূর্ব বঙ্গ ও বিশেষভাবে ঢাকাকেন্দ্রিক বিশ শতকী নাট্যকলার তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নিহিত আছে এদের গুণগত মানের মধ্যে। পেশাদার নাট্যদলগুলো সারা রাত ধরে হালকা বিনোদনমূলক নাটক উপহার দিত এবং এর সঙ্গে যুক্ত করতো বেশ ভাল মাত্রার নাচ ও গান। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটারের মালিকানা পরিবর্তিত হলে এর নতুন নামকরণ হয় লায়ন থিয়েটার। এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটির প্রদর্শনীতালিকায় যেমন থাকতো বাঙালি অভিনেত্রীসমৃদ্ধ উর্দু নাটক (*বুলবুল-এ-বিমার, শিরি-ফরহাদ, জালমা-এ-পারিশতান*), তেমনি থাকতো স্থানীয় বাঙালি নাট্যকাররচিত প্রহসনও (যোগেন গুপ্তের *চিড়িয়াখানা*, বিপিন বিহারী দাসের *লাঞ্ছনা* ইত্যাদি)।[১৩৮] ইতিমধ্যে নাট্যনির্মাণব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পেশাদার

---

১৩৫. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৯।
১৩৬. মুনতাসির মামুন, *থিয়েটার*, ৩৫।
১৩৭. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ১৭-১৮।
১৩৮. ঐ, ৯, ১০, ১৩।

নাট্যশালাগুলো প্রভূত দুর্ভোগের সম্মুখীন হয় এবং এসময়ে সিনেমা বা চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটলে অবশেষে শিল্পটি এমনভাবে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে যে তা আর কখনো পুনঃসঞ্চার করা যায় নি। অধিকাংশ নাট্যগৃহ রূপান্তরিত হয় সিনেমা হলে এবং কেবল সৌখিন নাট্যদলগুলোই সময় সময় এসব স্থানে তাদের প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকতো। সৌখিন নাট্যদলগুলো তা সত্ত্বেও বিক্ষিপ্তভাবে তাদের নাট্যপ্রয়াস অব্যাহত রাখে প্রধানত কলকাতায় জনপ্রিয়তালাভকারী নাটকসমূহের উপর নির্ভর করে। তা ছাড়া বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ঢাকায় দ্রুত গড়ে উঠে বেশ কিছু 'নাট্যচক্র', যেমন ওয়ারী নাট্যচক্র, টিকাটুলি নাট্যচক্র, আর্মানিটোলা নাট্যচক্র, শব্জি মহল নাট্যচক্র, গেণ্ডারিয়া নাট্যচক্র, ফরাশগঞ্জ নাট্যচক্র ইত্যাদি। এদের মঞ্চসফল নাটকগুলোর মধ্যে *সীতা, রাম, জোনা, শাজাহান, বাজী রাও, কারাগার, অশোক, টিপু সুলতান* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'পোস্টাল ড্রামাটিক ক্লাব' বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রচেষ্টা নিয়েছিল মধ্যবিত্ত ঘরের নারী অভিনেত্রী দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার, কিন্তু এ উদ্যোগ সাফল্য লাভ করে নি। পরে এই নাট্যচক্রের প্রধান সংগঠক 'ঢাকেশ্বরী নাট্যসমাজ' নামক আরেকটি নাট্যদলের সঙ্গে যৌথভাবে দর্শনীর বিনিময়ে অনুরূপ একটি নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করে। কিন্তু এবারের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। ১৯২০-এর দশকের মধ্যভাগে কোন এক সময়ে বলধার জমিদার একটি পেশাদার নাট্যদল গঠন করে অন্তত পাঁচ কি ছয় বছর ধরে তাঁর স্বরচিত ও স্বনির্দেশিত নাটকসমূহ মঞ্চস্থ করতে থাকেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি।[১৩৯] এ সময়ে ১৯৩০-এর দশকে সৌখিন উর্দু নাট্যচর্চার ধারাটিকে বেশ বেগবান হয়ে উঠতে দেখা যায় প্রধানত এর রোমান্সধর্মী নাটকগুলোর জন্য। এসব জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে রয়েছে *গুল নাহার* (১৯৩১), *আনজুমান আরা* (১৯৩২), *আলম আরা, হোসনা আফরোজ, গুলশান-ই-জানফিদা, বিমার-এ-বুলবুল, শিরি-ফরহাদ* (১৯৩৬-১৯৩৭ সনের দিকে) ইত্যাদি। ঢাকায় উর্দু নাটকের এই জনপ্রিয় ঐতিহ্য নাট্যকলার প্রতি বাংলার মুসলমানের সাধারণ আগ্রহকেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে।[১৪০]

১৯৪০-এর দশকের প্রথমদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পটভূমিতে IPTA একটি যথার্থ ধনাত্মক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। দেশপ্রেমমূলক গান (পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে) এবং নাট্যানুষ্ঠান (কলকাতার *নবান্ন*, বরিশালে ১৯৪৫ সালে) আয়োজনের মাধ্যমে এটি জনগণের মাঝে সমাজসচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। 'ঢাকা থিয়েটার' নামক ঢাকার একটি নাট্যদল ১৯৪৩ সনে তাদের একটি রূপকধর্মী নাটক *মেশিন ও মানুষ* প্রদর্শন দ্বারা বেশ আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রজগোপাল দাস রচিত নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে

---

১৩৯. প্রাগুক্ত, ১০-১১।

১৪০. ঐ, ১৩।

মানবসমাজের আভ্যন্তর সঙ্কট এবং নাটকে এর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান উদ্ভাবনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যদলটি পাঁচদিনে এই নাটকের মোট দশটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল এবং এগুলো সবই দর্শনীর বিনিময়ে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী সাফল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা রণেশ দাশ গুপ্তের এক-চরিত্র বিশিষ্ট সমাজচেতনামূলক নাটক মঞ্চস্থ করে, যেগুলোর একটি হচ্ছে *আমন ধান* এবং অন্যটি *ওরা ঘর বাঁধতে চায়* ।[১৪১]

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই কালপর্বের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ সমাধা করেছে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রগণ প্রথমে ডি. এল. রায়ের *বঙ্গনারী* (১৯২১) নাটকটি দিয়ে শুভসূচনা করে এবং পরবর্তী চার বছরে মোট নয়টি নাটক মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব দেখায়। নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে জগন্নাথ হলের ছাত্ররা বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করে এবং একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জনে সমর্থ হয়। তারা ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সনের মধ্যে গিরিশ ঘোষের *প্রফুল্ল*, বিধায়ক ভট্টাচার্যের *ক্ষুধা* এবং রবীন্দ্রনাথের *বৈকুণ্ঠের খাতা* ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ছয় বছরে এই ছাত্ররা আরো সাতটি নাটক উপহার দেয়, যেগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের *শেষরক্ষা*, বিধায়ক ভট্টাচার্যের *মেঘমুক্তি* ও বনফুলের *মধুসূদন* ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪২]

উপনিবেশোত্তর কাল

১৯৪৭ সনে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশকে বিভক্ত করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর পেছনে ছিল বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, যাকে উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক ট্র্যাজেডি বলে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য অন্যদিকে একই সময়ে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র এতকাল শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকা অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার এক বিরাট সুযোগও এনে দেয়। ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের অর্থপুষ্ট বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। দেশবিভাগের পর তারা ক্রমবর্ধমান হারে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে কলকাতায় বসবাস শুরু করলে স্থানীয় নাট্যকারদের আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সুস্পষ্ট সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। নবোদ্ভূত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির রাজনীতি ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্তির দিকে এগোতে থাকে, যার একদিকে অবস্থান

---

১৪১. ঐ, ১২।

১৪২. প্রাগুক্ত, ১৪-১৫।

নেয় রক্ষণশীল ইসলামী মৌলবাদী শক্তি এবং অন্যদিকে জড়ো হতে থাকে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী শক্তি। সুকুমার সেন[১৪৩] এই সময়কালকে যথার্থভাবে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন :

ক. ১৯৪৭-১৯৫১ : আত্মপরিচয়ের সঙ্কট

খ. ১৯৫২-১৯৫৭ : বসন্ত জাগরণ

গ. ১৯৫৮-১৯৬৭ : দমন ও প্রতিরোধ

ঘ. ১৯৬৮-১৯৭১ : বিস্ফোরণ

ক. *১৯৪৭-১৯৫১ : আত্মপরিচয়ের সঙ্কট*

এ সময়ে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়। ফলে এখানেও দুটো প্রধান শিল্পপ্রবণতা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে। এদের একটি হচ্ছে রক্ষণশীল-মৌলবাদী ধারা, যা ঢাকার বাইরের মফস্বল শহরগুলোয় অধিক শক্তিসঞ্চয় করে এবং মূলত কেন্দ্রীভূত থাকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যেই। এসব নাটক সাধারণভাবে মহিমামণ্ডিত করতে চাইতো মুসলিম ইতিহাসকে। মুগল ঐতিহ্য, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যসমূহ, মুসলিম বাংলা এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিমণ্ডলেই এই ধারা এর সহজ গতিপথ এবং সার্থকতা অনুসন্ধান করে ফিরতো। এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাট্যরচয়িতাগণ হচ্ছেন আকবরউদ্দিন (১৮৯৫-১৯৭৮), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), শাহাদাৎ হোসেইন (১৮৯৩-১৯৫৩) ও ইবরাহিম খলিল (জন্ম ১৯১৬)। আকবরউদ্দিনের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে *সিন্ধু বিজয়, সুলতান মাহমুদ*; রূপকাত্মক নাটকের মধ্যে *বন্দীমুক্তি* এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে *আযান* ও *অভিশাপ* উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুটি ছাড়া তাঁর সব নাটকই ইসলামী ঐতিহ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। শাহাদাৎ হোসেইন লিখেন কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক নাটক, যেমন *মসনদের মোহ, সরফরাজ খান, আনারকলি* ইত্যাদি। ইব্রাহীম খাঁ রচিত গুরুত্বপূর্ণ নাটকের মধ্যে *কামাল পাশা* ও *আনোয়ার পাশা* ঐতিহাসিক শ্রেণীর নাটক এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থান কামনায় নিবেদিত। তাঁর *কাফেলা* একটি একাঙ্কিকা, যার পটভূমি হচ্ছে গ্রামীণ মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনধারা। আর ইবরাহিম খলিলের *স্পেন বিজয়ী মুসা* নাটকটিতে স্পেনে মুসলিম বিজয়াভিযানের কাহিনী ফুটে উঠেছে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে।[১৪৪]

---

১৪৩. কালপর্বে বিভক্তির এই বিষয়টি এবং আলোচ্য পৃষ্ঠাগুলোয় এসংক্রান্ত বিশ্লেষণ সুকুমার সেন কর্তৃক পরিচালিত এক ব্যাপক ও তথ্যপূর্ণ জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণীত। দেখুন সুকুমার সেন, *ইতিহাস*।

১৪৪. প্রাগুক্ত, ৮১-৮৯।

নাট্যকলায় পরিলক্ষিত দ্বিতীয় মূলধারাটির অস্তিত্ব এ সময়ে প্রধানত ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে। এই ধারায় অবস্থানরত আদর্শগতভাবে প্রগতিপন্থী ও গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী নাট্যকারগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক নাট্যচর্চার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শতকত ওসমান (জন্ম ১৯১৭), নুরুল মোমেন (জন্ম ১৯০৮), আশকার ইবনে শাঈখ (জন্ম ১৯২৫), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), জসীমউদদীন (১৯০৩-১৯৭৬), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), ওবায়দুল হক (জন্ম ১৯০২) এবং সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম ১৯২২)।

শওকত ওসমান তাঁর দ্বি-অঙ্কবিশিষ্ট সামাজিক নাটক *তস্কর ও লস্কর*-এ সমসাময়িককালের নৈতিক মূল্যবোধের স্খলনজনিত সামাজিক সঙ্কটকে চিত্রায়িত করেন। তাঁর পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট প্রহসনধর্মী *কঙ্কর মণি* নাটকে আছে সমাজের বিত্তশালী এলিট শ্রেণীর প্রতি তীর্যক সমালোচনা এবং *আমলার মামলা* নামক পরবর্তী নাটকে শওকত ওসমান আক্রমণ পরিচালনা করেছেন সরকারি আমলাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। নুরুল মোমেন তাঁর *নেমেসিস* নাটকে একজন মাত্র অভিনেতার দ্বারা সম্পন্ন করেন এক কৌতূহলী নিরীক্ষণ। এতে ঘটনাস্থল অপরিবর্তিত রেখে অর্থনৈতিক চাপেব ফলে কীভাবে সমাজে নৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয় তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পরবর্তী নাটক *রূপান্তর*-এ তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন এক পারিবারিক জীবনের জটিলতর রূপ। আশকার ইবনে শাইখের সামাজিক নাটক *বিরোধ* অঙ্কন করে গ্রামবাংলার সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রতিকৃতি। তাঁর *পদক্ষেপ* নাটকেও পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামীণ জীবন এবং এতে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভারসাম্যপূর্ণ সমালোচনা করেন। *দিগ্বিজয়ী চোরাবাজার* ওবায়দুল হকের পাঁচটি একাঙ্কিকার সঙ্কলনগ্রন্থ, যেখানে তিনি সমসাময়িককালের সামাজিক ব্যাধিসমূহকে বিদ্রূপ করেছেন। আবুল ফজল সমকালীন জীবনের এক সরস চিত্র তুলে ধরেছেন *একটি সকাল* নামক তাঁর চারটি একাঙ্কিকার সঙ্কলনগ্রন্থে। *আলোকলতা* নামক তাঁর দ্বিতীয় একাঙ্কিকা সঙ্কলনের বিষয়ও হচ্ছে সামাজিক সমস্যাবলী। এর অন্তর্ভুক্ত চারটি নাটক কৌতুকধর্মী, তন্মধ্যে *ভাই ভাই*-তে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজের একটি অংশ নিরন্তর ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে চলেছে। গ্রন্থভুক্ত পঞ্চম নাটক *তা তো হবেই* উপস্থাপন করে এক দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পরিবারের মর্মস্পর্শী কাহিনী। আবুল ফজলের পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটক হচ্ছে *প্রগতি ও কায়েদ এ-আজম।* শেষোক্তটি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর জীবনভিত্তিক পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট নাটক। মুনীর চৌধুরী এ সময়ে দুটি নাটক প্রকাশ করেন। এর একটি *স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত* এবং অন্যটি *বেশরিয়তী।* এই দুই নাটকেই সামাজিক সমস্যাকে কৌতুকভঙ্গিমায় উপস্থাপনের চেষ্টা আছে। সৈয়দ আলী আহসানের *জোহরা মুশতারি* ও *কুরবানী* নাটকদ্বয় কাঠামোগত নতুনত্বের দাবিদার, তবে জাপানী 'নোহ্‌' থিয়েটারের সুস্পষ্ট প্রভাব এতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই কালপর্বে নাট্যকার হিসেবে আমরা জসিমউদ্দীনকেই কেবল এককভাবে

গ্রামবাংলার একান্ত নিজস্ব নাট্যকলার ঐতিহ্য অনুসরণে যত্নবান হতে দেখি। তাঁর *পদ্মাপার* নাটককে আখ্যায়িত করা হয়েছে রহস্যাত্মক-রূপক বলে, যা বাউল দর্শনের ভিত্তিতে রচিত। নাটকটিতে উত্তর বঙ্গের স্থানীয় *'মনাই যাত্রার'* রূপ ও রীতির লক্ষণীয় প্রভাব রয়েছে। তাঁর *বেদের মেয়ে* ত্রি-অঙ্কবিশিষ্ট নাটক এবং জসিমউদ্দীন এতে উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় *হুমরা বাইদা* উপাখ্যানটি ব্যবহার করে বাংলার সাপখেলা প্রদর্শক বেদে সম্প্রদায়ের এক অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন।[১৪৫]

এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের বাকি অংশকে নাটকনির্মাণে নেতৃত্ব প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাটকগুলোর বেশিরভাগই ছিল সামাজিক বিষয়ভিত্তিক এবং সেসব ছিল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, নুরুল মোমেন, আশকার ইবনে শাঈখ ও মুনীর চৌধুরী প্রমুখ লিখিত উপন্যাসের নাট্যরূপ অথবা এঁদের লেখা অবলম্বনে রচিত নাটক। উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যচর্চার নির্দেশনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সক্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব। ভার্সিটি ক্যাম্পাসের বাইরে প্রদর্শিত নাটকসমূহ ছিল সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় বিষয়ভিত্তিক। সামাজিক নাটকের মধ্যে ১৯৫১ সনে মাহবুব আলি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের *বিজয়া*-র মঞ্চায়ন উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে নারীচরিত্রে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ ছিল সেসময়ে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত বিরচিত *টিপু সুলতান* ও অন্য কয়েকটি মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক নাটক প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঢাকার বাইরের শহর এলাকাতেও মুসলিম বীরদের কাহিনীসম্ভূত ঐতিহাসিক নাটকই ছিল অধিক জনপ্রিয়। মঞ্চসফল এজাতীয় নাটকের মধ্যে *শাজাহান, টিপু সুলমান ও সিরাজউদ্দৌলা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪৬]

খ. *১৯৫২-১৯৫৭ : বসন্ত জাগরণ*

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন রক্ষণশীল মৌলবাদী ও গণতন্ত্রী-মানবতাবাদী শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছিল। রঙ্গমঞ্চের পর্দাতেও আমরা এই ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ্য করি; বিশেষত গণতন্ত্রী-মানবতাবাদীদের লিখিত নাটকসমূহে রাজনৈতিক অঙ্গীকার দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক সচেতনতার ক্রমবর্ধমান মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। এসব নাট্যকার কখনো কখনো খুবই কৃত্রিম এবং শহুরে এলিটের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হলেও তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে অধিকতর

---

১৪৫. প্রাগুক্ত, ৮৯-১০৬।

১৪৬. ঐ, ৭২-৮০, ১২৮।

ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যাহোক, এটা অনস্বীকার্য যে, তাদের নাট্যপাঠ ও প্রদর্শনী ছিল গতিশীল এবং সেসময়ে বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণী রাষ্ট্রীয়ভাবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যুর মোকাবেলা করছিল, এর বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে সেসব নাটক ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। গণতন্ত্রী-মানবতাবাদী দল ঢাকায় তাদের তৎপরতা চালাতো মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করে। এ সময়ে তাদের প্রদর্শিত নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী এবং আনিস চৌধুরীর নাটকই ছিল বেশি। রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলো, প্রগতিবাদীদের কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করতো যাদের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার প্রতিফলন ঘটতো না।[১৪৭]

মুনীর চৌধুরীর নবযুগ সৃষ্টিকারী নাটক *কবর* সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে, যখন লেখক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি কারাগারে বসেই নাটকটি লিখেন এবং তাঁর সঙ্গী অন্যান্য রাজবন্দি সহযোগে সেখানেই তা মঞ্চস্থ করেন। এটি পূর্ব বাংলার নাট্যকলাকে এক নতুন ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করে। কারাকর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা সত্ত্বেও বন্দিগণ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের সীমিত সামর্থের মধ্যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, যা ছিল '৪৭-উত্তরকালে এদেশের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নাট্যানুষ্ঠানসমূহের অন্যতম। তাঁরা বৈদ্যুতিক বাতির পরিবর্তে হারিকেন, মোমবাতি ও দিয়াশলাই জ্বালিয়েই নাট্যপ্রদর্শনীর জন্য আলোর ব্যবস্থা করেন। নাটকটির প্রকৃত আবেদন ও গুরুত্ব নিহিত এর রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে—যেমন একজন নাগরিকের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ঘোষণা এবং সুতীব্র মানবিক দুর্দশার (পুলিশী নৃশংসতা ও গণহত্যা) চিত্র তুলে ধরা। যদিও আরইউন 'শ-এর *বারি দ্য ডেড* নাটকের গভীর প্রভাব এতে লক্ষণীয়, তথাপি বাংলা নাটকের ইতিহাসে *কবর* এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে এর সহজ-সরল অভিব্যক্তি ও প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য। ১৯৫৫ সনে বার্নাড 'শ-এর *ইয়্যু নেভার ক্যান টেল* অবলম্বনে রচিত মুনীর চৌধুরীর অপর নাটক *কেউ কিছু বলতে পারে না* সাহিত্যিক ও নাট্যকলাগত মূল্যের বিচারে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।[১৪৮] এ সময়ে লিখিত তাঁর অন্য দুটি নাটক *মানুষ* এবং *নষ্ট ছেলে* বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক বীক্ষণ ও মূল্যায়ন তুলে ধরে।

আনিস চৌধুরীর মানচিত্র (প্রথম প্রদর্শন ১৯৫৫) দারিদ্র্যকবলিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক সঙ্কটকে প্রতিফলিত করে। এটি মঞ্চায়নকালে প্রথাগত রঙিন ব্যাকড্রপের পরিবর্তে একজন স্কুলশিক্ষকের গ্রামীণ বসতভিটার অবিকল ছবি ব্যবহৃত হয়।[১৪৯] আশকার ইবনে শাইখের *বিদ্রোহী পদ্মা* প্রমত্তা পদ্মা নদীর তীরে বসবাসকারী

---

১৪৭. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ১২৫-২৬, ১৪০-৪২।
১৪৮. ঐ, ১৩১, ১৪৯, ১৫০, ১৯১-১৯৪।
১৪৯. ঐ, ১৫০।

মানুষের জীবন ও তাদের সংগ্রামের চিত্র অঙ্কনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। এতে দেখা যায় যে, এইসব সংগ্রামী মানুষ সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টিতে মদদদাতা জমিদারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় এবং অবশেষে তাদের জমির ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় মৌলবাদ অনুসরণের বিরুদ্ধে নাটকটিকে এক দৃঢ় প্রতিবাদরূপে গণ্য করা যায়। লেখকের *দুরন্ত ঢেউ* নামক গ্রন্থটি সামাজিক বিষয়ে রচিত তাঁর কয়েকটি ক্ষুদ্র নাটিকার একটি সঙ্কলন। এগুলোর মধ্যে *দুর্যোগে* ভাষা আন্দোলনের বিদ্রোহ এবং সামগ্রিকভাবে *দুরন্ত ঢেউ* মৌলবাদী রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলে।[১৫০]

শতকত ওসমানের পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট ঐতিহাসিক রূপক নাটক *বাগদাদের কবি*-ও সমকালীন সামাজিক অবিচার এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের প্রতিবাদে সোচ্চার।[১৫১] শহুরে সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয়, বিশেষকরে এর ক্ষয়িষ্ণুতা ও দুর্নীতির করুণ দিকগুলো ফুটিয়ে তুলতে ওবায়দুল হক লিখেন *এই পার্কে*।[১৫২] অন্যদিকে জসিমউদ্দীন আগের মতোই বাংলার গ্রামীণ উপাদাননির্ভর নাটক রচনায় তাঁর আগ্রহ বজায় রাখেন এবং জনপ্রিয় এক লোককাহিনীর ভিত্তিতে লিখেন *মধুমালা* নাটক। তিনি নাটকে সঙ্গীত যোজনায় যথেষ্ট সাফল্য দেখালেও দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ব্যবহৃত ভাষা শহুরে শিষ্ট বাংলা ভাষাগোষ্ঠী থেকে বেশ দূরবর্তী হয়ে পড়ে। পল্লীবাংলার সামগ্রিক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলায় সার্থক তাঁর আরেকটি নাটকের নাম হচ্ছে *পল্লীবধূ*।[১৫৩] পাশাপাশি *ময়মনসিংহ গীতিকার* অন্তর্ভুক্ত জনপ্রিয় কাহিনীর ভিত্তিতে আজিমুদ্দিন আহমদ (১৯০৪-১৯৭১) *মহুয়া* নাটক রচনা করলেও পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট রোমান্টিক নাটক হিসেবে এর সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুন এটি তেমন সফল হতে পারে নি।[১৫৪] উপরে উল্লেখিত নাটক ও নাট্যরচয়িতাগণ ছাড়া ক্ষুদ্র আরেক দল নাট্যকার ছিলেন, যাঁদের সৃষ্টিকর্মে ভাষা আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না, বরং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁদের কর্মকাণ্ডকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে—আকবরউদ্দিনের ঐতিহাসিক নাটক *নাদির শাহ* ও *সমাধি*, ইবরাহিম খলিলের ঐতিহাসিক নাটক *ফিরিঙ্গি রাজ*, গ্রামীণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমাজজীবন নিয়ে লিখিত ইব্রাহীম খাঁর *ঋণ-পরিশোধ* এবং আবদুল হকের (জন্ম ১৯১৮) মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ সম্পর্কিত সামাজিক নাটক *অদ্বৈত*। যদিও ঢাকার বাইরের শহর এলাকাগুলোতেই রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে অবস্থান করছিল, তথাপি ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সেসব অঞ্চলের

১৫০. প্রাগুক্ত, ১৬০-৬৫।
১৫১. ঐ, ১৬৫-৬৮।
১৫২. ঐ, ১৬৯-৭০।
১৫৩. ঐ, ১৭৬-৭৭।
১৫৪. ঐ, ১৫৯-৬০।

নাটকসমূহে পরিলক্ষিত ক্রমবর্ধমান সামাজিক সচেতনতার মাঝে স্থান করে নিচ্ছিল। ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রবণতা সেসব অঞ্চলে যদিও ঢাকার তুলনায় অনেক বেশি প্রবল ছিল, তথাপি স্বল্পকিছু প্রগতিবাদী নাটকের মধ্য দিয়ে একটি ধনাত্মক বিকাশের ইঙ্গিত অনুভব করা যেতো। এসব নাটকের মধ্যে ছিল *বৈকুণ্ঠের খাতা* (নারায়ণগঞ্জ ১৯৫৫), *উল্কা* (দিনাজপুর, ১৯৫৭; রংপুর এবং রাজশাহী, ১৯৫৬), *ছেঁড়া তার* (রাজশাহী, ১৯৫৭) ইত্যাদি।[১৫৫] নাট্যকর্মীরা এসময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরব হয়ে উঠেন। তা হচ্ছে, তাঁরা এমন একটি স্থায়ী থিয়েটারভবন নির্মাণের দাবি উত্থাপন করেন, যা পূর্ব বাংলার জাতীয় নাট্যমঞ্চের অভাব পূরণে সক্ষম হবে। এই দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় ১৯৫৬ সাল নাগাদ। এটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল গঠন ও গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে সপ্তাহকালব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। অবশেষে সে বছরেই পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স সরকারি অর্থসাহায্যে ৮০০ আসনবিশিষ্ট একটি থিয়েটারভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।[১৫৬]

পূর্ববর্তী কালপর্বের সঙ্গে তুলনায় ১৯৫২-১৯৫৭ কালপর্বটি ছিল নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে, এমনকি নাট্যপ্রদর্শনরীতিতেও অভিনব অগ্রগতি সাধনের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। অধিকন্তু এসময়েই প্রতিষ্ঠালাভ করে 'ড্রামা সার্কেল' (১৯৫৬), যা গঠন করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি দল এবং এই দলটি স্থানীয় নাট্যকলায় আধুনিক পাশ্চাত্য কলাকৌশল প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা এসময়ে যেসব নাটক প্রদর্শন করে সেগুলোর মধ্যে দুটো ভাষান্তরিত বিদেশী নাটক *দ্য প্রটেক্টর অব ইসপাহান* (১৯৫৬), *ইয়্যু নেভার ক্যান টেল*[১৫৭] এবং *মানচিত্র* (১৯৫৭) উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী কালপর্বের অনিশ্চিত পরিস্থিতি এমন একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের পথ খুলে দেয়, যা নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য বয়ে আনে এবং অর্থবহ নাট্যাঙ্গন নির্মাণের জন্য ঢাকায় অদক্ষ হলেও অমিত প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠে।

৩. *১৯৫৮-১৯৬৭ : দমন ও প্রতিরোধ*

গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী বলে পরিচিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাট্যকর্মীরা সামাজিক সুবিচার ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে এতদিন সোচ্চার ছিল, ১৯৫৮ সনে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করে তাদের বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার

---

১৫৫. প্রাগুক্ত, ১৪৫-৪৮।

১৫৬. ঐ, ১৫২-৫৫।

১৫৭. হেদায়েত হোসেইন মোর্শেদ, "ড্রামা সার্কেল ঃ প্রসঙ্গকথা এবং একক বজলুল করিম", রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা,* (ঢাকা ১৯৮৬), ২১৭।

কার্যকরভাবে হরণ করা হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ইসলামীকরণ নীতির ভিত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার বিপরীতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনাতা এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য ও অর্থবহ প্রয়োজনের নিরিখে নাট্যকলার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এসময়ে জনপ্রিয় নাট্যকলার[১৫৯] সপক্ষে এবং মৌলবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কখনো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ক্ষীণ আহ্বান ধ্বনিত হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব আহ্বান ছিল বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত। পূর্ববর্তী কালপর্বে যাঁরা নাট্যাঙ্গনে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন নুরুল মোমেন, আশকার ইবনে শাঈখ, শওকত ওসমান প্রমুখ, তাঁরা সরকারি রাজনৈতিক দমননীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিরাপত্তার কারণে এসময়ে পালন করেন 'নিরপেক্ষ' বা 'চাতুর্যপূর্ণ' ভূমিকা। সর্বপ্রথম সংগঠিত ও কার্যকর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সূচনা ঘটে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাট্যজগতের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সাঈদ আহমদ ও ড্রামা-সার্কেল পূর্ব বাংলার নাট্যকলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ভাবচেতনা প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হন। এসময়ে একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণের পূর্বোক্ত দাবি ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করলেও তা আগের মতোই নিষ্ফল থেকে যায়।

অন্যান্য জেলাশহরের মতো ঢাকাতেও নাটক রচনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। জেলাশহরগুলোতে এসব নাটকের প্রদর্শনীসংখ্যাও ঢাকার মতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও সেসবের মধ্যে সেকেলে হয়ে পড়া পুরাণাশ্রিত ও ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। এসময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে বাংলা একাডেমী আয়োজিত একটি ছয়দিনব্যাপী সেমিনারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সনের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'ড্রামাটিক লিটারেচার এ্যান্ড থিয়েটার আর্টস্'। ১৯৬৪ সনে শেক্সপিয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজন করে *ভ্রান্তিবিলাস* নাটক (শেক্সপিয়রের *কমেডি অব এররস্* অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত গদ্যানুবাদ অনুসরণ করে এর নাট্যরূপ দেন রামেন্দু মজুমদার এবং তা পরিচালনা করেন মুনীর চৌধুরী)। একই বছর একাডেমী আরো একটি উল্লেখযোগ্য নাটক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে আর তা ছিল মধুসূদনের *কৃষ্ণকুমারী*[১৬০]। এসময়ে ঢাকার গুটিকয়েক মাত্র পেশাদার নাট্যদলের মধ্যে 'থিয়েটার' ছিল অন্যতম। ১৯৫৭ সনে একজন ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে এটি ১৯৬৪ সন পর্যন্ত এর কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে।[১৬১] কিন্তু ড্রামা সার্কেল ছাড়া '৪৭-পরবর্তী বাংলা থিয়েটার সম্পর্কিত কোন

১৫৯. কালিপদ দাস, "পূর্ব পাকিস্তান গণনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গ", *দৈনিক সংবাদ,* জানুয়ারি ২১, ১৯৬৫; উদ্ধৃত সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা,* ২৫৫।

১৬০. সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা,* ২৪৮-৫০, ২৫৯।

১৬১. আশকার ইবনে শাঈখ, *বাংলা মঞ্চনাট্যের পশ্চাৎভূমি,* (ঢাকা ১৯৮৬), ৯৭।

মুল্যায়নই সম্পূর্ণ হবে না। এই নাট্যদলটি প্রবর্তন করে আধুনিক মঞ্চসজ্জার ধারণা, যা বিভিন্ন নাট্যনির্মাণোপকরণের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংশ্লেষণ ঘটায়। সামগ্রিক অভিনয়কলা, নাট্যকলার অঙ্গীভূত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ এবং 'সাইক্লোরামা'র কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আদর্শ ত্রিমাত্রিক মঞ্চবিন্যাস গঠন ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ড্রামা সার্কেলের আধুনিক পাশ্চাত্যপ্রভাবিত নাট্যচর্চার স্বাক্ষর বহন করে। এই কালপর্বে ড্রামা সার্কেল যেসব নাটক নির্মাণ ও প্রদর্শন করে সেগুলো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* (১৯৫৮), *তাসের দেশে* এবং *রাজা ও রানী* (১৯৬১); সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর *বহিপীর* (১৯৬১); সাঈদ আহমদের *কালবেলা* (১৯৬২); সফোক্লিসের *ইডিপাস রেক্স'র* (১৯৬২) অনুবাদ; বার্নার্ড শ'র *আর্মস এ্যান্ড দ্য ম্যান* (১৯৬৩) এবং মিলারের *অল মাই সানস্* অবলম্বনে লিখিত নাটক (১৯৫৯)। এই নাট্যদলটির সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে আছে তিনি হচ্ছেন বজলুল করিম (মৃ. ১৯৭৭)। দলের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি এর নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব পালনে যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তা আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে।[১৬২]

এসময়ের প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) অন্যতম। তিনি তাঁর নাটকে ইউরোপকেন্দ্রিক শৈল্পিক ভাবচেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির এক সাফল্যজনক প্রয়োগ ঘটান, যা বাংলা নাট্যকলা ইতিপূর্বে আর কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। সচরাচর 'প্রতীকবাদ' নামে আখ্যায়িত তাঁর এই রীতি কিন্তু বস্তুসংযোগ অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতীকবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, কারণ তাঁর প্রতীকবাদে আছে প্রবল বস্তুআসক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি। তাঁর একাঙ্কিকা *বহিপীর* স্বল্পসংখ্যক নিটোল ও বহুমাত্রিক চরিত্রের দ্বারা চিত্রিত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণী ও নবোত্থিত পুঁজিপতি শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যকার মূল্যবোধের চরম সংঘাতময় সম্পর্ক তুলে ধরে : দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে আমেনা নাম্নী একজন বোবা রমণী কর্তৃক স্বীয় স্বামী ও সন্তান হত্যার কাহিনী নিয়ে লিখিত ওয়ালিউল্লাহর আরেকটি নাটক হচ্ছে *তরঙ্গভঙ্গ*। এখানে আমেনার আভ্যন্তর মনস্তত্ত্ব ও নিগূঢ় সামাজিক বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ত্রি-চরিত্রবিশিষ্ট *উজানে মৃত্যু*-র নায়ক একজন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও জীবনযুদ্ধে পরাজিত নৌকাচালক। এর অপর দুই চরিত্র হচ্ছে শ্বেতশুভ্র বসন পরিহিত 'সত্য' এবং কালো আলখাল্লাধারী 'মিথ্যা'। এই ছোট্ট রূপকধর্মী নাটকে উক্ত নৌকাচালকের আত্মার উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্য ও মিথ্যার নিরন্তর লড়াই দেখানো হয়েছে। নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর প্রদর্শিত সকল নাটকেই মঞ্চপরিকল্পনায় তিনি নির্ভেজাল, মৌলিক ও অগতানুগতিক চিন্তাধারার স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।[১৬৩]

---

১৬২. হেদায়েত হোসেইন মোর্শেদ, "ড্রামা সার্কেল", ২১৪-১৭।

১৬৩. ঐ, ১৭৫-৮৩।

এই উপমহাদেশের নাট্যকলার ইতিহাসে 'এ্যাবসার্ড নাটক' প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সাঈদ আহমেদের (জন্ম ১৯৩১) *কালবেলা* (১৯৬৬) নাটকটি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর সংঘটিত ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনাকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে লেখক ঘূর্ণিঝড়ের নিবিড় অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন কার্যকরভাবে গড়ে তোলেন এক বিমূর্ত জগত, যেখানে ঘূর্ণিঝড় নিজেই হয়ে উঠে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র।[১৬৪] এই সময়কালে অপর নাট্যকার মুনীর চৌধুরী যেসব নাটক রচনা করেন সেগুলো হচ্ছে—যুদ্ধবিরোধী ঐতিহাসিক *রক্তাক্ত প্রান্তর* (যেখানে জাতীয় অন্তরাত্মার চেয়ে বরং দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে ব্যক্তিসত্তার মর্মমূলে); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির পটভূমিতে রচিত পূর্ণদৈর্ঘ্য কমেডি *চিঠি*; ক্যাম্পাসজীবন অবলম্বনে রচিত কৌতুকনাট্য *মর্মান্তিক* এবং তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটকের একটি সঙ্কলন *দণ্ডকারণ্য*।[১৬৫] আশকার ইবনে শাইখও এসময়ে অনবরত লিখে গেছেন। তাঁর *অগ্নিগিরি* ও *রক্তপদ্ম* দুটি ঐতিহাসিক নাটক। কয়েকটি সামাজিক নাটকের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন নিয়ে লিখা *অনুবর্তন*, জেলে সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামভিত্তিক *বিল বাওড়ের ঢেউ* এবং গ্রামীণ পটভূমিতে নীতিকথামূলক *এপার ওপার* উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ১৯৫৭ সালে বৃটিশ ভারতে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘটিত সিপাহি বিদ্রোহের চেতনাকে সেসময়ে পূর্ব বাংলায় চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টায় তিনি লিখেন *অনেক তারার হাতছানি*।[১৬৬] এ পর্যায়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন আলাউদ্দীন-আল-আজাদ (*মরক্কোর যাদুকর, ঈহুদীর মেয়ে, মায়াবী প্রহর, ধন্যবাদ*); আজিমুদ্দীন আহমেদ (*মা, অহঙ্কার, কাঞ্চন*); নুরুল মোমেন (*যদি অমন হতো, আলোছায়া, নয়া খান্দান, আইনের অন্তরালে*); আনিস চৌধুরী (*এ্যালবাম*); বজলুর রশীদ (*উত্তর ফাল্গুনী, শীলা ও শৈলী, সুর ও ছন্দ*); সিকান্দার আবু জাফর (*সিরাজউদ্দৌলা, মহাকবি আলাওল, মাকড়শা, শকুন্ত উপাখ্যান*); রাজিয়া খান (*আবর্ত*) এবং লায়লা সামাদ (*বিচিত্রা*)। স্থানীয় উপাদান-উপকরণকে নাটকের সঙ্গে যুক্ত করার পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক দুটি ব্যতিক্রমধর্মী নাটক হচ্ছে ফররুখ আহেমেদের *নওফেল ও হাতেম* এবং বজলুর রশীদের *ধনুয়া গাঙ্গের তীরে*। প্রথমটি একটি ত্রি-অঙ্কবিশিষ্ট নাটক, যার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে গ্রামবাংলায় বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় পুঁথি সাহিত্য থেকে। অন্যটির কাহিনী নেয়া হয়েছে *ময়মনসিংহ গীতিকা* হতে। এ দুটির মধ্যে *নওফেল ও হাতেম* প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৬১ সালে এবং সমালোচকদের কাছ থেকে লাভ করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা।

---

১৬৪. ঐ, ৩১১-১৪।

১৬৫. প্রাগুক্ত, ২৮৪-৮৮।

১৬৬. ঐ, ২৬০-৬৬।

৪. ১৯৬৮-১৯৭১ : *বিস্ফোরণ*

দীর্ঘ এক দশকেরও অধিক কালব্যাপী পাকিস্তানী মৌলবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনমূলক শাসনের পর ১৯৬৮ সনের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ও '৭৯-এর গণঅভ্যুত্থান এই দুটি রাজনৈতিক ঘটনা একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনকে আরো ঘনীভূত করে তোলে, যা চূড়ান্তভাবে ১৯৭১ সনে এসে বাঙালির রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাসংগ্রামে পর্যবসিত হয়। এই কালপর্বে নাট্যচর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে—ক্রমবর্ধমান হারে নাট্যকর্মীদের জনসম্পৃক্তি অর্জন এবং তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরে বর্ধিত সংখ্যায় উচ্চ শিল্পমানসম্পন্ন নাটক রচনার পরিবর্তে বর্ধিত সংখ্যায় নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের বিক্ষুব্ধ দিনগুলোয় জনতা ও নাট্যকর্মীদের সম্পৃক্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, দেশের অন্যান্য শহরসহ সমগ্র ঢাকা নগরী শিল্পী-জনতার ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি তৎপরতায় প্রকম্পিত হয়ে উঠে। সর্বত্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় রচিত পথনাটক ও উন্মুক্ত প্রদর্শনীসমূহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এসব নাটকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : ১৯৬৮ সনে 'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী' প্রযোজিত গোর্কীর *মা* এবং জন রীডের *টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড* অবলম্বনে একটি ছায়া-নাটক; ১৯৭১ সনে উদিচী আয়োজিত দুটি নাটক *শপথ নিলাম* ও *রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্যে*; ১৯৭১ সনে 'পারাপার' আয়োজিত পোস্টার এবং একই সনে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' আয়োজিত *ভোরের স্বপ্ন*।[১৬৭] একদফা দাবিতে '৭১-এর মার্চ মাসের দিনগুলোতে জনগণের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সরকারি প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণভার নিজ হাতে তুলে নেয়। এ সময়ে বাঙালি শিল্পীগণও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত রেডিও ও টেলিভিশনকেন্দ্রসমূহের অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৬৮] এই সময়কার রাজনীতিতাড়িত নাটকগুলো অধিকাংশই সংক্ষুব্ধ ও স্থূল প্রকৃতির হলেও এবং এসবের মধ্যে শৈল্পিক উৎকর্ষের ঘাটতি থাকলেও সময়ের দাবি পূরণে তা পালন করে প্রত্যাশিত ভূমিকা। কেবল জনগণের হৃৎস্পন্দন অনুভবই নয়, নাট্যশিল্পীগণ এসময় অর্জন করেছিলেন সেই স্পর্ধা, যা তাদেরকে দমন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করে। একটি স্বাধীন ও সুখী সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাঙালি জনগণের মধ্যে যে বিপুল আবেগ-উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল নাট্যকলা তখন সহজেই এর শিখরে আরোহণে সক্ষম হয়।

নাট্য-ইতিহাসের এই পর্বে সাঈদ আহমেদ বিশিষ্ট হয়ে আছেন *মাইলপোস্ট* ও *তৃষ্ণায়* নামক তাঁর দুটো নিরীক্ষাধর্মী নাটকের জন্য। *মাইলপোস্ট*-এ নাট্যকার এক অযৌক্তিক

---

১৬৭. প্রাগুক্ত, ৩৬৬-৭২।

১৬৮. ঐ, ৩৭১-৭২।

ও অসমঞ্জস বিশ্বব্যবস্থার অধীনে মানবাত্মার ক্ষুধাকে রূপদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর অপর নাটক *তৃষ্ণায়* বৈশিষ্ট্যে রূপকধর্মী এবং এতে মানবসত্তার অস্তিত্বের সঙ্কট ও উদ্বর্তনকে উপস্থাপন করতে নাট্যকার একটি সুপরিচিত লোককাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। জিয়া হায়দারের আরেকটি নিরীক্ষাধর্মী নাটক *শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* সমসাময়িক নাট্যকলায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মানবসমাজে বিদ্যমান শান্তি সম্পর্কিত মিথকে নাট্যকার তাঁর এই প্রতীকধর্মী নাটকের মধ্য দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে মুনীর চৌধুরী এসময়ে প্রকাশ করেন তাঁর ছয়টি স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটক সমবায়ে গঠিত নাট্যসঙ্কলন *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য*। তাঁর তীক্ষ্ণ কিন্তু সূক্ষ্ম রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সুশীল রসিকতা এসব নাটকে নিহিত সংক্ষিপ্ত সমাজনিরীক্ষণকে দান করে এক ব্যতিক্রমী উৎকর্ষ। উক্ত নাট্যসঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত একটি নাটক *ফিট কালাম*-এ দেখা যায় একজন বোরকাপরিহিত ব্যক্তিকে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ নিষিদ্ধ গোপন রাজনৈতিক দলের কর্মী সন্দেহে আটক করে। নাটকের শেষে আটক ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেলেও তার প্রকৃত পরিচয় কি সে রহস্য কখনো উন্মোচন করা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাট্যকার কার্যকরভাবে এ ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনমূলক চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করার উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করে নেন। শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদারের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত *ক্রীতদাসের হাসি* এ সময়ের আরেকটি প্রধান নাট্যকর্ম। এতে নির্যাতিত মানুষের তিক্ত প্রতিবাদের এক রূপক-কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকারদ্বয় এই মর্মবাণী উপস্থাপন করেন যে, ঐশ্বর্য দাস ক্রয় করতে পারে বটে, তবে তা কখনো ক্রীতদাসের হাসিটুকু কিনতে সক্ষম নয়। এই কালপর্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন : আশকার ইবনে শাইখ (*লালন ফকির, প্রচ্ছদপট*); নুরুল মোমেন (*শতকরা আশি, যেমন ইচ্ছা তেমন, রূপরেখা, হোসেইন সফদারের উইল*) এবং বজলুর রশীদ (*একে একে এক, ধান কমল, রূপান্তর*)।[১৬৯]

এতক্ষণ আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দ্বারা আমরা বাংলা নাট্যকলার বিবর্তনের ধারা অনুসরণের চেষ্টা করেছি। নাট্যকলা আজ বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে দুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা সহকারে বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের শহুরে নাট্যকর্মীগণও নাট্যকলায় বাংলার স্থানীয় উপাদানসমূহ সন্নিবেশনের জন্য বিভিন্নভাবে পরীক্ষাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনি এক উদ্দীপনাময় পরিস্থিতিতে আমরা আজ গর্বভরে উদ্‌যাপন করি নাট্যকলায় আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে এবং স্বীকার করে নিই সেইসব আন্তঃসাংস্কৃতিক উপাদানের সম্পৃক্তি, যা আমাদের শিল্পকলাকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত ও সমৃদ্ধ করেছে।

---

১৬৯. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন সুকুমার বিশ্বাস, *নাট্যচর্চা*, ৩৮২-৯৮।

১৬

স্থাপত্য ও চিত্রকলা

পারভীন হাসান*

আবহমানকাল থেকে বাংলার চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্প শাসকশ্রেণীর ধীকল্প (idea), রুচি-অভিরুচি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব এই যে বিদেশী শাসকশ্রেণীর স্থাপত্য ও চিত্রকলা এতে এমনভাবে সমন্বিত হয়েছে যেন তা এদেশের বদ্বীপ পরিবেশ ও মৌসুমি আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। দেখা যায় যে, ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আগত প্রতিটি শাসকশ্রেণী এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রচলিত শিল্পরীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। তুর্কী, আফগান, মুগল, ইংরেজ সবাই তাদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে বঙ্গীয় শিল্পকলায় অবদান রেখেছে। এদের অবদানের একটি কালক্রমিক বিবরণ দেয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। মসজিদ, দরগাহ, মন্দির, ঐহিক (secular) ইমারত ও অন্যান্য স্থাপত্য কাঠামোসমূহের শতাব্দীওয়ারি বিবরণ দেয়া হয়েছে এজন্য যে আমাদের ধারণা, এর ফলে বাংলার স্থাপত্য ও চিত্রকলাশিল্পের বিকাশধারা নির্ণয় অধিকতর সুবিধাজনক হবে।

স্থাপত্য

আঠারো শতক : মসজিদ ও দরগাহ

খৃস্টীয় সতেরো শতকের প্রারম্ভে বাংলায় মুগল শাসন সুসংহত হওয়ার সময় থেকে এ ভূখণ্ডের, বিশেষভাবে রাজধানী ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থাপত্য দিল্লীর রাজকীয় ঐতিহ্যের অনুকরণে রূপায়িত হতে থাকে। ফলে এ অঞ্চলের প্রাক-মুগল যুগের স্থাপত্যের প্রকট আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বেশ খানিকটা হারিয়ে যায়। প্রাক-মুগল যুগের ইষ্টকনির্মিত ইমারতগুলো ছিল ভারিক্কিভাবের; এগুলোর অপ্রলিপ্ত বহির্গাত্র ছিল পোড়ামাটির ফলকে

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অলঙ্কৃত; ছাদ ও কার্নিস ছিল গ্রামীণ কুটিরের খড়ের চালের অনুকরণে বক্রাকৃতি; খিলানগুলো ছিল সূক্ষ্মাগ্র ও গম্বুজগুলো অনুচ্চ স্কন্ধযুক্ত অর্ধগোলাকৃতির। অল্প ক'বছরের কথা বাদ দিলে পুরো সতেরো শতক ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী থাকাকালে এখানে একটি বিশিষ্ট মুগল আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতি বিকাশ লাভ করে। পূর্ববর্তী কয়েক শতক ধরে প্রচলিত পোড়ামাটির অলঙ্করণের স্থলে ইমারতগাত্র প্রলেপসজ্জিত হয়, আর অলঙ্করণের কৌশল হিসেবে কুলুঙ্গি ও লতাপাতাপুষ্পের অনুকৃতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। অভ্যন্তরস্থল আচ্ছাদনের জন্য বিভিন্ন রকমের ভল্ট (বক্রাকৃতির ছাদ) প্রচলিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আড়াআড়ি সংস্থাপিত অগভীর কৌণিক ভল্ট বা বক্র কার্নিসের সমতল ছাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রকমারি প্রলিপ্ত পৃষ্ঠতল দ্বারা অলঙ্কৃত গম্বুজের ঠেকনো তৈরি হয়।

আঠারো শতকের শুরুতেই বাংলা ও উড়িষ্যার দীউয়ান হিসেবে মুহম্মদ হাদী কারতলব খান বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁকে 'মুর্শিদকুলী খান' উপাধিতে ভূষিত করা হলে এরপর থেকে তিনি সাধারণ্যে এই নামেই পরিচিত হন। আঠারো শতকের শুরুতে ঢাকায় দুটি মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী শতকে বিকশিত বাংলার পরিণত মুগল স্থাপত্যের মহান ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। এর একটি বেগম বাজারে কারতলব খানের মসজিদ যা মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক তাঁর ঢাকায় অবস্থানকালে (১৭০০-১৭০৩ খৃস্টাব্দে) নির্মিত বলে কথিত, এবং অন্যটি লালবাগে অবস্থিত খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ, যা শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৭০৪ খৃস্টাব্দে নির্মিত (যথাক্রমে ছবি নং ১ ও ২)।

সুলতানি আমলে অপরিবেষ্টিত আঙিনাসহ মসজিদ নির্মাণের প্রচলিত ধারা অব্যাহত থাকে। উল্লিখিত দুটি মসজিদের উঁচু চত্বরের চারদিকে বক্রাকৃতির ছাদযুক্ত কক্ষগুলো দোকান অথবা মাদ্রাসাছাত্রদের পাঠশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। প্রথাগতভাবে এগুলো পোড়া ইট দিয়ে তৈরি; গাঁথুনীতে সুরকি হিসেবে ব্যবহৃত হয় গুঁড়ো ইট ও চুন, যা সচরাচর শামুকখোল থেকে প্রস্তুত। পরিকল্পনার দিক দিয়ে এই মসজিদগুলো প্রচলিত মুগল স্থাপত্য আদলের আওতায় পড়ে। এগুলো একক আইলবিশিষ্ট ও বহুপত্র সম্বলিত (laterel) পার্শ্বিক খিলান দ্বারা একাধিক বে (bay)-তে বিভক্ত। কারতলব খানের মসজিদটি পাঁচ বে-বিশিষ্ট আর মৃধার মসজিদ তিন বে-বিশিষ্ট। এগুলোর প্রাচীর প্রলেপযুক্ত ও বহির্দেশ আয়তাকার প্যানেলের প্রয়োগে মূর্তিমান। অন্যান্য মুগল লক্ষণাদির মধ্যে এগুলোতে রয়েছে সোজা কার্নিস, গম্বুজে মারলন (merlon: ছাদের কিনারে সংগামার্থে তৈরি উঁচু অংশবিশেষের আদলে তৈরি নক্সা) শোভিত পিপা এবং পদ্ম ও কলসখচিত চূড়া, কুলুঙ্গি অন্তর্ভুক্ত প্রবেশপথ, চৌকেন্দ্রিক খিলান, দেয়ালে সংযুক্ত সরু স্তম্ভ ও চাঁদোয়া (kiosk : ছত্রী)।

কারতলব খানের মসজিদের উত্তরভাগে সংযুক্ত রয়েছে ঝুঁকানো ছাঁইচযুক্ত ইট নির্মিত দোচালা ছাদের একটি কক্ষ। গ্রামীণ দোচালা ঘরের ছাদের চাল দু'টি শীর্ষের সঙ্গমরেখা

(আলি) থেকে দু'পাশে ঢালু হতে হতে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকে এবং প্রান্ত দু'টি সচরাচর বক্র হয়। বক্র আলি ও ছাঁইচের ফলে ছাদটি দেখতে কুঁজাকৃতি বলে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেকটি চাল বাঁশের কাঠামোতে নলখাগড়া অথবা জাফরিকর্ম দিয়ে ভরাট করে তৈরি করা হয়। চারচালা ঘরের চাল শীর্ষ আলি থেকে চতুর্দিকে ঢালু হয়। মুগল স্থাপত্যে এরকম ছাদযুক্ত কক্ষের ব্যবহার সিংহপ্রবেশদ্বারেও পরিদৃষ্ট হয়। অন্যদিকে রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় এগুলো পোড়ামাটির অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে স্থানীয় পীরদের দরগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত মুসা খানের মসজিদও চতুর্দিকে কক্ষ পরিবেষ্টিত ও সুউচ্চ ভিতের উপর নির্মিত এবং নির্মাণকালের বিচারে এটিকে অষ্টাদশ শতকে ফেলা যায়। মসজিদমঞ্চে আরোহণের সিঁড়িটি দক্ষিণ দেয়ালে সংস্থাপিত এবং মসজিদের সামনে রয়েছে একটি উন্মুক্ত চত্বর।

আঠারো শতকের বেশ কিছু সংখ্যক মসজিদ সমূলে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সেখানে নতুন বৃহদায়তন বহুতল মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পুনর্নির্মাণ সত্ত্বেও যেসব মসজিদে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আংশিকভাবে অক্ষুণ্ন রয়েছে, সেগুলো আঠারো শতকের প্রথমার্ধের এবং সেগুলো প্রায়ই তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ, যার মধ্যগম্বুজটি দু'টি পার্শ্বগম্বুজের চেয়ে বৃহত্তর। অভ্যন্তরে বে-গুলো বহুপত্র সম্বলিত পার্শ্বিক খিলান দ্বারা আলাদা করা হয়েছে। দেয়াল ও গম্বুজের ক্রান্তিস্থলগুলো পরিস্ফুট করা হয়েছে ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভোপরি বহুপত্র খিলানসারি অথবা ক্ষুদ্র স্কুইঞ্চের উপর মারলনসারি ব্যবহারের সাহায্যে।

এসব মসজিদের কয়েকটির নির্মাণকাল শিলালিপি দ্বারা নির্ধারিত, যেমন ঢাকা বোর্ড কার্যালয়ের অদূরে বক্শীবাজারস্থ খাজা দেওয়ানের মসজিদ (১৭০৪-০৫) এবং নিউ মার্কেটের অদূরে বলাকা প্রেক্ষাগৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মনিয়ম-সালেহার মসজিদ (১৭০৬)। ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত তারা বা সিতারা মসজিদ বাংলাদেশের সর্বাধিক অলঙ্করণসমৃদ্ধ মসজিদ। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এ মসজিদের পূর্বদিকে একটি বারান্দা নির্মাণ করান, এবং সমগ্র মসজিদটিকে বিদেশী চীনামাটির টাইল ও স্থানীয়ভাবে 'চিনি-টিক্রী' নামে পরিচিত চীনামাটির খণ্ডাংশযোগে তৈরি মোজাইক দিয়ে আচ্ছাদিত করান। স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার প্রাঙ্গণে অবস্থিত আজিমপুর এতিমখানা মসজিদ (১৭০৫-০৬) ও আজিমপুর দায়রা শরিফ মসজিদ উভয়ই এক-গম্বুজবিশিষ্ট।

নিশ্চিতরূপে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত এবং কিছু কিছু মুগল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে টিকে থাকা যেসব মসজিদ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে সোনারগাঁও-এর গোয়ালদিতে অবস্থিত আবদুল হামিদের মসজিদ (১৭০৫-০৬), কিশোরগঞ্জের বোকাইনগর কেল্লা মসজিদ (১৭০৫),

মহাস্থানে অবস্থিত শাহ সুলতান মাহী সওয়ারের দরগাহ-মসজিদ (১৭১৮) নোয়াখালীর বাজরা মসজিদ (১৭৪১) এবং দিনাজপুরের পাকের-হাটের অদূরে অবস্থিত লাল বেগের মসজিদ (১৭৫৮-৫৯)।

১৭০৩ সালে মুর্শিদকুলী খান ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এ নগরী বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেশমব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খানকে মকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ নামকরণের অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৭১৭ সালের দিকে বাদশাহ ফররুখশিয়র ইংরেজদেরকে যখন ফরমান মঞ্জুর করেন, মুর্শিদকুলী খান তখন দীউয়ান ও সুবাদার উভয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আর সে সুবাদে মুর্শিদাবাদও বাংলার সর্বশেষ মুগল রাজধানীতে পরিণত হয়।

স্বীয় রাজধানী মুর্শিদাবাদকে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদকুলী খান যেসব ইমারত নির্মাণ করেন সেগুলোর মধ্যে অদ্যাবধি টিকে থাকা সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইমারত হচ্ছে জামি মসজিদ, যা 'কাটরা মসজিদ' নামেও পরিচিত। শিলালিপির তারিখ অনুযায়ী এটি ১৭২৪-২৫ সালে নির্মিত (ছবি ৩)। বাংলায় নির্মিত মুগল মসজিদগুলোর মধ্যে এটিই বৃহত্তম এবং এতে নির্মাতার ধর্মপরায়ণতা ও শক্তিমত্তার প্রকট বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে অবলুপ্ত এ মসজিদটি ৫৪ বর্গমিটার মাপের একটি উঁচু ভিতের উপর নির্মিত হয়।[১] এটির একক আইল ও পাঁচ বে-বিশিষ্ট পরিকল্পনাটি ইতিপূর্বে ঢাকায় বিকশিত মুগল রীতিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে এর অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের প্রবেশদ্বারের খিলান ও বহির্গাত্রের অলঙ্করণশৈলী ভারিক্কি ভাবের ইঙ্গিতবহ, যা প্রাক-মুগল যুগের স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ ১৫৩৫ সালে গৌড়ে নির্মিত জাহানিয়া মসজিদের উল্লেখ করা যায়। এর বহুপত্র সম্বলিত খিলানের গোলাকার গঠন আদি ইউরোপীয় প্রভাব হয়তো নির্দেশ করে। মুগল রীতি থেকে এটির যে বিচ্যুতি তাতে বাস্তব ক্ষেত্রে নিযামতের স্বাধীন প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। 'সুবাদার' পদবিধারী হলেও মুর্শিদকুলী খান প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনই ছিলেন, কারণ আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের গৃহবিবাদের ফলে দিল্লীর মুগল শক্তির অবক্ষয় সূচিত হয়। মসজিদটির চতুর্দিকেই রয়েছে গম্বুজাচ্ছাদিত দ্বিতল কক্ষাদি, যা সম্ভবত একটি মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যু হলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় বৃহৎ আঙিনার প্রবেশতোরণের অভ্যন্তরস্থ সমাধিগাহে। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজবংশ ইলিয়াসশাহী বংশের শাসক সুলতান সিকান্দার শাহের সমাধির কথা। জনশ্রুতি আছে, সিকান্দর শাহ ১৩৭৪-৭৫ সালে পাণ্ডুয়ায় তাঁরই নির্মিত আদিনা মসজিদের

১. Catherine Asher, "Inventory of Key Movements" in George Michell (ed.),*The Islamic Heritage of Bengal* (UNESCO, Paris 1984), 37-140.

প্রবেশদ্বারের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ হন। মুর্শিদকুলী খানের দৃষ্টান্তের অনুকরণে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা উভয়কেও তাঁদেরই নির্মিত মসজিদগুলোর প্রবেশদ্বারের নিচে কবরস্থ করা হয়।

জামি মসজিদের উল্টোদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রয়েছে মুর্শিদকুলী খানের জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব শুজাউদ্দীনের সমাধিক্ষেত্র। এ স্থানে ১৭৪৩ সালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন নবাব আলিবর্দী খান, যিনি শুজা-আল-দীনের পুত্রকে হত্যা করে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। প্রধান প্রবেশপথের উভয়দিকে নিমগ্ন স্তম্ভরাজিযুক্ত ও তিন বে-বিশিষ্ট এ আয়তাকার মসজিদটিতে ঢাকার সুবিদিত মুগল নির্মাণশৈলীর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে, যা আলিবর্দী খানের কর্তৃত্বের মূল আধার মুগল রাজশক্তির প্রতি তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি বহন করে। সদর দেয়ালে মুখ্য প্রবেশদ্বারের ঊর্ধ্বে সংযুক্ত স্তম্ভসারির উপর সংস্থাপিত একটি দোচালা ছাদের নক্সা এবং পাশ্ববর্তী প্রবেশদ্বারগুলোর উপর চৌচালার নক্সা রয়েছে। এরই সাথে সঙ্গতি রেখে মধ্যগম্বুজের উভয় দিকে রয়েছে চৌচালা ধনুকাকৃতির ছাদ (ভল্ট)। পশ্চিম প্রাচীরে উদ্‌গত দোচালা মিহরাব প্রথম এ মসজিদেই পরিদৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদে আঠারো শতকের আরো কয়েকটি মসজিদেও এ অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আলিবর্দী খানের খোশবাগস্থ সমাধিসৌধের আভ্যন্তর পরিকল্পনা ঢাকার লালবাগের পরীবিবির সমাধিসৌধের একটি সাদামাটা রূপ বলে প্রতীয়মান হয়। আর এটির চতুষ্পার্শ্বস্থ বারান্দা নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়মের সমাধিসৌধের বারান্দারই অনুরূপ।

১৭৫৬-৫৭ সালে শাসনরত নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত ইমামবাড়ার একমাত্র টিকে থাকা অংশ 'মদিনা' এক অনুপম ধর্মীয় ইমারত এবং এতে নবাবদের শিয়া মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। জনশ্রুতি মতে একক গম্বুজবিশিষ্ট এই বর্গাকার ইমারতের ভিত ইরাকের কারবালা থেকে আনীত মৃত্তিকা দিয়ে ভরাট করা হয়। মহানবীর দৌহিত্র হোসেনের শাহাদৎস্থলের সাথে এর এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে শিয়া কর্তৃত্বের এক আদি উৎসের সাথে মুর্শিদাবাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

মুর্শিদাবাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মসজিদটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চক মসজিদ (ছবি ৪)। নবাব মীর জাফরের স্ত্রী মুন্নি বেগম কর্তৃক ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে শেখ খলিলুল্লাহর তত্ত্বাবধানে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। সাত বে-বিশিষ্ট এ মসজিদে রয়েছে পাঁচটি ক্রমঃপ্রসারমান গম্বুজ ও দু'টি চারচালা প্রান্তিক ভল্ট। সামনের বৃহৎ ঘেরা সাহনের চারদিকের কক্ষগুলো একটি মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অন্তঃখচিত (pietra-dura) প্রস্তর অলঙ্করণের ফলে এর শিলালিপিটি অনুপম রূপ পেয়েছে, কারণ অন্যসব শিলালিপির বেশিরভাগই কালো পাথরে উৎকীর্ণ। জাঁকালো পূর্ব প্রাচীরের প্রবেশদ্বারের গোলাকৃতি খিলানগুলো পাখা-নকশাসজ্জিত বহুপত্র সম্বলিত খিলানবিশিষ্ট কুলুঙ্গিতে সংস্থাপিত বলে এতে ইউরোপীয় প্রভাব লক্ষণীয়। এটি নির্মিত হয় মুর্শিদকুলী খানেরই প্রশাসনিক

কেন্দ্রস্থলে। সম্ভবত তাঁর পুনরুজ্জীবিত কর্তৃত্বের এটি একটি অক্ষম বহিঃপ্রকাশ। এ সময়ে বাংলার প্রকৃত ক্ষমতা বৃটিশের হাতে চলে যায়, আর এ ঘটনার প্রভাব শুধু কিছু স্থাপত্যিক উপাদানেই সীমিত থাকে নি, বরং এ ইমারতে লক্ষণীয় সার্বিক সংযমপ্রবণতায়ও তা বিধৃত।

মহানবীর পদছাপ সম্বলিত একটি দরগাহের নামানুসারে অভিহিত 'কদম শরিফ ইমারত' প্রকল্পের মধ্যে নির্মাণতারিখযুক্ত সর্বপ্রথম ইমারত হলো এর মসজিদটি। মীর জাফরের প্রধান খোজা খান-ই-আলা ইতওয়ার আলি খান কর্তৃক ১৭৮০ সালে এটি নির্মিত হয়। তিন বে-বিশিষ্ট একটি গতানুগতিক মসজিদ হলেও গম্বুজের অভিনব গঠনশৈলীর জন্য এটি অনন্য। এর গম্বুজগুলো শিরাল ও অতিশয় সঙ্কুচিত স্কন্ধবিশিষ্ট বলে দেখতে এগুলো কন্দাকার। বেশ আগে বিজাপুর ও দিল্লীতে দেখা গেলেও পূর্ব ভারতে এ আকৃতির গম্বুজের আবির্ভাবের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত (ছবি ৫)। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ঢাকার লালবাগ দুর্গের সতেরো শতকের মসজিদটির গম্বুজ ও শিরাল এবং পার্শ্বস্থিত গম্বুজগুলোও সঙ্কুচিত অবয়বের। এতে বোঝা যায় যে, ১৭৮০ সালে লালবাগ মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিটি সম্ভবত এর গম্বুজ নির্মাণের সূত্রেই উৎকীর্ণ।

মহানবীর পদছাপ সম্বলিত দরগাহটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৮৮ সালে। অনুচ্চ এ ইমারতের দক্ষিণ দিকে পাঁচটি খিলানবিশিষ্ট দ্বার রয়েছে, আর এর একহারা সমতল ছাদে সংযোজিত হয়েছে একটি কন্দাকৃতি গম্বুজ। এটির আভ্যন্তর পরিকল্পনাও গৌড়ীয় কদম রসুলেরই প্রায় অনুরূপ, এবং সেখান থেকেই পদছাপটি সরিয়ে আনা হয়েছিল। জনশ্রুতি মতে, পদছাপটি আরব দেশ থেকে আনয়ন করে প্রথমে পাণ্ডুয়ার মসজিদে সংস্থাপিত হয় ও পরে হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। সরকারি দপ্তরাদি কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে মহানবীর এ পদছাপটিকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেয়ার ঘটনাটি এ নগরীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের অবক্ষয়ের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সম্ভবত এর ধর্মীয় মর্যাদাকে উন্নীত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত।

মনে হয় এ ধরনের আরো কতিপয় দরগাহ আঠারো শতকে সারা বাংলা জুড়ে নির্মিত হয়। এগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ ইয়াসিন কর্তৃক ১৭১৮ সালে চট্টগ্রামে নির্মিত কদম-ই-মুবারক মসজিদ অন্যতম। রহমতগঞ্জের রসুলনগরে অবস্থিত এ মসজিদটি আঠারো শতকের চট্টগ্রামের একটি অতিশয় সুরক্ষিত ইমারত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ ইমারতের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে সংযুক্ত কক্ষাদি। বিশ্বাস করা হয় যে, উত্তর পার্শ্বের কক্ষে মহানবীর পদছাপটি রয়েছে, আর দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষে আছে কাদেরিয়া সুফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদির জিলানীর (মৃঃ ১১৬৬) পদছাপ, যাঁকে শ্রদ্ধাভরে 'গাউস-ই-পাক' সম্বোধনে স্মরণ করা হয়। ইমারতটি নির্মিত সায়াহ্নকালীন মুগল রীতিতে।

আরেকটি কদম রসুল ইমারত রয়েছে লক্ষ্যানদীর পূর্ব তীরে নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে অবস্থিত নবীগঞ্জে। মির্জা নাথানের মতে, রসুলের এ পদছাপটি বণিকদের কাছ

থেকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করেছিলেন মাসুম খান কাবুলী, যিনি ১৫৮০ সালে মুগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলার শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন। পদছাপটি ক্রয় ও পরে দরগাহে সংস্থাপনকে গণসমর্থনলাভ ও বৈধতা অর্জনের লক্ষ্যে মাসুম খানের একটি সচেতন প্রয়াস বলে মনে করা যেতে পারে। বিদ্রোহী শাহজাদা খুররম (পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহান) ১৬২৪ সালে এ দরগাহটি পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে তাঁর প্রতিশ্রুত একটি মঞ্জুরির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] বর্তমানে প্রাচীরঘেরা পূর্বদিকে বারান্দাযুক্ত সাদামাটা বর্গাকার ইমারতটি ১৭৫৮ সালে গোলাম নবী কর্তৃক নির্মিত হয়।

মন্দির

দিল্লীতে মুগল রাজশক্তির অবক্ষয়ের ফলে এ প্রদেশে (বাংলায়) এক নব্য আমলা শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলোতে মুর্শিদকুলী খানের আত্মীয়বর্গকে নিয়োগদান করা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আমলাগণ, বিশেষভাবে রাজস্ব বিভাগের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং এদের বেশ কয়েকজনকে জমিদারি প্রদান করা হয়। বংশগত এ শক্তিধর ভূস্বামীরা যতোকাল প্রাদেশিক সদর দপ্তরে নির্ধারিত রাজস্ব নিয়মিত পাঠাতেন ততোকাল তাদের প্রায় পূর্ণস্বাধীনতাভোগের সুবিধা প্রদান করা হতো। তাদের নির্মিত মন্দিরগুলো ছিল সুবৃহৎ ও জটিল নকশাভিত্তিক। উদাহরণস্বরূপ দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের উল্লেখ করা যায়। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মঞ্জুরকৃত ফররুখশিয়ারের ফরমানের পরবর্তীকালে বৃটিশ বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ সাধিত হয়। শীঘ্রই গজিয়ে উঠে পণ্য-উৎপাদনকারী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক সম্পদশালী উদ্যোগী বণিক (বানিয়া) সম্প্রদায়। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবাবি শাসনের অবক্ষয় ঘটলে এ নব্য বিত্তশালী বাঙালি সম্প্রদায় ভূমিক্রয়ে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করে এবং জমিদার উপাধি লাভ করে। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষকরে হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া ও বীরভূম জেলায় বিপুলসংখ্যক মন্দির নির্মিত হয়। নির্মাতাদের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা ছাড়াও মন্দিরনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়।

মসজিদে যেমন, মন্দিরের ক্ষেত্রেও তেমনি নির্মাণোপকরণ ছিল ইষ্টক, যা বৌদ্ধ যুগ থেকে প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী, মন্দিরস্থপতিরা সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়।[৩]

---

২. Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi*, trans. by M. I. Borah, (Govt. of Assam 1936), Vol. II, 710.

৩. Tarapada Santra 'Architects and Builders' in George Michell (ed.), *Brick Temples of Bengal* (Princeton 1983);

উত্তর ভারতীয় উড়িষ্যার রেখা-দেউল মন্দির রীতির শৈলীগত প্রভাবই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বহির্দেয়ালের সুবিন্যস্ত ছন্দায়িত অভিক্ষেপণ ও কুলুঙ্গি এবং করবেল প্রণালীতে তৈরি শূন্যগর্ভ বুরুজে এ প্রভাব সুস্পষ্ট। উড়িষ্যা ও বিহার সন্নিহিত পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে 'দেউল' অভিধার এ মন্দিরগুলোর রয়েছে সর্বাধিক প্রাধান্য। তবে হুগলী ও বর্ধমানেও এগুলো পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গে এ গোত্রের মন্দিরের খানিকটা ভিন্ন রূপ হচ্ছে বাকেরগঞ্জ জেলার মাহিলারায় অবস্থিত সরকারের মঠ। নবাব আলিবর্দী খানের আমলে সরকার রূপরাম দাসগুপ্ত কর্তৃক এটি নির্মিত হয় (ছবি ৬)।

অনুপ্রেরণার দ্বিতীয় উৎসটি হচ্ছে চৌদ্দ-ষোল শতকের বাংলার স্বাধীন সালতানাতের স্থাপত্যিক ঐতিহ্য, যার বহুল ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গম্বুজ, ভল্ট ইত্যাদি এবং ঠেকনোকৌশল হিসেবে খিলান, স্কুইঞ্চ পান্দান্‌তিভ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, এ ঐতিহ্যে আঞ্চলিক নির্মাণকাঠামোগুলো স্থায়ী উপাদান দ্বারা নির্মিত হয়। এভাবে কুটির-নকশা ও বক্রকার্নিশ ইটের ব্যবহারে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। অলঙ্করণের কাজে পোড়ামাটির ফলকও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

অন্য প্রভাবশালী উৎস ঢাকায় পরিদৃষ্ট সতেরো শতকের মুগল স্থাপত্য। মুসলিম স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের প্রভাবে আবির্ভাব ঘটে মন্দির নির্মাণের দু'টি নতুন রীতির—এর একটি সাধারণ কুটিরসদৃশ ও অন্যটি রত্নচূড়াযুক্ত। কুটির রীতিতে খড়ের চালযুক্ত কাদামাটি বা বাঁশের তৈরি গ্রামীণ কুঁড়েঘরের অনুকরণ করা হয়। সুলতানি আমলের মুসলিম স্থাপত্য ঐতিহ্যে যেখানে কুঁড়েঘরের কোন কোন উপাদানমাত্র, যেমন বক্র কার্নিশ ইত্যাদি ইট দিয়ে তৈরি হতো, সেখানে এখন আমরা আস্ত কুটিরই ইটে গ্রথিত হতে দেখি। এক-বাংলা বা 'দো-চালা' হলো কুটির রীতির সহজতম রূপ। এটা যে আবাসিক কুঁড়েঘরের অনুকরণে তৈরি তা এক সম্প্রসারিত ভিতের উপর নির্মিত। দুটি চালা এবং ত্রিকোণ প্রান্ত সম্বলিত আঠারো শতকের এরকম কয়েকটি মন্দিরের একটি রাজশাহীর পুঠিয়ায়, একটি নওগাঁয়ের কালিগ্রামে, একটি পাবনা জেলার হান্দিয়ালে (১৭৭৯ সালে ব্রজরাম দাস কর্তৃক নির্মিত), একটি যশোরের অদূরে সেনহাটি মন্দির ও আরো একটি ফরিদপুরের কাইচালে অবস্থিত।

মন্দির স্থাপত্যে জোড়-বাংলা বা যমজ মন্দিরকুটির হচ্ছে সবচাইতে সুস্পষ্ট দেশীয় অবদান। দু'টি সংলগ্ন এক-বাংলা সমবায়ে এটি তৈরি এবং এর মধ্যে পশ্চাতেরটিই প্রকৃত মন্দির। পুরুলিয়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী এগুলো ছড়িয়ে রয়েছে এবং যশোর, খুলনা ও পাবনা জেলায় এগুলোর সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। এগুলোর মধ্যে পাবনা শহরে অবস্থিত দক্ষিণ রাঘবপুরের জোড় মন্দিরটি উত্তমরূপে সংরক্ষিত (ছবি ৭)।

চার-চালা মন্দির চারটি ঢালু চালবিশিষ্ট। বর্গাকৃতি ভিতের উপর নির্মিত হলে চালগুলো ঊর্ধ্বে এক বিন্দুতে মিলিত হয় আর আয়তাকার ভিতের উপর হলে সঙ্গমরেখা

বা আলিতে গিয়ে শেষ হয়। কক্ষটি বর্গাকৃতি হলে অভ্যন্তরে এটি পান্দান্তিভের উপর সংস্থাপিত গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এ গম্বুজের বহিঃস্থ শীর্ষদেশেই শুধু কুটিরছাদ তৈরি হয়। ক্ষেত্রবিশেষে অভ্যন্তরটিও চৌকৌণা বা পিরামিড আকৃতির হয়। মন্দিরফাসাদ (সম্মুখ দেয়াল) এক বা তিন প্রবেশদ্বার- বিশিষ্টও হতে পারে। এ ধরনের মন্দির পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায়ই দেখা যায়। চার-চালা ভল্ট দিয়ে ছাদের একাংশ আচ্ছাদনের যে রীতি, তার ব্যবহার বাংলার সুলতানি আমলেও কখনো কখনো পরিলক্ষিত হয়। পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদটি এ রীতির প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। পোড়ামাটির জমকালো অলঙ্করণসমৃদ্ধ ফাসাদবিশিষ্ট চারচালা মন্দির হচ্ছে পাবনার হাটিকুমরুল শিব মন্দির ও রাজশাহীর পুঠিয়ার গোবিন্দ মন্দির (ছবি ৮)। ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সম্পূরক ইমারত চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিই মূলত চার-চালা। এগুলোর কার্নিশের বাঁকগুলো নকশারূপে ছাদেও পুনঃপ্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলোর প্রাচীরগাত্র প্রলেপযুক্ত এবং স্থাপত্যশৈলীর বিচারে আঠারো শতকের মুগল স্থাপত্যরীতির সাথে এগুলো সম্পর্কযুক্ত।

চার-চালা ইমারতের উপরে ক্ষুদ্রকায় প্রতিরূপ নির্মিত হলে সেটি আট-চালায় পরিণত হয়। অত্যধিক জনপ্রিয় ও ব্যাপক প্রসারপ্রাপ্ত এ শ্রেণীর মন্দির বিশেষভাবে লক্ষণীয় পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগনা জেলায়। আর বাংলাদেশে এ জাতীয় মন্দিরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে নলডাঙ্গার রামেশ্বরী মন্দির, তেলকুপীর শিবমন্দির ও ধূলগ্রামের রঘুনাথ মন্দির এবং খুলনা জেলার দোহাজারীতে অবস্থিত জোড় শিবমন্দির।

চূড়াবিশিষ্ট বা রত্ন-রীতির মন্দিরও ছিল খুব জনপ্রিয়। এজাতীয় মন্দিরে বক্র কার্নিশ পর্যন্ত নিম্নাংশ কুটির-রীতিতেই নির্মিত হয়। এ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাদের উপর সংস্থাপিত হয় এক বা একাধিক বুরূজ-শীর্ষ, যা 'রত্ন' অর্থাৎ মণি নামে অভিহিত।

রত্ন-রীতির সহজতম রূপ হচ্ছে একরত্ন মন্দির। এতে থাকে একটি মাত্র চূড়া আর এটির অবস্থান মধ্যবিন্দুতে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায় মল্ল রাজগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দির গুচ্ছই এ শ্রেণীর বিশালতম ও সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক নিদর্শন। সাধারণত এগুলোর তিন দিকে স্তম্ভসহ বারান্দা এবং পশ্চাতে দরদালান (corridor) থাকে। মুসলিম ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ বা স্মৃতিসৌধের সাথে রয়েছে এ শ্রেণীর মন্দিরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। ১৫৩১ সালে গৌড়ে নির্মিত কদম রসুল ইমারতের সাথে বিষ্ণুপুর মন্দিরের তুলনা করলে এ মিল লক্ষ্য করা যায়। ত্রি-খিলান দরবারান্দা, পোড়ামাটির অলঙ্করণসমৃদ্ধ ফাসাদ (সম্মুখ প্রাচীর) ও ছাদপ্রান্ত থেকে দূরবর্তী ক্ষুদ্র গম্বুজ এ যোগাযোগ স্পষ্ট প্রমাণ করে। মসজিদের সাথে এগুলোর বৈসাদৃশ্য চতুর্দিক জুড়ে অবস্থিত বারান্দায় নিহিত। তাছাড়াও এগুলোতে রয়েছে সিঁড়িপথ যা দ্বিতীয় মন্দিররূপে ব্যবহৃত ঊর্ধ্ব-চূড়া পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

পঞ্চরত্ন মন্দিরে থাকে পাঁচটি চূড়া। এর একটি মধ্যস্থলে ও অবশিষ্ট চারটি চার কোণে অবস্থিত। পঞ্চরত্ন ও আট-চালা রীতির মন্দির বাংলায় সর্বাধিক জনপ্রিয়। পশ্চিম

বঙ্গে এগুলো বেশি সংখ্যায় বিরাজমান এবং এগুলোর ক্ষুদ্র চূড়াগুলো সর্বক্ষেত্রেই রেখাদেউল (ক্রমঃসঙ্কোচনশীল চূড়াবিশিষ্ট); অথচ বাংলাদেশে এর সমগোত্রীয় মন্দিরগুলো চালাবিশিষ্ট। অতীতের মুসলিম স্থাপত্যের সাথে এগুলোর সংযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। পূর্ব ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে ছাদের বিভিন্ন স্তরে গম্বুজসারি ও চাঁদোয়াসারির প্রয়োগ ছিল একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এর প্রকৃত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিহারের সাসারামে শেরশাহের সমাধিসৌধ ও ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদ। উভয়ই ষোল শতকে নির্মিত। চূড়াকে মন্দিরের অবিকল ক্ষুদ্র প্রতিরূপ প্রয়োগে ভূষিত করার রীতি সুপ্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বার্মার পাগানে এমন কতকগুলো মন্দির আজো বিদ্যমান, যেগুলোতে ধাপবিশিষ্ট ছাদের কোণে কোণে স্তূপাকার চূড়া সংস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ থাটবিনিয়্যু (১১৪৪) ও টিলোমিলো (১২১৮) মন্দিরদ্বয়ের উল্লেখ করা যায়। পাগানের এসব মন্দিরের আদি রূপ বর্তমানে বাংলায় অবিদ্যমান হলেও এগুলো কোন এককালে যে এখানে বিদ্যমান ছিল, সেকথা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। অতএব, পাগান মন্দিরের ছাদে চূড়া বা স্তূপ সংস্থাপনের রেওয়াজ সম্ভবত বাংলা অঞ্চল থেকে ধার করা হয়েছিল।

অন্য সম্ভাব্য উৎসটি হচ্ছে রথ। প্রাচীনতম রত্নমন্দিরের পূর্বেকার কোন রথ আজ আর টিকে না থাকলেও মন্দিরের এমন কিছু কিছু পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়, যেগুলোতে অভিক্ষিপ্ত অবস্থায় রথচিত্র বিধৃত রয়েছে। পঞ্চরত্নমন্দির রীতির সাথে উত্তর ও মধ্য ভারতে পরিদৃষ্ট পঞ্চায়তন মন্দিরগুচ্ছের কিছু কিছু সম্বন্ধ থেকে থাকবে, যা একক পিঠিকার উপর নির্মিত ও পঞ্চয়াতন নামে পরিচিত। এরূপ মন্দির অধিক সংখ্যায় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে। এ শ্রেণীর মন্দির বাংলাদেশে আছে মাত্র দু'টি, যার একটি ১৭০৩ সালে যশোরের মুহম্মদপুরে নির্মিত হরেকৃষ্ণ মন্দির এবং অন্যটি ১৭৪৩-৪৫ সালে দিনাজপুরের গোপালগঞ্জে নির্মিত প্রাণগোপাল মন্দির। এই শেষোক্ত মন্দিরের ফাসাদ ভূপাতিত হয়ে গেছে।

চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরশ্রেণীসমূহের মধ্যে নবরত্ন রীতির মন্দির সর্ববিখ্যাত। নির্মাতার জন্য এ মন্দির বয়ে আনতো উচ্চ মর্যাদা। মূলত এটা পঞ্চরত্ন মন্দির, যার উপরে একটি অতিরিক্ত তলা নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এগুলো প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয় মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলায়। বাংলাদেশের এ জাতীয় বিরল মন্দিরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলোর আয়তনগত বিরাটত্ব। কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরটি বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নিদর্শন (ছবি ৯)। দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথ ১৭৫২ সালে এটি নির্মাণ করেন। চতুর্দিকের তিন আইলবিশিষ্ট দরবারান্দাসহ ত্রিতল এ মন্দিরের নিচতলার পরিমাপ ১৫ বর্গমিটার। এর সবশুদ্ধ ন'টি চূড়াই উনিশ শতকের ভূমিকম্পে বিলয়প্রাপ্ত। এর ফাসাদ চতুর্দিকে প্রতি ইঞ্চি ও স্তর নির্বিশেষে পোড়ামাটির ফলকে অনুপমভাবে সুসজ্জিত। খুলনার সোনাবাড়ীয়ায় ১৭৫৭ সালে হরিনাথ সেন কর্তৃক নির্মিত শ্যামসুন্দর মন্দিরটিও ত্রিতল, তবে আকারে এটি ক্ষুদ্রতর এবং পোড়ামাটির অলঙ্করণও এতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

'চান্দনী' বা 'দালান' নামে খ্যাত সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরও খৃস্টীয় আঠারো শতক থেকে নির্মিত হতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে হাওড়া জেলার গাজীপুরে ১৭১৪ সালে নির্মিত দ্বিতল গোবিন্দ মন্দিরটিই কালনির্ণীত সর্বপ্রথম মন্দির। এগুলোর 'S' আকৃতির ব্র্যাকেট ভারী কার্নিশের ভার বহন করে। এ শ্রেণীর আদিপর্বের মন্দিরগুলোতে রয়েছে স্তম্ভ ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ, আর উনিশ শতকের মন্দিরগুলোতে রয়েছে আধুনিক স্তম্ভ ও আস্তরের (stucco) অলঙ্করণ। ইন্দো-মুসলিম প্রাসাদস্থাপত্যে সম্ভবত এর কোন পূর্ববর্তী নমুনা ছিল, যা পরবর্তীকালে মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতীকীরূপে পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

উড়িষ্যা ঐতিহ্যের 'রেখা' ও 'পীড়া' সমন্বিত রীতির মন্দির বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত সন্নিহিত পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় অভিন্ন রূপে লক্ষণীয়। পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে কখনো কখনো এ শ্রেণীর মন্দিরের সম্মুখে অতিরিক্ত চালা বা সমতল ছাদবিশিষ্ট দরবারান্দা সংযুক্ত হতে দেখা যায়।

আঠারো ও উনিশ শতকে গৌণ নকশাগত বৈসাদৃশ্য নিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠে 'দোলমঞ্চ' ও 'রাসমঞ্চ'। বাংলার যেসব অঞ্চলে কৃষ্ণপূজা অনুষ্ঠিত হতো সেসব অঞ্চল্ জুড়ে এগুলো ব্যাপকভাবে নির্মিত হয়। পূজ্য দেব-দেবীকে চতুর্দিক থেকে লক্ষ্যগোচর করার উদ্দেশ্যে এগুলো খাড়াভাবে সংস্থাপিত হতো চার বা আট দিকে খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারবিশিষ্ট সুউচ্চ পিঠিকার উপর। মূল 'দোলমঞ্চ' হলো পিরামিডের অনুকরণে খাড়াভাবে নির্মিত সিঁড়িগুচ্ছ বা মঞ্চ, যার কাদামাটিতে গড়া নমুনা আজো দেখতে পাওয়া যায়। 'দোলমঞ্চ' নির্মাণ আঠারো শতকে এক মামুখী ব্যাপারে পরিণত হয়। এগুলো বর্গাকৃতির এবং রাসমঞ্চের তুলনায় ক্ষুদ্রকায়। পঞ্চবিংশতি চূড়াবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ রাসমঞ্চ দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায় কর্তৃক গোপালপুরে নির্মিত হয় ১৭৫৪ সালে। বর্তমানে এটি বিধ্বস্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

ঔপনিবেশিক স্থাপত্য

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত গির্জাসমূহ ও বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রয়োজনে নির্মিত ইমারত সকল এশ্রেণীর স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৬৯০ সালে জব চার্ণক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাকেন্দ্র কলকাতা ভারতে বৃটিশ শক্তির অবস্থানস্থায়িত্বের ক্রমঃপরিবর্তনশীলতার ফলে সহসা একটি রাজকীয় নগরীতে রূপান্তরিত হয়। কোন সুস্পষ্ট রাজকীয় স্থাপত্যশৈলী ভারতে কখনো বিকশিত হয় নি বটে, তবে পুরো বৃটিশ শাসনামল এক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কেটে যায়। আঠারো শতকের প্রথমভাগেই কলকাতায় ছিল একটি দুর্গ, গির্জা, আদালতভবন ও উদ্যানশোভিত ঘরবাড়ি। ব্যবসা-বাণিজ্যিক ও স্বাস্থ্যগত উভয় কারণে তখন পর্যন্ত নির্মাণকর্মকাণ্ড নদীতীরেই সীমিত থাকে।[৪]

---

৪. Philip Davies, *Splendours of the British Raj* (Penguin Books, Harmondswoth 1987), 14;

১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় দেওয়ানি স্থানান্তরের পর থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কলকাতা ভারতের রাজধানী হিসেবে অধি-ষ্ঠিত থাকে। বিশ লক্ষ পাউন্ড অর্থব্যয়ে একটি নতুন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। এর সীমানাপ্রাচীরের বাইরে ময়দানের চতুর্দিকে সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি ভবনগুলো স্থান পায়। ফলে দুর্গের চতুর্দিকের বিস্তীর্ণ ময়দান এলাকা দুর্গ থেকে নির্বিঘ্নে কামান দাগানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ দিত। কলকাতা নগরী অচিরেই সম্প্রসারিত হতে থাকে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের বিত্তবৈভবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে জমকালো সব ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এগুলোর যুৎসই তুলনা চলতো শুধু ইংল্যান্ডের পল্লীভবন ও সমকালীন পালাডিয়ান বিশাল বাসভবনগুলোর সাথে।[৫] এর মধ্য দিয়ে সূচিত হলো ভারতীয় পরিবেশে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়। এগুলোর অধিকাংশই ছিল উদ্যানপরিবেষ্টিত ও ইষ্টকনির্মিত দ্বিতল বা ত্রিতল ভবন, যার অন্তঃস্থিত কক্ষগুলো প্রশস্ত বারান্দাদ্বারা সুরক্ষিত।

হেস্টিংস-এর ভবনটি নির্মিত হয় ১৭৭৭ সালে আলিপুরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে। গোড়ার দিকে এটি ছিল একটি সাধারণ সাদা রঙয়ের দ্বিতল ঘন ক্ষেত্রবিশিষ্ট (cufical) ইমারত, যার নিচতলায় ছিল বসবাসের ঘরগুলো। বড়লাট হেস্টিংস এগুলো এতই পছন্দ করেছিলেন যে, ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর ডেইল্‌স্‌ফোর্ডের বাড়ির উদ্যান বানিয়ে নিয়েছিলেন আলিপুরের উদ্যানেরই আদলে। এর কাছাকাছি রয়েছে বেলভেডেয়ার, যার মধ্যাংশ হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম। বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগাররূপে ব্যবহৃত এ ভবনটি এক সময়ে বাংলার ছোট লাটদের এবং পরবর্তীকালে দিল্লী থেকে আগত পরিদর্শক ভাইসরয়দের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হতো। উভয় ভবনই পরে সম্প্রসারিত করা হয়।

১৭৮০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানিকুলের কার্যালয় হিসেবে কলকাতার মুখ্য মুক্তাঙ্গনের উত্তর দিকে নির্মিত হয় একটি বিরাট অট্টালিকা। সমকালীন নকশাচিত্রে এটিকে একটি সুদীর্ঘ সাদামাটা সেনাছাউনি সদৃশ অট্টালিকারূপে লক্ষ্য করা যায়। এর জানালাগুলো সবই একই ধরনের, এবং আয়োনীয় স্তম্ভ ও ক্ষুদ্র স্তম্ভসারির প্যারাপেট (ছাদের কিনারা) বিশিষ্ট উদগত মধ্যমাংশ দিয়ে এর ফাসাদে বৈচিত্র্য আনয়ন করা হয়েছে। এটিকে 'রাইটার্স বিল্ডিং' বলে অভিহিত করা হয়। কারণ, কোম্পানির চাকুরিতে নবনিযুক্ত কেরানিবর্গের প্রশিক্ষণের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এ অংশটি ব্যবহার করে। 'বেঙ্গল

---

৫. ইতালির শ্রেষ্ঠতম স্থপতিদের অন্যতম এন্‌ড্রিয়া পাল্লাডিও (১৫০৮-৮০) কর্তৃক নির্মিত ইমারতরাশি থেকে উদ্ভূত এক বিশেষ স্থাপত্য-রীতি। তিনি ছিলেন সুসমঞ্জস পরিকল্পনা ও ঐক্যানুপাতিক রোমান স্থাপত্যের প্রবক্তা। ইংল্যান্ডে মহান পাল্লাডীয় রীতির পুনঃপ্রবর্তন সূচিত হয় আঠারো শতকের গোড়ায় এবং আবাসিক অট্টালিকাসমূহে তা সীমিত থাকে। নব্য-ধ্রুপদী (neo-classical) আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এর দ্বারা সুচিহ্নিত হয়।

সচিবালয়' হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৮৮০ সালে আয়োনীয় (Ionic) ফাসাদ ও পেডিমেন্ট (pediment) যুক্ত করে এ ভবনের সম্মুখভাগ নতুন করে নির্মিত হয়[৬] (ছবি ১০)।

সন্ত জন-এর গির্জা নির্মিত হয় ১৭৮৭ সালে, এবং পরবর্তী শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এটি ক্যাথিড্রাল গির্জার মর্যাদায় সমাসীন থাকে। এটা তিন বে সম্বলিত নেভ্ ও গ্যালারিবিশিষ্ট। চুনারের বেলে পাথর দিয়ে খুব সহজেই সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম সম্পাদনের সুবিধার্থে এতে ডরিক রীতি অনুসৃত হয়। এর চূড়াটি বেটে বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ এর চতুর্থ ধাপটি ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে বাদ দেয়া হয়েছে। এর বহির্ভাগে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্রে রয়েছে কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের সমাধিসৌধটি। প্রস্তরনির্মিত অষ্টকোণী প্যাভিলিয়ন হাল্কা ধরনের কুটির)-এর গম্বুজাকৃতির চাঁদোয়ার শীর্ষে শোভা পায় শব ভস্মের কলস। এর প্যারাপেটে আছে এক সারি কানজুরা বা শোভাবর্ধক মারলন, আর অষ্টকোণ ক্ষেত্রের প্রতিটি দিকে রয়েছে খর্ব খিলানের একাধিক প্রবেশদ্বার।

আর্মেনীয়রা তাদের একান্ত নিজস্ব গির্জা 'সন্ত নাযারেথ' নির্মাণ করে ১৭২৪ সালে। উত্তরকালে ঢাকায় নিজেদের গির্জা নির্মাণে এটিকে তারা আদর্শরূপে গ্রহণ করে।

ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ বিত্ত-বৈভবে এ সময়ে কোনক্রমেই কলকাতার সমকক্ষ ছিল না। ফলত পূর্ববঙ্গে প্রাচীনতম ইউরোপীয় স্থাপত্য কেবলমাত্র গির্জা নির্মাণেই গণ্ডিবদ্ধ থাকে। তেজগাঁয় অবস্থিত হলি রোজারির গির্জাটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম গির্জা, যা অদ্যাবধি বিদ্যমান। সতেরো শতকে পর্তুগীজগণ নির্মাণ করে একটি ছোট্ট গির্জা (chapel), যা পরবর্তীতে ১৭১৪ সালে সম্প্রসারিত হয়। এটি একটি নেভ্ (nave), আইল (aisle) ও বর্গাকার এ্যাপস্ (apse) বিশিষ্ট বেসিলিকান (basilican) গির্জা, যার ছাদ সমতল ও চূড়াবিহীন। এর অভ্যন্তরে রয়েছে কতকগুলো খৃস্টান সমাধি প্রস্তরফলক। পর্তুগীজ ভাষায় উৎকীর্ণ ৭ জুন ১৭১৪ সাল তারিখযুক্ত চয় ডেভিয়েট্স-এর সমাধি-প্রস্তরফলকটি এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ঢাকার সমাধি প্রস্তর-ফলকগুলোর মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। আগস্ট ১৭১৪ সাল তারিখ সম্বলিত এ্যাভিয়েটিস-এর সমাধিসৌধটিও এখানে অবস্থিত এবং এটি প্রাচীনতম আর্মেনীয় সমাধিসৌধ। এতে নিজস্ব গির্জা নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর্মেনীয়রা পর্তুগীজ চ্যাপেলসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রটি ব্যবহার করতো বলে প্রতীয়মান হয়। এর পূর্বদিকের সম্মুখ প্রাচীরের বহিরঙ্গের ঢেউখেলানো উপরিতলের ঊর্ধ্বে রয়েছে একটি ক্রুশ এবং এটি মুগল ও খৃস্টীয় উপাদানসমূহের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ (ছবি ১১)। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের

---

৬. আয়োনিক, ডরিক, কোরিন্থীয়ান, তুস্কান ইত্যাদি নির্দেশ করে ধ্রুপদী (গ্রেকো-রোমান) স্থাপত্যের স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষস্থ টোপশ্রেণী। পেডিমেন্ট অট্টালিকার সম্মুখভাগের উপরিদেশে ত্রিকোণ স্তম্ভবিশেষ।

মধ্যে রয়েছে ফুলদানিভিত্তিক খাঁজকাটা স্তম্ভরাজি, চতুষ্কোণ খোপবিশিষ্ট প্রাচীরগাত্র ও খিলানবিশিষ্ট প্রবেশদ্বারের উপর অধিক বক্র ছাঁইচ। এসবের সাথে আরো রয়েছে একাধিক ক্রুশ ও মা মেরির কোলে শিশু যিশুর মূর্তি।

আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে হলি রেজারেকশন (Holy Resurrection) আর্মেনীয় গির্জাটি নির্মিত হয় ১৭৮১ সালে একটি পুরনো চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষের উপর (ছবি ১২)। এর শিলালিপিটি রয়েছে মূল উপাসনাস্থলের সম্মুখাংশে। এ গির্জার সাথে কলকাতার গির্জা ও আর্মেনিয়ার ইখ্‌মিয়াদযিনের গির্জার কিছু সাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যাকিছু পার্থক্য লক্ষণীয় তা কেবল এসব গির্জার আকার-আয়তন, নির্মাণোপকরণ ও আবহাওয়া, উপযোগিতার মধ্যে নিহিত। জোহানেস আরাপিয়েট সার্কিস কর্তৃক ১৮৩৭ সালে নির্মিত এর মূল সূক্ষ্ম চূড়া ও ঘটিকা বুরূজটি ১৮৯৭ সালের মহা ভূকম্পে ভূপাতিত হয়। পূর্বদিকে অবস্থিত এ্যাপস্‌টি ধনুকাকৃতি ও এর শীর্ষে রয়েছে মুকুটসদৃশ শোভাবর্ধক প্যারাপেট। এর উত্তরে ও দক্ষিণে রয়েছে সুপ্রশস্ত বারান্দা। অভ্যন্তরস্থ মূল উপাসনাস্থলটি মেঝের তুলনায় উত্তোলিত ও রেলিংঘেরা এবং বিপরীত প্রান্তে রয়েছে একটি গ্যালারি, যাতে প্রবেশের জন্য আছে ঘোরানো সিঁড়ি। যিশুর নৈশভোজ উৎসব ও ক্রুশে তাঁর প্রাণবধের ঘটনার স্মারক ১৮৪৯ সালে চার্লস পোট কর্তৃক অঙ্কিত দু'টি তৈলচিত্র সমন্বয়ে এর বেদিমঞ্চ গঠিত।

ওয়ারির খৃস্টান গোরস্থানের পুরাতন অংশে স্থান পেয়েছে প্রথাসিদ্ধ নিও ক্লাসিক্যাল[৭] সমাধি স্থাপত্য, যেমন পিরামিড, ওবেলিস্‌ক্‌ (ক্রমসঙ্কোচনশীল চতুষ্কোণ স্তম্ভ), চাঁদোয়া শবাধার। বেক্‌ (Beck)-এর সমাধিসৌধটিই এক্ষেত্রে বাকি সবগুলোকে ছাপিয়ে নজর কেড়ে নেয়। (ছবি ১৩)। জনশ্রুতি মতে, কলম্বো সাহেবের সমাধি হিসেবে পরিচিত এ চৌকো ইমারতের শীর্ষে রয়েছে গম্বুজ আচ্ছাদিত একটি সুউচ্চ অষ্টকোণ বুরূজ (tower) এবং অন্তঃস্থলে রয়েছে পরিচয়বিহীন তিনটি সমাধি। চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ ক্ষেত্রের প্রতিটি দিকেই রয়েছে প্রবেশদ্বার। এতে দৃশ্যমান মুগল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বহুপত্র সম্বলিত খিলানবিশিষ্ট জানালা ও অন্তঃপ্রবিষ্ট কুলুঙ্গিসমৃদ্ধ প্রাচীর, আর প্যারাপেটের প্রতি কোণায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযোজিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকার চূড়া। দেয়ালগাত্রে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট রয়েছে কতকগুলো সমাধি-প্রস্তরফলক। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ১৭৯১ সালে প্রয়াত ইযেকিয়েল বেক-এর স্মৃতিফলকটি। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকুরিরত ও ১৭৭৪ সালে প্রয়াত উইলিয়ম কার্কম্যানের সমাধিফলকটিও রয়েছে এখানে এবং এটিই ঢাকায় ওলন্দাজদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন।

---

৭. নিও-ক্ল্যাসিসিজমঃ বিশেষ নির্মাণ-রীতি যা তৎপূর্ববর্তী 'ব্যারক' (Baroque) ও 'রকোকো' (Rococo) রীতিদ্বয়ের মাত্রাধিক্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভূত হয় আঠারো শতকের ইউরোপে, প্রাচীন পৃথিবীর মাহাত্ম্য পুনরুদ্ধার করে স্থাপত্যে সাদামাটা ও মহৎ ভাব-গাম্ভীর্য প্রবর্তন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

সামন্ত প্রভু বা জমিদারগণ, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন 'রাজা' বা 'মহারাজা' উপাধিধারী, তাঁরা গ্রামাঞ্চলে প্রসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করতেন। এগুলো ছিল তাঁদের স্ব স্ব এলাকার শাসনকাজ পরিচালনার কেন্দ্রস্থল। এ দেশের পূর্ববর্তী ও বর্তমান শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত যথাক্রমে মুগল ও নিও-ক্লাসিক্যাল স্থাপত্যধারার সুসমন্বয় ঘটে এসব অট্টালিকায়। রাজশাহীর অদূরে নাটোর ছিল বৃহত্তম জমিদারিগুলোর অন্যতম। সাড়ে সাইত্রিশ একর ভূমি জুড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়িটি কতগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রাসাদ সমন্বয়ে গঠিত। ডেপুটি কমিশনারের দপ্তররূপে ব্যবহৃত মূল অংশের মধ্যভাগে রয়েছে একটি অভিক্ষিপ্ত বারান্দা (porch) ও দুপ্রান্তে দু'টি পেডিমেন্টবিশিষ্ট উদ্‌গত গলিপথ (bay) (ছবি ১৪)। এর অর্ধবৃত্তাকার খিলানগুলো কোরিন্থীয় স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত এবং ফাসাদটি জ্যামিতিক ও পুষ্প-নকশায় সজ্জিত। এ অট্টালিকার মধ্যভাগে অবস্থিত সুবৃহৎ অভ্যর্থনাকক্ষের উভয়দিকে সুবিন্যস্ত রয়েছে এগারোটি করে প্রশস্ত এপার্টমেন্ট (কয়েকটি কক্ষের সমন্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা)। অভ্যর্থনাকক্ষের অভ্যন্তরে ছাদ পার্শ্ববর্তীগুলোর তুলনায় উত্তোলিত এবং আঠারোটি বাতায়নপথে (clerestory) আগত আলোকে এটি আলোকিত। মূলে এগুলো রঙিন শার্সিকাঁচসমৃদ্ধ ছিল। এর মেঝেটি কৃষ্ণ ও শুভ্র মর্মর, পাথরে বাঁধাইকৃত।

কান্তনগরের নবরত্ন মন্দিরের উদ্যোক্তা মহারাজা প্রাণনাথ কর্তৃক দিনাজপুরে নির্মিত দোতলা মূল প্রাসাদভবনটি বর্তমানে বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। এটির ছিল প্রশস্ত বারান্দা ও আয়োনীয় স্তম্ভবিশিষ্ট জাঁকালো সুদৃশ্য ফাসাদ।

কারখানা হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক নীলকুঠিও সারা দেশ জুড়ে নির্মিত হয়। সাধারণত সাদাসিধে ও দেয়ালঘেরা এসব ইমারতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক তাৎপর্য ছিল না বললেই চলে।

উনিশ শতক : মসজিদ ও ইমামবাড়া

দীউয়ানি কার্যালয়সমূহ, সরকারি কোষাগার এবং দীউয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহ কোলকাতায় স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে আঠারো শতকের ষাটের দশকের বাংলার সমৃদ্ধতম ও সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ মুর্শিদাবাদ নগরীর ভাগ্যে ঘনঘোর দুর্দিন নেমে আসে। উনিশ শতকের প্রারম্ভে এটি কলকাতাভিত্তিক বৃটিশ প্রশাসনের ভাতাভুক্ত ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণাধীন নামমাত্র নবাবের বসবাসের স্থানে পরিণত হয়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই মুর্শিদাবাদের স্থাপত্যে এর বৃটিশ-নির্ভরতা ও মূলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ প্রতিফলিত হয়।

১৮০১ সালে নির্মিত মিয়া হালালের তিন বে-বিশিষ্ট মসজিদের ফাসাদ ও খাঁজকাটা কন্দাকৃতি গম্বুজ হচ্ছে এর ঐতিহ্যগত উপাদান। সম্ভবত মুর্শিদাবাদের সব মসজিদের মধ্যে এটিরই অভ্যন্তরভাগ সর্বাধিক সুবিস্তৃত ও আস্তরের নানা নকশায় অলঙ্কৃত। বিপুল সজ্জার

অট্টালিকার জনপ্রিয়তার যুগপৎ চরমোৎকর্ষ ও পরিসমাপ্তির এটিই ক্রান্তিবিন্দু। কেননা, বৃটিশ প্রভাবের ফলে এ সময় থেকে অধিকতর সুসংযত স্থাপত্যরীতির প্রচলন শুরু হয়। এ ধারানুক্রমে মিয়া হালালের মসজিদ নির্মিত হওয়ার মাত্র বারো বছর পরে নির্মিত ফারহাত আল্লাহ খানের মসজিদটি সাদাসিধে, অনাড়ম্বর ও সমতল ছাদযুক্ত, যদিও এটি প্রথমোক্তটির মতোই তিন বে-বিশিষ্ট। প্রাচীর ও মিহরাব, যা প্রচলিত নিয়মে অলঙ্কৃত থাকে, এক্ষেত্রে সেসব অনাচ্ছাদিত। মুর্শিদাবাদ রীতির অনুবৃত্তিতে এর মিহরাবের বহিঃস্থ অভিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলোই শুধু দোচালা আকৃতির ছাদবিশিষ্ট।

১৮২৯-৩৭ সময়কালে নির্মিত নবাবের বাসভবনেই সর্বোৎকৃষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বৃটিশনির্ভরতা। ডারবিশায়ারের কেডলস্টন হলের অনুকরণে নির্মিত কলকাতার সরকারি ভবনের আদলে এটি নির্মাণের জন্য নওয়াব হুমায়ুন ঝা ইউরোপীয় স্থপতি ডানকান মেকলিওডকে দায়িত্ব প্রদান করেন। উচ্চ পদমর্যাদার বৃটিশ কর্মকর্তা ও তথাকার সব ইউরোপীয় বাসিন্দার উপস্থিতিতে এ ভবনের নির্মাণকার্যের উদ্বোধন বিষয়ে অবগত হওয়া যায় এর দ্বি-ভাষিক শিলালিপি থেকে।

এর দশ বছর পর ১৮৪৭ সালে ইতিপূর্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত ইমামবাড়ার স্থলে নির্মিত হয় নতুন আরেক বিশাল ইমামবাড়া। এর পরিমাপ হচ্ছে ২০৯×৯৫ মিটার। পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ ইমামবাড়াটি নবাবের প্রাসাদের চেয়েও বৃহত্তর (ছবি ১৫)। মহানবীর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শাহাদাৎবার্ষিকী উৎসব মোহররম পর্ব শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়। একটি শিলালিপির সাক্ষ্যানুসারে এর পৃষ্ঠপোষক ও নির্মাণতত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যথাক্রমে নবাব ফেরিদুন শাহ ও সাদিক আলি খান। নবাবের প্রাসাদের সরাসরি উত্তরদিকে নির্মিত এই ইমারতের গঠনশৈলীও ইউরোপীয় স্থাপত্য প্রভাবপুষ্ট। এর দুই স্তরবিশিষ্ট দক্ষিণ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তরে রয়েছে সবদল রীতিতে তৈরি (trabeated) খড়খড়িযুক্ত সুবৃহৎ জানালা। এর মধ্য প্রবেশদ্বারে রয়েছে তুস্কান স্তম্ভোপরি সমতল কার্নিশের উপর গোলাকৃতি বহুপত্র খিলান। বৃটিশ প্রভাব এড়িয়ে নবাব যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বীয় কর্তৃত্ব এখনো জাহির করতে পারেন তা এ ইমামবাড়ার আকারের বিশালত্ব দৃষ্টে জোর দিয়েই বলা যায়। একদিকে যেমন বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করতো, অন্যদিকে তেমন এরই সমান্তরালভাবে মুর্শিদাবাদে শিয়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি উদ্‌যাপনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নির্মাণশিল্পে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য প্রবর্তনের বিষয়টি মূলত শাসক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সূচিত স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত থেকে যায় বলে মনে হয়। কলকাতায় যখন এক ভিন্ন শৈলীতে মসজিদসমূহ নির্মিত হচ্ছিল তখনো তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ইমারতাদি রূপায়িত হতে থাকে পূর্ববর্তী মুগল ঐতিহ্যে, যেমনটি দেখা যায় ইমামবাড়ারই নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক সাদিক আলি খান কর্তৃক ১৮৮১ সালে নির্মিত 'ছোটে চৌক কি মসজিদ'-এ।

সুস্পষ্ট ইউরোপীয় প্রভাবযুক্ত মসজিদ প্রথম আবির্ভূত হয় কলকাতায়। এসব মসজিদের মধ্যে কয়েকটি নির্মিত হয় টিপু সুলতানের বংশধরগণ কর্তৃক ১৮৩৫-৪২ সময়কালে। এগুলোর প্রবেশদ্বারের গোলাকৃতি খিলানগুলো পাখা-নকশাখচিত ও সংযুক্ত আয়োনীয় স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত। এসব প্রবেশদ্বার ও খড়খড়িযুক্ত দরজাগুলো বৃটিশদের বাংলো ও দপ্তরাদির আদলে তৈরি। এসব মসজিদের দুই-আইল ও বহু গম্বুজবিশিষ্ট পরিকল্পনা ইতিপূর্বে ১৫৮২ সালে পাণ্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদে সর্বশেষ দৃষ্ট নমুনারই অনুকৃতি। মুগল যুগের একক-আইলের পরিকল্পনা যে কেন এসময় পরিত্যক্ত হলো তার কারণ স্পষ্ট নয়।

এ ধারার মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমটি হচ্ছে গোলাম মুহম্মদ মসজিদ (ছবি ১৬)। ১৮৩৫ সালে এটি নির্মাণ করেন টিপু সুলতানতনয় গোলাম মুহম্মদ, যিনি দ্বাদশ বছর ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন। টালিগঞ্জের উপকণ্ঠে এটি অবস্থিত। ফার্সি ভাষায় লিখিত এর ওয়াক্ফ ফরমানে মুসলিম তারিখ ব্যবহারের রীতির স্থলে খৃস্টীয় তারিখ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে 'গভর্নমেন্ট', 'কালেক্টরশিপ' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। এর পাঁচ বছর পরে টিপু সুলতানের দৌহিত্রী শাহবানী বেগম নির্মাণ করেন আরেকটি মসজিদ, যা আকারে ছোট হলেও গোলাম মুহম্মদের মসজিদেরই ঘনিষ্ঠ আদলে নির্মিত।

এ ধরনের তৃতীয় মসজিদটি সচরাচর টিপু সুলতানের মসজিদ বলে পরিচিত হলেও শিলালিপির সাক্ষ্যানুযায়ী মধ্য কলকাতায় ১৮৪২ সালে এটি নির্মাণ করেন প্রকৃতপক্ষে তাঁরই পুত্র গোলাম মুহম্মদ। এটিও তাঁরই নির্মিত টালিগঞ্জ মসজিদের অবিকল প্রতিরূপ। এর অভ্যন্তরে বহুপত্রের স্থলে দন্তখচিত গোলাকার জোড়া-খিলানযুক্ত মিহরাব এবং সংযুক্ত তুস্কান স্তম্ভসারি ধ্রুপদী ইউরোপীয় ইমারতের আবহ সৃষ্টি করেছে।

মুগল স্থাপত্যরীতিতে বেশ কিছু সংখ্যক মসজিদ ঢাকায় নির্মিত হয়। এগুলোতে অবশ্য ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য সামান্য মাত্রায় লক্ষণীয়, বিশেষভাবে খিলান ও প্রবেশদ্বারের রূপায়ণে। সাম্প্রতিককালে এসব মসজিদের প্রায় সবগুলোরই পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ সাধিত হওয়ায় এখানে শুধু এমন সব মসজিদেরই উল্লেখ করা হলো যেগুলোতে মূল বৈশিষ্টের সনাক্তযোগ্য চিহ্ন টিকে রয়েছে।

ত্রি-গম্বুজ মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে কায়েতটুলীর আবদুল হামিদ লেন মসজিদ (১৮০৪), সিংটোলার সিতারা বেগমের মসজিদ (১৮১৪, এটি উঁচু মঞ্চোপরি নির্মিত); কাজী আলাউদ্দিন সড়ক মসজিদ (১৮২৬); বাদামতলী ঘাটে দারোগা আমিরুদ্দিনের মসজিদ, এটি তাঁরই এক-গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধের পাশে উনিশ শতকে নির্মিত। এ মসজিদটি বিশদীকৃত ও উজ্জ্বল রঙে ভাস্বর, আর আস্তরে গড়া ভেনিসীয় রীতির কৃত্রিম খড়খড়ি বিশিষ্ট বন্ধ প্রবেশদ্বারের ব্যবহারের ফলে এর পশ্চিম দেয়ালের বহিঃস্থাপিত মিহরাবগুলোর রূপায়ণ দৃষ্টি আকর্ষক হয়েছে।

উল্লেখিত সময়ের একমাত্র পঞ্চ-গম্বুজ মসজিদটি হচ্ছে বেচারাম দেউড়ি মসজিদ (১৮৭৩)। এই ইমারতে গম্বুজের বিন্যাস অসাধারণ, কারণ এর অভ্যন্তরদেশ তিন বে-বিশিষ্ট। কেন্দ্রস্থ বৃহত্তর গম্বুজটির উভয় পাশে রয়েছে দু'টি করে গম্বুজ। অভ্যন্তরে পার্শ্ব-বে দু'টিকে আনুভূমিকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে আড়াআড়ি সংস্থাপিত ছোট খিলান দিয়ে, যেন ক্ষুদ্র গম্বুজগুলোর স্থান সঙ্কুলান হয়।

এক-গম্বুজ মসজিদগুলোর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা যায়, যেমন হরনাথ ঘোষ সড়ক মসজিদ (১৮০১), এটি উঁচু মঞ্চোপরি নির্মিত এবং রাস্তার দিকে রয়েছে এর দু'টি সংলগ্ন দোকান; পৌরসভা সড়ক মসজিদ (১৮১০), এটির রয়েছে একটি বাঁকানো কার্নিশ; কলুটোলা জামে মসজিদ (১৮১২) এবং লক্ষ্মীবাজারস্থ মিয়া সাহেব ময়দান মসজিদ (১৮২৫), যার চিনি-টিক্রী মোজাইক ১৯০৮ সালে এর নবরূপায়ণ উপলক্ষে করা হয়।

ঢাকার বাইরে এই শ্রেণীর মসজিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নোয়াখালীর মাতাবী মসজিদ (১৮১৪), দিনাজপুরের কারাগার মসজিদ, রংপুরের মুন্সীপাড়া মসজিদ ও বরিশালে কারাপুর মিয়াবাড়ি মসজিদ। শেষোক্ত মসজিদটি উত্তল মঞ্চোপরি নির্মিত।

ঢাকার বকশী বাজারস্থ হোসেনী দালান বা ইমামবাড়া এই নগরীতে বিদ্যমান উনিশ শতকের একমাত্র বৃহৎ ধর্মীয় অট্টালিকা, যা এর উনিশ শতকীয় বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অটুট রেখে টিকে আছে (ছবি ১৭)। মূল ইমারতের সম্ভবত সতেরো শতকের একটি রজত-নকশা বর্তমানে ঢাকায় জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান অট্টালিকাটি উনিশ শতকের শেষপাদে নবাব আহসানউল্লাহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত। মূল অট্টালিকাটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর খিলানযুক্ত জানালাসহ সংযুক্ত ত্রিতল চাতাল (pavilion) ও ছাদের কান্জুরা (অলঙ্কৃত মারলন) আঠারো শতকের মুগল ইমারতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর দক্ষিণদিকের বারান্দার অবলম্বনস্বরূপ ধ্রুপদী স্তম্ভ চতুষ্টয় ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মন্দির

বাংলায় মন্দিরস্থাপত্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যেমন তুঙ্গে পৌঁছে তেমনি শেষার্ধে তা লক্ষণীয়ভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায় এ সময়ের ইমারতগুলো ক্ষুদ্রায়তনের ও কম পরিমাণ পোড়ামাটির অলঙ্কারসমৃদ্ধ আর গুণগত দিক দিয়েও এগুলোতে তেমন কোন উন্নতি লক্ষণীয় নয়। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এ মন্থরতার কারণ সম্ভবত ঐশ্বর্যবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্যায়ন। এ শ্রেণীটি নতুন রাজধানীতে এসে ভিড় জমায় এবং পোশাকে ও শিক্ষায় ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করে। ইউরোপীয় সামগ্রীর প্রতি যে আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় তার প্রতিফলন শুধু যে ধনিক শ্রেণীর শহর ও

গ্রামের নব্য-ধ্রুপদী রীতির ঘরবাড়িতে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, বরং মন্দিরের খুঁটিনাটিতেও তা অবিকল রূপায়িত হয়। এই ধারা অনুসারে সমসাময়িক গির্জাস্থাপত্যের সরাসরি প্রভাবে নির্মিত হয় চূড়াসম্বলিত (spired) মন্দিরগুচ্ছ। এ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ পোড়ামাটির ভাস্কর্যের স্থান দখল করে নেয় সস্তা দামের স্টাকো (আস্তরের) শিল্পকর্ম। আর যদিও বিশ শতক পর্যন্ত ঐতিহ্যগত শিল্পরীতি ক্ষীণভাবে অব্যাহত থাকে, তথাপি উপাদান হিসেবে কংক্রিট ও লোহার প্রচলন ইট ও পোড়ামাটি ব্যবহারের প্রথাকে মারণাঘাত হানে।

পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলাতেই রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির এবং এসবের মধ্যে অধিকাংশই শিখরবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন রীতির। এর চূড়াগুলো মুখ্যত রেখা-দেউল। পশ্চিমবঙ্গের অন্য যেসব জেলায় অধিক সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বর্ধমান, হুগলী, বীরভুম ও বাঁকুড়া। বাংলাদেশে রাজশাহীর পুঠিয়ায় পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরটি ১৮২৩-২৫ সালে নির্মাণ করেন পুঠিয়া জমিদারির জনৈক মহারানী (ছবি ২০)। এটি ১৪.১৮ মিটার পরিমাপের একটি বর্গাকার দ্বিতল ভবন। এটির নিচতলার প্রতি কোণায় রয়েছে অলঙ্কৃত ক্ষুদ্রাকৃতি চৌচালা চূড়া আর দ্বিতীয় তলার উপর রয়েছে একটি বৃহত্তর চূড়া। সুসংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান এ ইমারতটির চতুষ্পার্শ্ব পোড়ামাটির অলঙ্কার ভূষিত।

খিলানযুক্ত একক প্রবেশদ্বার, সোজা কার্নিশ ও ঘন শিরাল (ridge) বিশিষ্ট রেখারীতির মন্দিরও বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় জনপ্রিয় ছিল, যদিও এসময় পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও বাংলাদেশে আটচালা রীতির মন্দির নির্মাণ অব্যাহত থাকে। উত্তমরূপে সংরক্ষিত এরকম একটি আটচালা মন্দির বিদ্যমান রয়েছে কুমিল্লার চান্দিনা অঞ্চলে সড়ক পাশে (ছবি ১৯)। অনুরূপ আরো দু'টি মন্দির মহাসড়কের কোল ঘেঁষে পাশাপাশি দণ্ডায়মান। উনিশ শতকের শেষদিকে এগুলো নির্মাণ করেন ভুঁই কৈলাসের মহারাজা। কখনো কখনো চারচালা ছাদ ঊর্ধ্বমুখী ক্রমসঙ্কোচনের ফলে চূড়ায় পরিণত হতো। এমনটি ঘটেছে পাবনার হাটি কুমরুলের শিবমন্দিরে। সুউচ্চ মঠের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উচ্চতা বৃদ্ধি করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্ভবত গির্জাস্থাপত্যেরই প্রভাবে পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন মন্দিরের মধ্যচূড়ার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ একটি রেওয়াজে পরিণত হয়। মানিকগঞ্জের শ্রীবাড়ি শিবমন্দির (১৮৪৭); রূপচন্দ্রনির্মিত কালীমন্দির (১৮৩৮-৪৩), সোনারং শিবমন্দির (১৮৮৬) ও জয়দেবপুরে কালী নারায়ণ রায় মন্দির ঢাকা জেলায় এ-রীতির মন্দিরের উত্তম দৃষ্টান্ত।

আধুনিক নির্মাণকৌশলাদির সাথে সর্বাধিক সুসঙ্গতিপূর্ণ বিধায় গুরুভার কার্নিশযুক্ত সমতল ছাদের ব্যবহার সর্বজনীনতা লাভ করে। অভ্যন্তর ছাদ প্রায়শই সমতল হয়, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে গম্বুজ বা অগভীর ভল্টের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বার্ষিক পূজা উপলক্ষে রাজা বা জমিদারগণ প্রায়শই দুর্গা বা কালীদালান নির্মাণ করতেন। এগুলো ছিল একদিক থেকে

উন্মুক্ত বিশাল হলঘর এবং শেষাবধি সেগুলো আধুনিক আবাসিক স্থাপত্যেরই রূপ পরিগ্রহ করে। সমতল ছাদের চান্দনী বা দালান জাতীয় মন্দির সর্বাধিক সংখ্যায় পরিদৃষ্ট হয় মেদিনীপুরে।

দোলমঞ্চের তুলনায় রাসমঞ্চই অধিকতর সর্বজনীনতা লাভ করে। রাজশাহীর পুঠিয়ায় যেমন রয়েছে একরত্ন বিশিষ্ট একটি অষ্টভুজী রাসমঞ্চ বা রথমন্দির, তেমনি রয়েছে ১৮৯৫ সালে নির্মিত এক প্রকাণ্ড চারতলা দোলমঞ্চ (ছবি ২০)।

আঠারো শতকের শেষপাদে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে বসতিস্থাপন করে 'মগ' নামে পরিচিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আরাকানী জনগোষ্ঠী। প্যাগোডা ও খিয়াং নির্মাণ করে তারা সেগুলোতে উপাসনা করতো। প্যাগোডা হচ্ছে ইষ্টকনির্মিত বৃত্তাকার ক্রমহ্রাসমান শীর্ষ ও সৌন্দর্যবর্ধক চূড়াবিশিষ্ট ইমারত, আর খিয়াং হচ্ছে ইষ্টক, মঞ্চোপরি কাঠ ও ঢেউখেলানো লৌহপাতের সমবায়ে নির্মিত গৃহ (ছবি ২১ ও ২২)। এগুলোর ধাপযুক্ত উপরিকাঠামো বেলনাকৃতির কাষ্ঠস্তম্ভের উপর সংস্থাপিত এবং প্রবেশদ্বারের উপরকার ছাদের প্রান্তস্থ শোভাবর্ধক ত্রিকোণ অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে পাকানো পুষ্পালঙ্কার।

ঔপনিবেশিক স্থাপত্য

গথিক রিভাইভ্যাল[৮] ভারতে প্রবর্তিত হলে এ শৈলীর ভেনিসীয় রূপটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রয়োগোপযোগী বলে চিহ্নিত হয়। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সর্বপ্রথম আবির্ভূত এ শৈলীটি ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার উপযোগী। অন্যান্য ধ্রুপদী স্থাপত্যরীতি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আর এ সূত্রে যাকিছু নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় তার অধিকাংশের মধ্যে স্থাপত্যিক ব্যাকরণ তেমন কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হয় নি। রানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে বৃটিশ রাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতে বৃটিশ উচ্চাভিলাষ প্রকটভাবে রাজকীয় রঙে রাঙা হয়ে উঠে। নেহায়েত বণিক থেকে শাসকে বৃটিশের যে রূপান্তর তার প্রতিফলন লক্ষণীয় হয়ে ধরা দিয়েছে আয়োনীয় রীতির মধ্যমাংশবিশিষ্ট সাধারণ ব্যারাকসদৃশ রাইটার্স বিল্ডিং ও সুদৃশ্য জর্জীয় রীতির[৯] প্রাসাদ হিসেবে চিহ্নিত

৮. গথিক রিভাইভ্যাল : আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপে প্রাচীন গথিক স্থাপত্য-রীতির পুনঃপ্রবর্তনের এক সংগঠিত আন্দোলন। প্রধানত গির্জা নির্মাণে প্রযুক্ত এই রীতির মুখ্য লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে সূঁচাগ্র খিলান, শৈলশিরার ধনুকাকৃতি ছাদ (rib vauft), শূন্যধাবী ঠেকনো (flying buttress) খিলান সারির ব্যাপক প্রয়োগে প্রাচীরের গৌণরূপায়ণ, ও চওড়া ক্লেরেস্টোরি (Clerestory) বাতায়ন।

গভর্নমেন্ট হাউস (বড়লাট ভবন)-এর মধ্যকার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের মধ্যে (ছবি ২৩)। অথচ এ দুয়ের নির্মাণকালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কুড়ি বছরের।

বড়লাট মর্নিংটনের আর্ল ও ভাবী মার্কুয়িস ওয়েলেসলি কর্তৃক নির্মিত হয় কলকাতার নতুন বড়লাট ভবন। ডিউক অব ওয়েলিংটনের ভ্রাতা ও মার্জিত রুচির এক অভিজাতরূপে ১৭৯৮ সালে ভারতে আগমন করে তিনি সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ স্থপতি পরিবারের সদস্য ও প্রখ্যাত প্রকৌশলী কর্মকর্তা চার্লস ওয়াইয়াটকে প্রস্তাবিত প্রাসাদের নকশা-পরিকল্পনার দায়িত্ব প্রদান করেন। এ ভবনটি ভারতবর্ষে জর্জীয় রীতির সর্বাধিক সুরম্য অট্টালিকা হিসেবে টিকে আছে। আঠারো শতকের শেষার্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ স্থপতি রবার্ট এ্যাডাম কর্তৃক ১৭৫৯-৭০ সময়কালে নির্মিত ডারবিশায়ার কেডল্স্টন হলের নকশা-পরিকল্পনার ভিত্তিতে ও বাংলার আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর সযত্ন প্রয়াসে তিনি এর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রাসাদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয় ১৮০৩ সালে। ডারবিশায়ারের প্রাসাদে ব্যবহৃত বেলেপাথরের বিকল্প হিসেবে এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে রং করা পলেস্তরা। এতে রয়েছে প্রশস্ত বারান্দা, এবং দক্ষিণদিকে অর্ধবৃত্তাকার উদ্‌গত গাড়িবারান্দা ও স্তম্ভসারি, আর কেডল্স্টন প্রাসাদের দুই কোণের দুই প্যাভিলিয়নের স্থলে এটিতে চার কোণেই প্যাভিলিয়নের সংস্থান রাখা হয়েছে। আভ্যন্তর পরিকল্পনায় পূর্বোক্ত প্রাসাদের জাঁকালো একক সিঁড়ির স্থলে এটিতে মূল অংশের চারকোণার প্রত্যেকটিতে হাতলযুক্ত ছোট সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ছাব্বিশ একর ভূমির উপর পরিব্যাপ্ত এ অট্টালিকার প্রধান প্রবেশপথগুলোতে রয়েছে চারটি নব্য-ধ্রুপদী রীতির বিশাল ফটক, যা এর রাজকীয় আবহের পরিপোষক। সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষক হচ্ছে এর সুবিশাল বলরুমটি (নাচঘর), যা কাঁচ ও ঝাড়বাতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। উত্তরকালে কলকাতা নগরীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ অট্টালিকাটি এক জ্যোতিঃকেন্দ্রে পরিণত হয়।

টাউন হল, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হাউস, প্রধান ডাক কার্যালয় ও ভারতীয় যাদুঘর প্রভৃতি সরকারি অট্টালিকায় ইটের গাঁথুনির উপর সামুদ্রিক শম্বুকখোলজাত চুনকামের ব্যবহারসহ ধ্রুপদী স্থাপত্য ঐতিহ্য অনুসৃত হয়েছে।

সন্ত জনের ক্যাথেড্রালটির নকশা ১৮৪৭ সালে উইলিয়াম নায়ার্ন ফর্বস নামক একজন সামরিক প্রকৌশলী কর্তৃক প্রণীত হয় ইংলিশ উল্লম্ব গথিক রীতির ছাঁচে।[১০] বায়ুচলাচলের

৯. জর্জিয়ান স্থাপত্যঃ ইংল্যান্ডের আঠারো শতকের স্থাপত্য বোঝাতে ঢালাওভাবে ব্যবহৃত অভিধা। পাল্লাডীয় রীতি থেকে শুরু করে সমসাময়িক গথিক, চৈনিক ও নব্য-ধ্রুপদী রীতির প্রতি এর ঝোঁক লক্ষণীয়।

১০. ইংলিশ উল্লম্ব গথিক রীতি (English Perpendicular Gothic Style) ঃ চৌদ্দ শতকে ইংল্যান্ডে সূচিত ও পরবর্তী প্রায় দু'শতাব্দী ধরে প্রচলিত নির্মাণরীতি। এটি সরল উল্লম্ব দণ্ড ও আনুভূমিক দণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপসহ লম্বভাবে বিভক্ত সরু খেকনো ও জালি নকশাযুক্ত বৃহৎ জানালা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

অধিকতর সুবিধার্থে সঙ্গীতস্থল ও ট্রানসেপ্টের ল্যান্‌সেট্ (সরু ও তীক্ষ্ণাগ্র খিলানযুক্ত) গবাক্ষগুলো পীঠিকাতল পর্যন্ত নামিয়ে আনা হয়েছে, আর নেভ, খিলান ও পার্শ্ব-আইল এতে পরিহার করা হয়েছে। ১৮৮০ সালে বার্ন জোনস-এর নকশাঙ্কিত পশ্চিম দিকের রঙিন কাঁচযুক্ত জানালাটি এ গির্জার সর্বাধিক সুদৃশ্য বৈশিষ্ট্য।

পূর্ববাংলার স্নায়ুকেন্দ্র ঢাকা ইতিমধ্যে তার গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং কলকাতার স্থাপত্যসমারোহের সাথে তুলনায় ঢাকার অট্টালিকাদি কোনরকম সমকক্ষতার যোগ্যতা বহন করে না। বাহাদুর শাহ পার্কের উত্তরে জনসন সড়কস্থ সন্ত থমাসের এ্যাংলিকান গির্জার নির্মাণকাজ ১৮১৯ সালে সমাপ্ত হয় এবং ১৮২৪ সালে এতে উপাসনার উদ্বোধন করেন বিশপ হেবার (ছবি ২৪)। এর অলিন্দ, খাঁজকাটা (crenellated) প্যারাপেট, ঘটিকা বুরুজ ও গথিক খিলানগুলো বাহ্যত ইংল্যান্ডের যাজকপল্লীর গির্জারই অনুরূপ। মূল হলঘর এবং উত্তর ও দক্ষিণের ঢালু বারান্দার ছাদ কড়িকাঠের উপর সংস্থাপিত, হলঘরের অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত সুসমঞ্জস এবং সব কিছু ছাপিয়ে দৃশ্যমান হয়ে রয়েছে খাঁজকাটা স্তম্ভ দু'টি—যাদের উপর কোনরকম ভার আরোপিত হয় নি। বেদিটি পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এটি বাংলাদেশের সকল গির্জার মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী।

মুগল ও ইউরোপীয় উপাদানের পরীক্ষামূলক সমন্বিত প্রয়োগের ফলে গজিয়ে উঠে এক শঙ্কর নির্মাণশৈলী। এটি উপলব্ধি করা যায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে টাউন হল হিসেবে নির্মিত ওয়াইজঘাটের নর্থব্রুক হলটি দেখলে। ১৮৭২-৮৬ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের নামানুসারে এটির নামকরণ হয়। এর কোণাস্থিত গম্বুজবিশিষ্ট অষ্টকোণী চূড়া এবং অলঙ্কৃত প্যারাপেটের মতো মুগল উপাদান ভবনটির বহিরঙ্গে ধরে রাখার এক বিপুল প্রয়াস এতে লক্ষণীয় (ছবি ২৫)। প্রবেশদ্বারের ত্রিখাঁজ খিলান মুসলিমপূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য। লাল ইষ্টকের বহির্গাত্রের জন্য এটি 'লালকুঠি' নামে পরিচিত এবং নদীতীর থেকে দেখতে এটি অত্যন্ত নয়নাভিরাম।

বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের তৈরি বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে ফরাশগঞ্জের বাকল্যান্ড বাঁধের উপর রূপলাল ও রঘুনাথ দাস ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক নির্মিত বাসভবনটি অতিশয় আকর্ষণীয় (ছবি ২৬)। ১৮৪০ সালে আরাতুন নামক ঢাকার জনৈক আর্মেনীয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তাঁরা ভূমি ক্রয় করেন এবং কলকাতার মার্টিন কোম্পানিকে স্থপতি নিযুক্ত করেন। দ্বিতল এ অট্টালিকার নদীমুখী সদরাঙ্গন ৯১.৪৪ মিটার দীর্ঘ। এটি দু'ভায়ের মধ্যে অসম দু'টি অংশে বিভক্ত হয়। রূপলাল দাসের মালিকানাধীন বৃহত্তর পশ্চিমাংশ ইংরেজি বর্ণ 'E'র আকৃতিবিশিষ্ট এবং এর তিনটি বাহুই উত্তর দিকে উদ্‌গত। প্রধান গাড়িবারান্দাটি মধ্য বাহুতে অবস্থিত এবং মূল ভবন থেকে এটি ১৮.২৮ মিটার দূরত্বে অভিক্ষিপ্ত। এটিতে রয়েছে কোরিন্থীয় রীতির খাঁজকাটা স্তম্ভসারি ও একটি ত্রিকোণী উপরিকাঠামো (পেডিমেন্ট)। এর অভ্যন্তরে রয়েছে কতগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এ্যাপার্টমেন্ট ও

একাধিক হলঘর। এগুলোর মধ্যে উপরতলার কেন্দ্রস্থিত হলঘরটি একটি 'নাচঘর' ছিল বলে অনুমিত হয়।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গজিয়ে উঠে নতুন এক অভিজাত বিত্তশালী শ্রেণী। পূর্ববর্তী মুগল যুগের যে জমিদারিগুলোর খাজনা অনাদায়ী ছিল এ শ্রেণীটি সেগুলো ক্রয় করে নেয়। এসব জমিদারিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন কলকাতায়। তবে গ্রামাঞ্চলে নিজ নিজ জমিদারিতে এদের প্রাসাদও ছিল। পাশ্চাত্য জীবনপ্রণালী নিয়ে এই নব্য সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের যে আচ্ছন্নতা তার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে তাদের উদ্যোগে নিষ্পন্ন স্থাপত্যে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ধ্রুপদী স্তম্ভ, উচ্চ পিপাযুক্ত ও সুবিন্যস্ত বাতায়নসারিবিশিষ্ট গম্বুজ, ত্রিকোণী উপরিকাঠামো (পেডিমেন্ট) অর্ধবৃত্তাকার রোমান খিলান, দু'ধারে কক্ষযুক্ত মূল ভবনাংশের কেন্দ্রস্থলে হলঘর ও হাতলযুক্ত সিঁড়ির ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নওয়াব আবদুল গণি কর্তৃক ১৮৭২ সালে ঢাকায় নির্মিত আহসান মঞ্জিল এ- শ্রেণীর অট্টালিকাসমূহের মধ্যে অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষক প্রাসাদ (ছবি ২৭)। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পুরনো ফরাসী কারখানার নির্মাণস্থলের উপর প্রতিষ্ঠিত এ-অট্টালিকাটি আখ্যায়িত হয়েছে নওয়াবতনয় আহসানউল্লাহর নামানুসারে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াব পর পরিবর্তিত রূপ ও আঙ্গিকে এটি পুনর্নির্মিত হয়। মূল ইমারতের রৌপ্যতারে কারুকার্যখচিত নকশাটি ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সুউচ্চ মঞ্চোপরি নির্মিত দ্বিতল এ ভবনটি নদীতীর থেকে এক রাশি ধাপযুক্ত জাঁকালো সোপানপথে অভিগম্য। দ্বিতীয় তলার তিন খিলানবিশিষ্ট প্রক্ষিপ্ত প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এ সিঁড়ির ধাপগুলো ব্যাপ্ত। প্রশস্ত স্তম্ভোপরি সুউচ্চ পিপাযুক্ত ও সুবিন্যস্ত বাতায়নসারিবিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য গম্বুজ প্রক্ষিপ্ত প্রবেশদ্বারের পশ্চাতে ঊর্ধ্বমুখী ধাবমান। নিচতলার পশ্চিম ও পূর্বভাগে রয়েছে যথাক্রমে একটি প্রশস্ত দরবারকক্ষ ও ভোজনকক্ষ। এতে আরো রয়েছে কয়েকটি এ্যাপার্টমেন্ট ও অতিথিকক্ষ। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুর তাঁকে এ প্রাসাদে আতিথ্য প্রদান করেন।

ধনাঢ্য লবণব্যবসায়ী গোবিন্দ রাম সাহার পরিবার কর্তৃক মানিকগঞ্জে নির্মিত বলিয়াটি প্রাসাদ ও ১৮৩৮ সালে জমিদার কালি নারায়ণ কর্তৃক জয়দেবপুরে নির্মিত ভাওয়াল প্রাসাদও সুস্পষ্ট নব্য-ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। বাংলাদেশে জমিদার শ্রেণী কর্তৃক নির্মিত সামন্তযুগীয় অন্যান্য প্রাসাদগুলো হচ্ছে রাজশাহী শহরের আঠারো মাইল পূর্বে অবস্থিত পুঠিয়া প্রাসাদ, নাটোরের অদূরে অবস্থিত ও বর্তমানে উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত দিঘাপতিয়া প্রাসাদ; নারায়ণগঞ্জের মুড়াপাড়া প্রাসাদ; পাবনা শহরে মহাসড়কের পাশে অবস্থিত ও বর্তমানে সরকারি কার্যালয়রূপে ব্যবহৃত 'তাড়াস রাজবাড়ী'; ময়মনসিংহ শহরের ১৯ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত 'মুক্তাগাছা প্রাসাদ', যেটি বর্তমানে মুক্তাগাছা

মহাবিদ্যালয় ও একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়রূপে যুগপৎ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং গনিপুর প্রাসাদ, যা শহর থেকে উনিশ কিলোমিটার পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর তীরে অবস্থিত এবং উপজেলা থানা সদর দপ্তররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ শতক

ধর্মীয় ইমারত

মসজিদ ও মন্দির এই উভয় প্রকার ধর্মীয় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে যে মন্দা পরিলক্ষিত হয় তা বিপুল সংখ্যক ভারতীয়ের ধর্মভাবমুক্ত ঐহিক (secular) শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য ব্যবস্থা গ্রহণেরই ফল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকালে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বৃটিশের ভারতত্যাগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ততোদিনে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ অভীষ্টের প্রশ্নে পুরোমাত্রায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের উপর জোর দিতে থাকে এবং বৃটিশদের ভারতত্যাগের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পূর্বতন পূর্ব বাংলা এসময়ে পূর্ব পাকিস্তান নামে খ্যাত হলো এবং ঢাকা এ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পেলো।

মুসলিম লীগ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভরা জোয়ারের কালে ১৯৪২ সালে কলকাতায় নির্মিত হয় নাখোদা মসজিদ (ছবি ২৮)। জনাকীর্ণ শহুরে এলাকায় অবস্থিত প্রকাণ্ড চারতলা ইমারত এটি। সদর প্রাচীর শ্বেত মর্মর ও লোহিত বেলেপাথরে গাঁথা এই ইমারতটি এককালে গোটা ভারতে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক একাধিপত্যশালী মুগলদের স্থাপত্যিক ঐতিহ্যকীর্তির সচেতন পুনঃপ্রবর্তন প্রমাণ করে, এবং বঙ্গীয় বলে সনাক্ত করা যায় এমন যেকোন উপাদান এতে পরিত্যক্ত হয়। এর খিলানযুক্ত মনোরম পিশ্‌তাক (প্রকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত প্রবেশদ্বার)-এর উভয় পার্শ্বে রয়েছে দ্বৈতখিলানের চতুর্ধাপ ফাসাদ। প্যারাপেট শোভাবর্ধক কানজুরা নকশামণ্ডিত এবং এর ঊর্ধ্বভাগে পিশ্‌তাকের নিমগ্ন স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত হয়েছে গম্বুজযুক্ত ছত্রী। এর প্রতি তলার মেঝে কিবলা প্রাচীর পর্যন্ত পূর্ণভাবে বিস্তৃত নয় বলে এর সুবৃহৎ মূল মিহরাবটি প্রতি তলা থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও পরবর্তীকালে একে ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্যতম অংশহিসেবে এর চিহ্নিত হওয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ১৯৪৭ সালের পরে এ দেশে নির্মিত বহুসংখ্যক মসজিদের মধ্যে যেটিতে এসব ভাবাদর্শের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে সেটি হলো ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থলে নির্মিত বায়তুল মোকাররম মসজিদ, যা এ নগরীর বৃহত্তম মসজিদও বটে (ছবি ২৯)। ষাটের দশকে নির্মিত এ দ্বিতল ইমারতের নিচতলা একটি ব্যস্ত বিপনিকেন্দ্র। উপর তলায় অবস্থিত মূল মসজিদটি ঘনক্ষেত্রের আকৃতিবিশিষ্ট এবং মক্কার বায়তুল হারাম কাবাগৃহের একটি সচেতন নকল বা অনুকৃতি।

মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির শিল্পকর্মের ব্যবহার বর্তমান শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত চালু থাকে, যদিও পূর্ববর্তী শতকের মধ্যভাগ থেকেই এর বদলে বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল অধিকতর সস্তা দামের আস্তর (stucco)-এর শিল্পকর্ম। সহসাই এর একচ্ছত্র বিকল্প হিসেবে কংক্রিট ও ইস্পাতের প্রচলন শুরু হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইষ্টকনির্মিত পুরনো মন্দিরগুলো পরবর্তীকালীন কংক্রিট সংযোজনের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। তবুও অবক্ষয়ের বছরগুলোতেও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুরে মন্দির নির্মাণ কর্মকাণ্ড অধিক মাত্রায় অব্যাহত থাকে এবং চালা, রত্ন ও দালান রীতির বেশ কিছু সংখ্যক মন্দির এ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলোতেও নির্মিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে যে গ্রিক স্মৃতিসৌধটি আজো বিদ্যমান সেটি সন্ত থমাস গির্জার যাজক জে. এম. ম্যাকডোনাল্ডের উদ্যোগে ১৯১৫ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয় (ছবি ৩০)। সরকারি স্থপতি প্রাচীন গ্রীসের ডরিক রীতির সর্বাঙ্গসুন্দর একটি স্মৃতিসৌধ হিসেবে এ ইমারতটির একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রণয়ন করেন। এটি বর্গাকার ও সমতল ছাদযুক্ত। এর চতুর্দিকে বহির্দেয়াল প্রক্ষিপ্ত এবং একমাত্র প্রবেশদ্বারটি রয়েছে পূর্ব প্রাচীরে। আজো এর প্রাচীরে দৃঢ় সংযুক্ত রয়েছে ন'টি সমাধি-প্রস্তরফলক।

ক্যাথোলিক খৃস্টানদের বর্তমান উপাসনালয় সন্ত মেরির ক্যাথেড্রালটির নকশা প্রণয়ন করেন জনৈক কানাডীয় স্থপতি। আর্চবিশপের কাকরাইলস্থ বাসভবনের পাশে এটি নির্মিত হয় ১৯৫০-এর দশকে।

ঐহিক (secular) ইমারত

গণস্বার্থে ব্যবহারোপযোগী একরাশি অট্টালিকাও এ সময়ে নির্মিত হয়। ইঙ্গ-ভারতীয় কলা ও প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণার্থে যাদুঘর হিসেবে ব্যবহারের জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মারক হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। মধ্য গম্বুজের নিচে রানী ভিক্টোরিয়ার একটি মর্মরমূর্তি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা স্থিরীকৃত হয়। লর্ড কার্জন এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দেন যে, কলকাতার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে 'ধ্রুপদী' বা 'রেনেসাঁ' রীতি আবশ্যক। কেননা উৎসগতভাবে কলকাতা ইউরোপীয় নগরী হওয়ায় এখানকার সব মুখ্য ইমারতই দৃশ্যত ধ্রুপদী রীতিতেই নির্মিত হতে হবে। মাকরানী মর্মর পাথর এ ইমারতটিতে ব্যবহৃত হয়। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে ওয়েলস-এর যুবরাজ এটির উদ্বোধন করেন। এর কোণস্থিত গম্বুজগুলো মুগল রীতির ক্ষীণ ছাপযুক্ত এবং তৎকালীন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম বলে স্বীকৃত। এর মুখ্য গম্বুজটির শীর্ষে শোভা পায় ব্রোঞ্জে নির্মিত ঘূর্ণায়মান বিজয়দূত। এর ঠিক নিচেই স্থান পেয়েছে বালিকাবেশে রানী ভিক্টোরিয়ার একটি মূর্তি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা পুনরায় স্বল্প সময়ের জন্য সরকারি মনোযোগ লাভ করে। রমনা এলাকাটিকে

পরিপাটি করে রাজধানীর ভাবমূর্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যুৎসই একগুচ্ছ ইমারত এখানে নির্মাণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে বৃহত্তম ইমারতটি হচ্ছে কার্জন হল। ১৯০৪ সালে স্বয়ং লর্ড কার্জন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (ছবি ৩১)। মূলত একটি নগরভবন (town hall) হিসেবে নির্মিত হলেও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের পর এটিকে ঢাকা কলেজের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এটিকে তার বিজ্ঞান শাখার অঙ্গীভূত করা হয়। লোহিত ইষ্টক বর্ণের এ দ্বিতল অট্টালিকার মধ্যস্থলে রয়েছে একটি সুবৃহৎ হলঘর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দুই প্রান্তে রয়েছে দু'টি সংযুক্ত প্রান্তভাগ। সবদিকে টানা বারান্দা সম্বলিত এ ভবনের উত্তর দিককার অভিক্ষিপ্ত ফাসাদে রয়েছে অশ্বক্ষুরাকৃতি এবং বহুপত্র খিলান। গম্বুজযুক্ত ছত্রীবিশিষ্ট সংযুক্ত পিলাস্টার, ঠেকনো (bracket)-এর উপর সংস্থাপিত ছাঁইচ ও শোভাবর্ধক ইষ্টক-কারুকর্মের সমাহার থাকায় ইউরোপীয় ও মুগল রীতির এক অপূর্ব মধুর সমন্বয় এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ফতেহপুর সিক্‌রি যে এর প্রেরণার উৎস তা সহজেই বোধগম্য হয়। কার্জন হলের প্রক্ষিপ্ত প্রবেশপথের সাথে ফতেহপুর সিক্‌রির দিওয়ানে খাস বলে পরিচিত ইমারতটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নতুন রাজধানী হিসেবে ঢাকার প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মুগলদের মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও সহিষ্ণু শাসক হিসেবে বিবেচিত সম্রাট আকবরের ফতেহপুর সিক্‌রিতে রাজধানী স্থানান্তরের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। ১৮৭২ সালে নির্মিত নর্থব্রুক হলে যেসব লক্ষণ গোচরীভূত হয়েছিল, সেগুলো এটিতে এসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বৃটিশদের উদ্যোগে বিকশিত যে শঙ্কর নির্মাণরীতি, তা এ সুরম্য অট্টালিকায় সর্বোৎকৃষ্ট পরিণতি লাভ করে।

কার্জন হলের বিপরীত দিকে অবস্থিত পুরনো হাইকোর্ট ভবনটি নির্মিত হয় এর অব্যবহিত পরেই এবং গভর্নমেন্ট হাউস বা লাটভবন হিসেবেই এটি পরিকল্পিত হয়েছিল (ছবি ৩২)। এটি প্রধানত ইউরোপীয় রেনেসাঁ রীতিতে নির্মিত।[১১] এর ফাসাদের ত্রিকোণী উপরিকাঠামোটি (পেডিমেন্ট) কোরিন্থীয় রীতির স্তম্ভের উপর অধিস্থাপিত এবং এর গম্বুজটির অবলম্বন হচ্ছে বৃত্তাকারে বিন্যস্ত পিল্‌পা ও স্তম্ভরাজি।

একটি ছাত্রনিবাস হিসেবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলটি নির্মিত হয় ১৯২৯ সালে। এটি সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস একটি দ্বিতল ইমারত, যার অভ্যন্তর আঙিনার চতুর্দিকে রয়েছে টানা বারান্দা। এর মূল প্রবেশদ্বারটি অবস্থিত দক্ষিণদিকে এবং হরিদ্রা বর্ণের গম্বুজযুক্ত দু'টি চৌকো বুরূজের মধ্যস্থলে এর অবস্থান।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা-উত্তরকালে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায় এখানে এক জমজমাট নির্মাণোদ্যোগ লক্ষগোচর হলেও তৎপূর্ববর্তীকালের ইমারতগুলোর

---

১১. ইউরোপীয় রেনেসাঁঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইউরোপীয় স্থাপত্য যা গথিক রীতির বিপরীত ধ্রুপদী স্থাপত্যের বিধি-নিয়ম পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়াসী। ইতালির বাইরে এ রেনেসাঁ শৈলী ইতালীয় রেনেসাঁ মটিফ অবলম্বন করে তাকে গথিক রীতির স্থলাভিষিক্ত করে।

ভাবগাম্ভীর্য ও সৌকর্যের সমকক্ষ হওয়ার মতো কিছুই নেই এ সময়ে নির্মিত অট্টালিকারাজির মধ্যে। সরকারি গণপূর্ত বিভাগের (পি.ডব্লিউ. ডি) উদ্যোগে নির্মিত আবাসিক ও অফিস ভবনগুলোর নির্মাণপরিকল্পনায় কোনরকম সৌন্দর্যচেতনা অনুপস্থিত এবং স্বল্পতম ব্যয়ে সর্বাধিক স্থান সঙ্কুলানের মূর্তিমান প্রয়াস হচ্ছে এসব উপযোগবাদী ভবন। নির্মাণশিল্পে ম্রিয়মাণ এ যুগে প্রথমবারের মতো স্থাপত্যমানসম্পন্ন যে একমাত্র ইমারতটি ১৯৫৩ সালে নির্মিত হয় সেটি হলো বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট (ছবি ৩৩)। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাগ্রগণ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থপতি মাযহারুল ইসলাম এটির নকশা প্রণয়ন করেন। এতে সমকালীন আন্তর্জাতিক স্থাপত্যবিধিসম্মত কাঁচ ও কংক্রিট উপাদানের সমন্বিত প্রয়োগ ঘটানোর ফলে ঢাকার অন্যান্য সর্বত্র পরিদৃষ্ট ব্যারাকসদৃশ ইমারতরাজির তুলনায় এর উন্মুক্ত নকশা-পরিকল্পনা ছিল একটি উৎসাহব্যঞ্জক ব্যতিক্রমী পরিবর্তন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের শহীদানের স্মৃতি সংরক্ষণার্থে নির্মিত যথাক্রমে শহীদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ হলো বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি ঘটনার স্মারক (ছবি ৩৪ ও ৩৫)। এগুলো দেখতে বিশাল ভাস্কর্য সদৃশ হওয়ায় এবং এগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে গণশিল্পে নানারূপে এগুলো অনুকৃত হয়েছে। ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী যে স্থানে ভাষা আন্দোলনে বিক্ষোভকারিগণ পুলিশের গুলিতে নিহত হন, ঠিক সে স্থানেই শহীদমিনারটি অবস্থিত। শিল্পী হামিদুর রহমান ও নভেরা আহমেদ অঙ্কিত মূল নকশার স্মৃতিসৌধটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়। স্বাধীনতা- উত্তরকালে মূল নকশা-পরিকল্পনার আদলে এটি বৃহদাকারে পুনর্নির্মিত হয় এবং বর্তমানে এটি একটি নগরচত্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। এর মঞ্চোপরি বিন্যস্ত হয়েছে কংক্রিট ও ইস্পাত সমন্বয়ে তৈরি তিনটি খাড়া অবয়ব। তন্মধ্যে মধ্যমটি দু'পাশের দু'টি দণ্ডের চেয়ে বৃহত্তর। মঞ্চে আরোহণের পথে রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী জমকালো সোপানশ্রেণী। স্থপতি সৈয়দ মঈনুল হোসাইনের নকশা-পরিকল্পনায় নির্মিত সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধটি একটি উদ্যানপরিমণ্ডলে অবস্থিত। কংক্রিটে নির্মিত এ বিশাল ভাস্কর্যটি ক্রমহ্রাসমান সমতল ক্ষেত্র সমন্বয়ে গঠিত। ভিত হতে ঊর্ধ্বমুখী উন্নীত বলে এটিকে সুউচ্চ পর্বতসদৃশ মনে হয়।

মার্কিন স্থপতি লুই কান-এর নকশা-পরিকল্পনায় নির্মিত শেরেবাংলা নগরস্থ সংসদ ভবনটি বাংলাদেশের প্রকাণ্ডতম ইমারত। পঞ্চাশের দশকে সূচিত হলেও এটির নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় এবং অবশেষে ১৯৮৪ সালে এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। ১৯৮৯ সালে এটি স্থাপত্যের জন্য আগা খান পুরস্কার লাভ করে। দ্বীপসদৃশ সলীল আবহ পরিমণ্ডলে উৎসারিত এ অসাধারণ কমপ্লেক্সটি ভরাট ও ফাঁকা এবং সমতল ও বক্রতল—এ উভয় শৈলীর সমন্বিত প্রয়োগবিশিষ্ট জমকালো অট্টালিকা। ভবনের প্রতিচ্ছবি উৎপাদক জলাধারটি এবং উন্মুক্তাঙ্গনের সাথে ঘনমান আয়তনের সুসমন্বয় এর

স্থপতির পক্ষে মুগল স্থাপত্যের সুগভীর উপলব্ধির প্রমাণ বহন করে, যদিও উক্ত স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের চিরায়ত বিধিসম্মত কোন উপাদান তিনি এতে প্রয়োগ করেন নি। এ উপলব্ধি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে অট্টালিকার অঙ্গীভূত মসজিদটিতে, যেখানে মসজিদস্থাপত্যের ঐতিহ্যের কোনরূপ উল্লেখ ছাড়াই প্রার্থনার একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্রকলা

আঠারো শতক

বাংলার চিত্রকলায় দু'টি ধারা প্রবহমান—লৌকিক ও দরবারি চিত্রশিল্প। লোক চিত্রশিল্পের ধারাটির শেকড় প্রোথিত রয়েছে বলিষ্ঠ অতীত ঐতিহ্যে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বুদ্ধ সম্পর্কিত জাতক কাহিনীগুলো চিত্রায়নের জন্য গোটানো পট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। মৃত্যুদেবতা যমের হাতে পুরস্কৃত ও দণ্ডিত হওয়ার ঘটনার চিত্রায়ন যে পটুয়া বা ভ্রাম্যমাণ চিত্রকরদের দ্বারা সম্পাদিত হতো, তার একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায় বাণরচিত সপ্তম শতকের *হর্ষচরিত*-এ। রাম, কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের কাহিনীও ভ্রাম্যমাণ চিত্রপ্রদর্শনীর বিষয়ভুক্ত ছিল। আর এসব ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ছবিগুলোর চিত্রায়ন এবং কাহিনীর ধারাবর্ণনা প্রায়শই একই ব্যক্তি কর্তৃক নিষ্পন্ন হতো।[১২]

মুসলিমদের মধ্যে গাজীর কিস্‌সার চিত্রিত রূপ 'গাজীর পট' আবির্ভূত হয় পনেরো শতক থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গাজী হচ্ছেন সুন্দরবনের কাঠুরে ও মৌ-চাষীদের রক্ষক সিদ্ধপুরুষ। বাঘের পিঠে সওয়ার অবস্থায় তাঁকে সাধারণত চিত্রিত করা হয়। কথিত আছে যে, উড়িষ্যা ও কামরূপের রাজাদের পরাস্তকারী সুলতান রুকন-আল-দীন বারবক শাহের সেনাপতি শাহ্ ইসমাইল গাজীই হচ্ছেন 'গাজীর পট' চিত্রকর্মের মূল নায়ক। যাদু-পটুয়া অর্থাৎ যাদু-পটের চিত্রকরগণ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন সাঁওতাল ও বেদীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং এ কথা মনে করা হতো যে তাঁদের ছবিতে মৃত ব্যক্তির চোখচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে তারা তাকে দৃষ্টিদান করতে পারতেন এবং এরই ফলে মৃত ব্যক্তি নিজেই স্বর্গের পথ খুঁজে নিতে পারতো।

প্রাচীনতম পটগুলো অঙ্কিত হতো কাপড়ের উপর এবং পরবর্তীকালে কাপড়ে সাঁটা কাগজে। বেলফল বা তেঁতুল বীজের আঠা ও ইষ্টকচূর্ণ দিয়ে তৈরি পটভূমিতে ব্যবহৃত হতো উদ্ভিজ্জ বা খনিজ প্রাকৃতিক রঞ্জক। গোটানো পটগুলো সাধারণত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ১/২

---

১২. Andrew Topfield 'Painting' in Robert Skelton and S. Mark Francis (ed.), Exhibition Catalogue *Arts of Bengal, The Heritage of Bengal and Eastern India* (London 1977), 34-38; Tofail Ahmed 'The Art of the Patuas' in কারুশিল্প পুরস্কার ১৯৮৯ (বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ, ঢাকা), ১-৬।

থেকে ৯ মিটার ও প্রস্থে প্রায় ১ মিটার পরিমাপের হতো। আনুমানিক ৩০×১৮ সে. মি. দৈর্ঘ্য-প্রস্থের ক্ষুদ্র চৌকো পটের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল কলকাতার কালিঘাটের পটুয়াদের। উজ্জ্বল রঙিন ক্ষেত্রের চতুর্দিকে ভারী, পুরু বেষ্টনীরেখা ও ইষ্টকচূর্ণ ব্যবহারের ফলে প্রায়শই স্বাভাবিক লাল রঙের উজ্জ্বল পশ্চাদপটের উপরে অঙ্কিত ছবি ছিল তাঁদের অঙ্কনশৈলীর মূল লক্ষণ, যা পশ্চিম ভারতীয় রাজপুত. রীতির চিত্রকলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কালিঘাটের পটুয়ারা এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হন এবং তারা প্রায় শতাব্দীকাল সক্রিয় থাকেন।* শক্তিদেবীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত একান্নটি পবিত্র পীঠের অন্যতম হিসেবে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত কালিঘাটের ক্রমোন্নতির সমকালীন ছিল তাদের জনপ্রিয়তা। এ নগরীর ক্রমসম্প্রসারণ ও তীর্থযাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি এদিকে আসতে আকৃষ্ট করে পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের পটুয়াদের। কাদামাটি ও কাঠ দিয়ে দেব-দেবীর মূর্তিগড়া ও পুতুল তৈরির পাশাপাশি এঁরা কাপড় ও হস্তনির্মিত কাগজের গায়ে দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন। এভাবে উন্মেষকালে 'কালিঘাট রীতি' লোকঐতিহ্যের একটি শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর মুখ্য গুণ ছিল রেখা প্রয়োগের সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা।

দরবারি ধারার চিত্রকলার ক্ষেত্রে বলতে হয় যে, বাংলায় পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নের ঐতিহ্য খৃস্টীয় দশম শতকে চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপির মতোই সুপ্রাচীন এবং দ্বাদশ শতকে বাংলায় পাল রাজবংশের পতনের পরও তা নেপাল ও তিব্বতে প্রবহমান থাকে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বেশিরভাগ সময়েই দিল্লীর প্রভাবমুক্ত বাংলার মুসলিম সুলতানদের স্বাধীন শাসনামলে চিত্রায়িত একমাত্র পাণ্ডুলিপি *ইসকান্দারনামা* বা *আলেকজান্ডার* রোমান্সটি এখনো টিকে আছে। গৌড়ের সুলতান নুসরাত শাহের উদ্দেশ্যে ১৫৩১-৩২ সালে প্রস্তুতকৃত ও বর্তমান বৃটিশ যাদুঘরে সুরক্ষিত এ পাণ্ডুলিপিটির চিত্রায়নে পারসিক প্রভাব প্রকটভাবে লক্ষণীয়।

বাংলায় মুগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেবল আঠারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদই একটি সুস্পষ্ট মুগল প্রাদেশিক রীতির চিত্রকলা মুর্শিদাবাদে লক্ষ্যগোচর হয়, যদিও সতেরো শতকে ঢাকার মুগল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভাব্য দিকটি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ১৭০৭ সালে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীতে মুগল শক্তির দ্রুত অবক্ষয়ের যুগে শাহী দরবারের চিত্রকরগণ চাকুরির খোঁজে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। এ সময়ে মুর্শিদাবাদ একটি প্রাদেশিক রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা কঠোর আত্মসংযমী মুর্শিদকুলী খান বা তাঁর পৌত্র ও উত্তরাধিকারী সরফরাজ খান চিত্রশিল্পের কোন পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি।

---

* Tofail Ahmed 'The Art of the Patuas' in কারুশিল্প পুরস্কার ১৯৮৯।

কেবল আলিবর্দী খানের শেষ ক'বছরের শাসনকালে মারাঠা আক্রমণের হুমকি অপসৃত হওয়ার পরই অর্থাৎ ১৭৫০ সাল থেকে শুরু করে ১৭৫৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একটি জমজমাট চিত্রকলার অস্তিত্বের সপক্ষে সাক্ষ্য মিলেছে। তাঁর সময়ের চিত্রকর্মে দরবারি জীবনযাত্রার নানা দিক যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রতিকৃতিও চিত্রিত হয়েছে। এসব চিত্রকর্মে প্রায়শই পুরুষোচিত কর্মানুশীলনের প্রাধান্য লক্ষণীয়। তবে অঙ্কনশৈলী ছিল রূঢ় ও আঙ্গিকসর্বস্ব এবং ধূসর ও সাদা রঙের ব্যবহার এতে প্রাধান্য পেয়েছে।[১৩]

হারেম দৃশ্যাবলীর চিত্রায়ন ও চিত্রিত রাগমালার আবির্ভাব ঘটে আলিবর্দীর শাসনের চূড়ান্ত লগ্নে এবং তাঁর তরুণ দৌহিত্র ও দরবারে প্রভাবশালী সিরাজউদ্দৌলার উদ্যোগেই সম্ভবত এর সূচনা ঘটে। মুর্শিদাবাদে চিত্রশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সিরাজউদ্দৌলার প্রায় এক বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী আমলের সাড়ম্বর কৃত্রিম অঙ্কনরীতির স্থলে এ সময়ে প্রাণবন্ত উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার সমাদৃত হয় এবং সুকোমল গঠন (modelling) ও শিথিল রেখার ব্যবহারে ছবির প্রাণবন্ততা বৃদ্ধি পায়। নারীনেত্রের ঊর্ধ্বমুখী বাঁক রাজপুত চিত্রকলার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। আর দিকচক্রবালের প্রান্তঘেঁষা তমসাঘেরা পিণ্ডাকৃতির ঝোপঝাড় মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। রাগমালার দ্বিতীয় আরেক পুঞ্জ চিত্রকর্ম অধিকতর রক্ষণশীল প্রকৃতির এবং এতে সযত্নে চিত্রিত খুঁটিনাটি ও মৃদু-কোমল রঙের ব্যবহার আলিবর্দীর শাসনকালের দিকে এর পশ্চাদ্মুখিতা সপ্রমাণ করে।[১৪] মানবমূর্তিচিত্রণে এক ধরনের স্থূলতা লক্ষ্যযোগ্য হয়। এসময়ে মুর্শিদাবাদে আগত লাখনৌ-শিল্পীদের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় কিছুসংখ্যক চিত্রকর্মে চটকদার রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে। আলিবর্দীর আমলে প্রচলিত ফ্যাকাশে রঙ ব্যবহারের সুস্পষ্ট রীতির অনুসরণে এ সময়ে নওয়াব ও আমলাদের প্রতিকৃতি চিত্রায়নের পাশাপাশি এক শ্রেণীর হিন্দু জমিদার ও তাঁদের আমলাদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর চিত্রকর্মও তৈরি হয়। দীপচান্দ এ যুগের একজন খ্যাতনামা চিত্রকর ছিলেন।

১৭৬৩ সালে মীর কাশিমের পলায়ন ও ক্ষমতায় মীর জাফরের পুনরাধিষ্ঠানের সাথে সাথে চিত্রকলার অবনতি সূচিত হয়। কেননা তিনি এবং তাঁর নামসর্বস্ব উত্তারাধিকারীগণ এর সযত্ন লালনে কোনরকম মনোযোগ দেন নি। পরবর্তীকালে চিত্রকরগণ চাকুরির জন্য হয় হিন্দু জমিদারদের অথবা বৃটিশদের দ্বারস্থ হন। চিত্রকর্মে পৌরাণিক বিষয়াদি

---

১৩. Robert Skelton. "Murshidabad Painting", *Marg*, No. 1, Vol. X, Dec. 1956, 10-22. লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত মুর্শিদাবাদ রীতির আদিপর্বের চিত্রকর্মগুলোর নমুনা সংখ্যা হচ্ছে ডি ১১৯৯-১৯০৩ ও ডি ১২০১-১৯০৩।

১৪. The Johnson Collection, Vol. 36, India Office Library, London.

প্রাধান্যলাভ করে এবং হিন্দুদের দরবারে যে নতুন রীতি বিকাশলাভ করে, তা সমকালীন রাজস্থানী চিত্রকলার (যা হিন্দু দরবারে লালিত) সাথে তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ছিল না। বর্তমানে ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত বাদশাহ মুহম্মদ শাহের প্রতিকৃতির মতো অন্যান্য মুগল বাদশাহের প্রতিকৃতিগুচ্ছও এ সময়ে প্রস্তুত করা হয় (ছবি ৩৭)। যথার্থ মুর্শিদাবাদ রীতির বিকাশের সর্বশেষ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ছিল বাদামী রঙের পাতলা প্রলেপযুক্ত মাত্রাঙ্কিত মুখাবয়ব ও বেঁটেখাটো গঠন। বর্তমানে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস পাঠাগারে রক্ষিত *নলদময়ন্তীর* একটি ফার্সি অনুবাদের চিত্রিত পাণ্ডুলিপির ছবিগুলো দেখলে এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করা যায় (Ms. Pers. No. 2724, Ethe No. 1471)।

মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার আদিরীতির অবনতি ঘটলে সরাসরি ইউরোপীয় প্রভাবে গজিয়ে উঠে জলরঙ চিত্রকলার এক নতুন ধারা। ১৭৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে সূচিত এ ধারা বৃটিশ জনগোষ্ঠীঅধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বিকশিত হয় এবং 'কোম্পানি চিত্রকলা' অভিধায় এটি সাধারণভাবে পরিচিতি লাভ করে। ইতিমধ্যে বৃটিশ কর্তাকুলের বিত্ত-বৈভব কতিপয় বৃটিশ চিত্রকরকে আকৃষ্ট করে। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন টিলী কেট্‌ল। এঁরা অঙ্কন করেন প্রকাণ্ড তেলরঙ ছবি, যা ছিল ভারতীয় পরিবেশে নিতান্তই অভিনব। অন্যরা প্রস্তুত করেন ক্ষুদ্রকায় গজদন্ত প্রতিকৃতি বা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর জলরঙ তুলিচিত্র। উদাহরণস্বরূপ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় উইলিয়াম হজেসের চিত্রাবলী (Select Views, 1785-88) এবং থমাস ও উইলিয়াম ডেনিয়েলস-এর চিত্রকর্মসমূহ (Oriental Scenery, 1795-1808), যা অন্য সবগুলোর চাইতে অধিক সুপরিচিত।

ভারতীয় চিত্রকরগণ বৃটিশের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করলে দেয়ালে টাঙানোর উপযুক্ত ছবি ইউরোপীয় ঢঙে অঙ্কনের দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়। এঁদের হাতে প্রস্তুতকৃত প্রকাণ্ড মাপের চিত্রকর্মে পরিপ্রেক্ষিতচিত্রায়ন ও আলোছায়ার বিন্যাসে বেশ এক মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ দেশীয় চিত্রকরগণ এই নতুন বিদেশী অঙ্কনশৈলীর এতই বোদ্ধা ছিলেন যে, তাঁদের আঁকা চিত্রকর্মকে ইউরোপীয় চিত্রকর্ম থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য ছিল। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত মুর্শিদাবাদ ও লখনৌর জলরঙ দৃশ্যাবলী প্রসঙ্গত উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় (I. S. 11-1887)।

উনিশ শতক

পটের সাহায্যে গল্প বলার রেওয়াজ গ্রামাঞ্চলে অক্ষুণ্ন থাকে। এ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যখন মন্দিরই ছিল মুখ্য তীর্থকেন্দ্র, কালিঘাটের শহুরে পটুয়া তখন যথেষ্ট যশখ্যাতি অর্জন করে এবং নানা দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি ও বিক্রয় করে একটি বেশ লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে। বাংলার লোকঐতিহ্যমূলে দৃঢ়বদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ সময়ে

এদের শিল্পশৈলী ইউরোপীয় প্রভাব আত্মস্থ করতে থাকে (ছবি ৩৮)। কোম্পানিরীতির চিত্রকর্মের মতোই এ ছবিগুলোও কলে তৈরি কাগজের বড় খণ্ডের উপর জলরঙে চিত্রিত এবং আলোছায়ার যথার্থ প্রয়োগের সাথে দৃঢ় ও স্পষ্ট তুলিকর্মে সুসমন্বিত। চিত্রকর্মের উপজীব্য ছিল ধর্মভিত্তিক ও ঐহিক উভয়বিধ; আবার সময়বিশেষে চলমান ঘটনাবলীও এতে স্থান পেতো। নিমেষে চিত্রায়িত এসব ছবি বিক্রিও হতো নিতান্ত স্বল্পমূল্যে।

এ সময়ে কোম্পানিচিত্রকলার ধারা অব্যাহত থাকে এবং কলকাতায় বসবাসরত বৃটিশ নাগরিকদের জন্য চিত্রগুচ্ছ অঙ্কিত হয়। কলকাতার সর্বাধিক খ্যাতিমান চিত্রকর ছিলেন কররায়ার শেখ মুহম্মদ আমির ও ই. সি. দাস। ঢাকাস্থ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার নগরীর ঈদ ও মোহররম মিছিলের দুই কেতা জলরঙ চিত্র, যার মধ্যে একটি চিত্রশিল্পী আলম মুসাব্বিরের নামাঙ্কিত (ছবি শিল্পী নং ৩৯)। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আলোকচিত্রগ্রাহক যন্ত্রের (ক্যামেরা) আমদানির ফলে কোম্পানিরীতির চিত্রকর্মের বাজার মন্দীভূত হয়ে পড়ে।

চিত্রকলার প্রথম বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০ সালে মাদ্রাজে এবং শিল্পসংক্রান্ত একটি চারুকলা বিদ্যালয় (School for Industrial Arts) ১৮৫৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে গড়ে উঠে বোম্বাই ও লাহোরে। এসব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ফলিত কলা ও নকশাঙ্কনবিদ্যার কারিগরি ও পরিকল্পনাগত মানোন্নয়ন এবং রপ্তানিযোগ্য কলা-পণ্য উৎপাদন করা। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যভিত্তিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে নেমে আসে সর্বকালের অধোগতি। প্রকল্পটি তেমন বেশি কিছু সার্থকতা অর্জন করে নি। কারণ, এরই ফসল পাশ্চাত্য রীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে চিত্রকর শ্রেণী তাদের কর্মসংস্থান ছিল নিতান্ত দুঃসাধ্য।

এসব শিল্পীরই একটি দল কলকাতায় গড়ে তোলে একটি সমবায়ী প্রতিষ্ঠান, যার নাম ছিল 'দ্য ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'। এ চিত্রশালা প্রস্তুত করে হিন্দু দেবদেবীর হাতে রং করা লিথোগ্রাফ (খোদাই করা প্রস্তর হতে ছাপানো ছবি)। এসব ছবির চিত্রকল্প রেনেসাঁ ও ব্যারক আদর্শেরই সচেতন অনুকরণ। কালিঘাটের পটুয়াদের সাথে স্বল্পকাল স্থায়ী প্রতিযোগিতার অব্যবহিত পরেই তারা সহসা মার খায় অধিকতর সস্তা ক্রমো (রঙিন) লিথোগ্রাফ ছবির সাথে প্রতিযোগিতায়। এসব ছবি ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয় এবং পরবর্তীতে খোদ কলকাতায় তৈরি হতে থাকে। রঙিন ছাপচিত্রের ব্যাপক যান্ত্রিক উৎপাদনের ফলে কাঠখোদাই চিত্রকরদের সস্তা ছাপচিত্রের বাজারও খতম হয়ে যায়। এই শিল্পীরা ছিল স্বর্ণকার জাতিভুক্ত আর কালিঘাটের পটুয়াদের মতো এরাও ধর্মভিত্তিক ও ঐহিক বিষয়াবলীর চিত্র সযত্নে অঙ্কন করতো।

লিপিকলার (calligraphy) পৃষ্ঠপোষকতা করতেন মুসলিমগণ। এঁদের মধ্যে গোঁড়া মতবাদীরা নিজেদের বাড়িঘরে মূর্তি বা মূর্তির ছবি রাখতেন না। লিপিকলার চর্চা উনিশ

শতকে যে কী বিস্তৃত পরিসরে সংঘটিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত লিপিকলার বেশ কিছু উৎকৃষ্ট নমুনা থেকে (ছবি ৪০)।

কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে ১৮৯৬ সালে ই. বি. হাভেলের নিযুক্তি ছিল এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যে ক'জন ব্যতিক্রমী ইংরেজ সজ্জন উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজি ভাবধারায় ভারতকে দীক্ষিত করার নীতি ভ্রমাত্মক এবং ভারতীয় জীবনবোধই ভারতীয় কলা শিক্ষায়তনগুলোর অযথা পাশ্চাত্যপ্রীতির স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত—হাভেল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইউরোপীয় ধাঁচ অনুকরণের রেওয়াজ তিনি বিলুপ্ত করেন এবং এতদ্‌বিষয়ে তিনি এও শর্তারোপ করেন যে, বৃটিশদের আগমনপূর্ব যুগের ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকেই ভারতীয় চিত্রকরদের ফিরে যেতে হবে।[১৫]

বিশ শতক

ভ্রাম্যমাণ চিত্রপ্রদর্শনীর সংগঠক গ্রামীণ পটুয়া সম্প্রদায় বর্তমানে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এ ব্যাপারে এক অনুসন্ধান চালিয়ে বাংলাদেশ কারুশিল্প পরিষদ মুন্সীগঞ্জের কালিন্দীপাড়ায় খুঁজে পেয়েছে সুধীর চন্দ্র আচার্য নামের একজন পট-শিল্পীকে যার 'গাজীর পট' চিত্রকর্মের জন্য তাঁকে ১৯৮৯ সালের কারুশিল্পী পুরস্কারে বিভূষিত করা হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষগণও ছিলেন পটুয়া। ছবি আঁকার কাজে তিনি ব্যবহার করেন প্রথাসিদ্ধ গামছা-ক্যানভাস ও প্রাকৃতিক রঙে চোবানো তুলোর সলতের তুলি।

১৯০৫ সাল থেকেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং হাভেলের একজন যথার্থ শিষ্য হিসেবে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত ভারতীয় চিত্রকলার উপজীব্য হতে হবে ভারতেরই ঐতিহ্যানুগ এবং অজন্তা, মুগল প্রভৃতি পূর্ববর্তী চিত্ররীতির কৌশলাদির ব্যবহার এর পক্ষে অপরিহার্য। চিত্রশিল্পে তিনি প্রবর্তন করেন নব্যবাঙালি ধারা, যা ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত চিত্রকলায় সনাতনী আচারনিষ্ঠ ধারারূপেই টিকে থাকে। তবে এ ধারার পাশাপাশি আরেকটি স্বতন্ত্র ধারায় বিশ্বাসী শিল্পীগোষ্ঠীর মতে, যুগোপযোগিতার খাতিরে আধুনিক চিত্রকলাকে অবশ্যই যুগপৎ ভারতীয় ও আধুনিক উভয় বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট হতে হবে এবং সেইসাথে ভারতীয় সমাজের আধুনিকত্বকেও অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। এ ধারায় আমরা পাই অবনীন্দ্রনাথের ভাই গগনেন্দ্র নাথকে, যিনি ঘনাকার চিত্রাঙ্কন রীতি (cubism) [১৬] নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এতে আরো রয়েছেন এঁদেরই খুড়ো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি কোনরকম আনুষ্ঠানিক পূর্বপ্রশিক্ষণ ছাড়াই ১৯২৮ সালে ৬৭ বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন।

---

১৫. W. G. Archer, *India and Modern Art*, (London 1959), 28-37.

১৬. কিউবিজম (Cubism): বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একটি শিল্প আন্দোলন, যাতে প্রকৃতির বাস্তবানুগ প্রতিরূপ-এর বদলে ঘনক (cube) ও অন্যান্য জ্যামিতিক রেখাচিত্রের দ্বারা বিমূর্ত বিন্যাস ঘটানো হয়।

যেমন লেখার ক্ষেত্রে তেমনি চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিচিত্র সৃজনশীল শিল্পী এবং তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। তিনি ছবি আঁকতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং প্রায়শই অর্ধ-বিমূর্ত ঢঙে। তাঁর আঁকা হিজিবিজি রেখা ও আঁচড়গুলো মূর্ত হয়ে উঠতো মানুষ ও অন্যান্য জীবের আকৃতিতে। একজন অভিব্যক্তিবাদী (Expressionist)[17] শিল্পী হিসেবে তাঁর চিত্রকর্মগুলো বিশ শতকের বড় মাপের শিল্পীদের চিত্রকর্মের পাশাপাশি জায়গা দখল করে নিয়েছে।

যামিনী রায়ও কলকাতা আর্ট স্কুলের 'নব্য-বাঙালি' রীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু এ রীতি তিনি ত্যাগ করেন গ্রামীণ ও কালিঘাট পটুয়াদের সহজ-সরল ও স্পষ্ট রীতির অনুশীলনের স্বার্থে। কলকাতার মালিন্য ও জীর্ণতায় বিতৃষ্ণ হয়ে এর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি সাঁওতালী বিষয়াদিতে মনোযোগ দেন এবং ১৯৪০-এর দশকে যে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে ব্যাপক ভিত্তিতে তৈরি হয় তাঁরই স্বাক্ষরযুক্ত অসংখ্য চিত্রকর্ম, যা ছিল তাঁর সহকারী শিল্পীদের যৌথ প্রচেষ্টারই ফসল।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তির পর জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, এস. এম. সুলতান ও শফিউদ্দিন আহমদ ঢাকায় চলে আসেন। এঁরা সবাই ছিলেন কলকাতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কলকতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন জয়নুল এবং বাংলার ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষের নকশা-চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছিলেন। কালি-তুলির প্রচণ্ড আঁচড় ছিল তাঁর বরাবরের অঙ্কনবৈশিষ্ট্য। তা দিয়েই তিনি আঁকেন এসব ছবি, যা এক মানবিক মহাবিষাদের মর্মস্পর্শী দলিলরূপে এখনো টিকে আছে। অর্ধ-বিমূর্ত রীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন সত্ত্বেও সাধারণত তাঁর অঙ্কনশৈলী ছিল বাস্তবানুগ আর তাঁর ব্যবহৃত রঙ ছিল কোমল (ছবি ৪১)। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকায় যে সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউটের গোড়াপত্তন করেন সেটিই পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সালে সম্প্রসারিত কলেবরে পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন চারুকলা ইনস্টিটিউট। এছাড়াও ১৯৭৫ সালে তিনি সোনারগাঁও-এ স্থাপন করেন লোকশিল্প যাদুঘর। এর পরের বছরই বাষট্টি বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

প্রাচীন পটরীতি ও পাশ্চাত্য কৌশলের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে কামরুল হাসান পঞ্চাশের দশক থেকে অতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এক চিত্ররীতির বিকাশে সচেষ্ট হন। গ্রামবাংলার নৈসর্গিক শোভা তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। শক্তিশালী তুলিরেখার সীমানার মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন উজ্জ্বল একবর্ণ তলের ব্যবহারে তিনি এর বিমূর্ত রূপ দিয়েছেন (ছবি ৪২)। ১৯৪৮

১৭. অভিব্যক্তিবাদ (Expressionism): শিল্প, সাহিত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে সমসাময়িক আর একটি আন্দোলন যাতে প্রতীক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলীর সাহায্যে অন্তরতর অভিধার বাস্তব রূপায়ণ করা হয়।

সাল পর্যন্ত আমৃত্যু এ নিজস্ব রীতির সার্থক অনুশীলনে তিনি ব্যাপৃত থাকেন। ভারতীয় চিত্রকলায় প্রাচীনকাল থেকে বিশ শতকের এসকল শিল্পীদের শিল্পকর্ম পর্যন্ত রেখার প্রাধান্য বরাবরই লক্ষণীয়। শফিউদ্দিন আহমদের মুখ্য শিল্পমাধ্যম হচ্ছে খোদিত নকশার ছাপচিত্র (intaglio)। রেখায় আঁকা তাঁর ছবিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোড় নেয় বিশুদ্ধ বিমূর্ততায়।[১৮]

ভাস্কর্য

আঠারো শতক

পূজার্থ প্রস্তরমূর্তি তৈরির কাজ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা প্রাচীনকাল থেকেই একটি সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম ছিল। ক্ষুদ্রকায় ধাতব মূর্তি বিশেষকরে ভক্তিবাদীদের ব্যবহার্য কৃষ্ণমূর্তি এ সময়ে ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা হতো বটে, কিন্তু চরিত্রবিচারে এগুলো যতোটা না ধ্রুপদী, তার চেয়ে বেশি লৌকিক ঐতিহ্যমণ্ডিত।

কোম্পানি শাসনামলে মুর্শিদাবাদ গজদন্তশিল্পের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। ক্ষুদ্র মূর্তির পাশাপাশি গৃহসজ্জার সামগ্রীও এ উপাদানে প্রস্তুত করা হতো। পূর্ববঙ্গের গজদন্ত শিল্পকেন্দ্রগুলোতেও সুদৃশ্য প্যানেল ও অন্তঃখচিত কারুকর্ম তৈরি করা হতো। গজদন্তের পাতলা, সরু ও লম্বা ফালি দিয়ে বোনা একটি সিলেটী পাটি বর্তমানে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এটির প্রান্তদেশ সুবর্ণতন্তু দিয়ে বোনা।

ভাস্কর্যশিল্পের ঐতিহ্যটি প্রবহমান থাকে কুম্ভকার শ্রেণীরই হাতে। কালপ্রবাহে প্রস্তরমূর্তির স্থান দখল করে নেয় বাঁশ ও খড়ের কাঠামোর গায়ে কাদামাটির আস্তরণযুক্ত প্রকাণ্ড চিত্রিত মূর্তি। পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষে জলরাশিতে নিমজ্জিত করে ফেলা হতো বলে সংরক্ষিত অবস্থায় এগুলো বর্তমানে অবিদ্যমান। বাংলার ভাস্কর্যশিল্পের দৃশ্যমান নিদর্শনাদি দেখতে হলে এ দেশের ইষ্টকনির্মিত মন্দিরগুলোর পোড়ামাটির অলঙ্করণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। এসব মন্দিরের কতকটির সর্বাঙ্গে রয়েছে পোড়ামাটির প্যানেল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্মুখ প্রাচীর (ফাসাদ)-এর বহির্গাত্রই সর্বাধিক অলঙ্করণসমৃদ্ধ। এর মধ্যেও আবার অকৃপণভাবে অলঙ্কারভারে সুসজ্জিত করা হয় খিলানযুক্ত মধ্য প্রবেশদ্বারের উপরিস্থ ফাঁকা অংশটিকে। এসব পোড়ামাটির অলঙ্করণের বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন স্থান পেয়েছে সমকালীন জীবনধারার দৃশ্যাবলী, তেমনি রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী ও উপাখ্যান আর মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জ্যামিতিক নকশা। রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার বিষয়বস্তুর ছড়াছড়ি এগুলোতে সর্বাধিক, আর উদ্ভিজ্জ ও জ্যামিতিক

---

১৮. Abstract Expressionism (বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে অ-জ্যামিতিক শিল্পরীতি গড়ে উঠে সেটি এই নামে পরিচিত। এটি মূর্তিহীন এবং প্রথাগত চিত্রের বিপরীত।

বন্ধনী ব্যবহৃত হয়েছে ছবির কাঠামোরেখার স্পষ্টীকরণে ও বর্ণনামূলক বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রকে সুচিহ্নিতকরণে। এ শতকের পোড়ামাটি ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নমুনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় দিনাজপুরের কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরে (ছবি ৪৩)।

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের পোড়ামাটির মন্দিরগুলোর সমন্বিত অলঙ্করণপদ্ধতি এ ইঙ্গিত বহন করে যে, ব্যাপক নির্মাণকর্মকাণ্ডের ফলে আঠারো শতক নাগাদ মন্দির অলঙ্করণের একটি সুনির্দিষ্ট ধরন প্রামাণ্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। পূর্ববর্তী যুগের সাদাসিধে উদ্ভিজ্জ নকশা এযুগে পরিত্যক্ত হয় এবং এর বিকল্প হিসেবে প্রবর্তিত হয় গভীরভাবে খোদাই করা পুরুপুষ্ট জটিল মূর্তি যার গাত্র অলঙ্কৃত হয়েছে নানা রকমের সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট নকশায়। মূর্তির দেহভঙ্গিমা প্রাণবন্ত এবং অবয়বের গঠন পরিপূর্ণ। স্তম্ভের নিম্নদেশের কারুকার্যময় অংশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে ইউরোপীয়দের ছবিযুক্ত শিকার ও নৌকাচালনার দৃশ্যাবলী।

উনিশ শতক

মন্দির নির্মাণের বিপুলতম কর্মকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র হলো পশ্চিম বঙ্গ। আর এতে উদ্ভিজ্জ অলঙ্করণের তুলনায় মূর্তির ভাস্কর্যই প্রাধান্য পেয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক দৃশ্যাবলী চিত্রিত হলেও তাতে ইউরোপীয় চিত্ররীতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, আর তা শুধু অলঙ্করণ নকশা (মটিফ) ও মূর্তির পুরুপুষ্ট গঠনেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং পুরোদস্তুর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ও নব্য-ধ্রুপদী (neo-classical) স্থাপত্যিক আঙ্গিকের সযত্ন চিত্রায়নেও তা বিধৃত। আর এভাবেই কোরিন্থীয় রীতির স্তম্ভগাত্রে রাম, সীতা বা দুর্গামূর্তির রূপায়নও সম্ভবপর হয়। এসব চিত্রিত মূর্তি তিন-চতুর্থাংশ মাত্রায় দৃশ্যমান এবং এগুলোর মুখাবয়ব ভাবব্যঞ্জনাময়। খড়খড়িযুক্ত জানালা ইত্যাদির মতো বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চিত্রনির্মাণের প্রতি সুস্পষ্ট ঝোঁক এতে বিদ্যমান। ক্রমে ভাস্কর্য ঐতিহ্যের স্থান দখল করে নেয় স্টাকো পদ্ধতি, যার প্রয়োগ অব্যাহত থাকে বিশ শতকের গোড়ার বছরগুলোতে নির্মিত অল্পসংখ্যক মন্দিরে। একটি স্থাপত্যিক অলঙ্কারকৌশলমাত্রে পর্যবসিত হয়ে স্বল্পকাল পরে এটিও বিলীন হয়ে যায়।

আধুনিককালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ভাস্কর্যকলার অনুশীলন ও বিকাশলাভ ধর্মীয় সংস্কারবশে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে নোভেরা আহমেদ কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে একজন ভাস্কর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তিনি এবং শিল্পী হামিদুর রহমান আদি শহীদ মিনারের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই তরুণী স্বদেশ ছেড়ে ইউরোপে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন। স্বাধীনতাউত্তরকালে উন্মুক্ত এলাকায় কিছু মূর্তিসমৃদ্ধ ভাস্কর্য স্থান পেলেও একটি জোরালো শিল্প হিসেবে এটি এখনো বিকশিত হয় নি।

১৭

গ্রামীণ চারু ও কারুকলা

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান*

বাংলাদেশের লোক তথা গ্রামীণ ঐতিহ্য শুধুমাত্র প্রাচীন নয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক রীতিবৈচিত্র্যে ও অলঙ্করণে সমুজ্জ্বল। লোকায়ত শিল্পধারায় লোকসমাজ ও সংস্কৃতির অপূর্ব আলেখ্য ফুটে রয়েছে। লোকশিল্প যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি নয়, বরং একাডেমিক রীতিবহির্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত তথাকথিত অশিক্ষিত অথচ দক্ষ গ্রামীণ শিল্পীর ব্যক্তিপ্রতিভার মূর্ত প্রকাশ। কখনও প্রতীকী অলঙ্করণশৈলী এবং রঙের বিন্যাস রসোত্তীর্ণই নয়, বংশানুক্রমে সম্প্রসারিত। লোকাচার, লৌকিক বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিক প্রভাব, উপাদান ও উপকরণের সমন্বয়ে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার লোকশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।[১]

বলাই বাহুল্য, লোকশিল্প লোকসংস্কৃতি বা 'ফোকলোর'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম প্রধান ও বর্ণাঢ্য শাখা। আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, "বাংলা-ফোকলোর বৃটিশ শাসনামলে ১৮০০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত ও গবেষণালব্ধ বিভিন্ন উপকরণকে বোঝায়, যেমন গল্প, গান, প্রবাদ, ধাঁধা, টোটকা, কুসংস্কার এবং অনুরূপ ঐতিহ্যবাহী উপাদান।"[২] নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফোকলোরের একটি প্রতিষ্ঠিত শাখা হিসেবে লোকশিল্পকলা সর্বজনস্বীকৃত এবং গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য লোকশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধৃত। এ প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদ বলেন, "খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীক পণ্ডিত, ইতিহাসশাস্ত্রের জনক হেরোডোটাসের কাল থেকে লোকঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহল দৃষ্ট হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন আলোচনার সূত্রপাত হয় নি।"[৩] মূলত ১৮৪৬

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

১. *লোকঐতিহ্য*, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ।

২. Ashraf Siddiqui, "Collections and Studies of Bengal Folklore", in Shamsuzzaman Khan (ed.), *Folklore of Bangladesh*, (Dhaka 1987), 1.

৩. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮৭), ২৭।

সালে ডব্লিউ. জেটমাস সর্বপ্রথম ফোকলোর শব্দটি প্রচলন করেন। ফোকলোরের অন্যান্য শাখা থেকে লোকশিল্পের মূল পার্থক্য এই যে, লোকশিল্প গ্রামীণ সংস্কৃতির দর্শনেন্দ্রিয় ও বস্তুনির্ভর উপাদানের উপর গড়ে উঠেছে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির ধারা বিধৃত হয়েছে লোকশিল্পে, যার ব্যাপকতা ও নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "লোকসংস্কৃতির ধারা সমাজজীবনের উপর দিয়ে প্রবহমান, কোথাও স্থির হয়ে থাকে না। সমাজ যেমন একটি জীবকোষের মতো ক্রমবিবর্তিত হয়ে অগ্রসর হতে থাকে, লোকসংস্কৃতিও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত থাকে বলে তারও বিবর্তনের ধারা তার সঙ্গেই চলতে থাকে।"[৪]

লোকশিল্পের সংজ্ঞা ও পরিধি প্রসঙ্গে বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞগণ নানাপ্রকার মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাকিছু চোখে দেখা যায়, হাত দিয়ে ধরা যায়, যার মধ্যে শিল্পীর মন-মানস ফুটে উঠে, জীবনবোধের উপলব্ধি রয়েছে অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ স্বকীয় শিল্পসৃষ্টির মূর্ত প্রতীক, তাকেই লোকশিল্প বলা যায়, যেমন পোড়ামাটির ফলক, নকশি কাঁথা, কাঁসা-পিতলের দ্রব্যাদি, পটচিত্র, মৃৎপাত্র ইত্যাদি।[৫] এ প্রসঙ্গে কানাই সামন্তের মতবাদ প্রণিধানযোগ্য,—"যাকিছু মানুষের কল্পনার সৃষ্টি, চিত্র, মূর্তি, কবিতা, থালা-বাটি, হাঁড়ি-কলসী, আসনপিঁড়ি, পুতুল, খেলনা, হাতের, পায়ের, কানের, কণ্ঠের, সিঁথির ও শিরের ভূষণ, সোনা-রূপার অলংকার ইত্যাদিকে লোকশিল্প বলা যায়। যদিও এগুলো মানুষের কঠিন শ্রমের ফসল, তথাপি এগুলো তার সৃজনশীল প্রতিভা ও পরিশীলিত রুচির স্বাক্ষর বহন করে।"[৬]

লোক বা গ্রামীণ শিল্প প্রসঙ্গে স্বভাবত গ্রামভিত্তিক আরও কিছু শিল্পের কথা এসে পড়ে, যেমন কুটির, হস্ত, কারু ও ক্ষুদ্রশিল্প। শৈল্পিক বিচারে কুটির ও লোকশিল্প এক নয়, কারণ কুটিরে যন্ত্রচালিত তাঁত, পাট ও অন্যান্য সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে যে পণ্য উৎপাদিত হয় তাকেই কুটিরশিল্প বলে। অন্যদিকে হস্ত, কারু ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য এবং এগুলি উৎপাদনে প্রচ্ছন্ন বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য থাকে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় গ্রামের চারু ও কারুশিল্পীগণ যখন কোন শিল্পসামগ্রী তৈরি করেন, তখন তাতে শিল্পবোধ, মননশীলতা ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন দক্ষতা প্রকাশ পায়।[৭] মূলত এগুলি কমার্শিয়াল অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায়ভুক্ত নয়।

লোকশিল্পের সঙ্গে একাডেমিক আর্ট বা আধুনিক শিল্পকলার প্রভেদ রয়েছে। আনন্দ কুমার স্বামী বর্ণিত মার্গ বা সনাতনী বা 'high way'-র সঙ্গে লোক বা দেশী শিল্প বা

---

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *লোকসংস্কৃতি ও তার সমস্যা—বাংলাদেশের লোকশিল্প*, (সোনারগাঁ ১৯৮৩), ২৮।

৫. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প : সংজ্ঞা ও পরিধি*; ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১।

৬. কানাই সামন্ত, *চিত্রদর্শন*, (কলকাতা ১৯৮৩), ২৭।

৭. *Encyclopaedia of World Art*, Vol. V, 470.

'by way'-র কোন মিল নেই। তোফায়েল আহমদ বলেন, "লোকায়ত শিল্প লোকবিশ্বাস ও লোকধর্ম সম্পৃক্ত বলে তার উপর একটি মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আরোপিত হয়। পক্ষান্তরে 'একাডেমিক' আর্ট ঐতিহ্যবিরোধী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বৈষয়িক ও ভাবাবেগপূর্ণ।"[৮] ফিরোজ মাহমুদ একটি প্রবন্ধে "লোকশিল্পকে বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতির নন্দনতাত্ত্বিক বহিঃপ্রকাশ এবং সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যের ভিত্তি, সমষ্টিগত প্রয়াস এবং আবহমান ধারা বজায়কারী শিল্প বলে অভিহিত করেন।"[৯] লোকশিল্পের সঙ্গে 'পপুলার' শিল্পকলার প্রভেদ রয়েছে এজন্য যে শেষোক্ত শিল্পমাধ্যমটি সাধারণের প্রয়োজনে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। দরবারী শিল্পরীতির বিপরীতে লোকশিল্প গোটা গ্রামীণ সমাজের যৌথ অথবা একক শিল্পমাধ্যম। এই শিল্প কেবল মার্জিত ও পরিশীলিত শিল্পরসের সঞ্চারই করে না, যেন গোটা শিল্পী সমাজকে একই সূত্রে গ্রথিত করে রাখে।

গ্রামীণ শিল্পীদের সৃজনশীল শিল্পকর্ম তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছে, তবে বিচ্ছিন্ন করে নয়। যেসমস্ত শিল্পীগোষ্ঠী অর্থাৎ চারু ও কারুশিল্পী গ্রামীণ শিল্পে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মালাকার, কামার, কুমার, সূত্রধর, ওস্তাগার, স্বর্ণকার, পটুয়া, চিত্রকর, ছৈয়াল, তাঁতি, সেকরা, মাদুর-নকশি কাঁথা-শিকা-পাখার নারী ও পুরুষ শিল্পী। লোকশিল্পের প্রকাশভঙ্গি তিন প্রকারের—বাস্তবধর্মী, বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্র্যাক্ট ও রীতিবদ্ধ বা স্টাইলাইজড। আন্তর্জাতিক কোন রীতি-কৌশল লোকশিল্পে গড়ে না উঠলেও এতে সর্বজনীন আবেদন থাকে। রেখা, রঙ, মডেলের ভঙ্গিমা ও আকৃতিতে ফুটে উঠে অসাধারণ নৈপুণ্য ও বৈপরীত্য। বাংলাদেশের লোকঐতিহ্যের পরিমণ্ডল খুবই ব্যাপক। এই ঐতিহ্য লোকায়ত বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই শিল্পসম্ভার বাঙালির মন-মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছে, যেমন মাটির পুতুল, পোড়ামাটির ফলক, সরাচিত্র, ঘটচিত্র, মুখোশচিত্র, পটচিত্র, দারুশিল্প, অলঙ্কার, ঢোকরাশিল্প, বাদ্যযন্ত্র, নকশি কাঁথা, নকশি পাখা, নকশি পিঠা, নকশি পাটি, বাঁশ-বেত-শোলার কাজ, বয়নশিল্প ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে চালচিত্র, পুঁথির পাটা, আলপনা, শঙ্খ, খড়ের বাস্তুশিল্প।

ক. চারুশিল্প

পুঁথিচিত্র

হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পুঁথি নামে পরিচিত। পুঁথিতে বর্ণিত ঘটনাবলী অবলম্বনে শিল্পী পুঁথিটি চিত্রিত করেন। এগারো শতকে পালযুগে বাংলায় সর্বপ্রথম পুঁথিচিত্রের উদ্ভব হয়।[১০] এমন একটি পুঁথিচিত্র সম্বন্ধে এন্ড্রু টপসফিল্ড বলেন :

---

৮. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ১৪।

৯. Firoz Mahmud, "*Methodologies for the Study of Folk Art of Bangladesh*" in Shamsuzzaman (ed.), *Folklore*, 449.

১০. J. C. French, *The Art of the Pala Empire in Bengal*, (New Delhi 1983), 46.

> তালপাতায় অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রাবলী তালপাতায় লিপিবদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অলঙ্করণে প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্যায় লিপিবদ্ধ করা হতো। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ও মনোমুগ্ধকর চিত্র বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব ও বর্জায়নের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অঙ্কিত হয়।[১১]

যেসমস্ত পাণ্ডুলিপিতে পুঁথিচিত্রের নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *অষ্টসাহাসরিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা, বোধিচর্যাব্রত, পাঞ্চবাকসা, মনসা-মঙ্গল* ইত্যাদি। বুদ্ধদেবের জীবনীর বিভিন্ন আলেখ্য, যেমন তাঁর জন্ম, পরিনির্বাণ, বিভিন্ন দেব-দেবী, যেমন বোধিসত্ত্ব তাতে চিত্রিত হয়েছে।

পটচিত্র

পটচিত্র মূলত গ্রামের লোকজ চিত্র। যাঁরা পটচিত্র আঁকেন তাঁদের বলা হয় পটুয়া। তাঁদের গণশিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[১২] পট্ট অথবা কাপড় শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি। পট সাধারণত মোটা সুতীাপড়ের লম্বা খণ্ড, এতে বিশেষ প্রলেপ লাগিয়ে বর্ণনাধর্মী কোন পৌরাণিক অথবা লোককাহিনী অঙ্কিত করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধর্মপ্রচারের জন্য পটচিত্র অঙ্কন করতেন।[১৩] পটচিত্রকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) জড়ানো পট ও (২) চৌকো পট। বারো থেকে ষোল ফুট দীর্ঘ এবং দুই থেকে তিন ফুট চওড়া হতো জড়ানো পট। এই জড়ানো পটে দক্ষ পটুয়া এক খণ্ডচিত্র কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করে অঙ্কিত করতো পরপর সাজিয়ে। চৌকো পট এক ফুট লম্বা, ছয় থেকে আট ইঞ্চি চওড়া হয়। জড়ানো ও চৌকো পটে আঠাল রঙ ব্যবহার করে কাপড়ের উপর চিত্র আঁকা হয়। গ্রামীণ শিল্পীগণ এসমস্ত পট নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে গান-বাজনা-নৃত্যের তালে তালে বিভিন্ন ধরনের রোমাঞ্চকর ও ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করে শুধু মনোরঞ্জনই করতেন না, এগুলি তাঁদের আয়েরও উৎস ছিল।

ভারত উপমহাদেশে পটচিত্রের ইতিহাস ষোল শতকের পর থেকে শুরু হয়। মুগল আমলের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পটচিত্র হচ্ছে 'দাস্তান-ই-আমির হামজা'। পটচিত্রের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ। নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি, গ্রাম ও লোকসমাজের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বহু পট আঁকা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী ও প্রেমলীলা বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। পটচিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে দু'টি সম্প্রদায়ের উপযোগী চিত্রাবলী রয়েছে, যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসভিত্তিক 'রামায়ণ', 'রূপকথা', 'কৃষ্ণলীলা', 'বেহুলা', 'মনসামঙ্গল', 'কমলে কামিনী', 'শিব পার্বতী',

---

১১. Andrew Topsfield, *Painting in Arts of Bengal*, (London 1979), 34.

১২. কৃষ্ণনাথ দাস, *শিল্প ও শিল্পী*, ৪২০।

১৩. ঐ।

'হরিশচন্দ্রের পট' (চিত্র ১)। অপরদিকে মুসলিম সমাজের উপযোগী গাজীর পট (চিত্র ২) বা গাজীকালু-চম্পাবতীর উপাখ্যানভিত্তিক পটচিত্র।[১৪] ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও জাগতিক বিষয়বস্তু, প্রচলিত লোককাহিনী ও উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক পটও অঙ্কিত হয়েছে, যেমন রূপকথা পট (চিত্র ৩), যাদুর পট, সাহেব পট, সাঁওতাল পট, কালিঘাটের পট ইত্যাদি। খৃস্টীয় উনিশ শতকে কাগজের উপর অঙ্কিত কালিঘাটের পটচিত্র তৎকালীন বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছে এবং সেইসঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অবক্ষয় সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছে।[১৫] পটচিত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজিবপটের আবির্ভাব ঘটে। এমনকি বন্যার বিভীষিকা ও পরিবার পরিকল্পনাকে ভিত্তি করেও পটচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

পাটাচিত্র

প্রাচীন পুঁথি লিপিবদ্ধ করা হতো তুলট কাগজ, তালপাতা প্রভৃতিতে এবং এই পুঁথি কাঠের দু'টি পাটা বা ফালির সাহায্যে সুতা দিয়ে বাঁধা থাকতো। কাঠের এই প্রচ্ছদকে পুঁথিপাটা বলে এবং এতে নকশা করা থাকতো। পাল আমলের বহু পুঁথিতে এ ধরনের পাটাচিত্র দেখা যায়। পনেরো শতকে চিত্রিত বিষ্ণুর দশ অবতারের যে ক্ষুদ্রাকৃতি পাটাচিত্র রয়েছে তা বৃটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। উড়িষ্যারীতিতে চিত্রিত বিষ্ণুপুরাণের একটি পুথি এই পাটায় আবদ্ধ রয়েছে।[১৬] অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণলীলা ও রসলীলার বিভিন্ন চিত্র পাটায় দেখা যাবে।

পিঁড়িচিত্র

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমানদের ঘরে এক ধরনের নকশাকৃত পিঁড়ি বা কাঠের আসন ব্যবহৃত হয়। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজা-পার্বণ, আহার, খৎনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে পিঁড়ির ব্যবহার দেখা যায়। কাঠের পিঁড়ি খোদাই করে এবং তাতে রঙ লাগিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়। এই সমস্ত চিত্র প্রতিকৃতিবর্জিত গাছ-লতা-পাতা-ফল-ফুল সম্বলিত থাকতো। (চিত্র ৪)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বাংলার ব্রত* গ্রন্থে ২০টি পিঁড়িচিত্রের উল্লেখ করেন।

---

১৪. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৪৮-৫০; রজতানন্দ দাসগুপ্ত, *'ভারতীয় উপমহাদেশে পটচিত্রকলা'*; ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ৫৪-৫৫।

১৫. W.G. Archer, *Bazar Paintings of Calcutta* (London 1953), 1-5; পারেশ ইসলাম, *বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্য, কালিঘাটের পট*, (ঢাকা ১৩৮৬-৮৮), ৩১।

১৬. *লোকঐতিহ্য*, ৩।

চালচিত্র

কোন মহান ব্যক্তি, দেবদূত ও মহাপুরুষের মাথার পিছনে মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য গোলাকার বলয় বা 'হ্যালো'র ব্যবহার দেখা যায়। বাইজানটাইন ও চীনা চিত্রকলায় এ ধরনের হ্যালো ব্যবহারের প্রচলন হয় এবং পরবর্তীকালে মুসলিম চিত্রকলায় এই রীতি বিশেষ রূপ ধারণ করে। স্বর্গীয় জ্যোতির কল্পনা থেকে চালচিত্রের আবির্ভাব হয়েছে। মাটির বিগ্রহের মাথার পিছনে বাঁশের গোলাকার চাটাই-এর উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় চালচিত্র।

কুলাচিত্র

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চিত্রিত কুলার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রত ও লক্ষ্মীপূজায় কুলার ব্যবহার সর্বজনীন। ডালা ও কুলায় বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা অঙ্কন করে অলঙ্করণের উপাদান সৃষ্টি করা হয়। বিবাহের লগন পাঠাবার জন্য নকশাকৃত কুলার প্রয়োগ সর্বাধিক। এছাড়া চিত্রিত কুলা দিয়ে তোরণ, মঞ্চ ও গৃহসজ্জাও করা হয়।

ঘটচিত্র

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষকরে মেলায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অলঙ্কৃত ঘট পাওয়া যায়। কুমারেরা ছোট আকারের কলসের আদলেই এই সমস্ত ঘট তৈরি করে। অবশ্য এতে লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তিও সৃষ্টি করা হয়। মনুষ্যাকৃতি এসমস্ত ঘট খুবই জনপ্রিয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যবহৃত এই সমস্ত ঘটের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মঙ্গলঘট, মনসাঘট, নাগঘট, শীতলাঘট, লক্ষ্মীঘট। ধর্মীয় বিষয়বস্তুভিত্তিক এই সমস্ত ঘটের প্রতিকৃতিতে রঙের সাহায্যে মুখাবয়ব, ভুরু, চোখ, তিলক, চুল, হাত অলঙ্কৃত হয়। জাগতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে যেসমস্ত ঘট খুবই প্রচলিত তা হচ্ছে জোড়ঘট, হাতবাইয়া, পাঁচটোপা ও তেরটোপা।[১৭]

সখের হাঁড়ি

গ্রামীণ জীবনের নিত্যব্যবহার্য হাঁড়ি খুবই সহজলভ্য। বিন্নীখই, আঁকড়ি, চিনির সাঁচ, কদমা প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী রাখার জন্য ব্যবহার্য হাঁড়ি মেলাতে প্রচুর পাওয়া যায়। কুটুমবাড়িতে মিষ্টান্ন নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহৃত হয় সখের হাঁড়ি। এটি আকারে তরকারির পাতিলের মতো, কিন্তু মুখটি ঈষৎ লম্বা। এসব হাঁড়িতে সাধারণত জমিন থাকে হলদে ও সাদা এবং তার উপরে কালো, লাল, গোলাপী রঙ ও রেখার মাধ্যমে লতাপাতা ও জ্যামিতির নকশা অঙ্কন করা হয়। কখন কখন মাছ ও পাখিও আঁকা হয়। তোফায়েল আহমদের মতে :

---

১৭. প্রাগুক্ত, ৫।

> সখের হাঁড়ীর দু'টি প্রচলিত ধারা বা স্টাইল রয়েছে। একটি বাঁয়া আর একটি বাঙাল পাড়া। বাঁয়া রীতিতে হলদে জমিনের ওপর লাল রঙের মাছ, পদ্ম ও দল-দামের (গো-খাদ্য) ছবি, তার ওপর সবুজ ও গাঢ় নীল রঙের টান থাকে। এ পদ্মের অঙ্কনরীতি ভিন্ন। দেখতে অনেকটা আপেলের মতো অর্ধফুটন্ত স্টাইলাইজড চিত্র।[১৮]

অপরদিকে বাঙালপাড়া হাঁড়ির লাল জমিন তিনটি চওড়া হলদে রেখায় ভাগ করা হয়। তলদেশে তিনটি রেখার মিলনস্থলে একটি লাল রঙের অষ্টদল পদ্ম এবং তিনটি খোপে মাছ, চিরুনী ও পাখি অঙ্কিত হয়।

সরাচিত্র

রাজশাহী শহরের অদূরে বাঁয়া গ্রামে এবং পুটিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঢাকা জেলার নয়ারহাটে সরা প্রস্তুত হয়ে থাকে। সরা বলতে সাধারণত পাতিলের ঢাকনা বা বঁউউফ বোঝায়। এই ঢাকনায় দক্ষ চিত্রকর যখন নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ প্রকাশের জন্য চিত্রাঙ্কন করেন তখনই সরাচিত্রের সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যেমন, বিবাহ উৎসব, পালা-পার্বণ, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীসরার ব্যবহার সর্বজনীন। একারণে সরাচিত্রে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। হিন্দু বাঙালির শুধু গৃহসজ্জার নয়, বরং লক্ষ্মীপূজার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে লক্ষ্মীসরা স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ লক্ষ্মী সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের প্রতীক (চিত্র ৫)। এতে মৃৎশিল্পীগণ পটচিত্রের আদলে দেব-দেবীর ছবি অঙ্কন করেন। লক্ষ্মীসরার আকার, রীতি, কৌশল ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঢাকা ও ফরিদপুরের সরাচিত্রে ধানের শীষ ও পায়ের ছাপের সাথে লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি দেখা যায়। কখন কখন পেঁচা, চিরুনি, সিন্দুরকৌটা ও অন্যান্য প্রতীক অঙ্কিত হয়ে থাকে। লক্ষ্মী ছাড়াও দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, মহিষমর্দিনী ও সরস্বতীর প্রতিকৃতি দেখা যায়।[১৯] মুসলিম মৃৎশিল্পী সরাতে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা বিধৃত করেন। কখন কখন মোহররমের চিত্রও অঙ্কিত হয়।

মুখোশচিত্র

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আজও নানা লোকজ-ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অভিনয়, নৃত্য ও গীত পরিবেশিত হয়। লৌকিক দেব-দেবীর আচরণ বিষয়ক ও লোকজীবনের মঙ্গলামঙ্গলচেতনা সম্পর্কিত মুখোশ পরিহিত নৃত্যশিল্পীগণ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য শিবনৃত্য, কালীনৃত্য, পালা ও যাত্রাগান বিশেষভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে পরিপুষ্ট (চিত্র ৬)। মুখোশ আসলে

---

১৮. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬৪-৬৬; মোহাম্মদ শাহজালাল, *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮৫), ৩৬।

১৯. নিজামউদ্দিন আহমদ, *মহাস্থান—ময়নামতি ও পাহাড়পুর*, (ঢাকা ১৯৭৯), ৪২।

টোটেমের প্রতীক। অপদেবতার ক্রোধ থেকে রেহাই পাবার জন্য সরলমনা মানুষ মুখোশ পরে থাকে এবং মুখোশ পরিধানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় নানা অভিব্যক্তি, যেমন বীরত্বব্যঞ্জকভাব, করুণভাব বা সম্মোহনভাব। এধরনের মুখোশনৃত্য গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেমন ছৌ-নৃত্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "পশ্চিম বঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ছৌ-মুখোশনৃত্য (পুরুলিয়া) পুরোপুরি লোকনৃত্য না হলেও এদের বাদ্য ও সঙ্গীতে লৌকিক প্রভাব আছে।"[২০] সাধারণত মাটি, কাপড়, কাঠ ও লাউয়ের খোল দিয়ে মুখোশ তৈরি করা হয়। মুখোশে ব্যবহৃত রঙের মধ্যে হলুদ, লাল, নীল এবং কালোই প্রধান। মুখোশ তৈরির পদ্ধতি খুবই সহজ। প্রথমে মুখোশের 'পেটা' তৈরি করতে হয় মাটি দিয়ে একটি কাঠের পাটার উপর। তারপর হাতে টিপে যে চরিত্রের মুখোশ হবে তার মোটামুটি আদল ফুটিয়ে তোলা হয়।

কুষ্ঠীচিত্র, ঘুড়িচিত্র, অঙ্গচিত্র, গৃহসজ্জা

সম্প্রতি লোকজ শিল্পকলার প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ শিল্পীগণ বিভিন্ন সহজলভ্য দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত করে থাকেন বিভিন্ন সামগ্রী, যেমন হাঁড়, দাঁত, শিব, কাঁচ, শংখ, ঝিনুকের জিনিসপত্র, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, ফুলকারী, ঘুড়িচিত্র, দশাবতার তাস, করাণ্ডিচিত্র, বৃক্ষচিত্র, মোহররমের ঢাকচিত্র, চামড়ার কাজ, ফিলিগ্রী, বিদরী, অঙ্গচিত্র, দিঘলচিত্র, কুষ্ঠীচিত্র ইত্যাদি। কুষ্ঠীচিত্র বা বংশলতিকা একটি লম্বা কাগজ, যাতে নবজাত শিশুর জীবনবৃত্তান্ত বিধৃত থাকে। তা দেখে ভবিষ্যৎবাণী করা হয় গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে। হিন্দুপরিবারে যেমন কুষ্ঠীচিত্র থাকে তেমনি মুসলিম পরিবারে থাকে কুরসিনামা।

শিশু-কিশোরদের অপার আনন্দ দেয় বিচিত্র রঙের ঘুড়ি। গ্রাম ও শহরে এর জনপ্রিয়তা সমানভাবে বিস্তৃত। পাতলা কাগজের চারকোণা ঘুড়িতে কখন কখন লেজ দেয়া হয় এবং জমিনে বিভিন্ন রকমের নকশা, জ্যামিতিক লতাপাতা বা প্রাণীর প্রতিকৃতি থাকে। বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে বিভিন্ন রকমের ঘুড়িকে, যেমন মালাদার, চোকদার, তেলেঙ্গা, পতঙ্গা, পেটকাটা। ঘুড়িতে ব্লকের ছাপ দিয়ে অথবা আলগা পাতলা রঙিন কাগজ সেঁটে নকশা করা হয়। তোফায়েল আহমদ বলেন, "গৌরীপুর অষ্টমীর মেলায় ময়ূর ও বাঘের ছাপচিত্র সম্বলিত পেটকাটা ঘুড়ি প্রভৃতি প্রচুর আমদানি হয়।"[২১]

প্রসাধন ও অঙ্গসজ্জা নারীদের স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা এবং বিবাহ উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান পরিবারে অঙ্গসজ্জার বিরাট সমারোহ দেখা যায়। হাত-পায়ে বিভিন্ন নকশা মেহেদি রঙে অঙ্কিত হয়, এমনকি পায়ের উপরিভাগও মেহেদি দিয়ে রঞ্জিত করা হয়। মুখমণ্ডলের জন্য চন্দন একপ্রকার অপরিহার্য উপকরণ। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও উপজাতীয়দের

---

২০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *লোকসংস্কৃতি*, ২৮।

২১. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৫৭-৫৮।

শরীরে উল্কি-চিত্র অঙ্কিত হয়। এই সমস্ত উল্কিতে সাপ, সূর্য, পাখি ও বৃত্ত প্রাধান্যলাভ করে। তোফায়েল আহমদের মতে, "ইন্দ্রজালে বিশ্বাস, যৌনতা এবং নান্দনিক চেতনা থেকে কষ্টকর এ আচার উদ্ভূত।"[২২]

গ্রামবাংলায় মাটির বাড়িতে মাটির প্রলেপ ও বিভিন্ন রঙের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নকশা সৃষ্টি করা হয়। উপজাতীয়দের মধ্যে গৃহসজ্জার প্রবণতা সর্বাধিক। রাজশাহী অঞ্চলের সাঁওতালদের ঘরে বিভিন্ন নকশা দেখা যায়। এতে যেসমস্ত মটিফ প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে মন্দির, দোলনরত ময়ূর, হাতি, ঘোড়া, সিংহ, ফুলগাছ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলপনা

মূলত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক আচারের মধ্যে সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত আলপনা অলঙ্করণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চালের গুঁড়া মিশিয়ে এক ধরনের মণ্ড তৈরি করে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আলপনা অঙ্কন করা হয়। কখন কখন চালের গুঁড়া ছিটিয়ে তার উপর আঙ্গুল দিয়ে আলপনা আঁকার প্রথা রয়েছে। সাধারণত ঘরের বারান্দায়, উঠানে ও মেঝেতে আলপনা আঁকার রেওয়াজ রয়েছে। কৃষ্ণলাল দাস আলপনাকে 'মণ্ডন শিল্প' নামে অভিহিত করেছেন।[২৩] বৈষ্ণব সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে আলপনার উল্লেখ আছে। এ থেকে মনে হয় যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে মধ্যযুগে আলপনার প্রচলন হয়। হিন্দু, এমনকি অধুনা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে আলপনার নকশা প্রাধান্য লাভ করেছে। সামাজিক, ধর্মীয়, এমনকি রাজনৈতিক (একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবস) অনুষ্ঠানে আলপনা ব্যবহৃত হয়। মূলত হিন্দু সমাজের পূজা-পার্বণের সঙ্গে আলপনা বিশেষভাবে জড়িত। লোকসংস্কার ও লৌকিক শিল্প হিসেবে আলপনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৪] তোফায়েল আহমদ বলেন, "আলপনা সাধারণত ব্রতের আনুষ্ঠানিক অলঙ্করণ।"[২৫] ব্রত তিন প্রকারের—শাস্ত্রীয়, নারী ও কুমারীব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, ১২১ ধরনের আলপনা রয়েছে।[২৬] অনেকটা বিমূর্ত রীতিতে সৃষ্ট আলপনার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডায়াগ্রাম, যার মধ্যভাগে মহিলারা তাদের কাম্যবস্তুটি মণ্ডপের মধ্যে অঙ্কিত করেন। এ মটিফটি পদ্ম, সূর্য, চন্দ্র, মাতৃকা, জন্তু, পাখি বা উদ্ভিজ্জ হতে পারে। এছাড়া

---

২২. ঐ, ৫৭।

২৩. Ashraf Siddiquee, Collections, 1-161 আশরাফ সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি;* ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১৫-২২।

২৪. Hameeda Hossain, *Craft tradition of Bangladesh* in Shamsuzzaman Khan (ed.) *Folklore of Bangladesh*, 460.

২৫. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬৮-৬৯।

২৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত;* তোফায়েল আহমদ কর্তৃক উদ্ধৃত, ৪৭-৪৮।

খগেশ কিরণ তালুকদারের মতে, সুপারি, মাছ, পান, আয়না, চিরুনি, কলমিলতা, সুবচনীয় হাঁস, পৃথিবী, পুতুল, সিন্দুর ও সিংহাসনও মটিফ হতে পারে।[২৭]

খ. কারুশিল্প

গ্রামীণ স্থাপত্য

কাদা, মাটি, ছন, বাঁশ, গোলপাতা ও খড়-কুটো দিয়ে তৈরি ঘর-বাড়ি আধুনিক স্থাপত্যের পর্যায়ে না পড়লেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গ্রামবাংলার দো-চালা ও চার-চালা ঘর গ্রামীণ কারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ্ শ্লিফারের মতে :

> এই পদ্ধতিতে খুব কমই অর্থব্যয় হয়ে থাকে এবং উন্নতমানের স্থানীয় সনাতনী কৌশল গ্রামীণ ঘর-বাড়ি নির্মাণে সহায়তা করে। এর ফলে স্থানীয় নির্মাতারা সনাতনী নির্মাণরীতির সঙ্গে পরিচিতই হয় না, বরং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে এবং সমবায়ের মাধ্যমে নির্মাতা পরিবার স্থানীয় উপকরণ, যেমন কাদা,কাঠ,নল-খাগড়া প্রভৃতি দিয়ে উন্নতমানের ও সুদৃশ্য ঘর-বাড়ি তৈরি করতে পারে।[২৮]

বাংলাদেশের আর্দ্রতা ও প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রামীণ বাংলার ঘর-বাড়িতে ঢালু ছাদ ব্যবহৃত হয় যাতে সহজেই বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। এর ফলে কার্নিস বক্রাকার হয়, ছাদও ঢালু করে তৈরি করা হয়। 'দো-চালা' ও 'চার-চালা' থেকে গ্রামীণ কারুশিল্পী ছৈয়াল, ছুতার, বেলকীর কারিগর 'আট-চালা' ও 'বার-চালা' ঘর নির্মাণকৌশল প্রয়োগ করে। *ময়মনসিংহগীতিকা* ও *আইন-ই-আকবরীতে* বাংলা ঘরের উল্লেখ আছে।[২৯] দো-চালা ও চার-চালা ঘর নির্মাণের কৌশল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। চার কোণায় চারটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে আড়াআড়িভাবে বাঁশ লাগিয়ে ঈষৎ বাঁকা করে মজবুতভাবে তৈরি করা হতো বাংলা-ঘর। গ্রামীণ বাংলার চালাঘর পরবর্তীকালে ইটের মসজিদ ও মন্দিরে ব্যবহৃত হলে বক্রাকার কার্নিস ও ঢালু ছাদের সৃষ্টি হয়। দো-চালা ইটের ইমারত দেখা যায় মালদার গৌড়ে সতেরো শতকে নির্মিত ফতেহ্ খানের সমাধিতে। এর প্রতিফলন দেখা যায় ময়মনসিংহের এগারসিন্ধুতে নির্মিত শাহ্ মুহম্মদের মসজিদের দো-চালা প্রবেশপথে এবং ঢাকার বেগমবাজারে অবস্থিত করতলব খানের মসজিদের পূর্বদিকে সংযোজিত গৃহে। বক্রাকার কার্নিসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি, ঢাকার রামপালে বাবা-আদমের মসজিদ ও টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদে (চিত্র ৭)।

---

২৭. *লোকঐতিহ্য*, ৬; তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬৯।

২৮. Abdullah Schleifer, 'Hasan Fathy: A Voyage to New Mexico' in *Arts and the Islamic World*, (1982-83), 32-33.

২৯. Syed Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh*, (Dhaka 1987), 11; Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, Vol. I, 303.

মোহিত রায় বলেন, "বাঙ্গালীর বাসগৃহ কুঁড়েঘরের সকল রূপ দো-চালা আদলেই বঙ্গদেশের গ্রামে পাকা-মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল।"[৩০] উদাহরণস্বরূপ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা, যশোরের চাঁচড়ার মন্দির ও রাজশাহীর পুটিয়ার গোবিন্দ মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যায়।[৩১] এক বাংলা অথবা দো-চালা থেকে চার-চালা এবং চার-চালা থেকে আট ও বারো-চালা ঘরের সৃষ্টি হয়েছে। এক বাংলা থেকে জোড় বাংলায় রূপান্তর ঘটে, যার নিদর্শন পাবনার গোপীনাথ জোড় মন্দির (চিত্র ৮), বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দির প্রভৃতি। দো-চালার সম্পূরক হিসেবে চার-চালার উদ্ভব। খুলনার বাগেরহাটে ১৪৫৩ সালে নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদের মধ্যস্থলে চার-চালা ছাদ রয়েছে। পরবর্তীকালে রাজশাহীর গৌড় অঞ্চলে দরসবাড়ী ও ছোট সোনা মসজিদে চার-চালা ছাদের পুনরাবৃত্তি হয়। মন্দিরেও চার-চালার প্রতিফলন দেখা যায়, যেমন যশোরের নলডাঙ্গায় গণেশ মন্দির, নদীয়ার শান্তিপুরে জলেশ্বর মন্দির। গ্রামীণ বাস্তুকলার এক আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে আট-চালা ঘর, যা চার-চালা ঘরের সম্প্রসারণ। আট-চালা মন্দিরের উদাহরণ হচ্ছে নদীয়ার শান্তিপুরের আট-চালা মন্দির ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রাধাবিনোদ মন্দির। আট-চালা থেকে বারো-চালা ঘর নির্মাণ কারিগরদের সৃজনশীল দক্ষতার পরিচায়ক। তিন থাক ছাদযুক্ত বারো-চালা ইটের মন্দিরের নিদর্শন উনিশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার রাউতাড়া গ্রামের রায়পরিবারের মন্দির ও হাওড়ার দেউলপুর মন্দির।

উল্লেখ্য যে, গ্রামবাংলার নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দো-চালা ও চার-চালা নির্মাণকৌশল মুগল ও রাজপুত স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এর উদাহরণ আগ্রাদুর্গের 'বাংলা মহল', দিল্লীর লাল কেল্লার 'মতি মসজিদ' ও লাহোরের 'নৌলক্ষ্যা প্যাভেলিয়ন'। রাজপুতানার আম্বর, যৌধপুর, আলওয়ার প্রভৃতি স্থানে চার-চালা ধরনের ইমারত বাংলার গ্রামীণ বাস্তুকলার পরিচয় বহন করে।[৩২]

নকশি কাঁথা

আবহমান বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নকশি কাঁথা গ্রামীণ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সৃজনশীল বিকাশ হিসেবে পরিগণিত। পল্লীবাংলার মহিলাদের জীবনের প্রয়োজনে তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নকশি কাঁথার উদ্ভব হয়। একাধিক পুরাতন, জীর্ণ ও মলিন কাপড়ের টুকরা পাট করে একটির উপর আর একখানা রেখে অবিন্যস্তভাবে সেলাই করে তৈরি করা হয় কাঁথা। তোফায়েল

---

৩০. মোহিত রায়, *নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি*, সম্পাদনায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীররঞ্জন দাস, (কলিকাতা ১৯৭৫), ১২-১৬।

৩১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *লোকস্থাপত্য, বিশ্লেষণ ও প্রভাব;* ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১০২-১১০।

৩২. প্রাগুক্ত, ১৩৯-৪০; অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য, পশ্চিম বাংলার লোকশিল্প*, (কলিকাতা ১৯৭৬), ১৩।

আহমদের মতে, সংস্কৃত শব্দ 'কন্থা' থেকে বাংলা কাঁথা শব্দের উৎপত্তি।[৩৩] কাঁথায় শাড়ির পাড় থেকে নেয়া বর্ণালী সুতা দিয়ে বাংলার প্রকৃতির অতি চেনা ফুল, ফল, লতাপাতা, পশুপাখি, মানুষের মটিফ ও জ্যামিতিক নকশার ব্যবহারে একটি সাধারণ কাঁথা রূপান্তরিত হয় নকশী কাঁথায়।

এই কাঁথায় ধর্মীয় ও লোকজ বিশ্বাস, সামাজিক রূপবৈচিত্র্য, শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবাদ বিধৃত হয় শৈল্পিক লালিত্যে। এই সমস্ত বিচিত্র ধরনের কাঁথা পাওয়া যায় যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে।

উপযোগিতার ভিত্তিতে নকশি কাঁথাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) লেপকাঁথা, (খ) সুজনি কাঁথা, (গ) শিশুর কাঁথা, (ঘ) চাদর কাঁথা, (ঙ) বরের আসন কাঁথা (চিত্র ৯), (চ) দস্তরখান, (ছ) রুমাল কাঁথা, (জ) পান-প্যাচানী, (ঝ) জায়নামাজ, (ঞ) বালিশের ঢাকনা, (ট) আরশিলতা (চিত্র ১০), (ঠ) গিলাফ, (ড) বোঁচকা, (ট) বর্তনঢাকনী, (ন) নকশি থলে, (ত) কবর ঢাকনা। নকশি কাঁথায় সহজ ও সরল গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য ফুটে উঠে। মহিলাদের অসাধারণ সূচিনৈপুণ্যের ধারক এই সমস্ত নকশি কাঁথা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি লোকজ বিশ্বাস, মন-মানসিকতা ও ধর্মীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। গিলাফ ও জায়নামাজে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের ফলস্বরূপ লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নকশি কাঁথায় রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে।[৩৪] কাঁথার ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে, যেমন বর-বধূ পালকিতে যাওয়ার সময় নকশি কাঁথা বিছিয়ে দেয়া হয় (চিত্র ১১)। প্রধান প্রধান নকশার মটিফ হচ্ছে জীবনবৃক্ষ, পদ্ম, চাঁদ, তারা, মাছ, হাতি, চিরুনি, আয়না প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে শঙ্খলতা, হৈতনের (সতীনের) মোচড়, তৈরসী ফুল, আলপনা, চাঁপা ফুল, শতদল, কালকা, পান পাতা, সয়াস্তিকা (স্বস্তিকা), গোলকধাঁধা, বেড়ি, বটি, কৃষিসরঞ্জাম, হাতি, ময়ূর, হাঁস, পরী ইত্যাদি।[৩৫]

নকশি কাঁথার সেলাই-এর মূলধারা দু'টি—যশোর এবং রাজশাহী। যশোর রীতিতে কাঁথার তিনটি কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন চিত্রিত কাঁথা, মটিফ কাঁথা ও পাইড় কাঁথা। রাজশাহীর কাঁথা প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমদ বলেন যে চার ধরনের কাঁথা বিশেষ

---

৩৩. তোফায়েল আহমদ, লোকশিল্প, ৫৯-৬০, Niaz Zaman, *The Art of Kantha Embroidery*, (Dhaka 1981), 12-17.

৩৪. সৈয়দ মাহবুব আলম, *'লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন : প্রসঙ্গ নকশীকাঁথা'*, ভট্টাচার্য, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ১৪০-৫০; Zaman, *The Art of Kantha Embroidery*, 13-14.

৩৫. Zaman, *Kantha Embroidery*, 41-61; দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা ১৩৪১)।

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেমন লহরী, কার্পেট, লীক ও সুজনী।[৩৬] নকশি কাঁথা গ্রামীণ বাংলার একান্ত ও নিজস্ব মেয়েলি শিল্প। গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আহৃত নকশি কাঁথা দেখে অভিভূত হয়ে এর সূক্ষ্ম বয়নশৈলী সম্বন্ধে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন :

> কাঁথার সর্বাপেক্ষা বড় মনোহারিত্ব ইহার বিচিত্র বর্ণসম্পদ। ইহার ঘন ফোড় দেখিয়া মনে হয় যে জীবন অস্থায়ী, পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় টলমল। ইহার নির্মাণে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া মনে হইবে জীবন অমর। শিল্পের সূক্ষ্মতায় যে রূপের অবধি নাই, শিল্পীর জীবনেরও তদ্রূপ অবধি নাই। কারণ শিল্পী যদি ক্ষণতরেও ভাবিতেন যে তিনি মরিবেন তবে তিনি এরূপ কার্যে হাত দিতেন না।[৩৭]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নকশি কাঁথা একটি অবসরবিনোদনের শিল্প হয়েও এরূপ চমৎকারিত্ব ও সৌকর্য প্রদর্শনে সমর্থ। ভেরোনিকা মারফী যথার্থই বলেন, "মহিলাদের দ্বারা সৃষ্ট নকশি কাঁথা লোকশিল্পের প্রাণমূল ও স্বতঃপ্রবৃত্ততা দ্বারা সম্পৃক্ত।"[৩৮]

নকশি পাখা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক পাখার বিকল্প হিসেবে নকশি পাখার সর্বজনীন ব্যবহার দেখা যায়। বাঁশ, বেত, চুলের ফিতা, সুতা, খেজুরপাতা, তালপাতা, শন, কলার শুকনো খোল, পাখির পালক, শোলা কাপড়, কাশ, তাল, বিন্না, গমের ডাঁটা, মোটা কাগজ, চন্দন কাঠ প্রভৃতি উপাদানে নকশি পাখা তৈরি করা হয়। পাখা নানা আকারের হয় এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়। লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, পশু-পাখির মটিফ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে (চিত্র ১২)। সুতার তৈরি পাখার নাম শঙ্খলতা, তারাফুল, বলদের চোখ, সাগরদীঘি; বাঁশের পাখার মধ্যে ওলপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, ভালবাসা, এছাড়া হাতি, মানুষ ও ফুল রয়েছে। বেতের তৈরি পাখার মধ্যে পালঙ্কপোষ ও পাশার দান উল্লেখযোগ্য। বলাই বাহুল্য, যেকোন ধরনের পাখার মূল আকর্ষণ হচ্ছে নকশা। কখনো কখনো প্রবাদবাক্য, নীতিকথা ও ছড়া নকশিতে দেখা যায়। সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘরে বাঁশের দণ্ডে লাল কাপড়ের ঝালরযুক্ত কাপড়ের যে পাখা রয়েছে তাতে জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যার উভয়পাশে লতাপাতার মাঝে দু'টি হাতি এবং উপরে গাছের ডালে অনেক টিয়া পাখি বোনা হয়েছে (চিত্র ১৩)।

নকশি সাঁচ ও পিঠা

গ্রামীণ কারুশিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নকশি সাঁচ, যা দিয়ে পিঠা তৈরি করা হয়। সাঁচ মাটি, পাথর, কাঠ ও ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়। পূজা-পার্বণ, পালা, বিবাহ ও

---

৩৬. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৬০।

৩৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ২০।

৩৮. Veronica Murphy, *Textiles, Arts of Bengal, The Heritage of Bangladesh and Eastern India*, (London 1979), 69.

সামাজিক অনুষ্ঠানে পিঠা পরিবেশিত হয়ে থাকে। সাঁচের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের মিষ্টান্নও তৈরি করা হয় বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। মটিফের মধ্যে লতাপাতা, মাছ, ফল, পশু-পাখি প্রধান। এ ছাড়া দেব-দেবীর প্রতিকৃতিতেও সন্দেশ, আমস্বত্ব প্রভৃতি তৈরি করা হয় (চিত্র ১৪)। কখনো কখনো নকশি পিঠায় নীতিবাক্য ও সুবচন উদ্ধৃত থাকে, যেমন 'ফুলশয্যা', 'শুভবিবাহ', 'সুখে থাক' ইত্যাদি। মোহররম ও শবেবরাতের সময় মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকগণ প্রতিকৃতিসজ্জিত নকশা ব্যবহারে মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করে।

নকশি পাটি

তোফায়েল আহমদ বলেন, "সুতাবেত, মোত্রাবেত, পাটিবেত, পাটিতা বা মোস্তগ নামে বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে পরিচিত গাঢ় সবুজ রঙের লাঠির মতো গাছের শক্ত অথচ মসৃণ ছাল দিয়ে শীতল পাটি বোনা হয়।" সিলেট অঞ্চলে শীতল পাটি তৈরি হয়। এই সমস্ত শীতল পাটিতে মসজিদ, মিনার, পালকি, নৌকা, হাঁড়ি, হাঁস, কবুতর, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, হরিণ বোনা হয়।[৩৯] কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায়ও পাটি প্রস্তুত হয়। নানা রঙের ব্যবহারে পাটি বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করে। নকশি পাটি জায়নামাজ (চিত্র ১৫), খাবারের আসন ও বরের আসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নকশি শিকা

সংস্কৃত শব্দ শিক্য থেকে শিকার উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণত পাট দিয়ে শিকা তৈরি করা হয়। এছাড়া কাপড়, পুঁতি ও কড়ি দিয়েও শিকা প্রস্তুত করা হয়। এগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে গ্রামীণ মহিলাগণ নানা ধরনের শিকা তৈরি করে থাকেন। শিকার বিভিন্ন নাম রয়েছে; যেমন মাছকাটা, কউতর খোপী, জালী বেড়ী, উল্টা কেশী, গুরুর ধানধা, আউলাকেশী, জিলাপী, আমির্তি ইত্যাদি। কখন কখন অষ্টদল ও রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি সম্বলিত শিকা দেখা যায়। শিকা ঝুলানো অবস্থায় থাকে এবং লেপ-তোষক, কাঁথা-বালিশ, আয়না-চিরুনি প্রভৃতি গৃহসামগ্রী রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাঁশ-বেত-শোলার কাজ

গ্রামীণ কারুকলার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হচ্ছে বাঁশ-বেত ও শোলার তৈরি আকর্ষণীয় দ্রব্যাদি। মেলায় সহজলভ্য এই সমস্ত সামগ্রী গ্রামীণ জীবনের কেবল অপরিহার্য সম্পদই নয়, বরং ঘর-বাড়ি, বেড়া, চাল, জানালা, ভেলকী, ঝাপ, মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রভৃতিও তৈরি হয় এ সমস্ত উপাদানে। আবুল ফজল তাঁর *আইন-ই-আকবরীতে* বলেন যে, "পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে বাঙালিরা বাঁশের সুন্দর ঘর তৈরি করতো।" বাঁশের তৈরি দরমা, ঝুড়ি, কুলা, ডালা (চিত্র ১৬), খাঁচা, চালনী, ডোল, ডুলা, ধামা ও লাঠিও বিশেষ জনপ্রিয়।

---

৩৯. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, ৮১; *লোকঐতিহ্য; বাংলাদেশের লোকশিল্প*, চিত্র ১৯ ও প্রচ্ছদ।

নৌকার ছৈ, চেয়ার, ঝাঁপি, মোড়া, সাঁজি (চিত্র ১৭), কৃষকের মাথাল, গরুর গাড়ির ছৈ, খাঁচা ও খালুইও তৈরি করা হয় বাঁশ ও বেত দিয়ে। শোলার খেলনা পুতুল মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। শোলার পুতুল, মুকুট, মালা, চালচিত্র, কদমফুল ও টোপর ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী। হিন্দু গৃহের চৌকাঠে শোলার ফুল ধর্মীয় ভাবধারার পরিচায়ক। গ্রামীণ কারিগর শোলাকে কেটে ও বিভিন্ন রঙ দিয়ে নানা রকম খেলনা তৈরি করেন, যেমন দোলনা। যারা শোলার দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন তাদের বলা হয় মালাকার। পুতুলনাচের পুতুল শোলা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তোফায়েল আহমদ বলেন, "শুকনো শোলায় রঙের জলীয় অংশ তাৎক্ষণিকভাবে শুকিয়ে যাবার ফলে একটা পেলব রঙের আমেজ সৃষ্টি হয়। রঙের লালিত্য আর নমনীয়তা এ শিল্পের প্রধান আকর্ষণ।"[৪০]

মসলিন

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মসলিনকে লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেন (চিত্র ১৮)। অতি উৎকৃষ্ট মানের কার্পাস দিয়ে সূক্ষ্ম ও সুপ্রসিদ্ধ মসলিন তৈরি করা হতো। আবুল ফজল সোনারগাঁয়ের মসলিনের উল্লেখ করেন। ধারণা করা হয়, মসলিনের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। মনে করা হয় যে, মিশরের মমিও তৈরি করা হতো বাংলাদেশে প্রস্তুত মসলিন দিয়ে। ঢাকাই মসলিনের কাহিনী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। বলা হতো যে, ঘাসের উপর মেলে দেয়া হলে এবং শিশিরসিক্ত হলে মসলিন নজরে পড়তো না। মুগল বাদশাহের অতি প্রিয় গৃহসামগ্রী ছিল মসলিন। মসলিনের মধ্যে জামদানি আজও প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ করে রেখেছে। বিভিন্ন নামে মসলিনকে অভিহিত করা হয় তাদের সূক্ষ্মতা, বৈচিত্র্য ও বুননের ভিত্তিতে, যেমন আবরোয়া, সওগাতি, শবনম, মলমল খাস, তানজেব, সরবতি। নকশার পার্থক্য অনুযায়ী মসলিনকে নানা প্রকার নাম দেয়া হয়েছে, যেমন বুটিদার, তেরসা, পান্নাহাজার ইত্যাদি।

তামা-কাঁসা-পিতল

দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী তামা, কাঁসা ও পিতলের দ্রব্যাদি গ্রামীণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (চিত্র ২৯)। এসব ধাতু উত্তাপে গলিয়ে মাটি ও মোমের ছাঁচের মাধ্যমে ও পাত পিটিয়ে কারিগরেরা বিভিন্ন তৈজসপত্র ও মূর্তিপুতুল তৈরি করেন। এ পর্যায়ের গৃহসামগ্রীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পানদানী, হুক্কা, বাটি, বদনা, হাঁড়ি, কুলা (চিত্র ২০), চালনী, মাদুর, রুটি বেলার বেলন, সের (চিত্র ২০), গাড়ু, নারিকেল কুড়নী, যুদ্ধাস্ত্র, যেমন ঢাল ও রামদা। এছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক যেসমস্ত সামগ্রী তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে দেব-দেবীর মূর্তি, নাগদেবতা, প্রদীপ, রামদা ইত্যাদি। ঢাকা জেলার ধামরাই,

---

৪০. প্রাগুক্ত, ৭৯।

টাঙ্গাইলের কাগমারী, জামালপুরের ইসলামপুর ও রাজশাহীর নওয়াবগঞ্জ অঞ্চলে তামা-কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্র তৈরি হয়।

মৃৎশিল্প

মোহাম্মদ শাহজালাল বলেন, "বাংলাদেশের মৃৎশিল্প একটি ব্যাপক, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প,...এই শিল্পকর্মের সাথে জড়িত হাজার হাজার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, জড়িত তাদের শিল্পকর্ম, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, জীবনসংগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি।"[৪১] মৃৎশিল্পের উদ্ভব হয়েছে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়। এতে মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র তৈরি করা হয়, যেমন কলসী (চিত্র ২২), সরা, পেয়ালা, থালা-বাটি, ঘট, ঢাকনি। এছাড়া মাটির পুতুল মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, যেমন গরু, হাতি,বানর, ভেড়া, মানুষ, গাভী ইত্যাদি। ধর্মীয় তাৎপর্যের বিচারে মাতৃকা-মূর্তি বা 'মাদার গডেস' প্রাধান্য পেয়ে থাকে। হিন্দু পাল সম্প্রদায় মৃৎশিল্পে অসামান্য অবদান রেখেছে। মাটির তৈরি দ্রব্য পোড়াবার পর এতে নানা রঙের সমাবেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ নকশা করা হয়। হাতে অথবা চাকার সাহায্যে এই সমস্ত সামগ্রী তৈরি করার রেওয়াজ রয়েছে। বহুল ব্যবহৃত তৈজসপত্রের মধ্যে দীপাধার, ফুলদানি, কুপি, পিদিম, মটকা, ছাইদান, হুক্কা ও কল্‌কি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাটির ফলক

জাতিতাত্ত্বিক বিচারে মাটির ফলক মৃৎশিল্পের এক সম্প্রসারিত ও সার্থক রূপান্তর। মাটির ফলক সাধারণভাবে 'টেরাকোটা' নামে পরিচিত। উৎকৃষ্ট গ্রামীণ শিল্পরসবোধের পরিচায়ক মাটির ফলক মুসলিম ও হিন্দু ইমারতে, বিশেষকরে মসজিদ ও মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রাচীন ঐতিহ্য দেখা যায় পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ে। এসমস্ত ফলক বাংলার লোকজ শিল্পধারার পরিচায়ক। নিজামউদ্দিন আহমদ বলেন, "যদিও শিল্পকৌশলের দিক থেকে মূলত এগুলি ময়নামতি ও পাহাড়পুরের ফলকগুলির অনুরূপ সুপরিচিত ধারায় সৃষ্ট, কিন্তু শিল্প সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিচারে এগুলির উৎকর্ষের পরিচয় সহজেই প্রতীয়মান হয়।"[৪২] পুণ্ড্রনগরীর বসুবিহারের মাটির ফলকের প্রধান বিষয়বস্তু হলো অর্ধপুষ্প মটিফ, কিন্নর-কিন্নরী, বিভিন্ন ভঙ্গিতে গ্রামীণ মানুষ, জীবজন্তু, রাজা-রানী, হস্তী, হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি। ময়নামতি ও পাহাড়পুরের ফলকচিত্রগুলোর সঙ্গে মহাস্থানের ফলকের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এগুলির শৈল্পিক অভিব্যক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়বস্তু, যেমন শিব, বিষ্ণু, গণেশ, কৃষ্ণ, মঞ্জুশ্রী, তারা ও ব্রহ্মা ছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, উল্লাস-বেদনা ও জীবনধারা প্রতিফলিত হয়েছে এসমস্ত পোড়ামাটির ফলকে।

---

৪১. মোহাম্মদ শাহজালাল, *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮৫), ৯।

৪২. নাজিমউদ্দীন আহমদ, *মহাস্থান-ময়নামতি-পাহাড়পুর*, ৪২।

মুসলিম আমলে নির্মিত বহু মসজিদ, যেমন ষোল শতকের বাঘা মসজিদ এবং পরবর্তীকালের বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকের (চিত্র ২২) ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বাঘার মসজিদ ও কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

পুতুল

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, "ইমেজ (আইকনগ্রাফী, প্রতিকৃতি, মূর্তি অঙ্কন) থেকে দৈব কিংবা দেবতা খসে গেলে পুতুল হয়।"[৪৩] গ্রামীণ শিল্পী পুতুল তৈরি করেন খেলনা হিসেবে। মহেঞ্জোদারো থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের খেলনা পুতুল তৈরি হয়ে আসছে। জীবজগতের জড় প্রতীক হিসেবে পুতুলের সঙ্গে যাদুবিদ্যা, টোটেম-বিশ্বাস জড়িত। পুতুলকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[৪৪] প্রথম শ্রেণীতে ধর্মীয় প্রতীক রয়েছে, যেমন মাতৃকা দুর্গা, মনসা, শিব, নাগঘট, রাধা-কৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুদের বর্ণাঢ্য রঙে রঞ্জিত পুতুল খেলনা (চিত্র ২৩), যেমন হাতি, ঘোড়া, কলসীকাঁখে বধূ, নৃত্যরত বধূ, মাছকুটনরত অবস্থায় বধূ, মা ও শিশু। মুসলিম পীর-দরবেশদের সমাধিতে পুতুল ঘোড়া (চিত্র ২৪) ধর্মীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এ ছাড়াও রয়েছে দুলদুল ঘোড়া। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গ্রামীণ শিল্পীগণ কাঠ, বাঁশ, মাটি, বেত, পিতল-কাঁসা, শোলা, কাপড়, কাগজের মণ্ড, পাথর, মহিষের শিং, চিনি, হাতির দাঁত দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ পুতুল তৈরি করেন। ব্যবহার, উপকরণ, গঠনশৈলী ও আকৃতির দিক থেকে পুতুল লোকশিল্পের বিশেষ অধ্যায় দখল করে রয়েছে। ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বগুড়া, শেরপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের খেলনা পুতুল বিশেষ আকর্ষণীয়। যেসব খেলনাপুতুল বিশেষ সৃজনশীল ক্ষমতার পরিচায়ক সেগুলো হচ্ছে কাঠের তৈরি নৌকা, চাকাওয়ালা গাড়ি, হাতি, বাঘ, গরুর গাড়ি ও রাজা-রানীর পুতুল (চিত্র ২৫)। নানা ধরনের ফলমূল ও পশুপাখির খেলনা শিশুদের আকর্ষণ না করে পারে না যেকোন মেলায়, যেমন ময়ূর, টিয়া, ময়না, আম, কাঁঠাল, কমলা, বেদানা, রুই, কামরাঙ্গা ইত্যাদি। কাপড়ের পুতুল নারী শিল্পীদের একচেটিয়া শিল্প। এর সাথে পুতুলবিয়ে জড়িত। বস্তুত খেলনাপুতুল একটি ব্যক্তিসত্তার প্রকাশই নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির মানসপট।

দারুশিল্প

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কাঠের প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রী রক্ষা না পেলেও দারুশিল্প ছিল খুবই সমৃদ্ধ। গীতিকাব্যে এই গ্রামীণ শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়—

> কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, তাল।
>
> গাম্ভারী, তামালবহু নখে চিরে দিল বহু, ব্রহ্মা গাড়য়ে গজাল।

---

৪৩. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, (ঢাকা ১৯৮২), ২৫।

৪৪. Ajit Kumar Mokerjee, *Folk Toys of India*, (New Delhi 1976); তোফায়েল আহমদ, *লোক শিল্প*, ৬৭।

দারুশিল্পের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যাবে নকশাকৃত নৌকা—ময়ূরপঙ্খী, বজরা, ছিপ, বাইচ, ঘাড়া (চিত্র ২৬), গয়না প্রভৃতিতে। কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের মধ্যে লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি সম্বলিত দ্রব্যাদি শৈল্পিক চাতুর্যের পরিচায়ক, যেমন পাটা, পিঁড়ি, সিন্দুক, জলচৌকি, ডুলী, দোলা, পালকি, বাটি, ঘটি, ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির, খাট-পালঙ্ক, দরজার কপাট, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, বারকোশ, রথ।[৪৫] হিন্দু ও বৌদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী-উপাখ্যান সম্বলিত কাঠে উৎকীর্ণ দারুসামগ্রী শিল্পীর দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে (চিত্র ২৭)। সূত্রধরেরা অসামান্য নৈপুণ্যে কাঠ খোদাই করে দেব-দেবীর তান্ত্রিক ও লৌকিক উপাদান সৃষ্টি করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃষ কাঠে মৃত ব্যক্তির স্মরণে সৃষ্টি করা হয়। তোফায়েল আহমদ কাঁচিকাটা গ্রামের একটি সিংহাসন প্রসঙ্গে বলেন, "সিংহাসনের তিন পাশে কৃষ্ণলীলা, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, ননীচোর, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী প্রাচীন বাংলার চিত্ররীতিতে উৎকীর্ণ। তান্ত্রিক মতে বিবসনা দুটি নারী-পুরুষের গোপন অঙ্গ তাতে প্রদর্শিত।"[৪৬]

অলঙ্কার

ঐতিহ্যবাহী ও চিত্তহরণকারী লোক-অলঙ্কারের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সোনা-রূপা-ব্রোঞ্জের অলঙ্কারের ব্যবহার পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু সভ্যতার পাদপীঠ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় দেখা যায়। ধাতুর অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় *ঋগ্‌বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ* ও *মহাভারতে*। মহাস্থানে খননের ফলে ধাতুর দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন তামার বালা, আংটি, পদক, অষ্টধাতুর বালা, স্বর্ণালঙ্কার। এ ছাড়া ময়নামতিতেও সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের তৈরি অলঙ্কার পাওয়া গেছে। লোকজ অলঙ্কারের গড়ন ও উপকরণ বৈচিত্র্যময়। কাঁচ, পুঁতি, লাক্ষা, তামা, ফলের বীজ, শামুক, পিতল, সোনা, রূপা, হাতির দাঁত ও শঙ্খ দিয়ে গ্রামীণ অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বাংলার মেয়েদের অলঙ্কারের প্রতি রয়েছে অসাধারণ মোহ। এই সমস্ত অলঙ্কার শুধু সৌন্দর্যবোধই প্রকাশ করে না, এগুলো লোকাচার ও ধর্মবিশ্বাসেও প্রভাব রেখেছে।

নারীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য অঙ্গসজ্জা অপরিহার্য। আটটি অঙ্গ, যেমন মাথা, নাক, কান, গলা, বাহু, হাত, কোমর ও পায়ের শোভা বর্ধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের প্রচলন রয়েছে। মাথা ও কপালের জন্য সিঁথিপাটি, টিকলি, টায়রা, শিরবন্দী, চৌবন্দী, সিঁথি, অলকা; নাকের জন্য নথ, নোলক, বোলাক, নাকচাবি, নাকমাছি, বিজলী ফুল, নাকফুল; কানের জন্য কানফুল, মাকড়ি, কানপাশা, ঝুমকা, টপ, মকর, কানবালা, কুণ্ডলী; গলার জন্য হাঁসুলী, মাদুলি, হার, তাবিজ, পাঁচনরী, সাতনরী (চিত্র ২৮), চাম্পেল (চিত্র ২৯),

৪৫. *লোকঐতিহ্য,* ৪১।

৪৬. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প,* ৭৬।

টিকার ছড়া; বাহুর জন্য কলসী, অনন্ত, কাঁটাবাজু, তাগড়া বাজু, টেইটি; হাতের জন্য বায়লা (বালা), বেতল, রংফুল, কঙ্কন, বাউ বালা, রুলি, চুড়ি; কোমরের জন্য বিছা, তারাহার, চন্দ্রহার (চিত্র ২৯), কোমরদানী, মেখলা, কাঞ্চী; পায়ের জন্য খাড়ু (চিত্র ৩০), বাঁক, মল, মল্লতোড়, নূপুর, পাতামল। যাদুবিদ্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সাপের আকৃতিতে বাজুবন্ধ। কারুকার্যের চমৎকারিত্বের দিক দিয়ে সাতনরীর হার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অলঙ্কার, যাতে রূপা ও মতির ব্যবহার হয়েছে। ফিলিগ্রী বা জালীর কাজও অলঙ্কারে দেখা যাবে।

বাদ্যযন্ত্র

লোকসঙ্গীত চিরায়ত শিল্প, যা বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। লোকসঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠে মানুষের মনের কথা, প্রাণের স্পর্শ, হৃদয়ের আর্তি। লোকসঙ্গীত গান ও তানের সংমিশ্রণ, যার আবেদন চিরন্তন। লোকবাদ্যযন্ত্র চার প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন তারযন্ত্র—একতারা (চিত্র ৩১), দোতারা, সারঙ্গ; ফুৎকার যন্ত্র—বাঁশি, শঙ্খ, সানাই; ঘনযন্ত্র—করতাল, মন্দিরা; আনন্দযন্ত্র—ঢোল, ঢাক, ডুগডুগি, খোল, মাদল। বাদ্যযন্ত্র সাধারণত মাটি, কাঠ, চামড়া, বাঁশ ও কাঁসা দিয়ে তৈরি হয়। দুভাবে সঙ্গীত সৃষ্টি করা হয়—আঙ্গুলের সাহায্যে এবং ধনুর সাহায্যে। রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চর্যাপদ থেকে যেমন বাংলাদেশের রাগসঙ্গীতের ধারা বহমান, তেমনি লোকসঙ্গীত সেই প্রাচীনকাল থেকে পাশাপাশি অবস্থান করছে। গ্রামীণ বাংলার জারি, সারি, ভাটিয়ালি, কবিগান, বাউল, মুর্শিদী, কীর্তন, পালাগান, গম্ভীরা এই সমস্ত যন্ত্র দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

লোকবাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত যন্ত্রগুলো হচ্ছে একতারা, দোতারা, সারিন্দা (চিত্র ৩২), বাঁশি, সানাই, শাঁখ, মন্দিরা, করতাল, সারঙ্গ, জয়ঢাক, ডুগডুগি, চটি, খমক ও খঞ্জনী। একটি শুকনো লাউ-এর তলায় একটি কাঠের বয়লা ও তার দিয়ে একতারা তৈরি করা হয়। দোতারা ও সারিন্দার শেষ প্রান্তে ময়ূর ও অন্যান্য জীবজন্তুর নকশা দেখা যায়। বাঁশ, মাটি, কাঠ, টিন ও পিতলের সাহায্যে বাঁশি তৈরি করা হয়। বাঁশির উন্নতমানের প্রকরণ হচ্ছে সানাই। এছাড়া শঙ্খের সাহায্যে শাঁক দেয়ার রেওয়াজ হিন্দু সমাজে সমধিক প্রচলিত। কাঁসার মন্দিরা ও করতাল দেবালয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাদল, ঢোলক, জয়ঢাক, খোল (চিত্র ৩৩), খমক, ডুগডুগি ও খঞ্জনী গ্রামীণ ও উপজাতীয় জীবনের বিনোদনের অপরিহার্য সামগ্রী। পল্লীকবি ও বাউল সম্প্রদায়, রাখাল, মৈশাল ভাই আলকাপ ও গম্ভীরা, ব্রতচারী, ওরশ ও মোহররম, মেলা, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৮

আইন ও সমাজ

কাজী এবাদুল হক*

প্রতিটি স্বাধীন সমাজ নিজস্ব আইনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়, তা প্রথাগত হউক, ঐশ্বরিক হউক অথবা ইহজাগতিক হউক। কোন একটি সমাজকে বুঝবার জন্যে এবং ঐ সমাজ পরিচালনাকারী আইনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্যে "সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর পরিধির মাঝে আইনের যথার্থ স্থান নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে সমাজের এবং সংস্কৃতির সামগ্রিক অবস্থার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টিপাত করতে হবে। আইন কি এবং আইন কিভাবে কার্যকরী হয় সে সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করার পূর্বে সমাজ কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমাদিগকে অবশ্যই পূর্ণ ধারণা লাভ করতে হবে।"[১] একারণে মুগল আমলের আইনব্যবস্থা এবং সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদের জন্যে খুবই যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজ

প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে 'সুবাহ বাংলা' নামে পরিচিত বাংলা প্রদেশ প্রধানত কৃষি-প্রধান একটি দেশ ছিল। গ্রামবাসীরা প্রধানত কৃষিজীবী রায়ত ছিল। এ কৃষিজীবী রায়তগণ খুদকাস্ত বা আবাসিক এবং পাইকাস্ত বা অনাবাসিক প্রধানত এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। খুদকাস্ত রায়তেরা বংশানুক্রমিকভাবে তাদের জমি চাষ করার অধিকারী ছিল, ভূমিতে তাদের দখলস্বত্ব ছিল এবং তাদেরকে কর দিতে হতো। আর পাইকাস্ত রায়তরা বার্ষিক বা অস্থায়ী চাষী ছিল। ভূমিতে তাদের কোন দখলস্বত্ব ছিল না। তারা ছিল কেবল

---

* বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।

১. ই, এডামসন হোয়েবল, *ল অব প্রিমিটিভ ম্যান* (কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৫৪), ৫।

অধিকারহীন রায়ত।[২] গ্রামবাসীদের কিয়দংশ ছিল নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী হস্তশিল্পী এবং সামান্য কিছু অংশ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত সওদাগর। পরিবার ছিল সমাজের এক একটি ইউনিট বা একক এবং অধিকাংশ পরিবারই ছিল যৌথ পরিবার। কৃষিজীবী, হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ী অধ্যুষিত গ্রাম ছিল মোটামুটি স্বনির্ভর এবং স্বায়ত্তশাসিত। গ্রামের অধিবাসীগণ পরস্পর ধর্ম, বর্ণ ও আত্মীয়তার স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তারা ধর্ম, বর্ণ ও আত্মীয়তার কাঠামোতে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে গঠিত একটি স্থায়ী পঞ্চায়েতের দ্বারা শাসিত হতো। এই পঞ্চায়েত গ্রামের অধিবাসীদের মনোনীত বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা গঠিত হতো। মুকাদ্দাম, মণ্ডল অথবা গ্রামপ্রধান নামে অভিহিত ব্যক্তি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বা নেতা ছিলেন। গ্রামপঞ্চায়েত ছিল সরকারের অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই পঞ্চায়েতের এখতিয়ারাধীন গ্রামের অধিবাসীদের পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পঞ্চায়েত পাটোয়ারি ও চৌকিদার প্রভৃতি কর্মকর্তাদের সাহায্যে গ্রামের বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনা করতো। পঞ্চায়েতের প্রধান সাধারণভাবে গ্রামবাসীরা যে জমি চাষ করতো তার খাজনা নির্ধারণ করতেন এবং তাদের নিকট থেকে বার্ষিক খাজনা আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে অথবা তার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করতেন। পঞ্চায়েতনির্ভর গ্রামসমাজ অর্থনৈতিক একক হিসেবে ক্রমশ গুরুত্ব হারালেও তার সামাজিক গুরুত্ব যথার্থভাবে ধরে রাখতে পেরেছিল।[৩] শাসকশ্রেণী ও তাদের সেবা দানকারী কর্মচারীগণ এবং অন্য কারণে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শহরে বসবাস করতো। নগদ টাকায় লেনদেনের অর্থনীতির বিষয়টি গ্রামের নিকট একেবারে অপরিজ্ঞাত না থাকলেও তাদের নিকট পণ্য বিনিময় পদ্ধতিই আদান-প্রদানের প্রধান রীতি ছিল। সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই অর্থনীতি সক্রিয় রাখা হতো।[৪] ব্যক্তিগত আইন দ্বারা প্রধানত সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন শাসিত হতো। মুসলমানগণ ইসলামী আইনের দ্বারা শাসিত হতো এবং হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ আইনের দ্বারা শাসিত হতো। ফৌজদারি বিচার প্রধানত ইসলামী আইনের মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হতো। অমুলমানদের মাঝে দেওয়ানি বিরোধসমূহ তাদের স্ব স্ব আইনের দ্বারা পরিচালিত ও নিষ্পত্তি করা হতো। সম্রাটের আদেশ বা বাদশাহী ফরমানই ছিল দেশের অধিকাংশ ইহজাগতিক আইন। এ আইন সকলের উপর প্রযোজ্য ছিল এবং প্রধানত তা রাজস্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং তা কোন কোন সময় প্রথাগত ও ধর্মীয় আইনের কঠোরতা হ্রাস করতো।[৫] বাদশাহ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর কার্যকলাপের জন্য তাঁকে কারও নিকট জবাবদিহি করতে হতো না। তিনি ওমরাহ্গণ বা মন্ত্রীপরিষদ এবং সুবাদারদের সহায়তায় দেশ শাসন

---

২. এ, সি, ব্যানার্জি, *এগ্রেরিয়ান সিষ্টেম অব বেঙ্গল* (কলিকাতা, ১৯৮০), ১৭৩

৩. আর্থার ফিলিপস, *দি 'ল রিলে'টিং টু দা ল্যাণ্ড টেনিউরস অব লোয়ার ব্যাঙ্গল* (কলিকাতা, ১৮৭৬), ৬২

৪. সিরাজুল ইসলাম, *ব্যাঙ্গল ল্যান্ড টেনিউর* (কলিকাতা, ১৯৮৮), ১।

৫. ওয়াহিদ হোসেন, এডমিনিষ্ট্রেশন অব জাস্টিস ডিউরিং মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া (কলিকাতা, ১৯৩৪), ১৪-১৬।

করতেন। এসকল ওমরাহ্ এবং সুবাদার সাম্রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ন্যায়বিচার করার জন্যে সম্রাটের নিকট দায়ী থাকতেন। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে মানুষের জীবন ও সম্পদ সর্বতোভাবে নিরাপদ রাখার জন্যে তাদের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় ছিল। জনসাধারণের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্যজীবনে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনে কেউ বাধা সৃষ্টি করতো না। দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং রাজস্ব আদায় করাই ছিল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রধান দায়িত্ব।[৬]

মুগল আমলে আইন ও বিচারব্যবস্থা

সুবাদার (নাজিম) বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা শুধু প্রদেশের প্রধান সেনাপতিই ছিলেন না, বরং তিনি প্রদেশের সাধারণ প্রশাসনও পরিচালনা করতেন। উপরন্তু অপরাধের বিচার করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক দেওয়ান ছিলেন সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত অন্য একজন কর্মকর্তা। প্রদেশের রাজস্ব প্রশাসন এবং দেওয়ানি বিষয়ক বিচারের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। কাজি-উল-কুজ্জাত বা প্রাদেশিক প্রধান বিচারপতির আদি দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা ও আপীল বিচারের এখতিয়ার ও ক্ষমতা ছিল। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার মত একই প্রকার এখতিয়ার প্রয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মামলা নিষ্পত্তিতে নাজিম বা প্রাদেশিক প্রশাসককে পরামর্শ দেয়ার জন্যে প্রধান মুফতি অর্থাৎ ইসলামী আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকারী এবং অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে নাজিমের আদালতে নিয়মিত আসন গ্রহণ করতেন। প্রদেশটি যেসকল সরকার বা জেলায় বিভক্ত ছিল সেগুলোর প্রতিটিতে কাজী-ই-সরকার বা জেলাবিচারক জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন এবং সকল প্রকার দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর আদিম ও আপীল এখতিয়ার ছিল। তাঁর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক প্রধান বিচারপতির নিকট আপীল পেশ করা যেতো। জেলার আমলগুজার রাজস্ব বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তি করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক দেওয়ানের নিকট আপীল দায়ের করা যেতো। জেলার ফৌজদার জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তাঁর এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মামলাও নিষ্পত্তি করতেন। প্রতিটি জেলা যেসকল পরগনায় বিভক্ত ছিল সেগুলোর প্রত্যেকটিতে কাজী-ই-পরগনা বা পরগনার বিচারক পরগনার সকল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলার কাজীর নিকট আপীল দায়ের করা যেতো। আমিন পরগনার রাজস্ব মামলার বিচার করতেন। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলার আমলগুজারের নিকট আপীল করা যেতো। মুফতি, মুহতাসিব, দারোগা-ই-আদালত-ই-সুবাহ, মির আদিল, পণ্ডিত, সাওয়ানেহ নবিস ও ওয়াকায়ে নিগার প্রধান বিচারপতিকে বিচারকার্যে সাহায্য করতেন। দারোগা-ই-আদালত, মির আদিল, মুফতি, পণ্ডিত, শাস্ত্রি, মুহতাসিব ও ওয়াকিল-ই-সরা জেলা বিচারককে মামলার বিচারে সাহায্য করতেন। কোতোয়াল শহরের আইন-শঙ্খলা রক্ষা করতেন। গ্রামপঞ্চায়েত

৬. বি, এন, পান্ডে, *দি ইন্ট্রোডাকশন অব ইংলিশ 'ল' ইন ইন্ডিয়া* (লন্ডন, ১৯৬৭), ৩।

গ্রামবাসীদের ছোটখাট দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সালিসের মাধ্যমে অথবা বিচারের দ্বারা নিষ্পত্তি করতো। গুরুত্বপূর্ণ মামলা-মোকদ্দমা গ্রামপঞ্চায়েত নিষ্পত্তি করতে পারতো না। তারা অপরাধীকে তিরস্কার করতে পারতো, জরিমানা করতে পারতো এবং সমাজচ্যুত করতে পারতো। পঞ্চায়েত গ্রাম পাহারা দেওয়ার জন্যে চৌকিদার রাখতো। চৌকিদার বা গ্রামপাহারাদার অপরাধীকে পাকড়াও করে যথাযথ সরকারি কর্মকর্তার নিকট সোপর্দ করতো। গ্রামপ্রধানকে গ্রামবাসীদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। রাজস্বের একটি অংশ তাঁর পারিশ্রমিক হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ গ্রামের যেকোন ব্যক্তি স্থানীয় আদালতে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারতো। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রথাগত আইন প্রয়োগ করে যে বিচার করতো সে বিচারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যেতো না।[৭] তৎকালে মামলা-মোকাদ্দমা খুব কম ছিল। পঞ্চায়েত অধিকাংশ ছোটখাট বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করতো। তাই কাজীর নিকট অধিক মামলা আসতো না এবং গুরুতর রকমের মামলার সংখ্যা খুবই কম ছিল।[৮] মামলার এক পক্ষ মুসলমান এবং অপর পক্ষ অমুসলমান হলে কাজী মামলায় ইসলামী আইন প্রয়োগ করতেন।[৯] ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনার সময় কোন আইনগত প্রশ্ন দেখা দিলে মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্যে কাজী ইসলাম ধর্মীয় আইনবিশেষজ্ঞ মুফতির মতামত গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি মুফতির মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন না।[১০] কাজী রায় দেয়ার পর মির আদিল তা কার্যকর করতেন।[১১] ইসলামী আইন তখন ছিল প্রধান আইন। সময় সময় সম্রাট কর্তৃক ঘোষিত ইহজাগতিক আইন, প্রথাগত আইন, হিন্দু আইনসহ অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন ছিল ইসলামী আইনের সম্পূরক অতিরিক্ত আইন। ফৌজদারি মামলার বিচারে ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হতো। রাজস্ব প্রশাসন অন্তর্ভুক্ত করে যে দেওয়ানি বিচারের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত আইন, প্রথাগত আইন এবং সময় সময় সম্রাট কর্তৃক ঘোষিত আইন প্রয়োগে নিষ্পত্তি করা হতো।

জমিদার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিচারকার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা।

যখন মুগল প্রশাসনিক অবকাঠামো খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং বাংলার নবাবের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন কাজীর পদমর্যাদারও অবমূল্যায়ন ঘটতে থাকে। ঐ সকল পদ দীর্ঘকাল শূন্য পড়ে থাকায় অথবা অযোগ্য ব্যক্তিগণ এই সকল পদে আসীন থাকায় এবং দেশে ব্যাপক গোলযোগের কারণে দেশের অভ্যন্তরে কাজীর পদের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক

---

৭. ভি. ডি. কুলশ্রেষ্ঠ, *ল্যান্ডমার্ক ইন ইণ্ডিয়ান লিগ্যাল এন্ড কনস্টিটিউশনাল হিস্টোরী*, লক্ষ্ণৌ, ১৯৬৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮১), ২৯-৩০; ওয়াহেদ হোসেন, প্রাগুক্ত, ৮০-৮৪।

৮. পি. সরন, প্র*ভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট অব দি মুগল্স* (এলাহাবাদ, ১৯১৪), ৩৩৯।

৯. এস. এ. কিউ. হুসাইনি, *দি এডমিনিস্ট্রেশন আন্ডার দি মুগলস* (ঢাকা, ১৯৫২), ১৯৪।

১০. হুসাইনি, পূর্বোক্ত, ২০৩।

১১. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, জেরেট কর্তৃক অনূদিত দ্বিতীয় খণ্ড (কালিকাতা, ১৯৪৯), ৪৩।

অচলাবস্থা এবং অনুপস্থিতির জন্যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন বড় বড় জমিদারগণ, যারা সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধি ছিলেন, তারাই কাজীর পদের শূন্যতা পূরণে আবির্ভূত হলো এবং বিচারকার্য পরিচালনা করতে লাগলো। এভাবে অন্যায়ভাবে অধিকৃত বিচারক্ষমতা তারা একান্ত স্বেচ্ছাচারীভাবে প্রয়োগ করতো। জমিদারি আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে নাজিমের আদালতে আপীল দায়ের করা যেতো। বাংলায় কোম্পানির শাসন কার্যত আবির্ভূত হওয়ার সময় নাজিমের ক্ষমতা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর অস্তিত্ব এর সীমানার বাইরে খুব একটা অনুভূত হতো না। নাজিমের আদালত ছিল প্রদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এ আদালত নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনতো ও পর্যালোচনা করতো এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তের জন্যে প্রেরিত মামলার বিচার করতো। দারোগা-ই-আদালত-আল-আলিয়া নাজিমের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর পক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। প্রদেশের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে দেওয়ানের আদালত ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার বিচার করতো। দেওয়ানের প্রতিনিধি হিসেবে দারোগা-ই-আদালত-ই-দেওয়ানি দেওয়ান কর্তৃক তার উপর ন্যস্ত বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কানুনগোর আদালতে প্রেরণ করা হলে তিনি ভূমি সংক্রান্ত বিরোধে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। কাজী উত্তরাধিকার, স্থলবর্তিতা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তি করতেন। মুফতি তাঁর মতামত দিয়ে কাজীকে সাহায্য করতেন। ফৌজদার মৃত্যুদণ্ডে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছাড়া অন্যান্য ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। কোতোয়াল শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং অপরাধীদের খুঁজে বের করে ফৌজদারিতে সোপর্দ করতেন। মুহতাসিব মদাসক্ত অপরাধী, মদবিক্রেতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও মাপ সংক্রান্ত অপরাধীদের মামলার বিচার করতেন। এভাবে কাজী, জমিদার, ফৌজদার, কানুনগো এবং কোতোয়ালগণ প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।[১২]

কলিকাতায় প্রচলিত আইন ও বিচারব্যবস্থা

১৬৯০ সনে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-উপনিবেশ হিসেবে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯৮ সনে কোম্পানি ঐ এলাকার জমিদারিস্বত্ব অর্জন করে। ১৬৬১ সনে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে সনদ প্রদান করেন সে সনদের ক্ষমতাবলে ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী কোম্পানির গভর্নর ও তাঁর পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে কোম্পানির কর্মচারী, কর্মকর্তা ও ইউরোপীয়দের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। ১৭২৬ সনে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জর্জ কোম্পানিকে যে সনদ প্রদান করেন, সে সনদবলে কলিকাতা

১২. জৈন, *আউটলাইন্‌স অব ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরী* (বোম্বে ১৯৭২, পূনর্মূদ্রণ ১৯৭৬), ৩৯-৪০; কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ৮৭।

প্রেসিডেন্সি শহরে একজন মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যান নিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন গঠিত হয়। মেয়র অথবা একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অল্ডারম্যানের পৌরোহিত্যে আরও দু'জন অল্ডারম্যান নিয়ে কলিকাতায় মেয়র-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী শহর এবং তার অধীনস্থ বাণিজ্যকুঠিগুলির এলাকার সব ধরনের দেওয়ানি মামলার বিচার করার সর্বময় ক্ষমতা এই আদালতের ছিল। যেসকল ব্যক্তি উইল বা ইচ্ছাপত্র রেখে মারা গিয়েছিল, এ আদালতের তার সত্যতা প্রমাণকরণের এবং তার প্রবেট বা সত্যায়িত অনুলিপি প্রদানের ক্ষমতা ছিল এবং যে ব্যক্তি উইল বা ইচ্ছাপত্র না রেখে মৃত্যুবরণ করেছিল, তার নিকট-আত্মীয়কে উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্যে এ আদালত ক্ষমতাপত্র প্রদান করতে পারতো। মেয়র-আদালত ইংরেজদের আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতো। মেয়র-আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম আপীল গভর্নর এবং তাঁর কাউন্সিলে দায়ের করা যেতো। ১০০০ পেগোডা বা ৩০০০ সিক্কা টাকার অধিক মূল্যমানের মামলার আপীল পর্যায়ে গভর্নর ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিং ইন-কাউন্সিলে (প্রিভি কাউন্সিলে) আর একবার আপীল দায়ের করা যেতো। মেয়রের আদালত ছিল কোর্ট অব রেকর্ড অর্থাৎ এ আদালতের নথিপত্র সংরক্ষিত হতো এবং আদালত অবমাননার জন্যে এ আদালত শাস্তিও দিতে পারতো। গভর্নর এবং তাঁর কাউন্সিলের দ্বারা নিযুক্ত শহরের শেরিফ এ আদালতের পরওয়ানা ইত্যাদি জারি করতেন। ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন গভর্নর এবং পাঁচজন জ্যেষ্ঠ কাউন্সিলসদস্য। প্রত্যেক কাউন্সিলসদস্য ইংল্যান্ডের জাস্টিস অব দি পীসের মত সর্ব প্রকার ক্ষমতা পরিচালনাকারী জাস্টিস অব দি পীস ছিলেন। জাস্টিস অব দি পীস হিসেবে তাঁদের প্রত্যেকে অপরাধীদের আটক করতে পারতেন এবং ছোটখাট অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দোষী প্রমাণিত হলে তাদের শাস্তি দিতে পারতেন এবং অপর সব অপরাধীকে বিচারের জন্যে কোয়ার্টার সেশন আদালতে সোপর্দ করতে পারতেন। তিনজন জাস্টিস অব দি পীস সম্মিলিতভাবে 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসেবে ইংল্যান্ডের কোর্ট অব অয়ার এন্ড টারমিনার এন্ড জেল ডেলিভারীর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো এবং কলিকাতা এবং এর অধীনস্থ বাণিজ্যকুঠিতে সংঘটিত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক গুরুতর অপরাধ ছাড়া যেকোন অপরাধের বিচার করে শাস্তি বিধান করার জন্যে বছরে চারবার কোয়ার্টার সেশন আদালত হিসেবে অধিবেশনে বসতে পারতো। কোয়ার্টার সেশন আদালতে গ্র্যান্ড জুরি (অধিকসংখ্যক জুরি) ও পেটি জুরির (স্বল্প সংখ্যক জুরি) মতামত নিয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হতো। ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করা হতো ইংরেজদের দণ্ডআইন ও বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করে। ১৭২৬ সনের সনদে গভর্নর ও কাউন্সিলকে কর্পোরেশন এবং উপনিবেশের অধিবাসীদের যথাযথ পরিচালনা এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের উদ্দেশ্যে উপ-আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। এসব আইন যুক্তিসঙ্গত হতে হতো এবং ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন ও বিধিবদ্ধ আইনের পরিপন্থী হতে পারতো না। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ ১৭২৬ সনের সনদ

সংশোধন করে ১৭৫৩ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নতুন সনদ প্রদান করেন। এ সনদে মেয়রের আদালতের এখতিয়ার খর্ব করা হয় এবং মামলার উভয়পক্ষ এদেশীয় হলে যদি তারা মেয়রের আদালতের এখতিয়ার মেনে না নেয়, তবে এরূপ মামলা গ্রহণ করা থেকে কিংবা মামলায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা থেকে ঐ আদলতকে বিরত রাখা হয়। এ সনদবলে কোর্ট অব রিকোয়েস্ট নামক ছোট আদালত গঠন করা হয়। এ আদালত পাঁচ পেগোডা অথবা পনেরো সিক্কা টাকা পর্যন্ত দাবির মামলার সংক্ষিপ্ত বিচার করে ডিক্রী দিতে পারতো। কলিকাতার জমিদার হিসেবে গভর্নরের কাউন্সিলের একজন সদস্য বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি কলিকাতার এ দেশীয় অধিবাসীদের দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব মামলার বিচার করতেন। তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেওয়ানি বিষয়ে গভর্নর ও কাউন্সিলের নিকট আপীল দায়ের করা যেতো এবং উক্ত আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে গভর্নর ও কাউন্সিল কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হতো। ১৬০০ সনে রানী প্রথম এলিজাবেথের নিকট থেকে প্রাপ্ত সনদবলে গঠিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজ ও বিষয়াবলী আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে ১৭৭৩ সনে বৃটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করে। এ অ্যাক্টটি কোম্পানির উপর বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণকে আরও দৃঢ় ও সংহত করেছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সির সাধারণ প্রশাসন ও সামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ও তাঁর চার সদস্যের কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করা হয়। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলকে বিধি, প্রবিধান ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিধি, প্রবিধান ও অধ্যাদেশ কোন অবস্থাতেই ইংল্যান্ডের আইনের পরিপন্থী এবং অযৌক্তিক হতে পারতোনা। এসব বিধি, প্রবিধান ও অধ্যাদেশ নবগঠিত সুপ্রীম কোর্টে নিবন্ধন এবং প্রকাশ করতে হতো। রাজা তৃতীয় জর্জ ১৭৭০ সনের সনদ দ্বারা কলিকাতায় একটি সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ ব্যারিস্টারদের মধ্য থেকে রাজা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন এবং তাঁরা ইংল্যান্ডের নৃপতির ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ পদে বহাল থাকতে পারতেন। তাঁদের জাস্টিস অব দি পীসও করা হয়েছিল এবং ইংল্যান্ডের কোর্ট অব কিংস বেঞ্চের বিচারপতিদের মতই তাদের এখতিয়ার ও বিচারক্ষমতা ছিল। এ আদালত দেওয়ানি, ফৌজদারি ও ধর্মীয় বিষয়ে ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করতো এবং এ আদালত ছিল একটি কোর্ট অব রেকর্ড অর্থাৎ এ আদালতের নথিপত্র সংরক্ষিত হতো। ফৌজদারি আদালত হিসেবে সুপ্রীমকোর্ট ইংল্যান্ডের কোর্ট অব অয়ার এন্ড টারমিনার এবং জেল ডেলিভারীর ক্ষমতা পরিচালনা করতো এবং তৎকালীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংল্যান্ডের রাজার যেকোন প্রজা, কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রাজার প্রজাদের কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করার জন্যে গ্র্যান্ড জুরি অর্থাৎ অধিক সংখ্যক জুরিদের ডাকতে পারতো এবং ফৌজদারি মামলার বিচার করার জন্যে পেটি জুরি অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যক জুরিদের মতামত গ্রহণ করার জন্যে

ডাকতে পারতো। দেওয়ানি বিষয়ে কোম্পানি, কলিকাতা কর্পোরেশন, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী অথবা এ সকল স্থানে ঋণগ্রস্ত বা সম্পত্তির অধিকারী বৃটিশ প্রজাগণ, কোম্পানি ও কলিকাতা কর্পোরেশনর কর্মকর্তা-কর্মচারী বা উক্ত স্থানে বসবাসকারী বৃটিশ প্রজাদের মধ্যে যারা বৃটিশ নাগরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পাঁচশত সিক্কা টাকার অধিক মূল্যমানের দাবির বিষয়ে উক্ত আদালতের এখতিয়ার মেনে নিয়েছিল তাদের উপর এ আদালতের এখতিয়ার ছিল। এ আদালত কোর্ট অব ইকুইটি ও কোর্ট অব এডমিরালটির ক্ষমতাও প্রয়োগ করতো এবং 'প্রিরোগেটিভ রিট' আদেশ জারি করতে পারতো এবং কলিকাতাস্থ সকল অধস্তন আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা যেতো। এ আদালতের এডভোকেট ও এটর্নিদেরকে আইন ব্যবসা করার অনুমতি দেয়ার ক্ষমতা ছিল। এ আদালত ইংরেজদের সাধারণ আইনের নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করতো। মেয়রের কোর্ট বিলুপ্ত করা হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারাধীন বিষয়ে গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের ক্ষমতাও রদ করা হয়। কলিকাতায় কোর্ট অব রিকোয়েস্টের কার্যক্রম পূর্বের মত বহাল থাকে। ১৭৮১ সনের অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার সীমিত করে দেয়। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলকে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার থেকে মুক্ত রাখা হয় এবং ঐ আদালতকে রাজস্ব বিষয়ে এখতিয়ার প্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার কলিকাতার অধিবাসীদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সুপ্রীমকোর্ট মুসলমানদের মাঝে দেওয়ানি মামলার বিচার করার সময় ইসলামী আইন, হিন্দুদের মাঝে মামলায় হিন্দু আইন এবং মামলার একপক্ষ হিন্দু বা মুসলমান হলে বিবাদীর ব্যক্তিআইন প্রয়োগ করে বিচার করতো। এতে দেখা যায় যে সুপ্রীম কোর্ট প্রধানত ইংরেজদের আইন প্রয়োগ করতো এবং কলিকাতার স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে দেওয়ানি মামলা তথা ব্যক্তিগত বিষয়ক মামলার বিচার করার সময় সুপ্রীম কোর্ট ইসলামী আইন অথবা হিন্দু আইন প্রয়োগ করতো।[১৩]

১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত বিচারব্যবস্থা

১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে নাজিম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাবের মুখে পতিত হন। ১৭৬৫ সনে সম্রাট শাহ আলম কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্যে সনদ প্রদান করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কার্যত বাংলার শাসকে পরিণত হয়। কিন্তু তারা তখন প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করা পছন্দ করে নি। কারণ বাংলায় তাদের জনশক্তি স্থানীয় অবস্থা, ভাষা এবং প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। এমতাবস্থায় বিচারব্যবস্থাসহ প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব নাজিম এবং তাঁর কর্মকর্তাদের হাতেই রেখে দেয়া

---

১৩. জৈন, প্রাগুক্ত, ৩৮, ৪১, ৪৩-৪৮, ৫৫, ৫৬, ৮৮-৯০, ১২২, ১২৩।

হয়েছিল।[১৪] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুধু এদেশী কর্মকর্তাদের কাজের তদারক করতো, কিন্তু তারা দেশের সার্বিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতো না।[১৫] এ ব্যবস্থাপনা সাধারণভাবে দ্বৈত শাসন নামে অভিহিত হয়, যা ১৭৭২ সন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যখন কোম্পানি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ সময় পর্যন্ত কোম্পানি কলিকাতা ছাড়া বাংলার আর কোন অঞ্চলের আইনব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন করে নি কিংবা সংশোধনও করে নি। পরবর্তী আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকেই কোম্পানি ক্রমে আইনব্যবস্থা সংশোধন করতে আরম্ভ করে এবং ১৮৬২ সন পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে যখন ইংরেজদের সংশোধিত সাধারণ আইনব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারব্যবস্থা

১৭৭২ সনে কলিকাতায় কোম্পানির গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস নাজিম-এর নিকট থেকে দেওয়ানি প্রশাসন এবং দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে তা কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি প্রতি জেলায় রাজস্ব আদায় করার জন্যে কোম্পানির একজন চুক্তিবদ্ধ পদস্থ কর্মকর্তাকে কালেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। নায়েব দেওয়ানের মত স্থানীয় কর্মকর্তাগণ, কালেক্টরের কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা, একজন মৌলবি ও একজন পণ্ডিতের সাহায্যে দেওয়ানি মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করার জন্যে তিনি কালেক্টরকে নবগঠিত জেলা দেওয়ানি আদালতের প্রধান নিযুক্ত করেন। বিবাহ, উত্তরাধিকার, বর্ণ, প্রথা, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দেওয়ানি আদালত মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমান বিজ্ঞ মৌলবির নিকট থেকে ইসলামী আইনের বিধান অনুযায়ী লিখিত মতামত নিয়ে এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু বিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট থেকে হিন্দু আইনের বিধান অনুযায়ী লিখিত মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতো। পরগনায় দশ সিক্কা টাকা পরিমাণ দাবির মত ছোটখাট দাবির বিষয়ে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য জমিদারগণকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। প্রতি জেলায় কাজী, মুফতি এবং দু'জন মৌলবিকে নিয়ে একটি ফৌজদারি আদালত গঠন করা হয়েছিল। এ আদালত ইসলামী আইনের মুলনীতি অনুসরণ করে হত্যা মামলাসহ সকল প্রকার ফৌজদারি মামলার বিচার করতো। জেলা ফৌজদারি আদালতের মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড ও দৈহিক শাস্তি প্রদান, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং জরিমানা করার ক্ষমতা ছিল। একশত টাকার অধিক জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও মৃত্যুদণ্ডের জন্যে সদর নিজামত আদালতের অনুমোদন নিতে হতো। মৃত্যুদণ্ডের জন্যে সদর নিজামত আদালতকে নাজিমের নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হতো। গভর্নর এবং তাঁর দু'জন কাউন্সিলারকে নিয়ে সদর দেওয়ানি আদালত গঠিত

---

১৪. কে. এম. মহসীন, *এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশন*, মুর্শিদাবাদ, ১৭৬৫-৯৩ (ঢাকা, ১৯৭৩), ১৫৫-৫৬।
১৫. বি. এন. পান্ডে, প্রাগুক্ত, ১২-১৩।

হয়। এ আদালত জেলা দেওয়ানি আদলতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের বিচার করতো। নায়েব নাজিম, কাজি-উল-কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতি, প্রধান মুফতি এবং তিনজন মৌলবিকে নিয়ে সদর নিজামত আদালত গঠিত হয়েছিল। এ আদালত জেলা ফৌজদারি আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আনীত আপীল ও পর্যালোচনা মামলার বিচার করতো এবং এ আদালত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডযোগ্য আসামীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্যে ঐ প্রকার মামলা নাজিমের নিকট পাঠাতো। ওয়ারেন হেস্টিংস মামলাকারীদের নিকট থেকে ডিক্রীর চার ভাগের একভাগ আদায় করার পরিবর্তে মামলা দায়ের করার সময় মামলাকারীদের নিকট থেকে পরিমিত পরিমাণে ফিস আদায়ের বিধান করেন। তিনি বারো বছর পূর্বের দাবি আদায়ের জন্যে কোন মামলা গ্রহণ না করার বিধানও করেন। তিনি ১৭৭৩ সনের রেগুলেটিং অ্যাক্টের অধীনে ১৭৭৪ সনে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপে কর্তৃক প্রণীত সিভিল কোড বা দেওয়ানি আইনসংকলন গ্রহণ করেন। উক্ত অ্যাক্টের অধীনে হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর সাথে চারজন কাউন্সিলর বা পারিষদ নিযুক্ত করা হয়। গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল অর্থাৎ সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে দেশ শাসনের বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[১৬]

১৭৮১ সনে তিনি ফৌজদারের পদ বিলুপ্ত করেন এবং জেলা জজদের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে বিচারের উদ্দেশ্যে জেলা ফৌজদারি আদালতে প্রেরণের জন্যে তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৭৮৫ সনে ছোট ছোট অপরাধের বিচার করার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৭৮১ সনের অ্যাক্ট অব সেট্‌ল্‌মেন্ট দ্বারা সদর দেওয়ানি আদলতকে আপীল আদালত হিসেবে এবং কোর্ট অব রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং এসব আদালতের ৫০০০ পাউন্ডের অধিক মূল্যমানের দাবি সংক্রান্ত মামলায় প্রদত্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়ের করার সুযোগ প্রদানের বিধান করা হয়।[১৭]

কর্নওয়ালিসের সংস্কার

কর্নওয়ালিসের শাসনকালের সর্ববৃহৎ উদ্ভাবন ছিল দেশের শাসনকার্যকে শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের একচেটিয়া ব্যাপারে পরিবর্তিত করা । তিনি ক্লাইভ ও হেস্টিংসের এদেশীদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। অতি ক্ষুদ্র ও নীচ কাজ ছাড়া সকল প্রশাসনিক দায়িত্বে ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়। কাজী, মুফতি প্রভৃতির মতো এদেশীয় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, যাঁদের খুবই সামান্য অর্থ

১৬. ডব্লিউ. এইচ. মরলি, *দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন বৃটিশ ইন্ডিয়া* (নয়াদিল্লী) ১৯৫১), ৪৫-৪৭, জৈন, প্রাগুক্ত, ৮৫-৮৮; মিত্তাল, জে. কে. *ইন্ডিয়ান লিগ্যাল হিস্টোরী* (এলাহাবাদ, ১৯৮১), ৪৮-৫০।

১৭. জৈন, প্রাগুক্ত, ১২৫, ১৫৩, ১৫৮।

প্রদান করা হতো, তাঁদেরকে ইংরেজ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অধীনস্থ করা হয়। তাঁরা যেসব মামলার বিচারে ইসলামী আইনের মূলনীতি এবং মুসলমানদের ব্যাক্তিগত আইনের মূলনীতি প্রয়োগ করতে হতো সেসব মামলায় ইংরেজ বিচারকগণকে ঐ সকল আইন ব্যাখ্যা করে সাহায্য করতে পারতেন মাত্র। অনুরূপভাবে হিন্দুদের ব্যাক্তিগত বিষয়ে মামলার বিচার করার সময় ইংরেজ বিচারকগণের নিকট হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনের মূলনীতি ব্যাখ্যা করার জন্যে হিন্দু পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হতো।

এতকাল যাবৎ রাজস্ব বিচার প্রশাসনের অংশ ছিল। কর্নওয়ালিসের বিধানে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়। কালেক্টরগণ ছাড়া অন্য চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ বেসরকারি কর্মকর্তাগণকে ওলামা ও পণ্ডিতদের সাহায্যে আদিম মামলা এবং নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে জেলা ও নগর দেওয়ানি আদালতে পৌরোহিত্য করার জন্যে জেলা বিচারক নিযুক্ত করা হয়। প্রতিটি জেলা দেওয়ানি আদালতে জেলা বিচারক কর্তৃক প্রেরিত স্বল্প মূল্যমানের মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে একজন কনিষ্ঠ চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ বেসামরিক কর্তকর্তাকে রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্ত করা হয়। জেলা বিচারকের প্রেরিত পঞ্চাশ সিক্কা টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলা মুন্সেফ পদধারী এদেশীয় বিচারকগণ নিষ্পত্তি করতে পারতেন। জেলা বিচারকগণ এবং রেজিস্ট্রারগণকে গুরুতর অপরাধের মামলা তদন্ত করার জন্যে এবং ছোটখাট ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তারা সীমিত কারাদণ্ড দিয়ে ও জরিমানা করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারতেন এবং গুরুতর অপরাধের মামলা তদন্ত করতে পারতেন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে তাঁরা চূড়ান্ত বিচারের জন্য অভিযুক্তকে ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালতে সোপর্দ করতে পারতেন। অন্যথায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ অভিযুক্তকে কয়েদাবস্থা থেকে খালাস দিতে পারতেন।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি বিভাগে একটি করে চারটি প্রাদেশিক আদালত গঠন করা হয়েছিল। তিনজন জ্যেষ্ঠ চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠিত এ আদালত যেসকল জেলা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ গঠিত হয়েছিল সেসকল জেলার জেলাবিচারকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনতেন। একজন ইংরেজ রেজিস্ট্রার, একজন কাজী, একজন মুফতি এবং একজন হিন্দু পণ্ডিত এ আদালতকে আপীল মামলার বিচারে সাহায্য করতেন। প্রাদেশিক আদালতের দু'জন বিচারককে নিয়ে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত গঠিত হয়েছিল। তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রেরিত ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। উক্ত আদালত ম্যাজিস্ট্রেট-আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল ও পর্যালোচনা মামলার বিচার করতো। উক্ত আদালত অপরাধীকে যেকোন প্রকার শাস্তি দিতে পারতো। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সদর নিজামত আদালতের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানের দ্বারা সংশোধিত ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে উক্ত

আদালত কাজী ও মুফতির সাহায্যে ফৌজদারি মামলার বিচার করতো। গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সমবায়ে গঠিত সদর দেওয়ানি আদালত এবং সদর নিজামত আদালত যথাক্রমে প্রাদেশিক আপীল আদালত এবং ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনানির জন্যে গঠিত হয়েছিল। সদর দেওয়ানি আদালতে প্রধান কাজী, দু'জন মুফতি এবং দু'জন পণ্ডিত এবং সদর নিজামত আদালতে প্রধান কাজী ও দু'জন মুফতি তাঁদের মতামত দিয়ে আপীল মামলার বিচারে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সাহায্য করতেন।[১৮] কর্নওয়ালিস প্রবিধান প্রণয়ন করে মামলাকারীদের নিকট থেকে কোর্টফি নেয়া বন্ধ করেন এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সনদ প্রদান এবং দেশীয় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের এবং বিভিন্ন মামলায় ইসলামী ও হিন্দু আইনের ব্যাখ্যাকারীদের বেতন প্রদানের পরিবর্তে তারা যেসকল মামলার বিচার করতেন বা বিচারকাজে সহায়তা করতেন যথাক্রমে তার সংখ্যার ভিত্তিতে তাঁদের ফি দেয়ার বিধান করেন। ১৭৯৩ সনের ১২ নং রেগুলেশন বা প্রবিধান দ্বারা এ বিধান করা হয় যে বিভিন্ন আদালতে ইংরেজ বিচারকদের সাহায্য করার জন্য এদেশীয় আইন কর্মকর্তাগণকে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ নিয়োগ দান করবেন। ১৭৯৩ সনে কোর্ট ফি রহিত করার দরুন মামলা-মোকাদ্দমার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে তা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ১৭৯৫ সনে জন শোর মামলায় কোর্ট ফি আদায়ের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। যেসকল মামলা পূর্বে কোর্ট ফি ছাড়া দায়ের করা হয়েছিল সেই সব বিচারাধীন মামলায়ও তিনি কোর্ট ফি আদায়ের বিধান করেন।[১৯]

ওয়েলেসলী ও হেস্টিংসের সংস্কার

১৮০১ সনে লর্ড ওয়েলেসলী সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিজামত আদালতের প্রত্যেকটিতে তিনজন করে চুক্তিবদ্ধ জ্যেষ্ঠ ইংরেজ বেসামরিক কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক বিচারক পদে নিযুক্ত করে উক্ত আদালত দুটি পুনর্গঠন করেন। ১৮০৩ সনে প্রবিধান প্রণয়ন করে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে তিনি চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ কর্মকর্তাদের জেলা দেওয়ানি আদালতে সহকারী বিচারক এবং এদেশীয়দের সদর আমিন নিযুক্ত করার বিধান করেন।[২০] মুন্সেফ এবং সদর আমিনগণ কোন বৃটিশ প্রজা, অন্য ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ ও বিচার করতে পারতেন না।[২১] ১৮১৪ সনে সহকারী জজের পদ লুপ্ত করা হয় এবং রেজিস্ট্রারদের সংখ্যা ও এখতিয়ার বৃদ্ধি করে ঐ শূন্যতা পূরণ করা হয়।[২২] হেস্টিংসের সরকার প্রণীত ১৮২১ সনের ৪ নং প্রবিধান দ্বারা গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদকে কালেক্টর বা অন্য কোন রাজস্ব কর্মকর্তাকে

---

১৮. মরলি, প্রাগুক্ত ৫৭-৬০।

১৯. কুলশেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৬৮-৬৯, ১৭৫-৭৬।

২০. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৩৩।

২১. মরলি, প্রাগুক্ত, ৬১, ৬২, ৭০।

২২. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৩৫।

ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্যে নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[২৩] অনুরূপভাবে ১৮২১ সনের ৩ নং প্রবিধান দ্বারা সামান্য অপরাধের মামলা বিচারের নিমিত্ত এদেশীয় আইনকর্মকর্তাদের ও সদর আমিনদের নিকট প্রেরণের জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাঁরা অপরাধীদের ১৫ দিনের কারাদণ্ড এবং ৫০ সিক্কা টাকা পর্যন্ত জরিমানা করে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।[২৪]

ব্যান্টিংক-এর সংস্কার এবং তৎপরবর্তী সংস্কার

লর্ড উইলিয়াম ব্যান্টিংক সকল কালেক্টরকেই ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করেন।[২৫] মূল মামলা নিষ্পত্তি ও আপীল মামলার শুনানির জন্যে তিনি জেলা দেওয়ানি আদালতে প্রধান সদর আমিনের পদ সৃষ্টি করেন এবং রেজিস্ট্রারের পদ বিলুপ্ত করেন। তিনি মুন্সেফ, সদর আমিন এবং প্রধান সদর আমিনকে নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের আর্থিক এখতিয়ারও বর্ধিত করেন।[২৬] তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও কালেক্টরদের কাজ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ১৮২৯ সনে প্রতি বিভাগে একজন কমিশনার অব রেভেনিউ ও সার্কিট অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ বিভাগীয় রাজস্ব কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন এবং তিনি তাঁদের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের দায়রা বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন এবং ভ্রাম্যমাণ দায়রা আদালত বিলুপ্ত করেন।[২৭] ১৮৩৩ সনে তিনি জেলা আদালতে এডিশনাল জজ বা অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করার বিধান করেন এবং বিভাগের প্রাদেশিক আদালত বিলুপ্ত করেন।[২৮]

১৮৩১ সনের ৫ নং প্রবিধান দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রেরিত ফৌজদারি মামলা তদন্ত করার জন্যে প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিনদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। তাঁরা শুধু তাঁদের তদন্তের ফলাফল ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে পারতেন, কিন্তু আসামীদের দায়রা বিচারে সোপর্দ করার আদেশ দিতে পারতেন না। ১৮৩২ সনের ২নং প্রবিধানের দ্বারা তিনি প্রধান সদর আমিন এবং এদেশীয় আইন কর্মকর্তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করে অপরাধীদের এক মাস পর্যন্ত কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড এবং রত্তন বেত দ্বারা ত্রিশ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাত করে দৈহিক শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করেন।[২৯] ১৮৩১ সনের ৭নং প্রবিধান গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদকে জেলা ও নগর বিচারকদের মধ্যে যাঁরা

---

২৩. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৫১।

২৪. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৮১।

২৫. মরলি, প্রাগুক্ত, ৭২।

২৬. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৬৩-৬৪।

২৭. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৫৬।

২৮. জৈন, প্রাগুক্ত, ৭৩-৭৪।

২৯. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৫৯-৬০।

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না তাঁদেরকে কমিশনার অব রেভিনিউ এবং সার্কিটের পরিবর্তে গুরুতর অপরাধের মামলায় দায়রা বিচার করার জন্যে অধিবেশনে বসার ক্ষমতা প্রদান করার জন্যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।[৩০] কমিশনার অব রেভিনিউ এবং সার্কিট ও জেলা এবং নগর আদালতের বিচারকদের মধ্যে যাঁরা দায়রা বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা যেসকল মামলায় জুরি অথবা এসেসরদের মতামত গ্রহণ করতেন সেসকল মামলায় তাঁদের কাজী ও মুফতির ফতোয়া আগ্রাহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৩১] এভাবে পর্যায়ক্রমে জেলা বিচারকগণকে জেলার দায়রা বিচারকে পরিণত করা হয় এবং কমিশনারগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় বিভক্ত) ব্যতীত অপর এলাকার দায়রা বিচারে বসার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।[৩২] পরবর্তীকালে ১৮৪৩ সনে লর্ড এলেনবরার সরকার কর্তৃক প্রণীত ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাক্টের বিধান দ্বারা ছোটখাট ফৌজদারি মামলার বিচার করার জন্যে এদেশী শিক্ষিত এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩৩] নওয়াব আবদুল লতিফ এবং বিখ্যাত বাঙালি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রথম নিযুক্ত বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপীয়দের জন্যে সংরক্ষিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ১৮৫৫ সাল থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মকর্তা নিযুক্ত করার বিধান বলবৎ হওয়ায় ঐ সকল পদে এদেশীয়দের নিযুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ সনে সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এভাবে উচ্চপদে এদেশীয়দের নিযুক্ত করার বাধা পরোক্ষভাবে অপসারিত হয়। পদোন্নতি এবং মনোনয়নের দ্বারা অতিরিক্ত জেলা বিচারক এবং জেলা বিচারকের মত উচ্চ পদে এদেশীয়দের নিযুক্ত করার জন্যে পরবর্তীকালে ১৮৭৫ সনে বিধান প্রণয়ন করা হয়। ১৮৬৮ সনে সদর আমিনের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং বর্ধিত ক্ষমতা প্রদান করে প্রধান সদর আমিনের পদকে সাবজজ পদে রূপান্তরিত করা হয়। উক্ত বিধানবলে অতিরিক্ত বিচারক এবং জেলা বিচারকদের পদের এক-পঞ্চমাংশ অভিজ্ঞ সাবজজদেরকে পদোন্নতি দিয়ে এবং অভিজ্ঞ এদেশীয় আইনজ্ঞদের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ নিযুক্তির মাধ্যমে পুরণ করা হয়। এভাবে ঐ সকল উচ্চ পদে ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র আধিপাত্যের অবসান ঘটে।

আইন সংকলন

১৮৩৩ সনের চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর জেনারেলকে ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয় এবং গভর্নর জেনারেলের পরিষদকে আইন

---

৩০. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত ১৮৪

৩১. মরলি, প্রাগুক্ত ৭৩-৭৪।

৩২. ১৯০০ সনের চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস্ রেগুলেশন-এর ৮ নং রেগুলেশন।

৩৩. জৈন, প্রাগুক্ত, ২৭১

পরিষদ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং ম্যাকলেকে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। উক্ত অ্যাক্টে ভারতের আইন সংকলনের জন্যে প্রস্তাবাদি পেশ করার উদ্দেশ্যে একটি আইন কমিশন নিযুক্ত করার বিধান করা হয়। লর্ড ম্যাকলেকে সভাপতি করে ১৮৩৫ সনে প্রথম আইন কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম আইন কমিশন দণ্ডবিধির খসড়া তৈরি করে ১৮৩৫ সনে সরকারের নিকট পেশ করে। কমিশন দেওয়ানি মামলার পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্যে সুপারিশও পেশ করে এবং দেওয়ানি কার্যবিধি ও তামাদি আইনের খসড়াও প্রণয়ন করে।[৩৪] ১৮৫৩ সনের চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা কতিপয় অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করে আইন পরিষদের পরিসর বৃদ্ধি করার বিধান করা হয়। এতে এ বিধানও করা হয় যে, গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ না করা পর্যন্ত আইন পরিষদ প্রণীত কোন আইন বৈধ ও বলবৎযোগ্য হবেনা। ক্রমান্বয়ে এ পরিষদ একটি আংশিক নির্বাচিত আইন পরিষদে পরিণত হয়। ১৮৫৩ সনের চার্টার অ্যাক্টবলে প্রথম আইন কমিশনের সুপারিশ পরীক্ষা এবং বিবেচনা করে ভারতীয় আইন ও বিচারপদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করার জন্যে ১৮৫৩ সনে দ্বিতীয় আইন কমিশন গঠন করা হয়। অন্যান্য বিষয়াবলী ছাড়াও এই কমিশন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালতদ্বয়ের সমন্বয় করেন, একটি সমন্বিত ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধি প্রণয়ন এবং অন্যান্য আইন প্রণয়নের জন্যে সুপারিশ পেশ করে।[৩৫] পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যে একটি মাত্র সমন্বিত আইন প্রণয়ন ও সংকলনের সুপারিশ পেশ করার জন্য ১৮৬১ ও ১৮৭৯ সনে পর পর আরও দুটি আইন কমিশন নিয়োগ করা হয়। উপরোক্ত আইন কমিশনগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৩ ও ১৮৫৫ সনের সাক্ষ্য আইন, ১৮৫৯ সনের দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৮৫৯ সনের তামাদি আইন, ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধি ও ১৮৬১ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি ভারতীয় আইন পরিষদ হিসাবে গভর্নর জেনারেলের পরিষদ বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করে।[৩৬] লর্ড ম্যাকলে দণ্ডবিধির যে খসড়া প্রণয়ন করেন, ১৮৬০ সনে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইনসদস্য, পরবর্তীকালে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের শেষ প্রধান বিচারপতি এবং প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটির সদস্য স্যার বার্নস পিকক তা ব্যাপকভাবে সংশোধন করেন এবং পরে আইন পরিষদের দ্বারা আরও সংশোধিত হয়ে তা আইন হিসেবে প্রণীত হয়। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইনসদস্য এবং বহু আইন প্রণয়নকারী স্যার জেমস ফিটজেমস স্টিফেন মন্তব্য করেন : "ভারতীয় দণ্ডবিধিকে বৃটিশ ভারতের অবস্থার সাথে মিল রেখে সুসংবদ্ধভাবে সাজানো এবং অল্প কিছু বিষয়ে (বিস্ময়করভাবে যা অতি অল্প) পরিবর্তিত এবং সকল ত্রুটি ও বাহুল্যমুক্ত ইংল্যান্ডের ফৌজদারি আইনরূপে অভিহিত করা যায়। আমি বিশ্বাস করি না এর কোন বিষয় মুসলিম আইন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।"[৩৭] ১৮৬২ সনের ১৭ নং

---

৩৪. জৈন, প্রাগুক্ত, ৫১৩।

৩৫. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ৩০৪।

৩৬. জৈন, প্রাগুক্ত, ৫৩৭।

৩৭. *এ হিস্টোরী অব ক্রিমিনাল ল অব ইংল্যান্ড,* তৃতীয় খণ্ড (লন্ডন ১৮৮৩), ৩০০।

অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী ঈষৎ পরিবর্তিত ইসলামী বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে ঈষৎ পরিবর্তিত ইংরেজদের সাধারণ আইনের বিচারব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৪ সনের ১১ নং অ্যাক্টবলে কাজী, মৌলবি এবং পণ্ডিতের পদ বিলুপ্ত করা হয়।[৩৮] মুসলমান এবং হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনে সামান্য পরিবর্তন সাধন ব্যতীত ঔপনিবেশিক শাসকগণ অন্য সকল আইন সংশোধন বা সম্পূর্ণভাবে বদল করে বিশেষ প্রতিকার, কার্যবিধি, তামাদি, সাক্ষ্য, কোর্ট ফিস, বিবাহ, ব্যবসা, চুক্তি, অংশিদারিত্ব, পণ্যক্রয়, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, দাসপ্রথা, সতীদাহপ্রথা, সাবালকত্ব, মানসিক বিকৃতি, অভিভাবকত্ব, সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলার অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ, শিশুবিবাহ নিরোধ ও ভূমিসংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করেন।[৩৯] নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ১৮৬১ সনের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী ১৮৬২ সনে মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা ক্রমান্বয়ে একটি নির্বাচিত সংস্থায় পরিবর্তিত হয়ে বাংলার অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতিবিধান করার জন্যে বহু আইন প্রণয়ন করেছিল।

সরকারি ভাষার পরিবর্তন

মুসলিম শাসনামলের সরকারি ভাষা ফার্সির পরিবর্তে ১৮৩৭ সনে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা হয়। ইংরেজির পাশাপাশি এদেশী ভাষা নিম্ন আদালত ও মফস্বল অঞ্চলের সরকারি দপ্তরে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। সদর আদালতে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে কিছুদিন উর্দু ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু পরিশেষে সেসব আদালতে ফার্সি ও উর্দু ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করা হয়।[৪০]

কোম্পানির শাসনের অবসান এবং সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে কলিকাতা হাইকোর্ট

রাজস্ব, আইন ও বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন, জলপথ, রেলপথ, সড়ক ও জনপথের প্রসারের ফলে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বনির্ভর গ্রামব্যবস্থার অবক্ষয়, বিদেশ থেকে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদির আমদানির ফলে কুটিরশিল্পের ধ্বংস, একদিকে কোম্পানি ও এর কর্মকর্তাগণ, অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যায্য প্রতিযোগিতার ফলে মুগল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল অভিজাত শ্রেণীর খণ্ডবিখণ্ড হওয়ার এবং এদেশী ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৫৭ সন পর্যন্ত কোম্পানির অপকর্ম দেশকে এমনভাবে নিঃস্ব করে দেয় যে দেশের মানুষ প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে।[৪১] দেশের অভিজাত শ্রেণী এবং অন্যান্য যারা কোম্পানির দুঃশাসনে দুর্দশাগ্রস্ত

---

৩৮. স্যার জর্জ ক্লস র‍্যাঙ্কিন, *ব্যাকগ্রাউন্ড টু ইন্ডিয়ান 'ল'* (কলিকাতা ১৯৪৬), ১৩৯-৪০।

৩৯. কুলশ্রেষ্ঠ, পুর্বোক্ত, ৩৪২-৩৪৯।

৪০. আর. সি. শ্রীবাস্তভ, *ডেভেলপমেন্ট অব জুডিসিয়াল সিস্টেমস ইন ইন্ডিয়া আন্ডার দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন ১৮৩৩-৫৮* (লখনৌ ১৯৭১), ১২৩-২৮।

৪১. উইল ডুরান্ট, *আওয়ার ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ* (নিউইয়র্ক ১৯৫৪), ৬১৪।

ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা তাদের হারানো ক্ষমতা এবং মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্যে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এ বিদ্রোহ দমন করে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারত শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৮৫৮ সনের ভারত শাসন আইন পাশ করে। ১৮৫৮ সনে রানী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাবলে কোম্পানির নিকট থেকে ভারতের কোম্পানিশাসিত এলাকার শাসনভার বৃটিশ সরকার কর্তৃক গ্রহণ করার ফলে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৬১ সনের ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট অ্যাক্টে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রানী কর্তৃক প্রদত্ত ১৮৬২ সনের 'লেটারস পেটেন্ট' বা সনদ দ্বারা কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত বাংলায় দু'ধরনের আদালত ছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে অবস্থিত সুপ্রীমকোর্ট ইংল্যাণ্ডের কিংস কোর্টের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতো এবং প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সামান্য অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলার বিচার করতো এবং গুরুতর অপরাধের তদন্ত করতো। উপরোক্ত সকল আদালতই ইংরেজদের আইন অনুযায়ী মামলার বিচার করতো। অপরপক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রণীত আইনের বিধান অনুযায়ী দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে প্রতি জেলায় ছিল মুন্সেফ, প্রধান সদর আমিন, সদর আমিন, জেলা বিচারক ও অতিরিক্ত বিচারকের আদালতসমূহ এবং ঐ সকল আদালতের উপরে ছিল সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি মামলার বিচার করার জন্যে প্রতি জেলায় ছিল ম্যাজিস্ট্রেটদের ও দায়রা বিচারকদের আদালত এবং ঐ সকল আদালতের উপরে ছিল সদর নিজামত আদালত। এভাবে বাংলায় ১৮৬২ সন পর্যন্ত পৃথক পৃথক এখতিয়ারসম্পন্ন দু'ধরনের আদালত ছিল এবং তারা পৃথক পৃথক আইনব্যবস্থা প্রয়োগ করতো। তখন কোম্পানির আদালতসমূহ ইংরেজদের আইন প্রয়োগ করতো না। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমায় বিচার করার সময় এদেশীয় আইন, প্রথা, প্রবিধান এবং অ্যাক্টে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকলে ইংরেজ বিচারকগণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে ন্যায়নীতি, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিবেক প্রয়োগ করতে পারতেন। ইংরেজ বিচারকগণ তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় প্রায়শ স্থানীয় অবস্থার সাথে যে পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেই পরিমাণে ইংরেজদের আইনের মূলনীতি মফস্বলের আদালতেও প্রয়োগ করতেন। ঐ সকল উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল দায়ের করা যেতো এবং ১৮৬১ সন পর্যন্ত প্রিভিকাউন্সিল নজীর আইন ঘোষণার মাধ্যমে বিচার প্রশাসনে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছিল।[৪২]

১৮৬২ সনে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানি আদালত এবং সদর নিজামত আদলতসমূহ বিলুপ্ত হয়। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে নবগঠিত হাইকোর্ট অব জুডিকেচারকে উপরোক্ত সকল আদালতের পূর্বের সর্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়। উপনিবেশের সর্বোচ্চ আদালতের

৪২. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৮৭-৮৮।

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলের আপীল শুনানির এখতিয়ার ছিল। তাই কলিকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উক্ত কোর্টে আপীল দায়ের করা যেতো। এভাবে বাংলায় ঐ দু'ধরনের আদালত একীভূত বা সমন্বিত হয়েছিল।[৪৩]

ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন

হিন্দু আইনে যে ব্যক্তি বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ভূমি চাষোপযোগী করতো সে ব্যক্তি উক্ত ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ রাজাকে দেয়ার শর্তে তা ভোগ করার অধিকারী ছিল এবং রাজা তার পরিবর্তে কৃষকদের রক্ষা করতে বাধ্য ছিলেন। গ্রামে আদি বসতকারী কৃষক এবং তাদের বংশধরগণের প্রথাগত হারে খাজনা প্রদান করে ভূমি ভোগদখল করার প্রথাগত অধিকার ছিল। পরবর্তীকালে বহিরাগতদের মধ্যে যাদেরকে স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তাদেরও একই অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু তারা একবার গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে তাদের পরিত্যক্ত জমি আবার ফেরত পাওয়ার অধিকার ছিল না এবং গ্রামের আদি বসতকারীদের বা তাদের বংশধরদের মত ভূমি বণ্টনের সময় উর্বর ভূমি পছন্দ করার সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারতো না কিংবা তাদের দখলী ভূসম্পত্তি হস্তান্তরও করতে পারতো না। কিন্তু যারা প্রতিবেশী গ্রাম থেকে যেসব গ্রামে তারা বাস করতো না সেসব গ্রামের স্থানীয় বসতকারীদের অকর্ষিত ভূমি চাষাবাদের জন্য আগমন করতো তারা সেসব ভূমিতে অধিকারহনী রায়ত ছিল। সেসব ভূমি দখলে রাখার কোন অধিকার তাদের ছিল না এবং আদি বসতকারী ও তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকে তারা সম্মানী প্রদান করতে বাধ্য ছিল। অনার্যগণ তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। আদিতে রাজস্ব আদায়কারীগণকে দ্রব্যে অথবা নগদ অর্থে পারিশ্রমিক দেয়া হতো, কিন্তু পরবর্তীতে তাদেয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমির একাংশের রাজস্ব তাদের সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হতো। ঐ সকল পদ পরে বাংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছিল। মুসলিম শাসনের অভ্যুদয়ের সময় রাজস্ব আদায়কারীগণকে বংশানুক্রমিক পদ থেকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা এবং রাজস্বহার বর্ধিতকরণ ছাড়া আর কোন বিষয়ে পরিবর্তন সাধিত হয় নি।[৪৪] মুসলিম শাসকগণ খুদকাস্ত হিসেবে পরিচিত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষকদের অধিকার এবং পাইকাস্ত হিসেবে পরিচিত অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষকদের অধিকারেও কোন পরিবর্তন করেন নি। কিন্তু ১৭৯৩ সনের পূর্বে সম্পাদিত কোম্পানির অস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজস্ব আদায়কারীদের ভূম্যধিকারীতে রূপান্তরিত করায় রাজস্ব আদায়কারী ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কৃষকগণ জমিদারদের অধীনে অধিকারহীন প্রজায় পরিণত হয়। আইনত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে পরিচিত এ

---

৪৩. কুলশ্রেষ্ঠ, প্রাগুক্ত, ১৯২, ২২০-২১।

৪৪. আর্থার ফিলিপস, প্রাগুক্ত, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ২১-২৩, ৪৬, ৫৩।

ব্যবস্থা দেশের আইনব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে কর্নওয়ালিস যে আইনসংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন তাকে বেগবান করা হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করার জন্যে। ১৮৫৯ সনের খাজনা আইন, ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮ এবং ১৯৩৮ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন এবং ১৯৫০ সনের পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন কৃষকের অধিকার রক্ষা করার জন্যে কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ছিল, যা মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত।

বৃটিশ শাসনকালে নিম্ন আদালত

বিচারপ্রশাসন সংস্কারের জন্যে আইন সংকলন ও প্রণয়নে ১৮৬২ সন থেকে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ খুবই দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিল। ব্যান্টিংক-এর প্রশাসনকাল পর্যন্ত উদ্ভাবিত আদালতের যে ক্ষমতা ও গঠন ছিল তা ১৮৮৭ সনের দেওয়ানি আদালত আইন, ১৯০৮ সনের দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা কিছুটা সংশোধিত হয়। বিচারকার্যের জন্যে প্রতিটি জেলাকে কতিপয় মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। মহকুমাসদরে তখন অবস্থিত ছিল মুন্সেফদের ও ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত। আর সাবজজ, অতিরিক্ত বিচারক, জেলা বিচারক, জেলা মেজিষ্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা বিচারকদের আদালত জেলাসদরে অবস্থিত ছিল। কতিপয় মুন্সেফের আদালত তখন দুরবর্তী থানা সদরে অবস্থিত ছিল এবং এরূপ মুন্সেফদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও দেয়া হয়েছিল। ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার এবং তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ফৌজদারি, দেওয়ানি ও রাজস্ব আদালত হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন এবং বিভাগীয় কমিশনার দায়রা বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। ঐ সকল আইনে নিম্ন আদালতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার সম্পর্কে মামলা অথবা আপীল দায়ের করার স্থান এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় কি প্রকার কার্যবিধি অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান ছিল। ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইন এবং উক্ত দুটি কার্যবিধিতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় সুবিচার নিশ্চিত করার জন্যে বিস্তারিত বিধিবিধান ছিল। বিভিন্ন প্রবিধান ও ১৮৫৮ সনের খাজনা আইন দ্বারা জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারবহির্ভুত হওয়ার পর ১৮৬৯ সনের খাজনা আইন দ্বারা তা পুনর্বহাল করা হয়। ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার খাজনার দাবিসহ সর্ব প্রকার বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেওয়ানি আদালতের উপর অর্পিত হয়।

ফেডারেল কোর্ট

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী ১৯৩৭ সনে ভারতে একটি ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টসহ অন্যান্য সকল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শুনানির ক্ষমতা এই কোর্টের ছিল। কিন্তু সে আপীলক্ষমতা শুধু

আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা অন্যান্য বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলের আপীল শুনানির ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে প্রভাবিত করে নি।

বৃটিশ শাসনের অবসান

১৮৫৮ সনের ভারত শাসন আইন পাশ এবং ঐ সনে রানীর ঘোষণার মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনের সূচনা হয়। কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া নামে অভিহিত পনেরো সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ গ্রহণ করে কোম্পানি যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতো সেক্রেটারী অব স্টেটকে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার কর্তৃত্ব দেয়া হয়, বোর্ড অব কন্ট্রোল বিলুপ্ত করা হয় এবং পূর্ববর্তী আইনের বিধানানুযায়ী ভারতে গঠিত পরিষদ ভারতের গভর্নর জেনারেলের পরিষদ নামে পুনঃআখ্যায়িত হয়। আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ১৮৬১ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট দ্বারা গভর্নর জেনারেলের পরিষদে আরও বারোজন অতিরিক্ত সদস্য মনোয়নের মাধ্যমে ঐ পরিষদের গঠনকাঠামো বর্ধিত করা হয় এবং ঐ সদস্যগণ শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের সময় পরিষদে অংশ গ্রহণ করতে পারতো। আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে মনোনয়নের মাধ্যমে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের একটি পৃথক পরিষদ গঠন করার বিধানও এ আইনে ছিল। ১৮৯২ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টে গভর্নর জেনারেলের পরিষদ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯০৯ সনের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টে নির্বাচনের মাধ্যমে ঐ সকল পরিষদে কতিপয় সদস্য বাছাই করার এবং বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করারও বিধান ছিল এবং উক্ত পরিষদগুলিতে মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা পঞ্চাশে নির্ধারিত করা হয়েছিল। ১৯১৫ সনের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ষাটে বর্ধিত করা হয়েছিল। ১৯১৯ সনের ভারত শাসন আইনে হস্তান্তরিত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করার জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করার বিধান করা হয়েছিল এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ১২৫-এ বর্ধিত করার বিধান করা হয়েছিল। প্রদেশের কতিপয় গুরুত্বহীন বিষয় গভর্নর এবং নির্বাহী পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থেকে হস্তান্তর করে স্থানীয় মন্ত্রীদের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের জন্যে জনসাধারণের দাবি মেটাতে পারে নি। ১৯২৪ সনের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় আইনসভাকে ৬০ জন মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য সম্বলিত কাউন্সিল অব স্টেট্‌স বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং চল্লিশ জন মনোনীত এবং একশত জন নির্বাচিত সদস্য সম্বলিত ১৪০ জন সদস্যের বিধানসভায় বিভক্ত করা হয়। স্বায়ত্তশাসনের গণদাবি পূরণের জন্যে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। এ আইনে বাংলা প্রদেশ প্রশাসনে এবং আইন প্রণয়নে অধিক ক্ষমতা লাভ করে। প্রাদেশিক আইনসভাকে অধিক সদস্য সম্বলিত আইন পরিষদ ও বিধানসভায় বিভক্ত করা হয়। গভর্নরের নিকট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে দিয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণের ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়। এ আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের গণদাবি মেটাতে না পারায় ১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে ভারতে বৃটিশ

শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সনে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে বৃটিশ পার্লামেন্ট এদেশকে বিভক্ত করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নূতন রাষ্ট্রকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করে। এভাবে ১৯৪৭ সনে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

পাকিস্তান আমলে আইন ও বিচারব্যবস্থা

১৯৪৭ সনে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একাংশে পরিণত করা পর্যন্ত আদালতের গঠন ও কাঠামোতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট থেকে পূর্ব বাংলার আইনব্যবস্থা ও বিচারপ্রশাসনে তেমন কোন বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় নি। সামান্যরূপে সংশোধন ও পরিবর্তন করে ঔপনিবেশিক আমলের সকল আইন ও বিচার বিভাগের গঠন ও কাঠামো গ্রহণ করা হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের সর্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্যে ১৯৪৭ সনের হাইকোর্ট (বেঙ্গল) অর্ডারের বিধান অনুযায়ী যেসকল এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা গঠিত হয়েছিল সেসকল এলাকার জন্যে ঢাকা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অপরপক্ষে ১৯৪৭ সনের ফেডারেল কোর্ট অর্ডারের বিধান অনুযায়ী করাচীতে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫০ সনের প্রিভিকাউন্সিল (এখতিয়ার বিলুপ্তকরণ) আইনের বিধান অনুযায়ী হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করার অধিকার প্রত্যাহার করা হয় এবং একই অধিকার ১৯৫০ সনের ফেডারেল কোর্ট (এখতিয়ার বর্ধিতকরণ) আইনের বিধান অনুযায়ী পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৫৬ সনের ইসলামিক গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানের সংবিধান কার্যকরী হওয়ায় ফেডারেল কোর্টের স্থলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আদালতের উপর ঢাকা হাইকোর্টসহ সকল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল এখতিয়ার ন্যস্ত করা হয়।[৪৫] উক্ত সংবিধানে সকল হাইকোর্টকে শুধুমাত্র নির্বাহী কার্যাবলীর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করা নয়, বরং সংবিধানে নিশ্চিত করা কোন মৌলিক অধিকার খর্ব করে কোন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং এরূপ আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকলে তা বাতিল বলে ঘোষণা করার জন্যে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রিট বা পরওয়ানা জারি করার অধিকার প্রদান করা হয়।[৪৬] উপরোক্ত ক্ষমতা ছাড়াও এডমিরালটি, কোম্পানি এবং অন্য কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়ে হাইকোর্টের মূল এখতিয়ার ছিল। ঢাকা হাইকোর্টের প্রধানত আপীল ও পর্যালোচনা করার এবং নিম্ন আদালতের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল।[৪৭] যাহোক সংবিধানে পবিত্রভাবে সংরক্ষিত আইনের শাসনব্যবস্থা খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে দেশে সামরিক আইন ঘোষিত হয় এবং সংবিধান বাতিল করা হয়। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রিট জারি করার

৪৫. ১৯৫৬ সনের পাকিস্তানের সংবিধান, ১৪৮, ১৫৭-৬০, অনুচ্ছেদ।

৪৬. প্রাগুক্ত, ১৭০ অনুচ্ছেদ।

৪৭. প্রাগুক্ত, তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় অংশের ৪ নং দফা।

ক্ষমতা রহিত করা হলেও ঔপনিবেশিক আমলে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের আপীল শুনার ও নিম্ন আদালতের মামলা পর্যালোচনা করার যে ক্ষমতা ছিল তা বহাল রাখা হয়। ১৯৫৯ সনের জুন মাসে দায়রা বিচারে জুরিব্যবস্থার বিলুপ্তি ছিল বিচার প্রশাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং অন্যটি ছিল ১৯৬১ সনের কন্‌সিলিয়েশন কোর্টস অধ্যাদেশবলে ইউনিয়ন পরিষদকে মামলার বিচার করার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদান। ১৯৬২ সনে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ দেশকে আর একটি সংবিধান উপহার দেয় এবং পরবর্তীতে সংশোধনের দ্বারা ১৯৬৪ সনে কতিপয় মৌলিক অধিকার এ সংবিধানে সংযুক্ত করা হয় এবং হাইকোর্টকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রিট জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৪৮]

কিন্তু ১৯৬৯ সনে উক্ত সংবিধান পুনরায় বাতিল করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকিস্তানে কখনও আইনের শাসন তেমন গভীরভাবে সুরক্ষিত হয় নি। মানবাধিকারের নিদারুণ লঙ্ঘন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত পূর্ব বাংলার অধিবাসীদেরকে কার্যকর প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রদানে অস্বীকৃতি এদেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে দেয় এবং ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। যা হোক, ঐগুলি হচ্ছে অন্য কাহিনী। ক্ষণস্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি তা সত্ত্বেও ১৯৭১ সন পর্যন্ত সময়ে সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করে দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বিচার প্রশাসনব্যবস্থা বহাল ছিল।

সমাজে ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থার প্রভাব

আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, সূচনায় কোম্পানির প্রশাসন এদেশীয় আইনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে নি। ওয়ারেন হেস্টিংস এ দেশের আইনব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। কর্নওয়ালিস আইনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। বিচারকার্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ক্ষমতা ন্যস্ত করে জজ হিসেবে এক গুচ্ছ চুক্তিবদ্ধ বেসামরিক কর্মকর্তাকে এবং রাজস্ব ক্ষমতা ন্যস্ত করে কালেকটর হিসেবে আরেক গুচ্ছ চুক্তিবদ্ধ বেসামরিক কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করে লর্ড কর্নওয়ালিস নির্বাহী ক্ষমতা থেকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা পৃথক করার জন্যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অবাধে শান্তিপূর্ণভাবে রাজস্ব আদায় করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের দমনমূলক ক্ষমতা প্রদানের প্রক্রিয়া ১৮২১ সনে লর্ড হেস্টিংস আরম্ভ করেছিলেন এবং তার ফলে তারা জমিদারদেরকে তাদের প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করতে সহায়তা দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন যেন তারা সময়মত কালেক্টরকে সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়। নির্বাহী ক্ষমতা থেকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা পৃথক করা একটি খুবই ক্ষণস্থায়ী পরীক্ষামূলক বিষয় ছিল। উপরন্তু ক্ষমতার বাস্তব পৃথকীকরণ সাধনের জন্যে বিচার বিভাগীয় এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের পৃথক ক্যাডার বা কর্মকর্তাকাঠামো ছিল না।

---

৪৮. ১৯৬২ সনের পাকিস্তানের সংবিধান, ৯৮ অনুচ্ছেদ।

দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানির ক্ষমতা এবং মর্যাদা সুরক্ষিত করার জন্যে জমিদারকে পুলিশ বাহিনী প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে কোম্পানি থানায় দারোগা এবং পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ পূর্বক পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং জেলাকে পরগনায় বিভক্ত করে যে প্রশাসনব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করে দিয়ে প্রত্যেক জেলাকে থানায় বিভক্ত করে। এমনকি গ্রামপঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত চৌকিদারদেরকে দেশীয় দারোগাদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ন্যস্ত করা হয় এবং এদেশী দারোগাদেরকেও ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপারিনটেন্ডেন্টদের মত ইংরেজ কর্মকর্তাদের তদারকিতে ন্যস্ত করা হয়। পরিশেষে স্থানীয় সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচন করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে তা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ পঞ্চায়েতের সদস্য মনোনীত করতে আরম্ভ করেন। বিনা খরচে নিজেদের মধ্যে সকল বিরোধ মীমাংসা করার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সংগঠন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং তা অতীতে যা ছিল তার শুধুমাত্র ছায়ায় পরিণত হয়। ১৮৮৫ সনের গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হলেও ইহার গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষমতা ছিল না এবং সার্কেল অফিসারের মত একজন নগণ্য সরকারি কর্মকর্তার তদারকির অধীনে গ্রামের অধিবাসীদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সরল, সহজ, অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামের সাধারণ মানুষ মুগল আমলে কোনদিন পঞ্চায়েতকে এড়িয়ে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে কোর্ট-কাছারিতে যায় নি। তৎকালে গুরুতর অপরাধের মামলার বিচার এবং গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে জনগণ আইন-আদালতের শরণাপন্ন হতো। এজন্যে রাজধানী শহর, জেলা ও পরগনা সদরে এবং সকল শহরে কোর্ট-কাছারি থাকা সত্ত্বেও মামলা-মোকাদ্দমার সংখ্যা খুব কম ছিল। উপরন্তু তৎকালে উচ্চতর আদালতে আপীল করার সুযোগ থাকলেও খুব অল্প সংখ্যক লোকই আপীল করতে ইচ্ছুক ছিল।

কর্নওয়ালিস মক্কেলদের নিকট থেকে ফি নেয়ার অনুমতি দিয়ে পেশাদারী আইনজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করে বিচারব্যবস্থায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। স্বাভাবিকভাবেই মক্কেলদের নিকট থেকে ফি গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে উকিলগণ মক্কেলদের নিকট থেকে ফি নিয়ে বিত্তবান হওয়ার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তাই তারা মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার জন্যে এবং মামলা দীর্ঘায়িত করার জন্যে আদালতকে ব্যবহার করার সুযোগ খুঁজতো এবং মামলা নিষ্পত্তি করার জন্যে নয়, বরং আইনের কূটতর্ক আলোচনার জন্যে আদালতকে ব্যবহার করতো।[৪৯]

১৭৯৩ সনের ১৭ নং রেগুলেশন এবং ১৭৯৯ সনের ৭নং রেগুলেশনে রায়তদের মালামাল ক্রোক করার জন্য জমিদারদের ক্ষমতা দেয়া হলেও জমিদারগণ কর্তৃক

৪৯. আর. সি. শ্রীবাস্তভ, প্রাগুক্ত. ১৯৪-৯৫

অবৈধভবে মালামাল ক্রোক এবং বিক্রয় করার বিরুদ্ধে রায়তদের দেওয়ানি আদালতে প্রতিকার লাভের যে অধিকার দেওয়া হয় তাতে রায়তদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে অযৌক্তিক মালামাল ক্রোক প্রতিরোধে রায়তগণ সন্ত্রাসী হয়ে উঠে। ফলে অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়। ফলে ঘুষ ও দুর্নীতি বেড়ে যায়। মামলা এগিয়ে আনা হবে এবং দ্রুত শুনানি হবে এই আশায় মানুষ আদালতের অধস্তন কর্মচারীদের অবৈধভাবে ঘুষ দিতে থাকে।[৫০] জমিদারদের ক্ষমতার অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী অপব্যবহারের ফলে মামলার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় এবং ১৮১২ সনের ১লা জানুয়ারিতে বিচারাধীন মূল মামলা এবং আপীল মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৩৯,২৭১ তে।[৫১]

নিম্ন আদালতে বর্ধিত মামলার চাপ মোকাবেলা করার জন্যে কোম্পানি প্রথমে কমিশন প্রদানের এবং পরে নামমাত্র স্বল্প বেতন প্রদানের ভিত্তিতে এদেশীয়দের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এভাবে শুধু মুন্সেফদের সংখ্যাই বৃদ্ধি করা হয় নি, বরং সদর আমিন এবং প্রধান সদর আমিনের মত দেশীয় পদস্থ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাও নিয়োগ করা হয়। কোম্পানির শাসনামলে বিচার বিভাগের উচ্চপদগুলি ইংরেজদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং নিম্নপদে এদেশীয়দের নিয়োগ করা হয়। কোম্পানির নিকট থেকে বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ইংরেজদের জন্যে উচ্চপদ সংরক্ষিত রাখার নীতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং পদোন্নতির মাধ্যমে এদেশীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। এভাবে ইংরেজ বিচারকদের সংখ্যাধিক্য ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে এবং এদেশীয় বিচারকদের প্রকৃত সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদেশীয় বিচারকগণ স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে বেশি অবহিত থাকায় বিচারপ্রার্থীদের জন্য তাঁরা তাঁদের ইংরেজ সহকর্মীদের চেয়ে অধিকতর ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে পারতেন। ১-৩-১৮৩৭ তারিখের একটি সরকারি প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৩৬ সনে নিষ্পত্তিকৃত ১, ১২, ৩৮০ টি মামলার মধ্যে ৬৮০৩ টি মামলা ইউরোপীয় বিচারকগণ নিষ্পত্তি করেন এবং এদেশীয় বিচারকগণ ১, ০৫, ৪৮৭ টি মামলা নিষ্পত্তি করেন। উপরন্ত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করে মুন্সেফ পদে নিয়োগ লাভ করার সুযোগ আইনের কৃতী স্নাতকদের বিচার বিভাগীয় পদস্থ চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট করতো এবং পদোন্নতির বিভিন্ন স্তর পার হয়ে তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যাক্তিগণ জেলা বিচারক পদেও নিযুক্ত হতে পারতেন। অনুরূপভাবে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদেরকে প্রত্যক্ষভাবে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যাক্তিদেরকে বিচার বিভাগীয় চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট করতো, যাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যাক্তি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে চাকুরিজীবন শেষ করেছেন।

---

৫০. ফ্রেডারিক শোর ; *নোটস অন ইন্ডিয়ান এফেয়ার্স* (লেন্ডন ১৮৩৭), ৫০-৬৫।
৫১. জৈন, প্রাগুক্ত, ২২৩।

কলিকাতা হাইকোর্টের ১৯৪৬ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে উক্ত সময়কালে বিচারকদের সংখ্যা (যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি) এবং বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান থেকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে। ১৯৪৬ সনে দেওয়ানি আদালতে ৫৬ জন সাবজজ, ২১ জন অতিরিক্ত বিচারক এবং ২২ জন জেলা বিচারকসহ ৩১৬ জন বিচারক ছিলেন এবং সেই বছর ৭, ১৩, ৪০৮টি মূল মামলা এবং অন্যান্য বিচরাধীন মামলা ব্যতীত ২১, ৭২৭টি আপীল মামলা বিচারাধীন ছিল। এগুলোর মধ্যে ৫, ০৯, ৭১৫ টি মূল মামলা ও ৮, ১৩৯ টি আপীল মামলা উক্ত বিচারকগণ নিষ্পত্তি করেন। পক্ষান্তরে, ১৯৪৬ সনে দায়রা আদালতে ৭৮ জন বিচারক ছিলেন এবং ফৌজদারি আদালতে ৬০৫ জন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেই বছর ১৮১০টি দায়রা মামলার সব কয়টি উক্ত দায়রা বিচারকগণ নিষ্পত্তি করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং দায়রা আদালতের বিচারকগণ ৩,০০০টি আপীল মামলা নিষ্পত্তি করেন। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট দায়েরকৃত ৩, ৭৫, ৬১০টি অভিযোগের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ২, ৭৭, ৫০৭টি মামলা বিচারের জন্যে গ্রহণ করেন এবং যেসব মামলা বিচারের জন্য দায়রা আদালতে প্রেরিত হয় সেগুলি সহ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ১, ৮২. ৫৮৪ টি মামলা নিষ্পত্তি করেন। বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিনগুলোতে এভাবে এদেশীয় বিচারকদের যোগ্যতা এবং মামলা নিষ্পত্তির হার খুব উচ্চ পর্যায়ের ছিল, ফলে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল না। এদেশে বিচার বিভাগের কার্যকারিতা সম্পর্কে যে পরিসংখ্যানতথ্য কলিকাতা হাইকোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে বিচার প্রশাসনে এদেশীয়দের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণের ফলে অবস্থার উন্নতি হয়। এমনকি বাংলায় বিদেশী বিচার প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত করা না গেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার ফলপ্রসূ হয়েছিল।

মুগল আমলে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিচারব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে অনুসন্ধানমূলক ছিল। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে নাজিম ও কাজীদের সাক্ষ্য ও শপথ গ্রহণের উপর সন্তুষ্ট না থেকে ঘটনা সম্পর্কে নিষ্ঠাপূর্ণ ও ব্যাপক ও অনুসন্ধান করতে বলেছেন এবং এভাবে মামলায় বিচারপ্রার্থীদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে মামলার পারিপার্শ্বিকতাও জানতে বলেছেন।[৫২] অপরপক্ষে ইংরেজদের সাধারণ আইনের মূলনীতি প্রয়োগ করে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে কোম্পানির কর্মচারীদের বিচার করার জন্যে সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত দ্বন্দ্বমূলক বিচারব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের রাজার আদালতের অবিকল অনুসরণে ১৭৭৪ সনে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। ক্রমান্বয়ে এদেশের অবশিষ্টাংশে ইসলামী ব্যবস্থার পরিবর্তে উপরোল্লেখিত বিচার প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

---

৫২. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, ৩৮ এবং ৪৩।

নতুন বিচারব্যবস্থা শুধু কালক্ষেপণকারীই নয়, বরং ব্যয়বহুলও ছিল। বিচারক হিসেবে কর্মরত অনভিজ্ঞ ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ স্থানীয় মানুষের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে পরিচিত না থাকায় দেশীয় অধস্তনদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা দুই পক্ষের মাঝে মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিরোধীয় বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় পক্ষদের মূল বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে আইনের বিভিন্ন খুঁটিনাটির প্রতি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপন করতেন। ফলে বিভিন্ন আদালতে প্রচুর অর্থ খরচ করে মামলা পরিচালনা করে বিচারপ্রার্থীগণ কোন প্রতিকারই পেতেন না।[৫৩] মৌখিক এবং দালিলিক সাক্ষ্যের উপর বিচারকদের নির্ভরশীলতা মামলাকারীদের জালিয়াতি করতে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দানে উৎসাহিত করতো। এসব দুষ্কর্ম দেশীয় সরকারের আমলে ততটা দৃষ্টি আকর্ষক ছিল না।[৫৪] সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আইনের কূটতর্ক এবং জটিলতার প্রতি ইংরেজ বিচারকদের একমাত্র নির্ভরশীলতা সুবিচার প্রদানে প্রায়শ ব্যর্থ হতো। ফৌজদারি মামলায় বাদীর প্রতি সাক্ষ্য-প্রমাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এবং অভিযুক্তকে নিরব থাকার সুযোগ দিয়ে সন্দেহের অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে মামলা থেকে প্রকৃত দোষী ব্যাক্তির খালাস পাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অপরপক্ষে অকাট্য এবং সংগতিপূর্ণ মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রদান করে প্রভাবশালী ব্যাক্তিগণ তাদের নিরপরাধ প্রতিপক্ষকে দণ্ডিত করতো। চতুর লোক ছাড়া কোন ব্যাক্তিই অবস্থার শিকার হয়ে বাধ্য না হলে আদালতের শরণাপন্ন হতো না। প্রথম যুগের একজন বাঙালি সিভিলিয়ান আর, সি, দত্ত বলেছেন যে দেওয়ানি মামলা সময়সাপেক্ষ ও ব্যায়বহুল হওয়ায় দরিদ্র লোকেরা ফৌজদারি আদালতে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ব্যর্থ হতো।[৫৫] তাই সঠিকভাবেই বলা হয়ে থাকে যে সর্বশেষ আদালতে জয়লাভকারী একজন মামলাকারী অসংখ্য কোর্টে মামলা করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যান। তাই এদেশের জনসাধারণ, বিশেষত গ্রামের সহজ সরল মানুষের পক্ষে আদালতকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ তারা মনে করতেন, সততা নয়, বরং ছলচাতুরীরই জয় হয় সেখানে। ঔপন্যাসিক প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলা কান্তের দফতরে' অত্যন্ত সার্থকভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কোর্ট-কাছারিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার প্রাণবন্ত ও সঠিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যার জন্য সাধারণ মানুষ আদালতকে খুবই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতো। একাধিক আপীলের বিধানসম্পন্ন এবং মামলার নিষ্পত্তিতে অধিক বিলম্বকারী বিচারপ্রশাসন ব্যবস্থা মামলাকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও হয়রানিমূলক করে তুলেছিল। এতদসত্ত্বেও এ ব্যবস্থা মামলাবাজ লোকদেরকে তাদের দুর্বল প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে তুচ্ছ ব্যাপারে মামলা করা থেকে বিরত করে নি। কারণ আদালত মামলায় বিজয়ী পক্ষকে পরাজিত পক্ষের বিরুদ্ধে সামান্যই খরচ ডিক্রী দিত। পাকিস্তানে মামলাবাজগণ কর্তৃক আইন ও বিচারব্যবস্থার এমন অপব্যবহারের

---

৫৩ আর. সি. শ্রী বাস্ট্রভ, প্রাগুক্ত, ৩।

৫৪. ঐ, পূর্বোক্ত, ৭।

৫৫. *পিজান্ট্রি অব বেংগল* (কলিকাতা, ১৮৭৪ পুনর্মুদ্রণ ১৯০০, ৮৮-৮৯।

লক্ষ্য যে সুবিচার পাওয়া নয় অন্য কিছু ছিল, তা ষাটের দশকে আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ ই. এডামসন হোয়েবেলের গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়।[৫৬]

দেশে ঔপনিবেশিক শাসনকালে আইনের শাসনের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৮১ সনের অ্যাক্ট অব সেট্‌ল্‌মেন্ট দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকারের কর্মচারীদের অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্যে সুপ্রীম কোর্টের রিট জারির ক্ষমতা ব্যপকভাবে খর্ব করা হয়। উক্ত আদালতের এখতিয়ার প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট ঐতিহ্যসূত্রেই রিট জারি করে নির্বাহী কর্মের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করার সীমাবদ্ধ এখতিয়ার লাভ করেছিল এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরের সীমানায় উহার প্রয়োগ করতে পারতো এবং তার বাইরে তা করতে পারতো না। এদেশীয়দের মাঝে মামলার বিচার করার সময় ইংরেজ বিচারকগণ কোন বৈষম্য না করলেও দেশীয়দের এবং বৃটিশ নাগরিকদের মধ্যে মামলার বিচার করার সময় বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ ছিল। ১৮১৩ সনের চার্টার অ্যাক্ট প্রণীত হওয়া পর্যন্ত জেলা দেওয়ানি আদালতের ইংরেজ বিচারকদের বৃটিশ নাগরিকদের বিষয়ে সীমাবদ্ধ এখতিয়ার ছিল, যা ঐ আইন দ্বারা দূরীভূত হয় এবং ঐ বিষয়ে তাদের সীমাহীন এখতিয়ার প্রদান করে। কিন্তু দেশীয় বিচারকগণ বৃটিশ নাগরিকদের বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলার বিচার করতে পারতো না। ১৮৩৬ সনের ১১ নং আইনে সদর আমিনদের এবং ১৮৪৩ সনের ৬ নং আইনে মুন্সেফদের ঐ অসামর্থ্য দূর করে তাঁদের আদালতে ব্রিটিশ নাগরিকদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৮৩৬ সনের ১১ নং আইন দ্বারা বৃটিশ নাগরিকদের সুপ্রীমকোর্টে আপীল করার অধিকার রহিত করা হয়। এর পরিবর্তে বৃটিশ নাগরিকগণকে কোম্পানির অধস্তন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতে আপীল করার অধিকার প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে কোম্পানির ফৌজদারি আদালত বৃটিশ নাগরিকদের বিচার করতে পারতো না এবং ম্যাজিস্ট্রেট জাস্টিস অব দি পিস রূপে তাদের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্যে প্রেরণ করলেই মাত্র সুপ্রীমকোর্ট সেই মামলার বিচার করতে পারতো। ১৮৭২ সনের ফৌজদারি কার্যবিধিতে মফস্বল আদালতকে বৃটিশ নাগরিকদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হলেও এদেশীয় বিচারকগণ তাদের বিচার করতে পারতো না । শুধু ১৯২৩ সনের ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইনে এদেশীয় বিচারকগণ কর্তৃক ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করার বাধা দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ নাগরিকগণ, অন্যান্য ইউরোপীয় নাগরিকগণ এবং আমেরিকান নাগরিকগণ দায়রা মামলায় ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান জুরিদের দ্বারা বিচারের দাবি করতে পারতো। তাদের এ অধিকার ১৯৪৭ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনামলে বলবৎ ছিল। শ্বেতাঙ্গ জুরি পছন্দ করার কৌশলের দ্বারা ইউরোপীয় এবং আমেরিকান নাগরিকগণ প্রকৃতপক্ষে দোষী হওয়া স্বত্ত্বেও নির্দোষ বলে জুরিদের মতামতের ফলে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যেতো, কারণ জুরিদের মতামত বিচারকের উপর বাধ্যকর ছিল।

---

৫৬. জে, এফ, হলম্যান, ট্রাবল কেইসেস এন্ড ট্রাবললেস কেইসেস ইন দি স্টাডি অব কাস্টমারী ল এন্ড লিগ্যাল রিফরম", *দি ল এন্ড সোসাইটি রিভিউ,* সপ্তম খণ্ড, ৪ নং গ্রীষ্ম সংখ্যা জুন-আগস্ট, ১৯৭৩, ৬০২।

এভাবে ঔপনিবেশিক আমলে বিচার প্রশাসনে এক প্রকারে বা অন্য প্রকারে বর্ণবৈষম্য বলবৎ ছিল এবং তাদের বেলায় আইনের শাসনের কোন প্রয়োগ ছিল না।

১৮৩৭ সনে সরকারি ভাষারূপে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তিত হওয়ায় যেসব এদেশীয় লোক ইংরেজি জানতেন না বা শিখেন নি তারা অধস্তন সরকারি চাকুরি থেকেও বঞ্চিত হন। এমনকি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে যেসব আইনজ্ঞ ফার্সি ও উর্দু ছাড়া ইংরেজি ও বাংলা জানতেন না, তাঁরা আইন পেশা ও বিচার বিভাগীয় চাকুরি হারিয়ে সমাজে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন। পণ্ডিত, মৌলবি, মুফতি ও কাজীর মত আইন-উপদেষ্টাদের ১৮৬৪ সনে আইন ব্যাখ্যাকারীর পদ থেকে অপসারণ করে তাদের শবাধারে পেরেকের শেষ ঠোকা মারা হয়। ১৮৮০ সনের আইন দ্বারা চাকুরি থেকে অপসারিত কতিপয় কাজীকে মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক আইন ও বিচারব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসেবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আইনজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, যারা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। আইনজীবীগণ তাদের জীবিকার জন্যে খুব সামান্যই ঔপনিবেশিক শাসকদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরা প্রধানত জমিদার ও অন্যান্য পেশাদার শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। তাই তাঁরা ঔপনিবেশিক প্রভুদের তোয়াক্কা না করে দেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে এবং তাদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে কাজ করতে পারতেন। তারা বাংলায় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন দাস, প্রমথ মিত্র, আবদুর রসূল, খাজা নাজিমুদ্দীন, জে. এম. সেন গুপ্ত, শরৎ চন্দ্র বসু কিরণ সঙ্কর রায় এবং এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর মত ব্যারিস্টারগণ এবং এ. কে. ফজলুল হক, সৈয়দ নওশের আলী, তমিজউদ্দিন খান, শামসুদ্দিন আহম্মদ, আবু হোসেন সরকার, নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অখিল চন্দ্র দত্ত, কামিনী কুমার দত্ত, অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের মত এডভোকেটগণ, যাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, সন্ত্রাসী বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি, স্বরাজ্য পার্টি, মুসলিম লীগ এবং কৃষক প্রজা পার্টি যেসব আন্দোলনের সূচনা করেছিল তাতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন এবং সামাজিক ও বাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে দেশে আইন শিক্ষার বিস্তার ঘটায় বিচার বিভাগে বাঙালিদের অংশগ্রহণও বেড়ে যায়। এস. পি. সিনহা, সৈয়দ আমির আলী, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, স্যার আবদুর রহিম, নওয়াব শামসুল হুদা এবং অন্যান্য বহু বাঙালি আইনজ্ঞ উচ্চতর আদালতের বিচারপতি হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগে প্রভূত অবদান রাখেন। এস. পি. সিনহা ইংল্যাণ্ডের হাউস অব লর্ডসের সদস্য হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যও হয়েছিলেন। সৈয়দ আমির আলী হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যও হয়েছিলেন। প্রজাদের ভূমিস্বত্ব অর্জন, কৃষকদের দেয় ঋণ হ্রাস, বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন করে আইনজীবীগণ বৃটিশ

শাসনামলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রভাব বিস্তার করেন। আইনজীবীগণ পাকিস্তান গণপরিষদে এবং পূর্ব বাংলা আইনসভায় প্রভাব বিস্তার করে দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে জনগণের অধিকার রক্ষায় বহুবিধ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন প্রণয়নে সাহায্য করেন, আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার জন্যে ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন, জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং সমাজে বিচার প্রশাসনে পরিবর্তন সাধনের জন্যে অন্যান্য বহুবিধ আইন প্রণয়নে সাহায্য করেন। পাকিস্তানের সংবিধান নাগরিকদেরকে শুধু মৌলিক অধিকারই প্রদান করে নি, বরং হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টকে প্রিরগেটিভ রিট জারি করার কর্তৃত্ব প্রদান করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যবস্থা করে।

আইনের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অপরাধীদের অঙ্গহানি ও শিরচ্ছেদের মত নিষ্ঠুর ও মানহানিকর প্রথা, সতীদাহ প্রথায় বিধবাদের জলন্ত আগুনে পুড়ে মারা, দাসপ্রথা, বঙ্গোপসাগরের সাগরদ্বীপ থেকে বা অন্য স্থান থেকে সাগরে শিশু নিক্ষেপ করার প্রথা, কন্যাশিশু হত্যা এবং শিশুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, বর্ণপ্রথা বিলোপ, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বৈধকরণ, সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলার অধিকার সংরক্ষণ, বিবাহিতা হিন্দু মহিলাকে পৃথক আবাস প্রদান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকার প্রদান এবং বিবাহিতা মুসলিম মহিলার আদালতের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার প্রদানের সকল কৃতিত্ব ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রাপ্য। ভূমিতে বিভিন্ন স্তরের ভূমিস্বত্ব সৃষ্টি করে প্রণীত আইন এবং অন্যান্য আইন প্রণয়নের ফলে গ্রামীণ সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। আইন ও বিচারব্যবস্থায় পরিবর্তন, রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক শক্তির সক্রিয়তা, শিল্পায়ন, যোগাযোগ ও যাতায়াতব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদির ফলে নগরায়ণের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিশীল হয় এবং গ্রামবাসীদের শহরে গমন ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, যা অতীতে ঘটে নি। উপরোক্ত শক্তিসমূহের সক্রিয়তার কারণে যৌথ পরিবারব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবারব্যবস্থার উত্থান ঘটে। এভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে প্রধানত প্রথাগত গতানুগতিক এবং মধ্যযুগীয় সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাশাসিত সমাজ থেকে একটি ঐতিহ্যবন্ধনে আবদ্ধ, বর্ণপ্রথায় শাসিত এবং মর্যাদাসচেতন সমাজ ক্রমান্বয়ে তুলনামূলকভাবে মুদ্রা অর্থনীতিশাসিত ও চুক্তিভিত্তিক সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক সম্পর্কনির্ভর একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়, যা ঔপনিবেশিক শাসকগণ কর্তৃক এদেশবাসীদের শোষণ অক্ষুণ্ন রাখার জনেই তাদের প্রবর্তিত আইন ও বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৬২ সন থেকে ১৮৬৯ সন পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইনসদস্য এবং বহু আইন সঙ্কলনকারী স্যার হেনরি সুমনার মেইন সমাজের এরূপ পরিবর্তনকে "পদমর্যাদা থেকে চুক্তিবন্ধনের দিকে অগ্রসর হওয়া" বলে অভিহিত করেছেন।[৫৭]

৫৭. *এন্‌শেন্‌ট্‌ 'ল* (বোস্টন, ১৯৬৩) ১৬৫।

১৯

নারী ও সমাজ

সোনিয়া নিশাত আমিন*

নারীর মর্যাদার চিহ্নিত ক্ষেত্রাবলী ও নারী সমাজের প্রধান প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার (বিবাহ, পণ, বৈধব্য, সম্মতিপ্রদানের বয়স, বহুবিবাহের আনুষঙ্গিকতাসহ), ধর্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি। নারীর মর্যাদার স্বরূপ অনুসন্ধানে এ কথা পরিষ্কারভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজের এহেন বিভাজন শুধু বৈশ্লেষিক সুবিধার মূল্য এবং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য করা হয়। সমাজের কোন কোন আদর্শগত বা আচরণগত উপাদান, যেমন, কোন সামাজিক মূল্যবোধ (নারীর পবিত্রতা বা সতীত্ব) অথবা কোন সামাজিক রীতি (পর্দাপ্রথা) বহুবিধ উপায়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং সেই সাথে ধার্মিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমাত্রা গ্রহণ করতে পারে। আবার কোন এক বিশেষ সময়ে সব উপাদান একইভাবে বা একই গুরুত্ব বহন করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সতীদাহপ্রথা, বিধবাবিবাহ এবং সম্মতিপ্রদানের বয়ঃসীমার সমস্যাবলী উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে সামাজিক পরিবর্তনের ঝড় তুলেছিল এবং এক গৌরবময় সংস্কারযুগের সূচনা করেছিল। এরই দ্বিতীয়ার্ধে নারী যখন 'আধুনিকীকরণে' সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে, তখন শিক্ষা প্রধান দাবিতে পরিণত হয়।

পর্দা ও নারী

সমীক্ষার আলোচ্য সময়ে পর্দাপ্রথা সর্বদাই একটা পরিব্যাপক সামাজিক রীতি হিসেবে বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা নারীর গতিরোধ করা হয়েছে এবং সমাজসংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণের মাত্রা ও প্রকৃতির প্রভাবকে খর্ব করা হয়েছে। ফার্সি ভাষায় 'পর্দা' শব্দের অর্থ যবনিকা বা অবগুণ্ঠন। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় সামাজিক রীতি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হিসেবে পর্দাপ্রথা নারীকে আলাদা করার এবং নারীর শালীনতা নিয়ন্ত্রণ করার এক অধিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার পথকে রুদ্ধ করার মধ্যে পর্দাপ্রথার কঠোর বৈশিষ্ট্য নিহিত। ব্যতিক্রম শুধু কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র, যা আবার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

একটি সাংস্কৃতিক অধিষ্ঠান হিসেবে (বহুবিধ ধারণা ও আচরণ এবং মূল্যবোধের জটিল সংমিশ্রণ হিসেবে) পর্দাপ্রথা[১] নারীকে তার ঘরের বাইরে যেতে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয় এবং জনসমাগমক্ষেত্রসমূহে নারীর উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ করে দেয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে থাকে শুধু পুরুষেরই অধিকার। মোদ্দাকথা, নারীর গতিবিধি তার পরিবারের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে। আদর্শে ও আচরণে পর্দাপ্রথা নারীর যৌনতা, সতীত্বস্খলন, পবিত্রতা ও প্রজননের উপর পাহরাদারি ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্নিহিত অসাম্যই এই ধরনের ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে, যেখানে কিনা শিশুর প্রাকৃতিক (biological) পিতৃত্ব সমাজে সব চাইতে বড় প্রশ্ন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণে বাধা প্রদান করার বিষয়ে পর্দাপ্রথার ভূমিকাই এখানে প্রাসঙ্গিক, যদিও পর্দাপ্রথা প্রয়োগের ধরন ও তীব্রতা সম্প্রদায়, শ্রেণী, বলয়, সংস্কৃতি ও সময়ের তারতম্যে ভিন্ন।

শিক্ষা ও নারী

সাধারণত যেকোন ধরনের নিয়মমাফিক প্রতিষ্ঠানগত বিদ্যার্জনকে 'শিক্ষা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এই আখ্যায়নের পরিধি পর্দাপ্রথার মতোই ব্যাপক এবং ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা ভিন্ন অর্থ বহন করেছে। আঠারো শতকে 'শিক্ষার' অর্থ ছিল শাস্ত্রীয় জ্ঞান, লেখা ও পড়ার সক্ষমতা বা বড়জোড় হিসাব রাখার বা কবিতা লেখার বা ইতিহাস লেখার সক্ষমতা। এই শেষোক্ত ক্ষমতাগুলি অবশ্য সীমিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হতো। মোটামুটিভাবে সাধারণ জ্ঞানার্জনের মাত্রার বাইরে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মতো মুক্তবিদ্যার বিষয়ে জ্ঞানার্জন নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতো না।

উনিশ শতকে সুরুচিসম্পন্ন ও সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের সাথে 'শিক্ষা' যুক্ত হলো এবং এর ব্যাপকতা সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক বিবেচিত হলো। বিশ শতকে কর্মসংস্থানের

---

১. দক্ষিণ এশিয়ায় পর্দাবিষয়ক আলোচনার জন্য দেখুন, Patricia Jeffery, *Frogs in a Well Indian Women in Purdah,* (New Delhi 1979); Hanna Papanek, "Purdah : Separate Worlds and Symbolic Shelter" in Hanna Papanek and Gail Minault (eds.), *Separate Worlds Studies of Purdah in South Aisa,* (New Delhi 1982); Milly Cattell, *Behind the Purdah,* (Thacker & Co. 1916), (this book discusses purdah among Hindu women); Mushir Hosain Kidway, *Harem, Purdah or Seclusion,* (Lahore 1920) (this book is a defense of purdah). and Attia Habibullah, "Seclusion of Women", in Shyam Kumari (ed.), *Our Cause*, (Allahabad 1938).

অবশ্যপূরণীয় শর্ত হিসেবে 'শিক্ষা'র নতুন অর্থ দেখা দিল এবং তা জন্মগত অধিকারের অঙ্গরূপে গণ্য হলো।

এই সমীক্ষার কাঠামো ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য সময়ে নারীর ভূমিকার সূচক ও নির্ধারক হিসেবে 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' এই দুই উপাদানকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাই সেই ঘটনাবলী ও মনোবৃত্তির উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যেগুলি এই দুই সমস্যাকে ঘিরে বিরাজমান এবং যেগুলি আলোচনা, বিশ্লেষণ ও কর্মধারার বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' 'প্রিজমের' মতো কাজ করে গত কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়। উপক্রমণিকা ব্যতীত এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় আরও তিনটি ভাগ রয়েছে, যা মোটামুটিভাবে সময় ও মূল সুরের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়েছে। এ তিনটি ভাগ হচ্ছে—

ক. আঠারো শতক : ব্যতিক্রমের কাল

খ. উনিশ শতক : পুনর্জাগরণ, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ পর্যায়

গ. বিশ শতক : স্বাধীনতার সংগ্রাম

আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের তৃতীয়ভাগ পর্যন্ত বাংলার 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' সম্পর্কিত প্রধান ঘটনাবলী ও মনোবৃত্তি সম্পর্কে একটা ধারণা প্রদান করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরেও প্রবেশ করা হয় নি, যদি না শিথিলভাবে শুধু ঘটনাপ্রবাহের জন্য সেসব উল্লেখের আবশ্যকতা থাকে। আলোচিত কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বিশেষ ঘটনাবলীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বিবৃত করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য মাধ্যমিক তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রচলিত আলোচনার সাথে যুক্ত করার মতো কোন নতুন তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কারের সুযোগ থাকতে পারে, এরকম ক্ষেত্রে কোন কোন সময় প্রাথমিক তথ্যও পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিরেট বাস্তব বিষয়াবলীর প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার বা উল্লেখেরও চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক-ঐতিহাসিক বিষয়াদি পরস্পর সমন্বিত বিধায় ঘটনাবলী পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা কঠিন। তাই উপস্থাপিত 'পর্দা' ও 'শিক্ষা' বিষয় দুটি সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে।

এই সমীক্ষার শিরোনামের অধীনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু আলোচনাকালে প্রধানত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে সেই ভৌগোলিক অঞ্চলের উপর, যা রাজনৈতিকভাবে বর্তমান বাংলাদেশ নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ইতিহাস সঙ্কলনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে বলেই সেটা করা হয়েছে। বাংলার অন্যভাগে, যা বর্তমানে পশ্চিম বাংলা নামে পরিচিত, সেখানে নারীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এই বিষয়ে বহু সমীক্ষাও বিদ্যমান। এই কারণে যেখানেই সম্ভব হয়েছে, সেখানেই বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি সচেতনভাবে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

দুই

ক. আঠারো শতক : ব্যতিক্রমের কাল

নারীঅবরোধের (পর্দাপ্রথার) উৎস

ভারতীয় নারী বিষয়ক ঐতিহাসিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, নারীর মর্যাদার উত্থান ও পতনের সুনির্দিষ্ট পর্যায় রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মোটামুটি বিশ্বাস যে, প্রাচীন ভারতে নারী যথেষ্ট উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৈদিক যুগের পরে এই অবস্থানের অবনতি ঘটে। পৌরাণিক শাস্ত্রজ্ঞ মনুর প্রদত্ত বিধান থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় : "জীবনের কোন পর্যায়েই নারীর জন্য কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" এই অবস্থা মুসলিম বা মধ্যযুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, নারীকে অধীনস্থ করে রাখার ইসলামী রীতি এই ব্যবস্থাকে জোরদার করে। আবার অন্য মনীষীরা[২] উল্লেখ করেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের আগেও হিন্দুদের মধ্যে পর্দাপ্রথা বা অবরোধপ্রথা বিদ্যমান ছিল। তাই ইসলামী প্রভাবেই নারীমর্যাদার অবনতি ঘটেছে—এই দাবি ইতিহাসসিদ্ধ নয়।

একথা সর্বজনবিদিত যে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সামাজিক কাঠামো দ্বারা সীমিত। এই সামাজিক কাঠামোই পর্দাপ্রথা বা অবরোধপ্রথা বলবৎ করে আর শিক্ষার সুযোগ যদি থেকেও থাকে, সেখানে নারীর প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ করে দেয়। যদিও এলাকা ও সম্প্রদায়ের তারতম্যে পর্দাপ্রথার রূপও ভিন্ন হয়[৩], কিন্তু সব সম্প্রদায়ের, সব এলাকার এবং সব যুগের নারী এই প্রথা মোটামুটিভাবে মেনে চলেছে। "নারী-ভূমিকাকে পরিবেষ্টনকারী অন্যান্য প্রথা জাত... শ্রেণী ও এলাকা ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ছিল এবং ভারতের সকল নারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ছিল না।"[৪]

অবরোধপ্রথা ভারতে কখন চালু হয়েছিল তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় পর্দাপ্রথার বিধান সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে, যদিও এই প্রথা প্রচলনের সূত্র হিসেবে প্রায়ই কোরানের কোন কোন আয়াত উল্লেখ করা হয়। আবার এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা অনেকে ভিন্নভাবে করেন এবং এই অভিমত পোষণ করেন যে, সার্বিকভাবে অবরোধ এবং পৃথকীকরণের ব্যবস্থা প্রচলন করা কোন ক্রমেই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না।

---

২. Shahida Lateef, *Muslim Women in North India*, (New Delhi 1990), 78. ইসলামের পূর্বে পর্দাপ্রথার অস্তিত্বের বিষয়ে লতিফ বলেন, "পর্দাবিষয়ের উপর এক প্রবন্ধে কে. কে. স্বামী বর্ণনা দিয়েছেন যে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে ইসলামের আগমনের বহু পূর্বেই প্রথাটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল এবং এর সমর্থনে *রামায়ণ*, *পুরাণ* ও *মহাভারতে* ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।"

৩. শাহিদা লতিফ এই মত পোষণ করেন যে, দাক্ষিণাত্যের চেয়ে উত্তর ভারতে পর্দাকে অধিকতর রীতিমাফিক মান্য করা হয়। দেখুন, ঐ।

৪. ঐ, 75.

তাহলে একথাই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে, পূর্ব থেকেই বিরাজমান নারী অবরোধপ্রথাসমূহ মুসলিম আমলে শুধু আরো জোরদার হয়েছিল।

বাঙালি নারী বিষয়ক সমীক্ষা এবং সমসাময়িক বিবরণ

আলোচ্য সময়ে নারীর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে কালীকিংকর দত্ত ও আবদুর রহিম[৫] উভয়েই একই উৎস ব্যবহার করেছেন, যেমন সমসাময়িক পারসিক বিবরণ—*রিয়াজ-উস-সালাতিন, সিয়ার-উল-মুতাখেরিন, খুলসাত-এ তাওয়ারিখ, বাহারিস্তান-ই-গায়েবী;* কিছু বিদেশীদের লেখা বিবরণ এবং সমসাময়িক সাহিত্য (প্রধানত ভারতচন্দ্র)। তা সত্ত্বেও তাঁদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ ভিন্ন ছিল। দত্ত হিন্দু নারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন; রহিম দৃষ্টি দিয়েছেন মুসলিম নারীর প্রতি। অপরদিকে মিসেস গ্রে[৬] বিদেশীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

আঠারো শতকের ভারতে বিদ্যমান পর্দাপ্রথা ও রীতির সঠিক পরিসংখ্যান প্রদান করা সম্ভব নয়। গ্রের মতে, আঠারো শতকের শেষভাগে ভারতে প্রায় চার কোটি নারী পর্দাপ্রথায় আবদ্ধ ছিল।[৭] রাজকীয় ও ধনী পরিবার নারীদেরকে অবরোধে রাখতো, তবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও পর্দাপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। আপাতবিরোধী মনে হলেও বাস্তবে দেখা যায় যে, উচ্চশ্রেণীর মহিলারাই সামাজিক অঙ্গনে যাতায়াতের সুবিধা ভোগ করতো এবং সামাজিক কার্যক্রমে অধিকতরভাবে অংশগ্রহণ করতো। সব ঐতিহাসিকই এই সময়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে বিরাজমান পর্দাপ্রথার উল্লেখের চেয়ে সামাজিক কার্যক্রমে কতিপয় নারীর (অধিকাংশই অভিজাত সম্প্রদায়ের) ভূমিকার বিবরণ তুলে ধরেছেন। এতে নারীর স্বাধীনতা যে সীমিত ছিল, তাই প্রমাণিত হয়।

সাধারণ হিন্দু নারী জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে পবিত্র অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় জীবনযাপন করতো। ধর্মীয় পূজা-অর্চনা এবং সতীত্ব তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ছিল। পতির সেবার জন্যই নারী আদিষ্ট ছিল এবং সে তার আদেশ কখনই অমান্য করতো না।[৮]

পোশাককে যদি পর্দাপ্রথার একটি নির্দেশক হিসেবে ধরা যায়, তবে এই বিষয়ে সমসাময়িক ইতিবৃত্তে অনেক চমৎকার বিবরণ দেখা যায় (বিবরণে অনেক ক্ষেত্রে অমিলও রয়েছে)। গোলাম হোসেন সেলিম লিখেছেন :

---

৫. M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Vol. II, 1576-1757, (Karachi 1967).

৬. Mrs. Gray, "The Progress of Women" in L. S. S. O'Malley (ed.), *Modern India and the West,* (London 1941).

৭. ঐ, 449.

৮. মনুর নির্দেশাবলীর সাথে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন সাহিত্য-কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে ভারতচন্দ্র থেকে গৃহীত দৃষ্টান্তের সাহায্যে কে. কে. দত্ত এ বর্ণনা দেন।

> উচ্চ এবং নিম্ন উভয় শ্রেণীর পুরুষ এবং নারীর পোশাক ছিল এক প্রস্থ কাপড়, যা দিয়ে শুধুমাত্র গুপ্তাঙ্গগুলো ঢাকা যেতো... । নারীরা যে এক প্রস্থ কাপড় পরিধান করতো তাকে শাড়ি বলা হতো, যার অর্ধেকটা দিয়ে নাভি থেকে নিচে পা পর্যন্ত জড়িয়ে রাখা হতো এবং বাকি অর্ধেকটা ঘাড় পেঁচিয়ে বা পার করে রাখতো। তারা মাথা খোলা রাখতো এবং অন্য কোন পোশাক পরতো না। এমনকি, জুতা বা মোজাও পরতো না ... । বাঙালি নারীরা পর্দাপ্রথা মান্য করতো না এবং রেচন কর্মে এবং অন্যান্য সাংসারিক কাজে বাড়ির বাইরে যেতো।[৯]

এই সময়ে বাংলাদেশে ভ্রমণকারী ইতালীয় পর্যটক ম্যানরিক এদেশীয় পোশাকের এক প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে গেছেন। তাঁর বিবরণে জানা যায়, নারীরা ১৮ থেকে ২০ বিঘত লম্বা সুতী কাপড়ে এবং পুরুষেরা ৭ থেকে ৮ বিঘত লম্বা কাপড়ে তাদের শরীর ঢেকে রাখতো। নারীদের ব্যবহৃত গহনার বিবরণে তিনি বলেছেন, গলায়, মুখমণ্ডলে, হাতে ও পায়ের আঙ্গুলে নারীরা গহনা ব্যবহার করতো। মনে হয় ম্যানরিক সাধারণ মানুষদের কথাই উল্লেখ করেছেন।[১০] এই বিবরণে যে অসঙ্গতি দেখা যায় তা আংশিকভাবে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে পর্দাপ্রথার ব্যবহারিক পার্থক্যের জন্য। মুসলিম নারী সারা জীবন ধরে পর্দাপ্রথা মেনে চলতো। কিন্তু হিন্দু নারীর বেলায় বিবাহোত্তর জীবনেই পর্দাপ্রথার প্রয়োজন বেশি ছিল।

পুরুষের কাছে নারীর অধীনতা প্রসঙ্গে দত্ত তাঁর নিবন্ধের এক পাদটীকায় বলেছেন যে, নারীরা সাধারণত তাদের স্বামীর আদেশ-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং স্বামীর মত গ্রহণ না করে কোন কাজ করতে পারতো না। তারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকতো এবং তাদের জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আসার অনুমতি দেয়া হতো না। ভেরেলস্ট এই বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, "নারী-অবরোধ এমন এক আইন যার পরিবর্তন করা যায় না। সমগ্র ভারতে এই প্রথা সুনিশ্চিতভাবে বিদ্যমান এবং জনসাধারণের ধর্ম ও লোকাচারের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। নারীকে দৃষ্টিগোচর করানো যে চরম অসম্মানজনক কাজ সে বিষয়ে হিন্দুরা মুসলিমদের চাইতে কম ভীত ছিল না।"[১১]

নারীরা যে পর্দা মেনে চলতো সেকথা এম. এ. রহিমও সমর্থন করেন, "মুখ বা মাথা খোলা রেখে নারীর জনসমক্ষে উপস্থিতি হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই অসম্মানজনক মনে করতো।"[১২] তথাপি বিদেশীদের সমসাময়িক ইতিবৃত্তে নারীর কেশবিন্যাসের ধারা এবং অলঙ্কারের বিবরণ এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে নারীরা বিশেষ বিশেষ সময়ে দৃশ্যমান ছিল।

---

৯. Ghulam Hussain Salim, *Riyaz-us-Salatin*, (translation by Abdus Salam 903), 22.

১০. উদ্ধৃত A.C.Roy in *History of Bengal-Mughal Period*, (Calcutta 1968), 468.

১১. উদ্ধৃত, Dutta, "Position of Women", 244.

১২. Rahim, *Social and Cultural History*, 236.

অতএব দেখা যাচ্ছে, আঠারো শতকের বাংলাদেশে পর্দাপ্রথা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ আমরা পাই। এই বিভ্রান্তি কিছুটা দূর হতে পারে যদি বর্তমান কালের সমীক্ষা এবং বিশ্লেষণের দিকে নজর দেয়া হয়। পাপানেক[১৩] উল্লেখ করেন যে, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল অভিন্ন, শুধু প্রকাশভঙ্গিতে তা পৃথক ছিল। মুসলিম পর্দাপ্রথার আবশ্যকতা একান্ত স্বজনদের মধ্যে আরোপ করা হতো না। এ ছিল বাইরের লোকদের জন্য। পক্ষান্তরে হিন্দু পর্দাপ্রথা নারী ও তার বৈবাহিকসূত্রে পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিহারের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রথার বিধান রয়েছে। সতর্কতার সাথে কেউ এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে পর্দাপ্রথা সামাজিক বিধির এক অখণ্ড উপাদান, যা শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের নিম্নাংশের জন্য (বিশেষত গরিব) শিথিল ছিল, কিন্তু মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর জন্য বেশ কঠোর ছিল। এ কথাও আবার সত্য যে উচ্চ শ্রেণীর নারীরাই মাঝে মধ্যে পর্দার বাঁধন ছিন্ন করতো।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে নারীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এম. এ. রহিম বর্ণনা করেছেন। সাধারণত তারা ছিল পুরুষের উপর নির্ভরশীল, তারা হারেমের অবরোধে জীবনযাপন করতো। লেখাপড়া শেখার সুযোগ তাদের ছিল না (শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণী ব্যতীত) এবং অন্তঃপুরের সীমানার মধ্যেই তাদের কর্মজীবন সীমিত ছিল। হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদার তুলনায় রহিম মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদার বিষয়ে স্পষ্টত পক্ষপাতিত্ব করেন। যেকোন ব্যক্তিই লক্ষ্য করবেন যে, তাঁর লেখায় কোন এক বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে পুরো বিষয়টা যুক্তিগ্রাহ্য বা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশৃঙ্খলভাবে সংগৃহীত এই ধরনের দৃষ্টান্ত এবং ইচ্ছামতো প্রদত্ত উদ্ধৃতি যেকোন দিকেই প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণের সহায়ক হয় না। মোদ্দাকথা, এই ভিন্নতা ছিল মাত্রায়, প্রকারে নয় এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীকেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পবিত্রতা ও পর্দাপ্রথার নিগড়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকতে হতো।

এযুগের কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী নারী

আলোচ্য সময়ে সমাজের উচ্চস্তরের কতিপয় অসাধারণ মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহিলাদের উদ্দীপনা ও তেজস্বিতা দেখে অভিভূত হতে হয়। এই ধরনেরই এক মহিলা ছিলেন. উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্নর সুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিনাতুননিসা, যিনি স্বামীর লাম্পট্যের কারণে তার সঙ্গে একসাথে বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তিনি সুবিধামতো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করতেন বলেও জানা যায়। উড়িষ্যার আর এক ডেপুটি গভর্নর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী দুর্দানা বেগম আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সমসাময়িক লেখকদের ধারণা, জনসাধারণ

১৩. Papanek, "Purdah".

দুর্দানা বেগমকে তাঁর স্বামীর চাইতেও বেশি শ্রদ্ধা করতো। মারাঠাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরফুননিসা বেগম তাঁর স্বামী আলিবর্দী খাঁর সাথে ছিলেন। আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং সিরাজের খালা ঘসেটি বেগমও একজন শিক্ষিতা, প্রতিভাময়ী এবং নির্ভীক মহিলা ছিলেন এবং তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর সুবার দেওয়ান নিযুক্ত হন। মনুজান খানম (১৭১৭-১৮০৩) হাজি মোহাম্মদ মোহসিনের বোন। তিনিই জমিদারি দেখাশুনা করতেন। মোহসিন ট্রাস্ট ফান্ড তাঁর সৃষ্টি। বাংলাদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ প্রখ্যাত মহিলাদের দৃষ্টান্ত আছে।[১৪] মীর জাফর আলি খানের স্ত্রী মুন্নি বেগম ওরফে 'কোম্পানির আম্মা'[১৫] সার্দানার বেগম সমরুর[১৬] মতোই বিখ্যাত ছিলেন।

কতিপয় হিন্দু রমণীরও বিবরণ আছে, যাঁরা নির্ভরশীলতা ও অবরোধের প্রাচীর অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এরকম বিখ্যাত কতিপয় রমণীর বিবরণ দত্ত প্রদান করেছেন। নাটোরের রানী ভবানী এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। যোগ্য জমিদার হিসেবে তিনি তাঁর বিশাল জমিদারি বেশ ভালভাবে এবং প্রজ্ঞার সাথেই পরিচালনা করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টা, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তাঁর দয়া ও ব্যাকুলতা বাংলাদেশে কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়। একটু কম পরিচিতি থাকলেও একই ধরনের তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন রংপুরের জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরানী। তিনি ঐ অঞ্চলের অপর এক জমিদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্যান্য জমিদার ও রায়তদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আঠারো শতকের আর এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন দেবী চৌধুরানী। জয়দুর্গার মতো তিনিও ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির বিরুদ্ধে স্বদেশী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আঠারো শতকের এক আকর্ষণীয় ব্যাপার এই যে, দৃষ্টান্তমূলক সাহসিকতা ও তেজস্বিতা প্রদর্শনের জন্য নারীকে তখনও 'রায় বাঘিনী' উপাধি দেবার রাজকীয় প্রথা বিদ্যমান ছিল। ষোলো শতাব্দীতে আকবর বাংলাদেশের ভবশঙ্করীকে এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন; তাঁর নেতৃত্বে আফগান আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব সাবিত্রী বাঈকে এই উপাধি দিয়েছিলেন; তিনি সাবিত্রী বাঈকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

মূল ধারার বাইরের নারী

এই সময়ে বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক নারীর মধ্যে এমন সুখ্যাতি ও কর্মক্ষমতা যদিও অচিন্তনীয়, তবুও সাধারণ নারীদের কিছু অংশ সামান্য মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ

---

১৪. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Ghulam Hussain Khan Tabatabai *Seir-ul- Mutakherin*, Translation by John Briggs, (Madras,831). মন্নুজানের জন্য দেখুন, Shirin Akhtar, "Mannujan Khanam: An unrecognised Benefactor", Clio, Jahangirnagar University, Vol. viii, 1990.

১৫. Brojendranath Banerjee, *Begams of Bengal*, (Calcutta 1942).

১৬. George Huddleston's "A Calcutta Benefactoress", in *Bengal Past and Present*, 1:2 (1907).

করতো। তবে মূলধারার জীবনের মূল্যবোধ ও জীবনযাত্রা এই অংশকে 'সামাজিক সম্ভ্রম'-এর সীমানার বাইরে অন্য এক জগতে নিক্ষেপ করে তাদের 'সমাজ'-এর বাইরে স্থান দিয়েছিল। এই দলের মধ্যে রয়েছে শিল্পকলা পরিবেশনকারী নানা পেশার দল, নৃত্যশিল্পী এবং 'দরবার'-এর রাজনর্তকী ও 'বাঈজী'। রাজনর্তকীদের জীবনধারার উপর ইদানিং বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। অভিজাত পুরুষের জগৎ 'কুঠি' ও 'কোঠা'য় বিভক্ত ছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল নারী দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এদের একটি ছিল পবিত্র গৃহের পরিবেশ এবং অপরটি ছিল প্রেম, মোহ এবং আনন্দের উত্তেজনাময় জগৎ। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই 'পবিত্রতা' রক্ষা ও 'আনন্দ' পরিবেশন করার ভার ছিল নারীর উপর।

এরপর ছিল বৈষ্ণবধর্মীয় নারী (বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মবিশ্বাসী), যাদের জীবনধারা 'ভদ্র' মূলধারার হিন্দু নারীর জীবনধারা থেকে অনেক শিথিল ছিল। সেখানে নারী অধিকতর স্বাধীনতা, এমনকি যৌন স্বাধীনতাও পেতো। বৈষ্ণব সমাজ এই ধরনের বিকল্প জীবনধারা অনুমোদন করেছে (হয়তো বা বিকল্প সামাজিক ধারাকে গোটা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কার্যকরভাবে অঙ্গীভূত করার একটি প্রয়াস হিসেবে)। কে. কে. দত্ত এই নারীদেরকে 'কতিপয় কলঙ্কিত নারীচরিত্র' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যারা ঐ যুগের কবিগণের সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছিল, যেমন ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এ 'হীরা' বা রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর*-এ 'বিদুবামনী'। এই বিষয়ে দত্তের মন্তব্য, "এরা খুব সম্ভব ছিল জনপ্রিয় সহজিয়া ধর্মের বা অধঃপতিত তান্ত্রিক অর্চনাপ্রথার কুপ্রভাবে প্রভাবান্বিত কতিপয় পতিতা মানবীর সম্ভ্রান্ত চিত্রায়ন।"[১৭] চৌহদ্দির বাইরে অবস্থান ছিল সাঁওতাল ও অস্পৃশ্য উপজাতির। সবাই এ বিষয়ে একমত যে 'পারিয়া' নারী এখনকার মতো তখনও পর্দাপ্রথা বা সতীত্বের কঠোর বিধান মেনে চলতো না বা তারা মান্য করবে এ আশাও করা হতো না। সামান্য কয়েকটি সমীক্ষায় স্বল্প সংখ্যক নারীর উল্লেখ রয়েছে, যারা জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির বাধা ডিঙিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহ করেছে। এইচ. ডব্লিউ. বি মরেনো[১৮] ভারতীয় এমনসব নারীর তালিকা দিয়েছেন, যারা পাশ্চাত্যের পুরুষকে বিবাহ করে এবং এর ফলে নিজ সম্প্রদায় থেকে জাতিচ্যুত হয়।

শিক্ষার সনাতন পদ্ধতি

বাংলাদেশের জন্য কোম্পানির শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডি. পি. সিংহ[১৯] বলেছেন যে, বৃটিশ রাজত্ব শুরু হবার আগে এক স্বদেশী ও সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি বিরাজমান ছিল। ব্রাহ্মণরা গ্রাম্য 'টোলে' শিক্ষাদান করতো এবং মুসলিমদের শিক্ষালয়

---

১৭. Dutta, "Position of women", 26.

১৮. H.W.B. Moreno "Woman's Place in the Anglo-Indian Community", *Muslim Review*, No. 1, 1929.

১৯. D. P. Sinha, *The Educational Policy of the East India Company in Bengal to 1854*, (Calcutta 1964).

ছিল মাদ্রাসা। এগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার স্থান। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল 'পাঠশালা' ও 'মক্তব', যেখানে যথাক্রমে 'গুরু' ও মৌলবিরা এলাকার শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞান দান করতেন। শুধু বালকেরাই এই ধরনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিত।[২০] মেয়েদের জন্য যেকোন রীতিমাফিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অজ্ঞাত। উইলিয়ম এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে[২১] বলেছেন যে, মেয়েদের জন্য কোন স্কুল ছিল না, কিন্তু জমিদারগণ কোন কোন সময় বাড়িতে তাঁদের কন্যাদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করতেন। তিনি আরও বর্ণনা দেন যে, সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের জন্য অধিকাংশ ভারতীয় তাদের মেয়েদেরকে শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিল না, অপরদিকে নিম্নশ্রেণীর পক্ষে তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সামর্থ্যই ছিল না।

ইসলাম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় রহিমের মতে মুসলিমদের আগমনে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাপদ্ধতির বন্ধ দ্বার উন্মোচিত হয়। যদিও পর্দাপ্রথা মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে (মাদ্রাসায়) শিক্ষাগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে, তথাপি মক্তব ও পাঠশালায় মেয়েরা ছেলেদের সাথেই লেখাপড়া করতো। মুগল ধারাকে অনুকরণ করে বাংলাদেশের কতিপয় শিক্ষিত সুলতান, নবাব এবং সুবাদার 'জেনানা' বা অন্দরমহলে (মহিলাদের অন্তঃপুর) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই এই ধরনের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থার কথা এ্যাডাম উল্লেখ করেছেন।

নারীদের বিদ্যাচর্চা ও সৃষ্টিশীল রচনা

উপরে উল্লেখিত বিখ্যাত মুসলিম মহিলাবৃন্দ, যাঁরা তাঁদের যোগ্যতা ও জ্ঞানের জন্য পরিচিত, তাঁরা ছাড়াও মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার ইরান দুখ্ত (বিবি পরী)[২২] এবং তুরান দুখ্ত (বিবি বিবান) নাম্নী শায়েস্তা খানের কন্যাদ্বয়, যাঁরা খুবই পরিমার্জিত ও জ্ঞানী ছিলেন। এ রকম কাহিনীও আছে যে, মালিকা নামের এক মুসলিম বালিকা ঘোষণা করে যে, যে পুরুষ তাকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে তাকেই সে বিবাহ করবে। অনেকের ভাগ্যপরীক্ষা শেষ হবার পর জনৈক আবদুল হালিম গাজী বিজয়ী হলে সে তাকে বিবাহ করে। তবে যে সামান্য সাক্ষ্য রয়েছে তাতে এই ধারণা করা যায় যে, আলোচ্য সময়ে মুসলিমদের মধ্যে নারীশিক্ষা প্রধানত গৃহশিক্ষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল। বয়স্কা মহিলারা জেনানার কঠোর

---

২০. এই ধরনের শিক্ষা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নআয়ের লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। সিনহার মতে, অভিজাত শ্রেণী তাদের শিশুদেরও বাড়িতে পড়ানো পছন্দ করতো।

২১. W. Adam, *Report on Education*

২২. ঢাকার লালবাগ ফোর্টে কবর দেয়া হয়।

অবরোধের মধ্যে শিক্ষাদান করতেন, যার মধ্যে কোরান, হাদিস ও নীতিকথার উপর বেশি জোর দেয়া হতো।

মুসলিমদের মধ্যে 'পুঁথি'র আকারে এদেশের সাহিত্যের এক শক্তিশালী ধারা প্রবহমান ছিল। মধ্যযুগের শেষভাগের এ সৃষ্টি বিশ শতকেও বহুল প্রচলিত ছিল। ১৯৫০ সালে *পদ্মাবতী* পুঁথি এবং এর রচয়িতার[২৩] আবিষ্কার বাংলা ভাষার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বড় ঘটনা। সাহিত্য জগৎ এ কথা জেনে রোমাঞ্চিত হয় যে, ঐ পুঁথি রহিমুন্নেসা নামের এক মহিলার রচনা। তিনি চট্টগ্রাম জেলার কোন এক গ্রামে ১৭৬৩ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। রহিমুন্নেসা বাড়িতে তাঁর মায়ের কাছে লেখাপড়া শেখেন। পরে তিনি একজন পুরুষ 'গুরু'র (শিক্ষক) কাছে লেখাপড়া শেখেন, যাঁর প্রতি তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়। চারদিকের গ্রামীণ কৃষ্টি এবং তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে যে নতুন রচনাশৈলীর প্রসার ঘটছিল তার চিহ্ন রহিমুন্নেসার সাহিত্যকর্মে দেখা যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং একমাত্র পরিচিত মুসলিম মহিলা কবি রহিমুন্নেসা সবদিক দিয়েই 'বাঙালি' কবি ছিলেন। এ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, কারণ, পরবর্তীকালে আরবি-ফার্সি সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম মহিলাদের কৃত সাহিত্যকর্মের বিরাট অংশ ছিল উর্দু ও ফার্সি ভাষায়।

হিন্দু রমণীদের বেলায় অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই রকম ছিল। দত্ত এবং রহিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে, এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে নারীশিক্ষা অপরিচিত ছিল না। হিন্দু ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় পড়তে যেতো। সাধারণত এগুলি কোন ধনী লোকের বাড়িতে বা গুরুগৃহের কোন গাছতলায় অবস্থিত ছিল। (কিন্তু উপরোল্লেখিত পি. সি. সিংহের অভিমত এর বিপরীত)। কোন কোন সময় মক্তব ও পাঠশালা একই সাথে ছিল। বিয়ের পর হিন্দু মেয়েদের পর্দা অবলম্বন শুরু হয় বলে তখন থেকে তাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো এবং সত্যিকার অর্থে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার উপরে কখনও যেতে পারে নি। তথাপি আঠারো শতকের ইতিহাস ঘিরে রয়েছে ময়নামতি, লীলাবতী, রানী ভবানী প্রমুখ মহিলার নাম, যাঁরা তাঁদের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একজন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত রমণী হিসেবেই ভারতচন্দ্রের এবং রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দরী* চিত্রায়িত। কবি জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী নিজেও একজন খ্যাতনাম্নী কবি ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাকার সাথে ১৭৭২ সালে যৌথভাবে 'হরিলীলা' রচনা করেন।

গ্রামাঞ্চলেও মহিলা কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ওয়ার্ডকে অনুসরণ করে দত্ত হাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হাতি এক বাঙালি নারী, যিনি হাতি বিদ্যালঙ্কার নামে পরিচিতা

---

২৩. প্রফেসর মুজিরউদ্দিন, *'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা,* (ঢাকা ১৯৬৭), ১১।

ছিলেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে তিনি বিধবা হন এবং পিতৃহীন থাকায় খুবই দুর্দশায় পড়েন। তিনি বারানসিতে চলে যান। সেখানে তিনি আইন ও ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন এবং শিষ্যদের গ্রহণ করতে শুরু করেন। এরকম আরো অনেকের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈরাগিনী ও সন্ন্যাসিনীবৃন্দ (জনপ্রিয় বৈষ্ণব ও অন্যান্য ধর্মের ভিক্ষুক) অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিতও হতেন। তাদের পাঠ্যসূচির মধ্যে ছিল কবিতা, সংস্কৃত, আইন (শাস্ত্র), গান-বাজনা, গার্হস্থ্য, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি।

গোলাম হোসেন তাবাতাবায়ীর *সিয়ার-উল-মুতাখেরিন* গ্রন্থে অভিজাত পরিবারে নারীশিক্ষার বিদ্যমান্যতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে উল্লিখিত সমস্ত দৃষ্টান্ত এ বিষয়ই নির্দেশ করে যে সাধারণভাবে নারীশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে নি।

তিন

উনিশ শতক : পুনর্জাগরণ, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ

উদার সংস্কার এবং নারীর পরিবর্তিত অবস্থান

"হিন্দু রমণীর অবস্থা যে আলোকেই দেখি না কেন, তাদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা অবলোকন করলে আমরা গভীর বেদনার সাথে দেখতে পাব যে সে অবস্থা খুবই শোচনীয়। অন্তঃপুরের চিরন্তন কারাগারে বন্দি হয়ে দুঃখ ও অবরোধের মধ্যে কালাতিপাত করাই তার নিয়তি।"[২৪] ১৮৩৯ সালে 'সাধারণ জ্ঞান আহরণ সমিতির' (সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ)[২৫] কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় মহেশ চন্দ্র দেব এই কথাগুলো বলেন। এই সমিতি 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সদস্যদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল এবং ডিরোজিওর নেতৃত্বে সমাজের আমূল সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার ছিল। ১৮৩০ সালব্যাপী নারীর অবস্থার উন্নয়নের দাবিতে 'ইয়ং বেঙ্গল' খুবই আবেগপ্রবণ এবং ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়েছে। এরাই সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য মতাদর্শের ভাবগ্রাহী হয় এবং হয়ে উঠে সামাজিক পরিবর্তনের সর্বপ্রথম সমর্থক।

বৃটিশ ভারতে, বিশেষত বাংলায় উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নারীব মর্যাদা হানিকর নিপীড়নমূলক সামাজিক প্রথা সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। সামাজিক পরিবর্তনের সুচিন্তিত ও যুক্তিবাদী কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতকে এক 'আধুনিক' রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে উনিশ শতকে উদার সংস্কারের এক মহান যুগের সূচনা হয়। বাংলায় এই আন্দোলনকে প্রায়ই 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' বা বাংলার নবজাগরণ নামে অভিহিত করা হয়, যদিও শহুরে ভদ্রলোকদের দ্বারা পরিচালিত এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে অনেকেরই

---

২৪. Mahesh Chandra Deb, " A Sketch of the Condition of the Hindoo Women, Calcutta, 1839" in Goutam Chattopadhyay (ed.), *Awakening in Bengal,* (Calcutta 1965).

২৫. SAGK ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের এক সমিতি। এই গ্রুপ সামাজিক পরিবর্তনের আমুল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল।

মনে প্রশ্ন জেগেছে। যাই হোক, এ যুগের লক্ষ্য করার মতো প্রধান এক বৈশিষ্ট্য ছিল, সব সংস্কারকই নারীর ভূমিকা ও মর্যাদাকে ঘিরেই আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। নারীর সমস্যা সমাজের প্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এই সময় নারীমুক্তি আন্দোলন উদারপন্থী এবং সংরক্ষণবাদী উভয় মনোভাব ও কার্যধারার সাথে যুক্ত ছিল। উপরন্তু সমকালীন নারী আন্দোলনে 'উদার উপযোগবাদী' ইউরোপীয় চিন্তা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং গতানুগতিক পুরুষশাসিত সামাজিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ—এ সমস্তের সংমিশ্রণ ঘটে। সংস্কারকগণ প্রথমেই সামাজিক সেসব অন্যায়ের প্রতিকারে এগিয়ে আসেন যেগুলো কোন না কোনভাবে পরিবার বা নারীর মর্যাদার সাথে জড়িত ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের[২৬] সদস্যরাই সর্বপ্রথম সংস্কারপ্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন। এঁরা ছিলেন বাংলাদেশের নবউদ্ভূত শহুরে ভদ্রলোক, যাদের ইচ্ছা ছিল হিন্দুধর্মকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে তোলা। ব্রাহ্মরা ছিলেন ভদ্রলোক শ্রেণীর[২৭] আদর্শ প্রতিনিধি, যাঁদের চূড়ান্ত ভূমিকায় আধুনিক ভারত গড়ে উঠে।[২৮]

সংস্কারপ্রচেষ্টায় হিন্দু নারীদের বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়ার কারণ হয়তো এই যে, (ক) হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ বাংলাদেশের সবচাইতে উন্নত সম্প্রদায় ছিল; (খ) তত্ত্বের দিক থেকে মুসলিম নারীরা সংস্কারকদের দাবিকৃত অধিকারগুলো আগে থেকেই ভোগ করছিল, যেমন বিধবাবিবাহ, তালাক, সম্পত্তির অধিকার (অধিকন্তু এগুলো সমাজের এক বিশেষ স্তরের—উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সমস্যা); (গ) রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায় সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অবনতির দিকে যায় এবং তাদের পুনর্জাগরণ উনিশ শতক শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হয়।

প্রথম প্রথম 'ভদ্রলোক শ্রেণী' অনুভব করেন যে বহু কাঙ্ক্ষিত সংস্কারসমূহ পুরুষশাসিত পরিবারব্যবস্থাকে নতুন জীবন দেবে এবং সংরক্ষণ করবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমস্যাগুলি এক এক করে মোকাবেলা করা হয় এবং "এক একটা আইন পাশের দ্বারা"[২৯] এই সংস্কারের সফলতা নিশ্চিত করা হয়। সামাজিক সংস্কারের সকল দাবিই পরিবারকে সংশ্লিষ্ট করে এবং অনেক মনীষী মনে করেন যে তৎকালীন কিছু কিছু সংস্কারের চূড়ান্ত পরিণতি সংরক্ষণবাদকে জোরদার করেছিল।[৩০]

---

২৬. ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসের জন্য দেখুন, Sivanath Sastri, *A History of the Brahmo Community,* (Calcutta 1912)। এটি হচ্ছে একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মর বিবরণ। আবো দ্রষ্টব্য, David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind.* (Princeton 1979). পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের জন্য দেখুন, David Kopf, ঐ আরো দেখুন মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ (ঢাকা ১৯৮৬)।

২৭. John Broomfield এটিকে জনপ্রিয় করেন তাঁর *Elite Conflict in a Plural Society,* (Berkeley 1968) পুস্তকে।

২৮. David Kopf, *Brahmo Samaj.*

২৯. Kumari Jayawardene, *Feminism and Nationalism in the Third World.* (The Haguc 1982), 81.

৩০. Jayawardene, ঐ, Sangari and Vaid (eds.), *Recasting Women · Essays in Colonial History,* (New Delhi 1989).

প্রথমেই যে সমস্যাগুলির মোকাবেলা করা হয় সেগুলির মধ্যে ছিল সতীদাহ প্রথা এবং বিধবাবিবাহ। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), যাঁর উদার মনোভাব ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভার' মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে পুনর্গঠিত করতে উৎসাহ সৃষ্টি করে। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে রায়ের এ আন্দোলন সফল হয় ১৮২৯ সালে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সরকার কর্তৃক এক আইন পাশের মাধ্যমে, যার ফলে সতীদাহ এক দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু এ আইনে 'সতী' শব্দের অর্থের কিছুটা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল এবং সাঙ্গারি ও ওয়াইদ সম্পাদিত গ্রন্থে লতামনি এই অভিমত প্রদান করেন যে এই আইন পাশের পরেও সতীদাহের ঘটনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।[৩১]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯১) বাংলার নবজাগরণের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে গণ্য করা হয় এবং তিনিই বিধবাবিবাহ বিষয়ে সর্বপ্রথম সার্থক বিজয়ী। সংবাদমাধ্যম এবং বৃটিশ প্রশাসনের সমর্থন পেয়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ১৮৫৬ সালে এক আইন পাশ করাতে সক্ষম হয়, যা বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দেয়। কিন্তু সামাজিক প্রথা বা আদর্শ শুধু আইনের দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের দাবি কখনো গণসমর্থন পায় নি এবং সামাজিকভাবে বাস্তবেও পরিণত হতে পারে নি, যা এর প্রবক্তা চিন্তা করেছিলেন। ভারতে পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা মুসলিমদের মধ্যে সর্বস্তরে এবং হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণ বা শ্রেণীতে প্রচলিত ছিল। মুসলিমদের বেলায় চারটি এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের বেলায় অগণিত স্ত্রী রাখার অনুমোদন ছিল। একজন হিন্দু কুলপতি তার নাবালিকা কন্যাকে বয়োবৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী একজন কুলীনের কাছে বিনাদ্বিধায় বিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল শুধু তার কাছে কোন অবিবাহিতা কন্যা রাখার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এমনকি এ ধরনের বিবাহ যদি তার কন্যার বৈধব্যকে ত্বরান্বিত করতো, তবুও। এই কুলীনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সংস্কারক এবং সেই সাথে নাট্যকার ও সাহিত্যিকবৃন্দ এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৭০ সাল অবধি এ আন্দোলন চলতে থাকে। কিন্তু বৃটিশ সরকার প্রচলিত প্রথায় খুব বেশি হস্তক্ষেপের বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকায় এ বিষয়ে কোন আইন পাশ হয় নি।

সতীদাহপ্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ বা বিধবাবিবাহে নিষেধাজ্ঞার বিধানগুলি সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের প্রভাবিত করতো। কিন্তু বাল্যবিবাহ সকল বর্ণ এবং শ্রেণীতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা ধর্ম এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতার জন্য এবং নিম্নবর্ণের লোকেরা ধনীদের হাত থেকে কন্যাকে রক্ষার উপায় হিসেবে এই প্রথা মেনে চলতো। এই প্রথার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং বিদ্যাসাগর এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৭২ সালে বিবাহ আইন পাশের ফলে এই আন্দোলনে কিছুটা সফলতা দেখা যায়, যেখানে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের বেলায় ১৪ এবং ছেলেদের

---

৩১. Lata Mani, "Contentious Traditions. The Debate on Sati in Colonial India", in Sangari and Vaid (eds.) , *Recasting Women*, 88-126.

বেলায় ১৮ ধার্য করা হয়। ১৮৯১ সালে 'সম্মতির বয়স' বিল পাশ করা হয়, যার ফলে যৌনসঙ্গমে অনুমতিদানের বয়স স্ত্রীর জন্য ১০ থেকে ১২ বছরে উন্নীত করা হয়।

বিরাজমান শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ অনুসারে হিন্দু রমণী, বিশেষকরে বিধবাগণ সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৮৭৪ সালে 'সম্পত্তি অধিকার আইন' হিন্দু বিধবাকে তার স্বামীর সম্পত্তিতে 'জীবনস্বত্ব' প্রদান করে এবং এ বাবদ একজন পুত্রের অংশের সমান অংশ নির্ধারণ করে দেয়। তথাপি এই আইন কিন্তু বিধবাকে সম্পত্তির স্বত্ব এবং তা হস্তান্তর করার অধিকার দিল না এবং কন্যাগণ আগের মতো কোন অংশই উত্তরাধিকার সূত্রে পেলো না।

সামাজিক জাজ্বল্যমান অন্যায় দূর করে নারীর মর্যাদা উন্নীত করার উদ্দেশ্যে ভদ্রলোকশ্রেণীর পরিচালিত উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ১৮৬০ সালের মধ্যে শেষ হয়ে আসতে থাকে। যদিও সংস্কার আন্দোলনে দৃশ্যত পর্দাপ্রথা সম্পর্কে কোন বক্তব্য ছিল না (পর্দাপ্রথার সমস্যা মুখ্য হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে), তথাপি সংস্কার আন্দোলনের স্তরগুলিকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে, যে, সবসময়েই পর্দাপ্রথার সমস্যাটি কোন না কোনভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। সতীদাহপ্রথা বা বিধবাবিবাহ বা বাল্যবিবাহের প্রতিটি দৃষ্টান্তেই নারীর ভূমিকা, কার্যবিধি, সচলতা ইত্যাদির অনিবার্য প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। উল্টোভাবে বলা যায় যে, পর্দাপ্রথা আসলে নারীর ভূমিকা, কার্যবিধি, গতিবিধি (মূলত এগুলিই হচ্ছে নারীমর্যাদার উপাদান) বিষয়ে এক নিবারণমূলক অধিষ্ঠান। অবশ্য এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উনিশ শতকে বাংলার নারীর কাছে পর্দাপ্রথার প্রচলন সবসময় অভিশাপ হিসেবে অনুভূত হতো না। এ প্রথা তার নিজস্ব প্রতীকী আশ্রয় ছিল, যা এক পৃথক সংস্কৃতির রূপ ধারণ করে এবং এক সীমাবদ্ধ অর্থে কখনও কখনও মেয়েদের মধ্যে আসঞ্জন, আত্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায়বোধের সৃষ্টি করে।

পুরো উনিশ শতকব্যাপী পর্দা ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন সম্পর্কে উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণ বাংলাদেশের পুনর্জাগরণে বৈপরীত্য ও সীমাবদ্ধতা এবং পর্দার বাইরে নারীর অনুমোদিত যাতায়াতের মাত্রা (বা যেটুকু তারা নিজেরাই যেতো) পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। পর্দাসমস্যা, তার প্রয়োজনীয়তা ও পরিব্যাপকতা, তার পক্ষের এবং বিপক্ষের মানসিকতা এক ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে (যা আজও অব্যাহত)। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সচেতন বিশ্লেষণ এই আলোচনার ধারাকে পুনর্গঠনে সাহায্য করতে পারে। সতীদাহের সমস্যা থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষলগ্নে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ পর্যন্ত পর্দাপ্রথা এবং নারীর সতীত্ব ছিল এক বহুল আলোচিত বিষয়।

নারীসমস্যা বিষয়ক সমিতি এবং আন্দোলনসমূহ

শিক্ষার বিস্তারের ফলে এবং জীবনযাপনে কঠোর বিধির আংশিক শিথিলতার ফলে মহিলারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। পর্দাপ্রথার সমস্ত সমস্যা, যা বহু দশক ধরে প্রচ্ছন্ন ছিল, ১৮৬৬ সালে তাই মুখ্য হয়ে উঠলো, যখন প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্মনারী কলকাতায় ব্রাহ্মদের বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবে উপস্থিত হয়।[৩২] এর কয়েক মাস পরে বরিশালে এক সভায় ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৮৭২ সালে বিষয়টা এক বিতর্কের ঝড় তোলে, যখন কেশবচন্দ্র সেন পর্দার শিথিলতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। কেশব সেন জোর দাবি জানাতে থাকেন যে মহিলারা পর্দার পেছনে বসবে। এই কারণে দাস, ঘোষ, শাস্ত্রী এবং অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁকে পর্দাপ্রথা বলবৎ করার দোষে দোষারোপ করেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী নামের অন্য এক দৃঢ়চেতা ব্রাহ্ম যুবক একমত হলে প্রগতিশীল অংশ পর্দাপ্রথার সম্পূর্ণ বিলোপের দাবি জানান।"[৩৩] যদিও কেশব বিবাদটি মিটিয়ে ফেলেন এবং 'সমাজে'র কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়, তবুও পর্দাপ্রথার আশু সমস্যা ঘিরে নারীমুক্তির মাত্রার বিষয়ে মেরুকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তী দশকগুলিতেও তা বিদ্যমান থাকে। অবশেষে 'সমাজ' নিজেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—একদল তুলনামূলকভাবে 'সংরক্ষণবাদী' এবং অপর দল 'বিপ্লবী'। এই সময়ে মহিলারা তাদের নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ, ১৮৭৯ সালে বঙ্গ মহিলা সমাজ এবং ১৮৮৬ সালে সখী সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। এগুলোই বাংলাদেশের প্রথম মহিলা সংগঠন। ব্রাহ্ম মহিলাদের বাইরে বাংলাদেশের খৃস্টান মহিলারাও কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং ১৮৮১ সালে তাদের নিজস্ব সংগঠনসমূহ স্থাপন করে।[৩৪]

সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় পর্দাপ্রথা ও শিক্ষা মুখ্য সমস্যা হিসেবে দৃষ্টিগোচর হলেও অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান উনিশ শতকের শেষার্ধে দেখা দেয়, তা হলো মহিলারা নিজেরাই এগিয়ে এসে কেবল সমাজসংস্কারের 'বিষয়' বা ফলভোগকারী নয়, বরঞ্চ আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়। তৃতীয় আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কম খ্যাতিসম্পন্ন অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র হতে উদ্ভূত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 'উদারনৈতিক জাগরণ' দেখা দেয়, যা বহু সংখ্যক নর-নারীর জীবনধারাকে স্পর্শ করে।

---

৩২. Ghulam Murshed, *The Reluctant Debutante, The Response of Bengali Women to Modernization 1849-1950,* (Rajshahi 1983), 90.

৩৩. David Kopf, *Brahmo Samaj,* 35.

৩৪. Murshed, *Reluctant Debutante,* 94.

নারীশিক্ষা : প্রাথমিক প্রচেষ্টা এবং আলোচনা

উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার বিস্তার কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি সবসময় সময়ের ক্রমানুসারে ঘটে নি। খৃস্টান মিশনারিরা এ ব্যাপারে অগ্রদূত ছিলেন। তাঁরা উপনিবেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরিত করা। ছাত্রীরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে এসেছিল, কেননা কোন 'ভদ্রলোক' তাদের বাড়ির কোন বালিকাকে এই ধরনের স্কুলে পাঠাতে প্রস্তুত ছিল না।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষা প্রসারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দেখা যায় কোম্পানির কর্মকর্তা এবং এ দেশে বসবাসকারী বৃটিশ নাগরিকবৃন্দ এবং তাদের পরিবারের মধ্যে। তৃতীয় প্রবাহ দেখা যায় বাংলাদেশের শহরের উঠতি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে। শিক্ষা প্রসারে চতুর্থ এবং সবচাইতে শক্তিশালী প্রবাহ সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক সরকার স্বয়ং, যদিও এক্ষেত্রে তার ভূমিকা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

এ সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পর্দাপ্রথার আবরণ যতো তীক্ষ্ণভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও হয় নি। ১৮৫০ সালে সংস্কারবাদীগণ উত্তরোত্তর অনুভব করেন যে, শিক্ষার অভাব এবং পর্দাপ্রথা নারীকে তার মুক্তির পথ থেকে সরিয়ে রেখেছে (এই মুক্তি বলতে সংরক্ষণবাদী উদারপন্থী বা বিপ্লবীরা যাই বুঝুক না কেন)। প্রকৃতপক্ষে শত শত বছরের পর্দাপ্রথা বাংলাদেশের নারীকে এতই ভীত ও অসহায় করে রেখেছিল যে পর্দাপ্রথা বাতিল না হলে প্রগতিশীল যতো আইনই পাশ হোক না কেন, তাতে কিছু লাভ হবে না এ কথা সবাই অনুভব করেছিল। কিন্তু মূল প্রশ্ন রয়ে গেল কিভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত পর্দাপ্রথা রহিত করা হবে।

যদিও নারীশিক্ষার উপর হিন্দুশাস্ত্রে কোন বাধা ছিল না, তবুও আঠারো এবং উনিশ শতকে এ শিক্ষাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবহেলা করা হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে যখন উইলিয়ম এ্যাডাম[৩৫] তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন, তখন তিনি উল্লেখ করেন যে, বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণকে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো, কারণ জনগণ বিশ্বাস করতো যে এর ফলে মেয়েরা বিধবা এবং কুচক্রী হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মুসলিমরাও একই কুসংস্কারে ভুগছে।

ভদ্রলোক সংস্কারবাদীগণ প্রথমদিকে এই চিন্তা করেছিল যে, কিছু লেখাপড়া নারীজাতির উপকারে আসবে (একইভাবে সমাজ উপকৃত হবে), তা ভাল জননী ও সঙ্গিনী তৈরী করতে সাহায্য করবে এবং তাতে সনাতন আদর্শ অব্যাহত থাকবে। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে জি. বিদ্যালঙ্কার, দ্বারকানাথ ঠাকুর (এমনকি কট্টরপন্থী রাধাকান্তদেব),

---

৩৫. William Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar. (1868), 132.

এ. কে. দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের মতো উদারপন্থী ভদ্রলোক সংস্কারবাদীদের মধ্যে এভাবে উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে প্রত্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুক্তি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকজন বাদে মহিলারা নিজেরাই সহযোগী পুরুষদের সাথে একমত পোষণ করতো যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল বর পাওয়া এবং ভাল বধূ হওয়া। অবশ্য তৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের নারীদের বেলায়ও একই বক্তব্য সত্য ছিল।[৩৬]

উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে আনুমানিক ১৮১৭ সালের দিকে বৃটিশ সরকার কর্তৃক কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা শুধু পুরুষদের শিক্ষা দেবার কাজে লাগানো হয়। যাই হোক ১৮২০ সালে ডেভিড হেয়ার এবং কতিপয় স্থানীয় অধিবাসী মেয়েদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জে. ই. ডি. বেথুন কর্তৃক মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ছিল নারীশিক্ষার উন্নতির মাইলফলক। এর পরেও ভদ্রলোকেরা পর্দাপ্রথাকে অমান্য করে তাদের বাড়ির মেয়েদেরকে ঐ স্কুলে পাঠাবে কিনা এই ভেবে বেশ কিছু সময় নষ্ট করেন । বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ভদ্রলোকদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি তারা পর্দার বাধা অতিক্রম করতে পারবে ? খুব কম লোকই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পেরেছিল।

যাই হোক, নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে এবং ১৮৬০ সালে বাঙালি ভদ্রলোকেরা বুঝতে পারে যে নারীশিক্ষা এবং নারীমুক্তি সমাজ সংস্কারেরই পথ এবং পর্দাপ্রথা এই পথে বিরাট বাধা। কালিপ্রসন্ন ঘোষ[৩৭] এবং অক্ষয়কুমার দত্ত নারীর জন্য অবাধ শিক্ষা এবং স্বাধীনতার দাবিতে দ্ব্যর্থহীন ছিলেন। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত এ. কে. দত্তের *ধর্মনীতি* নারীমুক্তির সমস্যার উপর এক বিশদ তথ্য প্রদান করে। এতে বলা হয় :

> আগের যেকোন বাঙালি লেখকের চাইতে অনেক বেশি যুক্তি ও সমর্থন এসেছে ধর্মনীতির লেখকের কাছ থেকে । হিন্দু সমাজের সংস্কারের মূল সমস্যা দূরীকরণে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যথার্থতার যৌক্তিকতা দেখা যায়। বাঙালি পরিবারে সামাজিক অন্যায়সমূহ নিরীক্ষা করে অক্ষয়কুমার দেখতে পান যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্তঃপুরে নারীর হীন ও দুঃখজনক অবস্থা থেকেই সেগুলোর সৃষ্টি। অতএব এখান থেকে সমাজ-সংস্কার শুরু হতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যমেই তার যাত্রা শুরু হওয়া প্রয়োজন।[৩৮]

নারীশিক্ষার প্রসার

নারীশিক্ষার প্রতি অক্ষয়কুমার দত্তের এই নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সব সংস্কারবাদী একমত ছিলেন না এবং বিদ্যাসাগর ও অন্য সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও

---

৩৬. সেই সময়ের নারীশিক্ষার পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, Ghulam Murshed, *Reluctant Debutante*.

৩৭. কালিপ্রসন্ন ঘোষ, 'স্ত্রীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব'।

৩৮. উদ্ধৃত, David Kopf, *Brahmo Samaj*, 53.

১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত নারীশিক্ষা খুবই সীমিত সফলতা অর্জন করে। জয়কৃষ্ণ মুখার্জী বেথুন মডেল অনুসরণ করে সেই একই সালে (১৮৪৯) উত্তরপাড়ায় এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিশোরচন্দ্র মিত্র পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে রাজশাহীতে অনুরূপ এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বেথুন স্কুলের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সালে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুরে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়তো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নারীশিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতার জন্য এই স্কুলগুলি অর্থাভাবে অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। একজন বিশ্লেষকের মতে, বিদ্যাসাগরের স্থাপিত স্কুলসমূহ গ্রামীণ নারীশিক্ষার ব্যাপারে কোন সফলতা অর্জন করতে পারে নি, কেননা একদিকে অভিভাবকদের অনীহা ছিল, অপরদিকে স্কুলের সামান্য বেতন যোগাতেও তারা অপারগ ছিল।[৩৯]

নারীশিক্ষার প্রতি ডালহৌসির অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও এবং ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষানীতিতে ভারতে নারীশিক্ষার প্রসারের অনুকূলে বিভিন্ন জোরালো পদক্ষেপের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ১৮৬০ সাল অবধি বিষয়টি খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কেননা এই ঘটনা সাধারণভাবে যেকোন সংস্কারের এবং বিশেষকরে নারীশিক্ষার দাবির ব্যাপারে সরকারি দায়িত্বগ্রহণের বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারকে খুবই সতর্ক করে দেয়।

১৮৭০ সালে বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার সংযোগে তা সম্ভব হয়েছিল। বৃটিশ সরকার শিক্ষার দায়িত্বের বিরাট অংশ নবগঠিত পৌরসভাসমূহের নিকট হস্তান্তর করে। এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নারীশিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে এবং সেই সাথে গ্রামে 'স্ব-শাসিত' প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয়ের বহুল প্রসার সম্ভব হয়। ১৮৬০ এবং ১৮৭০ সালে মহিলারা তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িকী, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন।

এ সময় দুইজন যোগ্য এবং নিবেদিতপ্রাণ ইংরেজ মহিলা মিস মেরি কার্পেন্টার (১৮৬৬) এবং মিস এ্যানেট এ্যাক্রয়েড (১৮৭২)-এর উপস্থিতি দেখা যায়, যাঁরা বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন।[৪০] প্রগতিবাদী ব্রাহ্মরা এঁসব প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানায়। মিস এ্যাক্রয়েডের স্কুল ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় এবং মিস কার্পেন্টার ভারতে তৃতীয় বার এসে এই স্কুলকে ১৮৭৬ সালে 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত করেন। দু'বছর পর এই প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুলের সাথে সম্মিলিত হয়ে ১৮৭৮ সালে বেথুন কলেজে পরিণত হয়।

---

৩৯. শরিফা খাতুন, 'আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকের বাংলার নারী সমাজ', *এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা ১৯৮৫)

৪০. David Kopf, *Brahmo Samaj.* 16, 34.

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজে মেরুকরণ প্রচ্ছন্নভাবেই শুরু হয়েছিল এবং ১৮৭০ সালের মধ্যে এ সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। সমস্যাটি তীক্ষ্ণভাবে দুটি ধারা বা দল তৈরি করে—একদল গার্হস্থ্য শান্তির জন্য প্রবুদ্ধ স্ত্রী তৈরির ব্যবস্থা হিসেবে নারীশিক্ষাকে গণ্য করেছিল এবং অপর দলের দাবি ছিল, পুরুষের সমভিত্তিতে এবং সমপর্যায়ে নারী শিক্ষালাভ করবে।[৪১] এরপর বেথুন কলেজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দাবি করা হয় যাতে মহিলারা বি. এ. ডিগ্রি লাভ করতে পারে। বাংলাদেশের মধ্যে এই ডিগ্রিধারী প্রথম মহিলারা ছিলেন কাদম্বিনী বসু (ব্রাহ্ম) এবং চন্দ্রমুখী বসু (খৃস্টান)।

এই সময়ে শিক্ষা আর কেবল মার্জিত রুচি ও মুক্তবুদ্ধি অর্জনের উপায় থাকলো না, বরঞ্চ তা কর্মসংস্থানের এক উপায় হিসেবেও দেখা দিল। ঢাকার মহিলা নর্মাল স্কুলের ছাত্রী এক বাঙালি বিধবা রাধামনি দেবী ভদ্রলোকশ্রেণী থেকে এ অঞ্চলের প্রথম মহিলাদের একজন, যিনি পেশাগত চাকুরিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৬ সালে শেরপুরে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভা'তে শিক্ষকের পদ লাভ করেন। মহিলারা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং বেশ কিছু বাক্-বিতণ্ডার পর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজেও প্রবেশাধিকার লাভ করে। ব্রাহ্ম প্রগতিবাদী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ১৮৮৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার হন।[৪২] বাঙালি নারীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির জন্য ১৮৮০ সাল এক উল্লেখযোগ্য দশক। এই দশকেই শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদেরকে উপযুক্ত বেতনে সরকারি চাকুরি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের বড় বড় শহর এলাকার (কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী) মহিলারা গণপ্রতিষ্ঠানসমূহে আরও অধিকহারে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন। এঁরাই ছিলেন 'ভদ্রমহিলা'দের নতুন প্রজন্ম।[৪৩] এসব পেশাজীবী মহিলাদের মধ্যে বামা সুন্দরী দেবী, মনোরমা মজুমদার ও রাধারানী লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত বিধবা মহিলার প্রচেষ্টাও বেশ উল্লেখ করার মতো। এঁদের মধ্যে ছিলেন মনমোহিনী হুইলার, পণ্ডিতা রমাবাঈ এবং স্বর্ণময়ী দেবী। রমাবাঈকে মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৮৮০ সালে হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট 'পণ্ডিতা' উপাধি প্রদান করে। "কাশিমবাজারের দয়াবতী মহিলা" স্বর্ণময়ী নারীশিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশে অন্যতম শক্তিধর ও দয়াবতী জমিদার হিসেবে পরিচিত এবং পর্দার অন্তরাল থেকেই তিনি প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

---

৪১. ঐ, 34.

৪২. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Murshed, *Reluctant Debutante.*

৪৩. Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905.* (Princeton 1984). তিনি 'ভদ্রলোকে'র বিপরীতে নারীদেরকে বুঝাতে গিয়ে 'ভদ্রমহিলা' শব্দটিকে জনপ্রিয় করেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮২ সালে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার যখন শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হন, তখনকার অবস্থা ১৮৩৫ সালে যা ছিল তা থেকে বেশ ভিন্ন। এই সময়ে বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১০১৫টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪১,৩৪৯। স্কুলগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল বেসরকারি, তবে এগুলি সরকার থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য লাভ করতো। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বালিকা স্কুলের সংখ্যা ৩০৯৪-এ পৌঁছায় এবং ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৭,৪০৩। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের হার ছিল বালক ২৮.৯০% এবং বালিকা ১.৯০%। অথচ ১৮৮৬-৮৭ সালে এই হার ছিল বালক ২৫.৮৫% এবং বালিকা ০.৯১%। তুলনা করলে বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।[৪৪] মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে বালিকাশিক্ষার ব্যাপারটা ততোখানি আশাব্যঞ্জক ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে এই হারের অবনতি ঘটে। ১৮৯৬-৯৭ সালে মেয়েদের জন্য মাত্র দুটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল—কলকাতার বেথুন স্কুল এবং ঢাকার ইডেন স্কুল।

বাংলায় মুসলিম নারী

উল্লিখিত রিপোর্টে (হান্টার কমিশন, ১৮৮২) মুসলিম সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যজনক আর্থিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার কথা বর্ণিত হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত এক ব্যাপক জাগরণের সূত্রপাত করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ। কিন্তু তাসত্ত্বেও মুসলিম নারীর শিক্ষা ও মুক্তির বিষয়টি খুব বেশি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে পারে নি।

বাংলার মুসলিমদের বিষয়ে বলতে হয়, এই সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ নারীশিক্ষার বিরোধী ছিল এই কারণে যে, তাতে পর্দাপ্রথার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে। ১৮৬৭ সালে 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সমিতি'র (বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন) এক সভায় যখন নবাব আবদুল লতিফ একটা সমীক্ষা পড়ে শোনান, তখন প্যারীচাঁদ মিত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হিন্দু নারীদের মতো মুসলিম নারীদের মধ্যেও শিক্ষা প্রসারের একই ধরনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান আছে কি না। এ প্রশ্নের জবাবে কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবি আবদুল হাকিম বলেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো স্কুল-কলেজে মুসলিম নারীদের প্রেরণ করা অচিন্তনীয়। এই জবাবে কট্টর পর্দাপ্রথার পক্ষের শক্তির মত ব্যক্ত হয়, সেই সাথে

৪৪. পরিসংখ্যানের সংখ্যাসমূহ নেয়া হয়েছে, শরিফা খাতুন রচিত "আধুনিক শিক্ষা" গ্রন্থের ২৯০ পৃষ্ঠা দেখুন, তালিকা তৈরি করা হয়েছে *Education Department of Bengal*, 1886-87, 1899-1900-এর রিপোর্ট থেকে।

এককথায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া মনোভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৪৫] মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রশ্নটি বেশ কিছু সময় পর্যন্ত আর তুলে ধরা হয় নি।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীই (১৮৪৭-১৯০৩) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং বিখ্যাত লোক-হিতৈষিণী মহিলা ছিলেন। তিনি কুমিল্লার পশ্চিম গাঁও-এর জমিদার ছিলেন। এ জমিদারির রাজস্ব আয় ছিল এক লাখ টাকা। লোকহিতকর কাজের জন্য রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'নবাব' উপাধি প্রদান করেন এবং তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি নিজ গুণে এই উপাধি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা থেকে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম আখ্যানকাব্য *রূপজালাল*কে তাঁর নিজের ঝঞ্ঝাময় দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ফয়জুন্নেসার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সমকালীন এক বিখ্যাত ব্রাহ্ম কালিচরণ দে-র সহযোগিতায় ১৮৭৩ সালে কুমিল্লাতে ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই স্কুল পরবর্তীতে ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং এতে অনেক প্রতিভাধর ছাত্রী শিক্ষালাভ করে।[৪৬]

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়।[৪৭] পূর্ববাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিস্তার, ছাপাখানার প্রসার, শহুরে সংস্কৃতির প্রচলন (যেমন নাট্যশালা) ইত্যাদির দ্বারাও এই সময়টি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে আছে। ১৮৭০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাদের লক্ষ্য ছিল বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, সমাজসেবা প্রদান করা এবং শিক্ষার উন্নতির (বিশেষকরে নারীদের জন্য) লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নারীর শিক্ষা ও তার সার্বিক উন্নতির জন্য নিবেদিত হলো। নারীর দুর্দশা মোচন (বিশেষকরে শিক্ষার মাধ্যমে) এদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। পূর্ব বাংলার এমন ধরনের সমিতির মধ্যে ফরিদপুরের 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষাসভা' (১৮৭০) এবং 'কৌলিন্য সংশোধনী ও কন্যাবিক্রয় নিবারণী সভা' (১৮৭১), বগুড়ার 'কন্যাপণ নিবারণী সভা' (১৮৮৯) এবং ঢাকার 'বিধবা বিবাহসভা' (১৮৯৪) ও 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮২) উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অন্যান্য শহরকেন্দ্রের পরিবর্তনের ধারার সাথে পূর্ববাংলার এই সময়ের সামাজিক পরিবর্তনের ধারার নিশ্চিত মিল থাকা সত্ত্বেও এর নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যও ছিল।

---

৪৫. শরিফা খাতুন, ঐ, ২৯৭।

৪৬. বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৪৭. মুনতাসির মামুন, "উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৮৩, ৬৩-১২৫।

উপরে উল্লেখিত সমিতিসমূহের মধ্যে ঢাকার '*মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী*'[৪৮] মুসলিম নারীদের শিক্ষার বিষয়টাকে পুনরায় তুলে ধরতে প্রধান ভূমিকা রাখে। মুসলিম উদার ও প্রগতিশীলদের সৃষ্ট এই সমিতি সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কাজে অগ্রসর হয়। এর অগ্রদূতদের মধ্যে ছিলেন নোয়াখালীর আবদুল আজিজ (তিনি তখনও ছাত্র), ফজলুল করিম, বজলুর রহিম, বরিশালের হেমায়েতউদ্দীন এবং আবদুল মজিদ, হিম্মত আলি প্রমুখ। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। এই উদ্দেশ্যে বাড়িতে শিক্ষাদানের এক অনুপম পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। বাড়িতেই বালিকাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকাদি এবং পাঠ্যসূচি পৌঁছে দেয়া হতো এবং পরীক্ষাও তাদের বাড়িতেই গ্রহণ করা হতো। স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও এই আন্দোলনের অপরিহার্য উপাদান ছিল ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যসূচি প্রবর্তন। উদার সমাজসংস্কারকেরা স্কুলের পাঠ্যসূচির ধর্মনিরপেক্ষীকবণের প্রচারক ছিলেন। 'সম্মিলনী' এক সাড়াজাগানো আদর্শের কাজ করে যার ফলে উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে সীমিত হলেও মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বেশ কিছু মহিলা কবি এবং লেখিকার সন্ধান পাওয়া যায়, বিশেষকরে গ্রামীণ বা আধা-শহুরে এলাকায়। এই শ্রেণীর মধ্যে একজন খ্যাতনামা কবি হলেন সিলেটের মুসাম্মৎ সহিফা বানু[৪৯] (আনু ১৮৫০-১৯২৬)। তিনি বিখ্যাত হাসনরাজার ভগিনী এবং সিলেটের আলি আমজাদ এস্টেটের ম্যানেজারের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দশকগুলো রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের প্রারম্ভিক কর্মজীবনের সমকালীন। রোকেয়া কলকাতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কিন্তু এই আন্দোলনের কোন প্রভাব যতদূর মনে হয় সুদূর সিলেটে বসবাসকারী সহিফার কাছে পৌঁছে নি। বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় সহিফা লিখতেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর সাহিত্যকর্ম সমকালীন সমাজের ইসলামী ও হিন্দু সাংস্কৃতিক ধারার মিলন প্রতিফলিত করে।

রোকেয়ার বেশ কিছুকাল পূর্বে খুলনার আজিজন্নেছা লেখালেখি শুরু করেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তাঁর জীবনীতে (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬) জীবনীকার আবুল আহসান চৌধুরী লেখেন : "বেগম রোকেয়ার পূর্ববর্তী একজন ইংরেজি শিক্ষিতা মুসলিম লেখিকা হিসেবে তাঁর যে সম্মান, স্বীকৃতি ও মনোযোগ প্রত্যাশিত ছিল তা তিনি পাননি।" (আবুল আহসান চৌধুরী, *আজিজন্নেছা খাতুন*, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৪)। আনুমানিক ১৮৬৪ সালে আজিজন্নেছা ভারতের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মীর চাঁদ আলী পুলিশের দারোগা ছিলেন। আজিজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও অধ্যাপক মৌলবি মেযারাজউদ্দীনের গৃহশিক্ষায় ও যত্নে তিনি ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজি রপ্ত করেন।

---

৪৮. মুনতাসির মামুন, ঐ।

৪৯. প্রফেসর মুজিরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, ৪৮-৫৬।

সংসারজীবনে তিনবার বিবাহ করেও আজিজন্নেছা বিধবা হন এবং ভ্রাতৃগৃহে তাঁর বাকী জীবন কাটে।"১৯৪০ সালের কোন এক প্রত্যুষে" তাঁর মৃত্যু হয়। আজিজনের *হারমিট বা উদাসীন* ১৮৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২ হলেও সেই যুগে সুদূর খুলনা নিবাসী এক বাঙালি মুসলিম মহিলার পক্ষে এই পুস্তক রচনা একটি কীর্তি বৈ কি। এ ছাড়া তিনি *কোরবানী* নামের এক অপ্রকাশিত কাব্য ছাড়া পত্র-পত্রিকায় কিছু (৬টি) লিখে গেছেন। এর মধ্যে *ইসলাম দর্শন* ১৩৩০ -এ প্রকাশিত হয়, *স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ* আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রোকেয়ার কিছুকাল পূর্বের পথিকৃৎ নারীদের মধ্যে অপর একটি নাম খায়েরন্নেসা খাতুন। এই অসাধারণ মহিলার জীবনীকার সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন : "খায়েরন্নেসা খাতুনের জন্মসন ও তারিখ শুদ্ধ নয়, তাঁর শৈশব-কৈশোর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি ; এমন কি তাঁর পিতা-মাতার নামও জানা যায় নি।" (সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়েরন্নেসা খাতুন,* ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮)। এতটুকু জানা যায় যে তাঁর জন্ম ১৮৭৪-৭৬-এর মধ্যে, সিরাজগঞ্জ মহাকুমা শহরের " 'মুন্সিবাড়ী' নামক এক মধ্যবিত্ত পরিবারে।" (ঐ)। খায়রন্নেসা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্প বয়সেই এক বিদ্যানুরাগী সাবরেজিস্ট্রার আসিরউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খায়েরন্নেসা 'নবনূর'-এ 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' ও 'স্বদেশানুরাগী' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এ ছাড়া তিনি ছদ্মনামেও কিছু প্রবন্ধ লেখেন (মকসুদ, পৃ. ৩১)। তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ 'সতীর পতিভক্তি' ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হয়। এই ৬১ পৃষ্ঠার বইটি নারীর জন্য একটি উপদেশমূলক বই। তবে খায়েরন্নেসা সম্পর্কে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সিরাজগঞ্জের হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে খায়েরন্নেসা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু তা পালন করেন (১৯১০-এর দশকে ?)। 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধে খায়েরন্নেসা একটি উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে উদ্ভাসিত হন। সেই যুগে তাঁর এই উদার মনোভাব ও কর্মজীবী ভূমিকা আজ বিস্ময় জাগায় বিশেষত যখন তা রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সদস্য দ্বারা সম্পন্ন হতে দেখা যায়।

আধুনিককালের প্রথম মুসলিম গদ্যলেখিকা হিসেবে তাহেরুন্নেসাকে গণ্য করা হয়। অনুমান করা হয় যে, তিনি ১৮৫০ সালের কিছু আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে মাত্র একটা লেখাই আজও সংরক্ষিত আছে এবং উনিশ শতকের 'ভদ্রলোক'দের বিখ্যাত সাময়িকী *বামাবোধিনী* পত্রিকায় ১২৭১ (বা. স.) সনের ফাল্গুন (১৮৬৪) সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "বামাগণের রচনা"। খুবই উন্নতমানের রচনাশৈলীতে লেখা এই প্রবন্ধে নারীর সমস্যাসমূহ সম্পর্কে এক গভীর উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং সেই সাথে নারীশিক্ষার উপর জোর দিয়ে তার সমাধানও উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়।

মহিলা কবি ও লেখিকাদের এই প্রজন্মের অনেকেই 'অন্দরমহলে' স্ব-শিক্ষিতা এবং প্রায়শই প্রচলিত সামাজিক বাধা-নিষেধ এবং মহিলাদের যেকোন ধরনের সামাজিক আত্মপ্রকাশ ও অংশগ্রহণের বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রাচীর অতিক্রমে সক্ষম ছিলেন। তাঁদের কার্যাবলীও মুসলিম মহিলাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের 'ভদ্রমহিলা'দের মতো মুসলিম মহিলাদের মধ্যে রীতিমতো এক শ্রেণী তৈরি হতে আরও কয়েক দশক লেগে যায়।

মূলধারার বাইরে মহিলাবৃন্দ

উনিশ শতক যখন সমাপ্তির পথে, তখন বাঙালি সমাজে নিশ্চিতভাবে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই পরিবর্তনের কোন গণভিত্তি ছিল না বা তা বাংলার বিশাল নারীসমাজের অধিকাংশের জীবনধারাকে আদৌ স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। সুমন্ত ব্যানার্জীর কথায় : "আমরা এই সম্ভাবনার কথা প্রায়ই অগ্রাহ্য করি, যে সমস্যাবলি ঘিরে 'মুক্তি'র বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলেছে তা শুধু ভদ্রবাড়ির নারীদেরকে জড়িত করে, হিসেবে যারা বাংলাদেশের সমগ্র নারীর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ।"[৫০]

এই সময়ে যদিও ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মপ্রভাবিত হিন্দু এবং খৃস্টান সম্প্রদায়ের বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত নারীর দেখা মেলে, তবুও বিশাল বালিকাশ্রেণীর অধিকাংশই স্কুলে যেতো না। নারীশিক্ষা মোটামুটিভাবে বড় ও ছোট শহরভিত্তিক ছিল, যা উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মিটাতো। এইভাবে পুরুষশাসন এবং শ্রেণীব্যবস্থা জোরদার করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। তাই প্রশ্ন, এই ভদ্রলোকদের এই সংস্কার আন্দোলন এবং সেসবের শিক্ষাকর্মসূচি যদি গণমুখী না হয়ে থাকে, তবে এই সময়ে বাংলার বিশাল নারী সমাজের অধিকাংশের ভাগ্যে কি ঘটেছিল? পর্দা ও শিক্ষার নিরিখে তাদের মর্যাদাই বা কি ? তাদের গতিবিধির বা প্রকাশ্যে আগমনের মাত্রাই বা কেমন ছিল ? কারা তারা, যারা এই বিশাল নারীসমাজের অধিকাংশ ? এই প্রশ্নাবলী আরো অধিক গবেষণার দিকনির্দেশ করে এবং সমাজবিদ ও ঐতিহাসিকবৃন্দ আজ এই সমস্যাবলী নিরসনে সচেষ্ট রয়েছেন। নারীও যে ইতিহাসে উপেক্ষিত একটা শ্রেণী বা গোষ্ঠী তা এ পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর প্রায় সকল ঐতিহাসিক গবেষণায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নারীবাদী সুধীসমাজ আজ এই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করছেন এবং তাঁরা দাবি তুলেছেন আরও যথাযথ ও পূর্ণ সমীক্ষার, যেখানে 'লিঙ্গ'কে (জেন্ডার) গবেষণার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। এই প্রসঙ্গে কুমকুম সাঙ্গারি এবং সুদেশ ওয়াইদ উনিশ শতকের

---

৫০. Sumanta Banerjee, "Marginalization of Women's Popular Culture in 19th Century Bengal": Sangari and Vaid (eds.), *Recasting Women*, 110.

বাংলার পুনর্জাগরণের বিদ্যমান ব্যাখ্যা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। "ঔপনিবেশিক শাসন সমাজ পুনর্গঠনের এমন এক প্রক্রিয়া শুরু করে, যা পিতৃতন্ত্রকে জোরদার করে।"[৫১] বাংলাদেশের পুনর্জাগরণের মানসিকতাকে শ্রেণীচেতনায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের সমীক্ষা এই দিকনির্দেশ করে যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন যুগপৎ শ্রেণী ও লিঙ্গবৈষম্যের কাঠামো দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বিগত শতকের মতো উনিশ শতকের বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর সীমানার বাইরেও অবস্থান করছিল যেসব নারী, অবশেষে তাদের উপর গবেষণা দৃষ্টি দিচ্ছে।

গোলাম মুর্শিদ তাঁর *দি রিলাকট্যান্ট ডেবিউতাঁত* (সঙ্কোচের বিহ্বলতা) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ শতকের "শুধুমাত্র চাকরানি, অশিক্ষিতা, ধাত্রী ও বেশ্যাদেরই স্বাধীন আয় ছিল।"[৫২] নিম্নস্তরের মেয়েরা পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতো, যেমন পশুদের খাবার দেওয়া, ধান ভাঙ্গা, দুধ দোয়ানো এবং ক্ষেতের ফসল তোলা। তারা অর্থ আয় করুক বা না করুক, নিম্ন শ্রেণী বা বর্ণের নারীরা উল্লেখযোগ্য আর্থিক ভূমিকা পালন করতো (ভদ্রমহিলাদের জন্য যা বহুদিন পর্যন্ত অস্বীকৃত ছিল)। "এই কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে (নিম্নস্তরের নারীগণকে) স্বভাবতই পর্দাপ্রথাকে উপেক্ষা করতে হতো।...এর অর্থ এই যে, ভদ্রলোক-পরিবারের নারীদের চাইতে তারা নিজেদের পরিবারে যথেষ্ট মর্যাদা পেতো।"[৫৩] গ্রন্থকার আরো উল্লেখ করেন যে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাদের যেকোন উপায়ে অর্থ উপার্জন কার্যক্রমে জড়িত থাকার ব্যাপারে কার্যত কঠোর কুসংস্কার ছিল।

ভদ্রলোকদের প্রচারিত 'পোশাকি সংস্কৃতি'র সাথে সাথে উনিশ শতকের বাংলাদেশে পৃথক লোকজ সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। এই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে অনেকগুলো চারুকলার চর্চা হতো, যেমন কবিতা, প্রবাদবাক্য, গান, চটকা, কীর্তন, পাঁচালি, টপ্পা, ঝুমুর, খেউড়, ক্ষেমটা, নাটক, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি। এগুলি সেসব মহিলারাই গড়ে তুলেন এবং প্রচার করেন, যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রমের বাইরে ছিলেন। উনিশ শতকের বাংলায় বিশেষ করে কলকাতার লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে বহুসংখ্যক মহিলা দর্শক উপস্থিত থাকতো, যাদের মধ্যে থাকতো বাজারে স্বনিয়োজিত নিম্ন শ্রেণী বা বর্ণের নারী থেকে শুরু

---

৫১. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, "Recasting Women: An Introduction" in Sangari and Vaid (eds.), ঐ, 1-26. উনিশ শতকের আগের এবং বর্তমান ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Nimai Shadhan Bose, *The Indian Awakening and Bengal,* (Calcutta 1969); বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* (কলকাতা ১৯৪৮); A. C. Gupta (ed.), *Studies in the Bengal Renaissance,* (Jadavpur 1958); Sushobhon Sarkar, *Bengal Renaissance and Other Essays,* (New Delhi 1970); V. C. Joshi (ed.), *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India,* (New Delhi 1975).

৫২. Murshed, *Reluctant Debutante,* 98-99.

৫৩. ঐ, 99.

করে ভদ্রলোকদের অন্দরমহলের কন্যা পর্যন্ত।[৫৪] এই সকল তথ্য বিশ্লেষণ সকল পর্যায়ের নারীদের মর্যাদা এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত পর্দা ও শিক্ষা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

যখন ধনী নারীরা অন্দরমহলের অন্তরালে অবরুদ্ধ, তখন কর্মজীবী নারীদের বিরাট অংশ (নাপ্তিনী, ঝাড়ুদার, তরকারিওয়ালী, বৈষ্ণবী, বোষ্টমী, পথ-গায়িকা প্রমুখ) প্রকাশ্যে যাতায়াত করছে ও অন্দরমহলেও যাবার অনুমতি পাচ্ছে (শিক্ষা, আনন্দ ও সেবাদানের জন্য) এবং এইভাবে তারা অবরোধবাসিনীদের সাথে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগের একমাত্র সূত্র হয়ে উঠে। এই দলের মধ্যে বেশ্যারাও অন্তর্ভুক্ত। ১৮৯১ সালের লোকগণনায় বাংলাদেশে ১৭,০২৩ জন নটী, গায়িকা, নর্তকী দেখা যায়। ১৮৫৩ সালে ৪ লক্ষ লোকের কলকাতা শহর ১২,৪১৯ জন বেশ্যাকে প্রতিপালন করতো।[৫৫]

আঠারো শতকে এবং পরে উনিশ শতকে বাংলাদেশে রাস্তাঘাটে বা বাজারে যেসব গায়িকার দল দেখা যেতো তারা ছিল বৈষ্ণবী বা বোষ্টমী (চলতি ভাষায় তাদেরকে 'নেড়ী' বলা হতো)। পুরুষ ও নারীর সমমর্যাদার প্রভাব থাকায় বৈষ্ণবধর্ম সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাঙালি নারীদের, যেমন—কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা এবং জাতিচ্যুতি থেকে বা বেশ্যাবৃত্তি থেকে পরিত্রাণকামী নারীদের সমাজে স্থান করে দেয়। ভারতীয় আদমশুমারির (১৮৭২) বর্ণনামতে বৈষ্ণবধর্ম "অন্য সবাই যাদেরকে পরিত্যাগ করেছে, তাদেরকে গ্রহণের জন্য দুইবাহু প্রসারিত করে দিয়েছিল।" বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীতি তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা দেয়, সমাজের উঁচু বা নীচু যেকোন স্থানে প্রবেশাধিকার দেয় এবং পুরুষের সাথে সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। এসমস্ত সুবিধা ভদ্রমহিলাদের নাগালের বাইরে ছিল।

"বৈষ্ণবী নারীর স্বাধীন জীবনধারা এবং লজ্জাবিদূরিত অবাধ যৌনসম্পর্ক একটা পাল্টা সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে উনিশ শতকের ভদ্রলোকদের নিকট চ্যালেঞ্জ আকারে দেখা দেয়। অন্দরমহলের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী অথচ তাদের নারীদের শিক্ষা ও মুক্তি প্রচেষ্টার সফলতা দিয়ে তাদের ইংরেজ প্রভুদের খুশি করতে গিয়ে ভদ্রলোক শ্রেণী এক অদ্ভুত ফাঁদে আটকা পড়ে।"[৫৬]

নিজেদের নারীদের সতীত্ব ও আনুগত্য সংরক্ষণের ইচ্ছার তাগিদে এবং পর্দাপ্রথা থেকে নারীদের দ্রুত বের করে আনা হলেও শিক্ষার মাধ্যমে পুরুষজগতে প্রবেশাধিকার দিলে ফলশ্রুতিতে লাম্পট্যজীবন দেখা দিতে পারে এই ভয়ে ভদ্রলোকেরা এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ও অবিরাম আদর্শগত ও বস্তুগত আন্দোলন শুরু করে। এর সাথে অন্যান্য আর্থসামাজিক উপাদান (পুরাতন পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যাহ্রাস এবং পুস্তকসংস্কৃতির উদ্ভব) মিশে এই লোকজ সংস্কৃতিকে এবং এর মহিলা অংশগ্রহণকারীকে কোণঠাসা করে শহুরে

---

৫৪. Banerjee, "Marginalization".

৫৫. ঐ।

৫৬. ঐ, 153.

সমাজ থেকে বিতাড়িত করে। ভদ্রমহিলারা এবার তাদের কাজ ও চেতনার মাধ্যমে শহর এলাকায় প্রভাবশালী দলে পরিণত হয়। পুরাতন লোকজ সংস্কৃতি, যা বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদেরকে এক সামাজিক বন্ধনে বেঁধে রাখতো, তা শুধু সীমাবদ্ধ থাকে নিম্ন শ্রেণীর নারীর মধ্যে। "কিন্তু তাদেরকেও পরিবর্তিত সামাজিক জগতের যুক্তি বুঝতে হয় এবং লোকজ সংস্কৃতির এই পুরাতন ধারা উধাও হয়ে যায়।"[৫৭]

চার

স্বাধীনতাসংগ্রাম (১৯০০-১৯৭১)

জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং নারীর সমস্যা

বিশ শতকের ঊষালগ্নে ভারত তার ইতিহাসের এক জটিল সময়ে উপনীত হয়। নানাবিধ স্বার্থ, বিক্ষোভ ও আন্দোলন কোন সময় সমমুখী হয়ে, কোন সময় ভিন্নমুখী হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এর কোনটা প্রাধান্য পেতে থাকে আবার কোনটা অবদমিত হতে থাকে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, সংরক্ষণবাদী ও সংস্কারবাদীদের মধ্যেকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং পুরাতন সমাজপদ্ধতি ও নতুন পদ্ধতির মধ্যেকার সংঘাত—এসব উপাদান দিয়ে গঠিত এ যুগের ইতিবৃত্ত। অবশ্য এসব মেরুকরণ সর্বদা অতোটা স্পষ্ট ছিল না, এগুলো প্রায়ই জটিল পদ্ধতিতে সমন্বিত হয়েছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম তীব্রভাবে দৃশ্যপটে প্রাধান্য পেতে থাকে এবং নারীবিষয়ক সমস্যাবলী গৌণ হয়ে যাবার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

বাড়ির বাইরের জীবনে এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেই এই প্রথম ভারতীয় নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত শক্তির সুবিধা দেখে এবং যে- কোন কাজে নারীর একাগ্রতার কথা উপলব্ধি করে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা নারীদেরকে ঘরের বাইরে এসে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের উৎসাহ দেন।[৫৮]

উনিশ শতকের শেষভাগে নারীসমস্যার এহেন অবস্থান সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জী কিন্তু ভিন্ন এক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা ঠিক নয় যে ভারতে তখন আরো জরুরি সমস্যা রাজনৈতিক ক্ষমতার আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ফলে উনিশ শতকের শেষভাগে এসে নারীমুক্তির বিষয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকাশ্য কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে; বরঞ্চ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় নারীসমস্যার

---

৫৭. ঐ, 130.

৫৮. ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন Manmohan Kaur, *Women in India's Freedom Struggle*, (New Delhi 1985), and Kamala Devi Chattopadhay, *Indian Women's Battle for Freedom*, (New Delhi 1983).

বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয়তাবাদী শক্তির অসম্মতিই এর মূল কারণ।[৫৯] উনিশ শতকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যে একটা সিদ্ধান্তে আসা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কেননা ইতিমধ্যেই কিছু অঘটন ঘটে গেছে ভারতে— ভারত চলে গেছে বৃটিশের অধীনে এবং ভারতীয় জনগণের উপর নেমে এসেছে অপমান ও লাঞ্ছনার অভিশাপ।

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজের অভ্যন্তরে দুটি পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত জন্ম নেয়। পার্থ চ্যাটার্জীর মতে এই সিদ্ধান্তের মূল প্রবণতা ছিল সাংস্কৃতিক বলয়কে বস্তুগত ও আধ্যাতিক, ভেতর ও বাইরের তথা *ঘর* ও *বাহিরের* বিষয় হিসেবে বিভাজন। বস্তুগত বিচারে পাশ্চাত্য জয়ী হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের অন্তর্জাত আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ববোধ অপর পক্ষকে হার মানিয়েছিল এবং তাদের মনে পরাজিতের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। এ সময়ে ভারতীয়দের মাঝে স্বরূপ অন্বেষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং কোন না কোন ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুভূতির প্রয়োজনীয়তাও পরিলক্ষিত হয়। তখন নারীরাই ছিল সঙ্কটময় ক্ষেত্র, যেখানে এই ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছিল।

কিন্তু পর্দার বিষয়ে প্রচলিত ধারণা এবং ব্যবহারের কি হলো ? নারীর অধিকার সম্পর্কে গান্ধীর আদর্শ ছিল—কোন কোন ক্ষেত্রে সমান অধিকার, নিজেদেরকে উন্নত করার সুযোগ-সুবিধা এবং যৌনপ্রতীক হিসেবে নারীর ভূমিকা পরিহার। কিন্তু তিনি আর্থিক ক্ষমতার বিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা করেন নি। গান্ধীর আদর্শ নারী হলো সতীত্বের চরম উৎকর্ষের প্রতীক পৌরাণিক 'সীতা'। অনেক উদার মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও অধিকাংশ নেতা তখনও নারীকে বাস্তবে গৃহের পবিত্র অঙ্গনে গৃহবধূ হিসেবেই দেখতে চাইতেন।

এই শতকের প্রারম্ভিক দশকগুলোর ঘটনা নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যায় যে, পর্দাসমস্যা এক নতুন রূপ নেয়। নারীর সতীত্বরক্ষার জন্য শরীর ঢাকা—পর্দার এই পূর্বেকার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ শব্দের অর্থ রূপান্তরিত হয়ে বহির্জগতে নারীর অধিকার ও বিচরণ ক্রমশ স্বীকৃত হয়। পর্দা এখন এক ব্যাপক অর্থ বহন করতে থাকে। নারী এবং নারীর ভূমিকা সংক্রান্ত পর্যালোচনা গুরুত্ব পায়, কেবল এ পর্যালোচনার বিশেষ উপাদান (যেমন পর্দা, শিক্ষা) পরিবর্তিত হয়। এতে এই অভিমত ব্যক্ত হয় যে, নারীসমস্যার সমাধান সন্তোষজনক নয়, চূড়ান্তও নয় (হয়তো বা এই চূড়ান্ত সমাধান অভিপ্রেতও নয় বা সম্ভবও নয়)। পর্দার শিথিলতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার হয়তো বা বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্যা আকারেই থেকে যাবে এবং 'সেই বহু শীর্ষবিশিষ্ট সর্পদানব' এর এক অংশে পরিণত হবে, যার বিরুদ্ধে নারীকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল, হবেও। পর্দার নতুন রূপ গ্রহণের বাস্তবতা থেকে পার্থ চ্যাটার্জীর যুক্তি খুব বেশি দূরে নয়। নারীত্বের এক নতুন ধারণা ভদ্রমহিলাদের মধ্যে গড়ে উঠে, যা পর্দার

---

৫৯. Partha Chatterjee, "The Nationalist Resolution of the Women's Question" in Sangari and Vaid (ed.), *Recasting Women*, 249.

পূর্বেকার সংজ্ঞানির্ধারিত 'অন্তঃপুর' থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে সক্ষম করে। ভদ্রমহিলারা নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যা পূর্বের চেয়ে উদার হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সীমাবদ্ধ বিধির দ্বারা নির্ধারিত ছিল।[৬০] পৌরাণিক 'সীতা-সাবিত্রী-সতী'র ভাবমূর্তির এহেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা নারীকে তার 'ভয়াবহ' যৌনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পবিত্র ও যৌন-উদাসীন এক ব্যক্তি হিসেবে পর্দার বেড়াজালের বাইরে যেতে সহায়তা করে। 'সতী'কে দেবীর আসনে বসানো হয়, কিন্তু 'অসতী'কে পুরুষশাসিত সমাজ কখনো ভুলে যায় না। কখনও যদি সে বিস্মৃতির আড়ালে যায়, তবু পুরুষমন থেকে বিলীন হয় না এবং বারে বারেই তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। আদর্শে ও ব্যবহারে আজও যে পর্দাপ্রথা বিদ্যমান রয়েছে তার আংশিক ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যেতে পারে। নারীর ভোটাধিকারের ঘটনায় নারীর তথা অবস্থার বৈপরীত্য এবং জটিলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ১৯১৭ সালে নারীর ভোটাধিকারের বিষয়ে যখন সরোজিনী নাইডু এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে ভাইসরয় মন্টেগু সমীপে হাজির হন, তখন তিনি (মন্টেগু) মন্তব্য করেন[৬১], "এই সন্ধিক্ষণে ভারতের সামাজিক অবস্থা যা তাতে নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা সমীচীন হবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অবরোধপ্রথা শিথিল করা না হচ্ছে, ততোক্ষণ নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা আদৌ বাস্তবসম্মত হবে না।" এই বিষয়টি প্রাদেশিক আইন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। মাদ্রাজ হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রদেশ, যেখানে ১৯২১ সালে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় এবং এর অনুসরণে ১৯২৩ সালে বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে এবং ১৯২৯ সালে বাংলায় নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

রাজনীতি ও গণআন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ

সংস্কারবাদী আন্দোলনের এবং একইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত ছিল বাংলাদেশ। বিশ শতকের উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত মহিলারাও রাজনৈতিক বিক্ষোভে অগ্রণী ছিলেন। ১৯০০ সালের মধ্যে প্রথম মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। উদার সংস্কার, নারীর মর্যাদা এবং জাতীয় আন্দোলনের যোগসূত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য শক্তি যোগায় এবং নারীসমস্যা বিষয়ে সমর্থন তৈরি করে। সরোজিনী নাইডু এবং মার্গারেট কাসিন্‌সের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে 'ভারতীয় নারী সমিতি' এবং ১৯২৭ সালে 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলন' গঠিত হওয়ায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

এই সময়ের সকল গণআন্দোলনে নারীরা অংশগ্রহণ করে যদিও তাদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশি ছিল। লবণ সত্যাগ্রহে গ্রেপ্তারকৃত ৮০ হাজার লোকের মধ্যে ১৭ হাজার ছিল নারী। মহিলারা আরো সহিংস আন্দোলনেও অংশগ্রহণ

৬০. ঐ।
৬১. *স্ত্রী ধর্মে* প্রকাশিত, ১৯৩৪, ১০২। এটি ইন্ডিয়ান উইমেন্স এসোসিয়েশনের মুখপত্র ছিল।

করে। কল্পনা দত্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (চট্টগ্রাম রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে আক্রমণ), শান্তি ও সুনীতি (১৯৩১ সালে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা), সরলাদেবী চৌধুরানী (ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি) প্রমুখ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁদের দৃষ্টান্তে একথা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের নারীর এক ক্ষুদ্র অংশ কোন বাধাই গ্রাহ্য করে নি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করে দেয়।

নারী-অধিকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রাজনৈতিক, আইনগত, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রসমূহে বাংলার নারীসমাজ বেশ অগ্রসর হয়। কিন্তু এই উন্নতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উদার অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা সাধারণভাবে জন্মায় যে, পর্দা এবং শিক্ষার অভাবের কারণে মুসলিম নারীদের আইনগত বা ধর্মসংক্রান্ত (শরিয়ত) অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। মুসলিম নারীদের চাহিদাপূরণে সমগ্র ভারতে 'পর্দা ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্যন্ত অবরোধে থাকা মহিলারা বাইরে এসে তাদের সমস্যা নিয়ে সভা ও আলোচনা শুরু করে যার ফলে সামাজিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১৮৮৬ সালে আলিগড়ে প্রতিষ্ঠিত স্যার সৈয়দ আহমদের 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' ১৯০৩ সালে নারীদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। এই ব্যবস্থা মুসলিম নারীর উন্নতির সহায়ক হয়। এই সমিতির সভাগুলোতে শিক্ষা এবং পর্দার উপর সিদ্ধান্তসমূহ রুটিনমাফিক গ্রহণ করা হতো। ১৯০৫ সালে আলিগড়ে 'মুসলিম মহিলা সম্মেলন' প্রতিষ্ঠালাভ করে। এর অনুসরণে ১৯০৭ সালে লাহোরে 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন' এবং বাংলাদেশে 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতি' গঠিত হয়।

১৯১৩ (মতান্তরে ১৯০৯) সালে কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীয়া বেগম বা খুজিস্তা আকতার 'পর্দানশীন মাদ্রাসা' (অবরোধ প্রথায় বালিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। নবাবজাদী সারা বানু বেগম 'মহিলাদের স্বাস্থ্য ও বিনোদনকেন্দ্র' সংগঠিত করেন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলি ও শওকত আলির মা বিবি আম্মান প্রকাশ্যে উপস্থিত হয়ে জনসভায় যোগ দেন, নারীবিক্ষোভ সংগঠনে তুরস্কের প্রতি সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা করতে শুরু করেন। ১৯১৭ সালে 'লীগসভাপতি'র পুত্র জেলে আটক থাকায় বিবি আম্মান মুসলিম লীগ সভাতেও ভাষণ দেন। তিনি পর্দাপ্রথার সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে নারীর মর্যাদার উন্নতিকল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বৃহত্তর সমাজের জীবনধারায় অংশগ্রহণকারী এমন অন্যান্য বিখ্যাত মুসলিম মহিলা হচ্ছেন বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মা খুজিস্তা আখতার বানু। এই সময়ে মুসলিম নারী আন্দোলন যেহেতু শহরকেন্দ্রিক ছিল, তাই এর নেতৃত্ব কয়েকটি বিখ্যাত পরিবার ঘিরে গড়ে উঠে।

পরিবেশে তখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। পর্দাবিরোধী এবং নারীভূমিকাকে উদারভিত্তিক করার আন্দোলন গড়ে উঠছে। পর্দাপ্রথা শহর এলাকায়, বিশেষকরে উত্তর ভারতের শহরগুলোতে লোপ পেতে চলেছিল এবং অন্যান্য এলাকায়ও তা আর ততো কড়াকড়িভাবে মান্য করা হচ্ছিল না।[৬২] ১৯৩০ সালে 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে'র মন্তব্য— "অর্থনৈতিক পরিবর্তন পর্দাপ্রথাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে" এই পরিবর্তনের প্রমাণ বহন করে।

প্রথম কয়েক দশকের শেষে ভারতে নারী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়। 'ভারতীয় নারী সমিতি' এবং 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলন' ছিল এমন দুটি কার্যকরী সংগঠন যাদের প্রত্যেক প্রদেশেই শাখা এবং বিপুল সদস্য ছিল। হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, খৃস্টান, শিখ বা বৌদ্ধ—এই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে বিদ্যমান একতা ছিল নারী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় রাজনীতিতে একতা ছিল নারীআন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি হবার পরেও 'মুসলিম মহিলা সমিতি'র মহিলারা 'ভারতীয় নারী সমিতি'রও সদস্যা হন। সাইমন কমিশন উল্লেখ করে যে, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত এক ভারতের জন্য ভারতীয় নারীআন্দোলনের হাতেই সম্ভবত উন্নতির চাবিকাঠি রয়েছে। সেতুবন্ধনের প্রতিবন্ধক সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিকারী এমন কিছু বাধা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় নারীরা নারীবিষয়ক সমস্যার বিষয়ে এক হতে পেরেছিল। 'মহীশূর প্রাদেশিক নারী সম্মেলনে'র এক সভায় সভানেত্রীর ভাষণে মার্গারেট কাসিনস্ বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকারী নারীদের যে তালিকা পাঠ করে শোনান তাতে ছিলেন ভূপালের বেগম, মিসেস এ্যানি বেসান্ট, মিসেস সরোজিনী নাইডু, লেডি মির্জা ইসমাইল, মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী ও কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।[৬৩] সরকারী নীতি ও আইন পরিষদের কার্যাবলী নিরীক্ষা করা এবং আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক আইনসমূহের তদারকি করা এবং (সম্ভব হলে) পরিকল্পনা করা পর্যন্ত আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত ছিল। ১৯৩৫ সালের পর মুসলিম লীগ যখন তার মহিলা শাখা প্রতিষ্ঠা করে, তখন মুসলিম নারীদের মনোযোগ ইসলামে প্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহের দিকে আকৃষ্ট হয়।

যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের স্বাধীনতার সমস্যা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনারত, তখন আন্দোলনে সক্রিয় নারীরা এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে শুরু করে যাতে ভবিষ্যতের সরকার নারীদের দাবিসমূহ পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে। তখন ভারতীয় নারীদের অধিকার ও কর্তব্যের এক সনদ তৈরি করা হয়। এর মধ্যে ছিল —

> নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ : আইনের চোখে সমতা—চাকুরি বা শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম, জাত, বিশ্বাস বা লিঙ্গভেদে কোন অসমতা না থাকা, সমবেতন এবং উত্তরাধিকারের অধিকার।

---

৬২. Shahida Lateef, *Muslim Women*, 80.

৬৩. ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণের জন্য ইন্ডিয়ান উইমেন্স এসোসিয়েশনের ম্যাগাজিন *স্ত্রী ধর্ম* এবং অল ইন্ডিয়া উইমেন্স এসোসিয়েশনের ম্যাগাজিন *রোশিনি* দেখুন। মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আরও দ্রষ্টব্য, Elizabeth Hume, "Women's Part in Modern Movements in India", *The Muslim World*, 22:4 (1932), Princeton, New Jersey.

নারীর কর্তব্য : শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষাদান—সামাজিক কল্যাণ ও নীতিবোধের প্রসারণ ও বিশ্বশান্তি।

সবার মনে হতে লাগলো, পর্দার অন্তরালের জগৎ হতে ভারতীয় নারীরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এলো।[৬৪]

নারীশিক্ষার উন্নতিসাধন

পর্দার মতোই নারীশিক্ষার বিষয়টিও বিশ শতকে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। নারীকে শুধুমাত্র জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তার মর্যাদা উন্নীত করা নয়, নারীর কর্মবিনিয়োগক্ষেত্রেও বাস্তব পদক্ষেপের এক শক্তিশালী সহায়ক হিসেবে শিক্ষার মূল্য বিবেচিত হতে শুরু হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে শিল্পায়ন এবং আরও অধিক সংখ্যক শ্রমিকের চাহিদা নারীমুক্তিকে তরান্বিত করেছিল। কিন্তু গৃহ থেকে নারীকে কর্মক্ষেত্রে আনার এই প্রক্রিয়ার (যদিও গৃহের বোঝা তার কাঁধেই রয়ে গেল, যা কখনও ঝেড়ে ফেলা যায় নি বা গেল না) সাথে শিক্ষাও এলো; একই সঙ্গে নারীকে নিয়ন্ত্রণকারী সতীত্বের কড়া বাঁধন—যেমন পর্দা শিথিল হতে শুরু করে। ভারতে সার্বিক পরিবর্তন একটু ভিন্নভাবে এসেছিল এবং নারীর ভূমিকাসংক্রান্ত সার্বিক পর্যালোচনাও ভিন্ন রূপ নেয়।

বিশ শতকের প্রারম্ভিক দশকগুলোতে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার মধ্যে ৫২.৩% মুসলিম এবং ৪৫.২ % হিন্দু ছিল। নারীর চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষার অবকাঠামোর আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ সরকার অনুভব করে। 'নারীশিক্ষা কমিটি' ১৯০৯, ১৯১০ ও ১৯১১ সালে আলোচনায় বসে। ১৯০১ সালে 'সিমলা সম্মেলনে' মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ে নানা ধরনের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সরকারের শুরু করা এই কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায় ১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গে'র দরুন।[৬৫] সরকার তখনো বিরাজমান দেশজ শিক্ষাব্যবস্থাকে, যেমন মক্তব ও পাঠশালাকে ব্যবহার করে এবং এক দ্বিমুখী অভিযান চালিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচিকে ধর্মনিরপেক্ষ করে এবং যতোসংখ্যক সম্ভব ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও গ্রহণ করে। আসাম ও পূর্ব বাংলাকে নিয়ে নবগঠিত প্রদেশের নবাব সলিমুল্লাহ এবং রায় দুলাল চন্দ্র দেব জনশিক্ষা পরিচালককে (ডি. পি. আই.) এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁরা নারীশিক্ষার উন্নতিসাধনে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। এই কাজের জন্য 'নারীশিক্ষা কমিটি' গঠিত হয়েছিল।[৬৬]

---

৬৪. Shahida Lateef, *Muslim Women.*

৬৫. শীলা বসু, "রাজনীতিক পটভূমিকায় বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ", *ঐতিহাসিক*, ২, এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যা, কলকাতা।

৬৬. M. K. U. Molla, "Women's Education in Early Twentieth Century Bengal" in *The Bengal Studies*, University of Michigan, East Lansing, 1985.

এই সময়ে অর্জিত উন্নতির বেশিরভাগই ঘটেছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ঢাকার ইডেন বালিকা স্কুল, ময়মনসিংহের আলেক-জান্ডার বালিকা স্কুল এবং চট্টগ্রামের ডঃ খাস্তগির স্কুলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।[৬৭] ১৯০৬ সালে প্রথমবারের মতো ইডেন স্কুলে মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং এইভাবে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকের অভাবজনিত এক বিরাট সমস্যার সুরাহা হয়।

১৯০১ সালে পূর্ব বাংলায় ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৫৬৪ জন। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৬ সালে ১৬,৪৬৮ জনে ও ১৯১১ সালে ৫৬,৬৮৩ জনে উন্নীত হয়। মুসলিমদের মধ্যে পর্দার কঠোরতা তুলনামূলকভাবে বেশি বিদ্যমান বলে বুঝতে পেরে সরকার এই বাধা অতিক্রমকল্পে মুসলিম নারীশিক্ষার উন্নতির নীতিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে (যেমন মুসলিম বালিকাদের জন্য তাদের বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দেবার সুযোগ ইত্যাদি)। পর্দাপ্রথা এবং বাল্যবিবাহ নারীশিক্ষার জন্য প্রচণ্ড বাধা হওয়া সত্ত্বেও ১৯১২ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

মুসলিম নারীশিক্ষার দিশারীগণ

প্রায় এই সময়ে লেখিকা, সমাজসেবী, বিদ্যানুরাগিনী, ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত এবং মুসলিম নারীমুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কলকাতায় ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর সক্রিয় কর্মজীবনের ধারার সূচনা করলেন। রংপুরের পায়রাবন্দ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি তৎকালীন উচ্চবিত্ত মুসলিম জীবনধারার কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যেই লালিত হন।[৬৮] এই জীবনধারায় কোরান পড়ার সামর্থ্যের বাইরে অন্য কোন ধরনের জ্ঞানার্জনকে একেবারে হারাম করা না হলেও খুবই অপছন্দনীয় হিসেবে গণ্য করা হতো। রোকেয়ার জীবনী লিখতে গিয়ে শামসুননাহার মাহমুদ বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে বাড়িতে থেকে রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ও বোন করিমুন্নেসার এবং পরে তাঁর স্বামীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্দরমহলের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল ছিন্ন করে সামাজিক সংস্কারের বিশাল জগতে প্রবেশ করেন।

---

৬৭. ঐ, 43.

৬৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত (১৯৭৩) *রোকেয়া-রচনাবলী*র অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ 'অবরোধবাসিনী'-তে রোকেয়া বিবরণ দিয়েছেন কিভাবে পর্দা তাঁর শৈশবকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর *রোকেয়া জীবনী*তে (ঢাকা ১৯৮৭) এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কিছুদিন আগে সুফিয়া কামাল '*একাল সেকালের কথা*'য় (ঢাকা ১৯৮৮) তাঁর শৈশবের কথা বলেছেন এবং বিবরণ দিয়েছেন কিভাবে উচ্চশ্রেণীর মুসলিম নারীদের জীবনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল।

অবরোধপ্রথা (পর্দাপ্রথার এক বিকৃত ও অযৌক্তিক রূপ) এবং অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে জেহাদ রোকেয়ার আমরণ সাধনা। মুসলিম নারীদের মধ্য হতে এই দুই অন্যায়ের উচ্ছেদকল্পে তাঁর জীবনধারা নিবেদিত ছিল। রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্মে (উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গসাহিত্য, কবিতা) এবং সামাজিক কার্মধারায় মুসলিম নারীদের পর্দাপ্রথা ও অজ্ঞানতার নিগড় ভাঙার প্রয়োজনীয়তার কথা অবিরাম উপস্থাপন করেছিলেন। স্বচ্ছদৃষ্টি এবং একাগ্রচিত্তসম্পন্না হয়ে (তাঁর পূর্বের বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের মতো) তিনি এক যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিতে সমাজ ও ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, যথা মানব-ইতিহাসে পুরুষশাসিত সমাজে বিভিন্ন যাঁতাকলে নারীদের চরম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা সে যুগের এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর চিন্তাধারার এই পরিচ্ছন্নতায় আরো বিস্মিত হতে হয় যখন বিবেচনা করা হয় যে, গৃহশিক্ষায় ও স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিতা রোকেয়া শহুরে সামাজিক পরিবেশের কোন সুযোগ-সুবিধা পান নি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সম্পর্কে ১৯০৪ সালে রোকেয়া তাঁর 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছেন : "...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" (*নবনূর*, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা)। এই প্রবন্ধটি যখন পরবর্তীকালে গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশিত হয় তখন উক্ত পরিচ্ছেদটি বাদ দেয়া হয়।

রোকেয়া অবরোধ ও পর্দাপ্রথার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। পর্দাপ্রথা' সামাজিক ভদ্রতার পরিচায়ক বিধায় অনুমোদনযোগ্য, কিন্তু 'অবরোধ প্রথা' পর্দাপ্রথার এক সামাজিক ও সাময়িক বিকৃত রূপ, তাই নিন্দনীয়। রোকেয়া নিজেও পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন (এমনকি জীবনের কোন এক পর্যায়ে বোরকাও পরেছেন)। উনিশ শতকের অন্যান্য উদার সমাজসংস্কারকদের মতো নারীমর্যাদার সমস্যাকে ঘিরেই রোকেয়ার আহ্বান ছিল এবং তিনি একই অনিশ্চয়তা, বৈপরীত্য ও অবিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন।[৬৯] পুরুষশাসিত সমাজে নারীসমস্যার সমাধান (যদিও কথাগুলো তখন ঠিক এইভাবে প্রকাশিত হয় নি) এবং নারীর আর্থিক মুক্তির উপায় হিসেবে শিক্ষাপ্রচার করতে গিয়ে তিনি এক বিরল, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

নুরুন্নেসা খাতুন (১৮৯২-১৯৭৫) রোকেয়ার সমসাময়িক এবং বাংলার' মুসলিম নারীমুক্তির অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও তাঁর লেখার মধ্যে *স্বপ্নদ্রষ্টা* (১৯২৩), *জানকীবাঈ* (১৯২৪) এবং *আত্মদান* (১৯২৫) উল্লেখযোগ্য। নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদিনী' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁকে 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিও প্রদান

৬৯. দেখুন. Sonia Nishat Amin, "Rokcya Sakhawat Hossain and the Legacy of the Bengal Renaissance", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka, 24: 2(1988), 185-192.

করা হয়, যা কিনা তখনকার জন্য এক বিরল সম্মান। মামলুকুল ফাতিমা খানমের সাহিত্যকর্মও ১৯১২ -১৯২১ সালের অন্তর্গত। রোকেয়া, নুরুন্নেসা ও ফাতিমা এঁরা সবাই উনিশ শতকের শেষ দশকসমূহে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় বিশ শতকে।

রোকেয়া শামসুননাহার মাহমুদকে (১৯০৯-১৯৬৪) একজন সহকর্মী এবং শিষ্যা হিসেবে পেয়েছিলেন। শামসুননাহার ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং রাজনীতিবিদ। নোয়াখালীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রথম দিশারী ছিলেন তাঁর মা এবং তাঁর উপর তাঁর নানা মৌলবি আবদুল আজিজের (পূর্বে উল্লেখিত 'মুসলমান সুহৃদ সম্মেলনে'র একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য) বিশেষ প্রভাব ছিল। যদিও মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে আবদুল আজিজ এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, তথাপি তিনি সামাজিক নিন্দার মোকাবেলা করতে সাহস পান নি, যা নিশ্চিতরূপে দেখা দিত যদি তাঁর এই প্রতিভাময়ী নাতনী পর্দাপ্রথাকে উপেক্ষা করে স্কুলে যেতো। তাঁর আগের ও পরের অনেক উদার মতাবলম্বী সমাজসংস্কারকের মতো সম্ভবত তিনি সাবধানতায় বিশ্বাস করতেন এবং প্রয়োজনবোধে আপোস করে নিতেন। তাই মাত্র নয় বছর বয়সে শামসুননাহারকে স্কুল থেকে ঘরে নিয়ে আসা হলো এবং গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। ১৯২৬ সালে 'প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী' হিসেবে তিনি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেন ও বিশেষ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। এই প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার পদ্ধতি ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে সম্ভবত পর্দাপ্রথা ও শিক্ষার দ্বন্দ্বের বিশ শতকের গোড়ার দিকের এক সমাধান।

১৯৩৯ সালে ফজলুল হক যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তখন মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরেই শামসুন্নাহারকে একজন শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হয়। কলকাতা থাকাকালীন সময়ে তিনি রোকেয়ার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন' (রোকেয়ার নারীমুক্তি সংগ্রামের অর্থনৈতিক ফ্রন্ট) গড়ে তোলার ব্যাপারে। "শামসুন্নাহারের কাজ শুরু হলো সেখান থেকে যেখানে রোকেয়া শেষ করেছিলেন।"[৭০] তিনি ছিলেন দুই যুগের সেতুবন্ধন— বিশ শতকের প্রথম দিকের দশকগুলো (যখন রোকেয়ার মতো নারীরা প্রায় একাই লড়াই করে চলেছেন) এবং বর্তমান যুগ (যখন একজন বাঙালি নারী, যার সামর্থ্য আছে, অন্তত পর্দার দোহাই দিয়ে তার শিক্ষাগ্রহণে বাধা দেয়া যাবে না)-এ দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন।

---

৭০. শাহিদা পারভীন, 'বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি' (অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৮৬)— এতে লেখক শামসুন্নাহারের জীবনের এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তিবিশেষই ইতিহাসে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকাকে কোনক্রমেই অতিরঞ্জিত বলা চলে না। ১৯১৬ সালে রোকেয়া কর্তৃক 'সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান' আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে বাঙালি মুসলিম নারী আন্দোলনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষাবিদদের জন্য এক আদর্শ হিসেবে কাজ করে। রোকেয়া ও শামসুন্নাহারের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের নারী ও পুরুষকে নারীশিক্ষার প্রসারকল্পে কাজ করার উৎসাহ যুগিয়েছে। ১৯১৪ সালে রোকেয়ার স্কুল থেকে একটি বৃত্তি প্রদান যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই সময়ের পরিসংখ্যানে এক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা হিন্দু ছাত্রীদের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী স্তরে (মাধ্যমিক) এই সংখ্যা দ্রুত নীচে নেমে যায়, যার কারণ পর্দা ও বাল্যবিবাহ (যা মুসলমানদের মধ্যে কঠোরভাবে পালিত হতো)। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, যেমন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম নারী এই সময় খুব অল্পই উন্নতি লাভ করতে পেরেছে।

পূর্ব বাংলার শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাসে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এক যুগনির্দেশক যোজনা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন লীলা নাগ, যিনি বেথুন কলেজ থেকে বি. এ পাশ করার পর ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এম. এ পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯২৪-১৯২৫ সময়ের মধ্যে ঢাকায় মেয়েদের জন্য চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত 'দীপালী সঙ্ঘ' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছাত্রীভর্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধা দিতে থাকে এবং পরে তা বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার করার পরেও ছাত্রীদের জন্য এক পৃথক সময়সূচির ব্যবস্থা করে। আরো অবাক হবার কথা এই যে, এই গুটিকতক অদম্য ছাত্রীকে পাহারা দেয়ার জন্য একজন মহিলা পরিচারিকাও নিয়োগ করা হয়েছিল। ভয় ছিল, এই কয়েকজন নারী ঘরের বাইরে আসার জন্য বহুদিনের প্রথা ভেঙেছে, না জানি কি বিপদ আসে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী হিসেবে ১৯২৭ সালে অঙ্কশাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রির জন্য যখন ফজিলাতুন্নেসা এই বিভাগে প্রবেশাধিকার পেলেন, তখন মুসলিম সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ফজিলাতুন্নেসা মাস্টার ডিগ্রি পেলেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এই ঘটনা পরবর্তী দশকসমূহে স্ত্রীশিক্ষার গতিসঞ্চার করে এবং মেয়েরা ক্রমেই বেশিকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করে।

১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে করুকণা গুপ্তার নিয়োগ আর এক মাইলফলক। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৩৩ সালে করুকণা ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন। তাঁর এই নিয়োগ দক্ষিণ এশিয়ায় কর্মজীবী মহিলাদের এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করে।[৭১]

---

৭১. আরো বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Nurul Huda Abul Mansur. "Participation of Women in Dhaka University : The Early Phase", *The Dhaka University Studies*, Part A, Vol. 47, NO, 2, Dec. 1989.

যুদ্ধ এবং বাংলার নারীসঙ্ঘসমূহ

দেশ যখন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদী-আন্দোলনে (separatist) নিমগ্ন, তখনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাগদানব ফণা মেলে উঠলো। এই মহাসংগ্রামের প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের আনাচেকানাচে দেখা দিল। মহিলারা নতুন নতুন ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হলো। দুর্ভিক্ষ আর অরাজকতার মধ্যে নারীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেলো। বিভিন্ন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'তে বাংলাদেশের নারীরা নিজেদেরকে সংগঠিত করে। ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে এই ধরনের অনেক সংগঠন ছিল। এই সমিতিসমূহ এবং সেইসাথে মাতঙ্গিনী হাজরা ও লালবিবির মতো মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন পূর্ববাংলায় পর্দাপ্রথার বন্ধন ছিন্ন করতে এক বিরাট ভূমিকা রাখে। "এই সমস্ত আন্দোলনের প্রভাবে পর্দাপ্রথার মুঠো ধীরে ধীরে শিথিল হতে শুরু করে।"[৭২]

বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি ও 'পাকিস্তানে'র দাবি ভারতীয় নারী আন্দোলনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের উপর কালো ছায়া ফেলে। 'অভিন্ন কর্মসূচি'র ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং লালিত আগের দশকসমূহের সেই একাত্মবোধ খুব তাড়াতাড়িই হারিয়ে যায় এবং হয়তো বা তা ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে ও ভিন্ন এক সময়ে পুনর্জন্মের অপেক্ষায় রয়ে গেল।

ভারতবিভাগ ও নতুন বাস্তবতা

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের ফলে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের সৃষ্টি হয় এবং এইসাথে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের পূর্বাংশরূপে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। যে ধর্মের ভিত্তিতে এই নতুন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে, সে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, যা বিরাট আঞ্চলিক ব্যবধানে থাকা দুটো ভৌগোলিক অংশের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। সাবেক পূর্ব বাংলা দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হলো এবং এভাবে হঠাৎ করেই বাংলা তার হাজার বছরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্রোতোধারা হারিয়ে ফেলে। নতুন রাষ্ট্রের এই ধর্মনির্ভরতা নারীর জন্য এক সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। কেননা ধর্ম প্রায়শই কিছু লোকের ক্রীড়নক হয়ে নারীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করে থাকে। ১৯৪৭ সালের পর আবার কিছু সময়ের জন্য নারীরা কঠোর 'অবরোধ', নিরক্ষরতা এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দি হলো।[৭৩] ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি'র মতো সমাজে নারীর ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালনে নিবেদিত কিছু সংখ্যক মহিলা সমিতি সংগঠনকে সরকার উৎসাহিত করেছিল।

---

৭২. মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, (ঢাকা ১৯৮৫)।

৭৩. ঐ।

পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শাসকশ্রেণী চব্বিশ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি উপনিবেশে পরিণত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক কারণে। বিরাট সংখ্যায় হিন্দুরা দেশত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় চলে গেলে পূর্ব বাংলার শিক্ষাকার্যক্রমের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়ে। এক সময়ে শিক্ষামন্ত্রী মেয়েদের স্কুল ও কলেজসমূহ বন্ধ করে দেবার কথাও চিন্তা করেছিলেন। যাই হোক, কতিপয় সাহসী মহিলা শিক্ষাবিদ এই দুঃসময়ে যেকোন মূল্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ চালু রাখার চেষ্টা করেন, বিক্ষোভ করেন এবং ছাত্রী সংগ্রহাভিযান চালান। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র গুণ্ডাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে স্কুল-কলেজে মেয়েদের আগমনে বাধা দিয়ে আবার তাদেরকে পর্দার অন্তরালে নিক্ষেপের প্রচেষ্টা চালায়। বুদ্ধিজীবী নর ও নারীদের অনেক যত্নে লালিত ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য নতুন রাষ্ট্রে লুপ্ত হবার আশংকা দেখা দিল।

রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়াতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করে। অনেক নারী এই আন্দোলনে ও ১৯৫০ সালের কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ইলা মিত্র ও নাদিরা বেগম এই সময়ের দুজন বিখ্যাত মহিলা। নারীর এই অংশগ্রহণ তাদের নিজেদের সমস্যা মিটাতেও সহায়ক হয়, অন্তত নারীর প্রকাশ্যে উপস্থিত হবার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে।

সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট আইয়ুব খানের সরকারে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। তবু অন্তত একটি ব্যাপারে এই সরকার গর্ব করতে পারে, তা হচ্ছে ১৯৬১ সালে 'মুসলিম ফ্যামিলি'ল অর্ডিন্যান্স' (মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স) জারি এবং তা ছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক মাইলফলকবিশেষ। যদিও এটি ছিল অনেকখানি 'কেতাবে', বাস্তবে নয়, তবুও এই অর্ডিন্যান্স পরবর্তীকালে সংগ্রামী নারীদের সামনে এক আদর্শ হয়ে দেখা দেয়। "বৈষম্যমূলক লিঙ্গতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমগ্র পাকিস্তানী আমলে বিরোধিতা করা হয়েছে, যদিও তলে তলে।"[৭৪] রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ধর্মের বিধিবদ্ধ ও তুলনামূলক গোঁড়া ব্যাখ্যার সাথে স্থানীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গির অশান্ত বিরোধ জাতীয় চিন্তাধারার এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধের বহিঃপ্রকাশ প্রায়শই দেখা যেতো এবং নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত মতাদর্শের নানা বিরোধপূর্ণ ব্যাখ্যার মধ্যেই তা মূর্ত হতো। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি, এর সুপ্ত জাতীয়তাবাদের প্রতি এবং বিশেষকরে বাঙালি নারীর জীবনধারার মধ্যে সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রতি শাসক সম্প্রদায়ের সর্বদাই তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রাক-মুহূর্তের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাই বাঙালিজীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত সাজসজ্জা মেয়েদের পরিহিত লাল ও হলুদ বর্ণের উৎসবশাড়ি, কপালের টিপ, স্থানীয় ফুল, মেলা, বাঙালি খাবার গুড়-মুড়ি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতার আসর প্রতীকী প্রতিবাদের তথা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটি রূপ হিসেবে দেখা দিল।

---

৭৪. Naila Kabeer, "Subordination and Struggle : Women in Bangladesh", *New Left Review*, March/April, 1988.

পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের গণবিদ্রোহ আর একবার গণআন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের পথ খুলে দিল। ঐ বছরেই 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি, সমাজসংস্কারক ও নারী-অধিকারের আন্দোলনকারী বেগম সুফিয়া কামালের (১৯১১-১৯৯৯) নেতৃত্বে এই সমিতি স্বাধীনতার পর 'মহিলা পরিষদে' রূপান্তরিত হয়। এককভাবে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বাংলাদেশে গণভিত্তিক বৃহত্তম মহিলা সংগঠন।

যদিও ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কাল নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করে, তথাপি এ কালপর্বে নারীর সমস্যাবলীর বৃহদাংশই সমাধান না করে বহাল রাখা হয়েছিল। আইনগত ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ছিল মানবেতর পর্যায়ে। আদর্শিকভাবে তখনো অব্যাহত ছিল পিতৃতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রাধান্য—সমাজের অনেক গভীরে বিস্তারলাভ করেছিল তার শেকড়। তা ছাড়া তখনো নারী আন্দোলন ছিল কেবল শহরকেন্দ্রিক ব্যাপার, বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলে তা গড়ে উঠে নি।[৭৫]

এই সমীক্ষায় বহু ব্যক্তির আলোচনা বাদ পড়ে গেছে সময়, স্থান ও তথ্যের স্বল্পতার জন্য। এই প্রবন্ধকে একটি জানালা হিসেবে আমি দেখতে চেয়েছি (এবং আশা করি পাঠকও তাই চাইবেন), এমন একটি জানালা যার মধ্য দিয়ে বিগত যুগের কিছু কিছু দৃশ্য, ঘটনা ও ব্যক্তি থেকে থেকে ভাস্বর হয়ে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। তাতে সেই কালের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি আমরা পাই না, পাই একটি স্বাদ ও ধারণা।

---

৭৫. Salma Khan, *The Fifty Percent : Women in Policy and Development in Bangladesh*, (Dhaka 1988), 107.

২০

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি

মোহাম্মদ শাহ্*

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। এসব লেখার প্রায় সবটুকুই 'এলিট' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে, যার ফলে জাতীয়তাবাদ আখ্যা পেয়েছে 'এলিট' কিংবা 'মধ্যবিত্তে'র আন্দোলন হিসেবে, যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।[১] এই মতামতকে রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে 'সাব অলটার্ন গ্রুপ' নামধারী একদল ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, গুহ ১৮৬০ সালে বাংলায় নীলকর, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রজাদের আক্রমণকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের একটি বাস্তব ঘটনা বলে অভিহিত করেন।[২] এই অধ্যায়ে কোন বিশেষ মতামতকে সঠিক বা ভুল বলার যুক্তি উপস্থাপন করা হবে না, তবে এখানে দেখানো হবে যে, উৎপত্তি, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি বলে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' যে সূত্র রচনা করা হয়েছে, তা বাংলার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর গবেষণা করে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে, হিন্দু ভদ্র সম্প্রদায় ও মুসলমান কৃষককুলের সংঘর্ষ কখনো সাম্প্রদায়িক রূপ নেয় নি।[৩] এ অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, একটি পৃথক জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবে

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১. Tarasankar Banerjee, "Early Nationalism in Bengal. Its Concept and Content" , *The Quarterly Review of Historical Studies*, xxi: 4 (1981-82), 13.

২. Ranjit Guha, "Neel-Darpan : The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror", *The Journal of the Peasant Studies*, 2:1 (1974), 41.

৩. C. A. Bayly, " The Pre-History of 'Communalism': Religious Conflict in India, 1700-1860", *Modern Asian Studies*, 19: 2 (1985), 203.

বাঙালিত্বের ধারণা প্রাক-বৃটিশ যুগেই সূচিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে এই ধারণা স্তিমিত থাকে, কিন্তু পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের স্বার্থের পরিপন্থী শাসনের ফলে তা পুনর্জীবন ও পূর্ণতা লাভ করে। জাতীয়তাবাদের সর্বসম্মত ও পরিপূর্ণ সংজ্ঞায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবের কারণে জাতীয়তাবাদের একটি সাধারণ সংজ্ঞাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝানো হয়েছে একটি 'মানসিক অবস্থা' বা 'একটি চেতনা', যা কোন লোককে তার নিজের দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে তুলে ধরতে, তার পক্ষাবলম্বন করতে এবং তার জন্য কাজ করতে প্রলুব্ধ করে।[৪]

১. বাঙালি জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের উদ্ভব

বাংলায় হিন্দুধর্মের বিকাশলগ্ন থেকেই অবাঙালি ব্রাহ্মণরা বাঙালি ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ার অভ্যাসটিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন এবং তাদের সাথে একত্রে আহার করতে অনীহা প্রকাশ করেন। তারা অন্যভাবেও বাঙালি ব্রাহ্মণদের কলুষিত বলে বিবেচনা করেন।[৫] হিন্দু শাসনের কেন্দ্রস্থল থেকে বহু দূরত্ব এবং নদীবহুল বাংলার দুর্গম যোগাযোগব্যবস্থার কারণে গুপ্ত ও অন্যান্য হিন্দু রাজবংশের শাসক বাঙালিদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে উদার নীতি গ্রহণ করেন। এইভাবে 'সহজিয়া' ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৬] মুসলমানদের বিজয়ের পর পরই আরব, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে সুফিরা সর্বজনীন প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে যখন বাংলায় আগমন করেন, তখন হিন্দুরা ইসলামের ঐসব উদার গুণাবলীকে স্বীয় ধর্মে গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। অনেকে আবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) তাঁর সমসাময়িক সুফিদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর নতুন বৈষ্ণব আন্দোলন 'গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ' ইসলাম ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁর নতুন বৈষ্ণব আন্দোলনটিকে মোটামুটিভাবে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। পণ্ডিতরা মূর্তিপূজা ও বর্ণহিংসার প্রতি তাঁর বিমুখতাকে ইসলামী প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।[৭] শ্রীচৈতন্য একটি নতুন অতীন্দ্রিয়বাদ প্রতিষ্ঠা করেন, যার ভিত্তি হলো বাংলার বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। বৈষ্ণব সাধুদের জীবনকাহিনী প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে

---

৪. Hafeez Malik, "Sir Sayyid Ahmad Khan's Contribution to the Development of Muslim Nationalism in India, *Modern Asian Studies*, 4: 2 (1970), 129; Niharranjan Roy, *Nationalism in India: An Historical Analysis of its Stresses and Strains*, (Aligarh 1973), Lectures 1-2.

৫. Ramkrishna Mukherji, "The Social Background of Bangladesh" in Kathlan Gough and Hari Sharma (ed.), *Imperialism and Revolution in South Asia*, (New York 1973), 400.

৬. M.G. Rasul, "The Advent of Islam in Bengal: Its Socio-cultural Impact" in M I. Hoque (ed.), *Society and Culture in Islam*, (Chittagong 1986), 105.

৭. ঐ, 106-107.

তাজকিরাহ-ই-আউলিয়ার অনুরূপ, বৈষ্ণব পদাবলী বা গীতিকবিতাকে উপমার ব্যবহার, প্রকাশভঙ্গি বা সার্বিক আকৃতির দিক থেকে গজলের অনুকরণ বলে মনে করা হয়।[৮]

হিন্দুদের সঙ্গে শত শত বছরের সান্নিধ্যের কারণে মুসলমান সমাজে কিছুটা হিন্দু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও তা তাদের ধর্মের মূলনীতির প্রতি বিশ্বাসকে নাড়া দিতে পারে নি। কিছু বাঙালি মুসলমান কবিও যোগী এবং তান্ত্রিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁদের অন্যতম হলেন *জ্ঞানপ্রদীপ*-এর লেখক সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), *যোগ কলন্দর*-এর লেখক সৈয়দ মুর্তজা (১৫৯০-১৬৬২), *নূর জামাল*-এর লেখক *হাজি মোহাম্মদ* (১৫৫০-১৬২০), *জ্ঞানসাগর*- এর লেখক আলি রেজা (১৬৯৫-১৭৮০), *চারি মাকাম ভেদ* গ্রন্থের প্রণেতা আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) এবং *সিরনামা* গ্রন্থের লেখক শেখ মনসুর (১৭০৩ খৃ.)। তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে সুফি ভাবধারা ও তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হন। সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, আলি রেজা, শাহ্ আকবর, নাসির মাহমুদ, সালেহ্ বেগ এবং করম আলি 'পদাবলী' রচনা করেন। অতীন্দ্রিয়বাদী চারণ কবি লালন শাহ (১৭৬৮-১৮৪০) গতানুগতিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুসরণ করেন নি। তিনি তাঁর অসংখ্য গীতিকবিতার মাধ্যমে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের শান্তিপূর্ণ ঐক্যের বাণী প্রচার করেন এবং ধর্ম ও বর্ণের বাধা ডিঙিয়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আগত লোকজনকে তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইভাবে মুসলমান 'তাসাউ-উফ' বা সুফি ভাবধারার সাথে হিন্দু 'যোগ' এবং 'তান্ত্রিক' দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটে।[৯]

গ্রামবাংলার দরিদ্র এবং নিম্ন পেশাজীবী মুসলমানরা হিন্দুধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হবার পরও সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের পুরনো ঐতিহ্যকে বহুলাংশে আঁকড়ে ধরে থাকে। বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যেসব মুসলমান প্রথম প্রয়াসী হন,তাঁদের রচনাতেও হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। যেমন, *গাজী কালু চম্পাবতী* কাব্যে হিন্দু দেবী দুর্গাকে মুসলমান গাজীর 'মাসী' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, *জেবুল মুল্‌ক শামারুখ* কাব্যে হিন্দু দেবদেবীদের মুসলমান পীরদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কখনো কখনো হিন্দু দেবদেবীদের আল্লাহ ও নবীর সমমর্যাদায় উন্নীত করা হয়।[১০] মুহাম্মদ

---

৮. M. Enamul Haq, "Muslim Contributions to the Development of Bengali Language and Literature" in S. Sajjad Hussain (ed.), *East Pakistan: A Profile*, (Dacca 1962), 109.

৯. Rasul, "Islam in Bengal", 110-11; Haq, "Bengali Language and Literature", 113; A. F. Salahuddin Ahmed, "Muslim Thought and Leadership in Bengal in Nineteenth Century" in Diptendra Banarjee et al. (ed.), *Essays* in Honour of Professor S. C. Sarkar, (New Delhi 1976), 639; যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি*, (কলিকাতা ১৯৬২) এবং আনোয়ারুল করিম, *বাউল কবি লালন শাহ*, (ঢাকা ১৯৬৬)।

১০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, (ঢাকা ১৯৬৫), ৮৩।

আকবর (জ. ১৬৫৭ খৃ.) তাঁর *পুঁথি কাব্যে* আল্লাহকে ঈশ্বরের, হাওয়াকে কালীর, রসুলুল্লাহর সাহাবাদের শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ রাখাল সঙ্গী এবং *কোরানকে* পুরাণের সমমর্যাদা প্রদান করেন। তিনি হিন্দু দেবদেবীদেরও নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীচৈতন্যকে রসুলুল্লাহর অবতার হিসেবে বর্ণনা করেন। সেকালের মুসলমান বাউলরা হিন্দু দেবী নিরঞ্জনের প্রশংসা করেই তাঁদের কাব্যের মুখবন্ধ রচনা করেন। পীর এবং পবিত্র নগর মক্কা ও মদীনার প্রশংসা করতে গিয়ে কখনো কখনো তাঁরা কাশী, বৃন্দাবন ও হিমালয়ের বন্দনা বা প্রশস্তি রচনা করেন। তাঁদের কেউ কেউ জগন্নাথ, নারায়ণ, পদ্মা এবং সীতার বন্দনাও রচনা করেন।[১১] কিছু কিছু মুসলমান আতসবাজি পোড়ানো, চৈত্রসংক্রান্তি ও দুর্গাপূজা উৎসব পালন, হিন্দু নাম গ্রহণ, কবরে চেরাগ, বাতি বা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সিজদা প্রদানের মতো হিন্দু আচার অনুসরণ করেন।[১২] এইভাবে বেশ কিছু মুসলমানের ধর্মীয় আচরণ হিন্দু আচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায় আরো একটি প্রচলিত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। বাংলায় পীর নামে খ্যাত সুফিরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মাঝেই বসবাস করতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে তাঁরা লৌকিক উপাখ্যানের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হন। এইভাবে 'সত্যপীরকে' (যাঁকে হিন্দুরা 'সত্যনারায়ণ' বলে আখ্যায়িত করে) কেন্দ্র করে একটি নিয়মিত ধর্মীয় আচার গড়ে উঠে।[১৩] সত্যপীর সকল মন্দের অবসানকারী এবং সকল উন্নতির বিধায়ক হিসেবে বাংলায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। মজার ব্যাপার এই যে, নিম্ন পেশায় নিয়োজিত গরিব মুসলমানরাও সত্যপীর পূজায় অংশগ্রহণ করতো বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মত পোষণ করেন।[১৪] কারো কারো মতে, হিন্দু সমর্থন লাভের আশায় হুসেন শাহের মতো শাসকও সত্যপীরকে লৌকিক দেবতায় রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছিলেন।[১৫] আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে একই মঞ্চে সমবেত করার উদ্দেশ্যে সুফিরাও সত্যপীরের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন ১৫৭৫ সালে শেখ ফয়জুল্লাহ লিখেন *সত্যপীর*। আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আঠারো শতকে উভয় সম্প্রদায়ের কবিরা এই বিষয়ে একটি বিশেষ সাহিত্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন।[১৬] এইসব সাহিত্যিকের অন্যতম হলেন গরিবউল্লাহ এবং আরিফ। জনপ্রিয় দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল

---

১১. প্রাগুক্ত, ৮৫।

১২. রিয়াজুদ্দিন আহমদ, *আল-এসলাম*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫।

১৩. Haq, "Bengali Language and Literature", 109-110.

১৪. Aparna Bhattacharya, "Worship of Satyapir: An Example of Hindu-Muslim Rapproachment in Bengal", *Proceedings of the Indian History Congress*, 32 Session, Jabalpur 1970, 204.

১৫. ঐ, 205.

১৬. Haq, "Bengali Language and Literature", 110.

হয়ে গরিবউল্লাহ লিখেন *সত্যপীর* এবং নতুন গল্প রচনার মাধ্যমে সত্যপীরের প্রশস্তি রচনার উদ্দেশ্যে আরিফ লিখেন *লালমনের কেচ্ছা*।[১৭]

বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দের ক্ষেত্র রচনায় মুসলমান শাসকরাও সুফিদের অনুসরণ করেন। তুর্কী শাসকরা ইসলামের সাম্য ও সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। ফলে সাধারণ মানুষের উপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য খর্ব হয়। যদিও সেন রাজারা বাংলা ভাষাকে অবহেলা করে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেন এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন, কিন্তু মুসলমান শাসকরা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করেন নি, বরং সাধারণ মানুষের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যাতে বাংলাও সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে সেই চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষার উন্নতির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সুযোগও তাদের ছিল না এই জন্য যে, তাঁরা স্বাধীন সুলতান হবার আশায় প্রায়ই দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসকদের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন। এইভাবে তাঁরা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে এর নিজস্ব গতিতে চলার সুযোগ দেন। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের 'পিতৃভূমি' থেকে বছরের পর বছর ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলার মাটিতে বসবাসের কারণেও এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে তাঁদের মনে সদিচ্ছার ভাব জাগ্রত হয়েছিল। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার স্বাধীন সুলতানরা (১৩৫১-১৭৭৫ খৃ.) অত্যন্ত উদারতার সাথে বাঙালি কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মধ্যযুগীয় বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৯-১৩৮৯ খৃ.) পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। *ইউসুফ-জুলেখার* লেখক মুহাম্মদ সগীর, মিথিলার বিখ্যাত গীতিকবি বিদ্যাপতি এবং ফার্সিপ্রভাবিত বাংলা গানের রচয়িতা নূর কুতুবে আলম সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪১০ খৃ.) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি এবং বাংলা *রামায়ণের* লেখক কৃত্তিবাসকে সম্মানিত এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন সুলতান জালালউদ্দিন (১৪১৮-১৪৩১ খৃ.)। *ভাগবত*-এর বাংলা অনুবাদক মালাধর বসু এবং *রসুল বিজয়*-এর লেখক কবি জয়নুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খৃ.)। হুসেন শাহী বংশের সুলতানরা (১৪৯৩-১৫৩৮ খৃ.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিখ্যাত *মনসামঙ্গল* কাব্যের লেখক বিজয় গুপ্ত (মৃ. ১৪৯৪ খৃ.) এবং বিপ্রদাস পিপিলাইকে (মৃ. ১৪৯৫ খৃ.) তাঁরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিদ্যাপতি নামে খ্যাত যশোরাজ খান, বাংলায় *মহাভারত*-এর অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং বিদ্যাসুন্দর বিষয়ে প্রথম গাথা রচয়িতা কনক, পদাবলীর লেখক কবিরঞ্জন, শেখ কবির এবং শ্রীধর কবিরাজ সহ এক দল কবি সুপ্রতিষ্ঠিত হন।[১৮]

---

১৭. ঐ, 117.
১৮. ঐ, 104-106; মমতাজুর রহমান তরফদার, "বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা", মোঃ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, (ঢাকা ১৯৮৭), ৪৬।

মুসলমান শাসকরা মনসবদারের মতো উচ্চ রাজপদে এবং জমিদার হিসেবে হিন্দুদের নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন নি । তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় বহু আরবি ও ফার্সি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয় এবং এই ভাষা সমৃদ্ধ হয়। এমনকি মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের আগে থেকেই আরবদের 'মিশনারি' ও বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলা ভাষা আরবি ও ফার্সি শব্দের সংস্পর্শে আসে। কুমিল্লার ময়নামতি ও রাজশাহীর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ আশ্রমে প্রাপ্ত নবম হতে দ্বাদশ শতকের আব্বাসীয় মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরব ও পারস্য দেশের সঙ্গে পূর্ব বাংলার দীর্ঘ এবং ক্রমাগত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বাংলায় সুফিদের আগমনের পর এই যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে আরব বণিক, মুসলমান শাসক ও সুফিরা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে এমনই প্রভাবিত করে যে, এর ফলে একটি মিশ্রিত নতুন বাঙালি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে, যা আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে আলাদা ছিল।[১৯]

বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলমানের তাঁত বা কাপড় বোনা, মাছ ধরা, তৈল-নিংড়ানো (কলু বা খুলুর পেশা) প্রভৃতি পেশায় যৌথভাবে নিয়োজিত হওয়াও হিন্দু-মুসলমানের মিলনে সহায়ক হয়েছে। ফলে প্রাক-বৃটিশ যুগে ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গোষ্ঠীগত ও জাতিগতভাবে বাঙালি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়।[২০]

২. মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

হিন্দু ও মুসলমানের উপরোক্ত মিলন বেশ কয়েক শতক ধরে চলে, কিন্তু উনিশ শতকে মুসলমান সংস্কারকরা বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনা থেকে অমুসলিম ভাবধারা বহুলাংশে কমিয়ে আনতে সক্ষম হন।[২১] যতোদিন হিন্দু-মুসলমান মাত্র দুটি পক্ষ ছিল, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে ভিন্নতর অবস্থান এবং ধর্মের মূলনীতিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ততোদিন দু'পক্ষ সরাসরি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়ে বাঙালি সমাজে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। উপনিবেশপূর্বকালের বাংলার সীমারেখা সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। এ কারণে তারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রতি যতোটা আগ্রহী ছিল, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল ধর্মের প্রতি। ইহলৌকিক প্রসঙ্গে তাদের আগ্রহ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ফলে ইহলৌকিক জীবনযাত্রায় ধর্মকে কেন্দ্র করে বিরোধের অবকাশও ছিল কম। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে বস্তুগত পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে হিন্দু-মুসলমান প্রাক্তন ধর্মীয় বৈষম্য শুধু প্রকটই হয় নি, নতুন আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চাপে সেই বৈষম্য ক্রমশ স্ফীত ও বিরোধমূলক হয়ে উঠে।[২২]

---

১৯. Haq, "Bengali Language and Literature", 103-104.

২০. মুখার্জী, "বাংলাদেশ", ৪০১।

২১. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, (কলিকাতা ১৯৫১), ৯৮; Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, (Dhaka 1983), xi-xiii.

২২. সুরঞ্জিত দাসগুপ্ত, *ভারতবর্ষ ও ইসলাম*, (কলিকাতা ১৩৮৩), ১৫৪, ১৫৭-১৫৮।

মুসলমান সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব এবং এর প্রকৃতি

ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি বাড়তে থাকে প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, ইসলামবিরোধী খৃস্টান 'মিশনারি' প্রচারণা; দ্বিতীয়ত, অতীন্দ্রিয়বাদ ও সংমিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব এবং তৃতীয়ত, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। সংক্ষেপে ও পর্যায়ক্রমে নিচে এগুলি আলোচনা করা হলো।

উনিশ শতকে খৃস্টান ধর্মপ্রচারকরা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *প্রফেটস টেস্টিমোনি অব খ্রাইস্ট*, *মোহামেডান সেরিমোনিজ*, এবং *রিজনস ফর নট বিইং এ মুসলমান* । তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে খাটো করে মুসলমানদের খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। যেহেতু 'মুসলমানী বাংলা' বা মিশ্রিত ভাষা মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় ছিল, তাই খৃস্টান পাদ্রীরা মুসলমানী বাংলায় কিছু বই লিখেন। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একটি মিশনারি পুস্তিকায় ইসলামের নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালানো হয়।[২৩] ১৮৮৫ সালে জে. লঙ প্রণীত (শুদ্ধ বাংলায়) *মোহাম্মদের জীবনচরিত* গ্রন্থে নবীকে কোরানের প্রণেতা, মৃগীরোগী এবং বহু নারীর প্রতি আসক্ত সংসার সুখান্বেষী একজন পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪] পাদ্রী জি.এইচ. রউস প্রণীত *ফোরকান* (১৮৮৪ খৃ.) গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোরান আল্লাহ্‌প্রদত্ত ধর্মগ্রন্থ নয়।[২৫]

কিভাবে অতীন্দ্রিয়বাদী এবং মিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তারলাভ করে তা আগে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু এটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, উনিশ শতকের শেষদিকে ঐ অতীন্দ্রিয়বাদী এবং মিশ্রিত সংস্কৃতিকে মুসলমান সংস্কারবাদীরা তাদের সম্প্রদায়ের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের নজির হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করে।[২৬] তাঁদের ভয় ছিল হিন্দু ও খৃস্টান মিশনারিদের প্রভাবের ফলে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বুঝি হুমকির সম্মুখীন হয়। অতএব, মুসলমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করে তাঁরা এক ধরনের সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত হন, যা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে জাগ্রত এবং সুসংহত করবে বলে তাঁরা ধারণা করেন। এ ধরনের সাহিত্যিকদের একজন হলেন শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), যিনি *হযরত মোহাম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি* গ্রন্থটি প্রণয়ন

---

২৩. M. Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities, 1833-1857*, (Chittagong 1965), 3.

২৪. Muslims believe that God revealed Quran to the Prophet Muhammad. Muhammad is the messenger of God rather than the author of the Quran.

২৫. *Catalogue of printed Bengali Books in the British Library* , 3 Vols., (London 1886-1939), 1, 25; আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৭৫৭-১৯১৮*,(ঢাকা/কলিকাতা ১৯৬৪/ ১৯৭১), ২৫৯।

২৬. আকরম খাঁ, *সামাজিক ইতিহাস*, ৮৫; রিয়াজুদ্দিন আহমেদ, *আল-এসলাম*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫।

করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হযরত মোহাম্মদকে খৃস্টান পাদ্রীরা বহু নারীর প্রতি আসক্ত ও ভোগবিলাসী পুরুষ হিসেবে যেভাবে চিহ্নিত করেছে এবং শক্তি প্রয়োগে ইসলাম প্রচারের যে কাহিনী প্রচার করা হয়েছে তা সঠিক নয়।[২৭]

মুন্সি মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) ও তাঁর বন্ধু শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০) খৃস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন বাংলার বিভিন্ন এলাকায়। ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে খৃস্টান পাদ্রীদের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য মেহেরউল্লাহ *খৃস্টান ধর্মের অসারতা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। হিন্দুপ্রভাবিত মিশ্রিত সংস্কৃতি থেকে মুসলমানদের খাঁটি ইসলামী জীবনধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি *হিন্দু ধর্ম রহস্য বা দেবলীলা* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।[২৮]

উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশ এইসব লেখককে স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে। উনিশ এবং বিশ শতকের জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তাদের আধুনিক অগ্রগতি ও অতীত গৌরবের তুলনায় মধ্যযুগের ভারতকে অন্ধকার ও লজ্জার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করে।[২৯] এমনকি, তাঁদের একজন সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) শাসনামলে বাংলার গৌরবময় যুগকেও অত্যাচারী এবং ধর্মান্ধের শাসনকাল হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৩০] কেউ কেউ মুগল শাসককে 'বিদেশী' এবং শিবাজীকে 'হিন্দু জাতির' বীর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩১] দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) 'আর্যসমাজ আন্দোলনও' ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামান্তর। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৩৪-১৮৮৩) বাংলায় যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন তার মূলেও ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি। তাই মুসলমানরা ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নি।[৩২] পি. সি. মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো বিপ্লবীরাও ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে আশা করেছিলেন যে মুসলমানরা ঐ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করবে।[৩৩] এইভাবে হিন্দু জাগরণের সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দুদের কাছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিসেবেই

---

২৭. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম ইতিহাস*, ২৬১-১৬২।

২৮. শেখ মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন, *মেহের চরিত*, (নদিয়া ১৯০৯), ১১, ৭৮, ৯০-৯১; মোহাম্মদ অছির উদ্দিন, *মেহেরুল্লার জীবনী*, (জলপাইগুড়ি ১৯০৯); শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ*, (কলিকাতা ১৯৩৪)।

২৯. কাজী আবদুল ওদুদ, "হিন্দু মুসলমানের বিরোধ", বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতামালা, ১৯৩৫, *বিশ্বভারতী স্টাডিজ*, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩৬।

৩০. R. C, Majumder (ed.), *The Delhi Sultanate*, Vol. 6, (Bombay 1966), 339-344.

৩১. Jadunath Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vols. 1 & 2 (combined), Bombay, xii; *Shivaji and His Times*, (Calcutta 1948), 372.

৩২. Jawaharlal Nehru, *Glimpses of the World History*, (4th edn.), 1949, 437.

৩৩. মুজফ্‌ফর আহমদ, *আমার জীবন ও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি*, ১৯২০-২৯, (কলকাতা ১৯৭১), ৪৩২-৪৩৩।

প্রতিভাত হয় এবং ভারতে মুসলমানদের মনে করা হয় বহিরাগত।[৩৪] হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদী সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঊষালগ্নে হিন্দুরচিত ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের চিত্র এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়, যা মুসলমানদের মনে এই নিশ্চিত ধারণা সৃষ্টি করে যে হিন্দু লেখকরা তাদের ইতিহাস ও ধর্মকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)-এর *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮) 'যবন' (মুসলমান) শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুতদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করেছে।[৩৫] দুর্ভাগ্যবশত রঙ্গলাল ১৮৫৭ সালের বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে শুধু সেই সকল সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা নেবার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানান যেগুলোতে হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

রঙ্গলালের সাথে সুর মিলিয়ে হেমচন্দ্র তাঁর *বীরবাহু-তে* মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে হিন্দুদেরকে সচেতন হবার জন্য আহ্বান জানান।[৩৬] ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) তাঁর *সামাজিক প্রবন্ধে* ভারতে বৃটিশ শাসনকে মুসলমান শাসনের চেয়েও অধিক নিপীড়নমূলক হিসেবে দেখিয়ে মোটামুটিভাবে মুসলমান প্রশাসনের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাঁর *স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস*-এ তিনি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের কাল্পনিক বিজয় প্রচার করেন এবং ভারতকে শুধুমাত্র হিন্দুদের মাতৃভূমি হিসেবে বর্ণনা করেন। এখানে তিনি হিন্দুদের ভারত মাতার গর্ভজাত সন্তান এবং মুসলমানদের 'বিদেশী' না বলে ভারতের পোষ্য সন্তান হিসেবে দেখিয়েছেন। ভূদেব তাঁর *দি নাইনটিনথ পুরাণ* গ্রন্থেও মুসলমানদের বিকৃতভাবে চিত্রিত করেছেন এবং মধ্যযুগে সত্যিকারের দেশপ্রেম লক্ষ্যগোচর না হলেও তিনি তাঁর *অঙ্গুরীয় বিনিময়* (১৮৫৭)-এ শিবাজীকে হিন্দুর জাতীয় বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৭] *পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে* (১৮৫৭) নবীনচন্দ্র সেন দেখাতে চেয়েছেন যে, যবনদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাংলার অধিবাসীরা বৃটিশের আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাঁর মতে, বাংলার জনসাধারণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি হীন 'যবন'দের শ্রদ্ধা ছিল না এবং সেজন্যই ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে বাংলার 'নদী ও পাহাড়' বৃটিশের গৌরবের জয়গান গায়।[৩৮]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৪) তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্যখ্যাতির পাশাপাশি হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের জনক হিসেবেও সুপরিচিত। তাঁর সাহিত্যকর্ম হিন্দু এবং মুসলমান

---

৩৪. Bipan Chandra, "History of Modern India and Communalism" in Romila Thaper *et al.* (ed.) *Communalism and the Writing of Indian History*, (New Delhi 1973), 58

৩৫. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মিনী উপাখ্যান*, কলকাতা ১২৭৮ (১৮৭১), ভূমিকা ও ১৯, ১৫০।

৩৬. কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ১৯৬৯)।

৩৭. Tapan Raychaudhuri, *Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*, (Delhi 1988), 39-73; "ভুদেব মুখোপাধ্যায়", সম্পাদকীয়, *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩০১, ১০৯।

৩৮. নবীনচন্দ্র সেন, *পলাশীর যুদ্ধ*, (কলকাতা ১৩১৮), ৬৬, ৭২-৭৩।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। প্রধানত ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং স্থানীয় স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্ধর্ষ জাতিগোষ্ঠীগুলির বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কিছু ইতিহাসভিত্তিক এবং কিছু অনৈতিহাসিক উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেসবের উপর ভিত্তি করেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস রচিত হয়। তাঁর উপন্যাসসমূহে তিনি বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে নিগৃহীত ভারতবাসীর কথা বলেছেন; অবশ্যই সে ভারতবাসীর মাঝে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি তিনি তাঁর নিজের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রথম স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে গৌরবদীপ্ত প্রাচীন ঐতিহ্যবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।[৩৯] ইংরেজের কাছ থেকে শেখা 'নিউ লার্নিং' বঙ্কিমচন্দ্রের মানসজগৎ গঠন করেছিল। ফলে তিনি শেকড়সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। যেহেতু ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান শাসকরা ছিল বহিরাগত এবং তারা স্থানীয় হিন্দু শাসকদের সঙ্গে সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদেরকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, তাই স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিজাত অংশের মাঝে মুসলমানের প্রতি এক ধরনের চাপা ক্ষোভ বিরাজমান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই অনুভূতি দ্বারা তাড়িত ছিলেন। তাই তিনি মুসলমানের হাতে হিন্দুর পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে কী ঐতিহাসিক, কী অনৈতিহাসিক যে ঘটনাবলীকেই তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন, সেখানে অনিবার্যভাবে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের চিত্র এসেছে এবং সেখানে তিনি তাঁর সেই চাপা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বহুক্ষেত্রে হিন্দু শক্তির দেশপ্রেম, মহত্ত্ব এবং বীরত্বকে বিপক্ষ মুসলিম শক্তির চেয়ে উন্নত দেখিয়েছেন এবং প্রায়ই স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হিন্দু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চিত্র সাধারণ হিন্দু পাঠকের মনে দেশপ্রেম এবং মুসলমান আশরাফ শ্রেণীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। এমনকি তাঁর সর্বাধিক বিতর্কিত উপন্যাস *আনন্দ মঠ* (১৮৮২) তৎকালীন গোঁড়া মুসলমানদের এমনভাবে উত্তেজিত করেছিল যে কলকাতার রাস্তায় তারা বইটির বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করেছিল। তবে স্থানীয় সাধারণ বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় নয়, বখতিয়ার খলজী থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত যারাই এদেশ শাসন করেছে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সকলকেই বহিরাগত বা 'যবন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একে ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় বলা যায় না, কিন্তু একশ্রেণীর মুসলমান বিশ শতকের প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির চরম অবনতিকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পান এবং দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে এটাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

রমেশ দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) ঐতিহাসিক উপন্যাসেও[৪০] বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসসমূহেও হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ প্রাধান্য পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর *মাধবীকঙ্কন*-এ আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত

---

৩৯. Kazi Abdul Wadud, Creative Bengal, (Calcutta 1950), 92.

৪০. বিশেষকরে *বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কন, জীবনপ্রভাত* এবং *জীবনসন্ধ্যা* দ্রষ্টব্য।

করে উপস্থাপনের বিষয়টি। এতে রয়েছে আওরঙ্গজেবের নারীসংসর্গলাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, হারেমজীবনের প্রতি মোহ, বেগমমহল ও মিনা বাজারে মহিলাদের সঙ্গে বেফাঁস কথাবার্তার বিবরণ। মুসলমান চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি শব্দাবলীর যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন।[৪১]

মুসলমান সমাজ ও শাসকদের হেয় প্রতিপন্ন করার চারটি কারণ নির্ণয় করেছেন তপন রায় চৌধুরী। প্রথমত, উনিশ শতকে অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী লেখকই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁরা মুসলমান শাসকদের অত্যাচারী বলেই ভাবতেন। তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে মুসলমান প্রজারাও কুৎসিতভাবে চিত্রিত হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের মুসলমান শাসনামলকে বৃটিশ ঐতিহাসিকরা অত্যাচারের আমল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখকরা নির্দ্বিধায় সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, খৃস্টান ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক ভারতীয়দের চিরাচরিত, বহুকাঙ্ক্ষিত বিশ্বাস এবং আচার-আচরণকে কটাক্ষ করার ফলে ভারতীয়দের আত্মসম্মানের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে এবং তাদের আত্মসম্মানবোধ পুনর্জাগরিত করতে *আনন্দমঠে* এর রূপক সংঘর্ষ রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চতুর্থত, বৃটিশ সরকারের কর্মচারী হিসেবে তাদের পক্ষে সরাসরি বৃটিশ সরকারকে অত্যাচারী বলে বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা 'অত্যাচারী' লেবেলটি মুসলমান শাসকদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে বৃটিশ শোষণের নিন্দা করেন।[৪২]

খৃস্টান ধর্মপ্রচারক ও হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদী লেখকদের মুসলমানবিরোধী প্রচারণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং মুসলমান সংস্কারবাদীদের প্রভাবে মুসলমান লেখকদের রচনা আত্মরক্ষামূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। মুসলমান লেখকরা হিন্দু লেখকদের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনা করতে শুরু করেন। হিন্দু লেখকরা রাজপুত এবং মারাঠাদের হাতে আফগান এবং মুগলদের পরাজয়ের কথাই কেবল লিপিবদ্ধ করেন আর মুসলমান লেখকরা শুধুমাত্র সেই সকল যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে তার উল্টোটাই ঘটেছে। হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমানদের কুৎসিতভাবে চিত্রিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যেই কোন কোন মুসলমান লেখনী ধারণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ হিন্দু লেখকদের এই প্রবণতাকে মুসলমান বাদশাহ ও বেগমদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস বলে অভিহিত করেন।[৪৩] সম্মানীয় মুসলমানদের কদর্যভাবে চিত্রিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই তাঁরা

৪১. প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), *রমেশরচনাসম্ভার*, (কলিকাতা ১৩৬৪), ২৯, ৩৪, ৪৭-৪৯, ৫২, ৫৪, ৮৯, ৯১।

৪২. Raychaudhuri, *Europe Reconsidered*, 6-13, 337-338, 342.

৪৩. মুসলিম পত্র-পত্রিকায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, *আল-এসলাম*, পৌষ ১৩১০; *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০; *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১০।

সোচ্চার হন।[৪৪] কালী দেবীর সাথে ভারতমাতার তুলনা করে *আনন্দমঠ*-এ বর্ণিত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত মুসলমানদের এতই বিক্ষুব্ধ করে তোলে যে তারা একে 'কুফর' বা পৌত্তলিকতা বলে অভিহিত করে। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে *মুসলমান* পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক মুসলমান এবং হিন্দুদের বৈষম্যমূলক বর্ণনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[৪৫] ১৯০৭ সালে 'দি রেড প্যাম্ফলেট' 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের তীব্র সমালোচনা করে।[৪৬] ১৯২৩ সনে মওলানা সুফী সদরুদ্দীন 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের বিরোধিতা করে একটি প্যাম্ফলেট লিখেন।[৪৭] ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকর ঘোষণা করেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা 'বন্দেমাতরম' বা 'গান্ধী কি জয়' শ্লোগান দিয়েছে, তারা কাফেরদের দলভুক্ত হয়েছে।[৪৮]

হিন্দু সাহিত্যে বর্ণিত মুসলমান যুবতীদের হিন্দু যুবকদের প্রেমে পড়ার গল্প-কাহিনী পড়ে মুসলমান পাঠক বিব্রত বোধ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী এবং রাজসিংহ*-তে শিবাজীর প্রতি রওশন আরার, জগৎ সিংহের প্রতি আয়েশার প্রেমনিবেদন এবং রমেশ দত্তের উপন্যাস *মাধবী কাঞ্চন*-এ নরেন্দ্রের প্রতি জোলেখার প্রেমনিবেদনের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাকে কোন কোন মুসলমান লেখক পরোক্ষভাবে মুসলমান রমণীর চরিত্রহননের অপচেষ্টা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪৯]

মুসলমানদের প্রবন্ধ এবং উপন্যাসে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১৯০৩ সালে *ইসলাম প্রচারক*-এ তসলিম আহমদ বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশ দত্তের উপন্যাসের তীব্র সমালোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* এবং রমেশ দত্তের *রৌশিনারা* এবং *মাধবী কাঞ্চন*-এর বিরুদ্ধেই তিনি বেশি সোচ্চার হন।[৫০] ১৯১৫ সালে *আল এসলাম*-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আবদুল মালেক চৌধুরী ক্ষুব্ধ চিত্তে এই দাবি উত্থাপন করেন যে, হিন্দুরচিত উপন্যাসে মুসলমান মহিলা চরিত্রে যেসকল নাম ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি যেন মুসলমান কুলরমণীদের নামের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়।[৫১] ১৯১৬ সালে ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) দুঃখ করে বলেন, হিন্দুসাহিত্য

---

৪৪. আকবরউদ্দিন, "বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের স্থান", *আল-এসলাম*, পৌষ ১৩২৩।

৪৫. *Mussalman*, 14 December 1906; *Mussalman*, 26 April 1907.

৪৬. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, 1903-1908, (New Delhi 1973), 243, 457.

৪৭. মওলানা সুফী সদরুদ্দীন আহমদ, *মুসলমানদের জন্য বন্দেমাতরম বলা হারাম ও কুফর*, (ঢাকা ১৩৩০)।

৪৮. Government of Bengal (Intelligent Branch), Confidential File No. 1/22; Chandiprasad Sarkar, "Bengal Muslim Politics, Society and Culture During the Khilafat and Non-Co-operation Movement", *Bengal Past and Present*, 107, Parts 1-2, Nos. 196-197, January-December 1984, 5.

৪৯. বিশী (সম্পাদিত), *রমেশরচনাসম্ভার*, ১০২, ১০৩, ১০৫।

৫০. শ্রীতঃ, "হিন্দু সাহিত্য", *ইসলাম প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩।

৫১. আবদুল মালেক চৌধুরী, "বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান", *আল-এসলাম*, বৈশাখ ১৩২২।

মুসলমান যুবকদের আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে তাঁদের এতই ভীরু বানিয়েছে যে মুসলমান বাদশাহ, বেগম ও শাহজাদীদের রঙ্গমঞ্চে তিরস্কৃত এবং অপমানিত হতে দেখেও তাদের রক্ত গরম হয় না।[৫২]

সিরাজী আরো অভিযোগ করেন যে, হিন্দুসাহিত্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের সদিচ্ছার ভাবকে বিনষ্ট করে দেয়।[৫৩] তাঁর সাহিত্যকর্মের সিংহভাগ জুড়ে ছিল বঙ্কিমবিরোধিতা। বঙ্কিম যেখানে দেখান মুসলমান যুবতীরা হিন্দু যুবকদের কাছে প্রেমনিবেদন করছে, সিরাজী দেখালেন তার উল্টোটা অর্থাৎ হিন্দু যুবতীরাই মুসলমান যুবকদের প্রেমভিক্ষা করছে।[৫৪] এর প্রমাণ রয়েছে সিরাজীর উপন্যাস *রায়নন্দিনী* (১৯১৫), *তারাবাঈ* (১৯০৪) এবং *নূরুদ্দিন* (১৯২৩)-এ। হিন্দু সাহিত্যে হিন্দু যুবকদের প্রতি মুসলমান যুবতীদের প্রেমনিবেদনের কাহিনী মতিউর রহমান খানকেও (১৮৭২-১৯৩৭) বিক্ষুব্ধ করে। এর উল্টো ঘটনাকে সত্য প্রমাণের জন্য তাঁর উপন্যাস *মোক্ষপ্রাপ্তি ও যমুনা*-তে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে হিন্দু যুবতীরা মুসলমান যুবকের প্রেমে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৫৫]

হিন্দু যুবকের প্রতি মুসলমান যুবতীদের প্রেমনিবেদনের কাহিনী মুসলমানদের হিন্দুবিরোধী গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করে। হিন্দু সাহিত্যে মুসলমানদের 'ম্লেচ্ছ' এবং 'যবন' রূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা সেই ঐক্যকে আরো জোরদার করে। মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি ধারণা জন্ম নেয় যে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক নামের স্থলে ঐ সব বিশেষণ প্রয়োগ করে হিন্দুরা তাদেরকে ভারতীয় সমাজ ও জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা করেছে। এ ধরনের বিশেষণের আদি ব্যবহার যা-ই হোক না কেন, উনিশ শতকের শেষদিক থেকে মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই মূলত সেসব বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়। এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের তীব্র প্রতিবাদের প্রতিফলন ঘটে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত সিরাজীর একটি কবিতায়। কবিতাটির একস্থানে পাপিয়া এই বলে গেয়ে উঠে যে :

গোলাম হিন্দু জাতি তাহারাও দিবারাতি
হেরে এবে ঘৃণার নয়নে,
'ম্লেচ্ছ' 'যবন' বলি দেয় সদা গালাগালি
অস্পৃশ্য ভাবিয়া মনে মনে।[৫৬]

---

৫২. ইসমাইল হোসেন সিরাজী, "*সাহিত্য ও জাতীয় জীবন*", *আল-এসলাম*, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৩, ১৩৪।

৫৩. ঐ, ১৩৩-১৩৪।

৫৪. রশীদ আল-ফারুকী, *বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান*, (কলকাতা ১৯৮৪), ৩২৫-৩৩১।

৫৫. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ৩৫১।

৫৬. "চোখ গেলো", প্রচারক, ১৩০৬; আবদুল মান্নান, *মুসলিম সাধনা*, ৩৯৯।

১৯০০ সালে *ভারতীতে* প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেন যে, হিন্দু সাহিত্যে মুসলমানদের ধর্মশিক্ষা ও ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে, এবং 'তরবারির দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছে' বলে যে প্রচারণা চালানো হয়েছে তাতে মুসলমানদের অত্যাচারের চিত্রই ফুটে উঠেছে। তবে এ ধরনের বিকৃত ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি সেসব বৃটিশ লেখকদেরই দায়ী করেন, যাঁদের দ্বারা ঐ সকল হিন্দু লেখক এবং ঐতিহাসিক দারুণভাবে প্রভাবিত হন।[৫৭]

কোন কোন মুসলমান লেখকের রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের যুক্তির প্রতিফলন ঘটে। ১৯০৩ সালে *ভারতী-তে* ইমদাদুল হক লিখেন যে, বিদেশী বৃটিশ ঐতিহাসিকরা মুসলমান শাসকদের নির্মম অত্যাচারের অলীক কাহিনী রচনা করেন এবং ঐ কুৎসিত সাহিত্য মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের মনকে বিষিয়ে তোলে।[৫৮] মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীও তাঁর *ভারতের মুসলমান সভ্যতা* (১৯১৪) নামের গ্রন্থে অভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের রচিত ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস পাঠে এবং তাদের অনুকরণে হিন্দু লেখকদের রচিত গ্রন্থাবলীতে ভারতে মুসলমান রাজত্বের যে মলিন ও কলঙ্ক কালিমাযুক্ত চিত্র অঙ্কিত হয়, তাতে হিন্দু পাঠকদের মনে মুসলমান শাসনকর্তা ও বাদশাহদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। ইসলামাবাদী হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমত, রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশরা মুসলমানদের নানারকম মিথ্যা দুর্নাম ও কলঙ্ক রটনা করে এবং নিজেদের গুণ-গরিমা প্রচার করে জনসাধারণের মনে মুসলমান শাসকদের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি এবং বৃটিশদের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি ও ভক্তি আকর্ষণে প্রয়াসী হয়। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের প্রকৃত জাতীয় গৌরবের কাহিনী এবং সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরতে পূর্বতন মুসলমান ঐতিহাসিকদের উদাসীনতা ও নীরবতা মুসলমান শাসনকালের গৌরবময় কীর্তি আলোচনা থেকে অমুসলমান লেখকদের বিরত রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। পূর্ববর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকরা বাদশাহদের শৌর্য-বীর্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী অত্যন্ত যত্নের সাথে বর্ণনা করেন, কিন্তু তাদের সৎ ও জনহিতকর কাজগুলিকে রাজধর্মের অনিবার্য কর্তব্য জ্ঞান করে স্বতন্ত্রভাবে সেসবের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করেন নি।[৫৯]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত পাঠ্যবইও মুসলমান লেখকদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। অতীতের বিশ্লেষণ ছাড়িয়ে এই সমালোচনার পরিসর আরও বহুদূর প্রসারিত হয়। ১৮৯৫ সালে শেখ আবদুর রহিম অভিযোগ করেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু প্রভাব মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করেছে।[৬০] ১৯০০ সালে মোহাম্মদ মীর আলি স্কুল

---

৫৭. *ভারতী*, কার্তিক ১৩০৭; আবদুল মান্নান, *মুসলিম সাধনা*।

৫৮. ইমদাদুল হক , "হিন্দু মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য", *ভারতী*, বৈশাখ ১৩১০, ২৭।

৫৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, *ভারতে মুসলমান সভ্যতা*, কলিকাতা ১৯১৪, ভূমিকা, ১-৪।

৬০. শেখ আবদুর রহিম, "আমাদের নিম্নশিক্ষার মান", *মিহির ও সুধাকর*, ১৮৯৫, সম্পাদকীয়।

পাঠ্যবইয়ের সমালোচনা করে বলেন, মুসলমানদের পক্ষে আপত্তিকর এই সকল বই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে সরকারি স্কুলগুলি হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[৬১] এই মতের অনুসারীদের ধারণা, এ ধরনের পাঠ্যপুস্তকের কারণেই পাঠশালাগুলোতে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করতে যায় না। এসব পাঠশালার শিক্ষাক্রমে 'হিন্দুয়ানী' প্রভাবের সমালোচনা করতে গিয়ে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে স্বীয় পাঠশালার শিক্ষক নন্দী মহাশয়ের কাছ থেকে যে পাঠ গ্রহণ করেন তার নিম্নলিখিত বিবরণ দেন :

জয় জয় দেবী, চর চর সার
কুচ যুগে শোভে মুক্তার হার
বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
ত্বং সরস্বতী নির্মল বরণ;
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণ।[৬২]

নিঃসন্দেহে এই ধরনের পাঠ ভগবতী ও সরস্বতী দেবীর পূজার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল। পাঠশালার পাঠ্যক্রম ছাড়াও স্কুলকলেজ পাঠ্যক্রমেও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল। মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়া স্কুল এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে স্মরণ করেন যে, অনেক পাঠ্যপুস্তকে আল্লাহ ও রসুলের উল্লেখ না থাকলেও শ্যাম, হরি, কালী, দুর্গা ও রামের বহু উদ্ধৃতি ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের নির্ধারিত পোশাক ছিল ধুতি ও চাদর, যা তাঁর কাছে 'হিন্দুয়ানী পোশাক' বলে মনে হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার পর পরই মশাররফকে তাঁর 'মোসলমানি পোশাক' পাজামা, চাপকান ও টুপি বদল করে ধুতি ও চাদর পরতে হয়। তাঁর পাজামা ও চাপকান বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয় এবং সহপাঠীরা তাঁর টুপি পুড়িয়ে ফেলে।[৬৩]

মশাররফ হোসেন আরও অভিযোগ করেন যে, পাঠ্যবইতে হিন্দু মহত্ত্বের কথা, যেমন রাম, লক্ষ্মণ, গোপাল, কৃষ্ণ, অর্জুন, সীতা, সাবিত্রী, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকান্ত প্রমুখ হিন্দু বীরপুরুষদের জীবনকাহিনী বেশি থাকতো। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সেই কারণেই মোল্লা ও মুন্সিরা মুসলমান ছেলেমেয়েদের পাঠশালা ও স্কুলে পড়তে নিরুৎসাহিত করেন এবং মাদ্রাসায় ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করেন।[৬৪]

---

৬১. মোহাম্মদ মীর আলি, "এখন কর্তব্য কি?" *নূর-আল-আমিন*, আষাঢ় ১৩০৭।

৬২. মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী*, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা) ১৯০৮-১৯০৯, ১০৬।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. ঐ, ১০৬।

একইভাবে *প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্য* নামের একটি স্কুল পাঠ্যবইয়ে দেবেন্দ্রনাথের জীবনী অংশে উদ্ধৃত সূর্যপূজার সমালোচনা করতে গিয়ে মওলানা আকরম খাঁ (১৮৭০-১৯৬৮) এ ধরনের পাঠ্যক্রমকে মুসলমান ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাতের ব্যবস্থা বলে তাঁর যুক্তির সপক্ষে কোরানের নিম্নবর্ণিত উদ্ধৃতি তুলে ধরেন :

সূর্যের পূজা করোনা
এবং চাঁদেরও না; কিন্তু পূজা কর
আল্লাহর, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহও (১৮৮৫-১৯৬৯) স্কুল পাঠ্যবইয়ের সমালোচনা করে বলেন, ঐসব বইতে মুসলমানদের গৌরব ও মহত্ত্বের কোন উল্লেখ না থাকলেও ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ সব বইতে লিপিবদ্ধ হিন্দুগৌরবের গল্প-কাহিনী মুখস্থ করতে হয়। স্কুলবইতে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের "রসুলুল্লাহ তাঁর শিষ্যদের শক্তিপ্রয়োগে ইসলাম প্রচারের উপদেশ দিয়েছেন"—এ ধরনের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এই শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের শিখতে হয় যে, তাদের আপন সম্প্রদায়ে এমন কিছু নেই যাতে তারা গৌরববোধ করতে পারে, আর হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা শেখে, তারা তুলনামূলকভাবে উন্নত জাতির বংশধর এবং তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মুসলমানদের চেয়ে উন্নততর।[৬৬]

বাস্তবে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার পরও বিশ শতকের সূচনা অবধি কোন মুসলমান সাহিত্যিক নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৪-১৮৯৩) *মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি* (১৮৬৩) বা সৈয়দ আমির আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) *ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন* (১৮৭৮)-এর মতো কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হন নি। বরং ঐসব প্রতিষ্ঠানকে একজন লেখক 'জী হুজুর'-এর সংগঠন বলে সমালোচনা করেন।[৬৭] কিন্তু হিন্দু লেখকদের ক্রমাগত মুসলমানবিরোধী প্রচারণার ফলে মুসলমান লেখকরা, এমনকি যাঁরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য কাজ করেন, তাঁরা ক্রমে তাঁদের মত পরিবর্তন করেন। যেমন ১৮৯৭ সালে শেখ ওসমান আলি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানান।[৬৮] কিন্তু যখন বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দু-

৬৫. *The Holy Quran*, Abdullah Yusuf Ali (tr.) Sura 41: 37, 1207; মোহাম্মদ আকরম খাঁ, "বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান", *মাসিক মোহাম্মদী*, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৪২, ২-৩।

৬৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা", *আল-এসলাম*, ১৩২৩ এবং তাঁর "ভাষা ও সাহিত্য", ঢাকা ১৩৩৮, ১৯-২৩।

৬৭. সৈয়দ ইমদাদ আলী, "বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব", *ইসলাম প্রচারক*, ৫ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩।

৬৮. শেখ ওসমান আলী, "কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি", *হাফেজ*, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।

মুসলমান সংঘর্ষ বাঁধে, ওসমান আলি তখন হিন্দু লেখক কর্তৃক ইসলাম ও মুসলমান শাসনের উপর আক্রমণকে নিতান্তই উস্কানিমূলক বলে বর্ণনা করেন। ১৯০৩ সালে তিনি মুসলমানদের নিন্দা না করার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানান।[৬৯] মীর মশাররফ হোসেনও প্রথম জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্বার্থে গো-মাংস ভক্ষণ এবং গো-কোরবানী না করতে মুসলমান সমাজের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান তাঁর *গো-জীবন* (১৮৮৮) গ্রন্থে এবং 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' নামের প্রবন্ধে । কিন্তু তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ ও রচনায় তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু প্রভাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা উপরে আলোচিত হয়েছে। এভাবে তাঁর মতপরিবর্তনের আংশিক কারণ ছিল মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি, যেহেতু *গো-জীবন* প্রকাশিত হবার পর তাঁকে কাফের ঘোষণা করা হয় এবং এই লেখার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।[৭০]

বাংলা সাহিত্যের এই একপেশে হিন্দুঘেঁষা প্রভাববলয় থেকে মুক্ত হবার জন্য মুসলমান লেখকরা বাংলা ভাষায় তাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ধরনের উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটেছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যুক্তিতে। তাঁর মতে, স্বীয় বক্তব্য সাহিত্যে প্রতিফলিত করার প্রয়োজনেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে তোলা উচিত, কারণ—

যার কাজ তারে সাজে
অন্য লোকের লাঠি বাজে।

শহীদুল্লাহ বিশ্বাস করেন যে, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেক মার্জিত ও রুচিসম্মত লেখার চেয়েও একজন মুসলমানের কাছে অপর একজন মুসলমানের লেখা মাঝারি মানের ইসলামী কাব্য ও রচনা বহুলাংশে মূল্যবান বলে মনে হয়।[৭১] এভাবে শহীদুল্লাহ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে তোলার জন্য মুসলমান লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাহিত্যে এই প্রতিযোগিতার ফল হলো সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব। একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা নিজেদের প্রয়োজনে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে তোলার

---

৬৯. ঐ, "হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়", *কোহিনুর*, বৈশাখ, ১৩১৪।

৭০. *গো-জীবন* প্রকাশিত হয় ২৫ ফাল্গুন ১২৯৫। "গোকুল নির্মূল আশংকা" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *আহমদী পত্রিকায়*, বৈশাখ ১২৯৫। তাঁর বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য , তাঁর *মদীনার গৌরব* (১৯০৬), *মুসলিম বীরত্ব* (১৯০৮), *ইসলামের জয়* (১৯০৮) এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা *আমার জীবনী* (১৯০৮-১৯১০); ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা*, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ৮১।

৭১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "*আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা* ", ২৫।

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এই সাহিত্যকে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করা। বিশ শতকের শুরু থেকেই তাই মুসলমানদের সাহিত্যে তাদের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতা ধরা পড়ে শেখ ফজলুল করিমের *পরিত্রাণ কাব্য* (১৯০৩) ও *কাসেম বধ কাব্য* (১৯০৩) গ্রন্থ, মীর মশাররফ হোসেনের *মদীনার গৌরব* (১৯০৬) ও *মোসলেম বীরত্ব* (১৯০৪) গ্রন্থ, শেখ আবদুর রহিমের *ইসলামের ইতিবৃত্ত* (১৯১০) গ্রন্থ, আবু জেকারিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলির *শ্রীহট্ট বিজয়* কাব্য, কায়কোবাদের (১৮৫৮-১৯২৫) *মহাশ্মশান* (১৯০৪) কাব্য, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর *স্পেন বিজয়* (১৯১৪) কাব্য এবং মৌলবি জমিরউদ্দিনের *গ্লোরি অব ইসলাম* (১৯২৯) গ্রন্থে।[৭২]

কেবল বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণ আরবি, ফার্সি বা উর্দু শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমেই মুসলমান সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হয় নি, বরং ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকেও মুসলমান সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য থেকে আলাদাভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাই এই সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যেসব আরবি-ফার্সি শব্দ মুসলমানের কথ্য ভাষায় এবং বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে জোরপূর্বক বাদ দেবার বিরোধিতা করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এবং এর প্রকৃতি

শ্রীরামপুর থেকে খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলার হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকরা মনে করতেন যে ধর্মান্তরের ক্ষেত্র হিসেবে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সমাজই বেশি উপযোগী। কারণ, অতীতে হিন্দু সমাজ থেকে বহুলোক ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাই খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা হিন্দু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। মুসলমান এলাকায় তাদের কর্মতৎপবতা ছিল আগ্রহবর্জিত, সীমিত আকারের এবং বিলম্বিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি কম আগ্রহী ছিল বলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মিশনারিদের শরণাপন্ন হতেও মুসলমানরা তেমন আগ্রহী ছিল না। এমনকি বৃটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার আগে সরকারি কার্য পরিচালনার জন্যও তাদের ইংরেজি শেখার প্রয়োজন হয় নি। অতএব, বাংলা বা ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারি তৎপরতার একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে হিন্দু সম্প্রদায়।[৭৩]

---

৭২. Mohammad Shah, " The Emergence of a Muslim 'Middle Class' in Bengal: Attitudes and Rhetoric of Communalism, 1880-1940", Ph.D. thesis, (University of London 1990), 99-101.

৭৩. Selections From the Records of Bengal Government, Vol. 14; Papers Relating to Presidency College, 10-11; M. Fazlur Rahman, *The Bengal Muslims and English Education, 1765-1835*, (Dacca 1973), 96-98.

মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই তাদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য দায়ী। এই আর্থিক সঙ্কটের কারণেই তারা ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহু মুসলমান জমিদারকে জমিদারিচ্যুত করে। পুরনো হিন্দু জমিদাররাও এই ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মধ্য থেকে সৃষ্ট নতুন এক হিন্দু জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে হিন্দু সমাজ তার প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। কলকাতা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী এসব হিন্দু জমিদার যেসব আমলার হাতে জমিদারি পরিচালনার ভার অর্পণ করেন তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ভদ্রলোক। এসব আমলা রাজস্বের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা ছাড়াও জমিদারদের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য জবরদস্তিমূলক নজরানা ও সেলামির মতো কিছু অতিরিক্ত কর আদায় করতো প্রজাদের কাছ থেকে, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান কৃষক।[৭৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে মুসলমানদের মধ্যে 'আশরাফ' শ্রেণী 'মদদ-ই-মাশ' বা রাজস্ববিহীন ভূমিঅনুদান ভোগ করতো, রাজদরবারে ও কোন কোন প্রশাসনিক চাকুরিতে একচেটিয়াভাবে নিয়োগলাভ করতো; মুনশি বা মৌলবির পদে নিয়োজিত হতো এবং শিক্ষকতা করে কিংবা দলিল-দস্তাবেজ নকল করে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি না হলে একমাত্র তারাই পারতো ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে আশরাফদের প্রিয় পেশা দলিল নকল, কাগজ তৈরি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হলে তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণেই 'ইনগিলাব-ই-জামানা' (অবস্থার সঙ্কট), 'আশরাফ গর্দিদ' (সম্মানিত শ্রেণীর দুরবস্থা) প্রভৃতি অভিযোগ মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এই আর্থিক সঙ্কটই স্কুলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের কম উপস্থিতির জন্যে বিশেষভাবে দায়ী।[৭৫]

মুসলমানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হওয়ার তিনটি শিক্ষাগত কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, মুসলমান ছাত্রকে স্কুলে অধ্যয়ন শুরু করার আগে মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় বলে হিন্দু ছাত্রের তুলনায় তাদের স্কুলে শিক্ষা বিলম্বে শুরু হতো।

---

৭৪. Amalendu De, "Roots of Separatism in the Nineteenth Century Bengal—A Case Study of Socio-economic and Demographic Factors" in Diptendra Banerjee *et al.* (ed.), *Essays*, 327-329.

৭৫. From Blochmann to Sutcliffe, 9 October 1871, 3; *Bengal Education Proceedings* (henceforth BEP), 1872; India Office Library and Records (IOR.), 163; From Maulvi Abul Khair Muhammad Siddique (Superintendent, Dacca Madrassa) to the District Judge, Dacca, No. 7, 8 February 1886, para 2, BEP., 1888.

দ্বিতীয়ত, আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রকে স্কুল ছাড়তে হতো। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীতে বর্ধিত বেতন ও অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য মুসলমান অভিভাবকদের অনেকেরই ছিল না। তৃতীয়ত, মুসলমান পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের পার্থিব উন্নতির কথা না ভেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তানদের জন্য এমন এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বেছে নিতেন, যা তাদের আধুনিক পেশায় দক্ষ হতে কিংবা জীবনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করার পরিবর্তে জ্ঞানী-গুণীদের মাঝে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। ফলে যেসময় একজন তরুণ হিন্দু ছাত্র সরকারি স্কুলে ইংরেজি পড়ে এবং অংক শিখে, সেসময় একজন তরুণ মুসলমান ছাত্র মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম, ইসলামী আইন ও আরবি-ফার্সি ভাষা শিক্ষা করে। তরুণ অবস্থা থেকে মুসলমান ছাত্রের এভাবে বিদ্যাশিক্ষার কারণে তার পরবর্তী জীবনের চিন্তা-চেতনায় লাভজনক পেশায় নিয়োজিত হবার পরিবর্তে জ্ঞানচর্চার পেশায় নিয়োজিত হবার প্রতি ঝোঁক থাকে বেশি।[৭৬]

মুসলমান সংবাদপত্রে অভিযোগ উঠে যে মুসলমান স্কুলপরিদর্শক না থাকার কারণে মুসলমানদের অভাব ও প্রয়োজনাদির কথা সরকারকে যথাযথভাবে অবহিত করা সম্ভব হয় নি।[৭৭] বস্তুতপক্ষে ১৮৭১ সালে হান্টার কর্তৃক তাঁর *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* গ্রন্থে ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা যে মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সরকারকে সতর্ক করার আগে এব্যাপারে সরকার তেমন মাথা ঘামায় নি। ১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট তারিখে ভারত সরকারের এক প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করা হয় যে, যেখানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সুশিক্ষিত হয়ে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, সেখানে মুসলমানদের মতো একটি 'বিশাল' এবং 'গুরুত্বপূর্ণ' সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ হতে দূরে থেকে বৈষয়িক এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব, সরকার মুসলমানদের সরকারি স্কুল এবং কলেজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুসলমানপ্রধান এলাকায় ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা, ঐ সব স্কুলে মুসলমানদের মধ্য থেকে যোগ্য ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ এবং 'গ্রান্টস-ইন-এইডস'-এর মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিতব্য ইংরেজি ও মাতৃভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭৮] এই ধরনের ব্যাখ্যা এবং প্রস্তাবাবলী বাস্তব অবস্থা, প্রকৃতি ও দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের সমস্যাকে হিন্দুদের চেয়ে পৃথক বলে প্রমাণ করার জন্যেই প্রদান করা হয়।

---

৭৬. Sir Alfred Croft (Director of Public Administration in Bengal), Review of Education in India in 1886, with Special Reference to the *Report of the Education Commission*, (Calcutta 1888), 1459-60.

৭৭. উদাহরণ, *Urdu Guide*, 2 and 3 December 1885; *Bengal Native Newspaper Report* (henceforth BNNR.), 5 December 1885, 1459-60.

৭৮. From W. S. Atkison (Director of Public Instruction in Bengal) to the Secretary to the Government of Bengal, General Department, No. 135, Fort William, 12 January 1872, BEP., 1872; IOR, 165.

১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং কেবলমাত্র মুসলমান শিক্ষকদের দ্বারা আরবি ও ফার্সি সাহিত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে লর্ড মেয়োর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার কর্তৃক দুজন পরিদর্শক নিয়োগ[৭৯] মুসলমান সমাজের ধ্যান-ধারণা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার অভিপ্রায়কে আরো তীব্রতর করে।

কিন্তু এধরনের বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তার ও ভাগ্যোন্নয়নে তেমন সাহায্য করে নি। অতএব, পরিস্থিতির চাপে মুসলমানরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা সরকারি সাহায্যের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার চিন্তাভাবনা করে। আমির আলির 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' হিন্দুদের সাথে তাল মিলিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায়।[৮০] ১৮৯৪ সালে কমপক্ষে দুটি বাংলা সাময়িকী মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এই শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে। মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিষয়সমূহের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুসলমান সংবাদপত্রে জোর দাবি উঠে।[৮১]

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেন মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা। বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমান লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদরা আরবি ও ফার্সির পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেন। ১৯০০ সালে কাজি গোলাম মওলা মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে *প্রচারক*-এ একটি প্রবন্ধ লিখেন।[৮২] ১৯০৪ সালে *ইসলাম প্রচারক*-এ প্রকাশিত 'বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আফতাবউদ্দিন আহমদ যুক্তি দেখান যে, আরবি ও ফার্সি ভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা শিখলে জাতি হিসেবে মুসলমানরা শক্তিশালী হবে।[৮৩] ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম সংস্কারের এক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব করেন, যা উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে মক্তব পাঠ্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে

---

৭৯. Croft, *Review of Education in India*, 1886, 320-21.

৮০. Report of the Muhammadan Educational Endowments Committee, Calcutta, 1888, Appendix 3, Memorandum 2, para 3, 24-25, *Bengal General Proceedings* (henceforth BGP), January-July 1888, IOR, 316.

৮১. *Sudhakar*, 5 January 1894; BNNR. 13 January 1894, 23. *Mihir O Sudhakar*, 9, 16 Decemder 1898; BNNR., 17-24 December 1898. *Mihir O Sudhakar*, 30 June 1899.

৮২. "বসন্ত সহচর", *প্রচারক*, আশ্বিন ১৩০৭, ৯ম সংখ্যা।

৮৩. "বিজ্ঞ মুসলমানের শিক্ষা", *ইসলাম প্রচারক*, অগ্রহায়ণ ১৩১১, ৮ম সংখ্যা।

এর অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। জুনিয়র মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ বা পার্থিব বিষয়গুলো সংযোজিত করে ছাত্রদের হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার উপযোগী করে তোলার প্রস্তাব করা হয়। সিনিয়র মাদ্রাসা কোর্সকে হাইস্কুলের সমমানে উন্নীত করার পরামর্শ দেয়া হয় এবং মাদ্রাসার উচ্চতর কোর্সকে উচ্চতর মানে উন্নীত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। সহসাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলমান সম্মেলনে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকারের সমীপে পেশ করা হয়। এত সব করার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যটি বিশেষভাবে কাজ করেছে তা হলো প্রচলিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।[৮৪]

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন বাংলার সরকার শিক্ষিত সমাজকে উন্মুক্ত সরকারি কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার এবং 'সংস্কৃতিবান মুসলমান' তৈরির উদ্দেশ্যে মাদ্রাসাগুলো পুনর্গঠিত করার জন্য একটি 'সংস্কার পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেন।[৮৫] তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যক্রম থেকে ঐ পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয় এবং একমাত্র কলকাতা মাদ্রাসা ছাড়া প্রদেশের সকল সরকারি এবং অধিকাংশ বেসরকারি মাদ্রাসায় ১৯১৫ সাল থেকে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের স্বার্থে কলকাতা মাদ্রাসাকে এই পরিকল্পনার বাইরে রাখা হয়। এ পর্যায়ে ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন যে, এভাবে জাগতিক বিষয়সমূহ শিক্ষা এবং জাগতিক জীবনে সাফল্যলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ছাত্ররা কলকাতা মাদ্রাসার চেয়ে পার্থিব শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। কিন্তু মুসলমান শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের দ্বিমুখী ব্যবস্থা নতুন সংস্কারমূলক শিক্ষার সাফল্যের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কলকাতা মাদ্রাসাকে ঘিরে ধর্মীয় গোঁড়া ও স্বার্থপর একটি দল নতুন সংস্কারকৃত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। মুসলমানদের এক বিরাট দল নতুন মাদ্রাসা-স্কিম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে এবং কলকাতা মাদ্রাসা মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান ধারা থেকে দূরে সরে পড়ে। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্বগৌরব এবং প্রতিপত্তি হারাতে থাকে।[৮৬]

মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ধর্মশিক্ষার সাথে 'আধুনিক' শিক্ষার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। আর্থিক ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে কলকাতা মাদ্রাসার 'কলেজ ক্লাস' বন্ধ করে দেয়া হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে

---

৮৪. *Report of the Committee to Advise on the Policy of Advancing Muslim Education in Bengal*, 77-78.

৮৫. ঐ, 59-77.

৮৬. ঐ, 73.

বলা হয়। তখন সমগ্র কলকাতায় শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই আরবি ও ফার্সি শিক্ষা দেওয়া হতো। ম্যাট্রিক কোর্সে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যেসকল ছাত্রের আরবি ও ফার্সি ছিল, তাদের প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্তি হতে হতো। মুসলমান ছাত্রদের প্রায় সকলেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবি অথবা ফার্সি নিত। এছাড়াও কলকাতা মাদ্রাসার 'কলেজ ক্লাস' তুলে দেয়ায় এবং শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই আরবি ও ফার্সি পড়ার ব্যবস্থা থাকায় মুসলমান ছাত্রদের ১২ টাকা মাসিক ফি-এর ১০ টাকাই মহসিন ফান্ড থেকে দেয়া হতো। কিন্তু মুসলমান ছাত্ররা প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হলে মহসিন ফান্ডের ঐ সাহায্যটি পেতো না। অন্য দিকে নিজ খরচে সন্তানদের পড়াশুনার ব্যয়নির্বাহের ক্ষমতা খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানেরই ছিল।[৮৭]

মুসলমান ছাত্রদের কলকাতা মাদ্রাসা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসার জন্য আহ্বান করে তাদের তেমন কোন উপকার করা হয় নি। প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলমান ছাত্রদের মহসিন ফান্ড থেকে সাহায্য প্রদান করেও মুসলমান সমাজের তেমন কোন লাভ হয় নি। কারণ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ না হলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে না বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ মুসলমান ছাত্রদের ভর্তিতে বাধার সৃষ্টি করে। ১৯০৮ সালে কর্তৃপক্ষ প্রথম বর্ষের ক্লাসে মাত্র ৩৫ জন মুসলমান ছাত্রকে ভর্তির কোটা নির্ধারিত করে দেয়। কলকাতা মাদ্রাসার কলেজ-ক্লাসে পড়ার সহজ সুযোগ গ্রহণ না করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতেও তারা বাধার সম্মুখীন হয়। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে *মুসলমান* পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে সিটের অভাবের অজুহাতে আই. এ. পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ২১তম এবং মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারীর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তির আবেদন নাকচ করা হয়।[৮৮] এই ধরনের অজুহাতের ফলে ভর্তি থেকে বঞ্চিত ছাত্ররা তাদের বৃত্তি পাবার অধিকার হারায়, কারণ তাদের বৃত্তি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার শর্তসাপেক্ষ ছিল। *মোহাম্মদী* পত্রিকা সৈয়দ ইব্রাহিম, শফিউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুল লতিফের মতো বহু মেধাবি ছাত্রের ভর্তির আবেদন নাকচ এবং তাদের প্রাপ্য স্কলারশীপ থেকে বঞ্চিত হবার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।[৮৯]

নিয়ম-কানুনের ত্রুটির কারণে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অন্যান্য কলেজে মুসলমানদের শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। ১৯১৩ সালে ফজলুল হক অভিযোগ করেন যে, কলকাতার বিভিন্ন কলেজেই দুই শতেরও অধিক সংখ্যক মুসলমান ছাত্রের ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। 'দি মুসলমানস অব বেঙ্গল : হাউ দে রিমেইন আনএডুকেটেড' শিরোনামের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশিত

---

৮৭. *Mohammadi, !* July 1910; BNNR., 9 July 1910, 806-807.

৮৮. *Mussalman*, 4 July 1913; BNNR., 12 July 1913, 466.

৮৯. *Mohammadi*; BNNR., 27 April 1912, 467-468.

তথ্যে ফজলুল হকের অভিযোগের প্রমাণ মেলে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুসলমান ছাত্রদের বঞ্চনার পরিসংখ্যান প্রদান করে মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধাসমূহ চিহ্নিত করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার সাথে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মুসলমানদের প্রাপ্য অংশ লাভের ব্যর্থতা যুক্ত হবার ফলে মুসলমান সমাজ দারুণ হতাশায় নিমজ্জিত হয়।[৯০] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলমান পরিদর্শক নিয়োগ মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নবজীবনের সঞ্চার করে। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নতুন প্রাদেশিক সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ১৯০৮-১৯১৩ সালের পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রত্যেক কলেজ এবং প্রায় প্রত্যেক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ। এর ফলে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন এলো, তেমনি তাদের চিন্তা-চেতনায়ও পরিবর্তন দেখা গেল। কিন্তু এতে তাদের অভিযোগ কিংবা সম্প্রদায় হিসেবে তাদের মনে আলাদা হবার ধারণা মুছে যায় নি। তাদেরকে যতো বেশি সুবিধা প্রদান করা হতো, তারা তার চেয়েও বেশি দাবি করতো এবং মুসলমানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও তাদের অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য দাবি অনবরতই উত্থাপিত হতে থাকে। যেমন, মুসলমানরা অভিযোগ করে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাধ্যমিক স্কুলের প্রতি ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের কোটা ৩০ জনে নির্ধারিত করা এবং উক্ত শিক্ষাকোর্সে আরবি ও ফার্সি পড়ার সুযোগ না রাখার ফলে মুসলমানরা সঙ্কটে পড়েছে। ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রদের সংখ্যা নির্ধারিত করে দেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, ঠিক তখনই ঐ ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হয় যখন মুসলমান ছাত্ররা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দলে দলে স্কুলে যেতে শুরু করে, অথচ কিছুদিন আগেও তাদের স্কুলে যাবার জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হতো।[৯১]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে পূর্ব বাংলা থেকে কোন সদস্য না থাকা এবং এর একশত জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ছয়জন মুসলমান সদস্য থাকার বিষয়টির উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ১৯১২ সালে ভারত সরকার এই অভিমত প্রকাশ করে যে, মুসলমানরা তাদের ছেলেমেয়েদের অধিক হারে 'কলেজ ক্লাশে' পাঠাবেন না যদি তাদের এলাকায় ইসলাম শিক্ষাবিষয়ক অনুষদসহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হয়, যার

---

৯০. A. K. Fazlul Huq's speech on the budget for 1913-14, Bengal Legislative Council Debates (henceforth BLCD), 4 April 1913, *Bengal Legislative Council Proceedings* (hereafter referred to as BLCP), Vol. 45, 1913, 576-78; *Bengal District Administration (Levinge) Report* (1913-14), 144; *Muhammadi*, 19 July 1912; BNNR., 27 July 1912; *Mussalman*, 18 April 1913; BNNR., 26 April 1913, 294.

৯১. *Sanjibani*, 6 January 1910; BNNR, 15 January 1910, 57; *Mussalman*, 16 May 1913; BNNR., 24 May 1913, 362.

পরিচালনায় তাদের নিজস্ব ভূমিকা থাকবে।[৯২] ১৯১২ সালের মে মাসে *দি মুসলমান* সব মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বার উন্মুক্ত রাখার কিংবা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করার দাবি উত্থাপন করে।[৯৩] পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সাথে উপরোক্ত দাবি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ১৯১৩-১৭ সালের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, একজন সাধারণ মুসলমান তার সন্তানকে মাদ্রাসায় মুসলিম আইন, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, বিতর্ক, দর্শন, হাদিস ও তফসির পড়াতে বেশি আগ্রহী, কারণ তার চিন্তাধারা বাংলার একজন অমুসলমানের চিন্তাধারার চেয়ে ভিন্নতর ছিল। সে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করতে গিয়ে মৌলবিদের দ্বারা প্রভাবিত হতো। সে কারণে যখন কোন বেসরকারি মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা উঠতো, তখন মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি উঠতো। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সুবিধা দাবি করতে গিয়ে মুসলমান আঞ্জুমানগুলো তাদের জন্য বিশেষ 'ইনস্পেকটিং অফিসার' নিয়োগের দাবি করতো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান সম্প্রদায় তার সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় এবং নিজ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে ব্যাকুল ছিল। সামাজিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তারা চেয়েছিল পৃথক এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলে মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহী হয়, অথচ সরকারি চাকুরির জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই ছিল অপরিহার্য। উপরোক্ত পাঁচসালা পর্যালোচনার রাজনৈতিক উপসংহার ছিল এই যে, বাংলা কখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত হবে না যদি এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হিসেবে মুসলমানদের সুশিক্ষিত হয়ে যথেষ্ট হারে সরকারি কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়। উক্ত পর্যালোচনায় এই আশাবাদও ব্যক্ত করা হয় যে, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে বৃটিশ রাজের প্রজা হিসেবে তারা তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে।[৯৪] প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—এই প্রচলিত ধারণা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ তাদের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক ধারণা জন্মলাভ করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা বৃটিশ সরকারকেও সেই ধারণায় বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম হয়।

---

৯২. From H. Sharp (Joint Secretary to the Government of India, Department of Education) to the Secretary to the Government of Bengal, General Department, No. 811, Simla, 4 April 1912, 4.

৯৩. *Mussalman*, 17 May 1912: BNNR., 25 May 1912, 320-321.

৯৪. *Fifth Quenquennial Review on Education* (1912-13 to 1916-17), Calcutta, 11 January 1918, 133; *Report of the Committee Appointed by the Government of Bengal to Consider Questions Connected with Muhammadan Education*, (Calcutta 1915), 16.

মুসলমানদের মানসিকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯) উল্লেখ করে যে, একজন মুসলমানের কাছে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন সচেতন সদস্য হবার কোন বিকল্প নেই, যদিও সে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ইসলামী ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি বর্জন করে সে ঐ সুযোগ নিতে মোটেও আগ্রহী ছিল না। সে এই ভেবে গর্বিত যে তার আপন সংস্কৃতি ইসলামের শৌর্য-বীর্যের দিন থেকেই বিবর্তিত হয়ে এসেছে। এমনকি বাংলার একজন মুসলমান গ্রাম্য বালকও এই ভেবে গর্ববোধ করে যে, সে যে ধরনের ইসলামী বিদ্যাচর্চা করে তা কায়রোর আল-আজহার মসজিদের পাঠ্যক্রমের সমতুল্য। মৌলবি আবদুল করিমের মতো নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা তাই যুক্তি উত্থাপন করেন যে, ইসলামী দেশগুলিতে যে শিক্ষা মহা-রাষ্ট্রনায়ক ও প্রশাসক তৈরি করতে সাহায্য করে ভারতের মাদ্রাসাগুলোতে সে ধরনের শিক্ষাই প্রদান করা হয়। স্যাডলার কমিশন একজন ভারতীয় মুসলমানকে ইসলামী মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বলেই বিবেচনা করে এবং যুক্তি দেখায় যে, ঐ ইসলামী মূল্যবোধই একজন মুসলমানকে তার অতীতে নিয়ে যায় যেখানে তার কল্পনা শুধুমাত্র ভারতীয় ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আরো বিস্তৃত হয়। এই অবস্থার প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমান প্রতিনিধিরা কমিশনকে জানায় যে, যদি কমিশন মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মানসিকতার স্বীকৃতি প্রদান না করে, তবে এর কোন পরিকল্পনাই কার্যকর হবে না।[৯৫] এ ধরনের মতামত সমর্থন করতে গিয়ে বৃটিশ সরকার বিতর্কের সেই যুক্তিগুলোই সমর্থন করে যেগুলো মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়।

১৯১০ ও ১৯২০-এর দশকে কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলার সরকার মুসলমানদের দেখায় যে তারা মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কাজ করছে। ১৯১৮ সালে সরকার ইসলামী শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী গঠনের জন্য অনুমোদন দান করেন এবং ১৯১৯ সালে ঢাকা মাদ্রাসায় এই শ্রেণী চালু করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত মাদ্রাসার চারটি উচ্চশ্রেণী এবং দুটি ইসলামিক উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী নিয়ে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে ১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও ইসলামী শিক্ষার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হয়।

এইভাবে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাকে শক্তিশালী করে। ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় প্রভূত উন্নতিলাভ করে। ১৯২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সরকার মুসলমানদের সরকারি স্কুলের শিক্ষক, সাব-ইন্সপেক্টর এবং ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। ১৯২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক আদেশবলে সরকার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এবং ঢাকা ট্রেনিং কলেজে উপযুক্ত মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ আসন সংরক্ষিত করে।

---

৯৫. *Calcutta University (Sadler) Commission Report* (1917-19), (Calcutta 1919), 143, 209.

১৯২৪ সালের ১৭ এপ্রিল অপর এক আদেশবলে সরকার চট্টগ্রাম কলেজে মুসলমান ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত আসনের শতকরা হার ২৫ থেকে ৩০-এ উন্নীত করে। ১৯২৪ সালের ১৪ নভেম্বর অপর এক আদেশের মাধ্যমে সরকার শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ঢাকা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মান অক্ষুণ্ন রেখেই মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা যতোটা সম্ভব বাড়াতে পরামর্শ দেয়।[৯৬]

১৮৮০ সাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত মুসলমানদের অগ্রগতি সাধিত হয়। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকেই এই অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ১৯২১-২৬ সালের মধ্যে প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর হার ২৯.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬-২৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের হার ছিল শতকরা ৫১.৪। এই হারের তুলনায় উচ্চ ও মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৫.৫ এবং ১৯.৩। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার হারেই শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতির প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির হার কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কম-বেশি হলেও মোটামুটিভাবে একইরকম থাকে। প্রতিটি স্তরেই এই অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি[৯৭] থেকে প্রতীয়মান হয় যে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হয়েছে এবং তাদের আর্থিক অগ্রগতিও সাধিত হয়। উচ্চ শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে মুসলমান ছাত্রবৃদ্ধি (সম্ভবত হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর দ্রুতগতিতে) এবং তাদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতি অধিকহারে ঝুঁকে পড়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে তখন এক নতুন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

মুসলমানদের শিক্ষার এই তুলনামূলক অগ্রগতি নিজ সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য দাবি জানাতে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে তাদের মধ্যে কিছু মুখপাত্রের উদ্ভব হয় এবং যদিও অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল, তবুও কিছু মুসলমান তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে তাদের অভাব-অভিযোগ উত্থাপনের জন্য তৎপর হন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের কিছুটা অগ্রগতি হলেও হিন্দুদের তুলনায় তারা পিছিয়ে আছে। তাঁরা বলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রসরতা মুসলমানরা অর্জন করেছে তা সম্ভব হয়েছে বৃটিশ সরকার কর্তৃক কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই। উচ্চস্তরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়েছে ১৯২১ সালে মুসলিম হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২৬ সালে বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল হকের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য সরকারের উপর ফজলুল হক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে

৯৬. *Guide to Laws and Orders in Force in Bengal*, Vol. 6, Education, Nos. 605-775, Calcutta 1926; IOR V/27/242/41f, 129-30.

৯৭. Shah, "Muslim Middle Class", 155, 167-172.

অবশেষে সফল হন। মুসলিম হলে ছাত্রসংখ্যা ১৬০ থেকে ৪০০তে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান উচ্চশিক্ষা লাভ করে বাংলার রাজনীতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার দাবি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলার আইনসভায় মুসলমান সদস্যগণ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারি অনুদান বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকেন। মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই ছিল বেশি। এধরনের সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দেবার মাধ্যমেই মুসলমান নেতারা মুসলমান ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্বাচিত হতে এবং শক্তিসঞ্চয় করতে সমর্থ হন।[৯৮]

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে পুনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ফজলুল হক ঘোষণা করেন, যে শিক্ষাব্যবস্থা অমুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক বলে ধরা হয়, তা বহুক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। তিনি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন যে, কোন মুসলমান পিতা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান না করে তার সন্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাগ্রহণ করতে দেবে না। অতএব, তাঁর দাবি ছিল মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন তাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।[৯৯] ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব থেকে এ ধারণা উদ্ভূত হয়। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতি নতুন উদ্দীপনা দেখা গেলেও ধর্মশিক্ষার প্রতি তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, যা তাদের ধর্মসম্প্রদায়গত সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করে।

চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব

উদীয়মান মুসলমান 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র উদ্বিগ্নতার অন্য দিকগুলি ছিল সরকারি চাকুরিতে তাদের অবস্থান এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত। তাঁরা এমন ধারণা পোষণ করতেন যে, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের স্বার্থ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুসলিম রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা বাংলায় তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের অনগ্রসরতা, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রাদেশিক রাজস্বে তাদের বৃহত্তম অংশ প্রদান, ভিন্ন স্বার্থ, যোগ্যতা ও 'রাজনৈতিক গুরুত্ব' বিবেচনা করে সরকারি চাকুরিতে অধিকহারে মুসলমান নিয়োগের দাবি উত্থাপন করেন।[১০০]

---

৯৮. *Report of the Indian Statutory Commission* (henceforth ISCR.), Vol. 8; *Memorandum* Submitted by the Government of Bengal to the Commission, London 1930, para 43; আরও দেখুন, '*Bengal Administration Report* (henceforth BAR.), (1926-27 to 1935-36), Government of Bengal, Revenue Department, Alipore 1939, 107-11.

৯৯. *Presidential Address* by A. K. Fazlul Huq, Chief Minister of Bengal, at the All-India Muslim Educational Conference, 51st Session, Poona, 28-30 December 1940, 3-4, 12.

১০০. Evidence of A. K. Fazlul Huq to the Royal Commission on the Public Services in India, January 1913, 159.

যে যুক্তিগুলি তাঁদের অনমনীয় এবং তাদের দাবিকে শক্তিশালী করেছে সেসবের একটি হলো বাংলার জনসংখ্যায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কারণেই জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানদের চাকুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তা না হলে অন্তত আগের চেয়ে অধিকহারে তাদের চাকুরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবার অধিকার রয়েছে। অপর একটি শক্তিশালী যুক্তি হলো, প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের মূল উৎস খাজনা ও রাজস্ব উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানরা অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি অর্থ সরকারকে প্রদান করে। সেই কারণে সরকারি চাকুরিতে অধিকহারে নিয়োজিত হবার অধিকার তাদেরই বেশি।[১০১]

স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব

হিন্দু-মুসলমান মতবিরোধের তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো জেলাবোর্ড এবং পৌরসভার নির্বাচন। ১৯১০, ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মুসলমানরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। মুসলমান নেতারা যুক্তি দেখান যে, দেশ যদি গণতন্ত্রের নীতিতে চলে, তাহলে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবি বিবেচনা করতে হবে। তাঁরা পৃথক নির্বাচন দাবি করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন যে, মিশ্র নির্বাচনে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হিন্দু কর্মকর্তা, উকিল, ব্যবসায়ী, জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর অশুভ প্রভাবের ফলে 'প্রকৃত মুসলমান' নেতা নির্বাচনে জয়ী হবেন না। অর্থনৈতিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে দুর্বল বলে একজন মুসলমান নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে তার হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সমান সম্পদ ও শক্তি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। খান বাহাদুর আজিজুল হকের মতো মুসলমান নেতার অভিযোগ ছিল এই যে, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কংগ্রেস তার প্রার্থীদের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করে, যার ফলে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক হিন্দু জমিদার জয়লাভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা জাগ্রত করেও হিন্দু জমিদারদের পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। আরো অভিযোগ করা হয় যে, কিছু কিছু মুসলমানকেও কংগ্রেস অর্থপ্রদানসহ অন্যান্য উপায়ে প্রভাবিত করে যেন তারা স্বীয় মতামত বির্সজন দিয়ে স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করতে সচেষ্ট হয়। প্রচুর অর্থসম্পদ ও হিন্দুনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমকে সপক্ষে ব্যবহার করে হিন্দু প্রার্থীরা বহু 'প্রকৃত মুসলমান' প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে।[১০২] এক কথায়, হিন্দু সমর্থন নিয়ে মিশ্র নির্বাচনে কোন মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করলেও তিনি মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি হবেন না, কারণ সেসব ক্ষেত্রে কে জয় লাভ করবেন বা

---

১০১. *Mihir O Sudhakar*, 2 December 1898; BNNR. 10 December 1898, 1050.

১০২. Director of Public Information (Bengal), *Bengal Ministry and the Hindus of Bengal*, Part 1, (Alipore 1943), 3-6.

করবেন না তা নির্ভর করবে অন্য সম্প্রদায়ের পছন্দ-অপছন্দের উপর। মুসলমান নেতাদের ধারণানুসারে একজন প্রকৃত মুসলমান অবশ্যই তাঁর সম্প্রদায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।[১০৩] অতীতে হিন্দু প্রার্থীদের কাছে মুসলমান প্রার্থীদের পরাজয় বা তাঁদের ব্যর্থতার গ্লানিতেই এ ধরনের মনোভাবের কারণ নিহিত রয়েছে।[১০৪] এ ধরনের যুক্তির মাধ্যমে মুসলমান প্রতিনিধিদের দাবির পরিধিও বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

সাম্প্রদায়িক বাক-বিতণ্ডা

জেলাবোর্ড ও পৌরসভার ক্ষেত্রে মুসলমান নেতারা যে যুক্তি উপস্থাপন করেন আইনসভায় ঐ যুক্তিকে আরো জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করা হয়। ১৯২০-এর দশকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে যখন ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা ভারতীয়দের হাতে বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে কি ধরনের প্রশাসন চালু হবে সে সম্বন্ধে অগ্রিম চিন্তাভাবনা থেকেই হিন্দু-মুসলমান প্রতিযোগিতায় নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হিন্দু নেতৃবর্গের ভবিষ্যৎ সদাচরণ সম্পর্কে মুসলমানদের সংশয়ী করে তোলে। আবার এই সময় 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' নামের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিস্তারলাভের ফলে মুসলমানরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই নতুন মানসিকতার উদ্ভবের দরুন সাম্প্রদায়িকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতি প্রবল হিন্দুবিরোধিতাকে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতি প্রথম বড় রকমের আঘাত বলে বিবেচনা করে, কারণ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে তাদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত হবে।[১০৫] কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হিন্দু স্বার্থান্বেষী মহলের বৈষয়িক উন্নতির পরিপন্থী বলেই বিবেচিত হয়। এই হিন্দু স্বার্থান্বেষী মহলের অন্যতম ছিলেন কলকাতার আইনজীবী ও সাংবাদিকগণ। নতুন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব বাংলার মামলাকারীদের কলকাতায় না গিয়ে ঢাকায় যাবার সম্ভাবনা থাকায় কলকাতার আইনজীবীদের আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কলকাতার মতো ঢাকা ও পূর্ব বাংলার প্রধান প্রধান শহরে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের পাঠক কমে গিয়ে এগুলোর আরও হ্রাস পাবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই কারণেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে।[১০৬]

---

১০৩. ঐ, 14.

১০৪. Shah, "Muslim Middle Class", 220-49.

১০৫. ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বেশ কয়েকটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। Humaira Momen, *Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Praja Party and the Elections of 1937*, (Dacca 1972), 15.

১০৬. Sir Robert Reed, "The Partition of Bengal", *The Eastern World*, London, February 1951, Vol. 5, No. 2,11.

বঙ্গভঙ্গ রহিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনকে মুসলমান রাজনীতিবিদরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার স্বার্থে ব্যবহার করেন। অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। আন্দোলনে যোগ দিতে মুসলমানদের বাধ্য করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় তা মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। এই আন্দোলনের একটি কৌশল হিসেবে 'স্বদেশী' ভাবধারাকে অনেকটা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চালানো হলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দানা বেঁধে উঠে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বদেশী ভাবাদর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করতে অস্বীকার করায় ময়মনসিংহ এবং সিলেট জেলায় হিন্দু জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের নানাভাবে নির্যাতন করেন। কিছু প্রজাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয় এবং কোন কোন প্রজাকে প্রচুর জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। অন্যদিকে সিলেটের শিলচরের মুসলমানরা স্বদেশী নেতৃবৃন্দের কঠোর আদেশ অমান্য করে নিজেদের ব্যবহারের জন্য বৃটেনের লিভারপুলের লবণ আমদানি করে। স্বদেশী নেতাদের পরামর্শে ছোট ছোট শহরগুলিতে হিন্দুরা মুসলমান জমিদারদের বয়কট করে। যেমন, বিপিনচন্দ্র পালকে অভ্যর্থনা করতে ব্যর্থতার কারণে এবং তাঁর বিপ্লবী সংস্থায় চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় কুমিল্লার আইনজীবী সমিতি দুই জন মুসলমান জমিদারকে বয়কট করে। উল্লেখ্য যে, বিপিনচন্দ্র পালের বিপ্লবী সংস্থায় প্রবেশের দ্বার মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।[১০৭] ১৯০৭ সালে স্বদেশী সমর্থকরা কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত নবাব সলিমুল্লাহর এক সভা পণ্ড করে এবং নবাবের ব্যক্তিগত সচিবকে মারাত্মকভাবে আহত করে। নবাবের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল এই যে, নবাব তাঁর অনুগামী মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে নিয়ে যান। বস্তুতপক্ষে খুব কমসংখ্যক মুসলমান স্বদেশীসমর্থক ছিলেন। এমনকি যেসকল মুসলমান বিদেশী পণ্য ও খেতাব বর্জন করে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট করার স্বদেশী কৌশলকে সমর্থন করেন নি। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজ বয়কটকে মুসলমান নেতারা শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির ঝুঁকি বলে বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে ফজলুল হকের একটি যুক্তি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের প্রস্তাব হিন্দুদের শিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হবে না, কারণ হিন্দু ছেলেমেয়েরা তাদের সুশিক্ষিত পিতামাতার কাছে ঘরেই পড়াশুনা চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এই বয়কট মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কারণ অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর বাবা-মা অশিক্ষিত বলে ঘরে বসে লেখাপড়া চালিয়ে নেবার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে।[১০৮]

---

১০৭. M. N. Das, *India Under Morley and Minto: Politics Behind Revolution and Reforms*, (London 1964), 43-44, 153; **মুজফ্‌ফর আহমদ**, ***আমার জীবন***, ৪৩২-৪৩৩।

১০৮. A. S. M. Abdur Rab, *A. K. Fazlul Huq: Life and Achievements*, (Lahore 1966), 55.

এক কথায় ১৯২০, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্র ছিল সংঘাতময়। ইউরোপে লুজান চুক্তি স্বাক্ষর এবং কামাল পাশা কর্তৃক খেলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করার ফলে খেলাফত আন্দোলন প্রত্যাহারের সাথে সাথে সে সময়কার হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্বপূর্ণ ঐক্য বিনষ্ট হয়, এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস আবার দেখা দেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে খান বাহাদুর নবাব মোশাররফ হোসেন বাংলায় সব সরকারি দপ্তরের শতকরা ৫০ ভাগ চাকুরিতে মুসলমান নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বাংলার আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১০৯] চিত্তরঞ্জন দাস বিলটি পাস না করার জন্য তাঁর মুসলমান অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, স্বরাজ যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জিত না হয়, তাহলে তিনি নিজেই আইনসভায় প্রস্তাব আনবেন শতকরা ৫০ ভাগ চাকুরিতে মুসলমান নিয়োগের জন্য। ঐ প্রস্তাবকে আইনে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করবেন বলেও তিনি তাদের আশ্বাস দেন।[১১০] চিত্তরঞ্জন দাসের মুসলমান অনুসারীরা তাঁর উপদেশ ও আশ্বাস মেনে নেন।

কিন্তু ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট তথা হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট এবং প্রাদেশিক আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের ঘোষণা কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় তাঁর মুসলমান অনুসারীরাও স্তম্ভিত এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর প্রস্তাবানুসারে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানাদিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য শতকরা ৬০ ভাগ আসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ আসনের ব্যবস্থা থাকতো এবং বাংলার সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি আসন সংরক্ষিত হতো।[১১১] হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁর প্রস্তাবকে হিন্দুস্বার্থের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। হিন্দু সাংবাদিকরাও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। দাস নিজেও স্বরাজ অর্জনের আগে মুসলমানদের দেয়া তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।[১১২] ফলে হিন্দু নেতাদের আশ্বাসের প্রতি মুসলমানদের অবিশ্বাস ঘনীভূত হয়।

বেঙ্গল প্যাক্টের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তীব্র প্রতিবাদ এবং স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক ১৯২৬ সালের ২২ মে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যানের কারণে স্বরাজ সমর্থক ক্ষুদ্র মুসলমান

---

১০৯. BLCD.,12 March 1924, BLCP., Vol. 14, No. 4, 58.

১১০. ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। BAR, 1920-21, Calcutta 1922, 3.

১১১. BAR, 1923-24, Calcutta 1925, 2.

১১২. ISCR, Vol. 8, 1930, 58; "Communal Dissensions", in Government of India in 1924-25, Calcutta, 1926; Shah Muhammad (ed.), *The Indian Muslims: A Documentary Record, 1900-1947*, Vol. 8, (New Delhi 1985), 73-75; Kenneth McPherson, *The Muslim Microcosm: Calcutta, 1918-36*, (Wiesbaden 1974), 78-79.

গোষ্ঠীটিরও মনোভাবের পরিবর্তন হয়। কোকানাডার কংগ্রেস অধিবেশনে দাসের প্যাক্ট প্রত্যাখ্যাত হবার সাথে সাথে স্বরাজ সমর্থক মুসলমান নেতাদের অধিকাংশই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে। তাঁরা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সিরাজগঞ্জে সেই সময় চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনটি তাই মুসলমানবর্জিত একটি হিন্দু সম্মেলনের নামান্তর ছিল।[১১৩] সিরাজীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবিই তুলে ধরে নি, কৃষক-স্বার্থের পরিপন্থী প্রচলিত আইনের সংস্কারের জন্যও তারা জোরালো দাবি উত্থাপন করে। সে সময় ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় সাহা-মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের তীব্র অসন্তোষের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১১৪]

মুসলমান রাজনীতিবিদরা অভিযোগ করেন যে, হিন্দু নেতারা সাম্প্রদায়িক ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করেছেন[১১৫], যেমন হিন্দু নেতারা মুসলমান জনগণকে সুশিক্ষিত করে তোলার কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে একে চালু রাখার সুপারিশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করলে আইনসভার হিন্দু সদস্যরা একযোগে এর বিরোধিতা করেন। হিন্দু প্রতিনিধিরা সংঘবদ্ধভাবে গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং মুসলমান প্রতিনিধিদের দ্বারা উত্থাপিত ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা বিলটির বিরোধিতা করেন। জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমান চাকুরীজীবীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু নেতারা চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমান প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসার জন্য জেদ ধরে। অপরদিকে হিন্দু জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে হিন্দু প্রতিনিধিরা প্রজাস্বার্থের পরিপন্থী জমিদারের অবৈধ সেলামি গ্রহণকে বৈধ করার জন্য মুসলমান প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯২৫ সালে বেঙ্গল টেন্যান্সি (সংশোধনী) বিলটি পাশ করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দের এসব গণবিরোধী ভূমিকাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে মুসলমান নেতারা অভিযোগ করেন যে, হিন্দু নেতারা মুখে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে তারা গরিব প্রজাদেরকে জমিদারের কাছে দাসখত লিখে দিতে বাধ্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। তারা অত্যাচারী ও চড়া হারে সুদখোর মহাজনদের পক্ষ অবলম্বন করে ১৯৪০ সালে মুসলমান নেতাদের উত্থাপিত মানি লেন্ডার বিল-এরও বিরোধিতা করেন।[১১৬]

---

১১৩. BAR., 1923-24, 6.

১১৪. BAR., 1923-24, 11.

১১৫. এই সংগঠনগুলোর সাথে জড়িত একটি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দল ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় সংগঠিত ভয়াবহ দাঙ্গার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। কলকাতা শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত আখড়ায় তারা লাঠি ও চাকু চালনায় প্রশিক্ষণ লাভ করে। Tanika Sarkar, "Communal Riots in Bengal", in Mushirul Hasan (ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India*, (New Delhi 1982), 291-92; McPherson, *Microcosm*, 89.

১১৬. Shah, "Muslim Middle Class, 314-54.

বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দু নেতৃবৃন্দের যুক্তি-তর্ককে খণ্ডন করে বিকল্প যুক্তি উত্থাপন করার পিছনে মুসলমান নেতাদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' স্বার্থ ভিন্ন প্রকৃতির এবং 'মুসলমান স্বার্থ' সাম্যবাদী ও প্রতিনিধিত্বশীল আর 'হিন্দু স্বার্থ' জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর সংরক্ষক বলে প্রমাণ করা।

১৯২০, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের রাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থ পৃথকভাবে চিহ্নিত করার প্রবণতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। মুসলমান নেতারা ব্যর্থ হয়েছেন সরকারি চাকুরিতে মুসলমান নিয়োগে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের উন্নতি ঘটাতে। মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু নেতাদের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে তাঁরা নিজেরাও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই ব্যর্থতার গ্লানি থেকে রেহাই পান নি মুসলমান নবাব শামসুল হুদা, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু প্রতিযোগীর কাছে হেরে যান। তেমনিভাবে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ফজলুর রহমানও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী এলাকা থেকে মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। ফজলুল হকের মতো জনপ্রিয় মুসলমান নেতাও কলকাতা পৌরসভার এক মিশ্র নির্বাচনে পরাজিত হন, তেমনি পরাজিত হন প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুর রসুল।

এই ব্যর্থতা তাদের মনে এমন বিশ্বাস জন্মায় যে, তাদের সমস্যার মূল কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থবুদ্ধি, যা প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। স্পষ্টতই এসব মুসলমান নেতার রাজনৈতিক কৌশল তখন তাঁদের স্বীয় স্বার্থকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য প্রযুক্ত হয়। স্বসম্প্রদায়ের পক্ষে জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরির অংশ আদায়, পৃথক নির্বাচন নিশ্চিত করা ও শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা তৎপর হন। কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ নয়। বাংলায় মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদ তাদের নেতাদের গলাবাজির ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নামান্তর মাত্র নয়। একটি বাস্তবধর্মী এবং মৌলিক মুসলমান আত্মপরিচিতিকে কেন্দ্র করেই এই বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়। যে চেতনাকে ঘিরে এই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় তা হলো 'সকল মুসলমানই সমান বা একরকম এবং সকল হিন্দুর চেয়ে আলাদা এবং বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানরা হলো একটি পৃথক গ্রুপ'। অতএব মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ ছিল দুটি—অভিজাত শ্রেণীর প্রতিযোগিতা এবং ধর্মীয় আত্মপরিচিতি। এই উভয়বিধ কারণ থেকেই প্রতীয়মান হয় কেন ১৯২০, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে বাংলার রাজনৈতিক বিষয়গুলি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। এইভাবে বাংলার একটি ধর্মসম্প্রদায় রাজনৈতিক আত্মপরিচয় লাভ করে এবং তা কালক্রমে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাজনৈতিক ইউনিটে রূপান্তরিত হবার দাবি তোলে।

স্বরূপ নির্ণয়

বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলমান রাজনীতিবিদরা ইসলামের সাম্যবাদী নীতি অনুসরণ করে এমন একটি সমাজচিত্র কল্পনা করেন, যেখানে ইস্পাহানী, সিদ্দিকী ও অন্যান্য অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদের স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে মৌলবি আবদুল লতিফ বিশ্বাসের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :

> বাংলার বা অন্য প্রদেশের মুসলমান ও অভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকার করে না। সেই কারণেই ইসলামে এমন নিয়ম করা হয়েছে যে একে অপরের সাথে ভাববিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ মুসলমানরা জামাতে নামাজ পড়বে, প্রতি সাত দিনে একবার জুমা পড়বে এবং অন্ততপক্ষে জীবনে একবার হজ্ব করার জন্য মক্কায় যাবে।[১১৭]

তুর্কী খেলাফত রক্ষার স্বার্থে মুসলমানদের সংহতি বজায় রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে কিছুকাল যাবৎ এধরনের মুসলমান আত্মপরিচয় স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। খেলাফত বিলুপ্ত হবার পর প্যান-ইসলামীরা তুর্কী প্রেসিডেন্ট কামাল পাশার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদে মুখর থাকেন। খেলাফতবিলুপ্তিকে ইসলামের এক বিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কেউ কেউ একে মুসলমান সংহতি বিপন্ন করার লক্ষ্যে বৃটেনের এক সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করেন। 'ইয়ং তুর্কীরা' বলশেভিকদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বর্ণিত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলমান বিশ্বকে প্রতারণা করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।[১১৮] এইভাবে বাঙালি মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্যান-ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভৌগোলিক (ভারতীয় বা বাঙালি) আত্মপরিচয়ের পরিবর্তে ধর্মীয় ও মুসলমানদের সমষ্টিগত আত্মপরিচয়কে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পায়। এধরনের আত্মপরিচয় বিশ্লেষণ অন্যান্য বাঙালি মুসলমানদেরকেও বিভ্রান্ত করে। তাদের কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় ভৌগোলিক আত্মপরিচয় প্রকাশে দ্বিধাবোধ করেন।[১১৯] এইভাবে বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয় অতিরাষ্ট্রিক ধারণায় প্রভাবিত মুসলমানদের সমষ্টিগত পরিচয় এবং ভৌগোলিক বা ভূখণ্ডভিত্তিক বাঙালি আত্মপরিচয়ের মধ্যে টানা-পড়েনের শিকার হয়।[১২০] এই সমস্যার সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দিক আগে আলোচিত হয়েছে।

মুসলমানদের সমষ্টিগত আত্মপরিচয়ের সমর্থকরা মনে করেন যে, ১৯২০-এর দশকে ভারতে 'জাতি' সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় মাত্র; তখন পর্যন্ত ভারত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, যারা স্বীয় সত্তা বজায় রেখে পাশাপাশি অবস্থান করে আসছিল।

---

১১৭. কলকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধনী) বিলের উপর তাঁর বক্তৃতা; BLC., 27 February 1939, BLCP., Vol. 54. No. 2, 34.

১১৮. BAR., 1923-24.

১১৯. এস. ওয়াজেদ আলী, "বাঙালী না মুসলমান", *ভারতবর্ষ*, আষাঢ় ১৩৫১।

১২০. Asim Roy, "Bengali Muslim and the Problem of Identity", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, December 1977, Vol. 22, No. 3, 198.

তাই এক শ্রেণীর ভারতীয় আত্মপরিচয়দানকারীদের অনেকেই "আমরা প্রথমে বাঙালি এবং পরে হিন্দু বা মুসলমান" এই রাজনৈতিক ফরমুলাটি গ্রহণ করেন নি।[১২১] তাঁদের যুক্তি হলো, মুসলমান ও বাঙালি হওয়ার মধ্যে কোন সংঘাত নেই অর্থাৎ মুসলমান ও বাঙালি পরিচয় এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুসলমান বাঙালি হতে পারে এবং ইসলাম দেশেপ্রেমের পরিপন্থী নয়।[১২২] তাঁরা আরো যুক্তি দেখান যে, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক স্বার্থোন্নতির সঠিক প্রয়াস চালানোর ফলে জাতির স্বার্থের কোন ক্ষতি তো হয়ই না, বরং তা জাতীয়তার জন্য মঙ্গলজনক হয়।[১২৩] ধর্মীয় আত্মপরিচয় ও ভৌগোলিক আত্মপরিচয়ের মধ্যে কোন সংঘাত নেই বলে সৈয়দ বদরুদ্দোজা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন :

> আমরা যে ধর্ম পালন করি তার কারণে আমরা মুসলমান, আমরা যে ভূখণ্ডে বাস করি তার কারণে আমরা ভারতীয়, যে প্রদেশে আমাদের জন্ম হয়েছে তার কারণে আমরা বাঙালি…ইসলাম জাতীয় বা দেশপ্রেমের পরিপন্থী নয়; তা মানবজীবনে স্বাধীনতা ও মুক্তির মহৎ কামনা ও অন্যান্য অকৃত্রিম আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী নয়।[১২৪]

এই মতের অনুসারীরা মনে করেন যে, মুসলমানের ধর্মই তাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে।[১২৫] অতএব বাঙালি পরিচয় দিতে যদি কখনো কোন মুসলমান দ্বিধাবোধ করে থাকে, তাকে মুসলমানদের ধর্মের দোষ বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না, দোষটা খুঁজতে হবে হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের (কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বৃটিশদেরও) 'বাঙালি' বলতে হিন্দু সমাজকে এবং 'জাতীয় উন্নতি' বলতে হিন্দু সমাজের উন্নতিকে বোঝাবার প্রবণতার মধ্যেই।[১২৬] এই বিভ্রান্তির নজির শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও দেখা যায়। যেমন, তিনি 'বাঙালি' অর্থাৎ হিন্দু ও 'মুসলমানদের' মধ্যে ফুটবল খেলার বর্ণনা দেন।[১২৭] আত্মপরিচয়ের এ ধারণার পাশাপাশি অপর একটি ভিন্ন প্রকৃতির ধারণা বিদ্যমান ছিল স্বল্পসংখ্যক প্রতিভাবান মুসলমান চিন্তাবিদের মধ্যে। বাংলার মুসলমানদের আত্মপরিচয়কে তাঁরা 'বাঙালি মুসলমান' বলে আখ্যায়িত করেন। বাংলা এবং বাঙালি মুসলমানদের প্রতি তাঁরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং বাংলার বাইরের মুসলিম জগতের প্রতি তাঁদের আগ্রহ

---

১২১. "Nationalism Vs. Communalism", *Mussalman*, 5 March 1925, editorial.

১২২. মোঃ আবদুল জব্বার, "বাঙলার মুসলমান", *মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন ১৩৫১, "চিন্তাধারা", ১৫০-১৫১।

১২৩. "Dr. Kichlew's Advice to Muslim Young Men", *Mussalman*, 21 May 1926, editorial.

১২৪. Speech of Sayed Badruddoza, Bengal Legislative Assembly Debates (henceforth BLAD.), 2 April 1942, *Bengal Legislative Assembly Proceedings* (henceforth BLAP.), April 1942, 254.

১২৫. Speech of Maulvi Sayed Majed Bakhah, BLCD., 20 August 1930., BLCP., Vol. 35, 567.

১২৬. মোঃ আবদুল জব্বার, "বাঙলার মুসলমান", ১৫৬।

১২৭. শরৎচন্দ্র, *শ্রীকান্ত*, ১ম খণ্ড।

তেমন ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁরা প্রায়ই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেই থাকতেন।[১২৮] বাঙালি ও অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যকার সাংস্কৃতিক পার্থক্যই ছিল এই বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিতে চমৎকার ভাষায় এই সাংস্কৃতিক পার্থক্য তুলে ধরেন :

> ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এক জাত নয়, তাদের সংস্কৃতিও এক নয়...কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি এক একটা আস্ত জাত ? ... ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ...এই জন্যই পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাতি থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।[১২৯]

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) মনে করেন যে, জন্মের অধিকারে বাংলার মুসলমানরা প্রথমে মানুষ, তারপর বাঙালি মুসলমান। তাঁর মতে, দেশের স্বার্থ ও সময়ের দাবি অগ্রাহ্য করে কারো প্রথমে মুসলমান হবার প্রয়োজন নেই এবং মুসলমান প্রমাণ করার জন্য কারো আরবভূমিতে যাবারও প্রয়োজন নেই। বাংলার জীর্ণ কুটিরে নিজের আত্মীয়-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকেও মুসলমান হওয়া সম্ভব।[১৩০]

কিন্তু মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ জাতীয়তাবাদকে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতো, যদিও অনাগত দিনে বাংলা বা ভারতে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের এক সঙ্গে বসবাস করবার অপরিহার্যতার কথা তারা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নি। সহ-অবস্থান সত্ত্বেও অনেক মুসলমানই মনে করতো যে এদেশে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণে তারা যে বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তা তাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।[১৩১] সেজন্যেই তারা মুসলমান ও ভারতীয় বাঙালি এই উভয় পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।[১৩২] তাদের দাবি ছিল, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখেই যেন ভারতীয় রাজনীতি বিবর্তিত হয়। এদের মতে, "আমরা আগে ভারতীয়, পরে হিন্দু বা মুসলমান"—এই বিশেষ তত্ত্বটি সকল সম্প্রদায়ের, বিশেষকরে মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উপযোগী নয়।[১৩৩] এইভাবে ১৯২০, ১৯৩০ এবং' ১৯৪০-এর দশকে ক্রমে 'মুসলমান' আত্মপরিচয় 'বাঙালি' আত্মপরিচয়ের চেয়ে অধিক প্রাধান্য পায়।

---

১২৮. BAR., 1928-29, 16.

১২৯. আবুল মনসুর আহমদ, মূল সভাপতির অভিভাষণ, *পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি সম্মেলনের কার্যবিবরণী,* ১৭তম বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১, ৪৩৯।

১৩০. ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ,* ৩৫।

১৩১. Khan Bahadur Azizul Huq's speech, BLCD., 14 August 1930, BLCP., Vol. 35, 294.

১৩২. "Muslims and the Congress", *Mussalman*, 17 December 1926, editorial.

১৩৩. Resolution for 50 percent appointments of qualified Muslims in government posts moved by Maulvi Abdul Quader, BLCD., 8 July 1926, BLCP., 21, 1926, 88.

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী বাংলার অখণ্ডত্ব বজায় রাখার জন্য তৎপর হন। কিন্তু সেই প্রয়াসের সমর্থনে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও জনতা ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ তখনো ঘটে নি।[১৩৪] ফলে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলার পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতীয় পশ্চিম বাংলায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালিরা নিজেদের পাকিস্তানী বলে পরিচিত করে। এইভাবে জীবনযাপনের মুসলমানী প্রথার উপর ভিত্তি করে একটি জাতির জন্ম হয়।

৩. বাঙালি আত্মপরিচয়ের পুনরাবির্ভাব

১৯৪৭ সালে বাংলার দ্বিতীয় বিভক্তির কারণে হিন্দু জমিদার ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা ভারতে পাড়ি দেয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে 'ক্ষমতার শূন্যতা' সৃষ্টি হয়।[১৩৫] অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমিক স্তরে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় বাঙালিরা তার অনেকটাই পূর্ণ করতে সমর্থ হলেও উচ্চস্তরের শূন্যস্থানে অবাঙালি মুসলমানরাই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান শরণার্থী হিসেবে লাভ করে গুজরাট, বোম্বে প্রভৃতি স্থান থেকে আগত মেমন, বোহরা ও খোজা সম্প্রদায়ের ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের, যারা পাকিস্তানের করাচীতে পুনর্বাসিত হয়। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা গৃহীত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারশ্রেণী তাদের আগের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বহাল থাকে। পাকিস্তানের আমলা ও সেনাবাহিনী অনেকটাই গঠিত হয় অবাঙালিদের নিয়ে। ফলে আমলা ও সেনাবাহিনীর চাকুরিতে নিয়োগের সুযোগ থেকে বাঙালিরা বঞ্চিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলি এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় সে প্রদেশ শিল্পায়িত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থেই কিছু শিল্প-কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করে। সেসব শিল্প-কারখানায় পশ্চিম পাকিস্তানী ম্যানেজার নিয়োগ করার ফলে বাঙালি শ্রমিকদের সাথে তাদের একটা জাতিগোষ্ঠীগত বিদ্বেষের সূত্রপাত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলারা এইসব প্রতিষ্ঠানে সস্তায় স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করে। এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পাচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।[১৩৬]

পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়। এই প্রয়াস সূচিত হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। এই

---

১৩৪. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-47*, (Dhaka 1987), 273, 345-46.

১৩৫. Mukherjee, " Background of Bangladesh," 407, 414.

১৩৬. Feroz Ahmed, "The Structural Matrix of the Economic Struggle in Bangladesh" in Gough and Sharma (ed.), *Imperialism*, 420-428.

সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে পরিষদের সদস্যদেরকে ইংরেজি বা উর্দু ভাষায় পরিষদে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে হবে। পরিষদে বিতর্কের সময় উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্যের মাধ্যমে। ধীরেন্দ্রনাথ কেবল পরিষদের বাঙালি সদস্যদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেন নি, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬.৪০ শতাংশ) নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বলে ঘোষণার জন্যও বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, উর্দু ছিল পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৩.৩ শতাংশের মাতৃভাষা। কিন্তু বাঙালিদের উক্ত দাবির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করে ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-জনতা 'না না' বলে চিৎকার করে জিন্নাহর ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়। কারণ, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নীতি কেবল বাঙালির পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয় নি, তাদেরকে অতিরিক্ত অর্থব্যয় ও অযথা হয়রানির দিকেও ঠেলে দেয়। বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ফলে মাতৃভাষার অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে উর্দু শিক্ষার জন্য বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে তাদের অভিভাবককে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক অভিভাবকের পক্ষেই এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। ফলে সরকারি চাকুরিতে বাঙালি নিয়োগের সুযোগ কমে যায়। এসব অসুবিধার কথা বিবেচনা না করেই তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে বাংলাদেশে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন কিছু সংগ্রামী তরুণ। এভাবে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের ভারত প্রত্যাবর্তনের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মাঝে বিদ্যমান বিষফোঁড়াটি যখন অপসারিত হলো, তখন মাতৃভাষা আন্দোলন তাদের পুনরায় একত্রিত হবার সুযোগ এনে দিল। বাঙালি স্বার্থবিরোধী পাকিস্তানী শাসন সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে।[১৩৭]

এরপর ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাকিস্তানের গণপরিষদ উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করলেও পশ্চিম বাংলা থেকে বাংলা সাহিত্যের বইপত্র আমদানির

---

১৩৭. Golam Morshed. "Cultural Identity of former East Pakistan and Conflicting State Policies", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* (JIBS), 3 (1978), 65-66; S. A. Akanda, "The National Language Issue: Potent Force for Transferring East Pakistani Regionalism into Bengali Nationalism," JIBS., 1 (1976), 4-13.

উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য লেখকের প্রতি সরকারিভাবে নিন্দাজ্ঞাপনের নীতি অবলম্বনের ফলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিক্ষুব্ধ হয়।[১৩৮] বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী শাসকদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাঙালি শোষণ ও দলননীতি গ্রহণের ফলে পাকিস্তানী মুসলমানদের সাথে এক জাতীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের আঞ্চলিক চিন্তা-চেতনা বাঙালি জাতীয় চেতনায় রূপান্তরিত হয়। বাঙালিরা পাকিস্তানী আত্মপরিচয় বর্জন করে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনায় তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো প্রাক-বৃটিশ যুগে বাঙালি মানসে পৃথক জাতিত্ববোধের উদ্ভব। এ সম্পর্কে আলোচনায় যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, হিন্দু সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব, সুফিদের ইসলামের উদারনীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মুসলমান শাসকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের এক মিশ্রিত সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। কতগুলি প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের মধ্যে এই মিশ্রণ ধরা পড়ে । যেমন, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কিছু লোকের পীরপূজা; জোলা, তেলী ও জেলের মতো কিছু পেশায় নিয়োজিত হওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে মুসলমান জাতীয়তাবাদের বিকাশ। এ বিষয়ে যুক্তি হলো, উনিশ শতকের শেষদিক থেকে মুসলমান 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' বেশ কিছু ব্যাপারে হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সাহিত্য, শিক্ষা, চাকুরি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সুবিধা লাভে মুসলমানদের ব্যর্থতা এবং উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংহতি এবং হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দ্বন্দ্ব মুসলমানদের বাঙালি আত্মপরিচয়কে আড়াল করে এবং তাদের মুসলমান জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে 'দ্বি জাতিতত্ত্বের' উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিতীয়বারের মতো বিভক্ত হয়। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে বিভাগোত্তর (১৯৪৭-এর পরবর্তী) পূর্ব বাংলা বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্বিকাশ। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, বিভাগোত্তরকালে পূর্ব বাংলা থেকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের ভারতে প্রত্যাবর্তনের ফলে পূর্ব বাংলায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে একটা বড় বাধা অপসারিত হয়। পাকিস্তানী শাসকদের বাঙালিবিরোধী নীতি সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দিক থেকে বাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ আরো সুগম করে। অবশেষে 'বাঙালি' আত্মপরিচয় 'মুসলমান' আত্মপরিচয়কে ছাপিয়ে প্রবল হয়ে উঠে।

---

১৩৮. Morshed, "Cultural Identity", 67-69.

নির্ঘণ্ট